সাপ্তাহিক
সুমতী

আয়ুবশাহীর নাভিশ্বাস
সারা পূর্ব পাকিস্তানে তীব্র গণ-আন্দোলন

আয়ুবের উদ্দেশ্যে এয়ার মার্শাল আসগর খাঁ ও
মৌলানা ভাসানীর কঠোর সতর্কবাণী

সংখ্যা, বৃহস্পতিবার, ৪ঠা পৌষ, ১৩৭৫ বঙ্গাব্দ] OLDEST WEEKLY OF NORTH INDIA [73rd year, No. 26, 19th Dec. 1968

Cuk-W05263-24-27/457

সূচীপত্র

বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা
সম্পাদকীয়		১৬০৩
আজকের মানুষ		১৬০৪
জীবন-স্মৃতি	— ত্রৈলোক্যনাথ চক্রবর্তী	১৬০৫
ধর্মদর্শন		১৬০৯
নিকট-দূরে	— কৌশিক বসু	১৬১০
ভারতদর্শন		১৬১৫
আন্তর্জাতিক		১৬১৮
সপ্তাহের বোঝা	— কৃত্তিবাস ওঝা	১৬২১
আজকের বিজ্ঞান	— ডঃ বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য	১৬২৩
ইয়োরোপা	— হিরণ্ময় ভট্টাচার্য	১৬২৫
তিস্তার বন্যা (কবিতা)	— মুকুলেশ সান্যাল	১৬২৬
পথ কে রুখবে? (ধারাবাহিক উপন্যাস)	— মনোজ বসু	১৬২৭

যে কোন
গয়না
আর
আসল
গ্রহরত্ন
কেনার
দক্ষিণ কোলকাতায়
নামকরা প্রতিষ্ঠান

ফোন ঃ ২৬-৫৮৬৭

সন অ্যাণ্ড গ্র্যাণ্ডসন্স অব লেট
এস. বি. সরকার

24

এ. সরকার এণ্ড সন্স
৭১।১এ রাসবিহারী এভিন্যু কলিকাতা-২৯

সূচীপত্র

বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা
অশ্লীলতার বিরুদ্ধে (প্রবন্ধ)	— সমীর মুখোপাধ্যায়	১৬৩০
গ্রাম-গ্রামান্তরে	— সমর চট্টোপাধ্যায়	১৬৩৩
রবীন্দ্রনাথ ও সুভাষচন্দ্র (ধারাবাহিক প্রবন্ধ)	— শঙ্করীপ্রসাদ বসু	১৬৩৫
বিংশ শতাব্দীর মার্কিন সাহিত্য (প্রবন্ধ)	— অমীক বন্দ্যোপাধ্যায়	১৬৩৯
ফুচিকের দেশে	— গীতা বন্দ্যোপাধ্যায়	১৬৪২
দহন (গল্প)	— রজত রায়চৌধুরী	১৬৪৪
নেপথ্য নাটক (কবিতা)	— উল্লুখড়	১৬৪৬
সেই লাল ত্রিকোণটি! (প্রবন্ধ)	— ধীরানন্দ রায়	১৬৪৭
প্রহরী (কবিতা)	— শক্তিব্রত ঘোষ	১৬৪৮
রঙ্গমঞ্চ ওদেশে এবং এদেশে	— শিলাসি	১৬৪৯
চলচ্চিত্র		১৬৫১
পাঠকমন		১৬৫৫
খেলাধুলা	— শান্তিপ্রিয়	১৬৬০

আমাদের বই পাঠককে তৃপ্তি দেয় ঃ পাঠাগারের গৌরব বৃদ্ধি করে.

৭ই কার্তিকের বই

সতীন্দ্রমোহন চট্টোপাধ্যায়ের
বিজ্ঞানভিত্তিক গ্রন্থ
বিজ্ঞান-ধর্ম ৪·৫০

৭ই অগ্রহায়ণের বই

প্রেমাঙ্কুর আতর্থীর
অদ্বিতীয় উপন্যাস
মহাস্থবির জাতক (১ম খণ্ড) ৬·০০

উপহারে অনবদ্য ঃ

গজেন্দ্রকুমার মিত্রের উপন্যাস
শুভ-বিবাহ কথা ৩·০০
স্বরাজ বন্দ্যোপাধ্যায়ের উপন্যাস
যখন তরু ৭·০০
'বনফুল'-এর উপন্যাস
নবদিগন্ত ১০·০০
বোধিসত্ত্ব মৈত্রেয়'র
সেই প্রেম আস্বাদন ৩·০০
অগ্নিমিত্রের
নাবিক ও নক্ষত্র ৬·০০
সুনীলকুমার নাগ-এর
মনের আলোয় দেখা ৫·০০
দীপক চৌধুরীর
ললিতা প্রসঙ্গ ৮·০০

মূল্যবান বিবিধ গ্রন্থ ঃ

সেযুগের মননশীল লেখক
অক্ষয়চন্দ্র সরকারের
অক্ষয় সাহিত্য সম্ভার
১ম খণ্ড ১০·০০ ঃ ২য় খণ্ড ১৩·০০
প্রখ্যাত সাহিত্যিক ও সাংবাদিক
হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ-এর গবেষণামূলক গ্রন্থ
বঙ্কিমচন্দ্র ৫·০০
কানাই সামন্ত'র
রবীন্দ্র প্রতিভা ১০·০০
মোহনলাল গঙ্গোপাধ্যায়ের
দক্ষিণের বারান্দা ৪·৭৫
নটসূর্য অহীন্দ্র চৌধুরীর
নিজেরে হারায়ে খুঁজি ২০·০০
প্রখ্যাত বিপ্লবী
ডঃ যাদুগোপাল মুখোপাধ্যায়ের
বিপ্লবী জীবনের স্মৃতি ১২·০০
প্রখ্যাত কার্টুনিস্ট
চন্ডী লাহিড়ীর
বিদেশীদের চোখে বাংলা ৫·২৫

'পদ্মভূষণ' উপাধিপ্রাপ্ত
গোপীনাথ কবিরাজ মহোদয়ের
সাহিত্য চিন্তা ৪·০০
শ্রীনরেন্দ্রনাথ বাগল জ্যোতিঃশাস্ত্রী
ভারতে জ্যোতিষচর্চা ও কোষ্ঠীবিচারের সূত্রাবলী ৩০·০০
পরিবর্ধিত ও পরিমার্জিত দ্বিতীয় সংস্করণ ঃ
গণিত-জ্যোতিষ, সংহিতা-জ্যোতিষ তন্ত্র ও ষটচক্র, ষড়বর্গ, দশপ্রাণ, জন্ম ও জন্মনিয়ন্ত্রণে জ্যোতির্বিজ্ঞানের প্রয়োগ, নক্ষত্র, জাতকের দ্বারা জাতকের বয়সানুযায়ী ঘটনাবলী, ফলিত জ্যোতিষের গুরুত্বপূর্ণ সূত্রসমূহ, শ্রেষ্ঠ ফলিত জ্যোতিষ গ্রন্থ 'সর্বার্থচিন্তামণি' এ গ্রন্থের দ্বাদশ ভাববিচারে সম্পাদনাসহ সংযোজিত হয়েছে। জ্যোতিষ শিক্ষার্থীদের সুবিধার জন্য কোষ্ঠীবিচার, ভাবস্ফুট ও দশাগণনা প্রভৃতির নানাবিধ সহজ সারণী (Table) এই গ্রন্থে আছে।

গ্রাম ঃ কালচার (বি) ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েটেড পাবলিশিং কোং প্রাইভেট লিঃ ফোন ঃ ৩৪-২৬৪১
৯৩, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিকাতা-৭

CALCUTTA UNIVERSITY CENTRAL LIBRARY

৭৩ বর্ষ ঃ ২৬শ সংখ্যা মূল্য ঃ ৩০ পয়সা বাংলা ভাষায় দ্বিতীয় সর্বাধিক প্রচারিত সাপ্তাহিক পত্রিকা PRICE : 30 Paise
বৃহস্পতিবার, ৪ঠা পৌষ, ১৩৭৫ বঙ্গাব্দ Thursday, 19th December, 1968

বিকৃত রুচির বিরুদ্ধে

আজকাল কথায় কথায় দেশের যুব-সমাজের প্রতি দোষারোপ করা হয় এবং তাদের অধঃপতনের কথা লিখতেও কেউ কেউ বিশেষ নৈপুণ্য দেখান। সবচেয়ে বিস্ময়ের কথা, এই সব লেখাকে সাহিত্যের ট্রেড মার্ক দিয়ে বাজারে ছাড়া হয়। আর যাঁরা ঐ সব ছাড়েন, তাঁরা দেশ-প্রেমের আদর্শ সাহিত্যের তত্ত্ব নিয়ে বুলি কপচালেও আসলে তাঁদের উদ্দেশ্য অর্থ উপার্জন। তাঁদের দেখাদেখি, দুর্নীতিপরায়ণ ব্যবসায়ীরাও অগ্রসর হন। এই শহরের যে কোনো বুক স্টলে চোখ রাখলেই তার বহু প্রমাণ পাওয়া যায়।

এই যেখানে পরিস্থিতি, সেখানে যুবসমাজকে দোষ দেওয়া নিরর্থক। বরং বলা যায়, বিকৃত রুচির লেখার দ্বারা এক শ্রেণীর লেখক যুবসমাজকে আকৃষ্ট করতে চায়—যাতে ঐ সব যুবকেরা বিপ্লব-টিপ্লব না ঘটিয়ে বসে।

বিকৃত রুচির লেখকদের উদ্দেশ্য কী—এখন আর তা কারো অজানা নয়। অন্তত সম্প্রতি তার প্রমাণও পাওয়া গেছে।

ইতিপূর্বে বিকৃত রুচির লেখার বিরুদ্ধে বহুবার আমরা বলেছি। বাংলা-ভাষাভাষী পাঠকরা আমাদের প্রতি সমর্থন জানিয়েছেন। আবার যে সমাজের লোকদের বিকৃত রুচির লেখকরা অধঃপতনে নিয়ে যাবার ষড়যন্ত্র করে—সেই সমাজেরই কিছু ব্যক্তি জনসমক্ষে মোকাবিলা করে দিয়েছেন যে, বাংলা দেশে এক শ্রেণীর নীচ প্রকৃতির লোক কী ধরনের হীন কাজে লিপ্ত রয়েছেন। বিশেষভাবে সেই লেখকের ব্যাপারে আজ সতর্ক হওয়া দরকার, একদা যিনি বিপ্লবের জয়ধ্বজা তুলে সাহিত্যের ক্ষেত্রে অবতীর্ণ হয়েছিলেন। আসলে উনি জনশত্রু। তাঁর লেখাতেই তার প্রমাণ রয়েছে। বিকৃত রুচির বেআইনী পুস্তিকা-লেখকদের সঙ্গে ইনিও তুলনীয়। অবশ্য ব্যবসা যাঁরা করেন, তাঁদের কাছে তাঁর বাজারদর আরো চড়বে। এবং একবার আইনের কবলে পতিত হওয়ার পর বৃদ্ধ দলপতি সহ তিনি অন্য পথে পরিক্রমা সুরু করবেন। কিন্তু বাংলা দেশের জাগ্রত পাঠকদের কর্তব্য এই ধরনের লেখা ও লেখকের প্রতি সর্বদা হুঁসিয়ার থাকা।

বিকৃত রুচির লেখার বিরুদ্ধে আমাদের ঘৃণা ও অভিযোগ জানানোর সঙ্গে সঙ্গে আমরা জনসাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণ করি আধো আলো-আঁধারী অলি-গলির প্রতি। কারণ একবার ভালোভাবে লক্ষ্য করলেই দেখা যাবে কী ধরনের বিকৃত রুচির ছবি ও বই প্রকাশ্যেই দেওয়ালে টাঙিয়ে রেখে বিক্রি করা হচ্ছে। অথচ এ সব ব্যাপার পুলিশের চোখে পড়ে না, দৃষ্টি আকর্ষণ করলে গোয়েন্দা বিভাগ প্রকাশক ও মুদ্রককে খুঁজে বের করতে পারে না।

ইংরেজি নববর্ষ আগত। এই বর্ষকে উপলক্ষ করে যে সব ক্যালেন্ডার প্রকাশিত হয়, তাদের একাংশ কী ধরনের ছবি ধারণ করে পার্কগুলির লোহার রেলিঙে শোভা পায়—এটাও কারো অজানা নয়। এই সব ছবি রাস্তার ধারেই শোভা পায় এবং কোনো ভদ্রব্যক্তি সপরিবারে যখন সেই রাস্তা পার হন—তখন তাঁর অবস্থা কী হয়, তাও বলার অপেক্ষা রাখে না। এই ধরনের ছবির দ্বারা দেশের সরল লোকগুলিকে প্রলোভিত করা হয়। আমরা সাধারণ শিক্ষা দিতে যখন অসমর্থ, তখন এই ধরনের বিকৃত রুচির সৃষ্টির দ্বারা সমাজের আর এক শ্রেণী যে লাভবান হয় তা বলাই বাহুল্য।

আরো বিপজ্জনক অবস্থার সৃষ্টি করছে—এক ধরনের চলচ্চিত্র। সরকারের আইনে গঠিত সেন্সর বোর্ড কিভাবে যে বেআইনী চলচ্চিত্রগুলি জনসাধারণের মধ্যে প্রদর্শনের ছাড়পত্র দেন, তা আমাদের কাছে দুর্বোধ্য। সাপ্তাহিক বসুমতীর চলচ্চিত্র বিভাগে এই সম্পর্কে ইতিপূর্বে বিস্তারিত আলোচনা ও সমালোচনা হয়েছে, 'নাইট' নামধারী ছবিগুলি প্রদর্শন করার বিরুদ্ধে ক্ষোভ জানানো হয়েছে।

বস্তুত এই দেশের সর্বত্র বিকৃত রুচির প্রসার ঘটাবার জন্য এক শ্রেণীর লোক উঠে-পড়ে লেগেছেন। অথচ আমাদের সরকার আদর্শের বাঁধা বুলি বললেও এদের বিরুদ্ধে কিছু করতে পারেন নি। কেন্দ্রীয় সরকার তথা পশ্চিম-বঙ্গের শিক্ষাদপ্তর এ ব্যাপারে নিশ্চুপ! কেন্দ্রীয় সরকারের সমাজকল্যাণদপ্তর সমাজের কল্যাণের কথা বললেও আজ পর্যন্ত বিকৃত রুচির লেখা বা ঐ জাতীয় ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে কিছু করেন নি। যা হোক এখন আইন জনসাধারণের পক্ষে থাকায় আমরা মনে করি, বিকৃত রুচির লেখাগুলি জঞ্জালের মতো দূরে সরিয়ে দেওয়া সম্ভব হবে। তার সঙ্গে এটাও পরিষ্কার হয়ে যাবে যে, সমাজের শত্রু কারা, আর মিত্রই বা কে।

সম্পাদকীয়

আজকের মানুষ

একটার পর একটা দুর্ভেদ্য দুর্গের যখন পতন ঘটে, তখন সেনাপতির মনের ভাবগতি কী হয় ফিল্ডমার্শাল আয়ুব খাঁর তা বিলক্ষণ জানা আছে। কিন্তু একবার ভাঙন যখন সুরু হয় তাকে রোধ করা প্রায় দুঃসাধ্য, সে যেন নদীর মতো আপন ধর্মেই ভাঙতে ভাঙতে এগিয়ে চলে। সে-নদীতে প্লাবন এলে বা বান ডাকলে হাজার স্লুইস গেটের ক্ষমতা নেই তার জল বাঁধ দিয়ে ধরে রাখার। পাকিস্তানের রাজনীতিতে এখন সেই প্লাবন এসেছে, আয়ুব-বিরোধীরা বাঁধ-ভাঙা জলের মতো দিনকে-দিন স্ফীত হচ্ছে। বিরোধী শিবিরে জেনারেল আজম খাঁর যোগদানের পর মনে হচ্ছে প্রেসিডেন্ট আয়ুব বেগবতী বন্যার তোড়ের মুখে দাঁড়িয়েছেন। খোদায় জানে আয়ুব শেষরক্ষা করতে পারবেন কি-না।

অথচ আজম বলতে আয়ুর অজ্ঞান ছিলেন একদিন। উঠতে-বসতে, চলতে-ফিরতে আজম আছেন আয়ুবের পাশে। বস্তুত আয়ুব সেদিন আজমের কাঁধে পা রেখেই ক্ষমতার মগডালে চড়তে পেরে-ছিলেন। ইস্কান্দার মির্জাকে ক্ষমতার গদি থেকে অপসারণ করার চক্রান্তের তিনি ছিলেন অন্যতম নায়ক। এ-পরিকল্পনাকে ত্বরান্বিত করতেও আয়ুবের একান্ত প্রয়োজন হয়েছিলো আজমের শক্ত হাতের। সেদিন পাকিস্তানের প্রধান সামরিক আইন অফিসার যে আদেশপত্রবলে ইস্কান্দারকে ক্ষমতাচ্যুত করেছিলেন, সে পত্রখানি বয়ে নিয়ে যেতে সাহসী হয়েছিলেন একমাত্র আজম খাঁ-ই।

বস্তুত আয়ুব খাঁ সেদিন আজম খাঁকে তাঁর অনুগত ভৃত্যের মতোই ব্যবহার করেছিলেন, আজমও প্রভুসেবা করে নিজেকে ধন্য মনে করতেন। সেদিন আজমের ওপর আয়ুবের অটুট আস্থাও ছিলো, তাই যে নোংরা কাজে নিজে হাত দিলে হাত এবং ক্যারিয়ার মলিন হবার আশংকা থাকতো, সে কাজ অম্লানবদনে আয়ুব আজমের ঘাড়েই চাপিয়ে দিয়ে নিশ্চিন্ত থাকতেন।

ডিক্টেটররা জানেন রাইফেলই তাঁর শক্তির উৎস। মূক জনতা যাতে কখনো মুখর না হয়ে উঠতে পারে তার জন্যে হাতের কাছে রাইফেলটি তৈরি রাখতে হবে আর রক্তচক্ষু দেখাতে হবে তাদের। তাঁরা আরো জানেন, গণসমর্থন তাঁরা কোনোদিনই পাবেন না, স্বয়ং ডিক্টেটর তো ননই, তাঁর পারিষদবর্গের কারো পক্ষেও তা সম্ভব নয়। আয়ুবশাহীর পেছনেও গণসমর্থন কিছু ছিলো না, যদিও গোষ্ঠীসমর্থনের দাবি তিনি অবশ্যই করতে পারেন, কিন্তু জনতার হাততালি? নৈব নৈব চ। রেনেভোলেন্ট ডেস্পটিজম-এর যুগ দুনিয়া কবে ফেলে এসেছে!

তাই সে-অঘটন যখন ঘটলো, তখন

আজম খাঁ

আয়ুব মুহূর্ত বিলম্ব করলেন না, সঙ্গে সঙ্গে ব্যবস্থা করে ফেললেন। ব্যাপারটা আর কিছুই নয়। অমূল্য সহযোগিতার পুরস্কারস্বরূপ প্রেসিডেন্ট আয়ুব খাঁ দোসর আজম খাঁকে মন্ত্রিত্ব দিয়েছিলেন: উদ্বাস্তু পুনর্বাসন দপ্তর। অনুন্নত দেশের ক্যাবিনেটে খাদ্যদপ্তরের মতো পুনর্বাসন দপ্তরের ভার নেয়ার অর্থ দুয়ারে মঙ্গল-ঘট দিয়ে দুশ্চিন্তাকে আমন্ত্রণ জানানো। হাজার হাজার উদ্বাস্তুর হাজার সমস্যা এবং হাজারো কিসিমের। এ দায়িত্ব সন্তোষজনকভাবে পালন করা প্রায় দুঃসাধ্য ব্যাপার। আয়ুব বোধ হয় জেনেশুনেই ছিলেন তাই এ কাজের ভারে আজম খাঁ হিমসিম খান, সমস্যার সমুদ্রে ডিঙি হাবুডুবু খান। কিন্তু কাজে ঢিলেমি ঠিক তার উল্টো। উদ্বাস্তু পুনর্বাসন সমস্যাটি তিনি আন্তরিকতা দিয়ে সমাধানে সচেষ্ট হলেন, উদ্বাস্তুরা পুনর্বাসনমন্ত্রীর মধ্যে কোমল হৃদয়ের স্পর্শ পেলো। কিন্তু এতটা 'বাড়াবাড়ি' আয়ুবের মনঃপূত ছিলো না। জনসাধারণ মন্ত্রীকে ভয়ে শ্রদ্ধা করুক, ঠিক আছে; কিন্তু মন্ত্রীর আবার উপরি-পাওনা হয় কী করে? জনপ্রিয়তা লাভ করেন তিনি কোন্ হিসেবে?

স্পষ্টতই আয়ুব চটলেন আজমের ওপর। কিন্তু চতুর ডিক্টেটর অধস্তন আজমকে তা জানতে দিলেন না, কেবল তাঁর কর্মক্ষেত্র দিলেন পাল্টে। আজম খাঁকে সুদূর পূর্ব পাকিস্তানের গভর্নর করে সরিয়ে দেওয়া হলো। নিয়ে যান দেখি তাঁর ভক্তদের তিনি সেখানে। পূর্ব পাকিস্তানের বাঙালীদের আয়ুব ভালো করেই জানেন। তিনি ধরেই নিয়েছিলেন এই পাঠান শাসকের প্রাণ পূর্ব বাংলার তরুণ দেশপ্রেমিকরা দুদিনেই ওষ্ঠাগত করে ছাড়বে। কিন্তু এখানেও দেখা গেলো, আয়ুবের হিসেবে বিস্তর গোলযোগ। বাঙালীরা অবাক হলো, এ কেমন শাসক, রক্তচক্ষু নেই, উদ্যত তর্জনী নেই, বদলে আছে স্মিত হাসি, আন্তরিক আলিঙ্গন? সবার বন্যায় যখন গ্রামের পর গ্রাম ডুবলো, চারদিকে আর্ত চীৎকার উঠলো, তখন ত্রাণসামগ্রী বোঝাই করে নৌকো নিয়ে প্রদেশের এ জেলা থেকে সে জেলায় দিনের পর দিন ভেসে বেড়াতে দেখা গিয়েছিলো গভর্নর আজম খাঁকে। জীবন ফিরে পেয়ে সেদিন কত মরণোন্মুখ মানুষ আজম খাঁকে পিতৃজ্ঞানে অভিনন্দন জানিয়েছিলো তার বিশদ বিবরণ আয়ুবের দরবারেও গিয়ে পৌঁছেছিল।

পূর্ববঙ্গেও সেই একই জনপ্রিয়তার অপরাধে আজম খাঁকে শাস্তি পেতে হলো। বিনা আড়ম্বরে আজমকে বরখাস্ত করা হলো এবং আর সাহস করলেন না কোন পদ দিয়ে নতুন বিপদ ডেকে আনতে, প্রতিদ্বন্দ্বী সৃষ্টি করতে। আয়ুবের চক্ষুশূল হলেও আজম এতদিন সুযোগ পান নি প্রতিশোধ নেবার। যদিও তাঁর কোনো রাজনৈতিক আদর্শ নেই, এবং আয়ুবের বিরুদ্ধে নিজের সীমিত শক্তি সম্পর্কেও তিনি সচেতন। তাই তিনি প্রাক্তন এয়ার মার্শাল আসগর খাঁকে দিয়েই তাঁর প্রতি অপমান, অবিচারের শোধ তুলতে আজ কৃতসঙ্কল্প।

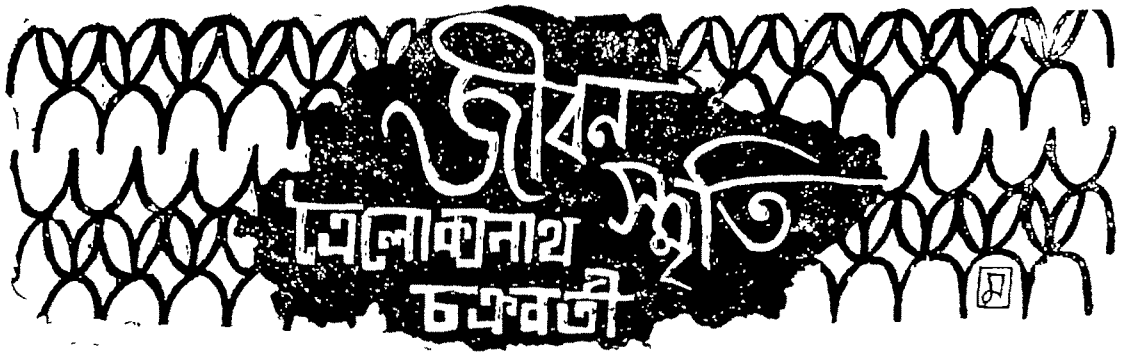

[পূর্ব-প্রকাশিতের পর]

গত ১৯৬৪ সনের জানুয়ারী মাসে এই কনফারেন্স ডাকা হইয়াছিল, সর্বত্র নিমন্ত্রণ-পত্র পাঠান হইয়াছিল, প্রয়োজনীয় সকল ব্যবস্থাই করা হইয়াছিল কিন্তু দাঙ্গার জন্য অধিবেশন স্থগিত রাখা হয়। পরে বিভিন্ন জেলার কিছু প্রতিনিধিস্থানীয় লোক একত্র হইয়া, গভর্নরের নিকট ডেপুটেশন ও স্মারকলিপি দেওয়া হয়।

পূর্ব পাকিস্তানের সংখ্যালঘুরা নিজদিগকে সংখ্যালঘু বলিয়া ভাবিতে অভ্যস্ত নয়, কারণ পরাধীন পাক-ভারতে তাহারাই স্বাধীনতার জন্য সংগ্রাম করিয়াছে, স্বাধীনতার জন্য যথাসর্বস্ব বিসর্জন দিয়াছে, ফাঁসিকাঠে ঝুলিয়াছে, কারাগারে-দ্বীপান্তরে অসহ্য যন্ত্রণা সহ্য করিয়াছে, গুলীবিদ্ধ হইয়া প্রাণত্যাগ করিয়াছে,—তাহাদের কল্পনায় সাম্প্রদায়িকতা-প্রাদেশিকতা ছিল না। তাহাদের কল্পনায় ছিল প্রাদেশিকতা-সাম্প্রদায়িকতা-অস্পৃশ্যতা বর্জিত স্বাধীন দেশ, যে-দেশে থাকিবে সকলের সমান অধিকার, সমান সুযোগ—সেখানে থাকিবে না দুর্নীতি, দুর্ভিক্ষ, শোষণ-নিষ্পেষণ। স্বাধীনতা-সংগ্রামীরা এতকাল দেশ ও জাতি হিসাবে চিন্তা করিয়া আসিয়াছে, প্রাদেশিকতা-সাম্প্রদায়িকতার কল্পনা তাহারা কখনও করে নাই কিন্তু স্বাধীনতা লাভের পর গত ১৮ বৎসরের ইতিহাস, সংখ্যালঘুদের দুর্ভাগ্যের ইতিহাস।

বন্ধুগণ, আজ আমরা এখানে সমবেত হইয়াছি, সমবেতকণ্ঠে আমাদের পুঞ্জীভূত বেদনা প্রকাশ্যে প্রকাশ করার জন্য। আমরা এখানে সমবেত হইয়াছি, সমবেতকণ্ঠে ক্রন্দন করার জন্য। আমাদের এই ক্রন্দন অরণ্যে রোদনই হয়ত হইবে। বালক অসহায়, বালকের বল ক্রন্দন। পাকিস্তানের সংখ্যালঘুরাও নিজদিগকে বালকের মত অসহায় বোধ করিতেছে, তাই তাহাদের সম্বল ক্রন্দন বা আবেদন-নিবেদন। আমরা এখানে সমবেত হইয়াছি, সমবেতকণ্ঠে আবেদন-নিবেদন করার জন্য, সংখ্যাগরিষ্ঠ সম্প্রদায়ের সহানুভূতি লাভের জন্য, গভর্নমেন্টের দৃষ্টি আকর্ষণের জন্য।

পরাধীন পাক-ভারতে বৃটিশ আমাদের মস্তিষ্কে যে চিন্তাধারা প্রবেশ করাইয়া দিয়াছে, স্বাধীন পাকিস্তানে আমরা তাহারই জের টানিতেছি। দুর্নীতি ও সাম্প্রদায়িকতা এদেশের জিনিস নয়—বৈদেশিক কূটনীতির সৃষ্টি। বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদী শাসন ও শোষণের জন্য ভেদনীতি আমদানী করিয়া জাতীয় চরিত্র কলুষিত করিয়াছে, আমাদের জাতি হিসাবে চিন্তা করার শক্তি নাই। একটা জাতির মধ্যে যদি সাম্প্রদায়িকতা, উচ্ছৃঙ্খলতা ও দুর্নীতি থাকে তবে সেই জাতির ভবিষ্যৎ কি?

পৃথিবীর কোন দেশই সম্প্রদায় হিসাবে পরিচিত নহে, জাতি হিসাবে পরিচিত। ভৌগোলিক সীমারেখাই দেশ। সেই সীমারেখার মধ্যে যাহারা বাস করে তাহারা সেই দেশের নামে, সেই জাতি হিসাবে গণ্য হয়। যেমন ইংলণ্ড, আমেরিকা, তুরস্ক, জাপান ইত্যাদি। ঐ সব দেশের অধিবাসীরা ধর্ম বা সম্প্রদায় হিসাবে পরিচিত নহে। এক দেশে বিভিন্ন ধর্মাবলম্বী থাকিতে পারে কিন্তু জাতি হিসাবে তাহারা এক। একটা জাতির মধ্যে যদি বিভেদ থাকে, সেই জাতি দুর্বল হইয়া পড়ে। জাতির যাহারা শত্রু তাহারাই জাতির মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করিয়া, সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা বাধাইয়া, জাতিকে দুর্বল করে। সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা দ্বারা এক সম্প্রদায়ের লোক যদি অপর সম্প্রদায়ের লোকের ধন অপহরণ করে, এক সম্প্রদায়ের লোক যদি অপর সম্প্রদায়ের লোকের সম্পত্তি নষ্ট করে, এক সম্প্রদায়ের লোক যদি অপর সম্প্রদায়ের লোককে হত্যা করে, তবে জাতি হিসাবে আমরা কতটুকু লাভবান হইলাম? দাঙ্গায় যে কোটি কোটি টাকার সম্পত্তি নষ্ট হয় তাহা কি আমার জাতীয় সম্পত্তি নয়? সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার অর্থ সেই জাতির মধ্যে দেশপ্রেম নাই। দেশপ্রেম থাকিলে কেহ জাতির মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করিয়া জাতিকে দুর্বল করিবে না। দেশপ্রেম থাকিলে মনে করিবে এই দেশের প্রত্যেক নর-নারী আমার আপন জন। তখন কেহ কাহাকেও হত্যা করার চেষ্টা করিবে না, রক্ষা করার চেষ্টা করিবে। সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা জাতীয় কলঙ্ক বিশেষ, ইহা দ্বারা জাতির ভিত্তি শিথিল হইয়া পড়ে। দাঙ্গা কাহারা কি উদ্দেশ্যে বাধায় গভর্নমেন্টের তাহা জানা উচিত এবং দাঙ্গা বন্ধ করার ক্ষমতাও গভর্নমেন্টের থাকা প্রয়োজন। পরাধীন পাক-ভারতে গভর্নমেন্ট রাজনৈতিক উদ্দেশ্যসাধনের জন্য দাঙ্গা বাধাইয়াছে, এখন স্বাধীন দেশে দাঙ্গা বন্ধ হইবে না কেন? স্বাধীনতার পর সকলের মনে এই আশা ছিল, দাঙ্গা আর হইবে না। কিন্তু সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা আর বন্ধ হইল না। গত ১৮ বৎসরে কতবার দাঙ্গা হইয়াছে, কত হাজার লোক নিহত হইয়াছে, কত কোটি টাকার সম্পত্তি নষ্ট হইয়াছে, সে খবর গভর্নমেন্টের নিশ্চয়ই জানা আছে, তবে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা বন্ধ হয় না কেন? সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা বন্ধ করার জন্য কোন কার্যকরী পন্থা অবলম্বন করা হইয়াছে কি? সংখ্যালঘুরা আর কতকাল অনিশ্চয়তার মধ্যে বাস করিবে?

দেশ-বিভাগের পর সংখ্যালঘুদের হাত হইতে ব্যবসা-বাণিজ্য ও চাকুরী সংখ্যাগরিষ্ঠদের হাতে চলিয়া গিয়াছে, ফলে এক শ্রেণীর লোকের হাতে টাকা হইয়াছে, তাহারা চায় জমি কিনিতে। জমি হিন্দুদের হাতে। যাহারা জমি কিনিতে চায়, তাহারা জানে হিন্দুরা চলিয়া না গেলে জমি-বাড়ি সস্তায় পাওয়া যাইবে না, সংখ্যালঘুরা জমি বিক্রি করিবে না, কারণ তাহাদের জীবিকা-নির্বাহের একমাত্র অবলম্বন জমি। তাই সংখ্যালঘুদের দেশত্যাগ করিতে বাধ্য করার জন্য নানাভাবে উৎপীড়ন চলিতে থাকে,—জমির ধান কাটিয়া লইয়া যাওয়া গরু দিয়া ক্ষেত খাওয়ান, মেয়ে চুরি, ভীতি প্রদর্শন ইত্যাদি। সময় সময় এরূপ মিথ্যা মামলা সৃষ্টি হয় আমি এই সম্পত্তি ক্রয়ের জন্য এত টাকা বায়না দিয়াছি, এখন কবলা করিয়া দিতেছে না। এইসব মামলার সাক্ষীর অভাব হয় না।

দেশ-বিভাগের পর হইতে সংখ্যালঘুদের মনোবল সম্পূর্ণ ভাঙিয়া গিয়াছে, প্রতি-

বাদ করার বা থানায় এজাহার দেওয়ার সাহস নাই। থানায় এজাহার দিলেও কোন লাভ হয় না। এখানে একটা দৃষ্টান্ত দিতেছি, অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। বেশি দিন নয় ১৯৬৪ সালের কথা, আমার গ্রামের ছয়জন হিন্দুর জমির ধান কাটিয়া লইয়া গেল, ভয়ে কেহ কোন প্রতিবাদ করিল না। ইহার পর এক রাত্রে আমার ক্ষেতের ধান কাটিয়া লইয়া গেল, আমি বাড়ি ছিলাম, থানায় লিখিত এজাহার দিলাম, থানার দারোগা সাহেবকে তাগিদ দিলাম, কোন ফল হইল না, কিছুদিন পর দারোগা সাহেব তারাইল থানায় বদলী হইয়া গেলেন। ইহার কয়েক মাস পর আমি ঢাকা যাই, ইদ্রিস সাহেব তখন I.G.P. ছিলেন, আমি ইদ্রিস সাহেবের সহিত দেখা করিয়া কুলিয়াচর থানার ও-সি'র নিকট যে এজাহার দিয়াছিলাম, তাহার নকল I.G.P. সাহেবকে দিয়া বলিলাম, আমি এখন ও-সি সাহেবের বিচার চাই। ইদ্রিস সাহেব আমাকে আশ্বাস দিয়াছিলেন। কিন্তু কার্যত কিছুই হইল না। ইদ্রিস সাহেবের বিচার কে করিবে? ইহার পরও, ১৯৬৫ সনেও আমার ক্ষেতের ধান কাটিয়া লইয়া গিয়াছে, থানায় এজাহার দিয়াছি, এজাহারের নকল আমার নিকট আছে কিন্তু ফল কিছুই হইল না, পাকিস্তানের সর্বত্র এরূপ ঘটনা ঘটিতেছে।

যখনই একজনের সারা বৎসরের পরিশ্রমের ফল ক্ষেতের ফসল, কাটিয়া লইয়া যায়, তখনই তাহার মনে এই প্রশ্ন জাগে—আর কি, তখনই এই কথা মনে আসে, এই দেশে আর থাকা যাইবে না, তখনই হিন্দুস্থানের দিকে নজর পড়ে। যখনই একজনের কন্যাকে লইয়া যায়, তখনই তাহার মনে এই ভাব আসে, এদেশে আর মান-সম্মান লইয়া থাকা যাইবে না, তখনই হিন্দুস্থানে চলিয়া যাওয়ার চেষ্টা করে। তখনই কোন সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা হয়, তখনই সকলের মনে এই বিশ্বাস জন্মে, এদেশে আর থাকা যাইবে না। যাঁহারা বলেন, সংখ্যালঘুরা হিন্দুস্থানের প্রলোভনে পড়িয়া দেশত্যাগ করিয়া যায়, তাঁহারা কাটা-ঘায়ে নুনের ছিটাই দেন, তাঁহারা জানেন না, রিফিউজিরা সেখানে কি অবস্থায় আছে।

পাকিস্তান ইসলামিক রাষ্ট্র, এখানে অপর ধর্মাবলম্বীদের স্থান কোথায়? আমি ইসলাম ধর্মাবলম্বী নই, এখন আমি কি করিয়া এই রাষ্ট্রকে নিজ রাষ্ট্র বলিয়া মনে করিতে পারি? এখন আমার এই রাষ্ট্রে বাস করিতে হইলে দ্বিতীয় শ্রেণীর নাগরিক হিসাবেই বাস করিতে হইবে। এই দেশকে যদি আমি আমার নিজের দেশ বলিয়া মনে করিতে না পারি, তবে এই দেশের সহিত আমার সম্পর্ক কি? অবশ্যই আইনত সকলের সমান অধিকার আছে কিন্তু কার্যত আমরা কি দেখিতে পাই? আমরা দেখিতে পাই, গত ১৮ বৎসরের মধ্যে কোন সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের লোক গভর্নর, চীফ সেক্রেটারী, আই জি পুলিশ, জেলা ম্যাজিস্ট্রেট, পুলিশ সুপারিন্টেন্ডেন্ট হয় নাই। সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের মধ্য হইতে কোন রাষ্ট্রদূত নেওয়া হয় নাই। সৈন্য বিভাগেও নেওয়া হয় না। আমি এই দেশের নাগরিক, দেশ রক্ষায় আমার অধিকার থাকিবে না কেন? চাকুরীক্ষেত্রে মুষ্টিমেয় কেরানী বা কনস্টেবলের চাকুরী লইয়াই সংখ্যালঘুরা সন্তুষ্ট থাকিবে কেন? ব্যবসাক্ষেত্রে নানা অজুহাতে সংখ্যালঘুদের লাইসেন্স কাটিয়া দেওয়া হয়।

পাকিস্তানের সংবিধানে ১৩ ও ১৫ ধারায় যদিও সমান অধিকার এবং সম্পত্তি ক্রয়-বিক্রয়ের অধিকার দেওয়া হইয়াছে, কিন্তু কার্যত আমরা কি দেখিতে পাই? আমরা দেখিতে পাই সংখ্যালঘুর জন্য এক আইন, সংখ্যাগরিষ্ঠর জন্য অপর আইন। সংখ্যালঘুরা জমি-বাড়ি-গাছ বিক্রয় করিতে পারিবে না। অবশ্যই জমি, বাড়ি, বৃক্ষ বিক্রয় বন্ধ নাই, দাম কমিয়া গিয়াছে মাত্র। সংখ্যালঘুরা তাহাদের নাগরিক অধিকার, পাসপোর্ট পাইবে না কেন? হিন্দুরা মুসলমানের সহিত এক বাড়িতে বাস করিতে অভ্যস্ত নয়, শহরে অবশ্যই চলিয়া গিয়াছে কিন্তু পল্লীগ্রামে তাহা অচল। রিফিউজী নাম দিয়া হিন্দু-বাড়িতে মুসলমান বসানর অর্থই সেই পরিবারকে দেশত্যাগ করিতে বাধ্য করা।

পাকিস্তানের সংখ্যালঘুরা চায় গণতন্ত্র। দেশে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত না হইলে, জনগণের হাতে ক্ষমতা না আসিলে, দেশের শ্রীবৃদ্ধি হইতে পারে না, দেশ শক্তিশালী হইতে পারে না। গণতন্ত্রের অভাবেই সংখ্যালঘুদের বর্তমান দুর্দশা। গণতন্ত্রের অভাবেই সংখ্যালঘুরা সকল রাজনৈতিক অধিকার হইতে বঞ্চিত। গত দুই নির্বাচনে জাতীয় পরিষদে কোন সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের লোক যাইতে পারে নাই, প্রাদেশিক পরিষদের সংখ্যাও অতি নগণ্য। জাতীয় পরিষদে কোন সংখ্যালঘু মন্ত্রী নাই।

দেশে যুক্ত নির্বাচন প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, আমার ভোটে প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হইবে, আমি প্রেসিডেন্ট পদপ্রার্থী হইতে পারিব না কেন? যেখানে সংখ্যাগরিষ্ঠরা শতকরা ৮০ জন, সেখানে রক্ষাকবচের প্রয়োজন হয় কেন? সেখানে কেন আইন করা হয়, শতকরা ২০ জন সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের লোক নির্বাচনে প্রেসিডেন্ট পদপ্রার্থী হইতে পারিবে না? এত ভয় কিসের? সংখ্যালঘুদের দাবি, পাকিস্তান ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র হইবে, যুক্ত নির্বাচন প্রথা বলবৎ থাকিবে, সংখ্যালঘুদের প্রেসিডেন্ট পদপ্রার্থী হইতে কোন বাধা থাকিবে না। যদি তাহা না হয়, তবে সংখ্যালঘুদের দাবি "পৃথক নির্বাচন"। তাহাদের দাবি পাকিস্তানের মধ্যে স্বায়ত্ত-শাসন। ইসলামিক রাষ্ট্রে যুক্ত নির্বাচন চলিতে পারে না, যুক্ত নির্বাচন অর্থই ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র।

এখন প্রশ্ন এই, এই দেশে আমি কেন থাকিব? এই দেশে আমার কি অধিকার আছে? আমি যখন দেখিতে পাই, এই দেশে আমার কোন অধিকার নাই, আমার সম্পত্তি আমি ইচ্ছামত দান-বিক্রয় করিতে পারি না, আমার সারা বৎসরের পরিশ্রমের ফল, খেতের ফসল, ঘরে আনতে পারি না, কোন্ সময় আমার বাড়িতে রিফিউজী ঢুকিবে, কোন্ সময় তহশিল কাছারীর নায়েব বলিবে, তোমার খাজনা নিব না, ইহা হিন্দুস্থানী সম্পত্তি। আমি ব্যবসায়ী, ব্যবসার সুযোগ পাইব না, আমি দোকানদার, আমার জিনিস বাকী দিতে হইবে, সেই টাকা আর ফেরৎ পাওয়া যাইবে না। আমি মৎস্যজীবী, আমার মাছ কাড়িয়া লইয়া যাইবে, আমার গাছের ফল, পুকুরের মাছ লইয়া যাইবে, আমি কিছু বলিতে পারিব না। আমার খেত গরু দিয়া খাওয়াইবে, কিছু বলিলে গ্রাম্য বিচারে আমার সাজা হইবে এই মিথ্যা অভিযোগে, "আমি রাখালকে গালি দিয়াছি, প্রহার করিয়াছি, জাতি তুলিয়া গালি দিয়াছি"। আমি চাকুরীর সুযোগ পাইব না, পাসপোর্ট পাইব না, বন্দুকের লাইসেন্স পাইব না, কোন সময় সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা বাধিবে, আমার গৃহ লুণ্ঠিত-ভস্মীভূত হইবে, আমাকে হত্যা করিবে, আমি এই অনিশ্চয়তার মধ্যে কেন বাস করিব? কোন দেশে কি ঘটিবে, সে জন্য এ দেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ সম্প্রদায়ের লোক কেন গরম হইবে, আর আমাদিগকে কেন আতঙ্কের মধ্যে বিনিদ্ররজনী যাপন করিতে হইবে? অপর দেশে যদি কিছু ঘটে সেজন্য আমি কি দায়ী? আমি কি এ দেশের নাগরিক নই? সংখ্যাগরিষ্ঠ সম্প্রদায়ের লোকের দেশে বাস করা যদি সংখ্যালঘুদের অপরাধ হয়, তবে আমি বিনা অপরাধে কেন অপরাধীর মত এ দেশে বাস করিব? পাকিস্তান যদি ইসলামিক রাষ্ট্র হইয়া থাকে, ইসলামের যদি এরূপ বিধান থাকে, বিধর্মীকে হত্যা করিতে হইবে,—রক্ষা করিতে নয়, তবে অপর ধর্মাবলম্বীরা এরূপ ইসলামিক রাষ্ট্রে কেন বাস করিবে? এই দেশে আমার ভবিষ্যৎ কি? আমার যদি নিরাপত্তার কোন ব্যবস্থা না থাকে, থানায় এজাহার দিলে যদি কোন প্রতিকার না হয়, সকলেই যদি মনে করে আমি অবাঞ্ছিত, তবে আমি কি করিয়া এই দেশে বাস করিতে পারি? নারায়ণগঞ্জে নোভাক সাহেব নিহত হইলেন, হত্যাকারীদিগকে

খুঁজিয়া বাহির করিতে কোন বেগ পাইতে হইল না, সাক্ষী সংগ্রহ করিতে কোন অসুবিধা হইল না। কিন্তু গত সাম্প্রদায়িক দাঙ্গায় বা তাহার পূর্বে, শত শত সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের লোক নিহত হইয়াছে, তাহাদের বাড়ি লুণ্ঠিত-ভস্মীভূত হইয়াছে, আশ্চর্যের বিষয় একটি অপরাধীকেও খুঁজিয়া পাওয়া গেল না। সংখ্যালঘুরা কি এতই বেওয়ারিস মাল? সংখ্যাগুরু সম্প্রদায় এবং গভর্নমেণ্ট যদি সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের লোকদিগকে না চায়, তবে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের দাবি লোক বিনিময়। ভারতের সংখ্যালঘুরাও সম্ভবত অনিশ্চয়তার মধ্যে দিন কাটাইতেছে। Exchange of population হইলে উভয় দেশেই সংখ্যালঘু সম্প্রদায় থাকিবে না, সাম্প্রদায়িক দাঙ্গাও হইবে না, রিফিউজী সমস্যাও থাকিবে না। অবশ্যই Exchange of population সহজ নয় কিন্তু উপায় কি?

উপায় আছে। উপায় সংখ্যাগরিষ্ঠ এবং সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের লোকের হাতে। সংখ্যাগরিষ্ঠ সম্প্রদায় যদি আন্তরিকতার সহিত চান সংখ্যালঘুরা এ দেশে থাকুক এবং সংখ্যালঘুরাও যদি অপর দেশের দিকে না তাকাইয়া সাহসের সহিত নিজের অধিকার বজায় রাখার জন্য দৃঢ়সংকল্প হন, তবেই সমস্যার সমাধান হইবে। উভয় সম্প্রদায়ের নেতারা যদি এই সমস্যার সমাধান করিতে চান, তাঁহারা যদি সঙ্ঘবদ্ধভাবে নতুন আবহাওয়া সৃষ্টি করেন, তবেই সমস্যার সমাধান হইবে।

সংখ্যালঘু সমস্যা সমাধান দেশত্যাগ নয়, দেশত্যাগ করিয়া যাহারা গিয়াছে, তাহাদের শতকরা কতজন লোক সমাজে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে? যাহারা দেশত্যাগ করিয়া গিয়াছে, তাহাদের এক-চতুর্থাংশ লোক মৃত্যুবরণ করিয়াছে,—ছুরিকাঘাতে নয়—অনাহারে, অর্ধাহারে, অচিকিৎসায়, বিভিন্ন ব্যাধিতে। শিয়ালদহ স্টেশনে, ফুটপাথে বা রিফিউজী ক্যাম্পের জীবন পশু-জীবন অপেক্ষা নিকৃষ্ট,—সেখানে তাহারা সম্মানী অতিথি নয়—অনাহূত অতিথি।

যাঁহারা ভারতের দিকে তাকাইয়া আছেন, তাঁহারা নিরাশ হইবেন। গত দাঙ্গার পর ঢাকা মাইগ্রেশন অফিসের দৃশ্য হৃদয়বিদারক ছিল না কি? যাহারা গত সাম্প্রদায়িক দাঙ্গায় সর্বস্বান্ত হইয়া—স্বামী-পুত্র হারাইয়া, ভয়-ভীত, শোকাকুল অবস্থায়, ভারতে আশ্রয় পাইবে আশায়, ভারতীয় মাইগ্রেশন অফিসে গিয়াছিল তখন ভারতীয় কর্মচারীদের নিকট হইতে কোন সহানুভূতিপূর্ণ ব্যবহার পায় নাই। ভারতীয় কর্মচারী, যাহাদের অনেকেই এক সময় পূর্ব পাকিস্তানের নাগরিক ছিল, কাপুরুষের মত দেশত্যাগ করিয়া, কোনপ্রকারে সীমানা পার হইয়া, ভারতের নাগরিক হইয়াছে, সৌভাগ্যক্রমে মাইগ্রেশন অফিসে চাকুরী পাইয়াছে, এখন বীর সাজিয়া মাইগ্রেশন প্রার্থীদের উপর বীরত্ব দেখাইয়াছে, এমন কি চাপরাশীরা পর্যন্ত স্ত্রীলোকদিগকে ধাক্কা মারিয়া মাটিতে ফেলিয়া দিয়াছে। সেই সময় এক সেট মাইগ্রেশন ফর্ম ১০৲ ১৫৲ টাকায় বিক্রি হইয়াছে। আবার যে সব সৌভাগ্যবান পুরুষ মাইগ্রেশন পাইয়াছে, তাহাদের রাস্তায় কুলির দৌরাত্ম্য, বর্ডার কর্মচারীদের দৌরাত্ম্য ভোগ করিয়া নিঃস্ব অবস্থায় যখন হিন্দুস্থানের পথে পাড়ি দিল, তখন তাহাদের মোহনিদ্রা ভাঙ্গিল, তখন তাহারা দেখিল, তাহারা অবাঞ্ছিত অতিথি। উপায় নাই! স্রোতের জলে গা ভাসাইয়া দিল, কোথায় দণ্ডকারণ্য, বিহার-উড়িষ্যা—নানা স্থানে, নানা ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্য দিয়া প্রাণ হারাইতে লাগিল। তাহাদের মনে তখন এই প্রশ্নই জাগিয়াছিল, "আমি কি অপরাধ করিয়াছি?"

আজ ভাগ্যচক্রে আমি আমার দেশে সংখ্যালঘু। কিন্তু আমার সংখ্যা ত কম নয়? আমি সংখ্যালঘু হইলেও আমার সংখ্যা এক কোটি। এক কোটি সংখ্যা ত কম নয়? এক কোটি লোক সঙ্ঘবদ্ধ হইলে কি না করিতে পারে? এই দেশ, পূর্ববঙ্গ বা পূর্ব পাকিস্তান, আমার দেশ, আমার পিতৃ-পিতামহের দেশ। এই দেশে আমার জন্মগত অধিকার। আমার মাতৃভূমি, আমার পিতৃপিতামহের স্মৃতি জড়িত সোনার বাংলা, কেন আমি ছাড়িয়া যাইব? আমি কি এতই ভীরু? আমি কেন নিজ দেশ ছাড়িয়া অপর দেশে যাইয়া, ভিক্ষাপাত্র লইয়া, দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা মাগিব? আমার অধিকার আমার রক্ষা করিতে হইবে। আমার অধিকার যদি আমি রক্ষা না করি, তবে সে দোষ আমার নিজের, অপরের নয়। পশুর মত বাঁচিয়া লাভ কি? ভীরুর কোন স্থান নাই। ভীরু পদদলিত হইবে, লাঞ্ছিত-অপমানিত হইবে ইহাই স্বাভাবিক। শক্তিমানকে সকলেই ভয় পায়। পাকিস্তানের সংখ্যালঘুরা নিজ দেশে অপরের অনুগ্রহের উপর থাকিবে না।—জিম্মি হিসাবে থাকিবে না, তাহারা থাকিবে তাহাদের প্রতিভার উপর, বাহুবলের উপর। সংখ্যালঘুদের বাঁচিতে হইলে মরিতে প্রস্তুত থাকিতে হইবে, নিজ অধিকার রক্ষা করিতে হইবে, আক্রমণকারীকে বাধা দিতে হইবে। তাহাদের স্মরণ রাখিতে হইবে, আক্রমণকারীরা লুণ্ঠ করিতে আসে—মরিতে নয়, বাধা পাইলে পলাইয়া যায়।

সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার জন্য কনফারেন্স বন্ধ হইয়া যায়, পরে আর একটা কনফারেন্স ডাকার কথা ছিল "কিন্তু ডাকা সম্ভবপর হয় নাই। পরে বিভিন্ন জেলার প্রতিনিধি একত্র হয় এবং আলাপ-আলোচনার পর গভর্নরের নিকট ডেপুটেশন দেওয়া হয়। আমার অভিভাষণ প্রতিনিধি সভায় পাঠ করা হয়।

আমি যে সব দেশবরেণ্য নেতা ও দেশপ্রেমিক রাজনৈতিক কর্মীদের সঙ্গে জেলে একত্র ছিলাম*

১৯০৮ সন, ঢাকা সেণ্ট্রাল জেল।
মহিমচন্দ্র নন্দী—শিক্ষক, সাটীরপাড়া হাই স্কুল।
ত্রৈলোক্যনাথ চক্রবর্তী—ছাত্র, সাটীরপাড়া হাই স্কুল।
যদুনাথ দাস—ছাত্র সাটীরপাড়া হাই স্কুল।
বিনোদ চক্রবর্তী—ছাত্র সাটীরপাড়া হাই স্কুল।
১৯১১ সন ঢাকা সেণ্ট্রাল জেল—খুনের মামলায় ধৃত, নির্জন সেল বাস।
১৯১৪—১৫ সন—বরিশাল জেল।
ত্রৈলোক্যনাথ চক্রবর্তী—বরিশাল ষড়যন্ত্র মামলা।
প্রতুলচন্দ্র গাঙ্গুলী—বরিশাল ষড়যন্ত্র মামলা।
মদনমোহন ভৌমিক—বরিশাল ষড়যন্ত্র মামলা।
ব্রমেশচন্দ্র চৌধুরী—বরিশাল ষড়যন্ত্র মামলা।
১৯১৬ সন—প্রেসিডেন্সী জেল—শচীন্দ্রনাথ সান্যাল, ত্রৈলোক্য চক্রবর্তী, মদন ভৌমিক, স্বপ্নেন চৌধুরী।
১৯১৬—২০ সন—সেলুলার জেল—আন্দামান (কালাপানি)।
বিনায়েক দামোদর সাভারকার—বার-এট-ল—নাসিক ষড়যন্ত্র।
গণেশ দামোদর সাভারকার—নাসিক ষড়যন্ত্র।
নারায়ণ কর্শী—জ্যাকসন হত্যা মামলা।
প্রফেসার ভাই পরমানন্দ—লাহোর ষড়যন্ত্র।
বাবা জোয়ালা সিং—লাহোর ষড়যন্ত্র।
বাবা সোহন সিং—লাহোর ষড়যন্ত্র।
সর্দার শের সিং—লাহোর ষড়যন্ত্র।
সর্দার গুরুমুখ সিং—লাহোর ষড়যন্ত্র।
সর্দার পৃথ্বী সিং—লাহোর ষড়যন্ত্র।
সর্দার প্যারা সিং—লাহোর ষড়যন্ত্র।
সর্দার কেশর সিং—লাহোর ষড়যন্ত্র।
ষন্ত্র।
সর্দার ভান সিং—লাহোর ষড়যন্ত্র।

* [বহু লোকের নাম ভুলিয়া গিয়াছি, যাহাদের নাম স্মরণ আছে দিলাম।]

সর্দার বিশাখা সিং—লাহোর ষড়যন্ত্র।
সর্দার নন্দ সিং—লাহোর ষড়যন্ত্র।
সর্দার ইন্দ্র সিং—লাহোর ষড়যন্ত্র।
সর্দার শিব সিং—লাহোর ষড়যন্ত্র।
সর্দার মদন সিং—লাহোর ষড়যন্ত্র।
সর্দার বীর সিং—লাহোর ষড়যন্ত্র।
সর্দার হরনাম সিং—লাহোর ষড়যন্ত্র।
সর্দার নিধান সিং—লাহোর ষড়যন্ত্র।
সর্দার কৃপাল সিং—লাহোর ষড়যন্ত্র।
পণ্ডিত পরমানন্দ—লাহোর ষড়যন্ত্র।
পণ্ডিত রামসরণ দাস—লাহোর ষড়যন্ত্র।
পণ্ডিত হৃদয়রাম—লাহোর ষড়যন্ত্র।
সর্দার ছত্র সিং—লাহোর ষড়যন্ত্র।
বাবা বুর সিং—লাহোর ষড়যন্ত্র।
পণ্ডিত জগৎরাম—লাহোর ষড়যন্ত্র।
সর্দার বুড্ডা সিং—বার্মা ষড়যন্ত্র।
সর্দার অমর সিং—বার্মা ষড়যন্ত্র।
সেখ আলি আহম্মদ—বার্মা ষড়যন্ত্র।
মোহম্মদ মোস্তাফা—বার্মা ষড়যন্ত্র।
পণ্ডিত রাম রক্ষা—বার্মা ষড়যন্ত্র।
বারীন্দ্রকুমার ঘোষ—আলিপুর বোমার মামলা।
হেমচন্দ্র কানুনগো—আলিপুর বোমার মামলা।
উপেন্দ্রচন্দ্র মুখার্জি—আলিপুর বোমার মামলা।
পুলিনবিহারী দাস—ঢাকা ষড়যন্ত্র।
অমৃতলাল হাজরা—রাজাবাজার বোমার মামলা।
ত্রৈলোক্যনাথ চক্রবর্তী—বরিশাল ষড়যন্ত্র।
মদনমোহন ভৌমিক—বরিশাল ষড়যন্ত্র।
খগেন্দ্রনাথ চৌধুরী—বরিশাল ষড়যন্ত্র।
শচীন্দ্রনাথ সান্যাল—বেনারস ষড়যন্ত্র।
নিকুঞ্জ পাল—সিরাজগঞ্জ খণ্ডযুদ্ধ।
গোবিন্দ কর—সিরাজগঞ্জ খণ্ডযুদ্ধ।
আশুতোষ লাহিড়ী—প্রাগপুর ডাকাতি।
গোপেন্দ্রলাল রায়—প্রাগপুর ডাকাতি।
ক্ষিতীশচন্দ্র সান্যাল—প্রাগপুর ডাকাতি।
ফণিভূষণ রায়—প্রাগপুর ডাকাতি।
নরেন্দ্রচন্দ্র ঘোষচৌধুরী—শিবপুর ডাকাতি।
ভূপেন ঘোষ—শিবপুর ডাকাতি।
সত্যরঞ্জন বসু—শিবপুর ডাকাতি।
নিখিলচন্দ্র গুহরায়—শিবপুর ডাকাতি।
সানুকূল চ্যাটার্জী—শিবপুর ডাকাতি।
সুরেন্দ্রচন্দ্র বিশ্বাস—শিবপুর ডাকাতি।
যতীন্দ্রচন্দ্র নন্দী—শিবপুর ডাকাতি।
মহেন্দ্রচন্দ্র দাস—মালদহ হেড মাস্টার খুন।
সুরেশচন্দ্র সেন—জয়দেবপুর ট্রেন ডাকাতি।
চৌধুরী বোগ্‌গা মল—পাঞ্জাব মার্শাল ল মামলা।
মহাশয় রত্ন চান্দ—পাঞ্জাব মার্শাল ল মামলা।

১৯২১—২৩ সন—আলিপুর সেন্ট্রাল জেল।
দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ—বার-এট-ল, দেশপ্রিয় যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্ত—বার-এট-ল, কিরণশঙ্কর রায়—বার-এট-ল, বীরেন্দ্রনাথ শাসমল—বার-এট-ল, ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়, ডাঃ সুরেশচন্দ্র ব্যানার্জী, ডাঃ প্রতাপচন্দ্র গুহরায়, প্রোফেসার জে, এল, ব্যানার্জী (জিতেন্দ্রলাল) প্রোফেসার অনিলবরণ রায়, প্রোফেসার নৃপেন্দ্রচন্দ্র ব্যানার্জী, সুভাষচন্দ্র বসু—আই, সি, এস, হেমেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত—উকিল, নগেন্দ্রচন্দ্র গুহরায়—মোক্তার, শ্যামসুন্দর চক্রবর্তী—এম, এ. সম্পাদক সার্ভেন্ট, চিত্তরঞ্জন দাশ, হেমন্তকুমার সরকার, সুশীল ব্যানার্জী, মৌলানা আবুল কালাম আজাদ, মৌলানা আক্রাম খাঁ, পীর বাদশা মিঞা (ফরিদপুর) হাজী আবদুর রসিদ খান (নোয়াখালী) চান্দ মিঞা সাহেব (জমিদার, করটিয়া) কবি, কাজী নজরুল ইসলাম, পদ্মরাজ জৈন, বসন্তলাল মুরারকা, মূলচাঁদ আগরওয়ালা, (সম্পাদক—বিশ্বামিত্র) হীরালাল লোহিয়া, সতীন্দ্রনাথ সেন (বরিশাল) মহিমচন্দ্র দাস (চট্টগ্রাম) ত্রিপুরাচরণ চৌধুরী (চট্টগ্রাম) বসন্তকুমার মজুমদার (কুমিল্লা) কালিকাপ্রসাদ ভট্টাচার্য (কালিগঞ্জ-সরাইল) পঞ্চানন চক্রবর্তী (মাদারীপুর) বম ইয়ার্ড—অমৃতলাল (শশাঙ্ক) হাজরা, (রাজাবাজার বোমার মামলা) ত্রৈলোক্যনাথ চক্রবর্তী (বরিশাল ষড়যন্ত্র) মদনমোহন ভৌমিক (বরিশাল ষড়যন্ত্র), খগেন্দ্রনাথ চৌধুরী (বরিশাল ষড়যন্ত্র), নরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জী (বেনারস ষড়যন্ত্র) নিকুঞ্জ পাল, (সিরাজগঞ্জ সুটিং) গোবিন্দ কর, (সিরাজগঞ্জ সুটিং), মহেন্দ্রচন্দ্র দাস (মালদহ হেড মাস্টার খুন) আশুতোষ লাহিড়ী (প্রাগপুর ডাকাতি) গোপেন্দ্রলাল রায় (প্রাগপুর ডাকাতি) ফণিভূষণ রায় (প্রাগপুর ডাকাতি) নরেন্দ্রচন্দ্র ঘোষচৌধুরী (শিবপুর ডাকাতি) ভূপেন্দ্রচন্দ্র ঘোষ (শিবপুর ডাকাতি) সানুকূল চ্যাটার্জী (শিবপুর ডাকাতি), সত্যরঞ্জন বসু—(শিবপুর ডাকাতি), যতীন্দ্রচন্দ্র নন্দী (শিবপুর ডাকাতি), সুরেন্দ্রচন্দ্র বিশ্বাস (শিবপুর ডাকাতি), হরিচৈতন্য দে (কলতাবাজার সুটিং) মোহিনীমোহন বসু (ডাকাতি) অতুলচন্দ্র দত্ত (ডাকাতি) মথুরামোহন চক্রবর্তী (ডাকাতি), সুধীরচন্দ্র মজুমদার (ডাকাতি), প্রফুল্লচন্দ্র রায় (ডাকাতি)।

১৯২৪—ফেব্রুয়ারী, ময়মনসিংহ জেল। মুক্তির জন্য প্রেরিত, কয়েকদিন একাকী অবস্থান।

১৯২৪ সন, নভেম্বর মাস, আলিপুর সেন্ট্রাল জেল। (বিনা বিচারে আটক) নরেন্দ্রমোহন সেন, ত্রৈলোক্যনাথ চক্রবর্তী।

১৯২৪ সন—মেদিনীপুর সেন্ট্রাল জেল। (বিনা বিচারে আটক)
ডাঃ যাদুগোপাল মুখার্জী, ভূপতি মজুমদার হরি চক্রবর্তী, ত্রৈলোক্যনাথ চক্রবর্তী, প্রতুলচন্দ্র গাঙ্গুলী রবীন্দ্রমোহন সেন, মদনমোহন ভৌমিক, গিরীন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় অনুকূল মুখার্জী, বিপিনচন্দ্র গাঙ্গুলী, সতীশচন্দ্র পাকড়াশী অমৃত সরকার।

১৯২৫—২৬ সন, মান্দালয় সেন্ট্রাল জেল (ব্রহ্মদেশ) বিনা বিচারে আটক।
সুভাষচন্দ্র বসু, সত্যেন্দ্রচন্দ্র মিত্র, ত্রৈলোক্যনাথ চক্রবর্তী, মদনমোহন ভৌমিক, বিপিনচন্দ্র গাঙ্গুলী, সুরেন্দ্রমোহন ঘোষ, অমরকৃষ্ণ ঘোষ, জীবনলাল চ্যাটার্জী, সতীশচন্দ্র চক্রবর্তী।

১৯২৭ সন—মিঞ্জান জেল—ত্রৈলোক্য চক্রবর্তী, প্রতুলচন্দ্র গাঙ্গুলী।

১৯২৭—২৮ সন, ইন্‌সিন্ সেন্ট্রাল জেল। (ব্রহ্মদেশ)
নরেন্দ্রমোহন সেন, ত্রৈলোক্যনাথ চক্রবর্তী, প্রতুলচন্দ্র গাঙ্গুলী, ভূপেন্দ্রচন্দ্র দত্ত।

১৯২৮ সন—হাতীয়া দ্বীপে অন্তরীণ ও মুক্তি।

১৯৩০ সন—রাজসাহী সেন্ট্রাল জেল (বিনা বিচারে আটক)
বিপিনচন্দ্র গাঙ্গুলী, ত্রৈলোক্যনাথ চক্রবর্তী, প্রতুলচন্দ্র গাঙ্গুলী, বঙ্কিমচন্দ্র মুখার্জী, অমূল্যচন্দ্র অধিকারী, জিতেশচন্দ্র লাহিড়ী।

[ক্রমশঃ]

পশ্চিমবঙ্গে নির্বাচনী অভিযান পুরোদমে সুরু হয়েছে

অবশেষে নির্বাচন পশ্চিমবঙ্গের দুয়ারে সজোরে আঘাত করতে শুরু করেছে, তাকে দ্বার খুলে অভ্যর্থনার জন্যও বিভিন্ন রাজনৈতিক দল রীতিমত প্রস্তুতি-পর্ব চালিয়ে যাচ্ছে। কংগ্রেস এবং যুক্তফ্রন্ট উভয় তরফেরই আশা যে তারাই এবার নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করবে। পক্ষান্তরে সদ্যোনির্মিত কয়েকটি দল, যেমন আই-এন-ডি-এফ, লোকদল প্রভৃতি, আশা করেছে যে, এবারে কোন পক্ষই নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করতে পারবে না; কাজেই তাদের দলীয় যে ক'জন সদস্য বিধানসভায় থাকবেন শেষ পর্যন্ত মন্ত্রিসভা গঠনের জন্য তাঁদেরই দ্বারস্থ হতে হবে। কিন্তু কংগ্রেস বা যুক্তফ্রন্ট কোন তরফই এই বক্তব্যের প্রতি কোন মূল্য আরোপ করছে না, উভয় তরফেরই বক্তব্য যে, তৃতীয় শক্তি বলে কোন কিছুরই অস্তিত্ব পশ্চিমবঙ্গে বর্তমানে নেই আগামী নির্বাচনই তা প্রমাণ করে দেবে।

কাজেই এবারকার আসল সংগ্রামটা দু তরফের মধ্যেই, এবং এ রকমটি ইতিপূর্বে কখনো ঘটে নি। কেন না বামপন্থী শক্তি-গুলি এবারের মত ঐক্যবদ্ধ ইতিপূর্বে কখনো হয় নি। গতবারেও বামপন্থী শক্তি দ্বিধাবিভক্ত হয়ে লড়েছিল এবং যার ফলে প্রায় পঞ্চাশটি আসন তাদের খোয়াতে হয়েছিল। এবারে অবশ্য এই সুবিধাটা যুক্তফ্রন্ট পেয়েছে। তবে অসুবিধাও যুক্ত-ফ্রন্টের কিছু কিছু আছে। এইবারেই প্রথম তাদের বিগত শাসনকালের সমালোচনা শুনতে হচ্ছে।

কংগ্রেস দলের প্রচারে যুক্তফ্রন্টের আমলের আইন ও শৃঙ্খলাহানি, ঘেরাও ও স্ট্রাইক, চালের মূল্যবৃদ্ধি, ইত্যাদি নানা বিষয়ের উল্লেখ করা হচ্ছে। পক্ষান্তরে যুক্তফ্রন্টও প্রচারের ব্যাপারে পিছিয়ে নেই। তাদেরও বক্তব্য হচ্ছে—উপরি উক্ত সকল অবস্থা কংগ্রেসী আমলেও ছিল আর টানা বিশ বছর কুশাসন চালিয়ে নয় মাসের শাসনের ব্যর্থতার কথা বলার কোনো অধিকার কংগ্রেসের নেই, থাকতে পারে না। এছাড়া রাজ্যপালের আমলে অবস্থার যে আরও অবনতি ঘটেছে, বিশেষ করে আইন ও শৃঙ্খলার ক্ষেত্রে, শিল্প ও শ্রমবিরোধের ক্ষেত্রে, তা যুক্তফ্রন্টের প্রচারের পক্ষে অনু-কূল অবস্থার সৃষ্টি করেছে। যুক্তফ্রন্টের বিরুদ্ধে কংগ্রেস অনৈক্যের অভিযোগ এনেছে, কিন্তু হরিয়ানার সাম্প্রতিক ঘটনা-বলী কংগ্রেসের ভিতরকার অবস্থাটা প্রকাশ করে দিয়েছে, যার ফলে যুক্তফ্রন্টের পক্ষে প্রচারের একটা ভাল হাতিয়ার পাওয়া সম্ভবপর হয়েছে।

নির্বাচনী লড়াই কখনো কখনো গণ-তান্ত্রিক রীতিনীতির সীমা লঙ্ঘনও করে যাচ্ছে। সংবাদে প্রকাশ যে, একটি নির্বা-চনী সফরে লোকদলের নেতা শ্রীহুমায়ুন কবির কতিপয় ব্যক্তির দ্বারা আহত হয়ে-ছেন। যারা এই দুষ্কার্য করেছে, তাঁদের সকলেই তীব্র ভাষায় নিন্দা করবে। যুক্ত-ফ্রন্টের তরফ থেকে শ্রীকবিরের ওপর এই হামলার নিন্দা করা হয়েছে। কিন্তু এটিকে একটি রাজনৈতিক ইস্যুতে দাঁড় করাবার যে প্রচেষ্টা কবির সাহেব করেছেন সেটা ঠিক নয়। কোন কোন লোক রাজ-নীতির ক্ষেত্রে অগণতান্ত্রিক নীতি অবলম্বন করে, সেটা সর্বদাই নিন্দনীয় এবং যে-কোন দলেরই কাণ্ডজ্ঞানসম্পন্ন মানুষ তা সমর্থন করেন না। কিন্তু কবির সাহেব এবং তাঁর দল যেভাবে যুক্তফ্রন্টকে এজন্য দায়ী করছেন সেটা রাজনৈতিক শিষ্টাচার বিরোধী। যদি কোন লোকদলের কর্মী কোন যুক্তফ্রন্টের কর্মীকে আঘাত করে (এরকম সম্ভাবনা যে একেবারেই থাকে না তা নয়) তাহলে যদি এরকম ঘোষণা করা হয় যে লোকদল হিংসা ও গুণ্ডামীর নীতিতেই বিশ্বাসী, তাহলে কি সিদ্ধান্তটা ন্যায়সংগত হবে?

একটি গুরুত্বপূর্ণ রায়

সম্প্রতি জনৈক প্রখ্যাত লেখক একটি অশ্লীল গ্রন্থ রচনা করার জন্য আদালত কর্তৃক দণ্ডপ্রাপ্ত হয়েছেন। বিচারক এই সিদ্ধান্তে এসেছেন যে, লেখক ইচ্ছাপূর্বক তাঁর এই রচনায় বিকৃত যৌনতত্ত্ব পরি-বেশন করেছেন এবং এই রচনা পাঠকদের মানসিক উৎকর্ষের পরিবর্তে বিপথগামী

করতেই সহায়তা করবে। এই রায়টি নিঃসন্দেহে গুরুত্বপূর্ণ। মার্কিনী কায়দায় এদেশের তরুণ-তরুণী ও কিশোর-কিশোরীদের রুচি ইচ্ছাকৃতভাবে বিকৃত করার একটা অপচেষ্টা এদেশে দীর্ঘকাল ধরেই চলছে, সিনেমায়, পোস্টারে, পোষাকে-পরিচ্ছদে তার প্রভাব সুস্পষ্ট। সাহিত্যও এই অপচেষ্টার একটা হাতিয়ার হয়ে দাঁড়িয়েছে এবং কয়েকজন লেখক ও কয়েকটি পত্রিকা এই অপচেষ্টার শরিক হয়েছেন। এর আসল উদ্দেশ্য হচ্ছে কাঁচা বয়স থেকে ছেলেমেয়েদের মাথায় যৌনতার ভূত ঢুকিয়ে তাদের মেরুদণ্ড ভেঙে দাও, তাহলে কোন অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদে কোনদিন তারা মুখর হয়ে উঠবে না। এই অপচেষ্টারই শরিক হয়ে কয়েকটি পত্র-পত্রিকাও আত্মপ্রকাশ করেছে, যৌনজগতের নাম করে যেগুলি বিকৃত রুচি ফিরি করে। বিচারপতির রায়ের পর অবস্থার কোন পরিবর্তন হবে কি-না তা দেখার জন্য আমরা সাগ্রহে অপেক্ষা করছি।

কল্যাণপুর

সারা পশ্চিমবঙ্গের জেলাগুলিতে সবে-মাত্র কিছু কিছু ধান কাটা শুরু হয়েছে, কিন্তু বিভিন্ন জেলা থেকে নানান ধরনের অভিযোগ আসছে, জোতদার শ্রেণী কৃষকের ধান জোর করে লুঠপাট করছে এবং বহু ক্ষেত্রেই পুলিশ সক্রিয়ভাবে এই জোতদার শ্রেণীকে সাহায্য করছে। কৃষক-দের বিরুদ্ধে ৩০৭ ধারা মামলা রুজু করে, জামিনবিহীন ধারায় গ্রেপ্তার করে শত শত কৃষককে আটক করা হয়েছে। মেমারী থানার অন্তর্গত কল্যাণপুর গ্রামে এই রকমই কিছু ঘটনা ঘটেছে। ধান কাটার ব্যাপারকে উপলক্ষ করে কল্যাণপুর গ্রামে পুলিশের গুলীতে একজন নিহত ও কয়েকজন গুরুতর আহত হয়েছে। তিন বিঘা বিলি-করা খাস জমির ধান কাটাকে কেন্দ্র করে ঘটনার সূত্রপাত। যাদের এই জমি চাষ করার জন্য বিলি করা হয়েছিল চাষের অন্তে ফসল তোলার অধিকার তাদের কাছ থেকে হরণ করার প্রচেষ্টা হয়েছিল। সংবাদে প্রকাশ, প্রাক্তন জমি-দারের বেনামদার লোকেরাই প্রথমে অন্যায়-ভাবে জোর করে ধান কাটতে যায় এবং যারা ওই জমি চাষ করেছিল, তারা বাধা দেয়। তারপর স্থানীয় এক নেতার মধ্য-স্থতায় ব্যাপারটা মিটে যায়, কিন্তু আকস্মিকভাবে পুলিশের উপস্থিতিতে ব্যাপারটি আবার অন্যদিকে মোড় নেয়। পুলিশ বিনা প্ররোচনায় কৃষকদের ওপর উক্ত হামলা চালায়। কল্যাণপুরের অনু-রূপ ঘটনা পশ্চিমবঙ্গের অন্যত্রও ঘটছে। বস্তুত প্রতি বছরেই ফসল ওঠার সময় এই রকম গণ্ডগোল পশ্চিমবঙ্গের প্রায় সকল গ্রামেই দেখা যায়। গতবারে ফসল সংক্রান্ত বিরোধ মীমাংসাকল্পে যুক্তফ্রন্ট সরকার ক্যাম্পকোর্ট বসিয়েছিলেন। এবারেও অনুরূপ কর্ম করা হয়েছে, তবে এক্ষেত্রে বিরোধগুলিকে বৃহৎ চাষী, জোতদার এদেরই স্বপক্ষে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। অবি-লম্বে ভূমিসংক্রান্ত একটি বাস্তবনীতি গৃহীত হওয়া উচিত। নতুবা একদল লোক প্রাণপাত করে চাষ করবে, আর মাঝখান থেকে অপরে তা জোর করে কেটে নিয়ে যাবে, বাধা দিতে গেলে পুলিশ এসে অপহরণকারীরই পক্ষ নেবে; এইরকম হতে দেওয়া যায় না।

ডানকুনিতে ছাত্রীহত্যা

ডানকুনি শ্রীরামকৃষ্ণ বিদ্যাশ্রমের অষ্টম শ্রেণীর ছাত্রী কুমারী রুমা কর গত ৪ঠা ডিসেম্বর তারিখে বিদ্যালয় থেকে প্রত্যা-বর্তনকালে তার বাড়ির নিকট থেকেই এক-দল দুর্বৃত্ত কর্তৃক অপহৃতা হয়। দুর্বৃত্তেরা তাকে প্রথমে ধর্ষণ করে এবং তারপর তাকে হত্যা করে একটি পুষ্করিণীর জলে ফেলে দেয়। তার পরের দিন মেয়েটিকে নোনা-পুকুর নামক স্থানীয় একটি পুষ্করিণীর জলে মৃতাবস্থায় ভাসতে দেখা যায়। তৎক্ষণাৎ বিধানসভার প্রাক্তন সদস্য শ্রীমনো-রঞ্জন হাজরা চণ্ডীতলা থানার ও-সি'কে জানান, ও-সি তৎক্ষণাৎ ঘটনাস্থলে আসেন এবং মৃতদেহটিকে তোলার ব্যবস্থা করেন। এখন সমগ্র কেসটি পুলিশের হাতে। স্থানীয় অধিবাসীদের পক্ষ থেকে শ্রীমনো-রঞ্জন হাজরা ও-সি'কে জানান যে, প্রকাশ্য দিবালোকে বাড়ির অত্যন্ত কাছাকাছি এই রকম একটি বর্বর পৈশাচিক ঘটনার অনু-ষ্ঠান প্রত্যেকটি লোককে সন্ত্রস্ত করে তুলেছে। এ অবস্থায় অপরাধীদের খুঁজে বার করতেই হবে।

ইতিমধ্যে একজন ধরা পড়েছে বলে শোনা গেছে। কিন্তু ঘটনাস্থলে আমাদের মনে হয় যে, এই ব্যাপারে দুষ্কৃতকারী সংখ্যায় বেশ কয়েকজন। দলবদ্ধভাবে ধর্ষণ ও পরে ধর্ষিতাকে হত্যা আজ পশ্চিমবঙ্গে ব্যাপকভাবে দেখা যাচ্ছে। আমাদের স্মরণে আছে আমাদেরই জনৈক সাংবাদিক বন্ধুর ভগ্নীর ঠিক একই অবস্থা হয়েছিল। সে-ক্ষেত্রে অবশ্য পুলিশ অতি দ্রুত অপরাধী-দের ধরতে সক্ষম হয়। চণ্ডীতলার ও-সি যতদূর আমরা জানি বা শুনেছি একজন তরুণ সদক্ষ অফিসার। স্থানীয় ভীত-সন্ত্রস্ত অধিবাসীরা তাঁর ওপর আস্থাশীল বলেও আমরা শুনেছি। এই জঘন্য হত্যাপ-রাধীদের তিনি গ্রেপ্তার করতে সমর্থ হবেন সে বিশ্বাস অনেকেরই আছে। আমরা এও আশা করি—যে-কোন চাপের নিকট তিনি নতিস্বীকার করবেন না। এ পোড়া দেশে জঘন্য অপরাধে অপরাধী ব্যক্তিদের পৃষ্ঠ-পোষকতা করার মত ভি-আই-পি'রও অভাব নেই। ডানকুনির আবগারী বিভাগ থেকে জানা যায় যে সেখানে বিয়াট চোলাই মদের ব্যবসায়ী দল আছে, ওয়াগন ভাঙা উঠতি মস্তানেরও দল আছে এবং প্রকাশ্য দিবালোকে তারা এইসব কাজ নির্বিঘ্নে চালিয়ে যাচ্ছে। এই অবস্থায় সেই দলের কাজই যে এটা নয় তা কে বলতে পারে?

এই জাতীয় ঘটনার পুনরাবৃত্তি যাতে বন্ধ হয় তার জন্য সরকারেরও কিছু কর্তব্য আছে। দুর্ভাগ্যক্রমে এইসব অপ-রাধের ক্ষেত্রে যে শাস্তির ব্যবস্থা আছে তা প্রয়োজনের তুলনায় নগণ্য। আমেরিকার মত দেশেও ধর্ষণের জন্য প্রাণদণ্ডের বিধান আছে। এদেশে শাস্তির মাত্রা সর্বক্ষেত্রেই অল্প হওয়ার জন্য অপরাধের সংঘটন অধিক হয়। তাছাড়া পুলিশবাহিনীকে অপরাধমূলক কার্যকলাপ দমনে উৎসাহিত করার পরিবর্তে নিষ্ক্রিয় করে তোলাই যেন সরকারের নীতি হয়ে দাঁড়িয়েছে। আমরা পূর্বে বারবার লিখেছি, পুলিশকে নিজ কর্মের ক্ষেত্র থেকে সরিয়ে এনে অন্যত্র নিযুক্ত করা শুধু অন্যায়ই নয়, নীতি-বিরুদ্ধও বটে। পুলিশকে অপরাধমূলক কাজ দমন করার পরিবর্তে রাজনৈতিক প্রয়োজনেই নিয়োগ করার ট্রাডিশান গত বিশ বছরে গড়ে উঠেছে। ধান-চাল ধরতে পুলিশ, ছাত্র-বিক্ষোভ দমন করতে পুলিশ, জনতার ওপর লাঠিচার্জ গুলীবর্ষণ করতে পুলিশ, বিরোধী রাজনৈতিক কর্মীদের পিছনে লেগে থাকতে পুলিশ, এত ধান্ধা সামলে অপরাধ ও অপরাধীর দিকে নজর দেবার সময় কোথায় পুলিশের। ফলে তার স্বাভাবিক কর্মের এলাকা থেকে পুলিশকে সরিয়ে আনার জন্য পুলিশের স্বক্ষেত্রে কর্মদক্ষতা হ্রাস পেয়েছে, যার পরিণামে অপরাধ ও সমাজবিরোধী কাজকর্ম দিনের পর দিন বেড়ে যাচ্ছে।

যাই হোক বর্তমান কেসটির অপরাধীরা যাতে ধরা পড়ে এবং চূড়ান্ত শাস্তি পায় সেই দাবিই আমরা পুলিশ ও কর্তৃপক্ষের নিকট করব। এই জাতীয় অপরাধের এমন শাস্তি হওয়া উচিত যা পুনরাপি এই জাতীয় অপরাধের সংঘটন বহুলাংশে রোধ করতে সমর্থ হবে।

রাষ্ট্রীয় পরিবহন

ত্রুটিপূর্ণ পরিকল্পনা, অযোগ্য পরি-চালন, দুর্নীতি, অপচয় ও স্বজনপোষণের জন্য রাষ্ট্রীয় পরিবহন শিল্প না হল স্বয়ং-সম্পূর্ণ না দেখল কোন লাভের মুখ। বর্তমানে এই শিল্প এক সংকটজনক অব-স্থায় উপনীত হয়েছে এবং রাষ্ট্রীয় পরিবহন কর্তৃপক্ষ লোকসানের দায়-দায়িত্ব শ্রমিক-কর্মচারীদের ঘাড়ে চাপানোর চেষ্টা করে-ছেন। অন্যদিকে দফায় দফায় ভাড়া বাড়িয়ে

জনগণের পকেট কেটে লোকসান উশুল করা ভিন্ন রাষ্ট্রীয় পরিবহন কর্তৃপক্ষ আর কিছুই করতে পারেন নি। সম্প্রতি আর একদফা ভাড়া বাড়ানোর অপচেষ্টা চলছে, তবে এ পর্যন্ত এখনো তা হয় নি, যদিও সংবাদপত্রে ঘোষণার অভাব এ বিষয়ে নেই। পরিবহনের ক্ষেত্রে ভাড়া বাড়াবার যে ঘোষণাগুলি করা হয়েছে, আপাতত স্থগিত থাকলেও, তা বলবৎ একদিন-না-একদিন হবে, যখন কর্তাদের মাথায় এই ভূত একবার চেপেছে। ফলে ভাড়া বাড়বে স্টেট বাসের, ভাড়া বাড়বে ট্রামের এবং ভাড়া বাড়বে প্রাইভেট বাসের। কিন্তু সত্যই কি এর কোন প্রয়োজনীয়তা আছে? রাজ্য সরকারের হিসাবমত রাষ্ট্রীয় পরিবহনের ঘাটতি পূরণ বাবদ বছরে এক কোটি চুয়াল্লিশ লক্ষ টাকা দিতে হয়। কিন্তু ভাড়া না বাড়িয়ে কি এই ঘাটতি পূরণ করা যায় না? রোড ট্যাক্স ও মোটর ভিহিকল্‌সের বিভিন্ন ট্যাক্স যদি পুরো-পুরি আদায় করা যায় তাহলে ভরতুকির টাকা যোগান দেওয়া যেতে পারে ভাড়া না বাড়িয়ে। এই বিভাগ থেকে যা আদায় হওয়া উচিত তার এক-তৃতীয়াংশও আদায় হয় কি-না সন্দেহ। রোড ট্যাক্স বর্ধিত করতেও কোন অসুবিধা নেই। সমীক্ষায় প্রকাশ যে পশ্চিমবঙ্গে এই ট্যাক্সের হার ভারতের অন্যান্য সকল রাজ্যের চেয়ে অনেক কম। গুডস্-ট্রান্স তদন্ত কমিটির সামনে ১৯৬৬ সালের সেপ্টেম্বর মাসে লরি মালিকেরা স্বেচ্ছায় শতকরা পাঁচ টাকা ট্যাক্স বৃদ্ধি মেনে নেওয়া সত্ত্বেও আজ পর্যন্ত সেই বাড়তি ট্যাক্সের এক পয়সাও আদায় করা হয় নি। তাহলে দেখা যাচ্ছে যে সত্যই যদি ভরতুকি দিয়েই রাষ্ট্রীয় পরিবহনকে টিকিয়ে রাখতে হয়, তাহলে ভাড়া বৃদ্ধি না করেই তা করা সম্ভব। এবং এরপর যে প্রশ্নটি অনিবার্যভাবেই আসছে তা হচ্ছে এই যে, ভরতুকি দেবার আদৌ কোন প্রয়োজনীয়তা আছে কি-না?

এম-ডি প্রসঙ্গ

গত সংখ্যার আগের সংখ্যার সাপ্তাহিক বসুমতীর এই বঙ্গদর্শন বিভাগে এম-ডি পরীক্ষা সংক্রান্ত ব্যাপারে কিছু মন্তব্য করা হয়েছিল। আমাদের সেই বক্তব্যের স্বপক্ষে ও বিপক্ষে অনেক চিঠিপত্র আসছে এবং এই বিষয়টিকে উপলক্ষ করে চিকিৎসক মহলে অদ্ভুত আলোড়নের সৃষ্টি হয়েছে। দলে দলে চিকিৎসক, এম-ডি পরীক্ষার্থী আমাদের এখানে আসছেন এবং নিজ নিজ বক্তব্য প্রকাশার্থে রেখে যাচ্ছেন। প্রত্যেকেরই ইচ্ছা এই চিঠিগুলি যাতে প্রকাশিত হয়। আমরা লিখেছিলাম যে, এই সংখ্যাতেই বঙ্গদর্শন লেখকের বক্তব্য প্রকাশ করব। কিন্তু পত্রগুলির প্রকাশ শেষ না হওয়া পর্যন্ত তা তো সম্ভব হতে পারে না, কাজেই বারান্তরে এই বিষয়ে আমাদের বক্তব্য প্রকাশিত হবে।

প্রসঙ্গত একটি কথা এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন বলে মনে করি। কোন কোন পত্রলেখক লিখেছেন যে, আমাদের বক্তব্য কতিপয় স্বার্থান্বেষী ব্যক্তির উদ্দেশ্যপ্রণো-দিত অপপ্রচার। এটা ঠিক নয়, এখানে আমাদের কারোরই কোন স্বার্থ নেই। সাপ্তাহিক বসুমতীর পাঠকমাত্রই জানেন যে, সাপ্তাহিক বসুমতী তার নবপর্যায়ে জন্মলাভের পর থেকে চিকিৎসা, জনস্বাস্থ্য সংক্রান্ত নানা সমস্যার ওপর চূড়ান্ত গুরুত্ব আরোপ করে এসেছে। কেন না এগুলি জনজীবনের সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে সম্পর্কিত। ব্যক্তিবিশেষকে লোকচক্ষে হেয় করা আমাদের উদ্দেশ্য নয়, কাজও নয়।

বন্যার্ত শিল্পী, সাহিত্যিক ও সাংবাদিকদের সাহায্য দান

গত ১০ই ডিসেম্বর জলপাইগুড়িতে এক মনোজ্ঞ অনুষ্ঠানে সাপ্তাহিক বসুমতী উত্তরবঙ্গ বন্যাত্রাণ কমিটির পক্ষ থেকে বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত শিল্পী, সাহিত্যিক ও সাংবাদিকদের সাহায্য বণ্টন করা হয়।

অপরাহ্নে স্থানীয় গোপালপুর হাউস হলে শহরের বিশিষ্ট ব্যক্তিদের উপস্থিতিতে এক অনুষ্ঠানে এই সাহায্য বণ্টন করা হয়। বিশিষ্ট সমাজসেবী ও উত্তরবঙ্গের ত্রাণকার্য সংগঠনের অন্যতম প্রধান উদ্যোগী শ্রীবীরেন্দ্রচন্দ্র ঘোষ এই অনুষ্ঠানে পৌরোহিত্য করেন। জলপাইগুড়ি জেলা সাংবাদিক সমিতির সভাপতি এবং বিশিষ্ট সাহিত্যিক, সমাজসেবী ও জননেতা ডাঃ চারুচন্দ্র সান্যাল শিল্পী, সাহিত্যিক

ডঃ চারুচন্দ্র সান্যালের হাত থেকে জলপাই গুড়ির প্রবীণ সংগীতশিল্পী শ্রীকেশু বসু সাপ্তাহিক বসুমতী উত্তরবঙ্গ বন্যাত্রাণ কমিটির সাহায্য গ্রহণ করছেন। পাশে বসে আছেন অনুষ্ঠানের সভাপতি শ্রীবীরেন্দ্রচন্দ্র ঘোষ এবং মাঝখানে দাঁড়িয়ে আছেন অধ্যাপক নির্মল বসু।

সাংবাদিকদের মধ্যে সাপ্তাহিক বসুমতী উত্তরবঙ্গ বন্যাত্রাণ কমিটির সাহায্য বণ্টন করেন।

এইদিনের অনুষ্ঠানে সাতটি সঙ্গীত ও যাত্রা প্রতিষ্ঠান, সাতজন সঙ্গীতশিল্পী, দশজন সাংবাদিক ও তিনজন সাহিত্যিককে নগদ অর্থ দেওয়া হয়।

অনুষ্ঠানের প্রারম্ভে সাপ্তাহিক বসুমতী উত্তরবঙ্গ বন্যাত্রাণ কমিটির সহকারী সভাপতি অধ্যাপক নির্মল বসু বন্যার্তদের সেবায় ত্রাণ কমিটির উদ্যোগের বিবরণ দেন। কিভাবে বাংলার প্রবীণ ও নবীন বিশিষ্ট সাহিত্যিক, কবি, সাংবাদিক, শিল্পী, চিকিৎসক কলকাতায় পথপরিক্রমা করে উত্তরবঙ্গের বন্যার্তদের জন্য অর্থ এবং অন্যান্য জিনিস সংগ্রহ করেন, সে সম্পর্কে তিনি বলেন। শিল্পী, সাহিত্যিক, সাংবাদিকদের জন্য সাহায্য দেবার সিদ্ধান্তের কথা জানিয়ে তিনি বলেন, এঁদের দিকে কারও নজর পড়ে নি বলেই প্রয়োজনের তুলনায় অতি সামান্য হলেও সাপ্তাহিক বসুমতীর ত্রাণ-কমিটি এঁদের প্রতীক-সাহায্যদানে সাহসী হয়েছে। ভবিষ্যতে আরও বেশি ব্যক্তিকে সাহায্য দেবার জন্য চেষ্টা করা হবে বলে তিনি জানান। অধ্যাপক বসু বক্তৃতা প্রসঙ্গে উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন স্থানে সাপ্তাহিক বসুমতীর ত্রাণকার্যের বিস্তৃত বিবরণ দেন।

সভাপতির ভাষণে শ্রীবীরেন্দ্রচন্দ্র ঘোষ সাপ্তাহিক বসুমতীর ত্রাণ-কমিটির উদ্যোগের ভূয়সী প্রশংসা করে বলেন, একটি অতি বড় প্রয়োজনের প্রতি তাঁরা আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। তিনি জলপাইগুড়ি তথা উত্তরবঙ্গের জনসাধারণের পক্ষ থেকে এই ত্রাণ-কমিটির কর্তৃপক্ষ এবং উদ্যোগী শিল্পী, সাহিত্যিকদের ধন্যবাদ জানান।

ডঃ চারুচন্দ্র সান্যাল বলেন, আজকের অনুষ্ঠানে এসে ও এই ত্রাণকার্যের সঙ্গে যুক্ত হতে পেরে তিনি অত্যন্ত আনন্দিত বোধ করছেন। তিনি বলেন, যাঁরা মাথার কাজ করেন, যাঁরা মানুষের মনের খোরাক যোগান তাঁরা ভিড়ের আড়ালে থাকেন বলে সাধারণত কারও নজর তাঁদের দিকে পড়ে না। তাই দেখা যাচ্ছে, বিরাট ত্রাণযজ্ঞে অসহায় শিল্পী, সাহিত্যিকদের কোন স্থান নেই। সাপ্তাহিক বসুমতী উত্তরবঙ্গ বন্যাত্রাণ-কমিটি এঁদের সাহায্যে এগিয়ে এসে একটি মহৎ কাজ করলেন, একটি মহৎ দৃষ্টান্ত স্থাপন করলেন। সাহায্যের পরিমাণ যত কমই হোক এর সঙ্গে যে প্রীতির স্পর্শ আছে, যে দরদী মনের যোগ রয়েছে, তা সবাইকে অভিভূত করেছে।

যাঁরা সাহায্য পেলেন তাঁদের পক্ষ থেকে ধন্যবাদ দিতে উঠে সাহিত্যিক শ্রীনির্মলেন্দু গৌতম বলেন, যখন তিনি এই অনুষ্ঠানে যোগ দেবার ও সাহায্য গ্রহণের আহ্বান পেলেন, তখন তিনি একটু বিস্মিতই হয়েছিলেন। বন্যায় সর্বস্বান্ত তাঁদের কথা সমাজ ভোলে নি, সাপ্তাহিক বসুমতীর ত্রাণ-কমিটির এই প্রচেষ্টা এই কথাই প্রমাণ করল। এর ফলে তাঁরা নতুন করে শক্তি ও উদ্দীপনা লাভ করবেন।

জলপাইগুড়ি জেলা বন্যাক্লিষ্ট শিল্পী সমিতির সভাপতি শ্রীগণেশ রায় (দৈলা-বাবু) অসুস্থ শরীর নিয়েও এই অনুষ্ঠানে বিশিষ্ট অতিথিরূপে উপস্থিত ছিলেন। অসুস্থতার জন্য আনুষ্ঠানিক বক্তৃতা না করলেও তিনিও তাঁর শুভেচ্ছা জানান।

অনুষ্ঠান শেষে সাপ্তাহিক বসুমতী উত্তরবঙ্গ বন্যাত্রাণ-কমিটির পক্ষে জলপাইগুড়ি কেন্দ্রের ভারপ্রাপ্ত স্থানীয় উচ্চতর মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয়ের প্রধানা শিক্ষয়িত্রী শ্রীমতী আশা গুপ্তভায়া উপস্থিত সকলকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন।

সাপ্তাহিক বসুমতী উত্তরবঙ্গ বন্যাত্রাণ কমিটির উত্তরবঙ্গ সংগঠক শ্রীমুকুলেশ সান্যাল, জেলা বন্যাক্লিষ্ট শিল্পী সমিতির সম্পাদক শ্রীপ্রবীর রায় প্রমুখ অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন।

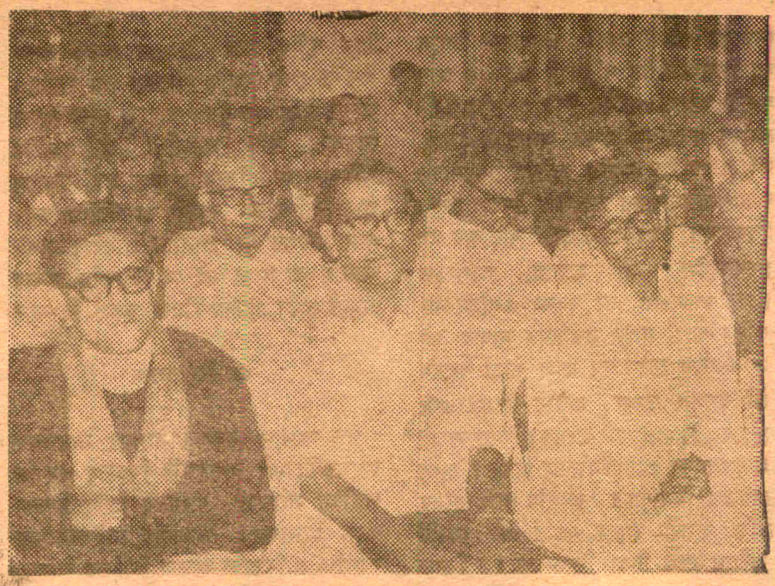

চিত্রে জলপাইগুড়িতে সাপ্তাহিক বসুমতীর আয়োজিত অনুষ্ঠানে উপস্থিত শিল্পী সাহিত্যিক ও সাংবাদিকদের একাংশকে দেখা যাচ্ছে।

উত্তরবঙ্গে সাপ্তাহিক বসুমতীর ত্রাণকার্য

উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন স্থানে সাপ্তাহিক বসুমতী উত্তরবঙ্গ বন্যাত্রাণ-কমিটির পক্ষ থেকে কয়েকটি ত্রাণকেন্দ্র খোলা হয়েছে। এই কেন্দ্রগুলি থেকে বিভিন্নভাবে বন্যার্তদের মধ্যে নগদ অর্থ, কম্বল, পুরনো জামা-কাপড়, বেবি ফুড, ওষুধ প্রভৃতি বণ্টন করা হয়েছে।

নিচে জেলাগতভাবে বিভিন্ন কেন্দ্র, এবং এই কেন্দ্রগুলির দায়িত্বে যাঁরা রয়েছেন, তাঁদের নাম দেওয়া হল ঃ

জলপাইগুড়ি জেলা ঃ (১) জলপাইগুড়ি উচ্চ মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয়ের প্রধানা শিক্ষয়িত্রী শ্রীমতী আশা গুপ্তভায়া। (২) ময়নাগুড়ি—ময়নাগুড়ি উচ্চ মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয়ের প্রধানা শিক্ষয়িত্রী শ্রীমতী ইরাণী মিত্র (৩) মাণিকগঞ্জ—মাণিকগঞ্জ জুনিয়ার হাই স্কুলের প্রধান শিক্ষক শ্রীসুধাংশু মজুমদার।

কোচবিহার জেলা ঃ (১) হলদিবাড়ি—হলদিবাড়ি উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের সহকারী প্রধান শিক্ষক শ্রীউপেন্দ্রমোহন দে। (২) পার-মেখলিগঞ্জ — পার-মেখলিগঞ্জ অঞ্চল পঞ্চায়েতের প্রধান শ্রীরবি রায়।

পশ্চিম দিনাজপুর জেলা ঃ (১) ডালখোলা—ডালখোলা উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক শ্রীঅরুণচন্দ্র ঘোষ (২) বালুরঘাট—শ্রীপ্রভাস সমাজদার (৩) ইসলামপুর—ইসলামপুর কোর্টের এ্যাডভোকেট শ্রীদেবকুমার ঘোষ।

খবরের কাগজের প্রথম পাতা

খবরের কাগজের প্রথম পাতা খুললেই দেখা যাবে ভারতবর্ষের প্রধান প্রধান শহরের অধিকাংশ কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় এখন বন্ধ, না ছুটি নয়, তারা এখন যুদ্ধকালীন শান্তি উপভোগ করছে। কিসের যুদ্ধ? শেষ পর্যন্ত ছাত্র-পুলিশ, কিন্তু তার আগে কর্তৃপক্ষের সঙ্গে এবং নিজেদের মধ্যে এই যে যুদ্ধ যা এখন প্রায় প্রাদেশিক জলবায়ুর সঙ্গে মিশে গেছে, তার কারণ বুঝে ওঠা ভার। ছাত্রদের মধ্যে রাজনৈতিক দলাদলি, কলেজ বা বিশ্ব-বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের সঙ্গে সংঘর্ষ, ছাত্র-ছাত্রীর বহিষ্কারে অসন্তোষ ইত্যাদি ঘটনা থেকেই শুরু হয় বিশৃঙ্খলা, তারপর সেই বিশৃঙ্খলা বাড়তে থাকে, বাড়তে বাড়তে এমন অবস্থায় পৌঁছোয় যখন বিদ্যায়তনের দরজা বন্ধ করে না দেওয়া ছাড়া কোনো উপায় থাকে না। এমনিতেই প্রচুর ছুটি উপভোগ করেন বলে শিক্ষককুল অপবাদে কলঙ্কিত, তারপরে যদি বছরের কর্মদিবস কমতে কমতে একটি লজ্জাকর অঙ্কে এসে ঠেকে, তখন আর কিছুতেই তাঁদের বাঁচানো যাবে না। মুস্কিল হচ্ছে এই যে, ছুটি-ছাটা যাই থাকুক না কেন, নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে তাদের পাঠ্যবইগুলি শেষ করতে হয়—অন্তত, করার কথা। কিন্তু যদি খোঁজ খবর নেওয়া যায় তাহলে দেখা যাবে যে, কলেজের অনার্স ক্লাশে টেস্ট পরীক্ষা পর্যন্ত যা পড়ানো হয়, তার সঙ্গে সমগ্র পাঠ্যসূচীর ব্যবধান হতাশাব্যঞ্জক, কৃত-কর্মের সঙ্গে করণীয়ের ফারাক মনস্তাপের যোগ্য বিষয়। এর পরেও যদি কলেজের দরজা অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ হয়ে যায়, তবে কী ঘটবে তা সহজেই অনুমেয়ঃ ছাত্ররা উদ্যোগী হয়ে বাড়িতে নিজেদের পড়া তৈরি করে আসন্ন পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত হবে, এমন ভাবতে পারলে সুখী হতুম, কিন্তু তা নিশ্চয়ই হবে না, হবে একটি আন্দোলনের জন্ম এবং সেই আন্দোলনের স্নিগ্ধ শ্লোগান—'পরীক্ষা পিছিয়ে দিতে হবে।'

ছাত্র-উজেজনা ব্যাপারটি এখন দেশের সর্বত্র উত্তেজিত বিতর্ক সৃষ্টি করছে। অর্থনৈতিক চাপ, চাকুরি সম্পর্কে হতাশা, নানা রাজনৈতিক মতবাদের ঘূর্ণাবর্ত। সমাজজীবনের বহুবিধ টানা-পোড়েনে ছাত্রদের পক্ষে এখন আর অধ্যয়নকে তপস্যা মনে করা অসম্ভব (নাকি সেকেলে)—হয়তো এই সমস্ত কারণের যোগফলেই উদ্ভূত তাদের অসন্তোষ ও উত্তেজনা। এই কারণগুলির কোনোটিকেই যখন দূর করা আপাতত অসম্ভব, তখন বিশৃঙ্খলা ও উত্তেজনাকে মেনে নেওয়া ছাড়া অন্য কোন উপায় দেখি না। ফলত, কলেজ বা বিশ্ববিদ্যালয় বছরের অধিকাংশ সময় ছাত্র-অসন্তোষজনিত কারণে বন্ধ থাকবে, এ ঘটনা এখন স্বাভাবিক। এবং যে মুষ্টিমেয় দিন শিক্ষালয়ে পড়াশুনো হয়, তা ভারী পাঠ্যসূচীর তুলনায় নিতান্তই অল্প সময়। এইজন্যই পরীক্ষা পিছিয়ে দেবার শ্লোগান ওঠে, প্রশ্ন-পত্রকে অকারণে সিলেবাস-বহির্ভূত মনে হয়, অজানা প্রশ্নই শক্ত প্রশ্ন হয়ে ওঠে, 'গ্রেস' নম্বরের লজ্জা গায়ে উড়ে আসে।

যাকে বলে, সসম্মানে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়া, সেই সম্মান লাভ করার জন্য একজন ছাত্রকে একটি কাজই করতে হয় এবং সেই কাজটি পড়াশুনো। কিন্তু পড়াশুনো করবার জন্য সময় চাই, চাই মানসিক স্থিরতা, নিজেকে অকারণে ব্যস্ত না করা। এমন কিছু নতুন কথা বললুম না, সব সময় নতুন কথা বলবার দরকারও নেই, দরকার পুরোনো কথাই আবার শুনিয়ে দেওয়া। কিন্তু ছাত্ররা যদি সারা বছরই কোনো-না-কোনো কারণে আন্দোলিত হতে থাকেন, যদি ট্রাম-বাসের ভাড়া বৃদ্ধি থেকে শুরু করে প্রেসিডেন্ট জনসনের ভিয়েতনাম-নীতি পর্যন্ত সমস্ত বিষয়ই তাঁদের মিছিলে হাঁটায়, প্রতিবাদে ডাক দেয়, তবে লেখাপড়া হবে কী করে? আবার দেখুন, বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষায় বেশি সংখ্যক ছাত্র-ছাত্রী ফেল করলেও বিপদ, তখন কর্তৃপক্ষ কী জবাবদিহি করবেন? তখন হয়তো এই অভিযোগ উঠবে যে কলেজে পড়াশুনো হয় না, পাঠ্যসূচী দীর্ঘ, নম্বর দেওয়ার ব্যাপারে কড়াকড়ি হয়েছে ইত্যাদি।

* * *

ঘটনাগতির এই পরিণাম দেখে দেখে এখন মনে হয় যে, পরীক্ষার সিলেবাস ও পরীক্ষাপদ্ধতির আমূল পরিবর্তনের সময় এসেছে কি না। কলেজে ঢোকার আগে ছাত্রদের যে দুটি পরীক্ষা দিতে হয়, স্কুল ফাইনাল ও হায়ার সেকেণ্ডারি, তার জন্য পড়তে হয় যথা-ক্রমে দুই ও তিন বছর। হায়ার সেকেণ্ডারিতে ইংরেজির দুশো নম্বর শুধু 'কম্পোজিশন'-এর ওপর ছিল, এই প্রথার সমাপ্তি ঘোষিত হলো এই বছর। পরের বছর থেকে যারা পরীক্ষা দেবে তাদের টেক্স্ট বই পড়তে হবে, সঙ্গে অন্যান্য বিষয়গুলিও থাকবে যাতে পরিক্ষার্থীদের রচনাশক্তি প্রমাণিত হয়। হঠাৎ আবার টেক্স্ট বই ঢুকিয়ে দেবার কী সদুদ্দেশ্য আমরা বুঝতে পারি না; যাঁরা টেক্স্ট বই বাদ দিয়ে-ছিলেন, তাঁরা নিশ্চয়ই কাণ্ডজ্ঞানহীন

ছিলেন না, ছাত্রদের হিতৈষীই ছিলেন। ভেবেচিন্তেই তো তাঁরা কাজটি করেছিলেন, সুতরাং এখন যখন আবার পাঠ্যসূচী পরিবর্তিত হলো, তখন কি আমরা ধরে নেবো যে, বর্তমান পাঠ্যসূচীই ঠিক, ছাত্রদের পক্ষে সহজ ও মঙ্গলজনক? এত ঘন ঘন যদি কর্তাব্যক্তিদের মতিগতি পাল্টায়, তবে এমন ধারণাই হয় যে, তাঁদের মধ্যে সংহতি নেই, কিসে ছাত্রদের ভালো হবে তা তাঁরাও জানেন না, ছাত্রদের পরীক্ষা নেওয়ার বদলে তাঁরা ছাত্রদের ওপরেই পরীক্ষা চালাচ্ছেন।

স্কুল ফাইনাল পাশ করে কলেজে ঢোকার পর ছাত্রদের প্রি-য়ুনিভার্সিটি পরীক্ষা দিতে হয়। আমি অনেকদিন এই নামটি নিয়ে ভেবেছি; পরীক্ষাটি যখন য়ুনিভার্সিটিই নেন, তখন তার আগে 'প্রি' কথাটি যোগ করার মানে কী? এই পরীক্ষাটি বি. এ. বা বি. এস্‌সি ক্লাশে প্রবেশের ছাড়পত্র; সুতরাং প্রি-য়ুনিভার্সিটি পরীক্ষা বলবো কেন, বড় জোর বলতে পারি প্রি-গ্র্যাজুয়েশন পরীক্ষা, প্রি-মেডিক্যাল বা প্রি-ইঞ্জিনীয়ারিং পরীক্ষার মতো। আর যদি নিতান্তই এই নামটি রাখতে হয়, তবে পরীক্ষাগ্রহণের দায়িত্ব নিন বোর্ড অব্ সেকেণ্ডারি এডুকেশন—তখন অন্তত হায়ার সেকেণ্ডারির সঙ্গে স্কুল ফাইনালের একটি সমতা খুঁজে পাওয়া যাবে, এবং হায়ার সেকেণ্ডারির সঙ্গেই প্রি-য়ুনিভার্সিটি পরীক্ষা নেওয়া যাবে। যেভাবেই হোক না কেন, বিদ্যালয়ে এগারো বছর ছাত্রদের তখন কাটাতে হবে, পড়াশুনোর মধ্যে একটি অনবচ্ছিন্নতা থাকবে। স্কুল ফাইনালের পর প্রচলিত প্রি-য়ুনিভার্সিটি পরীক্ষাটি বেশ খাপছাড়া একথা মানতেই হবে,—পরিবেশ ভিন্ন পাঠ্যসূচী দীর্ঘ, ইতিমধ্যে ছাত্ররা যা জেনেছে তার সঙ্গে যা পড়তে হবে তার বিচ্ছিন্নতা স্পষ্ট। সমস্ত ব্যাপারটি যদি বিদ্যালয়ের পরিবেশেই নিষ্পন্ন হতো, তাহলে স্কুল ফাইনালের দু' বছরে অর্জিত বিদ্যাকে ছাত্ররা তৃতীয় বছরের প্রি-য়ুনিভার্সিটি পরীক্ষায় অসন্দিগ্ধভাবে কাজে লাগাতে পারতো, তৃতীয় বছরের 'কোর্স'টি অনেক হাল্কা হয়ে যেতো। কিন্তু এখন এই তথাকথিত প্রি-য়ুনিভার্সিটি একটি পুরো দস্তুর ভারী পরীক্ষার বিভীষিকা ধারণ করে আছে।

বলা বাহুল্য, যারা স্কুল ফাইনাল পাশ করছে, তারা প্রি-য়ুনিভার্সিটি (বা এস্. এফ্.২) পরীক্ষাটি তাদের নিজেদের স্কুল থেকে দিতে পারছে না। কারণ স্কুলটি হায়ার সেকেণ্ডারি স্কুল নয়। সুতরাং হায়ার সেকেণ্ডারি স্কুলে তাদের ভর্তি হতে হবে, এইচ্. এস্. ছাত্রদের সঙ্গেই তাদের পরীক্ষায় বসতে হবে। যদিও ভিন্ন প্রশ্নপত্রে। এই পরিকল্পনার দু'টি উদ্দেশ্য—এক, ছাত্রদের ওপর থেকে পি. ইউ.-এর অকারণ বোঝা নামানো এবং দুই, আরো একটি বছর তাদের বিদ্যালয়ে আটকে রাখা। দ্বিতীয় উদ্দেশ্যের পক্ষে এইটুকু বলতে পারি যে, কলেজজীবনের আয়ু এক বছর কমে গেলে (আমি আইনসিদ্ধ ন্যূনতম সময়টি ধরছি) ছাত্রদের ভালোই হবে, কারণ আজকাল কলেজ-টলেজের যা আবহাওয়া তা তো খবরের কাগজের প্রথম পাতা খুললেই জানতে পারছেন, আমি আর কী বলবো?

—সদ্য প্রকাশিত হইয়াছে !!—

বহুকাল পরে পুনর্মুদ্রণ

"নবীনবাবু বর্ণনা এবং গীতিতে একপ্রকার মন্ত্রসিদ্ধ।..... এই সকল বিষয়ে তাঁহার লিপিপ্রণালীর সঙ্গে বাইরণের লিপিপ্রণালীর বিশেষ সাদৃশ্য দেখা যায়। ....বায়রণের ন্যায় নবীনবাবু বর্ণনায় অত্যন্ত ক্ষমতাশালী।..... নবীনবাবুর যখন স্বদেশ বাৎসল্য স্রোতঃ উচ্ছলিত হয়, তখন তিনিও রাখিয়া ঢাকিয়া বলিতে জানেন না।"—বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।

মহাকবি

নবীনচন্দ্র সেনের গ্রন্থাবলী

রৈবতক কাব্য ।। কুরুক্ষেত্র প্রভাস

গ্রন্থের পৃষ্ঠা সংখ্যা ৩০৮।

মূল্য মাত্র সাত টাকা।

বসুমতী প্রাইভেট লিমিটেড ঃ ১৬৬, বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী ষ্ট্রীট, কলিকাতা—১২

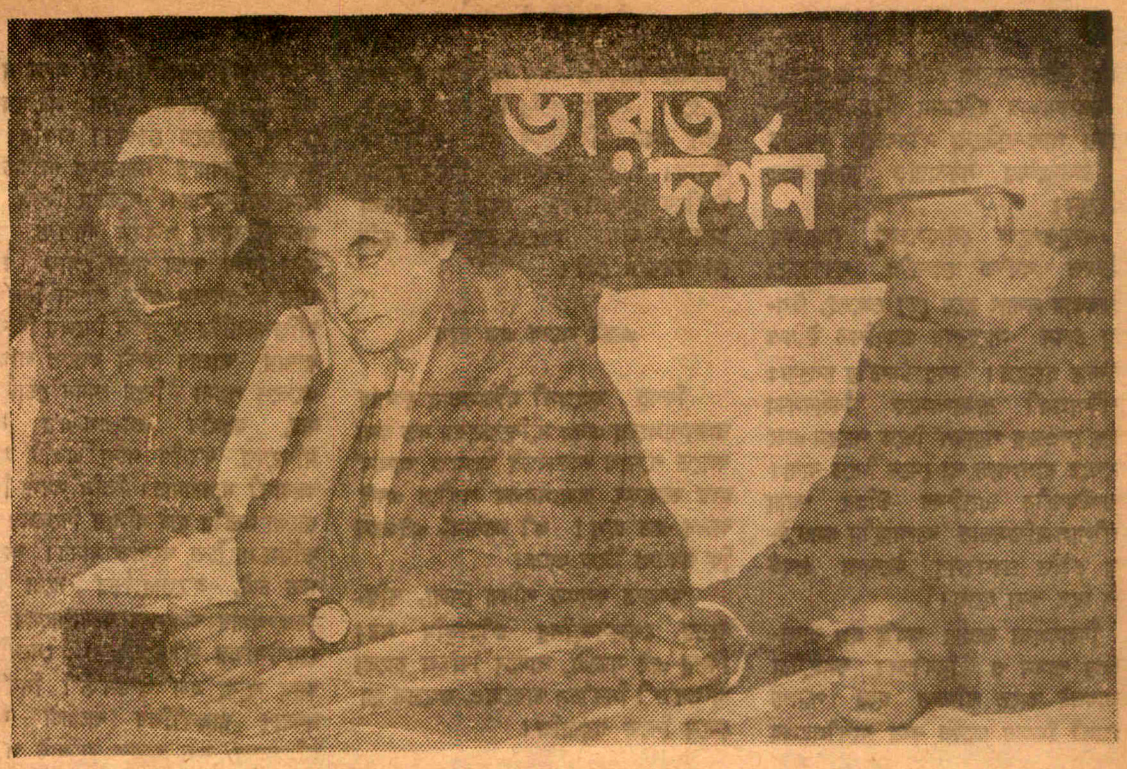

হরিয়ানার সঙ্কট সম্পর্কে আলোচনারত কংগ্রেসের তিন প্রধান—শ্রীমোরারজী দেশাই, শ্রীমতী গান্ধী ও নিজলিংগাপ্পা

হরিয়ানার আলোকে রাজনীতি ফেরৎ মাঘের শীত

কথায় বলে এক মাঘে শীত যায় না। কংগ্রেসের ভাগ্যে কথাটা বংশীলাল-সরকার এমনভাবেই প্রমাণ করে দেবেন এবং এত তাড়াতাড়ি, বস্তুত একে ললাট-লিখন ছাড়া আর কী-ই বা বলা যেতে পারে। হরিয়ানার বর্তমান সরকারের প্রতি সংখ্যা-গুরু সদস্যের সমর্থন নেই। এই দাবির উত্তরে বিধানসভায় শক্তিপরীক্ষায় নামতে যে কোন কারণেই হোক, শ্রীযুত বংশীলাল নারাজ হয়ে দিন কেবল পিছিয়ে দিয়েছেন। তাঁর সৌভাগ্য, তিনি কংগ্রেস হাই কম্যাণ্ডের স্নেহধন্য এবং হরিয়ানা রাজ্যে ধর্মবীরের মতো জবরদস্ত রাজ্যপাল নেই, আছেন শ্রী বি এন চক্রবর্তী মহাশয়। সুতরাং সন্ধ্যারাতে বংশীলালের সরকার কেড়ে নেওয়ার পশ্চিমবঙ্গীয় প্রথা সেখানে যথার্থ কারণেই গৃহীত হয় নি। বংশীলাল খোদ হাই কম্যান্ডের মনোনীত। রাজ্যপাল তাঁকে সময় না দিয়ে যাবেন কোথায়। সময় তাঁকে দিতে হয়েছে এবং রাজ্যপাল বলছেন, আহা, বেকায়দা মুখ্যমন্ত্রীকে আর পীড়াপীড়ি করার দরকার নেই। রাজ্যপাল তাতে অসুবিধা বোধ করছেন। 'থাউক গা জাউক!' বংশীলালের ২৭শে জানুয়ারী তক সময় দরকার (হয়ত এর মধ্যে দাবার ছক পুনরায় সামলে কিস্তির ধাক্কায় সামাল দিতে পারবেন তিনি), তা তাই দেওয়া যাক।

রাজ্যপালের এ হেন সহানুভূতি কিন্তু পশ্চিমবঙ্গের ভাগ্যে জোটে নি। অজয় মুখার্জি-মন্ত্রিসভাকে রাতারাতি পেড়ে ফেলে ডঃ প্রফুল্ল ঘোষের শাসন চাপিয়ে দিয়ে গুরুতর সংসদীয় সঙ্কট সৃষ্টি করা হয়েছিল সেখানে। যার ফলে আদিল্লী টাল-মাটাল হয়েছে। চ্যবন সাহেবের চিত্ত-চমৎকার ঘটেছে। শেষে স্পীকার সম্মেলন পর্যন্ত ডাকাডাকি করে বিজয় ব্যানার্জি মহোদয়ের ঐতিহাসিক রুলিংয়ের দাপট সামলাতে হয়েছিল। এত সব করা হয়েছিল, কারণ পশ্চিমবঙ্গে হাই কম্যান্ডের আশীর্বাদপুত মন্ত্রিসভা ক্ষমতায় আসীন ছিলেন না। যেমন বলা যেতে পারে, দেশের কুত্রাপি ল' এ্যান্ড অর্ডারের পান থেকে চুন খসে নি ডাকাতি, রাহাজানি এবং সামালহীন বিক্ষোভাদির পরেও, কেবল যত গণ্ডগোল দেখা দিচ্ছে কেরালা রাজ্যে। এ-ও তেমনি নিজের বেলা আঁটি-সুঁটি ব্যবস্থা আর কি।

পশ্চিমবঙ্গ পরিস্থিতির পর যে স্পীকার সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছিল তাতেও বিধানসভার সদস্যগণই মন্ত্রিসভা ভাঙা-গড়ার মালিক বলে বিবেচিত হয়েছিলেন। বলা হয়েছিল, মন্ত্রিসভার ওপর আস্থা আছে কি নেই, এই গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নের মীমাংসা শুধু বিধানসভার সদস্যরাই করতে পারেন। আর সেজন্যই সদস্যরা যদি এ ব্যাপারটার ফয়সালা করতে চান, তবে মুখ্যমন্ত্রীর কর্তব্য হবে সপ্তাহ-কালের মধ্যে বিধানসভার অধিবেশন আহ্বানের জন্য রাজ্যপালকে পরামর্শ দান করা।

লোকসভায় উত্তেজনা

লোকসভার সদস্যবর্গ এই কারণেই উত্তেজনায় বিস্ফোরিত হয়েছিলেন। উপাধ্যক্ষ যখন রুলিং দিলেন যে, হরিয়ানায় বিধানসভার অস্তিত্ব (বৈঠক নয়) থাকাকালীন লোকসভায় এতদ্বিষয়ে আলোচনা চলতে পারে না, তখন ক্ষুব্ধ সদস্যরা যথার্থই প্রশ্ন উত্থাপন করেনঃ সে কি, এমন নীতিধর্মের কথা তো পশ্চিমবঙ্গের ক্ষেত্রে শোনা যায় নি। বংশীলাল-সরকারকে শক্তিপরীক্ষা এড়িয়ে যাওয়ার সুযোগ দেওয়া হচ্ছে বলে তাঁরা অভিযোগ করেন। অথচ স্পীকার নিজে মনে করেন হরিয়ানার বিধানসভা আহূত হওয়া উচিত ছিল। বিরোধীকণ্ঠে কণ্ঠ মিলিয়ে শ্রীপ্রকাশবীর শাস্ত্রী বলেছেনঃ কয়েকটি রাজ্যে আসন্ন অন্তর্বর্তী নির্বাচনের কথা মনে রেখে সমস্ত ঘটনা-বলী ব্যাখ্যা করার দায়িত্ব কংগ্রেসী সরকার এড়িয়ে যেতে পারেন না। হরিয়ানা বিধানসভা আহূত না হলে লোকসভায় এ বিষয়ে আলোচনা চলতে

হরিয়ানা-রাজনীতিতে সকল গোষ্ঠী ও সম্প্রদায় থেকে মন্ত্রী বাছাই করে নিয়ে ভেবেছিলেন, এম-এল-এ নিলাম ঘরে স্থায়ী তালা ঝোলানোর চমৎকার ব্যবস্থা তিনি করে ফেলেছেন। সুতরাং ভি ডি শর্মাকে অতঃপর তিনি বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ প্রদর্শনে আর ইতস্তত করলেন না।

মহাজনের চোখে তখন বিরাগবহ্নি পুনশ্চ প্রজ্বলিত হতে শুরু করল। আবার ফ্লোর-ক্রশিং-এর হাওয়া বইয়ে দেওয়ার খেলা শুরু হল হরিয়ানা বিধানসভায়। শর্মা নিজে কংগ্রেস ছেড়েছেন। কংগ্রেস পরিষদীয় দল থেকে এম-এল-এ ভাঙানোর কাজটি তিনি পাকা হাতেই শুরু করলেন। ঘোষিত হল, ষোলজন কংগ্রেসের বিপরীতে আসন গ্রহণে প্রস্তুত। ওদিকে একচল্লিশ-সদস্যক হরিয়ানা বিধায়ক দলের চিঠি গেছে রাজ্যপালের কাছে, বংশীলালের আর সংখ্যাগরিষ্ঠতা নেই, হুজুর যেন বিধানসভায় একটা বিচারের ব্যবস্থা করেন। হুজুর চুপচাপ।

কিন্তু এই নীরবতা দিয়ে মন্ত্রিত্ব শিকারের হুড়োহুড়ি বন্ধ করে রাখা যাবে না। ভগবৎদয়াল যে সে লোক নন। হরিয়ানা দলাদলি বিধ্বস্ত রাজনীতিতে তাঁর ভগনতরীর হাল এখনও পর্যাপ্ত পানি বঞ্চিত হয়ে পড়ে নি। কাণ্ডারী হাওয়ার গতি পুনরায় উল্টো খাতে বইয়ে নিয়ে যাবেন। বিরোধীপক্ষের সমর্থনও রাও বীরেন্দ্র সিং-এর মাধ্যমে ইতিমধ্যেই ঘোষিত হয়েছে। বিধানসভা আহ্বানের দাবি যেভাবে উঠেছে তাতে রাজ্যপাল কতদিন আর শালগ্রামশিলাবৎ নীরবতা অবলম্বন করবেন। তাছাড়া স্পীকার মহোদয়ের বক্তব্যকে ফুটবলতেই উড়িয়ে দেওয়া যায় না। তবে চাবন সাহেবের হাতে যে মোক্ষম মুশ্কারটি সর্ববিষয়ে ভীমবিক্রমে আন্দোলিত হতে থাকে, এখন একমাত্র ভরসা সেইটিই। চাবন সাহেবের গদাই মন্ত্রিত্বলোভীদের চেতনায় ঝাঁকি দিতে একমাত্র এবং অদ্বিতীয় অস্ত্র।

গত ১২ই ডিসেম্বর যখন রাজ্যপাল সাড়ম্বরে বংশীলাল-মন্ত্রিসভার প্রতি ৪২ জনের সমর্থন ঘোষণা করেন, ঠিক সেইদিন রাত্রেই শ্রী ভি ডি শর্মা মুখ্যমন্ত্রী বংশীলালকে এক পত্রে পদত্যাগের আহ্বান জানান।

রেওয়ারীতে একটি নির্বাচনী সভায় তিনি বলেছেনঃ মাত্র একটি ভোটে পরাজিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই তিনি তাঁর মন্ত্রিসভা ভেঙে দিয়ে হরিয়ানায় সুস্থ রাজনৈতিক এবং গণতান্ত্রিক আবহাওয়া সৃষ্টি করেছিলেন। আর সেই ভোটটিও তাঁর পক্ষে পড়ে নি শুধুমাত্র বংশীলালের অনুপস্থিতির দরুণ। বংশীলাল তখন চণ্ডীগড়েই উপস্থিত। অথচ বিধানসভায় অনুপস্থিত থেকে শর্মা-মন্ত্রিসভার পতনের কারণ হয়েছিলেন। আজ সেই বংশীলাল নিজে কি করছেন?

তিনশ' কংগ্রেসীর দলত্যাগ

হাওয়া মোটেই সুবিধের নয়। হিসার জেলার তিন শতাধিক কংগ্রেস সদস্য দল থেকে হানসি মিউনিসিপ্যালিটির কমিশনার শ্রীজনার্দন দাশগুপ্তের নেতৃত্বে পদত্যাগ করেছেন বলে সংবাদ। তাঁদের অভিযোগ কংগ্রেস হাই কম্যান্ডের অগণতান্ত্রিক মনোভঙ্গির বিরুদ্ধে। শ্রীগুপ্ত বলেনঃ হাই কম্যান্ড একনায়কী ক্ষমতা প্রয়োগ করে হরিয়ানা কংগ্রেসের প্রতি বিমাতৃসুলভ ব্যবহার করছেন।

তবে প্রত্যাবর্তনও শুরু হয়েছে। এক এক করে দলছুটরা দলে ভিড়ছেন। এ-ও কি স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর হার্ড-লাইনের হ্যামারিং-এর ফল!

বিহারে সঙ্কট

হরিয়ানার পর বিহার। হাই কম্যান্ডের হাত সেখানে কিছুটা নীতিনিষ্ঠ হতে গিয়ে কতিপয় বিহার কংগ্রেসী নেতার সমূহ বেদনার কারণ ঘটিয়েছে। তাঁরা স্বভাবতই বলতে চাইছেনঃ এই কী পুরস্কার এতকাল কংগ্রেস সেবার!

নেতৃপঙ্কজ হলেন, সর্বশ্রী কে বি সহায়, মহেশপ্রসাদ সিংহ, সত্যেন্দ্রনারায়ণ সিংহ, রামলখন সিং যাদব এবং অম্বিকাশরণ সিং। প্রত্যেকেই বিহার রাজ্য কংগ্রেসের ক্ষমতাশালী নেতা। কিন্তু এঁদের কেউই দলের মনোনয়ন চাইবেন না। কারণ কিছু দায়িত্বশীল ব্যক্তি প্রকাশ্যে পঙ্কজপ্রধানের মনোনয়নের ব্যাপারে অবমাননাকর উক্তি করেছেন। যাতে তাঁরা ব্যথা পেয়েছেন। কংগ্রেস সভাপতির বিরুদ্ধেও এঁরা অভিযোগ করেছেন।

বোঝা যাচ্ছে, এঁদের সরে দাঁড়ানোটা স্বেচ্ছাপ্রণোদিত নয়, সদুদ্দেশ্যেও নয়। নিতান্ত আত্মমর্যাদার আঘাতেই এঁদের নির্বাচনী মহোৎসবের প্যান্ডেল থেকে দূরে নিক্ষেপ করেছে। ব্যাপারটি সুতরাং গুরুতর। ক্ষুব্ধ কংগ্রেসী ভয়ানক কাণ্ডই করতে পারেন। একশ বছরের মিঠাই নোনতা হলে মানসিক ভারসাম্য রক্ষা করা স্বভাবতই অসম্ভব হয়ে উঠতে পারে। আর কংগ্রেস হাই কম্যান্ড তা-ও জানেন। তবু এমনটাই ঘটল।

ওদিকে বিহারের কংগ্রেসী মন্ত্রিসভার ছ'জন প্রাক্তন মন্ত্রীকে নিয়েও কংগ্রেসী নির্বাচনী কমিটিতে বিতর্কের ও অসন্তোষের তুষে আগুন পড়েছে। এই সমুদয় মন্ত্রীর বিরুদ্ধে দুর্নীতির অভিযোগ থাকায় আসন্ন মধ্যবর্তী নির্বাচনে এঁদের টিকিট দিতে পাতিল-লিঙ্গাপ্পা প্রমুখ নেতারা গররাজি। কংগ্রেস সভাপতি শ্রীযুত নিজলিঙ্গাপ্পা একটি আবেদনে এঁদের স্বেচ্ছায় সরে দাঁড়াবার জন্য আহ্বান জানিয়েছেন। কিন্তু তাই কি হয়। মন্ত্রী হওয়ার জন্যই কী কাণ্ড, আর একবার মন্ত্রিত্বের স্বাদ পেয়ে সরে দাঁড়ানো, সে কি চাট্টিখানি কথা। সুতরাং ঐ ছ'জন ভীষণ বিক্ষুব্ধ প্রায় বিদ্রোহী হওয়ার উপক্রম।

কিন্তু কংগ্রেস সভাপতির সঙ্গে একমত হয়ে প্রধানমন্ত্রী এবং জগজীবন রাম, ডি পি মিশ্র এবং ফকরুদ্দীন আলি আমেদ প্রমুখ নেতারাও মনে করছেন যে, উক্ত ছ'জনকে মনোনয়ন দেওয়া হলে মধ্যবর্তী নির্বাচনে কংগ্রেসের আর মুখ দেখানোর উপায় থাকবে না। এমতাবস্থায় এ পর্যন্ত কোন সিদ্ধান্তে সি ই সি-র পক্ষে উপনীত হওয়া সম্ভব হয় নি।

শ্রীযুত অতুল্য ঘোষ এবং শ্রীমোরারজী দেশাইয়ের যুক্তি নেহাৎ ফেলে দেওয়ার মত নয়। তাঁরা বলেন, হতে পারে এঁদের মনোনয়নের ফলে কংগ্রেসের নির্বাচনী লড়াই কিছু কঠিন হয়ে দাঁড়াবে, কিন্তু সেকথা আগেই ভাবা উচিত ছিল। প্রদেশ কংগ্রেসকে এঁদের নাম না পাঠাতে আগে থেকে নির্দেশ দেওয়ার প্রয়োজন ছিল। কিন্তু হাই কম্যান্ড থেকে তেমন নির্দেশ যায় নি। এখন এই এগার ঘটিকায় (শেষ মুহূর্তে) এঁদের বাদ দেওয়া অসমীচীন।

অন্যপক্ষের বক্তব্য দুর্নীতি ও স্বজনপোষণ, গোষ্ঠীস্বার্থ রক্ষা ও দলাদলির অবসানের জন্যই আজ কংগ্রেস নির্বাচনী কমিটিকে শক্ত হতে হবে। সাধারণের সামনে তুলে ধরতে হবে একটি আদর্শ নীতি।

কিন্তু আদর্শ-ফাদর্শের কথা টেনে আজ আর সবিশেষ লাভ আছে বলে মনে হয় না। জল নিচের দিকেই গড়ায়। কড়ি বছর ধরে আপন-গুছানোর স্রোত নিম্নখাতে অবাধে বইয়ে দিয়ে আজ হঠাৎ কয়েকজন ইঞ্জিনীয়ারে মিলে স্রোতের মুখে বাঁধ বাঁধতে গেলে ফল কি আর ভাল হবে। বিশেষ, শুধু কংগ্রেস কেন, সব দলেই যে-স্বার্থের দাপাদাপি বন্ধ ধমনীতে নতন উত্তেজনার সঞ্চার করেছে তাকে ঠাণ্ডা করতে কেবলমাত্র বাইরের চাপ সৃষ্টি মোটেও কার্যকর নয়। কেন না কে সেই নিষ্কলুষ যিনি নির্নিমিন না করে সদর্পে নীতিহীনতাকে নীতিহীনতা বলে ঘোষণা করবেন! যিনি রক্ষক, ভক্ষণে তাঁর ভূমিকাও যে একেবারে অস্বীকার্য নয়। তাই আদর্শ চিত্র তুলে ধরবেন এমন ভয়ঙ্কর পণ করে কেউই পার পাবেন না।

[১৪।১২।৬৪]

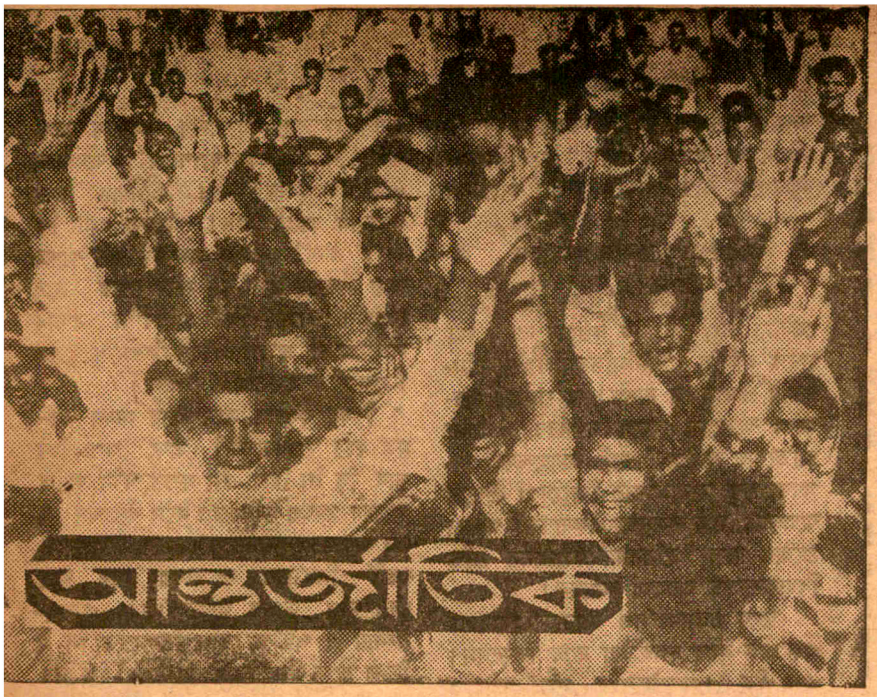

পূর্ব পাকিস্তানে আয়ুবীবরোধী প্রচণ্ড গণ-বিক্ষোভ

ইতালী ঃ

ইতালীর রাজনৈতিক সঙ্কটের এখনও কোন সমাধান খুঁজে পাওয়া যায় নি। গত জুন মাসে আলডো মোরোর সরকারের পদত্যাগের পর এখানে কোন স্থায়ী সরকারের প্রতিষ্ঠা সম্ভব হয় নি। জিওভান্নি লিওনের সরকারও মাসখানেক হল পদত্যাগ করেছে। লিওন কোনরকমে তদারকি সরকারের কাজ চালাচ্ছেন। ক্রিশ্চিয়ান ডেমোক্রাটিক পার্টি, য়ুনাইটেড সোস্যালিস্ট পার্টি (সম্প্রতি সম্মেলনে এঁরা নামের গোড়া থেকে সংযুক্ত কথাটি বাদ দিয়েছেন) ও রিপাবলিকান পার্টির মধ্যে কোয়ালিশন সরকার গঠনের কথাবার্তা চলছে। তবে এখনও তাঁরা কোন ঐক্যমতে পৌঁছতে পারেন নি।

কিন্তু ইতিমধ্যে সারা ইতালী জুড়ে এক বিরাট ঝড় বয়ে গেল। ছাত্র, শ্রমিক ও কর্মচারীদের প্রচণ্ড আন্দোলনের ফলে ইতালী কেঁপে উঠেছে। সিসিলীর সায়রাকিউজ থেকে শুরু করে রোম, মিলান, ভেনিস, স্পেজিয়া, পিসা, জেনোয়া কোন শহর এই আন্দোলন থেকে বাদ যায় নি। এই আন্দোলনের ফলে সমগ্র ইতালী অচল হয়ে পড়েছিল।

কৃষি-শ্রমিকদের মজুরীবৃদ্ধির আন্দোলন থেকে এর সূত্রপাত। সিসিলীর কৃষি-শ্রমিক ও ভাগচাষীরা তাদের দাবিতে আন্দোলন শুরু করেছে। তাদের দাবির প্রতি সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করার জন্য তাঁরা লেনটিনি, রোসোলিনি ও আভোলা শহরের পথঘাট অবরোধ করে রাখে। পুলিশ এসে এই অবরোধ সরিয়ে দেবার চেষ্টা করলে সংঘর্ষ শুরু হয়। আভোলার কাছে পুলিশের গুলীতে ২ জন কৃষক নিহত হন এবং ৫২ জন আহত হন।

আভোলার সংবাদ ছড়িয়ে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে শুরু হয় দেশব্যাপী বিক্ষোভ। কৃষকদের পাশে এসে দাঁড়ায় ছাত্র, শ্রমিক, শিক্ষক ও কর্মচারীর দল। দেশের ৩টি প্রধান কেন্দ্রীয় শ্রমিক সংগঠন একযোগে ধর্মঘটের ডাক দেয়। কৃষকদের দাবি ও ধর্মঘটের সমর্থনে দেশের সর্বত্র বিরাট বিরাট মিছিল ও সমাবেশ হয়। রোমে ৩০ হাজার ছাত্র ও ২০ হাজার শ্রমিকের দু'টি বিরাট সমাবেশ হয়। দেশব্যাপী এই বিক্ষোভের প্রত্যক্ষ কারণ আভোলার ঘটনা হলেও মূল কারণ আরও গভীরে। ইতালীর অর্থনৈতিক সঙ্কট ক্রমেই তীব্র হচ্ছে। শ্রমিকশ্রেণীর মধ্যে অসন্তোষ বৃদ্ধি পাচ্ছে। ছাত্ররা দীর্ঘকাল ধরে শিক্ষা সংস্কারের দাবি জানাচ্ছে। কিন্তু কিছুই হচ্ছে না। তাই এতদিনের বিক্ষোভ হঠাৎ সুযোগ পেয়ে আত্মপ্রকাশ করেছে। যে-অবস্থার উদ্ভব হয়েছিল, অনেকের মতে তা মে-জুনের ফ্রান্সের মত।

তবে অবস্থা দ্রুত স্বাভাবিক হয়েছে। সরকারও কিছু দাবি মেনে নিয়েছেন। কৃষকদের দাবি সরকার বিবেচনা করছেন। গুলীতে নিহত দু'জনের বিধবাকে আজীবন পেন্সন দানের সিদ্ধান্ত ঘোষণা করা হয়েছে। সিসিলীর পুলিশ-প্রধানকে সরিয়ে দেওয়া হয়েছে। রাষ্ট্রপতি সারাগাত থেকে শুরু করে সরকারের বিশিষ্ট ব্যক্তিরা সবাই ঘটনার জন্য দুঃখ প্রকাশ করেছেন, সমবেদনা জানিয়েছেন। সবচেয়ে বড় কথা, ইতালীর বামপন্থী দলগুলি, বিশেষ করে কমিউনিস্ট পার্টি এখনই এই ব্যাপার নিয়ে বড় রকমের কোন আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়তে চায় না। বর্তমান রাজনৈতিক সঙ্কটের পূর্ণ সুযোগ গ্রহণ করে তারা নির্বাচনী পন্থাতেই ক্ষমতা দখলের আশা পোষণ করে।

তবু ইতালীর অবস্থা কিরূপ বিস্ফোরক, এই বিক্ষোভ তার প্রমাণ।

পাকিস্তান ঃ

পূর্ব পাকিস্তানে আয়ুববিরোধী বিক্ষোভ ক্রমেই বেশি তীব্র হচ্ছে। গণতন্ত্র পুনঃপ্রতিষ্ঠার দাবিতে এবং আয়ুবী স্বৈরাচারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাবার জন্য সমগ্র পূর্ব পাকিস্তানে হরতাল পালন করা হয়েছে।

জনসাধারণের স্বতঃস্ফূর্ত বিক্ষোভ দমনের জন্য সরকার সর্বপ্রকার দমননীতির আশ্রয় গ্রহণ করেছে। লাঠি, গুলী, টিয়ার-গ্যাস, কোন কিছুই বাকি নেই। ৭ই ডিসেম্বর ঢাকায় পুলিশের গুলীতে ২ জন নিহত হয়েছেন এবং ২০ জন আহত হয়েছেন। ১৩ই ডিসেম্বর চট্টগ্রামে পুলিশের গুলী চলেছে। হতাহতের পূর্ণ বিবরণ এখনও জানা যায় নি। তবে সব মিলিয়ে নিহতের সংখ্যা এ পর্যন্ত প্রায় ১০ বলে একটি সংবাদে প্রকাশ। গ্রেপ্তারের সংখ্যা হাজারের ওপর। কিন্তু পুলিশী সন্ত্রাস গণ-আন্দোলনকে স্তব্ধ করতে পারে নি।

আয়ুবের বিরুদ্ধে যেন সমগ্র পূর্ব পাকিস্তান ক্ষেপে উঠেছে। গত মাসে পশ্চিম পাকিস্তানে দমননীতির বিরুদ্ধে পূর্ব পাকিস্তানে খুব একটা বড় রকমের কোন প্রতিবাদ হয় নি দেখে যাঁরা ভাবছিলেন পূর্ব পাকিস্তান বুঝি ঝিমিয়ে পড়ল, তাঁদের ভুল ভেঙেছে। আরও ব্যাপকভাবে বিক্ষোভ জানাবার জন্য পূর্ব পাকিস্তান তৈরি হচ্ছিল। ৫ই ডিসেম্বর আয়ুব খাঁর ঢাকা আগমনের সঙ্গে সঙ্গে শুরু হল প্রচণ্ড বিক্ষোভ। মুহূর্তের মধ্যে যেন সারা দেশে আগুন জ্বলে উঠল। কি নিদারুণ আয়ুববিদ্বেষ! রাস্তায় রাস্তায় পোস্টার ঃ আয়ুব চোরের মত দেশ থেকে পালাচ্ছেন! আয়ুব আশ্রয়ের আশায় পাগলের মত গ্রেট বৃটেন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, সুইজারল্যান্ড, ফ্রান্স প্রভৃতি দেশের দিকে একের পর এক ছুটছেন!

ঢাকায় বিমান থেকে অবতরণের সময় যে সরকারী অনুষ্ঠান হবার কথা ছিল, তা বাতিল করতে হয়েছে। রমনার মাঠে যে শিক্ষা ও কৃষি সমাবেশ হয়েছে, সেখানে কড়া সৈন্য ও পুলিশ পাহারায় বক্তৃতা করতে হয়েছে। জীবনে কখনও আয়ুব খাঁ

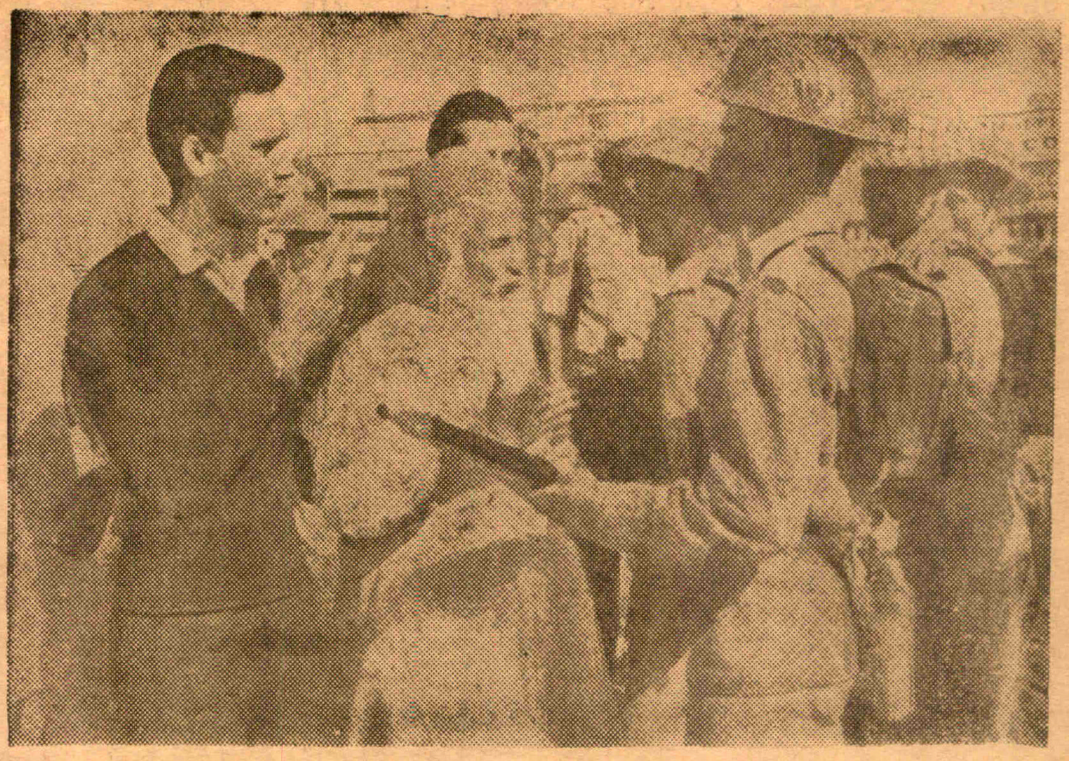

ঢাকায় আয়ুববিরোধী বিক্ষোভ-মিছিল পরিচালনার সময় পূর্ব পাকিস্তানের জাতীয় আওয়ামী দলের ৮৬ বছরের বৃদ্ধ নেতা ভাসানীর গতিরোধ করছে পুলিশের দল।

এরূপ বিক্ষোভের সম্মুখীন হন নি, কখনও এ রকম অপমান সহ্য করেন নি। অনেক দুঃখে আয়ুবের মুখ থেকে বেরিয়েছেঃ সারা জীবনের জন্য তিনি রাষ্ট্রপতি থাকতে চান না!

পূর্ব পাকিস্তানের মানুষকে ভয় দেখাবার জন্য আয়ুব খাঁ ও তাঁর সুযোগ্য সহচর পূর্ব পাকিস্তানের গভর্নর আবদুল মোনেম খাঁ পশ্চিম পাকিস্তানের দমন-নিপীড়নের কাহিনী খুব ফলাও করে প্রচার করছিলেন। মতলব ছিল, এইসব কাহিনী শুনে পূর্ববঙ্গবাসী ভয় পেয়ে যাবে এবং আর তারা বিক্ষোভ দেখাবে না। কিন্তু হিসাবে ভুল হয়েছে। বাঙালীরা ভয় তো পায়-ই নি, বরং তাদের প্রতিরোধের দৃঢ়তা আরও বেড়েছে।

বিভেদ সৃষ্টির অপচেষ্টাও করেছে আয়ুব সরকার। পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের সাধারণ মানুষের মধ্যে যে সংগ্রামী ঐক্য গড়ে উঠতে চলেছে, তাতে ফাটল ধরাবার জন্য আয়ুব ঢাকায় এমন ইঙ্গিত করেছেন যে, তাঁর সরকার পূর্ব পাকিস্তানের জন্য বেশি অর্থব্যয় করছে বলেই পশ্চিম পাকিস্তানের লোক তাঁর ওপর চটছে। এবারের পশ্চিম পাকিস্তানের বিক্ষোভের এই নাকি আসল কারণ। কিন্তু পূর্ব পাকিস্তানের মানুষ এই মিথ্যা-প্রচারের দ্বারা বিভ্রান্ত হয় নি।

চিরাচরিত কায়দায় হিন্দু-মুসলমান দাঙ্গা বাধাবার চেষ্টাও হয়েছে। পূর্ব পাকিস্তানে যাঁদের গ্রেপ্তার করা হয়েছে, তাঁদের মধ্যে কয়েকজন হিন্দুও আছেন। হিন্দুদের নাম ফলাও করে প্রচার করে দেখাবার চেষ্টা হয়েছে যে, আয়ুববিরোধী বিক্ষোভের মূলে রয়েছে হিন্দুরা। কিন্তু এসব কৌশলে আর কাজ হচ্ছে না। ঢাকা ও অন্যান্য শহরে সাম্প্রদায়িক মৈত্রী বজায় রাখার জন্য পোস্টার পড়েছে। হিন্দু-মুসলমান সম্মিলিতভাবে আজ আয়ুব-শাহীর বিরুদ্ধে সংগ্রাম করছে।

ভারতের বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা করে পূর্ব পাকিস্তানের দৃষ্টি অন্য দিকে ফেরাবার চেষ্টাও আয়ুব করেছেন। ফারাক্কা বাঁধের কথা তুলে তিনি পূর্ব পাকিস্তানে ভারতবিরোধী মনোভাব সৃষ্টির চেষ্টা করেছেন। কিন্তু এতেও কাজ হয় নি। সাধারণ মানুষের আজ প্রথম দাবিঃ গণতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা চাই, স্বৈরাচারের অবসান চাই।

এবারের আন্দোলনের সবচেয়ে বড় বৈশিষ্ট্য সকল শ্রেণীর মানুষের ঐক্য। বিপ্লবী ছাত্রদের পাশে আইনঘেঁষা উকিলেরাও এসে দাঁড়িয়েছেন। প্রগতিশীলদের সঙ্গে উদারনৈতিকেরা এসে মিশেছেন। হিন্দু-মুসলমান মিলেছে। শ্রমিক ও কৃষক এক হয়েছে। পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তান আজ এক লড়াই-এর ময়দানে। এমন কি মৌলানা ভাসানী সম্পর্কে কারও কারও মনে সন্দেহ ছিল যে তিনি হয়তো শেষ পর্যন্ত আয়ুব খাঁর বিরুদ্ধে সংগ্রামে নামবেন না, সেই ভাসানী পর্যন্ত এই বৃদ্ধ বয়সে আয়ুববিরোধী মিছিলের নেতৃত্ব করেছেন, ধর্মঘটের ডাক দিয়েছেন।

আসগর খাঁ-ও ঢাকায় এসে পৌঁছেছেন। তাঁর প্রাইভেট সেক্রেটারীকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। আসগর খাঁ থামেন নি। তিনি সর্বত্র আয়ুব শাসনের কঠোর সমালোচনা করে বক্তৃতা করছেন।

সর্দ্দি ও কাশিতে
রক্ষিতের
তাল মিছরি
ফোন ৫৫-৩০৮৫

ভেনেজুয়েলা :

আনুষ্ঠানিকভাবে ঘোষণা করা হয়েছে, র‍্যাফেল ক্যালডেরা ভেনিজুয়েলার নতুন রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হয়েছেন। গত সপ্তাহে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়েছে। কিন্তু ভোট-গণনায় কিছু গোলমালের জন্য ফল প্রকাশে বিলম্ব হল।

র‍্যাফেল ক্যালডেরা সোস্যাল ক্রিশ্চিয়ান পার্টির প্রার্থী। তিনি তাঁর প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বী ক্ষমতাসীন দল ডেমোক্রাটিক অ্যাকশন পার্টির প্রার্থী বিদায়ী স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী গোলজালো ব্যারিয়সকে প্রায় ত্রিশ হাজার ভোটে পরাজিত করে নির্বাচিত হয়েছেন। ব্যারিয়সের পরাজয় রীতিমত বিস্ময়কর। তিনি ভেনিজুয়েলার শক্ত মানুষ এবং স্বরাষ্ট্রমন্ত্রিরূপে দেশে শান্তি-শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠা করে যথেষ্ট সুনাম অর্জন করেছেন। ক্যালডেরা এর আগেও তিনবার রাষ্ট্রপতি পদের জন্য দাঁড়িয়ে হেরেছেন। এবারও তিনি হারবেন, প্রায় সবাই তাই ধরে নিয়েছিলেন। তবু তিনি জিতলেন।

ব্যারিয়সের পরাজয়ের ফলে ভেনিজুয়েলায় ডেমোক্রাটিক অ্যাকশন পার্টির দশ বছরের একটানা শাসনের অবসান ঘটল। ১৯৫৮ সালে মারকোস পেরেজ জিমেনেৎস্-এর একনায়কতন্ত্রী শাসনের অবসান ঘটিয়ে ডেমোক্রাটিক অ্যাকশন পার্টি ভেনিজুয়েলায় গণতান্ত্রিক শাসনের পত্তন করে। ভেনিজুয়েলার বিপুল তৈলসম্পদ থেকে প্রাপ্ত অর্থ জিমেনেৎস রাজধানী কারাকাসের শোভাবর্ধনের জন্য ব্যয় করছিলেন। ডেমোক্রাটিক পার্টি ক্ষমতায় এসে এই তেলের টাকা স্কুল-কলেজ, রাস্তা ঘাট এবং স্বাস্থ্য ও গ্রামোন্নয়নের জন্য ব্যয় করে। ফলে সাধারণ মানুষের অবস্থার কিছুটা উন্নতি হয়। এই নির্বাচনেও দলের ধ্বনি ছিল: 'এই নীতি অব্যাহত থাক'—'কনটিনুউজ্‌মো'।

ব্যারিয়স নির্বাচনে নেমেছেন 'পরিবর্তনের' ধ্বনি নিয়ে। দশ বছর এক শাসন চলেছে, এবার পরিবর্তন চাই। এই পরিবর্তনের আহ্বানে অনেকে সাড়া দিয়েছে।

ব্যারিয়সের জয়লাভের পেছনে দুটি প্রধান কারণ রয়েছে। প্রথম, তিনি প্রাক্তন ডিক্টেটর জিমেনেৎসের দলবলের সমর্থন পেয়েছেন। আর, দ্বিতীয়, ডেমোক্রাটিক অ্যাকশন পার্টির ভাঙন। দলের সভাপতি লুই বেলট্রান পিল্টো পৃথকভাবে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছেন। তিনি যে ছ' লক্ষ ভোট পেয়েছেন, তার অধিকাংশই ব্যারিয়সের ভোট।

এবারের নির্বাচনে আর একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা জিমেনেৎসের ভেনিজুয়েলার রাজনীতিতে প্রত্যাবর্তন। সরকারী অর্থ আত্মসাৎ করার অভিযোগে তিনি ছ' বছর জেল খাটার পর অল্প কিছুদিন আগে মুক্তি পেয়েছেন। বর্তমানে তিনি মাদ্রিদে। সেখান থেকে তিনি ভেনিজুয়েলার সেনেটে নির্বাচনপ্রার্থী হয়েছেন এবং জয়লাভও করেছেন। তাঁর দল 'ন্যাশনাল সিভিক ক্রুসেডে'র ১১ জন প্রার্থীও নিম্নকক্ষে নির্বাচিত হয়েছেন। আইন অনুসারে এবার তিনি দেশে ফিরবেন এবং রাজনীতিতে অংশ নেবেন। হয়তো আগামীবার রাষ্ট্রপতি পদের জন্যও তিনি দাঁড়াবেন।

লাতিন আমেরিকার অন্যতম সমৃদ্ধ দেশ ভেনিজুয়েলা। সামরিক অভ্যুত্থান ও একনায়কত্বের মহাদেশের এই দেশটিতে কিছুটা স্থায়ী গণতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা হয়েছিল। ডেমোক্রাটিক পার্টির সরকার প্রগতিশীল না হলেও মোটামুটি গণতান্ত্রিক ছিল। কিন্তু এবারের নির্বাচনে দক্ষিণপন্থীরা প্রাধান্য লাভ করল। কেবল ভেনিজুয়েলা নয়, সমগ্র লাতিন আমেরিকার রাজনীতিতে এর প্রভাব পড়বে।

(১৫-১২-৬৮)

উপনিষদ গ্রন্থাবলী :

১ম খণ্ড : ঐতরেয়, কৈবল্য, কাঠকো নৃসিংহতাপনী।

২য় খণ্ড : শ্বেতাশ্বতর, পরমহংস, সন্ন্যাস, নীলরুদ্রচুলিক, আরুণেয়, কণ্ঠশ্রুতি, জাবাল, পিণ্ড, আত্ম, ষটচক্র, ভৃগু, শিক্ষা, ব্রহ্মবিদ, নারদ, পরিব্রাজক, পৈঙ্গলা, তুরীয়াতীত, বাসুদেব, শাণ্ডিল্য, নারায়ণ (ক), নারায়ণ (খ)।

৩য় খণ্ড : ঈশ, কেন, প্রশ্ন, মুণ্ডক, মাণ্ডুক্য, তৈত্তিরীয়, পাশুপত-ব্রহ্ম, প্রাণাগ্নিহোত্র, ভাবন, গরুড়, শ্রীরামপূর্বতাপনীয়, শ্রীরামোত্তরতাপনীয়, পঞ্চব্রহ্ম, কালাগ্নিরুদ্র, যাজ্ঞবল্ক্য, রামরহস্য, গোপালপূর্বতাপনীয়, গোপালোত্তরতাপনীয় কৌষীতক্য, অমৃতবিন্দু, কালিকা সর্বসার ও অমৃতনাদ। কাপড় ও বোর্ডে বাঁধা। মূল্য : প্রতি খণ্ড—৪'০০ টাকা।

বসুমতী প্রাইভেট লিমিটেড
১৬৬ বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী স্ট্রীট, কলিকাতা—১২

সাপ্তাহিক বসুমতী

উত্তরবঙ্গ বন্যাত্রাণ কমিটির তহবিলে দান

[পূর্ব-প্রকাশিতের পর]

১৭১·০০ টাকা : ডকমাস্টার মেরিন স্টাফ রিক্রিয়েশন ক্লাব, খিদিরপুর, কলকাতা—২৩।

১১৭·০০ টাকা : 'ড্রেজার সুবর্ণরেখা'-এর কর্মিবৃন্দ। ১৫, স্ট্র্যান্ড রোড, কলকাতা—১।

১০১·০০ টাকা : মধ্য কলকাতা সার্বজনীন শ্যামাপূজা কমিটি, ফরডাইস লেন, কলকাতা—১৪।

৮৩·০৯ টাকা : রামনগর কর্মী সংঘ, দক্ষিণ বারাসত (২৪-পরগনা)।

৫১·০০ টাকা : এরুয়ার উদয়াচল ক্লাব, এরুয়ার (বর্ধমান)।

৪৩·০০ টাকা : টি· এস· সনাতন হায়ার সেকেণ্ডারী স্কুলের ছাত্রবৃন্দ, সরবেড়িয়া, (২৪-পরগনা)।

প্রত্যেকে ১০·০০ টাকা : বিশ্বেশ্বর চ্যাটার্জী, দক্ষিণ বারাসত (২৪-পরগনা), ডঃ বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য, কলকাতা—৫০।

প্রত্যেকে ৫·০০ টাকা : ডাঃ মিহিরকুমার মুখার্জী, খড়দহ, (২৪-পরগনা), ডাঃ প্রবীরকুমার মুখার্জী, টিটাগড়, (২৪-পরগনা), রথীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য, রঞ্জি স্টেডিয়াম, কলি—১১। অধ্যাপক জগদিন্দু ভট্টাচার্য, জয়পুরিয়া কলেজ, কলকাতা।

প্রত্যেকে ১·০০ টাকা : প্রফুল্লকুমার জ্যোতি, রঞ্জি স্টেডিয়াম, কলকাতা—২১। ব্যোমকেশ ভট্টাচার্য, কলকাতা—১২। অবনীভূষণ চট্টোপাধ্যায়, রঞ্জি স্টেডিয়াম, কলি—২১। বিভূতিভূষণ ঘোষাল, রঞ্জি স্টেডিয়াম, কলি—২১। সুশীলকুমার বিশ্বাস, রঞ্জি স্টেডিয়াম, কলি—২১। গৌতম সাধুখাঁ, ব্যারাকপুর। জীবন সরকার, ধুপগুড়ি, জলপাইগুড়ি। সীতানাথ ধর, কলকাতা—৫। সুচরিতা চক্রবর্তী, কলকাতা—৩১। মনীষা ঘোষাল, ৩/১, মহারাজা টেগোর রোড, কলকাতা। হিন্দুস্থান বিল্ডিংস-এর বাসুদেব মুখার্জী, পি· কে· ধর, বিশ্বনাথ মুখার্জী, মিহির ঘোষ, জে· কে· মজুমদার, এস· এস· ব্যানার্জী, বি· কে· বিশ্বাস, জহর চ্যাটার্জী, অনিল সেনগুপ্ত, ডি· ব্যানার্জী, চিত্ত চন্দ, এইচ· মুখার্জী, এস· এন· চ্যাটার্জী, এন· জি· দত্ত, জিতেন ভট্টাচার্য, ডি· দাস, এস· গাঙ্গুলী, এন· সেনগুপ্ত, বিমল রায়, রীতা মুন্সী, এস· এম· নাগ, এইচ· চৌধুরী। সমীর সরকার, কলকাতা—৩৬। এস· ডি· ব্যানার্জী, কলকাতা—৫০। [ক্রমশঃ]

প্রপ্তের বোঝা

কৃত্তিবাস ওঝা

আজ পশ্চিম বাংলার নিজস্ব ঘরাণা অথবা ঐতিহ্য বলতে এমন কিছু অবশিষ্ট নেই, যা বুকে এঁটে বাঙালী ভারতের দরবারে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতে পারে। স্বাধীনতা সংগ্রামের কালে তথা পরাধীন ভারতে পশ্চিম বাংলা সর্ববিষয়েই অগ্রণী ছিল। তাই "What Bengal thinks today, India thinks to-morrow" —এত বড় সম্মানজনক জয়টীকা বাংলা দেশের ললাটে জুটেছিল। এমন কি সেইদিন পর্যন্ত শিক্ষিতের হারে, শিক্ষার প্রসারে, অগ্রগতিতে বাংলা দেশের স্থান সর্বোচ্চ ছিল। আজ শিক্ষার ক্ষেত্রে বাংলা দেশের স্থান গ্রহণ করেছে কেরল-মহারাষ্ট্র প্রভৃতি রাজ্য। তবে শনিবারের প্রভাতী সংবাদপত্রে একটি সংবাদ পড়ে বোঝা গেল, পশ্চিম বাংলা আজও কোন কোন ক্ষেত্রে অন্য রাজ্যকে পিছনে ফেলে শীর্ষস্থান অধিকার করে তাক লাগিয়ে দিতে পারে। শনিবারের কাগজটি পড়ে বোঝা গেল একটি ক্ষেত্র রয়েছে, যেখানে কেরল, মহারাষ্ট্র, মাদ্রাজের কোন নাম নেই আর অন্য যাদের নাম আছে তারা কেউ বাংলা দেশের গোড়ালি, হাঁটু—খুব বেশি হলে কোমর পর্যন্ত উঁচু। মাথার কাছে পৌঁছবার যোগ্যতা কেউ অর্জন করে নি। আমি গত এক বৎসরে পশ্চিম বাংলায় গুলীবর্ষণ ও নিহতের যে তালিকা প্রকাশিত হয়েছে সেই তালিকার কথা বলছি। ১৯৬৮ সালের ১লা জানুয়ারী থেকে ৩১শে অক্টোবর পর্যন্ত পশ্চিম বাংলায় ৩১৫ বার গুলীবর্ষণ ও ১১৫ জন নিহত হয়েছে। বিহারে ৫৪ বার গুলীবর্ষণ, ৪১ জন নিহত, উত্তর প্রদেশে ৫২ বার গুলীবর্ষণ, ৪৭ জন নিহত, পাঞ্জাবে ৮ বার গুলীবর্ষণ, ১২ জন নিহত হয়েছে। দেখুন, এই তালিকায় কেরল, মহারাষ্ট্র, মাদ্রাজ প্রভৃতি রাজ্যের নামোল্লেখের যোগ্যতা পর্যন্ত নি। শিক্ষার অগ্রগতিতে কেরল, মহারাষ্ট্র, মাদ্রাজ আমাদের হারিয়ে দিয়েছে বটে—কিন্তু গুলী আর খুনের সংখ্যায় কেবল, মহারাষ্ট্র, মাদ্রাজ আমাদের কাছে আসতে পারে নি।

পশ্চিম বাংলায় এবং অন্যান্য কয়েকটি রাজ্যে যখন কংগ্রেস-বিরোধী সরকার গঠিত হয়, সেই সকল সরকার বহুক্ষেত্রেই একদলীয় ছিল না, বিভিন্ন ক্ষেত্রে বহু দলের নেতৃত্বে গঠিত সরকার ছিল। এই সরকারগুলি গঠিত হলে সারা ভারতবর্ষে বিশেষ করে পশ্চিম বাংলায় একটা ত্রাহি ত্রাহি রব উঠেছিল। "সত্য নাশ হো গিয়া"—আর এই সত্যের পূজারীরা অনেক কসরৎ করে অনেকগুলি সরকারের পতন ঘটিয়েছে এবং সেইসব রাজ্যে রাষ্ট্রপতির শাসন তথা রাজ্যপালের শাসন কায়েম হয়েছে। বিভিন্ন রাজ্যে গুলীবর্ষণের শীর্ষে যে রাজ্যগুলির নাম আছে সেগুলি হল পশ্চিমবঙ্গ, বিহার উত্তর প্রদেশ। এই তিনটি রাজ্যই রাষ্ট্রপতি শাসনের অধীন। রাষ্ট্রপতির শাসন নেই এইরকম রাজ্য—যেমন মহারাষ্ট্র, মহীশূর কংগ্রেসের একক সংখ্যাগরিষ্ঠতায় গঠিত সরকারের দ্বারা পরিচালিত। উড়িষ্যা যেখানে স্বতন্ত্র পার্টি ও জনতা পার্টির আধিপত্যের সরকার—মাদ্রাজ, যেখানে ডি, এম, কে দলের নেতৃত্বে পরিচালিত সরকার চলছে—কেরল, যেখানে কম্যুনিস্ট পার্টির (মার্ক্সবাদী) প্রভাবের সরকার—আর মধ্যপ্রদেশ, যেখানে কংগ্রেস ছাড়া অন্য দলের এক জগাখিচুড়ি ও হযবরল সরকার চলছে। কিন্তু লক্ষ্য করলে দেখা যাবে কংগ্রেস পরিচালিত মহারাষ্ট্র আর মহীশূরেই হোক অথবা স্বতন্ত্র পার্টি পরিচালিত উড়িষ্যাই হোক, কিংবা মধ্যপ্রদেশের ক্ষণভঙ্গুর হযবরল সরকারই হোক, কোন রাজ্যই কিন্তু এই গুলীচালনা আর মানুষ খুনের তালিকায় স্থান লাভ করতে পারে নি। অন্য রাজ্যের কথা থাক—পশ্চিম বাংলার কথাই যদি শুধু ধরা যায় তবে একদা কবি ঈশ্বর গুপ্ত কলকাতা বাসের অভিজ্ঞতা বর্ণনা করে বলেছিলেন, "রাতে মশা দিনে মাছি/এই নিয়ে কলকাতায় আছি।" আর এযুগে যদি কোন নতুন ঈশ্বর গুপ্ত সত্য কথা বলা অথবা লেখার স্পর্ধা রাখেন তবে তিনি বলবেন, "খুন-ডাকাতি অরাজকতা/এই তিন নিয়ে কলকাতা।" তবে আজকে সবচেয়ে মজার কথা হল কোন সত্যকথা বলবার উপায় নেই—বললে শত্রু বাড়বে এবং সেই শত্রু ছলে-বলে-কৌশলে আপনার ঘাড় মটকাবে। কলেজে অধ্যাপক অথবা শিক্ষক সত্য কথা বলতে পারবেন না—সাংবাদিক যে সত্য দেখবেন, সে সত্য লিখতে বা প্রকাশ করতে পারবেন না। রাজনৈতিক নেতারা যে সত্য বুঝবেন, সেই সত্য বলবেন না। এর কোনটার যে কোন নির্দিষ্ট বাধা আছে অথবা কারো নির্দেশে অথবা নিষেধে এই সত্যের গতিপথ রুদ্ধ হচ্ছে তা নয়। সর্বক্ষেত্রেই একটি প্রশ্ন—এই সত্য প্রকাশ করলে আমার নিরাপত্তা থাকবে না। এই নিরাপত্তা চাকরীর ক্ষেত্রেও হতে পারে, জীবনের ক্ষেত্রেও হতে পারে। তাই সকলেই যে যার জীবন-জীবিকার নিরাপত্তার কথা ভেবে অতি সুনিপুণভাবে সত্য প্রকাশে বিরত থেকে যাচ্ছেন।

সম্প্রতি মেদিনীপুরের একটি ছোট্ট সভায় ভাষণ দিতে গিয়ে অধ্যাপক হুমায়ুন কবির আহত হলেন। অধ্যাপক কবিরকে পি, জি, হাজপাতালে আনা হল, দৈনিক কাগজগুলোতে কত সংবাদ ছবি ছাপা হল। কেউ বলছেন এই কাজ করেছে কম্যুনিষ্টপন্থী ছাত্ররা, আর 'গণশক্তি' পত্রিকা বলছে পটকা ছোঁড়ার অভিযোগে যাদের গ্রেপ্তার করা হয়েছে, তারা ছাত্র-পরিষদের কর্মী। অধ্যাপক কবির নিঃসন্দেহে ভারতবর্ষের একজন সুমহান সন্তান। বাংলা দেশের বিভিন্ন ক্ষেত্রে তিনি গৌরবের পাত্র। কিন্তু পটকা অধ্যাপক কবিরের গায়ে লাগলেই হৈ-চৈ হবে আর নিত্যদিনে পটকা ছোড়া অথবা গুলীচালনায় নিহত হলে তার কোন গুরুত্ব দেওয়া হবে না এই তত্ত্ব মেনে নেওয়া হলে ঠিকই ভুল হবে। অর্থাৎ মূল সমস্যা যেটা সেই সমস্যাকে গুরুত্ব না দিয়ে শুধু ব্যক্তিকে নিয়ে হৈ-চৈ করে সমস্যার সমাধান হবে না। বেলেঘাটার বিশ্বনাথ চৌধুরী, বাগনানের অমর মান্না, অথবা বরাহনগরের সুশীল পাল, বিরাটির শ্রীদত্ত এমনি আরো অনেকেই আততায়ীর হাতে প্রাণ হারিয়েছেন। দৈনিক সংবাদপত্রে এমন একটি দিন নেই যেদিন দেখা যাবে না, পশ্চিম বাংলার কোথাও একটি খুন, একটি ডাকাতি, একটি রাহাজানি, একটি পটকা নিক্ষেপ বা ছুরি-চালনার ঘটনা না আছে। সমস্যা হল সেইখানে আর এই সমস্যাকে দিনে দিনে পুষে রেখে আজ পশ্চিম বাংলা গুলীচালনার খুনের খতিয়ানে শীর্ষস্থানে চলে এসেছে। এই সমগ্র ঘটনার পিছনে রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ এবং তাঁদের অনুগামীদের ভূমিকা মোটেই ছোট করে দেখবার নয়। বরঞ্চ দেখা যাচ্ছে—বেশির ভাগ ক্ষেত্রে কিছু না কিছু রাজনীতির গন্ধ রক্তঝরার ঘটনার সঙ্গে পাওয়া যাচ্ছে। প্রকৃতপক্ষে আজ বোতলের ভূত বোতলের বাইরে চলে

এসেছে। কোন একটি দল বা কোন এক-জন পদস্থ অফিসারের শত চেষ্টাতেও এই ভূতকে আর বোতলে পোরা যাবে না। তার জন্য প্রয়োজন দেশের কথা যাঁরা ভাবেন অর্থাৎ দেশের মানুষকে নিয়ে যাঁরা রাজ-নীতি করেন, তাঁদের সমবেত ও ঐক্যবদ্ধ প্রচেষ্টা। বিশ্বনাথ চৌধুরীর হত্যা যদি কোন দলের কাছে নিন্দার ঘটনা হয়, তবে সুশীল পালের হত্যাও নিন্দার ঘটনা হিসাবে গ্রহণ করতে হবে এবং অধ্যাপক কবিরের উদ্দেশ্যে পটকা নিক্ষেপও একই প্রকার নিন্দার কাজ হিসাবে গ্রহণ করতে হবে। নইলে জামাতার মৃত্যুতে যদি ভাবা যায় "মড়ক অপরের ওপর দিয়ে গেল"—তবে এক্ষেত্রেও সেই একই বোকামী হবে। গুণ্ডার কোন জাত নেই—গুণ্ডামীর পেছনে কোনও রাজনীতি বা কোন নীতিই থাকতে পারে না। যারা পরম বিপ্লবী অথবা নিষ্ঠাবান গান্ধীবাদী—সকলের কাছেই এটা সত্য হওয়া উচিত। কিন্তু দুর্ভাগ্যের হলেও সত্য—এর ব্যতিক্রম হচ্ছে। যে দলের কর্মী যখন আহত-নিহত হচ্ছে, তখন সেই দল অথবা তার পরিমণ্ডলের সাথীরা বুক চাপড়াচ্ছে। কিন্তু এই পথে সম্ভবত সমস্যার কোনদিন সমাধান হবে না। বিশেষ করে পশ্চিম বাংলায় যখন পরম উত্তেজনা-কর অন্তর্বর্তী নির্বাচন শিয়রে উপস্থিত। শ্রীসেনবর্মা কেন্দ্র থেকে পুলিশ আনলে সব ভাল ছেলে হয়ে যাবে এ যুক্তি বিশ্বাসের কোন কারণ নেই। গুণ্ডাদের অথবা ব্যক্তি-গত বিদ্বেষীদের যদি কোণঠাসা করতে হয় অথবা একঘরে করতে হয়, তবে অধ্যাপক কবিরের মত "আমি আগেই বলেছিলাম অজয় মুখুজ্যে-জ্যোতি বোসকে জেলে পোরা হোক"—এই কথা বললে যেমন সমস্যার সমাধান হবে না, তেমনি এই ঘটনার প্রতি কোন গুরুত্ব না দিয়ে মুখ ফিরিয়ে থাকাও সঙ্গত নয়। শুধু অজয় মুখুজ্যে আর জ্যোতি বোস জেলে থাকলে যদি রাজ্যের শান্তি ফিরে আসে, তা হলে সম্ভবত শ্রীবসু ও শ্রীমুখোপাধ্যায় স্বেচ্ছায় জেলে গিয়ে বসে থাকতেও অরাজী হবেন না। কিন্তু সমাধান সম্ভবত দুজন লোককে জেলে পোরাতেও নয়—তেমনি কোন সভায় ও নেতার উদ্দেশ্যে পটকা ছোড়াতেও নয়। সব দল যখন চান শান্তিপূর্ণভাবে নির্বা-চন পরিচালিত হোক এবং কোন দলই যখন এই নির্বাচনে বোমা-পিস্তল-পটকার আধিপত্য চান না, তখন সব দলনেতারা একটা বৈঠকে মিলিত হোন না কেন! সেই বৈঠকে রচনা করা হোক একটা আচরণবিধি —যে আচরণবিধি সব দল মেনে চলবেন ও তাঁদের কর্মী ও অনুগামীদের মেনে চলতে বাধ্য করবেন। রাজ্যের রাজনৈতিক দলের কর্মী, সদস্য, অনুগামীর সংখ্যা যে পরি-মাণ, গুণ্ডা অথবা চপলমতি পটকাবাজের সংখ্যা কোনক্রমেই তার চেয়ে বেশি নয়। ভবের ঘরে চুরি না করে আন্তরিকভাবে সেই আচরণবিধি সব দল যদি মেনে চলেন, তবে পশ্চিম বাংলায় অশান্তি সৃষ্টি ও নির্বাচনে বিঘ্ন সৃষ্টির অশুভশক্তি কোন-ক্রমেই মাথাচাড়া দিয়ে উঠতে পারবে না। এই কাজের জন্য কোন দলেরই কোন খরচ নেই, কোন আদর্শ ত্যাগেরও প্রশ্ন নেই। শুধুমাত্র নিজেদের উদ্যোগে তাঁরা একটি বৈঠকে মিলিত হবেন—ছোট-বড় দল সে যে আদর্শেই হোক না কেন, নির্বাচনে অংশ গ্রহণ করছে—তাদের ডাকা হবে এবং একমত হয়ে মেনে নেওয়া হবে নির্বাচনের আচরণবিধি। নির্বাচন কমিশনার অথবা রাজ্যপাল ডেকে যদি এই জাতীয় চেষ্টা করেন তবে তার মধ্যে নানাপ্রকার ফর্মা-লিটির প্রশ্ন উঠবে। আর দেশটা যখন তাঁদের—নির্বাচনে জয়যুক্ত হয়ে দেশ শাসন যখন তাঁরা করতে চান তখন অপরের ডিক্টে-শনে যাবার প্রয়োজন কী? এখনও সময় আছে, এখন যদি সাধু সাবধান না হন, তবে শয়তানের হাত থেকে কেউই রক্ষা পাবেন না। আর এই শয়তানের হাত থেকে রক্ষা পাবার পথ বোমার জবাবে পিস্তলের গুলীতেও নয়—দুজন নেতাকে জেলে পুরেও নয়। ভদ্র, সহনশীল, অনাক্রমণাত্মক আচরণবিধি মেনে নেওয়াই একমাত্র পথ। সে আচরণবিধি মনেপ্রাণে নিজেদের মানতে হবে—দলের সর্বস্তরের কর্মী, অনুগামী ও সমর্থকদের মানাতে হবে। তবেই হবে সমস্যার সমাধান। এর ব্যতিক্রম যদি করা হয়, তবে গত দশমাসে গুলীচালনায় এবং হত্যায় যে শীর্ষস্থান পশ্চিম বাংলা দখল করেছে, সারা ভারতের রেকর্ড ভেঙেছে—আগামীদিনে তা বিশ্ব রেকর্ড ভাঙলেও অবাক হবার কিছু থাকবে না।

(১৪।১২।৬৮)

ভারসাম্য—

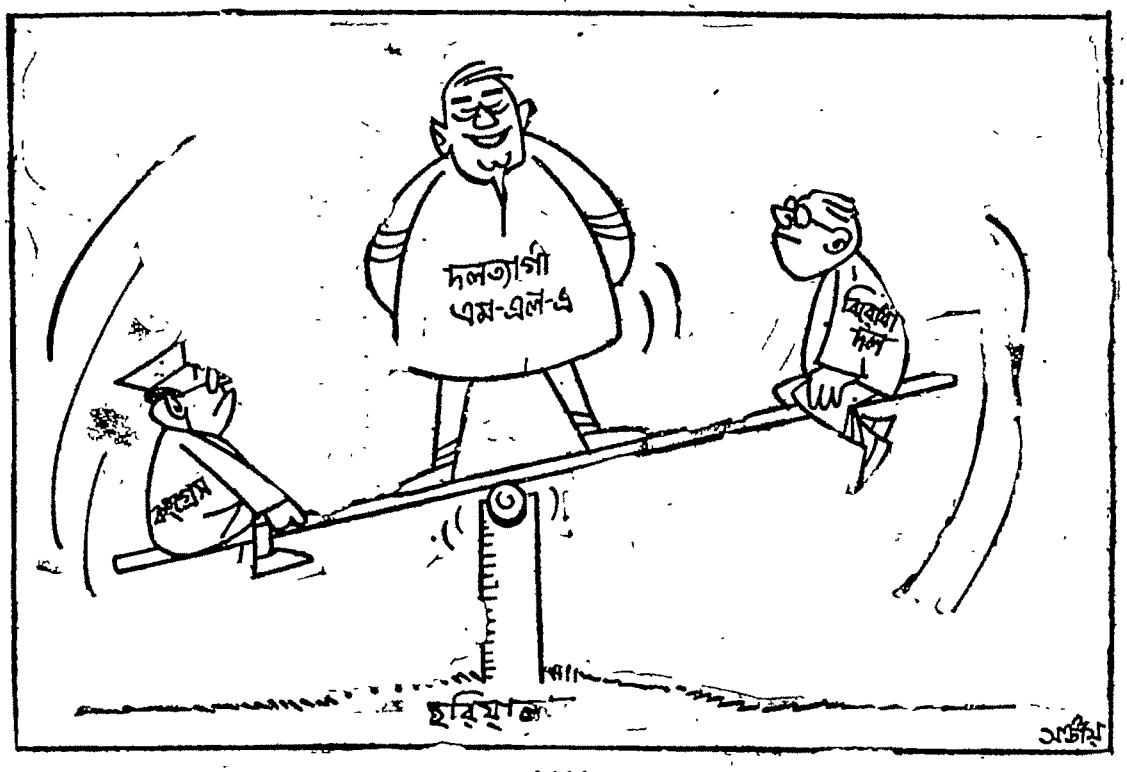

আজকের বিজ্ঞান

ডঃ বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য

সাগর-সমীক্ষা (২)

জয়ন্তাক শুনেছি। শোনাচ্ছে কারিগরি বিজ্ঞান। এ বিজ্ঞান জলে যেমন, ডাঙায়ও তেমনি নতুন সম্ভাবনার ইঙ্গিত দিচ্ছে। বলছে, সাগরে আছে বিপুল খাদ্যসম্ভার; আছে এত প্রচুর উদ্ভিদ ও জীবজন্তু, যাদের কাজে লাগালে অচিরেই আমাদের খাদ্যসমস্যার সমাধান হতে পারে।

এ ছাড়া খাদ্য সম্পর্কে আরও অনেক নতুন কথা শোনাচ্ছে বিজ্ঞান। জানিয়ে দিচ্ছে যে সাগর থেকে পাওয়া আহার্য স্থলের তুলনায় অনেক বেশি খাদ্যগুণ-সম্পন্ন; আর এই গুণসম্পন্ন খাদ্যের বিশিষ্ট উদাহরণ হল সাগরে জাত নানা ধরণের লতাপাতা। ওই সব লতাপাতায় প্রোটিন থাকে শতকরা ৫০ ভাগ। কিন্তু স্থলে জাত লতাপাতায় সাধারণত শতকরা ২০ ভাগের বেশি প্রোটিন থাকে বলে আমাদের জানা নেই।

আর শুধু প্রোটিনই বা কেন, চর্বি। সমুদ্রজ আহার্য-সম্পদের কথা। এদের তুলনায় সমুদ্রের অনাহার্য বা অখাদ্য-সম্পদও বড় কম নয়। আজকের বিজ্ঞানী-দের ধারণা, সমুদ্রে আছে লক্ষ লক্ষ টন ইউপো, লক্ষ কোটি টন সোনা, আর হীরের অদ্ভুত ও বিচিত্র সব উপত্যকা। এছাড়া সমুদ্রগর্ভে বিপুল পরিমাণ ইউরেনিয়াম, পেট্রোলিয়াম ইত্যাদি মূল্যবান পদার্থ বিপুল পরিমাণে মজুত আছে বলে বিজ্ঞানীদের ধারণা।

বিশেষজ্ঞদের মতে, এই ধারণাটা অযৌক্তিক কিছু নয়; কেন না, সমুদ্রে সত্যি আছে এরা এবং এরা ছাড়া সমুদ্রে আছে আরও অনেক রহস্য। এই সব রহস্যের অন্যতম হল জোয়ার-ভাঁটা। বিজ্ঞানীরা বলছেন, জোয়ার-ভাঁটা থেকে সমুদ্রে প্রতিদিন ৮০,০০০,০০০ কিলো-ওয়াট শক্তি উৎপন্ন হয় এবং এই শক্তি হল পৃথিবীর সবগুলো জলবিদ্যুৎ-প্রকল্পের শক্তি-উৎপাদন-ক্ষমতার ১০০ গুণ। এদিকে হিসেব করে দেখা গেছে যে, সমুদ্রোপকূলে অবস্থিত ১০ লক্ষ কিলোওয়াট শক্তি-বিশিষ্ট একটি বহুমুখী 'নিউক্লিয়ার রিঅ্যাক্টর' থেকে প্রতিদিন ৪০ লক্ষ টন মিঠে জল পাওয়া যেতে পারে এবং এই জল দিয়ে বোম্বে বা কলকাতার মতো বিরাট শহরের সব রকম জলের চাহিদা মেটানো সম্ভবপর। আর শুধু জলের চাহিদার কথাই বা বলি কেন! এই ধরণের একটি প্রকল্পে কাজ শুরু হলে এ থেকে জল ছাড়াও প্রতিদিন পাওয়া যাবে ১০০,০০০ টন লবণ, ৩,৫০০ টন পটা-সিয়াম, ৫,০০০ টন ম্যাগনেসিয়াম, ৩,০০০ ব্রোমিন এবং ১০,০০০ টনের চেয়েও বেশি সালফিউরিক এ্যাসিড।

ভেবে দেখুন একবার, একটিমাত্র 'নিউ-ক্লিয়ার রিঅ্যাক্টর' কাজে লাগালে প্রতিদিন পাওয়া যাবে এই বিপুল পরিমাণ সম্পদ; এবং যাবে বলেই পৃথিবীর উন্নত দেশ-গুলো আজ সমুদ্র সম্পর্কে হঠাৎ খুব বেশি রকম কৌতূহলী হয়ে উঠেছে।

এই কৌতূহল রাষ্ট্রসঙ্ঘের সভ্যদের ভাবিয়ে তুলেছিল। রাষ্ট্রসঙ্ঘ চেয়েছিল, সমুদ্রের ওপর গার্জেনীর দায়িত্বটা নিজের হাতে তুলে নিতে। কিছুদিন আগে এ নিয়ে এমন কি প্রস্তাবও উঠেছিল সঙ্ঘে। কিন্তু এ প্রস্তাবে পৃথিবীর ধনী ও উন্নত দেশগুলো সায় দেয় নি। ওরা নিজ নিজ তত্ত্বাবধানে সমুদ্রকে কাজে লাগাতে চেয়েছে বরং। উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র গত বছরের বাজেটে সমুদ্র-সম্পর্কিত গবেষণা এবং উন্নয়ন-খাতে মোট ৩৪০ কোটি টাকা বরাদ্দ করেছিল, আর সোভিয়েত ইউনিয়ন বরাদ্দ করেছিল ২২০ কোটি টাকা। তবে ছোটখাটো দেশগুলোও সমুদ্র-সম্পর্কিত গবেষণায় খুব একটা পিছিয়ে নেই আজ। দেশের আর্থিক উন্নয়নের খাতিরে ওরাও আজ সমুদ্রকে কাজে লাগাতে চাইছে। মালয়েশিয়া, থাই-ল্যান্ড ও ইন্দোনেশিয়া চাইছে সমুদ্র থেকে টিন আহরণ করতে।

সুখের কথা, আহরণের কাজ শুরু হয়েছে এরই মধ্যে। ওই সব দেশের সমুদ্রোপকূলে টিন-অন্বেষণ এখন পুরো-দমেই চলছে। ওদিকে জাপান মেতেছে লোহা-অন্বেষণে। সমুদ্রতীর থেকে ৩০ মিটার অবধি গভীর অঞ্চলে এমন সব পদার্থ সংগ্রহ করছে ওরা, যাদের থেকে হাজার হাজার টন লোহা পাওয়া যেতে পারে।

এছাড়া কোনো কোনো দেশের দৃষ্টি আবার সমুদ্রের মৎস্য-সম্পদের ওপর নিবদ্ধ। উদাহরণ হিসেবে পেরুর কথা বলা যায়। আজ থেকে দশ বছর আগেও ওদেশে মৎস্যশিল্প বলে কিছু ছিল না। কিন্তু আজ মৎস্যশিল্পে পেরু অগ্রণীর ভূমিকা নিয়েছে।

এইখানে প্রশ্ন উঠবে, মৎস্যশিল্পে এবং বিশেষ করে সমুদ্র-সম্পদকে ব্যবহার করার কাজে ভারতের ভূমিকা কি? ভারতবর্ষ কি সমুদ্র থেকে রত্ন-আহরণে তৎপর হয়েছে? না কি সে এখনও বসে আছে মান্ধাতার আমলের জাল হাতে নিয়ে? বসে বসে চরম অসহায়ের মতো বিরাট ও মহান রত্ন-গর্ভার দিকে তাকাচ্ছে?

এই সব প্রশ্নের জবাব দিতে হলে ভারতবর্ষের সঙ্গে সমুদ্রের সম্পর্কটা খোলসা করে বলতে হয়। বলতে হয় যে, এদেশের সমুদ্রোপকূল আছে প্রায় ৫,৬০০ কিলোমিটার; কিন্তু সমুদ্র থেকে বছরে মাত্র ২৫ লক্ষ টন মাছ ধরা হয় এখানে। বিশেষজ্ঞদের ধারণা, নতুন যুগের বিজ্ঞান-বুদ্ধিকে কাজে লাগালে এই মাছ ধরার পরিমাণকে ১০ গুণ বাড়ানো যেত: এবং এছাড়া বাড়ানো যেত অন্য কয়েকটি সম্পদকে। এই শ্রেণীর সম্পদের বিশিষ্ট উদাহরণ হল তেল, গ্যাস এবং সার হিসেবে ব্যবহৃত ফসফরাস। সম্প্রতি বিভিন্ন দেশের সমবায়ে গঠিত 'আন্তর্জাতিক ভারত-মহাসাগর অভিযান' থেকে প্রমাণিত হয়েছে যে, ভারতবর্ষের পশ্চিম উপকূলের সমুদ্রে আছে প্রচুর তেল এবং ফসফরাস জাতীয় সম্পদ। এছাড়া আরব সাগরের জায়গায় জায়গায় মৎস্য-সম্পদের পরিমাণও নগণ্য নয়। এখন ভারতবর্ষ যদি প্রতিবেশী দেশ-গুলোর সঙ্গে সহযোগিতার ভিত্তিতে এই নতুন আবিষ্কৃত মৎস্য-সম্পদকে কাজে লাগাবার জন্যে উদ্যোগী হয় তো একদিকে যেমন এদেশের মানুষগুলো উপকৃত হবে, অপরদিকে তেমনি দেশের সম্পদেরও হবে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি।

কিছুদিন হল, এই অগ্রগতির ছোট-খাটো একটি চিত্র তুলে ধরেছেন ভারত-বর্ষের কোনো কোনো সাগর-সমীক্ষক। ওঁরা বলেছেন, সাগর থেকে পাওয়া বাগদা চিংড়ির সংরক্ষণ ও রপ্তানীতে এরই মধ্যে কৃতিত্ব দেখিয়েছে ভারতবর্ষ: ভারত থেকে রপ্তানী করা বাগদা এখন পৃথিবীর ৩৫টি দেশে সমাদরের সঙ্গে গৃহীত হচ্ছে।

কিন্তু প্রশ্ন, এই সমাদর কি এমন কিছু যা ভারতবর্ষের অর্থনৈতিক জীবনে ছাপ ফেলছে? যা'র দিকে তাকিয়ে আমরা বলতে পারি, মান্ধাতার আমলের জালটা আমাদের হাতে এখন নেই আর?

আন্তর্জাতিক সাগর-সমীক্ষকরা বল-ছেন, না; এত বড় কথা বলার দিন ভারত-বর্ষের এখনও আসে নি। কারণ, মান্ধাতার আমলের জালটা এখনও পুরোপুরি খসে পড়ে নি তার হাত থেকে। তবে জালটাকে খসাবার বা ছুটি দেবার সময় যে হয়েছে, সে সম্পর্কে আজ সে মোটামুটি ওয়াকি-বহাল। আজ সে বুঝতে পেরেছে যে, সমুদ্রকে ঘিরে বিরাট কোনো পরিকল্পনা রচনা করা হয়তো তার পক্ষে সম্ভব হবে

না; কিন্তু প্রতিরক্ষা ও বাণিজ্যের খাতিরে তাকে আজ যেমন করেই হোক সমুদ্র সম্পর্কে আগের তুলনায় আরও বেশি সচেতন হতে হবে। তাকে খবর নিতে হবে সমুদ্র-স্রোতের, জোয়ার-ভাঁটার এবং সাইক্লোনের। এছাড়া জলবায়ু ও সমুদ্রবায়ু সম্পর্কেও অনেক সব নতুন তথ্য-সংগ্রহের প্রয়োজন দেখা দিয়েছে আজ। কিন্তু প্রশ্ন, এত কিছু প্রয়োজনের দাবিকে মেটাতে গিয়ে আজ অবধি কী করেছে ভারতবর্ষ? সাগর-সমীক্ষায় কতটুকু কৃতিত্ব সে দেখিয়েছে?

এইসব প্রশ্নের জবাব দিতে গিয়ে বিজ্ঞানীরা বলছেন, কৃতিত্ব সে প্রায় কিছুই দেখায় নি। কারণ, ৫২ কোটিরও বেশি লোক অধ্যুষিত এই বিশাল ভারতবর্ষে 'ওসানোগ্রাফার' বা সাগর-সমীক্ষক আছেন মাত্র ১০০ জন এবং সাগর-সমীক্ষার জন্যে বা সাগর সম্পর্কে গবেষণা করবার জন্যে এদেশে বছরে এমন কি ১০ লক্ষ টাকাও বরাদ্দ করা হয় না।

WIN Rs. 25,000

ENTER THE new SILKO SHAMPOO SLOGAN CONTEST!

* IN ATTRACTIVE PRIZES *

TWO SETS OF PRIZES, TWO OPPORTUNITIES, WITH JUST ONE ENTRY.

(A) PRIZES FOR ARRANGING THE 8 SLOGANS IN CORRECT ORDER

1st PRIZE: GODREJ REFRIGERATOR 9 CFT

2nd PRIZE: KISSAN GRINDMASTER 'MINI'

3rd PRIZE: U.M.S. GRUNDIG ELECTRO MODEL P48

4th PRIZE: MAZDEN ICE-CREAM CHURNER

5th PRIZE: BUSH BAROM TRANSISTOR

6th PRIZE: HGE THERMAL URN

over 125 consolation prizes.

(B) PRIZES FOR BEST SLOGAN SUBMITTED BY CONTESTANTS

1st PRIZE: BAJAJ COOKING RANGE 'SENIOR'

2nd PRIZE: ADLER AIR CIRCULATOR WITH REGULATOR

3rd PRIZE: MURPHY TABLE MODEL RADIO

4th PRIZE: MURPHY TRANSISTOR RADIO

5th PRIZE: MANTECH ICE-CREAM FREEZER

6th PRIZE: BUSH BANJO

over 125 consolation prizes.

ENTER NOW... IT'S SO EASY

A The first thing you have to do is to arrange the 8 slogans given by us in your order of preference.

B Then write one brief, catchy slogan for New Silko Shampoo yourself.

That's all you do, it's so simple, separate prizes will be given to winners in the two categories, although you send in both entries in just one form.

NEW SILKO SHAMPOO

ANOTHER CHOICE PRODUCT FROM PEARLINE-PARIS, MAKERS OF COSMETICS FOR OVER A GENERATION.

FREE - A useful gift with every large size bottle

Get your entry forms from any Pearline-Paris Dealer.

NO ENTRY FEE!

CLOSING DATE: 15th February, 1969.

THE CROWN OF RENOWN

PEARLINE-PARIS PRIVATE LIMITED, BOMBAY 1

Other Pearline Products: Icy-Kool (After Shave Lotion) Vitex (hair vitaliser), Depil (hair remover), Brilliantine, Eau-de-Cologne, Lavender, Lotion, Perfumes.

ইয়োরোপা / হিরন্ময় ভট্টাচার্য

কে? মিঃ সিং? আচ্ছা পাঠিয়ে দাও।

—গুড মর্নিং। বসুন।

—আপনার নাম মিঃ জগন-স্ত্র সিং। মাপ করবেন। আপনার নামটা বোধহয় ঠিক উচ্চারণ করতে পারলাম না। থাকেন ২ নম্বর...

—এক মুহূর্তের জন্যে ক্ষমা করবেন। আপনার ফাইলটা বের করি।

—কতদিন আছেন এদেশে?

—কটা ছেলেমেয়ে?

—চার-চারটে।

—কি করা হয়?

—তার মানে, বেকার।

—কত দিন চাকরী নেই?

—ন্যাশনাল অ্যাসিসটেন্স কত দেওয়া হয়।

—বড় ছেলে চাকরী করে, তার সাহায্যে চলে যায়। কোন সাহায্য দেওয়া হয় না।

—সাবধান করে দেওয়া ভালো, ভুল তথ্য আইন অমান্যের দায়ে পড়বে।... বেকারী ভাতা তো পান।

—দেশে কে আছে?

—দেশে কত টাকা নিয়মিত পাঠান হয়?

—বলছেন, বেকার। কি করে পাঠাবেন। কিন্তু রিপোর্টে লেখা আছে প্রতি মাসে টাকা পাঠানর কথা। না না অন্যায় নয়। বুড়ো মা—দিশ্চয় টাকা পাঠাবেন। সে তো আপনার কর্তব্য। দেশের সঙ্গে যোগাযোগ রাখা ভালো। দেশের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক আছে দেখছি। তিন বছর আগে ভারতে গিয়েছিলেন। তা ভালো।

—এ দেশে কোন ক্লাবের সভ্য। দাচে-টাচে অংশ গ্রহণ করেন?

—চার্চে যান?

—তা তো বটে আপনি খৃশ্চান নন, শিখ।

—পেরেন্টস কমিটি, স্কাউটস কমিটি কিম্বা ধরুন কোন বিংগ ক্লাবের সভ্য? আমায় ফর্মের সমস্ত কলম ভরতে হবে। তাহলে লিখি Integration—Nil.

মিঃ সিং এটা মিনস্ট্রি অফ রিপ্যাট্রিয়েশন বিভাগ। এদেশে কমনওয়েলথ থেকে অনেক লোক এসেছে। ভেবেছে দেশটা সোনায় ভরা। আমাদের দায়িত্ব সে ভুল ভেঙে দেওয়া। এদেশে কত অসুবিধে। গরমকালেও পচা বৃষ্টি। শীতকালে স্মোক। ধোঁয়ায় দম বন্ধ হয়, কুয়াশায় পথ দেখা যায় না। কখন বা বরফ পড়ে। ঠাণ্ডায় জল বরফ হয়ে যায়। ভারতবর্ষে কেমন সূর্যের আলো।

আরও আছে, ধরুন আপনি গ্র্যাজুয়েট। দেশে ভালো চাকরী করতেন। এদেশ আপনার শিক্ষার মর্যাদা দেয় নি। আপনাকে ফ্যাকটরিতে চাকরী করতে হয়েছে। ভাবলে আমারই লজ্জা হয়। অন্ধ সংস্কার। আমার তো মনে হয়, ভারতে ফিরে যাওয়াই আপনার পক্ষে সব দিক দিয়ে মঙ্গল।

—কি বলছেন মিঃ ব্রাউন। এ তো লেবার সরকার। আমরা লেবার পার্টিকে ভোট দিয়েছি। তারা তো উদার, সমাজতান্ত্রিক। টোরি পার্টি যখন ইমিগ্রেশন বিল পাশ করে লেবার পার্টির নেতা মিঃ গেটস্কেল বলেছিলেন, লেবার পার্টি গদি পেলে ইমিগ্রেশন বিল নাকচ করে দেবেন। ১৯৬৪ সালে যেবার লেবার পার্টি টোরি পার্টিকে হারিয়ে দিয়ে গদি দখল করে। সে সময় আমি দোরে দোরে গিয়ে লেবার পার্টিকে ভোট দেবার জন্যে অনুরোধ করেছি। মনে আছে সে সময় লেবার পার্টির নেতা মিঃ হ্যারল্ড উইলসন এক উদ্ধত বৃদ্ধকে ধমক দিয়েছিলেন, কমনওয়েলথ থেকে ডাক্তাররা না এলে উপস্থিত লোকের অনেকে হয়ত চিকিৎসার অভাবে মারা যেত।

আরও মনে আছে, কলসারভেটিভ পার্টির পিটার গ্রিফিথস বর্ণবৈষম্যের ভিত্তিতে লেবার পার্টির নামকরা নেতা মিঃ গর্ডন ওয়াকারকে হারিয়ে দেন। মিঃ উইলসন তাঁকে পার্লামেন্টের কুষ্ঠ রোগ বলে সম্বর্ধনা জানান।

—মিঃ সিং আপনি শিক্ষিত লোক। আপনার কথা সব ঠিক। তবে সে সব হল ১৯৬০ সালের কথা। পৃথিবী ডাইনামিক—প্রচণ্ড গতিবেগে এগোচ্ছে। ১৯৭০ সালের পর থেকে আদর্শের রদ-বদল হয়েছে। আর আমাদের সঙ্গে কোন পার্টির দহরম মহরম নেই। আমরা সিভিল সার্ভেন্ট। রাণীর আদেশে আমাদের চাকরি। পার্লামেন্ট যা আইন করে তা পালনের দায়িত্ব আমাদের।

আমাদের সরকার আপনাদের জন্যে দরাজ হস্তে খরচ করছেন। দরকার হলে ফিরে যাবার জন্যে টাকা সাহায্য করতে পারে। এই খাতে বরাদ্দ আছে বছরে ৫০ মিলিয়ন পাউণ্ড। টাকার হিসেব করুন। প্রায় একশ কোটি টাকা।

রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয় প্রকাশনা

SOCIOLOGY OF PLANNING

ডক্টর শোভনলাল মুখোপাধ্যায় ১৪·৫০

শ্রীহিরণ্ময় বন্দ্যোপাধ্যায় ২·০০ দি হাউস অফ দি টেগোরস। ডক্টর প্রবাসজীবন চৌধুরী ১০·০০ স্টাডিজ ইন এস্থেটিক্স। ৮·৫০ টেগোর অন্ লিটারেচার অ্যান্ড এস্থেটিক্স। ডক্টর ননীলাল সেন ১৫·০০ এ ক্রিটিক অব দি থিওরিজ অফ বিপর্যয়। ডক্টর মানস রায়চৌধুরী ১৫·০০ স্টাডিজ ইন আর্টিস্টিক্ ক্রিয়েটিভিটি। ডক্টর ধীরেন্দ্র দেবনাথ ৬·০০ রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টিতে মৃত্যু। ডক্টর শিবপ্রসাদ ভট্টাচার্য ৫·০০ পদাবলীর তত্ত্বসৌন্দর্য ও কবি রবীন্দ্রনাথ। শ্রীরতনমণি চট্টোপাধ্যায়, শ্রীপ্রিয়রঞ্জন সেন, শ্রীনির্মলকুমার বসু ৩·০০ গান্ধীমানস। গোপেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায় ১৫·০০ সঙ্গীতচন্দ্রিকা। শ্রীবিনয়েন্দ্রনারায়ণ সিংহ-সংকলিত ১২·০০ রবীন্দ্রসুভাষিত। ডক্টর অমিতাভ মুখোপাধ্যায় ১৬·৫০ ব্রিফার্স অ্যান্ড রিজেনারেশন ইন বেঙ্গল, ১৭৭৪—১৮২৩। শ্রীবালকৃষ্ণ মেনন ২৫·০০ ইণ্ডিয়ান ক্ল্যাসিক্যাল ডান্সেস্।

রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়। ৬/৪ দ্বারকানাথ ঠাকুর লেন, কলিকাতা-৭

পরিবেশক : জিজ্ঞাসা, ১এ কলেজ রো ও ১৩৩এ রাসবিহারী এ্যাভেনিউ, কলিকাতা

তিস্তার বন্যা

মুকুলেশ সান্যাল

এবং যখন মানুষে শ্বাপদে কোলাকুলি
যখন রাত শেষে তিস্তার ভীষণ বাঁধভাঙা বন্যায়
মায়ের কোল থেকে শিশু ভেসে যায়,
স্বামীর হাত থেকে অষ্টমঙ্গলার
গন্ধ-মুছে-না যাওয়া স্ত্রী
অথবা সপরিবারের সকরুণ স্বর
বাঁচাও বাঁচাও
তখন-ও মানুষ মন্দিরে মন্দিরে
অথবা পাহাড়ে কন্দরে ঈশ্বর চিন্তায় মগ্ন
অথবা অথবা গ্রহবিজ্ঞানীদের
চন্দ্রালয়ের নবতর সংবাদ
আর ম্যাকনামারার রক্তাক্ত হাতে
বিশ্ব কোষাগারের চাবি।

বন্যার ছামাস পরে-ও অসহায় মায়েরা
চলেছেন দলে দলে তিস্তার পুজোয়।

—কিন্তু কি বলছেন আপনি। নামে সিং হলেও আমি তো ভারতের নাগরিক নয়। আমার বৃটিশ পাসপোর্ট।

—আপনি বোধহয় একটু চটে গেছেন। অন্যায় কিছু বলে ফেললে মার্জনা করবেন। ও পাসপোর্টের দাম নেই। আপনার বাবা, মা, বা ঠাকুর্দা, ঠাকুর্মা যদি স্বাভাবিক বৃটিশ হয়ে জন্মে থাকেন তাহলে অবশ্য আপনার হক আছে। আসলে আপনারা ভারতবাসী। ভারত সরকারের সঙ্গেও এ বিষয়ে আমাদের ফয়সালা হয়েছে। ছিমমূল আপনারা নন। সেখানে ফিরে গেলেই সুখে থাকবেন। আপনার ভালোর জন্যেই বলা। আরও তিন মাস সময় দিলাম। ভেবে দেখুন। তারপর আসবেন। তাহলে আজকের মত বিদায় নেওয়া যাক। কোন প্রয়োজন মনে করলে আমাকে স্মরণ করতে দ্বিধা করবেন না, আমরা আপনাকে যথাসাধ্য সাহায্য করব। আচ্ছা মিঃ সিং থ্যাঙ্ক ইউ ফর কামিং। তারপর আত্মীয়তাভরা করমর্দন।

মিঃ সিং বিদায় নেন। এবার অফিসার বলেন, নাইজিরিয়ার মিঃ বাবা-কুম্বকে পাঠিয়ে দাও।

পাঠক হয়ত ভাবছেন ১৯৭০-এর পর কি হবে না-হবে তাই নিয়ে এখন থেকে মাথার চুল পাকিয়ে কি লাভ? লাভ-ক্ষতির কথা বলা কষ্টকর তবে প্রয়োজন হয়ত আছে। শুধু মিঃ ইনখ পাওয়েল যদি আকাশে ঘুসি ছুঁড়তেন হয়ত ভাববার কিছু ছিল না। কিন্তু দেশের অধিকাংশে লোকের মতামত তাই। মিঃ পাওয়েল ঘটনা ও রটনা মিলিয়ে লোককে উত্তেজিত করেন। কন্সারভেটিভ পার্টির তরফ থেকে তা ছাপিয়ে বিলি করা হয়। সমস্ত পত্রিকা বড় বড় হরফে প্রথম পাতায় ছাপায়। এদেশের প্রধানমন্ত্রীও এতো প্রাধান্য পায় না। এপ্রিল মাসে বলে-ছিলেন সাদারা সাবধান, না হলে ইংলণ্ডের নদীতে রক্তবন্যা বইবে। এবার বলেছেন, কালো লোকগুলো এদেশের পরিবেশ কদাকার করছে। এ ইংরেজ সইবে না।

তাঁর সাম্প্রতিক বক্তৃতার সার বস্তু, আর একজন কালো লোককেও আসতে দেওয়া উচিত নয়। যারা এদেশে আছে তাদের স্ত্রী ছেলে মেয়েদের আসার অনু-মতি দেওয়া হবে না। এবং Ministry of Repatriation খোলা হবে। তাদের কাজ হবে কালো লোকদের নিজেদের দেশে পাঠিয়ে দেওয়া। তিনি যে তথ্য ও স্ট্যাটিসটিক দিয়েছেন তা তিলকে তাল করা। সুবিধে মত বিকৃত করা। বলা বাহুল্য, এ বক্তৃতার প্রতিবাদ উঠেছে। এমন কি টোরি পার্টির নেতা মিঃ হিথও জোর গলায় অস্বীকার করেছেন যে, এ টোরি পার্টির পলিসি।

ঘটনার পারম্পর্য চমৎকার। গত দশ বছরে ঠিক এক ছাঁচে ঘটে চলেছে। বহুদিন আগে Defence for the Whites-এর মাথা ছিলেন স্যার অস-ওয়াল্ড মোসলে। তিনি ফ্যাসিস্ট সুতরাং তাঁকে সমর্থন করা যায় না। কাগজের কোন এক কোণে ছাপা হত তাঁর বক্তৃতা।

তারপর আসরে নামলেন মিঃ সিরিল ওসবর্ন, পরে স্যার হন। সাম্প্রতিক কালে ডানকান স্যান্ডস ও ইনখ পাওয়েল। তিন-জনেই টোরি পার্টির হোমরা-চোমরা সভ্য। এঁদের বক্তৃতা শুনে দেশের বিচক্ষণ লোক বিচলিত হয়েছেন, বলেছেন এ অসঙ্গত এ আদর্শহীন, তীব্রকণ্ঠে এর প্রতিবাদ জানিয়েছেন। কিছুদিন যেতে না যেতেই ছোট ছোট প্রেশার গ্রুপ চাপ দিয়েছে টোরি পার্টির কর্ণধারকে। টোরি পার্টির মনে হয়েছে প্রথমে শুনতে যত খারাপ লেগেছিল আসলে তত খারাপ নয়। তাদের মন গলেছে, আদর্শ গেছে চুলোয়। মেনে নিয়েছে পার্টির পলিসি হিসেবে। আশ্চর্য, দুদিন বাদে লেবার সরকার সেই ছাঁচে আইন পাশ করেছে। সবার বড় দেশ। দেশের মঙ্গলের জন্যে তাঁরা সব করতে পারেন।

মিঃ পাওয়েলের শেষ বক্তৃতা নতুন ইতিহাস করল। কদিন না যেতেই লেবার পার্টির এক হোমরা-চোমরা সভ্য মিসেস রেনী শর্ট পাওয়েলের কথা পুনরাবৃত্তি করেছেন। মিসেস শর্টকে দুদিনে ধর্মান্তরিত করায় অনেক পার্লামেণ্টা-রিয়ান পাওয়েলকে সম্বর্ধনা জানিয়েছেন। পাওয়েলইজমের জয়জয়কার। তা রোধ করার ক্ষমতা বা ইচ্ছে এদেশের আছে কি না বলা মুস্কিল।

পথিক কথার ?

মনোজ বসু

[পূর্ব-প্রকাশিতের পর]

॥ তিরিশ ॥

পাত্র কোথা পাকিস্তানে? ভাল পাত্র যা ছিল, সবই তো বর্ডার-পারে চলে গেছে। দুটো-চারটে রদ্দি মাল পড়ে আছে, ফুল্লরার যোগ্য তারা নয়।

কমলবাসিনী বলেন, বর্ডার পার হয়েই তবে খোঁজ-খবর করো। ন-মাস ছ-মাসের পথ নয়। লোকে তো পট পট করে পার হয়ে যাচ্ছে।

নিজের বিয়ের ব্যাপার হলেও ফুল্লরা ঠাকুরমার কাছে গিয়ে ফোড়ন কাটে : অত হাঙ্গামা দাদু পেরে উঠবেন না।

না পারলে কে আর পারবে? ধার করবার কথা সে যে ফাঁকি দিয়ে পালাল।

চোখ ছলছলিয়ে ওঠে কমলবাসিনীর। ধারাপতন শুরু হয়ে যায় আর কি। ফুল্লরার কৌশল আছে। তাড়াতাড়ি কলহ জুড়ে দেয় : বুঝি গো বুঝি দিদা, আমার তাড়ানোর ফিকির। কতগুলো করে খাই তোমাদের? না হয় এক বেলা করে খাবো এখন থেকে।

কথার মোড় ঘুরল। হাসি চিকচিক করে ওঠে কমলবাসিনীর মুখে নাতনির থুতনি ধরে নাড়া দিয়ে বললেন, তাড়ানোর ফিকির—তাই বটে! নিজের যেন ইচ্ছে হয় না। তোর বয়সীরা দুটো-তিনটের মা হয়ে ছেলে-মেয়ে কোলে-কাঁখে নিয়ে দিব্যি সুখে ঘরসংসার করছে।

শিউরে উঠে ফুল্লরা বলে, রক্ষে করো দিদা। ছেলে-মেয়ে কোলে-কাঁখে নেবার শখ নেই আমার অত।

নাছোড়বান্দা ঠাকুরমা বলেন, দরকারও নেই—কোলে-কাঁখে আমরাই করব। ছুঁতেও দেবো না তোকে। শখ তোর না থাকুক আমাদের আছে—ঘরবাড়ি আলো-করা নাদুস-নুদুস একটা নাতজামাই আসবে। কোমর বেঁধে লেগে গেছেন তোর দাদু। চিঠিপত্তোর লিখছেন, যার সঙ্গে দেখা হয় তাকেই বলছেন। জুটে যাবে শিগগির, দেরি হবে না।

ফুল্লরা বলে, নাতনি তোমাদের অনেক তো আছে। আমায় রেহাই দাও, তাদের নিয়ে পড়ো গে।

বুঝতে না পেরে কমলবাসিনী সপ্রশ্ন চোখে তাকালেন।

শতদলের নাতনিরা। এখন তো দশটি তারা। ছোটদের বাদ দিলাম, তোমাদের হিসাব মতো দুটি-তিনটি তো দস্তুরমতো অরক্ষণীয়া। বিয়ে-থাওয়া দাও একটায়। ঘরজামাই এনে চব্বিশ ঘণ্টা চোখের উপরে রেখে মনের শখ মেটাও।

ঘেন্না! ঢিল-পাটকেলের মতন রাস্তা থেকে কুড়িয়ে আনা—তারা নাকি নাতনি আমাদের!

মুখ বাঁকিয়ে কমলবাসিনী সরে গেলেন।

কমলবাসিনীর কথা মিথ্যা নয়। বীরেশ্বর পাত্রের সন্ধানে উঠেপড়ে লেগেছেন। ফুল্লরা তাঁর উপরে ঝঙ্কার দিয়ে পড়ল : তোমার নাতনির কত কুড়ি বয়স হয়েছে দাদু, যে বিয়ে না দিলে ঘর ভেঙে পালাব? আট বছরে গৌরীদান হত, দিদার কাছে গল্প শুনে থাকি। কিন্তু সে কাল পার হয়ে অনেক তো এগিয়ে এসেছি। বিয়ে ধরো মোটে না-ই হল আমার।

বীরেশ্বর বললেন, তোর ঠাকুরমা ব্যস্ত হয়ে পড়েছে। তাকে নিয়ে বড্ড ভয়। সাংঘাতিক অবস্থা হয়ে উঠেছিল, তুই তখন একফোঁটা শিশু। তোকে পেয়েই ঠাণ্ডা হয়ে গেল। তোর সুখের সংসার হবে, এবারে তার সেই ঝোঁক। না হলে হয়তো ক্ষেপে যাবে আবার।

ঘোর বেগে খোঁজাখুঁজি চলল। সত্যি, কঠিন হয়েছে উপযুক্ত পাত্র জোটানো। এক একটা খবর আসে, বীরেশ্বর পুত্রবধূর সঙ্গে পরামর্শ করতে বসেন। অযোগ্যপাত্র বিবরণ দিয়ে প্রশ্ন করেন : বলো দিকি শুনি, সোনার পদ্ম মেয়ে এমন ছেলের হাতে কেমন করে দিই?

হনুমান-মেয়ে—

জানলার ওধারে ফুল্লরা পড়াশুনোর আছে—উঁচু গলায় মেয়ের কানে পেঁছিয়ে নোর মতো করে লীলা বলল।

বীরেশ্বর চটে গেলেন : কোন চোখ দিয়ে দেখে তুমি হনুমান বলো?

ফনফন করে গাছ বেয়ে উঠে যায়, এ গাছ থেকে ও-গাছে লাফ দিয়ে পড়ে—হনুমান ছাড়া আর কি। হুপ হুপ করে আওয়াজটাই কেবল করে না।

হেসে পড়ল লীলা। হাসতে হাসতে বলে, মিছে চেষ্টা বাবা। কার্তিক কি কন্দর্প যে পাত্রই আসুক, পছন্দ হবে না। নাতনি চলে যাবে ভাবতেই আপনার মন বিগড়ে যাচ্ছে।

ভুল ধারণা তোমার। পছন্দ হয় কি না দেখবে। ভাল পাত্র পাকিস্তানে নেই, পার হয়ে সমস্ত চলে গেছে। ও-পারের খোঁজ নিতে হবে। নিচ্ছিও।

লীলা বলে, পাকিস্তানেও ভাল বিয়ে-থাওয়া অঢেল হচ্ছে বাবা। পাত্র-পাত্রী পাকিস্তানেরই।

হচ্ছে বই কি! হবার যাদের, হচ্ছে—

ঢোক গিলে বীরেশ্বর আবার বললেন, পাত্র-পাত্রী কেন ভাল হবে না! সোনার টুকরো ছেলেমেয়ে, আমারই ছাত্র কতজনা।

রাণী ধূপ
কাকাত্র প্রোডাক্টস

হিন্দু মুসলমান আমার কাছে বাছবিচার নেই। ধর্ম জীবনের কোন সমস্যাই নয় আজকের দিনে। লোকটা খৃস্ট ভজে না কৃষ্ণ ভজে, বুদ্ধ ভজে, না আল্লাহ্ ভজে, কারও কোন মাথাব্যথা নেই তা নিয়ে। ভুল বললাম, আছে সামান্য কিছু লোকের —কিন্তু খোঁজ নিয়ে দেখগে, কারণটা নিছক ঐহিক স্বার্থ। এদেরও দিন ফুরিয়েছে, দ্রুত লয় পেয়ে যাচ্ছে ধর্ম-ধ্বজীরা।

একটু থেমে আবার বললেন, কিন্তু তোমার শাশুড়ি বেঁচে রয়েছে। তার চোখের উপরে হতে পারবে না। ধর্মের চেয়েও বড় বাধা বুকের ক্ষত। সে কালের সেই ক্ষত আজও শুকোয় নি, জীবন থাকতে শুকোবে না। উপরে একটা পর্দা পড়ে আছে, সামান্য নাড়াচাড়া খেলেই ঘা দগ-দগ করে উঠবে। মুখ দিয়ে তোমরা কেউ এ ধরনের কথা উচ্চারণও করবে না।

মা হনুমান বলেছে, কায়দা পেয়ে এই-বারে ফুল্লরা শোধ নিয়ে নেয়। দাদুর কাছে নালিশ করে: আমার নাম মা জোহরা দিয়ে রেখেছে। ডাকে—ফুল্লরা নয়, জোহরা।

নাতনির নালিশ বীরেশ্বর উড়িয়ে দেন: নামে কি আসে যায়? তুই দিদি আমাদের যে গোলাপ, সেই গোলাপই—যে নামে খুশি ডাকুকগে।

এবারে লীলারই প্রতিবাদ: না বাবা, নামের অনেক দাম। ফুল্লরাকে জোহরা নামে ডাকি, ধর্মে সে মুসলমান হবে কিম্বা মুসলমান পাত্র বিয়ে করবে সে সব কিছুই নয়। মেয়ে বড় হয়ে পরিপুষ্ট জ্ঞানবুদ্ধি নিয়ে পছন্দমতো বিয়ে করবে, আমি অন্তত তাতে বাধা দিতে যাবো না। বিয়ে নিয়ে দুশ্চিন্তা নেই, আমি ভাবি অন্য জিনিষ। এই পূব-পাকিস্তানে অহরহ মুসলমানের সঙ্গে মেলামেশা—হিন্দুর সঙ্গে তিলমাত্র ফারাক দেখিনে তো ওদের। কেন হতে যাবে—বাঙালি উভয়েই, এক ভাষা একই রকমের চালচলন। বিভেদপন্থীরা রন্ধ্র খুঁজে খুঁজে মাথা গলাতে চায় তবু। তার মধ্যে একটা হল নাম। সর্বাংশে এক হলেও নামের মধ্য দিয়ে সন্দেহ আসে, বুঝি-বা পৃথক আমরা।

একটু থেকে আবার বলল, হরেন মুখুজ্জে মশায় ধর্মে খৃস্টান, কিন্তু নামের সঙ্গে মাইকেল এডোয়ার্ড স্টিফেন কোন-কিছুই জোড়া ছিল না। গেঞ্জি গায়ে থেলোহুঁকোয় তামাক-খাওয়া দানবীর পবিত্র মানুষটি দশজনের থেকে কোন দিক দিয়ে আলাদা-কিছু, ভুলেও কেউ ভাবতে পারত না। কোন ধর্মেই বিধান নেই অমুক ভাষায় নামকরণ করতে হবে। বাংলা ভাষার জন্য মুসলমান কিশোররা সকলের আগে প্রাণ দিয়েছেন, নামে কেন তাঁরা বাংলা নিচ্ছেন না বুঝতে পারি নে।

ফুল্লরা বলে ওঠে, ঘরব্যাভারি প্রায়ই তো বাংলা নাম। মীরা ছন্দা সন্ধ্যা—আমারই বন্ধু তারা। এমন কি লক্ষ্মী নামেরও একটি। লক্ষ্মীর মা বলেন, এ হল আমার মেয়ে লক্ষ্মী। ঐ নামের এক হিন্দু দেবী আছেন বলে এমন মিষ্টি নামটা বাতিল করে দিতে পারি নে।

লীলা বলে, পোশাকি নামেই বা বাধা কিসের?

বীরেশ্বর ঘাড় নেড়ে বললেন, কিছু না, কিছু না। ইসলাম ঝড়ের বেগে চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ল, আরবি নামেরও তার সঙ্গে আমদানি। চীনারা কিন্তু এ বাবদে গোঁড়া—চীনা মানুষ ইসলাম গ্রহণের পরেও চীনা নাম আঁকড়ে ধরে রইলেন। সোবিয়েতের মুসলমানরা আরবি নামের পিছনে রুশ-প্রত্যয় জুড়ে মিশাল করে নিয়েছেন। বাংলা দেশে বাংলা-নাম ইতিমধ্যেই ঘরের ভিতরে ঢুকে গেছে, বাইরে বেরুতেও আর বেশি দেরি হবে না।

লীলা বলে, কত দিনে বেরুবে—আমরাই বা চুপচাপ থাকি কেন? ফুল্লরার আর এক নাম জোহরা। ওঁরা বাংলার দিকে এগোচ্ছেন, আমরাও না-হয় আরবি-ফারসির দিকে খানিকটা এগিয়ে গেলাম। শত্রু তো ছুতো খুঁজে খুঁজে বেড়ায়, এমনটি হলে অমুক জিতল তমুক হারল, কথা উঠতে পারবে না। কত বাঙালি মেয়ের নাম মেরি ডলি কুইনি, তা হলে লায়লা জোহরা নাজমা মিষ্টি মিষ্টি নামগুলোই বা কী দোষ করেছে? নামে নামে মিলেমিশে থাক—কে হিন্দু কে মুসলমান নামের ভিতর দিয়ে বক্ষম উঁচিয়ে না থাকে।

ফুল্লরা দাদুর দিকে একবার চোখ টিপে খিলখিল করে হেসে উঠল।

মেয়ের হাসির মর্ম লীলা বোঝে, এ প্রসঙ্গ আগেও হয়েছে। তবু না বোঝার ভান করে বলে, হাসি কিসের এত?

হিন্দুস্থান থেকে ছোটমামার সঙ্গে পাকিস্তানে এসে পড়লে—তখন মা তুমি মানুষ নও, গনগনে একখানা আগুনের চাংড়া। এসেছিলে স্কোলের মেয়েটা দাদু-দিদার হেপাজতে ছুঁড়ে দিয়ে বদলা নিতে ঝাঁপিয়ে পড়বে। রক্তগঙ্গা বইয়ে দেবে—রিভলভার-কার্তুজ নিয়ে তৈরি হয়ে এসেছিলে।

অনেকবারই এসব কথা হয়েছে, তবু লীলা লজ্জা পেয়ে যায়। বলে, হ্যাঁ, স্কোলের মধ্যে থেকে আগুনের আঁচ পেয়েছিলি বুঝি তুই—সর্বাঙ্গ ঝলসে গিয়েছিল? রিভলভার-কার্তুজ সব পুটপুট করে দেখেছিলি একবছুরে মেয়ে?

আমি আর দেখব কি করে, দাদুর কাছে গল্প শুনে থাকি। দাদু কেন বানিয়ে বলতে যাবেন? যা তোমার মতলব ছিল মা, অর্ধেকখানি দিব্যি হাসিল করেছ। মেয়েকে দিদা-দাদুর হেপাজতে দিয়ে ভার-মুক্ত হয়েছ। মুখের একটা 'মা' ডাক ডাকব, তারও একটু ফুরসত খুঁজে পাই নে। তোমার নতুন ছেলেমেয়েরা ঘিরে থেকে দিনরাত 'মা' 'মা' করছে, তার মধ্যে আমার একলা গলার ডাক কান অবধি পৌঁছবে কেমন করে?

লীলা মেয়েকে কোলের কাছে টেনে নিল। সামনে উচ্ছৃঙ্খল চুল কটি ঠিক করে দিয়ে মৃদু হেসে বলল, তাই যদি বলিস, মতলবের বাকি অর্ধেকও হাসিল করে ফেলেছি। সেটা দেখতে পাস নে কেন জানি নে।

ফুল্লরা সবিস্ময়ে বলে, বদলা নেওয়া শত্রুর উপরে?

তাই, ঠিক তাই—

সগর্বে লীলা বলে ওঠে: শত্রু একেবারে নির্মূল হয়ে গেছে। রিভলভার চালাতে হয় নি, রিভলভারে এমন নির্মূল হয় না। এক শত্রু মেরে ফেললাম, তার জায়গায় দশ শত্রু নতুন করে জন্মায়। রিভলভার কোথায় জং ধরে পড়ে আছে, খবরও রাখি নে। অথচ একটা শত্রু নেই দেখ কোনদিকে—সবাই আপন, সবাই আত্মীয়। এর চেয়ে জোরের বদলা কে করে নিয়েছে। অমুক অমুক জাতে হিন্দু, অতএব অমুক অমুক জাতে মুসলমান—এমনি করে ভাববার ক'টা মানুষ আছে, বের কর দিকি এত বড় দেশের মধ্যে।

ফুল্লরা ফস করে বলল, খুঁজতে হবে না, ঘরেই তো একটি। আমার দিদা।

ওঁরাই আছেন কয়েকটি, বোধকরি আঙুলে গণা যায়। সয়ে যেতে হবে। শঙ্কার কিছু নেই—মাবধোর দাঙ্গা-হাঙ্গামায় যাচ্ছেন না বুড়োমানুষরা। যে

পাকা চুল কাঁচা

আমরা বেশী প্রশংসা করিতে চাহি না। আমাদের "কেশরঞ্জন" তৈল ব্যবহারে পাকা চুল চিরতরে স্বাভাবিক কাল রং-এ পরিণত হয় ও চুল পাকা বন্ধ হয়। ভবিষ্যতে নূতন কাল চুল গজায়। ইহা মানসিক শক্তি ও দৃষ্টিশক্তির উন্নতি সাধন করে। যদি আপনি মনে করেন যে এই তৈল অন্য কোন কাল কেশতৈলের মতন; একবার অবশ্যই ইহার শক্তির বিকাশলাভ প্রত্যক্ষ করুন। গুণের তুলনায় ইহার মূল্য কিছুই নয়। দাম ১০৲ টাকা। বিশ্বাস না হইল, টাকা ফেরৎ লইবেন।

Western India Co. (S.N.),
P.O. Katrisarai (Gaya)

ক'টা দিন জীবন আছে, শান্তিতে থাকুন নিজেদের সংস্কার-বিশ্বাস নিয়ে। কিন্তু এই বস্তু ও'দের কাছ থেকে নিয়ে নেবার মানুষ জন্মাচ্ছে না—ও'রা যেদিন চলে যাবেন, সংস্কার-বিশ্বাসও সঙ্গে সঙ্গে ও'দের চিতায় উঠে যাবে।

যশোর শহরে, জানাশোনার মধ্যে, ভাল এক ঘটক আছেন। ঘটকালি করে বিস্তর বিয়েথাওয়া দিয়েছেন তিনি। ফুল্লরার বাপ-মায়ের বিয়েও তাঁর যোজনা। ঘটক-মশায় এখন বুড়ো হয়ে পড়েছেন, ঘটকালি কাজটাও তেমন আর চালু নেই। সে কাজ অনেকক্ষেত্রে পাত্র-পাত্রী নিজেরাই স্কন্ধে নিয়ে নেয়। তা সত্ত্বেও ঘটকমশায়ের খুব একটা অসুবিধা হয় না। ছেলে-মেয়ে যাদের বিয়ের একদা যোজনা করে দিয়েছিলেন, তারাই এখন প্রবীণ। অভাবে পড়লে ঘটকমশায় তাদের বাড়ি চলে যান। একটা বেলার পরিপাটি ভোজন-ক্রিয়া এবং একটা-দুটো টাকা দক্ষিণা মিলে যায়। পাকিস্তান হবার পর পালানোর হিড়িক পড়ে গেল, ঘটকমশায় নড়লেন না : নতুন জায়গায় কে চেনে আমায়? পেটের ভাত জোটাতে পারব না, অনাহারে মরতে হবে এই অন্তিম বয়সে।

থেকে গেলেন তিনি। বুদ্ধির কাজ করেছিলেন। মুসলমান ঘরেও ছেলেমেয়ে-দের বিয়েয় ঘটকের প্রয়োজন পড়ে। কিছু মক্কেল সেখানেও জুটেছে। কেটে যাচ্ছে কোনরকমে। হিন্দুস্থানে গিয়েও যা কী লাটসাহেব হতেন।

কর্মব্যস্তা ঘটকমশায়কে নিজের হাতে চিঠি লিখে পাঠিয়েছিলেন : নাতনি অরক্ষণীয়া হয়ে উঠেছে। ওর বাপ-মায়ের বেলা আপনারই ঘটকালি; মেয়েটাকেও এবার পাত্রস্থ করে দিন। পাকিস্তানে সুপাত্র দুর্লভ বটে, কিন্তু আপনার উপর আমাদের অশেষ আস্থা। এপার-ওপার খুঁজে পেতে আপনিই উপযুক্ত পাত্র এনে দেবেন। আপনার পাওনাগণ্ডায় কৃপণতা হবে না, এ বিষয়ে নিশ্চিন্ত থাকতে পারেন।

ঘটক বৃদ্ধ হয়েছেন, তবু উঠেপড়ে লাগলেন তিনি। এবং অচিরেই ভাল একটি সম্বন্ধ জুটিয়ে ফেললেন। পাত্র চার্টার্ড একাউন্টান্ট, কলকাতায় থাকে, নতুন পাশ করে অন্যের অফিসে বসছে। আদিবাস যশোর শহরেরই কাছাকাছি এক বর্ধিষ্ণু গ্রামে। ডাকসাইটে বনেদি পরিবার। পাকিস্তান হবার সঙ্গে সঙ্গে এখানকার বাস তুলে বাড়ি সুদ্ধ কলকাতায় গিয়ে উঠেছে। বিষয়-সম্পত্তি ও ঘরবাড়ির বন্দোবস্ত সারা হয় নি এখনো, ধীরেসুস্থে হচ্ছে। পাত্রের পিসেমশায় যশোরের পশারওয়ালা উকিল, ওকালতি ছেড়ে তিনি যেতে পারেন নি। তিনিই তাড়াহুড়ো করতে দেন নি, ধীরে-সুস্থে হলে মনের মতন দর আদায় করে দিতে পারবেন। পাত্রের বাপের সেই সূত্রে যশোরে আসা-যাওয়া আছে। ঘটক-মশায় তক্কেতক্কে ছিলেন, ধরে ফেললেন সেই সময়। পাত্রের বাপ, পিসে এবং জনা-দুই ভদ্রলোক কনে দেখতে বীরেশ্বরের গ্রামের বাড়িতে উপস্থিত হলেন।

ফুল্লরাকে দেখে গেলেন তাঁরা। দেখতে সুশ্রী, পালটি ঘর, বীরেশ্বর হাতে ধরে নাতনিকে লেখাপড়া শিখিয়েছেন—অপছন্দের কোন হেতু নেই। তাহলেও আর একটু আছে—আরও একবার কষ্ট করতে হবে মা-জননীকে। আজকালকার ছেলেপুলে—আমাদের সেকেলে পছন্দে ওদের মন ভরে না। বন্ধুবান্ধব নিয়ে পাত্র নিজেও একদিন আসবে। ছেলের মায়েরও সেই রকম ইচ্ছা, কথার তলে আমরা থাকতে চাইনে। পাশপোর্ট-ভিসা করে এখানেই আসবে তারা, আপনাদের কষ্ট করে ওপার অবধি যেতে বলছিনে।

বেশ তো, বেশ তো—

অটস্থ হয়ে বীরেশ্বর সায় দিলেন। মুরুব্বিদের সঙ্গে সঙ্গে বাস-রাস্তা অবধি গিয়ে বাসে তুলে আপ্যায়িত করে এলেন।

বাড়ি ফিরলে নাতনি ঝঙ্কার দিয়ে পড়ে : কেন তুমি রাজি হয়ে গেলে দাদু? মানা করে চিঠি দাও, আসতে হবে না। আমি যেন জেলের ডালার মাছ—কেনার আগে খদ্দেরে কানকো তুলে পরখ করবে। একবার একদলের পরীক্ষায় হবে না—দলের পর দল আসবে।

বীরেশ্বর বোঝাচ্ছেন : কথা দিয়ে ফেলেছি, এসে যাক তারা। এই শেষ, আর নয়। তাতে বিয়ে হোক আর না-ই হোক। সত্যি সত্যি ভাল সম্বন্ধ। পাকিস্তানে পাত্র জোটানো বড় মুশকিল। মনের মতন একটি পাওয়া গেছে কপালক্রমে—

লীলাও দেখি শ্বশুরের সঙ্গে একমত। মেয়েকে বলে, মন্দটা কিসে হল? তোকেই তো শুধু দেখবে না, তুইও তাকে দেখে নিবি। তার মতন তোরও পছন্দ-অপছন্দ আছে—মস্ত বড় সুযোগ পেলি। বরই ইন্টারভিউ দিতে আসছে, সেইরকমটা ধরে নে। ফাঁকতালে আমাদেরও দেখা হয়ে যাবে। শতেক হাঙ্গামা করে বাড়ির উপর আসছে, এতে কেন রাগড়া দিবি তুই?

[ক্রমশঃ]

অশ্লীলতার বিরুদ্ধে

নবীন মুখোপাধ্যায়

আমরা বেশ ভালো আছি। বেশ একা আছি। ঘোরতর নির্জনে আছি। আমরা আছি হে আছি। কিন্তু কেউ কাউকে চিনি না। কারুর ভাষা কেউ জানি না। এক অনিঃশেষ রাত্রির ভেতরে আছি। বুকের ভেতরে আছে এক অমর ঘুণপোকা। সে আমাদের কুড়মুড় কুড়মুড় করে কী চমৎকার কুরে কুরে খাচ্ছে। তাকে আমাদের এতদিনের অর্জিত পুণ্যফল, বিশ্বাস, ভালোবাসা, স্নেহ-প্রীতি, শ্রদ্ধা, বিশ্বস্ত বন্ধুর মত, সে খাবে বলে, টেবিলে সাজিয়ে রেখেছি। কতো ভালোভাবে, দ্যাখোরে দ্যাখো, নিরাসক্ত আর নির্বিকার হয়ে যেতে পেরেছি কাফ্‌কা আর কামুর মত, সার্ত্রের মতন না, কেন না উনি আবার মাঝে মাঝে বেগোড়বাঁই করেন, দুম করে বলে বসেন,

'Against a crying child
'La Nausia' is insignificant',

নির্বিকার আর নিরাসক্ত হয়ে যেতে পেরেছি সমাজ ও রাষ্ট্রের ব্যাপারে। কেন না সজীব, প্রাণশক্তিসম্পন্ন সৃষ্টিশীল সাহিত্য এরকমই দাবি আজকাল করছে আমাদের কাছে, কিন্তু নারীর বেলায়? আমরা আর নির্বিকার, নিরাসক্ত থাকছি না। কেন না বেঁচে থাকার, বাঁচবার কী আর অবলম্বন আছে ও ছাড়া! সৃষ্টিশীল সাহিত্যের কাঁচা-মাল ত' আর নীতিশিক্ষার কোল্ড স্টোরেজে থাকবন্দী করে রাখা যায় না, এবং এ কারণেই এসে যাচ্ছে এমন সব নায়ক—রক্ষণশীল সমালোচক আপনি যাকে অপনায়ক বলেন। যাদের অন্তরক্ষুধা মোটেই নেই, যারা যে-কোন নিষেধ-কেই মনে করে পরাধীনতা (?)। সেই পরাধীনতার শেকল ছিন্ন করবার স্থান বেছে নেয় নিয়ন-ঝলকিত কলকাতা। যেন কলকাতা মানেই বাংলা দেশ। কলকাতার অলিতে-গলিতে বার, ক্যাবারে পেয়ে যায়। কথায় কথায় ফ্লাশ, জুয়ো, মদ—অনর্গল সেই করণাধারা, যন্ত্রতত্র পেয়ে যায় শরীর। আর এর সঙ্গে এসেই পড়ে স্বাধীনতার সেই বিরাট (?) আকাঙ্ক্ষাটি, যার একমাত্র সমাধান ক্লাইমে, সামান্য প্ররোচনায় অথবা বিনা প্ররোচনাতেই প্রায়। খুব শান্ত মাথায় কখনো নিজের প্রেমিকাকে খুন, কখনো সন্তান হয়ে নিজের মাকে খুন, কখন নিজেরই খুন হয়ে যাওয়া, মোটমাট একটা রক্তারক্তি খুনোখুনি না হলে কি নাটক জমে! তার সঙ্গে একটু দিশী রাজনীতির ককটেল, ব্যাপারটা বুঝলেন!

নায়কেরা প্রশ্ন তোলেন, কেন কেন আমাদের অপরিমিত অর্থ থাকবে না হে হে করে উড়িয়ে দেবার? কেন, কেন আমাদের অপরিমিত নারী থাকবে না আমাদের বন্ধ্যা দার্শনিক চিন্তাকে উত্তপ্ত করার? আমরা যা খুশি তাই করবো, মুখ ভেঙচাবো, ঘাড় মটকাবো, শিস দোব, কোমর দুলিয়ে নাচবো, তাতে কার কী! এমনি করে জীবনের মধ্যে যে আরো এক জীবন আছে তাকে জেনে যাচ্ছি আমরা ক্রমশ। আমরা স্পষ্টই বুঝে ফেলেছি এ জীবনে আমাদের শত্রু কে। কে আমাদের বাড়া ভাতে ছাই দিচ্ছে। আগেকার লেখকেরা বড্ড ইনিয়ে-বিনিয়ে কথা বলতো। নিজেরা যা বলছে হলফ করে বলতে পারি নিজেরাই বুঝতো না, তা আমরা কি করে বুঝবো। এ-কালের সাহিত্যিকরা বেশ চাঁছাছোলা। সব স্পষ্টাস্পষ্টি, আমরাও, ওদের হাতে তৈরি একালের নায়কেরাও তাই যা করছি, যা করছি সব সোজাসুজি। বেশ আছি আমরা। এতদিন পর যা হোক একটু চুটিয়ে বেঁচে থাকার মানে খুঁজে পাচ্ছি।

যতদিন এসব আমাদের দেওয়া না হবে ততোদিন, দেখবেন, আমরা ট্রাম পোড়াবো, বাস জ্বালাবো, মিছিলে ঢুকে পড়ে পুলিশের মাথায় ডাণ্ডা হাঁকড়াবো। এল এম ডি খাবো, রক্তের রণক্ষেত্র করে তুলবো। আমরা দেখিয়ে দোব, দেখিয়ে দোব, দেখিয়ে দোব। এই নায়কেরা গলার শির ফুলিয়ে উচ্চকণ্ঠে প্রচার করছেন, আমরা আজ শেয়ানা হয়েছি শেয়ানা চিনেই, আমরা আমাদের বাবা, মা, বোন সকলের 'ফেরেব্বাজী' ধরে ফেলেছি, হুঁ হুঁ বাব্বা, ঝোপেঝাড়ে সব লুকিয়ে থাকে। আমরা সব ধরে ফেলেছি। ধরে ফেলে আমরা তৈরি হয়ে গেছি সম্পূর্ণ 'ফেরেব্বাজ'। শুধু মদ আর তার অনুষঙ্গ আমাদের পৌঁছে দিতে পারে যাকে আমরা দার্শনিক ভাষায় বলি 'স্বাধীনতা' তার কৈলাসে। অবশ্য এর জন্যে খুনটুন, তা আমাদের প্রেমিকাকেই হোক বা মাকেই হোক যাকে পারি তাকে, যখন যেমন মন থাকে, এ একেবারে অপরিহার্য। পুলিশ, পিনালকোড ইত্যাদি দুর্গন্ধযুক্ত নর্দমা-গুলো অবশ্য আছেই। ওদেরই বা একটু ভয়, কিন্তু এদের বিরুদ্ধে আমাদের অভিমানও খুব, কেন এরা বুঝতে চাইছে না। ড্রাই ডে মুখে সবাই জানলেও, হুঁ হুঁ বাব্বা, কার মুখই বা ড্রাই থাকে। এই হচ্ছে বাংলা সাহিত্যের হাই-এক্সপ্লোসিভ বইগুলির ভেতরের কথা।

এর সঙ্গে পুরোদস্তুর সহযোগিতা করছেন, আমাদের লজ্জা, অধিকাংশ সাহিত্য-পত্রিকা। কোন একটি পত্রিকার কাছ থেকে নবীন লেখক-লেখিকাদের কাছে 'একটি আদিরসাত্মক গল্প পাঠান' এরকম অনুরোধ আসছে পত্রযোগে।

যাঁরা জ্যেষ্ঠ লেখক, একদা প্রচুর ভালো লিখেছেন, আজ স্বাভাবিক যৌবন হারিয়ে কিছুতেই অবস্থাটাকে মেনে নিতে পারছেন না। বিকৃত ক্ষুধার তেজস্ক্রিয় টনিক খুঁজছেন। তাঁদের রচনার প্রতি ঔৎসুক্য সামান্য, কিন্তু তবু তাঁদের কথা কিছু বলতে হচ্ছে এ কারণেই যে তাঁরা নিজেরা যে গাড্ডায় পড়েছেন, অনেক সম্ভাবনাপূর্ণ তরুণ লেখক-লেখিকাদেরও সেই একই সর্বনাশ, বন্ধ্যা ভবিষ্যতের দিকে ঠেলে দিচ্ছেন।

একদিকে সম্পাদক চাইছেন আদি-রসাত্মক লেখা। সে লেখা কেমন করে লিখলে ওৎরাবে তার লাইন ঠিক করে দিচ্ছেন জ্যেষ্ঠরা নিজে লিখে। শূন্যতা-বোধ, জীবনের উদ্দেশ্যহীনতা ইত্যাদি জুড়ে দিয়ে লাইনটিকে একটা শক্ত ভিত্তির ওপর দাঁড় করিয়ে দিতে চেষ্টা করছেন। কামু, কাফ্‌কা যেন এইটুকুই আমাদের শিখিয়েছেন। জীবনের কোন সংকেত নেই, কোন কবিতা নেই। 'শরীর, শরীর, তোমার মন নেই কুসুম'—যেন এ প্রশ্ন অবান্তর, প্রেম ঠাট্টা-তামাসা জড়ানো কিম্ভূত বস্তু!

কামু, কাফ্‌কার এরকম বিকৃত ব্যাখ্যায় রীতিমত লাভজনক জোয়ারে বাহাত্তুরে থেকে সদ্য কফি-হাউসে গজানো, চিকণ যুবক লেখক পর্যন্ত নেমে পড়েছেন।

এ এক অদ্ভুত, উন্মাদ ব্যাপার। সাহিত্যের অলিতে-গলিতে কিলবিল করছে হাজার হাজার কাফ্‌কা, হাজার হাজার কামু। এরা-সবাই 'ভীষণ' একা, 'ভীষণ' ক্লান্ত, সামাজিক রীতিনীতির ওপর 'ভীষণ' বিরক্ত।

বাংলাসাহিত্যের উৎকৃষ্ট লেখকদের চর্চায় বাংলা গদ্য একটা স্ট্যাণ্ডার্ডে দাঁড়িয়ে গেছে। একটু চেষ্টা করলে, একটু মনো-যোগ দিলে যে-কেউ মোটামুটি চলনসই গদ্য লিখতে পারেন আর এর সঙ্গে যদি

একটু উচ্চাশা থাকে, মানমর্যাদা বোধটা নিতান্তই যদি ভোঁতা করে নেওয়া সম্ভব হয়, আমার ধারণা তাহলেই আজকাল বাংলাদেশের একজন লেখক হওয়া যায়।

কামু ও কাফ্‌কা, আমরা এঁদের যতোটা চিনি, তাতে মনে হয় এঁরা সহৃদয় পাঠককে যে মৌন শূন্যতা, শস্যহীন মরুভূমি, সুস্থির অন্ধকারে পৌঁছে দেন, শ্বাসরোধকারী অপ্রতিরোধ্য সেই অতলে দাঁড় করিয়ে দিয়ে আমাদের ঘাঁটা-পড়া, উদাসীন মনের কুম্ভকর্ণ-ঘুম ভাঙান। আমরা ভয়ংকর সর্বনাশ জেনে নিয়ে পরস্পরকে আরো ভালোভাবে জানবার জন্যে আরো আপন আরো অন্তরঙ্গ হবার চেষ্টা করি। স্বদেশে আমরা যতোই পরবাসী হই তবু এক অদ্ভুত টান-ভালোবাসা অনুভব করি সকলের প্রতি। গোপনে, অত্যন্ত গোপনে এক বিচিত্র বিশ্বাস এঁদের বই পড়ে আমাদের হয় যে হয়তো ভালোবাসার চাষবাস ঠিকমত শিখলে ও পোড়া-জমি আর অতো পোড়া পোড়া লাগবে না। কিন্তু কামু, কাফ্‌কা, প্রুস্ত ইত্যাদির নাম নিয়ে আমাদের দেশে যেটা হচ্ছে সাহিত্যের নামে সেটাকে কি বলবো? স্পষ্টই দেখছি আলু-অলা, পটল-অলার মত এক ধরণের সাহিত্য-অলায় দেশ ছেয়ে গেছে।

'সাপ্তাহিক বসুমতী'তে শ্রদ্ধেয় কবি ধীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায় পাঠকদের প্রতি অভিমানক্ষুব্ধকণ্ঠে অনুযোগ করেছিলেন। শ্রদ্ধেয় কবির অনুযোগের প্রতি মনোযোগ রেখেও আমরা বলতে বাধ্য সরলমতি পাঠকদের তরলমতি করবার দায়িত্ব লেখকেরা কি অস্বীকার করতে পারেন?

পাঠকেরা অজীর্ণে ভোগেন না, তাঁরা ক্ষুধা পেলে 'বৈকুণ্ঠের খাতা'র তিনকড়ির মত সোজাসুজি বলেন, 'খিদে পেয়েছে, মশাই'। এই অকপট খিদের মুখে যা তাঁদের পাতে দেওয়া হয় তাই তাঁরা গোগ্রাসে গেলেন। মুখরোচক খাদ্য তালিকার ভেতর কোনটা বিশুদ্ধ প্রোটিন তা ওঁরা জানবেন কি করে? এর জন্যেও তো শিক্ষার দরকার। ঠিক এ কারণেই বিখ্যাত রুশ লেখক এরেনবুর্গ এদেশে এসে বলেছিলেন, 'এতোদিন আমরা দেয়াল তৈরি করেছি, এইবার ছবি টাঙাবো।'

আমাদের পাঠকেরা যে অর্ধ-শিক্ষিত বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্বোচ্চ ডিগ্রি পেলেও, এর জন্যে তো ওঁরা দায়ী হতে পারেন না। ওঁদের অর্ধশিক্ষার এই সুযোগ নিয়ে নষ্ট, ভ্রষ্ট লেখকেরাই কি দজ্জালতা করে যাচ্ছেন না?

এক সময় মার্কসবাদী লেখকেরা লড়াই করতেন সাহিত্যে। সে-লড়াই ছিল বাইরের লড়াই'। সেখানে 'বাইরের লড়াই' চালাতে চালাতে যদি কেউ নিজস্ব কোন দুঃখের কথা বলতো, অমনি নিষেধাজ্ঞার লাল আলো জ্বলে উঠতো। গল্পের গ্রন্থিতে সুচারু কারিগরি নিন্দিত হোত বুর্জোয়াবিলাস বলে। অপার জ্যোৎস্নার মত যদি কোন গভীর কথা মগ্ন হতে চাইতো তবে তা হত প্রতিক্রিয়ার হাতিয়ার।

অবিকল এরই বিপরীত ক্রিয়া দেখছি, যাঁরা ভেতরের লড়াই করছেন তাঁদের ভেতরের। মার্কসবাদী লেখকদের সে সব রচনা সংগত কারণেই সেদিন স্থূল প্রচার হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে। এখানে-সেখানে দু'চারটি শ্বেতপদ্ম যে কলমের মুখে সেদিন রচিত হয় নি তা নয়। কিন্তু দলবদ্ধভাবে, একই ছকে একই নীতি আঁকড়ে সেদিনের প্রায় অধিকাংশ রচিত লেখাই সত্যি ডাস্টবিনে স্থান পাবার যোগ্য। তরুণ যুবক হয়তো সেই সব

★ ★ সদ্য প্রকাশিত হইয়াছে।

স্বনামধন্য সাহিত্যিক
ও লব্ধপ্রতিষ্ঠ ব্যারিস্টার

নারায়ণ দাশগুপ্তের
গ্রন্থাবলী

গ্রন্থাবলীতে
আছে দুইখানি
সুবৃহৎ ও
সুপাঠ্য
উপন্যাস

সুশান্ত-সা
ও
নীল শাড়ী

পৃষ্ঠা সংখ্যা
সর্বসমেত
৩০৪

বাঙলা সাহিত্যে
অভিনব সংযোজন

মূল্য মাত্র দশ টাকা

বসুমতী (প্রাঃ) লিঃ
কলিকাতা—১২

বারুদগন্ধী লেখা পড়ে, তাঁর উত্তেজনায় হোক পড়ে পুলিশের ব্যারিকেড ভেঙেছে, তবু বিনীতভাবে বলবো লেখাগুলো কিন্তু লেখা হয় নি।

তেমনি আজ অন্য ধারায়, হাঁ মার্কসবাদী লেখকদের মত দলবদ্ধভাবে, একই প্যাটার্নে আজ যে-সব লেখা ফলে উঠছে সেগুলোও একটি বন্ধ্যা দর্শনের স্থূল প্রচার ছাড়া আর কী?

শুধু 'ভেতর' নিয়েই জীবন সম্পূর্ণ নয়। যেমন শুধু 'বাহির' নিয়েই সেদিন জীবন সম্পূর্ণ ছিলো না। গোটা মানুষকে খুঁজতে গেলে এই 'ভেতর' ও 'বাহির'—এই দুটিকেই একসূত্রে বাঁধতে হবে।

এই 'ভেতর'-সর্বস্ব লেখকেরা সাহিত্যের আবহাওয়াকে আরও বিষাক্ত করছেন অশ্লীলতাকে কামধনু করে। মার্কসবাদী লেখকেরা সেদিন সাহিত্য রচনা করতে পারেন নি বটে, কিন্তু সাহিত্যের স্বাস্থ্যে তাঁরা লাবণ্য না এনে দিন, দৃঢ়তা, পৌরুষ এনে দিয়েছিলেন। আর এঁরা, এঁরা কি করছেন?

এঁদের অশ্লীলতা অসহ্য হোত না, দু' পায়ে মাড়িয়ে যাওয়া যেত অনায়াসে। এঁদের গ্রাহ্যেই আমরা আনতাম না, নির্মম উপেক্ষা দিয়ে মনে মনে হেসে নিতাম। কিন্তু এঁদের অশ্লীলতা আজ একা নয়। অস্ত্রহীন নয়। এর হাতে আছে নানাবিধ আয়ুধ। উর্বর মস্তিষ্ক এই অশ্লীলতার সমর্থনে দর্শনকে সহযোদ্ধা বানিয়েছে। এ কারণে একে উপেক্ষা করা যাচ্ছে না। উপেক্ষা করা অবশ্য সংগতও নয়। এর সংগে লড়ে একে হারাতে হবে। স্পষ্টতই এ অত্যন্ত দুরূহ কাজ। কেন না সকলেই জানেন, এই অশ্লীলতা একাধিক গোপন কেন্দ্র থেকে অনবরত উৎসাহ উত্তেজনা পাচ্ছে। আমরা সব জেনেও সেই ভীমরুলের চাকটি ভাঙতে পারছি না। ঐ চাকটি ভাঙলেই ওঁদেরও যে জারিজুরি সব শেষ তা জানেন ঐ 'প্রতিভার অশ্লীল বিক্রেতা'রা।

দুর্ভাগ্য, দু'-একটি পত্র-পত্রিকা বাদে সাহিত্য-পত্রিকাগুলির অধিকাংশই ভরে উঠেছে এক ধরনের দায়িত্বজ্ঞানহীন বে-আব্রু, স্মার্ট অক্ষরে। দুর্ভাগ্য, বাংলাদেশে আজ গানের বেলা ফুরিয়ে এলো। দুর্ভাগ্য, আজ আর বাংলাদেশে প্রেমের গল্প তেমন গড়ে ওঠে না। দুর্ভাগ্যের কি শেষ আছে? জ্যেষ্ঠ, প্রবীণ লেখকরা, যাঁরা এই গন্ডলে গা ভাসান নি, তাঁরাও কেমন ম্লান বিবর্ণ যেন ভয় পান। কোথাও যেন আটকে যাচ্ছে, গলা ঝেড়ে স্পষ্টকণ্ঠে বলতে পারছেন না: এসব কিছু হচ্ছে না, কামু, কাফকা, জয়েস, প্রুস্ত অমন গন্ডায় গন্ডায় জন্মায় না। কেউ ইচ্ছে করলেই একাকী বিষণ্ণ মগ্ন হয়ে যেতে পারে না, শ্রেষ্ঠ আর্টের চোখ রূপে কখনো ক্লান্ত হয় না, সে বারেবারে আবিষ্কার করে নবীনকে। সৃষ্টি-উৎসের গভীরে যে আনন্দ আছে, আধুনিকের ছিন্নতার ফাঁকে ফাঁকে চিরকালের সাহিত্যিক তাকেই অনির্বচনীয় করে তোলে। প্রচ্ছন্নতাই আর্টের লক্ষ্য, ব্যক্ত করা নয়, আর জীবনও অসমাপ্ত যদি না তাতে থাকে কবিতা, এসব জেনে, বুঝেও এঁরা এখন একটু পাতার আড়াল খুঁজছেন।

নইলে এখনো ত' শুদ্ধতার, শুভ্রতার প্রতীক অন্নদাশংকর আছেন। সৃষ্টি-বৈচিত্র্যে যিনি এদেশের সেই বনফুল, তিনি আছেন। আছেন তারাশংকর, গ্রামবাংলাকে যিনি প্রতি ইঞ্চিতে ইঞ্চিতে চেনেন। শহরের মধ্যবিত্ত আর নিম্ন-মধ্যবিত্তদের জীবন সম্বন্ধে জানতে উৎসুক এমন কোন বিদেশীকে স্বচ্ছন্দে, একবাক্যে যাঁর সম্বন্ধে বলে দিই, 'ওঁর বইগুলি পড়ুন তাহলেই সব জানতে পারবেন, অনর্থক লাইব্রেরী ঘাঁটাঘাঁটি আর গাইড নিয়ে হন্যে হয়ে ঘুরবেন কেন? সেই কুশলী নরেন্দ্র মিত্র আছেন। সাম্প্রতের তরংগে তরংগে বারংবার আন্দোলিত হতে যাঁর কোন ক্লান্তি নেই অথচ যিনি চিরন্তনের রশ্মিদূত সেই নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় আছেন, বৃদ্ধ হয়ে ত' যান নি।

কিন্তু ওঁরা কিছু বোধ হয় বলবেন না। এ সময়ের এই মূঢ়তা দেখে প্রচ্ছন্ন কৌতুক বোধ করবেন। এই অন্ধকারেও একদিন আলো জ্বলে উঠবে, এই গভীর বিশ্বাস, এই গাঢ় প্রত্যয়ই ওঁদের স্থির রেখেছে। একমাত্র ব্যতিক্রম প্রেমেন্দ্র মিত্র।

সংকেত, নিঃশব্দতা, অস্পষ্ট গন্ধের এই অনুপম লেখকই যখনি সুযোগ পেয়েছেন তখনি অশ্লীলতার এই মুখরতাকে স্তব্ধ করে দিতে চেয়েছেন। জনপ্রিয়তা হারানোর ভয়কে পৌরুষের সংগে অস্বীকার করে তিনি সত্যকথনের নির্ভীক দায় বারংবার নিজের কাঁধে তুলে নিয়েছেন। বাংলাসাহিত্যের পংকিল জলে আজো যিনি তরুণ রৌদ্রের মত ঝলোমলো, আশ্চর্য, এই বয়েসেও যিনি অনবদ্য প্রেমের গল্প লিখতে পারেন, নানা কারণেই যিনি রুশলেখক শেখভের সংগে তুলনীয়, আমাদের অশেষ সৌভাগ্য তাঁর তূণীরের বাণ আজো নিঃশেষ হয় নি।

আমরা জানি এ দেশ যুদ্ধবিধ্বস্ত ইউরোপ নয়। এ দেশ ও জাতি অগ্নি-পরীক্ষার ভেতর দিয়ে কখনো যায় নি। প্রায় বিনামূল্যে স্বাধীনতা পেয়েছি। রক্তমূল্য দিই নি। ঋণ পরিশোধ করি নি। তাই যেমন এদেশের মানুষ তেমনি এদেশের সাহিত্যিক। এমন গন্ডায় গন্ডায় আত্মবিক্রিত, আত্মধিক্কৃত, কেঁচোর মতন মাটির ভেতর ভয়ে ভয়ে আত্মগোপনকারী লেখকের দল বোধ করি পৃথিবীর অন্য কোথাও নেই। বোধ করি এদেশের লেখকদের পক্ষেই সম্ভব দু-চারদিনের জন্যে অপরের টাকায় বিদেশে গিয়ে তাদেরই আপ্যায়িত করবার জন্যে সেই দেশ ও জাতির কাছা-খোলা প্রশংসা করে ফেলা। এও ত' অশ্লীলতা!

সুতরাং এই সর্বব্যাপী, বিপুল অন্ধকারের সংগে মরণপণ লড়াই চালাবার জন্যে যেমন চিরকাল সব দেশে হয়েছে, সংকটে পড়লেই তাঁরা রবীন্দ্রনাথের আশ্রয় নিয়েছেন, তেমনি আমরা 'দূর আকাশের অনাত্মীয় নক্ষত্র' বলে অধুনা-পরিত্যক্ত, রবীন্দ্রনাথের আশ্রয়চ্ছায়ায় ফিরে আসবো 'রক্ষণশীল' এই অপবাদ মাথায় নিয়েও।

আসক্তি দিয়ে যিনি প্রেমকে আবিল করে তোলেন নি, যিনি স্তব্ধ, নিঃশব্দ ও সুদূর। সকল সুন্দরের মধ্যে যাঁর আসন, যাঁর সৃষ্টির অনেক বাতিল হয়ে যাবে নিশ্চিত কিন্তু তবু যা' থাকবে, ক্ষণকালের আত্মবিস্মৃতির যবনিকা উঠে গেলে দেখা যাবে, তা' সকরুণ, শান্ত ও সুগম্ভীর। তাঁর বইগুলি বারংবার পড়তে হবে, তাঁর মহান নায়ক যেমন নিজের দেশকে আবিষ্কার করতে গিয়ে একদিন দেশ ও তিনি এক হয়ে গিয়েছিলেন, বলেছিলেন মেঘমন্দ্রধ্বনিতে, 'আমিই ভারতবর্ষ'—তেমনি করে আমাদেরও দেশকে চিনতে হবে, জানতে হবে। তাঁর কবিতাগুলি, মুক্তোর মত নিটোল: ছোটো গল্পগুলি আরো একবার পড়তে হবে। কেন না অসহ্য পেষণের মাঝখানে দাঁড়িয়ে তিনিই ত' বলেছেন, 'আমি জীর্ণজগতে জন্মগ্রহণ করি নি। আমি চোখ মেলে যা' দেখলুম তাতে চোখ আমার কিছুতেই ক্লান্ত হোল না' তিনিই ত' আমাদের নারীর মধ্যে যে অসীম রহস্য রয়েছে তা' জানিয়েছেন, বলেছেন, 'তুমি যে তুমিই ওগো সেই তব ঋণ, আমি শুধু প্রেম দিয়ে শুধি চিরদিন'। অতএব যুদ্ধ, সংঘবদ্ধ প্রতিরোধ অশ্লীলতার বিরুদ্ধে। অতএব আমাদের ঘোষণা, আমরা কেউ অশ্লীল লেখা লিখবো না। সম্পাদক আদিরসাত্মক গল্প চাইলে একযোগে অস্বীকার করবো। কবি আমাদের যা' হাতে ধরে শিখিয়েছেন, সংকেত, ব্যঞ্জনা, রহস্য তারই ধ্যানে মগ্ন হয়ে, মানুষের মধ্যে যে সেই অপরাজিত মানুষ আছে তাকে আবিষ্কার করবো।

ওঁদের আছে অশ্লীলতা। আমাদের আছে রবীন্দ্রনাথ। দেখা যাক।

অশ্লীলতার বিরুদ্ধে এই অভিযান দীর্ঘজীবী হোক।

গাঁয়ে গাঁয়ে আবার অশান্তি

নাঃ, গাঁয়ে দেখছি শান্তিতে আর থাকা যাবে না। পাড়গাঁযেব উন্নতির জন্যে সকলেই এমন উঠে-পড়ে লেগেছেন, শেষ পর্যন্ত ভিটে-মাটি ছেড়ে হয়তো গ্রামবাসী-দেব পালাতে হবে। গাঁয়ের উন্নতি আর গ্রামবাসীদের কল্যাণের ঠেলায় এবার সত্যি ত্রাহি ত্রাহি রব উঠেছে।

বৎসরান্তে অঘ্রাণ-পোষ—এই দুটি মাস শত দুঃখকষ্ট, দারিদ্র্য ও লাঞ্ছনার মধ্যেও গ্রামবাসীদের শরীরে ও মনে আনন্দের খোরাক জোগায়; সংসারে ঘরের লক্ষ্মী বিরাজ করে—ভাঙা-চোরা ঘর-দোর মেরামত করার সুযোগ আসে, মনের সাধ-আহ্লাদ মেটাবার উপযোগী একটা পরিবেশ ও আবহাওয়ার সৃষ্টি হয়। কিন্তু এ বছরটা কেন জানি না গোড়া থেকেই বড় অসোয়াস্তিতে কাটছে। বোশেখ-জ্যৈষ্ঠ মাসে এমন খরা গেল যে চাষবাস তো পরের কথা সামান্য পানীয় জলটুকু জোটানও যেন দায় হয়ে দাঁড়ালো। তারপর ধরতে গেলে আষাঢ় মাস থেকেই শুরু হল অকাল বন্যা: সেই বন্যার ঢেউ পুরো চার মাস গাঁয়ের মানুষকে নাস্তানাবুদ করে ছেড়েছে। খরা ও বানে কত প্রাণ গেল, কত ঘরবাড়ি নষ্ট হল, কত জমি-জমার ফসল ডুবলো তার ঠিক হিসেব কোনদিনই হয়তো পাওয়া যাবে না। এ সবই যাঁরা আমাদের কল্যাণের জন্যে উঠে-পড়ে লেগেছেন তাঁদেরই অবদান! তা সত্ত্বেও গাঁয়ের মানুষ এখনও মরিয়া হয়ে বেঁচে আছে এবং সমানে ভাগ্যের সঙ্গে লড়াই করে চলেছে।

সব সময় তো হেয় করার চেষ্টা করা হয় আমাদের গাঁয়ের মানুষকে অন্য দেশের গাঁয়ের মানুষের সঙ্গে তুলনা করে। কিন্তু পর পর এত বিপর্যয়ের পর, সর্বস্বান্ত ও রিক্ত হয়ে পৃথিবীর কোন্ দেশের গাঁয়ের মানুষ নিজের চেষ্টায় সেই ধ্বংসস্তূপ সরিয়ে এতো সোনার ফসল ফলাতে পারে তা আমার জানা নেই; কিন্তু নিঃসন্দেহে এবং গর্বের সঙ্গে বলতে পেরেছে আমাদের এই বাংলা দেশের গাঁয়ের চাষীভাইয়েরা।

গাঁয়ের দিকে যদি আপনাদের বেড়াতে আসার সখ হয় দেখবেন আজও হাজার হাজার পরিবার ঘরবাড়ি খুইয়ে রাস্তায় তাঁবু খাটিয়ে বাস করছে; কিন্তু সেই পরিবারের একজনও জোয়ান বসে নেই। জল সরতে না সরতেই ছুটে গেছে ক্ষেতের পানে—কোন রকমে চাষটা সারা চাই-ই। মেদিনীপুর, বাঁকুড়া, হাওড়া, হুগলী, ২৪ পরগনা ও বর্ধমানের বানে ভেসে-যাওয়া অনেক জমিতে হয়তো এ বছর ফসলই ফলতো না—যদি না চাষীরা নিজেরা উদ্যোগী হয়ে সেখানে ছুটে যেতো। উত্তর-বঙ্গের দিকে তাকিয়ে দেখুন এত বড় দুর্যোগের পরও চাষীরা সরকারী সাহায্য ছাড়াই লাঙল নিয়ে মাঠে নেমে পড়েছে। হয়তো ভগবানের আশীর্বাদে তাদেরও পরিশ্রম সার্থক হবে—আর যদি বিপত্তি না হয় সেখানেও সোনার ফসল ফলবে।

কিন্তু মুস্কিল হচ্ছে এত ভাগ্য-বিপর্যয়ের পর হাড়ভাঙা খাটুনি খেটে চাষীরা যে ফসল ফলিয়েছে তা ঘরে তোলা নিয়ে ক্ষেতে ক্ষেতে যে অশান্তি সৃষ্টি হয়েছে তা থেকে ওরা পরিত্রাণ পাবে কি করে? জমির মালিকানা নিয়ে শুরু হয়েছে গোলমাল—এ বলে আমার ফসল, ও বলে আমার ফসল। ফসল কাটা নিয়ে গোলমাল তো আছেই। লেভি ফাঁকি দেওয়ার জন্যেই হোক বা অন্য যে-কোন কারণেই হোক কেউ কেউ আগে-ভাগে ফসল কাটিয়ে অপরের পাকা ধানের ক্ষেত মাড়িয়ে পরুর গাড়ি নিয়ে যাচ্ছে—ফলে মারামারি, কাটাকাটি, রক্তারক্তি।

মেমারীর কল্যাণপুরে জোর করে ধান কাটা নিয়ে দু' দলে কুরুক্ষেত্র হতে হতে ব্যাপারটা এমন হয়ে দাঁড়ালো যে পুলিশকে শেষ পর্যন্ত গুলী চালাতে হল। সিঙ্গুরের পায়রাওড়া গ্রামে জমি দখল ও ধান তোলা

প্রাগৈতিহাসিক শুশুনিয়া

রচনা ঃ শ্রীপরেশচন্দ্র দাশগুপ্ত

মূল্য ঃ দশ টাকা

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের

প্রত্নতত্ত্ব অধিকার কর্তৃক প্রকাশিত

প্রাগৈতিহাসিক বাংলার প্রথম মানবজীবন প্রসঙ্গে

একটি অপরিহার্য গ্রন্থ

॥ প্রাপ্তিস্থান ॥

চক্রবর্তী-চ্যাটার্জি অ্যাণ্ড কোং

১৫, কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা-১২

প. ব. (তথ্য ও জনসংযোগ) বি. ২৩৯৯৫/৬৮

হয়ে এমন মারামারি হল যে শেষ পর্যন্ত একজন মারাই গেল। কাকদ্বীপের কুয়োরবেড়িয়া গ্রামে ধান কাটা নিয়ে ঝগড়া এমন চরম অবস্থায় পৌঁছলো যে এক পক্ষ আর এক পক্ষকে বল্লম ও লাঠি মেরে জখম করলো—ফলে ফসল কাটা বন্ধ। কালনার বৈদ্যপুর থেকে খবর পাওয়া গেল ভাগচাষীদের মেহনতের ধান জোতদাররা কাটিয়ে নিয়ে চলে গেছে। গোপালপুর গাঁয়ের ৬০।৭০ বিঘে সরকারী খাসজমির ধানও জোতদাররা নাকি কেটে নেবার চেষ্টা করেছে। কাঁদিরা আরাজি ময়ূরপুর মৌজায় আদিবাসী সাঁওতাল ও গরীব তপশিলী চাষীরা খাস জমিতে যে ধান ফলিয়েছে তা রাতের অন্ধকারে কে বা কারা কেটে নেবার চেষ্টা করে। সাঁওতালরা তীরধনুক নিয়ে বাধা দিতে এগিয়ে আসে; লোকগুলো পালিয়ে যায় বটে, কিন্তু পরের দিন সকালে দেখা যায় প্রচুর কাটা ধান জমির এখানে-ওখানে পড়ে রয়েছে।'

বর্ধমান, হাওড়া, মেদিনীপুর, ২৪ পরগনা, পশ্চিম দিনাজপুর, মালদা ও নদীয়া জেলায় এ রকম ছোট বড় বহু ঘটনা ঘটে গেছে। ক্ষেতে যখন ফসল রয়েছে তখন হয়তো আরও এই ধরনের অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটবে।। এইসব বিরোধের ফয়সালা করার জন্য এখানে-সেখানে ক্যাম্পকোর্ট বসেছে; হয়তো আরও বসবে।। ঝগড়া-বিবাদ শুধু জোতদার আর বর্গাদারেই হচ্ছে না; জোতদার আর জোতদারেও হচ্ছে, ফলে সাধারণ মানুষও জড়িয়ে পড়ছে। সামনেই নির্বাচন—কাজেই অত্যাচারিত, নিপীড়িত যেই হোক না কেন সব রাজনৈতিক দলই ছুটে আসবেন তাদের পিছনে। গত একুশ বছরে কতকগুলি রাজনৈতিক স্লোগানে শেখানো ছাড়া যারা গাঁয়ের অত্যাচারিত নিপীড়িত মানুষগুলির জন্যে গঠনমূলক কাজ কিছুই করেন নি, প্রচণ্ড খরার সময় যাঁরা এক বালতি জল দিয়েও মানুষের উপকার করতে পারেন নি, বানের জলে ভেসে-যাওয়া মানুষগুলির ঘর-সংসার উদ্ধার করা বা তাদের আবার পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করতেও যাঁরা এগিয়ে আসতে পারেন নি, মানুষের ঘোরতর বিপদের দিনে যাঁরা শুধু খবরের কাগজে বিবৃতি প্রচার করে তাঁদের কর্তব্য শেষ করেছেন, আজ ক্ষেতে সোনার ফসল ফলতে না ফলতেই তাঁদের আনাগোনা বেশ কিছুদিন ধরেই গাঁয়ের সাধারণ মানুষের মধ্যে রহস্যের সৃষ্টি করেছিল। যতই দিন যাচ্ছে সেই রহস্যের জাল ততই উদ্ঘাটিত হচ্ছে। গাঁয়ের মানুষের ঘাড়ে পা দিয়ে এঁরা নিজের নিজের রাজনৈতিক দলের আদর্শ চরিতার্থ করতে চান—চান না গাঁয়ের সত্যিকারের কোন মঙ্গল।। তা যদি তাঁরা চাইতেন রাতের অন্ধকারে ক্ষেত থেকে ধান কাটার ইন্ধন কেউ জোগাতেন না, বন্দুক লাঠি-সোঁটা নিয়ে কোন জোতদারের ক্ষমতা ছিল না জোর করে বস্তা বস্তা ধান কেটে নিয়ে সরিয়ে ফেলার, জমি কার বা ফসল কার তা নিয়ে বিরোধের সৃষ্টি হতো না, বর্গাদারদের মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়তে হতো না—খুনের রক্তে ক্ষেতের ফসল রঞ্জিত হতো না।'

আজ সত্যিই দুর্ভাগা গাঁয়ের মানুষের —একদিকে শোষক আমলার দল তাঁদের শাসনদণ্ড নিয়ে এগিয়ে আসছেন আর একদিকে তথাকথিত হিতৈষীর দল গাঁয়ের মানুষকে বাঁচানোর নামে বিপদের মুখে ঠেলে দিচ্ছেন—ফলে যা ঘটবার তাই ঘটছে। বলি হচ্ছে সেই গাঁয়ের সাধারণ মানুষ। ফসল নিয়ে মারামারি কাটাকাটি এ পর্যন্ত যা ঘটে গেল তাতে দেখা যাচ্ছে যারা মরেছে বা জখম হয়েছে তারা সবই গাঁয়ের মানুষ—ঐ সব দেশহিতৈষীদের বা শাসকদের কারুর গায়ে আঁচড়টি পর্যন্ত লাগে নি।

অবশ্য ফসল নিয়ে কৃষকের সঙ্গে জমিদার বা জোতদারের বিরোধ ও সংঘর্ষ বাংলা দেশে নতুন ঘটনা নয়। প্রতি বছরই বিরোধ হয় এবং খুন-জখমেরও ঘটনা ঘটে। কিন্তু এবার বিরোধটা যেন বড্ড বেশি; এখনও সিকি ফসলও কাটা হয় নি এবং সরকারের দলবল এখনও আসরে নামেন নি। তা সত্ত্বেও প্রতিদিনই যেরকম রক্তারক্তি কাণ্ড ঘটছে, আশঙ্কা হয় পৌষ মাসও এবার গাঁয়ের মানুষের জীবনে সর্বনাশ টেনে না আনে।' সরকারের ভূমিব্যবস্থা যদি ঠিক থাকতো আর খাদ্যনীতি যদি মানুষের অনুকূলে হতো তাহলে অঘ্রাণ-পৌষ মাসে গাঁয়ের মানুষ বোধ হয় শান্তিতে ও স্বস্তিতে কাটাতে পারতো। কিন্তু তা বোধহয় হবার নয়। বছরের সেই গোড়া থেকে যে শনির দশা এবার গাঁয়ে লেগেছে মানুষের শত চেষ্টাতেও তাকে কিছুতেই ঘাড় থেকে নামানো যাচ্ছে না। কি করলে যে এই শনির শোধন হয় ভগবানই জানেন।

—শঙ্কর চট্টোপাধ্যায়

রবীন্দ্রনাথ ও সুভাষচন্দ্র

শঙ্করীপ্রসাদ বসু

[পূর্ব-প্রকাশিতের পর]

কারামুক্ত সুভাষচন্দ্রের সংবর্ধনা উৎসবে রবীন্দ্রনাথের আশীর্বাদ-বাণী বর্তমান পরিচ্ছেদের শিরোনামা হয়েছে। এই প্রসঙ্গে আর একটি সংবর্ধনা উৎসবের কথা পাঠকদের স্মরণ করিয়ে দিতে চাই। সেদিন উৎসব হয়েছিল রবীন্দ্রনাথকে কেন্দ্র করে, আর শ্রদ্ধাবাণী নিবেদন করেছিলেন সুভাষচন্দ্র।

রবীন্দ্রনাথের সপ্ততিতম জন্মজয়ন্তী উৎসব বাংলাদেশের ইতিহাসে ব্যক্তিকেন্দ্রিক উৎসবের মধ্যে অতি স্মরণীয় এক ঘটনা। সেই উৎসবে যে-সংখ্যায় শ্রেষ্ঠ বাঙালী ও ভারতীয় সম্মিলিত হয়েছিলেন, সে রকম অন্য কোনো সময়ে দেখা গিয়েছে কি না সন্দেহ। অনুষ্ঠানের প্রধান উদ্যোক্তা শ্রীঅমল হোম তাঁর 'পুরুষোত্তম রবীন্দ্রনাথ' গ্রন্থে তার চমৎকার বিবরণ দিয়েছেন। সমসাময়িক সংবাদপত্রে বিস্তারিত বিবরণও আমরা দেখেছি। মূল উৎসব হয় ১৯৩১ সালের ডিসেম্বর মাসে। উৎসবের উদ্যোগ আয়োজনের জন্য একটি বৃহৎ উদ্বোধনী সভা অনুষ্ঠিত হয় ১৬ মে তারিখে, হউনিভার্সিটি ইনস্টিটিউটে। ঐ সভার আমন্ত্রণকর্তাদের অন্যতম ছিলেন সুভাষচন্দ্র।*

১৬ই মের সেই উদ্বোধন সভায় যে জয়ন্তী-উৎসব-পরিষৎ গঠিত হয়েছিল, তার অন্যতম সহকারী সভাপতি নির্বাচিত হয়েছিলেন সুভাষচন্দ্র। অন্যান্য সহকারী সভাপতিরা হলেন, হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, বিপিনচন্দ্র পাল, কামিনী রায়, ডবলিউ শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, প্রফুল্লচন্দ্র রায়, এস আর্কুহার্ট, আবুলকালাম আজাদ, চন্দ্রশেখর ভেঙ্কটরমণ, রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়, রাজেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, নীলরতন সরকার, ঘনশ্যামদাস বিড়লা, দেবপ্রসাদ সর্বাধিকারী, নৃপেন্দ্রনাথ সরকার, যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্ত, বিধানচন্দ্র রায়। সভাপতি হন আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু এবং কোষাধ্যক্ষ—হীরেন্দ্রনাথ দত্ত।

সেই স্মরণীয় সভা সম্বন্ধে সংবাদপত্রে লেখা হয়েছিল—

> "Never was a gathering more distinguished or more representative in recent times than that at the Calcutta University Institute Hall on Saturday (May 16) when a large number of ladies and gentlemen, young, old and grey,—the learned and the learner, the scientist and the philosopher, the literature and the aspirant, the artist and the politician, the educationist and the student—assembled and offered their respectful greetings and warm felicitations to poet Rabindranath Tagore on his completing seventieth year of his life and formed a distinguished committee with Sir Jagadish Chandra Bose as president to celebrate the seventieth birthday of the great poet in a fitting

* অমল হোম মহাশয় তাঁর গ্রন্থে আমন্ত্রণপত্রের একটি প্রতিলিপি মুদ্রিত করেছেন। স্বাক্ষরকারীদের নাম—জগদীশচন্দ্র বসু, শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র রায়, শ্রীরামানন্দ চট্টোপাধ্যায়, শ্রীরাজেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, শ্রীকামিনী রায়, শ্রীযতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্ত, বাসন্তী দেবী, শ্রীঅবলা বসু, শ্রীসরলা রায়, শ্রীনীলরতন সরকার, শ্রীমন্মথনাথ রায়-চৌধুরী, আবুলকালাম আজাদ, ঘনশ্যামদাস বিড়লা, শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ শীল, শ্রীকৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য, শ্রীহরপ্রসাদ শাস্ত্রী, সি ভি রমণ, এইচ এস সারাওয়ার্দি (ভাইস চ্যান্সেলার), শ্রীশরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, শ্রীবিধানচন্দ্র রায়, শ্রীহৃষীকেশ লাহা, মোহাম্মদ আকরাম খাঁ, শ্রীপ্রমথনাথ চৌধুরী, শ্রীহীরেন্দ্রনাথ দত্ত, সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণন, ফস ক্যালকাটা (মেট্রোপলিটান), শ্রীদেবপ্রসাদ সর্বাধিকারী, শ্রীশ্রীশচন্দ্র নন্দী, ডবলিউ এস আর্কুহার্ট, জে আর ব্যানার্জি, শ্রীহেরম্বচন্দ্র মৈত্রেয়, এ কে ফজলুল হক, এইচ এ গিডনে, শ্রীনগেন্দ্রনাথ বসু, শ্রীদীনেশচন্দ্র সেন, শ্রীজলধর সেন, মুজীবর রহমান, শ্রীনরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত, আনন্দজী হরিদাস, শ্রীসুরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত, আর্থার মুর, ই সি বেনথল, শ্রীমতী সরোজিনী দেবী, শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ শীল, শ্রীকৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য, শ্রীনৃপেন্দ্রনাথ সরকার, শ্রীবিপিনচন্দ্র পাল, শ্রীচারুচন্দ্র ঘোষ, শ্রীসুরেন্দ্রনাথ মল্লিক, শ্রীযতীন্দ্রনাথ বসু, শ্রীসুভাষচন্দ্র বসু, শ্রীদুর্গাচরণ সাংখ্যবেদান্ততীর্থ, শ্রীকৃষ্ণকুমার মিত্র, এস খুদাবক্স, হরিরাম গোয়েঙ্কা, শ্রীঅর্ধেন্দুকুমার গঙ্গোপাধ্যায়, পদ্মরাজ জৈন, জাহাঙ্গীর কয়াজী, শিবানন্দ (অধ্যক্ষ, রামকৃষ্ণ মিশন)।

manner in the city at a convinient time.

Men like Sir C. V. Raman, Sj. Bipin Chandra Pal, Sir Devaprasad Sarbadhikari, Sir J. C. Coyajee, and Mr. Arthur Moor squatted on the dais without chairs like humble students learning at the feet of and paying homage to a great Master and of thought in the one they had assembled to honour."

(অমৃতবাজার পত্রিকা, ১৭ মে, ১৯৩১)*

সভায় প্রভূত বক্তৃতাদি হয়। বিখ্যাত ব্যক্তিগণ অকুণ্ঠে তাঁদের শ্রদ্ধানিবেদন করেন। রবীন্দ্রনাথের মতই বঙ্কিমচন্দ্রের আশীর্বাদ নিয়ে যিনি বৃহত্তর সাহিত্য-ক্ষেত্রে প্রবেশ করেছিলেন, রবীন্দ্রনাথের চেয়েও বয়োজ্যেষ্ঠ সেই সর্বজনশ্রদ্ধেয় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী সভাপতিত্ব করেন। তিনি ইংরেজী ভাষায় ভাষণ দেন, কারণ তাঁর মনে হয়েছিল রবীন্দ্রনাথ যেহেতু 'ওয়ার্ল্ড পোয়েট', তাঁর সংবর্ধনা-ভাষণ 'ওয়ার্ল্ড-ল্যাঙ্গোয়েজেই হওয়া উচিত। ভারতবর্ষ পূর্বে কিভাবে যোগ্য উপায়ে কবিদের সংবর্ধিত করত তার নানা দৃষ্টান্ত দিয়ে একালের শ্রেষ্ঠ কবি সম্বন্ধে ভারতবাসীদের দায়িত্বের কথা শাস্ত্রী মহাশয় স্মরণ করিয়ে দিয়েছিলেন। বিপিনচন্দ্র পাল তাঁর বক্তৃতায় এই আন্তর্জাতিক কবি ও বিশিষ্ট শান্তিবাদীর রচনার মধ্যে বৈষ্ণব প্রভাবের কথা বিশেষভাবে বলেন। কামিনী রায় বলেন, রবীন্দ্রনাথ কেবল বিরাট কবি নন, সেই সঙ্গে বিরাট জাতীয় কর্মী, তরুণদের কাছে আদর্শ নেতা এবং প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের ঐক্যের প্রতীক। শরৎচন্দ্র বিশ্বভারতীর জন্য অর্থদান করতে বিশেষভাবে আবেদন করেন: "আমাদের দেশের অনেকেই বিশ্ব-ভারতীকে তাঁর একটা খেয়াল বলে মনে করেন। আমি বলি, হলই বা খেয়াল, কিন্তু কার খেয়াল ও কত বড় সে খেয়াল, তা তো আমাদের ভুললে চলবে না।" বৈজ্ঞানিক সি ভি রমণ এক তীক্ষ্ণ ভাষণে বলেন—এ যুগ বিজ্ঞানের; কবিরা এখন বিরল; খাঁটি ও বিরাট কবি আরও অল্প। সেজন্য নোবেল পুরস্কারে কবিদের তুলনায় বিজ্ঞানীদের দাবি বেশি। সাহিত্যের নোবেল পুরস্কার ৫, ১০ বা ২০ বছরের ব্যবধানে দেওয়া উচিত, তাও কাব্যে নয়, কারণ যথার্থ বড় কবি শতাব্দীর ব্যবধানে মেলে। এই অবস্থাতেও, আমার মতে, রবীন্দ্রনাথের ক্ষেত্রে যোগ্য ব্যক্তিই পুরস্কার পেয়েছেন।"

এই উদ্যোগ সভার পরে মূল উৎসব হয়েছিল বিরাট আকারে ডিসেম্বর মাসের শেষের দিকে। সপ্তাহব্যাপী নানা আয়োজনে সমৃদ্ধ সেই উৎসবে কৃতজ্ঞ দেশবাসী শ্রেষ্ঠ কবির প্রতি শ্রেষ্ঠ নমস্কার জানিয়েছিল। এই সময়ের মূল অনুষ্ঠানে কবির উদ্দেশ্যে জাতির অভিনন্দনপত্রে শরৎচন্দ্র-রচিত অবিস্মরণীয় পংক্তিটি উচ্চারিত হয়েছিল: "কবিগুরু, তোমার প্রতি চাহিয়া আমাদের বিস্ময়ের সীমা নাই।" এবং স্যার সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণন চমৎকার ভাষায় বলেছিলেন—

"..He (Rabindranath) has added considerably to the sweetness of civilization..Rabindranath in his works emphasises the necessity for this inward life and meditation. Much of modern literature is lacking in feeling and intensity. Bernard Shaw and H. G. Wells are intellectual, entertaining, instructive and interesting but they do not stir the depths in us. Robert Bridges treatment of Beauty is a classical exposition of philosophical thesis in language but does not touch the soul. Uuless we speak from depth we cannot engage depths in us. Tagore belongs to the great tradition of pure artists who speak from the profundity of their experience. His works have that magnetic touch of the Eternal and the magnificence of mind which goes beyond the surface and looks into deeper reality. Not only does he insist on inward life but is conscious that the life of the world is also informed by spirit. Being a man of great sensitivity he is up against all social wrongs which are perpetrated in the name of social code. Life is higher than law even as beauty is greater than harmony, and truth greater than consistency. A soul which stands on the basis of spirit cannot help loving the whole of the humanity. ..Tagore in all his works stands up for these three principles—inwardness of spiritual life, futility of mere renunciation and positive development of love and sympathy. His ideal is one of the wholeness where life and mind are not sacrificed but are subdued in the purpose of the higher."

জয়ন্তী অনুষ্ঠানের অন্যতম আহ্বায়ক ও অনুষ্ঠান সমিতির অন্যতম সহকারী সভাপতি সুভাষচন্দ্র বসু কিন্তু মে মাসের উদ্যোগ-সভা কিংবা ডিসেম্বর মাসের মূল সভা—কোনো সময়েই উপস্থিত থাকতে পারেন নি। ১৭ মে তারিখের সংবাদপত্রে উদ্যোগ-সভার বিবরণ বেরিয়েছিল, সেই-দিনেরই সংবাদ—"Sj. Subhas Bose: Busy programme at Noakhali." নোয়াখালিতে জেলা যুব সম্মেলনে প্রদত্ত সুভাষচন্দ্রের ভাষণের মধ্যে ছিল—

"বাংলাদেশের যুবসমাজের ভিতর থেকে সহস্র সহস্র যতীন দাস আমরা চাই, যারা তাঁর আত্মোৎসর্গের ভাবকে রূপায়িত করবে। তীব্র জাতীয় চেতনাসম্পন্ন নতুন একদল যুবক আমাদের অবশ্যই চাই কারণ তারাই ভাবী ভারতবর্ষকে নির্মাণ করবে, যে-ভারতবর্ষে কৃষক শ্রমিক নির্বিশেষে সকল নরনারী স্বাধীনতার আশীর্বাদ উপভোগ করবে। আপনাদের আমি আহ্বান করছি, অদূর ভবিষ্যতে কি গৌরবময় ভূমিকা আপনাদের গ্রহণ করতে হবে তা অনুভব করুন, তারপর আপনারা অগ্রসর হয়ে চলুন একটিমাত্র ভাবনা নিয়ে—মাতৃভূমির মুক্তিব্রতই আমার একমাত্র কর্তব্য।"

বেদি সংবাদপত্রে এই ভাষণ প্রকাশিত হয় সেদিনকার কাগজেরই অন্য

* শ্রীযুক্ত অমল হোমের বইয়ে এই তারিখের অমৃতবাজার থেকে যে উদ্ধৃতি দেওয়া আছে, তার থেকে আমাদের উদ্ধৃতির কিছু পার্থক্য আছে। আমরা অমৃতবাজারের শহর সংস্করণ থেকে উদ্ধৃত করেছি।

সদ্য বিকশিত গোলাপের মত সুন্দর আনন ও
কুসুম কোমল
পাপড়ি পেলব তনু

সাধনা বিউটি ক্রীম-এর
এইতো সবচেয়ে বড় অবদান।
নিজেদের সৌন্দর্য্য সম্পর্কে
সচেতন আধুনিকারা তাই
এর প্রশংসায় মুখর।

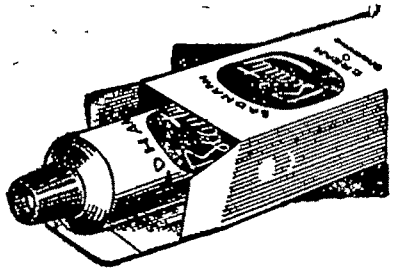

সাধনা
বিউটি
ক্রীম
রূপসাধনায় অপরিহার্য
অতি আধুনিক অঙ্গরাগ

সাধনা ঔষধালয়-চাকা কলিকাতা-৪৩

পঠিত হয়, রবীন্দ্র-জয়ন্তী উদ্‌যাপন অনুষ্ঠান বিজ্ঞপ্তীর মধ্যে ছিল—

"Echoes of the voice of Will Durant, who wrote to Rabindranath—'you are the reason why India should be free"—seemed to reverberate through the hall *when Alderman Subhas Chandra Bose's message of regret for his inability to attend the meetting was read by Mr. Amal Home* before the representative assembly of Indians and Europeans—Hindus and Mahomedans, Sikhs, Parsis, Jews and Christians."*

নোয়াখালির যুবসম্মেলনে সুভাষচন্দ্র যুবকদের কাছে আবেদন জানিয়েছিলেন—স্বাধীনতা অর্জনের ব্রতে তাঁরা যেন একাগ্রমন হন, কোনো কিছুই যেন তাঁদের মনোযোগ ব্যাহত করতে না পারে। তরুণদের নেতার মনোযোগকে অন্তত অন্য কিছু যে বিচলিত করতে পারে নি, তার প্রমাণ রবীন্দ্রনাথের উদ্দেশ্যে প্রেরিত তাঁর শ্রদ্ধা-বাণী, যার মধ্যে তিনি বিশ্বপ্রেমিক কবিকে জাতীয়তার এক অতিশ্রেষ্ঠ আচার্যরূপে বন্দনা করেছেন। সুভাষচন্দ্রের রচনাটুকু আমরা শ্রীযুক্ত অমল হোমের গ্রন্থের কল্যাণে পেয়েছি:

"I am very sorry that my absence from Calcutta does not permit me to take part in the meeting convened to organise the celebrations in observance of Rabindranath's seventieth birth-anniversary. I would have really felt honoured to do so.

I take this opportunity of wishing all success to the movement to celebrate an occasion which has more than a special significance for our national life, and I shall certainly do whatever I can for its promotion and success.

Before I conclude, I would like to say just one word. Will Durant, in presenting his well-known book—*The Case for India*—to Rabindranath Tagore, wrote : 'You are the reason why India should be free.' Mine has always been exactly the same feeling. A country which can give birth to a Rabindranath Tagore cannot but be free, and to the freedom Movement in India Tagore has contributed his unrivalled poetry and lofty patriotism. He has indeed been one of the greatest Prophets of Indian Nationalism in its best and noblest manifestation; he serves as the becon light in our struggle for freedom. May he live long to see his dreams realised—India enthroned once more in the pedestal of Her God-given destiny—the Teacher of all Nations."

ডিসেম্বর মাসের বৃহত্তর অনুষ্ঠানেও সুভাষচন্দ্রের পক্ষে উপস্থিত থাকা সম্ভব হয় নি। তখন তিনি পশ্চিম ভারত সফর করছিলেন, ভারতের স্বাধীনতার পক্ষে রবীন্দ্রনাথ নামক কারণকে যাদের কাছে যথেষ্ট মনে হয় নি, সেই শাসকদের জ্ঞানোদয়ের চেষ্টায়। পুনায় মহারাষ্ট্র যুব সম্মেলনে সভাপতিরূপে তিনি অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি শ্রীযুক্ত গ্যাডগিলের উক্তিকে সবিনয়ে সহাস্যে প্রত্যাখ্যানের চেষ্টায় বললেন, "না, না, আমি মোটেই ভারতের সর্বাধিক অশান্তিকর ব্যক্তি নই, যেমন সরকারী কর্মচারীরা মনে করে থাকেন। আমি খুবই শান্তিপ্রিয়।" * সরকারী কর্মচারীরা অবশ্য সুভাষচন্দ্রকে ঐ মুহূর্তে পরম সত্যবাদী মহাপুরুষ বলে গ্রহণ করে নি। সুতরাং কলকাতা শহরের জ্ঞানী-গুণী ও সাধারণ মানুষেরা যখন ভারতের স্বাধীনতার পক্ষে রবীন্দ্রনাথ নামক পরম কারণকে বাক্যে অর্চনা করছে, প্রায় ঠিক তখনই ঐ স্বাধীনতাকে যিনি জীবনে অর্চনা করেছিলেন তাঁকে কারান্তরালে পাঠিয়ে দিল শাসক সম্প্রদায়। ১৯৩২, জানুয়ারীর প্রথম দিকে সুভাষচন্দ্র গ্রেপ্তার হলেন—পাঁচ বছর পরে কলকাতায় ঐ ভগ্ন-স্বাস্থ্য মানুষটি মুক্ত হয়ে উপস্থিত হবেন—এবার তাঁকেই দেশবাসী অভিনন্দন জানাবে এবং কবিগুরু বার্তা পাঠিয়ে বলবেন—'তোমাকে সংবর্ধনা করি।'

[ক্রমশঃ]

---

* ১৭ মে তারিখের শহর সংস্করণ অমৃতবাজারে কিন্তু এই বিবরণটি খুঁজে পাই নি। আমি শ্রীযুক্ত হোমের গ্রন্থের উপরে নির্ভর করেই অংশটি উদ্ধৃত করলাম।

---

* "NOT THE MOST TURBULENT MAN"

Sj. Subhas Bose Presides Over Maharastra Youth Conference

Mr. Subhas Chandra Bose referring to Mr. Gadgil's remarks about him humorously prefaced his address by saying that he was a peace-loving man though he was described by some, including the official, as the most turbulent man of the land. (Amrita Bazar Patrika, Dec. 24, 1931).

রিস্ট ওয়াচ

মাত্র ৬৲ টাকায়

আমাদের চেন পদ্ধতি স্কীমের মাধ্যমে মাত্র ৬৲ টাকায় ৫ বৎসরের গ্যারান্টী সমেত ৫ জুয়েল রিস্ট-ওয়াচ লাভ করুন। ডাকমাশুল ১/১৫ টাকা অতিরিক্ত।

দ্রষ্টব্য : আমাদের মধু-চন্দ্রিমা সেন্টের বিক্রয় বৃদ্ধির জন্যই এই স্কীম চালু করা হইল। পছন্দ না হইলে মূল্য ফেরৎ।

SWISS WATCH TRADING CO.
P. B. 87, (WBC) Jullundur City.

বিংশ শতাব্দীর মার্কিন সাহিত্য

শমীক বন্দ্যোপাধ্যায়

[পূর্ব-প্রকাশিতের পর]

৯. ১৯৫০-৬৮ : উপন্যাসে ব্যক্তির প্রশ্ন

মার্কিন উপন্যাসের যে ধারাটি অধিকতর পরিচিত, তার ভিত্তি সমাজ-বাস্তবতা, অর্থাৎ একটি বিশেষ সামাজিক-রাজনৈতিক পারিবেশের বিশ্লেষণ। এই বিশ্লেষণের মধ্যে সময়ে সময়ে ব্যক্তির চেহারা যেন তলিয়ে গেছে, ব্যক্তিত্ব যেন দানাই বেঁধে উঠতে পারে নি। জন ডস প্যাসস তো যেন ইচ্ছা করেই ঘটনাস্রোতকে অবাধে বইবার সুযোগ করে দিয়ে তাঁর সৃষ্ট বিচ্ছিন্ন মানুষগুলিকে সেই স্রোতে খড়কুটোর মত ভাসিয়ে দিয়েছেন; তারা কখনও কখনও হয়ত পরস্পরে ধাক্কা খেয়েছে, খানিকক্ষণের জন্য মুখোমুখি হয়েছে, কিন্তু তাদের ভেসে চলাটাই যেন জীবন। এই মূল ধারার বাইরে হেনরি জেমস অবশ্য একেবারেই বিপরীত কোটিতে চলে গেছেন—"মনেরই আব-হাওয়া"র মধ্যে। অথচ পঞ্চাশের দশকে পৌঁছে যেন মনে হল, ঐ দুই ধারার কোনটাতেই লাভ নেই। প্রাচুর্যের মধ্যে বসে আত্মসন্তুষ্ট মানুষ অভাব-দারিদ্র্যের কথা শুনতে চায় না, সে মনেরই হোক, আর দেহেরই হোক, ঐহিক হোক, পারত্রিকই হোক। এই পর্বের সমাজেতিহাসেও স্বার্থপরতাই যেন ধর্ম। দৃষ্টি-নির্ভর ও শ্রুতিনির্ভর কারুকৌশলের বিপুল বিস্তারে, চোখ ধাঁধানো চলমান ও স্থির ছবির ব্যাপক আয়োজনে ভাববার মনটাও খানিকটা থমকে দাঁড়িয়েছিল। এই পর্বের ঔপন্যাসিকদের স্বভাবতই নিজেদের বুদ্ধিবৃত্তি দিয়ে সংযোগহীনতার এই জটিল পরিস্থিতিকে বুঝতে হয়েছিল। সল বেলো-রই একটি উপন্যাসে "ম্যাস ম্যান" বা পিণ্ডমানুষ কথাটির সংজ্ঞা আছে —"ভিড়ের মানুষ। ভিড়ের আত্মা। প্রত্যেককে ছিঁড়ে কেটে নিজের মাপে এনে দাঁড় করায়।" এই পিণ্ডমানুষকে জাগিয়ে তোলার দায়ই ঔপন্যাসিকদের গ্রহণ করতে হয়েছিল। ঘটনাকে দৈনন্দিনতার স্তরে রেখে, সহজ রেখেই ব্যক্তির সংকট ও দায়িত্বকে বড় করে তোলার যে চেষ্টা, সেই চেষ্টার মধ্য দিয়ে ঔপন্যাসিকেরা যেন পিণ্ডমানুষকে আবার সম্পূর্ণ ও স্বতন্ত্র ব্যক্তিত্বসম্পন্ন মানুষে রূপান্তরিত করার সাধনা শুরু করেছিলেন। ব্যক্তি যদি ভিড় থেকে পৃথক করে নিজেকে দেখতে পারে, চিনতে পারে, তবেই সে সমাজে নিজের ভূমিকা সম্পর্কে সচেতন হয়ে উঠতে পারে। এই তাগিদ মাথায় ছিল বলেই এই পর্বের ঔপন্যাসিকেরা তাঁদের চরিত্র-গুলিকে কখনই সমাজমুক্ত হতে দেন নি,

সল বেলো

পলাতক হতে দেন নি। অথচ তাঁদের নিঃসঙ্গ স্বাতন্ত্র্যেই জোর দিয়েছেন।

সল বেলো-র (১৯১৫—) একটি প্রবন্ধে এই বোধের আভাস আছে : লেখকের "হয়তো কখনও রাস্তায় চলতে চলতে মনে হতে পারে যে জনমণ্ডলীর সমূহ শক্তিই সামূহিক কর্মকাণ্ড, শিল্পোৎপাদন ও ঐশ্বর্যবৃদ্ধিতেই নিয়োজিত।... কখনও কখনও সন্দেহ হয়, হয়ত স্টুডিবেকার, হয়ত বা বেনডিকসই আজ মানুষের মহত্তম ক্ষমতাকে আবিষ্ট করেছে। মানবজাতির বুদ্ধিগত, শিল্পবোধগত, নৈতিক প্রতিভা কি শেষ পর্যন্ত অবসিত? সে-পরিণতি অসম্ভব। এই তো সবে বিমান প্রয়োগ। বিদেরা দেখিয়ে দিলেন, একনাগাড়ে পঁয়তাল্লিশ ঘণ্টা বিমান চালিয়ে সারা পৃথিবীটা একবার চক্কর দিয়ে আসা যায়। একেই তো বলে প্রতিভা—মানুষকে আর ধাতুকে মাটি থেকে তুলে তাদের পৃথিবীর মুখের উপর দিয়ে ঘুরিয়ে আনা।... মানুষের মধ্যে সংযোগের অভাব নিতান্তই সাময়িক। টাইপরাইটারে আঁটা এক-টুকরো কাগজে যখন এমন একটা সংলাপ বর্ণিত হয় যা কখনও আসলে শোনা যায় নি, তখন সেই রচনা দেবতাদের কাছে নিবেদিত অর্ঘ্য—সেই দেবতাদের কাছে যাঁরা আজ আমাদের সম্মুখে নেই। কিন্তু তাঁরা নিশ্চিত ফিরে আসবেন, কারণ কালে প্রত্যেকেই তাঁদের অভাব অনুভব করবেন।...লেখক নিজেকে বলতে পারেন, 'তোমার আশপাশের মানুষের সঙ্গে তোমার সংযোগ অনেক ঘনিষ্ঠ। কারণ আসলে পরস্পরের সঙ্গে ওদের সংযোগ আর কতটুকু? ওরা আসলে আলতো করে জোড় লাগানো ভঙ্গুর জড়পিণ্ড। কারখানার অ্যাসেমব্লি লাইনের দোস্তি, কিংবা খেলার জায়গার, কিংবা ক্লাব, কিংবা পানশালা, কিংবা দোকানের দোস্তিও তো কখনই প্রগাঢ় নয়।...মনে রেখো, তোমার আনুগত্য মানবাত্মার প্রতি। তুমি লেখক নও, তুমি নিতান্তই জেলে কিংবা চাষী, এমনি কোন মিথ্যা বলে তুমি জনতার লেজুড় হতে যাবে কেন? কেবলমাত্র ভয়েই তুমি অমন অঙ্গীকার করতে পার —অন্য মানুষ থেকে পার্থক্য তোমাকে বিচ্ছিন্ন করে দেবে, সেই ভয়ে; বহুর জান্তব শক্তির ভয়ে।" এই প্রবন্ধেই (দ্রঃ 'ডিসট্র্যাকশন্‌স্ অফ এ ফিক্‌শন রাইটার') বেলো বলেন: "আমাদের বিলাসে, আমাদের আহার পান ও উড়ন-চণ্ডী অমিতব্যয়ে আমরা আমাদের সরকারকে বাঁচিয়ে রাখার জন্য লড়াই করে

চলেছি কারণ বিপুল দ্রব্যসম্ভারে উৎপাদন ও বিক্রয়ের জোরেই এই সরকারের অস্তিত্ব। লেখক ভাবতেই পারেন যে, এই ধরনের দায়িত্বপালন আমাদের আত্মাকেই বিনাশ করবে।"

বেলো জাতে ইহুদি, পেশায় দীর্ঘকাল সাহিত্যের অধ্যাপনা করেছেন। হয়ত তারই প্রভাবে চল্লিশের দশকে লেখা তাঁর প্রথম দুটি উপন্যাস 'ড্যাংলিঙ ম্যান' ও 'দ ভিকটিম' একটু বেশি সাহিত্যগন্ধী ও ধরনধারণে য়োরোপিয়। প্রথম উপন্যাসে পদবিহীন জনৈক জোসেফ চাকুরি ছেড়ে অতীতের কোন এক বিশেষ পর্বের চরিত্র অনুধাবনের পণ্ডিতি প্রয়াসে স্বাধীনতা খোঁজে; প্রয়াস ব্যর্থ হয়ে যায়। তার সমস্ত মানবিক সম্পর্ক বিষিয়ে ওঠে। নির্বস্তুক স্বাধীনতাকে আঁকড়ে থাকতে গিয়ে সে সব কিছুকেই ঘৃণা করতে শুরু করে। শেষ পর্যন্ত হাঁপিয়ে উঠে সে সেনাবাহিনীতে যোগ দেয় : "আমাকে আর আমার নিজের ভাবনা ভাবতে হবে না। আমি তাই কৃতজ্ঞ। আমি এবার অন্যদের হাতে, অন্যেরাই আমাকে চালাবে। আমার স্বাধীনতা বাতিল। হুকে বাঁধা সময়ের জয় হোক। আত্মার উপর খবরদারির জয় হোক। দাসত্ব দীর্ঘজীবী হোক।" 'ড্যাংলিঙ ম্যান'-এর সর্বত্রই যেমন মহাযুদ্ধের প্রচ্ছন্ন উপস্থিতি, 'দ ভিকটিম'-এ তেমনি ইহুদিবিদ্বেষ। অলবী নামে এক ইহুদিবিদ্বেষী ইহুদি লেভেনথালের কাছে এসে অভিযোগ জানায়, লেভেনথালেরই নালিশে অলবীর একদা চাকুরি গেছল; তার পরবর্তী জীবনের যাবতীয় ব্যর্থতাই তারই উত্তরফল : অর্থাৎ লেভেনথালই তার জীবনকে নষ্ট করেছে। লেভেনথাল প্রথমে মানে না সে কথা। কিন্তু তারা এক সঙ্গে থাকতে শুরু করে। বিদ্বেষ, ঘৃণা, ভয়, সংকোচ, অবিশ্বাস সব নিয়েই কিন্তু তারা ক্রমে ক্রমে জড়িয়ে পড়তে থাকে, একটা অদ্ভুত আত্মীয়তায়। অলবীর অধঃপতনে নিজের দায়িত্ব মেনে নিয়েই লেভেনথাল শেষ পর্যন্ত অলবীর সঙ্গ থেকে মুক্তি পায়, নিজের স্বাভাবিক পরিবারজীবনে ফিরে আসতে পারে, আরো স্বচ্ছন্দ দৃষ্টি নিয়ে।

পঞ্চাশের দশকে 'দি অ্যাডভেনচার্স অফ অগি মার্চ' ও 'হেনডারসন দ রেন কিং' উপন্যাসে বেলো তাঁর রচনার জাত বদলে দিয়েছেন—তিনি আর আগের মত অতটা বিষয়গত নন। শিকাগোর জীবন, শঠ, প্রবঞ্চক ও চোরদের গোপনলোক, নয়তো আফ্রিকার এক কাল্পনিক রাজ্যের পরিবেশ রচনায় বেলো-র সযত্ন নিষ্ঠার মধ্যেও গুরুত্ব পেয়েছে অভিজ্ঞতার মূল্য। অগি মার্চ সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য ও সম্পদের প্রলোভনের পরোয়া না করে বাউন্ডুলে জীবন কাটিয়ে দেয়, অর্থের নিশ্চিত আশ্রয়ে শান্তি পাবার সুযোগ পেয়েও ছেড়ে দেয়। উনিশ শতকে মার্ক টোয়েনের সৃষ্টি হাকলবেরি ফিন-এর যোগ্য উত্তরাধিকারী অগি মার্চ। এমনি যারা বাউন্ডুলে তারাই পারে বেপরোয়া হয়ে অর্থলোভী স্থিতিবিলাসী স্বার্থপর সমাজকে বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দেখাতে। হেনডারসন তার সঞ্চিত সম্পদ ও প্রিয়তমা স্ত্রীকে ফেলে আফ্রিকার গভীর অরণ্যে পাড়ি দেয়, আদিম উপজাতিকে জীবনের প্রাণময়তায় ও আচাররক্ষায় মানিয়ে নেবার চেষ্টায় হেনডারসন নিজেকে পরীক্ষা করে নেবার সুযোগ পায়। অগি মার্চের মধ্যে যেমন মার্ক টোয়েনের হাকলবেরি ফিনের ছায়া, তেমনি হেনডারসনের মধ্যে মার্ক টোয়েনেরই কানেকটিকাট ইয়াংকির ছায়া। দুই সভ্যতার মধ্যে সরাসরি সংঘাতে বিপর্যস্ত হেনডারসনকে শেষ পর্যন্ত পালিয়ে আসতে হয়—কিন্তু সে সঙ্গে নিয়ে আসে এক অনাথ সিংহশাবক —"আমার সঙ্গে আর কোন মালপত্র নেই, ঐ সিংহশাবক ছাড়া।" বেলোর এই সদর্থক দৃষ্টি তাঁর ১৯৬৪ সালের 'হেরজগ' উপন্যাসে অবশ্য কিছুটা ছায়াচ্ছন্ন হয়েছে। সাহিত্যের অধ্যাপক মোজেস হেরজগ তার জীবনের দ্বিতীয় বিবাহবিচ্ছেদের পরিপ্রেক্ষিতে অতীত রোমন্থন ও পত্ররচনায় তার জীবনকে ভরিয়ে তোলে। নানা পরিচিত ও অপরিচিতজনকে লেখা নানা বিষয়ে চিঠি, যার কোনটাই কোনদিন পাঠানো হবে না, কেবল আত্মপ্রকাশেই তাদের সার্থকতা—সাহিত্য, রাজনীতি থেকে শুরু করে সত্যজিৎ রায়ের 'পথের পাঁচালী'র ইন্দির ঠাকরুণ ও দুর্গার মৃত্যু পর্যন্ত যাবতীয় বিষয়, কিন্তু প্রত্যেকটি বিষয়েই তার একান্তই ব্যক্তিক স্মৃতি ও অনুভূতির রেশ লেগে থাকে। বিনোবা ভাবেকে 'পথের পাঁচালী'র কথা লিখতে গিয়ে হেরজগ ভাবে : "ভারতের সেই গ্রামের মত নিউ ইয়র্কেও বৃষ্টি পড়ছে। তার হৃদয় আর্দ্র হয়ে ওঠে। আরও তো কন্যা আছে, তার মাও ছিলেন গরীবের ঘরের মেয়ে। সেও শুয়েছে চটের থলি পেতে।" কিন্তু এই নিরন্তর আত্মপ্রকাশে ও নানাজনের সঙ্গে সংযোগ স্থাপনের প্রাণান্ত চেষ্টায় হেরজগ শেষ পর্যন্ত যেন নিঃশেষিত হয়ে যায় : "তার আর কাউকে কিছু বলার নেই। কিচ্ছু নেই। একটা কথাও নেই।"

প্রায় সমবয়সী বার্নাড মালামুড-ও (১৯১৪) জাতে ইহুদি, পেশায় শিক্ষক। 'দি অ্যাসিসটান্ট' উপন্যাসে নিউ ইয়র্কের গরীব ইহুদি পাড়ায় বৃদ্ধ ইহুদি দোকানদার মরিস একদিন দুই দুর্বৃত্তের অতর্কিত আক্রমণে আহত হয়। অভিসন্ধি ছিল ডাকাতির। আহত মরিসকে দোকানের কাজে সাহায্য করতে আসে একটি ইতালীয় ছেলে, নাম ফ্র্যাংক অ্যালপাইন। কী এক জটপাকানো অপরাধবোধে সেদিনকার ডাকাতির অন্যতম নায়ক ফ্র্যাংক অ্যাসিসটান্টের কাজ নিয়ে বসে। মরিসের মেয়ে হেলেনের প্রতি সে আকৃষ্ট হয়। কিন্তু ইহুদিয়ানির দেমাকে হেলেন তাকে প্রশ্রয় দেয় না। এতদিনের ইহুদিবিদ্বেষী ফ্র্যাংক এদের সবাইকেই বুঝবার চেষ্টা করে। মরিসের মৃত্যুর পর দোকান চালাবার দায়, মরিসের স্ত্রী-কন্যার সংসারে খরচ যোগাবার দায় এসে পড়ে ফ্র্যাংকের উপর। নীরবে ফ্র্যাংক সেই দায় পালন করে। হেলেনও যেন তাকে বুঝতে শুরু করে। দুজনে বেশ কাছাকাছি আসে, কিন্তু আবার একটা ভুল বোঝাবুঝি ওদের পরস্পরকে পরস্পরের কাছ থেকে দূরে সরিয়ে দেয়। সংসার আর দোকান, এই উভয়কেই চালাবার কাজে ওদের একত্রেই থাকতে হয়। জীবনের দিনানুদৈনিক টানাপোড়েনেই ওদের একসঙ্গে কাজ করতে হয়। ওরা পরস্পরকে বোঝে, তবু কোথায় যেন একটা বাধার প্রাচীর আছে। ফ্র্যাংক একদিন ইহুদিধর্মের আচারে ইহুদিধর্মে দীক্ষিত হয়ে আসে। ফ্র্যাংকের জীবনটাই বদলে যায়। এইখানেই উপন্যাসের শেষ। ফ্র্যাংক জীবনে হেলেনকে পাবে কি না সে প্রশ্ন অবান্তর। ফ্র্যাংক আরেকটা জীবনকে চিনেছে, আরেকজনকে চিনেছে। ইহুদিদের কাব্যিক চিত্রকল্পময় স্বচ্ছন্দ 'ইডিশ' ভাষার ভাবান্তরিত রূপে আস্থা ও ভরসার যে শান্ত মূর্তি ধরা পড়ে, প্রতিদিনকার জীবনের বিবর্ণ ক্লান্তিকরতার মধ্যে তা যেন আলো নিয়ে আসে। অন্য কোন আঙ্গিককৌশলের সুযোগ না নিয়েও ভাষা প্রয়োগেই মালামুড এক ধরনের বহুমাত্রিকতা রচনা করতে পারেন।

ভ্রম সংশোধন

গত ৫ই ডিসেম্বর সাপ্তাহিক বসুমতী সংখ্যাটিতে প্রকাশিত 'রবীন্দ্রনাথ ও সুভাষচন্দ্র' গ্রন্থটির বিজ্ঞাপনটিতে ভুলবশতঃ লেখকের নাম ছাপা হয় নাই। গ্রন্থটির লেখক :—দেবপাল মজুমদার। প্রকাশক : "সারস্বত লাইব্রেরী"।

২০৬, বিধান সরণী, কলিকাতা—৬

এই মুদ্রণ প্রমাদের জন্য আমরা দুঃখিত।

ম্যানেজার :

(বিজ্ঞাপন বিভাগ)

মা বলছিলেন,
আমায় নাকি
দিন-দিনই
কচি দেখাচ্ছে...

মা তো ছেলের দিক
টেনে কথা কইবেনই!
আসলে কিন্তু **নির্মল**
আর আমার তারিফ করা
উচিত। তিনি তো জানেন না
ওঁর আদরের ছেলেটিকে
আমিই **নির্মল বার সাবানে**
কাচা ধবধবে পোশাক
পরিয়ে অমন খোকাটি
করে রেখেছি।

পূর্ব ভারতে বার সাবান
হিসেবে কাটতিতে
সবার উপরে
—সবার সেরা
বলেই।

কুসুম
প্রোডাক্টস লিমিটেড,
কলিকাতা-১

KPN 4639

ফুচিকের দেশে

গীতা বন্দ্যোপাধ্যায়

[পূর্ব-প্রকাশিতের পর]

প্রাগ যে বোহেমিয়ার কোলের ছেলে সেটা বেশ বোঝা যায় বিশেষ করে ওখানকার উৎসবগুলো দেখলে। ওরা মজা করতে জানে। সারারাত ধরে নাচগানের উৎসবগুলোর শেষ হয় ভোরের আলো ফোটার পর। ড্যানিউব নদীর ধারে হলে ওরা বলবে—'দেখো দেখো—ড্যানিউব ভোরের আকাশের নিচে সত্যিই নীল—নু ড্যানিউব!'

'তাই বুঝি ভোর পর্যন্ত নেচেকুঁদে অস্থির হও!'

'নিশ্চয়ই। আর একটা কারণেও ভোর পর্যন্ত জাগি। দেখো, দেখো আমার বান্ধবীর চোখ কত গাঢ় নীল দেখাচ্ছে।'

সত্যিই তাই। বান্ধবীর সোনালী চুলে ঢাকা মর্বেল পাথরের মত সাদা মুখের মধ্যে নীল চোখ জোড়ায় ড্যানিউব নদীর ছায়া। নীলার মত নীল দেখাচ্ছে।

গ্রামাঞ্চল আরও সুন্দর। বিশেষ করে আমাদের মত বিদেশীর চোখে। এপ্রিল মাসের পাগল করা চেরীগাছের ফুল—ইংরিজিতে যাকে বলে ব্লসম। কোথাও ন্যাসপাতি গাছে বোল ধরেছে। কোথাও আপেল ফলতে শুরু হয়েছে। পাহাড়ী অঞ্চলগুলোর রূপ যেন দু' জোড়া চোখে ধরে না! উঁচু, নিচু, উঁচু, নিচু! হাঁটছি, পাহাড় চড়ছি,—আবার হাঁটছি। মনের কোণে কত স্মৃতি জাগতে থাকে। মনে পড়ে যায় ছোটবেলার টুকরো-টাকরা ছবি। মালয় দেশে থাকতে যখন কুয়ালালামপুরে ছিলাম তখন এমনি পাহাড়ী পথ ধরে স্কুলে যেতাম। অনেক উঁচুতে মস্ত বড় স্কুল। সেখান থেকে সারা কুয়ালালামপুর দেখা যেত।

কিন্তু বনের চেহারা কি ভয়ানক আলাদা। এশিয়া আফ্রিকার বন বা পাহাড়ী অঞ্চল কত অন্য রকমের। এমন কী গরু, ছাগল, ভেড়া, ঘোড়ার চেহারাও সম্পূর্ণ আলাদা ধরণের। এখানকার গৃহপালিত পশুরা এখানকার লোকের মতই স্বাস্থ্যবান। পাহাড়ী গরুগুলোর গায়ের লোম ইঞ্চি কয়েক লম্বা।

তখন বরফ গলে গিয়ে বসন্ত এসেছে। তাই সমস্তক্ষণ একটা চাঞ্চল্য। লোকের মধ্যে, গাছপালার মধ্যে, জীবজন্তুর মধ্যে। আর একটা চাঞ্চল্য এখানে সব সময় অনুভব করেছি—নতুন জীবন গড়ার চাঞ্চল্য। কেবলি গড়ে চলেছে—অক্লান্ত শ্রমিক পিঁপড়ের মত।

লিদিচে গ্রাম দেখতে গিয়েছিলাম। যাদের গত যুদ্ধের কথা মনে আছে, তারা লিদিচের নাম শুনেছে নিশ্চয়ই। ১৯৩৯ থেকে ১৯৪৫ সাল পর্যন্ত হিটলারের সাম্রাজ্য গড়ার বীভৎস দুঃস্বপ্ন ভাঙতে হাজার হাজার চেকোশ্লোভাক মানুষ প্রাণ দিতে কুণ্ঠা করে নি। সেই সব সাধারণ মানুষের অসামান্য কীর্তির কথা ফুচিক তাঁর ডাইরীতে লিখে গেছেন:

'পানক্রাৎস জেলের এই সংক্ষিপ্ত সময়ের মধ্যে এই বিবরণী যেমনভাবে লিখতে চাই তা লিখতে পারছি না। আমাকে আরও সংক্ষেপ করতে হবে। সে সময়ের ঐতিহাসিক তাৎপর্যের চাইতে মানুষগুলোর ওপর নজর বেশি করে দিতে হবে। তারা সবচাইতে জরুরী।

'আমি জেলিনেক দম্পতির কথা দিয়ে শুরু করেছিলাম। সরল সাধারণ মানুষ। স্বাভাবিক অবস্থায় এদের মধ্যে বীর খুঁজে পাওয়া ভার হত। তাদের গ্রেপ্তার হবার সময়, তারা দুজনে পাশাপাশি দাঁড়িয়েছিল। হাত ছিল মাথার ওপর তোলা। স্বামী ফ্যাকাশে, স্ত্রীর রগের কাছটায় যক্ষ্মা রোগের লালচে আভা। গেস্টাপোর লোকেরা যখন তার আদর্শ ফ্ল্যাটখানা পাঁচ মিনিটে ধ্বংস করে ফেলল তখন স্ত্রীর চোখে কিছুটা ভয় দেখা দিয়েছিল। তারপর সে মাথাটা আস্তে আস্তে স্বামীর দিকে ঘুরিয়ে জিজ্ঞেস করল—

"এখন কী হবে, জো?"

'স্বামী কখনই খুব বেশি কিছু বলতে পারত না। তাকে কথা খুঁজতে হত। কথা বলতে গেলে সে উত্তেজিত হয়ে পড়ত। এখন সে শান্তস্বরে উত্তর দিল। কোনো-রকম প্রচেষ্টা বা করুণ রসের অবতারণা করল না:

"অমন মরতে চলে যাব, মারি।"

'স্ত্রী চিৎকার করল না। কিম্বা কাঁপলও না। খুব সাবলীল ভঙ্গিতে নিজের ডান হাতখানা নামিয়ে এনে স্বামীর হাত ধরল। একেবারে পিস্তলের মুখের সামনে। এইটুকুর জন্যে তাদের প্রথম পাওনা হল ঘুঁষি। স্ত্রী নিজের গাল মুছে, আক্রমণকারীদের আপাদমস্তক দেখে নিয়ে প্রায় হাস্যকৌতুকের ঢঙে বলল:

"এমন সুন্দর দেখতে ছেলেগুলো", বলে সে গলার স্বর উঁচিয়ে দিল—"সুন্দর দেখতে, কিন্তু কি বর্বর।"

'সে তাদের ধরেছিল ঠিকই। কয়েক ঘণ্টা পরে ওরা যখন তাকে "পরীক্ষক কমিশার"-এর অফিস ঘর থেকে মেরে প্রায় অজ্ঞান অবস্থায় তুলে নিয়ে গেল তখন তারা পিটিয়ে তার কাছ থেকে কিছু বার করতে পারে নি। তখন কিম্বা পরে—কখনই তারা তার কাছ থেকে কিছু জানতে পারে নি।'

ফুচিকের শেষ ডাইরীতে জেলিনেক দম্পতির মত আরও অনেক অসামান্য সাধারণ মানুষের বীরত্বের কথা লেখা আছে। এইসব মানুষ নিয়েই চেকোশ্লোভাকিয়ার নয়া গণতন্ত্রের গোড়াপত্তন।

১৯৪২ সালের জুন মাসে সারা দুনিয়া নাজী বর্বরতার প্রমাণ পেয়েছিল লিদিচেতে। এ গাঁয়ের সমস্ত পুরুষদের গুলী করে মেরে ফেলা হয়েছিল। নারী আর শিশুদের পাঠানো হয়েছিল সনসেন্ট্রেশন ক্যাম্পে। গোটা গ্রামটি ধ্বংস করা হয়েছিল।

সারা পৃথিবীর সঙ্গে গলা মিলিয়ে ভারতবর্ষেও আমরা মিছিল করেছিলাম। আমাদের বড় বড় শহরে "লিদিচে বেঁচে থাকবে" আওয়াজ তুলে দেশবাসীকে যুদ্ধ আর ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে জাগাবার চেষ্টা হয়েছিল। ১৯৪৩ সালে "ইউনাইটেড নেশানস ডে" উপলক্ষে এদেশে টাকা তোলা হয়েছিল লিদিচের জন্যে একটি ঘণ্টা কিনে দেবার জন্যে। ১৯৪৪ সালে মে বিদ্রোহের ভেতর দিয়ে সারা চেকোশ্লোভাকিয়া জ্বলে

উঠেছিল। যুদ্ধ শেষ হয়েছিল প্রাগে। সোভিয়েত সৈন্যবাহিনী শেষ পর্যায়ে জার্মান নাজীবাদকে একেবারে পিষে ফেলেছিল।

১৯৪৫ সালে চেকোশ্লোভাকিয়ায় নয়া গণতন্ত্রের গোড়াপত্তন হল। বড় বড় কল-কারখানা, জীবনবীমা, ব্যাঙ্ক, খনিজ সম্পদ, আর বৈদেশিক বাণিজ্য জাতীয়করণ করা হল এই গণতন্ত্রের প্রথম কাজ। বেগ পেতে হয়েছিল প্রচুর। কিন্তু অভিজ্ঞতার দাপটে মানুষ বুঝেছিল লাগাম আল্গা রাখলে চলবে না। যে সব বড় বড় ভূস্বামী আর যারা নাজীদের সঙ্গে হাত মিলিয়েছিল তাদের জমিজমা বাজেয়াপ্ত করে গরীব চাষীদের হাতে তা বিলিয়ে দেওয়া হয়েছিল। এ কাজে ছিল প্রচুর ঝামেলা। ধাপে ধাপে এগোতে হয়েছিল। ১৯৪৮ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে ধনতন্ত্রের পুনরুত্থানের অপচেষ্টা ব্যর্থ করতে চেকোশ্লোভাকিয়ার জনসাধারণকে মুঠো শক্ত করতে হয়েছিল।

চেকোশ্লোভাকিয়ার ওপর নজর রাখতে সোভিয়েত সৈন্যদের এদেশে থাকাটা অনেকে প্রয়োজনীয় মনে করতো। লোকে তাদের সম্মান করত, ভালবাসত। কিন্তু তবু কোনো বিদেশী সৈন্যের বছরের পর বছর এমনি অতিথি হয়ে থাকাটা বাঞ্ছনীয় মনে হত না। বিশেষ করে তাদের, যারা যুদ্ধোত্তর চেকোশ্লোভাকিয়ায় বড় হয়ে উঠল। ছোট দেশ। এমনিতেই সব সময়ে খবরদারীর মধ্যে থাকতে হয়। অথচ খোল নলচে বদলে ফেলতে চাইলেও আগের উপসর্গ কিছুটা থেকেই যায়। মাপকাঠি নিয়ে বসা বড় কঠিন।

মনে আছে লিদিচের কথা। ধ্বংসপ্রাপ্ত গাঁ-টাকে গড়তে গিয়েছিল যুব ব্রিগেড। দেখতে দেখতে সে গাঁয়ের চেহারা বদলে গেল। হাসি-কান্নায় যেন কানায় কানায় ভর্তি!

এদের কাণ্ডকারখানা দেখে নিজেকে বেজায় কুঁড়ে মনে হত। আদরে অপ্যায়নে একেবারে ল্যাজে গোবরে হয়ে আছি। কাজ করব বলে জানাতে ওরা বলল—'বেশ তো, একটু গভরে খাটতে চাও? —যাও পাহাড় ভাঙো।'

শুনে তো আমি আহ্লাদে গদগদ। কিন্তু ঈশ্বর! এ কি! হাতে যে ফোস্কা পড়েছে! প্রথম পাঁচ মিনিটেই আমার দম নিকলে গেল।

লেনা বলে একটা মেয়েই সেদিন হেসে অস্থির হয়ে এমন অনায়াসে আমার ভাগের কাজ করে দিতে লাগল যে আমি একেবারে বেকুব। কিন্তু পরে জেদের বশে কিছুটা পারতাম।

ভেবেছিলাম অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করে দেশে ফিরে নিদেনপক্ষে আমাদের সমাজের কলকাতাকে ঢেলে সাজাব। অভিজ্ঞতা হল বটে। কিন্তু দেশের মাটিতে পা দেওয়া মাত্র বিমানবন্দরেই যে আদর-আপ্যায়নের ব্যবস্থা দেখলাম, তাতে চোখে সরষে ফুল ফুটতে লাগল। আমার কাগজপত্র, পাসপোর্ট, ছবি, নোটখাতা ইত্যাদি যাবতীয় "উৎসাহজনক" জিনিস বাজেয়াপ্ত করা হল। কেন তা বলা হল না। ওসব কথা না কি বলতে নেই।

তারপর যা হবার হল। সাধের কলকাতা শুধু মিছিল দেখল। কিন্তু হাতে ফোস্কা পড়িয়ে একে গড়ে তোলার কোনো নিশানা খুঁজে পেলাম না। শুনেছিলাম এখানে আসন্ন সমাজতন্ত্র হয়েছে। অনেকটা সেই কারণেই আমাদের বিদেশে অভিজ্ঞতা কুড়িয়ে আনতে যাওয়া। কিন্তু এ যে দেখি নামাবলী গায়ে মন্ত্র পড়ে চলেছে তো চলেছেই। হাতে আছে একটি জপের মালা। তাই আঙুলেই কেবল কড়া পড়ে যাচ্ছে আর কলকাতার রাস্তাগুলো গর্তে গর্তে ক্ষতবিক্ষত।

[ক্রমশঃ]

সাহিত্য সংসদের

অভিধান সিরিজ

SAMSAD ENGLISH-BENGALI DICTIONARY

পূর্ণাঙ্গ শব্দকোষ। সর্বস্তরের সর্ববৃত্তিধারীর প্রয়োজনের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া শব্দচয়ন, শব্দার্থ বিন্যাস ও অধুনা প্রচলিত শব্দাবলী সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। শব্দের ব্যুৎপত্তি ও উচ্চারণ-সঙ্কেত। ১২০৮+৮ পৃঃ, ডিমাই অক্টেভো আকার। বোর্ড বাঁধাই। [১২·৫০]

SAMSAD LITTLE ENGLISH-BENGALI DICTIONARY

অহরহ ব্যবহারের জন্য সহজ বহনীয় আকারে ছাত্র ও অফিস কর্মচারীদের বিশেষ উপযোগী। অধুনা প্রচলিত শব্দের প্রাধান্য ও শব্দের প্রয়োগের উদাহরণ। ৮২০+১২ পৃঃ, ৪½″×৬⅝″×১″ আকার। শক্ত বাইবেল কাগজ। [বোর্ড বাঁধাই —৭·৫০। সাধারণ বাঁধাই ৫·০০]

SAMSAD BENGALI-ENGLISH DICTIONARY

সর্ববৃত্তিধারীর বিশেষ করিয়া ছাত্রদের উপযোগী পূর্ণাঙ্গ শব্দকোষ। বিশিষ্টার্থ-প্রকাশক শব্দসমষ্টির ইংরেজি। ১২৭৮+১৬ পৃঃ ক্রাউন অক্টেভো আকার। বোর্ড বাঁধাই [১২·০০]

অভিধান তিনটির সংকলক ঃ শ্রীশৈলেন্দ্র বিশ্বাস ও সংশোধক ঃ ডঃ সুবোধচন্দ্র সেনগুপ্ত

সংসদ বাঙ্গালা অভিধান

৪০,০০০-এর অধিক শব্দসংখ্যা। ছাত্রদের সুবিধার্থে শব্দের পদপরিচয়, ব্যুৎপত্তি, সমাস প্রভৃতি এবং পারিভাষিক শব্দাবলীর তালিকা। শ্রীশৈলেন্দ্র বিশ্বাস সঙ্কলিত ও ডঃ শশিভূষণ দাশগুপ্ত সংশোধিত। ১৩৬+১৬ পৃঃ ক্রাউন অক্টেভো আকার লাইনো হরফে ছাপা। বোর্ড বাঁধাই। [৮·৫০]

সাহিত্য সংসদ

৩২এ, আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড ঃ কলিকাতা-৯

রজত রায়চৌধুরী

তখন শেষ চৈত্রের তেতে-ওঠা রোদ্দুরে পুকুরের জলটা চিক্‌চিক করে কেঁপে কেঁপে উঠছে। লাইনবন্দী কয়েকটা নারকেল গাছের সরু লম্বা ছায়ার মধ্যে ছোট্ট দুটো ছায়া নিজেদের ধরাতে পারছে না। তাদের কিছু কিছু অংশ সামনে পেছনে বিচিত্র ধরণের ছায়ার ছবি এঁকে পড়ে রয়েছে।

গন্ধটা অনেকক্ষণই ছড়াচ্ছিল বাতাসে। এখন দুপুরের বাতাসে সেই কটু গন্ধটা নাকের ভেতর একটা অস্বস্তিকর সুড়-সুড়ি দিতে লাগল। ওরা, ওই ছায়া দুটো যাদের, তারা জানে, গন্ধটা কিসের। আরও জানে গন্ধ আজ থামবে না, কালও না, পরশুও নয়।

ওদেরই ঠিক পেছনে, হাত পঁচিশের মধ্যে কয়েক হাজার কাঁচা ইঁট পুড়ছে। তার হাজার রন্ধ্রের মধ্য দিয়ে ধোঁয়ার হাজার ফণা কুণ্ডলী পাকাচ্ছে। আর বাতাস সেই ধোঁয়ার গন্ধ গায়ে মেখে ছড়িয়ে পড়ছে চারধারে। কাঁচা ইঁট পুড়ছে। পুড়বে অনেকক্ষণ ধরে। পুড়ে পুড়ে লাল হবে। শক্ত হবে।

শুক্লা ছোট্ট রুমালটা আলগাভাবে নাকের ওপর বুলিয়ে নিয়ে বলল, না, তোমায় আর বাহাদুরী দেখাতে হবে না। তুমি বুঝি ভেবেছ, এই আধপোড়া ইঁট দিয়ে অবনীর মাথা ফাটাতে পারলে খুব একটা বাহাদুর গোছের কাজ করা হবে।

এতে তুমি বাহাদুরী দেখলে কোথায়? সুনীল শুক্লার চোখের দিকে তাকাল।

তুমি নিজেও বেশ জানো, এটা বাহাদুরী দেখানোরই সামিল।

তোমাকে বোঝাতে পারব না শুক্লা, এটা বাহাদুরী নয়।

শুক্লা মাটির গায়ে লেপটে-থাকা খানিকটা তাজা খানিকটা শুকিয়ে যাওয়া ঘাস ছিঁড়ল। তারপর সেই নেতিয়ে পড়া দুমড়ে থাকা সরু সরু ঘাসগুলোকে হাতের চেটোয় রেখে সোজা করবার চেষ্টা করতে লাগল।

সুনীল কয়েক মুহূর্ত পুকুরের জলের দিকে চেয়ে কী যেন ভাবতে চেষ্টা করল। শেষে এপাশে নতুন কাটা বড় পুকুরটার বিশাল গহ্বরের দিকে চেয়ে বললে, তুমি কী বলবে শুক্লা এই যে ছোট পুকুরটা কেটে বড় পুকুর করা হল, এটা কি কোনো বাহাদুরী নেবার জন্য?

ওটা প্রয়োজনের। তৃষ্ণার জল আর মারামারি এক নয়।

পৃথক মনে করলে পৃথক। কিন্তু ধরো যে লোক পুকুরটাকে বড় করেছে তার মনে তাতে তৃপ্তি; তেমনি মারামারি করেও অন্যায়ের প্রতিবিধান করতে পারলে তৃপ্তি। তখন আর পৃথক থাকে না।

তোমার কথাগুলো ঠিক বি. কে. জি'র মতো। শুক্লা হাসল। দাঁতগুলো ঈষৎ ফাঁক হল। আর সেই সময়েই শুক্লার দিকে তাকিয়েছিল সুনীল। তার মুখখানাও হাসিহাসি খুশিতে ভরে উঠল। ঈষৎ নয়, মুখগহ্বরের ফাঁক দিয়ে আত্মপ্রকাশ করল অনেকগুলো দাঁত।

এখন কার ক্লাশ।

টি. পি. এস-এর। যাবে না?

সুনা।

ওরা কিন্তু খুঁজবে?

খুঁজুক গে।

চারদিকে দুপুরবেলার স্তব্ধতা। সুমুখের ফাঁকা মাঠের ওপর দিয়ে ছুটে আসছে বাতাস। কেবল তারই একটা সন্-সন্ আওয়াজ। একটানা ছেদচিহ্নহীন। এমন সময় বাতাসে ঢেউ তুলল কয়েকটি ঘণ্টার ধ্বনি। শুক্লা একটু নড়ে সুনীলের মুখের দিকে চোখ তুলে বললে, উঠবে না?

বললাম তো উঠব না।

তরুণবাবু কিন্তু ঠিক খুঁজবেন আমাদের?

কেমন করে জানলে?

পোড়া ইঁটের পাঁজা থেকে ধোঁয়া বেরুচ্ছে। তারই পেছনে একটা ছোট ধান-ক্ষেত পেরিয়ে কলেজের কম্পাউণ্ড। সেখান থেকে যখন সকলের অলক্ষ্যে ধোঁয়ার অফুরন্ত কুণ্ডলীর ভেতর দিয়ে ওরা এখানে আসছিল, সে সময় প্রফেসরস্-রুমের জানালায় তরুণবাবুকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখেছিল শুক্লা।

শুক্লা বললে, তরুণবাবুর চোখ! তুমি জান না?

কিরকম? হৃদয়ভেদী কটাক্ষের মতন কি?

তুমি ঠাট্টা করছ!

ঠাট্টা নয়। তুমি এই মেয়েমানুষকে অপরাধ বলে ভাবছ কেন?

অপরাধ বলে আবার কেন? বলছিলাম, ঠাট্টা-বিদ্রূপ ভাল লাগে না।

প্রফেসরও তোমায় ঠাট্টা করে না কি?

ইয়ার্কি নয় সুনীল। তোমার কি? কেউ কিছু বললে, হয় দাঁত বার করে হাসবে, নয়তো এমন একটা ভাব দেখাবে যেন কত বাহাদুরী।

তোমায় আজ বাহাদুরীতে পেয়েছে। তোমার সঙ্গে বসে গল্প করছি, তাতেও বাহাদুরী!

লজ্জার আভাস মুহূর্তে ছড়িয়ে পড়ল শুক্লার সমস্ত মুখে। কপালের ওপর ইংরেজি কমা চিহ্নের মতন অসংখ্য ছোট ছোট চুলগুলো বাতাসে নড়ে-চড়ে শূন্যে ওড়বার বিফল চেষ্টা করছে। ছোট কপালের নিচে কাজলমাখা চোখে স্বপ্নের মত আবেশঘন রোমাঞ্চ। সুনীল চেয়ে চেয়ে দেখল। খুশি হল। আর তখন, ঠিক তখনই সুমুখের পুকুরের ওপারের ঘন বাঁশঝাড় কি আম-কাঁঠালের বন থেকে ভেসে এল কু-হু-হু। কু-হু-হু।

সদ্য জাগা খুশিটা চনমনিয়ে উঠল। সুনীল বলল, উঁ-হু-হু, উঁ-হু-হু, তোমায় ডাকে যে বাহাদুরী আছে তা সরবে ঘোষণা না করলেই কি নয়?

ঠিক তোমার মত। উচ্ছ্বসিত হল শুক্লা। কোথায় করে কখন কিভাবে মারা-মারি করে কার মাথা ফাটিয়েছে—কাকে নাক খৎ দেওয়াতে বাধ্য করিয়েছে—তাই উচ্চকণ্ঠে ফেনিয়ে ফেনিয়ে বলা।

একটুও ফেনানো নয়। জিজ্ঞেস করো রমেনকে। হঠাৎ উত্তেজিত হল সুনীল। কেন, তোমার তরুণবাবুকে জিজ্ঞেস করো না, তিনিও তো ওই বাসেই যাচ্ছিলেন।

আঁচলটার কোণ ধরে সেটা আঙুলে জড়াবার চেষ্টা করল শুক্লা। ঠোঁটের কোণে একটা মিচকে হাসি। বললে, তরুণবাবু বুঝি তোমার পক্ষের উকিল।

রাখো, ওসব বাজে কথা। শোনো, স্পষ্ট কথাই বলি। অন্যায় হতে দেখলে আমি মেজাজ ঠিক রাখতে পারি নে। তখন আমার হাত চলে আগে।

সেটাই ভীষণরকম অন্যায়। এক অন্যায়কে রুখতে গিয়ে আর এক অন্যায়ের প্রশ্রয় দেওয়া।

অন্যায়ের দমন শক্ত হাতেই করতে হয়। তোমাদের মতন নরম হাতে হয় না।

আমাদের হাত নরম জানলে কেমন করে?

অ্যাঁ—থমকে পড়ল সুনীল। অস্ফুট-কণ্ঠে বললে, জানতে হয় না, জানতে পারা যায়।

তেমন করেই কি জানতে পারো না যে আমি ওই মারামারি পছন্দ করি না।

তুমি কি আমাকে একজন গুণ্ডা বলে মনে করো?

তোমার আজ হল কি? আমার মন এত নিচু তুমি ভাবতে পারলে?

না হলে তোমার কথাবার্তায় আমার কেবলই মনে হয় তুমি আমাকে মারামারি করে বাহাদুরী নিতে ছাড়া অন্য কোনো ভাবে ভাবো না।

দুজনেই চুপ করল। বাতাসে কটু গন্ধটা ছড়িয়ে বেড়াচ্ছে। পোড়া মাটির গন্ধ। কাঁচা ইঁট পুড়ে পাকা হচ্ছে। লাল হবে। শক্ত হবে। সুনীল-শুক্লা মনে মনে নানা আঁকিবুকি কাটল কিছুক্ষণ। শুক্লার কপালটা তেলতেলে। নাসারন্ধ্র স্ফীত হচ্ছে, ঠোঁট দুটো ঈষৎ ফাঁক। দুটো হাঁটু জড়ো করে দুহাত দিয়ে পা দুটোকে জড়িয়ে চিবুকটাকে সে আলতোভাবে ছুঁইয়ে রেখেছে যুগল হাঁটুর ওপর।

সুনীল একটা সিগারেট ধরাল। ধোঁয়া ছাড়ল কয়েকবার। তারপর বললে, বিশ্বাস করো শুক্লা, কোনো প্রকার বাহাদুরী নেবার জন্য আমি অন্যায়ের প্রতিবাদ করি নে—সহ্য করতে পারি নে বলেই করি।

কিন্তু সেটা যখন কলেজে ফলাও করে বলো? তখন? তখন সেটা বাহাদুরী নেবার প্রচেষ্টা ছাড়া আর কিছু নয়।

তোমার তাই মনে হয়?

কার হয় না। সবাই হাসাহাসি করে। বিশেষ করে মেয়েরা।

মেয়েরা হাসে! কে হাসে? অনীতা হাসে কি?

হঠাৎ অনীতার কথা জিজ্ঞেস করছো?

হাসে কি না বলো?

বরং জিজ্ঞেস করতে পারো হাসে না এমন একজনও কেউ কাছে কি না?

হুঁ। ওই অনীতারা সম্মান রাখতে গিয়ে গত বছর কে মারামারি করেছিল, জিজ্ঞেস করো তো?

জিজ্ঞেস করবার কি আছে? আজ বাসে অনর্থক ঝগড়া করলে কেন?

করব না? যখন খুশি বাস থামাবে,

বি. সি. মাইতি এণ্ড কোং
—ইলেকট্রো প্লেটিং সামগ্রী—
নিকেল ভ্যাট ও ব্যারেল * ডাইনামো * পলিশিং মেসিন এবং প্লেটিং করিবার জন্য যাবতীয় সামগ্রীর আদি সরবরাহক
শো রুম ঃ—৯৪, প্রেমচাঁদ বড়াল স্ট্রীট, কলি-১২। ফোন ঃ ৩৪ ৩১৭৩
৩, রামমোহন পাল লেন: কলি-১২ ঃ অফিস-ফোন—৩৪-৪৮৪৬

নেপথ্য নাটক

উলুখড়

শ্রীমান

শ্রীমান সমরেন
মানুষ চিনেছেন:
দেশ বাঁচাতে, দেশের টাকায়
উকীল কিনেছেন।

হিজ্ হাইনেস্

হিজ্ হাইনেস্ কসু-র
একটিমাত্র কসুর;
তাঁর শ্বশুরের জামাতাটি
'সেণ্ট্ পার্সেণ্ট' অসুর।

হিজ্ মাস্টার্স্

হিজ্ মাস্টার্স্ বক্সী
চান না কোনো বক্শিস;
তিনি শুধুই সাক্ষীগোপাল
সময়ে দেন 'প্রক্সী'।

প্যাসেঞ্জার নামবার আগেই ঘণ্টা বাজাবে এটা কি মগের মুল্লুক—

প্রতিবাদের একটা ধারা আছে তো? তোমার প্রতিবাদ সব সময়ই মারমুখী।

চুপ করল সুনীল। মনে মনে ভাবল, আশ্চর্য মেয়েরা। এতো বোঝে, এই সামান্য কথাটা কেন বোঝে না। না, বুঝতে চায় না। তাও তো নয়। আসলে পছন্দ করে না। আমি যা পছন্দ করি, ওর তাতে অপছন্দ। হ্যাঁ, এটাই আসল কথা।

রোদ সরে সরে যাচ্ছে। লাইনবন্দী নারকেল গাছের ছায়াও। ওদের গায়ে রোদ এসে পড়ে ওদের উত্তপ্ত করছিল। তখন বুঝতে পারল দু'জনে। ছায়ার সঙ্গে তাল মিলিয়ে ওরাও নড়ল-চড়ল।

তখন চোখে পড়ল। দূরে, ধান-ক্ষেতের আল ধরে দুটি মূর্তি ক্রমশ দূরে আরও দূরে মিলিয়ে যাচ্ছে। শুক্লা বলল, অনীতা আর লতিকা।

তুমি চিনতে পারছ।

হুঁ। হাসল শুক্লা। তুমি পারছ না। পাগল। এতো দূর থেকে কখনও চেনা যায়। তুমি মেয়েমানুষ, তাই চিনতে পেরেছ?

তার মানে?

মানে জলবৎ তরলম্। চিনেছ প্রেফ শাড়ির রঙ্-এর জন্য। এ কলেজের কোন্ মেয়ে কবে কোন্ নতুন শাড়ি কিনেছে—তা তোমাদের নখদর্পণে।

তুমি তো খুব মেয়েদের মনের খবর রাখো দেখি—কিন্তু মশাই, এ মন্তব্য সঠিক নয়।

তুমি কি বলতে চাও, শাড়ির রঙ্ দেখে তুমি ওদের চিনতে পারো নি?

অস্বীকার করব না। কিন্তু সব মেয়ের শাড়ির ইতিহাস আমি রাখি না, অনেকেই রাখে না। যাক্ গে। ওরা বাড়ি ফিরছে: তার মানে টি. পি. এস-এর ক্লাশ শেষ। ঘণ্টা বাজা শুনেছ তুমি?

শুনব কেমন করে! সারাটা দুপুর ধরে কেবল তো ঝগড়াই করছ। আমাকে বলছ আমি মারামারি করে বাহাদুরী দেখাই—তুমি বোধহয় তেমনি ঝগড়া করেই বাহাদুরী দেখাও।

আমি মোটেই ঝগড়া করি নে। এখানে আসবার আগে ইঁটগুলোকে পুড়তে দেখে তুমি কেন বললে, এই ইঁট দিয়ে তুমি অবনীর মাথা ছাতু করবে!

কেন করব না। জানো ও আমাদের নামে কি সব বানিয়ে বানিয়ে বলেছে।

সেজন্য ওর মাথা ফাটাবে?

ফাটাব। হাজার বার ফাটাব। ইডিয়টটা বলে কি না—আমাদের জড়া-জড়ি অবস্থায় চুমু খেতে দেখেছে সে।

বলেই হঠাৎ চুপ করল সুনীল। চোখের দৃষ্টি পুকুরের চিক্‌চিকে জলের ওপর ফেলে রাখল অনেকক্ষণ। শুক্লাও নীরব। দু' হাঁটুর মধ্যে মাথা গুঁজে ডান হাতে ঘাস ছিঁড়ছে।

সুনীলই নীরবতা ভাঙল। বলল, শুক্লা তুমি জানো বাজে কথায় অন্যায় আচরণে আমি সহসা উত্তেজিত হয়ে উঠি। তুমি বলো—তোমার হাত পর্যন্ত কোনোদিন ছুঁই নি—অথচ এমন অপবাদ মুখ বুজে সহ্য করব।—ছটফট করে উঠল সুনীল।

শুক্লা দেখল সুনীলের চোখের তারায় সেই বুনো জন্তুটা জেগে উঠেছে। হাতের শিরাগুলো ভেসে উঠেছে। এমন অবস্থা মারামারির পূর্ব মুহূর্তে।

সুনীল। আস্তে করে ডাকল শুক্লা। আলতো করে ছুঁল সুনীলের হাতটা। বললে, অবনীর মাথা ফাটালেই এ অপবাদ থামবে তা ভেবো না।

সূর্য সরে গেল চোখের সামনে থেকে গাছপালার অন্তরালে। পুকুরের জলটা আর চিক্‌চিক্ করছে না। ধোঁয়ার সরু-মোটা রেখাগুলো এঁকে-বেঁকে মিলিয়ে যাচ্ছে বাতাসে। শুক্লা ফিরে বসল। তাকাল সুনীলের দিকে। বললে, আজকেই একটা চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেওয়া দরকার। শয়তানের হাত তো বাড়তে পারে যত খুশি, সুতরাং তার আগেই ভাবা দরকার নিজেদের। না হলে—

নাহলে কি শুক্লা। বলো, থামলে কেন?

আজ এখানে বসে পর্যন্ত তো বলছি। তুমি এক এক দিন এক-একটা কাণ্ড বাধাও, আর আমি মনে মনে পুড়ে মরি। ভাবি, কেন তুমি এমন করো?

আমিও কি জানি না শুক্লা, এই মারামারির ইতিবৃত্তগুলো তোমার পছন্দ নয়। তুমি চাও শান্ত, নিরুদ্বিগ্ন, নির্ঝঞ্ঝাট প্রহরভরা দিন। স্বার্থে ঘা না লাগলে আর পাঁচজন মানুষের মতন সব কিছুকে পাশ কাটিয়ে যাবার মতন মানসিকতা। শুক্লা, আমিও ভাবি, মনের মধ্যে ঝড় ওঠে। দেখা দেয় স্বন্দ্ব। সারা-রাত সারাদিন ভাবি আর ভাবি। অন্তর্দ্বন্দ্বে জ্বলি আর জ্বলি। তবু কোনো সিদ্ধান্তে পৌঁছুতে পারি নে।

শক্ত করে সুনীলের হাতটা ধরল শুক্লা। বলল, কেন পারো না?

অনেকক্ষণ চুপ করে রইল সুনীল। তারপর ধীরে ধীরে শুক্লার হাতটা ছাড়িয়ে নিয়ে বলল, যাতে পারি তার চেষ্টাই আমি দিনরাত করি শুক্লা। তবু পারি নে। তবু কথা দিচ্ছি তোমায়—আমি সেই চেষ্টাই করব। যদি পারি তবেই আবার কোনোদিন এমন নিবিড়-ভাবে বসব দু'জনে না হলে—

উঠে দাঁড়াল সুনীল। পেছন পেছন শুক্লা। পোড়া ইঁটের স্তূপের কাছে এসে দু'জনে দু'দিক দিয়ে এগিয়ে চলল।

সেই লাল ত্রিকোণটি !

ধীরানন্দ রায়

আমাদের বাড়ির পাশেই এক হাতুড়ে ডাক্তার ছিল। সে কানে কম শুনতো, চোখে কম দেখতো, একটা পাও ছিল তার খোঁড়া। কিন্তু সেই বিকলেন্দ্রিয় ব্যক্তিটি পশার জমিয়েছিল কম নয়! তার চিকিৎসার পদ্ধতি, সে ছিল এক দেখার মত জিনিষ! পায়ের গোড়ালীতে ফোড়া হলে অবলীলাক্রমে সে গিয়ে দাঁত তুলে দিয়ে আসত।

—"ব্যাপারটা কেমন হোল ?"—জিজ্ঞেস করলে সে যুক্তি দিত—"কেন, খারাপ জিনিষ পেটে গিয়েছে বলেই না ফোড়া হয়েছে! দাঁত তুলে আমি সেই ফাঁড়াটা কাটিয়ে দেবার চেষ্টা করেছি!"

তার জবর যুক্তি শুনে সবাই ধন্য ধন্য করতো। ওতে রোগ না সেরে, রোগী মরলেও তার পশার জমত খুবই!

আমাদের দেশের রাজনীতিতে এমন ধরনের হাতুড়ে অথচ পশার জম-জমাট কর্তাব্যক্তির অভাব নেই মোটেই। এঁরা, সকল অর্থনৈতিক উপসর্গের, প্রজননগত দাওয়াই আউড়ে এক চলেই আসর জমিয়ে ফেলেন।

এই ফ্যামিলি প্ল্যানিং আর তার উদ্ভাবকদের কথাই ধরুন না!—এঁদের মূল জিগিরটাই হচ্ছে দেশের দারিদ্র্য ঘোচাতে জন্ম-নিয়ন্ত্রণ করতে হবে; অর্থাৎ জন্মের হার কমাতে হবে। কেন না, দেশে, আবাদযোগ্য জমির একটা সীমা আছে। চাকুরীতে নিয়োগের সীমাও ক্রমশ সংকুচিত। অতএব জনসংখ্যার বাড়তি হার কমিয়ে ফেল। হাতুড়ে পলিটিশিয়ানদের এ সব যুক্তি অবশ্যই মুখরোচক।

"খাদ্য নেই অতএব জনসংখ্যা কমাও।"—এ কথা যাঁরা বলেন, তাঁরা দেশে অনাবাদী জমি কতটা যে পড়ে আছে সে হিসেব চেপে যান। সমুদ্রে যে অফুরন্ত খাদ্যভাণ্ডার রয়েছে সেটাও বলেন না। মাটির তলায় গভীরে যে তৈল সঞ্চয় রয়েছে, তা থেকে কোটি কোটি মানুষের খাদ্যের উপযোগী প্রোটিন যে উৎপাদন করা যায় সেটাও গোপন করেন!

সে যাক, জন্ম-নিয়ন্ত্রণের ডোকড্রেল পেটাতে, আর 'জন্ম'-এর পোস্টার ছড়াতে, ভারতবর্ষে আজ সরকারী খাতে যে টাকা খরচ হচ্ছে, তার অর্ধেক ব্যয় করলে লাখ দশেক শিশুর বিনামূল্যে দুধের ব্যবস্থা করা যেত। পঁচিশ হাজার একর অনাবাদী জমি স্থায়িভাবে চাষযোগ্য হয়ে উঠত।

জোর করে বা ঠকিয়ে নির্বীর্যকরণ খাতে যে টাকা জলের মত নর্দমায় ঢালা হচ্ছে তার একাংশ ব্যয় করলে—দেশে গোটা দশেক চিনির কল চালু করা যেত বা নিদেনপক্ষে বেশ কয়েকটা হাসপাতাল বা মেডিক্যাল কলেজ তৈরি হতে পারত।

জন্ম-নিয়ন্ত্রণের ধোঁকা যাঁরা দিচ্ছেন, তাঁরা (আমাদের সেই হাতুড়ে ডাক্তারের মত) অর্থনৈতিক সমস্যার বায়োলজিক্যাল সমাধান দিয়েই যে ক্ষান্ত থাকছেন, তা নয়,—আগামী যুগের ভারতবর্ষের গোটা মানুষ সমাজটাকেই পঙ্গু করে দেবার এক মস্ত চক্রান্তের জাল ফেলেছেন।

অবশ্য, এ ষড়যন্ত্রে, কতখানি যে বিদেশী সাহেবদের জ্ঞান, আর এ দেশী মোসাহেবদের অবদান রয়েছে—তা সঠিকভাবে বলা শক্ত। অবশ্য এ বিষয়ে এ-দেশ, ও-দেশের মধ্যে প্রকাশ্য ও গোপন সলা-পরামর্শের কিছু কিছু তথ্য ফাঁস হয়ে গেলেও, সম্পূর্ণ দলিলপত্র জনসাধারণের হস্তগত হতে হয়ত কিছু দেরিই হবে।

* * *

পরিবার পরিকল্পনা, বা জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ,—এই জাতীয় জিগিরগুলোর আড়ালে, নিছক লালসা-ভিত্তিক দুর্নীতিবাদের অস্তিত্বটাই যে আছে তাই নয়, ব্যাপারটা আরও গভীর,—ব্যাপকভাবে ভবিষ্যৎ-হত্যার ষড়যন্ত্রটাই এতে প্রধানভাবে কার্যকরী। আগেই বলেছি,—এই শতকের উত্তর-তিরিশে, হিটলার, Genocide বা জাতিধ্বংসের পরিকল্পনা শুরু করেছিল। অবশ্য তার প্রধান লক্ষ্যটা ছিল য়িহুদী সম্প্রদায়! বর্তমান দশকে নাইজেরিয়ায় রায়াফ্রানদের প্রত্যক্ষভাবে ঝাড়ে-বংশে ধ্বংস করার মতলব ফেঁদেছে ফেডারেল সরকার আর ইংলণ্ডের উইলসন সাহেবরা। বোমা ফেলে, রাসায়নিক আর জীবাণু যুদ্ধ চালিয়ে ভিয়েৎনামের মানুষকে নির্মূল করার সদিচ্ছা পোষণ করছে মার্কিন শাসকগোষ্ঠী। এগুলো সাংঘাতিক হলেও,—এ সবের বিরুদ্ধে বিশ্ব জনমত লড়াই করছে ও করবে! কিন্তু ভারতবর্ষে, দারিদ্র্য-মুক্তির স্বপ্ন দেখিয়ে, গণবিবেককে সহজ দুর্নীতির পিল খাইয়ে, কণ্ঠরোধ করে, যেভাবে জাতি-ধ্বংসের পরিকল্পনা শুরু করা হয়েছে—তার বোধহয় আর তুলনা নেই।

সরকারী প্রচারসূচীটিকে এমন সূক্ষ্মভাবে চালানো হয়, যাতে সাধারণ লোক ভাবে,—যেন জন্ম-নিয়ন্ত্রণ ঘটলেই, সব দারিদ্র্য ঘুচে যাবে,—দেশে দুধ আর মধুর বন্যা বইবে!—যেন শ্বেতশুভ্রটা কিছু নয়! লোভ আর মুনাফাবাজীর কুটিল পথে, ফাটকাবাজদের আনাগোনাটা কিছু নয়!! যেন ধনতন্ত্রের পেষাই কলটাও কিছু নয়!!! সব মায়া!!

যারা চালে কাঁকর, খাদ্যে-পানীয়ে বিষ, আর ওষুধে ভেজাল চালিয়ে বর্তমানটাকে হত্যা করছে, তাদেরই সরকারী দোসররা বলছে,—"ভবিষ্যতের অনাগত শিশুগুলোর গলা টিপে ধরো! নইলে, সুখ যাকে বল, তা মিলবে না!"

এই সুখ বা আরাম লাভের ফাঁদে আর কেউ না হোক, কিছুসংখ্যক মধ্যবিত্ত নিশ্চয়ই ধরা পড়েছে।

জ্ঞাতসারে হোক, বা অজ্ঞাতসারে হোক,—এই মধ্যবিত্ত শ্রেণীর একটা অংশই জন্ম-নিয়ন্ত্রণের সবচেয়ে উচ্চকিত প্রবক্তা হয়ে উঠেছে। কারণ এদেশে অবক্ষয়ের অভিশাপ, মধ্যবিত্ত শ্রেণীকেই প্রত্যক্ষভাবে ঘা দিয়েছে।

* * *

জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কে পশ্চিমী দুনিয়ার ছলা-কলার জবাব একবার দিয়েছিলেন স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ। এ-বিষয়ে কবির কথাতেই তাঁর বক্তব্য তুলে ধরি :—

"এটা বাহুল্য, তাতে ছোট বড় কোন মানুষের কোন অধিকার নেই। ...মানুষের আসল প্রয়োজনের ভার খুব বেশি নয়।

"অনাতিপ্রয়োজনীয়কে প্রয়োজনীয় করে তোলা যখন দেশশুদ্ধ সকল লোকেরই নিত্য সাধনা হয়, তখন বিশ্বব্যাপী দস্যুবৃত্তি অপরিহার্য হয়ে ওঠে।

"লোকসংখ্যা বৃদ্ধির সমস্যা নিয়ে পাশ্চাত্যেরা অনেকে উদ্বেগ প্রকাশ করে থাকেন। সমস্যাটি প্রধান হবার কারণ হচ্ছে সর্বসাধারণেরই ভোগ বাহুল্যের প্রতি দাবি। এত বড় ব্যাপক দাবি মেটাতে গেলে,—ধর্মরক্ষা করা চলে না মানুষকে মানুষপীড়ক হতেই হয়। সেই পীড়ন কার্যে ভাল করে হাত পাকান হয় দূরস্থ অনাত্মীয় জাতির উপর দিয়ে।"

ইংরেজ অধিকারে এই "দূরস্থ অনাত্মীয়" জাতি ছিলাম আমরা—ভারতীয়রা। আর আজ শাসক-সম্প্রদায়ের কাছে সেই দূরস্থ অনাত্মীয় জাতি হচ্ছে, শাসিত মানুষ, যারা অর্থনৈতিক সৌধের সবচেয়ে নিচুতলার অধিবাসী।

কিন্তু এ সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের শেষ কথাটি অমোঘ অভিশাপ বাক্যের মত উচ্চারিত হয়েছে :—

প্রহরী

শক্তিব্রত ঘোষ

ভরা দুপুরের ভরা কলকাতা
কুকুরের মত চিৎকার করে ;
চিৎকার করে, কেন না উঠোনে
ব্যস্ত শোকের আততায়ীদল বাড়িয়েছে পা,
ছোট্ট বুকের ভিতে সিঁদ কেটে ঢোকার আগেই
ভক্ত কুকুর চিৎকার করে
ধর্মতলায় টেরিটিবাজারে ;
গির্জের ঘড়ি পদতলনত, ডুবে যায় তার
ধরফরশ্টা সুখী দরোয়ান।
সূর্য কখন জমাট-আঁধার ধনী কামনায় সমর্পিত,
নির্জনতায় মৃত্যু কখন দুপুরের দিনে
বাদুড়ের ঘুম, কখন দালাল ঘরে ফিরে গেছে
তলা বারোটার মধ্যরাতে।

কবিতার চেয়ে ঢের বিশ্বাসী কুকুর আমার
উঠোন কাঁপায়, ধর্মতলা, টেরিটিবাজার,
সমতলবাহী গৃহজনবধূ অনিদ্রিত।

"এর বিপদ এই যে, জীবনের ক্ষেত্রে, যে কিনারাতেই ধর্মবুদ্ধিতে আগুন লাগান হোক না,—সে আগুন, সেইখানেই থেমে থাকে না। ভোগী স্বভাবতই যে নিষ্ঠুরতার সাধনা করে—তার সীমা নেই। কারণ আত্মম্ভরিতা কোথাও এসে বলতে জানে না—"এইবার ব্যস্ হয়েছে।"

"বস্তুগত আয়োজনের অসঙ্গত বাহুল্যকেই, যে সভ্যতার প্রধান লক্ষণ বলে মানা হয়,—সে সভ্যতা অগত্যাই নরভুক!! নররক্ত শোষণের বিশ্বব্যাপী চর্চা একদিন আত্মহত্যায় এসে ঠেকবেই! —এতে আর সন্দেহ নেই!"

বহুতর পরিকল্পনার অপমৃত্যু ঘটানোর তালে তালে—জন্ম-নিয়ন্ত্রণের প্রচারে সেই আত্মহত্যারই পদচারণা শুরু হয়েছে।

* * *

এ কথা আজ কে না জানে, সব যুগের সভ্যতাই দাঁড়িয়ে আছে, যুগে যুগে বঞ্চিত মানুষেরই উদ্বৃত্ত শ্রমের ওপরে!! অর্থাৎ একজন মানুষ সারা জীবন ধরে যা উৎপন্ন করে, তার একটা ক্ষুদ্র অংশ সে নিজে ভোগ করে। বাকিটা সে রেখে যায় অন্যের জন্যে। ভবিষ্যতের জন্যে।

ঐশ্বর্য, একদিকে যেমন তাই মানুষেরই সৃষ্টি, অপরদিকে, শ্রমরত-মানুষই সভ্যতার সবচেয়ে বড় ঐশ্বর্য।

মানুষের সংখ্যা কমানোর অভিসন্ধি যাঁরা আঁটেন, তাঁরা আসলে মানুষের সভ্যতা আর ঐশ্বর্যের মূলেই কুঠারাঘাত করতে চান। এদিক থেকে তাঁরা মূলত অবক্ষয়ী।

অন্য দিক থেকে দেখলেও এই অবক্ষীয়দের জীবন-বিমুখী পথের রেখাটিও স্পষ্ট হয়ে ওঠে।

সম্প্রসারিত হওয়া, জীবনের একটা মূল সর্ত। কেবল মেটারলিজমে নয়—মাইটোসিস-এও সে অবলুপ্তিকে পরাস্ত করে। কেবল নিজে বর্ধিত হওয়া নয়—সংখ্যার বৃদ্ধিও অনিবার্য।

নিয়ন্ত্রণের নামে যারা মানুষের সংখ্যা কমিয়ে আনতে চায় তারা জীবনের পরিপন্থী বলে কেবল দুর্নীতিগ্রস্তই নয়—মৃত্যুর অগ্রদূত বলে যমরাজের চেলাও।

এই চেলাদের কার্যকলাপের অন্য সামান্য কটি বিবরণ দিয়েই—লাল ত্রিকোণের পালাটি শেষ করব।

স্বাস্থ্যদপ্তর থেকে হাসপাতালগুলোয় পাঠানো প্রায় চল্লিশ বছরের পুরোনো এক গোপন বৃটিশ সার্কুলার সম্প্রতি সকলের গোচরে এসেছে। তার মোদ্দা কথাটা ছিল এই. "পঞ্চাশ-ষাট বছরের রোগীগুলোকে. বিনা চিকিৎসাতেই মরতে দাও!" খোদ বৃটেনেই যদি এমনতর গোপন নির্দেশ জারী হয়ে থাকে তো, তার অধীনস্থ উপনিবেশে কি ধরনের সার্কুলার নরভুক আমলাদের হাত চুইয়ে যথাস্থানে গিয়ে পৌঁছাতো তা সহজেই অনুমেয়।

১৯৪৭-এর পর ভারতবর্ষের স্বাস্থ্যকেন্দ্রগুলিতে ও অন্যত্র কি ধরনের সার্কুলার কার্যকরী হচ্ছে তা, কয়েকটি ঘটনা পর পর সাজিয়ে রাখলেই প্রকট হয়ে ওঠে।

নবজাত শিশু হাসপাতাল থেকে উধাও হয়ে যাওয়া এখানকার নৈমিত্তিক ঘটনা। প্রসূতি ধনুষ্টংকার রোগে মারা যাচ্ছে, আকস্মিকভাবে নয়—সরকারী ব্যবস্থাপনার গুণে, গাদায় গাদায়, প্রায় পরিকল্পিতভাবেই। রোগী ভর্তি হল, মেডিক্যাল কলেজে, পরদিন তাকে রাস্তায় মৃত অবস্থায় পড়ে থাকতে দেখা গেল।... প্রায় একদিন আগে জানা গেল, ষাট ফুট উঁচু হয়ে তিস্তার জল আসছে। অথচ সে কথা চেপে যাওয়া হল, জানানো হল না তাদের যাদের গায়ে প্রলয়ের ধাক্কা এসে লাগতে পারে।...কুড়ি হাজার লোক ডুবে মারা গেল! এমন কি সাহায্য দেবার নাম করে এমনভাবে অনির্ধারিত স্থানে বন্যা ফেলা হোল যেখানে কিছুসংখ্যক শিশু পিষ্ট হয়ে সঙ্গে সঙ্গে মারা গেল। কাশ্মি-কাচুবেলার সেই বিবেকবর্জিত গ্রামে কাজমাদের বাচ্চা ছেলেটিকে পুড়িয়ে মারা, বা গান্ধী জন্মদিনে হরিজন শ্রমিককে কুপিয়ে হত্যা করা; সুখাদিয়ার রাজস্থানে ১২ বছরের ছেলেকে বলি দিয়ে সরকারী বাঁধের নির্মাণ উদ্বোধন; আন্দমানে হামফ্রেগঞ্জে তৃষ্ণার্ত মানুষকে জলের বদলে বুকের ছাতিতে লাথি মেরে নিহত করা; ইন্দ্রপ্রস্থ ভবনের ছাদ থেকে ঠেলে ফেলে দিয়ে নিম্নপদের সরকারী কর্মচারীকে থেঁৎলে মারা—এর প্রত্যেকটির সঙ্গে বর্তমানের পরিকল্পনাবাজ সরকারের প্রত্যক্ষ না হয় পরোক্ষ যোগ রয়েছে।

এসব নিশ্চয়ই সেই নরভুক পরিকল্পনার অন্তর্গত। কিন্তু প্রশ্ন এই, এসব আর চলবে কত দিন??

রঙ্গমঞ্চ ও দেশে বিদেশে

[পূর্ব-প্রকাশিতের পর]

জে, বি ফাগান ও অক্সফোর্ড প্লে হাউস : আমাকে যদি কখনও আত্মজীবনী লিখতে হয়—বলেছেন নর্মান মার্শাল—তাহলে আমার প্রথম জীবনের রঙ্গমঞ্চের অভিজ্ঞতার পরিচ্ছেদটি পড়তে পাঠকের অত্যন্ত একঘেয়ে লাগবে। অন্যান্য লোকের লেখা বইতে দেখতে পাই তাদের বালক বয়সের স্মৃতির সঙ্গে জড়িত হয়ে রয়েছে মানন বঙের দিনগুলি—পড়ে আমার হিংসাই হয়। কারণ আমার প্রথম জীবনে কোন উল্লেখযোগ্য ভাল থিয়েটার দেখবার সুযোগ হয় নি। আরভিং-এর শাইলক দেখি নি, ফর্বস রবার্টসন শহরে সফরে এলে এক সপ্তাহ ধরে লাঞ্চের টাকা বাঁচিয়ে তাঁর থিয়েটারের সিট রিজার্ভ করি নি, ডুজের স্বল্প সময়ের ম্যাটিনি দেখবার জন্য স্কুল পালাই নি, জুলিয়াস সিজারে অজমাণ্ড টিয়ার্লের এ্যাণ্টনীরূপী ফ্রেণ্ডস, রোমান্স, [illegible] বক্তৃতা শুনি নি, রাত্রে নিদ্রিত অবস্থায় টির সেঙ্গালীর চেহারা স্বপ্নে দেখে আঁতকে উঠি নি। এলেন টেরীর পেন্সা পড়ে গিয়ে সপ্তাহের পর সপ্তাহের হাতখরচার টাকা বাঁচিয়ে তাঁকে ফুলের বোকে উপহার দেবার ব্যবস্থা করি নি। সারা বার্নার্ডকেও আমার দেখবার সৌভাগ্য হয় নি।

আমার থিয়েটার দেখার প্রাথমিক অভিজ্ঞতা হচ্ছে এই রকম—এডিনবরার লাইসিয়াম থিয়েটারের ড্রেস সার্কেলের প্রথম সারিতে গিয়ে বসেছি মায়ের সঙ্গে—পরণে প্রথম দিকে থাকতো ইটন সুট, পরের দিকে ডিনার-জ্যাকেট। যে সব দল মিউজিক্যাল কমেডী নিয়ে সফরে আসতো তাদের শো দেখতে যেতাম। এই সব কিছু কিছু শোর—যা দেখেছিলাম—নাম হচ্ছে : দি পার্ল গার্ল, টিনা, দি ডান্সিং মিস্ট্রেস, দি ম্যারেজ মার্কেট। জিপসী লাভ, দি বার্নসাইন গার্ল, দি গার্ল ফ্রম উটা, বেটি, হাই জিঙ্কস, টু লাইটস দি নাইট, দি মেইড অভ মাউণ্টেন্স, থিয়োডোর এ্যাণ্ড কম্পানী—আরও অনেক নাম মনে নেই। যে সব স্টেইজ প্লে আমি দেখেছিলাম, তাদের বেশির ভাগই ছিল সে সময়ের টুরিং কম্পানীগুলোর দ্বারা অভিনীত সফল কতকগুলো নাটক—যেমন ধরুন : হোয়েন নাইটস ওয়্যার বোল্ড, আর ইউ এ মেসন? দি প্রাইভেট সেক্রেটারী, চার্লিজ আণ্ট, ব্রুস্টার্স মিলিয়নস। অবশ্য ডয়লি কার্ট দেখেছিলাম, টেরিজদের দেখেছি দি স্কারলেট পিম্পারনেল-এ ও সুইট নেল অভ ওল্ড ড্রুরী-তে এবং মার্টিন হার্ভেকে দেখেছি, দি ওনলি ওয়েতে, দি সিগারেট মেকার্স রোমান্সে এবং দি ব্রেড অভ স্ট্রেস-হ্যামসে। ফ্লাইং ডাচম্যান সম্পর্কীয় একটি নাটকে ম্যাথিসন ল্যাংকে এবং গার্লস স্কুল বিষয়ক একটি প্লেতে আওয়েন নেয়ার্সের অভিনয় দেখবার সৌভাগ্য আমার হয়েছিল। এ ছাড়া নামকরা শিল্পীর ভেতর এক সিসিল কোর্টনিজের মিউজিক্যাল কমেডীজে অভিনয় দেখেছি—এঁর বাবা যখন দল নিয়ে সফরে আসতেন তখন মিস কোর্টনিজ তাতে অংশগ্রহণ করতেন।

আজকের দিনের কথা আলাদা। কোন বালক বড় প্রভিন্সিয়াল সিটিতে মানুষ হলেও ভাল ভাল লণ্ডন প্রোডাকসন দেখবার আজ কোনই অসুবিধা হয় না। ঐ সব দল মূল কাস্ট সহ অভিনয় দেখাতে আসেন লণ্ডন থেকে। আর স্থানীয় রেপারটরী থিয়েটার তাকে সুযোগ দেয় অন্যান্য নাটক এবং তৎকালীন সফল নাটকগুলোর মঞ্চাভিনয় দেখবার। এই সব রেপারটরীতে ক্ল্যাসিকসও প্রডিয়ুস করা হয়। আমার বয়স যখন টিনসের গণ্ডীতে অর্থাৎ প্রথম বিশ্বযুদ্ধ এবং তার পরবর্তী সময়ে, প্রভিন্সিয়াল থিয়েটার তখন খুব খারাপ অবস্থার ভেতর দিয়ে চলছিল। থিয়েটার দেখতে ভালই লাগতো—কিন্তু ঐ সময় এমন কোন ভাল নাটক দেখি নি বলেই বুঝতে পারি নি যে বই পড়ে যে চিন্তার খোরাক এবং উত্তেজনা পাওয়া যায় তা থিয়েটার থেকেও আহরণ করা সম্ভব। আমাদের সময়ে ছাপা নাটক হাতে পাওয়াও সহজ ছিল না। আজকাল প্রতি স্কুলে ডিবেটিং সোসাইটি এবং লিটারেরী

জন গিলগুড

সোসাইটির মত প্লে-রিডিং সোসাইটিও যুক্ত থাকে। আমাদের সময়ে প্লে-রিডিং সোসাইটির কোন অস্তিত্বই ছিল না। অত্যন্ত দুঃসাহসী প্রধান শিক্ষকের কাছ থেকেই তাঁর ছাত্ররা শ, ইবসেন বা গ্র্যানভিল বার্কারের নাটক একত্রিত হয়ে পড়বার অনুমোদন লাভ করতে পারতো। এই সব নাট্যকারকে সে সময় নীতি-বিযুক্ত নাট্যকার হিসেবে গণ্য করা হোত—কারণ এঁদের তিনজনেরই এক একটি নাটককে লর্ড চেম্বারলেন 'নিষিদ্ধ নাটক' হিসাবে ঘোষণা করেছিলেন। গলসওয়ার্দিকেও সন্দেহাতীত মনে করা হোতো না—কারণ তিনিও স্ট্রাইক, দি স্কিন গেম এবং দি মব নাটকে ভবাবহ সব চিন্তা-ধারার অবতারণা করেছিলেন। ভাষার দোহাই দিয়ে সিঙ্গুকে বাতিল করা হয়েছিল। আর অসকার ওয়াইল্ডের ইম্পরটেন্স অভ বিয়িং বা অন্য কোন নাটক ছেলেরা পড়ছে জানতে পারলে অভিভাবকেরা নিশ্চয় তীক্ষ্ণ ভাষায় প্রধান শিক্ষককে ভর্ৎসনা করে চিঠি লিখতেন—কারণ ঐ সময় ওয়াইল্ডের রচনাকে মনে করা হোত 'টেইন্টেড স্টাফ'। কেউ যদি মনে ভাবেন আমার এই সব উক্তিতে বাহুল্য আছে তবে তাঁকে সে সময়ের দু-একটি ঘটনার কথা স্মরণ করতে বলবো—অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটির ভাইস চ্যান্সেলার একটি সফররত দলকে নিষেধ করে দিয়েছিলেন স্ট্যানলি হাউটসের হিন্ডল ওয়েকস নাটকটি অক্সফোর্ডে আনতে। ১৯২৩ সালে অক্সফোর্ডে আমার কলেজের কর্তৃপক্ষ কলেজ ড্রামাটিক সোসাইটিকে 'এ্যান্ড্রোক্লিস এ্যান্ড দি লায়ন' প্রডিয়ুস করতে দেন নি—কারণ তাঁদের মতে নাটকটি না কি অধার্মিকতার ভাবে ভরা।

আমি যখন অক্সফোর্ডে যাই থিয়েটার বিষয়ে আমার কোন কৌতূহল ছিল না—তাই অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি ড্রামাটিক সোসাইটির সঙ্গে যুক্ত হই নি। এমন কি কলেজ প্লে-রিডিং সোসাইটির সভ্য হওয়াও দরকার মনে করি নি।

অক্সফোর্ডে থাকাকালীন প্রথম দু' বছরে আরও কয়েকটি মিউজিক্যাল কমেডীজ দেখেছিলাম, সেমোর হিক্সকে একটি ফার্সে এবং আইরীন ভ্যানব্রাকে মিস্টার পিম পাসেস বাইতে অভিনয় করতে দেখি, দি ক্যাট এণ্ড দি ক্যানারী নামে একটি থ্রিলারেও গিয়েছিলাম। এই সময় রোয়িং নিয়ে মেতে না উঠলে বোধহয় আরও একটু বেশি থিয়েটার দেখতে যেতাম। নৌকা চালানোর ব্যাপারে ট্রেনিং নিচ্ছিলাম বলে রাত দশটার ভেতর শুতে যেতাম। এই জন্যই থিয়েটার দেখার উপায় ছিল না। আর এই কারণেই যখন স্ট্র্যাটফোর্ড কম্পানী, ম্যাকডোনা প্লেয়ার্স বা বার্মিংহাম রেপারটরী কম্পানী অক্সফোর্ড সফরে এসেছিল আমি তাদের অভিনয় দেখতে যেতে পারি নি।

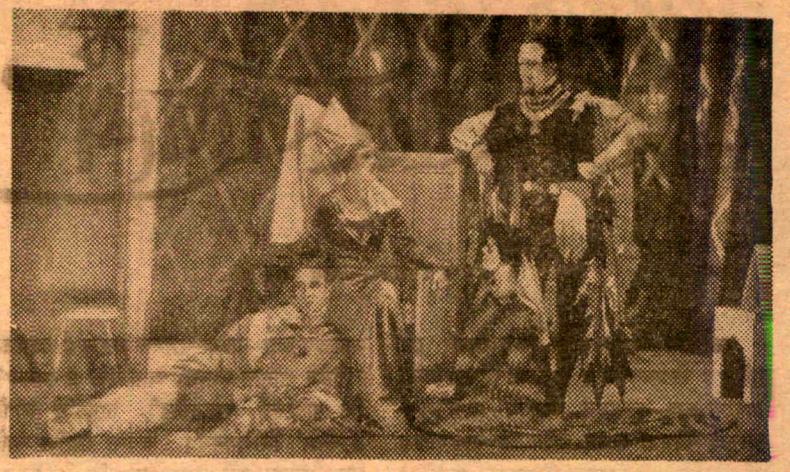

রিচার্ড অভ বোরডোয়া : জন গিলগুড, জেন ক্র্যাক্সেন ভেভিস, বারবারা ভিলন ফ্র্যান্সিস লিস্টার

১৯২৩ সালে, অর্থাৎ আমার অক্সফোর্ডে থাকার তৃতীয় বছরের প্রথম দিকে জে বি ফাগান তাঁর অক্সফোর্ড প্লে হাউসের শুভ উদ্বোধন করলেন। ফাগান এই সময় আবেদন জানালেন সিজন টিকেট কিনবার জন্য—এক উৎসাহী বন্ধুর অনুরোধে আমাকেও একটি সিজন টিকেট কিনতে হোল। ভাগ্যবশত এই সময় আমার একটি মাসল ছিঁড়ে যাওয়াতে আমাকে নৌচালনের অভ্যাস পরিত্যাগ করতে হয়। সুতরাং রাতে থিয়েটার দেখবার আমার সুবিধা হবে না এ অজুহাত দেখাবারও উপায় ছিল না।

একটি ভয়াবহ জরাজীর্ণ পুরনো অট্টালিকায় ফাগান তাঁর রঙ্গালয়ের প্রতিষ্ঠা করলেন—এ বাড়িটি আগে যাদুঘর হিসাবে ব্যবহৃত হত। এর দেওয়ালগুলো সাউণ্ড-প্রুফ না থাকাতে বাইরে উডস্টক রোডের যে সব আওয়াজ বা গণ্ডগোল হোত তার শব্দ হলের ভেতর এসে পৌঁছতো। যখন বৃষ্টি পড়তো বাড়ির টিনের ছাদের থেকে বৃষ্টির জলের পটাপট পটাপট আওয়াজ হতে থাকতো। কোন বিশ্রামাগার বা পান-শালা থিয়েটারের ভেতর ছিল না—ধূমপান নিষিদ্ধ ছিল। দর্শকদের বসতে হোত বিশ্রী কাঠের চেয়ারে—সারা সন্ধ্যা তাদের নড়াচড়ার সঙ্গে সঙ্গে ক্যাঁচর-কোঁচর আওয়াজ হতে থাকতো।

একটি চওড়া এপ্রন স্টেজ ছিল—তার পেছনে ছোট ভেতরকার স্টেজ-এর সামনে কার্টেন। প্রায় এলিজাবীথান স্টেজের মত শুধু পেছনে এলিজাবীথান গ্যালারী ছিল না। সেটিং হিসাবে পেছনের ছোট স্টেজে সিনারী ব্যবহৃত হোত। যখন এপ্রন স্টেজে অভিনয় হত, তখন কার্টেনের অপরদিকে ছোট স্টেজে সিন সাজিয়ে দৃশ্য বদলের ব্যবস্থা করা হোত। প্রত্যেক অঙ্কের শেষ হবার আগে এমনভাবে ব্যবস্থা করা হোত যাতে অভিনেতারা তখন সরে এসে ভেতরের স্টেজে চলে আসেন—যাতে তাঁদের সামনে অঙ্কের সমাপ্তির পর কার্টেন টেনে দেওয়া যায়। ডাউন স্টেজে প্রপস বা ফার্নিচার সাজাতে হলে বিরতির সময় দর্শকদের চোখের দৃষ্টির সামনেই এপ্রনের উপর গিয়ে দৃশ্যসজ্জা করতে হোত। এই জাতীয় একটি ঘটনার কথা জন গিলগুড তাঁর বইতে লিখেছেন—'মনা ভান্না' (মেত্তারলিঙক লিখিত নাটক) অভিনয়ের সময় স্টেজ হ্যাণ্ডস গিয়ে একটি বিরাট কাউচ এপ্রনের উপর রাখে—অক্সফোর্ডের আণ্ডারগ্র্যাজুয়েট ছাত্রের দল হৈ-হুল্লোড় করে ওঠে এবং অত্যন্ত কৌতুকের সঙ্গে ব্যাপারটাকে গ্রহণ করে। আমিও তখন এই দর্শকের দলের ভেতর ছিলাম।

[ক্রমশঃ]

কিস্তিতে ট্রানজিস্টর

মাসিক ১০৲ কিস্তিতে ৩২০৲ মূল্যের বিশ্ববিখ্যাত "এস-কর্ট" ৩ ব্যাণ্ড অল ওয়ার্ল্ড পোর্টেবল ট্রানজিস্টর লাভ করুন। প্রতি গ্রাম ও শহরে প্রেরণের যোগ্য।

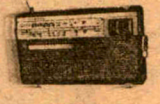

আবেদন করুন :—

Japan Agencies (B.W.C—10)
Post Box 1194, Delhi—6.

রঙ্গিন

সুন্দরী প্রতিযোগিতা ফ্যাসন প্যারেড

সৌন্দর্য প্রতিযোগিতার নামে একটা তামাসা শুরু হয়েছে দেখা যাচ্ছে। এতকাল সৌন্দর্য প্রতিযোগিতা গ্র্যান্ড, গ্রেট ইস্টার্নের মত হোটেলের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল। ক্রমে দেখা যাচ্ছে পরগাছাদের স্বপ্নরাজ্য থেকে মাটির জগতে নেমে আসছে। কথাটায় শ্রেণী গন্ডী লোপ পাচ্ছে মনে করে খুশি হবার কিছু নেই, বরঞ্চ ভাববার আছে।

দেশে নাটকের অভিনয় বাড়ছে, চলচ্চিত্র-চিন্তা বাড়ছে, সঙ্গীত ও নাচের চর্চাও বেশ বেড়েছে। শিল্প-চিন্তা ও চর্চা বাড়া আনন্দের কথা। শিল্পের বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে মনের বিকাশ ও প্রসার ঘটে। সুন্দরকে ভালবাসতে শেখে। কিন্তু সৌন্দর্য প্রতিযোগিতা, ফ্যাসন প্যারেড এসব কোন ধরণের শিল্পের মধ্যে পড়ে কি না জানি না। সম্প্রতি দেখা যাচ্ছে শিল্পচর্চার সঙ্গে সঙ্গে এদিকেও একদল লোক উদ্যোগী হয়েছেন।

ভারতের মেয়েরা সৌন্দর্যের রাণী হয়ে বিশ্ব-সুন্দরী প্রতিযোগিতায় অংশ গ্রহণ করছে। এ পর্যন্ত কয়েকজন বিদেশে গিয়ে বেশ আসর জমিয়েছেন। যাঁরা সুন্দরী প্রতিযোগিতা থেকে ফিরে এসেছেন—লক্ষ্য করার ব্যাপার তাঁরা আর এসব ব্যাপারে কোন উৎসাহ দেখান না। রীতা ফারিয়ার সম্পর্কে অবশ্য খবর মাঝে মাঝে কাগজে প্রকাশিত হয়। সৌন্দর্য প্রতিযোগিতার ব্যাপার নিয়ে কয়েকটি ফিল্ম হয়েছে। ফিল্মগুলিও সত্যকে গোপন করতে পারে নি। দেখা গেছে এসব প্রতিযোগিতার পেছনে প্রধান পান্ডা একদল ব্যবসায়ী। টয়লেট কোম্পানী, ফিল্মের শিল্পী সরবরাহকারী থেকে বিভিন্ন রকমের ব্যবসায়ীরা এর মধ্যে থাকেন। প্রতিযোগিতা শেষে নজরকাড়া সুন্দরীরা কেউ অভিনেত্রী, কেউ এয়ারহোস্টেস, কেউ রিসেপশনিস্ট, কেউ বা মডেল হিসাবে কাজ পান। কিন্তু সবাই কি পান!

আজকাল সুন্দরী প্রতিযোগিতার ব্যাপারটা কেবল ব্যবসায়ীদের ব্যাপারও আর নয়। এর মধ্যে রাজনীতিও রয়েছে। কথাটা বিভিন্নভাবে প্রকাশ পেয়েছে। সাম্রাজ্যবাদীদেশগুলি নানাভাবে প্রাচ্যের এবং ইউরোপ ও লাতিন আমেরিকার মানুষকে নেশাগ্রস্ত করছে। দেখা যায় প্রাচ্যের ও পিছিয়ে পড়া দেশগুলি থেকেই বিশ্বসুন্দরী নির্বাচিত হচ্ছে। এই প্রাচ্য ও লাতিন আমেরিকা প্রীতির পেছনে নাকি সি, আই, ই নামক মার্কিন গোয়েন্দা সংস্থার উৎসাহ রয়েছে। কয়েকদিন আগে খবরের কাগজে বেরিয়েছে ম্যানিলায় এশীয় সুন্দরী প্রতিযোগিতার ছবি।

পশ্চিমবঙ্গে সম্প্রতি এক সুন্দরী প্রতিযোগিতা হয়ে গেছে। এবার প্রতিযোগিতা যেভাবে হয়েছে তাতে মধ্যবিত্ত ঘরের মেয়েরা যোগ দিতে পেরেছে। এই প্রতিযোগিতাকে সাধারণের মধ্যে যাঁরা নিয়ে এসেছেন তাঁদের মধ্যে বিখ্যাত ব্যায়ামবিদ্ বিষ্ণু ঘোষ অন্যতম। এতদিন ইনি দেহ-চর্চার সাধনা করেছেন, জীবনসায়াহ্নে সুন্দরী প্রতিযোগিতায় আগ্রহী হয়েছেন। সকলকে টেক্কা দিয়েছে অর্ডন্যান্স ক্লাব। ওদের কাজটা নীরস হলে কি হবে, রস সিঞ্চন করেছে ফ্যাসন প্যারেড করে। প্রায়

'দি সাইড স্ট্রীট' ছবির নায়িকা নেভেনা কোকোনোজ

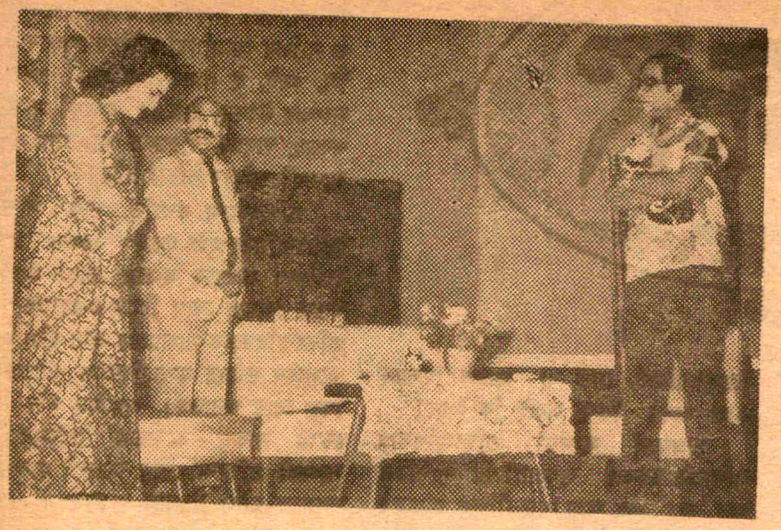

সন্ধ্যা নীড় সংস্থার 'বনলতা মিটার' নাটকের একটি দৃশ্য

৫৬ জন বঙ্গললনা নাকি যোগ দিয়েছিল। কেউ কেউ মিনিস্কার্ট পরে, কেউ সাঁতারের পোষাকে। একটানা সাড়ে ছয় ঘণ্টা এই সুন্দরীরা নাচ গানও করেছে। অবশ্য খানা এবং পিনা যে বাদ গেছে সে কথা নয়। সি, আই, ই-র অনুপ্রেরণায় কত-রকমের শিল্পের সঙ্গে আমরা পরিচিত হচ্ছি!

সুন্দরের সাধনা চিরন্তন। মানুষ সুন্দর হতে চায়। কিন্তু জীবনের নিম্নতম চাহিদা মেটাবার ব্যবস্থা সকলের জন্য না থাকলে সুন্দরের নামে ঘটে বিকৃতি। আজ যা ঘটছে তা সুন্দরের বিকৃতি। দেশের বিরাট অংশে যখন বন্যার্ত নারীরা নিরাশ্রয় ও নিরন্ন, যখন কলকাতার রাজপথে শত শত নারী ফুটপাতে আশ্রয় নিতে বাধ্য হয়েছে, যখন দারিদ্র্যের নিষ্পেষণে কত তরুণীর সৌন্দর্য ফুটে উঠতে পারছে না, তখন দেশ ও মানুষ সম্পর্কে বোধহীন মেয়েরা সেজেগুজে মাথায় মুকুট পরে সৌন্দর্যের রাণী সাজছে, সাঁতারের পোষাক পরে ফ্যাসন প্যারেডের নামে নিজেদের সম্মান বিসর্জন দিচ্ছে। ব্যাপার দেখে 'নীরোর বাঁশী' বাজাবার কথা মনে পড়ছে।

সায়গন, ফরমোজা, ফিলিপাইন প্রভৃতি দেশে এবং সম্প্রতি ভারতে সুন্দরী প্রতি-যোগিতা ও ফ্যাসন প্যারেডের বাড়াবাড়ির সঙ্গে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার রাজনৈতিক পরিস্থিতির কোন সম্পর্ক আছে কি?

—সুজন

নাটকের কথা

সন্ধ্যানীড়ের অনুষ্ঠান

গত ৭ই ডিসেম্বর শ্রীশিক্ষায়তন মঞ্চ-গৃহে শ্রীঅশোক সেন (শিলালি)-এর পরি-চালনায় "সন্ধ্যানীড়" পরিবেশন করেন ব্রেশট্-এর কতকগুলি অমর গান এবং ফরাসী নাট্যকার হেনরী ফ্রানকইস বেক-এর La Parie-sienne-এর ভাবালম্বনে একটি বুদ্ধিদীপ্ত নাটিকা "বনলতা মিটার"।

ব্রেশটের মোট পাঁচটি অনূদিত গান ও দুটি কবিতার আবৃত্তি নিয়ে অশোক সেন-এর মনোজ্ঞ আলোচনা সহ ব্রেশট-এর গানের এই অনুষ্ঠান বাংলাদেশে অভিনব এবং অভিনন্দনযোগ্য। গানগুলি অনুবাদ করেছেন কবি দুর্গাদাস সরকার। সাপ্তাহিক বসুমতীর পৃষ্ঠায় কবিতার আকারে এগুলি প্রকাশিত হয়েছিল। গানগুলিতে সুর দিয়েছেন প্রভাতভূষণ। গেয়েছেন নয়নিকা দাসগুপ্ত ও প্রভাতভূষণ। আবৃত্তিতে অংশ গ্রহণ করেছিলেন দীপ্তি চক্রবর্তী। পরিচ্ছন্ন প্রাণময় দীপ্ত এই অনুষ্ঠানটি অনেকদিন মনে থাকবে। অনূদিত গানের প্রতিটি শব্দ সুপ্রযুক্ত। সহজ স্পষ্ট ভাষায় ব্রেশট-এর দরদ, মানবিকতা ও বঞ্চিত সর্বহারাদের কর্তব্য এখানকার দিনে অত্যন্ত যুগোপ-যোগী করে পরিবেশিত হয়েছে। সুরারোপে প্রভাতভূষণ কৃতিত্ব দেখিয়েছেন। দু-একটি গান কোরাস-এ গাওয়া হলে হয়ত ভাল হত। গানগুলির ছন্দে আরও বৈচিত্র্য আসার অবকাশ ছিল। একখানি সুপ্রযুক্ত রবীন্দ্রসঙ্গীতের পর এই অনুষ্ঠানটি শেষ হল। এক হিসাবে এটি তাৎপর্যপূর্ণ। কারণ দুই দেশের দুই মহান মনীষীর অন্তরের সাযুজ্য অনুভব করা যায়।

ব্রেশট-এর গানের অনুষ্ঠানের পর আরম্ভ হল "বনলতা মিটার" নাট্যাভিনয়।

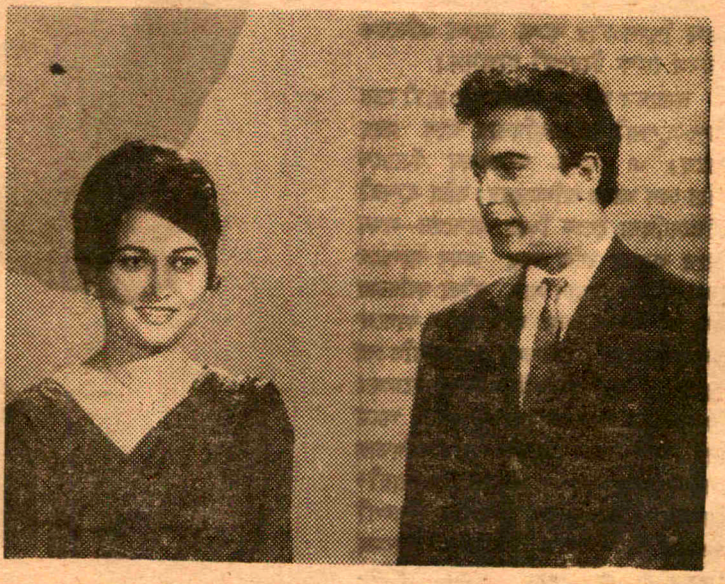

'সন্ধ্যানীড়' সংস্থার 'বনলতা মিটার' নাটকের একটি দৃশ্যে ফটো: দেব দাস

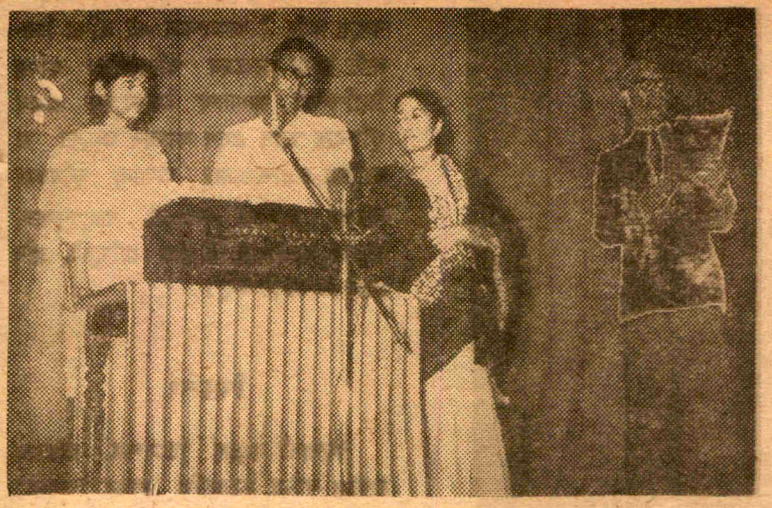

সন্ধ্যানীড়-এর 'ব্রেশট ইভিনিং' গানের আসর

সভ্যগণ শ্রীকুমারেশ ঘোষের একাঙ্কিকা 'ম্যানিয়া' অভিনয় করেন। মূকাভিনয় করেন সুবল সাহা। এই সঙ্গে এক বিচিত্রানুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছিল তাতে অংশ গ্রহণ করেন শুকদেব চক্রবর্তী, সন্ধ্যা পোদ্দার, তন্ময় চট্টোপাধ্যায়, রীণা গুহ, স্বপ্না দাস, নবনীতা লাহিড়ী, গোপাল মুখার্জী, ভারতী বসাক, কমল রায়, অমল বসু, সৌমেন গোস্বামী। যন্ত্র-সঙ্গীত পরিবেশন করে নর্থ ক্যালকাটা মিউজিক ক্লাব।

স্টুডিও খবর

ফিরে পাওয়া

বিষ্ণুপুরের প্রাকৃতিক পরিবেশে 'ফিরে পাওয়া' ছবির কিছু দৃশ্য গ্রহণ করা

হেনরী ফ্রানকইস বেক-এর একটি বিখ্যাত নাটক La Pariesienne. শিলালির অনুবাদের ভাষা অনবদ্য। দর্শকমণ্ডলীকে শেষ অঙ্কের শেষ কথাটি পর্যন্ত আকৃষ্ট করে রাখে। গগন তাঁর স্ত্রীর একান্ত অনুগত ও বাধ্য। অগাধ তাঁর বিশ্বাস। নিবারণ মনে করে গগনের স্ত্রী বনলতা নিবারণেরই প্রেমিকা। এই মনোভাব বুঝি শুভেন্দুরও। এদিকে নিবারণ সব সময় সন্দেহপরায়ণ বনলতার ব্যবহারে। শেষ পর্যন্ত বনলতা দেখিয়েছেন যে, বিশ্বাসের জয় সর্বত্র—তিনি শুধু তাঁর স্বামীর উন্নতির জন্যেই নিবারণ ও শুভেন্দুর সঙ্গে অভিনয় করেছিলেন। স্বামীর ন্যস্ত বিশ্বাসের অমর্যাদা নারী করে না।

বনলতার অভিনয়ে বিনতা রায় খুব সুন্দর সাবলীল অভিনয় করেছেন। নিবারণ (হারু ব্যানার্জী), গগন (অরুণ চ্যাটার্জী), শুভেন্দু (সমর সেন) ও মলিনা (প্রণতা নন্দী) চরিত্রগুলি যথাযথ ফুটিয়ে তুলেছেন। শিলালির নির্দেশনা শিল্পরুচি সম্মত।

ম্যানিয়া

গত ৩রা ডিসেম্বর মহাজাতি সদনে ইয়ং ইণ্ডিয়া এম্বুলেন্স ডিভিশনের (সেন্টজন এম্বুলেন্স) দ্বাবিংশতিতম বার্ষিক উৎসব অনুষ্ঠিত হয়েছে। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেছেন বিচারপতি শ্রীসব্যসাচী মুখোপাধ্যায়। এম্বুলেন্স ডিভিশনের

'সন্ধ্যানীড়'-এর 'ব্রেশট ইভনিং' গানের আসর ফটো : দেবু দাশ

'সাবরমতী' ছবিতে সুপ্রিয়া দেবী ও মাঃ অরিন্দম

হয়েছে। ছবিটি পরিচালনা করছেন সুব্রত সেন। এক সন্তানহারা মায়ের কাহিনী ছবিটির বিষয়বস্তু।

তিন ভুবনের পরে

আশুতোষ বন্দ্যোপাধ্যায়ের পরিচালনায় 'তিন ভুবনের পরে' ছবির চিত্র গ্রহণ করা

মাসিক ১০৲ টাকা কিস্তিতে
ট্রানজিস্টার লউন

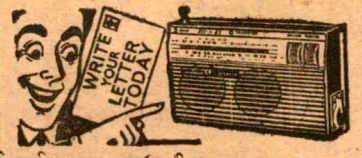

বিশ্ববিখ্যাত সর্বাধুনিক জাপান মডেল, চিত্তাকর্ষক শক্তিশালী, গ্যারাণ্টিযুক্ত "ওয়ার্ল্ডভয়েস" ৩ ব্যাণ্ড অল ওয়ার্ল্ড আশ্চর্যজনক নাইট ল্যাম্পযুক্ত। প্রত্যেক গ্রামে ও শহরে পাঠানো যায়।
Write to :—
ALL WORLD AGENCY,
(B.W.) Kalyanpura, Delhi–6.

ছে নিউ থিয়েটার্স স্টুডিওতে। সমরেশ বসুর কাহিনী অবলম্বনে এই ছবির চিত্রনাট্য রচনা করেছেন পরিচালক। ছবির চিত্রশিল্পী রামানন্দ সেনগুপ্ত। প্রধান ভূমিকায় অংশ গ্রহণ করছেন তনুজা ও সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়। অন্যান্য ভূমিকায় আছেন সুমিতা সান্যাল, তরুণকুমার, সুব্রতা চ্যাটার্জী, সুলতা চৌধুরী, রবি ঘোষ ও অরুণ বসু।

শিশুস্বপ্ন

আগামী ২২শে ডিসেম্বর, রাববার সকাল ন'টায় মহাজাতি সদনে "বাবলা" ছায়াছবি প্রদর্শিত হবে।

সংবাদকণা

দি

ক্যান আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবে পুনায় ফিল্ম ইনস্টিটিউটের ছাত্রদের তোলা

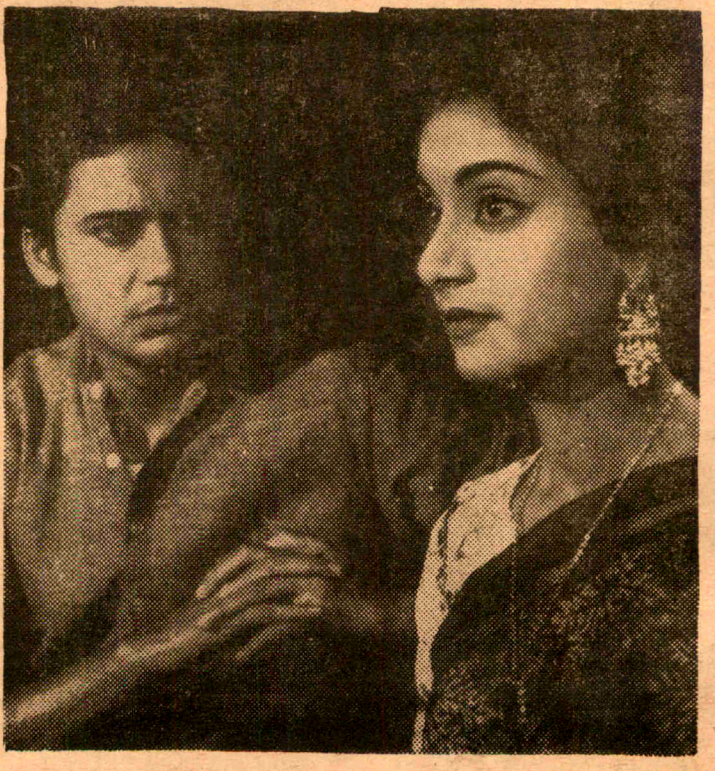

তপন সিংহের 'আপনজন' ছবিতে স্বরূপ দত্ত ও মুই ব্যানার্জী

'জীবনসঙ্গীত' ছবিতে সন্ধ্যারাণী ও অনিল চট্টোপাধ্যায়

ছবি 'দি ট্রেন' পুরস্কৃত হয়েছে। ছবিটির পরিচালক নিখিলেশ ঘোষ। চিত্র গ্রহণ করেছেন অশোক সাগর। ছবিটি রৌপ্য ক্বাপ লাভ করেছে। এই প্রথম ফিল্ম ইনস্টিটিউটের ছবি আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে পুরস্কার লাভ করল।

সঙ্গীতকথা

বহির্বঙ্গে উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের আসর

সম্প্রতি ইণ্ডিয়ান মেডিকেল এসোসিয়েশন ময়ূরভঞ্জ শাখার উদ্যোগে বারিপদায় এক বিচিত্রানুষ্ঠানের আয়োজন হয়। স্থানীয় সিভিল সার্জেন ডাঃ কিরণচন্দ্র ঘোষের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন রাজ্যের সরবরাহ ও সাংস্কৃতিক বিষয়ক মন্ত্রী শ্রীনিত্যানন্দ মহাপাত্র।

রাগসঙ্গীতের আসরে প্রখ্যাতা শিল্পী শ্রীমতী শিশিরকণা ধরচৌধুরী বেহালায় 'মালকোশ' রাগের যথাযথ রূপায়ণে স্বকীয় বৈশিষ্ট্য, স্বাতন্ত্র্যধর্মী পরিবেশন ও সংগীতের মৌলিকতার পরিচয় দেন। অননুকরণীয় 'টিপের' সাহায্যে ভৈরবী ঠাটের এই রাগের ধ্রুপদী বিস্তার, ব্যঞ্জনাময় জোড় ও বিদ্যুদ্‌গতি ঝালায় শিল্পী রাগের শান্ত রসটি ফুটিয়ে তোলেন। শিল্পী পরিবেশিত 'যোগ' রাগটিও রসোত্তীর্ণ হয়।

এ ছাড়া কুমার বীরেন্দ্রকিশোর রায়-চৌধুরীর সুরবাহার ও ওস্তাদ শওকৎ আলী খানের সুরশৃঙ্গার শ্রোতাদের আনন্দ দেয়। অধুনা প্রায়-বিলুপ্ত এই ধ্রুপদী যন্ত্রগুলির সুরসাধনায় শিল্পীদ্বয় মুন্সীয়ানার পরিচয় দেন। ডাঃ কিরণচন্দ্র ঘোষের রাগাশ্রিত গানের উৎকর্ষতা চিকিৎসা জগতের বাইরে সংগীত জগতে দক্ষতার প্রমাণ। সমগ্র অনুষ্ঠানের সুষ্ঠু পরিচালনার জন্য স্থানীয় আই এম এ কর্তৃপক্ষ ধন্যবাদার্হ।

চন্দ্রশেখর

নাট্যকার—অমৃতলাল বসু

ইংরেজের আইনে নিষিদ্ধ অংশগুলি নাট্যকারের মূল পাণ্ডুলিপি হইতে সংগৃহীত।

উদ্ধৃতি—

শৈবালিনী—ইংরেজ ধরে নে গেছল—

গুরগণ—ইংরেজ? একবার পেলে হয়—

মীরকাশেম মসনদে থাক, তার সহায় হয়ে বাংলা হতে ইংরেজ নাম লোপ করব।—

মীরকাশেম—পাপাত্মা এই রাজা ইংরেজদের বিক্রয় করবে।

প্রতাপ—ইংরেজকে বাংলা থেকে তাড়াতে হবে—

অভিনব সংস্করণ—মূল্য ঃ দুই টাকা

সেই সাহিত্যজগজ্জ্যোতি—প্রতিভা ও মনীষার অবতার—সাহিত্য-তপস্যানিষ্ঠ-

মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর

হরপ্রসাদ গ্রন্থাবলী

কাঞ্চনমালা, বেণের মেয়ে, মেঘদূত, বাল্মীকির জয়, ভারত-মহিলা, বাঙ্গালা সাহিত্য সমালোচনা, ঐতিহাসিক নিবন্ধমালা, শিক্ষাসন্দর্ভ, সমাজসংস্কার নিবন্ধরাজি. মোহিনী।

এই জাতীয় সাহিত্য-জয়ন্তী দুই ভাগ একত্রে পাঁচ টাকা।

বসুমতী প্রাইভেট লিমিটেড ঃ

১৬৬, বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী স্ট্রীট, কলিকাতা—১২

পাতা মত

"বঙ্গদর্শনে" প্রকাশিত মন্তব্য প্রসঙ্গে

এম-ডি পরীক্ষার ব্যাপারে 'বঙ্গদর্শনে' প্রকাশিত মন্তব্য প্রসঙ্গে আপনার পত্রিকার গত দুটি সংখ্যায় যে সংবাদ এবং প্রতিবাদপত্রগুলি ছাপা হয়েছে, তা আমার মত হতভাগ্য এম ডি'তে অকৃতকার্য এক ছাত্রের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। আপনারা মৌচাকে ঢিল দিয়েছেন। বলতে পারি সাপের গর্তে হাত ঢুকিয়েছেন। জানি না, শেষ পর্যন্ত সাপটিকে টেনে আনতে পারবেন কি না। কারণ তার আগেই তার ল্যাবলে আপনাদের অক্কা প্রাপ্তি ঘটতে পারে। দীর্ঘ এই দুর্ভেদ্য চক্রকে কেউ ভাঙতে পারে নি!

আমি কয়েকটা প্রশ্ন আপনাদের কাছে তুলে ধরতে চাই—নিজের কেরিয়ার এর দলে নিশ্চিতভাবে বিপন্ন হবে জেনেও। আমি জানি, আমার নাম যদি কোনোক্রমে প্রকাশ পায়, তাহলে এম ডি পাশ করতে পারব না এবং চাকরিজীবনে প্রমোশনও পাব না। কারণ ভজনা না করতে পারলে এ বৈতরণী পার হওয়া কারুর পক্ষেই সম্ভব নয়।

যাহোক, আমার প্রশ্নগুলির জবাব আপনার বঙ্গদর্শনের লেখক বা সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ দয়া করে জানাবেন কি?—

(১) অনেক মেধাবী ছাত্রও এম ডি-তে ফেল করেন কেন? এরকম প্রমাণ আছে, এম আর সি পি পাশ করা ব্রিলিয়ান্ট রেকর্ডের ছেলেও ফেল করেছেন। তুলনায় দেখা যায়, যাঁরা এম বি বি এস-এ ভাল ফল করেন নি, তাঁরাও পাশ করেছেন এক চান্সে।

(২) এ কথা কি ঠিক যে, যাঁরা প্রাইভেট প্র্যাকটিস করেন, তাঁরা 'কর্তা'কে বেশি 'কেস' দেন বলে তলনায় বেশি পাশ করেন?

(৩) এ কথা কি ঠিক যে, কর্তার মতানুযায়ী না চলায় কয়েকজন প্রখ্যাত চিকিৎসকের ছেলেকে বারবার ফেল করতে হয়েছে বা এখনো ফেল করছে?

(৪) এ কথা কি ঠিক যে, ট্রপিকাল স্কুলের কোনো এক ডাক্তার ভাল পোস্টিং-এর লোভে অর্গানাইজ করে আপনার পত্রিকায় প্রকাশিত খবরের প্রতিবাদ করতে দলে দলে ডাক্তারদের পাঠাচ্ছেন?

(৫) এ কথা কি ঠিক যে, যাঁরা প্রতিবাদ পাঠাচ্ছেন, তাঁরা অনেকে কর্তার চাপে পড়ে বা হুকুম ঐ প্রতিবাদ জানাতে? টেলিফোন করে বা লোক মারফৎ তাঁদের নির্দেশ দেওয়া হচ্ছে দলে দলে আপনার অফিসে যাবার জন্যে?

(৬) এ কথা কি ঠিক যে, একাডেমিক কাউন্সিলের প্রমোশনের লোভ দেখিয়ে অনেককে প্রতিবাদ জানাবার জন্যে পাঠানো হচ্ছে?

(৭) এ কথা কি ঠিক যে, কর্তাব্যক্তিটি সমস্ত একাডেমিক কাউন্সিল বা সমস্ত কলেজের সমস্ত কমিটিতে আছেন এবং কোনো মিটিং-এ গরহাজির থাকতে চান না?

(৮) এ কথা কি ঠিক যে, যাঁদের প্রতিবাদপত্র ছেপেছেন, তাঁদের অধিকাংশ-এর নামেই একটি ডাক্তারী বই-এর লেখক কৃতজ্ঞতা স্বীকার করেছেন?

(৯) এ কথা কি ঠিক যে, একদল ছাত্র পরীক্ষার প্রাক্কালে বিশেষ সুযোগ-সুবিধা পান? অনেকে কেস দেখেন আগে থেকেই—যে কেস আসে পরীক্ষায়? আর একদল হতভাগ্য ছাত্র এ সুযোগ থেকে বঞ্চিত হন?

(১০) আর একটি প্রশ্ন, 'কর্তার ইচ্ছায় কর্ম' এই মতবাদের উপরেই কি এম ডি পরীক্ষার অন্য পরীক্ষকগণ নিযুক্ত হন না?

(১১) এরকম মড়াকান্না শোনা গেছে, আর নাকি কেউ পড়ান না। ভবিষ্যতে একজন নাকি পড়াবেন না এবং তাঁদের বক্তব্য—এই একজনই যেন এম ডি পড়াবার উপযুক্ত, আর কেউ নন। একথা কি সত্যি যে, কোনো প্রখ্যাত প্রবীণ চিকিৎসকের ক্লাসে অধিকাংশ ছাত্র যান না,—ভিড় করেন একজনেরই দরবারে? অন্য সকল বিশেষজ্ঞ-দের কি এর দ্বারা অপমানিত করা হচ্ছে না?

(১২) এটা কি এথিকস্ যে, যিনি এম ডি পরীক্ষার কর্তা তাঁর ছেলে পড়াবেন? এটা কি বাঞ্ছনীয়?

(১৩) এম ডি পরীক্ষার এ জাতীয় গলদ সম্পর্কে ১৯৬২ সালে 'যুগান্তর' ও 'অমৃতবাজার' পত্রিকায় চাঞ্চল্যকর পত্র বের হয়েছিল। তার প্রতিকার কি হয়েছে?

(১৪) আবহমান কাল থেকে একই কলেজে পরীক্ষা হয় কেন?

পরিশেষে বক্তব্য, আপনারা সত্য প্রকাশের জন্য সচেষ্ট হয়েছেন। আমার মনে হয়, আপনাদের কপালেই দুঃখ আছে। দুষ্ট স্বার্থচক্রকে ভাঙা কি আপনাদের ক্ষমতায় কুলোবে? যদি তা সম্ভব হয়, তাহলে তখন কতকগুলি মেরুদণ্ডহীন পদালোভীর কি অবস্থা দাঁড়াবে? সবচেয়ে অবাক লাগছে দেখে সরকারী ডাক্তাররা সরাসরি বিভাগে আপনার কাছে প্রকাশের জন্য পত্র পাঠালেন আর আপনিই বা কি করে ছাপলেন। রাজ্য সরকারের স্বাস্থ্য-দপ্তর কি 'থ্রু প্রোপার চ্যানেল' ছাড়া সরকারী ডাক্তারদের প্রতিবাদপত্র ছাপাবার আদেশ দিয়েছেন বর্তমান ক্ষেত্রে? তবে এ কথাও ঠিক, কিছু পেটোয়া ডাক্তার চাকরি রক্ষার খাতিরে 'কর্তা'ব্যক্তিকে সায় দিলেও এমন কিছু নিরুপায় সৎ ডাক্তার আছেন, যাঁরা নিরপেক্ষ তদন্ত হলে গোপন সাক্ষ্যের দ্বারা সাপটিকে গর্ত থেকে টেনে বের করে দিতে পারেন। সেই তদন্তের ভার হাই-কোর্টের কোনো বিচারপতির উপর দিতে হবে। বিচার বিভাগীয় তদন্ত না হলে 'কর্তা'ব্যক্তিটি অতি ক্ষমতার বলে হয় দংশন করবেন, না হয় সব চাপা দেওয়ার ব্যবস্থা করে ফেলবেন।

—জনৈক অকৃতকার্য এম-ডি পরীক্ষার্থী

*

গত ৫ই ডিসেম্বর আপনার পত্রিকার "বঙ্গদর্শন" অন্তর্ভুক্ত কয়েকটি মন্তব্যের প্রতিবাদ না করলে অন্যায় হবে বলে আমি মনে করি। আমার মনে হয় যে, কোন উচ্চতর পরীক্ষায় সাফল্য প্রধানত ২টি জিনিসের উপর নির্ভরশীল। প্রথমটি অধীত বিদ্যার উপর দখল। আর দ্বিতীয়টি "লাক"। দুর্ভাগ্যবশত কারো কারো ক্ষেত্রে এই দ্বিতীয় কারণটি পুনঃ পুনঃ অসাফল্যের প্রধান কারণ হলেও এ কথা কিছুতেই বিশ্বাস করা যায় না যে এম ডি ডিগ্রী পাওয়াটা 'জনৈক ব্যক্তির মর্জির উপর নির্ভরশীল'। এম ডি পাশ করতে হলে কোন বিশেষ কোচিং ক্লাশে বাধ্যতামূলকভাবে ভর্তি হতে হবে বা চিকিৎসা শিক্ষাজগতের কোন হর্তাকর্তা বিধাতাকে পকেটের মোটা টাকা খরচ করে

খুশি করতে হবে—এ ধরনের মন্তব্য আমাকে আশ্চর্যান্বিত করেছে।

—ডাঃ কে সি সাহা
নীলরতন সরকার মেডিক্যাল কলেজ
কলকাতা

*

আপনাদের ৭৩ বর্ষ, ২৪শ সংখ্যা, ১৯শে অগ্রহায়ণ ১৩৭৫ সংখ্যায় "বঙ্গ-দর্শনে" চিকিৎসা জগতের কায়েমী স্বার্থ সম্পর্কে আলোচনায় লেখক এম ডি ডিগ্রী প্রসঙ্গে যে মন্তব্য করেছেন, তার বিরুদ্ধে আমরা নিম্নস্বাক্ষরকারী চিকিৎসা জগতের স্নাতকোত্তর শ্রেণীর ছাত্র-ছাত্রীরা প্রতিবাদ জানাচ্ছি।

'বঙ্গদর্শনে' এম ডি ডিগ্রী প্রসঙ্গে বলা হয়েছে যে, চিকিৎসাশাস্ত্রের সর্বোচ্চ ডিগ্রী এম ডি পাওয়াটা জনৈক ব্যক্তির মর্জির উপর নির্ভরশীল, অধীত বিদ্যার উপর নয়। চিকিৎসা জগতের প্রতিটি অধ্যাপক তো বটেই, স্নাতকোত্তর শ্রেণীর ছাত্র-ছাত্রীরাও জানেন, বিশ্ববিদ্যালয়ের এই এম ডি ডিগ্রী পরীক্ষায় চারজন পরীক্ষক নির্বাচিত হন। ফলে, এই পরীক্ষায় কোন এক ব্যক্তিবিশেষের মর্জির উপর নির্ভর করে না। আরো বলতে চাই যে, উক্ত বিশেষ ব্যক্তির 'সূত্রের' কোচিং ক্লাস প্রসঙ্গে যে দুর্নীতির কথা বলা হয়েছে, তাও মিথ্যা এবং অপপ্রচার মাত্র। ছাত্র-ছাত্রীদের অনুরোধেই উক্ত বিশেষ ব্যক্তির 'আলোচ্য সূত্র' স্বীয় পসার ক্ষুণ্ণ করে, এম ডি ছাত্রদের সহানুভূতির সঙ্গে শিক্ষা-দান করেন। বিনা পারিশ্রমিকে নিঃস্বার্থ-ভাবে ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য সমাজের সুপ্রতিষ্ঠিত একজন কৃতী চিকিৎসক তাঁর যে বহুমূল্য সময় অপব্যয় করেন, তার জন্য চিকিৎসা জগতের অসংখ্য ছাত্র-ছাত্রী চিরকৃতজ্ঞ।

ইতি—ডাঃ চিত্ত ব্যানার্জী, এম-ডি, ডাঃ বন্দিতা বসু, ডাঃ প্রণবকুমার দাস, ডাঃ সুজয়া চক্রবর্তী, ডাঃ অরবিন্দ মল্লিক, ডাঃ রাজশ্রী সিনহা প্রভৃতি।

গত ৫ই ডিসেম্বর তারিখের বঙ্গদর্শনে আপনি চিকিৎসা জগতের কায়েমী স্বার্থ সম্পর্কে আলোচনায় এম-ডি পরীক্ষা সম্পর্কে যে অভিযোগ করেছেন তার জন্য আপনাকে কি বলে যে ধন্যবাদ জানাব তা ভেবে পাচ্ছি না। চিকিৎসা জগতে যে কথাটি ছিল ওপেন সিক্রেট অথচ ভয়ে যে বিষয়ে কেউ কোনদিন মুখ খুলতে সাহস করেন নি, এখনো মুখ খুলতে নারাজ, আপনারা তা বলিষ্ঠভাবে প্রকাশ করেছেন দেখে আপনাদের আন্তরিক অভিনন্দন না জানিয়ে পারছি না।

যাঁদের বিরুদ্ধে আপনাদের অভিযোগ, তাঁদেরই কিছু ঘনিষ্ঠ ব্যক্তি গত সংখ্যার সাপ্তাহিক বসুমতীর পাঠকমনে একটি প্রতিবাদপত্র পাঠিয়েছেন। তাঁরা লিখেছেন, "চিকিৎসাশাস্ত্রের সঙ্গে জড়িত প্রতিটি অধ্যাপকই জানেন যে, বিশ্ববিদ্যালয়ের এই সর্বোচ্চ ডিগ্রীর পরীক্ষায় চারজন পরীক্ষক নির্বাচিত হন এবং ইঁহাদের মধ্যে বহিরাগত বিশিষ্ট অধ্যাপকগণও থাকেন। ফলে কোন এক বিশেষজনের মর্জির উপর পরীক্ষার কৃতকার্যতা বিন্দুমাত্র নির্ভর করে না।" আক্ষরিক অর্থে কথাগুলি অসত্য নয়। কিন্তু এই প্রসঙ্গে আপনারা বঙ্গদর্শনে যে মৌলিক প্রশ্নটি তুলেছিলেন, পত্র-লেখকগণ তা সুকৌশলে এড়িয়ে গেছেন। সেই প্রশ্নটির পরিপ্রেক্ষিতেই উপরি-উক্ত বক্তব্যটিকে বিচার করতে হবে। আপনারা যে মৌলিক প্রশ্নটি তুলেছিলেন তা হচ্ছে এই যে, একমাত্র মেডিক্যাল কলেজেই কেন এম-ডি পরীক্ষার কেন্দ্র হবে? এই পরীক্ষা গ্রহণের উপযোগী মোট চারটি প্রতিষ্ঠান যখন কলকাতায় রয়েছে, তখন একটি বিশেষ কলেজকেই কেন এই উদ্দেশ্যে বেছে নেওয়া হবে? দু' বছর আগে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে এই প্রসঙ্গটি অব-লম্বন করে তীব্র বাক্-বিতণ্ডা হয়ে গিয়েছিল, কিন্তু শেষ পর্যন্ত বিশ্ববিদ্যা-লয় পূর্বতন ব্যবস্থাই বজায় রেখেছিলেন। একথা কি উক্ত পত্রলেখকদের নতুন করে স্মরণ করিয়ে দিতে হবে? সম্প্রতি যতজন এম-ডি পাশ করেছেন, তার মধ্যে বেশির ভাগই যে মেডিক্যাল কলেজের এই স্থূল বিষয়টিকে কি অগ্রাহ্য করা যায়? উদাহরণস্বরূপ বলা যায় যে এবারে উত্তীর্ণ পরীক্ষার্থীদের মধ্যে অধিকাংশই মেডিক্যাল কলেজের ছাত্র। কন্ডাক্টিং ডাক্তারদের সাহায্যটা কি পরীক্ষাকালে মেডিক্যাল কলেজের ছাত্ররাই সর্বাংশে লাভ করেন না? এইবার পত্র-লেখকদের মূল কথায় আসি। তাঁরা যে চারজন পরীক্ষকের কথা তুলেছেন, এবারে তাঁদের মধ্যে তিনজনই কি মেডিক্যাল কলেজের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট নন? অর্থাৎ চারজন নির্বাচিত পরীক্ষকের তিনজনেই সচরাচর মেডিক্যাল কলেজেরই হয়ে থাকেন। এরপর বাইরের পরীক্ষকের কথা। গত কয়েক বছরের ইতিহাসের খোঁজ নিলে দেখা যাবে যে দক্ষিণ ভারতের দু'জন মাত্র ব্যক্তিই পালাক্রমে একস্টারনাল একজামিনার হয়েই আসছেন, এক্ষেত্রেও কুমীরের সাতটা ছানা হিসাবে একটাকেই সাতবার দেখানোর উপমাটা মনে পড়ছে।

তাহলে দেখা যাচ্ছে শেষ পর্যন্ত ব্যাপারটা বিশেষ একজন ব্যক্তির মর্জির উপরেই চলে যাচ্ছে, এবং এই কথাটিই বঙ্গদর্শনে খোলাখুলি বলা হয়েছে। কোচিং প্রসঙ্গে উক্ত পত্রলেখকেরা জানিয়েছেন যে, এর পিছনে কোন অর্থনৈতিক ব্যাপার নেই, বিষয়টি আগাগোড়াই ফিলানথ্রপিক। তাঁদের এই বক্তব্যে আমার কোন ভিন্নমত নেই। নন-প্র্যাকটিসিং ফিজিসিয়ান যখন বাইরের রোগী দেখেন, সেটাও নিশ্চয়ই ফিলানথ্রপি এবং এতগুলি যে কোচিং ক্লাস ও টিউটোরিয়াল হোম পশ্চিমবঙ্গ জুড়ে চলছে, সেগুলিও নিশ্চয়ই ফিলানথ্রপিরই নিদর্শন। বঙ্গদর্শনে উল্লিখিত বিষয়টি অবলম্বনেই যখন একটি প্রখ্যাত ইংরাজী দৈনিকে একটি দীর্ঘ পত্র প্রকাশিত হয়ে-ছিল, তখন এই পত্রলেখকগণ কোথায় ছিলেন? যাঁদের বিরুদ্ধে বঙ্গদর্শনে অভিযোগ আনা হয়েছে পত্রলেখকেরা তাঁদেরই যে ঘরের লোক এটা কি প্রমাণের অপেক্ষা রাখে? বঙ্গদর্শনে আলোচ্য ব্যক্তি-দের একজনের রচিত একটি গ্রন্থের ভূমিকা থেকেই বোঝা যায় তাঁদের সঙ্গে এই পত্র-লেখকদের ব্যক্তিগত সম্পর্ক কি প্রকারের।

কিন্তু ব্যাপারটি তো নিছক গুরু-ভক্তির নয়, আমারা দেখেছি ভাগ্যবানরা কিভাবে ঝটপট এম-ডি হয়ে যান, এবং বাকিরা "অধীত বিদ্যা" সত্ত্বেও বছরের পর বছর ফেল হন। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র থেকে সমতুল্য ডিগ্রী যিনি অর্জন করেছেন, কয়েক-বার পরীক্ষা দিয়েও তিনি এম-ডি হতে পারলেন না। বোধ হয় তাঁর অধীত বিদ্যা নেই। অপর একজন যিনি কলকাতার একটি প্রখ্যাত হাসপাতালের কার্ডিওলজি বিভাগে আছেন, বার বার এম-ডি'তে ব্যর্থ হয়ে, দুঃখের বলে বিলাতে গিয়ে এক-চান্সেই এম-আর-সি-পি পাশ করেন। অপর একজন পত্রলেখক শ্বিজেনবাবুর ভাষায় "উভয় ক্ষেত্রেই সমপরিমাণ অধীত বিদ্যার প্রয়োজন আছে।" কিন্তু উক্ত কার্ডিওলজিস্টের ক্ষেত্রে দেখা গেল, যে অধীত বিদ্যা তাঁকে বিদেশে এম-আর-সি-পি দিয়েছে, স্বদেশে সেই অধীত বিদ্যা তাঁকে আটবারেও কৃপা করে নি। খবর নিলে অনুরূপ একটি ঘটনার বিবরণ ন্যাশন্যাল মেডিক্যাল কলেজে পাওয়া যাবে। এ রকম আরও বহু নিদর্শনই দেওয়া যায়, বাহুল্য বোধে তার প্রয়োজন আপাতত বোধ করছি না, নিজের ঘরেও তো এই একই চিত্র দেখতে পাচ্ছি।

সুপ্রিয়া চক্রবর্তী
কলকাতা—৩

"লোকসঙ্গীতের একাল না আকাল" প্রসঙ্গে

স্বাধীনতার পরবর্তীকালে আঞ্চলিক লোকসঙ্গীতের বহুল প্রচারের সুযোগ গ্রহণ করে নতুন ও পুরনো লোকসঙ্গীত-শিল্পীরা লোকগীতির মাধ্যমে বৃহত্তর জগতের সামনে দাঁড়াবার এবং উন্নততর জীবিকার সুযোগ লাভ করেছে। তাই আপনার সাপ্তাহিক বসুমতীতে মুরশিদের "লোকসঙ্গীতের একাল না আকাল" সমালোচনাটি বিভিন্নমুখী ও সময়োপযোগী হয়েছে।

সমালোচনায় তথাকথিত খ্যাতিমান লোকসঙ্গীতশিল্পীদের অনুশীলন এবং তাঁদের "ফকো-মডার্ন" গান সম্বন্ধে তিনি যা লিখেছেন সে কথা আমাদের মত সাধারণ লোকসঙ্গীতানুরাগী শ্রোতারই মনের কথা। অবশ্য শিল্পীদের নামের তালিকায় কয়েকজন অতিপরিচিত গুণী শিল্পীর নামের উল্লেখ না থাকার কোন কারণ জানি না। এঁদের মধ্যে আমরা দীর্ঘদিন যাবৎ সন্তোষকুমার ঘোষের ভাওয়াইয়া, চটকা, দেহতত্ত্ব, ভাটিয়ালী প্রভৃতি বিশুদ্ধ লোকগীতি শুনে আসছি। বহু শ্রোতা ও সঙ্গীতজ্ঞের কাছে এঁর দরদীকণ্ঠের ভূয়সী প্রশংসাও শুনেছি। এছাড়া প্রদ্যোৎনারায়ণ, নিখিল চক্রবর্তী, গৌর বসাক, সুবোধ রায়, রাধারাণী, ছবি বন্দ্যোপাধ্যায়, নীলিমা বন্দ্যোপাধ্যায়, লাবণ্যলেখা পাঞ্জেল (ঢাকার পুরনো শিল্পী) প্রভৃতি শিল্পীরা প্রাচীন ধারার লোকসঙ্গীতে শ্রোতাদের মনে যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করেছেন এবং পল্লীসঙ্গীতের গ্রামাভাব ও বৈশিষ্ট্য রক্ষা করে চলেছেন। মুরশিদ তাঁর সমালোচনায় এঁদের নামের উল্লেখ না করায় বিস্ময়বোধ করছি।

আর একটি বিষয় মুরশিদের দৃষ্টি আকর্ষণ করি সেটা হচ্ছে—লোকসঙ্গীতের শিল্পীরা বর্তমানে সাংস্কৃতিক দূত হিসাবে বিদেশ সফরের সুযোগ লাভ করছেন। যোগ্য ব্যক্তিই যাতে নির্বাচিত হয়ে প্রতিনিধিত্ব করার সুযোগ পান এবং এরূপ গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপারে শিল্পী নির্বাচন যাতে দুর্নীতিমুক্ত হয় তার প্রতি লক্ষ্য রাখতে মুরশিদকে অনুরোধ করি।

লোকসঙ্গীতের অনুরাগী শ্রোতা হিসাবে আমি মুরশিদকে (আমাদের গুরুদেব) ধন্যবাদ জানাই এবং সঙ্গে সঙ্গে তাঁর উপর এই ভরসা পোষণ করি, তিনি যেন তাঁর নির্ভীক নিরপেক্ষ লেখনীর কশাঘাতে আকাশবাণী, গ্রামোফোন কোম্পানী, বিভিন্ন সাংস্কৃতিক সংস্থা ও শিল্পিসমাজের চেতনা উদ্বুদ্ধ করে পল্লীর স্বভাবকবির রচনা ও সুরকে অবশ্যম্ভাবী অকালমৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা করার মহান ব্রত গ্রহণ করেন। এ ব্যাপারে তাঁকে (মুরশিদকে) বিন্দুমাত্র সহায়তা করতে পারলেও নিজেকে ধন্য মনে করব।

সুজেন মজুমদার
দেলীগড়, মধ্যমগ্রাম

•

"গান্ধীবাদ কি সচল?" প্রসঙ্গে

"গান্ধীবাদ কি সচল" প্রবন্ধটি খুব আগ্রহের সঙ্গে পড়েছিলাম, দেখেছিলাম বাংলাদেশের যা ফ্যাসন, এতে তার বেশি কিছু নেই। ফ্যাসনে গা ঢেলে দিলে, তার সমর্থনে যত কিছু প্রমাণ যোগাড় করে প্রবন্ধ লিখলে সস্তায় প্রতিষ্ঠাও হয়, বহুক্ষেত্রে অর্থও আসে এ কে না জানে, কে না বোঝে। আমার অনুমান যে একেবারে মিথ্যা নয়, এই প্রবন্ধের সমর্থনে যে সব চিঠি ছাপা হয়েছে, তা থেকেই বোঝা যায়।

গান্ধীবাদ কি তা লেখক পরিষ্কার করে বলেন নি, যেটুকু বলেছেন তাঁর নিজের অনুমান না অন্য কিছু তা বোঝা যায় না। বস্তুত কুহেলিকার সৃষ্টি হয়েছে। যদি তিনি সে বিষয়ে প্রামাণ্য আলোচনা স্পষ্টভাবে করতেন, তা হলে একটা সত্যকার কাজ করতেন। প্রত্যেক বিরাট নেতার বা মানুষের চরিত্রে বহু বৈষম্য দেখা যায়, যদি বিচ্ছিন্নভাবে বৈষম্যগুলোই আলোচনা করা যায়, ব্যক্তি থাকে না, রুচিও থাকে না, মূল্যায়নের কথা দূরে থাক।

ইংরাজীতে একটা কথা আছে "Give the devil his due", গান্ধীকে যদি devil-ও ধরা যায়, তা হলেও লেখককে সে মূল্য দিতেও দেখা গেল না।

গান্ধীকে বিরাট শক্তির সাথে অতি প্রতিকূল অবস্থায় মোকাবিলা করতে হয়েছে, স্বাধীনতার পর তিনি বেঁচে থাকলে হয়তো তাঁর কাছ থেকে তাঁর কাজ বা বক্তব্যের পেছনে কি যুক্তি ছিল তা জানা যেত, কিন্তু তা যখন সম্ভব হয় নি, তাঁর অবদান নিয়েই আলোচনা করলে আজকের দুঃস্থিত জাতীয় জীবনে শান্তির বারি সেচিত হত।

বাংলাদেশে যদি এইরূপ চলতে থাকে অপরাপর রাজ্যে তার প্রতিদান চলতে থাকবে, সেটা স্বাভাবিক। স্বাধীনতালাভের প্রয়াস সম্বন্ধে বহু হিন্দি পুস্তিকা পেয়েছি, তাতে বিপ্লবী বা নেতাজী সম্বন্ধে কোন উল্লেখ নেই। বস্তুত কোন মানুষের নীতি গ্রহণ না করা চলে কিন্তু তাঁর প্রাপ্য সম্মান ও শ্রদ্ধা না দিলে জাতির ক্ষতি, কিশোর-যুবক বিভ্রান্ত হয়, তারাই তো জাতির ভবিষ্যৎ।

কোন নীতি, মত বা পথ নিয়ে একইভাবে ভাবতে ভাবতে, সেই পথে কাজ করতে করতে মানুষ বেশ বিভ্রান্ত হয়, পক্ষপাতদুষ্টও হয়ে পড়ে, সে তিনি ধর্মীয় নেতাই হোন বা জাতীয় নেতাই হোন একথা প্রত্যেক লোকের পক্ষে সত্য, নেতাদের তো কথাই নেই। গান্ধী তার ব্যতিক্রম নন। লেখক পুরাতন কাগজ খুঁজলে দেখতে পাবেন, তিনি হিটলারকে পরাজিত করবার উপায় হিসেবে চার্চিলকে আত্মসমর্পণের উপদেশ দিয়েছিলেন। আবার তিনিই গুজরাটে যন্ত্রণাকাতর দুরারোগ্য ব্যাধিতে আক্রান্ত গরুকে গুলী করে মেরেছিলেন এবং তাতে দেশে প্রবল আলোড়ন হয়েছিল।

গান্ধী সন্ত্রাসবাদের বিরোধী ছিলেন কিনা বিচার করা অসম্ভব, তবে সেইটাই যে একমাত্র পথ তা মনে করতেন না, এটা সত্য। তিনি বিপ্লবীদের প্রতি শ্রদ্ধাহীন ছিলেন সেটা বলাও ভুল। তাঁর মুখ সে যুগে এ বিষয়ে বন্ধ রাখতে হয়েছিল এটাও ঠিক না হলে তিনিই আন্দামান নির্বাসিত তিন হাজার (বাঙালী বোধ হয় প্রায় সকলে) রাজবন্দীর মুক্তি আনতে পারতেন না; যে বাংলা তাঁর গলায় জুতার মালা পরাতে চেষ্টিত ছিল।

তিনি যে মূলত সুভাষ-বিরোধী ছিলেন একথাও ঠিক নয়, কারণ তিনিই হরিপুরা কংগ্রেসে সুভাষবাবুর কংগ্রেস সভাপতি নির্বাচনের পৌরোহিত্য করেছিলেন এবং তাঁর পদকে রাষ্ট্রপতি বলে ঘোষণা করেন সেই প্রথম। বিরাট নেতৃত্বের মধ্যে যখনই বিবাদ হয়েছে, ব্যক্তিস্বার্থে

বিষাদ হয় নি, হয়েছে মূলনীতিতে, বাহিরে তার জঞ্জাল নিয়ে আলোচনা চলেছে। দুঃখের বিষয় যাঁরাই এ নিয়ে আলোচনা করেছেন, ত্রিপুরীর সভাপতি সুভাষবাবুর নির্বাচন পূর্ব বিবৃতি উদ্ধৃত করা পরিহার করেছেন বা এ আই সি সি'র কলকাতা অধিবেশনে সর্তহীন-ভাবেও ওয়ার্কিং কমিটি গঠনে অস্বীকারের কথা উল্লেখ করেন নি। এটা বললে সুভাষ-ব্যক্তিত্ব কিছুমাত্র ক্ষুণ্ণ হতো না, বরং দেশ কতটা সংগ্রামে প্রস্তুত ছিল বোঝা যেতো।

বিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধের শেষ তিন দশকে ভারতের রাজনৈতিক গগনে দু'টি বিরাট নেতৃত্ব গড়ে উঠেছিল তা হ'ল গান্ধী ও নেতাজী। বিরাট ব্যক্তিত্ব, লক্ষ্য নির্দিষ্ট, ভারতের স্বাধীনতা, উভয়ে নিষ্করুণ স্বাভাবিকভাবে, আবার উভয়ে পরস্পরের প্রতি শ্রদ্ধাশীল, একজন অভিজ্ঞতায় পরিপক্ক আর একজন যৌবনে উল্লেখিত। নেতাজী যে গান্ধীশ্রদ্ধ কম ছিলেন না তা অপর প্রবন্ধে শঙ্করীবাবুর উদ্ধৃতি এবং নেতাজীর সাইগন-ভাষণ (শঙ্করীবাবু অবশ্য নেতাজীর "মহানুভবতা" বলে বর্ণনা করে নেতাজীকে ছোটই করেছেন) থেকে প্রমাণিত। লক্ষ্য এক থাকলেও তা সিদ্ধির পথ নিয়ে সংঘর্ষ সর্বত্রই সর্বযুগে হয়েছে, হয়; ভারতেও হয়েছে, কিন্তু তার ফলে কোন পক্ষ যদি বিদ্রূপের পাত্র হন, তা হলে যাঁরা নেতা তাঁদের অপমান হয় না, যিনি তা করেন তিনিই নীচমন্য প্রমাণিত হন।

৫৫০ পৃষ্ঠার ১ম কলমে লেখক বালকসুলভ যুক্তির আশ্রয় নিয়েছেন। তিনি বলেছেন, "তিলক, দেশবন্ধু, সুরেন্দ্রনাথ ও বিপিন পাল প্রমুখের তৈরি বুনিয়াদ না পেলে গান্ধীর এতটুকু অবদানও সম্ভব হতো না"। কথাটা সত্য। রামমোহন, বিদ্যাসাগর, মধুসূদন বঙ্কিমচন্দ্র প্রমুখ বিরাট সাহিত্যরথীদের আবির্ভাব না হলে আমরা রবীন্দ্রনাথকে পেতাম কি? বিপ্লবীদের অক্লান্ত সাত যুগব্যাপী আত্মত্যাগ, সর্বোপরি রাসবিহারী বসুর সুদূরপ্রসারী দৃষ্টি এবং সংগঠন ক্ষমতা না থাকলে আমরা সুভাষবাবুকে নেতাজীরূপে কি পেতাম?

৫৫৮ পৃষ্ঠার দ্বিতীয় কলমের শেষাংশে এবং তৃতীয় কলমের প্রথমাংশে লেখক স্বাধীনতা প্রাপ্তির কারণগুলো বলেছেন এবং তাঁর বক্তব্য "অনস্বীকার্য" শব্দ দিয়ে ঢাকতে চেয়েছেন অর্থাৎ সিপাহী বিদ্রোহ থেকে আরম্ভ করে ১০ই বছর যে সকল আন্দোলন বিভিন্ন ফ্রন্টে চলেছে তা অস্বীকার করেছেন, তা বাতুলেরাই করতে পারে।

লেখকের মূল বক্তব্য বোধ হয় একমাত্র সাহিংস বিপ্লব ছাড়া কিছুই হতে পারে না, যদি তাই হয় তা তো সকলে করতে পারবে না, কোন দিন পারে নি। তিনি বা তাঁর অনুগামীরা তা পারবেন কি না জানি না, কাজেই সে বিষয়ে আমার বক্তব্য কিছু নেই। তবে আছে একটা জিজ্ঞাসা, তিনি কি বলেন, বিপ্লবীদের দিকে তাকিয়ে সমস্ত লোক বসে থাকবে? তাঁদের কি আর কিছু করণীয় নেই? যদি না থাকে বিপ্লব কি সম্ভব হবে? আর যদি তাও সম্ভব হয়, সে বিপ্লব কি সার্থক হবে? আর তাদের সত্যিই করার যদি কিছু থাকে কি তা? তিনি যেন মনে রাখেন বহু বিপ্লবী আন্দামান থেকে ফিরে এসে ভিক্ষুকের মত সাহায্য চাইতে বাধ্য হয়েছে এবং ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সাহায্য পাওয়ার পর তাদের যখন জিজ্ঞাসা করা হয়েছে পরবর্তী কার্যক্রম কি, তাঁরা বুকে হাত দিয়ে বাজিয়ে দেখিয়েছেন এবং সে বুক ধাতব-পাতের মত বেজেছে।

গান্ধী রাজনীতিতে ধর্ম টেনে এনেছেন, এ কথাও ঠিক নয়, এরূপ কোথায়ও পাওয়া যায় না। তিনি "সত্য" ও "নীতি"তে বিশ্বাস করতেন, সেটা তাঁর ব্যক্তিগত, এতে বলবার কি আছে, অনেক কম্যুনিস্ট ত ধর্মের অনুশাসন, আচার বা ভগবানকে মানেন তা তো আলোচ্য বিষয় হয় না।

লেখক বহু উদ্ধৃতি দিয়েছেন। বিচ্ছিন্ন উদ্ধৃতিতে সত্য প্রতিষ্ঠিত হয় না। আর ঐতিহাসিক তো ইতিহাসের ব্যাখ্যা দেবেন। তাঁর জীবিতকালের ঘটনার ব্যাখ্যা সে হবে তৎকালের আগুনে কতটা তিনি পুড়েছেন, তার বিবৃতি। পরবর্তী যুগের ঐতিহাসিক তার আবার ব্যাখ্যা করবেন। এইটেই তো স্বাভাবিক।

গান্ধী-অনুগামীদের কার্য দিয়ে গান্ধীর বিচার লেখক করেছেন, বুদ্ধের অনুগামীদের দিয়ে বুদ্ধের, খৃস্টের অনুগামীদের দিয়ে খৃস্টের বিচার হয় কি? বিবেকানন্দের অনুগামীরা তাঁরই গড়া প্রতিষ্ঠানে তাঁরই মানস-কন্যা ভগিনী নিবেদিতাকে স্থান দিয়েছিলেন কি?

লেখক ৫৫৫ পৃষ্ঠার প্রথম কলমে দেশবন্ধুর ভাষণ বলে উদ্ধৃতি দিয়েছেন। তাতে বক্তব্য সংগ্রামে স্নায়ু সবল শেষ পর্যন্ত গান্ধী রাখতে পারতেন না। এটা ব্যর্থতার, সাময়িক দুঃখের একটা অভিব্যক্তি ভিন্ন কিছু নয় এবং তা স্বাভাবিক, কিন্তু তাতে তাঁর বক্তব্য প্রমাণিত হয় না। দেশবন্ধুর মহাপ্রয়াণের সময় দেশবন্ধু রচিত ভ্রমণসূচীতে গান্ধী বাংলাদেশের জেলায় জেলায় ভ্রমণ করছিলেন এবং তাঁর তিরোভাবের কথা বরিশালে পান।

১৯৩৭ সালে নির্বাচনের পরে কংগ্রেস ততদিন সরকার গড়ে নি, যতদিন না বৃটিশ সরকার গভর্নরের বিশেষ ক্ষমতা প্রয়োগ হবে না এ আশ্বাস দেয় নি, কাজেই লেখকের বক্তব্য প্রলাপ ভিন্ন কিছুই নয়।

বহু ভুল তথ্য বা ব্যাখ্যা এই লেখার রয়েছে তা আলোচনা করে কি হবে, দৃষ্টি ও লক্ষ্য যেখানে ন্যাব্যাগ্রস্ত সেখানে সবই হলদে দেখাবে। বিরাট ব্যক্তিত্বে পরস্পর শ্রদ্ধাশীল, বহু মতদ্বন্দ্বর মধ্যেও, দেখা যায় রবীন্দ্রনাথ ও গান্ধীর মধ্যে। চরকাকে কুটিরশিল্প ও আত্মনির্ভরতার প্রতীক হিসাবে কাজ করেছি এবং জেনেছি। যে সায়েন্স কলেজে আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র চরকাকে বিদ্রূপ করতেন, তাঁর শেষ জীবন যখন সেই সায়েন্স কলেজে থেকেই চরকা প্রচারে কাটালেন, কারণ জিজ্ঞাসা করলে বলেছিলেন, "He convinced me, I could not convince him", এই হলো বিরাট ব্যক্তিত্ব।

দেশ বিভাগের জন্য মূলত দায়ী সেই বৃটিশ শক্তি যারা ১৯৩৫ সালে একবার দেশ বিভাগ করেছিল তারাই। মুসলিম লীগের স্বাধীনতালাভ প্রতিরোধ ভিন্ন কোন সংগ্রামনীতি ছিল না, যেমন আজ ভারত-বিদ্বেষ ভিন্ন পাকিস্তানের কোন নীতি নেই। দৃষ্টি একটু পরিষ্কার করলে লেখক বুঝতে পারবেন। গান্ধী যথাসাধ্য দেশ বিভাগ প্রতিরোধ করার চেষ্টা করেছিলেন। মুসলিম লীগের সংগ্রামী নীতি ছিল এক দাঙ্গা বাধানো তাতে শেষে যখন হিন্দুরাও দেশ বিভাগের জন্য জীবনমরণ পণ করলো, তখন হল দেশ বিভাগ। এই বিভাগকে গ্রহণ করা ভিন্ন গান্ধীর কোন উপায় ছিল না, অশীতিপর বৃদ্ধ আর কি করতে পারতেন, লেখক অনুগ্রহ করে জানাবেন।

শ্রীবীরেন্দ্রনাথ সেন
কলকাতা-৫

খেলাধুলা

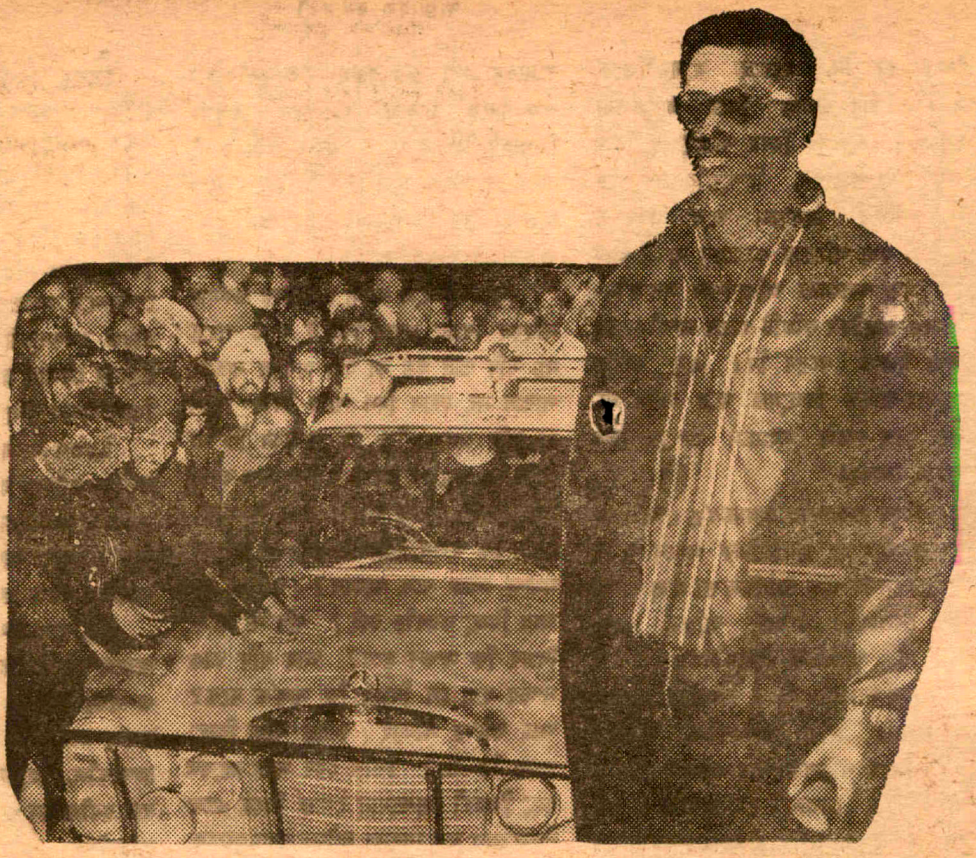

বড়বাড়ি

ইংরেজীতে একটা প্রবাদ আছে—'টু মাচ অফ এনীথং ইজ ব্যাড...।' কথাটা যে কতোবড় সত্যি তার জলজ্যান্ত প্রমাণ ভারতীয় স্কুল ক্রিকেট দল। অস্ট্রেলিয়ায় সফররত ভারতীয় স্কুল ক্রিকেট দলকে নিয়ে আলোচনায় ভারত আর অস্ট্রেলিয়া বড় বেশি সরগরম হয়ে উঠেছিলো। সে আলোচনা ছিলো প্রশংসার আর বিষয়টি ছিলো ভারতীয় স্কুল ক্রিকেট দলের ভিন্নত ধরণের ক্রীড়ানৈপুণ্যের আর ব্যক্তিগত ক্রীড়াচাতুর্যের। তাই সকলেই খুশিমনে ভারতীয় স্কুল ক্রিকেট দলের প্রশংসায় হয়ে উঠেছিলেন পঞ্চমুখ। আর শেষ পর্যন্ত সে প্রশংসালোচনা গিয়ে পৌঁছুলো টু মাচের পর্যায়ে। কিন্তু তারপরই ভারতীয় স্কুল ক্রিকেট দলের খেলোয়াড়রা দিলেন ব্যর্থতার পরিচয়। হয়তো এ ব্যর্থতা অস্বাভাবিক নয়। পর পর সব খেলাতেই ভালো খেলতে হবে এমন কোন কথা নেই। আর তা সম্ভবও নয়। খেলায় জয়-পরাজয় আছেই। তাই ভারতীয় স্কুল ক্রিকেট দলের পরাজয় কিছু একটা অস্বাভাবিক নয়। ঐ পরাজয় হয়তো সকলে স্বাভাবিকভাবেই নিতেন। কিন্তু ভারতীয় স্কুল ক্রিকেট দলকে মাথায় তুলে বড় বেশি নাচা হয়েছে আর বোধ হয় সেই জন্যেই ভারতীয় স্কুল ক্রিকেট দলের পরাজয়কে আজ কেউ আর স্বাভাবিকভাবে নিতে পারছেন না। তাই আজ আর বলতে বাধা নেই যে অতি প্রশংসা মোটেই ভালো নয়!

গত সংখ্যায় আমরা খেলাধুলার বিষয় আলোচনা করতে গিয়ে লিখেছিলাম যে বর্তমানে ভারতীয় ও বাংলা দেশের খেলাধুলার জগতে ছোটরাই বড়। আর আমাদের সে উক্তি যে কতো বড় সত্য তার প্রমাণ সম্প্রতি পাওয়া গেছে জুনিয়ার বাংলা দলের চ্যাম্পিয়ানশীপ লাভ করে বিধান রায় ট্রফি লাভ করায়। ফুটবল, ক্রিকেট, হকি...খেলাধুলার সব বিভাগে আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতার আসরে ভারতীয় দল দিনের পর দিন পিছিয়ে পড়ছে। ফুটবলে বাংলাই ছিলো ভারতের পথিকৃৎ। কিন্তু সেই বাংলা দলই জাতীয় ফুটবল প্রতিযোগিতায় গত ক'বছর মোটে সুবিধেই করতে পারে নি। কিন্তু ফুটবলে এবার বাংলা দেশের ছোটরাই দিয়ে এলো অসামান্য নৈপুণ্যের পরিচয়। সর্বভারতীয় স্কুল ফুটবলে কলকাতার কুমার আশুতোষ বিজয়ীর সম্মান অর্জন করে জিতে এনেছে সুব্রত মুখার্জী কাপ। আর জুনিয়র ফুটবলেও এবার চ্যাম্পিয়ানশীপ লাভ করেছে বাংলা দলই। তাই আজ আর এ-কথা বলতে বাধা নেই যে ভারতীয় খেলাধুলার ক্ষেত্রে ছোটরাই আগুয়ান। আর এখন যদি এই ছোটদেরই গড়ে-পিঠে তৈরি করে নেওয়া যায় তাহলে মনে হয় ভালো ছাড়া খারাপ হবে না কিন্তু তৈরি করবেন কে? সে দায়িত্ব নেবেন যাঁরা তাঁরা যে আজো ঘুমিয়ে। এ ঘুম কি তাঁদের কোনদিনও ভাঙবে না...?

লণ্ডন-সিডনি ম্যারাথন মোটর রেসে ভারতের একমাত্র প্রতিযোগী ডাঃ ওয়াদেকে দেখা যাচ্ছে ভারতের মাটিতে

ব্রিসবেনের খবর

ক্রিকেট জগতের দৃষ্টি এখন অস্ট্রেলিয়ায়। সেখানে চলেছে এখন অস্ট্রেলিয়া-ওয়েস্ট ইণ্ডিজের টেস্ট লড়াই। ব্রিসবেনের প্রথম টেস্ট ম্যাচও শেষ হয়ে গেছে। অস্ট্রেলিয়াকে ১২৫ রানে হারিয়ে দিয়েছে ওয়েস্ট ইণ্ডিজ। যখন অস্ট্রেলিয়ার শেষ ব্যাটসম্যান আউট হয়ে প্যাভেলিয়নে ফিরে এলেন তখনো খেলা শেষ হতে বাকি ছিলো এক দিনের কিছু বেশি সময়।

প্রথম টেস্টে অস্ট্রেলিয়াকে হারিয়ে ওয়েস্ট ইণ্ডিজ এই মরশুমের লড়াই-এ এগিয়ে গেলো ১—০ খেলায়। বাকি

॥ লরি ॥

শতরান করা সত্ত্বেও অস্ট্রেলিয়াকে পরাজয়ের হাত থেকে বাঁচাতে পারেন নি।

চারটে টেস্টের ওপর নির্ভর করছে ব্রাবারের ভাগ্য।

অস্ট্রেলিয়া-ওয়েস্ট ইণ্ডিজের টেস্ট লড়াই-এ যে দল রাবার লাভ করবে সেই দলই লাভ করবে ওরেল ট্রফি।

যাই হোক প্রথম টেস্টে অস্ট্রেলিয়ার পরাজয় খুব একটা অস্বাভাবিক ব্যাপার না হলেও প্রত্যাশিত ছিলো না। সকলেই আশা করেছিলেন যে খেলাটা শেষ পর্যন্ত জমবে খুব আর হয়তো শেষ দিনে সাংঘাতিক একটা কিছু খেলা হবে।

কিন্তু লড়াই শেষ দিন পর্যন্ত গড়ালোই না। তার আগেই ব্রিসবেনের প্রথম টেস্টের ওপর পড়লো ইতির দাঁড়ি। তাই বাকি চারটে টেস্টের ওপর এখন নির্ভর করছে ওরেল ট্রফির ভাগ্য। তবে এ-কথা ঠিক যে ওয়েস্ট ইণ্ডিজ দল এবার রাবার লাভ করে ওরেল ট্রফি জেতার জন্যে আপ্রাণ চেষ্টা করবে।

তাই মনে হয় যে বাকি চারটে টেস্টে লড়াই এবার জমবে খুব। তবে এ-কথা ঠিক যে ওয়েস্ট ইণ্ডিজ দলই এবার মনে হচ্ছে অস্ট্রেলিয়া-মাঠের ফেবারিট। অন্তত প্রথম টেস্টের ফলাফল দেখে তাই তো মনে হয়।

প্রথম টেস্টে ওয়েস্ট ইণ্ডিজের জয়-লাভের পেছনে ছিলো লয়েড, কানহাই আর কেরুর ব্যাটিং এবং সোবার্স ও গিবসের অসাধারণ বোলিং। প্রথমে ব্যাটিং করার সুযোগ পেয়ে ওয়েস্ট ইণ্ডিজ প্রথম ইনিংসে করেছিলো ২৯৬ রান। এর মধ্যে ছিলো কানহাই-এর ৯৪ আর কেরুর ৮৩ রান। কনোলী পেয়েছিলেন ৬০ রানের বিনিময়ে ৪টি উইকেট।

অস্ট্রেলিয়ার চ্যাপেল ১১৭ আর লরি ১০৫ রান করা সত্ত্বেও প্রথম ইনিংসে তারা ২৮৪ রানের বেশি করতে পারলো না। অবশ্য তার জন্যে দায়ী গিবসের মারাত্মক বোলিং। গিবস ৫টি উইকেট পেয়েছিলেন মাত্র ৮৮ রানের বিনিময়ে।

॥ সোবার্স ॥

শুধু অধিনায়ক হিসেবেই নয়, বোলার হিসেবেও সোবার্স প্রথম টেস্টে অস্ট্রেলিয়াকে হারানোয় নেতৃত্ব করেছেন।

গল্প হলেও সত্যি

ক্রিকেট খেলার সময় ওভার বাউণ্ডারী অনেকেই মেরে থাকেন। কিন্তু ওয়ারউইকশায়ারের রেভ.-রেণ্ড জে এইচ পারসনের মতো আর কেউ মারতে পারেন নি। ওভার বাউণ্ডারী মেরে পারসন যে অভাবনীয় নজীর সৃষ্টি করে-ছিলেন তার তুলনা মেলা ভার। সত্যি কথা বলতে কি—অমন ঘটনা আর একটাও ঘটে নি।

ঘটনাটা অবশ্য অনেক পুরনো। এ সেই ১৯২৮ সালের কথা। সেবার ওয়েস্ট ইণ্ডিজ গিয়েছিলো ইংলণ্ড সফরে। সেই সফরে ওয়েস্ট ইণ্ডিজ দলের বিরুদ্ধে খেলার সময় পারসন করেছিলেন সেই অসাধ্য সাধন।

একটা ওভারে পর পর ওভার বাউণ্ডারী মারতে আরম্ভ করলেন পারসন। পর পর চারটে ওভার বাউণ্ডারী মেরে পারসন তো কুড়োলেন অনেক প্রশংসা, অনেক হাততালি। কিন্তু পারসন সাহেবের মারা ওভার বাউণ্ডারী নেপথ্যে যে কি কাণ্ড করে বসেছে সেই মুহূর্তে বিশেষ কেউ আর তা জানতে পারলেন না।

পারসনের মারা বলটা শূন্যে ভেসে বাউণ্ডারীর ওপর দিয়ে সোজা চলে গিয়েছিলো প্যাভেলিয়ানের মধ্যে খাবার ঘরে। খাবার ঘরে তখন এক ভদ্রমহিলা বসে বসে চা খাচ্ছিলেন।

চয়ে চুমুক দেবার জন্যে তিনি যখন কাপটা তুলেছেন ঠিক তখনই বলটা এসে সজোরে লাগলো কাপে। ফলে বলের সংগে কাপটাও গেলো ছিটকে। ভদ্রমহিলার হাতে শুধু থাকলো কাপের ডাঁটিটা।

চা খাওয়া মাথায়। ভদ্রমহিলার চক্ষু তখন চড়কগাছ.....!

লয়েড ১২৯ আর কেরু ৭১ রান করায় ওয়েস্ট ইণ্ডিজের দ্বিতীয় ইনিংস শেষ হলো ৩৫৩ রানে। বোলিং-এ অস্ট্রেলিয়ার গলীসন ১২২ রানের বিনি-ময়ে পেয়েছিলেন ৫টি উইকেট।

দ্বিতীয় ইনিংসে অস্ট্রেলিয়া মোটে সুবিধেই করতে পারলো না। সোবার্স

আর ৯ বসের মারাত্মক বোলিং-এর জন্যে মাত্র ২৪০ রানে শেষ হয়ে গেলো অস্ট্রেলিয়ার দ্বিতীয় ইনিংস। সোবার্স ৭৩ রানে ৬টি ও গিবস ৮২ রানে ৩টি উইকেট পেয়েছিলেন। ব্যাটিং-এ একমাত্র চ্যাপেলের ৫০ রানই উল্লেখযোগ্য।

ফলে প্রথম টেস্টে ওয়েস্ট ইণ্ডিজ ১২৫ রানে পরাজিত করলো অস্ট্রেলিয়াকে।

এক নজরে ওয়েস্ট ইণ্ডিজ-অস্ট্রেলিয়ার খেলার ফলাফল

সাল	সফঃ অধিনায়ক	অস্ট্রেঃ জয়	ওঃ ইঃ জয়	ড্র	টাই	মোট
১৯৩০-৩১	জি সি গ্রাণ্ট (ওঃ ইঃ) —	৪	১	০	০	৫
১৯৫১-৫২	জে ডি গডার্ড (ওঃ ইঃ) —	৪	১	০	০	৫
১৯৫৪-৫৫	আই জনসন (অস্ট্রেঃ) —	৩	০	২	০	৫
১৯৬০-৬১	এফ ওরেল (ওঃ ইঃ) —	২	১	১	১	৫

কানহাই।
প্রথম ইনিংসে মাত্র ৬ রানে অন্য পারেন নি শত রান করতে।

ফুটবল-ফুটবল

জাতীয় জুনিয়র ফুটবল প্রতিযোগিতায় বাংলা দল এবার লাভ করেছে চ্যাম্পিয়ানশীপ। বাংলা দেশের ফুটবল উৎসাহীদের কাছে এ'টি অত্যন্ত আনন্দের বিষয়।

তাই সেদিন যখন বাংলা দলের খেলোয়াড়রা জব্বলপুর থেকে কলকাতায় ফিরে এলেন তখন হাওড়া স্টেশনে বসে গিয়েছিলো আনন্দের হাট। বাংলা দলের অধিনায়ক এস সেনগুপ্তকে কাঁধে নিয়ে ক্রীড়ামোদীরা আনন্দে হাসি গানে মাৎ করে তুলেছিলেন হাওড়া স্টেশন।

বাংলার খেলোয়াড়দের স্বাগত জানাবার জন্যে সেদিন হাওড়া স্টেশনে উপস্থিত ছিলেন আই· এফ· এ'র সভাপতি শ্রীঅক্ষয়কুমার বসু, যুগ্ম সম্পাদকদ্বয় এবং আরো অনেকে। শ্রীবসু বাংলার খেলোয়াড়দের গলায় মালা পরিয়ে তাদের জানিয়েছিলেন আন্তরিক অভিনন্দন।

বাংলা দলের ম্যানেজার বলেছেন যে প্রচণ্ড প্রতিদ্বন্দ্বিতার সম্মুখীন হলেও বাংলা দলের খেলোয়াড়রা প্রত্যেকটি খেলায় জয়লাভের অদম্য বাসনা আর আন্তরিকতার সংগে খেলায় তাদের কাছে জয়লাভ অনেকটা সহজ হয়ে যায়। তাঁর মতে বাংলা দলের প্রত্যেকটি খেলোয়াড়ই জয়লাভের জন্যে আপ্রাণ চেষ্টা করে খেলেছেন। তাই বাংলার

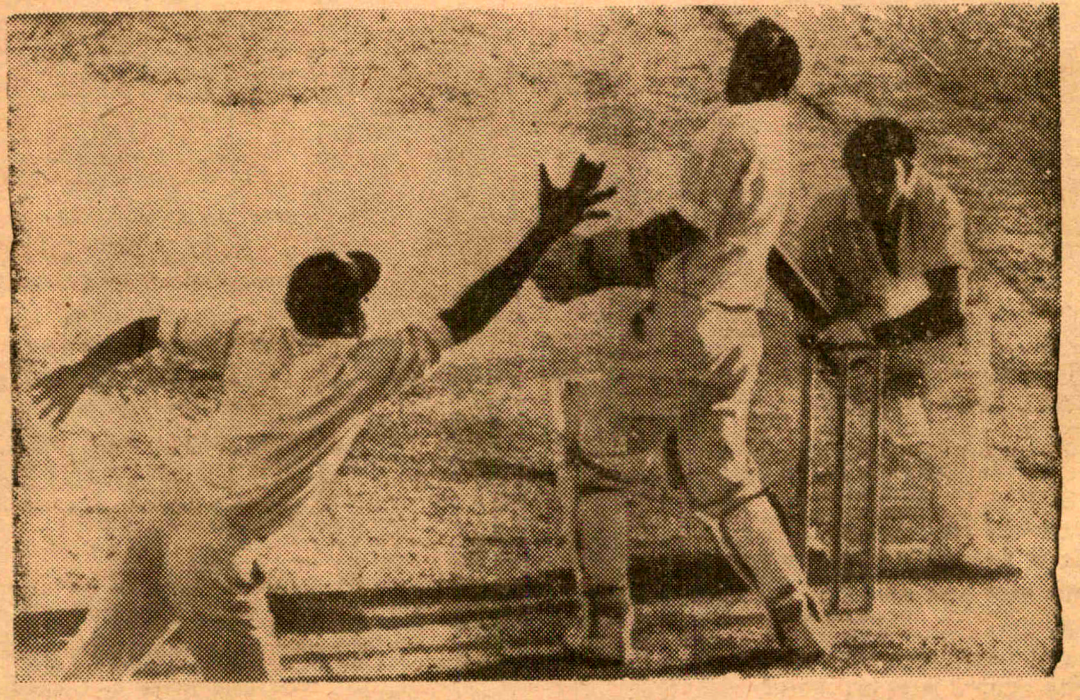

ব্রিসবেনে অনুষ্ঠিত অস্ট্রেলিয়া ও ওয়েস্ট ইণ্ডিজ দলের প্রথম টেস্ট খেলায় গিবসের বলে অস্ট্রেলিয়ার অধিনায়ক বিল লরী ক্যাচ তুললে নর্স (বাঁদিকে) বলটি ধরার জন্য ডান হাত বাড়িয়েছেন। এই সময় লরীর রান ছিল ৬৩

খেলোয়াড়দের গতিবেগ ও ক্রীড়া-কৌশলের কাছে হার স্বীকার করতে বাধ্য হয় অন্য প্রদেশের দলগুলো।

তিনি বলেন যে, জুনিয়ার ফুটবলে বাংলা দেশের ছোটদের খেলা সকলকে যেমন আনন্দ দিতে পেরেছে, তেমনি একথাও প্রমাণ করে আসতে পেরেছে যে, ভারতের ফুটবল জগতে বাংলা আজো শ্রেষ্ঠ।

সমাচার দর্পণ

ওয়ার্ল্ড কাপ অর্থাৎ বিশ্ব ফুটবল প্রতিযোগিতার মতো এবার নাকি বিশ্ব হকি কাপ খেলার ব্যবস্থা হবে। লণ্ডন থেকে পাওয়া এক খবরে জানা যায় যে, ভারতীয় অলিম্পিক ফেডারেশনের সভাপতি রাজা বলীন্দ্র সিং খুব শীগ্‌গির নাকি এই প্রস্তাব তুলবেন। মনে হয় এ

॥ গিবস ॥

দু'ইনিংস মিলে প্রথম টেস্টে পেয়েছেন আটটি উইকেট।

প্রস্তাবে সকলেই সম্মতি জানাবেন। তারপর বিশ্ব ফুটবল কাপের মতো সমস্ত বিশ্ব জুড়ে বসবে হকি প্রতিযোগিতার আসর।

কলকাতার ইডেন উদ্যানে ডিসেম্বর মাসের শেষে কিম্বা জানুয়ারী মাসের প্রথম হয়তো বসবে একটা প্রদর্শনী ক্রিকেট প্রতিযোগিতার আসর। প্রধানমন্ত্রী একাদশের সংগে খেলবে রাজ্যপালের দল। এ খেলায় অতীতের আর বর্তমানের অনেক খেলোয়াড়ই হয়তো অংশ গ্রহণ করবেন। এখনকার খেলোয়াড়দের মধ্যে পতৌদির নবাব, বোরদে, জয়সীমা, প্রসন্ন, ভেঙ্কটরাঘবন, মানকাদ, সারদেশাই, ভোঁসলে, ইন্দ্রজিৎ সিংজী, ইঞ্জিনীয়ার, ওয়াদেকার, চন্দ্রশেখর, হনুমন্ত সিং, সুব্রহ্মনিয়াম, আব্বাস আলী বেগ, বেদী প্রমুখ খেলোয়াড়দের আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে। আর এঁদের সংগে থাকবেন অতীতের অনেক নামকরা খেলোয়াড়।

* * *

লণ্ডন-সিডনি মোটর ম্যারাথন রেস এখন শেষ পর্যায়ে এসে পৌঁচেছে। বোম্বাই থেকে জাহাজে করে ৭২খানা গাড়ি গিয়ে হাজির হয়েছিলো ফ্রিমেন্টেল বন্দরে। আর সেখান থেকে গাড়িগুলো এখন ছুটছে সিডনির দিকে। অভিনব এই প্রতিযোগিতায় কে যে বিজয়ীর সম্মান লাভ করবেন কে জানে...।

* * *

ইংলণ্ড ক্রিকেট দলের প্রাক্তন অধিনায়ক ওয়ালটার রবিনস মারা গেলেন গত বারোই ডিসেম্বর। তিনি ইংলণ্ডের পক্ষে অংশ গ্রহণ করেছেন ১৯টি টেস্টে। রবিনস করেছেন মোট ১৩৯৪০ রান। রবিনস নিজে ছিলেন আক্রমণাত্মক খেলায় বিশ্বাসী।

* * *

লাল রং-এর একটা দোতলা বাস নিয়ে বিশ্বভ্রমণে বেরিয়েছেন বৃটেনের ৭ জন তরুণ। দু' বছর ধরে তাঁরা ঘুরে বেড়াবেন সমস্ত পৃথিবী। কুড়ি বছরের পুরনো এই বাসটা ১৪৫ স্টার্লিং দিয়ে কিনে ও'রা পথে নেমেছেন। এর মধ্যে ৫০,০০০ হাজার মাইল পার হয়ে তাঁরা এখন এসে হাজির হয়েছেন মেক্সিকো শহরে। অবশ্য পথে তাঁদের পার হতে হয়েছে প্রশান্ত মহাসাগর। দোতলা ঐ বাসটা এখনো পর্যন্ত বিশেষ কোন বেগ না দিলেও আটবার ফেটে গেছে গাড়ির টায়ার আর একটু-আধটু মেরামত করতেও হয়েছে গাড়িটাকে।

॥ লয়েড ॥

দ্বিতীয় ইনিংসে শত রান করে ওয়েস্ট ইণ্ডিজকে জেতার পথে এগিয়ে দিয়েছিলেন অনেকখানি।

১৯৬৯তে আপনার ভাগ্য

যে-কোন একটি ফুলের নাম লিখিয়া আপনার ঠিকানাসহ একটি পোস্টকার্ড আমাদের কাছে পাঠান। আগামী বারমাসে আপনার ভাগ্যের বিস্তারিত বিবরণ আমরা আপনাকে পাঠাইব, ইহাতে পাইবেন ব্যবসায়ে লাভ লোকসান, চাকুরিতে উন্নতি, দলাদলী, জন্ম, বিবাহ ও সুখ-সম্বন্ধির বিবরণ; আর থাকিবে দুষ্ট-গ্রহের প্রকোপ হইতে আত্মরক্ষার নির্দেশ। একবার পরীক্ষা করিলেই বুঝিতে পারিবেন।

PT. DEV DUTT SHASTRI
RAJ JYOTISHI (B. M. W)
P. B. 86, JULLUNDUR CITY

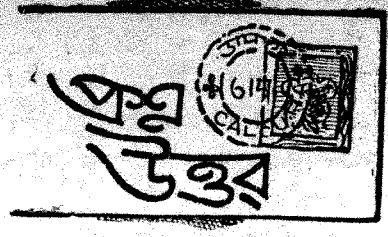

প্রশ্ন : "পরে আবার টেলিফোন করার কি দরকার। আমি না হয় একটু ধরেই থাকি...!" উক্ত কথার বক্তাকে কতোক্ষণ টেলিফোন ধরে থাকতে হয়েছিলো?

আয়রনমঙ্গারের সামান্য পরিচয় দিলে খুব খুশি হবো।

উত্তর : তা তো জানি না। তবে বেশিক্ষণ যে নয় সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই।

এইচ আয়রনমঙ্গারের জন্ম ১৮৮৩ সালের ৭ই এপ্রিল। তিনি ছিলেন কুইন্সল্যান্ড ও ভিক্টোরিয়া দলের খেলোয়াড়। অস্ট্রেলিয়ার পক্ষে খেলেছিলেন মোট ১৪টি টেস্ট ম্যাচ। ইংলণ্ডের বিরুদ্ধে ১৯২৮ সালে দু'টো ও ১৯৩২ সালে ৪টি আর সাউথ আফ্রিকার বিরুদ্ধে ...১৯৩১ সালে ৪টি এবং ওয়েস্ট ইণ্ডিজের বিরুদ্ধে ১৯৩০ সালে ৪টি টেস্ট খেলেছিলেন আয়রনমঙ্গার।

বিপুল সরকার (রায়গঞ্জ বি· এন)

উত্তর : ভারতীয় ক্রিকেট এবং হকিতে ক'জন বাঙালী খেলেছেন এ প্রশ্নের উত্তর আগেই দেওয়া হয়েছে। একই প্রশ্নের উত্তর কি বারবার দেওয়া উচিত... আপনি পুরনো সংখ্যাগুলো একটু দেখে নেবেন।

গোবিন্দ, বাবুয়া ও কমল (হিলা চা-বাগান, নাগরকাটা)

উত্তর : পি· দে'কে হাবিবের জায়গায় কেন নেওয়া হয় নি—তা তো জানি না।

পঙ্কজ গুপ্ত তো কোনদিন টেস্ট ক্রিকেট খেলায় অংশ গ্রহণ করেন নি! তবে তিনি ভারতীয় ক্রিকেট দলের ম্যানেজার হয়েছেন অনেকবার।

সেণ্টু, বণ্টু, অর্চনা ও চন্দনা চক্রবর্তী (কালীবাড়ি রোড, লামডিং আসাম)

প্রশ্ন : অলিম্পিক সংখ্যা পড়ে খুব ভালো লেগেছে। অলিম্পিক সংখ্যার মতো যদি একটা ক্রিকেট সংখ্যা করেন তাহলে খুব ভালো হয়।

উত্তর : ধন্যবাদ! চেষ্টা করা হবে।

প্রদীপ বিশ্বাস (গুলমা চা-বাগান, গুলমা, দার্জিলিং)

প্রশ্ন : বর্তমান ক্রিকেট জগতে বিশ্বের মধ্যে সেরা স্পিন বোলার কে?

উত্তর : গিবসই বোধহয়।

পরিতোষ নাগ (প্রসন্ননগর, বেলাকোবা, জলপাইগুড়ি)

উত্তর : বিমন দু'ফুটের কাছাকাছি বেশি লাফিয়েছেন লং জাম্পে। যাই হোক বিমনের পরিচিতি তো সাপ্তাহিক বসুমতীতে পড়েছেন। আশা করি এখন আর কোন গোলমাল নেই। আপনার রিপ্লাই কার্ডের চিঠি পেয়েছি। ব্যক্তিগতভাবে উত্তর ক'দিনের মধ্যেই পাবেন।

সবিনয় নিবেদন

পাঠক-পাঠিকাদের অনুরোধ জানাই যে তাঁরা যেন একসংগে বেশি প্রশ্ন না করেন। আর প্রশ্নগুলো খেলাধুলোর ওপর হওয়াই বাঞ্ছনীয়। প্রতিদিন অনেক চিঠি আসে, তাই প্রশ্নের উত্তর পেতে মাঝে মাঝে একটু-আধটু দেরি হয়ে যায়। আশা করি আমাদের অসুবিধাটুকু আপনারা বুঝবেন।

পৃথিবীতে একটাই টেস্ট টাই হয়েছে। টেস্ট ম্যাচটা ছিলো অস্ট্রেলিয়া বনাম ওয়েস্ট ইণ্ডিজের। সেবার অস্ট্রেলিয়ার অধিনায়ক ছিলেন বেনো আর ওয়েস্ট ইণ্ডিজের ওরেল।

দিলীপকুমার রক্ষিত (সিহিকা, বাঁকুড়া)

প্রশ্ন : আমি জানতে চাই যে পতৌদি টেস্ট ম্যাচে আজ পর্যন্ত কতবার শূন্য রান করেছেন—কোন্ কোন্ দেশের বিরুদ্ধে?

উত্তর : আমিও জানি না। কেউ জানালে জানিয়ে দেবো।

হীরেন্দ্রমোহন ভদ্র (সুভাষপল্লী, শিলিগুড়ি)

প্রশ্ন : টেস্ট ক্রিকেট খেলায় বিশ্বের কোন্ দেশের খেলোয়াড় সবচেয়ে বেশি সময় ধর ব্যাট করেছেন? তিনি কতো সময় ধরে খেলে কতো রান করেছিলেন?

উত্তর : পাকিস্তানের হানিফ মহম্মদ ১৬ ঘণ্টা ৩৯ মিনিট ধরে ওয়েস্ট ইণ্ডিজের বিরুদ্ধে বার্বাডোজের টেস্টে (১৯৫৭-৫৮ সালে) করেছিলেন ৩৩৭ রান।

তন্দ্রা, মিতা, স্বাতী, কৃষ্ণা, স্বপ্না ও রুমাদি (গুলমা টি এস্টেট, দার্জিলিং)

প্রশ্ন : ভারতীয় মহিলারা তো সব কিছু খেলা খেলে থাকেন, কিন্তু ক্রিকেটটা খেলেন না কেন?

উত্তর : যতোদূর জানি দিল্লীর কয়েকজন মেয়ে ভি জি-কে একবার ধরেছিলেন মেয়েদের ক্রিকেট খেলার ব্যবস্থা করে দেবার জন্যে। ভি জি-ও তাঁদের কথা দিয়েছিলেন চেষ্টা করবেন বলে। কিন্তু হঠাৎ মারা যাওয়ায় ভি জি আর কিছু করে যেতে পারেন নি।

যাই হোক আপনারা তো বাড়িতে ক্রিকেট খেলতে পারেন। আমরা কিন্তু বাড়িতে সবাই মিলে খুব ক্রিকেট খেলতাম...!

রবীন্দ্রনাথ হালদার ও মনোরঞ্জন দাস (হিংগলগঞ্জ, ২৪ পরগনা)

উত্তর : খেলাধুলোর বিভাগের জন্যে এর চেয়ে বেশি জায়গা পাওয়া বোধহয় সম্ভব নয়। না খেলা চলার সময় কোন খেলোয়াড় ঘুমপাড়ানি করতে পারেন না।

অসিতকুমার চৌধুরী (টাকী, বো ২৪ পরগনা)

উত্তর : আপনার রিপ্লাই কার্ড পেয়েছি। ব্যক্তিগতভাবে উত্তর পাবেন কয়েক দিনের মধ্যে।

অরুণকুমার গৃহকর্মকার (তেজগঞ্জ, বর্ধমান)।

প্রশ্ন : বর্তমানে ভারতীয় ব্যাটসম্যানদের মধ্যে কাকে একমাত্র নির্ভরযোগ্য অথচ নিপুণ বলা যায়?

উত্তর : আমার মতে অজিত ওয়াদেকার।

দুর্গাশঙ্কর সুর (বারাসত, দশভূজাতলা, চন্দননগর)।

উত্তর : এবারের ক্রিকেট মরশুম শুরু হয়ে গেছে। তাই এ বছর তো কিছু করা সম্ভব নয়। তবে আপনি শ্রীকার্তিক বসু, C/o. সি, এ, পি, ইডেন গার্ডেনস, কলকাতা—এই ঠিকানায় চিঠি লিখে কিম্বা অন্য কোনভাবে যোগাযোগ করে দেখতে পারেন।

হ্যাঁ চুনী গোস্বামী তো এ বছরও ক্রিকেট খেলছেন।

সম্পাদিকা—জয়ন্তী সেন

বসুমতী (প্রাঃ) লিঃ-এর পক্ষে ১৬৬, বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী স্ট্রীটস্থ কলিকাতা-১২
বসুমতী প্রেস হইতে শ্রীসুকুমার গুহমজুমদার কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

বসুমতীর কালজয়ী গ্রন্থরাজি

॥ গ্রন্থনসৌষ্ঠবে নয়নাভিরাম ॥

কালিদাস গ্রন্থাবলী--- ১ম ৬-০০
কালিদাস গ্রন্থাবলী--- ২য় (যন্ত্রস্থ) ৬-০০
কালিদাস গ্রন্থাবলী-- ৩য় ৮-০০
মাইকেল গ্রন্থাবলী--- ১ম ৪-৫০
মাইকেল গ্রন্থাবলী--- ২য় ৩-৫০
বঙ্কিম গ্রন্থাবলী (উপন্যাস)---১ম ৪-৫০
বঙ্কিম গ্রন্থাবলী (উপন্যাস)---২য় ৪-৫০
বঙ্কিম গ্রন্থাবলী (উপন্যাস)---৩য় ৪-৫০
বঙ্কিম গ্রন্থাবলী (সাহিত্য)---১ম ৩-০০
বঙ্কিম গ্রন্থাবলী (সাহিত্য)---২য় ৩-০০
বঙ্কিম গ্রন্থাবলী (সাহিত্য)---৩য় ৩-০০
দ্বিজেন্দ্রলাল গ্রন্থাবলী--- ১ম ৬-০০
" " ২য় ৬-০০
" " ৩য় ৮-০০
সেক্সপীয়র গ্রন্থাবলী---১ম খণ্ড ৪-৫০
সেক্সপীয়র গ্রন্থাবলী---২য় খণ্ড ৪-৫০
ত্রৈলোক্য গ্রন্থাবলী--- ১ম ৩-০০
দীনবন্ধু মিত্র গ্রন্থাবলী--- ১ম ৩-০০
মানিক গ্রন্থাবলী--- ১ম ৩-০০
মানিক গ্রন্থাবলী--- ২য় ৩-০০
দামোদর গ্রন্থাবলী--- ১ম ৩-০০
দামোদর গ্রন্থাবলী--- ৪র্থ ৪-০০
অমৃতলাল গ্রন্থাবলী--- ১ম ৩-০০
অমৃতলাল গ্রন্থাবলী--- ২য় ৪-০০
অমৃতলাল গ্রন্থাবলী--- ৩য় ৪-০০
যোগেশ গ্রন্থাবলী--- ১ম ৩-০০
যোগেশ গ্রন্থাবলী--- ২য় ৩-০০
বিহারীলাল গ্রন্থাবলী--- ৩-০০
রঙ্গলাল গ্রন্থাবলী--- ৩-০০
উপেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় গ্রন্থাবলী-- ৩-০০
রামপ্রসাদ সেন গ্রন্থাবলী-- ৩-০০
হরপ্রসাদ শাস্ত্রী গ্রন্থাবলী--- ৫-০০
ঈশ্বরগুপ্তের গ্রন্থা:---১ম ও ২য় খণ্ড ৫-০০
ভারতচন্দ্র গ্রন্থাবলী--- ৩-৫০
স্কট গ্রন্থাবলী--- ২য় ৩-০০
স্কট গ্রন্থাবলী--- ৩য় ৩-০০
নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়ের গ্রন্থা:-- ৪-০০
দীনেন্দ্র রায় গ্রন্থাবলী---১ম ৪-৫০
দীনেন্দ্র রায় গ্রন্থাবলী---২য় ৪-৫০
প্রভাবতী দেবী গ্রন্থাবলী--- ৩-৫০
বিভূতিভূষণ মুখো: গ্রন্থাবলী--- ৪-৫০
রামনাথ বিশ্বাস গ্রন্থাবলী--- ৩-৫০
শৈলজা গ্রন্থাবলী--- ১ম ৩-৫০
শৈলজা গ্রন্থাবলী--- ২য় ৩-৫০
মণিলাল বন্দ্যো: গ্রন্থা:---১ম ৩-৫০
মণিলাল বন্দ্যো: গ্রন্থা:---২ম ৩-৫০
অসমঞ্জ গ্রন্থাবলী--- ৪-০০
সৎসাহিত্য গ্রন্থাবলী--- ১ম ৪-০০
সৎসাহিত্য গ্রন্থাবলী--- ২য় ৪-০০
সৎসাহিত্য গ্রন্থাবলী--- ৩য় ৪-০০
সৎসাহিত্য গ্রন্থাবলী--- ৪র্থ ৩-০০
রামপদ মুখার্জী গ্রন্থাবলী--- ৪-০০
" " " ---২য় ৩-০০
হেমেন্দ্র রায় গ্রন্থাবলী--- ৬-০০
মতিলাল দাশের গ্রন্থাবলী--- ৩-০০
জগদীশ গুপ্তের গ্রন্থাবলী--- ৩-৫০
বিভূতিভূষণ ভট্টের গ্রন্থাবলী--- ৪-৫০
শচীশ চট্টো: গ্রন্থা:---২য় ভাগ ৩-০০
সৌরীন্দ্রমোহন মুখো: গ্রন্থা:---৩য় ৩-০০
সৌরীন্দ্রমোহন মুখো: গ্রন্থা:---৫ম ৩-০০
বিদ্যাসুন্দর গ্রন্থাবলী--- ৫-০০
কথাসরিৎসাগর---১ম ভাগ ৪-০০
কথাসরিৎসাগর---২য় ভাগ ৪-০০
অরবিন্দ দত্তের গ্রন্থাবলী--- ৩-০০
জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের গ্রন্থাবলী---
১ম, ২য়, ৩য়---প্রতি খণ্ড ৪-০০
ক্ষীরোদ গ্রন্থাবলী ২য় ও ৪র্থ হইতে
৮ম খণ্ড---প্রতি খণ্ড--- ৩-৫০
ডিকেন্সের গ্রন্থাবলী---২য় ৪-০০
চারু বন্দ্যোপাধ্যায়ের গ্রন্থাবলী--- ৪-০০
বিলাতী গুপ্তকথা--- ২য় ভাগ ৫-০০
অতুল মিত্র গ্রন্থাবলী---২য় ৩-০০
,, , গ্রন্থাবলী---৩য় ৩-০০
রস-গ্রন্থাবলী--- ৩-০০
নবীন সেনের গ্রন্থাবলী--- ৭-০০
নেপোলিয়ান--- ৫-০০
গোপেশ্বর বন্দ্যো:
ভারতীয় সঙ্গীতের ইতিহাস---
১ম ভাগ ৫-০০
নীরদ দাশগুপ্তের গ্রন্থাবলী--- ১ম ১০-০০
অরুণ বহ্নি--- ৪-০০
কাবকঙ্কণ চণ্ডী--- ৪-৫০
জ্যোতিষ রত্নাকর--- ৩-৫০
পরলোক--- ৪-৫০
পরলোক রহস্য--- ২-০০
পরলোক ও প্রেততত্ত্ব--- ৪-৫০
দৃশ্যকাব্য পরিচয়--- ১০-০০
নাড়ীজ্ঞান প্রদীপিকা--- ৩-০০
ভারত প্রতিভা--- ৫-০০
প্রতাপাদিত্য--- ৩-০০
সাধক কমলাকান্ত--- ২-৫০
মহারাজ নন্দকুমার--- ৩-০০
নানার মা--- ৩-০০
জালিয়াৎ কুইভ--- ৩-০০
বিক্রমাদিত্য--- ৩-০০
বিসমার্ক--- ২-০০
সুরেশচন্দ্র চক্রবর্তীর আত্মজীবনী---৩-০০
মহারাষ্ট্র জীবন-প্রভাত--- ২-০০
সাধবীকঙ্কণ--- ২-০০

যৌন-মনোদর্শন

৩য় ভাগ : কামাবেগের বিশ্লেষণ ৪-০০
৪র্থ ভাগ : প্রেম ও পীড়া ৪-০০
৫ম ভাগ : কামাবেগের নিয়ত-
কালিকত্বের ব্যাপার সমূহ ৪-৫০
আশাপূর্ণা দেবীর গ্রন্থাবলী--- ১ম ৬-৫০
আশাপূর্ণা দেবীর গ্রন্থাবলী--- ২য় ৫-০০
হেমচন্দ্র বন্দ্যো: গ্রন্থাবলী--- ৮-০০
কূটনীমত্ম --- ৪-০০
ANANDAMA'TH 8-00
(শ্রীঅরবিন্দ কর্তৃক ইংরেজী অনবাদ)
DAVID HARE 8-00

বসুমতী প্রাইভেট লিমিটেড ॥ ১৬৬, বিপিন বিহারী গাঙ্গুলী স্ট্রীট, কলি-১২

চাঁদের মাটিতে মানুষ হুঁকো

হাঁ, সব স্বাভাবিক আছে।
যন্ত্রগুলো চমৎকার কাজ করছে।
আকাশ গাঢ় কালো নীল। অত চোখধাঁধানো সূর্যের আলোতেও
তারাগুলো আগুনের মত জ্বলছে।

এখন ভারতের ঠিক উপর দিয়ে যাচ্ছি —
ঐ মশলার দেশটা নিচে দেখা যাচ্ছে — ঐ দূরে মশলার
দ্বীপপুঞ্জ SPICE ISLANDS চোখে পড়ছে। এ সব স্থান হতেই
হাজার বছর ধরে পৃথিবীর সবজাতি মশলা নিয়ে যাচ্ছে।
আর,... হাঁ, হঠাৎ মনে পড়ে গেল.....

এখান থেকেই সব চাইতে সেরা ভারতের গুঁড়ো মশলা
কুকমী কলকাতা হতে তৈরী হয়ে ভারতের সর্বত্র
ছড়িয়ে পড়ছে!

20 DEC 1968

বাজারের সেরা
গুঁড়ো মশলা

গ্রাম ঃ "স্পাইসমার্ট" মিল—কাশীপুর

নিজস্ব মিলে বৈজ্ঞানিক প্রথায় প্রস্তুত
'কুকমী'—সর্বাধিক বিক্রীত গুঁড়ো মশলা
পনের লক্ষ প্যাকেট মাসিক বিক্রয়
১২০ বৎসরের অধিক প্রাচীন ও বর্তমানে মশলার বৃহত্তম প্রতিষ্ঠান
কৃষ্ণচন্দ্র দত্ত (স্পাইস) প্রাঃ লিঃ ২৩৫নং মহর্ষি দেবেন্দ্র রোড, পোস্তা, কলিকাতা-৭

সাপ্তাহিক বসুমতী

নির্বাচনী সভা-সমাবেশে সরগরম পশ্চিমবঙ্গ

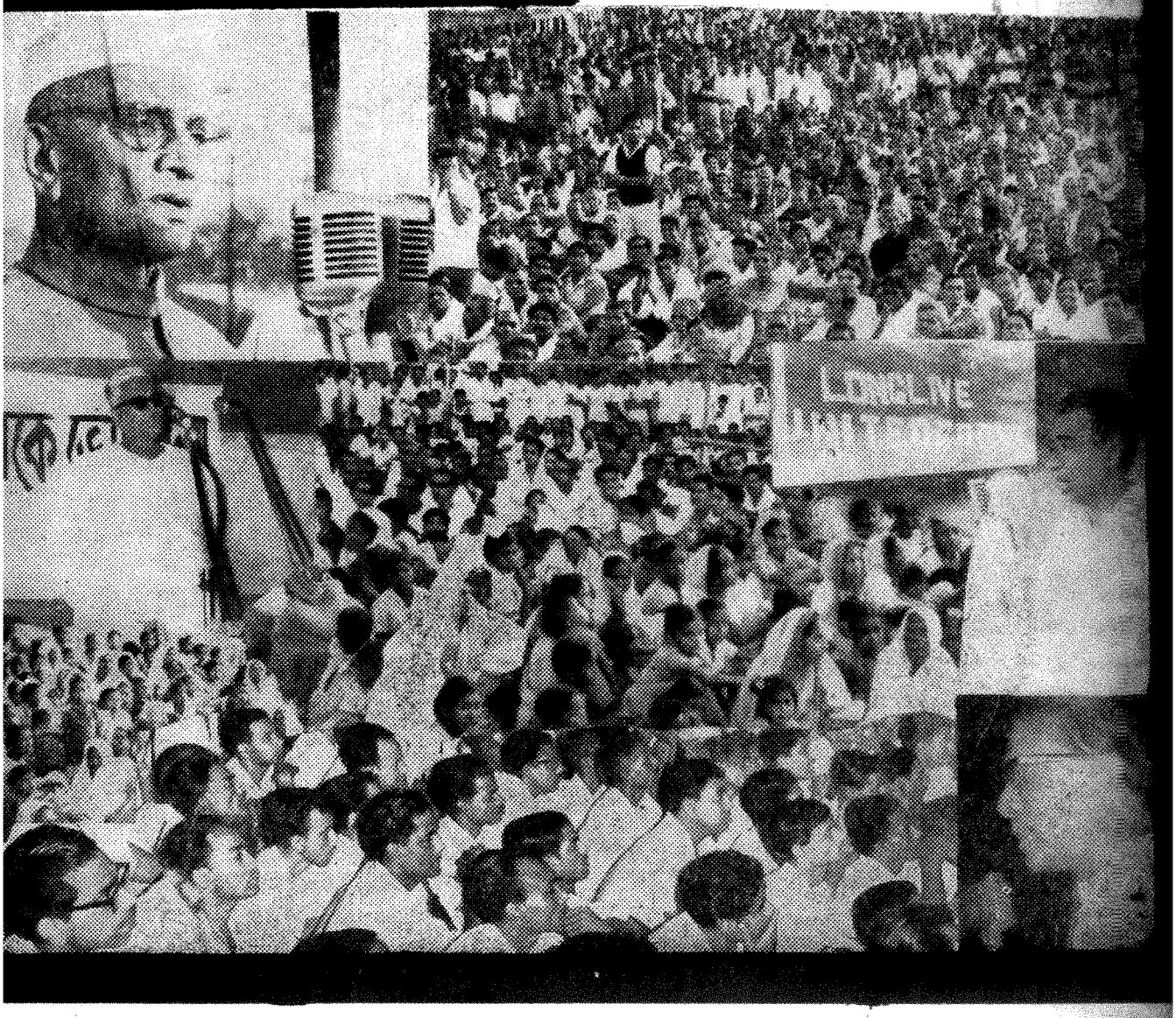

বর্ষ ঃ ২৭শ সংখ্যা, বৃহস্পতিবার, ১১ই পৌষ, ১৩৭৫ বঙ্গাব্দ] OLDEST WEEKLY OF NORTH INDIA [73rd year, No. 27, 26th Dec. 1968

শীত
প্রতিদিন
বোরোলীন
ব্যবহার করুন
আপনার শুষ্ক ও বিদীর্ণ ত্বকের অস্বস্তি দূর করবে
এই অ্যান্টিসেপ্টিক সুরভিত ক্রীম।
বোরোলীন হাউস, কলিকাতা-৩

সূচীপত্র

বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা
সম্পাদকীয়		১৬৬৭
আজকের মানুষ		১৬৬৮
জীবন-স্মৃতি	— ত্রৈলোক্যনাথ চক্রবর্তী	১৬৬৯
বঙ্গদর্শন		১৬৭২
কথায় কথায়	— নিবারণ মুন্সী	১৬৭৫
গ্রাম-গ্রামান্তরে	— সমর চট্টোপাধ্যায়	১৬৭৭
ঘড়িদিনে : একদল উপোসী মানুষ (কবিতা)	— জয়ন্তী সেন	১৬৭৮
ভারতদর্শন		১৬৭৯
আন্তর্জাতিক		১৬৮৩
চাঁদের চিঠি	— রামেন্দু মুখোপাধ্যায়	১৬৮৫
সীমান্ত গান্ধার স্বপ্ন ও বিষাদ (প্রবন্ধ)	— বীরেন্দ্র মিত্র	১৬৮৭
সপ্তাহের বোঝা	— কৃত্তিবাস ওঝা	১৬৯০

যে কোন
গয়না
আর
আসল
গ্রহরত্ন
কেনার
দক্ষিণ কোলকাতায়
নামকরা প্রতিষ্ঠান

ফোন : ২৬-৫৮৬৪

সব অ্যাণ্ড গ্র্যাণ্ডসন্স অব লেট
ভ্রম. বি. সরকার

এ. সরকার এণ্ড সন্স
৩১।১৩ রাসবিহারী এভিন্যু, কলিকাতা-১৯

সূচীপত্র

বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা
আগতিদি, অনিতাদি	— কামাক্ষীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়	১৬৯২
পাঠকগণ	— ...	১৬৯৪
রবীন্দ্রনাথ ও সুভাষচন্দ্র (ধারাবাহিক প্রবন্ধ)	— শঙ্করীপ্রসাদ বসু	১৬৯৭
চাঁদ সদাগর (গল্প)	— অনিলকুমার দলুই	১৭০১
কিউবার আশে পাশে	— সুরেশচন্দ্র সাহা	১৭০৭
কুচিকের দেশে	— গীতা বন্দ্যোপাধ্যায়	১৭১০
ব্রহ্মবান্ধব ভট্টাচার্য স্মরণে (প্রবন্ধ)	— সত্যেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়	১৭১২
পথ কে রুখবে ? (ধারাবাহিক উপন্যাস)	— মনোজ বসু	১৭১৪
ব্রহ্মদেশ ওদেশে এবং এদেশে	— নীলালি	১৭১৭
ক্রীড়াজগৎ ...	...	১৭১৯
খেলাধুলা ...	— শান্তিপ্রিয়	১৭২৪

॥ নাটক ॥ নাটক ॥ নাটক ॥ নাটক ॥ নাটক ॥

বহুকাল পরে আবার পাওয়া যাচ্ছে ॥

ম হা ক বি

গিরিশচন্দ্র ঘোষের রচনাবলী

প্রথম খণ্ড : প্রফুল্ল, ম্যাকবেথ, ঠাকুর শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেব ও স্বামী বিবেকানন্দ সম্পর্কে চারটি প্রবন্ধ, তিনখানি গীতিনাট্য ও গ্রন্থপরিচয়। পৃষ্ঠা সংখ্যা ৪১২। মূল্য দশ টাকা।

দ্বিতীয় খণ্ড : সিরাজদ্দৌলা ; ম্যায়সা কা ত্যায়সা ; জনা ; দোললীলা ও গ্রন্থপরিচয়। পৃষ্ঠা সংখ্যা ৩৫৮। মূল্য দশ টাকা।

তৃতীয় খণ্ড : পাণ্ডবগৌরব, বলিদান, আবুহোসেন ও গ্রন্থপরিচয়। পৃষ্ঠা সংখ্যা ৩৫২। মূল্য দশ টাকা।

চতুর্থ খণ্ড : চৈতন্যলীলা, ভ্রান্তি, অভিনয়বিকাশ, হীরার ফুলে, বিবিধ রচনা ও গ্রন্থপরিচয়। পৃষ্ঠা সংখ্যা ৩৩২। মূল্য দশ টাকা।

পরমহংসদেব শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁর ভক্ত-শিরোমণি অতি প্রিয় নোটো গিরিশকে বলেছিলেন, —"অভিনয়ের প্রয়োজন আছে বৈ-কি—ওতে লোকশিক্ষা হবে। আর তোমার লেখা—ও যে ভারি ভাল হয়েছে।"

প্রতিটি খণ্ড বোর্ডে বাঁধাই। মূল্যবান কাগজে ছাপা।

রচনাবলী সম্পাদনা : শ্রীরমেন চৌধুরী

আবলম্বে অর্ডার পেশ করুন।

বসুমতী প্রাইভেট লিমিটেড : ১৬৬, বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী স্ট্রীট, কলি-১২

CALCUTTA
CENTRAL
LIBRARY
UNIVERSITY

৭৩ বর্ষ ঃ ২৭শ সংখ্যা মূল্য ঃ ৩০ পয়সা বাংলা ভাষায় দ্বিতীয় সর্বাধিক প্রচারিত PRICE : 30 Paise
বৃহস্পতিবার, ১১ই পৌষ, ১৩৭৫ বঙ্গাব্দ সাপ্তাহিক পত্রিকা Thursday, 26th December, 1968

ভেজালের বিরুদ্ধে চাই কঠোর ব্যবস্থা

জনসাধারণকে অতি সাধারণ অধিকারগুলি থেকে বঞ্চিত করার জন্য সরকারের পক্ষে নিত্য-নতুন আইন প্রণয়ন করতে কুণ্ঠিত দেখা যায় না। কিন্তু যে সব স্থলে অধিকার কিছুটা সীমিত হলে জনসাধারণের প্রাণ রক্ষা পায় সে সব জায়গায় কঠোর আইন প্রণয়নের কথা সরকার কল্পনাও করতে পারেন না। বিগত একুশ বছরের—এই হচ্ছে আমাদের দেশের এক মর্মান্তিক ইতিহাস।

সেই কঠোর আইন প্রণয়নের প্রয়োজন কাদের বিরুদ্ধে—তা বলা নিষ্প্রয়োজন। তবু পুনরুক্তি করতে বাধা নেই যে, আমাদের কল্যাণকামী সরকার জাল, ভেজাল, দুর্নীতিগ্রস্তদের বিরুদ্ধে কঠোর আইন প্রণয়ন করতে অসমর্থ হয়েছেন। অথচ দেশ যখন স্বাধীনতা লাভ করে নি, তখন এ দেশের জনদরদী নেতৃবৃন্দ হামেশাই চোরাবাজারী আর ভেজালদারদের প্রকাশ্য ল্যাম্পপোস্টে কিংবা ফাঁসি-কাঠে ঝোলাবার বাসনা ঘোষণা করতেন। তারপর সত্যি সত্যি দেশ যখন স্বাধীন হোল এবং সেই স্বাধীনতার আস্বাদ জনসাধারণ অপেক্ষা এক শ্রেণীর সমাজ-বিরোধী ব্যবসায়ী বেশি ভোগ করার সুযোগ নিল, তখন নেতৃবৃন্দের সেই পুরাতন ঘোষণা কেবলমাত্র উদ্ধৃতি হিসেবেই ব্যবহৃত হতে লাগলো, প্রচুর ক্ষমতা তাঁদের হাতে থাকলেও সমাজ-বিরোধীদের শায়েস্তা করার মতো উপযুক্ত ব্যবস্থা তাঁরা গ্রহণ করতে পারলেন না। ফলে, ভেজাল ও নানারকম দুর্নীতি ক্রমশ আরো বিস্তার লাভ করলো। এবং ভেজালদার ও দুর্নীতি পরায়ণদের মধ্যে যেটুকু ভয় ছিল, জামাতাসুলভ আদর-বরলাভে সে-ভয়ের অস্তিত্ব পর্যন্ত তাদের থাকলো না। তা ছাড়া ভেজালনিরোধে, দুর্নীতি দূরীকরণে যে সব প্রতিষ্ঠান নিযুক্ত, তারাও ধীরে ধীরে ঐ সব কাজে নিরুৎসাহ বোধ করলো, কেউ কেউ বা দুর্নীতি দূরীকরণে থেকে অসৎভাবে অর্থ উপার্জনের পথ খুঁজে পেলো। উপরি উক্ত বক্তব্য কারো অজ্ঞাত নয় এবং আমরা নতুন করেও বলছি না। মাসাধিক কাল আগে একটি সম্পাদকীয় প্রবন্ধে আমরা দেশময় দুর্নীতির রাজত্ব কেন—তা আলোচনা করেছি। বলা বাহুল্য, আমরা আশা করেছিলাম, কেন্দ্রীয় সরকার জাল, ভেজাল বা দুর্নীতির ব্যাপারে জনসাধারণকে বড় বড় কথা না শুনিয়ে এমন একটি আইন রচনা করে দেবেন—যার সাহায্যে দুর্নীতিগ্রস্তরা শুধু প্রকাশ্যে কানমলাতেই রেহাই পাবে না, উপরন্তু নরহত্যার দায়ে তাদের অভিযুক্ত করে মৃত্যুদণ্ড পর্যন্ত দেওয়া হবে।

দুর্ভাগ্যের ব্যাপার কেন্দ্রীয় সরকারের দৃষ্টি সেদিকে নেই এবং কোনো কোনো রাজ্যও এখন মন্ত্রিত্বের উত্থানে, পতনে কিংবা সাময়িক অবসানে পঙ্গু অথবা দৃষ্টিশক্তিহীন।

আমাদের ধারণা, পশ্চিমবঙ্গের জনসাধারণের এখন অত্যন্ত দুর্ভাগ্য। সম্প্রতি সরিষার তেলে ভেজালের ব্যাপারে যেটুকু খবর প্রকাশ পেয়েছে—তাতে সরিষার তেল ব্যবহারকারীরা আতঙ্কিত এবং ইতিমধ্যে অনেকেই রোগগ্রস্ত।

সরিষার তেলে শেয়ালকাঁটা ভেজাল দেওয়া এবং তা খাওয়ার জন্য রোগীদের মধ্যে চক্ষুরোগ, বেরিবেরি, সংক্রামক শোথ, হৃদ্‌রোগ প্রভৃতি আরো অন্যান্য মারাত্মক ব্যাধির লক্ষণ দেখে স্কুল অব ট্রপিক্যাল মেডিসিন থেকে রাজ্য সরকারকে জানালেও সরকার এ ব্যাপারে কোনো ব্যবস্থাই গ্রহণ করেন নি। পরে বঙ্গীয় চক্ষু চিকিৎসক সমিতির সভাপতি ডাঃ মুরলীধর সেনগুপ্ত পৌরসভা ও রাজ্য সরকারের স্বাস্থ্য দপ্তরের কুম্ভকর্ণের নিদ্রা ভাঙিয়ে দিতে সমর্থ হলে স্বাস্থ্যবিভাগ এমন হৈ-চৈ সুরু করে ভেজাল তেল আটকের ফতোয়া জারী করে যে, বুদ্ধিমান ব্যবসায়ীরা রাতারাতি সুযোগ পেয়ে সমস্ত সরিষার তেল সরিয়ে ফেলে। এ ছাড়া পৌরসভার যে বিভাগের উপর ভেজাল প্রমাণ করার দায়িত্ব রয়েছে তারা যে নিতান্ত দায়িত্বজ্ঞানহীনতার পরিচয় দিয়েছে তার প্রমাণ মেলে একটি ঘটনায় ঃ তারা এতোদিন কোনো কিছুই করে নি। কেন করে নি—তার জবাবদিহি, আশা করা যায়, পৌরসভা অবশ্যই গ্রহণ করবেন। সঙ্গে সঙ্গে এ কথাও বলা দরকার যে, পৌর লেবোরেটারীর সংখ্যা যতই কম হোক না কেন—ব্যবসায়ীদের মিলে বা দোকানে আকস্মিক উপস্থিত হয়ে সেই তেল পরীক্ষা করতে বাধা ছিল কোন্ আইনে? এবং কেনই বা তা করা হয় নি? সম্ভবত সেখানেও দুর্নীতির সন্ধান মিলবে।

যারা সরিষার তেলের ডীলার, তারা কেউই সরকারের অপরিচিত নয় এবং কিছুমাত্র আন্তরিকতা থাকলে ভেজাল তেল কোথা থেকে এবং কিভাবে আসছে, তা খুঁজে বার করা সরকারের পুলিশ বিভাগের পক্ষে মোটেও কঠিন কাজ হবে না আমরা চাই—রাজ্য সরকারের স্বাস্থ্য ও পুলিশ দপ্তর অবিলম্বে যুক্তভাবে ও কঠোরতার সঙ্গে ভেজাল-বিরোধী অভিযান সুরু করুন। আগে থেকে তৎপর হলে অপরাধী ডীলারদের আড়তে হানা দিয়ে অনেক কাজ হত, কিন্তু এখন আড়তগুলি সাবধান হয়ে গেছে। তবে পি. ডি. এ্যাক্টের নির্মম প্রয়োগে অনেকটা কাজ এখনো হতে পারে।

রাজ্য সরকার কতদূর কি করছেন আমরা তা সাগ্রহে লক্ষ্য রাখছি।

সম্পাদকীয়

আজকের মানুষ

কোনো কোনো শিল্পব্যবসার ক্ষেত্রের মতো তেমনি জাতির জনক গান্ধীজীর ওপরেও কি বিড়লারা একচেটিয়া কর্তৃত্ব স্থাপন করেছেন? নয়াদিল্লীর ছাত্ররা এই প্রশ্নই তুলেছেন। শুধু ছাত্রদের নয়, শশিভূষণ সমগ্র জাতিকে উদ্বুদ্ধ করেছেন একটি মূল জিজ্ঞাসা নিয়ে : যেখানে শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করে গান্ধীজী জায়গাটি পবিত্র করে গিয়েছেন, তাকে জাতীয় সম্পদে, জাতীয় স্মৃতিমন্দিরে পরিণত করা হবে না কেন, তাকে ব্যক্তিগত খেয়াল-খুশি মাফিক ব্যবহারের জন্য ছেড়ে দেওয়া হবে কেন? নয়াদিল্লীর যে বিড়লাভবনে ১৯৪৮ সনের ৩০শে জানুয়ারী আততায়ীর গুলীতে বিদ্ধ হয়ে মহাত্মা গান্ধী মহাপ্রয়াণে গিয়েছিলেন তাকে জাতীয় সম্পত্তিতে পরিণত করার দাবি নিয়ে লোকসভার সদস্য শ্রীশশিভূষণ অনশন সুরু করেছিলেন।

অথচ শশিভূষণ বিরুদ্ধে কোন দল-ভুক্ত সদস্য নন, কিম্বা নাম-কাটা সেপাইও তিনি নন; কংগ্রেসীদের তিনি সগোত্র, কংগ্রেসের টিকিটেই তিনি মধ্যপ্রদেশের ইন্দোরস্থ পশ্চিম নিমার কেন্দ্র থেকে লোকসভার সদস্য নির্বাচিত হয়েছিলেন। তবে হ্যাঁ, শশিভূষণকে কংগ্রেস থেকে বার করে দেওয়ার রবও ছুৎমার্গীরা তুলেছেন।

কিন্তু বিড়লাভবনকে জাতীয় সম্পত্তিতে রূপান্তরিত করার দাবিকে শশিভূষণ কংগ্রেসের বিরুদ্ধাচরণের সমান্তরাল বলে মনে করতে পারেন নি, বরঞ্চ তিনি তাঁর ব্যক্তিগত দাবিকে জাতীয় দাবিতে উত্তরণ করতে চেয়েছেন। তাই তিনি কংগ্রেসী হয়েও জাতির এ-জরুরী প্রয়োজন নিয়ে মাথা ঘামাতে দ্বিধা করেন নি।

শশিভূষণের চরিত্রের এ-বিশিষ্টতা কিন্তু আজই প্রথম প্রকাশ পেলো না, বরং বলা যেতে পারে ওই চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য নিয়েই শশিভূষণ বালক বয়সে কংগ্রেসে যোগদান করেছিলেন। দেশীয় রাজ্য গোয়ালিয়রে চল্লিশ বছর আগে শশিভূষণের জন্ম। স্বাধীনতা আন্দোলনে অংশ গ্রহণ করার অপরাধে শশিভূষণকেও বিস্তর হুজ্জত পোহাতে হয়েছিলো, হলেনই বা তিনি কিশোর-মাত্র। এই কিশোরকে সেদিন যাঁরা কাসুর সাব জেলে দেখেছিলেন রাজবন্দী হিসেবে, সেদিন বিস্ময়ে সকলে অবাক হয়ে গিয়েছিলেন, বৃটিশরাজ এই বালককেও ভয় করেন। রাজবন্দীদের মধ্যে শশিভূষণই ছিলেন সেদিন

শ্রীশশিভূষণ

কনিষ্ঠতম। কিন্তু দেশবাসীর বিস্ময় প্রকাশে বৃটিশ শাসকের রক্তচক্ষু শান্ত হয় নি, শশিভূষণের কারাবাস পাকা করার জন্যে তাঁকে লাহোর সেন্ট্রাল জেলে স্থানান্তরিত করা হলো।

মুক্তি পাবার পর তরুণ শশিভূষণ দ্বিগুণ উৎসাহ নিয়ে সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়লেন। সীমান্তগান্ধী আবদুল গফুর খানের সংস্পর্শে এসে শশিভূষণের বুকের ভেতরে যে-আগুন ছিল তার দাহিকাশক্তি আরো বেড়ে গেলো। তাঁর রাজনীতিক দীক্ষা ও শিক্ষা যেমন শক্ত ভিত্ খুঁজে পেলো, তেমনি তাঁর মধ্যে সীমান্তগান্ধী সযত্নে পুঁতে দিলেন অন্যায়ের সঙ্গে আপোষহীনতার বীজ।

তাই শশিভূষণ কংগ্রেসের কেবল হাত-তোলা সমর্থকমাত্র হয়ে থাকতে পারেন নি, পার্লামেন্টে নীরব শ্রোতার ভূমিকা তাঁর জন্যে নয়, যে-কোনো জাতীয় প্রশ্নে উচ্চগ্রামের কণ্ঠ শুনলে মাননীয় সদস্যরা বুঝতে পারেন সোচ্চার হয়ে উঠেছেন কে। অন্যায়ের সঙ্গে আপোষ তিনি করতে পারেন না, তাই তাঁকে বিবেকের তাড়নায় কংগ্রেস হাই কম্যাণ্ডের সুস্পষ্ট নির্দেশের বিরুদ্ধে বিতর্কে অংশ গ্রহণ করতে দেখা যায়। তখন তিনি নবীন তুর্কী।

অর্থাৎ সাধারণের চোখে দলের অমর্যাদা ঘটে, শশিভূষণের তা কখনই অভিপ্রেত নয়। তিনি চান প্রতিক্রিয়াশীলতা, সঙ্কীর্ণতা এবং অন্তর্কলহের পাপপঙ্ক থেকে গান্ধীজীর কংগ্রেসকে উদ্ধার করতে, পৃথিবীর পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে কংগ্রেসের নবীন যাত্রায় সহায়ক হতে। দলের মধ্যে প্রগতিশীলতার প্রতিষ্ঠা দিয়ে তিনি কংগ্রেসকেই পুনরুজ্জীবিত করতে চান। তাই তাঁকে দেখা যায় রাজন্যবর্গের ভাতা দানের বিরুদ্ধে জ্বালাময়ী ভাষণ দিতে, ব্যাঙ্ক জাতীয়করণের সপক্ষে অকাট্য যুক্তিজাল বিস্তার করতে, একচেটিয়া পুঁজির বিরুদ্ধে বিষোদ্গার করতে। স্বভাবতই কংগ্রেসের প্রাচীনপন্থী 'ওল্ডগার্ড'রা তাঁর ওপর চটেছেন। কিন্তু তিনি নাচার, দল তাঁর প্রাণাধিক প্রিয় ঠিকই, কিন্তু জাতি দলের চেয়েও বড়ো।

শশিভূষণকে নিয়ে কংগ্রেস হাই কম্যাণ্ডের দুশ্চিন্তার সীমা নেই। তিনিই একমাত্র কংগ্রেস এম-পি যিনি লোকসভার সদস্য নির্বাচিত হবার দু' বছরের মধ্যে পুলিশের হাতে গ্রেপ্তার হন। অবশ্য সেই একই সাধারণ মানুষের মৌলিক দাবির প্রশ্নে। গত বছর উত্তরপ্রদেশের বিলাসপুরের হরিজনরা যখন দুর্বৎসরে তকাভি ঋণ আদায়ের বিরুদ্ধে আন্দোলনে নামেন, তখন তাতে শশিভূষণও নেতৃত্ব দিয়েছিলেন।

বয়সে যেমন শশিভূষণ এখনো তরুণ, তারুণ্যের দীপ্তি তাঁর মুখে-চোখেও। তাঁর কাজকর্মের মধ্যেও তেমনি সুবোচিত ছাপ। বিশ্ব যুব ফেডারেশনে ভারতের প্রতিনিধি হিসেবে তিনি ভিয়েনা গিয়েছিলেন, এবার তাঁকে যেতে হচ্ছিলো সোফিয়া।

কিন্তু বিড়লাভবনকে গান্ধী শতবার্ষিকীর বছরে জাতীয় সম্পত্তিতে রূপান্তরিত করার দাবি কেবল যুবকদেরই নয়, তবে যুবকদের তিনি কর্মচঞ্চল করে তুলেছেন। তাঁর দাবির সমর্থনে এগিয়ে এসেছেন দলমত নির্বিশেষে সকল শ্রেণীর লোক, গঠিত হয়েছে সর্বদলীয় কমিটি, কংগ্রেসের নামজাদা নেতারাও যার মর্যাদা বৃদ্ধি করেছেন। এই কমিটির অনুরোধ এবং সর্বসম্মত প্রস্তাবেই শশিভূষণ শেষ পর্যন্ত অনশন ভঙ্গ করেছেন। তাঁর উদ্দেশ্য পূর্ণ সার্থকতা লাভ করেছে, একটা জরুরী প্রশ্নে তিনি জাতিকে উদ্বুদ্ধ করতে চেয়েছিলেন, জাতি আজ প্রয়োজনের ব্যাপারে উত্থিত ও জাগ্রত, সজাগ ও সতর্ক।

[পূর্ব-প্রকাশিতের পর]

(আইন অমান্য আন্দোলনে)

ব্রমেশচন্দ্র রাগচী—উকিল (চৌপাই নওয়াবগঞ্জ), রজনীকান্ত সান্যাল (নওগাঁ), সুধাংশু (চেরু) চৌধুরী, গোরা মৈত্র, সুরেন্দ্রচন্দ্র দাস, বীরেশ্বর চক্রবর্তী, সুশীলচন্দ্র ধাড়া (মেদিনীপুর), ঝাড়েশ্বর মাঝি (মেদিনীপুর), সতীশচন্দ্র সামন্ত (মেদিনীপুর)।

১৯৩০ সন—বহরমপুর জেল। (বিনা বিচারে আটক)।

প্রতুলচন্দ্র গাঙ্গুলী, ত্রৈলোক্যনাথ চক্রবর্তী, কেদারেশ্বর সেন।

১৯৩০—৩১ সন—বক্সা ক্যাম্প জেল। (বিনা বিচারে আটক)।

প্রফেসার জ্যোতিষচন্দ্র ঘোষ, ত্রৈলোক্যনাথ চক্রবর্তী, প্রতুলচন্দ্র গাঙ্গুলী, রবীন্দ্রমোহন সেনগুপ্ত, রমেশচন্দ্র আচার্য, জ্ঞানেন্দ্রচন্দ্র মজুমদার, সুরেন্দ্রমোহন ঘোষ, আনন্দচন্দ্র মজুমদার, পূর্ণচন্দ্র দাস, পঞ্চানন চক্রবর্তী, অমলেন্দু দাশগুপ্ত, ফণিভূষণ মজুমদার, বিপিনচন্দ্র গাঙ্গুলী, ভূপতি মজুমদার, হেমচন্দ্র ঘোষ, অনিলচন্দ্র রায়, ভূপেন রক্ষিত, সত্যরঞ্জন বক্সী, সত্য গুপ্ত, জ্যোতিষচন্দ্র জোয়ারদার, মদনমোহন ভৌমিক, তরণীভূষণ সোম, চিরঞ্জীব মিশ্র, স্বদেশরঞ্জন নাগ, চারু রায়, রবি বসু, দুর্গেশ ভট্টাচার্য, মনোরঞ্জন গুপ্ত, ভূপেন দত্ত, অরুণচন্দ্র গুহ, প্রভাতচন্দ্র চক্রবর্তী, নরেশচন্দ্র সোম, অমূল্যচন্দ্র অধিকারী, রাখালচন্দ্র ঘোষ, দক্ষিণারঞ্জন মিত্রমজুমদার, শ্যামানন্দ সেন, ক্ষিতীশচন্দ্র বসু, পৃথ্বীশচন্দ্র বসু, প্রতুলচন্দ্র ভট্টাচার্য, ক্ষিতীশচন্দ্র ব্যানার্জী, বঙ্কিমচন্দ্র মুখার্জী, কালী সেন, আব্দুল রেজ্জাক, আল্লাব উদ্দিন আহম্মদ চৌধুরী, নিতাই কুণ্ডু, সুকুমার ভৌমিক (আগরতলা), প্রতাপচন্দ্র রক্ষিত (চট্টগ্রাম) শ্যামাচরণ বিশ্বাস (চট্টগ্রাম), যশোদারঞ্জন চক্রবর্তী (চট্টগ্রাম), কবিরাজ যতীন রক্ষিত (চট্টগ্রাম) অতীন্দ্রমোহন রায় (কুমিল্লা), অমূল্য মুখার্জী (কুমিল্লা), মণীন্দ্র চক্রবর্তী (কুমিল্লা), ব্রজেন্দ্র চক্রবর্তী (কুমিল্লা), রবি ভট্টাচার্য (কুমিল্লা), মাখনচন্দ্র পাল (নোয়াখালী), প্রতুলচন্দ্র চৌধুরী (নোয়াখালী), শান্তিময় দত্ত (নোয়াখালী), শুভময় শূর (নোয়াখালী), সুখময় চক্রবর্তী (নোয়াখালী), সন্তোষ চক্রবর্তী (নোয়াখালী), রসময় শূর (নোয়াখালী) দেবেন্দ্রনাথ ঘোষ (বরিশাল), দেবকুমার (মনা) ঘোষ (বরিশাল), যতীন (ফেগু) রায় (বরিশাল), নরেন দাস (বরিশাল), রঞ্জিৎ সরকার (বরিশাল), নলিনীকান্ত দাশগুপ্ত (বরিশাল), ধূর্জটি নাগ (বরিশাল), অমর বসু (কলিকাতা) ধীরেন মুখার্জি (কলিকাতা), হরিকুমার চক্রবর্তী (কলিকাতা), গোবিন্দ ব্যানার্জি (খুলনা), নারায়ণ চ্যাটার্জি (খুলনা), কিরণচন্দ্র মুখার্জি (খুলনা), ইন্দ্রচন্দ্র নারাং (লাহোর), নিরঞ্জন সেন (বরিশাল), অরলা কর (বরিশাল), প্রভাসচন্দ্র লাহিড়ী (রাজসাহী), সুধাংশু (চেরু) চৌধুরী (রাজসাহী), প্রভাতকুসুম ভাদুড়ী (রাজসাহী), নলিনী বাগচী (জলপাইগুড়ি), প্রফুল্লচন্দ্র ত্রিপাঠী (জলপাইগুড়ি), প্রতাপচন্দ্র মজুমদার (হিলী, বগুড়া), কেদারেশ্বর সেন (ফরিদপুর), সরল সেন (ফরিদপুর), সন্তোষ দত্ত (ফরিদপুর), সতীশচন্দ্র পাকড়াশী (ঢাকা), মাখন দত্ত (ঢাকা), ডাঃ গুরুগোবিন্দ রায় (ঢাকা), পূর্ণানন্দ দাশগুপ্ত (ঢাকা), সুরপতি চক্রবর্তী (ঢাকা), অমর ব্যানার্জি (ঢাকা), জীবনলাল চ্যাটার্জি (ঢাকা), বীরেন্দ্রচন্দ্র গাঙ্গুলী (ঢাকা), গোপাল গুপ্ত (ঢাকা), সতীন্দ্র রায় (ঢাকা), সুশীল সরকার (ঢাকা), ভবেশচন্দ্র নন্দী (ঢাকা), বিমল নন্দী (ঢাকা), অমল নন্দী (ঢাকা), সুধীর নন্দী (ঢাকা), মণীন্দ্র রায় (ঢাকা), উমাপদ চক্রবর্তী (ঢাকা), তারাপদ চক্রবর্তী, কৃষ্ণপদ চক্রবর্তী (ঢাকা), জগদীশ চক্রবর্তী (ঢাকা), পরিমল ভট্টাচার্য (ঢাকা), সুধীর কুশারী (ঢাকা), সুখময় চাকলাদার (ঢাকা), সুশীলচন্দ্র দেব (রংপুর), ক্ষিতীশচন্দ্র দেব (রংপুর), পরেশচন্দ্র গুহ (রংপুর), অমর চক্রবর্তী (চট্টগ্রাম), যামিনী পাল (কুমিল্লা), জগদীশ চ্যাটার্জি (বরিশাল), ত্রিদিব চৌধুরী (ঢাকা) (বহরমপুর), মিহির মুখার্জি, ননী ভট্টাচার্য (বহরমপুর), অমিয় সান্যাল (ময়মনসিংহ), জ্ঞানাঞ্জন নিয়োগী (ময়মনসিংহ), ফণী আচার্য (ময়মনসিংহ), সৌরভ ঘোষ, ব্রজেন্দ্রব্রহ্ম, রেবতী বর্মণ (ময়মনসিংহ), দেবব্রত (দেবু) রায় (ময়মনসিংহ), অমূল্য লাহিড়ী (লাহিড়ী মোহনপুর পাবনা), জলপেশ লাহিড়ী (লাহিড়ী মোহনপুর পাবনা), সুরেন রায় (নওগাঁ, রাজসাহী), রণেন গোস্বামী (নওগাঁ, রাজসাহী)।

১৯৩১—৩২ সন, কেনান্দুর জেল—মধ্য প্রদেশ। (রাজবন্দী)।

প্রতুলচন্দ্র গাঙ্গুলী, রবীন্দ্রমোহন সেন, রমেশচন্দ্র আচার্য, ত্রৈলোক্যনাথ চক্রবর্তী।

আইন অমান্য বন্দী—(কংগ্রেস)

কে পি রামন মেনন, (কংগ্রেস মন্ত্রী হইয়া ভেল্লোর জেলে আমাদের সহিত দেখা করিয়াছিলেন) কর্ণাটক সদাশিব রাও, গোবিন্দ মেনন, শঙ্কর নাম্বুদ্রিপাদ (বর্তমান কম্যুনিস্ট নেতা), এ কে গোপালন (বর্তমান কম্যুনিস্ট

নেতা), কৃষ্ণ পিল্লে, দামোদর মেনন, মাধব মেনন ইত্যাদি।

১৯৩২ সন—ত্রিচিনপল্লী জেল।
ঠৈলোক্যনাথ চক্রবর্তী, রবীন্দ্রমোহন সেন, প্রতুলচন্দ্র গাঙ্গুলী।

১৯৩৩—৩৫ সন ভেলোর জেল। (রাজবন্দী)।
ত্রৈলোক্যনাথ চক্রবর্তী, প্রতুলচন্দ্র গাঙ্গুলী, রবীন্দ্রমোহন সেন, রমেশচন্দ্র আচার্য।
আইন অমান্য কংগ্রেস বন্দী
প্রোফেসার এন জি রঙ্গ, লিঙ্গ রাজু (অন্ধ্র), নারায়ণ মেনন (মালাবার মোপলা বিদ্রোহ নেতা, যাবজ্জীবন কারাদণ্ড), কমলনাথ তেওয়ারী (কাঁকড়ী ষড়যন্ত্র মামলায় যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর দণ্ড)।

১৯৩৫—৩৭ সন হিজলী জেল। (বিনা বিচারে আটক)।
প্রোঃ জ্যোতিষচন্দ্র ঘোষ (হুগলী), ভূপতি মজুমদার (হুগলী), ত্রৈলোক্যনাথ চক্রবর্তী (ময়মনসিংহ), সুরেন্দ্রমোহন ঘোষ (ময়মনসিংহ), প্রতুলচন্দ্র ভট্টাচার্য (ময়মনসিংহ), পূর্ণচন্দ্র দাস (ফরিদপুর), প্রতুলচন্দ্র গাঙ্গুলী (ঢাকা), রবীন্দ্রমোহন সেনগুপ্ত (ঢাকা), ভূপেন্দ্রকিশোর রক্ষিত (ঢাকা), সত্যরঞ্জন গুপ্ত (ঢাকা), জীবনলাল চ্যাটার্জি (ঢাকা), রমেশচন্দ্র আচার্য—(ঢাকা), রসিকলাল দাস (খুলনা), অরুণচন্দ্র গুহ (বরিশাল), মনোরঞ্জন গুপ্ত (বরিশাল), ভূপেন দত্ত (যশোহর)।

১৯৩৯ সন—চট্টগ্রাম জেল—(এক বৎসর দণ্ডিত)।
আশ্রাফ উদ্দিন আহম্মদ চৌধুরী (কুমিল্লা), ত্রৈলোক্যনাথ চক্রবর্তী (ময়মনসিংহ)।

১৯৩৯ সন—ঢাকা সেণ্ট্রাল জেল—
আশ্রাফ উদ্দিন আহম্মদ চৌধুরী, ত্রৈলোক্যনাথ চক্রবর্তী।

১৯৪০ সন—মেদিনীপুর সেণ্ট্রাল জেল—(দণ্ডিত)।
ডঃ প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ, নিকুঞ্জ মাইতি, কমলকৃষ্ণ রায়, মিহিরলাল চ্যাটার্জি, কুমারচন্দ্র জানা, ত্রৈলোক্যনাথ চক্রবর্তী।

১৯৪২ সন—ঢাকা সেণ্ট্রাল জেল—বিনা বিচারে আটক।
(এই সময় ঢাকা সেণ্ট্রাল জেলে গুণ্ডা সিকিউরিটিদের উপর গুলী চালান হয় এবং ফজলুল হক সাহেব জেলে অনুসন্ধান করিতে যান এবং বিনা বিচারে আটক রাজবন্দীদের সহিত দেখা করেন।)
ত্রৈলোক্যনাথ চক্রবর্তী, প্রতুলচন্দ্র গাঙ্গুলী, রবীন্দ্রমোহন সেন, রমেশচন্দ্র আচার্য, জ্ঞানেন্দ্রচন্দ্র মজুমদার, সুরেন্দ্রমোহন ঘোষ, শ্যামানন্দ সেন, পূর্ণচন্দ্র দাস, প্রফুল্ল চ্যাটার্জি, ভবেশচন্দ্র নন্দী, রবি বসু, চিরঞ্জীব মিশ্র, স্বদেশরঞ্জন নাগ, দেবেন্দ্রনাথ ঘোষ, দেবকুমার ঘোষ (মনা ঘোষ), অমূল্য মুখার্জি, মণীন্দ্র চক্রবর্তী, নিরুপম কুশারী, উমাপদ চক্রবর্তী, তারাপদ চক্রবর্তী, রাখাল ঘোষ, মাখন দত্ত, সত্য গুপ্ত, রমেশচন্দ্র ঘোষ।

১৯৪৪—৪৬ সন—দমদম জেল—(বিনা বিচারে আটক)।
প্রোফেসার জ্যোতিষচন্দ্র ঘোষ, বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী, প্রতুলচন্দ্র গাঙ্গুলী, রবীন্দ্রমোহন সেন, রমেশচন্দ্র আচার্য, ত্রৈলোক্যনাথ চক্রবর্তী, ভূপতি মজুমদার, জ্ঞানেন্দ্রচন্দ্র মজুমদার, সুরেন্দ্রমোহন ঘোষ, শ্যামানন্দ সেন, পূর্ণচন্দ্র দাস, ভবেশচন্দ্র নন্দী, পঞ্চানন চক্রবর্তী, মিহির মুখার্জি, হ্রিদিব (ঢাকু) চৌধুরী, অমূল্যচন্দ্র অধিকারী, নরেশচন্দ্র সোম, ধনঞ্জয় কর, রাম মজুমদার, হরেন্দ্র রায় (দক্ষিণ চাতরা), অতীন্দ্রমোহন রায়, অমূল্য মুখার্জি, মণীন্দ্র চক্রবর্তী, শান্তিময় দত্ত, মাখন পাল, কেদারেশ্বর সেনগুপ্ত, বিনয়জীবন ঘোষ (মেদিনীপুর), ধীরেন্দ্রনাথ মুখার্জি, হরিকুমার চক্রবর্তী।

মহাত্মা গান্ধী হিজলী ও প্রেসিডেন্সী জেলে যাঁহাদের সহিত আলাপ করিয়াছিলেন

(১) প্রোঃ জ্যোতিষচন্দ্র ঘোষ (হুগলী) (২) ত্রৈলোক্যনাথ চক্রবর্তী (ময়মনসিংহ) (৩) প্রতুলচন্দ্র গাঙ্গুলী (ঢাকা) (৪) রমেশচন্দ্র আচার্য (ঢাকা) (৫) রবীন্দ্রমোহন সেনগুপ্ত (ঢাকা) (৬) সুরেন্দ্রমোহন ঘোষ (ময়মনসিংহ) (৭) পূর্ণচন্দ্র দাস (মাদারীপুর) (৮) ভূপতি মজুমদার (হুগলী) (৯) সত্যরঞ্জন গুপ্ত (ঢাকা) (১০) মনোরঞ্জন গুপ্ত (বরিশাল) (১১) জীবনলাল চ্যাটার্জী (ঢাকা) (১২) ভূপেন্দ্রকিশোর রক্ষিত (ঢাকা) (১৩) প্রতুলচন্দ্র ভট্টাচার্য (ময়মনসিংহ) (১৪) রসিকলাল দাস (খুলনা) (১৫) ভূপেন দত্ত (যশোহর) (১৬) অরুণ গুহ (বরিশাল)।

ভারতবর্ষের সর্বত্র বিপ্লব দলের ধ্বংসাত্মক কাজ চলিতেছিল, জাতীয় কংগ্রেস আন্দোলনও জোরে চলিতেছিল, তখন ভারত গভর্নমেণ্ট চেষ্টা করিয়াছিলেন, মহাত্মা গান্ধীর মাধ্যমে বিপ্লবীদের মনের পরিবর্তন করিতে। ১৯৩৫ সন বাংলার বিপ্লবী নেতাদিগকে ভারতের বিভিন্ন জেল হইতে মেদিনীপুর জিলার অন্তর্গত হিজলী জেলে একত্র করা হয়। মহাত্মা গান্ধীর আগমন সংবাদ আমরা পূর্বেই পাইয়াছিলাম। মহাত্মা গান্ধীকে সাদরে অভ্যর্থনা করার জন্য আমরা প্রস্তুত ছিলাম। তাঁহার বসার স্থান ফুল দিয়া সাজান হইল, ফুলের তোড়া তৈয়ার করা হইল। তিনি নির্দিষ্ট সময়ে হিজলী জেলে উপস্থিত হইলেন, আমরা সকলে দণ্ডায়মান হইয়া তাঁহাকে অভ্যর্থনা করিলাম। তিন ঘণ্টা আলাপ-আলোচনা হইল, সেখানে জেলের কোন কর্মচারী উপস্থিত ছিল না। মহাত্মা গান্ধী চাহিয়াছিলেন আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে আমাদের মতের পরিবর্তন করা। তিনি চাহিয়াছিলেন, আমরা যেন হিংসানীতি পরিত্যাগ করিয়া মহাত্মা গান্ধীর অহিংস নীতিতে বিশ্বাসী হইয়া দেশের স্বাধীনতার কাজে অগ্রসর হই। বিপ্লবীরা যদিও মহাত্মা গান্ধীর অহিংস নীতিতে বিশ্বাসী ছিলেন না, তবুও তাঁহারা মহাত্মা গান্ধীর অহিংস সংগ্রামে যোগদান করিয়াছেন, খাঁটি সত্যাগ্রহীর ন্যায় পুলিশের লাঠিচার্জের সম্মুখীন হইয়াছেন, কোনপ্রকার দুর্বলতা দেখান নাই বা হিংসা প্রকাশ করেন নাই। তাঁহারা বিশ্বাস করিতেন মহাত্মার অহিংস আন্দোলন দেশকে স্বাধীনতার পথে অগ্রসর করিবে। মহাত্মা গান্ধী বলিয়াছিলেন, আমরা যদি এই প্রতিশ্রুতি দেই (মৌখিক) হিংসায় আমাদের বিশ্বাস নাই, আমরা অহিংস নীতিতে বিশ্বাসী, তবে মহাত্মা গান্ধী আমাদের মুক্তির জন্য গভর্নমেণ্টকে সুপারিশ করিবেন এবং আশা করা যায়, গভর্নমেণ্ট সকল রাজনৈতিক বন্দীদিগকে মুক্তি দিবেন। বিপ্লবীরা অহিংস নীতিতে বিশ্বাসী নন। তাঁহারা মনে করেন স-শস্ত্র বিপ্লব দ্বারাই ভারতের স্বাধীনতা আসিবে। বিপ্লবী নেতারা মহাত্মা গান্ধীর সহিত এক মত হইতে পারিলেন না। মহাত্মা গান্ধী আমাদের নিকট হইতে বিদায় লওয়ার সময় বলিলেন, "ইহার পর আমি আবার তোমাদের এখানে আসিয়া তিন দিন তোমাদের সহিত একত্র থাকিব এবং তোমাদিগকে আমার মতে আনিব।" মহাত্মা গান্ধীর সহিত সকলেই খুব সম্মানের সহিত আলাপ-আলোচনা করিয়াছেন। ইহার কয়েক মাস পর আমরা সংবাদ পাইলাম, মহাত্মা গান্ধী আমাদের সহিত দেখা করিবেন। এযাত্রা তিনি হিজলী আসিতে পারিবেন না, তিনি অসুস্থ, প্রেসিডেন্সী জেলে দেখা করিবেন। আমাদিগকে প্রেসিডেন্সী জেলে (কলিকাতা) স্থানান্তরিত করা হইল।

প্রেসিডেন্সী জেলে বেলা ৩টার সময় মহাত্মা গান্ধীর সহিত আমাদের আবার দেখা হইল, আলাপ-আলোচনা সুরু হইল। আলাপ-আলোচনায় কেহ কাহাকেও স্ব-মতে আনিতে পারিলেন না; প্রত্যেকেই নিজ নিজ মতে অটল রহিলেন। মহাত্মা গান্ধীর সঙ্গে দুই ঘণ্টা আলাপ হইয়াছিল। মহাত্মা গান্ধী হাসিমুখেই বিদায় লইলেন।

কারা সংস্কার

আমি জেলখানায় জেল রিফর্ম সম্বন্ধে লিখিয়াছিলাম। আমি আন্দামান, ব্রহ্মদেশ ও ভারতের বিভিন্ন জেলে ছিলাম। আমি তৃতীয় শ্রেণীর করেদী, হিসাবে সাধারণ করেদীর সঙ্গে বহু বৎসর কাটাইয়াছি, আমি দ্বিতীয় শ্রেণীর করেদী ছিলাম, আমি সিকিউরিটী বন্দী ছিলাম, আমি স্টেট্ প্রিজনার ছিলাম *। জেল কোডে যে সব দণ্ডের কথা লিখিত বা অলিখিত আছে, আমি বেত্রদণ্ড ব্যতীত সকল দণ্ডই ভোগ করিয়াছি। আমি রিগ্যারফেটার্স (বেত্রদণ্ডের পরিবর্তে দেওয়া হয়) বারফেটার্স (তাড়া বেড়ি) সিকলিস বেড়ি, খাড়া হাতকড়ি, পেছনে হাতকড়ি, মার ভাত, নির্জন সেল বাস প্রভৃতি সকল দণ্ডই ভোগ করিয়াছি, আমার জেলের সব রকম অভিজ্ঞতাই আছে। আমার লেখা "কারা সংস্কার" প্রবাসীতে বাহির করার জন্য শ্রদ্ধেয় রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের নিকট দিয়াছিলাম, তিনি ছাপাইতে রাজী হইয়াছিলেন, খাতা তাঁহার নিকটই ছিল। ইহার পর ১৯৪০ সনে আমি ধৃত হই, খাতার কোন খোঁজ লইতে পারি নাই, তাহার পর রামানন্দ-বাবুরও মৃত্যু হয়, আমার খাতাখানারও পঞ্চত্বপ্রাপ্তি হয়।

আমি এক সময় পূর্ববঙ্গে কালীচরণ মাঝি নামে পরিচিত ছিলাম। (জিতেন-চন্দ্র লাহিড়ী প্রণীত "নমামী" দ্রষ্টব্য) বিপ্লব যুগে বিপ্লবীরা অর্থ সমস্যা সমাধানের জন্য ডাকাতি করিত, ইহার দ্বারা সামরিক শিক্ষাও হইত। বিপ্লবীরা ডাকাতি করার সময় চোরের মত গৃহে প্রবেশ করিত না, তাহারা বিগল বাজাইয়া, বন্দুকের আওয়াজ করিয়া, গ্রামবাসীকে জাগাইয়া, গৃহের দরজা ভাঙিয়া লুণ্ঠন করিত। ঢাকা জিলার অন্তর্গত বাহাদুরাবাদ ডাকাতিই প্রমাণ। (জেলে ত্রিশ বছর ও ভারতের বিপ্লব সংগ্রাম দ্রষ্টব্য) জলপথে ডাকাতির জন্য বিপ্লব দলের বড় ঘাসি নৌকা থাকিত, বিপ্লবীরাই নৌকা চালাইত। ১৯১০।১১ সনে, আমার পলাতক অবস্থায়, আমি বিভিন্ন মামলার পলাতক আসামী ছিলাম, আমার নামে পাঁচ হাজার টাকা পুরস্কার ঘোষণা ছিল, আমি তখন ঘাসি নৌকার মাঝি। আমার সঙ্গে দলের অপর তিনজন মাঝি হিসাবে থাকিত, তাহাদের মধ্যে বীরেন্দ্র-নাথ চট্টোপাধ্যায় (ফতেজঙ্গপুর—ফরিদপুর) সতীশ দাশগুপ্ত (কুয়েরপুর—ফরিদপুর, বর্তমান স্বামী সত্যানন্দ)* থাকিতেন। পূর্ববঙ্গের যতগুলি বড় বড় নদী আছে, আমি সব নদীতেই নৌকা চালাইয়াছি, আমি ঢাকা হইতে বরিশাল গিয়াছি, নোয়াখালী গিয়াছি, বর্ষাকালে ঝড়-বৃষ্টির দিনে পদ্মানদী পাড়ি দিয়াছি। আবার সময় সময় নৌকা নিরাপদ স্থানে ডুবাইয়া রাখিয়া ভদ্রলোক সাজিয়াছি। আমি ঐ সময় পলাতক অবস্থায়, মাণিকগঞ্জ মহকুমার অন্তর্গত গড়পাড়া মাইনর স্কুলে হরেন্দ্র চক্রবর্তী নামে কিছুদিন হেডমাস্টারী করিয়াছি, গড়-পাড়ার জমিদারপুত্র অশ্বিনী ঘোষ আমা-দের দলের সভ্য ছিল। (জেলে ত্রিশ বছর ও ভারতের বিপ্লব সংগ্রাম দ্রষ্টব্য)

গীতা ভাষ্য

আমি ১৯৩১ সনে বাক্সা ক্যাম্প জেলে গীতা ভাষ্য লিখি। ১৯৩৮ সনে ঢাকার রাজনৈতিক কর্মী শ্রীতরণী সোম আমার গীতা ভাষ্য "গীতায় স্বরাজ" নামে চারি অধ্যায়ে প্রথম খণ্ড প্রকাশ করে। ১৯৪০ সনে ধৃত হওয়ার পর বিভিন্ন জেলে গীতার বাকী অধ্যায়গুলির ব্যাখ্যা করি। আমি জেলে বহু লোকের গীতা ভাষ্য পড়িয়াছি, সকলেই নিজ নিজ মত গীতা ভাষ্যে ব্যক্ত করিয়াছেন, আমিও আমার মত গীতা ভাষ্যে প্রকাশ করিলাম। আমি গীতার রাজনৈতিক ব্যাখ্যা করিলাম। গীতার উৎপত্তি কোন্ সময়? যুদ্ধক্ষেত্রে উভয়পক্ষের সৈন্য সমাবেশ হইয়াছে, যুদ্ধ আরম্ভ হওয়ার আর বেশি বাকী নাই, তখন অর্জুনের মনে এই প্রশ্ন জাগিল, এই যুদ্ধে বহু লোকক্ষয় হইবে, ভারত বীরশূন্য হইবে, এখন এই যুদ্ধ করা উচিত কি অন্যায়। শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে যুদ্ধে নিযুক্ত করার জন্যই গীতার উপদেশ দিলেন। গীতায় ভক্তিতত্ত্ব আছে, জ্ঞানতত্ত্ব আছে, কর্ম-সন্ন্যাস আছে, উপনিষদ-সাংখ্য সব কিছুই আছে; সর্বত্র ব্রহ্মানুভূতি আছে কিন্তু গীতার ভগবান এই কথা ভুলেন নাই যে স্ব-রাজ্যভ্রষ্ট পার্থের পিতৃরাজ্য উদ্ধারের চাইতে প্রথম ও প্রধান বড় আর কোন কাজই নাই; জ্ঞানের কথা আছে, যোগ ভক্তির কথা আছে; বিশ্বাত্মিক যে ভগবান তাঁহার কথা আছে কিন্তু অর্জুনের কাছে "অতএব যুদ্ধ কর" ইহাই প্রধান কথা। জ্ঞান ভক্তির ভাণ্ডার উজাড় করিয়া যোগ-মার্গ বিশ্লেষণ করিয়া ভূমার সন্ধান দিলেন; কিন্তু ভুল হইল না; না বক্তার, না শ্রোতার—না গুরুর, না শিষ্যের, কাহারও এই ভুল হইল না, যে অর্জুন স্ব-রাজ্যভ্রষ্ট; সুতরাং অর্জুনের পক্ষে সর্বাগ্রে স্ব-প্রতিষ্ঠ হওয়াই শ্রেষ্ঠ ধর্ম—একমাত্র ধর্ম। কারণ এই হাজার উপ-দেশের পর, অর্জুন যে কার্যটি করিলেন তাহা যুদ্ধ—পৈতৃক রাজ্য পুনরুদ্ধারের জন্য যুদ্ধ, এবং স্বয়ং ভগবান এত উপ-দেশের পর কার্যত যাহা করিলেন তাহা ঐ যুদ্ধেরই নেতৃত্ব। অর্জুন গীতার উপদেশ শ্রবণ করিয়া যোগমার্গ অবলম্বন করত ধ্যানস্থ হইয়া বসিয়া থাকেন নাই, বা ভক্তিমার্গ অবলম্বনপূর্বক প্রেম বিতরণ করেন নাই। তিনি মোহ নষ্ট হইয়াছে বলিয়া পৈতৃক রাজ্যের পুনরুদ্ধারের জন্য যুদ্ধ করিলেন এবং যুদ্ধে জয়ী হইলেন। আমার গীতা ভাষ্য, অষ্টাদশ অধ্যায়, গীতায় স্বরাজ নামে, শ্রীগৌরাঙ্গ প্রেস হইতে শ্রীসুরেশচন্দ্র মজুমদার মহাশয় ১৯৫২ সনে প্রকাশ করেন। ১৯৬১ সনে আমার অনুরোধে শ্রীঅশোক-কুমার সরকার অবশিষ্ট গীতায় স্বরাজ—প্রায় পাঁচ শ' কপি "অনুশীলন ভবনকে" দান করেন। অনুশীলন ভবন—৩২।৮, চণ্ডী ঘোষ রোড—কলিকাতা ৪০।

সমাপ্ত

* অন্তরীণে আবদ্ধ ছিলাম।

সাপ্তাহিক বসুমতীর চাঁদার হার

সাপ্তাহিক বসুমতীর বাৎসরিক চাঁদা সডাক ১৮৲ টাকা, ষাণ্মাসিক ৯৲ টাকা ও ত্রৈমাসিক ৪·৫০ টাকা। প্রতি সংখ্যা ৩০ পঃ।

তিন মাসের কমে গ্রাহক করা হয় না। গ্রাহক হতে হলে আগিমে অগ্রিম টাকা জমা দিতে কিংবা মনি অর্ডারে টাকা পাঠাতে হবে।

—কর্মাধ্যক্ষ, বসুমতী

রঙ্গদর্শন

সরষের তেলে ভেজাল,
সর্বনাশা রোগের প্রকোপ,
২৮টি নমুনায় ৭টি ক্ষেত্রে
শেয়ালে কাঁটার বীজ।নিউ
ব্যারাকপুরে ত্রাসের রাজত্ব।
মধ্যশিক্ষা পর্ষদ এবং
রাজ্য শিক্ষাদপ্তরের দ্বৈত
শাসনে পঃবঙ্গে মাধ্যমিক
শিক্ষার নাভিশ্বাস।
কোচবিহারের হলদিবাড়ি
থানার বক্সীগঞ্জে পুলিশের
ত্রাসের রাজত্ব।
চব্বিশ ঘন্টার মধ্যে
শহরে তিনটি ছুরিকাহতের ঘটনা,
নয় সপ্তাহ পরেও উত্তরকণ্ঠ
স্বাভাবিক নয়। সাড়ে বারো
লক্ষ দুর্গত মানুষের জন্য মাথাপিছু
মাত্র ২২ টাকা ব্যয় ত্রাণ ও পুনর্বাসন
সচিবের স্বীকারোক্তি।
উত্তরপাড়ায় পঞ্চবার্ষিকের পুলিশের
নৃশংসতার প্রতিবাদ।

উত্তরবঙ্গের বন্যাত্রাণের জন্য কেন্দ্রীয় সাহায্যের অভাব হবে না একথা গোড়া থেকেই শোনা গিয়েছিল। প্রধানমন্ত্রী, অর্থমন্ত্রী, খাদ্যমন্ত্রী, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী প্রত্যেকেই এক-একবার হাওয়াই জাহাজ চেপে জলপাইগুড়ি বেড়িয়ে গেছেন এবং আশার বাণী শোনাতে কার্পণ্য করেন নি। কিন্তু নিছক বাণী ছাড়া আর কিছুই পাওয়া যায় নি। ভি, আই, পি-দের আনাগোনার বিরাম ছিল না, সরকারী খরচয় ইনটারেস্টিং ভ্রমণকার্য অনেকেই সম্পন্ন করেছেন, কিন্তু বন্যাক্লিষ্ট উত্তরবঙ্গের অধিবাসীদের ভাগ্য যেখানে ছিল সেখানেই আছে। পশ্চিমবঙ্গ সরকারও কেন্দ্রের দিকে আঙুল দেখিয়ে খালাস, নিজেরা সমর্থকর যেটুকু করতে পারতেন তাও করেন নি। একেবারে যে কিছু করা যেত না তা নয়; মনে আছে গত বছরে ত্রাণখাতে যুক্তফ্রন্ট সরকার তের কোটি টাকা বরাদ্দ করতে পেরেছিলেন। রাজ্যপালের সরকার কুড়ি কোটি টাকার একটা পরিকল্পনা নিয়েছেন, কিন্তু টাকাটা আর পাওয়া যাচ্ছে না। কেন্দ্র এখনো উপুড়-হস্ত করে নি। ইতিমধ্যে কেন্দ্রীয় সরকারের তরফ থেকে একটি সমীক্ষক দল এসেছিল। আমরা আগে লিখেছিলাম যে উড়িষ্যায় এই ধরনের সমীক্ষা চালিয়ে ওখানকার সরকার যা চেয়েছিলেন তার চেয়ে বেশি দিতে কুণ্ঠিত হন নি এবং সেটাও ঘটে গেছল অল্প দিনের মধ্যে। কিন্তু পশ্চিমবঙ্গে এসে তাঁরা তুরুপের তাস গ্রহণ করেছেন, তাঁরা সত্যই কি রিপোর্ট দিয়েছেন আপাতত ভগবান জানেন, কিন্তু লোকপরম্পরায় শোনা যাচ্ছে যে তারা নাকি সাড়ে বারো কোটি টাকা মঞ্জুর করার চিন্তা করছেন। এই টাকাটা উড়িষ্যায় প্রদত্ত টাকার চেয়ে অনেক কম, যদিও উড়িষ্যার বন্যার তুলনায় উত্তরবঙ্গের বন্যাজনিত ক্ষয়ক্ষতি শতগুণে বেশি। সমীক্ষক দলের সুপারিশ অনুযায়ী যদি সাড়ে বারো কোটি টাকাও পাওয়া যায় তা দিয়ে কিছুই করা যাবে না কেন না পশ্চিমবঙ্গ সরকার এই বিষয়ে যে পরিকল্পনা নিয়েছেন তার জন্য প্রয়োজন কুড়ি কোটি টাকার। কেন্দ্রীয় সরকার যে এই বিষয়ে কার্যত কিছু করতে অনিচ্ছুক তার প্রমাণ খয়রাতি সাহায্যের ক্ষেত্রে ব্যয় কর্তন। তাঁরা এই খাতে মাত্র এক কোটি টাকা মঞ্জুর করেছেন। যাঁরা সবকিছু হারিয়ে পথে এসে দাঁড়িয়েছেন, তাঁদের পুনরায় নিজেদের ওপর নির্ভর করে রুজি-রোজগার করে খেতে অনেক সময় লাগবে এবং খয়রাতি সাহায্য না দিলে তাঁদের অনাহারেই মৃত্যু হবে। অথচ এই সামান্য বরাদ্দ থেকে এটাই অনুমান করা যায় যে, বন্যাক্লিষ্ট মানুষগুলির প্রতি কোন মনুষ্যত্ববোধের পরিচয় দিতেই কেন্দ্র নারাজ। উত্তরবঙ্গের ত্রাণকার্য বস্তুতিকই একটা ছেলেখেলা পর্যায়ে এখনো পড়ে আছে। গৃহনির্মাণের জন্য দুশো-আড়াইশো করে টাকা দেওয়া হচ্ছে। ব্যাপারটা একান্তই হাস্যকর, শুধু হাস্যকরই নয় এই দেওয়া-টার মধ্য দিয়ে সরকারের যে মনোভাবের প্রতিফলন ঘটেছে সেটা নিশ্চয়ই কল্যাণ-রাষ্ট্রের পক্ষে অনুকূল নয়। গঞ্জিকা-প্রসাদাৎ-ও বোধ হয় কেউ আড়াইশো টাকায় গৃহনির্মাণের কথা ভাবতে পারে না. অথচ সরকার সেইরকম-ই ভেবেছেন। উত্তরবঙ্গের তীব্র শীতে কোন শীতবস্ত্রের যোগান নেই, দেড় মিটার মাপের যে তুলোর কম্বল দেওয়া হয়েছে তা দিয়ে এক-একটি পরিবারের কিভাবে শীতনিবারণ হবে তা ভাবতেই গায়ে কাঁটা দেয়। মাঠের পর মাঠ জমিতে পলি পড়ে সেগুলি চাষের অযোগ্য হয়ে আছে, একটি সুসংবদ্ধ পরিকল্পনা এরই বুকে সোনা ফলাতে পারে, কিন্তু কোন কিছু কাজই হয় নি। স্থানীয় ব্যবসায়ীদের পুনর্বাসনের জন্য ঋণ মঞ্জুরের ব্যবস্থা হয়েছে, কিন্তু তা এত সর্ত-কণ্টকিত যে সে ঋণ গ্রহণ করতে কেউই উৎসাহ পাচ্ছে না। বাস্তবিকই হৃদয়হীনতা ও অমানবিকতা উচ্চমহলে পরিব্যাপ্ত হয়েছে উত্তরবঙ্গের বন্যাত্রাণের ব্যাপারটি তারই জ্বলন্ত নিদর্শন।

গুলী ও হত্যা

রাজ্যপালের প্রশাসন পশ্চিমবঙ্গে গুলীবর্ষণ ও হত্যায় রেকর্ড স্থাপন করেছে। এটা আমাদের কথা নয়, কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র দপ্তরের বক্তব্য। ১৯৬৮ সালের পয়লা জানুয়ারী থেকে একত্রিশে অক্টোবর পর্যন্ত পশ্চিমবঙ্গে ৩১৫টি গুলীবর্ষণের ঘটনা ঘটেছে এবং এর ফলে নিহত হয়েছে ১১৫ জন। অন্যান্য রাজ্য সম্পর্কে বলা হয়েছে যে, বিহারে ৫৪টি গুলীবর্ষণের ঘটনায় ৪১ জন নিহত হয়েছে, উত্তর প্রদেশে ৫২টি গুলীবর্ষণের ঘটনায় ৪৭ জন এবং পাঞ্জাবে ৮টি গুলীবর্ষণের ঘটনায় ১২ জন নিহত হয়েছে। অর্থাৎ পশ্চিমবঙ্গ

এ বিষয়ে রেকর্ড স্থাপন করেছে। অর্থাৎ এই হচ্ছে পশ্চিমবঙ্গে রাজ্যপাল প্রশাসনের আসল চিত্র। অথচ এই শাসনের গুণগানের কোন ক্ষমতি নেই। বরং এই কথা বলে বাজার তাতানো হয়েছে যে, যুক্তফ্রন্টের আমলে দেশ গোল্লায় যাচ্ছিল এবং রাজ্যপাল দেবদূতের মতই পশ্চিমবঙ্গকে উদ্ধার করতে আবির্ভূত হয়েছেন। অথচ এই হিসাব থেকেই দেখা যায় মানুষ খুন করার ব্যাপারে পশ্চিমবঙ্গ সারা ভারতে গত দশ মাসে প্রথম স্থান অধিকার করেছে। এ ছাড়া গত এক বছরে কলকাতায় খুন হয়েছে মোট ৬০ জন এবং সারা পশ্চিমবঙ্গে ৫২৯ জন। বস্তুত গত এক বছরে আইন ও শৃঙ্খলার ক্রমাবনতি ছাড়া আর কিছু দৃষ্ট হয় নি। গত একুশ বছরের প্রশাসন জনগণের সঙ্গে সরকারের সম্পর্ককে অহি-নকুল সম্পর্কে পরিণত করেছে। সরকারের সঙ্গে জনসাধারণের সম্পর্কটা শাসক ও শাসিতের সম্পর্কে পরিণত হয়েছে। নামে গণতান্ত্রিক দেশ হলেও গত একুশ বছরে শাসকবর্গ দেশের মধ্যে কোন গণতান্ত্রিক জীবনাদর্শের সৃষ্টি করতে পারেন নি, কল্যাণ রাষ্ট্রের খোলের আড়ালে কার্যত পুলিশী রাষ্ট্রের সৃষ্টি হয়েছে। গণতান্ত্রিক জীবনাদর্শ প্রতিষ্ঠার জন্য কোন বিজ্ঞানসম্মত পরিকল্পনা নেই, কিন্তু আইন ও শৃঙ্খলার নামে পুলিশকে বেপরোয়া নরঘাতনের প্ররোচনা দেবার ব্যবস্থা পাকা আছে। এবং যে সমস্যাগুলিকে আইন ও শৃঙ্খলার সমস্যা বলে চালানো হয়। কার্যত সর্বক্ষেত্রে সেগুলি আইন-শৃঙ্খলার সমস্যা নয়। শ্রমবিরোধের ক্ষেত্রে যদি পুলিশ মালিকপক্ষের হয়ে ধর্মঘটী শ্রমিকদের ওপর লাঠি ও গুলী চালায়, যে দৃশ্য গত একশ বছর ধরে দেখতে অভ্যস্ত, তাহলে এটা কি আইন ও শৃঙ্খলা রক্ষার ব্যাপার বলে গণ্য হবে? পৃথিবীর সর্বত্রই শিল্পোন্নত রাষ্ট্রে শ্রমবিরোধ আছে, কিন্তু কোন ক্ষেত্রেই ভারতের মত পুলিশ তথা সরকার একটি পক্ষের সঙ্গে একাত্ম হয়ে যায় না। আজ এই যে ফসল ওঠার প্রাক্কালে পশ্চিমবঙ্গে বহু স্থানেই পুলিশ জোতদারদের সঙ্গে একাত্ম হয়েছে, নিশ্চয়ই এই একাত্মতা আইন ও শৃঙ্খলার স্বার্থে নয়, অথচ এক্ষেত্রেও রক্তপাতের ব্যাপার ঘটবে। রাজ্যপালের প্রশাসন যে নজির দেখিয়েছেন তা অভূতপূর্ব, আইন-শৃঙ্খলার এমন অবনতি বোধ হয় ইতিপূর্বে পশ্চিমবঙ্গে আর কখনো হয় নি। অন্তত হত্যা ও গুলীর ক্ষেত্রে পশ্চিমবঙ্গ যে রাজ্যপালের আমলে রেকর্ড সৃষ্টি করেছে, সে তথ্যকে তো আর বামপন্থী অপপ্রচার বলে উড়িয়ে দেওয়া যাবে না।

সরষের তেল

যারা খাদ্যদ্রব্যে ভেজাল মেশায় তারা এদেশে দণ্ড তো পায়-ই না, উল্টে টাকার জোরে সমাজে কৌলীন্যের অধিকারী হয়। ভেজাল খাদ্য, ভেজাল ঔষধে হাজার হাজার মানুষকে রোগগ্রস্ত করে মেরে ফেলার অপরাধে যারা অপরাধী আইন তাদের কেশাগ্র স্পর্শ করতে পারে না, একান্ত বেকায়দায় পড়ে যদি কেউ ধরাও পড়ে যায় —দু'-চারশো টাকা জরিমানা দিয়ে তারা স্বচ্ছন্দেই বেরিয়ে আসতে পারে। এবং তাতেও মূল গায়েনরা ধরা পড়ে না। আমাদের পরিচিত একজন মহাপুরুষ আছেন, যিনি হাসপাতালে দুধের যোগান দিয়ে বাড়ি-গাড়ি করেছেন। দুধে ভেজালের জন্য ধরাও পড়েছিলেন, কিন্তু দণ্ডটা গেল যে লোকটি দুধ বয়ে নিয়ে যেত তার ওপর দিয়ে, আর এক মাস জেল খেটে এসে সে বলল যে, এই রকম মাঝে মাঝে তাকে যেতেই হয়, আর তার এই জেলখাটার সময়ের মাইনেটা তার বাবু ডবল করে দেন। অনেকেরই নিশ্চয়ই পরশুরাম বিরচিত গণ্ডেরিরাম বাটপাড়িয়ার কাহিনী মনে আছে, ভেজাল দেয় কাসেম আলি, গণ্ডেরিরামজী তা চোখেও দেখেন না, খালি মুনাফার টাকা গোণেন। আগে, অর্থাৎ দেশ স্বাধীন হবার আগে কংগ্রেসী নেতারাই বলতেন স্বাধীনতার পর ভেজাল বন্ধ করে দেওয়া হবে এবং যারা খাদ্যদ্রব্যে ভেজাল দেয় তাদের কঠোর সাজা দেওয়া হবে, কিন্তু অন্যান্য বহু ঘোষণার মত এইগুলিও ক্লীবের বাগাড়ম্বরে পরিণত হয়েছে। এবারে আসল কথায় আসা যাক। পশ্চিমবঙ্গ অন্ধত্ব নিবারণী সমিতির সভাপতি এবং বিশিষ্ট চক্ষু চিকিৎসক ডঃ মুরলী সেনগুপ্ত সাংবাদিকদের নিকট এই তথ্য প্রকাশ করেছেন যে, শিয়ালকাঁটা মিশ্রিত ভেজাল সরষের তেল পশ্চিমবঙ্গে ব্যাপকভাবে চালু হওয়ায় সরষের তেল-ভোজীদের মধ্যে প্রচণ্ডভাবে এপিডেমিক-ড্রপসি বা বেরিবেরি এবং মারাত্মক রকমের চক্ষুরোগ দেখা দিয়েছে। ডঃ সেনগুপ্ত আরও জানিয়েছেন যে, "এক বিশেষ সম্প্রদায়ের" মিল মালিকরা এই ভেজাল তেলের ফলাও কারবার চালাচ্ছেন। সরষের তেলের ব্যবহারটা বাঙালীর মধ্যেই সীমাবদ্ধ হওয়ায়, এই মারাত্মক রোগে বাঙালীরাই বেশি আক্রান্ত হচ্ছেন। লক্ষণীয় যে সরষের তেলের আমদানীটা এ রাজ্যে ভিন্ন রাজ্য থেকেই বেশি হয়। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের উচিত এইদিকে বিশেষ নজর দেওয়া এবং এখানকার তেলকলগুলির ক্রিয়াকলাপের ওপর বিশেষ দৃষ্টি দেওয়া। আমাদের স্মরণে আছে, কয়েক বছর পূর্বে কিভাবে সরষের তেলের কৃত্রিম অভাব সৃষ্টি করে এক শ্রেণীর অসাধু ব্যবসায়ী কোটি কোটি টাকা অতিমুনাফা অর্জন করেছিল। ভেজালের কথাতেই আবার ফিরে আসা যাক। এ পর্যন্ত পশ্চিমবঙ্গ সরকারের স্বাস্থ্যদপ্তর বা কলকাতা কর্পোরেশন এ বিষয়ে কোন বাস্তব ব্যবস্থাই অবলম্বন করেন নি, দশ দিনের জন্য সরষের তেল বর্জন করার পরামর্শ দেওয়া ছাড়া। অথচ আরও সুলভ ছিল। যারা সরষের তেলের ডীলার, তারা কেউই সরকারের অপরিচিত নয় এবং এদের বেশির ভাগ আড়তই কলকাতার বড়বাজার অঞ্চলে। সব কটাকে ধরে ঠাণ্ডাঘরে এনে পোরবার দরকার আগে ছিল এবং এই প্রতিটি আড়তের তেল বাজেয়াপ্ত ও পরীক্ষা করতে সরকার অক্লেশে পারতেন। পশ্চিমবঙ্গের সমস্ত তেলের যোগানদার তো এরাই এবং ভেজাল তেল নিশ্চয়ই এদের আড়ত থেকে এসেছে আকাশ থেকে করে পড়ে নি। কাজেই ভেজাল তেল বিক্রির অপরাধে তাদের কোর্টে তোলা চলত অনায়াসেই। এবং এই ভেজালের উৎস কি তা জানতে পুলিশেরও বিশেষ বেগ পাবার কথা নয়। চাপ দিয়ে কিভাবে নাড়ীর ভিতর থেকে গাহ্য খবর বার করে আনতে হয়, সে ট্রেনিং তো ব্যারাকপুর থেকে পুলিশের নেওয়াই আছে। কাজেই সরকারের কিছু করণীয় নিশ্চয়ই এই প্রসঙ্গে ছিল। দুর্ভাগ্যক্রমে গত একুশ বছর ধরে সরকার কন্ট্রাক্ট ইত্যাদির মারফৎ নিজ পোষ্যদের কিছু পাইয়ে দেবার চেষ্টাতেই ব্যস্ত ছিলেন এবং এখনো আছেন, এসব বিষয়ে মাথা ঘামানোর অবকাশ কোথায়? কর্পোরেশনের কথাই বা কি বলব, ওই প্রতিষ্ঠানটি এখন মুক্তনীতিমার্গের শিক্ষানবীশদের রিহ্যাবিলিটেশন কেন্দ্র হয়ে দাঁড়িয়েছে। কোন সভ্য সরকার যা বিন্দুমাত্র সহ্য কোথাও করে না, ভারতবর্ষেই তা চলে, সত্যই বিচিত্র এ দেশ!

রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয় প্রসঙ্গে
(বিলম্বে প্রাপ্ত)

রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের গুরুতর অনিয়মের কয়েকটি বিবরণ নির্ভরযোগ্য সূত্র থেকে আমাদের হাতে এসে পৌঁছেছে। বঙ্গদর্শনের লেখা আগেই প্রেসে চলে যাওয়ায়, বিবরণসমূহ চাঞ্চল্যকর হওয়া সত্ত্বেও এ সংখ্যায় প্রকাশ করা সম্ভব হলো না। আগামী সংখ্যায় এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করার ইচ্ছা রইল।

কলকাতা উন্নয়নের নেপথ্যে

পাঠকের বোধ হয় স্মরণ আছে কিছুকাল আগে কলকাতায় কয়েকজন শিল্পপতি সভা করে ঘোষণা করেছিলেন যে, অতঃপর কলকাতা শহরের উন্নতির জন্য তাঁরা উঠে-পড়ে লাগবেন। কিন্তু এই ঘোষণায় আমাদের মনে কিছুটা সন্দেহ ও আশঙ্কার সৃষ্টি হয়েছিল। শত বছরের ইতিহাসে তাঁরা যা করেন নি, কিসের অনুপ্রেরণায় হঠাৎ তাঁরা দাতাকর্ণ হতে চলেছেন? তাঁরা নাফা ভিন্ন কলকাতার অন্য তাৎপর্য আছে তা কখনোই বোঝেন নি। আজ হঠাৎ তাঁরা এতদিনের ঐতিহ্য ভুলে কলকাতাপ্রেমে হঠাৎ গদগদ হয়ে উঠলেন কেন? এই কারণেই আমরা এই প্রসঙ্গে কিছু লিখি নি, কেন না যাদের মূলধনের মূল উৎসই হচ্ছে ভেজাল দিয়ে মানুষ মারা, তাদের এই আকস্মিক মাতৃপ্রেম দেখে আমরা কোথাকার জল কোথায় দাঁড়ায় তা দেখবার প্রতীক্ষায় ছিলাম। আমাদের অপেক্ষা করাটা ব্যর্থ হয় নি। ঝুলির ভিতর থেকে বিড়াল বেরিয়ে পড়েছে।

গত ১১ই ডিসেম্বর রাজ্যপাল কলকাতায় ইণ্ডিয়ান চেম্বার অফ কমার্সের এক সভায় এবং ১২ই ডিসেম্বর রাইটার্স বিল্ডিংসে বৃহত্তর কলকাতা উন্নয়নের এক পরিকল্পনা পেশ করেছেন। এই পরিকল্পনা এবং পূর্ব প্যারায় বর্ণিত শিল্পপতিদের আগ্রহ কোন বিচ্ছিন্ন ব্যাপার নয়। এগারোই ডিসেম্বর ইণ্ডিয়া এক্সচেঞ্জ ভবনে ইণ্ডিয়ান চেম্বার্স অফ কমার্সের উদ্যোগে অনুষ্ঠিত শিল্পপতিদের এক সভায় রাজ্যপাল ধরমবীর একটি নগর-উন্নয়ন ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠার প্রস্তাব ঘোষণা করেছেন এবং সেই প্রস্তাব অবাঙালী শিল্পপতিরা লুফে নিয়েছেন। রাজ্যপালের প্রস্তাবের সারমর্ম হল এই যে, ব্যাঙ্কটি শুরু হবে কুড়ি কোটি টাকার মূলধন নিয়ে এবং শিল্পপতিরা এতে কম করে আরও ষাট কোটি টাকা বাড়তি করবেন। কলকাতা উন্নয়নের ব্যাপারে শিল্পপতিদের আগ্রহের কারণ এতক্ষণে বোঝা গেল, কিন্তু এটি উপলব্ধি করে তাঁদের মহলে যে উল্লাসের তরঙ্গ প্রবাহিত হয়েছে তার তাৎপর্য বুঝতে আরও একটু সময় লাগবে। এই ব্যাঙ্কের মারফৎই কেন্দ্রের কাছ থেকে এবং বিশ্ব ব্যাঙ্ক ও ফোর্ড ফাউণ্ডেশনের মত প্রতিষ্ঠানের নিকট থেকে টাকা সংগ্রহ করা হবে। ফোর্ড ফাউণ্ডেশনের প্রতিনিধি ওই সভায় উপস্থিত থেকে রাজ্যপাল প্রস্তাবিত কলকাতা উন্নয়ন ব্যাঙ্ক ও তার কার্যবলীর প্রতি পূর্ণ সহযোগিতা দানের প্রতিশ্রুতি ঘোষণা করেছেন। কলকাতায় ম্যাকনামারার আগমনের তাৎপর্য উপলব্ধি করার কোন অসুবিধা বোধ হয় আর রইল না। এবং এও বোঝা গেল যে ম্যাকনামারা কেন শিল্পপতিদের মন্দ তিরস্কার করেছিলেন। ইণ্ডিয়ান চেম্বার্স অফ কমার্সের সভাপতি শ্রীভরুৎ রাজ্যপালের প্রস্তাবকে স্বাগত জানিয়ে বলেছেন যে কলকাতা উন্নয়নের ভার সেবার জন্য ব্যবসায়ী ও শিল্পপতিদের নিয়ে একটি কার্যকরী সমিতি গঠন করা হচ্ছে এবং ওই সমিতিই কলকাতা উন্নয়ন ব্যাঙ্কের ভার নেবে।

কিন্তু পরিকল্পনাটা কি? সেইটাই আমাদের জ্ঞাতব্য বিষয়। এই পরিকল্পনার মূল উদ্দেশ্য হল বাংলা দেশ থেকে বৃহত্তর কলকাতাকে বিচ্ছিন্ন করে নেওয়া। এই বিচ্ছিন্নকরণের ব্যাপারটি ঘটবে কলকাতার চারদিকের সমস্ত জমিতে অবাঙালী কলোনী গড়ে তুলে। ব্যাপারটাকে আরও একটু খুলে বলা যাক। পরিকল্পনা হচ্ছে এই যে কলকাতার দক্ষিণে কালিয়াদহ, রাজেরহাট, বৈকুণ্ঠঘাটা, বজবজ ও জোকা অঞ্চল নিয়ে একটি, এবং হাওড়ায় কোনা ও দাশনগর নিয়ে আরও একটি উপনগরী স্থাপন করা হবে। পরিকল্পনা অনুযায়ী এই উদ্দেশ্যে জমি সংগ্রহ ও ভরাট করার জন্য খরচ পড়বে মোট সাড়ে বত্রিশ কোটি টাকা এবং উপনগরী দুটির মোট আয়তন হবে চার হাজার সাতশো ছাব্বিশ একর।

কিন্তু আমরা আগেই বলেছি যে এই উপনগরী দুটিতে অবাঙালীর কলোনী হবে এবং তার ফলে বৃহত্তর কলকাতার ওপর অবাঙালীর অধিকার আরও চেপে বসবে এবং তা ঘটলে কলকাতাকে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের প্রশাসনের বাইরে নিয়ে যেতে ও কেন্দ্র-শাসিত অঞ্চলে পরিণত করতে কোন বাধা থাকবে না। এখন অনেকেই এ প্রশ্ন তুলবেন, উক্ত উপনগরী দুটি অবাঙালী কলোনীতে পরিণত হবে এই কথাটা বলার হেতু কি। কারণটা খুবই সহজ। জমি কিনতে হলে তা কিনতে হবে ওই কলকাতা উন্নয়ন ব্যাঙ্ক মারফৎ এবং কলকাতার যেখানে সকল শিল্পপতিই প্রায় অবাঙালী, তাঁদের ব্যাঙ্কের মারফৎ জমি পাওয়ার আশা বাঙালীকে ত্যাগ করতেই হবে। ১২ই ডিসেম্বর রাইটার্স বিল্ডিংসের সভায় এই প্রসঙ্গ আলোচনার কালে প্রেসিডেন্সী বিভাগের কমিশনার শ্রীরঘু ব্যানার্জী এবং রাজস্ব বোর্ডের সদস্য শ্রীকল্যাণ সেন এই পরিকল্পনার তীব্র বিরোধিতা করে বলেছেন যে, এই পরিকল্পনার আসল উদ্দেশ্য হল কলকাতার পার্শ্ববর্তী অঞ্চল থেকে বাঙালীকে উচ্ছেদ করে সেখানে অবাঙালীর কলোনী নির্মাণ। কিন্তু এই আপত্তি সভায় গ্রাহ্য হয় নি, রাজ্যপাল এই পরিকল্পনা কার্যকর করতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ।

এই অপচেষ্টার বিরুদ্ধে আন্দোলন এখনি শুরু হওয়া উচিত, এ বিষয়ে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলগুলিরও আমরা দৃষ্টি আকর্ষণ করছি।

(২১।১১।৬৮)

শিল্প-বাণিজ্য-অর্থনীতি

সাপ্তাহিক বসুমতীর নতুন ফিচার

১৯৬৮ সালের মার্চ মাস পর্যন্ত ভারতে অনাদায়ী আয়করের পরিমাণ ছিল ৩৭৪ কোটি ৫২ লক্ষ টাকা। ১৯৬৫-৬৬ সালে ভারতের জাতীয় আয়ের মোট ৪.৭ শতাংশ সরকারী কর্মচারীদের জন্য ব্যয় করা হয়েছিল। ১৯৬৬-৬৭ সালে কেন্দ্রীয় সরকারের তত্ত্বাবধানে পরিচালিত শিল্প লগ্নী ছিল ২০৫৬.৯ কোটি টাকা। তার মুনাফা এসেছিল মাত্র ৫৭.৭ কোটি টাকা। তার আগের বছর একই ক্ষেত্রে ১৬১৩.৫ কোটি টাকা লগ্নীর উপর মুনাফা এসেছিল ৫৫.৯ কোটি টাকা। ভারতের জাতীয় আয় ১৯৬৬-৬৭ সালে ছিল মোট ১৫,২৭২ কোটি টাকা। ১৯৬৭-৬৮ সালে তার পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ১৬,৬৬৫ কোটি টাকা। তার মধ্যে কৃষি ক্ষেত্রে আয় বেড়েছে সবচেয়ে বেশী (২০.৩ শতাংশ)। ৮,১৩৩ কোটি টাকা থেকে বেড়ে ৭,৩৮১ কোটি টাকায় পৌঁছেছে।—সাধারণ বাঙালী ব্যবসা-বাণিজ্য এবং অর্থনৈতিক দুনিয়ার এই সমস্ত সংবাদ সম্পর্কে অনেকটা নিরাসক্ত। কারণ ব্যবসা-বাণিজ্য আমাদের আয়ত্তে নয়। কিন্তু দেশের সামাজিক জীবনে শিল্প বাণিজ্যের প্রভাব যে রকম ক্রমবর্দ্ধমান, তাতে সে সম্পর্কে বাঙালী বেশীদিন উদাসীন থাকলে তাকে দরদর পেছনে পড়তে হবে। অনতিদূরে দুনিয়ায় দেশের বণিক সম্প্রদায়ই রাষ্ট্রীয় কাঠামো নিয়ন্ত্রণ করেন। আমরা নূতন সমাজতন্ত্রের পথে বিশেষ অগ্রসর হতে পারি নি, তখন এই বাস্তব সত্য সম্পর্কেও আমাদের সচেতন থাকা উচিত। তাই পাঠকের মনে ব্যবসা-বাণিজ্য অর্থনীতির চিন্তা আদান-প্রদানের জন্য আমরা সাপ্তাহিক বসুমতীতে একটা নতুন বিভাগ খুলছি ২রা জানুয়ারী, ১৯৬৯ তারিখ থেকে। এই প্রস্তাব সম্পর্কে পাঠকের মতামত পেলে খুশি হব।

কথায় কথায়

নিবারণ মুনশী

পৃথিবীর সব দেশের অধ্যাপকেরা কি একই রকম হয়? কলকাতায় উক্রাইনের পণ্ডিত অধ্যাপক মার্তিনোভস্কির প্রেস কনফারেন্সে বসে সেদিন বার বার আমার এই প্রশ্নটা মনে জাগছিল।

উক্রাইন সোভিয়েত ইউনিয়নের অন্যতম সমাজতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র। উক্রাইনের প্রযুক্তিবিদ্ ডক্টর মার্তিনোভস্কি এবং ইংরাজি ভাষার শিক্ষিকা লিলিয়া ভোলস্বুক কলকাতায় এসেছিলেন মৈত্রী সফরে। ভারতের এই যুগলবন্ধুর সঙ্গে একাধিকবার আমার দেখা হয়েছে কখনও প্রেস কনফারেন্সে, কখনও সভায়, কখনও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে।

মার্তিনোভস্ককে প্রথম দর্শনেই মনে হয় পৃথিবীর যে-কোন দেশের, যে-কোন শহরের যে-কোন পথেই যেন এই বৃদ্ধ অধ্যাপককে মানিয়ে যায়। বয়স কত আন্দাজ করা কঠিন। ষাটের ঊর্ধ্বে অবশ্যই, তবে সত্তরও হতে পারে আশীও হতে পারে। দীর্ঘ ওকগাছের মত অকপট দেহ কাঁধের কাছে সবে একটু নুয়ে পড়তে শুরু করেছে কিন্তু কথা বলতে বলতে আচমকা হঠাৎ হঠাৎ কাঁধ টান করার অভ্যাস দেখে মনে হয় অধ্যাপক মার্তিনোভস্কি যেন সেই ন্যুব্জতাকে ছুঁড়ে ফেলে দিতে চাইছেন। পুরু কাঁচের ভারী চশমাটা প্রায়ই ঢিলে হয়ে নাকের প্রান্তে এসে পড়ে। চশমার কাঁচের ভিতর দিয়ে দুটি চোখ মনে হয় অনেক দূরের দুটি আলো। প্রাচীন ঠোঁট দুটির কোণে মাঝে মাঝেই যে হাসির রেখা ফুটে ওঠে সে হাসি নবজাতকের ঠোঁটেই মানায়। গলার স্বর গম গম করছে। সেই স্বরে মাঝে মাঝে আনুনাসিক সুর কানে লাগে এবং তখনই নজর পড়ে অধ্যাপকের দীর্ঘ নাকের দিকে। এই নাক ভারতীয়ের হোতে পারত, খাঁটি ইংরেজ কিংবা আইরিশেরও হতে পারত। কণ্ঠস্বরে ইউরোপীয় টান কিন্তু মার্তিনোভস্কির স্বদেশ সোভিয়েত উক্রাইন।

উক্রাইন আমাদের পরিচিত নাম। গত মহাযুদ্ধের সময় জয়-পরাজয়ের মরণপণ যুদ্ধের ইতিহাসে প্রতিদিন উক্রাইনের নাম আমরা শুনেছি। উক্রাইনের গমে ভারতের তন্দুরিতে অনেক রুটি তৈরি হয়েছে। উক্রাইন আমাদের অপরিচিত নয়।

অধ্যাপক মার্তিনোভস্কির পাশে দাঁড়িয়ে ও'র দীর্ঘ দেহের দিকে তাকালে মনে হয় দেওদার গাছের নিচে দাঁড়িয়ে আছি। পাশে দাঁড়ালেই কাঁধে হাত রেখে কথা বলতে শুরু করেন। "তুমি দেখছি ক্রমাগত সিগারেট খেয়ে যাচ্ছ, অত খেও না" এক সাংবাদিক বন্ধুর কাঁধে হাত রেখে মার্তিনোভস্কি বলেছিলেন। একটু থতমত খেয়েই বন্ধুটি এবার হাতের সিগারেটটি লুকোতে চেষ্টা করলেন। নিজের পকেট থেকে সিগারেট বের করে ধরিয়ে এরপর অধ্যাপক বললেন—"সিগারেট খাও ভাল, কিন্তু কক্ষণো ঘন ঘন ব্র্যান্ড বদল কোরো না। প্রেমের বেলায় যেমন, ধূমপানের ক্ষেত্রেও ঠিক তেমনি, একনিষ্ঠতাই হোল সবচেয়ে বড় কথা।" হাসতে হাসতে বৃদ্ধ অধ্যাপক একমুখ ধোঁয়া ছাড়লেন।

তবু ধূমপান নয়, অধ্যাপক মার্তিনোভস্কির একনিষ্ঠ ধ্যানের বিষয় হল থার্মোডায়নামিক্স। ওডেসার প্রযুক্তিবিদ্যা ইনস্টিটিউটের রেক্টর অধ্যাপক মার্তিনোভস্কি এ পর্যন্ত তাঁর নিজস্ব বিশেষ বিষয়ের উপর একশোটিরও বেশি গবেষণা নিবন্ধ প্রকাশ করেছেন। ডিজাইন ও গবেষণার জন্য একাধিক পুরস্কার পেয়েছেন। ফলিত বিজ্ঞানের ভাইরেক্টররূপে বহুদিন তিনি উনেস্কোয় কাজ করেছেন।

তবু আমার চোখে অধ্যাপক মার্তিনোভস্কির আকর্ষণের কারণ ভিন্ন। ভারতের প্রতি গভীর, নিখাদ ভালবাসা এবং তাঁর ভারতচর্চা—এ দুটো আমাকে মার্তিনোভস্কির প্রতি সবচেয়ে বেশি করে আকর্ষণ করেছে। ওডেসার অধ্যাপক মার্তিনোভস্কির হাতে তৈরি হয়ে উঠছে অসংখ্য ভারতীয় বিজ্ঞানী। ভারতের অন্যতম এক বিজ্ঞানী সম্প্রতি সোভিয়েত ইউনিয়ন থেকে বিজ্ঞানের পোস্ট গ্র্যাজুয়েট ডিগ্রী নিয়ে স্বদেশে ফিরেছেন। তিনি মার্তিনোভস্কির ছাত্র।

"কোন্ কোন্ ভারতীয় কবির কবিতা আপনাদের ভাষায় অনূদিত হয়েছে?" এক সাংবাদিক এই প্রশ্ন করেছিলেন মার্তিনোভস্ককে। লম্বা লম্বা আঙুল দিয়ে শূন্যে আঁচড়াতে আঁচড়াতে অধ্যাপক জবাব দিয়েছিলেন—"আমি যতদূর জানি রবীন্দ্রনাথ টেগোরের বই অনূদিত হয়েছে এবং একালের বাংলার কবিদেরও কিছু কিছু

মাসিক ১০ টাকা কিস্তিতে
ট্রানজিস্টার লাউন

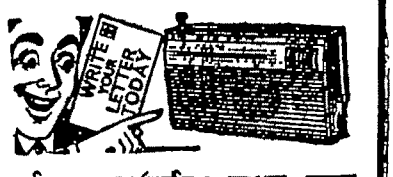

বিশ্ববিখ্যাত সর্বাধুনিক জাপান মডেল, চিত্তাকর্ষক শক্তিশালী, গ্যারান্টিযুক্ত "ওয়ার্ল্ডভয়েস" ৩ ব্যান্ড অল ওয়ার্ল্ড আশ্চর্যজনক নাইট ল্যাম্পযুক্ত। প্রত্যেক গ্রামে ও শহরে পাঠানো যায়।
Write to :—
ALL WORLD AGENCY,
(B.W.) Kalyanpura, Delhi–6.

কবিতার অনুবাদ প্রকাশিত হয়েছে তবে তার হুবহু সংখ্যা ও নাম আমি বলতে পারব না। তবে বিজ্ঞানের কথা যদি বল তাহলে বলতে পারি"..... এ পর্যন্ত বলেই বৃদ্ধ বিজ্ঞানী একলাফে কবিতা থেকে চলে এলেন বিজ্ঞানে, যেখানে তাঁর স্বচ্ছন্দ বিচরণ।

আবেগরুদ্ধকণ্ঠে মার্তিনোভস্কি শোনালেন বাংলা দেশের বিজ্ঞানী জাতীয় অধ্যাপক সত্যেন বসু, বিজ্ঞানী চন্দ্রশেখর ও অধ্যাপক রমণ—এই নামগুলো তাঁদের কাছে শুধু নামের তালিকা নয়, এঁদের থিওরী এবং এঁদের রচনা উক্রাইনের বিজ্ঞানের ছাত্রদের অবশ্য পাঠ্য। বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে এইসব ভারতীয় বিজ্ঞানীদের অবদানের কথা বলতে গিয়ে বৃদ্ধ এই অধ্যাপকের চোখের কোণে আলো চিকচিক করছিল।

"আশ্চর্য উজ্জ্বল প্রতিভা দেখেছি আমার ভারতীয় ছাত্রদের। কিন্তু তাদের স্বদেশে সবচেয়ে যে বড় সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়—সেটা হচ্ছে ব্যবহারিক শিক্ষার আয়োজনের অপ্রতুলতা। ভারতের কয়েকটি বিজ্ঞান-সংস্থার মান সন্তোষজনক নয় বটে তবে উচ্চমানের সংস্থাও ভারতে আছে"—অধ্যাপক মার্তিনোভস্কির কাছে শোনা এই উক্তি।

ভারতের প্রযুক্তি বিদ্যায়তন সম্পর্কে মার্তিনোভস্কির অভিজ্ঞতা পুঁথিলব্ধ নয়। ১৯৫৬-৫৭ সালে তিনি উনেস্কো মিশনের প্রধানরূপে এসেছিলেন খড়্গপুর আই, আই, টি-তে। ১৯৬৮ সালে তিনি বোম্বাইতে বিশেষজ্ঞ শিক্ষণ কেন্দ্র আই, আই, টি-তে প্রধানের কর্মভার নিয়ে আসেন।

কিন্তু এবার মার্তিনোভস্কি এসেছিলেন মৈত্রী সফরে, উক্রাইন ও বাংলা দেশের মধ্যে একটি অদৃশ্য সেতুবন্ধনের কাজে। এবার মার্তিনোভস্কি ঘুরেছেন শান্তিনিকেতন, দেখেছেন জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়ি আর রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়। স্বদেশ যাত্রার প্রাক্কালে সদ্য শান্তিনিকেতন প্রত্যাগত মার্তিনোভস্কি বললেন : "বাংলা দেশের সঙ্গে আমার দেশ উক্রাইনের আর একটা সুন্দর মিল খুঁজে পেলাম। আমার দেশের সেরা গান হল উক্রাইনের গান, আর এদিকে বাংলা গান হল ভারতের শ্রেষ্ঠ গান।"

কলকাতায় উক্রাইনের লোকশিল্পীর কণ্ঠে আমি একবার উক্রাইনের গান শুনেছিলাম। চোখ বুজে সে গান শুনলে মনে হয় রৌদ্রকরোজ্জ্বল ফসলের ক্ষেতের পাশ দিয়ে হেঁটে চলেছি। অধ্যাপক মার্তিনোভস্কি হয়তো শান্তিনিকেতনের পথে দূরে থেকে ভেসে-আসা কোন বাউলের গান শুনে এসেছেন।

জোয়ারের জল চলে গেলে উপকূলে পড়ে থাকে ভাঙা ঝিনুক। অধ্যাপক মার্তিনোভস্কি তাঁর সংক্ষিপ্ত সফর শেষ করে স্বদেশের দিকে রওনা হয়ে গেছেন। এ ক'দিনে এই মানুষ মাঝে মাঝে দেখার শেষে আমি এখন আমারও মনের মধ্যে বিচিত্র সব ভাবনার ভাঙা ঝিনুক কুড়িয়ে চলেছি।

আমি খুব কম বিদেশী দেখেছি যাঁদের সামনে দাঁড়ালে নিজের দেশ সম্পর্কে একটা গভীর শ্রদ্ধা নতুন করে মনের মধ্যে জেগে ওঠে। স্বদেশ সম্পর্কে একটা হীনমন্যতার ভাব যেন আজকাল আমাদের অনেকের মনেই বদ্ধমূল হয়ে দাঁড়িয়েছে। দেশের দারিদ্র্য, দেশের ব্যর্থতা এসব কিছু নিয়ে আজকাল শুধু বিদ্রূপ আর বিক্ষোভই যেন শুনতে পাই পথে-ঘাটে, দেশে ও বিদেশে। ভুলেই গিয়েছিলাম এতসব ব্যর্থতা ও অকর্মণ্যতার আড়ালেও আমার দেশ নিয়ে গর্ব করার, নতুন করে আবার আশায় বুক বাঁধার কিছু বিত্তও আছে। অধ্যাপক মার্তিনোভস্কি দু' দিনের জন্য এসে আমায় সেই কথাই স্মরণ করিয়ে দিয়ে গেলেন। উপকূলে ভাঙা ঝিনুকের টুকরো রেখে জোয়ার যেমন চলে যায়।

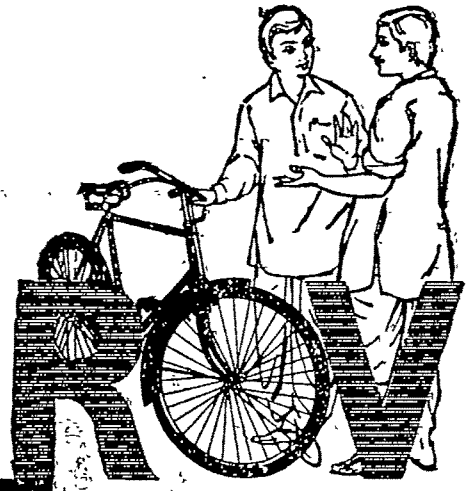

রোভার—
আমার গর্ব
আমার বন্ধু...

এইটি আমার রোভার, উৎসবে-ব্যসনে নির্ভরতম সুহৃদ। রোদে, ঝড়-বৃষ্টিতে সদাই আমার সঙ্গী—হোক্-না ক্ষেত-খামার, কল-কারখানা, হাসপাতাল, ডাকঘর, ইস্কুল-পাঠশাল, দূর-দূর ইষ্টিশান—স্বচ্ছন্দ আরামে, সর্বসময়ে, তীব্রবেগে আমায় সটান পৌঁছে দেয়। সত্যি, এতটুকু বাড়িয়ে বলছি না।

অভিন্নহৃদয় এই বন্ধুটির গুরু ধথাদামেও কিন্তু শোধ হবার নয়।

জনগণের নিজস্ব বাহন, রোভার আজই কিনুন

এভারেস্ট সাইকেলস লিমিটেড গৌহাটি • কলিকাতা • বারাণসী • পাটনা
সারা ভারতেই স্টকিস্ট

গ্রাম-গ্রামান্তরে

লেভির নোটিশ ঝুলছে

এতদিনে লেভির নোটিশ লটকানো হয়েছে। বি-ডি-ও'র অফিস্য অঞ্চল পঞ্চায়েত ও গ্রাম পঞ্চায়েতের অফিস, থানা ও ফাঁড়িতে নামের তালিকা ও কাকে কত দিতে হবে সে সব নোটিশ টাঙিয়ে দেওয়া হয়েছে বা হচ্ছে। নোটিশের তারিখের ১৫ দিনের মধ্যে আপত্তি জানাতে হবে; তারপর সেই আপত্তির ভিত্তিতে শুনানীর দিন ধার্য হবে; শুনানীর পরই সংশোধিত যদি কিছু হয় সেই তালিকা বা নোটিশ হাতে হাতেই দিয়ে দেওয়া হবে। যারা এই সংশোধিত আদেশেও সন্তুষ্ট হবেন না, তাঁদের এস-ডি-ও'র কাছে দরখাস্ত করতে হবে; অবশ্য সংশোধিত আদেশে যতটা লেভি ধার্য করা আছে তার শতকরা প্রায় ৭৫ ভাগ লেভি আগে আদায় দিয়ে তার রসিদ সমেত এস-ডি-ও'র সমীপে যেতে হবে। তারপর এস-ডি-ও'র রায়েও যদি কেউ সন্তুষ্ট না হন তার জন্যে হাইকোর্টের দরজা তো খোলাই আছে।

এ সব পরের ঘটনা। এখন নোটিশে কার ভাগে কি পড়লো তাই নিয়েই গাঁয়ে গাঁয়ে আলোচনা চলছে, বাদানুবাদ হচ্ছে, উকিল-মোক্তারের দরজায় দরজায় ভিড় জমছে। ছুটির দিনে উকিল-মোক্তাররা নাওয়া-খাওয়ার সময় পাচ্ছেন না; চাটাইয়ে বসার সকলকে জায়গা দিতে পারছেন না। আপত্তির আর্জির মুসাবিদা হচ্ছে ২ টাকা, ৪ টাকা ও টাকা যে যেমন পাচ্ছেন আর্জি লেখার জন্যে নিয়ে নিচ্ছেন; সময় অল্প, অথচ একে একে সকলকেই লিখে দিতে হবে। বড় বড় জোতদাররাও আসছেন, তাঁরা তো প্রতিবারই আসেন, পয়সা আছে, কাজেই মামলা-মকদ্দমা লড়ার তাঁদের ক্ষমতা আছে। কাগজে-কলমে যতই জোতদারদের শ্রাদ্ধ করা হোক না কেন, এখনও কিন্তু গাঁয়ে এঁদের বেশ খ্যাতি ও সম্ভ্রম রয়েছে। দূর থেকে উকিলের নাম ধরে ডাকতেই আর পাঁচজন গাঁয়ের মানুষ যাঁরা উকিলবাড়ির চত্বরে আর্জি লেখানোর জন্যে সাতসকালে এসে বসে আছেন তাঁরাও সসম্ভ্রমে উঠে দাঁড়ান, অনেকে নতজানু হয়ে জোতদারমশাইকে প্রণাম জানান। উকিলবাবু গায়ের চাদর গুছোতে গুছোতে আসন ছেড়ে জোতদার-মশাইকে সম্বর্ধনা দিতে এগিয়ে আসেন; তারপর আড়ালে, দুচারটি কথা বলে, হাসতে হাসতে ফিরে আসেন; বোধ হয় আর্জি লেখার জন্য মোটা টাকার ব্যবস্থা হয়।

নিম্নমধ্যবিত্ত যাঁরা তাঁরা এবার স্বস্তির নিশ্বাস ফেলেছেন। ৮ একর/১০ একরের মধ্যে থেকে তাঁরা অনেকটা নিশ্চিন্তই আছেন; তবু আমলাদের কর্ম-দক্ষতায় তাঁদের এতটুকু আস্থা নেই বলে লেভির তালিকায় একবার চোখ বুলোতে দ্বিধা করছেন না। তার ওপর শত্রুপক্ষ তো আছেই; দু' দশ টাকা ঘুষ দিয়ে তালিকায় নামটা তুলে দিয়ে তাঁরা মজা দেখেন; অযথা হয়রানি তাঁরা উপভোগ করেন। এরকম কারুর নাম তালিকায় উঠেছে কি না, এখনও জানা যায় নি; হয়তো আসছে সপ্তাহেই জানতে পারবো। দু' সপ্তাহ আগে আমি লিখে-ছিলাম—সরকারের লেভির নীতি ঘোষণার পরই অনেকে জমি ছোট করে নিচ্ছেন, ছেলেমেয়ে,নাতিনাতনী সকলের নামে এমনভাবে দলিল হচ্ছে যাতে লেভি না দিতে হয়। এর বিরুদ্ধে ব্যবস্থা অবলম্বনের জন্যেও আমি অনুরোধ করে-ছিলাম। এখন দেখছি আমার সে অনুরোধ বৃথা যায় নি। দেরি হয়ে গিয়েছে, তাই জমি হস্তান্তর আর বন্ধ করা যাবে না বলে সরকার নির্দেশ দিয়েছেন যে, ৮ একর বা ১০ একরের নিচে জমি দেখালেই চলবে না, তাকে সংসারে হাঁড়ি আলাদা, সংসার আলাদা সেটাও দেখাতে হবে। সরকারের লোকজন নিজেরাই গিয়ে খোঁজ-খবর করবেন, এমন কি আশপাশের বাসিন্দারাও যদি সাক্ষী দেন যে, ওঁদের একান্নবর্তী সংসার তাহলে সেই সাক্ষ্যের উপর নির্ভর করেও লেভি ধার্য করা হবে। উত্তম ব্যবস্থা; আর এ ছাড়া উপায়ই বা কি আছে! নীতির ত্রুটি দিয়ে যাঁরা গলে গিয়েছেন তাঁদের ধরে আনার এ ছাড়া আর উপায়ই বা কি? কিন্তু এতে বিপদ আছে অনেক। এই সুযোগে গ্রাম্য শত্রুতা ও দলাদলি মাথাচাড়া দিয়ে উঠবে; ফলে স্থানে স্থানে অশান্তি ঘটাও বিচিত্র নয়।

কিন্তু ব্যবস্থায় যেখানে আসল ত্রুটি তা দূর করার কোন চেষ্টাই হল না; ফলে সরকারের লক্ষ্য পূর্ণ হবে কি না সন্দেহ। গত বছরের অভিজ্ঞতায় আমরা দেখেছি বেশির ভাগই বড় বড় জোতের মালিক লেভির পরিমাণ নির্ধারণে সরকারী সিদ্ধান্তে কোনদিনই সন্তুষ্ট হন না। ঘুষঘাষ দিয়ে একদফা চেষ্টা চলে পরিমাণ কমাবার; তারপর আপত্তি। এতেও সন্তুষ্ট না হয়ে এস-ডি-ও'র কাছে দরবার—তার-পর হাইকোর্ট। কাজেই লেভির পরিমাণ নির্ধারিত হতেই বছরের পর বছর ঘুরে যায়, তারপর প্রশ্ন আসবে লেভি আদায়ের। গত বছর যার আদায় শত ছয়েকের মত মামলা এখনও হাইকোর্টে ঝুলছে; অর্থাৎ যাঁরা হাইকোর্টে মামলা টেনে এনেছেন তাঁরা লেভির অংশবিশেষ দিয়েই পরমানন্দে দিন কাটাচ্ছেন। তার-পর হাইকোর্ট থেকে যখন লেভির পরিমাণ নির্ধারণে চূড়ান্ত রায় বেরুবে তখন তো সব ফর্সা। হাই-কোর্টের রায় নিশ্চয় কেউ অবজ্ঞা করবেন না; কিন্তু গোলায় যদি তখন একদানাও আয় ধান না থাকে অনুকূলে ডিগ্রী পেয়েও সরকার কিছু করতে পারবেন না। কাজেই আটঘাট এমনভাবে বেঁধে সরকারের চলা উচিত ছিল যাতে কেউ লেভি কোন অবস্থাতেই ফাঁকি দিতে না পারে।

* * *

অসেচ এলাকায় ৮ একর ও সেচ এলাকায় ১০ একর পর্যন্ত জোতের মালিক-দের লেভি থেকে রেহাই দিয়ে সরকার ভাল কাজ করেছেন। তার ফলে হাটে-বাজারে চাল এখন অঢেল; দামও পড়তির দিকে। নিম্নমধ্যবিত্তরা তাদের বারো মাসের খাবার ধান রেখে বাকী ধান কি বেচে দিচ্ছে বলেই দাম নেমে এসেছে এবং সকলেই বলাবলি করছে গোলমাল যদি কোথাও না হয় তা হলে চালের দর এক টাকায় নেমে যাওয়াও বিচিত্র নয়। কিন্তু গ্রামবাসীরা সে ভাগ্য করেছে বলে তো মনে হচ্ছে না। ধান কাটা নিয়ে হাঙ্গামাটা এ বছর বন্ধ বেড়েছে। ছুতোনাতা করে গোলমাল বাঁধানো হচ্ছে, জোর করে ধান কেটে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে, বংশপরম্পরায় যাকে জমিতে চাষ করতে দেখছি, যারা জমির মালিক বলেই জানি—তাদের সে জমির ফসল থেকে বঞ্চিত করার চেষ্টা চলছে। ক্ষেতখামারে রাজনৈতিক দলের ছেলেরাও আজকাল বন্ধু আনাগোনা করছে, ভোটবাবুরাও আসছেন—কি যে তাঁরা ছাই-ভস্ম এদের বুঝাচ্ছেন জানি না; দেখছি শুধু বিরোধ বেড়েই চলেছে। মারামারি কাটাকাটি লেগেই আছে। ২৪ পরগনা, বর্ধমান ও হুগলীর নানা স্থানে এ সব ঘটনা ঘটছে; ফলে পুলিশ গাঁয়ের মধ্যে আবার ঢুকছে। আগে পুলিশ দেখলে লোকে ভয় পেতো, ঘরে গিয়ে লুকোতো—কিন্তু এখন পুলিশ দেখলে কেন জানি না ছেলেবুড়ো সকলেরই দেখি লোম খাড়া হয়ে ওঠে। গত বছর পুলিশ গাঁয়ে গাঁয়ে যে অত্যাচার চালিয়ে গেছে মনে হয় কারুর গা থেকেই সে দাগ এখনও মোছে নি; তাই পুলিশ দেখলে ঘৃণা ও রাগে তাদের শরীর যেন ফুলেফেঁপে ওঠে। তবু সত্যি কথা বলতে কি পুলিশের সে উগ্রমূর্তি এখনও দেখছি না—গত বছরের চেয়ে এবারে কিছুটা ভদ্র ও সংযত হয়েছে বলে মনে হচ্ছে।

অবশ্য এখনও লেভি আদায়ের ধুম সুরু হয় নি। প্রকৃতপক্ষে জানুয়ারীতে

বড়দিনে ঃ একদল উপোসী মানুষ

ক্ষয়ন্তী সেন

এ রাস্তা অসহ্য ছিলো, লক্ষ্য থেকে দূরে
কত দূরে
কোথায় এনেছে বল? আগুনের ধারে জড়োসড়ো
বুড়োটা কান্নার সুরে অবিরত
একই প্রশ্ন করে।
উপোসের তীক্ষ্ম ছাপ ক্লান্ত মুখে, শরীরের খাঁজে
এবং ক্ষুধার্ত মনে,
যার কান্না আরও ভয়াবহ!
সকলে এ ওর মুখে চেয়ে থাকে,
নীরবতা বাধ্যতামূলক,
কেন না উত্তর কারো জানা নেই। শুধু মাত্র
ক্ষুধার শরিক,
বঞ্চনার সহভোগী, পথভ্রষ্ট যন্ত্রণার সাথী
পথের ক্লান্ত দৃশ্যে একত্রিত
একদল উপোসী মানুষ
প্রশ্নের আবর্তে ঘুরে খাবি খায়
স্রোতে ভাসা কুটো!

বড়োটার স্থির হাতে আগুনের তাপ
শুষে নিতে
করুণ প্রচেষ্টা আছে, হিমবাহ
সময় এখানে
অজস্র তুষারপাত করে চলে
ঋতু বৃত্তাকারে!
কে দেবে উত্তাপ বল—কার বুকে
নিশ্চিত আশ্রয়
হারানো লক্ষ্যের দিশা, চির উষ্ণ
ঘুমের পৃথিবী!
আগুনের লাল আভা
ছায়া আরোপিত
নিরুপায় কপালের প্রতি ভাঁজে
স্থির ওষ্ঠাধরে
দিনের তৃষিত-কান্না, সেও স্তব্ধ
রাত্রি গাঢ় হলে।

সুরু হবে তখন হয়তো দেখতে পাবো পুলিশের আসল চেহারা।

নির্বাচনটা যদি মাথার ওপর না থাকতো তাহলে বোধহয় ক্ষেতখামারে যে গণ্ডগোলটা প্রায়শই হচ্ছে তা হতো না। কারণ পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছি একদল রাজনৈতিক কর্মী ওৎ পেতে রয়েছেন কখন হামলা বাধবে; যে পক্ষ অত্যাচারিত ও নির্যাতিত হবে অমনি তাদের সপক্ষে এঁরা এসে দাঁড়াবেন, অন্যায়ের প্রতিকার চাইবেন। প্রতিকার কিছু হোক আর না হোক ভোটের ব্যবস্থাটা তো হবে। সেই-জন্যেই বড় আশঙ্কা হয় হাঙ্গামাটা যে রেটে বাড়ছে, ভোট আরও কাছে এগিয়ে এলে আরও না বাড়ে।

তারপর লেভি আদায়ের দিনক্ষণ এমনভাবে করা হয়েছে ঠিক ঐ ভোটের সময়ে গিয়েই পৌঁছবে। একদিকে লেভি আর একদিকে ক্ষেতের ফসলের মালিকানা নিয়ে বিরোধ এমন অবস্থায় এসে পৌঁছচ্ছে সামনের দুটি মাস ভগবানের কৃপায় ভালয় ভালয় কাটলে হয়। অথচ এ বছরই আমাদের সবচেয়ে আশা ও আনন্দের দিন। কারণ ভষাবহ দুর্যোগ কাটিয়ে এবার আমাদের ক্ষেতখামার সোনা ফসলে ছেয়ে গিয়েছে। সরকারী কর্তারাও হিসেব করেছেন এত রেকর্ড ফলন আর কখনও হয় নি। কিন্তু দুর্ভাগ্য আমাদের এত ফসল পেয়েও আমরা সর্বহারা—সে ফসল যে শান্তিতে ভোগ করবো, ধসে-পড়া বাড়িঘরগুলি নতুন করে যে বানিয়ে নেবো, নতুন মাটি দিয়ে যে গোলা সাজাবো, আগামী বছরের জন্য দুটো ভাল বলদ কিনবো, গৃহ-লক্ষ্মীকে বৎসরান্তে একখানা ভাল শাড়ি দেবো, ছেলেমেয়েগুলো জাড়ে কষ্ট পাচ্ছে গরম দুটো জামা-কাপড় দেবো তারও দেখছি উপায় নেই। একটা না একটা উৎপাত লেগেই আছে। আমরা মুখ্যুসুখ্যু মানুষ—অতশত বুঝি না। আমাদের বিশ্বাস লেভি আদায়ে জোর-জুলুম না করে সরকার গাঁ থেকে চাল কেনার দিকে, আর একটু যদি জোর দেন তাহলে কয়েক লক্ষ টন চাল সংগ্রহ হয়ে যাবে। ফড়েরা কিনছে চোখের সামনে দেখছি; সরকারের লোকজনও যদি এইভাবে চাল সংগ্রহ করেন এবং এক একটি এলাকা থেকে দিনে ১০০ কুইন্টল চাল কিনতে থাকেন (যা পাওয়া এখন মোটেই দুষ্কর নয়) তাহলে সারা পশ্চিমবঙ্গে কয়েক লক্ষ কুইন্টল ধান সংগ্রহ হবে এক মাসের মধ্যেই—যা সংগ্রহ করছে ব্যবসায়ীরা। ব্যবসায়ীরা যা পারে সরকার তা পারবেন না কেন বুঝি না। অথচ এতে হাঙ্গাম-হুজ্জতেরও ভয় নেই। ৮ একব ও ১০ একবের মধ্যে যাঁরা পড়েছেন তাঁরা অনেকেই নিজের প্রয়োজন-টুকু রেখে বাকীটা এখনই বেচে দিচ্ছেন। সরকারের উচিত যেখানে যা পাওয়া যায় তাই সংগ্রহ করে নেওয়া এবং দর যেখানে ১ টাকার কাছাকাছি রয়েছে সেখানে সুযোগ হাতছাড়া করা কখনই উচিত নয়। অবশ্য ফুড কর্পোরেশনের বাবুদের দিয়ে এ সব কাজ হবে না। গাঁয়ে ঢুকতে গেলে, গাঁয়ের রাস্তা চিনতে গেলে, গাঁয়ের মানুষের হাঁড়ির খবর পেতে হলে গাঁয়ের মানুষকে ফুড কর্পোরেশনে চাকরি দিতে হবে এবং তাদের দিয়ে এ কাজ করাতে হবে। মাপ করবেন, অপরাধ নেবেন না সরকার এমন সব ডি পি এজেন্ট নিয়োগ করেছেন যাঁদের লোকজনের অনেকে ধান-চালের হিসেবের 'হ'ও বোঝেন না, লাভ-লোকসানের খতিয়ানও ঘাঁটতে জানেন না। তবুও এঁরা যদি গাঁয়ের মানুষের সঙ্গে ব্যবহারটাও ভাল করেন তাহলে অশান্তিটা অন্তত হয় না।

আমি সরকারের বড়কর্তাদের করজোড়ে অনুরোধ করবো এবার সরকারের যে সব লোকজন গাঁয়ে ধানচাল সংগ্রহের জন্যে আসবেন বা এসেছেন এবং লেভিও যাঁরা আদায় করবেন বা লেভির পরিমাণ সম্পর্কে আপত্তির বিচার করবেন, তাঁরা যেন গাঁয়ের মানুষের সঙ্গে একটু ভদ্র ও নম্র ব্যবহার করার চেষ্টা করেন। ওরা অনেক জিনিষ বোঝে না; বুঝতে চাইলে তাদের ওপর খড়্গহস্ত হওয়া বা দেখা না করার চেষ্টা যদি এবারেও করা হয় তার ফল যে মোটেই ভাল হয় না গতবারে আমরা তা দেখেছি। যাঁরা বিচার করবেন দয়া করে তাঁরা যদি একটু সহানুভূতিশীল হন তাহলে লেভি নিয়ে আইন-আদালতের ঝামেলায় অনেকেই যেতে চাইবেন না। এতে সরকারের উদ্দেশ্যও সফল হবে। উদ্দেশ্য যখন ধান-চাল সংগ্রহ করা তখন সেইটেকেই বড় করে দেখা উচিত; এর ব্যতিক্রম হলে সরকারের একূলও যাবে, ওকূলও যাবে।

—সমর চট্টোপাধ্যায়

ভারত দর্শন

গান্ধীজী ঃ বিড়লাপরিবার এবং বিড়লাভবন

গান্ধীজীর নামের সঙ্গে বিড়লাজীর নাম জাতীয় আন্দোলনের কাল থেকেই বিজড়িত আছে, যে কারণ বংশ পরম্পরায় বিড়লাপরিবার ব্যাপারটাকে শ্লাঘার বিষয় বলে ভাবতে পারেন। কৌপীনধারী মহাত্মা গান্ধী অন্নহীন, বস্ত্রহীন ভারতবর্ষকে তাঁর পবিত্র উপদেশাদি প্রাসাদোপম বিড়লাভবন থেকেই বহুবার প্রদান করে আসায় বিড়লাভবন প্রায় দরিদ্র বান্ধবালয়ে পরিণত হয়েছিল। বিড়লাপরিবার ভারতের সেই সমুদয় সৌভাগ্যবানদের মধ্যে অন্যতম প্রধান যাঁরা দরিদ্র ভারতের নেতার তথা জাতির পিতার অকুণ্ঠ আশীর্বাদ লাভ করে এসেছেন। গান্ধীজীর আশীর্বাদপূত বিড়লাভবনকেও সে-কারণে সাধারণ মানুষের সমস্তপ্রকার দাবি-দাওয়ার ঊর্ধ্বে রাখা উচিত ছিল। দুঃখের বিষয় তা হয় নি।

কংগ্রেস এম-পি শ্রীশশিভূষণ হঠাৎ বিড়লাভবনে অনশনের হাট বসিয়ে বিড়লাভবন অধিকারের আন্দোলন সুরু করেছেন। এ-বিষয়ে 'ভারত দর্শন'-কার সবিনয়ে বলতে বাধ্য, ব্যাপারটি যথার্থ শোভন হচ্ছে না।

দৈনন্দিন জীবনে আমরা দেখে থাকি, পিতা-মাতার স্নেহভাজন পুত্র বা কন্যা একটু জেদীই হয়ে থাকেন। শৈশবকাল থেকে পরিবারের মধ্যে তাঁদের বিশেষ প্রতিষ্ঠা জীবন সম্বন্ধে তাঁদের এক বিশেষ দর্শনের হদিস দিয়ে থাকে। তাঁরা ধরে নেন, পরিবারকে তাঁদের কিছুই দেয় নেই, পরিবারবর্গের সঙ্গে তাঁদের কেবলই প্রাপ্তির সম্পর্ক। এজন্য বয়সকালে তাঁদের সমাজজীবনে কিছু বিসদৃশ দেখালেও, মনে রাখতে হবে, এই মানসিকতার জন্য যদি কারও বস্তুত দায়িত্ব থেকে থাকে তবে সে দায়িত্ব সেই পরিজন স্থানীয় অভিভাবকবর্গেরই। অত্যধিক প্রশ্রয় এঁদের মধ্যে আত্মকেন্দ্রিক ব্যক্তিত্ব গঠনে সহায়তা করে এসেছে। পরবর্তী জীবনে এঁদের ওপর দোষারোপ তাই বাস্তবের যথার্থ ব্যাখ্যা নয়।

গান্ধীজী জাতির পিতা। বিড়লাপরিবার তাঁর স্নেহভাজন অতঃপর স্বাধীন ভারতে বিড়লাপরিবারের জাতির কাছ থেকে যত প্রাপ্তি আছে, তদনুরূপ দেয়ও আছে এমন তর্ক পূর্বের উদাহরণকে বানচাল করে দেয়। অতঃপর সেই যুক্তিতেই বিড়লাভবনের টুকরো জমিই যদি আজ গান্ধী-স্মৃতির উদ্দেশ্যে প্রদত্ত হয় এবং তদ্দ্বারাই যদি গান্ধীজীর স্নেহভাজন পরিবার মনে করেন যে তাঁরা তাঁদের যথার্থ ঋণ শেষ করেছেন, তবে তাই নিয়ে আর জল ঘোলা করে লাভ কি।

ব্যাপারটা এই যে, গান্ধীজীর ভালবাসার ধন গান্ধী-স্মৃতির উদ্দেশ্যে উৎসর্গীকৃত হবে কি না তা বিড়লাজীরই বিচার্য। কারণ গান্ধীজীর কাছে বিড়লাপরিবার যা পেয়েছেন তার জন্য কতটুকু তাঁর দেয় এ বিচার তো তাঁরই। সমগ্র ব্যাপারটিকে তাই, অধীনের মতে, ভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকেই দেখতে হবে।

আর জাতীয় স্মৃতিমন্দির, সে কি দাবি ক'রে আদায় করার বস্তু? সেই যে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন (প্রমুখ নেতারা যাঁদের আমরা আজ প্রায় ভুলতেই বসেছি) তিনি তাঁর যথাসর্বস্ব দান করে গেছলেন। নেতাজী ভবনও নেতাজীর স্মৃতির প্রতীক। কিন্তু বিড়লাভবনকেও গান্ধীজীর স্মৃতিকে সমভাবে বহন করতে হবে এ দাবির মধ্যে যথার্থ বিষয়বস্তুর তাৎপর্য নেই।

দেশবন্ধু ছিলেন দাতা। তিনি সর্বস্ব দিয়ে যেতে পারেন। কিন্তু বিড়লাজীকে সেই সব আদর্শের সম্মুখীন করে বাপুজী-স্মৃতির জন্য ঘর-বাড়ি দিয়ে দেওয়ার দাবি তুলে ব্যস্ত করা কি দাবিদারের পক্ষেই যুক্তিযুক্ত ব্যাপার হচ্ছে।

আগা খাঁ তাঁর প্রাসাদের সেই অংশে দান করেছেন বৃটিশ যে অংশে গান্ধীজীকে প্রাসাদবন্দী করে রেখেছিলেন। কিন্তু এই নিদর্শন তুলেও বিড়লাজীকে বলা যায় না তিনিও দান করুন তাঁর প্রাসাদ যেখানে গান্ধীজী শেষনিশ্বাস ত্যাগ করেছেন।

অথচ সদলবলে বিড়লাজীকে বিড়ম্বনায় ফেলা হয়েছে। কয়েকজন কিছু কিছু কড়া কথাও বলেছেন। যেমন জনসঙ্ঘ নেতা স্বামী ব্রহ্মানন্দজী প্রকাশ্যে বললেন ঃ বড়ই আশ্চর্যের কথা, যে বিড়লাপরিবার গান্ধীজীর সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপনের সুযোগে প্রভূত অর্থাগমের পথ করে নিয়েছেন, তাঁরা বিড়লাভবনটি জাতির নিকট দান করার মতো একটা সামান্য কাজ করতে পারছেন না!

অন্যদিকে কংগ্রেসী সংসদ সদস্য শ্রীঅমৃত নাহাতা আবার এক গদগদরসী বক্তৃতায় বললেন ঃ যে সরকার (তাঁর দলেরই সরকার!) কিষাণ ও কুটীরবাসীদের অতি সামান্য সম্পত্তির এতোটুকু কালহরণ না করেই ক্লোক করে নিতে পারেন পরিতাপের বিষয় তাঁরাই বিড়লাভবনের ক্ষেত্রে কার্যকরী ব্যবস্থা অবলম্বনে এতো ধীরগামী।

গান্ধীজীর জন্য কম্যুনিস্ট সদস্য শ্রী এম ফারুকীকেও খুব চিন্তিত দেখা গেল।

বিষয়টি তাই জরুরী চিন্তার বিষয় সন্দেহ নেই। কারণ বিড়লাভবনকে কেন্দ্র করে ভিন্ন ও বিভিন্ন মতাদর্শ একই মঞ্চে এসে উপনীত হয়েছেন।

বিড়লাজী অন্তত এইটুকু বুঝুন, জাতির পিতার জন্য মতধর্মাদর্শ নির্বিশেষে সন্তানগণ জাতীয় দাবি উত্থাপিত করেছেন। একই সঙ্গে শ্রীচন্দ্রশেখর অবশ্য আশ্বস্ত করে বলেছেন ঃ গান্ধীজী যেখানেই গেছেন ও থেকেছেন, সমবেতভাবে সেগুলির উপর কোনও দাবি রাখা হচ্ছে না। শুধু গান্ধীজী যেখানে শহীদ হয়েছিলেন সেই ভবনটিই দাবি করা হচ্ছে।

এখন বিড়লাজী তথা ভারত সরকার যদি বিষয়টিকে কেবলমাত্র হ্যাভ-নটস-দের চ্যালেঞ্জ বলে গ্রহণ করেন, তবে এই দাবি মেনে নেওয়া শক্ত হবে। নচেৎ একটি সাধু উদ্দেশ্যে বিড়লাভবন ঐতিহাসিক মর্যাদা লাভ করতে পারে, যদি এক্ষেত্রে কোন চ্যালেঞ্জের প্রশ্ন না গণনা করা হয়। যতদূর দেখা যাচ্ছে, কংগ্রেস ও জনসঙ্ঘ যেখানে আন্দোলনের বড় শরিক, সেখানে ব্যাপারটিকে কেবলমাত্র চ্যালেঞ্জ বলে গ্রহণ না করাই বিধেয় এবং সে-কারণে বিড়লাজী অবশ্যই ফিরে ভাবতে পারেন। হাজার হোক, গান্ধীজীর সঙ্গে তাঁদের সম্পর্কটা খুবই ঘনিষ্ঠ ছিল। এবং বিড়লাজীর পক্ষে গোটা-কয়েক প্রাসাদ দান, লাভ ও তৈরি করা বাস্তবিক কোন সমস্যাই নয়।

কর্মী-অধিকার-হরণ অনুমোদিত

যেমন সচরাচর হয়ে থাকে, বলবন্ত রাও চ্যবন সাহেবের কেন্দ্রীয়-কর্মী-অধিকার-হরণ বাঞ্ছা ভোটের বলে পাশ হয়ে গেল লোকসভায়। বিরোধী সদস্যরা অবশ্য সেই "কালা কানুন" পাশের অংশীদার হতে অস্বীকৃত হয়ে সভাগৃহ ত্যাগ করেছিলেন। কিন্তু প্রকৃত বিরোধী আর কজন। দেশের সংখ্যাগুরু লোক ভোট দিয়ে যে সমুদয় আইন চাপিয়ে দেওয়ার ব্যবস্থা করেছেন, তাই চেপেছে। বলবার কিছু নেই। বিরোধীরা তাকে কালা কানুনই বলুন, আর যা ইচ্ছে তাই বলুন, আইন যাঁদের ওপর চাপছে তাঁদেরও মধ্যে ঢের লোক আছেন, যাঁরা ফের সেই আইনপ্রণয়নকারীদেরই দোসরা সমজাতীয় আইন রচনা করতে বিধানসভা ও লোকসভায় প্রেরণ করবেন। সুতরাং দেশের মানুষ যা চান, তাই হয়েছে। বেশ হয়েছে।

বিরোধীপক্ষ অবশ্য মুষ্টিমেয় ভোটের জোর নিয়ে যথাসম্ভব লড়েছেন। বলেছেন: ও বিল তামাম শ্রমিকসমাজের অধিকার হরণে ব্যগ্র। আজ যা কেন্দ্রীয় কর্মীদের কণ্ঠরোধ ও ধর্মঘট করার অধিকার হরণে ব্যগ্র, কাল তাই শ্রমিক ভারতের মৌলিক অধিকারে হস্তক্ষেপ করবে। তা করবে বৈকি, দেশের নির্বাচকমণ্ডলী যতদিন চাইবেন, ততদিন এমন সব বিল হামেশা পাশ হয়ে যাবে।

বিরোধীরা নিয়মমাফিক হট্টগোল ছাড়াও সংসদীয় পন্থায় বিলটির বিরোধিতা করেন। যেমন বৈষম্যের প্রশ্ন, ডিভিসন এবং শেষ পর্যন্ত (সভা) গৃহ ত্যাগ। ফলে বিলটির কৃষ্ণবর্ণ কিছু ফিকে করায় তাঁদের ভূমিকা কিছু কাজেও এসেছিল। বিরোধী চাপ সৃষ্টির ফলে সরকারপক্ষ বিলের মেয়াদ পাঁচ থেকে তিন বছরে স্থির করতে বাধ্য হন। অর্থাৎ সাধারণ নির্বাচনের মুখোমুখি এই বিলের মেয়াদও শেষ হবে। অর্থাৎ বিলের মেয়াদ অতঃপর বাড়াতে হলে নির্বাচনের মুখে এই অপ্রিয় কাজটি করতে হবে। নির্বাচকমণ্ডলীর সামনে শ্রমিক-বিরোধী বিল পুনরনুমোদনে তোলা তখন একটু কণ্টকর হতে পারে। অবশ্য ভারতের নির্বাচকমণ্ডলী অতশত ভেবে সরকার গঠন করেন না। তাই নির্বাচনের টিকিট নিয়ে কোন সরকার কী করলেন না করলেন সংখ্যাগুরু নির্বাচকের তাতে থোড়াই কিছু এসে যায়। তাঁরা পঞ্চবার্ষিক ভোটটি স্রেফ থেলাচ্ছলেই বাক্সে ভরে দিয়ে যাবেন। অন্তত গত একুশ বছরের অভিজ্ঞতা তাই-ই। তবু কেন বিরোধীরা চেঁচিয়ে মরেন? না, তাঁরা নির্বাচকমণ্ডলীকে জাগ্রত করতে চান। জানাতে চান ঐ 'কালা কানুনের' পেছনে পরোক্ষে নির্বাচকমণ্ডলীর সমর্থনই রয়ে গেল।

যাই হোক, ভাবনা ছিল সরকার খুশিমত এই আইনবলে যে কোন কাজকেই অত্যাবশ্যক শ্রেণীভুক্ত করে কর্মীকণ্ঠ দাবিয়ে দিতে পারবেন। কিন্তু এক্ষেত্রে একটি প্রতিবন্ধক এই রাখা হয়েছে যে, কোন কাজ অত্যাবশ্যক ঘোষণার আগে ঘোষণার সরকারী বিজ্ঞপ্তি সংসদে উত্থাপন করা হবে। উত্থাপন মানেই আলোড়ন। সরকারী ইচ্ছা কার্যে অবশ্যই পরিণত হবে, তবে তার আগে পুনশ্চ আলোড়নের সুযোগ মিলবে। ফলে এদেশে তথাকথিত জনমত সৃষ্টিতে সাহায্য হবে।

প্রস্তাবাকারে অনুমোদিত আইনটি নাকি সরকার কেবলমাত্র প্রয়োজনেই ব্যবহার করবেন। এবং এই আইনও অত্যাবশ্যক না হলে ব্যবহৃত হবে না। সরকার আরও পরিষ্কার করে দিয়েছেন যে, শীঘ্রই আর একটি বিল আনা হবে যার বলে কেন্দ্রীয় কর্মীদের অভাব-অভিযোগ সালিশীতে পাঠানো হবে। কিন্তু এমনতর বদান্য ব্যবস্থা থাকা সত্ত্বেও বিরোধীরা অসন্তুষ্ট। তাঁরা মনে করেন, যে ব্যবস্থা কর্মীদের ন্যূনতম চাহিদা পূরণে অনিচ্ছুক, সেই ব্যবস্থার আওতায় কোনো সান্ত্বনা সালিশীই যথেষ্ট নয়। ধর্মঘটের অধিকার ব্যতিরেকে কর্মী ও শ্রমিক স্বার্থ পর্যুদস্ত হবেই। বস্তুত কার্যকরী সালিশীর সুফল গ্রহণের ইচ্ছা থাকলে মাত্র এক দিনের প্রতীক-ধর্মঘটকে কেন্দ্র করে সরকার কেন্দ্রীয় কর্মী-সমাজে বিভীষিকার রাজত্ব কায়েম করতেন না। একদিনের ধর্মঘটকে সরকার যেমন রূঢ়তার সঙ্গে দমন করলেন এবং সঙ্গে সঙ্গে অর্ডিন্যান্স ও আইন প্রভৃতি দমনমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করে বিরোধীদের মুখে 'সালাজার সরকার নিপাত যাক' ধ্বনির যোগান দিলেন, আর মালিকশ্রেণীর সামনে তুলে ধরলেন শ্রমিক-দমনকারী এক শাসনের প্রকাশ্য রূপ, যার দ্বারা মালিকশ্রেণী অতঃপর শ্রমিক শোষণে আরও অকুতোভয় হওয়ার প্রেরণা লাভ করলেন।

অথচ আমাদের জাতীয় সরকারের মুখে অধরোষ্ঠের সুখবর্ধক একটি আওয়াজ হাটে-ঘাটে-মাঠে চালু আছে। তা' হল গণতন্ত্রী সমাজতন্ত্রের আশ্বাস। কিন্তু সরকার নিজেই যে আদর্শ-নিয়োগকর্তার 'স্পেসিমেন' প্রদর্শন করলেন, তার দ্বারা ঐ গালভরা 'সমাজতন্ত্রের' বুলিটিকে কি একেবারেই কবরখানায় চালান করা হলো না?

শ্রমিকদরদী না হয়ে বর্তমান ক্ষমতাসীন সরকার শ্রমিক নিপীড়কের ভূমিকা গ্রহণে বদ্ধপরিকর হয়ে উঠছেন। এর ফলে শিল্পোদ্যোগে ও শিল্পে শান্তি ব্যাহত হবে এবং তার দায়িত্ব সরকারেরই অদূরদর্শিতারূপে কীর্তিত হতে থাকবে, এই পরিণতির কথাও গুরুত্বের সঙ্গে চিন্তা করার প্রয়োজন।

হরিয়ানা-পশ্চিমবঙ্গে বৈষম্যমূলক আচরণ প্রসঙ্গে

হরিয়ানা ও পশ্চিমবঙ্গে রাজ্যপালদ্বয় বৈষম্যমূলক আচরণ করেছেন, সদস্য-বর্গের এই অভিযোগের উত্তরে চ্যবন সাহেব বলেন, দুই রাজ্যের পরিস্থিতি মোটেও এক রকম ছিল না। হরিয়ানার রাজ্যপালের বিশ্বাস ছিল, বংশীলালই সংখ্যাগুরুর সমর্থনভাজন। কিন্তু পশ্চিমবঙ্গে রাজ্যপাল বুঝেছিলেন, যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রিসভা সংখ্যাগুরুর সমর্থন বঞ্চিত।

যেহেতু রাজ্যপালদ্বয়ের উপরোক্তরূপ উপলব্ধির ওপর মতিপত্র-বিবাদ উপস্থিত করা সম্ভব নয়, সে কারণ সদস্যবর্গ সমস্যার মূল প্রশ্নে বিতর্ককে টেনে নিয়ে গিয়ে বলেন, হরিয়ানার ক্ষেত্রে রাজ্যপালের ক্ষমতার প্রয়োগ স্পীকার সম্মেলনের সুপারিশের পর সীমিত হয়ে গেছল। স্পীকার সম্মেলনে বিধানসভাকেই উচ্চতম ক্ষমতা দান করার প্রস্তাব ছিল। মন্ত্রিসভার সংখ্যাগরিষ্ঠতা সম্পর্কে বিবাদ নিষ্পত্তির স্থান হিসেবে স্পীকার সম্মেলন বিধানসভাকেই নির্দেশিত করেন।

সংখ্যাগরিষ্ঠতা সম্পর্কে বিবাদ উপস্থিত হওয়ার এক সপ্তাহকালের

মধ্যেই, স্পীকার সম্মেলনের সুপারিশ, মুখ্যমন্ত্রীর বিধানসভা আহ্বান করা উচিত। এই সাদা কথাটা স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বুঝতে চাইছেন না বলে সদস্যগণ ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন।

কিন্তু চ্যবন সাহেবও স্পষ্টাস্পষ্টি জানিয়ে দিয়েছেন যে, স্পীকার সম্মেলনের সুপারিশ কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভায় গৃহীত না-হওয়া পর্যন্ত ঐ সুপারিশ কার্যকরী করার অধিকার তাঁর নেই।

সুতরাং যেমন চলছিল, রাজ্যপালই এ বিষয়ে চূড়ান্ত বিচারক রয়ে গেলেন। রইল না শুধু স্পীকার সম্মেলনের সুপারিশের মর্যাদা, অন্তত কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভা যদি ঐ সুপারিশ গ্রহণ না করেন, তাহলে গত সাধারণ নির্বাচনের পর দেশব্যাপী পটপরিবর্তন এবং পরীক্ষামূলক গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাকে প্রয়োজন অনুসারে সাজিয়ে তোলার যে চেষ্টা শুরু হয়েছিল তা অঙ্কুরেই বিনষ্ট হবে।

স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী স্বয়ং বলেছেন, "কোন রাজ্যে রাজ্যপাল বিশেষ অবস্থায় কি করবেন তা কেন্দ্রেরও বিচার্য নয়।"

এ বক্তব্যের তাৎপর্য তো এই দাঁড়ায় যে রাজ্যে নির্বাচিত সরকার নিয়ে যখন বিবাদের সূত্রপাত হবে তখন সে বিবাদের

বছর শেষ হয়ে এল।
আজ আমাদের অসংখ্য
পৃষ্ঠপোষক ও শুভানুধ্যায়ীদের
আন্তরিক প্রীতি সম্ভাষণ
জানাচ্ছি। আগামী বছরে
এবং বছরের পর বছর
তাঁদের তথা আরও অনেক
নতুন নতুন পৃষ্ঠপোষকদের
সেবায়
সমভাবে নিযুক্ত থাকার
আশা রাখি।

ইউনাইটেড ব্যাঙ্ক
অব ইণ্ডিয়া লিঃ

ইউবিআই

রেজিঃ অফিসঃ
৪, ক্লাইভ ঘাট স্ট্রীট
কলিকাতা-১

পশ্চিমবঙ্গে ১০০টিরও অধিক শাখা অফিস আছে

১৬৮১

চূড়ান্ত মীমাংসার ভার থাকবে সর্বোচ্চ আমলার ওপর, কোন নির্বাচিত প্রতিনিধি বা প্রতিনিধিসভার ওপর নয়।

ভারত পৃথিবীর অন্যতম বৃহত্তম গণতন্ত্র। সুদীর্ঘকাল প্রগেতিহাসিক বাস্তব অবস্থার সম্মুখীন হওয়ার সুযোগ পায় নি। তাঁরা প্রাথমিক অনুশাসন লিপিবদ্ধ করে গেছেন, বাস্তবের অবস্থার সঙ্গে যার ব্যাখ্যা ও সংশোধনাদি অবশ্যই প্রয়োজন হবে বলে নিশ্চয় তাঁদেরও ধারণা ছিল। বস্তুত প্রকৃত অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতেই তো কোন কিছুর পরীক্ষা সম্ভব। হরদম দল বদলের ঘটনা মাত্র রাজ্যে রাজ্যে কংগ্রেসী সরকার পতনের পরই সুরু হয়েছে। এই নতুন অবস্থার সঙ্গে তাল রেখে সেইমত গণতান্ত্রিক বিধি-ব্যবস্থা, তাই নতুন করে প্রয়োজনের আবশ্যকতাও দেখা দিয়েছে। স্পীকার সম্মেলন সেই উদ্দেশ্যেই একটি গণতান্ত্রিক উপায় উদ্ভাবন করেছিলেন, সাধারণ বুদ্ধিতেও যা বিনা দ্বিধায় গ্রহণযোগ্য।

কোন কারণে কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভা এই সুপারিশ গ্রহণে কালহরণ করছেন তা দুর্বোধ্য না হলেও বিস্ময়কর। যদি গণতন্ত্রই বজায় রাখতে হয় তবে মনোনীত রাজ্যপালের হাতে নির্বাচিত সরকারের বৈধতা বিচারের ক্ষমতা নিরঙ্কুশভাবে ন্যস্ত থাকা উচিত কি। আজ কেন্দ্রীয় ক্ষমতায় কংগ্রেস। কিন্তু গণতন্ত্র বজায় থাকলে সুস্থ গণতান্ত্রিক পটপরিবর্তনের ফলেই সেখানে অন্যতর দলের মন্ত্রিসভার পত্তনও হতে পারে। সেটাই স্বাভাবিক। সুতরাং সে কথা ভেবেও কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভার বিষয়টি ভেবে দেখা দরকার। ক্ষমতাসীন সরকারের মনোনীত রাজ্যপালের ওপর নিরঙ্কুশ ক্ষমতার্পণ এবং প্রেসিডেন্ট-প্রধান গণতন্ত্রে চারিত্রিক বৈচিত্র্য বিশেষ নেই। ভারত কি শেষ পর্যন্ত প্রেসিডেন্ট-প্রধান গণতন্ত্রের দিকেই পা বাড়াবে?

কংগ্রেস সংসদীয় কমিটিতে ছাত্র অশান্তির প্রশ্ন

কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী ডঃ ত্রিগুণা সেন গভীর দুঃখের সঙ্গে কংগ্রেস সংসদীয় কমিটির কার্যনির্বাহক সভার বৈঠকে বলেন, কেন্দ্রীয় সরকার বিশ্ববিদ্যালয় আইনের যে খসড়া তৈরি করেছেন, রাজ্য সরকারগুলি সেই খসড়া আইনের মূল নীতি অনুসারে রাজ্য বিশ্ববিদ্যালয় আইন সংশোধনে নারাজ। এই খসড়া আইনের মূলনীতি গ্রহণ করা হলে উপাচার্য নিয়োগে রাজ্য সরকারগুলির ক্ষমতা খর্বিত হবে, তাঁদের আপত্তি সেকারণেই দেখা দিয়েছে।

ছাত্র অশান্তি সম্পর্কে শিক্ষামন্ত্রী তাঁর পূর্বপ্রদত্ত অভিমতের পুনরাবৃত্তি করে বলেছেন, শিক্ষার অর্থকরী মূল্যের অভাবই ছাত্র অশান্তির পঁচাশিভাগ কারণ।

কেন্দ্রীয় খসড়া আইনের মূলনীতি কেবলমাত্র রাজ্য সরকারের ক্ষমতার ভিত্তিতেই রচিত হবে, রাজ্য সরকারগুলির এহেন দাবির শিক্ষাজগতে উত্তরোত্তর অস্বাস্থ্যের আবহাওয়া তৈরি করবে। সুতরাং ছাত্র অশান্তি সম্পর্কে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতাসম্পন্ন ছাত্রপ্রিয় শিক্ষামন্ত্রী যে গভীর ক্ষোভ ও চিন্তার সঙ্গে রাজ্য সরকারগুলির আচরণ লক্ষ্য করেছেন তা বলাই বাহুল্য। ক্ষমতার জাল বিস্তার করে রাজত্ব চালানই যদি উদ্দেশ্য হয় তবে কল্যাণব্রতী সরকার প্রতিষ্ঠার স্বপ্নও কোনোদিন প্রভাতের পবিত্র বাতাসের স্পর্শে সফল হবে না। কিন্তু বস্তুত কল্যাণব্রতী সরকার প্রতিষ্ঠার দিকে নজর আমরা কেবলই সরিয়ে এনে সমগ্র দৃষ্টিভঙ্গিকে ক্ষমতা ও স্বার্থের গণ্ডীতে সীমিত করে তুলছি। ফলত ভারতবর্ষ দিন দিন সমস্যাসঙ্কুল একটি ভৌগোলিক অস্তিত্বে পরিণত হচ্ছে। এখানে কোন বিশেষ মন্ত্রীর ও সদস্যের শুভ ইচ্ছা কার্যকরী করার উপায় নেই। সমস্যারও তাই সমাধান নেই।

শিক্ষামন্ত্রী ছাত্র অশান্তির কারণকে সর্বদাই মনস্তাত্ত্বিক কারণ বলে ব্যাখ্যা করে আসছেন। যেক্ষেত্রে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী প্রমুখের নজরে এ সমস্ত শুধুই ল' এণ্ড অর্ডারের প্রশ্ন। বলা বাহুল্য, ছাত্রসমাজের সঙ্গে শিক্ষামন্ত্রীর যেমন প্রত্যক্ষ সহানুভূতির সম্পর্ক ছিল, অন্যান্যদের ক্ষেত্রে তার সুযোগ ঘটে নি। তাঁরা যৌবনের আশা কল্পনা ও আকাঙ্ক্ষার কথা বার্ধক্যে বিস্মৃত হয়েছেন। গণ্ডগোলও সেইখানেই।

শিক্ষামন্ত্রী মনে করেন, উপাচার্য, বিভাগীয় প্রধান ও শিক্ষকদের ছাত্রদের সঙ্গে বৈঠকে মিলিত হওয়া উচিত। শিক্ষামন্ত্রীর এমত প্রস্তাব রুদ্ধদ্বার গ্রহণযোগ্য হবে জানি না, তবে দেশের বর্তমান পরিস্থিতিতে শিক্ষামন্ত্রীর প্রস্তাব তাৎক্ষণিকভাবে গৃহীত হওয়াই উচিত।

শিক্ষার জগতে যেভাবে আমলাতন্ত্রের প্রবেশ সুরু হয়েছে তাতে অবশ্য সে আশায় প্রথম থেকেই ইস্তফা দিয়ে রাখতে হয়। ঐ তো রাজ্য সরকারগুলি উপাচার্য নিয়োগের ক্ষমতা প্রয়োগে কিছু অসুবিধা দেখে বিগড়ে গেছেন। অর্থাৎ উপাচার্যকেও আমলায় পরিণত করার প্রবল ইচ্ছা অন্তর্নিহিত। অন্যদিকে শিক্ষাপর্ষৎগুলিও আমলাচক্রের আওতাভুক্ত। স্কুল-কলেজের কমিটিগুলিকে বিশেষ দল সংগঠন ও সম্পাদকের হাতে তুলে দেওয়া হচ্ছে স্পেশ্যাল কনস্টিটিউশনের (Special Constitution) ঢালাও সুযোগ দিয়ে। যেখানে অভিভাবক প্রতিনিধিরা সংখ্যালঘু, শিক্ষকগণ প্রায় অস্তিত্বহীন পরিচালনার ব্যাপারে, ছাত্রদের গণ্যই করা হয় না। এইভাবে শিক্ষাব্যবস্থায় সুস্থ আবহাওয়া গড়ে তোলা দেবতারও অসাধ্য।

এরই মধ্যে শিক্ষামন্ত্রীর প্রস্তাব, অর্থাৎ বিভাগীয় কর্তাদের সঙ্গে ছাত্রদের যোগাযোগ মন্ত্রবৃক্ষের বাড়ি দিগ্দর্শনের কাজ করতে পারে। কিন্তু সে আশাও যে ফলবতী হবে এমন দুরাশা রাখা যায় না।

বিশ্ববিদ্যালয় ও শিক্ষাপর্ষৎগুলির এক একটি জনসংযোগ বিভাগ অবশ্যই থাকা উচিত, যেখানে অভাব-অভিযোগগুলির দ্রুত মীমাংসা সম্ভব হবে। শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের পরিচালনাগত, ত্রুটি সম্পর্কে অভিযোগের মীমাংসা শুধু কয়েকটি আমলার ওপর ন্যস্ত থাকলে সেখানে লাল ফিতে ও অন্যান্য ভয়াবহ প্রতিবন্ধক যেমন চলে আসছে তেমনিই মাথা তুলে দাঁড়িয়ে থাকবে। ছাত্র এবং অভিভাবকদের বর্তমানে বস্তুত কোন "কোর্ট অব আপীল" নেই, যেখানে অভাব-অভিযোগের দ্রুত নিষ্পত্তি হতে পারে। কেবলমাত্র অভিযোগ সংক্রান্ত বিষয় পরিচালনার জন্যই একটি করে সমর্থ জনসংযোগ বিভাগ, মনে হয়, অভিযোগ সংক্রান্ত রিয়ারগুলির দ্রুত ফয়সালা করতে সমর্থ হতে পারে। এই বিভাগের সঙ্গে শিক্ষামন্ত্রকের সরাসরি যোগাযোগ এবং এই বিভাগের পুরোভাগে একটি নির্বাচিত সভাও থাকা বাঞ্ছনীয়। অবশ্যই সে সভা সরকারী মনোনয়নপ্রাপ্ত সদস্যদের দ্বারা ভারাক্রান্ত হলে কোন সুফলই দেখা দেবে না।

বিশ্ববিদ্যালয় ও শিক্ষা পর্ষৎ পর্যায়ে যেমনা বিভিন্ন বিষয়ক কমিটি আছে, এই বিভাগও তদনুরূপ একটি কমিটিকে শীর্ষে নিয়ে দ্রুত কার্য পরিচালনা করতে পারেন। তবে কমিটির গঠন অবশ্যই নিম্নরূপ হওয়া আবশ্যক। এই কমিটির সদস্যবর্গ ছাত্র ও অভিভাবক শ্রেণীর ভোটেই নির্বাচিত হবে এবং সেখানে আমন্ত্রণপ্রাপ্তির না থাকলেই একমাত্র অভিযোগগুলির গণতান্ত্রিক মীমাংসা সম্ভব। আশা করি এ জাতীয় প্রস্তাব কতদূর বাস্তবায়িত করা সম্ভব সে সম্পর্কে কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষিত হবে এবং তিনি এ বিষয়টি ভেবে দেখবেন। শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলিকে যতদিন না সাধারণের পরিচালনাধীনে আনা যাচ্ছে, ততদিন সমস্যার প্রকৃত উপলব্ধি ও তদনুযায়ী শিক্ষাসংস্কারেরও কোন উপায় হবে না, এমন কথা নতুন শোনালেও গভীরতর চিন্তায় এর যাথার্থ্য উপলব্ধ হবে বলেই বিশ্বাস।

(২১।১২।৬৮)

নিকসন মন্ত্রিসভার সদস্যগণ

লাতিন আমেরিকার দেশগুলির মধ্যে আয়তনে সব চেয়ে বড় ও জনবহুল ব্রেজিলে অনেক দিনই গণতন্ত্রের কোন চিহ্ন নেই। চার বৎসর আগে জোয়াও গুয়েলার্তের অপশাসনের হাত থেকে দেশকে উদ্ধারের জন্য সৈন্যবাহিনীর ক্ষমতা দখলের পর থেকে এখানে যা চলছে তা সামরিক অফিসারদের জঙ্গী শাসন। তবু তার মধ্যেও আইনসভা, রাজনৈতিক দল, সংবাদপত্র, এ সব চলছিল। গত সপ্তাহ থেকে সে-সবেরও ইতি হয়েছে।

রাষ্ট্রপতি আর্থার দা কস্তা অ' সিলভা 'ইনস্টিটিউশনাল অ্যাক্টে' স্বাক্ষর করে রাষ্ট্রশাসনের সকল ক্ষমতা নিজের হাতে গ্রহণ করেছেন। এই নিয়ে গত চার বৎসরে পাঁচ বার এই আইনের প্রয়োগ করতে হল।

রাষ্ট্রপতির ঘোষণা অনুসারে ব্রেজিলের সংবিধান বাতিল করে দেওয়া হয়েছে, আইনসভা কংগ্রেস ভেঙে দেওয়া হয়েছে, এবং রাষ্ট্রপতিকে যে-কোন নাগরিকের রাজনৈতিক অধিকার কেড়ে নেওয়া, যে-কোন ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করা, হেবিয়াস কর্পাসের অধিকার বাতিল করা, যে-কোন সরকারী কর্মচারীকে কর্মচ্যুত করা, যে-কোন সম্পত্তি দখল করা এবং সংবাদপত্র নিয়ন্ত্রণ করার ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে।

সামরিক অফিসারদের স্বৈরাচারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাবার জন্যই ব্রেজিলে আজ এই চরম একনায়কতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা হল। গত সেপ্টেম্বর মাসে ব্রাসিলিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে পুলিশী অনুপ্রবেশের ঘটনা থেকে এর সূত্রপাত। ছাত্র আন্দোলন দমনের নাম করে পুলিশ বিশ্ববিদ্যালয়ে ঢুকে ছাত্র ও অধ্যাপকদের ওপর নির্মমভাবে অত্যাচার চালায়। দেশের সামরিক কর্তারা পুলিশকে পূর্ণ সমর্থন জানান। এই ঘটনার নিন্দা করে আইনসভার নিম্নকক্ষ চেম্বার অব ডেপুটিজ-এ মার্সিও মরেরো আলভেজ এক জ্বালাময়ী ভাষণ দেন।

বিরোধী দলের ৩২ বৎসর বয়স্ক তরুণ সদস্য আলভেজ সামরিক শাসনের একজন কঠোর সমালোচক। তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ে পুলিশী অনুপ্রবেশের জন্য সামরিক কর্তাদের দায়ী করে এদের 'অত্যাচারীর গোষ্ঠী' বলে অভিহিত করেন। এই ঘটনার প্রতিবাদে তিনি দেশবাসীর কাছে স্বাধীনতা দিবসের সামরিক কুচকাওয়াজ বর্জনের জন্য আহ্বান জানান। যুবতী মেয়েদের প্রতি আলভেজের অনুরোধ : কোন সামরিক অফিসারের প্রেমে পড়বেন না! এদের বয়কট করুন!

সামরিক কর্তাদের পক্ষে আলভেজের স্পর্ধা সহ্য করা অবশ্যই সম্ভব নয়। তাঁরা চাপ দিলেন রাষ্ট্রপতির ওপর, এখনই আলভেজকে গ্রেপ্তার করুন। দেশব্যাপী সামরিক শাসনের বিরুদ্ধে যে বিক্ষোভ দেখা যাচ্ছে, আলভেজ তার প্রতীক। সুতরাং, আলভেজকে গ্রেপ্তার করলে বিক্ষোভও থামবে। অন্তত সামরিক অফিসারদের তাই ধারণা।

কিন্তু আইনসভার সদস্যরূপে আলভেজের কিছু বিশেষাধিকার আছে। তাঁকে গ্রেপ্তার করা যায় না। চেম্বারে কস্তা অ' সিলভার দলের সংখ্যাগরিষ্ঠতা রয়েছে। তাই রাষ্ট্রপতি চেষ্টা করলেন, আলভেজের বিশেষ অধিকার কেড়ে নেবার জন্য চেম্বারকে দিয়ে প্রস্তাব পাশ করিয়ে নেবার জন্য। সব ঠিকও ছিল। কিন্তু শেষ মুহূর্তে, ভোটের ফলাফলে দেখা গেল, কস্তা অ' সিলভার দলের অন্তত ১০০ জন সদস্য এ ব্যাপারে বিরোধীপক্ষের সঙ্গে ভোট দিয়েছেন। তাঁরা 'নেকড়ের মুখে' তাঁদের সহকর্মী আলভেজকে ছুঁড়ে দিতে রাজী হন নি। ১৪১—২১৬ ভোটে আলভেজের বিশেষাধিকার কেড়ে নেবার সরকারী প্রস্তাব অগ্রাহ্য হয়েছে। ভোটের ফলাফল প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে দর্শক গ্যালারী থেকে দর্শকেরা আনন্দে নৃত্য শুরু করে, এবং জাতীয় সঙ্গীত গাইতে থাকে। চেম্বারের সদস্যরাও তাদের সঙ্গে সমবেত সঙ্গীতে যোগ দেন।

আইনসভার সদস্যরা স্বাধীনতা রক্ষার জন্য সাহসের সঙ্গে অগ্রসর হলেন বটে। কিন্তু সামরিক নেতাদের নিয়ন্ত্রণ করতে পারলেন না। জেনারেল সিসেরো সারমেনতোর নেতৃত্বে সামরিক অফিসাররা রাষ্ট্রপতির সঙ্গে গোপন আলোচনায় বসলেন। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী জেনারেল আফনসো দ্য আলবুকার্ক লিমা এঁদের মদত দিলেন। দ্রুত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হল। সংবিধান, আইনসভা, সব কিছু বাতিল। সব ক্ষমতা রাষ্ট্রপতির হাতে।

আইনসভার ভোটের ফলাফল প্রকাশ করা বন্ধ করে দেওয়া হল। রেডিও, টেলিভিশন এমন কি সংবাদপত্রের ওপর কঠোর নির্দেশ গেল। কয়েকটি সংবাদপত্রের প্রকাশ বন্ধ করে দেওয়া হল। পরদিন মধ্যরাত্রে রেডিও টেলিভিশনে আইনমন্ত্রী লুইজ আনতোনিও দা গামা অ' সিলভা ঘোষণা করলেন, রাষ্ট্রপতি কর্তৃক সকল ক্ষমতা গ্রহণের কথা। রাষ্ট্রপতির নামে আসলে সব ক্ষমতা এল সামরিক বাহিনীর হাতে। এতদিনও তাই ছিল। তবে এখন আর কোন লুকোচুরি রইল না।

ব্যাপক গ্রেপ্তার শুরু হয়েছে। ধৃত ব্যক্তিদের মধ্যে রয়েছেন প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি, জনপ্রিয় নেতা ও আগামী রাষ্ট্রপতি নির্বাচনের সম্ভাব্য প্রার্থী জুসেলিনো কুবিৎচেক, বিখ্যাত গায়ক সিকো বুয়ার্কে দ্য হলান্ডা, সাংবাদিক হোলিও ফার্নান্ডেজ, প্রভৃতি। সামরিক কর্তাদের চক্ষুঃশূল আলভেজের কোন সংবাদ এখনও পাওয়া যায় নি। সম্ভবত তিনি গা ঢাকা দিয়ে আছেন।

দেশের সকল শ্রেণীর জনসাধারণ, বিশেষ করে প্রভাবশালী ক্যাথলিক ধর্মযাজক গোষ্ঠী, ছাত্র, শ্রমিক এমন কি ব্যবসায়ীরাও আজ সামরিক শাসনে ক্ষুব্ধ। এই অবস্থায় একনায়কতন্ত্রী শাসন কি এখানে টিকবে? রিও দ্য জানেরোর বিখ্যাত দৈনিক পত্রিকা অ' এসতাদো দ্য সাও পোলো কস্তা অ' সিলভার উদ্দেশে সতর্কবাণী উচ্চারণ করেছে : "আট কোটি লোককে একটি সৈন্যবাহিনীর মত শাসন করা যায় না।"

ইতালী :

শেষ পর্যন্ত বোধ হয় ইতালীর রাজনৈতিক সংকটের অবসান হল। মারিয়ানো রুমরের নেতৃত্বে গত সপ্তাহে ইতালীর নতুন মন্ত্রিসভা শপথ গ্রহণ করেছেন।

আলভো মোরোর মন্ত্রিসভার পদত্যাগের পর দেশে একটানা রাজনৈতিক সংকট চলছিল। আইনসভার আস্থাভাজন কোন মন্ত্রিসভা গঠন সম্ভব হচ্ছিল না। এই অবস্থার মধ্যে আবার শুরু হয়েছিল ব্যাপক শ্রমিক ও ছাত্র বিক্ষোভ। শেষ পর্যন্ত দেশের প্রধান তিনটি দল ক্রিশ্চিয়ান ডেমোক্রাটিক পার্টি, সোস্যালিস্ট পার্টি ও রিপাবলিকান পার্টি একযোগে বামঘেঁষা

মধ্যপন্থী একটি কোয়ালিশন সরকার গঠন করতে রাজী হয়েছেন।

নতুন মন্ত্রিসভা দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর ইতালীর ২৯তম মন্ত্রিসভা। এটি বৃহত্তম মন্ত্রিসভাও বটে, এর মোট সদস্য হলেন ২৭ জন। আইনসভা সদস্যদের ব্যাপক অংশের সমর্থন লাভের জন্য মন্ত্রি-সংখ্যা বাড়াতে হয়েছে। এই মন্ত্রিসভায় ক্রিশ্চিয়ান ডেমোক্রাটিক পার্টির ১৭, সোস্যালিস্ট পার্টির ৯ ও রিপাবলিকান পার্টির ১ জন সদস্য আছেন।

৭২ বৎসর বয়স্ক প্রবীণ সোস্যালিস্ট নেতা পিয়েত্রো নেন্নি নতুন মন্ত্রিসভায় পররাষ্ট্রমন্ত্রী হয়েছেন। আর নেন্নির সহ-কর্মী ফ্রান্সেসকো দ্য মার্তিনো হয়েছেন সহকারী প্রধানমন্ত্রী।

রুমর মন্ত্রিসভা চেম্বার অব ডেপুটিজ-এর ৬৩০ জন সদস্যের মধ্যে ৩৬০ জনের সমর্থন লাভ করতে সক্ষম হবেন বলে আশা করা হচ্ছে। রুমর প্রধানমন্ত্রী হয়েই প্রতি-শ্রুতি দিয়েছেন, অর্থনৈতিক ও সামাজিক সংস্কারের কাজে তিনি হাত দেবেন এবং ছাত্রদের শিক্ষা সংস্কারের দাবিও বিবেচনা করবেন।

কিন্তু ইতালীর অর্থনৈতিক সংকট যেরূপ তীব্র আকার ধারণ করেছে, বর্ণ-বৈষম্য যেমন প্রকট হয়ে উঠেছে, এবং আমলাতন্ত্রের অপদার্থতার বিরুদ্ধে দেশ-বাসীর মনে যে ঘৃণা দেখা দিয়েছে, তাতে রুমর সরকারও কার্যকরী কিছু করে উঠতে পারবেন কি না, তাতে সন্দেহ রয়েছে। এই গুরুতর সংকটের মোকাবিলা করার জন্য যে কর্মপন্থা প্রয়োজন, সোস্যা-লিস্ট পার্টির সদস্যরা তা চাইলেও রক্ষণ-শীল ক্রিশ্চিয়ান ডেমোক্রাটদের অধিকাংশই তা সমর্থন করবেন না। এ অবস্থায় কিছু করা মুশকিল, আর করতে গেলে সরকারের পতন।

তাই ইতালীর কমিউনিস্ট পার্টির সম্পাদক লুইজি লোঙ্গো বলেছেন, এই

মারিয়ানো রুমর

মন্ত্রিসভার গঠনই এমন যে এর পক্ষে মৌলিক কিছু করা সম্ভব হবে না। এও সেই নতুন বোতলে পুরনো মদ।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র :

নির্বাচিত রাষ্ট্রপতি রিচার্ড নিকসন ২০শে জানুয়ারী দায়িত্বভার গ্রহণ করবেন। ইতিমধ্যে তিনি তাঁর মন্ত্রিসভার ১২ জন সদস্যের নাম ঘোষণা করেছেন। আসলে মার্কিন শাসনব্যবস্থায় মন্ত্রীদের কোন উল্লেখযোগ্য ভূমিকা নেই। এখানে রাষ্ট্র-পতিই সর্বেসর্বা। তবু মন্ত্রীদের একেবারে উপেক্ষা করা যায় না। পরামর্শদাতারূপে তাঁরা রাষ্ট্রপতির ওপর প্রভাব বিস্তার করতে পারেন।

মন্ত্রীদের বিশেষ কোন ক্ষমতা নেই, এ কথা নিকসন জানেন বলেই বোধ হয় একটা অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে টেলিভিশন মারফত তিনি সমগ্র জাতির কাছে মন্ত্রীদের হাজির করেছেন। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ইতিহাসে এই জাতীয় অনুষ্ঠান এই প্রথম। কেবল মন্ত্রীরা নন, মন্ত্রীদের স্ত্রীদেরও তিনি পরিচয় করিয়ে দিয়েছেন। মন্ত্রী-পত্নীদের জন্য বিশেষ রাজনৈতিক সুযোগ-সুবিধার কথাও নিকসন ঘোষণা করেছেন।

নিকসন মন্ত্রিসভার সকলেই রিপাবলি-কান দলভুক্ত, সকলেই শ্বেতাঙ্গ, সকলেই পুরুষ। সর্বশ্রেণীর প্রতিনিধি নিয়ে নিকসন একটি ব্যাপক মন্ত্রিসভা গঠন করবেন বলে যে কথা শোনা গিয়েছিল, তা ভ্রান্ত প্রমাণিত হয়েছে।

পররাষ্ট্র সচিব (রাষ্ট্রপতির পরেই যাঁর স্থান এবং যিনি 'কিপার অব দি গ্রেট সীল অব দি য়ুনাইটেড স্টেটস') পদে নিযুক্ত হয়েছেন উইলিয়াম রজার্স। রজার্স নিকসনের দীর্ঘকালের ঘনিষ্ঠ বন্ধু। ১৯৫২ সালে যখন নিকসন উপরাষ্ট্রপতি পদের জন্য প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন, তখন তহবিল সংগ্রহ নিয়ে যে কেলেঙ্কারী হয় তা থেকে নিকসনকে উদ্ধার করেন রজার্স। তখন থেকে প্রতি সমস্যায় নিকসনের প্রধান পরামর্শদাতা এই রজার্স। প্রতিরক্ষামন্ত্রীর পদে আসছেন মেলিভন লেয়ার্ড। লেয়ার্ড রিপাবলিকান পার্টির অন্যতম প্রধান নেতা ও নিকসনের অনুগামী।

এই দুই প্রধান পদে যাঁদের নিয়োগ করা হয়েছে, তাঁদের কারও সংশ্লিষ্ট কাজের ব্যাপারে কোন অভিজ্ঞতা নেই। দুজনেই আনকোরা নতুন। এই নিয়ে রীতিমত বিস্ময়ের সৃষ্টি হয়েছে। আবার এর জন্য অনেকে নিকসনের প্রশংসাও করেছেন। এঁরা খোলা মন নিয়ে কাজ করতে পারবেন। আগের থেকে এঁদের মন আচ্ছন্ন হয়ে নেই। এ কথাও অবশ্য কেউ কেউ বলছেন যে, নিকসন সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ দুজনকে এই দুই প্রধান গুরুত্বপূর্ণ পদে নিয়োগ করেছেন, কারণ, পররাষ্ট্র ও প্রতিরক্ষার ব্যাপার আসলে তিনি নিজে চালাবেন।

নিকসন মন্ত্রিসভার সদস্যদের অধি-কাংশই মার্কিন রাজনৈতিক জীবনে বিশেষ পরিচিত নন। এঁদের সম্পর্কে বলা হয়েছে, এঁরা খুব বিরাট নন, নতুন নতুন চিন্তার উদ্ভাবকও নন। এঁরা হলেন দক্ষ ও পারদর্শী কারিগরের মত। বর্তমানে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে এমন লোকেরই দরকার। জনসন শাসনে যে বিশৃঙ্খলা হয়েছে, তা সামলাবার জন্য দক্ষ প্রশাসকের প্রয়োজন, চিন্তাবিদের দরকার নেই।

মন্ত্রিসভার মধ্যে রজার্স ছাড়া আরও দুজন রয়েছেন নিকসনের একান্ত ঘনিষ্ঠ। এঁরা হলেন অ্যাটর্নী জেনারেল জন মিচেল, এবং স্বাস্থ্য, শিক্ষা ও জনকল্যাণ সচিব রবার্ট ফিনশ। এই তিনজনকে নিয়েই হবে মূল মন্ত্রিসভা।

২১-১২-৬৮

বড়দিনের
কমিশন !!

২০শে ডিসেম্বর
থেকে
৭ই জানুয়ারী
পর্যন্ত
বসুমতী থেকে
প্রকাশিত যাবতী
গ্রন্থ ও গ্রন্থাবলী
ঘরে ঘরে রাখবার
মত, যত দুর্মূল্য সম্ভার
সমগ্র পরিবারের
পড়বার
এই বই বই আর বই!
পুস্তক বিক্রেতাদের
জন্য শতকরা পঁচিশ টাকা
এবং
সাধারণ ক্রেতাদের জন্য
কমিশন শতকরা কুড়ি টাকা
যাকে বলে

সুবর্ণ সুযোগ !!

আপনি স্বয়ং আসুন
কিম্বা লিখিত অর্ডার
পেশ করুন অর্ধেক টাকা
অগ্রিম পাঠিয়ে—

বসুমতী (প্রা) লিঃ
১৬৬, বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী স্ট্রীট
কলিকাতা-১২

চাঁদের চিঠি

রামেন্দু মুৎসুদ্দি

প্রিয়তমাসু,

তোমরা সব কেমন আছো, সুসান ?

আমরা তিনজন তো বেশ দিব্যি ফুর্তিতে ছিলাম। সকালের জলখাবারও মহানন্দে খেলাম। কিন্তু তারপর থেকেই কেমন যেন গা-বমি করছে। অ্যান্ডার্সেরও নাকি তাই। তা তুমি যেন বেশি ভেবো না আমার জন্যে। টুকটাক ওষুধ তো আমাদের সঙ্গেই রয়েছে। আবার ঠিক হয়ে যাবো'খন। যে-কাজে আমরা নেমেছি, আমাদের ওপর যে-বিশ্বাস দেশবাসী স্থাপন করেছে, কাজ সমাধা করে তার মর্যাদা রাখতে প্রাণপণ চেষ্টা করবো। তুমি তো আমায় জানো, সুসি, কেমন একরোখা আমি। আমার একগুঁয়েমি দেখে তুমিও তো মাঝে মাঝে বিরক্ত হয়েছ।

কাজটা যে মোটেই সহজসাধ্য নয়, সে কে না জানে। পৃথিবী থেকে চাঁদের দূরত্ব কম করে ২ লাখ ২০ হাজার মাইল। এতটা পথ পাড়ি দেওয়া কি চাট্টিখানি কথা নাকি? কবিরা কল্পনার ডানায় ভর দিয়ে অবশ্য এবেলা-ওবেলা পারাপার করেছেন, রূপকথার নায়কেরা পক্ষীরাজের পিঠে চেপে চাঁদের দেশে গিয়েছে, চাঁদ বুড়ির সঙ্গে আলাপ করেছে। কিন্তু কোন রক্তমাংসের মানুষ সত্যি সত্যি কতটা এগুতে পেরেছে? চাঁদ মানুষকে বার বার হাতছানি দিয়ে ডেকেছে ঠিকই, কিন্তু সে ডাক শুনেই মানুষ এক ঢোক জল খেয়ে নিয়ে ছুটে তার কাছে যেতে পেরেছে কি?

এ তো মেরুসাগর পাড়ি দেওয়া নয় সুসান, কিম্বা এভারেস্ট শৃঙ্গে ওঠাও নয় যে, যার হচ্ছে সেই বোঁচকা-বুঁচকিতে খাবার-দাবার নিয়ে হুট্ করে যাত্রা সুরু করবে। তাই আন্তর্জাতিক কূটনীতির ক্ষেত্রে যেমন, তেমনি মহাকাশযাত্রাতেও আমাদের প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বী হলো সোভিয়েট রাশিয়া। এতদিন মানুষের ধারণা ছিলো আমেরিকা হেরে যাবে, সোভিয়েট রাশিয়াই চাঁদে মানুষ পাঠানোর ব্যাপারে এগিয়ে আছে। কিন্তু এবার তুমি তোমার রুশ বান্ধবীদের নিশ্চিন্তে বলতে পারো, আমেরিকা ওদের দেশকে ছাড়িয়ে কতদূর এগিয়ে গিয়েছে।

ওঃ সেদিন তো তুমি এলে না, সুসান। আমরা যেখান থেকে শূন্যে যাত্রা করলাম সেই কেপ কেনেডিতে সেদিন লোকে লোকারণ্য। জিমের (লোভেলের) বৌ মেরিলীনও এসেছিলো। আমার এত খারাপ লাগছিলো তোমার জন্যে, কী বলবো। যাক গে, তার জন্যে মন খারাপ করো না তুমি, তোমার অসুবিধে আমি বুঝি, সুসি। যাই হোক, কর্মসূচী মতো ভারতীয় সময় ঠিক ছ'টা একুশে আমরা মহাশূন্যে যাত্রা করলাম। সেদিন ফ্রেডারিক আর এডুইনকে যখন আমাদের প্রোগ্রাম বোঝাচ্ছিলাম, তুমিও তো সেখানে ছিলে। বলছিলাম না, কী বিরাট দৈত্যি বানানো হয়েছে স্যাটার্ন-৫ রকেটটিকে, আমাদের অ্যাপোলো-৮ মহাকাশযানটিকে যে ঠেলে ওপরে নিয়ে এসেছে। কত উঁচু জানো রকেটটা? একটা মোটামুটি আকাশ-ছোঁয়া ৩৬ তলা বাড়ির সমান। এর শরীরের ওজন হলো তিন হাজার টনেরও বেশি। আর এক-একটা ধাক্কা যখন সে দেয় তখন তার শক্তি দাঁড়ায় ৭৫ হাজার পাউণ্ডের সমান।

সুসান, মনে আছে নিশ্চয়ই তোমার, সেদিন বলছিলাম আমাদের এ যাত্রাকে তিনটি স্তরে ভাগ করা হয়েছে। প্রথম স্তরে স্যাটার্নের প্রচণ্ড ধাক্কায় আমাদের বাহন অ্যাপোলো-৮ এক লাফে ৩৮ মাইল উঁচুতে উঠে গেলো। দূর বোকা মেয়ে, ধাক্কা খেয়ে গুঁড়িয়ে যাবো কেন, আমরা টেরই পাই নি কিছু, শুধু মনে হলো খুট করে একটা আলতো অনুভূতি। ঘণ্টায় সেদিন ছ' হাজার মাইল বেগে ছুটে এসেছিলাম। এরপর দ্বিতীয় পর্যায়। মানে আর একটি ধাক্কা, ব্যস আরো ৮০ মাইল। মানে তোমার কাছ থেকে আমি তখন ১১৮ মাইল দূরে। তারপর তৃতীয় পর্যায়ে সুরু করলাম আমরা চন্দ্রমণ। ঘুরছি তো কেবল ঘুরছিই। না গো, কেবল আমেরিকার চার পাশেই চক্কর দিচ্ছিলাম না, গোটা পৃথিবীর চারদিকে আমরা ঘণ্টায় ১৭ হাজার ৪ শ' মাইল জোরে ঘুরে বেড়াচ্ছিলাম। আমরা তখন তোমাদের পৃথিবীর কক্ষপথে। বার দুয়েক পাক দিলাম। দেখে নিচ্ছিলাম পরবর্তী পদক্ষেপ নেবার আগে বাহন অ্যাপোলো-৮-এর যন্ত্রপাতি সব ঠিক আছে কি না, পরে আবার তারা বিশ্বাস-ঘাতকতা না করে। নিচের মহাকাশ স্টেশনের ডাইরেক্টর রোজারের (ক্রিস ক্র্যাফট) সঙ্গে হরদম কথা বলছিলাম। বেশ স্পষ্ট শোনা যাচ্ছিল ওর কথা, টেলিফোনে তোমার গলাটা যেমন পেতাম। তখনই আমি ওপরের সব অবস্থা রোজারকে জানিয়ে আমাদের ভবিষ্যৎ কর্তব্য সম্পর্কে নির্দেশ চাইলাম। এসে গেলো নির্দেশঃ এগিয়ে চলো, সোজা চাঁদে পাড়ি জমাও।

গ্রহ থেকে গ্রহান্তরে। একবার কল্পনা করো, সুসান। মনে আছে, আমাদের বাগানে একদিন আমরা চারজনে গল্প করছিলাম। এডুইন তখনো বাচ্চা। আমি ওকে ওপরে ছুঁড়ে দিতে তুমি ভয়ে আঁ আঁ করে উঠেছিলে। আমার ওপর কী রাগই না হচ্ছিলো তোমার সেদিন। কিন্তু আমি জানতাম, ওপর থেকে খোকা আবার

(বাম থেকে দক্ষিণে) নেতা বোরম্যান, অ্যান্ডার্স ও লোভেল

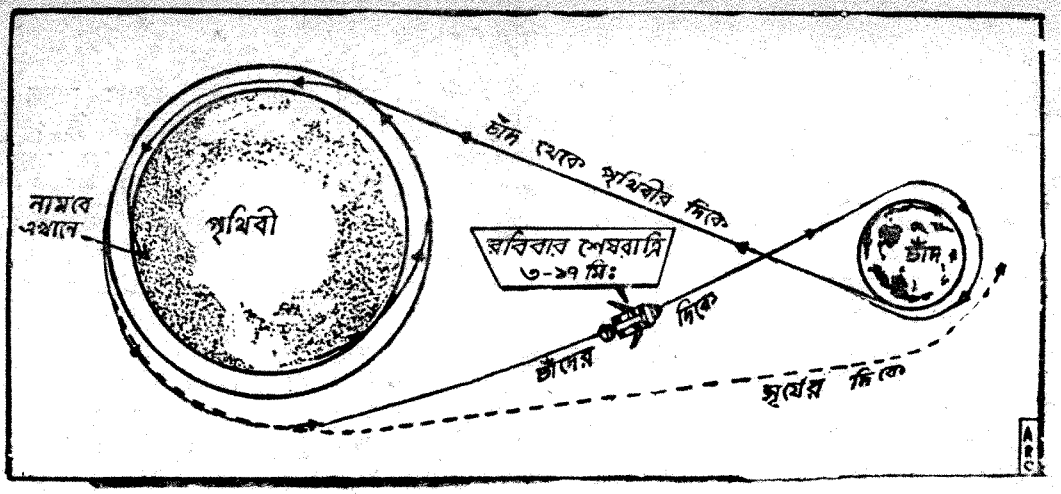

আমার কোলেই নেমে আসবে। জানতে তুমিও। পৃথিবীর তাই নিয়মঃ মাধ্যাকর্ষণ বা অভিকর্ষ। কিন্তু তা জেনেও তোমার আতঙ্কের সীমা ছিলো না, এই বুঝি তোমার ছেলে গেলো শূন্যে উড়ে, থাকবে সেখানে ঝুলে অনন্তকাল ধরে। কিন্তু সুসান, আমরা এখন সেই শূন্যতার মাঝখানে ভেসে বেড়াচ্ছি, চাঁদের কক্ষপথে। তোমার প্রতি আমার প্রাণের টান থাকলে কী হবে, সুসি, তোমার এমন কি তোমার পৃথিবীর কোনো টানই আর আমাদের ওপর রইলো না, পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণ ডিঙিয়ে আমরা এখন চাঁদের মায়াজালে পড়ে গিয়েছি। এখন আমরা পৃথিবী থেকে এক লক্ষাধিক মাইল দূরে উঠে গিয়েছি। অবশ্যি ঠ্যালাটা বেশ জোরেই পেতে হয়েছে। ঘণ্টায় ২৫ হাজার মাইল বেগে ছুটে তবে এখানে পৌঁছুতে পেরেছি। এ প্রচণ্ড বেগ না দিলে পৃথিবীর চুম্বকশক্তির হাত থেকে যে আমরা রেহাই পেতাম না। এখন টানছে চাঁদ, তারও তো মোহিনীশক্তি, মাধ্যাকর্ষণ রয়েছে। কেন ওর কাছে যাবো না, বলো। এ কথা আমি তোমায় মুখে বলি বটে তোমার মুখটা চাঁদপানা, কিন্তু সে তো কেবল সোহাগ করে। আসলে তুমি তুমিই, মানে সুসান বোরম্যান, (আমার এক বাঙালী বন্ধু অবশ্য আমাকে ডাকে 'বর্মণ' বলে, ওদের নাকি এই পদবীর লোক আছে প্রচুর, মায় একজন নামডাকঅলা সুরশিল্পী পর্যন্ত!) আর ও হলো কিনা স্বয়ং চন্দ্রমা। কিসে আর কিসে! ওকি, অভিমানে ঠোঁট ওল্টালে নাকি সুসান। আরে নারে, পাগলী, চাঁদের দেশে নামার কোন প্রোগ্রামই নেই আমাদের। বলেছিলাম না, ভুলে গেলে কী করে তুমি এরই মধ্যে? আমাদের অ্যাপোলোর সঙ্গে সে বিশেষ যন্ত্র 'লুনার মড্যুল' দেওয়াই হয় নি তো যাবো কী করে। হ্যাঁ, আমরা কেবল বার দশেক চাঁদকে ঘিরে নাচবো। ভারতের পৌরাণিক কাহিনীতে নাকি আছে মুনি-ঋষিদের ধ্যান ভাঙার জন্যে রূপসী অপ্সরা-কিন্নরীরা ধেই ধেই করে নাচতো। আমাদের ঠিক উল্টো। চাঁদ-সুন্দরীর মন পাবার জন্যে আমাদের তিন সোমত্ত মরদকেই নাচতে-কুঁদতে হবে। কী জ্বালা বলো দিকি! আমরা যখন এভাবে চক্কর দেবো তখন সে আমাদের মাত্র ৭৫ মাইল দূরে—তাকে 'ছুঁই ছুঁই' করেও ছুঁতে পারবো না, অথচ সে যে বলবে 'ছুঁয়ো না, ছুঁয়ো না বঁধু, ওইখানে থাকো', এমনও নয়, কেবল ওই 'লুনার মড্যুলা'র অভাবেই আমাদের মনের ইচ্ছে মনে পুষে বাড়ি ফিরতে হবে। মড্যুলা নিয়ে যাবে অ্যাপোলো-১১, তার আগে আরো দুটো অভিযানের কথা আছে। তোমরা যখন বড়দিনের কেকে কামড় দিচ্ছো, ছেলেরা যখন খৃস্টমাস ট্রি সাজাচ্ছে, সান্টা ক্লজ বানাচ্ছে, তখন আমরা অবিরাম ঘুরছি তো ঘুরছি, না তোমাদের চারপাশে নয়, সম্পূর্ণ অন্য জগতে, চন্দ্রলোকে।

ঝুঁকি, বিপদ? তা তো রয়েছেই, ব্রিটেনের বিশ্ববিখ্যাত বিজ্ঞানী স্যার বার্নার্ড লোভেলই বিপদ সম্পর্কে হুঁশিয়ারি দিয়েছেন তো তুমি-আমি কোন ছার, সুসান। তবে পৃথিবীর চারপাশে চক্কর দিতে দিতে আমরা যদি দেখতে পেতাম কোন যন্ত্র বিগড়েছে তখন আমরা সঙ্গে সঙ্গে ফিরে যেতে পারতাম। সে ব্যবস্থা ছিলো। কিন্তু এখন আর সে রাস্তা নেই, সুসান। এখন যখন চাঁদের চারদিকে ঘুরছি, এখন কোন এদিক-ওদিক হলে ব্যস, আর রক্ষে নেই। না, পপাত ধরণীতলে হবারও কোনো আশা নেই। ঘুরতে ঘুরতে যেদিন অক্সিজেন ফুরিয়ে যাবে, সেদিন দম বন্ধ হয়ে ওই অ্যাপোলো—(আহা, তবু সান্ত্বনা থাকবে এমন একটা মধুর নামের মহাকাশযানের কোলে মাথা রেখে মরবো!) মহাকাশযানেই টুপ্ করে শেষনিশ্বাসটি যাবে। ওকি, তোমার চোখ ছলছল করছে কেন? আরে সত্যি আমরা মরছি নাকি? ইস, মরাটা যেন অতই সস্তা!

আরে বাপু, তুমি এটা কেন বুঝতে পারছো না, সরকার এই অ্যাপোলোর পেছনে ২৩২ কোটি ৫০ লাখ টাকা খরচা করছেন এবং স্যাটার্ন-৫ রকেটের বাবদ সাড়ে ১৮ কোটি ডলার, সে কি অত সহজে নষ্ট হতে দেবেন? টাকা কি খোলামকুচি নাকি? সাধারণ লোক তোমার-আমার টাকা না সেটা?

উঁহুঁ, চোখ মুছে ফেলো, সুসি আমার, কেঁদো না। আমি আবার ফিরে আসছি, আমরা তিনজনেই। তাছাড়া ফেরাটাই তো বড় কথা নয়, আমরা যে অপূর্ব সম্পদ মানুষের দোরে এনে দিলাম তার দাম কে দেবে? অ্যাণ্ডার্স ইতিমধ্যে যে অজস্র ফটো পাঠিয়েছে, তার ওপর নির্ভর করেই তো ভবিষ্যতে অ্যাপোলো-৯, ১০, ১১কে যেতে হবে। লাভ হবে প্রতিদ্বন্দ্বী সোভিয়েট রাশিয়ারও। কী ভাবছো আবার? এত কৃতিত্ব অর্জন করেও আমাদের মাইনে এক পয়সাও বাড়বে না এই কথা? আমরা কি মাইনে বাড়ানোর জন্যে এ ঝুঁকি নিয়েছিলাম বলে মনে করো নাকি তুমি? আশ্চর্য!

যাক, আগে তো ফিরি। ফিরে কত গল্প বলবো তোমাদের। ওখান থেকে আমাদের পৃথিবী দেখতে কেমন, চাঁদের দেশই বা কেমনতরো। তুমি ভেবো না, সুসান, ২৭-২৮ তারিখে প্রশান্ত মহাসাগরে হাওয়াই দ্বীপের কাছে নামবো আমরা, সেদিন থাকবে তুমি সেখানে? থেকো, কেমন?

ফ্রেডারিক আর এডুইনকে আমার স্নেহচুমো দিয়ো। অনেক আদর তোমার জন্যে।

—তোমার আদরের ফ্রাঙ্কি

সীমান্ত গান্ধীর স্বপ্ন ও বিষাদ

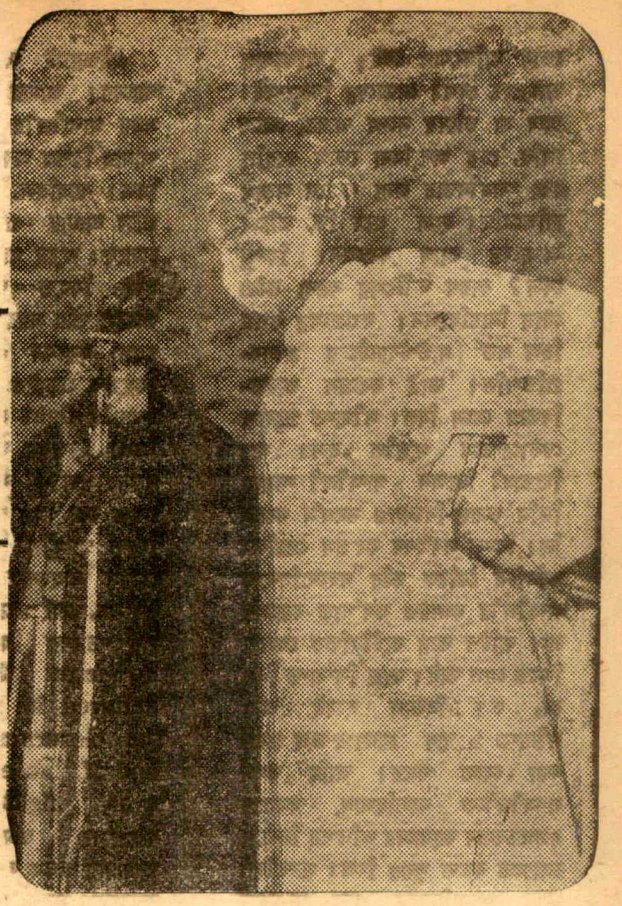

বীরেন্দ্র মিত্র

প্রবাদিত সীমান্ত গান্ধী খান আবদুল গফ্‌ফর খান কি আজও স্বপ্ন দেখেন ভারতের অধুনাতন নেতারা তাঁর কাছে প্রদত্ত গান্ধীজীর প্রতিশ্রুতি পালন করবেন আর "নেকড়ের মুখ থেকে" মুক্ত করবেন তাঁর স্বদেশবাসী পাখতুন ভায়েদের? বছরের পর বছর পাক জেলে কয়েদ থেকেও তাঁর সে স্বপ্ন বোধহয় ভঙ্গ হয় নি। আশ্চর্য, অমন জেদী পুরুষের মধ্যে এমন সরলতা প্রায় অবিশ্বাস্য, তবু সেটাই বাস্তব। সীমান্ত গান্ধী ভারতবাসীকে কাছে পেলে দু'হাতে ধরে যখন শিশুর মতো চোখের জল ফেলেন তখনও সেই অবরুদ্ধ বৃদ্ধ-শিশুটির ছবিই আমাদের সামনে ফুটে ওঠে, যিনি পাক-ভারতের স্বাধীনতা-উত্তরকালীন নেতৃবৃন্দের দিকে আজও আশা ও ভরসার দৃষ্টি তুলে ধরে কেবলমাত্র প্রবাদিত হতেই ভালোবাসেন। বুঝতে পারেন না, স্বাধীনতাপূর্ব এবং স্বাধীনতা-উত্তর ভারতবাসীর (অধুনা দ্বিখণ্ডিত) মন-মেজাজে বেবাক পরিবর্তন এসেছে। 'কোন এক গান্ধীজী'র প্রতিশ্রুতি নিয়ে মাথা ঘামাবার সময় সুযোগ কারও নেই। সকলের সামনে এখন কেবল গদির প্রতিকৃতি। গান্ধীজীর যদি কোনও প্রতিকৃতি আজও কারো কারো ড্রইং রুমের শোভা বর্ধন করে তবে সে প্রতিকৃতির আর সেই অমোঘ প্রভাব নেই। তবু সীমান্ত গান্ধী আজও আশা ও আশঙ্কায় দুরু দুরু বক্ষে কোন এক অনাগত শুভদিনের প্রতীক্ষা নিশ্চয় করেন, যেদিন ইচ্ছের বিরুদ্ধে ঠেলে-দেওয়া পাখতুনরা পুনরায় পাকিস্তানের থাবা থেকে মুক্ত হয়ে ভারতের উদার আবহাওয়ায় এসে স্বস্তির নিশ্বাস ফেলার সুযোগ পাবে। এই বিশ্বাসই সীমান্ত গান্ধীকে দীর্ঘকাল পাক-প্রভুদের কাছে অনমনীয় এবং বিদ্রোহী মনোভাব প্রদর্শন করে যেতে সাহায্য করেছিল। কিন্তু সে আশা শুধু ছলনা, ভারত তার মর্যাদা রাখে নি। অথচ গান্ধীজী বলেছিলেন যদি লড়াই করেও পাখতুনদের স্বস্থানে প্রতিষ্ঠা দিতে হয়, ভারতের তাতে কার্পণ্য করা উচিত নয়। কিন্তু পাখতুনিস্তানের স্বপ্ন সীমান্ত গান্ধীর চোখে ঝাপসা হয়ে আসছে। তথাপি গান্ধীজীর ওপর আস্থা তিনি আটুটই রেখেছেন। ভারতের প্রতি ভালোবাসায় এতোটুকু টাল খায় নি।

গান্ধী-শতবার্ষিকী উপলক্ষে কাবুলে প্রদত্ত তাঁর বক্তৃতায় সীমান্ত গান্ধী সশ্রদ্ধ স্বীকৃতি জানিয়েছেন গান্ধীজীর নেতৃত্বের প্রতি। অবরুদ্ধকণ্ঠে ক্ষোভ ও অভিমান অবশ্যই ঝরে পড়েছে, কিন্তু পাখতুন নেতার এবং পাখতুনদের ক্ষতির তুলনায় সে আর কতটুকু।

১৯৪৭-এর ভারত-বিভাগের সেই বিভীষিকাময়ী দিনগুলি আজও মনে পড়ে প্রায়-নির্বাসিত ভারতবন্ধু সীমান্ত গান্ধীর। তাঁর ভাষায় সেই নিষ্ঠুর ইতিহাস এইভাবে ধরা পড়েছে:

> ১৯৪৭-এ ভারতবর্ষ দু'ভাগে ভাগ হয়ে গেল। আমাদের অঞ্চলে রেফারেন্ডাম গ্রহণ করা হয়েছিল, যদিও ভারত-বিভাগের এক বছর আগে সীমান্ত প্রদেশে সাধারণ নির্বাচন হয়ে গেছে। আর আমরা মুসলিম লীগের বিরুদ্ধে বিপুল সংখ্যাধিক্যে জয়লাভও করেছিলাম। দ্বিজাতি-তত্ত্বের ভিত্তিতেই এই নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। অত্যন্ত দুঃখের বিষয়, ভারতের নেতৃবর্গ পাঞ্জাব এবং বাংলা দেশকে ভাগ করে দিলেন। কিন্তু এ ব্যাপারে রাজ্যের জনগণকে আমলই দেওয়া হল না, রাজ্য এ্যাসেম্বলীর পরামর্শেই ভাগ হল। কেন এমনটা হল? কেন পাঞ্জাব ও বাংলার জনগণকে তাদের মাতৃভূমি ভাগ-বাঁটোয়ারার ব্যাপারে নিজস্ব বক্তব্য রাখতে দেওয়া হল না? আর আমাদের রাজ্য এ্যাসেম্বলীকেই বা অন্যতর রাজ্য এ্যাসেম্বলীর মতো পছন্দ করার অধিকার দেওয়া হল না কেন? তার কারণ এ্যাসেম্বলীতে আমাদের সংখ্যাধিক্য ছিল, কিন্তু বৃটিশ প্রভু ছিলেন পাখতুনদের প্রতি বিরূপ। আর ভারতের দশ কোটি মুসলমান যখন বৃটিশ প্রভুর সঙ্গে কদম কদম ফেলে চলছিল, আমরাই তখন বৃটিশ-বিরোধী।

তথাপি বৃটিশের বিরুদ্ধে আমাদের

কোন অভিযোগ নেই। অভিযোগ আমাদের দেশী নেতাদের বিরুদ্ধেই। কেন না তাঁদের সঙ্গে আমরা জেলে গেছি, ঢের অসুবিধা ভোগ করেছি এবং স্বাধীনতার জন্য সমানে লড়াই চালিয়েছি। হলে হবে কি, তাঁরাই আমাদের ত্যাগ করলেন। কিন্তু কেন? কারণ বৃটিশের বক্তব্য তাঁরা মেনে নিয়েছিলেন। কংগ্রেসের ওপর ছিল লর্ড মাউন্টব্যাটেনের প্রভাব-প্রতিপত্তি। তাই কংগ্রেস ভারত-বিভাগ মেনে নিল। সীমান্ত প্রদেশে রেফারেন্ডাম গৃহীত হল। যার বিরোধী ছিলেন গান্ধীজী স্বয়ং। তিনি ভারত-বিভাগও সমর্থন করেন নি। কিন্তু সর্বশেষ কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির বৈঠকে তাঁর সহযোগিবৃন্দ গান্ধীজীর কথায়ও কর্ণপাত করলেন না। বৃটিশ তার কূটনৈতিক খেলায় জিতে গেল তাই। তারা সিদ্ধান্ত নিল যে, ভারত-বিভাগ হবেই আর সীমান্ত প্রদেশে রেফারেন্ডাম গ্রহণ করা যেতে পারে। আমি তখন গান্ধীজীকে বলেছিলাম, কংগ্রেস দলগতভাবে আমাদের কতিপয় নিষ্ঠুর লোকের হাতে তুলে দিল। গান্ধীজী দুঃখ পেয়েছিলেন এবং আমাকে আশ্বাস দিয়েছিলেন যে তিনি ব্যাপারটি বিচার করে দেখবেন।.....

হায়, সেই বিচারের আর রায় বের হল না। পাখতুন পাঞ্জাবী আর বাঙালী চোখের জলে বুক ভাসিয়ে ভারত থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যেতে বাধ্য হল। একদল নিষ্ঠুর লোকের হাতে নির্যাতন ভোগ করার জন্যই কি তারা স্বাধীনতা-সংগ্রামে সর্বস্ব পণ করেছিল? আজও সীমান্ত গান্ধীর মনে এইসব প্রশ্ন উথাল-পাথাল হচ্ছে। যেমন বিচ্ছিন্ন পাঞ্জাবী ও পূর্ববঙ্গবাসীরা নিঃশব্দে গণতন্ত্রগ্রাসী আয়ুবশাহীর দাপটে দুবেলা শুধু অদৃষ্টে করাঘাত করেন। দেশ-বিভাগের পর দীর্ঘ নরক-যাতনার বিভীষিকাময়ী দিনগুলির স্মৃতি-চারণ করতে বসে অসহায়ের মতো কেবল-মাত্র অশ্রুবিসর্জন করেন তাঁরা। আর কী-ই বা করণীয় আছে। দেশ-ভাগ করে মুষ্টি-মেয় কতকগুলি মানুষ মসনদ পেলেন। আর ওঁরা পেলেন স্বপ্নভঙ্গজনিত বেদনার হিমশীতল স্পর্শ। ওঁদের স্বাধীনতার স্বপ্ন এইভাবে দলিত-মথিত করে বিভক্ত ভারতের নেতারা তৎপর হয়ে উঠলেন অর্থ ক্ষমতা এবং প্রতিপত্তি হাতানোর অন্ধ প্রতিদ্বন্দ্বিতায়। জনগণকে, এমন কি সীমান্ত গান্ধীকে প্রদত্ত প্রতিশ্রুতিও তাঁরা বেমালুম ভুলতে বসলেন। সীমান্ত গান্ধী সেই ঐতিহাসিক বিস্মরণের ছবি এঁকেছেন এইভাবে:

এইভাবেই সৃষ্টি হল পাকিস্তানের। আমার ছেলে ঘনী এই সময় গান্ধীজীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করে আমার বিপন্ন অবস্থা তাঁকে জানিয়েছিল। বলেছিল, পাক সরকার কি-ভাবে আমার প্রতি অবিচার করে চলেছে। শুনে গান্ধীজী বলেছিলেন, যদি বিবৃতে ঘটনাবলী সত্য হয় তাহলে তাঁর সরকার সমুচিত ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন এবং পাকিস্তানের বিরুদ্ধে লড়াইও করবেন (and would fight against Pakistan). তখন আমার ছেলে একটু সন্দেহ প্রকাশ করেছিল, কেন না সে-ও তো ছিল অহিংসার উপাসক। কিন্তু গান্ধীজী বলেছিলেন, যদিও কংগ্রেস অহিংসায় বিশ্বাসী, সরকার তা নয়, এবং প্রয়োজন হলে সরকার পাকিস্তানের বিরুদ্ধে লড়বে বৈকি (whereas the Congress believed in non-violence, the Government did not, and if necessary, would even fight Pakistan). কংগ্রেসের জন্যই পাকিস্তানে আমাদের যতেক যন্ত্রণা সইতে হচ্ছিল। কংগ্রেসের সঙ্গে সংযোগ রক্ষার কারণে আজও আমাদের 'হিন্দু' বলে অভিহিত করা হয় সেখানে। আজ ভারত সরকার বলছেন, তাঁদের হাতে এমন কোনো নথিপত্র নেই যার বলে তাঁরা আমাদের সাহায্যদান করতে পারেন। কিন্তু কোন নৈতিক কর্তব্যও কি নেই যার বলে আমরা সাহায্য পেতে পারি? ভারতের স্বাধীনতার জন্য আমরা কি আত্মত্যাগ করি নি? আমরা ভারত ছাড়ি নি, ভারতই আমাদের ত্যাগ করেছিল।

বৃদ্ধ নীতিনিষ্ঠ নেতার কণ্ঠে এই একই আর্তি বারম্বার ধ্বনিত-প্রতিধ্বনিত হচ্ছে, আমরা বধির, সেই বেদনার্ত আবেদন আমাদের স্পর্শমাত্র করে না। নথি-পত্রের দোহাই যে যুক্তির ধোপে শেষ পর্যন্ত টেকে না সীমান্ত গান্ধী সে বিষয়েও যুক্তির অবতারণা করে বলেছেন:

> কোরিয়ার একাংশকে চীন সাহায্য প্রদান করেছিল. সেই অংশ আমেরিকা ও অন্যান্য শক্তির বিরোধী। আর আমি? আমিও ভারতকে একাধিক-বার এই দৃষ্টান্ত অনুসরণের আবেদন জানিয়েছিলাম, বলেছিলাম, পাকিস্তানীরা আজও আমাদের ভারতের নামের সঙ্গেই জড়িয়ে রেখেছে।

বস্তুত সীমান্ত গান্ধী এবং তাঁর ভক্ত-বৃন্দের ভারতবাসী ও কংগ্রেসের প্রতি অটুট স্নেহ এবং বিশ্বাস পাকিস্তানের মনে একাধারে ঈর্ষা ও বিদ্বেষের জন্মদান করেছে। হরেক প্রলোভন এবং সুবিধা-সুযোগের টোপ ফেলেও পাখতুনদের তাঁরা ভারত-বিদ্বেষের মন্ত্রে দীক্ষিত করতে সমর্থ হন নি। এবং যতদিন ভারতবন্ধু সীমান্ত গান্ধীর নীতিনিষ্ঠ পবিত্র অস্তিত্ব বর্তমান, ততদিন কোন নির্যাতনই তাঁদের যে নমনীয় করতে পারবে না, তাও প্রায় সুনিশ্চিত। কিন্তু এই মহান ভারতপ্রেমের পুরস্কার শুধুই হতাশা আর বেদনার মধ্যে পরিশোধিত হচ্ছে।

বৃটিশ তার রক্তচক্ষু প্রদর্শন করেও সীমান্ত গান্ধীকে প্রভুভক্ত প্রজায় পরিণত করতে ব্যর্থ হয়ে তাঁর ওপর নির্যাতনের ধারাবাহিক চাপ সৃষ্টি করেছিল। সেদিনও সীমান্ত গান্ধীর একমাত্র অপরাধ ছিল গান্ধীজী এবং কংগ্রেসের প্রতি অনুরক্তি। পাক-প্রভুরাও সেই গভীর অনুরাগে কোন-মতেই ফাটল সৃষ্টি করতে না পেরে খান আবদুল গফ্‌ফর খানকে বছরের পর বছর অন্ধকার কারাগারে আবদ্ধ করে রেখে-ছিলেন আর মধ্যে মধ্যে তাঁর মন পরীক্ষা করার জন্য বিচিত্র টোপ ফেলে ব্যর্থ হয়েছিলেন।

মাত্র গত বছরের কথা। আফগানি-স্থানে তখন পাকিস্তানের কূটনৈতিক প্রতিনিধি জেনারেল ইউসুফ। প্রজাতন্ত্র দিবসে তাঁরই পাশে উপস্থিত ছিলেন সীমান্ত গান্ধী। ইউসুফ সাহেব তখনও শেষ চেষ্টা করেছেন সীমান্ত গান্ধীর আনুগত্য লাভের জন্য। পাকিস্তানে ভ্রাতৃত্ব, মিত্রতা এবং ঐক্য গড়ে তোলার শরিক হওয়ার জন্য আহ্বান জানিয়ে-ছিলেন তিনি বৃদ্ধ নেতাকে। উত্তরে সেই দুর্দমনীয় নীতিনিষ্ঠ নেতা বলেছিলেন, পাকিস্তান সর্বদাই মুসলিম ভ্রাতৃত্বের কথা বলে। তারা পাখতুনদের প্রতি ভ্রাতৃত্বের বাহু প্রসারিত করে ধরে না কেন? তাহলে তো আফগানিস্থানের ভ্রাতৃত্বও তারা লাভ করতে পারে। পাকিস্তান নিজেকে মুসলিম রাজ্য বলে অভিহিত করে। আফগান এবং পাখতুনরাও মুসলমান। পাখতুনদের ভ্রাতৃ-ভাবে গণনা করলে, আফগানরাও পাকি-স্তানের সঙ্গে ভ্রাতৃভাব বজায় রাখবে।

পাক প্রেসিডেন্ট গত ১০ই অক্টোবর মর্দানে বক্তৃতাকালে ভ্রাতৃত্বের বাণী উচ্চারণ করেছিলেন কিন্তু একই সময় পাখতুনদের প্রতি দোষারোপ করতেও ভুল করেন নি। সীমান্ত গান্ধীর প্রেসিডেন্ট আয়ুব সম্পর্কে চমৎকার মন্তব্য তাঁর ভাষাতেই উদ্ধার করি:

> তাঁর প্রতি আমার ব্যক্তিগত বিরাগ নেই। তিনি এক সময় আমাকে 'চাচা' বলে সম্বোধন করতেন। একদিন আমাকে বলেছিলেন, কেন্দ্রে সেনা-

বাহিনীর সাহায্যে তিনি একটি শক্ত সরকার গঠন করতে চান। কিন্তু আমি বলেছিলাম, সেনাবাহিনীর দ্বারা সমর্থ সরকার প্রতিষ্ঠিত হয় না, জনগণের সহযোগিতাই সমর্থ সরকার গঠনের একমাত্র সহায়ক।

সুতরাং একনায়কী শাসক আয়ুব খাঁকে উত্তেজিত করার পক্ষে ঐটুকুই যথেষ্ট ছিল। তাঁর 'চাচা'র প্রতি শ্রদ্ধ ভক্তি তারপরেই কর্পূরের মতো উবে গেছে। প্রেসিডেন্ট আয়ুব খাঁ এরপর পাখতুনদের সম্পর্কে মর্দানে বলেছেন, পাখতুনরা পাকিস্তানের ধ্বংস কামনা করে। আয়ুবের অভিধানে পাখতুনদের নাম হল 'black sheep', কালো ভেড়ার দল।

পাখতুনদের সততার প্রতি পাক-রোষ আজকের বলে নয়, আজন্ম কালের। কেন না খোদ মুসলিম লীগ সম্পর্কেই সীমান্ত গান্ধীর ধারণা ছিল বিরূপ। মুসলিম লীগকে তিনি কোনদিন স্বাধীনতার শরিক বলে গণ্য করতেন না। তাঁর দৃঢ় বিশ্বাস, মুসলিম লীগ ছিল বৃটিশ প্রভুর পদলেহী একদল জাতীয় আন্দোলন-বিরোধী সুযোগসন্ধানীর সংগঠন। সীমান্ত গান্ধী আজও সেকথা সোচ্চারে উচ্চারণ করতে ইতস্তত করেন না। বলেন ঃ

> লীগ আমাদের সাহায্য করতে প্রস্তুত ছিল না। কেনই বা করবে, তারা ছিল বৃটিশ প্রভুর মিত্রবাহিনী। বৃটিশের দ্বারাই লীগের সৃষ্টি। বৃটিশ সরকার জাতীয়তাবাদীদের বিরুদ্ধে লড়াই করার জন্যই লীগের জন্ম দেন। তাই আমরা যারা বৃটিশ-বিরোধী, লীগ তাদের সাহায্য করবে কি করে?

বস্তুত 'খুদাই খিদমদগারে'র আন্দোলনে (বৃটিশ যখন আফগানিস্থানকে পদানত করার আয়োজন করেছিল, পাখতুনরা তখন বৃটিশ-বিরোধী আন্দোলন পরিচালনার জন্য যে সংগঠন গড়েন, ইতিহাসে তারই অমর নাম 'খুদাই খিদমদগার।') মুসলিম লীগ নেতাদের সাহায্য এগিয়ে আসে নি। সাহায্য করতে এগিয়ে গেছলেন গান্ধীজী ও কংগ্রেস। সেই স্মৃতিবহুল দিনগুলির স্মরণে আজও সীমান্ত গান্ধীর হৃদয় ভারতবর্ষ এবং কংগ্রেসের জন্য আন্দোলিত হয়, কিন্তু বৃথাই। গান্ধীজীর প্রতিশ্রুতি ভারত পালন করে নি। সীমান্ত গান্ধীর সকৃতজ্ঞ ভালবাসার মূল্য দিতে পারে নি আজকের আত্মতৃপ্ত নেতৃত্ব।

প্রকৃত দেশপ্রেমিক সীমান্ত গান্ধী আজও তাই মুক্তকণ্ঠে বলেন ঃ

> ভারতীয় মুসলিমগণ (প্রাক্-স্বাধীনতা যুগের), আমরা জানি, এমনই এক বক্তব্যের প্রচারক যার সম্পর্কে তাঁদের নিজেদেরই কোন ধারণা নেই। শুধু অন্ধ উন্মাদনার বশেই তাঁরা প্রচারে নেমেছিলেন। বৃটিশ তাঁদের সর্বক্ষণ বুঝিয়েছে, যদি কংগ্রেস ও স্বাধীনতা যোদ্ধাদের হাতে ক্ষমতা চলে যায় তবে কি মুসলিম লীগ কি বৃটিশ কারও নিরাপত্তাই বজায় থাকবে না। তাই মুসলিম লীগের উচিত একটি স্বতন্ত্র রাষ্ট্রের দাবি তোলা। সেক্ষেত্রে সে রাষ্ট্র উভয়ের পক্ষেই সুবিধাপ্রদ হবে। এই বৃটিশ মানসকন্যা পাকিস্তানকে আমরা মনে-প্রাণে গ্রহণ করতে পারি নি। কারণ আমরা ছিলাম বৃটিশ-বিরোধী। .....তাই যখন পাকিস্তান সৃষ্টি হল, আমরা বলেছিলাম, এ রাষ্ট্র ভারতীয় মুসলমানদের জন্য নয়, বৃটিশ এবং তার ক্রীতদাসদের জন্য সৃষ্টি করা হয়েছে (it was created by the British for themselves and their slaves).

খান আবদুল গফ্ফর খান সাহেব কালাপাহাড় নন। তিনিও মুসলিম। তাঁর অপরাধ তাঁর প্রগাঢ় নীতিনিষ্ঠা এবং ঐকান্তিক দেশপ্রেম। কোন ভৌগোলিক সীমায় চিহ্নিত ভারতের জন্য তাঁর চোখে কোনো মোহাঞ্জন নেই, সীমান্ত গান্ধীর সমস্ত দুঃখ আপত্তি এবং বিদ্রোহ বিশ্বাসহননকারী নেতৃত্বের প্রতি, যে নেতৃত্ব মানুষের সংস্কারকে ক্যাপিটাল করে ভারতবর্ষকে ভাগ-বাঁটোয়ারা করে নিয়েছিল শুধু রাজ্যলোভী শকুন-মনোবৃত্তির জন্য। তাঁরাই সীমান্ত গান্ধীর বক্তব্যের কদর্থ করেছেন। পাখতুনদের সততার প্রতি সাধারণের চোখ ফিরিয়ে ধরার জন্য পাখতুনদের গায়ে কুচক্রীরা 'হিন্দু' নাম লিখে দিয়েছে। যেমনভাবে ফ্যাসিস্টরা দিত জু-দের গায়ে পোড়া মাংসের ছাপ এঁকে। কিন্তু গফ্ফর খানের বক্তৃতাবলী আজও পাক পার্লামেন্টের বিবরণী ঘাঁটলে উদ্ধার করা যাবে যে পার্লামেন্টে দাঁড়িয়ে পাখতুন নেতা একদা বলেছিলেন ঃ

> পাকিস্তান আমাদের দেশ। আমরা এদেশের উন্নতির জন্য সর্বদাই সহযোগিতা করতে প্রস্তুত। আমাদের বিন্দু বিন্দু রক্তের মূল্যে পাকিস্তানের স্বপ্ন সম্ভব হয়েছে। সেই পাকিস্তানকে নষ্ট করার কল্পনা কেমন করে আমরা করতে পারি?

বস্তুত কোন ভৌগোলিক সীমানাই সীমান্ত গান্ধীর কামনার ধন নয়। আজকের গুছিয়ে-নেওয়ার যুগে এই বৃদ্ধ নেতা শুধু এক টুকরো শোষণমুক্ত ভূমি চান যেখানে সত্যকার স্বাধীনতা ও গণতন্ত্রের স্বাদ পাওয়া যায়। পাকিস্তান সেই সাধ পূরণে অক্ষম। তাছাড়া পাক-নেতাদের ক্ষমতালোভী চরিত্রে স্খলিত-বিশ্বাস সীমান্ত গান্ধীর তীব্র ভর্ৎসনা এবং সমালোচনা তাঁদের রুষ্ট করে তুলেছে। পাক-প্রচারে সীমান্ত গান্ধী তাই হিন্দু কাফের ছাড়া অন্য কিছু নন। এই যুজরুকী এবং অবিচারের নাগপাশ থেকে সীমান্ত গান্ধী মুক্তি চেয়েছিলেন। সাহায্যের জন্য ভারতের দিকে সকাতরে বহুবার আবেদন-নিবেদন রেখেছেন। স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন গান্ধীজী প্রদত্ত প্রতিশ্রুতি। কিন্তু তাঁর জীবন-সায়াহ্নেও সেই প্রতিশ্রুতি পূরণের কোন লক্ষণই ভারত দেখাতে পারে নি। তবুও বৃদ্ধ নেতার আশা মরীচিকার মতো তাঁকে কোন এক শুভলগ্নের অপেক্ষায় উজ্জীবিত করে রেখেছে, এ বড় বিচিত্র বিস্ময়।

যে ভারতবর্ষ ভারতের জমি-জায়গাই পাক আবদারে পাকিস্তানের কাছে গচ্ছিত করে দিতেই উৎসুক, সীমান্ত গান্ধী সেই ভারতীয় নেতৃত্বেরই জবাব শোনার জন্য আজও উৎকর্ণ। এই প্রগাঢ় বিশ্বাসমুগ্ধ প্রতীক্ষার বস্তুত কোনো ব্যাখ্যা নেই।

পাঞ্জাব ও বাংলার লক্ষ লক্ষ ছিন্নমূল অসহায় মানুষের জন্য যে ভারতবর্ষ সামান্য জমি আদায় করতেও অক্ষম, বরং পাক হুমকীতে প্রভূত অন্যায় দাবি মেনে নিয়ে আপোষে টিকে থাকাই যাঁদের লক্ষ্য, সীমান্ত গান্ধী আজও তাঁদের মুখে কোন সান্ত্বনার বাণী শুনতে চান, বুঝিতে বস্তুতই তার ব্যাখ্যা হয় না।

সীমান্ত গান্ধীর বেদনাকে আমরা বুঝি। বাংলা দেশের মানুষ, স্বাধীনতার শিকার। কিন্তু আর কে তাঁর অন্তরের নিদারুণ ব্যথাকে উপলব্ধি করবেন!

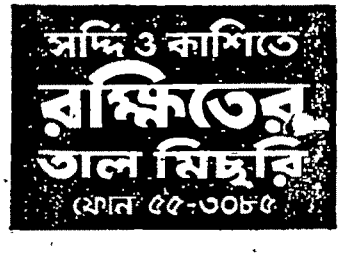

সপ্তাহের বোঝা

কৃত্তিবাস ওঝা

নির্বাচনী কমিশনার শ্রীসেনবর্মা গত সপ্তাহে কলকাতায় এসে রাইটার্স বিল্ডিংসের রোটোন্ডা হলে শীতাতপ-নিয়ন্ত্রিত কক্ষে বসে রাজ্যের নির্বাচনীপর্ব শান্তিপূর্ণভাবে অনুষ্ঠানের জন্য সব দলনেতাদের সঙ্গে একমত হয়ে একটি আচরণবিধি প্রণয়ন করে গেছেন এবং সকল দলই ভালো ছেলের মত সেই আচরণবিধি মেনে চলবার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। সপ্তাহকাল পরে সপ্তাহের বোঝাতে এই রকমই একটি আচরণবিধির প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছিল। কিন্তু নির্বাচনী কমিশনারের ঘাতলানো দাওয়াই রাজ্যের নির্বাচনপর্ব শান্তিপূর্ণভাবে সমাধার সহায়ক হবে কি না এ প্রশ্ন তোলার প্রয়োজন নেই। আমি যে কথাটা বলতে চাই, সেটা হল শান্তিপূর্ণভাবে নির্বাচন পরিচালনার দায়িত্ব নির্বাচনে অংশগ্রহণকারী দলনেতাদের গ্রহণ করতে হবে। শুধুমাত্র মুখের কথা অথবা কাগজ-কলমে এই শান্তিচুক্তি রচনা করলে চলবে না। শান্তিচুক্তির ভিত্তিটা হবে পরস্পরের প্রতি সহমর্মিতার ভিত্তিতে—যেখানে একের প্রচারে অন্যে হস্তক্ষেপ করবেন না। একের প্রতি অন্যে দোষারোপ করে সাধারণ মানুষকে উত্তেজিত করবেন না। অর্থাৎ—সকলেই একটি সর্ত মেনে নেবেন যে—আমরা কোনপ্রকার শান্তি বিঘ্নিত হতে দেব না। শান্তি বিঘ্নিত হয় এমন কোন কাজের প্রশ্রয় দেব না।' এই কাজ করানো শ্রীসেনবর্মার পক্ষে সম্ভব নয়। এই কাজ করতে পারেন নির্বাচনে অংশগ্রহণকারী দলগুলি নিজেদের মধ্যে উদ্যোগ নিয়ে। আমি সেই উদ্যোগের ওপরেই গুরুত্ব দিতে চাই। ওপর থেকে চাপানো সিদ্ধান্ত রাজ্যের অগ্নিগর্ভ পরিস্থিতিতে কতটা শান্তিবারি সিঞ্চিত করতে পারবে অথবা সেই শান্তবারিতে কতটা উত্তেজনার আগুন নির্বাপিত হবে সে বিষয়ে যথেষ্ট সন্দেহের কারণ আছে। শ্রীসেনবর্মার সামনে পাঠশালার পড়ুয়ার মত দলনেতারা বসলেন আর সমবেতভাবে প্রার্থনা সঙ্গীতের ঢঙে অথবা নামতাপড়ার মত পড়লেন—তার দ্বারা কতটা কাজ হবে বলা শক্ত। প্রভাতে উঠিয়া আমি মনে। মনে বলি/সারাদিন আমি যেন ভালো হয়ে চলি।—গুরুমহাশয়ের সামনে এই আপ্তবাক্য উচ্চারণ এক কথা আর ইস্কুলের সীমানার বাইরে এসেই অপরের বাগানের পেয়ারা চুরি অথবা ডাঙাগুলির ডাণ্ডা দিয়ে বন্ধুর মাথা ফাটানো অন্য কথা।

মূল কথা হল পরিবেশ সৃষ্টি। আর এই পরিবেশ সৃষ্টি করতে পারেন দলনেতারা, সরকারী আমলারা নয়। আজ যদি কোন একটি সভায় শ্রীঅতুল্য ঘোষ, শ্রীঅজয় মুখোপাধ্যায়, শ্রীজ্যোতি বসু প্রমুখ নেতারা মুখোমুখি বসে আলোচনা করে সিদ্ধান্ত নিতেন যে, আমরা নির্বাচনী প্রচারে কর্মীদের সর্বপ্রকার হিংসাত্মক পথ অবলম্বন প্রতিরোধ করব, কোনপ্রকার উত্তেজনা সৃষ্টির পথ পরিত্যাগ করব। ধর্ম-জাতি-প্রাদেশিকতা প্রভৃতি বিষয়গুলিকে কোনক্রমেই নির্বাচনী প্রচারের চৌহদ্দির মধ্যে প্রবেশ করতে দেওয়া হবে না, ভোটারদের টাকা দিয়ে বা ভীতিপ্রদর্শন করে দলে টানার চেষ্টা পরম গর্হিত কাজ বলে গণ্য করা হবে, সভার নীতির সমালোচনা ছাড়া কোনপ্রকার ব্যক্তিগত আক্রমণ ও কুৎসা প্রচারের চেষ্টা করা হবে না, কোন দল কোনক্রমেই অন্য দলের সভা ভাঙবার বা প্রচারকার্যে বাধা দেবার চেষ্টা করবে না, কোন পক্ষেই একের প্রচারকে অন্যের প্রচারের দ্বারা চাপা দেওয়ার চেষ্টা করা হবে না—তবে আজ দ্বারা যে কাজ হত সেই কাজ কখনই শ্রীসেনবর্মার দাওয়াইয়ে হতে পারে না। আজ যদি সর্বস্তরের কর্মী ও সমর্থকরা বুঝতো যে, তার দলের নেতা শ্রীঅতুল্য ঘোষ, শ্রীঅজয় মুখার্জী, শ্রীজ্যোতি বসু যে প্রতিশ্রুতি ও প্রতিজ্ঞাপত্রে স্বাক্ষর করেছেন, সেই প্রতিজ্ঞাপত্রের মর্যাদা রক্ষা করা কর্মীর একান্ত কর্তব্য এবং কর্মীদের আচরণে নেতৃবৃন্দের মর্যাদা রক্ষা হবে, তবে পরিবেশের পরিবর্তন হত। রাজ্যে প্রতিটি রাজনৈতিক দলের সম্পর্ক দীর্ঘদিনের বৈরিতার আজ এমন একটা স্তরে এসে পৌঁচেছে—যেখানে পাঠশালার পড়ুয়াদের মত শান্তিবাণী উচ্চারণে শান্তি স্থাপিত হবে না। আজ এই যে বিরোধ, এ শুধু আদর্শের নয়। আদর্শের বিরোধ যদি বলা যায়, তবে কম্যুনিস্টদের সঙ্গে কংগ্রেসের যে বিরোধ, কম্যুনিস্টদের সঙ্গে বাংলা কংগ্রেসের একই বিরোধ। আর তাছাড়া এমন বহু দল রয়েছে যাদের বিরোধ সাদা চোখে ধরা একান্তই অসম্ভব। যেমন লোকদল, জাতীয়দল, আই এন ডি এফ, বাংলা কংগ্রেস, ক্রান্তিদল, পশ্চিমবঙ্গ কৃষক সমাজ, রিপাবলিকান পার্টি—এই দলগুলির পরস্পরের আদর্শের ফারাক বিচার করে বের করা প্রায় অসাধ্য। একইভাবে এস এস পি, পি এস পি দলের আদর্শের ফারাক খুঁজে বের করা দেবতারও অসাধ্য। ফরওয়ার্ড ব্লক ও বলশেভিক পার্টির মধ্যে আদর্শের ফারাক কোথায় এবং কতটুকু সেটা খুঁজে বের করা রীতিমত গবেষণার বস্তু। সর্বোপরি দুই কম্যুনিস্ট পার্টির মধ্যে অথবা আর এস পি, এস ইউ সি। আর সি পি আই, ওয়ার্কার্স পার্টির মধ্যে রাজনৈতিক মতাদর্শের ফারাক এই দলনেতারা হয়তো খুবই বোঝেন অথবা অন্যকেও বোঝাতে পারেন, কিন্তু সাধারণ মানুষের বোঝা নিতান্তই কষ্টসাধ্য ব্যাপার। , তাই সাধারণ মানুষকে যখন একদল আর একদলের মধ্যে যুক্তিতর্কের দ্বারা নিজের দলের উচ্চ আদর্শের কথা বোঝাতে ব্যর্থ হন, তখন শুরু হয় গায়ের জোরে বোঝাবার চেষ্টা। এই গায়ের জোরে বোঝাবার চেষ্টাই নানা ফর্মে সংঘর্ষের রূপ নেয়। রোগ নিরাময় করতে হলে রোগ ও রোগীর সব কথা জানা চাই। পশ্চিমবঙ্গের রাজনৈতিক যুদ্ধে শান্তিরক্ষার ক্ষেত্রেও এই এক কথাই প্রযোজ্য। এই সমস্যার মোকাবিলার জন্যই প্রয়োজন দলনেতাদের উদ্যোগ এবং সেই উদ্যোগ আন্তরিক হওয়া প্রয়োজন। কিন্তু দুঃখের হলেও সত্য সেই আন্তরিকতার বড় অভাব সর্বক্ষেত্রে। যেমন কলকাতার কোন একটি দেওয়াল জুড়ে বড় বড় করে একজন প্রার্থীর স্বপক্ষে লেখা হয়েছে, কিন্তু রাতারাতি অপর এক প্রতিদ্বন্দ্বী প্রায় ঐ দেওয়াল-লিপি লেখার সমান পরিশ্রম করে উক্ত প্রার্থীর নামের আগে একটি কুৎসাত্মক বিশেষণ জুড়ে দিয়েছেন। প্রার্থী যেমন লিখছেন—"ডাঃ গণিকে ভোট দিন" আর প্রতিদ্বন্দ্বী সেই লেখার আগে লিখে দিয়েছেন—"দালাল ডাঃ গণিকে ভোট দিন"। কোথাও আরো অন্য বিশেষণ আছে। প্রশ্ন হল, ডাঃ গণির প্রতিদ্বন্দ্বী যখন দেওয়াল জুড়ে কালি ও পয়সা খরচ করে লিখলেন তো নিজের নামই লিখতে পারতেন, কিন্তু সেই কষ্ট

না করে তিনি তাঁর সব পরিশ্রম ব্যর্থ করলেন অন্য প্রার্থীর নামের আগে বিশেষণ লিখতে। এই যে মনোভাব, এই যে জঘন্য কাজ, এর মূল উৎপাটন দরকার। অনুরূপ আর একটি ঘটনা উল্লেখ করা যায়। রাজ্যের ছোট দলগুলি এবার প্রতীক নির্বাচন নিয়ে খুবই বিপাকে পড়েছেন। ছোট দলগুলিকে নির্বাচন কমিশনার কর্তৃক ঘোষিত ফ্রি সিম্বলগুলি ব্যবহার করতে হবে। কিন্তু সেই ক্ষেত্রে এই প্রতীক ও দলের সংখ্যা প্রায় সমান, কাজেই দুই দল একটি প্রতীক চাইলে বিপদ। এই বিপদের কথা ভেবে লোক-দলের পক্ষ থেকে একটি সভা আহ্বান করা হল ছোট দলগুলি যাতে নিজেরা বসে প্রতীক সম্পর্কে মীমাংসা করে নিতে পারেন। কিন্তু সভার দিন দেখা গেল যে দুই দল সাইকেলকে নিজেদের নির্বাচনী প্রতীক হিসাবে চেয়েছেন, আর একটি দলই সভায় আসেন নি। ফলে প্রতীকের বিরোধ, যেটা নিজেদের মধ্যে মীমাংসার চেষ্টা হয়েছিল সেটা বন্ধ হয়ে গেল।

রাজ্যের রাজনৈতিক শত্রুতার অন্যতম মূল কারণ হল ভ্রাতৃবৈরিতা। অর্থাৎ একদল ভেঙে যাঁরা দুই দল হয়েছেন, বিরোধ তাঁদের মধ্যেই বেশি। যেমন কংগ্রেসের সঙ্গে বিরোধ বেশি, বাংলা কংগ্রেসের—মার্ক্সবাদী কম্যুনিস্ট পার্টির প্রধান শত্রু নকশালপন্থীরা—বাংলা কংগ্রেসের প্রধান শত্রু লোকদল ও জাতীয় দল—লোকদলের প্রধান শত্রু আই এন ডি এফ। এই সব বড় দল বাদ দিলে অন্য আরো অনেকে আছে যারা নিজেদের মধ্যে শত্রুতা বৃদ্ধি করে রাজ্য রাজনীতিতে কর্দম সৃষ্টি করছে। পশ্চিম বাংলায় একটা মুসলিম লীগ সৃষ্টি হয়েছে—যদিও নামের আগে একটা প্রগতিশীল কথা আছে কিন্তু সেই দলও এর মধ্যে ভেঙে দু টুকরো হয়েছে। এক দল পাকি-স্তানের সঙ্গে প্রায় অভিন্ন পতাকা গ্রামে গ্রামে উড়িয়ে মুসলিম স্বার্থের কথা বলছেন, আর দল-ভাঙা আর এক দল তাঁদের ওপর দিয়ে আর এক কাঠি প্রচার চালাচ্ছেন। পশ্চিম বাংলায়—'জাগো বাঙালী' নামে বাঙালীর স্বার্থ রক্ষার জাগ্রত প্রহরী বলে পরিচয় দিয়ে একটি দল বহুদিন থেকে দেওয়াল নষ্ট করে আসছেন। এই জাগো বাঙালী সংসদ সম্প্রতি বাঙালী দল বলে একটা দল গঠন করেছেন কিন্তু এই দল গঠনের সঙ্গে এই দল ভেঙে আরো তিনটি দল মাথাচাড়া দিয়ে উঠছে। বাঙালী দলের লক্ষ্য হল, পশ্চিমবঙ্গের নাম পরিবর্তন করে রাজ্যের নাম "বাংলা" করা কিন্তু অপর দল যাঁরা উঠেছেন—তাঁদের লক্ষ্য হল "বাংলাস্থান" গঠন করা। এই দল আমরা বাঙালী সংগঠনের নামে ইতিমধ্যে অনেকগুলি কেন্দ্রে প্রার্থী দাঁড় করিয়ে দিয়েছেন। এই দলটি আবার শুধু পশ্চিমবঙ্গে নয়, সদ্যগঠিত সারা ভারতের একটি সংগঠনের সঙ্গে নিজেদের যুক্ত করেছে—দলের নেতা হলেন সদ্য কংগ্রেসত্যাগী জনৈক এম পি। কথায় বলে এক রামে রক্ষা নাই সুগ্রীব সহায়। পশ্চিমবঙ্গে একে রাজনৈতিক দলের সীমা নেই, তার মধ্যে আবার মাথা-চাড়া দিচ্ছে এই সব দল—যাদের পিছনে প্রাদেশিক ধর্মীয় ও নানা সংকীর্ণ স্বার্থের টান রয়েছে। বড় দলগুলি যদি নির্বাচনে শান্তি রক্ষা করার প্রতিশ্রুতিতে আবদ্ধ হন তবে এই মাথাচাড়া দেওয়া শক্তিগুলি রাজ্যকে কোথায় টেনে নিয়ে যাবে তার ঠিক নেই। এই বিপদের দিকটি রাজ-নৈতিক দলগুলি যদি নিজেদের উদ্যোগে লক্ষ্য না করেন, তবে হয়তো দেখা যাবে উচ্চ লক্ষ্য ও আদর্শের নির্বাচনী যুদ্ধ বিপথগামী হয়ে তাদের অনেকের ঘাড় মটকাবে ও রক্ত খাবে।

(২১-১২-৬৮)

বড়দিন—

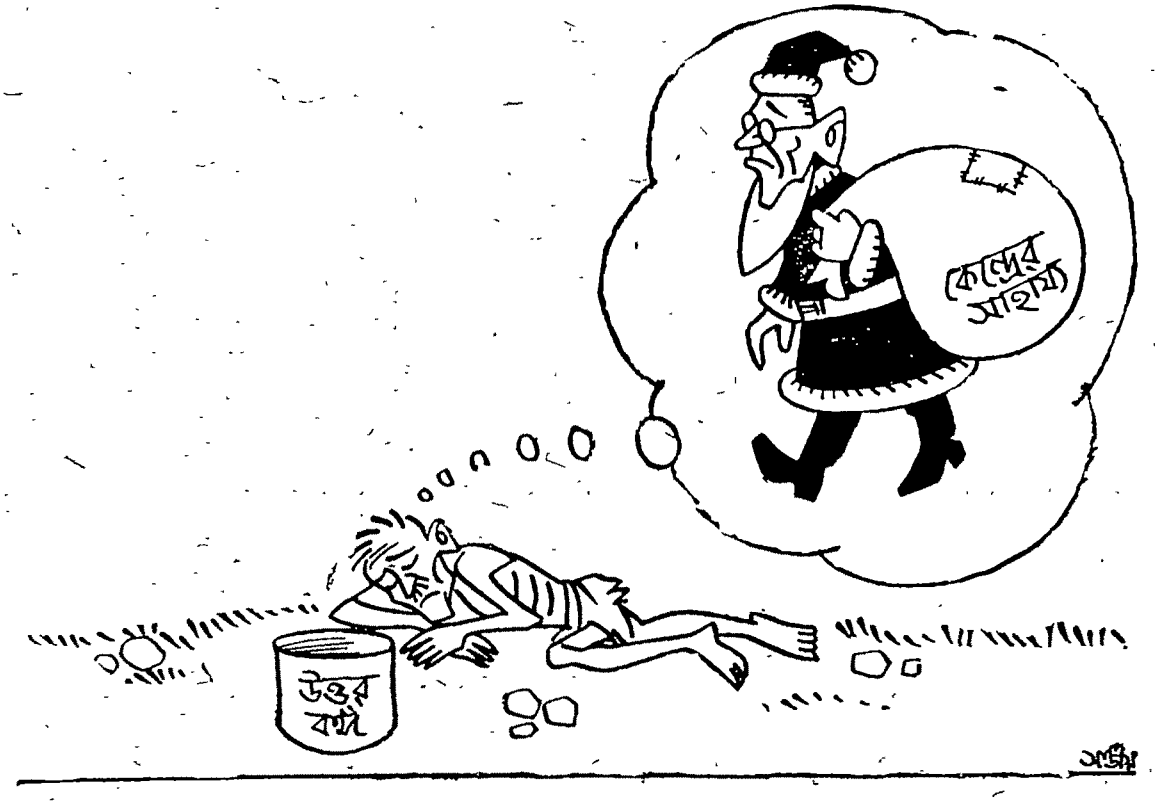

কামাক্ষী প্রসাদ চট্টোপাধ্যায়

ন্যালিদা, ন্যালিদা

ডাঃ প্রবীর সেন অনেককালের ডাক্তার। মাঝামাঝি ধরণের তাঁর প্র্যাকটিস। তাঁর বাঁধা কয়েকটি পুরনো পরিবারের অসুখে-বিসুখে প্রথমে তাঁরই ডাক পড়ে। অধিকাংশ ক্ষেত্রে তাঁর ওষুধেই জ্বর-জ্বালা সেরে যায়। যখন সারে না, রোগ যখন ঘোরালো হয়ে ওঠে তখন তিনিই রোগীর আত্মীয়-স্বজনকে পরামর্শ দেন বত্রিশ বা চৌষট্টি টাকা ফি-ওলা স্পেশ্যালিস্টকে ডাকতে। কিন্তু সেরকম ঘটনা সচরাচর ঘটে না। তাঁর ওষুধেই কাজ হয়।

কলকাতায় ডিসেম্বরের রাত তখন প্রায় ৯টা। বেশ জমিয়ে ঠাণ্ডা পড়েছে। তার সঙ্গে হালকা কুয়াশা। খুব বেশি দূরে নজর চলে না। পথের আলোর রাল্‌ব্‌ ঘিরে গোল-গোল চাকা—দেব-দেবীর ছবিতে তাঁদের মাথার চারপাশে গোলাকার জ্যোতি যেরকম আঁকা হয়ে থাকে অনেকটা সেরকম দেখাচ্ছে। পথে লোকজন বিশেষ নেই। গাড়ি-ঘোড়াও খুব কম।

ডাঃ প্রবীর সেন সেকেলে মানুষ। সুট-টুট পরেন না। পায়ে গরম মোজার ওপর ফিতে বাঁধা জুতো। পরণে ধুতি। গায়ে গরম পাঞ্জাবীর ওপর হাঁটু পর্যন্ত লম্বা গলাবন্ধ কালো গরম কোট। কাঁধে গরম চাদর। মাথা ও থুতনি ঘিরে রয়েছে গরম একটা কম্‌ফর্টার। হাতে কালো ব্যাগ।

ঠাণ্ডাকে চিরকালই তাঁর ভয়।

এই বেশভূষায় লোকের চোখে তাঁকে কী রকম যে দেখায় সেটা নিয়ে কখনো তিনি মাথা ঘামান না। শীতের মধ্যে শরীরটা আরামে আর গরমে থাকলেই তিনি খুশি। তাঁর বেশভূষা দেখে লোকে মনে-মনে যদি হাসে তো হাসুক গে—তাঁর বয়ে গেছে।

ল্যান্সডাউন রোডে বহুকালকার পরিচিত এক বাড়িতে তিনি রোগী দেখতে এসেছিলেন রাত ৮টায়। উঠেছেন ৯টায়। এ বাড়িতে প্রথম কবে এসেছিলেন মনে-মনে হিসেব করতে তিনি চেষ্টা করলেন। ত্রিশ বছর আগে তা হবে। তখন তিনি ভিজিট পেতেন দু টাকা—এখন তাঁরা নিজে থেকেই বাড়িয়ে আট টাকা করেছেন। তিনি কিছু বলেন নি।

ল্যান্সডাউন রোডে অন্ধকার সরু গলিটা যেখানে পড়েছে সেখানে একটা ল্যাম্পপোস্ট। সেটার গায়ে আঁটা চৌকো বাস স্টপের প্লেট। সেই বাস স্টপের কাছে এসে তিনি দাঁড়ালেন। বাস পেলে হাজরায় নেমে তেত্রিশ নম্বর ধরে তিনি ট্রাম রাস্তায় পৌঁছবেন। তারপর ট্রামে গিয়ে টালিগঞ্জে নিজের বাড়িতে পৌঁছনো সহজেই যাবে। ট্রামের মাসিক টিকিট তাঁর পকেটে। মিনিট দশেকের মধ্যে বাস পেলে একটা রিক্সা ধরে এলগিন রোড দিয়ে তিনি ট্রাম রাস্তায় পড়বেন। তারপর ট্রামে টালিগঞ্জ। আসল কথা ট্রাম রাস্তায় কোনোরকমে পৌঁছনো। বাসে গেলে দু'-চার আনার সাশ্রয় হয়। অনর্থক বেশি ওষুধ দেবার তিনি যেমন পক্ষপাতী নন অনর্থক বেশি পয়সা খরচ করতেও তেমনি তাঁর মন সায় দেয় না।

অনর্থক বেশি ওষুধ দেবার কথাটা ভেবে এইমাত্র ল্যান্সডাউন রোডের গাঙ্গুলীমশাইয়ের যে-বাড়ি থেকে তিনি বেরিয়ে এলেন সেখানকার কথা তাঁর মনে হলো। মনে হতেই তাঁর ঠোঁটে মৃদু হাসি ফুটে উঠলো। কিন্তু গরম কমফর্টারের প্যাঁচ ভেদ করে বাইরে সেই হাসি প্রকাশ পেলো না।

বরাবর যেমন হয় আজ সন্ধ্যেতেও গাঙ্গুলীমশাইদের বাড়িতে তাই হয়েছে। তাঁদের নাতির জ্বর। অবশ্য জ্বরটা একটু বেশিই। বুকে-পিঠেও সামান্য সর্দি বসেছে। ছেলেটার জন্মাবধি শীতকালে এই সর্দি-জ্বরের ধাতের কথা তিনি ভালো করেই জানেন। আরো জানেন নাতির অসুখ করলে গাঙ্গুলীমশাই, গাঙ্গুলীগিন্নী থেকে বাড়ির সবাই কী রকম ব্যস্ত হয়ে ওঠেন।

রোগীর বিছানার পাশে চেয়ারে বসতেই বাড়ির সবাই ভিড় করে এলো। গাঙ্গুলীগিন্নী নাতির শিয়রে বসে তার মাথায় ওডিকোলন-মেশানো জলপটি লাগিয়ে তালপাখা দিয়ে বাতাস করছিলেন। শুকনো মুখে তিনি বলছিলেন, "ডাক্তারবাবু জ্বর তো কমলো না।"

গাঙ্গুলীমশাই-এর ছেলে বলেছিলো, "পেনিসিলিন কি টেরামাইসিন ইনজেকশান দিলে হয় না?"

ডাঃ প্রবীর সেন কোনো উত্তর দেন নি। মাথা ও থুতনিতে জড়ানো কম্‌ফর্টার খুলে পকেট থেকে গোল ঘড়িটা বার করে রোগীর নাড়ী ভালো করে দেখেছিলেন, থার্মোমিটার লাগিয়ে জ্বর দেখেছিলেন, স্টেথিস্কোপ দিয়ে ভালো করে বুক-পিঠ পরীক্ষা করেছিলেন। তারপর মন্তব্য করেছিলেন, "হুঁ! জ্বরটা একটু বেশিই। বুকে-পিঠেও কিছুটা সর্দি বসেছে। আপনাদের নাতির এই জ্বর-সর্দি তো ঘরের লোক। পেনিসিলিন-টেরামাইসিনের দরকার নেই। তিন ঘণ্টা ছাড়া-ছাড়া মিক্সচারটা যে-রকম চলছে সে-রকমই চলুক। তবে বুকে-পিঠে এ্যাণ্টিফ্লজেস্টিন আজ রাতে লাগিয়ে দিন।—ভাবনার কিছু নেই। কাল-পরশুর মধ্যে জ্বর ছেড়ে যাবে।"

তারপর গাঙ্গুলীমশাই-এর পুত্রবধূ যে চা তৈরি করে এনেছিলো সেই চা পান করেছিলেন, গাঙ্গুলীগিন্নীর ডিবে থেকে গোটাচারেক পান মুখে ভরেছিলেন, গাঙ্গুলীমশাই-এর সঙ্গে হিন্দুমহাসভা, কংগ্রেস, কর্পোরেশন

হলেকশন ইত্যাদি রাজনীতির নানা সমস্যার কথা আলোচনা করেছিলেন। তারপর সেখানে ঘণ্টাখানেক কাটিয়ে, গাঙ্গুলীমশাই-এর নাতির পিঠে আস্তে করেকটা চাপড় দিয়ে, গাঙ্গুলীগিন্নীকে অভয় দিয়ে, মাথায় ও থুতনিতে সেই গরম কম্‌ফর্টারটা জড়িয়ে কালো ডাক্তারি ব্যাগটা নিয়ে ধীরে-সুস্থে এসে দাঁড়িয়েছিলেন ল্যান্সডাউন রোডের সেই অন্ধকার গলির সামনেকার ল্যাম্পপোস্টের সঙ্গে আটকানো বাস স্টপের প্লেটটার নিচে। তাড়াহুড়ো করা একেবারেই তিনি পছন্দ করেন না।

সেই গোল ঘড়িটা পকেট থেকে বার করে ডাঃ প্রবীর সেন দেখলেন প্রায় আট মিনিট ধরে তিনি অপেক্ষা করছেন। কিন্তু বাসের কোনো আভাস নেই। আর দু' মিনিট অপেক্ষা করে একটা রিক্সা নেবেন বলে মনে-মনে যখন তিনি স্থির করেছেন এমন সময় একটা দারুণ কাণ্ড ঘটে গেলো।

সেই অন্ধকার গলিটা থেকে আচমকা ঝড়ের মতন দৌড়ে এক ছোকরা বেরিয়ে এলো। পরণে চোঙা প্যান্ট। এই শীতেও তার গায়ে শুধু একটা টেরেলিনের নীল শার্ট। বগলের কাছটা ছেঁড়া। চুল উস্কখুস্ক গলার স্বর খসখসে, চাপা, উত্তেজিত।

ডাঃ প্রবীর সেনের সামনে যাতায়াত করতে করতে হাঁফাতে হাঁফাতে সে বলে চললো, "উঃ, কী পালানই পালিয়েছি... ...কিন্তু মালতীদির কী হবে...? তাকে খুন করে ফেলবে?...লোপাট করে দেবে? ...সিনেমার ভিরেক্টর না ছাই!...পাকা একটা রথেল!...যত মাতালের আড্ডা!... দু'শ টাকা দেবে বলেছিলো।...টাকা চাইতেই কী একখানা থাপ্পড়...

....আজ পাঁচ পয়সা

উরি বাসরে.....মালতীদিকে চলে আসতে বললে.....উঃ কী মার, কী মার.....এই দেখুন স্যার, জামা ছিঁড়ে গেছে.....এই দেখুন স্যার, কপাল থেঁতলে গেছে.....এই দেখুন স্যার, রক্ত পড়ছে.....উঃ, কী টরচারটাই না করছে.....শালাদের জ্যান্ত পোড়াবো.....রিফিউজি বলে কী আমরা মানুষ নই ? .....ভদ্দরলোকদের মেয়েছেলে নিয়ে এই ব্যবসা জন্মের মতো ঘোচাবো... এক্ষুণি লালবাজার থেকে পুলিশ-আনছি... কিন্তু তার আগেই না সটকায়....."

তারপর ডাঃ প্রবীর সেনের সামনে হঠাৎ থেমে গিয়ে আরো হাঁফাতে-হাঁফাতে বললো, পাঁচটা টাকা দিন স্যার.....সময় নেই..... আমার কাছে টাকাও নেই.....এক্ষুণি ট্যাক্সি করে লালবাজারে ছুটতে হবে..... কুত্তার দল এসে পড়লো বলে.....পাঁচটা টাকা.....লাইফ এ্যান্ড ডেথ নির্ভর করছে....."

ডাঃ প্রবীর সেন প্রৌঢ় ভদ্রলোক। তিনি নির্বিরোধী মানুষ। তাড়াহুড়ো তিনি যেমন পছন্দ করেন না, দাঙ্গা-হাঙ্গামাকেও সে-রকমই ভয় পান। হ্যাঁ, তিনি একটু ভীতু গোছেরই মানুষ। ছোকরাকে দেখতে-দেখতে, তার কথা শুনতে-শুনতে তাঁর বুক দুরদুর করে উঠলো। মুখ শুকিয়ে গেলো। গাঙ্গুলীমশাই-এর বাড়িতে যে আট টাকা ভিজিট পেয়েছিলেন সেটা তাঁর পকেটে ছিলো। সেটা বার করে পাঁচ টাকার নোটটা ছোকরাকে দিলেন।

"বাঁচালেন.....থ্যাঙ্কস্" বলতে বলতে ঊর্ধ্বশ্বাসে সে এলগিন রোডের ট্যাক্সি স্ট্যান্ডের দিকে ছুটলো। আর সঙ্গে সঙ্গেই প্রায় খালি সাতচল্লিশ নম্বর একটা বাস এসে স্টপে দাঁড়ালো। কোনো দিকে না চেয়ে তিনি উঠে পড়লেন।

কলকাতায় শীতটা যাই-যাই করেও যাচ্ছে না। বাতাস বন্ধ। ধোঁয়া আর কুয়াশা শহরের ওপর যেন চাপ হয়ে বসেছে। চোখ জ্বালা করে। বালিগঞ্জ প্লেসের মিত্তিরবাড়ি-ও ডাঃ প্রবীর সেনের পুরনো ঘর। মিত্তিরমশাই-এর বয়েস হচ্ছে। হাঁফানীতে প্রায়ই ভোগেন, প্রেসারও মাঝে মাঝে গোলমাল পাকায়।

মিত্তিরমশাইকে দেখে, হাঁফানী, প্রেসার ও ঘুমের বড়ির প্রেসক্রিপশান করে তাঁর মেয়ের তৈরি চা ও মিত্তিরগিন্নীর ডিবে থেকে পান নিয়ে চিবোতে-চিবোতে মাথায় কমফর্টার ও হাতো কালো ব্যাগ নিয়ে তিনি যখন জনবিরল রাস্তায় নামলেন তখন রাত পৌনে দশটা। মিনিট সাতেক হাঁটলে তবেই রডস্ট্রীটের তেত্রিশ নম্বর বাস স্টপ। সেখান থেকে হাজরা মোড়। তারপর টালিগঞ্জের ট্রাম।

ধীরে ধীরে হাঁটতে হাঁটতে ডাঃ প্রবীর সেনের মনে হোলো আরো মিনিট পনের

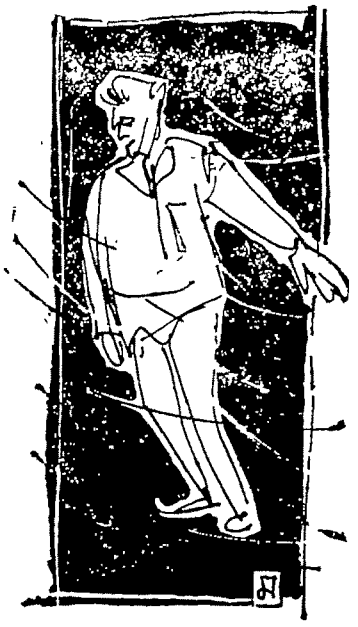

...আচমকা ঝড়ের মতন দৌড়ে এক ছোকরা.

আগে উঠলেই ভালো হতো। বাস আসতে দেরি হলে ট্যাক্সি নেওয়া ছাড়া উপায় নেই। অনাবশ্যক তাড়াহুড়ো, অনাবশ্যক ওষুধ, অনাবশ্যক খরচ—এর কোনোটাই তিনি পছন্দ করেন না।

এমন সময় পাশের অন্ধকার গলিটা থেকে আচমকা ঝড়ের মতো চোঙা প্যান্ট পরা এক ছোকরা বেরিয়ে এলো। হাঁফাতে-হাঁফাতে তাঁর কাছে এসে বললো, "উঃ কী পালানই পালিয়েছি.....কিন্তু অনিতাদিকে যে খুন করে ফেললো.....রিহার্সাল না ছাই.....সেন্ট পার্সেন্ট রথেল.....মাতালের আড্ডা.....এ্যাডভান্স দেবে বলে নিয়ে এসে .....উঃ কী টরচার.....এই দেখুন স্যার, কপাল থেঁতলে গেছে.....এই দেখুন স্যার, রক্ত পড়ছে.....রিফিউজি বলে কি আমরা মানুষ নই.....লাইফ এ্যান্ড ডেথ কোয়েশ্চন স্যার.....এক্ষুণি ফাঁড়ি থেকে পুলিশ নিয়ে আসবো.....ট্যাক্সি ভাড়া নেই.....গোটা পাঁচেক টাকা....."

আজ আর ডাঃ প্রবীর সেনের বুক দুরদুর করলো না, মুখ শুকিয়ে গেলো না। কিন্তু তিনি নির্বিরোধী মানুষ। ঝামেলা পছন্দ করেন না। একটা ল্যাম্পপোস্টের তলায় দাঁড়িয়ে তিনি পকেটে হাত ভরলেন। ছোকরা তার ডান হাত বাড়ালো।

একমুঠো খুচরো বার করে তার থেকে পাঁচ পয়সা বেছে ছোকরার উদ্যত হাতে ফেলে তিনি বললেন, "আজ পাঁচ পয়সা।"

ছোকরা হকচকিয়ে তাঁর মুখের দিকে তাকালো। তারপর ঝড়ের মতো এমনভাবে পাশের গলিটার মধ্যে উধাও হয়ে গেলো যেন ভূত দেখেছে।

পাঠকমন

'বঙ্গদর্শনে' প্রকাশিত মন্তব্য প্রসঙ্গে—

১১ই ডিসেম্বর সাপ্তাহিক অমৃতপত্রিকায় প্রকাশিত 'এম· ডি' ডিগ্রি প্রসঙ্গে আপনার ৫ই ডিসেম্বর "বঙ্গদর্শনের" মন্তব্যগুলিকে সমর্থন করে লেখা দুটি দীর্ঘ পত্র পড়লাম।

আপনার এ সপ্তাহে 'বঙ্গদর্শনে' দ্বারান্তরে এই বিষয়ে আমাদের বক্তব্য প্রকাশিত হবে"—এই মন্তব্যটির পরিপ্রেক্ষিতে আমরা আশা করছি যে, আগামী সপ্তাহে এ বিষয়ে আপনার নিজস্ব মতামত আমরা জানতে পারব। এ প্রসঙ্গে আমাদের একান্ত অনুরোধ আপনি এ বিষয়ে বিশদ তদন্ত করে তবেই আপনার বক্তব্য প্রকাশ করবেন। আপনারা যদি বিশিষ্ট চিকিৎসাবিদ ডাঃ যোগেশচন্দ্র ব্যানার্জী, ডাঃ নলিনীরঞ্জন কোনার, ডাঃ শিশিরকুমার মুখার্জী, ডাঃ অরুণকুমার নন্দী, ডাঃ ভুবনচন্দ্র সিংহ প্রমুখ 'এম· ডি' পরীক্ষার পরীক্ষকদের সহিত সাক্ষাৎকার আপনাদের তদন্তের অন্তর্ভুক্ত করেন, তাহলে মনে হয় প্রকৃত সত্য উদ্‌ঘাটিত হবে। যা হোক, আমরা আপনার নিকট নিরপেক্ষ অভিমতই আশা করি।

আমাদের পূর্বের একটি পত্রে এরূপ লেখা হয়েছিল যে, "এই সব কতিপয় স্বার্থান্বেষী ব্যক্তির উদ্দেশ্যপ্রণোদিত অপপ্রচার"। এই কথাটিতে আপনাকে আক্রমণ করার কোন উদ্দেশ্য ছিল না। যাঁরা ঐ সংবাদ আপনার কাছে পরিবেশন করেছিলেন, তাঁদের সম্বন্ধেই ঐ মন্তব্য। আশা করি আপনারা ইহার অন্য অর্থ করবেন না।

শ্রীসুধীরকুমার চক্রবর্তী, শ্রীআদিনাথ নান, শ্রীসুধীরকুমার পাল ও শ্রীপ্রশান্ত বক্সী।

*

আপনাদের পত্রিকায় প্রকাশিত 'বঙ্গদর্শনে'র লেখককে ধন্যবাদ। তিনি এমন একটি প্রসঙ্গের অবতারণা করেছেন, যা আজ পর্যন্ত কেউ বলতে সাহস পান নি—সুতরাং চাঞ্চল্য ও আলোড়নের সৃষ্টি হবে তাতে সন্দেহ কি? এ বিষয়ে 'পাঠকমনে' লেখকের স্বপক্ষে ও বিপক্ষে প্রকাশিত চিঠিগুলোও আমি খুব আগ্রহের সাথেই পড়লাম। 'অপ্রিয়সত্য' কথা ফাঁস হয়ে যাওয়ায় আলোচ্য বিখ্যাত ব্যক্তির "জো হুজুর" গোষ্ঠীর মহলে বোধ হয় এখন সামাল সামাল রব উঠেছে। নিজেদের 'আখের' গোছাবার জন্যে যাঁরা ব্যস্ত, তাঁরা হয়ত ভাবছেন দলে দলে প্রতিবাদ না করলে হয়তো "বিশিষ্ট ক্ষমতাবান" ব্যক্তি রুষ্ট হবেন। সুতরাং প্রতিবাদপত্রের মাধ্যমে তাঁরা নিজেদের ব্যক্তিগত স্বার্থ ও স্নাতকোত্তর পরীক্ষার ফলাফলের কথা চিন্তা করে ধামা ধরেছেন। কিন্তু শাক দিয়ে মাছ ঢাকা যায় কি?

আলোচ্য ক্ষমতাবান ব্যক্তির পুত্র কিছুদিন আগে একটা বই প্রকাশ করেছেন। সেই বইয়ের ভূমিকায় তিনি যাঁদের কাছে চির কৃতজ্ঞতা জানিয়েছেন, তাঁদের প্রায় অধিকাংশই ২৫শ সংখ্যার পাঠকমনে প্রকাশিত প্রতিবাদপত্রের দলবদ্ধ লেখক—যদি আপনার সন্দেহ থাকে তাহলে মিলিয়ে নিতে পারেন। বইটির preface দেখলে সব বুঝতে পারবেন। আচ্ছা, এতজন ডাক্তার নিজেদের সময় ও পরিশ্রম দিয়ে "কোন স্বার্থ (?) ছাড়াই পুস্তক প্রকাশের ব্যাপারে কেন সাহায্য করেছেন বলতে পারেন? কারণ অনেকেই জানেন, কিন্তু মুখ ফুটে কেউ বলতে নারাজ। ভগবানের কাছে পৌঁছুতে গেলেও পুরুতের দরকার হয়—আলোচ্য ক্ষমতাবান ব্যক্তিটি যে চিকিৎসাবিদ্যা জগতের তথাকথিত ভগবান—যাঁর অঙ্গুলি হেলনে এবং ইচ্ছায় অসম্ভবও বোধ হয় সম্ভব হয়। তাই ভগবানের কাছে পৌঁছুতে গেলে সরাসরি আর সবাই কি করে যায়? পুত্র খুশি থাকলেই পিতা খুশি। 'খোঁজ লোক যে জানে সন্ধান'। প্রাইভেট কেস দিয়ে দিয়ে ছেলের কন্যায় ভাসিয়ে দিলে কে জানে শিকে ছিঁড়তে কতক্ষণ। নেকনজর বলে কথা। এ কি আর যে-সে ডিগ্রী—এম· ডি।

পত্রলেখকদের অত চটবার কি আছে বুঝি না। বিশ্ববিদ্যালয়েও দুষ্ট লোকেরা বলে সব চেয়ে বড় পেপার হচ্ছে 9th Paper, ডাক্তারীতেও যে 9th Paper থাকবে না, তা হয় নাকি? আর ফেবারিটিজম বলুন, নেপাটিজম বলুন—সে কোথায় নেই? বার বার কেস দিয়ে কোন ক্ষমতাবান ডাক্তারের পরিচিত হওয়াটা কি এমন অগৌরবের বুঝি না। কেস দেওয়া সেই চেনামুখটা যখন পরীক্ষার্থী হয়ে এসে দাঁড়ায়, তখন জানবেন পরীক্ষক কোর্টের বিচারক নন—আইনের নিষ্পত্তি নিয়ে তো বসে নেই—তাই "চেনামুখ"কে খাতির না করতে চাইলেও খাতির এসে যায়। নম্বর দিতে গিয়ে ফেলের নম্বর যদি কলমের মুখ থেকে না বেরোয়—তাহলে মানুষ হিসেবে তিনি বোধহয় ক্ষমার্হ। এমন তো কেউ বলে দেয় নি পরীক্ষকরা প্রাইভেট প্র্যাকটিশ করবেন না—তাঁরা সবাই নন প্র্যাকটিশিং হবেন। এই সহজ কথাটা কেন যে প্রতিবাদকারী পত্রলেখকরা বুঝছেন না বুঝি না। সারা জগৎ জুড়েই তো আজকাল গায়ের জোর, মেধার জোর থেকেও মামার জোর বেশি। এখন মেধা-টেধার কথা ভুলে যান—"তম্বিরের নাও শুকনো ডাঙায় চলে"—"সুপারিশের গরু গাছে ওঠে।"

সুতরাং বিশিষ্ট কোন লোকের ক্লাশে যোগ দিয়ে, মাথার ঘাম পায়ে ফেলে যেন-তেন-প্রকারেণ তাঁর দৃষ্টি আকর্ষণ করাটা মানে ভালো একটা "সুপারিশ যোগাড়" করা। মনের আর্তি ঠিক জায়গায় পৌঁছে দেওয়া। তিনি যদি ভাল নাও পড়ান, তবুও ক্লাশে ভিড় হবে—নিশ্চয়ই ভিড় হবে, মোসাহেবরা মাছি হয়ে ভনভনিয়ে আশেপাশে উড়বেন—এ কিন্তু খুবই স্বাভাবিক। যাঁরা তাঁর ক্লাশে যাবেন, বুক ফুলিয়েই যাবেন—তথাকথিত তম্বির-দু নি য়া র নিয়মেই যাবেন, ঘাবড়াবার কী আছে? যাঁরা ঠিক জায়গায় কেস দেন তাঁরা কেসের সংখ্যা তিন ডবল, চার ডবল করে দিন—কেউ বলবে না আপনি বোকা। বলবে আপনি ট্যাক্টফুল—আপনি চালাক। যা বলবেন সোজাসুজি বলবেন—খোশামুদি ভাষায় "খরি মাছ না ছুঁই পানি" গোছের বক্তব্য পেশ করবেন না—তাতে হাসি পায়।

আলোচ্য ব্যক্তিটির পুত্র যখন ভাল ক্লাশ নেন—তখন তিনি নিশ্চয়ই নেবেন। তাঁর কাছ থেকে সবাই যখন উপকৃত তখন তিনি কেন কোন এক বিশেষ কলেজে ক্লাশ নেন? কেন বাইরে "টিউটোরিয়াল হোম গোছের" কিছু একটা খুলছেন না। তিনি পয়সা নেন না, কিন্তু এমন তো ছাত্র থাকতে পারে যাঁরা "বিনা-পয়সার" ক্লাশে গিয়ে অবলিগেশনের মধ্যে যেতে চান না। তাঁর পড়াবার ক্ষমতার গুণে বাধ্য হয়েই যদি স্নাতকোত্তর ছাত্রদের ক্লাশ করতে হয় তবে যে-সব ডাক্তাররা অন্য কলেজের প্রাক্তন ছাত্র—তাঁরা "গুরুদক্ষিণা" বলে কিছু একটা যদি দিতে চান কীভাবে দেবেন? না বললেও বলা চলে 'কেসের মাধ্যমে'—তাই নয় কি? তাই আমার মনে হয় কোন এক বিশেষ কলেজে ক্লাশ না নিয়ে তাঁর বাইরে ক্লাশ নেওয়া উচিত এবং সম্মানজনক দক্ষিণাও নেওয়া উচিত। এতে তাঁর সম্মানই বাড়বে—নইলে এ যুগে নিঃস্বার্থ লোকদের নিয়েই যত গণ্ডগোল—রটনা কখনও থেমে থাকে না।

আরেকটা কথা, একটা বিশেষ সেন্টারেই বছরের পর বছর এম· ডি পরীক্ষা হবে কেন? তবে কি অন্য কোন কলেজ হাসপাতালের এম· ডি পরীক্ষা

দেবার যোগ্যতা নেই? এ বিষয়ে বঙ্গদর্শনের লেখকের বক্তব্যকে আমি সম্পূর্ণ সমর্থন করি। একই কলেজে বার বার পরীক্ষা নেবার ব্যাপারে বিশেষ কোন ব্যক্তির হাত আছে কি না কে জানে? তবে ব্যাপার-স্যাপার কেমন সন্দেহের। পরীক্ষার সময় নিজের কলেজের পরীক্ষার্থীরা সুবিধা পাবেন—এ কথা চিকিৎসা-বিদ্যার সংশ্লিষ্ট লোকমাত্রই জানেন। কাজেই এ নিয়ে নানা কথা উঠবে তাতে আশ্চর্য কী? কথা ওঠার আগেই তো এক-একবার এক এক কলেজে পরীক্ষা হওয়া উচিত। ভিন্ন ভিন্ন পরীক্ষক হওয়া দরকার। "কন্ডাক্টার" নতুন নতুন হওয়াই বিধেয়। তাহলে দেখবেন ফলাফল হয়তো বদলে গেছে—পরিবর্তন হয়েছে College-সাম্প্রদায়িকতার।

বঙ্গদর্শনের লেখক এ বিষয়ে বেশি কিছু লিখে কী কোন পরিবর্তন আনতে পারবেন? মনে হয় না। তবে তিনি যে আমাদের সচেতন করে তুলতে চাইছেন তার জন্যে ধন্যবাদ।

—ডাঃ এস. সেন
কলকাতা—২৮।

*

গত ৪ঠা পৌষ আপনার সাপ্তাহিক পত্রিকায় 'পাঠকমন' বিভাগে প্রকাশিত দুটি পত্রের আমরা নিম্নলিখিত স্বাক্ষরকারীরা প্রতিবাদ জানাচ্ছি।

১। মেডিকেল পরীক্ষায় সাফল্যের জন্য সাধারণ জ্ঞান ও প্রবল নিষ্ঠার দরকার। এখানে ত্রিবিদ্যাসাগরীর বিশেষ স্থান নেই। বিশ্ববিদ্যালয়ের নামজাদা ছাত্রের এখানে এম-বি, বি-এস পরীক্ষায় বার বার অকৃতকার্য হওয়ার অনেক নজির আছে—এম-ডি তো দূরের কথা।

২। পরিসংখ্যান থেকে এই তথ্যই স্বীকৃতি পাবে যে, গত দশ বছরে শতকরা আশিজন এম-ডিই সরকারী বা প্রাক্‌টিসিং ডাক্তার।

৩। পিতা প্রখ্যাত চিকিৎসক হলেই তাঁর পুত্র এম-ডির যোগ্য হবেন, এমন কোন কথা নেই। তাহলে "গাছের ভলার আন্দাজা" এই কথার উৎপত্তি হোত না।

৪। উল্লিখিত ট্রপিক্যালের ডাক্তারের কথা আমাদের জানা নেই। পত্রলেখকের নিজের নাম প্রকাশের সৎসাহস না থাকতে পারে, কিন্তু যাঁকে অভিযুক্ত করছেন তাঁর নাম প্রকাশের জন্য যেটুকু সততা থাকা দরকার, আমরা সেটুকু আশা করতে পারি কি?

৫। যাঁরা প্রতিবাদ জানাতে যাচ্ছেন, তাঁরা স্বতঃস্ফূর্ত ভাবেই যাচ্ছেন। দলে দলে প্রতিবাদ জানানো ব্যক্তিবিশেষের জনপ্রিয়তারই নিদর্শন।

৬। একাডেমিক কাউন্সিলের সাথে এম-ডি পরীক্ষার্থীদের কি সম্পর্ক থাকতে পারে তা আমাদের জানা নেই। আমরা জানি না পত্রলেখক এম-ডি পরীক্ষায় পাশ না করেও কি করে একাডেমিক কাউন্সিলের আওতায় আসেন।

৭। উল্লিখিত ক্ষমতাসম্পন্ন ব্যক্তিটি উচ্চপদস্থ সম্মানিত ব্যক্তিদের দ্বারাই নির্বাচিত। পত্রলেখকের মন্তব্যে মনে হয়, যেন মিটিং-এ গরহাজির থাকাটা দায়িত্বশীল ব্যক্তিদের পক্ষে বিশেষ গুণ।

৮। যে ডাক্তারী বই-তে লেখক কয়েকজনকে কৃতজ্ঞতা জানিয়েছেন, তাঁরা লেখকের বহুদিনের ছাত্র অথবা তাঁর হাউস-ফিজিসিয়ান—তাঁরা সবাই এম-ডি পরীক্ষার্থী নন। কৃতজ্ঞতা স্বীকার মনুষ্যত্বেরই লক্ষণ।

৯। কেস দেখার সুযোগ সকল পরীক্ষার্থীদের জন্য সারা বছর ধরে উন্মুক্ত। পত্রলেখকের (এম-ডি পরীক্ষার্থী?) জানা উচিত ছিল যে পরীক্ষার অন্তত পনের দিন আগে থেকেই পরীক্ষার্থীদের হাসপাতালে ঢুকতে দেওয়া হয় না।

১০। এম-ডি'র পরীক্ষক নিযুক্ত হন সিন্ডিকেটের মত অনুযায়ী। সিন্ডিকেটের মাননীয় সদস্যগণ নিশ্চয়ই 'অর্দ্ধদগ্ধহীন' মন যে, তাঁরা ব্যক্তিবিশেষের মর্জিকে মেনে নেবেন।

১১। মড়াকান্না'ই তো করবেন—কারণ উল্লিখিত ব্যক্তি একজন অত্যন্ত জনপ্রিয় শিক্ষক। তিনি না পড়ালে ছাত্রদের সমূহ ক্ষতি। যে প্রবীণ শিক্ষকের কথা বলা হয়েছে তার উত্তরে এইটুকু বলা যায় যে, বার্ধক্যই যোগ্য গুণ। ছাত্ররা যদি এই কারণে কোন বিশেষ শিক্ষকের প্রতি বেশি আকৃষ্ট হয়, তাহলে অপর কোন 'বিশেষজ্ঞের' অপমানিত বোধ করা উচিত নয়।

১২। লেখক দয়া করে জানাবেন কি যে, বিশ্ববিদ্যালয়ের কোন্ আইনে লেখা আছে এম-ডি পরীক্ষকের পুত্র ছাত্র পড়াতে পারবেন না।

১৩। "১৯৬২ সলের চাঞ্চল্যকর খবরের" প্রতিকারের দায়িত্ব বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের—এম-ডি পরীক্ষার্থীদের নয়।

১৪। মেডিকেল কলেজ এখনও এশিয়ার অন্যতম শ্রেষ্ঠ মেডিকেল কলেজ। সুতরাং এম-ডি পরীক্ষার কেন্দ্র হিসেবে নিশ্চয়ই যোগ্য। এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য যে, এম-ডি পরীক্ষা শুধু মেডিকেল কলেজেই নয়, আর জি কর ও স্কুল অফ ট্রপিক্যাল মেডিসিনেও অনুষ্ঠিত হয়েছে। এর আগে এম-ডি পরীক্ষা শুধু আর জি করেই অন্তত দশবার হয়েছে।

এই সংখ্যায় আর একটি পত্রের লেখিকা "সুপ্রিয়া চক্রবর্তী"।

তাঁর অভিযোগ, পরীক্ষা পরিচালনায় বিশেষ কলেজের ছাত্রদের বিশেষ সুবিধা দেওয়া হয়ে থাকে। তাই যদি হবে, অন্য কলেজের ছেলেরা পাশ করেন কি করে? সুপ্রিয়া দেবী কি প্রকারান্তরে অধীত বিদ্যার কৃতিত্ব স্বীকার করে নিচ্ছেন না?

আর একটি অভিযোগ এম-ডি'র তিনজন পরীক্ষকই মেডিকেল কলেজে যুক্ত থাকেন। কিন্তু লেখিকা জানেন না বোধ হয় সাধারণত বিখ্যাত চিকিৎসকরা মেডিকেল কলেজে যুক্ত থাকেন। অন্য কলেজের বিখ্যাত চিকিৎসকদেরও পরীক্ষক হওয়ার অনেক নজির আছে (ডাঃ এ কে নন্দী, ডাঃ সি সি সাহা, ডাঃ আর এন চৌধুরী, ডাঃ বিধু ভট্টাচার্য ও আরও অনেকে)।

সুপ্রিয়া দেবীর হিসাব অনুযায়ী মেডিকেল কলেজের ছাত্ররাই বেশি সংখ্যায় সফল হন। কিন্তু আমরা জানি বিগত পরীক্ষায় ন্যাশনাল মেডিকেল কলেজের ছাত্ররা বেশি সংখ্যায় পাশ করেছেন।

শিক্ষকতাকে টিউটোরিয়াল হোমের কোচিং-এর সঙ্গে তুলনা করা লেখিকার বিকৃত রুচির পরিচয় মাত্র।

লেখিকা এম-আর-সি-পি এবং এম-ডি পরীক্ষার্থীর যে নজির দিয়েছেন এবং কোন বিশেষ ডাক্তারের এম-ডি পরীক্ষায় বারংবার অসাফল্যের কথা লিখেছেন তার উত্তরে এইটুকু বলা যায়—তিনি বোধহয় জানেন না ঐ ডাক্তারবাবুটি এম-আর-সি-পি পরীক্ষায় বারকয়েক ঘায়েল হয়েছেন। এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য যে, এম-ডি ও এম-আর-সি-পি পরীক্ষার পার্থক্য সম্বন্ধে লেখিকা নিশ্চয়ই অবহিত নন। একটি বিশ্ববিদ্যালয়ের ডক্টরেট ডিগ্রী অপরটি বিদেশী এক প্রতিষ্ঠানের ডিপ্লোমা মাত্র।

প্রথম পত্রের লেখক নিজেকে নিরপেক্ষ, সৎ, মেধাবী এবং সাহসী বলে জাহির করেছেন। কিন্তু তাঁর নিজের নাম প্রকাশের সৎসাহস নেই। আশা করি নীতির লড়াই-এর মোকাবিলা করার জন্য নিজে তাঁর 'গর্ত' থেকে প্রকাশ্য দিবালোকে আসবেন এবং যিনি কুলবধূর আঁচলের আড়ালে ফিসফিস করছেন তিনিও আমাদের সামনে নিজেকে মেলে ধরবেন—আমরা তাঁদের অভিনন্দন জানাবো। ইতি—

অনিলকুমার সাহা, বিজনকান্তি ভৌমিক, দীনেশচন্দ্র দাস, সুনীলকুমার মুখার্জী, সনৎকুমার ঘোষ, কিশোরঞ্জন মান্না, অবিনাশচন্দ্র মণ্ডল, সুবোধকুমার বালিয়াল, দিলীপকুমার মজুমদার, বিশ্বনাথ জানা, সুবীরকুমার চক্রবর্তী, বাবুরাম হাজরা, রবীন্দ্র মিত্র, কমলকুমার ও ইতি ও আরো অনেকে।

*

আপনার পত্রিকায় এম-ডি পাশ হওয়ার বিষয়ে যে লেখা স্থান পাইয়াছে, তাহা পড়িয়া বিস্মিত হইলাম। এখন নাকি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে এক অত্যন্ত ক্ষমতাশালী ব্যক্তি আছেন, তাঁহাকে সন্তুষ্ট করিতে পারিলেই এবং তাঁহার পুত্রের

নিকট "কোচিং" করাইলেই নাকি এম-ডি পাশ করা নিশ্চিত।

আমি সর্বভারতের যে সংবাদ পাই তাহাতে দেখিতেছি যে, কলিকাতা বিশ্ব-বিদ্যালয় হইতে যতজন এম-ডি পাশ হইতেছে দিল্লী, লক্ষ্ণৌ, পাটনা বা বিশাখা-পত্তনম হইতে তদপেক্ষা অনেক বেশি এম-ডি পাশ হইতেছে। এখানে এত সহজ উপায় থাকিতে পাশ হইতে পারে না ইহা সম্ভব নয়। বিশ্ববিদ্যালয়ে একজন ক্ষমতাসম্পন্ন ব্যক্তি আছেন বলিয়া যে অভিযোগ করিয়াছেন, লেখক কি মনে করেন যে এম-ডি পরীক্ষার অন্যান্য পরীক্ষকরা পরীক্ষার্থীদের যোগ্যতা বিচার না করিয়া কেবল ইহার কথাতেই তাহাদের পাশ করাইতে রাজী হইবেন? আরও জানিলাম এই ব্যক্তির পুত্র "কোচ" করিয়া অর্থগ্রহণ করেন না।

যাঁহারা কলিকাতা হইতে এম-ডি পাশ করিয়া ভারতের সর্বত্র কলিকাতা বিশ্ব-বিদ্যালয়ের এম-ডি'র মানবর্ধন করিয়া গিয়াছেন তাঁহাদের অপেক্ষা বর্তমানের এম-ডি'রা কোন অংশে ন্যূন নহেন ইহা আমি বলিতে পারি।

শ্রীনলিনীরঞ্জন সেনগুপ্ত

*

আপনার ৪ঠা পৌষ ১৩৭৫ বঙ্গাব্দের (২৬শ সংখ্যা) সাপ্তাহিক বসুমতী পত্রিকায় 'পাঠকমনে' জনৈক অকৃতকার্য এম· ডি পরীক্ষার্থীর মন্তব্যের উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করিতেছি।

১। স্নাতকোত্তর পরীক্ষার ফলের কথা কেহই নিশ্চিত করিয়া বলিতে পারেন না, ইহা স্নাতকোত্তর ছাত্র-ছাত্রী মাত্রই ভাল করিয়াই জানেন। কোন মেধাবী ছাত্র বার বার স্নাতকোত্তর পরীক্ষায় ফেল করেন এমন কোন নজীর নাই। চেষ্টা ও শ্রম থাকিলে মেধাবী ছাত্রের স্নাতকোত্তর পরীক্ষায় অন্তত দুই-তিনবারেও পাশ করিবার সম্পূর্ণ সম্ভাবনা আছে বা থাকে। যাঁহারা এম· বি·· বিএস পরীক্ষায় ভাল ফল করিতে পারেন না অধ্যবসায়ের ফলে তাঁহারাও স্নাতকোত্তর পরীক্ষায় একবারেই পাশ করিতে পারেন। যাঁহারা এম· ডি-তে পাশ না করিয়া এম· আর· সি· পি পরীক্ষায় পাশ করেন এমন ব্রিলিয়ান্ট ছাত্রের নজীর খুবই কম। এইসব ছাত্ররা এম· ডি পরীক্ষার জন্য ভালভাবে চেষ্টা করেন নাই। ইঁহাদের মধ্যে কয়েকজন যাঁহারা এম· আর· সি· পি পাশ করিয়া ফিরিয়া আসিয়া আবার এম· ডি পাশ করিয়াছেন।

২। প্রাইভেট কেস্ দিয়া এম· ডি পাশ করা যায় না। লেখক নিজেই পরীক্ষার আগে কথিত 'কর্তা-ব্যক্তি'কে কেস্ দিয়াছিলেন; কিন্তু তিনি পরীক্ষার্থীর কেস্ জানিয়া ঐ রোগীর কাছ হইতে কোন পারিশ্রমিক গ্রহণ করেন নাই।

৩। এম· ডি পরীক্ষায় পাশ বা ফেল কোন একজন 'কর্তাব্যক্তি'র উপর নির্ভর করে না।

৪। একথা আপনার জানা দরকার যে ঐ চিঠির প্রতিবাদ করা এবং চাকুরিতে ভাল পোস্টিং পাওয়া—এ দুইয়ের মধ্যে কোন সম্বন্ধ নাই।

৫। স্বাধীন ভারতে ডেমোক্রেটিক কনস্টিটিউশনে কারও টেলিফোনে নির্দেশ পাওয়া মাত্র দলে দলে পত্রিকা অফিসে ছুটিয়া যাওয়া দুঃসাধ্য।

৬। একাডেমিক কাউন্সিলের ১২ জন ব্যক্তি আছেন। কাহারও এক-জনের কথায় বা মর্জির উপর প্রমোশন হয় না।

৭। তথাকথিত কর্তাব্যক্তি কোন মিটিং-য়েই থাকিতে চাহেন না। তাঁহাকে জোর করিয়াই আনা হয়।

৮। তথাকথিত ডাক্তারী বইয়ের লেখক এ পর্যন্ত কাহারও নিকট কৃতজ্ঞতা স্বীকার করেন নাই। ইহা তাঁহার সম্পূর্ণ নীতিবিরুদ্ধ।

৯। একথা ভুল যে কোন ছাত্র স্নাতকোত্তর পরীক্ষায়—তাঁহাদের কেস্ জানিতে পারেন।

১০। ডেমোক্রেটিক কনস্টিটিউশনে এক-জন কর্তাব্যক্তির ইচ্ছায় পরীক্ষক নিযুক্ত হন না।

১১। এম· ডি পরীক্ষার্থীরা যাঁহাদের কাছে শিখিবার সুযোগ পান তাঁহাদের সকলের কাছেই ছুটিয়া যান।

১২। এম· ডি পরীক্ষার 'কর্তা'র পুত্র শুধুমাত্র এম· ডি পরীক্ষার্থীদের জন্যই ক্লাস নেন না। তিনি স্নাতক ও স্নাতকোত্তর সমস্ত ছাত্রদের বিনা পারিশ্রমিকে শিক্ষা দান করেন।

১৩। ১৯৬২ সালে যুগান্তর ও অমৃত-বাজার পত্রিকায় যে চাঞ্চল্যকর পত্র প্রকাশিত হইয়াছিল তাহা মিথ্যা।

১৪। আর· জি· কর মেডিক্যাল কলেজে এম· ডি পরীক্ষা পূর্বে অনেকবার হইয়াছে। ট্রপিক্যাল স্কুলেও এম· ডি পরীক্ষা হইত। মেডি-ক্যাল কলেজ শহরের মধ্যবর্তী অঞ্চলে অবস্থিত বলিয়া আপাতত এইখানেই এখন এম· ডি পরীক্ষা গ্রহণ করা হইয়া থাকে।

—জনৈক এম· ডি পরীক্ষায় কৃতকার্য ছাত্র এবং কলিকাতার কোন বিশিষ্ট হাসপাতালের ভিজিটিং ফিজিসিয়ান।

*

"এম· ডি পরীক্ষা" প্রসঙ্গে আপনাদের বক্তব্যের স্বপক্ষে ও বিপক্ষে যেসব মন্তব্য ও পত্র প্রকাশিত হয়েছে, তা আমাদের সমাজজীবনের এক অপরিহার্য চিত্র। এক-জন পত্রলেখক বিচার বিভাগীয় তদন্তের দাবি করেছেন, আমি এ দাবিকে ন্যায়-সঙ্গত ও যথার্থ বলে মনে করি।

গত সংখ্যায় যাঁরা বিপক্ষে চিঠি দিয়ে-ছেন, মনে হয়, তাঁরা প্রায় সবাই এম-ডি পরীক্ষার্থী। চিকিৎসক মহলে অনেকেরই ধারণা, এঁদের অধিকাংশই আগামীবার এম-ডি'তে পাশ করবেন। এম-ডি পাশ করার এ এক সুবর্ণ সুযোগ।

আমি একজন প্র্যাকটিশিং ডাক্তার। এম-ডি'র দুষ্ট স্বার্থচক্রের অনেক কথাই আমি জানি। প্রয়োজনে সেসব তথ্য প্রকাশ করে দেব। কই, এম-ও এবং এম-এস (বা এম-ডি'র সমতুল্য) পরীক্ষা নিয়ে তো এসব স্ক্যান্ডাল হয় নি।

একথা কি সম্পাদিকা মহোদয়া জানেন যে, অনেক বড় বড় ডাক্তারকেও শাসানো হচ্ছে—যাতে করে তাঁরা প্রতিবাদ জানিয়ে আসেন—অনেকেই ভয়ে ভয়ে প্রতিবাদ জানাতে যাচ্ছেন।

এক পত্রদাতা পরীক্ষা পাশের ক্ষেত্রে 'লাক'-এর কথা বলেছেন। এই লাক-কি ফেভার করে এমন কারো পুত্রের কোচিং ক্লাশে গেলে বা কারো পিতার প্রসন্নদৃষ্টি লাভ করলে? পিতাব প্রসন্নদৃষ্টি-ই তো 'লাক' এখানে! এবং এই লক-ই প্রধান সহায় এম-ডি পাশের।

যাঁরা বিপক্ষে প্রতিবাদপত্র পাঠাচ্ছেন, তাঁদের সকলের ভাষাই এক—সেই জন্যেই কি প্রমাণিত হয় না যে, ও'দের দলবদ্ধ-ভাবে প্রম্পট করে পাঠানো হচ্ছে—একই কথার পুনরাবৃত্তি ঘটছে তাই!

কোচিং ক্লাশ—বেতন নিয়েই হোক বা অবৈতনিক হোক, অত্যন্ত দৃষ্টিকটু। বিশেষত পিতা যেখানে এম-ডি'র পরীক্ষক। শাক দিয়ে মাছ ঢাকা যায় না—ঢাক পিটিয়ে যতই প্রচার করা হোক না কেন সময় অপব্যয়ের কথা, নিঃস্বার্থ সহানুভূতির কথা, পশার ক্ষুণ্ণ করার কথা। একবার পিতা যদি এম-ডি'র পরীক্ষক না হন, তাহলে তাঁর কোচিং ক্লাশে ক'জন ছাত্র যাবেন ভেবে দেখতে ইচ্ছা হয়। ভবিষ্যতে তেমন দিনেই তাঁর জনপ্রিয়তার এবং পরার্থপরতার পরিচয় পাওয়া যাবে, তার আগে নয়। তার আগে পুত্রের স্বার্থ ও পিতার স্বার্থ অভিন্ন বলেই আমরা ভাববো।

ডাঃ এ, কে, দাশ কলকাতা—১৬

রবীন্দ্রনাথ ও সুভাষচন্দ্র

শঙ্করীপ্রসাদ বসু

[পূর্ব-প্রকাশিতের পর]

মুক্তি দাও ! মুক্তি চাই !

সংবর্ধনা সভায়, অনেক ফুলের মাঝে ও তার সুবাসে আচ্ছন্ন সুভাষচন্দ্রের পক্ষে ফুলের কাঁটার কথা ভোলা সম্ভব হয় নি। আমার গলায় মালা, কিন্তু, সুভাষচন্দ্র ভেবেছিলেন, আমারি মত দেশকে ভালবাসার অপরাধে অপরাধী অনেক মানুষের গলায় রজ্জু এবং পায়ে শিকল। বড় তীব্র, তিক্ত যন্ত্রণার সঙ্গে এইসব কথা তাঁর মনে পড়েছিল। তখনো তাঁর সম্পূর্ণ নিরাময় ঘটে নি, কাজে নামবার মত শরীরের অবস্থা নয়, ডালহৌসিতে গিয়েছেন হৃত স্বাস্থ্য সন্ধানে, এবং অসহ্য মানসিক কষ্টে আছেন দেশের, বিশেষত বাংলা দেশের রাজনৈতিক অবস্থার কথা চিন্তা করে ডালহৌসি থেকে এই সময়ে লেখা একটি চিঠিতে তাঁর মনের অবস্থার কিছুটা পরিচয় পাওয়া যায়—

> "একথা বলতেই হচ্ছে, বাংলা থেকে যেসব খবর পাচ্ছি, তা আমাকে মোটেই সুখী করছে না। একদিকে, বন্দীমুক্তির ব্যাপারে সবচেয়ে কম প্রত্যাশাও পূরণ হয়নি; অন্যদিকে, বাংলায় কংগ্রেসের কাজেও কোনো উন্নতি দেখা যায়নি। ফলে, কাজে ঝাঁপিয়ে পড়তে দেরী হচ্ছে বলে আমি অস্থির হয়ে পড়ছি; কিন্তু উপায়ও নেই। আবার যখন স্বাভাবিক কাজের জীবনে ফিরে যাব, তখন অনুমান করতে পারছি, কী কঠোর কার্যভার আমার জন্য অপেক্ষা করে আছে; আমি যদি শারীরিকভাবে সম্পূর্ণ সুস্থ না হই, তাহলে সে কাজ সামলে উঠতে পারব না। আমার যুক্তি বা বুদ্ধি বলছে, আমার ধৈর্য ধরা উচিত। তাহলেও, সবসময়ে নিজের ভাবানুভূতিকে তো দমন করা সম্ভব হয় না! আর একটি নিয়ন্তর উৎকণ্ঠার মূলে আছে মুক্তিপ্রাপ্ত ডেটিনিউদের চিন্তা, সেই সঙ্গে যারা মুক্তি পায়নি তাদের পরিবারের চিন্তাও। তাদের কাছ থেকে যেসব চিঠি পাচ্ছি, বড় যন্ত্রণাদায়ক সেগুলি।"*

সুভাষচন্দ্রের বিশেষ যন্ত্রণার কারণ বুঝতে হলে তৎকালীন রাজনৈতিক অবস্থার কথা স্মরণ করতে হবে। ১৯৩৫ অ্যাক্ট অনুযায়ী তথাকথিত প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসন ব্যবস্থা ভারতবর্ষে প্রবর্তিত হয়েছে এই ১৯৩৭ সালেই। নির্বাচনে অংশগ্রহণ করে কংগ্রেস অধিকাংশ প্রদেশে সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করেছে এবং বহু টালবাহানা করে মন্ত্রিত্ব গ্রহণে স্বীকৃত হয়েছে। বাংলা কংগ্রেস কিন্তু সংখ্যাগরিষ্ঠতা পায় নি; অধিকন্তু, কংগ্রেস কর্তৃপক্ষের ছুৎমার্গী মনোভাবের জন্য বাংলা দেশে কংগ্রেস-লীগ কোয়ালিশনের প্রস্তাব বানচাল হয়ে গিয়েছে। কংগ্রেস-কর্তারা কদাপি নীতিগত দৃঢ়তার জন্য বিখ্যাত নন, সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারার ব্যাপারে তাঁদের বিচিত্র না-গ্রহণ না-বর্জন নীতি রাজনৈতিক মেরুদণ্ডহীনতার চরম প্রমাণ, তা হলেও কখনো কখনো তাঁরা আশ্চর্য বীর্য প্রকাশ করেন, এবং দেখা যায়, তাঁদের বীরত্বের ফলভোগ করে বাংলা দেশ। বাংলা দেশের সম্বন্ধে কোনো বিরাগবশে তাঁরা বাংলার প্রতি ক্ষতিকর সিদ্ধান্তগুলি নিয়মিত করেছেন, তা যদি সত্য নাও হয়, একথা স্বচ্ছন্দে বলা যায়, তাঁদের "সিদ্ধান্তের দ্বারা বাংলা দেশ নিয়মিত ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। ফজলুল হকের কোয়ালিশন প্রস্তাবে গররাজি হয়ে কংগ্রেস কর্তৃপক্ষ পরবর্তী দেশ বিভাগের পথে সগৌরবে আর একটি দৃঢ় পদক্ষেপ করেছিলেন। আশাহত ফজলুল হকের লীগ মন্ত্রিসভা অতি প্রতিক্রিয়াশীল আচরণের দ্বারা বাংলা দেশের জীবন দুর্বহ করে তুলেছিল অতঃপর। এবং বাংলা দেশের জীবনের সেই অন্ধকার গাঢ়তর হয়ে উঠেছিল অন্যতর কংগ্রেস-প্রদেশসমূহের আলোকোৎসবের পাশে। অধিকাংশ প্রদেশে জনপ্রিয় কংগ্রেসী মন্ত্রিসভাগুলি যখন বন্দীমুক্তি দান, এবং অন্যান্য জনকল্যাণমূলক কাজে ব্রতী হল, তখন বাংলা দেশের চারদিকে অবরুদ্ধ দেশপ্রেমিকদের যন্ত্রণা ও পীড়নের হাহা স্বর, বাংলা দেশেই দীর্ঘদিন সে যন্ত্রণা সর্বাধিক, কারণ সে দেশ সবচেয়ে বেশি সংখ্যক ত্যাগী বেপরোয়া দেশপ্রেমিক দান করেছে স্বাধীনতা সংগ্রামে। স্বাধীনতার 'মধ্যাহ্নে অন্ধকার' দেখবার জন্য এই প্রদেশকে ১৯৪৭ সালের আগস্ট মাস পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হয় নি, ১৯৩৭ সালের আগস্ট মাসেই সে গ্রহণের পুণ্যস্নান করেছিল।

সুভাষচন্দ্র মনে মনে কতখানি অস্থির হয়েছিলেন বোঝা যায় পূর্বোক্ত পত্রের কয়েক দিন পরে, ২৪ জুলাই তারিখে প্রকাশিত তাঁর বিবৃতি পড়লে। বঙ্গীয় কংগ্রেসের সভাপতিরূপে বন্দীমুক্তির ব্যাপারে এই জোরালো বিবৃতিটি তিনি দেন। সূচনায় বলেন, গত এপ্রিল মাসে বাংলা ছাড়ার সময়ে তিনি স্থির করেছিলেন রাজনীতিতে প্রত্যাবর্তনের আগে কোনো বিবৃতি দেবেন না; কিন্তু সেখানে রাজনৈতিক অবস্থা ক্রমাগত মন্দের দিকে চলেছে, তাই বিবৃতিযোগে তাঁর বক্তব্যকে সর্বসাধারণের গোচর করতে হচ্ছে, যেহেতু এখনি তাঁর পক্ষে ফিরে যাওয়া সম্ভব হচ্ছে না। তারপরে সুভাষচন্দ্র

---

* ২০ জুলাই, ১৯৩৭, অমৃতবাজার পত্রিকা থেকে অনূদিত।

হক-মন্ত্রিসভার প্রতিক্রিয়াশীল চেহারার তুলনা করেছেন—

"চার মাসের অভিজ্ঞতা থেকে দেখা গেছে, বাংলা দেশ সারা ভারতের সবচেয়ে প্রতিক্রিয়াশীল মন্ত্রিসভার দ্বারা শাসিত। খাজা-হক মন্ত্রিসভার কাছ থেকে যদিও কেউই বড় কিছু আশা করেনি, কিন্তু যে গভীর-ব্যাপক নৈরাশ্য এই প্রদেশকে আচ্ছন্ন করেছে—আমার নিশ্চিত ধারণা, তাও কেউ কল্পনায় আনতে পারেনি।...

"সারা পৃথিবীতে দেখা যায়, ভারতের শাসন প্রবর্তনের সূচনা হিসেবে রাজনৈতিক বন্দীদের দণ্ড মকুব করা হয়। সুতরাং বাংলা দেশে, যেখানে দু' হাজারের উপর ডিটেনিউ বিনা বিচারে আটক রয়েছে, যেখানে বহু সংখ্যক রাজনৈতিক বন্দী বিচারের পর দণ্ডভোগ করছে, যাদের অনেকেই আন্দামানে দ্বীপান্তরবাসী, যেখানে পীড়নের সকল ব্যবস্থাই পূর্ণভাবে বলবৎ, সেখানে একথা বিশ্বাস করা কদাপি সম্ভব নয় যে, প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসন-জাতীয় কিছু প্রবর্তিত হয়েছে।

"বিনা বিচারে আটক বন্দীদের মুক্তি না হওয়াই অবশ্য সবচেয়ে নৈরাশ্যের জিনিস। গভর্নর, আমলাতন্ত্র বা সি আই ডি বিভাগের মনোভাব এক্ষেত্রে বোধগম্য, কিন্তু যিনি একদা জনদরদীর ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন, তাঁর এখনকার মনোভাব আমাদের বোধগম্য নয়—তিনি এখন বিনা বিচারে আটক রাখা সমর্থন করার চেষ্টা করছেন, এবং বিশ্ব-বিদ্যালয়ের ছাত্রদের রাজনীতি পরিত্যাগ করবার সদুপদেশ দিচ্ছেন। মিঃ ফজলুল হক যথার্থই নিষ্ঠুরতায় নিষ্ঠুরতম ঐতিহাসিক চরিত্রকেও অতিক্রম করেছেন।"

অবস্থা যেখানে ঐ রকম, সেখানে প্রচণ্ড আন্দোলন সৃষ্টি করা ছাড়া গত্যন্তর নেই—সুভাষচন্দ্র জানালেন। "এমন আন্দোলন করতে হবে যাতে মন্ত্রি-সভা ভেঙে পড়ে।" সেই সঙ্গে বন্দী-দিবস পালনের ঘোষণার কথাও বললেন। তার পরে তিনি গভর্নর স্যার জন অ্যান্ডারসনের অহমিকায় আঘাত এবং বিদ্বেষের কাছে আবেদন করলেন—

"বক্তব্য শেষ করার আগে মাননীয় গভর্নর স্যার জন অ্যান্ডার-সনের কাছে, এবং স্থায়ী আমলাদের কাছে (যাঁরা কার্যতঃ বাংলা দেশ শাসন করছেন) কিছু নিবেদন করতে চাই। স্যার জন সাম্প্রতিক এক বক্তৃতায় তাৎপর্যপূর্ণ মন্তব্য করেছেন। তিনি বলেছেন, আইন ও শৃঙ্খলা রক্ষার ব্যাপারে মন্ত্রিসভার সঙ্গে তাঁর কিছু মতভেদ রয়েছে। এবং আমাদের বলছে এটা বিস্ময়ের বিষয় মনে হয়নি যে, বর্তমান মন্ত্রি-সভা গত সাত বছর ধরে বাংলা দেশে যে নিপীড়নমূলক ব্যবস্থা চলেছে, তারই ধারাই গ্রহণ করেছে।

"আয়ারল্যাণ্ডের রাজনৈতিক বন্দীদের মুক্তির ব্যাপারে যে ভূমিকা তিনি গ্রহণ করেছিলেন, তাঁর বিষয়েও মাননীয় গভর্নর মহোদয় উল্লেখ করেছেন; সেই সঙ্গে সঙ্গেদে জানিয়েছেন, বাংলার পরিস্থিতি আয়ারল্যাণ্ড থেকে ভিন্ন। কিন্তু একথা কি সত্য নয় যে, আয়ারল্যাণ্ডে মুক্ত বিদ্রোহ হয়েছিল ও তাতে সহস্র সহস্র ইংরেজ নিহত হয়েছিল, অপর-পক্ষে বাংলা দেশে বড় জোর একটা গুপ্ত বৈপ্লবিক আন্দোলন ছিল, যার ফলে সর্বোচ্চ কয়েক ডজনের বেশী প্রাণহানি হয়নি?

"স্যার জন জানেন, সেই সূত্রে তাঁর স্থায়ী আমলারাও জানেন যে, বৈপ্লবিক আন্দোলন এখন অতীতের ব্যাপার। ব্যক্তিগতভাবে আমি যে সংবাদ পেয়েছি, তা ছাড়াও বন্দিদ্দশা-কালে একাধিক দায়িত্বশীল পুলিশ অফিসারের কাছ থেকে শুনেছি, বাংলা দেশের তরুণেরা—তাদের মধ্যে দণ্ডিত বা বিনা বিচারে আটক বন্দীরাও আছেন—আর গুপ্ত বৈপ্লবিক আন্দোলনের কথা ভাবছেন না; পরিবর্তে তাঁরা সমাজতান্ত্রিক আন্দোলন ও গণ-আন্দোলনের পরি-কল্পনাই করছেন।

"সরকারী মতে বৈপ্লবিক আন্দোলনের সংযোগের জন্য যাদের অবরুদ্ধ করা হয়েছে, এক্ষেত্রে তাদের এখনো আটক রাখার কী যৌক্তিকতা থাকতে পারে? পাঁচ বছর আগে, তখনো স্যার জন ইংলণ্ড ছেড়ে আসেননি, আয়ারল্যাণ্ডে 'ব্ল্যাক অ্যাণ্ড ট্যান' শাসনে তাঁর ভূমিকার জন্য সম্মানোচিত হয়েছিলেন; তিনি চোখা উত্তর দিয়ে বলেছিলেন, একই সঙ্গে তিনি আইরিশ জনগণের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তরের ব্যাপারেও অংশ নিয়েছিলেন।

"মহামান্য গভর্নর মহোদয় শীঘ্রই শাসনভার ত্যাগ করবেন। তার আগে এখানেও কি তিনি আয়ারল্যাণ্ডে যা করেছিলেন তার পুনরাবৃত্তি করবেন? অর্থাৎ, সকল রাজনৈতিক বন্দীকে মুক্তি দেবেন এবং ভারতভূমি ত্যাগ করে যাবার আগে যথার্থ জনপ্রতিনিধিদের হাতে শাসনভার তুলে দিয়ে যাবেন?

"কংগ্রেসসেবীদের এবং বাংলার কংগ্রেস প্রতিষ্ঠানসমূহের পক্ষ থেকে পরিপূর্ণ দায়িত্বের সঙ্গে আমি বলতে পারি, বিলম্বে হলেও সরকার যদি এক্ষেত্রে ন্যায়বিচার করেন, তাহলে আমরা জনগণের মধ্যে অহিংসার ভাবপ্রসার, আমাদের প্রচারাভিযান ও গণ-আন্দোলনের পরিত্যাগ দ্বারা সরকারকে সাড়া দেব। বাংলার নিজের স্বার্থে, বৃহত্তর ভারতের স্বার্থেও বটে, বাংলাকে জাতীয় কংগ্রেসের আদর্শ, নীতি ও পদ্ধতিকে বরণ করতেই হবে।"

সুভাষচন্দ্রের এই বিবৃতি প্রকাশিত হবার কয়েকদিনের মধ্যে রাজনৈতিক ঘটনাগতি অকস্মাৎ তীব্রবেগ ধারণ করল। ৩রশে জুলাইয়ের সংবাদপত্রের বিরাট সংবাদ, আন্দামানে বন্দীদের অনশন শুরু হয়ে গেছে ন্যায্যব্যবহারের ও মুক্তির দাবিতে। আন্দামান-বন্দীদের কোন্ নিষ্ঠুর অত্যাচারের মধ্যে দিনযাপন করতে হত, রাজনৈতিক ইতিহাসের সঙ্গে পরিচিত ব্যক্তিরা তার কিছুটা জানেন। অত্যাচারিত কিছু কিছু মানুষ এখনো বেঁচে আছেন সেখানকার কল্পনাতীত পীড়নের সাক্ষ্য দিতে। বেশি সন্ধানের প্রয়োজন নেই, পাঠকরা যদি গত ৭ নভেম্বর, ১৯৬৮, তারিখে সাপ্তাহিক বসুমতীতে প্রকাশিত শ্রদ্ধেয় ত্রৈলোক্যনাথ চক্রবর্তীর জীবনস্মৃতির অংশটুকু পড়েন, তাহলে অবস্থার কিছুটা আভাস পাবেন।

২৪শে জুলাই থেকে বন্দীরা অনশন শুরু করেছিলেন। সেখানকার ২৮৩ জন বন্দীর অধিকাংশই বাঙালী; অনশন করে-ছিলেন যে ১৮৭ জন বন্দী, তাঁদেরও প্রায় সকলেই বাঙালী। অনশনের সংবাদ অবিলম্বে জানানো হয় নি। ২৪শে জুলাইয়ের অনশনের সংবাদ কলকাতার সংবাদপত্রে প্রথম বেরিয়েছিল ৩১শে জুলাই।*

দেশপ্রেমিকদের মরণপণ অনশনের সংবাদে এবং শাসকচক্রের নিষ্ঠুর ঔদা-সীন্যের চেহারা দেখে বাংলা দেশ ও ভারতবর্ষ রোষে-ক্ষোভে ফেটে পড়ল। প্রচণ্ড আন্দোলন শুরু হয়ে গেল সর্বত্র,

* বিস্ময়ের কথা, ২৪ জুলাই, যেদিন অনশন শুরু হয়, সেই দিনের সংবাদপত্রেই ডালহৌসি স্কোয়ার থেকে সুভাষচন্দ্রের পাঠানো বন্দীমুক্তি বিষয়ক বিবৃতিটি বেরিয়েছিল। এটা কি কাকতালীয় ব্যাপার!

কালকের দিনের
চাষবাসের পদ্ধতি
ফসল কম...
লাভ আরও কম

এর পরের বার যখন আপনার নতুন ক'রে
চাষবাসের সরঞ্জামের দরকার হবে, যেমন
ট্রাক্টর, ট্রাক্টর, স্প্রেয়ার বা বৈদ্যুতিক
শক্তিচালিত লাঙ্গল—সোজা আপনার
কাছাকাছি স্টেট ব্যাঙ্কের
শাখা-অফিসে চলে আসবেন।
প্রত্যক্ষভাবে চাষীদের অর্থসাহায্য করবার
পরিকল্পনা অনুযায়ী স্টেট ব্যাঙ্ক ঋণ বা
নগদ দাদন দিয়ে আপনাকে সাহায্য করবে
আপনার চাষবাসের ব্যবস্থাকে আধুনিক ক'রে
তুলতে এবং ফসল উৎপাদন বাড়িয়ে তুলতে।

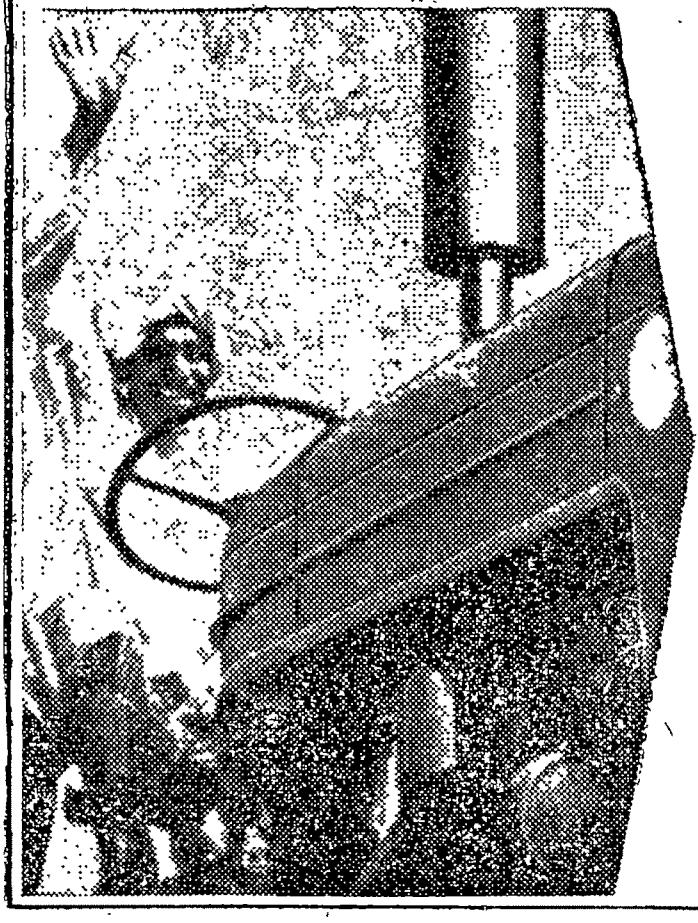

আজকের দিনের
আধুনিক চাষবাস
প্রচুর ফসল...
প্রচুর লাভ

সকলের সেবায়
স্টেট ব্যাঙ্ক

A 380 BN

বিশেষত বাংলায়। সুভাষচন্দ্রের অনুপস্থিতিতে শরৎচন্দ্র বসু আন্দোলনে নেতৃত্ব নিলেন। "আন্দামান দিবস" পালিত হল। সেদিন এবং প্রতিদিন শোভাযাত্রা, সভা, বিক্ষোভ—প্রতিবাদ ও ধিক্কার। সহানুভূতিতে অনশন হল নানা স্থানে, বিশেষত বন্দীনিবাসগুলিতে। এই সব বিক্ষোভ কিন্তু নিরুপদ্রবে হতে পারে নি—কলকাতায় শোভাযাত্রার উপরে লাঠি-সুদ্ধ পুলিশ ঝাঁপিয়ে পড়ল নিষ্ঠুরভাবে, মহিলা শোভাযাত্রী সমেত আহত হলেন বহুজন।

এই সমস্ত আন্দোলন যখন চলেছে, আশঙ্কায় ও শাসকদের প্রতি ঘৃণায় যখন দেশবাসীর মনপ্রাণ শিহরিত এবং দূর দ্বীপের ক্ষীণবৃন্ত প্রাণশিখাগুলির প্রতি শ্রদ্ধায় ও মমতায় ভারাতুর, তখনো কিন্তু বাংলা সরকারের আত্মতুষ্টির সীমা নেই। ইতিমধ্যে ভারত সরকার বন্দীদের ব্যাপারে দায়িত্ব ছেড়ে দিয়েছে, দায় চাপিয়ে দিয়েছে বাংলা সরকারের ঘাড়ে, কিন্তু এখানকার শাসনতান্ত্রিক অহমিকা অনশনের চাপের কাছে হার মানতে একেবারেই নারাজ। এদিকে উদ্বেগের মাত্রা প্রতিদিন বেড়েছে—চরমে পৌঁছেছে অনশনের ৩৪-তম দিনে—যেদিন মৃত্যুর গুজব ছড়িয়ে পড়ল এবং বাংলার আইনসভা থেকে কংগ্রেসী সদস্যরা বেরিয়ে এলেন। রুদ্ধ যাতনার উপর দিয়ে আরও কয়েকদিন কাটল, অবশেষে ৩১ আগস্টের সংবাদপত্রে পরম স্বস্তিকর সংবাদটি বেরুল—জাতীয় দুর্দৈব শেষ পর্যন্ত ঘটে নি—বন্দীরা অনশন ত্যাগ করেছেন।

ডালহৌসিতে স্বাস্থ্যোদ্ধারে ব্রতী সুভাষচন্দ্রই বোধ হয় এই সময়ে সর্বাধিক ক্ষুব্ধ ছিলেন, কারণ স্বাস্থ্যসঞ্চয় করা ছাড়া তাঁর গত্যন্তর ছিল না অথচ করবার ছিল কত কিছু! মাত্র বিবৃতিদানে সন্তুষ্ট থাকতে হয়েছিল তাঁকে। ডালহৌসি থেকে ৬ই আগস্ট তারিখে প্রচারিত বিবৃতিতে তিনি বাংলার তৎকালীন স্বরাষ্ট্রসচিব খাজা নাজিমুদ্দিনের হৃদয়-হীনতা ও কপটতাকে কঠোরভাবে আঘাত করলেন।

"বাংলা মন্ত্রিসভার কিছু কিছু সদস্যের কথাবার্তা শুনে বিরক্তি ও বিতৃষ্ণা দমন করা সত্যই শক্ত"—সুভাষচন্দ্র লিখলেন—"বর্তমান শাসন সংস্কারের পূর্ববর্তী কোনো কঠিন চোয়াল আমলাও এঁদের থেকে অধিক দায়িত্বহীনতার খেলা দেখাতে পারতেন না। স্বরাষ্ট্রসচিব স্যার নাজিমুদ্দিন সেদিন বলেছেন, আন্দামান বন্দীরা বেয়নেটের মুখে তাঁদের দাবিকে এগিয়ে দিয়েছেন। আমরা একথা কদাপি জানতে পারিনি, সেই 'নরক দ্বীপের বন্দীদের ইতিমধ্যে বেয়নেট সরবরাহ করা হয়েছে।' অনশন ধর্মঘট সম্বন্ধে যদি স্যার নাজিমুদ্দিনের আপত্তি থাকে, তাহলে যে-চার মাস ধরে তিনি পদে অধিষ্ঠিত আছেন, তার মধ্যে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা অবলম্বন করেন নি কেন?" সুভাষচন্দ্র আরও বললেন—"স্যার নাজিমুদ্দিনের বোধোদয়ের জন্য জানাতে পারি, শাসন সংস্কারের পূর্ববর্তী আমলাতান্ত্রিক সরকারের আমলে অনশন ধর্মঘটীদের দাবির কাছে অজস্রবার সরকার নতি-স্বীকার করেছে; আমার ক্ষেত্রেই তা ঘটেছে, যখন আমি ব্রহ্মদেশে ১৯২৬ সালে রাজবন্দী ছিলাম। ভারতের বাইরে, তাঁর সরকারের চেয়েও অনেক শক্তিশালী সরকার অনশন ধর্মঘটের নৈতিক চাপের কাছে নত হয়েছে। আমাদের ইদানীন্তন কালের এইসব পূর্ণ-প্রস্ফুটিত আমলা মহোদয়দের বোধ হয় ১৯৩২ সালে মহাত্মা গান্ধীর সুবিখ্যাত অনশনের কথা স্মরণ করাতে হবে না, যা মহামান্য বৃটিশ সরকারকে পর্যন্ত বিবেচনাসম্পন্ন করে তুলেছিল।"

সুভাষচন্দ্রের কঠোর বিদ্রূপের পিছনে ছিল আতঙ্ক ও অন্তর্যাতনা। ১৯৩৩ সালের আন্দামান অনশনে তিনজনের প্রাণহানি হয়েছিল। আন্দামান থেকে সদ্যপ্রত্যাগত বন্দীর কাছে তিনি শুনেছেন, বন্দীদের শারীরিক অবস্থা অতি শোচনীয়। না জানি অনশন চলতে দিলে এবার আরও কত বেশি প্রাণহানি ঘটবে! অথচ বন্দীরা দৃঢ়প্রতিজ্ঞ।

সুতরাং, বাংলা কংগ্রেসের সভাপতি-রূপে সুভাষচন্দ্র ঐ বিবৃতিতে আহ্বান করলেন—অবিরাম আন্দোলন চলুক—সপ্তাহমধ্যে আন্দামান দিবস ঘোষিত হোক।*

অনশনের চতুর্দশ দিবসে সুভাষচন্দ্রের বিবৃতি প্রকাশিত হয়। দ্বিতীয় বিবৃতি পাই অনশনের এক মাস পরে। এবার তাঁর লক্ষ্য ভাইসরয়, কারণ তিনি জানতেন, কোন্ হাতে কান ধরা আছে। ২৪ অগস্ট তারিখে প্রকাশিত এই বিবৃতিতে তিনি বহু সরকারি কুযুক্তি তীক্ষ্ণভাবে খণ্ডন করেছেন। ভারত সরকার অহিংস ও সহিংস—রাজনৈতিক বন্দীদের মধ্যেও এই দুই শ্রেণী ভাগ করেছেন। বলাবাহুল্য অহিংস রাজবন্দীরা সরকারের পক্ষে নিরাপদ শত্রু। সুভাষচন্দ্র লিখলেন—"শুধু ভারতবর্ষেই রাজবন্দীদের মধ্যে শ্রেণীভাগ করার ব্যাপারে অহিংস এবং না-অহিংস শ্রেণীভাগ করা হয়; অপরপক্ষে অন্যান্য দেশে রাজবন্দী হিসাবে তাঁদেরই গণ্য করা হয়, যাঁরা দারুণতম অপরাধে শাস্তিপ্রাপ্ত, তাঁদের গুণের মধ্যে থাকে, অপরাধের পিছনে উদ্দেশ্য ছিল দেশপ্রেমমূলক।...জার্মানী, রাশিয়া, ইটালী, স্পেন, আইরিশ; ফ্রি স্টেট এবং আরও কয়েকটি দেশের রাষ্ট্র-প্রধানরা আন্দামান বন্দীদের অধিকাংশ যেসব অপরাধে দণ্ডপ্রাপ্ত, তার থেকে বহুগুণ বেশী, দোষে কারারুদ্ধ হয়েছিলেন।" মুক্তির ব্যাপারে আবেদন-নিবেদনের পন্থা কেন নিয়েছেন সে বিষয়ে সুভাষচন্দ্র বললেন—"কারণ এখন অবস্থার পরিবর্তন হয়েছে, নতুন শাসনতন্ত্র প্রবর্তিত হয়েছে, নচেৎ আমি ধরেই নিতাম, সরকার মন্দতম ব্যবহারই করে যাবে।" আমলাতন্ত্রের যুক্তি ও উক্তির নিষ্ঠুরতায় সুভাষচন্দ্র বেদনাবোধ করেছিলেন। সরকারের প্রধান বলেছিলেন, অপর বন্দীদের তুলনায় আন্দামান বন্দীদের মৃত্যুহার কম। মর্মবিদ্ধকণ্ঠে সুভাষচন্দ্র বললেন—তাজা সব তরুণদের ধরে নিয়ে আন্দামানে রেখে দেওয়া হয়েছে, সুগঠিত তাদের স্বাস্থ্য ছিল; তাই তারা মার খেয়েও টিকে আছে; আর অন্যত্র বন্দীরা বয়স্ক, অধিকাংশই জঘন্য অপরাধী, কোকেনখোর, মদ্যপ, অসুস্থ। সরকার বলেছিল আন্দামানে বন্দীদের জন্য খেলাধুলোর পরিপাটি ব্যবস্থা হয়েছে। সুভাষচন্দ্র বললেন, ঘটেই তো! অবশ্যই সেখানে একটি ফুটবল মাঠ আছে, টেনিস কোর্টের আকারে; এবং সরকারের নিনাদিত প্রচারযন্ত্রের কল্যাণে সারা পৃথিবী জেনেছে, চমৎকার সুইমিং পুলে বন্দীরা সন্তরণাদি করে; সেটা আর কিছু নয়, জেলগুলিতে যে জলাধার থাকে, তারই কিছু বর্ধিত সংস্করণ।

সুভাষচন্দ্র আরও বহু যুক্তিতে সরকারপক্ষের অসার কথাগুলিকে খণ্ড খণ্ড করলেন। সব শেষে অতি ব্যাকুলতার সঙ্গে বললেন—"এই চরম সংকটের কালে প্রতি ঘণ্টা, না, প্রতিটি মিনিট পর্যন্ত বিপজ্জনক—অবিলম্বে সরকার সক্রিয় হোন।"

[ক্রমশঃ]

*অমৃতবাজার পত্রিকা, ৭ অগস্ট, ১৯৩৭।

চাঁদ সদাগর

অতীন কুমার দলুই

টিফিনের ঘণ্টা শেষ হলো। ছেলেরা যে যার ক্লাশে ফিরে গেছে। একটু আগে তাদের প্রচণ্ড কলরব সারা বাড়িতে প্রতিধ্বনি তুলে ফিরছিল। এখনো তার রেশ একেবারে মিলিয়ে যায় নি। চাপা গুঞ্জন এখনো চলেছে ঘরে ঘরে—যেন লক্ষ লক্ষ মৌমাছি তাদের চাকে ফিরে এসেছে দিনান্তে।

টিচার্স রুমে চলেছে রাজনীতির তুমুল তর্ক। টিফিনের সময় সকলে একসঙ্গে মেলবার সুযোগ পায়। মোহিতবাবু কংগ্রেসের গোঁড়া সমর্থক এবং বারীনবাবু কম্যুনিস্ট পার্টির। এই দুজন এক সঙ্গে মিললে উচ্চগ্রামে তর্কের জোয়ার বয়ে চলে। অন্যান্য টিচাররাও দু'দলে বিভক্ত হয়ে গিয়ে দুজনকে সমর্থন জানায়। মাঝে মাঝে তর্ক এতো জোরালো হয়ে পড়ে, ছেলেদের মিলিতকণ্ঠের চিৎকারও তার তলায় চাপা পড়ে যায়। ঘরের উত্তেজনাপূর্ণ আলোচনা ও বাইরের ছেলেদের অবাধ কণ্ঠের চিৎকারকে আমলে না এনে আধ ঘণ্টার দিবানিদ্রাটুকু উপভোগ করেন হেড পণ্ডিত রামকমলবাবু। তাঁর স্থির দেহ ও মুদ্রিত নেত্র দেখে মনে হয় তিনি বাস্তব জগতের অনেক ঊর্ধ্বে বাস করেন—যেখানে সমস্ত কোলাহল শান্ততার মাঝে বিশ্রাম লাভ করছে। কিন্তু ঐ আধ ঘণ্টা। টিফিনের শেষ ঘণ্টা পড়ায় সঙ্গে সঙ্গে তাঁর শরীরে চঞ্চলতা জাগে। পকেট থেকে নস্যির কৌটো বার করে এক টিপ নস্যি নেন। তারপর ভারী গলায় একবার বলে ওঠেন : মাধব, পার করো।

পার করো। তাঁর এই পার করবার আকুল আর্তি অন্যান্য টিচারদের সব আলোচনাকে স্তব্ধ করে দেয়।

কিন্তু আজকের আলোচনা থামে না। বারীনবাবু ও তাঁর সমর্থকরা "ভারতরক্ষা আইনের" অসারতা প্রমাণ করবার চেষ্টা করেন। রামকমলবাবু বলেন : ভায়ারা, ঘণ্টা পড়ে গেছে, এখুনি ধুর্জটি এসে পড়বে।

মুহূর্তে সকলে চুপ করে যায়। ঘরটাকে অত্যন্ত নিশ্চুপ মনে হয়। সকলে ক্লাশে যাবার জন্যে তৈরি হয়। ঠিক এই সময়ে হেডমাস্টার ধুর্জটিবাবু ঘরে ঢোকেন। বলেন : ছেলেরা ক্লাশে চলে গেছে, আর আপনারা এখনো বসে আছেন?

কারো মুখে কোনো কথা নেই। সকলে একে একে ধুর্জটিবাবুকে পাশ কাটিয়ে চলে যায়। দোতলার সিঁড়িতে উঠতে উঠতে কমলবাবু পার্শ্ববর্তী নবেন্দুবাবুকে বলেন : না, যুধিষ্ঠিরের জন্যে আর পারা যায় না।

ধুর্জটিবাবুকে আড়ালে আবডালে অন্যান্য টিচাররা যুধিষ্ঠির বলে থাকেন। ধুর্জটিবাবু ইস্কুলে আসার পর সকলের মনে মনে একটা চাপা অসন্তোষ আছে। কারণ তাঁর সততা, নিয়মানুবর্তিতা ইত্যাদি অনেকের পছন্দ নয়। এ যুগে এমন একটা লোক থাকতে পারে, অনেকের ধারণার অতীত। অনেক ব্যাপারে অনেকের আর্থিক ক্ষতি পর্যন্ত হয়ে গেছে। সুতরাং এই রকম একটা ফক্কা

ধাতের লোক মাথার ওপর থাকার জন্যে অর্থের টিটারই তাঁর ওপর হাড়ে-হাড়ে চটা। তাই মনের চাপা ক্রোধ প্রকাশ পেতো উক্তির মাধ্যমে।

রামকমলবাবুর ছাত্র ছিলেন ধূর্জটিবাবু। তিনি রামকমলবাবুকে শ্রদ্ধা করেন। তারই সুযোগ নিয়ে তিনি একবার ধূর্জটিবাবুকে বলেছিলেন ঃ শ্যামলকে তুমি সায়েন্স দিয়ে দাও।

ঃ কোন্ শ্যামল—আপনার নাতি?

ঃ হ্যাঁ।

ঃ কিন্তু ও তো অঙ্কে ফেল করেছে।

ঃ ওকে একটা চান্স দাও।

ধূর্জটিবাবু ক্ষণকাল চুপ করে-ছিলেন। হাতের পেন্সিলটা ধীরে ধীরে টেবিলের ওপর ঠুকতে ঠুকতে বলে-ছিলেন ঃ পণ্ডিতমশাই আপনি প্রবীণ লোক। তা ছাড়া আপনার কাছে যে আদর্শ একদিন পেয়েছি তা আজ লঙ্ঘন করি কি করে? শ্যামলকে দিতে হলে আরো অনেককে দিতে হয়।

ঃ আজকাল তো অনেকে...

তাঁকে শেষ না করতে দিয়েই ধূর্জটিবাবু বলেছিলেন ঃ ও কথা আমাকে বলবেন না। ওরকম কোন অন্যায় কাজ আমার পক্ষে করা সম্ভব নয়।

একথা শিক্ষকমহলে ডালপালা মেলে ছড়িয়ে পড়তে দেরি হয় নি। সকলেই এক-বাক্যে রামকমলবাবুর পক্ষ নিয়েছিলেন এবং একথা সকলে স্বীকার করেছিলেন, রাম-কমলবাবুর নাতিকে সায়েন্স গ্রুপে নেওয়া উচিত ছিলো ধূর্জটিবাবুর। তাদের মধ্যে যতই বিরূপতা থাকুক না কেন, তা মুখে প্রকাশ করবার শক্তি কারো নেই। তারা নিরুপায়, তাই তারা সকলেই বিষের জ্বালায় ছটফট করে।

সন্ধ্যের সময় ধূর্জটি বাড়ি ফেরেন। সারা রাস্তা তিনি চিন্তা করতে করতে আসেন—স্বাধীনতা পাবার পর সত্যি কি দেশটা বদলে গেছে? দেশের রন্ধ্রে রন্ধ্রে এসেছে দুর্নীতি। কিন্তু কেন এ অবস্থা হলো? কোথা এর উৎস?

তাঁর মনে পড়ে, একদিন দেশের সেবার জন্যে সব কিছুকে পরিত্যাগ করেছেন। সেদিনের একমাত্র সোনার স্বপ্ন ছিল দেশের স্বাধীনতা। স্বাধীন দেশের কথা বইয়ে পড়তেন আর ভাবতেন, ভারত একদিন স্বাধীন হবে। দেশের লোক কলুষমুক্ত হবে, স্বাধীন দেশের আকাশের নিচে লোক মাথা উঁচু করে চলবে। প্রতি মুহূর্তে পরাধীনতার গ্লানি তাদের পীড়া দেবে না। অহরহ পায়ে বাজবে না পরাধীনতার লৌহ-নূপুর।

সরকারী চাকরি উপেক্ষা করে শিক্ষকতা বৃত্তি গ্রহণ করেছিলেন। ইংরেজের অফিসে সুখে কলম পেশা অপেক্ষা গরীব শিক্ষক হওয়া শ্রেয়। এখানে প্রতি পদে পদে দাসত্বের লাঞ্ছনা নেই, নেই গোলামীর কলঙ্কময় জীবনের গ্লানি; এখানে আছে মানুষ গড়ার পবিত্র কর্তব্য, দেশসেবার মহান আদর্শ।

বাপ-মায়ের স্নেহ হারিয়েছেন। রিটায়ার্ড সরকারী অফিসরের ছেলে শিক্ষকতা করবে, এ তাঁরা স্বপ্নে কল্পনা করতে পারেন নি। তাঁদের অনেক আশাকে সেদিন ধূর্জটি ব্যর্থ করে দিয়ে-ছেন। একমাত্র ছেলে ধূর্জটি; তাঁর এই পরিণামে তাঁরা ভেঙে পড়েছিলেন ব্যর্থ-তার বেদনায়, হতাশার হতাশ্বাসে।

কিন্তু সেদিন একজন তাঁকে, তাঁর আদর্শকে অভিনন্দন জানিয়েছেন—তিনি কল্যাণী। না, তখনো তাঁর স্ত্রী হন নি। তখনকার দিনের কলেজে-পড়া মেয়ে। রীতিমত প্রগতিশীল। ধূর্জটি যেদিন তাঁর দাবি নিয়ে হাজির হয়েছেন কল্যাণীর কাছে, তাঁকে শূন্য হাতে ফিরে আসতে হয় নি। সমাজসংস্কার সব কিছুকে পেছনে ফেলে রেখে কল্যাণী এসে দাঁড়িয়েছেন ধূর্জটির পাশে। সেদিন একটি কোমল হাতের স্পর্শ তাঁর মনে সঞ্চারিত করত অসীম শক্তি, অমেয় প্রেরণা।

কারাগারের অন্ধ কক্ষে বসে মাঝে মাঝে একটি মুখের ছবি তাঁর চোখের সামনে প্রতিভাত হত। সে দুটি চোখে ছিল অগ্নির প্রতিভাস। যৌবনের বিরহ বেদনা তাঁকে স্পর্শ করত না। একটা অসীম তৃপ্তি ছিল মনে, প্রাণে ছিল অদম্য উৎসাহের অফুরান জোয়ারের কলতান।

তারপর একদিন এলো পরম ঈপ্সিত লগ্ন। দেশ স্বাধীন হলো। দেশের চেহারা পরিবর্তন হলো। কিন্তু সে রূপান্তর দেখে চমকে উঠলেন ধূর্জটি। এ কি দেখছেন তিনি? এ তো তিনি চান নি। সুস্থ ভারত কোথা? চারিদিকে নীতিহীনতা। যে সমস্ত সহকর্মী একদিন কঠিন সংকল্প নিয়ে এগিয়ে এসেছিলেন, তাঁরা রাতারাতি রূপ বদলে ফেললেন। বঙ্কিমের সন্তানদের অকাল-মৃত্যু দেখে নিদারুণ ব্যথিত হলেন তিনি। সারা ভারতবর্ষ ঘোর অন্ধকারে ঢাকা পড়ল। সেই নিশ্ছিদ্র অন্ধকারের মাঝে শ্মশান-শিবাদের অবিরাম চিৎকারে কম্পিত হলো চারিদিক। ধূর্জটির একটি দৃশ্য মনে পড়ল ঃ একদিন তিনি গো-ভাগাড়ের পাশ দিয়ে যেতে যেতে দেখলেন, একটা মরা গোরুর ওপর অসংখ্য শকুনি বসেছে; লাল চোখে তাদের মাংসের মাদকতা; তীক্ষ্ণ ঠোঁটে জিঘাংসার বিভীষিকা; গোরুটার পচা মাংস খুবলে খুবলে খায় তারা; দারুণ ক্রোধে পাখসাট মারে অপরকে।

কল্যাণীর মনের দিক পরিবর্তন হয়েছে। যৌবনের কঠিন শপথ শিথিল হয়ে গেছে দারিদ্র্যের নিষ্ঠুর পেষণে। সংসারের বিরাট চাহিদা মেটে না ধূর্জটির উপার্জনে। প্রতি পদক্ষেপে অনুভব করেন দারিদ্র্যের জ্বালা; প্রতি মুহূর্তে ত্রুটি চোখে পড়ে ধূর্জটির আদর্শবাদের। এবং মাঝে মাঝে—হ্যাঁ, ধূর্জটির বাস্তব-বোধের ঔদাসীন্যে—কল্যাণীর মনে হয়, যৌবনের নীল স্বপ্নের মাঝে ধূর্জটিকে চিনতে তাঁর ভুল হয়েছিল। সেদিন ধারণা হয়েছিল, ধূর্জটি বিরাট, অপার তাঁর শক্তি, অসীম তাঁর জীবনবোধ। কিন্তু আজ? নিজের প্রশ্নের সামনে নিজে থমকে থামেন কল্যাণী। ধূর্জটি আজ তাঁর কাছে একটা শূন্যগর্ভ নিঃশেষিত হাউই। ঊর্ধ্ব-মুখে অগ্নি-বিকিরিত হাউইকে তাঁর মনে হয়েছিল, অনন্ত দীপ্তিসম্পন্ন জ্যোতিষ্ক।

কল্যাণী মাঝে মাঝে ধূর্জটির কাছে দরবার করেছেন ঃ তোমার বন্ধুবান্ধবরা অনেকে বড় বড় কাজ বাগিয়ে নিচ্ছে আর তুমি চুপ করে বসে আছ?

নিস্পৃহ কণ্ঠের পাল্টা প্রশ্ন এসেছে ধূর্জটির কাছ থেকে ঃ কি করব?

মাস্টারী করে ক' পয়সা ঘরে আনছ? ছেলেমেয়েদের ভালো খেতে দিতে পারি না, ভালো পরতে দিতে পারি না—এ কি দুচোখে দেখতে পাও না?

ঃ সব পাই কিন্তু কি করব? তুমি জান, আমি গরীব।

ঃ এ গরীবানা তোমার বিলাস!

ঃ না কল্যাণী এ আমার আদর্শ।

জ্বলে উঠেছেন কল্যাণী ঃ কিসের তোমার আদর্শ? ছেলেমেয়েদের যদি প্রতিপালন না করতে পারো তবে বিয়ে করেছিলে কেন?

ঃ কল্যাণী, এ রকম প্রশ্ন তোমার কাছ থেকে আশা করি নি। সে দিনের কথা এর মধ্যে ভুলে গেলে? যেদিন আমার হাত ধরে সংসারে তুমি পা দিয়েছিলে। বিলাস-বিভব তো তুমি চাও নি।

ঃ সেদিন আজ আর নেই, দিন পাল্টে গেছে।

ধূর্জটি থেমে পড়েন, কল্যাণীর কথাটা তাঁর মনে পড়ে—সত্যি কি দিন পাল্টে গেছে? ভারতের রূপান্তর ঘটেছে? বিশ্বাস করতে মন চায় না। এতদিনের বিশ্বাসের সৌধ কি এবার ধসে পড়বে? এ তিনি ভাবতে পারেন না।

রাস্তায় চলমান মানুষের স্রোত, ঘরে ঘরে আলোর বন্যা; ক্ষণে ক্ষণে উচ্চ হাসির উচ্ছল রব; সংগীতের সুরেলা রেশ; দূরে আকাশে নিওনের হাতছানি।

এতো আলো, এতো হাসি, এতো গান—সবই বাহারূপে?

ভাবেন ধূর্জটিমা। ভাবেন আর পথ চলেন। সকলেই লক্ষ্যের কেন্দ্রে ছুটে চলেছে—তিনিমাত্র শুধু কক্ষচ্যুত তারার মত শূন্যমার্গে ভেসে চলেছেন।

বিশ্বাস করতে তাঁর মন চায় না।

এই ঘর। চার দেওয়ালের মধ্যে আবদ্ধ ধূর্জটি। ঘরে আলো জ্বালা নেই। অন্ধকার ঘরের মধ্যেই তিনি বসে থাকেন। বাড়ির চারদিকে আলোর রোশনাই। শুধু তাঁর ঘরে আছে অন্ধকারের বিস্তার। অথচ এ রকম হওয়া উচিত ছিল না। হিসেব অনুযায়ী আজ রকম হওয়া উচিত ছিল। সব এলোমেলো হয়ে গেছে। হিসেবের কাঁধা পথটা হঠাৎ বেঁকে গেছে। কেন এমন হলো তিনি ভেবে পান না।

সকলের গলার স্বর তিনি শুনতে পান। কিন্তু কথার ইঙ্গিতগুলোকে ঠিক ধরতে পারেন না। সবই যেন কেমন অস্পষ্ট। মাঝে মাঝে ওদের কণ্ঠস্বর ক্ষীণ হয়ে আসে। আবার স্তিমিত হয়ে পড়ে ওরা, ওই ইন্দ্রাণী, অমলেশ, বিদিশা, কমলেশ, তাঁর আত্মজ। অথচ ওরা কতো দূরের। ওদের কথা শোনা যায়, ওদের চোখে দেখা যায়, কিন্তু ওদের স্পর্শ করা যায় না। একটা দুরতিক্রমণীয় বাধা এসে সামনে দাঁড়ায়। তিনি ভাবেন, নিঃসীম শূন্য আকাশের মাঝে তিনি যেন একেবারে একা। একা তিনি তাঁর কক্ষপথে ছুটে চলেছেন।

ঘরের আলো জ্বলে ওঠে। ধূর্জটিকে দেখে ইন্দ্রাণী বিস্মিত হয়। বলে : বাবা, কখন তুমি এলে?

ধূর্জটি বলেন : এই কিছুক্ষণ আগে।

: ডাকো নি কেন?

: এমনি।

: তোমার শরীর ভালো আছে?

: হ্যাঁ।

: চা দেবো?

: দে।

ইন্দ্রাণী চলে যায়। বড়ো মেয়ে ভালো। রেখাবহুল। এবারে বি. এ. দেবে। ঐ তাঁর একটু অম্বর-অন্তরক করে। বড়ো ছেলে অমলেশ; বিলিতি ফার্মে কাজ করে; ভালো মাইনে। সে ধূর্জটিকে গ্রাহ্যের মধ্যে আনে না; আজকাল আর বাবা বলে না, বলে 'ওল্ড ফসিল'।

বিদিশা আর কমলেশ তাঁর ঘরে কাছে আসে না।

ইন্দ্রাণী চা নিয়ে আসে। বলে : বাবা, তোমার শরীরটা বারাপ হয়ে যাচ্ছে।

ধূর্জটি মেয়ের মুখের দিকে তাকান। তাঁর মনে অভিমান হঠাৎ প্রবল হয়ে ওঠে। কেউ যে তাঁর শরীরের খবর নিতে আসে, এ তাঁর ধারণার বাইরে। সত্যি, এ সংসারে তিনি 'ওল্ড ফসিল'। অনেকদিন আগে তিনি যে বেঁচে ছিলেন, আজ কোথাও তাঁর অস্তিত্ব নেই। তিনি মৃতের সামিল।

ইন্দ্রাণী মুখের দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে তাঁর আর একজনের কথা মনে পড়ে। এক বিস্মৃত কালে, আরো একটি মেয়ে এমনি করে তাঁর কাছে এসে দাঁড়াত। উচ্চ গ্রীবায় থাকত কঠিন শপথের ইস্পাত।

মোহিনী রূপপ্রকাশের

সহায়ক ওটিন ম্যাজিক ব্লেণ্ড ক্রীম

আপনি ওটিন ম্যাজিক ব্লেণ্ড ক্রীম দিয়ে দিনে-রাতে আপনার ত্বকের সুপরিচর্য্যা করুন। ওটিন ম্যাজিক ব্লেণ্ড ভ্যানিশিং ক্রীম সকালে ব্যবহার করলে রৌদ্র, বাতাসের হাত হ'তে আপনার কোমল ত্বক রক্ষা পাবে। পাউডার প্রলেপনের সুদৃঢ় ভিত্তি গড়ে তোলার এক আশ্চর্য্য ক্ষমতা এর আছে। রাত্রে শোবার আগে ত্বকের উপর ওটিন ম্যাজিক ব্লেণ্ড কোল্ড ক্রীমের রমনীয় প্রলেপ দিন। ইহা আপনার ত্বকের পুষ্টিসাধন করে উহাকে কোমল মসৃণ ও লাবণ্যময় করে তুলে।

ওটিন ম্যাজিক ব্লেণ্ড ক্রীম দিনরাত্রি আপনার ত্বককে রক্ষা করে।

ওটিনও ফ্যাক্টরিজ অভিনব উপহার

দ্যোতনা। চোখে থাকত দুর্বার যৌবনের অগ্নিস্ফুলিঙ্গ। বুকে ছিল অসীম প্রেমের অফুরান স্রোতোধারা।

ঃ বাবা, তোমার চা ঠাণ্ডা হয়ে যাচ্ছে।

ধূর্জটি চায়ে চুমুক দেন। ইন্দ্রাণীকে বলেন ঃ তোর পড়াশোনা কেমন হচ্ছে?

ঃ ভালো।

ঃ ইংরিজি কেমন হলো?

ঃ ইয়ারো কবিতা দুটো বুঝিয়ে দেবে?

ঃ দোব। হ্যাঁরে, কমল পড়াশোনা করে? ওকে তো ইস্কুলে দেখতে পাই না। ও কি রোজ ইস্কুলে যায় না?

ইন্দ্রাণী একটু চুপ করে থাকে। কমলেশের কথা বাবাকে বলতে তার কষ্ট হয়। কমলেশ মা-র প্রশ্রয় পেয়ে ইস্কুল তো ছেড়েই দিয়েছে, উপরন্তু সে দিনরাত হৈ হৈ করে ঘুরে বেড়ায়। কারো কথা শোনে না। এমন কি প্রকাশ্য রাস্তায় তাকে সিগারেট খেতে দেখেছে ইন্দ্রাণী। এ সব কথা বাবাকে বললে, তিনি ভীষণ আঘাত পাবেন, সে জানে। এ বাড়িতে বাবা কারো প্রিয় নয়, ইন্দ্রাণীর অজানা নয়। তাই সে চুপ করে থাকে। ইন্দ্রাণীর নীরবতার অর্থ ধূর্জটির বুঝতে দেরি হয় না। কমলেশের সম্বন্ধে কিছু কিছু কথা তাঁর কানেও এসেছে। পরীক্ষার হলে কমলেশ অসৎ আচরণ করে। এমন কি তার নকল করার কথাও শিক্ষকমহলে সুবিদিত। কিন্তু কোনদিন সে হাতে-নাতে ধরা পড়ে না।

কল্যাণীকে তিনি দু-একবার কমলেশের বিরুদ্ধে অভিযোগ করেছেন। কল্যাণী বলেছেন ঃ কোন প্রমাণ পেয়েছ?

ঃ না।

ঃ তবে?

ঃ ও পড়াশোনা করে না, ইস্কুলে যায় না, ক্লাশ প্রমোশন পায় কি করে?

ঃ সে কথা তুমি ভালো জান।

ঃ তাই তো বলছি, ও বোধহয় টোকাটুকি করে।

ঃ এটা তোমার অনুমান?

ঃ হ্যাঁ।

ঃ ধরা পড়েছে কোনদিন?

ঃ ধরা পড়লে ইস্কুল ছাড়তে হবে।

ঃ দ্যাখো, তোমার আদর্শবাদের কথা শুনতে শুনতে আমার কান ঝালাপালা হয়ে গেল। তোমার আদর্শবাদের কি মূল্য? কে এর কানাকড়ি দাম দেয়? তুমি একবার চোখ খুলে দ্যাখ কে চুরি করছে না। সত্যমেব জয়তের দেশে মিথ্যাচার না করে কে বাঁচতে পারে?

ঃ কল্যাণী, তা হলে কি সত্যের কোন মূল্য নেই?

ঃ আছে, যারা ফুলস প্যারাডাইসে বাস করে তাদের কাছে।

কল্যাণী হয়ত ঠিক কথা বলেছেন, তিনি নির্বোধের স্বর্গে বাস করেন। তাঁর শিক্ষা ব্যর্থ, ব্যর্থ তাঁর নীতি। এ যুগে কেউ সৎ থাকতে পারে না। চারিদিকে মিথ্যাচার, প্রলোভনের দীর্ঘ প্রসারিত হাত। কালো হাতের ক্লেদাক্ত স্পর্শ থেকে কারো নিস্তার নেই।

একদিনের কথা তাঁর মনে পড়ে। সকালবেলা একটা লোক তাঁর সঙ্গে দেখা করতে এলেন। পরিচয় দিলেন শিক্ষক বলে।

ধূর্জটি বলেন ঃ কি করতে পারি আপনার জন্যে?

ঃ আমার একটা ইংরিজি গ্রামার আপনার ইস্কুলে ধরাতে হবে।

ঃ বেশ, স্পেশিমেন কপি পাঠিয়ে দেবেন।

ঃ এই নিন।

বইটা এগিয়ে দেন ভদ্রলোক। ধূর্জটি বইয়ের পাতা উল্টে যান। পাঁচটি দশ টাকার নোট মেঝেতে পড়ে যায়। ধূর্জটি নোট কটি কুড়িয়ে নিয়ে বলেন ঃ এরকম অসাবধান করে টাকা রাখেন কেন?

ভদ্রলোক একটু হেসে বলেন ঃ ও টাকা আপনার।

বিস্মিত ধূর্জটি বলেন ঃ আমার কি রকম!

ঃ আপনার প্রাপ্য।

ধূর্জটি ইঙ্গিত বুঝতে পেরে ক্রুদ্ধ হয়ে ওঠেন। জলদগম্ভীর স্বরে বলেন ঃ ঘুষ দিতে এসেছেন! বেরিয়ে যান বলছি।

ভদ্রলোক হতভম্ব। কি বলবার চেষ্টা করেন কিন্তু ধূর্জটি গর্জন করে ওঠেন ঃ কোন কথা নয়, আগে বেরিয়ে যান।

ভদ্রলোক চলে যান। কল্যাণী আসেন। প্রশ্ন করেন ঃ কি হলো?

ধূর্জটি আনুপূর্বিক ঘটনা বলেন। কল্যাণী সব শুনে বলেন ঃ এতে ক্ষতি কি হচ্ছিল?

ঃ তুমি বলতে চাও, আমি ঘুষ নোব?

ঃ মাসের শেষে পঞ্চাশ টাকার মূল্য কিন্তু কম নয়। যারা সংসার করে তাদের কাছে টাকার দাম আছে।

ঃ অঃ।

চুপ মেরে গেছলেন ধূর্জটি।

চিন্তার জগৎ থেকে ফিরে এসে ধূর্জটি দেখেন, ইন্দ্রাণী চলে গেছে। কাপের চা ঠাণ্ডা হয়ে গেছে। আজকের পৃথিবীর রূপান্তর ঘটেছে। কল্যাণী হয়তো ঠিক কথা বলেছিলেন, ধূর্জটি নির্বোধের স্বর্গে বাস করছেন। কিন্তু সত্যি কি তাই?

এ প্রশ্নের জবাব তিনি কোথায় পাবেন?

ধূর্জটি শুয়ে পড়েন। আজকাল তাঁর ঘুম আসতে চায় না। শুয়ে শুয়ে কত কি চিন্তা করেন। মাথামুণ্ডু কিছু নেই। ফাঁকা মাথাটা সব সময় একটানা চিন্তার জাল বুনে যায়। শুধু চিন্তা, কেবল চিন্তা। চিন্তার একটানা মিছিল।

কল্যাণী ঘরে আসেন। মশারির মধ্যে এসে বসেন। বলেন ঃ আজ তুমি ইস্কুল থেকে ফিরে অন্ধকার ঘরে বসেছিলে কেন?

ধূর্জটি কল্যাণীর প্রৌঢ় মুখের দিকে চেয়ে কি যেন খুঁজে ফেরেন। অনেকদিন পরে এমন শান্ত সহজ সুরে কল্যাণী কথা কইছেন। এমন ঘনিষ্ঠ নৈকট্য ইদানীং কালে মনে পড়ে না।

বলেন ঃ এমনি।

কল্যাণী ধূর্জটির গায়ে হাত বুলিয়ে দিয়ে বলেন ঃ তোমার শরীরটা খারাপ হয়ে যাচ্ছে একবার চেঞ্জে যাও না।

ঃ চেঞ্জে যাবার মত অবস্থা আমার নয়। যা মাইনে পাই সব তোমার হাতে তুলে দিই, তাতে তোমার সংসার চলে না, চেঞ্জে যাব কি করে?

ঃ তা বলে শরীর খারাপ হলে মানুষ চেঞ্জে যাবে না? না তোমার কোন কথা শুনছি না, এ্যানুয়াল পরীক্ষার পর একবার ঘুরে এসো।

এ কি অনুরোধ, মিনতি না আদেশ? এই রাত গভীরে, নিদালী নিশীথে, স্তব্ধ ঘরে ধূর্জটির কেমন যেন অবাক লাগে। কালের চাকা কি উল্টো দিকে ঘুরতে শুরু করেছে? না কি পুরনো একটা রাত অতীতের যবনিকা সরিয়ে, অঙ্গে অঙ্গে স্বপ্নের রেণু মেখে বেরিয়ে এসেছে?

ঃ কি চুপ করে আছ যে?

ঃ ভাবছি।

ঃ কি এতো ভাবো?

ঃ কল্যাণী, ভাবনার কি শেষ আছে? যতক্ষণ বেঁচে আছি ততক্ষণ চিন্তা করতেই হবে।

ঃ ছেলে বড়ো হয়েছে, উপায় করছে, এবার তুমি ছুটি নাও।

ঃ বলছ যখন তাই হবে।

কল্যাণী চুপ করে যান। তাঁর কথার পরিধির শেষ প্রান্তে পৌঁছে গেছেন তিনি। এবার নীরবতা। কল্যাণীর ডান হাত ধূর্জটির বুকের ওপর চলাফেরা করে। ধূর্জটি মশারির বাইরে তাকিয়ে থাকেন। দেয়ালের গায়ে একটা টিকটিকি চুপ করে বসে থাকে। চোখে তার আলো পড়ে চক চক করে। বাতাস আসে মশারি কাঁপিয়ে।

একটু পরে কল্যাণী বলেন ঃ সুকোমল মিত্র নামে তোমার কোন ছাত্র ছিল?

ধূর্জটি একটু চিন্তা করেন। কতো নাম, কতো মুখের মিছিল চোখের সামনে দিয়ে পার হয়ে যায়। সব নাম মনে থাকে না, সব মুখ চেনা যায় না। বলেন ঃ হতে পারে। তাকে কিসের দরকার?

ঃ ঐ সুকোমল এখন সিমেন্টের ইন্সপেক্টর হয়েছে।

ঃ হতে পারে।
ঃ ওকে ধরে একটা সিমেন্টের পারমিট যার করে দিতে পার?
ঃ কার পারমিট?
ঃ অমলের অফিসের বড়বাবুর।
ঃ তিনি নিজেই তো করতে পারেন।
ঃ করতে পারলে তোমাকে বলবো কেন? একে ঘুষ দিতে হবে, তার ওপর ধরা-করা ঘোরাঘুরি করতে হবে।
ঃ কল্যাণী এ অন্যায় কাজ আমার দ্বারা হবে না।
ঃ ছেলেটার কাজে উন্নতি হয়, এ তুমি চাও না?
ঃ চাই। সব বাপ-মা-ই চায় ছেলের উন্নতি হোক কিন্তু তা ফেযার মিনসের দ্বারা। ঘুষ দিয়ে উন্নতি হোক, এ আমি চাই না।

সহসা কল্যাণীর মুখের পেশীগুলো কঠিন হয়ে ওঠে। চোখে জ্বালা ধরে ক্রোধে। বলেন ঃ কবে তোমার জ্ঞান হবে? যে পুজোর যে মন্তোর।

ছোটবেলা থেকে সাধনা দশন ব্যবহার করলে

সাধনা ঔষধালয়-ঢাকা
কলিকাতা-৪৮
অধ্যক্ষ ডাঃ যোগেশ চন্দ্র ঘোষ, এম এ,
আয়ুর্বেদ-শাস্ত্রী, এফ.সি এস (লণ্ডন)
এফ.সি.এস. (আমেরিকা) ভাগলপুর কলেজের রসায়ন শাস্ত্রের ভূতপূর্ব অধ্যাপক।

শৈশব বয়স পর্যন্ত দাঁত সুস্থ, সবল, সুন্দর ও মাড়ি সুদৃঢ় থাকে। মুখ স্বচ্ছ ও দুর্গন্ধমুক্ত হয়।

সাধনা দশন

একটি আদর্শ দাঁতের মাজন

কলিকাতা কেন্দ্র ঃ
ডাঃ নরেশ চন্দ্র ঘোষ, এম.বি.বি.এস. ক্যেমিক্যাল আয়ুর্বেদাচার্য

৩০-২/৫৪

ঃ কেউ কেউ অজ্ঞান থেকে যার সারা জীবন, আমি তাদের একজন। তোমাদের পুজোর মন্ত্র আমার আর এ জন্মে শেখা হোল না।

ঃ এই করে নিজের সারা জীবন বরবাদ করলে, জানো না?

ঃ জীবন বরবাদ হয়েছে কি-না জানি না, তবে এটুকু জানি, কোন অন্যায় কাজ কোনদিন করি নি। সারা জীবন সৎ থাকবার চেষ্টা করেছি। প্রলোভনের কাছে মাথা নোয়াই নি। মাথা উঁচু করে এতকাল চলেছি, বাকি জীবনটাও চলব।

ঃ চুপ করো। তোমার গসপেল তুলে রাখ তোমার ছাত্রদের জন্যে।

কল্যাণী পাশ ফিরে শুয়ে পড়েন। আর ধূর্জটি শূন্যদৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকেন। ঘরের আলো জ্বলে। বাইরে মশার অবিরাম গুঞ্জন। কল্যাণীর দ্রুত নিশ্বাস শুনতে পান। মৃত আগ্নেয়গিরির মধ্যে হঠাৎ প্রাণ সঞ্চার হয়েছে। এবার বিস্ফোরণের পালা।

ধূর্জটি আলোটা নিভিয়ে দেন। জানলার ধারে এসে দাঁড়ান। আকাশে তারার দীপান্বিতা, সারা শহর অন্ধকারে ঢাকা। কোথাও কোন আলোর নিশানা নেই। আকাশের আলো পৃথিবীর বুকে এসে পৌঁছয় না।

টিচার্স রুমে আনন্দের জোয়ার। সকলের মনের আশা এতদিন পরে পূর্ণ হতে চলেছে। ধূর্জটির ছেলে কমলেশ এবার টেস্টে ধরা পড়েছে বামালসুদ্ধ। ছেলেটা বেশ চালিয়ে যাচ্ছিল, কিন্তু শেষ দিনে রামকমলবাবুর শ্যেন দৃষ্টিকে ফাঁকি দিতে পারে নি। সেদিন তিনি যে আনন্দ পেয়েছিলেন তা জীবনে কোনদিন পান নি।

সব টিচারদের একটা-না-একটা ব্যথার স্থান আছে। ধূর্জটির আদর্শবাদ সকলকেই ছোবল মেরেছে। এতোদিন পরে সেই ছোবল তাঁর দিকে ফিরে দাঁড়িয়েছে।

কিস্তিতে ট্রানজিস্টার

মাসিক মাত্র ১০৲ টাকা কিস্তিতে ৩২০৲ টাকা মূল্যের বিশ্ব-বিখ্যাত ৩ ব্যান্ড অল ওয়ার্ল্ড পোর্টেবল "টেলিকুইন" ট্রানজিস্টার কিনুন।

নিম্ন ঠিকানায় আবেদন করুন ঃ—
ATLAS CO. (BC—22)
P.O. Box 1329, Delhi—6.

সকলের মনের জিঘাংসা আজ নগ্ন হয়ে প্রকাশ হয়ে পড়ে।

রামকমল বলেন ঃ এবার দেখা যাবে।

বারীন বলে ঃ ভগবানের মার দুনিয়ার বার। ওদিকে খবর এসেছে, গৃহযুদ্ধ শুরু হয়ে গেছে। দেখা যাক, কি হয়।

মোহিত বলে ঃ মা কালী, জোড়া পাঁঠা দোব, মুখ রেখো।

ওদিকে নিজের ঘরে বসে ধূর্জটি চিন্তা করেন। বাইরে ছেলের গোলমাল শোনা যায়। রেজাল্ট বার করতে হবে। এ কটা দিন তাঁর ওপর দিয়ে ঝড় বয়ে গেছে। কল্যাণী তাঁকে শাসিয়েছেন, আত্মঘাতী হবেন বলে।

কল্যাণীর যুক্তি ঃ কে না চুরি করে?

এ কথা ধূর্জটি মানতে পারেন না। চুরি না করলে এ দুনিয়ায় বাঁচা যায় না, এ কথা বিশ্বাস করতে তাঁর মন চায় না। তাঁর বিশ্বাসের ভিত্তিমূল ধীরে ধীরে আলগা হয়ে আসছে। সংসারে যাঁর হাত ধরে সব বাধাবিঘ্নকে অতিক্রম করে এসেছেন, সেই কল্যাণী তাঁর পরম বৈরী। হ্যাঁ, এ কথা স্বীকার করতে তাঁর দ্বিধা নেই। তাঁর ভালবাসার ওপর কল্যাণী অনেক অত্যাচার করেছেন এবং ধূর্জটি তা সব সহ্য করেছেন দিনের পর দিন। আর নয়। কল্যাণী যদি আত্মহত্যা করতে চান, করতে পারেন।

ধূর্জটি কলিং বেল টেপেন। বেয়ারা রামকিশান ঘরে ঢোকে। ধূর্জটি বলেন ঃ শ্যামবাবু.....

ক্লার্ক শ্যামবাবু আসেন। ধূর্জটি বলেন ঃ রেজাল্ট তৈরি হয়ে গেছে?

ঃ হ্যাঁ। কিন্তু কমলেশ.....

ঃ ও' সেন্ট আপ হবে না।

রেজাল্ট টাঙানো হয়। টিচার্স রুমে শোকের ছায়া নামে। কারো মুখে কোন কথা নেই। এবারেও ধূর্জটি জিতে গেলেন। এ তাদের কল্পনাতীত। এ পরাজয় তাদের সকলের। মোহিত বলে ঃ না ঠাকুর-দেবতাদেব ওপর আর বিশ্বাস করা যায় না।

ধূর্জটির মনে গভীর প্রশান্তি—কঠোর কর্তব্য সমাধা করতে পেরেছেন। এ কদিন তাঁর জীবনের অগ্নিপরীক্ষা গেছে। ইন্দ্রাণী ছাড়া সকলে তাঁর প্রতি বিমুখ। কল্যাণী কথা বন্ধ করেছেন। অমলেশ তাঁর ছায়া মাড়ানোকে পাপ মনে করে। বিদিশা ঘৃণায় নাক কুঁচকিয়েছে। আর কমলেশ নাকি তাঁকে মারধোর করবার পরিকল্পনা করেছে।

অনেকদিন পরে গঙ্গার তীরে এসে বসেন। ছোটবেলা থেকে ও-জায়গাটা তাঁর ভালো লাগে। বেশ নিরিবিলি। শহরের কোলাহল এখানে এসে পৌঁছয় না। সামনে গৈরিক চলমান জলধারা।

সন্ধ্যে হয়ে আসে। জেলেডিঙিতে আলো জ্বলে। এক চিলতে আলো পড়ে গঙ্গার জলে চিক-চিক করে। শীতের বাতাস শরীরে কাঁপন ধরিয়ে দেয়। ধূর্জটি উঠে পড়েন।

বাড়িতে ঢোকার মুখে ছোট একটা জনতা। ধূর্জটি চঞ্চল হয়ে পড়েন। ব্যাপার কি কেউ খুলে বলেন না। বাড়িতে ঢুকে দেখেন ডাক্তার এসেছে। তিনি জিজ্ঞেস করেন ঃ ব্যাপার কি ডাক্তার?

ঃ কল্যাণী দেবী আপিং খেয়েছেন। এ কেস অব সুইসাইড।

চমকে ওঠেন ধূর্জটি—সত্যি, কল্যাণী আত্মহত্যা করতে চায়? দ্রুত কল্যাণীর ঘরে ঢুকতে চান। অমলেশ বাধা দেয় ঃ আপনি যান। বেরিয়ে যান বাড়ি থেকে।

ধূর্জটি তার কথা বুঝতে পারে না। বলেন ঃ কি বলছ অমল?

গর্জে ওঠে অমলেশ ঃ হ্যাঁ, য়্যু অর দ্য মার্ডারার, আপনি মাকে খুন করেছেন।

ইন্দ্রাণী এগিয়ে আসে। বলে ঃ কি বলছ, দাদা?

ঃ তুই চুপ কর।

ঃ বাবা, তুমি এসো.....

ইন্দ্রাণী হাত ধরে ধূর্জটিকে কল্যাণীর বিছানার কাছে নিয়ে যায়। ধূর্জটি স্থাণুর মত বিছানায় বসে পড়েন। কল্যাণীর মুখের দিকে তাকান—বিষের ছায়া কল্যাণীর গৌর মুখে।

চোখ বোজা। ঠোঁট শুকনো। বিস্রস্ত চুলের রাশ।

ধূর্জটি ডাকেন ঃ কল্যাণী।

চোখ খোলেন কল্যাণী।

ঃ এ তুমি কি করলে?

কল্যাণী ধূর্জটির একটি হাত তুলে নেন নিজের হাতে। বলেন ঃ তুমি আমাকে বাঁচাও। ধূর্জটি স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকেন কল্যাণীর পাংশু মুখের দিকে। গভীর বেদনায় তাঁর মন ভরে যায় কান্নায় কান্নায়। দুই শিথিল বাহু দিয়ে জড়িয়ে ধরতে চান কল্যাণীকে। তাঁর একান্ত আপনজন—তাঁর জীবনের দীপশিখা।

একটি স্বর ডাকে ঃ রামকিশান!

রামকিশান বেরিয়ে আসে। চোখে তার বিস্ময় ঃ আপনি?

ঃ হ্যাঁ, অফিস ঘরটা খুলে দাও।

বোর্ডে একটা নাম ওঠে—কমলেশ চট্টোপাধ্যায় সেন্ট আপ।

একটা ছায়া বেরিয়ে আসে। বাইরে আঁধারের বন্যা। চলার পথের সব দীপ নিভে গেছে। কানের পাশ দিয়ে বাতাস বয়ে যায় জোরে। বিদ্যুতের অট্টহাসি ছড়িয়ে পড়ে নিঃসীম আকাশের নীরব আঙিনায়। দ্রুত পা চালায় ছায়া। আর এ আলোর রাজ্যে নয়, এবারে লুকিয়ে পড়তে হবে আঁধারে—কোন অন্ধ-বিবরে।

কিউবার আশে পাশে

সুরেশচন্দ্র সাহা

গল্পে গল্পে ডঃ গাঙ্গুলীর সঙ্গে কথা হচ্ছিল। ডঃ রমা গাঙ্গুলী কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের নামকরা ছাত্রী, মাইক্রো-বাইওলজির প্রচণ্ড পি-এইচ-ডি। বিশ্ব-স্বাস্থ্য-সংস্থার কর্মী হিসেবে আমেরিকায় এসে তিনি তখন ইউনিভার্সিটি টেকসাস মেডিকেল ব্র্যাঞ্চের গ্যালভেস্টনে গবেষণা করছিলেন।

গ্যালভেস্টনের অদূরে নাসার বৈজ্ঞানিক কারখানায় তৈরি মহাকাশযান কেপ কেনেডি থেকে উৎক্ষিপ্ত হয়ে হিউস্টন থেকে নিয়ন্ত্রিত হচ্ছে। কিন্তু হিউস্টনের গর্ব তার এস্ট্রোডম—বিশ্বের প্রথম শীতা-তপনিয়ন্ত্রিত স্টেডিয়াম। পৃথিবীর অষ্টমাশ্চর্যও বটে। তিরিশ মাইলের হিউস্টন, অথবা একুশ মাইলের নাসার বিস্ময় ডঃ গাঙ্গুলীর মনোযোগ যত আকৃষ্ট করেছে, সাতশ' মাইল দূর ক্যারি-বিয়ানের রাজনীতি তার কম নয়। সত্যি আজ ক্যারিবিয়ান সাগরের রাজনীতির রঙ্গমঞ্চ এরেবিয়ান নাইট্‌সের মতই রোমাঞ্চকর। আমার আসন্ন ক্যারিবিয়ান যাত্রার আগে তাঁর সঙ্গে সেই আলোচনাই হচ্ছিল।

গ্যালভেস্টন থেকে এগিয়ে চলেছিলাম জাহাজে। সামনে দেখা হল একটি যাত্রী-বাহী জাহাজের সঙ্গে। নাম তার ক্যাবো ইজাবা। ক্যারিবিয়ান থেকে আমেরিকার এই দিকটাতে ক্যাবো ইজারা ঘন ঘন পাড়ি জমায়। জাহাজীয় রীতিতে ইজারা আমাদের অভিবাদন জানাল লম্বা-মাত্রার বোঁ-বোঁ-করা বাঁশি তিনবার বাজিয়ে। তারপর মাস্তুলে উড়িয়ে দিল তিন অক্ষরজ্ঞাপক তিনটি নিশান—WAY, যার-অর্থ—তোমাদের যাত্রা শুভ হোক। ক্যারিবিয়ান দ্বীপগুলির বেশির ভাগ আবিষ্কার করেছিলেন ক্রিস্টোফার কল-ম্বাস। সেই দ্বীপাবলীমেখলা সাগরের দিকে এগিয়ে যেতে যেতে ক্যাবো ইজারার অর্থবহ অভিবাদন আমাদের ভাল লাগল, কিন্তু কোথায় আজ কলম্বাস, কোথায় দিগ্‌বিজয়ের দ্বীপে দ্বীপে তাঁর পদ-চিহ্নের ছাপ। আজ ক্যাস্ট্রো-মার্কা লাল জুজু ক্যারিবিয়ানের কূলে কূলে নীল জলের ধারে ধারে মাথা তুলে প্রতি মুহূর্তে বলছে—এই যে আমি এসেছি। আর তখন আমেরিকার ওয়াশিংটনে ভূমিকম্পন ঘটে যাচ্ছে।

গ্যালভেস্টনের বাইরে এসে পাইলট যেখানে আমাদের ছেড়ে দিয়ে গেলেন সেইখান থেকে দেখছিলাম বিলীয়মান কূলের কলঙ্করেখা। নীলে-সবুজে জলরাশি রূপালী আভায় দীপ্ত হয়ে কানায় কানায় ভরে আছে। এইখান থেকে মিসিসিপির মোহনা ২৮০ মাইল দূরে। সেই মিসিসিপি উজিয়ে দু'শ' মাইল গিয়ে একদিন যা খুঁজে বেড়িয়েছিলাম, আজ তারই যেন আভাস ছিল টেকসাসের দিগন্তরেখায়—নদী কিনারে পিয়া পুকারের মত একটি ব্যথার সুর।

বিয়াল্লিশ ঘণ্টার পর মেক্সিকো উপ-সাগরের শেষে ক্যারিবিয়ানের ছাই-ছাই রঙের জলে কম্পিত মেঘের ছায়া দেখে মনটা মোচড় দিয়ে উঠল। তবে যে শুনেছিলাম ক্যারিবিয়ানের জল নীল। এইখানে ডানদিকটাতে মেক্সিকোর ইউকাতান অন্তরীপটি এগিয়ে এসে স্তব্ধ হয়ে থেমে গেছে। কিউবার একটি ক্রমশ-সরু অগ্রভাগ বাঁদিকে ক্রমে এগিয়ে আসছিল; ইউকাতান তাকে এক ধমকে থামিয়ে দিয়েছে। এটি ক্যারিবিয়ান সাগরের পশ্চিমপ্রান্ত। হণ্ডুরাস ও গুয়াতেমালার উপকূল পশ্চিম ক্যারি-বিয়ানকে কিছুটা ঘিরে রেখেছে। ক্যারিবিয়ানের উত্তরে কিউবা, হাইতি, ডোমিনিকান রিপাবলিক, পোর্টোরিকো দ্বীপ। পূর্বে আটলান্টিকের সঙ্গে এর বিভেদ ঘটিয়ে ছড়িয়ে আছে ভারজিন আইল্যান্ডস্, গুয়েডেলপ, ডোমিনিকা, মার্তিনিক, সেন্ট লুসিয়া, গ্রেনেডিন্স ইত্যাদি দ্বীপগুলি। জ্যামিতিক রেখা টেনে সব কটিকে যোগ করলে মনে হয় যেন অল্প-গুণ-টানা একটি ধনুক। ক্যারিবিয়ানের দক্ষিণে দক্ষিণ আমেরিকার ভেনিজুয়েলা, কলাম্বিয়া এবং মধ্য আমে-রিকার পানামা, কস্টারিকা, নিকারগুয়ার সাগরসীমা। সুতরাং সব মিলিয়ে ক্যারিবিয়ানকে বলা হয় ল্যান্ড-লকড সি। আমাদের ছোটবেলাকার ভূগোলের ভাষায় হ্রদ অবশ্য আকারে আরও অনেক ছোট।

বিশ্ব রাজনীতিতে লালিমারেখা আজ যেন বিশেষ দুটি খাতে বয়ে চলেছে—ভিয়েতনামের জঙ্গলে, আর ক্যারিবিয়ানের কূলে কূলে—কিউবার কক্ষের দিকে লক্ষ্য রেখে। আমেরিকার রাজনীতিরও আজ তাই বিশেষ দুটি দিক—দূরের ভিয়েতনাম, কাছের ক্যারিবিয়ান। ক্যারিবিয়ানের দ্বীপে দ্বীপে একটি করে আস্ত ফিডেল ক্যাস্ট্রো কিউবার কায়দায় যাতে কায়েম হয়ে না বসে সেজন্য আমেরিকার ঘুম নেই। চিন্তা ও চেষ্টার অন্ত নেই। চক্ষু লজ্জারও বালাই নেই। ভিয়েতনাম যুদ্ধ যতই দীর্ঘস্থায়ী হয়েছে, ওয়াশিংটনের কর্তারা ততই ক্ষ্যাপা ক্ষ্যাপা হয়ে উঠেছেন, ডলার ঢেলে থাইল্যান্ডের পেছু হটা মার্কিনে আরও জোরদার করেছেন এবং অন্য সব অ-থাই লোকের মধ্যে আরও গমের দাক্ষিণ্য ছিটিয়ে দেওয়া উচিত কি না তাই নিয়ে গবেষণা করেছেন। যুক্তরাষ্ট্রের অনেকেই কিন্তু প্রেসিডেন্ট জনসনের সঙ্গে তখন একমত হয়ে বলেছিলেন—কম্যুনিস্টদের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে একদিন-না-একদিন আমাদের লড়তে হবেই। সেটি কেন আজই নয়, কেন নয় ভিয়েতনামে? যাঁরা আরও একটু ভারিক্কি লোক, স্বভাবে যাঁরা চিন্তাশীল, তাঁরা কিন্তু বরাবর বলে এসেছেন—ভিয়েতনামের শেষ নেই, শেষ নেই তার পরিণামের।

আমেরিকার কবি ও সাহিত্যিক নরম্যান মেইলার লাল রাজনীতিওয়ালা নন, বুর্জোয়াও নন—একেবারে নোর বাস্তববাদী মানুষ। একের পর একজন মেয়েকে ভালবেসে তিনি বিয়ে করেছেন, তারপর ডাইভোর্স করেছেন। চতুর্থ পত্নীর সঙ্গে যখন মনান্তর হল, সাহিত্যিকপ্রবর প্রিয়তমার বুকে তখন দিব্যি ছুরি চালিয়ে দিলেন। এই সময় ভদ্রলোক ছিলেন আমেরিকার বেস্ট-সেলার এবং নিউইয়র্ক-মেয়রের পদপ্রার্থী। এই নরম্যান মেইলার সাহেব একদিন প্রেসিডেন্ট জনসনের সমালোচনায় বলে-ছিলেন—আমেরিকার চতুরতম প্রেসিডেন্ট অত্যন্ত অচতুর আচরণ করেছেন ভিয়েতনামে। প্রেসিডেন্ট কেনেডি হলে অমন করে জড়িয়ে পড়তেন না—

কম্যুনিস্টরা যে ঘোর ক্যানিব্যালিস্ট তা তিনি জানতেন। নরম্যান মেইলার অন্য অনেক প্রজ্ঞাশীল আমেরিকানের মতই এই কথা বিশ্বাস করেন, আর বলেন—লড়ুক না ওরা নিজেরা, একদিন একে অপরকে সাবাড় করে ফেলবেই।

কিউবার শুকরোপসাগরের শোকাবহ নাটক আমেরিকাবাসীরা ভোলেন নি, এখনও ভোলেন নি লিণ্ডন জনসন, যে নাটকের অপটু (?) পরিচালনার জন্য জন এফ কেনেডিকে প্রাণ দিতে হয়েছিল। টেকসাসবাসীরা আজও কিন্তু টগবগিয়ে উঠে বলেন—কেনেডির ভুলের জন্য আমরা কিউবাকে হারিয়েছি। সুতরাং আর নয়—দ্বিতীয় কিউবার পুনরভিনয় কোথাও আমরা কিছুতেই ঘটতে দেব না। আমেরিকার কূল থেকে ক্যারিবিয়ানের নীল জলে আজ শুধু এই কথাই প্রতিধ্বনিত হয়ে চলেছে—ভিয়েতনামে, ক্যারিবিয়ানে, ওয়াশিংটনে চিরজীবী হয়ে বেঁচে থাক আমেরিকা; আর সব যাক রসাতলে।

কিউবার শতখানেক মাইল দূরে জ্যামাইকা। এখানে ক্যারিবিয়ানকে দেখে আনন্দের সীমা রইল না। কি মনোহারী নীল জল! জ্যামাইকার তীরে প্রহত হয়ে ঢেউগুলি ফিরে আসছে। কদলী, লবঙ্গ কিংবা দারুচিনিবনের একটি গাছও বিশ্লিষ্ট হয়ে চোখে পড়ল না। নীল আকাশের নিচে নীল সাগরের তীরে বনরাজিনীল জ্যামাইকা নীলকান্ত মণিটির মত উদ্ভাসিত হয়ে আছে। দিগ্‌বিজয়ী কলম্বাস এইখানে এক বছর বাস করেছিলেন। মনে হয় নাবিক কলম্বাস হয়ত ছিলেন নিদারুণ কবি।

আমাদের অনেকেরই পশ্চিম ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জের সঙ্গে অল্প-বিস্তর পরিচয় আছে। সে পরিচয় বেশির ভাগই ক্রিকেটের নামে ও গুণে, ক্রীড়াজগতের মধ্য দিয়ে। ভারতীয়—এই কথাটি পশ্চিমের এই গোলকে একটি বহুব্যবহৃত শব্দ। কলম্বাস সমুদ্রের পথে বের হয়েছিলেন ভারত আবিষ্কারের উদ্দেশ্যে। আটলান্টিক পাড়ি দিয়ে এসেই ভেবেছিলেন, সত্যিকারের ভারতবর্ষে তিনি পৌঁছে গেছেন। নতুন দেশের অধিবাসীদের অভিহিত করেছিলেন ইণ্ডিয়ান বলে। আজও বজায় আছে সেই নাম। আমেরিকায় অনেককেই জিজ্ঞেস করেছিলাম—আপনার পূর্বপুরুষ কোন্ দেশের লোক ছিলেন? শতকরা তিনজনের কাছে জবাব এসেছে—আমরা ইণ্ডিয়ান। হিউস্টনবাসী একজন মেক্সিকান ভদ্রলোক বলেছিলেন—আমরা খাঁটি ইণ্ডিয়ান, সন্স অব দি সয়েল। ভেনিজুয়েলা গুয়াতেমালা কিংবা ব্রাজিলের লোকেরাও বলে—আমরা ইণ্ডিয়ান। স্থানীয় অধিবাসী বাদে ইউরোপীয় লোকেরা এইসব দেশে আসলে বহিরাগত—গায়ের জোরে জমিয়ে বসা বেহকদার মানুষ।

কলম্বাসের আবিষ্কৃত ক্যারিবিয়ান দ্বীপগুলিতে আদিতে স্পেন, ইংলণ্ড, ফ্রান্স, হল্যাণ্ড, পর্তুগাল, ডেনমার্ক ইত্যাদি দেশের লোকের মধ্যে অনেকদিন আধিপত্যের লড়াই চলেছিল। ১৬৫০ সালে সামান্য স্থিতাবস্থা এলো, কলোনী স্থাপনের কাজ একটু একটু করে এগিয়ে চলল। তারপর পরবর্তী দু'শ বছর কেটে গেল গোলমাল দখল বেদখল জবরদখলের মধ্য দিয়ে। শেষ পর্যন্ত অবস্থা স্বাভাবিক হয়ে এলো সম্রাট নেপোলিয়নের পতনের পর।

কলম্বাসের আগমনের আগে দক্ষিণ আমেরিকার ভেনিজুয়েলা থেকে কিছু ইণ্ডিয়ান এসে হাজির হয়েছিল ডোমিনিকা দ্বীপে—অবশ্য বর্তমান ডোমিনিকান রিপাবলিক নয়, ভিন্ন একটি দ্বীপ। তখন ডোমিনিকার ইণ্ডিয়ানদের শৌর্য-বীর্যের খ্যাতি ছিল। ভেনিজুয়েলার ইণ্ডিয়ানরা এসেই স্থানীয় পুরুষগুলিকে খেয়ে ফেলল, আর মেয়েগুলিকে বিবি বানিয়ে ঘরে তুলল। মাংসের ভক্ষণ আর রক্তের মিশ্রণের মধ্য দিয়ে ডোমিনিকান শৌর্য-বীর্যের উত্তরাধিকারী হবার পক্ষে এই নাকি ছিল তাদের শ্রেষ্ঠ পথ!

তৃতীয়বার আটলান্টিক অতিক্রমের সময় ১৫০২ সালে কলম্বাস মাত্র তিন দিনের জন্য মার্তিনিক দ্বীপে অবতরণ করেছিলেন। তখন বাংলাদেশে চৈতন্য যুগের সূচনা হতে চলেছে। দিল্লীর সিংহাসনে বাবর তখনও শক্ত হয়ে বসেন নি। পানিপথের ধূলিও ইব্রাহিম লোদীর রক্তে রাঙা হয়ে ওঠে নি। ক্রমে আরও দেড় শতাধিক বছর চলে গেল, পলাশীর পথ বেয়ে ভারতে এলো ইংরেজ—আটলান্টিক, উত্তমাশা অন্তরীপ এবং ভারত মহাসাগর পাড়ি দিয়ে। কলম্বাস থেকে ফ্লাইভ, কিংবা আকবর থেকে মাউণ্টব্যাটেন যুগ পর্যন্ত অঙ্গ, বঙ্গ, কলিঙ্গের কেউ কখনও আটলান্টিক, ক্যারিবিয়ান, প্রশান্ত মহাসাগরে বের হল না। ভাবপ্রবণ বাঙালী খোল করতাল মৃদঙ্গের তাল ঠুকে বঙ্গীয় নৌকীর্তির জয়গান করবার জন্য কবির সঙ্গে কণ্ঠ মিলিয়ে গদগদস্বরে গেয়ে উঠল—আমাদের ছেলে বিজয়সিংহ লঙ্কা করিয়া জয় ইত্যাদি। কিন্তু সে ত' প্রায় আড়াই হাজার বছর আগে বঙ্গোপসাগর পাড়ি দিয়ে লঙ্কা জয় করবার ইতিকথা। অবশ্য ১৯৪৮ সালের এক সুপ্রভাতে আবার আমরা বঙ্গোপসাগরে বের হয়েছিলাম, গভীর জলে মৎস্য শিকার করতে। তার ইতিহাস খুব সুখপাঠ্য নয়। ক্যারিবিয়ানে কেবলই মনে হচ্ছিল, চারশ' বছর আগে যদি আড়াই হাজার বছরের পুরনো মডেলে জাহাজ তৈরি করে বঙ্গসন্তানরা একবার এই দিকটাতে পাড়ি জমাতেন, তাহলে কিউবা-জ্যামাইকা কিংবা বাহামা-বার্বাডোসের একটি দ্বীপও কি আমরা আজ আমাদের বলে দাবি করতে পারতাম না!

কিউবা, জ্যামাইকা, হাইতির পর এগিয়ে এলাম ডোমিনিকান রিপাবলিকের কাছে। ডোমিনিকান রিপাবলিকের বর্তমান রাজধানী স্যাণ্টো ডোমিঙ্গো, ফ্লোরিডার মায়ামী থেকে আটশ' মাইল দূরে। ১৫০৪ সালের ১২ই সেপ্টেম্বর ক্রিস্টোফার কলম্বাস বর্তমান হাইতি (প্রশান্ত মহাসাগরের তাইহিতি নয়) এবং ডোমিনিকার মিলিত দেশটি দেখে মুগ্ধ হয়ে বলেছিলেন—লা আইলা এসপ্যানোলা (LA ISLA ESPANOLA). তাই দ্বীপটির নামকরণ হয়েছিল হিসপ্যানিওলা। টাসমেনিয়ার জল-বায়ু, বন-প্রকৃতি, তার পাহাড়ের পঞ্জরে পঞ্জরে বরফের স্তর দেখে বৃটেনের কনভিক্টরাও একদিন বলে উঠেছিল—এ লিট্‌ল বিট অব ইংলণ্ড। আজ হিসপ্যানিওলার অখণ্ডতা নেই, আগের নামেও তাকে আর কেউ ডাকে না। হাইতি আর ডোমিনিকান রিপাবলিক—এই দুই নামে দুটি দেশের সৃষ্টি হয়েছে পুরনো হিসপ্যানিওলা থেকে। তবু কিন্তু আবহাওয়া আপিসের খেয়ালী লোকেরা আজও মাঝে মাঝে বলে—আজ হিসপ্যানিওলার তাপমাত্রা আশি ডিগ্রী; আর হয়ত শুধু জাহাজী লোকেরা বেতার কক্ষে বসে বসে তাই শোনে!

১৯৬৫ সালের মে মাসে ডোমিনিকান রিপাবলিকে একটি গণ-অভ্যুত্থানের সূচনা হয়; ১৯৬৩ সালের গদিচ্যুত প্রেসিডেণ্ট জুয়ান বশের সমর্থকরা বিপ্লবের ঘূর্ণিঝড় ডেকে আনে। তাই-না-দেখে সিঁদুরে-মেঘ-ভীত ওয়াশিংটন প্রায় ল্যাজে-গোবরে এক—বুঝি বা দ্বিতীয় কিউবায় পরিণত হয়ে গেল ডোমিনিকান রিপাবলিক। কিউবার পর এমন সাংঘাতিক ঘটনা কি আর মনের শান্তি বিঘ্নিত না করে পারে? এমন কি ওয়াশিংটনের সে অশান্তি আরও বেড়ে গেল ফিডেল ক্যাস্ট্রোর এককালের অনুচর ও সহকর্মী, লালচীন-পরিব্রাজক গুয়েভারার সুদীর্ঘ অজ্ঞাতবাসের সূত্রে। শেষ পর্যন্ত গুয়েভারা বলিভিয়াতে মৃত্যু বরণ করে প্রমাণ করলেন, তিনি আর বেঁচে নেই। কিন্তু ওয়াশিংটনে কত

ন শান্তি ফিরে এসেছিল সে বিষয়ে অশেষ সন্দেহ আছে।

ডোমিনিকান রিপাবলিকে গণ-বিপ্লবের সময় মার্কিন প্রেসিডেন্ট জনসন হিমসিম খেয়ে ভাবছিলেন, ওখানে আমেরিকার নাক গলানো উচিত হবে কি না। তাঁর আদেশে ডাক পড়ল সামরিক কর্তাদের, সি-আই-এ শিরোমণি দের, আইন-রাষ্ট্রবিজ্ঞান-ইতিহাস-বিশেষজ্ঞদের। ডাক পড়ল ম্যাক জর্জ বান্ডির। এই ভদ্রলোক আদিতে ছিলেন হারবার্ডের অধ্যাপক। আপৎকালে তাঁর সৎপরামর্শের মূল্য আছে মনে করে প্রেসিডেন্ট জন এফ কেনেডি তীক্ষ্ণধী বান্ডিকে ওয়াশিংটনে ডেকে এনেছিলেন। ক্যালাসের পর লিণ্ডন জনসনও তাঁকে ওয়াশিংটনে থেকে যেতে অনুরোধ জানালেন। ডোমিনিকান রিপাবলিকের পরিস্থিতির পরিপ্রেক্ষিতে প্রেসিডেন্ট জনসন বান্ডিকে জিজ্ঞেস করলেন—ওখানে আমাদের হস্তক্ষেপ করা কি উচিত? অশান্ত দ্বীপটিতে আমেরিকার জান, মাল, মর্যাদার বিচার-বিশ্লেষণ করে ম্যাক জর্জ বান্ডি জবাব দিলেন—নিশ্চয় উচিত। মার্কিন প্রেসিডেন্টের আদেশে তখন সৈন্যদল সক্রিয় হল অ-মার্কিন মুলুকে, ডোমিনিকান রিপাবলিকে। আর সঙ্গে সঙ্গে কিউবা, রাশিয়া, লালচীনে প্রতিবাদের ঝড় উঠল। প্রেসিডেন্ট বশকে উৎখাত-করা পাণ্ডা ব্রিগেডিয়ার জেনারেল ওয়েসিন ওয়াই ওয়েসিন আমেরিকার সমর্থন সাহায্য এবং এক্তার ডলার পেয়ে ডোমিনিকান রিপাবলিকের মাটিতে দ্বিতীয় কিউবাকে রুক পেতে ঠেকালেন।

ডোমিনিকান রিপাবলিকের শত-খানেক মাইল পুবে পোর্টোরিকো। আমেরিকার নিকটতম উপকূল থেকে পোর্টোরিকো নশ' মাইল দূরে। প্রতি-দিন শত শত পোর্টোরিকান মানুষ হিউস্টন গ্যালভেস্টন মায়ামীতে আসছে রোজগারের ধান্দায়—অজস্র দেহোপ-জীবিনীও আসছে স্পানীশ এবং মেক্সিকান মেয়েদের মত। আমেরিকার কিছুতেই 'না' নেই। হাওয়াই আর আলাস্কা যুক্তরাষ্ট্রে যুক্ত হওয়ার পর এখন আবার শোনা যাচ্ছে, পোর্টোরিকো হবে একান্নতম রাষ্ট্র—এমন কি মেক্সিকোর আমেরিকাভুক্তি সম্বন্ধেও বিস্তর গুজব শুনেছি আমেরিকার অনেক জনপদে। এ বিষয়ে একজন মেক্সিকান ভদ্রলোকের দৃষ্টি আকর্ষণ করলে তিনি কিন্তু বলেছিলেন—দায় পড়েছে!

পোর্টোরিকোর উপর আমেরিকার ভরসা অনেক। এইখানে বসে ক্যারি-বিয়ান শাসনের সুবিধা হবে, হয়ত কিউবার লোকসানও পুষিয়ে নেওয়া যাবে. শক্তিও মর্যাদা নয়। তবে পোর্টোরিকোর অস্ত্রসজ্জায় কোটি কোটি টাকার শ্রাদ্ধ হবে আমেরিকার। সিঁদুরে মেঘের বর্ষণ ক্যারিবিয়ানের নীল জলে কিছুতেই মিশতে দেওয়া হবে না। ঠিক এমন অবস্থায় বসে আজ কিন্তু কোন কোন পণ্ডিত মনে করছেন, যে সব দেশ লালে লাল হয়ে যেতে চায় তাদের পথে বাধা সৃষ্টি না করাই উত্তম উপায়। বছর দশেক পর সবারই একদিন স্বপ্নভঙ্গ হবে, ঘুরে ফিরে সবাই তখন বলবে—দূর ছাই, আগেই ত' ছিলাম ভাল!

কিন্তু সর্বসাধারণ আমেরিকাবাসীর মনের কথা তা' নয়। শুধু ভিয়েতনাম, ক্যারিবিয়ানেই তাঁরা লাল-দুঃস্বপ্নকে বিদায় করে দিতে তৎপর নন—সম্ভব হলে সমস্ত দুনিয়া থেকে তার অবলুপ্তি স্বপ্নে জাগরণে তাঁরা কামনা করেন। তাই উত্তর, দক্ষিণ, মধ্য আমেরিকার রাষ্ট্র-গুলিকে নিয়ে আগেই তাঁরা গড়ে তুলেছিলেন একটি আত্মরক্ষামূলক সংস্থা —ও-এ-এস (অর্গানিজেশন অব আমে-রিকান স্টেট্‌স); ন্যাটো, সেন্টো, সিয়াটোর মত। তবু কিন্তু শান্তি নেই—আজ গুয়াতেমালা, কাল বলিভিয়া, পরশু হয়ত ব্রাজিলে কম্যুনিস্ট উৎক্ষেপ প্রকট হয়ে উঠছে, আর আমেরিকানরা তা দমন করবার জন্য বেমালুম টাকা ঢেলেই চলেছেন। মনে হয় শেষ ডলারটি খরচ করতেও যেন তাঁরা দ্বিধা করবেন না। কোথাও ত' আর দ্বিতীয় কিউবা ঘটতে দেওয়া যায় না!

১৯১৭ সালের রুশ বিপ্লবের কালে সাম্যবাদের ঋষি নিকোলাই লেনিন যে কথাটি বলেছিলেন, হয়ত তাই আজ নতুন করে কারও আবার মনে পড়তে পারে। তিনি বলেছিলেন—জার্মানী সমরসজ্জার মধ্য দিয়ে পৃথিবী থেকে নিশ্চিহ্ন হবে, ইংলণ্ড বিলুপ্ত হবে সাম্রাজ্য সম্প্রসারণের মাত্রাধিক তাড়নায়—আর আমেরিকা নিঃশেষ হবে আর্থিক অপচয়ের গুরুভারে।

চুচকের দেশে

গীতা বন্দ্যোপাধ্যায়

[পূর্ব-প্রকাশিতের পর]

আমাদের যেমন যুবশক্তি বলতে কিছু নেই অর্থাৎ যুবশক্তি শুনলে যেমন আমাদের কিছু বেকার, কিছু ছাত্র ছাড়া কিছু মনে আসে না, ইউরোপে কিন্তু ঠিক তার উল্টো। বিশেষ করে পূর্ব ইউরোপে। আমাদের অবশ্য ছাত্রশক্তি বলে একটা প্রচন্ড শক্তি আছে। কিন্তু ছাত্রজীবন পেরোলেই আমরা অকালবার্ধক্যের স্তবে চলে যাই। শুধু ধাঁধায় ঘোরা বা রকে বসে থাকা ছাড়া কোন গতি থাকে না। আর আমাদের মেয়েদের কথা বাদই দিচ্ছি। এ দেশে এখনও মেয়েদের দুটো বয়েস—বিয়ের আগের আর বিয়ের পরের।

চেকোস্লোভাকিয়ায় যুবশক্তি যেমন প্রাণচঞ্চল, তেমনি শক্তিমান। অবশ্য দুর্বলতা ছিল না তা নয়। প্রচুর ছিল। এবং স্বাভাবিকভাবেই ছিল। ওদের কাগজ ছিল—স্লাদা ফ্রন্টা। তার আপিসে গেলে তাক্ লেগে যেত—বিরাট সংগঠন। গিজ গিজ করছে ছেলেমেয়ে। ভয়ানক গম্ভীর মুখে কেউ কাজ করছে। কোথাও বা টেবিল থাবড়ে তর্ক। আমরা ভারতীয়রা গেলে ওরা বেশ একটু চমকিত হত। অনেকরকম লোকের আনাগোনার মধ্যে আমাদের একটু আলাদা করে বসিয়ে গল্প করত কেউ কেউ। খাওয়াত। কফি বা চা খাওয়া ওসব দেশে প্রচন্ড বিলাসিতা। ভারতীয়দের চায়ের কথা ভেবে ওরা যখন চা খাওয়াবার জন্যে ব্যস্ত হয়ে পড়ত আমাদের একটু হাসি পেয়ে যেত। সে যে কী বিশ্রী চা! প্যাকেটগুলোয় চায়ের খড়কুটো। ছোট্ট এক চামচের মত চা থাকত প্যাকেটে। তাই কাপে গুলে দুধ ছাড়া খাওয়া। না আছে স্বাদ, না গন্ধ। ওরা তো তাই খেয়েই উচ্ছ্বসিত। ভারতবর্ষ থেকে নাকি এ চা এসেছে। ভীষণ চড়া দামে কেনা জিনিস। দেখেশুনে এ দেশের ব্যবসায়ীদের জন্যে একটু লজ্জা হত।

লুড্‌মিলা আর ডাসা নামে দুটি মেয়ে ছিল। লুড্‌মিলা ইংরিজি ভাষা শিখে দো-ভাষীর কাজ করত। আর ডাসা ছিল কোনো একটা কারখানার শ্রমিক। কি কারখানা মনে নেই। তবে যুব-সংগঠনের আপিসে মেয়েটির খাতির দেখে বোঝা যেত সে তার কর্মক্ষেত্রে সম্রান্তা। জাঁহাবাজ মেয়ে কারখানার একটা ডিপার্টমেন্ট ছিল তার অধীনে। ট্রেড-ইউনিয়নের কর্মী হিসেবে তার কাজ ছিল একদিকে শ্রমিকদের ভালমন্দ দেখা আর অন্যদিকে উৎপাদন বাড়ানো। উৎপাদন বাড়ানোর ব্যাপারটা পূর্ব ইউরোপে তখন মূলমন্ত্র। আর সেই কাজে সব চাইতে আগে বেড়েছিল—এদের যুবশক্তি।

লুড্‌মিলা শান্ত প্রকৃতির। সবকিছু বুঝিয়ে দেওয়া ছিল তার কাজ। এ ব্যাপারে ওর কোনো ক্লান্তিও ছিল না। আমাদের প্রয়োজনমত ও এখানে-ওখানে যেত, চেকোস্লোভাকিয়াকে চেনাত। যুদ্ধের সময় ও ছিল ছোট। বাবা, মা, এক ভাই—সব ফ্যাসিস্টদের অত্যাচারে প্রাণ দিয়েছিলেন। একটি ভাই হারিয়ে গিয়েছিল কনসেনট্রেশান ক্যাম্পে। এখন ও একা।

ওদেরই সঙ্গে গিয়েছিলাম চার্লস্ বিশ্ববিদ্যালয়ের বাৎসরিক উৎসবে। চার্লস বিশ্ববিদ্যালয়ের মত আশ্চর্য সুন্দর কোনো শিক্ষা প্রতিষ্ঠান আগে কখনও দেখেছি বলে মনে হয় না (খানিকটা অন্ধ্র বিশ্ববিদ্যালয়ের আদল আসে)। পাহাড়ী পথ বেয়ে পৌঁছতে হয়। ওঠা-নামার মধ্যেই এর অবস্থান। গোটা জিনিসটাই এত ঐতিহাসিক, এখনকার আধুনিক পরিবেশে একে খানিকটা স্বপ্নাবিষ্ট লাগে।

আধুনিক শিক্ষাব্যবস্থার শুরু যাঁরা করেছিলেন তার মধ্যে চেক্ দার্শনিক ইয়ান্ আমোস্ কোমেনিয়াস্ অন্যতম। তাঁরই আদর্শে প্রাগে চার্লস বিশ্ববিদ্যালয়ে (তিনশ' বছর আগে) আধুনিক শিক্ষার গোড়াপত্তন হয়েছিল। এই বিশ্ববিদ্যালয় অবশ্য চতুর্থ চার্লস প্রাগে প্রতিষ্ঠা করেছিলেন ১৩৪৮ সালে।

এখানে আগে ধনী বংশের ছেলেমেয়েরা পড়াশুনো করত। এখন দ্বার অবারিত। আমাদের দো-ভাষী ছেলেটি সব ঘুরিয়ে-ঘারিয়ে দেখাচ্ছিল। বক্তৃতাগুলো শোনার তেমন উৎসাহ ছিল না। কেন না, সব দেশে বক্তৃতা প্রায় একই রকমের হয়। অনেকেই শুনছিল না। আমি গোড়ায় বোকার মত সব বক্তৃতা শুনতাম। শব্দগুলো মুখস্থ হয়ে যেতে লাগল। একজন আমাব এই অভ্যাসের কথা শুনে একেবারে অবাক। বলে—'পাগল নাকি? বক্তৃতা তো আহাম্মকরা শোনে। ওসব কাল সকালে কাগজে পড়ে নিও।'

একটা জিনিস বড় চোখে পড়ত। এদের নেতা-প্রীতি। সব দেশের মত এরাও রাজনৈতিক নেতাদের দেবতার আসন দিত। তারপর সেই নেতাদের কেউ কেউ যখন দাবার দানে খেলার বার হয়ে যেতেন—কেমন যেন একটা ভাব দেখতাম। টিটোর ব্যাপারটা মনে আছে। তখন সোভিয়েত ইউনিয়নের সঙ্গে টিটোর মনোমালিন্য চলেছে। আগে পূর্ব ইউরোপে তিনটি নেতার নাম ধরে ওরা আওয়াজ দিত। অর্থাৎ স্তালিন-টিটো থাকতেন-ই। আর তৃতীয় নামটা হত জাতীয় নেতার। এই

রিস্ট ওয়াচ

মাত্র ৬৲ টাকায়

আমাদের চেন পদ্ধতি স্কীমের মাধ্যমে মাত্র ৬৲ টাকায় ৫ বৎসরের গ্যারান্টী সমেত ৫ জুয়েল রিস্ট-ওয়াচ লাভ করুন। ডাকমাশুল ১/১৫ টাকা অতিরিক্ত।

দ্রষ্টব্য : আমাদের মধুচন্দ্রিমা সেন্টের বিক্রয় বৃদ্ধির জন্যই এই স্কীম চালু করা হইল। পছন্দ না হইলে মূল্য ফেরৎ।

SWISS WATCH
TRADING CO.
P. B. 87, (WBC) Jullundur City.

তিন নাম ধরে ওরা 'জিন্দাবাদ, জিন্দাবাদ' করত। ছবি টাঙানোর ব্যাপারেও তাই। সব সংগঠনে, প্রতিষ্ঠানে, কারখানায়, স্কুল-কলেজে—ঐ তিন নেতার অবস্থিতি। সুন্দর ফ্রেমে বাঁধানো সব ছবি। একদিন দেখলাম রাতারাতি টিটোর ছবি উধাও। আমতা আমতা করে এক যুবনেতা বললেন,—'বুঝলে না,—উনি রেনিগেড হয়ে গেছেন।' পরে অবশ্য স্তালিনের ছবিও উঠিয়ে নেওয়া হয়েছিল শুনেছি। আমি ঠাট্টা করে বলেছিলাম—'আর আমরা যে এত হাত লাল করে জিন্দাবাদ করেছি—সে পরিশ্রমের খেসারত কে দেবে?' ছেলেটি হেসে উত্তর দিয়েছিল—'ওটাই তো এখানকার একমাত্র দান নয়? তোমাদের দেশে এসব হয় না?'

কথাটা ঠিক। আমাদেরও তো রাজনীতিতে এই আছি এই নেই। সব দেশেই তাই। রাজনীতি আর সিনেমা থিয়েটারের যেন একই অবস্থা। দৃশ্য বদল, চরিত্র বদল।

কিন্তু এরা কয়েক বছরের মধ্যে দেশটাকে যা তুলে ধরেছিল, মুগ্ধ না হয়ে পারা যায় না। সমাজতন্ত্রের আওতায় সাধারণ মানুষ যে কত জীবন্ত হয়ে ওঠে তা এসব দেশে না থাকলে বোঝা যায় না। বাইরে কত রকমের প্রচার-অপপ্রচারের ঘটা। ভেতরেও যে শত্রু নেই তা নয়। কিন্তু টানাপোড়েনে এই সাধারণ মানুষের জয় হচ্ছে চারিদিকে। ভুলচুক যা হত বা হচ্ছে, তার মধ্যে কিন্তু একটা স্বাভাবিক সুস্থ মানুষের দোষ-ত্রুটির সন্ধান মেলে।

একদিন গেলাম অল্পবয়সী মায়েদের বাচ্চা রাখার আয়োজন দেখতে। শিল্প বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে মজুরের চাহিদা বেড়েছে। স্কুল-কলেজ বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষিকা-শিক্ষকের দরকার হয়েছে। সব দিকেই একটা সাজসাজ রব হলে যা হয়। ফলে মেয়েরা আগের চাইতে অনেক বেশি করে উৎপাদন অংশ নিচ্ছেন। শুধু শিক্ষার ব্যাপারে একটা হিসেব দিলে (সরকারী) খানিকটা আন্দাজ পাওয়া যাবে।

বছর	বিশ্ববিদ্যালয়, উচ্চশিক্ষার আর ফেকাল্টি কলেজের সংখ্যা		মোট ছাত্র-ছাত্রী সংখ্যা	ছাত্রী সংখ্যা
১৯৩৬/৩৭	১৩	৫২	২৪,৪৩৫	৪,০৬৩
১৯৬৬/৬৭	৪২	১০৫	৯৩,০০০	৩৭,০০০

বোঝা-ই যায় কর্মী মেয়ের সংখ্যা কি আন্দাজ বাড়ছে। ফলে তাদের শিশুদের রাখার ব্যবস্থা সরকারই করেছেন। কারখানাগুলোয় তা বা নিজস্ব মেয়ে শ্রমিকদের ব্যবস্থা করে নিয়েছে। অন্যান্য অনেক প্রতিষ্ঠানও তাই করেছে।

যে নার্সারীটি দেখতে গিয়েছিলাম, তাতে বাচ্চাদের বয়েস—তিন মাস থেকে তিন বছর পর্যন্ত। নার্সারী বলতে আমরা এখানে যা বুঝি তা ঠিক নয়। ভেতরে ঢুকে একটা করে 'ওভারঅল' পরিয়ে দেওয়া হল। ছোট ছোট বাচ্চাদের যাতে কোনোরকম ছোঁয়াচ না লাগে। একেবারে খুদেগুলো শুয়ে আছে উঁচু ঘেরা খাটে। কাঁচের জানলা খোলা। রোদ এসে পড়েছে বাচ্চাদের গায়ে। এমন সুন্দর গাবদা-গোবদা সব ছেলে-মেয়ে। চোখ ফেরে না। মা'রা সারাদিনের জন্যে রেখে গেছে। বিকেলে বা সন্ধ্যেবেলা কাজ শেষ হলে এদের নিয়ে বাড়ি ফিরবে। যারা একটু বড় বাচ্চা তারা শিক্ষামূলক খেলা খেলছে। পুতুলগুলো সাজানো দেখে অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করেছিলাম 'এরা ভাঙে না?' ভারপ্রাপ্তা মহিলা উত্তর দিলেন—ভাঙে। তবে আমরা ওদের পুতুল দিয়ে সমাজশিক্ষা দিই। পুতুলের যন্ত্রের ভেতর দিয়ে একটা দায়িত্ববোধ ফুটিয়ে তোলার চেষ্টা হয়।

বাচ্চাগুলো যেন মোমের পুতুল। আমাকে দেখে একটু অবাক হয়েছিল গোড়ায়। একজন সপ্রতিভভাবে জিজ্ঞেস করল, 'এ এরকম কেন?' 'কি রকম?' 'অন্য রকম।' দো-ভাষী বুঝিয়ে দিল। আমি বললাম—'আমি যে অন্য দেশের লোক।' 'কোন্ দেশ?' 'ভারতবর্ষ।' 'সে কোথায়?' 'অনেক দূরে।' 'কত দূরে?'

সব দেশের বাচ্চাই সমান। প্রশ্নে প্রশ্নে অস্থির করে তোলে। যাঁদের ওপর এদের শিক্ষার ভার, তাঁরা সকলেই অভিজ্ঞ এবং শিশু-বিষয়ে শিক্ষাপ্রাপ্ত। এমন অনায়াসে এই এককুড়ি বাচ্চা নিয়ে সারাটা দিন থাকেন, অবাক না হয়ে পারা যায় না।

এখান থেকে গেলাম নার্সারী স্কুলে। সেখানকার বাচ্চাদের বয়েস তিন থেকে ছ' বছর। এদের একটা পদ্ধতির অনুসরণ করে শিক্ষা দেওয়া হয়। একটা সিলেবাস থাকে। খেলা আর ঘুরে বেড়ানোর জন্যে অনেকটা সময় থাকে। ওরা নিজেরা নিজেদের খাবার টেবিল গোছাতে শেখে, গাছে জল দিয়ে ফুলের বাগান করে, পুতুল সাজায়। ব্যস্! সামাজিক জীব হতে শেখাতে পারলেই এ পর্যায়ের শিক্ষা সম্পূর্ণ হল বলে ধরে নেওয়া হয়। তারপর ছ' থেকে পনের বছর পর্যন্ত বাধ্যতামূলক শিক্ষাব্যবস্থায় ওদের লেখাপড়া শুরু হয়।

শুনে অবাক হয়েছিলাম যে যাদের আয় কম সেসব মা-বাবাদের এই নার্সারীতে বা নার্সারী স্কুলে ছেলেমেয়ে রাখার জন্যে কোনো খরচই দিতে হয় না। যাঁদের মাইনে বেশি তাঁরা সামান্য একটা অঙ্ক দেন এদের খাওয়া-দাওয়া বাবদ।

চেকোশ্লোভাকিয়ায় এখন এইরকম নার্সারীর শিশু সংখ্যা ৬৫,০০০ আর নার্সারী স্কুলে আছে ৩৪৫,০০০ ছেলে-মেয়ে। প্রত্যেক বছরে সরকার মাথাপিছু প্রতি শিশুর খাতে ১,৭০০ ক্রাউন খরচ করে থাকেন।

তুলনা করলে মন খারাপ লাগে। তবু মনে হয়—এদেশে কিছু কি করা যেত না? যা সামান্য আছে তা তো সমুদ্রে একফোঁটা জলের মত। আর পাড়ায় পাড়ায় যেসব নার্সারী স্কুলের ভড়ং, তা এখন ব্যবসায়িক লাভের অঙ্ক কষে বাচ্চা নেয়। গরীব কেন, সাধারণ মধ্যবিত্তেরাও নার্সারীতে ছেলে-পুলে রাখতে পারে না। আসলে যেসব কর্মী মায়েরা নতুন মা হন, তাঁদের অবস্থা সচরাচর নিম্নবিত্তের। ফলে তাঁদের পক্ষে বাচ্চাকে নার্সারী স্কুলে দেওয়া অসম্ভব হয়ে দাঁড়ায়। তাছাড়া সারাদিন রাখার মত ক্রেস্ কোথায় এদেশে?

অথচ চেকোশ্লোভাকিয়া আর আমরা প্রায় একই সঙ্গে স্বাধীন হয়েছিলাম।

[ক্রমশঃ]

ধরানাথ ভট্টাচার্য স্মরণে

সত্যেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়

Let action be man's God,
O'er whom even Fate
Can rule not, nor his puissance
abrogate.
—Aurobinda

কর্ম হোক মানুষের আরাধ্য দেবতা
ভাগ্য যেথায়,
আসনে অক্ষম কিংবা তার যত পরাক্রম
বিলুপ্ত সকলি।

এমনই একটি কর্মযোগীর আবির্ভাব হয়েছিল খুলনা জেলার বাগেরহাট সাব-ডিভিশনের ধলনগর গ্রামে, ১৩ই ফেব্রুয়ারী, ১৮৮২ খৃস্টাব্দে—পিতা উমাচরণ ভট্টাচার্যের ঔরসে আর মাতা বিন্দুবাসিনীর গর্ভে শিশু ধরানাথের। কিন্তু নাম তো মানুষকে পরিচিতি দেয় না, পরিচয় তার কর্মের মাধ্যমে। তাই ধরানাথকে তাঁর আসল নামের কথা জিজ্ঞাসা করায় তিনি একদিন বলেছিলেন—আমার নাম তো ছিল অনেক, কোন্‌টা বলবো বল। আমার দুটি নাম শেষ পর্যন্ত যা চালু হয়েছিল তার মধ্যে প্রথম হচ্ছে ধূর্জটিনাথ ভট্টাচার্য আর পরে চলেছিল ধরানাথ বসু। তবে তিনি যে সত্যই ধরানাথ হয়েছিলেন, তার প্রমাণ তাঁর ৮৬-বছরের কর্মময় জীবন।

ধরানাথের পিতামহ ছিলেন রামসুন্দর বিদ্যালঙ্কার বাচস্পতি আর তাঁর প্রপিতামহ ছিলেন জগন্নাথ তর্কপঞ্চানন। স্বাভাবিকভাবেই পণ্ডিত বংশের পৈতৃক পেশা ছিল যাজন-যজন, আর এই গুরুপরিবারের অন্তর্গত শিশু-সন্তানদের ছিল ইংরাজী শিক্ষার পথে প্রগাঢ় বাধা। ধরানাথও তাই ৮।৯ বছর বয়সে মাইনার পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে নিলেও, ইংরাজী শিক্ষার দিকে তিনি আর এগুতে পারেন নি। বরিশালের কুমার জগদীশ মুখোপাধ্যায়রা ছিলেন উক্ত পণ্ডিত পরিবারের শিষ্য। বালক ধরানাথ ঐভাবে ইংরাজী পড়ায় বাধা পেয়ে কুমার জগদীশের সঙ্গে বরিশালে চলে যান এবং সেখানে গিয়ে মহাত্মা অশ্বিনীকুমার দত্তের সান্নিধ্য লাভ হয় ধরানাথের সর্বপ্রথম। এইভাবে বালকমনে বৈপ্লবিক বীজ অঙ্কুরিত হয়েছিল তাঁর বরিশাল জেলায় এসে। তারপরে তিনি ১৯০০-১৯০১ সালের কোন সময় পিতার সঙ্গে কলকাতায় এসে হাজির হন। ধরানাথের বয়স তখন ১৫-১৬ বছরে পৌঁছেচে। ঐ সময় কলকাতায় থাকাকালে ধরানাথ তাঁর পিতার সঙ্গে কালীঘাটে যাবার উদ্দেশ্যে একদিন ধর্মতলা ও চৌরঙ্গীর সংযোগস্থলে দাঁড়িয়েছিলেন। আলোচ্য সময় ফিরিঙ্গী আর গোরা সৈন্যের অত্যাচারে কলকাতার বাঙালী-জীবন অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছিল। হঠাৎ ঐ ফিরিঙ্গীদেরই কেউ এসে তাদের আচরিত প্রথায় উমাচরণকে গালিগালাজ ইত্যাদি করে অপমানিত করে। বালক ধরানাথের মন, সেই পিতৃ-অপমান স্বচক্ষে দেখে চাপা ক্রোধে ফেটে পড়ে। হাতে বা নিকটে, কোন কিছু না পাওয়ায় তিনি সেদিন তাঁর পিতৃ-অপমানের প্রত্যুত্তর দিতে অক্ষম হন বটে কিন্তু আন্তরিক সঙ্কল্প নেন এই বলে যে —এর পর থেকে হাতে এক টুকরো লাঠি, নিদেন দু-একটি ইঁটের টুকরা নিয়ে, সুযোগ পেলেই ঐ অঞ্চলে ঘুরে বেড়াবেন এবং ফিরিঙ্গী জাতীয় কোন জীবকে দেখলেই তিনি তাঁর পিতৃ-অপমানের প্রতিশোধ নেবেন। অতঃপর একদিন দু'-তিনটি ফিরিঙ্গীর সঙ্গে তাঁর তাণ্ডব বেধে গেছে, এমন সময় দেখেন তাঁরই সমবয়সী আর একটি ফুটফুটে স্বাস্থ্যবান বালক ছুটে এসেছেন তাঁর সাহায্যকল্পে। এইভাবে ঐ দুটি বলবান বাঙালী ছেলের হাতে একদিকে ফিরিঙ্গীরা যেমন তাদের ঔদ্ধত্যের প্রত্যুত্তর পেয়েছিল, অপর দিকে ধরানাথের সঙ্গে উক্ত বালকের সৌহার্দ্য প্রতিষ্ঠিত হয়ে তাঁর জীবনের বৈপ্লবিক ভাবগুলি বাস্তবে পরিণত হওয়ার দরজা উন্মুক্ত হয়ে গিয়েছিল। উক্ত বালকটি ছিলেন পরবর্তী কালের বিপ্লবী নেতা বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী, তিনি আজও বাংলা যুব-সমাজে বিপিনদা বলেই অধিক পরিচিত। ফিরিঙ্গী ঠেঙানোর কাজ সেদিনকার মত শেষ করে বিপিনদা তৎক্ষণাৎ ধরানাথকে নিয়ে যান তৎসময়ের মধ্য কলকাতায় প্রতিষ্ঠিত আত্মোন্নতি সমিতিতে।

ধরানাথ ভট্টাচার্য

অতঃপর ১৯০৮ সালে আলিপুরের বোমার মামলার আগে পর্যন্ত ধরানাথের বৈপ্লবিক জীবনের প্রস্তুতিপর্ব চলতে থাকে আত্মোন্নতি সমিতির মাধ্যমে। এই সময় তিনি সুরেন্দ্রনাথ ও বিপিনচন্দ্র পালের আহ্বানে বঙ্গ-ভঙ্গ আন্দোলনে যোগদান করাও তাঁর জীবনের একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা। ইতিহাসে প্রমাণ পাওয়া যায়, উক্ত সময় আত্মোন্নতি সমিতির বিশিষ্ট সভ্যদের মুরারিপুকুরের বাগানের সঙ্গেও যথেষ্ট যোগ-সাজস ছিল। আর তা না হলে ঐ সমিতির প্রথমকালীন একজন বিশিষ্ট সভ্য শ্রীইন্দ্রনাথ নন্দী ঐ মামলায় জড়িত

১৯৬৯তে আপনার ভাগ্য

যে-কোন একটি ফুলের নাম লিখিয়া আপনার ঠিকানাসহ একটি পোস্টকার্ড আমাদের কাছে পাঠান। আগামী বারমাসে আপনার ভাগ্যের বিস্তারিত বিবরণ আমরা আপনাকে পাঠাইব, ইহাতে পাইবেন ব্যবসায়ে লাভ লোকসান, চাকুরিতে উন্নতি, বদলী, জন্ম, বিবাহ ও সুখ-সমৃদ্ধির বিবরণ; আর থাকিবে দুষ্ট-গ্রহের প্রকোপ হইতে আত্মরক্ষার নির্দেশ। একবার পরীক্ষা করিলেই বুঝিতে পারিবেন।

PT. DEV DUTT SHASTRI
RAJ JYOTISHI (B. M. W)
P. B. 86, JULLUNDUR CITY

হয়ে গ্রেপ্তার হবেন কেমন করে। তবে বোমার মামলা সংক্রান্ত ব্যাপারে ধরপাকড় শুরু হলে আত্মোন্নতি সমিতির বিশিষ্ট সভ্যদের অনেকেই আত্মগোপন করতে বাধ্য হয়। ধরানাথও সেই উদ্দেশ্যে একটি রিভলভার সঙ্গে নিয়ে পদব্রজে পাড়ি দিয়েছিলেন ধর্মা অভিমুখে। সঙ্গে ছিলেন ক্ষিতীশ গাঙ্গুলী আর গিরীন রায়চৌধুরী। এই সকল তথ্য জানা গিয়েছিল ধরানাথের কাছে ১৯৬৩ সালের জানুয়ারী মাসে। ১৯১০ সালের শেষের দিকে আবার তিনি দেশে ফিরে আসেন এবং ১৯১৩ সালের বর্ধমান বন্যার সময় সেখানে গিয়ে আর্তত্রাণে আত্মনিয়োগ করেন।

১৯১৪ সালের শেষে অমর চট্টোপাধ্যায়, ডাঃ যাদুগোপাল মুখোপাধ্যায়, সতীশচন্দ্র চক্রবর্তী প্রমুখ বিপ্লবীরা যখন নানা বেশে নানা দিকে ছড়িয়ে পড়েন, আত্মগোপনের উদ্দেশে, গ্রেপ্তার এড়ানর জন্যে, ধরানাথও সেই সময় নানা নামে নানা স্থানে ঘুরে গ্রেপ্তার এড়াতে সক্ষম হয়েছিলেন। তাই ধরানাথকে একদিন তাঁর জীবনকাহিনী জানবার জন্যে পীড়াপীড়ি করায় তিনি বলেছিলেন—১৯০১ সাল থেকে ১৯২০ সাল পর্যন্ত দেশের মুক্তিকল্পে কোন কাজই আমাদের কাছে অসম্ভব বোধ হয় নি। তবে সহজে ধরা দেওয়া বা কোন্ প্রকারে আত্মপ্রচার করা ছিল আমাদের আদর্শ-বিরোধী। গ্রেপ্তার হয়ে পড়ার কথা জিজ্ঞাসা করায় তিনি বলেছিলেন—

১৯০৬ সালে খুলনা জেলায় তিনি একবার গ্রেপ্তার হয়ে বেশ কিছুদিন জেলে কাটাতে বাধ্য হয়েছিলেন।

১৯১৪ সালে—সন্দেহে গ্রেপ্তার হয়ে কিছুকাল হাজতবাস করতে বাধ্য হন।

তারপরে ১৯২১ সালে তারকেশ্বর সত্যাগ্রহের ব্যাপারে মূল উদ্যোক্তা হতে হয়েছিল ধরানাথকে।

শেষে বলেছিলেন ১৯২৬ থেকে ১৯৪৬ পর্যন্ত সময় জেলের বাইরে বেশি সময় তাঁকে থাকতে হয় নি। তাই বোধ হয় দেওঘর ষড়যন্ত্র মামলায় ২১ জন অভিযুক্তের মধ্যে ধরানাথের নামটিও দেখতে পাওয়া যায়।

ধরানাথের জীবনের আর একটি উল্লেখ-যোগ্য ঘটনা, বিশেষ করে স্বাধীনতা অর্জনের পর থেকে—দেশে শিক্ষা বিস্তারের জন্যে আন্তরিক প্রচেষ্টা। এই সম্বন্ধে তিনি একদিন বলেছিলেন, তাঁর জীবনে কমপক্ষে ২০টি স্কুল ও কলেজ প্রতিষ্ঠার ব্যবস্থা করা সম্ভব হয়েছিল। আর শেষ চেষ্টা চলছিল হরিপাল কলেজ প্রতিষ্ঠার। এই চেষ্টা প্রায় পূর্ণতায় পৌঁছে দিয়েই ১৩ই ডিসেম্বর ১৯৬৮ সালের প্রভাতে স্নানাদি নিত্যকর্ম শেষ করে গীতাপাঠ করতে করতে তিনি সেদিন শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করে গেছেন। এ যেন স্বর্গীয় গিরিশচন্দ্রের ভাষায়—

ফোটে ফুল সৌরভ হৃদয়ে ধরি
সৌরভ বিতরি
আপনি শুকায়ে যায়
মৃত্যুভয় আছে কি কুসুমে!

কলগেট ব্যবহার করে মুখের দুর্গন্ধ দূর করুন ৩ মিনিটে দন্তক্ষয় রোধ করুন!

কারণঃ একবার মাত্র কলগেট ডেণ্টাল ক্রীম দিয়ে দাঁত ব্রাশ করলেই দুর্গন্ধ ও ক্ষয়ের জন্য দায়ী বীজাণুর শতকরা ৮৫ ভাগ পর্যন্ত দূর হয়ে যাবে

বৈজ্ঞানিক পরীক্ষায় প্রমাণিত হয়েছে যে কলগেট প্রতি ১০ জনের মধ্যে ৭ জনের মুখের দুর্গন্ধ সঙ্গে সঙ্গেই দূর করে দেয় এবং কলগেট প্রক্রিয়ায় খাওয়ার ঠিক পরে দাঁত ব্রাশ করলে বেশীর ভাগ লোকের দন্তক্ষয় রোধ করা যায়—আজ পর্যন্ত দন্ত-চিকিৎসার ইতিহাসে যেমনটি আর কখনো দেখা যায়নি! আর একমাত্র কলগেট'এর সেই প্রমাণ আছে।

কী সুন্দর এর পিপারমেণ্টের সুস্বাদ—তাই ছেলেমেয়েরা কলগেট ডেণ্টাল ক্রীম দিয়ে নিয়মিত দাঁত ব্রাশ করতে ভালবাসে!

ধরি পাউডার পছন্দ করেন, কলগেট টুথ পাউডারে এ সব গুণই পাবেন। এক কৌটো পাউডার কয়েক মাস চলবে।

পরিচ্ছন্ন নির্মল শ্বাসপ্রশ্বাস নিতে এবং দাঁতকে উজ্জ্বল সাদা করতে···পৃথিবীর অন্য যে কোন টুথপেষ্টের চেয়ে কলগেট অনেক বেশী লোক কেনেন।

এখন! সুপার সাইজ কিনে পয়সা বাঁচান!

DCA-38 BN

পথ কে রুখবে?

মনোজ বসু

[পূর্ব-প্রকাশিতের পর]

॥ একত্রিশ ॥

চারজন এসেছে। ফুল্লরা এসে দাঁড়াল। নমস্কার করে সকলের দিকে মুখ ঘুরিয়ে নিল একবার। যে চেয়ারটা খালি ছিল, তার উপরে বসে পড়ল।

পাত্র এবং বন্ধুরা হকচকিয়ে গেছে। গাঁয়ের মেয়ের এতখানি সপ্রতিভতা ভাবতে পারে নি।

মিনিটখানেক স্তব্ধ হয়ে বসে রইল ফুল্লরা। তারপর মৃদুকণ্ঠে বলে, কিছু জিজ্ঞাসা করবেন না?

চারের মধ্যে এক ছোকরার ছাঁটাই-করা মনোরম গোঁফ ও দাড়ি, গায়ে ছাপা-সিল্কের ঘুশসার্ট। কথাবার্তা যত-কিছু সে-ই বলছে। তাকে লক্ষ্য করে ফুল্লরা বলল, কিছু প্রশ্ন থাকে তো বলুন।

ছোকরা বলল, শিক্ষা-দীক্ষার ভার যিনি নিয়েছিলেন, তাঁর খ্যাতি দেশ-জোড়া। আমিও কিছুদিন ছাত্র ছিলাম তাঁর। বিস্তর গাধাকে তিনি ঘোড়া বানিয়ে দিয়েছেন।

মুখ টিপে হেসে ফুল্লরা বক্তাকে তাকিয়ে দেখল। ছোকরা থতমত খেয়ে যায়। গাধাকে ঘোড়া বানানোর কথা বলল—তার চেহারাবার ভিতর-পূর্বতন গাধাকে খোঁজে নাকি মেয়েটা?

কথা শেষ করে দিল ছোকরা ঃ প্রশ্ন আবার কি থাকবে?

বোবা কিনা, অন্তত সেই পরীক্ষার জন্যেও তো জিজ্ঞাসাবাদ করতে হয়।

ছোকরা হেসে বলে, কথা বলে আপনি নিজে থেকেই তো সন্দেহ ভঞ্জন করে দিয়েছেন। ইচ্ছে করলে আপনি চলে যেতে পারেন।

ফুল্লরা উঠে দাঁড়াল। মুহূর্তকাল ইতস্তত করে বলে, সুব্রতবাবুটি কে আপনাদের মধ্যে?

পাত্রের নাম ধরে পাত্রী জিজ্ঞাসা করে—হতভম্ব হয়ে গেছে সকলে। ছাঁটা-গোঁফ-দাড়ি সেই ছোকরাই আবার বলে ওঠে, উঠে দাঁড়া সুব্রত। তোকে দেখতে চাইছেন।

ফুল্লরা সহজভাবে বলে, কৌতূহল আসে কিনা বলুন। দয়া করে এতদূরে যখন পদধূলি দিয়েছেন, সন্দেহ কেন রাখব। চারজনের মধ্যে তিনি কে, জিজ্ঞাসা করে নিলাম। দোষের হল নাকি?

না, দোষের কী আর। বেশ হল। উভয়পক্ষেরই চাক্ষুষ দেখা হয়ে গেল।

ফুল্লরা চলে যাচ্ছে, মুখফোঁড় ছোকরা আবার বলে, পছন্দ হল কিনা সুব্রতকে বলে যান।

ঘাড় ফিরিয়ে ফুল্লরা বলে, বলি তাই, আর বেহায়া বলে নিন্দে রটে যাক। তা ছাড়া ব্যাপারটা নির্ভর করছে সম্পূর্ণ আপনাদের রায়ের উপরেই। আপনাদের পক্ষই সর্বেসর্বা। প্রশ্নটা আমাদেরই বরঞ্চ আপনাদের কাছে করার কথা।

ছোকরা বলে, আমাদের রায় দিতে এক মুহূর্তও সময় লাগবে না। সুব্রতর পছন্দ—ঘোরতর পছন্দ। পরমানন্দে সে স্বীকৃতি দিচ্ছে। আমাদের সর্ববাদী-সম্মত অভিমত এই। এইবারে শুনব আপনার নিজের কথা।

জবাব না দিয়ে ফুল্লরা যুক্তকরে নমস্কার করল। হাসিমুখে বলে, আমি যাই। আমি গেলে দাদু এসে বসবেন। দাদুকে আমি মানা করেছিলাম ঃ তুমি থাকলে ওঁদের অসুবিধা হবে, মন খুলে জেরা করতে পারবেন না। তা জেরা তো একেবারেই করলেন না। দাদু ঐ উঠোনে পাষচারি করছেন। নাতনি বেচারি না-জানি কত নাকানি-চোবানি খাচ্ছে—এই সমস্ত ভাবছেন আর কি।

প্রসন্ন ভঙ্গিতে ফুল্লরা চলে গেল। যেতেই উচ্ছ্বসিত কলরব উঠল ঃ এমনই তো চাই। জবড়জং শাড়ি-গয়নার এক-একটা পুঁটলি নিয়ে ঘর করা যায় আজকের দিনে?

পাত্র সুব্রত মুখ টিপে হেসে বলল, পুঁটলির একটা সুবিধা যেখানে যেমন নিয়ে রাখো, চুপচাপ তেমনিভাবে থেকে যাবে। তর্কাতর্কি করবে না, বিদ্রোহ করবে না। মতামতের বালাই নেই। পাকা উকিল-ব্যারিস্টারের মতন এ মেয়ে আমাদের পেটের ভিতরের সবগুলো কথা শুনে নিয়ে চলে গেল, নিজের মতামত কিন্তু একবর্ণ বলল না।

আর বলবে কেমন করে? হাত ধরে টেনে বলবে নাকি, চলো এক্ষুণি ছাতনা-তলায় গিয়ে বসিগে?

উভয়পক্ষেরই পছন্দ, মোটামুটি বুঝতে পারা গেল। এবং গয়না বরসজ্জা ও পণের টাকার দর-কষাকষি আজকাল বড় হয় না। তবে আর কি, দিনক্ষণ ঠিক করে ফেলা যাক। দু-হাত এক করতে পারলেই নিশ্চিন্ত। শুভকর্ম তাড়াতাড়ি সমাধা হওয়ার দরকার—সেকেলে গিন্নি-মানুষ কমলবাসিনী মেয়ে সেয়ানা বলে বলে ব্যতিব্যস্ত করে তুলেছেন।

শুভকর্ম কোনখানে সম্পন্ন হবে, বরের বাবা প্রশ্ন তুললেন। নিরর্থক প্রশ্ন—পুরুষ-পুরুষান্তর ক্রমে যেমনধারা বিধি। সারা জন্মের ব্যাপার—লক্ষণ-অলক্ষণ, এমন কি বাড়ির মানসম্ভ্রমের কথাও আছে। পুরানো পদ্ধতির এক চুল এদিক-ওদিক হবে না—হতে দেবেন না কমলবাসিনী যতদিন বর্তমান আছেন।

বীরেশ্বর বললেন, আমার বাড়িতে পদধূলি পড়বে আপনাদের সকলের। বাজি-বাজনা করে ষোল বেহারার পালকি হুমদাম আওয়াজ তুলে বর নিয়ে আসবে। শহুরে এক রাত্রির বিয়ে নয়—টিমটিমে আলোয় দশ-পনেরোটা মন্তোর পড়ে পুরুত বলে দিলেন হয়ে গেল বিয়ে, রাত পাহাড়ে না পোহাতে শোনা গেল বিদেয় হয়ে গেছে বরকনে, বউভাতের আগেই কনে ভাঁড়ারের চাবি আঁচলে বেঁধে সংসারধর্মে লেগে যায়। আমাদের গাঁ-গ্রামের বিয়েয় এলাহি ব্যাপার। সাঁজো-বিয়ে হয়ে গেল রাত্রিবেলা, পরের দুপুরে বাসি-বিয়ে। দীয়তাম্ ভুজ্যতাম্—এসো-জন বসো-জন খাচ্ছে বিয়েবাড়িতে মাস-খানেক ধরে। নিমন্ত্রিত-অভ্যাগতজনের

শোবার জন্য অস্থায়ী চালাই বা তোলা হয়েছে কত। গ্রামের কোন বাড়ি উনুনে হাঁড়ি চাপছে না বিয়ের আগে-পিছে হপ্তা-খানেক ধরে—

বর্ণনার মাঝখানে সুব্রতর বাপ বলে উঠলেন, এই নিত্যি-আকালের দিনে শুনতে খাসা লাগছে। ছিল বটে এমনি দিনকাল।

বীরেশ্বর বলেন, একমাত্র নাতনি এই আমার। বাপ নেই। সবখানি না পেরে উঠি—ওর ঠাকুরমার বড় ইচ্ছে, খানিকটা অন্তত করতেই হবে আমায়।

বরের বাপ বললেন, আমার তরফেও ঠিক সেই সমস্যা। ছেলের বিয়ে প্রথম এই আমার। পাঁচ মেয়ের পর ছেলে—আত্মীয়জনেরা মুকিয়ে আছে। বিস্তর ব্যাদসাদ দিয়েও তো বরযাত্রী শ'য়ের নিচে নামানো যাবে না।

বীরেশ্বর দরাজভাবে বললেন, বাদ দিতে কেন যাবেন? কুটুম্ব আত্মীয় যিনি আসতে চান সবাইকে আনবেন। একশ' দেড়শ' কেন, তিনশ' হলেও অসুবিধে নেই। লোক বেশি তো চাই-ই, লোক জমজমাট না হলে আবার বিয়ে কিসের? ভাববেন না আপনি। বরযাত্রী যেমন ইচ্ছা আনবেন—সংখ্যাটা মোটামুটি আগে একটু জানিয়ে দেবেন, আপনার বাপ-মায়ের আশীর্বাদে পাতে পাতে চাট্টি ডাল-ভাত দেওয়া কঠিন হবে না।

বরের বাপ বললেন, ডাল-ভাত নয় পেল্লাও-কালিয়া, সেটা বিলক্ষণ জানি। কিন্তু মুখের কথা বলে দিলেন, তাতেই তো লোক এসে হুমড়ি খেয়ে পড়বে না। যে রকম অবস্থা তাতে একলা বর এনে হাজির করতেই আমার নাভিশ্বাস উঠে যাবে। হাজারো হয়রানি ভিসা-পাশপোর্ট পেতে—বিশগণ্ডা হাত মুঠো মেলে রয়েছে, ঘুষ দিয়ে মুঠোগুলো এঁটে দিন। না মশায়, হাড়ির মধ্যে বড়ছেলে—একলা বর এসে বিয়ে করে চুপিসারে চলে যাবে, সে জিনিস হতে পাবে না।

বীরেশ্বর জোর দিয়ে বললেন, আমাদের তরফেও তো ঠিক এই কথা। আগেই বলে দিয়েছি। কী হতে পারে, ঠাণ্ডা মাথায় বিবেচনা করুন এবারে।

বিবেচনার কি আছে? দিন স্থির করে আপনারা কলকাতায় চলে আসুন।

বীরেশ্বর বললেন, সে-ও তো একরকম শুকো মেয়ে নিয়ে হাজির করা। বিয়ের আগে পাত্রপক্ষের জায়গায় মেয়ে নিয়ে তোলা—'তোলা-বিয়ে' তাকে বলে। খুবই অপমানের ব্যাপার। তেমন ক্ষেত্রে আমার আত্মীয়স্বজনরাও তো বিয়েয় যোগ দিতে পারবেন না।

কেন, পার হয়ে কতই তো চলে গেছেন। বেশি তো তাঁরাই। হিন্দুস্থানে আত্মীয়ের অভাব হবে কিসে?

ঘাড় নেড়ে দৃঢ়কণ্ঠে বীরেশ্বর বললেন, অনেক তবু রয়ে গেছেন এপারে। দুঃখকষ্ট উপেক্ষা করে পিতৃপুরুষের ভিটার উপর আছেন। পাকিস্তানে রয়ে গেছেন বলে সমাজ-সামাজিকতার ব্যাপারে তাঁরা বাদ পড়বেন, এ জিনিস হতে দিতে পারিনে। একত্রে আমরা অহরহ হাজার রকম দুশ্চিন্তা বয়ে বেড়াই, আমোদ-উৎসবের বেলা সেই মানুষগুলোকে ছেড়ে টুক করে ওপারে চলে যাবো, সে জিনিস কেমন করে হয়?

পাত্রের বাপ বললেন, সমস্যা শুনে গেলাম—বাড়ি গিয়ে সকলের সঙ্গে পরামর্শ করে দেখিগে। এখন অকাল চলছে—শুভকর্ম ফাল্গুন কি বৈশাখের আগে হচ্ছে না। দেখা যাক ভেবেচিন্তে।

পছন্দের মেয়ে। নাতনিকে দেওয়া-থোওয়ার ব্যাপারে বীরেশ্বর কৃপণতা করবেন না, সে-ও জানা। ইত্যাদি বিবেচনা করে বরের বাপ সম্বন্ধ সঙ্গে সঙ্গে কেটে দিতে পারলেন না। লম্বা সময় হাতে নিয়ে তিনি বাড়ি ফেরত চললেন।

ফুল্লরা বীরেশ্বরকে বলল, বেশ শুনিয়ে দিয়েছ। দাদু তুমি এমন খাসা!

বীরেশ্বর বলেন, কী জানি, আমি আরও কত কি ভাবছিলাম। চটেমটে তুই কথাই বলবিনে আমার সঙ্গে। বর পছন্দ হয়ে গেছে, রকমারি ফ্যাকড়া তুলে মিলনের ব্যাঘাত ঘটাচ্ছি আমি—

ফুল্লরা অবহেলা ভরে বলে, পছন্দর জন্যে কি? কানা-খোঁড়া গলা-কাটা না হলেই হল। বলে দিচ্ছি দাদু, পুরোপুরি—আস্ত যে-কোন পাত্র হাজির কোরো—সঙ্গে সঙ্গে পছন্দ করে ফেলব। আমার অত বায়নাক্কা নেই। তা-ই বা কেন—তুমি একলাই পছন্দ কোরো, তোমার পছন্দে আমার পছন্দ। তুমি হুকুম করবে, মাথায় ঘোমটা তুলে সুড়সুড় করে অমনি ছাতনা-তলায় গিয়ে বসব। ভালমন্দ একটি কথাও বলতে যাব না। পাত্রপক্ষের কোট ষোল-আনা বজায় থাকবে, মেয়ের পক্ষ বলে আমাদের কথার দাম হবে না—এ জিনিস কক্ষণো হবে না। ঠিক করেছ তুমি দাদু, বড্ড বাঁচান বাঁচিয়ে দিয়েছ। নইলে তুমি হয়তো ঠিকঠাক করে ফেলেছ, রওনা হবার মুখে কনে বেঁকে বসল। ঝাঁকা-মুটের মতন মেয়ে ঘাড়ে নিয়ে হাজির হবে, তাতে আমার অপমান।

ঠাকুরদা-নাতনিতে চুপিসারে কথা-বার্তা। কমলবাসিনী ইতিমধ্যে ঘটক-মশায়ের কাছে সবিস্তারে শুনলেন। শুনে তো মারমূর্তি বীরেশ্বরের উপর: নিজেদের উদ্যোগে কিছু তো হয় না—এত চেষ্টায় ঘটকমশায়কে দিয়ে একটা ভাল সম্বন্ধ জোটানো গেল—দিলে সেটা ভেস্তে। থুবড়ো মেয়ের বিয়ে দিতে পারলেই লোকে বর্তে যায়, ঘটা হতে পারবে না বলে উনি এখন মোচড় দিতে গেলেন।

বুঝিয়ে-সুজিয়ে ঠাণ্ডা করেন বীরেশ্বর: ভেস্তে গেল কিসে? বাড়িতে শলাপরামর্শ না করে উনি জবাব দিতে পারলেন না। গিয়েই চিঠি দেবেন। তার পরে আমরাও লিখতে পারব আবার। কথাবার্তার সবে তো শুরু—লাখ কথা ছাড়া বিয়ে হয় না। ডাকে ছেড়েছেন চিঠি এদ্দিনে, দু-পাঁচ দিনের মধ্যে এসে যাবে। পাকিস্তানের চিঠি পৌঁছানো চাট্টিখানি কথা নয়।

এক মাস যায় দু-মাস যায়, এলো না কোন চিঠি সুব্রতর বাপের কাছ থেকে। কমলবাসিনী অধীর হয়ে উঠেছেন: চিঠি লিখতে বয়ে গেছে ভদ্রলোকের। ওসব ছেলে পড়তে পায় না। এত ফৈজত করে বাড়ি অবধি এসে উঠল, সে মাণিক হেলায় হারালে। ওসব জানি নে, এ বছরের মধ্যে নাতনিকে সাতপাক আমি ঘোরাবই এ ছেলে না হয়, অন্য ছেলে।

তারই পরে লড়াই বাধল পাকিস্তানে আর হিন্দুস্থানে। হায়রে হায়, এক দেশ কেটে দু-খানা করে সুখ নেই, খবরের-কাগজ ও রেডিও'র বেধড়ক গালিগালাজেও যথেষ্ট হল না—রণমত্ত দুই শত্রুদেশ! এই না হলে এত চক্রান্তের ভাগাভাগির ফল কি? হুবহু একই রকমের মানুষজন

অবশ্যই। চন্দ্রগুপ্ত

সাপ্তাহিক বসুমতীতে উক্ত শিরোনামায় দীর্ঘ দু বছর (১৯৬৬-৬৮) ধরে যে রচনাগুলি পাঠকমহলে প্রভূত আলোড়ন ও আলোচনার সৃষ্টি করেছিল, বর্তমান গ্রন্থ তারই নির্বাচিত সংকলন। বর্তমান সমাজের নানাবিধ অন্যায় অবিচার ও ভণ্ডামির উদ্ঘাটনে চন্দ্রগুপ্তের লেখনী যেমন শাণিত ও সাহসী, রবীন্দ্রনাথ, নজরুল ও জীবনানন্দের সাহিত্যকৃতি সম্পর্কিত আলোচনায় তেমনই সরস ও স্নিগ্ধ। নিঃসন্দেহেই অবশ্যই সমাজচেতন ও মননজীবীদের অবশ্যপাঠ্য। দাম ৬.০০।

পিলগ্রিম পাবলিশার্স । ১৮-বি/১-বি, টেমার লেন, কলকাতা—৯

ভূ'ইফোঁড় সাজপোশাক কথাবার্তা—কোন্ দিন হয়তো শোনা যাবে, কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে হুট করে ওরা এক হয়ে গেছে। হয়ে আসছেও তাই ঘোর বেগে। অতএব দেরি নয় আর—ডাঙায় ছুটাও ট্যাঙ্ক, আকাশে বম্বার। মানুষ যত ঘায়েল হল আর না হল—মিলমিশের যে বেয়াড়া কথাবার্তা উঠছিল, গুলিগোলা ছিন্নভিন্ন করে দিক সেগুলো।

তবু জুত হল না তেমন—লড়াই বাইশ দিনের বেশি জিইয়ে রাখা গেল না। এবং দুই বাংলার মধ্যে তো একেবারে কিছুই নয়। তবে অজুহাত পাওয়া গেল বটে। পাশপোর্ট-ভিসা বন্ধ, চলাচল বন্ধ করে দাও উভয় বঙ্গের মধ্যে। মুখ দেখাদেখি বন্ধ হলে প্রাণের টান কমে আসবে।

হরি—হরি! কলসির মুখে জল ঢালতে দেবে না—কিন্তু এ যে সেই পৌরাণিক ছিদ্রকুম্ভ! ছিদ্রপথে শতেক ধারে জল পড়ছে। আগেও ছিল না যে তা নয়—পাশপোর্ট করে যারা যেত হিসাবের মধ্যে পাওয়া যেত তাদের। তার বাইরেও যেত কিন্তর মানুষ—কিন্তু এবারের এই কাণ্ড ভাবতে পারা যায় না। আইনের পথ সম্পূর্ণ বন্ধ হয়ে আবালবৃদ্ধ ব্লাকের পথে দেখতে দেখতে পুরোদস্তুর ওস্তাদ হয়ে গেল—ব্লাকে চলাচল, ব্লাকে ব্যাপার বাণিজ্য। এর পরে দরাজ হাতে পাশপোর্ট ছাড়লেও লোকে কি আর তেমনিধারা লাইন দিতে যাবে? ব্লাকে কিন্তর সুবিধা—ইচ্ছে হলেই বেরিয়ে পড়লাম। ছ' মাস আগে থেকে এ-বাবুকে খোশামুদি ও-সাহেবের কাছে ধন্না দেওয়া ইত্যাদি তদ্বির করে বেড়াতে হবে না। খরচা উভয়ত্র। কিন্তু ব্লাকে দরদাম চলে, ঘাটোয়ালরা বিবেচনাশীল সহৃদয় মানুষ—লোকের অবস্থা বিশেষ অবস্থা। ঝামেলা বিন্দুমাত্র নেই—কি কি মাল পাচার করছেন কি-ই বা সঙ্গে নিয়ে এলেন, এপারে-ওপারের কোন ব্যক্তি চোখ তুলে দেখতে যাবে না।

কমলবাসিনী দিনকে-দিন ক্ষেপে যাচ্ছেন। নাতনির ছেলেপুলে দিয়ে বংশের ধারাটা বজায় থাকত, সে যেন আর হবার নয়। ফুল্লরা আইবুড়ো থেকে যাবে এমনি যেন সন্দেহ আসে। বীরেশ্বরই এর মূলে। স্বাধীনতার পর থেকে সর্বনাশ চতুর্দিকে, এরই মধ্যে উনি আগের মতন জাঁকজমকের বায়নাক্কা তুললেন। এত বয়স্ক এবং এমন পণ্ডিত মানুষ হয়েও বুঝলেন না যে, সে-জিনিস আর হবার নয়। পাত্র বাড়ির উপরে এসেছিল—রত্নমাণিক হাতের মুঠোয় পেয়ে ছুঁড়ে ফেলে দিলেন।

ঘটকমশায়কে কাকুতিমিনতি করে কমলবাসিনী পুনশ্চ চিঠি দিয়েছিলেন। জবাব এলো না। লোক পাঠানো হলে, ফিরে এসে সে-লোক খবর দিল ঘটক-মশায়ও হিন্দুস্থানে সরেছেন। স্বাধীনতার গোড়াতেই দুই ছেলে ওপার গিয়ে উঠে-ছিল, লড়াই অন্তে এবারে বাপকেও জোরজার করে নিজেদের কাছে নিয়ে তুলেছে। বাস্, হয়ে গেল। ছুটোছুটি করে এবং চিঠিপত্র লিখে সম্বন্ধ নতুন করে জুড়ে-গেঁথে দেবার মানুষ কেউ রইল না।

যত রাগ এখন বীরেশ্বরের উপরে। সময় সময় ক্ষেপে ওঠেন কমলবাসিনী চোখ-মুখের ভঙ্গি দেখে বীরেশ্বর শঙ্কিত হয়ে পড়েন—আবার সেইরকম মাথা খারাপ না হয়, লাহোরের সর্বনাশের পর যেমন-ধারা হয়েছিল।

কী করা যায় এখন?

গ্রামের বাসিন্দা রঘুনাথ দাস মহাকুমা-শহরে থেকে মোক্তারী করেন। ঘুঘু লোক, মোক্তারির বাইরেও নানান ফিকিরে রোজ-গার। ভাইয়ের ছেলের অন্নপ্রাসন উপলক্ষে রঘু দাস বাড়ি এলেন কয়েকদিনের জন্য। বীরেশ্বর তাঁর কাছে চলে গেলেন। কমল-বাসিনীর কথা সব বললেন। বললেন, নাতনির বর না জোটালে আর উপায় নেই মোক্তারমশায়। ঘটকমশায় ওপারে, তাঁকে আর পাচ্ছি নে। ওপারেও অনেক আছে আমার কিন্তর বন্ধুবান্ধব। গিয়ে পড়লে যেছেগুছে সম্বন্ধ একটা ঠিক করা যাবে না, এমন মনে করি নে। তা ছাড়া নিজেও ওমুখ দিকে কতদিন যাই নি—একই তো ছিলাম আমরা—বড্ড মন কেমন করে সময় সময়।

মোক্তার এক কথায় বলে দিলেন, সেই ভাল। চলে যান নাতনিকে নিয়ে।

কিন্তু যাই কি করে? লড়াই থেকে পাশপোর্ট বন্ধ, যাতায়াতের কড়াকড়ি।

রঘু দাস মোক্তার ভ্রূভঙ্গি করে বললেন, ঘোড়ার ডিম! গরজ বড় বালাই। লাইন কেটে মাটি ভাগ করলেই সঙ্গে সঙ্গে মানুষ অমনি ভাগ হয়ে যায় না। বর্ডার সিল করে দেবার পর যাতায়াত চার-পাঁচ গুণ বেড়ে গেছে। হরবখত দেখতে পাচ্ছি।

বীরেশ্বর বললেন, গিয়ে একবার উঠতে পারলে তারপরে অবিশ্যি অসুবিধা নেই। ফুল্লরার ছোটমামা হিন্দুস্থানে। সেখানে রেখে যত খুশি মেয়ে দেখানো যাবে। ভাল সম্বন্ধ একটা না একটা যাবেই গেঁথে।

মোক্তার জোর দিয়ে বললেন, রওনা হয়ে পড়ুন দু'-পাঁচ দিনের ভিতর। মানুষ পটাপট চলে যাচ্ছে, আপনি ভয় পাচ্ছেন কেন জানিনে।

বীরেশ্বর ইতস্তত করে বলেন, ব্লাকে যাওয়া কিনা। চিরকেলে মাস্টার মানুষ—বাঁকা পথে চলি নি কখনো। তায় বুড়ো হয়ে পড়েছি, সঙ্গে সোমত্ত মেয়ে—

রঘু দাস মোক্তার দরাজভাবে বললেন, নির্ভাবনায় চলে যান। পাশপোর্ট-ভিসা করে বেনাপোলে পেট্রোপোলে দাঁড়ি আসামীর মতো দু-দুবার খানাতল্লাসি আর হয়রানি—তার চেয়ে অনেক ভাল যেতে পারবেন।

মল্লিকঘাটের কথা তাঁর মুখে শুনলেন তখন। পথ কিছু ঘুর হলেও ঐ ঘাটে পার হওয়া ভাল। ভারি চমৎকার ব্যবস্থা, এপারে ওপারে ঘাটোয়াল দুটিও ভাল। এপারের ঘাটোয়াল আনোয়ার। কাজি-বাড়ির ছেলে, বনেদি বংশ—আমার সঙ্গেও কাজকর্ম আছে। যাবার মুখে আমার বাসা হয়ে যাবেন, চিঠি দিয়ে দেবো আনোয়ারের নামে।

{ ক্রমশঃ }

ঘরের কাজকর্ম করতে আপনার হাত ঘুটি দিনে বেশ কয়েকবার নোংরা হয়ে যায়। হোমাকল একটু বাঁকিয়ে ধরে আঙুলের ডগায় লাগিয়ে হাতে ঘসে নিন। ফেনা হবে। হাত ধুয়ে নিন, দেখবেন পরিষ্কার আর সুগন্ধময় হয়ে যাবে। সময় অপচয় নেই। আধুনিক জীবনধারণে হোমাকল দরকার। ঘরের জন্য আদর্শ, হাসপাতাল, অফিস এবং ফ্যাক্টরীর জন্য অবশ্য প্রয়োজনীয়। নানা আকর্ষক প্যাকিং-এ এবং মনোরম গন্ধে হোমাকল পাবেন।

নন্দ-কিশোর খান্না এণ্ড সন্স
জিরশ চেম্বারস, তাবদেও রোড
বোম্বে-৩৪ ফোন : ৩৭৮-৩৬০
প্রতিনিধিহীন এলাকায় পরিবেশক চাই

কলিকাতার ডিস্ট্রিবিউটর :
মেসার্স ভিক্টরী এণ্টারপ্রাইজ "শ্যামকুঞ্জ"
১২, লর্ড সিন্‌হা রোড, কলিকাতা-১৬
টেলিফোন নং : ৪৪-৩০৭৩

রঙ্গমঞ্চ তখনে এবং এখনে

[পূর্ব-প্রকাশিতের পর]

জে, বি, ফাগান ও অক্সফোর্ড প্লে হাউস : ফাগানের দলটিতে বহু প্রতিভাবান তরুণ-তরুণী এসে যোগ দিয়েছিল। এর ভেতর ছিল টাইরন গাথরি, এলান নিপিয়ার, জেমস হোয়েল, পিটার ক্রেসওয়েল ও রিচার্ড গর্ডন। নায়িকার ভূমিকায় নামতেন ফাগানের স্ত্রী ম্যারী গ্রে। রয়েল আকাডেমী অভ্ ড্রামাটিক আর্ট থেকে বেরিয়ে কয়েকদিন বাদেই জন গিলগুড এখানে এসে যোগ দিলেন। অন্যান্য আরও যাঁরা এলেন তার ভেতর ছিলেন ফ্লোরা রোব্সন, রেমণ্ড মেসী, ফ্রেড ও'ডোনোভ্যান, ভেরোনিকা টারলে, গ্লেন বায়াম শ, রবার্ট মরলে এবং রেজিন্যাল্ড ডেনহ্যাম—যিনি পরে সহকারী প্রডিউসার হয়েছিলেন। ম্যারী গ্রে এবং ফ্রেড ও'ডোনোভ্যান ছাড়া বাকী সবাই ছিলেন নাট্যমঞ্চে নতুন এবং অপরিচিত। ফাগানের একটা অদ্ভুত ক্ষমতা ছিল—তিনি বিকাশোন্মুখ প্রতিভার শিল্পীদের আগে থেকেই চিনতে পারতেন।

প্লে হাউসের শুভ উদ্বোধন হল ১৯২৩ সালের মাইকেল মাস টার্মে 'হার্টব্রেক হাউস' নাটক দিয়ে। প্রোগ্রামের বাকী নাট্যতালিকা ছিল এইরকমঃ 'দি ইম্পরটেন্স অফ বিয়িং আর্নেস্ট'। গোল্ডোনীর 'মিরানডোলিনা'। সেইন্ট জন হ্যাঙ্কিনের 'দি রিটার্ন অফ দি প্রডিগ্যাল', 'দি মাস্টার বিল্ডার', দ্য মুসের 'নো ট্রাইফলিং উইথ লাভ' ও 'দি রাইভ্যালস'।

আণ্ডারগ্র্যাজুয়েট দর্শকদের পক্ষে এটি ছিল একটি আকর্ষণীয় নাট্যতালিকা। এ জাতীয় দর্শকদের খুশি করা খুব সহজ কাজ নয়। আণ্ডারগ্র্যাজুয়েট দর্শকের মনটা সব সময়েই একটা অস্বাভাবিক সেমি-সফিশটিকেটেড অবস্থায় থাকে। এর ফলে তার মননশক্তি অত্যন্ত আত্মসচেতন হয়ে থাকে—থিয়েটারে ইমোশানের প্রভাবমুক্ত হয়ে থাকতে হবে এই চিন্তা মাথায় নিয়েই সে অভিনয় দেখতে আসে। তার সব সময় ভয়, পাছে কেউ তাকে সেণ্টিমেণ্টাল ভাবে—এর ফলে ভাবাবেগের সঙ্গে ভাবাহত হওয়াকে প্রায়ই গুলিয়ে ফেলে। অন্যান্য অনেক পরিণত শ্রেণীর প্যাশন সম্বন্ধেও তার অভিজ্ঞতা না থাকাতে সে-সব জিনিস তার কাছে একটু হাস্যকরই মনে হয়। যেহেতু নিজের মনের দৃঢ়তা নেই, সেজন্য সব সময়েই ভয় পায় সে ভাবাপ্লুত হয়ে পড়বে এবং আত্মরক্ষার জন্য বিদ্রূপ এবং উপহাসকে বর্মস্বরূপ অবলম্বন করে। অথচ সে স্টাইল, কাব্যসৌন্দর্য, উইট সব কিছুই ঠিকমত ধরতে পারে এবং আলোচনায় মেতে উঠে আনন্দ পায়।

His reactions to everything that he enjoys are quick, lively and generous.

১৯২৪ সালে "সেইণ্ট জোন্" নাটকে সিবিল থর্নডাইক।

যে সব নাটক ফাগান তাঁর প্রথম প্রোগ্রামের জন্য ঠিক করেছিলেন, তার সাতটির মধ্যে ছ'টিই ছিল সর্বজনস্বীকৃত মাস্টারপিসেস। আর এক 'দি মাস্টার বিল্ডার' নাটকটি ছাড়া অন্য সব প্লে'গুলো ভাবাবেগের ওপর নির্ভরশীল ছিল না মোটেই—এদের উপজীব্য ছিল সরস উক্তি, বাচনভঙ্গী, উল্লাসের দিক এবং যুক্তি-তর্কের অবতারণার ওপর। 'মাস্টার বিল্ডার' নাটকটিকেও আণ্ডারগ্র্যাজুয়েট দর্শকেরা অন্তর থেকেই গ্রহণ করেছিল—কারণ এর জটিল সাংস্কৃতিকতার ব্যাপারটা নিয়েই তারা মাথা ঘামাচ্ছিল—নাটকের ভাবাবেগের দিকগুলো তাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে নি।

এই সিজনে সেইণ্ট জন হ্যাঙ্কিনের 'দি রিটার্ন অফ দি প্রডিগ্যাল' নাটকটি অত্যন্ত জনপ্রিয়তা এবং সাফল্য অর্জন করেছিল। অথচ পরে এ নাটকের নামও লোকে ভুলে গেছে।

এই সময়কার থিয়েটার দেখে আমি কিন্তু অনেক বিষয়ে ওয়াকিবহাল হতে পেরেছিলাম। এখানকার নাটক এবং অভিনয় আমাকে বিস্মিত এবং উত্তেজিত করে তুলেছিল। ফাগানের দলটি দি অক্সফোর্ড প্লেয়ার্স নামেই পরিচিত ছিল। অভিনেতারা বেশির ভাগই ছিল অল্পবয়সী এবং অনভিজ্ঞ—তাদের অভিনয়ে পরিণত প্রতিভার ছাপ ছিল না বটে, কিন্তু ছিল যথেষ্ট প্রাণবন্ত এবং সতেজ ভাব, ছিল কল্পনার বিস্তার এবং উৎসুক আগ্রহের ভঙ্গী। এই গুণগুলো আগে মঞ্চাভিনয়ে দেখবার সুযোগ আমার হয় নি। আমি যে ধরণের অভিনয় দেখতে অভ্যস্ত ছিলাম তা হচ্ছে, লণ্ডনের কোন নাটকের মূল অভিনেতাদের অভিনয়ের অনুকরণ, অথবা লণ্ডনের রেপারটরীর অভিনীত নাটকের বড় বড় ভূমিকাভিনেতাদের সফর করবার সময় নিজ নিজ রোলের একঘেয়ে পুনরাবৃত্তি অথবা ওয়েস্ট এণ্ড এ্যাক্টরের নিজের পুরনো ভূমিকার একঘেয়ে ধরণের অভিনয়। দীর্ঘদিন লণ্ডনে ঐ সব নাটকের একটানা অভিনয় হওয়াতে নটনটীরা আগে থেকেই সফরে আসবার সময় নিজেদের ভূমিকা বিষয়ে বীতশ্রদ্ধ হয়ে থাকতো এবং সেই ভাবেই প্রভাবিত হয়ে সফরের সময় অভিনয় করতো। অক্সফোর্ড প্লে হাউসেই আমি প্রথম নতুনভাবে সৃষ্ট নাটকের প্রডাকসন দেখি—এসব নাটকে হয়তো দোষত্রুটি থাকতো—কিন্তু এগুলো যে যথেষ্ট সজীব এবং তাজা ছিল একথা জোর গলায় বলা যায়। ওয়েস্ট এণ্ডের সফররত দলের পুরনো কাসুন্দি ঘাঁটবার প্রয়াসের থেকে ফাগানের প্রডাকসন আমাদের কাছে অনেক বেশি মর্মস্পর্শী মনে হোত।

একটা কথা মনে রাখা দরকার—অক্সফোর্ডের প্লেয়াররা ঠিক সাধারণ রেপারটরী দলের মত ছিলেন না। এঁদের যে সব গুণাগুণ ছিল রেপারটরীর দলে তা পাওয়া যায় না। রেপারটরীতে সাধারণত কি হয়? বছরের প্রতি সপ্তাহে তারা একটি করে নাটক অভিনয় করে। কোন বড় অভিনেতা অমুক নাটকের অমুক রোল কিভাবে অভিনয় করেছিল দেখে, রেপারটরীর সেই রোলের অভিনেতা সেই বড় অভিনেতার অভিনয়ভঙ্গী অনুকরণ করেই চরিত্রটি দাঁড় করাতে চেষ্টা করে—অভিনয়ের দুর্বলতাকে ঢাকতে চায় চাকচিক্যপূর্ণ ভাসা ভাসা তথাকথিত টেক্নিকের দ্বারা। কতকগুলো চিরাচরিত

একঘেয়ে 'কায়দা-কানুন' এবং 'থেল্' দেখিয়ে আসর মাতিয়ে রাখবার চেষ্টা করে —কিন্তু এসব নাটকের প্রদর্শনীতে সত্যিকার শিল্পসৃষ্টির প্রয়াসেরই অভাবটা বিশেষভাবে চোখে পড়ে। অক্সফোর্ড প্লে' হাউসে বছরে সর্বসমেত একুশটি প্রডাকসন হোত। সিজন ছিল তিনটি। এক সিজনে সাত সপ্তাহ। এর ফলে রেপারটরী দলগুলোর তুলনায় প্লে' হাউসের অভিনেতারা অনেক বেশি সময় নিয়ে ভালভাবে রিহার্স করতে পারতো। সাধারণ রেপারটরীর অভিনেতাকে কর্মশক্তি অক্ষুণ্ণ রাখতে হয় —এজন্য যতটা সম্ভব কম রিহার্সাল দেওয়া হয়, যাতে সে যথেষ্ট অবসর এবং বিশ্রাম লাভ করতে পারে। এ ব্যবস্থা না করলে সপ্তাহের পর সপ্তাহ, মাসের পর মাস তাকে দিয়ে অভিনয় করানো সম্ভবপর হয় না। কিন্তু সাত সপ্তাহের সিজনে অভিনেতা প্রাণপণ করে পরিশ্রম করতে পারে—সে জানে সাত সপ্তাহ কেটে গেলে সে বিশ্রামের জন্য অবসর পাবে—তার ফলে তার সমস্ত শারীরিক গ্লানি এবং ক্লান্তির অপনোদন হবে। প্লে' হাউসে কিছু খারাপ প্রদর্শনীও আমি দেখেছি। কিন্তু এমন কোন প্রডাকসন দেখি নি যাকে অসাড়, একঘেয়ে বা নির্জীব আখ্যা দেওয়া চলে।

এরপর নর্মান মার্শাল লিখেছেন ঃ প্লে' হাউসের উন্নতমানের অভিনয় যে শুধুমাত্র সংক্ষিপ্ত সিজনের জন্যই সম্ভব হয়েছিল একথা বলা ঠিক হবে না। এ দলটিতে যারা ছিল তাদের ভেতর প্রায় সবারই ছিল অসামান্য প্রতিভা। এদের অনেকেই পরে রঙ্গজগতে বিরাট নাম-যশ এবং খ্যাতির অধিকারী হিসাবে নিজেদের প্রতিষ্ঠিত করতে পেরেছে। কিন্তু ১৯২৩ সালে এরা সবাই ছিল প্রায় প্রাথমিক শিক্ষার্থী নটনটীর মত।

যে সব গুণ পরবর্তী জীবনে অভিজ্ঞতা এবং অধ্যবসায়ের ফলে এই সব অভিনেতা-অভিনেত্রী অর্জন করেছিল, শুরুতে সে সব গুণ না থাকলেও তার অভাব পূরণ করতো অন্য ধরণের কয়েকটি বিশেষত্ব। বয়সের সঙ্গে সঙ্গে অভিজ্ঞতা, টেকনিক এবং ম্যাচিওরিটি লাভের পর ঐ সব বিশেষত্বকেও আপনা থেকেই তাদের বাদ দিতে হয়েছিল। কারণ এই দুটো দিক ছিল পরস্পরবিরোধী।

১৯৪৩ সালে হে-মার্কেটে 'লাভ্ ফর লাভ-এ' জন গিলগুডের ভ্যালেনটিন দেখতে দেখতে বারবার আমার বিশ বছর আগে অক্সফোর্ড প্লে' হাউসে তাঁর ঐ পার্টের আদি অভিনয়ের কথা স্মরণ হচ্ছিল। মনে মনে এই দুই অভিনয়ের তুলনাও করছিলাম। এ কথা বলছি না যে, অতদিন আগেকার প্রদর্শনীর সব কিছু আমার স্মরণে ছিল, অবশ্য তার জন্য ক্ষতিও বিশেষ হয় নি। একথা ঠিকই যে, যে সুন্দর সংলাপটি ভ্যালেনটিন এঞ্জেলিকাকে সম্বোধন করে বলছিলেন, "ইউ আর এ ওম্যান...ইত্যাদি" দিয়ে শুরু করে, হে-মার্কেট থিয়েটারে গিলগুড যে চমৎকারিত্বের সঙ্গে আবৃত্তি করেছিলেন, বিশ বছর আগে প্লে' হাউসে তাঁর পক্ষে তা সম্ভব হয় নি। হে-মার্কেটে যে অভিনয় গিলগুড করেছিলেন, তার পেছনে ছিল তাঁর বহুদিনের অভিজ্ঞতা এবং অভিনয় সম্পর্কীয় কারিগরীবিদ্যা—আর তার সঙ্গে যুক্ত ছিল তাঁর সূক্ষ্ম অনুভূতির ক্ষমতা এবং কল্পনাশক্তি। বিশ বছর আগেকার গিলগুডের টাইমিং জ্ঞানও এত সঠিক ছিল না, পংক্তিবাদনও এত সুন্দরভাবে সমতা মেনে চলতো না, কার্যকরী অভিনয়ের

"হার্টব্রেক হাউস" নাটকে রবার্ট ডোনাট ক্যাপটেন শট্ওভার এবং ডেবোরা কার এলি ডানের ভূমিকায়।

দিকগুলোও এত স্পষ্ট হোত না এবং কোথায় কিভাবে সংলাপবাদনে বিরতি দিতে হবে তাও এত নিখুঁত হোত না। কিন্তু বিশ বছরের আগেকার প্রদর্শনীতে এমন অনেক গুণাগুণ ছিল যার স্পষ্ট আভাষ দেখতে পেয়েছি হে-মার্কেটের প্রডাকসনে—

Gaiety and impudence and high spirits, fresh, ringing tones, a youthful, self-confident dash and swagger.

দুটি প্রদর্শনীতে বৈষম্য ছিল অনেক দিক থেকে—ঐক্যের দিক ছিল কল্পনাশক্তির মিশ্রণে, উপলব্ধি এবং অনুভূতির সূক্ষ্মতা এবং গভীরতায়। সংলাপের ভাষার মর্মস্পর্শী কথনে। কিন্তু এ বিষয়ে আমার আসল বক্তব্য হোল—দুটি প্রদর্শনীই হয়েছিল মনোমুগ্ধকর। অসাধারণ শক্তিসম্পন্ন যুবক গিলগুড পরিণত অভিজ্ঞতা এবং টেকনিকের অভাবকে প্রথম প্রদর্শনীতে ঢেকে দিয়েছিলেন যৌবনের নানাবিধ গুণাবলীর সাহায্যে।

টোয়েন্টিজের পর থেকে থিয়েটারগুলোতে এক অদ্ভুত ঝোঁক দেখা দিয়েছে। সেটা হচ্ছে অভিজ্ঞতা এবং টেকনিকের ওপর অতিমাত্রায় প্রাধান্য দেওয়া। এর ফলে টাটকা, সতেজ, প্রাণবন্ত যৌবনশক্তির বিকাশের সুযোগ হচ্ছে না রঙ্গমঞ্চের ওপর। খুবই দুঃখের কথা ওল্ড ভিক্—যাঁরা এক সময় নিজেদের যুবক অভিনেতাদের স্টার তৈরি করতেন—পরে তাঁরা তাঁদের প্রচলিত ধারা বিসর্জন দিয়ে বয়স্থ, প্রতিষ্ঠিত, নামডাকওলা স্টার-অভিনেতা নিয়েই থিয়েটার চালাচ্ছেন। অক্সফোর্ড প্লে হাউসের মূল দলটি, টোয়েন্টিজের ওল্ড ভিক্ এবং সমসাময়িক বার্মিংহাম রেপারটরী কোম্পানীর মতই প্রমাণ করে দিয়ে গেছে যে সঠিকভাবে বাছাই করে নিতে পারলে এবং দক্ষতার সঙ্গে প্রডাকসন করলে তরুণ অভিনেতা-অভিনেত্রী দিয়েও আলোড়ন সৃষ্টিকারী অভিনয় করানো যেতে পারে।

[প্রত্যেক দেশেই রঙ্গালয়গুলো হচ্ছে অভিনয় শিক্ষার আদর্শ পীঠস্থান। আমাদের দেশেও গিরিশচন্দ্র, অর্ধেন্দুশেখরের কাছে কত যুবক-যুবতী মঞ্চাভিনয়ের মাধ্যমে অভিনয় শিক্ষা করে ভবিষ্যতে নিজেদের স্টার হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করে গেছেন। শিশিরকুমার তো সারাজীবন ধরেই অভিনেতা-অভিনেত্রী তৈরি করে গেছেন। কিন্তু শিশিরোত্তর যুগের কথা একবার ভেবে দেখুন! আজকের দিনের মঞ্চের ভীষ্ম, দ্রোণ, কর্ণের আখড়ায় কোন নটনটী তৈরি হতে দেখেছেন? অথচ এই প্রত্যেক দলই দেখবেন দিল্লীর নাটক কলা আকাদেমী থেকে প্রতি বছর নাট্যশিক্ষার বিদ্যালয় চালাচ্ছেন দেখিয়ে বিরাট অঙ্কের টাকা আদায় করছেন। কিন্তু ঐ সব টাকা কোথায় কিভাবে মিলিয়ে যাচ্ছে, আমাদের সরকার সে বিষয়ে কোন নজর দিচ্ছেন কি? গিরিশ-অর্ধেন্দুর যুগে মঞ্চ অর্থসাহায্য পায় নি, শিশির যুগেও নয়—অথচ এদেশে সত্যিকার মঞ্চাভিনয়, নাট্য রচনা প্রভৃতি ঐ সব যুগেই হয়েছে। সুতরাং এই অর্থসংকটের দিনে এভাবে নাট্যোন্নয়নের নামে অর্থের অপচয় না ঘটিয়ে টাকাগুলো অন্যান্য ব্যাপারে, যেমন কৃষি উন্নয়ন খরচ করাটাই বিধেয় নয় কি?—লেখক]

[ক্রমশঃ]

রঙ্গজগৎ

অসামান্য ক্ষতি

যাত্রাজগতের অপ্রতিদ্বন্দ্বী শিল্পী ফণিভূষণ বিদ্যাবিনোদের জীবনাবসানে আমরা শোকস্তব্ধ। মাত্র কয়েক সপ্তাহ আগে সংগীত নাটক একাডেমি যাঁকে সম্মান জানিয়েছে; যাঁর সম্মানে যাত্রাজগৎ সারা ভারতের স্বীকৃতি লাভ করেছে; যে স্বীকৃতির জন্য পশ্চিমবঙ্গের যাত্রামোদীরা গর্বিত হয়েছে, সেই মহৎ শিল্পী আজ জীবিত নেই। সেদিনও যাঁর অভিনয় দেখার জন্য অসংখ্য মানুষ দূর-দূরান্ত থেকে ভিড় করতেন আজ আর তাঁর কণ্ঠস্বর শোনা যাবে না; সেই অঙ্গুলী সঞ্চালন আর চোখের তীক্ষ্ণ চাহনী দেখা যাবে না। যাত্রাজগতের মধ্যমণি, যাঁকে কেন্দ্র করে যাত্রার দলগুলি জনপ্রিয় হয়ে উঠেছিল তিনি তাঁর জীবন-অভিনয় শেষ করেছেন। যাত্রার এই নিষ্ঠাবান শিল্পী অভিনয়ের আসর থেকেই বিদায় নিয়ে গেছেন। জীবনের রঙ্গমঞ্চে সকলেই অভিনেতা; ফণিভূষণ ছিলেন বৃহত্তর রঙ্গমঞ্চের অভিনেতা। কৈশোরে যিনি রঙ্গমঞ্চে আবির্ভূত হয়েছিলেন এবং জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত সেই ভূমিকাকে তিনি যথার্থভাবে সম্পাদিত করেছেন। ইঞ্জিনীয়ারিং শিক্ষালাভের পর চাকুরি জীবন তাঁকে ততটা আকৃষ্ট করতে পারে নি যতটা আকর্ষণ করেছিল যাত্রাজগৎ। একাধারে তিনি হয়ে উঠেছিলেন অভিনেতা, যাত্রাপালা রচনাকার এবং উপদেষ্টা। শিল্পিজীবনের কোন কোন সময়ে তিনি চলচ্চিত্রেও অভিনয় করেছেন; হয়ত মঞ্চনাট্য জগতেও তাঁর সার্থকতার পথে বাধা ছিল না। কিন্তু যাত্রাকেই তিনি ভালবেসেছিলেন। যাত্রা যে পল্লীবাংলার লোকসংস্কৃতি এই চেতনাই তাঁকে উদ্বুদ্ধ করেছিল। তিনি বুঝেছিলেন যাত্রার মাধ্যমে পল্লীবাংলার অবহেলিত মানুষকে যে আনন্দ দেওয়া যায় আর কোন শিল্পমাধ্যম তখন এত শক্তিশালী ছিল না। যাত্রার উৎপত্তি যেখান থেকেই হোক, তিনি বুঝেছিলেন যাত্রা বাংলার নিজস্ব লোকসংস্কৃতির মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত হবে। যে সময় ফণিভূষণ যাত্রাকে জীবন বিকাশের ক্ষেত্ররূপে গ্রহণ করেছিলেন তখন যাত্রা আজকের মত এতো বেশি মর্যাদা লাভ করে নি। বর্তমান যাত্রার জনপ্রিয়তা ও মর্যাদায় ফণিভূষণের দান অনেক। সেই শিল্পনিষ্ঠা ও সাধনার কথা স্মরণ করে আমরা যাত্রাগুরু ফণিভূষণ বিদ্যাবিনোদের প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করছি।

একই সময়ে আমরা হারিয়েছি আর একজন লোকশিল্পীকে। এই লোকশিল্পী বিখ্যাত তর্জা গায়ক গুরুদাস পাল। ময়দানের জমায়েতে, বড় বড় সভায় গুরুদাস পালের গান যাঁরা শুনেছেন তাঁরা জানেন কত নির্ভীক, কত ক্ষমতাশালী ছিলেন এই শিল্পী। লোকশিল্পের এই অবজ্ঞাত সংগীতধারাকে তিনি মর্যাদার আসনে প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন সমসাময়িক চিন্তাধারা ও গণ-আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত করে। খেউড়-খিস্তি ও হাল্কা রসিকতার নিম্নস্তর থেকে তর্জাকে তিনি টেনে তুলেছিলেন এমন এক স্তরে যা শোনবার জন্য গ্রামের অশিক্ষিত মানুষের সঙ্গে শহরের শিক্ষিতরা একই আসরে জমায়েত হতেন। শহরের ও গ্রামের মানুষ একইভাবে এই সংগীতরস উপভোগ করতে পারতেন। এই সংগীতরীতির মাধ্যমে গুরুদাস পাল দেশী-বিদেশী শোষকদের চরিত্র উদ্‌ঘাটন করে—জনগণকে ঐক্যবদ্ধ হবার জন্য প্রেরণা দিতেন। তাঁর বাক্য প্রয়োগ কারো কাছে কড়া চাবুকের মত মনে হলেও—জনগণের মনের কথাই তিনি ব্যক্ত করতেন। সঙ্গে সঙ্গে শ্লেষাত্মক কথায় শ্রোতারা হাসিতে ফেটে পড়ত। জমায়েতের মঞ্চে দাঁড়িয়ে কোমর নেড়ে গুরুদাসের সেই কশাঘাত ও শ্লেষস্পর্শ সংগীত আর শোনা যাবে না। তাঁর মৃত্যু লোকশিল্পজগতে এক অপূরণীয় ক্ষতি।

সারাটা জীবন তিনি অশেষ দারিদ্র্যের সঙ্গে সংগ্রাম করেছেন। চরম দারিদ্র্যের মধ্যেও তিনি যেমন এই লোকশিল্পকে ত্যাগ করেন নি, তেমনি অর্থের জন্য তাঁর সংগীতকে অবনমিত করেন নি। এই সংগ্রামী লোকশিল্পী গুরুদাস পালকে দেশবাসী ভুলবে না। আমরা শ্রদ্ধার সঙ্গে তাঁর কথা স্মরণ করছি। —সুজন।

'মাল্যদান' ছবির নায়িকা নন্দিনী মালিয়া

চিত্রআলোচনা

কখনো মেঘ

(অগ্রদূত)

বাংলা চলচ্চিত্র জগতে অগ্রদূত পরিচালক গোষ্ঠীর একটি বিশেষ ভূমিকা আছে। তাঁদের প্রায় প্রত্যেকটি ছবি জনপ্রিয় হয়েছে। এবার তাঁদের নির্মিত 'কখনো মেঘ' একটি অপরাধধর্মী ছবি। ছবির কাহিনীকার ও চিত্রনাট্যকার প্রশান্ত দেব। তবে এতে বিদেশী গল্পের ছায়া রয়েছে। তা হলেও, ঘটনার পর ঘটনার উন্মোচন এবং শেষ সময় আসল অপরাধীকে আবিষ্কারে দর্শকরা সন্তুষ্ট হন।

অপরাধ কাহিনীর সাধারণ যা ধরণ, যাকে অপরাধী বলে সামনে দেখছি তার চেয়েও ভয়ংকর অপরাধী রয়েছে অন্তরালে। উদ্বেগ ও উৎকণ্ঠা বজায় রেখে তাকে খুঁজে বার করার মধ্যেই কাহিনীর সার্থকতা। এই ছাবিতেও আসল অপরাধী বলে যাদের দেখা গেছে, তাদের সবার ওপরে টেক্কা দিয়ে রয়েছে এক ভয়ংকর লোক। সে ছদ্মবেশে ঘুরে বেড়াচ্ছে, সেই যেন অপরাধীদের খুঁজে বার করার মহৎ কাজের ভার নিয়েছে। এদের সঙ্গে সমান পাল্লা দিয়ে কাজ করতে হয়েছে পুলিশকে। তাদেরও একজন ছদ্মবেশে এতদূর অগ্রসর হয়েছে যে—যাকে কেন্দ্র করে এত ঘটনা সেই শিক্ষয়িত্রী সীমার

সঙ্গে তার প্রেমই হয়ে গেল। জানি না সার্ভিস কোডে এটা আপত্তিকর কি না। তদন্তে গিয়ে পুলিশরা যদি ক্ষেত্র বিশেষে প্রেম করে বসে তবে ত' পুলিশের কাজটা বড় মজার!

কাহিনী গড়ে উঠেছে একদল দুর্বৃত্তের মধ্যে হীরা চুরির জন্য প্রতিযোগিতা নিয়ে। পরস্পরকে ঠকাতে গিয়ে হত্যা থেকে কিছুই বাদ যায় নি। স্কুলের শিক্ষয়িত্রী সীমা এতে জড়িয়ে পড়ে নিজের অজান্তে। তার ওপর যেমন পুলিশের নজর, তেমন দুর্বৃত্তদের নজর। সকলের ধারণা ওরই কাছে চোরাই হীরেটা লুকোনো রয়েছে। কারণ সে দুর্বৃত্তদলের সুরেশের ভাইঝি। একদিন দেখা গেল সত্যিই হীরেটা তারই বাড়িতে রয়েছে। পেয়েই সে ছুটল পুলিশের বাড়িতে। সেখানে গিয়ে তার যখন জীবন বিপন্ন—ঠিক সে সময় আশ্চর্যভাবে তার জীবন রক্ষা পেল।

সীমার চরিত্রে অভিনয় করেছেন অঞ্জনা ভৌমিক; নারায়ণ চৌধুরী বা মিঃ মুখার্জী হয়েছেন উত্তমকুমার। কালী ব্যানার্জী এখানে এক শঠ চরিত্রে অভিনয় করেছেন। সুব্রতা চ্যাটার্জী, শোভা সেন, জহর রায়, নীলিমা দাস প্রমুখ বিভিন্ন চরিত্রে অভিনয় করেছেন। দুর্বৃত্তদলে বঙ্কিম ঘোষ, তরুণ মিত্র, কানু মুখার্জী অভিনয় করেছেন।

ছবির টেকনিক্যাল দিক ও সঙ্গীত প্রশংসা পাবার মত এমন কিছু নয়।

আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র মেলা এক অভিনব প্রচেষ্টা

গত ১৪ই ডিসেম্বর রাজা সুবোধ মল্লিক স্কোয়ারে আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র মেলার উদ্বোধন হয়েছে। পার্কের অর্ধাংশব্যাপী নির্মিত বিরাট প্যাণ্ডেল, চারিদিকে আলোসজ্জা, সুসজ্জিত দুটি তোরণ, নানা রকম খাবার ও পানীয়ের তিনটি স্টল, এম্বুলেন্স কোরের সদস্যদের ও ফায়ার ব্রিগেডের এবং পুলিশের উপস্থিতি ইত্যাদিতে পার্কটি এক নতুন রূপ গ্রহণ করেছে। প্যাণ্ডেলের মধ্যে সাড়ে তিন হাজার লোকের বসার ব্যবস্থা হয়েছে—চেয়ার ও গ্যালারী মিলে। দুটি করে শো'তে ছবি দেখছেন প্রতিদিন সাত হাজার করে লোক। মেলা উপলক্ষে ফিল্ম সোসাইটি অস্থায়ী সদস্য গ্রহণ করে বহু লোককে ছবি দেখার সুযোগ দিয়েছেন।

'রাজা আউর রংক' ছবিতে কমল কাপুর ও মহেশকুমার

আনুষ্ঠানিকভাবে আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র মেলা উদ্বোধন করেন বিখ্যাত চলচ্চিত্রস্রষ্টা শ্রীমধু বসু। উদ্বোধনকালে তিনি এরূপ মেলার আয়োজনকে অভিনব প্রচেষ্টা বলে অভিনন্দন জানান। তিনি বলেন, এরূপ প্রচেষ্টায় যেমন ফিল্ম সোসাইটি মুভমেণ্টের ভাল হবে, তেমনি ভাল দর্শক তৈরির সহায়তা হবে এবং সামগ্রিকভাবে দেশীয় চলচ্চিত্র শিল্পের উন্নতির সুযোগ করে দেবে। জার্মান ডেমোক্রেটিক রিপাবলিকের মিঃ এ রেডার আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র মেলার উদ্দেশ্যকে অভিনন্দন জানিয়ে বলেন, ভাল ছবি দেখান—ভাল সমাজ গঠনের সহায়ক।

আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র মেলা কমিটির সম্পাদক শ্রীকল্পতরু সেনগুপ্ত বলেন, ফিল্ম সোসাইটি মুভমেণ্টে এই মেলা এক নতুন পদক্ষেপ। এরূপ উদ্যোগের ফলে ফিল্ম সোসাইটিগুলি মানুষের কাছাকাছি যাবার সুযোগ পাবে, সোসাইটিগুলিতে উন্নাসিকদের প্রাধান্য থাকবে না। নর্থ ক্যালকাটা ফিল্ম সোসাইটির পক্ষে শ্রীসুশীল করণ সমাগত ব্যক্তিদের এবং এই মেলা সংগঠনে যাঁরা সহায়তা করেছেন তাঁদের অভিনন্দন জানিয়ে বলেন, এরূপ আয়োজন ভারতে এই প্রথম, সুতরাং অভিজ্ঞতাও প্রথম।

মেলায় প্রথম দিন প্রদর্শিত হয় ঋত্বিক ঘটকের 'সুবর্ণরেখা'। ছবিটি দেখার জন্য প্রচুর দর্শক সমাগম হয়েছিল। বিরাট জনতার মধ্যে দেখে ছবিটিকে যেন নতুন ভাবে উপলব্ধি করা গেল। ছবিটির প্রযোজক শ্রীরাধেশ্যাম ঝুনঝুনওয়ালা বার বার বলছিলেন, বিশ্বের নানা স্থানে দেখিয়ে তিনি এত আনন্দ পান নি. এত বিরাট সংখ্যক দর্শকের আগ্রহ ও অভিনন্দনে আজ তিনি যে আনন্দ পেলেন। আমাদের দেশের চিত্র-সমালোচনার মান যে কত নিম্নস্তরের আজকের দর্শকদের উচ্ছ্বাস তার প্রমাণ।

১৫ই তারিখে প্রদর্শিত হয়েছে বুলগেরিয়ার 'দি সাইড ট্রেক'। মস্কো চলচ্চিত্র উৎসবে স্বর্ণপদক প্রাপ্ত এই ছবিটিতে বর্তমানের পরিণত বুদ্ধিতে দুজন নরনারীর অতীতকে বিচার করা হয়েছে। এতে গভীর মানবিক দৃষ্টিতে এসেছে বুলগেরিয়ার কমিউনিস্ট বিপ্লব ও মানসিক উন্নয়ন। প্রেম ও জীবনের সম্পর্ক এবং দায়িত্ব। বুদ্ধির দীপ্তিতে প্রেমের প্রশ্ন আলোচিত, যা ধনতান্ত্রিক দেশের ছবিতে পাওয়া যায় না। অথচ কোন উগ্র আধুনিকতা বা প্রকৃতিবাদের প্রশ্রয় নেই।

১৬ই তারিখে দেখান হয়েছে ইতালীর বিখ্যাত ছবি "বাইসাইকেল

'মেরে হুজুর' ছবিতে রাজকুমার ও মধুমতী

আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র মেলার উদ্বোধন করছেন শ্রীমধু বসু। পাশে বসেছেন জার্মান ডেমোক্রেটিক রিপাবলিকের মিঃ এ, রেডার।

থীফ"। যে ছবিতে ভিত্তোরিও দে সিকা খ্যাতির উচ্চাসন পেয়েছেন। যুদ্ধোত্তর-কালে ইতালীর শোচনীয় অর্থনৈতিক অবস্থায় এক বেকারের চাকুরী লাভ, তার ভাড়া করা সাইকেল চুরি যাওয়া এবং সাইকেলটি উদ্ধারে ব্যর্থ হয়ে নিজে চুরি করতে গিয়ে ধরা পড়ার ঘটনার মধ্যে একটা সমাজব্যবস্থা ও সময় প্রকাশ পেয়েছে।

১৭ই দেখান হয়েছে জাপানের 'ইউকিওয়ারসু'। এই ছবিতেও এক জাপানী দম্পতি ও একটি শিশুকে নিয়ে সংক্ষিপ্তভাবে যুদ্ধোত্তর জাপানকে দেখান হয়েছে। ছবিটি প্রধানত মনস্তাত্ত্বিক হলেও এতে সর্বকালীন আবেদন রয়েছে।

১৮ই প্রদর্শিত হয়েছে সোভিয়েত ইউনিয়নের 'অক্টোবর'। সেগেই আইজেন-স্টাইন যে ছবি করে বিশ্বখ্যাতি লাভ করে-ছিলেন—'অক্টোবর' তার অন্যতম। এই ছবিতে রাশিয়ার ফেব্রুয়ারী বিপ্লবের পরে কেরেনেস্কির অস্থায়ী সরকার গঠন, জন-গণের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা ও বল-শেভিকদের ক্ষমতা দখলের ইতিহাস দেখান হয়েছে। ছবিটিতে আইজেন-স্টাইনের ব্যংগ ক্ষমতার যেমন চমৎকার নিদর্শন রয়েছে, তেমনি সংবাদচিত্রের মত করে ঘটনা সাজানোর চমৎকারিত্ব রয়েছে। সর্বাধিক আকর্ষণীয় লেনিনের বক্তৃতা।

মেলায় সর্বাধিক লোক সমাগম হয়ে-ছিল বাইসাইকেল থীফ, ইউকিওয়ারসু ও অক্টোবর দেখার জন্য।

১৯ তারিখে দেখান হয়েছে জার্মান ডেমোক্রেটিক রিপাবলিকের "ইউ এন্ড ইয়োর প্যল"। থর্নডাইক দম্পতি নির্মিত

মূকাভিনেতা অরূপ নাগ সাংবাদিক সমর চ্যাটার্জীর লেখা 'উত্তরবঙ্গের কালরাত্রি' অভিনয় করছেন।

এই ছবি বিশ্ব ইতিহাসের এক মূল্যবান দলিল। এতে দেখান হয়েছে ধনতান্ত্রিক সংকট থেকে কিভাবে ফ্যাসিজম জন্ম লাভ করেছে। ফ্যাসিস্টবিরোধী সংগ্রামের চিত্রও দেখান হয়েছে—তবে এই সংগ্রামে যিনি নেতৃত্ব দিয়েছিলেন—সেই স্তালিনকে দেখান হয় নি।

২০শে দেখান হয়েছে হাঙ্গেরীর 'টু হাফ টাইমস ইন হেল'। এই ছবিতে জার্মান অধিকৃত হাঙ্গেরীতে এক বন্ধী-শিবিরের বন্দীদের দিয়ে নাজীদের ফুটবল খেলার ঘটনা এবং তা থেকে ফ্যাসিস্টবিরোধিতার চমৎকার পরিণতি দেখান হয়েছে। খেলার অংশ বিস্ময় ও উত্তেজনা সৃষ্টি করে।

২৩শে ডিসেম্বর পর্যন্ত আরো তিনটি ছবি—দি গ্রেট এ্যাডভেঞ্চার (সুইডেন), বার্থ সার্টিফিকেট (পোলান্ড) এবং হিন্দী ছবি মেহবুবের আওরৎ দেখান হবে।

ইতালী, হাঙ্গেরী প্রভৃতি দূতাবাসের প্রতিনিধিগণ মেলায় বিভিন্ন দিনে উপস্থিত ছিলেন।

পুরনো দিনের জার্মান ছবি

সিনে ক্লাব অব ক্যালকাটা চারটি

আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র মেলা উপলক্ষে চলচ্চিত্র ইতিহাসের চিত্র ও লেখায় প্রদর্শনীর আয়োজন করা হয়েছে। প্রদর্শনী স্টলে উদ্যোক্তাদের কয়েকজনকে দেখা যাচ্ছে।

পুরনো দিনের জার্মান ছবি দেখাবার উদ্যোগ গ্রহণ করেছিল। গত ১৭ই ও ১৮ই ডিসেম্বর সরলা রায় মেমোরিয়াল হলে স্টুডেন্টস অব প্রাগ (১৯১৩), দি জয়লেস স্ট্রীট (১৯২৫), দি গোলেম (১৯২০) এবং রয়্যাল স্কাণ্ডাল (১৯২৭) দেখান হয়েছে।

শংকরাচার্যের গ্রন্থমালা :

পণ্ডিতপ্রবর পঞ্চানন তর্করত্ন সম্পাদিত। সুবিস্তারিত ব্যাখ্যা ও বিবৃতি সন্নিবেশিত।

প্রথম খণ্ড—৫'০০ টাকা।

দ্বিতীয় খণ্ড—৪'০০ টাকা।

কৃত্তিবাসী রামায়ণ :

(সমগ্র সপ্তকাণ্ড। কবির জীবনী-সম্বলিত)

আদি কবির মহাকাব্যের বাঙালীর সংস্করণ। সোনার বাংলার ভক্তি-অর্ঘ্য। পদানুসারে। রাজসংস্করণ। সচিত্র। রেক্সিন ও বোর্ডে বাঁধা। মূল্য—৮'০০ টাকা।

বসুমতী প্রাইভেট লিমিটেড
১৬৬. বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী স্ট্রীট.
কলিকাতা-১২

নাটকের কথা

মসিজীবী

বেলুড় 'কৃষ্টিলোক'-এর বার্ষিক উৎসব উপলক্ষে ১৫ই ডিসেম্বর সন্ধ্যায় ই আর ইনস্টিটিউট, হাওড়া মঞ্চে শ্রীভানু চট্টোপাধ্যায় রচিত 'মসিজীবী' নাটকটি সাফল্যের সঙ্গে অভিনীত হয়ে দর্শক-মণ্ডলীর সপ্রশংস দৃষ্টি আকর্ষণ করতে সমর্থ হয়।

বিভিন্ন চরিত্র-অভিনয়ে ছিলেন শ্রীকৃষ্ণ হাজরা, নিমাই চট্টোপাধ্যায়, নীরেন সেন, শংকর রায়, শক্তিকিঙ্কর গাঙ্গুলী, সন্তোষ গাঙ্গুলী, দুলাল পাত্র, দুলাল ঘোষ, দিলীপ মজুমদার, গোপাল সরকার, মণ্টু ভট্টাচার্য, অরুণ ভট্টাচার্য, অমিতাভ ভট্টাচার্য, স্বপ্না মিত্র, সেবা দাস, রঞ্জনা মুখার্জী। নাটকটির পরিচালনায় ছিলেন সুখ্যাত নাট্য-পরিচালক শ্রীবিজলীমোহন মুখোপাধ্যায়। আবহ সংগীতে শ্রীবিশ্বনাথ সুর ও শ্রীঅলোক পণ্ডিত। মঞ্চ পরিচালনায় শ্রীসীতাংশু মুখোপাধ্যায়।

জে কে নগরে বিচিত্রানুষ্ঠান

গত ২৩শে নভেম্বর জে কে নগর অফিসার্স ক্লাব রঙ্গমঞ্চে অ্যালুকয়েন ক্লাবের উদ্যোগে এক বিচিত্রানুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। এতে কুলটির জনপ্রিয় শিল্পসংস্থা "উদয় চক্র" শ্রীসমীপেন্দ্র লাহিড়ীর পরিচালনায় মূকাভিনয় ও সংগীতানুষ্ঠান পরিবেশন করে প্রশংসা অর্জন করেন। অংশগ্রহণকারী শিল্পীদের মধ্যে অরুণ গুপ্ত, সুশান্ত ঘোষ, বাদল দাস, অশোক ঘোষ, তপেশ রায় ও সমীপেন্দ্র লাহিড়ীর নাম উল্লেখযোগ্য।

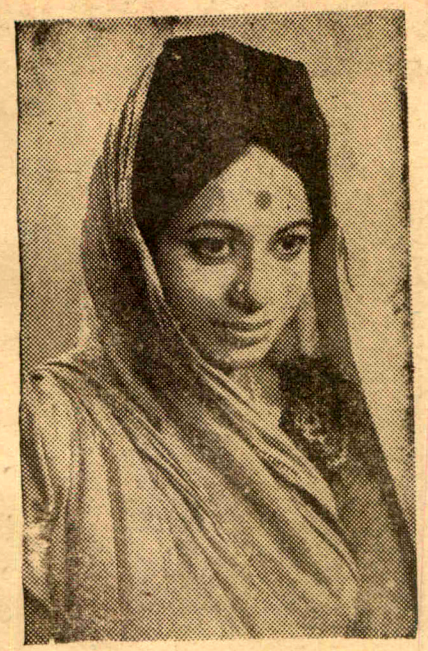

'অগ্নিযুগের কাহিনী' ছবিতে সীমন্তিনী রায়

ত্রিসপ্তক

গত ১৪ই ডিসেম্বর ঝামাপুকুর রাজবাড়ি মঞ্চে নবগঠিত ত্রিসপ্তক সংগীত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শীতকালীন সংগীত অনুষ্ঠিত হয়েছে।

অনুষ্ঠানের অন্যতম শ্রেষ্ঠ আকর্ষণ ছিল সুনির্বাচিত রবীন্দ্রসংগীত সহযোগে "বিরহ-মিলন" নৃত্যনাট্যটি। মাত্র ছ' মাস পূর্বে প্রতিষ্ঠিত সংস্থার কাছ থেকে এরূপ মিশ্ররসের নৃত্যনাট্য অভিনন্দনীয়।

নৃত্য পরিচালনা করেন সুজাতা বন্দ্যোপাধ্যায়। নেপথ্য কণ্ঠসংগীতে বিদ্যালয়ের শিক্ষয়িত্রী ও শিক্ষকদের মধ্যে ছিলেন বন্দনা সিংহ, শ্রীকুমার চট্টোপাধ্যায়, প্রিয়াঙ্ক মৈত্র ও তৎসহ ছাত্র-ছাত্রীবৃন্দ। নৃত্যে সূক্ষ্মরসের পরিচয় দান করেন ভদ্রা মিত্র। গ্রন্থনায় ছিলেন অশীষ মজুমদার ও বিদ্যালয়ের সর্বাধ্যক্ষা শ্রীমতি মিত্র। বিদুষী বসুর পরিচালনায় ছাত্রছাত্রীদের সাধনার পরিচয় পাওয়া যায়। এই সন্ধ্যার অন্যান্য আকর্ষণীয় অনুষ্ঠানের মধ্যে একক রবীন্দ্রসংগীতে ছিলেন বিদ্যালয়ের সংগীত উপদেষ্টা অশোকতরু বন্দ্যোপাধ্যায়, স্বপন গুপ্ত ও প্রতিষ্ঠানের পরিচালক ঋষিণ মিত্র। বেহালায় রবীন্দ্রসংগীতের সুর বাজিয়ে শোনান সত্য মজুমদার।

স্টুডিও খবর

মেমসাহেব

'চৌরঙ্গী'র প্রযোজিকা নিমাই ভট্টাচার্য রচিত 'মেমসাহেব'কে চিত্ররূপ দিতে উদ্যোগ গ্রহণ করেছেন বলে জানা গেল। ছবিটি পরিচালনা করবেন পিনাকী মুখার্জী।

সূর্য পরশ

একটি অপরাধমূলক কাহিনীচিত্রের নাম 'সূর্য পরশ'। আন্তর্জাতিক অপরাধের পটভূমিতে চিত্রনাট্য লেখা। ছবিটির সঙ্গীত পরিচালনার দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন সলিল চৌধুরী। নেপথ্য সঙ্গীতে অংশ গ্রহণ করছেন মান্না দে, আশা ভোঁশলে, সবিতা চৌধুরী। বিভিন্ন ভূমিকায় অভিনয় করছেন অনিল চ্যাটার্জী, মাধবী মুখার্জী, বিকাশ রায়, দীপ্তি রায়, সুখেন দাস, জহর রায়, দিলীপ রায়, মধুমতী, উদয়কুমার, নীলয় চৌধুরী প্রমুখ।

সাগিনা মাহাতো

তপন সিংহ তাঁর নতুন ছবি সাগিনা মাহাতোর কাজ নিউ থিয়েটার্স স্টুডিওতে আরম্ভ করেছেন। রূপশ্রী ইণ্টারন্যাশনালের এই ছবিতে অভিনয় করবেন হিন্দী চিত্রজগতের দিলীপকুমার ও সায়রাবানু। বাঙালী শিল্পীদের মধ্যে থাকবেন অনিল চ্যাটার্জী, সুমিতা সান্যাল, চিন্ময় রায়, স্বরূপ দত্ত, অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ। চিত্রনাট্য রচিত হয়েছে একই নামের উপন্যাস অবলম্বনে।

সংবাদকণা

"তাসের রাজা যাদুকর হাউয়ার্ড থার্স্টনের স্মৃতি উৎসব"

যাদুকর প্রফেসার হাউয়ার্ড থার্স্টনের জন্ম-শতবার্ষিকী উপলক্ষে গত ১৫ই ডিসেম্বর (২২৬এ, আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড) শ্যামবাজারে এক ম্যাজিক উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। যাদুকর জি· সি· ভট্টাচার্য সমগ্র অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন। মহীশূর, বম্বে, মাদ্রাজ সমগ্র ভারতবর্ষের বহু যাদুকরই বিভিন্ন খেলা দেখিয়ে দর্শকদের মুগ্ধ করেন। এই সভায় প্রধান অতিথির আসন গ্রহণ করেন সঙ্গীতাচার্য জয়কৃষ্ণ সান্যাল। উদ্বোধন করেন শ্রীদক্ষিণারঞ্জন বসু। প্রারম্ভে মাঙ্গলিকী উচ্চারণ করেন শ্রীবনমালী ভট্টাচার্য।

শর্মিলা-পতৌদির বিয়ে

শর্মিলা ঠাকুরের সঙ্গে পতৌদির নবাবের বিয়ে হচ্ছে ২৭শে ডিসেম্বর। বিয়ে কলকাতাতে সামরিক এলাকাতে হবে। এক খবরে প্রকাশ শর্মিলা ঠাকুর বিয়ের পর চলচ্চিত্র অভিনয় করা ছেড়ে দেবেন।

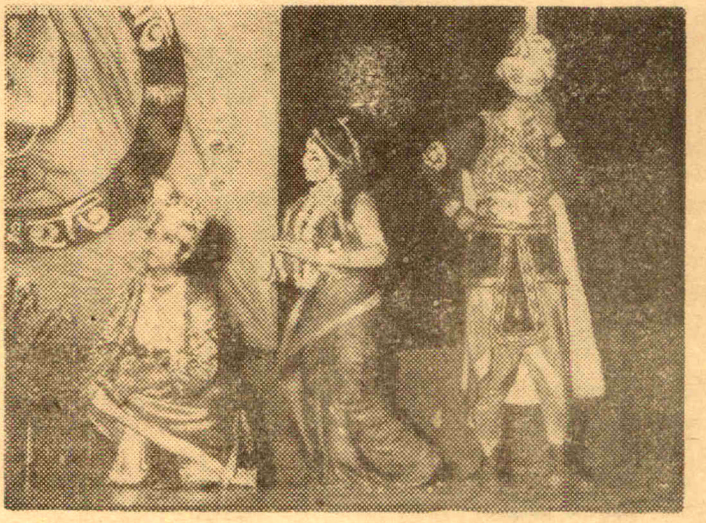

রবীন্দ্রসরোবর হলে ভারতীয় নৃত্যকলা মন্দিরের 'শ্যামা' নৃত্যনাট্যে সুতপা দা শুক্লা সেনগুপ্ত ও অনুপশংকর।

খেলা ধুলা

স্বজনপোষণ

আমাদের দেশে এই সময়টাকে যদি স্বজনপোষণের যুগ বলা যায় তাহলে মনে হয় যে কেউই আপত্তি করবেন না। কারণ পথে-ঘাটে, হাটে-বাজারে, অফিসে-আদালতে যেখানেই যাওয়া যাক না কেন—দেখা যাবে স্বজন-পোষণের অভিনব প্রচেষ্টার আধুনিক কায়দা। তা সে রাজনীতিই বলুন কিম্বা দুর্নীতিই বলুন—জীবনের সর্বক্ষেত্রে আজ চলেছে স্বজনপোষণ। সুতরাং ক্রীড়াজগৎই বা কেন আর এমন একটি কায়দা থেকে, এমন একটা সুবিধাজনক ব্যাপার থেকে পিছিয়ে থাকবে? আর এ বিষয়ে আমাদের খেলাধুলার জগৎও যে পিছিয়ে নেই সে আমরা সকলেই হলপ করে বলতে পারি! উদাহরণ চাই? তাহলে দিতে হবে একটার পর একটা অতি মনোরম কাহিনীর পরিচয়। অবশ্য তার যে খুব একটা বেশি প্রয়োজন আছে তা মনে হয় না। কারণ পাঠক-পাঠিকারা নিজেরাই জানেন একাধিক ঘটনার কথা। সে সব ঘটনার মধ্যে আছেন ভারতীয় ক্রিকেট কনট্রোল বোর্ড, সি· এ· বি, আই· এফ· এ, বি· এইচ· এ সবাই। কেউ বাদ নেই। থাকবেনই বা কি করে! যুগের হাওয়ায় আজকাল সবাই যে দুলছেন। কেউ কেউ আবার ঝুলছেনও। সত্যি কথা বলতে আজ বোধহয় কেউই বুকে হাত দিয়ে বলতে পারবেন না যে তিনি ধোয়া তুলসীপাতা। তবে একথাও সত্যি যে এ যুগে কেউই বোধহয় আর ধোয়া তুলসী পাতাটির মতো পবিত্র হতে চান না বা পারবেন না...!

তবে বর্তমানে যে সব ক্রীড়া প্রতিষ্ঠানের স্বজনপোষণ নীতি স্বেচ্ছাচারিতার পর্যায়ে গিয়ে পৌঁচেছে তার মধ্যে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের স্পোর্টস বোর্ড অগ্রণী। কথাটা শুনতে অবশ্য বড়ই পুরনো লাগতে পারে। আর সেইটাই স্বাভাবিক। কারণ কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় দলের খেলোয়াড় নির্বাচনের কীর্তিকানিীর কথা কেই বা আর না জানেন। প্রতি বছরই তাঁরা নিজেদের পছন্দমত খেলোয়াড় খেলিয়ে বহুকাল আগে থেকেই সৃষ্টি করে বসে আছেন একটা উল্লেখযোগ্য নজীর। সম্প্রতি আমাদের দপ্তরে একটি কলেজের জনৈক অধ্যাপকের চিঠি এসেছে। চিঠিটির প্রতিটি ছত্রেই পাওয়া যায় তাঁর বিক্ষুব্ধ মনের পরিচয়। আর তাঁর মনের পুঞ্জীভূত ঐ ক্ষোভ বিশ্ববিদ্যালয় স্পোর্টস বোর্ডের বিরুদ্ধেই। তিনি ভুক্তভোগী—তাই তাঁর জ্বালা একটু বেশি। চিঠিটির এক জায়গায় তিনি লিখেছেন, "...এবারে কলিঃ বিশ্ববিদ্যালয়ের (আন্তঃ বিশ্ববিদ্যালয় হকি প্রতিযোগিতার) ট্রায়ালগুলো প্রহসনে রূপান্তরিত হয়েছে। ২১।১১ ও ২২।১১ তারিখে ট্রায়াল ছিল। ট্রায়ালে কোন একজন খেলোয়াড় আসে নি। কিন্তু তাকে কোচের দ্বারা ফোন করিয়ে মাঠে এনে পরে দলে চান্স পাইয়ে দেওয়া হলো। অথচ সে ছিলো আহত ও সম্পূর্ণ আনফিট। কিন্তু আর একজন খেলোয়াড় যে কলকাতার একটি নামকরা কলেজের হকি অধিনায়ক ও প্রথম বিভাগের খেলোয়াড়—সে রোজ ট্রায়ালে আসা সত্ত্বেও চান্স পেল না। অথচ অনেকেই জানতেন যে, এবার তারই বিশ্ববিদ্যালয় দলের অধিনায়ক হবার সম্ভাবনা সব থেকে বেশি ছিল। কিন্তু শেষ পর্যন্ত দেখা গেলো যে, যে দলে আসে নি তার নাম আছে অতিরিক্ত খেলোয়াড় তালিকায়!....." জানি নে বিশ্ববিদ্যালয় স্পোর্টস বোর্ড এ প্রশ্নের কোন উত্তর দেবেন কি না। —শান্তিপ্রিয়।

যুদ্ধং-যুদ্ধং

সুব্রত মুখার্জী কাপ আগেই এসেছে, এসেছে জুনিয়ার জাতীয় ফুটবল প্রতিযোগিতায় চ্যাম্পিয়ানশীপের ট্রফি, আর এবার বাংলা দেশে এলো রোভার্স কাপ। মোহনবাগান ক্লাব এ বছর লাভ করেছে রোভার্স কাপ বিজয়ীর সম্মান।

এ বছরের রোভার্স কাপ ফাইন্যাল

অশোক চ্যাটার্জী
রোভার্স কাপ ফুটবল প্রতিযোগিতার ফাইন্যাল খেলার প্রথম দিনে গুরুতরভাবে আহত হয়েছেন।

খেলাটা ছিলো মর্যাদার লড়াই। কলকাতা তথা বাংলা দেশের প্রেসটিজ জড়িয়েছিলো খেলাটির ফলাফলের ওপর। কারণ অনেক আগেই হেরেছিল ইস্টবেঙ্গল, তারপর পরাজিত হলো মহামেডান স্পোর্টিং অর্থাৎ একমাত্র মোহনবাগান ছাড়া একে একে হেরে গিয়েছিলো কলকাতার দলগুলো। তার ওপর ইস্টবেঙ্গল আর মহামেডান স্পোর্টিং পরাজিত হয়েছিলো ঐ লীডার্স ক্লাবের কাছেই।

তাই ফাইন্যাল খেলার ফলাফলের সংগে জড়িয়েছিলো কলকাতার মর্যাদার প্রশ্ন। কারণ অন্যদিকে ফাইন্যালে উঠেছিলো জলন্ধরের লীডার্স ক্লাবই। এইবার সর্বপ্রথম তারা উঠেছে ফাইন্যালে।

গত বছর ডুরাণ্ড কাপের খেলাতেও সম্মুখ সমরে অবতীর্ণ হয়েছিলো এই দু'টি দল অর্থাৎ কলকাতার মোহনবাগান আর জলন্ধরের লীডার্স ক্লাব। লীডার্স সে খেলায় হারিয়ে দিয়েছিলো মোহনবাগানকে।

তাই এ বছরের রোভার্স কাপ ফাইন্যালের গুরুত্ব ছিলো অপরিসীম। বাংলা দেশের সমর্থকদের মনে ছিলো আশা-নিরাশার দোলা। সংশয়ে ভরা ছিলো সকলের মন। সকলেরই মনে ছিলো চিন্তা—পারবে কি মোহনবাগান লীডার্স ক্লাবকে হারাতে? পারবে কি মোহনবাগান পূর্বে পরাজয়ের প্রতিশোধ নিতে.....?

কিন্তু প্রথম দিনের খেলা শেষ হলো অমীমাংসিতভাবে। কোন দলই পারে নি একটাও গোল করতে। অথচ গোল করার জন্যে প্রাণপণ সংগ্রাম চালিয়েছিলো দু'টি দলই। উন্নত ধরণের ক্রীড়ানৈপুণ্য প্রদর্শনের বদলে উভয় দলের খেলোয়াড় দৈহিক শক্তি প্রকাশের দিকেই দিয়েছিলেন বেশি জোর।

মোহনবাগান ক্লাবের খেলোয়াড়দের মাথা গরম হয়েছিলো খেলার প্রথম দিকে অশোক চ্যাটার্জী বিশ্রীভাবে আহত হবার পরে। শেষ পর্যন্ত মাঠে ঢিল-

নঈম
একাই দু'টো গোল দিয়েছিলেন এবারের রোভার্স কাপ ফাইন্যাল খেলায়।

পাটকেল থেকে আরম্ভ করে আগুনও জ্বলেছিলো। আর তার মধ্যে শেষ হয়ে গেলো খেলা অমীমাংসিতভাবে।

পরের দিন খেলার আগেই মোহনবাগানের খেলোয়াড়রা মাথা ঠাণ্ডা করে খেলবেন ঠিক করেই মাঠে নেমেছিলেন।

গল্পহলেও সত্যি

ক্রিকেট মাঠে আর মাঠের বাইরে আমরা হামেশাই ক্রিকেট ব্যাট দেখি। ছোট-বড় নানা মাপের ব্যাট। তবে ক্রিকেট ব্যাট এখন আর চওড়ায় সওয়া চার ইঞ্চি আর লম্বায় আটত্রিশ ইঞ্চির বেশি হতে পারে না। কিন্তু এই নির্দিষ্ট মাপ একদিনে হয় নি। এর পেছনে আছে একটি মজার ঘটনা। আর সেই ঘটনার নায়ক চারটেসী দলের খেলোয়াড় হোয়াইট সাহেবের নাম ক্রিকেট ব্যাটের সংগে চিরকাল জড়িয়ে থাকবে।

১৯৭৯ সালে বিলেতের হ্যাম্বলডন ক্লাব আর চারটেসী দলের মধ্যে ক্রিকেট ম্যাচ খেলা হচ্ছে। চারটেসী দলের ব্যাটিং। হোয়াইটের পালা এলে সে দরজার মত চওড়া একখানা ব্যাট নিয়ে এসে দাঁড়ালো। চওড়া ব্যাটের আড়ালে উইকেট ঢাকা পড়ে গেছে। বোলার? সারাদিন আপ্রাণ চেষ্টা করেও হোয়াইটকে আউট করতে পারলো না। পারবেই বা কি করে? হোয়াইটের ব্যাট যে দরজার মত চওড়া। আর সে ব্যাট মোটে তোলেই না!

আজকালকার এম· সি· সি'র মতো হ্যাম্বলডন ক্লাব ছিলো সেকালের ক্রিকেট খেলার হর্তা-কর্তা-বিধাতা। তাঁরা দেখলেন, এ বড় ভাবনার ব্যাপার। এর বিহিত না করলে কেউ হয়তো কোনদিন একটা আস্তো দরজা ভেঙে নিয়ে ব্যাট করতে আসবে। তাই এর একটা কিছু ব্যবস্থা করার জন্য তাঁরা উঠে পড়ে লেগে গেলেন। ঠিক হলো যে ক্রিকেট খেলার ব্যাট কোন মতেই সওয়া চার ইঞ্চির বেশি চওড়া করা চলবে না। তাঁরা একটা ঐ মাপের ফ্রেম বানালেন। আর ঐ ফ্রেমে মাপা না হলে সে ব্যাটে খেলতে দেওয়া হবে না বলে ঠিক হলো।

আর তাঁর লীডার্স দলের আক্রমণ আর রক্ষণভাগকে ভেঙে তছনছ করে দিয়ে মোহনবাগানের খেলোয়াড়রা দিলেন পর পর তিনটে গোল।

রেফারীর সমস্ত সিদ্ধান্ত ঠাণ্ডা মাথায় মেনে নিয়ে খেলেছিলেন মোহনবাগানের খেলোয়াড়রা। অথচ রেফারীর অনেক নির্দেশই ছিলো নাকি অহেতুক, অবাঞ্ছনীয় এবং অযৌক্তিক।

যাই হোক শেষ পর্যন্ত নঈমের দেওয়া দু'টি ও কাননের একটি গোলে লীডার্স ক্লাবকে হারিয়ে দিয়ে মোহনবাগান লাভ করলো বিজয়ীর সম্মান।

কানন

মোহনবাগানের রোভার্স কাপ লাভের পেছনে ছিলো কাননের একটা গোল।

লণ্ডন থেকে সিডনি

অনেকটা সেই অশ্বমেধের ঘোড়ার মতো শেষ পর্যন্ত লণ্ডন থেকে ১০,৬০০ মাইল পাড়ি দিয়ে সিডনিতে গিয়ে হাজির হয়েছে ম্যারাথন মোটর রেসের গাড়িগুলো।

হিলম্যান হাণ্টার গাড়ি নিয়ে স্কটল্যাণ্ডের অ্যাণ্ড্রু কাওয়ান সবার আগে গিয়ে পেঁাচেছেন নির্দিষ্ট সীমানায়। ফলে বিজয়ীর সম্মান হিসেবে তিনি লাভ করলেন দশ হাজার স্টার্লিং। এই প্রতিযোগিতায় দ্বিতীয় স্থান লাভ করেছেন আয়ারল্যাণ্ডের প্যাডী হপকার আর তৃতীয় স্থান পেয়েছেন অস্ট্রেলিয়ার আয়ান ভাণ্ডল।

গত ২৪শে নভেম্বর লণ্ডন থেকে আরম্ভ হয় এই অভিনব মোটর রেস। দশ হাজার ছ'শ' মাইলের এই মোটর দৌড় প্রতিযোগিতায় অংশ গ্রহণ করেছিলেন ৯৮ জন প্রতিযোগী।

গাড়িগুলো প্যারিস, তুরিন, বেলগ্রেড, ইস্তামবুল, তেহেরান, কাবুল, খাইবার পাশ, সাবোবিনি হয়ে দিল্লী থেকে বোম্বাই-এ আসে। বোম্বাই থেকে ৭২টি

শান্তি দত্ত

সম্প্রতি ভারতীয় বডিবিল্ডিং ফেডারেশন পরিচালিত 'ভারতশ্রী' শ্রেষ্ঠদেহী প্রতিযোগিতায় শ্রেষ্ঠত্বের সম্মান অর্জন করেছেন।

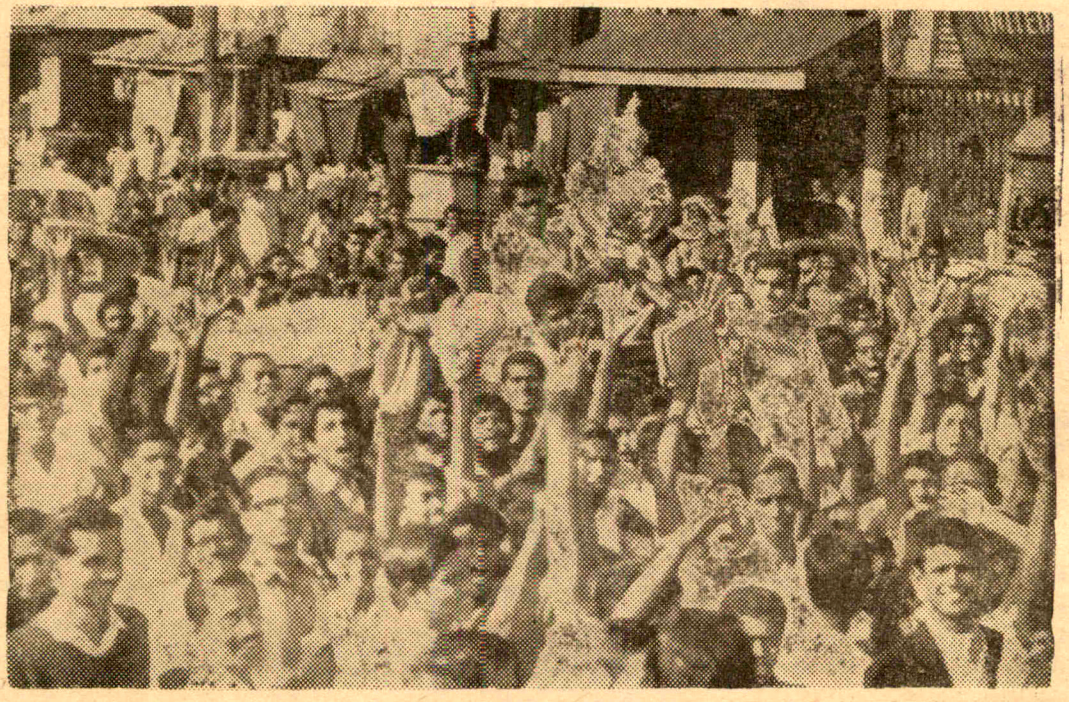

রোভার্স কাপ বিজয়ী মোহনবাগান ক্লাবের খেলোয়াড়রা শনিবার কলকাতা পেঁাছলে অসংখ্য ক্রীড়ামোদী ও সমর্থকগণ তাঁদের বিপুলভাবে সম্বর্ধনা করে। ট্রফি নিয়ে শোভাযাত্রায় সমর্থকদের আনন্দ প্রকাশ করতে দেখা যাচ্ছে।

গাড়ি জাহাজে করে যায় ডি মেল্টাল বন্দরের পথে। তারপর পার্থ থেকে সিডনি পর্যন্ত ৩,৫০০ মাইল পথ অতিক্রম করতে হয়েছিল গাড়িগুলোকে বিপদসংকুল পথের ওপর দিয়ে। এই পথে ৩১টি গাড়ি প্রতিযোগিতা থেকে সরে আসে।

সিডনি থেকে মাত্র একশ' মাইল দূরে একটা বিশ্রী রকমের দুর্ঘটনা ঘটে। বেলজিয়ামের লুসিয়েন বিয়ানচি চলেছিলেন সকলের আগে। তিনি যে প্রথম স্থান লাভ করবেন সে বিষয়ে ছিল না কারো এতোটুকুও সন্দেহ। কিন্তু শেষ সীমানা থেকে মাত্র একশ' মাইল দূরে একটা দুর্ঘটনার কবলে পড়ে গুরুতর আহত হন বিয়ানচি। তাঁর গাড়ি ভেঙে চুরমার হয়ে যায়। আর তিনি আঘাত পান মাথায়।

যাই হোক এই অভিনব প্রতিযোগিতার কর্তৃপক্ষ ঘোষণা করেছেন যে প্রতি অলিম্পিক বছরে অনুষ্ঠিত হবে দূরপাল্লার এই মোটর দৌড়ের ম্যারাথন রেস।

সমাচারদর্পণ

থাইল্যান্ড অলিম্পিক কমিটির একজন মুখপাত্র বলেছেন যে থাইল্যান্ডেই বসবে ষষ্ঠ এশিয়ান গেমস ক্রীড়া প্রতিযোগিতার আসর। তবে এই প্রতিযোগিতার অনুষ্ঠানসূচীতে যেমন কাট-ছাঁট করা হবে তেমনি কমানো হবে খরচের অংকও। খরচের হিসেবে ধরা হয়েছে সাড়ে সাতষট্টি লক্ষ টাকা। আর অনুষ্ঠানসূচী থাকবে — এ্যাথলেটিকস, বাসকেটবল, সাঁতার, ভলিবল, টেবল টেনিস, ফুটবল, মুষ্টিযুদ্ধ, ভারোত্তোলন, সাইকেলচালনা আর শুটিং কিম্বা মল্লযুদ্ধ।

* * *

নিউ সাউথ ওয়েলসের উইকেটরক্ষক রায়ান ট্যাবার দক্ষিণ অস্ট্রেলিয়ার ১২ জন খেলোয়াড়কে ক্যাচ ধরে আউট করে বিশ্ব রেকর্ডের সমান কৃতিত্ব অর্জন করেছেন। আজ থেকে ঠিক একশ' বছর আগে ১৮৬৮ সালে সারে কাউন্টি দলের উইকেটরক্ষক ই· এইচ· পুল এসেকসের বিরুদ্ধে আর ১৯৩৮-৩৯ সালে কুইন্সল্যান্ডের ডন ট্যালন নিউ সাউথ ওয়েলসের বিরুদ্ধে উইকেই কিপিং-এ বিশ্ব রেকর্ড স্থাপন করেছিলেন।

ফুটবলের মান কোনপথে?

• নীলিমেশ রায়চৌধুরী •
(সংকলক)

[ফুটবল খেলার মান এখন নাকি নিম্নমুখী, খেলার সৌন্দর্যের বিষয়টিও এর সংগে জড়িত। সমস্ত ফুটবল-বিশ্ব আজ তাই এই চিন্তায় মগ্ন। পৃথিবীর দিকপাল কোচ, ম্যানেজার ও খেলোয়াড়রাও এই বিষয়ে তাঁদের মতামত প্রকাশ করেছেন। আমরাও তাঁদের সেই মন্তব্যগুলো পাঠক-পাঠিকাদের জানার জন্যে আলোচ্য লেখাটির মাধ্যমে ছাপার ব্যবস্থা করেছি। —ক্রীড়া সম্পাদক]

বিশ্ব ফুটবলের মান ও সৌন্দর্য নিম্নমুখী কেন?—আজ এই প্রশ্নই গোটা বিশ্বের ফুটবল-উৎসাহীদের মুখে মুখে ফিরছে। গত বিশ্বকাপ প্রতিযোগিতার পর থেকে সবাই এই প্রশ্নেই সোচ্চার। বিভিন্ন দেশের নামী-দামী প্রশিক্ষকেরা বিভিন্ন অভিমতও ব্যক্ত করেছেন এই বিষয়টি নিয়ে। আসলে গত বিশ্বকাপে খেলার মান দেখে সবাই বেশ কিছুটা মর্মাহত। সেই সংগে ভয়ও পাচ্ছেন ফুটবলের ভবিষ্যৎ ভেবে। সময় থাকতে কাজে হাত না দিলে ভবিষ্যৎ শুভ নয়—এটা জেনেই সবাই উঠে পড়ে লেগেছেন কারণ অনুসন্ধানে। বিভিন্ন জনের বিভিন্ন মত—প্রত্যেকেই স্বপক্ষে বলিষ্ঠ যুক্তি রাখতে কসুর করেন নি—আমাদের এই আলোচনায় বিভিন্ন দেশের খেলোয়াড়, প্রশিক্ষক ও ম্যানেজারের মতামতকে তুলে ধরা হচ্ছে পাঠক-পাঠিকাদের সামনে।

হেলমাট্স্কুল (জাতীয় প্রশিক্ষক—জার্মান ফেডারেল রিপাবলিক)

ওঁর মতে "ফুটবল খেলা 'আইস্ হকি' নয়"। ফুটবলের বর্তমান দশায় ওঁর বক্তব্য হল—"বিভিন্ন দেশে আজকাল ফুটবল খেলা হয় কতকটা রক্ষণাত্মক ঢঙে। কিন্তু আজকাল দেখা যাচ্ছে যে আক্রমণ ও রক্ষণভাগের সমান দায়িত্ব রয়েছে। এর জ্বলজ্বলে দৃষ্টান্ত এবারের বিশ্বকাপে রেখেছে—ইংল্যান্ড, পর্তুগাল, হাঙ্গেরী এবং আমাদের দেশ।

আন্তর্জাতিক ফুটবল আইনের কোন রদবদলের আমি তীব্র বিরোধী। এখনকার আইন নিয়ে কোচেরা ততটা চিন্তিত নন যার ফলে আইন বদলের প্রয়োজন আছে। অনেকেই ফুটবলের অন্ধকার ভবিষ্যৎ-এর কথা উল্লেখ করেছিলেন আইনের জন্মলগ্নে অর্থাৎ ১৯২৬ সালে। অথচ সে ফুটবল সগৌরবে গড়িয়ে চলেছে। খেলার মাঝে খেলোয়াড় বদলে খেলার মাঝে ছন্দঃপতন ঘটায়—এ জিনিস 'আইস হকিতেই' চলে। ফুটবল আইস হকি নয়।"

গ্যাভরিল কাচালিন্ (সোভিয়েট ওলিম্পিক দলের প্রশিক্ষক)

ওঁর লোজা কথা—"সবাইকে দায়িত্ব নিতে হবে"! আরও সহজ করে উনি যে কথা বলতে চেয়েছেন তাহলে—"গত বিশ্বকাপের আসরে ফুটবল রক্ষণাত্মক পদ্ধতিতেই বেশি খেলা হয়েছে—তবে এটা সুনিশ্চিত এ জিনিস বেশিদিন টিকবে না। এখন থেকেই প্রশিক্ষকদের উচিত কার্যকরী আক্রমণপদ্ধতি বার করা। আজ একথা সবার কাছেই পরিষ্কার হয়েছে যে ফুটবলের সব গুরুত্বই গোলে রক্ষণাত্মক ঢঙে খেলাতে নয়। আইন নিয়ে মাতামাতি না করে আমার মতে কোচ আর ম্যানেজারদের 'সাইকোলজির' পরিবর্তন দরকার। পরাজয়ের ভয়ে তাঁরা যথাসাধ্য চেষ্টা করেন রক্ষণভাগ সামাল দিতে—এতে আক্রমণভাগ দুর্বল হয়ে পড়ে। আমার কথা—ঝুঁকি নিতে হবে। আজকাল তেমন দক্ষ ফরোয়ার্ড আমার চোখে পড়ে না—কিন্তু সেরা দলেও না। সেক্ষেত্রে বরং রক্ষণভাগের দু'-একজনকে আক্রমণভাগে নিয়ে গেলে ভাল ফল মিলবে বলেই আমার বিশ্বাস।"

[চলবে]

টেলকুলোর কলোনী, পান্ডু, আসাম)

(টেলকুলোর কলোনী, পান্ডু, আসাম)

উত্তর : না।

শীরেন পাল (বংশীহারী, পশ্চিম দিনাজপুর)

উত্তর : শারদীয়া সংখ্যায় 'মাই ডিয়ার গোপালদা' আর অন্য সংখ্যাগুলোতে খেলাধুলো বিভাগটা আপনার ভালো লাগে জেনে আমরা উৎসাহিত হয়েছি। এর আগে কিন্তু আপনার কোন চিঠি পাই নি আমরা।

যাই হোক আপনার প্রশ্নের উত্তরে জানাই যে শর্মিলা-পতৌদির বিয়ে আগামী ২৭শে ডিসেম্বর। সুতরাং অন্য কারো সংগে শর্মিলার বিয়ের প্রশ্নই ওঠে না।

গোপাল পালচৌধুরী (কালীপ্রসাদ ব্যানার্জী লেন, হাওড়া)

প্রশ্ন : গত বছর কলকাতার আই· এফ· এ শীল্ড ও এ বছরের লীগ ও শীল্ড খেলা হবে কি?

উত্তর : গত বছরের আই· এফ· এ শীল্ড খেলা পরিত্যক্ত বলে ঘোষণা করা হয়েছে। আর এ বছরের খেলাগুলো এখন ঝুলছে আইন আদালতের আঙিনায়.....!

অশোক অরোরা (নর্দান বেনজী লীগ, লোয়ার চিৎপুর রোড, কলকাতা—৭)

প্রশ্ন : এমন কি কোন রেকর্ড আছে যে একজন গোলরক্ষক এক সিজনে কোন গোল খান নি?

উত্তর : মনে হয় নেই!

হরেন্দ্র তিওয়ারী (কলকাতা—৭)

প্রশ্ন : বোলার বল করলো। বল ব্যাটে না লেগে ব্যাটসম্যান যখন ক্রীজের মধ্যে তখন প্রথমে উরুতে লাগার পর প্যাডের মধ্যে পড়ে পায়ে লাগলো। এল· বি· ডব্লিউ হবে কি?

উত্তর : যদি আম্পায়ার মনে করেন যে ব্যাটসম্যানের পা উইকেট আড়াল করে ছিলো অর্থাৎ পায়ে না লাগলে বলটা নির্ঘাৎ উইকেট ভেঙে দিত আর বলটা লেগস্টাম্পের বাইরে পড়ে নি তাহলে ব্যাটসম্যানকে এল· বি· ডব্লিউ-এর নির্দেশ দেবেন আম্পায়ার!

প্রভাত ভট্টাচার্য (নর্দান বেনজী লীগ, কলকাতা—৭)

প্রশ্ন : ব্যাটসম্যান একটা বল ঠুকে রান নেবার চেষ্টা করলো। একজন ফিল্ডসম্যান বলটা তুলে নিতে এলে দু'জনের মধ্যে সংঘর্ষ হলো (ক্রীজের বাইরে)—ফলে দু'জনেই মাটিতে পড়ে গেলো। অন্য একজন ফিল্ডার ছুটে এসে বল ছুড়ে উইকেট ভাঙলো। আউট হবে কি ব্যাটসম্যান?

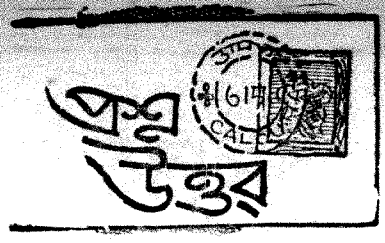

উত্তর : নিশ্চয়ই হবে।

অমিত বসু (কলকাতা—৭)

প্রশ্ন : টেনিস টেনিস খেলা পুরোদমে চলার সময় একজন খেলোয়াড় হাত দিয়ে বল ধরে ব্যাট বদল করার আবেদন জানালো। এ ক্ষেত্রে পয়েন্ট যাবে না কি?

উত্তর : পরিস্থিতির ওপর নির্ভর করবে সব কিছু.

সুব্রত মিত্র (লোয়ার চিৎপুর রোড, কলকাতা—৭)

প্রশ্ন : গোল হলো। বল জালে ঢুকলো। গোলরক্ষক এসে দেখালো যে বলটা পাংচার হয়ে গেছে। গোল নাকচ হবে কি না?

উত্তর : রেফারীর ওপর নির্ভর করবে। কারণ গোল হবার সময় রেফারী গোলের কাছাকাছি ছিলেন। তিনিই ব্যাপারটা ভালো বুঝবেন ও যা করণীয় তাই করবেন।

ঈশিতা মন্ডল (নর্দান বেনজী লীগ, কলকাতা—৭)

প্রশ্ন : বাম্প ক্যাচ ও ক্যাচে সন্দেহ থাকলে কি করা হয়?

উত্তর : ব্যাটসম্যান আউট দেবার আগে কোনরকম সন্দেহ জাগলে আম্পায়ারের রায় সাধারণত ব্যাটসম্যানের অনুকূলেই যায়। সুতরাং এ ক্ষেত্রেও তাই হবে।

হীরেন্দ্রমোহন ভদ্র (সুভাষপল্লী, শিলিগুড়ি)

উত্তর : আপনার চিঠিটি হুবহু তুলে দিলাম. "গত ২৫শ সংখ্যায় সুজন মুখার্জী ও টাইগারের প্রশ্নের উত্তর (ট্রুম্যানের রেকর্ড) প্রকাশিত হয়েছে। তাতে অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে ট্রুম্যান যত রান দিয়েছেন তার হিসেব দেওয়া হয়েছে ১৯১৯ রান। কিন্তু এটা ভুল। আসলে হবে ১১৯১ রান...!"

কাজল ভট্টাচার্য ও পলক ধী (সংচারীপাড়া রোড, কলকাতা—২)

প্রশ্ন : "গতবারে বেসিল ডলিভিয়েরার বিষয়ে যে প্রশ্ন করেছিলুম তার উত্তর না পাওয়ায় আমরা বড়ই ক্ষুব্ধ। আপনি যখন প্রশ্ন-উত্তর বিভাগ খুলেছেন তখন যদি প্রশ্নের উত্তর নাই দিতে পারেন তবে সেটা লজ্জার বিষয়। বলেই দিতে পারতেন যে উত্তর দিতে পারবো না তাহলে এইবার থেকে জানা রইল যে আপনাকে বাচ্চা ছেলেদের মত প্রশ্ন করতে হবে। মনে হয় একমাত্র তারই উত্তর দিতে পারবেন। যদি বলে দিতেন তাহলে অন্য জায়গা থেকে জানার চেষ্টা করতুম। যা হোক এবার যা প্রশ্ন করছি তার যথাযথ উত্তর পেলে বুঝবো 'প্রশ্নোত্তর' বিভাগ সার্থক।"

উত্তর : বাবা : এর পরেও কি আর আপনাদের প্রশ্নের উত্তর না দিয়ে পারা যায়!

তবে কিনা ডলিভিয়েরার জীবনী প্রকাশিত হয়েছিল "আজকের মানুষ" বিভাগে। তাই উত্তর দেওয়া সম্ভব হয় নি।

যাই হোক ১৯৩০ সালে উরুগুয়েই প্রথম বিশ্ব কাপ পেয়েছিল।

নরেন রায় (শিবপুর, হাওড়া)

প্রশ্ন : বড় ফুটবল খেলোয়াড় হতে হলে কি করতে হবে?

উত্তর : এ প্রশ্নটি আর একজন করেছিলেন। আমরা বলেছিলাম :

প্রথমে কোচের পায়ে আর পরে নিজের পায়ে তেল মালিশ.....!

সম্পাদিকা—জয়ন্তী সেন

বসুমতী (প্রাঃ) লিঃ-এর পক্ষে ১৬৬, বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী স্ট্রীটস্থ কলিকাতা-১২

বসুমতী প্রেস হইতে শ্রীসুকুমার গুহমজুমদার কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

বসুমতীর শাস্ত্র-প্রচার গ্রন্থরাজি

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা :

(মূল, ব্যাখ্যা ও বঙ্গানুবাদ সম্বলিত)

প্রামাণ্য অনুবাদ—সহজ, সরল, প্রাঞ্জল, প্রাণময়। বিশুদ্ধ সংস্করণ। সুন্দর বোর্ডে বাঁধা। মূল্য : ২-০০ টাকা।

গীতা গ্রন্থাবলী :

(পঞ্চবিংশতি গীতার সমাহার)

মূল সংস্কৃত ও সরল বঙ্গানুবাদ। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা যেমন মহাভারতের সার, এই গীতাগুলি তেমনি সর্বশাস্ত্রের সারাৎসার। হারীত, দেবী, যম, বৈষ্ণব, তুলসী, অবধূত, জীবন্মুক্তি, ষড়্জ, হংস, মস্কি, গীতাসার, পিতৃ, পৃথিবী, সপ্তশ্লোকী, রাম, পরাশর, শান্তি, শিব, ভগবতী, বোধ্য, গর্ভ, পাণ্ডব, উত্তর, রাস, শ্রীমদ্গীতাসার—এই পঞ্চবিংশতি গীতার সমাবেশ, প্রতিটি ধর্মপ্রাণ ব্যক্তির অবশ্যপাঠ্য গ্রন্থ। রেক্সিন ও বোর্ডে বাঁধা। মূল্য : ৫-০০ টাকা।

উপনিষদ গ্রন্থাবলী :

১ম খণ্ড : ঐতরেয়, কৈবল্য, কঠক, নৃসিংহতাপনী।

২য় খণ্ড : শ্বেতাশ্বতর, পরমহংস, সন্ন্যাস, নীলরুদ্র, চূলকি, আরুণেয়, কণ্ঠশ্রুতি, জাবাল, পিণ্ড, আত্ম, ষটচক্র, ভৃগু, শিক্ষা, ব্রহ্মবিদ, নারদ, পরিব্রাজক, পৈঙ্গলা, তুরীয়াতীত, বাসুদেব, শাণ্ডিল্য, নারায়ণ (ক), নারায়ণ (খ)।

৩য় খণ্ড : ঈশ, কেন, প্রশ্ন, মুণ্ডক, মাণ্ডুক্য, তৈত্তিরীয়, পাশুপত-ব্রহ্ম প্রাণাগ্নিহোত্র, ভাবন, গরুড়, শ্রীরামপূর্বতাপনীয়, শ্রীরামোত্তরতাপনীয়, পঞ্চব্রহ্ম, কালাগ্নিরুদ্র, যাজ্ঞবল্ক্য, রামরহস্য, গোপালপূর্বতাপনীয়, গোপালোত্তরতাপনীয়, কৌষীতক্য, অমৃতবিন্দু, কালিক, সর্বসার ও অমৃতনাদ। কাপড় ও বোর্ডে বাঁধা। মূল্য : প্রতি খণ্ড—৪-০০ টাকা।

ছান্দোগ্য-উপনিষদ :

সামবেদের তাণ্ড্যশাখার ছান্দোগ্যব্রাহ্মণের অন্তর্গত। মূল সংস্কৃত ও বঙ্গানবাদ। মূল শ্রুতি ও শ্রুতির অনুবাদ। শঙ্করাচার্যের মহাভাষ্য, শাঙ্কর ভাষ্যের সরল অনুবাদ। তথ্যপূর্ণ-জ্ঞানগর্ভ ভূমিকা সম্বলিত বৃহদায়তন গ্রন্থ। ৮১২ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ। শাস্ত্র প্রচারোদ্দেশ্যে এখনও নামমাত্র মূল্যে বিক্রয় হইতেছে। মূল্য—৬-০০ টাকা।

সাংখ্য-দর্শন :

মহর্ষি কপিলকৃত : উপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় অনূদিত। সাংখ্যদর্শন সর্ব দর্শনের সার বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। মূল্য—২-০০ টাকা।

বৈশেষিক দর্শন :

মহর্ষি কণাদ প্রণীত। বোর্ড বাঁধাই। মূল্য—৩-০০ টাকা।

জৈমিনির মীমাংসা-দর্শনম্ :

॥ পরমর্ষি জৈমিনি বিরচিত : মূল ও বঙ্গানুবাদ ॥

প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ডে—পারমর্ষ সূত্র, পূর্ব মীমাংসা, বেদার্থবিচার, ধর্ম মীমাংসা, জৈমিনি সূত্র, পূর্বতন্ত্র, জৈমিনি সূত্রের আক্ষরিক অর্থ, শ্রীমৎ শবর স্বামীর ভাষ্যের ভাবার্থানুবাদ, কর্মকাণ্ডের পুনঃ প্রবর্তক কুমারিল ভট্টের শ্লোকবার্তিক ও তন্ত্রবার্তিক টীকা-বিষয়ক পাদটীকা-সমন্বিত। পণ্ডিত ভূতনাথ সপ্ততীর্থের দীর্ঘকালের সাধনায় অনূদিত, দুই খণ্ডে সম্পূর্ণ এই বৃহদায়তন গ্রন্থের মূল্য প্রতি খণ্ড—৮-০০ টাকা।

শ্রীশ্রীগুরুশাস্ত্রম্ :

(বিবিধ তন্ত্র ও পুরাণাদি হইতে গুরু-শিষ্যের কর্তব্যাকর্তব্যাদি, দীক্ষা প্রণালী, গুরুপূজা, স্তোত্র, পরশ্চরণ প্রভৃতির অপূর্ব সঙ্কলন।)

গুরুগীতা, গুরুতন্ত্রম্, দীক্ষাপদ্ধতি, শ্রীগুরু, মন্ত্রমালা প্রভৃতি অধ্যায়ে বিভক্ত। মূল্য—৩-০০ টাকা।

মহানির্বাণতন্ত্র :

(সর্ব দেবদেবীর মন্ত্রকোষ ও শিবতত্ত্ব-প্রদীপিকা-সম্বলিত)

মূল সংস্কৃত, বঙ্গানুবাদ, ব্যাখ্যা, পাদটীকা-সমন্বিত বৃহদায়তন দুর্লভ গ্রন্থ। তন্ত্রশাস্ত্রের সার। পঞ্চমকার সাধনার নিগূঢ় মর্ম, তন্ত্রসাধনার গুহ্যতত্ত্ব উদ্ঘাটিত। কাপড় ও বোর্ডে বাঁধা। মূল্য—১০-০০ টাকা।

হঠযোগ প্রদীপিকা :

(যোগশাস্ত্রের হঠযোগ সাধন গ্রন্থ মূল ও সরল বঙ্গানুবাদ। শ্রীমৎ স্বাত্মারাম যোগীন্দ্র প্রণীত ও শ্রীমৎ জ্ঞানানন্দ স্বামী সম্পাদিত।) মূল্য—৩-০০ টাকা।

বসুমতী প্রাইভেট লিমিটেড ॥ ১৬৬, বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী স্ট্রীট, কলিকাতা - ১২

Thursday, 26th December, 1968 SAPTAHIK BASUMATI Regd. No. C 71
Price : 30 Paise Gram : "Basumati" Phone : 34-7771, 72, 73, 74

28 DEC 1968

বলো কি ঠাকুমা?

আরে, হ্যাঁরে খুকী!
এরা কি আজকের?
সে প্রায় আশী বছরেরও আগে
ঠাকুর্দা এদের দোকান থেকে
মশলা কিনতো!
সে মশলার কী ঘ্রাণ!
তখন আমি ছোট্ট খুকী!

এতদিনকার ব্যবেসা না হলে
এদের 'কুকুমী' গুঁড়ো মশলা
এত নাম করেছে?

'কুকুমী' গুঁড়ো মশলা বাজারের সেরা!

কুমঃ চন্দ দত্ত (স্পাইস) প্রাইভেট লিঃ

৯০ বছরের ও তারিক প্রাচীন ও বর্তমানে মশলার বৃহত্তম প্রতিষ্ঠান

আড়তদারি রপ্তানি আমদানি পাইকারি খুচরা

সর্বাধিক বিক্রীত গুঁড়ো মশলা • নিজস্ব মিলে প্রস্তুত
পানের লঙ্কা সুপারফাইন মাসিক বিক্রয়

গ্রাম : "স্পাইসমার্ট" মিল—কাশীপুর

২৩৫নং মহর্ষি দেবেন্দ্র রোড, পোস্তা, কলিকাতা-৭

সাপ্তাহিক বসুমতী

চন্দ্রলোক থেকে মর্ত্যলোকে ফিরে

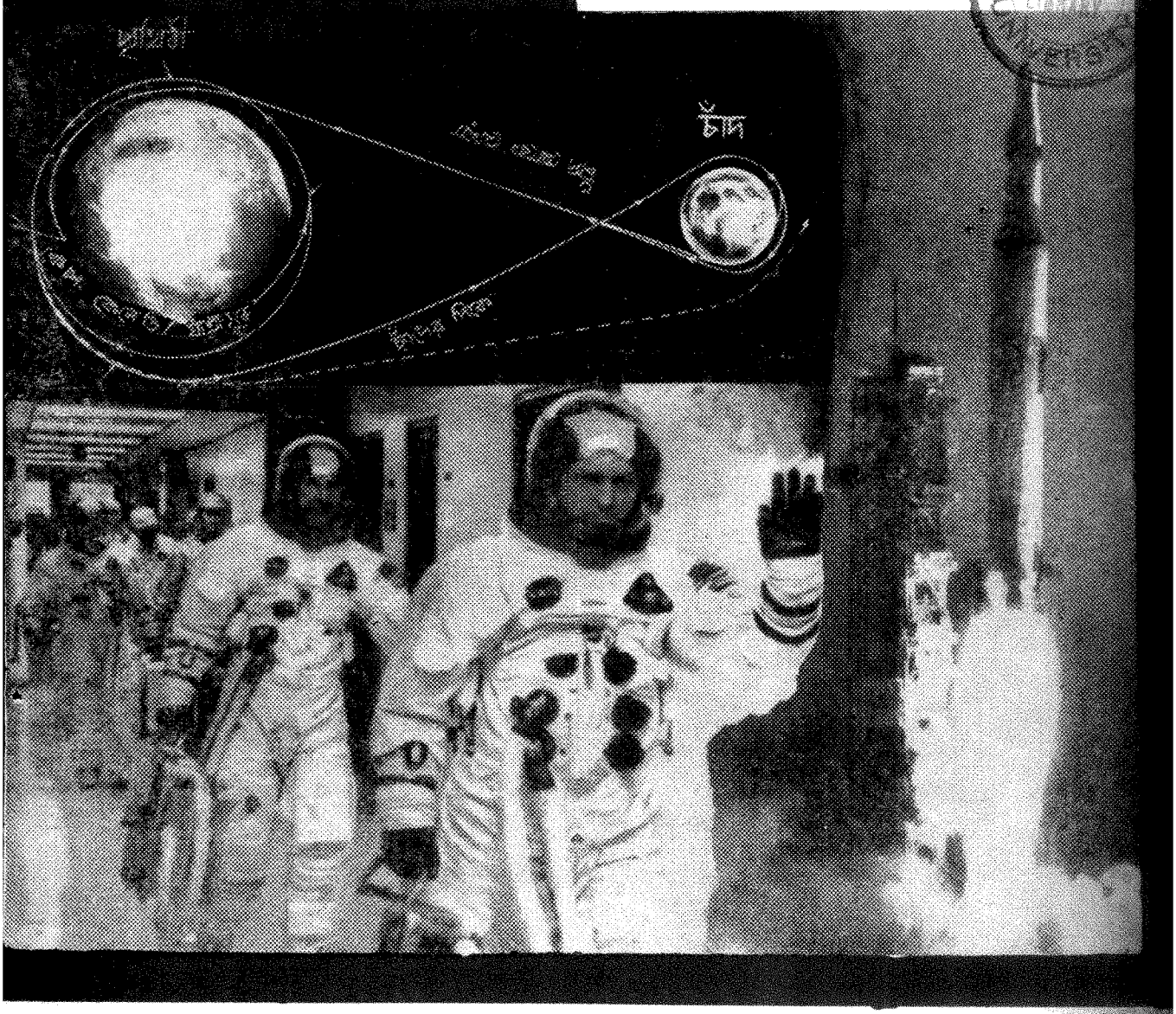

CALCUTTA CENTRAL LIBRARY

৩ বর্ষ ঃ ২৮শ সংখ্যা, বৃহস্পতিবার, ১৮ই পৌষ, ১৩৭৫ বঙ্গাব্দ | OLDEST WEEKLY OF NORTH INDIA | 73rd year, No. 28, 2nd Jan. 1969

সূচীপত্র

বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা
সম্পাদকীয়		১৭০১
আজকের মানুষ		১৭০২
রবীন্দ্রনাথ ও সুভাষচন্দ্র (ধারাবাহিক প্রবন্ধ)	— শঙ্করীপ্রসাদ বসু	১৭০৩
খণ্ডদর্শন		১৭০৭
সপ্তাহের খোঁজ	— কৃত্তিবাস ওঝা	১৭৪১
ভারতদর্শন		১৭৪৩
আন্তর্জাতিক		১৭৪৬
ভাই সভ্যেন	— ডাঃ পশুপতি ভট্টাচার্য	১৭৫০
পথ কে রুখবে? (ধারাবাহিক উপন্যাস)	— মনোজ বসু	১৭৫২
চাঁদের কাছাকাছি	— ডাঃ বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য	১৭৫৫

যে কোন
গয়না
আর
আসল
গহরত
কেনার
দক্ষিণ কোলকাতায়
নামকরা প্রতিষ্ঠান

ফোন : ৪৬-৬২৫৮

সন অ্যাণ্ড গ্র্যাণ্ডসন অব লেট
এম. বি. সরকার

এস.সরকার এণ্ড সন্স
৯১।১এ রাসবিহারী এভিন্যু, কলিকাতা-২৯

সূচীপত্র

বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা
পাঠকমন	—	১৭৫৯
ফেরারী (গল্প)	— রবীন রায়চৌধুরী	১৭৬৪
শিল্প-বাণিজ্য-অর্থনীতি	— শ্রীসওদাগর	১৭৭২
রুচিকের দেশে	— গীতা বন্দ্যোপাধ্যায়	১৭৭৪
খুঁজুন, সেই জিপসীদের (কবিতা)	— গোবিন্দ চক্রবর্তী	১৭৭৫
গ্রন্থমেলা		১৭৭৬
বুদ্ধদেব ওদেশে এবং এদেশে	— শিলালি	১৭৮০
বুদ্ধজগৎ		১৭৮৩
খেলাধুলো	— শান্তিপ্রিয়	১৭৮৮

—সদ্য প্রকাশিত হইয়াছে।।—

বহুকাল পরে পুনর্মুদ্রণ

"নবীনবাবু বর্ণনা এবং গীতিতে একপ্রকার মন্ত্রসিদ্ধ। ... এই সকল বিষয়ে তাঁহার লিপিপ্রণালীর সঙ্গে বায়রনের লিপি-প্রণালীর বিশেষ সাদৃশ্য দেখা যায়।..... বায়রনের ন্যায় নবীনবাবু বর্ণনায় অত্যন্ত ক্ষমতাশালী।..... নবীনবাবুর যখন স্বদেশ-বাৎসল্য স্রোতঃ উচ্ছলিত হয়, তখন তিনিও রাখিয়া ঢাকিয়া বলিতে জানেন না।"—বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।

মহাকবি

নবীনচন্দ্র সেনের গ্রন্থাবলী

রৈবতক কাব্য ।। কুরুক্ষেত্র প্রভাস

গ্রন্থের পৃষ্ঠা সংখ্যা ৩০৮।

মূল্য মাত্র সাত টাকা।

বসুমতী প্রাইভেট লিমিটেড ঃ ১৬৬, বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী ষ্ট্রীট, কলিকাতা—১২

CALCU
CENTRA
LIBRAR
UNIVERS

৭৩ বর্ষ ঃ ২৮শ সংখ্যা মূল্য ঃ ৩০ পয়সা বাংলা ভাষায় দ্বিতীয় সর্বাধিক প্রচারিত সাপ্তাহিক পত্রিকা PRICE : 30 Paise
বৃহস্পতিবার, ১৮ই পৌষ, ১৩৭৫ বঙ্গাব্দ Thursday, 2nd January, 1969

সাহিত্যের সত্য

মহাকাশ বিজয় ও চন্দ্র পরিক্রমার চূড়ান্ত সাফল্য দেখিয়ে মার্কিন বিজ্ঞানীরা পৃথিবীকে বিস্মিত করেছেন। যে তিনজন মহাকাশচারী মরণ-বটিকাকে অগ্রাহ্য করে সর্বপ্রথম চন্দ্রাভিযান সেরে পৃথিবীতে ফিরে এসেছেন—তাঁরা মানুষের মহাকাশ বিজয়ের স্বপ্নকে বাস্তবে আর এক ধাপ এগিয়ে দিলেন। গ্রহ থেকে গ্রহান্তরে মানুষ একদিন যাবেই—একথা এখন আর অলীক নয়।

তেমনি অলীক নয় সেই সব বিজ্ঞান-চেতন লেখকদের লেখা যাঁরা একদা কল্পনা-শক্তিতে মর্ত্যলোকের মানুষকে মহাকাশের জিজ্ঞাসায় অনুপ্রাণিত করে-ছিলেন। অ্যাপোলো-৮-এর মহাকাশ যাত্রা সুরু থেকে তার নেমে আসা পর্যন্ত যে বিবরণ প্রকাশিত হয়েছে—তার সঙ্গে প্রায় মিলে গেছে জুলস ভার্নের চন্দ্রাভিযানের কাহিনী।

অবশ্য সাহিত্যের কাজ হচ্ছে সামাজিক মানুষকে প্রেরণা দেওয়া। অনেকের ধারণা সাহিত্য ও বিজ্ঞান পরস্পর বিমুখী। কিন্তু বিজ্ঞান স্বক্ষেত্রে শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন করলেও সাহিত্যের সঙ্গে তার কোনো বিরোধ নেই। বরং এটাই সত্য যে, বিজ্ঞানের নানারকম আবিষ্কার জ্ঞাত হবার পর দেখা গেছে ভূয়োদর্শী সাহিত্যিকরা তাঁদের কল্পনার বলে যা লিখে গেছেন—তার সঙ্গে কোনো অমিল নেই। তবু দুর্ভাগ্য এই যে, ঐ সব লেখকদের মধ্যে কেউ কেউ কল্পনাবিলাসী বলে অভিহিত হয়েছেন এবং সাহিত্যের ক্ষেত্রে রসের মূল্যায়ন করতে গিয়ে তাঁদের যথার্থ যোগ্যতার পরিমাপ করা হয় নি। এমনি একজন সাহিত্যিক জুলস ভার্নে। হয়তো এবার তাঁকে যথাযোগ্য মর্যাদার আসনে প্রতিষ্ঠা দান করা হবে। কারণ জাগতিক জীব হাতে-নাতে প্রমাণ না পেলে সাহিত্যের ক্ষেত্রেও প্রশ্ন তুলতে পিছপা হয় না। এবং আরো বিস্ময়কর ব্যাপার এই যে, সাধারণ চোখে যা দেখা যায়—তাতে উত্তেজনার মশলার মিশেল দিলেই এক শ্রেণীর লোক মনে করে বুঝি এটাই সাহিত্য।

সাহিত্য নিশ্চয়ই যুগধর্মবিধৃত, তবু সত্যিকারের যিনি স্রষ্টা তাঁর সৃষ্টি আগামীকালের ইংগিত বহন করে। আমরা একথা না বুঝলেও বিজ্ঞানীরা কিন্তু তা বোঝেন। তাই দেখা যায়, আইনস্টাইনের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের সাক্ষাৎকারের সময় এই দুই মনীষী অন্তরঙ্গ হতে পেরেছিলেন।

আমাদের দেশের ধ্রুপদী সাহিত্যে বিজ্ঞানের যান্ত্রিকতার স্বরূপ নিয়ে কোথাও গল্প ফাঁদার চেষ্টা নেই। কিন্তু যেসব কাহিনী থাকলে মানুষ প্রেরণা পেতে পারে—তা রামায়ণ বা মহাভারত—এই দুই মহাকাব্যে আছে। পুষ্পকরথের কাহিনী রোমাঞ্চকর কাহিনীর অন্তর্গত বলে মনে হলেও বিজ্ঞানীদের মনে ঐ কাহিনী শুধু রসই সৃষ্টি করে নি, তাঁদের প্রেরণা দিয়েছে আকাশ পাড়ি দেবার। তাছাড়া ত্রিশঙ্কুকে স্বর্গ থেকে ফেলে দেওয়া ও তারপর স্বর্গ ও মর্ত্যের মধ্যস্থলে তার ঝুলে থাকার কাহিনী অবিশ্বাস্য বিবেচিত হলেও আকর্ষণ-বিকর্ষণ ঘটিত বিজ্ঞানের তথ্য থেকে সাধারণ লোক অনুমান করতে পারেন যে, সাহিত্যিক যে প্রেরণাবলে ঐ কাহিনী রচনা করেছেন তার মধ্যে ঊর্ধ্বাচারী কল্পনাই ক্রিয়া করেছে।

তবে, পুরাণে বা সাহিত্যে কী আছে—তা নিয়েও বড়াই করা নিষ্প্রয়োজন, যদি তা বিন্দুমাত্র প্রেরণা দিয়ে মানুষকে এগিয়ে দিতে না পারে। ফরাসী সাহিত্যিক কী লিখেছেন—এই নিয়ে তাঁদের কল্পনাবিলাস বৃথা এবং তাঁরা কোনোরকম বিশেষ দাবিও আরোপ করেন নি। এক দেশের সাহিত্যকর্মকে আর এক দেশের বিজ্ঞানী সার্থক করে তুলেছেন,—তেমনি এক দেশের বিজ্ঞানের জয়যাত্রায় অন্য দেশের মানুষ সামিল হবেন—এটাই সত্য। তাহলেই দেশের সীমা ছেড়ে সাহিত্য ও বিজ্ঞান সর্বদেশের মানুষের মধ্যে সমান আগ্রহ সৃষ্টি করবে এবং সকলেরই কল্যাণ সাধিত হবে।

বলা নিষ্প্রয়োজন, বিজ্ঞানের অত্যুন্নতির ক্ষেত্রে সাহিত্যের সত্য কি—সে সম্বন্ধে পৃথিবীর শিক্ষিত মানুষ চন্দ্রাভিযানের ফলে কিছুটা জ্ঞাত হলেন। কিন্তু আসলে সাহিত্য বিষয়টি কি—তা গভীরভাবে অনুধাবন করতে হবে। বস্তুর জগতে তার গতিবিধি থাকলেও কল্পনার জগতেও সে এই বিংশ শতকে অপাংক্তেয় নয়। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন,—

"কবি তব মনোভূমি রামের
জনমস্থান....."

আমাদের মতো সাধারণ মানুষ অযোধ্যায় গিয়ে হয়তো বহুবার রামের জন্মস্থান খুঁজে ফিরেছে—এবং খুঁজে পেলে হয়তো সাজানো-গোছানো কিছু ধ্বংসাবশেষের সম্মুখীন হয়েছে...। কিন্তু সেখানেই তো কাহিনীর শেষ নয়। কবি যে আদর্শ ও চরিত্র সমাজের মনে আরোপ করতে চেয়েছেন—আমরা কি তার অনু-সন্ধান করি?

সাহিত্য ও বিজ্ঞানের মেলবন্ধন তখনই সার্থক হবে যখন এই পৃথিবীতে সেই আদর্শ সার্থক হবে। বিজ্ঞানের জয়যাত্রাও তখনই হবে সার্থক। কিন্তু বিজ্ঞানের সঙ্গে সাহিত্যের যোগ নির্ণয় করতে গিয়ে একালের সাহিত্য সমাজ ও পৃথিবীকে কী দিচ্ছে—তার বিচার করার দিন কি আজ নয়? তবে সাহিত্য রসনিরপেক্ষ কোনো অপার্থিব বস্তু নয়। পৃথিবীর মানুষকে অপার্থিব বিস্ময়ের সম্মুখীন হতেই সাহায্য করে।

সম্পাদকীয়

আজকের মানুষ

আজ সকলের মুখে মুখে বোরম্যান, বোরম্যান। অবশ্য লোভেল, অ্যান্ডার্সের নামও তারা নিচ্ছে। কিন্তু দলের নেতা ফ্র্যাঙ্ক বোরম্যান, তাই হরিনাম জপ করার মতো সবাই বিড়বিড় করে ওই নামটিই উচ্চারণ করছে বার বার। এই তিন মার্কিন তরুণ নিজেদের অমূল্য জীবন বাজি রেখে অসাধ্য সাধন করেছেন, মানুষের চন্দ্রজয়ের দিগন্ত খুলে দিয়েছেন। রাবণ স্বর্গের সিঁড়ি তৈরি করতে গিয়ে বিফল হয়েছিলেন, বোরম্যানরা স্বচ্ছন্দে চন্দ্রলোকের স্বর্গসিঁড়ি বানিয়ে দিলেন।

মানবজাতির ইতিহাসে, বিজ্ঞান ও সভ্যতার ইতিহাসে একুশে ডিসেম্বর তারিখটি অবিস্মরণীয় হয়ে থাকবে, যেদিনটিতে এই তিনজন মহাকাশচারী অ্যাপোলো-৮ মহাকাশযানে চেপে চন্দ্রলোকে যাত্রা করেন। চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে সাতাশে ডিসেম্বর দিনটিও, যেদিন সগৌরবে দায়িত্ব পালন করে তাঁরা নির্ধারিত স্থানে অবতরণ করলেন। রেকর্ড তাঁরা কম করলেন না, একটার চেয়ে একটা উজ্জ্বল। এঁরাই প্রথম পৃথিবীর অভিকর্ষ-বন্ধন ছাড়িয়ে চন্দ্রের অভিকর্ষে পৌঁছুলেন, প্রথম চাঁদের কক্ষপথ ধরে চাঁদকে চক্কর দিলেন। এঁরাই পৃথিবীর প্রথম মানুষ চাঁদের অপর পিঠের অন্ধকার দিকটি দেখতে পেয়েছেন। পৃথিবীর সঙ্গে সমস্ত যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়েও এঁরাই প্রথম সে যোগাযোগ পুনঃসংস্থাপন করেছেন।

যোগ্যতার যে-কোনো মাপকাঠি দিয়ে বিচার করুন, নেতৃপদ দিতে হবে ফ্র্যাঙ্ক বোরম্যানকেই। লোভেল, অ্যান্ডার্সকে কোনো দিক থেকে খাটো না করেও। আমেরিকা এবং সোভিয়েট রাশিয়ার মোট ৩৪ জন মহাকাশচারীর মধ্যে অনেক বিষয়েই প্রথম স্থান দখল করার কৃতিত্ব ফ্র্যাঙ্ক বোরম্যানের।

ইণ্ডিয়ানাপলিসের গ্যারী শহরে ১৯২৮ সালের ১৪ই মার্চ ফ্র্যাঙ্ক বোরম্যানের জন্ম। কিন্তু তিনি বড় হয়েছেন অ্যারিজোনার টাস্কান শহরে, ছোটবেলার লেখাপড়াও তাঁর এখানে। ওয়েস্ট পয়েন্ট মিলিটারী একাডেমি থেকে তিনি বিজ্ঞানের স্নাতক হন, আর ক্যালিফোর্নিয়া ইনস্টিটিউট থেকে এরোনাটিক্যাল ইঞ্জিনীয়ারিং বিষয়ে এম-এসসি পাশ করেন ১৯৫৭ সালে।

কিন্তু তার আগে, মানে স্নাতক হবার পরেই বোরম্যান বিমানবাহিনীতে যোগ দেন এবং অ্যারিজোনার উইলিয়ামস এয়ার বেস-এ বিমানচালনার শিক্ষা নেন। জঙ্গী বিমানবাহিনীর বিভিন্ন দায়িত্ব নিয়ে বোরম্যানকে পাঁচ বছর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং ফিলিপিন্সের জায়গায়-জায়গায় যেতে

বোরম্যান

হয়েছে। এর পরে তিনি কিছুকাল শিক্ষকতা করেছেন, হাতে-কলমে যা শিখেছেন তার থিয়োরীটিক্যাল যা পুঁথিগত বিদ্যা দান করেছেন মিলিটারী একাডেমিতে—বিষয় ছিলো থার্মোডায়নামিক্স এবং ফ্লুইড মেকানিক্স। এক বছর বাদে তাঁর সুযোগ ঘটলো ভবিষ্যৎ স্বপ্নের বীজ বপন করার, মার্কিন বিমানবাহিনীর মহাকাশ সমীক্ষা বিদ্যালয়ে বিশেষ ট্রেনিং নেবার। এখান থেকে '৬০ সনে তিনি গ্র্যাজুয়েট হলেন, তারপর এই বিষয়েই দু' বছরকাল শিক্ষকতা করলেন।

একই বছরে, '৬২ সনের সেপ্টেম্বর মাসের সে-দিনটির কথা বোরম্যান কখনোই ভুলতে পারবেন না, যেদিন তাঁর কাছে এলো আকাঙ্ক্ষিত চিঠিটি এলো। দেশের মহাকাশ বিজ্ঞান সংস্থা (NASA) তাঁকে মহাকাশচারী মনোনীত করে চিঠি দিয়েছেন। নতুন ক্ষেত্রে তাঁকে কয়েকটি বিশেষ দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল গোড়ার দিকে। জেমিনী-৪ মহাকাশযানের তিনি ছিলেন ব্যাক আপ কম্যাণ্ড পাইলট, অ্যাপোলো-২০৪ রিভিউ বোর্ডের তিনি একজন দায়িত্বশীল সদস্য।

তবে ১৯৬৫ সালের ৪ঠা ডিসেম্বর জেমিনী-৭ মহাকাশযানের নেতা মহাকাশচারী হিসেবে তিনি এক রেকর্ড স্থাপন করেছিলেন। বোরম্যানের সে-রেকর্ড হলো ওই জেমিনী-৭ মহাকাশযানে চেপে তিনি মহাকাশে দীর্ঘতম সময় ৩৩০ ঘণ্টা ৩৫ মিনিট অর্থাৎ প্রায় ১৪ দিন বিচরণ করেছেন। আর একটা রেকর্ড হলো পৃথিবীর কক্ষপথে তিনি তাঁর জেমিনী-৭কে জেমিনী-৬ মহাকাশযানে প্রথমবার সংযুক্তি করেছিলেন।

চন্দ্রলোক পরিক্রমার অবিশ্বাস্য কৃতিত্ব প্রদর্শনের আগে বোরম্যান অন্যান্য বিষয়েও তাঁর যোগ্যতার প্রমাণ দিয়েছেন। তার পুরস্কারও তিনি যথাসময়ে পেয়েছেন। 'নাসা'র অতি দুর্লভ সার্ভিস মেডেল পেয়েছেন তিনি। বিমানবাহিনীর মহাকাশচারীর উইংস দেওয়া হয়েছে, পেয়েছেন তিনি ফ্লাইং ক্রসও। জেমিনী-৭-এর কৃতিত্বের জন্যে তাঁকে দেওয়া হয়েছিল বিশেষ পুরস্কার, পেয়েছেন ডেস্টিড শিলিং-ট্রফি, অ্যাভিয়েশন ট্রফি, ক্যালিফোর্নিয়া টেকনলজি থেকে বিশিষ্ট ছাত্রের সার্ভিস পুরস্কার।

অ্যাপোলো-৮কে পৃথিবীর সীমানা ছাড়িয়ে চন্দ্রলোক থেকে ঘুরিয়ে এনে বোরম্যান আজ অভূতপূর্ব কৃতিত্ব দেখিয়েছেন। কিন্তু ভাবলে অবাক হতে হয়, বোরম্যানের মহাকাশচারী হবার স্বপ্ন একদিন অঙ্কুরেই বিনাশ হতে বসেছিলো ১৯৫১ সালে যেদিন জেট বিমানে নামতে গিয়ে বাতাসের চাপে তাঁর কানের পর্দা ছিঁড়ে গিয়েছিল এবং ডাক্তাররা তাঁর বিমানচালনা নিষিদ্ধ করে দিয়েছিলেন। কিন্তু সে কান সেরেছে। তিনি মোট দু'বার মহাকাশ যাত্রা করলেন।

৪০ বছর বয়স্ক, ৫ ফুট ১০ ইঞ্চি উচ্চতা, নীল চোখ, লাল চুলো কর্নেল বোরম্যানের দু' ছেলে এবং স্ত্রী সুসানকে নিয়ে চারজনের সুখী পরিবার।

রবীন্দ্রনাথ ও সুভাষচন্দ্র

শঙ্করীপ্রসাদ বসু

[পূর্ব-প্রকাশিতের পর]

মুক্তি দাও! মুক্তি চাই!

॥ দুই ॥

সুভাষচন্দ্রের মত নিরুপায় যাতনায় ছিলেন আরো একজন। তিনি বাঁধা ছিলেন বয়সে ও স্বধর্মে। ৭৭ বৎসরের বৃদ্ধ কবির ধর্ম নয় রাজনীতি, কিন্তু ন্যায়নীতির দাবিকে অগ্রাহ্য করবেন কি করে? মানবতার মহাকবি বিপন্ন মানবের প্রয়োজনে সাড়া দেবেন না? ২রা অগস্ট অনশনকারীদের প্রতি সমবেদনা জ্ঞাপন ও সরকারী নীতির প্রতিবাদের জন্য আহূত টাউন হলের জনসভায় সভাপতি রবীন্দ্রনাথের মথিত কণ্ঠ শোনা গেল—

"সপ্তাহকাল হল আন্দামানে প্রায় দুশো বন্দী অনশন ধর্মঘট করেছেন। এই সংবাদ আমাদের কাছে সরকার দীর্ঘকাল গোপন রেখেছেন। জনসমাজের সেন্টিমেন্টের প্রতি সরকারের এই নিষ্ঠুর ঔদাসীন্য আমাদের জাতীয় অসহায়তারই স্মারক। ইংলণ্ড বা অন্য কোনো ডেমোক্র্যাটিক দেশে সরকারের পক্ষে জাতীয় জীবনের এমন বিশেষ ঘটনাকে লোকসমাজের নিকট অবিদিত রাখা সম্ভব হত না। বন্দীদের দাবি ন্যায়সঙ্গত ও সামান্যই। আমাদের শাসনকর্তারা দেশের লোকের কাছে দায়ী নয়। সে অবস্থায় লোকের এ আশঙ্কা খুবই স্বাভাবিক যে, ভারত থেকে সহস্র মাইল দূরে দ্বীপের মধ্যে আবদ্ধ এই বন্দীরা ন্যায্য ব্যবহার থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। জনসমাজের দাবি এই যে, রাজনৈতিক বন্দীদিগকে ভারতেই রাখা হোক। সেখানে জনমত যদি আর কিছু না পারে, কারাগারের অমানুষিক রূঢ়তাকে কিয়দ পরিমাণে নিয়ন্ত্রিত ও শমিত করতে পারবেন।

"শাস্তিদানের হৃদয়হীন পদ্ধতি এখনো যা পৃথিবীর বেশীরভাগ স্থানে চলেছে, তা আধুনিক সভ্যতাকে লজ্জিত করবার পক্ষে যথেষ্ট। অধুনা পাশ্চাত্ত্য জগতে রাজনৈতিক মতবিরোধীদের বিরুদ্ধে প্রতিহিংসাপরায়ণ মনোভাব অনেক রাষ্ট্রেই দেখা দিচ্ছে। দেশের বিধিবদ্ধ আইন ও মানুষের স্বাধীনতার বিধিসঙ্গত দাবির প্রতি শ্রদ্ধাহীন এই ফ্যাসিস্ট মনোভাব থেকে ভারত সরকারও আজ মুক্ত নয়।

"এই হতভাগ্য প্রদেশের শত শত উৎপীড়িত ঘরে নিরাশার অন্ধকার আজ পরিব্যাপ্ত। এখানে অপরিণত বয়সের নরনারী অনির্দিষ্টকালের জন্য বিনা বিচারে নানাপ্রকার দৈহিক ও মানসিক শাস্তিভোগ করছে।

"বর্তমান পরিস্থিতিতে দেশবাসী কর্তৃক অনুরুদ্ধ হয়ে আমি আমাদের শাসকসম্প্রদায়ের কাছে শাসনব্যাপারে কোনো আমূল সংস্কারের দাবি—যদিও তার বিশেষ প্রয়োজন হয়েছে—পেশ করছি না; কেবল বন্দীদের প্রতি যে কঠোর ব্যবহার চলছে, তাকেই শমিত করবার জন্য অনুরোধ জ্ঞাপন করছি।"*

এর পরে ১৪ অগস্ট আন্দামান দিবসে শান্তিনিকেতনে ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে রবীন্দ্রনাথ যে ভাষণ দেন, রবীন্দ্রজীবনীকার প্রভাতকুমারের মতে "তাহার সুর কলিকাতায় প্রদত্ত বক্তৃতা হইতে সম্পূর্ণ পৃথক।" রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন—

"আজ একটি বিশেষ নির্দিষ্ট দিনে বন্দীদের দুঃখে দরদ জানাবার জন্য তোমরা সভা আহ্বান করেছ। সম্প্রতি আমাদের দেশে বিশেষ উপলক্ষে বিশেষ দিনে দল বেঁধে আন্দোলন করবার একটা রীতি দাঁড়িয়ে যাচ্ছে। তাতে কিছুক্ষণের জন্যে নিজেদের নালিশ উপভোগ করবার একটা নেশায় আমাদের পেয়ে বসে। সেটার রাষ্ট্রীয় সার্থকতা কিছু থাকে তো থাক, কিন্তু ক্ষণে-ক্ষণে এইরকম পোলিটিক্যাল দশা-পাওয়ার উত্তেজনা উদ্রেক করা আমাদের এখানকার কাজের ও ভাবের সঙ্গে সঙ্গত হয় বলে আমি মনে করিনে।"

প্রভাতকুমার ঠিকই বলেছেন, এই বক্তৃতার সুর সম্পূর্ণ পৃথক। রাজনৈতিক আন্দোলনের প্রচলিত পদ্ধতি যে রবীন্দ্রনাথের মনোমত নয়, তা রীতিমত তীব্র ভাষায় তিনি জানালেন; বিশেষত শান্তিনিকেতনের ছাত্রছাত্রীদের পক্ষে এই ধরণের আন্দোলনে জড়িয়ে পড়া যে তাঁর পছন্দ নয়, তা স্পষ্টই বোঝা গেল। যাই হোক, বাস্তব রাজনৈতিক মত-পথের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের উচ্চ নৈতিক কর্তব্যবুদ্ধির যে মিল ঘটে নি, তা পুরাতন তথ্য। তাহলেও, কবির নীতি শুধু কবির নীতি হলেও, কবি অপরাদিকে অত্যাচারীকে ক্ষমা করতে প্রস্তুত ছিলেন না।*

---

* এই বক্তৃতাতেই রবীন্দ্রনাথ আরও বলেছিলেন—

"Continuing, the Poet reiterated his feelings of shame and sorrow at the inhuman treatment metedout by the

দাবি আদায়ের জন্য অনশন করা উচিত কি না উচিত, সে বিষয়ে ন্যায়ের সূক্ষ্ম তর্ক যদি কবির মনে উঠে থাকেও, সমস্ত প্রাণ কিন্তু ব্যাকুল হয়ে উঠেছিল সেই দূর দ্বীপের মানুষগুলির কল্যাণ কামনায়, যাদের চোখের আলো প্রতি মুহূর্তে ক্ষীণ হয়ে আসছে। তিনি অনশন ধর্মঘটীদের কাছে অনশন ত্যাগের অনুরোধ করে তার পাঠালেন, এবং গান্ধীজী ও তৎকালীন কংগ্রেস-সভাপতি জওহরলালের উদ্দেশ্যে সবিশেষ মিনতি

Government to the large number of political prisoners whose very lives to-day depended on their mercy. No sensible person would deny that there must be provisions for punishment for law-breakers in any civil society, but, the Poet asked, must such punishment be entirely devoid of all sense of humanity and decency? There are law-breakers in England too and even political offenders but are they ever subjected to a hundreth of humiliation and suffering as is the daily lot of prisoners in this country?

We are told, said the Poet, that we are to-day living in a new regime when the fundamental powers of Government have been transferred to the people of the country. Can our own people who are to-day holding the reins of office ignore the united demand of the nation calling for redress of the grievances of the Andaman prisoners? They might be sitting on Treasury Benches but must that necessarily dry up the fountains of mercy in their hearts? In our *Shastras* it is said that mercy is only possible where there is real power. Let our new rules prove their strength by tempering their justice with mercy. They must remember that any indignity heaped upon their prisoners is also heaped upon themselves." (Amrita Bazar Patrika, Aug. 15, 1937).

জানালেন এ বিষয়ে তৎপর হতে। রবীন্দ্রনাথ ওঁদের লিখেছিলেন—

> "I have wired to Andaman prisoners to give up hunger-strike. Their lives must be saved. Hope you and Jawaharlal will exert utmost influence."

গান্ধীজী কবিকে আশ্বস্ত করে লিখলেন, নিশ্চিন্ত থাকুন, এ বিষয়ে যথাসাধ্য করব; জওহরলাল জানালেন, তিনি স্বরাষ্ট্রসচিবের মারফৎ বন্দীদের কাছে তার পাঠিয়ে জানিয়েছেন যে, কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটি তাঁদের বিষয়ে সুদীর্ঘ প্রস্তাব গ্রহণ করেছে এবং ওয়ার্কিং কমিটির পক্ষে তিনি তাঁদের কাছে অনশন ত্যাগের আবেদন জানিয়েছেন।*১

২৭ অগস্ট তারিখে গান্ধীজী ভাইসরয় মারফৎ বন্দীদের কাছে অনশন ত্যাগের অনুরোধ করেছিলেন; তাঁর অনুরোধজ্ঞাপক তারের মধ্যে রবীন্দ্রনাথের পরামর্শের উল্লেখ ছিল এবং বন্দীরা যে আর হিংসাত্মক বৈপ্লবিক কর্মে বিশ্বাস করেন না, সে বিষয়ে পুনর্ঘোষণার আবেদন ছিল। বন্দীরা ইতিমধ্যেই জানিয়েছিলেন, গুপ্ত বৈপ্লবিক পথের ঔচিত্যে তাঁরা আর বিশ্বাস করেন না।*২

---

*১ অমৃতবাজার, ২১ অগস্ট।

*২ গান্ধীজীর তার—

"I venture to add my advice to Gurudeva Tagore's and Working Committee's to abandon strike relying upon us all trying best to secure relief for you. It would be graceful on your part to yield to nation-wide request. You would help me personally if I get assurance that those who believed in terrorist methods no longer believe in them and that they have come to believe in non-violence as best method. I ask this because some leaders say detenues have abjured terrorism but opinion to contrary also has been expressed." (অমৃতবাজার ২ সেপ্টেম্বর)

গান্ধীজীর আবেদনে সাড়া দিয়ে বন্দীরা অনশন স্থগিত রাখতে সম্মত হয়েছিলেন। তাঁরা গান্ধীজীকে জানান—

> "সমস্ত জাতির আবেদনে এবং আপনার বার্তায় অভিভূত হয়ে আমরা অনশন স্থগিত রাখছি; তা করছি এই বিশ্বাসে যে, সমগ্র দেশ আমাদের দাবি ও প্রয়োজনকে নিজের বলে গ্রহণ করেছে। আমরা আশা ও বিশ্বাস করছি, ন্যায়সঙ্গত সময়ের মধ্যে আপনি আমাদের সর্বপ্রকার দাবি আদায়ে সমর্থ হবেন। এই সূত্রে সন্ত্রাসবাদ সম্বন্ধে আমাদের দৃঢ় অভিমত প্রকাশের সুযোগ যে আপনি করে দিলেন, তার জন্য আমরা আনন্দিত। আপনাকে, এবং আপনার মধ্য দিয়ে সমগ্র দেশকে এই সংবাদ জানিয়ে আমরা গৌরব বোধ করছি যে, আমাদের মধ্যে যাঁরা সন্ত্রাসবাদে বিশ্বাস করেছিলেন, তাঁদের সে বিশ্বাস আর নেই, রাজনৈতিক মত ও পথরূপে সন্ত্রাসবাদের ব্যর্থতা তাঁরা বোধ করেছেন। আমরা এখানে জানাচ্ছি, ঐ পথ দেশের অগ্রগতিকে সম্ভব তো করেই না, অপরপক্ষে নিশ্চিত ব্যাহত করে।"

বন্দীরা সাময়িকভাবে হলেও পরিষ্কার নীতি স্বীকার করলেন। অথবা কথাটাকে 'নীতি স্বীকার' না বলে দেশের এবং দেশনেতার ডাকে সাড়া দেওয়াও বলা চলে। তাঁরা স্পষ্টই নিজেদের পূর্ব মত ও পথের ভ্রান্তিকে মেনে নিলেন। ধারণাবদলের অধিকার সকলেরই আছে; এবং নিরাপদ দূরত্বে থেকে আমাদের মত লেখকদের কলমের বীরত্বে কোনো বীরত্ব নেই তা আমরা জানি। তা হলেও একটা কথা বলতে হবে, এই সময়ে যাঁরা সন্ত্রাসবাদে ('টেররিজম্' কথাটাকে এঁরা মেনেই নিয়েছিলেন) আস্থা হারিয়েছিলেন, তাঁরা যেন পরবর্তীকালে নিজেদের বৈপ্লবিক ভূমিকা নিয়ে গৌরবগান না করেন। ইতিহাসের পক্ষে আমরা যে-পর্যন্ত তাঁরা একাগ্র আদর্শে যন্ত্রণা সয়েছেন, সেই পর্যন্ত তাঁদের প্রতি শ্রদ্ধা জানাবো এবং যদি পরবর্তী কোনো নতুন ভূমিকার দ্বারা শ্রদ্ধাযোগ্য কাজ করে থাকেন, তার জন্য নমস্কার করব, কিন্তু কদাপি নতুন পথের পথিকদের ত্যক্ত এবং ভ্রান্ত বলে ঘোষিত পুরাতন পথের গৌরব পিছন ফিরে কুড়িয়ে নিতে দেব না।

যাই হোক অনশন ত্যাগের ফল কিন্তু 'ন্যায়সঙ্গত সময়ের' মধ্যে পাওয়া যায় নি। অবিলম্বে কোনো বন্দীমুক্তি হয় নি।

গান্ধীজীকে শাসনকর্তাদের স্বাস্থ্য হতে হল বারবার। অক্টোবর মাসে নিখিল ভারত রাষ্ট্রীয় সমিতির অধিবেশন উপলক্ষে গান্ধীজী কলকাতায় এলেন, একদিকে বন্দীদের ও প্রাক্তন বন্দীদের সঙ্গে, অন্যদিকে শাসনকর্তাদের সঙ্গে আলোচনা চালালেন। এইসব আলোচনাকালে কখনো কখনো সুভাষচন্দ্র গান্ধীজীর সঙ্গে মিলিত হইলেন। তিনি ইতিমধ্যে রুলরাজ্যে ফিরে এসেছেন।*১ আন্দোলন ও আলোচনা—দুইয়ের দ্বারা বন্দীমুক্তির ব্যাপারকে ত্বরান্বিত করতে বসু-ভ্রাতারা ব্যস্ত ছিলেন।*২ গান্ধীজী গভর্নর এবং স্বরাষ্ট্রসচিব খাজা নাজিমুদ্দিনের সঙ্গে সুবিধামত আলোচনা করলেন। এবং যখন "আনন্দের সঙ্গে" কলকাতা ত্যাগ করে গেলেন*৩, তখন সকলে ধরে নিল, এ ব্যাপারে সরকারের সঙ্গে নিশ্চয় একটা পড়া হয়ে গেছে। সুভাষচন্দ্র আবার স্বাস্থ্যের কারণে ইউরোপ যাত্রা করলেন, যাবার আগে ১৮ নভেম্বর তারিখে প্রকাশিত এক বিবৃতিতে বললেন, দেশে অহিংসার আদর্শ বজায় থাকলেই তবে গান্ধীজীর পক্ষে বন্দীমুক্তি করানো সম্ভব হবে।

এই সব আলাপ-আলোচনা এবং সংবাদ থেকে যে প্রত্যাশার সূত্রপাত হয়েছিল, তার ফল দেখা গেল অচিরে। গান্ধী-গভর্নর

---

*১ 'অমৃতবাজার ৮ নভেম্বর, ১৯৩৭।

*২ ৮ নভেম্বর, ১৯৩৭ তারিখে গান্ধীজী জওহরলালকে চিঠিতে লেখেন—"বাংলার বন্দীদের ব্যাপারে আমি কি করছি, তা তোমাকে জানাবার জন্য এই চিঠি লিখছি।....কথাবার্তার কাজটা বড় বিরক্তিকর লেগেছে। এ ব্যাপারে অগ্রসর হওয়ার পূর্বে—আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে মুক্তিলাভ বাঞ্ছনীয় কি না, এই বিষয়ে (বসু) ভ্রাতৃদ্বয়ের সঙ্গে আলাপ করেছি। ....ভ্রাতৃদ্বয়ের ইচ্ছা যে কথাবার্তা চালানো হোক, ওদিক থেকে গণ-বিক্ষোভও চলুক। আমি কিভাবে অগ্রসর হতে চাই ওঁদের খুলে বললুম।" (পত্রগুচ্ছ)

*৩ ঐ চিঠিতে গান্ধীজী আরও লিখেছিলেন—"আমি দ্বীপান্তর-প্রত্যাগত ও দেউলী-প্রত্যাগত বন্দীদের সাথে এবং গতরাত্রে হিজলী বন্দীদের সাথে দেখা করি। মন্ত্রিগণ গ্রামে এবং স্বগৃহে অন্তরীণ রাজবন্দীদের অবিলম্বে মুক্তি দিতে সম্মত হয়েছেন এবং আগামী চার মাসের মধ্যে বন্দীশিবিরের যে-সমস্ত রাজবন্দীদের নিরাপদ বিবেচনা করবেন, তাদেরও মুক্তি দেবেন। আর যারা থাকবে, তাদের যদি শীঘ্র মুক্তি দেওয়া না হয়, তবে গভর্নমেণ্ট আমার সুপারিশ গ্রহণ করবেন। বন্দীদের বর্তমান মনোভাবটা জানতে পারলে তবে আমি সুপারিশ করতে পারব। স্বাধীনতালাভে সহিংস পন্থায় তারা আর বিশ্বাসী নয় এবং তারা কংগ্রেস অনুমোদিত কার্যক্রম মেনে চলবে, একথা যদি আমি বোঝাতে পারি তাহলে সরকার তাদের মুক্তি দেবেন।...বিভিন্ন জেলে এবং হিজলী ক্যাম্পে সব বন্দীদের সঙ্গে আমার যে কথাবার্তা হয়েছে, তার বিস্তারিত বিবরণ দেবার প্রয়োজন বোধ করছিনে।"

আলোচনার পরিণতিতে ১১০০ জন বন্দীর মুক্তিদানের সংবাদ ঘোষিত হল এবং জানা গেল, বাকি বন্দীদের মুক্তি হবে ক্রমে ক্রমে। রবীন্দ্রনাথ আনন্দিত হলেন; কৃতজ্ঞ হলেন মহাত্মার সম্বন্ধে, যিনি নিজের বার্ধক্যজীর্ণ 'পাঁজর জ্বালিয়ে' বাংলার আঁধার ঘরে আলো আনছেন। শান্তিনিকেতন থেকে রবীন্দ্রনাথের বিবৃতি প্রচারিত হল ১৯ নভেম্বর তারিখে—

"আমাদের প্রিয়জনেরা ঘরে ফিরে আসছেন, তাঁদের অভ্যর্থনা জানাবার সময়ে আমরা যেন মন্ত্রিমণ্ডলীকে তাঁদের রাজনৈতিক সদ্‌বুদ্ধিপ্রণোদিত উদারতার জন্য অভিনন্দন জানাতে ভুলে না যাই। আর, মহাত্মাজীর প্রতি আমাদের কৃতজ্ঞতা নিছক ভাষায় কখনো প্রকাশ করা যাবে না; আমাদের রাজনৈতিক কারাগৃহের দ্বার উন্মোচন করাই তাঁর জীবনব্রত; বন্দী-মুক্তির জন্য তাঁর প্রয়াসের মধ্যে তারই ক্ষুদ্র প্রতীক-রূপ আমরা দেখতে পেয়েছি। এইসব বন্দীদের কেউ কেউ মিথ্যা সন্দেহে আটক ছিলেন, বাকি সকলে এমন সমস্ত কাজের জন্য দোষী, যার পিছনে ছিল মহৎ উদ্দেশ্য, যদিও সম্পূর্ণ ভ্রান্ত পথে তাঁরা চালিত হয়েছিলেন।

"তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশের একটিমাত্রই যথার্থ পথ আছে। আমাদের চরম মুক্তির একমাত্র যে সত্য পথ, সেই অহিংসার নৈতিক পরিবেশ যদি জনগণ সৃষ্টি করতে পারে, তা হলেই ঐ কৃতজ্ঞতা জানানো যাবে। আমাদের মুখপাত্র হয়ে মহাত্মাজী সেই প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন; আমরা যদি তাকে রক্ষা করতে না পারি, তাহলে আমাদের সর্বশ্রেষ্ঠ কল্যাণকারীর প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করব।"

না, উল্লাসের যথেষ্ট কারণ সত্যই ঘটে নি। মুক্তি পেয়েছিলেন শুধু বিনাবিচারে আটক বন্দীরাই, দণ্ডিত রাজনৈতিক বন্দীরা নন। ইউরোপের পথে করাচী থেকে সুভাষচন্দ্র তাঁর অসন্তোষ জানিয়ে গেলেন,*১ এবং গান্ধীজীও আংশিক নৈরাশ্য প্রকাশ করলেন। তিনি বাংলা সরকারের কাছ থেকে আরও বেশি কিছু আশা করেছিলেন। ভেটিনিউদের গান্ধীজী অভিনন্দন জানালেন, সেইসঙ্গে আশা করলেন, আন্দামান বন্দীদেরও মুক্তি ঘটবে।*২

কিন্তু আশার আগুনে ভস্মের পরিমাণ ক্রমেই বাড়তে লাগল; 'ন্যায়সঙ্গত সময়-সীমা' অতিক্রান্ত হল যখন, তখন আন্দামান-বন্দীরা আবার অনশনের সংকল্প করলেন, ভাবিত হলেন গান্ধীজী, আর্তনাদ করে উঠলেন শরৎ বসু ও সেই সঙ্গে বাংলা দেশ,*৩ ঠিক তখনি আন্দামানে অনশন আরম্ভ হল না, আরও মাস দেড়েক কাটল, সুভাষচন্দ্র দেশে ফিরে এলেন, এখন তিনি রাষ্ট্রপতি সুভাষচন্দ্র, এমন সময়ে ৩১শে জানুয়ারীর সংবাদপত্রে বিঘোষিত হল—

ঢাকা জেলে শোচনীয় ঘটনা : অনশন ধর্মঘটী বন্দী হরেন্দ্রনাথ মুনশীর মৃত্যু।

আবার দেশ বেদনার্ত ও বিক্ষুব্ধ, নিরুপায়ের উপায় সভা শোভাযাত্রা ও বিবৃতি দান—সবই যথানিয়মে ঘটল। রাজনৈতিক সম্মেলনে যোগ দেবার জন্য সুভাষচন্দ্র বিষ্ণুপুর গিয়েছিলেন, সেখান থেকে লিখে পাঠালেন,

"ঢাকা জেল থেকে যে শোকের সংবাদ পেলাম, তাতে আমি এতই অভিভূত যে, বিশেষ কিছু বলা সম্ভব নয়। মনে পড়ে যাচ্ছে ১৯২৯ সালের কথা, যখন লাহোরে যতীন্দ্রনাথ দাসের মৃত্যুর সংবাদ পেয়ে স্তম্ভিত হয়ে গিয়েছিলাম। এমন সব বেদনা-দায়ক ঘটনা ঘটে যাচ্ছে, তবু কি সরকারের হৃদয় বিচলিত হবে না! যাঁরা চলে গেলেন, তাঁরা তো চিরদিনের জন্য চলে গেলেন, কিন্তু জীবিতকালে তাঁরা যে-আদর্শের প্রতীক ছিলেন, তাকে সফল করবার দায়িত্ব আমরা যারা পড়ে রইলাম, আমাদের উপরে রয়ে গেছে। আসুন আমরা অদম্য শক্তিতে দৃঢ়চিত্ত হয়ে সকল আইন-সম্মত শান্তিপূর্ণ উপায়ে বিনা-বিচারে আটক বা দণ্ডিত সকল রাজ-বন্দীদের নিঃশর্ত মুক্তির জন্য সংগ্রাম করি।"*১

৮ ফেব্রুয়ারী তারিখে বঙ্গীয় কংগ্রেসের উদ্যোগে টাউন হলে এ-ব্যাপারে যে প্রতি-বাদসভার আয়োজন হয়েছিল, তাতে পঠিত হবার জন্য রবীন্দ্রনাথ সুভাষচন্দ্রের কাছে এক বার্তা পাঠিয়েছিলেন, সেটি উদ্ধৃত করেই বর্তমান প্রসঙ্গ শেষ করছি—

"রাজনৈতিক বন্দীদের মুক্তি দেবার ক্ষমতা যাঁদের হাতে আছে, তাঁদের দূরে থেকে স্মরণ করিয়ে দিই, ক্ষমা শক্তিমানের গৌরবভূষণ। তথা-কথিত সুসভ্য দেশসমূহের হৃদয়-হীনতা থেকে উদ্ভূত কাপুরুষতা এবং নীচতার যে-রূপ আমরা আজ দেখছি, তা যদি এ দেশের শাসনকর্তাদের মধ্যেও সংক্রামিত হয়, তাহলে তাঁদের দীর্ঘ দুঃখবাহী স্বদেশবাসীর জন্য ন্যায়ব্যবহারের সকল প্রার্থনাই যে ব্যর্থ হবে, তাতে কোনো সন্দেহই নেই। শাসনকর্তাদের পক্ষে এই ধরনের দুরারোগ্য বধিরতাকে আমি অন্তত রাজনৈতিক প্রজ্ঞার লক্ষণ মনে করি না। এই পরিস্থিতিতে, দণ্ডিত রাজনৈতিক বন্দীদের উদ্দেশ্যে আমাদের বিক্ষত হৃদয়ের বেদনা-নিবেদন ছাড়া আজ আমাদের গত্যন্তর নেই; আর সেই সর্বশক্তিমান ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করি, আমাদের শাসন-কর্তাদের চিত্তে তিনি যেন অচিরে শুভবুদ্ধি জাগ্রত করেন।"*২

রবীন্দ্রনাথের কঠিনতম ভাষা। শাসন-কর্তাদের কাছে আবেদনে ফল নেই, তাঁরা এতই হৃদয়হীন,—রবীন্দ্রনাথ লিখলেন, যিনি মাত্র দু' মাস আগে ধন্যবাদ জানিয়ে-ছিলেন বাংলার মন্ত্রিমণ্ডলীকে, উদারতা ও রাজনৈতিক প্রজ্ঞার জন্য। কবির কলমের সরসতা শুকিয়ে গেল চিতার আগুনের তাপে অচিরকালে। [ক্রমশঃ]

১৯৬৯তে আপনার ভাগ্য

যে-কোন একটি ফুলের নাম লিখিয়া আপনার ঠিকানাসহ একটি পোস্টকার্ড আমাদের কাছে পাঠান। আগামী বাংমাসে আপনার ভাগ্যের বিস্তারিত বিবরণ আমরা আপনাকে পাঠাইব, ইহাতে পাইবেন ব্যবসায়ে লাভ লোকসান, চাকুরিতে উন্নতি, বদলী, জন্ম, বিবাহ ও সুখ-সমৃদ্ধির বিবরণ; আর থাকিবে দুষ্ট-গ্রহের প্রকোপ হইতে আত্মরক্ষার নির্দেশ। একবার পরীক্ষা করিলেই বুঝিতে পারিবেন।

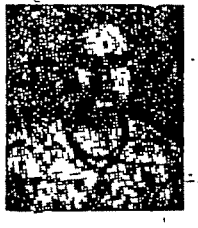

PT. DEV DUTT SHASTRI
RAJ JYOTISHI (B. M. W)
P. B. 86, JULLUNDUR CITY

*১ অমৃতবাজার, ২০ নভেম্বর।
*২ অমৃতবাজার, ২২ নভেম্বর।
*৩ অমৃতবাজার, ১৬, ১৭, ১৮, ডিসেম্বর, ১৯৩৭।

*১ অমৃতবাজার, ৩১ জানুয়ারী, ১৯৩৮।
*২ অমৃতবাজার, ১২ ফেব্রুয়ারী, ১৯৩৮।

বঙ্গ দর্শন

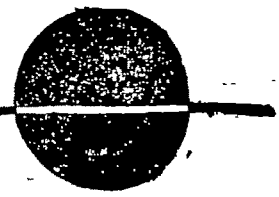

গত সংখ্যার বঙ্গদর্শনে কলকাতা উন্নয়নের নামে কলকাতাকে অবাঙালী শিল্পপতিদের হাতে তুলে দেবার যে নেপথ্য চক্রান্তের কথা আমরা তুলে ধরেছিলাম, এখন দেখা যাচ্ছে সে অনুমান মোটেই অসত্য নয়। বিভিন্ন মহল থেকেই এই বিষয়ে শঙ্কিত জিজ্ঞাসার পরিচয় পাওয়া যাচ্ছে। গত কয়েকদিনের ঘটনাবলী এবং বিশেষ করে প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীর সঙ্গে কলকাতার কয়েকজন বিশিষ্ট শিল্পপতির বৈঠকের পর বিভিন্ন মহলে এই শঙ্কিত জিজ্ঞাসাটি দেখা দিয়েছে। পাঠকদের নিশ্চয়ই স্মরণে আছে যে, রাজ্যপাল এ মাসের মাঝামাঝি কলকাতা উন্নয়নে তাঁদের সাহায্য ও সহযোগিতা প্রার্থনা করেন। তারও কয়েকদিন আগে ম্যাকনামারার প্রত্যাগমনের অব্যবহিত পরেই কলকাতার কয়েকজন বিশিষ্ট শিল্পপতি অকস্মাৎ কলকাতার জন্য বিশেষ দরদ দেখাতে শুরু করেন এবং রাজ্যপালের সাহায্য প্রার্থনার ঘটনাটি তারই ফলশ্রুতি। রাজ্যপালের প্রস্তাবটি মোটামুটি হচ্ছে এই যে, পুঁজিপতিরা সবাই মিলে ইকুইটি শেয়ার কিনে একটি ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠা করবেন, তার নাম হবে ডেভালপমেণ্ট ব্যাঙ্ক এবং ওই ব্যাঙ্কের টাকা দিয়ে কলকাতা উন্নয়নের ব্যবস্থা করা হবে। উন্নয়ন পদ্ধতি হচ্ছে এই যে, কলকাতার উপকণ্ঠে বিশালায়তন জমি নিয়ে কয়েকটি উপনগর তৈরি করা হবে। ওই জমি বিক্রয় করা হবে উক্ত ডেভালপমেণ্ট ব্যাঙ্কের মারফৎ। এই ব্যাঙ্ক গঠনের প্রস্তাবটি কিন্তু রাজ্যপালের মস্তিষ্কপ্রসূত নয়। ওটি তৈরি করেছেন কলকাতা মেট্রোপলিটান প্ল্যানিং অরগানাইজেশনের আমেরিকান পরামর্শদাতারা। ওই পরিকল্পনানুযায়ী রাজ্যপাল এই ব্যাঙ্ক গঠনে পুঁজিপতিদের সাহায্য পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তাঁদের কতকগুলি বিশেষ বিশেষ সুবিধা দেওয়ারও প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। উপরোক্ত ব্যাঙ্কের কাজকর্মের ওপর সরকার ও আইনসভার কর্তৃত্ব করার নাকি কোন সুযোগই থাকবে না। প্রস্তাবিত ওই ব্যাঙ্কের হাতে অপরিক্ষমতা থাকবে। এই ব্যাঙ্কের ইচ্ছামত শহরের যে-কোন অংশের জমি দখল করতে পারবে, তার বিরুদ্ধে কোন মামলা দায়ের করা চলবে না। জমি দখলের পর সে অঞ্চল উন্নয়নের জন্য সেখানে বড় বড় বসতবাড়ি তৈরি করে সেগুলি বিক্রয় করার পূর্ণ অধিকারও এই ব্যাঙ্কের থাকবে। শুধু জমির উন্নয়ন নয়, কলকাতার রাস্তা-ঘাট উন্নয়ন, জল ও বিদ্যুৎ সরবরাহ, এমন কি শিক্ষা ও স্বাস্থ্য সংক্রান্ত কোন কোন বিষয়েও এই ব্যাঙ্কের ব্যাপক ক্ষমতা থাকবে। ব্যাঙ্ক গঠনের প্রস্তাবের উদ্যোক্তারা বলেছেন যে, এই ধরণের ব্যক্তিগত পুঁজির ব্যাঙ্ক স্থাপন করলে কলকাতা উন্নয়নের জন্য আমেরিকা বা বিশ্ব ব্যাঙ্কের কাছ থেকে অনেক সহজে টাকা পাওয়া যাবে। কেন না আমেরিকা বা বিশ্ব ব্যাঙ্ক সরকারী সংস্থার চেয়ে বেসরকারী সংস্থার মারফৎ টাকা খাটাতে অধিকতর আগ্রহী। দৃশ্যতই এটা কলকাতাকে অবাঙালী পুঁজিপতিদের হাতে তুলে দেবার চক্রান্ত। এর ফলে বৃহত্তর কলকাতার ওপর অবাঙালীর অধিকার আরও চেপে বসবে এবং তা' ঘটলে কলকাতাকে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের প্রশাসনের বাইরে নিয়ে যেতে এবং কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলে পরিণত করতে কোন বাধা থাকবে না। বৃহত্তর কলকাতার ওপর অবাঙালীর অধিকার আরও চেপে বসবে একথাটা বলার হেতু হচ্ছে এই যে, সেখানে জমি কিনতে হলে তা' কিনতে হবে ওই কলকাতা উন্নয়ন ব্যাঙ্কের মারফৎ এবং কলকাতার যেখানে সকল শিল্পপতিই প্রায় অবাঙালী, তাঁদের ব্যাঙ্কের মারফৎ জমি পাওয়ার আশা বাঙালীকে ত্যাগ করতেই হবে। কলকাতা উন্নয়নের নামে এই অপচেষ্টার বিরুদ্ধে জনমত গঠিত হওয়া প্রয়োজন এই মুহূর্তেই।

উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়

উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের বর্তমান উপাচার্যের বিরুদ্ধে নানান অভিযোগ বিভিন্ন মহল থেকে শোনা যাচ্ছে, এবং একথা বলা হচ্ছে যে, বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশাসন ব্যবস্থায় স্বেচ্ছাচার ও দুর্নীতির অনুপ্রবেশ ঘটেছে, যার ফলে এমন একটা অবস্থার উদ্ভব হয়েছে যে, বিশ্ববিদ্যালয়ের পঠন-পাঠন ও অন্যান্য কার্যক্রম একরকম বন্ধই হয়ে গেছে এবং সেখানে কার্যতঃ নাকি জঙ্গলের আইন চলছে। সম্প্রতি শিলিগুড়ি কলেজ হলে অনুষ্ঠিত পশ্চিমবঙ্গ কলেজ এবং বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সংস্থার একটি মহতী সভায় উপাচার্যের কার্যাবলীর গভীর নিন্দা করা হয়েছে এবং তাঁর কাজকর্ম সম্বন্ধে তদন্তের দাবি জানানো হয়েছে। শোনা যায় উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের বর্তমান উপাচার্য হাওড়া কো-অপারেটিভ বিল্ডার্স সোসাইটি নামক একটি বেসরকারী প্রতিষ্ঠানেরও চেয়ারম্যান এবং সেই কারণেই নাকি বিনা টেণ্ডারে সিকিউরিটির টাকা টাকা জমা না নিয়ে উপরন্তু অগ্রিম টাকা দিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য লো-কস্ট হাউসিং স্কীমে প্রায় পাঁচ লক্ষ টাকা ব্যয়ে গৃহনির্মাণ করানো হয়েছে। এই অর্থব্যয়ের ও গৃহনির্মাণের জন্য একজিকিউটিভ কাউন্সিলের কোন অনুমোদন পর্যন্ত নাকি নেওয়া হয় নি। স্মরণ থাকতে পারে ঠিক অনুরূপ ঘটনা কিছুকাল আগে বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্ষেত্রেও ঘটেছিল এবং সেই সংবাদ প্রকাশিত হবার পর দেশজোড়া চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছিল। কিন্তু উত্তরবঙ্গের ক্ষেত্রে এখনো তা হয় নি। আরও রহস্য এই যে, উক্ত গৃহনির্মাণের জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষে একজন সহকারী ইঞ্জিনীয়ার এবং একাধিক কর্মচারী নিযুক্ত রয়েছেন এবং তাঁদের বেতন বিশ্ববিদ্যালয়ের তহবিল থেকেই দেওয়া হচ্ছে, যদিও গৃহনির্মাণের ভার অর্পিত হয়েছে বেসরকারী প্রতিষ্ঠানের ওপর। বর্তমান উপাচার্য তাঁর কোন কাজের জন্যই বিশ্ববিদ্যালয়ের একজিকিউটিভ কাউন্সিল বা 'দি ইউনিভার্সিটির' অনুমোদন নেবার নাকি প্রয়োজন বোধ করেন না, তাঁকে নাকি এক্সট্রা অর্ডিনারী পাওয়ার দেওয়া আছে বলে

তিনি ঘোষণা করেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপকবৃন্দ, কর্মচারী ও ছাত্রবন্দের ওপর তিনি নাকি ইচ্ছামত ক্ষমতা জাহির করেন, এবং কিছু মেরুদণ্ডহীন লোককে নাকি নানা প্রকার অনুগ্রহ বিতরণ করে নিজপক্ষে রেখেছেন, যেমন জনৈক প্রাক্তন অধ্যক্ষকে তিনি একই সঙ্গে একাধিক উচ্চপদে আসীন হবার সুযোগ দিয়েছেন। কিছু অনুগামী লোককে নিয়ে তিনি কর্মচারীদের ইউনিয়নের পাল্টা একটি ইউনিয়ন গঠন করেছেন। সবচেয়ে বড় কথা এখানে ছাত্রদের পঠন-পাঠনের কোন ব্যবস্থা নেই, মাসের পর মাস অকারণে ক্লাস বন্ধ থাকে। খেয়াল-খুশিমত সিলেবাস বদল, পরীক্ষা গ্রহণের ব্যবস্থা বদল, যে-কোনভাবে পরীক্ষা প্রহসনপর্ব সমাপ্ত, যে যেমন খুশি, দু-তিনটি পেপার পরীক্ষা দিয়ে নাকি উঠে আসতে পারে, তাতেও নাকি ফার্স্ট ক্লাস পাওয়া যায়। উপাচার্যের নিজের লোক ছাড়া নাকি পরীক্ষক, অন্য কেউ মনোনীত হন না, অভিজ্ঞ অধ্যাপকবৃন্দের পরীক্ষক পদ নাকি লোপ করা হয়েছে। প্রচুর অর্থব্যয়ে সিকিউরিটি স্টোর্স রেখে ছাত্র-অধ্যাপক-কর্মচারীদের প্রতিনিয়ত নানাভাবে অপমানিত করা হচ্ছে, যে উত্তরবঙ্গের ছাত্রসমাজ সুশৃঙ্খল, অনুগত ও শ্রদ্ধাবান ছিল, সেই উত্তরবঙ্গের ছাত্রসমাজকে উচ্ছৃঙ্খল ও দুর্বিনীত করে তোলা হচ্ছে। কর্মরত টেলিফোন কর্মী ও উচ্চপদস্থ সরকারী কর্মচারীদের সঙ্গে দুর্ব্যবহার করায় প্রায় তিন মাস বিশ্ববিদ্যালয়ের টেলিফোন বন্ধ হয়ে ছিল। অনেক জল ঘোলা করার পর রাইটার্স বিল্ডিংসে উচ্চপদস্থ অফিসার ও ট্রেড ইউনিয়ন নেতাদের নিকট উপাচার্য মৌখিক ও লিখিতভাবে ক্ষমা চাওয়ার পর বিষয়টির ফয়সালা হয়। এই সকল ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতেই উত্তরবঙ্গের মনস্বী অজস্রভাবেই প্রশ্ন তুলেছেন যে, জাতীয় অর্থ ও সম্পত্তিকে যারা এইভাবে নিজেদের প্রয়োজন ও স্বার্থে ব্যবহার করে তাদের কতদূর বরদাস্ত করা উচিত। অবিলম্বে উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্ববিধ কার্যাবলীর একটি পূর্ণাঙ্গ তদন্ত হওয়া প্রয়োজন।

রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের দুর্নীতি

শেষ পর্যন্ত রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ও কি দুর্নীতির অন্যতম একটি পীঠস্থান হয়ে দাঁড়াবে? এই বিশ্ববিদ্যালয় সম্পর্কে সম্প্রতি যে সব সংবাদ আমাদের নিকট আসছে, তা যথার্থই উদ্বেগজনক।

আজকের আলোচ্য বিষয়টি হচ্ছে একটি ইউ জি সি রিসার্চ স্কলারশিপ দেওয়াকে কেন্দ্র করে। এ ছাড়া আরও কয়েকটি অভিযোগ আছে বেগুলির কথাও আমরা এখানে উল্লেখ করব। সব কটি অভিযোগই ইন্টার রিলেটেড বা পারস্পরিক সম্পর্কযুক্ত।

এ কাহিনীর নায়িকা একটি ছাত্রী যাকে ইউ জি সি রিসার্চ স্কলারশিপ দেওয়া হয়েছে। রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয় স্নাতকোত্তর বাংলা বিভাগের প্রাক্তন ছাত্রছাত্রী সম্মিলনীর তরফ থেকে অভিযোগগুলি এসেছে। আমাদের আলোচ্য নায়িকা, যিনি ইউ জি সি রিসার্চ স্কলারশিপ পেয়েছেন, আসলে তিনি ম্যাট্রিক বা স্কুল ফাইন্যাল বা হায়ার সেকেণ্ডারী কোন পাশই করেন নি। অথচ তাঁর প্রতি রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের এমনই কৃপাদৃষ্টি যে, এই একজনের ক্ষেত্রে প্রচলিত সকল আইন লঙ্ঘন করতেও নাকি কর্তৃপক্ষের বাধে নি।

এই ভদ্রমহিলার জন্য কিভাবে আইন লংঘন ও পক্ষপাতমূলক আচরণ রবীন্দ্রভারতী কর্তৃপক্ষ করে এসেছেন তার কিছু নিদর্শন দেওয়া প্রয়োজন। আগেই বলেছি, তিনি ম্যাট্রিকও পাশ করেন নি। সঙ্গীতে একটি ডিপ্লোমা পাশ করেছিলেন। তাঁকে সঙ্গীতে তিন বছরের ডিগ্রী কোর্সে ভর্তি হবার সুযোগ দেওয়া হল। শুধু তাই নয়, তাঁকে তিন বছরের জায়গায় দু বছরেই ডিগ্রী পরীক্ষা দিতে দেওয়া হল। এও এক রহস্য। পরের ঘটনা আরও চিত্তাকর্ষক। ওই সৌভাগ্যবতী রমণীকে বাংলায় এম-এ পরীক্ষা দিতে দেওয়া হল, এবং ফলাফল বেরোবার পর দেখা গেল যে, এঁকেই ইউ জি সি রিসার্চ স্কলারশিপের জন্য মনোনীত করা হয়েছে। আরও একটি কথা বলা বাকি রয়ে গেল। তা হচ্ছে এই যে, ইনি কি-এ পাশ করার আগেই নাকি এম-এ ক্লাস করারও সুবিধা পেয়েছিলেন। একজনের ক্ষেত্রে এই বিশেষ সুবিধাদান নিঃসন্দেহে বিশেষ ইঙ্গিতবহ। আশা করি তা আর খুলে বলার প্রয়োজন নেই।

এরপর কিভাবে তাঁকে স্কলারশিপ দেওয়া হল, সে কাহিনীটিও বলা দরকার। ছাত্রদের একটি প্রতিনিধিদল উপাচার্য শ্রীহিরণ্ময় বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে দেখা করে এই মর্মে একটি মেমোরেণ্ডাম দাখিল করেন যে, যেহেতু ১৯৬৭ সালের বাংলায় এম-এ পরীক্ষায় কেউ ফার্স্ট ক্লাস পান নি, অতএব যেন আলোচ্য ইউ জি সি স্কলারশিপটির জন্য সকল পাশ করা ছাত্রের ইন্টারভিউ নেওয়া হয় এবং রীতিমত পরীক্ষান্তে যোগ্যতমকে যেন সেই সুযোগ দেওয়া হয়। উপাচার্য এই সম্পর্কে সহানুভূতিসূচক আশ্বাস দেন। কিন্তু অকস্মাৎ অতি অল্প সময়ের নোটিশে শুধুমাত্র হাই সেকেণ্ড ক্লাস প্রার্থীদের কাছ থেকে দরখাস্ত চাওয়া হয়, অথচ কত পার্সেন্ট মার্ক যে হাই সেকেণ্ড ক্লাস তা বলে দেওয়া হয় নি। উপাচার্যের অনুপস্থিতিতে একটা মৌখিক ইন্টারভিউ হয় এবং বলাই বাহুল্য, আমাদের আলোচ্য সৌভাগ্যবতীই ওই স্কলারশিপের অধিকারিণী হন। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে সঙ্গীত বিভাগের স্কলারশিপের জন্য অনুরূপ কায়দার একজনকে নেবার সংবাদ পাওয়া গেছে।

অতঃপর ছাত্ররা উপাচার্যের সঙ্গে সাক্ষাৎ করলে তিনি বলেন, "যা হবার তা হয়ে গেছে, গুলী ছুঁড়লে তা গায়ে লাগবেই, আর কি করা যাবে?" এতে সন্তুষ্ট না হয়ে গত ১২ই ডিসেম্বর তারিখে বিশ্ববিদ্যালয় প্রাঙ্গণে একটি সভায় তাঁদের আন্দোলনের সংকল্প ঘোষণা করেন, একদল ছাত্রছাত্রী তাঁদের ডিগ্রী ফিরিয়ে দেবার প্রস্তাবও করেন। এই বিশেষ ছাত্রীটির প্রতি এইরকম পক্ষপাতিত্বের অভিযোগ ছাড়াও পরীক্ষা গ্রহণ পদ্ধতি সম্পর্কেও ছাত্ররা কিছু কিছু অভিযোগ করেছেন। প্রথমত আর্টটি পেপারের য়োলটি হাফ, আভ্যন্তরীণ ও বাইরের উভয় ধরণের পরীক্ষকদের দিয়ে পৃথকভাবে পরীক্ষা করানো হয়েছে কিন্তু দু সেট পরীক্ষকদের দেওয়া নম্বরের পার্থক্য এতই দুস্তর হয়েছে যে, তৃতীয় একজন পরীক্ষকের নাকি প্রয়োজন হয়েছে। এই তৃতীয় পরীক্ষকের নিয়োগ অ্যাকাডেমিক কাউন্সিলের অনুমোদনে হয় নি, এবং এই তৃতীয় পরীক্ষকের কোন বিশ্ববিদ্যালয় স্তরে অধ্যাপনার অভিজ্ঞতা নেই।

কবিগুরুর নামাঙ্কিত বিশ্ববিদ্যালয় এবং তাঁরই গৃহে অবস্থিত প্রতিষ্ঠানে যদি এরকম স্বজনপোষণ ও দুর্নীতির নগ্ন নিদর্শন দেখা যায় তাহলে এর চেয়ে দুঃখের বিষয় আর কি হতে পারে? রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের কাজকর্ম সম্পর্কে তদন্ত হওয়ার সত্যই প্রয়োজন দেখা গেছে।

এশিয়াটিক সোসাইটি

সংস্কৃতির ব্যাপারে দেশের সরকার যখন একদিকে ব্যস্ততা প্রকাশ করছেন, তখন আর একদিকে ভারতের সাংস্কৃতিক সমৃদ্ধিসার প্রথম সর্বভারতীয় প্রতিষ্ঠান এশিয়াটিক সোসাইটির প্রতি কেন্দ্রীয় সরকারের পক্ষ থেকে আর্থিক সহায়তা

উদারভাবে প্রসারিত হচ্ছে না। কলকাতার এশিয়াটিক সোসাইটির মত প্রাচীন বিদ্যা-ভবনের সঙ্গে তুলনা করার মত প্রতিষ্ঠান সারা ভারতবর্ষে আর একটিও নেই। এশিয়াটিক সোসাইটি বিদ্বজ্জনদের কাছে জ্ঞানের প্রদীপ।

এশিয়াটিক সোসাইটি যদি প্রদীপ হয়, তাহলে সোসাইটির কর্মীরা পিলসুজ। তার প্রধান কারণ, কর্মীরাই এই প্রতিষ্ঠানটি মাথায় করে রেখেছেন। কর্মীরা নীরবে ছাত্র, শিক্ষক, গবেষক, লেখক এবং সাংবাদিক সকলের জন্য সাধ্যমত সেবা করে আসছেন কিন্তু আজও এই এশিয়াটিক সোসাইটির কর্মীরা অন্ধকারে দুঃখের বোঝা বইতে বাধ্য হচ্ছেন।

পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সরকার ও কেন্দ্রীয় সরকারের বদান্যতায় প্রায় ১৬ লক্ষ টাকা ব্যয়ে পার্ক স্ট্রীট ও চৌরঙ্গীর সংযোগ-স্থলে বিরাট বাড়ি উঠেছে। কিন্তু নিঃস্ব কর্মচারীদের মহার্ঘভাতা বৃদ্ধির জন্য সরকার কোনরূপ দৃষ্টিপাত করছেন না। সংসদের হিসাব কমিটি সোসাইটির কর্মচারীদের দুর্দশার কথা স্বীকার করেছেন। তাঁদের রিপোর্টে উল্লেখ করেছেন সোসাইটির কর্মচারীদের মাইনেপত্র নামমাত্র। লোক-সভায় কয়েকবার আলোচনাও হয়েছে। কিন্তু ভারত সরকার এ বিষয়ে নির্বিকার রয়েছেন।

গত ১১ই এবং ১৩ই নভেম্বর ১৯৬৮ তারিখে কেন্দ্রীয় সরকারের শিক্ষাদপ্তরের ডেপুটি সেক্রেটারী শ্রী পি, গাঙ্গুলী এবং কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রণালয়ের আণ্ডার-সেক্রেটারী শ্রীসুব্রহ্মনিয়াম সরকারীভাবে পর্যবেক্ষণের (official visit) জন্য এশিয়াটিক সোসাইটিতে আসেন এবং সোসাইটির কাজকর্ম এবং হিসাবপত্র পরীক্ষা করেন। সেই সময় কর্মচারীদের পক্ষ থেকে মহার্ঘভাতা বৃদ্ধির জন্য একটি দাবিপত্র পেশ করা হয়। ওই দাবিপত্রে কেন্দ্রীয় সরকার প্রদত্ত হার অনুসারে মহার্ঘভাতা দাবি করা হয়। এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য যে, কেন্দ্রীয় সরকারী মহার্ঘভাতার হার তো দূরের কথা, রাজ্য সরকারের সর্বাপেক্ষা অধস্তন কর্মচারিগণও এশিয়াটিক সোসাইটির সর্বাপেক্ষা উচ্চপদের কর্মচারী অপেক্ষা বেশি মহার্ঘভাতা পেয়ে থাকেন (রাজ্য সরকারের অধস্তন কর্মচারী ৬২·৫ টাকা এশিয়াটিক সোসাইটির অধস্তন কর্মচারী ২৫৲ টাকা এবং সর্বোচ্চ মহার্ঘ-ভাতার হার ৬০৲ টাকা)।

এশিয়াটিক সোসাইটির পরিচালনার জন্য কেন্দ্রীয় সরকার কয়েক বছর ধরে কোন অর্থ বরাদ্দ করছেন না। সোসাইটির পক্ষ থেকে আবেদন-নিবেদন করা হয়েছে। কিন্তু কোন ফল হয় নি। আরও আশ্চর্য এই যে, বর্তমান কেন্দ্রীয় সরকারের শিক্ষামন্ত্রী ডক্টর ত্রিগুণা সেন মহাশয় একদা এই এশিয়াটিক সোসাইটির সদস্য ছিলেন। ডক্টর সেন মশায় কর্ম-জীবনের অধিকাংশ সময় কলকাতার নানা শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। সোসাইটির সঙ্গেও তাঁর যোগাযোগ ছিল। সোসাইটির পরিচয় তাঁর অজানা নেই। তবু কেন তিনি অর্থ-সাহায্যের ব্যাপারে মৌনব্রত অবলম্বন করে আছেন তা আমাদের বুদ্ধির অগম্য।

এইজাতীয় প্রতিষ্ঠানে প্রায় এক লক্ষের বেশি পুঁথিবীর নানা ভাষায় ছাপানো বই আছে। প্রতিদিন বই এবং পুঁথিবীর বিভিন্ন দেশের জার্নাল এখানে জমা হচ্ছে। দুর্লভ পুঁথির সংখ্যা প্রায় চল্লিশ হাজার। তা ছাড়া বহু মুদ্রা, তাম্রফলক, মূর্তি, চিত্র ইত্যাদি বিপুল ঐশ্বর্য রয়েছে। যাঁরা এই দুর্লভ সংগ্রহশালা রক্ষা করছেন, সেই নিঃস্ব সোসাইটির কর্মচারীদের সোসাইটির কর্তৃপক্ষ কেন্দ্রীয় সরকারের দেয় মহার্ঘ-ভাতার হার অনুযায়ী মহার্ঘভাতা দেবার ব্যবস্থা করুন, এটাই আমরা চাই।

স্বাস্থ্যদপ্তর-হাসপাতাল-চিকিৎসক-চিকিৎসা

গত ২৭শে ডিসেম্বর তারিখের দৈনিক বসুমতী পত্রিকায় নিম্নলিখিত সংবাদটি প্রকাশিত হয়েছে:

"সাধারণ মানুষের রক্ত জলকরা পয়সা নিয়ে কিভাবে ছিনিমিনি খেলা হচ্ছে, পশ্চিমবঙ্গ সরকারের স্বাস্থ্য অধিকারের নথিপত্র ঘাঁটলে তার অনেক দৃষ্টান্তই মিলবে। সুযোগসন্ধানী একটি কায়েমী চক্র স্বাস্থ্য অধিকারকে একটি তোগলকী রাজত্বে পরিণত করেছে। এই চক্রের আঁতে ঘা দিয়ে অনেক সাধারণ কর্মচারীকে নাজেহালও হতে হয়েছে। খারাপ জায়গায় ট্রান্সফার, সাসপেন্সান, ইনক্রিমেন্ট বন্ধ প্রভৃতির ভয়ে কর্মচারীরা ভীত, কিন্তু দুর্নীতির চক্রজাল বিস্তার করে বেশ কিছু সংখ্যক অফিসার ও ক্লার্ক নিজেদের কাজ গুছিয়ে নিচ্ছেন।

এ প্রসঙ্গে গত ৩১শে জানুয়ারী (১৯৬৮) তারিখে স্বাস্থ্য অধিকর্তার উদ্দেশে লিখিত নদীয়া জেলার তদা-নীন্তন চীফ মেডিক্যাল অফিসার অফ হেলথ (সি এম ও এইচ)-এর চিঠিটি উল্লেখ্য। ঐ চিঠিটিতে (মেমো নং এইচ সি ই-২/৮৪৩) নদীয়া জেলার হেলথ সেন্টারে কর্মরত কোন একজন মেডিক্যাল অফিসারের সম্পর্কে মন্তব্য করা হয়েছে:—

..."On previous occasions on 13-6-67, 18-6-67 and on 11-8-67 he similarly claimed double Bus fares in place of daily allowance as he travelled by UNICEF Jeep. He was verbally questioned about it and he having admitted that he travelled on these days by Govt. vehicle, he was allowed to change the T.A. bill. Accordingly he submitted a modified T.A. bill claiming daily allowances as admissible for those days and he was allowed to destroy the previous false T.A. bill on the expectation that he will correct himself. Instead of it he again submitted a false claim for journey on 23-11-67...."

..."Necessary action in this matter may please be taken. Dr. Saha is a gazetted Medical Officer."

বারবার মিথ্যা টি-এ বিল করার গুরুতর অভিযোগ আনেন যখন নদীয়ার সি এম ও এইচ তাঁরই এক অধস্তন মেডিক্যাল অফিসারের বিরুদ্ধে, ঠিক তখনই তাঁরই অফিসের একজন ক্লার্ক সে অভিযোগ চাপা দেবার জন্যে সংশ্লিষ্ট প্রয়োজনীয় কাগজপত্র সরিয়ে দেন। তার ফলে আজও সেই মেডিক্যাল অফিসার নাকি বহাল তবিয়তেই আছেন।

আলোচ্য এই ক্লার্কের রাইটার্স বিল্ডিংসে স্বাস্থ্য অধিকারের ওপর-মহলে প্রভাব-প্রতিপত্তি থাকায়, তাঁর বিরুদ্ধে বিভিন্ন সময়ে আনীত দুর্নীতি ও অনাচারের নানা অভিযোগ সম্পর্কে কোন ব্যবস্থা অবলম্বিত হয় নি। সম্প্রতি তাঁর দুর্নীতির কয়েকটি নির্দিষ্ট অভি-যোগ সংবাদপত্রে প্রকাশিত হওয়ায় স্বাস্থ্য-দপ্তরে দারুণ চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয় এবং স্বাস্থ্য অধিকর্তা নদীয়ার ঐ ক্লার্কটির

সর্দ্দি ও কাশিতে
রক্ষিতের
তাল মিছরি
ফোন ৫৫-৩০৮৫

অতীত ও বর্তমান সার্ভিস রেকর্ড দেখে অবিলম্বে তাকে অন্যত্র বদলী করার নির্দেশ দেন। কিন্তু ইতিমধ্যে নদীয়ার বর্তমান চীফ মেডিক্যাল অফিসার অফ হেলথ নাকি ক্লার্কের অনুকূলে স্বাস্থ্য অধিকর্তার নিকট একটি D. O. Letter লেখেন। জানা গেছে, এর ফলে ঐ ক্লার্কের বদলীর আদেশ নাকি আর কার্যকরী হচ্ছে না।"

প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে, উপরোক্ত ক্লার্কের গুরুতর দুর্নীতিমূলক কার্যকলাপ সম্পর্কে ইতিপূর্বে বঙ্গদর্শনে আমরা অনেক প্রামাণ্য তথ্য সন্নিবেশিত করেছিলাম।

উক্ত ক্লার্কের বিরুদ্ধে যাতে কোনো শাস্তিমূলক ব্যবস্থা অবলম্বিত না হয়, তার জন্যে তদ্বির-তদারক করার লোকের অভাব নেই। শুধু যে সি এম ও এইচ-ই D. O. Letter দিয়েছেন তাই নয়, খোদ রাইটার্স বিল্ডিংসে জনৈক ডেপুটি ডিরেক্টর নির্লজ্জভাবে ক্লার্কটির পক্ষে জিমেদারী করে বেড়াচ্ছেন এবং তাঁর অস্বাভাবিক তৎপরতার ফলে ক্লার্কটি এ যাত্রা রেহাই পেয়ে যাচ্ছেন—এ-সংবাদও আমরা পেয়েছি।

হাসপাতাল, না কসাইখানা?

নীলরতন সরকার মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালের কীর্তি শতমুখে কীর্তন করলেও ফুরোয় না। সাত বছর পূর্বে মৃত রোগীকে নিয়ে এই হাসপাতালের একটি বিভাগ যে কিরকম রসিকতা করেছে, তার নিদর্শন আমরা কয়েক সংখ্যা পূর্বের বঙ্গদর্শনে ফটোস্টাট কপি সহ দিয়েছিলাম। সেই নিবন্ধেই প্রসঙ্গক্রমে এম ডি পরীক্ষা সম্বন্ধে একটি ঘক্রোক্তি ছিল, যা পাঠ করে কিছুসংখ্যক চিকিৎসক ক্ষিপ্ত হয়ে একের পর এক প্রতিবাদপত্র পাঠিয়ে যাচ্ছেন, কিন্তু চিকিৎসকসমাজ (দু'-একজন বাদে) আজ যে কতদূর দায়িত্বজ্ঞানহীন হয়েছেন, অত বড় একটা নিদর্শন দেবার পরেও একজন চিকিৎসকেরও পরিচয় পাওয়া গেল না, যিনি নীলরতন সরকার হাসপাতালে ঘটিত উক্ত লজ্জাজনক ও দুঃখময় নির্মমতার নিন্দা করেছেন। এবারে আমরা এখানে একটি চিঠি পত্রস্থ করছি যা থেকে বোঝা যাবে উক্ত হাসপাতালটি একটি কসাইখানা ভিন্ন আর কিছু নয় এবং ওখানকার চিকিৎসক ও অপরাপর চিকিৎসাসংক্রান্ত কর্মচারী (দু'-চারজন বাদে) কত দূর নির্মম, মনুষ্যত্বহীন এবং দায়িত্বজ্ঞানশূন্য।

শ্রদ্ধেয়া সম্পাদিকা, সাপ্তাহিক বসুমতী
কলকাতা।

আজ একটা ছোট্ট হত্যাকাহিনী আপনাকে জানাবো—একজন সাধারণ লোকের অতি সাধারণ মৃত্যুকাহিনী। স্থান—নীলরতন মেডিক্যাল কলেজ। তারিখ ১১।১০।৬৮।

সুদূর গৌহাটি থেকে আমার স্ত্রী শ্যামেলী দত্তকে কলকাতা নিয়ে গিয়েছিলাম আমাদের প্রথম সন্তান লাভের আকাঙ্ক্ষায়। প্রথম থেকেই নীলরতন মেডিক্যাল হাসপাতালের বিখ্যাত বিলাতফেরৎ স্ত্রীরোগ বিশেষজ্ঞের চিকিৎসাধীনে রেখেছিলাম। ভাল স্বাস্থ্যের অধিকারিণী ছিল ও—বারবার antenatal check করেও বিশেষজ্ঞ কোন রোগ ধরতে পারেন নি। ওঁরই তত্ত্বাবধানে গত ৯ই অক্টোবর আমার স্ত্রীকে ভর্তি করা হলো Baker ward-এ ১০নং বেডে —confinement date দেওয়া হলো ১০ দিন পর। ১১ই অক্টোবর সন্ধ্যায় ওকে সুস্থ হাসিখুশি দেখে এলাম—সে-রাত্রেই ১১টায় এক সুস্থ সন্তানের স্বাভাবিকভাবে জন্ম দেবার ৩ ঘন্টা পর আমার স্ত্রী অসহায়ভাবে এ পৃথিবী থেকে চিরদিনের মত বিদায় নেয়। কিন্তু কেন?

মৃত্যুর ছ'ঘন্টা পর আমাকে দয়া করে খবর দেওয়া হলো—ছুটে গেলাম হাসপাতালে। বিলাতফেরৎ বিশেষজ্ঞ দুঃখ করে বললেন, আমাদের ভুল হয়ে গেছে—আমরা ঠিক বুঝতে পারি নি। নার্সদের ধমকে দিলেন এ অবহেলার জন্যে।

এবার শুনুন নেপথ্যকাহিনীটুকু। সুস্থ সন্তান জন্ম নিল স্বাভাবিকভাবে—মাকে খবরও দেওয়া হলো। তারপর নার্সরা নিশ্চিন্ত হয়ে খোশগল্পে ব্যস্ত হয়ে পড়লেন। এদিকে internal hæmarrhage হতে হতে রুগী যখন sink করছে, তখন ওদের চৈতন্য হয়। টেলিফোন যায় বিশেষজ্ঞের কাছে—উনি আর এত রাত্রে এলেন না—অন্য আরেকজন ক্ষুদে ডাক্তার এলেন—তখন অনেক, অনেক দেরি হয়ে গেছে—রুগী তখন অন্য জগতে পাড়ি দিয়েছে।

ওঁরা রিপোর্টে লিখেছিলেন, 'obstetrics shock'—এটাই না কি লিখতে হয়। এক নিষ্পাপ শিশু, যে জন্মমুহূর্তেই মাতৃস্নেহ থেকে বঞ্চিত হলো, তার কাছে এদের কি কৈফিয়ৎ জানি না। আমার তো সবই শূন্য হয়ে গেল—আমার স্ত্রী আর কোনদিন ফিরে আসবে না, তার ছেলেকে কোলে নিতে। আমার শুধু অনুরোধ—আর যেন কোন ভাবী মাকে এমনি করুণ, অসহায়ভাবে তার ছেলেকে ফেলে রেখে হাসপাতাল থেকেই বিদায় নিতে না হয়।

আমার এটাই শুধু জিজ্ঞাস্য—

১। স্বাভাবিকভাবে delivery হবার ৩ ঘন্টা পরে hæmarrhage হতে হতে রুগী মারা গেল, এ সুদীর্ঘসময় কি ওঁরা একবারও ওকে পরীক্ষা করেন নি? pulse বা ঠোঁট দেখলেই এটা ধরা পড়তো। যদি ওঁরা পরীক্ষা করে থাকেন, তবে রুগীকে বাঁচানোর চেষ্টা হলো না কেন? কেন ওকে labour room-এ মৃত্যুবরণ করতে হলো?

২। বিশেষজ্ঞকে কতক্ষণ পরে টেলিফোন করা হয়েছিল? উনি এলেন না কেন? উনি কীভাবে নিশ্চিত ছিলেন যে ওঁর দেওয়া তারিখ ১৯শের আগে কিছু হবে না?

৩। এটা কি সত্যি নয় সে-রাত্রে ৭ জনের জায়গায় ৩ জন মাত্র নার্স spot-এ ছিলেন?

৪। যে তরুণ অনভিজ্ঞ House Surgeon-এর হাতে delivery হলো, উনি যখন দেখলেন যে normal bleeding হয় নি, ওঁর মনে কি একবারও সন্দেহ হলো না যে এ blood কোথায় যাচ্ছে? অসাবধানে কোন nerve ছিঁড়ে যাবার জন্যেই কি hæmarrhage হচ্ছিল?

এগুলোর জবাব আমি কার কাছে চাইব বলতে পারেন? ইতি—

ক্ষিতীন্দ্রলাল দত্ত
পশ্চিম কোদালিয়া,
নিউ ব্যারাকপুর।

এর পর কোন মন্তব্য নিষ্প্রয়োজন। এই দায়িত্বহীনতা শুধু একটি বিশেষ হাসপাতালেরই ব্যাপার নয়, পশ্চিমবঙ্গের সকল হাসপাতালেরই প্রায় স্বাভাবিক চিত্র। চিকিৎসক ও নার্সরা, কয়েকটি বিশেষ ক্ষেত্র বাদ দিয়ে, কতদূর অধঃপতিত ও দায়িত্বজ্ঞানশূন্য হয়েছেন, উল্লিখিত এবং অনুরূপ ঘটনাগুলিই তার প্রমাণ।

(২৭-১-৬৯)

সপ্তাহের বোঝা

কৃত্তিবাস ওঝা

এর নাম বুমেরাং। পশ্চিমবঙ্গ রাজনীতিতে ডিফেকশনের জনক শ্রীআশুতোষ ঘোষ আজ তারস্বরে চিৎকার করছেন—লোকদল তাঁর প্রার্থীদের ডিফেকশন করাচ্ছে। নির্বাচনের আগেই ডিফেকশনের কবলে পড়েছেন আই-এন-ডি-এফ নেতা শ্রীআশুতোষ ঘোষ। শ্রীআশুতোষ ঘোষ বলেছেন—ইতিমধ্যে তাঁর সাতজন প্রার্থীকে নানা লোভ দেখিয়ে ভাঙিয়ে নেওয়া হয়েছে। এই অভিযোগ করবার সময় শ্রীঘোষ তাঁর দলের কয়েকজন সদস্যকে হাজির করে জানিয়েছেন যে, কিভাবে এই দলত্যাগ ঘটাবার চেষ্টা হচ্ছে। একজন সদস্য লোকদলের প্রার্থী হিসাবে কাগজে তাঁর নাম দেখে প্রথমে অবাক হন, পরে তার কাছে একখানা চিঠি এসে হাজির—আপনি লোকদলের প্রার্থী হয়েছেন, অতএব অমুক জায়গায় অমুকের সঙ্গে দেখা করে আপনার যা দরকার (টাকা-পয়সা) বুঝে নিন। শুধু এই প্রার্থীকেই নয়—এই পত্রে লেখা হয়েছে যে, আপনাকে তো প্রার্থী করা হলই, আপনার যে মেয়েটি আছে, তাকেও আমরা প্রার্থী করতে চাই—রাজী আছেন কি না বলুন? আর একজন প্রার্থী জানালেন—তাঁকে বলা হয়েছে টাকা আর জীপ গাড়ি দরকার মত পাবেন, আপনি আমাদের প্রার্থী হন। আর একজন প্রার্থী বললেন—তিনি কিছুই জানেন না, তিনি আগেই আই-এন-ডি-এফ দলের প্রার্থী হয়েছেন অথচ কাগজে খবর বেরুল—তিনি নাকি আই-এন-ডি-এফ দলের প্রার্থী হচ্ছেন না, খোঁজ নিয়ে দেখলেন তাঁর নামের প্যাডে কেউ তাঁর নামে কাগজে এই রকম খবর লিখে পাঠিয়েছে—যার তিনি কিছুই জানেন না। আর একজন বললেন—তিনি বহুদিন কংগ্রেস ত্যাগ করে আই-এন-ডি-এফ করছেন, অথচ মাত্র ক'দিন আগে কংগ্রেস দলের জনৈক সর্বোচ্চ নেতা দুবার বাড়িতে এসে হাজির, আর একমাত্র কথা—তুমি আই-এন-ডি-এফ ত্যাগ করো। শুধু তাই নয় তাঁর সঙ্গে দুদিন কথা বলে উক্ত কংগ্রেস নেতা এক জনসভায় পর্যন্ত ঘোষণা করেছিলেন যে, তিনি নাকি আই-এন-ডি-এফ ত্যাগ করছেন।

হায়! শ্রীআশুতোষ ঘোষ রাজ্যের প্রায় অনেক দলেই দলত্যাগ ঘটিয়েছেন, যুক্তফ্রন্ট ও কংগ্রেস-পি ডি এফ কোয়ালিশন মন্ত্রিসভার পতন ঘটিয়েছেন, অথচ আজ তিনিই দলত্যাগের শিকার। শ্রীআশুতোষ ঘোষ যাঁদের নিয়ে বা যাঁদের দিয়ে রাজ্যে ডিফেকশন রাজনীতি শুরু করেছিলেন, আজ তাঁদের অনেকেই শ্রীঘোষকে ত্যাগ করেছেন নানা কারণে। শ্রীশঙ্করদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, নবাবজাদা কাজেম আলি মির্জা সরে গেছেন শ্রীঘোষের কাছ থেকে। সকল কাজের ও দিবারাত্রের সঙ্গী শ্রীরণধীর বর্মণ আজ শ্রীঘোষের কাছে নেই, বিধানসভা সদস্যদের মধ্যে হাজী সাজ্জাদ হোসেন, শ্রীনেপাল বাউরী ও ব্রহ্মচারী ভোলানাথ ছাড়া বড় কেউ নেই—তাই শ্রীঘোষ নতুন করে তাঁর সঙ্গী সংগ্রহ করে যাত্রা শুরু করেছেন। কিন্তু সেখানেও বাধা, সেই নতুনদেরও কক্ষচ্যুত করার চেষ্টা হচ্ছে। শুক্রবার মুসলিম ইনস্টিটিউট হলে অনুন্নত সমাজের এক সম্মেলন হয়ে গেল। মূলত এই সম্মেলনে যাঁরা মিলিত হয়েছিলেন, তাঁরা একদা শ্রীআশুতোষ ঘোষেরই ঘরের আলো ছিলেন। অনেকেই চর্বচোষ্য খেয়ে, বিমানে মোটরে হিল্লী-দিল্লী ঘুরে নগদ মাসোহারা পেয়ে সুখের পায়রা হয়ে দিন কাটিয়েছেন, কিন্তু আজ ব্রজের মধুতে ঘাটতি দেখে ইন্টালী সি আই টি রোডের ব্রজধাম ত্যাগ করে গেছেন।

বড়ই অশান্ততে আছেন রাজ্যের বিকে ডি দলের নেতৃবৃন্দ। পশ্চিম বাংলায় প্রথম ক্রান্তি দলের পত্তন করেন শ্রীহরেন মজুমদার, শ্রীগঙ্গাধর প্রামাণিক, শ্রীনলিনাক্ষ সান্যাল প্রমুখ যুক্তফ্রন্ট রাজত্ব চলাকালে। তখন এই নেতৃবৃন্দ নিজেদের বাংলা কংগ্রেস থেকে আলাদা করে নিয়ে পশ্চিম বাংলায় নিজেদের ক্রান্তি দলের শাখা কর্মিরূপে প্রকাশ করেন। পরে বাংলা কংগ্রেস যখন ক্রান্তি দলের সঙ্গে মিলে গেল, তখন শ্রীঅজয় মুখার্জী, শ্রীসুশীল ধাড়া প্রমুখ হলেন ক্রান্তিপন্থী আর আদি ক্রান্তিপন্থীরা দলত্যাগ করে গঠন করলেন পি-ডি-এফ ইন্দোরে ক্রান্তি দলের সম্মেলনের পর। এর পর ক্রান্তি দল যখন পশ্চিমবঙ্গের যুক্তফ্রন্ট ত্যাগের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলো, তখন শ্রীঅজয় মুখার্জীর নেতৃত্বে ক্রান্তিপন্থীরা সব দল ত্যাগ করে আবার বাংলা কংগ্রেস গঠন করলেন। এই সময় ক্রান্তিদলে একমাত্র থেকে গেলেন শ্রীনীহারেন্দু দত্তমজুমদার। শ্রীনীহারেন্দু দত্তমজুমদারও ক্রান্তিদলের খুব গোড়ার লোক নন। প্রথম পাটনায় ক্রান্তি দলের যে প্রতিষ্ঠা সম্মেলন হয়, সেখানে শ্রীদত্তমজুমদার উপস্থিত হয়েছিলেন আমন্ত্রিত হিসাবে, তার পর ধীরে ধীরে ক্রান্তি দলের শীর্ষে নিজেকে নিয়ে আসেন। এই ব্যাপারে প্রধান সহায়তা পেয়েছিলেন ক্রান্তি দলের সভাপতি শ্রীমহামায়াপ্রসাদ সিংহের কাছ থেকে। কারণ শ্রীমহামায়াপ্রসাদ সিংহ আর শ্রীনীহারেন্দু দত্তমজুমদার বলতে গেলে সেই বাল্যকালের বন্ধু, বিলাতে লেখাপড়া করবার সময় দুজনের সখ্যতা—আজ জীবনের প্রান্তসীমায় এসেও সেই বন্ধুত্ব অটুট আছে। শ্রীমহামায়াপ্রসাদ সিংহ জীবনে অনেক বার রাজনৈতিক জীবনের গতি পরিবর্তন করেছেন

এবং সত্য কথা বলতে জীবনে অনেক বার অনেকভাবে অনেক দলের নেতৃত্ব করেছেন। ঠিক একই অবস্থা শ্রীনীহারেন্দু দত্তমজুমদারের। একদা চটকল মজদুর আন্দোলনের অতি উচ্চ নেতৃত্বে থেকে পাঞ্জাওয়ালা নামে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন, তারপর ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়ের মন্ত্রিসভায় আইন ও বিচার মন্ত্রিরূপে মন্ত্রিত্ব করেছেন কিছুকাল—তারপর শুরু হয় চড়াই-উৎরাই জীবন—বজবজ থেকে বীজপুর অনেক জায়গায় নিজেকে নির্বাচন প্রার্থিরূপে দাঁড় করিয়েছেন, কিন্তু কোথাও আর নিজেকে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করতে পারেন নি। অবশেষে পুনর্বাসন লাভ করলেন বন্ধু মহামায়াপ্রসাদের সহযোগিতায় ক্রান্তি দলে আর শ্রীঅজয় মুখার্জী, অধ্যাপক কবির ক্রান্তিদল ত্যাগ করায় দলের নেতৃত্ব পেয়ে গেলেন বিনাশ্রমে। কিন্তু বিধি বাম! সেই শীর্ণকায় ক্রান্তি দলের মধ্যেও ভাঙন দেখা দিল। গত ২১শে ডিসেম্বর শ্রীসুখেন্দু বসু রাজ্য ক্রান্তি দলের (বি-কে-ডি'র) সংগঠক সম্পাদকরূপে এক বিবৃতি দিয়ে জানালেন যে, দলের সভাপতি শ্রীনীহারেন্দু দত্তমজুমদার দলের মনোনীত কোষাধ্যক্ষ শ্রী বি পি হিম্মৎসিংকাকে দল থেকে বহিষ্কার করে দিয়েছেন, কারণ শ্রীহিম্মৎসিংকা অন্য দলের (কংগ্রেসের) সহায়তা করতে সচেষ্ট হয়েছেন। কাজেই তাঁর সদস্যপদ বাতিল হয়ে গেছে। দলের অপর মনোনীত সম্পাদক শ্রীতারাশঙ্কর চক্রবর্তীকেও দল থেকে বের করে দেওয়া হয়েছে, কারণ তিনি ব্যাপকভাবে দলীয় শৃঙ্খলা ভঙ্গ করেছেন। এই বিবৃতি খবর কাগজে এসে পৌঁছাবার কয়েক ঘণ্টার মধ্যে আর এক দল এসে হাজির হলেন—তাঁদের হাতেও এক তাড়া কাগজ। এই দলের নেতা হলেন শ্রীমঙ্গলাপ্রসাদ অগরওয়ালা। শ্রীঅগরওয়ালা জানালেন—তাঁরা গত ২০শে ডিসেম্বর এক সভায় মিলিত হয়ে শ্রীনীহারেন্দু দত্তমজুমদার ও শ্রীসুখেন্দু বসুকে দল থেকে বের করে দিয়েছেন। শ্রীঅগরওয়ালা আরো জানালেন যে, তাঁরা পাটনায় গিয়ে শ্রীমহামায়াপ্রসাদ সিংহের সঙ্গে দেখা করে এক স্মারকপত্র দিয়ে এসেছেন এবং জানিয়ে এসেছেন যে, তাঁরা আর শ্রীনীহারেন্দু দত্তমজুমদারের নেতৃত্ব মানতে রাজী নন। অশান্তি কিছু সৃষ্টি হয়েছে বাংলা কংগ্রেস দলেও। সম্প্রতি বাংলা কংগ্রেসের কয়েকটি জেলায় নেতৃত্বের নামে একখানি প্রচারপত্র বিলি করা হয়েছে। এই প্রচারপত্রে লেখা হয়েছে—"বাংলা কংগ্রেস সভাপতি শ্রদ্ধেয় শ্রীঅজয় মুখোপাধ্যায় সমীপেষু—মহাশয়, আমরা বাংলা কংগ্রেসের বিভিন্ন জেলার বিভিন্ন স্তরের বিক্ষুব্ধ ও হতাশাগ্রস্ত কর্মিবৃন্দ আজ আপনার নিকট কয়েকটি আবেদন রাখিতেছি। আমরা আশা করি আপনি সর্বপ্রকার দুর্বলতা পরিত্যাগ করিয়া প্রাদেশিক পর্যায়ের সংগঠনের সর্বপ্রকার অন্যায়-অবিচার পদদলিত করিয়া দলীয় সাংগঠনিক শৃঙ্খলা রক্ষার জন্য আপনার সবল বাহু প্রসারিত করিবেন এবং আপনার প্রদত্ত প্রতিশ্রুতি রক্ষা করিয়া আমাদের মানসিক নৈরাশ্য দূরীভূত করিবেন। গত ১৯৬৬ সালের সুভাষবাগের সম্মেলনে আপনি উদাত্তকণ্ঠে আমাদের যে আশার বাণী শুনাইয়াছিলেন, আমাদের প্রাণে যে নতুন উদ্দীপনার সৃষ্টি করিয়াছিলেন, তাহা আজ প্রাদেশিক স্তরের কয়েকজন উচ্চ পর্যায়ের ব্যক্তির হীন স্বার্থপ্রণোদিত কার্যকলাপ ও তাদের উদ্দেশ্যমূলক স্বেচ্ছাচারী মনোভাবের ফলে দূরীভূত হইয়াছে। আজ আমরা অতি দুঃখের সহিত বেদনার্তকণ্ঠে জানাইতে বাধ্য হইতেছি যে, ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের প্রাদেশিক শাখার সভাপতিরূপে আপনি কংগ্রেসের সর্বস্তরে যে দুর্নীতিপূর্ণ স্বৈরাচারী মনোভাব ও কোটারীগত সাংগঠনিক প্রচেষ্টা দেখিয়া মর্মাহত হইয়াছিলেন, আজ বাংলা কংগ্রেসের কতিপয় নেতার স্বৈরাচারী মনোভাব, দুরভিসন্ধিমূলক কার্যকলাপের ফলে বাংলা কংগ্রেসের সর্ব জেলার কর্মিবৃন্দ বিক্ষুব্ধ ও বেদনার্ত হইয়া পড়িয়াছে। একদা আপনি জনতার দরবারে ন্যায় বিচারের ভার দিয়াছিলেন আজ সেই জনতা আপনার নিকট ন্যায় বিচারের ভার অর্পণ করিতেছে। ইতি—"

এই প্রচারপত্রের মাত্র অংশ বিশেষ তুলে ধরা হল। এই প্রচারপত্রে আরো অনেক কথা আছে। এই বিক্ষুব্ধদের পেছনে যাঁরা আছেন, তাঁরা সম্প্রতি কর্পোরেশনের কাউন্সিলার শ্রীভূপেন দেব বাড়িতে এক সভায় মিলিত হয়েছিলেন এবং সেখানে শ্রীঅজয় মুখার্জীও এসেছিলেন। এই প্রচারপত্র বের হবার পর অবশ্য অনেক জেলাই জানিয়েছে যে, তাঁদের এই প্রচারপত্রের সঙ্গে কোনো সম্পর্ক নেই। আর এই কথাও সত্য যে বাংলা কংগ্রেস আজ একটি রাজনৈতিক দলের রূপ গ্রহণ করতে অগ্রসর হওয়ায় অনেকের পক্ষে অবস্থাটা সহনীয় হচ্ছে না, আবার অনেকে যাঁরা মনোনয়ন পাবার আশায় দলে ভিড়েছিলেন, মনোনয়ন না পেয়ে হতাশ হয়েছেন। কিন্তু মূল কথা হল একটা দল, তারা যত ছোটই হোক বাংলা কংগ্রেসে নিজেদের বিক্ষুব্ধ বলে প্রতিষ্ঠিত করতে চাইছেন। বিক্ষুব্ধ হলেই বা বিদ্রোহ ঘোষণা করলেই তিনি শ্রীঅজয় মুখার্জী হবেন না সত্য। কিন্তু রাজ্যের বর্তমান ক্রান্তিকালে এটা একটা ফ্যাশনে দাঁড়িয়ে গেছে যে, নিজেদের বিক্ষুব্ধ হতে হবে। তবে অন্য দলের সঙ্গে বাংলা কংগ্রেসের একটু তফাৎ আছে। সেটা হল বাংলা কংগ্রেসের নেতৃত্বের চাবি যাঁর হাতে, সেই ভদ্রলোক হলেন শ্রীসুকুমার রায়—যাঁর সম্পর্কে বলা যায় "এ বড় কঠিন ঠাঁই গুরু-শিষ্যে দেখা নাই"। আর যে অজয় মুখার্জী বিক্ষোভ-রাজনীতির জনক হয়ে আজ রাজ্যে প্রথম সারির নেতায় পরিণত হয়েছেন, সেখানে বিক্ষুব্ধরা কতটা অসর জমাতে পারবেন বলা মুশকিল। তবে কথা হল—একদা যাঁরা কংগ্রেস থেকে বিক্ষুব্ধ হয়ে বেরিয়ে এসেছিলেন, আজ দীর্ঘদিন পরে তাঁরা সবাই কিছু-না-কিছু বিক্ষোভের শিকার হয়েছেন— তিনি শ্রীঅতুল্য ঘোষ অথবা অধ্যাপক কবির অথবা শ্রীনীহারেন্দু দত্তমজুমদার অথবা শ্রীঅজয় মুখার্জী, যিনিই হোন না কেন।

অধ্যাপক কবিরের লোকদল ৮০টা আসনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে ৬০টা আসন পাবে এবং লোকদলের লোকই হবে রাজ্যের ভবিষ্যৎ মুখ্যমন্ত্রী বলে ঘোষণা করেছে, অথচ সেই দলেই ভাঙন দেখা দিয়েছে এই নির্বাচনের মুখে। শনিবারের কাগজগুলোতে খবর দেখে অনেকেই অবাক—শ্রীঅমলেন্দু গাঙ্গুলী—যিনি লোকদলের শুধু একজন প্রতিষ্ঠাতা সদস্যই নন, বর্ধমান জেলা কমিটির আহ্বায়ক—তিনি পদত্যাগ করেছেন। 'জনসেবক' পত্রিকার খবর শুধু অমলেন্দু গাঙ্গুলী নয়, শ্রীঅমিয় কিসকুও নাকি নেতৃত্বের আচরণে খুব খুশি নন; তিনিও নাকি কি একটা করে ফেলেছেন। সবচেয়ে মজার ব্যাপার হল শ্রীঅমলেন্দু গাঙ্গুলীর অভিযোগপত্র তথা পদত্যাগপত্রখানি, যেখানা তিনি রাজ্য কমিটির সম্পাদক শ্রীঅজিতরায় মুখার্জীকে লিখেছেন। পত্রে তিনি লিখেছেন—লোকদল নির্বাচনে ১৪।১৫টি আসন পাবে আর সেই বিজয়ী প্রার্থীদের অর্ধেক নাকি সঙ্গে সঙ্গে দল-ত্যাগ করবে, লোকদল নাকি একটা দলই নয়—একটা টিকিট বিলির দোকানে পরিণত হয়েছে। এমনি আরো অনেক কথা আছে শ্রীগাঙ্গুলীর পত্রে। অধ্যাপক কবির আহত হয়ে হাসপাতালে আছেন, তাই দলনেতার অভাবে দলের নির্বাচনের মুখে খুব ভাল সময় চলছে না; কিন্তু এমনি সময়ে আবার যদি পদত্যাগের হিড়িক পড়ে যায়, তবে লোকদল ৬০টা আসন পাবে কি করে সেটা খুবই ভাবনার কথা হবে লোকদল-অনুরাগীদের। নদীর এক কূল ভাঙলে আর এক কূল গড়ে ওঠে—এটা নদীর নিয়ম। লোকদল অন্য দল থেকে কিছু লোকজন পাচ্ছে, কিন্তু আবার জমার ঘর থেকে খরচ সরে হয় তবে তো মুস্কিল। লোকদল এই মুস্কিল আসান কিভাবে করেন, আগামী দিনে সেটা দেখা যাবে। (২৮-১২-৬৮)

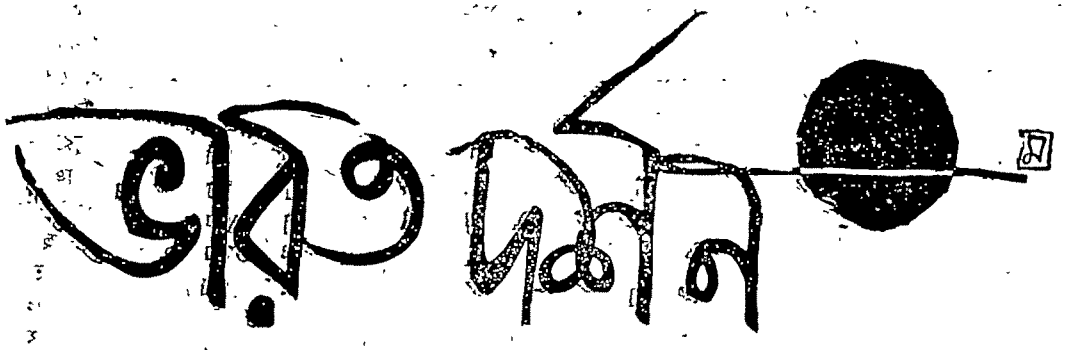

নৈনী জেলে লাঠি

নৈনী জেলে সম্প্রতি ছাত্র ও শিক্ষকদের ওপর যে নির্মম লাঠিবাজি হয়ে গেল; পুলিশ বা আমলের চরিত্র তুলে ধরার ক্ষেত্রে তা বোধহয় নির্লজ্জতম নিদর্শন। অনেকে বলেছেন এমন নির্লজ্জ, নিষ্ঠুরতম বিদেশী বৃটিশ সরকারও প্রদর্শন করতে ভরসা পান নি। বৃটিশ আমলে কস্তুত কিছু আইন ছিল যা অন্তত বাহ্যিকভাবে শোভনতার সীমা অতিক্রম করত না। জেলবন্দী করে যথেচ্ছ পিটিয়ে মারার মধ্যে বাহাদুরী নেই। অবশ্য পুলিশ আদৌ কোন বাহাদুর জীব নয়। চোর, ছ্যাঁচড়, গুণ্ডা ও অসামাজিক ব্যক্তিদের সঙ্গে যে কোন কারণেই হোক তারা এঁটে উঠতে পারে না। যত বীরত্ব শিষ্ট সামাজিক মানুষের ওপর ফলিয়ে এদের তাই পুলিশিয়ানা টিকিয়ে রাখতে হয়। মারতে শিখেও এবং অবাধ মারের অধিকার পেয়েও যারা অপরাধীর পশ্চাদ্ধাবনে ভীত, নিরাপরাধ জনতার ওপর চড়াও হতে সেই জন্যই তাদের ভীষণ আগ্রহ।

কিন্তু নৈনী জেলের ঘটনা তদপেক্ষা লজ্জা আমাদের মুখের ওপর কালির আঁচড় টেনেছে। সভ্য দেশ হিসেবে অতঃপর বিদেশ-বিভুঁই-এ গিয়ে গলাবাজি করলে সেখানকার ছাত্র ও শিক্ষক যদি প্রশ্ন করেন, শিক্ষকদের জেলবন্দী করে তোমরা যারা পিটিয়ে মারো, তাদের বড় কথার মধ্যে গলদ আছে বলে আমাদের বিশ্বাস। কারণ চারিত্র্যধর্মে তোমাদের ওহেন কাজ তোমাদের একদল অপোগণ্ড মূর্খ, অকৃতজ্ঞে পরিণত করেছে। মঞ্চে দাঁড়িয়ে বক্তৃতার অধিকার তোমরা হারিয়েছ। তোমাদের সেই সমস্ত নেতা, যেমন স্বামী বিবেকানন্দ কিম্বা নেতাজী সুভাষ, যাঁদের আবার পুনরুজ্জীবিত হন, তবেই তোমরা শেখা বুলি আওড়াতে এসো। তোমাদের মুখে আদর্শবাদের মেকি কথা কানে লাগে। —তাহলে, তখন, আমাদের মুখ শানি পোড়ারেগুন করে হেটমুণ্ডে নেমে আসা ছাড়া গত্যন্তর থাকবে না। সুরিয়ে এই এমন সম্ভাবনা বড় একটা দেখা যায় না। তাই জাতির ললাটে কলঙ্কতিলক এঁকে দেওয়ার অবাধ সুযোগ আমরা পুলিশ ও জেল কর্তৃপক্ষকে দান করেছি। স্বাধীনতার সবচেয়ে বড় দেওয়া অবোধ-জনের হাতে বোধ হয় ঐটিই একমাত্র।

নৈনী জেল কর্তৃপক্ষ সেই আত্ম-রক্ষার পুরনো সাফাই গেয়েছেন। বন্দী মানুষ নাকি ইট-পাটকেল নিয়ে তাঁদের আক্রমণ করেছিলেন। আচ্ছা, বাহারা, আত্মরক্ষার খাতিরে লাঠিবাজি করেছেন জেলবন্দী কতকগুলি শিক্ষিত নিরস্ত্র মানুষের ওপর। এর পর চতুর্দিকে 'শেম' 'শেম' রব উঠলেও যাঁরা দাঁত বার করে হাসেন, তাঁদের নিয়ে দুশ্চিন্তার কারণ আছে। ভারতের সমস্ত ঐতিহ্য এবং শিক্ষা-দীক্ষাকে তাঁরা পদদলিত করছেন মূর্খের স্বর্গে বাস করে। একবার ভেবে দেখছেন না আগামী ভারতের জন্য কী তাঁরা রেখে যাচ্ছেন। কতকগুলি অন্ধ ক্ষমতামদমত্ত হস্তীর বপুভারে প্রশান্ত ভারত-তপোবনের শান্তি বিঘ্নিত হচ্ছে। হরেও।

উত্তরপ্রদেশ শ্রীমতী কৃপালনীর আমল থেকে কড়া শাসনের ভক্ত হয়ে উঠেছে। চরণ সিং-এর সরকারও সেই মোহ থেকে মুক্ত ছিলেন না। এখন গভর্নরের শাসন। নৈনী জেলে শিক্ষক ঠেঙানো ভারতের শিক্ষাবিদ রাষ্ট্রপতিরা কেমনভাবে গ্রহণ করছেন জানি না, তবে তাঁদের এই জাতীয় কার্যকলাপের প্রতি দৃষ্টি দেওয়া দরকার। বর্তমান রাষ্ট্রপতি কম কথা বলেন, প্রায় যতটুকু না বললেই নয়। কিন্তু নৈনী জেলের ঘটনায় তাঁর পক্ষে চুপ করে থাকার অর্থ শিক্ষাবিদ হিসেবে আপনাকে আজ বিস্মৃত হওয়া। শিক্ষকসম্প্রদায় আজ তাঁর দিকে তাকাতে পারেন, তাঁর দৃষ্টি আকর্ষণ করতে পারেন।

উত্তরপ্রদেশের শিক্ষকগণ বড় অসহায়। উত্তরপ্রদেশ সরকার ঠেঙিয়ে ওঁদের মুখ বন্ধ করতে চান। কিন্তু অত্যাচারীরও সাধারণ সহবৎ দরকার। অন্যথা আজকের প্রশ্নাতুর যুগে তাঁদের কায়েমী স্বার্থকে খুব বেশিদিন টিকে থাকা বাঞ্ছনীয় বলে মনে না-ও করতে পারেন। এ যুগটা ভদ্র অত্যাচারীর, মূর্খ অত্যাচারীর জন্য নয়।

অত্যাচার অনুষ্ঠানের পর ধর্মের ডাক ডাকার মতো তদন্তের নির্দেশও আজ আর গুরুত্ব পাচ্ছে না। সাধারণের তাৎক্ষণিক বিরাগ বশীভূত করার জন্যই তদন্তের নামে অনেক ক্ষেত্রে প্রহসনের রেওয়াজ সৃষ্টি করা হয়েছে।

নৈনী জেলে আশঙ্কাজনকভাবে আহতের সংখ্যা দশজনকেও অতিক্রম করল। শ্রী পি এন সপ্রু ও সমাজতন্ত্রী নেতা শ্রীধরমবীর গোস্বামী জেল পরিদর্শনের পর জানিয়েছেন একাধিক শিক্ষক গুরুতর চোট পেয়ে শয্যাশায়ী। এখন গভর্নর তদন্তের নির্দেশ দিয়ে এবং উপাচার্য সম্মেলন ডেকে কৃতকর্মের কতটুকু কালি মুছতে পারবেন। তদন্তের ফলাফলও এমন কিছুই হবে না যার দ্বারা ভবিষ্যতে অনুরূপ ফ্যাসিস্ট অবিমৃষ্যকারিতা বন্ধ হবে। তাই তদন্ত বস্তুটাতেও বর্তমানে শ্রদ্ধা চটে গেছে। তদন্ত মানেই সাফাই আর সাফাই কখনো প্রতিকার করে না।

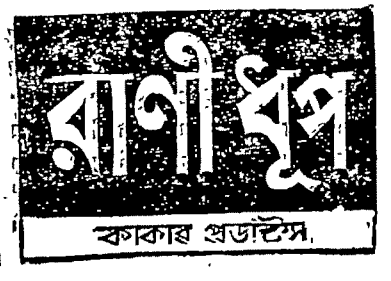

বারাণসী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয় তদন্ত কমিটি

অবশেষে বারাণসী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্র-অশান্তি সম্পর্কে তদন্তের জন্য একটি কমিটি গঠিত হয়েছে বিশ্ববিদ্যালয় পরিদর্শক রাষ্ট্রপতি ডঃ জাকির হোসেনের নির্দেশে। তদন্ত কমিটির নেতৃত্ব করবেন সুপ্রিম কোর্টের প্রাক্তন প্রধান বিচারপতি ডঃ পি বি গজেন্দ্রগদকর এবং অপর তিনজন সদস্যরূপে তদন্তে অংশ গ্রহণ করবেন বোম্বাই হাইকোর্টের বিচারপতি ভি এস দেশাই, ভারত-সিংহল আন্তঃ বিশ্ববিদ্যালয় বোর্ডের চেয়ারম্যান অধ্যাপক এস কে রুদ্র এবং রাজস্থান বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য।

বারাণসী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ের অশান্তি স্বয়ং উপাচার্যের কার্যকলাপের ইন্ধনেই প্রজ্বলিত আকার ধারণ করেছিল, এই মর্মে বহু বাদবিতণ্ডা ইতিপূর্বে হয়েছে। তথাপি আশ্চর্যের বিষয় শেষ পর্যন্ত একটি তদন্ত কমিটি গঠিত হল বটে কিন্তু তদন্তকালে সেই উপাচার্য ডঃ যোশী স্বপদেই বহাল থাকছেন। যাতে অনেকেরই সন্দেহ হওয়া স্বাভাবিক যে নিরপেক্ষ তদন্ত ব্যাহত হতে পারে। এজন্যই রাজ্যসভায় শ্রীভূপেশ গুপ্ত এবং শ্রীরাজনারায়ণ উপাচার্যকে তাঁর পদ থেকে অপসারিত করার জন্য একযোগে দাবি উত্থাপন করেছিলেন কিন্তু শিক্ষামন্ত্রী সে দাবি অগ্রাহ্য করেছেন। এমন কি শ্রীভাণ্ডারী যখন প্রশ্ন করলেন, উপাচার্য ডঃ যোশীর ক্রিয়াকলাপ সম্বন্ধে কোনও তদন্ত হবে কি না, এবং পরিদর্শকের তদন্ত কমিটি কি শুধু এজন্যই নিযুক্ত হলেন যে, ডঃ যোশী নিজে এমন কমিটি গঠনের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেছিলেন? তখন শিক্ষামন্ত্রীকে বলতে হল, কমিটি ডঃ যোশীর কার্যের কোনো তদন্ত বা বিচার করবেন না। অথচ মজা এই, ডঃ যোশীর আচরণ আগাগোড়াই এমন যাতে শিক্ষামন্ত্রীকেও স্বীকার করতে হয়েছে, ডঃ যোশী কোনোরকম তদন্তের অনুষ্ঠান চান নি। এ হেন ডঃ যোশীকে তবুও কেন যে স্বপদে বহাল রেখেই একটা সাজানো তদন্ত করা হচ্ছে, সাধারণের কাছে তার কোন সমুচিত ব্যাখ্যা নেই। এই সমস্ত ব্যাপার দেখে বেশ বোঝা যায় ডঃ যোশীর প্রতি সরকারী তরফে কিছু দুর্বলতার স্থান রয়ে গেছে। যেজন্য ডঃ যোশীর কার্যকলাপ সম্পর্কে সরকার কোনও বাহ্যিক তদন্তের ব্যবস্থা করতেও নারাজ।

এমন যে তদন্ত কমিটি তা কতদূর সফল অনুসন্ধান চালাবেন তাতে সন্দেহের অবকাশ কাজেকাজেই থেকে যায়। পদে পদে অবশ্যই প্রতিবন্ধক সৃষ্টি হবে। সুতরাং এই তদন্ত কমিটি কি সমস্যার কোনরকম সুরাহা করে উঠতে পারবেন?

পাঞ্জাব রাজনীতিতে পুঞ্জীভূত মেঘ

হরিয়ানার ভগবদয়াল শর্মা গেলেন। পাঞ্জাব কংগ্রেস থেকে দলছুট হলে রাড়েওয়ালার নেতৃত্বে কয়েকজন হোমরা-চোমরা কংগ্রেসী সহ বেশ একটি মোটা গ্রুপ। কংগ্রেস সভাপতি অবশ্য বলেছেন, যেতে দাও! কিন্তু এই যেতে দেওয়া যে পাঞ্জাব কংগ্রেসের কতখানি দেওয়া আগামী অন্তর্বর্তী নির্বাচনেই তা বেশ মালুম দেবে। তৎসত্ত্বেও কংগ্রেস সভাপতির ঐ অকুতোভয়োক্তি প্রশংসার্হ। কেন না লোভের চার ফেলে আর যে বেসাতিই চলুক-না-কেন, সমর্থ রাজনীতি চলে না। আর সে হিসেবে কংগ্রেস সভাপতির উক্তি বলিষ্ঠ একথা মানতেই হবে। কিন্তু বড় দেরি হয়ে গেছে। একুশ বছর ধরে কংগ্রেসই এমনভাবে গুছিয়ে দেওয়ার মোচ্ছব শুরু করে দিয়েছেন যে, খাঁটি দলপ্রেমিক কংগ্রেসীর আজ সর্বাংশে ঘাটতি দেখা দিয়েছে। নির্বাচনের প্রাক-মুহূর্তে এবং গদি বণ্টনের সময় কিম্বা নির্বাচনে মনোনয়ন দেওয়ার বিষয় নিয়ে তাই আজ কংগ্রেসী নেতারা যথেষ্ট দলত্যাগে মেতে উঠেছেন।

শ্রীজ্ঞান সিং রাড়েওয়ালার রাজনৈতিক জীবন প্রায় দুই দশককালের। এরই মধ্যে তিনি বার তিনেক দল বদল করলেন। ইতিপূর্বেও তিনি একবার আকালী দলে যোগ দিয়েছিলেন। তার পর আকালী দলের সঙ্গে স্বার্থের টান বজায় রাখার হাইফেন স্বরূপ কংগ্রেস কর্তৃক তিনিই ব্যবহৃত হয়ে এসেছেন। এবার কংগ্রেস ছেড়েই বলেছেন, যদি স্থান থাকে আকালী দলেই যোগ দেব। আকালীরাও সঙ্গে সঙ্গে দু'হাত বাড়িয়ে রাড়েওয়ালাকে কাছে টেনে নিয়েছেন। রাড়েওয়ালার বিশেষ বেগ পেতে হয় নি। দরকার হয় নি কোনও অগ্নি-পরীক্ষার। কেন না আকালীদের সঙ্গে শ্রীযুত রাড়েওয়ালার শুধু যে ব্যক্তিগত সম্পর্ক কংগ্রেসী হিসেবেই চালু ছিল তাই নয়, রাড়েওয়ালার কন্যা আকালী টিকিটেই এম-পি। সন্ত ফতে সিং বলেছেন, জ্ঞান সিং রাড়েওয়ালার প্রকৃত স্থান আকালী দলে। প্রমাদবশে তিনি কংগ্রেসে গিয়ে পড়েছিলেন।

সন্তজীর বক্তব্যে রাড়েওয়ালার আন্তরিক টানের হদিশ পাওয়া যায়। রাড়েওয়ালার শিখ-রাজনীতি অতঃপর সোজাসুজি আকালী দলে হাত মেলালে আকালী শক্তি বহুল পরিমাণে বর্ধিত হচ্ছে। ইতিমধ্যেই তারা সিং তাঁর গোঁড়া দক্ষিণপন্থী মনোভাব নিয়ে সদলে আকালী দলে প্রবেশ করেছেন। এখন রাড়েওয়ালা চললেন তারা সিং-এরই হাত শক্ত করতে। কারণ রাড়েওয়ালা নিজে সামন্ততান্ত্রিক শক্তির বন্ধু-স্থানীয় প্রতিনিধি। মাস্টারজীর সঙ্গে তাঁর ঐকান্তিকতা সুতরাং আশা করা যায়।

আকালী দলে প্রবেশ করতে-না-করতেই রাড়েওয়ালা তাঁর আন্তরিক আকাঙ্ক্ষা প্রকাশও করে ফেলেছেন। বলেছেন, পাঞ্জাবে আকালী দলেরই নিজেরই ক্ষমতার্জনের সুযোগ আছে। (শিখরাই সংখ্যাগুরু)। এখন সেই ক্ষমতা গ্রহণ করে কম্যুনিস্ট প্রভাব খর্ব করতে হবে তাঁদের।

অর্থাৎ উত্তর-পশ্চিম ভারত জুড়ে দক্ষিণী শক্তির জয়-জয়কার।

পাঞ্জাব রাজনীতি যদি আকালীদের মুঠিবন্ধ হয়ে পড়ে তাহলে দক্ষিণী রাজনীতির দুয়ার ধরে ভয়াবহ সাম্প্রদায়িকতা যে এগিয়ে না আসবে এমন কথা কেউ বলতে পারেন না। কংগ্রেসকেও বেশ পিছু হটতে হবে।

আকালী দলের মধ্যেও কংগ্রেসী কায়দায় অপেক্ষাকৃত বৈপ্লবিক চিন্তার ধারক-বাহক তরুণদের ছাঁটাই চলছে। একটি নিদর্শন : বলবন্ত সিং-এর মতো তরুণ নেতাকে বসিয়ে দিয়ে সাম্প্রদায়িক উপদলীয় চিন্তার মুখপাত্র আত্মা সিং-কে স্থান করে দেওয়া।

পাঞ্জাব রাজনীতি সুতরাং ঘোর দক্ষিণী হাওয়ায় আলোড়িত। একদিকে কংগ্রেস, অন্যদিকে আকালী। আকালীদের সঙ্গে স্বতন্ত্র জনসঙ্ঘের মিলনও অত্যন্ত সম্ভাবনাপূর্ণ। এমতাবস্থায় দক্ষিণপন্থার করালগ্রাস থেকে পাঞ্জাবকে অন্তত নিশ্বাস ফেলার সুযোগ দিতে পারেন একটি সুসংগঠিত বামজোট। কিন্তু ভারতের মানচিত্রে এঁদের স্থান ক্রমেই সঙ্কুচিত হয়ে আসছে এবং আসবে এঁদের নিজেদের মধ্যে স্বার্থসংঘাতের ফলেই। লক্ষ্যণীয় এই যে, দক্ষিণী শক্তি যেমন করে সহজে হাত মেলাতে পারেন বামেরা তা পারেন না। বামেদের মধ্যে বাম ও অতিবামের সঙ্ঘর্ষ ছাড়াও সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বিসম্বাদের পথ যত বেশি, দক্ষিণীদের তত নেই। তাঁদের চাঁছা সোজা পথ স্বার্থের সমভূমিতে প্রতিষ্ঠিত। সঙ্ঘাত শুধু স্বার্থের। এই স্বার্থের প্লাস্-মাইনাস যেহেতু আঙ্কিক নিয়মে সম্ভব, তাই সমঝোতাও দেওয়া

নেওয়ার মধ্যেই সরল হয়ে আসতে পারে। কিন্তু বাম সঙ্ঘাত মূলত আদর্শভিত্তিক ও সে কারণ তা বহুক্ষেত্রে বাস্তব-অবাস্তবের সঙ্ঘাতেও পর্যবসিত। সেক্ষেত্রে সমঝোতার ইচ্ছে থাকলেও উপায় হয় না।

কিন্তু উপায় যদি না হয়, তবে ভারতের দক্ষিণীগ্রাসী আবহাওয়ার ঝড়ে বাম-চরা উৎপাটিত হয়ে যেতে পারে। অন্তত এই একটি বাস্তব স্বার্থের জন্যই বামেদের একজোট হওয়া প্রয়োজন বিশেষভাবে দেখা দিয়েছে। শুধু পাঞ্জাবেই নয়, এই প্রয়োজন আজ অন্যান্য রাজ্যেও। উত্তর ভারতে দক্ষিণী-হাওয়ার দাপট অত্যন্ত শক্তিশালী হলেই, অন্যান্য অঞ্চলে নিরুদ্বেগ আদর্শরাজ্যে বামবাদের সুযোগ আছে, এমন আত্ম-তৃপ্তির আজ আর সময় নেই। এখন ছোট ছোট বিভেদ দূরে রাখার প্রয়োজন কেবলমাত্র বড় বিপত্তি থেকে ত্রাণ লাভের জন্যই। (২৭।১২।৬৮)

চিঠিপত্র তাড়াতাড়ি ডাকে দিন তাহলে সেই দিনের ডাকেই যাবে

দিনের শেষে অফিস বন্ধ হওয়ার সময় এতো বেশী চিঠিপত্র ডাকে দেওয়া হয় যে পোষ্ট অফিসগুলির পক্ষে তা একটা বড় সমস্যার সৃষ্টি করে। এতে কাজ খুব বেশী বেড়ে যায় ফলে সেগুলি বাছাই ক'রে পাঠাতে দেরী হয়।

চিঠিপত্র তাড়াতাড়ী ডাকে দিলে সেগুলি সে দিনই পাঠানো যায় এবং সেগুলির গন্তব্যস্থলে পৌঁছতে দেরী হয় না।

এখনই ডাকে দিন। বিকেল পর্য্যন্ত অপেক্ষা করবেন কেন?

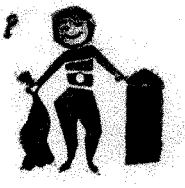

ভারতীয় ডাক ও তার বিভাগ

davp 68/434

সাংবাদিক সম্মেলনে মার্কিন গোয়েন্দা জাহাজ 'পুয়েব লো'র নাবিকগণ

গায়না ঃ

গত সপ্তাহে গায়নার সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়েছে। প্রধানমন্ত্রী ফরবেস বার্নহামের দল পিপলস ন্যাশনাল কংগ্রেস আইনসভায় একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করেছে। পার্লামেন্টের মোট ৫৩টি আসনের মধ্যে পিপলস ন্যাশনাল কংগ্রেসের সদস্যরা ৩০টি আসন লাভ করেছেন। প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বী প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী ডঃ ছেদি জগানের দল পিপলস প্রোগ্রেসিভ পার্টি নির্বাচনে পরাজিত হয়েছে।

নির্বাচনের ফল প্রকাশিত হবার পর ডঃ জগান সমগ্র নির্বাচনকে এক "বিরাট ধাপ্পা" বলে অভিহিত করেছেন। প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত এই নির্বাচন জাল-জোচ্চুরিতে ভরা। সাংবাদিক সম্মেলনে ডঃ জগান ঘোষণা করেন, তিনি এই নির্বাচনের ফলাফলকে মেনে নেবেন না। নতুন সরকারকে তিনি স্বীকার করবেন না। সম্ভবত তাঁর দলের নির্বাচিত সদস্যরা পার্লামেন্টের বৈঠকেও যোগ দেবেন না। বার্নহামের সরকারের পতন ঘটানোর জন্য তিনি সম্ভাব্য সকল উপায়ে চেষ্টা করবেন। তবে হিংসাত্মক পন্থা তিনি গ্রহণ করবেন না বলে জানিয়েছেন। সরকারবিরোধী আন্দোলনের কর্মপন্থারূপে তিনি জনসভা, স্টিক্ষাভ মিছিল ও ধর্মঘটের কথা ঘোষণা করেন। অবশ্য তিনি সঙ্গে সঙ্গে সরকারকে এই বলে সতর্ক করে দিয়েছেন যে, আন্দোলন দমন করার জন্য হিংস্যর আশ্রয় নেয়া হলে আন্দোলন অহিংস থাকবে না।

লাতিন আমেরিকার ৮৩ বর্গমাইলের এই ক্ষুদ্র প্রাক্তন ইংরেজ উপনিবেশের শতকরা ৫১ জন অধিবাসীই ভারতীয় বংশোদ্ভূত। ভারতীয় বংশোদ্ভূতদের অবিসম্বাদী নেতা ডঃ ছেদি জগান ও তাঁর দলের সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোটে জয়লাভ করাটাই এখানে স্বাভাবিক। তার জায়গায় মাত্র শতকরা ৩০ জন নিগ্রোর নেতা বার্নহামের জয়লাভ একটু বিস্ময়কর। মনে রাখা দরকার, গায়নার রাজনীতি এখনও জাতিভেদের ওপর প্রতিষ্ঠিত।

বার্নহাম

১৯৫৭ থেকে ১৯৬৪ পর্যন্ত ডঃ জগান (ব্রিটিশ) গায়নার প্রধানমন্ত্রী ছিলেন। ১৯৬৪ সালের সাধারণ নির্বাচনের মুখে ইংরেজ সরকারের উস্কানিতে চিরাচরিত কায়দায় ভারতীয়-নিগ্রো দাঙ্গা সুরু হয়, এবং ইংরেজ সৈন্যবাহিনী ও স্বয়ং গভর্নর-জেনারেল বার্নহামের সাহায্যে এগিয়ে আসেন। নির্বাচনে জগানের দল পরাজিত হয়। এবারও নির্বাচনের মুখে নানা কারসাজি সুরু হয়। জগানের দলের বহু সদস্যকে গ্রেপ্তার করে ঘোষণা করা হয়, এঁরা ভেনিজুয়েলার গেরিলাদের সঙ্গে যোগসাজসে গায়নায় কিউবার মত বিপ্লব সংগঠনের চেষ্টা করছেন। মার্কিন ও ইংরেজরা প্রকাশ্যে বার্নহামকে সাহায্য করে। নির্বাচনের ফল প্রকাশের পর বিখ্যাত মার্কিন সংবাদ-সাপ্তাহিক 'নিউজউইক' লিখেছে (৩০শে ডিসেম্বর, ১৯৬৮ তারিখের সংখ্যা) ঃ "...গায়নার ছেদি জগান লাতিন আমেরিকার এমন একজন রাজনীতিক যাঁকে ওয়াশিংটন সরকারী ক্ষমতার বাইরে রাখতে চায়।" এবং,

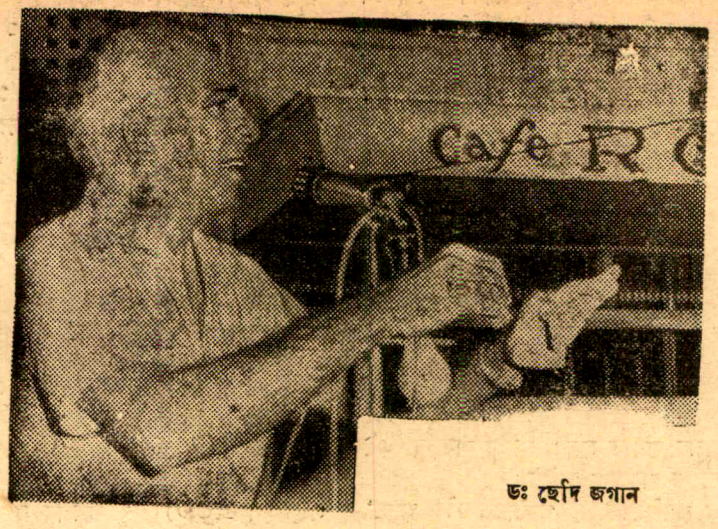

ডঃ ছেদি জগান

"বার্নহাম ওয়াশিংটনের আশীর্বাদপুষ্ট"। বার্নহামের দল যাতে ক্ষমতায় আসীন থাকতে পারে তার জন্য গত তিন বৎসরে মার্কিন সরকার গায়নাকে সাড়ে পাঁচ কোটি ডলার অর্থসাহায্য দিয়েছেন।

এত করেও জগানের দলকে হারানো যেত না। বার্নহামকে জয়লাভের জন্য জাল ভোটের আশ্রয় নিতে হয়েছে। নির্বাচনী আইনের পরিবর্তন করে এবারই প্রথম বিদেশে অবস্থিত গায়না-বাসীদের ভোটের অধিকার দেয়া হয়েছে। বিদেশে মোট ৬৬ হাজার ভোটদাতার নাম রেজিস্ট্রি করা হয়েছে। বিদেশে প্রদত্ত ৩৬,৭৪৫টি ভোটের মধ্যে ৩৪,৪২৯টিই পেয়েছে বার্নহামের দল। অভিযোগ করা হয়েছে, এই সব ভোটের অধিকাংশই জাল। ৬৬ হাজার বিদেশের ভোটদাতাদের মধ্যে ৪৩ হাজারই ব্রিটেনে। সম্প্রতি এক ব্রিটিশ টেলিভিশন কোম্পানীর সমীক্ষায় প্রকাশ পেয়েছে, এই ৪৩ হাজার ভোটদাতাদের অধিকাংশেরই কোন অস্তিত্ব নেই!

বার্নহাম অবশ্য বলছেন, তিনি এবারের নির্বাচনে নিগ্রো ছাড়াও ভারতীয় বংশোদ্ভূতদের অনেকের ভোট পেয়েছেন। এই ঐক্যের ওপর ভিত্তি করে তিনি আগামী দিনের শাসন পরিচালনা করবেন। তবে আখক্ষেতের শ্রমিকদের মধ্যে অধিকাংশই জগানের অনুগামী, এবং এদের ভেতর ভারতীয়দের সংখ্যাই বেশি। মার্কসবাদে বিশ্বাসী ডঃ ছেদি জগান এবং তার পি-পি-পি দল বার্নহাম সরকারের বিরুদ্ধে কিভাবে আন্দোলন সুরু করেন, এবং তার পরিণতি কি হয়, তা বিশেষভাবে লক্ষ্য করার বিষয়।

উত্তর কোরিয়া :

অবশেষে উত্তর কোরিয়া সরকার মার্কিন গোয়েন্দা জাহাজ 'পুয়েবলো'র ৮২ জন জীবিত নাবিককে মুক্তি দিয়েছেন। নিহত নাবিক ডুয়ান হজেসের মৃতদেহও একটি বিশেষ বাক্সে করে মার্কিন সরকারের হাতে ফিরিয়ে দেয়া হয়।

২৩শে ডিসেম্বর বড়দিনের মুখে এঁদের মুক্তি দেয়া হয়। ঠিক এগারো মাস আগে ২৩শে জানুয়ারী জাহাজ সহ এঁদের আটক করা হয়েছিল। অভিযোগ ছিল, মার্কিন গোয়েন্দা জাহাজ 'পুয়েবলো' গোয়েন্দাগিরির জন্য 'আক্রমণাত্মক উদ্দেশ্যে' ইচ্ছা করে উত্তর কোরিয়ার আঞ্চলিক দরিয়ায় প্রবেশ করেছে। এবং এর দ্বারা উত্তর কোরিয়ার আঞ্চলিক সার্বভৌমত্ব ক্ষুণ্ণ হয়েছে।

মার্কিন সরকার এই অভিযোগ অস্বীকার করেন, এবং বলেন, 'পুয়েবলো' উত্তর কোরিয়ার আঞ্চলিক সাগরে প্রবেশ করে নি, তার বাইরে 'আন্তর্জাতিক সাগরে' ছিল। উত্তর কোরিয়ার নৌবাহিনী জবরদস্তি করে অন্যায়ভাবে আন্তর্জাতিক দরিয়া থেকে মার্কিন জাহাজ আটক করেছে। আটক 'পুয়েবলো'র ক্যাপটেন লয়েড বুচারের স্বীকারোক্তিতে প্রকাশ পায়, মার্কিন সরকারের পক্ষ থেকে তাঁদের ওপর সুস্পষ্ট নির্দেশ ছিল, উত্তর কোরিয়ায়

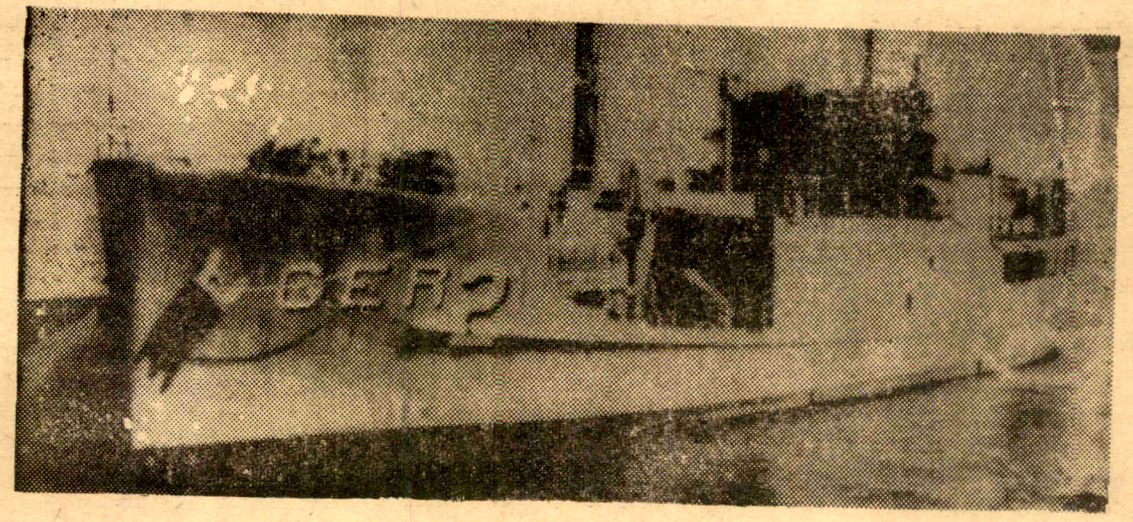

'পুয়েবলো' জাহাজ

আঞ্চলিক দরিয়ায় প্রবেশ করার জন্য। বুচার এ কথাও বলেন, তাঁরা সজ্ঞানে ইচ্ছাকৃতভাবে আঞ্চলিক দরিয়ায় প্রবেশও করেছেন। মার্কিন সরকার বুচারের এই স্বীকারোক্তি অস্বীকার করেন, এবং অভিযোগ করেন, জোর করে, ভয় দেখিয়ে এই স্বীকারোক্তি আদায় করা হয়েছে।

যাই হোক, উত্তর ও দক্ষিণ কোরিয়ার সীমান্তে শান্তিগ্রাম পানমুনজানে উত্তর কোরিয়া ও মার্কিন সরকারের প্রতিনিধিদের মধ্যে দীর্ঘদিন ধরে বৈঠক চলে, কিভাবে কোন সর্তে পুয়েবলোর আটক নাবিকদের মুক্ত করা যায়। শেষ পর্যন্ত গত সপ্তাহে উভয় পক্ষ মীমাংসায় পৌঁছেছেন। মার্কিন সরকার খোলাখুলি স্বীকার করেছেন ঃ তাঁরা অন্যায় করেছেন, এবং এর জন্য তাঁরা উত্তর কোরিয়া সরকারের কাছে ক্ষমা চেয়েছেন। মার্কিন সরকারের পক্ষ থেকে এই দলিলে স্বাক্ষর করেছেন জেনারেল গিলবার্ট এইচ্ উডওয়ার্ড। এর পর উত্তর কোরিয়া সবাইকে ছেড়ে দিতে রাজী হয়েছে।

'পুয়েবলো'র নাবিকরা ছাড়া পেয়ে স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করেছেন।

মার্কিন সরকার অবশ্য মুখরক্ষার জন্য এখন বলছেন, নেহাৎই নাবিকদের প্রাণ বাঁচানোর জন্য তাঁরা দোষ স্বীকার করেছেন। তা না হলে, তাঁরা নিশ্চিত যে তাঁরা কোন অন্যায় করেন নি, উত্তর কোরিয়ার আঞ্চলিক সাগরেও প্রবেশ করেন নি। কিন্তু 'পুয়েবলো'র ঘটনার পর থেকে এই এগারো মাসে মার্কিন সরকার এই ব্যাপারে তাঁদের নির্দোষিতার বক্তব্য কি স্বদেশে কি বিদেশে, কোথাও দৃঢ়তার সঙ্গে রাখতে পারেন নি। তাঁরা যে অন্যায় করেছেন, এ সত্য লুকানো যায় নি। প্রবল পরাক্রান্ত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে সামান্য উত্তর কোরিয়ার কাছে নাকে খৎ দিতে হল, এ নিতান্তই অদৃষ্টের পরিহাস ছাড়া আর কি!

পশ্চিম এশিয়া ঃ

রিচার্ড নিকসনের নেতৃত্বে নতুন মার্কিন সরকার কি ইজরায়েলকে ত্যাগ করে আরবদের পক্ষাবলম্বন করবেন, এই প্রশ্ন হঠাৎ বিভিন্ন মহলকে চিন্তিত করে তোলে। সোভিয়েট ও ইজরায়েল, দু' পক্ষই চিন্তিত হয়েছিল।

নিকসনের প্রতিনিধি পেনসিলভানিয়ার প্রাক্তন গভর্নর উইলিয়াম স্ক্র্যানটনের সাম্প্রতিক পশ্চিম এশিয়া সফরকে কেন্দ্র করেই এই প্রশ্ন দেখা দেয়। স্ক্র্যানটন বিভিন্ন আরব দেশ সফর করে আরব নেতাদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক স্থাপনের চেষ্টা করেছেন, এবং তাঁদের বুঝিয়েছেন, নিকসন তাঁদের বন্ধুত্ব চান। স্ক্র্যানটন সফরকে উপলক্ষ করে একাধিক প্রভাবশালী আরব পত্রিকাও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে বন্ধুত্বের ওপর গুরুত্ব আরোপ করে।

কিন্তু সব জল্পনা-কল্পনার অবসান হয়েছে। মার্কিন নীতিতে কোন পরিবর্তন হচ্ছে না। বরং প্রত্যাশামত, নিকসন সরকার আরও বেশি ইজরায়েল-ঘেঁষা নীতি অনুসরণ করবেন, তাই আবার প্রকাশ পেয়েছে।

স্ক্র্যানটন নিজেই বলেছেন, ইজরায়েলের স্বার্থ রক্ষার জন্যই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র আরবদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক স্থাপন করতে চায়। বলা বাহুল্য, এই মন্তব্যে আরবরা চটেছে।

সোভিয়েট পররাষ্ট্রমন্ত্রী আন্দ্রে গ্রোমিকো চারদিন কায়রো থেকে গেলেন। সংযুক্ত আরব সাধারণতন্ত্রের রাষ্ট্রপতি

পশ্চিম এশিয়া সফরে স্ক্র্যানটন

আবদুল গামেল নাসের ও পররাষ্ট্রমন্ত্রী মাহ্‌মুদ রিয়াদের সঙ্গে দীর্ঘ আলোচনার পর গ্রোমিকো স্থিরনিশ্চিত হয়ে গেছেন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রতি বর্তমানে আরবদের যে বৈরী মনোভাব রয়েছে, তার আশু পরিবর্তনের কোন সম্ভাবনা নেই। আলোচনা শেষে সোভিয়েট ও আরব নেতৃবৃন্দ ঘোষণা করেছেন, তাঁরা এক-যোগে ইজরায়েলের আক্রমণাত্মক কার্যকলাপের বিরুদ্ধে দাঁড়াবেন।

ইজরায়েলের প্রতিরক্ষামন্ত্রী মশে ডায়ান গত সপ্তাহে নিউ ইয়র্কে নির্বাচিত মার্কিন রাষ্ট্রপতি রিচার্ড নিকসনের সঙ্গে 'সৌজন্য-সাক্ষাৎ' করেছেন। নিকসন তাঁকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন, পুরোনো বন্ধু ইজরায়েলকে ত্যাগ করে নতুন বন্ধু আরবদের সন্ধানে তিনি যাবেন না। এই প্রতিশ্রুতির কথা বিশেষ ফলাও করে প্রচার করা হয়েছে।

তেল আভিভে ইজরায়েলের প্রধানমন্ত্রী লেভি এশকল ঘোষণা করেছেন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ইজরায়েলকে ৫০টি বোমারু জেট্ বিমান দিতে সম্মত হয়েছে।

পাকিস্তান ঃ

করাচীতে দু'দিন ধরে তিন মুসলিম রাষ্ট্রপ্রধানের শীর্ষ বৈঠক হয়ে গেল। 'আঞ্চলিক সহযোগিতা ও উন্নয়ন সংস্থার' (Regional Cooperation and Development, বা সংক্ষেপে RCD) অধিবেশন বসেছিল করাচীতে ২৫ ও ২৬শে ডিসেম্বর। ইরানের শাহ্ রেজা শাহ্ পহলভী, তুরস্কের প্রধানমন্ত্রী সুলেমান ডেমিরেল ও পাকিস্তানের রাষ্ট্রপতি আয়ুব খাঁ এই উপলক্ষে মিলিত হয়ে নানা বিষয়ে আলাপ-আলোচনা করেছেন।

আলোচনা শেষে ঘোষণা করা হয়েছে, তিন রাষ্ট্রপ্রধান বিভিন্ন বিষয়ে এই তিনটি রাষ্ট্রের মধ্যে সহযোগিতার ক্ষেত্রকে আরও প্রসারিত করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন। আরও বলা হয়েছে, পারস্য উপসাগর, পশ্চিম এশিয়া, সাইপ্রাস, কাশ্মীর এবং ভিয়েতনামের ব্যাপারে প্যারিস সম্মেলনের প্রশ্ন এই সব গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে তাঁদের মধ্যে আলোচনা হয়েছে, এবং প্রতিটি বিষয়েই তিন রাষ্ট্রপ্রধানই ঐক্যমত পোষণ করেন।

অর্থাৎ, কাশ্মীরের ভারতভুক্তির বিরুদ্ধে পাকিস্তানের বক্তব্য ইরান ও তুরস্ক সমর্থন করে। এটা নতুন কিছু নয়। ইরান ও তুরস্ক এ ব্যাপারে ভারতের বিরুদ্ধে, এ সকলেরই জানা আছে।

কিন্তু পশ্চিম এশিয়ার ব্যাপারে ঐকমতের অর্থ কি? আরব-ইজরায়েল বিরোধে ইরান ও তুরস্ক কার্যত ইজরায়েলের পক্ষে। তাহলে কি পাকিস্তানও আরবদের বিরুদ্ধে ইজরায়েলকে সমর্থন করবে?

আর-সি-ডি মার্কিন অনুপ্রেরণায় গঠিত। পশ্চিম এশিয়ায় নাসের নেতৃত্বের বিরুদ্ধে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র যে শক্তিগোষ্ঠী গড়ে তুলতে চায় ইরান, তুরস্ক ও পাকিস্তান তার অন্তর্ভুক্ত। সৌদি আরবের রাজা ফয়জালকেও এর ভেতর আনবার চেষ্টা চলছে।

(২৮-১২-৬৮)

সদ্য বিকশিত গোলাপের মত সুন্দর আনন ও
কুসুম কোমল
পাপড়ি পেলব তনু

সাধনা বিউটি ক্রীম-এর
এইতো সবচেয়ে বড় অবদান।
নিজেদের সৌন্দর্য্য সম্পর্কে
সচেতন আধুনিকারা তাই
এর প্রশংসায় মুখর।

সাধনা
বিউটি
ক্রীম

প্রসাধনীর অপরিহার্য্য
অতি আধুনিক অঙ্গরাগ

সাধনা ঔষধালয়-ঢাকা, কলিকাতা-৪৮

ভাই সত্যেন

ড: পশুপতি ভট্টাচার্য

জগদ্‌বরেণ্য স্বনামখ্যাত জাতীয় অধ্যাপক সত্যেন বোস আমাকে বলে বড়দা, তাই সে হয় আমার ছোটো ভাই। বাল্যকাল থেকে এখনও পর্যন্ত বরাবরই তাই, এখনও তার কাছে গেলে সে শত কাজ ফেলে উঠে এসে 'বড়দা এসেছ' বলে আমাকে জড়িয়ে ধরে, নিজের বিছানাতে টেনে নিয়ে বসায়।

এখানে গোড়াতেই সে কথা বলে পরিচয় দেবার অর্থ কি? অত বড়ো একজন বিজ্ঞানী আমাকে দাদা বলে সম্মান করে, তাই জানিয়ে নিজের গৌরব বাড়াতে চাই? গৌরব তো আছেই, কিন্তু ঠিক সেই উদ্দেশ্য এখানে নয়। আমি কেবল ঐ মানুষটির ভিতরকার মানুষটির কথাই বলতে চাইছি, যেমন দেখেছি তাই বলছি। সত্যেনের বিদ্যাবুদ্ধির ধীশক্তির গভীরতা যে কতখানি তা জানতেন আইনস্টাইন এবং আরো কত নামজাদা আন্তর্জাতিক বিজ্ঞানী। অঙ্কশাস্ত্রে বা পদার্থবিদ্যায় বা রসায়নচর্চায় তিনি যে কতদূর পর্যন্ত এগিয়েছেন তা জানেন ঐ সকল বিষয়ের ধুরন্ধর বিশেষজ্ঞরা, আমরা সাধারণ সামান্য মানুষরা সত্যেনের জ্ঞানের সেই গভীরতারও যেমন নাগাল পাব না, তার ব্যাখ্যা যাঁরা করবেন তারও তেমনি নাগাল পাব না। এইটুকু মাত্রই জানি যে এসব উজ্জ্বল প্রতিভা কেবল আমাদের দেশে নয় —সারা পৃথিবীতেই খুব কম জন্মেছে। কিন্তু সে কথা আমি আর কি বলব?

আমি শুধুই বলতে পারি ঐ ব্যক্তিগত মানুষটির কথা। মহাযোগী শ্রীঅরবিন্দ একটি খুব খাঁটি কথা আমাদের বলেছেন, তার ভাষাটা মোটামুটি এই রকম— "The real value of a person is not to be judged by what he has done but what he has become"—অর্থাৎ কে কতটা কি কাজ করলে তাই নিয়ে তার দাম নয়, কতটা সে হয়ে উঠতে পারলে তাই নিয়েই তার দাম। এই হয়ে ওঠা জিনিসটা হয় নিজের ভিতর থেকে, বাইরের থেকে কোনো কিছুই তাকে হইয়ে দিতে পারে না। বিদ্যা নয়, বিত্ত নয়, মান নয়, যশ নয়, ক্ষমতা নয়, বুদ্ধিমত্তা নয়.—এগুলির দ্বারা বাইরে একরকমের চরিত্র সৃষ্টি করে বটে, কিন্তু ভিতরকার যে আসল মনুষ্যত্ব, তার আত্মার যে ফুলের মতো সহজ প্রস্ফুটন, তা হয় ভিতর থেকে ভিতরের মানুষটির দ্বারা। বিদ্যাবুদ্ধি জ্ঞান বিত্তের সৌভাগ্য বিধাতা যাকে যেমন দিয়ে পাঠিয়েছেন যে পরিস্থিতির মধ্যে, সে তেমনিই হয়ে উঠতে পেরেছে, যে কর্ম তাকে দিয়ে করিয়েছেন তাই সে করতে পেরেছে। এবং তার জন্য তার নামযশও হয়তো চিরদিনের জন্য থেকে যাবে। বিজ্ঞানোন্নতির ইতিহাসে সত্যেন বোসের নামটা যে স্থায়ী হয়ে রইল তাতে সন্দেহ নেই। কিন্তু তা ছাড়াও—

ঐ যে সহজ সরল নির্মলচিত্ত সদানন্দ মানুষটি, ও যে আপনা-আপনি অমনি হয়ে ফুটে উঠেছে নিজেরই ভিতর থেকে। ও ঠিক সেই সত্যেন বোস, যেমন বরাবরই একভাবে দেখে আসছি। যত বড়োই নামকরা বিদ্বান হোন, তবু উনি সেই সত্যেন বোস। জগতের সর্বদেশে উনি যতই উচ্চমান্য পেয়ে থাকুন, তবু উনি সেই সত্যেন বোস। বিজ্ঞানীদের যত বড়ো বড়ো সভাতে ওঁকে যেমনই উচ্চাসন দেওয়া হোক, তবু উনি সেই সত্যেন বোস। তেমনি অমায়িক, তেমনি হাসিমুখ, তেমনি মিষ্টি মিষ্টি কথা। যে-কেউ তাঁর কাছে যাক, তাঁকে ঠিক ঐরকমই দেখবে। দেখে কেউ বলতে পারবে না যে উনি এত বড়ো একজন প্রতিভাবান পুরুষ। তাঁর সেই প্রতিভা মানুষটাকে চাপা দিতে পারে নি, মানুষটাই প্রতিভাকে বেমালুম চাপা দিয়ে রেখেছে। আপনারা যাকে তাঁর greatness বলবেন তার চেয়েও বড়ো তাঁর selfness. আমি তাঁর জ্ঞানমুগ্ধ ততটা নই যতটা তাঁর গুণমুগ্ধ।

কিন্তু কিসে এতটা গুণমুগ্ধ হলাম সে বৃত্তান্ত দেওয়া খুব কঠিন। আমার এই দীর্ঘজীবনের ঘাতপ্রতিঘাতের নানা অবস্থাতে কখন কতখানি তাঁর হৃদ্যতার পরিচয় পেয়েছি সে কথা গুছিয়ে বলা সম্ভব নয়। কিছু কিছু বলতে পারি যেটুকু এখন স্মরণ হচ্ছে।

আমার ভাই গিরিজা পড়ত হিন্দু স্কুলে, সত্যেন বোস ছিলেন তার সহপাঠী, দু'জনে খুব বন্ধুত্ব। গিরিজার মুখে শুনতাম আঁকে সত্যেন বোসের আশ্চর্য কৃতিত্বের কথা। একদিন শুনলাম ক্লাসের মাস্টার উপেন বক্সি তাঁর পরীক্ষার খাতা দেখে এত খুশি হয়েছেন যে তাঁকে ফুল নম্বর ১০০-র চেয়েও বেশি ১১০ নম্বর দিয়েছেন। এমন একটি ছেলেকে দেখবার কৌতূহল হলো। গিরিজার সঙ্গে সত্যেন বোস আমাদের বাড়িতে আসা-যাওয়া করতে থাকলেন। সোজাসুজি একটি ছেলে, কিন্তু চোখে একটা প্রশান্ত দৃষ্টি। গোড়া থেকেই তিনি গিরিজার মতো আমাকে বড়দা বলতে শুরু করলেন। আমিও গেছি তাঁদের বাড়িতে, তখনকার বাড়ির একটি ছোট্ট ঘরের পশ্চিম দিকের জানলা দিয়ে উঁকি মেরে দেখেছি, প্রদীপ জেলে বসে তিনি একমনে আঁক কষছেন। আমাকে দেখেই সব খাতাপত্র বন্ধ করে দিয়ে বললেন—এসো বড়দা বসো। তাঁর কোনো এক পাগল দাদার গল্প শুরু করলেন।

হৃদ্যতা বেড়ে উঠল যৌবনকালে, তখন ওঁরা প্রেসিডেন্সিতে পড়ছেন। আমাদের বাড়িতে তখন প্রায় প্রত্যহই বিরাট আড্ডা বসে। আড্ডায় যাঁরা এসে জুটতেন তাঁরা সকলেই প্রতিভাবান, পরবর্তী জীবনে সকলেই নামজাদা হয়েছেন। তার মধ্যে ছিলেন গিরিজা (বিজ্ঞানী), যামিনী রায় (জগৎখ্যাত শিল্পী), রজনী পালিত (পোস্টমাস্টার জেনারেল), হরিপদ মাইতি (মনস্তত্ত্বের অধ্যাপক), বীরেশ্বর সেন (লক্ষ্ণৌ-এর চিত্রশিল্পী), পূর্ণ সেন (খ্যাতনামা ক্ষিতিশ সেনের ভাই), ধূর্জটি মুখোপাধ্যায় (খ্যাতনামা অধ্যাপক), যোগীশ ও হরিশ সিংহ (দু'জনেই বড়ো অধ্যাপক), প্রমথ মিত্র ও ভূপাল ভট্টাচার্য (দু'জনেই কবি), সতীশবাবু (একজন সুগায়ক), আরো কেউ কেউ যাঁদের নাম মনে আসছে না।

আর সত্যেন বোস ছিলেন আমাদের মধ্যমণি। তিনি না এলে আড্ডা জমতোই না। আমার অবশ্য ওঁদের কারো মতো কোনো গুণই ছিল না, কিন্তু আমি গানবাজনা করতে, সাহিত্যচর্চা করতে কবিতা প্রবন্ধাদি লিখতে পটু ছিলাম, তাই দিয়ে আড্ডার রসদ যোগাতাম। তাই আমি হলাম সকলেরই বড়দা। সত্যেনেরও দেখলাম গানবাজনার দিকে আর বাংলা সাহিত্যের দিকে খুব ঝোঁক। গানের সঙ্গে এসরাজ বাজাতে বসে যেতেন। আমাকে বললেন নতুন গান তৈরি করো বড়দা, আমি সুর দেবো। আমি একটা গান বাঁধলাম— "বিশ্বমাঝে কি যে সঙ্গীত বাজে, কানে যায় না শোনা, অন্তরে আনাগোনা" ইত্যাদি। তৎক্ষণাৎ সুর তৈরি হয়ে গেল।

এর পরে একটা হাতে-লেখা পত্রিকা বের করবার দিকে সত্যেনের ঝোঁক হলো। বললেন, কেন হবে না, আমরা সবাই মিলে

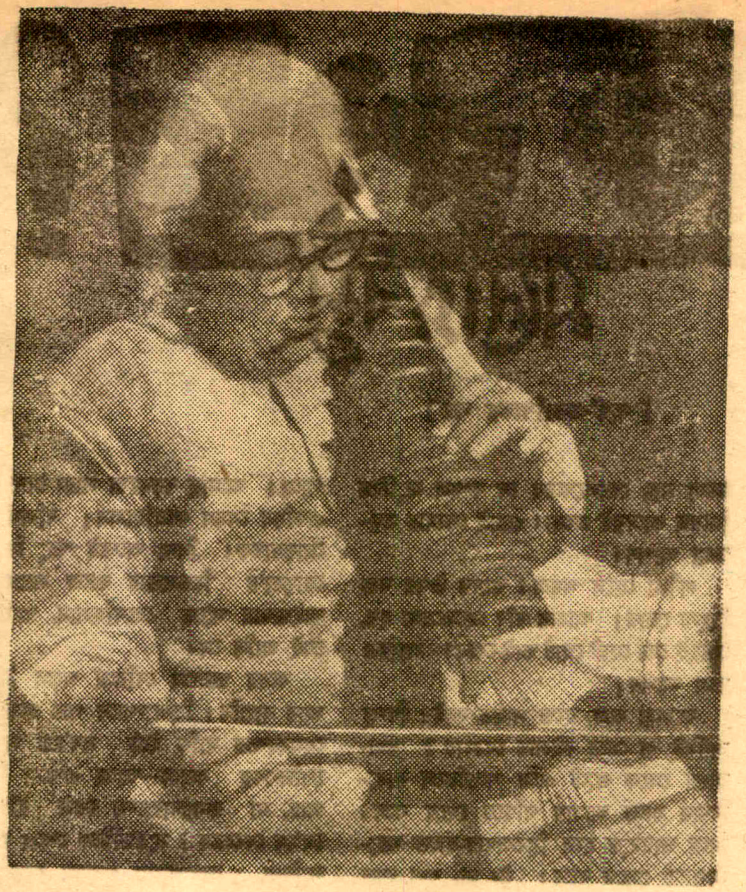

এসরাজ বাজাচ্ছেন সত্যেন বোস

লিখব। সকলেই উৎসাহিত হলো। সত্যেন সেই পত্রিকার নাম দিলেন "মনীষা"। যামিনী রায় ছবি আঁকতে থাকলেন, আমরা সবাই নিয়মিত লিখতে থাকলাম, প্রবন্ধ গল্প কবিতা। লেখাগুলো খুব ভালোই হচ্ছিল। সত্যেন একটা মস্ত গল্প ফাঁদলেন, তার নাম দিলেন "সে"। সে এমন একজন সে, যার আমি-নামক লেখক দু'-একবার দেখাও পেয়েছে, তাকে ভালোও বেসেছে, আভাসে-ইঙ্গিতে তার আশ্চর্য মনের পরিচয়ও পেয়েছে, কিন্তু তার পর থেকে কেবলই সেই সে-কে খুঁজে ফিরছে নানা স্থানে বনে-জঙ্গলে পাহাড়-পর্বতে, কিন্তু কিছুতেই তাকে খুঁজে পাচ্ছে না, আর খোঁজারও নিবৃত্তি হচ্ছে না। মনে হচ্ছে ঐ বুঝি দূরে তার ছায়া দেখা যাচ্ছে, কিন্তু তবু ধরা যাচ্ছে না। সে এক অদ্ভুত গল্প, ধারাবাহিকভাবে চলল। অল্প কিছুকাল আগে ঠিক এই রকমেরই একটি গল্প পড়লাম খ্যাতনামা সাহিত্যিক হাড্‌সনের লেখা "Green Mansions". কিন্তু সত্যেনের লেখাটা সম্পূর্ণ হয় নি, কয়েক মাস পরেই উৎসাহ কমে যাওয়ায় কাগজ বন্ধ হয়ে গেল।

অতঃপর সত্যেনের বিবাহ, আমাদেরই পাড়ার একজন বড়ো ডাক্তারের কন্যার সঙ্গে। সেই বিবাহে আমি লিখলাম এক গদ্যকবিতা। সেটি আবার সত্যেন দেখালেন শ্রীযুক্ত প্রমথ চৌধুরীকে। সেই থেকে তাঁরও দলে ভিড়লাম এবং রবীন্দ্রনাথকেও পেলাম। কিন্তু সে আবার অন্য কথা।

আরো অনেক কথা বলতে পারি সত্যেন বোস সম্পর্কে। সামান্য সামান্য নানারকম তুচ্ছই ঘটনা, কিন্তু সব-কিছুকে নিয়ে যা দাঁড়ায় তা আর তুচ্ছ নয়।

এই সেদিনের কথাই মনে পড়ছে। আমার পেটের গোলমাল চলছিল, কিছুতে সারে না। সত্যেন শুনে বললেন, তুমি হোমিওপ্যাথিক ওষুধ খাও দেখি। চলো তোমাকে নিয়ে যাই এক ভালো হোমিওপ্যাথের কাছে। নিয়ে গেলেন আমাকে সুদূর বালিগঞ্জে, একজন অবসরপ্রাপ্ত প্রিন্সিপ্যালের বাড়িতে। তিনি অঙ্কশাস্ত্রে এক মহাপণ্ডিত, অ্যামেচার হিসাবে হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা করেন। তিনি ওষুধ দিলেন।

আমার ফাউন্টেন কলমটা বিগড়ে গিয়েছিল, ভালো লেখা হচ্ছিল না। তাই জেনে সত্যেন বললেন, দাঁড়াও বড়দা, আমি রাশিয়া যাচ্ছি। সেখান থেকে তোমার জন্যে ভালো কলম নিয়ে আসব। রাশিয়াতে গিয়েছিলেন তিনি বিজ্ঞানসভার আমন্ত্রণে। ফিরে এসেই আমাকে ডেকে পাঠিয়ে কলম দিলেন। অত কাজের মধ্যেও তিনি এই সামান্য কথাটা ভোলেন নি।

আর তাঁর ছেলেমানুষির পরিচয় যে কতই আছে। বাড়িতে তিনটি কেঁদো কেঁদো বেড়াল আছে, এরা হলো তাঁর পোষ্যপুত্র। খাটে বসে, চেয়ারে বসে, কাছ ঘেঁষে শুয়ে থাকে। খাবার সময় পাতের কাছে হাজির থাকে। পাতে যা মাছ দেওয়া হয় তার তিন ভাগ তিনি ঐ বেড়ালদের দিতে থাকেন, নিজে খান মাত্র একটুখানি। প্রায় সমস্তই যায় বেড়ালের পেটে।

আর এসরাজ বাজানো তো এখনও সমানেই চলে।

শুনেছি আইনস্টাইনও নাকি এমনি ছেলেমানুষ চরিত্রের ছিলেন। তিনিও বেহালা বাজাতেন। যারা প্রকৃত মহৎজন হয় তারা ভিতরে ভিতরে অমনি শিশুর মতোই থেকে যায়। তারা জানে যে বিদ্যায় গুণে মহত্ত্বে তারা যতই উপরে উঠে থাক, মহত্ত্বের যেখানে আদি উৎস সেখানে তারা শিশুই মাত্র। তাই তারা হয় এত সরল ও সহজ।

কিন্তু তাই বলে অবোধ শিশু নয়। সত্যেন বোস হলেন এক সর্বজ্ঞানের শিশু। জগৎ-ম্যাথেমেটিক্‌সের যতরকম বৈচিত্র্য আছে তার সবরকম আঁকই তিনি কষতে জানেন। তাই বিজ্ঞানের মহাসভাতেও গিয়ে তিনি যেমন সভাপতির ভাষণ দেন, তেমনি আবার গণিতের বা পরিসংখ্যানের প্রতিষ্ঠানেও গিয়ে তাদের মতো কথাই বলেন, তেমনি আবার ধর্মসভাতে, সংস্কৃত কলেজের উৎসবে, যোগীদের আশ্রমের উৎসবে, তেমনি আবার মেডিকেল কলেজের সমাবর্তনে, কলেজের ছাত্রদের সম্মেলনে, সাহিত্যের সভাতে, বৃদ্ধদের স্মৃতিসভায়, এমন কি সাবান তৈরির কারখানাতে ও নানা ব্যবসায়ীদের আহ্বানেও গিয়ে তাদেরই মতো কথা বলেন। যারাই তাঁকে ডাকে তাদের কাছে যেতে তাঁর কিছু বাধে না। আর তাই তিনি আমাকেও যেমন ভালোবাসেন, গিরিজাকেও তেমনি ভালোবাসেন, সাধক ও গায়ক দিলীপ রায়কেও তেমনি ভালোবাসেন, অতুলবিহারী কবিরাজকেও তেমনি ভালোবাসেন, গায়ক-বাদক কবি-সাহিত্যিক সকলেই তাঁর কাছে গিয়ে আনন্দ পায়, সকলেই তাঁর কাছে কিছু খোরাক পায়। কোনো দিক দিয়ে কোনো কিছুতেই তাঁর ঠিকে ভুল হয় না। তিনি জগতের সকল রকম আঁকের বিষয়েই ফুল নম্বর ১০০-র উপরে ১১০ পাবারই উপযুক্ত, যেমন নম্বর দিয়েছিলেন তাঁর মাস্টার মশাই।

পথ কি কথা?

মনোজ বসু

[পূর্ব-প্রকাশিতের পর]

॥ বারশ ॥

যাওয়ার গোছগাছ হচ্ছে। ফুল্লরা লীলাকে বলল, তুমিও চল মা। ছোড়দা-ছোড়দা করো—সুযোগ হল যখন, এ্যাকসিডেন্টের পর একটিবার ছোটমামাকে চোখে দেখে এসো। খুশি হবেন তিনি।

সে তো বটেই। যেতে পারলে ভালই হত—

ভাবছে লীলা। ফুল্লরা হেসে উঠে বলে, ভয় পাচ্ছ নাকি মা? আর তুমিই একদিন রিভলভার নিয়ে প্রতিশোধ নিতে ছুটেছিলে। মেজারমশায় তো ব্যবস্থা করে দেবেন বললেন, নির্ঝঞ্ঝাটে গিয়ে হাজির হবো। আমি যাচ্ছি, বুড়োমানুষ হয়ে দাদুও চললেন, তোমারই কেবল আকাশ-পাতাল ভাবনা চেপে গেল।

লীলা চুপচাপ আরও একটু ভেবে ঘাড় নড়লঃ মা তো আর যাচ্ছেন না। আমি গেলে মা একেবারে একলা থাকবেন। ঠিক হবে না সেটা।

ফুল্লরা তর্ক করে। দিদার তো স্বপাকে রান্না, তুমি থেকে ওঁর কোন্ কাজটা হবে? যাওয়া তো কয়েকটা দিনের জন্য। দাদু কি তার বেশিদিন থাকতে যাবেন—দরকার হলে আমি কিছুদিন না-হয় ছোটমামার ওখানে থেকে যাবো, দাদুর সঙ্গে তুমি ফিরে এসো।

জোর দিয়ে আবার বলে, এবাড়ি-ওবাড়ির বুড়িরা বুড়োরা—আর সকলে হিন্দুস্থানে গিয়ে উঠেছে, একলাই তো তাঁরা বাড়ি আগলে আছেন। দিদার সঙ্গে ভাবসাব তাঁদের, কয়েকটা দিন তাঁরাই দেখাশুনো করবেন। আচ্ছা, জিজ্ঞাসা করে দেখি দিদাকে, তিনিই বা কি বলেন।

লীলা নিষেধ করলঃ না, জিজ্ঞাসা করতে হবে না। আমি যাবো না।

ফুল্লরা অভিমান করে বলে, জানি মা, সে আমি জানি। যাওয়া আটকাচ্ছে, দিদার জন্যে নয়, ছেলেমেয়ের যে দঙ্গল জুটিয়ে নিয়েছ তাদেরই জন্যে। ওরাই তোমার সবচেয়ে আপন।

লীলা হেসে পড়লঃ ওদের উপর বড্ড হিংসা তোর। আমার যদি ছেলেমেয়ে হয়, তোরই তো ছোট ছোট ভাই-বোন। তোরও তবে আপন।

ফুল্লরা বলে, হতে পারত তাই। কিন্তু আমিই বা মেয়ে রইলাম কোথায়? কলকাতা থেকে ছুটে এসে পড়েছিলে দাদু-দিদার ঘাড়ে আমায় গছিয়ে দেবে বলে। দিয়ে ভারমুক্ত হয়ে রিভলবার-হাতে শত্রু-নিপাতে লেগে যাবে। উঃ মা, বড্ড ভাল হত তোমায় যদি সঙ্গে নিতে পারতাম। বড্ড আশায় আশায় বোনের হাতে ছোটমামা রিভলভার গুঁজে দিয়েছিলেন, গরম গরম কথা শুনিয়ে এসেছিলে তাঁর কাছে। তোমায় পেলে ঠিক তিনি শুধাবেনঃ কী করে এলে বছর আঠারো ধরে, শত্রু কতগুলো নিপাত করে এলে আমার রিভলভারে? সেই সময়ে তোমার জবাবটা কি শুনতে বড় লোভ হয় মা।

একটুও লজ্জিত নয় লীলা। হাসিমুখে বলল, জবাব শুনে নে আমার কাছ থেকে, গিয়ে তোর ছোটমামাকে বলিস। বলবি, শত্রু একেবারে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে, এমনটা হবে স্বপ্নেও ভাবতে পারি নি। পূর্ব-বাংলার মানুষের মধ্যে একটি শত্রুও কোনদিকে কেউ নেই। যারা উল্টো-কথা বলে, স্বার্থদুষ্ট মিথ্যাবাদী তারা। ক্ষমতা নিয়ে চুড়োয় বসে রয়েছে। ধনদৌলত অস্ত্রশস্ত্র খবরের-কাগজ রেডিও সবই তাদের দখলে। গলা তাই ভুবন জুড়ে গমগম করে। আমার হয়ে বলিস ছোড়দাকে, ভাঁওতাবাজি কানে না নেন যেন। পঙ্গু মানুষটা শান্তি পাবেন তাহলে জীবনে।

একটু থেমে আবার বলে, এরা হিন্দু জানে না মুসলমান জানে না, জানে শুধু বাংলা দেশ আর বাঙালি মানুষ। বাংলাকে ভালবেসে প্রাণ হাতের মুঠোয় নিয়ে বেড়ায়, দরকারের সময় হাসিমুখে ছুঁড়ে দিতে পারে। আমার বড়দা'রা সারা দেশ জুড়ে একদিন যেমন করেছিলেন। বলিস এসব ছোড়দাকে। বিনা অস্ত্রেই শত্রু নিশ্চিহ্ন, ছোড়দা'র রিভলভার কাজে লাগে নি। ছাইগাদায় পুঁতে রেখেছিলাম, আছে কি নেই জানি নে।

বরের তল্লাসে বেরিয়ে পড়ল ঠাকুরদা আর নাতনি। হিন্দুস্থানে পার হয়ে গিয়ে হেমকান্তর বাড়ি উঠে সর্বাগ্রে সুব্রত'র খোঁজখবর করবে—আছে এখনো বিয়ের পাত্র, না কন্যাদায়গ্রস্ত কেউ ইতিমধ্যে গেঁথে ফেলেছে? সুব্রতটিকে পেলে অনেক সুবিধা, দেখাশুনো দরদাম হয়ে কাজ এগুনো আছে, শুভকর্ম চট করে সমাধা হয়ে যাবে। সুব্রত না হলে নতুন সম্বন্ধ খুঁজতে হবে। কুলশীল গাঁইগোত্র মেলানো হিন্দুস্থানের উপর কঠিন হবে না—কমলবাসিনীর ধনুর্ভঙ্গ পণ যে বস্তু নিয়ে। বিয়ে-থাওয়া অন্তে, যেমন করে হোক, নাতনি-নাতজামাইকে জোড়ে একবার তাঁর চোখের সামনে নিয়ে দেখিয়ে দেওয়া। পুত্রশোক আজও শেল হয়ে বিঁধে আছে, ব্যথা এক-এক সময় টনটনিয়ে ওঠে, পাগলের লক্ষণ প্রকাশ পায় সেই সময়। বংশের একমাত্র দুলালীর সুখের সংসার হলে কমলবাসিনীর মস্ত সান্ত্বনা—কঠিন পুত্রশোকের উপর অমৃত-প্রলেপ পড়বে।

এমনি সব কথাবার্তা হয়ে ব্লাকের পথে নাতনি সহ বীরেশ্বর বেরিয়ে পড়েছেন। সদা-পাওয়া মিতার কাছে ফুল্লরার কিন্তু উল্টো কথাঃ ডাইনে-বাঁয়ে দাদু বলে বেড়াচ্ছেন, বর ধরতে ছুটেছি আমি। ভেবে আছেন ওঁরা তাই বটে—মেয়ে নই, কলের পুতুল বলে ভাবেন ওঁরা। কল টিপলে উঠব বসব, হাঁ করব, হাত নাড়ব পা নাড়ব, 'আমায় কে নিবি গো আয়'—বলে নিজেকে ফেরি করে বেড়াব হিন্দুস্থানের পথে পথে। ক্ষেপেছ ভাই, আমি ওর মধ্যে নেই—

তবে যাচ্ছ কি জন্যে?

ফুল্লরা বলে, মতলব আছে। দুই মামা

আমার—খুঁজলেই হিন্দুস্থানে। এই বয়স অবধি গল্পই শুনেছি তাঁদের। সেসব গল্প শুনে গায়ে কাঁটা দেয়। এইবারে মানুষ দেখব।

সঙ্গে সঙ্গে সংশোধন করে নিয়ে আবার বলে, দেখব ছোটমামাকে। বড়মামাকে কোথায় পাবো, তিনি ফাঁসিতে গেছেন ইংরেজ-আমলে। পারি তো সেই ফাঁসির জায়গা দেখব, আর গড় হয়ে প্রণাম করে আসব।

চপল মেয়ে তারাফুলি কেমন এক দৃষ্টি মেলে ফুল্লরার দিকে তাকিয়ে পড়ে।

ফুল্লরা বলতে লাগল, আরও একটা কাজ আমার—কিছু খবর শুনিয়ে আসা। আসল খবর, মানুষের খবর পায় না তো বড় কেউ—যে বস্তু মেলে সে হল মসনদ যাঁরা জুড়ে বসে আছেন তাঁদেরই নানান রকম খবর। সে খবরে সরকারি গরজ মতন আ ক যিনি বুকের নিধি কাল সকালেই তিনি পথের আবর্জনা। অপবাদের কালিমা চাপিয়ে সত্য সম্পর্কে চক্ষুরীরা ঢাকতে পারে নি। কথাটা বুঝিয়ে বলে ছোটমামাকে সান্ত্বনা দিয়ে আসব—কিন্তু পাশপোর্ট-ভিসা করে কে আমায় সেখানে পৌঁছে দিচ্ছে? লড়াইয়ের ছুতোয় শেষটা তো ও-জিনিস বিলকুল বন্ধ। কিন্তু তারই মধ্যে কয়াল খুলল—পাশপোর্ট জুটে গেল ঠাঁই।

তারাফুলি অবাক হয়ে বলে, পাশপোর্ট করেছ তবে বর্ডারের উপরে কেন এই রাত্রিবেলা?

সোমত্ত মেয়ের ব্লাকের পথেও পাশপোর্ট লাগে। অরক্ষণীয়ার পাত্র জোটানোর জন্য জরুরি গরজে ছাড়পত্র মিলেছে। নইলে সেকেলে গিন্নিমানুষ দিদা গাঁয়ের বাইরে আমায় পা ফেলতে দিতেন? অথচ সেই তিনিই যাত্রামুখে আঁচলে বিল্বপত্র বেঁধে দিয়েছেন। আর দাদু নিজে সঙ্গে থেকে ব্লাকের পথে বর্ডার-অফিসে এনে তুলেছেন।

তারাফুলির দিকে প্রশংসার চোখে চেয়ে বলল, তোমার কিন্তু বেশ। সঙ্গী-সাথী লাগে না, রাত-বিরেত নেই—

তারাফুলি দেমাক করে বলে, মন কেমন করে উঠল, তক্ষুণি যদি ছুটে না গেলাম তেমন যাওয়ার সুখটা কি?

তোমার বাড়িতে কিছু বলে না?

তারাফুলি হেসে বলল, বলে না আবার! শুধু কি মুখের বলা, মা ধরে ধরে ঠেঙানি দিত যখন ছোট ছিলাম। চুলের মুঠো ধরে চক্কোর দিয়েছে কত। তা চুলের মুঠো দিনরাত চব্বিশ ঘণ্টা ধরে বসে থাকতে পারে না—ছাড়া পেলে সঙ্গে সঙ্গে পিঠটান। এখন আর কিছু বলে না, দেখেশুনে হাল ছেড়ে দিয়েছে।

বলতে বলতে থেমে গেল। ফুল্লরার শুকনো মুখের দিকে চেয়ে মাথার মতলব ঢুকেছে। বলে, পারাপার তো অনেক রাতে। ততক্ষণ বসে বসে কী করা যায়? খিচুড়ি রাঁধিগে যাই চলো, তোমার ক্ষিধে পেয়েছে।

ক্ষিধের দোষ নেই। সেই কোন্ সকালে বেরিয়ে পড়ে সারাটা দিন চিঁড়ের উপর আছে। তা বলে ক্ষিধে স্বীকার করতে চায় কোন মেয়ে? ঘাড় নেড়ে ফুল্লরা বেকবুল গেলঃ নাঃ—

না-ই পাক ক্ষিধে, তবু খেতে হবে। ভাইয়ের বাড়ি আমার—তা জানো। হরবখত আসি যাই—আনোয়ার কাজি ভাই হয়ে গেছেন। আনোয়ারের বউ ভাবী। ভাবী নেই এখানে—অতিথ-কুটুম এলো, আমি যখন হাজির আছি, সম্পূর্ণ দায় আমার উপর বর্তেছে। তুমি এসেছ, তা ছাড়া আমার মামা-মামির আসবার কথা। তাঁরা এ তল্লাটে একেবারে নতুন। অনেক পথ ভেঙে আসছে আমারই উপর ভরসা করে। তাদেরও চাট্টি খাইয়ে দেবো।

বেশি তর্কাতর্কিতে না গিয়ে ফুলি হাত ধরে হিড়-হিড় করে ফুল্লরাকে ভিতরে নিয়ে গেল। ভিতর-বাড়িতে আনোয়ারের বউ-ছেলে থাকত, এখন বর্ডার এলাকার বাইরে কাজিবাড়ির পুরনো দালানে আপাতত গিয়ে উঠেছে। এ জায়গায় থাকতে আইনত যে বাধা আছে তা নয়। কিন্তু ঐ যে বলে 'খেদাই নে তোর উঠোন চষি', হুবহু সেই জিনিস। এলাকার মধ্যে গোলায় একচিটে ধান থাকতে পাবে না, মাঠে গরু-বাছুর ছাড়লে বিপদ, হাটবাজার দোকানপাট সমস্ত বন্ধ, পড়শিরা সব বাস ওঠাচ্ছে—হেন জায়গায় ঘরবসত করা অতিশয় দুষ্কর। মাথা গুঁজবার জায়গা রয়েছে—কষ্ট করে বউ বর্ডারে কেন পড়ে থাকতে যাবে?

রান্নাঘরে গিয়ে তারাফুলি উনুন ধরাতে লেগে গেল। ফুল্লরাকে বলে, রাঁধাবাড়া আমিই সব করব। মিতা তুমি, দাদার বাড়ি একদিনের তরে এসেছ। উনুনে জ্বালটা ঠেলে দিলে কি বাটিটা ঘটিটা এগিয়ে দিলে, এর বেশি তোমায় কিছু করতে দেবো না। গিয়ে তারপর নিন্দেমন্দ করবে—দেখেছ, খাটিয়ে নিল কেমন করে!

ফুল্লরা ঘাড় নেড়ে বলে, তা বই কি! যশ একলা নেবার মতলব। সেটা হতে দিচ্ছি নে। একজনে বাটনা করবে, একজনে জ্বাল ঠেলবে। হাঁড়িতে চাল চাপাবে একজনে আর একজনে ডাল। বলি, উনুন ধরাচ্ছ—জিনিসপত্তোরের জোগাড় হবে তো বটে?

সগর্বে তারাফুলি বলে, বর্ডার-জায়গায় আবার জিনিষের অভাব! তাবৎ পাকিস্তান-হিন্দুস্থানে যা পেলে না. খোঁজ করো, এখানেই তা মিলে যাবে। লেডিজ ওয়াচ চাই—এই আমার মতন? ফরাসি সেন্ট, জার্মান ক্যামেরা? কোন জিনিষটা চাই তোমার বলো না।

ফুল্লরা হেসে বলে, চাই চাল-ডাল ঘি-মশলা—খিচুড়িতে যা লাগবে।

সে সমস্ত ঘরেই পাওয়া গেল। চলে যাবার সময় গুছিয়ে রেখে গেছে—বউয়ের বিহনে আনোয়ারের যাতে কষ্ট না হয়। নিত্যিদিন আনোয়ার হাত পুড়িয়ে রেঁধে খায়, পরের রান্না খাবে আজ অনেক দিনের পরে।

সমস্ত ধানতো দান করতে বলে দিল রাজীব ত্রিপাঠি। গোপন মজুতের দোষ কেটে গিয়ে দাতাকর্ণ বলে কাগজে নাম

বড়দিনের কমিশন !!

২০শে ডিসেম্বর

থেকে

৭ই জানুয়ারী

পর্যন্ত

বসুমতী থেকে

প্রকাশিত যাবতীয়

গ্রন্থ ও গ্রন্থাবলী

ঘরে ঘরে রাখবার

মত, যত দুর্মূল্য সম্ভার

সমগ্র পরিবারের

পড়বার

বই বই বই আর বই।

পুস্তক বিক্রেতাদের

জন্য শতকরা পঁচিশ টাকা

এবং

সাধারণ ক্রেতাদের জন্য

কমিশন শতকরা কুড়ি টাকা

যাকে বলে

সুবর্ণ সুযোগ !!

আপনি স্বয়ং আসুন

কিম্বা লিখিত অর্ডার

পেশ করুন অর্ধেক টাকা

অগ্রিম পাঠিয়ে—

বসুমতী (প্রা) লিঃ

১৬৬, বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী স্ট্রীট

কলিকাতা-১২

বেরুবে নাকি—তদ্বির করলে হবিও বেরুতে পারে। হরিহর কানে নেন না। পত্যের বেলাই দরাজ উপদেশ। নিজে তো জন্ম-গরু, বাটি-ঘটি মায় কাঁথাখানা কম্বল-খানা অবধি পাকিস্তানে পাচার করে দিয়েছ। দিব্যি ন্যাংটেশ্বর শিব হয়ে বসেছ—মুখে লম্বা লম্বা জবান।

ঘরেও এই ব্যাপার। স্ত্রী শান্তিলতা যাতে শয্যাশায়ী—হাটু ফুলে সুডৌল ফুটবলের মতো। কিন্তু বাতব্যাধি মুখে ধরে না যে।—পা দুটো গিয়ে মুখ দুনো তেদুনো বড় হয়েছে। হরিহরকে সামনে পেলেই ঝঙ্কার ছাড়ে ঃ সকলের হিংসা আমাদের উপর। খুটকো ছোঁড়ারা নিত্যদিন শাসিয়ে যাচ্ছে। কবে কি কাণ্ড ঘটে যায়—তেমন-তেমন হলে তোমরা বেপাত্তা হবে, আমি যে উঠে দাঁড়াতেও পারব না। ধান এখন বিষ হয়ে দাঁড়িয়েছে। বিষ বাড়িঘরে রেখো না, শিগগির সরাও।

বিরক্ত হরিহর বলেন, আগে তো তোমায় সরাই। আর কি করি না করি, ভেবে দেখব।

হর্ষনাথ উকিলের সেরেস্তায় ছুটলেন হরিহর। দাঙ্গাহাঙ্গামার সম্ভাবনা—এস-ডি-ওকে বুঝিয়ে বাড়ির দরজায় পুলিশের বন্দোবস্ত করা যায় কিনা। এমন যে প্রাণাধিক বন্ধু হর্ষ-উকিল—ভাবভঙ্গি তাঁরও বদলেছে। হরিহরকে দেখতে পেয়ে তাড়াতাড়ি ঢাউশ আইনের বই খুলে নিলেন তিনি। নাকি কোন শাঁসানো মক্কেলের ঘোরতর মামলা। —এখন নয়, এখন নয়, পরে এক সময় শোনা যাবে। ঘাড় হেঁট করে বইয়ে নিবিষ্ট হয়ে গেলেন।

সেখান থেকে সরাসরি শ্রীমন্ত-ডাক্তারের ডিস্পেনসারিতে। ভণিতা নয়, মুখ শুকনো করে গোড়াতেই স্ত্রীর কথা তুললেন ঃ পা সাংঘাতিক ফুলেছে, নড়ানো সরানো যায় না। পক্ষাঘাতে না দাঁড়ায়। আহার-নিদ্রা গিয়ে, দিনরাত চিললাচ্ছে। অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছি। চলুন একবার।

ডাক্তার হয়ে বিপদ হয়েছে, পুরনো রোগী ঝেড়ে ফেলা যায় না। লক্ষণ শুনে নিয়ে শ্রীমন্ত তবু ওখান থেকেই ব্যবস্থা দিচ্ছিলেন, হরিহর নাছোড়বান্দা হয়ে বাড়ি নিয়ে চললেন। শান্তিলতাকে শেখানো ছিল ঃ রোয়াকে উঠেই গলা-খাঁকারি দেবো, মোক্ষম চেঁচানি জুড়ে দিও তুমি অমনি।

শ্রীমন্তের গা টিপে হরিহর বলেন, শুনতে পাচ্ছেন?

শ্রীমন্ত বললেন, ডাক্তার মানুষ—হর-বখত এ রকম শুনে থাকি। টানাটানি করে কেন আমায় নিয়ে এলেন বুঝিনে। ব্যস্ত হবার কি আছে? যা-প্য ব্যাধি—দু-দশ দিনে মুছে নেবার জিনিষ নয়।

বেজার মুখে বলতে লাগলেন, এমন করে আমায় ডাকাডাকি করবেন না খাঁ-বাবু। ধান গাপ করে রেখেছেন, আপনাকে লোকে বদনাম দেয়। আমার আসা-যাওয়ায় সন্দেহ করবে, চিকিচ্ছে-টিকিচ্ছে মিছে কথা—শলাপরামর্শ হচ্ছে দুজনার মধ্যে। হাজার টাকা লাখ টাকা আপনার হাতের ময়লা—আপনি সামলে নিতে পারবেন, আমিই মার পড়ব একেবারে।

সাফ মাথা শ্রীমন্ত-ডাক্তারের—হরিহরের পরামর্শদাতা শুভানুধ্যায়ী সুহৃৎ। বাড়ি তৈরির সময় পাতালের ভল্ট তাঁরই বুদ্ধিতে বানানো। সেই ভল্ট এবার কী কৌশলে খালি করা যায়—কিন্তু গতিক দেখে কথা তোলারই সাহস হল না। পা রেখে দাঁড়ানোর মাটি পাওয়া যাচ্ছে না আজ যেন, নিশ্বাসের বাতাসও অপ্রতুল। আপন-হাত জগন্নাথ—যা করতে হবে সম্পূর্ণ নিজেকেই।

হরিহর বললেন, ভাল করে দেখেশুনে প্রেস্কৃপশন করে দিন। সেইজন্য কল দিয়েছি। ওষুধ-মালিশ সব কিনে দিচ্ছি—ভাইয়ের বাড়ি চলে যাক। বড় গৃহস্থ তারা, বিস্তর লোকজন। সেবাযত্নেও ভাল ব্যবস্থা হবে। ছেলেপুলে নিয়ে থেকে আসুক দিনকতক।

ডাক্তারকে বিদায় করে দিয়ে হরিহর শান্তিলতাকে বললেন, ঝড়ের মুখ থেকে সরে পড়ো এণ্ডিগেণ্ডি নিয়ে। তোমরা ভাল থাকগে—আমি একলা রইলাম আমার ধান আর আমার কপাল নিয়ে। লাভে কাজ নেই, অর্ধেক দাম পেলেও ছেড়ে দেবো। একবার ঝাড়া-হাত-পা হতে পারলে চোতা শহরের মুখে ঝাড়ু মেরে আমিও শ্বশুরবাড়ির দেশে আবাদ অঞ্চলে ঘরবাড়ি বানাবো। ইনক্লাব পথ খুঁজে পাবে না সেই অতদূর। [ক্রমশঃ]

চাঁদে যাওয়া আর—

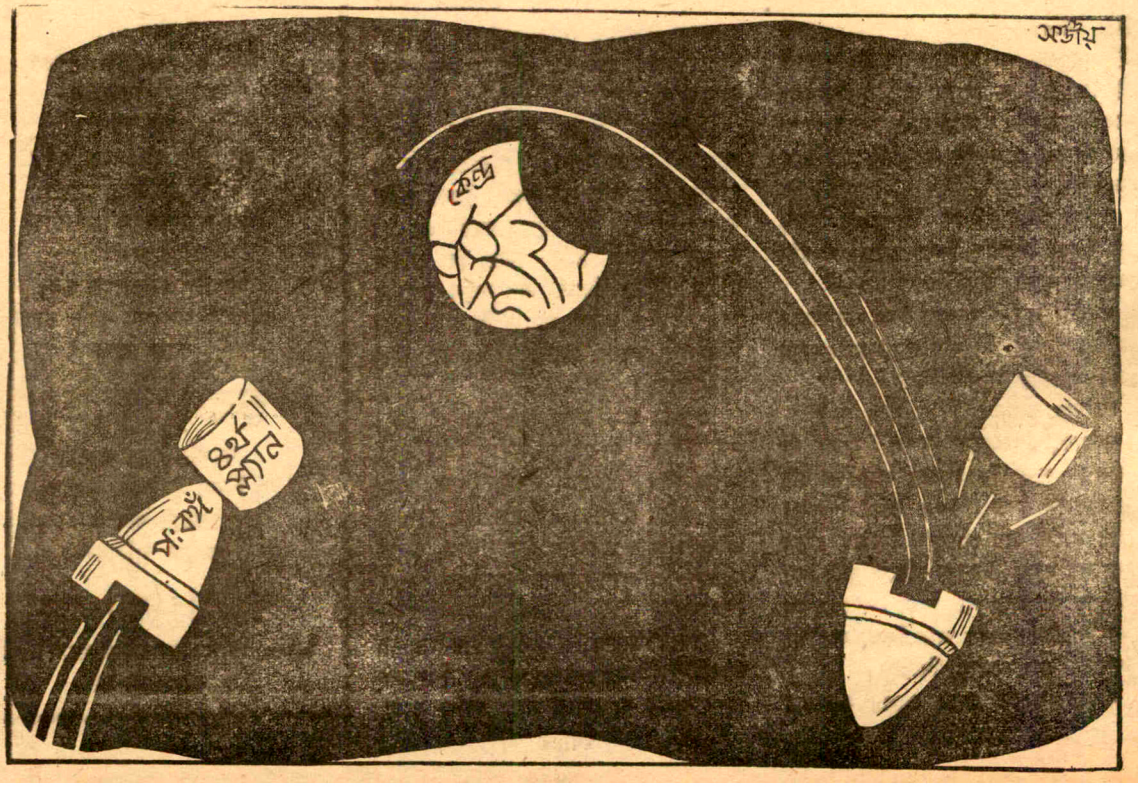

চাঁদের কাছাকাছি

ডঃ বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য

গল্প কি কখনও সত্য হয়? যুগে যুগে প্রশ্ন করেছে মানুষ।

—হ্যাঁ, হয়। মানুষই জবাব দিয়েছে।

—ফ্যান্‌টাসী?

—হ্যাঁ, তা'ও সত্যি হয়।

মানুষ এই সেদিন জবাব দিয়েছে,—হ্যাঁ, তা'ও হয়, সত্যি। সত্যি যদি না-ই হবে তো জুলে ভার্ন-এর গল্পটা বাস্তবের সঙ্গে অমন মিলে যাবে কেন? কেন ১৮৬৫-তে লেখা তাঁর সায়ান্স্-ফ্যান্‌টাসী 'ফ্রম দি আর্থ টু দি মুন অ্যান্ড এ ট্রিপ্ রাউন্ড ইট' ১৯৬৮-তে অমন সত্যি হয়ে উঠবে? আর কেনই বা চাঁদের একেবারে কাছাকাছি থেকে আদ্যিকালের সেই প্রতিবেশী-উপগ্রহকে প্রদক্ষিণ করবে মানুষ?

একবার নয়, চাঁদকে দশবার প্রদক্ষিণ করল সে এবং মাত্র ৬০—৭০ মাইল দূরে থেকে প্রতিবেশীর চারদিকে ঘুরপাক খেতে খেতে মানববুদ্ধির নবজন্মের খবরটা সে যীশুখ্রীস্টের জন্মদিনে প্রচার করল।

কিন্তু হায় জন্মদিন! আর হায় যীশুখ্রীস্ট!—বলছেন কেউ কেউ। পৃথিবীর লক্ষ লক্ষ মানুষ যখন রুগ্ন ও বুভুক্ষু তখন চাঁদে-পাড়ির জন্যে এই রাজসূয় আয়োজনটা কতখানি খ্রীস্ট-আদর্শ-অনুমোদিত, তা' নিয়ে কেউ কেউ প্রশ্ন তুলছেন। কেউ কেউ আবার বলছেন, ওসব বাগ্‌বিতণ্ডা থাক এখন। এখন বরং চাঁদের দেশের নতুন খবর নেয়া যাক।

আমরা বলি, বেশ! যাক নেয়া। খ্রীস্টের জন্মদিনকে ঘিরে চাঁদ-উৎসব এবার আমরা কিভাবে পালন করেছি, তা' একটু তলিয়ে দেখা যাক।

তলিয়ে দেখতে গিয়ে আসুন, রাজসূয়ের সেই যজ্ঞভূমিতে যাই আমরা। আমরা যাই সেই কেপ কেনেডীতে যেখানে পৃথিবীর সবচেয়ে ধনী দেশ সবচেয়ে সেরা তিনজন মহাকাশচারীকে দিয়ে চাঁদকে সেলাম দেয়াবে বলে পৃথিবীর সবচেয়ে ব্যয়বহুল পরিকল্পনার একটি পুণ্যফল এ্যাপোলো-৮কে হাজির করেছে।

হ্যাঁ, এ্যাপোলো-৮ হাজির। হাজির সেটার্ন সি-ফাইভ্ রকেট। ১৯৬৮-র ২১শে ডিসেম্বর ফ্লোরিডার কেপ কেনেডী লোকে লোকারণ্য।

হাজার হাজার লোক অধীর আগ্রহ নিয়ে অপেক্ষা করছে ওখানে। ওখানে সবাই একটিই প্রশ্ন করছে, ওঁরা কি তৈরি?

—হ্যাঁ, তৈরি ওঁরা; কন্ট্রোল রুম থেকে এক সময় ঘোষণা করা হয়। বলা হয়,—হ্যাঁ ওঁরা তিনজন নভশ্চর এয়ার-ফোর্স-কর্নেল বোরম্যান, নেভি-ক্যাপ্টেন জেমস্ লোভেল এবং এয়ার-ফোর্স-মেজর উইলিয়াম এ্যান্ডার্স চাঁদে পাড়ি দেবার জন্যে এখন তৈরি।

—স্টার্ট! কন্ট্রোল রুম থেকে নির্দেশ ভেসে আসে ঠিক সকাল পৌনে আটটায়। আর সঙ্গে সঙ্গেই রাক্ষুসে একটা হাউই-এর মতো আকাশের দিকে হাত বাড়ায় এ্যাপোলো-৮। তিনটি রকেট (অথবা বলা যায়, একটি রকেটেরই তিনটি অংশ) মাত্র আড়াই মিনিটের মধ্যে তাকে পৃথিবী থেকে ৩৮ মাইল উঁচুতে ঠেলে দেয়।

প্রথম রকেটের পাঁচটি ইঞ্জিনের কাজ শেষ হয় এবার। ইঞ্জিনগুলো এবার আপনার থেকেই খুলে পড়ে যায়। আর মহাকাশযানটি ছুটতে থাকে ঘণ্টায় ৬,০০০ মাইল বেগে।

এবার দ্বিতীয় রকেটের পালায়। পাঁচটি ইঞ্জিনকে ছ মিনিটের মধ্যে জ্বালিয়ে দিয়ে সে-ও দেখতে দেখতে নিঃশেষিত হয়ে যায়। আর মহাকাশযানটি উঠে আসে পৃথিবী থেকে ১১৮ মাইল ওপরে। এতক্ষণে তার গতিবেগ দাঁড়িয়েছে ঘণ্টায় ১৪ হাজার মাইলেরও বেশি।

তৃতীয় রকেট কাজ সুরু করে এবার। অ্যাপোলো-৮ অস্থায়ী একটি কক্ষপথে এবার পৃথিবীকে প্রদক্ষিণ করতে সুরু করে। এই হল 'পার্কিং প্লাটফর্ম' এ-ধরে প্রায় দুবার পৃথিবী-প্রদক্ষিণের পর অ্যাপোলো-৮ চাঁদের দিকে এগোয়। ঘণ্টায় প্রায় ২৫ হাজার মাইল বেগে অসীম-অনন্ত মহাকাশের বুকে ছুটে চলে সে। সেটার্ন-রকেটের তৃতীয় পর্যায়ের ইঞ্জিন তাকে চলার রসদ যোগায়।

এতক্ষণে আড়াই ঘণ্টা কেটে গেছে। পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণকে কাটিয়ে এতক্ষণে সত্যিকারের চাঁদমুখী হয়েছে অ্যাপোলো-৮।

অ্যাপোলো-৮ ঠিক পথ ধরেই চলে; এবং সে পথটা পূর্ব-পরিকল্পিত পথের সঙ্গে এমন হুবহু মিলে যায় যে, জোর করে তার দিক্-পরিবর্তনের প্রশ্ন আদৌ আর ওঠে না।

নভশ্চররা নিশ্চিন্ত এখন। নিশ্চিন্ত-মনে ওঁরা এখন পৃথিবী থেকে ৬২,৫০০ মাইল দূর দিয়ে যেতে যেতে রকেটের প্রধান মোটরটিকে সক্রিয় করে তোলেন।

২২শে ডিসেম্বর ভারতীয় সময় ভোর পাঁচটা নাগাদ পৃথিবী থেকে ওঁদের দূরত্ব দাঁড়ায় এক লক্ষ মাইল। চাঁদ-প্রদক্ষিণ সুরু করতে হলে আরও এক লক্ষ ২৩ হাজার ৩৩৭ মাইল যেতে হবে ওঁদের।

কিন্তু যেতে ওঁরা পারবেন কি? চাঁদেরা অর্ধেক পথ যেতে না যেতেই অসুস্থ হয়ে পড়েন দুজন নভশ্চর। বোরম্যান জানান, পেটের গোলমাল দেখা দিয়েছে তার; গা বমি-বমি করছে। আর এ্যান্ডার্স জানান, জ্বর আসছে তার, সারা শরীরে কেমন যেন কাঁপুনি ধরছে।

খবর শুনে পৃথিবীর কন্ট্রোল রুম থেকে দাওয়াই বাৎলানো হয় অচিরেই; এবং ভাগ্য ভালো, সে দাওয়াই খেয়ে অচিরেই নভশ্চররা সেরে ওঠেন।

এদিকে দেখতে দেখতে নতুন খবর আসে পৃথিবীতে। লোভেল জানান, চাঁদকে ভারি সুন্দর দেখাচ্ছে; ঠিক যেন ফিকে নীল রঙের মনে হচ্ছে তাকে।

কিন্তু ওই নীল রহস্যপুরীর খুব কাছাকাছি যেতে পারবেন তো ওঁরা? গিয়ে, ওকে প্রদক্ষিণ করে পৃথিবীতে ফিরে আসা অবধি মোট ৪ লক্ষ ৮০ হাজার মাইল পথ নির্বিঘ্নে ওঁরা পাড়ি দিতে পারবেন তো?—

পৃথিবীর অনেক মানুষেরই তখন মাথায় হাত। তখনও অনেককেই কানাঘুষো করতে শোনা যাচ্ছে,—যন্ত্র যদি বিশ্বাস-ঘাতকতা করে? যদি চাঁদের দেশে গিয়ে হুমড়ি খেয়ে পড়েন ওঁরা? অথবা যদি ওঁরা অনন্ত মহাশূন্যে চিরকালের মতো হারিয়ে যান?

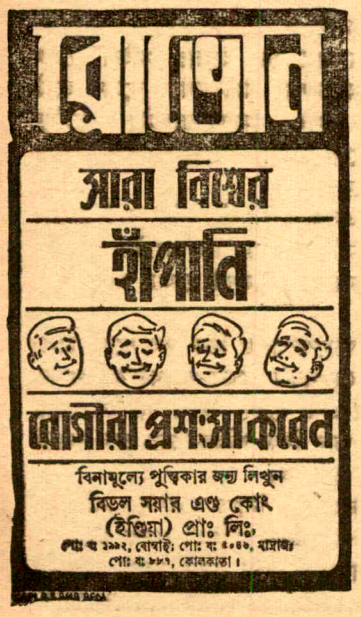

—না, হারিয়ে ওঁরা যাবেন না। বিজ্ঞানবিদ্যায় বিশ্বাসীরা টেলিভিসানের সামনে দাঁড়িয়ে সান্ত্বনা দেন, ওই যে! দেখুন না, গতি কমে আসছে ওঁদের। ঘণ্টায় ২৫ হাজার মাইল বেগে ওঁরা ছুটে-ছিলেন পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণ থেকে ছাড়া পাবেন বলে। কিন্তু এখন ওঁরা ছুটছেন ঘণ্টায় মাত্র তিন হাজার মাইল বেগে। চাঁদের মাধ্যাকর্ষণের আওতায় আসবার আগে ওঁরা অবিশ্যি আরও কিছুটা জোরে ছুটবেন। তখন ঘণ্টায় পাঁচ হাজার মাইল গতিবেগ হবে ওঁদের।

—তা' হবে। হয়তো ঠিক সফল হবেন ওঁরা, ২৩শে ডিসেম্বর অনেকেরই বলতে শোনা যায়।

ওদিকে ওই বিশেষ দিনটিতেই মহা-কাশযান থেকে নতুন খবর আসে। মহা-কাশচারীরা জানান, চাঁদের মাধ্যাকর্ষণ-বৃত্তের দিকে এগিয়ে চলেছেন ওঁরা। ওঁরা সুস্থ শরীরে প্রতিবেশী-উপগ্রহের দিকে এগোচ্ছেন।

—পৃথিবী থেকে আমাদের দূরত্ব এখন ১ লক্ষ ৮০ হাজার মাইল; আর চাঁদ থেকে ৫০ হাজার মাইল,—বলেন ফ্রাঙ্ক বোরম্যান।

তিনি আরও বলেন, আগামীকালের দিকে সাগ্রহে তাকিয়ে আছি আমরা। আমরা তাকিয়ে আছি সেই শুভ মুহূর্ত-টির দিকে যখন চাঁদ থেকে আমাদের দূরত্ব দাঁড়াবে মাত্র ৬০ মাইল।

শুভ মুহূর্তে জুলে ভার্ণ-এর গল্পের মতো এগিয়ে আসে যেন। ২৪শে ডিসে-ম্বর ভারতীয় সময় রাত ১টা ৫৯ মিনিটে বোরম্যান, লোভেল ও এ্যান্ডার্স চাঁদের মাধ্যাকর্ষণ-বৃত্তের মধ্যে পৌঁছুলেন।

মানব-সভ্যতার ইতিহাসে নতুন একটি দিগন্ত উন্মোচিত হয় এবার। কারণ, এবার থেকে মানুষ বলতে পারবে, পৃথিবী ছাড়াও সৌরজগতের অন্য একটি শরিকের আকর্ষণ বা টান আমরা অনুভব করে-ছিলাম।

এদিকে চাঁদের টানে অ্যাপোলো—৮-এর গতিবেগ বাড়তে থাকে। নভশ্চররা অপেক্ষা-কৃত দ্রুত এগোতে থাকেন এবার।

রকেট-ইঞ্জিনকে হঠাৎ প্রজ্বলিত করে এবার সুরু হয় ওঁদের চাঁদ-প্রদক্ষিণ।

কিন্তু প্রদক্ষিণ সুরুর মুহূর্তে পৃথিবীর কিছু বন্ধুর চুল খাড়া হয়ে উঠেছিল। যতক্ষণ অবধি চাঁদের আড়াল-করা দিকটিতে ছিলেন ওঁরা, ততক্ষণ পৃথিবীর কন্ট্রোল রুমের সঙ্গে ওঁদের কোনো যোগাযোগ ছিল না।

যোগাযোগ নতুন করে স্থাপিত হয় ২৪শে ডিসেম্বর, ভারতীয় সময় ৩টে ৫৫ মিনিটে। ওই বিশেষ সময়টিতেই পৃথিবীর কিছু চাঁদ-বিশেষজ্ঞকে নিশ্চিন্ত হয়ে বলতে শোনা যায়, আমরা পেয়েছি! চাঁদ-প্রদক্ষিণরত অ্যাপোলো-৮কে খুঁজে পেয়েছি আমরা!

—খুঁজে আমরাও পেয়েছি। আমরা খুঁজে পেয়েছি পৃথিবীকে, অ্যাপোলো-৮ থেকে জবাব আসে।

বোরম্যান জানান, চাঁদের আড়াল-করা দিকটিতে থাকবার সময় প্রধান রকেটটিকে পূর্ব-পরিকল্পনা-মাফিকই কাজে লাগি-য়েছি আমরা। এমনভাবে ওকে প্রজ্বলিত করেছি যাতে অ্যাপোলো-৮-এর গতিবেগ কমে আসে এবং চাঁদ সুযোগ পায় তার মাধ্যাকর্ষণের আওতার মধ্যে অ্যাপোলোকে টেনে নিয়ে ওকে একটি নির্দিষ্ট কক্ষপথে পৌঁছে দিতে।

শেষ অবধি সে পৌঁছে দেয় ঠিক। চাঁদ তার সম্পর্কে মানুষের প্রত্যাশা অক্ষরে অক্ষরে পূরণ করে। অ্যাপোলো-৮ যখন চাঁদের আড়াল-করা দিকটি থেকে বেরিয়ে আসে তখন দেখা যায়, নভশ্চররা প্রত্যা-শিত উপবৃত্তাকার একটি পথ ধরেই প্রতি-বেশী-উপগ্রহকে প্রদক্ষিণ করছেন। আড়াল-করা দিকটিতে থাকবার সময় অ্যাপোলো-৮-এর গতিবেগ ছিল ঘণ্টায় ৯,৩৩৪ কিলোমিটার। কিন্তু এখন তা' কমে গিয়ে ৫,৯৪৪ কিলোমিটারে দাঁড়িয়েছে। চাঁদকে নির্দিষ্ট একটি কক্ষপথ ধরে প্রদক্ষিণ করতে গেলে ঠিক এই গতিবেগই দরকার।

—আমাদের দিকে লক্ষ্য রাখুন এখন, বোরম্যান চাঁদ-প্রদক্ষিণ করতে করতে পৃথিবীতে খবর পাঠালেন।

পৃথিবীর মানুষ জবাব দিল, লক্ষ্য রাখছি। আপনাদের মহাকাশযানটিকে চাঁদের কিনারা থেকে বেরিয়ে-আসা একটি বিন্দুর মতো দেখছি আমরা।

বিন্দুই বটে; এবং সে বিন্দুটি তার কক্ষপথে ঠিক ১২ ডিগ্রী হেলে থাকে।

বিশেষজ্ঞরা বলছেন, মহাকাশযান এই-ভাবে হেলান দিয়ে চাঁদ-প্রদক্ষিণ না করলে চাঁদে নামবার উপযুক্ত স্থানগুলো বেছে নেওয়া কঠিন হবে।

ওদিকে চাঁদে নামবার স্থানগুলো খুঁজে বেড়ান নভশ্চররা। শেষ পর্যন্ত একটি বৃত্তাকার পথে মহাকাশযানটিকে স্থাপন করে ওঁরা চাঁদ-প্রদক্ষিণ সুরু করেন মাত্র ৬৯ মাইল দূরে থাকে। ২০ ঘণ্টায় মোট দশবার চাঁদ-প্রদক্ষিণ করেন ওঁরা এবং প্রদক্ষিণ করতে করতে চাঁদের পাহাড়-পর্বত ও 'ক্রেইট্যার'গুলোর আশ্চর্য-সুন্দর সব ছবি তোলেন।

চাঁদকে কেমন দেখায়?

নভশ্চররা বলছেন, দেখায় প্লাস্টার অব্ প্যারিস-এর মতো, ধূসর রঙের বালির মতো। কোথাও আবার বিপজ্জনক মনে হয় চাঁদের ভূখণ্ডকে। মনে হয়, বহু-

বর্ণে চিত্র-বিচিত্র মার্বেল দিয়ে যেন সে দেশটার কোনো কোনো জায়গা আঁকা। তবে সবদিক মিলিয়ে দেখলে সন্দেহ থাকে না যে, বিশেষ কোনো রঙ নেই চাঁদের বেশির ভাগ জায়গারই। ধূসরেরা সঙ্গে সাদা সেসব জায়গায় এমনভাবে মিশে আছে যে বার বারা দেখেও ঠাওর করা যায় না, কী বলবো চাঁদকে!—ধূসর? না সাদা? না কি রঙহীন?

এ্যাণ্ডার্স রিপোর্ট পাঠালেন,—বাই বলি নয় কেন, চাঁদকে যে স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি আমরা, সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। কোনোই সন্দেহই নেই যে, চাঁদের বহুকথিত জায়গাগুলো আমাদের চোখের সামনে দিয়ে ছায়াছবির মতো ছুটে চলে যাচ্ছে।

—ওই তো!—২৫শে ডিসেম্বরের সুরুতেই জানিয়ে দিলেন এ্যাণ্ডার্স, ওই সেই তো বিখ্যাত 'ক্রেইট্যার ক্লাভিয়াস'। আর ওই তো গুটেনবার্গ'। খুব ভালোভাবে দেখতে পাচ্ছি ওদের। দেখতে পাচ্ছি ক্রেইট্যার-এ সমাচ্ছন্ন চাঁদের সমভূমি, পাথরে আকীর্ণ চাঁদের উপত্যকা এবং গাছপালাহীন চাঁদের পাহাড়-পর্বত।

—কিন্তু পাহাড়-পর্বত নয়, অগুনতি ক্রেইট্যার দেখেই স্তম্ভিত হচ্ছি আমি, জানালেন লোভেল। তিনি বললেন, আমি মুগ্ধ হচ্ছি দেখে যে, ক্রেইট্যারগুলোর প্রায় সবই বৃত্তাকার। আমার মনে হয়, উল্কা-জাতীয় কোনো পদার্থের সঙ্গে চাঁদের সংঘর্ষের ফলেই এরা সৃষ্ট হয়েছে।

লোভেল আরও বললেন, ক্রেইট্যারের চারিদিকে যে পাথুরে দেওয়ালগুলো আছে, তারা সারিবদ্ধভাবে দাঁড়ানো। তাদের দিকে তাকালে ওপর থেকে নিচে অবধি মোট ছ'-সাতটি সারি চোখে পড়ে। অবিশ্যি এমন ক্রেইট্যার ও চাঁদে অনেক আছে যাদের মাঝখানটা দেখতে উঁচু-মতো।

এদিকে দেখতে দেখতে মহাকাশযান চাঁদের 'সী অব্ ফার টিলিটির' ওপর এসে পড়ে। লোভেল দেখতে পান, ওখানকার একটি ক্রেইট্যার থেকে রশ্মি বেরিয়ে আসছে।

এ্যাণ্ডার্স দেখেন, পৃথিবী থেকে যে পরিমাণ প্রতিফলিত-আলোক চাঁদ পায় বলে তাঁর ধারণা ছিল, তা ঠিক। ঠিকই অনেকটা আলোক পায় চাঁদ; এবং পায় বলেই তার ক্রেইট্যারগুলোকে স্পষ্ট দেখায়।

—স্পষ্ট দেখাচ্ছে চাঁদের তিন কোণা পাহাড়গুলোকেও,—লোভেল জানিয়ে দেন এক সুযোগে। বলেন, চাঁদের আড়াল-করা দিকটিকেও ভালোভাবে দেখে নিয়েছি আমরা; এবং আমার মনে হয়, আমাদের এই অভিজ্ঞতা থেকে বিজ্ঞানীদের বহুকালের বহু জিজ্ঞাসার জবাব মিলবে।

—তা তো মিলবেই, পৃথিবীতে বসে আমরা কানাঘুষো করি। বলি, চাঁদের দেশের ক্রেইট্যারগুলো কী করে সৃষ্টি হল, তা হয়তো এতদিনে জানা যাবে। আর জানা যাবে চাঁদের ধূলোয়-ভরা সাগরগুলোর রহস্য।

—কিন্তু চাঁদে তো বাতাস নেই। অতএব এত ধূলো কোত্থেকে এল?—বলাবলি করেন অনেকেই।

এদিকে অনেকেই আবার চাঁদের দেশের নতুন খবরের জন্যে কান পাতেন।

খবর আসে ঠিকই। নভশ্চরেরা জানান, আমরা এখন চাঁদের 'সী অব্ ক্রাইসিস্'-এর ওপর দিয়ে চলেছি। 'ক্রাইসিস্'-এর বেশির ভাগ অঞ্চল সমতল এবং ঘোর রঙের। কিন্তু তার কিনারাগুলো একটু বেশি উজ্জ্বল। এত উজ্জ্বল যে, দেখলেই মনে হয়, কোনো কিছুর সঙ্গে সংঘর্ষের ফলে সম্প্রতি ওদের সৃষ্টি হয়েছে।

এ্যাণ্ডার্স জানান, এখন যে অঞ্চলটা দেখছি, তা সম্ভবত বহুকালের পুরনো একটি সত্তা লাভস্রোত। কিন্তু সব কিছু খুব ভালো দেখতে পাচ্ছি না এখন। চাঁদের দেশের প্রতিফলিত-আলোক এখন আমাদের চোখ ধাঁধিয়ে দিচ্ছে।

লোভেল জানান, এখন আমরা প্রতীক্ষা করে আছি চাঁদের সেই অঞ্চলটির জন্যে, যাকে বলা হয় 'টারমিনেট্যার'। যেখানে চাঁদের আঁধার-রাজ্যের শেষ এবং আলোক-রাজ্যের সুরু। ওই বিশেষ রাজ্যটিতেই চাঁদের পাহাড়-পর্বতগুলোর দীর্ঘ ছায়া পড়বে; এবং পড়বে বলেই ওদের চিনে নিতে সুবিধে হবে আমাদের।

—চাঁদে সূর্যোদয় ভারি সুন্দর! লোভেল জানিয়ে দেন একবার। বলেন, ওদেশে যেখানটায় সূর্য ওঠে, শুধুমাত্র সেখানটাই আলোকিত হয়ে ওঠে দেখতে দেখতে। বাতাস নেই বলে আলোক ওখানে পৃথিবীর সূর্যোদয়ের মতো ছড়িয়ে পড়ে না। ওখানে সূর্য একটু দূরে সরে যাবার সঙ্গে সঙ্গেই আলো কিন্তু জায়গাটা ঘন আঁধারে ডুব দেয়।

এই আঁধার-আলোর খেলা দেখতে দেখতে চন্দ্র-প্রদক্ষিণের সময় শেষ হয়ে আসে। মহাকাশযান সাফল্যের সঙ্গে নবম-বার চাঁদ-পরিক্রমা শেষ করে। এই পরিক্রমার পথটা প্রতিবেশী-উপগ্রহের খুব কাছে আসে যখন, প্রতিবেশী থেকে তখন তার দূরত্ব দাঁড়ায় প্রায় ৫৯ মাইল; আর যখন খুব দূরে যায়, তখন এই দূরত্ব গিয়ে ৬৩ মাইলে ঠেকে।

আর মাত্র একবার। দশম বার চাঁদ-প্রদক্ষিণ সুরু হয় এবার। এবং এই প্রদক্ষিণ-পর্ব শেষ হতে না হতেই নভশ্চররা তাঁদের রকেটের প্রধান ইঞ্জিনকে প্রজ্বলিত করেন। ২৫শে ডিসেম্বর তারিখে ভারতীয় সময় সকাল ১১টা ৪০ মিনিটে পৃথিবীর দিকে ফিরে আসতে সুরু করেন ওঁরা। চাঁদ তখন পৃথিবী থেকে ২ লক্ষ ৩২ হাজার মাইল দূরে।

অবিশ্যি দূরত্ব এর চেয়েও বেশি অতিক্রম করতে হবে নভশ্চরদের। কারণ পৃথিবীতে একেবারে সোজা রাস্তায় ফিরে আসবেন না ওঁরা। চাঁদ ও পৃথিবী দুই-ই চলনশীল বলে ওঁদের আসতে হবে একটু ঘুরে। ঘুর-পথে পরিকল্পনা-অনুযায়ীই এগোন ওঁরা। পৃথিবী-ছাড়ার ৯৯ ঘণ্টা ৩৩ মিনিট পরে কেপ কেনেডীর সঙ্গে ওঁদের দূরত্ব দাঁড়ায় ১ লক্ষ ৭৮ হাজার ৫২৯ মাইল।

পৃথিবীর হিসেবে নভশ্চরদের গতি এখন ঘণ্টায় ২ হাজার ৮১৬ মাইল। ওঁরা এখন মহাশূন্যের সেই কল্পিত 'কস্‌মিক্-প্রাচীর'-এর দিকে এগিয়ে আসছেন যেখানে পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণ চন্দ্রের মাধ্যাকর্ষণকে প্রতিহত করবে এবং যেখান থেকে পৃথিবীর দিকে অপেক্ষাকৃত দ্রুত গতিতে এগিয়ে আসবে অ্যাপোলো-৮।

অ্যাপোলো-৮ এগোয় ঠিক। যখন চাঁদ ও পৃথিবীর মাঝামাঝি জায়গায় পৌঁছয় সে, অর্থাৎ যখন পৌঁছয় পৃথিবী থেকে ১ লক্ষ ১৫ হাজার ৬২৫ মাইল দূরে, তখন তার গতিবেগ দাঁড়ায় ঘণ্টায় ৪ হাজার মাইল।

নির্দিষ্ট পথ ধরে নির্বিঘ্নেই এগিয়ে আসে অ্যাপোলো-৮; এবং সে পথ এত নিখুঁত যে ফেরবার পথে অ্যাপোলোকে আর নতুন করে দিক-পরিবর্তন করতে হয় না।

—তারার সাহায্যে দিক্-নির্ণয় নির্বিঘ্নেই করে চলেছি আমরা; এবং ২৬শে ডিসেম্বরও আমাদের নির্বিঘ্নেই কেটে গেল,—নভশ্চররা জানান।

২৭শে ডিসেম্বর মাঝরাত্রি থেকে পৃথিবীতে অনেকেরই ঘুম নেই চোখে। অনেককেই তখন বলতে শোনা যাচ্ছে, নভশ্চররা আজ ফিরে আসবেন।

ওঁরা ফিরলেন ঠিক। ২৭শে ডিসেম্বর ভারতীয় সময় রাত ৯টা ২১ মিনিটে

—ফটো বিউটি স্টুডিও—
সুন্দর ছবি তোলাতে হ'লে
ফটো বিউটিতে আসুন
৪৩, নেতাজী সুভাষ রোড
কালী বাবুর বাজার
হাওড়া
(ইণ্ডিয়ান ওভারসীজ ব্যাঙ্কের নীচে)

ওঁরা প্রশান্ত মহাসাগরের বুকে নেমে এলেন।

প্রশান্তের হাওয়াইয়ে সূর্যোদয় হয় নি তখনও। তখনও প্রদোষের আঁধারে সে অঞ্চলটা আচ্ছন্ন। আর নভশ্চররা আচ্ছন্ন বিগত কয়েকদিন ধরে যে মহানাটক ওঁরা অভিনয় করেছেন, তারই স্মৃতিতে।

নাটকটা পৃথিবীতে নেমে আসবার কয়েক ঘণ্টা আগে থেকেই সবচেয়ে বেশি জমে উঠেছিল।

২৭শে ডিসেম্বর ভারতীয় সময় সন্ধ্যে ৫টা ৫৪ মিনিটে পৃথিবী থেকে ৩১ হাজার ৪০ মাইল দূরে পৌঁছয় অ্যাপোলো-৮। তখনও দুরন্ত গতিতে চলছে সে। এবং তখন তাকে পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলে ঢুকবার উপযোগী করবার জন্যে প্রস্তুতি চলছে।

প্রস্তুতি হিসেবে ভারতীয় সময় রাত ৮টা ৫৩ মিনিটে অ্যাপোলোর রকেট ইঞ্জিন, বাড়তি অক্সিজেনের আধার এবং বিদ্যুৎ তৈরির সেল ইত্যাদি ফেলে দেওয়া হল। অর্থাৎ, ব্যবস্থা হল, মহাকাশে অ্যাপোলোর ফিরে-যাবার পথকে রুদ্ধ করার।

ওদিকে কন্ট্রোল রুমের কর্মকর্তাদের সঙ্গে পরামর্শের পর নভশ্চররা স্থির করলেন, বায়ুমণ্ডলে ঢুকবার সময় অ্যাপোলোর তেরচা প্রবেশ-পথের কোন-রকম পরিবর্তন প্রয়োজন হবে না। কিন্তু প্রয়োজন হবে তার তলদেশের তাপ-প্রতি-রোধক প্রধান আবরণটিকে ছোট ছোট ইঞ্জিনের সাহায্যে বায়ুস্তরের দিকে ঘুরিয়ে দেওয়ার।

যথাসময়ে আবরণটিকে ঘুরিয়ে দেওয়া হল এবং ভারতীয় সময় রাত ৯টা ৭ মিনিটে অ্যাপোলো-৮ পৃথিবীর বায়ু-মণ্ডলে প্রবেশ করল।

বায়ুমণ্ডলে প্রবেশের প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই অ্যাপোলোর তাপ-নিরোধক আবরণটির তাপমাত্রা ৩,৩০০ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড ছাড়িয়ে গেল এবং পৃথিবীর কন্ট্রোল রুমের সঙ্গে নভশ্চরদের বেতার-সংযোগ হল বিচ্ছিন্ন।

বিশ্বখ্যাত ট্রানজিস্টর

মাসিক ১০৲ কিস্তিতে ৩২০৲ মূল্যের বিশ্ববিখ্যাত "এস-কর্ট" ৩ ব্যান্ড অল ওয়ার্ল্ড পোর্টেবল ট্রানজিস্টর লাভ করুন। প্রতি গ্রাম ও শহরে প্রেরণের যোগ্য।

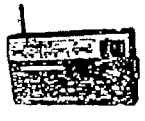

আবেদন করুন :—

Japan Agencies (B.W.C—10)
Post Box 1194, Delhi—6.

কিছুক্ষণের জন্যে এমন যে হবে, তা' আগে থাকতেই অনুমান করা হয়েছিল। অতএব, রাত ৯টা ১০ মিনিটে যখন নভশ্চরদের সঙ্গে বেতার-সংযোগ স্থাপিত হল আবার তখন বিশেষজ্ঞদের কেউই খুব একটা অবাক হন নি।

ওদিকে ভারতীয় সময় রাত ৯টা ১৫ মিনিটে মহাকাশযানের গতিহ্রাসকারী দুটো প্যারাসুট আপনার থেকেই খুলে গেল এবং রাত ৯টা ২১ মিনিটে অ্যাপোলো-৮-এর ক্যাপসুলটি প্রশান্ত মহাসাগরের বুকে ইয়র্কটাউন জাহাজ থেকে মাত্র ৫ হাজার গজ দূরে নেমে এল।

অ্যাপোলো-৮-এর এই সাফল্যের ফলে মহাকাশ-পরিক্রমার ক্ষেত্রে কয়েকটি অভি-নব রেকর্ড স্থাপিত হয়েছে। এই রেকর্ড-গুলির মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য হল, এই সর্বপ্রথম পৃথিবীর মানুষ ঘণ্টায় ২৪ হাজার ১৭১ মাইল গতিবেগে পৃথিবীর অভিকর্ষের বন্ধন ছিন্ন করে কক্ষপথের বাইরে যেতে পেরেছে। মানুষ এই সর্বপ্রথম পৃথিবী থেকে ২ লক্ষ ৩৩ হাজার মাইল দূরে পৌঁছে চাঁদ-প্রদক্ষিণ করেছে। এ ছাড়া চাঁদের মাধ্যাকর্ষণের আওতায় এই সর্বপ্রথম এসেছে মানুষ; এই প্রথম সে চাঁদের অদৃশ্য অংশ স্বচক্ষে দেখেছে।

কিন্তু এত কিছু সাফল্য সত্ত্বেও হার্ভার্ডসটন-এর মহাকাশ-বিশেষজ্ঞরা প্রশ্ন তুলেছেন, চাঁদের মাটিতে সত্যি কবে পা দেবে মানুষ?

প্রশ্নটা উঠত না, যদি না অ্যাপোলো-৮ দশবার ধরে চাঁদ-প্রদক্ষিণ করবার সময় তার নির্দিষ্ট কক্ষপথ থেকে একটু-আধটু সরে যেত।

কিন্তু কেন সরে গেল অ্যাপোলো-৮?

বিজ্ঞানীরা বলছেন, সরে গেল চাঁদের মাধ্যাকর্ষণের হেরফেরের ফলে। চাঁদের দেশের জায়গায় জায়গায় আছে বিরাটকায় সব উল্কাখণ্ড। ওই সব উল্কায় লোহা এবং নিকেলের ছড়াছড়ি। আকৃতিতেও বিরাট ওরা। ওদের কোনো কোনোটির ব্যাস এমন কি ৫০ মাইল। ওরা আছে চাঁদের পৃষ্ঠদেশে প্রোথিত হয়ে। অতএব, ওদের ধারেকাছে পৌঁছুলে চাঁদের মাধ্যা-কর্ষণের হেরফের তা হবেই।

কিন্তু হেরফের ঠিক কতটুকু হয়ে থাকে, চাঁদের দেশে ঠিক কী পরিমাণে আছে ওরা, তা' পুরোপুরি না জানলে চাঁদে অবতরণকারী মানুষের পক্ষে পৃথিবীতে ফিরে আসা কঠিন হবে।

এদিকে চাঁদে অবতরণের উদ্যোগ-আয়োজন অবিশ্যি পুরোদমেই চলছে। শোনা যাচ্ছে, ১৯৬৯-এর গোড়ার দিকে হবে অ্যাপোলো-৯ ও অ্যাপোলো-১০-এর অভিযান। অ্যাপোলো-৯ চাঁদে যাবে না; কিন্তু অ্যাপোলো-১০ তিনজন নভশ্চরকে নিয়ে চাঁদ থেকে ৫০ হাজার ফুট দূর অবধি যাবে এবং তারপর পৃথিবীতে ফিরে আসবে আবার।

অ্যাপোলো-৯কে দিয়ে 'চান্দ্র তরণী' বা 'লুনার মডিউল' সম্পর্কে পরীক্ষা-নিরীক্ষা চলবে। চান্দ্র তরণীটিকে মূল মহাকাশযান থেকে বিয়োজন করা হবে পৃথিবীর কক্ষ-পথে; এবং তারপর আবার এটিকে সংযো-জন করা হবে মূল যানের সঙ্গে। বিশেষজ্ঞরা বলছেন, চান্দ্র তরণীর এই সংযোজন ও বিয়োজন চাঁদে পাড়ি দেবার ক্ষেত্রে অত্যাবশ্যকীয়।

আমরা বিশ্বাস করি, কিছুদিনের মধ্যেই চাঁদে পাড়ি দেবে মানুষ। কিছু-দিনের মধ্যেই সে গিয়ে দাঁড়াবে প্রতিবেশী উপগ্রহটির ওপর। কিন্তু প্রশ্ন, এইভাবে বিশ্বজগতের কতটুকু জানা সম্ভব? বিশ্ব-লোকের কতটা দূর অবধি পাড়ি দিতে পারবে আগামী কালের মানুষ? সূর্য একটি নয়, লক্ষ লক্ষ। গ্রহ কয়েকটি নয়, কোটি কোটি। লক্ষ-লক্ষ সূর্যলোক আছে এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে। সেই সব সূর্যকে প্রদক্ষিণ করছে লক্ষ লক্ষ গ্রহ। এমন সূর্যও অনেক আছে, যাদের আলো এখনও পৃথিবীতে এসে পৌঁছয় নি। আলো সেকেণ্ডে চলে ১ লক্ষ ৮৬ হাজার মাইল। আমাদের পরিচিত সূর্য থেকে পৃথিবীতে আলো পৌঁছুতে সময় লাগে মাত্র সাড়ে আট মিনিট। অথচ সূর্য থেকে পৃথিবীর দূরত্ব অল্প কিছু নয়, ৯ কোটি ৩০ লক্ষ মাইল। যে সূর্য থেকে এখনও আলো এসে আমাদের কাছে পৌঁছয় নি, পৃথিবী থেকে তার দূরত্বটা কল্পনা করুন একবার। এদিকে রকেটকে যত জোরেই আমরা চালাই না কেন, আলোর চেয়ে বেশি গতি-বেগে লাভ করা কোনোদিন আমাদের পক্ষে সম্ভব নয়। অতএব আমাদের পক্ষে বিশ্বজগৎকে পাড়ি দেওয়াও সম্ভব নয় কোনোদিন।

এইখানে মন্তব্য করেন কেউ কেউ। বলেন, সম্ভব তো আরও অনেক কিছুই নয়। মৃতকে জীবিত করা সম্ভব নয়; অমরত্ব লাভ করা সম্ভব নয়। কিন্তু তাই বলে মানুষ হাত-পা গুটিয়ে বসে থাকবে কেন।

আমরা বলি, ঠিক কথা। কেন বসে থাকবে।

আর বলি, মানুষ কোটি কোটি টাকা খরচ করে গ্রহে-গ্রহান্তরে ছোটাছুটি করার সময় তার চেনা-পৃথিবীর বুভুক্ষু ও রুগ্ন মানুষদের কথা যেন একেবারে ভুলে না যায়।

"অবজারভার"-এ প্রকাশিত মন্তব্য প্রসঙ্গে

পাঠকের মত

সম্প্রতি এম· ডি পরীক্ষায় দুর্নীতি বিষয়ে যে আলোচনা শুরু করেছেন তার জন্য আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই। আশা করি এবার চিকিৎসাবিজ্ঞানের এই উচ্চতম ডিগ্রীটা রাহুমুক্ত হবে এবং ছাত্র, বিশ্ববিদ্যালয় আর সমাজের কল্যাণ হবে। যে যবনিকা আজ উঠল আশা করি অকালে তার পতন ঘটবে না। এ বিষয়ে কিছু আলোচনা করব, ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার ফসল এগুলি।

মনে পড়ছে আরও একবার আলোচনা হয়েছিল ৬ বৎসর আগে একটা বাংলা এবং একটা ইংরাজী দৈনিকের সম্পাদকীয় চিঠিপত্রের বিভাগে। কিন্তু কোন ফল হয় নি। যাঁরা এম· ডি পেয়েছেন তাঁদের অনেকেই—কিল খেয়ে কিল চুরি করছেন। সত্য প্রকাশের ফল আত্ম-অবমাননা। সেটা কেইবা চায়। কে চায় সকলকে ডেকে বলতে যে যে ডিগ্রী আমি নামের পিছনে সযত্নে বহন করি—সেটা কারও অশেষ করুণার দান এবং আমার নিজের আত্ম-অবমাননার চরম নিদর্শন। সে ডিগ্রী আমি অর্জন করতে পারি নি নিজের যোগ্যতা দেখিয়ে—আমাকে সেটা ভিক্ষা করে নিতে হয়েছে। বরং এর বিপরীতটাই স্বাভাবিক। সত্য-ভাষণের আরও বিপদ বর্তমান। যে পরম ক্ষমতাধর ব্যক্তিটি আজ চিকিৎসা-জগতের মাথায় ছড়ি ঘোরাচ্ছেন তাঁর কোপদৃষ্টিতে পড়লে বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বীকৃতি (যেমন শিক্ষকতা, গবেষণা-গাইড, পরীক্ষক ইত্যাদি) থেকে সরকারী চাকুরেদের পদোন্নতি পর্যন্ত সবকিছুই ব্যাহত হতে পারে। পক্ষান্তরে এই ব্যক্তিটিকে তুষ্ট রাখতে পারলে অনেক সুযোগ-সুবিধা আসতে পারে। যেসব প্রতিবাদপত্র ছেপেছেন সেগুলি পড়বার সময় এই কথাগুলি মনে রাখতে হবে। প্রতিবাদকারীদের একজন বিদেশী ডিগ্রী-ধারীকে জানি, যিনি পরীক্ষাক্ষেত্রে চরমভাবে অপমানিত হয়েছেন এবং ফেল করেছেন। পরে যথোপযুক্ত তৈল-প্রলেপনে রথের চাকা মসৃণ করে পাশ করে আজ উল্টো কথা বলছেন। একটা জিনিস লক্ষ্য করে দেখেছেন কি যে আপনি এতবড় অভিযোগ আনা সত্ত্বেও প্রতিবাদকারীরা কেউই তদন্তের দাবি জানান নি? কারণ অত্যন্ত পরিষ্কার। তদন্তের দাবি জানাতে হলে এবং তদন্তের সম্মুখীন হতে হলে যে নিষ্পাপ মন এবং সবল মেরুদণ্ডের প্রয়োজন হয় প্রতিবাদকারী-দের তা কোথায়? আশু তদন্ত হলে প্রকাশ পাবে প্রতিবাদকারীরা এগিয়ে এসেছেন কোন্ স্বার্থে। তাঁরা কি সদ্য অনুগৃহীত এম· ডি নন? সরকারী 'একাডেমিক কাউন্সিলে' কারও কি 'কেস' ঝুলছে না? বহুবার ফেল করবার পর আপনার লেখার প্রতিবাদ করে তাঁরা কি আগামী পরীক্ষায় পাশের পথ সুগম করে না? কোন কোন নতুন পরীক্ষার্থী 'ফার্স্ট চান্স ক্যান্ডিডেট' হবার আশায় কি এই কাজ করছেন না?

যাই হোক মেধাবীই হন আর নিরেটই হন গত বেশ কয়েক বছরের মধ্যে যাঁরা এম· ডি পেয়েছেন তাঁদের সকলকেই—ঐ বিশেষ ব্যক্তির সন্তানের কাছে স্বীকার করতে হয় যে তাঁর অশেষ করুণা ব্যতীত ঐ ডিগ্রী তাঁরা লাভ করতে পারতেন না। এই স্বীকৃতি কেউ না দিলে ঐ ক্ষমতাধর তনয়ের প্রচণ্ড আস্ফালন শোনা যায়। অতএব এই ভিক্ষা-লব্ধ ধনে যাঁরা তুষ্ট নন সামর্থ্য থাকলে তাঁরা সাগর পাড়ি দিয়েছেন গ্লানি ঘোচাতে। এম· ডি'র পর এম· আর· সি· পি যোগ করবার—এটা একটা গূঢ় কারণ।

এ প্রশ্ন স্বাভাবিক যে বাঁধাধরা নিয়মমাফিক পরীক্ষায় কি করে একজনের মর্জিমত পাশ-ফেল সম্ভব। যদি পরীক্ষা-পদ্ধতি কেউ তলিয়ে দেখেন, দেখবেন এটা সত্যিই সম্ভব। বছরের পর বছর প্রায় একই পরীক্ষকদের নিযুক্ত করা হয়। এঁরা সব একই গোষ্ঠীর এবং এঁদের মনোনয়ন নিয়মমাফিক হলেও ঐ ব্যক্তির মর্জির ওপরেই নির্ভর করে। এমন কি কলকাতার বাইরে থেকে যাঁরা আসেন তাঁরাও গুটিকয়েক। অনেকে ভেতরের গলদ দেখে আসতে চান না অথচ তাঁদের নাম তালিকায় রাখা হয়। শেষ মুহূর্তে তাঁর বদলে আশ্রিত কাউকে স্থান করে দেওয়া হয়। আবার কেউ কেউ সম্মানিত হয়ে আসেন, ভেতরের গণ্ডগোলে মাথা গলান না। আর স্থানীয় পরীক্ষকরা তো বাধ্য ভদ্রলোক, আগে থেকেই যে নামের 'লিস্ট' পান তাঁদের টেনে বের করে দেন। যদি কোন একজন হঠাৎ অবাধ্য হন তবে আর সবাই মিলে তাঁকে কোণঠাসা করে দেন এবং পরের-বারের পরীক্ষকের তালিকা থেকে তাঁর নাম বাদ পড়ে যায়। অতএব ক্ষমতাধরের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে উপযুক্ত মেধাবী ছাত্রকে পাশ করাবেন এমন সাধ্য কার আছে? কোনো পরীক্ষক নিরপেক্ষ হতে চাইলেই বিশেষ ব্যক্তিটি রুষ্ট হন এবং সেবারে পাশের হার খুব কমে যায়। গত কয়েক বছরের—পরীক্ষকের তালিকা এবং এম· ডি পাশের হার দেখলেই পরিষ্কার বোঝা যাবে অবাধ্য পরীক্ষকের অন্ত-র্ভুক্তির সঙ্গে সঙ্গে এই পাশের হার কিভাবে নেমে যায়। এবারও ত' যখন ওপরের তলায় পরীক্ষা চলছিল, নিচের তলায় সর্বসমক্ষে ঐ বিশিষ্ট ব্যক্তির সন্তান ঘোষণা করছিলেন কাকে কাকে তিনি পাশ করাচ্ছেন। পরিতাপ এই যাঁরা সেখানে উপস্থিত ছিলেন, হয়ত তাঁদের কেউই আজ সত্যভাষণে এগিয়ে আসতে পারবেন না।

এই পরীক্ষার পদ্ধতিই এমনি যে মৌখিক ও 'প্রাকটিক্যালে' যে কোনো পরীক্ষার্থীকেই অনায়াসে ফেল করান যায়। পরীক্ষায় কোনো 'মার্কিং সিস্টেম' নেই। 'ইমপ্রেশনের' ওপর 'এ', 'বি' 'সি' ইত্যাদি দেওয়া হয়। ফলে একজন পরীক্ষক ফেল করালে অন্যজনের 'ইমপ্রেশন' দিয়ে সেটা 'ব্যালান্স' হয় না। কাজেই একজনের মর্জির ওপরেই সব নির্ভর করে। ভুল বললাম কিছু। অনেক সময় খুব কায়দা করে এই 'ব্যালান্সের' খেলা দেখান হয়। পূর্ব-কল্পিত হিসাবে দেখা হয় এই 'ব্যালান্সিং' কেমন হলে অনুগতরা পাশ হবেন। আর একান্ত অবাধ্যদের শায়েস্তা করা অতি সহজ। যে কেউ একজন পরীক্ষক কোনো এক 'আইটেমে' (আইটেম্ ২০।২৫টা) 'মাইনাস' 'সি' অথবা × (অর্থাৎ অত্যন্ত নিকৃষ্ট ছাত্র) দিয়ে রাখলে কে বাঁচাবে। আরও আছে। লজ্জার সঙ্গে প্রকাশ করছি কোন কোন বার অনেক পরীক্ষার্থীকেই মোটামুটি 'কেস ডায়োগনসিস্' বলে দেওয়া হয়। এও আর এক 'ব্যালান্সিং'-এর খেলা। 'কেস' অনেকেই আনলেন অথচ পাশ করলেন গুটিকতক। কারণ কারও 'ডায়োগনসিসে' পরীক্ষক ইচ্ছা করেই খুশি হলেন এবং দু'-চারটে মামুলী প্রশ্ন ধরে ছেড়ে দিলেন আর কারও উত্তরে প্রথমত খুশি ভাব দেখিয়ে পরে অবান্তর 'ক্রস্' করে গণ্ডায় ফেললেন। 'ডায়োগ-নসিস' সকলকে বলে দেবার প্রয়োজন আছে। কারণ যদি বাঞ্ছিত পরীক্ষার্থী-দের মুখে উৎকট কিছু 'ডায়োগনসিস' শোনা যায়, তবে বহিরাগত পরীক্ষকের কাছে লজ্জায় পড়তে হয়। দ্বিতীয়ত অনেককে সাহায্য করা হয়েছে দেখান হলো, যাতে কেউ বিক্ষুব্ধ হয়ে বিদ্রোহ ঘোষণা না করেন। এঁরা গুরুদেব। নমস্য। যেসব আইটেম অনেককে বলে দেওয়া সম্ভব হয় না সেগুলিতে চোখের সামনে অসম্ভব ভুল বলে অনেককে পাশ করতে দেখেছি, আবার অনেককে ঠিক

বলে ধমক খেতে দেখেছি। উদাহরণ অজস্র। স্থান সংকুলান হবে না। বিষয়গুলি 'টেকনিক্যালও'।

'প্রাকটিক্যাল' এবং মৌখিক পরীক্ষা দু'দিনে হয়। প্রথমদিন রোগী পরীক্ষা করে ডায়োগনসিস' করা, পরের দিন অন্যান্য ছোট ছোট 'আইটেম' এবং মৌখিক। প্রথমদিন পরীক্ষার পর ক্ষমতাধর তনয় পিতার কাছ থেকে সমস্ত পরীক্ষার্থীর 'এ', 'বি', 'সি'-এর তালিকা নিয়ে তাঁর 'চেম্বারে' হাজির হন, 'কনডাক্টিং' ডাক্তাররাও উপস্থিত হন, একে একে পরীক্ষার্থীদেরও ভিড় জমে। তারপর কিভাবে দ্বিতীয় দিনে 'বর্ডার লাইন' বাঞ্ছিতদের সাহায্য করতে হবে সে বিষয়ে 'কনডাক্টরদের' তালিম দেওয়া হয়। প্রথমদিন খুব খারাপ পরীক্ষা দেওয়া সজলচক্ষু কোন পরীক্ষার্থীকে এই বলেও আশ্বাস দিতে শুনেছি —"ভগবানের কাছে প্রার্থনা করুন অমুক (পিতার নাম করে) যেন কাল পর্যন্ত 'করোনারী' হয়ে না মরেন"— এবং তার পরদিন তাঁকে পাশ করতেও দেখেছি।

এবার বলি 'কোচিং'-এর কথা। পুত্রের কোচিং না করলে পাশ করা যায় না এটা অংশত সত্য। তিনি পড়ান বটে, কিন্তু তাঁর ক্লাসে শুধু নিজের দলের লোকেরই প্রবেশাধিকার আছে। যতদিন যাচ্ছে এটা ততই প্রকট হয়ে উঠছে। অনভিপ্রেতদের অত্যন্ত অভদ্র ভাষায় গালাগালি করে না আসতে বলা হয়। অনেকে নিরুপায় হয়ে তবুও আসেন। তাই কোচিং করলেও সকলে পাশ করেন না। প্রিয়ভাজন হতে হলে তোষামোদকারীদের দলে ভিড়তে হয়, তাঁর কোনও না কোন স্বার্থসিদ্ধিতে সাহায্য করতে হয়। অবশ্য 'কোচিং'-এর জন্য কোন নগদ পয়সা তিনি নেন না। আবার 'কোচিং' না-করেও কেউ কেউ পাশ করেন। তার কারণ অন্য। কোনো প্রভাবশালী লোককে ধরে তাঁরা পাশ করেন। তাই নিজগুণে পাশ কেউ করেন কি না যথেষ্ট সন্দেহ আছে যেহেতু গুণ বিচারের কোন সুযোগ নেই।

এম. ডি. পরীক্ষার্থীদের কেউ পড়ান না বলে যে অভিযোগ করা হয়েছে সেটা সম্পূর্ণ মিথ্যা। কারণ মাঝে মাঝেই বিশিষ্ট অভিজ্ঞ শিক্ষকদের এম. ডি ছাত্রদের সাহায্যার্থে এগিয়ে আসতে দেখেছি। তাঁদের 'ক্লাসে' সত্যিকারের শিক্ষা পাবার আশায় বেশির ভাগ পরীক্ষার্থীকে প্রথমত উপস্থিত হতেও দেখেছি। কিন্তু দু'টো-একটা ক্লাস হতে-না-হতেই ঐ ক্ষমতাধর তনয়কে অমুকের ক্লাসে গেলে পিতা ক্ষুব্ধ হবেন বলে হুঙ্কার দিতে দেখেছি—এবং তারপর কেউই ঐ সব 'ক্লাসে' যেতে সাহস করেন নি। অনেক শিক্ষকই শিক্ষা দিতে প্রস্তুত এবং অনেক পরীক্ষার্থীই তাঁদের কাছে পড়তে প্রস্তুত কিন্তু কারও অন্যত্র যাবার সাহস ও স্বাধীনতা নেই।

সবশেষে এঁদের 'প্রাকটিসের' কথা। একথা সত্য যে এঁদের তুষ্ট করতে কেউ কেউ 'কেস' খাইয়ে এঁদের পকেট ভারী করেন, আবার কেউ কেউ তাঁদের চিকিৎসক পিতা ও আত্মীয়-স্বজনের 'কেস' এঁদের কাছে পাঠাবার ব্যবস্থা করে দেন। এটা অস্বীকার করা যায় না কারণ এ প্রশ্ন স্বাভাবিক হয়ে নইলে ফিসের লোভে এঁরা এই খেলায় মেতেছেন!

সবকিছু বিচার করলে দেখা যাবে, এই এম. ডি পরীক্ষার ব্যাপারে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছেন একদিকে সৎ ও মেধাবী এম. ডি. ছাত্রসম্প্রদায়, অন্যদিকে এই দেশের অসুস্থ জনসাধারণ। প্রথমোক্তরা কোনোদিনই এম. ডি হতে পারছেন না। আর দ্বিতীয়োক্তদের প্রয়োজন থাক আর নাই থাক, পকেটে মোটা টাকা নজরানা নিয়ে এই সব এম. ডি পরীক্ষার্থীদের মারফৎ দিনের পর দিন হাজির হতে হচ্ছে পিতা-পুত্রের গোপন কক্ষে।

আমাদের একান্ত দাবি বিষয়টার পূর্ণ তদন্ত হোক অথবা কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের নাম আর কলঙ্কিত না করে এম. ডি ডিগ্রী বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিবর্তে ব্যক্তি বিশেষের বাড়ি থেকে দেবার ব্যবস্থা করা হোক, যেহেতু বর্তমানে কার্যত তাই হচ্ছে।

—জনৈক ভুক্তভোগী

•

সম্পূর্ণ জনস্বাস্থ্যের স্বার্থে বিশেষ অনুরোধ সহ এই চিঠিখানা আপনাকে পাঠাইতেছি "পাঠকমন" শীর্ষক ফিচারে ছাপাইবার জন্য। বিষয়টি হইল কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের এম-ডি পরীক্ষার সম্বন্ধে। আমি ঐ পরীক্ষার পরীক্ষার্থী নই, এমন কি চিকিৎসকও নই, সামান্য একজন কলেজের অধ্যাপক। এই তথ্যাদি আমার গৃহ-চিকিৎসকের কাছ হইতে প্রাপ্ত।

গত ৮।৯ বৎসর সময়ের মধ্যে, যতদিন হইতে এই বর্তমান কর্তাব্যক্তিটি এম-ডি পরীক্ষার মালিক হইয়াছেন, এই অমূল্য ডিগ্রী কত যে অপাত্রে দান করা হইয়াছে, তাহার ইয়ত্তা নাই। আমাদের গরীব দেশবাসী নিকটতম আত্মীয়ের জীবনবিপন্ন পীড়ার সময় এইসব এম-ডি (হাতুড়ে) চিকিৎসকদের ভুল চিকিৎসার ওপর আজ নির্ভরশীল। এইসব হাতুড়ে এম-ডি'দের মধ্যে কেহ কেহ আবার শিক্ষক হিসাবে বিভিন্ন মেডিক্যাল কলেজে দেশের ভবিষ্যৎ চিকিৎসক তৈরি করিতেছেন। তাই জনগণের স্বার্থ আজ কতদূর বিপন্ন তাহা সহজেই অনুমেয়।

কিন্তু একটা কথা স্বীকার না করিলে সত্যের অপলাপ করা হইবে। উপরোক্ত কর্তাব্যক্তির আমলে শতকরা ১০০ জনই হাতুড়ে এম-ডি হন নাই। কিছুসংখ্যক (১০—১৫ পার্সেন্ট) চিকিৎসক প্রকৃতই এই কৃতিত্বের উপযুক্ত অধিকারী। কিন্তু তাঁহাদেরও বড়কর্তা ও ছোটকর্তার মনোরঞ্জনের জন্যই অধিকতর সময় ও শ্রম ব্যয় করিতে হইয়াছে। কিন্তু অনুরূপ বা ততোধিক মেধাবী ছাত্র-ছাত্রীগণ, বছরের পর বছর বৃথাই পরিশ্রম করিয়া যাইতেছেন।

গত ১২ই ডিসেম্বরের সংখ্যায় যাঁহারা 'বঙ্গদর্শনে' প্রতিবাদ করিয়া নিজেদের নাম প্রকাশ করিতে লজ্জিত বোধ করেন নাই, তাঁহারা কেহ এবারে প্রথমবারের পরীক্ষার্থী, কেহ থিসিস সুরু করিয়াছেন, কেহ কেহ দুই-তিনবার অকৃতকার্য হইয়াছেন। শেষোক্তগণ হয়তো উক্ত চিঠিতে সই করিয়াছেন এই প্রতিশ্রুতিতে যে, সই করিলেই এবার পুরস্কৃত হইবেন। তিনজন মুক্ত পুরুষের (এম-ডি) আজীবন কৃতজ্ঞ থাকিবারই কথা।

মহাশয়া, আমার সনির্বন্ধ অনুরোধ যে, আপনি যে মহান কাজে হাত দিয়াছেন, তাহা 'বঙ্গদর্শন' লেখকের মারফৎ সম্পূর্ণ করুন।— আপনি বর্তমান জনপ্রিয় উপাচার্যকে অনুরোধ করুন যেন তিনি এ বিষয়ে উপযুক্ত তদন্তের ব্যবস্থা করেন। গত ৮।৯ বছরের ভিতর যাঁহারা এম-ডি ডিগ্রীপ্রাপ্ত হইয়াছেন, তাঁহাদের নিকট হইতেই গোপন ও ব্যক্তিগত অনুসন্ধানের দ্বারা তিনি আমার ও বঙ্গদর্শনে প্রকাশিত অন্যান্যদের বক্তব্যের সত্যতা যাচাই করিয়া দেখিতে পারেন। এমন কি এই সময়ের ভিতর অন্যান্য কো-একজামিনারদের নিকট গোপন অনুসন্ধানের দ্বারা তিনি জানিতে পারিবেন যে, তাঁহারা এম-ডি পরীক্ষার ব্যাপারে কতখানি নিজেদের স্বাধীন মতামত ব্যক্ত করিতে পারিয়াছিলেন।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সুনাম রক্ষার্থে এবং চিকিৎসাশাস্ত্রে এই সম্মানিত ডিগ্রীর মান বজায় রাখার জন্যও এই তদন্ত একান্ত প্রয়োজন মনে করি।

শ্রীপরেশচন্দ্র ভৌমিক,
১৮।৪ ফার্ন রোড,
কলিকাতা-১৯।

আপনাদের "বঙ্গদর্শন" শীর্ষক রচনায় এম-ডি ডিগ্রী পাওয়া সম্পর্কে লেখকের মতামত পড়লাম। আর, পাঠকমনে কয়েকজন তথাকথিত তোষামুদে ডাক্তারদের মতামতও পড়লাম। এসব বড় বড় ব্যাপার। আমার মত একজন সাধারণ ডাক্তারের এ ব্যাপারে নাক না গলানই উচিত। তবুও, আমি "বঙ্গদর্শনের" লেখকের স্বপক্ষে কিছু বলতে চাই।

"বঙ্গদর্শনে" লেখক যা বলেছেন, তা সবার কাছেই একটা open secret. আসল বস্তুকে কেমনভাবে এড়ানো যেতে পারে—তারই নমুনা দেখলাম কয়েকজন তোষামুদে ভদ্র ডাক্তারদের প্রতিবাদে। যে কজনই লেখকের বিরুদ্ধে মন্তব্য করে সমালোচনা করেছেন—তাঁদের অধিকাংশই বোধ হয় খাতিরের জন্য, কিন্তু খাতির আর প্রতিবাদের বন্ধনটায় কোথায় যেন সবার অলক্ষ্যে একটা ছোট্ট গেরো পড়ে গেছে।

আপনারা হয়তো অবগত আছেন যে, সেই বিখ্যাত ব্যক্তিটির পুত্র রিসেন্টলি একটা বই বার করেছেন। বইটা লিখতে গিয়ে তিনি যে ক'জন ডাক্তার বন্ধুর কাছে চিরকৃতজ্ঞ থাকবেন বলে বইটার গোড়ায় ছাপার হরফে ঘোষণা করেছেন—তাঁদেরই অধিকাংশ প্রতিবাদ করেছেন তাঁদের এই বিখ্যাত বন্ধুটির অপমানে। সত্যিই তাঁদেব গ্রেট ইন্টারেস্টই আছে। নতুবা কলকাতায় এত ডাক্তার থাকতে তাঁদের মধ্যে প্রায় সকলেই তারস্বরে বন্ধু ডাক্তারের সম্মানহানি (?) হয়েছে বলে চিৎকার করবেন কেন? পাঠকবৃন্দে এবারে আপনাবা ১২ই ডিসেম্বরের 'সাপ্তাহিক বসুমতী'র 'পাঠকমন'-এর আসরে বঙ্গদর্শনের বিরুদ্ধবাদী ডাক্তারদের নামের সঙ্গে ওপরে সেই বিখ্যাত যে ক'জন ডাক্তারেব কাছে চিরকৃতজ্ঞ আছেন—তাঁদের নাম মিলিয়ে দেখুন। পরের ব্যাপারটা সহজেই অনুমেয়।

এম-ডি পরীক্ষার ব্যাপারে হর্তাকর্তা-বিধাতা একজন চিকিৎসক যে কিরকম তার কিছু পরিচয় দিচ্ছি। ইনি পরীক্ষার হল থেকে বেরিয়ে এসে তাঁর প্রিয় এক ভদ্রলোককে বলতে পারেন, "জানলে হে, এবার বারজনকে এম-ডি দিলাম!" এম-ডি ডিগ্রীটা কি তাঁর পৈতৃক সম্পত্তি? তাঁর প্রশ্নের ধারা এই রকমের। জনৈক ছাত্রের প্রতি তাঁর প্রশ্ন, "বল তো এ্যামিটিনের বাক্সয় ক'টা এ্যাম্পুল থাকে?" —ছাত্র নিরুত্তর। তিনি রাগে ফেটে পড়েন। তাঁর অভিব্যক্তি "এসব ছেলেরাও কি এম-ডি'তে বসার উপযুক্ত?" কিন্তু আশ্চর্য এই যে, উপর্যুক্ত এই ছাত্রটির সেই বারেই এম-ডি পেতে কোন অসুবিধেয় পড়তে হয় নি। এর থেকে আমরা কি সিদ্ধান্তে পৌঁছতে পারি?

ডাঃ দ্বিজেন্দ্রকুমার রায়ের মতামত ও বলার ভঙ্গি নিঃসন্দেহে অতুলনীয়—অভাবনীয়। কিন্তু তিনি কোন্ ডিগ্রীটা আগে পেয়েছিলেন, এম-ডি না এম-আর-সি-পি? আর এম-ডি আগে পেলেও তিনি হয়ত একটা "exception"—তাই নয় কি?

সবাই সব বলছেন। কারোর হয়তো পিতৃস্থানীয় গুরুজনের (?) অপমানে বুক ভেঙে যাচ্ছে—কেউ বা হয়ত বন্ধু-শোকে মুহ্যমান, কিন্তু বঙ্গদর্শনের লেখকের প্রশ্ন—"সমস্ত ইকুইপমেন্টস থাকা সত্ত্বেও কেন এম-ডি পরীক্ষা মেডিক্যাল কলেজ ছাড়া অন্য কোন কলেজে হবে না....." এ প্রশ্নটার তো কেউই উত্তর দিচ্ছেন না। কেন?

একজন পৌঢ় অভিজ্ঞ ডাক্তার, যিনি কোন হাসপাতালের সম্ভবত সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট, প্রচুর অভিজ্ঞতা থাকা সত্ত্বেও কেন বছরের পর বছর এম-ডি পরীক্ষায় ফেল করছেন?

তিনি কোন এক সময়ে চিকিৎসা-জগতের সেই বিখ্যাত "বিধাতার" কোনও একটি কেস হাসপাতালে ভর্তি করেন নি বলে তার জের কি এখনও চলবে? তাঁর অপরাধ?

বেশ তো—এত কথা যখন ওঠে, একবার অন্তত একটা নিদর্শনের জন্য "examiner" change করা হোক, change "examination centre" —হয়ত দেখা যাবে যেখানে ১২ জন এম-ডি পাশ করেন এবং উল্লেখযোগ্য এই যে ১০ জনই মেডিক্যাল কলেজ-এর ছাত্র, তা হয়তো উল্টে যেতে পারে।

—ডাঃ নির্মল দত্ত

*

বঙ্গদর্শনে 'এম-ডি' পরীক্ষা সম্পর্কে গত কয়েকদিন যাবৎ যে বাদানুবাদ চলছে সে সম্পর্কে আমার কিছু বক্তব্য আপনাদের পত্রিকায় প্রকাশিত হলে কৃতজ্ঞ হবো।

আপনাদের ১৯শে ডিসেম্বর তারিখের সংখ্যায় 'পাঠকমন' এই বিভাগে 'জনৈক অকৃতকার্য পরীক্ষার্থী'র পত্রের কিছু প্রশ্নের উত্তর দেওয়া সমীচীন বলে মনে করছি।

১। অনেক মেধাবী ছাত্র শুধুমাত্র এম-ডি কেন যে-কোনো উচ্চতর পরীক্ষায় যে অসফলকাম হয়েছে এরূপ দৃষ্টান্ত বিরল নয়।

২। অধিকাংশ এম-ডি পরীক্ষার্থীই (শতকরা অন্তত ৮০ ভাগ) নন-প্র্যাকটিশিং কাজে কাজেই "কর্তাকে" 'কেস' দেওয়া তাঁদের পক্ষে নিতান্তই অবাস্তব কল্পনা।

৩। প্রখ্যাত চিকিৎসকের ছেলে হলেই এম-ডি পাশ করার যোগ্যতা অর্জন করা যায় এরকম কোনো মাননির্ণয় করা আছে কি?

৪। এবং ৫। প্রত্যেকেরই নিজস্ব মতামত আছে এবং তাই থাকা উচিত।

৬। একাডেমি কাউন্সিলের সঙ্গে এম-ডি পরীক্ষার কোনো সম্পর্কই নেই। লেখক বোধহয় নিজেকে ছাড়া আর সবাইকে 'মেরুদণ্ডহীন' বলে মনে করেন?

৭। সমস্ত মিটিং-এ হাজির হওয়া যে-কোনো ব্যক্তির পক্ষে দোষের কারণ হয় তা এই প্রথম জানলাম—বিশেষত যাঁকে কমিটিতে নিযুক্ত করা হয়েছে তাঁর পক্ষে।

৮। কৃতজ্ঞতা স্বীকার করা মনুষ্যত্বের লক্ষণ। লেখক যাঁদের নামে তাঁর বই-এ কৃতজ্ঞতা স্বীকার করেছেন, তাঁরা ব্যক্তিগত জীবনে অনেকেই হাউস-স্টাফ ছিলেন এবং বই লেখার বিভিন্ন পর্যায়ে তাঁরা লেখককে যথেষ্ট সাহায্য করেছেন, সেই হেতু বই লেখকের বিরুদ্ধে অভিযোগের যে তাঁরা প্রতিবাদ করবেন, তা খুবই স্বাভাবিক।

৯। পরীক্ষার দিন-পনেরো আগে থেকেই কেস দেখা নিয়ম করে বন্ধ করে দেওয়া হয়। তখন কেউই আর ওয়ার্ডে ঢুকতে পারেন না—পক্ষপাতিত্বের কোনো প্রশ্নই সেখানে উঠতে পারে না।

১০। পরীক্ষক নির্বাচন করা নিশ্চয়ই একজনের কাজ নয়—প্রত্যেক বারই বিভিন্ন কলেজের পরীক্ষক নির্বাচিত হয়েছিলেন।

১১। ছাত্র-ছাত্রীরা নিশ্চয়ই নিজেদের ভাল-মন্দ বুঝতে শিখেছেন। কার কাছে পড়লে তাঁরা উপকৃত বেশি হবেন এ বিষয়ে তাঁরা নিজেরাই যথেষ্ট সচেতন। তিনি প্রবীণ কি নবীন সে প্রশ্ন তোলা নিরর্থক।

১২। য়ুনিভার্সিটিতে এরকম কোন নিয়ম আছে বলে জানা নেই যে "এম-ডি পরীক্ষকের" পুত্র পড়াবেন না।

১৩। "চাণক্যকর" হলে সে সংবাদ সকলেই জানতেন বলে বোধহয় অথবা তাই নিয়ে নিশ্চয়ই আলোড়ন হত।

১৪। পরীক্ষা "আবহমানকাল থেকেই" যে মেডিক্যাল কলেজে হয়েছে এই তথ্য ভুল। কারণ কয়েক বছর আর, জি, কর মেডিক্যাল কলেজেও হয়েছে। কারণ

পরীক্ষা সাধারণত কলেজের-এর সুবিধা-মত জায়গাতেই হয়।

এই সঙ্গে সুপ্রিয়া চক্রবর্তী তাঁর পত্রে যে প্রশ্ন তুলেছেন তার উত্তরেও কিছু বলা প্রয়োজন মনে করছি।

যাঁরা পাশ করেছেন তাঁরা যে অধিকাংশই মেডিক্যাল কলেজের ছাত্র এই তথ্য ভুল। ১৯৬৮ সালের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ ছাত্রদের মধ্যে অধিকাংশই ন্যাশন্যাল মেডিক্যাল কলেজের ছাত্র।

কণ্ডাক্টিং ডাক্তারগণ মেডিক্যাল কলেজের ছাত্রদেরই বেশি সাহায্য করেন এই তথ্যও ঠিক নয়। তাঁরা কাউকেও সাহায্য করেন না। আর "এম-আর-সি-পি" ও "এম-ডি" সমগোত্রীয় নয়—দুটোর মূল্য আলাদা এও সবাই জানেন।

পরিশেষে আমি এই প্রসঙ্গে বলব যে-কোনো এক বিশেষ পরীক্ষকের "পুত্রের কোচিং ক্লাস" সম্পর্কে কথা বলা হয়েছে, সে বিষয়ে নিজ অভিজ্ঞতা দিয়ে বলতে পারি, আমি নিজে এই ক্লাসের সাহায্য নিয়েও পাশ করতে পারি নি।

এ ব্যাপারে একথা না প্রকাশ করলেও অকৃতজ্ঞতা হবে যে আমাদের অনুরোধ এড়াতে না পেরে তিনি নিঃস্বার্থভাবেই বিনা পারিশ্রমিকে শিক্ষাদান করে থাকেন।

—ডাঃ মান্না দত্ত
(নীলরতন সরকার মেডিক্যাল কলেজ
কলকাতা—১৪)

*

রঙ্গদর্শনে এম. ডি প্রসঙ্গ নিয়ে যে খবর প্রকাশিত হয়েছে, তার পক্ষে ও বিপক্ষে দেখছি কলম লড়াই সুরু হয়ে গেছে। আপনার মন্তব্যের প্রতিবাদে একই লোক বারবার চিঠি লিখেছেন, এবং আপনি তা ছাপিয়েছেন। এম. ডি পরীক্ষা নিয়ে যে কেচ্ছা, তা বহুকালের। এই সম্পর্কে কিছু তথ্য আপনার কাগজে পাঠালাম।

প্রশ্ন উঠেছে নন-প্র্যাকটিশিং ডাক্তাররা কেস কোথায় পাবেন, কর্তাব্যক্তিকে ভেট দেবার জন্যে? প্র্যাকটিশিং ডাক্তাররা তো সরাসরি কেস পাঠান। নন-প্র্যাকটিশিংরা ইণ্ডিরেকটলি। তাছাড়া ক্যান্ডিডেটেদের পরিবেশ দেখতে হবে। কলুরে বাবা রা মামা কেস দেয়, কেউ বা শুদ্ধ তেল দেয়, কেউ অন্য উপকার করে কর্তার ছেলে পড়িয়ে বা ছেলেকে পাশ করিয়ে, কোন নন-প্র্যাকটিশিং বা অন্য কোম্পানীর ডাক্তার যেখান থেকে কর্তার কাছে প্রচুর কেস যায়। এ ছাড়া আছে গোষ্ঠীর প্রশ্ন—ক্ষমতার লোভ ও নেশা, যার জন্যে মরাকে সরা জ্ঞান করেন কর্তাব্যক্তিটি—অনেক সময়ই শ-কারান্ত গালাগাল দিয়ে কথা সুরু করেন।

এক প্রবীণ ডাক্তার হঠাৎ দুম করে এক পত্রাঘাত করে বসেছেন। ভদ্রলোকের বাড়ি কর্তাব্যক্তির কাছাকাছি। কর্তার পুত্র কোচিং ক্লাশে একাধিক ছাত্রকে এই ডাক্তারের দেওয়া সার্টিফিকেট মার্কা চিঠি দেখিয়েছেন—যাতে পুত্রের চিকিৎসার সুনাম করা হয়েছে। এরকম পরস্পর মিঠে চুলকানি তাঁর মত প্রবীণ ডাক্তারের কাছ থেকে আশা করি নি। স্নেহ অতি বিষম বস্তু—বুঝতে পারছি। স্নেহান্ধকে কাণ্ডজ্ঞানও লোপ পায়। যা জানেন না, যার খোঁজ রাখেন না, তাই নিয়ে মাতব্বরী মার্কা চিঠি—ধৃষ্টতা বলেই মনে করি।

একাডেমিক কাউন্সিলের সঙ্গে কর্তাব্যক্তির যে সম্পর্কের কথা উঠেছে আজ তা ওপেন সিক্রেট। অনেক ধরণের ইরেগুলারিটি সেখানে এই ব্যক্তিটির কলকাঠি নাড়ার জন্যে ঘটছে বলে খবর পাওয়া যাচ্ছে। তিনি এখানেও হর্তা-কর্তা-বিধাতা হয়ে বসেছেন। হেল্থ সার্ভিসেসের এম. ডি পরীক্ষার্থীদের তাই ছো হুজুর না করলে উপায় কি। একাডেমিক কাউন্সিল বিগড়ে গেলে প্রমোশন, স্পেশাল সিলেকসন এসব আটকে যাবে যে। সর্ষেটের কাঁঠালী কলা হয়ে তাই এখানে আসর জাঁকাতে চান কর্তাব্যক্তি—খেল্ দেখাতে চান।

এম. ডি একজামিন কণ্ডাক্ট করা নিয়ে যাঁরা ভুক্তভোগী, তাঁরাই জানেন কি নরকলীলা চলে সেখানে। কর্তার পুত্র কোনকোনবার সকলকেই কেস জানিয়ে দেন, কিন্তু যাঁরা তাঁর নিজের ক্যান্ডিডেট, (এম. ডি পরীক্ষার্থীদের মধ্যে একটা চালু প্রবচন আছে—"পুত্রের তালিকায় পরীক্ষার্থীর নাম উঠেছে তো!") তাঁদের সোজা সোজা প্রশ্ন করা হয়, অন্যান্যদের আবোল-তাবোল প্রশ্নে বিভ্রান্তিত করা হয়। কর্তাব্যক্তিটি অনেক সময় কলেজের ডিরেক্টর প্রফেসরের সঙ্গে পরামর্শ না করেই বা তাঁর ইচ্ছামতই কণ্ডাক্টর নিয়োগ করেন—যার মারফৎ দলের লোকেরা কেস জানতে পারে। প্রয়োজনে এ সম্পর্কে প্রামাণ্য তথ্য দেওয়া যাবে। সাধারণত যাঁরা কণ্ডাক্টর হন, তাঁরা হাউস ফিজিসিয়ান—নিজের কলেজের দাদাদের যে আপ্রাণ সাহায্য করবেন এ তো জানা কথাই। এই জন্যেই যদি গালাগালে প্রত্যেক মেডিক্যাল কলেজে এম. ডি পরীক্ষার ব্যবস্থা করার কথা ওঠে, তাহলে কার কি আপত্তি থাকতে পারে?

কোচিং ক্লাশের কাহিনী এবার কিছু পরিবেশন করছি। সবার কাছে এর খবর নাকি উন্মুক্ত। ঠিক কথাই। কিন্তু ঐ চালু কথাটা আগেই বলেছি—সবার নাম পুত্রের লিস্টে ওঠে না। অনেক সময় তেলের দরকার। কোন প্রবীণ শিক্ষক একবার নিয়মমাফিক ক্লাশ নিতে আরম্ভ করেন। তাতে কর্তাব্যক্তির পুত্র বক্রোক্তি করেছিলেন—সুটকেশ নিয়ে ঐ শিক্ষকের কাছে গেলেই কি পরীক্ষার্থীরা পাশ করবে? এর পর ঐ শিক্ষকের ক্লাশে ছেলে জোটে নি আর। আবার কি উদ্যম! কোন পরীক্ষার্থী হয়ত বলেছে, পুত্রকে ফুল-চন্দন দিয়ে আসি' সেই কথা শুনে কী রাগ! কি গালাগালি! ডেমোক্র্যাটিক রুলসটিটিউশনের কথা এক পত্রলেখক বলেছেন। পিতা-পুত্র এ্যাণ্ড কোম্পানী থাকতে ঐ কথা উচ্চারণ করাও হাস্যকর।

এক ইউফোরিয়া রোগগ্রস্ত আবার এম. আর. সি-পি-কে কার্যত এম. ডি ডিগ্রীর ছোট বলে রায় দিয়েছেন। কোনটাই ছোট বলে মনে করি না। তবে ইদানীং ঐ একটি মাত্র কর্তাব্যক্তির খামখেয়ালী ও খুশিতে এম. ডি পরীক্ষা প্রহসনে পরিণত হয়েছে।

তাই বিচার বিভাগের তদন্ত হোক—এই দাবি কেউ কেউ যে তুলেছেন, তা পরিপূর্ণ সমর্থন করি। আপনি এক গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপারে জনমত গঠন করবার দায়িত্ব নিয়েছেন। যখন এত কথাই উঠেছে, একদল স্বার্থান্ধ লোক যখন নিজেদের সৎ সাধু প্রমাণ করতে একান্ত উদগ্রীব, তখন তাঁদেরও নিশ্চয়ই কোন আপত্তি থাকা উচিত নয় বিচার বিভাগীয় তদন্তের। মনে করি, জনস্বার্থের সঙ্গে এই প্রসঙ্গে অঙ্গাঙ্গিভাবে যুক্ত—কাজেই বিচার বিভাগীয় তদন্তের দাবি আরো সোচ্চার হোক—জনগণও এগিয়ে আসুন—জীবন-মরণ যাঁদের হাতে, তাঁদের আমরা সমস্ত বিতর্কের ঊর্ধ্বেই দেখতে চাই। যে বিষাদ ও বিতর্কের কালো রয়েছে, তার থেকে সত্য শিব শুভ ও সুন্দর আবির্ভূত হোক।

—ডাঃ অজিত বেনগুপ্ত
—ডাঃ হরিপ্রসন্ন চক্রবর্তী

দৃষ্টি রাখবেন!

যেন বিদেশী মাল গোপনে এসে আমাদের অর্থনীতির ক্ষতি না করে!

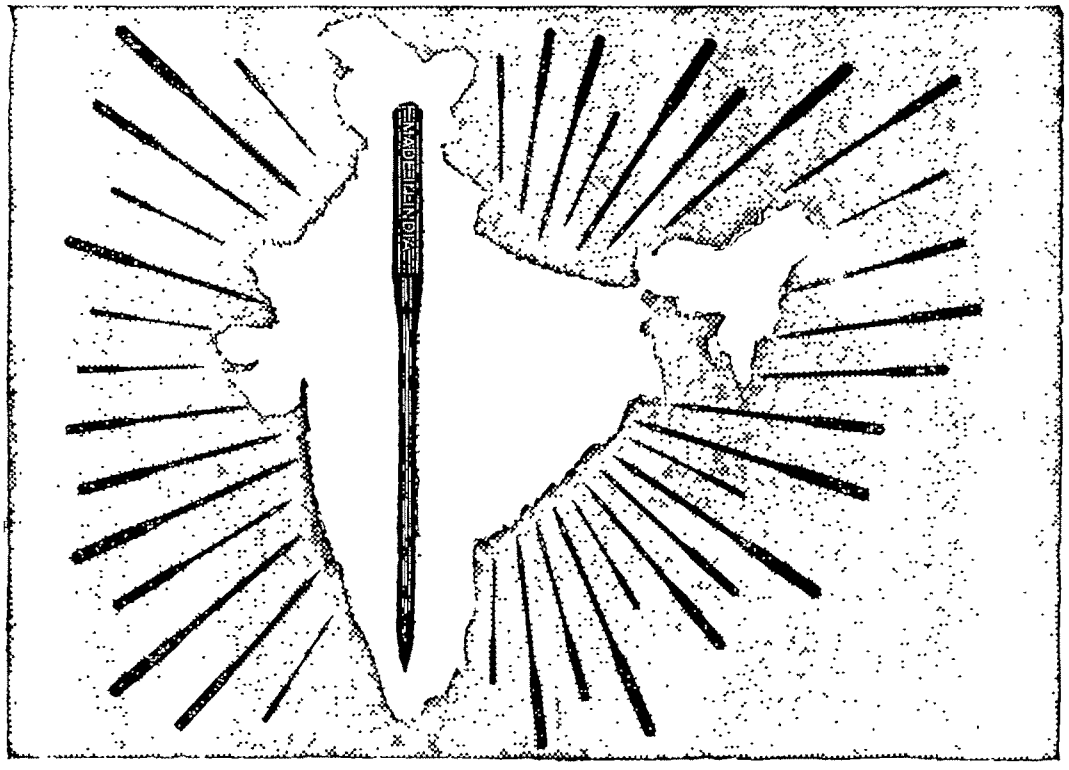

কেনবার সময় শুধু চাইবেন

সিঙ্গার*

সেলাই কলের ছুঁচ...

আসল জিনিস • সিঙ্গারের আন্তর্জাতিক মান অনুযায়ী ভারতে তৈরী !

বিদেশী ছুঁচ গোপনে ভারতে প্রবেশ করছে এবং তাতে ভারতের অর্থনৈতিক ক্ষতির সম্ভাবনা। আপনি এই আশঙ্কাকে রোধ করতে সাহায্য করতে পারেন, যদি আপনি ভারতে তৈরী ছুঁচের ওপর সম্পূর্ণ আস্থা রেখে চলেন।

সিঙ্গার* সেলাই কলের ছুঁচ কিনবেন। আর মনে রাখবেন, ওটা শুধু আস্থারই প্রশ্ন নয়, ওটা আপনার নিজের স্বার্থরক্ষার প্রশ্নও বটে!

সিঙ্গার – সবসময় ভাল জিনিসই পরিবেশন করে

প্রস্তুতকার•: সিঙ্গার-টিডিএস্ লিমিটেড, বাঙ্গালোর।
ব্যবসা-সংক্রান্ত অনুসন্ধানের জন্য যোগাযোগ করুন:
সিঙ্গার সোয়িং মেশিন কোম্পানী
সিঙ্গার বিল্ডিং, ২০৭, ডি. এন. রোড, বোম্বাই-১।
• সিঙ্গার কোম্পানীর রেজিস্টার্ড ট্রেডমার্ক
রেজিস্টার্ড ব্যবহারকারী: সিঙ্গার সোয়িং মেশিন কোম্পানী
SM 91 BN

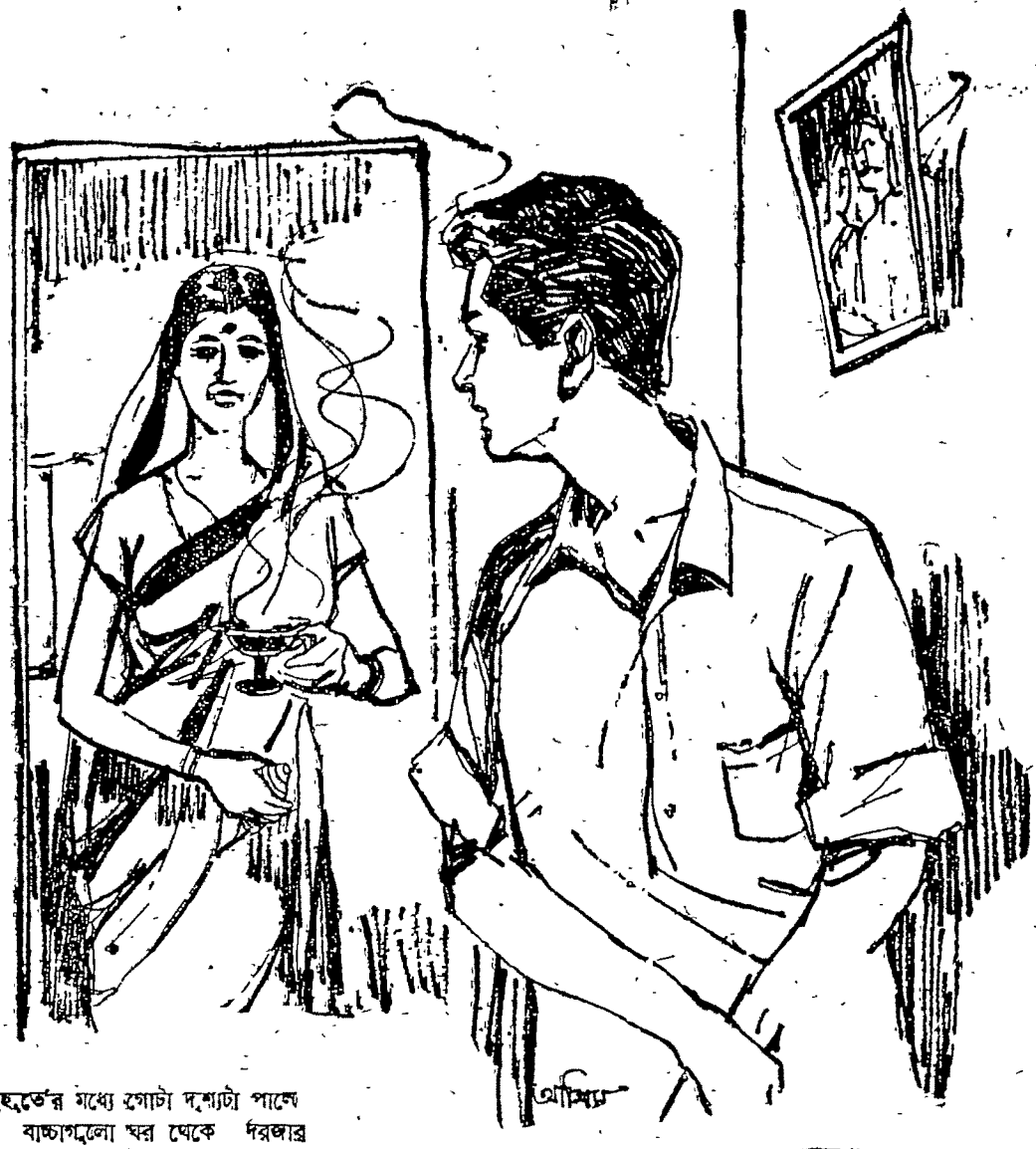

ফেরারী

রবীন রায়চৌধুরী

মুহূর্তের মধ্যে গোটা দৃশ্যটা পাল্টে গেল। বাচ্চাগুলো ঘর থেকে দরজার আড়ালে, আর সব বউয়েরা লজ্জা-পাওয়া চোখ নিয়ে যে-যার ঘরে, চঞ্চল বালিকারা যে-যার ফ্রক টেনে আর একটু ঝুঁকড়ে হাঁটু মুড়ে বসল। প্রবেশের সংগে সংগে মা'র ঘরটা দারুণ নির্জন হয়ে গেল।

ফিস্‌ফিস্ গলার শুনতে পেলাম কোন দ্রুত নেপথ্য নির্দেশ। রাতদিনের কিটা হাত কচলে ধুয়ে দাঁড়িতে এলো-মেলো কাপড়গুলো গুছিয়ে ঘরটা ঝাঁট দিল। উঠোনের নামা-ওঠার তিনটে জায়গায় গোবরজল দিয়ে গোল গোল করে ন্যাতা বুললো। এধার-ওধারে পড়ে-থাকা পিঁয়াজের খোসা, ডিমভাঙা, বাসি মুটির টুকরো আর সব জঞ্জাল পরিপাটি করে কুড়িয়ে ঘাটের দিকে চলে গেল।

ধূপ-ধুনোর গন্ধের সংগে মাকে ঘরে ঢুকতে দেখলাম। বাঁ হাতে ধুনুচি, ডান হাতে একটা লাল শাঁখা। মা'র চোখমুখ বড় ক্লান্ত মনে হল। নজরে পড়ল, তার পরনে নক্সাপাড় ময়লা শাড়ি। আমার দৃষ্টি কাপড়ের দিকে থাকায় মা ম্লান গলায় বলে উঠল, শীতকালে জামা-কাপড় বড্ড ময়লা হয়। মা'র সেই ধুনুচি হাতে চেহারাটা কৈফিয়তের সংগে সংগে আরো সঙ্কুচিত হয়ে পড়ল। আমি সেই পাক-দিয়ে-ওঠা সুগন্ধি ধোঁয়ার দিকে দৃষ্টি ফিরিয়ে নিলাম।

ধোঁয়াটা ঘুরতে ঘুরতে দেওয়ালে টাঙানো বাবা-মা'র ছবিটা ছুঁচ্ছে। ছবিটার কাঁচটায় কেমন বাদামী চটা পড়েছে। তবু বাবার গায়ের সেই কাশ্মীরী শালটা ঠিক চিনতে পারছিলাম।

মা'র রাজ্যের ছেঁড়া কাপড়ের ট্রাঙ্ক হাতড়ে এককালে বড় সুখ পেতাম। ট্রাঙ্কটা খুললেই একসংগে ন্যাপথলিনের গন্ধ, পশমের গন্ধ, পুরনো পোষাকের

সব সব নাকে এসে লাগত। কতদিন আমি ট্রাঙ্কের গর্ভে মাথা ঢুকিয়ে চাকনাটা ঘাড়ের ওপর ফেলে দিয়েছি। সেই অন্ধকার অন্ধকার আওতায় পোষাক-গুলোয় হাত বোলাতাম। কেমন কুসুম কুসুম আমেজ। আমি চোখ বুজতাম, নাক ঘষতাম। সারা গ্রীষ্মকালটা মাকে জ্বালিয়ে মারতাম—মা, কাপড়গুলো রোদ দেবে না, রোদে দেবে না।

এমনি ট্রাঙ্ক ঘাঁটতে ঘাঁটতে সেই শালটা আমার নজরে পড়েছিল। মাঝখানটায় জমি ঘিরে কী জমাট নক্সা! গোটা শালটায় বনেদীয়ানা থৈ-থৈ করছে। ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দেখতে দেখতে একটা ঘুণের মতো ফুটো ধরা পড়ল। চমকে শালটা আলোর দিকে তুলে ধরেছি। সেই আধো অন্ধকারে অজস্র নক্ষত্র দেখলাম। গোটা বনেদী শালটা ঘিরে নক্ষত্রের আলো!

শালকরকে অনেক টাকা দিতে হয়েছে। শাদা পাতায় মোম দিয়ে আঁক দিলে যেমন দেখায় তেমনি গোটা শালটায় রিপুর নক্সা। আমি জানতাম, বাবা দেখলে খুব খুশি হবেন। শালটাকে বাঁচাতে পেরেছি দেখে অন্তত সান্ত্বনা পাবেন।

ছবিটার নিচের দরজা দিয়েই বাবা ঢুকলেন। পরনে পাটভাঙা ধুতি। এমন অসময়ে ঘরে পাটভাঙা ধুতি পরতে দেখে অবাক হয়েছি। ন্যাপথলিনের গন্ধটা বড় নিকটে মনে হল। শালটার কথা বলতে যাব, দেখলাম, বাবা ঢলঢলে হাতে একটা চেয়ার টেনে আনছেন।

কোথায় যে বসাবি, সব নোংরা, বলে নিজেই পাটভাঙা কাপড়ের খুঁট দিয়ে চেয়ারটা ঝাড়তে লাগলেন। কুঁজো-হয়ে-থাকা বাবার পিঠের শিরদাঁড়াটা বেঁকে ধনুক হয়ে উঠেছে।

বোস্ বাবা বোস্, কদ্দুর থেকে এলি। মাকে বেরিয়ে যেতে দেখি নি তাই গলার স্বরে দরজার দিকে তাকিয়েছি। মা'র সেই ধনুর্চিধরা হাতে একটা পদ্মকাটা ডিস্, লাল শাঁখা হাতে একটা কাঁসার গেলাস। মা'র পেছনে পেছনে একটা বাচ্চা ছেলে একটা গোল টুল নিয়ে এল। বাবা চেয়ারটার সামনে টুলটা সাজিয়ে দিলেন। মা হাতের ডিস্, গ্লাস নামিয়ে দিয়ে পুনরায় অনুরোধ করার ভঙ্গিতে কিছু বলার আগেই আমি গিয়ে চেয়ারে বসলাম।

চেয়ারের পিছনে বাবা, সামনে মা। জানলায় লুকিয়েপড়া ছেলে-মেয়েদের চুল মাথা। দরজার গায়ে আর সব বাসা-বাড়ির বউদের ঘষামাজা মুখ। আমি সকলের চোখ খুঁজলাম। সবকটি চোখ আমার অনুগমন করছে। সব চোখের ভাষাই এক। সবটুকুতেই একটু দূরত্বের ছাপ। সবাইয়ের কাছে আমি দ্রষ্টব্য বিষয় হয়ে গেছি।

আমি হাতের বোতাম খুলে আলগোছে আঙুল ভিজিয়ে নিলাম। এতগুলো মানুষের মাঝে কেমন অস্বস্তি লাগছিল। অস্বস্তি লাগছিল, বাবা মা'র আর সবাইয়ের নিশ্চল প্রতীক্ষা লক্ষ্য করে।

আমি দু' আঙুলে সিঙাড়া নাড়াচাড়া করছি। মা'র সামনে সিঙাড়া নাড়তে নাড়তে মা'র কথাই বার বার মনে পড়ছিল। সিঙাড়া পেলেই তিনটে কোণ আগে ভাঙতাম। পরে আঙুল দিয়ে সিঙাড়া চটকে বাদাম, কিসমিস খুঁজতাম।

মা বকতো, দিলি তো সিঙাড়াটা চটকে। শেষে নিজেই ফলুই মাছের কাঁটা বাছার মতো অনায়াসে গল্প করতে করতে দু'-একটা বাদাম, একটা কিসমিস খুঁজে আমার হাঁ-করা মুখটায় দিয়ে দিত। পরে সিঙাড়ার পুরটা ভেঙে ভেঙে নিজে খেত। মা'র মুখে ঝাল ঝাল স্টা স্টা শব্দটা আমার ভীষণ ভাল লাগতো। আমি নড়তাম না। জানি, মা এরপর পান খাবে। মা'র পানচিবোনো মুখটার দিকে তাকিয়ে থাকতাম। মা ঠোঁটটা বেঁকিয়ে আড়-চোখে দেখতো। মা'র জিভ, ঠোঁট লালে লাল। আমাকেও মুখ বেঁকিয়ে ঠোঁট দেখতে দেখে, মা হাসত। শেষে মুখ থেকে চিবোনো এক টিমটে পান আমাকে দিত। কী খুশি, কী খুশি। আমি অমনি আরসি নিয়ে মা'র মতো আড়-চোখে ঠোঁট দেখতে বসতাম।

মা আজ আর কোন কিছুই বলল না। বাবা, মা আর সবাই চুপচাপ আমার খাওয়া দেখতে লাগল। আমি খুব যত্নে একটু একটু করে খেতে সুরু করলাম।

বাইরে কে যেন কড়া নাড়ল। বাবা খেয়ালই করলেন না। আমার চেয়ার ছাড়িয়ে বাবা তখন পায়চারী সুরু করেছেন। বাবার সেই অতি-পরিচিত পিছনে হাত রেখে ঘুরে বেড়ান চেহারাটা লক্ষ্য করলাম। বাবা বেড়াতে বেড়াতে আপন মনেই কিছু বলছিলেন। বাবার চশমার ওপর মোটা ভ্রু-দুটো টান টান। চোখ দুটো মাটির দিকে নামানো। আমি জানি, বাবার খুশি খুশি ভাবটা এবার ফুটে উঠবে। পেছনে-পড়ে-থাকা বাঁ মুঠির ওপরের খাঁজে ডান হাতের আঙুল দিয়ে শব্দ উঠবে। কৈশোরে এই শব্দ শোনার জন্য আমি সারাদিন আব্দারগুলো পুষে রাখতাম। শব্দ উঠলেই বাবা দরাজ হতেন। এমন কি একদিন আমার সংগে মার্বেল খেলতেও বসেছিলেন।

কিন্তু আঙুলে শব্দ ফোটার আগেই আবার সেই কড়া নাড়ার শব্দ, মাস্টার মশাই, মাস্টার মশাই।

বাবার ভ্রু-দুটো জোড়া হল। হাত দুটো সামনে এল। বাবার সওয়া ছ'ফুট ছায়াটা দরজা দিয়ে বেরিয়ে গেল। খুট করে খিল খোলার শব্দ। বাবার ভাঙা হাসি, আরে সামন্তমশাই, আসুন, আসুন।

কি ব্যাপার বলুন তো, আপনি ছেলেদের আজ একেবারে ছুটি দিয়ে দিলেন! রবিবারও আপনি বাদ দেন না, আজ একেবারে ছুটি! তাই ভাবলাম, কি হল একবার দেখে আসি। খবর সব ভাল তো?

বাবার কণ্ঠস্বরে খুশি ফুটলো, না, না খবর খুব ভাল। তরুণ তো অনেক-দিন পর এল তাই ছেলেদের ছুটিই দিয়ে দিলাম। তরুর অনেক গল্প শুনতে হবে তো!

আলাপচারী বাবার মধ্যে খুশির চেহারাটা অনুভব করে আমি একসময় উঠে পড়লাম। বাইরে ততক্ষণে কি দু' বালতি জল গামছা ঢাকা দিয়ে রেখে গেছে। মা একটু ঝুঁকে একটা বড় হাঁড়ি গরম জল নিয়ে এল। আমাকে নারকেল তেল চালতে দেখে বলল, রুপ, ওটা মাখিস না। শীতকালে চুলে নারকেল তেল জমে বড় আঠা হয়। দাঁড়া জবাকুসুম আনছি।

একটু পরেই শিশি হাতে মা ফিরে এল, দেখ তো, এটা খুলতে পারিস কি না। আমি তো পারলাম না। মুখটা ভাল করে কাটে নি।

আমি নতুন ফাইলটা নিয়ে নাড়াচাড়া করলাম। মা'র বড় প্রিয় তেল। এককালে মাকে এই তেল নিয়ে বাবার ওপর অভি-মান করতে দেখেছি। আজ আর নারকেল তেল চুলে মাখলে মা'র অভিমান হয় না। আঠার কথা মনে পড়ে না। তেলটা রেখে দেবার কথা ভাবতে পার-ছিলাম না। অনুযোগ করার সংগে সংগে বাবা-মা'র চেহারাটা পাল্টে যেত। সঙ্কোচে আর সামনে আসতে পারত না। আমার সামনে থেকে আড়ালকরা সংসা-রের চিত্রটা এক মুহূর্তে প্রকট হয়ে উঠত। সে আঘাতে বাবা, মাকে ভীষণ বিষণ্ণ, ব্যথিত দেখাত। তাঁরা খুব অসহায় হয়ে পড়তেন।

মুঠোর চাপে খুলতে না পেরে দাঁত দিয়ে ঘুরিয়ে চাপ দিলাম। কট্ কট্ করে শিশির মুখটা খুলে গেল। ধূপ-ধুনো ও ন্যাপথলিনের গন্ধের সংগে ফুলেল তেলের গন্ধ মিশল। আমি হুস্, হুস্, করে মাথায় জল ঢালতে লাগলাম।

ঘরে ঢুকেই কেমন অন্যরকম লাগল।

বিছানায় পাটভাঙা চাদর, ট্রাঙ্কের ওপর জড়োকরা ছেঁড়া কাপড়ের পুঁটলির ওপর পাড়ের ঢাকা, বালিশগুলোয় ফরসা খোল। জানলা দিয়ে খানিকটা কাটা রোদ এসে সবটাই পাল্টে দিয়েছে।

ঘরের মাঝখানে একটা ক্রচেটের কাজ-করা আসন পাতা। তার চার ধারে শাড়ির পাড় ফুল করে বসানো। ডানপাশে কাঁচের ডিস ঢাকা কাঁসার গেলাস। ভেবেছিলাম সেই আগের মতো বাবাও খেতে বসবেন কিন্তু বাবার জায়গা দেখলাম না। চুল আঁচড়াতে আঁচড়াতে পাশের ঘরে গিয়ে দেখি বাবা নেই, দরজা ভেজানো।

পরার জন্য মা তার লালপাড় বাসন্তী রঙের শাড়িটা বার করে দিয়েছে। খোলের রঙ ফিকে হয়ে এলেও পাড়ের রঙ এখনও টকটকে লাল। লাল লাল সেই স্মৃতিটা আজো জীবন্ত মনে হল। ঢেউয়ে ঢেউয়ে পুনরায় সেই লালপাড় বাসন্তী রঙের দৃশ্যটা মনে পড়ল।

নৌকোর খুব ধার ঘেঁষে বসেছিলাম। মা অদূরে থেকে মাঝে মাঝেই ধমক দিচ্ছিল, অত ধারে যাচ্ছিস কেন, পড়ে যাবি। আমি কিন্তু ততই ধারে ঝুঁকছিলাম। কেন ঝুঁকছিলাম সে কথা সেদিন মাকে বোঝাতে পারি নি। তখন কতই বা আমার বয়স, হয়ত বোঝানোর মতো ভাষাই ছিল না।

ছৈ-অলা নৌকোটা ঘাট ছাড়ার পরই আর সব নৌকো, পাড়ের মানুষ, কৃষ্ণচূড়ার ফুল জলে ভাসতে দেখলাম। মাস্তুল, গোটান পাল, গুণের দড়ি, লম্বা হাল সব ক্রমেই দূরে চলে যাচ্ছিল। রামকৃষ্ণদেবের মন্দিরের ছায়া হারিয়ে যাওয়ার সাথে সাথে পাড়ের শেষ কোলাহলটুকু মিলিয়ে গেল। কানে তখন শুধু দাঁড় পড়ার ছপ্ ছপ্ শব্দ, উজান গঙ্গার ছল ছল শব্দ, নৌকার দ্রুত স্রোত কাটার তির্ তির্ শব্দ খুঁজতে গিয়ে কিনারে আরো ঝুঁকেছি। দাঁড়ের তালে গঙ্গার জল ছিটকে এসে মুখে-চোখে পড়ছে। আমিও দাঁড়ের মতো হাতের পাতা দিয়ে জল কাটতে গিয়ে দেখি, আমার দু'চোখ জুড়ে লালপাড় বাসন্তী রঙের শাড়ি। চমকে মা'র দিকে ঘুরে তাকিয়েছি, আমাকে ঝুঁকতে দেখে মা এগিয়ে এসে একহাতে আমায় আগলে ধরে বকছে। আমার কানে তখন কিছুই ঢুকছিল না। আমার অনুভূতিতে শুধু সেই দৃশ্যটাই ভাসছে। গোটা গঙ্গাটা বুঝি লালপাড় বাসন্তী রঙে ভরে উঠেছে। ঢেউগুলো ভেঙে ভেঙে দূরে মিলিয়ে যাচ্ছিল। লালপাড় বাসন্তী রঙের শাড়িও যেন দুলতে দুলতে ঢেউ হয়ে উঠছিল। গোটা গঙ্গা পারাপারটা আমি তাই ঝুঁকে ঝুঁকে সেই দৃশ্যই দেখছিলাম। দক্ষিণেশ্বর যাত্রায় আমার আর কোন স্মৃতি জীবিত নেই।

আর দেরি করিস না রুণ। সেই কখন খেয়েছিস্। মা'র কণ্ঠস্বরে আমার তন্ময়তা ভাঙল। আমি আসনপিঁড়ে হয়ে তর্পণ করার চারিদিকে জল ছিটিয়ে খাওয়ায় মন দিলাম। শুক্তো দিয়ে এক গ্রাস মুখে দিয়েছি, আঃ তৃপ্তির হারানো সুখটুকু যেন খুঁজে পেলাম। আমি সেই শৈশবের দিনগুলোর মতো ভাত নাচাতে নাচাতে শুক্তো, ঘন্টো, চচ্চড়ি একে একে সবকটি পদ শেষ করলাম। এই সময় আমার ভাবনাগুলো কোথায় হারিয়ে গিয়েছিল। আমি যেন পুরনো তৃপ্তির তাড়ায় দারুণ নিষ্ঠার সংগে খাচ্ছিলাম।

ফুলকাটা বাটিটা কাছে টেনে অবাক হলাম, একটা মস্ত মুড়ো! জলে-ডোবা মানুষের চোখের মতো মাছের একটা চোখ ডব্‌কা হয়ে তাকিয়ে আছে। কাম্‌-কোর কাছে শ্যাওলা শ্যাওলা কালো কালো দাগ। গা ঘিন্ ঘিন্ করে উঠলো। ইচ্ছে হল বলি, মা তুমি আমার গোটা শৈশবকালটাই ভুলে গেছ। মা, তুমিই তো প্রথম আবিষ্কার করেছিলে, মাছের মুড়ো দেখলে আমার গা বমি বমি করে। অথচ তুমিই আজ আমার পাতে মুড়ো তুলে দিলে!

পাখীবৌদি আমার মাছ খাওয়া দেখে হাসতো। তার ভীষণ ঝকঝকে চোখ দু'টোয় অদ্ভুত এক হাসি ফুটিয়ে বলত, তোমার কিস্যু হবে না ঠাকুরপো, তুমি মাছের মুড়োই খেতে পার না।

পিঁড়ের ওপর উবু হয়ে বসে-থাকা বৌদির পায়ের গোছার দিকে তাকিয়ে নীল নীল শিরা, পাতলা লোম, লালচে নখ চোখে পড়ল। টান টান পায়ের পাতার দিকে তাকিয়ে বলেছিলাম, মুড়ো খেলে কি হয়?

বৌদি নিচের ঠোঁটটা দাঁত দিয়ে কেটে, দু'চোখে এক ধরণের হাসি ফুটিয়ে বলেছিল, বলা নিষেধ, তোমার মতো বালকদের ওসব জানতে নেই।

আমি পাখীবৌদির চোখ দু'টোর দিকে তাকিয়ে থাকতাম। বৌদির কানের লতির ওপর লাল পাথর দু'টো জ্বলত। বৌদির ঐসব রসিকতা লাল পাথরের মতোই রহস্য হয়ে থাকত। আমি মাছের মুড়োর সংগে বিবাহের কোন সম্পর্ক খুঁজে পেতাম না। শেষে বুঝেছিলাম, মাছের মুড়োটা উপলক্ষ্য মাত্র।

আজ কিন্তু পাতে মা'র নিজের হাতে তুলে-দেওয়া মুড়ো দেখে বেশ অভিমান হচ্ছিল। আমি হয়ত অনায়াসে ভাঙা ভাঙা স্বরে মাকে হারানো দৃশ্যগুলো মনে করিয়ে দিতে পারতাম কিন্তু মা'র সর্বাঙ্গে অবসাদ দেখে কিছুই বলতে পারি নি। মনে মনে বলেছিলাম, মা তোমাদের সব সাধ আমি মেটাব। তোমরা যদি আমাকে এইভাবে অতিথির মতো যত্ন করে সুখী হও, আমি তোমাদের দুঃখ দিতে চাই না।

আমার তন্ময়তা ভেঙেছিল বাবার ডাকে, কি রে, তোর খাওয়া হয়ে গেল? বাজার যেতে যেতে ভাবলাম, মণিবাবুদের মেসে তোর আসার খবরটা দিয়ে যাই। তোর নানান গল্প তো ওদের কাছে করেছি। তোর সংগে আলাপ করার ওদের খুব আগ্রহ। ওদের ওখানেই দেরি হয়ে গেল। এখন আর কি দই ভাল লাগবে?

আমাকে উত্তর দেওয়ার আগেই মা বলল, কতটুকুই বা খেল। এ খোড়া দেশে কি কিছু পাওয়ার উপায় আছে। আর একমুঠো ভাত দিয়ে বরং দইটা মেখে নে।

মা'র কণ্ঠস্বরে কি কেন ছিল। আমি যুগপৎ উভয়ের দিকে তাকিয়ে বাবার দ্বিধা, সঙ্কোচ, মা'র স্পর্শকাতরতা লক্ষ্য করলাম। আমি কোন উত্তর না দিয়ে নিঃশব্দে খেয়ে উঠে পড়লাম।

মা'র খাওয়া এখনও হয় নি। পাশের ঘরে শুকনো আমলকি চিবতে চিবতে শুয়ে আছি। ভেজানো জানলা, দরজা দিয়ে আবছা আবছা আলো আসছে। ক্লান্তি, ঘুম, নির্জনতা ছাড়িয়ে আমার মনে অনেক যত্নে রাখা স্মৃতি সব নড়ে-চড়ে উঠেছিল। এই পাটভাঙা, ধূপ-ধুনো ন্যাপথলিনের গন্ধভরা চাদরে শুয়ে, ফুলেল গন্ধের আওতায় আমার বার বার মনে হচ্ছিল, আমি প্রবাস থেকে ফিরে স্বগৃহে অতিথি হয়েছি। মা, বাবা সংসারের চেহারাটা আড়াল করে, সবটুকু সুখ আমার পাতে তুলে দিয়ে অতিথিসেবা করছেন। এতদিনকার যত্নে রাখা মা-বাবার চিত্রটা ক্রমেই অপরিচিত, অচেনা কিছু মনে হচ্ছে। আমি আমার উপযুক্ত বয়স, যোগ্য চাকরি, স্বতন্ত্র ভাবনা নিয়ে বাবা-মা'র কাছে বিশেষ সমাদরের বস্তু হয়ে উঠেছি।

দীর্ঘ প্রবাসের দিনগুলো যে স্মৃতি নিয়ে কাটত আজ তার কোথাও কোন মিল নেই। অনেক অর্থ দিয়ে সেই জীর্ণ শাল গায়ে বাবা-মা'র ছবিটার কপি করিয়েছিলাম। আমার ডর্মিটরীর কুলুঙ্গের মধ্যে বাঁধিয়ে রেখেছিলাম। মনে করে প্রতি সন্ধ্যায় ধূপ জ্বালাতাম। নিমেষে ধূপের ধোঁয়ার মধ্যে কয়েকটি বিশেষ দৃশ্য ভেসে উঠত। সুজনীর ওপর মা'র পাশে চুপচাপ শুয়ে থাকা, মা'র ছোট্ট বিনুকে নিয়ে পিট্ পিট্

জামাটি মারা, পান চিবোনো লাল মুখ থেকে এক চিমটে পান তুলে দেওয়া, স্কুল থেকে ফেরার সময় সেই উৎকণ্ঠিত প্রতীক্ষা—মা'র এই সব চিত্রগুলো সেই বাঁধান ফ্রেমের মধ্যে জীবন্ত হয়ে উঠল। আমি পরম তৃপ্তিতে মাকে প্রণাম করতাম। পাশে দাঁড়িয়ে-থাকা বাবার সেই ব্যক্তিত্ব-পূর্ণ চেহারাটার দিকে দৃষ্টি পড়ত। অসঙ্কোচে বাবার সোনালী চশমা, গলা-বন্ধ কোট, কালো নিউকাট জুতো প্রতিটি অংশ দেখতাম। বাবাকে বড় ক্লান্ত, বড় উদাসীন মনে হোত। আমি বিড়বিড় করে মন্ত্রোচ্চারণের স্বরে বলতাম, বাবা, বাবা এই তো আমি। আমি তরুণ। আমি বড় হয়েছি, চাকরি পেয়েছি, তোমার এত চিন্তা কিসের? বাবার সম্মুখে দাঁড়িয়ে একসঙ্গে এত কথা কখনো বলতে পারি নি। বাবার ব্যক্তিত্ব, অন্যমনস্কতার কাছে সহজেই মাথা হেঁট হয়ে যেত। তাই আমার সেই নির্জন ঘরে বাবার ছবির দিকে তাকিয়ে সাহস অর্জন করতাম। মনে মনে সঙ্কল্প নিতাম, এবার বাড়িতে গিয়ে বাবার মুখোমুখি দাঁড়িয়ে ঐ সব কথা বলব।

কিন্তু মা, মা'র শেষ চিঠিতে লেখা ছিল, 'বাবা, তুমি উপযুক্ত...দেশের মুখ উজ্জ্বল...তোমার উত্তরোত্তর শ্রী...কিন্তু আমি...আমার বুকের সেই ব্যথা...মাকে মাকে আমি জ্ঞান হারিয়ে...বড় সাধ বউ-মার হাতে ঘর-সংসার...কিন্তু তুই...' চিঠি হাতে মা'র দিকে তাকিয়ে সেই নির্জন ঘরে বুকে কান্না ডুকরে উঠেছিল। আমার চিন্তায় মৃত অনেক ভাললাগা স্বপ্ন পুনর্জীবিত বলে মনে হল। আমার সমস্ত স্নায়ু প্রত্যঙ্গ তখন শুধু প্রতিধ্বনি তুলেছে, মা, মা, মা।

মা'র ছবির দিকে তাকিয়ে সেদিন অনেক কথা বলেছিলাম, মা, বিয়েতে তো আমার কোন আপত্তি নেই কিন্তু বড় আশঙ্কা, আমি এগোতে পারি না। বিয়ের নামে আমি সুখ পাই কিন্তু সাহস পাই না।

না, মা, তেমন কেউ আমার জন্য প্রতীক্ষা করে নেই। কারুর সঙ্গে আমার সম্পর্ক অতদূর গড়ায় নি। কাউকে নিয়ে নিবিড় হয়ে ওঠায় আমার বড় যন্ত্রণা।

মা, তোমার কষ্ট আমি বুঝি। তোমারও তো ইচ্ছে করে; দিদির স্থান আর কেউ এসে পূরণ করুক।

আমারও কি কষ্ট নেই? বন্ধুদের একে একে বিয়ে হয়ে যাওয়া, অবিবাহিতা মেয়েদের চোখে-মুখে আমার জন্য শ্রদ্ধা, সম্মান ফুটে ওঠা, আমার অভিভাবকত্বে অনূঢ়া মেয়েদের অবাধ যাতায়াত—মা, তোমায় বোঝাতে পারব না, কী তীব্র বুকফাটা বেদনা আমি বয়ে বেড়াচ্ছি। মেয়েদের লজ্জিত, বিব্রত, উত্তেজিত করার সব সামর্থ্যই বুঝি আমার শেষ হয়ে যাচ্ছে। বৌদিরা আর আমাকে নিয়ে তেমন রসিকতা করে না। নির্জন ঘরে একে একে ফিরে যাওয়া স্বপ্নকে আমিও দেবীর মতো ধরে রাখতে পারতাম কিন্তু সেই না পারার গ্লানি আমাকে কতখানি অসহায় করে তোলে আমি কাউকে বোঝাতে পারি না।

মাসীমা, তরুদা নাকি এসেছে, সত্যি! মুহূর্তে সেই নির্জন ঘরে আমার আত্মমগ্নতা ভেঙে গেল। পাশের ঘর থেকে মা ও সেই তরুণীর টলটলে কণ্ঠস্বর শুনতে পেলাম।

কী আশ্চর্য, এখনও আমার বুকে কোন যুবতীর শব্দে, কোন যুবতীর নামে, কোন যুবতীর উপস্থিতিতে এক ধরণের তিরু তিরু ঝর্ণার সাড়া পড়ে যায়। আমি এখনো বুঝি একটি কুমারীর জন্য অনেক ছেলেমানুষী কাণ্ড করে ফেলতে পারি।

ঘরের ভেজানো কপাট খোলার আওয়াজ হল। সেই আবছা অন্ধকার থেকে দেখতে পেলাম, একটি নবীন পরিপাট্য অবয়ব।

তরুদা, ঘুমিয়েছ?

আমি অনায়াসে সাড়া দিতে পারতাম কিন্তু এমন সব মুহূর্তে অনির্দিষ্টকাল প্রতীক্ষা করায় যেন কত সুখ।

মেঘলাকে অন্ধকার ঠেলে এগিয়ে আসতে দেখলাম। মেঘলার কণ্ঠস্বর আমি চিনতেই পারি নি। কত বছরই না পেরিয়ে গেল। সেই সব পরিচিত চঞ্চল, ছটফটে সুরগুলো কোথায় হারিয়ে গেছে। এখন ওর সাড়া-শব্দে একটা নারীর উপস্থিতি ফুটে ওঠে।

চৌকি বরাবর ও এগিয়ে এসে একটু সুর করে ডাক দিল, তরুদা, তরুদা।

উঁ; কে?

তরুদা, তুমি ঘুমিয়েছ?

কে মেঘলা, আয় বস্।

মেঘলা হাত বাড়িয়ে সামনের জানলাটা খুলতে খুলতে বলল, আমার যে কি বিচ্ছিরি লাগছে না, তুমি আসবে জানলে আর ক'টা দিন পিছিয়ে দিতাম। কিন্তু আজই আমায় কল্যাণী ফিরে যেতে হচ্ছে। দেখা না করে গেলে তুমি আবার রাগ কর তাই এই বেলাতেই চলে এলাম। তোমার রাগ তো আমি জানি।

খোলা জানলার পাশে দুপুরের আলোয় মেঘলার সেই ঘন নিবিড় চুলের মধ্যে টকটকে সিঁদুরটা বড় উজ্জ্বল দেখাচ্ছিল। মেঘলার সেই ভরাট স্বাস্থ্যটা, তার তৃপ্তির চেহারাটা তার অদ্ভুত এক ভঙ্গিতে ঠোঁট কাঁপিয়ে কাঁপিয়ে কথা বলা—সব কিছু আমার কাছে বড় বেশি রহস্যময় বলে মনে হল। আমি মেঘলার চোখের দিকে তাকিয়ে হাসতে চাইলাম। একদিন এর সঙ্গে আমার বিয়ের সম্বন্ধ হয়েছিল।

তোমায় কিন্তু কেমন শুকনো—

আমার কথা থাক্, তোর কথা বল। মণীত কি তোকে নিতে আসবে?

ওঁর কথা আর বল না। ওঁর সময় কই? ফার্ম নিয়ে দারুণ ব্যস্ত। একটা মেসিনের ইম্পোর্ট নিয়ে দিল্লী-কলকাতা আর স্পেয়ার পার্টসের এক্সপোর্ট নিয়ে পার্টি পাসপোর্ট করছে। এই পাড়াগাঁয়ে আসতে তার বয়েই গেছে।

ঝরঝর করে মেঘলা একসঙ্গে অনেক কথা বলে গেল। স্বামীর ইন্‌কাম-ট্যাক্স থেকে রেড ট্র্যাঙ্গেল পর্যন্ত সব কথা কত নিপুণতার সঙ্গে কত অভ্যস্ত গতিতে বলে গেল। পরে বুঝেছিলাম, ওর কথা বলার সময় ঐ যে বিচিত্র ঠোঁট কাঁপা এটা তার স্বামীর আয়ের একটা অনিবার্য প্রতিক্রিয়া। মেঘলার চেহারাটা দিন দিন অভিজাত হয়ে উঠেছে।

এই রকম নানান সংবাদ দিয়ে ও একসময় উঠে দাঁড়াল। এই দীর্ঘক্ষণ আলোচনায় আমার কোন কথাই বলা হয় নি। এ নিয়ে ওর কোথাও অস্বস্তি ছিল না। নিজেকে নিয়ে নিজের কথা নিয়ে ও তখন ভীষণ ব্যস্ত। তাই বার বার মনে হচ্ছিল, ও সুখী। ওর তৃপ্তি তাই ওর কণ্ঠস্বরে অত সহজে নিটোল আওয়াজ তোলে। ওর সুখ, ওর তৃপ্তিতে আমি কোন সান্ত্বনা পাচ্ছিলাম না। মনের কোথাও একটা ছোট্ট প্রত্যাশা, ও যদি আরো একটু কম সুখী হোত! অবশেষে আমি দেখলাম, একটা জীবন্ত সুখ কত অনায়াসে আমার ঘরের চৌকাঠ ডিঙিয়ে আলোয় হারিয়ে গেল।

ঝিমভাবে পড়ে থাকতে থাকতে আমি একসময় ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। মা কখন ঘরে ঢুকেছে, জানলাগুলো খুলে দিয়েছে জানতে পারি নি। কপালে একটা ঠাণ্ডা হাতের স্পর্শ পেয়ে চোখ মেলে তাকিয়েছি —মা।

রুপ, তোর কি শরীর খারাপ লাগছে, মা কপালে হাত বুলোতে বুলোতে বলল।

মা, তোমার খুব কষ্ট, না মা? কেন যে বোকার মতো প্রশ্নটা করলাম।

প্রশ্নটা শুনে মা'র হাতটা একটু থেমেছিল। একটা রুদ্ধ শ্বাস আমার মুখ ছুঁয়ে নেমে গেল। মা'র সেই শীতল হাতটা আমার কপাল, চিবুক, চোখদুটো

থেমে থেমে স্পর্শ করছিল। আমি সেই হারানো শিশুকালের মতো মা'র সান্নিধ্যে ঘনিষ্ঠভাবে শুয়েছিলাম।

মা, তুমি আমার সঙ্গে চল না। এখন ওখানকার ক্লাইমেট খুব ভাল। তুমি দু'দিনেই সুস্থ হয়ে উঠবে।

মা কেমন এক ধরণে হাসল, আমার আর সুস্থতা। মেঘলা যে ক'দিন ছিল বেশ কাটত। ওর তো আরো দিন পনের থাকার কথা। অথচ আজ বলল, কালই চলে যাবে। কি যে খেয়ালী হয়েছে। স্বামীটা তো একটা অমানুষ। না হলে মেঘলার মতো মেয়ের চোখে জল আসে।

কি বলছ মা। আমার সামনে তখন মেঘলার সুখী-সুখী চেহারাটা ভাসছিল।

হ্যাঁ রে। প্রথমে তো কিছু বলতেই চায় নি। কিন্তু মা'র চোখ কি ফাঁকি দিতে পারে। ওকে তো সেই ছেলেবেলা থেকেই দেখছি, বন্ড চাপা। একদিন আর এড়িয়ে যেতে পারল না, কান্নায় ভেঙে পড়ল, মাসীমা, আমি এত টাকা পয়সা, সম্মান কিছু চাই নি, শুধু একটু মমতা, ভালবাসা। আপ্রাণ চেষ্টা করেছি কিন্তু ওকে ফেরাতে পারি নি। ওর সব অত্যাচার মুখ বুজে সহ্য করেছি। যখন আর পারতাম না তখন কেঁদে ফেলতাম। ওর কিন্তু কোন ভ্রূক্ষেপ ছিল না। প্রথম দু-একদিন রাতে ফিরত পরে তাও বন্ধ হয়ে গেল।

একদিন ওর পিঠে সেই কালসিটে দাগগুলো দেখিয়েছিল। বাবা-মা'র স্নেহ তো পায় নি তাই একটু ভালবাসার ও এত কাঙাল। অথচ তুই যদি তখন একটু মত দিতিস, ওর ভাগ্যটা অন্যরকম হোত।

মা'র কথায় আমার বুকে অনেক পুরনো ব্যথাটা মোচড় দিয়ে উঠল। মেঘলার চেহারায় সুখ, কণ্ঠস্বরে তৃপ্তি যে কতবড় মিথ্যে এ-মুহূর্তে তা তীব্রভাবে অনুভব করলাম। আমি আসার সঙ্গে সঙ্গে ওর ফিরে যাওয়াটা তাই অনিবার্য হয়ে দাঁড়াল। এক তীব্র অভিমানের যন্ত্রণা নিয়ে ও ক্রমেই দূরে, অনেক দূরে সরে যাচ্ছে। আমার স্নেহ, প্রেম, সহানুভূতির কাছে তার আর কোন প্রত্যাশা নেই।

মা'র কথাগুলো আমায় বড় উন্মনা করে তুলেছিল। হারিয়ে-যাওয়া অনেক সত্য-মিথ্যা তখনও যে ঝিমিয়ে ঝিমিয়ে বুকের মধ্যে জ্বলছিল, যা আমি কখনো জানতে চাই নি, যা এড়িয়ে গিয়ে নির্বিকার থাকতে চেষ্টা করেছি, আজ মা'র আশ্রয়ে সেগুলো যেন পুনর্বার প্রশ্ন হয়ে দাঁড়াল। মা,—একটা শিশুর মতো নিশ্চিন্তে বার বার ঐ নামে ডাকতে ইচ্ছে করছে। ঐ ডাকটা আমার স্নায়ুতরঙ্গে প্রতিধ্বনি তুলছে। অবশেষে ঐ শব্দটির মধ্যে আমি সান্ত্বনা খুঁজতে শুরু করলাম।

আমার আর কিছুই ভাল লাগে না মা। কেমন যেন সবকিছু বড় জটিল, বড় অভিসন্ধিমূলক বলে মনে হয়। নিজেকেই আর তেমন বুঝতে পারি না। নিজের মধ্যেও যেন একটা অবিশ্বাস মাথা-চাড়া দিচ্ছে। আমি যেন নিজের সঙ্গে নিয়ত প্রতারণা করে চলেছি। অথচ নিজের সঙ্গে আর কাউকেই সুখী করতে পারলাম না।

বাবা, মিথ্যে আমায় নিয়ে গর্ব করে। আমি জানি, সব্বাই পেছনে হাসে, আমাকে নিয়ে মস্করা করে। বাবা সারা জীবনের পরাজয়কে ভুলতে শেষ বয়সে আত্মবিশ্বাস হারিয়েছেন। আমার আপাত-সাফল্যে নিজের গ্লানি ঢাকতে চাইছেন। কিন্তু তাতে তাঁর দুঃখ কমলো কই ?

মা, তোমার শেষ সাধও আমি মেটাতে পারলাম না। তোমার সাজানো সংসারের স্বপ্নটা তুমি নিজের হাতে-গড়া কাউকে দিয়ে যেতে পারলে না।

মেঘলা, সেও সুখী হল না। সেও তোমার কাছে কেঁদে গেল। তার অভিমান যে কত মর্মান্তিক, এখন বুঝতে পারছি। ও-ও আজ নিজের সঙ্গে প্রতারণা করে চলেছে।

মা, আমি দিন দিন ক্লান্ত হয়ে পড়ছি। আমি আর নতুন কিছু চিন্তা করতে পারি না। চাকরীতে কেমন যেন ভয় হয়। মানুষের ঘনিষ্ঠতায় নিজেকে বড় অসহায় মনে হয়। পৃথিবীতে বেঁচে থাকার দিন-গুলো যেন ক্রমেই সংক্ষিপ্ত হয়ে আসছে।

মা'র দিকে তাকিয়ে আমার চোখ দুটো জ্বালা করে উঠল। মা'র চোখে জল। আমার মধ্যেও কান্নাটা সংক্রামিত হচ্ছিল। আমার জন্যেও কেউ কেউ চোখের জল ফেলে। মা, পৃথিবীর কারুর কাছে আমি এটুকু সান্ত্বনাও পাই নি। আমার অনেক যন্ত্রণা কেউ বোঝে নি। কারুর চোখেই এমন সহানুভূতি, মমতা ফুটতে দেখি নি। দূর থেকে নিকট হবার বাসনা আমাকে তাই নিয়ত প্রতারণা করে চলেছে।

কিন্তু মাকে কিছুই বলতে পারছিলাম না। সেই নিস্তব্ধ ঘরে মা'র আশ্রয়ে মা'র কান্নার মধ্যে আমি এক অসীম প্রশান্তির সন্ধান পেয়েছিলাম। বহুদূর প্রবাসী দিন-গুলোর সব বেদনা, সব কল্পনার গ্লানি নিমেষে মুছে গেল। বহুদিন পর আমিও কাঁদতে পারলাম।

বিকেলে চা খেয়ে সোজা পশ্চিমে হাঁটছিলাম। ইঁটখোলা পেরিয়ে, বাগানের পাশ দিয়ে বড়মুড়ির দিকে হাঁটছিলাম। এখানে এলেই আমি মুড়ির ধারে বেড়াতে যাই। দু' পাশে দিগন্তজোড়া ধানক্ষেত, মাঝখানে ঐ খাল। সে সময় ঘোলা ঘোলা জলে খালটি থৈ-থৈ করত। আমি গুটিকয় বালক-বালিকা নিয়ে ওর ধারে-কাছে বেড়াতে যেতাম। পাড়ে বসে সকলে গলা খুলে গান গাইতাম। কখনো কখনো আমি মাঠে নেমে দূর কোন গাছকে উদ্দেশ্য করে চিৎকার করতাম, ওরা বাতাসে কান পেতে থাকত। আমি ওদের প্রতিধ্বনি চিনতে শিখিয়েছিলাম। আমি সকলকে ডেকে ডেকে এনে সন্ধ্যাকাশে শর্মিলা, চিত্রা, অরুন্ধতী প্রভৃতি নক্ষত্র চিনিয়েছিলাম। শালতি চড়ে ভাসতে ভাসতে ওরা অনেক অপরিচিত শব্দ, ইঙ্গিতের সঙ্গে পরিচিত হয়েছিল। ওরা অনায়াসে চাঁদের আয়তন দেখে প্রতিপদ, একাদশী, অমাবস্যার খবর দিতে পারত। পাখীর ডাক শুনে কত অবহেলায় একটি, দুটি, তিনটি...সংখ্যা বলে দিত। ঘাসের বাতাস কাটা দেখে প্রবীণ নাবিকের মতো কত নিপুণভাবে ঝড়, বৃষ্টি, রোদ্দুরের সংবাদ দিতে পারত।

কিন্তু আমি বা ওরা যা পারি নি, মেঘলা তারই সন্ধান দিয়েছিল। ফ্রক পরে এক কোমর চুল নাচাতে নাচাতে থিতিয়ে-যাওয়া জলে নিজের প্রতিবিম্ব চিনতে শিখিয়েছিল। সেই থেকে ছেলেমেয়েরা জলে মুখ নামিয়ে মুখোমুখি হোত। কখনো হাসত, কখনো আপন মনে সংলাপ শুরু করত। তাদের সেই অবনত শরীর, বিচিত্র আলাপ দেখে-শুনে আমি পাড়ে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে হাসতাম। ওদের মতো সারিবদ্ধ হয়ে মুখ ঝুঁকিয়ে আমারও নিজেকে দেখতে ইচ্ছে করত। ইচ্ছে প্রবল হয়ে ওঠার আগেই আমি একটা নুড়ি কুড়িয়ে জলে ছুঁড়তাম। টুপ্ করে একটা আওয়াজ তুলে নুড়ি তলিয়ে যেত। আর সঙ্গে সঙ্গে সবকটি আনত শরীর তীব্র-বেগে আমার দিকে মুখ ফেরাত। সব কটি চোখে ভীষণ রাগ ঝক্‌ঝক্ করে জ্বলে উঠত। চার বছরের তিতিরের চোখেও পর্যন্ত সেই রাগ। শুধু রাগ ছিল না মেঘলার চোখে। মেঘলার চোখে তখন দু' ফোঁটা জল। আমি মুখ ফিরিয়ে নিতাম। আপন খেয়ালে হাততালি দিয়ে মাঠাল ঘুঘু তাড়াতাম।

আজো সেই বুড়ো বাবলার ডালে অজস্র হলদে ফুল। আমি হলদে ফুলের গালচে মাড়িয়ে অদূরে খালটার দিকে এগোচ্ছিলাম। নয়নজুলিটা ডিঙিয়ে, উঁই ঢিবিটা পেরিয়ে দূর থেকে পাড়ে-বসা একটা শরীর দেখলাম। মাছ ধরার মতো হাঁটুভাঙা, হাঁটুর মধ্যে মাথা গুঁজে জলের দিকে মুখ নামিয়ে বসে আছে। ওপারের শ্যাওড়াবনটার পটভূমিকায় ঐ হাঁটুভাঙা শরীর দূর থেকে চিনে ওঠা কঠিন। যত কাছে এগিয়ে যাচ্ছিলাম ততই একটা অনুমান স্পষ্ট হচ্ছিল। বিস্তির খালটা পেরিয়ে চমকে উঠলাম, জলের দিকে মুখ

ফিরিয়ে বাবা বসে আছে। পায়ের গতি যেন আপনা থেকেই থেমে আসছিল। মজা খাল, কাদাজল, ফেনাধরা পাড়, তগিতে গাঁথা পচা ফোলা ব্যাঙ সব কিছুর সঙ্গে বাবার অস্তিত্বটা এক হয়ে গেছে। সন্ধ্যা-পূর্বে সেই পরিবেশে বাবার জলে মুখ ফেরানো শরীরটার আর অন্য অর্থ ছিল না।

প্রতিটি মুহূর্ত আমায় কেমন বিষণ্ণ করে তুলছিল। বাবাকে বড় অসহায়, বড় ক্লান্ত, বড় অবসন্ন মনে হচ্ছিল। বাবার শেষ জীবনটা কি এমনভাবে মজাখালের পাড়ে বসে কাটবে! বাবা, তোমার দুঃখ কোথায়? শুধুই কি সংসারের নিত্য টানাপোড়েন না হারানো জীবনের মনস্তাপ? আমি বাবার সেই বিষাদগ্রস্ত শরীরের পাশে গিয়ে বসতে পারছিলাম না। আমার নির্জন ঘরে বাবার ছবির দিকে মুখোমুখি দাঁড়িয়ে যে-সব কথা বলেছিলাম, যা এবার বলব বলে সংকল্প করেছিলাম, আমি তার কিছুই পারলাম না। বাবার ঐ বিষণ্ণতা আমার সহ্য হচ্ছিল—না—সেই খালের মুখ, স্মৃতি, সন্তাপ সব কিছু অদূরে রেখে আমি ভিন্ন পথ ধরলাম।

স্টেশন, হাট, ব্লক অফিস ঘুরে ঘরে ফিরতে সন্ধ্যা হয়ে গেল। মা'র ঘরে একটা লণ্ঠন তখন মিট্ মিট্ করে জ্বলছে। মা সেই অন্ধকারে জানলার দিকে মুখ ফিরিয়ে বসে আছে। আমি ঘরে ঢোকার পরও মা'র আত্মমগ্নতা কাটল না। আমি মা'র পাশে জানলায় পিঠ দিয়ে বসেছি। মা মুখ ফিরিয়ে আমায় দেখতে চেষ্টা করল।

—মা, বাবার রিটায়ারমেন্টের আর কত দেরি?

মা একটু থেমে উত্তর দিল, এই ফেব্রুয়ারী থেকেই তো এক্সটেনসন শুরু। তারপর কি করবেন, জানি না। আমি তো বলি, আরো দু-এক বছর নিতে। বরুণের হোস্টেলের খরচ, অরুণের কলেজের খরচ, সংসারের খরচ, তুই একলা কত দিক সামলাবি? ওঁকে জোরও করতে পারি না। উনি ভেতরে ভেতরে বড় বুড়িয়ে গেছেন। সারা জীবনটা তো আশা করেই গেছেন, এখন শেষ জীবনে আর কিছুতে সান্ত্বনা পাচ্ছেন না, দিন দিন তাই ভেঙে পড়ছেন। আর তুই তো জানিস না, মাস্টারী করতে গিয়ে কত লজ্জা, অপমান সহ্য করতে হয়। এক-একদিন খুবই উত্তেজিত হয়ে পড়েন। সেই মুহূর্তেই চাকরি ছেড়ে দেবেন। শেষে অনেক বুঝিয়ে ঐ দুটো ছেলের কথা ভেবে সব সহ্য করে নেন। জানি না, শেষ পর্যন্ত কি হবে।

হ্যাঁ রে, রুণ, সৌরভরা সব কেমন আছে রে? পুরীর দিনগুলো বড় ভাল লেগেছিল। সৌরভের মা আর ওর বউ না থাকলে ঐ দিনকটাতেই হাঁপিয়ে উঠতাম। হ্যাঁ রে, সৌরভের মা ভাল আছেন তো?

সৌরভের কথা আর বল না। সারাদিন শুধু সংসার আর সংসার। বৌদিকে তুমি আর চিনতেই পারবে না। অত লেখাপড়া শিখে কিভাবে যে এ্যাডজাস্ট করে নিয়েছেন ভাবাই যায় না। সত্যি মা, খুব শ্রদ্ধা হয়। বাড়ির আর সব ভাই-বোনের মতো বৌদি মাসীমার কাছে বায়না করে কিংবা নিজেদের মধ্যে বাঘবন্দী খেলে। মাসীমা তো প্রায়ই তোমার কথা বলেন। তুমি একবার আমার সংগে চল না। বৌদিরাও তোমাকে নিয়ে যেতে বলে।

মা একটু ম্লান হেসে বলল, হ্যাঁ রে সুনীলের খবর কি? দেবী, পবিত্র ওরা সব ভাল আছে তো?

—জানো মা, সুনীলের একটা ভারি সুন্দর ছেলে হয়েছে। কি রকম মোটাসোটা। ওর বিয়ের কথা তো তোমাকে লিখেছিলাম। আমি গেলে, এখনও ওরা হৈ-চৈ করে।

—দেবীর বিয়ের কথা তোমায় জানাই নি। সব একরকম ঠিক হয়ে গেছে, এই ফাল্গুনে বিয়ে। পাত্রী ওর পরিচিত, আমিও দেখেছি, বেশ মানাবে। মেয়েটি যেন আনন্দের প্রতিমূর্তি, সর্বদা কেমন একটা সুখী সুখী ভাব। জানো মা, একদিন আমি আর দেবী প্রাচীন বটগাছ ছুঁয়ে প্রতিজ্ঞা করেছিলাম, আমরা কোনদিন বিয়ে করব না। তা দেবীরও বিয়ে হয়ে গেল।

মা একটু জিরিয়ে নিয়ে বলল, ঠিকই করেছে। সবকিছুরই একটা বয়স আছে। তোর মাথায় কি যে ঢুকেছে, বিয়ে করলেই বুঝি সব আদর্শ বিসর্জন দিতে হয়। এই পৌষে তোর উনত্রিশ বছর হয়ে যাবে। আমার শরীরের অবস্থা তো দেখছিস। তোর সব বন্ধুরাই তো বিয়ে করল। তারা কি সকলেই অসুখী, না তাদের কোন সমস্যা নেই। আসলে তুই সংসারের কথা, মা-বাবার কথা একটুও ভাবিস না। উনি এক-একদিন ভীষণ ক্লান্ত হয়ে পড়েন। তখন তো ওঁরও ইচ্ছে করে, যাঁইয়ের মতো আর কেউ ওঁর সেবা করুক, নিজের মেয়ের অভাব আর কেউ পূর্ণ করুক। কিন্তু কিছুই হবে না, তোকে আর কত বলব, সবই ভাগ্য।

মা'র সেই বড় বিষাদগ্রস্ত কণ্ঠস্বরের আক্ষেপ আমার বুকেও এক তীব্র হাহাকার তুলছিল। লালপাড় বাসন্তী রঙের শাড়ি, পানখাওয়া লাল লাল ঠোঁট কিংবা একপিঠ ঘন নিবিড় কাল চুল—মা'র এই সব পরিচিত চেহারা স্মৃতিতে কোথায় হারিয়ে গেছে। সেই সমৃদ্ধির অবর্তমানে আর এক ঐশ্বর্য ফুটে উঠছে। এখনকার ক্লান্তি, বিষণ্ণতার মধ্য দিয়ে মা'র সেই ধূনুচিহাতে অসহায় শরীরটা বড় স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। মা'র এই ফুরিয়ে-আসা আদল আমার অনুভূতিতে দারুণ কোলাহল সৃষ্টি করেছে। আমার বার বার বলতে ইচ্ছে করল, মা, আমি জীবন থেকে পালাতে চাই না। এতদিন সমস্যাকে এড়িয়ে গেছি। এবার থেকে আমিও সমস্যা সৃষ্টি করব। সেটাই বেঁচে থাকা। মা, আমি বাদবাকী নিরানব্বই জনের মতো বাঁচতে চাই।

কিন্তু আমি কিছুই বলতে পারলাম না। আগত ত্রিশ বছরের আশংকাটা আমাকে বড় বেশি প্রবীণ করে তুলেছে। আমি মনে মনে অনেক—অনেকদিন আগেই প্রৌঢ় মানুষে পরিণত হয়েছি।

সেই সাময়িক নিস্তব্ধতার মধ্যে বাবাকে ঘরে ঢুকতে দেখলাম। সেই প্রায় অন্ধকারে আমাকেও মাকে অমন নির্বাক হয়ে বসে থাকতে দেখে বললেন, কি রে, এত চুপচাপ?

বাবা নিচু হয়ে লণ্ঠনের পলতেটা বাড়িয়ে দিলেন। আলোটা হঠাৎ চোখে জ্বালা করে উঠল। মা আলো থেকে অন্ধকারে মুখ ফিরিয়ে নিল।

আমার পাশ ঘেঁষে বিছিয়ে বসার মতো হাতে ভর দিয়ে বাবা চৌকিতে বসলেন। বক্তৃতা শোনাবার ভঙ্গিতে ঘাড় কাত করে সেই শাল গাছে ছবিটার দিকে তাকিয়ে রইলেন। তারপর কারুর দিকে না তাকিয়ে বললেন, হ্যাঁ রে, অহিনের বাবার খবর কি? আজও সেই মসজিদ-মন্দির করে মামলা চালাচ্ছেন না বাঁশের খুঁটি দেওয়া ভাঙা বাড়িটা সারাচ্ছেন-টারাচ্ছেন?

ঠিক এই মুহূর্তে এই প্রসঙ্গের জন্য প্রস্তুত ছিলাম না। অহিনের বাবার কথায় সেই মুখ বেঁকে যাওয়া, দাঁত বেরিয়ে আসা ভয়াবহ চেহারাটা মনে পড়ল। কানে বাজতে লাগল, তাঁর অর্থহীন গোঙানি। তাঁর অদ্ভুত গোল গোল চোখ দুটো যেন এখনও আমার শরীরে ওঠানামা করছে।

জীবিত বাবাকে উদ্দেশ্য করে অহিন নানান শব্দ বানাত, প্রসঙ্গ উঠলেই টেলিগ্রাফের টরেটক্কার মতো এক-একটা শব্দ অব্যর্থভাবে ছুঁড়ে দিত। শব্দগুলো অহিনের বাবার শরীর ছুঁয়ে আমাদের শরীরে বাজতো। অহিনের বাবার জন্য আমাদের কষ্ট হোত। অহিনকে কিছু বলার আগেই অহিন আমাদের লক্ষ্য করে 'ডাব' নামক ইঙ্গিতটা ছুঁড়ে দিত। আমরা কুঁকড়ে যেতাম। অহিন তার উনানোব্বই পাউন্ডের শরীরটা নিয়ে কত অনায়াসেই আমাদের পরাস্ত করত। ঘাড় কাত করে আমরা ওর শব্দগুলো হজম করতাম। একে একে অহিনের বাবার পক্ষ ছেড়ে ঐসব শব্দগুলোর মধ্যে আশ্রয় খুঁজছিলাম।

অথচ বাবার মৃত্যুতে অহিন কত সহজে আমাদের পক্ষ ছেড়ে দিল। সেদিন ওকে ভীষণ অসহায় মনে হচ্ছিল। ওর সেই উদ্দেশ্যহীন তাকিয়ে থাকার মধ্যে আমরা এগিয়ে গিয়ে সঙ্গ দিতে পারি নি। কোথায় যেন একটা বিরাট ব্যবধান। কলকলির ধারে বসে আমরা ওর প্রতিটি আচরণ লক্ষ্য করে গেছি।

পিতার শবটিকে দক্ষিণাবর্তে তিনবার প্রদক্ষিণ করে পাটের ফেঁসোয় করে মুখে আগুন দিল। আগুনের আঁচে মুখ ঝলসে না-ওঠা পর্যন্ত ও তেমনিভাবে বসে রইল। শেষে ঘড়ার গঙ্গাজল দিয়ে আগুন নিভিয়ে বাড়ি ফিরল।

আজকাল অহিন বাবার শেষ মুহূর্তের ছবিটা পুজো করে। ছবিটা দেখলেই আমার মনে হোত, ওর বাবার বদলে আর কেউ যেন মুখ বাড়িয়ে রয়েছে। বাঁ গালের মাংসের ফাঁকে ওপর-নিচে দু পাটির দাঁত বেরিয়ে রয়েছে। কথা বললে, দাঁতের ফাঁকে আলজিভটা থর থর করে কাঁপত। শেষ ক'টা দিন তাই ওঁকে এড়িয়ে চলেছি। তাঁর যন্ত্রণা আমি সহ্য করতে পারতাম না অথচ অহিন সেই ছবিটায় কি দেখত, কে জানে।

কলকলির ধারে যখন চিতাটা দাউ দাউ করে জ্বলছিল তখন আমার কানে তাঁর শেষ দিনের ফুরিয়ে-যাওয়া কণ্ঠস্বরটা ভাসছিল। প্রার্থনা করার ভঙ্গিতে তিনি অনেক কথা বলতে চাচ্ছিলেন। তাঁর সর্বাঙ্গ দিয়ে এক অস্বাভাবিক জ্যোতি বেরচ্ছিল। তাঁর সেই ভয়াবহ মুখমণ্ডলের মধ্যে আমি এক অনির্বচনীয় হাসি ফুটে উঠতে দেখলাম, শুনতে পেলাম, জান বাবা আমি স্বপ্ন দেখলাম অচীনতলার আখড়ায় মোচ্ছব বসে গেছে। তেরাত্তির নামগান। দূর-দূরান্তর থেকে অনেক মানুষ এসেছে। ছোট ছোট কুঁড়েগুলোয় আর জায়গা কুলোচ্ছে না। তবু মানুষের ভিড়ের কমতি নেই। আসছে তো আসছেই। তুলসী-মঞ্চকে ঘিরে তারা সবাই নামগানে মত্ত।

আমি ভাল হয়ে উঠেই ওখানে একটা ধর্মশালা করে দেব, কি বল? তার সঙ্গে সঙ্গে আমিও যেন স্বপ্ন দেখছিলাম, অচীনতলা, মোচ্ছব, তেরাত্তির নামগান। মানুষটা চিরকাল শুধু মন্দির, আখড়া, মোচ্ছবের স্বপ্নই দেখে গেল। মনটা তাঁর বোরেগীর মতো আখড়ায় বাঁধা পড়েছিল তাই নিজের ঘরের ছাদে বাঁশের ঠোকার কথা খেয়াল পড়ত না। হয়ত তাই অহিন বাবাকে আপন ভাবতে পারে নি।

কিন্তু মুখাগ্নি দেবার পর অহিন কেমন পাল্টে গেল। সেই দাউ দাউ চিতার পাশে আঁচলাগামুখে ও আজকাল কেমন-ভাবে যেন মানুষ দেখে। ও কথা বললে, হাসলে, স্নিগ্ধ কোন মানুষের শব্দ পেতাম। অহিনকে তখন ভীষণ দূরের কেউ মনে হোত। মনে পড়ত, চিতার পাশে আঁচলাগা সেই মুখ।

অত্যুজ্জ্বল লণ্ঠনের আলোয় মা-বাবার মাঝে বসে অহিনের বাবার কথা ভাবতে আমার খুব কষ্ট হচ্ছিল। অহিনের বাবার সেই মোচ্ছব, আখড়া, মন্দির কিংবা অহিনের সেই চিতার পাশে ঝলসানো মুখ এসব কিছুর সঙ্গেই আমার, আমার বাবা, মা'র কোন মিল নেই। তাই চিতা কি মোচ্ছবের কথায় বড় ক্লান্ত হয়ে পড়ছিলাম। তাই কতকটা গল্প করার ভঙ্গিতে বললাম, জানো বাবা, অহিনের বাবার তো ক্যানসার হয়েছিল তাই শেষ দিনক'টি বড় কষ্ট পেয়েছিলেন। ওঃ সেই মন্দির নিয়ে কি মামলা! আখড়া করবেন বলে অচীনতলায় তো পাঁচ বিঘে জমিই দিয়ে দিলেন। অহিনরা অনেক চেষ্টা করেছিল কিন্তু বাঁচাতে পারল না। শেষ ক'টা দিন কী লোকই না আসতো। মানুষটা যে এত দরদী ছিল, বেঁচে থাকতে ভাবতেই পারি নি। অথচ কী কষ্ট পেয়ে বাবা গেলেন।

কি বললি, অহিনের বাবা মারা গেছেন? বাবা কেমন যেন চমকে উঠলেন। আমার থেকে তো উনি বেশ কয়েক বছরের ছোটই হবেন। অথচ—বাবার কথাগুলো অস্পষ্ট হয়ে এল।

বাবার চোখ তখন সেই দপ দপ করে জ্বলা লণ্ঠনটার দিকে। বাবার মধ্যে মজা-খালের পাশের সেই চেহারাটা স্পষ্ট হয়ে উঠতে দেখলাম। বাবাকে অনেক—অনেক বেশি বৃদ্ধ মনে হল।

কার যে কখন মৃত্যু আসে কেউ বলতে পারে না। অনেক দূর থেকে বাবার গলা ভেসে এল। অহিনের বাবা তবু পাঁচজন উপযুক্ত ছেলে রেখে গেছেন। দু'মুঠো খেয়ে পরে তারা বাঁচবে। সেদিন বনমালী-বাবু তো ক্লাশ নিতে-নিতেই শেষ হয়ে গেলেন। আজ্ঞা তাঁর স্ত্রী তিনটে বাচ্চার হাত ধরে স্কুলে এসেছিলেন। কিছুই করতে পারি নি। বনমালীর পরিবারকে আজ ডাইডোলের জন্য মানুষ ধরতে হচ্ছে। অথচ—বাবার বক্তব্য অসম্পূর্ণ থেকে যায়।

মা অনেকক্ষণ থেকে চুপচাপ। মা'র দিকে তাকিয়ে দেখলাম, সেখানে মিনতি ফুটে উঠছে। আমি তখন কোন প্রসঙ্গ তুলে এই প্রসঙ্গটা পাল্টাতে পারছিলাম না। তাই চুপচাপ বসে রইলাম।

লণ্ঠনের আলোটা কাঁপছিল। দড়ি থেকে ঝুলে-পড়া আমার পায়জামাটা একটু একটু নড়ছিল। দেয়ালে তার ছায়াটা আমার কাছে ক্রমেই একটা ঘটনার রূপ নিচ্ছিল। সেই ছায়াটাকে আমি কখনো গলায় দড়ি দেওয়া মানুষ কিংবা অতিকায় ময়াল সাপ কিংবা ঐরকম প্রতিপক্ষ কিছু ভাবতে শুরু করেছিলাম। পরে লক্ষ্য করলাম, আমার মতো বাবা-মাও ঐ ছায়া-টাকে দোদুল্যমান দেখেছেন। তাঁরাও ছায়াটাকে অনুসরণ করে ফিরছেন।

অনেকক্ষণ পর দেখলাম, লণ্ঠনের আলো দারুণ কমে এসেছে। সেই ছায়া-টাকে আর ছায়া বলে চেনা যাচ্ছে না। আমি উঠে লণ্ঠনে তেল ভরবার কথা ভাবছিলাম। একসময় সেই পায়জামাটাকে সরিয়ে দেবার জন্য উঠে দাঁড়ালাম। আর বাইরে কড়া নাড়ার শব্দ উঠল। বাবা উঠে বাইরের ঘরে চলে গেলেন।

তেল ভরতে ভরতেই শুনলাম, এই নিন টিকিট। নম-ডি-প্লুম তরুণই রইল তাহলে। আর এবারের ড্রইংয়ের দিনটা দেখেছেন তো—যাকে বলে একেবারে মাহেন্দ্রযোগ। আমার মশাই বিশ বছরের লাক টাইয়ে এমন দিন আর দেখি নি। এবার একটা কিছু না হয়ে যায় না। টিকিটটা কিন্তু বেশ ভাল করে রাখবেন।

একটু অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছিলাম। নিজের নামটা লটারীর টিকিটে দেখে কেমন এত তীব্র অস্বস্তিবোধ করলাম। বাবাকে বলতে ইচ্ছে করল, বাবা, আমিও আজকাল নিজের নামকে বিশ্বাস করি না। নানান সফল মানুষ দিয়ে নিজের পাথর-চাপা-ভাগ্যটা রাতারাতি পাল্টে নেবার স্বপ্ন দেখি। ওরা সব আমায় অনেক—অনেক পিছনে ফেলে কত উঁচুতে উঠে যাচ্ছে। আমি আর কিছুতেই ওদের কাছাকাছি পৌঁছতে পারব না। তবু আজো আমি লটারীর টিকিট কিনে মুহূর্তের জন্যও ওদের মতো উঁচুতলার মানুষ হই। ক'দিন অন্তত ওদের মতো নিজেকে ভাববার সময় পাই। কিন্তু বাবাকে নিজের কোন কথাই জানানোর তাগিদ এল না।

আলোটায় জোর দিয়ে পুনরায় মা'র পাশে এসে বসেছি। মা জানলা দিয়ে আকাশ দেখছে। একটা রকেট পুব হোতে পশ্চিমে উড়ে যাচ্ছে। মা সেটা লক্ষ্য করেই বলল, রুণ ঐ দেখ একটা রকেট যাচ্ছে।

আমি খুব আগ্রহ নিয়ে দেখলাম। আস্তে আস্তে সেটা পশ্চিমের দেয়ালের আড়ালে চলে গেল। মা'র দিকে ফিরে বললাম, মা কাল সাড়ে ন'টার ট্রেনে আমাকে ফিরে যেতে হবে। রান্না হবে তো?

কেন তুই যে লিখেছিলি, এবার বেশ কিছুদিন থাকবি। আর আজই বলছিস চলে যাবি।

আমি খুব সচ্ছন্দে একটা সাজানো উত্তর দিলাম, তোমাকে লিখেছিলাম ঠিকই কিন্তু ছুটির কোন ব্যবস্থা করতে

পারি নি। অথচ তোমাদের দেখার জন্যও বড় মন কেমন করছিল তাই সর্ট লিভে চলে এলাম। কালকে ফিরতেই হবে।

মাকে কিছুতেই সত্য কথাটা বলতে পারলাম না, মা আমি চাকরী ছেড়ে দিয়ে এসেছি। তোমরাই না ছেলেবেলায় শিখিয়েছিলে, কখনো অন্যায় কাজ করবে না। পরীক্ষার খাতায় 'অন্যায় যে করে আর' হত্যাদি ব্যাখ্যা লিখে প্রথম হয়েছিলাম। এইসব স্মৃতির জন্যই চাকরী-ক্ষেত্রেও অন্যায়টা সহ্য হয় নি। চাকরী ছাড়তে তাই কোন অনুশোচনা বা আফশোষ জাগে নি। কিন্তু এই সব সত্য যে কত দূরে মিথ্যে তা আজ আমার চেয়ে বেশি কেউ জানে না। আমি ফিরে গিয়ে আমার ধৃষ্টতার জন্য তাদের কাছে ক্ষমা চাইব। আন্ডারটেকিং দেব, আমি আর কোন কিছুতেই প্রতিবাদ জানাব না। চাকরীটা আমার চাই-ই। বদলি, প্রমোশন, তদ্বির কোন কিছুতেই আমি পিছপা নই। আমাকে বাঁচতে হবে। আমি বাকি নিরানব্বই জনের মতো বাঁচতে চাই।

অবাঞ্ছিত সন্তান জন্মের ঝুঁকি না নিয়ে.....
বিবাহিত জীবনের সমস্ত সুখ উপভোগ করুন।

আজকাল সব পুরুষই, জন্ম নিয়ন্ত্রণের একটা নিরাপদ ও সন্তোষজনক উপায় "নিরোধ" কিনে নিতে পারেন।

নিরোধ

পরিবার পরিকল্পনার জন্য

৩টির মূল্য ১৫ পয়সা, ১টি ৫পয়সা

(সরকারি সাহায্যে হ্রাসমূল্যে)

বর্তমানে মাত্র কয়েকটি জেলায় পাওয়া যায়।

আগামী ২০ বছরের মধ্যে ভারতের জনসংখ্যা ৫০ কোটি থেকে বেড়ে এর দ্বিগুণ অর্থাৎ ১০০ কোটি হয়ে যাবে।
এর ফলে—বাসস্থান, শিক্ষা, চিকিৎসা ইত্যাদির মতো মৌলিক সুযোগ সুবিধে এবং খাদ্য বস্ত্রের মতো মূল প্রয়োজনগুলির যে বিপুল চাহিদা দেখা দেবে তা জোগানো মোটেই সহজ হবেনা। এর ফলে শিশুরা—আপনারাদের সন্তানেরাই কষ্ট পাবে।
কাজেই এখনই নিরোধ ব্যবহার করতে সুরু করুন। আপনার পরিবার সীমিত রাখুন।
জন্ম প্রতিরোধ করার ক্ষমতা আপনার হাতেই রয়েছে।
'নিরোধ' ব্যবহার করুন।

শিল্প • বাণিজ্য • অর্থনীতি

ভারতে বিদেশী মূলধন আমন্ত্রণ

ডিসেম্বরের তৃতীয় সপ্তাহে ভারতের সহকারী প্রধানমন্ত্রী এবং অর্থমন্ত্রী শ্রীমোরারজী দেশাই এসোসিয়েটেড চেম্বার্স অফ কমার্সের বার্ষিক সভায় ভাষণ দেবার জন্য কলকাতায় এসেছিলেন। সেখানে তিনি ঘোষণা করেন যে, ভারতের শিল্প বাণিজ্যে অর্থলগ্নীর জন্য বৈদেশিক মূলধনকে আমন্ত্রণ জানানো হবে। কথাটা অবশ্য নতুন নয়।

নভেম্বরের শেষ সপ্তাহে ভারতীয় লগ্নী কেন্দ্র (ইণ্ডিয়ান ইনভেস্টমেন্ট সেন্টার) এবং আন্তর্জাতিক বণিক সমিতির নয়াদিল্লী স্থিত ভারতীয় কমিটির যৌথ উদ্যোগে "আন্তর্জাতিক লগ্নী ও ভারত" শিরোনামায় দিল্লীতে এক আলোচনা-সভার অনুষ্ঠান হয়। সেখানেও ভারত সরকারের পক্ষ থেকে ঘোষণা করা হয় যে, এ দেশে বিদেশী মূলধনকে স্বাগত জানানো হবে। সেখানে মোরারজী বলেন যে, "বর্তমানে যে হারে বিদেশী মূলধন ভারতে প্রবেশ করছে, প্রয়োজনের তুলনায় সেটা নিতান্তই অপ্রতুল এবং এখনও বহুকাল ধরে ভারতে কয়েকটি ক্ষেত্রে বেসরকারী বৈদেশিক মূলধনের চাহিদা বজায় থাকবে।" বে-সরকারী বিদেশী লগ্নীকারকদের তিনি প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন যে, ভারতে রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা অক্ষুণ্ণ থাকবে, মুনাফার কোন অভাব হবে না এবং লগ্নীকারকরা তাঁদের মূলধন ফিরিয়ে নিয়ে যেতে পারবেন। তা ছাড়া দেশী এবং বিদেশী লগ্নীকারকদের মধ্যে কোন বৈষম্য রাখা হবে না। ভারত সরকার চান যে, বিদেশী মূলধনের সহায়তায় এ দেশে যে-সব কলকারখানা খোলা হবে, তাতে যেন ভারতীয় লগ্নীকারকদের প্রাধান্য বজায় থাকে। তবে বিশেষ বিশেষ শিল্পে ভারতীয়দের চেয়ে বিদেশীদের অংশ বেশি থাকলেও কোন ক্ষতি নেই। ভারতের ২২টি শিল্প প্রকল্পে এখনও বৈদেশিক প্রাধান্য বজায় আছে। দেশী ও বিদেশী শিল্পপতিরা যৌথভাবে বাকী যে ৩ হাজার শিল্প গড়ে তুলেছেন, তাতে বিদেশীদের চেয়ে ভারতীয়দের লগ্নীর পরিমাণই বেশি। দিল্লীর সেই আলোচনা সভায় বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের সেক্রেটারী কে, বি, লাল বিদেশী মূলধনকে স্বাগত জানিয়ে বলেন যে, ভারতের বিভিন্ন শিল্পে বৈদেশিক মূলধন লগ্নীর অবাধ সুযোগ রয়েছে। সেইসব শিল্পজাত মাল বিক্রির জন্য দেশের মধ্যে একটা বিরাট বাজার তো আছেই, রপ্তানির ক্ষেত্রও সুদূর প্রসারিত। শিল্পপতি এল, এন, বিড়লা বলেন, সার, পেট্রো-কেমিকাল্‌স, মিশ্র ও স্টেনলেস স্টীল, ইলেকট্রনিক্‌স, মৌলিক রাসায়নিক দ্রব্য, ভেষজ, জাহাজ নির্মাণ, লৌহেতর ধাতু, ট্রাক্টর এবং ভারী কেমিকাল্‌স-এ বৈদেশিক মূলধন লগ্নীর অবাধ সুযোগ রয়েছে।

ভারতের ব্যবসা-বাণিজ্যে অর্থলগ্নীর কি কি বিশেষ সুবিধা আছে, তা ব্যাখ্যা করে কেন্দ্রীয় প্রত্যক্ষ কর বোর্ডের চেয়ারম্যান শ্রীসুন্দররাজন বলেন যে, (১) এদেশে যৌথ কোম্পানীর (কার্পোরেট) ট্যাক্স অন্য দেশের তুলনায় অনেক কম, (২) কারখানার সাজ-সরঞ্জামের ব্যয়ের ওপর অগ্রাধিকার প্রাপ্ত শিল্পে ৩৫ শতাংশ এবং অন্যান্য শিল্পে ২০ শতাংশ রিবেট দেওয়া হয়, (৩) নতুন শিল্পে পাঁচ বছর কোন ট্যাক্স দিতে হয় না। ২৫ শতাংশ মুনাফা অর্জনকারী শিল্পে কার্পোরেট ট্যাক্সের পরিমাণ ৫০·৯৫ শতাংশের অনেক কম। কিন্তু ঐ খাতে আমেরিকায় ট্যাক্স দিতে হয় ৫২·৮ শতাংশ। তা ছাড়া আমেরিকায় প্রাদেশিক এবং স্থানীয় আয়কর বাবদ ব্যবসায়ীদের আরও ১০ শতাংশ দিতে হয়। ভারতে সে-ধরণের কোন স্থানীয় ট্যাক্স চালু নেই। ভারতে যে কোন কোম্পানীকে নীট ১০ শতাংশ লাভ করতে হলে গ্রস ৩০ শতাংশ আয় হওয়া দরকার, অথচ অন্যান্য অগ্রসর দেশে সমপরিমাণ নীট লাভের জন্য ১২ থেকে ২০ শতাংশ গ্রস আয় হলেই চলে বলে লগ্নীকারকরা যে যুক্তি দেখিয়ে থাকেন, তার উত্তরে সুন্দররাজন বলেন যে, ভারতে মুনাফার হার অত্যন্ত বেশি। সমস্ত মূলধনটাই ৪।১০ বছরের মধ্যে উঠে আসে। এ-দেশে রয়ালটির হার অত্যন্ত কম (১·২৫ শতাংশ) বলে বিদেশী লগ্নীকারকরা যে অভিযোগ করেন, তার উত্তরে বলা হয় যে, এ-দেশে বিক্রির ওপর রয়ালটি দেওয়া হয় এবং যে-হেতু এ-দেশে

জিনিসপত্রের দাম অত্যন্ত বেশি, সেই হেতু রয়ালটির পরিমাণ কার্যত ৩ শতাংশে এসে দাঁড়ায়।

মুনাফা এবং সুযোগ-সুবিধার এই বহর দেখলে বেশ বোঝা যায় যে, বিদেশী পুঁজি লগ্নীর পক্ষে ভারতবর্ষ সত্যই স্বর্গরাজ্য। এ-দেশের বে-সরকারী শিল্প-বাণিজ্যে মোট বৈদেশিক পুঁজির পরিমাণ কত তার সঠিক এবং সর্বাধুনিক তথ্য পাওয়া না গেলেও দেখা যাচ্ছে যে, ১৯৬০ সাল পর্যন্ত বৈদেশিক লগ্নীর পরিমাণ ছিল ৬৯০ কোটি ৫০ লক্ষ টাকা। বিগত ৮ বছরে তার পরিমাণ নিশ্চয়ই আরও বেড়েছে।

বৈদেশিক মূলধনের সহযোগিতায় ভারতে যে-সমস্ত শিল্প গড়ে উঠেছে, তাতে দেশের কি সুবিধা হয়েছে, তা ব্যাখ্যা করে শিল্পোন্নয়নমন্ত্রী শ্রীফকরুদ্দীন আলী আমেদ গত ২৩শে ডিসেম্বর পার্লামেন্টে বলেন যে, বৈদেশিক সহযোগিতার ফলে এ-দেশের শিল্পের কারিগরী বিচ্ছিন্নতার অবসান ঘটেছে এবং ভারত বিশ্বের কারিগরী প্রবাহে গা ভাসাতে সক্ষম হয়েছে। দেশে পরিকল্পিত শিল্পায়নের পথ প্রশস্ত করেছে। তা ছাড়া প্রচুর বৈদেশিক মুদ্রার সাশ্রয় হয়েছে এবং রপ্তানি-বাণিজ্যের সমৃদ্ধি ঘটেছে। এখন সব জিনিস এখন বিদেশে চালান যেতে সুরু করেছে, যেগুলো আগে কখনও চালান যায় নি। ২৪শে ডিসেম্বর অর্থদপ্তরের রাষ্ট্রমন্ত্রী শ্রীপন্থ উদাহরণ দিয়ে দেখিয়েছেন যে, এই ধরণের একটি যৌথ কোম্পানী মুনাফা এবং রয়ালটি বাবদ ১ কোটি টাকার বৈদেশিক মুদ্রা ভারত থেকে টেনে নিয়েছে বটে কিন্তু ঐ কোম্পানী যে মাল তৈরি করেছে তাতে ভারতের প্রায় ১৪ কোটি টাকার বৈদেশিক মুদ্রা বেঁচে গেছে।

সরকারী কর্তাদের এই সব কথা থেকে বোঝা যায় বৈদেশিক মূলধনের জন্য তাঁরা একেবারে লালায়িত হয়ে উঠেছেন। এটা নতুন ঘটনা নয়। যখনই ভারতে বৈদেশিক সাহায্যের (সরকারী পর্যায়ে) পরিমাণ হ্রাস পায়, তখনই তাঁরা বৈদেশিক বে-সরকারী মূলধনের আশায় বিদেশী পুঁজিপতিদের খোশামোদ করতে বেরিয়ে পড়েন। প্রাক্তন অর্থমন্ত্রী টি, টি, কৃষ্ণমাচারীও এই পথ অবলম্বন করেছিলেন। বর্তমান অর্থমন্ত্রী মোরারজীও সেই পথ বেছে নিয়েছেন। কিন্তু বৈদেশিক বে-সরকারী মূলধনের খারাপ দিকটা লোকের কাছে কখনও প্রকাশ করতে চান না। বিদেশীরা ভারতে যে মূলধন নিয়োগ করেন, তারা মুনাফাটা আমাদের বৈদেশিক মুদ্রায় শোধ করতে হয়। গত ২৪শে ডিসেম্বর শ্রীপন্থ পার্লামেন্টে যে হিসাব দাখিল করেছেন, তাতে দেখা যাচ্ছে ১৯৬১ সাল থেকে ১৯৬৫ সাল পর্যন্ত এ দেশে মোট ৯০ কোটি টাকা বৈদেশিক মূলধন আমদানী হয়েছে কিন্তু ঐ ক' বছরে ভারত বিদেশী মূলধনের মুনাফা এবং রয়ালটি বাবদ বিদেশে পাঠিয়েছে প্রায় ১৬০ কোটি টাকার মত। অর্থাৎ বিদেশীরা মূলধনের ওপর যে মুনাফা টেনে নিয়ে যাচ্ছে, তারই একটা ক্ষুদ্র অংশ আবার বিদেশী মূলধন হিসাবে ফিরে এসে তাদের মুনাফার পরিমাণ বাড়িয়ে দিচ্ছে। একে বলে মাছের তেলে মাছ ভাজা। ভারতের দুয়ার বিদেশী মূলধনের সামনে একেবারে উন্মুক্ত করে দিলে কয়েক বছর বাদে তাদের মুনাফার পরিমাণ এত বেড়ে যেতে পারে যে সেটা বৈদেশিক মুদ্রায় শোধ করাও আমাদের কাছে কষ্টকর বোধ হতে পারে। মনে রাখা দরকার, ৮। ১০ বছরের মধ্যে বিদেশী বণিকরা তাদের মূলধন পুরোটাই মুনাফার আকারে দেশে ফিরিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। তারপর বছর বছর শুধু ফাউটা আত্মসাৎ করা ছাড়া তাদের আর কিছু করবার নেই। ক্যালকাটা ইলেকট্রিক সাপ্লাই কর্পোরেশন তার মস্ত বড় দৃষ্টান্ত।

স্বিতীয়ত অসমাজতান্ত্রিক দুনিয়ায় দেশের ধনিক-বণিক সম্প্রদায়ের প্রাধান্যের কথা কেউ অস্বীকার করতে পারবেন না। কার্যত রাষ্ট্রযন্ত্রকে এঁরাই পরিচালনা করেন। নির্বাচনের আগে এঁরা রাজনৈতিক দলগুলিকে মোটা মোটা চাঁদা দেন এবং স্বভাবতই নির্বাচনের পর ক্ষমতাসীন দল তাঁদের অনুগত হয়ে থাকেন। তাঁরা সেই আনুগত্যের পুরো সুযোগ গ্রহণ করে নিজেদের স্বার্থে রাষ্ট্রযন্ত্রের ওপর প্রভাব বিস্তার করেন। বাবা বাছা করে বিদেশী পুঁজিপতিদের এ-দেশে ডেকে এনে দেশীয় পুঁজিপতিদের সঙ্গে জুড়ে দেবার যে বিরাট আয়োজন হচ্ছে, তাতে দেশের অর্থনীতির ওপর তাদের প্রবল প্রতিপত্তির সূত্রপাত হবে। আমাদের সমাজতান্ত্রিক ধাঁচে সমাজগঠনের পথটা কি তাতে প্রশস্ত হবে? ইংরেজরা কিছু বৈদেশিক মূলধন নিয়ে বণিকের বেশে ভারতে প্রবেশ করেছিল। কালক্রমে বণিকেরা মানদণ্ড দেখা দিল রাজদণ্ড রূপে। সে আশঙ্কা আজও অমূলক নয়। কারণ দক্ষিণ আমেরিকার দেশগুলোয় প্রচুর বৈদেশিক মুদ্রা লগ্নী করা আছে। সেই সুযোগে বিদেশী লগ্নীকারকরা সেখানকার বহু দেশের রাষ্ট্র-কাঠামোর ওপর দস্তুর মত প্রভুত্ব করে থাকেন। ফলে সেখানে ক্যুপ এবং রাষ্ট্রবিপ্লব লেগেই আছে। অতএব বৈদেশিক মূলধন আমন্ত্রণের সময় সরকারের এসব জিনিস ভালভাবে বিচার-বিবেচনা করে দেখা উচিত।

—শ্রীসওদাগর

বাঙলা সাহিত্যের ধারাস্রোতে ক'টি জীবন্ত তরঙ্গ

বেদে, বিবাহের চেয়ে বড়, প্রচ্ছদপট ও একটি গ্রাম্য প্রেমের কাহিনী

এই চারটি উপন্যাস নিয়ে

অচিন্ত্য-গ্রন্থাবলী

প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হয়েছে

ছাপা ও বাঁধাইয়ে রাজকীয়, ছয় শতাধিক পৃষ্ঠা ॥ ১৮·০০

আনন্দধারা প্রকাশন ॥ ৮ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা-১২

ফুচকের দেশে

গীতা বন্দ্যোপাধ্যায়

[পূর্ব-প্রকাশিতের পর]

চেকোশ্লোভাকিয়ার সাম্প্রতিক গোলমাল সম্পর্কে নানা মুনির নানা মত। কেউ বলছেন সোভিয়েত ঝোঁকের মাথায় ভুল করে বসেছে। কেউ বা ঠিক উল্টো কথাটাই বলছেন—চেকোশ্লোভাকিয়া ভুল পথে যেতে বসেছিল বলে এই বিপত্তি। খুব চরম মতামত যাঁদের, তাঁরা বলছেন—গোটা সোস্যালিস্ট দুনিয়াতে বুর্জোয়া সংশোধনবাদের ঢেউ উঠেছে—তাকে কঠিন হাতে দমন করাই তো বুদ্ধিমান, নীতিমানের কাজ।

কিন্তু এ সব মতামতই কোনো না কোনো একটা রাজনৈতিক প্যাটার্নের সঙ্গে জড়িত। আসল চেকোশ্লোভাকিয়াকে বুঝতে হলে তার দেশের মানুষ, দেশ শাসনের ব্যবস্থা আর নাড়ীর টানগুলো জানা দরকার। একবার যে দেশের মানুষ সমাজবাদের স্বাদ পেয়েছে, সে যে সেধে ধনতন্ত্রের খপ্পরে পড়ার জন্যে ঝেঁপ উঠবে, তা কিছুতেই বিশ্বাস হয় না। ভুলত্রুটি থাকতে পারে। কিন্তু জেনেবুঝে নিজেদের বেচে দেবে, এমন দেশ অন্তত চেকোশ্লোভাকিয়া নয়। তার গঠনতন্ত্রের যে চেহারা দেখে এসেছি তাতে অনেক চিন্তা আর বিশ্বাসের জায়গা ছিল। যদি এ কবছরে তাতে ঘুণ ধরে থাকে, তাহলে বলব অনেক দেশের সমাজবাদের পরীক্ষা-নিরীক্ষা বিফল হয়েছে।

মোট কথা সকলেই চায় নিজের বৃত্তে নিজের খুশিতে ঘুরতে। শুধু তাই নয়—সকলেই চায় নিজের ভাগ্য, ভালমন্দের কর্তা নিজে হতে। এখন প্রশ্ন হল, নিজের এই বাসনা অপরের বৃত্তে কতখানি টান দিচ্ছে। কিম্বা ধাক্কা লাগার সম্ভাবনা কতখানি।

যাই হোক, চেকোশ্লোভাকিয়া দেশটা সমুদ্রমন্থনের গোড়াপত্তনের গোড়া থেকে আটঘাট বেঁধে নেমেছিল। আজ চেকোশ্লোভাকিয়ায় তাই সাধারণ মানুষের স্বাচ্ছন্দ্যের অভাব নেই। প্রতি এক হাজার জন পিছু আজ ২৮৫টি ফ্ল্যাট বাড়ি, ৩৪১টি রেডিও সেট, ১৫৪টি টেলিভিশন সেট ৬০টি প্যাসেঞ্জার গাড়ি আছে। খাবারদাবারের ক্ষেত্রে চেকোশ্লোভাকিয়া ইউরোপের যে কোনো ধনী, বড় দেশের মত উন্নত বলা যায়। সাধারণভাবে যুদ্ধের আগের চাইতে, এ দেশের প্রকৃত মজুরী বেড়েছে শতকরা ৭০ ভাগ। আর শিল্পের ক্ষেত্রে মজুরী বেড়েছে শতকরা ১২৭ ভাগ।

সব চাইতে চোখে পড়ে চেকোশ্লোভাক মেয়েদের উন্নতি। শিল্পে শতকরা ৪৫ জন মেয়ে কাজ করেন। সমান কাজে সমান মজুরীর নীতি এখানে বলবৎ। মেয়েরা প্রসবের জন্যে ২২ সপ্তাহ ছুটি পান। এই সময়ে তাঁরা তাঁদের মাইনের ৯০ ভাগ পেয়ে থাকেন। এ ছাড়া বাচ্চা জন্মালে তাঁদের অর্থনৈতিক সাহায্য দেবার ব্যবস্থা আছে। বড় পরিবার হলে, তাঁদের ট্যাক্স কমিয়ে দেওয়া হয়। বুড়ো বয়েসের জন্যে, অসুস্থতা বা কর্মক্ষমতা চলে গেলে আছে সরকারী সাহায্যের ব্যবস্থা। বছরে মজুরী সমেত ছুটি মঞ্জুর করা আছে দুই থেকে চার সপ্তাহ।

সব চাইতে বড় যে জিনিসটি চোখে পড়ে, তা হল বিনা পয়সায় সরকারী চিকিৎসার ব্যবস্থা। সমস্ত ধরণের চিকিৎসাই এখানে সরকারী খরচে মিলে থাকে। প্রতি ৪৭৬ জনের জন্যে এখানে একজন ডাক্তার আছেন। এ ক্ষেত্রে পৃথিবীতে উন্নত দেশগুলোর মধ্যে চেকোশ্লোভাকিয়া চতুর্থ স্থান অধিকার করে আছে। ভাবলে অবাক হতে হয়, যে এত ছোট একটা দেশে প্রতি হাজার জনের জন্যে হাসপাতালে 'বেড' আছে ১২·৫ খানি। এ ছাড়া পাড়ায় পাড়ায় ডাক্তারখানা, ক্লিনিক, পলিক্লিনিক ইত্যাদি তো আছেই। অন্যান্য ব্যবস্থার মধ্যে আর একটি ব্যবস্থা বিশেষ লক্ষণীয়। ৩০ বছরের ওপরের মহিলাদের নিয়মিত গায়নোকলজিকাল পরীক্ষার ব্যবস্থা আছে—ক্যান্সারের প্রতিষেধক হিসেবে। এই সমস্ত ব্যবস্থার ফলে রোগ ভোগ, সংক্রামক অসুখ-বিসুখ যথেষ্ট পরিমাণে আয়ত্তাধীন হয়েছে। শিশুমৃত্যু বা মায়েদের প্রসবকালীন মৃত্যুর হার খুব বেশি রকম কমে গেছে।

চেকোশ্লোভাক মহিলাদের জীবনের সব ক্ষেত্রে উন্নতির পেছনে যাঁদের অক্লান্ত পরিশ্রম আছে, তাঁরা এ দেশেরই মেয়ে।

প্রাগে পৌঁছে তাঁদেরই একজনের সঙ্গে আলাপ হয়েছিল। হোদিনোভা স্পর্না। বেশ একটু বিশাল মানুষটি। বয়েসও হয়েছে। হাসিটি সব সময় ঠোঁটে লেগে আছে। প্রথম দেখাতেই বহুদিনের পরিচিতের মত বুকে জড়িয়ে ধরলেন। ভাষা ব্যবধান এসব ক্ষেত্রে এবং দেশে বিশেষ বাধার সৃষ্টি করে না।

প্রথমেই জিজ্ঞেস করলেন—

'খুব শীত করছে, না ?'

এ প্রশ্নটা ইউরোপে থাকাকালে অনেক শুনেছি। আমাদের দেখলেই ওদের মনে হতে থাকে, আমরা বোধ হয় শীতে মরে যাচ্ছি। আর এ কথা মনে হওয়া মাত্র রাজ্যের মমতাবোধ ওদের ভর করবে। উত্তাপ দেবার জন্যে ব্যস্ত হয়ে পড়বে। নিদেনপক্ষে একটু বিয়ার খাইয়ে ওদের আতিথেয়তা ওরা দেখাবেই। স্লাভনিব দেশগুলোর এই এক অদ্ভুত সবল শিশুসুলভ মনের পরিচয় মেলে সর্বত্র।

আমার যে শীত বোধ কম এটা হোদিনোভা স্পর্নাকে বোঝাতে পারলাম না। উনি আমার গরম জামা পরখ করে দেখলেন—'ইস, বেচারার কী পাৎলা গরম জামা। এভা, এর গরম জামার ব্যবস্থা কর।'

আমার সরব আপত্তি কেউ শুনল না। মোটাসোটা একটা গরম জামা এসে হাজির হল। বললেন—'এ তোমার ভারতবর্ষ নয়—নিউমোনিয়া হয়ে যাবে।'

আমি যা-ই বলি, উনি ভাবেন বুঝি ছেলেমানুষীর ঘোরে বলছি। তাছাড়া ওঁর বোধহয় এমন কোনো একটা অনুভূতির জোর ছিল যার থেকে বুঝতে পারছিলেন, আমি ছোটবেলায় মা হারানোয় এই ধরণের মাতৃস্নেহের কাঙাল। ফলে বহু বছরের বয়েসের ব্যবধান সত্ত্বেও এর পর আমি যতবার চেকোশ্লোভাকিয়া গেছি, হোদিনোভা স্পর্নার বিশাল বুকটিতে আমার জায়গা বাঁধা ছিল। আরও একটা ব্যাপারে আমি খুব মজা পেতাম। প্রথম দেখা হবার সময় আর বিদায়ের মুহূর্তে উনি আমার মুখটা দু' হাতে ধরে, নীল চোখ মেলে একটু চেয়ে থাকতেন। তারপর শব্দ করে দু'গালে দু'টো চুমো খেতেন। এটা এ দেশীয় রীতি। কিন্তু হোদিনোভা স্পর্নার

খুঁজুন, সেই জিপসীদের

গোবিন্দ চক্রবর্তী

খুঁজে দেখুন।
আছেই আছে—
সকলের সঙ্গে আমিও খুঁজছি,
খুঁজে আনুন সেই জিপসীদের।

খুঁজুন—অলিতে-গলিতে,
জাহাজঘাটায়, কয়লাখনিতে—
ক্ষেতে-খামারে, কারখানায়;
খুঁজুন, যেখানে যখন।

কেপরোয়া কেউ না এলে,
ভেবে দেখুন—এই বিপুল সমর
দূরের মতন কেমন জুড়িয়ে যাচ্ছে—
পড়ে আসছে হাওয়া।

সেইরকম কাউকেই চাই
ম্যাপটার সামনে এসে দাঁড়ালে
হাততালি দিয়ে যারা
হঠাৎ উঠবে চীৎকার করে :

পেয়েছি, পেয়েছি।
কোথায় এতদিন লুকিয়ে রেখেছিলে
কোহিনূর ভারতবর্ষকে—।
এই ত' ধূলোর মধ্যে পেলাম,
পেয়ে গেছি।

তারপর, জামার আস্তিন গুটিয়ে
ঝাড়ু-বুরুশ হাতে
এখানে-ওখানে চটে-ওঠা রঙ
ঝাড়তে-মুছতে লেগে যাবে।

জানি, একটা ধাক্কা খাব।
হয়ত আমরাই তখন লাফিয়ে উঠব :
এই, এ কী হচ্ছে?
স্যাঁ, এ সব কী করছ তোমরা?

করার যা তা' তারা করবেই।
ছোট্ট মেয়ের মত
হাতের তালুতে পা দুটোকে সাপ্টে
দেশটাকে, হঠাৎ, মাথায় তুলে দেখাবে :

ভাই সব,
চমকে উঠবেন না।
দুঃশকের বীক্ষণাগারে জিয়োনো
এই হচ্ছে—আসল দেশ।

এই, এই আমাদের স্বর্ণপ্রতিমা—
আসল মা :
যার কান্না আপনারা শুনতে পাচ্ছেন না,
নিঃশব্দে অহল্যা হচ্ছে।

আসুন এখন হাত লাগাই—
আবর্জনাগুলো কেঁটিয়ে ফেলি।
কবে কাঁধ দিন, চাগাই
আরও ক'ফুট ঐ হিমালয়কে।

ধরুন হাত লাগান।
গঙ্গার তরঙ্গ করছে এখনো গান।
ভিজে মাটিতে শুভ্র কিছু বীজ বুনি—
ডাকছে সেই তারারাই—স্বাতী,
উত্তরফাল্গুনী।

আমরা নতুন আরেক দেবতা গড়ব।
ভারতবর্ষকে আবার ভারতবর্ষ করব
যে ভারত মা, আমাদের মা।
শ্যামা সুন্দরী, মমতাময়ী, মনোরমা।

এ আদরের মধ্যে একটা দারুণ 'মা, মা' ভাব আমাকে ভয়ানক আকর্ষণ করত।

চেকোশ্লোভাকিয়ার মহিলা ইউনিয়নের নেত্রীরা বেশির ভাগই ছিলেন যুদ্ধের সময়ের লড়াকু গুপ্ত আন্দোলনের যোদ্ধা। প্রত্যেকেই কাউকে না কাউকে জার্মান ফ্যাসিস্টদের হাতে হারিয়েছেন। কিন্তু এখন তাঁরা দৃঢ়সংকল্প—যুদ্ধ আর নয়, ফ্যাসিবাদ আর নয়। শুধু আর নয় বলে এঁরা চুপ করে থাকেন নি। জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে মেয়েদের অধিকার প্রতিষ্ঠিত করতে এঁরা সমস্ত দেশকে সচকিত করে তুলেছিলেন।

এঁদেরই কাছে গল্প শুনেছিলাম—তেরেজা ভানসোভার সত্তর বছর আগে এই তেরেজা ভানসোভা চেকোশ্লোভাক মেয়েদের মধ্যে সংগঠনের ঢেউ তুলেছিলেন।

অন্যান্য ইউরোপীয় দেশের তুলনায় শ্লোভাকিয়ার মহিলা আন্দোলন খানিকটা নবীন। ১৮৯৬ সালে 'জিভেনা' নামে এক মহিলা সংগঠন গড়ে ওঠে তেজস্বী লেখিকা বোজেনা নেমকোভার নেতৃত্বে। এই সংগঠন তৈরি করার ব্যাপারে অবশ্য পুরুষদের অবদান ছিল যথেষ্ট। এই আন্দোলনের ঢেউ বেশ সাড়া জাগাল। তার ফলে মেয়েরা একটা কাগজ বের করবেন ঠিক করলেন। ৭০ বছর আগে তেরেজা ভানসোভার নেতৃত্বে তাই 'দেনিকা' (ভোরের তারা) পত্রিকা প্রকাশিত হল। তখন ফ্রান্স, ইংল্যান্ড বা আমেরিকায় যে ধরণের তেজস্বী মহিলা আন্দোলন ছিল, সে তুলনায় মুরমাণ হলেও, এই সূত্রপাত-টুকু ছিল আজকের শ্লোভাক মেয়েদের আত্মপ্রতিষ্ঠার প্রথম পদক্ষেপ।

চেকোশ্লোভাক মহিলা আন্দোলন আসলে দানা বেঁধে ওঠে হিটলারি অত্যাচারের চরম আঘাতের দিনে। ইহুদী আর কমিউনিস্ট বধের যে ব্যাপক যজ্ঞ হিটলারের গ্যাস চেম্বারগুলোয় দৈনন্দিন ঘটনা হিসেবে দেখা দেয়, তার মধ্যে থেকে বিদ্রোহের মাতৃমূর্তি মাথা চাড়া দেয়।

বলতে বলতে হোদিনোভা বলেছিলেন—'কোনো মা এই অনর্ঘক জীবনক্ষয়ের সামনে চুপ করে থাকতে পারে না। দেশে ফিরে গিয়ে আমাদের অভিজ্ঞতার কথা বোলো। যুদ্ধ কক্ষনো নয়। ফ্যাসিরম কক্ষনো নয়। আমরা জীবন দিয়ে এ কথা বুঝেছি।'

ক্রমশঃ

প্রত্নমেলা

পাক-ভারতের রূপরেখা : শ্রীপ্রভাসচন্দ্র লাহিড়ী : শ্যামা প্রকাশনী—চাকদহ : নদীয়া : প্রাপ্তিস্থান দে বুক স্টোর্স, ১৩, বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট, কলকাতা ১২ ও ইণ্ডিয়ান বুক ডিস্ট্রিবিউটিং কোং ৬৫-২, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলকাতা—৯. : মূল্য—তেরো টাকা।

ভারতবর্ষের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাস যাঁরা জানেন প্রধান-মুক্তিযোদ্ধা শ্রীপ্রভাসচন্দ্র লাহিড়ীর পরিচয় তাঁদের কাছে নতুন করে তাঁর পরিচয় দেবার কোন প্রয়োজন নেই। ছাত্রজীবনে তিনি অনুশীলন দলের সাথে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত ছিলেন এবং ১৯১৮ খৃস্টাব্দে গৌহাটিতে পুলিশের বিরুদ্ধে এক যুদ্ধে আহত অবস্থায় বন্দী হয়েছিলেন। তাঁর জীবনের দীর্ঘ বাইশ বছর ইংরাজের কারাগারে কেটেছে এবং প্রায় পাঁচ বছর তিনি পলাতক অবস্থায় ছিলেন। স্বাধীনতালাভের পর জন্মভূমির সেবায় তিনি দীর্ঘকাল পাকিস্তানেই ছিলেন। রেকর্ড ভোট পেয়ে বিধানসভার সদস্য হবার পর কিছুদিনের জন্য পূর্ব পাকিস্তানের অর্থ ও কারামন্ত্রীর পদও অলংকৃত করেছিলেন। ভারতবর্ষের নাগরিক হয়ে আজও পাকিস্তানের সংখ্যালঘুদের দুঃখ-দুর্দশার কথা তিনি ভুলতে পারেন নি। দেশ বিভাগের ফলে ভারতবর্ষ এবং পাকিস্তানে যে দুর্লঙ্ঘ্য সমস্যা দেখা দিয়েছে 'পাক-ভারতের রূপরেখা' তারই একটি অবিকল-চিত্র।

এই বইটিকে সাহিত্যের পঙক্তিতে না বসিয়ে ইতিহাসের পঙক্তিতে বসানোই বাঞ্ছনীয়। তবে লেখকের মানবদরদী মন এই গ্রন্থ রচনায় তাঁর ঐতিহাসিক সত্তাটিকে মুখ্য স্থান দখল করতে দিলেও, তাঁর সাহিত্যিক সত্তাটিকে সম্পূর্ণভাবে বিসর্জন দেন নি। এই কথাটির স্বপক্ষে সবচেয়ে বড় যুক্তি হল, প্রভাসবাবু তাঁর গ্রন্থটি উস্কানিমূলক ভাষায় রচনা করেন নি। পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পিছনে ছিল মহম্মদ আলী জিন্নার ক্লান্তিহীন সংগ্রাম, বৃটিশের ভেদনীতি এবং কংগ্রেসী নেতৃবৃন্দের দুর্বলতা এবং তাড়াতাড়ি গদিলাভের জন্য অবাঞ্ছিত আকুলতা। সুভাষচন্দ্রের সাবধান বাণী, অরবিন্দের উপদেশ অথবা গান্ধীর অসম্মতি সত্ত্বেও, ইংরাজ ভারত ছাড়ার মুহূর্তে আমাদের নেতৃবৃন্দ ক্ষমতালাভের জন্য এতই অস্থির হয়ে উঠেছিলেন যে, ভারত এবং পাকিস্তানের সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের ভবিষ্যতের কথা চিন্তা করার অবকাশ তাঁদের তখন ছিল না। ইংরাজ ভারত ছেড়ে গেল কিন্তু ভারতকে দুটি ভাগ করে গেল। তাদের গায়ে আঁচড়টি লাগল না, কিন্তু ১৯৪৭ খৃস্টাব্দের আগস্ট মাস থেকে ন' মাসের মধ্যে ছ' লক্ষ নিরীহ হিন্দু এবং মুসলমান নর-নারী ও শিশু সাম্প্রদায়িক হাঙ্গামায় প্রাণ হারালেন। সে হত্যাকাণ্ডের বিবরণ এত ভয়াবহ এবং পৈশাচিক যে, তা জানবার পর নাৎসী বাহিনীর ইহুদিদের প্রতি অত্যাচারের কথা মনে পড়ে। আমাদের দেশের প্রধান রাজনৈতিক দলগুলি যেহেতু ইংরাজের বিরুদ্ধে সশস্ত্র সংগ্রাম করে নি, সুতরাং আজও আমরা খুব গলাবাজী করে বলে থাকি আমাদের স্বাধীনতা এসেছে অহিংস সংগ্রামের মাধ্যমে। নেতাজী এবং অন্যান্য বিপ্লবী নেতার আদর্শে উদ্বুদ্ধ হয়ে যাঁরা প্রাণ দিয়েছেন তাঁদের কথা না হয় ছেড়েই দেওয়া হল। কারণ তাঁরা বীরের মত এবং মানুষের মত প্রাণ বিসর্জন দিয়েছেন। কিন্তু স্বাধীনতার মাশুল দিতে গিয়ে এই যে মানুষগুলি অগৌরবের মৃত্যুকে বরণ করে নিয়েছিলেন তা কি হিংসা এবং রক্তলোলুপতার এক অতি অমানবিক রূপ নয়। আসল শত্রুকে অর্থাৎ ইংরাজকে হৃদয়ে অধিষ্ঠিত করা হল। আর তাদের পরিবর্তে মারা গেল এই উপমহাদেশের লক্ষ লক্ষ নিরীহ সন্তান। এইভাবেই ইংরাজ আমাদের শেষ আঘাতটি হেনে গিয়েছে।

জিন্না থেকে আয়ুব খাঁ পর্যন্ত পাকিস্তানের সব ক'জন দেশনায়কেরই সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের প্রতি একটি নীতি অভিন্ন এবং অবিচল। সেটি হল Terrorise and govern, ওদেশে যখনই কোন বড় রকমের সমস্যা দেখা দিয়েছে, রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ জনসাধারণের মনকে সে বিষয়ে চিন্তা করার সুযোগ না দিয়ে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে ক্ষেপিয়ে তুলেছে। এর ফলে দাঙ্গা, হত্যাকাণ্ড, গৃহদাহ, নারীধর্ষণ ও লুণ্ঠন বারবার অনুষ্ঠিত হয়েছে। মনে হয় ভারত সরকার এ বিষয়ে গোড়া থেকেই শক্ত হলে, পাকিস্তানে বহু হতভাগ্য সংখ্যালঘু নরনারী স্বাভাবিকভাবে জীবন অতিবাহিত করতে পারতেন। ১৯৫০ খৃস্টাব্দে পাকিস্তানে দাঙ্গার সূত্রপাত হতে ভারতের প্রধানমন্ত্রী বলেছিলেন শান্তিপূর্ণভাবেই এ গোলযোগ মেটাবার চেষ্টা করা হবে। এর পর তিনি বলেছিলেন—if these measures fail, other measures will be taken. এর উত্তরে তৎকালীন পাক প্রধানমন্ত্রী আস্ফালন করেছিলেন—If India wants war she will find us well prepared. দুঃখের কথা, ভারতের সুর তার পরই অনেকটা নরম হয়ে গিয়েছিল। আমাদের সরকারের আর যে দোষই থাকুক না কেন, তা সত্যিই সাম্প্রদায়িকতার ঊর্ধ্বে। তবে যা নিন্দনীয় তা হল পূর্ব পাকিস্তানের সংখ্যালঘুদের প্রতি ভারত সরকার সর্বদাই বেশ কিছুটা উদাসীন। পশ্চিমবঙ্গ কংগ্রেসের শ্রদ্ধেয় নেতা অতুল্য ঘোষ মহাশয় লেখককে একদিন বলেছিলেন পাকিস্তান থেকে আগত সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের মানুষকে সাহায্য করতে তাঁরা আগ্রহী নন, কারণ, তাঁর ভাষায় 'এখন কথা হচ্ছে, আমরা যে এসব বাস্তুত্যাগীদের সাহায্য করবো, তারা ত' আমাদের সাহায্য নিয়ে পরে বামপন্থীদের সাথে ভিড়ে যাবে। সে অবস্থায় আমরা সাহায্য করবো কেন?' কি অদ্ভুত দূরদৃষ্টি! পাকিস্তানে থাকলেই বা এঁরা কি অবস্থায় থাকেন, এবং এদেশে এসেই বা এঁদের কি হাল হয়, তা চিন্তা করবার মত এবং তাঁদের সমস্যা সমাধান করবার মত লোক এদেশে নেই বললেই চলে।

পাকিস্তানের অন্ধকারাচ্ছন্ন ইতিহাসের মধ্যে কিছু কিছু আলোর সন্ধান প্রভাসবাবু দিয়েছেন। বাংলা ভাষাকে মর্যাদার আসনে প্রতিষ্ঠিত করবার জন্য পূর্ব পাকিস্তানের ছাত্র সম্প্রদায়ের সংগ্রামের ইতিবৃত্তটি অনন্যসাধারণ। এখান থেকেই পূর্ব পাকিস্তানের জনসাধারণের হৃদয়ের পরিবর্তনের সূত্রপাত হয়েছে।

পাকিস্তানের বহু ইতিহাসপ্রসিদ্ধ ব্যক্তির আয়ুব খাঁর মৌল গণতন্ত্রের চাপে কি দশা ঘটেছিল সে ইতিহাস সত্যিই উপভোগ্য। সুরাবর্দী, নাজিমউদ্দিন, নুরুল আমিন প্রমুখ নেতৃবৃন্দের শেষ পরিণতি, জিন্না ও লিয়াকতের মৃত্যুর কাহিনী অভিনয়ের 'লেটার

মোগল্‌সের' ষড়যন্ত্র প্রভৃতির কথা মনে এনে দেয়। আবার সীমান্তগান্ধী, ফজলুল হক অথবা মৌলানা ভাসানীর সংগ্রামের বিবরণ উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ সম্ভাবনার নির্দেশ দেয়।

এই গ্রন্থটি সাপ্তাহিক বসুমতীতে ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয়েছিল। বাংলার ইতিহাস-সচেতন পাঠকগোষ্ঠী এটি পড়ে সত্যিকার আনন্দলাভ করবেন বলে আমরা আশা করি।

(ক) **বৈদিক সমাজ ও সংস্কৃতি** (প্রথম ভাগ) : লেখক—নৃপেন্দ্র গোস্বামী। প্রকাশক : নিউ এজ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড। ১২, বঙ্কিম চাটার্জি স্ট্রীট, কলকাতা-১২ মূল্য : ১৫ টাকা।

(খ) A SURVEY OF FOLK-LORE STUDY IN BENGAL : By Sankar Sengupta. Published by Indian Publications, 3, British Indian Street, Calcutta—1. Rs. 20/-.

(গ) **লৌকিক শব্দকোষ** : লেখক—শ্রীকামিনীকুমার রায়। প্রকাশক : ইণ্ডিয়ান পাব্লিকেশন্‌স, ৩, বৃটিশ ইণ্ডিয়ান স্ট্রীট, কলকাতা-১। দাম : ১২·৫০।

বৈদিক আর্যদের সামাজিক সংগঠন ও সংস্কৃতি বিষয়ক নানাবিধ আলোচনায় গড়ে উঠেছে 'বৈদিক সমাজ ও সংস্কৃতি' গ্রন্থটি। সমাজতত্ত্ব ও সংস্কৃতিতত্ত্ব বিষয়ে আমাদের জিজ্ঞাসা ও কৌতূহল দিন দিন বেড়ে চলেছে। এ বিষয়ে অল্পবিস্তর আলোচনাই বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় দৃষ্টিগোচর হয়ে থাকে। এ-সব আলোচনা অধিকাংশ ক্ষেত্রে ভাবালুতার দ্বারা অনুপ্রাণিত, গভীর বৈজ্ঞানিক মননশীলতার দ্বারা উদ্বুদ্ধ নয়। আলোচ্য গ্রন্থে সমাজের বিবর্তন, সংস্কৃতির বিকাশ, বাস্তব সংস্কৃতি ও মানসিক সংস্কৃতির আকারগত পার্থক্য, সভ্যতার সংজ্ঞা প্রভৃতি বিষয়গুলি ভূমিকার আকারে বিশেষভাবে আলোচিত হয়েছে এবং নৃবিজ্ঞানের আধুনিক চিন্তাধারাও অত্যন্ত নৈপুণ্যের সঙ্গে সংযোজিত হয়েছে। আদিম গোষ্ঠীগুলির কৌমতন্ত্র বা 'ট্রাইব্যাল'-সংগঠন এবং পিতৃতন্ত্র ও মাতৃতন্ত্র বিষয়েরও বিস্তৃত বিবরণ আমরা এই গ্রন্থ থেকে পাই। মোটামুটি তিনটি দীর্ঘ পরিচ্ছেদে আলোচ্য গ্রন্থের প্রথম ভাগটি সংগ্রথিত। এতে মর্গানের সামাজিক বিবর্তনবাদ, রিফল্টের মাতৃতন্ত্রবাদ, গর্ডন চাইল্ডের সমন্বয়সূত্র, কার্ল মার্কসের ঐতিহাসিক বস্তুবাদ ও ইতিহাসের ধারা থেকে শুরু করে ভাষা ও গোষ্ঠী, আর্য সমন্বয়রীতি ও জন্মান্তরবাদের প্রশ্ন, কৌমী পরিবেশ, গোত্র ও টটেম এবং শাস্ত্রীয় বিভিন্ন পর্যায়গুলি তুলনামূলক বিচারে বিশদভাবে বর্ণিত হয়েছে। এ-সব বিবরণ থেকে আমরা আধুনিক সমাজতত্ত্বের ধারা সম্বন্ধে একটা মোটামুটি ধারণায় আসতে পারি। গ্রন্থগত মূল উদ্দেশ্য বৈদিক জনগণের সামাজিক সংগঠন ও সমাজব্যবস্থার স্বরূপ উদ্‌ঘাটন। বৈদিক সমাজের ট্রাইব্যাল আকৃতি কিরূপ ছিল, সে বিষয়ে প্রচলিত ইতিহাস-গ্রন্থগুলিতে কোনো আলোকপাতের চেষ্টা বিশেষ লক্ষিত হয় না। বৈদিক আর্যরা কৌমী সমাজে বাস করতেন, এইটুকু মাত্র আমরা জানি। আমাদের ধারণায় কৌমী সমাজ তো প্রাক্‌-সভ্য হাল-চালবিশিষ্ট হওয়া উচিত। বৈদিক আর্যেরা কি প্রাক্‌-সভ্যস্তরে বিরাজ করতেন ? এই প্রশ্ন নৃবিজ্ঞানের অন্তর্গত। এ সম্বন্ধে গভীর চিন্তাপূর্ণ তথ্যরাশি ও সিদ্ধান্ত আলোচ্য গ্রন্থে বিন্যস্ত হয়েছে। বাংলা ভাষায় নৃবিজ্ঞান ও সমাজবিজ্ঞানের ক্ষেত্রে নতুন অবদানরূপে আমরা গ্রন্থটিকে সাদর আমন্ত্রণ জানাই। শ্রীযুক্ত নৃপেন্দ্র গোস্বামী মূলত সংস্কৃত সাহিত্য ও দর্শনশাস্ত্রের অধ্যাপক ও পণ্ডিত ব্যক্তি। তিনি বিশেষ যুক্তিবাদী ও স্থিতধী ব্যক্তি। তাঁর চিন্তাধারা বিজ্ঞানভিত্তিক, অথচ প্রকাশের ক্ষেত্রে তিনি সহজপন্থী। তার উজ্জ্বল স্বাক্ষর রয়েছে আলোচ্য গ্রন্থের ভাষাবিন্যাস ও আলোচনায়। গ্রন্থসূচনায় ডক্টর নীহাররঞ্জন রায় লিখিত একটি সংকীর্ণ ভূমিকা ছাড়পত্র হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে। এই গ্রন্থে এই জাতীয় ভূমিকার প্রয়োজন খুবই কম, তবু ডক্টর রায়ের সর্বশেষ কথাটি এই সূত্রে উল্লেখযোগ্য। তিনি বলেছেন : 'গোস্বামী মশায় তাঁর দৃষ্টি যে শুধু বৈদিক সাহিত্য ও ভারতবর্ষের মধ্যেই আবদ্ধ করে রাখেন নি, এতে তাঁর বিচারালোচনা সমৃদ্ধিলাভ করেছে। আমাদের প্রাচীন ইতিহাসালোচনা ও গবেষণায় দৃষ্টির এই ব্যাপকতা বড় বিরল।' ভাবততত্ত্বের ক্ষেত্রে এই জাতীয় একটি উচ্চমানের গ্রন্থ রচনার দৃষ্টান্ত উপস্থাপিত করে অধ্যাপক গোস্বামী বাঙালী মাত্রেরই ধন্যবাদভাজন হলেন, সন্দেহ নেই। তাঁকে আমাদের অভিনন্দন জানিয়ে আমরা গ্রন্থটির দ্বিতীয়ভাগের প্রতীক্ষায় রইলুম।

বাঙালী সংস্কৃতি ভারতীয় সংস্কৃতিরই অন্যতম অঙ্গ। কিন্তু এই সংস্কৃতি একদিনে জন্মলাভ করে নি। সমাজবন্ধনের মধ্য দিয়ে যখন থেকে ভারতীয় সমাজ-মানস গড়ে ওঠে, তখন থেকেই ধীরে ধীরে সেই মানসপটে জন্ম নেয় সংস্কৃতির অঙ্কুর। ক্রমে সমাজবিকাশ, তার উত্থান-পতন ও নানা বিচিত্র জীবনলীলার মধ্য দিয়ে এই সংস্কৃতি বিকশিত ও বিবর্তিত হয়ে ওঠে। ভারতে প্রধানত বৈদিক যুগ থেকেই এই সংস্কৃতি-বিকাশের ধারা লক্ষ্য করা যায়। তার মূলের যে প্রাপক্ষেত্র—তাকে লোকসংস্কৃতি বলাই বিধেয়। সাধারণ ও নিম্নকোটি জীবনের মাধ্যমে যে সংস্কার, শিল্প ও গীতিকার সৃষ্টি, তাকেই প্রধানত লোকযান, লোকসংস্কৃতি বা লোকশিল্প নামে আখ্যায়িত করা হয়। আর এই লোকযানের ওপরেই ক্রমে গড়ে উঠেছে উচ্চকোটি মানবসভ্যতা। ভারতের ক্ষেত্রে এই সভ্যতা ও সংস্কৃতির ইতিহাস এত বহুধা বিস্তৃত ও যুক্তিতর্কসাপেক্ষ যে, কোথাও কখনও তাকে এক কথায় রূপ দেওয়া সম্ভব নয়। ভারতের ভৌগোলিক ও মানসিক ইতিহাসও যেমন বিস্তৃত, তেমনি তার সংস্কৃতির সংজ্ঞাও নানারূপে রূপান্তরিত। তবু বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্যই যেখানে ভারতের মূল চরিত্র, সেখানে তার রূপান্তরিত সাংস্কৃতিক সংজ্ঞাকেও একটি আলোকে গ্রহণ করা কঠিন নয়। এই সূত্র থেকেই ঐতিহাসিক ও প্রত্নতাত্ত্বিকেরা বিভিন্ন সময়ে ভারতের এই কয়েক সহস্র বর্ষব্যাপী ঐতিহ্যবান সংস্কৃতি ও সভ্যতার অনুশীলন করে আসছেন। বাংলার সংস্কৃতি-চর্চার মূলেও এই লোকযান বা লোকশিল্পই প্রধান। কিন্তু তার ধারাবাহিক চর্চা অনুশীলন ও লিপিকর্মের অভাবে অখণ্ড ও খণ্ডিত বাংলার লোকসংস্কৃতি সম্পর্কে এতকাল আমরা অনেকখানি অজ্ঞই ছিলাম। শ্রীযুক্ত শঙ্কর সেনগুপ্ত 'A Survey of Folklore Study in Bengal' গ্রন্থে বাংলার সেই বিপুল ঐতিহ্যের ইতিহাস বিজ্ঞানসম্মতভাবে তুলে ধরতে চেয়েছেন। ভারতীয় লোকসংস্কৃতির ইতিহাসচর্চার ক্ষেত্রে শ্রীযুক্ত সেনগুপ্তের এই প্রয়াস ও নিষ্ঠা উল্লেখযোগ্য।

তিনি বলেছেন—'As the object of this study is to assist the students of Folklore, social and cultural Anthropology, literature, history and other subjects, it will not be amiss to begin with a survey so as to able to form a rough estimate of the work done so far in the field of folklore and allied subjects in Bengal. From this survey readers will know of certain activities and movements along with the wants in the field, so that they may try to fulfil the gaps.'

এই শূন্যস্থান পূরণের সহায়তায় শ্রীযুক্ত সেনগুপ্তের কৃতিত্বও উল্লেখ্য, সন্দেহ নেই। লোকসংস্কৃতি কি, তার বিভিন্ন পর্যায় ও অনুশীলনের তাৎপর্য, লোক-সংস্কৃতির প্রাচীন যুগ ও যুগবিবর্তনের ধারা, বিদেশী ভারততত্ত্ববিদ্ ও এদেশীয় চিন্তাবিদ লেখকদের মাধ্যমে এর চর্চা, শ্রেণিগত প্রচেষ্টার মাধ্যমে এর অনুশীলন কেন্দ্র গড়ে তোলা প্রভৃতি বিষয়গুলি সুসংবদ্ধ বিবিওগ্রাফীসহ এই গ্রন্থে এমন-ভাবে লিপিবদ্ধ করা হয়েছে যে, যে-কোনো উৎসাহী ব্যক্তিই এর দ্বারা বিশেষ উপকৃত হবেন। গ্রন্থটি ইংরেজি ভাষায় রচিত হওয়ায় আরও একটি মহৎ কল্যাণ সাধিত হয়েছে এই যে, বাংলার লোক-সংস্কৃতির সঙ্গে অবাঙালী পাঠকবৃন্দও বিশেষভাবে পরিচয় লাভের সুযোগ পাবেন।

অসংখ্য ধূলিমলিন সাহিত্যের জঞ্জালের মধ্যে ক্বচিৎ কখনও এমন এক-একখানি গ্রন্থের আবির্ভাব হয়—যার সংস্পর্শে ও প্রভাবে অনেক মালিন্য ধুয়ে মুছে যায়। 'লৌকিক শব্দকোষ' এমনি একখানি গ্রন্থ। আমাদের দেশাচারের সঙ্গে যেমন জড়িয়ে আছে লোকাচার, তেমনি লোকযানের সঙ্গে মিশে আছে লৌকিক সংস্কৃতি। নানা শব্দ, শ্রুতি, স্মৃতি ও ভাবের আদান-প্রদানের মধ্য দিয়েই এই সংস্কৃতি গড়ে উঠেছে। সব দেশের সাংস্কৃতিক ইতিহাস কমবেশি প্রায় একই পর্যায়ের। অতএব বাংলা দেশেও তার অন্যথা হবার কথা নয়। তার উজ্জ্বল প্রমাণ রয়েছে আলোচ্য শব্দকোষে। পূর্ব পাকিস্তান ও পশ্চিমবঙ্গ মিলিয়ে সমগ্র বাংলার বিভিন্ন অঞ্চলের উপভাষা ও বিভাষার হাজার হাজার শব্দ বিজ্ঞানসম্মত-ভাবে এই গ্রন্থে গৃহীত হয়েছে। বিশেষত বাংলার সাধারণ মানুষ, গৃহস্থ, শ্রমিক, কৃষক প্রভৃতির মৌখিক ব্যবহৃত প্রচলিত ভাষা ও তৎসহ আঞ্চলিক বৈশিষ্ট্যপূর্ণ শব্দরাশি এমন সুবিন্যস্তভাবে এই গ্রন্থে সাজানো হয়েছে—যার দ্বারা বঙ্গভাষার যে-কোনো গবেষকের ও সাধারণ লোকের পক্ষে শব্দচয়ন ও শব্দের আপেক্ষিক গুরুত্ব-সহ তার তুলনামূলক অর্থোদ্ধার করা অত্যন্ত সহজ হবে। সাতটি অধ্যায়ে গ্রন্থ-খানি বিভক্ত, যথা—ঘর-বাড়ি, গৃহ-সামগ্রী, চাষ-আবাদ, উদ্ভিদ, জীবজন্তু, আচার-অনুষ্ঠান ও নামাবলী। প্রতিটি বিষয়ে কত যে শব্দ ও শব্দার্থ বাংলার প্রাণ-ভাণ্ডারকে রসে পূর্ণ করে রেখেছে, তা সাধারণত এতকাল আমাদের প্রত্যক্ষ জ্ঞানের বহির্ভূতই ছিল। তাকে অত্যন্ত নিষ্ঠার সঙ্গে সংগ্রহ করে লেখক শ্রীকামিনীকুমার রায় বঙ্গভারতীর পাদপদ্মে অর্ঘ্য সাজিয়ে-ছেন। গ্রন্থসূচনায় সুদীর্ঘ ষাট পৃষ্ঠার ভূমিকায় এই সংগ্রহের নানা ইতিহাসের সঙ্গে লোক-সংস্কৃতি গবেষণার বিষয়ে নানা প্রশ্ন উত্থাপন করেছেন। নব্যকালে বহন করে নেবার যোগ্যতার প্রশ্নটি বড়। ডক্টর সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় 'পরিচয়' লিখে গ্রন্থটির মর্যাদা বাড়িয়েছেন। তিনি গ্রীয়রসনের গ্রন্থের সঙ্গে এই গ্রন্থের ছায়া-সূচক তুলনা করে লেখকের প্রতি যথেষ্ট সম্মান প্রদর্শন করেছেন। শ্রীরায় ইতিপূর্বে 'দীন শরতের বাউল গান' সম্পাদনা করে যে লোক-মনস্কিতার সার্থক পরিচয় দেন, আলোচ্য এই গ্রন্থ প্রণয়নের মাধ্যমে তাঁর সেই সার্থকতা আরও দৃঢ় ও সম্প্রসারিত হলো, সন্দেহ নেই। আমাদের পাঠক-বৃন্দের কাছে গ্রন্থখানি তুলে ধরতে পেরে আমরা আনন্দবোধ করছি—কারণ এই গ্রন্থের মধ্য দিয়ে যেন সমগ্র বঙ্গজীবনই কথা বলে উঠছে।

—

নদী বহে খরধারে : (আষাঢ় ১৩৭৫) অমল মিত্র। ৮৫/২, সি আই টি রোড, কলকাতা-১৪। দাম : ৫ টাকা।

৭৬ পৃষ্ঠায় মোট ৪১টি কবিতার সমষ্টি "নদী বহে খরধারে"। অধিকাংশ কবিতা তান প্রধান ছন্দে রচিত। রবীন্দ্র-প্রভাব, এবং একটি কবিতায় ("আমিই") নজরুল প্রভাব সুস্পষ্ট। কয়েকটিতে প্লানির আমেজ আছে। "শয়তানের স্বগ-তোক্তি" কবিতাটি উল্লেখযোগ্য। ছাপা ও বাঁধাই সুন্দর। প্রচ্ছদপট চলনসই। বই-এর দামটি অত্যধিক।

রূপনগরের ময়না (১৩৭৫) : অমল সেনগুপ্ত। ৭১-বি, শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জী রোড, কলকাতা-২৬। দাম : দেড়টাকা।

'রূপনগরের ময়না' ছোটদের জন্যে লেখা ছড়ার বই। নানা ধরণের ত্রিশটি ছড়া এতে স্থান পেয়েছে। যাদের জন্যে শ্রীঅমল সেনগুপ্তের এই প্রচেষ্টা, তারা খুশি হবে। বাস্তব-অবাস্তবের সীমানা পেরিয়ে রূপকথার স্বপ্নরাজ্যের আবেশ মেশানো ছড়াগুলি। অনেকগুলি ছড়ায় গানের সুরের মিষ্টি আমেজ। 'গ্রীষ্ম, বর্ষা, শরৎ, শীত, বসন্ত নিয়ে ছড়া যেমন আছে, তেমনি আছে 'স্বপ্নরঙ্গীন', 'ঘুমপরী', 'চাঁদের বুড়ি', 'কুকুর নাচ', 'চৈতালি' প্রভৃতি ছড়া। 'কলকাতার বর্ষা', 'ব্যাঙের বিয়ে', 'উদার পিণ্ডি বুদোর ঘাড়ে' ইত্যাদি মজার ছড়াগুলি পড়ে সকলেই আনন্দ পাবেন। লেখার ভঙ্গী সাবলীল, সরস। ছন্দে দখল আছে। প্রতিটি পৃষ্ঠায় রেখাভূষণ অঙ্কিত ছবি ছড়াগুলিকে আরও চিত্তাকর্ষক করেছে। আমরা আশা করব, ছোটদের আনন্দদানের জন্যে শ্রীসেনগুপ্তের এই উদ্যম অব্যাহত থাকবে।

রূপসী নগরী : শারদ সংকলন—প্রবীর-রঞ্জন বসু ও সহকারী শিশির গৃহ কর্তৃক সম্পাদিত ও বিশ্বনাথ চক্রবর্তী কর্তৃক কার্টুন এন্ড কোং হইতে প্রকাশিত। মূল্য : এক টাকা।

সাহিত্য ও চলচ্চিত্র সম্পর্কিত একটি পরিচ্ছন্ন পত্রিকা। শারদ সংখ্যায় অন্নদা-শঙ্কর রায়, হরিনারায়ণ চট্টোপাধ্যায়, অ-ক্রূর প্রমুখের লেখা আছে। শিশির গৃহের ঐতিহাসিক উপন্যাস 'বেগম শায়রা' ও প্রবীর বসুর বড় গল্প 'ত্রিবৃত্ত' ভালো লাগবে।

দূরের বলাকা—শ্রীপথিক। অনামিকা প্রকাশনী, ২৭, মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ রোড, কলকাতা-৭। মূল্য : ২·৫০।

গল্প-গ্রন্থ। ছদ্মনামের আড়ালে লেখক দশটি গল্প বলেছেন। গল্পগুলির কোনোটা বাস্তবধর্মী, কোনোটা বা আবেগপ্রবণ। চরিত্র সৃষ্টির মুন্সিয়ানা অপেক্ষা গল্প বলার চেষ্টার প্রাধান্য আছে।

সূর্যগ্রহণ—সত্যদর্শী। ১০৬ডি, 'এফ' ব্লক, নিউ আলিপুর, কলকাতা-৫৩। মূল্য : তিন টাকা।

উপন্যাসোপম বড় গল্প। ঘেরাও থেকে অতিবিপ্লববাদের কাহিনী। শেষ পর্যন্ত লেখক অন্ধকারেই আত্মসমর্পণ করেছেন।

ঐ সুন্দর কেশ বিন্যাস অতি দীর্ঘকাল সুন্দর থাকবে না - - -

শেলাক ব্যতীত

চুল আটকাবার প্রসাধন সামগ্রীতে, এরোসলযুক্ত ও এরোসলহীন কেশ সিঞ্চনে উভয়তই শেলাকই প্রাথমিক আঠা।

শেলাকসমূহ ফ্লেক্সোগ্রাফিক কালি, পেষাই কল, পিল, কনফেকশনারী, জলীয় বাষ্প সেট করা কালি, প্রসাধন, বৈদ্যুতিক ইন-স্যুলেটর, কোল্ড টপ এনামেল ইত্যাদিতে বিভিন্ন প্রান্তিক ব্যবহার সামগ্রী পছন্দমত প্রস্তুত হয় পৃথিবীর বৃহত্তম শেলাক প্রস্তুতকারক, এঞ্জেলো ব্রাদার্স কর্তৃক। উহারা নিখুঁতভাবে স্পেসিফিকেশন অনুযায়ী প্রস্তুত হয়। সমুদয় এঞ্জেলো গ্রেডই আই-এস-আই স্ট্যাণ্ডার্ড ও এতদ্ব্যতীত কঠোরতর এঞ্জেলো স্পেসিফিকেশন মত। সবচেয়ে বড় কথা এই যে, এঞ্জেলো ব্রাদার্স গুণের সমতা রক্ষা করেন।

Angelo Shellacs

এঞ্জেলো ব্রাদার্স লিমিটেড, কাশীপুর, কলিকাতা-২

ASP/AB-2/68

রঙ্গমঞ্চ ওদেশে এবং এদেশে

[পূর্ব-প্রকাশিতের পর]

ইংলিশ থিয়েটারঃ এরপর নর্মান মার্শাল লিখেছেন—সাধারণভাবে বিচার করতে গেলে বলতে হয় ফাগান খুব ভাল রেপারটরীর প্রডিউসার ছিলেন না। সময়ের দিক বিবেচনা করে সর্টকাট করে কাজ করা তাঁর ধাতে পোষাতো না। অনেক সোম-বারেই মনে হত তাঁর প্রডাকসনগুলো ঠিক সম্পূর্ণভাবে গড়ে উঠতে পারে নি—সংলাপ-বাদনেও নটনটীরা ঠিক ওয়ার্ড পারফেক্ট হোতো না। সুদক্ষ রেপারটরী উডিউসার খুব তাড়াতাড়ি গ্রুপিং এবং মুভমেণ্ট ঠিক করে ফেলেন, চরিত্র রূপায়ণে একটা মোটামুটি ধারণা দেবার চেষ্টা করেন, অভিনেতা-অভিনেত্রীদের নানা বিষয়ে বিব্রত না করে যতোটা সম্ভব সময় দিতে বলেন পার্ট মুখস্থ করবার জন্য। অভিনয় দেখে সাধারণ দর্শকরা ভাবে সবদিক দিয়ে সম্পূর্ণ একটি নাটকের প্রদর্শনী তারা দেখছে। ফাগান নাটকের মঞ্চ-প্রয়োগরীতি শিখেছিলেন গ্র্যান্‌ভিল বার্কারের কাছে—সুতরাং অসম্পূর্ণ নাটককে সম্পূর্ণতার পালিশ দিয়ে দর্শকদের ঠকাবেন একথা তিনি ধারণাতেও আনতে পারতেন না। অল্প সময়ের ভেতরই তিনি প্রচেষ্টা করতেন নাটকের মুড এবং ভঙ্গিকে ফুটিয়ে তুলতে এবং নাট্যকারের চরিত্র-রূপায়ণ অনুসারেই বিভিন্ন পাত্রপাত্রীকে যথাযথ এবং স্পষ্টভাবে দর্শকদের কাছে তুলে ধরতে। অপর্যাপ্ত সময় না পাওয়াতে এর ফল হত এই রকম—নাটক পালিশ-বিহীন এবং রুক্ষ আকার ধারণ করতো। তবে নাটকের সমস্ত বিশেষত্বগুলো স্পষ্ট এবং সহজভাবে প্রতিভাত হোত।

নটনটীদের কল্পনাশক্তিকে জাগিয়ে তোলার এক বিরাট ক্ষমতা ছিল ফাগানের—প্রডিউসার হিসাবে এটিই ছিল তাঁর সব থেকে বড় গুণ। দর্শকমনকে উত্তে-জিত করে তোলবার আদর্শ মঞ্চগৃহ ছিল অক্সফোর্ড প্লে-হাউস। স্টেজ এবং প্রেক্ষা-গারে সব সময়ই একটা উৎসাহ এবং উত্তেজনার পরিবেশ বিরাজ করতো। শুধু সন্ধ্যাবেলাটা কোনরকমে কাটিয়ে দেবার জন্য কেউ প্লে-হাউসে আসতো না। কারণ এই থিয়েটারগৃহটি ছিল একটু আউট-অভ-দি-ওয়ে-প্লেসে এবং প্রেক্ষাগারে স্বচ্ছন্দের দিকটাই ছিল বেশি। ভাল থিয়েটার সম্বন্ধে বিশেষভাবে আগ্রহী দর্শকরাই নানারকম অসুবিধা সত্ত্বেও এই সর্বরকমে কুৎসিত মঞ্চগৃহে সন্ধ্যা কাটাতে আসতো। দর্শকসংখ্যা হয়তো অনেক সময়ই বেশি হোতো না—কিন্তু যারা আসতো তারা সত্যিকার ভাল শ্রেণীর দর্শক। তাদের মনে থাকতো কৌতূহল এবং শিল্প সম্বন্ধে সচেতনতা।

আমার অক্সফোর্ডে আসা এবং সেখান থেকে চলে যাওয়ার সময়টার ভেতরে ছ'টি সিজন আমি প্লে-হাউসে থিয়েটার দেখেছি। আগে যেসব নাটকের নাম করেছি সেগুলো ছাড়া আর যেসব প্লে দেখেছি তা হচ্ছে—ক্যাপ্টেন ব্রাস্‌বাউণ্ডস্ কনভার্শন, ক্যান-ডিডা, গেটিং ম্যারেড, দি লেডী ফ্রম দি সি, জন গেব্রিয়েল বর্কম্যান, দি স্কুল ফর স্ক্যাণ্ডেল, সি স্টুপস টু কঙ্কার, টুয়েলভথ নাইট, ঈডিপাশ, সিয়েরার ম্যাডাম পোঁপটা, মমের স্মিথ, পিনেরোর ড্যাণ্ডি ডিক্, এ ছাড়া আরও বারটি বা ততোধিক একাঙ্ক নাটক। প্রতি সিজনে তিনটি বা চারটি একাঙ্ক নাটক দেখানো হোতো একটি সম্পূর্ণ সন্ধ্যার এনটারটেনমেণ্ট হিসাবে। এই জাতীয় প্রোগ্রামেই আমার সুযোগ হয়েছিল পিরানদেল্লোর 'দি ম্যান উইথ এ ফ্লাওয়ার ইন হিজ মাউথ', ষ্ট্রিণ্ডবার্গের 'দি স্ট্রেঞ্জার', ইয়েটস্-এর 'ল্যাণ্ড অভ হার্টস ডিজায়ার', টুর্গেনেভের 'কাশ্চি কাজিন', লেডী গ্রেগরীর 'দি ওয়ার্ক হাউস ওয়ার্ড', শ'-এর 'ডার্ক লেডী অভ দি সনেট্‌স্', গলসওয়ার্দির 'দি ফার্স্ট এণ্ড দি লাস্ট', লেনক্সের 'রবিনসন ক্রাব্‌ড্ ইয়ুথ' এবং বেনাভেণ্টের 'হিজ উইডোজ হাজবেণ্ড' দেখবার।

তিনটি প্রডাকসন এখন পর্যন্ত অত্যন্ত স্পষ্টভাবে আমার স্মরণে আছে। এ তিনটি হচ্ছেঃ সিঙ্গের 'ডেয়ারড্রি অভ দি সরোস'—এ নাটকে ভেনোরিকা টারলে অদ্ভুত এবং অসাধারণ অভিনয়-প্রতিভার পরিচয় দিয়ে-ছিলেন ডেয়ারড্রির ভূমিকায়। দ্বিতীয়টি রিচার্ড হিউজেসের 'এ কমেডি অভ গুড এণ্ড ইভিল' আর তৃতীয়টি 'দি চেরী অর্চার্ড', এটি এর আগে ইংলণ্ডে পাবলিক স্টেজে মঞ্চস্থ হয় নি। এটির প্রদর্শনের দু'-এক সপ্তাহ আগে উইলিয়াম আর্চার এসে আমার সঙ্গে অক্সফোর্ডে ছিলেন। তাঁর আগমনের উদ্দেশ্য ছিল একটি ইউনি-ভার্সিটি ক্লাবে বক্তৃতা দেওয়া—এই ক্লাবের আমিই ছিলাম প্রেসিডেণ্ট। আর্চার আমাকে উপদেশ দিয়েছিলেন যেন চেরী অর্চার্ড দেখতে গিয়ে আমি সময় এবং অর্থের অপব্যয় না করি। এই নাটকের স্টেজ সোসাইটির প্রডাকসন নাকি তিনি দেখে-ছিলেন। অনেক সময়েই পরে আমি আশ্চর্য হয়ে ভেবেছি স্টেজ সোসাইটির চেরী অর্চার্ড প্রডাকসনে কি এমন ত্রুটি হয়ে-ছিল যার ফলে শুধু আর্চারই নন, আরও বেশির ভাগ নাট্য-সমালোচকই নাটকটি সম্পর্কে এভাবে বিভ্রান্ত হয়ে গিয়েছিলেন। হয়তো এমনও হতে পারে ত্রুটিটা ছিল দর্শকদেরই, প্রডাকসনটির নয়। তখনকার

"জেনিভা" (বার্নার্ড শ) নাটকের একটি দৃশ্য

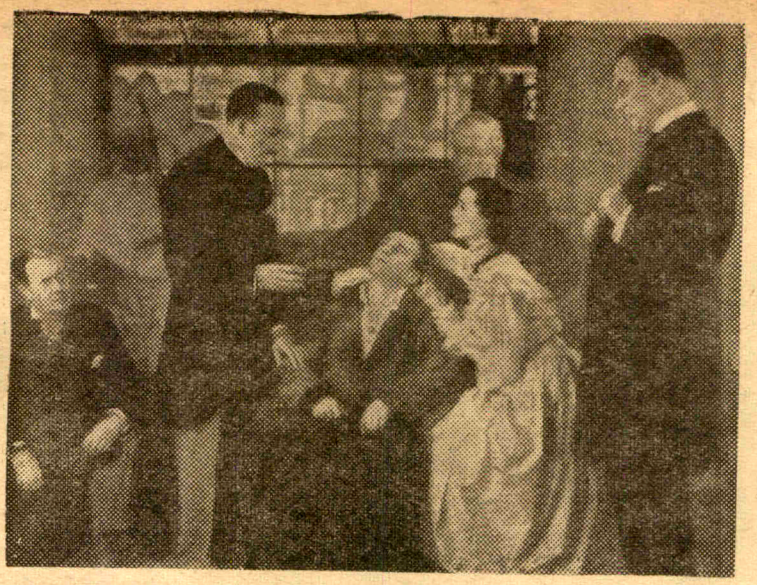

"ডক্টরস ডিলেমা"তে ডুবেডাট-এর মৃত্যু

দিনে স্টেজ সোসাইটির প্রধান দু'জন নাট্যকার বলতে বোঝাতো শ' এবং ইবসনকে। এই থিয়েটারের সদস্যারা প্রধানত চাইতেন সামাজিক এবং নৈতিক সমস্যা সম্পর্কে নাটকের মাধ্যমে আলোচনা শুনতে। সমাজতান্ত্রিক মনোবৃত্তিসম্পন্ন স্টেজ সোসাইটির দর্শকেরা চেখভের কোন বক্তব্য নেই দেখে হয়তো খুবই হতাশ এবং বিরক্তবোধ করেছিলেন—কিন্তু নাটকটির অন্তর্বর্তী বেদনার দিকটা, কোমল অনুভূতির সূক্ষ্ম এবং হিউমার তাঁদের মনকে স্পর্শ করতে পারে নি কেন একথা বুঝতে পারি না।

এক সোমবারের সন্ধ্যায় সন্দেহের দোলায় ভরা মন নিয়ে প্লে-হাউসে এ নাটকের অভিনয় দেখতে গেছিলাম। ভেবেছিলাম বিরক্তিবোধ করবো, একঘেয়ে লাগবে। কিন্তু আমার জীবনে এ রাতের মত উত্তেজিত খুব কমই হয়েছি। নাটকটিতে এমন একটি বাস্তবতার অবতারণা করা হয়েছিল যা কোনও মঞ্চের ওপর করা সম্ভব বলে আমি আগে ভাবতে পারি নি। আমার মনে হয়েছিল যেন এই প্রথম আমি মঞ্চের ওপর সাধারণ নরনারীকে দেখছি। এর আগে তাদের সব সময়েই লার্জার দ্যান লাইফ হিসাবে চিত্রিত হতে দেখেছি। অথবা দেখেছি টাইপ চরিত্র হিসাবে, বা নাট্যকারের উদ্দেশ্য প্রতিষ্ঠার জন্য বিশেষ বিশেষ গুণের দ্বারা বিভূষিত হয়ে প্রতিভাত হতে। কদাচিৎ নাটকের চরিত্রকে এর আগে সম্পূর্ণ স্বাভাবিকভাবে কথাবার্তা বলতে বা কাজ করতে দেখেছি। অন্যান্য নাটকে চরিত্রগুলোর আচার-আচরণ নির্ধারিত হয় নাটকীয় বা নৈতিক আবশ্যকতার ওপর নির্ভর করে। তারা প্রতিভাত করে কোন ভাবধারা, পরিস্ফুটন করে নাটকের প্লট, লোককে হাসায় বা কাঁদায়। কিন্তু চেরী অর্চার্ড এমন শ্রেণীর নাটক যেখানে নাট্যকার নিরপেক্ষ সাক্ষী হিসাবে চরিত্রগুলো সম্পর্কে যা তিনি সত্য বলে জানেন তাই বলে যাচ্ছেন, তাদের সম্বন্ধে কোনো মতামত প্রকাশ করছেন না—recording their doings and sayings but making no obvious attempts to control their behaviour so as to fit them into some pre-arranged plan of his own.

উইলিয়াম আর্চার নাটকটির গাঠনিক আকৃতিহীনতা এবং অ-সংস্কৃত রচনাভঙ্গির কথা তুলে বিরক্তি প্রকাশ করেছিলেন। আমার মনের প্রতিক্রিয়া কিন্তু সম্পূর্ণ বিপরীতভাবেই হয়েছিল—নাট্যকার জীবনের একটি সুষ্ঠু ও সম্পূর্ণ ছবি তুলে ধরতে গিয়ে জীবনকে যে তাঁর রচনায় অতি সরল-সহজ করে দেখান নি তারই ফলে নাটকটি অত্যন্ত বেশি বাস্তব বলে আমার মনে হয়েছিল। সেই সন্ধ্যায় প্লে-হাউসে আমি আমার ভাবধারাগুলোকে বিশ্লেষণ করে দেখতে পারি নি। আমার শুধু মনে হয়েছিল এমন একটি নাটক দেখলাম যা জীবনের অনেক বিস্ময় এবং সৌন্দর্য দিয়ে পরিপূর্ণ। জীবনের হিউমার, বেদনা, বহু রকমের অর্থহীনতা—সবই আছে এই চেরী অর্চার্ডে। মানুষের জীবনকে অন্তর দিয়ে, সহানুভূতি ভরে বুঝতে চেষ্টা করেছেন চেখভ, তাদের অন্তর থেকে ভালবেসেছেন, কিন্তু কোথাও সেন্টিমেন্টালিটি দেখান নি। মানুষ সম্পর্কে তাঁর কোন মোহ বা ভ্রান্তধারণাও যেমন ছিল না, তেমনি ছিল না কোনরকমের তিক্ততা। এই প্রথম আমি উপলব্ধি করেছিলাম যে অন্যান্য শিল্পের তুলনায় থিয়েটারেই অপেক্ষাকৃত গভীর এবং তীক্ষ্ণ ধরণের বাস্তবতার রূপায়ণ করা সম্ভব।

এর পরেও আরও বহু দেশে আমি 'দি চেরী অর্চার্ড' নাটকের মঞ্চাভিনয় দেখেছি। এখনও আমার দৃঢ় বিশ্বাস এসব প্রডাকসনের সঙ্গে তুলনা করে ফাগানের মঞ্চরূপায়ণটিকে সবদিক থেকে সেরা বলা চলে। অবশ্য আমি নিজে স্তানিসলাভস্কির চেরী অর্চার্ড প্রডাকসন দেখি নি। কিন্তু একজন যাঁর মতামতের প্রতি আমার আন্তরিক শ্রদ্ধা আছে এবং যিনি ঐ নাটকের স্তানিসলাভস্কি-প্রডাকসন এবং অন্যান্য অনেক প্রডাকসন দেখেছেন, তাঁর মতে--Fagan's production was closest in spirit to Stanislavsky's. স্তানিসলাভস্কি প্রযোজিত চেরী অর্চার্ড ফাগান দেখেন নি—তিনি রাশিয়াতে কখনও যান নি—তবে এক দিক দিয়ে তাঁর খুব সুবিধা হয়েছিল, তিনি জাতে ছিলেন আইরিশম্যান। চেরী অর্চার্ডে বর্ণিত রাশিয়ার সঙ্গে ফাগানের পরিচিত আয়ার্ল্যান্ডের অনেকদিক থেকে অনেক রকমের মিলা ছিল। চেখভের রাশিয়ার মত, ফাগানের আয়ার্ল্যান্ডেও ছিল বিচ্ছিন্ন, নিস্তেজ গ্রামের সব পরিবার—তাদের প্রাসাদোপম সব অট্টালিকাগুলো ধ্বংসের দিকে এগিয়ে আসছিল, তাদের জমিদারী ক্রমে ক্রমে ক্ষয়প্রাপ্ত হচ্ছিল। তাদের অসংখ্য ভৃত্যের দল কমতে কমতে দু'-তিনটিতে এসে নামছিল। চেখভের রাশিয়ানদের মত ফাগানের পরিচিত ঐ সব বাড়ির আইরিশ অধিবাসীদের একই ধরণের অতীতের প্রতি বিশ্বাস এবং ভালবাসা ছিল, রাশিয়ানদের মত তারাও অনুভব করতো তাদের বর্তমান জীবনে কোন আশার আলো জ্বলবে না, অস্পষ্ট একটা দুরাকাঙ্ক্ষা মনে মনে পোষণ করতো যে ভবিষ্যতে কিছু একটা ঘটবে এবং তাদের জীবনের গতি বদলে যাবে।

এ ছাড়াও আরও একটা গভীর ধরণের চরিত্রগত ঐক্য ছিল ফাগান এবং চেখভের মধ্যে। স্লাভ এবং কেল্টদের ভেতর একই ধরণের একটা গভীর বেদনাবোধ থাকে যা ইংরাজরা কোনমতেই বুঝে উঠতে পারে না। তারা এই বেদনাবোধকে বিষণ্ণতা এক

হতাশার সঙ্গে গুলিয়ে ফেলে। চেখভের এই বেদনাবোধের ব্যাপারটা ইংরেজ প্রযোজকরা ঠিকমত বুঝতে পারতো না, তারা ভাবতো দর্শকেরা চেখভের নাটক দেখে বিমর্ষ হয়ে পড়বে এবং সেটাকে কাটিয়ে ওঠবার জন্যই এরা হিউমারের দিকটাকে ফাঁপিয়ে তুলবার চেষ্টা করতো অন্যান্য ভাবাবেগকে দাবিয়ে রেখে। নিজেদের এই ধরণের ভুল প্রচেষ্টাকে সমর্থন করতে গিয়ে তারা বলতো—'দি চেরী অর্চার্ড' নাটকটিকে চেখভ নিজেই বলেছেন—"এটি একটি ফার্স।" কিন্তু এ কথাটা ঠিক নয়। নাটকটি রচনা করবার সময় চেখভ তাঁর বোনকে লিখেছিলেন—"কয়েকটি দৃশ্য কমেডি না হয়ে ফার্সের গা-ঘেঁষে চলেছে।"

চেরী অর্চার্ডে সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিত সব মুহূর্তে হঠাৎ হঠাৎ ফার্সের অবতারণায় ইংরেজ দর্শক সব কিছুর খেই হারিয়ে ফেলে। আসলে মেণ্টাল এবং ইমোশন্যাল এজিলিটি না থাকাতে দ্রুত একটি মুড থেকে আরেকটি মুডে যাওয়া তাদের পক্ষে সম্ভব হয় না। এই যে চট্ করে ভাব থেকে ভাবান্তরে যাওয়া—এ জাতীয় এজিলিটি কেল্ট এবং শ্লাভদের পক্ষে একটা অতি স্বাভাবিক ব্যাপার। চেখভের কোন নাটকের সঙ্গে কোন আইরিশ প্লে-র—যেমন ধরুন ও'কেসীর লেখা কোন নাটকের—তুলনা করে দেখুন। দুটি নাটকেই দেখবেন দর্শক হঠাৎ হঠাৎ উৎক্ষিপ্ত হচ্ছেন—কমেডি থেকে ট্র্যাজেডিতে, ট্র্যাজেডি থেকে ফার্সে এবং ফার্স থেকে পেথোসে।

ফাগানের চেখভ প্রডাকসন সাফল্যলাভ করেছিল, কারণ ফাগান নিশ্চিন্তমনে

'শেপী' নাটকে স্যার র‍্যাল্‌ফ্ রিচার্ডসন

নাটকের ক্রমান্বয়ে পরিবর্তনশীল মুডগুলোকে সঠিকভাবে কার্যকরী করতে পেরেছিলেন, কখনও দর্শকদের মনে এ দ্বিধা আসতে দেন নি যে নাট্যকার তাদের হাসাতে চাইছেন, না কাঁদাতে চাইছেন।

এমনতর চেখভের নাটকের আর কোন প্রডাকসন আমি দেখি নি—একই সঙ্গে এতোটা হাস্যরস এবং এতোটা ভাবাবেগের প্রাবল্য। সে রাতে অক্সফোর্ডের দর্শকেরা চেখভের নাটকটিকে মোটেই বিভ্রান্তিকর বা অর্থহীন প্লে বলে মনে করে নি—যেমনটা মনে করেছিল স্টেজ সোসাইটির সদস্যেরা যখন তারা ঐ নাটকের প্রডাকসন দেখেছিল। নাটকের শেষে কয়েক মুহূর্তের জন্য দর্শকেরা নিস্তব্ধ হয়ে বসে ছিল, তারপর শুরু হল প্রশংসাধ্বনি, ক্রমে ক্রমে সেটা একটা বিরাট আনন্দের হুল্লোড়ে পরিণত হল।

সিজনের শেষে ফাগান 'দি চেরী অর্চার্ড' নাটকটি নিয়ে লণ্ডনে গেলেন, প্রথমে লিরিক হ্যামারস্মিথে এবং পরে রয়ালটিতে।

আজকের দিনে 'দি চেরী অর্চার্ড' পৃথিবীর একটি সেরা নাটক বলে সর্বজনস্বীকৃত। কিন্তু লণ্ডনে ফাগানের প্রডাকসন দেখে বহু সমালোচক তখন যেভাবে নাটকটিকে ধিক্কৃত করেছিলেন আজ তা ভাবতেও আশ্চর্য লাগে। জেমস এগেট প্রমুখ দু'-চারজন বিখ্যাত সমালোচক অবশ্য নাটকটির অতিমাত্রায় প্রশংসা করে বলেছিলেন—"an imperishable masterpiece."

[ক্রমশঃ]

মাসিক ১০ টাকা কিস্তিতে
ট্রানজিস্টার লউন

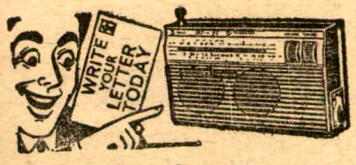

বিশ্ববিখ্যাত সর্বাধুনিক জাপান মডেল, চিত্তাকর্ষক শক্তিশালী, গ্যারাণ্টিযুক্ত "ওয়ার্ল্ডভয়েস" ৩ ব্যাণ্ড অল ওয়ার্ল্ড আশ্চর্যজনক নাইট ল্যাম্পযুক্ত। প্রত্যেক গ্রামে ও শহরে পাঠানো যায়।
Write to :—
ALL WORLD AGENCY,
(B.W.) Kalyanpura, Delhi-6.

রঙ্গজগৎ

কি নাটক দেখব

বড়দিনের ছুটিতে অনেকে কলকাতা আসেন নাটক দেখার ইচ্ছা নিয়ে। বাংলা নাটকের খ্যাতি এবং আকর্ষণ ভারত জুড়ে। বিষয়বস্তু এবং আঙ্গিকে বাংলা নাটক সারা ভারতের নাটকপ্রিয়দের কাছে আকর্ষণের জিনিস। অনেক বন্ধু-বান্ধব এসে জিজ্ঞাসা করেন কি নাটক দেখব বলুন ত'! এ প্রশ্নের সম্মুখীন হলে কয়েক বছর আগে যেমন চট করে জবাব দিতে পারতাম, কয়েকটি নাটকের নাম করতে পারতাম বা দেখা নাটক তাঁদের সঙ্গে গিয়ে আবার দেখতে পারতাম, এখন তা' আর সম্ভব হয় না। আজ অনেক ভেবে তবে বলতে হয় এই নাটক দেখুন, ঐ থিয়েটারে যান।

যদিও নাটকের দল যেমন অগুণতি, পেশাদার থিয়েটারগুলির সংখ্যাও বেড়েছে। নাট্যোৎসব ত' লেগেই আছে। কিন্তু বিষয়বস্তুর দিক চিন্তা করলে নাটকগুলির গতি যেন এক জায়গায় এসে থেমে রয়েছে। ভাল নাটকও হয়—কিন্তু সেগুলিও অনিয়মিত। পেশাদার মঞ্চগুলিই সব সময়ের জন্য খোলা। অথচ পেশাদার মঞ্চে যে নাটকগুলি হচ্ছে বিষয়বস্তুর দিক থেকে খুব যে আশা-ব্যঞ্জক এমন ত' বলা যায় না। এক সময় বাংলার গণনাট্য আন্দোলনের ঢেউ পেশাদার মঞ্চকেও প্রভাবিত করেছিল, বাস্তবধর্মী বলিষ্ঠ নাটক মানুষ চায় এবং মানুষকে উদ্দীপিত করা নাটকের ধর্ম একথা তাঁরা হয়ত মনে করেছিলেন। কিন্তু গত ক'বছরে দেখা যাচ্ছে—ধীরে ধীরে পেশাদার মঞ্চের নাটকগুলি যেন পিছনে হটে আসছে। যে মিনার্ভা এক সময় 'কল্লোল'-এর মত নাটক করেছিল—আজ মিনার্ভার নাটকে সেই সুর যেন নেই। পর পর দুটি নাটকই দর্শকরা গ্রহণ করতে পারেন নি। অথচ মিনার্ভার ছিল পেশাদার নাট্যমঞ্চে অগ্রণী ভূমিকা। সেই ভূমিকা থেকে তাঁরা কিছুটা সরে এসেছেন নাটককে সংকীর্ণ দৃষ্টিভঙ্গিতে জড়িত করার জন্যে। অন্যান্য নাটকগুলির কথা বলার তেমন প্রয়োজন নেই—একবার দেখে দ্বিতীয়বার দেখার মত উৎসাহ বোধহয় কারো থাকে না।

আধা-পেশাদার নাটকের দলগুলিও তাঁদের উদ্যোগকে আবদ্ধ করে রেখেছেন অনুবাদ নাটকের মধ্যে। কখনো স্বীকৃতি দিয়ে, কখনো বিনা স্বীকৃতিতে। সে নাটকগুলি বক্তব্যে ভাল হলেও সব সময় দেশের পরিবেশের ছোঁয়া পাওয়া যায় না। কেউ কেউ নতুন কিছু করা বা চমক লাগাবার জন্যে এ্যাবসার্ড নাটককে অবলম্বন করেছেন। এ্যাবসার্ড নাটকে আঙ্গিকের চমক আছে, কথার ঝঙ্কার আছে সত্যি কিন্তু বক্তব্যে রয়েছে বিরাট শূন্যতা। মানুষের প্রতি অবিশ্বাস, জীবনের প্রতি অনীহা কখনো খোলা কথায়, কখনো আকারে-ইঙ্গিতে বলে যাচ্ছে।

কিন্তু নাটককে ত' আমরা জীবন থেকে আলাদা করে ভাবতে পারি না। স্থূল রঙ্গরস অথবা কথার ঝঙ্কার দিয়ে মন ভোলাবার দিনও এখন নয়। পেশাদার নাট্যমঞ্চগুলির দিকে তাকালেই তাই মনে প্রশ্ন জাগে। কি নাটক দেখব জিজ্ঞাসা করলে জবাব দিতে পারি না।

—গুঞ্জন

শর্মিলা ঠাকুর

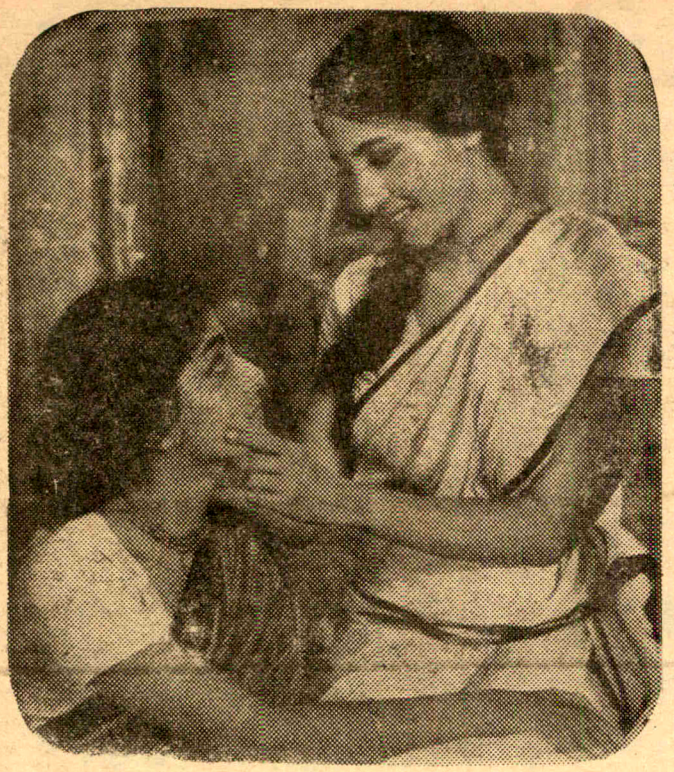

'কমললতা' ছবিতে সুচিত্রা সেন ও মৃণাল বন্দ্যোপাধ্যায়

স্বর্ণ শিখর প্রাঙ্গণে

মাধবী মুখার্জীর বিয়ের আগে একটানা স্যুটিং-এর পরে সম্প্রতি 'স্বর্ণ শিখর প্রাঙ্গণে' ছবির বাকি কাজ শেষ হয়েছে। ছবিটি এখন সম্পাদনাগারে গেছে। এই ছবির বিভিন্ন চরিত্রে রূপ দিয়েছেন স্বরূপ দত্ত, দিলীপ রায়, তরুণকুমার, সুব্রতা চট্টোপাধ্যায়, কৃষ্ণা প্রধান, প্রশান্ত চট্টোপাধ্যায়, অরুণ মুখার্জী।

জাপানী ও সোভিয়েট ছবি

সিনে সেণ্ট্রাল ক্যালকাটা আগামী ৩রা থেকে ৫ই জানুয়ারী এক জাপানী ছবির সেসন করছেন। এই সেসনে দেখান হবে 'এ্যাংগ্রী সী', 'আওয়ার নাইলেণ্ট লাভ', 'জিন চে গে'।

৬ই থেকে ৯ই জানুয়ারী হবে সোভিয়েট ছবির সেসন। সিনে সেন্ট্রাল ক্যালকাটা এই সেসনে দেখাবে 'সাডেন এন কাউন্টার', 'থ্রি প্লাস টু', 'আই ব্যট এ ডাডি', 'কিডন্যাপিং ককেশিয়ান স্টাইল' ও 'ইভান্স চাইল্ডহুড'।

নাটকের কথা

লঘু-গুরু

গত ২১শে ডিসেম্বর একাডেমি ফাইন আর্টস ভবনে 'ন্যাশনাল কোম্পানী বিক্রিয়েশন ক্লাবের প্রথম বার্ষিক উৎসব অনুষ্ঠিত হয়েছে। অনুষ্ঠানে নিমু ভৌমিকের পরিচালনায় 'লঘু-গুরু' নাটক অভিনীত হয়। নাটকাভিনয়ের পর এক বিচিত্রানুষ্ঠান হয়। বিচিত্রানুষ্ঠানে অংশ গ্রহণ করেন হেমন্ত মুখোপাধ্যায়, ভি, বালসারা প্রমুখ শিল্পিগণ। ভারতীয় নৃত্যকলা মন্দিরের পরিচালনায় নাগা নৃত্য, রাজস্থানী নৃত্য, ভাঙরা নৃত্য প্রদর্শিত হয়।

লগ্ন এলো

গত ২৭শে নভেম্বর দক্ষিণ কলকাতার নাট্য সংস্থা ভারতীর সদস্যগণ বেহালার অতীন্দ্র মঞ্চে প্রদ্যোতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের পরিচালনায় অরুণকান্তি সাহার নাটক 'লগ্ন এলো' অভিনয় করে। অভিনয়ে অংশ গ্রহণ করে পাচুগোপাল দাস, নবকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, শেখরকুমার, হরপ্রসাদ মালিক, দুর্গাপদ ঘোষ, আলো মজুমদার, শিখা মণ্ডল, রীতা মাকাল, কৃষ্ণা ভট্টাচার্য প্রমুখ।

স্টুডিও খবর

পরিণীতা

শরৎচন্দ্রের 'পারণীতা' ছবির সেন্সর হয়ে গেছে। ছবিটি মুক্তি প্রতীক্ষায়। ছবির পরিচালক শ্রীঅজয় কর জানালেন বাংলা ছবির জগতের বর্তমান অরাজক অবস্থা সৃষ্টির জন্য তাঁর ছবি মুক্তিলাভ করতে অযথা বিলম্ব হচ্ছে। এই ছবিতে অভিনয় করেছেন মৌসুমী চট্টোপাধ্যায়, সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়, কমল মিত্র, বিকাশ রায়, সমিতা ভঞ্জ, শৈলেন মুখার্জী, বঙ্কিম ঘোষ, ছায়া দেবী, অনুভা গুপ্তা, যমুনা সিংহ, গীতা দে, রমি চৌধুরী এবং শিশু শিল্পী নীরা মালিয়া।

সঙ্গীতকথা

সুরসভার সঙ্গীত সম্মেলন

হিমাংশু সঙ্গীত সম্মেলনের সহযোগিতায় গত ২২, ২৪ ও ২৫ ডিসেম্বর রবীন্দ্র সরোবর মঞ্চে সুরসভার উদ্যোগে তিনদিনব্যাপী সঙ্গীত সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। সম্মেলনে উচ্চাঙ্গসঙ্গীত, রবীন্দ্রসঙ্গীত, নজরুলগীতি, হিমাংশুগীতি, পল্লীগীতি, অতুলপ্রসাদের গান, সেতার ও নৃত্য পরিবেশিত হয়। উচ্চাঙ্গসঙ্গীতে অংশগ্রহণ করেন—কান্তি মৈত্র, কল্পনা বন্দ্যোপাধ্যায়, ধীরেন দাস, মঞ্জুশ্রী রায়, রঘুনাথ বসাক, মণিদীপা সাহু, গৌর বসাক, মায়া মিত্র (সেতার) ও সুজাতা বসু (বেহালা)। রবীন্দ্রসঙ্গীতের শিল্পীদের মধ্যে ছিলেন সুচিত্রা মিত্র, চিন্ময় চট্টোপাধ্যায়, সাগর সেন, পূর্বা সিংহ, বাণী ঠাকুর, সুমিত্রা মুখোপাধ্যায়, গৌতম বসু, তুষার ভঞ্জ, তপন রায়চৌধুরী, শাশ্বতী গুপ্ত, লক্ষ্মী গুপ্ত, শ্যামলী মিত্র, গোপা বাগচী। অন্যান্য

লঘুসঙ্গীত পরিবেশনায় ছিলেন রঞ্জিতা চক্রবর্তী, তপতী মৈত্র, ইরা মুখোপাধ্যায় (গজল), সুস্মিতা রায়চৌধুরী, মমতা ঘোষ, দীপ্তি রায়, চন্দ্রা মুখোপাধ্যায়, অনিন্দিতা ঘোষ, সবিতা মুখোপাধ্যায়, স্বপ্না দাস, জয়া সুন্দরেশন, অম্বিকা বন্দ্যোপাধ্যায়, ছন্দা ধর, মালবিকা বন্দ্যোপাধ্যায়, ইলিনা গুপ্ত ও কুমকুম বন্দ্যোপাধ্যায়। নৃত্য পরিবেশন করেন জয়শ্রী লাহিড়ী, শান্তা বসুরায় ও শেফালী মুখোপাধ্যায়। সঙ্গতে ছিলেন কিশোর নন্দী, দুলাল ভট্টাচার্য ও বেণু মুখোপাধ্যায়। যন্ত্রসঙ্গীতে সহযোগিতা করেন স্বপন মুখোপাধ্যায়, রথীন চৌধুরী, শম্ভু পাল, গোপাল বিশ্বাস, পরিতোষ রায় ও সলিল নিয়োগী।

সমগ্র সম্মেলনটি পরিচালনা করেন রথীন চৌধুরী। সুরসভার পক্ষ থেকে ৫০১ টাকা উত্তরবঙ্গ বন্যার্তদের সাহায্যার্থে ইণ্ডিয়ান মেডিক্যাল এসোসিয়েশনের হাতে দেওয়া হয়।

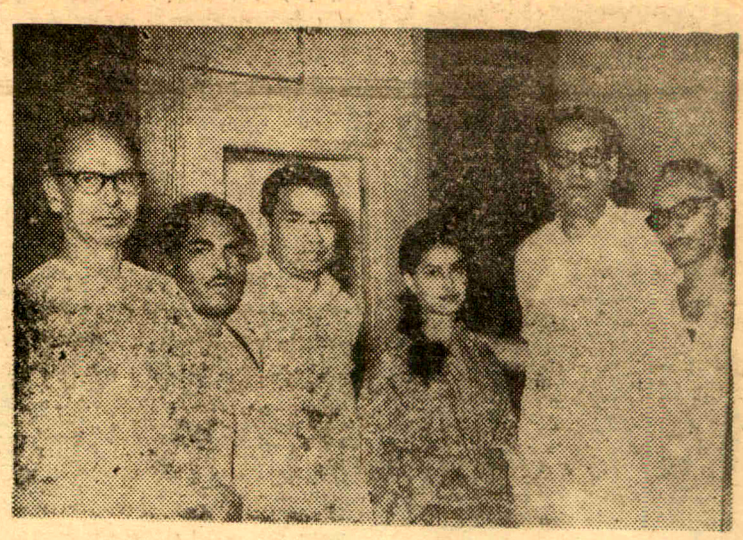

এইচ, এম, ভি স্টুডিওতে গৃহীত অধ্যাপক দীপংকর চট্টোপাধ্যায়ের দুর্লভ বাংলা গানের রেকর্ডিং-এ হেমন্ত মুখার্জীর সঙ্গে শ্রীচট্টোপাধ্যায়, সন্তোষ সেনগুপ্ত, রাধাকান্ত নন্দী, অজিত চট্টোপাধ্যায় ও মৌসুমী চট্টোপাধ্যায়।

সংবাদকণী

সেতার শিল্পী দেবব্রত চৌধুরীর বিদেশ সফর

দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয় ও নয়াদিল্লীর কলা কেন্দ্রের অধ্যাপক দেবব্রত চৌধুরী বর্তমানে ইংল্যাণ্ডে রয়েছেন।

গত বছরও দেবব্রত গিয়েছিলেন আমেরিকা ও ইয়োরোপ সফরে। একটানা দু' মাস পাঁচ দিনের ঠাসা অনুষ্ঠান-সূচীকে কেন্দ্র করে তাঁকে ঘুরতে হয়েছিলো আমেরিকার প্রতিটি প্রান্তে আর ফ্রান্স, ইংল্যাণ্ড ও জার্মানীতে।

১৯৬৮ সালের অক্টোবর মাসে দেবব্রত আবার গেছেন বিদেশে। এবার তাঁর দীর্ঘ সফর। আগামী ২৩শে জানুয়ারী ফিরে আসছেন দিল্লীতে।

ফিরে আসার আগে তাঁকে ওদেশের শ্রোতাদের খুশি করার জন্যে সেতার বাজাতে হবে ইয়োরোপের বিভিন্ন স্থানে। প্রথমে লণ্ডন, তারপর প্যারিস, জেনেভা, উঃ বার্লিন আর সব শেষে স্পেন।

আরো একটু বলার আছে। উত্তরবঙ্গে বন্যার সময় তিনি ছিলেন আমেরিকায়। সুদূর চিকাগো শহরে বন্যার্তদের সাহায্যের জন্যে তিনি বসিয়েছিলেন বাজনার আসর। আর সেই অনুষ্ঠান থেকে সংগৃহীত ৬০০০ টাকা (ছ' হাজার টাকা) তিনি পাঠিয়ে দিয়েছেন উত্তরবঙ্গের বন্যার্তদের সাহায্যের জন্যে।

থিয়েটার ওয়ার্কশপ

কলকাতার প্রখ্যাত নাট্যসংস্থা থিয়েটার ওয়ার্কশপ আগামী জানুয়ারী থেকে এপ্রিল পর্যন্ত মিনার্ভায় প্রতি মাসে একটি করে নাটক মঞ্চস্থ করার এক পরিকল্পনা গ্রহণ করেছেন। এই পর্যায়ের প্রথম নাটক পরিবেশিত হবে আগামী ১৪ই জানুয়ারী সন্ধ্যে ৭টায়। নাটকের নাম 'ছায়ায় আলোয়'। এর সঙ্গে প্রতি মাসে মুক্ত অঙ্গনেও এঁরা নাটক প্রযোজনা করবেন

সংরক্ষণ সমিতি অরাজকতা সৃষ্টি করছে
বিশিষ্ট পরিচালক-প্রযোজকদের অভিযোগ

পশ্চিমবঙ্গ চলচ্চিত্র সংরক্ষণ সমিতি থেকে শ্রীতপন সিংহ, শ্রীঅজয় কর, শ্রীবিভূতি লাহা, শ্রীতরুণ মজুমদার, শ্রীমতী কানন দেবী প্রমুখ পদত্যাগ করেছেন। কেন তাঁরা পদত্যাগ করেছেন সে কথা সাংবাদিকদের তাঁরা জানান—গত ২৬শে ডিসেম্বর গ্রাণ্ড হোটেলে গেস্ট-রুমে এক সাংবাদিক সম্মেলনে। এই সম্মেলনে শ্রীসত্যজিৎ রায়, শ্রীহেমেন গাঙ্গুলী, শ্রীহেমন্ত মুখার্জী, শ্রীমতী অরুন্ধতী দেবী, শ্রীহরিদাস ভট্টাচার্য প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন এবং তাঁরাও সংরক্ষণ সমিতির সমালোচনা করে সমিতির কাজ চলচ্চিত্র শিল্পের পক্ষে ক্ষতিকর বলে নিন্দা করেন। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে শ্রীসত্যজিৎ রায়, শ্রীমৃণাল সেন, শ্রীঋত্বিক ঘটক প্রথম থেকেই চলচ্চিত্র সংরক্ষণ সমিতির সঙ্গে যুক্ত ছিলেন না।

সাংবাদিক সম্মেলনে শ্রীসত্যজিৎ রায় বলেন, সংরক্ষণ সমিতির কাজে গোড়া থেকেই আমার সন্দেহ ছিল, পরবর্তীকালে সমিতি যেভাবে কাজ করেছে তাতে আমার সন্দেহ আরো বদ্ধমূল হয়েছে। এই সমিতি রেজিস্ট্রিকৃত নয়, সমিতিতে ব্যক্তিগত সদস্য হবার ব্যবস্থা নেই। সমিতি জোরজুলুম করে তাদের মতামত অন্যদের উপর চাপাবার চেষ্টা করেছে। স্টুডিওতে টেকনিশিয়ানদের মধ্যে, শিল্পীদের মধ্যে, প্রদর্শকদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করেছে। শিল্পীদের ব্ল্যাকলিস্ট করেছে এবং সেসব শিল্পী ও টেকনিশিয়ানদের যাতে কাজ দেওয়া না হয় তার জন্য চাপ সৃষ্টি করেছে। ফলে বাংলা দেশে ছবি করা প্রায় অসম্ভব হয়ে উঠেছে। আমি বাংলাদেশের বাইরে ছবি করার কথা কখনো ভাবি না, কিন্তু এইভাবে চললে আমাকে নতুন করে চিন্তা করতে হবে।

শ্রীতপন সিংহ বলেন ঃ সংরক্ষণ

'আবরমতী' ছবিতে সুপ্রিয়া দেবী

সমিতি এমন বাড়াবাড়ি করেছে যে সত্যজিৎবাবুর ক্যামেরাম্যানকে ক্যামেরা ভেঙে দেবার হুমকী দিয়েছে। আর্টিস্ট-দের বয়কট, ধীরে কাজ করে দিন নষ্ট করা ইত্যাদির দ্বারা কাজে বাধা দিয়েছে। 'সাগিনা মাহাতো'-র সুটিং শুরু হলে টেলিফোনে হুমকী দেওয়া হয়েছে এবং ভয় দেখান হয়েছে ল্যাবরেটরীতে প্রসেসিং করতে দেওয়া হবে না। শ্রীসিংহ বলেন, হুমকী দিয়ে সরকার যেখানে পারছে না, এই মুষ্টিমেয় লোকগুলি কি করে আশা করে যে ভয় দেখিয়ে আমাদের মাথা নত করাবে?

শ্রীতরুণ মজুমদার বলেন ঃ গোড়া থেকেই এই সংরক্ষণ সমিতি সত্যজিৎ-বাবুর প্রতি বিরুদ্ধ মনোভাব পোষণ করেছে, খ্যাত পরিচালক এবং শিল্পী-দের সম্পর্কে কুৎসা রটনা করেছে। টেকনিশিয়ান ও কর্মীদের প্রতি তাচ্ছিল্যের মনোভাব পোষণ করেছে। সংরক্ষণ সমিতির কাজের ফলে অনেক টেকনিশিয়ান বেকার হয়েছে। পরিচালক-দের মধ্যে হতাশা এসেছে। বাংলার চলচ্চিত্র শিল্পে অচল অবস্থা সৃষ্টি হয়েছে। সমিতি দর্শকদের কথা এবং চলচ্চিত্র শিল্পের স্বার্থ একেবারেই ভাবে নি।

'ক্ষুধিত পাষাণ' প্রভৃতি ছবির প্রযোজক শ্রীহেমেন গাঙ্গুলী বলেন ঃ আমি বাংলাকে ভালবাসি—তাই বোম্বাই-য়ের টাকা বাংলায় এনে ছবি করি। কিন্তু আমাকে বলা হয়েছে সংরক্ষণ সমিতির কথামত কাজ না করলে আমার ছবি রিলিজ করতে দেওয়া হবে না। এ অবস্থা চললে আমি বাংলা দেশে ছবি করব না।

এই সাংবাদিক সম্মেলনে শ্রীহেমন্ত মুখার্জী হাটে-বাজারে ও গুপী গায়েন-বাঘা বাইন-এর প্রযোজক শ্রীঅসীম দত্ত, শ্রীবিভূতি লাহা ও শ্রীঅজয় কর সহ সকলের বক্তব্যে প্রকাশ পায়—সংরক্ষণ সমিতির কাজ বাংলা চলচ্চিত্র শিল্পের পক্ষে ক্ষতিকারক হয়েছে। নতুন প্রোডাকশন কমে গেছে। ছবি রিলিজ হচ্ছে না। স্টুডিওতে শান্তিপূর্ণভাবে কাজ করার সুযোগ আর নেই। পরি-চালক ও শিল্পীদের ব্যক্তিস্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করা হচ্ছে।

এই বিশিষ্ট পরিচালকরা বলেন—বাংলা ছবি প্রদর্শন বাধ্যতামূলক করা, দুর্বল প্রযোজকদের সাহায্য করা, ছবি দ্রুত রিলিজের ব্যবস্থা করা এবং আরো বেশি টেকনিশিয়ান ও শিল্পীদের কাজের সুযোগ করে দেওয়া এবং বাংলা-দেশে নতুন প্রযোজকদের সুযোগ করে দেওয়া ইত্যাদি শিল্পের পক্ষে সহায়ক কাজগুলি না করে সমিতি চলচ্চিত্র শিল্পে এক অরাজকতা সৃষ্টির পথ নিয়েছে। এতে বাংলা চলচ্চিত্রের সংরক্ষণ না হয়ে—সর্বনাশ হবে।

আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র মেলার সমাপ্তি অনুষ্ঠান

রাজা সুবোধ মল্লিক স্কোয়ারে দশদিনব্যাপী অনুষ্ঠিত আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র মেলা গত ২৩শে ডিসেম্বর শেষ হয়েছে। এই অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন প্রবীণ চলচ্চিত্রকার শ্রীদেবকীকুমার বসু। প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন বিখ্যাত পরিচালক শ্রীমধু বসু। এই দুই প্রবীণ পরিচালক আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র মেলাকে আমাদের দেশে এক অভিনব প্রচেষ্টা বলে অভিনন্দন জানান, এবং বলেন যে, বিরাট সংখ্যক মানুষের ভাল ছবি দেখার ক্ষুধা মেটাবার পক্ষে এরূপ উদ্যোগ সহায়ক। নর্থ ক্যালকাটা ফিল্ম সোসাইটির সভাপতি শ্রীমন্মথ রায় বলেন, প্রায় হাজার হাজার লোকের অস্থায়ী সদস্য হবার মধ্যেই এইরূপ মেলার প্রয়োজনীয়তা প্রমাণিত হয়েছে। নর্থ ক্যালকাটা ফিল্ম সোসাইটির সহ-সভাপতি শ্রীসুশীল করণ সমাগত দর্শকদের ধন্যবাদ জানান। গত ১৪ই থেকে ২৩শে ডিসেম্বর এই চলচ্চিত্র মেলা অনুষ্ঠিত হয়েছে। উদ্যোক্তা ছিল—নর্থ ক্যালকাটা ফিল্ম সোসাইটি।

শেষ দিন প্রদর্শিত হয়েছে ১৯৪০ সালে বোম্বাইয়ে মেহবুব নির্মিত 'আওরৎ' হিন্দী ছবি। এই ছবিতে ভারতের পল্লী অঞ্চলের পটভূমিতে নারীজীবনের মাহাত্ম্য ও যাতনার দিক প্রকাশ করা হয়েছে ন্যায় ও সত্যনিষ্ঠার দৃষ্টিতে। অতি সত্যভাবে পল্লী অঞ্চলের ছবি—কৃষকদের দুর্দশা ও অনিশ্চিত ভাগ্যের উপর নির্ভরশীলতা এই ছবির বৈশিষ্ট্য। বর্তমানের দৃষ্টিতে ছবিটির সম্পাদনা ত্রুটিপূর্ণ মনে হবে, কিন্তু এক সময় এটি ছিল ভারতের বিখ্যাত ছবি।

মেলায় প্রদর্শিত ছবিগুলির মধ্যে একটা সুস্থ মানবিকতার সুর ছিল। ছবিগুলিতে 'অক্টোবর' বিপ্লবের দিনগুলি, ফ্যাসিজমের জন্ম ও তার বিরুদ্ধে গণসংগ্রাম (ইউ এন্ড ইয়োর প্যাল), গত মহাযুদ্ধের সময় ফ্যাসিস্ট নৃশংসতা এবং অপরাজেয় নৈতিক শক্তি (টু হাফ টাইম ইন হেল), যুদ্ধোত্তরকালের সমস্যা ও জাতি বিদ্বেষের মর্মান্তিক কাহিনী এবং বিস্ময়কর শিল্পরুচির পরিচায়ক 'দি গ্রেট এ্যাডভেঞ্চার' ইত্যাদি দেখান হয়েছে। ছবিগুলিতে শিল্পরীতির দিক থেকে সোস্যালিস্ট রিয়ালিজম, নিও-রিয়ালিজম এবং রিয়ালিজমের প্রকাশ দেখা গেছে অপূর্বভাবে। এই দশ দিনের দশটি ছবিতে দর্শকরা চলচ্চিত্র সম্পর্কে এক সুস্থ ধারণা করতে পেরেছেন। উৎসবের উল্লেখযোগ্য সাফল্য হল, ভাল

নৃত্যশ্রী কুমারী সুমিত্রা মিত্র। ভারতের বিভিন্ন স্থানে নৃত্য প্রদর্শন করে অভিনন্দন লাভ করেছেন।

সেতারশিল্পী দেবব্রত চৌধুরী

ছবি দেখার জন্য যে দর্শকরা কত আগ্রহী তা প্রমাণিত হয়েছে। বিশেষ করে 'অক্টোবর', 'ইউ এন্ড ইয়োর প্যাল'-এর মত ছবি হাজার হাজার দর্শক নির্বাক বিস্ময়ে দেখেছেন—যা ফিল্ম সোসাইটিগুলির সাধারণ 'শো'-তেও দেখা যায় নি।

মেলাটি ছিল অত্যন্ত সুসংগঠিত। ছবি বাছাই-এর ব্যাপারেও উদ্যোক্তারা চিন্তাশীলতার পরিচয় দিয়েছেন। এই মেলার সাফল্যে প্রমাণিত হয়েছে—ফিল্ম সোসাইটিগুলির প্রদর্শন ক্ষেত্র প্রসারিত হওয়া দরকার। ভাল ভাল ছবিগুলি অস্থায়ী সদস্যদের দেখালে ফিল্ম সোসাইটির মর্যাদা বৃদ্ধি পাবে এবং সোসাইটিগুলিতে উন্নাসিকদের প্রাধান্য হবে না। এতদিন ফিল্ম সোসাইটিগুলি যে কেবলমাত্র সীমাবদ্ধ সদস্যদের জন্য নির্দিষ্ট ছিল—এই মেলা সেই সীমানা ভেঙে দিয়ে নতুন দিক খুলে দিয়েছে। ভারতে দেশী-বিদেশী স্থূল পণ্য চিত্রের প্রাধান্যের বিরুদ্ধে এই মেলা একটি বলিষ্ঠ প্রতিবাদ। এরূপ মেলা প্রতি বছর হওয়া এবং জেলা শহরগুলিতেও হওয়া দরকার।

রাজ্য সংগীত-নাটক-চারুকলা একাডেমি পুরস্কার

পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সংগীত নাটক ও চারুকলা একাডেমি চলতি বছর থেকে সংগীত, নাটক, নৃত্য ও অঙ্কনশিল্পের ক্ষেত্রে পারদর্শিতার জন্য পর্যায়ক্রমে এক-জনকে শ্রেষ্ঠত্বের স্বীকৃতি হিসাবে রাজ্য একাডেমির পুরস্কার দেবেন। পুরস্কা-রের পরিমাণ নগদ দুই হাজার টাকা এবং অভিজ্ঞানপত্র। এ বছর সংগীতের ক্ষেত্রে স্মরণীয় অবদানের জন্য সংগীত রত্নাকর শ্রীসুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের নাম ঘোষণা করা হয়েছে।

সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বাঁকুড়া জেলার বিষ্ণুপুরের প্রখ্যাত সংগীতজ্ঞ অনন্তলাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের তৃতীয় পুত্র। ছোটবেলা থেকে তিনি অগ্রজ রামপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায় ও গোপেশ্বর বন্দ্যো-পাধ্যায়ের কাছে কণ্ঠ ও যন্ত্রসংগীত শিক্ষা করেন। তিনি কুড়ি বছর বয়সে কলকাতা আসেন এবং মহারাজা যতীন্দ্র-মোহন ঠাকুরের সভাগায়করূপে পরিচিতি লাভ করেন। বিষ্ণুপুর ঘরানার ধ্রুপদ, খেয়াল ইত্যাদি ছাড়াও সেতার, এস্রাজ, জলতরঙ্গ ইত্যাদি তালযন্ত্রে তাঁর পারদর্শিতা রয়েছে। তাঁর ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে সাহানা দেবী, ইন্দিরা দেবী-চৌধুরাণী, কমলা দাস, লেডি অবলা মুখার্জী, মালতী ঘোষাল এবং ডঃ রমা চৌধুরীর নাম উল্লেখযোগ্য। তিনি বর্তমানে বিষ্ণুপুরের রামশরণ সংগীত বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ।

বর্তমান বঙ্গসাহিত্যে সর্বাধিক জনপ্রিয় লেখিকা

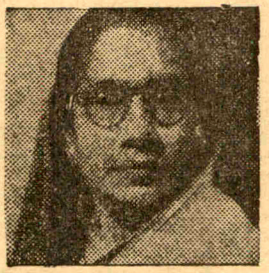

আশাপূর্ণা দেবীর

গ্রন্থাবলী

আবার একখণ্ড প্রকাশিত হয়েছে!

তিনখানি সম্পূর্ণ উপন্যাস। সাতটি বড় গল্প

১। বলয়গ্রাস ২। প্রেম ও প্রয়োজন

৩। দুনিবার ৪। এক গুচ্ছ গল্প

মূল্য মাত্র সাড়ে ছয় টাকা

আগেই বেরিয়েছে আর এক খণ্ড

গ্রন্থাবলী

১। জহুরী ২। অনির্বাণ

৩। সোনালী দিনের মন

৪। এক গুচ্ছ গল্প

মূল্য মাত্র পাঁচ টাকা

বসুমতী (প্রাঃ) লিঃ
কলিকাতা-১২

খেলা ধূলা

ছেলেখেলা

রনজি ট্রফির আসর বাংলা দেশেও জাঁকিয়ে বসেছে। কলকাতার ইডেন উদ্যানে গত সপ্তাহে শেষ হয়ে গেছে বাংলা বনাম উড়িষ্যা দলের খেলা। আর এ সপ্তাহে এইসবে শেষ হলো বাংলা-বিহারের ক্রিকেট লড়াই। কিন্তু এই খেলা কিম্বা লড়াইগুলোকে খেলা না বলে বাৎসরিক প্রতিযোগিতা বলাই বোধ হয় ভালো। কারণ সেই মান্ধাতা আমল থেকে বয়ে চলেছে একই ট্রাডিশন। সেই একই ধারায়, একইভাবে বছরের পর বছর অনুষ্ঠিত হচ্ছে খেলাগুলো। আর সব থেকে মজার বিষয় হলো, খেলাগুলো যে হবে তা যেমন জানা তেমনি সকলেরই বোধ হয় খেলার ফলাফলগুলোও জানা। কারণ এ তো সেই 'খেলতে হয় খেলা' গোছের খেলা। বছরে একবার করে বিহার, আসাম আর উড়িষ্যাকে বাংলার বিরুদ্ধে খেলতে হয় তাই তারাও খেলে যায় বছরের পর বছর। অবশ্য তারা খেলে খেলার ফলাফল জেনেই। অর্থাৎ খেলায় কারা জিতবে আর কারা হারবে—এ খবর খেলোয়াড়, দর্শক এমন কি কর্তৃপক্ষেরও জানা। তবু গালভরা নামের প্রতিযোগিতা রনজি ট্রফির খেলায় প্রতি বছর তাদের ছেলেখেলা খেলতে হয়। কারণ এই নিয়ম। এ নিয়ম শুধু পূর্ব অঞ্চলেই নয়—এই নিয়মেই চলছে সমস্ত ভারতবর্ষের রনজি ট্রফি ক্রিকেট প্রতিযোগিতা। তাহলে এই প্রতিযোগিতার সার্থকতা কোথায়? ক্রিকেট খেলার উন্নতির জন্যে যদি এই প্রতিযোগিতার ব্যবস্থা হয়ে থাকে, ক্রিকেট জগতের স্মরণীয় পুরুষ রনজির নামে তাহলে আজ এ কথা নিঃসন্দেহে বলা চলে যে, সম্পূর্ণভাবে ব্যর্থ হয়েছে এই প্রতিযোগিতার মাধ্যমে ক্রিকেট খেলার উন্নতিবিধানের সব ব্যবস্থা।

বেশি দূরে যাবার দরকার নেই। ঘরের দোরের দিকে তাকালেই এ কথার যৌক্তিকতা প্রমাণিত হয়। ধরা যাক বাংলা বনাম উড়িষ্যা কিম্বা বিহার বনাম আসাম দলের খেলার কথা। এই খেলা দু'টোতে গো-হারা হেরেছে উড়িষ্যা আর আসাম। প্রতি বছরই তারা ধরতে গেলে এই একই ফলাফলে হারে। তবু তাদের খেলতে হয়। কেন না—এই খেলাটা এখন এসে স্থান পেয়েছে বাৎসরিক কর্মসূচীতে। কিন্তু একটু চিন্তা করে দেখুন যে এই খেলা থেকে লাভ হয় কতোটুকু? আসল—কাজের কাজ কি এতোটুকুও হয়? ক্রিকেট খেলার উন্নতিই যদি এই প্রতিযোগিতার লক্ষ্য হতো তাহলে নিশ্চয়ই কর্তৃপক্ষ এই বাৎসরিক ক্রীড়াসূচী করেই হাল ছেড়ে দিতেন না। আরো কিছু করতেন—আনতেন কিছু একটা বৈপ্লবিক পরিবর্তন। কিন্তু তা না করে আজো তাঁরা সেই তেতো লেবু কচলাতেই ব্যস্ত। আর সেইজন্যেই আজো তাঁরা আঁকড়ে ধরে আছেন মান্ধাতা আমলের সেই পুরনো ধারা। কিন্তু আজকের দুনিয়ায় ঐ ধারা যে একেবারেই অচল এ কথাটা ঠিক যেন তাঁদের মাথায় ঢুকতে চাইছে না। তাই আজ রনজি ট্রফির প্রাথমিক খেলাগুলো রূপ নিয়েছে ছেলেখেলায়.....!

—শান্তিপ্রিয়

ক্রিকেটের খবর

রনজি ট্রফির প্রথম খেলায় বাংলা উড়িষ্যাকে এক ইনিংস আর ১১১ রানে হারিয়ে দিয়েছে। আমরা আগেই বলেছি যে এ ধরণের খেলার সত্যিকারের কোন মূল্য নেই। যে খেলার ফলাফল আগে

॥ বিল লরী ॥

দ্বিতীয় টেস্টে অস্ট্রেলিয়ার অধিনায়ক লাভ করেছেন অসাধারণ ব্যাটিং সাফল্য।

থেকেই বোঝা যায়, আগে থেকেই জয়-পরাজয় সম্বন্ধে নিশ্চিত হওয়া যায় সেই খেলার সার্থকতা কোথায়?

তবু বাৎসরিক এই ক্রিকেট প্রতিদ্বন্দ্বিতার প্রথম খেলায় ইডেন উদ্যানে বাংলার অধিনায়ক শ্যামসুন্দর মিত্র টসে জিতে প্রথমে ব্যাট করতে পাঠিয়েছিলেন উড়িষ্যাকে। তিনি বোধ হয় ভেবেছিলেন যে শিশিরসিক্ত সকালের পিচে উড়িষ্যার ব্যাটিং বিপর্যয় অবশ্যম্ভাবী।

শেষ পর্যন্ত হলোও তাই। মাত্র ২৮ রানের মাথায় পড়ে গিয়েছিল উড়িষ্যার আটটি উইকেট। তবু গড়িয়ে গড়িয়ে রান গিয়ে ঠেকলো একশ'-তে।

গল্প হলেও সত্যি

কিছুদিন আগে সোবার্সের একটা ওভার বাউণ্ডারী নিয়ে ইংলণ্ডে বেশ হৈ-চৈ হয়ে গেলো। বলটা মাঠ পেরিয়ে গিয়ে পড়েছিলো রাস্তায়। একটা ছেলে আবার সেটা নিয়ে যায়। পরে অবশ্য সে নিজের হাতে বলটা ফেরত দিয়েছিলো।

বল মাঠের সীমানার বাইরে পাঠাবার নজীর কিন্তু এই প্রথম নয়। ক্রিকেট ইতিহাসে এমনি কতকগুলো বড় হিটের হিসেব আছে। এর মধ্যে সেরা একটা ঘটনা ঘটেছিলো আবার এই ভারতের মাটিতেই। ১৯৩৬-৩৭ সালে লর্ড টেনিসনের দল এসেছিল ভারত ভ্রমণে। ওয়েলার্ড ছিলেন সেই দলের খেলোয়াড়।

ব্রাবোর্ন স্টেডিয়ামের খেলায় ওয়েলার্ড অমর সিং-এর একটা বল উঁচু করে করলেন স্ট্রেট ড্রাইভ। বলটা সামনের দিককার সাইট স্ক্রীনের ওপর দিয়ে চলো গেলো। এডরিচ আর টেনিসন প্যাভেলিয়নে পাশাপাশি বসে খেলা দেখছিলেন।

হিটটা দেখে এডরিচ বললেন, "বলটা নির্ঘাৎ স্টেডিয়াম পেরিয়ে বাইরে চলে গেছে।"

এডরিচের কথায় প্রতিবাদ জানিয়ে টেনিসন বললেন, "কক্ষণো তা যায় নি.....!"

শেষ পর্যন্ত কিন্তু এডরিচের কথাই সত্যি হলো। বলটা উইকেট থেকে ১৭ গজ দূরে সাইট স্ক্রীনের মাথার ওপর দিয়ে আর তার পেছনে ৬০ ফুট উঁচু বসার জায়গা পার হয়ে চলে গিয়েছিল মাঠের বাইরে।

সোবার্সের ওভার বাউণ্ডারী নিয়ে সেদিন খুব হৈ-চৈ হলো বটে, কিন্তু ওয়েলার্ডের ওভার বাউণ্ডারীর কথা ক্রিকেট ইতিহাস কোনদিনই ভুলতে দেবে না.....!

॥ গ্রাহাম ম্যাকেঞ্জি ॥

প্রথম ইনিংসে মাত্র ৭১ রানের বিনিময়ে আউট করে দিয়েছেন ওয়েস্ট ইণ্ডিজের আট জন ব্যাটসম্যানকে।

বাংলার কাছে যে ঐ একশ' রান কিছুই নয় এ কথা সকলেই জানতেন আর এও জানতেন যে ঐ একশ' রানই উড়িষ্যাকে এগিয়ে দেবে ইনিংস পরাজয়ের পথে। শেষ পর্যন্ত দিলোও তাই।

উড়িষ্যার ইনিংসের উত্তরে বাংলা প্রথম ইনিংসে করলো ৯ উইকেটে ৩২০ রান। বাংলার সহ-অধিনায়ক অম্বর রায় শতরান করার গৌরব অর্জন করলেন এ বছরের রনজি ট্রফি ক্রিকেট প্রতিযোগিতার প্রথম খেলায়। ১৪৬ রান করার পর আউট হয়েছিলেন অম্বর রায়।

অতি প্রত্যাশিতভাবে দ্বিতীয় ইনিংসেও এতোটুকু সাফল্য লাভ করতে পারলেন না উড়িষ্যা দলের ব্যাটসম্যানরা। বাংলার বোলারদের বিরুদ্ধে তাঁরা মোটে মাথা তুলে দাঁড়াতেই পারলেন না। টপাটপ পড়তে লাগলো উইকেট। শেষ পর্যন্ত উড়িষ্যার দ্বিতীয় ইনিংস শেষ হলো মাত্র ১০৯ রানে। ফলে এক ইনিংস ও ১১১ রানে জয়লাভ করলো বাংলা দল।

আসামে অনুষ্ঠিত রনজি ট্রফির আর একটা খেলায় ঠিক একইভাবে বিহার ইনিংসে হারিয়ে দিয়েছে আসামকে।

তবে খেলা মোটামুটি ভালো হয় যখন বাংলা খেলে বিহারের বিরুদ্ধে। ইডেন উদ্যানে বাংলা বনাম বিহারের খেলা

সবে শেষ হয়েছে। এই খেলা আর খেলার ফলাফল নিয়ে আলোচনা করা হবে সামনের সংখ্যায়।

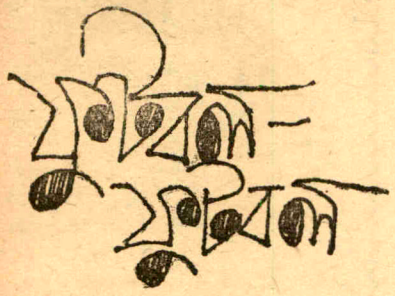

রোভার্সের পর ডুরাণ্ড। বম্বের রোভার্স কাপের খেলা শেষ হতে না হতেই জমে উঠেছে দিল্লীর ডুরাণ্ড কাপের খেলা। ডুরাণ্ড কাপের খেলাকে কেন্দ্র করে দিল্লী এখন নতুন সাজে সেজেছে।

করপোরেশন স্টেডিয়ামের মাথার ওপর পত্ পত্ করে উড়ছে এক সার পতাকা। দিল্লীর হিমঝরা হিমেল হাওয়া এসে দোলা দেয় সেই পতাকাগুলোকে। খেলার মাঠের বেশ খানিকটা দূর থেকে রোড মার্কের মতো এ্যারো দিয়ে লেখা 'ডুরাণ্ড ট্যুরনামেণ্ট'।

মাঠটাও সেজেছে অপরূপ সাজে। মাঠের কাছে গেলেই বোঝা যায় যে এক মন-ভোলানো খেলার আসর বসেছে সেই মাঠে। মাঠের মধ্যে আর বাইরে ছোট-বড় একাধিক স্টল। খেলার শেষে সাট্‌ল বাসের ব্যবস্থা। আরো কতো কি!

তবে সব থেকে সুবিধে দর্শকদের। যে খেলাটি দেখার ইচ্ছে তার টিকিট আগে থেকেই কেটে রাখা যায়। তা ছাড়া খেলার আগে মাঠে গেলে ভাগ্য নিতান্ত খারাপ না হলে নির্ঘাৎ টিকিট পাওয়া যায়।

আর সব থেকে ভালো হলো এই প্রতিযোগিতার পরিচালন বিভাগটি। প্রতিটি খুঁটিনাটি বিষয়ের ওপর সমান লক্ষ্য কর্তৃপক্ষের। তাই ওখানে চট করে আর পান থেকে খসে না চুন।

কিন্তু সব থেকে কষ্ট হয় আমাদের যখন কলকাতার আই এফ এ শীল্ড প্রতিযোগিতার সংগে মনে মনে তুলনা করি ডুরাণ্ড কাপ খেলার। কিন্তু কে কার কথা শোনে। আই এফ এ কর্তৃপক্ষের দ্বারে হাজার বার মাথা খুঁড়লেও তাঁরা

॥ সুব্রত গুহ ॥

রনজি ট্রফির খেলায় বাংলার আক্রমণভাগে নিয়েছেন একটা উল্লেখযোগ্য স্থান।

কারো কথা শোনেন না। শুনবেনই বা কি করে। শোনারও তো একটা ধৈর্য চাই। কিন্তু সেটারই অভাব তাঁদের সব থেকে বেশি। আজ তাই আর বলতে বাধা নেই যে এঁদের কর্মকুশলতার গুণে বার বার দু'বার আই এফ এ শীল্ড ফুটবল প্রতিযোগিতা ভেসে গেছে অকূল দরিয়ায়। আর এ বছরের লীগ ফুটবল? থাক ও-সব দুঃখের কথা।

যাই হোক রোভার্সের পর ডুরাণ্ড কাপ এখন ভারতীয় ফুটবলের আসর মাত্ করে রেখেছে। আর সকলেরই এখন এক চিন্তা—এ বছরে ডুরাণ্ড কাপ কে পাবে? ডুরাণ্ড কাপও কি কলকাতায় আসবে? এলে অবশ্য ষোলকলা পূর্ণ হয়। কারণ কলকাতায় এবার এসেছে রোভার্স কাপ, এসেছে সুব্রত মুখার্জী কাপ, বিধান রায় ট্রফি—ডুরাণ্ডটাই বা কেন বাকী থাকে। মোহনবাগান-ইস্ট-বেঙ্গল খেলছে ডুরাণ্ডে। ওদের যে কেউই না হয় ডুরাণ্ড কাপকে নিয়ে আসুক কলকাতায়।

খেলা দেশের জামাই পতৌদিকে দেখা যাচ্ছে বাংলা দেশেরই ছেলে-মেয়েদের অটোগ্রাফ দিতে।

প্রধানমন্ত্রী একাদশ বনাম রাজ্যপাল একাদশের মধ্যে চারদিনব্যাপী প্রদর্শনী ক্রিকেট খেলাটা পিছিয়ে যাচ্ছে। খেলাটা

এবার সপ্তম জানুয়ারী মাসের ২৩ তারিখ থেকে ২৬ তারিখ পর্যন্ত অনুষ্ঠিত হবে কলকাতার ইডেন উদ্যানে। এই খেলায় বর্তমান ভারতের নাম করা সব টেস্ট খেলোয়াড়রা ছাড়াও অতীতের ক'য়েকজন দিকপাল খেলোয়াড়েরও যোগদান করার সম্ভাবনা আছে।

॥ রোভার্স কাপ ॥

১৯৫০ সাল থেকে ১৯৬৮ সাল পর্যন্ত বিজয়ী দলের খতিয়ান :

রোভার্স কাপ বিজয়ীর খতিয়ান
(১৯৫০ থেকে ১৯৬৮ পর্যন্ত)

১৯৫০—হায়দ্রাবাদ পুলিশ
১৯৫১-৫২—হায়দ্রাবাদ পুলিশ
১৯৫৩—হায়দ্রাবাদ পুলিশ
১৯৫৪—হায়দ্রাবাদ পুলিশ
১৯৫৫—মোহনবাগান
১৯৫৬—মহামেডান স্পোর্টিং
১৯৫৭—হায়দ্রাবাদ পুলিশ
১৯৫৯—মহামেডান স্পোর্টিং
১৯৬০—অন্ধ্র পুলিশ
১৯৬১—ই. এম. ই. সেন্টার
১৯৬২—অন্ধ্র পুলিশ ও ইস্টবেঙ্গল
১৯৬৩—অন্ধ্র পুলিশ
১৯৬৪—বি. এন. আর
১৯৬৫—মফতলাল মিলস
১৯৬৬—মোহনবাগান
১৯৬৭—ইস্টবেঙ্গল
১৯৬৮—মোহনবাগান

ফুটবলের মান কোনপথে?

• নীলিমেশ রায়চৌধুরী •
(সংকলক)

[ফুটবলের মান ও সৌন্দর্য এখন নাকি নিম্নমুখী! এই বিষয় নিয়ে সমস্ত ফুটবল-বিশ্ব এখন চিন্তায় বিভোর। সেই চিন্তারই প্রতিফলনে মুখ খুলেছেন বিশ্বের সেরা ফুটবল-রসিকরা। তাঁদের সেই মতামতের কিছু অংশ আমরা গত সংখ্যায় প্রকাশ করেছি। এই কিস্তিতে ছাপা হলো আরে দু'জন ফুটবল বিশেষজ্ঞের অভিমত। —ক্রীড়া সম্পাদক]

ওয়ালটার উইনটারবটোম্ (ইংল্যাণ্ডের প্রাক্তন ম্যানেজার এবং ম্যানেজার স্পোর্টস কাউন্সিল)

"কোচেরা বিভ্রান্ত ফুটবলের বর্তমান হাল দেখে, কেউ কেউ আবার 'আন্তর্জাতিক কোচ সম্মেলন' ডাকার ইচ্ছে পোষণ করছেন। তবে আমার মনে হয় না এ ধরণের সম্মেলনে কোন উপকার আছে বা হবে।

কয়েকজনের অভিমতের ওপর আমার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার কয়েকটা দৃষ্টান্ত রাখছি—'অফসাইডে'র আইন তুলে দেওয়ার যে প্রস্তাব ছিল সেই ধরণের আইন প্রয়োগ করে খেলা দেখেছি—সত্যি বলতে কি তাকে ফুটবল বলে না। অনেকে আবার হকিতে অফসাইডের যে আইন আছে তাই প্রয়োগ করার পক্ষপাতি—আমার মতে এ প্রস্তাব গ্রহণযোগ্য নয় কারণ ফুটবল মাঠে হকির আইন চলে না। ফ্রান্সের জনৈক কোচ গোলের মাপ বৃদ্ধি করার অনুকূলে বক্তব্য রেখেছেন এতে না কি গোল সংখ্যা বৃদ্ধি পাবে। হয়তো গোলের সংখ্যা বাড়তে পারে তবে ফুটবল ধর্মচ্যুত হবে। আবার কারও কারও অভিমত পেনাল্টির সীমানা 'ওভালসেপেড্' করা সেই সাথে 'থ্রোয়িং'-এর বদলে পার্শ্বরেখার কাছ থেকে 'ফ্রি কিকের' আইন করে দেওয়া—আমার মতে এর কোনটাই ফুটবলের মানোন্নয়নে কাজে আসবে না।

আমি পরিবর্তনের বিরোধী নই তবে যুক্তিপূর্ণ নব আবিষ্কারের পক্ষপাতি। মেক্সিকোর আসরে দু-একটি নতুন আইন চালু হয়েছে যেমন গোলরক্ষক বল নিয়ে কেবলমাত্র চার পা এগোতে পারবে তার বেশি নয়—এ নিয়ম যুক্তিপূর্ণ কারণ একাধিক গোলরক্ষক আছেন যাঁরা অযথা বল নিয়ে সময় নষ্ট করেন। এ ছাড়া প্রশিক্ষক খেলার মাঝে আহত গোলরক্ষক বদল করতে পারেন এবং আহত যে কোন খেলোয়াড়ের বদলীও নামানো যাবে এমন আইনও তৈরি হয়েছে। এর কারণ একটি দল যেন খেলোয়াড়ের অভাবে দুর্বল না হয়ে পড়ে। যেমন ঘটেছিল গত বিশ্বকাপে ব্রেজিল আর পর্তুগালের খেলায়—'পেলে' আহত হওয়ায় ব্রেজিল অসহায় হয়ে পড়ল—এক্ষেত্রে এ আইনের উপকার আছে নিশ্চয়ই। এ সমস্ত ছাড়াও 'ফিফা' আরও একটি প্রস্তাব সমর্থন করেছে, তা হল আগামী বিশ্বকাপের আসর থেকে 'ফরোয়ার্ড লাইন' ও 'গোল-লাইনে'র চওড়া হবে গোলপোস্টের ব্যাসার্ধের সমান।

সর্বোপরি আমার ধারণা ফুটবলের আইন বদলে ফুটবলের মান ও সৌন্দর্য-বৃদ্ধি কখনই সম্ভব নয়। যদি কোন ফরোয়ার্ড 'পেলে' ও 'ইউসেবিওর' মত নিখুঁত গোল দেওয়ার ক্ষমতা রাখে, 'টম লটনে'র মত হেড আর ববি চার্লটনের মত উদ্যম আর বাড়তি মেহনতের ক্ষমতা রাখে তবে আইনের বেড়াজাল বা ছাঁচে ঢালা রক্ষণ-ভাগ তাকে সামাল দিতে পারবে না। ফুটবলের মানোন্নয়ন আর সৌন্দর্যবৃদ্ধিতে এ চরিত্রের খেলোয়াড়ই আজ চাই—কিন্তু কোথায় মেলে?"

ইগ্নাসিও ট্রেলেস্ (মেক্সিকো জাতীয় দলের প্রশিক্ষক)

সাফ কথা "ফুটবলে অলরাউন্ডার দরকার।" এর পেছনে ওঁর যুক্তি হল—"আজকাল আমরা প্রায়ই দেখি রক্ষণভাগের খেলোয়াড়েরা গোল করছেন। আর সেই ফাঁকে আক্রমণভাগের খেলোয়াড়েরা পেছিয়ে এসে রক্ষণভাগ সামাল দিচ্ছেন। তাই বলছি গোটা দলের প্রত্যেকটি খেলোয়াড়কে সব এলাকায় খেলার মত হতে হবে। এগিয়ে-পেছিয়ে না খেললে বিজ্ঞানভিত্তিক ফুটবল প্রাণ পায় না। নিজের জায়গায় দাঁড়িয়ে খেলার দিন অতিক্রান্ত—আজ প্রতিটি ফুটবল খেলোয়াড়কে অলরাউন্ডার হতে হবে।"

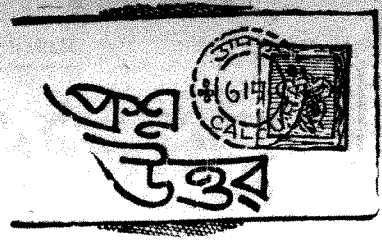

জয়শ্রী চ্যাটার্জী (বাগবাজার স্ট্রীট, কলকাতা—৩)

উত্তর ঃ আপনার চিঠির জন্যে ধন্যবাদ। সকলের অবগতির জন্যে আপনার চিঠির কিছু অংশ তুলে দিলাম।

"সাপ্তাহিক বসুমতীতে গুলমা টি এস্টেট দার্জিলিং থেকে কয়েকটি মহিলার প্রশ্নের উত্তরে আপনি দিল্লীর কয়েকটি মেয়ের ক্রিকেট খেলার জন্যে ভি-জি-কে অনুরোধ জানানোর কথা প্রকাশ করেছেন।

এই প্রসঙ্গে আমার সামান্য বক্তব্য আছে। আমি যখন স্কুলের নবম শ্রেণীর ছাত্রী তখন ক্লাসের ও স্কুলের জনাকুড়ি উৎসাহী ছাত্রীর স্বাক্ষর-সহ একটি চিঠি আমরা পাঠাই তৎকালীন শিক্ষামন্ত্রী ডাঃ রবীন্দ্রলাল সিংহ মহাশয়কে। চিঠির বিষয়বস্তু ছিলো 'আমরা ক্রিকেট খেলায় অনুরাগী ও উৎসাহী। এ দেশে মেয়েদের অন্যান্য অনেক খেলাধুলোর ব্যবস্থা আছে, ক্রিকেট খেলার ব্যবস্থা নেই কেন? এ বিষয়ে আমরা তাঁর সহানুভূতি আশা করেছিলাম। কিন্তু সে চিঠির উত্তর তো দূরের কথা, একটা প্রাপ্তি-স্বীকারের চিঠিও পাই নি আমরা। তাই অবসর সময়ে স্কুলের মাঠে আর বাড়ির একটু ফাঁকা জায়গায় বন্ধু কিম্বা ভাইদের সংগে খেলে দুধের স্বাদ ঘোলে মেটাতে চেষ্টা করেছি। কিন্তু কোন দিক থেকেই এতোটুকুও সমর্থন পাই নি...!"

কি আর করবেন বলুন! আমাদের দেশের বর্তমান সমাজ, সরকার আর পরিবেশই এমন যে, আজ আর দুধের স্বাদ ঘোলে মেটানো ছাড়া উপায় নেই কোন বিষয়েই! সুতরাং.....।

তপন মিত্র (ভবানীঠাকুর লেন, বর্ধমান)

উত্তর ঃ আপনি লেখা পাঠাতে পারেন।

প্রদীপকুমার বিশ্বাস (গুলমা চা-বাগান, গুলমা, দার্জিলিং)

প্রশ্ন ঃ আইন-কানুনের দুনিয়া বিভাগে হকি খেলার নিয়ম-কানুন সম্বন্ধে কিছু প্রকাশ করবেন কি? আগামী বিশ্ব অলিম্পিক মিউনিকে কি কোন ভারতীয় জিমন্যাস্টিক দল যোগদান করবে?

উত্তর ঃ হকির সময় প্রকাশ করার চেষ্টা করা হবে। যাবে কি না এখনো ঠিক হয় নি। তবে আমাদের যা স্ট্যান্ডার্ড তাতে না যাওয়াই ভালো।

সরলকুমার ঘোষাল (কর্নওয়ালিশ স্ট্রীট, কলকাতা—৬)

উত্তর ঃ এক কাজ করুন, নিচের কার্টুনটা দেখেই ঠিক করে নিন কি করে ওঁকে জব্দ করা যায়, তাহলে দেখবেন খেলার সময় উনি আর মাঠের মধ্যে নামবেন না। ফুটপাথের পাশ ঘেঁষেই চলে যাবেন।

দিবিব সাহা ও তপন চন্দ (ব্যারাকপুর ২৪ পরগনা)

প্রশ্ন ঃ কোন ক্রিকেট খেলায় কোন এক-জন ব্যাটসম্যান বল মারার পর বলটি উইকেটে লাগার ঠিক আগের মুহূর্তে পা দিয়ে আটকে দিল। ব্যাটসম্যান কি আউট হবে—হলে এল বি ডব্লিউ না বোল্ড আউট?

উত্তর ঃ কোন আউটই নয়। হিট করার পর বল যদি উইকেটের দিকে যায় তাহলে সেই বলটিকে পা দিয়ে আটকে দেবার বা পা দিয়ে কিক করার অধিকার ব্যাটসম্যানের আছে। তাই বলে ব্যাটসম্যান কিন্তু সেই বলটা হাত দিয়ে ধরতে কিম্বা ব্যাট দিয়ে মারতে পারবেন না।

অরুণকুমার গুহকর্মকার (তেজগঞ্জ, বর্ধমান)

প্রশ্ন ঃ পতৌদি-শর্মিলার শুভ বিবাহের পর পতৌদি মনে হয় আরো বেশি উৎসাহী হয়ে খেলবেন। আপনার কি মনে হয়?

উত্তর ঃ কি খেলবেন...? কিছু না...!

মনোজকুমার দাস (নামবাড়ি রেলওয়ে কলোনী, কামরূপ, আসাম)

প্রশ্ন ঃ পর পর তিনবার আই· এফ· এ শীল্ড বিজয়ী নিম্নলিখিত ক্লাব দু'টি কি এখনো আছে?

(১) গর্ডন হাইল্যান্ডার্স (১৯০৮—১০)

(২) শেরউড ফরেস্টার্স (১৯২৬—২৮)

উত্তর ঃ নামে আছে!

সোমনাথ গঙ্গোপাধ্যায় (হালিসহর গোলাবাড়ি, ২৪ পরগনা)

প্রশ্ন ঃ কোন্ দেশের ক্রিকেট খেলোয়াড় তিনবার সরকারী সফরকারী দলে অন্তর্ভুক্ত হলেও সবসুদ্ধ দু'টি প্রথম শ্রেণীর ম্যাচ খেলেছিলেন?

উত্তর ঃ আমি জানি না, কেউ জানালে জানিয়ে দেবো! 'ক্রিকেট' নামে ক্রিকেট খেলার ওপর একটা মাসিক পত্রিকা আছে। ইংলন্ড থেকে বেরোয়, তবে কলকাতায় পাওয়া যায়। খোঁজ করে দেখতে পারেন।

অসিত চৌধুরী (খুবা, টাকী, ২৪ পরগনা)

উত্তর ঃ তোমার চিঠি পেয়েছি।

দিলীপকুমার রক্ষিত (সিহিকা, আড়রা, বাঁকুড়া)

প্রশ্ন ঃ বোরদে, জয়সীমা ও পতৌদির মধ্যে কে বেশি রান করেছেন?

উত্তর ঃ বোরদে—এখনো পর্যন্ত...!

সম্পাদিকা—জয়ন্তী সেন
বসুমতী (প্রাঃ) লিঃ-এর পক্ষে ১৬৬, বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী স্ট্রীটস্থ কলিকাতা-১২
বসুমতী প্রেস হইতে শ্রীসুকুমার গুহমজুমদার কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

বসুমতীতে পাওয়া যাচ্ছে ! একরাশ শিশু-সাহিত্য !

কিন্তু সমগ্র পরিবার পড়তে পারেন

দামে যেমন সস্তা, তেমনি পাতায় পাতায় রঙীন ছবি।

মনোরম রঙীন প্রচ্ছদ। বোর্ড বাধাই।

আজই অর্ডার পেশ করুন আপনার পরিবারের সকলের জন্য।

(পাঠাগার ও সংস্থাসমূহের জন্য শতকরা পনেরো টাকা কমিশন !)

১। রঘুবংশ ...	মহাকবি কালিদাস ...	পঁচাত্তর পয়সা
২। শকুন্তলা ...	মহাকবি কালিদাস ...	পঁচাত্তর পয়সা
৩। এ্যারেবিয়ান নাইটসের গল্প ...	অনুবাদ—অলকেন্দ্রনাথ ঠাকুর ..	প্রতি খণ্ড এক টাকা পঁচিশ পয়সা
(দুই খণ্ডে সম্পূর্ণ)		
৪। জুলিয়াস সিজার ...	উইলিয়ম সেক্সপীয়র ...	এক টাকা পঞ্চাশ পয়সা
৫। ম্যাকবেথ ...	উইলিয়ম সেক্সপীয়র ...	এক টাকা পঞ্চাশ পয়সা
৬। রোমিও জুলিয়েট ...	উইলিয়ম সেক্সপীয়র ...	এক টাকা পঞ্চাশ পয়সা
৭। হারকিউলিস ...	হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ ...	এক টাকা বাষট্টি পয়সা
৮। আষাঢ়ে গল্প ...	হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ ...	এক টাকা পঁচাত্তর পয়সা
৯। স্নো-হোয়াইট ...	হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ ...	এক টাকা বাষট্টি পয়সা
১০। কুমারের বাঘা গোয়েন্দা ...	হেমেন্দ্রকুমার রায় ...	এক টাকা পঁচিশ পয়সা
১১। ছোট্ট পমির অভিযান ...	হেমেন্দ্রকুমার রায় ...	এক টাকা পঁচিশ পয়সা
১২। রতনপুরের যাত্রী ...	হেমেন্দ্রকুমার রায় ...	এক টাকা পঁচিশ পয়সা
১৩। ডন কুইকসোট	সারভেণ্টিস ..	এক টাকা পঞ্চাশ পয়সা
১৪। ওয়ার এ্যাণ্ড পিস ...	টলস্টয় ...	এক টাকা পঞ্চাশ পয়সা
১৫। বর্মায় যখন বোমা পড়ে ...	সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায় ...	এক টাকা পঁচিশ পয়সা
১৬। আমার দেশ ..	নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায় ...	দুই টাকা পঞ্চাশ পয়সা
১৭। মোহন সিংয়ের ফাঁসি ..	সুমথনাথ ঘোষ ...	এক টাকা পঁচিশ পয়সা
১৮। জন্মজন্মান্তরের কাহিনী ...	নরেন্দ্র দেব ...	এক টাকা পঞ্চাশ পয়সা
১৯। রকমারি গল্প ...	নরেন্দ্র দেব ...	দুই টাকা পঞ্চাশ পয়সা
২০। স্বার্থপর দৈত্য ...	বুদ্ধদেব বসু ...	এক টাকা পঁচাত্তর পয়সা
২১। সুখী রাজপুত্র ...	বুদ্ধদেব বসু ...	এক টাকা পঞ্চাশ পয়সা
২২। লক্ষ্মণ সেনের রাজমুকুট ..	— ...	এক টাকা পঁচিশ পয়সা
২৩। শান্তিপুরে অশান্তি ...	প্রভাবতী দেবী সরস্বতী ...	এক টাকা পঞ্চাশ পয়সা
২৪। বন্দী জেগে আছো? ...	প্রভাবতী দেবী সরস্বতী ...	এক টাকা পঁচিশ পয়সা
২৫। প্রেতাত্মার প্রতিহিংসা ...	প্রভাবতী দেবী সরস্বতী ..	এক টাকা পঁচিশ পয়সা
২৬। মনের মতো গল্প ...	প্রভাবতী দেবী সরস্বতী ...	এক টাকা পঁচিশ পয়সা
২৭। টিয়ার গ্যাস ..	স্বপন বুড়ো ...	এক টাকা পঁচিশ পয়সা
২৮। লাফিং গ্যাস ..	স্বপন বুড়ো ...	এক টাকা পঞ্চাশ পয়সা
২৯। অশরীরী আত্মা ...	স্বপন বুড়ো ...	এক টাকা পঞ্চাশ পয়সা
৩০। কর্নেলওয়ার্থ ...	সুমথনাথ ঘোষ ...	এক টাকা পঁচিশ পয়সা
৩১। টোয়েন্টি ইয়ার্স আফটার ...	সুধীন্দ্রনাথ রাহা ...	এক টাকা পঁচিশ পয়সা
৩২। টয়লার্স অব দি সী ...	সুধীন্দ্রনাথ রাহা ...	এক টাকা পঁচিশ পয়সা
৩৩। ডেভিলস আইল্যাণ্ড ...	বিশু মুখোপাধ্যায় ...	পঁচাত্তর পয়সা
৩৪। অচিন দেশের রাজকন্যা ...	দীনেশ মুখোপাধ্যায় ...	এক টাকা

শিশু-সাহিত্যের রত্নভাণ্ডার ! স্বপ্নের ময়ূর পঙ্খী ! বসুমতী (প্রাঃ) লিঃ ॥ কলিকাতা-১২

Price : 30 Paise GRAM : "BASUMATI" PHONE : 34-7771, 72, 73, 74

6 JAN 1969

রান্নার ইতিকথা

আদিম যুগ

তখন মানুষ
মন্ত্র পড়িয়ে খেতো।
কিন্তু স্বাদ গন্ধ ভাবতো না!

কুকমা নিজস্ব মিলে বৈজ্ঞানিক প্রথায় প্রস্তুত

দ্বিতীয় যুগ

তখন মানুষ
প্রথম স্বাদ
ও গন্ধের
খবর পেলো!

কুকমা সর্ব্বাধিক বিক্রীত গুঁড়ো মশলা

তৃতীয় যুগ

তখন মানুষ পালতোলা
জাহাজে ভারতের দিকে
মশলা আনতে ছুটলো!

কুকমা মাস্টিক নিষিদ্ধ – পলেথো লক্ষ প্যাকেট

বর্ত্তমান যুগ

এখন মানুষ
মশলা তৈরীর
ঝামেলা ছেড়ে
তৈরী গুঁড়ো মশলা
ব্যবহার করতে
শিখলো!

কুকমা বাজারের সেরা গুঁড়ো মশলা

© কালিয়া 2.67

১২০ বৎসরের অধিক প্রাচীন ও বর্ত্তমানে মশলার বৃহত্তম প্রতিষ্ঠান

কৃষ্ণচন্দ্র দত্ত (স্পাইস) প্রাঃ লিঃ

২৩৫ নং মহর্ষি দেবেন্দ্র রোড, পোস্তা, কলিকাতা-৭

গ্রাম : "স্পাইসমার্ট" মিল—কাশীপুর

সাপ্তাহিক বসুমতী

নির্বাচনী সভা-সমাবেশে
বিক্ষোভ-মিছিলে
উত্তাল বিগত সপ্তাহ

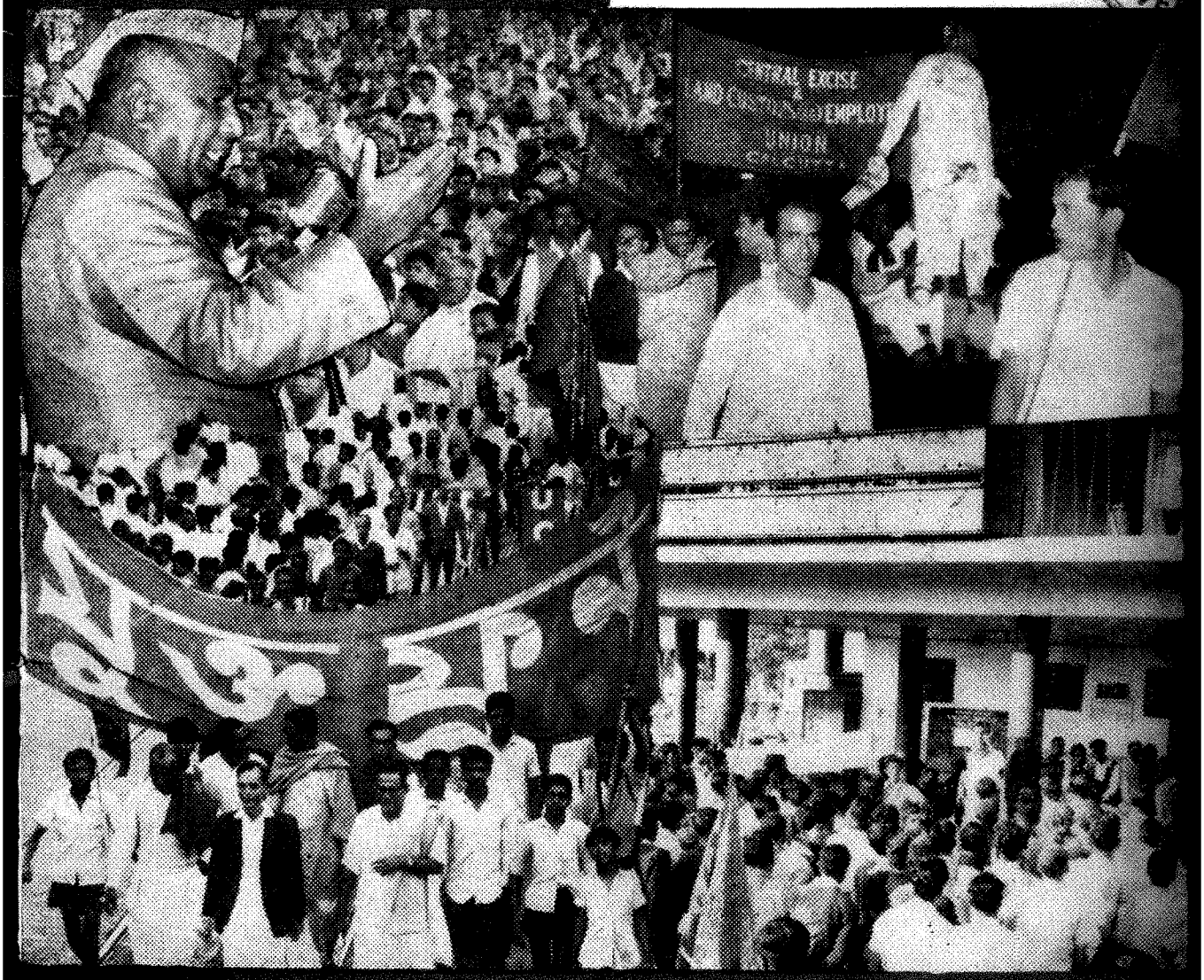

৭৩ বর্ষ ঃ ২৯শ সংখ্যা, বৃহস্পতিবার, ২৫শে পৌষ, ১৩৭৫ বঙ্গাব্দ] OLDEST WEEKLY OF NORTH INDIA [73rd year, No. 29, 9th Jan. 196

শীত
প্রতিদিন
বোরোলীন
ব্যবহার করুন
আপনার শুষ্ক ও বিদীর্ণ ত্বকের অস্বস্তি দূর করবে
এই অ্যান্টিসেপ্টিক সুরভিত ক্রীম।
বোরোলীন হাউস, কলিকাতা-৩

সূচীপত্র

বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা
সম্পাদকীয়	...	১৭১৫
আজকের মানুষ	...	১৭১৬
রবীন্দ্রনাথ ও সুভাষচন্দ্র (ধারাবাহিক প্রবন্ধ)	— শংকরীপ্রসাদ বসু	১৭১৭
বঙ্গদর্শন	...	১৮০২
কথায় কথায়	— নিবারণ মুন্সী	১৮০৭
পৃথিবী ছাড়িয়ে—১৯৬৮ (কবিতা)	— শম্ভুনাথ চট্টোপাধ্যায়	১৮০৮
ভারতদর্শন	...	১৮০৯
আন্তর্জাতিক	...	১৮১৩
সপ্তাহের বোঝা	— কৃত্তিবাস ওঝা	১৮১৬
গ্রন্থমেলা	...	১৮১৮
পাঠকমন	...	১৮১৯
কুচিকের দেশে	— গীতা বন্দ্যোপাধ্যায়	১৮২২
সাহিত্যস্রষ্টার সৃষ্টি কী নিরঙ্কুশ? (প্রবন্ধ)	— দ্বিজেন্দ্রলাল নাথ	১৮২৫
আসন্ন মধ্যবর্তী নির্বাচন ও তার পরিপ্রেক্ষিত	— পর্যবেক্ষক	১৮২৭

যে কোন
গয়না
আর
আসল
গহরত
কেনার
দক্ষিণ কোলকাতায়
নামকরা প্রতিষ্ঠান
ফোন : ৪৬-৬২৫৮

সব অ্যাণ্ড গ্যাণ্ডসন্স অব লেট
এস. বি. সরকার

সূচীপত্র

বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা
ব্লাইণ্ড কার্ভ : জাতীয় জীবনে (প্রবন্ধ)	— সাগর বিশ্বাস	১৮২৯
পথ কে রুখবে ? (ধারাবাহিক উপন্যাস)	— মনোজ বসু	১৮৩২
আমি এইখানে (কবিতা)	— বেণু দত্তরায়	১৮৩৪
বিংশ শতাব্দীর আমেরিকান সাহিত্য (প্রবন্ধ)	— শমীক বন্দ্যোপাধ্যায়	১৮৩৬
জয়া সম্পর্কিত (গল্প)	— অনিমেষ সেন	১৮৪০
রূপায়ণ ওদেশে এবং এদেশে	— শিলালি	১৮৪৪
ক্ষুদ্রজগৎ		১৮৪৭
খেলাঘরে	— শান্তিপ্রিয়	১৮৫২

কবিকঙ্কণ চণ্ডী

মুকুন্দরাম চক্রবর্তী

(কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতকোত্তর বিভাগের পাঠ্যপুস্তক)

মধ্যযুগের বঙ্গসাহিত্যে কবিকঙ্কণ মুকুন্দরাম চক্রবর্তীই সর্বশ্রেষ্ঠ কবি। তাঁহার চণ্ডীর কাহিনী বাঙ্গালার বিশিষ্ট জাতীয় জীবনের কাহিনী। তাঁহার কাব্যে পাই মধ্যযুগের বাঙ্গালার সমাজের সুস্পষ্ট আলেখ্য। শাসক সম্প্রদায়ের দ্বারা নির্যাতিত বাস্তুচ্যুত মুকুন্দরাম দুঃখী ও ডেমোক্রিস্ট বাঙ্গালার প্রতিনিধি কবি—ব্যক্তির দুঃখ কি করিয়া সর্বজনের দুঃখ হইতে পারে বাঙ্গালা সাহিত্যে তাহা মুকুন্দরামই সর্বপ্রথম দেখাইয়াছেন। এই হিসাবে তিনি আধুনিক বাঙ্গালার রোমান্টিক সাহিত্যসাম্রাজ্যের অগ্রদূত।

—বর্তমান গ্রন্থে আছে—

১। মূল কাব্য, ২। সুবিস্তৃত ভূমিকা, ৩। কবির জীবনী, ৪। কাব্য-পরিচিতি ৫। কবিকঙ্কণ চণ্ডীর বঙ্গানুবাদ (ঋষি বঙ্কিমচন্দ্র লিখিত), ৬। অধ্যাপক শ্রীবিজিতকুমার দত্তের সুলিখিত ভূমিকা, ৭। বিস্তৃত কাব্য সমালোচনা এবং ৮। অপ্রচলিত শব্দের অর্থ।

মূল্য সাড়ে তিন টাকা

ভক্তসাধক, কবিরঞ্জন রামপ্রসাদ সেনের ভক্তিমাধুরী-রঞ্জিত

রামপ্রসাদ গ্রন্থাবলী

শ্রীশ্রীকৃষ্ণকীর্তন, বিদ্যাসুন্দর পদাবলী, শ্রীকৃষ্ণকীর্তন সতি-বিলাপ, আগমনী, বিজয়া, অপূর্ব প্রকাশিত কবিতাবলী, কবির জীবনী।

একত্রে মূল্য তিন টাকা

উজ্জয়িনীর সেই বিশ্ব-চিত্তজয়ী বিশ্ববিমোহন মহাকবি—
সারস্বতকুঞ্জের পূর্ণজ্যোৎস্না—সাহিত্য-জগজ্জ্যোতি—
প্রতিভা ও মনীষার অবতার—সরস্বতীর বরপুত্র—
সৌন্দর্যের মহাকবি—

কালিদাসের গ্রন্থাবলী

সর্বাঙ্গসুন্দর রাজাধিরাজ সংস্করণ

অনুবাদক—বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক, সাহিত্য রস-সুরসিক

পণ্ডিত রাজেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ

প্রথম ভাগে :—রঘুবংশ, মালবিকাগ্নিমিত্র, ঋতুসংহার, পুষ্পবাণবিলাস, শৃঙ্গার-তিলক, শৃঙ্গার-রসাষ্টক। ৬·০০।

দ্বিতীয় ভাগে :—কুমারসম্ভব, নলোদয়, মেঘদূত। ৬·০০।

তৃতীয় ভাগে :—শকুন্তলা, বিক্রমোর্বশী, শ্রুতবোধ, দ্বাত্রিংশৎ-পুত্তলিকা, কালিদাস-প্রশস্তি। ৮·০০

প্রাচীন-সাহিত্যের-গৌরব-মুকুট—
সাহিত্যের চিরসমাদৃত কৌস্তুভ—
রায়গুণাকর

ভারতচন্দ্রের গ্রন্থাবলী

অন্নদামঙ্গল, বিদ্যাসুন্দর, মানসিংহ, চোরপঞ্চাশৎ, রসমঞ্জরী, সত্যপীর, ঘেড়েভেড়ের কৌতুক, ফর্দরফৎ, হিন্দী কবিতালহরী, বলিরাজা, চণ্ডী, নাগাষ্টক, 'সংস্কৃত, পার্শী, হিন্দী' নানা ভাষায় কবিতাবলী, কবির জীবনী, ঋতুবর্ণনা, রাধাকৃষ্ণের প্রেমালাপ, কবিতাবলী।

মূল্য তিন টাকা

বসুমতী প্রাইভেট লিমিটেড, ১৬৬, বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী স্ট্রীট, কলি-১২

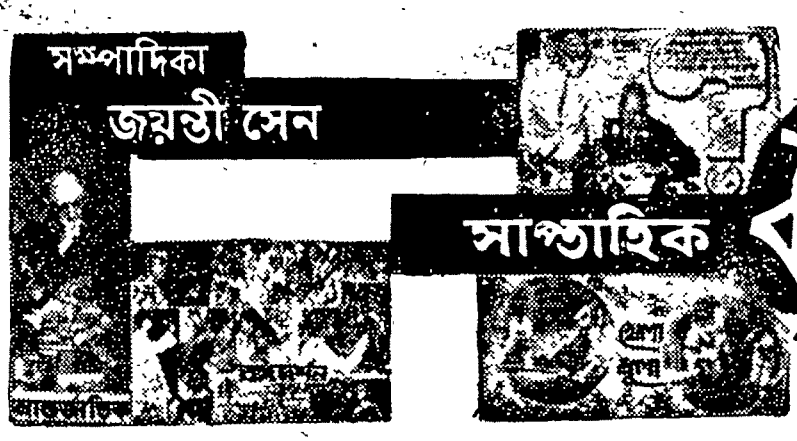

CALCUTTA UNIVERSITY CENTRAL LIBRARY

৭৩ বর্ষ ঃ ২৯শ সংখ্যা মূল্য ঃ ৩০ পয়সা বাংলা ভাষায় দ্বিতীয় সর্বাধিক প্রচারিত সাপ্তাহিক পত্রিকা PRICE : 30 Paise
বৃহস্পতিবার, ২৫শে পৌষ, ১৩৭৫ বঙ্গাব্দ Thursday, 9th January, 1969

জন্মনিয়ন্ত্রণের বিধিবিধান ও পরিবার পরিকল্পনা

জন্মনিয়ন্ত্রণ ভালো। জন্মনিয়ন্ত্রণ সফল করার জন্য প্রচার বা তা ফলপ্রসূ করার উদ্দেশ্যে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ সম্বন্ধে দ্বিমত থাকার অবকাশ নেই। যে কোনো দেশ একমাত্র জনসংখ্যা বৃদ্ধিতে কৃতিত্ব দেখালেই সে দেশ শক্তিশালী হয় না, সে দেশের সমগ্র মানুষ বলিষ্ঠতা অর্জন করতে পারে না।

দেশের বর্তমান জনপিছু আর্থিক দুরবস্থায়, অন্তত আত্মরক্ষার খাতিরে জনসাধারণের উচিত জন্মনিয়ন্ত্রণ-এর বিধিবিধান গ্রহণ করা। অবশ্য এই বিধিবিধান সহায়সম্পদে উন্নত আধুনিক দেশগুলিও গ্রহণ করেছে সবল সুস্থ পরিবার গড়ে তোলার জন্য, দ্বিতীয়ত পরিকল্পিত ২। ৩টি সন্তানের জননীরূপে মায়ের শরীর রক্ষার উদ্দেশ্যে।

আগেই বলা উচিত, প্রচারের কাজে সরকারী ব্যয় কম হচ্ছে না, কারণ, জন্মনিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা সফল করার জন্য দায়িত্ব এ দেশের বিপুল সংখ্যক জনসাধারণ অপেক্ষা অধিক এ দেশের সরকারেরই। কারণ, সবাইকে ক্ষুধার অন্ন যোগাতে যে সরকার অক্ষম, সে সরকার জাতিকে জনসংখ্যায় গুণোত্তর বৃদ্ধির সুযোগ দিলে তার দায় পড়বে সরকারেরই ওপর।

কিন্তু এই দিন কয়েক আগেই নির্বীজকরণের বিরুদ্ধে দাঙ্গা-হাঙ্গামা হোল হরিয়ানায়। পুলিশের গুলীবর্ষণে কয়েকজন আহত হওয়ার সংবাদ ঐ ঘটনারই জের। হরিয়ানায় কার্নাল জেলার সিউয়ান গ্রামে নির্বীজকরণের বিরুদ্ধে যাঁরা প্রতিবাদ করেছিলেন—তাঁদের অধিকাংশই হরিজন। অধিকন্তু শিক্ষা-দীক্ষায় তাঁরা অনগ্রসর।

সুতরাং জন্মনিয়ন্ত্রণের প্রচারাভিযানে যাঁরা নামবেন, তাঁরা সরকারী মাইনে করা লোক হোলেও তাঁদের দায়িত্ব বড়ই কঠিন। প্রথমত, এ দেশের ২/৩ ভাগ লোক নিরক্ষর এবং তাদের প্রায় সবাই অশিক্ষিত। কোনো পোস্টার বা লিখিত প্রচার তাদের কাছে অর্থহীন। দ্বিতীয়ত, হাসপাতালে অনেক সময় "ভ্যাসেক্টমী" করার জন্য কোনো কোনো অসামাজিক ব্যক্তি ও ডাক্তার টাকার লোভ দেখিয়ে স্বল্পবয়স্ক ছেলে কিম্বা যারতার ওপর অস্ত্রোপচার করায় বিরূপ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়েছে।

তৃতীয়ত, আমাদের দেশের বড় বড় হাসপাতালগুলি সম্পর্কেই নানা অভিযোগ, গ্রামের ছোট ছোট হাসপাতালগুলির অবস্থা শহরের বড় বড় হাসপাতালের চেয়ে ভালো নয়। চতুর্থত, যে দেশের পল্লীতে নিরক্ষর এমন কি বহু শিক্ষিত মহিলা দীর্ঘবন্ধ্যাতা—সে দেশে তাদের নারী চিকিৎসকদের সম্মুখীন করা কোনো মতে সম্ভব হলেও পুরুষ শল্যবিদদের সম্মুখীন করা প্রায় অসম্ভব ব্যাপার।

আমাদের মনে হয়, জন্মনিয়ন্ত্রণের প্রচারের কাজে একথাগুলি বিশেষভাবে ভেবে দেখতে হবে এবং প্রচারকদের মনে রাখতে হবে কোনো গ্রামে একটি দুর্ঘটনা ঘটলে কুসংস্কারের মতো গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে তার অপপ্রচার হবে। আর একটি কথা হচ্ছে এই —এখনো পর্যন্ত অসংখ্য অশিক্ষিত পল্লীবাসীর ধারণা, জন্মনিয়ন্ত্রণ মানে যেন একেবারেই সন্তান না হওয়া বা তা বন্ধ করে দেওয়া। এই ধারণা দূর করতে হবে, বন্ধ্যা নারীদের সর্বপ্রথম সন্তান লাভ করার প্রচেষ্টা দেখিয়ে। আমরা জানি জন্মনিয়ন্ত্রণের উদ্দেশ্যে পরিচালিত সংস্থাই সে সাহায্য দেয় —কিন্তু এখন হতে নাতে তা প্রমাণ করে দেখানো প্রয়োজন। তাহলে অশিক্ষিত মানুষের মনে ধীরে ধীরে জন্মনিয়ন্ত্রণ সম্বন্ধে সঠিক ধারণা জন্মাবে।

সর্বোপরি সরকারকে মনে রাখতে হবে লোকের মন থেকে জন্মনিয়ন্ত্রণ সম্বন্ধে ভয় দূর করার অব্যবহিত পরেই অস্ত্রোপচারের পরিবর্তে প্রথমে 'নিরোধ' বা 'পিল' জাতীয় ব্যবস্থার সাহায্যে জন্মনিয়ন্ত্রণকে জনসাধারণের কাছে গ্রহণীয় করে তোলা একান্ত দরকার। অস্ত্রোপচারের পূর্বেই নারী মন ভীত হয়ে পড়ায় অস্ত্রোপচারের পর মানসিক পঙ্গু হয়ে উঠছে। তাই মনস্তত্ত্বের দিক দিয়ে সেবন জাতীয় ঔষধই প্রথম লক্ষ্য হওয়া উচিত। আর এই গরীব দেশের জন্মনিয়ন্ত্রণের জন্য ব্যবস্থাদি বিনা মূল্যে বিতরিত হওয়াই উচিত। একথা সবাই স্বীকার করবেন যে, মাসে মাসে ৫/৬ টাকার ব্যয়ে কোনো নারীর পক্ষে নিয়মিত পিল ব্যবহার করা সাধারণ গৃহস্থ পরিবারের পক্ষে অসম্ভব। ঐ পিলের দাম প্রতি মাসে এক টাকা হলেও তা কম নয়। গ্রামের গরীবেরা রোজ ক'টাকাই বা রোজগার করেন? নিরোধ বিনামূল্যে দেওয়া হোক—এটাই আমরা চাই।

জন্মনিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থাকে সফল করার উদ্দেশ্যে আমাদের পরিপূর্ণ সমর্থন জানিয়েও বলবো সরিষার মধ্যে ভূত থেকেই যাচ্ছে। তা নইলে এখনো আইনত কোনো পুরুষ চার বার বিবাহ করার অনুমতি পায় কেন? ধরুন, কোনো পুরুষের চারজন পত্নী, প্রত্যেকে তিনটি করে সন্তানের জননী হতে চাইলে সে পরিবারের লোকসংখ্যা দাঁড়ায় মোট সতেরো। এখানে জন্মনিয়ন্ত্রণের বিধিব্যবস্থা কেমন—সেটাও জানতে আমরা ইচ্ছুক এবং এদেশে সরকার পরিবার পরিকল্পনার ক্ষেত্রে সতেরজনকে নিয়ে কি একটি সুখী পরিবার গড়তে দেবেন আইনের অসহায় যাঁতাকলে পিষ্ট হয়ে?

সম্পাদকীয়

আজকের মানুষ

ভারতের আতিথেয়তার খ্যাতি প্রাচীনকাল থেকেই। শত্রু হোক, মিত্র হোক, ভারতের মাটিতে একবার যিনি পা রেখেছেন, তিনিই ভারতের পরমাত্মীয়ের সম্মান এবং আদর-আপ্যায়ন পেয়েছেন। ইরানের শাহনশাহ্ রেজা শাহ পহ্লভীরও সম্মানে তাই নয়াদিল্লীতে ২১ বার তোপধ্বনি করা হয়েছে, লাল কার্পেট পেতে দেওয়া হয়েছে। হলেনই বা তিনি পাক-ভারত বিরোধে পাকিস্তানের সমর্থক!

রেজা শাহ্‌কে আধুনিক ইরানের জনক বললে কিছু অত্যুক্তি করা হবে না যদিও এ-বাবদে তাঁকে বিস্তর মেহনত করতে হয়েছে। ইরানের রাজসিংহাসনটি পেতেও কম হুজ্জত পোয়াতে হয় নি। পহ্লভী বংশের প্রতিষ্ঠাতা রেজা শাহ্-র বাবাকে সিংহাসনচ্যুত হতে হয়েছিল; দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে তাঁর সমর্থন ছিল নাৎসী জার্মানীর প্রতি। একই কারণে যখন মিত্রপক্ষের দখলদারী প্রতিষ্ঠিত হলো তখন তরুণ রেজা শাহ্-র অনুকূলে রাজা পহ্লভী সিংহাসন ত্যাগ করলেও পুত্র সঙ্গে সঙ্গে তা পান নি। তাঁকে ধৈর্য ধরে অপেক্ষা করতে হয়েছে।

শুধু তাই নয়, যুদ্ধ যখন শেষ হলো তখন ইরানের উত্তর-পশ্চিম সীমান্তের আজারবাইজানে সোভিয়েট রাশিয়া একটা স্বাধীন সরকারের প্রতিষ্ঠা দিল। ১৯৫১ সালে প্রধানমন্ত্রী আলি রাজমারা আততায়ীর হাতে নিহত হলেন, প্রধানমন্ত্রী হলেন মোসাদ্দেক। নতুন প্রধানমন্ত্রীর জাতীয়তাবাদী নীতি, তাঁর উগ্রতা ইত্যাদি রেজা শাহ্-র মনে আরো ভীতি ও ত্রাসের উৎপাদন করলো। মোসাদ্দেক যখন তেল শিল্পের রাষ্ট্রীয়করণ ঘোষণা করলেন, তখন রেজা যেন নিজেকে আরো নিরাপত্তাহীন মনে করতে লাগলেন। সিংহাসনের মায়া ত্যাগ করে তিনি দেশ ছেড়ে পালিয়েও গিয়েছিলেন। কিন্তু তাঁর বোন রাজকুমারী আশ্রাফ ছিলেন সুচতুর এবং বুদ্ধিমতী। দেশের বখ্‌তিয়ার উপজাতি এবং পশ্চিমী বিদেশীদের সাহায্যে তিনি এক অভ্যুত্থান ঘটালেন, ফিরে এলেন রেজা শাহ্ দেশে, ফিরে পেলেন সিংহাসন।

রেজা শাহ্ মোসাদ্দেককে প্রধানমন্ত্রীর গদি থেকে উৎখাত করলেন ১৯৫৩ সালে। হাত দিলেন তাঁর যুগান্তকারী সংস্কার-কার্যে। ইরানের ইতিহাসে শাহনশাহ্-র এই প্রশংসনীয় উদ্যম শ্বেত বিপ্লব (White Revolution) নামে প্রসিদ্ধি-

রেজা শাহ পহ্লভী

লাভ করেছে। এই কার্যক্রম অনুসরণ করেই রেজা শাহ্ ইরানে জমিদারী প্রথা উচ্ছেদ করে ব্যাপক ভূমিসংস্কার সাধন করেন। তিনি এমন আইন রচনা করলেন, যার দ্বারা শিল্পপ্রতিষ্ঠানের মুনাফায় শ্রমিক কর্মচারীরও অংশ স্বীকৃতি লাভ করে। এছাড়াও তিনি দেশে বাধ্যতামূলক শিক্ষা-ব্যবস্থার প্রচলন করেন, উন্নয়নের বিভিন্ন প্রকল্প নেন, বিচার বিভাগকেও পুরনো ভাবধারার বদলে যুগোপযোগী করে ঢেলে সাজেন।

পররাষ্ট্রনীতির ক্ষেত্রেও রেজা শাহ্ দুই বৃহৎ শক্তিগোষ্ঠীর মধ্যে ভারসাম্য বজায় রেখে চলেছেন। ভৌগোলিক অবস্থানের দিক থেকে বিরাট রাষ্ট্র সোভিয়েট য়ুনিয়ন তার দোরগোড়ায়, কাজেই তাকে চটিয়ে কোন কাজ করা তার পক্ষে সম্ভব নয়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময়ে তো ইরানের কোন কোন অংশে পুরোপুরি সোভিয়েট কর্তৃত্ব স্থাপিত হয়েছিল। বিশেষ করে ১৯৬২ সাল থেকে মস্কোর সঙ্গে ইরানের মৈত্রীর সম্পর্ক গড়ে উঠতে থাকে। এ বছরে দু' দেশের মধ্যে এক চুক্তিতে স্থির হয় যে, ইরান তার মাটিতে কোন বিদেশী যুদ্ধ-ঘাঁটি তৈরি করতে দেবে না, কিম্বা সোভিয়েট রাশিয়াকে আক্রমণের উদ্দেশ্যে ইরানকে ব্যবহার করতেও দেবে না। অর্থনীতির দিক থেকেও ইরানে ইস্পাত কারখানা, তেলের এবং গ্যাসের পাইপ-লাইন, বাঁধ নির্মাণ ইত্যাদির জন্যেও সোভিয়েট য়ুনিয়ন ইরানকে প্রভূতভাবে সাহায্য দিয়ে চলেছে।

সোভিয়েট রাশিয়া ছাড়াও পূর্ব ইয়োরোপের যুগোশ্লাভিয়া, চেকোশ্লোভাকিয়া, রুমানিয়া ইত্যাদি দেশের সঙ্গেও অর্থনৈতিক এবং বাণিজ্য সম্পর্ক দৃঢ় করেছে। কিন্তু অন্যদিকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গেও রেজা শাহ্ চুক্তি করেছেন যার বলে তিনি এখান থেকে জঙ্গী বিমান থেকে যুদ্ধ-জাহাজ পর্যন্ত পেয়েছেন।

রেজা শাহ্ দেশের বহু জরুরী সমস্যার সমাধানে যত্নবান হলেও সৌদী আরবের সঙ্গে সীমানা বিরোধের কোন মীমাংসা আজো করে উঠতে পারেন নি। ইরান মুসলমান রাষ্ট্র হলেও আরব রাষ্ট্র নয়, তাই আরব নেতা নাসের সম্পর্কে সৌদী আরবের মতো ইরানেরও কোন দুর্বলতা নেই।

রেজা শাহ্ তাঁর তিন সন্তান এবং সম্রাজ্ঞী ফারাকে নিয়ে দিব্যি সুখে আছেন। কিন্তু তাঁর বিবাহিত জীবন একদিন বিষময় লাগছিলো যখন রাণী সুরাইয়া তাঁকে কোন উত্তরাধিকারী দিতে ব্যর্থ হয়েছিলেন। সে কারণেই তাঁকে তালাক দিয়ে ফারা দিবাকে সাদি করেন রেজা ১৯৫৯ সালে। ফারাও এসেছেন রেজার সঙ্গে ১২ দিনের ভারত দর্শনে। ভারতবাসী এই রাজদম্পতিকে অতিথি পেয়ে খুশি।

রবীন্দ্রনাথ ও সুভাষচন্দ্র

শঙ্করীপ্রসাদ বসু

[পূর্ব-প্রকাশিতের পর]

বন্দেমাতরম্—জনগণমন

["রবীন্দ্রনাথ ও সুভাষচন্দ্র" ধারাবাহিক রচনার মধ্যে "বন্দেমাতরম—জনগণমন" নামে একটি গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায় অতঃপর প্রকাশিত হবে। এই বিস্তৃত অধ্যায়টি স্বতন্ত্রভাবে গ্রন্থমর্যাদা পাবার যোগ্য। কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটি কর্তৃক ১৯৫৭ সালে বন্দেমাতরম সঙ্গীতের অঙ্গচ্ছেদে যার শুরু, স্বাধীন ভারতবর্ষে প্রথম জাতীয় সঙ্গীতের মর্যাদা থেকে বন্দেমাতরমকে স্থানচ্যুত করায় তার শেষ। বন্দেমাতরম ও জনগণমন প্রশ্নে জহরলাল, রবীন্দ্রনাথ সুভাষচন্দ্র, রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়, সুরেশচন্দ্র মজুমদার প্রভৃতির ভূমিকা সম্বন্ধে বহু তথ্যে সমৃদ্ধ এই রচনা পাঠকসমাজে গভীর আগ্রহ ও আলোড়ন সৃষ্টি করবে—সম্পাদিকা]

স্বর্গলোক থেকে দেবতারাও পরমাগ্রহে নিষ্পলক মুখ হয়ে দেখবেন দেখে অতীব আনন্দিত হবেন, এমন একটি দৃশ্যের উল্লেখ করে বর্তমান অধ্যায় আরম্ভ করছি।

দৃশ্যটি এইরকম। স্থান ১নং উডবর্ন পার্ক, সময় সন্ধ্যা সাতটা-সাড়ে সাতটা, ১৯৩৫ সালের ১লা নভেম্বর ; উপস্থিত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, জহরলাল নেহরু, সুভাষচন্দ্র বসু, শরৎচন্দ্র বসু, মহাদেব দেশাই এবং একটি ইনভ্যালিড চেয়ার। ৭৫ বৎসরের বৃদ্ধ কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ইনভ্যালিড চেয়ারে আসীন হলেন। তাঁকে উপরতলায় নিয়ে যাওয়া হবে। চেয়ারের চারপাশে ঘিরে দাঁড়ালেন বাহকের দল—জহরলাল, সুভাষচন্দ্র, শরৎচন্দ্র, মহাদেব দেশাই। চেয়ারটি তুলে তাঁরা সন্তর্পণে সিঁড়ি বেয়ে উঠতে লাগলেন—মহাত্মার চললেন মহাত্মার উদ্দেশে, হ্যাঁ মহাত্মা গান্ধী মূর্ছাভঙ্গের পরে উপরতলায় একটি ঘরে শুয়ে আছেন।

এমন একটি দৃশ্যকে যদি দৈবভোগ্য বলি, নিশ্চয় পাঠক আমার সঙ্গে একমত হবেন যে, আমি একটুও অত্যুক্তি করি নি। ক্ষুদ্র অথচ অপূর্ব এমন একটি ঘটনা ভারতবর্ষে একালের ইতিহাসে ঘটেছে কি না সন্দেহ। বিংশ শতাব্দীর ভারতবর্ষের মানবপ্রধানেরা সেই সন্ধ্যায় বিচিত্রভাবে মিলিত হয়েছিল।

যদি কিছু ভাবালুতা প্রকাশিত হয়ে থাকে, তার জন্য পাঠকের কাছে ক্ষমা চেয়ে পটভূমিকাটি ব্যাখ্যা করা যাক। গান্ধীজী, কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির এবং নিখিল ভারত রাষ্ট্রীয় সমিতির অধিবেশনে যোগদান করবার জন্য কলকাতায় এসেছিলেন। ওয়ার্কিং কমিটির এই অধিবেশন খুবই গুরুত্বপূর্ণ। স্মরণ রাখতে হবে, ইতিপূর্বে প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসন প্রবর্তিত হয়েছে এবং কংগ্রেস অনেকগুলি প্রদেশে মন্ত্রিত্ব নিয়েছে। নানা সাফল্য ও সংকটের মধ্য দিয়ে সেগুলি চলেছে। অপরদিকে মুসলিম লীগ মন্ত্রি-সভাগুলি প্রতিক্রিয়াশীল নীতির জন্য আতঙ্ক সৃষ্টি করেছে বাংলা পাঞ্জাব প্রভৃতি প্রদেশে। বন্দীমুক্তি একটা বৃহৎ প্রশ্ন। আন্দামানবন্দীরা গান্ধীজীর কথায় অনশন প্রত্যাহার করেছেন অথচ তাঁদের বা অন্যান্য রাজবন্দীদের মুক্তি হয় নি। এইসব ব্যাপারের জন্য গান্ধীজীকে কলকাতায় আসতে হয়েছিল, এবং প্রতিদিন বহুঘণ্টাব্যাপী আলোচনাসভায় যোগদান করতেও হয়েছিল। তার প্রচণ্ড স্নায়ুতাপ বৃদ্ধ মহাত্মার সহ্যসীমা অতিক্রম করেছিল। ১লা নভেম্বর তাঁর ওয়ার্ধা ফিরে যাবার কথা ছিল। সেদিন দুপুর ও বিকেলে কয়েক ঘণ্টা ওয়ার্কিং কমিটির সভায় যোগদান করেছিলেন। সন্ধ্যায় হঠাৎ মূর্ছিত হয়ে পড়লেন।

সে কী অসহ্য উদ্বেগের ক্ষণ। গৃহস্বামী বসু-ভ্রাতারা অস্থির-ব্যাকুল। নিজের চিকিৎসার জন্য রবীন্দ্রনাথ তখন শান্তিনিকেতন থেকে বরানগরে এসে রয়েছেন। শরৎচন্দ্র বসু অবিলম্বে তাঁকে টেলিফোনে খবর দিলেন। "গান্ধীজীর হঠাৎ পীড়ার সংবাদ যখন কবির কাছে পৌঁছল," সংবাদ-পত্রের বিবরণে পাই, "তখন যদিও তিনি নিজে সম্পূর্ণ আরোগ্য লাভ করেন নি, তথাপি দ্রুত মোটরে ছুটলেন উডবর্ন পার্কের দিকে। উদ্বেগ ও উত্তেজনায় কবি নিতান্ত অবসন্ন। শ্রীযুক্ত বসুর বাড়িতে পৌঁছে কোনোক্রমে গাড়ি থেকে নেমে বৈঠকখানায় চেয়ারে এলিয়ে পড়েছিলেন।

তাঁর শক্তি তখন এতই নিঃশেষিত যে "তিনি এখন কেমন আছেন', মাত্র এই প্রশ্নটিই করতে পেরেছিলেন। তাঁকে আশ্বাস দিয়ে জানানো হয়—মহাত্মাজী ভাল হয়ে উঠেছেন। শুনে কবি বলেন, তিনি যে এসেছেন, একথা জানিয়ে মহাত্মাকে ব্যস্ত করার দরকার নেই। মহাত্মাজীর প্রাইভেট সেক্রেটারী শ্রীযুক্ত দেশাই তখন নীচের তলায় ছিলেন, তিনি কিন্তু মহাত্মাজীর সান্ধ্য প্রার্থনাসভায় থাকবার জন্য কবিকে বিশেষভাবে অনুরোধ জানান। মহাত্মাজীর অসুস্থতা সত্ত্বেও প্রার্থনাসভা হবে। সেখানে কবির উপস্থিতি মহাত্মাজীকে বিশেষ তৃপ্তিদান করবে।

"কবি রাজী হন, কিন্তু উপরতলায় তাঁর পক্ষে ওঠা সম্ভব নয়, সে শক্তি তাঁর নেই। তখন একটি ইনভ্যালিড চেয়ার চেয়ে আনা হয়। পণ্ডিত নেহরু, শ্রীযুক্ত মহাদেব দেশাই, শ্রীযুক্ত শরৎ বসু ও শ্রীযুক্ত সুভাষচন্দ্র বসু ঐ চেয়ারে বসিয়ে তাঁকে মহাত্মাজীর নিকটে নিয়ে যান।

"মহাত্মাজী শায়িত অবস্থাতেই প্রার্থনা করেন। প্রার্থনায় যোগ দেন ডঃ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, পণ্ডিত জহরলাল নেহরু, শ্রীমতী বিজয়লক্ষ্মী পণ্ডিত, শ্রীযুক্ত সুভাষচন্দ্র বসু, শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র বসু। প্রার্থনা পরিচালনা করেন শ্রীযুক্ত মহাদেব দেশাই।" *

গান্ধীজীর সহসা অসুস্থতার অতি সংকটক্ষণে রবীন্দ্রনাথের কলকাতায় অবস্থিতি "ঈশ্বরের আশীর্বাদের" মত মনে হয়েছিল অনেকের কাছে। ২০ নভেম্বরের হরিজন পত্রিকায় "অমর সঙ্গীতকার" নামক রচনায় শ্রীযুক্ত মহাদেব দেশাই লিখেছিলেন—

> "গুরুদেব রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সঙ্গে মিলন আর একটি শুভ ঘটনা। চিকিৎসার কারণে তখন যদি তিনি কলকাতায় না থাকতেন, তাহলে শুধু তাঁর দর্শনের জন্যই মহাত্মাজীকে শান্তিনিকেতনে যেতে হত; করুণাময় ঈশ্বর গুরুদেবকে মৃত্যুমুখ থেকে ফিরিয়ে দিয়েছেন।*

"কবির সঙ্গে গান্ধীজীর কথাবার্তা, এবং গান্ধীজীর মূর্ছার সংবাদ শোনামাত্র যেভাবে তিনি ছুটে এসেছিলেন, অবিস্মরণীয় হয়ে থাকবে সেই স্মৃতি। নিজের শরীর দুর্বল, সিঁড়ি ভেঙে উপরে ওঠা তাঁর পক্ষে সম্ভব নয়, এসব মনে রেখেও কবি এসেছিলেন। যতখানি আশঙ্কা করেছিলেন, গান্ধীজী ততখানি পীড়িত নন জেনে তিনি আনন্দ প্রকাশ করেছিলেন, তারপরে সাক্ষাৎ না করেই চলে যেতে চেয়েছিলেন। কিন্তু যখন তাঁকে জানানো হল, তাঁর দর্শন পেলে গান্ধীজী খুবই প্রীত হবেন, তখন তিনি বাহিত হয়ে উপরে ওঠার প্রস্তাবে রাজী হলেন। প্রার্থনাকালে তিনি উপবিষ্ট ছিলেন, কিন্তু গান্ধীজীর সঙ্গে একেবারেই কথা বলেন নি, প্রার্থনা শেষে শুভেচ্ছা ও আশীর্বাদ জানিয়ে চলে গিয়েছিলেন।"

হৃদয়কাব্যের মধ্যে আছি আমরা, সেই সূত্রে আরও কয়েক লাইন বিবরণ হাজির করি। এইবারের ভ্রমণে গান্ধীজী কলকাতায় পৌঁছেই রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছিলেন। "এই দুই মহামানবের মিলনের দৃশ্য অতি মর্মস্পর্শী", সংবাদপত্রের প্রতিনিধি লিখেছিলেন, "বৃদ্ধ অশক্ত কবি কাঁপা পায়ে তাড়াতাড়ি এগিয়ে এলেন সেবাগ্রামের ঋষিকে আলিঙ্গন করতে। সে দৃশ্য দেবতাদেরও দর্শনীয়।" *

এই সমস্ত কাব্য বা নাটক সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়েছিল, তিরিশ বছর পরে জীর্ণ সংবাদপত্রের পৃষ্ঠা থেকে সেগুলি উদ্ধার করে আমরা আনন্দিত, ভরসা করি পাঠকগণ আমাদের সঙ্গে এই আনন্দের অংশীদার। কিন্তু আমাদের গভীর সন্দেহ আছে, সমকালীন বাঙালী পাঠকগণ এই সমস্ত ভাবের কথা কতখানি উপভোগ করেছিলেন! যে গভীর যাতনার মধ্য দিয়ে দেশপ্রেমিক সংগ্রামী বাংলা তখন অগ্রসর হচ্ছিল, তার মধ্যে ব্যক্তিজীবনের সুখসৌন্দর্যের ছবিগুলি হারিয়ে যাবার মুখে। অন্তত কংগ্রেস নেতৃবৃন্দ এবং রবীন্দ্রনাথের মূর্তি তাঁদের কোনো কোনো ভূমিকার জন্য বাংলা দেশের বড়ো অংশে বিশেষভাবে মলিন। কংগ্রেস নেতৃবৃন্দের মধ্যে তৎকালীন কংগ্রেস-সভাপতি জহরলাল এবং রবীন্দ্রনাথ বাংলা দেশের পত্রপত্রিকায় যেভাবে আক্রান্ত হয়েছিলেন, খুব কম

---

* অমৃতবাজার, ২ নভেম্বর, ১৯৩৭

*কবির এই অসুস্থতার বিষয়ে রবীন্দ্র-জীবনীতে আছে—

'কলিকাতা হইতে (বর্ষামঙ্গল) উৎসবান্তে কবি শান্তিনিকেতনে ফিরিলেন (১৩৪৪ ভাদ্র ২১)। কথা ছিল গবালিয়র মহারাজার আমন্ত্রণে সেখানে যাইবেন। এমন সময়ে একদিন সন্ধ্যার পর সকলের সহিত কথাবার্তার মধ্যে কবি হঠাৎ হতচৈতন্য হইলেন (২৫ ভাদ্র, ১০ সেপ্টেম্বর)... পরদিন ডাক্তার নীলরতন সরকার আসিয়া কবির রোগনির্ণয় করিলেন ও তাঁহার চিকিৎসায় অচিরকালের মধ্যে কবি সুস্থ হইয়া উঠিলেন।

মহাত্মাজী নিয়মিতভাবে তারযোগে কবির সংবাদ লইতেছেন। সুস্থ হইয়া কবি গান্ধীজীকে লিখিলেন—

"The first thing which welcomed me into the world of life after the period of stupor I passed through was your affectionate anxiety and it was fully worth the cost of suffering which were unremitting in their long persistence." (র, জী, ৪র্থ—১৭)

* অমৃতবাজার, ২৭ অক্টোবর, ১৯৩৭।

ক্ষেত্রেই সেরকম হয়েছেন, এবং আমাদের স্বীকার করতেই হবে, আক্রমণের যথেষ্ট কারণও ঘটেছিল। সেই সমগ্র অর্থাৎ 'বন্দেমাতরম' সঙ্গীতের অঙ্গচ্ছেদের প্রসঙ্গে এখন আমরা আসতে যাচ্ছি, যা ক্রমে বন্দেমাতরম বর্জনে গিয়ে পৌঁছবে।

প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসনের অপক্ক অমৃতফলে যেসব কংগ্রেসী প্রদেশগুলি কামড় দিতে পারল, তারা স্বাধীনতার জন্য অল্প ত্যাগ স্বীকার করেছিল, একথা বলা অশোভন হবে। কিন্তু ত্যাগ স্বীকারে যে-বাংলা অগ্রণী ছিল (কংগ্রেস-কর্তাদের পিঠচাপড়ানি-বচন থেকে বাঙালী সেসব কথা যথেষ্টই শুনেছে), সে পেল তার বিফল। স্বায়ত্তশাসনের বিরুদ্ধে আপত্তি করা যায় না, নির্বাচনে জয়ী দলকেই মন্ত্রিত্ব গঠন করতে দিতে হবে, গণতন্ত্রের তাই বিধি, আপত্তি করে কে, বাংলা দেশে মুসলিম লীগ তদনুযায়ী মন্ত্রিসভা গঠন করতে পেরেছে—সবই সত্য। সর্বভারতীয় কংগ্রেস-কর্তারা বড় ব্যথায় এই নিষ্ঠুর ব্যাপারটিকে স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছিলেন, অবশ্যই, তবে সেই সঙ্গে বলা চলে, তাঁদের ব্যথার্ত বুকের মধ্যে একটি নিরেট ঔদাসীন্যের ক্ষেত্র ছিল, যা বাংলার মত প্রদেশগুলির স্বার্থের পরিপন্থী সাম্প্রদায়িক ঘাঁটোয়ারা সম্বন্ধে ধার্মিক নিরপেক্ষতা নিয়েছিল এবং পুণা প্যাক্ট ঘটিয়ে প্রগতিশীল শক্তির বিরুদ্ধে প্রতিক্রিয়াশীল শক্তিতে বলসঞ্চার করেছিল। জাতীয়তাবাদী বাংলা নিজেকে ছুতসর্বস্ব ভেবেছিল, ত্যাগের ফল সে পেল না (একেবারে দধীচি হওয়া কঠিন), গান্ধীপন্থী না হওয়ার জন্য কংগ্রেস পরিচালনায় তার অধিকার নেই, এবং একটা নিগূঢ় অপমান-বোধ না জেগে পারে নি যেহেতু গান্ধীপন্থার বিরোধী বাঙালী বিপ্লবীদের মুক্তিসংগ্রহ করতে হচ্ছে অহিংস গান্ধীনীতির কাছে আত্মসমর্পণ করে।

বাঙালীর পক্ষে তাই নিজেদের গৌরবময় সংগ্রামী ঐতিহ্যের অনুধ্যান থেকে সান্ত্বনা সংগ্রহ করা ছাড়া গত্যন্তর ছিল না। সবিস্ময়ে সবিশেষ ঘৃণার সঙ্গে বাঙালী দেখল, কংগ্রেসী বড়কর্তারা সেই ঐতিহ্যকে খণ্ডিতক্ষরতে উদ্যত, সাম্প্রদায়িক শক্তির কাছে মাথা নামিয়ে। বন্দেমাতরম কি জাতীয় সঙ্গীত থাকবে—কংগ্রেস-কর্তারা গম্ভীরভাবে বিচার করতে বসলেন—যে-বন্দেমাতরমের মন্ত্রশক্তিতে বাঙালী বিভক্ত বঙ্গকে অখণ্ড করেছিল, এবং সেই শক্তির বেগে বৃহত্তর ভারতবর্ষে ব্যাপক রাজনৈতিক চেতনাসঞ্চার হয়েছিল। বন্দেমাতরম সঙ্গীত ও বন্দেমাতরম ধ্বনি স্বরাজনীতিতে বাঙালীর মহৎ দান। সেই দান ফুলায় ফেলে ধুস্তি ও গুঁতির কাঁকর পাথর যখন কংগ্রেসী হাইকম্যাণ্ড সংগ্রহ করতে ব্যস্ত হলেন, সেই কাজে সমর্থক পেলেন রবীন্দ্রনাথকে, তখন নিরুপায় জাতির জন্য ক্ষোভ ও রোষই একমাত্র অবশিষ্ট রইল। রবীন্দ্রনাথ প্রমুখ অনেকে তারই কিছু অংশ পেয়েছিলেন।

বন্দেমাতরম সঙ্গীত আনন্দমঠ উপন্যাসের অন্তর্ভুক্ত। অত্যাচারী বিকৃতবুদ্ধি মুসলমান শাসনের বিরূপ চিত্র আনন্দমঠ উপন্যাসে মেলে। এর জন্য সাম্প্রদায়িক মুসলমানদের কাছে আনন্দমঠ জঘন্য সৃষ্টি, রাজসিংহও তাই, কেন-না, সেখানে সাম্প্রদায়িক-চূড়ামণি আওরঙ্গজেবের কিছু স্বরূপচিত্র পাওয়া যায়। সংকীর্ণচিত্ত মুসলমানদের কাছে আকবর আদর্শ নন, আওরঙ্গজেবই আদর্শ। সুতরাং ঐতিহাসিক-সত্যের খাতিরে বঙ্কিমচন্দ্র যখন আওরঙ্গজেবের কিছু বাস্তব ছবি আঁকলেন, তখন তার জন্য তাঁর 'মুসলমান-বিদ্বেষী' হতে দেরি হল না, কিন্তু মীরকাশিম বা নবাবক মাওসমান প্রভৃতির প্রষ্টা কদাপি মুসলমানপ্রেমী রূপে গণ্য হলেন না। আনন্দমঠের বিরুদ্ধে বিরাগের অংশ আনন্দমঠের অন্তর্ভুক্ত বন্দেমাতরম সঙ্গীত পেলই। তাছাড়া ঐ সঙ্গীতে মূর্তির প্রচ্ছন্ন এবং স্পষ্ট ছবি আছে—মূর্তি-দ্বেষীদের পক্ষে তাকেও সহ্য করা সম্ভব হয় নি। বন্দে-মাতরমের বিরুদ্ধে সাম্প্রদায়িক মুসলমানের আপত্তি গ্রাহ্য করার প্রয়োজন আগে হয় নি, কারণ স্বাধীনতা সংগ্রামের জোয়াল প্রধানত বন্দেমাতরমভক্তের দলই কাঁধে তুলে নিয়েছিলেন, কিন্তু সেই সংগ্রামের অর্জিত সম্পদের বাঁটোয়ারার ব্যবস্থা যখন ইংরেজ সরকার করলেন, তখন স্বভাবতই স্বাধীনতা-সংগ্রামের ঝঞ্ঝাটে যারা বেশি নিতে রাজী হয় নি তারাই সুপুত্রের অধিক প্রাপ্য লাভ করল। সেই সঙ্গে বন্দেমাতরম-সঙ্গীত, আনন্দমঠ গ্রন্থ আক্রমণের লক্ষ্য হল।

মুসলিম লীগের সাম্প্রদায়িক অভিসন্ধিগুলি ইংরেজ শাসকদের দ্বারা পুষ্ট তো হতই, কংগ্রেস-কর্তাদের মহানুভবতায় তা কম রসসিক্ত হয় নি। বন্দেমাতরম সঙ্গীত অনেকদিন ধরেই স্বীকৃত জাতীয় সঙ্গীত, কিন্তু কংগ্রেসে তার সরকারী স্বীকৃতির কথা ওঠে নি, কারণ, কংগ্রেসের অস্তিত্ব যেসব ধারণার উপরে নির্ভরশীল, বন্দেমাতরম-সংস্কৃতি (যদি কথাটি এখানে ব্যবহার করতে দেওয়া হয়) তার প্রথম একটি; তাই কংগ্রেসী মন্ত্রিসভা গঠিত হবার পরে সরকারী অনুষ্ঠানে জাতীয় সঙ্গীত হিসাবে স্বতঃই বন্দে-মাতরম গাওয়া আরম্ভ হল। সাম্প্রদায়িকতার সাফল্যে উৎফুল্ল মুসলিম লীগ অধিবেশনে আপত্তি তুলল।[১] লীগের

---

১ ২৪ সেপ্টেম্বর, ১৯৩৭-এর আনন্দবাজারের একটি সংবাদের শিরোনামা—

বন্দেমাতরম সঙ্গীতে মুসলমান সদস্যের আপত্তি

ইসলামকে অপমান করাই উহার উদ্দেশ্য

মাদ্রাজ পরিষদে চাঞ্চল্যের সঞ্চার

লখনৌ সম্মেলনে বন্দেমাতরমের বিরুদ্ধে প্রস্তাব গৃহীত হল২, বন্দেমাতরম নিয়ে সংঘর্ষ বাধল৩, আনন্দমঠের বহুৎসব হল৪, আনন্দমঠ ও রাজসিংহকে বাজেয়াপ্ত করার দাবি উঠল, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতীক চিহ্নে শ্রী ও পদ্মের অস্তিত্বের বিরুদ্ধে আন্দোলন-চলল।৫ সাম্প্রদায়িক মুসলিম সংবাদপত্রগুলি প্রতিদিন বিষমুখ বিষকুম্ভ হয়ে আত্মপ্রকাশ করতে লাগল।

সাম্প্রদায়িকদের তাণ্ডব নতুন কোনো ব্যাপার নয়। এইসব ক্ষেত্রে আমাদের অতি সাত্ত্বিক শুদ্ধশীল ব্যক্তিরা স্পর্শদোষ এড়াতে সরে গিয়ে তাদের নৃত্যগীতের ক্ষেত্র প্রস্তুত করে দেন। পণ্ডিত নেহরুর নিরপেক্ষতার মত পাণ্ডিত্যের খ্যাতিও সুবিদিত; সুতরাং বিখ্যাত প্রবাদটি, যা বলে, সর্বনাশ সমুৎপন্ন হলে পণ্ডিতেরা অর্ধ ত্যাগ করে, তাকে স্বিগুণ-বিশ্বাস করতে তাঁর অসুবিধা হয় নি। ১৯৩৭ সালে কংগ্রেস সভাপতিরূপে আলি সর্দার জাফরি নামক জনৈক মুসলমান পত্রলেখকের প্রশ্নের উত্তরে যা লেখেন, তাতে দেখা গেল, পণ্ডিতজী অর্ধ নয়, ক্ষেত্রবিশেষে পূর্ণ ত্যাগেও প্রস্তুত। পণ্ডিতজী লিখেছিলেন—

"কংগ্রেস সরকারীভাবে কোনো সঙ্গীতকে জাতীয় সঙ্গীত হিসাবে গ্রহণ করে নি। কার্যতঃ অবশ্য জাতীয় সম্মেলনসমূহে অন্যান্য সঙ্গীতের সঙ্গে বন্দেমাতরম প্রায়ই গীত হয়েছে। এর কারণ, ৩০ বছর আগে এই বন্দেমাতরম গান ও ধ্বনি নিষিদ্ধ করা হয়েছিল; তার ফলে তা ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়ায়। সহস্র সহস্র লোক এর জন্য দুঃখবরণ করে, এবং জনগণের কাছে এটি ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে সংগ্রামের স্মারক হয়ে ওঠে। এই দিক থেকে এটি জাতীয়তার প্রতীকরূপ লাভ করে। এর শব্দগুলি কোনো দেবীর সঙ্গে গানটি সংশ্লিষ্ট —একথা কারো মনে উদিত হয় বলে আমার মনে হয় না। ঐ ব্যাখ্যা অবাস্তব। অপরপক্ষে গানটি যে-গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত, সেই গ্রন্থ রচনার কালে লেখকের মাথায় কোন্ ভাব ছিল, সে সম্বন্ধেও আমরা সজাগ থাকি না, জনগণ ওসব দিক দিয়ে চিন্তাও করে না।

আমার বিবেচনায় সমস্ত গানটি এবং তার অন্তর্ভুক্ত শব্দগুলি সম্পূর্ণ নির্দোষ, কেউই তার অর্থে আপত্তি করতে পারবেন না। সেই সঙ্গে আমার এও ধারণা—গানটি জাতীয় সঙ্গীত হবার উপযোগী নয়। এর মধ্যে অত্যধিক কঠিন শব্দ আছে, জনগণ যেগুলি

---

২ ১৯ অক্টোবরের হিন্দুস্থান স্ট্যাণ্ডার্ড থেকে প্রস্তাবটি উদ্ধৃত করছি—

"The fifth resolution strongly condemned the attitude of the Congress in foisting Bande Mataram as the National Anthem upon the country in callous disregard of the feelings of Mussalmans and considered the song as not merely anti-Islamic and idolatrous in its inspiration and ideas but definitely subversive of the growth of genuine nationalism in India.

The meeting further called upon Mussalman members of the various Legislatures and public bodies in country not to associate themselves in any manner with the 'highly objectionable' song."

৩ আনন্দবাজার পত্রিকার ৩ অক্টোবরের একটি সংবাদের শিরোনামা :

বন্দেমাতরমে বিপত্তি
হিন্দু-মুসলমান ছাত্রে সংঘর্ষ
পাটনায় গান্ধীজয়ন্তী উৎসবে অপ্রীতিকর ঘটনা

৪ হিন্দুস্থান স্ট্যাণ্ডার্ড-এর ২০ অক্টোবরের সংবাদ—

Ananda Math Bonfire

The Working Committee of the Hindu Mahasabha at a recent meeting held under the presidency of Bhai Paramanand adopted a resolution denouncing the activities of certain sections of Bengal Muslims, such as agitation against Bande Mataram song and the Calcutta University symbol. The meeting also condemned the bonfire of Ananda Math which contains Bande Mataram song.

৫ আনন্দবাজার পত্রিকার ৮ অক্টোবরের সংবাদের শিরোনামা—

শ্রী ও পদ্মের উপর আক্রোশ
আনন্দমঠ ও রাজসিংহে বাজেয়াপ্ত করার দাবী
শ্রীহট্টে ঢাকার নবাব বাহাদুর

বোঝে না; এবং এর অন্তর্ভুক্ত ভাব জাতীয়তা ও প্রগতি সম্বন্ধে আধুনিক ভাবধারার সঙ্গে মেলে না। সহজ ভাষায় অধিক উপযোগী জাতীয় সঙ্গীত সন্ধানের চেষ্টা আমাদের করতেই হবে। কিন্তু মহান কণ্ঠ-সঙ্গীত বা যন্ত্রসঙ্গীত ফরমাসে তৈরি করা যায় না। উদ্দেশ্য ও প্রতিভার সম্মিলন ঘটা চাই তার জন্য। আমার ধারণায় যথাসময়ে একটা ভাল-কিছু আমরা পেয়ে যাব। তার আগে, বন্দেমাতরম ও অন্যান্য প্রিয় যেসব সঙ্গীতকে জনগণ স্বাধীনতা সংগ্রামের সঙ্গে যুক্ত করে দেখে, সেগুলির ব্যবহারের সম্পূর্ণ অনুমতি না দেবার কারণ নেই।**

জহরলালের এই চিঠিতে প্রকাশিত বক্তব্য সম্বন্ধে একটি কথাই বলা সম্ভব—সি-নি-স্টা-র! তিনি সবই জানেন এবং বোঝেন দেখাবার জন্য যথারীতি এই চিঠিতে সম্পূর্ণ বিপরীত দুটি বক্তব্য হাজির করেছেন। বন্দেমাতরমের বিরাট ঐতিহ্য তাঁর তুল্য ইতিহাসবোধসম্পন্ন ব্যক্তি কদাপি অস্বীকার করতে পারেন না, অপরদিকে তাঁর মত প্রগতি-শীল ব্যক্তি তাকে শেষ পর্যন্ত সহ্যও করতে অসমর্থ। মহান জাতীয় সঙ্গীত ফরমাইসে তৈরি হয় না তিনি জানেন, তবু প্রাণের কথাটা না বলে পারেন না—সহজ ভাষায় অধিক উপযোগী জাতীয় সঙ্গীত অন্বেষণ করতে হবে। সমস্ত উল্টে-পাল্টা কথা থেকে তাঁর [illegible] অভিমত পরিষ্কার হয়ে উঠল—'গানটি জাতীয় সঙ্গীত হবার উপযোগী নয়।'

পরোক্ত বক্তব্যকে আরও একদিক থেকে লক্ষ্য করতে হবে। এখানে জহরলাল আনন্দমঠকে সন্দেহ থেকে অব্যাহতি না দিলেও বন্দেমাতরমকে সম্পূর্ণত অব্যাহতি দিয়েছেন। এর কোথাও নাকি দোষজনক কিছু নেই। কিন্তু কিছু পরেই পাঠক দেখবেন, কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটি কর্তৃক বন্দেমাতরম-প্রস্তাব পাশ হবার পরে জহরলাল বক্তৃতায় পরিষ্কার বললেন, বন্দেমাতরমের শেষাংশের হিন্দুধর্মীয় ভাব ও ইঙ্গিত তাঁর মনকে অন্যমনস্ক উদাসীন করে তোলে, তাঁর বিশুদ্ধ জাতীয়তার মধ্যে 'কলুষের কুবাতাস' বইতে দেয়। মহান কংগ্রেস-সভাপতির এই দুই বক্তব্য সম্বন্ধে খুব মৃদুভাবে আমরা বলতে পারি, কয়েক দিনের ব্যবধানে এমন মত-বদল অসাধারণ ভিন্ন সাধারণ মানুষের অসাধ্য।

[ক্রমশঃ]

* মডার্ন রিভিউ, অক্টোবর, ১৯৩৭।

সাপ্তাহিক বসুমতী

* অন্তর্বর্তী নির্বাচন ঐ আগত
* নির্বাচকেরাই ঠিক করুন, দেশ-পরিচালনা করবেন কে
* এ ঠিক করা হাত গুণে বা কোষ্ঠী বিচার করে নয়
* নির্বাচকের দায়িত্ব ও কর্তব্য তাই আজ সবচেয়ে কঠিন
* কিন্তু তা জটিল নয়

কারণ আপনি আপনার বলিষ্ঠ ও দৃঢ় অভিমত যাচাই করে নিতে পারেন একমাত্র সাপ্তাহিক বসুমতীতে প্রকাশিতব্য আগামী সংখ্যার ( ) মূল্যবান প্রতিটি লেখা থেকেই।

গত সাধারণ নির্বাচনের প্রাক্কালে সাপ্তাহিক বসুমতী যে গুরু দায়িত্ব পালন করেছিল, এবার অন্তর্বর্তী নির্বাচনের প্রাক্-মুহূর্তে আরো গুরু-কর্তব্য পালনে সাপ্তাহিক বসুমতী প্রতিশ্রুত।

: লিখছেন :

অশোককুমার সেন, এম-পি অরুণপ্রকাশ চ্যাটার্জি, এম-পি
অজিত দত্ত (পশ্চিমবঙ্গের প্রাক্তন এ্যাডভোকেট জেনারেল)

[বিষয় : সংসদীয় গণতন্ত্রের ভবিষ্যৎ]

কয়েকটি বিশেষ নিবন্ধ লিখেছেন

অন্তর্বর্তী নির্বাচন ও সর্বভারতীয় রাজনৈতিক পরিস্থিতি —অরুণচন্দ্র গুহ
অন্তর্বর্তী নির্বাচন —প্রতাপচন্দ্র গুহরায়
দলত্যাগ ও গণতন্ত্রের সংকট —পান্নালাল দাশগুপ্ত
নির্বাচন ও জনসাধারণ —ভূষার চট্টোপাধ্যায়
মধ্যবর্তী নির্বাচনের পশ্চাৎপট —ডঃ নরেন ভট্টাচার্য

আসন্ন মধ্যবর্তী নির্বাচন ও বিভিন্ন সম্ভাবনার ওপর নির্ভীক ও নির্ভুল আলোচনা করেছেন

ক্ষুদ্র দাশগুপ্ত কৃত্তিবাস ওঝা অসীম মুখোপাধ্যায়

পাঠকমন : দূরপল্লীর নিরপরাধ নির্বাচক

: এতদ্ব্যতীত :

পশ্চিমবঙ্গের যে সব প্রখ্যাত সাহিত্যিক, ঐতিহাসিক, চিকিৎসক, রাজনৈতিক নেতাদের অভিমত তুলে ধরেছি তাঁদের মধ্যে আছেন—

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, রমেশচন্দ্র মজুমদার, নীহার মুন্সী, অজয় মুখোপাধ্যায়, প্রতাপচন্দ্র চন্দ্র, জ্যোতি বসু, সুবোধ ব্যানার্জী, জ্যোতি ভট্টাচার্য, জাহাঙ্গীর কবির, অশোক ঘোষ, মাখন পাল, ভূপাল বসু, সুকুমার রায়, হরিপদ ভারতী, বিশ্বনাথ মুখোপাধ্যায় প্রমুখ

ফিচার

সুভাষ সমাজদার সুমীর মুখোপাধ্যায়
বীরেন্দ্র মিত্র

আর থাকছে
কার্টুন, বহু ফটো, স্কেচ
দাম বাড়ানো হয় নি

বর্ষা দর্শন

১৯৬৮ সাল অতিক্রান্ত হয়ে গেল নানান দুর্যোগের মধ্য দিয়ে। নানান কারণে ১৯৬৮-র স্মৃতি পশ্চিমবঙ্গে দীর্ঘকাল জাগরূক থাকবে। এ বছরের শুরু হয়েছিল পশ্চিমবঙ্গে একটি রাজনৈতিক সন্ত্রাসের মধ্য দিয়ে। ১৯৬৭-র ২১শে নভেম্বর পশ্চিমবঙ্গ থেকে যুক্তফ্রন্ট সরকারকে উৎখাত করা হয়েছিল এবং তার স্থান দখল করেছিল ডঃ প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষের নেতৃত্বে পি: ডি: এফ: সরকার। রাজনৈতিক সন্ত্রাস সৃষ্টির দ্বারা এই সরকার টিকে থাকার চেষ্টা করেছিল, এবং তার ফলে তিন মাস ধরে প্রায় প্রতিদিনই বেপরোয়া লাঠি, গুলী চলেছে, এবং জেলখানায় রাজনৈতিক বন্দীর সংখ্যা বৃটিশ আমলের সকল রেকর্ডকেই ভঙ্গ করেছে। শেষ পর্যন্ত অবশ্য সাংবিধানিক কারণে, বিশেষ করে তৎকালীন স্পীকার শ্রীবিজয়কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের ঐতিহাসিক রুলিং-এর পর, পি: ডি: এফ: কংগ্রেস যৌথ সরকারের উচ্ছেদ হয় এবং পশ্চিমবঙ্গে রাষ্ট্রপতির শাসন প্রতিষ্ঠিত হয়।

১৯৬৮-র গোড়ার দিকে যখন রাজ্যপাল ধর্মবীর পশ্চিমবঙ্গের দায়িত্ব গ্রহণ করেন, তখন তাঁকে ঘিরে জনসাধারণের মধ্যে কিছুটা আশার ও উদ্দীপনার সৃষ্টি হয়েছিল। আশা করা গিয়েছিল যে রাজনৈতিক দলের বন্ধনবিহীন হবার জন্য হয়ত ধর্মবীর ও তাঁর প্রশাসন পশ্চিমবঙ্গের জন্য সত্যই কিছু করতে পারবেন, কিন্তু পশ্চিমবঙ্গবাসীর এই আশা অচিরেই বিনষ্ট হয়েছে। প্রশাসনিক ব্যবস্থার উন্নতি হওয়ার বদলে তার চূড়ান্ত অবনতিই লক্ষ্য করা গেছে। রাজ্যপাল ও তাঁর প্রশাসন প্রতিটি ক্ষেত্রেই শোচনীয় ব্যর্থতার পরিচয় দিয়েছেন। আইন ও শৃংখলা একেবারে বিপর্যস্ত হয়েছে, হত্যা, লুণ্ঠন ও অপরাপর অপরাধ বহুগুণে বেড়ে গেছে, কলকাতা শহরেই কয়েকটি বড় বড় ডাকাতি হয়ে গেছে তার কোনই কিনারা হয় নি। পশ্চিমবঙ্গের শিল্পাঞ্চলগুলিতে আজও পর্যন্ত সন্ত্রাসের রাজত্ব চলছে, সমাজবিরোধী লোকেরাই আজ সমাজের প্রভু হয়ে দাঁড়িয়েছে, এবং রাজ্যপালের প্রশাসন ও পুলিশ তাদের ওপরই নির্ভরশীল হয়ে রয়েছে। অথচ অকারণে জনসাধারণের মধ্যে সন্ত্রাস সৃষ্টির প্রয়োজনে পুলিশের হামলা পশ্চিমবঙ্গে নিত্যনৈমিত্তিক হয়ে দাঁড়িয়েছে। খোদ কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র-দপ্তরের হিসাব অনুযায়ী গুলীচালনায় ও হত্যায় রাজ্যপালের প্রশাসন পশ্চিমবঙ্গে সর্বভারতীয় রেকর্ড স্থাপন করেছে। ভারতের অন্য যে কোন রাজ্যের তুলনায় গত দশ মাসে পুলিশের গুলীবর্ষণ ও তজ্জনিত হত্যার সংখ্যা পশ্চিমবঙ্গে সর্বাধিক।

শ্রমবিরোধ, শিল্পোন্নয়ন ও বেকার সমস্যা সমাধানের ক্ষেত্রে রাজ্যপালের প্রশাসন অত্যন্ত হতাশাব্যঞ্জক। উৎপাদিত পণ্যের অপকর্ষ, ও অতিমুনাফার প্রবণতার জন্য এদেশের শিল্পক্ষেত্রে গত কয়েক বছর ধরেই যে মন্দার অবস্থা চলছে তার দায়িত্ব শ্রমিকদের স্কন্ধে চাপিয়ে দিয়ে মালিকপক্ষ গত কয়েক বছর ধরেই ক্রমান্বয়ে ছাঁটাই, লক আউট ও লে-অফ চালিয়ে যাচ্ছে। শ্রমিক-শ্রেণীর রুটি-রুজির ন্যায্য সংগ্রামকে সমূলে অপব্যাখ্যা করা হয়েছে, এবং এটাই প্রমাণ করার চেষ্টা করা হয়েছে যে, শিল্প-বাণিজ্যে নৈরাজ্যের জন্য যেন তারাই দায়ী। কিন্তু যুক্তফ্রন্টের আমলে যে কারখানা-গুলি বন্ধ হয়েছিল, রাজ্যপালের প্রশাসনে তা খোলে নি। উপরন্তু ছাঁটাই, লক আউট লে-অফ যুক্তফ্রন্টের আমলের তুলনায় রাজ্যপালের আমলে বিগুণ বর্ধিত হয়েছে। এ রাজ্যে মূলধন বিনিয়োগের নতুন ক্ষেত্র তৈরি করতে রাজ্যপাল ব্যর্থ হয়েছেন, চতুর্থ পঞ্চ বার্ষিকী পরিকল্পনার জন্য পশ্চিমবঙ্গের তরফ থেকে কেন্দ্রীয় দাক্ষিণ্য কিছুই বলতে গেলে আদায় করা সম্ভবপর হয় নি। এই বাবদে পরিকল্পনা কমিশন তথা কেন্দ্রীয় সরকার যা দিতে চাইছেন তাতে একটা প্রকল্পও সম্পূর্ণ করা সম্ভব হবে না। কোন নির্বাচিত সরকার না থাকায় পশ্চিমবঙ্গের তরফ থেকে দাবি-দাওয়া যথার্থভাবে তোলা সম্ভবও হয় নি।

১৯৬৮ সাল পশ্চিমবঙ্গের ক্ষেত্রে আরও কয়েকটি কারণে দুঃস্বপ্ন হয়ে পড়েছিল। প্রাকৃতিক বিপর্যয় পশ্চিমবঙ্গকে নানাভাবে আঘাত করেছে, বছরের মাঝামাঝি সময়ে মেদিনীপুর, হুগলী ও হাওড়া জেলার বহু অংশ বন্যার কবলগ্রাসে পতিত হয়েছিল। তাতে হাজার হাজার মানুষ বাস্তুচ্যুত, পেশাহীন ও সর্বহারা হয়েছে। রাজ্যপালের প্রশাসন এই বন্যাক্লিষ্টদের প্রতি প্রাথমিক কর্তব্যও করেন নি, সাহায্যের নামে মাথাপিছু যা বরাদ্দ করা হয়েছে তা হাস্যকর। অক্টোবর মাসে জলপাইগুড়ি সহ সমগ্র উত্তরবঙ্গে বন্যার দরুণ যে ভয়াবহ অবস্থার উদ্ভব হয়েছে, অতীতের সাম্প্রতিক ইতিহাসে তার তুলনা নেই। এই বন্যাজনিত অবস্থার মোকাবিলা করতে রাজ্যপালের প্রশাসন যে ব্যর্থতার ও অপদার্থতার পরিচয় দিয়েছেন তাও বুঝি যে কোন সরকারেরই সর্বকালের অপদার্থতার রেকর্ডটিকে ম্লান করে দেয়। বন্যাক্লিষ্ট জলপাইগুড়ি যে তিমিরে ছিল, সেই তিমিরেই আজও রয়েছে। সমগ্র শহর বিধ্বস্ত, মানুষগুলির সর্বস্ব গেছে, এই দারুণ শীতে মাথা গোঁজার আস্তানা নেই, অর্থনৈতিক পুনর্বাসনের কথা তো স্বপ্নমাত্র।

অথচ রাজ্যপালের হাতে যে ক্ষমতা ছিল না তা নয়—কিন্তু কার্যক্ষেত্রে তাঁর প্রশাসন পশ্চিমবঙ্গের কোন চাহিদাই পূরণ করতে পারে নি। ১৯৬৮ সাল পশ্চিমবঙ্গের প্রশাসনিক ক্ষেত্রে একটি বন্ধ্যা বৎসর, পশ্চিমবঙ্গবাসী এটুকু উপলব্ধিই করতে পারলেন না যে রাষ্ট্রপতির শাসন প্রবর্তনের কি প্রয়োজন ছিল। কিন্তু সেই সঙ্গে আরও একটি বিষয়ের জন্য ১৯৬৮ সাল দীর্ঘকাল স্মরণীয় হয়ে

গতিশক্তি সঞ্চারক

দ্রুত পদক্ষেপ আর অনুপম আরাম—এই অভিপ্রায়ে বাটার খেলার জুতোর বৈশিষ্ট্যগুলি দেখুন। কুশন আর্চ আর ইনসোল আকস্মিক আঘাত থেকে রক্ষা করে। ঘনবুনোট ক্যাম্বিসের আপার; ক্ষয়শীল সন্ধিস্থলে টেকসই বন্ধনী। ভারী বাম্পার টোগার্ড। আপার আর জুতোর তলির অভেদ্য বন্ধন। ঢালাই সোল আর হিল এমন কৌশলে তৈরি যা পারতপক্ষে হড়কাবে না। সব মিলিয়ে, আশ্চর্য সমর্থ সমাবেশ।

Bata

থাকবে। সেটি হচ্ছে ঠিক এই বছরটিতেই পশ্চিমবঙ্গের রাজনীতি কয়েকটি সুনির্দিষ্ট ধারা অবলম্বন করার সুযোগ পেয়েছে, যার ফলাফল আগামী দিনে সুদূরপ্রসারী হবে। গত নভেম্বরেই নির্বাচন হবার কথা ছিল, কিন্তু তা না হয়ে আগামী ফেব্রুয়ারীতে হচ্ছে। গোটা ১৯৬৮ জুড়েই এর পটভূমিকা তৈরি হয়েছে, এবং মনে হয় এই নির্বাচনের ফলে শুধু পশ্চিমবঙ্গে নয়, পরিণামে সমগ্র ভারতেই একটা বিরাট রাজনৈতিক পরিবর্তনের সূচনা ঘটবে। এই বিষয়টি বিশেষভাবে বর্তমান সংখ্যারই অপর একটি নিবন্ধে বিধৃত হয়েছে, কাজেই পুনরুক্তি নিষ্প্রয়োজন।

কল্যাণী জওহরলাল নেহরু মেমোরিয়াল হাসপাতাল প্রসঙ্গে

কল্যাণী জওহরলাল নেহরু হাসপাতাল দুর্নীতি ও ক্রায়েমীস্বার্থের যে একটি স্থায়ী আখড়ায় পরিণত হয়েছে সে কথা বঙ্গদর্শনে বারবার তথ্য সহযোগে বলা হয়েছে। স্বাস্থ্য অধিকর্তাকে ধন্যবাদ, অবশেষে তিনি এই বিষয়ে দৃঢ় মনোভাব অবলম্বন করেছেন এবং ওই হাসপাতালের যে পদস্থ কর্মচারী সর্বাধ্যক্ষ ছিলেন, এবং যিনি সকল দুর্নীতি ও অনাচারের মূল হোতা, তাঁর বিরুদ্ধে ব্যবস্থা অবলম্বিত হতে চলেছে। স্বাস্থ্যদপ্তরের পক্ষ থেকে রাজ্যপালের আদেশ সম্বলিত পনের দফার একটি অভিযোগ তাঁর বিরুদ্ধে ভিজিল্যান্স কমিশনের নিকট দায়ের করা হয়েছে। (এস্টাব/৮৮৩০/৩এ-১৪৪/৬৮ তাং—কলকাতা ১৬ই ডিসেম্বর, ১৯৬৮)।

কিছুকাল পূর্বে কল্যাণী হাসপাতালের ওই সর্বময় কর্তার বিরুদ্ধে একটি তদন্ত হয়েছিল। তদন্ত করেছিলেন সহস্বাস্থ্য অধিকর্তা ডঃ জি সি দে। উক্ত পনেরটি অভিযোগ ওই তদন্তে সত্য বলে প্রমাণিত হয়েছিল। এই পনেরটি অভিযোগ হচ্ছে হাসপাতালকে একান্ত অপরিচ্ছন্ন ও সংক্রামক রাখা, স্পেশাল ওয়ার্ডগুলি তদারক না করা, প্রয়োজনের তুলনায় অল্প ও ভেজাল পথ্য সরবরাহ, পথ্য তৈরিতে কারচুপি, রোগীর জন্য বরাদ্দ চিনিকে হাসপাতালের স্টাফের ভোগে লাগানো, ডাক্তারদের প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি না দেওয়া, বেড থাকতেও রোগীকে মাটিতে শয়ন করতে বাধ্য করা, স্টোরকিপারের কাজের কোন হিসাব না রাখা, বিশেষ প্রতিষ্ঠানের নিকট থেকে বেশি দামে কম মূল্যের জিনিষ কেনা (যে টেপের বাজার দাম রোল প্রতি তিন টাকা, তা কেনা হয়েছে রোল প্রতি একশো এক টাকা দামে, ইত্যাদি), রোগীদের প্রতি অযত্ন ও দুর্ব্যবহার, চতুর্থ শ্রেণীর স্টাফদের কর্মে শৈথিল্য, হাসপাতালের অতিথিশালাকে ব্যক্তিগত প্রয়োজনে ব্যবহার, নন ভিজিটিং আওয়ারে বিশেষ বিশেষ ব্যক্তিকে প্রবেশাধিকার দান, স্টোরে পুকুর চুরি, এবং সরকারী গাড়িগুলির ব্যক্তিগত প্রয়োজনে অপব্যবহার।

অর্থাৎ একটি হাসপাতালে যতরকম দুর্নীতি ও অনাচার ঘটা সম্ভব তার কোনটাই এখানে অনুপস্থিত নয়। এই সকল দুর্নীতি ও অনাচারের মূল নায়ক আমাদের আলোচ্য পদস্থ ব্যক্তিটি, যিনি কার্যত কল্যাণী হাসপাতালের দণ্ডমুণ্ডের মালিক ছিলেন, (এখন অবশ্য বেলেঘাটা সংক্রামক ব্যাধি হাসপাতালে আছেন)। এই সব কাজগুলি ছাড়াও তিনি ওই হাসপাতালের মধ্যেই একদল অনুগত ব্যক্তিকে তৈরি করেছেন, যারা তাঁর এই সব অপকর্মের প্রধান সহায়। এ ছাড়া হাসপাতালের বাইরেও তাঁর কিছু অনুগামী আছে, যারা নাকি এতদঞ্চলের কুখ্যাত সমাজবিরোধী লোক হিসাবে চিহ্নিত। এ ছাড়া স্টাইটার্স বিল্ডিংসের ওপরতলায় তিনি নিজের সমর্থক কোন কোন ব্যক্তিকে সংগ্রহ করেছিলেন, যার ফলে তাঁর বিরুদ্ধে ইতিপূর্বে আনীত অভিযোগগুলির বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থা অবলম্বন করা সম্ভব হয় নি। বর্তমান স্বাস্থ্য অধিকর্তাকে ধন্যবাদ, অবশেষে এই বৃহৎ মৎস্য জালে ধরা পড়েছে।

ডেপুটি ডিরেক্টরের কীর্তি !

স্বাস্থ্য অধিকারের (হেলথ ডিরেক্টরেটের) জনৈক ডেপুটি ডিরেক্টরের কন্যা নাকি সোস্যাল ওয়ার্কারের একটি চাকরি পেয়েছেন এবং বর্তমানে কলকাতার একটি হাসপাতালে নিযুক্ত হয়েছেন। তাঁর চাকরি পাওয়ায় আমাদের কোন আপত্তি নেই, কিন্তু যে পদ্ধতিতে তাঁকে নেওয়া হয়েছে সেটা রীতিমত আপত্তিকর ও অন্যায়। কোন ইন্টারভিউ ব্যতিরেকে এবং ওয়েটিং লিস্টে তাঁর নামের ওপরে অনেকে থাকলেও, তাঁদের বঞ্চিত করে একটি রহস্যজনক পন্থায় এঁকে চাকরি দেওয়া হয়েছে। বিষয়টির প্রতি আমরা স্বাস্থ্য অধিকর্তার দৃষ্টি আকর্ষণ করছি।

আমাদের আলোচ্য এই ডেপুটি ডিরেক্টরটি আরও অনেকের বৃহৎ মুরব্বি হয়েছেন। স্বাস্থ্য অধিকারের একজন করণিক ভাগ্যবিধাতা এঁর কৃপায় নয়কে হয় করার পবিত্র কাজে আত্মনিয়োগ করেছেন। করণিকের কৃপায় (টাকা-পয়সার বিনিময়ে) কয়েকজন হেলথ অ্যাসিস্ট্যান্ট স্যানিটারী ইন্সপেক্টর ট্রেনিং-এর জন্য মনোনীত হতে চলেছেন। দুজন অস্থায়ী পিওনকে একাউন্টস্ শাখার এক-জন অফিসারের চেম্টায় ক্যাশ অ্যাসিস্ট্যান্ট পদে উন্নীত করা হয়েছে অনেক পার্মানেন্ট সিনিয়ার স্টাফের দাবি অগ্রাহ্য করে।

স্বাস্থ্যদপ্তরের এস্টাব্লিশমেন্ট বিভাগের আরো কয়েকজন করণিকের বিরুদ্ধে দুর্নীতি ও অনাচারের বহু নথিপত্র আমাদের হস্তগত হয়েছে, বিশেষ করে যাঁরা ডাক্তারদের নিয়োগ ও বদলী সম্পর্কিত ফাইলগুলি নাড়াচাড়া করেন এবং যাঁরা নার্স, মিড-ওয়াইফ প্রভৃতির নিয়োগ-বদলি সংক্রান্ত ব্যাপারে আছেন। বারান্তরে এই প্রসঙ্গ বিশদভাবে আলোচনা করা যাবে।

পুরুলিয়া সদর হাসপাতাল

পুরুলিয়া সদর হাসপাতালটি ওই জেলার জনসাধারণের চিকিৎসার প্রধান আশ্রয়, অথচ এই হাসপাতালটির রন্ধ্রে রন্ধ্রে নানা দুর্নীতি ও অনাচারের সৃষ্টি হয়েছে, যার ফলে দরিদ্র জনসাধারণের চিকিৎসার কোন উপায়ই নেই। যোগ্য চিকিৎসকবর্গ থাকা সত্ত্বেও হাসপাতালটি নাকি কেবল একজন ডাক্তার ও একজন লেডি ডাক্তারের ব্যক্তিগত সম্পত্তিতে পরিণত হয়েছে। উক্ত হাসপাতালের কার্যধারা ও ব্যবস্থাপনার বিরুদ্ধে বিক্ষোভ জেলায় সর্বত্র ধূমায়িত হচ্ছে এবং একদিন তা সশব্দে ফেটে পড়তে পারে, অবস্থাদৃষ্টে আমাদের সে আশংকা হয়।

হাসপাতালের কার্যধারা অনুধাবন করে জানতে পারা গেল, এই হাসপাতালে জনৈক ডাক্তার ও লেডি ডাক্তার হাসপাতালের আওতায় থেকে রোগীদের যতটা সম্ভব শোষণ করে চলেছেন এবং চিকিৎসা তাঁদের ব্রত না হয়ে ব্যবসায় পরিণত হয়েছে। দু-একটি দৃষ্টান্ত-স্বরূপ নিবেদন করি যে—যে কোন রোগী তাঁদের নিকটে হাজির হয়, তাঁদের তিনি হাসপাতাল কোয়ার্টারে উচ্চ ফি নিয়ে এমারজেন্সি মারফৎ হাসপাতাল বেডে ভর্তি করেন। গত দু-এক বছরের বেড টিকিটগুলি পরীক্ষা করলেই তাঁদের প্রাইভেট প্রেসক্রিপশন এবং এমারজেন্সি ডাক্তারের মন্তব্য এর সত্যতা প্রমাণিত করবে।

অনেক ক্ষেত্রে স্থানীয় প্রাইভেট ডাক্তার প্রেরিত মরণাপন্ন রোগীকেও তাঁর

কোয়ার্টারে মোটা ফি দিয়ে এমারজেন্সি বিভাগের মাধ্যমে হাসপাতালে ভর্তি হতে হয়।

শহরের কতিপয় প্রভাবশালী ব্যক্তিকে হাতে রেখে নিজের প্র্যাকটিশ অব্যাহত-ভাবে চালাবার জন্য তিনি নাকি তাঁদের অতিরিক্ত সুযোগ-সুবিধা ও মূল্যবান ঔষধাদি মুক্তহস্তে বিতরণ করেন।

আউটডোর মারফৎ ঐ সকল বিশিষ্ট ব্যক্তিকে প্রচুর পরিমাণে মূল্যবান ঔষধ সরবরাহ করা হয়। এইভাবে হাস-পাতালের ছয় মাসের বরাদ্দ ঔষধ নাকি তিন মাসেই শেষ হয়ে যায়। ফলে ইনডোরে গরীব রোগীদের হাসপাতাল থেকে প্রয়োজনীয় ঔষধ দেওয়া যায় না। তাঁদের অতিকষ্টে বাইরে থেকে উচ্চমূল্যে ঔষধ কিনে প্রাণ বাঁচাতে হয়।

উক্ত চিকিৎসক কতিপয় প্রাইভেট প্যাথোলজিস্টকে হাতিয়ার হিসাবে ব্যব-হার করার জন্য ইনডোরের গরীব রোগী-দের উক্ত প্যাথোলজিস্টদের নিকট রক্ত, মল, মূত্র পরীক্ষা করাতে নাকি বাধ্য করছেন, যদিও উচ্চ-যোগ্যতা সম্পন্ন একজন সরকারী প্যাথোলজিস্ট এই হাসপাতালে আছেন। উক্ত বাইরের প্যাথোলজিস্টদের নিকট পয়সা দিয়ে পরীক্ষা না করলে তিনি চিকিৎসা করবেন না বলে নাকি ভয় দেখিয়ে থাকেন। হাসপাতালের ইনডোর রোগীদের বিনা পয়সায় সুষ্ঠুভাবে পরীক্ষা করবার যেসব সুবন্দোবস্ত আছে, সেক্ষেত্রে উক্ত ডাক্তার এইরূপ গরীব রোগীদের অযথা অর্থব্যয় করাচ্ছেন কেন? এবং কোন্ স্বার্থে?

এইরূপে উক্ত ডাক্তার পুরুলিয়া হাসপাতালে চিকিৎসা ব্যবস্থায় বিশেষ শ্রীবৃদ্ধি লাভ করছেন বলে অভিযোগ হয়েছে।

প্রায়ই হাসপাতালের জনৈকা লেডি ডাক্তারের দুর্ব্যবহারের কথা শোনা যায়। অনুসন্ধান-কালে জানতে পারা গেল যে—গত ১৫ই আগস্ট তারিখে যখন নড়িহা নিবাসী শ্রীভলু দাসের স্ত্রী শ্রীমতী সিন্ধুবালা দাসী চিকিৎসার জন্য হাসপাতালে লেডি ডাক্তারের নিকট আসেন, তখন লেডি ডাক্তার সামান্য কারণে উত্তেজিত হয়ে চিকিৎসার পরিবর্তে তার মাথা নাকি ফাটিয়ে দেন। শ্রীমতী সিন্ধুবালা দাসী রক্তঝরা ক্রন্দনরতা অবস্থায় এমারজেন্সিতে আসেন এবং সেখানেই চিকিৎসিত হন। এসম্বন্ধে ঊর্ধ্বতন কর্তৃ-পক্ষের নিকট অভিযোগ করেও কোন ফল হয় নি। তিনি গরীব বলেই কি এর কোন প্রতিকার হল না?

ডি এম ও, কর্তব্যনিষ্ঠ ও কর্মতৎপর হওয়া সত্ত্বেও উক্ত চিকিৎসক ও তাঁর প্রভাব-শালী চক্রের ক্ষমতাকে ডিঙিয়ে নিজের মহৎ ইচ্ছা ও উদ্যোগকে কাজে লাগাতে পারেন না।

রোগী দেখাতে গিয়ে যে ভদ্রমহিলা নিজেই ডাক্তার কর্তৃক প্রহৃত ও আহত হয়েছেন, তার প্রতিকার প্রার্থনা করে তাঁর স্বামী রাজ্যপালের নিকট যে পত্রটি লিখে-ছিলেন আমরা এখানে তার অনুলিপি প্রকাশ করলাম :

পশ্চিমবঙ্গের মহামান্য রাজ্যপাল মহোদয় সমীপেষু—

মহাশয়,

আমার সবিনয় নিবেদন এই যে, গত ১৩।৮।৬৮ তারিখে আমার স্ত্রী শ্রীমতী সিন্ধুবালা দাসী আমার ছেলেকে লইয়া সদর হাসপাতালে যায়। ডাঃ মিসেস রমা ব্যানার্জী আমার ছেলেকে দেখেন। উনি বলেন—পায়খানা পরীক্ষা করাইতে হইবে, তাই আজ ১৫।৮।৬৮ তাং আমার স্ত্রী আবার ছেলেকে লইয়া যায় এবং সঙ্গে করিয়া পায়খানাও লইয়া যায়। তখন ডাঃ রমা ব্যানার্জী আমার স্ত্রীকে জিজ্ঞাসা করেন—ছেলেকে কি খাওয়াইয়াছ। আমার স্ত্রী বলে—কিছু খাওয়াই নাই—একদিন বার্লি খাওয়াইয়াছি। তখন ডাঃ রমা ব্যানার্জী উত্তেজিত হইয়া আমার স্ত্রীকে স্টেথিসকোপ ও পেপার ওয়েটে মারিতে মারিতে বলে—বলেছি না চিড়াসিদ্ধ খাওয়াবে—চার-পাঁচবার আঘাত করে। আমার স্ত্রীর মাথা ফাটিয়া রক্ত বাহির হয়। তখন একজন নার্স আমার স্ত্রীকে লইয়া যায় এবং মাথা হইতে রক্ত মুছিয়া বলে—বাড়িতে গিয়ে বোলো না। তারপর আমি এই ঘটনা শুনিয়া ডাঃ রমা ব্যানার্জীর নিকট যাই—কিন্তু তাঁহাকে পাই নাই। তখন তাঁর স্বামী ডাঃ এস টি ব্যানার্জীকে (হাসপাতালের ডাক্তার) সমস্ত বিবরণ জানাই। তিনি ইহা শুনিয়া বলিলেন—আমি আমার স্ত্রীর তরফ হইতে ক্ষমা চাহিতেছি। ডি এম ও-র সঙ্গেও সাক্ষাৎ করি। ডি এম ও বলেন—এমারজেন্সীতে দেখাও—আমি তাহাই করি—টিকিট নং ৫০৬৩ তাং ১৫।৮।৬৮। তারপর আমি থানায় গিয়া সমস্ত ঘটনা জানাই। থানার বড়বাবু লিখিত দরখাস্ত দিতে বলেন। আমি তখন লিখিত দরখাস্ত দাখিল করি জি ডি নং ৫০৩৯।

সুবিচারের জন্য আমি আপনার নিকট কাতর প্রার্থনা জানাই—যেন গরীব নাগরিকের প্রতি এহেন অত্যাচারের প্রতিকার হয়।

বিনীত
শ্রীভোলানাথ দাস
তাং—১৫।৮।৬৮
সাং পুরুলিয়া (নড়িহা) পোঃ + জেলা—পুরুলিয়া (পঃ বঙ্গ)

পুরুলিয়া সদর হাসপাতালের এই সব অনাচার স্থানীয় জনমনে অত্যন্ত বিরূপ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করেছে, যার ফলে গত ২৩।১২।৬৮ তারিখে জেলার ডেপুটি কমিশনার কর্তৃক একটি তদন্ত-কার্য অনুষ্ঠিত হয়। সেই উপলক্ষে বিভিন্ন নথিপত্র ও জনসাধারণের লিখিত অভিযোগসমূহ সেখানে উপস্থিত করা হয়। কিন্তু তদন্তের ফলাফল প্রকাশিত হবার আগেই এই হাসপাতালের কয়েকজন ডাক্তারকে অকস্মাৎ বদলী করে দেওয়া হয়। অথচ এঁদের বিরুদ্ধে কারো কোন অভিযোগ নেই, তাঁরা এই হাসপাতালে দু'-এক বছর এসেছেন। অথচ এমন লোকও পুরুলিয়া জেলায় আছেন, যাঁরা একাদিক্রমে ৬ থেকে ১২ বছর পর্যন্ত এখানে রয়েছেন।

ট্রামের ভাড়া বৃদ্ধি

পশ্চিমবঙ্গে যখন কোন নির্বাচিত সরকার বর্তমানে নেই, এবং নির্বাচনের যখন আর বিশেষ দেরিও নেই—এমন সময় রাজ্যপালের আমলাতন্ত্র অকস্মাৎ ট্রামের ভাড়া বাড়িয়ে দিয়ে কার স্বার্থ যে সিদ্ধ করলেন সেটা বুঝতে কোন অসুবিধা হয় না। এবং সবচেয়ে বড় কথা হচ্ছে এই যে, এই ভাড়া বৃদ্ধির ব্যাপারে ন্যায়নীতির সকল আদর্শকেই বিসর্জন দেওয়া হয়েছে। প্রথম শ্রেণীর ক্ষেত্রে শতকরা পঞ্চাশ ভাগ এবং দ্বিতীয় শ্রেণীর ক্ষেত্রে শতকরা সাড়ে তেত্রিশ ভাগ ভাড়া বাড়ানো হয়েছে। এই বৃদ্ধি শুধু অস্বাভাবিকই নয়, বরং বলা যায় অসৎ উদ্দেশ্যপ্রণোদিত। যে কোন বাজারীয়া মুনাফাখোর পর্যন্ত শতকরা পঞ্চাশ ভাগ দাম বাড়াতে লজ্জা পাবে, যদিও বিদেশী ট্রাম কোম্পানীর স্বার্থে পশ্চিমবাংলার আমলাতন্ত্র এই অপকর্ম করতে বিন্দুমাত্র লজ্জিত হয় নি।

ট্রাম কোম্পানীর কার্যকলাপ সম্পর্কে একটা তদন্ত করা হয়েছিল, এবং তারই

পরিপ্রেক্ষিতে নাকি এই ভাড়া বৃদ্ধি করা হয়েছে, এইরকম কথা সংবাদপত্রে বিজ্ঞাপন মারফৎ ঘোষণা করা হয়েছে এবং এই ভাড়া বৃদ্ধির ফলে যাত্রীরা হাতাহাতি হাতে কোন্ স্বর্গ পাবেন (কিছুই পাবেন না) সাড়ম্বরে ঘোষণা করা হয়েছে। হ্যাঁ, তদন্তে প্রকাশ পেয়েছে যে, ট্রাম কোম্পানীর আয়-ব্যয়ের সমতা হচ্ছে না, আয়ের তুলনায় ব্যয় নাকি কিছু বেশি। কিন্তু তদন্তের রিপোর্টে অপরাপর যে সব তথ্য প্রকাশিত হয়েছে সেগুলির প্রতি কিন্তু জনসাধারণের দৃষ্টি আকৃষ্ট হলেও সরকারী আমলাতন্ত্রের দৃষ্টি আকৃষ্ট হয় নি। ট্রাম কোম্পানীর আয়-ব্যয়ের মধ্যে যে ফারাক তা একদিনে গড়ে ওঠে নি, তার পিছনে দীর্ঘকালীন ইতিহাস রয়েছে। বিদেশী কোম্পানী সকল লাভের গুড় বিনা দ্বিধায় বছরের পর বছর ইংলণ্ডে পাঠিয়েছে। জনসাধারণের স্বার্থে যে সব কাজগুলি কোম্পানীর করণীয় ছিল তা তারা করে নি, অর্থাৎ ট্রামের সংখ্যা বাড়ায় নি, অকেজো ট্রাম রিপেয়ার করে নি, ওভারহেড কেব্‌ল সারায় নি, রাস্তা ও লাইন যথোপযুক্ত রক্ষার ব্যবস্থা করে নি। ডাক্তার রায়ের আমলে ট্রাম কোম্পানীর সঙ্গে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের যে বিশ বছরের চুক্তি হয়েছিল তা পূর্ণ হবার দু-তিন বছর আগে থেকেই ট্রাম কোম্পানী বিগড়ে যেতে শুরু করেছে, মতলবটা হচ্ছে মোটা টাকার বিনিময়ে হস্তান্তরিত হবার সময়ে যাতে পশ্চিমবঙ্গ সরকার ট্রামগুলির মধ্যে পুরনো লোহা ছাড়া আর কিছু না পায়। তাদের সুপরিকল্পিত নীতির ফলেই আজ ট্রাম কোম্পানীর এই ঘাটতি।

এই ঘাটতির নাম করেই গত বছরের গোড়ার দিকে ট্রাম কোম্পানী ভাড়া বাড়ানোর নোটিশ দিয়েছিল এবং তখন যুক্তফ্রন্টের আমল। যুক্তফ্রন্ট সরকার কোম্পানীর মতলব বুঝে উঠতে বিলম্ব করেন নি এবং তৎকালীন উপ-মুখ্যমন্ত্রী শ্রীজ্যোতি বসু সংবিধানের ৩৫।ক ধারানুযায়ী ট্রাম কোম্পানীর পরিচালনভার সরকারী কর্তৃত্বে নিয়ে আসেন, এ কাহিনী সকলেরই জানা। অতঃপর শ্রীমুর্শেদকে পরিচালনভার দেওয়া হয় এবং তিনি ট্রাম কোম্পানীর পরিচালনব্যয় রীতিমত হ্রাস করতে সমর্থ হয়েছিলেন, এ কথাও সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়েছিল। তারপর যুক্তফ্রন্টের পতনের পর এই সুযোগ্য অফিসারটিকে অন্যত্র সরিয়ে দেওয়া হয়, সে কারণ অজ্ঞাত।

রাজ্যপালের প্রশাসনের গোড়ার দিকেই ট্রাম কোম্পানী কিনে নেবার কথা ভাবা হয়েছিল, চুক্তির মেয়াদ পূর্ণ হবার আগেই অশোভন ব্যস্ততার সঙ্গে রাজ্যপালের প্রশাসন ট্রাম কোম্পানীকে মোটা অংক দিয়ে কিনে নেবার সব বন্দোবস্তই পাকা করে ফেলেছিলেন, কিন্তু প্রবল জনমতের চাপে কোম্পানীকে অতটা অনুগ্রহ দেখানো সম্ভবপর হয় নি। তার পরেই ভাড়া বৃদ্ধি করে কোম্পানীর গায়ে যাতে কোনও আঁচড় না লাগে তার ব্যবস্থা পাকা করা হল। এ ছাড়া এই আকস্মিক ভাড়া বৃদ্ধির আর কোন কারণ খুঁজে পাওয়া যায় না। নির্বাচিত সরকার আসার আগেই এটা করা দরকার, কেন না নানাভাবে ট্রাম কোম্পানীর কাছে অনুগৃহীত হবার মত লোকের অভাব আমলাদের মধ্যে নেই, এবং বিদেশী পুঁজির প্রতি তাঁদের সশ্রদ্ধ মনোভাবের কথাও কারো অবিদিত নেই। জাতির স্বার্থকে পদদলিত করে যাঁরা বিদেশী পুঁজির স্বার্থে এই অপকর্ম করলেন দেশবাসীর নিকট তাঁরা কোনক্রমেই ক্ষমার যোগ্য নন।

(৪।১।৬৯)

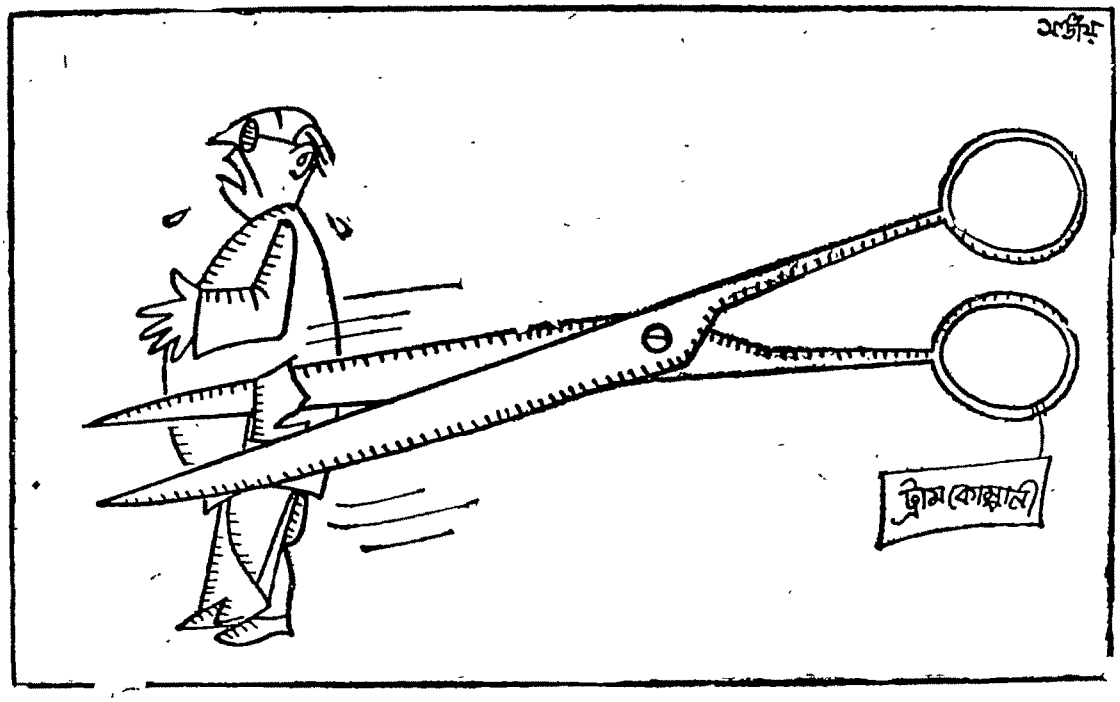

কথায় কথায়

নিবারিণ মুনশী

সেদিন কলকাতার এক বহুল প্রচারিত দৈনিকে জনৈক পত্রপ্রেরকের একটি চিঠি প্রকাশিত হয়েছিল। পত্রলেখক তাঁর চিঠিতে দুঃখ করেছেন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ভবনের পারিপার্শ্বিক পরিবেশ সম্বন্ধে এবং প্রস্তাব করেছেন মধ্য কলকাতার এই ঘিঞ্জি নোংরা পরিবেশ থেকে তুলে নিয়ে গিয়ে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়কে শহরতলীর কোন অধিকতর মুক্ত ও সুন্দর পরিবেশে প্রতিষ্ঠিত করা হোক। ছাত্রছাত্রীদের মনোগঠনের কাজে মুক্ত পরিবেশ ও খোলা জায়গা অনেকখানি সাহায্য করবে।

পত্রপ্রেরকের বক্তব্য সম্পর্কে আমি বহুলাংশে একমত। একদিন ছিল যেদিন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ভবনের নিচেই একতলার দোকানে বড় বড় অক্ষরে রঙিন আলোয় "সাইনবোর্ড ঝুলত—"জুতা"। একতলায় জুতোর দোকান ও কাপড়ের দোকানের সঙ্গে উপরতলায় বিদ্যাদানের ব্যবসার এই সহাবস্থান সকলেরই চোখে অত্যন্ত দৃষ্টিকটু ঠেকত। অনেক লেখালেখি অনেক বাদপ্রতিবাদের পরে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ শেষ পর্যন্ত বিশ্ববিদ্যালয় ভবন থেকে জুতো এবং কাপড়ের দোকান তুলে দিয়েছেন। দোকান তুলে দিলে বিশ্ববিদ্যালয়ের আয় কমে যাবে ইত্যাদি বহু ব্যবসায়িক অজুহাত দেখিয়ে অনেকদিন পর্যন্ত বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ টালবাহানা করেছিলেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত কর্তৃপক্ষের বেনেবুদ্ধিকে হার মানতে হয়েছে নীতি ও সৌন্দর্যের প্রশ্নের কাছে।

ঐতিহাসিক সেনেট হলকে ভেঙে যেদিন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের হালের এই অত্যাধুনিক ভবনটির গোড়াপত্তন হচ্ছিল সেদিনও আপত্তি উঠেছিল অনেক। কিন্তু স্থানাভাবের দোহাই দিয়ে, বিশ্ববিদ্যালয়ের লেখাপড়ার ব্যবস্থার উন্নতির দোহাই পেড়ে, কর্তৃপক্ষ সেদিন সকলের মুখ বন্ধ করেছেন। ঐতিহাসিক সেনেট ভবনকে ভেঙে অশ্লীল এই দেশলাইয়ের বাক্সের মত বাড়িটি নির্বিবাদে শেষ পর্যন্ত মাথা তুলেছে কলেজ স্ট্রীটের ওপর।

দেখা যাচ্ছে বাংলাদেশে এমনও দু-একজন পত্রলেখক আছেন যাঁরা এখনও আশা করেন যে, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় একদিন শহরতলীর নতুন ও খোলা পরিবেশে স্থানান্তরিত হবে এবং মুক্ত আবহাওয়ায় শিক্ষার সুযোগ পেয়ে ছাত্রছাত্রীদের গতিগতি কেবল ধ্বংসাত্মক রাজনীতি ও ইউনিয়ন ইলেকশন থেকে পড়াশুনার দিকে ফিরবে।

আশাবাদিতা নিঃসন্দেহে ভাল। এবং অচলায়তনের সামনে দাঁড়িয়ে নিরীহ, শান্তিপ্রিয় নাগরিক আশা ছাড়া আর কিই বা করতে পারেন?

কিন্তু আমার প্রশ্ন হচ্ছে একমাত্র পরিবেশ বদল করে কিংবা বহির্বিশ্বের চেহারা পাল্টে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কি ছাত্রছাত্রীদের মনোগঠনে এবং ছাত্র বিক্ষোভ দমনে সক্ষম হবেন?

মালিন্য ও ক্লেদ কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাইরে নেই। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়টি স্বয়ং আজ একটি আস্তাকুঁড়েতে পরিণত হয়েছে এবং সেই জঞ্জাল সাফ করে বিশ্ববিদ্যালয়কে নির্মল করতে হলে অনেক কিছু ঝেঁটিয়ে দূর করতে হবে। শুধু স্থান বদল করেই বিশ্ববিদ্যালয়কে বিদ্যালয়ে এবং ছাত্রছাত্রীদের বিদ্যার্থীতে রূপান্তরিত করা যাবে না।

সকলেই জানেন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় একদা ছিল পারিবারিক জমিদারী। বাংলাদেশ থেকে জমিদারী উচ্ছেদের আইন পাশের ফলেই কি না জানি না, সেই জমিদারী আজ ব্যবসায়ে পরিণত হয়েছে। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ স্বজনপোষণতা ও ব্যবসায়িক বুদ্ধির যে পরিচয় দিনের পর দিন দিচ্ছেন, তাতে শহরতলীর মুক্ত পরিবেশের কথা না ভেবে এই বিদ্যাব্যবসায় কেন্দ্রটিকে বড়বাজার কিংবা হাওড়া হাটে স্থানান্তরিত করার কথা ভাবলে সম্ভবত সেটা বেশি বাস্তবানুগ হতে পারে।

বিশ্ববিদ্যালয়ের নিয়মকানুন, শৃঙ্খলা ইত্যাদি ভঙ্গের জন্য বেচারা ছাত্রছাত্রীদের আমরা হামেশাই গালমন্দ করে থাকি। দোষ যে তাদের একেবারেই নেই তা নয়। কিন্তু আইন-শৃঙ্খলা ভঙ্গের নাটের গুরুকে যদি খুঁজতে হয় তাহলে তা কর্তৃপক্ষের মধ্যেই খুঁজতে হবে।

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের দুর্নীতি ও অন্যায়ের ফিরিস্তি দিতে গেলে আমাকে মহাভারত লিখতে হয়।

— লে লে বাবু.....

পৃথিবী ছাড়িয়ে—১৯৬৮

শম্ভুনাথ চট্টোপাধ্যায়

মাঝে মাঝে সভ্যতার মুখে
বড় স্নিগ্ধ আলো এসে পড়ে
মুপালী জ্যোৎস্নার মতো। যেন এক জ্যোতি বিকিরণ
ক্রমশ উজ্জ্বল করে চেতনার দিগন্ত-বলয়—
তা না হলে পৃথিবী আমার, পথ ভুলে
দূর অন্ধকারে চলে যেতো।

যাদুঘরে চলে যায় পুরাতন বিশ্বাসের সব
শবদেহগুলি ঃ
বিবর্ণ ধূসর যত জাগতিক প্রাচীন ধারণা,
বিগত যজ্ঞের নীল ধূম্রজাল, তপোবনে মন্ত্রের মহিমা
ছিন্ন কুয়াশার মতো কেঁপে ওঠে। যেন চোরাবালি
গ্রাস করে গল্পকথা, সাজানো স্বর্গের ছবি,
পৌরাণিক দেবতার দেশ।
সহসা বিস্মিত আজ মানুষের চোখের তারায়
অন্য এক আলো এসে পড়ে—

ক্রমশ পায়ের নিচে নেমে যায় গির্জা আর মন্দিরের চূড়া ঃ
মসজিদের গম্বুজ ছাড়িয়ে
আরো ঊর্ধ্বলোকে যায় সভ্যতার নূতন শরীর।

সুতরাং সে চেষ্টায় না গিয়ে আমি অতি সাম্প্রতিককালের একটি ঘটনার উল্লেখ করেই আপাতত ক্ষান্ত থাকব। ভবিষ্যতে ক্রমশ প্রকাশ্য সেই রোমহর্ষক চুরি, জুয়াচুরি ও দিনে ডাকাতির কাহিনী ধারাবাহিক-ভাবে লিখতে রাজী, যদি অবশ্য পাঠক-পাঠিকা ইতিমধ্যে অন্য কোন রোমাঞ্চকর উপন্যাসে মজে না যান।

হালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় বাংলার কয়েকজন অধ্যাপক নিযুক্ত করেছেন। নিযুক্ত অধ্যাপকদের প্রতি যথাযোগ্য শ্রদ্ধা প্রকাশের পরে আমি নিবেদন করছি যে, এই নিয়োগের ব্যাপারে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ যে নীতি অনুসরণ করেছেন তা বিশ্ববিদ্যালয়ের নিয়মবহির্ভূত এবং চলতি অনাচারেরই তা জ্বলন্ত এক নিদর্শন।

পদপ্রার্থীদের মধ্যে প্রথম শ্রেণী এবং ডি লিট উপাধিধারী যোগ্য প্রার্থী থাকা সত্ত্বেও বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ বিশেষ যত্ন-সহকারে তাঁদের বাতিল করে তৃতীয় ও দ্বিতীয় শ্রেণীর ডক্টরেটদের নিয়োগ করে-ছেন দেখা যাচ্ছে। তাহলে ব্যাপারটা কি দাঁড়ায়? প্রার্থী নির্বাচনের ব্যাপারে শ্রেণী-বিভাগের নিরিখ কি কর্তৃপক্ষ একে-বারেই বাদ দিয়ে দিলেন? তাই যদি হয় তাহলে ছাত্রছাত্রীদের জন্য পরীক্ষার সময়ে সেই শ্রেণী-বিভাগ কেন থাকবে? প্রথম শ্রেণীতে উত্তীর্ণ কোন পদপ্রার্থী যদি চাকুরির ক্ষেত্রে তৃতীয় শ্রেণীতে উত্তীর্ণ পদপ্রার্থীর চেয়ে যোগ্যতর বিবেচিত না হন তাহলে ছাত্রছাত্রীরা কেন শ্রেণী-বিভাগের ওপর গুরুত্ব দেবে?

কোন মাপকাঠিতে তাহলে পদপ্রার্থীর যোগ্যতা বিবেচিত হবে? নির্বাচকদের আত্মীয়-স্বজন বিভাগীয় ওপরওয়ালার খাতা দেখে দেওয়ার প্রতিশ্রুতি এবং ওপর-ওয়ালার পেয়ারের লোক—এইগুলিই কি যোগ্যতা পরিমাপক গুণ বলে পরিগণিত হবে? যখন দেখা যায় অনেকক্ষেত্রেই কর্তৃপক্ষস্থানীয়েরা যোগ্যতর প্রার্থীকে টেলিফোনে অনুরোধ করছেন দরখাস্ত প্রত্যাহার করতে তখন এ-ছাড়া কোন কারণ তো খুঁজে পাওয়া যায় না। কল-কাতার বুকে একাধিক বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপক-অধ্যাপিকা নির্বাচনে এবম্বিধ ঘটনা ঘটছে এবং নির্বিবাদেই ঘটে যাচ্ছে। যেন এমন ঘটারই কথা ছিল, কথা আছে।

ছাত্র-বিক্ষোভের প্রসঙ্গে আজকাল অভিভাবক, শিক্ষক ও বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ এমন কি পুলিশ কর্তাদের মুখে পর্যন্ত বিশ্ববিদ্যালয় ও বিদ্যায়তনের পবিত্রতার কথা হরদম শোনা যায়। ছুতো পেলেই তাঁরা ছাত্রছাত্রীদের উপদেশ দেন এবং বিদ্যালয় ও বিশ্ববিদ্যালয় ভবনে পুলিশ ঢোকিয়ে দিয়ে ছাত্র-অধ্যাপক নির্বিচারে ঠেঙিয়ে দেন। আমার প্রশ্ন প্রাপ্তবয়স্ক যে-সব ঘুঘু বিশ্ববিদ্যালয়-গুলিতে এইভাবে বাসা বেঁধে নিঃশব্দে বিদ্যায়তনের পবিত্রতা, আইন ও শৃঙ্খলাকে পদদলিত করে যাচ্ছে, বিশ্ব-বিদ্যালয়কে নোংরা করছে, সেইসব "সম্মানিত জ্যেষ্ঠদের" হাত চেপে ধরার প্রশাসনিক ব্যবস্থা কই?

ছাত্র-উচ্ছৃঙ্খলাকে আমি নিন্দা করি। কিন্তু জ্যেষ্ঠ ও কনিষ্ঠদের নিন্দনীয় কাজের বিচারের দু'রকম মাপকাঠি হতে পারে না। পৃথিবীর সব দেশেই আজ ছাত্রদের উচ্ছৃঙ্খল আচরণ ও বিক্ষোভের পটভূমিতে রয়েছে প্রাপ্তবয়স্ক কর্তৃপক্ষের দীর্ঘদিনের নোংরামি ও দুর্নীতি। যেখানেই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে এই দুর্নীতি অচলায়তনে রূপান্তরিত হয়েছে সেই-খানেই ছাত্রদের বিক্ষোভও লাগাম ছিঁড়েছে। ফ্রান্সের নানতেরের মত প্রাচীন ও খ্যাতনামা বিশ্ববিদ্যালয়ও এর হাত থেকে রেহাই পায় নি। বাংলা দেশের কোন বিশ্ববিদ্যালয় যদি সেই নৈরাজ্য-বাদী উচ্ছৃঙ্খলার হাত থেকে রেহাই পেয়ে থাকে, তাহলে যে ঘটনাকে অস্বাভাবিক ও অতি প্রাকৃত বলেই মনে করা উচিত। উচ্ছৃঙ্খলতার সপক্ষে এ আমার সাফাই নয়, ইতিহাসের দিকে তাকালেই এ সত্যকে উপলব্ধি করা যাবে।

—স্ট্যান্ড আপ্ অন দ বেঞ্চ

সুতরাং স্থান বদল করে খোলা প্রান্তরে গেলেই যে বিশ্ববিদ্যালয় কলুষ ও উচ্ছৃঙ্খলতা মুক্ত হবে তার কোন গ্যারান্টি নেই। প্রয়োজন আজ আগা-গোড়া এইসব বিশ্ববিদ্যালয় ও দেশের শিক্ষা-ব্যবস্থার সংস্কার।

ভারত দর্শন

সাংবাদিক সম্মেলন

সম্মেলন সাধারণত বৈঠক হয় না। বৈঠকে হয় কথাবার্তা সম্মেলনে বক্তৃতা। অর্থাৎ বৈঠক দ্বিপাক্ষিক। সম্মেলন এক-তরফা মঞ্চ থেকে। এরই মধ্যে সামান্য হেরফের সাংবাদিক সম্মেলনে। এখানে প্রশ্নোত্তরের সুযোগ থাকলেও, সঠিক প্রশ্নের যে সঠিক উত্তরই দিতে হবে এমন রেওয়াজ নেই। বিশেষ রাজনৈতিক সাংবাদিক সম্মেলন মানে কিছু সুচিন্তিত প্রশ্নের পিঠে প্রদত্ত কিছু ধাঁধা। চতুর রাজনীতিক ধাঁধা এক্সপার্ট। তেমন চতুরালিতে যিনি অক্ষম তিনি ধাঁধার ধোঁয়া সৃষ্টি না করতে পেরে কখনো বেকায়দায় উত্তেজিত, কখনো মূল প্রশ্ন থেকে বিচ্যুত হন।

ইংরেজি নববর্ষে প্রধানমন্ত্রী দীর্ঘদিন পর পুনশ্চ সাংবাদিক সম্মেলনে উপস্থিত হয়েছিলেন। প্রশ্নের ঝাঁক যখন তাঁকে আবৃত করছে তখন বহুক্ষেত্রে শ্রীমতী গান্ধী পিতা জওহরলাল নেহরুর মতো মাঝে-মধ্যে উত্তেজিত হয়েছেন। বাকি সময় উত্থাপিত প্রশ্নের মূল বিষয় থেকে সরে গিয়ে আত্মরক্ষা করেছেন। তবে যাকে বলে ধাঁধা সৃষ্টি, শ্রীমতী গান্ধী সে বিষয়ে নিজেকে পারদর্শিনী হিসেবে তুলে ধরতে পারেন নি। তাঁর অধিকাংশ জবাবই 'বো' 'বে' 'বা'-র স্তরে শূন্যতা সৃষ্টি করে সমস্যার হাত থেকে মুক্তি খুঁজেছে। তত্রাচ বিভিন্ন কাগজের সম্পাদকীয় স্তম্ভে প্রধানমন্ত্রীর পারফরম্যান্সকে 'প্রত্যয় দৃঢ়' বলে অভিহিত করা হয়েছে দেখে প্রধান-মন্ত্রীর বক্তব্যের সারগর্ভতা আবিষ্কারের জন্য রীতিমত পরিশ্রম করেছি। দুঃখের বিষয়, উল্লেখযোগ্য এমন কোন উত্তর এখানে উপস্থাপিত করতে পারছি না, যার মধ্যে প্রধানমন্ত্রীর প্রত্যয়কে খুঁজে পেতে পারি।

তবে হ্যাঁ, দুটি বিষয়ে অন্তত প্রধান-মন্ত্রী জলবৎ পরিষ্কার। এক, কেরালায় উদ্বেগের কারণ দেখা দিয়েছে যার সঙ্গে সমুচিত মোকাবিলা করার ব্যাপারে উপযুক্ত সময়ের জন্য সরকার ওৎ পেতে আছেন বলে দৃঢ় অভিমত জ্ঞাপনে প্রধানমন্ত্রীকে দ্বিতীয়বার ভাবতে হয় নি। দুই, ১৯শে সেপ্টেম্বর সরকারী কর্মচারীদের ধর্মঘটের প্রসঙ্গে প্রধানমন্ত্রীর মন্তব্য সুচিন্তিত মনে হয়েছে। তিনি বলেছেন, হাঙ্গামার সঙ্গে জড়িত নন এমন সরকারী কর্মীদের বিরুদ্ধে উত্থাপিত অভিযোগ আদালত থেকে তুলে নেওয়ার ব্যাপারে সরকার কোনও সাধারণ নীতি গ্রহণ করতে পারেন না। অর্থাৎ সরকারী কর্মীদের ঠাণ্ডা করার ব্যাপারে সরকার প্রতিটি ক্ষেত্রে ঠাণ্ডা-ভাবে বিবেচনা করে দেখবেন।

প্রধানমন্ত্রী এক জায়গায় বলেছেন, তিনি নাকি তাঁর সমস্ত কিছুর বিনিময়ে নীতিটুকু বজায় রাখবেন। বোঝা গেল উপরোক্ত দুটি বিষয়ে প্রধানমন্ত্রীর নীতিতে কোনোও 'কিন্তু'র কম্পন নেই। কেরালা ও কেন্দ্রীয় সরকারী কর্মীদের ব্যাপারে প্রধানমন্ত্রী এবং তাঁর সরকার লৌহাদপি কঠোর।

প্রধানমন্ত্রী অসহায় বোধ করে মানসিক প্রশান্তি (টেম্পার) হারিয়ে ফেলেছিলেন তখন, বিড়লা-সংবাদের ওপর সরকারের সমালোচক ইয়ং তুর্কদের সম্পর্কে যখন প্রশ্নবাণ তোলা হয়।

চীন ও পাকিস্তানের সঙ্গে সৌহার্দ্য-পূর্ণ আবহাওয়া তৈরি করা প্রয়োজন বলে প্রধানমন্ত্রীর কাছে মনে হওয়া খুবই স্বাভাবিক। তবে পন্থা তাঁর অজ্ঞাত। চীনের সঙ্গে সমঝোতায় আসার প্রশ্নে প্রধানমন্ত্রী যে আগ্রহ প্রকাশ করেছেন বাস্তবিক তা এক হিসেবে মারাত্মক সাহসের পরিচায়ক। কেন না প্রধানমন্ত্রী জানেন, পাকিস্তান দফায় দফায় যতই কেন না শত্রুতার পরিচয় দিক তবু দু' হাত বাড়িয়ে তাকে আলিঙ্গনে কারও বাধা না থাকলেও, চীনের ব্যাপারে একটি শক্তিশালী লবী সব সময়ই সমস্ত রকম সমঝোতার মাঝ-খানে অনড়-অচল হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। চীনের সঙ্গে বোঝাপড়ার আগ্রহ প্রকাশ করে প্রধানমন্ত্রী সুতরাং তাঁদের কট্টর লাল-বিরোধী মনে প্রচণ্ড আঘাত হানলেন। প্রধানমন্ত্রীর নীতিনিষ্ঠার এ হল আর এক দিক। অবশ্য রাজনীতিতে উচ্চারিত কথা সব সময় মনের কথা হতেই হবে এমন না-ও ধরা যেতে পারে। কিন্তু যদি ধরতেই হয় যে, ভারতের প্রধানমন্ত্রী দেশের বৃহত্তর স্বার্থের খাতিরে প্রতিবেশী ও শক্তিশালী একটি রাষ্ট্রের সঙ্গে সমঝোতায় আসতে উন্মুখ, তবে সে-ক্ষেত্রে প্রধানমন্ত্রীর বাস্তব দৃষ্টিভঙ্গির তারিফ করতেই হয়। চীনকে অ-মিত্র রাষ্ট্র হিসেবে দূরে রেখে একদিকে আমরা যেমন প্রতিরক্ষা খাতে অগাধ ব্যয়ের লাগাতার চাপ বহনে বাধ্য হচ্ছি অন্যদিকে তেমনি সীমান্তবাসী নাগা-মিজো সমস্যা জটিলতর হয়ে ওঠার সুযোগ পাচ্ছে। পাকিস্তানও নাগা-মিজোদের উৎসাহ দান করছে এবং নাগা-মিজোদের বিদ্রোহী গোষ্ঠীকে প্রত্যক্ষ সাহায্য দানে উদগ্রীব হয়ে আছে। কিন্তু কিছু লোক সেটাকে তবুও কেমালুম সহ্য করে নিতে রাজী আছেন; গররাজি চীনের বেলায়। সম্প্রতি নয়াদিল্লীর চীনা দূতা-বাসের সামনে কতিপয়ের বিক্ষোভ চীন-বিরোধী লবীর তৎপরতার অন্যতম প্রকাশ বলে ধরে নিলে বলতে হয় প্রধানমন্ত্রী বেশ কিছুটা দুঃসাহসিক উক্তি করেছেন সাংবাদিক সম্মেলনে। নির্বাচনের প্রাক্কালে চীনকে নিয়ে খানিক বাদবিসম্বাদের অন্য-তর কোনও রাজনৈতিক কারণ বর্তমান কি না তাও হয়ত অনেকে চিন্তা করে দেখার অবকাশ আছে বলে মনে করেন। তবে প্রধানমন্ত্রীর উক্তি সাধারণভাবে প্রশ্নোত্তরের ফেরে প্রকাশিত হওয়ায় তেমন সন্দেহ বাতিল হয়ে যায়। তাছাড়া চীনের সঙ্গে উন্নততর সম্পর্কের কথা ইতিপূর্বেও আলোচিত হয়েছে। কিন্তু চীনের তরফে সমুচিত সাড়ার অভাবে এই শুভেচ্ছা অধিকদূর অগ্রসর হওয়ার পথ পাচ্ছে না। তবে একেবারে হতাশ হওয়ারও কারণ নেই। কেন না আমাদের পরম মিত্রপক্ষ খোদ আমেরিকাতেই এখন হাওয়া বদলের পালা চলছে। আমেরিকা চীনকে আর ততদূর ভীতিপ্রদ বলে গণ্য করছে না। কাজে-কাজেই আমাদের মধ্যেও চীনভীতি ক্রমশ দূর হওয়ার সম্ভাবনা বর্তমান। এই পরি-প্রেক্ষিতে প্রধানমন্ত্রীর উক্তি ভয়ঙ্কর কোনো বৈপ্লবিক ঘোষণা বলে ধরে নেওয়ার কারণ নেই। সময় ঘুরছে, প্রধানমন্ত্রী সেই ঘূর্ণ্য-মান সময়ের সঙ্গে তাল রেখেই বন্ধুতরে আহ্বান রেখেছেন। তৎসত্ত্বেও যদি কট্টর

দক্ষিণপন্থী মহলে বিক্ষোভ দানা বাঁধে তাহলে প্রধানমন্ত্রী আর কী করবেন। তাঁকে সব অবস্থার জন্য ক্ষেত্র প্রস্তুত রেখেই চলতে হবে।

লক্ষণীয় এই যে, প্রধানমন্ত্রী বলেছেন বিশ্বরাজনীতি কোন অপরিবর্তনীয় জড়-মানসিকতা নয়। তাই শত্রু-মিত্রও চির-স্থায়ী ব্যাপার নয়। হাওয়া সব সময়ই ঘোরে আর তারই তক্কে তক্কে নীতিরও পরিবর্তন হয়ে থাকে। চীনের সঙ্গে সম্পর্কের ব্যাপারে এর চেয়ে স্পষ্ট করে আর কিছু বস্তুত বলা যায় না।

ভারত-ইরান মৈত্রী

ইরানের শাহন শা' পুনরায় ভারত-দর্শনে এলেন। সঙ্গে এসেছেন পারিষদবর্গ এবং মাননীয়া বেগম শাহেবানু ফারা। বেগম ফারার অবশ্য এই প্রথম ভারত সফর। ওঁরা বারো দিনের জন্য ভারতের আতিথ্য গ্রহণ করে ভারতবাসীকে কৃতজ্ঞতা-পাশে আবদ্ধ করেছেন।

রাজদম্পতীকে স্বাগত জানিয়ে রাষ্ট্রপতি জাকির হোসেন যে সংক্ষিপ্ত ভাষণ দেন তাতে তিনি চমৎকারভাবে ভারত ও ইরানের অতীত ঘনিষ্ঠ সম্পর্কের উল্লেখ করে জানিয়েছেন যে, সংস্কৃতিগতভাবে এই দুই দেশ একে অপরের অতি নিকট ও ঘনিষ্ঠ।

ইরানের সঙ্গে ভারতের যোগসূত্র স্থাপিত হয় খৃস্টপূর্ব দু' হাজার বছর আগে। ভারতে আগত আর্যরা এবং ইরানের অধিবাসিবৃন্দ একই গোষ্ঠীভুক্ত ছিলেন। ভাষা ও ধর্মেও ছিল ঐতিহ্যিক মিল। বৈদিক ধর্ম এবং জরথুস্ত্র প্রবর্তিত ধর্মে, সংস্কৃত এবং প্রাচীন পহলভী ভাষায় তাই যথেষ্ট সাদৃশ্য চোখে পড়ে। উভয় ভূখণ্ডের স্থাপত্য ভাস্কর্য এবং অঙ্কন-শিল্প ও সঙ্গীতচর্চার মধ্যেও স্বাধর্ম্য আবিষ্কার করা অসম্ভব নয়।

উভয় দেশের সেই ঘনিষ্ঠ ঐতিহ্য-বন্ধন সময়ের জলে কোনোদিনই ধুয়ে যেতে পারে না, রাজনৈতিক কারণ মাঝে-মধ্যে যতই কেন দুই দেশের মধ্যে ব্যবধান-রচনার ভূমিকা তৈরি করুক।

পাকিস্তানের সঙ্গে ইরানের মৈত্রী সে কারণেই ইরানকে ভারত থেকে দূরে সরিয়ে নিতে পারে না। শাহন শা'র দ্বিতীয়বার ভারত-পরিদর্শন ইরান-ভারত মৈত্রীকেই দৃঢ়তর করার বাসনার প্রতি-ফলন। শাহন শা'-এর আগে ১৯৫৬ সালে একবার ভারতে আসেন। অপর পক্ষে তেহরান নেহরুজী যান ১৯৫৯-এ এবং রাষ্ট্রপতি ডঃ রাধাকৃষ্ণন তেহরান সফর করেন ১৯৬৩ সালে। এরপর পাক-ভারত সংঘর্ষকালে ইরান পাকিস্তানকে সমর্থন জানালে স্বাভাবিক কারণেই দুই দেশ দূরে সরে যেতে বাধ্য হয়েছিল কয়েকটি বাস্তব কারণে। কিন্তু সেই দূরত্ব ছিল সঙ্ঘর্ষ-জনিত এবং আরোপিত। ১৯৬৭-তে চাগলা সাহেব আবার তেহরান সফর করে ছিন্নসূত্রে গিট বেঁধে এসেছিলেন। শাহন শা'ও চুপ করে থাকেন নি, যথেষ্ট আগ্রহ প্রকাশ করে সম্পর্কের ফাটলে পুনশ্চ সেতুবন্ধন করেছেন।

শাহন শা' কেবলমাত্র ভারতের সঙ্গে দৃঢ় বন্ধুত্ব স্থাপনের আগ্রহই প্রকাশ করেন নি, সঙ্গে সঙ্গে একথাও জানিয়ে দিয়েছেন যে, অতঃপর ইরান নিরপেক্ষ নীতি অব-লম্বন করবে ভারতের মৈত্রী কামনায়।

দুই দেশের মধ্যে কৃষিজ পণ্যের যে বাণিজ্যগত সহযোগিতা চালু আছে তা অতঃপর শিল্পের ক্ষেত্রে ও শিল্পোন্নয়নে নিয়োজিত হবে বলে আশা করা যাচ্ছে। ভারতের প্রধানমন্ত্রী ও ইরানের শাহন শা'র যৌথ বৈঠকও সব দিক দিয়েই সাফল্যপূর্ণ হয়েছে বলে মনে করা যেতে পারে।

বিশ্বপরিস্থিতির পরিবর্তনের সঙ্গে ইরান যে বাস্তব দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করতে চলেছে তা বস্তুতই অভিনন্দনযোগ্য। ভারত এই বাস্তব দৃষ্টির পরিচয় রেখে আসছিল। আজ তারই সুফল দেখা দিয়েছে। অতঃপর উভয় দেশের অগ্রগতি অপ্রতিহত হবে, এই কামনা ও আশা নিয়ে আমরা ভবিষ্যতের দিকে তাকাতে পারি।

শিল্প-মালিকের পৃষ্ঠপোষণা

ভারতের কোন কোন রাজনৈতিক দল শিল্পমালিকগোষ্ঠীর কতদূর আস্থাভাজন রাজনৈতিক দলে প্রদত্ত কোম্পানী-ডোনে-শনের ভিত্তিতে তার একটা হিসেব পাওয়া যেতে পারে। মালিকগোষ্ঠীর মনের মতো কি না, শিল্প-প্রতিষ্ঠানগুলির দানের অঙ্কে যদি তার হিসেব করা হয়, তবে নিঃসন্দেহে কংগ্রেস, স্বতন্ত্র ও জনসঙ্ঘ দলই যথাক্রমে মালিকী মজুরের প্রথম দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্থানাধিকারী বলে পরিগণিত হবে। তবে কংগ্রেস যেহেতু ক্ষমতাসীন দল, তাই চাঁদার হার কংগ্রেসের কপালে অপেক্ষাকৃত বেশি জোটাই স্বাভাবিক।

সম্প্রতি প্রকাশিত চাঁদাচিত্র নিম্নরূপ:

১৯৬২-র মার্চ মাস থেকে ৬৮-র ফেব্রুয়ারীতক কংগ্রেস পেয়েছে ২·০৫ কোটি টাকা। স্বতন্ত্র ছেচল্লিশ লক্ষের ঊর্ধ্বে। জনসঙ্ঘ ১·২০ লক্ষ। ভারতীয় শিল্পসংস্থার কাছ থেকে অনুদান বাবদ পাকিস্তান-মুসলিম লীগ পেয়েছে প্রায় দু' লাখ টাকা। ব্যাপারটি কেমন করে সম্ভব সে প্রশ্নের অবশ্য জবাব নেই।

পি-এস-পি ৬৬,৬০৭ টাকা আর-এস এস পি পেয়েছে ২৪,৫২০ টাকা। কম্যু-নিস্ট (দঃ)দের জন্যে নয় হাজার টাকার মতোও জোটে নি। মার্কসিস্টদের তো কোন উল্লেখই চোখে পড়ল না।

যদিও দীর্ঘ ছ'বছরে এই অনুদান এমন কিছু নয় যা সংবাদ হতে পারে। সংবাদ হিসেবে এগুলিকে নিয়ে টানা-পোড়েনের অর্থ মালিকের নেকনজরে কোন দল কত কাছে তারই একটি টাটকা ছবি সাধারণের সামনে রাখা, যার দ্বারা সাধা-রণের পক্ষে মালিকী অনুদানের ভিত্তিতে রাজনৈতিক দলগুলির একটি মূল্যায়ন করা সম্ভবপর হতে পারে।

ইন্দোরে নববর্ষ এলো না

একমাত্র ইন্দোরেই নববর্ষের নতুন আলোবাতাস প্রবেশপথ পেল না। কারণ গত ২৬শে ডিসেম্বর থেকে সেখানে যে হাঙ্গামার সূত্রপাত হয়েছিল তারই জের টেনে ইন্দোরে নববর্ষ শুরু হল সতেরো ঘণ্টা কারফিউ-র বন্ধন পরে। দু-দল গুণ্ডাবাহিনীর ঘৃণ্য নেশাগ্রস্ত মারপিট মুহূর্তে মধ্যে সাম্প্রদায়িক লুঠতরাজে মেতে উঠল। কয়েকটি অসামাজিক গুণ্ডাবাহিনীর দুর্বৃত্তের খেয়ালে সমগ্র ইন্দোরব্যাপী অসামাজিক লুঠেরাদের মত্ততা শিষ্ট নাগরিকবৃন্দকে সুস্থিরভাবে নতুন বছর বরণ করে নিতে বাধা দিল। তাঁরা ঘরবন্দী হয়ে জঘন্য সমাজের পাপের প্রায়শ্চিত্ত করলেন।

কোনো এক বিদেশী সাংবাদিক বলে-ছিলেন, ভারতে যদি কখনো (ভারত বলতে অখণ্ড ভারতই বোঝায়) সিভিল ওয়ার বা জনযুদ্ধ বাধে তবে তা হবে নৃশংসতম। বক্তব্যের দায়বত্তায় অবিশ্বাসের কারণ নেই। প্রতিবাদ নস্যাৎ হয়ে যায়। পাকভারতের ক্ষণদেহী মানুষের মধ্যে একটি নৃশংসতম শ্রেণী আছে যারা স্বভাব অত্যাচারী। অসামাজিক আচরণে তাদের একান্ত আগ্রহ। এরা সব সময়ই আইনের দুনিয়াকে তছনছ করে দেওয়ার জন্য ফিরকির খোঁজে। চেতনাহীন কয়েক তাল হুল্লোড় আংসিপিণ্ডের এই ভার বহন করতে গিয়ে পাক-ভারতের সমস্ত গরিমা আজ ভূলুণ্ঠিত। এরা উভয় জাতির নামে অবলীলাক্রমে কলঙ্ককলেপন করে। আর এদের কোন জাতি ও ধর্ম নেই। রাহাজানির অবাধ সুযোগ গ্রহণের জন্য এদের নৃশংস আচরণ হাঙ্গামার মধ্যে একটা সর্বজনীন ছাপ এঁকে দিতে চায় এইজন্যই যে, তার ফলে অবাধ হাঙ্গামাকে প্রসারিত করার সুযোগ মেলে। জঘন্য গুণ্ডামী একটা বিশেষ কারণের মর্যাদা লাভ করে আর সেই সুযোগে গুণ্ডারা নেতা গুছিয়ে।

হাঙ্গামা নিবারণে তাই পাড়ায় পাড়ায় টহলদারীর আগে সমস্ত গুণ্ডা এলাকা

ঐ সুন্দর কেশ বিন্যাস অতি দীর্ঘকাল সুন্দর থাকবে না - - -

শেলাক ব্যতীত

চুলে আটকাবার প্রসাধন সামগ্রীতে, এরোসলযুক্ত ও এরোসলহীন কেশ সিস্টমে উভয়তই শেলাকই প্রাথমিক আঠা।

শেলাকসমূহ ক্লেমোগ্রাফিক কালি, পেষাই কল, পিল, কনফেকশনারী, জলীয় বাষ্প সেট করা কালি, প্রসাধন, বৈদ্যুতিক ইন্সুলেটর, কোল্ড টপ এনামেল ইত্যাদিতে বিভিন্ন প্রান্তিক ব্যবহার সামগ্রী পছন্দমত প্রস্তুত হয় পৃথিবীর বৃহত্তম শেলাক প্রস্তুতকারক, এঞ্জেলো ব্রাদার্স কর্তৃক। ইহারা নিখুঁতভাবে স্পেসিফিকেশন অনুযায়ী প্রস্তুত হয়। সমুদয় এঞ্জেলো গ্রেডই আই-এস-আই স্ট্যান্ডার্ড ও এতদ্ব্যতীত কঠোরতর এঞ্জেলো স্পেসিফিকেশন মত। সবচেয়ে বড় কথা এই যে, এঞ্জেলো ব্রাদার্স গুণের সমতা রক্ষা করেন।

Angelo Shellacs

এঞ্জেলো ব্রাদার্স লিমিটেড, কাশীপুর, কলিকাতা-২

ঘেরাও করে ফেলাই দ্রুত হাঙ্গামা আয়ত্তে আনার প্রাথমিক উপায় বলে মনে হয়।

একটা সময় ছিল যখন থানায় থানায় রেকর্ডবন্ধ গুণ্ডারা হাঙ্গামায় নামতে ভয় পেত। কিন্তু দেশের লোকের হাতে দেশ শাসনের ক্ষমতা যাওয়ার পর, দেশের রাজনীতি ক্ষমতা দখলের রাজনীতিতে পর্যবসিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে গুণ্ডাদের প্রভাব-প্রতিপত্তিশালী মাতব্বর রক্ষকরা সুলভ হয়ে উঠেছেন। ফলত দ্বিপদ গুণ্ডারা জঙ্গলী চতুষ্পদীর স্বাধীনতা ভোগ করছে। অর্থাৎ তারা আর আইন-কানুনের দুনিয়াকে পরোয়া করে না। জানে পেছনে মাতব্বর রক্ষক সর্বঠাঁই প্রভাব বিস্তার করে বসে আছেন। সুতরাং মা ভৈঃ। অবাধ প্রসারমান গুণ্ডামীর এও এক কারণ এবং নেহাৎ সাধারণ কারণ নয়, বরং একেই যদি প্রধান কারণ বলা যায় তো বাস্তব অবস্থা সম্পর্কে অত্যুক্তি হয় না।

দেশব্যাপী দারিদ্র্য এবং দরিদ্রমন্যতা-ও লুঠতরাজ এবং গুণ্ডামীর পৃষ্ঠপোষণা করছে। উদগ্র স্বার্থপরতা আজ দিগ্বিদিক জ্ঞানহারা। রোরুদ্যমান মানুষকে চোখের সামনে সর্বস্বান্ত করে গুণ্ডামীর প্রশ্রয়ের মাধ্যমে নিজে কিছু গুছিয়ে আনতে পারলে, আশ্চর্য, অনেক শিষ্ট নাগরিককেও হৃষ্টচিত্ত হতে দেখা যায়।

দোকান বাজার লুঠের সময় এমন দৃশ্য চক্ষুপীড়ার কারণ হয়েছে। প্রতিবেশীর ঘরে লুঠের মাল আসতে দেখেও প্রতিবেশী চুপ করে থেকেছেন ভয়ে। বহু শিক্ষিত পরিবারেও দুটো শাড়ি গেঞ্জি শালের বাক্স লুণ্ঠিত সম্পদ হিসেবে সেই পরিবারেরই তরুণ ছেলেমেয়েদের দ্বারা আনীত হলে, পরিবারের কর্তাব্যক্তি বিকশিত দন্তরাজিকে খুশিতে বিকিয়ে তুলে সেই লুণ্ঠিত সম্পদ নাড়াচাড়া করেন এমন অভিজ্ঞতা এবং এমন দেউলিয়া করুণ দৃশ্যের সঙ্গে সম্ভবত অনেকেরই পরিচয় আছে। কেন না ভারতে বাস করেন অথচ লুঠতরাজের সঙ্গে পরিচিত নন এমন বয়ঃপ্রাপ্ত মানুষ আজ বড় একটা খুঁজে পাওয়া যায় না। সুতরাং অসামাজিক বর্বররা যা শুরু করে সামাজিক শিষ্টেরা তাতে ইন্ধন দিতে পিছপা নন। লুঠের মজা সবাই অল্পবিস্তর ভোগ করতে আজ আর দ্বিধাগ্রস্ত নন।

যারা নিদারুণ দারিদ্র্যে ক্লিষ্ট তারা এই-সব সময়ে কিছু সংগ্রহের আশায় নিজেদের জীবন সংশয় ঘটাতেও পিছপাও হয় না।

হাঙ্গামার মূলে একাধিক কারণ বর্তমান থাকলেও হাঙ্গামাকে কেবলমাত্র দুর্ভাবে দেখার একটা রেওয়াজ আমরা তৈরি করে নিয়েছি। হাঙ্গামাকে সাম্প্রদায়িক বলে উল্লেখ করা এবং তার পেছনে সর্বত্রই রাজনৈতিক অভিসন্ধি খুঁজে বেড়ানো। কিন্তু হাঙ্গামা যে অতি সহজে অধুনা দ্রুত প্রসারলাভ করছে তার জন্য অন্যতর কারণগুলি অনেক বেশি শক্তিশালী।

মাতব্বরী ছায়ায় বর্ধিত গুণ্ডা-সমাজের প্রতিপত্তি বৃদ্ধি ঘটছে। গুণ্ডা-প্রভাব বৃদ্ধির ফলে তাই সাধারণ মানুষের মনে গুণ্ডামী প্রতিরোধ বাসনা দায়ে পড়েই কমে আসলে। তাঁরা জানেন, গুণ্ডাসমাজ আজকে বিশিষ্ট সমাজপতিদের অনুগ্রহ-ভাজন ও সে কারণে তাদের অসামাজিকতা প্রশ্রয়পুষ্ট, বৃথা গুণ্ডা প্রতিরোধে নেমে তাই আর কেউ সমগ্র পরিবারের অমঙ্গল ডেকে আনতে রাজী নন। চোখের সামনে অবাধ গুণ্ডামী প্রকাশ্য দিবালোকে ঘটছে, যেন বে-আইনের দুনিয়ায় বাস করছি আমরা। ক্ষমতার আকাঙ্ক্ষায় মাতব্বররা বহু ক্ষেত্রেই শুকনো ডাঙায় আছড়ে ফেলার ব্যবস্থা করেছেন গোটা দেশটাকে। অর্থাৎ কোনো কারণ না থাকলেও তাঁরা নিজেরাই কারণ সৃষ্টি করে হাঙ্গামা বাধিয়ে দেন। তারপর এলোমেলো হয়ে গেলে দেশটাকে লুঠেপুটে যাওয়ার সুযোগ মেলে।

তাই কোনও হাঙ্গামার মধ্যে আজ আর কোন বিশেষ দলকে চিহ্নিত করার প্রয়াস বাঞ্ছনীয় বলে মনে হয় না। কোন বিশেষ দলকে নিষিদ্ধ করা হলেই সর্বত্র এবং সর্বদলের দ্বারা প্রশ্রয়পুষ্ট গুণ্ডামী স্তব্ধ হবে না। গুণ্ডামী দমন করতে গুণ্ডাদের বৃটিশ সরকার যেভাবে ঠাণ্ডা রাখত শক্ত আইনের চাবুকে, সেইভাবেই ঠাণ্ডা করতে হবে। আর আবেগহীন-ভাবে শান্তিরক্ষকদের ওপর এই লিখিত নির্দেশ দিতে হবে যে, কোনও গুণ্ডাকে আড়াল করার জন্য কোনও মাতব্বর সচেষ্ট হলে তখনই যেন বিনা পরওয়ানায় তাঁকেও গ্রেপ্তার করা হয়, তা সে মাতব্বর যদি কোন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীও হন, তথাপি যেন শান্তিরক্ষকবাহিনী অকম্পিতভাবে তাঁদের কর্তব্য সমাপন করেন। আজ এই ধরণের নির্মম কঠোরতা ছাড়া অবস্থা আয়ত্তে আনার আর কোন সদুপায় নেই। কিন্তু কোনও শান্তিরক্ষকবাহিনী যে এতোদূর এগুতে পারেন না তা বলাই বাহুল্য। কারণ রক্ষকের রক্ষকই যদি ভক্ষক হয়ে বসেন তবে আর ভরসা কোথায়!

তাহলে কি আমাদের দ্বিতীয় কোনো বাহিনীর সাহায্য গ্রহণ করতে হবে, যাঁরা কোনো স্তরের মন্ত্রী ও মাতব্বরের ভয়েই কম্পিত হবেন না?

তাই যদি হয় তবে সে তো পুলিশের কর্ম নয়। হাঙ্গামার মোকাবিলায় তাহলে দ্বিতীয় কোন বাহিনীর তৎপরতা প্রয়োজন। একজিকিউটিভ থেকে আদালত পুরাপেরি স্বাধীন হলে এবং আদালতেরই দ্বারা নিযুক্ত কোন বাহিনী থাকলে তবেই বোধহয় এই পাপচক্রের অবসান হতে পারে। না হলে পাপচক্র থেকে কাউকে তো মুক্ত দেখা যায় না। সমস্যার সমাধান কোথায়? কয়েকটা রাজনৈতিক দলের নিষিদ্ধকরণের প্রস্তাব সমগ্র দেশীয় পরিপ্রেক্ষিতে কেবল-মাত্র হাস্যকর প্রস্তাব বলেই মনে হচ্ছে। ওপথ যথার্থ পথ নয়।

রাজন্যভাতার ওপর শাহন শা'র বিবৃতি

কেন্দ্রীয় মন্ত্রী ডঃ করণ সিং, যিনি মস্ত মোটা রাজন্যভাতা ভোগ করে থাকেন, তাঁরই উপস্থিতিতে ইরানের শাহন শা' অম্লানবদনে বিবৃতি দিচ্ছিলেন রাজন্য-ভাতার ওপর।

শাহন শা' স্বেচ্ছায় রাজন্যভাতা ত্যাগ করার আহ্বান জানিয়ে বলেছেন, রাজা হওয়া আজকের দিনে মস্ত ফ্যাসাদ। বরং রাজন্যভাতা ত্যাগ করাই শ্রেয়।

ময়ূর সিংহাসনের মালিক যখন এবম্বিধ উপদেশ দিচ্ছেন, ডঃ করণ সিং তখন কেমন বোধ করছিলেন তার কোনও উল্লেখ নেই। তবে সাংবাদিকরা প্রাণ খুলে ঘটনাটি উপভোগ করেছেন। শাহন শা' সম্ভবত জানতেন না যে, ভারতের রাজনীতি আজ যে মোড় নিচ্ছে, বিশেষ উত্তর ও উত্তর-পশ্চিম ভারতে, তাতে ভবিষ্যতে ভারতের রাজন্যবর্গই ভারতে নয়া লর্ড সভা বসিয়ে শখের প্রজাতন্ত্র পরিপাটি করে ভোগ করবেন এমন সম্ভাবনাও দেখা দিয়েছে জনসঙ্ঘ স্বতন্ত্র দলের জনপ্রিয়তায়।

ইরানের শাহন শা নিজে অবশ্য তাঁর দেশের একতন্ত্রী শাসক। কিন্তু তিনিও স্বেচ্ছায় তাঁর সম্পত্তি জাতিকে দান করে-ছেন। সমগ্র ভূসম্পত্তি তো বটেই, অন্যান্য সম্পদের নব্বই ভাগই জনকল্যাণমূলক প্রতিষ্ঠানের হাতে তুলে দিয়েছেন অব-লীলাক্রমে।

শাহন শা'ই তাই বলতে পারেন: আপনার অর্থাগমের অন্যতর উপায় যদি থাকে তাহলে স্বেচ্ছায় ভাতা পরিত্যাগ করুন। তিনি পুনরুক্তি করে বলেন: রাজা হওয়া আজকে মস্ত বড় ফ্যাসাদ (হ্যাণ্ডিকাপ)।

কিন্তু ভারতবর্ষ রাজা-ওমরাহ নবাব জায়গীরদারের দেশ। এখানে একজন পালঙ্কে পা দুলিয়ে কোটি কোটি টাকা শুধু বিলাসব্যসনে ভোগের জন্য সংগ্রহ করেন অপরজন ছ' আনা পয়সার জন্য জীবন বিপন্ন করে গভীর জঙ্গলে যান কাষ্ঠাহরণ করতে। অনেকে ক্ষুৎপিপাসায় কাতর হয়ে কর্মস্থলেই প্রাণ দেন। এমন যে দেশ, সেখানে রাজারা বড় জোর মন্ত্রী হতে পারেন, তাই বলে স্বেচ্ছায় রাজত্ব ও রাজন্যভাতা ছেড়ে দেবেন, ছিঃ, অতটা তাঁদের কাছে আশা করা অন্যায়। শাহন শা বেনা বনে মুক্তো ছড়িয়ে গেলেন।

(৪।১।৬১)

৭ই জানুয়ারী লণ্ডনে কমনওয়েলথ প্রধানমন্ত্রী সম্মেলন সুরু হচ্ছে। এবার কমনওয়েলথ রাষ্ট্রগুলির ২৮ জন প্রধানমন্ত্রী বা রাষ্ট্রপতি কিংবা তাঁদের প্রতিনিধি সম্মেলনে উপস্থিত থাকবেন। এর আগে কখনও এত বেশি প্রতিনিধি কমনওয়েলথ প্রধানমন্ত্রী সম্মেলনে যোগ দেন নি।

এবারের কমনওয়েলথ প্রধানমন্ত্রী সম্মেলনে প্রধান আলোচ্য বিষয় হবে রোডেশিয়ার সমস্যা এবং ব্রিটেনের বহিরাগত তথা বর্ণবৈষম্যের সমস্যা। নাইজিরিয়া ও বায়ফ্রার কথাও উঠবে। গতানুগতিকভাবে আন্তর্জাতিক রাজনীতির সমীক্ষায় নিরস্ত্রীকরণ এবং পশ্চিম এশিয়া ও ভিয়েৎনামের আলোচনাও হবে। ব্রিটেনের পক্ষ থেকে কমনওয়েলথ রাষ্ট্রগুলির মধ্যে বাণিজ্য বৃদ্ধির প্রসঙ্গ তোলা হবে। সেই সঙ্গে সাম্প্রতিক অর্থনৈতিক সঙ্কটের কথা।

রোডেশিয়ার প্রশ্নে ব্রিটেনের প্রধানমন্ত্রী হ্যারল্ড উইলসনকে বেশ বেকায়দায় পড়তে হবে। আগের মত এবারও আফ্রিকার রাষ্ট্রনেতারা দক্ষিণ রোডেশিয়ার বিদ্রোহী ও সংখ্যালঘু শ্বেতাঙ্গ শাসনের বিরুদ্ধে বলপ্রয়োগের দাবি জানাবেন। এর আগেও সে দাবি জানানো হয়েছে। বলপ্রয়োগ দূরের কথা, দক্ষিণ রোডেশিয়ার বিরুদ্ধে কার্যকরী কোন কিছুই ব্রিটেন করে নি। বরং উইলসন সরকার গোপনে আয়ান স্মিথের সঙ্গে একটা বোঝাপড়ার চেষ্টা করেছেন। অবশ্য সে চেষ্টা ব্যর্থ হয়েছে। দক্ষিণ রোডেশিয়ার বিরুদ্ধে অবিলম্বে উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করা না হলে কমনওয়েলথের সংহতি টিকিয়ে রাখা শক্ত হবে।

নাইজিরিয়া থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে স্বতন্ত্র বায়ফ্রা রাষ্ট্র গঠন, এবং নাইজিরিয়া-বায়ফ্রা সংঘর্ষের বিষয়টি হয়তো উইলসন নিজেই তুলবেন, এবং বিরোধ নিষ্পত্তির জন্য কমনওয়েলথ রাষ্ট্রপ্রধানদের একটি শান্তি মিশন প্রেরণের প্রস্তাব করবেন। নাইজিরিয়ার পক্ষ থেকে সম্মেলনে এই প্রসঙ্গের আলোচনাতেই বাধা দেওয়া হবে। এটা তাদের ঘরোয়া ব্যাপার। তবু হয়তো আলোচনা হবে। বায়ফ্রার পক্ষ থেকে একটি শক্তিশালী প্রতিনিধিদল লণ্ডন এসেছেন কমনওয়েলথ রাষ্ট্রপ্রধানদের কাছে বায়ফ্রার প্রকৃত ঘটনা তুলে ধরার জন্য। ব্রিটেনের ওপর তাদের কোন ভরসা নেই। ব্রিটেন নাইজিরিয়ার যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকারের প্রধান সমর্থক, ব্রিটেনের অস্ত্র দিয়েই তারা বায়ফ্রার বিরুদ্ধে লড়ছে।

ব্রিটেনের বহিরাগত সমস্যা নিয়ে কমনওয়েলথ প্রধানমন্ত্রী সম্মেলনে তীব্র

কমনওয়েলথ প্রধানমন্ত্রী সম্মেলনে রোডেশিয়ার প্রশ্নে এবার উইলসনকে বেশ বেকায়দায় পড়তে হবে।

আলোচনা হবার সম্ভাবনা রয়েছে। ভারত, পাকিস্তান, পশ্চিম ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জ এবং আফ্রিকার বিভিন্ন দেশের বহু লক্ষ কৃষ্ণাঙ্গ ব্যক্তি নানা কাজ উপলক্ষে বংশপরম্পরায় ব্রিটেনে রয়েছে। এরা আজ ব্রিটিশ সমাজ ও জনজীবনের অংশে পরিণত হয়েছে। কিন্তু একদল উগ্র বর্ণবিদ্বেষী ইংরেজ এদের বিতাড়নের জন্য দাবি জানাচ্ছে। বহিরাগত বিতাড়নের আন্দোলন পুরোনো হলেও সম্প্রতি এই আন্দোলন এখানে বেশ জোরদার হয়ে উঠেছে। 'ব্রিটেনকে সাদা থাকতে দাও' এ যেন কালো না হয়ে যায়, এই হল আন্দোলনের উদ্দেশ্য।

হ্যারল্ড উইলসনের শ্রমিক দলের সরকার মোটামুটি বর্ণবৈষম্যের বিরুদ্ধে হলেও চাপে পড়ে কিছু বর্ণবৈষম্যমূলক ব্যবস্থা তাঁদেরও গ্রহণ করতে হয়েছে। বহিরাগত আগমন নিয়ন্ত্রণ করে আইন পাশ করা হয়েছে। এখন বর্ণবৈষম্য আন্দোলনের প্রধান নেতা রক্ষণশীল দলের এম-পি এনক পাওয়েল দাবি জানাচ্ছেন ঃ বহিরাগত আগমন একেবারে বন্ধ করে দিতে হবে, বর্তমানে দেশে যে সব কৃষ্ণাঙ্গ রয়েছে তাদের তাড়াতে হবে—প্রয়োজন হলে তাদের অর্থসাহায্য দিয়ে বিদায় করতে হবে, এবং একটি পৃথক 'রিপ্যাট্রিয়েশন' মন্ত্রিদপ্তর স্থাপন করতে হবে। এনক পাওয়েল যত্রতত্র জ্বালাময়ী ভাষণ দিয়ে বেড়াচ্ছেন। অনেক শ্বেতাঙ্গ, বিশেষ করে ছাত্র সম্প্রদায় পাওয়েলের বর্ণবৈষম্য নীতির বিরোধিতা করলেও বর্ণবৈষম্য আজ ব্রিটেনে বেশ মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছে, এবং কৃষ্ণাঙ্গরা রীতিমত নিরাপত্তার অভাব বোধ করছে। এই অবস্থায় কমনওয়েলথের অধিকাংশ রাষ্ট্রপ্রধান উইলসন সরকারকে বর্ণবৈষম্যের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য দাবি জানাবেন।

পশ্চিম এশিয়া ঃ

২৮শে ডিসেম্বর রাত্রির গোপন অন্ধকারে ইজরায়েলী গেরিলা কম্যাণ্ডো বাহিনীর লোকেরা লেবাননের ভেতর ঢুকে আন্তর্জাতিক বিমান বন্দর বেইরুটে হানা দেয়। হানাদাররা ৪৫ মিনিট ধরে বিমানবন্দরে হামলা চালায় এবং মেশিন গান ও গ্রেনেডের সাহায্যে ১৩টি যাত্রী ও মালবাহী বিমানকে ধ্বংস করে। তারপর যেমন তারা এসেছিল, তেমনি পালিয়ে যায়। এই হামলায় লেবাননের অসামরিক সব ক'টি বিমান ধ্বংস হয়েছে, এবং মোট ক্ষতির পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ১০০ মিলিয়ন ডলারেরও বেশি। ইজরায়েলী হানাদারেরা কেবলমাত্র বিমান ধ্বংস করেই ক্ষান্ত হয় নি, তারা বিমানবন্দরের হ্যাঙ্গারগুলিও পুড়িয়ে ছাই করে দিয়েছে।

এই ঘটনায় কেবল লেবানন বা আরব-রাষ্ট্রগোষ্ঠী নয়, সমগ্র জগতে তীব্র প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়েছে। সবাই এক বাক্যে ইজরায়েলের এই দস্যুতার নিন্দা করেছেন।

লেবানন সরকারের মুখপাত্র ডঃ মহম্মদ হাসান-আল-জায়াত এই ঘটনার বর্ণনা দিতে গিয়ে একে বর্বর ও নগ্ন আক্রমণ বলে আখ্যা দিয়েছেন। রাষ্ট্রপতি চার্লস হেলো ও প্রধানমন্ত্রী ডঃ আবদুল্লা আল্-ইয়াফি এই আক্রমণের বিরুদ্ধে দাঁড়াবার জন্য বিশ্ববাসীর প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন।

লেবাননের অনুরোধে ২৯শে ডিসেম্বরই রাষ্ট্রসঙ্ঘ নিরাপত্তা পরিষদের বৈঠক বসে বেইরুটের হামলা আলোচনার জন্য। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সহ নিরাপত্তা পরিষদের সকল সদস্য ইজরায়েলের এই জঘন্য কাজের নিন্দা করেছে।

ইজরায়েলের বক্তব্য, প্রতিশোধ নেবার জন্য তারা এই কাজ করেছে। এটা নিতান্তই আত্মরক্ষামূলক কাজ। বেইরুটের ঘটনার দু' দিন আগে এথেন্স বিমানবন্দরে ইজরায়েলের এল্ আল্ কোম্পানীর একটি যাত্রীবাহী জেট বিমানকে দু'জন আরব সন্ত্রাসবাদী অতর্কিতে আক্রমণ করে এবং বিমানটির যথেষ্ট ক্ষতিসাধন করে ও একজন ইজরায়েলীকে মেরে ফেলে। এই ঘটনায় ইজরায়েল খুব ক্ষুব্ধ। তাদের নিশ্চিত বিশ্বাস, এই দু'জন আরব সন্ত্রাসবাদী লেবানন থেকে এসেছে। এবং লেবাননের পূর্ণ সমর্থন রয়েছে এই সব সন্ত্রাসবাদী আরব গেরিলাদের কাজের পেছনে। তাই, পাল্টা প্রতিশোধ (reprisal) হিসাবেই তারা বেইরুটে ঢুকে লেবানীজ বিমান ধ্বংস করে গেল।

কিন্তু এই পাল্টা প্রতিশোধের যুক্তি এখানে সম্পূর্ণ অচল। যে দু'জন সন্ত্রাসবাদী আরব যুবক, মাহমুদ মহম্মদ ঈষা (২৫ বৎসর) ও মাহের হোসেন ইয়ামানি (১৯ বৎসর), এথেন্সে ইজরায়েলী বিমান আক্রমণ করেছিলেন, তাঁরা 'পপুলার ফ্রন্ট ফর দি লিবারেশন অব প্যালেস্টাইনের' সদস্য। তাঁদের সঙ্গে লেবাননের কোন সম্পর্ক নেই। ফ্রন্ট ঐ কথা পরিষ্কার করে ঘোষণাও করেছে। এথেন্স আক্রমণের খবর পর্যন্ত লেবানন জানত না।

ইজরায়েলের পক্ষে আক্রমণের সাফাই হিসাবে এ রকম অজুহাত তোলা নতুন নয়। ইদানীং রোজ একই কথা বলা হচ্ছে। জর্ডানের অভ্যন্তরে আক্রমণ চালানোর যুক্তিও একই। আরব গেরিলারা জর্ডান থেকে কাজকর্ম চালাচ্ছে। সুতরাং, জর্ডানে বোমাবর্ষণের অধিকার ইজরায়েলের আছে।

কিন্তু নিরাপত্তা পরিষদের কেউ ইজরায়েলের এই যুক্তি মেনে নেন নি।

বিনয় নিবেদন

স্থানাভাববশত এ সংখ্যায় মুরশিদের 'লোকসঙ্গীতের একাল, না, আকাল' এবং শ্রীসমর চট্টোপাধ্যায়ের 'গ্রাম-গ্রামান্তরে' প্রকাশ করা সম্ভব হোল না।

ইজরায়েলের প্রধান মুরুব্বী মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র পর্যন্ত বেইরুট আক্রমণের নিন্দা করতে বাধ্য হয়েছে। ওয়াশিংটনে পররাষ্ট্র-দপ্তরে ইজরায়েলী রাষ্ট্রদূতকে ডেকে ধমকানো হয়েছে। নিরাপত্তা পরিষদে মার্কিন প্রতিনিধি উইগনিস ইজরায়েলী কার্যের তীব্র নিন্দা করেছেন। সোভিয়েট প্রতিনিধি জ্যাকব মালিক অবশ্য মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকেও ছেড়ে কথা বলেন নি। তিনি বলেছেন, মার্কিন সাহায্য পেয়েই ইজরায়েলের এতখানি স্পর্ধা হয়েছে। সম্প্রতি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ইজরায়েলকে ৫০টি ফ্যানটম জেট বিমান দেবার কথা ঘোষণা করায় ইজরায়েলের সাহস আরও বেড়ে গেছে। ভারতের প্রতিনিধি শ্রীগোপাল পার্থসারথিও কঠোর ভাষায় ইজরায়েলের নিন্দা করেছেন।

লেবাননের প্রতিনিধি এডওয়ার্ড ঘোরা ও পরে প্রাক্তন পররাষ্ট্রমন্ত্রী ফুয়াদ বুটস দাবি করেন, কেবল ইজরায়েলের নিন্দা করেই ক্ষান্ত হলে চলবে না, রাষ্ট্রসঙ্ঘ সনদের সপ্তম অনুচ্ছেদ অনুসারে নিরাপত্তা পরিষদকে ইজরায়েলের বিরুদ্ধে কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে, এবং ইজরায়েলকে ক্ষতিপূরণ দানে বাধ্য করতে হবে।

৩১শে ডিসেম্বর নিরাপত্তা পরিষদ সর্বসম্মতিক্রমে একটি প্রস্তাব গ্রহণ করে ইজরায়েলের তীব্র নিন্দা করেছে এবং এই বলে ইজরায়েলকে সতর্ক করে দিয়েছে যে ভবিষ্যতে এইরূপ আক্রমণাত্মক কাজ চলতে থাকলে নিরাপত্তা পরিষদ ব্যবস্থা গ্রহণ করতে বাধ্য হবে। লেবাননের যে ক্ষতি হয়েছে, সে-ব্যাপারে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের কথাও প্রস্তাবে বলা হয়েছে।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ব্রিটেন, ক্যানাডা প্রভৃতি রাষ্ট্র সহ নিরাপত্তা পরিষদের সকল সদস্য কর্তৃক একযোগে এভাবে ইজরায়েলের নিন্দা করা (কেবলমাত্র একটি নির্দিষ্ট ঘটনা বা আচরণ নয়, রাষ্ট্র হিসাবে ইজরায়েলের নিন্দা নিরাপত্তা পরিষদের ইতিহাসেও এই প্রথম) খুবই গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু হলে কি হবে, ইজরায়েলের তাতে বিন্দুমাত্র ভ্রূক্ষেপ নেই। প্রস্তাব গ্রহণের সঙ্গে সঙ্গেই রাষ্ট্রসঙ্ঘে ইজরায়েলের প্রতিনিধি সাবতাই রোসেন জানিয়ে দিয়েছেন, তাঁরা নিরাপত্তা পরিষদের প্রস্তাবকে স্বীকার করবেন না। তিনি ক্রুদ্ধভাবে বলেছেন, রাষ্ট্রসঙ্ঘ যে একেবারে দেউলিয়া হয়ে গেছে এই প্রস্তাব গ্রহণ তারই প্রমাণ। তিনি দম্ভভরে আরও বলেছেন, আত্মরক্ষার প্রয়োজনে ইজরায়েল আরব রাষ্ট্রগুলির বিরুদ্ধে আক্রমণ চালিয়ে যাবে। থামবে না।

৩১শে ডিসেম্বর রাত্রেই ইজরায়েলী হেলিকপ্টার আবার লেবাননের আকাশ-সীমা লঙ্ঘন করেছে। ইজরায়েলী বিমান থেকে জর্ডানে ঘৃণ্য নাপাম বোমা নিক্ষেপ করা হয়েছে।

লেবানন আরব রাষ্ট্র হলেও, এখানকার অধিবাসীদের মধ্যে প্রায় অর্ধেক খৃস্ট ধর্মাবলম্বী। রাজনীতির দিক থেকেও ইজরায়েল নরমপন্থী। আরব-ইজরায়েল সংঘর্ষে লেবানন আরবগোষ্ঠীর সঙ্গেই। তবু সে পারতপক্ষে গোলমাল এড়িয়ে চলে। এ হেন লেবাননের ওপর ইজরায়েলের এই আক্রমণ থেকে এ কথাই প্রমাণ হয়, ইজরায়েল পশ্চিম এশিয়ায় শান্তি চায় না, এবং সংঘর্ষের এলাকা সে আরও বাড়াতে চায়। নতুন করে শান্তি প্রতিষ্ঠার যে কূটনৈতিক প্রচেষ্টা সুরু হয়েছে তা নষ্ট করার জন্য, ডঃ গানার জারিং-এর শান্তি মিশন ব্যর্থ করার উদ্দেশ্যে, ইজরায়েলের এই অভিসন্ধিমূলক আক্রমণ।

কিন্তু নিরাপত্তা পরিষদ কি পারে না

আক্রমণকারী ইজরায়েলকে শায়েস্তা করতে? গত বছরের যুদ্ধের পর ২২শে নভেম্বর, ১৯৬৭ তারিখে নিরাপত্তা পরিষদ প্রস্তাব গ্রহণ করে অধিকৃত আরব অঞ্চল ফিরিয়ে দেবার জন্য ইজরায়েলকে নির্দেশ দেয়। কিন্তু ইজরায়েল সে নির্দেশ মানে নি। আজও বিস্তীর্ণ আরব অঞ্চল তার দখলে। তা ছাড়াও একের পর এক আক্রমণ সে চালিয়ে যাচ্ছে। নিরাপত্তা পরিষদ কি কেবল প্রস্তাব গ্রহণ করেই বসে থাকবে? মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবার বাধ্য হয়েছে ইজরায়েলকে নিন্দা করতে। সত্যি যদি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ইজরায়েলকে সমর্থন না করে, তবে তো মুহূর্তের মধ্যে ইজরায়েলের সব লম্ফঝম্ফ বন্ধ হয়ে যাবে। মার্কিন সমর্থন ছাড়া তার জোর কোথায়?

(৪।১।৬৯)

সুপার সার্ফের রয়েছে অনুপম ধোওয়ার ক্ষমতা! সুপার সার্ফ দিয়ে ধুলে আপনার সব জামাকাপড়ের ময়লা একেবারে সাফ হয়ে যায়—তা সে যতো পুরু ময়লাই হোক না কেন। চোখে দেখা যায় না এমন সব ময়লাও সুপার সার্ফ দিয়ে ধুলে স্বচ্ছন্দে উঠে যায়। তাছাড়া এতে আপনার সব জামাকাপড় একেবারে ধবধবে পরিষ্কার হয়ে যায়। নীল প্রভৃতি অন্য কোন পাউডার মেশাবার প্রয়োজন নেই। সুপার সার্ফ গাদা গাদা জামাকাপড় ধোওয়ার ঝোঁঝা হাল্কা করে দেয়। আর কী মনোরম এর তাজা সুগন্ধ। অন্য কোন কাপড় কাচার পাউডার থেকে কি এত কিছু পাওয়া যায়!!

হিন্দুস্থান লিভারের একটি উৎকৃষ্ট উৎপাদন

লিগটাস-SU.155140.BG

সপ্তাহের বোঝা

কৃত্তিবাস ওঝা

অবশেষে সেই দিনটি এসে গেল। ইংরাজী মতের নববর্ষের দিন ১লা জানুয়ারী রাজ্যপাল এক বিশেষ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করে জানিয়েছেন, ১৯ই ফেব্রুয়ারী রাজ্যে রাজ্যে বিধানসভার সদস্য নির্বাচনে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে, ভোট গণনা শেষ হবে ১৬ই ফেব্রুয়ারীর মধ্যে আর মনোনয়নপত্র দাখিলের শেষ তারিখ ৮ই জানুয়ারী। রাজ্যপালের এই ঘোষণার পর প্রকৃতপক্ষে রাজ্যে মধ্যবর্তী নির্বাচন সুরু হয়ে গেল। মহালয়ার প্রভাতী চণ্ডীপাঠ যেমন মহাপূজার ঘোষণা—রাজ্যপালের বিশেষ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ তেমনি মহা-রাজনৈতিক সংগ্রামের নির্ঘণ্ট ঘোষণা। দীর্ঘ দিনের নানা প্রশ্নেরই মীমাংসা হবে মধ্যবর্তী নির্বাচনে। নির্বাচনের এক মাস পূর্বে সাধারণ মানুষের কাছে একটি প্রশ্ন সবচেয়ে বড়—সেটা হল মধ্যবর্তী নির্বাচনে জয়ী হবে কে? যিনি নিজে ঠিক করেছেন যে তিনি কংগ্রেসের অথবা যুক্তফ্রন্টকে ভোট দেবেন তাঁর মনেও প্রশ্ন : আমি তো ভোট অমুককে দেব, কিন্তু জয়ী হবে কে? অর্থাৎ সামগ্রিকভাবে নির্বাচনের মুখে কে এবার জয়ী হবে—এই প্রশ্ন যত বড় হয়ে দেখা দিয়েছে, অতীতে কখনও এই প্রশ্ন এতবড় হয়ে দেখা দেয় নি। গত ১৯৫২, ১৯৫৭ ও ১৯৬২ এবং ১৯৬৭ সালের নির্বাচনে সকলের মনেই ধারণা ছিল—লড়াই যাই হোক না কেন, জয়ী শেষ পর্যন্ত কংগ্রেসই হবে। কংগ্রেস-বিরোধী শক্তি বিভিন্ন নির্বাচনে বিভিন্ন ভাবে নিজেদের শক্তির সমাবেশ করেছেন, কিন্তু মূল ফলের ইতর-বিশেষ হয় নি। অর্থাৎ শেষ পর্যন্ত কংগ্রেসই জয়যুক্ত হল। এই একই বিশ্বাস ও প্রত্যয় নিয়ে ১৯৬৭ সালের নির্বাচনে কংগ্রেস নির্বাচনের সম্মুখীন হল—অর্থাৎ শেষ পর্যন্ত জয়লক্ষ্মী তাদের কণ্ঠেই বিজয়মাল্য পরাবেন। আর বামপন্থীরা নিজেরা ঝগড়া-বিবাদ করে দুই ফ্রন্টে বিভক্ত হয়ে নির্বাচনের সম্মুখীন হল। বিরোধী দল স্বপ্নেও ভাবেন নি যে, রাজ্যের ভোটাররা তাঁদের চেয়ে বেশি রাজনৈতিক সচেতনতার পরিচয় দিয়ে তাঁদেরই জয়যুক্ত করবেন। '৬৭ সালের নির্বাচনে কংগ্রেস পরাজিত হল এবং বিযুক্ত ফ্রন্ট যুক্ত হয়ে রাজ্যের শাসনক্ষমতা পরিচালনার দায়িত্ব গ্রহণ করলো। পরে সরকার কেউই রাখতে পারলেন না—না যুক্তফ্রন্ট না কংগ্রেস। '৬৭ সালের নির্বাচনে দুইটি তাৎপর্য সৃষ্টি হল। এক—ক্ষমতাদখলের রাজনীতি আর কংগ্রেসের মনোপলি নয় এবং যুক্তফ্রন্টও জয়যুক্ত হতে পারে ও সরকার গঠন করতে পারে। দুই হল শুধু ক্ষমতা দখল করলেই ক্ষমতা রক্ষা করা যায় না, তার জন্য চাই ব্যাপক সংখ্যাগরিষ্ঠতা। অর্থাৎ গত নির্বাচনের পর যুক্তফ্রন্ট যদি ১৬০ বা '৭০টা আসন পেত, তবে সেই সরকারের পতন ঘটানো সহজ হত না এবং অনেকের সাহসও হত না। শুধুমাত্র সংখ্যাগরিষ্ঠতার জোরে কেরলে কট্টর বাম কম্যুনিস্ট প্রভাবের সরকার, উড়িষ্যায় স্বতন্ত্র পার্টির সরকার মধ্যপ্রদেশে জনসংঘ সহ হ-য-ব-র-ল সরকার, মাদ্রাজে ডি এম কে সরকার নানা প্রতিকূল অবস্থার মধ্যেও ঠিক চলে যাচ্ছে। পশ্চিমবঙ্গে যুক্তফ্রন্ট বা কংগ্রেস কেউ ক্ষমতা দখল করেও রাখতে পারলো না একটিমাত্র কারণে যে, দলীয় সংখ্যাগরিষ্ঠতা তাদের যথেষ্ট ছিল না। তাই এবার নির্বাচনে ভাবনা তিন রকম। কংগ্রেসের ভাবনা,—তারা জয়ী হবেই এই ভাবনা ঠিক নয়, পরাজয় তাদেরও হতে পারে; তাই জয়কে নিশ্চিত জেনে যুদ্ধ নয় পরাজয় হতে পারে এই ভাব না নিয়েই সতর্কতার সঙ্গে লড়তে হবে ও জয়ী হতে হবে। যুক্তফ্রন্টের ভাবনা—তারাও জয়ী হতে পারে, পরাজয়ই তাদের কাছে শেষ কথা নয়। শেষ প্রশ্ন উভয়ের কাছেই সমান—শুধু জয়ী হলেই চলবে না, জয়ী হতে হবে এমন ভাবে যাতে কোন প্রকার দল ভাঙা-ভাঙিতে সরকারের পতন না হয়—অর্থাৎ সংখ্যাগরিষ্ঠতা চাই সেই সঙ্গে চাই বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠতা। শুধু শত্রুকে পরাজিত করা নয়—এমনভাবে পরাজিত করতে হবে, যাতে সেই শত্রু মাজাভাঙা সাপের মত কোন প্রকার ছোবল দেবার শক্তি না রাখে। সাপকে এমনভাবে মারতে হবে, যাতে সে আর ফণা তুলতে না পারে। এই হল মধ্যবর্তী নির্বাচনের পটভূমিকা। এই পটভূমিকাতেই মধ্যবর্তী নির্বাচনের হিসাব-নিকাশ করতে হবে। কংগ্রেস জানে সে যদি ১০টা ৫টা আসনের সংখ্যাগরিষ্ঠতায় জয়যুক্ত হয়ও, তবে সেই সংখ্যাগরিষ্ঠতা তিন রাত্রি থাকবে না। আজ যারা গুড বয় সেজে কংগ্রেসের অকৃত্রিম সেবক হয়ে নির্বাচনী বৈতরণী পার হচ্ছে, তারাই আবার নদী পার হয়ে উপযুক্ত মজুরী না পেলে কুমীরকে বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দেখাবে। যুক্তফ্রন্ট জানে—যারা আজ কংগ্রেসের কবর দেবার জন্য জান-প্রাণ কবুল করছে, নির্বাচনে যথেষ্ট সংখ্যাগরিষ্ঠতা না পেলে এইসব কংগ্রেস-বিরোধীদের কেউ কেউ রাতারাতি কবরের কংগ্রেসকে কফিন থেকে বের করে তার সঙ্গে মালা বদল করে ঘর-সংসার করবার জন্য প্রাণপাত করবে। তাই সমস্যা আজ শুধু জয়ী হওয়া নয়, বিপুল শক্তিতে জয়ী হওয়া।

কিন্তু সাধ এক কথা, সাধ্য আর কথা। সাধ তো অনেকেই থাকে, কিন্তু সব সাধই কি সব সময় সাধ্যে কুলায়? পঙ্গুরে লঙ্ঘাও গিরি—সাধক রামপ্রসাদের গানে সত্য হলেও এই বাস্তব কঠোর রাজনীতির জগতে পঙ্গু যে গিরি উলঙ্ঘন করবে এটা সহজ কথা নয়। চাঁদে মানুষ যাচ্ছে সত্য, তাই বলে মূলোর বিচি পুঁতে আঙুরফল ফলাবার আশা করার মত ঘটনা এখনও ঘটছে না।

পশ্চিমবাংলায় কংগ্রেস প্রায় যদ্দে নিয়েছে তারা জয়যুক্ত হচ্ছে। কারণ মানুষ ন'মাসের যুক্তফ্রন্টের শাসনে নাকি এমন অভিজ্ঞতা লাভ করেছে যে, তারা এবার কংগ্রেসকে ক্ষমতায় ফিরিয়ে আনতে একেবারে হাত-পা ধুয়ে বসে আছে। আর যুক্তফ্রন্ট—ওটা মোটেই যুক্তফ্রন্ট নয় এবং ওটা যে কি এখন পর্যন্ত এক কথায় তার কোন বর্ণনা করা যায় না। যুক্তফ্রন্ট যে কত নিকৃষ্ট, সেটা কংগ্রেস নেতারা ফলে ফেঁপে করে উঠতে পারেন নি। যা হোক, কংগ্রেসের প্রচারের প্রধান বক্তব্য হল যুক্তফ্রন্টের ন'মাসের শাসন আর বারো দলের যুক্তফ্রন্ট আসলে ফ্রন্ট নয়—এই দুইটি কথা। তবে প্রচারের দিক দিয়ে এটা বেশ নতুন কথা কংগ্রেস এইবারই পেয়েছে, অতীতে বাইশ

দিল্লীর মা পায় নি। এতকাল কংগ্রেস বিরোধীদের মধ্যে সর্বদাই কম্যুনিস্ট পার্টিকে আক্রমণের লক্ষ্য হিসাবে গ্রহণ করতো। অন্য দল সম্পর্কে সমবেদনা প্রকাশ করে কম্যুনিস্টদের বলা হত—ওরা অমুক দেশের দালাল। সাতচল্লিশ সাল থেকে কম্যুনিস্টরা ছিল—রুশের দালাল, ৬২ সালের সাধারণ নির্বাচনে কম্যুনিস্টদের অতিভাবক বেড়ে দুজন হল—এক দল রুশের দালাল আর এক দল চীনের দালাল। কিন্তু কোন অস্ত্র চিরকাল একরকম ধার থাকে না, তাছাড়া হাতের কাছে অন্য অস্ত্র পেয়ে রুশ-চীনের দালালীর প্রশ্নটা কংগ্রেসের পক্ষ থেকে এবার একটু কমই উল্লেখিত হচ্ছে।

যুক্তফ্রন্টের আশা সৃষ্টি হয়েছে সম্পূর্ণ ভিন্ন কারণে, আর যুক্তিও ভিন্ন। যুক্তফ্রন্ট মনে করে তাদের ক্ষমতায় পৌঁছে দিতে জনগণের কাছে কংগ্রেসের এই অভিযোগ ও প্রচারের কোন দামই নেই। যুক্তফ্রন্টের ন'মাসের শাসন যারা কলঙ্কিত অধ্যায় বলে বর্ণনা করছে—তারা কোন্ কথা দিয়ে, কোন্ যুক্তি দিয়ে কংগ্রেসের বিশ বছরের অপশাসনের কালিমালিপ্ত অধ্যায়কে ঢাকা দেবে। কংগ্রেস বিশ বছরে যে সর্বনাশ করেছে বা যে অপশাসনের স্রোত বইয়ে দিয়েছে, সেই স্রোতে বাঁধ দিতেই তো ফ্রন্ট সরকারের ন'মাস কেন, ছটি বছরের দরকার—অন্য কাজ করবে কখন? বিশ বছরের একটা অপদার্থ, অসময়ে, দুর্নীতিপূর্ণ শাসন-যন্ত্রের ছায়া অপসারণ করে নতুন কিছু করার চেষ্টা করতেই তো অনেক সময় দরকার। আর ন'মাসে এমন কি খারাপ কাজটা করেছে শুনি। কংগ্রেসীরা যেগুলোকে খারাপ কাজ বলছে, ওর অনেকগুলো কংগ্রেসীদের কাছে খারাপ হলেও দেশের শতকরা ৮০জন মানুষের পক্ষেই ভাল কাজ। আর বিষয় ফ্রন্ট—একশবার সত্য যুক্তফ্রন্টের সকলেই একদল নয়, এক আদর্শের লোক নয়, কিন্তু তাতে কংগ্রেসের আনন্দের কারণটি কোথায়? একবার তো ভগ্নদূরই হোক আর অকাজেরই হোক, যুক্তফ্রন্ট হয়েছে। গত বার তো বাম-পন্থীরা দুই ফ্রন্টে বিভক্ত ছিল, এমন কি যখন শ্রীপ্রমোদ দাশগুপ্ত শ্রীসোমনাথ লাহিড়ীর জামানত জব্দ করতে চেয়েছিলেন, তখনও লোকে তাদের ন্যায় ঠিকই দিয়েছে। আর গতবার দুই ফ্রন্টে লড়াই হওয়া সত্ত্বেও যদি কংগ্রেসীরা মাত্র ১২৭টা আসন পেয়ে থাকে, তবে এবার এক ফ্রন্টের কাছে জয়ী হবার আশাটা করা কোন্ আনন্দে?

কিন্তু রাজ্যে কংগ্রেস আর যুক্তফ্রন্ট ছাড়া আরো অনেকগুলি দল এবার নির্বাচনে পশ্চিমবঙ্গের ভাগ্য নির্ধারণে বেশ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেবে। পি-এস-পি, লোকদল, আই-এন-ডি-এফ, জাতীয় দল, মুসলিম লীগ ও আমরা বাঙালী এর অন্যতম। তবে এই দলগুলি যত গর্জন করছে—বর্ষণের বেলায় কতটা করবে বলা যায় না। নির্বাচনের এক মাস বাকী কিন্তু কোন দলেরই অবস্থা খুব একটা জোরদার বলা যায় না। আঞ্চলিক ভিত্তিতে কোন কোন প্রার্থী কিছু প্রভাব সৃষ্টি করলেও এই দলগুলিই যে রাজ্যের রাজনৈতিক ভারসাম্য রক্ষার প্রতীক হবে এমন সম্ভাবনাও বড় দেখা যাচ্ছে না। সামান্য কয়েকটা কেন্দ্র ছাড়া এই দলের প্রার্থীরা কংগ্রেস বা যুক্তফ্রন্টের প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বী নয়, সর্বত্রই এই শক্তিগুলি হল তৃতীয় শক্তি। কিন্তু কোথায় আবার তৃতীয় শক্তির স্থান দখলকারী একজন প্রার্থী বা এক দলের প্রার্থী নয়। এই তৃতীয় স্থানে আছেন একাধিক দলের প্রার্থীরা। এর ফল হল এই যে, তৃতীয় শক্তিতে অবস্থানকারীরা সর্বত্রই নিজেদের মধ্যে জোর লড়াই করবেন, এবং এই লড়াই শেষ করে অনেকের দ্বিতীয় বা তৃতীয় স্থানে পৌঁছনো কষ্টকর হবে। নমুনা হিসাবে বলা যায়—লোকদল প্রার্থীরা বা কোথাও জাতীয় দলের প্রার্থীরা আছেন কিন্তু এই সব কেন্দ্রে আবার আই-এন-ডি-এফ বা মুসলিম লীগ প্রার্থীরাও আছেন। লোকদল প্রার্থী যেখানে অধ্যাপক কবিরের নেতৃত্বে বেশ সঙ্ঘবদ্ধ হয়েছিল—সেখানে সেকেন্দার আলি মোল্লার নেতৃত্বে মুসলিম লীগ প্রার্থী হাজির হয়ে সেই শক্তিতে ভাঙন ধরাচ্ছে। অর্থাৎ প্রথম স্থানে আসবার আগেই কোথাও দ্বিতীয় স্থান নিয়ে কোথাও তৃতীয় স্থান নিয়ে কংগ্রেস ও যুক্তফ্রন্টের বাইরের দলগুলিকে অনেক বেশি লড়াই করতে হবে। তবে এর যে ব্যতিক্রম কিছু নেই এমন নয়—প্রার্থীগত যোগ্যতায় এই ছোট দলের প্রার্থীরা অনেকে কোথাও যুক্তফ্রন্ট কোথাও কংগ্রেসের প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বীরূপে দেখা দিয়েছেন।

তবে এখনও এক মাস সময় আছে নির্বাচনের। কিন্তু মনোনয়নপত্র দাখিল শেষ হয়ে যাবে ৮ই জানুয়ারী। ৮ই জানুয়ারী পার হয়ে গেলে বোঝা যাবে কোথায় কত প্রার্থী আছে বা থাকবে। অনেক দিন থেকেই অনেকে অনেক কথা বলছেন কিন্তু শেষ পর্যন্ত কত শক্তি সমাবেশ করতে পারবেন সেটা বোঝা যাবে মনোনয়নপত্র দাখিলের পর। তবে এই মনোনয়নপত্র দাখিলের সময়ও দেখা যাচ্ছে—ছোট দলগুলি তো নয়ই, এমন কি কংগ্রেস ও যুক্তফ্রন্ট দলেরও ঘর পুরোপুরি সাজানো বা সামলানো হয় নি, কংগ্রেসেরও কোন কোন প্রার্থী শেষ মুহূর্তে একটু কিন্তু কিন্তু করছেন—আর যুক্তফ্রন্টের তো এস-এস-পি দলকে নিয়ে ঝামেলা এখনও মেটে নি। এই অবস্থায় নির্বাচনের মুখে ও মনোনয়নপত্র দাখিলের সময় যেটা লক্ষণীয়, সেটা হল এবার রাজ্যে কোন একটি আসনও কোন একটি দলের পক্ষে একান্ত নিরাপদ নয়। এতদিন কিছু আসন ছিল, যেখানে কোন দল বলতে পারতেন—আমাদের প্রার্থী জয়ী হবেনই। কিন্তু এবার সেই কথা বলার মত জোর কোন আসনে নেই। সেই প্রার্থী শ্রীহরেকৃষ্ণ কোঙার, শ্রীজ্যোতি বসু হোন আর শ্রীবিজয় সিংহ নাহার, শ্রীসিদ্ধার্থশঙ্কর রায় হোন। সকল আসনেই এমন কিছু জট পাকিয়ে উঠেছে যে, কোন প্রার্থীই আপন আত্ম-বিশ্বাসে বলতে পারেন না যে, আমার জয় অবধারিত—বিপক্ষের পরাজয় হবেই। এই কথা কোন প্রার্থী বলতে পারেন না, পারছেন না—এটাই এবারের নির্বাচনের সবচেয়ে বড় তাৎপর্য বহন করে এনেছে।

(৩-১-৬৯)

সর্দ্দি ও কাশিতে
রক্ষিতের
তাল মিছরি
ফোন ৫৫-৩০৮৫

পত্রমেলা

স্বাধীন ক্রীতদাস—বরুণ রায়। বেঙ্গল পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, ১৪ বঙ্কিম চাটুজ্যে স্ট্রীট, কলকাতা—১২। মূল্য ঃ ৫·৫০।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মেধা সম্বন্ধে কোনো রকম প্রশ্ন এখন আর অবান্তর। বিজ্ঞানের জয়যাত্রায় আমেরিকার মানুষ উপগ্রহ চক্কর দিয়ে এলেন, অন্য গ্রহেরও হয়তো এখন তাঁরা প্রস্তুত যাত্রী। তবু সঙ্গে সঙ্গে মনে পড়ে স্বর্গত প্রেসিডেন্ট জন এফ কেনেডির বিশ্বস্ত বন্ধু ও উপদেষ্টা এবং একালের একজন প্রখ্যাত ঐতিহাসিক অধ্যাপক আর্থার এম শ্লেসিঞ্জারের কথা ঃ "এই গ্রহের মধ্যে আমেরিকানরা হচ্ছে সবচেয়ে ভয়াবহ লোক।"

পর পর তিনটি হত্যাকাণ্ডের পর অনেকেরই মনে প্রশ্ন জাগে—শ্লেসিঞ্জারের কথা কি তবে অক্ষরে অক্ষরে সত্য। অথচ এই আমেরিকাতেই দাসপ্রথার বিরুদ্ধে ও গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার জন্যে হয়েছে সংগ্রাম। বর্ণবিদ্বেষের বিরুদ্ধে আমেরিকানবাসীদের মধ্যেই আছে ঘোরতর ঘৃণা। তবে আমেরিকার এরা কারা, যারা সুখী ও সবল মার্কিনসমাজকে শুধু দুর্বল করেই দিচ্ছে না, সর্বনাশের পথে নিয়ে যাচ্ছে ধীরে ধীরে। তাই দেখা যাচ্ছে কম্যুনিস্ট না হয়েও প্রাণ দিতে হয়েছে কেনেডি ভ্রাতৃদ্বয় ও লুথার কিং-এর মতো মানবদরদীদের। এবং একথা সত্য ঔষধের দালিকপদার্থদের জন্য ক্লিয়াকলাপের যদি বিরোধ সাধন না ঘটে—তাহলে বিজ্ঞান ও সাহিত্যের মধ্য দিয়ে তার যে জয়যাত্রা তার অস্তিত্ব পর্যন্ত বিলুপ্ত হবে।

শ্রীবরুণ রায় স্বাধীন ক্রীতদাস গ্রন্থটিতে প্রমাণ করে দিয়েছেন যে, স্বাধীন হলেই মানুষ হয় না, আজ আমেরিকারই একশ্রেণীর মানুষ তীব্র লালসা ও হিংসার নন ক্রীতদাস।

তিনটি বিরাট হত্যাকাণ্ডের রহস্য উন্মোচন আজো সরকারিভাবে সম্ভব হয় নি। কিন্তু আমেরিকায় হত্যা করা কতো সহজ এবং প্রকাশ্য হত্যাকারীকে ধরা কতো কঠিন তার চাঞ্চল্যকর কাহিনী তুলেছেন পর পর কতকগুলি হত্যাকাণ্ডের তদন্ত ও বিচার-কাহিনীর মাধ্যমে। সেখানে আগ্নেয় অস্ত্র ক্রয়বিক্রয় সম্পর্কে কিছুকাল আগে আইন পাশ হয়েছে। কিন্তু যে ধরণের আগ্নেয় অস্ত্রের সাহায্যে এতোগুলো খুন হোল সেগুলোর বেচাকেনা বন্ধ করা সম্ভব হোল না, এও এক আশ্চর্য ব্যাপার!

স্বার্থসম্পন্ন ব্যক্তিরা জানে কিভাবে হত্যা-উদ্দেশ্য চরিতার্থ করা হয়। দুই বিচারপতি—(ক) মিঃ পীল, (খ) মিঃ চিলিংওয়ার্থ। মিঃ পীল ভাড়াটে গুণ্ডা দিয়ে হত্যা করালেন মিঃ চিলিংওয়ার্থের মতো সর্বজনশ্রদ্ধেয় বিচারককে। ভাড়াটের সাহায্যে খুন করানোর ফলে যিনি লোক লাগিয়ে খুন করাচ্ছেন তাঁকে সরাসরি খুনের সঙ্গে যুক্ত করা সম্ভব নয়। আর যে খুন করছে তার ক্ষেত্রে সাধারণ দৃষ্টিতে মোটিভের অভাবের দরুণ তাকে অভিযুক্ত করাও সহজ নয়" (পৃঃ ২১)। আইন এখানে অসহায়। তবু মিঃ পীল একদিন হঠাৎ ধরা পড়লেন। সে এক চাঞ্চল্যকর কাহিনী। এবং এভাবেই আমেরিকায় হত্যাকাণ্ড চলে। জেনে শুনেও সরাই খুনীদের ভয়ে নির্বাক। আর শ্রীবরুণ রায় বহু প্রমাণ, তথ্য ও সাক্ষ্য উদ্ধৃত করে বলেছেন, ..."এরা প্রেরণা পায় বিভিন্ন রাজ্য সরকারের কাছ থেকে। .....যদি সরকার নিজেরাই এই কাজ করতে পারেন তাহলে কোনো শক্তিশালী ব্যক্তি, দল ও সংস্থাই বা ভাড়াটে খুনী নিয়োগ করবে না কেন?" (পৃঃ ২২)। আরো আশ্চর্য, একটা অসুস্থ লোক বা পাগল পার্বত্য একটা মারণাস্ত্র যন্ত্রতন্ত্র কিনতে পারে। শ্রীরায় পর পর কয়েক বছরের হত্যাকাণ্ডের পরিসংখ্যান পেশ করেছেন। কুড়ি বছর আগে একটি তদন্ত কমিটিও বসেছিল। তাতে সেনেটার কফোভার তথ্যসহ উল্লেখ করেছেন যে কনস্টেবল, পুলিশ, ডিটেকটিভ এদের মধ্যে ঘুষ খাওয়ার ছড়াছড়ি। আর গভর্নররা নির্বাচনী প্রচারের জন্য লক্ষ লক্ষ ডলার অবৈধসূত্রে থেকেই পাচ্ছে। অবশ্য শ্রীরায় এক-একটি তদন্ত কাহিনী ও তার রিপোর্টের মধ্য দিয়ে প্রতিটি ঘটনার পুঙ্খানুপুঙ্খ চিত্র তুলে ধরেছেন। এবং এই সব রিপোর্ট পড়ে আমাদের দেশের রাজনৈতিক চিত্রটাও চোখের সামনে জ্বল জ্বল করে ভেসে ওঠে। এই কি গণতন্ত্রের নমুনা। একটা লোক অম্লানবদনে কিভাবে ১৩৫টা খুন করলো এবং এক-একটা খুনের কায়দাও কী বিচিত্র ও বীভৎস হতে পারে তা মার্ডার ইনকরপোরেটেড পড়লে গা শিউরে ওঠে। শুধু রাজনীতির জন্য হত্যাকাণ্ডের বিবরণ পাওয়া যায় একদিনে এক সঙ্গে বহু নাসকে হত্যার কাহিনীর মধ্য দিয়ে। খুনী অপরাধীরাই নয়, উগ্রপন্থী স্বার্থগোষ্ঠীও কম যায় না। অথচ রাজনীতিতে এদের নীতি বেশ সুনাম। এই কারণে স্বাধীন ক্রীতদাস পড়ে মনে হোল। উগ্রপন্থীদের কাছে নিগ্রোরা দুষমন, তেমনি তারা মনুষ্যত্ব-বিরোধী ও মানবতার বৈরীতার শত্রু।

শ্রীবরুণ রায় "স্বাধীন ক্রীতদাস" গ্রন্থটিকে গল্প বলার ভঙ্গিতে তীব্র আকর্ষণীয় করতে পেরেছেন। কিন্তু সবচেয়ে তাঁর বড় কৃতিত্ব একটি পঙ্‌ক্তিও তিনি প্রমাণ ছাড়া উল্লেখ করেন নি এবং সে প্রমাণ পেয়েছেন আমেরিকায় প্রকাশিত ও দলিলরূপে গৃহীত নানা রিপোর্ট ও গ্রন্থ থেকে। অসংখ্য লজ্জাজনক হত্যাকাহিনী ও তাদের তদন্ত থেকে অনুধাবন করা যায় কেনেডি ভ্রাতৃদ্বয় ও লুথার কিং কাদের শিকার হয়েছেন এবং শেষ পর্যন্ত সহজেই স্পষ্ট হয়ে ওঠে আসল খুনী কারা, কারা খুন করিয়েছে এবং কেনই বা খুন করা হয়েছে। শ্রীরায় বইটি লিখতে গিয়ে এটা অন্তত প্রমাণ করেছেন, আমেরিকায় মানুষ আছে সত্যি, কিন্তু অমানুষদের কাছে তাঁরা বড় অসহায়!

শ্রীবরুণ রায়কে ধন্যবাদ, তিনি নিরপেক্ষ দৃষ্টিতে ও অত্যন্ত সংযম সহকারেই গ্রন্থটিকে উপস্থাপিত করতে পেরেছেন।

স্পেনের কবিতা ঃ (আশ্বিন, ১৩৭৫)—অনুবাদক—শিবেন চট্টোপাধ্যায়। মেরিট পাবলিশার্স, ৫১, বিধান সরণী, কলকাতা—৬। মূল্য ঃ দুই টাকা।

স্পেনের ১৯ জন প্রতিনিধি স্থানীয় কবির ৯৯টি কবিতা নিয়ে স্পেনের কবিতা।" রুবেন ডারিও, হুয়ান রামন হিমেনেথ, ফেডারিকা গর্শিয়া লরকা, রাফায়েল আলবার্তি, পাবলো নেরুদা, মহিলা কবি সিলভিয়া ওকাম্পো প্রমুখ কবিদের কবিতার সঙ্গে অনুবাদক শিবেন চট্টোপাধ্যায় আমাদের পরিচয় করিয়ে দিয়েছেন। এই ধরণের কবিতা সংগ্রহ স্বভাবতই অসম্পূর্ণ। তাহলেও কবিতাগুলির মধ্যে আধুনিক স্পেনের বর্তমান জীবনের জটিলতা, নৈরাশ্য, যন্ত্রণা যেমন প্রকাশ পেয়েছে, তেমনিই সে দেশের ঐতিহ্যের কথাও বলা হয়েছে। ভূমিকায় অনুবাদক স্পেনের কাব্য-সাহিত্যের রূপরেখা অঙ্কিত করেছেন। অনুবাদ কবিতাগুলি মোটামুটি সুখপাঠ্য।

পাঠকমন

এম-ডি পরীক্ষা প্রসঙ্গে

এম-ডি প্রসঙ্গে আপনি 'বঙ্গদর্শন' পর্যায়ে যে বক্তব্য রেখেছিলেন, তার স্বপক্ষে ও বিপক্ষে গত কয়েকটি সংখ্যায় বেশ কিছু সংখ্যক ডাক্তার এবং সাধারণ লোকের প্রকাশিত মন্তব্য থেকে আমাদের এই কথাটাই মনে হচ্ছে যে, আপনারা যা অভিযোগ করেছিলেন, তার থেকেও গুরুতর দুর্নীতি বিদ্যমান এই কর্তাব্যক্তিটিকে কেন্দ্র করে। অর্থাৎ কোঁচো খুঁড়তে গিয়ে এখন সাপ বেরিয়ে পড়ছে। বঙ্গদর্শনের শক্তিশালী লেখককে ধন্যবাদ—তিনি সমাজের এমন এক স্তরের ভয়াবহ অবস্থার চিত্র লিপিবদ্ধ করতে সাহসী হয়েছেন বলে। এই পরিপ্রেক্ষিতে আমরা মাত্র কয়েকটি বিষয়ে আমাদের বক্তব্য রাখতে চাই।

প্রথম কথা হল এই যে, বিশ্ববিদ্যালয়ই এম-ডি পরীক্ষা পরিচালনার দায়িত্ব নেন। এক্ষেত্রে এম-ডি পরীক্ষা সম্বন্ধে যখন এরকম "স্ক্যান্ডাল" উঠেছে, তখন সিনেট ও সিন্ডিকেটের সদস্যগণ কি নির্বাক হয়ে থাকবেন? তাঁরা কি কোনরকম উচ্চবাচ্য করবেন না? এরকম গুরুত্বপূর্ণ একটা ব্যাপারে নিরপেক্ষ তদন্তের কি কোন ব্যবস্থা হবে না? সাধারণ মানুষ কি জানতে পারবে না সত্যিই এর ভেতরের রহস্য কি? অভিযোগের একাংশও সত্য বলে প্রমাণিত হলে কর্তাব্যক্তিটিকে বিশ্ববিদ্যালয়ের এমন সুউচ্চ সম্মানজনক পদে রাখা সমীচীন হবে কি? চিঠিপত্রগুলো পড়ার পর একথা বলা যায় যে, তাঁর সততা সর্বসংশয় মুক্ত নয়। এইসব অনাচার, অবিচার, স্বজনপোষণের কথা যেখানে উঠেছে, সেখানে এই কর্তাব্যক্তিটি এম-ডি'র পরীক্ষক হবার যোগ্য বলে বিবেচিত হতে পারেন কি? নিজে তিনি এবার সরে দাঁড়াবেন কি এম-ডি পরীক্ষা থেকে? সে সৎসাহস সম্ভবত তাঁর নেই। প্রকাশিত সংবাদের শতাংশের একাংশও যদি সত্য হয়, (বিচার বিভাগীয় নিরপেক্ষ তদন্তে—যার দাবি একাধিকবার উত্থাপিত হয়েছে), তাহলে তিনি পদত্যাগ করবেন কি?

কর্তাব্যক্তিটির পুত্র কোচিং ক্লাশ নেন। এই তথ্য পক্ষের ও বিপক্ষের সবাই দিয়েছেন। হয়ত নগদ অর্থ নেন না। কিন্তু এক পত্রলেখক যে বলেছেন, "পিতাপুত্র এন্ড কোং"—এ যে তাই সপ্রমাণিত হয়েছে। পুত্রের প্রকাশিত পুস্তকে তাবৎ প্রতিবাদকারীদের অধিকাংশের নাম জ্বলজ্বল করছে। পুত্র ব্যক্তিটি তাঁর এই "ফোপর দালালী" বন্ধ না করলে কি এম-ডি পরীক্ষার্থীদের জগৎ অন্ধকার হয়ে যাবে? অন্তত পিতা পরীক্ষক থাকাকালীন তিনি তাঁর এই পরোপকার প্রবৃত্তি বন্ধ রাখুন না। তাহলেই তো নিন্দুকদের রসনা অনেকখানি বন্ধ হয়ে যাবে। অনেক আন্ডারগ্র্যাজুয়েট ছাত্রও তাঁর শিক্ষকতার জন্য পাগল। তিনি সেইসব আন্ডারগ্র্যাজুয়েট ছাত্রের ভিত সুদৃঢ় করুন না। তাতে কেউ মাথা ঘামাতে আসবেন না। আর এম-ডি পরীক্ষার্থীমহলে একথাও না কি ইদানীং শোনা যাচ্ছে যে, তাঁর শিক্ষণপদ্ধতি ব্যাকডেটেড হয়ে পড়েছে। অর্থাৎ তিনিও এখন চর্বিতচর্বণ করছেন ও তাঁর বিপক্ষে যাঁরা, তাঁকে যাঁরা সম্মান না করেন, যাঁরা তাঁর এই কোচিং ক্লাশে বীতশ্রদ্ধ—তাঁদের প্রতি কটূক্তিতেই বেশি সময় কালাতিপাত করেন তাঁর এম-ডি পাশ করানোর "সিওর সাকসেস" কোচিং ক্লাশে। গুরুব, তিনি না কি আর পড়াবেন না। এ সৎসাহস তাঁর হবে না—একথা জোর করেই বলতে পারি।

—ডাঃ অশোক ব্যানার্জী

* * *

আপনাদের 'সাপ্তাহিক বসুমতীতে' গত কয়েক সপ্তাহ ধরিয়া একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ পর্বের অবতারণার জন্য শতেক ধন্যবাদ। এম-ডি পরীক্ষা লইয়া যে সমস্ত অভিযোগ করা হইয়াছে, সেইগুলি যদি সত্য হয়, তবে আমাদের সাধের কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অকলঙ্ক চরিত্রে এমন একটি দাগ পড়িবে যাহা বিস্মৃত হওয়া সম্ভব নয়। অভিযোগ সত্য না মিথ্যা তাহা তর্কের অপেক্ষা রাখে এবং কলিকাতার ডাক্তারমহলে ইহা যে আলোড়নের সৃষ্টি করিয়াছে তাহার প্রমাণ চিঠিগুলি। ইহা কিন্তু আমার খুব আশ্চর্য লাগে যে, যাঁহাদের বিরুদ্ধে এত আন্দোলন, তাঁহারা কেন একটিও প্রতিবাদ করিতেছেন না? কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য তথা সিনেটের কাছে আমার আবেদন যে, এই তর্কের ও অভিযোগের পরিপূর্ণ মীমাংসা না হওয়া পর্যন্ত সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গকে কোন দায়িত্বপূর্ণ পদ অধিকার করিতে যেন না দেওয়া হয়। পাশ্চাত্য কোন দেশ হইলে এতদিনে বোধহয় উক্ত ব্যক্তিরা পাদপ্রদীপের সামনে নিজেরাই আসিতেন, টানিয়া আনিতে হইত না।

সমস্ত সমাজের নিকট আমার অনুরোধ যে, এতবড় একটি ব্যাপার, যেন উপযুক্তভাবে বিচার করা হয়, অবহেলার অপেক্ষা যেন না রাখে। তেলে ভেজাল প্রমাণে আমরা রাগিয়া আগুন হই, তবে পরীক্ষা লইয়া জাল-জুয়াচুরি আমাদের দৃষ্টিগোচর হয় না কেন?

—মন্টু রায়, কলিকাতা-১৯

* * *

সাপ্তাহিক বসুমতীর "বঙ্গদর্শনে" এম-ডি ডিগ্রী সম্বন্ধে একটি নিবন্ধ এবং 'পাঠকমনে' উক্ত বিষয়ে বাদ-প্রতিবাদ আমি যথেষ্ট আগ্রহের সঙ্গেই পড়েছি। এ-বিষয়ে আমার কিছু নিবেদন আছে।

আমি একজন সামান্য ব্যক্তি—ডাক্তার বা এম-ডি পরীক্ষার্থী নই। কিন্তু স্বভাবে শহরের এক প্রান্ত হতে আর এক প্রান্ত পর্যন্ত উক্ত ক্ষমতাশালী ব্যক্তির ভক্ত শিষ্যবৃন্দ প্রতিবাদ নিয়ে ঝাঁকে ঝাঁকে ঝাঁপিয়ে পড়ছেন, তাতে মনে হয় ঢিলটি মৌচাক লক্ষ্য করে সঠিকভাবেই নিক্ষিপ্ত হয়েছে এবং এই জন্যেই মাছির এত উৎপাত।

আমাদের সমাজজীবনে, রাষ্ট্রীয়-জীবনে ও অন্যান্য অনেক প্রতিষ্ঠানেই এ ভাবেই অসংখ্য মৌচাক বাসা বেঁধেছে। অতীতে অনেক দুঃসাহসী শিকারী এইভাবে মৌচাকে ঢিল মেরে ঘায়েল হয়েছেন।

আমি বঙ্গদর্শন লেখকের প্রতি সহানুভূতি জানাই।

—শ্রীঅমরেন্দ্রনাথ সিংহরায়, আরামবাগ (হুগলী)

* * *

৫ই ডিসেম্বরের সাপ্তাহিকের 'বঙ্গদর্শনে' এম ডি পরীক্ষা সম্বন্ধে আপনার মন্তব্যকে কেন্দ্র করে 'পাঠকমনে' যে ঝড় উঠেছে, আজ সে সম্বন্ধে কিছু আলোচনা করতে চাই। জানি না আপনার মহামূল্য কাগজের পাতায় এর স্থান হবে কি না।

একটু নজর করলেই চোখে পড়ে কতকগুলি প্রতিবাদপত্রের বক্তব্য এবং ভাষা মোটামুটি এক। সেগুলির বহু জায়গাতেই আছে পরিষ্কার তোষামোদের ছাপ, প্রকৃত সত্যকে চাপা দেবার একটা নগ্ন বুদ্ধিহীন প্রচেষ্টা।

চিত্ত ব্যানার্জী এবং তাঁর বন্ধুরা (১৯-১২-৬৮) ব্যক্তিবিশেষের পুত্রকে কৃতী চিকিৎসক আখ্যা দিয়েছেন। এই কৃতী চিকিৎসকের কিছু পরিচয় দেওয়া দরকার।

ইনি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন নিম্নস্তরের ছাত্র, পিতার প্রচুর পয়সা ব্যয় করে বিদেশে 'কোচিং' নিয়ে কোনপ্রকারে এম আর সি পি পাশ করে আসেন। কলকাতার মাটিতে পা দেবার সঙ্গে সঙ্গে পিতার অনুগৃহীত বিভিন্ন বিষয়ের বহু এম বি বি এস পরীক্ষক, পোস্ট-গ্রাজুয়েট পরীক্ষক এবং বহু এম ডি পরীক্ষার্থী এঁর কাছে রোগী পাঠাতে শুরু করেন, তাই হুহু করে এঁর পসার জমে ওঠে। প্রকৃত গুণীর গুণ দেখিয়ে পসার জমাতে সময় লাগে, কেন না তাঁর গুণের কাহিনী দুদিনেই দিকে দিকে ছড়িয়ে যেতে পারে না। আলোচ্য কৃতী চিকিৎসককে আপনি কৃতী কন্ট্রাক্টরের সঙ্গে তুলনা করতে পারেন। কৃতী কন্ট্রাক্টর জানেন কোথায় কিভাবে ঘুষ দিলে টেন্ডার জেতা যাবে, অনেক লাভের অনেক কাজ পাওয়া যাবে, স্বল্প সময়ে ধনী হওয়া যাবে। কৃতী কন্ট্রাক্টরের ব্যবসা প্রসারের সঙ্গে যেমন ইঞ্জিনীয়ারিং জ্ঞানের কোন সম্পর্ক নেই, এইসব কৃতী চিকিৎসকের পসার বিস্তারের জন্যও তেমনি চিকিৎসায় বিচক্ষণতার প্রয়োজন নেই।

এরপর অনিল সাহা প্রভৃতি (২৪-১২-৬৮), জনৈক ভিজিটিং ফিজিসিয়ান (২৪-১২-৬৮) এবং মায়া দত্তের (২-১-৬৯) চিঠিতে আসা যাক। তিনটি চিঠিই যেন একই সুরে বাঁধা, একই দেবতা যেন তিন রূপে আবির্ভূত হয়েছেন। এঁদের বেশির ভাগেরই মতে পরীক্ষায় ব্রিলিয়ান্সির কোন স্থান নেই। আমিও এঁদের সঙ্গে সম্পূর্ণ একমত। আজকালকার এম-ডি ডিগ্রী যে বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই গবেটত্বের পরিচায়ক তাতে সন্দেহ কি।

এঁরা প্রশ্ন তুলেছেন নন-প্রাকটিসিং ডাক্তাররা 'কেস' পাবেন কোথায়? তার উত্তরে বলতে চাই যে, এই গোত্রের প্রায় সবাই কোন না কোন হাসপাতালে নিযুক্ত, প্রত্যহ প্রচুর 'কেস' নিয়ে ঘাঁটাঘাঁটি করেন। তাই একান্ত নিষ্ঠার সঙ্গে চেষ্টা করলে তার থেকে কি আর কিছু কিছু পাঠান যায় না? শোনা যায় হাসপাতালের রিয়ারার, 'ওয়ার্ডবয়রাও' কিছু কিছু কেস হাসপাতাল থেকে নিয়ে কোন কোন ডাক্তারবাবুদের চেম্বারে যায়, বকসিসের লোভে। তারাও তো নন-প্রাকটিসিং, তারা একাজ করে কি করে? আর যে কাজ নন-প্রাকটিসিং 'ওয়ার্ডবয়দের' দ্বারা সম্ভব, সেটা কি আর নন-প্রাকটিসিং ডাক্তারদের দ্বারা সম্ভব নয়? হাসপাতালে নিযুক্তির সঙ্গে প্রাইভেট প্রাকটিসের যদি কোন সম্পর্ক নাই থাকবে তবে ব্যক্তিবিশেষের পুত্রকে কেন কিছুদিন আগে কয়েকজন এম-ডি পরীক্ষার্থী (যাঁরা সবাই এবার এম-ডি হয়েছেন) মারফৎ 'হোম সেন্টারের' লোভ দেখিয়ে এম-বি-বি-এস ছাত্রদের ক্ষেপাতে হয়েছিল তাঁর হাসপাতালের যোগাযোগ রক্ষা করবার জন্যে?

একজন বলেছেন যে তিনি পরীক্ষার্থী জেনে তাঁর রোগীর কাছ থেকে কর্তাব্যক্তিটি নাকি পারিশ্রমিক নেন নি। খোঁজ করলে দেখা যাবে উনি নিশ্চয়ই অপর কোন শক্তিশালী গোষ্ঠীর লোক এবং পরীক্ষার আগে একটামাত্র 'কেস' দিয়ে বাজিমাৎ করবার আশায় গিয়েছিলেন। একটামাত্র কেসের ফী নিয়ে বিচক্ষণ পরীক্ষক কেন 'অবলিগেশনে' যাবেন বলুন তো? সন্তুষ্ট করতে হলে বহুদিন ধরে বহু 'কেস' যোগাতে হয়।

দলে দলে যাওয়া সবসময়ই নাকি জনপ্রিয়তার লক্ষণ। কোথাও চোর ধরা পড়লে সেখানে দলে দলে লোক উপস্থিত হয়, সেটা নিশ্চয়ই চোরের জনপ্রিয়তার লক্ষণ।

পরীক্ষার ১৫ দিন আগে থেকে পরীক্ষার্থীদের ঢুকতে দেওয়া হয় না। এটা তো 'অফিসিয়াল' আইন, 'আনঅফিসিয়াল'-ও কি তাই? তাছাড়া 'কন্ডাক্টর'-দের তো ঢুকতে দেওয়া হয়, পরীক্ষার আগের দিন 'কেস' সিলেকসন'-এর সময় তাঁকেও থাকতে দেওয়া হয় আর তাঁর ও পুত্র মারফৎ 'কেস'-এর 'লিস্ট' অনুগতদের পাঠান হয়।

মহামান্য ব্যক্তিটি নাকি কোন মিটিংয়ে-ই থাকতে চান না, জোর করে তাঁকে আনা হয়। জানি না দেশের কোন্ কাজে তিনি লাগছেন এবং কারা তাঁকে বরণ করে নিয়ে আসেন। তবে এইটুকু জানি যে বিশ্ববিদ্যালয়ের সেনেটের সভ্য হবার জন্য তিনি পকেটের পয়সা খরচ করে জানাশোনা মহলে প্রচুর 'রেজিস্টার্ড গ্র্যাজুয়েট ভোটার' তৈরি করেন (প্রতি বছর প্রতি ভোটারের জন্য তিন টাকা করে রেজিস্ট্রেশন ফী বিশ্ববিদ্যালয়কে দিতে হয়) এবং তাঁদের ভোটেই সেনেটে ঢোকেন। এটা নিশ্চয়ই নির্লিপ্ততা এবং প্রভূত জনপ্রিয়তার নিদর্শন। এর পর বিশ্ববিদ্যালয়ের সমস্ত রিসিন্ট স্থান লাভ করেন তাঁর সেখানকার গণ্যমান্য বিনা পারিশ্রমিকের রোগী ও পৃষ্ঠপোষকদের সাহায্যে।

প্রতিবাদকারীরা বলেছেন—সিন্ডিকেটের মতানুযায়ী এম-ডি'র পরীক্ষক নির্বাচিত হন। কিন্তু তা নয়। বিশ্ববিদ্যালয়ে খবর নিলে জানতে পারবেন পরীক্ষক নির্বাচিত হয় পোস্ট-গ্র্যাজুয়েট বোর্ডে এবং সেখানে ঐ ব্যক্তির নিজের দলের লোকই বেশি। তারপর সিন্ডিকেটে সেটা নিয়মমাফিক অনুমোদনের জন্য যায়। আরও জানতে পারবেন, ঐ ব্যক্তি শিশুস্বাস্থ্য বিভাগের প্রধান হয়েও জেনারেল মেডিসিন বিভাগে নাক গলাতে আসেন, সেখানকার পরীক্ষক হন, আবার কনভেনরও। অন্য বিভাগের লোক হয়ে কেন তিনি জেনারেল মেডিসিনের পরীক্ষক হবেন, জেনারেল মেডিসিনের প্রধান থাকতে কেন তিনি এম-ডি পরীক্ষার কনভেনর হবেন? নিশ্চয়ই স্বার্থ জড়িত আছে, নইলে এই অনিয়ম কেন? কই বিশ্ববিদ্যালয়ের রসায়ন বিভাগের প্রধান তো পদার্থবিদ্যার পরীক্ষক হন না।

ঐ ব্যক্তির পুত্র না পড়ালে নাকি ছাত্রদের সমূহ ক্ষতি এই মন্তব্য সম্বন্ধে কিছু বলা দরকার। এম-ডি'তে অনেকগুলি বিষয় আছে তার মধ্যে কার্ডিওলজী (হৃদ্‌রোগ) একটা। ঐ ব্যক্তির পুত্র শুধু কার্ডিওলজীই কিছুটা পড়ান কারণ আর কিছু তিনি জানেন না। এমন দেখা দরকার এই বিষয়টা এম-ডি কোর্সের কতটুকু। লিখিত চারটি প্রশ্নপত্রের একটায় চারটি প্রশ্নের মধ্যে একটা ঐ কার্ডিওলজীতে থাকতে পারে। অর্থাৎ লিখিত পরীক্ষার মোট ভাগের এক ভাগ (৬¼%)। প্রাকটিক্যালের পাঁচটা কেস-এর মধ্যে একটা থাকতে পারে ঐ বিষয়ে অর্থাৎ ২০% এবং মৌখ দিনের ৬টা আইটেমের মধ্যে একটা (ইসি-জি) অর্থাৎ ১৬¾%। সুতরাং ঐ ব্যক্তির পুত্র সমস্ত এম-ডি কোর্সের মাত্র শতকরা ১৪ ভাগের শিক্ষক। এখন কারও বুঝতে অসুবিধা হবে না যাঁরা ঐ ব্যক্তির পুত্রের কাছে পড়েই শুধু এম-ডি হচ্ছেন তাঁরা কোন্ দরের এম-ডি এবং যাঁরা ওঁর কাছে পড়বার জন্য, ওঁর কাছে যাবার জন্য আঁকুপাঁকু করছেন তাঁদের উদ্দেশ্য কি।

মেডিক্যাল কলেজে এম-ডি পরীক্ষার সেন্টার থাকার পক্ষে যুক্তি দেখিয়ে এঁরা বলেছেন যে, এটা এশিয়ার বৃহত্তম কলেজ। এর উত্তরে শুধু এইটুকু বলা যায় যে, এঁরা সত্যিই কূপমণ্ডুক। কেউ বলেছেন যে, এটা শহরের মধ্যস্থলে অবস্থিত। আচ্ছা, এগুলিই যদি যুক্তি হবে তবে, এম, এস, এবং এস, ও পরীক্ষাও কেন ঐ কলেজেই হয় না? সঙ্গে সঙ্গে আর জি কর কলেজেও বহুবার এম, ডি পরীক্ষা হয়েছে বলে নিজেদের যুক্তির বিরুদ্ধে রায় দিয়ে এঁরা যে সাধারণ বুদ্ধির পরিচয় দিয়েছেন সেটা সত্যিই উপভোগ্য।

মায়া দেবী কোচিং নিয়েও পাশ করতে পারেন নি লিখেছেন। সমবেদনার সঙ্গে তাঁকে জানাতে চাই ও কোচিং সে কোচিং নয়।

মাননীয় নলিনীরঞ্জন সেনগুপ্ত মশাই (২৬-১২-৬৮) এখানকার এম-ডি হবার আলোচ্য উপায়কে সহজ উপায় বলে অভিহিত করেছেন। এই সূত্রে একটা গল্প মনে পড়ে গেল। কোন এক স্কুলের বালক গভীর রাত্রে দুটি পা প্রসারিত করে দাঁড়িয়ে আছে। হঠাৎ পিতার নিদ্রাভঙ্গ হল। পুত্রকে ঐ অবস্থায় দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে পিতা জিজ্ঞাসা করেন, "কি

করছিস?" পুত্রের উত্তর, "চৌদ্দপোয়া 'প্রাকটিস' করছি।" পিতার প্রশ্ন, "কেন?" পুত্র, "কাল সকালে পড়া না পারলে এইভাবেই ত' দাঁড়িয়ে থাকতে হবে।" পিতা, "এর চেয়ে ত' পড়া করা সহজ!" পুত্রের উত্তর, "না এটাই সহজ।" তাই নলিনীবাবু যাকে সহজ উপায় বলছেন, সেটা গবেটদের পক্ষে সহজ উপায়, মেধাবী আত্মমর্যাদা জ্ঞানসম্পন্ন ছাত্রদের পক্ষে সহজ উপায় নয়। তিনি আরও বলেছেন বর্তমান এম, ডি-দের মান আগের মতই। আমার প্রশ্ন,—অমলকুমার রায়-চৌধুরী, হরিহর গাঙ্গুলী, তাপসকুমার বসু, হিমাংশুকুমার রায় এবং নলিনীবাবুর নিজের সমতুল্য একটাও আধুনিক এম, ডি-র নাম তিনি করতে পারবেন কি? এঁদের নিজেদের জ্ঞানের ওপর আস্থা ছিল; তাই পয়সা এবং সুযোগ থাকতেও এম, আর, সি, পি-র জন্য ছুটতে হয় নি, আধুনিক এম, ডি-দের ছুটতে হয়।

যাই হোক, সমস্ত বাক্‌বিতণ্ডার মধ্য থেকে একটা ধ্রুব সত্য যেন মাথা উঁচু করে উঠেছে। আপনার বক্তব্যের অনুকূলে যেন সে সাক্ষ্য দিচ্ছে। এম, ডি পরীক্ষা নিয়ে ব্যক্তিবিশেষ বা গোষ্ঠীবিশেষের এই স্বার্থান্বেষী খেলা শুধু কয়েকজন এম, ডি পরীক্ষার্থীর ভবিষ্যৎ নিয়ে খেলা নয়, এটা পরোক্ষভাবে এই রাজ্যের বিপুল জনসমুদ্রের জীবন নিয়ে খেলা। আপনারা জনগণের মুখপাত্র—তাই দায়িত্ব আপনাদের অপরিসীম। দেখুন, চেয়ে দেখুন, এই দুঃসংবাদে হতবাক্ কত নিরীহ নাগরিক কি অসীম আশা নিয়ে আপনার দিকে চেয়ে রয়েছে; আকুলকণ্ঠে আপনার কাছে তাদের এবং তাদের সন্তানসন্ততির জীবন ভিক্ষা করছে। তাই আর বিলম্ব নয়, চলুন, এগিয়ে চলুন, নির্ভীকভাবে এগিয়ে চলুন। পান্থকে আজ দীর্ঘ পথ দেখে ক্লান্ত হলে চলবে না—তাকে অন্যায়কে সমাধিস্থ করতে হবে, সত্যকে প্রতিষ্ঠিত করতে হবে, রোগাক্রান্ত জনগণের সুষ্ঠুভাবে রোগমুক্তির ব্যবস্থা করতে হবে। অন্যায়কারী যতই পরাক্রমশালী হোক না কেন, কোন ভয় নেই, বিপুল জনশক্তি আপনার পিছনে আছে। আপনার মহান্ ব্রত জয়যুক্ত হবেই, তবে এগোতে হবে ধীরে, খুব সাবধানে, বল্গু পদক্ষেপে।

চলার পথে কি কি সাবধানতা অবলম্বন করতে হবে তাই আজ আপনাকে জানাতে চাই। আপনার লক্ষ্য হবে একটি নির্ভীক এবং নিরপেক্ষ তদন্তের ব্যবস্থা করা। এই রাজ্য বা অন্য রাজ্যের উপযুক্ত বিচার বিভাগীয় লোকেদের দ্বারাই শুধু এটা সম্ভব। কোন কোন পত্রলেখক কয়েকজন লোকের কাছে অনুসন্ধান করে আপনার মন্তব্য প্রকাশ করতে বলেছেন অথবা বিশ্ববিদ্যালয়ের ওপর তদন্তের ভার অর্পণ করতে বলেছেন। কিন্তু সাবধান, কিছুতেই আপনি ঐ ফাঁদে পা দেবেন না। কেন না ঐ ধরনের তদন্তে কোনদিনই সত্য উদ্ঘাটিত হবে না, জনগণও আশ্বস্ত হবে না। এই সূত্রে আপনার জানা দরকার যে, ক্ষমতাধর ব্যক্তিটি বিশ্ববিদ্যালয়ের দুজন কর্তাব্যক্তির বিনা পারিশ্রমিকের গৃহ-চিকিৎসক। তাঁরা দুজনেই খুব মহান্ ও জনপ্রিয় সন্দেহ নেই। তাই প্রকৃত উপকারী চিকিৎসকের শাস্তিবিধান করে তাঁরা জনসমক্ষে অকৃতজ্ঞ, অমানুষ হন, এটা আশা করি কেন ব্যক্তিরই অভিপ্রেত হবে না। তদন্তের ভার ঐ দুই ব্যক্তির ওপর দিয়ে তাঁদের অস্বস্তিকর অবস্থায় ফেললে আপনার জনপ্রিয়তা ক্ষুণ্ণ হবে সন্দেহ নেই। এছাড়া বিশ্ববিদ্যালয়ের বহু গণ্যমান্য ব্যক্তিই ঐ বিশেষ চিকিৎসকের চিকিৎসার সুযোগ পান বিনা পয়সায়। তাই উচ্চশিক্ষিত পণ্ডিত ব্যক্তিরা উপকারীর উপকার স্বীকার করবেন না এমন নীচতা তাঁদের কাছে আপনার আশা করা উচিত নয়। আপনি জনদরদী, জনগণের দুঃখ-দুর্দশার কথা মনে রেখে তাই সুচিন্তিত পথে এগিয়ে চলুন।

—জনৈক চিকিৎসক

* * *

গত ১৯শে অগ্রহায়ণ, ১৩৭৫ প্রকাশিত সাপ্তাহিক বসুমতীর (৭৩ বর্ষ : ২৪শ সংখ্যা) 'বঙ্গদর্শন' শিরোনামায় কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের এম. ডি ডিগ্রী লাভ সম্পর্কে মন্তব্যগুলি দৈবক্রমে চোখে পড়ায় অতিশয় মর্মাহত হইলাম, এবং তাহার প্রতিবাদ না করিয়া পারিলাম না।

"চিকিৎসাশাস্ত্রের সর্বোচ্চ ডিগ্রি এম. ডি পাওয়াটা জনৈক ব্যক্তির মর্জির উপর নির্ভরশীল, অধীত বিদ্যার উপর নয়" এই মন্তব্যটি ভিত্তিহীন ও আমার মনে হয় ইহা জনৈক পরশ্রীকাতর ও স্বার্থান্বেষী ব্যক্তির উদ্দেশ্যপ্রণোদিত অপপ্রচার। কারণ বিশ্ববিদ্যালয়ের এই পরীক্ষায় বহিরাগত বিশিষ্ট অধ্যাপক সহ চারিজন পরীক্ষক নির্বাচিত হন। সুতরাং কোন এক বিশেষ জনের মর্জির উপর পরীক্ষার ফলাফল নির্ভর করে না।

আরও কটাক্ষ করা হইয়াছে—"এ কথা কে না জানেন ঐ ব্যক্তিটির পুত্রের কোচিং ক্লাশে ভর্তি না হইলে এম. ডি ডিগ্রি পাওয়া যায় না।" এই ধরনের মন্তব্যগুলি ব্যক্তিগত বিদ্বেষমূলক ও পরশ্রীকাতরতার নজির ছাড়া আর কিছুই নয়।

যাঁর সম্বন্ধে এই মন্তব্য করা হইয়াছে তিনি একজন ছাত্রদরদী অধ্যাপক, তিনি নিঃস্বার্থভাবে তাঁহার বহুমূল্য সময় নষ্ট করিয়া সর্বশ্রেণীর ছাত্রদেরই অনুরোধে শিক্ষাদান করেন। এমন অনেকেই আছেন, যাঁহারা তাঁহার ক্লাশের সাহায্য না লইয়াই এমন কি তাঁহার ও তাঁহার পিতার ব্যক্তিগত সংস্পর্শে না আসিয়াই এম-ডি ডিগ্রী পাইয়াছেন।

এই ধরনের মন্তব্যে যদি আজ এই অধ্যাপক মহাশয় শিক্ষাদানে বিরত থাকেন, তাহা হইলে অনেক ছাত্রই বিশেষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হইবেন।

—ডাঃ ভবেশচন্দ্র সামন্ত
(কলকাতা নীলরতন সরকার মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতাল।)

* * *

"সাপ্তাহিক বসুমতী"র পাতায় এম-ডি পরীক্ষাকে কেন্দ্র করে বঙ্গদর্শনের লেখক যে ঝড়ের সূত্রপাত করেছেন, সুধীজন মাত্রেই এটা গভীর মনোযোগ দিয়ে লক্ষ্য করে যাচ্ছেন। আমার অনুরোধ, যে সৎ-সাহসের পরিচয় আপনারা দিয়েছেন, কোনপ্রকার চাপেই যেন তাকে চেপে দেওয়া না হয়। সমাজের বহুক্ষেত্রে আজ এ-ধরনের দুর্নীতি চলছে। অথচ যাদের অর্থবল নেই এবং সবচেয়ে বড় বল 'মামার বল' নেই, তারা সব জেনেও মুখে কুলুপ এঁটে রাখতে বাধ্য হন। আর 'হায় হায়' বলে শুধুমাত্র কপাল চাপড়ে চুপ করে যান।

সমাজের একটি দিকেরও অন্ধকার যদি উন্মোচিত এর ফলে হয়, তবে ভবিষ্যৎ সমাজ বঙ্গদর্শনের লেখককে আশীর্বাদ জানাবে।

আজ যাঁরা প্রতিবাদে মুখর হয়ে বলছেন —'প্রতিবাদ জানাচ্ছি', 'অমুক নয়', 'তমুক নয়', ইত্যাদি তাঁদের মুখরোচক বুলিতে আমরা সন্তুষ্ট হতে পারছি না। তাঁরা যেন নথিপত্র সহ তাঁদের বক্তব্যের সত্যতা প্রমাণ করেন। কারণ সহজভাবেই একথা মনে কৌতূহল জাগায় যে, এম-ডি পরীক্ষার মূলে যদি কোন দুর্নীতি না-ই থাকত, তবে নিছক একটা ধারণার বশবর্তী হয়ে 'বঙ্গদর্শনের' লেখক তথা অন্যান্য পত্রলেখকগণ নিজেদের ভবিষ্যৎকে অন্ধকারে নিক্ষেপ করতেন না।

সব শেষে ধন্যবাদ পত্রলেখক ডাঃ এ, কে, দাশ মহাশয়কে—যে প্রতিশ্রুতি নিয়ে তিনি এগিয়ে এসেছেন, এমন সৎ-সাহস নিয়ে যদি আরও অনেকে এগিয়ে আসেন, তবেই সমাজের মেরুদণ্ডকে প্লাস্টিক সার্জারী করে আবার সোজা করে তোলা যেতে পারে।

—শ্রীমতী শান্তি রায়
বালী

ফুচিকের দেশে

গীতা বন্দ্যোপাধ্যায়

(পূর্ব-প্রকাশিতের পর)

গত সপ্তাহের 'ফুচিকের দেশে' লেখাটি শেষ করার পর হুগলী থেকে এক ভদ্রলোকের একখানি চিঠি পেলাম। লিখেছেন, তাঁর একটি ছেলে হৃদ্‌রোগে ভুগছিল। চেকোশ্লোভাকিয়ায় গিয়ে চিকিৎসা করে ছেলেটি ভাল হয়ে ওঠে এবং পরে ওখানে লেখাপড়া শুরু করে। ছেলেটি বিয়েও করেছিল। এবং তাদের একটি মেয়ের জন্মের পর ছেলেটি হঠাৎ মারা যায়। ভদ্রলোক এবং তাঁর স্ত্রী পুত্র-শোকে এখনও কতখানি ব্যাকুল, তা চিঠি পড়ে বোঝা যায়। তাঁরা জানতে চেয়েছেন, ছেলেটিকে আমি চিনতাম কি না এবং তার স্ত্রীকেও আমি জানি কি না। স্ত্রীটি নিয়মিত চিঠি দিলেও ওঁরা আরও জানতে চান।

এই রকম একটি চিঠি পেয়ে অবশ্যই মন খারাপ হয়ে গিয়েছিল। আরও এই ভেবে মন খারাপ হয়েছিল যে, ছেলেটিকে আমি চিনতাম না এবং তার বাবা ও মাকে ব্যক্তিগতভাবে সান্ত্বনা দিতে পারলাম না। তবু এই ভেবে ভাল লাগল যে, যে দেশে গিয়ে এই বাঙালী ছেলেটি কিছুদিন জীবনটাকে হাতে পেয়ে গেল সে দেশটাকে তাঁদের সামনে আমি কিছুটা তুলে ধরতে পেরেছি।

এই সূত্রে চেকোশ্লোভাকিয়ার আ চর্য চিকিৎসা-ব্যবস্থার কথা মনে পড়ে যায়। এবং সব রকম রাজনৈতিক প্রচার-অপপ্রচার সত্ত্বেও এ কথা বলা চলে যে, চিকিৎসার ব্যাপারে বহু দেশের বহু লোক এই ছোট দেশটির কাছে চিরঋণী হয়ে আছেন। আমাদেরই পরিচিত কেউ কেউ এ দেশের চিকিৎসার গুণে নবজীবন পেয়েছেন।

ভাবতে অবাক লাগে এতটুকু এই দেশটায় খাতব জলে, প্রাকৃতিক চিকিৎসার ব্যবস্থা আছে ৫৪টি স্পা'-তে। কার-লোভিভারি, মারিয়ান্‌স্কে লাজ্‌নে, ফ্রান্টি-স্কোভা লাজ্‌নে, পিয়েশ্‌তানি আর জাপিচে তো একশো বছরেরও ওপর পৃথিবীর অসুস্থ আর পশুদের চিকিৎসা করে আসছে। এখন, গত পনের বছর ধরে এইসব স্পা'-গুলোতে বৈজ্ঞানিক নিয়মে চিকিৎসার ব্যবস্থা হয়েছে। এখানকার জল আর কাদা নিয়ে গবেষণা করে বিভিন্ন রোগের বিভিন্ন রকমের চিকিৎসা চলছে।

১৯৬৫ সালে চেকোশ্লোভাকিয়ার স্পাগুলোতে ২৫,৬৯৫টি 'বেড' ছিল। এখানে ৪২৭ জন ডাক্তার বছরে প্রায় তিন লক্ষ লোকের চিকিৎসা করছেন। পূর্ব ইউরোপের এইসব দেশে একটা জিনিস খুব লক্ষণীয়, মেয়েরা ডাক্তারী পড়ে খুব বেশি। যেসব কলেজে ডাক্তারী পড়ানো হয় তার ছাত্রসংখ্যা প্রায় ১১,০০০ মত। আর এর শতকরা ৬০ ভাগ হল মেয়ে।

কলকাতার এই স্যাঁৎসেঁতে ঠাণ্ডা ঘরে বসে, ভোর সকালে উত্তুরে হাওয়ায় কাশতে কাশতে কারলোভিভারির কথা ভাবতে কিছুটা মুশকিল দেখা দেয়। মনে হয়, বুঝি স্বপ্নে দেখা। আচ্ছা, সত্যিই কী আমি কারলোভিভারি বা তেপ্‌লিচে দেখেছি? তেপ্‌লিচে হল বোহেমিয়ার। এর খাতব জলের খ্যাতি গত বারশো বছর ধরে বিশ্ব দুনিয়ায় ছড়িয়ে পড়েছে। আর বাতের চিকিৎসার জন্যে বিখ্যাত হল পিয়েশ্‌তানি। এখানে স্লোটে আর বেঠোভেনের ঐতিহাসিক মোলাকাতের কথা মুখে মুখে আজও শোনা যায়। আরও শোনা যায় যে স্বাস্থ্যোন্নতির আশায় এখানে নাকি প্রায় ৪৮ জন রাজা বিভিন্ন সময়ে এসে, থেকে গেছেন। মারিয়ানস্কে লাজ্‌নেতে এসেছিলেন গ্যেটে, শিলার, শোপ্যাঁ, লিস্‌ট্‌ আর কার্ল মার্কস্‌।

৬০০ বছরের পুরনো কারলোভি-ভারি (কার্লসবাদ) যেন পাহাড়ী ছবি। বাঙালীর চোখে এমন পাহাড়, জল, বাড়িঘর, পার্ক, স্থাপত্য—সত্যিই দুর্লভ। আর কী পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাস্তাঘাট। আমাদের কাছে রাস্তাঘাট মানেই খাব্‌লানো-খোব্‌লানো, ময়লা বাঁকাচোরা ব্যাপার। এ বিষয়ে কলকাতা পৌরসভা নিয়ে হাল্লা হল রাজনৈতিক দায়িত্বের স্বাভাবিক পরিণতি। একজন হেসে বললেন, 'কিসের সঙ্গে কি, পান্তা ভাতে ঘি। পারও বাপু তুলনা করতে। কোথায় প্রাগ, কারলোভিভারি আর কোথায় কলকাতা!'

'কেন, ভাল হবে না কেন?'

'পাঁকে পদ্ম তো ফোটে!'

রোগীর 'ইন্‌ফেন্‌টাইল প্যারা-লিসিসের' চিকিৎসা হয়েছিল চেকো-শ্লোভাকিয়ায়। অনেকদিনের পোষা অসুখ। কিন্তু বেশ ভাল হাঁটতে পারত শেষের দিকটায়।

মোটামুটিভাবে সুস্থ থাকায় এবং এ দেশের তুলনায় অসুরের মত স্বাস্থ্য হওয়ায় স্পা'-গুলো আমার তেমন কাজে লাগে নি। যদিও বাত বংশগত, কানের হাড়ে গোলমাল—তবু চেকোশ্লোভাকিয়ায় কোনো অসুখের চিকিৎসা আমাকে করাতে হয় নি।

যুদ্ধোত্তর চেকোশ্লোভাকিয়ায় মস্ত সমস্যা হয়েছিল পশুদের চিকিৎসা। যুদ্ধের ক'টা বছর ওদের শুধু যে বাড়ি-ঘর ধ্বংস হয়েছিল তাই নয়, মানুষগুলোও নানাভাবে বিধ্বস্ত হয়েছিল। কারুর হাত ছিল না, কেউ বা পা হারিয়েছে—দৃষ্টি গেছে বা কারুর কারুর। অনেকেই নার্ভের অসুখে কেমন যেন হয়ে গিয়ে-ছিল। যারা কন্‌সেনট্রেশন ক্যাম্পে ছিল এবং স্বাধীনতার সময় বেঁচেছিল, তারা কয়েকদিন ধরে কেবল কেঁদেছে। অনাহারে, অত্যাচারে তাদের শরীরগুলো ভাঙাচোরা অবস্থায় উদ্ধার পেয়েছিল। এদের আবার স্বাভাবিক জীবনে ফিরিয়ে আনতে কম বেগ পেতে হয় নি।

এমনি একটি উদ্ধার পাওয়া ভদ্র-লোকের সঙ্গে আলাপ হয়েছিল এক কাফেতে। কফির পেয়ালাটা হাতে কাঁপছে। কথা বলতে গেলে এমন উত্তে-জনা হয়, মুখের সমস্ত পেশীগুলো নড়তে থাকে। আলাপ করতে নিজেরই অপ্রস্তুত লাগছিল। কেন না, দেখে মনে হচ্ছিল ভদ্রলোক নিজের সমস্ত দুর্বলতা

"দিল্লীপের মুখ থেকে খবরটা শুনে আমার যে কি আনন্দ হল! ওকে দুহাতে বুকে টেনে নিলাম। ও যথেষ্ট অনুশীলন করেছে, খেটেছে। তবুও বলবো এর জন্য যে-বাড়তি শক্তি-সামর্থ্যের প্রয়োজন তার সবটুকুই ও পেয়েছে বোর্নভিটা থেকে। দুধের সঙ্গে মিশিয়ে বোর্নভিটা খেতে ও বরাবরই বড্ড ভালোবাসে। শরীর সুস্থ-সবল রাখতে যে পুষ্টি, শক্তি ও সামর্থ্যের প্রয়োজন বোর্নভিটায় তা পুরোমাত্রায় রয়েছে ব'লে ওকে আমি নিয়মিত বোর্নভিটা খাওয়াই। তাই কি খেলাধুলায়, কি পড়াশুনায় সবদিকেই ছেলে আমার সমান চৌকস।"

0772.Bea

ক্যাডবেরির বোর্নভিটায় পুষ্টিকর, শক্তিদায়ক সুষম পরিমাণে কোকো, দুধ চিনি ও মল্ট মিশিয়ে এটি তৈরি করেছেন ক্যাডবেরি—প্রাণোচ্ছল পানীয় প্রস্তুতে বিশেষজ্ঞ ব'লে যাঁদের খ্যাতি একশ বছরেরও বেশি। এর কোকো-সমৃদ্ধ স্বাদ ছেলেমেয়েদের ভারী পছন্দ।

ক্যাডবেরির বোর্নভিটা খাবেন—
শক্তি, উদ্যম—এবং স্বাদের জন্যে

সম্পর্কে সচেতন এবং যতই তিনি সচেতন হচ্ছেন ততই অস্বাভাবিক দেখাচ্ছে তাঁকে। অস্বস্তির মধ্যে পরিচয়ের পালা শেষ হল। পরে দোভাষীর কাছে শুনলাম—যুদ্ধের আগে এই ভদ্রলোক ছিলেন নাম করা ইঞ্জিনীয়ার। কমিউনিস্টদের সঙ্গে বন্ধুত্বের অপরাধে এঁকে নাৎসীরা ধরে নিয়ে গিয়ে বিনা বিচারে যুদ্ধের ক'টা বছর নকসেনট্রেশন ক্যাম্পে আটক করে রাখে। শুধু আটক নয়, বহু অত্যাচার সহ্য করতে হয় এঁকে। স্ত্রী পরিবারের সঙ্গে কোনো সম্পর্ক ছিল না এই সময়টায়। যখন স্বাধীনতার পর ফিরে এলেন, তখন গোড়ায় কাউকে পেলেন না খুঁজে। অবশেষে দেখা হল স্ত্রীর সঙ্গে। অন্যরা কেউই প্রায় বেঁচে ছিলেন না। গোড়ায় স্ত্রীর সঙ্গে একটা উচ্ছ্বসিত মিলন হয়েছিল। পরে দৈনন্দিন জীবনে ধরা পড়ল যুদ্ধ কোথায় এমন দাগ রেখে গেছে যে কিছুতেই যেন মিশ খাচ্ছে না। স্ত্রী গোড়ায় অনেক চেষ্টা করেছিলেন মিলে-মিশে থাকার। কিন্তু পঙ্গু ভদ্রলোকের মনে বিরাট দ্বিধার পাঁচিল—কিছুতেই স্বাভাবিক জীবনের কাছে আসতে পারছেন না।

এমনি অসংখ্য সমস্যা দেখেছি ইউরোপ জুড়ে। অনেক দিনের একটা ধ্বংসের প্রাবহাওয়ার থেকে পরে সুস্থ জীবনকে আপন করে নেবার লড়াইটা অনেক ক্ষেত্রে মর্মান্তিক হয়েছে। জার্মানীতে এই ধরনের সমস্যা সব চাইতে বেশি প্রকট হয়ে উঠেছিল। পুনর্বাসন সমস্যার কত মর্মান্তিক দিক যে মানুষকে উথাল-পাথাল করেছে তার সীমা-পরিসীমা নেই। আর সম্ভবত সেই জন্যেই যুদ্ধের পরের ইউরোপে অর্থনৈতিক স্বাচ্ছন্দ্য ফিরে এলেও মানুষ মানসিক স্বাচ্ছন্দ্য ফিরে পেয়েছে কম ক্ষেত্রে। কেমন যেন উতলাভাব—মনগুলো যেন কিসের আশঙ্কায় অস্থির। ঘা শুকিয়েছে কিন্তু গভীর দাগগুলো সব সময় অস্বস্তি জাগায়।

কিন্তু এইসব ক্ষতবিক্ষত দেশ আর মানুষের লড়াই করার ক্ষমতা দেখলে সেলাম না ঠুকে পারা যায় না। একটা ভাল যে এদের সব কিছু ছিটকে বেরিয়ে পড়েছিল। তাই জীবনের তাগিদটা ছিল খুব স্বাভাবিকভাবে জোরাল। আমাদের মত মাটির তলার কীট আর ড্রেনের জল ঘেঁটে প্রেরণা এদের খুঁজতে হয় নি।

ইলিনাকে মনে আছে। জাতে ইহুদী। তাকে আউসউইচিম কনসেনট্রেশন ক্যাম্পে পাঠানো হয়েছিল, কেবলমাত্র ইহুদী হবার অপরাধে। খুবই ছোট ছিল যুদ্ধের শুরুতে। হঠাৎ একদিন পাড়ার সমস্ত ইহুদীদের ধরে নিয়ে গেল জার্মান ফ্যাসিস্টরা। এর আগে, ভয় পেয়ে যারা পালিয়ে অন্য জায়গায় চলে গিয়েছিল তারাও নিষ্কৃতি পায় নি। ইহুদীদের ঠিক হন্যে কুকুরের মত সারা ইউরোপে ছুট করিয়েছিল ফ্যাসিস্টরা। তারই পরিণামে আজ ইজরাইল। যেমন আমাদের নিজস্ব ঢঙে পাকিস্তান।

ইলিনা অনেকগুলো ভাষা জানত বলে ওকে জেলে দোভাষীর কাজ করতে হত। সেই কারণে ওকে ঠিক মেরে ফেলা হয় নি। কিন্তু কোনো করুণাও করা হয় নি। ছোট চোদ্দ বছরের মেয়েটিকে গ্যাসচেম্বারে পাঠাবার আগে জ্যান্ত বাচ্চাগুলোকে উলঙ্গ করে ফেলার দায়িত্ব দিয়েছিল কয়েকদিনের জন্যে। মেয়েটা সেই দায়িত্ব পালন করতে গিয়ে প্রায় পাগল হয়ে গিয়েছিল। বিভিন্ন পরিবারের হরেকরকম অপরাধ। কেউ গোপন আন্দোলনকারীদের সাহায্য করেছে। কেউ বা হয়তো কেবল অত্যাচার দাঁড়িয়ে দেখার সময় সমবেদনার কথা বলায় গ্রেপ্তার হয়েছে। তাদেরই পরিবারের দুধের শিশুগুলোকে পাঠানো হচ্ছে কনসেনট্রেশন ক্যাম্পের গ্যাসচেম্বারে—'লিকিউডেট' করার জন্যে।

এমনি সব মর্মান্তিক অভিজ্ঞতার ভেতর দিয়ে চেকোশ্লোভাকিয়ার মানুষ পুনর্জীবন লাভ করেছে।

[ক্রমশঃ]

উত্তরবঙ্গের শিল্পী, সাহিত্যিক ও বুদ্ধিজীবীদের দুর্দিনে শিল্পী, সাহিত্যিক ও বুদ্ধিজীবীদের প্রতি আবেদন

উত্তরবঙ্গের ধ্বসবিধ্বস্ত ও বন্যা-বিপর্যস্ত মানুষগুলির অসহায় অবস্থার কথা আপনারা জানেন। তাঁরা আপনাদের সহানুভূতি থেকে বঞ্চিত হন নি। কিন্তু বন্যার্তদের জন্য যে পরিমাণ সরকারী সাহায্য পাঠানো ও বিতরণ করা হচ্ছে তা প্রয়োজনের তুলনায় খুবই সামান্য। এই প্রসঙ্গে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য যে, উত্তরবঙ্গের বন্যাগ্রস্ত সাহিত্যিক, সাংবাদিক, মঞ্চাভিনেতা, চিত্রশিল্পী, যন্ত্রসংগীতশিল্পী, যাত্রাভিনেতা ও যাত্রাগানের অন্যান্য শিল্পী, ফটোগ্রাফার ও গ্রন্থাগারিকদের মধ্যে কোনো প্রকার সরকারী সাহায্য আজ পর্যন্ত পৌঁছয় নি। অথচ এঁরা শিল্পিসুলভ স্বাভাবিক কুণ্ঠাবশত উপযাচক হয়ে দুর্দিনের মধ্যে সাহায্য প্রার্থনা করতেও পারেন নি। এই পরিস্থিতিতে সাপ্তাহিক বসুমতী উত্তরবঙ্গ বন্যাত্রাণ কমিটির তহবিল থেকে যৎকিঞ্চিৎ সাহায্য পাঠানো হয়েছিল—যাতে সেখানে মুমূর্ষু সংস্থাগুলিকে কিছুটা পুনরুজ্জীবিত করা সম্ভব হয়। বলা বাহুল্য পরিমিত সাহায্যে সে প্রয়াস সফল হওয়া অসম্ভব। এই কারণে সাপ্তাহিক বসুমতী উত্তরবঙ্গ বন্যাত্রাণ কমিটির পক্ষ থেকে আরো সাহায্য সংগ্রহের উদ্দেশ্যে অবিলম্বে জরুরী কর্মসূচী নিয়ে কাজ সুরু করার জন্য একটি সাব কমিটি গঠন করা হয়েছে। এই সাব কমিটির সভাপতি মনোনীত হয়েছেন শ্রীনারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় এবং আহ্বায়ক হয়েছেন শ্রীসবিতাব্রত দত্ত। বন্যার্ত শিল্পী ও বুদ্ধিজীবীদের রক্ষার জন্য দেশের সর্বশ্রেণীর শিল্পী ও বুদ্ধিজীবীরা এগিয়ে আসবেন—এই দৃঢ় ধারণা নিয়ে সাব কমিটি কলকাতায় সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছেন। উপরন্তু সাব কমিটি মনে করেন যে, নীরব ঐ বন্যার্তদের দুরবস্থা মোচনে শিল্পী ও বুদ্ধিজীবীরা এবং তাঁদের প্রতিষ্ঠানগুলি যদি সমষ্টিগত তথা ব্যক্তিগত সাহায্য নিয়ে এই মুহূর্তে এগিয়ে না আসেন, তাহলে উত্তরবঙ্গের শিল্প ও সংস্কৃতির ভবিষ্যৎ অন্ধকারাচ্ছন্ন হয়ে উঠবে। আপনাদের সকলের এবং প্রত্যেকের সাহায্য সাপ্তাহিক বসুমতী উত্তরবঙ্গ বন্যাত্রাণ কমিটির তহবিলে এসে পৌঁছলে অবিলম্বে তা উত্তরবঙ্গের উপরি উক্ত শিল্পী ও বুদ্ধিজীবীদের মধ্যে বিতরণ করা হবে। বন্যার্ত শিল্পী ও বুদ্ধিজীবীরা কারো দ্বারস্থ নয়, তাই আজ তাঁদের দ্বারে দ্বারে গিয়ে বাঁচিয়ে তোলার দায়িত্ব শিল্পী ও বুদ্ধিজীবীদের।

সাপ্তাহিক বসুমতী উত্তরবঙ্গ বন্যাত্রাণ কমিটি
১৬৬, বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী স্ট্রীট, কলকাতা-১২

সাহিত্যস্রষ্টার সৃষ্টি কী নিরঙ্কুশ?

দ্বিজেন্দ্রলাল নাথ

সাহিত্য রচনার উৎস সম্পর্কে আমাদের সাহিত্যাচার্যরা খুব ভালো ভালো জ্ঞান দান করে গেছেনঃ যেমন, সাহিত্য রচনার কোন উদ্দেশ্য নেই; সাহিত্য ছেলের হাতের মোয়াও নয়, গুরুর হাতের বেতও নয়' খেলার মাঠে যে আনন্দ পাওয়া যায় সাহিত্য রচনা এবং উপভোগের সাহায্যে শুধু সে আনন্দই লভ্য, একমাত্র রস সৃষ্টিই সাহিত্য রচনার লক্ষ্য—এমনি কতো চমক-লাগানো কথা। শুনতে বেশ ভালোই লাগে।

তবে বর্তমান প্রশ্নমনস্কতার যুগে অনেক প্রশ্নই আমাদের মনে জাগে। উকীল, ব্যারিস্টার, ইঞ্জিনীয়ার, শিক্ষক, ডাক্তার, কলকারখানার সামান্য কর্মী থেকে পরিচালক সকলেরই নিজের কাজ সম্পর্কে দায়-দায়িত্বের অন্ত নেই। শুধু কী সাহিত্যস্রষ্টার সৃষ্টিকার্যে কোন দায়িত্ব নেই? আনন্দের অভিব্যক্তি দিতে গিয়ে তাঁর স্বাধীনতার সীমা কতটুকু? মনের তাগিদে লিখতে গিয়ে নিজের খেয়াল-খুশিমত স্বেচ্ছাচারকে কী তিনি প্রশ্রয় দিতে পারেন? না কী ব্যক্তি, সমাজ, দেশ এমন কি বৃহত্তর মানবসমাজের আত্মিক উন্নয়নের জন্য সভ্যসমাজে যে অলিখিত আইন আছে তার যথোচিত মর্যাদা দিয়ে সংযতভাবে তিনি সৃষ্টিকার্যে মনোযোগী হবেন?

সৃষ্টিকর্মে সংযত সাধনার কথা বলতে গিয়ে আমরা রচনার সুডৌল পারিপাট্য, সুনীতি এবং শালীনতা মেনে লেখার কথাও বলতে চাই নে। নিত্য-নতুন ভাবধারার উদ্ভাবন এবং আঙ্গিক মক্স করার যুগে ওসব কথাও আজ পুরনো ও সেকেলে হয়ে গেছে। পুরনো যুগের লেখকদের বুদ্ধি-কাঁচা, অনুভূতি ভোঁতা, আঙ্গিক অনুজ্জ্বল, সুতরাং তাঁরা মানবাত্মার মহিমা ঘোষণাকে সাহিত্য সৃষ্টির চরম লক্ষ্য বলে মেনে নিয়েছিলেন —বিগত যুগের লেখকদের প্রতি এমন একটি উন্নাসিক মনোভাব এ-যুগের লেখক-সমাজে সোচ্চার হয়ে উঠেছে। এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছে আর একটি বিদ্রোহী মনোভাব—লেখকের স্বাধীন আত্মপ্রকাশের ওপর হাত দেবার এক্তিয়ার কারো নেই—না ব্যক্তির, না সমাজের, না রাষ্ট্রের, না বৃহত্তর মানবসমাজের। এতে নাকি শিল্পীর স্বাধীনতা এবং বুদ্ধির মুক্তি ব্যাহত হয়। অর্থাৎ সৃষ্টিকর্ম হওয়া চাই নিরঙ্কুশ।

এক শ্রেণীর সাহিত্যশিল্পীর এ ধরনের মনোভাবের ফলে সাম্প্রতিককালে সৃষ্টিধর্মী বাংলা সাহিত্যের হাওয়া কোন্ দিকে বইতে শুরু করেছে তা বোধ হয় কোন চক্ষুষ্মান্ বুদ্ধিমান পাঠককে বলে দিতে হবে না। পাঠককে ব্যক্তি ও সমাজ-জীবনের গ্লানি উদ্ধার করবার সৎ-সাহসের নামে সাহিত্যের ভাবভঙ্গীতে যে স্বেচ্ছাচার আজ উৎকটভাবে আত্মপ্রকাশ করেছে তাতে প্রাচীনপন্থীরা যে শুধু মাথায় হাত দিয়ে বসেছেন তাই নয়—যাঁরা সাহিত্যক্ষেত্রে সব সময় নতুনকে অভ্যর্থনা জানাতে উন্মুখ তাঁরা পর্যন্ত ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে গেছেন। সভয়ে তাঁরা ভাবছেন, এই কী আমাদের গণতন্ত্রী দেশে ব্যক্তি-স্বাধীনতা তথা শিল্পীর স্বাধীনতার পরিণতি? জটিল রাজনীতি এবং অর্থ-নীতির আবর্তে ব্যক্তি ও সমাজজীবন তো এমনিতেই ঘুরপাক খাচ্ছে। তার মধ্যে সমাজবাস্তবতার নামে শিল্প-স্বাধীনতার ধ্বজাধারী লেখকেরা বিচার-হীন এক শ্রেণীর পাঠক-পাঠিকাকে পঙ্কিলতার কোন্ নরককুণ্ডে নিক্ষেপ করছে?

বিবেকবান কোন কোন সৎ পাঠক স্বেচ্ছাচারী লেখকদের সমাজের চোখে নিন্দিত করবার অভিপ্রায়ে ইদানীংকালে আদালতের আশ্রয় নিয়েছেন। আদালত সমাজ-বিরোধী বিবেচনায় কোন কোন লেখককে এবং প্রকাশককে দণ্ডিতও করেছেন। কিন্তু সৎ পাঠকেরা সাধারণ পাঠকমনের ওপর এরূপ দণ্ডদানের সুদূরপ্রসারী প্রভাবের কথা ভেবে দেখেছেন কী? নিষিদ্ধ ফল ভক্ষণের জন্য কৌতূহল আদিম যুগ থেকে এ পর্যন্ত মনুষ্যসমাজে চলে আসছে। আশা করা যায়—ভবিষ্যতেও চলবে, কারণ মানুষের ওপর ওটা বিধাতার অভিশাপ। অশালীনতা ও অশ্লীলতার দায়ে দণ্ডিত হবার পূর্বে যে বই অনেক পাঠক পড়েন নি বা পড়বার সুযোগ পান নি—এখন বইখানি কি রকম বিকৃত রুচিসম্পন্ন সে সম্পর্কে ওয়াকিবহাল হবার জন্য আরো বেশি করে পড়বেন। এতে লেখক এবং প্রকাশকের 'ব্ল্যাক মনি' কামাবার পথ আরো সুগম হল।

সুতরাং সৃষ্টিধর্মী রচনার দেহ থেকে এ দুষ্ট ক্ষতকে অপসারণ করবার জন্য ব্যক্তিগত প্রচেষ্টায় আইনের আশ্রয় নিলে চলবে না। ডাক্তারের ছুরি চালিয়ে সে ক্ষতকে একেবারে নির্মূল করে দিতে হবে। এ অপসারণের ক্ষমতা আছে ব্যক্তির নয়—রাষ্ট্রের। সরকারী 'সেন্সর' (Censor) ছাড়া কোন সিনেমার বইকে জনসাধারণের সামনে পরিবেষণ করবার অনুমতি দেওয়া হয় না, পাছে সে বই জনসাধারণের মনের ওপর কোন প্রতিকূল প্রভাব বিস্তার করে। সিনেমার ক্ষেত্রে সরকারী নিয়ন্ত্রণ যদি আবশ্যিক বিবেচিত হয়, সৃষ্টিধর্মী সাহিত্যের বেলায় তা হবে না কেন? সমাজমনের ওপর সাহিত্যের প্রভাব কী সিনেমার চাইতে কম? কথাটি আমাদের রাষ্ট্রনায়কদের ভেবে দেখবার মত।

বাঁচবার পক্ষে অপরিহার্য খাদ্য সংগ্রহ ব্যাপারে আমরা পূর্ণ বা আংশিক খাদ্য নিয়ন্ত্রণ নীতি মেনে নিয়েছি। জানি, সাহিত্য রচনার ক্ষেত্রে সে সরকারী নিয়ন্ত্রণের কথা উঠলে হৈ-চৈ পড়ে যাবে। বলা হবে গণতন্ত্রের নীতি মাড়িয়ে রাষ্ট্র শিল্পীর স্বাধীনতা হরণ করছে। আমাদের সরকার এত বৈষ্ণবভাবপন্থী যে, শুধু মাত্র শিল্পীর স্বাধীনতা নয়, স্বেচ্ছাচার পর্যন্ত নীরবে সহ্য করে। তথাপি শিল্পীর স্বাধীনতা নিয়ে আমাদের দেশের এক শ্রেণীর লেখক যে তুলকালাম কাণ্ড বাধিয়ে তুলেছিলেন তা নিশ্চয়ই অনেক পাঠকের স্মরণ আছে। এই দৈবানুগৃহীত দেশে আমাদের সাহিত্যশিল্পীরা যেন বিধাতার জীব, তাঁদের ইচ্ছা-বিচরণে কারো কোন কথা কইবার অধিকার নেই। এ অবস্থায় তাঁরা সাহিত্যকে যে কোন্ পথে টেনে নিয়ে যেতে পারেন—'তরঙ্গ রোধিবে কে?'

এভাবে স্বাধীনতার নামে স্বেচ্ছাচারকে প্রশ্রয় দিয়ে গণতন্ত্রের সমাধি রচনার প্রস্তুতি করছেন আমাদের এক শ্রেণীর সাহিত্যশিল্পী। বলিষ্ঠ প্রাণময় সৃষ্টির সাহায্যে ব্যক্তি, সমাজ, জাতি, দেশের চিত্তভূমিকে দৃঢ়ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠা করবার অভিপ্রায় এঁদের নেই। একমাত্র জনপ্রিয়তার সাহায্যে ব্যবসায়িক সাফল্যই এঁদের লক্ষ্য। এবং যেহেতু আমাদের গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র এখনও দুর্বল,

শিল্পের মত অসহায়। সে কারণে সাহিত্য-শিল্পী নামধেয় কোন কোন লেখকের সমাজ-বিরোধী রচনাকেও নির্বিবাদে সহ্য করে। সুস্থ সবল জাতি গঠন পরিকল্পনা যদি আমাদের রাষ্ট্রের একমাত্র লক্ষ্য হত তাহলে এ ধরনের মরবিড লেখকদের স্থান কলকাতার সুদৃশ্য আরামদায়ক ফ্ল্যাটে না হয়ে হতো অন্ধকারাচ্ছন্ন নির্জন কারাগৃহে।

এ প্রসঙ্গে সোভিয়েট গণতন্ত্রে সোভিয়েট লেখকসঙ্ঘের ভূমিকার কথা মনে হওয়া অস্বাভাবিক নয়। এ লেখক-সঙ্ঘ সে দেশের যোজনাগুলির সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে বিজড়িত। এর সভ্যরা যোজনার সঙ্গে সাযুজ্য রেখে দেশের বিস্তৃত জনজীবন সম্পর্কে ব্যাপক অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেন। লিখবার সময় সে অভিজ্ঞতার সাহায্যে তাঁদের এত সাবধানে লিখতে হয় যাতে সে লেখা পড়ে সোভিয়েট নাগরিক জাতীয় উন্নয়ন কার্যে নিজেদের প্রস্তুত করতে পারে। সোভিয়েট লেখকসঙ্ঘের দায়িত্ব, রচনার পরিকল্পনা এবং বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে শ্রীপ্রবোধকুমার সান্যাল তাঁর 'রাশিয়ার ডায়েরী'তে যা লিখেছেন তা আমাদের স্বেচ্ছাচারী সাহিত্যশিল্পীদের অনুসরণযোগ্য বিবেচনায় তার প্রাসঙ্গিক অংশ নিম্নে উদ্ধৃত হল :

> "সকল জায়গা থেকে চলিষ্ণু জীবনের ছবি তুলে আনা, নতুন ভাষ্য তুলে ধরা, নতুন উৎসাহের কথা বলা, নবতম অধ্যবসায় ও কর্ম-শক্তিকে জাগ্রত করা।...সোভিয়েট কাব্যে বেদনা বা কান্নার শব্দ শোনা যায় না।...সাহিত্যে যৌন আবেদন এবং অশ্রু বা নৈরাশ্যের উচ্ছ্বাসকে 'এক্সপ্লয়ট' করে ক্যাপিটালিস্ট দেশের 'প্রকাশকরা' ধনী হয়।... বুর্জোয়া লেখকরা এই নৈরাশ্য এবং দুঃখবাদকে ভাঙিয়ে করে খায়। দেশ যত বেশী নৈরাশ্যে ভরা, তার কাব্য তত বেশী। প্রণয়াশ্রুজড়িত। সোভিয়েট কাব্যে অশ্রু কম, এবং সোভিয়েট উপন্যাসে বিচ্ছেদ বিয়োগের সুর আরো কম।... সোভিয়েট উপন্যাসে পরস্ত্রীর সঙ্গে অবৈধ কারবার, স্বামীকে লুকিয়ে স্ত্রীর পক্ষে অভিসারে যাওয়া, কুমারী মেয়েকে অগাধ জলে ভাসিয়ে পালানো, ভালোবাসা নিয়ে অস্বাস্থ্যকর বিতর্ক বা কান্নাকাটি, বেকার অবস্থার পরিচয়, লম্পট পুরুষ বা মেয়ের প্রতি স্নেহ প্রকাশ্য জনসঙ্ঘকে বাদ দিয়ে একের প্রচারকার্য—এগুলি অশুভ চিন্তার পরিচয়। ওরা চাইছে সুস্থ, সবল, উৎসাহী, অধ্যবসায়ী, প্রফুল্ল এবং উন্নতিশীল সোভিয়েট রাষ্ট্রের পরিচয় সাহিত্যের ভিতর দিয়ে শুনতে। '...দেশের উন্নতি অবনতির সঙ্গে লেখকের দায়িত্ব জড়ানো।'"
>
> [পৃঃ ৩০৩-৩০৪]

দুর্ভাগ্যের কথা, আমাদের স্বেচ্ছাচারী লেখকগোষ্ঠী দেশ ও জাতির উন্নতির জন্য কোনরকম দায়িত্ব মানতে নারাজ। দায়িত্বের কথা তুললেই এঁরা এনে ফেলেন শিল্পীর স্বাধীনতার কথা। নানা তর্ক নানা রকম ফেকড়া তুলে মূল প্রশ্নটিকে এড়িয়ে যেতে চান এঁরা জানা-পাপী। সুতরাং রাষ্ট্রের দিক থেকে শক্ত হাতে এঁদের রাশ টেনে ধরা দরকার। নাহলে এঁদের অসংযত উদ্দাম গতি রোধ করা যাবে না।

★★ সদ্য প্রকাশিত হইয়াছে ★★

স্বনামধন্য সাহিত্যিক
ও মনস্বী ব্যারিষ্টার

নারদরঞ্জন দাশগুপ্তের
গল্পাবলী

গল্পাবলীতে
আছে দুইখানি
সুবৃহৎ ও
সুপাঠ্য
উপন্যাস

সুশান্ত-সা
ও
নীল শাড়ী

পৃষ্ঠা সংখ্যা
সর্বসমেত
৬০৪

আজিকার সাহিত্যে
অভিনব সংযোজনা

মূল্য মাত্র দশ টাকা

বসুমতী (প্রাঃ) লিঃ
কলিকাতা-১২

আসন্ন মধ্যবর্তী নির্বাচন ও তার পরিপ্রেক্ষিত

॥ পর্যবেক্ষক ॥

(মতামত লেখকের)

মধ্যবর্তী নির্বাচন ক্রমশ এগিয়ে আসছে। শুধু পঃ বাংলাতেই নয়, আরও তিনটি রাজ্য—বিহার, উত্তরপ্রদেশ ও পাঞ্জাবে একই দিনে মধ্যবর্তী নির্বাচন হতে চলেছে। পঃ বাংলা থেকে পাঞ্জাব, অর্থাৎ ভারতের প্রায় সমগ্র উত্তর ও পূর্ব অংশ জুড়ে এই নির্বাচন। জনসংখ্যার দিক থেকে সমগ্র দেশের এক-তৃতীয়াংশেরও বেশি মানুষ নির্বাচনে অবতীর্ণ হচ্ছে। সুতরাং এই মধ্যবর্তী নির্বাচন প্রায় সাধারণ নির্বাচনেরই আকার ধারণ করেছে।

মধ্যবর্তী নির্বাচন হলেও একই দিনে সবগুলি রাজ্যে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হচ্ছে কেন তার কারণও অজ্ঞাত নয়। মুখ্য নির্বাচনী কমিশনার বলেছেন, এক জায়গার নির্বাচন-ফল যাতে অন্য জায়গাকে প্রভাবিত করতে না পারে তারই জন্য একসঙ্গে সব নির্বাচন করা হচ্ছে। অর্থাৎ, শুধু আকারেই সাধারণ নির্বাচনের মতো নয়, রাজনৈতিক ফলাফলের দিক থেকেও এ-নির্বাচনকে সাধারণ নির্বাচনের মতোই গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে। বরং আমি বলব এতদিনের সমস্ত সাধারণ নির্বাচনের চেয়েও এই মধ্যবর্তী নির্বাচনের রাজনৈতিক গুরুত্ব অনেক বেশি। কেন না, এ-নির্বাচন হচ্ছে একটা প্রকাণ্ড ওলট-পালটের অবস্থার মধ্যে, যে-অবস্থা কোনো সাধারণ নির্বাচনের সময় ছিল না, এমন কি চতুর্থ সাধারণ নির্বাচনের সময়ও ছিল না। পরিবর্তনের জন্য নির্বাচন-সংগ্রাম আর ক্ষমতা-ভারসাম্যের পরিবর্তন হয়ে যাওয়া অবস্থায় নির্বাচন-সংগ্রাম, দুইয়ের মধ্যে তফাৎ আছে। ক্ষমতা-ভারসাম্যের ওলট-পালট হয়ে যাওয়া অবস্থায় নির্বাচন-সংগ্রামে নতুন পরিপ্রেক্ষিত, নতুন গুরুত্ব, নতুন সম্ভাবনা এসে যায়।

আজকের অবস্থা কী? প্রায় নিশ্চিত কংগ্রেসী-শাসনের জায়গায় প্রায় নিশ্চিত কংগ্রেসী-শাসন-অবসানের সম্ভাবনাই আজকের অবস্থার লক্ষণ। সংখ্যায় হিসাব করে কংগ্রেসী-শাসনের রাজ্য বেশি কি কম সেটা প্রধান বিচার্য নয়। কেন্দ্রে কংগ্রেস-শাসন যে অপ্রতিহত সেটাও প্রধান বিচার্য নয়। অবস্থা যে ২ বছর আগে থেকে সম্পূর্ণ নতুন দিকে মোড় ঘুরেছে সেটাই প্রধান বিচার্য। নিশ্চিত ক্ষমতা কংগ্রেসের ভেঙে গিয়েছে এবং অনিশ্চিত অবস্থার ফাঁদ ক্রমশই বেশি করে ঘাড়ে চেপে বসছে।

১৯৬৭-তে অনেকগুলি রাজ্যে কংগ্রেস সংখ্যালঘু হয়েছে। শুধু তাই নয়, কেন্দ্রেও, অর্থাৎ লোকসভাতেও দুই-তৃতীয়াংশের কম শক্তি কংগ্রেসের। দুই-তৃতীয়াংশের কম শক্তির অর্থ, সংবিধান-সংশোধনের জন্য প্রয়োজনীয় ভোট এককভাবে কংগ্রেসের নেই। শাসন-শক্তির দিক থেকে এটি একটি উল্লেখযোগ্য শক্তি-হ্রাস—অন্তত কংগ্রেস যেভাবে শাসন-শক্তির ব্যবহার করে এসেছে।

অনেকগুলি রাজ্যে অ-কংগ্রেসী শাসন যে স্থায়ী হয় নি, সেটাও বড় কথা নয়। অ-কংগ্রেসী সরকার স্থায়ী হলেও, ক্ষমতায় ফিরে আসার নিশ্চিত অবস্থা কংগ্রেসের নেই। প্রচণ্ড সংঘাতের মধ্য দিয়ে শক্তি-পরীক্ষা চলেছে সে-সব রাজ্যে, তারই ফলাফল নির্ধারিত হবে মধ্যবর্তী নির্বাচনে। এবং এতই অনিশ্চিত অবস্থা কংগ্রেসের যে, সরাসরি বামপন্থী-গণতান্ত্রিক শক্তির সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার সাহসও তারা হারিয়েছে। নানাভাবে তৃতীয় শক্তির সাহায্যে বামপন্থী শক্তিতে ভাঙন ধরিয়ে নির্বাচন-দ্বন্দ্ব উত্তীর্ণ হবার চেষ্টা করছে। এবং ক্ষমতার অনিশ্চিত অবস্থা কংগ্রেসের যত বাড়ছে, ততই নতুন ভাঙনের সম্মুখীন হচ্ছে তারা দিনের পর দিন। মধ্যবর্তী নির্বাচনের মুখে দাঁড়িয়েই বিহার ও উত্তরপ্রদেশে কংগ্রেসের নতুন ভাঙন দেখা দিয়েছে। মধ্যবর্তী নির্বাচনের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েও হরিয়ানায় আবার কংগ্রেস ক্ষমতা হারাতে বসেছে। সব মিলিয়ে এ এমন একটা ওলট-পালটের অবস্থা যে, আসাম, মহারাষ্ট্র, অন্ধ্র প্রভৃতি কয়েকটি রাজ্য ছাড়া নিশ্চিন্ত হবার মতো কোনো রাজ্যই আর কংগ্রেসের হাতে নেই। শুধু কেন্দ্রের শাসন-ক্ষমতার লেবেল লাগিয়ে এই বিরাট ওলট-পালটের অবস্থাকে আড়াল করা যায় কি? এই পরিস্থিতিতে চারটি রাজ্যে মধ্যবর্তী নির্বাচন শুধু সেই রাজ্যগুলিরই ফলাফল নির্ধারণ করবে না, তার সুদূরপ্রসারী প্রভাব আসবে সারা দেশেই।

এই জন্যই এই মধ্যবর্তী নির্বাচনের নতুন গুরুত্ব, নতুন পরিপ্রেক্ষিত। কংগ্রেসের দিক থেকে এ-নির্বাচন-সংগ্রাম আত্মরক্ষার সংগ্রাম। সেই জন্যই লক্ষ্য করা যায় যে এবারে কংগ্রেসের শ্লোগানও নতুন এবং স্পষ্টতই আত্মরক্ষামূলক। বরাবর আমরা দেখেছি কংগ্রেস-প্রচারে কংগ্রেস শাসনের কীর্তির কথা, যত কিছু কংগ্রেস-শাসন দেশকে দিয়েছে সেই কথা। কিন্তু এবার সে-সব কথা গৌণ, মুখ্য কথা হচ্ছে Stable Government বা স্থায়ী গভর্নমেণ্ট কে করতে পারে—বিরোধীপক্ষ, না কংগ্রেস? যুক্তফ্রন্টের মধ্যে বহু দল, তাদের ঐক্য স্থায়ী নয়, তাই তাদের চেয়ে কংগ্রেসের পক্ষেই গভর্নমেণ্টের স্থায়িত্ব রক্ষা করা বেশি সম্ভব—এটাই হচ্ছে কংগ্রেসের আবেদনের প্রধান কথা। প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী পঃ বাংলার নির্বাচনী প্রচারের উদ্বোধন করতে গিয়ে এই কথাটার উপরই জোর দিয়েছেন। অন্যান্য কংগ্রেস-নেতাদের মুখে এটাই প্রধান কথা।

কিন্তু এই আত্মরক্ষার শ্লোগানে লোকে আকৃষ্ট হবে কি? যুক্তফ্রন্টের ক্ষমতা তো অল্প দিনের। তার স্থায়িত্বের শেষ পরীক্ষা তো এখনও হয় নি। তাছাড়া স্থায়িত্বের মূলধন নিয়ে যুক্তফ্রন্ট দাঁড়ায়ও না। যুক্তফ্রন্ট দাঁড়ায় তার কর্মনীতির উপর—সেটাই যুক্তফ্রন্টের আসল কথা। কিন্তু কংগ্রেস তো বিশ বছর ধরে রীতিমতো স্থায়িত্ব নিয়েই ছিল এবং সেই স্থায়িত্বের জোরেই ১৯৫৭-র তৈরি কেরালার কমিউনিস্ট গভর্নমেণ্টকেও উৎখাত করতে পেরেছিল। বিশ বছরের সেই স্থায়িত্বও যদি আজ ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে যায়, তাহলে নতুন করে স্থায়িত্বের বড়াই করা কি নিতান্ত অসার মনে হয় না?

কিন্তু তবু এই স্থায়িত্ব ফিরিয়ে আনার ব্যর্থ আবেদন করা ছাড়া কংগ্রেসের আর কোনো পথ নেই। কেন না, শুধু নির্বাচকমণ্ডলীকে আকৃষ্ট করাই নয়, এই স্থায়িত্বের প্রশ্নের উপর তাদের কেন্দ্রীয় সরকারের মামুলী কর্মসূচীও নির্ভর করছে। চতুর্থ পরিকল্পনা বার বার চেষ্টা করেও শুরু করাই গেল না আজ পর্যন্ত। এবং চতুর্থ পরিকল্পনা বানচাল হয়ে যাবার ফলেই দেশের উন্নয়ন প্রকল্প বন্ধ, কর্মসংস্থান বন্ধ, শিল্প-সংকট ও তজ্জনিত ক্রমবর্ধমান শ্রমিক-সমস্যা এবং তারই জরুরদস্তি সমাধানের চেষ্টায় সরকারী দমননীতি বৃদ্ধি—এই সামগ্রিক সংকটের মধ্যে ফেলে দেশকে নতুন করে আঘাত করার দায়িত্ব কেন্দ্রীয় সরকারের চতুর্থ পরিকল্পনা চালু করতে ব্যর্থ হওয়ায়। কিন্তু কেন চতুর্থ পরিকল্পনা ব্যর্থ হল? মার্কিনী-সাহায্য ছাড়া পরিকল্পনা চালু করার ক্ষমতা কংগ্রেস-সরকারের নেই। আর মার্কিনী-সাহায্যও আসবে না, যতক্ষণ না দেশের ক্ষমতা-ভারসাম্য কংগ্রেসের হাতে থাকছে। তাই আমরা দেখলাম যে চতুর্থ সাধারণ নির্বাচনের পর থেকে মার্কিনী-সাহায্যেও ইতস্তত ভাব শুরু হয়েছে, আর চতুর্থ পরিকল্পনাও শিকেয় উঠেছে। পঃ বাংলা, বিহার, উত্তর-প্রদেশ, পাঞ্জাব প্রভৃতি রাজ্যে রাষ্ট্রপতির শাসন হয়ে যাবার পর চেষ্টা-চরিত্র করে কেন্দ্রীয় সরকার মার্কিনী সুরকে একটু অনুকূল করে তুলেছিলেন ঘটে। কিন্তু সত্যই stability ফিরে না এলে এবং কংগ্রেসের হাতেই সেই stability না এলে, মার্কিনী-সাহায্য তো কিছুতেই নিশ্চিত হতে পারে না। অবস্থাটা সেই দিকে যাবে কি না তা বোঝবার জন্যই যে মধ্যবর্তী নির্বাচনের প্রাক্কালে ম্যাকনামারার ভারত-আগমন তা যে কোনো লোকেরই বোধগম্য। কিন্তু ম্যাকনামারা কি অবস্থা দেখে সন্তুষ্ট হয়ে গিয়েছেন? তাঁর কথায় তা মনে হয় না। মধ্যবর্তী নির্বাচনের ফলাফলের আগে, অর্থাৎ কংগ্রেসের stability কিছুটাও ফিরে আসে কি না, তা না দেখে মার্কিনী-বদান্যতায় ফাঁক থেকেই যাবে। আর তার ফলে চতুর্থ পরিকল্পনারও অনিশ্চয়তা কাটবে না। লক্ষ্য করার বিষয় যে সম্প্রতি চতুর্থ পরিকল্পনার সম্পর্কে কিছু কিছু অর্থ বরাদ্দ ঘোষণা হলেও এরকম সংবাদও প্রকাশিত হয়েছে যে, এক বছরের জন্য এ-পরিকল্পনা পিছিয়ে যেতেও পারে।

সুতরাং এই মধ্যবর্তী নির্বাচনটা কংগ্রেসের দিক থেকে এক সামগ্রিক আত্মরক্ষার সংগ্রাম হিসেবেই দাঁড়িয়ে গিয়েছে। বাহ্যত কংগ্রেস যতই শক্তিমত্তার ও সাফল্যের দাবি করুক না কেন, এই সত্য তাতে চাপা পড়ে না।

আর কংগ্রেসের দিক থেকে আত্মরক্ষার সংগ্রাম মানেই কংগ্রেস-বিরোধী শক্তির দিক থেকে এ-সংগ্রামে প্রধান উদ্যোগ, অগ্রগমনের প্রধান প্রেরণা ও জয়ের আহ্বান। এই vantage position-এ দাঁড়িয়ে আছে বলেই শত-সহস্র সমস্যা নিয়েও কংগ্রেস-বিরোধী মোর্চার আঘাত-শক্তি বেশি, তার অগ্রগমনের পথ প্রশস্ত। কংগ্রেস-বিরোধী মোর্চার মধ্যে কত সমস্যা। তার ঐক্যের সমস্যা, ঐক্য-রক্ষার সমস্যা, এক কর্মসূচীতে মিলিত হতে পারার সমস্যা, মিলিত হয়েও কর্মসূচী রূপায়ণের সমস্যা। এবং তার চেয়েও বড় কথা, জনসাধারণের মধ্যে এ-মোর্চা সম্বন্ধে আস্থা ও উদ্দীপনা সৃষ্টির সমস্যা। কিন্তু সব সমস্যাই অতিক্রান্ত হয়ে যাচ্ছে, স্রোতের অনুকূলে গতি বলে। কংগ্রেসের আঘাত যত প্রচণ্ডই হোক না কেন, তার প্রত্যেকটি আঘাতই যে আত্মরক্ষামূলক আঘাত, বাস্তবে তা আজ এত প্রত্যক্ষ যে, সে-আঘাত কংগ্রেস-বিরোধিতাকে দমিয়ে না দিয়ে, বিরোধিতাকে আরো প্রবল করে তোলে। এই জন্যই গত দু'বছর ধরে কংগ্রেসকেই কৌশল পাল্টে পাল্টে চলতে হয়েছে, কিন্তু বিরোধী মোর্চা চলেছে একই প্রতিরোধ-কৌশলে অটুট থেকে এবং দিনের পর দিন সে-প্রতিরোধ দৃঢ় হয়েছে, মোর্চা সবল হয়েছে। শত বিভ্রান্তি ও প্রশ্ন নিয়েও জনসাধারণও কি এই বিরোধী-মোর্চার সঙ্গেই পা মিলিয়ে চলছে না? তা যদি না চলত, তবে অনেকদিন আগেই বিরোধী-মোর্চা ভেঙে যেত। বাংলা দেশের দিকে তাকিয়েই লক্ষণটা ভাল বোঝা যাবে। সমস্যা জনসাধারণের বেড়েছে বই কমে নি। পরিবর্তনের মধ্যে সহজ প্রত্যাশা জনসাধারণের যা ছিল, তার বেশিটাই পূর্ণ হয় নি। প্রশ্নের পর প্রশ্ন এসে জমেছে তাদের মনে। বিভ্রান্তি এসেছে। কিন্তু তবু ভবিষ্যৎকে কংগ্রেসের হাতে ছেড়ে দেওয়ার মতো মন করতে পারে নি। কারণ, ভবিষ্যৎ কংগ্রেসের আর নেই, বর্তমানটা থাকে কি না সেটাই এখন কংগ্রেসের লক্ষ্য। এটাই হচ্ছে সামগ্রিকভাবে কংগ্রেস-বিরোধিতার অনুকূল স্রোত।

কিন্তু এটা তো স্বতঃস্ফূর্তি। এই স্বতঃস্ফূর্তির অনুষেধক আজকে যত প্রবলই হোক না কেন, বরাবর তা অগ্রগমনের অনুষেধকের কাজ করবে না। কংগ্রেস-বিরোধী মোর্চার সামনে পরবর্তী পর্যায়ের দায়িত্ব তাই আরো বেশি এবং আজ থেকেই সে দায়িত্বের মহড়া দিতে হবে। স্বতঃস্ফূর্তিকে সচেতন অবস্থায় রূপান্তরিত করতে হবে। শুধু তাই নয়, প্রগতিশীল শক্তি যেখানে যথেষ্ট প্রবল নয়, সেখানে এই স্বতঃস্ফূর্তির প্রবাহ বেরেই তো প্রতিক্রিয়াশীলতা মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছে। কংগ্রেস-বিরোধিতার সাধারণ পটভূমির মধ্যেই তাই ভারতের চিত্রে বহু রূপ। এই চিত্রই কি স্থায়ী? তা নয়। একটা অবস্থা থেকে আরেকটা অবস্থায় রূপান্তরের পর্যায়ে যদি রূপান্তরের শক্তির কিছুমাত্র দুর্বলতা থাকে, তাহলে সেই দুর্বলতা শুধু ফাঁক হিসাবেই থেকে যায় না, সেই ফাঁক দিয়ে প্রবেশ করে অবাঞ্ছিত উপাদান। কংগ্রেস-বিরোধিতার সমগ্র ক্ষেত্রটা যদি প্রগতিশীল শক্তির দ্বারা পূর্ণ হয়ে যেতে না পারে, তাহলে অপূর্ণ অংশটা ফাঁক হয়ে থাকতে পারে না, যে কেউ এসে সে-ফাঁক পূরণ করবেই। ঠিক এই জন্যই ভারতের কয়েকটি রাজ্যে কংগ্রেস-বিরোধিতার নাম করে প্রতিক্রিয়াশীল শক্তি আসর জাঁকিয়ে বসেছে। কিন্তু যেহেতু দেশের মূল সংঘাতটা চলেছে কংগ্রেস ও প্রগতিশীল শক্তির মধ্যে এবং যেহেতু এই সংঘাতের মধ্য দিয়েই পশ্চাদ্‌গতি হচ্ছে কংগ্রেসের আর অগ্রগতি হচ্ছে প্রগতিশীল শক্তি-সংহতির, সেই হেতু রূপান্তরটা এখানেই শেষ নয়, রূপান্তর আরো হবে এবং হবে ব্যাপক পরিধি নিয়েই। এবং সেই দিকে চেয়েই প্রগতিশীল গণতান্ত্রিক শক্তিকে সবল, সচেতন ও অগ্রগামী হতে হবে। এটাই হচ্ছে আজকের পরিপ্রেক্ষিত।

(২৮।১২।৬৪)

কিস্তিতে ট্রানজিস্টার

মাসিক মাত্র ১০৲ টাকা কিস্তিতে ৩২০৲ টাকা মূল্যের বিশ্ব-বিখ্যাত ৩ ব্যাণ্ড অল ওয়ার্ল্ড পোর্টেবল "চেলিকুইন" ট্রানজিস্টার কিনুন।

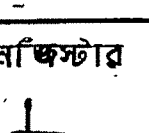

নিম্ন ঠিকানায় আবেদন করুন :—
ATLAS CO. (BC—22)
P.O. Box 1329, Delhi—6.

ব্লাইন্ড কার্ভ : জাতীয় জীবনে

॥ সাগর বিশ্বাস ॥

ভুচ্ছ তেলের শিশিটি ভাঙলো বলে কুকুর 'পরে সকলেই রাগ করতে পারে, কিন্তু যে 'বুড়ো খোকার' দল "ভারত ভেঙে ভাগ" করলো তাদের অপরাধের পরিমাপ কেউ করলো না। অথচ সেই মুষ্টিমেয় কতকগুলি ambitious মানুষের ধৈর্যাভাবের ফলে যে বিরাট ঐতিহাসিক পরিবর্তন ১৯৪৭ সালে ভারতবর্ষে হয়ে গেলো তার বিষময় ফল আজও আমরা ভোগ করছি। আজও রক্ত দিয়ে সে পাপের প্রায়শ্চিত্ত করতে হচ্ছে। তাই আজ স্বপ্নের স্বাধীনতা 'ঝুটা' হয়ে গেছে। সকলের চোখেই (কি ভারতে কি পাকিস্তানে) স্বাধীনতার সে সোনালী চেহারা আজ বিবর্ণ রূপ পরিগ্রহ করেছে। গান্ধী, নেহরু সকলেই বুঝেছিলেন এই খণ্ডিত স্বাধীনতার চেহারা কেমন হতে পারে। গান্ধী তাই বলেছিলেন—

"Vivi section of India is a sin", "If Congress wishes to accept partition it will be over my dead body."

কিন্তু রাজনীতি-দেবতার নির্মম পরিহাস যে এগুলি তাঁদের মুখে একটা 'কথার কথা' হয়ে রইলো। যে বসু-পরিবার ভারত-বিভাগের বিরুদ্ধাচরণ করেছেন এবং যে বসু-ভ্রাতৃদ্বয় পারতেন এই কুটিল চক্রান্তকে ব্যর্থ করে দিতে—ভারতের রাজনৈতিক মঞ্চ থেকে কিভাবে তাঁদের সরে আসতে হয়েছে সে ইতিহাস সকলেরই জানা। তবু সুদূর সিঙ্গাপুর থেকেও সুভাষচন্দ্র চুপ করে থাকতে পারেন নি। ১৯৪৫ সালে ভারতবাসীর উদ্দেশ্যে তিনি বললেন—

"I have no doubt that if India is divided, she will be ruined. I vehemently oppose the Pakistan scheme for the vivi section of our motherland, our divine motherland shall not be cut up."

কিন্তু কিছুতেই কিছু হলো না। জাতীয় জীবনে 'ব্লাইন্ড কার্ভ' তৈরি হয়ে গেলো। খণ্ডিত স্বাধীনতা আমরা পেলাম, জিন্না পেলেন তাঁর নিজের ভাষায় "Moth-eaten and truncated Pakistan." পরবর্তীকালে জহরলাল নেহরুর মুখে যে স্বীকারোক্তি পাওয়া গেলো, তা আসলে এক ধৈর্যহীনতারই ইতিহাস।

"The truth is that we were tired men... Few of us could stand the prospect of going to prison again. We saw the fires burning in the Punjab and heard everyday of killings. The plan for partition offered a way out and we took it."

ভারতের ইতিহাসের সেই যুগ-সন্ধিক্ষণের কাহিনী আজ একথা প্রমাণ করেছে যে, দেশ-বিভাগ হয়েছিল ঔপনিবেশিক শাসকগোষ্ঠীর কুটিল চক্রান্তে, আর মুসলিম লীগের অনমনীয় দ্বি-জাতিতত্ত্বের ভ্রান্ত অজুহাতে। ভারতের জাতীয় কংগ্রেস করেছিলো এই চক্রান্তের নিকট নির্লজ্জ আত্মসমর্পণ। জিন্না তথা মুসলিম লীগের দ্বি-জাতিতত্ত্ব আজ ভ্রান্ত বলেই শুধু প্রমাণিত হয় নি—একথা আজ দিবালোকের মতো স্পষ্ট হয়ে গেছে যে বৃটিশের চক্রান্তে পতিত মুসলিম লীগ ভারতবর্ষের সর্বনাশ করেছে। শুধুমাত্র হিন্দী এবং একদল উর্দু ফ্যানাটিক্সদের হীন স্বার্থ সংরক্ষিত হয়েছে—ভারতের বাদবাকী ভাষাভাষী এবং ধর্মীয় সম্প্রদায়ের চরম ক্ষতি সাধিত হয়েছে। যার বিষময় ফল আমরা ভারতে এবং পাকিস্তানে আজ দেখতে পাচ্ছি।

> **ভারতবর্ষের এক রাজনৈতিক যুগ-সন্ধিক্ষণে জাতীয় জীবনের যে সর্বজনপ্রমাণ ভুল বাংলা দেশ তথা বাঙালীকে স্বাধীনতার যজ্ঞাগ্নিতে আহুতি দিয়েছিলো, রক্ত রক্তস্নানের মধ্যে বাঙালী তার নগ্ন চেহারা দেখতে পেয়েছে। রক্তস্নাত বাংলার হিন্দু-মুসলমান তাই আজ সকল প্রকার ভেদ-বুদ্ধিকে বর্জন করে শুচি-শুভ্র বাঙালীয়ানার পরিচয় সকল ক্লেদাক্ত দিনের স্মৃতি ভুলতে চাইছে। পূর্ব বাংলায় তাই আজ মুসলিম লীগের একপ্রকার অবলুপ্তি ঘটেছে। পাকিস্তানে যার অস্তিত্ব বিপন্ন—পশ্চিম বাংলায় তারই পুনরাবির্ভাবে দেশ ও স্বজাতিপ্রীতি প্রতিটি বাঙালী আজ শঙ্কিত। ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি সর্বস্বান্ত বাঙালী আজ চায় না—সে বাঁচতে চায়। এ রচনা বিশেষ করে পূর্ব ও পশ্চিম বাংলার মুসলমান ভাইদের সুস্থ চিন্তার দরবারে নিবেদন করলাম।**
>
> **—লেখক**

পার্টিশনের ফলে আমরা বাঙালীরা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছি সব থেকে বেশি। রাজাগোপালাচারী একবার দুঃখ করে বলেছিলেন—

"Bengal and the Punjab are the two stumbling blocks to Indian Independence."

পাঞ্জাবের ক্ষত আজও সম্পূর্ণ না শুকালেও তার রক্তক্ষরণ বন্ধ হয়েছে—কিন্তু বাংলা দেশের ক্ষত থেকে আজও সমানে রক্তপাত হচ্ছে। এ ক্ষত নিরাময় হবার নয়। তাই সুস্থ জাতীয়তাবাদী এবং মানবতাবাদী নেতারা কেউই বঙ্গভঙ্গ সমর্থন করেন নি। ফজলুল হক বলেছিলেন বাংলা দেশ আমার কাছে এক ছাড়া দুই নয়। শুধু তাই নয়, বাংলা দেশের মুসলিম এম-এল-এ'রা কখনো মনে-প্রাণে বঙ্গ-ভঙ্গ সমর্থন করেন নি। অথচ বাংলার হিন্দু-মুসলমানের মতামত যাচাই না করে এত বড়ো একটি ঐতিহাসিক ঘটনা ঘটলো যেন পুতুল খেলার মতো সহজভাবে। ১৯০৫ সালে যে *'settled fact'*-কে 'unsettled' করে বাঙালী ইংরেজ সরকারের মুখের উপর ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছিলো—সেই অপমানেরই প্রতিশোধ নিলো ইংরেজ ১৯৪৭ সালে মুসলিম লীগের সহযোগিতায়। শেষ চেষ্টা করেছিলেন জনাব শহীদ সোহরাওয়ার্দি এবং শরৎচন্দ্র বসু। তাঁরা দূরদৃষ্টি দিয়ে বুঝেছিলেন—কি হতে চলেছে। ১৯৪৭ সালের জুন মাসেও শরৎচন্দ্র বসু সতর্কবাণী উচ্চারণ করলেন—

"I feel more and more convinced everyday that if Bengal

is rent in twain, the two provinces of Bengal will be exploited more and more by exploiters. The Bengali Hindu and Bengali Muslim will become quilldrivers of those exploiters ... I have no doubt what His Majesty's Government's plan would lead to. It is bound to lead to perpetual conflicts between the Hindus and the Muslims in the Hindu majority Provinces as well as in the Muslim majority Provinces."

ইতিহাস তাঁর এই ভবিষ্যদ্বাণীর যাথার্থতা প্রমাণ করেছে এই সুদীর্ঘ ২২ বছরের স্বাধীন দেশ দুটিতে। আজ তাই পূর্ববঙ্গের চেহারা ভিন্ন। ইসলামিক রিপাবলিকের ওই মানুষগুলি ধর্মে মুসলমান হলেও জাতিতে যে বাঙালী তাই পশ্চিমী পাঠান-পাঞ্জাবী একাধিপত্যের হাতে তাদের বিড়ম্বনার শেষ নেই। তাই চোখে আজ তাদের নতুন স্বপ্ন—নতুন তৃষ্ণা তাদের বক্ষ জুড়ে। আজ তাই সাম্প্রদায়িকতা নয়, হিন্দু-মুসলমানের প্রশ্ন নয় —'বাঙালী' এই জাতীয়তার নীলাঞ্জন মেখে এক বাংলা আর এক বাংলার দিকে তাকিয়ে প্রহর গুণছে।

ঠিক এমনি মুহূর্তে পশ্চিমবঙ্গের প্রগ্রেসিভ মুসলিম লীগের উৎপত্তি বাঙালীর অখণ্ড জাতীয় আদর্শের উপরই এক উদ্দেশ্যমূলক আঘাত বলে গণ্য হবে। যে মুসলিম লীগ ভারতের স্বাধীনতা-আন্দোলন থেকে দূরে থেকে ইংরেজ সাম্রাজ্যবাদের সহায়তায় পাকিস্তান সৃষ্টি করেছিলো—যে মুসলিম লীগের নেতা স্বাধীনতা-আন্দোলনে অংশ গ্রহণকারী মুসলিম নেতাদের ব্যঙ্গ করে ঘৃণায় রাজনীতি মুসলমান সমাজকে শিখিয়েছিলেন তিনিও 'জাতির জনক' আখ্যা পেয়েছিলেন। কারণ তখন নবগঠিত পাকিস্তানের মানুষের চোখে অনেক স্বপ্ন। ঔপনিবেশিক শাসনের পর নতুন স্বাধীনতায় এমন উচ্ছ্বাস খুবই স্বাভাবিক। কিন্তু ১৯৫৪ সালে পূর্ব বাংলায় ফজলুল হক-মৌলানা ভাসানী-শহীদ সোহরাওয়ার্দির যুক্তফ্রন্ট শাসন-ক্ষমতায় আসায় সেই মুসলিম লীগের সমাধি ঘটলো পূর্ব বাংলার মাটিতে। বাঙালী বুঝতে শিখেছে তার বঞ্চনার বেদনাকে। তাই ধর্মীয় জিগিরে আজ পূর্ব বাংলার গণতান্ত্রিক তরুণেরা ভোলে না। বরং দুই বাংলা সাহিত্যিক-সাংস্কৃতিক যোগাযোগ আজ গভীরতর হতে চলেছে। এই বাস্তব পরিপ্রেক্ষিতে পশ্চিমবঙ্গের অন্তর্বর্তী নির্বাচনের মুখে মুসলিম লীগের গঠন শুভবুদ্ধিপ্রণোদিত বলে ধরে নেওয়া যায় না। জাতীয় জীবনে এ আর একটি রাইন্ড কার্ড। এই নবগঠিত পার্টির পক্ষ থেকে দুর্নীতি ও শোষণমুক্ত গণতান্ত্রিক প্রশাসন ব্যবস্থার প্রয়োজনীয়তার কথা বলা হয়েছে। সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির জন্য উপযুক্ত পরিবেশ তৈরি করা দরকার এই ধরণের সুস্থ বক্তব্য লিখিতভাবে প্রচার করা হয়েছে। আরো বলা হয়েছে, মুসলমান সমাজের সগৌরব প্রতিষ্ঠা এবং বৃহত্তর স্বার্থরক্ষাই প্রগ্রেসিভ মুসলিম লীগের প্রধান লক্ষ্য।

ভারতবর্ষ একটি ধর্মনিরপেক্ষ গণতান্ত্রিক দেশ। জাতি-ধর্ম নির্বিশেষে এখানে সকলেরই সমান অধিকার। সকলেই ভারতীয় এই চেতনা যতক্ষণ থাকে ততক্ষণ একটা বিশেষ সমাজের বৃহত্তর স্বার্থরক্ষার প্রশ্ন ওঠে না। 'শোষণমুক্ত গণতান্ত্রিক প্রশাসন ব্যবস্থা' সকলেরই কাম্য। ভারতের সংবিধানেও এই নির্দেশ আছে। সমস্ত রাজনৈতিক দলের অনুশাসনেও এটা একটি সাধারণ বক্তব্য। এর জন্য একটি সম্পূর্ণ আলাদা রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানের প্রয়োজন অনিবার্য নয়। আর রাজনৈতিক দল গঠিত হলেই সেই সমস্যাগুলির সুরাহা হয়ে যাবে এমন গ্যারান্টি কোথায়? প্রগ্রেসিভ মুসলিম লীগের সম্পাদক মহম্মদ সিরাজুল হক বলেছেন, "প্রগ্রেসিভ মুসলিম লীগ আদৌ একটা সাম্প্রদায়িক দল নয়। আমার পার্টি সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি এবং সুস্থ অবস্থার মধ্য দিয়েই দেশের প্রতিটি সুস্থ অবস্থার মধ্য দিয়েই দেশের প্রতিটি মানুষের মঙ্গলসাধন করা যেতে পারে বলে বিশ্বাস করে।" এই সঙ্গে তিনি

একথাও বলেছেন, "আমার পার্টির মূলে সম্পর্কহীন কোন ব্যক্তি বা ব্যক্তিসমষ্টি সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি-বিরোধী কিংবা বিভ্রান্তিকর ও উত্তেজনামূলক কোনরূপ বক্তৃতা বা প্রচারকার্য করে থাকলে তার জন্য আমাদের কোন দায়িত্ব নেই।"

এভাবে কাগজে-কলমে দায়িত্ব স্খালন করা সহজ ব্যাপার সন্দেহ নেই এবং এ রেওয়াজ নতুনও নয়। বাংলা দেশের মানুষ তাদের অতীত অভিজ্ঞতা দিয়ে বুঝেছে যে এ ধরণের রাজনৈতিক দলের প্রচারকার্য কিভাবে অগ্রসর হতে পারে। কেন না রাজনৈতিক দলগুলির কিছু স্লোগান থাকবে একথা নিশ্চয়ই মিঃ হক অস্বীকার করবেন না। তাহলে সে স্লোগান কেমন হবে? নিশ্চয়ই 'দুনিয়ার মজদুর এক হও' এ ধরণের হবে না। সে স্লোগান হবে, 'ইসলাম তথা মুছলমানসমাজ বিপন্ন অতএব মুছলমান ভাইরা সব লীগের পতাকার নিচে এসে দাঁড়াও।' গত ১৭ই নভেম্বর তারিখের আনন্দবাজার লিখছে, সে ধরণের প্রচার শুরুও হয়ে গেছে। মুসলমানসমাজ বিপন্ন হোক বা না হোক তাদের সামাজিক, রাজনৈতিক অধিকার ক্ষুণ্ন হোক বা না হোক (ভারতরাষ্ট্রে মুসলমানের নাগরিক স্বার্থ ক্ষুণ্ন হয়েছে এ অপবাদ শত্রুরও দেবার সাধ্য নেই) দলবাজী করতে গেলে এ ধরণের প্রচারপার প্রয়োজন যে পড়বে সে কথা মিঃ হক নিশ্চয়ই জানেন। তিনি বলেছেন, "আমার পার্টি মনে করে যে দেশের মধ্য থেকে সমস্ত রকম সাম্প্রদায়িক বিচার-বিবেচনা দূর করে ঐক্য ও সম্প্রীতির দ্বারা 'সম্মিলিতভাবে গঠিত একটা সুস্থ গণতান্ত্রিক সুশাসন প্রতিষ্ঠার মধ্যেই মুসলমান-সমাজের বৃহত্তর স্বার্থ নিহিত রয়েছে।" এই সুস্থ গণতান্ত্রিক শাসন' কংগ্রেস এবং মুজফ্ফর উভয়কেই পরিত্যাগ করে তিনি আনতে চান। সে কোন্ পথে? এ কি সেই গণতন্ত্রের 'জনসঙ্ঘী' পদ্ধতি নয়? মিঃ হকের নিজের বক্তব্যের মধ্যেই পার্টির অব্যক্ত উদ্দেশ্য নিহিত আছে। সুস্থ গণতান্ত্রিক সুশাসনের মধ্যেই কেবলমাত্র মুসলমানসমাজের বৃহত্তর স্বার্থ নিহিত থাকবে কেন? ভারতবর্ষে আরো অনেক সমাজ-ই তো আছে। তাঁরা কি ভারতীয় নন? আর এই বৃহত্তর স্বার্থটাই বা কী?

কিছুদিন আগে একটি প্রবন্ধে আমি ১৯৬৫ সালে যুদ্ধকালীন আবহাওয়ায় ২৪ পরগনা-পূর্বরেখা সীমান্তের কোন এক গ্রামে পাকিস্তানের জাতীয় পতাকা উত্তোলিত হবার ঘটনা ব্যক্ত করেছিলাম। খবরের কাগজেও সে খবর বেরিয়েছিলো। জাতীয়তাবাদের এই উগ্রতা সুস্থও নয়—গণতান্ত্রিকও নয়। নবগঠিত মুসলিম লীগের প্রতি কটাক্ষ না করেও একথা বলা অন্যায় হবে না যে সব দেশেই এই জাতীয় দলীয় ও সম্প্রদায়-ভিত্তিক রাজনৈতিক দল ঐ ধরণের উগ্র দৃষ্টচক্রের হাত শক্তিশালী করে থাকে। এই প্রসঙ্গে হাজী মহীউদ্দিন আমেদের একটি বক্তব্য উদ্ধৃত করা যাক: "দেশ-বিভাগের পর পাকিস্তান নিজেকে ঐস্লামিক রাষ্ট্র বলে ঘোষণা করেছে। কিন্তু গান্ধী-নেহরু-আজাদের দেশ ভারত তার শাসনতন্ত্রে ধর্ম-নিরপেক্ষতাকেই রাষ্ট্রীয় আদর্শ হিসাবে গ্রহণ করেছে। আমাদের এই রাষ্ট্রে সব ধর্ম সমান। কিন্তু দুঃখের বিষয় স্বাধীনতার সূচনা থেকেই কিছুসংখ্যক উগ্রপন্থী ব্যক্তি ও দল এই উদার আদর্শকে বানচাল করার চেষ্টা করছে। তারা এখনো শান্ত হয় নি এটা চিন্তাশীল ভারতবাসীর কাছে উদ্বেগজনক সমাচার। ভারতের গিয়রে দুই শত্রু; পাকিস্তান আর চীন। দেশের ভেতরেও যদি উগ্রপন্থী রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘ বা নয়া গজানো ক্ষুদে প্রগ্রেসিভ মুসলিম লীগ প্রভৃতির ন্যায় সাম্প্রদায়িক রাজনৈতিক দল মাথাচাড়া দেয়, তবে সেটা আশঙ্কার কথা। সাম্প্রদায়িকতা এবং নাস্তিকতা আমার মতে দুই-ই নিন্দনীয়। অতএব স্বদেশের স্বার্থে সকলের উচিত এই দুই-কে পরিহার করে চলা।"

ভারতের গণতান্ত্রিক সংবিধানে কোনো দলকে সাম্প্রদায়িক আখ্যা দেওয়ার ক্ষমতা নেই। তাই রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘ, জমাতে উল উলেমা, হিন্দু মহাসভা প্রভৃতি দলকেও সাম্প্রদায়িক বলা হয় নি। এদিক থেকে প্রগ্রেসিভ মুসলিম লীগকেও সাম্প্রদায়িক বলা যাবে না। কিন্তু উপরোক্ত দলগুলিকে দেশের কোটি কোটি মানুষ কিভাবে গ্রহণ করেছে? কাজেই মহম্মদ সিরাজুল হক যতই বলুন "প্রগ্রেসিভ মুসলিম লীগ আদৌ একটা সাম্প্রদায়িক দল নয়"—শেষ রক্ষা হবে তো?

আজ পূর্ব বাংলার জন-জাগরণ এবং গণতান্ত্রিক বৈপ্লবিক চিন্তাধারা মুসলিম লীগের সংকীর্ণ চিন্তাধারার অবলুপ্তি ঘটিয়েছে। পূর্ব বাংলার শিক্ষিত তরুণ আর বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায় বাঙালীর জীবনের এই বিপর্যয়ের পরিমাপ করেছে। আমরা অনেক আঘাত খেয়েছি। বাঙালী—কি পশ্চিম বাংলায়, কি পূর্ব বাংলায় যেন একটি ভিখিরীর জাতে পরিণত হয়েছে একদল বুরোক্রাট শাসকগোষ্ঠীর চক্রান্তে। খোলা চোখে তাকিয়ে আজ শরৎচন্দ্র বসুর সেই সতর্কবাণীর সত্যতা আমাদের চোখে পড়ছে—

"...if Bengal is rent in twain, the two Provinces of Bengal will be exploited more and more by exploiters. The Bengali Hindu and Bengali Muslim will become quill-drivers of those exploiters..."

কিন্তু যতীন্দ্রনাথ, সূর্য সেন, প্রফুল্ল চাকী, শহীদ সালাম-বরকতের পূর্বাঞ্চল আর অরবিন্দ, বারীন্দ্র, সুভাষচন্দ্র, মাতঙ্গিনীর পশ্চিমাঞ্চল আজ এ দুর্বহ বেদনা সইতে পারছে না। তাই বাঙালীর অখণ্ড জাতীয় জীবনে আর ভেদবুদ্ধির প্রশ্রয় দিয়ে আমরা আত্মহত্যার ষোলকলা পূর্ণ করতে চাই না। হিন্দু মহাসভা, জনসঙ্ঘ তাই বাঙালীর আনুকূল্য লাভ করতে পারে নি। পশ্চিম বাংলার বাঙালী মুসলমানের সামনে তাই আজ আর এক পরীক্ষা। মুসলিম লীগ যদি হিন্দু মহাসভার অবস্থাপ্রাপ্ত হয়, তাহলেই বাঙালী মুসলমানের সত্যিকার প্রগ্রেসিভ মনের পরিচয় মিলবে—বড় বড় উদ্দেশ্যমূলক তোষণধর্মী বক্তৃতার কাছে আত্মসমর্পণ করে এ চ্যালেঞ্জের মোকাবিলা করা যাবে না।

বাজারে একটি সাড়াজাগানো নতুন বই বেরিয়েছে

অমরেন্দ্রকুমার ঘোষের

মহাজীবন—টাঃ ১৮·০০

৮০০ পৃষ্ঠার ওপরে বহু দুষ্প্রাপ্য ছবিসহ একটি অমূল্য গ্রন্থ

প্রকাশক—মোহন লাইব্রেরী, ৩৫-এ, সূর্য সেন স্ট্রীট, কলিকাতা-৯

ফোন: ৩৪-১৮০৮

পথিক কুহক?

মনোজ বসু

[পূর্ব-প্রকাশিতের পর]

॥ তেত্রিশ ॥

বাড়ির নিচে ইচ্ছামতী। খিড়কির দরজা খুলে—হাঁটতেও হবে না, ছোট একটা লাফ দিলেই শরবনে গিয়ে পড়বেন। জোয়ার বেলা হাঁটুভর জল সেখানে। শরবনের একটা অংশ পরিষ্কার করে ঘাট হয়েছে—খাঁ-বাবুর নিজস্ব ঘাট। মনে মনে হরিহর পিতৃপুরুষদের তারিফ করেন। তাঁরা যেন দিব্যচক্ষে ভবিষ্যৎ দেখতে পেয়েছিলেন—বেছে বেছে এমনি জায়গায় তাই বাস্তুভিটা নির্বাচন। ঘাটের পথ দিয়েই মা লক্ষ্মী কমলচরণ ফেলে খাঁ-বাড়ি জেঁকিয়েছেন—সেই পিতামহের আমল থেকে এই ঘাটে কত মালের চলাচল, তার লেখা-জোখা নেই।

পালান মাঝি পুরুষানুক্রমে চাকরান খেয়ে আসছে, অতিশয় বিশ্বাসী। নৌকো নিয়ে নিঃসাড়ে সে ঘাটে বসে আছে। দু-জন মাল্লা—তারাও পুরনো লোক। এদিক-সেদিক যতটা নজর চলে, জনমানবের চিহ্ন নেই কোথাও। রাত ঝিমঝিম করছে। হরিহর এক সময় খিড়কি-দরজা খুলে দিলেন, পালান তার লোক দুটি নিয়ে বাড়ির ভিতর ঢুকে গেল।

ছেলেপুলেরা ঘুমিয়ে গেছে, একে একে কাঁধে বয়ে পালান নৌকোয় এসে শোয়াল। মাল্লারা খেপে খেপে জিনিষ-পত্র বয়ে আনছে। হ্যারিকেন-লণ্ঠন আছে নৌকোয়। আলো জ্বালতে হরিহরের মানা। ফাঁকা নদীতে দিব্যি নজর চলবে, এক বাঁক দু-বাঁক পার হয়ে গিয়ে তার পরে না-হয় লণ্ঠন ধরিও। শান্তিলতাকে দেখা গেল, খিড়কি-দরজায় দাঁড়িয়ে চোখের জল মুছছে। স্বামীকে গণ্ডগোলের মধ্যে রেখে ঘরবাড়ি ছেড়ে চলে যেতে কষ্ট হচ্ছে তার। আলগোছে ধরে হরিহর আগনৌকোয় তুলে দিলেন। পালান হালে গিয়ে বসেছে। সর্বশেষ দুটো বস্তা মাথায় নিয়ে মাল্লা দু'জন আসছে—কাঁথা বালিশ ইত্যাদি। হরিহর মতলব করে বস্তায় ঢুকিয়ে মুখ বেঁধে দিয়েছেন।

দাঁড়াও—

শরবনের ভিতর থেকে গর্জন উঠল। ঠিক এমনি সন্দেহই ছিল হরিহরের, পরখ করে নিলেন। মেজাজ দেখানোর বিন্দুমাত্র বাধা নেই এখন। বললেন, কোন লাটসাহেব হে? বেরিয়ে দাঁড়াও না, মুখ দেখে নিই।

টর্চ জ্বলে ওঠে। মানুষ লাফিয়ে পড়ে ডাঙায়—একের পর এক পড়ছে। শরবনে ডিঙি ঢুকিয়ে নিঃসাড়ে বসে বসে মশার কামড় খাচ্ছিল। পারেও বটে!

কারা তোমরা? দেখবার কোন এক্তিয়ার আছে?

উত্তর না দিয়ে ছোকরারা হেঁচকা-টান দিয়ে বস্তা দুটো ছুঁয়ে নামিয়ে ফেলল। সঙ্গে সঙ্গে বলে, নিয়ে যাও।

হরিহর ব্যঙ্গ করে বলেন, খুলে দেখলে না যে?

ডাহা বেকুব! পালান ও দুই মাল্লা হি-হি করে হাসতে লাগল। হাসির ঢঙে হরিহরও দাঁত মেললেন। বুকের মধ্যে কিন্তু ধড়াস-ধড়াস করছে। সর্বনেশে কাণ্ড—নজরবন্দি করে রেখেছে। অষ্টপ্রহরের বন্দী, বাড়ির চতুর্দিক ঘিরে নজর।

আনোয়ারের ওয়েটিংরুম। পারাপারী মানুষ দুটি-চারটি করে জমতে লেগেছে। যত রাত বাড়ে তত জমজমাট। আরও আজ নিশিরাত্রে পারাপার—যথেষ্ট সময় এখনো।

রান্নাঘরের সামনে এসে আনোয়ার উঁকিঝুঁকি দিচ্ছে। একলা তারাফুলি থাকলে ঢুকে পড়ত, ফুল্লরার জন্য সঙ্কোচ। বাইরে থেকে ডাক দিয়ে বলল, বৈঠকখানায় আর একবার ফুলি। তোর মামু এসেছেন।

উল্লসিত হয়ে ফুলি বলে, এসে গেছেন তবে। বিকেলবেলা এসে পৌঁছনোর কথা—আমার আগে। ভাবলাম পিছিয়ে গেলেন, আসবেন না। আমার উপর ভরসা রাখতে পারেন নি।

উনুনে খিচুড়ি ফুটছে। খুন্তিতে একটু তুলে জল ছিটিয়ে টিপে দেখল। হয়ে গেছে, একটুখানি আর বাকি। বসাওগে ওঁদের আনোয়ার ভাই। হাঁড়ি নামিয়ে আমি যাচ্ছি।

মামাদের কথা বলছে ফুল্লরাকে। হিন্দুস্থানে এই বর্ডার পেরিয়ে মাইল পাঁচ ছয়ের মধ্যে বাড়ি, বিনিময় করে পাকিস্তানে চলে এসেছেন আজ ক'বছর। ছেড়ে এসেছেন বটে, মন থেকে কিন্তু ছাড়তে পারেন নি। যতজনকে আমি জানি সবারই এই গতিক—সাত-পুরুষের ভিটে ছেড়েছুড়ে আসে, ঘা দগদগ করে কিন্তু বুকের নিচে। মামাদের অবশ্য বাড়া-বাড়ি। তাঁদের মধ্যে বেশি আমার ছোট-মামা আর ছোট-মামানি। তিন মেয়ের পরে ছেলে হয়েছিল, ছোট মামানির—তিন বছরেরটি হয়ে ছেলে মারা গেল, সেই থেকে আধপাগল অবস্থা তাঁর।

তারাফুলি বলছে, ভিটে ত্যাগ করে এসেছেন, কিন্তু চিঠিপত্র লিখে ছোটমামা হরদম খবরাখবর নিতেন। বাড়ি শুধু নয়, সারা গাঁয়ের খবর। ওঁদের চেনা পড়শি বড় একটা নেই—পাকিস্তান থেকে হিন্দুরা বিনিময় করে সেই সব বাড়িতে উঠেছেন। কিন্তু মানুষ না চিনলেও বাড়িঘর গাছ-গাছালি পুকুরদীঘি পথঘাট—এমন কি পথের ধারের আশশ্যাওড়া ভাঁট দুর্বাঘাসটি অবধি চেনা—তাদের খবর পেতে চান।

হেসে উঠল সে। বলে, এই চাউল ঢাউস চিঠি! পাগলামি আর কাকে বলে! মামাদের বাড়ি যাঁরা আছেন, তাঁরা কিন্তু খুব ভাল। ধৈর্য ধরে পড়েন ঐ সব চিঠি, সমস্ত না হলেও জবাবও দেন কিছু কিছু জিজ্ঞাসার। ছোটমামার তবু ছটফটানি যায় না : ওটার বিষয়ে কিছু তো লিখলেন না, ওটার বিষয়ে জানতে পারলাম না! বলতেন, চোখে না দেখলে মন ঠাণ্ডা হচ্ছে না। পাশপোর্ট করে ঘুরে আসবেন

ছোটমামা মেজোমামা—আর ছোট মামানিকে ঠেকিয়ে রাখবে, কার ক্ষমতা ? তার নামেও পাসপোর্টের দরখাস্ত চলে গেল। কিন্তু লড়াই লাগল হঠাৎ—আয়োজন বরবাদ। চিঠি লেখালেখি পর্যন্ত বন্ধ। চিঠি ইদানীং ছাড় হয়েছে বটে, কিন্তু 'কেমন আছ' 'ভাল আছি' এর বাইরে কিছু থাকলে সে চিঠি বেপাত্তা হয়ে যায়।

খিচুড়ি নামিয়ে রেখে তারাফুলি ফুল্লরাকে বলল, রান্নায় হাত ছোঁয়াতে দেবো না ভেবেছিলাম, তা আর কী হবে—বেসমে ডুবিয়ে ডুবিয়ে আলু ভাজতে থাকো তুমি। দেখা দিয়ে ফিরে আসছি। আমার কথার উপরে ও'রা চলে এসেছেন : নির্ঝঞ্ঝাটে ঘুরিয়ে নিয়ে আসব, মনের সুখে সব দেখে আসতে পারবেন। হরবখত আমার যাওয়া-আসা দেখছেন, তাতেই সাহস পেয়ে গেছেন।

হাত ধুয়ে তারাফুলি বাইরের দিকে এলো। ছোটমামা আবুল হাসিম—ঘরে ঢোকেন নি তিনি, দাওয়ায় বেঞ্চির উপর বসে তারাফুলির অপেক্ষায় আছেন।

তারাফুলি এদিক-ওদিক তাকিয়ে বলল, মামানি কোথা ? মেজোমামারও তো আসবার কথা ছিল।

আবুল হাসিম বলেন, ভাইজান এলো না পিছিয়ে পড়ল শেষ অবধি। বলে, বিসর্জন দিয়ে এসেছি তো পিছন ফিরে আর দেখতে যাবো না। আর তোর মামানিকে ফাঁকি দিয়ে পালিয়ে চলে এসেছি—ছেলেমানুষকে যেমনধারা করে।

তারাফুলি বলে, ভারি অন্যায়। আমার জন্যে পাগল। কেঁদেকেটে আমার কাছে এত করে বলেছিল। ভরসা হল না বুঝি ? মেয়েলোক কত যাতায়াত করে, খোঁজ নিয়ে দেখ।

একজন তোকেই তো দেখতে পাচ্ছি চোখের উপর—ইচ্ছে মতন চলে যাস। পথ নিয়ে ভয়-ভাবনা নয়। ভয়টা হল, গিয়েই হয়তো চাঁপাতলায় আছড়ে পড়বে। অনেকদিন দেখে নি তো—পুরনো ব্যথা মোচড় দিয়ে উঠবে, কান্না জুড়ে দেবে সুর করে। বাঁরা সব আছেন, তাঁদের বিব্রত করবে তোলা। সাত-পাঁচ ভেবে, তোর মামানি ঘুমুচ্ছে, ভোররাত্রে রওনা হয়ে পড়লাম।

ম্লান হেসে আবুল হাসিম বলেন, কম ঝামেলা! যাওয়া হবে না, পথে নানান গণ্ডগোল—এই সমস্ত শোনাচ্ছিলাম কদিন ধরে। পোঁটলা, গুড়ের নাগরি আগেভাগে চালান করে দিলাম একজনের জিম্মায়! ভোরবেলা আবার সেই লোকের বাড়ি যেতে হল জিনিষ নিয়ে নেবার জন্য। এইসব হাঙ্গামার জন্যেই ঘাটে আসতে এত দেরি। ফিরতিবেলা আমাদের বাড়ি অবধি যেতে হবে তোকে। তোর মামানি আমায় আস্ত রাখবে না—তুই সামলাবি তখন।

পায়ের কাছে সেই পোঁটলা এবং গুড়। তারাফুলি বলে, এত সমস্ত নিয়ে যাচ্ছ মামা—নিজের ঘাড়ে বইতে হবে। বওয়ার লোক আগে মিলত, কড়াকড়ি হওয়ার পর থেকে অমিল। দৈবেসৈবে মেলেও যদি, সুষ্টিছাড়া রেট।

ছোটমামা তাচ্ছিল্যের সুরে বলেন, মুটে লাগবে না—আমিই বইব। বুড়ো-থুত্থুড়ে হয়ে যাই নি। চাট্টি বাসমতী নতুন চাল আর নলেনের গুড়। পায়েস রেঁধে খাবেন। ওঁদেরই ক্ষেতের ধান, ওঁদেরই গাছের গুড়। ভাবলাম, একলা আমরাই খাবো, সেটা উচিত হয় না—শাপমন্যি লাগবে। রাত দুপুরে বয়ে নিয়ে যেতে কষ্ট হবে, তা বলে কি করব ?

তারাফুলি বলে, কষ্ট হলেও নিয়ে যাওয়া অবিশ্যি আটকাবে না। রাকের কত সুবিধা বোঝ। পাসপোর্ট করে যেতে গেলে কাস্টমের লোক গুড়ের নাগরি ভেঙে গুড় ছড়িয়ে ফেলে দেখত, ওর ভিতরে সোনা-রুপো পাচার কবছ কি না। আর পথ-ভুরভুরে এমন খাসা চাল—পুটলি তো নিজেরাই নিয়ে নিত ঘরে গিয়ে পায়েস খাবার জন্য।

এত বড় বাড়ির মধ্যে একলা হরিহর। তিনি আছেন, আর আছে ভাবনা-চিন্তা। কখন কি ঘটে যায়—তটস্থ হয়ে থাকেন। মানুষজন বৈঠকখানায় এলে বর্তে যান। বড় একটা কেউ ইদানীং আসে না—নির্জনতায় অধীর হয়ে তিনিই সময় সময় চলে যান কোন অন্তরঙ্গ-জনের বাড়ি।

কী দিনকাল! মগের মুলুকে বাস যেন আমাদের। নাকে সরষের তেল দিয়ে সরকার নিদ্রামগ্ন। এখানে ডাকাতি, ওখানে রাহাজানি, সেখানে লুঠতরাজ। হক-না-হক আগুন ধরিয়ে পুড়িয়ে-জ্বালিয়ে দিচ্ছে। খুন-খারাপি একেবারে ডাল-ভাতের মতন হয়ে দাঁড়িয়েছে। দিনদুপুরে দরজায় কড়া নেড়ে বাইরে ডাকল। বেরিয়ে দাঁড়াতেই কথা নয়, বার্তা নয়, ঘ্যাচ করে দিল ছোরা বসিয়ে। দিয়ে পানের দোকান থেকে দুটো বাংলা-খিলি মুখে পুরে জ্বলন্ত দড়ির মুখে সিগারেট ধরিয়ে আস্তে-বাস্তে চলল—যেন নিমন্ত্রণ খেয়ে ফিরছে, ভাবখানা এমনি।

হরবখত এই সমস্ত হরিহরের কানে পৌঁছায়। কারো সঙ্গে দেখা-সাক্ষাৎ হলে দু'-এক কথার পর অনিবার্যভাবে এই প্রসঙ্গ এসে পড়ে। ইচ্ছে করেই শোনায় বলে হরিহরের সন্দেহ। শুকনো মুখে কাষ্ঠহাসি আনবার প্রাণপাত প্রয়াস করেন তিনি তখন।

বলরাম বৃদ্ধ বিশ্বাসী ভৃত্য। এবাড়ি কাজ করতে করতে চুল পাকিয়ে ফেলেছে। ফিসফিস করে সে খবর দিল : আপনার নামও খুব উঠেছে কিন্তু বাবু। সকলের মুখে আপনার কথা।

হরিহর তাচ্ছিল্যের ভাবে বললেন, এ-বাজারে দুটো ডাল-ভাত করে খাচ্ছি, হিংসুটেদের নজর পড়ে গেছে।

তা হোক, তা হোক—বড্ড গরম চারদিকে, আপনি কোনখানে সরে পড়ুন। খবরবাদ নিয়ে তবেই আমি বলছি।

মনের মধ্যে যা-ই হোক, মুখে হরিহর খুব সাহস দেখাচ্ছেন : সরবো কোন্ দুঃখে ? বলি, বাড়িটা আমার বই তাদের তো নয়। গ্যাঁট হয়ে আছি বসে, কে কি করতে পারে দেখা যাক।

বলরাম বলে, আমি তবে দেশে-ঘরে চলে যাই। ছেলেরাও তাই বলছে। বুড়ো বয়সে অপঘাতে প্রাণ দেবো না।

হরিহর বিরক্তকণ্ঠে বললেন, প্রাণ কিসে যাচ্ছে শুনি ?

আজ্ঞে হ্যাঁ। পুরনো দিনকাল আর নেই। মানুষ হন্যে হয়ে উঠেছে, ধর্মাধর্ম মানে না। কখন হামলা দিয়ে পড়ে, ঠিক-ঠিকানা নেই। বোমা-টোমা ফাটালে এক-সঙ্গে পাইকারি মরণ—তার মধ্যে বাছা-বাছি নেই।

মুখে তাম্বি, বুকের ভিতরে কিন্তু ধড়াস-ধড়াস করে। ভাগ্যিস সে আওয়াজ লোকে শুনতে পায় না। সন্ধ্যার পর গা ঢাকা দিয়ে হরিহর থানায় গেলেন। গুরু-প্রণামীর মতন নিয়মিত বন্দোবস্ত আছে, সেই হিসাবে দারোগার সঙ্গে দারুণ মাখা-মাখি—অন্ততপক্ষে তাই এতকাল বুঝে এসেছেন।

নিজের কথা না বলে অন্যের বকলমে চালাচ্ছেন : চাট্টি ধান আছে একজনের। মুশকিলে পড়েছে। আমার বড় আপন লোক। আপনার কাছে পরামর্শ নিতে এলাম।

মাসিক ১০ টাকা কিস্তিতে
রানজিস্টার লণ্ডন

বিশ্ববিখ্যাত সর্বাধুনিক জাপান মডেল, চিত্তাকর্ষক শক্তিশালী, গ্যারান্টিযুক্ত "ওয়ার্ল্ডভয়েস" ৩ ব্যান্ড অল ওয়ার্ল্ড আশ্চর্যজনক নাইট ল্যাম্পযুক্ত। প্রত্যেক গ্রামে ও শহরে পাঠানো যায়।
Write to :—
ALL WORLD AGENCY,
(B.W.) Kalyanpura, Delhi–6.

আমি এইখানে

বেণু দত্তরায়

পোড়ামাটির হাঁড়িতে আমড়া পুড়িয়ে
চটকে খাচ্ছি, সর্বাঙ্গে সহানুভূতির উত্তাপ—
চাঁদ, ও চাঁদ, সেই ভালো,
আলোহীন বর্ণহীন নীরক্ত একদলা
প্যারিস প্লাস্টার
ভৌতিক চেহারাটা জ্বলতে জ্বলতে জ্বলতে
ধুলোয় বালুতে ধুলোয় বালুতে
শিলায় ফাটলে.....আর্তনাদ.....
চমকে দ্রুত চোখ সরিয়ে নিচ্ছি।

আমার পোড়ামাটির হাঁড়িতে চটকানো
আমড়ার আস্বাদই ভালো। পান্তাভাতের সঙ্গে
কাললংকা-নুনের তুলনা নেই, বরং
ধনেপাতাবাটা প্রিয়ার চোখের ছায়া সস্নেহে আগলাবো
আর দুপুরে গরুগুলিকে মাঠে রেখে
বিষণ্ণ বটতলা
এক-আধ ছিলিম দা-কাটা তামাকের গন্ধ
যৌবনের যন্ত্রণামুখর দিনগুলি.....

ফিরিয়ে নাও ফিরিয়ে নাও। ভৃঙ্গারে দামী মদ
গলার কাছাকাছি ঠেকছে। কারা চীৎকার করে
কাকে ডাকছে...ডাইনে বাঁয়ে...কারা চীৎকার
করে কাকে ডাকছে।...আমার সাতপুরুষের
রাজপাট এইখানে ছিল। ঘাসের শিশিরে
দিনান্তের নদীটির পাড়ে...শিখাগুলি জ্বলে
উঠবার সঙ্গে সঙ্গে পবিত্রতায় স্নেহে পরম উত্তাপে
লীন হচ্ছি। মৃত্তিকার গাঢ়তায়.....

বসুন, বসুন—

খাতির করে বসিয়ে দারোগা সোৎসাহে বললেন, কার ধান, লোকের নাম বলুন।

নাম পরে শুনবেন। ধান লুঠ করবে, শোনা যাচ্ছে। পুলিশ-প্রোটেকশন চাইছি। আপনাদের যা প্রাপ্য, তার ত্রুটি হবে না। অগ্রিম নিয়ে নেবেন—আদেশ হলে আমিই এসে দিয়ে যাব।

এত সব লোভনীয় কথাবার্তা দারোগার কানেই গেল না যেন। নামের জন্য চাপা-চাপি : বাইরের মানুষ গিয়ে পড়বার আগে আমরাই ধান সীজ করে আনি। নামটা বলুন। ধান ধরতে পারছিনে বলে নানান কথা ওঠে। চাকরি ঠেকাতে গরজ হয়ে পড়েছে।

ভিখ চাই নে, তোর কুত্তা ঠেকা—সেই গতিক। নাম-ঠিকানা বলতেই হবে—দারোগা নাছোড়বান্দা। হরিহর জোড়হাত করলেন : বলি কেমন করে দারোগাবাবু, বন্ধুর সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা হবে। আচ্ছা, যাই তো এখন—বাড়ি গিয়ে ভেবেচিন্তে দেখিগে।

বিস্তর কষ্টে হাত ছাড়িয়ে উঠে পড়লেন। ঘুঘুলোক দারোগা, ঠিক আন্দাজ করেছেন। কাজ হল না তো গালি দিয়ে মুখের সুখ করে নিচ্ছেন : খবরটা যখন দিলেন, ছাড়ব না খাঁ-বাবু। আপনার বাড়ি গিয়ে জেনে আসব। নাম-ঠিকানা পেলে শালার মাথা কাঁয়িয়ে ঘোল ঢেলে কোমরে দড়ি বেঁধে বাজারের উপর ঘোড়দৌড় করে নিয়ে বেড়াব।

শুনতে শুনতে বেরুলেন হরিহর থানা থেকে। ত্রিপাঠি হেন ব্যাঙ দুঃসময় দেখে হাতীর পিঠে লাথি মেরেছি—দেখা-সাক্ষাৎ মুখের উপরে সেদিন মানা করে দিয়েছিল। তার কাছেই তবু চললেন—মান-সম্মান নিয়ে টং হয়ে থাকবার দিন আজকে নয়।

ত্রিপাঠিও ঘাবড়ে দেয়। বলে, সময় থাকতে কতবার সামাল করলাম হুজুর, পাঁজি জিনিষ খালি করে ফেললে। যে দর পান, তাতেই ঝেড়ে দিন। কানে নিলেন না, বাজার চিনে ফেললে সামান্যে আর-মন ওঠে না। কম-বেশি যা-হোক কিছু তখন সিন্দুকে উঠত, তার পরেই ধুন্দুমার লাগল। মনে করে দেখুন, বুদ্ধি দিতে তখনও কসুর করি নি। দাতাকর্ণ হয়ে স্বেচ্ছায় মাল ছেড়ে দিতে বলেছিলাম—

দোষ-ঘাট মেনে নিয়ে হরিহর অধীর-কণ্ঠে বললেন, এখন কি করতে পারি বলো ত্রিপাঠি। অক্ষরে অক্ষরে তাই করব।

ত্রিপাঠি বলল, শ্রীগোবিন্দের পায়ে সর্ব-সমর্পণ করে সরে পড়ুন পৈতৃক প্রাণ নিয়ে। প্রাণ বাঁচানো বড় কথা। দেখছি হুজুর, ধান-চাল থাকাও পাপ, না-থাকাও পাপ। যাদের নেই, না খেয়ে মরে যাচ্ছে তারা। যাদের আছে, পিটিয়ে তাদের মেরে ফেলছে। মরণ থেকে অব্যাহতি নেই।

সারাদিন হরিহর বিস্তর ছুটোছুটি করলেন, ভরসা কেউ দিল না, ভয়ের কথাই সকলে মুখে। নিন্দেমন্দ কটূক্তির বান ডেকে যাচ্ছে—পাপ-কলি যেন হরিহর নাম নিয়ে মূর্তি ধরে এসেছে, এমনিতরো কথাবার্তা সকলের। এবং শুধু মুখের গালিগালাজেই শোধ যাচ্ছে না—হাতে-কলমে কলি-দমনেরও নাকি বিবিধ উদ্যোগ-আয়োজন। হিতাথী যার সঙ্গেই দেখা হল, ত্রিপাঠির কথাই একবাক্যে বলে : যদি পারেন তো সরে পড়ুন। তিলার্ধ দেরি নয়।

'যদি' বলছ কেন হে? খালি হাতে চলে যাবো—তাতেও বাধা হবে নাকি?

কড়া-নজরে রেখেছে, টের পান না? আর বলে কি জানেন?

ঢোক গিলে মানুষটা বলল, বলছে ভাঁড়ে কইমাছ জিইয়ে রাখা—

আত্মগতভাবে হরিহর কথাটুকু যোগ করে দেন : জিয়ানো মাছ ইচ্ছে মতন তুলে নিয়ে মুণ্ডু ছেদন করবে। উঃ, মাগো—

[ক্রমশঃ]

সদ্য বিকশিত গোলাপের মত সুন্দর আনন ও
কুসুম কোমল
পাপড়ি পেলব তনু

সাধনা বিউটি ক্রীম-এর
এইতো সবচেয়ে বড় অবদান।
নিজেদের সৌন্দর্য্য সম্পর্কে
সচেতন আধুনিকারা তাই
এর প্রশংসায় মুখর।

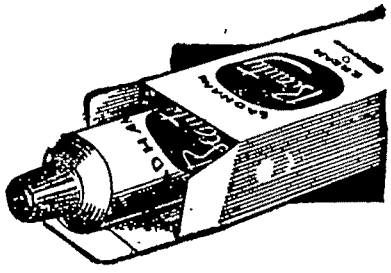

সাধনা
বিউটি
ক্রীম

প্রসাধনের অপরিহার্য্য
অতি আধুনিক অঙ্গরাগ

সাধনা ঔষধালয়-ঢাকা

বিংশ শতাব্দীর মার্কিন সাহিত্য

শম্ভুক বন্দ্যোপাধ্যায়

১০. ১৯৫০—৬৮ : উপন্যাসে অন্য জীবনধর্ম : অসামাজিকতার দিকে

ঔপন্যাসিক নরম্যান মেলার (১৯২৩—) মার্কিন উপন্যাসের দুই যুগের মধ্যে যোগসূত্র। বর্তমান পর্বের মধ্যেও বেলো-মালামুডের ধারা ও কেরুয়াক্‌, বারোজ্‌-জনলীভির অসামাজিক জীবন-সাধের বিপরীতধর্মী প্রবণতার সঙ্গেও তাঁর যোগ রয়েছে। সাহিত্যিক পূর্বসূরী-দের মধ্যে মেলার ডস প্যাসস, ফিট্‌স্‌জেরাল্‌ড, হেমিংওয়ে, স্টাইনবেক, উল্‌ফ্‌ ও জেম্‌স্‌ ফ্যারেলের কাছে ঋণ স্বীকার করেন, বিশেষত ডস প্যাসস ও হেমিংওয়ের কাছে। ডস প্যাসস যেভাবে ঘটনাপ্রবাহকে ব্যাহত করে বারবার অন্য স্বর অন্য দৃষ্টির বস্তুময়তা নিয়ে আসেন, ১৯৪৮-এর 'দ নেকেড অ্যান্ড দ ডেড' উপন্যাসে মেলারও সেই-ভাবেই আখ্যায়িকার মাঝে মাঝেই 'কোরাস' ও 'টাইম মেশিন' নামধেয় অংশগুলিতে ঘটনাবলীর কালগত তাৎপর্য প্রকাশে প্রয়াসী হয়েছেন। 'টাইম মেশিন' বলে চিহ্নিত অংশগুলিতে মেলার তাঁর চরিত্রাবলীর সামাজিক-মনস্তাত্ত্বিক ভিত্তি নির্দেশ করেন। মার্কিন সমাজজীবনে যে-বিচিত্র মানসিকতার বিভিন্ন ধারা প্রবাহিত, তারই এক-একটি যেন এক-একটি চরিত্রে মূর্ত হয়ে ওঠে। এরা প্রত্যেকেই নিজেদের ভূমিকার মধ্য দিয়ে নিজেদের বিচিত্র ক্ষোভ, আর্তি, কিংবা অভাব বা গ্লানির বোধ থেকে মুক্তি খোঁজে। যুদ্ধক্ষেত্র এইভাবে যেন সমাজ-শরীরেরই প্রতিরূপ হয়ে দাঁড়ায়। যুদ্ধের সামাজিক-অর্থনৈতিক কারণনির্দেশের রীতি পরিহার করে মেলার যুদ্ধের কর্ম-কাণ্ডের গভীরে দেখতে পেয়েছেন কিছু ব্যক্তিমাত্রের মনের বিকার। ফ্যাসিবাদী জেনেরল কামিংস ও উদারপন্থী লেফটেনেন্ট হার্ন, দু'জনেরই রাজনৈতিক মনোভঙ্গি তাঁদের মনস্তাত্ত্বিক পটভূমি থেকে উৎসারিত। যুদ্ধের যে রূপ মেলার প্রত্যক্ষ করেছেন, তার একদিকে জয়-পরাজয়ের যুক্তিরহিত আপাতিকতা, অন্য-দিকে প্রায় প্রত্যেকটি মানুষের স্বীয় ক্ষমতা প্রমাণের আপ্রাণ চেষ্টা। 'বারবারি শোর' উপন্যাসেও সামাজিক সমস্যাবলীর মনস্তাত্ত্বিক উৎসসন্ধানের প্রয়াস লক্ষণীয়। মেলারের নিজের ধারণা, "বারবারি শোর'-এর উৎস নিহিত আছে আমার অচেতন সত্তার বিধ্বস্ত অন্তর-প্রদেশে। এই উপন্যাসের দৃষ্টি যন্ত্রণাক্লিষ্ট। এই উপন্যাস চেয়েছে, আমার নতুন অভিজ্ঞতা এবং আত্মবিনাশ-মুখী এই পৃথিবীর ভয়ংকরতা মিলিয়ে

নরম্যান মেলার

দেবে।...আজ থেকে একশো বছর পর যদি আমার সৃষ্টি বেঁচে থাকে, 'বারবারি শোর'-ই আমার প্রথম তিনটি উপন্যাসের মধ্যে সমৃদ্ধতম বিবেচিত হবে। কেন না তার প্রচণ্ড জ্বরগ্রস্ত উত্তাপের মধ্যে প্রচ্ছন্ন রয়েছে স্তালিনপন্থী, গোপন পুলিশ, আত্মমোহবিলাসী, শিশু, সমকামিতার বিকারগ্রস্ততা নারী, হিস্টিরিয়া রোগী, বিপ্লবী, এই সমুদায় গোষ্ঠীর মনস্তাত্ত্বিক রহস্যের মধ্যে যেন উন্মাদের অন্তর্দৃষ্টি। আমি এই উপন্যাসের মধ্যে অনুভব করি আমার কালের হাওয়া, শাসনশক্তি ও নেতিবাদ যেন আমাদের শতাব্দীর তাণ্ডবের শূন্যতায় পরস্পরকে আক্রমণ করতে উদ্যত।" একটি বোর্ডিং হাউসের বাসিন্দাদের আত্মিক সংযোগ-বিহীন যৌথ জীবনযাত্রায় মেলার যাদের সমাবেশ ঘটিয়েছেন, তাদের মধ্যে রয়েছে অপ্রকাশিত উপন্যাসের উপন্যাস-কার মাইকেল লাভেট, যার স্মৃতি প্রাক্‌-যুদ্ধকে সম্পূর্ণ বিস্মৃত হয়েছে, প্রাক্তন কমিউনিস্ট ম্যাকলিঅড, মার্কিন সরকারের গোপন এজেন্ট হলিংসওয়র্থ, তার সহযোগিনী ল্যানি, দেহসর্বস্ব কামের পশুসত্তায় নিমজ্জিতা গিনেভিয়র। ম্যাকলিঅডের ওপর চোখ রাখছে হলিংসওয়র্থ; সে নাকি একটি "ক্ষুদ্র বস্তু" অপহরণ করেছে, যার রাজনৈতিক গুরুত্ব অপরিসীম। সন্দেহ, ত্রাস ও খবরদারির এই দমবন্ধকরা পরিবেশে জনসাধারণের নির্বিবাদ আত্ম-সমর্পণের ক্লীবতায় 'বারবারি শোর'-এর সুর এমন তিক্ত হয়ে ওঠে। সমাজের দাবির কাছে আত্মসমর্পণ ও সেই আত্ম-সমর্পণেই সুখের সন্ধান হলিউডকে ভিত্তি করে লেখা 'দ ডীয়ার পাক' বা আরো পরের 'অ্যান অ্যামেরিকান ড্রীম' উপন্যাসের বিষয়লোক। এই দুটি উপন্যাসেই সেনসেশনলইজম বা উত্তেজনা-প্রবণতার প্রাধান্য সত্ত্বেও, মেলার যাকে অস্তিত্ববাদ বলেন, তার ইংগিত রয়েছে, বিশেষত দ্বিতীয়োক্ত রচনায়। 'দ হোয়াইট নিগ্রো' বা 'হিপস্টার' নামে এই "মার্কিনী অস্তিত্ববাদী" চারিত্র্য বর্ণনা করতে গিয়ে মেলার লেখেন : "হিপস্টার জানে, আমাদের সামূহিক অস্তিত্ব বলতে যদি বোঝায় পারমাণবিক যুদ্ধে অতর্কিত মৃত্যুর সম্ভাবনা নিয়ে বেঁচে থাকা, নয়তো রাষ্ট্রের সর্বব্যাপী বন্দীশিবিরে মৃত্যুবরণ, নয়তো সমস্ত সৃষ্টিশীল ও বিদ্রোহী প্রবৃত্তিকে চাপা দিয়ে আপোষ-রফায় দীর্ঘায়ত মৃত্যু....মৃত্যুকে নিয়ে জীবনধারণ করাই..যদি বিংশ শতাব্দীর মানুষের নিয়তি হয়, তবে তার একমাত্র প্রাণদ প্রত্যুত্তর হবে মৃত্যুর বিধানকে মেনে নেওয়া, মৃত্যুকে প্রতি মুহূর্তেরই

সম্ভাবনা বলে স্বীকার করেই জীবন নির্বাহ, নিজেকে সমাজ থেকে নির্বাসিত করে মূলহীন জীবনযাপন, সোহহম্-এর বিদ্রোহী অনুশাসনকে অনুসরণ করে অনির্দেশ্য যাত্রায়।" অস্তিত্বের "প্রবৃত্তি-নির্ভর অনুভব" বা শারীর ইন্দ্রিয়জ অভিজ্ঞতার নীতিরহিত অসামাজিক বেপরোয়া সাধনায় মেলার যে হিপস্টার-ধর্মের চরিত্র নির্দেশ করেছেন, সেই হিপস্টারধর্ম শুধু 'অ্যামেরিকান ড্রীম'-এর রোজাকেরই চরিত্রগত বৈশিষ্ট্য হয় নি, মার্কিন উপন্যাসের একটি স্বতন্ত্র ধারার সূচনা করেছে।

মেলার নিজেই হিপস্টার ও বীটনিককে সগোত্র বলে স্বীকার করেছেন। তাদের আকর্ষণ একই উপকরণ-সমুদায়ের প্রতি : "মারিইউআনা, জ্যাজ, বেশি অর্থ নয়, এবং এই সাধারণ বোধ যে সমাজ স্নায়ুতন্ত্রের কারাগার।" অবশ্য পার্থক্যও আছে এই দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে : "হিপস্টারের জন্ম নির্বিত্ত শ্রেণীর নীরব বিদ্রোহের মধ্যে; তাকে বলা যায় অলস নির্বিত্ত মানুষ...নিতান্ত দায়ে না পড়লে সে কায়িক শ্রমে নারাজ। বীটনিক —প্রায়ই জাতে ইহুদি—মধ্যবিত্ত শ্রেণী-জাত, পঁচিশ বছর আগে হলে অল্পবয়সে কমিউনিস্ট লীগে নাম লেখাত। আজ সে কাজ না করার সংকল্প নেয়, তার অভিভাবকদের আত্মবিক্রয়ের প্রতিবাদে। ফলে তার নিজের সমাজত্যাগে সে এক নৈতিক মূল্য আবিষ্কার করে। হিপস্টার তার বেচে নেওয়া টাকার সংস্রবহীন অবসর জীবনযাপনের মূল্য অনেক সহজ মনে গ্রহণ করে।...হিপস্টার চলে বেড়ালের মত, ধীর পদক্ষেপ, সদা সতর্ক: তার সাজপোশাকে জেল্লা আছে।...বীটনিকের সাজপোশাক যেমন তেমন। মধ্যবিত্ত শ্রেণীর বিরুদ্ধে দাঁড়াতে গেলে তাদের সাজগোজের কেতাটাই ঘুরিয়ে দিতে হবে।" দুই সম্প্রদায়ের লোকই যৌন-কামনার দাবিপূরণে ও যাবতীয় নিষিদ্ধ নেশায় বুঁদ হয়ে মুক্তি খোঁজে। হিপস্টার তার নেশার স্নায়বিক মুক্তির মধ্যে নিজের জন্যে আরো খানিকটা জীবন ছিনিয়ে নিতে চায়, সে লড়াই করে তার স্নায়ুতন্ত্রের অদৃষ্টের বিরুদ্ধে, সে যেন ফাউস্ট-এর মত। বীটনিক অনন্তের স্বপ্ন দেখে, সেই অনন্তকে সুন্দর কল্পনা করে, বিশ্বাস করতে চায় সেই অনন্ত যেন তাকে বাহুপাশে গ্রহণ করবে বলে অপেক্ষা করে আছে। সে বাস্তবকে বদলাতে চায় না, বাস্তব থেকে পালিয়ে যেতে চায়।" হিপস্টারের ধর্ম কেবলই অস্বীকৃতি, বীটনিকের ধর্ম তার পরের পদক্ষেপ, সামগ্রিক অসামাজিকতায় প্রতিষ্ঠিত সচেতন এক জীবনযাত্রায়। এই দুই সম্প্রদায়কে মিলিয়েই বর্তমানের 'বীট জেনেরেশন' বা বীট প্রজন্ম। এরা পূর্ব প্রজন্মের স্বার্থপর সাফল্যসাধনায় বিরক্ত, তাদের আপোষরফায় পৃথিবী যে মহা-সর্বনাশের কিনারে এসে পৌঁচেছিল, তার স্মৃতিতে ক্ষুব্ধ। হিপস্টার তার পূর্ব-সূরীদের অবজ্ঞায় অস্বীকার করে, বীটনিক তাদের ঘৃণা করে।

বীটনিকদের মধ্যে যাঁর নাম প্রথমেই উল্লেখযোগ্য তিনি জ্যাক কেরুয়াক (১৯২২—)। কেরুয়াকের 'অন দ রোড', 'দ ধর্ম বাম্স্', 'ডকটর স্যাকস্', 'পিসটেসা' বা 'দ লোন্সাম ট্র্যাভেলার' উপন্যাসে সর্বসংস্কারমুক্ত জীবনযাপনের জয়জয়কার। প্রথমোক্ত দুটি উপন্যাসে তিনি একদল তরুণতরুণীকে এনে দাঁড় করান, যারা আধুনিক কোন মার্কিন শহরের বিভীষিকা ছেড়ে পালাতে চায়, পথের আয়াসসাধ্য পরস্পরনির্ভর জীবনের মধ্যে একটা মানে খুঁজে পায়, নিরন্তর পথ চলাকেই জীবন বলে ধরে মজা পায়। পথকে জীবনযাত্রার একমাত্র ক্ষেত্র বলে ধরলে স্বভাবতই কোন আইনের বা নিয়মনীতির আর অর্থ থাকে না, কারণ আইন সামাজিকতারই দুর্গপ্রাচীর। 'অন দ রোড'-এর নায়ক মরিয়ার্টি তার পথকে বর্ণনা করে: "এই পথ যার তার যেমন করেই হোক স্বতন্ত্রের পথ।" প্রতিটি মুহূর্তের মধ্যেই নিঃশেষে বেঁচে নেওয়ার এই তাগিদ কিন্তু কেরুয়াককে শেষ পর্যন্ত ওয়েস্টার্ন ছবির নায়কের ধর্মে পৌঁছে দেয় নি। বরং তাঁর রচনায় "মধুর" ও "বিষণ্ণ" কথা দুটি বারবার ফিরে এসেছে। তাঁর চরিত্রাবলীর কষ্টভোগের সামর্থ্যও অপরিসীম। ভাষাপ্রয়োগে কেরুয়াক যে "স্বতঃস্ফূর্ত গদ্যের" ব্যবহার করেন, তার নীতি ব্যাখ্যা করতে গিয়ে তিনি লেখেন, রচনা হবে ছবির খসড়া স্কেচ্-এর মত, জ্যাজ শিল্পীর 'ব্লোইং'-এর মত; বাক্যকে যতিচিহ্ন দিয়ে না ভেঙে "ইংরেজি ভাষার সমুদ্রে সাঁতার কেটে" চলা যাক। কেবল শ্বাস-প্রশ্বাসের সঙ্গে সংগতি রেখে লম্বা 'ড্যাশ' লাগানো যেতে পারে, "যেন টেবিলের ওপর ঘুঁসি মেরে জোর দিয়ে এক-একটা সম্পূর্ণ বাক্য, ব্যাস্। তার-পরেই ড্যাশ..."; "যথার্থ শব্দ বাছবার জন্য অবকাশ নেই"; "কী বলবে, তা স্থির করে নিয়ে লিখতে বস না, লেখার মুহূর্তে বিষয়ের গভীরতম রত্নভাণ্ডারে ডুবে যাও, তারপর ভাষার সমুদ্রে সাঁতার কাটতে কাটতে উঠে এস, যতক্ষণ না কূলে এসে পৌঁছতে পার, নয়তো ক্লান্ত হয়ে পড়।" 'সংস্কার' বা 'কলাকৌশল' পরিহার করে "সম্ভব হলে...প্রায় মোহাচ্ছন্ন" হয়ে স্বচ্ছন্দে অবলীলায় লিখে চলার যে পরামর্শ কেরুয়াক দিয়েছিলেন, উইলিয়ম বারোজ (১৯১৪—) মরফীনের নেশায় আবিষ্ট হয়ে যে অনুভব লাভ

রবীন্দ্রনাথ ও সুভাষচন্দ্র

নেপাল মজুমদার

ভারতের মুক্তি-আন্দোলনের বিশেষ এক পর্যায়ে—ত্রিশ থেকে চল্লিশের দশকে—সুভাষচন্দ্র যে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন, রবীন্দ্রনাথ তাকে কি চোখে দেখেছিলেন,—রবীন্দ্রনাথ ও সুভাষচন্দ্রের রাজনৈতিক ও ব্যক্তিগত সম্পর্কই বা কি ছিল, শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত তারই বস্তুনিষ্ঠ ইতিহাস 'রবীন্দ্রনাথ ও সুভাষচন্দ্র'। এই প্রসঙ্গে এসেছে দেশ ও বিদেশের ঘাত-প্রতিঘাতপূর্ণ সমসাময়িক রাজনৈতিক ঘটনা-বলী, কংগ্রেসের দক্ষিণ ও বামপন্থীদের বিরোধের কথা, আর সেই বিরোধকে ঘিরে ও অন্যান্য প্রশ্নে গান্ধী, জওহরলাল, পি সি রায়, মেঘনাদ সাহা প্রমুখ ঐতিহাসিক ব্যক্তিদের নানা ভূমিকার কথা। লেখক 'দেশ' পত্রিকার পাতায় যে আলোচনার সূত্রপাত করেছিলেন, তারই পূর্ণাঙ্গ প্রকাশ এই বইটি। বহু বিস্মৃতপ্রায় ও চাঞ্চল্যকর তথ্য সহযোগে আধুনিক ভারতের ইতিহাস রচনার ক্ষেত্রে এই বই নিঃসন্দেহে এক অসাধারণ সংযোজন। দুষ্প্রাপ্য চিঠিপত্রের প্রতিলিপি, প্রতিকৃতি চিত্র ও গুরুত্বপূর্ণ তথ্য সম্বলিত পরিশিষ্টসহ বইটির প্রকাশ অনুসন্ধিৎসু পাঠকদের অভিনন্দন লাভ করবে।

দাম : দশ টাকা

সারস্বত লাইব্রেরী : ২০৬ বিধান সরণী, কলিকাতা-৬

করেছেন, স্বয়ংগামী রচনায় তা প্রকাশ করার চেষ্টায় কেরুয়াকের সেই পথ ধরেছেন।

'নেকেড লাঞ্চ' উপন্যাসে বারোজ ভঙ্গ-তাৎপর্যের সচেতন জটিলতা পরিহার করেছেন, ঘটনার ক্রমান্বয়িক গতির ধার ধারেন নি। তথাপি তার আপাত বিশৃঙ্খলার মধ্যে দেখা যায়, সভ্যতা কূটকৌশল ও যান্ত্রিকতার চরমে এসে পৌঁচেছে, আর তার মধ্যে নিঃসঙ্গ মানুষ শিরায় মরফীনের বিষ নিয়ে তার স্বাতন্ত্র্য বাঁচাবার প্রাণপণ চেষ্টা করে চলেছে। রাষ্ট্র-ক্ষমতা, বিজ্ঞান ও পশুশক্তির সাংগঠনিক আঁতাতের এই ভয়ংকর কল্পনা ঐ নেশা-গ্রস্ত রচনার গুণেই এক উদ্ভট আন্তর যৌক্তিকতা লাভ করে। সত্যিই তো, স্থিরমস্তিষ্কে মুক্তদৃষ্টিতে এহেন কল্পনা কি সম্ভব? অথচ যন্ত্রের ক্রমপ্রসারমাণ সাম্রাজ্যের পরিপ্রেক্ষিতে, ব্যক্তিসত্তার লাঞ্ছনার পরিপ্রেক্ষিতে এই কল্পনা বাস্তবেরই ঈষৎ বিকৃত প্রতিবিম্ব মাত্র। কেরুয়াকের 'সিটিসিটিসিটি' বড় গল্পেও এমনি এক ভয়ংকর শহুরে নরকের ছবি আছে। সেই শহরে 'অসীম গুণের কমপিউটারের' নির্দেশে এক-একটি ব্লককে সম্পূর্ণ জ্বালিয়ে দিয়ে কয়েক সহস্র লোককে হত্যা করে অতিবসতির সমস্যার সমাধান করা হয়। এই সমাধান দেশের মানুষ বিনা প্রশ্নেই মেনে নিয়েছে, নিজেদের ঐ অদৃষ্টই ভবিতব্য জেনেও। তবু তারা একবার যেন মানবিক যন্ত্রণার স্বাদ পায় নিজেদের মৃত্যুর একেবারে মুখোমুখি এসে, প্রাণভয়ে। তবে তাও তো কয়েক মুহূর্তের জন্য। জন রেচির লেখাও ঐ নেশাগ্রস্ত ধরনেই। তবে তাঁর রচনায়—যেমন 'সিটি অফ নাইট'-এ—মার্কিন শহরের একালীন বাস্তবের কদর্য দিকগুলিই যেন আরো কদর্যরূপে দেখা দেয়—তার সস্তা সুখের এলাহি আয়োজনে গা ভাসিয়ে চলা, তার বিকারগ্রস্ত কাম, তার প্রবল হত্যাসাধ। হিউবার্ট সেলবি জুনিয়রের (১৯২৮—) 'লাস্ট একজিট টু ব্রুকলিন' মার্কিন জীবনে বিকৃত কামের এই নিষ্ঠুরতা আরো তীব্রভাবে প্রকাশ করেছে—একদিকে সমকামীদের অদ্ভুত আত্মবঞ্চনা, অন্যদিকে গণিকার লাঞ্ছনা ও হত্যায় মানবদেহের ঘোর অমর্যাদা। বারোজ, রেচি বা সেলবির লেখায়, বিশেষত তাঁদের "স্বতঃস্ফূর্ত গদ্যের" প্রয়োগেই, যে নরকের প্রকাশ ঘটে, তার বর্ণনায় কোন আবেগাতিশয্য নেই বলেই তার মৃত্যু-শীতল ভয়ংকরতায় যেন গায়ে কাঁটা দেয়। 'লাস্ট একজিট টু ব্রুকলিন'-এর অংশবিশেষ প্রকাশের অপরাধে 'প্রভিন্স-টাউন রিভিউ'-এর সম্পাদকের বিরুদ্ধে মামলা রুজু করা হলে বিশিষ্ট কবি-সমালোচক অ্যালেন টেট বিচারালয়ে সাক্ষীর ভাষণে বলেছিলেন, "এই গল্প পড়ে যদি কোন তরুণ যৌন অপরাধে প্রবৃত্ত হয়, তবে বলতে হবে এই গল্প পড়ার আগে থেকেই সে অস্বাভাবিক মানসিকতায় বিকারগ্রস্ত। আমার বিশ্বাস আইন জনসাধারণকেই রক্ষা করার জন্য, সাইকোপ্যাথ বা অপরাধপ্রবণ মানসিক বিকারগ্রস্তদের জন্য নয়।"

জে পি ডনলীভির 'দ জিনজার ম্যান', 'এ সিংগিউলার ম্যান' বা 'সেবাসটিসিয়ান এস্' প্রভৃতি উপন্যাসে তিনি একই ধরনের একটি চরিত্রই রচনা করেছেন। ডনলীভি নিজে আইরিশ, তাঁর এই চরিত্রের টাইপটিও তাই। এর জীবন সর্বনীতিবোধ-বিরহিত। অপরকে ঠকিয়ে, নিজের স্ত্রীকে ঠকিয়ে, এমন কি নিজের মেয়ের জন্য রাখা দুধ চুরি করে, প্রেমের অভিনয়ে বহু মেয়েকে ঠকিয়ে নিজের কামনা চরিতার্থ করে তার জীবনযাত্রা। লেখকের চাল মজাদার। তবু চালাকি-ওস্তাদির এই সুচতুর খেলার মধ্যেই এক-একবার পাঠক নিজেকেই প্রশ্ন করবেন: একে নিয়ে কি হাসা চলে? ক্ষেপে উঠছি না কেন এই স্বার্থপর প্রবঞ্চকের কদর্য লীলাখেলায়? ডনলীভির ঈষৎ ব্যঙ্গ-মিশ্রিত স্বরে যেন একটা ইঙ্গিত আছে: আমরা আমাদের এই বাস্তবে এই ধরনের একটা লোকের বাহাদুরি দেখে কি সত্যিই ক্ষেপে উঠি, না আসলে একে ঈর্ষা করি, তারিফ করি?

মার্কিন জীবনে নারীপুরুষের সম্পর্কের সহজতার সঙ্গে-সঙ্গেই সাহিত্যে যৌন সম্পর্ক ও বিকারগ্রস্ত কামের বর্ণনায় যে নির্লজ্জতা এসেছে, সেদিকে প্রথম পদক্ষেপ হেনরি মিলারের (১৮৯১—)। মিলার দীর্ঘকাল প্যারি-তে থেকেছেন, তাঁর উপন্যাসগুলির প্রথম প্রকাশও অনেক ক্ষেত্রেই বিদেশে। মিলারের সমগ্র রচনাবলী বস্তুত এক দীর্ঘ আত্ম-জীবনীর এক-একটি অংশ, এবং স্বভাবতই একটি বিশেষ ব্যক্তিত্বের আত্মপ্রকাশ। মিলারের অতিদরিদ্র বাল্যকাল কেটেছে নিউ ইয়র্কের রাস্তায়। 'ব্ল্যাক স্প্রিং' উপন্যাসে মিলার লেখেন, "রাস্তায় জন্ম-গ্রহণ করলেই সারা জীবন ঘুরে বেড়াতে হয়, স্বাধীন থাকা যায়। তার অর্থই হল ঘটনা-দুর্ঘটনা, নাটক, গতি। সর্বোপরি স্বপ্ন। অবাস্তব তথ্যাবলীর সমাহারেই এই ভবঘুরে জীবন এক দার্শনিক নিশ্চিতি খুঁজে পায়। মানুষ আসলে যে কী, তা কেবল ঐ রাস্তার জীবনেই ধরা পড়ে। সেই জানা যে জানে নি, তাকে অন্যভাবে আবিষ্কার করে নিতে হয়। খোলা রাস্তায় যা পাওয়া যায় না, তা-ই মিথ্যা, ধার করা, যাকে বলে সাহিত্য।" 'ট্রপিক অফ ক্যানসার', 'ট্রপিক অফ ক্যাপরিকর্ন', 'দ রোজি ক্রুসিফিকশন', প্রভৃতি উপন্যাসে সেই রাস্তার ভবঘুরে ছেলের মোহহীন অকালপক্ক বালকোচিত দৃষ্টিতে দেখা জীবনের ছবি পাওয়া যায়। দারিদ্র্য, ক্ষুধা ও অভাবের সেই জীবনে নিজের শরীরের অবাধ চাহিদা পূরণের চেষ্টায় একটা আত্মঘোষণা আছে, অথচ সেই আত্মঘোষণায় কোন মিথ্যা দম্ভ নেই, বরং একটা গয়ংগচ্ছ সাবলীলতা আছে। ইংরেজিতে যাকে 'নাইভেতে' বা ছেলে-মানুষী বলে, সেইটেই মিলারের লেখার ধরনের ভিত্তি। তাঁর রচনায় সাবেকি সুগঠিত উপন্যাসের প্লট, চরিত্রায়ণ বা এমন কি নির্দিষ্ট কোন প্রসঙ্গভূমি খুঁজতে যাওয়াও নিরর্থক। মিলারের অশ্লীলতাও যেন একালীন শহুরেপনার ধার ধারে না, বরং বোকাচ্চিও, রাবেলে, স্টার্ন কিংবা হুতোমি ধাঁচের, কিংবা হয়ত ভারতচন্দ্রকেও টেনে আনা যায়। এই অশ্লীলতা পূর্ণ-বয়স্ক স্বাভাবিক পুরুষ মানুষের ঘরোয়া আড্ডার সহজ অশ্লীলতা, অপ্রাপ্তবয়সীর অপূর্ণ কৌতূহলজাত নয়; ফলত তার প্রতিক্রিয়াও অন্যরূপ। অশ্লীলতার এই ধরনটিই প্রাজ্ঞতর মার্কিন ঔপন্যাসিকেরা গ্রহণ করেছেন। বাজারী ঔপন্যাসিকদের গ্রেস মেটালিয়স মার্কা ধরনের থেকে তার পার্থক্য স্বতঃপ্রকাশ। অবাধভাষণের এই শিক্ষা বীট জেনে-রেশনের লেখকেরা হেনরি মিলারের কাছ থেকেই পেয়েছেন বলে প্রায়ই স্বীকার করেন।

বীটনিক ধারার পাশাপাশি যে সাবেকি ধারা চলছিল, পঞ্চাশের দশকে সেই

রিস্ট ওয়াচ

মাত্র ৬৲ টাকায়

আমাদের চেন পদ্ধতি স্কীমের মাধ্যমে মাত্র ৬৲ টাকায় ৫ বৎসরের গ্যারান্টী সমেত ৫ জুয়েল রিস্ট-ওয়াচ লাভ করুন। ডাকমাশুল ১/১৫ টাকা অতিরিক্ত।

দ্রষ্টব্য: আমাদের মধু-চন্দ্রিমা সেন্টের বিক্রয় বৃদ্ধির জন্যই এই স্কীম চালু করা হইল। পছন্দ না হইলে মূল্য ফেরৎ।

SWISS WATCH TRADING CO.
P. B. 87, (WBC) Jullundur City.

ধারার মধ্যেও একটা নতুন প্রগাঢ়তা আসে, বিশেষত ১৯৫১ সালে জে ডি স্যালিংগারের (১৯১৯—) 'দ ক্যাচার ইন দ রাই' ও উইলিয়ম স্টাইরনের (১৯২৫—) 'লাই ডাউন ইন ডার্কনেস'-এ। স্যালিংগারের নায়ক হোলডেন কলফীল্ডের সাধঃ "আমি কেবলই কল্পনা করি এক বিশাল রাইয়ের ক্ষেতে একদল ছেলেমেয়ে খেলা করছে। হাজার হাজার ছেলেমেয়ে খেলা করছে, কাছাকাছি কেউ নেই—মানে, বড় কেউ নেই—এক আমি ছাড়া। আর আমিও দাঁড়িয়ে রয়েছি এক পাহাড়ের কিনারে। আমার কাজ বলতে, ওরা কেউ পাহাড়ের কিনারে এসে পড়লে আমি ওদের ধরে ফেলব—মানে, ওরা বেদম ছুটতে ছুটতে খেয়াল না রাখে, কোন্ দিকে চলেছে, তবেই আর কি আমাকে বেরিয়ে এসে ওদের ধরতে হবে। সারাদিন ধরে ঐ-ই করব। রাইয়ের ক্ষেতে ছেলে ধরা। জানি, ব্যাপারটা কেমন পাগলাটে লাগে। কিন্তু তবু পারলে ঐ একটা কাজই করতাম।" হোলডেনের সাধ, তার নিরপরাধ নিষ্পাপ কৈশোরকে আঁকড়ে থাকা, অন্যদেরও—রাইয়ের ক্ষেতের ছেলেমেয়েদেরও—অপাপবিদ্ধ মনগুলোকে বাঁচিয়ে রাখা। বয়স্কদের মনে সে দেখে কেবলই পাপ, চারিদিকে পাপ। তবু সে বয়স্কদের ক্ষমাও করতে পারে, তাদের যেন বুঝতেও পারে। কিন্তু ছোঁয়াচ বাঁচিয়ে চলবার প্রাণান্ত চেষ্টাই সে করে চলে। ছোট বোন ফীবি-র স্কুলের দেয়ালে কোন অশালীন উক্তি দেখে হোলডেন তা মুছে দেয়, তারপরেই দেখে, দেয়ালে আরো অমনি উক্তি। কত মুছবে? হোলডেনের জীবনের অভিজ্ঞতাও ঐ অসহায়তায় পৌঁছয়ঃ একটা নিষ্পাপ মনকে এই পৃথিবীতে বাঁচানো যায় না। স্যালিংগারের উপন্যাসে যে জীবন আভাসিত, তার পরিসর সীমিত; কিন্তু অপরাধবোধের তীব্রতা ও নিজেকে বাঁচিয়ে রাখবার আকুতির গভীরতায় তাঁর প্রগাঢ়তা অনস্বীকার্য। স্টাইরনও যুক্তরাষ্ট্রের দাক্ষিণাত্য প্রদেশের পটভূমিকা গ্রহণ করেও স্বামী-স্ত্রী-কন্যার পারস্পরিক সম্পর্কের জটিলতায় নিজেকে সীমিত করেছেন। ফকনরকে অনুসরণ করে তাঁরই ধরনে স্টাইরন একই কাহিনী একাধিক পর্যবেক্ষকের দৃষ্টিকোণ থেকে পরিবেশন করেছেন। আমার স্যালিংগারের মতই স্টাইরনেরও বিষয়ভূমি—পাপের সর্বগ্রাসী বিস্তারে নিষ্পাপ ব্যক্তিসত্তার অসম্মোঘ পতন: "বুঝতে পারছ না, গত সপ্তাহেই আমাদের মহামহীয়ান মার্কিন কমনওয়েলথ এক ফুৎকারে এক লক্ষ নিষ্পাপ প্রাণ উড়িয়ে দিয়েছে।" হিরোসিমা নাগাসাকিও এই পাপেরই অংশ। আন্তর স্বপ্নগ্রন্থোক্তির প্রয়োগে স্টাইরন আত্মহত্যার আগে পেটনের মনের বিধ্বস্ত দশা তুলে ধরেছেন। প্রতীকের জটিল ব্যঞ্জনায় তিনি তাঁর সীমিত কাহিনীকে একটা বৃহত্তর নৈতিক লোকের মধ্যে স্থাপন করেছেন। এই প্রতীকের আভাস তিনি রচনা করেন স্বচ্ছন্দ ভাষা প্রয়োগের এক-একটি সূক্ষ্ম ইঙ্গিতে। স্যালিংগার ও স্টাইরনের সঙ্গে বীট জেনেরেশনের যোগ, পূর্বসূরীদের

জে ডি স্যালিংগার

বিরুদ্ধে এই বিক্ষোভে। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ, হিরোসিমা নাগাসাকি, কোল্ড ওয়ার ও ম্যাকার্থিবাদের পাপে যে যুগ কলুষিত, তার প্রতি এই বিতৃষ্ণা থেকেই মার্কিন চিন্তায় একটা নতুন সদর্থক ধারার সূচনা ঘটেছে। মার্কিন জীবনের জীবনীশক্তিও নিহিত রয়েছে এই প্রতিবাদী চেতনার মধ্যেই।

জন আপডাইকের (১৯৩২—) রচনায়, বিশেষত 'পুওর হাউস ফেয়ার', 'দ সেন্টর' ও 'অন দ ফার্ম'-এ একটা ধর্মীয় চেতনার উপস্থিতি অনুভব করা যায়; মানব-সম্পর্কের জটিলতা থেকে মুক্তি পাবার একটা সাধই র‍্যাবিট, রান-এর ভিত্তি। 'দ সেন্টর'-এ গ্রীক পুরাণের পশ্চাদ্‌পট রচনাকৌশলরূপে মজা আনলেও যথেষ্ট অর্থময়তা লাভ করে নি। আপডাইকের রচনা ঘটনার বাস্তবে তেমন জোর দেয় নি, অন্য কোথায়ও পৌঁছতে চেয়েছে, অথচ সেই তাৎপর্যেও পৌঁছতে পারে নি। ফলে আপডাইকের উপন্যাসে এখনও অতৃপ্তিরই বোধ হয়।

মার্কিন উপন্যাসের এই পর্বের এহেন বৈচিত্র্যের মধ্যেও যা লক্ষণীয়, তা হল বিশ্লেষ সমাজপরিবেশ ও তারই মধ্যে স্থাপিত ব্যক্তিমানুষের পারস্পরিক সংযোগের বাস্তবধর্মী বিবরণের ঐতিহ্য পরিহার করে হয় সচেতন অসামাজিকতায় বা মোহাচ্ছন্নতায় আত্মনিমজ্জন, নয়তো এক ধরনের সহজ আধ্যাত্মিকতায় শিশুর নিষ্পাপ মন ফিরে পাবার সাধ। এ ধরনের দৃষ্টিভঙ্গি মননের ক্লীবতারই নামান্তর বলে মনে হতে পারে। কিন্তু প্রথম মহাযুদ্ধের কয়েক বছর পরে লেখা ডি এচ্ লরেন্স-এর 'লেডি চ্যাটারলিজ লাভার'-এর শুরুতে যে ঘোর বিশ্বাসভঙ্গ ও সবকিছু ভেঙে পড়ার একটা বোধ আছে, সেই বোধের সঙ্গে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পরবর্তী ও কোরিয়া-ভিয়েতনাম যুদ্ধের সমকালীন এই সভ্যতা-বিরাগ বা ভাবাদর্শবিরাগের প্রত্যক্ষ যোগ বর্তমান। যে জেনেরেশন বা প্রজন্মের মানুষ এই ক্রমান্বয় যুদ্ধ ঘটিয়েছে বা একে প্রশ্রয় দিয়েছে, সেই প্রজন্মের প্রতি একটা নৈতিক ঘৃণাবোধ থেকেই এই লেখকেরা তাদের মূল্যবোধ বা ভাবাদর্শ বর্জন করেছেন, তাদের কাল থেকে নিজেদের কালের মানসিকতার স্বাতন্ত্র্য রাখতে সচেষ্ট হয়েছেন। পূর্বসূরীদের অপরাধী বিবেচনা করেই এই যুগ তাদের ছোঁয়াচ বাঁচিয়ে যেন একটা শুদ্ধ মানসিকতার সন্ধান করছে। তার লক্ষ্য এখনও অনিশ্চিত; তার এই মন্থন-লীলায় হয়ত অনেক বিষেরই ফেনা ভেসে উঠছে; এ সবই স্বাভাবিক। তবুও এই অস্বীকৃতির সদর্থক মূল্য স্বীকার না করে উপায় নেই। কারণ অতীতের জরদ্গব অন্ধ বিশ্বাসের ভারকে অস্বীকার না করতে পারলে নতুন কিছু স্বীকার করে নেওয়াও সম্ভব হয় না। অস্বীকৃতির মধ্যে যে সম্ভাবনা, মার্কিন উপন্যাসের বর্তমান পর্বে সেই সম্ভাবনা।

নীল ফুলদানি

অনিমেষ চৌধুরী

প্রথম কিছুটা বিস্ময়। শেষে, কেমন এক ভয় আর আতংক আমায় পেয়ে বসল। বস্তুত তখনি, কোন এক হঠাৎ মুহূর্তে, আমি আমার নানা চিড়, ফাটল আর জোড়গুলো স্পষ্ট বুঝতে পেরেছিলাম। যেমন, ভাঙা কাচের কিছু জোড়া লাগালে হয়, সেরকম। তবে, এটা ঠিক, মীরা যদি টের পায় কখনো, এ ধরনের উপমায় ও, একাধিক টুকরোয় ভাঙা, শেষে জোড়া লাগল সেই নীল ফুলদানির উল্লেখ করবে। এ যেন অনিবার্য, মীরা করবেই।

অথচ, মনে পড়ছে, প্রথম প্রথম, সেই নীল ফুলদানি খুব অযত্নে আর অবহেলায় খাটের তলায় ধুলোমাখা হয়ে থাকতো। ভাঙার পর যত্ন বেড়ে গেল মীরার। মমতা। কারণ, তখন নাকি ভাঙা ফাটা দাগগুলো আশ্চর্য এক প্যাটার্ন দিয়েছিল। যেন, এতদিনে, মীরার কথায়, ওর নিজস্ব স্বাভাবিক ব্যক্তিত্ব খুঁজে পেয়েছে। ফুলদানিটার? আশ্চর্য! জানি, আমাদের সম্পর্ক কখনো বৈরিতাহীন নয়। এটাও সে ধরনের কিছু, ধরে নেওয়া গেলেও, কপালক ওর মুখের দিকে তাকিয়ে থাকতে, মীরা বলল, "তাই না, বল?" মীরার এ সব খুব স্পষ্ট আর পরিচিত। পালটা আঘাত দিতে চায় ও। বিন্দুমাত্র সুযোগ পেলে, মীরা, আমাকে রক্তাক্ত করতে ছাড়ে না। বিশ্বাসের শক্ত জমি থেকে আমূল উপড়ে ফেলতে আমায়, মরিয়া হয়ে ওঠে। হঠাৎ হঠাৎ কি যে হয় মীরার! মনে পড়ছে, কোন একদিন, বিজয় সম্বন্ধে তিক্ত কিছু আলোচনার পর সেই নীল ফুলদানির উল্লেখ করে বলেছিলাম, "মানুষও তাই। সততা,

পবিত্রতা আর সৌন্দর্যের আধার। শুধু শরীর, শরীর—এবং তার ক্ষুধা ছাড়া বিজয় আর কিছু বোঝে না।" মীরা চুপ। পলকে হাসি নিভে গেল। কিংবা মীরা চুপ করে, হাসিটা সরিয়ে নিল। যেন, দুর্বল কোন্ গোপন জায়গায় কি কোন গোপন ক্ষতয় হাত পড়েছে, ওর চোখমুখ করুণ হয়ে উঠল। কিংবা আমার এই গ্রাম্য উক্তিতে মীরা যেন ক্ষুব্ধ, বিরক্ত, অপমানিত, নিস্পৃহ থাকল। এতদিন পর সে আঘাত কি মীরা ফিরিয়ে দিতে চাইছে। বললাম, "হয়তো।"

বস্তুত সে সময় এ নীল ফুলদানি, সারাক্ষণ আমায় চিন্তিত রাখতো। আমি প্রায়ই স্মৃতি হাতড়ে খুঁজে দেখতাম, না পেয়ে অস্বস্তি যদিও বাড়তো কিছুটা, তাহলেও আমি প্রায় ধরে নিয়েছিলাম, এটা বিজয়ই কোন ভাবে গছিয়েছে মীরাকে। নয়তো মীরা কিনেছে কোথা থেকে, কিন্তু ইনিয়ে বিনিয়ে এমন সব রহস্য সৃষ্টি করেছে, যেন বিজয় ছাড়া অন্য কিছুর ভাবার সুযোগ না থাকে। এমন কিছু হবে। কারণ যে ঠিক কি, না বুঝলেও মনে হতো, যদিও আমি খুব নিরুত্তাপ নই, তবুও মীরা হয়তো আরো কিছু তাপ আশা করে। কিংবা এমনও হতে পারে: মীরা আমার সততা, নিষ্ঠা, প্রেম ইত্যাদিগুলো যাচাই করে নিতে চায়। নয়তো, বুঝতে চায়, ঘৃণা, ঈর্ষা, ক্ষয় ইত্যাদি পাপবোধে কতটুকু পীড়িত হই আমি। বা, এমনও হওয়া বিচিত্র নয়, এ সবই আমার ভুল আর ভ্রান্তি। হয়তো মীরা সে ধরনের ফুলের কোন গাছ, যা ভিন্ জমি আর জল-হাওয়ায় বাঁচে না। কেমন খাপছাড়া, অস্বাভাবিক হয়ে ওঠে। শুকিয়ে বিবর্ণ হয়ে নিষ্প্রাণ হতে থাকে ক্রমে। সত্যি মীরা খুব আশ্চর্য। ওর অদ্ভুত কতক-গুলো রুচির মত অদ্ভুত কতকগুলো রহস্য আছে। যা আমার বোধ ও বুদ্ধির অতীত।

তবে, আমি নিঃসন্দেহ, এ ফুলদানি মীরা কিংবা বিজয়ের সঙ্গে কোন না কোনভাবে জড়িত। যত দূর জানা আছে, এ আমাদের পৈতৃক সম্পত্তি নয়। এ সব রাখার শখ এবং অর্থ পিতা, পিতামহ এবং আমার, কারো ছিল না। এক আমাদের বিয়ে উপলক্ষ। তাও, আমাদের বিয়েতে ফুল, মালা, চন্দন, বরযাত্রী, নিমন্ত্রণ, উপহার ইত্যাদি [illegible] কিছুই ছিল না। স্রেফ আন্ডার [illegible] এ্যাক্টে রেজিস্ট্রি করা। এক [illegible] ঘুম ভেঙে চোখে পড়েছিল। প্রথম রোদের মত উজ্জ্বল হলুদ ফুল মাথায় নিয়ে ঝকঝকে নীল ফুলদানি হাসছে। আর, তার চারপাশে চক্রাকারে ডোমরা, বোলতা বা ওরকম কোন হিংস্র কীট্! "অহ্—" ভীষণ হয়ে, "কি বিট্রেয়াস! এই ফুল—উঃ মীরা—" আমি প্রায় চিৎকার করে উঠেছিলাম।

এ সবই সেই ঐতিহাসিক খরার আগে।

সম্ভবত, সে সময়, ফুলদানিটা খাটের তলায় ধুলো আর নানা জঞ্জালের মাঝে চালান হয়ে থাকবে। এবং তারপর, ওটা ভাঙা, জোড়া লাগা, মীরার যত্ন, ঠিক কখন শুরু হয়েছিল আমার স্মরণ থাকার কথা নয়। তখন আমি নিজের মধ্যে নানা ফাটল, বিচিত্র বিভেদরেখা টের পাচ্ছিলাম। খরা নিয়ে ভীষণ বিব্রত এবং কতকগুলো শব্দের সঠিক অর্থ উদ্ধারে বিভ্রান্ত, নাজেহাল। যেমন, ক্ষুধা, ফুড ক্রাইসিস, দুর্ভিক্ষের ছায়া বা কবলে হোমগার্ড, মূল্যমান হ্রাস, রিলিফ, দেশ, দেশের দুঃসময়, আইনশৃঙ্খলা, ফাটকাবাজী, মুনাফা, কালোবাজার, মুদ্রাস্ফীতি, গণতন্ত্র, গুপ্তচর, দালাল এবং এর পাশা-পাশি আরো কতকগুলো শব্দ দমননীতি, খাদ্য আন্দোলন, মিছিল, সংগ্রাম ইত্যাদি আরো অনেক। আমি এ সবের বিন্দু-বিসর্গ বুঝতাম না। কিন্তু ক্ষুধা ও অভাব আমাকে কাতর করে তুলছিল। ভয় এবং মরিয়াভাব পাশাপাশি কাজ করছিল। বিশেষত, বাবার অনাহার আমাকে অস্থির করে তুলছিল বেশি। বাবা যেন আর সহ্য করতে পারছেন না। দিনদিন বাবা কেমন নিস্তেজ হয়ে পড়ছেন। চুপ থাকেন প্রায় সারাক্ষণ। কিন্তু, মাঝে মাঝে কেমন চমকে চমকে উঠতেন। ঘোলা, নিষ্প্রভ চোখে কি যেন খুঁজতেন, কাকে যেন।

সে সময়টা কখন, কোন সাল। হয়তো খরা কিংবা খরার পর। দেশ জুড়ে ভীষণ আকাল। দারুণ খাদ্য [illegible] তখন হন্যে, মরিয়া। পরস্প [illegible] কোথাও কোন খাদ্যের স [illegible] হয়ে যাচ্ছে। তাতে [illegible] বা শক্তিমানরা কিছু [illegible] আমি খুব নির [illegible]

ক্ষীণ [illegible]

বোঝাতেন। অদৃষ্টবাদ। 'সবই, ঈশ্বরের ইচ্ছে, বুঝলে!" গলায় তুলসীর মালা, পিটপিট চাউনি, তেলের পিপের মত হারু মণ্ডলকে কেমন অদ্ভুত লাগত। তা বলে যে সে হেলাফেলার লোক নন্ হারু মণ্ডল। বিরাট জোতদার। ইদানীং কালোবাজারী, মুনাফাখোর, চাল চোরা-চালানদার প্রভৃতি কথায়, কিছু নিন্দুক দুর্জনেরা তাঁর চরিত্রহননের চেষ্টা করলেও শিক্ষা, সংস্কৃতি, রাজনীতি, সমাজ উন্নয়নমূলক নানা কাজে তাঁর অবদান অশেষ। "বুঝলে হে, এসব-খরাটরা ক্ষুধাটুধা কিছু না। সব টাকা। টাকা ফ্যাল, দেখবে, সব ভুয়া! ভোঁভাঁ। কি এক দারুণ পিপাসায় ওর কথা হঠাৎ ফিসফিস শোনাত, "টাকাই সব—" জানি, ধারে কারবার করেন না হারু মণ্ডল। সোনাদানা টাকা-পয়সা জমিজমার কাগজ-পত্র না হলে ও'র শক্ত মুঠো আলগা হয় না কখনো। ও'র চোরাকুঠরীর অন্ধকারে বস্তাবস্তা চাল প্রতি মুহূর্তে সোনা হয়ে যাচ্ছে। তবু যে কেন, হঠাৎ পিপাসায় হারু মণ্ডলের গলা শুকিয়ে আসে, কে জানে।

এর পর, সেই রিলিফ আর বি ডি ও অফিস। অহ্, সে এক আজব! এ আমার সম্পূর্ণ অদেখা ও অজানা ছিল। এ সব আমলাদের। দেখে তো থ। ওদেরও তাই বিশ্বাস, এসব খরাটরা দুর্ভিক্ষ-টুর্ভিক্ষ অনাহার-টনাহার কিছু না। এসব ঠগ, জোচ্চোর আর মতলব-বাজদের রটনা। কিছু হাতাবার ফিকির। স্রেফ দুর্নীতি। এবং তার দু'একটা ধরাও পড়ছিল; ফেঁসেও যাচ্ছিল কিছু কিছু। অখাদ্য কুখাদ্য কি পুষ্টির অভাব-জনিত মৃত্যু, অথচ অনাহারে মৃত্যু বলে চালাতে গিয়ে অকাট্য বৈজ্ঞানিক তত্ত্বে ফেঁসে যাচ্ছিল সব। সত্যমিথ্যা কে জানে, এমন সব নানা রটনা-ঘটনা নানা জনশ্রুতি। সুতরাং, আমার আবেদনপত্রটি ক'পলক দেখে, "প্রমাণ আছে—" শকুনের মত সরু গলা, উঁচু কাঁধ আমলাটি, "এ সব যে লিখেছেন, অভাব, অনাহার প্রমাণ করতে পারবেন—" হেঁকে উঠতে, আমি কেমন বিপন্নবোধ করলাম। "প্রমাণ—" উচ্চারণ করলাম ক'বার। হ্যাঁ, প্রমাণ! তুমি যে, ঠগ জোচ্চোর ফিকির ও মতলববাজ কি, কালোবাজারী মুনাফাখোর সমাজ-বিরোধী নও, প্রমাণ আছে কিছু। কি [illegible] ভয়ে গলা শুকিয়ে এল। শেষে মনে [illegible]

পারে রোধগম্য না হওয়ায় আমি কেমন দিশাহারা হয়ে গেলাম।

এছাড়া জাগতিক নানা ক্রিয়াকাণ্ডে কিছুটা বিভ্রান্ত হলেও, দিন দিন, আমি বেশ স্পষ্ট বুঝতে পারছিলাম, ক্ষুধা, অভাব, দুর্ভিক্ষ, খরা প্রভৃতির যোগফল, কি সমাধান, কি পরিষ্কার অর্থ, বেশ কিছু অর্থ। ক্রমে সে চিন্তা আমাকে উদ্‌ভ্রান্ত করে তুলছিল। কে যেন, ফিস-ফিস ভূতুড়ে শব্দে সারাক্ষণ মন্ত্র পড়তো, টাকা টাকা। বস্তুত, তখন থেকে আমি ভাগ্য নিয়তি ঈশ্বর, কোষ্ঠী ঠিকুজি হস্ত-রেখা ইত্যাদিতে বিশ্বাস করতে শুরু করি। এবং সে বিশ্বাস ক্রমে গভীর হচ্ছিল। পাপ পুণ্য, ন্যায় অন্যায় স্পষ্ট হচ্ছিল কিছু কিছু। এ সব গোলমালে আপেক্ষিক, প্রমাণসাপেক্ষ বিষয়গুলো সহজ হয়ে আসছিল। সে সময়, এমন এক গুণী জ্যোতিষের প্রয়োজন ছিল এবং তার খোঁজেও ছিলাম, কোষ্ঠী ঠিকুজি বিচারে যার গণনা নির্ভুল। সে জ্যোতিষ-সাধক, সন্ন্যাসী কি তান্ত্রিক হোক কিংবা হাটুরে, কালোবাজারী কি সমাজবিরোধী হোক, তাতে কিছু যায় আসে না, শুধু এসব বিষয়ে যার জ্ঞান সব সন্দেহাতীত। জনশ্রুতি, এসব অলৌকিক দৈবশক্তিসম্পন্ন মহাপুরুষের খুবই অভাব। সহজে মেলে না। খুবই দুর্লভ। খুব কপালজোর, কি পুণ্যফল বা স্বয়ং মহাপুরুষের দয়া বা করুণা না থাকলে এদের খোঁজ পাওয়া দুষ্কর। তা যা হোক, এ সবের কোন একটি, না, এর সব কিছুর ফলে, সেই মহাপুরুষের সন্ধান মিলল। হঠাৎ খুব উত্তেজিতবোধ করলেও সেই মহাপুরুষের আকৃতিতে বি ডি ও অফিসের অমলা ও হারু মণ্ডলের আশ্চর্য মিল থাকায়, কেমন দমে গেলাম। কিন্তু তিনি যখন ললাট, করও পদরেখাগুলো দেখে আমার দু' হাত লম্বা মাদুরের মত গোটানো কোষ্ঠীটা মেলে ধরলেন এবং একটার পর একটা বলে গেলেন, অতীত, বর্তমান, ভবিষ্যৎ, আমার ভাগ্য আর নিয়তি, তখন কেমন এক ভয়ে বিস্ময়ে আমি চমকে উঠলাম। উঃ কি সাংঘাতিক এই পুরুষ! আর কি নির্ভুল, কি অমোঘ এ বিদ্যা! সেই কোন শৈশবে, চেতলার উদ্বাস্তু এ কোষ্ঠী লিখিত অথচ পরবর্তী জীবনের সঙ্গে এবং জীবনের নানা ঘটনার সঙ্গে কি আশ্চর্য মিল। কি এক ভয়ে শরীর কাঁপছিল। কিন্তু তিনি বিড়বিড় [illegible] মন্ত্র উচ্চারণের মত কি যেন [illegible]

কোন আশা নেই—" "কে বললে নেই—আছে—" তিনি দৃঢ়স্বরে বললেন, "আমার সাধনালব্ধ ফল—" দু' আঙুলে একটা মাদুলি তুলে," এই সব বিপন্নাশ করচ। কিন্তু—" একটু থেমে, "আগে চাই বিশ্বাস, আছে?" চমকে, যন্ত্রচালিত আমার হাত, বুক আর দু' পাশের পকেট হাতড়ে কোমরে এসেছিল, "না না—" চেঁচিয়ে, আমার বুকের ঠিক মাঝখানে তর্জনী চেপে বললেন ফের, "বিশ্বাস, আছে?" আমার দিকে স্থির চোখে তাকিয়ে, বিড়বিড় করতে থাকলেন, "বিশ্বাস, বিশ্বাসই সব—" আর আমার চেতনা যেমন আবিল, আচ্ছন্ন হ'য়ে আসছিল ক্রমে।

মনে আছে, সে আচ্ছন্নতা কিছুটা ফিকে হ'লে, একদিন কৌতুকচ্ছলে মীরাকে বলেছিলাম সব। কোষ্ঠীর কিছু কিছু অংশ পড়িয়েও শুনিয়েছিলাম। ভাগ্য নিয়তি আর ভয়ংকর ক্ষুধার প্রতিকারহীন অনিবার্যতার প্রসঙ্গ বুঝিয়ে, জ্যোতিষ কি অভ্রান্ত, কোষ্ঠীর নানা অংশের সংগে আমার জীবনের নানা ঘটনার মিল আর অমিলগুলো আলোচনা করেছিলাম। বিংশোত্তরী দশায় যেখানে, 'জাতক পিতৃহন্তা', 'হীনবল, শুক্রপীড়াগ্রস্ত', 'অগম্যারমণী গমন' ইত্যাদি চেপে গিয়ে, 'স্ত্রী অসৎ-চরিত্রা', 'প্রভূত ধনশালী', 'বহু দেশ ভ্রমণকারী' ইত্যাদিতে জোর দিয়েছিলাম। ভীষণ চটেছিল মীরা। রাগে ফুলেছিল, "বেশ তো অত যদি বিশ্বাস হও না ধনশালী।" মীরাকে আর না ঘাঁটিয়ে প্রসঙ্গ পাল্টে, কিভাবে ধনশালী হওয়া যায়, কিছুক্ষণ, আলোচনা করলাম। পরামর্শও চাইলাম কিছু। নতুন কয়েকটা পরি-কল্পনার কথাও বললাম। শুনে, মীরা হাসছিল।

বাংলা দেশের মানচিত্র যেখানে জিবাফের গলার মত সরু তার কিছুটা পরে, কোন এক প্রাথমিক স্কুলের আমি তখন প্রধান শিক্ষক। বহুদিন [illegible] টানা ছুটি চলছে। এত দীর্ঘ-[illegible] থাকার ঠিক কি কারণ স্পষ্ট [illegible] ছাত্র-ছাত্রী অনুপস্থিত, [illegible] অনির্দিষ্টকাল অনাহার, [illegible] স্কার দায়িত্ব, ভগ্ন-[illegible] র্মঘট, দমননীতি, [illegible] রাচারীদের [illegible]

কিছু হুড়িয়ারি ছিল। অর্থ ও ব্যক্তি-তির। প্রাণ বিপন্ন, মনোকষ্ট প্রকৃতির ইঙ্গিত। যা আমায় ভীষণ দ্বিধায় ফেলত। কোন রকম ঝুঁকি নেওয়ায় চিন্তিত করে তুলত। কিন্তু সবচেয়ে ভাবিয়ে তুলেছিল, 'পিতৃহন্তা' কথাটায়। সেই ভয়ংকর পরিণতির দুর্বার অপ্রতি-রোধ্য টান আমি যেন প্রতিটিক্ষণ অনুভব করছিলাম। বেশ স্পষ্ট বুঝতে পারছিলাম, এ ক্ষুধা আর অনাহার রাবার সহোর অতীত। প্রত্যক্ষ না হোক, এ পিতৃহত্যার পাপ আমাকে বহন করতেই হবে। এ এক নিষ্ঠুর নিস্তারহীন নিয়তি।

সুতরাং, আমি খুব সাবধানে, স্থির চিত্তে, বেশ ঠাণ্ডা মাথায় ছোট-খাটো এক পরিকল্পনা তৈরি করেছিলাম। লক্ষ্যে পৌঁছানর সম্ভাব্য একাধিক পথের কোনটা সহজ এবং নির্বিঘ্ন যাচাই করে নিচ্ছিলাম। রিলিফ, রির, ডি-ও অফিস, হারু মণ্ডল, অলৌকিক শক্তিসম্পন্ন দিব্য-পুরুষ প্রভৃতির কার্যকারিতা পরখ করার পর আমি ললিত কুণ্ডুর কথা ভাব-ছিলাম। ললিত কুণ্ডু এক বিচিত্র মানুষ। বহুরূপী আর কি। একখানে বেশি দিন কোন সময় তাকে দেখা যায় না। আজ এখানে কাল সেখানে। সারা দেশ তিনি চষে ফিরতেন। একবার, কি এক গুরু-তর অপরাধে ধরা পড়ে, নির্ঘাৎ দশ বছর সশ্রম কারাদণ্ডের ফাঁস থেকে, কিভাবে যেন বেকসুর খালাস পেয়ে, চমক সৃষ্টি করেছিলেন। আমি জেনে-ছিলাম, ললিত কুণ্ডু নানা নামে নানা বৃত্তির আড়ালে / সাংঘাতিক অপরাধে লিপ্ত। অপরাধগুলো যে ঠিক কি জানা না থাকলেও, দু'হাতে টাকা খরচের বহর দেখে, আমি ধরে নিয়েছিলাম, ললিত কুণ্ডু চীনের দালাল, পাকিস্তানী চর কিংবা সি আই এ'র এজেন্ট—এ তিন-টির কোন একটি হবেন। যা, এর সব-গুলোতেই তিনি আছেন। যা হোক! এ সব ব্যাপারে আমার কোন মাথাব্যথা ছিল না। আমি ললিত কুণ্ডুকে ধরলাম। সব শুনে ললিত কুণ্ডু ভ্রু কোঁচকালেন। বললেন, "দেখ, এসব দেশদ্রোহিতা", "কিন্তু অনাহার?" "দেশদ্রোহী।" "ক্ষুধা?" "এতো কম্যুনিজমের কথা" "মৃত্যু?" এবার, তিনি একটু বিরক্ত হলেন, "দেখ, এসব খরাটরা অনাহার-টনাহার কিছু না। চাই দেশপ্রেম আর ত্যাগ। ত্যাগ কর, দেখবি ও সব কিছু [illegible] এরপর তিনি স্মরণ করিয়ে [illegible] পঞ্চবার্ষিকী পরি-

ডাইনে-বাঁয়ে-শিয়রে ঈর্ষাকাতর শত্রু। বললেন, "মনে রাখিস, এসব ভুলে যাওয়া পাপ। পিতৃহত্যার চেয়ে শত-গুণ পাপ।" শেষে, স্বর্গীয় হাসিতে ললিত কুণ্ডুর মুখ উজ্জ্বল দেখাল, "ত্যাগ, নিঃশেষে ত্যাগ। আর চাই অটুট দেশপ্রেম। দেখবি, তখন কোন সমস্যা নেই।"

কিন্তু, সমস্যা থাকায় সেহেতু দেশ-প্রেম ও ত্যাগ না থাকায়, খুব লজ্জিত হয়েছিলাম। তবে, মনে পড়েছিল, বৃদ্ধ রক্ষিতকে। যদিও আমার পরিকল্পনায় বৃদ্ধ রক্ষিত ছিল না। বৃদ্ধ রক্ষিত এ অঞ্চলের নামী নেতা। আবালবৃদ্ধবনিতার পরিচিত তিনি। তিনিই একমাত্র বক্তা যিনি সত্যিই পারেন কথায় চিঁড়ে ভেজাতে। আর ভেজেও। এ একেবারে চাক্ষুষ সত্য। অসীম ক্ষমতা তাঁর। অফুরন্ত শক্তি। সেই বৃদ্ধ রক্ষিত বললেন, "এতো জানা কথা, ভাই। আমাদের থিসিসেই আছে, এ আজাদী ঝুটা হ্যায়। বিপ্লবের পথ একমাত্র পথ। সংগ্রামের পথ বাঁচার পথ। এর কোন বিকল্প নেই।" "সংগ্রামে মানুষ বাঁচে?" "তা না হ'লে, এতোদিন বাঁচলে কিভাবে।" "না মানে—" "বুঝেছি, ঐ দালালদের কথা, দুর্ভিক্ষ নেই, এই তো?" "কিন্তু—" "কোন কিন্তু না, শুধু সংগ্রাম, প্রতিরোধ, আন্দোলন আর বিপ্লব। ব্যক্তি ভুলে সমষ্টিভাব। দলভাব। দেখবে, পলকে পৌঁছে গেছো, স্বর্গ-রাজ্যে।" কেমন ধাঁধাঁ লাগল। বোধ-বুদ্ধি গুলিয়ে উঠল হঠাৎ। মনে হলো, সবকিছু থেকে যোগসূত্র হারিয়ে ফেলছি।

ঠিক এর পরপর, আমার জীবনে এক অলৌকিক ঘটনা ঘটে গেল। ঘটনাটা অদ্ভুত আর বিচিত্র, কিছুটা অবিশ্বাস্য, বাস্তব কল্পনা স্মৃতি স্বপ্ন এমনভাবে মিলেমিশে একাকার হয়ে গিয়েছিল যে, এদের পৃথকভাবে চেনা, সত্যাসত্য নির্ণয় করা দুরূহ।

: বিরাট এক ভূখণ্ড ছিল। পায়ে পায়ে হাঁটছে। যেন কোন অনন্ত কাল থেকে, হয়তো মানুষ সৃষ্টির পর মুহূর্তে, ধীর মন্থর বুকে হাঁটা কোন প্রাণীর মত এ হাঁটা সুরু। ধূসর, রুক্ষ পথ, উপল-মুখর আর বন্ধুর। পার হয়ে যাচ্ছে, শহর, প্রান্তর, মহাদেশ। নিরস্ত্র, ছিন্নবাস মলিন কতকগুলো নারীপুরুষ। দেহ ন্যাব্জ, শীর্ণ, কোটরগত চোখে ক্ষুধা আর হতাশা। আমার এক হাত বাবার হাতে ধরা, অন্য হাত মীরার। বাবা ক্লান্ত, যেন আর পারছেন না, চোখে অনুযোগ আর ধিক্কার, 'অকৃতজ্ঞ'! মনে পড়ছে, ভূখণ্ডছিলের কোন একখানে, ঠিক আমার মত বাবা, আমার আর পিতামহের হাত ধরে হেঁটে এসেছিলেন। মাঝে মাঝে, প্রাগৈতিহাসিক কোন জন্তুর ক্ষুধার্ত হাঁয়ের মত এক-একটা তোরণ। কোনটা "স্নেহ" কোনটা "প্রীতি" কোনটা "কৃতজ্ঞতা"—এক-একটা তোরণ পার হচ্ছিলাম আমরা। আর, পার হবার আগে, সেই ক্ষুধার্ত হাঁয়ে, আমাদের যা কিছু, একটা একটা তুলে দিচ্ছিলাম। কোনটায় "প্রমাণ" কোনটায় "স্বর্ণ" এভাবে, "বিশ্বাস" "ত্যাগ" "প্রেম" "সংগ্রাম" ক্রমে আমরা নিঃস্ব হয়ে পড়ছিলাম। বাবা, মীরা, আমি, চেনা-অচেনা, আরো অনেকে। তখনো লক্ষ্য অজানা। এ ভূখণ্ডছিলও যেন ছেদ ও বিরামহীন। হতাশা আর নিরাশা আমাদের ক্ষয়, ক্লান্ত করে ফেল-ছিল। হঠাৎ, "অর্থ" তোরণের অদূরে "সুখ" তোরণের কাছে, বিজয়কে দেখে, আনন্দে, "বিজয়—" ডাকতেই, "কি খবর—" ছুটে এল বিজয়। কি খবর জানতে চায় বিজয়, ঠিক বুঝতে না পেরে, আমি ওকে বলে গেলাম সব। আমার ক্ষুধা, পাপবোধ, ঈশ্বর, দৈবশক্তিতে বিশ্বাস, অর্থ অন্বেষণ, সংগ্রাম, এমন কি সেই নীল ফুলদানি। শুধু আমার চিড় আর ফাটলগুলো ছাড়া সবই বলতে পারলাম ওকে। বিজয় শুনছিল, "দুস্, তুচ্ছ একটা ব্যাজে—" শুনতে শুনতে হাসছিল, "এ কি নোংরা ক্ষুধা তোর", নিচু হয়ে এল ওর স্বর, "ছিঃ, মীরা থাকতে তোর টাকার অভাব—" বিজয় অদ্ভুত সব কথা বলছিল, "ওরা লক্ষ্মী, মীরারা—" ওর কথা ফিসফিস শোনাল, "মনের অন্ধকারে ওরা সুড়ঙ্গ হতে পারে, স্বর্ণখনির সঠিক সন্ধান ওরা জানে—" বিজয় কি কাঁদছে, "উঃ, কি সাংঘাতিক ক্ষুধায় আমি জ্বলছি মীরা—"

এক সময় আমি, কিছু নির্মল পবিত্রতার আশায় বিজয়কে ছেড়েছিলাম। বিজয় জানত। "ঈশ্বর, নিয়তিবিশ্বাসী মানুষ" "রাজনৈতিক মানুষ" "নোংরা ক্ষুধাতাড়িত মানুষ" বলে বিদ্রূপ করে-ছিল কিছু আগে। এখন একটা টুটা-ফাটা মানুষ, এক ক্ষুধা থেকে অন্য ক্ষুধায় বিবর্তিত মানুষ, জেনেছ কি বিজয়ের চোখে জল, গলা ভার ভার, বিজয় বলল, "তুই কি সত্যি, সুখী?" সুখ! ভীষণ ধাক্কা দিয়েছিল কথাটা। এ আমার সম্পূর্ণ অজানা। একদিন, খরা আর ক্ষুধা নিয়ে ভীষণ বিব্রত ছিলাম। এ সব জানা আমার কথা নয়। কিন্তু ততক্ষণে, বিজয় মুঠো মুঠো টাকা ছড়িয়ে দিতেই, আমি, নিজের পাঁজরের মধ্য থেকে মীরার হৃদয়ের মত আমার হৃৎপিণ্ডটা ওর হাতে তুলে দিতেই, "সুখ" আর "অর্থ" তোরণ দুটো পার হয়ে গেলাম। কিন্তু, চিৎকার করে উঠল মীরা।

আমি জানি, সুখ কি, মীরা জানে। ওর অদ্ভুত কতকগুলো রুচির মত, আশ্চর্য কতকগুলো রহস্য আছে। কোন এক সময়, সুখ সম্বন্ধে ওর কাছ থেকে জেনে নেওয়ার ইচ্ছা রইল। সুযোগ পেলে, ওর মধ্যে চিড় বা ফাটল আছে কি না, জেনে, সুবিধা বুঝলে, ভাঙা-চোরাগুলো দেখবো। কিংবা গোপন করার ইচ্ছা থাকলে, কেন ভাঙা জোড়া-লাগান ফুলদানির 'পর এত যত্ন ও মমতা, খোঁজ নেব।

সেদিন, ভাঙা জোড়ালাগান ফুলদানি ভরা উজ্জ্বল সাদা ফুল দেখে, মীরা চমকে উঠল। খরা কি আর নেই। উল্লাসে মীরা আমাকে ডাকতে গিয়ে, আমার কাছ থেকে বাধা পেল, "না, এগুলো কাগজের—" খুব ভালোভাবে আমাকে লক্ষ্য করতে গিয়ে, ওর দু'চোখ জলে ভরে উঠল হঠাৎ। থর থর কাঁপতে থাকল ঠোঁট দুটি। "কেন, এগুলো এক ধরনের সুখ—" বললাম ভয়ে ভয়ে। কিন্তু মীরা, ক্রমে, কেমন ফ্যাকাশে সাদা আর নিষ্প্রাণ হয়ে আসতে থাকল।

মীরা সত্যি আশ্চর্য। ওর রুচি আর রহস্যগুলো সত্যি বিস্ময়কর। এখন ওকে আরো জটিল দুর্বোধ্য মনে হল। নির্মল পবিত্রতায় ওর বিশ্বাস নেই, জানা। কিন্তু, বিজয়ের ক্ষুধায় ওর কোন তৃষ্ণা নেই, জানা ছিল না। পলকে, নিজের নানা চিড়, ফাটল আর জোড়গুলো ভয় ধরিয়ে দিল। এগুলো এখন থেকে খুব গোপন করা প্রয়োজন, আমি মনে মনে ঠিক করলাম।

১৯৬৯তে আপনার ভাগ্য

যে-কোন একটি ফুলের নাম লিখিয়া আপনার ঠিকানাসহ একটি পোস্টকার্ড আমাদের কাছে পাঠান। আগামী বারমাসে আপনার ভাগ্যের বিস্তারিত বিবরণ আমরা আপনাকে পাঠাইব, ইহাতে পাইবেন ব্যবসায়ে লাভ লোকসান, চাকুরিতে উন্নতি, বদলী, জন্ম, বিবাহ ও সুখ-সমৃদ্ধির বিবরণ ; আর থাকিবে দুষ্ট-গ্রহের প্রকোপ হইতে আত্মরক্ষার নির্দেশ। একবার পরীক্ষা করিলেই বুঝিতে পারিবেন।

PT. DEV DUTT SHASTRI
RAJ JYOTISHI (B. M. W)
P. B. 86, JULLUNDUR CITY

রঙ্গালয় ও দেশে বিদেশে

[পূর্ব-প্রকাশিতের পর]

দি ইংলিশ থিয়েটার ঃ এরপর নর্মান মার্শাল লিখেছেন—১১২৪ সালে অক্সফোর্ড ছাড়ি—কিন্তু তার পরেও সময়ে সময়ে প্লে হাউসে শো দেখতে আসতাম। অর্থাৎ অনেক সময়েই ওখানে এমন নাটকের প্রদর্শনী হোত যা দেখবার জন্য যাতায়াতের হাঙ্গামাটাও কষ্টকর বলে মনে হোতো না। উদাহরণ হিসেবে স্ট্রিণ্ডবার্গের 'দি স্পুক্ সোনাটার' নাম করা যেতে পারে। ইংলণ্ডে স্ট্রিণ্ডবার্গ ততোটা পরিচিত নন্—তাঁকে ঠিকভাবে এ্যাপ্রিসিয়েটও ইংরেজরা করতে পারে নি—ফাগান কিন্তু স্ট্রিণ্ডবার্গের নাটক সম্বন্ধে উৎসাহী ছিলেন। অক্সফোর্ডে তিনি স্ট্রিণ্ডবার্গের লেখা আরও তিনটি নাটক প্রডিয়ুস করেন। এই তিনটির নাম—ইন্ টাক্সিকেশন, ইস্টার এবং দি আণ্ডারস্টর্ম। এরিক পামীস্টয়ারনার সহযোগিতায় ফাগান নিজেই এ নাটকগুলোর অনুবাদও করেছিলেন। অক্সফোর্ডে গিয়ে আর যে সব নাটক এসময় দেখেছিলাম সেগুলোর নাম হচ্ছে—মার্সেল আর্চার্ডের 'মারল্ বরো গোজ টু ওয়ার', দ্য মুসের 'ফ্যাণ্টাসিও', ষ্ট্রানব্রার 'দি কন্ফিডারেন্সী' এবং কোলম্যানের 'দি জেলাস ওয়াইফ'। অনেক সময়েই আমার মনে হয়েছে 'ফুল মুন্' নামে আর একটি নতুন নাটক আমার দেখতে যাওয়া উচিত ছিল। ক্রাইস্ট চার্চের একজন আণ্ডারগ্র্যাজুয়েট এটি রচনা করেছিলেন—নাম এম লিন উইলিয়ামস্।

এম লিন উইলিয়াম—জন্ম ১৯০৫ সাল, জাতে ওয়েলস, পেশায়—এ্যাক্টর, ড্রামাটিস্ট ও প্রডিউসার। বিখ্যাত নাটক 'দি কর্ন ইজ গ্রীনের' (১৯৩৮) রচয়িতা। কিছুকাল আগে ব্রিটিশ কাউন্সিলের ব্যবস্থাপনায় ইনি কলকাতায় এসেছিলেন এবং চার্লস ডিকেন্সের ভূমিকা নিয়ে ডিকেন্সের রচনা থেকে একক রিডিং দিয়েছিলেন। ১৯৫৬ সালে আমি ষ্ট্র্যাট্ফোর্ড-আপন্-এভন-এ ওথেলো নাটকের অভিনয়ে এ'কে ইয়াগোর ভূমিকায় অনবদ্য অভিনয় করতে দেখেছিলাম।

ফাগান কিন্তু উপলব্ধি করছিলেন যে বুদ্ধির দিকটায় প্রাধান্য দিয়ে অক্সফোর্ডে থিয়েটার চালু রাখা কখনই অসাধ্য হয়ে পড়ছে। কেমব্রিজ ফেস্টিভ্যাল থিয়েটারের সংগে ব্যবস্থা করা হল যে প্রত্যেক টার্মে এক সপ্তাহ করে অক্সফোর্ডের অভিনেতারা কেমব্রিজে এবং কেমব্রিজের দল অক্সফোর্ডে গিয়ে অভিনয় করবেন। কিন্তু এই বদল-অভিনয় ব্যাপারটা ভারসাম্যহীনতায় পর্যবসিত হল। অক্সফোর্ডের দল কেমব্রিজে যথেষ্ট সাফল্য লাভ করতে লাগল—কিন্তু কেমব্রিজের অভিনেতারা যে সব প্রডাকসনে কেমব্রিজে পূর্ণ প্রেক্ষাগারের সামনে অভিনয় করতেন, সেগুলো অক্সফোর্ডে অভিনয়ের সময় দর্শক সমাগম হোতো না ঠিকমত। ১৯২৭ এবং ১৯২৮ সালের সামার টার্মের সময় প্লে-হাউস বন্ধ রাখা হোল। ১৯২৯ সালে ক্রিসমাসের ছুটির পর প্লে-হাউস আর খোলা হোল না। গুজব শোনা গেল প্লে-হাউস নতুনভাবে নির্মাণ করা হবে বলেই বন্ধ রাখা হয়েছে। ১৯২৯ সালের মাইকেলমাস টার্মে ফাগান আবার প্লে-হাউস খুলে প্রদর্শনী শুরু করলেন। তাঁর প্রোগ্রাম ছিল আগের মতই দুঃসাহসিক। এবার যেসব নাটক মঞ্চস্থ করা হোল তার ভেতর ছিল—'দি মাস্ক এণ্ড দি ফেস্', গোগোলের 'ম্যারেজ', আন্দ্রেয়েভের 'হি হু গেটস্ স্ল্যাপ্ড্' ইয়েটসের 'ডেয়ারড্রি অভ্ দি সরোজ' গিলবার্ট মারে কৃত 'ইফিজোনিয়া ইন্ টাউরিসের' অনুবাদ, স্ট্রিণ্ডবার্গের 'দি আণ্ডারস্টর্ম' এবং আর একটি নতুন প্লে 'দি বিটন্ ট্র্যাক্'—এর লেখক জে· ও· ক্র্যান্সিস।

এই সিজনের প্রথম রাত্রিতে ফাগান যে ছোট এবং ব্যক্তিত্বপূর্ণ বক্তৃতা দিয়েছিলেন তার প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করে দি অক্সফোর্ড ম্যাগাজিন মন্তব্য করেছিল ঃ "ফাগান যখন মঞ্চের উপর এসে দাঁড়িয়েছিলেন আমরা প্রত্যেকেই গভীরভাবে অনুভব করেছিলাম এই লোকটি আমাদের জন্য কতোটা করেছেন এবং তাঁর কাছে আমরা কি বিরাটভাবে ঋণী। ভাগ্যের পরিহাসে আমাদের জন্য এতোটা করেও তাঁকে কম খেসারত দিতে হয় নি। এটা খুবই বিস্ময়কর ব্যাপার যে অক্সফোর্ড—যেখানে যেখানে সত্যিকারের উঁচুদরের নাটক অত্যন্ত সুদক্ষতার সংগে প্রডিয়ুসড্ হয়—একটা থিয়েটারকে বাঁচিয়ে রাখতে অক্ষম।

এই সিজনের শেষে ফাগান হার মেনে নিতে বাধ্য হলেন। অক্সফোর্ড প্লে-হাউস রূপান্তরিত হোল একটি ছোট-খাট গল্ফ্ কোর্সে।

বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষ যে ফাগানকে কোনও সাহায্য বা স্বীকৃতি দেন নি এটা খুবই লজ্জার ব্যাপার। অক্সফোর্ড যেখানে পুস্তক-সংগ্রহের

আন্দ্রেয়েভের 'হি হু গেটস স্ল্যাপড'-এ রবার্ট হেল্পেম্যান ও অড্রে ফিলডেস

প্রতি যথাযোগ্য কদর দেখানো হয় সুন্দর সুন্দর গ্রন্থাগারের মাধ্যমে, ভাল ভাল ছবি রাখবার জন্য পিকচার গ্যালারিজ করা হয়েছে, নানা জাতের উচ্চশ্রেণীর মিউজিয়াম কালেকসনস্ রয়েছে, সেই অক্সফোর্ড যে উডস্টক্ রোডের ঐ কদর্য প্রেক্ষাগারটিকে তার নাট্যশিল্পের পরীক্ষা-নিরীক্ষার আগার হিসাবে ঐভাবে কেন থাকতে দিয়েছিল—কেন তার সর্বাঙ্গীণ উন্নতির জন্য ব্যবস্থা করে নি এ কথা সত্যিই বুঝে ওঠা কঠিন।

"প্রাপ্তবয়স্ক ছাত্রদের শিক্ষার ব্যাপারে নাটকের স্থান"—এ সম্পর্কে ১৯২৬ সালেই যে গভর্নমেণ্ট রিপোর্ট বেরোয় তাতে বলা হয়—"এটা খুবই দুঃখের বিষয় যে, বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে অত্যন্ত পুরানো ধারায় নাটক পড়ানো হয়—সমস্ত জোরটা দেওয়া হয় নাটকের ভাষাবিজ্ঞান এবং সাহিত্য-সংক্রান্ত গুণাবলীর উপর কিন্তু যেজন্য আসলে নাটক লেখা হয় (অর্থাৎ মঞ্চাভিনয়ের জন্য) সেদিকটাকে সম্পূর্ণ অগ্রাহ্য করা হয়। এই সময়ের দীর্ঘ বাইশ বছর বাদে অক্সফোর্ড প্রথমে আণ্ডারগ্র্যাজুয়েটস-দের শিক্ষার ব্যাপারে থিয়েটারের ভূমিকা সম্বন্ধে কিছুটা আগ্রহ দেখাতে শুরু করেন। এরও একটা বিশেষ কারণ ছিল—স্যার আলেকজাণ্ডার করডা কর্তৃপক্ষকে প্রায় বাধ্য করে তুলেছিলেন এ বিষয়ে সক্রিয় হয়ে উঠতে। তিনি বিশ্ববিদ্যালয়কে পাঁচ হাজার পাউণ্ডের একটি চেক্ উপহার দিলেন এই উদ্দেশ্যে যে বিশ্ববিদ্যালয়ের কয়েকজন ডন যুক্তরাষ্ট্রে গিয়ে স্বচক্ষে দেখে আসবেন আমেরিকান বিশ্ববিদ্যালয়গুলো নাট্যমঞ্চ এবং অভিনয়-শিল্পের উপর কতোটা গুরুত্ব আরোপ করেন। এঁদের প্রত্যাবর্তনের পর অক্সফোর্ড ড্রামা কমিশন ঘোষণা করলেন ঃ "আমাদের মনে হয় আমাদের যদি নিজস্ব একটি থিয়েটার থাকে —যেখানে নাটকের পূর্ণ মর্মার্থ অনুধাবনের জন্য সম্পূর্ণ স্বাধীনতার সঙ্গে এবং পরীক্ষামূলকভাবে নাটকের প্রডাকসনের ব্যবস্থা আমরা করবো—তাহলে অক্সফোর্ডের নাট্যবিদ্যা-শিক্ষার্থীদের প্রভূত উপকার সাধিত হবে।"

কমিশনের রিপোর্টে এই ধরণের আশার বাণীও উচ্চারিত হয়েছিল যে, "বিশ্ববিদ্যালয়ের নিজস্ব থিয়েটার থাকলে এবং অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয়ের সহযোগিতায় ভাল পেশাদারী দল এলেও উপযোগী নাটকের প্রডাকসন করানো সম্ভব হবে।"

অথচ বিশ বছর আগে ফাগান নিজের খরচায় সত্যিকার প্রথম শ্রেণীর নাটকের প্রডাকসন করে চলেছিলেন অক্সফোর্ড প্লে-হাউসে, বিশ্ববিদ্যালয়ের তরফ থেকে তার কাজে কোনোরকম প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ সাহায্য দেওয়া হয় নি।

টেরেন্স গ্রে ১৯২৬ সালে কেমব্রিজে ফেস্টিভ্যাল থিয়েটার প্রতিষ্ঠা করেন। ড্রামা কমিশন বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর ভেতর নাট্যবিষয়ক যে সহযোগিতার কথা উল্লেখ করেছিলেন, ফাগান এবং গ্রে, ১৯২৯ সালেই সেই ধরণের প্রচেষ্টাকে কার্যকরী করবার প্রস্তাব করে ব্যর্থ হন—কারণ অক্সফোর্ড বা কেমব্রিজ বিশ্ব-বিদ্যালয় এ বিষয়ে এতটুকুও আগ্রহ দেখান নি।

ক্ষুদে প্লে-হাউসটি যেমন রঙ্গগৃহ হিসাবেও সাফল্যলাভ করতে পারে নি, তেমনি গলফ কোর্সে রূপায়িত হয়েও ব্যর্থতায় পর্যবসিত হোল। এরপর বেশ কিছুদিন এই অট্টালিকাটি খালি পড়ে রইল। তারপর ১৯৩০ সালে এক বিস্ময়কর ঘোষণাসহ চারদিকে পোস্টার পড়তে লাগল—স্যার ফিলিপ যেন গ্রীট নাকি 'রুকারি নুক্' নাটক নিয়ে আবার রঙ্গগৃহের উদ্বোধন করবেন। এই নতুন ম্যানেজমেণ্টের অন্য তিনজন পরি-চালকের নাম ছিল এডওয়ার্ড উইল-কিনসন, আর্থার ব্রার্ড এবং স্ট্যানফোর্ড হোম। প্রথম রজনীতেই বেন গ্রীট তাঁর

ওয়েবস্টারের 'দি হোয়াইট ডেভিল'-এর একটি দৃশ্য

ঋতুতায় জানালেন যে তাঁদের থিয়েটার চালাবার মূল উদ্দেশ্য হোল "দর্শকদের শিক্ষা দেওয়া নয়—আনন্দদান করা, চিত্তবিনোদন করা"। একথা শোনবার পর ফাগান নিশ্চয় বিস্ময়বোধ করেছিলেন। কারণ—তাঁর পরিচালনাধীনে প্লে-হাউসে শিক্ষাদানের জন্য নাটক প্রডিয়ুস করা হোত এ ধরণের কথা ইংলিশেও কেউ কখনও বলেন নি কোনদিন। আসলে ফাগান ছিলেন অত্যন্ত সুরুচিসম্পন্ন প্রডিউসার—নতুন ম্যানেজমেণ্টের "রুকারি নুক" এবং অন্যান্য জোলো কমেডী এবং ফার্সগুলোর থেকে বড় বড় নাট্যকারের সেরা নাটকগুলোই দর্শকদের চিত্তবিনোদন করতে সমর্থ হবে বলেই সেগুলো তিনি মঞ্চস্থ করেছিলেন—লোকশিক্ষা দেবার উদ্দেশ্য নিয়ে নয়। তবে নতুন ম্যানেজমেন্টও তাদের তথাকথিত চিত্তবিনোদনকারী নাটক দিয়ে দর্শকমনকে ড্রামা-মাইণ্ডেড করে গড়ে তুলতে পারল না। কয়েক বছর বাদে বহু টাকা লোকসান দিয়ে তারা এই ব্যর্থ প্রচেষ্টা থেকে অবসর গ্রহণ করলো। এর পর অক্সফোর্ডের অধিবাসী এক দল লোক এগিয়ে এল প্লে-হাউসের উদ্ধারের কাজে—তারা প্রথমেই একটা গ্যারাণ্টি ফাণ্ড তুলে ফেললো। বেন গ্রীট এবং গ্রার্ড ম্যানেজমেণ্ট থেকে অবসর নিলেন—প্রডাকসনের সমস্ত ভার দেওয়া হোল স্ট্যানফোর্ড হোমের ওপর। হোমের প্রডাকসনের নাটকগুলোর ভেতর কোন অগ্রগতি বা অসাধারণত্বের ছাপ পাওয়া যায় নি—কিন্তু তার জন্য তাঁকে দায়ী করা যায় না—অক্সফোর্ডের দর্শকদের মনোবৃত্তিই ছিল এর প্রধান কারণ। ভাল নাটক দিলেই আর্থিক লোকসান হবে একথা হোম জানতেন—আর লোকসান দেবার মত টাকা তাঁর একেবারেই ছিল না। তিনি বেশ ভালভাবেই অবহিত ছিলেন যে, জায়েণ্টসদের ভেতর একমাত্র বার্নার্ড শ'-কেই তিনি 'সিওর উইনার' হিসাবে কাজে লাগাতে পারবেন। এ ছাড়া নোভেলো, ট্র্যাভার্স, এলিস এবং কাওয়ার্ড—এই ক'জন নাট্যকারকেই মনে হোত অক্সফোর্ডের দর্শকদের কাছে প্রিয়। অবশ্য ফাগানের সময়ের প্লে-হাউসের দর্শকদের ঠিক সব দিক থেকে অক্সফোর্ডের রেপ্রেসেনটেটিভ-দর্শক আখ্যা দেওয়া চলে না—কারণ ফাগানের নাটক দেখতে আসতেন প্রধানত বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রেরা।

ফাগানের পরবর্তী নাট্যপরিচালকেরা অপেক্ষাকৃতভাবে উত্তর অক্সফোর্ডের অধিবাসীদেরই মনোহরণ করতে সমর্থ হয়েছিলেন। তবে স্ট্যানফোর্ড হোম অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি ড্রামাটিক সোসাইটির মাধ্যমে খানিকটা যোগাযোগ রেখেছিলেন বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে। তাঁর অভিনেত্রীরা ও ইউ ডি এস-এর প্রডাকসনে অংশ গ্রহণ করতেন, আর অনেক আণ্ডারগ্র্যাজুয়েট ছাত্র-অভিনেতাও প্লে-হাউসে এসে অভিনয়ে যোগ দিতেন। এরিক ডান্স ছিলেন এই দলেরই একজন যুবক—অনেক বাধাবিপত্তি কাটিয়ে ডান শেষ পর্যন্ত অক্সফোর্ডের বোমণ্ট স্ট্রীটে একটি নতুন রেপারটরী থিয়েটার খুলেছিলেন ১৯৩৮ সালে—এটি সবদিক দিয়েই সুন্দর এবং আরামপ্রদ হয়েছিল এবং এখানে ৫৯২ জনের বসবার আসন ছিল।

হোমের পরিচালনাধীনে প্লে-হাউসে প্রথম নাটক হিসাবে মঞ্চস্থ হোল ফাগান রচিত "এ্যাণ্ড সো টু বেড"। সিজনের বাকী প্রোগ্রামের ভেতর ছিল—"ডেথ টেক্স এ হলি ডে, হেইল নিরো, ফ্যানিজ ফার্স্ট প্লে, দি সিলভার কিং, ড্যাণ্ড ডিক্, দি গ্রেট এ্যাডভেনটার, দি পাসিং অভ দি থার্ড ফ্লোর ব্যাক, ও মিস্টার পিম পাসেস বাই"।

পুরনো প্লে-হাউসের দর্শকের অভাবের কারণ হিসাবে দেখানো হোত প্রেক্ষাগৃহের অস্বাচ্ছন্দ্যকর অবস্থা এবং শহরের সেন্টার থেকে এর দূরত্ব। নতুন থিয়েটার করবার সময় এই দুটি ত্রুটিই অপসারিত হোল। তবুও দর্শক সমাগম হোল না। এ থেকে একটা কথা পরিষ্কার হয়ে গেল—অক্সফোর্ডের লোকেরা ঠিক থিয়েটার-মাইণ্ডেড নয়। যুদ্ধের সময় অর্থাৎ যখন অক্সফোর্ড তার চারপাশের শহরগুলো সৈনিক, ইভাকুয়িজ এবং সরকারী চাকুরেদের দ্বারা ভরে গেল, তখনই প্লে-হাউস অভিনেতার দল, ফুল-হাউসের দর্শকদের সামনে অভিনয় দেখাবার সুযোগ পেল। কিন্তু এই সময়টায় স্ট্যানফোর্ড হোম চলে গিয়েছিলেন ফায়ার সার্ভিসে এবং ডান্স ছিলেন শত্রু-কবলে যুদ্ধবন্দী হিসাবে।

যাই হোক আর্থিক সাফল্যের দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে এই সময়ের ম্যানেজমেণ্ট মঞ্চস্থ করতে লাগলেন পুরনো ওয়েস্ট-এণ্ডের সাফল্যমণ্ডিত নাটকগুলো। মাঝে মাঝে এক-একটি ক্ল্যাসিক নাটকও এখানে প্রডিয়ুসড হোত। এখানকার ১৯৪৫ সালের প্রোগ্রাম তুলে দিচ্ছিঃ "টোনি ড্রজ এ হর্স, মার্ডার উইদাউট ক্রাইম, স্কুল ফর স্ক্যাণ্ডেল, দি সেক্রেড ফ্লেম, এ ডল্স্ হাউস, থ্রি মেন অন এ হর্স, প্রাইড এ্যাণ্ড প্রেজুডিস এবং সিজার এ্যাণ্ড ক্লিওপাট্রা"।

যুদ্ধের সময়টাতে দর্শকের ভিড় হোত প্লে-হাউসে—কিন্তু সেটা একটা সাময়িক ব্যাপার। এই পরিচ্ছেদের উপসংহারে নর্ম্যান মার্শাল বলেছেনঃ

"Oxford has yet to prove that it has anything like the real interest in the theatre which Cambridge has displayed in recent years."

[ক্রমশঃ]

শ্রীরামচরিত-মানস

ভক্তকবি তুলসীদাস

অধ্যাপক শিবপ্রসাদ গঙ্গোপাধ্যায় কর্তৃক বঙ্গানুবাদ

শ্রীরামচন্দ্রের বন্দনা-গানে ভারতবর্ষের বহু গুণী ও জ্ঞানীজন লেখনী ধারণ করিয়া আত্মোৎসর্গ করিয়াছেন। সেই সকল অমর লেখনীর প্রতিভা-নির্ঝরে ভারতবর্ষের মহাকাব্য পৃথিবীর সাহিত্যে স্বীয় বৈশিষ্ট্যে সমুজ্জ্বল। ভক্তকবি গোস্বামী তুলসীদাস তন্মধ্যে অন্যতম—যিনি সহজ সরল ভাষায় পতিতপাবন সীতা-রামের চরিত্র বর্ণনা করিয়াছেন সুমধুর সঙ্গীতের মাধ্যমে। তুলসীদাসের জীবনসর্বস্ব মহামানব শ্রীরামচন্দ্রের সেই বন্দনা-গানের সুললিত বাংলা অনুবাদ এই প্রথম—বসুমতী সাহিত্য মন্দিরের অপূর্ব কীর্তির নূতন এক পরিচয় এই শ্রীরামচরিত-মানস। বহু রঙীন চিত্রে সুশোভিত।

মূল্য—১ম খণ্ড তিন টাকা, ২য় খণ্ড তিন টাকা

বসুমতী প্রাইভেট লিমিটেডঃ ১৬৬ বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী স্ট্রীট, কলি-১২

রঙ্গজগৎ

চলচ্চিত্র সংরক্ষণ সমিতির ব্যর্থতা

বিখ্যাত চিত্র-পরিচালকগণ চলচ্চিত্র সংরক্ষণ সমিতির বিরুদ্ধে গুরুতর অভিযোগ করেছেন। তাঁরা অত্যন্ত জোরালো কণ্ঠে দ্বিধাহীনভাবে বলেছেন যে, সংরক্ষণ সমিতির কাজ বাংলা চলচ্চিত্র-শিল্পের পক্ষে ক্ষতিকারক হয়েছে। সামগ্রিকভাবে বাংলা ছবির উন্নতিতে সহায়তার পরিবর্তে সমিতি প্রতিবন্ধক সৃষ্টি করেছে। বাংলা দেশে বর্তমানে চলচ্চিত্র প্রযোজনা করা এক কঠিন ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে। সংরক্ষণ সমিতির বিরুদ্ধে আর এক গুরুতর অভিযোগ : সমিতি কয়েকজন শিল্পীকে ব্ল্যাকলিস্ট করে ও'দের জীবিকার পথে বাধা সৃষ্টি করেছে। কয়েকজন পরিচালকের বিরুদ্ধেও সমিতি একই ব্যাস্থা গ্রহণ করেছে।

এই অভিযোগকারীদের মধ্যে রয়েছেন সত্যজিৎ রায়, তপন সিংহ, তরুণ মজুমদার, অজয় কর, বিভূতি লাহা, হেমন্ত মুখার্জীর মত লোক। জনপ্রিয়তা ও সৃষ্টির দিক থেকে যাঁদের জন্য বাংলা দেশ গর্ব করে। এ'দের অভিযোগের জবাব সংরক্ষণ সমিতি দিয়েছেন কিনা জানি না, কোন জবাব আছে বলেও আমরা মনে করি না।

গত কয়েক মাসে সংরক্ষণ সমিতির কোন স্পষ্ট চরিত্র আমরা বুঝতে পারি নি। সমিতি কি চায় আমাদের বোধগম্য হয় নি। কেবলমাত্র দেখেছি সমিতি কর্তৃক পরিচালিত পিকেটিং ও তার ফলে দীর্ঘদিন সিনেমাগুলি বন্ধ থেকেছে। অথচ আজো কি বাংলা ছবি প্রদর্শন বাধ্যতামূলক করা হয়েছে? যদিও সরকারী নির্দেশনামা প্রকাশিত হয়েছে, কিন্তু তা কাগজে কলমে থেকে গেছে। সেই নির্দেশ কার্যকরী করার ব্যাপারে সমিতি কোন আন্দোলন করেছে বলে আমরা জানি না। কলকাতার অধিকাংশ সিনেমায় এখনো হিন্দী ছবির প্রাধান্য। সমিতি হিন্দী ছবির সিনেমাগুলির বিরুদ্ধে একটা শব্দও উচ্চারণ করে নি—অথচ বাংলা ছবির রিলিজ চেন নিয়ন্ত্রিত করতে চেয়েছে। রিলিজ চেনের সংখ্যা দিন দিন কমছে, তাকে আগের সংখ্যায় নেবার জন্যও কোন চেষ্টা হয় নি। অভিনেতৃ সঙ্ঘ বিভক্ত হয়ে যাওয়াও সংরক্ষণ সমিতিরই কাজের প্রতিক্রিয়া। যেখানে দীর্ঘদিন পর্যন্ত সব শিল্পীরা ঐক্যবদ্ধ হয়ে কাজ করতে পারল—আজ আর তা সম্ভব হচ্ছে না কেন? আসলে কয়েকজন শিল্পীকে তাঁদের মতামতের জন্য কোণঠাসা করার এটা একটা অপচেষ্টা। যার কথা আমরা একমাত্র আমেরিকাতে এবং ডিক্টেটর শাসনে হয় বলে শুনেছি।

আমরা শুনেছি সংরক্ষণ সমিতি এক সময় সাংবাদিকদের ওপরও ক্ষেপে উঠেছিল; সাংবাদিকরা সংরক্ষণ সমিতির সঙ্গে সহযোগিতা করে নি বলে নাকি 'বাঘিনী' ছবির কোন প্রেস শো করা হয় নি। কথাটা সত্য না হলেই আমরা খুশি হব।

সংরক্ষণ সমিতির কাজ শুভ কি অশুভ হয়েছে গত বছরের চলচ্চিত্র-শিল্পের অবস্থাটা দেখলেই বোঝা যায়। বাংলা ছবি গত দশ বছরে ৪০টা থেকে ১৮টায় নেমে এসেছে। এই অবস্থার পরিবর্তন একমাত্র সকলের ঐকাবদ্ধ চেষ্টা ও সহযোগিতাতেই সম্ভব। কোন শিল্পীকে ব্ল্যাকলিস্ট করে, কোন পরিচালককে কোণঠাসা করে, কোন প্রযোজককে অপমান করে এবং স্টুডিওতে বিশৃংখলা সৃষ্টিতে বাংলা ছবির উন্নতি হবে না। স্টুডিওকর্মী থেকে সিনেমাকর্মী সকলের প্রতি সম্মানবোধ বজায় রেখে, প্রত্যেকের মত ও চিন্তার মর্যাদা দিয়ে এবং স্বেচ্ছামূলক সহযোগিতার পরিবেশ সৃষ্টি করেই বাংলা ছবির বিকাশ সম্ভব। তাই সংরক্ষণ সমিতিকে হয় নীতি ও দৃষ্টিভঙ্গী পরিবর্তন করতে হবে নতুবা এই সংস্থাকে গুটিয়ে নিতে হবে। সত্যজিৎ রায় প্রমুখ খ্যাত পরিচালকদের অভিযোগের পর সমিতি আর জনসমর্থন পাবে না।

—সুজন

জাতিপ্রাপ্ত 'আবরণতী' ছবিতে সুপ্রিয়া দেবী ও উত্তমকুমার

হেমেন বোস পরিচালিত হিন্দী ছবি 'রাত অউর দিন' ছবিতে প্রদীপকুমার ও নার্গিস।

১৯৬৮ সালের বাংলা ছবি

১৯৬৮ সাল বাংলা চলচ্চিত্র-শিল্পের পক্ষে দারুণ দ্বন্দ্ব এবং সংকটের বছর। স্টুডিও, প্রযোজনা, পরিবেশনা, প্রদর্শন সর্বক্ষেত্রেই এবার দ্বন্দ্ব লেগেছিল। এই দ্বন্দ্বের মধ্যে জিজ্ঞাসা সৃষ্টি হয়েছে বাংলা ছবির ভবিষ্যৎ সম্পর্কে।

১৯৬৮ সালে মাত্র ১৮টি বাংলা ছবি মুক্তিলাভ করেছে। এই সঙ্গে মাদ্রাজের তিনটি ভাষান্তরিত ছবি ধরলে ২১ বলা যেতে পারে। আসলে কলকাতার স্টুডিওতে নির্মিত হয়েছে ১৮টি ছবি। ১৯৬৭ সালের সংগে তুলনা করলে বাংলা ছবি আরো কয়েকটি সিঁড়ি পিছিয়ে গেছে। ১৯৬৭ সালে ২৪টি বাংলা ছবি মুক্তিলাভ করেছিল। আরো যদি পেছনের দিকে তাকান তবে দেখতে পাবেন প্রতি বছর ৪।৫টি করে ছবি কমছে। তিন বছর আগে ২৮টি ছবি মুক্তিলাভ করেছিল। তারও আগে ছিল ৩০-৩৫টি। ৪০-৪৫টি বাংলা ছবির কথা এখন প্রায় বিস্মৃতির জগতে চলে গেছে।

এই ১৮টি বাংলা ছবি : পঞ্চশর, পথে হল দেখা, ছোট্ট জিজ্ঞাসা, চারণকবি মুকুন্দ দাস, হংসমিথুন, পরিশোধ, রক্তরেখা, আদ্যাশক্তি মহামায়া, বাঘিনী, চৌরঙ্গী, তিন অধ্যায়, অদ্বিতীয়া, বালুচরী, গড় নাসিমপুর, বৌদি, আপনজন, জীবনসঙ্গীত, কখনো মেঘ। মাদ্রাজে নির্মিত বাংলায় ডাব করা ছবি তিনটি—ভীষ্ম, পদ্মাবতী-জয়দেব, মেঘনাদ বধ।

এই ছবিগুলির মধ্যে জনপ্রিয় হয়েছে বাঘিনী ৪২ সপ্তাহ, ছোট্ট জিজ্ঞাসা ৩৭ সপ্তাহ, বালুচরী ৩৭ সপ্তাহ, চৌরঙ্গী তিন অধ্যায়, আপনজন ছবিগুলিও জনপ্রিয় হয়েছে—কিন্তু বাংলা ছবির গুণগত উন্নতি কোন ছবিতে দেখা যায় নি। বিষয়বস্তুর দিক থেকে পুরনো ভাবপ্রবণতা অথবা ছকে বাঁধা কাহিনীর পৌনঃপুনিকতা ছাড়া তেমন কিছু নেই। ২-৩ বছরে বাংলা দেশের সমাজ ও রাজনীতিতে যে ঝড় বয়ে গেছে, অধিকাংশ মানুষ যে কথা নিয়ে চিন্তা করেছে, অফিসে কারখানায় ছাঁটাই অটোমেশনের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ দেখা গেছে, গ্রামাঞ্চলে ধান নিয়ে বিরোধ বেধেছে; এ-সব কোন সমস্যাই ছবির কাহিনীতে আসে নি। প্রযোজকরা বাস্তবকে ছাড়িয়ে ছবি করা নিরাপদ মনে করেন। অথচ দেখা গেছে বাংলা ছবিতে হিন্দী ছবির প্রভাব। ক্যাবারে নাচ, অদ্ভুত সাজ-সজ্জা ইত্যাদি, এমন কি গানে পর্যন্ত হিন্দীর অনুকরণ দেখা গেছে। লক্ষ্য করার বিষয় যে গত বছর সত্যজিৎ রায়, ঋত্বিক ঘটক, অজয় কর প্রমুখের ছবি মুক্তিলাভ করে নি। অসিত সেন বাংলা ছেড়ে হিন্দীতে গেছেন।

১৯৬৮ সালের একটি উল্লেখযোগ্য বিষয় রাষ্ট্রপতির চলচ্চিত্র পুরস্কারে বাংলার দু'জন শিল্পীর ও একজন পরিচালকের কৃতিত্বের স্বীকৃতি। সত্যজিৎ রায় এবারও শ্রেষ্ঠ পরিচালকের সম্মান লাভ করেছেন তাঁর 'চিড়িয়াখানা' ছবির জন্য। উত্তমকুমার লাভ করেছেন শ্রেষ্ঠ অভিনয়ের পুরস্কার—'চিড়িয়াখানা' ও 'এণ্টনী ফিরিঙ্গী'তে অভিনয় করে। তপন সিংহের 'হাটে বাজারে' বছরের শ্রেষ্ঠ ছবির পুরস্কার লাভ করেছে। এত সংকটের মধ্যেও এই তিনটি পুরস্কার আমাদের গর্বের বিষয়।

এই সম্মানের সঙ্গে আমরা যে কয়েকজন শিল্পীকে হারিয়েছি তাঁদের কথাও স্মরণ করছি। নরেশ মিত্র, কালী সরকার, রেণুকা রায় এবং পরিচালক গুণময় বন্দ্যোপাধ্যায়, নির্মল দে, বিশু দাশগুপ্তের জীবনাবসান হয়েছে।

এবার গত বছর যে সংকট ও দ্বন্দ্বের সম্মুখীন হয়েছিল সে কথায় আসছি। ১৯৬৮ সাল পশ্চিমবঙ্গের জন্য ভয়ানক বছর ছিল। স্বাধীনতা লাভের পরে প্রথম বামপন্থী ও কংগ্রেস বিরোধীদের যুক্তফ্রন্ট সরকার গঠন করেছিল। আবার সেই সরকারকে বাতিলও করা হয়েছে। আশা এবং নিরাশার মধ্যে নানা ঘটনা ঘটেছে। পশ্চিমবঙ্গে 'শো'-ট্যাক্স প্রবর্তিত হয়েছে। তার চাপ সিনেমাগুলির ওপর পড়লেও শেষ পর্যন্ত দর্শকদের পকেট থেকেই টাকাটা আদায় করা হয়েছে। সিনেমা কর্মচারীরা সাড়ে তিন মাস লাগাতার ধর্মঘট করেছিলেন। এত দীর্ঘদিনের ধর্মঘট সিনেমার ইতিহাসে নেই। জুনের শেষের দিকে ধর্মঘটের অবসান হয়। কিন্তু চলচ্চিত্র-শিল্প সংরক্ষণ সমিতি নামে একটি সংস্থা গঠিত হয়ে প্রদর্শক বা সিনেমাগুলির বিরুদ্ধে আন্দোলন শুরু করে। ছবির রিলিজ আর বিক্রয়লব্ধ আয়ের বণ্টন নিয়ে প্রধানত এই বিরোধ। সংরক্ষণ সমিতি বাংলা সিনেমাগুলির সামনে পিকেটিং করে—হাউস বন্ধ করে দেয়। এতে কেবলমাত্র এমন সিনেমাগুলি ক্ষতিগ্রস্ত

তপন সিংহের 'আপনজন' ছবিতে মুঈ ব্যানার্জী ও স্বরূপ দত্ত

হয়—যেগুলি নিয়মিত বাংলা ছবি দেখায়। এতে আবার কয়েকটি সিনেমা বন্ধ থাকে। আগস্ট মাসের শেষে এই বিরোধের একটা সাময়িক মীমাংসা হয়। এসব আন্দোলনে বছরের মধ্যে সাড়ে পাঁচ মাস কাল বাংলা ছবি মুক্তিলাভ করতে পারে নি।

এ সময় পশ্চিমবঙ্গ সরকার বাংলা ছবি প্রদর্শনের বাধ্যতামূলক সময় নির্ধারণ করে এক নির্দেশ জারি করে। এই নির্দেশ অভিনন্দনীয় হলেও—শেষ পর্যন্ত দেখা গেল ফাঁকা কথামাত্র। অর্থাৎ এই নির্দেশ কেউ কার্যকরী করছে না; বাধ্যতামূলক করাবার জন্য সরকারেরও চেষ্টা নেই। ছেলেভুলনো কথার মত ব্যাপার হয়ে গেল। সংরক্ষণ সমিতির আন্দোলনেও বাংলা ছবির কোন লাভ হয় নি, বরঞ্চ লোকসান হয়েছে।

বাংলা ছবি ১৯৬৮ সালে এসব কারণে দারুণ ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। সরকার এবং চলচ্চিত্র সংশ্লিষ্ট সংস্থাগুলি একটা বলিষ্ঠ নীতি গ্রহণ না করলে এই সংকট ১৯৬৯ সালে আরো গভীরতর হবে। বলিষ্ঠ চিন্তার চিত্র-পরিচালক ও প্রযোজকদের স্থান বাংলা দেশে থাকবে না।

নাটকের কথা

দুর্গাদাস

বিগত ২৪শে ডিসেম্বর ১৯৬৮ নেতাজী সুভাষ ইনস্টিটিউটের (শিয়ালদহ) মঞ্চে পূর্বে রেলওয়ে শিয়ালদহ ক্লেমস রিক্রিয়েশন ক্লাবের সভ্যবৃন্দের উদ্যোগে ডি· এল· রায়ের "দুর্গাদাস" ঐতিহাসিক নাটক অভিনীত হয়।

নাটকের প্রারম্ভে পি· এন· এস বেদী প্রধান পৃষ্ঠপোষক ও শ্রীপরেশনাথ গঙ্গোপাধ্যায় পৃষ্ঠপোষক মহাশয়গণ ভাষণ প্রদান করেন এবং ক্লাবের সহ-সভাপতি শ্রীশচীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য মহাশয় উত্তরবঙ্গের বন্যার্তদের সাহায্যার্থে পাঁচশত এক টাকা দেওয়ার আকাঙ্ক্ষা ব্যক্ত করেন।

নাটকের প্রারম্ভে শ্রীমতী নমিতা নৃত্য প্রদর্শনও করেন। বিভিন্ন ভূমিকার অভিনয়ে অংশগ্রহণকারীরা সকলেই পারদর্শিতা দেখান। তার মধ্যে দুর্গাদাসের ভূমিকায় শ্রীনরেন্দ্রনাথ ঘোষ; ঔরংজীবের ভূমিকায় শ্রীপ্রিয়তোষ ভৌমিক; রাজসিংহের ভূমিকায় শ্রীঅনিলকুমার চ্যাটার্জী; সমর দাসের ভূমিকায় শ্রীজিতেন্দ্রনাথ ঘোষাল; কাশিমের ভূমিকায় শ্রীপরিমল ব্যানার্জী; কামবক্সের ভূমিকায় শ্রীনরেন্দ্রচন্দ্র রায়; গুলনেয়ারের ভূমিকায় শ্রীমতী সান্ত্বনা ঘোষ ও মহামায়ার ভূমিকায় শ্রীমতী সবিতা মুখার্জীর অভিনয় বিশেষ উল্লেখযোগ্য। নাট্য পরিচালনা করেন শ্রীদ্বিজেন্দ্রলাল রায়।

শীতের রাত উপেক্ষা করে বহু দর্শকের সমাগম হয়েছিল।

মনিজীবী

বেলুড় 'কৃষ্টিলোক'-এর বার্ষিক উৎসব ১৫ই ডিসেম্বর, '৬৮ হাওড়া গোলমোহর মঞ্চে সমাপ্ত হয়। এই প্রীতি অনুষ্ঠানে সদস্যবৃন্দ অভিনয় করলেন শ্রীভানু চট্টোপাধ্যায় বিরচিত সামাজিক নাট্যলেখ্য 'মনিজীবী'। নাটকটি প্রেক্ষাগৃহে উপস্থিত সেদিনের প্রতিটি সুধী দর্শক অত্যন্ত আনন্দের সঙ্গে উপভোগ করেন। দলগত অভিনয় এবং প্রতিটি চরিত্র সুন্দরভাবে রূপায়ণের জন্য

সকলেরই সপ্রশংস দৃষ্টি আকর্ষণ করতে সমর্থ হয়।

বিভিন্ন উল্লেখযোগ্য চরিত্র রূপায়ণে অংশ গ্রহণ করেন শ্রীকৃষ্ণ হাজরা, নিমাই চট্টোপাধ্যায়, নরেন সেন, শক্তিকিংকর গঙ্গোপাধ্যায়, শংকর রায়, সন্তোষ গাঙ্গুলী, দুলাল পাত্র, দুলাল ঘোষ, দিলীপ মজুমদার, অমিতাভ ভট্টাচার্য, গোপাল সরকার, স্ত্রীচরিত্রে শ্রীস্বপ্না মিত্র, সেবা দাস, রঞ্জনা মুখোপাধ্যায়।

নাটকটি পরিচালনা করেন শ্রীবিজলী-মোহন মুখোপাধ্যায়। অবহসঙ্গীত পরিচালনায় ছিলেন শ্রীবিশ্বনাথ সুর ও শ্রীঅলক পণ্ডিত।

ঋতুরাজ-এর 'উত্তমপুরুষ'

ঋতুরাজ শিল্পীগোষ্ঠী 'উত্তমপুরুষ' (রচয়িতা দীপ্তিকুমার শীল) নাটকটি গত ২৫শে ডিসেম্বর বাণীপুর লোক উৎসবে অভিনয় করে। এই হাসির নাটকটি সেদিনকার দর্শকদের প্রচুর খুশি করে। অভিনয়ে যাঁরা প্রশংসার দাবি রাখেন তাঁদের মধ্যে দীপ্তিকুমার শীল, দিলীপ বসাক, ডাঃ বিমলচন্দ্র ও ছন্দা চক্রবর্তী উল্লেখযোগ্য। প্রশান্ত মজুমদার, শিবদাস মুখোপাধ্যায়, উত্তমকুমার চক্রবর্তী, শংকর চট্টোপাধ্যায়, অমল চক্রবর্তী ও মদনমোহন মজুমদার সু-অভিনয় করেন। নাটকটি পরিচালনা করেন নাট্যকার শ্রীশীল স্বয়ং.

যাত্রাবদল

গত ২৭শে ডিসেম্বর শুক্রবার সন্ধ্যা ৬টায় ১৯৬৭-৬৮ সালের গিরিশ নাট্য প্রতিযোগিতায় (পূর্ণাঙ্গ) দ্বিতীয় স্থানাধিকারী নাট্যসংস্থা আর· সি· আই· রিক্রিয়েশন ক্লাব কর্তৃক নবম বার্ষিক নাট্যপ্রয়াস হিসাবে শ্রীস্বপন সেনগুপ্ত রচিত "যাত্রাবদল" নাটকটি মিনার্ভা থিয়েটারে মঞ্চস্থ করা হয়েছে। নির্দেশনায় ছিলেন নাট্যকার স্বয়ং।

সংস্কৃতিকথা

মধ্য এণ্টালী সাংস্কৃতিক সম্মেলন

দিশারী আয়োজিত মধ্য এণ্টালী সাংস্কৃতিক সম্মেলন গত ৫ই থেকে ১০ই ডিসেম্বর অনুষ্ঠিত হয়েছে। প্রথম দিনের অনুষ্ঠানে পরিবেশিত হয় রবীন্দ্রসঙ্গীত, মূকাভিনয় ও নাটক। অংশ গ্রহণ করেন ঃ বাণী ঠাকুর, সৌরেন পাল, স্বপন রায়, রুণু ভট্টাচার্য, দীপক মজুমদার এবং মূকাভিনয়ে অমিতাভ ও অধীর ঘোষ।

অন্যান্য দিনে উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের আসরে অংশ গ্রহণ করেন গৌতম রায়, মুনাব্বর আলি খান, শ্রীমতী গৌরী ভট্টাচার্য, মানস চক্রবর্তী, আশীষ গোস্বামী, মালশ্রী চক্রবর্তী, আভা চক্রবর্তী,

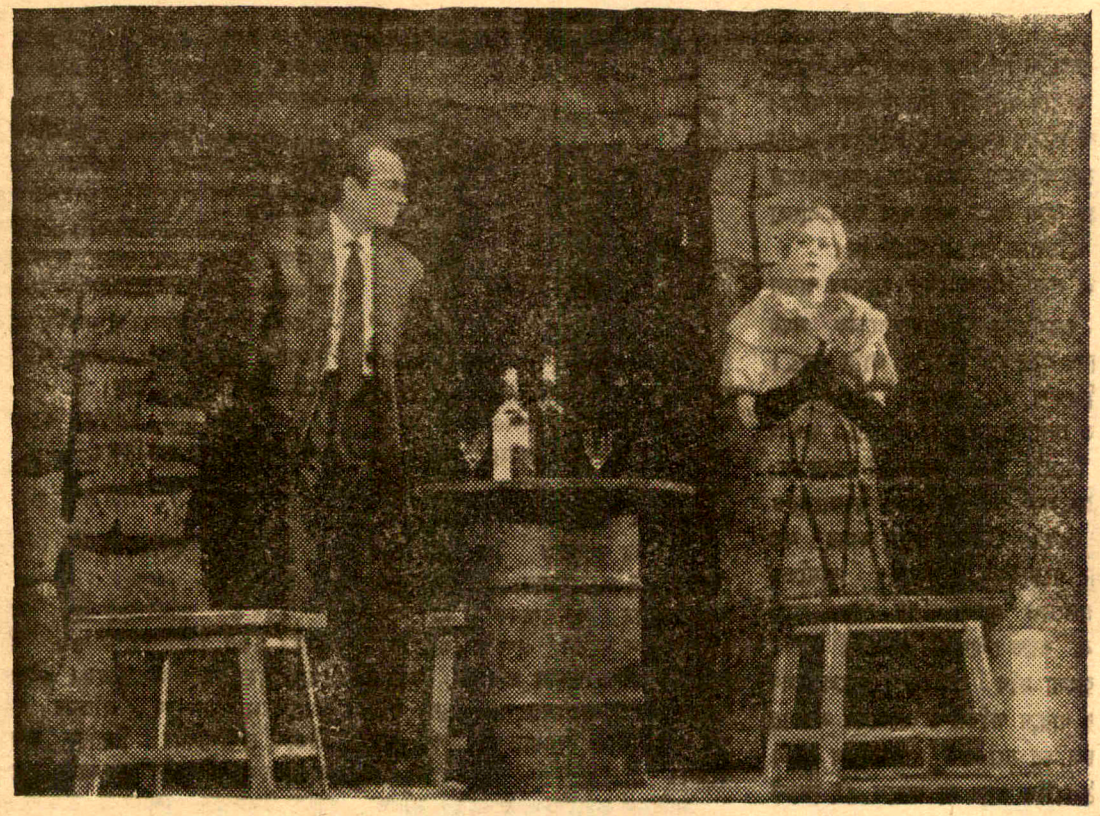

সোভিয়েট মঞ্চে 'লাইফ অব সেণ্ট একজুপা র' নাটকে তালিজিনা ও বেরোয়েভ

রামনরেশ মিশ্র। যন্ত্রসঙ্গীতে ডি এন গোস্বামীর বেহালা, বুদ্ধদেব দাশগুপ্তের স্বরোদ, কাশীনাথ মুখোপাধ্যায়ের সেতার, আলি আহমেদ হোসেনের সানাই এবং ভি বালসারার অর্কেস্ট্রা উল্লেখযোগ্য। শৈলেন লাহা কণ্ঠে সুর তুললেন বাঁশীর —ইমন রাগে।

কত্থক নৃত্য পরিবেশন করেন মায়া চট্টোপাধ্যায় ও বন্দনা সেন।

গানে ও নাচে তবলা সঙ্গত করেন সন্দীপ দেব, সুরেশ তেওয়ারী, দ্বিজেন ঘোষ, নানকু মহারাজ, রামগোপাল মিশ্র। সারেঙ্গীতে সহযোগিতা করেন রবীন বন্দ্যোপাধ্যায়।

সঙ্গীত পরিষদের মনোজ্ঞ অনুষ্ঠান

সম্প্রতি সঙ্গীত পরিষদের সদস্যারা ইন্দিরা দেবীচৌধুরাণীর জন্ম-উৎসব পালন করেন। শ্রীমতী কমলা বসু অনেক-গুলি রবীন্দ্রসঙ্গীত (ইন্দিরা দেবী-কৃত) গেয়ে শোনান।

সূচনায় পরিষদের ছাত্রছাত্রীগণ ইন্দিরা দেবী-রচিত একটি গান 'তাঁরে রেখো রেখো তব পায়', গেয়ে সভা শুরু করেন। শ্রীযুক্ত রাজ্যেশ্বর মিত্র ইন্দিরা দেবীর সঙ্গীতে অবদান সম্পর্কে মনোজ্ঞ আলোচনা করেন। "রবিকাকা ও সবুজপত্র" নামক ইন্দিরা দেবীর সর্বশেষ রচনা পাঠ করে শোনান অরুণ ভট্টাচার্য।

সঙ্গীত পরিষদের অধ্যক্ষ শ্রীঅরুণ ভট্টাচার্য সভা শেষে ঘোষণা করেন যে, পরিষদ ইতিমধ্যেই যথেষ্ট জনপ্রিয়তা অর্জন করেছে। গত ২৫শে আগস্ট সঙ্গীতাচার্য শ্রীতারাপদ চক্রবর্তী পরিষদের উদ্বোধন করেন এবং এই কয় মাসের মধ্যেই পরিষদ সিঁথি অঞ্চলে একটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলেছেন এবং দুটি গবেষণা গ্রন্থ প্রকাশ করেছেন ঃ রবীন্দ্র-সঙ্গীতের নানাদিক সম্পাদনা ঃ অরুণ ভট্টাচার্য ও লৌকিক ও রাগসঙ্গীতের উৎস সন্ধানে (অনুবাদ ঃ কৃষ্ণা বসু) ঃ ডঃ এস এন রতনজংকার। পরিষদের আগামী অধিবেশনে শ্রীকালিপদ পাঠক টপ্পা ও প্রাচীন বাংলা গান পরিবেশন করবেন বলে স্থিরিকৃত হয়েছে।

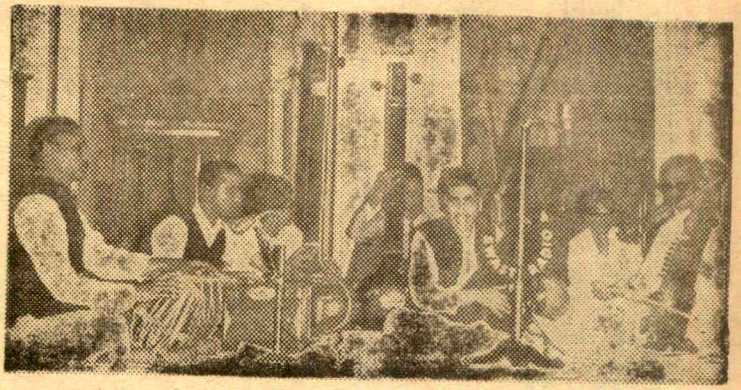

মধ্য এশটালী সাংস্কৃতিক সম্মেলনে সঙ্গীত পরিবেশন করছেন গৌতম রায়। সারেঙ্গী ও তবলায় রবীন বন্দ্যোপাধ্যায় ও সুরেশ তেওয়ারী।

স্টুডিও খবর

মেমসাহেব-এর মহরৎ

পাম্প ফিল্মসের তৃতীয় ছবি মেম-সাহেব-এর মহরৎ গত ৩রা জানুয়ারী টেকনিসিয়ান স্টুডিওতে অনুষ্ঠিত হয়েছে। ছবিটি পরিচালনা করছেন পিনাকী মুখার্জী।

আরো একটু কাছে

চৌধুরী প্রোডাকসন্সের প্রথম প্রয়াস নমিতা চৌধুরী রচিত 'আরো একটু কাছে' সমর চৌধুরীর পরিচালনায় সমাপ্তপ্রায়। গণেশ বসু আলোকচিত্র গ্রহণ করেছেন। বিভিন্ন চরিত্রে অভিনয় করেছেন ঃ সাধনা রায়চৌধুরী, গীতা দে, লতিকা দাশগুপ্ত, প্রীতি মজুমদার, রত্না ঘোষাল, পুষ্প মুখার্জী হারাধন প্রধান, মণি শ্রীমানী, মিতা চৌধুরী।

সংবাদিকী

নগ্নতার বছর

এক সংবাদে প্রকাশ বৃটেনের আঙ-নেত্রী ম্যাগি রাইট এ বছরটাকে নগ্নতার বছর বলে ভবিষ্যদ্বাণী করেছেন। মিস রাইট সম্প্রতি 'হেলেন অব ট্রয়'তে নগ্ন হয়ে অভিনয় করেছেন।

মিস রাইটের মতে নগ্নতা হল জীবনের স্বাভাবিক অবস্থা। তিনি বলেন, প্রথমে ছায়াচিত্রে এবং এখন মঞ্চে নগ্নতা প্রকাশ করছে। ধীরে ধীরে এ অবস্থা আরো বাড়বে বলে তিনি মনে করেন।

ইউরোপ আমেরিকায় ক্ষয়িষ্ণু চিন্তা-ধারা এত বাড়ছে যে—এখন নগ্নতা ছাড়া দর্শক আকর্ষণের আর পথ পাচ্ছে না।

চন্দ্রশেখর

নাট্যকার—অমৃতলাল বসু

ইংরেজের আইনে নিষিদ্ধ অংশগুলি নাট্য-কারের মূল পাণ্ডুলিপি হইতে সংগৃহীত।

উদ্ধৃতি—

শৈবালিনী—ইংরেজ ধরে নে গেছল—

গুরগণ—ইংরেজ? একবার পেলে হয়—মীরকাশেম মসনদে থাক, তার সহায় হয়ে বাংলা হতে ইংরেজ নাম লোপ করব।—

মীরকাশেম—পাপাত্মা এই রাজ্য ইংরেজদের বিক্রয় করবে।

প্রতাপ—ইংরেজকে বাংলা থেকে তাড়াতে হবে—

অভিনব সংস্করণ—মূল্য ঃ দুই টাকা

বসুমতী প্রাইভেট লিমিটেড ঃ

১৬৬, বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী স্ট্রীট, কলিকাতা—১২

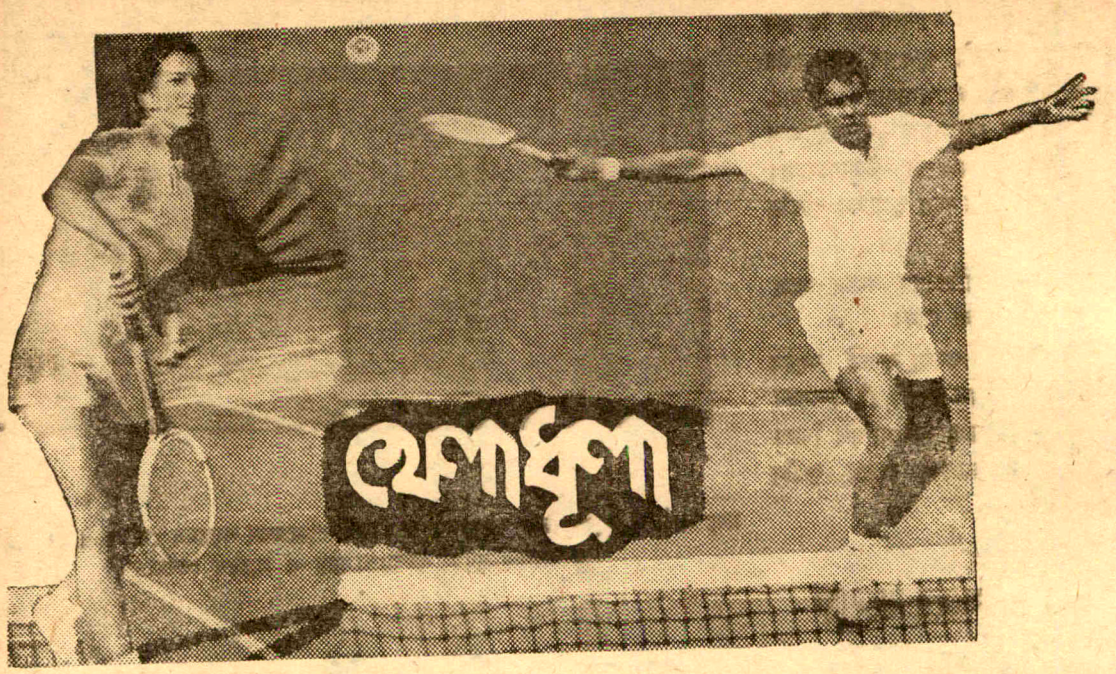

হিসাব মিলাতে

বছরটা খুব তাড়াতাড়ি কেটে গেলো ঠিকভাবে বোঝার আগেই যেন আমরা পার হয়ে এলাম বছরটা। আর কারো কথা জানি নে—আমার কিন্তু সেই কথাই তো মনে হচ্ছে। অবশ্য অজস্র ঘটনার বৈচিত্র্যে বছরটা ভরা। তাই হয়তো মনে হতে পারে যে সময়টা কেটে গেলো বড্ড তাড়াতাড়ি। তবু এই তাড়াতাড়ি কাটা সময়েরও একটা হিসেব আছে। হিসেব আছে লাভ-লোকসানের। কিন্তু লাভের গুড়ে বালি দিয়ে বছরটা নুয়ে পড়েছে লোকসানের ভারে। আটষট্টি সালের চারদিকেই শুধু লোকসান আর সেই সংগে তাল দিয়ে জমে উঠেছে ব্যর্থতার গ্লানি। উনিশ শ' আটষট্টি সালের সব চেয়ে বড় কলংক হলো মেক্সিকো অলিম্পিক প্রতিযোগিতায় হকি খেলার ফলাফল। এই প্রথম ভারতীয় দল প্রতিযোগিতার ফাইন্যালে উঠতে পারলো না। সেমিফাইন্যালেই হেরে গেলো। আর শেষ পর্যন্ত ঘরের ছেলেরা ঘরে ফিরে এলো একটা ব্রোঞ্জের মেডেল গলায় ঝুলিয়ে। ভারতীয় ক্রীড়ারসিক হিসেবে এর চেয়ে বড় লজ্জার বিষয় আমাদের কাছে আর কি হতে পারে! হকির কথা না হয় ছেড়ে দিলাম। ফুটবল, ক্রিকেট, টেনিস কিম্বা অন্য কোন বিষয়ে বিগত বছরে আমরা কি পেরেছি এতোটুকুও সাফল্য লাভ করতে? আন্তর্জাতিক ফুটবলের ক্ষেত্রে ভারতীয় দলের মানের কথা না তোলাই বোধহয় বুদ্ধিমানের কাজ। ক্রিকেটে অস্ট্রেলিয়ার কাছে চারটে টেস্টে হারার পর অবশ্য ভারত নিউজিল্যান্ডকে পর পর পরাজিত করে বিদেশের মাটিতে প্রথম 'রাবার' জেতার সম্মান অর্জন করেছে। কিন্তু এতে উল্লসিত হবার কি এতটুকুও কারণ আছে? টেনিসের আসরের হালও কিন্তু অনেকটা একই রকম। উইম্বেলেডনে ভারতীয় খেলোয়াড়রা এবার পারেন নি এতোটুকুও সুবিধে করতে। আর ডেভিস কাপের চ্যালেঞ্জ রাউন্ডে খেলার যোগ্যতা অর্জন করতে পারে নি ভারত আমেরিকার কাছে হেরে যাওয়ায়।

সুতরাং এ কথা আজ বিনা দ্বিধায় বলা যায় যে, উনিশ শ' আটষট্টি সালটা ভারতের কাছে ছিলো একেবারেই অকাল। কোথাও দেখা যায় নি এতোটুকুও আশার আলো, কোথাও ছিলো না সাফল্যের সম্ভাবনা। গত বছর খেলাধুলার জগতে যে-বিষয়টি বড় বেশি প্রকট হয়ে উঠেছিলো সেটি হলো স্বার্থে ভরা রাজনীতির লড়াই। সে লড়াই-এ নেমেছিলেন সবাই। তার মধ্যে ছিলেন ক্রীড়াজগতের ওপরতলার লোকরা, ছিলেন ক্লাব কর্তৃপক্ষরা আরো ছিলেন কেউ কেউ। এঁদের মধ্যে কারোরই কিন্তু খেলাধুলোর উন্নতির দিকে নজর নেই। আছে শুধু কায়দা করে নিজের দল ভারী করা আর নিজেদের কাজ গুছোতে আসন দখল করে থাকার প্রাণান্ত প্রচেষ্টা। তাই আজ নতুন বছরের প্রথম দিন মনে জাগছে সংশয়। যে বছর কেটে গেছে তার কথা না হয় বাদ দিলাম—কিন্তু আজ যে বছর শুরু হলো তার কি হবে? আটষট্টির মতো উনসত্তরও কি ক্রীড়া-রাজনীতির আবর্তে পড়ে শুধু হাবুডুবুই খাবে— না কি উজ্জ্বল ভবিষ্যতের সোনালী স্বপ্ন নিয়ে আমাদের নতুন আশার আলো দেখাবে.....? —শান্তিপ্রিয়।

ক্রিকেটের খবর

প্রথম টেস্টে ওয়েস্ট ইণ্ডিজ হারিয়ে দিয়েছিল অস্ট্রেলিয়াকে আর দ্বিতীয় টেস্টে অস্ট্রেলিয়া দিল ওয়েস্ট ইণ্ডিজকে। খেলার ফলাফল এখন সমান সমান। অবশ্য এ লেখা যখন আপনাদের হাতে পৌঁছুবে ততদিনে শেষ হয়ে যাবে অস্ট্রেলিয়া-ওয়েস্ট ইণ্ডিজের তৃতীয় টেস্ট ম্যাচ।

কিন্তু দ্বিতীয় টেস্ট ম্যাচের ফলাফলটা একটু যেন অস্বাভাবিক। ওয়েস্ট ইণ্ডিজ যে ঐভাবে এক ইনিংস ও ৩০ রানে হারবে এ কথা কেউ ভাবতেও পারেন নি। পাবার কথাও নয়। কারণ, এখনো ওয়েস্ট ইণ্ডিজ দলে সোবার্স, কানহাই, বুচার, নার্স, ফেডারিক প্রভৃতির মতো নাম করা ব্যাটসম্যান আছেন। আর সেই দলেরই যে অমন শোচনীয় ব্যাটিং বিপর্যয় ঘটবে তা আর কে ভেবেছিলেন।

কিন্তু অঘটন আজো ঘটে। তাই ওয়েস্ট ইণ্ডিজের ব্যাটসম্যানরা জলো আবহাওয়া আর বৃষ্টি-ভেজা পিচে অস্ট্রেলিয়ার বোলারদের বিশেষ করে গ্রাহাম ম্যাকেঞ্জির বিরুদ্ধে খেলতে গিয়ে হয়ে পড়লেন বেসামাল। ফলে মাত্র দু'শ রানে শেষ হয়ে গেলো ওয়েস্ট ইণ্ডিজের ইনিংস। এক ফেডারিক (৭৬) ছাড়া আর কেউ খেলতেই পারেন নি। ম্যাকেঞ্জি বোলিং-এ দেখালেন ভেল্কি। অবশ্য ভিজে পিচ আর ভারী আবহাওয়ার সুযোগ তিনি পেয়েছিলেন পুরোপুরি। তবু মাত্র ৭১ রানের বিনিময়ে ৮টা উইকেট দখল করা আর যাই হোক খুব একটা সহজ কথা নয়—বিশেষ করে ওয়েস্ট ইণ্ডিজের মতো দলের বিরুদ্ধে।

বহু দিন পরে ওয়েস্ট ইণ্ডিজ এবার অনুভব করলো সত্যিকারের ফাস্ট বোলারের অভাব। হল ছিলেন না দলে, গ্রিফিথও না। সে কাজ চালিয়েছিলেন সোবার্স-এডওয়ার্ডসরা। কিন্তু তাঁরা পিচের সুযোগ নিতে পারলেন না মোটেই।

হয়তো পারতেন—কিন্তু লরী আর চ্যাপেলের ব্যাটিং-এর ছটায় মাঠে বয়ে গেলো রানের বন্যা। লরী শেষ পর্যন্ত করলেন ২০৫, চ্যাপেল ১৬৫ আর ওয়ালটার্স করলেন ৭৬ রান। সত্যি কথা বলতে কি ও'রা তিনজন ছাড়া অস্ট্রে-

গল্পহলেওসতি

সমরসেটের ডব্লিউ ওয়েলার্ডের মতো অতো বেশি ওভার বাউণ্ডারী আর কোন খেলোয়াড় মারতে পারেন নি। ওয়েলার্ড তাঁর খেলোয়াড় জীবনে করেছেন এগারো হাজারের ওপর রান। এর মধ্যে তিন হাজারেরও বেশি রান করেছেন শুধুমাত্র ওভার বাউণ্ডারী মেরে। অর্থাৎ ওয়েলার্ড ৬ মেরেছেন ৫০০ বারেরও বেশি।

তা ছাড়া ৪টি মরশুমে তিনি মেরেছিলেন ৫০টিরও বেশি করে ওভার বাউণ্ডারী। ১৯৩৩ সালে ৫১টি; ১৯৩৬ সালে ৫৭টি; ১৯৩৭ সালে ৭২টি ও ১৯৩৮ সালে ৫৭ বার ওভার বাউণ্ডারী মেরেছিলেন তিনি।

তবে এর চেয়ে অনেক বড় কৃতিত্ব দেখিয়েছিলেন তখনকার দিনের খুব নামকরা বোলার আমস্ট্রং-এর দু' ওভারে সাতটা ওভার বাউণ্ডারী মেরে।

আমস্ট্রং-এর ঐ দু' ওভারের প্রথম ওভারে ছটা বল ওয়েলার্ড এইভাবে খেলেছিলেন ঃ ০, ৪, ৬, ৬, ১, ০ ॥

দ্বিতীয় ওভারটা ছিলো আরো সাংঘাতিক ঃ ০, ৬, ৬, ৬, ৬, ৬ ॥

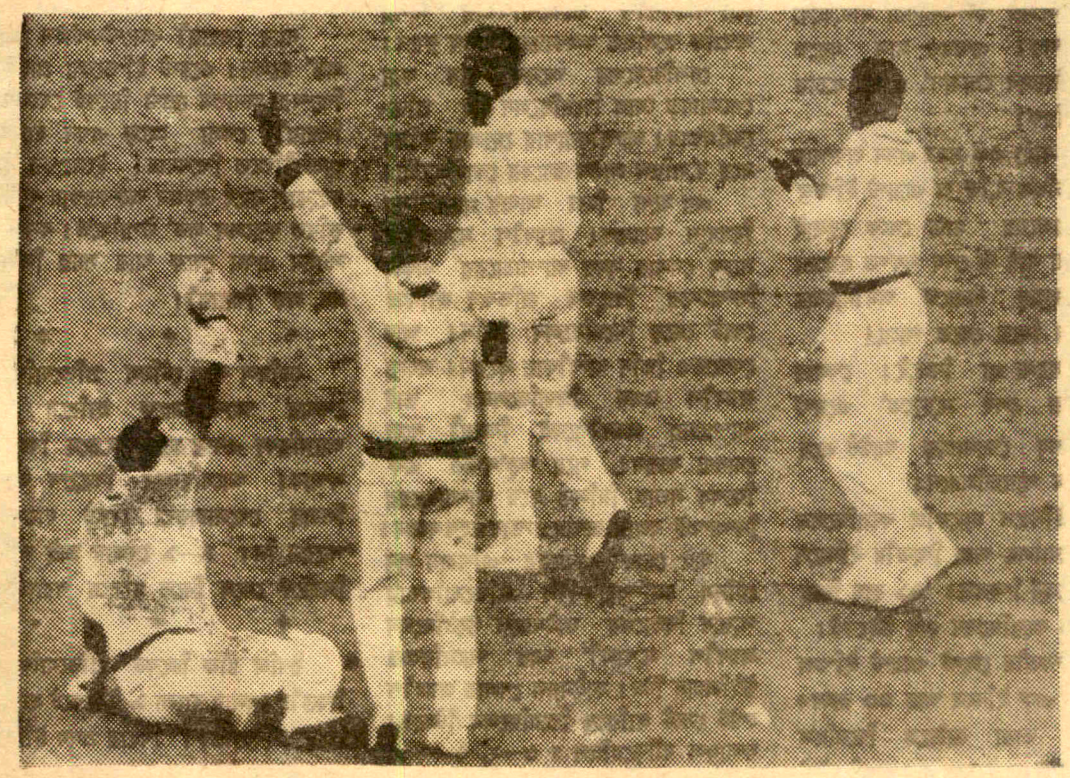

ওয়েস্ট ইণ্ডিজ-অস্ট্রেলিয়ার দ্বিতীয় টেস্ট ম্যাচে উইকেটরক্ষক হেনড্রিকস বসে পড়ে ক্যাচ লুফেছেন অস্ট্রেলিয়ার ওপেনিং ব্যাটসম্যান আয়ান রেড পাথের। ছবিতে সোবার্স, বুচার ও ফেডারিককে দেখা যাচ্ছে।

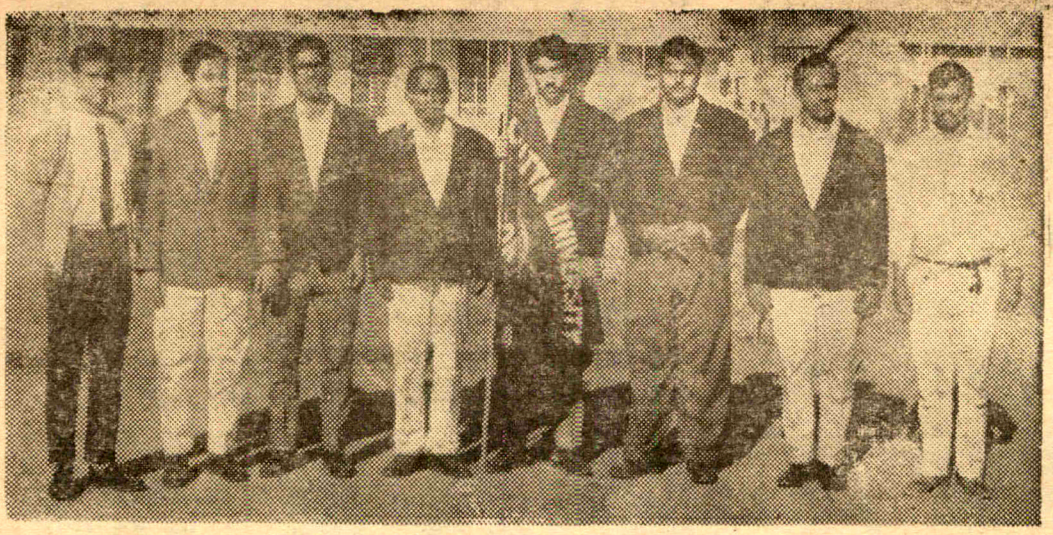

আন্তঃ বিশ্ববিদ্যালয় ভারোত্তলন প্রতিযোগিতায় এবার দলগত চ্যাম্পিয়ানশীপ লাভ করেছে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়। ছবিতে ম্যানেজার নীলমণি দাসের সঙ্গে দাঁড়িয়ে আছে বিশ্ববিদ্যালয় দলের প্রতিযোগীরা। বাঁ দিক থেকে দাঁড়িয়ে আছেন—এ সরকার, পি, রায়চৌধুরী, এন, রায়, নীলমণি দাস (ম্যানেজার), ইন্দ্র ব্যানার্জী (অধিনায়ক), এস জানা, অসীম দাস ও ডি জানা।

লিয়ার আর কোন ব্যাটসম্যান দাঁড়াতেই পারেন নি। সোবার্স আর গিবস তাঁদের কাছে রীতিমত ভয়াবহ হয়ে উঠলেন। শেষের দিকে মাত্র কুড়ি রানের মধ্যে পড়ে গিয়েছিল অস্ট্রেলিয়ার ছ'টা উইকেট। তবু অস্ট্রেলিয়ার ইনিংস শেষ হলো ৫১০ রানে। আর প্রথম ইনিংসের ফলাফলেই অস্ট্রেলিয়া এগিয়ে থাকলো ৩১০ রানে।

এর পরের ঘটনা খুবই সংক্ষিপ্ত। ওয়েস্ট ইণ্ডিজের ব্যাটসম্যানরা হাবুডুবু খেলেন আবার। এবারও হাল ধরতে চেষ্টা করেছিলেন সোবার্স, নার্স, বুচার আর ফেডারিক।

খেলার ধারা এক সময় এমন অবস্থায় এসে পৌঁচেছিল বুঝি বা ওয়েস্ট ইণ্ডিজ ইনিংস পরাজয়ের হাত থেকে রেহাই পাবে। বলা যায় না শেষ পর্যন্ত হয়তো বা তারা খেলার ধারাকে অমীমাংসার পথেও টেনে নিয়ে যেতে পারে।

কিন্তু হলো না কিছুই। খেলার চতুর্থ দিনের শেষ মুহূর্তে ওয়েস্ট ইণ্ডিজের শেষ খেলোয়াড় আউট হয়ে ফিরে এলেন প্যাভেলিয়নে।

প্রথম ইনিংসে ম্যাকেঞ্জি করেছিলেন সাংঘাতিক বোলিং, আর দ্বিতীয় ইনিংসে সে ভার নিলেন শিলসন। ৬১ রান দিয়ে শিলসন লাভ করেছিলেন ৫টা উইকেট।

ফলে দ্বিতীয় টেস্টে ওয়েস্ট ইণ্ডিজ হেরে গেলো এক ইনিংস আর ৩০ রানে। প্রথম টেস্টে তারা হারিয়ে দিয়েছিল অস্ট্রেলিয়াকে। তাই মনে হয় বাকী টেস্ট ম্যাচগুলোয় ফ্রাঙ্ক ওরেল ট্রফির ভাগ্য নিয়ে চলবে তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতা।

টেনিসের আসরে

আন্তর্জাতিক লন টেনিসের এশিয়ান চ্যাম্পিয়ানশীপ প্রতিযোগিতার আসর সম্প্রতি বসেছিল কলকাতার সাউথ ক্লাবে।

দেশবিদেশের অনেক নাম করা খেলোয়াড় যোগ দিয়েছিলেন এই প্রতিযোগিতায়। আশানিরাশার দোলায় ক'দিন ধরে দুলছিল সাউথ ক্লাবের কোর্টগুলো।

এর মধ্যে ছিল আবার ন্যাসটাসির বিসদৃশ আচরণ। জয়দীপ মুখার্জীর সঙ্গে খেলার সময় আম্পায়ারের একটা সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানিয়ে কোর্ট ছেড়ে গিয়েছিলেন তিনি। আর খেলতেও তিনি অস্বীকার করেন। অবশ্য জয়দীপ তখন জিতছিলেন। তাই আম্পায়ার জয়দীপকেই বিজয়ী বলে ঘোষণা করেন। পরে কর্তৃপক্ষও এক বিশেষ সভায় মিলিত হয়ে আম্পায়ারের সিদ্ধান্তই বজায় রাখার প্রস্তাব গ্রহণ করেন।

যাই হোক এবারের এশিয়ান লন টেনিস চ্যাম্পিয়ানশীপ প্রতিযোগিতার পুরুষ বিভাগের ফাইন্যালে উঠেছিলেন জয়দীপ মুখার্জী আর আমেরিকার উইলিয়াম টিম। ফাইন্যাল খেলায় জয়দীপ স্ট্রেট সেটে হারিয়ে দিয়েছিলেন টিমকে। ফলাফল দাঁড়িয়েছিল ঃ ৬—২, ৬—২ ও ৬—০।

মহিলাদের সিঙ্গল ফাইন্যালে নিরুপমা বসন্ত লাভ করেছেন বিজয়ীর সম্মান। তিনি ৬—১, ৩—৬ ও ৬—৩ সেটে হারিয়ে দিয়েছিলেন আমেরিকার মিসেস এ টিমকে।

সমাচারদর্পণ

স্যার লিয়ারী কনস্টেনস্টাইন এবার লর্ড হলেন। ওয়েস্ট ইণ্ডিজের প্রাক্তন ও বিশ্বের অন্যতম শ্রেষ্ঠ ক্রিকেট খেলোয়াড় লিয়ারী খেলা ছেড়ে এখন হয়েছেন রাজনীতিতে বিশেষজ্ঞ। ইংলণ্ডের রাণী বহুকাল বাদে একজন অশ্বেতকায় ব্যক্তিকে ভূষিত করলেন লর্ড উপাধিতে। কনস্টেনস্টাইন এখন থেকে আর স্যার লিয়ারী নন, লর্ড লিয়ারী।

* * *

ডেভিস কাপ টেনিস প্রতিযোগিতার খেলায় অস্ট্রেলিয়াকে হারিয়ে দিয়ে আমেরিকা এবার লাভ করেছে বিজয়ীর সম্মান। আমেরিকার বিরুদ্ধে অস্ট্রেলিয়ার খেলোয়াড়রা মোটে দাঁড়াতেই পারেন নি। ৪—১ খেলায় তাই অস্ট্রেলিয়াকে মেনে নিতে হয়েছে পরাজয়।

* * *

রণজি ট্রফি ক্রিকেট প্রতিযোগিতার দ্বিতীয় খেলায় বাংলা ৯ উইকেটে হারিয়ে দিয়েছে বিহারকে। বিহার প্রথম ইনিংসে ৮৬ ও ২য় ইনিংসে ২০৭ রান। বাংলা প্রথম ও দ্বিতীয় ইনিংসে ১৯২ ও ১ উইকেটে ১০৪ রান করে।

সত্যি কথা বলতে কি দ্বিতীয় টেস্ট ম্যাচে অস্ট্রেলিয়া যে ওয়েস্ট ইণ্ডিজকে হারালো তার পেছনে কিন্তু আসলে ছিল ফাস্ট বোলার গ্রাহাম ম্যাকেঞ্জির সাংঘাতিক বোলিং। মাত্র ৭১ রানের বিনিময়ে ওয়েস্ট ইণ্ডিজের ৮ জন খেলোয়াড়কে আউট করা আর যাই হোক সহজ কথা নয়। আর সেই জন্যেই ম্যাকেঞ্জিকে নিয়ে খুব হৈচৈ পড়ে গেছে।

ম্যাকেঞ্জির বয়েস কিন্তু খুব বেশি নয়। এই আঠাশের কাছাকাছি। জন্ম

পরিচীয়তে

১৯৪১ সালের ২৪শে জুন। টেস্ট খেলার সুযোগ পেয়েছেন মাত্র কুড়ি বছর বয়েসে। ১৯৬১ সালে ইংলণ্ডের বিরুদ্ধে শুরু হয় তাঁর টেস্ট খেলোয়াড় জীবন। সেবার তিনি অংশ গ্রহণ করেছিলেন তিনটে টেস্টে।

কিন্তু সেই শুরু, তারপর থেকে আজ পর্যন্ত ম্যাকেঞ্জি অস্ট্রেলিয়ার আক্রমণ-ভাগের অন্যতম প্রধান স্তম্ভ। ১৯৬৪-৬৫ সালে উইসডেনে 'ফাইভ ক্রিকেটার্স অফ দি ইয়ারে' স্থান লাভ করেছিলেন ম্যাকেঞ্জি। [বাকী অংশ শেষ পাতায়]

ফুটবলের মান কোন পথে?

নীলিমেশ রায়চৌধুরী
(সংকলক)

[ফুটবলের মান কোন্ পথে? এই পর্যায়ের তৃতীয় লেখায় ব্রেজিলের পেলে ও ভারতের শৈলেন মান্নার মতামত প্রকাশ করা হলো। —ক্রীড়া সম্পাদক]

পেলে (বিশ্ব ফুটবলের মুকুটহীন সম্রাট—ব্রাজিলের খেলোয়াড়)

"এর নাম অন্য কিছু হতে পারে, তবে ফুটবল নয়" অতি দুঃখে অভিমানে গত বিশ্ব কাপ শেষে এই ক'টি কথা বলেছিলেন বিশ্ব ফুটবলের অবিসংবাদী নায়ক পেলে। গত আসরে পেলেকে পঙ্গু করে দেওয়ার চিন্তাই ছিল অন্যান্য দলের।

পেলের কথা—"ফুটবল যে হালে চলছে তাতে ফুটবল শিল্পীর স্থান নেই—এখন চলছে দৈহিক শক্তি প্রয়োগ করে চটকদার খেলা। এখানে ভাল খেলার চেষ্টা করা নাকি অন্যায়। পায়ে বল রেখে নতুন টেকনিক্ প্রয়োগ মাঠে হাজির থাকা খেলোয়াড়েরা বা তাদের প্রশিক্ষকেরা সইতে পারে না—তাই দেখছি টেকনিক্ বদলাচ্ছে কিন্তু আইন বদল হচ্ছে না।

ব্যক্তিগত নৈপুণ্যে কোন দল আজ খেলতে পারবে না। প্রতিটি খেলোয়াড়-কেই মারমুখী হতে হবে—গোল দিতে না পারি—গোল আটকে বিপক্ষ দলের 'কণ্ডাক্টার'কে আহত করে মাঠ থেকে হটিয়ে দিতে পারাটাই আজকের ফুটবলের মস্তো কিছু। এ হালে ফুটবল চললে ফুটবলের মান এবং সৌন্দর্য দুই যে নিম্নমুখী হবে এতে আর আশ্চর্য কি? ফুটবল মাঠে এমন হাওয়া বইলে সে ফুটবলকে আমি দূর থেকেই সেলাম জানাই। আমি ফুটবল ভালবাসি তবে আজকের এই ফুটবলকে নয়।"

শৈলেন মান্না (হেলসিংকি ওলিম্পিকে ভারতীয় ফুটবলের অধিনায়ক)

"ফুটবলের সৌন্দর্য হানি হতে পারে কিন্তু মান নিম্নমুখী এ কথা মানি না"—দৃপ্তকণ্ঠে কথাকটি বলে সেদিনের সন্ধ্যার নির্জনতা ভঙ্গ করলেন মোহনবাগান তাঁবুতে বসে চল্লিশ ও পঞ্চাশ দশকের প্রথম পর্বের প্রখ্যাত খেলোয়াড় শৈলেন মান্না।

"আমাদের কালের ফুটবলের সাথে আজকের ফুটবলের অনেক তফাৎ। আজকের খেলা কত কঠিন হয়ে গেছে—খেলোয়াড়দের কত পরিশ্রম করতে হয়। সূক্ষ্ম চিন্তার দৌলতেই গোল করতে হয়। ফুটবল নিয়ে কত পরীক্ষা-নীরিক্ষা চলছে—কত নতুন নতুন প্রথা-প্রকরণ চালু হচ্ছে। আমাদের কালে তো এ-সব চিন্তাই হত না। তাই বলছি মান আগের চাইতে নিম্নমুখী নয় বরং নতুন পথে ফুটবল আজ গড়িয়ে যাওয়ার প্রয়াস পাচ্ছে। এইখানেই আজকের ফুটবলের বিশেষত্ব।

"আজকের ফুটবল দৈহিক সামর্থ্যহীন খেলোয়াড়দের জন্য নয়—শরীরের গঠন মজবুত করে তবেই আজ মাঠে আসতে হবে নইলে আহত হয়ে ফুটবলের নামে ধিক্কার তুলতে হবে। আরও পরিশ্রমী খেলোয়াড় আজকের দিনে দরকার। গতির সাথে পাল্লা দিয়েই 'স্কিম' তৈরি করতে হবে—স্কিমিং এবং 'স্কোরিং'এর তৎপর টেকনিক-গুলি রপ্ত করতে হবে। সে চরিত্রের খেলোয়াড়ের অভাব আছে স্বীকার করি—তবুও এদের মধ্যেও আছে বেন্নে, চার্লটন, পেলের মত খেলোয়াড়। আসল কথা হল নতুন কিছু গড়তে গেলে সামান্য যে সাময়িক ক্ষতি হবে তা নিয়ে হৈ-চৈ না করে তাকে বোঝার চেষ্টা করাটাই শ্রেয়।

আসল কথা খেলার মান এবং সৌন্দর্য দুই যেমন খেলোয়াড়দের ওপর নির্ভর করে তেমনই নির্ভর করে—দর্শক, প্রেস, প্রশিক্ষক এবং কর্মকর্তাদের ওপরও। আজকের ফুটবলে সুযোগ-সুবিধে দরকার প্রচুর তাই কর্মকর্তাদের সাথে প্রশিক্ষক-দের সোজাসুজি যোগাযোগ থাকা দরকার। আবার প্রশিক্ষণকেন্দ্রে প্রশিক্ষকের সাথে খেলোয়াড়দের যোগাযোগ তো থাকতেই হবে—সুযোগ-সুবিধে পেলেই প্রশিক্ষক নিজের মত করে তৈরি করতে পারেন খেলোয়াড়দের। আর প্রশিক্ষকের ছক্ বা টেকনিক্ ঠিকমত দর্শকদের কাছে পৌঁছিয়ে দেওয়ার দায়িত্ব সাংবাদিকদের। এক্ষেত্রে সাংবাদিকরা তৎপর না হলে দর্শকসমাজ বিজ্ঞানভিত্তিক ফুটবলকে ঠিক বুঝে উঠতে পারবেন না। তাই বলছি কর্মকর্তা, প্রশিক্ষক, খেলোয়াড় এবং সাংবাদিকদের মধ্যে নিখাঁজ যোগাযোগই আজকের ফুটবলকে আরও সুন্দর আরও প্রাণবন্ত করে তুলতে পারে।" [চলবে]

তপকের সরকার (শালবনী, মৌদনীপুর)

প্রশ্ন ঃ আজ আপনাদের ৭৩ বর্ষ ২৭শ সংখ্যা দেখে একটা ব্যাপারে বড় কৌতূহল জেগেছে। আমি আপনাদের খেলাধূলো বিভাগের "গল্প হলেও সত্যি" ফিচারটি নিয়মিত পড়ি। কিন্তু আজ পড়লাম, "..... ১৯৭১ সালে বিলেতের হ্যাম্বল্ডন ক্লাব আর চারটেসি দলের মধ্যে ক্রিকেট ম্যাচ খেলা হচ্ছে।....."

ছাপার ভুলে বোধকরি সালটা ১৯৭১ হয়ে গেছে। আসল সালটা জানার জন্যে বিশেষ কৌতূহল বোধ করছি। সুতরাং অবিলম্বে ওটি জানিয়ে আমার কৌতূহল মেটাবেন আশা করি। সালটা ১৯৭১ নয়। কারণ ১৯৭১ এখনও আসেই নি, সুতরাং.....!

উত্তর ঃ সুতরাং ওটা ছাপার ভুল।

১৭৭১-এর জায়গায় ছাপা হয়ে গেছে ১৯৭১। ছাপার এই ভুলের জন্যে আমরা দুঃখিত।

মান্তু সরকার (রায়গঞ্জ, খেঁকিপাড়া)

প্রশ্ন ঃ আচ্ছা চুনী গোস্বামী বাংলায় ব্যাট ধরেছেন ক্রিকেট খেলার জন্যে। কিন্তু এ বছর আর বোধহয় ভারতীয় ক্রিকেটে নামছেন না?

উত্তর ঃ চুনী গোস্বামী "বাংলায় ব্যাটই" তো ধরেন চিরকাল! এ বছর কি চুনী গোস্বামীর "ভারতীয় ক্রিকেটে নামার" কথা ছিলো?

পরিতোষ নাগ (বেলাকোবা, জলপাইগুড়ি)

প্রশ্ন ঃ রাজা মুখার্জী ও দীপঙ্কর সরকারের জীবনী জানতে চাই!

[পরিচীয়তের শেষাংশ]

১৯৬৪ সালে অস্ট্রেলিয়া দলের ভারত সফরের প্রথম টেস্টে (মাদ্রাজে) ম্যাকেঞ্জি প্রথম ইনিংসে ৫৮ রানে ৬টা ও দ্বিতীয় ইনিংসে ৩৩ রানে ৪টে, মোট ১০টা উইকেট দখল করেছিলেন। অবশ্য তার চেয়ে অনেক বড় কৃতিত্ব ম্যাকেঞ্জি এবার দেখিয়েছেন ওয়েস্ট ইণ্ডিজ- অস্ট্রেলিয়ার দ্বিতীয় টেস্ট ম্যাচে।

আর তার চেয়েও বড় কথা হলো ঐ দ্বিতীয় টেস্ট ম্যাচের সময়ই ম্যাকেঞ্জি লাভ করেছেন টেস্ট খেলায় দু'শ উইকেট দখলের কৃতিত্ব। ম্যাকেঞ্জির বয়েস কম, খেলবেন এখনো অনেক দিন। তাই মনে হয় ম্যাকেঞ্জি হয়তো বা শেষ পর্যন্ত টুম্যানের বিশ্ব রেকর্ডের কাছাকাছি গিয়ে হাজির হবেন...!

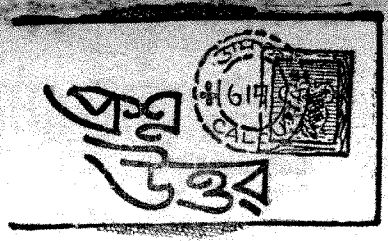

বর্তমান কাল পর্যন্ত যে সব টেস্ট ক্রিকেট খেলা হয়েছে তার মধ্যে টাই টেস্টের সংখ্যা কত? সেগুলি কোন্ কোন্ দেশের মধ্যে হয়েছে?

উত্তর ঃ রাজা মুখার্জী ও দীপঙ্কর সরকারের জীবনী আগেই সাপ্তাহিক বসুমতীতে প্রকাশ করা হয়েছে। তবে ওঁরা অস্ট্রেলিয়া থেকে ফিরে এলে ওঁদের নিয়ে একটা বিশেষ লেখা প্রকাশ করার চেষ্টা করবো।

আজ পর্যন্ত ক্রিকেটের ইতিহাসে একটা টেস্টেই শেষ হয়েছে টাই হয়ে। খেলাটি ছিলো অস্ট্রেলিয়া বনাম ওয়েস্ট ইণ্ডিজের মধ্যে।

অসিত মুখার্জী (হরিমোহন দত্ত রোড, কলকাতা-২৮)

প্রশ্ন ঃ পাতৌদি ও শর্মিলার বিয়ে তাহলে ভালোয় ভালোয় হলো। ক্রিকেট খেলোয়াড়রা এখন বোধ হয় খুব খুশি!

উত্তর ঃ খুশির চোটে নিচের কার্টুনের মত অবস্থা না হলেই বাঁচি!

শুভঙ্কর মুখোপাধ্যায় ও ইন্দ্রিরা মুখোপাধ্যায় (শংকরপুরে কলিয়ারী, উখরা বর্ধমান)

প্রশ্ন ঃ কোন্ দেশে কত সালে প্রথম ক্রিকেট খেলার প্রবর্তন হয় এবং প্রবর্তকই বা কে?

উত্তর ঃ আপনাদের প্রশ্নের উত্তর দিতে গেলে ক্রিকেট খেলার ইতিহাস লিখতে হবে। কারণ ক্রিকেট খেলা বিশেষ কোন্ সালে প্রবর্তিত হয় নি বা ক্রিকেট খেলার প্রবর্তক একজনও নয়। অনেক বছর ধরে অনেক উত্থান-পতনের মধ্যে দিয়ে আজকের ক্রিকেট খেলা বর্তমান রূপ নিয়েছে। আপনারা যদি এ ব্যাপারে সত্যিই উৎসাহী হন তাহলে 'হিস্ট্রি অফ ওয়ার্ল্ড ক্রিকেট' বইটা সংগ্রহ করে না হয় পড়ে নেবেন। খুব সুন্দর বই।

পার্থপ্রতিম দত্ত (মানসবাগ, বেলুরিয়া)

প্রশ্ন ঃ গত পাঁচ বছরের আই· এফ· এ শীল্ড ও লীগ বিজয়ী দলের নাম জানতে চাই।

উত্তর ঃ আই· এফ· এ শীল্ড ঃ ১৯৬৪ খেলা পরিত্যক্ত (ফাইন্যালে উঠেছিল মোহনবাগান ও ইস্টবেঙ্গল), ১৯৬৫—ইস্টবেঙ্গল, ১৯৬৬, ইস্টবেঙ্গল; ১৯৬৭ পরিত্যক্ত (ফাইন্যালে উঠেছিল মোহনবাগান ও ইস্টবেঙ্গল) ১৯৬৮—চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত হয় নি।

লীগ ঃ ১৯৬৪—মোহনবাগান; ১৯৬৫—মোহনবাগান, ১৯৬৬ ইস্টবেঙ্গল, ১৯৬৭—মহামেডান স্পোর্টিং, ১৯৬৮—সিদ্ধান্ত হয় নি।

মনীশ মুখোপাধ্যায় (মনোরহরপুকুর ২য় লেন, বালীগঞ্জ)

প্রশ্ন ঃ কোন ব্যাটসম্যান বল হিট করে রান নেবার সময় একজন ফিল্ডার উইকেট লক্ষ্য করে বল ছুঁড়লেন, কিন্তু ব্যাটসম্যান হাত দিয়ে বলটি আটকে দিলেন। এক্ষেত্রে আম্পায়ার কি আউটের নির্দেশ দেবেন। যদি দেন তাহলে কি আউট হবে?

উত্তর ঃ আম্পায়ার নিশ্চয়ই আউট দেবেন। হ্যাণ্ডল দি বল অর্থাৎ বলে হাত দেবার জন্যে আউট, এই নিয়মেই আউট হবেন ব্যাটসম্যান।

সম্পাদিকা—জয়ন্তী সেন

বসুমতী (প্রাঃ) লিঃ-এর পক্ষে ১৬৬, বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী স্ট্রীটস্থ কলিকাতা-১২ বসুমতী প্রেস হইতে শ্রীসুকুমার মুখোপাধ্যায় কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

বসুমতীর কালজয়ী গ্রন্থরাজী

॥ গ্রন্থনসৌষ্ঠবে নয়নাভিরাম ॥

কালিদাস গ্রন্থাবলী--- ১ম ৬-০০
কালিদাস গ্রন্থাবলী--- ২য় ৬-০০
কালিদাস গ্রন্থাবলী--- ৩য় ৮-০০
মাইকেল গ্রন্থাবলী--- ১ম ৪-৫০
মাইকেল গ্রন্থাবলী--- ২য় ৩-৫০
বঙ্কিম গ্রন্থাবলী (উপন্যাস)---২য় ৪-৫০
বঙ্কিম গ্রন্থাবলী (উপন্যাস)---৩য় ৪-৫০
বঙ্কিম গ্রন্থাবলী (সাহিত্য)---১ম ৩-০০
বঙ্কিম গ্রন্থাবলী (সাহিত্য)---৩য় ৩-০০
দ্বিজেন্দ্রলাল গ্রন্থাবলী--- ১ম ৬-০০
" " ২য় ৬-০০
" " ৩য় ৮-০০
সেক্সপীয়র গ্রন্থাবলী---১ম খণ্ড ৪-৫০
সেক্সপীয়র গ্রন্থাবলী---২য় খণ্ড ৪-৫০
ত্রৈলোক্য গ্রন্থাবলী--- ১ম ৩-০০
দীনবন্ধু মিত্র গ্রন্থাবলী--- ১ম ৩-০০
প্রেমেন্দ্র গ্রন্থাবলী--- ৩-৫০
মানিক গ্রন্থাবলী--- ১ম ৩-০০
মানিক গ্রন্থাবলী--- ২য় ৩-০০
দামোদর গ্রন্থাবলী--- ১ম ৩-০০
দামোদর গ্রন্থাবলী--- ৪র্থ ৪-০০
অমৃতলাল গ্রন্থাবলী--- ১ম ৩-০০
অমৃতলাল গ্রন্থাবলী--- ২য় ৪-০০
অমৃতলাল গ্রন্থাবলী--- ৩য় ৪-০০
যোগেশ গ্রন্থাবলী--- ১ম ৩-০০
যোগেশ গ্রন্থাবলী--- ২য় ৩-০০
বিহারীলাল গ্রন্থাবলী--- ৩-০০
রঙ্গলাল গ্রন্থাবলী--- ৩-০০
উপেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় গ্রন্থাবলী-- ৩-০০
রামপ্রসাদ সেন গ্রন্থাবলী-- ৩-০০
হরপ্রসাদ শাস্ত্রী গ্রন্থাবলী--- ৫-০০
ঈশ্বরগুপ্তের গ্রন্থা:---১ম ও ২য় খণ্ড ৫-০০
ভারতচন্দ্র গ্রন্থাবলী--- ৩-৫০
স্কট গ্রন্থাবলী--- ২য় ৩-০০
স্কট গ্রন্থাবলী--- ৩য় ৩-০০
নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়ের গ্রন্থা:-- ৪-০০
দীনেন্দ্র রায় গ্রন্থাবলী---১ম ৪-৫০
দীনেন্দ্র রায় গ্রন্থাবলী---২য় ৪-৫০
প্রভাবতী দেবী গ্রন্থাবলী--- ৩-৫০
বিভূতিভূষণ মুখো: গ্রন্থাবলী--- ৪-৫০
রামনাথ বিশ্বাস গ্রন্থাবলী--- ৩-৫০
শৈলজা গ্রন্থাবলী--- ১ম ৩-৫০
শৈলজা গ্রন্থাবলী--- ২য় ৩-৫০
মণিলাল বন্দ্যো: গ্রন্থা:---১ম ৩-৫০
মণিলাল বন্দ্যো: গ্রন্থা:---২ম ৩-৫০
অসমঞ্জ গ্রন্থাবলী--- ৪-০০
সৎসাহিত্য গ্রন্থাবলী--- ১ম ৪-০০
সৎসাহিত্য গ্রন্থাবলী--- ২য় ৪-০০
সৎসাহিত্য গ্রন্থাবলী--- ৩য় ৪-০০
সৎসাহিত্য গ্রন্থাবলী--- ৪র্থ ৩-০০
রামপদ মুখার্জী গ্রন্থাবলী--- ৪-০০
" " " ---২য় ৩-০০
হেমেন্দ্র রায় গ্রন্থাবলী--- ৬-০০
মতিলাল দাশের গ্রন্থাবলী--- ৩-০০
জগদীশ গুপ্তের গ্রন্থাবলী--- ৩-৫০
বিভূতিভূষণ ভট্টের গ্রন্থাবলী--- ৪-৫০
শচীশ চট্টো: গ্রন্থা:---২য় ভাগ ৩-০০
সৌরীন্দ্রমোহন মুখো: গ্রন্থা:---৩য় ৩-০০
সৌরীন্দ্রমোহন মুখো: গ্রন্থা:---৫ম ৩-০০
বিদ্যাসুন্দর গ্রন্থাবলী--- ৫-০০
কথাসরিৎসাগর---১ম ভাগ ৪-০০
কথাসরিৎসাগর---২য় ভাগ ৪-০০
অরবিন্দ দত্তের গ্রন্থাবলী--- ৩-০০
জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের গ্রন্থাবলী---
১ম, ২য়, ৩য়---প্রতি খণ্ড ৪-০০
ক্ষীরোদ গ্রন্থাবলী ২য় ও ৪র্থ হইতে
৮ম খণ্ড---প্রতি খণ্ড— ৩-৫০
ডিকেন্সের গ্রন্থাবলী---২য় ৪-৫০
চারু বন্দ্যোপাধ্যায়ের গ্রন্থাবলী--- ৪-০০
বিলাতী গুপ্তকথা--- ২য় ভাগ ৫-০০
অতুল মিত্র গ্রন্থাবলী---২য় ৩-০০
,, , গ্রন্থাবলী---৩য় ৩-০০
রস-গ্রন্থাবলী--- ৩-০০
নবীন সেনের গ্রন্থাবলী--- ৭-০০
নেপোলিয়ান--- ৫-০০
গোপেশ্বর বন্দ্যো:
ভারতীয় সঙ্গীতের ইতিহাস---
২য় ভাগ ৫-০০
নীরদ দাশগুপ্তের গ্রন্থাবলী--- ১ম ১০-০০
অরুণ বহ্নি--- ৪-০০
কাবকঙ্কণ চণ্ডী--- ৪-৫০
জ্যোতিষ রত্নাকর--- ৩-৫০
পরলোক--- ৪-৫০
পরলোক রহস্য--- ২-০০
পরলোক ও প্রেততত্ত্ব--- ৪-৫০
দৃশ্যকাব্য পরিচয়--- ১০-০০
নাড়ীজ্ঞান প্রদীপিকা--- ৩-০০
ভারত প্রতিভা--- ৫-০০
প্রতাপাদিত্য--- ৩-০০
সাধক কমলাকান্ত--- ২-৫০
মহারাজ নন্দকুমার--- ৩-০০
নানার মা--- ৩-০০
জালিয়াৎ কুইভ--- ৩-০০
বিক্রমাদিত্য--- ৩-০০
বিসমার্ক--- ২-০০
সুরেশচন্দ্র চক্রবর্তীর আত্মজীবনী---৩-০০
মহারাষ্ট্র জীবন-প্রভাত--- ২-০০
সাধবীকঙ্কণ--- ২-০০

যৌন-মনোদর্শন

৩য় ভাগ : কামাবেগের বিশ্লেষণ ৪-০০
৪র্থ ভাগ : প্রেম ও পীড়া ৪-০০
৫ম ভাগ : কামাবেগের নিয়ত-
কালিকত্বের ব্যাপার সমূহ ৪-৫০
আশাপূর্ণা দেবীর গ্রন্থাবলী--- ১ম ৬-৫০
আশাপূর্ণা দেবীর গ্রন্থাবলী--- ২য় ৫-০০
হেমচন্দ্র বন্দ্যো: গ্রন্থাবলী--- ৮-০০
কুট্টনীমতম্ --- ৪-০০
ANANDAMATH ৪-০০
(শ্রীঅরবিন্দ কর্তৃক ইংরেজী অনবাদ)
DAVID HARE ৪-০০

বসুমতী প্রাইভেট লিমিটেড ॥ ১৬৬, বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী স্ট্রীট, কলি-১২

Thursday, 9th January, 1969 SAPTAHIK BASUMATI Regd. No. C 71
Price : 30 Paise Gram : "Basumati" Phone : 34-7771, 72, 73, 74

13 JAN 1969

কি বল্লে, 'কুকমী' উড়ো মশলা?

আঃ বাঁচা গেল!

গ্রাম : "স্পাইসমার্ট" মিল—কাশীপুর

নিজস্ব মিলে বৈজ্ঞানিক প্রথায় প্রস্তুত

'কুকমী'—সর্বাধিক বিক্রীত গুঁড়ো মশলা

পনের লক্ষ প্যাকেট মাসিক বিক্রয়

১২০ বৎসরের অধিক প্রাচীন ও বর্তমানে মশলার বৃহত্তম প্রতিষ্ঠান

কৃষ্ণচন্দ্র দত্ত (স্পাইস) প্রাঃ লিঃ ২০৫নং মহর্ষি দেবেন্দ্র রোড, পোস্তা, কলিকাতা-৭

সাপ্তাহিক বসুমতী

আসন্ন মধ্যবর্তী নির্বাচনে
উল্লেখ্য প্রতিদ্বন্দ্বীদের
কয়েকজন

CALCUTTA UNIVERSITY CENTRAL LIBRARY

৭৩ বর্ষ ঃ ৩০শ সংখ্যা, বৃহস্পতিবার, ২রা মাঘ, ১৩৭৫ বঙ্গাব্দ] OLDEST WEEKLY OF NORTH INDIA [73rd year, No. 30, 16th Jan. 1969

সূচীপত্র

বিষয়		লেখক		পৃষ্ঠা
সম্পাদকীয়	...	... ...	...	১৮৫৯
পাথরটাকে সরিয়ে দাও	...	— বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়	...	১৮৬০
জলত্যাগ ও গণতন্ত্রের [illegible]	...	— পান্নালাল দাশগুপ্ত	...	১৮৬১
সংসদীয় গণতন্ত্রের ভবিষ্যৎ	...	— অশোককুমার সেন	...	১৮৬৩
এ লড়াই বাঁচার লড়াই, এ লড়াই জিততে হবে	...	— কৃত্তিবাস ওঝা	...	১৮৬৪
মধ্যবর্তী নির্বাচন প্রসঙ্গে রাজনীতিক, সাহিত্যিক ও বুদ্ধিজীবীদের অভিমত	...	— (প্রতিবেদন : প্রদ্যোত রায়)	...	১৮৬৭
বঙ্গদর্শন	...	—	...	১৮৭৮
মধ্যবর্তী নির্বাচনের পশ্চাৎপট	...	— ডঃ নরেন ভট্টাচার্য	...	১৮৮১
নির্বাচন ও জনসাধারণ	...	— তুষার চট্টোপাধ্যায়	...	১৮৮৩
বিগত নির্বাচনের পরিপ্রেক্ষিতে আগামী নির্বাচনের পূর্বাভাষ	...	— কুমুদ দাশগুপ্ত	...	১৮৮৬
ভারতে সংসদীয় গণতন্ত্রের ভবিষ্যৎ	...	— অজিতকুমার দত্ত	...	১৮৮৯

যে কোন
গয়না
আর
আসল
গহরত
কেনার
দক্ষিণ কোলকাতায়
নামকরা প্রতিষ্ঠান

ফোন : ৪৬-৬২৫৮

সব অ্যাণ্ড অ্যাণ্ডসন্স অব লেট
এম. বি. সরকার

এস.সরকার
এণ্ড সন্স

সূচীপত্র

বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা
পশ্চিমবাংলার নির্বাচন ও সর্বভারতীয় রাজনৈতিক পরিস্থিতি ...	— শ্রীঅরুণচন্দ্র গুহ	১৮৯১
মধ্যবর্তী নির্বাচন ...	— অরুণপ্রকাশ চট্টোপাধ্যায়	১৮৯৬
ভোট ফর, ভোট ফর ...	— সমীর মুখোপাধ্যায়	১৮৯৮
মাদের খেলা (কবিতা)	— সনাতন কারিয়াল	১৯০২
গ্রাম বাংলায় নির্বাচন ...	— অসীম মুখোপাধ্যায়	১৯০৩
আসন্ন মধ্যবর্তী নির্বাচন ও তার পরিপ্রেক্ষিত ..	— সাগর বিশ্বাস	১৯০৬
আসন্ন মধ্যবর্তী নির্বাচন	— ডাঃ প্রতাপচন্দ্র গুহরায়	১৯১০
১৯ই ফেব্রুয়ারী	— সুভাষ সমাজদার	১৯১২
রঙ্গজগৎ ...	—	১৯১৭
খেলাধুলো ...	... ...	১৯১৯

॥ নাটক ॥ নাটক ॥ নাটক ॥ নাটক ॥ নাটক ॥

বহুকাল পরে আবার পাওয়া যাচ্ছে।

মহাকবি

গিরিশচন্দ্র ঘোষের রচনাবলী

প্রথম খণ্ড : প্রফুল্ল, ম্যাকবেথ, ঠাকুর শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেব ও স্বামী বিবেকানন্দ সম্পর্কে চারটি প্রবন্ধ, তিনখানি গীতিনাট্য ও গ্রন্থপরিচয়॥ পৃষ্ঠা সংখ্যা ৪১২॥ মূল্য দশ টাকা।

দ্বিতীয় খণ্ড : সিরাজউদ্দৌলা ; য্যায়সা কা ত্যায়সা ; জনা ; দোললীলা ও গ্রন্থপরিচয়। পৃষ্ঠা সংখ্যা ৩৫৮। মূল্য দশ টাকা॥

তৃতীয় খণ্ড : পাণ্ডবগৌরব, বলিদান, আবুহোসেন ও গ্রন্থপরিচয়। পৃষ্ঠা সংখ্যা ৩৫২। মূল্য দশ টাকা।

চতুর্থ খণ্ড : চৈতন্যলীলা, ভ্রান্তি, মলিনাবিকাশ, হীরার ফুল, বিবিধ রচনা ও গ্রন্থপরিচয়। পৃষ্ঠা সংখ্যা ৩০২। মূল্য দশ টাকা।

পরমহংসদেব শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁর ভক্ত-শিরোমণি অতি প্রিয় নোটো গিরিশকে বলেছিলেন, —"অভিনয়ের প্রয়োজন আছে বৈ-কি—ওতে লোকশিক্ষা হবে। আর তোমার লেখা—ও যে ভারি ভাল হয়েছে।"

প্রতিটি খণ্ড বোর্ডে বাঁধাই। মূল্যবান কাগজে ছাপা।

রচনাবলী সম্পাদনা ঃ শ্রীরমেশ চৌধুরী

আবলম্বে অর্ডার পেশ করুন ॥

বসুমতী প্রাইভেট লিমিটেড ঃ ১৬৬; বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী স্ট্রীট, কলি-১২

সম্পাদিকা
জয়ন্তী সেন

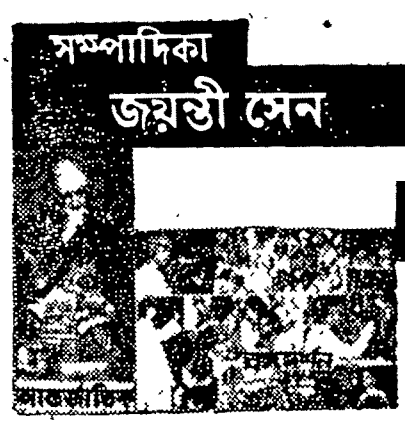

সাপ্তাহিক বসুমতী

৭৩ বর্ষ : ৩০শ সংখ্যা—মূল্য : ৩০ পয়সা
বৃহস্পতিবার, ২রা মাঘ, ১৩৭৫ বঙ্গাব্দ

বাংলা ভাষায় দ্বিতীয় সর্বাধিক প্রচারিত
সাপ্তাহিক পত্রিকা

PRICE : 30 Paise
Thursday, 16th January, 1969

CALCUTTA UNIVERSITY LIBRARY

অন্তর্বর্তী নির্বাচনে ভোটারদের দায়িত্ব

আগামী ৯ই ফেব্রুয়ারী অন্তর্বর্তী নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে। প্রায় দু' বছরের মধ্যে ভারতের বড় বড় কয়েকটা রাজ্যে নতুন করে নির্বাচন ব্যবস্থা করতে হয়েছে এই কারণে যে, গত সাধারণ নির্বাচনের পর নির্বাচিত প্রতিনিধিদের মধ্যে দলত্যাগের যে হিড়িক পড়েছিল, তা রোধ করা সম্ভব হয় নি। কারণ দলত্যাগ যাঁরা করেছিলেন, তাঁদের অধিকাংশই প্রলোভনের বশবর্তী হয়ে ঐ পথ অবলম্বন করেছিলেন। আমাদের সংবিধানে 'রি-কলে'র ব্যবস্থা না থাকার জন্যই ঐ সব প্রলোভিত প্রতিনিধিরা দেশের মধ্যে কুপ্রথার ইতিহাস সৃষ্টি করে গেলেন।

প্রসঙ্গত, এ কথাও আমরা বলতে চাই, দলত্যাগ ব্যাপারটি যে একেবারে নিবার্য—তাও সম্ভব নয়। বৃহৎ রকম মত-বিরোধের জন্য কেউ হয়তো দলত্যাগ করতে পারেন, কিন্তু নির্বাচকমণ্ডলীর কাছে যে প্রতিশ্রুতি দিয়ে তিনি নির্বাচিত তা থেকে কোনো মতেই বিচ্যুত হতে পারেন না। তাই তাঁর উচিত পুনর্নির্বাচনের সম্মুখীন হওয়া। গত সাধারণ নির্বাচনের পর দলত্যাগী নেতারা এই মনোভাব গ্রহণ করলে করদাতা নাগরিকদের অন্তর্বর্তী নির্বাচনের জন্য বিরাট ব্যয়ের বোঝা বহন করতে হোত না এবং রাজ্যে রাজ্যে স্থায়ী মন্ত্রিসভা গঠনও সম্ভবপর হোত।

যা হোক, অন্তর্বর্তী নির্বাচনের ঝুঁকি যখন এসে পড়েছে তখন নির্বাচকমণ্ডলীকেই সবচেয়ে বেশি সতর্ক ও হুঁশিয়ার হতে হবে। কারণ দলত্যাগ নিবারণের জন্য আজো কার্যকর ব্যবস্থা সম্পূর্ণভাবে গ্রহণ করা সম্ভব হয় নি। তাই নির্বাচকমণ্ডলীর দায়িত্ব এখন সর্বাধিক। তাদের কর্তব্য হবে, এমন প্রতিনিধি নির্বাচন করা যাঁরা পুনরায় ভোটদাতাদের অকূলপাথারে ফেলবেন না এবং নিজেদের স্বার্থসিদ্ধির পথ গ্রহণ করা অপেক্ষা নাগরিকদের স্বার্থ রক্ষাকেই সকলের ওপরে স্থান দিতে পারবেন।

বলা বাহুল্য, এ দেশে নানা দল, নানা মত। গণতন্ত্রে দলীয় প্রাধান্যকে অস্বীকার করার উপায় নেই। কিন্তু কোনো দল দলীয় মতের সম্পূর্ণ দাসত্ব করছে, না বণিক-বুদ্ধিতে পরিচালিত কিংবা দেশের সাধারণ মানুষগুলির মনোরঞ্জনের কথা ভাবছে—তার বিচার করতে হবে। মোট কথা, নির্বাচকমণ্ডলীই দেশের নেতাদের মতিগতি সুপথে পরিচালিত করতে পারে প্রতি ভোটদাতা নাগরিকের মনে এই বোধ দৃঢ়বদ্ধ থাকা উচিত। আর তাদের মনে এই বোধ থেকে যে-শক্তির সমাবেশ ঘটবে তা-ই দেশে সুস্থ চেতনা জাগিয়ে তুলতে সাহায্য করবে। দুর্ভাগ্যের ব্যাপার, এদেশের অধিকাংশ ভোটদাতাই অনেক সময় ভাবাবেগে পরিচালিত হয়। এ ঘটনা গত সাধারণ নির্বাচনেও ঘটেছিল বলে মনে হয়। তাই যে পরিবর্তন এক এক কেন্দ্রের নির্বাচকমণ্ডলী বাঞ্ছনীয় বলে মনে করেছিল, (ভোটাররাও নিশ্চয়ই প্রবঞ্চিত হয়েছিল এই ধারণায় যে, দলবদল করে মনবদল করেছে, বাস্তবে কিন্তু স্বার্থান্বেষী নেতারা মনবদল করে নি) তা সম্ভব হলেও পরবর্তীক্ষেত্রে তাঁদের দলত্যাগের মতো সমস্যার দ্বারা উৎপীড়িত হতে হয়েছে; অথচ তারা তা চোখের সামনে ঘটতে দেখেও নিবারণ করতে না পেরে দারুণ অসহায় বোধ করেছে।

এই অন্তর্বর্তী নির্বাচনের প্রাক্কালে সেই অসহায় মনোভাবের কথা স্মরণে রেখে আত্মজিজ্ঞাসার মধ্য দিয়ে ভোটাররা নিজেদের মর্যাদা ও শক্তি সম্বন্ধে সচেতন হয়ে উঠুক এই আমাদের কামনা। কিন্তু একটা প্রশ্ন অনেকের মনে ভিড় করছে আজ। প্রশ্নটা হচ্ছে, শিক্ষিত সম্প্রদায় ও ন্যূনতম বুদ্ধিসম্পন্ন ব্যক্তিরাও যদি এই দুই দশকে আত্মসচেতন না হয়ে ওঠে, তাহলে দেশের শতকরা সত্তর ভাগ অশিক্ষিত ও নিরক্ষর সম্প্রদায়ের কাছ থেকে আমাদের রাষ্ট্র কিভাবে সঠিক ভোট আশা করতে পারেন। এ সব প্রশ্ন অবান্তর নয়, বরং বলা যায় গুরুতর। কারণ নির্বাচকমণ্ডলীর ওপর যে দেশের শাসন ব্যবস্থা পরোক্ষভাবে পরিচালিত সে দেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ অশিক্ষিত হলে ও নিরুপায় বোধ করলে কিভাবে শক্তিধর নির্বাচকমণ্ডলীরূপে তারা পরিগণিত হতে পারে। বিশেষত, এদেশের পয়সাঅলা লোক ভোটপর্বের পূর্বাহ্নে প্রসাদ বিতরণ করে গরীবদের প্রভাবিত করে—এতো অনেকেই অনুমান করেন। অথচ এর বিরুদ্ধে আজ পর্যন্ত কোনো ব্যবস্থা গ্রহণ করাই সম্ভব হয় নি। সম্ভব হয় নি এই কারণে যে, এরা এ দশায় থাকলে আরো দশটা দশক দেশের হাওয়া একইভাবে বইবে।

কিন্তু এভাবে দেশের শিকড় যে ক্রমাগত আলগা হয়ে যাবে—তা বলা নিষ্প্রয়োজন। আর এ ব্যবস্থা কোনো মতেই চলতে দেওয়া যায় না—তা অন্তত সতর্ক জনসাধারণকে এখনই উপলব্ধি করতে হবে। নচেৎ গণতন্ত্রই বিপন্ন হয়ে উঠবে। মূলত গণভোট সুপথে পরিচালিত না হলে দেশে গণতন্ত্রই রক্ষা করা অসম্ভব। একেই তো গোটা দেশটা নিদারুণ বৈষম্যে ভুগছে, এখনো পর্যন্ত সকলের সমান মূল্য শুধু ভোটদানের ক্ষেত্রে। এই ভোট যাতে বিপথে চালিত না হয়, তার জন্যে প্রত্যেককেই আজ সাবধান হতে হবে।

সম্পাদকীয়

পাথরটাকে সরিয়ে দাও

বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

বুকের ওপর থেকে
পাথরটাকে সরিয়ে দাও
তবেই তো নিশ্বাস নিতে পারবে
হাত-পা ছড়িয়ে আবার দাঁড়াতে পারবে
তুমি বেঁচে উঠবে।

এই পাথরটা
তোমার দাসত্ব, ভীরুতা আর বিচ্ছিন্নতার সুযোগ নিয়ে
ক্রমেই একটা পাহাড়ের মত স্ফীত হচ্ছে
এই পাথরটা
তোমাকে উপবাসী, উলঙ্গ, নিরাশ্রয় ভিক্ষুকের মত দেখে
তার যে প্রাণ নেই, সে কথা ভুলে গিয়ে
একটা বীভৎস পিশাচের মত দানবীয় উল্লাসে
'হো হো' করে হেসে উঠছে।

বিশ বছর ধরে এই নরকের পাথর
তোমার, বুকের ওপর ;
সে কেবল তোমাকে আদেশ করে আর তোমরা মুখের অন্ন
কেড়ে খায়।
সে তোমার কাছ থেকে ভোট চায়, ট্যাক্স চায়, তোমার বশ্যতা চায়
আর বিনিময়ে তোমাকে দালাল, বেশ্যা, খুনে আর
দেশদ্রোহী হ'তে বলে।

গ্রামহীন অন্ধকারের এই পাথর, যার সারা গায়ে, এখনো নর্দমার
নোংরা লেগে আছে,
সে তোমার বিশ্বাসের, ভালমানুষীর এবং কাপুরুষতার
সুযোগ নিয়ে
এখন নিজেকে দেবতা ব'লে ঘোষণা করছে।
সে ভাবছে, ইলেকশনের আগে তোমাকে একশো গ্রাম বেশি
চাল ঘুষ দিয়ে
আরেকবার নাগরদোলায় নাচাবে, আর তারপর তোমার বুকের
ভেতরটাকে আরো মারবে,
আর তোমার আধখানা জন্মভূমি, যাকে নিয়ে তুমি পুরনো
জাতীয় সংগীত নতুন করে গাইতে শিখেছ,
ভিন্‌দেশী গুণ্ডাদের মত ইতর আর নোংরা মানুষদের কাছে
তাকে কুলাকড়ির বিনিময়ে বিক্রি করে দেবে।

বুকের ওপর থেকে এই ভয়ঙ্কর পাথরটাকে এবার সরিয়ে দাও ;
তারপর শরীর থেকে নর্দমার পাঁক আর ধুলো ঝেড়ে ফেলে
ঐ পাথরটাকে একটা প্রকাণ্ড দড়িতে বেঁধে নিয়ে
হাজার, লাখ কোটি মানুষে মিলে
ভারত মহাসাগরের গর্ভে বিসর্জন দাও।

তবেই, এবং সেদিনই
তুমি সত্যিকারের স্বাধীন মানুষ বলে
নিজেকে পরিচয় দিতে পারবে ; আর তোমার কণ্ঠে সেদিন
মন্ত্রের মত উচ্চারিত হবে যে জাতীয় সংগীত
তাকে নিয়ে সার্কাসের ক্লাউনেরা সাহস পাবে না ঘনঘন
হাততালি দিতে।

একবার তোমার সেই স্বপ্নের স্বদেশের কথা চিন্তা করো,
যেখানে উলঙ্গ, নিরন্ন মানুষেরা রাস্তায় রাস্তায় ভিড় করে না ;
যেখানে বেশ্যা, দালাল আর গুণ্ডারা চোখ রাঙিয়ে ভয় দেখায় না ;
'আমাদের ভোট দাও। নইলে তোমাদের চোখগুলি পর্যন্ত
উপড়ে নেবো।'
আর তখনই শক্তি আসবে ; তোমার বুকের ওপর শয়তানের
মন্ত্রপড়া পাথরটার আয়ুও
সেইদিনই শেষ। তারপর নতুন স্বদেশ, নতুন মন্ত্রের উচ্চারণ ;
আর ঘরে ঘরে সত্যিকারের নবান্নের উৎসব ;
'আবার আমরা মানুষ হবো।'

দলত্যাগ ও গণতন্ত্রের সংকট

পান্নালাল দাশগুপ্ত

যত সাধারণ নির্বাচনের পর সর্বভারতেই রাজনীতিক অস্থিরতার গতিবেগ বেড়ে গেছে। দলত্যাগ তার একটা বহিঃপ্রকাশ মাত্র। ভারতের রাজনৈতিক রঙ্গমঞ্চের অভ্যন্তরে যে পরিবর্তনের প্রয়োজনীয়তা সর্বস্তরে অনুভূত হচ্ছিল তার স্বাভাবিক পথ রুদ্ধ করে দাঁড়িয়েছিল কংগ্রেস। সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক পরিবর্তনের বা প্রগতির যেসব প্রতিজ্ঞা কংগ্রেস দফে দফে দেশ ও জাতিকে দিয়ে যাচ্ছিল, ব্যবহারের ক্ষেত্রে কংগ্রেস কর্তৃপক্ষ তার বিরুদ্ধাচরণই করে এসেছে, ফলে কংগ্রেসের রাজত্বে রক্ষণশীলতাই ক্রমশ ও শেষ পর্যন্ত শক্তিমান হয়ে ওঠে। গণতান্ত্রিক উপায়ে দেশের রূপান্তর অথবা সমাজতন্ত্র আনতে হলে তার রাজনৈতিক হাতিয়ারও সৃষ্টি করার দরকার ছিল। কোন দেশেই সংসদীয় গণতন্ত্র চালু হতে পারে না, যদি না একাধিক দায়িত্বশীল অথচ শক্তিমান পার্টি সৃষ্টি হয়। একদলীয় গণতন্ত্র শেষ পর্যন্ত সোনার পাথরের বাটিতে পরিণত হতে বাধ্য হয়। দলের ভেতরেই গণতন্ত্র থাকলেই হবে, দলের বাইরে গণতান্ত্রিক প্রতিযোগিতার আইনসম্মত ব্যবস্থা না থাকলেও চলবে, এ দাবি ইতিহাসের অভিজ্ঞতায় ভুল প্রতিপন্ন হয়েছে। এমন কি কম্যুনিস্ট দেশগুলিতে একদলীয় পার্টিতে আভ্যন্তরীণ গণতন্ত্র (Democratic Centralism) আছে ও চিরকাল থাকবে বলে যে দাবি করা হোত, আজ সে দাবি ভুল বলে প্রতিপন্ন হচ্ছে—যদিও সব কম্যুনিস্ট দলই মনে করেন যে তাঁরা চিরকালই বিপ্লবী থাকবেন।' তার জন্য আজ কম্যুনিস্ট রাষ্ট্রগুলিতেও যেসব সংকট দেখা দিয়েছে তার মূলে রয়েছে রক্ষণশীল কম্যুনিস্ট বনাম পরিবর্তনকামী কম্যুনিস্টের দ্বন্দ্ব। যদি পরিবর্তনকামীরা স্বাভাবিক পথেই অগ্রসর হতে পারতেন—আইনসম্মত উপায়েই বিরোধী মতের জন্য লড়াই করতে পারতেন, তবে কম্যুনিস্ট জগতে এত সংকট দেখা দিতো না। ক্ষমতাসীন গোষ্ঠীকে শেষ পর্যন্ত রক্ষণশীল হওয়া ছাড়া উপায় নেই, এবং কম্যুনিস্ট সমাজেও পরিবর্তনের প্রয়োজন আছে সেটা মুখে স্বীকার করেও কার্যত তাঁরা প্রতিবন্ধক হয়ে পড়েন। যদি চিরন্তন বিপ্লবী কম্যুনিস্টদেরই এই হাল হয়, তবে অবিপ্লবী কংগ্রেস মুখে এক কথা বলবেন, কাজে উল্টোটি করবেন, এতে মোটেই আশ্চর্য হবার সুযোগ থাকে না।

স্বাধীন ভারত রাজনৈতিক দিক থেকে একটি অবশ্যম্ভাবী রাজনৈতিক প্রয়োজন মেটাতে পারে নি, অর্থাৎ একাধিক সর্বভারতীয় গণতান্ত্রিক দল সৃষ্টি করতে পারে নি। পার্টি বা রাজনৈতিক গ্রুপ অবশ্যই শতাধিক সৃষ্টি হয়েছে—কিন্তু কংগ্রেসের বিকল্প, সর্বভারতীয় শক্তিমান কোন দল সৃষ্টি করতে পারে নি। মানুষ যেমন একপায়ে চলতে পারে না, তেমনি গণতন্ত্রও অন্তত দুটি বলিষ্ঠ দল ছাড়া চলতে পারে না। এদিকে একদা কংগ্রেস যেমন একটি সুসংগঠিত সর্বভারতীয় দল ছিল, তা আজ্যন্তরীণ গণতন্ত্রের অভাবে নিজেই খণ্ড-বিখণ্ড টুকরা-টাকরা নানা উপদলে বিভক্ত হয়ে পড়ছে, বহু কংগ্রেস কর্মী একে একে, কখনো কখনো দলে দলে, কংগ্রেস থেকে বেরিয়ে গেছেন, আজও যাচ্ছেন, এবং যাঁরা আছেন তাঁরাও কোন একমাত্রালম্বী নন—এমন কি কংগ্রেসকেও বলা যায় একটি যুক্তফ্রন্ট—অনেক রক্ষণশীল উপদলের যুক্তফ্রন্ট।

গত বিশ বছরে, স্বাধীনোত্তর ভারতে, ছোট বড় নানা দলের সৃষ্টি হয়েছে, কিন্তু বৃহৎ সর্বভারতীয় দল হিসেবে সারা ভারতকে ধরে রাখতে পারে এমন একটি বিকল্প দল ভারত সৃষ্টি করতে পারে নি। সমাজতন্ত্রীরাও নানা ভাগে বিভক্ত হয়ে পড়েন, এমন কি কম্যুনিস্টরা পর্যন্ত। কৃষক ও মজুর প্রতিষ্ঠান; ছাত্র প্রতিষ্ঠানগুলি পর্যন্ত নানা ভাগে বিভক্ত হয়ে পড়েন। ফলে কি কংগ্রেস, কি অকংগ্রেস—সর্বত্র দেশের ভেতরে চলেছে একটা বিভাজন বা divisive ক্রিয়া ও প্রতিক্রিয়ার অন্তহীন গতিবেগ। এই বিচ্ছিন্নমুখীনতা বা disintegration-এর গতিবেগ পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় রেল, উড়োজাহাজ, বৃহৎ শিল্প, পুঁজির কেন্দ্রীকরণ, রাষ্ট্রযন্ত্রের কেন্দ্রীকরণ—কোন কিছুই আটকাতে পারছে না। বৃহৎ পুঁজি বা একচেটিয়া পুঁজির স্বার্থ সর্বভারতীয় বাজারাশ্রয়ী হলেও, ভারতের মত বৃহৎ, বিশাল অথচ দরিদ্র দেশের তুলনায় তা কিছুই নয়। অর্থাৎ দেশের অর্থনৈতিক বুনিয়াদও রাজনৈতিক ঐক্য রক্ষার ক্ষেত্রে যথেষ্ট নয়, বরং অত্যন্ত সীমিত ও দুর্বল।

এই বিভাজন প্রক্রিয়া বা forces of disintegration-এর মূলে রয়েছে কিন্তু দ্রুত পরিবর্তনের চাপ। বিশাল বিস্তৃত ভারতের সর্বত্র জেগেছে অগ্রগতির জন্য প্রচণ্ড চাপ। ভারতের ৬ লক্ষ গ্রামে সকল জাতি ও উপজাতির সাধারণ মানুষেরা তার পুরাতন জীবন ও চিরন্তন দারিদ্র্যের মধ্যে বাস করতে রাজী নয়। আদিবাসীই হোক, শ্রমিক কৃষক ভূমিহীন দরিদ্র জনসাধারণই হোক, মধ্যবিত্ত ও নিম্নমধ্যবিত্তরাই হোক, বিশাল বিস্তারমান ছাত্রসমাজই হোক তাদের সকলেরই প্রাণে দুর্দান্ত গতিবেগ সৃষ্টি হয়েছে, নতুন দিগন্ত সৃষ্টি হয়েছে তাদের আশা-আকাঙ্ক্ষার ক্ষেত্রে। তৃপ্ত সেই ক্ষুধা মেটাবার সাধ্য নেই—সীমিত অর্থনৈতিক ব্যবস্থার ও তার ধারক রক্ষণশীল কংগ্রেসী নেতৃত্বের। ফলে সৃষ্টি হয়েছে দেশব্যাপী একটা chunk of dissatisfaction ও অসন্তোষের প্লাবন। উপরন্তু দেশের অর্থনীতিতে দেখা দিয়েছে এক ভয়াবহ সংকট, কোটি কোটি লোক বেকার, চতুর্থ পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা চালু করাই সম্ভব হচ্ছে না। এমন কি যা চলছিল, যতটুকু শব্দুকগতি সৃষ্টি হয়েছিল, তাও রুদ্ধ হয়ে পড়ছে। অগ্রগতি তো বন্ধই, এমন কি যতটুকু অগ্রসর হওয়া সম্ভব হয়েছিল, তা রক্ষা করাও সম্ভব হচ্ছে না—ফলে কেবল কলে কারখানায় আর অফিসে ছাঁটাই আর লে-অফ চলছে না, পরিকল্পনার টার্গেটেও চলেছে ছাঁট-কাটের অবিরাম চেষ্টা।

এই পরিপ্রেক্ষিতে সামাজিক বিস্ফোরণ, এমন কি বিপ্লবও অনিবার্য হয়ে ওঠে। যদি গণতান্ত্রিক উপায়ে সে আসন্ন বিস্ফোরণকে এড়িয়ে অগ্রসর হতে হয়, তবে গণতন্ত্রকেই আরও দশগুণ সক্রিয় ও সক্ষম হওয়া চাই। আর গণতন্ত্রকে সে ধরণের শক্তিমান হতে হলে কংগ্রেসকে আরও শক্তিমান করার ব্যর্থ চেষ্টা না করে, সর্বশক্তি দিয়ে, পাল্টা বা বিকল্প একটা গণতান্ত্রিক শক্তি সর্বভারতে সৃষ্টি করতে হবে। কংগ্রেস যদি সর্বশক্তি দিয়ে সর্বভারতে ক্ষমতায় সুদৃঢ় থাকতে চেষ্টা করে তবে কংগ্রেসের গণতান্ত্রিক ভোল সব ছেড়ে দিতে হবে, রাষ্ট্রপতির শাসন ও স্বৈরতন্ত্র, সামরিক শক্তির ব্যবহার, গণতান্ত্রিক অধিকারসমূহ হরণ ইত্যাদির সাহায্যেই কংগ্রেস তা করতে পারে। কাজেই কংগ্রেসের ওপরে আর গণতন্ত্রের জন্য নির্ভর করা চলে না। যে কারণে কংগ্রেস নানা উপদলের ফ্রন্ট হয়ে পড়লো এবং ধীরে

জগণতান্ত্রিক আচরণ গিলতে শুরু করলো, সেটি হলো দেশে একাধিক সর্বভারতীয় গণতান্ত্রিক দলের আবির্ভাবের অভাব—সংসদীয় গণতন্ত্র প্রকৃতরূপে চালু না হতে পারার অন্তরায়। সংসদীয় গণতন্ত্রের প্রয়োজনে বিরোধী বা পাল্টা একটি সর্বভারতীয় শক্তি দ্রুত সৃষ্টি করতে না পারলে ভারতে বিপ্লবাত্মক বিস্ফোরণ অনিবার্য। **সংসদীয় গণতন্ত্রের পূর্ণ বিকাশের সোর্স বা উৎস আজ তাই খুঁজতে হবে কংগ্রেসের বাইরে—অন্যান্য দলগুলির মধ্যে।** শেষ পর্যন্ত দেশের রাজনীতি যদি প্রধানতঃ দুটি ভাগে সংগঠিত হয়ে উঠতে পারে—একটি রক্ষণশীল যুক্তফ্রন্ট (কংগ্রেস আজ যার একটি অঙ্গ), অপরটি প্রগতিশীল যুক্তফ্রন্ট। উভয় ফ্রন্টকেই অবশ্য গণতান্ত্রিক সীমা মানতে হবে। আর শক্তিমান ঐক্যবদ্ধ প্রগতিশীল যুক্তফ্রন্ট সৃষ্টি হতে পারলেই, রক্ষণশীল যুক্তফ্রন্টের স্বৈরাচারপ্রবণতাকে নিয়ন্ত্রণাধীন রাখতে পারবে। প্রগতিশীল যুক্তফ্রন্ট দুর্বল থাকলে অথবা স্ববিরোধী থাকলে, স্বৈরতন্ত্রকে রোধ করা সম্ভব হবে না।

কংগ্রেস বিরোধী পরিবর্তনকামী প্রগতিশীল শক্তিগুলি কেন আজও শক্তিশালী সর্বভারতীয় কোন ঐক্যবদ্ধ যুক্তফ্রন্ট হয়ে উঠতে পারছে না? ভারতীয় সমাজের বহুবিচিত্রতা বা heterogenity হলো এর মূল কারণ। বিভিন্ন জাতি, উপজাতি, জনজাতি, ভাষা, জাতির ভেতর জাতপাত (Caste), ধর্ম ও ভৌগোলিক বিস্তৃতি বা দূরত্বের ব্যবধান এমন একটা স্ব-স্ববিরোধী মনোভাব সৃষ্টি করে রেখেছে যে কৃষক, শ্রমিক, ছাত্র প্রভৃতির মধ্যেও রয়েছে প্রচণ্ড প্রতিযোগিতা। জনসাধারণ সবাই অসন্তুষ্ট অথচ এই বিশাল বিস্তৃত দেশের জনসাধারণের মধ্যে কোন সাধারণ সূত্র বা common link সৃষ্টি হতে পারছে না। দেশের সর্বভারতীয় ঐক্যবদ্ধ বিকল্প নেতৃত্ব আসতে পারে যেখানে যত বিক্ষোভ, বিদ্রোহ, আন্দোলন চলেছে—যারা সবাই পরিবর্তনকামী—তাদের মধ্য থেকেই। অথচ দেশের সর্বত্রই চলেছে অসন্তোষের ধূমায়িত ও বহ্নিমান প্রকাশ। বাঙালী, বিহারী, অসমীয়া, পর্বতীয়া, মাদ্রাজী, কেরলী, আদিবাসী ইত্যাদি সবাই তো অসন্তুষ্ট—কিন্তু সব অসন্তুষ্ট শক্তিগুলিকে একত্রিত করা সহজ হচ্ছে না, ঐতিহাসিক বিবর্তনের পথে বিভিন্ন জাতি উপজাতিদের বিকাশ সমতলে সংঘটিত না হবার জন্য, অসন্তুষ্ট জনগণ সাধারণ শত্রুকে চিহ্নিত করতে পারছে না, জনসাধারণেরই এক অংশ অপর অংশের বিরুদ্ধে অন্তহীন মালিশ, এমন কি, বিরুদ্ধাচরণ করে চলেছে। জনসাধারণের সংগ্রাম শেষ পর্যন্ত জনসাধারণেরই মধ্যে আত্মহননকারী সংগ্রামে পরিণত হতে চাইছে। ফলে ভারতের শোষিত জনসাধারণ এক হও—এমন ডাকে সবাই একত্রে উঠে পড়তে পারছে না। আর স্থানীয় স্বজাতীয় অসন্তোষকে সম্বল করে যে সমস্ত ক্ষুদ্র নেতৃত্ব নিজেদের জনপ্রিয় করে রাখার জন্য নিজেদের মধ্যেই প্রতিযোগিতায় মত্ত হয়ে আছে, তাদের কার্যকলাপের ফলে শোষিত জনসাধারণের মধ্যেও অনৈক্য বৃদ্ধি পায়। তাছাড়া ঐতিহাসিক উপদলীয় দলাদলির ঐতিহ্যের অভিসম্পাত তো আছেই। জাতি-পাতি বিভক্ত সমাজের অভ্যন্তরেই যে দলাদলি ভারত এতদিন পুষে এসেছে—কোন গণতান্ত্রিক কর্তব্যকেই সমাধান না করে স্থগিত করে রেখেছে, সেই creed ও castism থেকেও সকল বৃহৎ চেষ্টাগুলি উপদলীয় চক্রান্তে খণ্ডীভূত ও প্রস্তরীভূত হতে চায়। প্রগতিশীল শক্তিগুলিও এই বিভাজনপ্রবণতা থেকে সহজে মুক্ত হতে পারে না।

গত বছর থেকে দলাদলিতে অভিশপ্ত পশ্চিম বাংলায় যে যুক্তফ্রন্টের আবির্ভাব হয়েছে তাকে বিপক্ষ দল সর্বদা এই বলেই নিন্দা ও বিদ্রূপ করে থাকেন যে, যুক্তফ্রন্ট সত্যিকার সংযুক্ত নয়, বিযুক্ত। সুবিধাবাদী প্রয়োজনেই তারা একত্র হয়েছে, এদের মধ্যে ফাটলের অন্ত নেই—ইত্যাদি। কিন্তু যুক্তফ্রন্টের অন্তর্গত দলগুলি স্ব-ইচ্ছায়ই (out of their own volition) একত্র হচ্ছে, এ-কথা তো ঠিক নয়, অবস্থার চাপ বা ইতিহাসের চাপেও তাঁরা একত্রে চলতে বাধ্য হচ্ছেন। নিজেদের মধ্যে মতপথের পার্থক্য থাকা সত্ত্বেও তাঁরা একত্র না হয়ে পারছেন না, কোন দলকেই সহজে যুক্তফ্রন্ট থেকে বেরিয়ে যাওয়া সহজ হচ্ছে না, হলেই জনসাধারণের তীব্র সমালোচনার মুখে পড়ে যাচ্ছেন। যুক্তফ্রন্টের সরকারও এই চাপের ফলেই সম্ভব হয়েছিল। অবশ্যই এই চাপের সঙ্গে বিচার, বিবেচনা ও ইচ্ছার তাগিদও আজ যুক্ত হচ্ছে। তাছাড়া যুক্তফ্রন্ট জিনিষটা জনসাধারণের কাছে কেবলমাত্র চৌদ্দটি দলের ফ্রন্ট নয়, জনসাধারণের ফ্রন্ট, জনসাধারণ ঐক্যের একটি বিকল্প ভাবমূর্তি হিসেবেই তাকে গড়ে উঠতে দেখতে চায়। বাঙালীদের মধ্যে এত দলাদলিই যে বাংলার এত দুর্দশার কারণ—বঙ্গ বিভাগ পর্যন্ত—একথা প্রত্যেক বাঙালী বোঝেন—অথচ এমন একটা পাপচক্রের ঐতিহ্য সৃষ্টি হয়েছে যে প্রগতিবাদী বাঙালীরা আজও পর্যন্ত একটি সমস্বার্থের ঐক্যভূমি বা মিলনক্ষেত্র দেখতে পাচ্ছেন না বলে হতাশায়, লজ্জায়, দুঃখে ক্ষুব্ধ হয়ে আছেন। এমন দিনে যুক্তফ্রন্টকেই তাঁরা একটা আশার লক্ষণ বলে মনে করেন। যুক্তফ্রন্টে যখনই কোন ভাঙন দেখেন তখনই বেদনাহত ও ক্রুদ্ধ হয়ে ওঠেন। অতএব যুক্তফ্রন্ট কেবল মাত্র চৌদ্দটি দলের একচেটিয়া নিজস্ব সম্পত্তি নয়—যুক্তফ্রন্টের যদি কোন সার্থক ঐতিহাসিক ভূমিকা থেকে থাকে—সে হলো তার জনসাধারণের ঐক্যক্ষেত্র সৃষ্টির সম্ভাবনায়। অতএব নির্দলীয় অসংখ্য জনসাধারণের সতর্ক ও সক্রিয় সমর্থনের ওপরেই যুক্তফ্রন্টের ভবিষ্যৎ নির্ভরশীল। কাজেই যুক্তফ্রন্টকে সুবিধাবাদীদের ঐক্যফ্রন্ট বলে ঠাট্টা করা উচিত নয়, বরং বলা যায়, বহুবিভক্ত আশাহত পশ্চিম বাংলার জনসাধারণকে ঐক্যবদ্ধ করার যদি এতটুকু কোথাও কোন সচ্চেষ্টা থেকে থাকে, তবে তা অনুসন্ধান করতে হবে যুক্তফ্রন্টেই—অন্যত্র নয়। যুক্তফ্রন্ট যদি ফেল করে, তবে জনসাধারণের আশার স্থান আর কোথায়? কোন একটি দলের ওপর আজ বাংলার ভাগ্য নির্ভর করতে পারে? অথচ মজার কথা এই, যাঁরা বাঙালীদের মধ্যে অনৈক্য ও দলাদলি দেখে খুব দুঃখিত ও চিন্তিত বলে ভাব দেখান, তাঁরাই, দুর্বল হলেও, ত্রুটিপূর্ণ হলেও, যুক্তফ্রন্টের মধ্যে এই ঐক্যভূমির অভিযান সার্থক করার যে কঠিন সংগ্রাম চলেছে তার প্রতি সহানুভূতি না দেখিয়ে বিদ্রূপ ও নিন্দার মাধ্যমেই বাঙালীর এই শেষ চেষ্টাকেও পণ্ড করে দিতে চান, দুর্বল করে দিতে চান, লোকের মন ভেঙে দিতে চান! এঁরা সত্যিই কী চান তবে?

একথা ঠিক, যুক্তফ্রন্টের অন্তর্গত দলগুলির মধ্যে পার্থক্য আছে, এমন কি বিরোধও আছে। কিন্তু সব পার্থক্যই বিরোধ নয়, আর বিরোধই শত্রুতা নয় (All differences are not contradictions and all contradictions are not irreconcilable antagonisms)। দার্শনিক এই তত্ত্বকে ভাল করে বুঝতে হবে এবং কাজে লাগাতে হবে। অনেক পার্থক্য ও বিরোধকে বৃহত্তর ঐতিহাসিক প্রয়োজনে মিটিয়ে নেওয়া যায়। তাছাড়া ঐতিহাসিক ও অবশ্যার দুর্দমনীয় চাপ তো আছেই, যে চাপের মুখে নানা ধরণের ক্ষুদ্রবুদ্ধি ও কূপমণ্ডূকতা দূর হয়ে যায়। লোহার নানা খণ্ড-বিখণ্ডগুলি যে আকারেরই হোক না কেন ফার্নেসের আগুনে তা গলে একাকারও হয়ে যায়। ভারতের অভ্যন্তরে যে বৈপ্লবিক আগুনের ফার্নেস জ্বলেছে তাতে বহুধরণের পার্থক্য ও বিরোধ গলে একাকার হয়ে যেতে বাধ্য। যুক্তফ্রন্টের শরিক দলগুলিও কম আত্মদহনের মধ্য দিয়ে চলছে না—তারা নিজেরা কিছু শিখছেন না একথা মনে করা হয়তো চলে না। সকল দলের মধ্যেই বোদ্ধা ও দূরদৃষ্টিসম্পন্ন লোকেরা এ বিষয়ে সচেতন হচ্ছেন বলেই আশা করা যায়। সকল দলীয় স্বার্থের ঊর্ধ্বে যুক্তফ্রন্টের স্বার্থ

সংসদীয় গণতন্ত্রের ভবিষ্যৎ

অশোককুমার সেন

সংসদীয় গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থার সাফল্যের জন্য সর্বপ্রথম প্রয়োজন হচ্ছে স্থিতিশীলতা। ক্ষুদ্র দল বা উপদলের দ্বারা গঠিত সরকার কখনও শক্তিশালী বা স্থিতিশীল হতে পারে না। দুটি বা তিনটি বড় শক্তিশালী দলের প্রতিযোগিতার মাধ্যমে নির্বাচিত সংসদ ও তার ওপরে অবলম্বনশীল সরকার যদি প্রতিষ্ঠিত হয় তবেই শাসনব্যবস্থার ভেতরে সজীব প্রাণ প্রতিষ্ঠা সম্ভব হয়। প্রাক-দ্যগল ফরাসী দেশে গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থার প্রতি জনসাধারণ আস্থাহীন হয়ে পড়ে একমাত্র এই কারণে যে, তদানীন্তন ফরাসী সরকার ক্ষুদ্র দল বা উপদলের সাময়িক মিলনের ওপরে নির্ভরশীল ছিল। সেই সাময়িক মিলনের দ্বারা শক্তি বা প্রাণসঞ্চার করা অসম্ভব। তার ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত সরকার কাজ শুরু করার আগেই ভেঙে পড়ে, তার সৃষ্টিশক্তি বা গঠনশক্তি প্রমাণিত হবার আগেই তার প্রাণবায়ু নিস্তব্ধ হয়ে যায়। প্রতি ছ মাসে ফ্রান্সে সরকার বদল হত। তাই আমলাবর্গ ছিল সেখানকার সত্যিকার শাসক। আমাদের দেশে যদি সংসদীয় গণতন্ত্রকে সফল করে তুলতে হয়, তবে তার বুনিয়াদ হতে হবে শক্তিশালী দুই বা তিনটি দল। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দল বা উপদলের ভিত্তিতে সংসদীয় গণতন্ত্রের শক্তি চিরকালই ভঙ্গুর থেকে যাবে।

আরেকটি প্রয়োজনীয় গুণ থাকা দরকার যা ছাড়া সংসদীয় গণতন্ত্রের জীবন-প্রসার অসম্ভব। বিভিন্ন দলের স্বাধীন প্রতিযোগিতার মধ্য দিয়ে গণতন্ত্রের পূর্ণ বিকাশ হয়। এক দলের স্বৈরাচারী শাসনের ভিত্তিতে কখনও গণতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা হয় না। তাই এক-দলীয় রাষ্ট্রগুলিতে, যেমন—রুশ দেশ বা চীন দেশে গণতন্ত্র কখনও জন্মলাভ করে নি। গণতন্ত্রের সংজ্ঞা সেখানে ভিন্নতর। বিভিন্ন দলের মধ্যে যদি পরস্পরের প্রতি সহমর্মিতার অভাব হয়—একের বিরুদ্ধে অন্য দল যদি হিংসাত্মক কার্যে বা ধ্বংসাত্মক পথে নিজেকে চালিত করে, তবে গণতন্ত্রের কবর রচনা করা হবে।

বড়—বিশেষ আজকের পরিস্থিতিতে এ প্রত্যয় সৃষ্টি হবার পক্ষে অনুকূল চাপ সব দিক থেকে সৃষ্টি হচ্ছে।

দলত্যাগ ভারতের বর্তমান অস্থির রাজনীতির আসল কারণ নয়, আশু কারণ মাত্রই। ভারতের অভ্যন্তরে পরিবর্তনের যে প্রচণ্ড চাপ সৃষ্টি হয়েছে দীর্ঘদিন ধরে—এবং আজ যা ঘনায়মান প্রচণ্ডতায় ফেটে পড়তে চাইছে—তার বহিঃপ্রকাশই এই দলত্যাগ। দলত্যাগটা কারণ নয়, বরং ফলশ্রুতি—এমন কি কোন কোন ক্ষেত্রে উপায় বিশেষ। দলত্যাগ অবশ্য দু'রকমের—এক অসহ্য ঐতিহাসিক চাপের জন্য—ঐতিহাসিক প্রয়োজনে, অপরটি হলো নেহাৎ ব্যক্তিগত অনাচারী সুবিধাবাদী স্বার্থে। যদি আমাদের শাসনতন্ত্রে right to recall বলে কোন ধারা থাকতো, অথবা দলত্যাগ করার সাথে পদত্যাগ করার বাধ্যবাধকতা থাকতো, তবে অতি সহজেই অনাচারী সুবিধাবাদী দলত্যাগ বন্ধ হয়ে যেতো। কিন্তু যে হারে যেভাবে ভারতের সর্বত্র একটা দলত্যাগের প্রচণ্ড সংক্রামক বিস্তার চলেছে, তাতে বুঝতে হবে ভারতের অভ্যন্তরে বৈপ্লবিক পরিবর্তনের প্রচণ্ড চাপ সৃষ্টি হয়েছে, সমাজের মাটির তলায় ভূকম্পন শুরু হয়ে গেছে। সে কম্পন ও তাপ এত চাপ সৃষ্টি করছে যে, দলগুলির মধ্যে নিত্যদিন অস্থিরতা সৃষ্টি করেছে—আর পুরাতন আনুগত্য বা পুরাতনের প্রতি আনুগত্য দিয়ে দলগুলিকে রক্ষা করা সম্ভব হচ্ছে না। এ অবস্থায় দলপতি বা দলীয় কর্মীদের (এমন কি বামপন্থী নেতা ও কর্মীদের) চিন্তা ও চলচ্ছক্তিকে যদি বৈপ্লবিকগতিসম্পন্ন না করা যায়, তাঁরা যদি আজও গয়ংগচ্ছ তালে চলতে চান, বা একই জাতীয় সনাতনী চিন্তার ও ভাবনার জালে আফিংখোরের মত ঝিমুতে থাকেন এবং "বেশ আছি, যেমন চলছে চলুক" বলে আত্মতুষ্ট থাকেন, তবে দেশ হয় সামরিক শাসনের কবলে পড়ে যাবে, অথবা তার কিছুদিনের মধ্যেই নানা ধরণের বিচ্ছিন্নতাবাদ দেশটাকে খণ্ড-বিখণ্ড করে ফেলবে।

যদি জনসাধারণ মনে করেন যে দেশে গণতন্ত্রকেই রক্ষা করতে হবে, তবে তার জন্য তাদের পক্ষে অনেক সময় মিলবে না। এবারের নির্বাচনের ওপর নির্ভর করে পশ্চিমবঙ্গে গণতন্ত্র থাকবে কি না, অথবা এবারই পশ্চিমবঙ্গের শেষ নির্বাচন কি না। যদি যুক্তফ্রন্টের সংখ্যাধিক্য যথেষ্ট না হয়, যদি কোন ফ্রন্টই একক যথেষ্ট শক্তিমান না হয় (comfortable majority), তবে গতবারের মতই একটা অনিশ্চিত অবস্থার সৃষ্টি হবে, দলত্যাগের হিড়িক পড়ে যাবে, সুবিধাবাদীরা লক্ষ লক্ষ টাকায় নিজেদের বিক্রি করবে—এবং শেষ পর্যন্ত আবার লাটতন্ত্র অধিকতর জোরের সঙ্গে এসে চেপে বসবে। আর সে লাটতন্ত্র শেষ পর্যন্ত সামরিক শাসনের নামান্তর হয়েই দেখা দেবে—হরণ করে নেবে সকল নাগরিক অধিকার। আর তখন জনসাধারণও সহজেই একথা মেনে নেবে যে রাজনৈতিক দলগুলির হাতে দেশ আর ছেড়ে দিলে চলবে না, শক্ত হাতের কোন একনায়কত্ব চেপে বসলে কোন প্রতিবাদ করবে না—যেমন হয়েছিল একদিন পাকিস্তানে। পাকিস্তানে অবশ্য আজ দশ বছরেই সেই মোহ কেটে যাচ্ছে, কিন্তু ভারতের সেই সম্ভাব্য স্বৈরতান্ত্রিক মোহ কতদিনে আবার কাটবে, এবং কত দুঃখের মধ্য দিয়ে কে জানে?

এ লড়াই বাঁচার লড়াই, এ লড়াই জিততে হবে

কৃত্তিবাস ওঝা

পশ্চিমবঙ্গের আগামী মধ্যবর্তী নির্বাচন শুধু নির্বাচন নয়—এই নির্বাচন হল বাঁচার লড়াই। এই নির্বাচনে জয়-পরাজয়ে শুধু রাজ্যের ভাগ্য নির্ধারিত হবে না, নির্ধারিত হবে রাজ্য-রাজনীতিতে কে বেঁচে থাকবে আর কে থাকবে না। তাই এই লড়াই হল বাঁচার লড়াই—এবং এই বাঁচার লড়াইয়ে জয়ী হতে হবে, নিজেকে বাঁচিয়ে রাখতে হবে; অন্যথায় নিজের অস্তিত্ব রক্ষা করা কঠিন হবে। অন্য আর চারটি নির্বাচনের সঙ্গে রাজ্যের এই মধ্যবর্তী নির্বাচনের মৌলিক তফাৎ এইখানে। শুধুমাত্র কোন দলের প্রশ্ন নয়—মধ্যবর্তী নির্বাচন সারা ভারতের রাজনীতিতেও অসাধারণ গুরুত্বের, কারণ ভারতবর্ষের রাষ্ট্রীয় কাঠামোতেও এই নির্বাচন অতি গুরুত্বপূর্ণ অবদান সৃষ্টি করবে। পরিষদীয় গণতন্ত্রে রাজ্য সরকারগুলির ভূমিকা—কেন্দ্র-রাজ্য সম্পর্ক প্রভৃতি প্রশ্নের মীমাংসা নির্ভর করছে পশ্চিমবঙ্গের মধ্যবর্তী নির্বাচনের ফলাফলে। কংগ্রেস যদি পশ্চিমবঙ্গ জয়ী হয়, তবে বিভিন্ন রাজ্যে কংগ্রেস-বিরোধী সরকার গঠিত হলে সেই সরকার টিকে না থাকার সম্ভাবনা বেশি হবে, যেখানে বিরোধী সরকার আছে সেইগুলির পতনের সম্ভাবনা উজ্জ্বল হবে। আর যদি যুক্তফ্রন্ট সরকার গঠিত হয়, তবে সেই সরকার হবে সারা ভারতের বিভিন্ন রাজ্যের যুক্তফ্রন্ট সরকারগুলির নেতা—পশ্চিমবঙ্গের যুক্তফ্রন্ট সরকার হবে অন্য রাজ্যের যুক্তফ্রন্ট সরকারকে বাঁচিয়ে রাখবার রক্ষাকবচ। পশ্চিমবঙ্গের মধ্যবর্তী নির্বাচনে জয়-পরাজয়ে শুধু রাজ্যে কংগ্রেস ও যুক্তফ্রন্ট শরিক দলগুলির ভাগ্য নির্ধারণ হবে না, ভাগ্য নির্ধারণ হবে সারা ভারতের আগামী দিনের কেন্দ্র ও রাজ্য রাজনীতির। দিল্লীর কেন্দ্রীয় সরকার এই সত্য বুঝেছেন, বুঝেছেন-কেন্দ্রীয় কংগ্রেস-নেতৃবর্গ—তাই দিল্লী সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব দিয়েছে পশ্চিমবঙ্গের ওপর। সারা ভারতের কংগ্রেস নেতৃবর্গ আর কেন্দ্রীয় মন্ত্রীরা পশ্চিমবঙ্গ চষে ফেলছেন এই একটি কারণে। কংগ্রেসের উচ্চতম নেতৃবর্গ জানেন যে, দিল্লীতে যদি কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভা ঠিক রাখতে হয়—যদি ১৯৭২ সালে কেন্দ্রেও কোন কোয়ালিশন সরকারের আগমন রোধ করতে হয়, তবে পশ্চিমবঙ্গে কংগ্রেস সরকার চাই—তাই পশ্চিমবঙ্গের এই মধ্যবর্তী নির্বাচন শুধু পশ্চিমবঙ্গের জন্য নয়, কি কংগ্রেস কি কংগ্রেস-বিরোধী সকলের জন্যই সারা ভারতের দৃষ্টিতে মোকাবেলা করা হচ্ছে।

পশ্চিমবঙ্গে মধ্যবর্তী নির্বাচনে প্রচার অভিযানে মনোনয়নপত্র দাখিল শেষ হয়ে এখন চলেছে চরম প্রস্তুতি পর্ব। এখন শুধু অবশিষ্ট আছে শান্তিপূর্ণভাবে ভোটপর্ব সমাধা এবং ভোটের ফলাফল ঘোষণা। অর্থাৎ এখন শুধু মীমাংসা বাকী রয়েছে শেষ প্রশ্নের—জয়ী হবে কে? অবশ্য শেষ প্রশ্নের জবাবেই প্রশ্নের শেষ হয় না, আরো অনেক প্রশ্ন উঁকি মারে; তবে সেই প্রশ্নগুলি আপাত গ্রাহ্য না হতে পারে—অর্থাৎ কেউ ভাবতে পারে রাজ্যে স্থায়ী মন্ত্রিসভা হবে কি-না—যারা সরকার গঠন করবে, সেই সরকার থাকবে কি-না, অথবা পশ্চিমবঙ্গের ভাগ্যে কি আবারও রাষ্ট্রপতির শাসন অবধারিত? এমনি আরো অনেক প্রশ্ন। কিন্তু সাধারণ মানুষের কাছে এই পরের প্রশ্নগুলি খুব বড় করে ভাববার অবকাশ নেই—কারণ তাঁরা এই কথা ভেবেই ভোট দেবেন যে, তাঁদের সমর্থিত দলই জয়যুক্ত হবে, এবং স্থায়ী সরকার গঠন করবে। এই বিশ্বাসে আঘাত লাগলে পরিষদীয় গণতন্ত্রের মহিমা থাকে না। কাজেই আজকের প্রশ্ন একটি। যাঁরা লড়াই করছেন—তাঁদের কাছে প্রশ্ন হল এই লড়াই বাঁচার লড়াই, এ লড়াই জিততে হবে, আর দেশবাসীর কাছে প্রশ্ন মধ্যবর্তী নির্বাচনে জয়ী হবে কে?

কংগ্রেসের আর যুক্তফ্রন্টের এই লড়াই জয়ের মীমাংসা হবে ৯ই ফেব্রুয়ারী ভোটের পর, কিন্তু উভয়ের সামনে এই জয়ের বাধা অথবা সম্ভাবনার কারণগুলি আলোচনার অপেক্ষা রাখে। এক-একখানি ইটের গাঁথুনীতে যেমন ইমারত তৈরি হয়, এক-একটি বিচ্ছিন্ন ফুল গ্রথিত করলে যেমন মালা হয়, তেমনি পশ্চিমবঙ্গে মধ্যবর্তী নির্বাচনে জয়-পরাজয় কোন আকস্মিক কারণে হবে না, উভয় পক্ষই যে সকল ফুল সংগ্রহ করেছেন গত ১৯৫২ সাল থেকে—একের পর এক নির্বাচনে সেই ফুলগুলি গ্রথিত হয়ে হবে এই মধ্যবর্তী নির্বাচনের বিজয়মালা। এইবার ফুলগুলিকে দেখা যাক—কংগ্রেস ও যুক্তফ্রন্ট কে কতটা ফুল সংগ্রহে সফল অথবা ব্যর্থ হয়েছেন।

পশ্চিম বাংলায় মধ্যবর্তী নির্বাচনের একটি দিক হল: এইবারই প্রথম পশ্চিম বাংলার কংগ্রেস ও কংগ্রেস-বিরোধী উভয় পক্ষই ক্ষমতা দখলের লড়াইয়ে নেমেছেন। সকলের লক্ষ্য হল প্রতিযোগিতায় অপরকে পরাজিত করে ক্ষমতা দখল করতে হবে। ১৯৫২ সাল থেকে কিন্তু এই ঘটনা ছিল না, অতীতে ছিল অপরের দখল থেকে ক্ষমতা দখল করতে হবে। দেশ-বিভাগ ও স্বাধীনতার পর কংগ্রেস ইংরাজের কাছ থেকে ক্ষমতা লাভ করে এবং ১৯৫১ সালে লোকসভায় গৃহীত জনপ্রতিনিধিত্বের আইন অনুযায়ী প্রাপ্তবয়স্ক ভোটদান ও নির্বাচনী ব্যবস্থা চালু করা হয় এবং ১৯৫২ সালে প্রথম সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। ১৯৫২ সাল থেকে কংগ্রেস তিনটি সাধারণ নির্বাচনে জয়ী হয়ে ক্ষমতা নিজের দখলে রাখে। তাই তখন প্রশ্ন ছিল কংগ্রেসের পক্ষে নিজের ক্ষমতা রক্ষা—অর্থাৎ দেশ শাসনের দুর্গে অন্যের প্রবেশ অধিকার রোধ করে নিজের শক্তিকে রক্ষা করাই ছিল কংগ্রেসের লক্ষ্য। আর বিরোধীদের লক্ষ্য ছিল—ক্ষমতার আসন থেকে কংগ্রেসকে অপসারণ করতে হবে এবং সেই স্থানে নিজেকে প্রতিষ্ঠা করতে হবে। অর্থাৎ ১৯৫২ সাল থেকে '৬৭ সাল পর্যন্ত তিনটি নির্বাচনে কংগ্রেসের একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল শাসনক্ষমতা রক্ষা করা, আর বিরোধীদের লক্ষ্য ছিল কংগ্রেসকে ক্ষমতা থেকে হটিয়ে সেখানে নিজেকে প্রতিষ্ঠা করা। কিন্তু '৬৭ সালের নির্বাচনে এই পরিস্থিতির সম্পূর্ণ পরিবর্তন হয়ে গেল। কংগ্রেস ক্ষমতাচ্যুত হল আর সেইখানে এল যুক্তফ্রন্ট। কিন্তু নির্বাচন-বহির্ভূত পথে যুক্তফ্রন্ট সরকারকে গদি হারাতে হল নয় মাস পরে। কংগ্রেস কুড়ি বৎসর গদি ভোগ করে হারালো '৬৭ সালের সাধারণ নির্বাচনে আর যুক্তফ্রন্ট গদি হারালো নয় মাস পরে, দলত্যাগের কারণে। তাই মধ্যবর্তী নির্বাচনে এইবার প্রথম দুই শক্তি লড়াইয়ে নেমেছে যারা উভয়েই কম অথবা বেশি সময়ের জন্য রাজত্বে বসেছে, আর উভয়েরই মধ্যবর্তী নির্বাচনের সংগ্রাম হল গদি দখলের সংগ্রাম।

কংগ্রেস সংগ্রাম করছে—১৯৬৭ সালের নির্বাচনে সে যে গদি হারিয়েছে সেই গদি মধ্যবর্তী নির্বাচনে তাকে দখল করতে হবে, আর যুক্তফ্রন্ট লড়াই করছে—১৯৬৭ সালের নভেম্বর মাসে সে যে গদি হারিয়েছে সেই গদি তাকে দখল করতে হবে। এই হিসাবে পশ্চিমবঙ্গের মধ্যবর্তী নির্বাচনের অন্যতম তাৎপর্য হল—এ লড়াই গদি পুনর্দখলের লড়াই। কথাটা অবশ্য গোদা বাংলায়—কোটিং দিয়ে এই লড়াইকে আরো অনেক ভাল কথায় বলা যায়।

লড়াইটা যখন পুনর্দখলের, তখন স্বভাবতই প্রশ্ন আসে—কংগ্রেসই বা তার কুড়ি বৎসরের দখল হারালো কিভাবে, যুক্তফ্রন্টই বা দীর্ঘ সাধনার শাসনক্ষমতা হারালো কিভাবে।

কংগ্রেস ১৯৫২ সাল থেকে '৬৭ সাল পর্যন্ত ক্ষমতা দখলে রাখতে পেরেছিল, তার অন্যতম প্রধান কারণ হল—১৯৪৭ সাল পর্যন্ত কংগ্রেস ছিল ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের কেন্দ্রীয় মঞ্চ। সকল দলই এই কংগ্রেসের সঙ্গে নিজেকে যুক্ত করে স্বাধীনতা সংগ্রাম করেছে, ফলে কংগ্রেস শুধু একটা দল নয় কংগ্রেস ছিল স্বাধীনতা সংগ্রামের প্রতীক। এই সকল দলের মিলিত চেষ্টার সুফল হিসাবেই কংগ্রেস ইংরাজের কাছ থেকে ক্ষমতার চাবি গ্রহণ করে— এই সঙ্গে অতি কৌশলে একটি সত্য প্রতিষ্ঠিত হয় যে, কংগ্রেসই দেশের স্বাধীনতা এনেছে। এই কৌশলের সঙ্গী হন গান্ধীজী, নেহরুজী, আজাদ প্রমুখ, যাঁরা কোন দলের নেতারূপে নয়, ভারতের গণ-মানসের দেবতারূপে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। ১৯৫২ সালের নির্বাচনে কংগ্রেস প্রথম দলীয় শক্তিতে আত্মপ্রকাশ করলো। '৫২ সালে কংগ্রেসের নির্বাচনী লড়াইয়ের প্রধান স্লোগান হল: কংগ্রেস দেশের স্বাধীনতা এনেছে, অতএব স্বাধীনতোত্তর ভারতকে গড়ে তোলবার অধিকার কংগ্রেসকে দাও। দেশবাসী তখনও জানে কংগ্রেস কোন দল নয়—কংগ্রেস হল জাতীয় প্রতিষ্ঠান—জাতীয় প্রতিষ্ঠানের হাতে ছাড়া অন্য কার হাতে দেশ গড়ার ক্ষমতা দেবে। এল '৫৭ সাল। গণতান্ত্রিক সংবিধানের সঙ্গে পঞ্চম বার্ষিকী যোজনার কাজ শুরু হয়েছে—কংগ্রেসের বক্তব্য হল —দেশকে সমাজতন্ত্রের পথে নিয়ে যাবার কর্মসূচী গ্রহণ করা হয়েছে, সেই কর্মসূচী রূপায়ণের অবকাশ চাই. তখনও দেশে কংগ্রেস ছাড়া অন্য কারো কোন ইমেজ গড়ে ওঠে নি, অন্য শক্তি যা আছে তারা না সংহত না সঙ্ঘবদ্ধ। তাই '৫৭ সালেও কংগ্রেসের হাতে শাসনক্ষমতা তুলে দেওয়া হল প্রায় অবলীলাক্রমে। এল '৬২ সাল। স্বাধীনতার পর পনের বৎসর চলে গেছে. শিশু রাষ্ট্রের দোহাই প্রায় অচল, আমরাই দেশের স্বাধীনতা এনেছি, অতএব আমরাই দেশ শাসনের হকদার এই যুক্তিও কিছুটা বস্তাপচা হয়ে গেছে। কিন্তু অন্য আর একটা প্রশ্ন এইবার নতুন করে দেখা দিল—সেটা হল দেশরক্ষার প্রশ্ন। প্রতিবেশী চীন ও পাকিস্তান আগ্রাসী ভূমিকা গ্রহণ করায় প্রশ্ন দেখা দিল দেশের অখণ্ডতা, নিরাপত্তা রক্ষা কে করতে পারে। পশ্চিমবঙ্গে কংগ্রেসের বিরোধী প্রধান শক্তি কম্যুনিস্ট, কিন্তু তাদের পাক-প্রেম ও চীনের প্রতি আনুগত্য বহুল প্রচারিত। কাজেই যাদের চীনের প্রতি আনুগত্য রয়েছে, সেই দল বা তার অনুগতদের হাতে কি শাসনক্ষমতা দেওয়া হবে? অর্থাৎ দেশ রক্ষার মত বড় প্রশ্ন দেখা দেওয়ায় দেশের প্রতি আনুগত্যহীনতার অভিযোগে কংগ্রেস-বিরোধী শক্তি আসন পেল না, '৬২ সালেও কংগ্রেস ক্ষমতায় ফিরে এল। এল '৬৭ সাল। দেশ স্বাধীন হবার পর বিশ বৎসর চলে গেছে। দেশ গঠন ও সমাজতান্ত্রিক ছাঁচের সমাজ গঠনের প্রতিশ্রুতি কংগ্রেস রক্ষা করতে পারে নি, আর সংগঠন হিসাবে কংগ্রেসের স্লামার ম্লান হয়ে গেছে। যে সকল যাদুকর নেতৃত্ব কংগ্রেসকে জনপ্রিয়তার শীর্ষে রেখেছিলেন, সেই নেতারা অনেকেই বিদায় নিয়েছেন একে একে। পণ্ডিত নেহরুর অনুপস্থিতির ছায়া এই প্রথম পড়ল কংগ্রেসের ওপর। নেহরু ছিলেন এমন একজন ব্যক্তি ও ব্যক্তিত্ব, যাঁর উপস্থিতিতে কংগ্রেসের সব মালিন্য আর গ্লানি দূর হয়ে যেত। আর কংগ্রেস ত্যাগ করেও গেছেন অনেক জনপ্রিয় নেতা। তাই '৬৭ সালের নির্বাচনে কংগ্রেস পশ্চিমবঙ্গে যে প্রশ্নের সম্মুখীন হল, সেটা হল: "ক্ষুধাতুর শিশু চায় না স্বরাজ, চায় দুটো ভাত একটু নুন"—দেশরক্ষা পঞ্চম-বার্ষিকী পরিকল্পনা সংবিধান গণতন্ত্র সব শিকেয় তোলা থাক আগে পেটে চারটে ভাত চাই। ১৯৬৬ সালের মার্চ মাসে পশ্চিমবঙ্গে এই ভাতের সংগ্রাম শুরু হল, সেই সংগ্রামের ভয়ঙ্কর রূপ— জনগণের সরকারের প্রতি ক্রোধ ঘৃণা ও হিংস্র প্রতিশোধস্পৃহা '৪২ সালের 'ভারত ছাড়ো' আন্দোলনকে হার মানালো। এছাড়া আর একটা ঘটনা ঘটে গেল—সেটা হল কংগ্রেস যতদিন স্বাধীনতা সংগ্রামের হাতিয়ার ছিল, ততদিন এর আভ্যন্তরীণ বিরোধের রূপ প্রকট হয়ে ওঠে নি। কিন্তু কংগ্রেস যখন শুধু ক্ষমতা ও দখলের হাতিয়ারে পরিণত হল, তখনই শুরু হল স্বার্থের সংঘাত। পশ্চিমবঙ্গ কংগ্রেসের অনেক নামকরা নেতা দলত্যাগ করলেন নানা প্রশ্নে. কেউ দলত্যাগ করলেন আদর্শের কৌটিন দিয়ে. কেউ দলত্যাগ করলেন ক্ষমতা ভোগের ভাগবাঁটোয়ারায় খুশি না হয়ে। শুধু কংগ্রেস নেতারা নয়—কংগ্রেসের সর্বাবস্থায় সুহৃদ ছিল গ্রামের জোতদার, মাতব্বর শ্রেণী, কারখানার সর্দার, আই এন টি ইউ সি পাণ্ডা, শহরের ব্যবসাদার ও লাইসেন্স পারমিটের রসে সঞ্জীবিত শ্রেণী, শিল্পপতি, মিলমালিক এবং সংখ্যালঘু ও অনুন্নত শ্রেণী। কিন্তু সরকারের খাদ্যনীতি, লেভী, কর্ডন, ব্যবসায়ের বিভিন্ন স্তরে নিয়ন্ত্রণ এই সুবিধাভোগী শ্রেণীকে সরকারের প্রতি বীতশ্রদ্ধ করে তুললো, পাক-ভারত যুদ্ধে ও সরষের তেল সহ কয়েকটি খাদ্যদ্রব্যে নিয়ন্ত্রণবিধি অগ্রাহ্য করায় সরকার কালো কানুনে এমন অনেককে গ্রেপ্তার করলো, যারা ব্যবসায়ী শ্রেণীর মধ্যমণি ও সংখ্যালঘুদের নেতা। জেলে আটক হয়ে এই ব্যক্তিরা সরকারের প্রতি চরম বিরূপ হল। এই সঙ্গে যুক্ত হল শহরের শিক্ষিত মানুষ, যারা নানা ইজমের ভক্ত, সরকারী কর্মচারী, শিক্ষক, সওদাগরী অফিসের কর্মচারী. স্বর্ণশিল্পী, মিষ্টান্ন ব্যবসায়ী ও অন্য ছোট ব্যবসায়ী— যারা প্রকৃতপক্ষে সমাজের সর্বাপেক্ষা প্রভাবশালী শ্রেণী। অনেক স্বর্ণশিল্পী গলায় এ্যাসিড ঢেলে আত্মহত্যা করলো, হাজারে হাজারে জেলে গেল. শিক্ষকরা রাজপথে দিনের পর দিন ধর্না দিয়ে জেলে গেল, সরকারী কর্মচারীরা সরকারের লৌহ-কঠিন নিয়ম-শৃঙ্খলা অগ্রাহ্য করে গণ-ছুটি গ্রহণ করে সরকারের রক্তচক্ষু ও হুমকিকে অস্বীকার করলো। রাষ্ট্রায়ত্ত শিল্পে ধর্মঘট-আন্দোলন, তারপর দুর্গাপুরে আশিষ সেন ও আবদুল জব্বরের মৃত্যুবরণ। অর্থাৎ বসিরহাট-কৃষ্ণনগরে খাদ্য আন্দোলনে নুরুল ইসলাম আর আনন্দ হাইত যে মৃত্যুর পথ রচনা করলো, দুর্গাপুরে আশিষ সেন জব্বর মৃত্যুবরণ করে গ্রাম আর শহরে মৃত্যু দিয়ে সেতুবন্ধ রচনা করলো। এই মৃত্যু আর আত্মত্যাগ রচনা করলো কংগ্রেসের মৃত্যুবাণ। এই অগ্নিগর্ভ পরিস্থিতির সঙ্গে শ্রীঅজয় মুখোপাধ্যায়, ডঃ প্রফুল্ল ঘোষ, অধ্যাপক হুমায়ুন কবির প্রমুখ কংগ্রেস-বিরোধী অভিযানে নেমে কংগ্রেসের ভরাডুবির পথ আরো প্রশস্ত করেছিলেন।

কংগ্রেস তো পরাজিত হবে, কিন্তু সেই স্থান দখল করবে কে? বিকল্প শক্তি কোথায়? ১৯৫২ সাল থেকে ১৯৬৭ সাল পর্যন্ত রাজ্যে এমন কোন শক্তি সৃষ্টি হয় নি, যা কংগ্রেসের বিকল্প হবার যোগ্যতা রাখে। ১৯৫২ সালেও পশ্চিমবঙ্গে কিন্তু কংগ্রেস এমন কোন ভোট পায় নি, যার দ্বারা বোঝা যায়

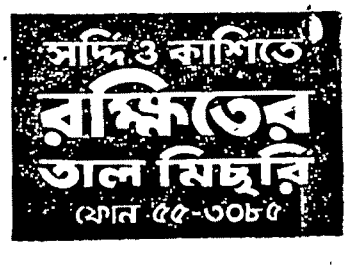

কংগ্রেসই একাধিপত্যের দল। ১৯৫২ সালে কংগ্রেস ২৩৭টি আসনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে ১৪৯টি আসন লাভ করে—ভোট পায় মাত্র ৩৯ শতাংশ। অর্থাৎ ৬১ শতাংশ ভোটই কংগ্রেসের বিরুদ্ধে ছিল। বরং বলা যায় ১৯৫২ সালের পরের নির্বাচনে কংগ্রেসের ভোটের হার বেড়েছে। যা হোক ১৯৫২ সালে কংগ্রেসের বিরুদ্ধে কোন একক বা সঙ্ঘবদ্ধ শক্তি ছিল না। ১৯৫২ সালের রাজনীতিতে রাজ্যে তিনটি প্রভাবশালী দল ছিল। কম্যুনিস্ট পার্টি ৮৭টি কেন্দ্রে প্রার্থী দিয়ে ২৮টি আসনে জয়লাভ করে। দ্বিতীয় বৃহত্তম দল ফরোয়ার্ড ব্লক ৪৭টি আসনে প্রার্থী দিয়ে ১১টি আসন দখল করে, আর এই সময় অভ্যুত্থান ঘটে জনসঙ্ঘের। ডাঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় কেন্দ্রীয় মন্ত্রিত্ব ত্যাগ করে এসে নির্বাচনে অংশগ্রহণ করে ১৬টি আসন দখল করেন। ১৯৫৭ সালে নির্বাচনের সময় আরো কিছু নূতন দল রাজ্যে শক্তি সংগ্রহ করলো—এর মধ্যে আর, এস, পি ও এস, ইউ, সি অন্যতম। কিন্তু '৫৭ সালে কংগ্রেস-বিরোধী তিনটি ফ্রন্ট হল। প্রথম ফ্রন্ট কম্যুনিস্ট, ফরোয়ার্ড ব্লক, পি এস পি, আর এস পি, দ্বিতীয় ফ্রন্ট জনসঙ্ঘ, হিন্দু মহাসভা, আর সি পি আই প্রভৃতি, তৃতীয় ফ্রন্ট এস ইউ সি, ঘলশেভিক, ডেমোক্রেটিক ভ্যানগার্ড সহ অন্যান্য দল। কংগ্রেস এই নির্বাচনে ভোট পায় ৪৬·১৪ শতাংশ। '৬২ সালে এল কংগ্রেসের সর্বাপেক্ষা সঙ্কটকাল। '৫৯ সালে খাদ্য আন্দোলনে ৮০ জন ব্যক্তি মৃত্যুবরণ করেছে, আইনমন্ত্রী শ্রীসিদ্ধার্থ-শঙ্কর রায় কংগ্রেসের খাদ্যনীতি ও ব্যাপক দুর্নীতির অভিযোগে কংগ্রেস ত্যাগ করেছেন, পাক-ভারত চুক্তিতে বেরুবাড়ী পাকিস্তানকে হস্তান্তর করার সিদ্ধান্তে জনমানসে প্রচণ্ড ক্ষোভ, কিন্তু এই পরিস্থিতিতেও বিরোধী দলগুলি সার্বিক ঐক্য গড়ে তুলতে পারলেন না। কম্যুনিস্ট পার্টি, ফরোয়ার্ড ব্লক, আর এস পি সহ ছয়টি দল একটি ফ্রন্ট করলো। আর, পি এস পি ফ্রন্টের বাইরে থেকে গেল। পি, এস, পি একা ৮৭টি আসনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে মাত্র ৫টি আসন লাভ করলো অথচ ১৯৫৭ সালের নির্বাচনে পি এস পি ৬৭টি আসনে লড়াই করে ২১টি আসনে জয়ী হয়েছিল। কম্যুনিস্ট পার্টির আসনসংখ্যা বৃদ্ধি পেয়ে ২৮ থেকে ৫০ হল, ফরোয়ার্ড ব্লকের আসন-সংখ্যা ৮ থেকে বেড়ে ১৩ হল, আর এস পি'র আসনসংখ্যা ৩ থেকে ৭ হল, আর পি এস পি ২১ থেকে নেমে ৫-এ এল। পি এস পি শুধু পরাজয়ই বরণ করলো না, ৮৭টি আসনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে মাত্র ৫টি আসন লাভ করে কংগ্রেসেরই চরম লাভ ঘটিয়ে দিল। '৬২ সালের নির্বাচনী অনৈক্যের আর এক শিকার এস ইউ সি। আসনগত বিরোধের জন্য এস ইউ সি একাই লড়াই করলো, ফলে দু'জন বর্তমান সদস্যই পরাজয় বরণ করলো।

এবার ১৯৬৭ সাল। এবারও সার্বিক ঐক্য না হয়ে দুই ফ্রন্ট হল পি, ইউ, এল, এফ ও ইউ, এল, এফ। শুধু ফ্রন্ট হওয়া নয়, দুই কম্যুনিস্ট পার্টির শরিকী ঝগড়া এমন পর্যায়ে গেল যে, তাকে আত্মহননের পথ ছাড়া অন্য কিছু বলা যায় না। এই দুই ফ্রন্টের লড়াইয়ের ফল হল এই যে, কংগ্রেস ৪২·৩ শতাংশ ভোট পেয়ে ১২৭টি আসন দখল করলো। অন্যদিকে বামপন্থী তথা কংগ্রেস-বিরোধী ৫৪·৩ শতাংশ ভোট পেয়ে ১৪৬টি আসন দখল করলো। কংগ্রেস-বিরোধী মনোভাব রাজ্যে কত তীব্র ছিল তার প্রমাণ হল কংগ্রেস ২৮০টি আসনের মধ্যে মাত্র ৩৯টি কেন্দ্রে ভোটে একক সংখ্যাগরিষ্ঠ ছিল—অন্য সব কেন্দ্রে কংগ্রেস-বিরোধী ভোটের পরিমাণ ছিল কংগ্রেস থেকে বেশি। দুই ফ্রন্টের একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা ছিল ৮২টি কেন্দ্রে। পি এস পি সমেত রাজ্যে যদি সার্বিক বাম ঐক্য হ'ত, তবে কংগ্রেসের আরো ৫৭টি আসন হ্রাস পেত। কারণ মাত্র ভোট ভাগের ফলে কংগ্রেস ৫৭টি আসন বেশি লাভ করে। কংগ্রেস ১২৭টি আসন থেকে ৫৭টি আসন কম পেলে কংগ্রেস পেত ৭০টি আসন আর কংগ্রেস-বিরোধীরা পেত ২১০টি আসন। ৭০টি আসন পুঁজি করে কোন ২১০টি আসনের সরকারের পতন ঘটানো সম্ভব হ'ত না।

কিন্তু ১৯৬৭ সালের নভেম্বর মাসে যুক্তফ্রন্টের আভ্যন্তরীণ অনৈক্য, দলত্যাগ ও অন্যান্য নানা কারণে যুক্তফ্রন্ট সরকারের পতন হ'ল—আবার পি, ডি, এফ ও কংগ্রেস-পি, ডি, এফ কোয়ালিশন সরকার হল—সেই সরকারেরও পতন হল—সুরু হল রাষ্ট্রপতির শাসন এবং অবশেষে এই মধ্যবর্তী নির্বাচন। তাই কংগ্রেস ও কংগ্রেস-বিরোধী উভয়েই নির্বাচনী শক্তিতে ক্ষমতা দখলের যুদ্ধে নেমেছেন। কংগ্রেসের বিরুদ্ধে কোন সার্বিক বাম ঐক্য হয় নি সত্য, কিন্তু গতবার দুই ফ্রন্টের কারণে কংগ্রেস যে সুবিধা পেয়েছিল এবার সেই সুবিধা কংগ্রেসের নেই, এমন কি প্রকৃত-পক্ষে '৫২ সাল থেকে আজ পর্যন্ত এই-বারই রাজ্যে একটি কর্মসূচীভিত্তিক কংগ্রেস-বিরোধী যুক্তফ্রন্ট হয়েছে।

তাই এবারের নির্বাচন সত্য-কার কংগ্রেস ও বামপন্থী যুক্তফ্রন্টের লড়াই, যা অতীতে হয় নি। দলীয় শক্তির বিচারে খুব বেশি তারতম্য ঘটেছে বলা যায় না। কারণ কংগ্রেস থেকেও কিছু শক্তি দলত্যাগ করে গেছে আবার যুক্তফ্রন্ট থেকেও কিছু শক্তি দলত্যাগ করে গেছে। তাই উভয়ের লড়াই হচ্ছে এক শক্তির ভিত্তিতে। কংগ্রেসকে তার ১২৭ শক্তি থেকে ১৭০ শক্তিতে পৌঁছতে হবে—আর যুক্তফ্রন্টকেও নানা-প্রকার দলত্যাগের পর তার যে দলীয় শক্তি ১২৭-এ নেমে এসেছিল, তাকেও ১২৭ থেকে ১৭০ শক্তিতে যেতে হবে। কংগ্রেসের অভ্যন্তরেও অন্তর্দ্বন্দ্ব আছে আর যুক্ত-ফ্রন্টও অন্তর্দ্বন্দ্বমুক্ত নয়। কিন্তু কংগ্রেসের পক্ষে বিপদ হল—গত নির্বা-চনে সে যুক্তফ্রন্টের অন্তর্দ্বন্দ্বে যে ৫৭টি আসন লাভ করেছিল, সেই আসনগুলি লাভ করবে কিভাবে। অর্থাৎ কংগ্রেসকে শুধু সংখ্যাগরিষ্ঠ হলেই হবে না, তাকে ক্ষমপক্ষে ৫০টি আসন আরো বেশি দখল করতে হবে। কিন্তু সেটা কিভাবে সম্ভব হবে। গত নির্বাচনে ১২৭ পেয়েছিল যে যে কারণে, আজ তার সবগুলি কারণ যুক্ত হোক না কেন, ৫০টি বেশি আসন দখলের পরিবেশ কোথায়? যুক্তফ্রন্ট সরকারের নয় মাস শাসনের ব্যর্থতার চিত্র যত রঙিন করে চিত্রিত করা হোক না কেন, কংগ্রেসের কুড়ি বছরের শাসন-কালকে তার দ্বারা মহত্বে ভরে তোলা যাবে না। কাজেই শাসনযন্ত্রের ব্যর্থতার কথা উভয় পক্ষই বলবেন এবং উভয় পক্ষই তার সুযোগ নেবেন। কাজেই যুক্তফ্রন্টের পক্ষে গতবারের আসন অপেক্ষা কম করে ৫০টি আসন বেশি দখল করার যে সম্ভাবনা আছে, কংগ্রেসের পক্ষে কিন্তু সেই সুযোগ নেই। এর মধ্যে এ-টি নতুন শক্তির অভ্যুদয় রাজ্যে ঘটছে, এটি হল রাইট রিয়াকসানারী পার্টির অনুপ্রবেশ। মুসলিম লীগ, পিপলস্ রিপাব্লিক্স ব্লক, লোকদল—এই দলগুলি বিপদ কোথাও কংগ্রেসের ঘটাবে, কোথাও যুক্ত-ফ্রন্টেরও ঘটাবে। ফলে দক্ষিণপন্থীরা শুধু কংগ্রেসের ভোট ভাঙবে এমন নয় আবার যুক্তফ্রন্টের ভোট ভাঙবে এমনও নয়। এই অবস্থায় নির্বাচনে কংগ্রেস ও যুক্তফ্রন্ট উভয়কেই লড়তে হবে মরণ-পণে। মরণপণে এই কারণে যে, কংগ্রেস যদি রাজ্যে পরাজিত হয় তবে এইবার কংগ্রেসে যে ভাঙন আসবে, সেই ভাঙন শুধু এ্যাড হক কংগ্রেস গঠনের বাণীতে রোধ করা যাবে না, আর বামপন্থীদের প্রধান শক্তি মার্কসবাদী কম্যুনিস্ট পার্টিতে যে ভাঙন আসবে নকশাল-পন্থীদের আক্রমণে, সেই আক্রমণও রোধ করা যাবে না নকশালদের শুধু হঠকারী আখ্যা দিয়ে। তাই রাজ্যের মধ্যবর্তী নির্বাচনে লড়াই হল বাঁচার লড়াই। এই লড়াইতে যে জয়ী হবে, সে বাঁচবে। যে জয়ী হবে না—তার সামনে অমানিশার অন্ধকার নেমে আসবে।

মধ্যবর্তী নির্বাচন প্রসঙ্গে রাজনীতিক, সাহিত্যিক ও বুদ্ধিজীবীদের

অভিমত

বাংলার রাজনীতিতে প্রথম সারির তিনজন

১। প্রঃ অন্তর্বর্তী নির্বাচন ফেব্রুয়ারী মাসে হবে কি?

উঃ **অজয় মুখোপাধ্যায়ঃ** মনে হচ্ছে নির্বাচন ফেব্রুয়ারী মাসেই হবে।

জ্যোতি বসুঃ আশা করা যায়।

প্রতাপচন্দ্র চন্দ্রঃ নিশ্চয়ই।

২। প্রঃ যুক্তফ্রন্ট সরকার গঠিত হবার পরেই আপনার কি মনে হয় নি যে সরকার টিকবে না?

উঃ **অজয় মুখোপাধ্যায়ঃ** না তেমন কিছু মনে হয় নি।

জ্যোতি বসুঃ প্রথম দিকে তেমন কিছু মনে হয় নি।

প্রতাপচন্দ্র চন্দ্রঃ বেশি দিন থাকবে না মনে হয়েছিল। নক্সী-কাঁথা মন্ত্রিসভা ধোপে টিকবে না—আমি বিধানসভায় এ কথা বলেছিলাম। এতগুলি দল—এদের মত বা পথের কোনও মিল নেই। শুধুমাত্র কংগ্রেস-বিরোধিতাই এদের মিলিয়ে দিয়েছিল। কাজেই এ অবস্থায় স্থায়ী সরকার গঠন করা অসম্ভব।

৩। প্রঃ যুক্তফ্রন্ট সরকারের পতনের অন্যতম কারণ কি?

উঃ **অজয় মুখোপাধ্যায়ঃ** যুক্তফ্রন্টের মধ্যে দুজন বিশিষ্ট ব্যক্তি, যথা অধ্যাপক হুমায়ুন কবির ও ডঃ প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ যুক্তফ্রন্টে থাকাকালীনই গোপন ষড়যন্ত্র করে এবং কংগ্রেসের সঙ্গে যোগাযোগ করে যুক্তফ্রন্টের ষোলজন এম এল এ-কে প্রচুর অর্থ ও মন্ত্রিত্বের লোভ দেখিয়ে ভাঙিয়েছিলেন। তা সত্ত্বেও যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রিসভা টিকে থাকত। কারণ যাঁরা এইভাবে চলে গিয়েছিলেন, তাঁদের মধ্যে অধিকাংশ এম এল এ-ই লিখিতভাবে তাঁদের ভুল স্বীকার করে যুক্তফ্রন্টে ফিরে আসার অনুমতি চেয়েছিলেন। আমরাও তাঁদের সানন্দে ফিরিয়ে নেব বলে স্বীকার করেছিলাম। সুতরাং বিধানসভায় শক্তি পরীক্ষা হলে যুক্তফ্রন্টের সংখ্যাগরিষ্ঠতা থাকবে—এ কথা যেদিন রাজ্যপাল জানতে পারলেন—সেই দিনই সংবিধানবিরোধী পথে তিনি রাতারাতি যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রিমণ্ডলীকে অপসারিত করে ডঃ প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষকে মুখ্যমন্ত্রীর পদে বরণ করলেন। এই শপথগ্রহণ পর্বে সাধারণ রীতি রক্ষিত হয় নি। বিধানসভা ও বিধান পরিষদের অধ্যক্ষ উপাধ্যক্ষ ও সদস্যগণকে, মহামান্য হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতিকে, কলকাতার মেহর ও শেরিফকে এবং আরও কয়েকজন বিশিষ্ট ব্যক্তিকে শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠানে নিমন্ত্রণ করার স্থায়ী রীতি আছে, কিন্তু এক্ষেত্রে তা লঙ্ঘিত হয়েছিল। অথচ সেখানে অধ্যাপক হুমায়ুন কবির ও শ্রীআশুতোষ ঘোষ উপস্থিত ছিলেন। এই শেষোক্ত ব্যক্তিও যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রিসভা ভাঙার জন্য এম এল এ ভাঙিয়ে নেবার ব্যাপারে একজন প্রধান নায়ক, একথা তিনি গর্বভরে নির্বাচনী বক্তৃতায়, ইস্তাহারে বলে বেড়াচ্ছেন।

জ্যোতি বসুঃ কেন্দ্রীয় সরকারের ষড়যন্ত্র ও যুক্তফ্রন্টের ভিতরে বিশ্বাসঘাতকতাই যুক্তফ্রন্ট সরকারের পতনের মূল কারণ।

প্রতাপচন্দ্র চন্দ্রঃ যুক্তফ্রন্ট গঠনের মধ্যেই দুর্বলতা ছিল। ওদের মত ও পথের ঠিক নেই। নির্বাচনের আগে ও পরে ওরা পরস্পর পরস্পরকে গাল-মন্দ করেছে। নিজেরাই নিজেদের মন্ত্রীদের পদত্যাগ চেয়েছে। বিশেষত বাম কমিউনিস্ট দল অন্যান্য দলের উপর সশস্ত্র আক্রমণ পর্যন্ত করেছে। দমদম মিউনিসিপ্যাল নির্বাচনে দক্ষিণ কমিউনিস্ট দল পর্যন্ত ওদের আক্রমণ থেকে রক্ষা পায় নি। এই সব নানা কারণেই ওরা ভেঙে পড়েছে।

৪। প্রঃ এবারকার নির্বাচনে আপনাদের দল সরকার গঠনে সমর্থ হবে কি?

উঃ **অজয় মুখোপাধ্যায়ঃ** ২৮০টি আসনের মধ্যে আপোষ সূত্রে প্রজা সোস্যালিস্ট পার্টিকে ৪টি আসন ছেড়ে দিয়ে বাকী ২৭৬টি আসনে যুক্তফ্রন্টের প্রার্থী আছে। ওর মধ্যে বাংলা কংগ্রেসের প্রার্থী ৪৯ জন।

আমি নির্বাচন উপলক্ষে পশ্চিম বাংলার সকল জেলায় একাধিকবার ব্যাপক পরিক্রমা করেছি। আমার মনে হয়, যুক্তফ্রন্ট এবার নিরাপদ সংখ্যাগরিষ্ঠতা পাবে।

জ্যোতি বসুঃ নিশ্চয়ই।

প্রতাপচন্দ্র চন্দ্রঃ হ্যাঁ।

৫। প্রঃ আপনারা সরকার গঠন করলেও এবারও যে দলত্যাগের ফলে সরকারের পতন ঘটবে না, এমন কি কোনও নিশ্চয়তা আছে?

উঃ **অজয় মুখোপাধ্যায়ঃ** ৪টি কারণে এবারে যুক্তফ্রন্ট থেকে দলত্যাগের সম্ভাবনা নেই বলে মনে করি।

প্রথম কারণ, অতীতের দলত্যাগীদের শোচনীয় পরিণতি। দ্বিতীয় কারণ, এবারে যুক্তফ্রন্টের সকল দলের প্রতিটি প্রার্থী সম্বন্ধে সকল দলই অনুসন্ধান করে সম্মতি দিয়েছেন, তবেই প্রার্থীর নাম সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়েছে।

তৃতীয় কারণ, যুক্তফ্রন্টের এম এল এ-দের সংখ্যা ও বাকি সবক্ষ দলের এম এল এ-দের সংখ্যার মধ্যে যদি বেশ ভাল রকম ব্যবধান থাকে তবেই অনেকগুলি এম এল এ কে ভাঙানোর প্রয়োজন হবে—সেটা সম্ভব হবে বলে মনে করি না।

চতুর্থ কারণ, কংগ্রেস পি ডি এফ মন্ত্রিসভাকে অপসারিত করার জন্য জনগণ যে ব্যাপক সংগ্রাম করেছিলেন তার ফলে প্রদেশের সর্বত্র জনমত জাগ্রত আছে। এই জনমতই এম এল এ-দের ওপর সতর্ক দৃষ্টি রাখবে।

জ্যোতি বসুঃ নিশ্চয়তা পৃথিবীর কোনও ব্যাপারেই নেই। বাংলা কংগ্রেস অতীতের শিক্ষাগ্রহণ করেছেন, ওঁরা বলেছেন যে, ওঁদের প্রার্থীরা এবার দলত্যাগ করবেন না।

প্রতাপচন্দ্র চন্দ্রঃ কংগ্রেস ২০ বছর রাজ্য পরিচালনা করেছে। কিন্তু তখন দলত্যাগের প্রশ্ন ওঠে নি। গতবারে দলত্যাগের প্রশ্ন বড় করে দেখা দিল। এই রোধ করার জন্য কংগ্রেসের কোনও দলত্যাগীকে আমরা মনোনয়ন দিই নি। যদিও অনেকে কংগ্রেসে ফিরে এসে মনোনয়ন চেয়েছিলেন। তা ছাড়া, একটি দলের মধ্যে যদি দলত্যাগের আশংকা থাকে : তবে চোদ্দ দলের মধ্যে তো তো বেশি করে থাকবে।

দলত্যাগ বন্ধের জন্য আমরা চেষ্টা করতে পারি। তবে ভবিষ্যতে কী হবে তা বলা যায় না। আমাদের বিশ্বাস কংগ্রেস থেকে কোনও দলত্যাগ হবে না।

৬। প্রঃ ভারতবর্ষের রাজ্যগুলিতে ১৯৬৭ সালের নির্বাচনের পর যেভাবে একের পর এক সরকারের পতন ঘটছে—তার ফলে ভারতে একনায়কতন্ত্রের পথ প্রশস্ত হচ্ছে না কি?

উঃ অজয় মুখোপাধ্যায়ঃ ভারতে বর্তমান রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে দেখা যাচ্ছে যে, জনমত বিভিন্ন রাজ্যে কংগ্রেসকে কোথাও বা সংখ্যালঘুতে এবং অন্যত্র অপেক্ষাকৃত দুর্বল করে দিয়েছে। এটা অসম্ভব নয় যে, পার্লামেণ্টে আগামী সাধারণ নির্বাচনে কংগ্রেস সংখ্যালঘু হয়ে যাবে। তবে গণতন্ত্র চলে গিয়ে একনায়কত্ব আসবে বলে মনে করি না। তবে আন্তর্জাতিক রাজনৈতিক কূটচক্রের খেলার পূর্বাভাষ এখনই নির্ণয় করা যায় না।

জ্যোতি বসুঃ না আপাতত তেমন কোনও সম্ভাবনা দেখা যাচ্ছে না।

প্রতাপচন্দ্র চন্দ্রঃ বেশি দিন যদি বর্তমান অবস্থা চলতে থাকে এবং কোনও সরকারই স্থায়ী না হয়, তা হলে দল-ভিত্তিক সংসদীয় গণতন্ত্র সম্পর্কে মানুষের শ্রদ্ধা কমে যাবে। এবং তার ফলে স্বৈরাচারের পথ প্রশস্ত হতে পারে।

৭। প্রঃ দলত্যাগ বন্ধের জন্য কোনও বিশেষ আইন প্রণয়নের প্রয়োজন আছে বলে মনে করেন?

উঃ অজয় মুখোপাধ্যায়ঃ নিশ্চয়ই। দলত্যাগ বন্ধ করার জন্য কঠোর আইন প্রণয়ন করা দরকার। আইন এমন হওয়া উচিত যাতে কোন লোক কোনও দলের নামে নির্বাচিত হয়ে দলত্যাগ করলেই যেন সঙ্গে সঙ্গে তার আইনসভার সদস্যপদ চলে যায়। কারণ গণতন্ত্রে ভোটের দ্বারা নির্ধারিত জনমতের স্থান সর্বোচ্চে রাখা দরকার।

জ্যোতি বসুঃ নিশ্চয়ই করা দরকার।

প্রতাপচন্দ্র চন্দ্রঃ নিশ্চয়ই করা উচিত। কোনও দলের প্রতীক নিয়ে যদি কেউ নির্বাচিত হন এবং পরে সেই দলের বিরুদ্ধে যান তবে আইনানুযায়ী তাঁর আসন খালি বলে ঘোষণা করা উচিত। এবং সেই শূন্য আসনে পুনর্নির্বাচন হওয়া বাঞ্ছনীয়। অনেকগুলি আসন যদি এইভাবে একসঙ্গে খালি হয় এবং সংখ্যাগরিষ্ঠ দল বা দলসমষ্টি যদি সংখ্যালঘুতে পরিণত হয় তবে সাময়িকভাবে রাষ্ট্রপতির শাসন প্রবর্তন করা যেতে পারে, যতদিন না উপনির্বাচনগুলি নিষ্পন্ন হচ্ছে। উপনির্বাচনের ফলে দলত্যাগীদের সম্পর্কে ভোটারদের মত যাচাই করে আবার সরকার গঠন করা যেতে পারে। এই প্রস্তাব গৃহীত হলে সমস্ত বিধানসভা বাতিল করার প্রশ্ন উঠবে না এবং যাঁরা দলত্যাগী মন—তাঁদের পুনর্নির্বাচনের সম্মুখীন না হলেও চলবে।

৮। প্রঃ এক সময়ে যুক্তফ্রন্টের সমর্থক হয়েও যাঁরা পরে যুক্তফ্রন্টবিরোধী কাজ করে সরকারের পতন ঘটালেন তাঁরা এবারেও রাজনীতির আসরে আছেন—এঁদের কার্যকলাপ সাম্প্রদায়িকতার দোষে দুষ্ট নয় কি?

উঃ অজয় মুখোপাধ্যায়ঃ কোনও কোনও ব্যক্তি বা রাজনৈতিক দল এই নির্বাচনে গণতন্ত্রবিরোধী সাম্প্রদায়িকতা ও প্রাদেশিকতার বিষ ছড়াচ্ছেন।

জ্যোতি বসুঃ হুমায়ুন কবির তো সাম্প্রদায়িকতার ওপরই নির্ভর করছেন।

প্রতাপচন্দ্র চন্দ্রঃ যে কোনও সাম্প্রদায়িক দল সে ধর্মভিত্তিকই হোক বা প্রদেশভিত্তিকই হোক—তা দেশের পক্ষে ক্ষতিকারক। তাদের কোনও মতেই সমর্থন করা উচিত নয়।

৯। প্রঃ নকশালবাড়িপন্থী কমিউনিস্টরা নির্বাচন চাইছেন না। এর ফলে আপনাদের দলের কি কিছু ক্ষতি হবার সম্ভাবনা আছে?

উঃ অজয় মুখোপাধ্যায়ঃ নকশালপন্থী ভাইরা যতই আদর্শবাদী হোন তাঁরা নির্বাচনে "ভোট দিও না" এই ধ্বনি তুলে কংগ্রেসকেই পরোক্ষভাবে সমর্থন করছেন। কারণ যদিও ভোটারগণ তাঁদের কথা মানবেন বলে মনে হয় না, তবুও যদি কেউ মানেন, তবে তাঁরা বামপন্থী সমর্থক হওয়ারই সম্ভাবনা বেশি।

জ্যোতি বসুঃ আমাদের ক্ষতি হবে বলে মনে হয় না।

প্রতাপচন্দ্র চন্দ্রঃ আমাদের তাতে কোনও ক্ষতি হবে না। এদের কথা কেউ শুনবে বলে মনে হয় না। যাঁদের ভোট দেবার ইচ্ছে নেই তাঁরা এমনিতেই ভোট দেন না।

১০। প্রঃ হরিয়ানার ঘটনার পর এখন কি বলা সম্ভব যে কংগ্রেস স্থায়ী সরকার গঠন করতে সক্ষম হবে?

উঃ অজয় মুখোপাধ্যায়ঃ আমি তো আগেই বলেছি যে, এই নির্বাচনে কংগ্রেসের পরাজয় ও যুক্তফ্রন্টের ক্ষমতায় আসার সম্ভাবনাই সর্বাধিক। কাজেই কংগ্রেসের এ-রাজ্যে স্থায়ী মন্ত্রিসভা গঠনের প্রশ্নই থাকে না।

জ্যোতি বসুঃ সরকার কী রকম হবে সেইটাই আসল কথা। সরকারের স্থায়িত্ব আসল কথা নয়। একনায়কত্ব পঞ্চাশ বছর স্থায়ী হতে পারে, তবে তাতে সাধারণ মানুষের কিছু যায় আসে কি? ওরা কখনই স্থায়ী সরকার গঠন করতে পারবে না। হরিয়ানাতে তো দেখলেন। ওদের কোনও নীতির ঠিক নেই, দল ভেঙে যাচ্ছে। ওরা স্থায়ী সরকার কখনই গঠন করতে পারবে না।

প্রতাপচন্দ্র চন্দ্রঃ কংগ্রেস ২০ বছর স্থায়ী সরকার গঠন করে শাসন পরিচালনা করতে সমর্থ হয়েছিল। এখনও অনেক রাজ্যে কংগ্রেস স্থায়ী সরকার গঠন করে কাজ চালাচ্ছে। কেন্দ্রেও স্থায়ী সরকার রয়েছে। হরিয়ানা সারা ভারতবর্ষ নয়।

১১। প্রঃ আপনাদের দল যদি সংখ্যাগরিষ্ঠ হতে না পারে, তা হলে অন্য কোনও দলের সহায়তায় সরকার গঠন করবেন কি?

উঃ জ্যোতি বসুঃ সে তো বলতে পারছি না। যুক্তফ্রন্টের বাইরে এমন তো কাউকে দেখছি না, যাদের সঙ্গে মিলিত হয়ে আমরা সরকার গঠন করতে পারি।

প্রতাপচন্দ্র চন্দ্রঃ এখনও পর্যন্ত আমাদের যে নির্দেশ আছে, তাতে আমরা অন্য কোনও দলের সহায়তায় সরকার গঠন করতে যাব না।

শ্রীজ্যোতি বসুকে নিম্নলিখিত দুটি প্রশ্নও জিজ্ঞাসা করা হয়।

প্রঃ ১। আপনারা সরকার গঠন করতে সক্ষম হলে, শ্রমনীতি কি আগেকার মতই থাকবে?

উঃ সাধারণভাবে গতবারের মতই থাকবে।

প্রঃ ২। কোনও কোনও বুদ্ধিজীবী রাষ্ট্রপতির শাসন চাইছেন। এ বিষয়ে আপনার অভিমত কি?

উঃ যাঁরা গণতন্ত্রের ওপর সম্পূর্ণ বিশ্বাস হারিয়েছেন, তাঁরাই ঐ রকম কথা বলেন। তাঁরা জানেন না রাজ্যপালের প্রশাসনে সমস্ত দিক থেকে বাংলাদেশের কী দুরবস্থা হয়েছে।

শ্রীপ্রতাপচন্দ্র চন্দ্রকে নিম্নলিখিত প্রশ্নটি জিজ্ঞাসা করা হয়।

প্রঃ ছাত্রদের যে বিদ্রোহ দেখা যাচ্ছে, এর প্রতিকারের বিষয় কিছু ভেবেছেন কি?

উঃ ছাত্রদের সঙ্গে মেলামেশা করে ও বুঝিয়ে তাদের মনের পরিবর্তন করা দরকার। অবশ্য ফৌজদারী অপরাধ করলে দেশের আইনানুযায়ী তাদের শাস্তি পেতে হবে। ছাত্রবিক্ষোভ অনেকটা মনস্তাত্ত্বিক ব্যাপার। এটা অর্থনীতি বা অভাববোধের ওপর নির্ভর করে না। কারণ বহু ধনীর দেশে ও সাম্যবাদী দেশেও ছাত্রবিক্ষোভ আছে।

গণতান্ত্রিক দেশে অবসর সময়ে ছাত্রেরা নিশ্চয়ই রাজনীতি করতে পারে। তারা কেমনভাবে লেখাপড়া করবে—তাও তো রাজনীতির সঙ্গে জড়িয়ে আছে। তাদের মধ্যে অনেকেই ভোটার। তবে তাদের প্রধান কর্তব্য হবে লেখাপড়া শিখে ভবিষ্যতের জন্য তৈরি হওয়া।

সাহিত্যিক ও বুদ্ধিজীবীদের মতামত

১। প্রঃ অনেকে রাষ্ট্রপতির শাসন চাইছেন; অনেকে মধ্যবর্তী নির্বাচনের পক্ষপাতী। এ-সম্বন্ধে আপনার অভিমত কি?

উঃ ঐতিহাসিক ডঃ রমেশচন্দ্র মজুমদার: নির্বাচন হবেই। তবে আমার অভিমত রাষ্ট্রপতির শাসনই কিছুকালের জন্য রাখা ভাল। কংগ্রেস বা যুক্তফ্রন্ট যেই আসুক না কেন দেশের পক্ষে তা ভাল হবে না। কারণ ঐ দলগুলি নিজেদের স্বার্থই দেখবে। দেশের স্বার্থ দেখবে না।

সাহিত্যিক তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়: কংগ্রেসের আমলে খাদ্য আন্দোলন এবং যুক্তফ্রন্টের আমলে ঘেরাও ইত্যাদির হাত থেকে এখন দেশ অনেক শান্তিতেই রয়েছে। কলহপ্রিয় এবং উত্তাপ এই দুয়ের থেকেই দেশ একটি শান্ত অবস্থায় আসতে পেরেছে। কেউ যদি বলেন যে, গণতন্ত্রের জন্য একটু কষ্টভোগ করা উচিত, তাহলে বলব যে, রাজনৈতিক দলগুলির কষ্টভোগ করার ক্ষমতা থাকলেও, সাধারণ মানুষের সে-ক্ষমতা আর নেই।

চিকিৎসক নীহার মুন্সী: আমার মনে হয় রাজ্যপালের যদি পুরো ক্ষমতা থাকতো এবং তিনি একটি 'নন-অফিসিয়াল এ্যাডভাইসারী কাউন্সিল'-এর সাহায্যে দেশের শাসনব্যবস্থা পরিচালনা করতেন তাহলে মোটামুটি ভালই হত। কিন্তু তা হয় নি। তবে ঐ কাউন্সিলের সাহায্যে রাজ্যপাল যদি শাসন পরিচালনা করতেন, তবে পরবর্তী নির্বাচন পর্যন্ত দেশের সর্ববিধ কল্যাণের আশা করা যেত।

সাহিত্যিক নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়: রাষ্ট্রপতির শাসনকে কায়েম রাখার অর্থে বোঝায় যে, রাজনৈতিক দিক থেকে আমাদের নাবালকত্ব ঘোচে নি। নির্বাচনের মাধ্যমে আমরা যে রাজনৈতিক দিক থেকে সাবালকত্ব লাভ করেছি—সে কথাই প্রমাণ করা সম্ভব। নির্বাচনের মাধ্যমে আমরা আমাদের প্রতিনিধিদের দ্বারা সরকার পরিচালনায় সাহায্য করতে পারি। নির্বাচনই শ্রেয়।

২। প্রঃ শিল্পী, সাহিত্যিক ও বুদ্ধিজীবীদের মধ্যবর্তী নির্বাচনে কোনও ভূমিকা থাকবে কি?

উঃ ডঃ রমেশচন্দ্র মজুমদার: আমাদের ভূমিকা যা আছে তাতে কোনও ফল হবে না। দলগুলিও আমাদের চায় না; দেশের লোকও আমাদের দ্বারা প্রভাবিত হয় বলে মনে হয় না। তবে আমাদের বক্তব্য রেখে যেতে হবে। কাজেই অনেকেই হয়ত এই প্রসঙ্গে তাঁদের বক্তব্য রাখবেন।

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়: শিল্পী, সাহিত্যিকদের নির্বাচনে নিরপেক্ষ থাকাই উচিত। কারণ নির্বাচনে যদি কেউ কোনও দলের হয়ে কাজ করেন, তবে রাজনৈতিক দলে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করতেই বা দোষ কি? আমি এর প্রত্যক্ষ ভুক্তভোগী। আমি এক সময়ে কংগ্রেসের সঙ্গে যুক্ত ছিলাম। পণ্ডিত জওহরলালের তিরোধানের পর কংগ্রেসে যখন বিরোধ আরম্ভ হল এবং ঐ দলের মধ্যেই নানা উপদল সৃষ্টি হল, তখন দেখেছি ব্যক্তি-স্বার্থ বা দলের স্বার্থই সেখানে বড় হয়ে ওঠে। দেশের স্বার্থ তখন শোচনীয়ভাবে উপেক্ষিত হয়।

ডাঃ নীহার মুন্সী: আপাতত আমরা নিষ্ক্রিয় দর্শকের ভূমিকা নিয়েছি।

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়: শিল্পী, সাহিত্যিকও সামাজিক মানুষ। সে তো আর শূন্যে বাস করতে পারে না। সামাজিক মানুষ হিসাবে আরও দশজনের মতই এই মধ্যবর্তী নির্বাচনে তার বিশেষ ভূমিকা আছে। যে কোনও দশজন মানুষের মতই দৈনন্দিন জীবনে তাকে সমস্যার মুখোমুখি দাঁড়াতে হয়।

৩। প্রঃ কংগ্রেস দল বলছে যে যুক্তফ্রন্ট সরকার পরিচালনায় ব্যর্থ হয়েছে। আপনি এ বিষয়ে কি মনে করেন?

উঃ ডঃ রমেশচন্দ্র মজুমদার: যুক্তফ্রন্টের কাছে মানুষ যা চেয়েছিল, তা হয়তো পায় নি। তবে কংগ্রেসের থেকে যুক্তফ্রন্ট বেশি অনিষ্ট করেছে বলে মনে হয় না। এখন এইটুকু বোঝা যাচ্ছে যে কোনও দল বা জোটই দেশের প্রকৃত কোনও উপকার করতে পারবে না। যুক্তফ্রন্টের শাসন সেই কথাই প্রমাণ করে।

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়: আমি মনে করি যে, যুক্তফ্রন্ট সরকার পরিচালনায় ব্যর্থ হয়েছেন। কংগ্রেসের শেষ পর্যায়ের শাসনের ব্যর্থতার মতন যুক্তফ্রন্টের শাসনও সমান ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়েছে।

ডাঃ নীহার মুন্সী: ব্যর্থ নয়, তবে যথেষ্ট সার্থকতা প্রমাণ করতে পারে নি। মানুষ যা আশা করেছিল—তা পায় নি।

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়: যুক্তফ্রন্ট সরকারের কিছু কিছু ত্রুটি-বিচ্যুতি ছিল। কারণ যে মৈত্রিক্য আশা করা গিয়েছিল—তা হয় নি। কিন্তু তাদের তো কাজ করার কোনও সুযোগই দেওয়া হল না। কুড়ি বছর একদল সুযোগ পেয়েছেন, পাঁচ বছর আরেক দলকে সুযোগ দিয়ে দেখাই যাক না কী দাঁড়ায়।

৪। প্রঃ শিল্পী, সাহিত্যিক ও বুদ্ধিজীবীদের স্বাধীনতার প্রশ্নে কংগ্রেস ও যুক্তফ্রন্ট এই দুই সরকারের দৃষ্টিভঙ্গির মধ্যে কোনও পার্থক্য চোখে পড়ছে কি?

উঃ ডঃ রমেশচন্দ্র মজুমদার: যুক্তফ্রন্টের সময় বুদ্ধিজীবীদের স্বাধীনতার ক্ষেত্রে কোনও বাধা দেখি নি। কংগ্রেস যথাসাধ্য চেষ্টা করেছে যে বুদ্ধিজীবিগণ কংগ্রেসের নীতির দ্বারা পরিচালিত হোন। আঠারো বছরে এ ধরণের অন্যায়ের নমুনা পাওয়া গেছে।

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়: আমাদের স্বাধীনতায় ঐ দুই সরকারের সময়েই কোনও বাধা হয় নি। তবে কংগ্রেসের কার্যকাল আঠারো বছর, ওদের আট মাস।

ডাঃ নীহার মুন্সী: কোনও সরকারই বাধা দেন নি।

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়: শিল্পীমাত্রেই সমাজের একজন। সুতরাং যে কোনও সাধারণ মানুষের ব্যক্তিগত মত প্রকাশের যে অধিকার গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে থাকে, শিল্পী-সাহিত্যিকেরও সে অধিকার নিশ্চয়ই আছে। কংগ্রেস সরকার হয়তো রাজনৈতিক কারণে কখনও বিশেষ শিল্পীকে আত্মপ্রকাশে বাধা দিয়েছেন, কিন্তু তাই বলে তাঁরা শিল্পীর স্বাধীনতা বিপন্ন করেছেন, এ-কথা ঠিক আমার মনে হয় না। আর যুক্তফ্রন্টের ক্ষেত্রে তো এ-পরীক্ষা হবার সুযোগই ঘটে নি।

৫। প্রঃ কংগ্রেস শাসনের ব্যর্থতার তুলনায় যুক্তফ্রন্টের নয় মাসের শাসনের ব্যর্থতা কি বেশি বলে মনে করেন? এই দুই সরকারের শাসনব্যবস্থার মূলগত পার্থক্য কিছু ছিল কি?

উঃ ডঃ রমেশচন্দ্র মজুমদার: দুই দলই নিজেদের স্বার্থে পরিচালিত হয়েছে। দেশের স্বার্থ কেউই দেখে নি।

ডাঃ নীহার মুন্সী: কংগ্রেস সমস্ত দিক থেকে ব্যর্থতার পরিচয় দিয়েছে। শুধু তাই নয়, মানুষের নৈতিক দিক সম্পূর্ণ ভেঙে দিয়েছে। ঐ দুই সরকারের শাসন-ব্যবস্থায় মূলগত পার্থক্য খুব বেশি ছিল বলে মনে হয় না। তবে পুলিশকে ওরা (যুক্তফ্রন্ট) নিষ্ক্রিয় করে রেখেছিলেন।

ক্রমনাতর ক্ষেত্রেও কিছু নতুনত্ব ছিল। তবে ঘেরাও নিয়ে অত্যন্ত বাড়াবাড়ি করা হয়েছে। শ্রমিকদের মঙ্গল আমরা সকলেই চাই। কিন্তু যে পথে ঐ মঙ্গল করার চেষ্টা হয়েছিল—তা অনেকেরই পছন্দ নয়। ঐ পথে শ্রমিকদের মঙ্গল না হয়ে, অমঙ্গলই হয়েছে বলে আমার বিশ্বাস।

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় : কংগ্রেস আমলে আমরা অনেক সদিচ্ছা ও সচ্চেষ্টার কথা শুনেছি। ওঁদের মধ্যে যে অনেকে কোনও চেষ্টা করেন নি, তা নয়। সজ্জন অনেকেই ছিলেন। ভাল কাজও নিশ্চয়ই হয়েছে। আমি রাজনীতিক নই। তবে বাংলাদেশের আরও দশজন সাধারণ মানুষের মত দেখেছি যে, আমাদের অন্নবস্ত্র-জীবনযারণ ক্রমশ জটিল হয়ে উঠছে। বেকার বাড়ছে। মর্মবিদ্ধ চোখে অন্ধকার দেখছেন। কৃষক আজ চোরাবালির ওপর দাঁড়িয়ে আছে। দুর্নীতি ও চোরাকারবার তো সারা ভারতবর্ষকে গ্রাস করেছে। সদিচ্ছা যতই থাক ও অর্থব্যয় যতই হোক, এ-কথা না বলে উপায় নেই যে, এই বিশ বছরের মধ্যে এতগুলি পরিকল্পনা সত্ত্বেও দেশের মৌলিক অর্থনীতি একেবারে বিপর্যস্ত হয়ে গেছে। সুতরাং সমস্ত ব্যবস্থাটার ভেতরে কোথাও না কোথাও প্রচুর ফাঁক ও ফাঁকি আছে।

যুক্তফ্রন্ট এক বছর বা দুই বছরে এই বাংলাদেশে এত বড় সর্বভারতীয় জটিলতার জাল খুলতে পারবেন—এ আশা করা শক্ত। কিন্তু বিরোধী পক্ষের ভূমিকায় এবং গণ-আন্দোলনের মধ্য দিয়ে তাঁরা রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে ঐ সব ফাঁক ও ফাঁকিগুলির অনেকখানি ধরতে পেরেছেন। সুতরাং রোগ নিরাময় হতে দেরি হতে পারে কিন্তু সেটা নির্ণয় করে, তার প্রতিকারের পথ তাঁরা অন্তত দেখাতে পারবেন, এ বিশ্বাস আমার আছে। সরকারী কর্মচারীদের ক্ষেত্রে, কৃষক এবং শ্রমিকদের ক্ষেত্রেও তাঁরা বিভিন্ন সমস্যা সমাধানের ইঙ্গিত এনে দিয়েছিলেন। আমার মনে হয়, শুধু বাংলাদেশে নয় সারা ভারতবর্ষেই যদি এইভাবে ঐক্যবদ্ধ যুক্তফ্রন্ট সরকার গড়ে ওঠে, তবে অবস্থার পরিবর্তন আসতে বাধ্য। এবং এ-ও আমি আশা করি বিশ বছরের জটিলতা তাঁরা অন্তত দশ বছরে কাটিয়ে উঠবেন।

৬। প্রঃ যুব ও ছাত্রসমাজে যে বিদ্রোহ চোখে পড়ে—এর প্রতিকারের উপায় কিছু ভেবেছেন?

উঃ ডঃ রমেশচন্দ্র মজুমদার : ওপরওয়ালা যদি সৎ হন, তবেই এরা সৎ হবে। সরকার যদি দুর্নীতি বন্ধ না করেন তবে এদের এ-অবস্থা চলবে। দুর্নীতির প্রভাব যুবকদের ওপর পড়ছে—বিক্ষোভের এইটাই প্রধান কারণ বলে মনে হয়।

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় : এর প্রতিকারের পথ তো এখনও কিছু দেখতে পাই না। পুরাতন ও নতুনের মধ্যে দ্বন্দ্বই এই বিক্ষোভের মূল কারণ। রাজনৈতিক দলগুলি এদের নিজেদের প্রয়োজনে লাগাচ্ছে বটে, তবে রাজনৈতিক দলের মধ্যে যখন এটা আত্মপ্রকাশ করবে, তখন চরম বোঝাপড়া হবে।

ডাঃ নীহার মুন্সী : ভেবেছি বৈকি। শিক্ষক হিসাবে যা দেখেছি—তাতে ছাত্রদের ওপর সব দোষ চাপাতে চাই না। গলদ আমাদের নিজেদের মধ্যেও আছে। আমরা কতজন শিক্ষক ছাত্রদের সামনে প্রকৃত আদর্শ তুলে ধরতে পেরেছি।

পিতা-মাতার প্রভাব ছেলে-মেয়েদের ওপর সবচেয়ে বেশি। নানা কারণে আজ আর পিতা-মাতা ছেলে-মেয়েদের নৈতিক ও মানসিক উন্নতির জন্য সময় দিতে পারছেন না। দেশের অর্থনৈতিক দুর্গতির জন্য মধ্য ও নিম্নবিত্তের পরিবারগুলির ছেলে-মেয়েদের মনে গভীর হতাশা লক্ষ্য করা যাচ্ছে। বড়লোকের ছেলে-মেয়েরা কিভাবে নষ্ট হয় তা তো আমরা সবাই জানি।

প্রধানত হতাশা থেকে ছাত্র-বিক্ষোভের সৃষ্টি। দুঃখের কথা, এদের মানসিক ও নৈতিক মান অনেক বেশি নেমে গেছে।

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় : অর্থনৈতিক স্থিতি ও ভবিষ্যৎ সম্পর্কে নিশ্চয়তা না আসা পর্যন্ত এই বিদ্রোহ থামবে না।

৭। প্রঃ ছাত্রদের নির্বাচনে প্রত্যক্ষ ভূমিকা থাকা বাঞ্ছনীয় কি?

ডঃ রমেশচন্দ্র মজুমদার : রাজনৈতিক দলগুলি নির্বাচনের কাজ ছাত্রদের দিয়েই করাবে। তবে এগুলি বাঞ্ছনীয় নয়।

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় : ১৮ বছরের কম যাদের বয়স তাদের রাজনীতিতে আসা অন্যায়। এ-কাজ রাষ্ট্র ও সমাজ দুয়েরই বিরোধী। ছাত্রদের রাজনীতিতে আসা বাঞ্ছনীয় নয়।

ডাঃ নীহার মুন্সী : সেমিনার ও বিতর্কসভা প্রভৃতির মাধ্যমে তারা নিজেদের সচেতন করে তুলবে। তবে ঝাণ্ডা নিয়ে ছাত্ররা জনসভা করুক—এ আমি চাই না।

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় : ছাত্রদের যদি কোনও রাজনৈতিক মতামত থাকে তাহলে তারা তাদের ভূমিকা গ্রহণ করবে—আপনি—আমি কেউই ঠেকাতে পারব না। তবে শিক্ষক হিসাবে আমি পরীক্ষার খাতায় সর্বদাই ভাল উত্তর আশা করব। মহম্মদ আলী পার্কে পি সি যোশী একবার বলেছিলেন যে স্কুলের সেরা ছাত্রেরই কমিউনিস্ট হবার অধিকার আছে—এ-কথা আমি সর্বান্তঃকরণে বিশ্বাস করি। শুধু কমিউনিস্ট কেন, সেরা কংগ্রেসী হতে গেলেও এ গুণটি থাকা দরকার।

৮। প্রঃ ছাত্রদের দাবি ও আন্দোলনের কোনও যৌক্তিকতা আছে কি?

উঃ ডঃ রমেশচন্দ্র মজুমদার : খুব কম। তবে রাজনৈতিক প্রভাব খুব বেশি।

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় : কিছু কিছু দাবির মধ্যে যৌক্তিকতা আছে বৈ কি?

ডাঃ নীহার মুন্সী : কোনও কোনও ক্ষেত্রে নিশ্চয়ই আছে।

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় : হয়তো দাবি-দাওয়ার ভেতরে কখনও কখনও তারা নিজেদের সংযত রাখতে পারে নি। তবে সেইজন্য তারা দায়ী নয়। আসলে অনিশ্চয়তাই তাদের উদ্ভ্রান্ত করে। আমার মনে হয়, এ সময় ছাত্র-আন্দোলনে এমন সজাগ নেতৃত্ব দরকার—যে নেতৃত্ব ছাত্রশক্তিকে সংগঠিত করে বৃহত্তর প্রয়াসের দিকে এগিয়ে দেবে। ছাত্রবিক্ষোভ অনেকটা নিরুপায় যন্ত্রণার একটা রুদ্ধ অভিব্যক্তি মাত্র। রাজনৈতিক নেতাদের কাছে আমার আবেদন, ছাত্রদের নিছক হাতিয়ার হিসাবে ব্যবহার না করে, তাদের আরও সংগঠিত, সুশিক্ষিত এবং বৃহত্তর দেশের কল্যাণের জন্য নিয়ন্ত্রিত করুন।

৯। প্রঃ কংগ্রেস, যুক্তফ্রন্ট এবং রাষ্ট্রপতির শাসন—এই ত্রিবিধ শাসনব্যবস্থার আইন ও শৃঙ্খলার দিক থেকে কোনও পার্থক্য বোধ করেছেন কি?

উঃ ডঃ রমেশচন্দ্র মজুমদার : কংগ্রেস বা রাষ্ট্রপতির শাসনে কোনও পার্থক্য নেই। তবে যুক্তফ্রন্টের সময়ে আইন ও শৃঙ্খলার অবনতি হয়েছিল। মন্ত্রীরাও প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে এই অবনতিতে সাহায্য করেছেন।

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় : রাষ্ট্রপতির শাসনই ভাল মনে করি।

ডাঃ নীহার মুন্সী : কংগ্রেস যথেচ্ছাচারের সহায়ক হয়েছে। ২০ বছরের অন্যায়ের ফল এখন ফলছে। রাষ্ট্রপতির শাসনে আইন-শৃঙ্খলার ক্ষেত্রে অনেক বেশি অবনতি হয়েছে। যুক্তফ্রন্টের ৯ মাসের শাসনকালে নতুন কিছু বোঝা যায় নি।

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় : যুক্তফ্রন্টের শাসন হিসেবের মধ্যেই আসে না, কারণ তা ক্ষণবুদ্বুদ। বাকি দুটি শাসনের মধ্যে এ ব্যাপারে আমি কোনও পার্থক্য দেখি না।

১০। প্রঃ রাষ্ট্রপতির শাসনে উচ্চ পর্যায়ের সরকারী আমলাদের সমস্ত রকম

ক্ষমতা দিলেও তারা জনগণের মঙ্গলসাধনে সমর্থ কি?

উঃ তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ঃ মঙ্গল-সাধন না করার কোনও কারণ নেই।

ডাঃ নীহার মুখার্জীঃ না। যেহেতু তাঁদের সাধারণ মানুষের সঙ্গে কোনও যোগাযোগ নেই। আইনের চোখেই তাঁরা সব দেখেন—তাঁদের প্রাণের যোগ নেই—শুধু গাড়ি করে যাওয়া ও ফাইল ঘাঁটা—এ-কবে জনগণের কল্যাণসাধন সম্ভব নয়।

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ঃ কি করে সম্ভব? তাঁদের তো অভ্যাস নেই।

১১। প্রঃ কংগ্রেস দল বলছে যে স্থায়ী সরকার (Stable Govt.) একমাত্র কংগ্রেসই গঠন করতে পারে। এই উক্তি আপনার কতখানি যুক্তিযুক্ত বলে মনে হয়?

উঃ ডঃ রমেশচন্দ্র মজুমদারঃ এবারও কোনও দলই স্থায়ী সরকার গঠন করতে পারবে না। তাতে আক্ষেপের কোনও কারণ নেই।

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ঃ সবটাই অলীক বলে মনে হচ্ছে। ভারতবর্ষে সর্বদলের একটি মিলিত শাসন প্রয়োজন। যারা ভারতবর্ষে অস্পৃশ্যতা ও জাতিভেদ দূর করার জন্য বদ্ধপরিকর—তারা অপরাপর রাজনৈতিক দলগুলির সঙ্গে মিলিত হয়ে জাতির কল্যাণসাধনের সঙ্কল্প গ্রহণে কোনও বাধা দেখি না।

ডাঃ নীহার মুখার্জীঃ মোটেই যুক্তিযুক্ত নয়। কংগ্রেসের পক্ষে স্থায়ী সরকার গঠন করা সম্ভব নয়।

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ঃ এ-দাবি কারোর পক্ষেই আজকের দিনে সঙ্গত বলে মনে হচ্ছে না। সারা ভারতবর্ষই কি বর্তমানে সে-কথা প্রমাণ করে না?

১২। প্রঃ বর্তমানের রাজনৈতিক অস্থিরতার পরিপ্রেক্ষিতে আপনার চিন্তায় আগামী দিনের ভারতবর্ষের রূপ কি রকম?

উঃ ডঃ রমেশচন্দ্র মজুমদারঃ নিরাশা-ব্যঞ্জক। ভবিষ্যৎ খুবই অন্ধকার।

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ঃ খুব স্পষ্ট নয়। ঝাপসা। হয়তো বা প্রচণ্ড একটা গৃহযুদ্ধই এর পরিণতি বলে মনে হচ্ছে।

ডাঃ নীহার মুখার্জীঃ আশার আলো দেখছি না।

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ঃ যদি সারা ভারতবর্ষে আগামী কয়েক বছরের মধ্যে স্থায়ী এবং প্রগতিশীল অর্থনৈতিক ভিত্তি দৃঢ় করা না যায়, তা হলে যে আগুন জ্বলবে—তাতে কংগ্রেস, কমিউনিস্ট, আর এস পি, আর এস এস ইত্যাদি কেউই নিস্তার পাবে না।

বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের নেতৃবৃন্দের মতামত

১। প্রঃ মধ্যবর্তী নির্বাচন কি ফেব্রুয়ারী মাসে হওয়া সম্ভব?

উঃ বিশ্বনাথ মুখোপাধ্যায়ঃ মনে হচ্ছে।

সুবোধ বন্দ্যোপাধ্যায়ঃ আমরা মনে করি হওয়া উচিত। যদি না হয় তবে মনে করব যে বাংলাদেশের জনমতকে পদদলিত করা হচ্ছে এবং সেটা করছে কংগ্রেস।

জ্যোতি ভট্টাচার্যঃ "নির্বাচন পিছিয়ে যেতে পারে কি?" নির্বাচন কমিশনারকে এ-প্রশ্ন করা হলে তিনি বলেছেন যে, "এ-রকম অসত্য আজগুবী, মিথ্যা খবর-তলে হতে পারে না।" কাজেই আশা করি নির্বাচন হবে। তবে কংগ্রেসের তরফ থেকে বিভিন্ন উপায়ে অশান্তি সৃষ্টি করার চেষ্টা হচ্ছে।

জাহাঙ্গীর কবির ঃ না হবার কোনও কারণ দেখছি না।

অশোক ঘোষঃ অঘটন কিছু না ঘটলে হবে।

সুকুমার রায়ঃ নির্বাচন-কমিশনার যখন বলেছেন, তখন ধরে নেওয়া যায় যে, নির্বাচন ফেব্রুয়ারী মাসে হবে।

মাখন পাল ঃ আশা করা যাচ্ছে হবে।

হরিপদ ভারতী ঃ না হবার কোনও কারণ দেখছি না। আমাদের সন্দেহ করার মত এখনও কোনও কারণ দেখছি না।

ডঃ ভূপাল বসুঃ কোনও অঘটন না ঘটলে হবে। যদি দলগুলির মধ্যে বর্তমানের ন্যায় গণ্ডগোল চলে এবং Political violence বাড়তে বাড়তে সীমা ছাড়িয়ে যায়, তবে কী হবে বলা মুশকিল। সংযুক্ত সমাজতন্ত্রী দল এ-ধরণের হিংসাত্মক কার্যকে সমর্থন করে না, বরং নিন্দা করে। আমরা মনে করি বর্তমান সরকারের পক্ষে এ ধরণের হিংসাত্মক কাজ বন্ধ করা সম্ভব নয়। কাজেই রাজনৈতিক দলগুলিকে নীতিগতভাবে বিশ্বাস করতে হবে যে, এ-ধরণের হিংসাত্মক কার্যের মাধ্যমে কোনও কাজই হবে না। আমার মনে সন্দেহ আছে যে, জলপাইগুড়ি অঞ্চলে যে ভয়ানক কাণ্ড হল তারপর এত অল্প সময়ের মধ্যে ভোটার তালিকা ঠিক করা সম্ভব কি না। তবে সরকার বলছেন সম্ভব হবে। আমার কিন্তু সন্দেহ ঘোচে নি।

২। প্রঃ যুক্তফ্রন্ট সরকার গঠিত হবার পরেই আপনার কি মনে হয় নি যে, সরকার টিকবে না?

উঃ বিশ্বনাথ মুখোপাধ্যায়ঃ কিছুদিন পরেই ধারণা হয়েছিল যে কেন্দ্র বাধা দেবে এবং তাদের সঙ্গে সংগ্রাম করেই আমাদের টিকতে হবে।

সুবোধ বন্দ্যোপাধ্যায়ঃ এ-রাজ্যের ও অন্যান্য রাজ্যের কায়েমী স্বার্থ ও প্রতিক্রিয়াশীল শক্তিগুলি এবং 'ব্যুরোক্র্যাসী' ও পুলিশের ওপরতলার একাংশ, কেন্দ্রীয় সরকার এবং তার মুখপাত্র রাজ্যপাল ও কংগ্রেস দল, যুক্তফ্রন্ট সরকারকে ভেঙে দেবার জন্য এবং যুক্তফ্রন্ট সরকারের জনস্বার্থরক্ষাকারী নীতিগুলিকে বানচাল করার জন্য সবরকম চেষ্টা করবে—সে কথা আমরা আমাদের 'মেমোরেণ্ডাম'-এর মাধ্যমে যুক্তফ্রন্টের নিকট উপস্থিত করেছিলাম। এই চক্রান্তকে ব্যর্থ করার জন্য জনগণকে রাজনৈতিকভাবে সচেতন ও উপযুক্তভাবে গণকমিটির মাধ্যমে সংগঠিত করার কথা বলেছিলাম।

জ্যোতি ভট্টাচার্যঃ হ্যাঁ হয়েছিল প্রথম দিন থেকেই। প্রথম থেকেই দেখা যাচ্ছিল যে, কিছু লোক যুক্তফ্রন্টের অন্তর্ভুক্ত হয়েও কথা-বার্তায়, আচার-আচরণের দৃষ্টিভঙ্গিতে জনস্বার্থবিরোধী। কায়েমী স্বার্থের সঙ্গে বিরোধ দেখা দিলে (যেটা ছিল অবশ্যম্ভাবী) এবং অপরপক্ষ থেকে যথেষ্ট প্রলোভন দেখালে এঁরা যুক্তফ্রন্ট ত্যাগ করবেন—এ সন্দেহ আগাগোড়াই ছিল।

জাহাঙ্গীর কবিরঃ তৈরি হবার সময় মনে হয় নি। কিছুদিন পরেই দেখা গেল যে, দলীয় স্বার্থ উগ্র হয়ে উঠল। তবুও মোটামুটিভাবে সামঞ্জস্য রক্ষা করে চলার জন্য চেষ্টা করা হয়েছিল। কিন্তু দোসরা অক্টোবর কংগ্রেসের সঙ্গে দীর্ঘদিন ধরে গোপনে ষড়যন্ত্র করে তাঁর সহকর্মী সকলের অজ্ঞাতে অজয়বাবু যে বিশ্বাস-ঘাতকতা করলেন, তার পরেই তাঁর প্রতি প্রত্যেকেরই আস্থা নষ্ট হল। আমরা যারা বাংলা কংগ্রেসে ছিলাম—তাঁদের মধ্যে অনেকেই তাঁর নেতৃত্ব অস্বীকার করলাম।

তখন থেকেই আমরা বুঝলাম সরকার আর টিকবে না। প্রফুল্লবাবুকে ছোটবেলা

থেকেই দেখছি। তাঁর মত স্বার্থপর, লোভী ও সংকীর্ণচিত্ত লোক এবং কোনও দল পরিচালনার ব্যাপারে সম্পূর্ণ অযোগ্য ব্যক্তি দ্বিতীয়টি নেই। প্রথম থেকেই তাঁর মুখ্য-মন্ত্রিত্বের ওপর লক্ষ্য ছিল বলে আমার ধারণা। তাঁর কার্যাবলী যুক্তফ্রন্ট সরকারকে ভেঙে দিতে অনেকখানি সাহায্য করেছে।

অশোক ঘোষ : যেহেতু একটা কর্ম-সূচীর ভিত্তিতে ফ্রন্ট সরকার গড়ে উঠেছিল, কাজেই ঐ সরকার পাঁচ বছর কাজ চালিয়ে যেতে পারবে—এ কথাই মনে হয়েছিল।

সুকুমার রায় : না তা হয় নি।

মাখন পাল : হয়েছিল। যুক্তফ্রন্টের অধিকাংশ দলই জনসাধারণের মৌলিক গণতান্ত্রিক দাবি পূরণে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ ছিল। সুতরাং সেই দাবি পূরণের কাজে অগ্রসর হলেই আমাদের বর্তমান সংবিধান তথা কেন্দ্রীয় কংগ্রেস সরকারের সঙ্গে মনোমালিন্য দেখা দেবে—এ কথা ভেবেছিলাম। সংবিধানের মধ্যেও এত ফাঁক আছে যে, তার সুযোগ গ্রহণ করে ধনিক-শ্রেণী এবং ধনিকশ্রেণীর প্রতিভূ কংগ্রেস সরকার ছলে বলে কৌশলে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ উপায়ে ফ্রন্ট সরকারের বিরোধিতা করবে এবং যত তাড়াতাড়ি সম্ভব একে পদচ্যুত করবে—এ কথাও মনে হয়েছিল।

হরিপদ ভারতী : তেমন ঠিক ভাবি নি। আমরা ফ্রন্ট সরকারকে আন্তরিক অভিনন্দন জানিয়েছিলাম। যদিও মতাদর্শের দিক থেকে এদের অনেকের সঙ্গেই বিশেষ করে কমিউনিস্ট পার্টির সঙ্গে আমাদের মৌলিক পার্থক্য আছে, তথাপি ফ্রন্ট সরকারকে আমরা সর্বপ্রকারে সহযোগিতার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলাম (অবশ্য তাদের কল্যাণকর প্রচেষ্টায়)। কিন্তু খুব শীঘ্রই তাদের কার্যকলাপ আমাদের হতাশ করতে শুরু করে। এবং আমরাও প্রয়োজনীয় গঠনমূলক সমালোচনাও আরম্ভ করি। নকশালবাড়ির হাঙ্গামা এবং ঘেরাও প্রভৃতি আন্দোলনের পরিপ্রেক্ষিতে আমরা এ সরকারের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ প্রদর্শন করা আমাদের কর্তব্য বলে মনে করি। কিন্তু কোনও অগণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে এই জনপ্রতিনিধিত্বমূলক সরকারকে হটাবার চিন্তা করি না। আমাদের দৃষ্টিভঙ্গি সংশোধনাত্মক ও গঠনমূলক ছিল। এই সরকারের পতনের পরিপ্রেক্ষিতে রাজ্যপাল ধর্মবীর যে ভূমিকা নিয়েছিলেন আমরা তার তীব্র প্রতিবাদ করেছি। কিন্তু এটাও স্পষ্ট হয়ে উঠেছে যে, ফ্রন্ট সরকারের শরিকেরা জনকল্যাণের জন্য কোনও সর্বসাদীসম্মত কার্যসূচী পালন করার চাইতে দলীয় প্রভাব বিস্তারে এবং অপরাপর শরিককে হতশক্তি করানোর কাজে অধিকতর সময় ব্যয় করেছে। ফলে এ সরকার জনস্বার্থের অনুকূলে হতে পারে নি।

ডঃ ভূপাল বসু : প্রথম দিকে মনে হয় নি। যখন দেখা গেল যে, দলগুলির মধ্যে খেয়োখেয়ি চলতে লাগল, তখন থেকেই সন্দেহের সৃষ্টি হল। এই বিরোধের কারণ আদর্শগত পার্থক্য ও কর্মসূচীকে কার্যে পরিণত করার পদ্ধতি নিয়ে মতভেদ। সরকার হাতে নিয়ে কোনও কোনও দল নিজ নিজ শক্তি বাড়াতে অত্যন্ত তৎপর হওয়ায় গণ্ডগোল আরও বৃদ্ধি পেল। এর মোট ফল হল, সরকারের পতন।

৩। প্রঃ যুক্তফ্রন্ট সরকারের পতনের অন্যতম কারণ কি?

বিশ্বনাথ মুখোপাধ্যায় : নানাবিধ। দলত্যাগও তার মধ্যে একটি। তবে দলত্যাগ যে হচ্ছে তা পূর্বে জানা যায় নি। কংগ্রেস প্রেসিডেন্ট নিজলিঙ্গাপ্পা অকংগ্রেসী সরকারগুলি যাতে টিকে থাকতে না পারে, তার সবরকম চেষ্টা তিনি করবেন—এ-কথা তিনি বলেছেন। এই নীতিকে কার্যকর করতে গিয়েই বিভিন্নভাবে এম-এল-এ'দের ক্রয় করা হয়েছে। নিজলিঙ্গাপ্পার মনোভাবই যুক্তফ্রন্ট সরকারের পতনের মূল কারণ।

জ্যোতি ভট্টাচার্য : বেআইনীভাবে, অন্যায় উপায়ে বিধানসভায় সরকারের শক্তি পরীক্ষার সুযোগ না দিয়ে যুক্তফ্রন্ট সরকারকে সরানো হয়েছে। কিন্তু হুবহু অনুরূপ অবস্থায় কেন্দ্রীয় সরকার হরিয়ানাতে বিধানসভার অপেক্ষা করেছিলেন। পশ্চিম বাংলার বেলায় ছাব্বিশ দিনও অপেক্ষা করা সম্ভব হল না। দলত্যাগ ও বিশেষ করে অগাস্ট মাস থেকেই ডঃ প্রফুল্ল ঘোষের গোপন চক্রান্ত ফ্রন্ট সরকারের পতনের অন্যতম কারণ। কায়েমী স্বার্থ অর্থ ও পদের প্রলোভন বিস্তার করেছে এবং সংসদীয় গণতন্ত্রকে লোকচক্ষে হেয় করেছে।

জাহাঙ্গীর কবির : দলীয় স্বার্থরক্ষার জন্য প্রতিটি দলের চেষ্টা ও দলত্যাগ প্রধানত এই দুটো কারণেই ফ্রন্ট সরকারের পতন হল। দলত্যাগের কারণ হল নেতার আযোগ্যতা ও ক্ষমতার লোভ।

অশোক ঘোষ : যুক্তফ্রন্ট সরকারের পতন ঘটে নি। জোর করে ষড়যন্ত্র করে এ-দেশের শিল্পপতিরা বিদেশী সাম্রাজ্যবাদীরা, আই সি এস, আই এ এস এবং আই পি এস চক্রের একটি অংশ এবং স্বয়ং রাজ্যপাল সংবিধান-বিরোধী উপায়ে এ-সরকারকে অপসারিত করেছেন।

সুকুমার রায় : নানাবিধ কারণ। তাড়াতাড়ি করে মন্ত্রিসভা গঠন করতে হল। নির্দিষ্ট কর্মসূচী ছিল না। ফ্রন্টের ভেতর বিশেষত আমাদের দলে কিছু স্বার্থান্বেষী ও বিশ্বাসঘাতক ব্যক্তি জুটেছিল। ছ' মাসের মধ্যে দল গঠন করে নির্বাচনের সম্মুখীন হতে গিয়ে আমাদের দলের প্রার্থী বাছাই খুব ভাল হয় নি। প্রথম থেকেই ডঃ প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ মুখ্যমন্ত্রী হবার জন্য চেষ্টা করতে থাকেন। এই ষড়যন্ত্রে হুমায়ুন কবিরও যোগ দিয়েছিলেন। হুমায়ুন কবির চব্বিশ পরগনা জেলায় আমাদের প্রার্থী বাছাই করেছিলেন। তাঁর নির্বাচিত প্রার্থীদের মধ্যে বেশির ভাগই কায়েমী স্বার্থের প্রতিভূ।

রাজনৈতিক দলগুলির মধ্যে বোঝাপড়ার অভাব ছিল। কংগ্রেস ও কেন্দ্রীয় সরকারের ষড়যন্ত্রও চলছিল। এখানকার ওপরতলার আমলাদের মধ্যে অনেকে এই ষড়যন্ত্রের অংশীদার ছিলেন। চালের মজুতদারদের বিরুদ্ধে action নিতে গেলে খাদ্যমন্ত্রী ডঃ প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ সে পরিকল্পনা বানচাল করে দেন।

মাখন পাল : আমার মনে হয় নিম্নলিখিত ঘটনাগুলি আমাদের আশঙ্কা সপ্রমাণ করেছে।

(১) সরকার প্রতিষ্ঠিত হবার কিছুদিনের মধ্যেই হিন্দু এবং অবাঙালী শিখদের মধ্যে দাঙ্গা-হাঙ্গামার সৃষ্টি।

(২) হিন্দু-মুসলমান সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা-হাঙ্গামা।

(৩) শ্রমিক-মালিক-বিরোধের কারণে ঘেরাও ও ধর্মঘটকে ভিত্তি করে বাংলাদেশে আইন-শৃঙ্খলা নেই বলে দেশ-বিদেশের অবাস্তব ও অতিরঞ্জিত প্রচার।

(৪) কেন্দ্রের অক্ষমতা সত্ত্বেও অন্যান্য রাজ্য থেকে আমদানীতে বাধাদান।

(৫) চা এবং পাট উৎপাদন ও রপ্তানীর মাধ্যমে বিদেশী মুদ্রা সংগ্রহে সুযোগদান সত্ত্বেও কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক যুক্তফ্রন্ট সরকারকে অর্থসাহায্য ও এমন কি অর্থ-ঋণদানেও অসম্মতিজ্ঞাপন।

হরিপদ ভারতী : দুটি কারণ প্রধানত আমার মনে হয়েছে। একটি যুক্তফ্রন্ট সরকারের মধ্যে অন্তর্দ্বন্দ্ব, পারস্পরিক তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতা এবং মার্কসবাদী কমিউনিস্ট পার্টির অত্যধিক প্রভাববিস্তারের প্রয়াস ও সেই পরিপ্রেক্ষিতে অগণতান্ত্রিক ক্রিয়াকলাপ। দ্বিতীয় কারণ, বিরোধী দলের ভূমিকা গ্রহণ করে অকংগ্রেসী সরকারকে প্রয়োজনীয় সহযোগিতা প্রদানে কংগ্রেসের অসহিষ্ণুতা। এবং সেই কারণে কেন্দ্র থেকে রাজ্য পর্যন্ত রাজ্যপাল ধর্মবীরও স্পষ্টতই কিছু ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন।

৪। উঃ এবারকার নির্বাচনে আপনাদের দল সরকার গঠনে সমর্থ হবে কি?

ডঃ বিশ্বনাথ মুখোপাধ্যায় : যুক্তফ্রন্ট জিতবে। এর পিছনে যথেষ্ট কারণও আছে। যুক্তফ্রন্টের জয় সুনিশ্চিত।

সুবোধ বন্দ্যোপাধ্যায় : আমি বিভিন্ন জেলায় ঘুরেছি। আমার দৃঢ় বিশ্বাস যুক্তফ্রন্ট যে শুধু জিতবে তাই নয়, গত-বারের থেকে এবারে অন্যান্য দলের সঙ্গে অনেক বেশি ব্যবধানে জিতবে।

জ্যোতি ভট্টাচার্য : যুক্তফ্রন্ট ভাল সংখ্যা-গরিষ্ঠতা অর্জন করে সরকার গঠন করবে। ওয়ারকার্স পার্টি দুটি আসনে প্রার্থী দিয়েছেন। গতবারের মত এবারও ঐ প্রার্থিগণ জয়লাভ করবেন। তবে গতবার যে ভোটের ব্যবধানে আমাদের প্রার্থীরা জয়লাভ করেছিলেন তা থেকে তাঁরা এবার আরও বেশি ভোটে জিতবেন।

জাহাঙ্গীর কবির : পঁয়ত্রিশজন প্রার্থী দেওয়া হবে। আন্দাজ ২০ জন অন্তত নির্বাচিত হবেন। যদি কখনও কোনও দলের সঙ্গে যুক্ত হয়ে আমাদের সরকার গঠন করতে হয়, তবে সেই দলকে আমাদের কর্মসূচী পুরোপুরি মেনে নিতে হবে। দু-মাসের মধ্যে যদি সরকার আমাদের কর্মসূচীকে আইনে রূপায়িত করেন, তবেই আমরা মন্ত্রিসভায় যোগদান করব এবং সরকারকে সমর্থন করব।

অশোক ঘোষ : ২৮ জন প্রার্থী দিয়েছি। এর মধ্যে ২২টি আসনের প্রার্থীরা নিশ্চিতভাবে জয়যুক্ত হবে।

সুকুমার রায় : সরকার গঠনে সমর্থ হব—এ-বিষয়ে সন্দেহ নেই। গতবার থেকে আমাদের মনোনীত প্রার্থিগণ অনেক বেশি সংখ্যায় নির্বাচিত হবে।

মাখন পাল : ১৭ জন প্রার্থী দেওয়া হয়েছে। কমপক্ষে ১৪টি আসনের প্রার্থী জিতবেন। যুক্তফ্রন্ট সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করবে এবং সরকার গঠনে সমর্থ হবে।

হরিপদ ভারতী : ৬২টি আসনে প্রার্থী দিয়েছি। বলা বাহুল্য যে সরকার গঠনের কোনও প্রতিশ্রুতি বা অভিপ্রায় আমরা জনসাধারণের কাছে রাখছি না। আনুমানিক ২০।২৫টি আসনে আমরা সাফল্যের আশা রাখছি।

ডঃ গোপাল বসু : ১৪ জন প্রার্থী দেওয়া হয়েছে। ১০।১২টি আসনের প্রার্থিগণ জয়যুক্ত হবেন বলে আশা করছি।

৫। প্রঃ আপনারা সরকার গঠন করলেও এবারও যে দলত্যাগের ফলে সরকারের পতন ঘটবে না—এমন কি কোনও নিশ্চয়তা আছে?

বিশ্বনাথ মুখোপাধ্যায় : এই বুর্জোয়া সমাজে দলত্যাগের সম্ভাবনা সব সময়েই আছে। যুক্তফ্রন্টের দলগুলি দেখে-শুনে প্রার্থী মনোনীত করেছেন। দলগুলি এখন অনেক বেশি সচেতন। জনগণও যথেষ্ট সচেতন। তাছাড়া আমরা অনেক বেশি সংখ্যায় জিতব। রাজনৈতিক দিক থেকে যুক্তফ্রন্টের দলগুলি এখন বেশি কাছাকাছি। বাংলা কংগ্রেস থেকে প্রতিক্রিয়াশীল লোক-গুলি সরে গেছে। কিছু আদর্শহীন গরীব লোক পয়সার লোভে দলত্যাগ করেছিল। বড়লোক বড়লোকের স্বার্থে দলত্যাগ করে-ছিল। খুব বড় জোতদার ও শিল্পপতিরাই দলত্যাগে সাহায্য করেছে।

সুবোধ বন্দ্যোপাধ্যায় : আমাদের দল মনে করে যে, বর্তমান অবস্থায় দলত্যাগ ঠেকাবার সম্ভাব্য সর্বোত্তম পন্থা হল নির্বাচনে এমন সব প্রার্থীকে মনোনয়ন দেওয়া যাদের রাজনৈতিক সততা প্রশ্নের অতীত। এবং যাঁরা ন্যায়সঙ্গত গণতান্ত্রিক আন্দোলনের আগুনে নিজেদের পরীক্ষিত রাজনৈতিক কর্মী হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করে-ছেন—এটা না ঘটলে দলত্যাগের সম্ভাবনা থাকে বলেই মনে হয়। তবে কংগ্রেসের সঙ্গে ব্যবধান যদি যথেষ্ট পরিমাণে বাড়ানো যায় এবং যার সম্ভাবনা এবার আছে, তবে দলত্যাগের সম্ভাবনা relatively কমে। এর সঙ্গে সঙ্গে গণ-কমিটিতে সংগঠিত জনসাধারণের সতর্কতা এবং দলত্যাগীর বিরুদ্ধে জনমত সংগঠন দলত্যাগের অন্তরায়।

যুক্তফ্রন্টের মধ্যে বিভিন্ন দল তাদের নিজ নিজ দলের প্রার্থী ঠিক করেছেন। প্রতিটি দল দাবি করেন যে, তাঁদের মনোনীত প্রার্থিগণ পরীক্ষিত কর্মী। অন্য দলের পক্ষে নিশ্চিতভাবে 'হাঁ' বা 'না' বলা স্বভাবতই কষ্টকর।

আমাদের কথা বলতে পারি যে, আমা-দের প্রতিটি প্রার্থী এই নীতির ভিত্তিতে মনোনীত হয়েছেন। প্রতিটি দলই ইতি-হাস থেকে শিক্ষা নিয়েছেন এবং ইতিহাসের যাতে পুনরাবৃত্তি না ঘটে সেদিকে সকলে সতর্ক দৃষ্টি রাখবেন। জনসাধারণও দলগুলির ওপর চাপ দেবেন যাতে এ-ধরণের ঘটনা আর না ঘটে।

জ্যোতি ভট্টাচার্য : গতবারের সঙ্গে এবারের গুণগত পার্থক্য আছে। গতবার নির্বাচনের পর অপ্রত্যাশিতভাবেই যুক্ত-ফ্রন্ট গঠিত হয়েছিল। কাজেই সরকার হাতে নেবার সঙ্গে সঙ্গেই যে-সব জরুরী কাজ এসে পড়ল, সেই কাজগুলি যথাযথ-ভাবে করতে হলে কী নীতি ও পদ্ধতির প্রয়োজন—সে-সম্বন্ধে পরস্পরের মতামত ও চিন্তা ভাল করে জানা ছিল না। এর ফলে খাদ্যের মত জরুরী বিষয় নিয়েও দীর্ঘকাল আলোচনা ও তর্ক-বিতর্ক করতে হয়েছে। অন্যান্য আরও অনেক গুরুতর বিষয়ে স্পষ্ট সিদ্ধান্তে একমত হতে সময় লেগেছে। কাজেই এই সব তর্কবিতর্ক তখনকার আবহাওয়ায় কিছুটা অসুবিধার সৃষ্টি করেছিল।

বর্তমানে যুক্তফ্রন্টের দলগুলি নির্বা-চনের অনেক পূর্বেই বিভিন্ন সমস্যা নিয়ে দীর্ঘ আলোচনা করে পরস্পরের দৃষ্টি-ভঙ্গি, চিন্তা ও আদর্শ সম্বন্ধে অনেক বেশি ওয়াকিবহাল হয়েছেন। এবং সুস্পষ্ট সিদ্ধান্তের ভিত্তিতে একমত হয়েছেন। এর ফলে যুক্তফ্রন্ট সরকার প্রতিষ্ঠিত হবার সঙ্গে সঙ্গে জরুরী কাজ শুরু করে দেওয়া সম্ভব হবে। বৃহৎ মতানৈক্যের ক্ষেত্রেও প্রায় নেই।

জাহাঙ্গীর কবির : পরিচ্ছন্ন শাসন-ব্যবস্থা এবং বলিষ্ঠ ও বাস্তব কার্যসূচী থাকলে দলত্যাগের সম্ভাবনা কম। তবে দলত্যাগ যে ঘটবে না—একথা জোর করে বলা যায় না। কারণ সুবিধাবাদ দেশকে ছেয়ে ফেলেছে।

অশোক ঘোষ : দলত্যাগ যে একদম ঘটবে না—এ কথা বলা যায় না। তবে প্রার্থী বাছাই করার সময় দলগুলি যদি সতর্ক হয়ে প্রার্থী দেন এবং গণ-আন্দো-লনের চাপ যদি ঠিক মত থাকে, তবে দলত্যাগ বন্ধ হবে। বাংলা কংগ্রেস থেকেই দলত্যাগ ঘটেছিল। তাঁদের দল নতুন হওয়ায় অনেক ক্ষেত্রে এমন সব প্রার্থীকে তাঁরা মনোনীত করেছিলেন, যাঁরা প্রকৃত-পক্ষে প্রতিক্রিয়াশীল শক্তির প্রতিনিধি। কাজেই যুক্তফ্রন্ট সরকার যখন জনগণের স্বার্থে কাজ করতে লাগলেন, তখন তাঁদের পক্ষে ঐ সরকারকে আর সমর্থন করা সম্ভব হয় নি। তাঁরা বিদ্রোহ করলেন অর্থাৎ দলত্যাগ করলেন।

কিন্তু এবার বাংলা কংগ্রেস জোতদার, ব্যবসাদার প্রভৃতি প্রতিক্রিয়াশীল লোক-দের প্রার্থী মনোনীত করেন নি। বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই ওঁরা এবার গণ-আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত লোককেই প্রার্থী মনোনীত করেছেন। কাজেই দলত্যাগের সম্ভাবনা কম।

সুকুমার রায় : প্রথম কথা হচ্ছে, দলত্যাগ করার মত প্রার্থী এবার আমরা মনোনীত করি নি। যতরকম সতর্কতা অবলম্বন করা সম্ভব তা করা হয়েছে। এবার যুক্তফ্রন্টের প্রার্থী এত বেশি সংখ্যায় নির্বাচিত হবেন—যার ফলে যদি কারোর দলত্যাগের ইচ্ছাও থাকে—তবে তিনি তা করতে সক্ষম হবেন না। আমি আশা করছি কংগ্রেসের মধ্যে দলত্যাগ হবে। কংগ্রেসের মধ্যে অন্তর্দ্বন্দ্ব যেভাবে প্রকট হয়ে উঠেছে তাতে শুধু দলত্যাগই নয়, কংগ্রেস সংগঠনেও কঠিন আঘাত হানবে। কংগ্রেস প্রার্থী বাছাই সম্পর্কে কোনও নীতি বা আদর্শের প্রশ্ন রাখেন না।

প্রার্থী মনোনয়নের সময় প্রত্যেক প্রার্থীর গুণাগুণ বাছাই-এর ভার যে পর্যায়ে যুক্তফ্রন্টের ওপর ছিল এবং এখনও আছে। যুক্তফ্রন্টের দলগুলি অনেক বেশি

'ডিসিপ্লিন্ড' এবং 'রেজিমেন্টেড'-ও বটে। যুক্তফ্রন্টের শরিকগণ আন্দোলনের মধ্য দিয়েই পরস্পর পরস্পরের কাছাকাছি এসেছে। প্রতিক্রিয়াশীল আদর্শভ্রষ্ট সদস্যেরা এখন বাংলা কংগ্রেস থেকে বিদায় নিয়ে গেছে।

মাখন পাল : দলত্যাগ ঘটবে না বলেই আমার ধারণা। প্রতিটি আসনে প্রার্থী দেবার আগে আমরা যথেষ্ট বিচার-বিবেচনা করেই প্রার্থী দিয়েছি। আর যদি তেমন অঘটন ঘটেও তাতেও যুক্তফ্রন্ট সরকারের পতন ঘটার সম্ভাবনা কম। আমাদের 'মেজরিটি' অনেক বেশি হবে।

হরিপদ ভারতী : না তার কোনও নিশ্চয়তা নেই। আমি আশংকা করি যে, এবারকার এই অন্তর্বর্তী নির্বাচনে কোনও দল বা ফ্রন্টই নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করতে পারবে না। ফলে কোয়ালিশন সরকার গঠন করা ছাড়া কোনও দিকেই কোনও গত্যন্তর থাকবে না। প্রার্থী বাছাই-এর যে নমুনা ইতিমধ্যে বহু স্থানে দেখা দিয়েছে, তাতে অন্য কারণেও দল-ত্যাগের সম্ভাবনা রয়েছে। তাই সংযুক্ত সরকার গঠন ও প্রার্থী নির্বাচনের পরি-প্রেক্ষিতে স্থায়ী সরকারের আশা বোধ করি অনেকটা ভিত্তিহীন।

এই প্রসঙ্গে দলত্যাগী গিরীন মণ্ডল সম্পর্কে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করা হলে হরিপদ ভারতী বলেন : গিরীন মণ্ডল ১৯৫২ সাল থেকেই জনসঙ্ঘের মনোনীত প্রার্থিরূপে নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে আসছেন। ১৯৬৭ সালের সাধারণ নির্বাচনে জনসঙ্ঘের মনোনীত প্রার্থিরূপেই তিনি জয়লাভ করেন। ফ্রন্ট সরকার গঠনের সময় সরকারপক্ষের সমর্থক এম এল এ-দের তালিকায় জনসঙ্ঘের অনুমতিক্রমেই তিনি স্বাক্ষর দিয়েছিলেন। কিন্তু পরবর্তীকালে জনসঙ্ঘকে সম্পূর্ণভাবে অন্ধকারে রেখেই তিনি আশুতোষ ঘোষ মহাশয়ের আশ্রয় নেন। এবং যথারীতি জনসঙ্ঘের সদস্য-পদ ত্যাগ না করেই অন্য দলভুক্ত হন।

জনসঙ্ঘের কার্যকরী সমিতি পরবর্তী-কালে এক অধিবেশনে গিরীনবাবুর বিরুদ্ধে দলত্যাগের ও বিশ্বাসভঙ্গের কারণে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করেন ও দল থেকে তাঁকে বিতাড়িত করেন। বিস্ময়ের বিষয়, এত কাণ্ডের পরও অন্তর্বর্তী নির্বাচনের পরিপ্রেক্ষিতে তিনি জনসঙ্ঘের নির্বাচনী প্রতীক ব্যবহার করার অনুমতি প্রার্থনা করেছিলেন। বলা বাহুল্য সে অনুমতি তাঁকে দেওয়া হয় নি।

এবার আমরা নির্বাচনে প্রার্থী মনো-নয়নের ব্যাপারে প্রার্থীর রাজনৈতিক নিষ্ঠা ও ব্যক্তিগত সুনামের দিকে অধিকতর দৃষ্টি দিয়েছি। জনসঙ্ঘের প্রতি আন্তরিকভাবে অনুগত ব্যক্তিদেরই মনোনয়ন দেওয়া হয়েছে। আশা করা যায়, দলত্যাগের বিড়ম্বনা থেকে জনসঙ্ঘ মুক্ত থাকতে পারবে।

ডঃ ভূপাল বসু : সংবিধানের পরি-বর্তন ছাড়া দলত্যাগ বন্ধ করা সম্ভব নয়। দলত্যাগ করলেই তাকে পুনর্নির্বাচিত হওয়া উচিত। যুক্তফ্রন্টের মধ্যেই কিছু কিছু দল আছে যাদের নির্দিষ্ট কোনও মতাদর্শ এখনও গড়ে ওঠে নি। যার ফলে, দলত্যাগ যে ঘটবে না—তা জোর করে বলা যায় না।

৬। প্রঃ ভারতবর্ষের রাজ্যগুলিতে যেভাবে সরকারের পতন হচ্ছে, তার ফলে ভারতের রাজনৈতিক জীবনে এক-নায়ক-তন্ত্রের পথ প্রশস্ত হচ্ছে না কি?

উঃ বিশ্বনাথ মুখোপাধ্যায় : কংগ্রেস এমন অবস্থার সৃষ্টি করেছে, যার ফলে দেশে বর্তমানে দারুণ অর্থনৈতিক সংকট দেখা দিয়েছে। গণতন্ত্রকে হত্যা করেছে কংগ্রেস। দলত্যাগ ও আরও অন্যান্য কারণে রাজ্য সরকারগুলির উত্থান-পতনকে উপলক্ষ করে প্রতিক্রিয়াশীল শক্তির দ্বারা 'ডিক্টেটরশিপ' প্রতিষ্ঠিত করার চেষ্টা হতেও পারে। গণতান্ত্রিক দলগুলির কর্তব্য হল গণতন্ত্রকে বাঁচিয়ে রাখবার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করা।

সুবোধ বন্দ্যোপাধ্যায় : আমরা বিশ্বাস করি যে, ফ্যাসিবাদ দ্রুতগতিতে ভারতের সমাজজীবনে শেকড় গাড়ছে এবং সেটা ঘটছে সংসদীয় গণতন্ত্রের মাধ্যমেই। ফলে বুর্জোয়া গণতন্ত্রের যে সীমিত অধিকার-গুলি এরূপ সংবিধানে স্বীকৃত হয়েছিল—সেগুলি ধীরে ধীরে কেড়ে নেওয়া হচ্ছে। তার লক্ষণ হল অর্থনৈতিক কেন্দ্রীভবন, বেসরকারী একচেটিয়া পুঁজির সঙ্গে সরকারী পুঁজির মিলনের মাধ্যমে রাষ্ট্রীয় একচেটিয়া পুঁজিরাদের জন্ম, রাষ্ট্রের হাতে রাজনৈতিক ক্ষমতার ক্রমকেন্দ্রীকরণ এবং সাংস্কৃতিক জীবনকে 'রেজিমেন্ট' ও এক বিশেষ ধাঁচে পরিকল্পনা এবং এ-সবের মধ্য দিয়ে 'more and more identification of the state with the interests of the monopolists'—ফ্যাসিবাদের এই সব লক্ষণগুলি আমাদের দেশে দেখা দিয়েছে। এইটাই তো এক-নায়কতন্ত্রের লক্ষণ।

তবে হ্যাঁ, দল-বদল প্রভৃতির মধ্য দিয়ে এবং বামপন্থী দলগুলি এই রাজনৈতিক ডামাডোলে জনসাধারণকে যদি সঠিক পথে পরিচালিত করতে না পারে—তা হলে বাম-পন্থী দলগুলির প্রতি জনগণের আস্থা হারানোর যথেষ্ট সম্ভাবনা দেখা দেবে। এবং জনসাধারণের মধ্যে হতাশাও দেখা দেবে। এ অবস্থা ফ্যাসিবাদের অগ্রগতিকে সাহায্যই করবে।

জ্যোতি ভট্টাচার্য : ফ্যাসিবাদের সম্ভাবনা ক্ষয়িষ্ণু ধনতন্ত্রে ও সংসদীয় গণতন্ত্র জীর্ণ অবস্থা প্রাপ্ত হলে থাকে। ভারতবর্ষে সেই সম্ভাবনা আছে। কিন্তু ভারতবর্ষের কয়েকটি রাজ্যে সমাজতন্ত্রী আন্দোলন সংগঠিত এবং সজীব। যদিও ভারতের সব রাজ্যে এই আন্দোলন একই স্তরে নেই। এখন একটা অনিশ্চিত অবস্থা চলছে। এখানে ফ্যাসিবাদের সম্ভাবনা যেমন আছে তেমনি সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের সম্ভাবনাও আছে।

স্বতন্ত্র জনসঙ্ঘ প্রভৃতি সংকীর্ণ মাত্রারলম্বী (Parochial) ও প্রতিক্রিয়া-শীল গোষ্ঠীগুলি এই পরিস্থিতিতে কোথাও কোথাও শক্তিসঞ্চয় করেছে। ভারতীয় ধনিকশ্রেণী—এদেরও কংগ্রেসেরই মতন সাহায্য করছে। কিন্তু এই দলগুলির কোনও রকম সর্বভারতীয় ভূমিকা নেই। এবং এদের রাজনীতি সর্বভারতীয় চরিত্রের নয়। কাজেই সারা ভারতবর্ষ জুড়ে কোনও শক্তিশালী শাসন প্রতিষ্ঠা করা এদের পক্ষে খুবই কষ্টসাধ্য। মার্কসবাদী দলগুলিরই সর্বভারতীয় ভূমিকা গ্রহণ করার সম্ভাবনা আছে। কোনও কোনও প্রতিক্রিয়াশীল গোষ্ঠী বিভিন্ন রাজ্যে নিজেদের অবস্থা সম্পর্কে হতাশ হয়ে নির্বাচনের পরিবর্তে রাষ্ট্রপতির শাসন চালু রাখার কথা বলছে। এই চিন্তাধারা ফ্যাসিবাদের দিকে একটা প্রবণতার সূচনা করে। কিন্তু আমরা ভরসা রাখি যে, জন-সাধারণের সংগঠিত ঐক্য এই প্রবণতাকে সমূলে বিনষ্ট করতে সক্ষম।

জাহাঙ্গীর কবির : খুব বেশি সম্ভাবনা রয়েছে। জনগণ খুব বেশি সজাগ না হলে গণতন্ত্রকে রক্ষা করা যাবে না। আমাদের দল গণতন্ত্রে বিশ্বাসী। গণতন্ত্রী মানুষের সঙ্গেই আমরা আছি। গণতন্ত্রকে রক্ষা করতে গেলে কেন্দ্রে ও রাজ্যে জাতীয় সরকার গঠিত হওয়া উচিত। বিভিন্ন দলের আদর্শের কচকচানি অন্তত কিছু-দিনের জন্য বন্ধ রাখা একান্ত কর্তব্য। একক কংগ্রেস গত একুশ বছর দেশকে নেতৃত্ব দিতে ব্যর্থ হয়েছে। কাজেই সর্ব-দলীয় জাতীয় সরকার দেশকে সুষ্ঠু নেতৃত্ব দিতে সক্ষম হবে বলে আমরা বিশ্বাস করি।

অশোক ঘোষ : কংগ্রেসের পরাজয়ের পর দেখা যাচ্ছে যে প্রতিক্রিয়াশীল শক্তি-গুলি মাথাচাড়া দিয়ে উঠছে। উদাহরণ-স্বরূপ জনসঙ্ঘ, স্বতন্ত্র প্রভৃতি দলগুলির উল্লেখ করা যায়। এদেশের শিল্পপতিরা ও বৃহৎ জোতদারগণ এইসব দলগুলিকে 'second line of defence' হিসাবে ব্যবহার করছে। তার ফলে উত্তর-ভারতের রাজ্যগুলিতে প্রতিক্রিয়াশীল শক্তিগুলি যে অনিশ্চিত অবস্থার সৃষ্টি করেছে, তা থেকে রক্ষা পেতে গেলে এই

সব রাজ্যে প্রকৃত গণতন্ত্র, সমাজতন্ত্র ও ধর্মনিরপেক্ষ নীতিতে বিশ্বাসী শক্তিগুলির ঐক্য একান্ত প্রয়োজন। এই ঐক্যের মাধ্যমে রাজনৈতিক অস্থিরতার হাত থেকে মুক্তি পাওয়া সম্ভব।

পশ্চিম বাংলায় যুক্তফ্রন্ট সরকারকে যেভাবে সরানো হয়েছে—তা থেকে বোঝা যায় যে, ধনিকশ্রেণী নিজেদের শ্রেণীস্বার্থ রক্ষার জন্য এদেশে সংসদীয় গণতন্ত্রের সৃষ্টি করেছে এবং যে-মুহূর্তে ধনিকশ্রেণী বুঝবে যে জনগণ সেই গণতান্ত্রিক শাসনযন্ত্রগুলিকে দখল করেছে—সেই মুহূর্তেই এদেশের পুঁজিপতিরা তাদের নিজেদের সৃষ্ট ঐ গণতান্ত্রিক শাসন-কাঠামোকে নিশ্চিহ্ন করে দিয়ে স্বৈরাচারী শাসনব্যবস্থা গড়ে তুলতে দ্বিধা করবে না। ভারতে তাই স্বৈরাচারী শাসনব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হবার সম্ভাবনা আছে। ধনিকশ্রেণীর প্রতিনিধি হিসাবে কংগ্রেসই স্বৈরাচারী শাসনব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত করতে চেষ্টা করছে। সঙ্কটের দিনে দেখা যাবে কংগ্রেস, স্বতন্ত্র, জনসঙ্ঘ প্রভৃতি দলগুলি একসারিতে দাঁড়িয়ে।

সুকুমার রায় : না, আমার নিজের মনে হয় যে, মতাদর্শের সংঘাতে ফ্যাসিবাদ আসবে না। তার কারণ শেষ পর্যায়ে দুটি শক্তি দাঁড়াবে। একটি প্রতিক্রিয়াশীল দক্ষিণপন্থী ও অন্যটি গণতান্ত্রিক বামপন্থী শক্তি। এ দুয়ের সংঘাতে, নিঃসন্দেহে বলা চলে যে, সাধারণ মানুষ গণতান্ত্রিক বামপন্থী শক্তির দিকে রায় দেবে।

মাখন পাল : আন্তর্জাতিক ধনবাদী সঙ্কট এবং সেই সঙ্গে ভারতের অনুন্নত ধনবাদের সঙ্কট—এই উভয়সঙ্কটে নিপতিত হয়ে ভারতীয় ধনিকশ্রেণীর প্রতিভূ কেন্দ্রীয় কংগ্রেস সরকারের পক্ষে ফ্যাসিবাদী পথ গ্রহণের প্রবণতা দেখা যাচ্ছে। ইতিমধ্যেই শ্রমজীবী জনগণের গণতান্ত্রিক অধিকার হরণের উদ্দেশ্যে আইন প্রণয়ন থেকেও এর আভাষ সুস্পষ্ট।

হরিপদ ভারতী : গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে ও সাংবিধানিক উপায়ে প্রতিষ্ঠিত সরকারগুলি যেভাবে একের-পর-এক ব্যর্থতার পরিচয় রাখছে এবং ক্ষুব্ধ জনমানসে ধীরে ধীরে নির্বাচন ও জনপ্রতিনিধিত্বমূলক সরকারের সম্বন্ধে যে সন্দেহ ঘনীভূত হচ্ছে, তাতে যদি কোনও সামরিক অভ্যুত্থানের মাধ্যমে একনায়কত্বের প্রতিষ্ঠার পথ ভারতবর্ষে প্রস্তুত হয়, তাহলে খুব বিস্ময়ের কিছু থাকবে বলে মনে হয় না। তবে এটা ভবিষ্যতের চিন্তা। বর্তমানে তেমন ক্ষেত্র প্রস্তুত হয়েছে বলে মনে করি না।

তাছাড়া ভারতবর্ষের বিস্তৃতি ও জনসংখ্যার অনুপাতে এ ধরণের সামরিক অভ্যুত্থান আপাতত কষ্ট-কল্পনা।

ডঃ ভূপাল বসু : না, কোনও সম্ভাবনা নেই। কংগ্রেসের নেতাদের দেশ পরিচালনার যোগ্যতা নেই। কাজেই তাঁরা তাঁদের প্রয়োজনে একনায়কতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করতে সাহায্য করতে পারে।

৭। প্রঃ দলত্যাগ বন্ধের জন্য কোনও আইন প্রণয়নের প্রয়োজন আছে বলে মনে করেন?

ডঃ বিশ্বনাথ মুখোপাধ্যায় : আইন করা কঠিন। আইনসভার কোনও সদস্য যদি সরকার পক্ষ থেকে বিরোধী পক্ষে যায়, অথবা বিরোধী পক্ষ থেকে সরকার পক্ষে আসে, তবে ঐ সদস্যকে আইনসভার সদস্যপদ ত্যাগ করে ছ'-মাসের মধ্যে আবার নির্বাচনের সম্মুখীন হওয়া উচিত।

সুবোধ বন্দ্যোপাধ্যায় : নিশ্চয়ই। 'Right to Recall' আমাদের দেশে হওয়া দরকার। শুধু দলত্যাগ বন্ধ করার জন্য কেন, কোনও নির্বাচিত প্রতিনিধি যদি নির্বাচিত হবার পর নির্বাচকমণ্ডলীর স্বার্থের বিরুদ্ধে কাজ করে, তা হলে তাকে নির্বাচিত পদ থেকে বিতাড়িত করার জন্য ভোটারদের "Right to Recall" থাকা দরকার।

জ্যোতি ভট্টাচার্য : জনসাধারণ ইচ্ছে করলে তাঁদের নির্বাচিত প্রতিনিধিকে পদত্যাগে বাধ্য করতে পারেন—এ অধিকার (Right to Recall) জনগণের থাকা উচিত। দলত্যাগ বন্ধের জন্য আইন থেকে "Right to Recall" অনেক বেশি কার্যকরী।

জাহাঙ্গীর কবির : আইন করে দলত্যাগ বন্ধ করা যায় না। জনমতের চাপই দলত্যাগ বন্ধ করতে পারে। এ ছাড়াও যদি দলত্যাগী সদস্যকে পুনরায় নির্বাচিত হতে বাধ্য করা হয়—তবে দলত্যাগ বন্ধ হতে পারে।

অশোক ঘোষ : আইন করে দলত্যাগ বন্ধ করা যায় না। দলগুলি যদি তাদের সাংগঠনিক দুর্বলতা দূর করতে পারে এবং গণতান্ত্রিক জনমত যদি প্রবল থাকে, তবেই দলত্যাগ বন্ধ করা সম্ভব।

সুকুমার রায় : আইন দ্বারা দলত্যাগ বন্ধ করা সম্ভব নয়। তবে আইনের প্রয়োজন আছে।

মাখন পাল : না। আইন করে দলত্যাগ বন্ধ করা যায় না। দলের কর্মী বাছাই সম্পর্কে স্থির নীতি গ্রহণ করলেই দলত্যাগ বন্ধ হয়।

হরিপদ ভারতী : হ্যাঁ মনে করি। আমি মনে করি, যে যে দলের প্রার্থিরূপে জনগণের ভোট নিয়ে নির্বাচনে জয়ী হবেন, সেই দল পরিত্যাগ করলে তাঁর আইনসভার সদস্যপদ বাতিল হওয়া বাঞ্ছনীয় এবং ঐ কেন্দ্রে পুনরায় নির্বাচনের সুযোগ সৃষ্টি করা দরকার।

ডঃ ভূপাল বসু : আইনের দরকার আছে—অর্থাৎ সংবিধানের পরিবর্তন করা দরকার। Functional basis of the constitution হওয়া উচিত। এখনকার basis হচ্ছে Mechanical।

৮। প্রঃ এক সময়ে যুক্তফ্রন্ট সরকারের সমর্থক হয়েও যাঁরা পরে যুক্তফ্রন্ট সরকারের বিরোধী কাজ করে সরকারের পতন ঘটাতে সাহায্য করলেন তাঁরা এবারও রাজনীতির আসরে আছেন—তাঁদের কার্যকলাপ সাম্প্রদায়িকতার দোষে দুষ্ট কি?

ডঃ বিশ্বনাথ মুখোপাধ্যায় : কবির সম্পর্কে কিছু জানি না। জনসঙ্ঘ, হিন্দু মহাসভা, প্রোগ্রেসিভ মুসলিম লীগ প্রভৃতি সাম্প্রদায়িক দল। যদিও লীগ খুবই ক্ষুদ্রশক্তি তথাপি লীগের আবির্ভাবে হিন্দু Communalism বাড়তে সাহায্য করবে। বুর্জোয়া সমাজে এ জিনিস থাকবে। তবে একে দমন করতে যথাসাধ্য চেষ্টা করতে হবে। Communal forces are tolerated by the ruling class.

সুবোধ বন্দ্যোপাধ্যায় : এটা সাম্প্রদায়িকতার প্রশ্ন নয়, বুর্জোয়া গণতন্ত্রের অত্যন্ত সীমাবদ্ধ জনসাধারণের অধিকারের প্রতি এদের যে কণামাত্র শ্রদ্ধা নেই এবং এদের যে কোনও রাজনৈতিক scruple নেই, তাদের ব্যবহারে এটাই প্রমাণ করে।

আমাদের মনে হয়, এদের কোনও প্রভাব জনসাধারণের উপর নেই। তবে এদের প্রকৃত চরিত্র জনসমক্ষে উদ্‌ঘাটিত করা প্রয়োজন এবং সেটা সম্ভব সঠিক নীতির ভিত্তিতে রাজনীতির প্রচার।

জ্যোতি ভট্টাচার্য : না। যুক্তফ্রন্টকে যাঁরা ভেঙে দেবার জন্য উঠে পড়ে লেগেছিলেন—প্রকৃতপক্ষে তাঁরা সর্বসম্প্রদায়েরই প্রতিক্রিয়াশীলদের প্রতিনিধি। আজকের পরিস্থিতিতে সারা ভারতেই প্রতিক্রিয়াশীলরা বিবিধ উপায়ে জনসাধারণের ঐক্য ও সংহতি ভাঙবার চেষ্টা করছে—সাম্প্রদায়িকতা, ভাষা নিয়ে কলহ ইত্যাদি এদের অবলম্বিত উপায়ের অন্তর্গত। পশ্চিমবঙ্গের যুক্তফ্রন্টের বিরোধীদের মধ্যে সাম্প্রদায়িকতাবাদীরাও আছেন। সন্দেহ করার মত যথেষ্ট কারণ আছে যে, এই সব আপাতদৃষ্টিতে পরস্পর-বিরোধী সাম্প্রদায়িকতাবাদী গোষ্ঠী ও ভাষাপ্রেমিক গোষ্ঠীর পিছনে এক শক্তিশালী বিদেশী সাম্রাজ্যবাদ সক্রিয়।

অশোক ঘোষ : না তা ভাবার কোনও কারণ নেই। এই সব প্রতিক্রিয়াশীল শক্তি-

গুলি নানারকম জিগির তুলে রাজনৈতিক জগতে বাঁচতে চেষ্টা করতে পারে।

সুকুমার রায় : এই সব লোকগুলো এখন জনগণের কাছে এত হেয় যে তাদের প্রকৃতপক্ষে জনগণের উপর কোনও প্রভাব নেই। কারো কারো সামান্য ব্যক্তিগত প্রভাব থাকতে পারে। তবে বাংলাদেশের জনগণ এত বেশি সচেতন, যার ফলে সাম্প্রদায়িকতার ধুয়ো তুলেও কিছু করতে পারবেন না।

মাখন পাল : এঁদের বিভিন্ন প্রচারের মধ্যে কিছু কিছু ইঙ্গিত পাওয়া যায়।

ডঃ ভূপাল বসু : না তা নয়।

৯। প্রঃ নকশালপন্থী কমিউনিস্টরা নির্বাচন চাইছেন না। আপনার দলের এই প্রচারে কি কিছু ক্ষতি হবার সম্ভাবনা আছে?

উঃ বিশ্বনাথ মুখোপাধ্যায়ঃ নির্বাচন সম্পর্কে এদের প্রচার কংগ্রেসকে সাহায্য করবে। এরা যুক্তফ্রন্টের খুব কমই ক্ষতি করতে পারবে। Marginal ক্ষেত্রে হয় তো ক্ষতি হলেও হতে পারে। জনগণের দৃষ্টি সজাগ থাকায় এরা জনগণকে ভোট দেওয়া থেকে বিরত করতে পারবে না। যুক্তফ্রন্টের জয়-পরাজয় ওদের উপর নির্ভর করছে না। তবে ওদের প্রচার harmful, কিন্তু এরা যুক্তফ্রন্টের disaster আনতে পারবে না।

সুবোধ বন্দ্যোপাধ্যায় : আমরা যে সব জায়গায় প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছি, সেখানে নকশালপন্থীদের কোনও প্রভাব নেই। আমাদের মনে হয়, জনসাধারণের রাজনৈতিক সচেতনতা, সঙ্ঘবদ্ধতা ও Militancy যে স্তরে থাকলে এবং দেশের মধ্যে যে-ধরণের flow of revolutionary movements থাকলে জনগণের কাছে নির্বাচন বয়কটের slogan বাস্তবভাবে কার্যকরী হয়, আমাদের দেশের এখন সে-অবস্থা নয়। পরে ও slogan ফলপ্রসূ হবে বলে মনে হয় না।

জ্যোতি ভট্টাচার্য : না, আমার দলের এতে কোনও ক্ষতি হবে না। নকশালপন্থীদের প্রকৃতপক্ষে জনগণের উপর কোনও কার্যকরী প্রভাব নেই। এঁরা যদি জনসাধারণকে প্রভাবিত করতে সক্ষম হন, তাহলে এঁদের নেতিমূলক বক্তব্যের দ্বারা গণ-আন্দোলনের ক্ষতি হবে। অত্যন্ত দুঃখের কথা যে, এঁরা নির্বাচন বয়কট করার বক্তব্যের সঙ্গে চীন-বিপ্লবের শিক্ষা ও মাও সে-তুং-এর চিন্তাধারার কথা উল্লেখ করেন। এঁরা অপরকে মাও সে-তুং-এর রচনা অধ্যয়ন করার উপদেশ দেন। কিন্তু নিজেরা বোধ হয় সে পরিশ্রমটুকু করেন না। চীন-বিপ্লবের কোনও স্তরেই নির্বাচন বয়কট করার কথা বলা হয় নি। চীন-এ সংবিধানও ছিল না, জনসাধারণের ভোটাধিকারও ছিল না। সর্বজনীন ভোটাধিকারের ভিত্তিতে নির্বাচন মারফৎ সরকার গঠন করা হোক—এটাই ১৯৪৯ সাল পর্যন্ত (অর্থাৎ চীনা-মুক্তি-সংগ্রামের জয়লাভ পর্যন্ত) চীন-বিপ্লবের অন্যতম প্রধান দাবি ছিল। জাপানের পরাজয়ের পরও, মাও, চিয়াং কাই-সেক্-এর সঙ্গে যুক্ত সরকার গঠনের প্রস্তাব দিয়েছিলেন এবং সেই ভিত্তিতে চুক্তিও সম্পাদিত হয়েছিল। এই চুক্তির অন্যতম সর্ত ছিল সর্বজনীন ভোটাধিকারের ভিত্তিতে নির্বাচন। চিয়াং-কাই-সেকই এই চুক্তি রক্ষা না করে গৃহযুদ্ধ সুরু করেন এবং সেই গৃহযুদ্ধের সমাপ্তিতে চীনা কমিউনিস্ট পার্টি ক্ষমতা দখল করেন।

চীনা-মুক্তি-সংগ্রামের ইতিহাস আমাদের এই শিক্ষাই দেয় যে, যুক্তফ্রন্ট ও সর্বজনীন ভোটাধিকারের ভিত্তিতে নির্বাচনের মাধ্যমে যত দূর অগ্রসর হওয়া যায়, তার প্রচেষ্টা করতে হবে। সেই প্রচেষ্টার শেষে জনসাধারণ ক্ষমতা দখলের জন্য বিপ্লবী সংগ্রামের একান্ত প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে কৃতনিশ্চয় হলে তখনই বিপ্লব জয়যুক্ত হয়।

জাহাঙ্গীর কবির : যাঁরা গণতন্ত্রে বিশ্বাস করেন না, তাঁরা জনসাধারণকে ভোট দেওয়া থেকে বিরত থাকতে বলতে পারেন। জনগণের উপর এঁদের প্রভাব এখনও বিস্তৃত হয় নি।

অশোক ঘোষ : আমরা মনে করি না যে এঁদের এই প্রচার ভোটের সময় ভোটারদের প্রভাবিত করবে। এঁদের প্রচার বামপন্থী চিন্তাধারা সম্পন্ন লোকেদের মধ্যে কিছু কিছু বিভ্রান্তি সৃষ্টি করছে এবং যার সুযোগ কংগ্রেস গ্রহণ করবে।

সুকুমার রায় : এঁদের শ্লোগান জনসাধারণ মেনে নিচ্ছে না। আমাদের দলের উপর ওঁদের কার্যকলাপের কোনও প্রতিক্রিয়া হবে না।

মাখন পাল : না।

হরিপদ ভারতী : আমাদের কোনও ক্ষতি করতে পারবে না।

ডঃ ভূপাল বসু : না, এঁদের কাজকর্মে আমাদের দল কোনওরকম ক্ষতিগ্রস্ত হবে না। এঁদের জনগণের উপর কোনও প্রভাব নেই। এঁরা রোমান্টিক। 'রোমান্স' আর 'রেভ্যুলিউশন' এক কথা নয়।

১০। প্রঃ কংগ্রেস দল বলছে, যে, কংগ্রেসই স্থায়ী সরকার (Stable Govt.) গঠন করতে সক্ষম; এ বিষয়ে আপনার অভিমত কি?

উঃ বিশ্বনাথ মুখোপাধ্যায়ঃ যুক্তফ্রন্টই 'Stable Govt.' গঠন করতে সক্ষম হবে। সরকার যদি তার কর্মসূচী নিয়ে এগিয়ে যায়, তবে কিছু কিছু মতভেদ দেখা দিলেও সরকার ঠিক এগিয়ে যেতে সক্ষম হবে। মতভেদ মানেই মত-বিরোধ নয়।

সুবোধ বন্দ্যোপাধ্যায় : যুক্তফ্রন্টের পক্ষে Stable Govt. গঠন না করার কোনও কারণ নেই।

জ্যোতি ভট্টাচার্য : যুক্তফ্রন্ট সরকার আপনা থেকে ভাঙবে না। কিন্তু আজকে ভারতের কোনও রাজ্যে সরকারের স্থায়িত্ব নির্ভর করে কেন্দ্রীয় সরকারের সংবিধান ও গণতান্ত্রিক নীতি মেনে চলার উপর। সরকারের স্থায়িত্ব তখনই বাঞ্ছনীয়—যখন সরকার জনসাধারণের পক্ষে মঙ্গলজনক। যে-সরকার জনস্বার্থবিরোধী, সে-সরকারের স্থায়িত্ব কখনই বাঞ্ছনীয় নয়।

জাহাঙ্গীর কবির : স্থায়ী সরকার গঠিত হবে, এই আশা রেখেই আমরা নির্বাচনে অংশ গ্রহণ করছি।

অশোক ঘোষ : স্থায়ী সরকার গঠিত হবে। এবং যুক্তফ্রন্টই বাংলাদেশে স্থায়ী সরকার গঠন করতে পারে।

সুকুমার রায় : যুক্তফ্রন্ট স্থায়ী সরকার গঠন করতে সক্ষম হবে।

মাখন পাল : কংগ্রেসের এই যাগাড়ম্বরের কোনও ভিত্তি নেই। কারণ ১৯৬৭ সালের নির্বাচনের পর পশ্চিমবঙ্গকে বাদ দিয়ে উত্তর ভারতের প্রায় প্রতিটি রাজ্যে কংগ্রেসের ভাঙনের ফলেই অকংগ্রেসী সরকার গঠিত হয়েছে। হরিয়ানাতে একক সংখ্যাগরিষ্ঠ হওয়া সত্ত্বেও আজকে যে শোচনীয় ঘটনা ঘটছে—তাতেও প্রমাণ হয় যে, কংগ্রেসের পক্ষে স্থায়ী সরকার গঠন করা সম্ভব নয়।

যুক্তফ্রন্ট স্থায়ী সরকার গঠন করতে পারবে এই কারণে যে, ফ্রন্টের অন্তর্ভুক্ত দলগুলির মতবাদগত পার্থক্য থাকা সত্ত্বেও বর্তমান কংগ্রেসশাসনের বিরুদ্ধে একটি সম্মিলিত কর্মসূচীতে তাঁরা আস্থাবান। এবং বিগত যুক্তফ্রন্ট সরকারের আমলেও ঐ নীতি ও কর্মসূচীকে সঠিকভাবে রূপায়িত করার ক্ষেত্রেই কোনও কোনও সময়ে নিজেদের মধ্যে তর্ক-বিতর্ক হয়েছে; কিন্তু তা প্রতিশ্রুত নীতি থেকে বিচ্যুত হবার জন্য নয়। যুক্তফ্রন্টের ৯ মাসের কার্যকলাপ থেকে এ-কথা অত্যন্ত স্পষ্টভাবেই প্রমাণিত হয়।

কংগ্রেস যে স্থায়ী সরকার গঠনের শ্লোগান তুলেছে তা বাস্তবিকপক্ষে জনসাধারণকে পরোক্ষভাবে শাসানিরই নামান্তর মাত্র। তবে এতেও কোনও কাজ হবে না।

হরিপদ ভারতী : খুব শক্ত। দলত্যাগের সম্ভাবনা রয়ে গেছে এবং তা সব দিকেই। বাংলাদেশ সম্পর্কে আমার ধারণা আগামী বেশ কিছুকাল ক্ষমতার লড়াই-এ অনেক উত্থান-পতনের ইতিহাস

রীচিত হবে। কংগ্রেসের মধ্যে দলাদলি ও অন্তর্দ্বন্দ্ব সব দলের থেকে বেশি। কংগ্রেসের ভবিষ্যৎ কিছু নেই।

ডঃ ভূপাল বসু : এখন কিছু বলা যায় না।

১১। প্রঃ আপনাদের দল যদি সংখ্যাগরিষ্ঠ হতে না পারে, তা হলে অন্য কোনও দলের সহযোগিতায় সরকার গঠন করবেন কি?

উঃ বিশ্বনাথ মুখোপাধ্যায় : আমি এটা কল্পনা করতেই পারি না। জনগণ বোকা নন, তাঁরা যুক্তফ্রন্টকে ভোট দেবেন এবং যুক্তফ্রন্ট সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করে সরকার গঠনে সক্ষম হবে।

সুবোধ বন্দ্যোপাধ্যায়ঃ Alliance কর্মসূচীর মাধ্যমে গড়ে ওঠে। তা ছাড়া ও-জিনিসের কোনও মূল্য নেই। সেটা সম্ভব কি, সম্ভব নয় তা বাস্তব অবস্থা বিবেচনা না করে বলা যায় না। আগে থেকে কোনও Hypothical প্রশ্নের উত্তর দেওয়া ঠিক নয়।

জ্যোতি ভট্টাচার্য : আমাদের কারোর সঙ্গে Coalition করার দরকার হবে না। যুক্তফ্রন্ট এককভাবে সরকার গঠন করতে সক্ষম হবে। যুক্তফ্রন্টের বাইরে যাঁরা রয়েছেন তাঁদের মধ্যে লোরুমেরক সঙ্ঘ (পুরুলিয়া) যুক্তফ্রন্টের সমর্থক।

অশোক ঘোষ : সে অবস্থা হবে বলে মনে হয় না। যুক্তফ্রন্টের কর্মসূচীর সঙ্গে যাঁরা এক মত হতে পারবেন, তাঁদের সঙ্গেই Alliance-এর প্রশ্ন উঠতে পারে।

মাখন পাল : আমরা বিশ্বাস করি যে আমরা সরকার গঠনে সমর্থ হব। যদি অন্যরকম কিছু ঘটে, তবে সেক্ষেত্রেও যথাকর্তব্য যুক্তফ্রন্টই ঠিক করবেন। ভবিষ্যতের অবস্থা ও কেন্দ্রের নির্দেশ প্রভৃতির উপর কোয়ালিশনের প্রশ্ন নির্ভর করবে। কংগ্রেসের সঙ্গে কোয়ালিশন সরকার গঠনের কোনও প্রশ্নই নেই।

ডঃ ভূপাল বসু : আমাদের দলের কেন্দ্রীয় নেতৃবৃন্দের নির্দেশ ভিন্ন আমরা এ-বিষয়ে কোনও মতামত দিতে পারি না।

বিশেষ প্রশ্নের উত্তরে

প্রঃ কৃষি ও সেচ সম্পর্কে আপনাদের নীতি কি হবে?

উঃ বিশ্বনাথ মুখোপাধ্যায় : রাজ্য সরকারের আর্থিক ক্ষমতা সীমাবদ্ধ। কেন্দ্রের হালচাল দেখতেই পাচ্ছেন। সেচ, মৎস্যের চাষ ও ভূমিব্যবস্থার যথাযথ সংস্কারের জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করা হবে। কৃষি ও কৃষকের উন্নতির জন্য সর্বাত্মক চেষ্টা যুক্তফ্রন্ট অবশ্যই করবে।

প্রঃ গতবার আপনাদের শ্রমনীতি ছিল বহু-বিতর্কিত। এবার সরকার গঠন করতে পারলে, শ্রমনীতি কি ঐ একই রকম থাকবে?

উঃ সুবোধ বন্দ্যোপাধ্যায় : প্রথম কথা আমাদের শ্রমনীতি সম্পর্কে একটি ভ্রান্ত ধারণা দেশের মধ্যে আছে। এই ভ্রান্ত ধারণা সৃষ্টিতে এদেশীয় সংবাদপত্রগুলিও কম দায়ী নয়। সবিনয়ে বলব, দৈনিক বসুমতীর সম্পাদকও এ-থেকে বাদ পড়েন না। আমাদের দলের বক্তব্য না জেনেই অনেক কটু কথা আমাদের দল সম্পর্কে বলা হয়েছে। আমরা মনে করি মন্ত্রিসভা গঠনের মাধ্যমে সমাজের মৌলিক পরিবর্তন সম্ভব নয় এবং জনজীবনের মৌলিক সমস্যাগুলিরও স্থায়ী সমাধান সম্ভব নয়। তা সত্ত্বেও মন্ত্রিসভায় যোগ দেবার অর্থ হল বর্তমান সমাজ-ব্যবস্থায় ঘনিষ্ঠ্যের অধীনে সম্ভবপর সংস্কারগুলি আনা, যাতে দেশের মধ্যে ন্যায়সঙ্গত গণতান্ত্রিক আন্দোলনগুলি গড়ে ওঠে ও শক্তিসঞ্চয় করে। এই হল নীতি। না বুঝে যদি কেউ বাড়াবাড়ি করে, তবে তার জন্য দায়ী তারা, যারা সে কাজ করেছে।

এই নীতি অনুসারেই আমরা চলব এবং যুক্তফ্রন্ট এই নীতি তার কর্মসূচীতে গ্রহণ করেছে।

প্রঃ অজয়বাবু অক্টোবরে যে সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন তার ফলে আপনার দলের কিছু ক্ষতি হবার সম্ভাবনা আছে কি? এবারে মন্ত্রিসভা গঠন করতে পারলে ঐ ধরণের কিছু ঘটার সম্ভাবনা আছে কি?

উঃ সুকুমার রায় : দলের এতে কিছু ক্ষতি হবে না। অজয়বাবু একাধিকবার এ প্রশ্নের উত্তর দিয়েছেন। আবার মন্ত্রিসভা গঠন করতে পারলে এ-ধরণের ঘটনা ঘটার কোনও সম্ভাবনা নেই।

ভুল বোঝাবুঝি থেকেই এ-ঘটনার সৃষ্টি হয়েছিল। কিন্তু এবার যুক্তফ্রন্টের দলগুলি অনেক বেশি কাছাকাছি। কাজেই এ ধরণের ঘটনা আর ঘটবে না।

প্রঃ যুক্তফ্রন্টের শিক্ষানীতি কি হবে?

উঃ জ্যোতি ভট্টাচার্য : যুক্তফ্রন্টের শিক্ষানীতি যা স্থির হয়েছে তাতে সার্বজনীন অবৈতনিক প্রাথমিক শিক্ষার উপর সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব দেওয়া হবে। শিক্ষাক্ষেত্রে দুর্নীতি দূর করার জন্য এবং প্রতিক্রিয়াশীল ক্ষমতাচক্র ভেঙে দেবার জন্য যথাযথ ব্যবস্থা অবলম্বন করা হবে। শিক্ষক ও শিক্ষা কর্মচারীদের বিভিন্ন জরুরী দাবি পূরণের জন্য সর্বপ্রযত্নে চেষ্টা করা হবে।

প্রঃ ছাত্র-বিক্ষোভের প্রতিকার সম্পর্কে কিছু ভেবেছেন কি?

উঃ জ্যোতি ভট্টাচার্য : ছাত্র ও শিক্ষকদের সহযোগিতার মাধ্যমে শিক্ষাক্ষেত্রে সন্তোষজনক পরিস্থিতি সৃষ্টি করা সম্ভব। যুক্তফ্রন্টের ৯ মাসের শাসনের সময় এ পদ্ধতিতে আমরা সুফল পেয়েছিলাম। বিশ বছরের বহু সঞ্চিত অভিযোগ ছিল। ফ্রন্ট সরকার গঠিত হবার পর সেই সব অভিযোগ নিয়ে ব্যাপক আন্দোলনও হয়েছিল। কিন্তু কোনও ক্ষেত্রেই দীর্ঘস্থায়ী বিশৃঙ্খলা বা অশান্তি ঘটে নি। ছাত্রদের বোঝালে তাঁরা বুঝবেন।

প্রঃ 'প্রগ্রেসিভ মুসলিম লীগ' সম্পর্কে আপনার অভিমত কি?

উঃ জাহাঙ্গীর কবির : কায়েমী স্বার্থের প্রয়োজনেই সাম্প্রদায়িক দলের সৃষ্টি হয়। 'প্রগ্রেসিভ মুসলিম লীগ'ও তার ব্যতিক্রম নয়। জনসাধারণের স্বার্থ অভিন্ন। কোনও সাম্প্রদায়িক দল কখনই কোনও সম্প্রদায়ের কোনও উপকারই করতে পারে না। বাংলাদেশের মুসলমান সম্প্রদায় উক্ত দলটিকে সমর্থন করবে না—বাংলার বিভিন্ন অঞ্চল ঘুরেই আমার এ-বিশ্বাস জন্মেছে। সাম্প্রদায়িক রাজনীতির বিষময় ফল সম্পর্কে বাঙালী মুসলমান সম্প্রদায় খুবই সচেতন।

প্রঃ যুক্তফ্রন্ট সম্পর্কে আপনার কিছু বক্তব্য আছে কি?

উঃ জাহাঙ্গীর কবির : আমরা যুক্তফ্রন্টেই ছিলাম। এবং আমরা থাকতেও চেয়েছিলাম। ফ্রন্ট প্রথম আমাদের গ্রহণও করেছিলেন কিন্তু পরে তাঁরা তদানীন্তন B. K. D.-র নেতা অজয়বাবুর বিরোধিতার জন্য তাঁদের পূর্ব সিদ্ধান্ত বাতিল করেন। যুক্তফ্রন্টের এই সিদ্ধান্তের ফলে যুক্তফ্রন্ট যে একটি সুবিধাবাদী সংস্থা—সেই কথাই প্রমাণিত হয়।

প্রঃ 'আমরা বাঙালী', B. N. V. P. প্রভৃতির কোনও প্রভাব বাংলাদেশে আছে কি?

উঃ ডঃ ভূপাল বসু : বাঙালীর মনে এদের বক্তব্যের প্রভাব আছে, তবে এখনও এরা দল হিসাবে গড়ে ওঠে নি।

প্রঃ স্বাস্থ্যনীতি যুক্তফ্রন্ট সরকারকে যেমন ছিল, সরকার গঠন করতে সমর্থ হলে এবারও কি সেই রকমই থাকবে?

উঃ মাখন পাল : জনগণের স্বাস্থ্যরক্ষা ও চিকিৎসার সুযোগ যাতে বৃদ্ধি পায় এবং সেই সুযোগ যাতে শহর ও গ্রামের মানুষ সমানভাবে পেতে পারে—তাকে কেন্দ্র করেই গতবারের স্বাস্থ্যসংক্রান্ত নীতি অনুসৃত হয়েছিল। এবারও সেই ভিত্তিতেই নীতি গৃহীত হবে বলে আমার বিশ্বাস।

প্রঃ ছাত্র-বিক্ষোভের প্রতিকার কেমন করে সম্ভব?

উঃ হরিপদ ভারতী : দুটি জিনিসের প্রয়োজন। একটি শিক্ষা-জগতের আবহাওয়ার মৌলিক পরিবর্তন আনা দরকার। শিক্ষাকে জীবনাশ্রয়ী ও উদ্দেশ্যমূলক হতে হবে। বিদ্যার্থী যেন বিদ্যার্জনের উদ্দেশ্য ও নিশ্চিত ফললাভ সম্বন্ধে সুরুতেই সচেতন থাকতে পারে। নতুবা অহেতুক

কণ্ঠ দর্শন

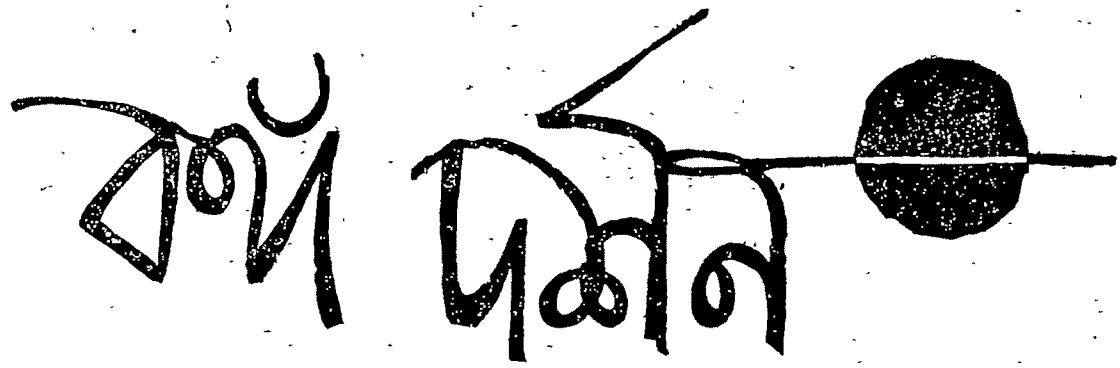

পশ্চিমবঙ্গের অন্তর্বর্তী নির্বাচনের আর একমাসও বাকি নেই। গত ৮ই জানুয়ারী সমগ্র পশ্চিমবাংলার মনোনয়নপত্র দাখিল শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলগুলির মধ্যে প্রবল কর্মব্যস্ততা শুরু হয়ে গেছে। ৯ই জানুয়ারী স্ক্রুটিনি এবং ১১ই জানুয়ারী নাম প্রত্যাহারের পালা চুকে গিয়ে শেষ পর্বের শুরু হল। এবারে প্রার্থীদের সংখ্যা গতবারের তুলনায় কিছু বেশি। ১৯৬৭ সালের চতুর্থ নির্বাচনে মোট ১০৫৮ প্রার্থী ছিলেন। কলকাতায় ২৩টি কেন্দ্রে ৯২ জন প্রার্থী মনোনয়নপত্র পেশ করেছেন। এঁদের অবশ্য বিকল্প প্রার্থীও আছেন।

গত সাধারণ নির্বাচনের তুলনায় এবারে সরাসরি প্রতিদ্বন্দ্বিতার ক্ষেত্র কম হবে না, তবে এমন অনেক কেন্দ্র আছে যেখানে বারোজন প্রার্থীও প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন। কলকাতার ঢাকুরিয়া, কালীঘাট, বাসবিহারী চৌরঙ্গী শিয়ালদহ, বড়তলা এবং বেলগাছিয়া কেন্দ্রে কংগ্রেস আর যুক্তফ্রন্ট প্রার্থীদের মধ্যে সরাসরি প্রতিদ্বন্দ্বিতা হচ্ছে। মেদিনীপুর ও বর্ধমান জেলাতেও বেশ কয়েকটি আসনে কংগ্রেস যুক্তফ্রন্ট সরাসরি প্রতিদ্বন্দ্বিতা হচ্ছে।

উল্লেখযোগ্য আসনের মধ্যে আরামবাগে দুই প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র সেন ও শ্রীঅজয় মুখোপাধ্যায় প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন। এই কেন্দ্রে আরও তিনজন প্রার্থী আছেন। মার্ক্সবাদী কমিউনিস্ট নেতা শ্রীজ্যোতি বসু বরাহনগর কেন্দ্রে প্রদেশ কংগ্রেসের সম্পাদক শ্রীঅমর ভট্টাচার্যের বিরুদ্ধে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন। এই কেন্দ্রেও আরও তিনজন প্রার্থী আছেন। বারাকপুর মহকুমায় টিটাগড় ও দমদমে কংগ্রেস যুক্তফ্রন্ট সরাসরি প্রতিদ্বন্দ্বিতা হচ্ছে। গুরুত্বপূর্ণ প্রতিদ্বন্দ্বিতাগুলির মধ্যে আরও উল্লেখযোগ্য শিয়ালদহ কেন্দ্রে যতীন চক্রবর্তী বনাম প্রতাপচন্দ্র চন্দ্র, কালীঘাট কেন্দ্রে সাধনগুপ্ত বনাম বিভা মিত্র, চৌরঙ্গী কেন্দ্রে অনন্ত সিংহ বনাম সিদ্ধার্থ রায়, জলপাইগুড়ি কেন্দ্রে নরেশ চক্রবর্তী বনাম ঋগেন দাশগুপ্ত, ঝাড়গ্রাম কেন্দ্রে পাঁচকড়ি দে বনাম প্রফুল্ল ঘোষ, কালনা কেন্দ্রে হরেকৃষ্ণ কোঙার বনাম দেবেন্দ্রবিজয় ঘোষ, বোলপুর কেন্দ্রে পান্নালাল দাশগুপ্ত বনাম রাধাকৃষ্ণ সিংহ, শ্যামপুকুর কেন্দ্রে হেমন্ত বসু বনাম গোবিন্দ দে, করিমপুর কেন্দ্রে শঙ্করদাস বন্দ্যোপাধ্যায় বনাম নলিনাক্ষ সান্যাল ইত্যাদি। এ ছাড়া প্রাক্তন স্পীকার বিজয় বন্দ্যোপাধ্যায় দাঁড়াচ্ছেন বাসবিহারী থেকে এবং প্রাক্তন শ্রমমন্ত্রী সুবোধ বন্দ্যোপাধ্যায় দাঁড়াচ্ছেন জয়নগর থেকে।

অজয় মুখোপাধ্যায় দু জায়গা থেকে দাঁড়াচ্ছেন, তমলুক ও আরামবাগ। তমলুকে তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বী কুমার জানা। একাধিক আসন থেকে আরও দাঁড়াচ্ছেন আশু ঘোষ, দেগঙ্গা কেন্দ্রে তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বী জাহাঙ্গীর কবির। আই এন ডি এফ-এর তরফ থেকে ২৮০টি আসনে প্রার্থী দেওয়া হবে বলে ঘোষণা করা হলেও ১৪০টির বেশি প্রার্থীর নাম পাওয়া যায় নি। লোকদল ঘোষণা করেছেন ৬৫ জন প্রার্থীর নাম। আমরা বাঙালী, বি-এন-ভি-পি, আনন্দমার্গ প্রভৃতির সম্মিলিত সংস্থা প্রাউটিস্ট দল ৫০টি আসনে প্রার্থী দিয়েছেন। প্রোগ্রেসিভ মুসলিম লীগ, সংখ্যালঘু লীগ, জাতীয় দল, রিপাবলিকান পার্টি, জনসঙ্ঘ প্রভৃতি দলও প্রার্থী দিয়েছেন। স্বতন্ত্র দল প্রার্থী দিয়েছেন মাত্র ১২টি কেন্দ্রে।

তবে আসল প্রতিদ্বন্দ্বিতা হবে যুক্তফ্রন্টের সঙ্গে কংগ্রেসের। আমাদের পর্যবেক্ষকরা জানাচ্ছেন যে, ঘুচরো দলগুলি

গতানুগতিকতা স্রোত আজকের সচেতন ছাত্রসমাজকে সন্তুষ্ট রাখতে পারে না। স্থিতাবস্থ রাজনৈতিক দল ও নেতৃবৃন্দকে ছাত্রদের সান্নিধ্যে দলাদলির ঊর্ধ্বে উঠে ব্যবহার করতে হবে। বলা বাহুল্য ছাত্রেরা আজ অনেকক্ষেত্রেই রাজনৈতিক শিকারে পরিণত। অবশ্য এ-কথা আমি বলি না যে, ছাত্রেরা রাজনীতি করবে না বা, সাময়িক বিক্ষোভ বা আন্দোলন থেকে বিরত থাকবে। যুগ-প্রবাহ তার কাজ নিশ্চয়ই করবে। পরিশেষে দেশের অর্থনৈতিক অবস্থার স্পষ্ট উন্নতি না হলে ছাত্র-বিক্ষোভের অবসান হবে না। কারণ পারিবারিক ও সামাজিক জীবনে অর্থনৈতিক দুর্গতির পটভূমিকায় লালিত-পালিত আমাদের ছাত্রসমাজের মনে স্বাভাবিকভাবেই অনেক বিক্ষোভ জমে উঠতে পারে।

প্রঃ ভারতের রাজনীতিতে দক্ষিণপন্থী বলতে কাদের বোঝায় ?

উঃ হরিপদ ভারতী : অর্থনীতির দিক থেকে আমরা ধনতন্ত্র ও সমাজতন্ত্র উভয়তন্ত্রেই অবিশ্বাসী। এবং বিশ্বাস করি যে অনিবার্যভাবেই অর্থনৈতিক চিন্তাকে এই দুই শিবিরে বিভক্ত হতে হবে—এমন কোনও কথা নেই। বাস্তব দৃষ্টিভঙ্গিতে উপযোগিতাই সর্বাপেক্ষা বড় কথা এবং মধ্যপন্থাই আদর্শ পন্থা। 'সীমিত ব্যক্তি মালিকানা' এবং 'জাতীয়করণ' এই দুই প্রক্রিয়ার সমন্বয়ই আমাদের দেশের পক্ষে অধিকতর কল্যাণকর। মূল শিল্প ও অত্যাবশ্যকীয় পণ্যসামগ্রীর উৎপাদন ও বণ্টন সরকারী নিয়ন্ত্রণাধীনে আনা প্রয়োজন। কিন্তু সর্বপ্রকারে সকল উৎপাদন ও বণ্টনব্যবস্থা রাষ্ট্রাধীন হলে অর্থনৈতিক উন্নতি ব্যাহত হয়ই, উপরন্তু ব্যক্তিস্বাধীনতা ক্ষুণ্ণ হয়। অতএব মিশ্রনীতিই অর্থনীতির কার্যকরী নীতি।

প্রঃ বাংলাদেশে আপনাদের প্রভাব নেই কেন ?

উঃ হরিপদ ভারতী : জনসঙ্ঘের সৃষ্টির সময় থেকেই সাংগঠনিক দিক থেকে পশ্চিমবাংলা উপেক্ষিত হয়েছে। স্বর্গত শ্যামাপ্রসাদবাবুও এ ব্যাপারে যত মনোযোগ ভারতের অন্যান্য প্রান্তে দিয়েছেন, তত নিজের প্রদেশে দেন নি।

শ্যামাপ্রসাদের মৃত্যুর পর বাঙালীর মনে জনসঙ্ঘের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে একটি গভীর নৈরাশ্য আত্মপ্রকাশ করে। তা ছাড়া সমস্যাসংকুল এই সীমান্ত রাজ্যে নানা কারণে রাজনৈতিক Polarization স্পষ্ট হয়ে গেছে। ফলে বহু অপপ্রচারে লাঞ্ছিত জনসঙ্ঘের পক্ষে সাংগঠনিক শক্তিলাভ কঠিন হয়ে পড়েছে। তবে চিন্তার দিক থেকে জনসঙ্ঘ বোধ করি সাধারণ বাঙালীর মনের অনেক কাছাকাছি। জনসঙ্ঘের বর্তমান যাই হোক্ ভবিষ্যৎ এ-রাজ্যে নিঃসন্দেহে উজ্জ্বল।

প্রতিবেদন : প্রদ্যোত রায়

যদিও আশা করছে যে, তারাই শেষ পর্যন্ত ব্যালান্সিং ফোর্স হবে, কিন্তু আজকে সে রকম কোন লক্ষণ দেখা যাচ্ছে না। পশ্চিমবঙ্গের সঙ্গে ভারতের অপরাপর স্থানের রীতিমত পার্থক্য আছে, এখানে প্রার্থীকে নির্দিষ্ট রাজনৈতিক বক্তব্য অপরাপর বিষয়ের সঙ্গে রাখতে হবে। ব্যক্তিকেন্দ্রিক রাজনীতির যুগ পশ্চিমবঙ্গ থেকে অপসারিত হয়েছে। তবে বিশেষ স্থানীয় প্রভাবের ফলে এই খুচরো দলগুলির তরফ থেকে দু-একজন প্রার্থী যে জয়লাভ করবেন না একথা হলফ করে বলা যায় না।

বিগত নির্বাচনগুলির হিসাব-নিকাশ

১৯৫২ সালে অনুষ্ঠিত ভারতের প্রথম সাধারণ নির্বাচনে পশ্চিমবঙ্গের মোট ২৩৮টি আসনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে কংগ্রেস পেয়েছিল ১৪৯টি আসন, ৮৭টি কেন্দ্রে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে কমিউনিস্টরা পেয়েছিল, ২৮টি আসন, ৪৭টি আসনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে ফরোয়ার্ড ব্লক পেয়েছিল ১১টি আসন, জনসঙ্ঘ ও হিন্দু মহাসভা একত্রে পেয়েছিল ১৬টি আসন এবং ৭০০ জন নির্দলীয় প্রার্থীর মধ্যে ১৭ জন নির্বাচিত হয়েছিলেন, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মার্ক্সবাদী অ-মার্ক্সবাদী কয়েকটি দলও দু-একটি করে আসন পেয়েছিল। তখনো জনসমাজের উপর কংগ্রেসের প্রভাব ছিল অপরিসীম, বিরোধী দলগুলি কমবেশি অপরিচিত, কমিউনিস্ট পার্টি তো নির্বাচনের কয়েকমাস আগে পর্যন্ত বে-আইনী ছিল, এছাড়া ছিল দেশ বিভাগ জনিত তিক্ততা, ডঃ শ্যামাপ্রসাদের ব্যক্তিত্ব ও জনপ্রিয়তা।

দ্বিতীয় সাধারণ নির্বাচন হয় ১৯৫৭ সালে। সীমানা পুনর্গঠনের ফলে পশ্চিমবঙ্গের আয়তন কিছুটা বেড়ে যায় এবং আসন সংখ্যা ২৩৮-এর জায়গায় ২৫২টিতে ধার্য্য হয়। কিন্তু কংগ্রেসের রাজনৈতিক অবস্থার কিছু অবনতি এই নির্বাচনের ক্ষেত্রে দেখা যায়। এবারে কংগ্রেস পায় ১৫২টি আসন, অর্থাৎ ১৪টি বেশি আসনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে, মাত্র তিনটি ক্ষেত্রে জয়ী হয়। কমিউনিস্ট পার্টি লাভ করে ৪৬টি আসন ১০৩টি আসনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে। প্রথম বারের তুলনায় তাদের দ্বিতীয় বারের কৃতিত্বের পরিমাণ দ্বিগুণেরও বেশি। ফরোয়ার্ড ব্লক এই নির্বাচনে দ্বিধাবিভক্ত হয়ে অংশ গ্রহণ করে এবং মোট ২৬টি আসনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে ৮টি আসন দখল করতে সমর্থ হয়। মার্ক্সবাদী ফরোয়ার্ড ব্লক ২টি আসন লাভ করে এবং আর-এস-পি ৩টি। দ্বিতীয় নির্বাচনে পি-এস-পি-র অংশ গ্রহণ একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা, মোট ৬৭টি আসনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে ২১টি আসন তারা দখল করে। এস-ইউ-সি লাভ করে ২টি আসন, পুরুলিয়ায় ৭টি আসনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে নির্দলীয় ৩২০ জনের মধ্যে ১১ জন নির্বাচিত হন। জনসঙ্ঘ ও হিন্দু মহাসভা এই নির্বাচনে একেবারে নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়। এই নির্বাচন পশ্চিমবঙ্গে বামপন্থী শক্তির বিকাশ ও কংগ্রেসের অবক্ষয়ের সূচনা করে।

তৃতীয় সাধারণ নির্বাচন ১৯৬২ সালে অনুষ্ঠিত হয়। এই নির্বাচনে ২৫২টি আসনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে কংগ্রেস লাভ করে ১৫৭টি আসন, ১৪৬টি আসনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে কমিউনিস্ট পার্টি লাভ করে ৫০টি আসন। ফরোয়ার্ড ব্লক, আর-এস-পি, লোকসেবক সঙ্ঘ ও গোর্খা লীগ ২৬টি আসন পায়। নির্দলীয়গণ পায় ১৪টি আসন এবং বিপর্যয় ঘটে পি-এস-পি-র, মোট ৮৭টি আসনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে মাত্র ৫টি আসনে জয়লাভ করে। দ্বিতীয় নির্বাচনের তুলনায় তৃতীয় নির্বাচনে কংগ্রেসের অবস্থার কোন হেরফের হয় নি। দলীয় অবস্থার দিক থেকে বামপন্থী দলগুলি যৎসামান্য উন্নতি করে। সর্বনাশ হয় পি-এস-পি-র, হিন্দু মহাসভার, জনসঙ্ঘ ও স্বতন্ত্র পার্টির। শেষ তিনটি দল একটিও আসন লাভ করতে পারে নি। আর সঠিকভাবে তৃতীয় নির্বাচন এটাই প্রমাণ করে যে পশ্চিমবঙ্গের অধিকাংশরা মোটামুটি প্রগতিশীল বামপন্থী শাসনের সরকারের পক্ষপাতী। স্মরণ রাখতে হবে তখনও কংগ্রেসের শীর্ষে জহরলাল নেহরুর মত প্রগতিশীল নেতা বিরাজিত ছিলেন এবং আজকের তুলনায় তখনকার কংগ্রেসী নীতি অনেকটা বেশি প্রগতিশীল ছিল, যে কারণে চরম দক্ষিণপন্থী এবং সাম্প্রদায়িক শক্তির কোন স্থান পশ্চিমবঙ্গে হয় নি।

১৯৬৭তে হল পশ্চিমবঙ্গের চতুর্থ নির্বাচন এবং এই নির্বাচনে কংগ্রেসের ভরাডুবি ঘটল। বিশ বছরের একটানা কংগ্রেসী শাসনে জনসাধারণ অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছিলেন যার পরিচয় মিলল ব্যালট বাক্সে। পশ্চিমবঙ্গবাসী একটা ব্যাপক রাজনৈতিক পরিবর্তন চাইছিলেন, কিন্তু প্রধান বিরোধী শক্তিগুলি এই ব্যাপারে বিশেষ সজাগ ছিলেন বলে মনে হয় না। কংগ্রেসের ভিতরে ভাঙনের ভিত্তি যে কত গভীর তা তাঁরা বুঝতে পারেন নি। বাংলা কংগ্রেসের সৃষ্টি যে একটা ঐতিহাসিক ঘটনা এবং তার যে রাজনৈতিক গুরুত্ব অপরিসীম এটা বুঝতে সময় লেগে-

সবিনয় নিবেদন

স্থানাভাববশত এ সংখ্যায় শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়ের ধারাবাহিক প্রবন্ধ 'রবীন্দ্রনাথ ও সুভাষচন্দ্র', মনোজ বসুর ধারাবাহিক উপন্যাস 'পথ কে রুখবে?', এবং 'আজকের মানুষ', 'ভারতদর্শন', 'আন্তর্জাতিক', 'নিকট-দূর' 'পাঠকমন' প্রভৃতি ফিচারগুলি প্রকাশ করা গেল না— এর জন্যে আমরা দুঃখিত। —সম্পাদিকা

পূর্বে কমিউনিস্ট পার্টি দুভাগে বিভক্ত হয়ে গিয়েছিল, এবং এই দুটি পার্টির পরস্পর বিরোধিতা কংগ্রেস বিরোধিতার চেয়ে কোন অংশে কম ছিল না। তাই চতুর্থ নির্বাচনে কোন সার্বিক কংগ্রেস বিরোধী ঐক্য গড়ে তোলা সম্ভব হয় নি। দুটি বামপন্থী ফ্রন্ট গঠিত হয় উলফ এবং পুলফ। উলফের মধ্যে ছিল মার্ক্সবাদী কমিউনিস্ট পার্টি, আর এস পি, এস এস পি, এস ইউ সি, ওয়ার্কার্স পার্টি, মার্ক্সবাদী ফরোয়ার্ড ব্লক এবং আর সি পি আই। পুলফের মধ্যে ছিল কমিউনিস্ট পার্টি, বাংলা কংগ্রেস, ফরোয়ার্ড ব্লক ও বলশেভিক পার্টি। এই দুটি ব্লক পরস্পরের বিরুদ্ধে যে প্রচার অভিযান চালিয়েছিল তাতে কংগ্রেসের অনেক সুবিধা হয়ে গিয়েছিল, এবং অনেকগুলি নিশ্চিত আসন তারা খুইয়েছিল। তথাপি এত অনুকূল সুযোগ পেয়েও কংগ্রেস তা কাজে লাগাতে পারে নি। জনসাধারণের কংগ্রেসের প্রতি বিতৃষ্ণা এত বেড়ে গিয়েছিল যে বিরোধী শক্তি পরস্পর বিবদমান দুটি শিবিরে বিভক্ত হওয়া সত্ত্বেও জনসাধারণ তাদেরই জয়যুক্ত করেছিলেন। কংগ্রেস ২৮০টি আসনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে লাভ করল ১২৭টি আসন, সি পি এম ১৩৫টিতে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে লাভ করল ৪৩টি, সি পি আই ৬২টিতে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে লাভ করল ১৬টি, বাংলা কংগ্রেস ৮১টিতে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে লাভ করল ৩৪টি, ফরোয়ার্ড ব্লক ৪২টির মধ্যে ১৩টি, এস এস পি ২৬টির মধ্যে ৭টি, আর এস পি ১৬টির মধ্যে ৭টি, এস ইউ সি ৮টির মধ্যে ৪টি, ওয়ার্কার্স পার্টি ২টির মধ্যে ২টি, মার্ক্সবাদী ফরোয়ার্ড ব্লক ৩টির মধ্যে ১টি, গোর্খা লীগ, লোকসেবক দল ও নির্দলীয়গণ মোট ১৭টি। পি এস পি পৃথকভাবে দাঁড়িয়ে আসন সংগ্রহ করেছিল ২৬টির মধ্যে ৭টি, জনসঙ্ঘ ৫৮টির মধ্যে ১টি, এবং স্বতন্ত্র ২১টির মধ্যে ১টি।

ঘড়ি ওয়াচ

মাত্র ৬৲ টাকায়

আমাদের চেন পদ্ধতি স্কীমের মাধ্যমে মাত্র ৬৲ টাকায় ৫ বৎসরের গ্যারাণ্টী সমেত ৫ জুয়েল রিস্ট-ওয়াচ লাভ করুন। ডাকমাশুল ১/১৫ টাকা অতিরিক্ত।

দ্রষ্টব্য : আমাদের চন্দ্রিমা সেন্টের বিক্রয় বৃদ্ধির জন্যই এই স্কীম চালু করা হইল। পছন্দ না হইলে মূল্য ফেরৎ।

SWISS WATCH TRADING CO.

P. B. 87, (WBC) Jullundur City

স্থায়ী সরকার
গঠন করুন
ইত্যাদি
দলীয় কোঁদল
দলত্যাগ
লোকদলের মুখ্যমন্ত্রী
হবে
- কবীর
আরও রোমাঞ্চকর,
আরও সাংঘাতিক
কাহিনী
যুক্তফ্রন্টের
নয় মাসের
শাসন
কংগ্রেসের
বিশ বছরের
শাসন

মধ্যবর্তী নির্বাচনের পশ্চাৎপট

ডঃ নরেন ভট্টাচার্য

প্রচলিত সংসদীয় গণতন্ত্র জনগণের রাষ্ট্রনৈতিক সার্বভৌমত্বকে কতদূর রক্ষা করতে পারবে, পশ্চিমবঙ্গ তথা ভারতের চতুর্থ নির্বাচনোত্তর রাজনৈতিক ঘটনাবলী সে বিষয়ে যথেষ্ট সন্দেহের কারণ ঘটিয়েছে। গণতন্ত্র বলতে যদি বোঝায় যে সার্বভৌম শক্তির অধিকারী একমাত্র জনগণই, তাহলে চূড়ান্ত বিশ্লেষণে দেখা যাবে যে, এদেশে সংসদীয় গণতন্ত্র যে-সমস্ত রাজনৈতিক আচরণ ও মূল্যবোধের দ্বারা পরিচালিত, তার দ্বারা জনগণের রাষ্ট্রনৈতিক সার্বভৌমত্ব রক্ষিত হবার কোন আশাই নেই। সংসদীয় গণতন্ত্রের মূল কথাই হচ্ছে একটি নির্দিষ্ট সময়ের জন্য একটি নির্দিষ্ট এলাকার জনগণ নির্বাচন মারফৎ একজন ব্যক্তির ওপরেই তাঁদের সার্বভৌম ক্ষমতা অর্পণ করবেন। যিনি নির্বাচিত হবেন তাঁর নির্বাচনের মধ্য দিয়ে অধিকাংশের মনোভাব, কোন নীতি বা আদর্শের প্রতি আগ্রহ, অথবা কোন দলের কর্মসূচীর প্রতি আস্থা নিশ্চয়ই প্রকাশ পাবে; কিন্তু ওই নির্বাচিত ব্যক্তিটির চিন্তাধারা ও কার্যকলাপ তাঁর নির্বাচকমণ্ডলীর আশা-আকাঙ্ক্ষার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ হবে কি না সে বিষয়ে বরাবরই সন্দেহ থেকে যাচ্ছে। যে আদর্শ, নীতি বা কর্মসূচীর প্রচার করে কোন ব্যক্তি জনগণের প্রতিনিধিত্ব করার অধিকারী হলেন, কার্যকালে সেই প্রতিনিধি তাঁর পূর্বঘোষিত আদর্শ বা নীতি বা কর্মসূচীর প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা যে করবেন না একথা হলফ করে বলা যায় না, বরং তা করাই অধিকতর সম্ভব। বিগত চতুর্থ নির্বাচন পশ্চিমবঙ্গ তথা ভারতের ক্ষেত্রে এ কথা নিঃসংশয়ে প্রমাণ করেছে যে, বাজারের পণ্যসামগ্রীর মত নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিরাও বরাবর ক্রীত ও বিক্রীত হতে পারেন।

পৃথিবীর মধ্যে হেন কোন অপকর্ম নেই যার পিছনে কোন-না-কোন যুক্তি খাড়া করা যায়। দলত্যাগীরা কখনোই একথা বলবেন না তাঁরা অর্থ বা প্রতিপত্তি বা ক্ষমতার লোভে কোন বিশেষ স্বার্থের নিকট আত্মবিক্রয় করেছেন। এইরকম ক্ষেত্রে তাঁরা বড় বড় আদর্শ ও নীতির দোহাই সচরাচর দিয়ে থাকেন, চতুর্থ নির্বাচনোত্তর ভারতে ও পশ্চিমবঙ্গে এরকম বুকনির অভাব মোটেই নেই। দলত্যাগের রাজনীতির যে ব্যাপক মহড়া সারা দেশজুড়ে চলছে তাতে নীট ফললাভ এই হচ্ছে যে, আপনার আমার মত সাধারণ মানুষ সংসদীয় গণতন্ত্রের ওপর বিশ্বাস হারিয়ে ফেলছি। যে দল বা নীতির প্রতি সমর্থন জানিয়ে আপনি আমি কোন প্রার্থীকে নির্বাচিত করলাম, যদি তিনি অকস্মাৎ ডিগবাজি খেয়ে বসেন আমাদের মতামত না নিয়ে, তখনই আমাদের মনে এ বিশ্বাস বদ্ধমূল হবে যে, বিধানসভা বা লোকসভা কতিপয় পেশাদার রাজনীতিবিদের উচ্চাশা চরিতার্থ করার স্থানমাত্র এবং সংসদীয় গণতন্ত্র নামক বিশেষ রাজনৈতিক ব্যবস্থাটি আসলে জনগণের প্রতি প্রদত্ত একটি বিশেষ ধোঁকামাত্র। এইভাবে নিজেদের আখের গোছাতে গিয়ে দলত্যাগীরা এদেশে গণতন্ত্রের ভবিষ্যৎকেই বিপন্ন করে তুলেছেন।

পশ্চিমবঙ্গের আসন্ন মধ্যবর্তী নির্বাচনের পশ্চাৎপট ব্যাখ্যা করার জন্য পূর্বকথিত বক্তব্যগুলিকে স্মরণে রাখার বিশেষ প্রয়োজন। সংসদীয় গণতন্ত্রকে সাফল্যমণ্ডিত করার জন্য একটা গণতান্ত্রিক জীবনাদর্শ ও কিঞ্চিৎ রাজনৈতিক শিক্ষার প্রয়োজন, এবং সর্বোপরি প্রয়োজন কতিপয় মূল্যবোধের প্রতি বিশেষ আস্থা। এ শিক্ষা জনসাধারণের চেয়ে রাজনৈতিক নেতাদেরই বিশেষ প্রয়োজন, কেন না অশিক্ষিত নেতৃত্বই ভারতের স্কন্ধে আবহমানকাল থেকেই চেপে আছে। অশিক্ষিত কথাটি রাজনৈতিক অর্থেই এখানে প্রয়োগ করা হচ্ছে এবং কথাটা শুনতে খুব খারাপ লাগলেও বোধ হয় অসত্য নয়। একদা ভারতে যাঁরা প্রখ্যাত নেতা হিসাবে পরিচিত ছিলেন এবং আজকেরও অনেক প্রখ্যাত নেতা তাঁদের রাজনৈতিক চিন্তার ফসল হিসাবে গ্রন্থাকারে আমাদের সামনে যা ধরে দিয়েছেন তাতে অপঠিত পাণ্ডিত্য, অনভিজ্ঞতা ও অসঙ্গতিপূর্ণ বক্তব্য ছাড়া আর কিছুই পাওয়া যায় না।

পৌনে এক শতাব্দী ধরে যে কংগ্রেস ভারতীয় রাজনীতির একচ্ছত্র নিয়ামক হয়ে এসেছে, সে প্রতিষ্ঠানটি কোনদিনই কিন্তু গণতান্ত্রিক আদর্শের দ্বারা পরিচালিত হয় নি। ভাবালুতা এবং ব্যক্তিপূজাই যে প্রতিষ্ঠানের একমাত্র অবলম্বন বরাবরই হয়ে এসেছে, সেখানকার সন্তানগণ যে গণতান্ত্রিক জীবনাদর্শে সর্বদাই উদ্বুদ্ধ হয়ে থাকবেন একথাটা চিন্তা করাই হাস্যকর। কাজেই স্বাধীনতার পর যখন কংগ্রেসই দেশের রাজনৈতিক ক্ষমতার একমাত্র অধিকারী হল, তার পক্ষে আর যে কোন কাজ করাই সম্ভবপর হোক না কেন, গণতন্ত্রের স্বার্থে কিছু করা মোটেই সম্ভব হয় নি। কেন না, এই প্রতিষ্ঠানটির মধ্যে আর যতই গুণ থাক, গণতন্ত্র ইত্যাদি অ্যাবস্ট্রাক্ট আইডিয়া নিয়ে যে কিছুমাত্রও মাথা ঘামানোর প্রয়োজন আছে সে কথা মনে করার অবকাশ কংগ্রেসীদের হয় নি। মনে আছে আমার এক বিশিষ্ট কংগ্রেসী বন্ধু যিনি একজন উচ্চস্তরের নেতা বলে পরিচিত এবং যিনি আগামীবার মন্ত্রী হবার আশা পোষণ করেন, আমায় বলেছিলেন 'ও সব নিয়ে মাথা ঘামিয়ে কি হবে? আমরা প্র্যাকটিকাল পলিটিক্স করি?'

অর্থাৎ স্বাধীনতালাভের পর কংগ্রেস এই প্র্যাকটিকাল পলিটিক্সই করে এসেছে। 'গণতন্ত্র' 'গণতান্ত্রিক জীবনাদর্শ' ইত্যাদিকে ক্ষমতায় যাওয়া বা ক্ষমতা বজায় রাখার মূলধন হিসাবেই ব্যবহার করে এসেছে। তার কারণ, পর পর তিনটি নির্বাচনে 'নিঃসপত্ন' সিংহাসন বজায় রাখার সুযোগ তার হয়েছে এবং কোন জায়গায় বিন্দুমাত্র অসুবিধা দেখা গেলে এই ডিফেকসানের নীতি নিজ স্বার্থেই প্রয়োগ করে লাভবান হয়েছে। আর তা ছাড়া তখন কংগ্রেসের বোলবোলাও অবস্থা, ডিগবাজি খেয়ে কংগ্রেসে ভিড়তে পারলে লাভ ছাড়া লোকসান নেই, ক্ষেত্রবিশেষে ষোল আনাই লাভ। কাজেই সব মিলিয়ে কংগ্রেসের চলে যাচ্ছিল মন্দ নয়। কিন্তু আগেই বলেছি, যেহেতু গণতন্ত্র ইত্যাদি অ্যাবস্ট্রাক্ট ব্যাপার নিয়ে মাথা ঘামানোর কোন প্রয়োজন ওই প্রতিষ্ঠানটি বোধ করে নি, তার ফলে একটি ঐতিহাসিক এবং স্থূল সত্য কংগ্রেসী কর্মকর্তাদের দৃষ্টি এড়িয়ে গেছল। সব জায়গাতেই পার্লামেন্টীয় গণতন্ত্রের একটি বড় সমস্যা হচ্ছে এই যে, নানা কারণে শাসকদলের মধ্যে ডিসইনটি-

ছোপন ঘটে, প্রথমে তার গতি হয় মন্থর, কিন্তু কালক্রমে তা খুব দ্রুত হয়ে ওঠে। শাসকদল ক্রমশ ভেঙে টুকরো হয়ে গিয়ে অসংখ্য দলে পরিণত হয়, কিছুকাল জোড়া দিয়ে বিভিন্ন ধরণের কোয়ালিশন শাসন চলে, ঘন ঘন মন্ত্রিসভা বদলায় এবং শেষ পর্যন্ত একনায়কতন্ত্রের উদ্ভব হয়। জগতের বহু দেশের উদাহরণ দেখিয়েই একথা প্রমাণ করা চলে।

এই ডিসইনটিগ্রেশন বরাবরই কংগ্রেসে ঘটেছে, কিন্তু এই বিষয়ে সতর্ক হবার কোন প্রয়োজন ওই প্রতিষ্ঠান কোনদিনই উপলব্ধি করে নি। সে ইতিহাসের আলোচনা এখানে করা নিষ্প্রয়োজন। তবে চতুর্থ নির্বাচনের প্রাক্কালে এই অবস্থাটা চরমে উঠেছিল। দীর্ঘকাল ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত থাকার ফলে অন্য কংগ্রেসী নেতৃত্ব 'সব ঝুটা হ্যায়' বলে ব্যাপারটিকে উড়িয়ে দিতে চেয়েছে, কিন্তু নির্বাচনের ফলাফল যখন প্রকাশিত হল তখন কংগ্রেসী নেতৃবৃন্দ মাথায় হাত দিয়ে বসলেন। এতটা হবে তা তাঁরা স্বপ্নেও কল্পনা করতে পারেন নি। মোট নয়টি রাজ্যে কংগ্রেস নির্বাচনে পরাজিত হল। একুশ বছরের কংগ্রেসী শাসনে কোনদিন মানুষের মনে শাসকদলের প্রতি যে বিপুল বীতরাগ দেখা যায় নি, এবারে তা দেখা গেল।

নির্বাচন এই অপ্রত্যাশিত পরিণতি দেখে কংগ্রেসদল দিশেহারা হয়ে পড়ল। বিপর্যয়ের প্রাথমিক ধাক্কাটা কাটিয়ে উঠতে তাঁদের বেশ কিছুকাল সময় লাগল। প্রথমে তাঁরা ঘোষণা করলেন যে, তাঁরা বিরোধীপক্ষ হিসাবেই আগামী পাঁচ বছর তাঁদের দায়িত্ব পালন করবেন। কিন্তু তা করা কার্যত তাঁদের পক্ষে অসম্ভব ছিল। প্রথমত, দীর্ঘকাল ধরে ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত থেকে তাঁরা বিরোধীপক্ষীয় রাজনৈতিক অভ্যাস ও রীতিনীতির সঙ্গে পরিচয় হারিয়ে ফেলেছিলেন। নতুন বিধানসভার বাজেট অধিবেশনে যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রীরা যখন তাঁদেরই বক্তব্যগুলিকে বুমেরাং করে ফিরিয়ে দিলেন তখন সে আঘাত তাঁদের কাছে দুঃসহ বলেই মনে হয়েছিল। যে বাজেট তাঁরা গদিত্যাগের আগে নিজেরাই প্রস্তুত করেছিলেন, বিরোধীপক্ষ হয়ে অনভ্যস্ত ভঙ্গিতে সেই বাজেটেরই সমালোচনা করতে গিয়ে তাঁরা অত্যন্ত অস্বস্তিকর ও হাস্যকর পরিস্থিতির মধ্যে পড়ে গিয়েছিলেন। দ্বিতীয়ত, বিশ বছর একাদিক্রমে শাসন করে তাঁরা গণ-সংযোগ হারিয়ে ফেলেছিলেন, যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রিসভার বিরুদ্ধে বিধানসভার বাইরেও তাঁরা কোন গণ-আন্দোলন গড়ে তুলতে পারেন নি। অথচ তাঁরা সবিস্ময়ে লক্ষ্য করেছিলেন যে, যুক্তফ্রন্টের শরিক রাজনৈতিক দলগুলি বিধানসভার বাইরে তখনো পর্যন্ত গণ-আন্দোলন চালিয়ে যাচ্ছে নানাভাবে। কখনো খাদ্যের দাবিতে মিছিল যাচ্ছে, কখনো বা বর্ধিত বেতনের দাবিতে শ্রমিকেরা মিছিল বার করছেন, অর্থাৎ যুক্তফ্রন্টের সংশ্লিষ্ট রাজনৈতিক দলগুলি প্রতিটা সমস্যাকেই মন্ত্রিসভার সামনে হাজির করছেন, কার্যত যা করা উচিত ছিল বিরোধীপক্ষ হিসাবে কংগ্রেসের।

ফলে কংগ্রেস প্রথমে দিশেহারা ও পরে মরিয়া হয়ে উঠল, যেমন করেই হোক যুক্তফ্রন্ট সরকারকে হটাতে হবে। যুক্তফ্রন্ট নাকি একেবারেই জনসমর্থন হারিয়ে ফেলেছে, আর এক মিনিটও তাকে বরদাস্ত করা উচিত নয়, এই কথা কংগ্রেসী নেতাদের মুখে মুখে ফিরতে লাগল, যদিও যুক্তফ্রন্ট সত্যিই জনসমর্থন হারিয়েছে এই যুক্তির পক্ষে কোন প্রমাণ দিল না। যুক্তফ্রন্টের আমলে চালের দাম চার টাকা কিলোয় উঠলেও, এতবড় প্রোভোকেশন সত্ত্বেও, কংগ্রেসী নেতারা খাদ্যের দাবিতে কোন গণ-আন্দোলন গড়ে তুলতে পারেন নি। অতএব তাঁরা অন্য পথে গেলেন, সেই সনাতন নেপথ্যের পথ, ডিফেকসান। নানাপ্রকার প্রলোভন দেখিয়ে প্রথমে তাঁরা চার-পাঁচজনকে যুক্তফ্রন্টের পক্ষ ত্যাগ করালেন, কিন্তু এই কৌশলটা সহজেই ধরা পড়ে গেল যার পরিণামে যুক্তফ্রন্টের সমর্থকগণ আইনসভার চারদিক ঘিরে রইলেন দিনের পর দিন। একজন বিধানসভার সদস্যের কথা মনে পড়ে যিনি তো ভয়ে তাঁর বহুদিন সঞ্চিত দাড়ি কামিয়ে ফেলে নিজের চেহারাকেই পাল্টে নিয়েছিলেন। এইসব দেখে কংগ্রেসের তরফ থেকে ডিফেকসানের পদ্ধতির পরিবর্তন ঘটল। ইতিমধ্যে রাজস্থানে এই ডিফেকসানের নীতি সফল হওয়াতে কংগ্রেসের কেন্দ্রীয় নেতৃত্বও অপরাপর রাজ্যে এই নীতি বলবৎ করতে উদগ্রীব হলেন।

এবার চেষ্টা হল অন্যভাবে। খোদ মুখ্যমন্ত্রীর ওপরেই টোপ ফেলা হল। তাঁকে বোঝানোর চেষ্টা করা হল যে, মন্ত্রিসভার তাঁর সহযোগী কমিউনিস্টগণ একটি দেশবিরোধী চক্রান্তে লিপ্ত হয়েছে, এবং তিনি যদি সদলে যুক্তফ্রন্ট থেকে বেরিয়ে আসেন তাহলে কংগ্রেসীরা তাঁরই নেতৃত্ব বরণ করে নেবে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত এ চক্রান্ত ধোপে টিকলো না। অতঃপর মায়ামৃগের পিছনে আর না ছুটে এবারে ডঃ ঘোষকেই আশ্রয় করা হল। ডঃ ঘোষকে রাজী করাতে বেশি বেগ পেতে হয় নি। যাঁরা এই সাপ্তাহিক বসুমতীতে প্রকাশিত প্রভাস লাহিড়ীর 'পাক-ভারতের রূপরেখা' পড়েছেন তাঁরা প্রত্যেকেই অবগত আছেন যে, ডঃ ঘোষ বরাবরই উচ্চাকাঙ্ক্ষী পুরুষ। আর তা ছাড়া খাদ্যদপ্তরের মন্ত্রী হয়ে তিনি নিজেকে অসুখী ও অতৃপ্ত বোধ করছিলেন, কেন না তাঁর খাদ্যনীতি বাম কমিউনিস্টদের সমালোচনার পাত্র হয়েছিল। অন্ধবাদী সাধনায় সিদ্ধ ডঃ ঘোষ জোতদার ও বৃহৎ চাষীদের হৃদয় পরিবর্তন করার অত্যুগ্র আগ্রহে সরকারী সংগ্রহ-নীতিকে নরম করে দিয়েছিলেন, এবং এটাই ছিল তাঁর প্রতি বাম কমিউনিস্টদের ক্রোধের কারণ এবং ডঃ ঘোষও প্রতি-মুহূর্তে পদত্যাগের হুমকি দেখিয়ে নিজের ইচ্ছাটাই অপরের ঘাড়ে জোর করে চাপিয়ে দিতেন। এখন প্রয়োজন হল, বিধানসভার কিছু সদস্যকে ডঃ ঘোষের দিকে ঠেলে দেওয়া। এই কাজটা করলেন দুজন, প্রত্যক্ষে শ্রীআশু ঘোষ এবং পরোক্ষে অধ্যাপক কবির।

যুক্তফ্রন্টের ওপর অধ্যাপক কবিরের ক্রোধের কারণ দ্বিবিধ। প্রথমটি হচ্ছে তাঁর ধারণা যে পশ্চিমবঙ্গে তিনিই নাকি যুক্তফ্রন্ট সরকার গড়েছেন, কিন্তু যুক্তফ্রন্ট তাঁকে আমল দেয় নি এবং তাঁর দ্বিতীয় ক্রোধটা হচ্ছে অজয় মুখোপাধ্যায়ের ওপর, কেন না নিজস্ব দলীয় সংগঠনের ক্ষেত্রে নেতৃত্বের প্রতিদ্বন্দ্বিতা। বাংলা কংগ্রেসের (তদানীন্তন বি, কে, ডি,) কিছু কিছু বিধানসভা সদস্যের ওপর অধ্যাপক কবিরের প্রভাব ছিল এবং তিনি অজয়-বাবুদের একটি প্রতিদ্বন্দ্বীগোষ্ঠী বাংলা কংগ্রেসের অভ্যন্তরেই গড়ে তুলতে সূক্ষ্ম হয়েছিলেন। তাছাড়া নির্বাচনের পূর্বে গঠিত বাংলা কংগ্রেসে কংগ্রেসের প্রতি মোহ হারিয়ে যেমন অনেক নিষ্ঠাবান ব্যক্তি এসেছিলেন, নির্বাচনে কংগ্রেসী টিকিট না পাওয়ার বিক্ষুব্ধ কিছু বেনো জলও ঢুকে পড়েছিল। এই বেনো জলকে বার করে নিয়ে যাবার কংগ্রেসী আড়কাঠি হয়ে এলেন শ্রীআশু ঘোষ, যিনি নিজেই ঘোষণা করেছেন যে, দলত্যাগীদের তাঁর সি, আই, টি রোডের আবাসে যথাযোগ্য আরাম ও আমোদ-প্রমোদের সঙ্গে বন্দী করে রাখতে তাঁর সাড়ে সাত লাখ টাকা ব্যয় হয়েছে।

এরপর পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপালের কথা আসছে। কেন না এই মহানাটকে তাঁরও কিছুটা ভূমিকা আছে। সংবিধান অনুযায়ী রাজ্যপালের প্রকৃত অবস্থাটা হওয়া উচিত সাংখ্যদর্শনের পুরুষের মত। কিন্তু দুঃখের সঙ্গে একথা বলতে বাধ্য হচ্ছি যে, রাজ্যপাল এই অবস্থায় তাঁর নিরপেক্ষতা বজায় রাখতে পারেন নি এবং তিনি কেন্দ্রের নির্দেশ অনুযায়ী পশ্চিমবঙ্গের রাজনীতির ক্ষেত্রে অনধিকার-চর্চা করেছেন। এ ধারণাটা আমার হয়েছে

নির্বাচন ও জনসাধারণ

কুমার চট্টোপাধ্যায়

বাহ্যত দেখলে মনে হয় নির্বাচনটা বুঝি প্রধানত রাজনৈতিক দলগুলির ব্যাপার, জনসাধারণের সঙ্গে নির্বাচনের সম্পর্ক যেন গৌণ। নির্বাচন এলেই সাজ-সাজ রব পড়ে যায় রাজনৈতিক দলগুলির মধ্যে। নির্বাচনী-কর্মনীতি তৈরি হয়, নির্বাচন-ফ্রন্ট তৈরি হয়, আসন ঠিক করার জন্য প্রচণ্ড তক-বিতর্ক চলে এবং এসব ঠিক হয়ে গেলে আরম্ভ হয় নির্বাচনী-প্রচার অভিযান। এ-সবের মধ্যেই রাজনৈতিক দলগুলির ভূমিকা ও উদ্যোগই প্রধান। এবং এই প্রধান স্তর অতিক্রম করে গেলে তবেই আসে জনসাধারণের কাছে যাওয়া, জনসাধারণের মতামত নেওয়া। যতক্ষণ না এই প্রধান স্তরটি অতিক্রান্ত হচ্ছে, ততক্ষণ জনসাধারণ যেন দর্শকমাত্র, মতামত দেওয়ার প্রশ্ন যেন অবান্তর। যদিও শেষ বিচারে জনসাধারণই হচ্ছে নির্বাচক, তবু জনসাধারণের ভূমিকার চেয়ে দলগুলির ভূমিকাই চোখে পড়ে অনেক বেশি নির্ধারক ভূমিকা হিসাবে।

কিন্তু বাহ্যত এইরকমটা মনে হলেও এবং এইরকমভাবে চলার একটা প্রবণতা থাকলেও নির্বাচনটা যে মূলত জনসাধারণেরই নির্বাচন, এই সত্য ক্রমশই স্পষ্ট হয়ে উঠছে আমাদের দেশে। এবং এ-সত্যকে স্পষ্ট করে তুলছে যতটা রাজনৈতিক দলগুলি, তার চেয়ে বেশি জনসাধারণই। আজকের নির্বাচন-পরিস্থিতি বলতে আন্দোলনের পরিস্থিতি ছাড়া অন্য কিছু নয়, আর আন্দোলনের পরিস্থিতি মানেই জনসাধারণ সচল, সক্রিয়, উদ্যোগী এবং সংগ্রামশীল। যে-রাজনৈতিক দল জনসাধারণের এই আন্দোলনের সঙ্গে সর্বপ্রকারে সম্পর্কহীন, সে-রাজনৈতিক দলের হাতে নির্বাচন-সংগ্রামের উদ্যোগও কমে যায়। তাকে যেন নিতান্ত আত্মরক্ষার সংগ্রাম করতে হয়। যে রাজনৈতিক দল এই আন্দোলনের সঙ্গে সংযোগ রক্ষা করে, নির্বাচন-সংগ্রামেও তার হাতে উদ্যোগ এসে যায়। আজকের পরিস্থিতিতে এই সত্যটা এমনভাবে প্রকট যে, বুঝিয়ে বলার দরকার করে না।

কিন্তু অনেকে একে অশুভ লক্ষণ মনে করেন এবং সরকার পক্ষ থেকে তো এই অভিযোগই বারবার শোনা যায় যে, নির্বাচন-পরিস্থিতিকে অনুকূল করার জন্যই নির্বাচন-বছরে বেশি করে গণ-আন্দোলন সৃষ্টি করছে বামপন্থী দলগুলি। নির্বাচন নিকটবর্তী হলে

সম্প্রতি হরিয়ানায় অনুষ্ঠিত ঘটনাবলী পর্যবেক্ষণ করে। হরিয়ানায় ডিফেকসানের ফলে শাসকদল নিশ্চিত সংখ্যালঘুতে পরিণত হল, রাজ্যপালের কাছে বিরোধীপক্ষের সঙ্গে দলত্যাগী সদস্যরা একযোগে হাজির হয়ে বিধানসভায় নিজেদের সংখ্যাগরিষ্ঠতা প্রমাণ করলেন। কিন্তু কেন্দ্রের ফতোয়া গেল যে এক্ষেত্রে এঁদের মন্ত্রিসভা গঠন করার সুযোগ দেওয়া হবে না, দরকার হলে রাষ্ট্রপতির শাসন হবে। পুনরায় ইলেকসানের ব্যয়ের কথা ভেবে বোধ হয় ওখানকার দলত্যাগীরা ভয় পেলেন এবং তাঁরা আপাতত দলত্যাগ বন্ধ করলেন। কিন্তু এই নীতি পশ্চিমবঙ্গের প্রতি আচরিত হয় নি, এমন কি রাজ্যপাল পনেরটা দিনও অপেক্ষা করতে রাজী হন নি। যুক্তফ্রন্ট সরকার ১০ই ডিসেম্বর তারিখে বিধানসভায় সংখ্যাগরিষ্ঠতার প্রমাণ দিতে রাজী হয়েছিলেন, কিন্তু মাত্র একপক্ষকাল অপেক্ষা করা রাজ্যপালের পক্ষে সম্ভবপর হয় নি। বিষয়টি স্বাভাবিকভাবেই দৃষ্টিকটু ঠেকেছে এবং এ কথা স্বীকার করতে কোন বাধা নেই যে, রাজ্যপাল একটি বদ নজিরের সৃষ্টি করেছেন। যে নীতি অবলম্বন করে যুক্তফ্রন্টকে উৎখাত করা হয়েছে সেই নীতির মূলে আছে শুধুমাত্র একটি "বিশ্বাস", আর সেই "বিশ্বাসটি" হচ্ছে ব্যক্তিবিশেষের, অর্থাৎ রাজ্যপালের। এবং "বিশ্বাস"-টির মূল বিষয় হচ্ছে কোন দল বিধানসভায় সংখ্যাগরিষ্ঠতা হারিয়েছে রাজ্যপালের এই "ধারণা"। এবং পশ্চিমবঙ্গের অনুসরণে যে কোন রাজ্যপালই এই "বিশ্বাসটুকুকে" ভিত্তি করেই যে কোন সরকারকেই বরখাস্ত করতে পারেন। ভারতীয় গণতন্ত্রের পক্ষে এই নজিরটি মোটেই উৎকৃষ্ট নয়।

১৯৬৭ সালের ২১শে ডিসেম্বর তারিখে রাত্রির অন্ধকারে যুক্তফ্রন্ট সরকারকে বাতিল করা হল এবং তার জায়গায় সপ্তদশ অশ্বারোহী নিয়ে ডঃ প্রফুল্ল ঘোষ পি ডি এফ সরকার গঠন করলেন। এই সরকার কোনদিনই আইনসিদ্ধ হতে পারে নি, এমন কি কংগ্রেস পি ডি এফ-এর সঙ্গে কোয়ালিশন সরকারে যোগদান করলেও তা সম্ভব হয় নি। তার প্রথম কারণ স্পীকার শ্রীবিজয় বন্দ্যোপাধ্যায়ের রুলিং এবং দ্বিতীয় কারণ কংগ্রেস থেকে আবার নতুন করে দলত্যাগ। মহাত্মা গান্ধী বলেছিলেন, দু'জন চক্রান্তকারীর মধ্যে কখনো কোন সৎ চুক্তি হওয়া সম্ভবপর নয়। এক্ষেত্রেও তাই হয়েছে। শাসকদল হিসাবে কংগ্রেস দীর্ঘকাল আগে থেকেই যে ডিসইনটিগ্রেশনের শিকার হয়েছে এবং কালরোগের মত তার সেই ডিসইনটিগ্রেশনের ব্যাপ্তি ঘটছে, আশু ঘোষের আই এন ডি এফ-ই তার আপাতত শেষ ফল, পরে আরও বিচ্ছিন্নতা আসতে পারে। কাজেই যুক্তফ্রন্টকে কাৎ করেও সেই শূন্য জায়গায় কংগ্রেস নিজেকে আর বসাতে পারে নি, ডঃ ঘোষের সঙ্গেও কংগ্রেসের গাঁটছড়া ছিন্ন হয়েছে এবং যে আশা নিয়ে কবির সাহেব ও আশুবাবু যুক্তফ্রন্টকে টপ্‌ল করতে এগিয়ে এসেছিলেন, তাতেও আজ ছাই পড়েছে। রাষ্ট্রপতির শাসনের সঙ্গে সঙ্গে পশ্চিমবঙ্গের রাজনীতির একটা অঙ্ক হয়ে আর একটা নতুন অঙ্কের সূত্রপাত হতে চলেছে। আসন্ন নির্বাচন তাই সকল দলের কাছেই একটা অসাধারণ গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হতে চলেছে এবং এই আসন্ন মধ্যবর্তী নির্বাচনের ফলাফল সর্বভারতীয় রাজনীতির ক্ষেত্রে একটা সুদূরপ্রসারী পরিবর্তন আনবে বলে আমার বিশ্বাস।

প্রত্যেকটা গণ-আন্দোলনকেই সরকার পক্ষ রাজনৈতিক অভিসন্ধিমূলক আন্দোলন বলে আক্রমণ করেন, তা সে কর্মচারীদের দাবির আন্দোলনই হোক, শিক্ষকদের আন্দোলনই হোক, আর কৃষকদের জমির সংগ্রামই হোক। সারা দেশে আজ যে ছাত্র-বিক্ষোভ দেখা দিয়েছে তাকেও সরকার পক্ষের অনেকে নির্বাচন-ক্ষেত্র প্রস্তুতির আন্দোলন বলেই অভিহিত করতে চান।

অর্কের খাতিরে এঁদের বক্তব্যকে যদি ঠিক বলে ধরে নেওয়া যায়, তাহলে দেখা যাক এই দৃষ্টিভঙ্গিতে নির্বাচনে জনসাধারণের ঠিক কিরকম ভূমিকা হওয়া উচিত। অনেক সময়ই বিধানসভায় বা লোকসভায় আমরা শুনে থাকি যে, সরকার পক্ষ থেকে বলা হচ্ছে যে, সরকার-বিরোধী আন্দোলন এত করবার দরকার কী? পাঁচ বছর পর পর সাধারণ নির্বাচন হচ্ছে, আর সার্বজনীন ভোটাধিকারের বিরাট সুযোগ আজ জনসাধারণের হাতে এসেছে। ইচ্ছে করলেই জনসাধারণ সেই অধিকার প্রয়োগ করে সরকার বদল করে দিতে পারে এবং এমন সরকার গঠন করতে পারে, যে-সরকার তাদের দাবি পূরণ করবে। আবার, উল্টো দিক থেকেও এই কথা বলা হয় যে, জনসাধারণই ভোট দিয়ে এক-সরকারকে গদিতে বসিয়েছে সে-সরকারের কাজকে সমর্থন করাই তো গণ-তন্ত্রের নিয়ম। শুনতে কথাটা যুক্তি-সঙ্গতই মনে হয় এবং গণতন্ত্রের প্রতি শ্রদ্ধাই প্রকাশ পায় এতে। কিন্তু প্রশ্ন এই, নির্বাচন-অধিকার প্রয়োগ করে যে-জনসাধারণ সরকার বদল করবে অথবা সরকারকে সমর্থন জানাবে, সে-জনসাধারণ কি একটা যন্ত্রমাত্র, অথবা সে-জনসাধারণ কি দর্শকমাত্র? সরকারকে বদল করাই হোক, আর সমর্থন করাই হোক, সেটা হবে কি শুধু পাঁচ বছর অন্তর একটি মাত্র দিনেই? তার আগের অবস্থায় সরকারকে বদল করার বা সমর্থন করার কোনো চিন্তা-ভাবনা, কোনো উদ্যোগ, কোনো আন্দোলন জনসাধারণ করবে না? সরকারকে বদল করার বা সমর্থন করার প্রশ্ন আসে সরকারের কাজ দেখেই। আর এই কাজটা যদি জনসাধারণের স্বার্থের প্রতিকূল হয়, তবে তার প্রতিক্রিয়া হিসাবে জনসাধারণের বিক্ষোভে জেগে উঠবে শুধু পাঁচ বছর অন্তর নয়, প্রতি বছর, প্রতি মাসে, প্রতি দিনে। আর সরকারের কাজকে যদি জনসাধারণ তার স্বার্থের অনুকূল মনে করে, তাহলেও সরকারের সমর্থনে দাঁড়াবে প্রতিটি ঘটনায়, প্রতিটি কাজে, প্রতিটি স্তরে। সুতরাং হয় সরকারের পক্ষে, আর না হয় সরকারের বিরুদ্ধে জনসাধারণ আন্দোলন যে করবে, এটাই হচ্ছে বাস্তব। যাঁরা নির্বাচনকে গণ-আন্দোলনবর্জিত একটা আইনগত পদ্ধতিমাত্র মনে করেন, তাঁরা এই বাস্তবকেই অস্বীকার করেন।

গণ-আন্দোলনের পরিপ্রেক্ষিত ছাড়া নির্বাচন কোনো সময়েই হয় না। ইংরাজ আমলেই বা আমরা কি দেখেছি? এখনকার মতো গণ-আন্দোলনের পরিপ্রেক্ষিত না থাকলেও, সে সময়কার সর্বব্যাপক ইংরাজ-বিরোধী স্বাধীনতা আন্দোলনের পরিপ্রেক্ষিতটাই তখন ছিল নির্বাচনের সময়কার অনুষেধক। সে-আন্দোলনের গভীরতা অত্যন্ত বেশি বলেই জনমনে সর্বদা তার প্রভাব থাকত এবং সেই প্রভাবই নির্বাচনে জনসাধারণের ভূমিকা তৈরি করে দিত। স্বাধীনতা-আন্দোলনের পরিপ্রেক্ষিতের জন্যই তখনকার নির্বাচনগুলোই এক-একটা ছোট স্বাধীনতা-সংগ্রামের চরিত্র অর্জন করত। সরকার-ঘোষিত প্রার্থীদের পরাজিত করার জন্য কি বিপুলে জন-উদ্যোগ দেখা দিত, কি বিপুলে কর্ম-প্রবাহ জেগে উঠত—তা কি শুধু নির্বাচনের আইনগত কাজটা করার জন্যই?

ইংরাজ-শাসনের অবসানের মতো গভীর ও সর্বব্যাপক প্রেরণা আজ নেই, কেন না, আজ এই দেশের প্রতিনিধিই সরকার গঠন করেছে। সেইজন্যই এ-সরকারের সমর্থনেও যেমনা লোক আছে, তেমনি এ-সরকারের কাজের ব্যর্থতায় উৎপীড়িত মানুষেরা বিক্ষোভও আছে। আর এই ব্যর্থতা দিনের পর দিন যত বাড়ছে এবং তার ফলস্বরূপ জন-জীবনের সমস্যা ও সংকট যত বৃদ্ধি পাচ্ছে, ততই বেশি বেশি মানুষ বিক্ষোভ-আন্দোলনে অংশ নিচ্ছে। এবং এরই বর্তমান রূপ দেখছি চতুর্দিকে মেহনতকারী মানুষের সকল অংশের নানা আন্দোলনে, যা একটা গণ-জোয়ারের মতো সারা দেশকে ছেয়ে ফেলেছে। এই সমস্ত আন্দোলনই তো সরকারের কোনো-না-কোনো কাজের বিরুদ্ধে এবং এই সমস্ত আন্দোলনের ভেতর দিয়েই তো সরকার-বদলের প্রতিজ্ঞা মূর্ত হয়ে উঠছে। নির্বাচন যত কাছে আসবে ততই এই প্রতিজ্ঞাও যেমন স্পষ্ট হয়ে উঠবে, তেমনি আন্দোলনও তত জোরালো হবে। এটা তো স্বাভাবিক ব্যাপার। সুতরাং, এইসব নির্বাচন-পূর্ব গণ-আন্দোলনকে রাজনৈতিক অভিসন্ধিমূলক বলাটাও যেমন অর্থহীন, তেমনি এর সঙ্গে নির্বাচনের কোনো সম্পর্ক নেই বলে কৈফিয়ৎ দেওয়ারও কোনো অর্থ হয় না। নির্বাচন যদি জনসাধারণের একটা সংগ্রাম হয়, তা হলে জনসাধারণের অন্য সংগ্রামগুলোর সঙ্গে নির্বাচনের পরোক্ষই হোক আর প্রত্যক্ষই হোক, সম্পর্ক থাকবেই। এবং সে-সম্পর্ক থাকাটা জনসাধারণের চেতনারই লক্ষণ, গণতন্ত্রের সার্থকতারই লক্ষণ। গণতন্ত্রকে স্বীকার করব, আর গণতন্ত্রের শক্তির উদ্বোধনকে, তার সক্রিয়তাকে অস্বীকার করব—এটা পরস্পর-বিরোধী কথা।

পশ্চিমবাংলার চিত্রটা আমাদের সামনে সর্বদাই প্রোজ্জ্বল হয়ে থাকে। পশ্চিমবাংলার চারটি সাধারণ নির্বাচনে জনসাধারণের কি ভূমিকা আমরা দেখেছি? প্রতিটি নির্বাচনে বামপন্থী শক্তির অগ্রগতির পিছনে আমরা দেখেছি জনসাধারণের আন্দোলনকে। এবং সরকার-বদলের সংকল্পও অগ্রসর হতে আমরা দেখেছি গণ-আন্দোলনের অগ্রগতির মধ্যেই। প্রথম সাধারণ নির্বাচনে বামপন্থী শক্তি উল্লেখযোগ্য পরিমাণে প্রবেশ করে বিধানসভায়। তখন জনসাধারণের সামনে সরকার-বদলের সংকল্প ছিল না, ছিল শুধু সরকারের ব্যর্থতার প্রশ্নগুলি নিয়ে এবং জনস্বার্থের নীতি নিয়ে অগ্রসর হওয়া বিধানসভার মধ্যে। পরের সাধারণ নির্বাচন থেকে এ-প্রশ্নের সঙ্গে সঙ্গে এসেছে সরকার-বদলের সম্ভাবনার প্রশ্নটিও। বিভিন্ন দাবি নিয়ে পশ্চিমবাংলা জোড়া গণ-আন্দোলন যেমন বেড়ে উঠেছে তেমনি জন-চেতনার মধ্যে সরকার-বদলের প্রশ্নটিও মূর্ত হয়ে উঠেছে। কিন্তু তবু তা বাস্তব আকার ধারণ করে নি ১৯৬৫-৬৬-র আগে পর্যন্ত। ১৯৬২-র নির্বাচনে বামপন্থী দলগুলির পক্ষ থেকে বিকল্প-সরকারের প্রশ্ন উঠেছিল। গণ-আন্দোলন তখন আগের চেয়েও তীব্র হয়েছে, ব্যাপক হয়েছে। কিন্তু তবু সরকার-বদলের প্রতিজ্ঞা সেসব আন্দোলনের মধ্য দিয়ে তখনও খুব স্পষ্ট হয়ে ওঠে নি। সেইজন্যই আমরা দেখলাম যে ১৯৬২-তে বামপন্থী-মোর্চার পক্ষ থেকে উপস্থাপিত বিকল্প-সরকারের আওয়াজটা জনসাধারণের চাহিদার থেকে যেন এক ধাপ এগিয়ে গিয়েছে এবং তাই নির্বাচন-ফলাফলের মধ্যে সে-আওয়াজের কোনো প্রতিফলন হল না। কিন্তু তার পরের অবস্থা কী? ১৯৬৭-র নির্বাচনের আগে জনসাধারণের বিক্ষোভ ও আন্দোলনের চেহারা কী? সে চেহারার সঙ্গে আগেকার চেহারার অনেক পার্থক্য। ১৯৬৬-র খাদ্য-সংগ্রাম আগেকার সমস্ত সংগ্রামের পরিধি ছাড়িয়ে এমন বিপুলে গণ-অভ্যুত্থানের রূপ নিল যাকে শুধু খাদ্যের দাবির সংগ্রাম বললে কমা বলা হয়, সে-সংগ্রাম সরকারের বিরুদ্ধে এক সামগ্রিক অভ্যুত্থানের মতো, যার মানে সরকার-বদলের জন্য গণ-প্রস্তুতি। এটাও সকলে জানেন যে, জনসাধারণের এই বিপুলে বিক্ষোভের মধ্যে স্বতঃস্ফূর্ততাই ছিল বেশি, বামপন্থী দলগুলির পরিচালনা ছিল অনেক কম। বরং, বামপন্থী দলগুলিই অবাক হয়ে গিয়েছিল জন-

সাধারণের এই দুর্বার অভিযান দেখে।

১৯৬৬-তে পশ্চিমবাংলার জনসাধারণের মেজাজই হচ্ছে এই যে, সরকার-বদল না করলে কিছু হবে না। বামপন্থী দলগুলি বিকল্প-সরকারের আওয়াজ দেবে কি দেবে না, এ-প্রশ্নের অপেক্ষায় জনসাধারণ তখন আর নেই। জনসাধারণই তাদের আন্দোলনের ভেতর দিয়ে সরকার-বদলের দায়িত্বকে অপরিহার্য করে দিয়েছে। তারই ফলশ্রুতি দেখলাম ১৯৬৭-র নির্বাচনে। এ-নির্বাচনে দুটো বামপন্থী ফ্রন্ট গঠিত হয়েছিল। দুটো বামপন্থী ফ্রন্ট গঠিত হওয়া মানে বামপন্থী শক্তির মধ্যে প্রবল বিরোধ। আগের দিনে এই বিরোধের মধ্যে জনসাধারণ শতধাবিভক্ত হয়ে যেত, নির্বাচনফল হত শোচনীয়। কিন্তু এবার যেহেতু জনসাধারণের প্রতিজ্ঞা সরকার-বদলের, সেহেতু বামপন্থী অনৈক্যকেও অতিক্রম করে কংগ্রেসকে সংখ্যালঘুতে পরিণত করা সম্ভব হল। জনসাধারণের এই রায়কেই বামপন্থী দলগুলি মাথা পেতে নিয়ে ঐক্যবদ্ধভাবে সরকার গঠন করল। জনসাধারণের এমন জয় ইতিহাসে খুব কমই দেখা যায়।

সুতরাং, নির্বাচনে জনসাধারণের ভূমিকা কি তা ব্যাখ্যা করার দরকার হয় না। ঘটনাবলী থেকেই তা স্পষ্ট হয়ে ওঠে। নির্বাচনের নিয়ন্তা জনসাধারণ, নির্বাচন-পরিপ্রেক্ষিতও তৈরি করে জনসাধারণ। জনসাধারণের শক্তি নিয়েই রাজনৈতিক দলগুলির ভূমিকা। সেইজন্যই আমরা দেখি যে, আজকাল ব্যক্তির ভিত্তিতে গঠিত নির্বাচন-দল কত তুচ্ছ হয়ে যায়, বিশিষ্ট ব্যক্তিকেও কিরকম শোচনীয়ভাবে পরাজিত হতে হয়।

পশ্চিমবাংলার উদাহরণ আরেকটা দিক দিয়েও ঐতিহাসিক। সরকারের সমর্থক হিসাবে জনসাধারণের দাঁড়ানর প্রকৃত অর্থ কী? কংগ্রেস-সরকারের সমর্থক মানুষও তো কম নেই দেশে। কিন্তু সে-সমর্থন কি জনসাধারণের মনের আবেগ থেকে, প্রতিজ্ঞা থেকে আসে? তা যদি আসত, তাহলে তার সঙ্গে থাকত জনসাধারণের আন্দোলন, জনসাধারণের অভিযান। সে-চিত্র দেশে দেখা যায় না। কংগ্রেসকে সমর্থন যোগাড় করতে হয়, বহুবিধ কায়দায় যোগাড় করতে হয়। জনসাধারণের স্বতঃস্ফূর্ত সমর্থন নেই কংগ্রেসের প্রতি। কিন্তু পশ্চিমবাংলায় যুক্তফ্রন্ট-সরকারের প্রতি জনসাধারণের সমর্থনের কি চিত্র আমরা দেখলাম? যুক্তফ্রন্ট সরকার কি জনসাধারণের প্রত্যাশা ঠিকমতো পূরণ করতে পেরেছে? পারে নি। কিন্তু তবু যুক্তফ্রন্ট সরকারের সমর্থনে এবং প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে বিপুল গণ-আন্দোলন আমরা দেখলাম এক বছর ধরে। তার কারণ শুধু এই নয় যে, জনসাধারণই যুক্তফ্রন্ট সরকারকে প্রতিষ্ঠিত করেছে। তার আসল কারণ হচ্ছে এই যে, জনসাধারণের সঙ্গে যুক্তফ্রন্ট-সরকারের সম্পর্ক কংগ্রেস-সরকারের সম্পর্কের সম্পূর্ণ উল্টো। কংগ্রেস-সরকারকে জনসাধারণ দেখেছে তাদের দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে থাকতে, আর যুক্তফ্রন্ট-সরকারকে জনসাধারণ দেখেছে তাদের দিকেই মুখ করে থাকতে, তাদের নিয়েই চলতে। সরকারের সঙ্গে জনসাধারণের এই একাত্মতা লোকে অন্তর দিয়ে অনুভব করেছে, জনসাধারণের শক্তিকেই যুক্তফ্রন্ট-সরকার যে সরকারী শক্তি মনে করেছে এটা লোকে দেখেছে। অল্প ঘটনায় জনসাধারণের সঙ্গে সরকারের এই ঐক্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছে এবং তাই সামান্য সাফল্য নিয়েও এই সরকারকে জনসাধারণ বিশ্বাস করেছে তাদের মঙ্গলকারী সরকার বলে। এইরকম মনোভাব ছিল বলেই যুক্তফ্রন্ট-সরকারের উৎখাতের বিরুদ্ধে জনসাধারণ লড়েছে বিপুল তেজে ও বিরাট ঐক্য নিয়ে এবং শেষ পর্যন্ত মধ্যবর্তী নির্বাচনকে সম্ভব করেছে। এককথায়, আজকের মধ্যবর্তী নির্বাচন শুধু নির্বাচন নয়, যুক্তফ্রন্ট-সরকারের গঠন থেকে আরম্ভ করে তাকে রক্ষা করা ও উৎখাতের চক্রান্তের বিরুদ্ধে তাকে পুনরায় প্রতিষ্ঠিত করা পর্যন্ত জনসাধারণের একটানা প্রচণ্ড সংগ্রামেরই একাংশ এই নির্বাচন। সরকারের প্রতি জনসাধারণের সমর্থন মানে এটাই। কংগ্রেস সরকারের প্রতি সমর্থনের চেহারা কি এইরকম?

হয়ত অনেকে প্রশ্ন করবেন, পশ্চিমবাংলার সকল মানুষই তো এই আন্দোলনমুখী জনতার অংশ নয়। সকল মানুষ বলতে এখানে নিশ্চিতভাবে কংগ্রেস-সমর্থকদের কথা আমি তুলছি না। আমি তুলছি তাদেরই কথা, যারা সাধারণভাবে কংগ্রেসের প্রতি বিরূপ মনোভাবাপন্ন এবং সেই হিসাবে হয় যুক্তফ্রন্টের সমর্থক অথবা যুক্তফ্রন্টকে বিকল্প হিসাবে পরীক্ষা করে দেখতে চায়। এইরকম মানুষ অগণিত, এঁদের কেউ গত নির্বাচনে যুক্তফ্রন্টকে ভোট দিয়েছেন, কেউ তখন ভোট না দিলেও পরে যুক্তফ্রন্টের প্রতি সহানুভূতিসম্পন্ন হয়েছেন। আজকের নির্বাচনের সামনে দাঁড়িয়ে এইরকম মানুষের মধ্যে নতুন করে দ্বিধা, দ্বন্দ্ব ও প্রশ্ন দেখছি না কি? আন্দোলনমুখী জনসাধারণের মেজাজের থেকে এই মানুষের মেজাজের তফাৎ দেখছি না কি? নিশ্চয়ই তফাৎ আছে। এই মানুষ এককথায় যুক্তফ্রন্টের পক্ষে নির্বাচনে ঝাঁপিয়ে পড়ে না। এই মানুষ প্রশ্ন করে, সন্দেহ প্রকাশ করে, জানতে চায় যুক্তফ্রন্ট পারবে কি না, যুক্তফ্রন্ট-সরকার হলে তা আবার উৎখাতের সম্মুখীন হতে পারে কি না। আরো জানতে চায়, যুক্তফ্রন্ট-সরকার হলেও তো তারা সমস্যার কোনো সমাধান করতে পারবে না, সেই তো আবার টাল-মাটাল চলবে, কায়েমী-স্বার্থের চক্রান্তের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ করে চলতে হবে এবং তাই অবস্থার নিশ্চয়তা কিছু না আসার সম্ভাবনাই বেশি। এসব জেনেশুনেও কি যুক্তফ্রন্টকে সমর্থন করতে হবে? নিশ্চয়ই প্রশ্ন উঠবে, এই মানুষের যে জনতা, তা কি আন্দোলনমুখী জনতার পথ রোধ করে দাঁড়ায় না? তাতে কি নির্বাচনের গণ-চরিত্র নষ্ট হয়ে যায় না?

না, তা হয় না। কেন না, এখানেও আন্দোলনমুখী জনতার হাতেই প্রধান উদ্যোগ। যদি আন্দোলনমুখী জনতা এই জনতার সঙ্গে ব্যবধান সৃষ্টি না করে, তাহলে এই জনতা নিজে থেকে ব্যবধান সৃষ্টি করবে না। কেন না, এই জনতা আন্দোলনমুখী জনতার বিরোধী অংশ নয়, তার পশ্চাদ্‌পদ অংশমাত্র। আর, পশ্চাদ্‌পদ অংশ বরাবরই সন্দেহ প্রকাশ করে, প্রশ্ন তোলে। কিন্তু প্রশ্ন তোলে আন্দোলনমুখী জনতার কাছেই, বিরুদ্ধ পক্ষের কাছে নয়। এ-থেকেই প্রমাণ হয় যে, তার সংযোগ আন্দোলনমুখী জনতার সঙ্গেই, বিরুদ্ধ পক্ষের সঙ্গে নয়। পশ্চিমবাংলার জটিল পরিস্থিতিতে তাদের প্রশ্নও জটিল হতে বাধ্য, কিন্তু তার জবাব পাবার জন্যই প্রশ্ন তোলে তারা, পাল্টা জবাব দেবার জন্য নয়। তা যদি না হত, তাহলে পশ্চিমবঙ্গের গত এক বছরের ক্ষমতা-ভারসাম্যের ওঠানামার মধ্যে সময় থাকতেই এই জনতা যুক্তফ্রন্ট-বিরোধী হয়ে কংগ্রেসের কাছে আশ্রয় নিয়ে নিত। কিন্তু তা হয় নি এবং হয় নি এইজন্যই যে, তার দৃষ্টি কংগ্রেসের দিকে নিবদ্ধ নয়, নিবদ্ধ যুক্তফ্রন্টের দিকেই। এই যোগসূত্রের জন্যই জনসাধারণ প্রধানত এক ও অভিন্ন। এই যোগসূত্র শক্ত করার প্রবণতাই হচ্ছে জনসাধারণের স্বাভাবিক প্রবণতা। এই স্বাভাবিক প্রবণতার বিরুদ্ধে গিয়ে যদি এই যোগসূত্র শক্ত করার বদলে আলগা করার, ছিন্ন করার দুর্বুদ্ধি জাগে, তা হলে তখন শুধু এই জনতাকেই হারাতে হয় না, আন্দোলনের হাত থেকেও উদ্যোগ খসে পড়ে। কিন্তু যে ঐতিহাসিক অভিজ্ঞতা নিয়ে আমরা চলেছি তাতে এরকমটা না হওয়ার সম্ভাবনাই বেশি।

বিগত নির্বাচনের পরিপ্রেক্ষিতে আগামী নির্বাচনের পূর্বাভাষ

কুমুদ দাশগুপ্ত

১৯৬৭ সালের মার্চ আর ১৯৬৯ সালের ফেব্রুয়ারি। মাত্র দুই বৎসরের ব্যবধান। এই অল্পকালের মধ্যে পশ্চিমবাংলার রাজনৈতিক পটভূমিতে যে বিরাট পরিবর্তন ঘটেছে তা অকল্পনীয়। পশ্চিমবাংলায় সর্বপ্রথম কংগ্রেসবিরোধী যুক্তফ্রন্টের শাসনের স্বাদ গ্রহণ করেছে; সংখ্যালঘু পি-ডি-এফ মন্ত্রিসভার শাসনের চেহারা উপলব্ধি করেছে আর অভিজ্ঞতা লাভ করেছে কংগ্রেস পি-ডি-এফ কোয়ালিশন মন্ত্রিসভার। রাজনৈতিক দলের ওপর আস্থাহীন একশ্রেণীর বুদ্ধিজীবী আমলাতন্ত্রের ওপর নির্ভরশীল। তাঁরা এবং তাঁদের সঙ্গে পশ্চিমবাংলার সাধারণ মানুষ রাজ্যপালের অধীনে সরাসরি আমলাতন্ত্রের বাধাবিহীন প্রশাসন ব্যবস্থার মর্ম হাড়ে হাড়ে টের পেয়েছে।

একদিকে যেমন মাত্র দুই বৎসরের মধ্যে চার রকম ব্যবস্থার নিয়ন্ত্রণাধীনে দেশের শাসন-ব্যবস্থা পরিচালিত হয়েছে অন্যদিকে তেমনি আবার মাত্র এই দুই বৎসরকালের মধ্যে রাজ্যের সর্বস্তরে বিভিন্নভাবে আন্দোলনের জোয়ার প্রত্যক্ষ করা গেছে। যুক্তফ্রন্টের মাত্র নয় মাস শাসনকালের মধ্যে গ্রামের ক্ষেতমজুর থেকে সুরু করে কলে-কারখানায়, অফিসে-আদালতে, সরকারী-বেসরকারী দপ্তরে দপ্তরে, স্কুল-কলেজের ছাত্র ও শিক্ষকদের মধ্যে আন্দোলনের জোয়ার দেখা যায়। পি-ডি-এফ এবং পি-ডি-এফ কংগ্রেস কোয়ালিশন সরকারের বিরুদ্ধে দীর্ঘ একটানা আন্দোলন-ও বাংলাদেশের আন্দোলনে নতুন নজির সৃষ্টি করেছে। তারপর রাজ্যপালের আমলেও পশ্চিমবাংলার বুকে শ্রেণীভিত্তিক আন্দোলনের বেগ বৃদ্ধি পেয়েছে।

এই দুই বৎসরের মধ্যে যে যে শ্রেণীর জনগণের ওপর কংগ্রেসের শক্তি নির্ভর করে তাদের মধ্যে বিরাট ফাটল দেখা দিয়াছে। লোকদল, আই-এন-ডি-এফ, জাতীয় দল, কৃষকসমাজ প্রভৃতি কয়েকটি নবগঠিত দলের শক্তি মূলত কংগ্রেসের অনুগামী শ্রেণীগুলি থেকে নিয়েই গঠিত। অবশ্য ১৯৬৭ সালের নির্বাচনকাল পর্যন্ত নবগঠিত বাংলা কংগ্রেসের শক্তি-ও ছিল কংগ্রেস অনুগামী শক্তি থেকেই উদ্ভূত। এ-দিক থেকে বিবেচনা করলে এবং উপরোক্ত নবগঠিত দলগুলির কাঠামো বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে, ঐ দলগুলি বাংলা কংগ্রেস অনুগামীদের থেকেও কিছুটা নিজেদের শক্তি সঞ্চয় করেছে।

আর একটি লক্ষণীয় বিষয় হলো দেশের বিচ্ছিন্নতাকামী শক্তিগুলি সংহত হওয়ার চেষ্টায় ব্রতী। প্রোগ্রেসিভ মুসলিম লীগ, সংখ্যালঘু লীগ, রিপাবলিক্যান পার্টি, আমরা বাঙালী, আনন্দমার্গ প্রভৃতির মিশ্রণে গঠিত প্রাউটিস্টরা এই শ্রেণীর মধ্যে পড়ে।

গত দুই বৎসরের মধ্যে পশ্চিমবাংলার কংগ্রেসের মধ্যে অন্তর্দ্বন্দ্ব আর-ও প্রবল হয়েছে। শুধু যে আশু ঘোষ বহু কংগ্রেসসেবীকে নিয়ে নতুন দল গঠন করেছেন তাই নয়, শুধু যে লোকদলের সমর্থকদের মধ্যে শতকরা নব্বই জন-ই কংগ্রেসী তাই নয়, মুর্শিদাবাদের শ্রীকাজেম আলি মির্জা, জগদীশ সিংহ, নদীয়ার শ্রীশঙ্করদাস ব্যানার্জির মত কংগ্রেসের বহু খুঁটি খসে পড়েছে। স্থানীয় ভিত্তিতে তাঁদের সমর্থক সংখ্যা-ও কম নয়। শুধু তাই নয় এখন পর্যন্ত যাঁরা কংগ্রেস ত্যাগ করে চলে যান্ নি তাঁদের মধ্যে-ও রাজ্য কংগ্রেস নেতৃত্বের বিরোধী সংখ্যা কম নয়। এই বিরোধ মূলত গোষ্ঠীতন্ত্রের বিরুদ্ধে, আদর্শগত নয় বলে যাঁরা কংগ্রেস ছেড়ে যান্ নি এমন অনেকেই কংগ্রেসের মধ্যে থেকেও যত্রতত্র কংগ্রেসের বিরোধিতা করছেন বলে যথেষ্ট প্রমাণ আছে। বস্তুত গত দুই বৎসরের মধ্যে পশ্চিমবাংলার কংগ্রেসের অন্তর্দ্বন্দ্ব প্রবলতর হয়েছে—সংগঠনের পুরাতন বাঁধুনি অনেক কমে গেছে।

আবার বামপন্থীদের মধ্যে বৃহত্তম শক্তি মার্কসবাদী কম্যুনিস্ট পার্টির মধ্যে-ও আর একটি বড় ভাঙন দেখা দিয়েছে। তরাইয়ের সামান্য এলাকার মধ্যে যে নকশালবাড়ি গোষ্ঠীর জন্ম তারা আজ সমগ্র পশ্চিমবাংলায় বিস্তৃত। অবশ্য নকশালবাড়ির আন্দোলনের প্রভাব সাধারণ মানুষের মধ্যে ব্যাপক কোন প্রভাব বিস্তার করতে পারে নি কিন্তু কর্মী সংখ্যার দিক থেকে মার্কসবাদী কম্যুনিস্ট পার্টিকে দুর্বল করেছে। এসব সত্ত্বে-ও মতাদর্শের ব্যাপক আলোচনার মধ্য দিয়ে বিগত সম্মেলনকে উপলক্ষ করে মার্কসবাদী কম্যুনিস্ট পার্টি নিজেদের অনেকটা সংহত করতে পেরেছে।

বাম জোটের দ্বিতীয় বড় শরিক বাংলা কংগ্রেস ধীরে ধীরে একটা রাজনৈতিক দলের কাঠামো পরিগ্রহণ করতে সুরু করেছে। বিগত সাধারণ নির্বাচনকালে এদের পরিচয় ছিল শুধু বিক্ষুব্ধ কংগ্রেসী হিসেবে। গত দুই বৎসরের মধ্যে এই দলের পিছন থেকে ব্যবসায়ীদের প্রতিনিধিরা সরে গেছেন, যাঁরা দলত্যাগ করেছেন তাঁদের-ও অধিকাংশই সাদা কথায় জোতদারের প্রতিনিধি। অন্যদিকে এই দল গ্রামাঞ্চলের নিম্নবিত্ত বুদ্ধিজীবী, মাঝারী ও গরীব কৃষক পরিবারের শিক্ষিত ব্যক্তিদের জমায়েত করতে পেরেছে। এবারের মধ্যবর্তী নির্বাচনে এই দলের যাঁরা মনোনয়ন পেয়েছেন তাঁদের মধ্যে শতকরা ৮০ জনই নিম্নবিত্ত পরিবারের এবং পেশার দিক থেকে শিক্ষক। এই অবস্থায় সাধারণ লোকের মধ্যে এই দলের প্রভাব কতটা কমেছে এই মুহূর্তে বলা না গেলেও সুস্পষ্টভাবেই বলা চলে যে, একদিকে এই দলের আর্থিক সঙ্গতি যেমন কমেছে অন্যদিকে আবার এই দলকে বামপন্থী মোর্চার দিকে আরো ঠেলে দিয়েছে। এই দলের নেতৃবৃন্দের ভিয়েৎনাম দিবস উদ্‌যাপন শুধু নির্বাচনের স্বার্থে কম্যুনিস্ট পার্টির লেজুড় বৃত্তি করা হিসেবে বিবেচনা করলে অন্যায় হবে। আসলে এই সংগঠনের যেভাবে পরিবর্তন ঘটছে তাতে সংগঠনের মধ্যে বামপন্থী মানসিকতার প্রভাব বৃদ্ধি পেয়েছে।

বাম জোটের অন্তর্ভুক্ত কম্যুনিস্ট পার্টির মধ্যে চেকোশ্লোভাকিয়ার প্রশ্নে কিছু মতদ্বৈধতার সৃষ্টি হওয়া ছাড়া এই দলের মধ্যে অন্য কোন অন্তর্দ্বন্দ্ব দেখা দেয় নি। মোটামুটিভাবে বলা চলে যে, কম্যুনিস্ট পার্টি গত সাধারণ নির্বাচনের সময় যে দুর্বলতায় ভুগছিল তা

ছাড়িয়ে উঠে সাংগঠনিক দিক থেকে সরতে হয়েছে।

বাম জোটে পি-এস্-পি নেই কিন্তু পি-এস্-পি'র প্রধান শক্তি মেদিনীপুরে সেখানে বামজোট বা যুক্তফ্রন্ট একটা সমঝোতায় এসেছে। এস্-এস্-পি'র মধ্যে দুটো গোষ্ঠীর সৃষ্টি হলেও যুক্তফ্রন্ট শেষ মুহূর্তে এস্-এস্-পি'র সঙ্গে সব ঝামেলা মিটিয়ে ফেলতে পেরেছে। অন্যান্য দলের মধ্যে ফরোয়ার্ড ব্লক, আর-এস্-পি এবং এস্-ইউ-সি. গত দুই বৎসরে নিজেদের শক্তিকে আর-ও সংহত করেছে।

এই অবস্থায় এবার মধ্যবর্তী নির্বাচনের সামনে এসে যুক্তফ্রন্ট যেভাবে ঐক্যবদ্ধ হয়েছে পশ্চিমবাংলার ইতিহাসে পূর্বে কোনদিন তা ঘটে নি। ফ্রন্টের অন্তর্ভুক্ত বৃহৎ দলগুলি যুক্তফ্রন্ট গঠন করেছে এবার তত্ত্বগতভাবে—এটা তাদের কাছে শুধু নির্বাচনী মোর্চা নয়। ফলে ফ্রন্টের অন্তর্ভুক্ত সাম্যবাদের আদর্শের দলগুলির সঙ্গে ফ্রন্টের অন্যান্য দলের বিরোধ কমে এসেছে।

আর-ও একটি কারণে ফ্রন্ট এবার পূর্বাপেক্ষা ঐক্যবদ্ধ। যুক্তফ্রন্ট সরকারের আমলে ফ্রন্টের অন্তর্ভুক্ত দলগুলির পারস্পরিক বিরোধ প্রত্যেকটি দলের মর্যাদাকে সেভাবে ক্ষুণ্ণ করেছে এবং তার সুযোগ কংগ্রেস সেভাবে গ্রহণ করেছিল তা থেকেও ফ্রন্ট অভিজ্ঞতা লাভ করেছে। আর তা ছাড়া, বামপন্থীরা বিগত দুটো সাধারণ নির্বাচনকালে বিরুদ্ধ সরকারের শ্লোগান তুললেও আন্তরিকভাবে তা বিশ্বাস করে নি। ১৯৬৭ সালের নির্বাচন থেকে তারা এবং জনসাধারণও বুঝতে পেরেছে নির্বাচনে কংগ্রেসকে হঠানো যায়। তারপর যত তত্ত্বকথাই বলা হোক্ না কেন, মন্ত্রিত্বের স্বাদ ফ্রন্টের নেতা ও কর্মীরা পেয়েছেন। মন্ত্রিত্ব আবার দখল করতে হলে ফ্রন্টের অন্তর্ভুক্ত কোন একক দলের পক্ষে সম্ভব নয়। তাই এবার ফ্রন্ট মন্ত্রিত্ব দখলের স্বার্থে-ও পূর্বাপেক্ষা বেশি ঐক্যবদ্ধ।

এবার গণ সমর্থনের দিক থেকে কংগ্রেস আর ফ্রন্টের পারস্পরিক শক্তির তারতম্য বিবেচনা করা যেতে পারে। প্রথমেই মনে রাখা দরকার কংগ্রেসকে দেশের ধনিকস্বার্থের প্রতিভূ বলা হলেও পশ্চিমবাংলার কংগ্রেস নেতৃত্ব বৃহৎ শিল্পপতিদের প্রতিনিধিত্ব করে না। শিল্পপতিরা ফ্রন্টের শাসন নিশ্চয়ই পছন্দ করেন না কিন্তু পশ্চিমবাংলার কংগ্রেসকেও সেভাবে মদত দেন না। কারণ পশ্চিমবাংলার কংগ্রেস মোটামুটিভাবে ভূমিস্বার্থের প্রতিনিধি এবং তাদের মধ্য থেকে সৃষ্ট চালকল, তেলকল প্রভৃতির মালিকদের স্বার্থের সঙ্গেই বেশি সংশ্লিষ্ট। এই অবস্থার ফলে রাজ্যের আমূল ভূমি-সংস্কার তাঁরা করতে পারেন নি। ফলে খাদ্যসঙ্কট সৃষ্টি হয়েছে—গ্রামের বেকার কৃষি মজুরের সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে। এই ধরণের শাসন বা সমাজ-ব্যবস্থা রাজ্যের শিল্পোন্নয়নের পক্ষে প্রশস্ত নয়। সেজন্যই শিল্পপতিরা পশ্চিমবাংলার নির্বাচন সম্পর্কে মোটা-মুটিভাবে নিস্পৃহ।

গ্রামীণ সমাজের অবস্থার-ও বিরাট পরিবর্তন ঘটেছে। কৃষি মজুর, অল্প জমির মালিক কৃষক এখনো নানাভাবে জোতদার মহাজনের ওপর নির্ভরশীল হলেও এখন তারা পূর্বের তুলনায় অনেক বেশি স্বাধীন এবং নিরপেক্ষ। ফ্রন্টের নয় মাস কালের শাসন গ্রামে একটা অস্থিরভাবের সৃষ্টি করেছিল সন্দেহ নেই। বৃহৎ জমির মালিকরা নিজেদের বিপন্নবোধ করেছে সে সময়ে। তা সত্ত্বেও সাধারণ ভূমিহীন কৃষকদের মধ্যে ফ্রন্টের ওপর আস্থা বেড়েছে। জোতদার এবং গ্রামের ধনীরা কংগ্রেসকে ক্ষমতায় ফিরিয়ে আনতে চাইলেও নির্বাচনের ফলাফল সম্পর্কে নিশ্চিত না হতে পেরে কংগ্রেসের পেছনে যতটা মদত দেবে বলে আশা করা গিয়েছিল তা করছে না। তাদের একটা বড় অংশ এখন পর্যন্ত কোন পক্ষকেই সক্রিয় সমর্থন জানাচ্ছে না।

এসব সত্ত্বেও মনে রাখতে হবে কংগ্রেসের দীর্ঘদিনের সংগ্রামী ঐতিহ্য দেশের জনসাধারণের মধ্যে কংগ্রেসের পক্ষে যে বিপুল সমর্থন এনে দিয়েছিল তার কিছুটা পরিবর্তন ঘটলেও এবং ইংরেজ আমলের স্বাধীনতা সংগ্রামীদের একটা বড় অংশ বিভিন্ন বামপন্থী দলে চলে গেলেও কংগ্রেসের একটা নির্দিষ্ট সংখ্যক অনুগামী আছেন। এঁরা সভা-শোভাযাত্রায় যোগ দেন না—হৈ-চৈ করেন না। নীরবে কংগ্রেসকে ভোট দিয়ে আসেন। নতুন ভোটারদের কাছে অর্থাৎ যুবশক্তির কাছে কংগ্রেসের এই ঐতিহ্য পরিচিত নয়। তাই প্রতি বৎসর-ই পুরাতন ভোটারদের অর্থাৎ বৃদ্ধ ও প্রৌঢ়দের সংখ্যা কতই কমছে কংগ্রেসের এই নিষ্ক্রিয় সমর্থকদের সংখ্যা ততই কমে আসছে। তবে কংগ্রেসের পক্ষে খুবই আশার কথা পূর্বের তুলনায় যুবক শ্রেণীর একটা অংশকে কংগ্রেস এবার বেশি করে আকৃষ্ট করতে পারছেন। কংগ্রেসের যে কোন নির্বাচনী সভায় গেলেই তরুণ কর্মী আর তাদের বামপন্থী কায়দায় প্রচারের নমুনা নজরে পড়ে। কংগ্রেসের ছাত্র সংগঠন ছাত্র পরিষদ সাধারণ ছাত্র-সমাজের কাছে যেভাবে অপাংক্তেয় হয়ে পড়েছিল সেই অবস্থা অতিক্রম করে ছাত্র পরিষদ আজ রাজ্যের একটা বড় ছাত্র সংগঠনে পরিণত। এই অবস্থা কেন ঘটেছে তা এই প্রবন্ধের আলোচ্য বিষয় নয়।

এ ছাড়া অফিস-কাছারীতে যাঁরা কাজ করেন তাঁদের মধ্যে কংগ্রেসের সমর্থক কম। সংগঠিত শ্রমিক ও কৃষকরাও কংগ্রেসের তুলনায় ফ্রন্টের অন্তর্ভুক্ত কোন-না-কোন দলের সঙ্গে তুলনামূলকভাবে বেশি জড়িত। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে মনে রাখা প্রয়োজন, রাজ্যের শ্রমিক ও কৃষক-দের মধ্যে এখনও বেশির ভাগই অসংগঠিত।

বাংলা ভাষায় প্রথম প্রকাশিত ক্রিকেট খেলার অদ্বিতীয় বই

খ্যাতনামা ক্রীড়াসাংবাদিক

শান্তিপ্রিয় বন্দ্যোপাধ্যায়ের

ক্রিকেট খেলার আইন কানুন

[দাম—চার টাকা মাত্র]

গল্প উপন্যাসের চেয়েও আকর্ষণীয়, ক্রিকেট উৎসাহীদের সবচেয়ে প্রয়োজনীয় বই। ক্রিকেট খেলা শিখতে হলে, ক্রিকেট খেলা জানতে হলে, ক্রিকেট খেলা বুঝতে হলে এই বইটি পড়তে হবে। শুধু বড়রাই নন, ছোটরাও হাতে পেলে বইটা আর ছাড়তে চাইবেন না।

অজস্র ছবি, আর স্কেচে ভরা বইটির আর একটা বিশেষ আকর্ষণ হলো ক্রিকেটের অভিধান। আর কোন বইতে এতো প্রয়োজনীয় জিনিস এক সঙ্গে পাওয়া যাবে না।

জ্ঞানতীর্থ

[১নং বিধান সরণী, কলকাতা—১২]

জনগণ মধ্যে কংগ্রেসের প্রভাব এখনও কার্যকরী।

প্রধান দুই প্রতিপক্ষ কংগ্রেস ও যুক্তফ্রন্টের কথা বাদ দিলে নবগঠিত দলগুলির মধ্যে লোকদল ও আই-এন-ডি-এফ-এর এবং প্রোগ্রেসিভ মুসলীম লীগের প্রশ্নও বিবেচ্য। এই তিনটি দলের শক্তি এখনো প্রমাণিত নয়। এঁরা প্রার্থী দাঁড় করিয়েছেন কিন্তু এখনো সংগঠন গড়ে তুলতে পারেন নি। শ্রীহুমায়ুন কবিরের লোকদল, শ্রীজাহাঙ্গীর কবিরের জাতীয় দল চব্বিশ পরগনা ও নদীয়া জেলায় বাংলা কংগ্রেসকে কিছুটা ক্ষতিগ্রস্ত করতে পারে ঠিক তেমনি ঐ দুইটি জেলা সহ আরো কয়েকটি জেলায় তাঁরা কংগ্রেসের ভোট ভাগ করবেন। আই-এন-ডি এফ বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই কংগ্রেসের ভোট ভাগ করবে। যে-সব জেলায় সংখ্যালঘুরা গত নির্বাচনে কংগ্রেস বিরোধী শিবিরের শক্তি বৃদ্ধি করেছিল সেই সব জেলায় প্রোগ্রেসিভ মুসলীম লীগ যুক্তফ্রন্টের ভোট ভাগ করবে—অন্যত্র ভাগ করবে কংগ্রেসী ভোট। সাধারণভাবে এই নতুন দলগুলি ফ্রন্টের তুলনায় কংগ্রেসকে বেশি আঘাত করবে। গত সাধারণ নির্বাচনে বাংলা কংগ্রেস নতুন দল হলেও নির্বাচনী সংগঠনের ক্ষেত্রে পি-ইউ-এল-এফ দলগুলির কর্মীদের সহায়তা লাভ করেছিল। এবারকার রাজনীতির আসরে নবাগত দলগুলির সেই ধরণের সুবিধা নেই। তাঁদের একক লড়তে হবে। কাজেই ঐ দলগুলি কতটা প্রভাব বিস্তার করতে পারবে এখন অনুমান করা সম্ভব নয়। ইতোমধ্যে জনসঙ্ঘ পশ্চিমবাংলায় পূর্বাপেক্ষা সবলতর হয়েছে—তাদের আঘাত আসবে কংগ্রেসী ভোটে। আবার আমরা বাঙালী বা প্রাউটিস্টরা ক্ষেত্রবিশেষে কংগ্রেস-বিরোধী ভোটেই ভাগ বসাবে।

শক্তির প্রশ্ন বিবেচনার পরে নীতির প্রশ্নে আসা যাক। কংগ্রেসের পক্ষে এবার একটা বড় হাতিয়ার যে কংগ্রেস চিরদিন আসামীর কাঠগোড়ায় ছিল, এবার তারা ফরিয়াদীর আসনেও দাঁড়াবার সুযোগ পেয়েছে। ফ্রন্টের নয় মাসের শাসনে আইন ও শৃঙ্খলার অবনতি, চালের কিলো দাঁচ টাকা, ঘেরাও, গ্রামের গণ-কমিটি প্রভৃতি প্রশ্ন তুলতে পারছে। অপরদিকে যুক্তফ্রন্টের হাতের নতুন অস্ত্র হোল কেন্দ্রের নির্দেশে রাজ্যপাল কর্তৃক যুক্তফ্রন্ট সরকারের পতন ঘটানো। বিগত সাধারণ নির্বাচনের পরবর্তীকালে উভয়পক্ষের হাতে যে নতুন হাতিয়ার এসেছে, তার ক্ষমতা প্রায় সমান সমান।

কলকাতা, নদীয়া আর চব্বিশ পরগনার খাদ্য আন্দোলনের ফলাফল বিগত নির্বাচনে বামপন্থীদের হাতে বিক্ষোভ সৃষ্টির হাতিয়ার এনে দিয়েছিল। গত এক বৎসরে রাজ্য ও কেন্দ্রীয় সরকারী কর্মচারী ধর্মঘট, অটোমেশন চালুর চেষ্টা, দুর্গাপুরে স্টীল প্ল্যান্টে অন্তর্ঘাতমূলক কাজের অভিযোগ প্রভৃতি এবার ফ্রন্টের নতুন হাতিয়ার।

সমস্ত অবস্থা বিবেচনা করলে মানসিকতার দিক থেকে গত সাধারণ নির্বাচন আর এবারের মধ্যবর্তী নির্বাচনের প্রাক্‌কালীন অবস্থার খুব বেশি হেরফের হয় নি। বরং ফ্রন্টের ভোট এবার কম বিভক্ত হওয়ার সম্ভাবনা।

পূর্বোক্ত আলোচনাকে পটভূমি হিসাবে রেখে ১৯৬৭ সালের নির্বাচনের ফলাফলের সমীক্ষা আগামী নির্বাচনের পরিণতির আভাস দিতে পারে।

১৯৬৭ সালের সাধারণ নির্বাচনে কংগ্রেস ১২৭, সি পি এম ৪৩, সি পি আই ১৬, বাংলা কংগ্রেস ৩৪, ফরোয়ার্ড ব্লক ১৩, আর-এস-পি ৭, এস-এস-পি ৭, পি-এস-পি ৭, এস-ইউ-সি ৪, ওয়ার্কার্স পার্টি ২, জনসঙ্ঘ ১, স্বতন্ত্র ১, মার্ক্সবাদী ফরোয়ার্ড ব্লক ১, গোর্খা লীগ ২ লোকসেবক সঙ্ঘ ৬ এবং নির্দলীয়রা ৯টি আসন লাভ করে।

শতকরা ৪১·৩ ভাগ ভোট পেয়ে কংগ্রেস যে ১২৭টি আসন দখল করে তার মধ্যে চূড়ান্ত সংখ্যাগরিষ্ঠতা ছিল মাত্র ৩১টি কেন্দ্রে আর অন্যদিকে বামপন্থীরা শতকরা ৫৪·৬ ভাগ ভোট পেয়ে যে ১৪৬টি আসন দখল করে আর তার মধ্যে তাদের চূড়ান্ত সংখ্যাগরিষ্ঠতা ছিল ৮২টি কেন্দ্রে। পি-এস-পি সমেত সার্বিক বামপন্থী ঐক্য হলে কংগ্রেসের আসন সংখ্যা কমে যেত আরো ৫০টি। পি-এস-পি'কে বাদ দিয়ে ঐক্য হলেও বামপন্থীরা আরো ৪৬টি আসন পেতেন।

চব্বিশ পরগনা, মেদিনীপুর, আর নদীয়া জেলায় কংগ্রেসের বিপর্যয় ঘটেছিল। চব্বিশ পরগনা জেলার ৫০টি আসনে কংগ্রেস ১২টি, মেদিনীপুর জেলার ৩৫টি আসনের মধ্যে ১২টি এবং নদীয়া জেলার ১৪টি আসনের মধ্যে ৪টি আসন কংগ্রেস দখল করতে পেরেছিল। ঐ তিন জেলা বাদ দিলে বাকী জেলাগুলির মোট ১৮১টি নির্বাচনী কেন্দ্রের মধ্যে কংগ্রেস ৯৯টি আসন দখল করে। এইগুলির মধ্যে কলকাতায় ২৩টি আসনের মধ্যে কংগ্রেসের ১১টি আসন লাভ বিশেষ উল্লেখযোগ্য। অর্থাৎ ঐ তিনটি জেলা ছাড়া অন্যান্য জেলাগুলিতে কংগ্রেসের অবস্থা অন্যান্য সাধারণ নির্বাচনের তুলনায় বিশেষ পরিবর্তন ঘটে নি। এই তিনটি জেলা ছাড়া অন্যান্য স্থানের কৃষক ও সংখ্যালঘুরা কংগ্রেসের বিপক্ষে গেছে বলে প্রমাণ করার কোন তথ্য নেই। উক্ত তিনটি জেলায় বাংলা কংগ্রেস পেয়েছিল যথাক্রমে ৯, ১০ এবং ৫ ! অর্থাৎ মোট ৩৪টি আসনের মধ্যে ২৩টিই এই জেলা তিনটি থেকে বাংলা কংগ্রেসের দখলে যায়; অর্থাৎ কংগ্রেসের ভাঁড় ফ্রন্টভুক্ত এবং চব্বিশ পরগনা ও নদীয়ায় খাদ্য আন্দোলনের ব্যাপকতা বাংলা কংগ্রেসকে জয়ী হতে সাহায্য করেছে।

এবারের নির্বাচনে লোকদল, জাতীয় দল এবং আই-এন-ডি-এফ, নদীয়া আর চব্বিশ পরগনার বাংলা কংগ্রেসের ১৪টি আসনকে কিছুটা ক্ষতিগ্রস্ত করতে পারে। আবার অন্যদিকে এবার বামপন্থীদের মাত্র একটি ফ্রন্ট হওয়ায় শুধু মেদিনীপুর আর চব্বিশ পরগনা জেলা দুটিতেই ফ্রন্টের পক্ষে নতুন ১৪টি আসন লাভ সম্ভব। কাজেই ঐ তিনটি জেলাতে ভোটদাতাদের মানসিকতার মধ্যে বিরাট কোন পরিবর্তন যদি না ঘটে থাকে তাহলে বাংলা কংগ্রেস চব্বিশ পরগনা ও নদীয়া জেলায় কিছুটা দুর্বল হয়ে পড়লেও গত নির্বাচনের তুলনায় সামগ্রিক অবস্থার বিরাট কোন পরিবর্তন না ঘটারই সম্ভাবনা।

বরং মুর্শিদাবাদ এবং সমগ্র উত্তর বাংলার ৫টি জেলায় কংগ্রেসের যে বিপুল সাফল্য গত সাধারণ নির্বাচনে ঘটেছিল, এবার কংগ্রেসের পক্ষে সেই অবস্থা বজায় রাখা খুবই কষ্টকর। উত্তর বাংলার বন্যা, মুর্শিদাবাদ জেলায় কাজেম আলী মির্জা, জগদীশ সিংহ, খোদাবক্স প্রমুখের দলত্যাগ, ঐ জেলায় প্রোগ্রেসিভ মুসলিম লীগের সৃষ্টি কংগ্রেসকে বিপন্ন করে তোলার সম্ভাবনা। দক্ষিণ বঙ্গের বর্ধমান, বীরভূম, বাঁকুড়া, হাওড়া, হুগলীর অবস্থায় খুব বেশি পরিবর্তনের কথা কোনপক্ষই আশা করছেন না। কলকাতায়-ও ২৩টি আসনের মধ্যে কংগ্রেস যদি গত নির্বাচনে প্রাপ্ত ১১টি আসন বজায় রাখতে পারে, তাহলেই কংগ্রেস নেতৃত্ব খুশি। এই অবস্থায় সামগ্রিক বিচারে মধ্যবর্তী নির্বাচনের পূর্বাভাস নিশ্চয়ই কংগ্রেসের পক্ষে অনুকূল নয়। অবশ্য নবাগত দলগুলির ভূমিকা সবই অনুমান সাপেক্ষ। গত নির্বাচনে নবাগত বাংলা কংগ্রেসের মত যদি লোকদল আর আই-এন-ডি-এফ ঐ দুই দলের নেতৃবৃন্দের আশা-আকাঙ্ক্ষার সঙ্গে সমান তালে এগিয়ে চলে, তাহলে হয়তো সামগ্রিক চেহারার কি পরিবর্তন ঘটবে তা অনুমান করা দুঃসাধ্য।

ভারতে সংসদীয় গণতন্ত্রের ভবিষ্যৎ

অজিতকুমার দত্ত

গণতন্ত্র বলিতে আমরা কি বুঝি এবং ইহার সংজ্ঞা সম্বন্ধে আমাদের মতভেদ এবং মানসিক বিভ্রান্তি রহিয়াছে। যে ব্যক্তি স্বৈরতন্ত্রে বিশ্বাসী বা হিংসাশ্রয়ী মতবাদে বিশ্বাসী সে-ও গণতন্ত্রের মহিমা-কীর্তন করে। যাঁহারা শ্রেণীসংগ্রামে বিশ্বাসী তাঁহারাও গণতন্ত্রের জন্য সংগ্রাম করিতেছেন বলিয়া ঘোষণা করিয়া থাকেন। যাঁহারা গোষ্ঠীতন্ত্রে বিশ্বাসী তাঁহারাও গণতন্ত্রের দোহাই পাড়িয়া থাকেন এবং যাঁহারা গুণ্ডাতন্ত্রকে বিপ্লব বলিয়া চালাইবার চেষ্টায় ব্রতী হইয়াছেন তাঁহারাও গণতন্ত্রের অকৃত্রিম সেবক বলিয়া নিজেদের প্রচারিত করিতেছেন। সুতরাং আমাদের সংবিধানে গণতন্ত্রের কি রূপ আমরা দেওয়ার প্রয়াস করিয়াছি সে সম্বন্ধে সুস্পষ্ট ধারণা থাকা প্রয়োজন।

বিভিন্ন দেশের সংবিধানে গণতন্ত্র বিভিন্নরূপে আত্মপ্রকাশের চেষ্টা করিতেছে। প্রত্যেক জাতি বা দেশ তাহার নিজ ঐতিহ্য এবং বিশিষ্ট প্রকৃতির পরিপ্রেক্ষিতে গণতন্ত্রকে স্বতন্ত্র রূপ দিয়াছে। ইহাই স্বাভাবিক। কোনও জাতি বা দেশের অপর জাতি বা দেশের উপর তাঁহাদের মতবাদ বা বিশিষ্ট ভঙ্গি জোর করিয়া চাপাইবার অধিকার নাই। আন্তর্জাতিক আইন বা বিচারে আজ পর্যন্ত এই অধিকার স্বীকৃত হয় নাই।

গণতন্ত্রের মূল সূত্র বলিতে আমি দুইটি সূত্রকে প্রাধান্য দিতে চাই। ব্যক্তি-স্বাধীনতা এবং আইনের শাসন। যে সংবিধানে ব্যক্তিস্বাধীনতা স্বীকৃত হয় না, বিশ্বাস ও মতের স্বাধীনতা স্বীকৃত হয় না, চিন্তা ও মতপ্রকাশের স্বাধীনতা স্বীকৃত হয় না—সেই সংবিধান আর যাহাই হোক গণতান্ত্রিক সংবিধান নহে। যে ব্যবস্থা আইনের শাসনকে স্বীকৃতি দেয় না সেই ব্যবস্থা গণতন্ত্রের পরিপন্থী।

আমাদের সংবিধান কতকগুলি মৌল অধিকারকে স্বীকৃতি দিয়াছে এবং অধুনা ভারতবর্ষের প্রধান বিচারালয়ে এই মৌল অধিকার সংশোধন বা পরিবর্তন করিবার অধিকার ভারতীয় সংসদের নাই বলিয়া ঘোষণা করা হইয়াছে। দেশের সামগ্রিক মঙ্গলের জন্য সংবিধানের এই মৌল অধিকারগুলিকে কখনও কোনও অবস্থায়ই পরিবর্তন বা পরিবর্ধন করা যাইবে না—সংবিধানের এই অনড় চরিত্র সম্বন্ধে মতভেদের অবকাশ রহিয়াছে, কিন্তু আমরা যে সংসদীয় গণতন্ত্রকেই জাতির জীবনে অগ্রগতির প্রকৃষ্ট বাহন বলিয়া গ্রহণ করিয়াছি এই সত্য সম্বন্ধে সন্দেহের অবকাশ নাই।

আমাদের সংবিধান সংসদীয় গণতন্ত্রকে গ্রহণ করিয়াছে এবং নানা ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্য দিয়াও সংসদীয় গণতন্ত্র জাতির মর্মে এবং জীবনে শিকড় গাড়িয়া বসিয়াছে বলিয়া আমি বিশ্বাস করি।

যাঁহারা সংসদীয় গণতন্ত্রে বিশ্বাস করেন না, ফ্যাসিবাদ বা একনায়কত্ব অথবা গণ্ডাতন্ত্রে বিশ্বাস করেন তাঁহারাও সংসদীয় গণতন্ত্রেরই আচ্ছাদনে দাঁড়াইয়া তাঁহাদের রাজনৈতিক বিশ্বাস ও মতবাদের প্রচার করিতেছেন। ইহাও সংসদীয় গণতন্ত্রে ভারতীয় জনগণের সুদৃঢ় বিশ্বাসের পরিচায়ক।

সাধারণ মানুষের মানবিক অধিকার রক্ষার দায়িত্ব একটি বিশেষ মতবাদে বিশ্বাসী দলের হাতে ন্যস্ত করিলে তাহার অপব্যবহার হইবে না এই প্রতিশ্রুতি কেহ দিতে পারে না। যেমন বিশেষ একটি মহামানবের হাতেও জনগণের মঙ্গল-সাধনের জন্য নিরঙ্কুশ ক্ষমতা অর্পণ করা যায় না, তেমন যায় না একটি বিশেষ দলকেই সংবিধানের দ্বারা কায়েমী কর্তৃত্বের অধিকার দেওয়া।

জনসাধারণের প্রতিনিধি নির্বাচনের অবাধ অধিকারই হইল সংসদীয় গণতন্ত্রের মূল নীতি, এবং যে সংবিধানে সে অধিকার স্বীকৃত হইয়াছে—আমি বিশ্বাস করি নির্বাচনের মাধ্যমে এই প্রকার সংবিধানের সুষ্ঠু প্রয়োগের দ্বারাই জনগণের সার্বভৌম অধিকার অর্জন করা সম্ভব। প্রতিটি নির্বাচনকে যদি জনমানসে রাজনৈতিক চেতনাবোধ জাগাইবার কাজে ব্যবহার করা যায় তবে প্রকৃত বিপ্লব যাহা দ্বারা জাতির অর্থনৈতিক ও সামাজিক কাঠামোরই আমূল পরিবর্তন করা যায়—তাহা উপলব্ধি করা সম্ভব।

যে শ্রেণী বা সম্প্রদায় আজ জাতির সম্পদ কুক্ষিগত করিয়া প্রভূত ক্ষমতার অধিকারী হইয়াছেন, পল্লীর কৃষক ও কারখানার শ্রমিক তাঁহাদের ভোটের দ্বারাই এই শ্রেণীকে ক্ষমতাচ্যুত করিতে পারেন। প্রয়োজন হইল সৎ রাজনৈতিক-চেতনা-বোধ-জাগ্রত দল ও কর্মবীর যাঁহারা গ্রামে কলে-কারখানায় যাইয়া আমাদের সংবিধান সাধারণ মানুষকে কি অমূল্য অধিকার অর্পণ করিয়াছে তাহার বিশ্লেষণ ও প্রচার করা।

কলিকাতা শহরের দেয়ালে বাণী প্রচার করিয়া বিপ্লব সৃষ্টি করা যায় না এবং অর্থহীন শ্লোগানের কোলাহলের দ্বারাও বিপ্লব সাধিত হয় না। কৃষি-বিপ্লব বা সশস্ত্র বিপ্লবের চিৎকারে কলিকাতার রাজপথ মুখরিত হইতে পারে কিন্তু জনগণের মুক্তি তাহাতে আসিবে না। আমি বিশ্বাস করি জনগণের জীবনে ও ভারতীয় সমাজে বৈপ্লবিক পরিবর্তন ভারতবর্ষের সংসদীয় গণতন্ত্রকে নিষ্ঠার সহিত পরিচালনের মাধ্যমেও অর্জন করা যায়, যদি সততার সহিত প্রকৃত দেশ-হিতৈষী ও জনদরদী কার্যসূচী রাজনৈতিক দলগুলি অবলম্বন করেন।

কংগ্রেস আজ বহুরূপীর ভেক ধারণ করিয়াছে—কোনও বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গি তাঁহাদের বাক্যবহুল প্রস্তাবের মধ্যে পাওয়া যায় না। বামপন্থী দলগুলিরও একই অবস্থা। বাক্যবহুল প্রস্তাবনার অরণ্যে তাঁহাদের মূল বক্তব্য ও দৃষ্টি-ভঙ্গি খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। রাজনৈতিক পরিভাষায় যাহাকে sense of direction বলে আমাদের রাজনীতিতে আজ তাহার অভাব ঘটিয়াছে। বন্দুকের নালির মুখেই শুধু বিপ্লবের তত্ত্ব নিহিত আছে এই প্রাগৈতিহাসিক তত্ত্বকথা একদল লোক তোতাপাখীর মতই মুখস্থ বলিয়া যাইতেছেন—অপরদিকে সাম্য বা দে বিশ্বাসী দলগুলি পরস্পরের নিন্দাবাদের দ্বারাই বিপ্লব সংঘটিত হইবে এই বিশ্বাসে অনুপ্রাণিত হইয়া শুধু প্রস্তাব আলোচনাই করিয়া যাইতেছেন। কিন্তু

জনগণের মধ্যে আমাদের সংবিধানের মূল সূত্রগুলি প্রচারণার কোনও প্রচেষ্টা অদ্যাবধি হয় নাই।

ভারতবর্ষের সংবিধানে প্রত্যেক সাবালক ব্যক্তিকেই নির্বাচনের অধিকার দেওয়া হইয়াছে। সে অধিকারের মধ্যে কি বৈপ্লবিক শক্তি নিহিত আছে তাহা তাঁহাদের উপলব্ধি করাইবার চেষ্টাও কোনও রাজনৈতিক দলই করিতেছেন না।

কাহারও মত বা বক্তব্যই সংসদীয় গণতন্ত্রে অপরিহার্য নয়, কিন্তু সংসদীয় গণতন্ত্রের ইহাও মূল সূত্র যে কাহারও মত বা বক্তব্যই একমাত্র সত্য নয় এবং অধিকাংশের মতের দ্বারাই রাষ্ট্র ও সমাজ পরিচালিত হইবে।

আমি নিজে বিশ্বাস করি এবং ভারতবর্ষের ইতিহাসও সম্ভবত এই বিশ্বাসের সমর্থক যে ভারতীয় চরিত্রে একনায়কত্ব বা একদলের নায়কত্বের স্থান নাই। ফ্যাসিবাদ বা গুণ্ডাতন্ত্রেরও ভারতবর্ষের জমিতে কায়েমী হইয়া বসিবার সম্ভাবনা নাই। সুতরাং ভারতবর্ষে সংসদীয় গণতন্ত্রের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে নিরাশ হইবার কারণ নাই। বিভিন্ন ঘাত-প্রতিঘাত ও স্বার্থের সংঘাতে এবং ক্ষমতালাভের দ্বন্দ্বে সংসদীয় গণতন্ত্র যেন ভাঙিয়া পড়িতেছে বলিয়াও আশঙ্কিত হইবার কারণ নাই। ভারতবর্ষের অগণিত নির্বাচকের শিক্ষা বা রাজনৈতিক প্রজ্ঞা নাই, কিন্তু তাঁহারা নিজ স্বার্থ সম্বন্ধে অজ্ঞ নহেন এবং দেশের মঙ্গল সম্বন্ধেও অনবহিত নহেন। সুতরাং আমাদের বিভিন্ন রাজনৈতিক দলগুলি যদি ব্যক্তির ও দলের ক্ষুদ্র স্বার্থের ঊর্ধ্বে উঠিয়া নিজেদের দলগত স্বার্থকে ও নেতৃত্বকে প্রাধান্য না দিয়া দেশের সামগ্রিক মঙ্গলের পরিপ্রেক্ষিতে সংসদীয় গণতন্ত্রকে পরিচালিত করেন—সাধারণ মানুষের মানবিক অধিকারের সংগ্রাম ও বিপ্লব এই সংসদীয় গণতন্ত্রের মাধ্যমেই জয়যুক্ত হইতে পারে। এই বৈজ্ঞানিক অগ্রগতির যুগে বন্দুকের গুলীর মধ্যেই শুধু বিপ্লব নিহিত বা হঠকারীদের দাঙ্গাহাঙ্গামার দ্বারাই বিপ্লব সাধিত হইতে পারে এই আত্মপ্রবোচনা হইতে আজ দেশের যুবমনের মুক্তির প্রয়োজন, সর্বাগ্রে এই সব সস্তা রোমান্টিক হঠকারী শ্লোগান ও কার্যক্রম হইতে যদি ভারতবর্ষের যুবমন মুক্ত না হইতে পারে তবে গণতন্ত্রের অগ্রগতি ব্যাহত হইবে।

ভারতবর্ষের মানুষের চরিত্রে সংসদীয় গণতন্ত্রের প্রতি প্রগাঢ় বিশ্বাস ও অনুরাগ রহিয়াছে। এই বিশ্বাস ও অনুরাগকেই আমাদের দৃঢ়তর করিতে হইবে এবং সাধারণ মানুষের অধিকার-বোধকে জাগ্রত করিতে না পারিলে সংসদীয় গণতন্ত্রের মধ্যে অসাধু ভণ্ডদের প্রাদুর্ভাব ঘটিবে।

সংসদীয় গণতন্ত্রের পরিপন্থী যে দুইটি ধারা আজ প্রকট হইয়া উঠিয়াছে সে সম্বন্ধে সতর্কবাণী উচ্চারণ করিয়া আমার বক্তব্য শেষ করিতেছি। রাজনৈতিক নীতিবোধ প্রায় লোপ পাইতেছে। দলত্যাগীর সংখ্যা বাড়িতেছে এবং তার ফলে বহু রাজ্যে গণতান্ত্রিক শাসনযন্ত্র সাময়িকভাবে বিকল হইয়াছে। আইনের দ্বারা এই সন্ত্রাস রোধ করার কথা আইনবিদরা চিন্তা করিতেছেন, কিন্তু সাধারণ মানুষের মধ্যে রাজনৈতিক চেতনাবোধ যত বেশি সঞ্চার করা যাইবে দলত্যাগ করিবার প্রবণতা ততই হ্রাস পাইবে। সুতরাং সংসদীয় গণতন্ত্রের যাহা ভিত্তি অর্থাৎ জনগণের রাজনৈতিক চেতনাবোধ তাহার বনিয়াদ যত দৃঢ় করা যাইবে ততই দলত্যাগীদের রাজনৈতিক ক্রিয়াকলাপের ক্ষমতা সীমিত হইবে। দ্বিতীয় যে ধারাটি সম্বন্ধে আমাদের সতর্কিত হওয়া প্রয়োজন হইয়া পড়িয়াছে তাহা হইল ক্ষুদ্র-ক্ষুদ্র বহু দলের উদ্ভব। কর্মসূচী বা আদর্শের ভিত্তিতে দল সৃষ্টি হইতেছে না—নেতৃত্ব ও ক্ষমতার লোভে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দলের আবির্ভাবে সংসদীয় গণতন্ত্রে মানুষের বিশ্বাসে আঘাত লাগিবার উপক্রম হইয়াছে। এই সব ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্বার্থান্বেষী নেতৃত্ব ও ক্ষমতালোভী দলগুলির অবলুপ্তি ঘটান আবশ্যক হইয়া পড়িয়াছে।

ভারতবর্ষে সংসদীয় গণতন্ত্রের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে আমি নৈরাশ্যবাদী নহি কিন্তু আজ প্রয়োজন সংসদীয় গণতন্ত্রের মাধ্যমে ভারতীয় জনগণের মধ্যে রাজনৈতিক চেতনাবোধ জাগ্রত এবং জোরদার করা, এবং ব্যাপকভাবে সংবিধানের মূল সূত্রগুলির প্রচার ও বিশ্লেষণের দ্বারা জনগণের মনে ভারতীয় সংবিধানের প্রতি শ্রদ্ধা, বিশ্বাস ও আত্মগত্যের মনোভাব সৃজন করা।

রোভার—
আমার গর্ব
আমার বন্ধু...

ROVER

এইটি আমার রোভার, উৎসবে-ব্যসনে নির্ভরতম বন্ধু। রোদে, ঝড়-বৃষ্টিতে সদাই আমার সঙ্গী—হোক না ক্ষেত-খামার, কল-কারখানা, হাসপাতাল, ডাকঘর, ইস্কুল-পাঠশালা, দূর-দূর ইস্টিশান—তক্ষুণি আমায়, সর্বসময়ে, তীব্রবেগে আমায় সটান পৌঁছে দেয়। সত্যি এতটুকু বাড়িয়ে বলছি না।

অভিজ্ঞতার এই বহুমূল্য দাম কখনোই কিন্তু শোধ হবার নয়।

জনগণের নিজস্ব বাহন রোভার আজই কিনুন

প্রেসারেস্ট সাইকেলস লিমিটেড গৌহাটি • কলিকাতা • বারাণসী • পাটনা
সারা ভারতেই স্টকিস্ট

পশ্চিম বাংলার নির্বাচন ও সর্বভারতীয় রাজনৈতিক পরিস্থিতি

শ্রী অরুণচন্দ্র গুহ

যে বিষয়ে আমাকে লিখতে হচ্ছে তা আমার পক্ষে একটু কঠিন। আমি কংগ্রেসের লোক; তাই আমার কাম্য হবে—কংগ্রেসের জয়। কিন্তু এই আলোচনা যদি দলগত দৃষ্টিভঙ্গি থেকে করা হয় তা' হলে বোধ হয় এর সুষ্ঠু আলোচনা হবে না, আমি চেষ্টা করব—দলগত আনুগত্য বাদ দিয়ে বাংলার তথা ভারতের বিভিন্ন সমস্যা ও মঙ্গলের দিক হতে আলোচনা করতে।

বাংলা একটি প্রান্তিক প্রদেশ বা রাজ্য। এর পূর্বে আছে পাকিস্তান এবং উত্তরে আছে চীন-চুম্বি-ভেলী ছোরার মতো প্রায় বাংলার বুকের ওপর বসে। পশ্চিম বাংলার রাজনীতিতে এটা একটা বিশেষ বিচার্য বিষয়। তার পর পশ্চিম বাংলার একটি সূক্ষ্ম অঞ্চল দিয়ে ভারতের সঙ্গে যোগ রয়েছে আসাম, ত্রিপুরা, মণিপুর, নাগাভূমি, নেফা প্রভৃতি বিস্তৃত অঞ্চলের। ভারতের প্রতিরক্ষার দিক থেকে ঐ সব অঞ্চলের বিশেষ গুরুত্ব আছে। ঐ সব অঞ্চলকে রক্ষা করতে হলে বাংলাকেই base বা মূল ভূমি হিসাবে ব্যবহার করতে হবে। তাই গত বিশ্বযুদ্ধের সময় মিত্রশক্তির প্রধান base ছিল বাংলা এবং সেই জন্যই বাংলার মানসিক বল ও কংগ্রেসী যুথবিরোধী মনোভাবকে খর্ব করার জন্য বাংলায় "মানুষের তৈরি" দুর্ভিক্ষ সৃষ্টি করতে হয়েছিল। এসব কাজে তখন কোন বিশেষ রাজনৈতিক দল ইংরাজ সরকারের সহায়তা করেছিল। বিভক্ত বাংলার ঐ বিষয়ে গুরুত্ব বেড়েছে বই কমে নি।

তার পর ভারতের অর্থনীতির দিক থেকেও বাংলার বিশেষ গুরুত্ব আছে। ৩।৪ বছর পূর্বে উড়িষ্যায় পরাদীপ বন্দর স্থাপিত হয়েছে; তবুও কলকাতা বন্দরই হল পূর্বাঞ্চলের একমাত্র বন্দর ও প্রধান ব্যবসায় কেন্দ্র। ভারতের রপ্তানীর একটা বিশেষ অংশ কলকাতা বন্দর দিয়েই যায়; এবং বাংলাই হল ইঞ্জিনীয়ারিং উদ্যোগের (engineering Industry) প্রধান কেন্দ্র। পাট, চা ও লৌহ-জাত দ্রব্য প্রধানত কলকাতা দিয়েই বাইরে যায়। আসাম ও বিহারের চা-বাগানের ও কয়লা-খনির কেন্দ্রীয় অফিস আজও কলকাতায়। পশ্চিম বাংলার এখনও বিভিন্ন কারখানায় এবং বিহারে ও আসাম, ত্রিপুরা প্রভৃতি অঞ্চলে যা উৎপন্ন হয় তা' সবই কলকাতার বাজার হয়ে বিভিন্ন স্থানে যায়। পশ্চিম বাংলার বিভিন্ন উদ্যোগ বা কল-কারখানা যে কেবল পশ্চিম বাংলার লোকেদের কর্মসংস্থান করে, তা' নয়; উত্তরপ্রদেশ, বিহার, পাঞ্জাব, হরিয়ানা, উড়িষ্যা প্রভৃতি বহু রাজ্যের ও অঞ্চলের লোকের কর্ম-সংস্থান হয় পশ্চিম বাংলায়। তাই ভারতীয় অর্থনীতিতে পশ্চিম বাংলার একটা বিশেষ স্থান আছে।

পশ্চিম বাংলায় আজ একটা বিশেষ সামাজিক ও আর্থিক সংকট দেখা দিয়েছে। গত কয়েক বছর যাবৎ পশ্চিম বাংলায় গুরুতর বেকার সমস্যা উপস্থিত হয়েছে। শিক্ষিত বেকার যুবক পশ্চিম বাংলায় যতটা আছে, হয়ত আর কোন প্রদেশে ততটা নেই। কলকাতায় এসে অন্য রাজ্যের লোকেরা তাদের কর্ম-সংস্থান করছে, রুজী-রোজগারের ব্যবস্থা করছে; কিন্তু বাঙালী যুবক চাকরি পাচ্ছে না। কেন ? যে কোন কারণেই হ'ক বাঙালী শ্রমিক বা কেরানির চেয়ে অন্য রাজ্যের শ্রমিক ও কেরানি বাংলায় বেশি আদর পায়;—এমন কি বাঙালীর ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানেও বাঙালীর চেয়ে অবাঙালী আদৃত হয়। শ্রমসাধ্য কিছু কাজ আছে—যেমন গাড়ির ড্রাইভার, কারখানার শ্রমিক, দারোয়ান প্রভৃতি; বাংলা দেশেও ঐ সব কাজে বাঙালীর চেয়ে অবাঙালীর আদর বেশি। তার ওপর কিছুদিন যাবৎ বাংলায় কেউ নতুন উদ্যোগ স্থাপন করতে সহজে রাজী হয় না। বহু বাঙালী প্রতিষ্ঠান তাদের নতুন প্রসার বা বিস্তার বাংলার বাইরে করছে; বাংলায় তারা করতে চায় না। বহু কারখানা বেশ কয়েক মাস যাবৎ দরজা বন্ধ করে বসে আছে। প্রধান কারণ নিরাপত্তাবোধের অভাব। আমি মানতে রাজী আছি যে, কারখানার মালিকরা অতি লোভী এবং শ্রমিকদের ন্যায্য প্রাপ্য দেয় না। তার জন্য শ্রমিক-দের অধিকার আছে—আন্দোলন করার। কিন্তু কারখানার মালিক যদি দেখে—এ দরজা পার হয়ে—অপরের আঙিনায় গেলে; সে এসব জ্বালাতন থেকে রেহাই পাবে—তবে সে কেন ঐ দরজার এ-পারে থাকবে? তা ছাড়া—আন্দোলন করার ও দাবি প্রতিষ্ঠা করার কতগুলি বিধি-বিধান আছে; তা মেনে চললে হয়ত উভয় পক্ষের দাবির ভারসাম্য বজায় রাখা অনেকটা সম্ভব হতো। যে মুরগী সোনার ডিম পাড়ত তাকে হত্যা করে সব সোনার ডিম একদিনে পাওয়া বোকামী, এ-কথা আজ উপকথায় উঠেছে। কারখানা থেকে সব পাচ্ছি না বলে, কারখানা বন্ধ করার রাস্তা নেওয়া ত' ঐ একই পর্যায়ের বুদ্ধির পরিচায়ক।

আজ ভারতের একটা প্রধান সমস্যা হল—কেন্দ্রীয় সরকারের সঙ্গে রাজ্য সরকারসমূহের সম্পর্ক নিয়ে। ১৯৪৬ সালের বৃটিশ মন্ত্রিসভার দূতদের (ক্যাবিনেট মিশন) প্রস্তাবে যা ছিল—তাতে কেন্দ্রের হাতে খুব সামান্য ক্ষমতা দেওয়া হয়েছিল। তখন অন্তর্বর্তী সর-কারের জাতীয়তাবাদী প্রতিনিধিরা এটা উপলব্ধি করেছিলেন যে—দুর্বল কেন্দ্রীয় সরকার দিয়ে ভারতের বৈষয়িক উন্নতি-করা-ও যাবে না এবং ভারতের সংহতিও রক্ষা করা যাবে না। গত দু'বছর ধরে বিভিন্ন প্রদেশ চাপ দিচ্ছে—কেন্দ্রীয় সরকার থেকে আরও ক্ষমতা রাজ্য সর-কারের হাতে যাতে আসে। একটা কথা খুব সহজে বলা হয়—বাংলা দেশ এতটা বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করে, কেরালা অতটা অর্জন করে। তাছাড়া—আয়করেরও হিসাব করা হয়। বাংলার কথাই ধরা যাক। যে বৈদেশিক মুদ্রা—রপ্তানী-বাণিজ্য থেকে বাংলার হিসাবে দেখানো হয়—তার একটা বিপুল অংশ বাংলার উৎপন্নদ্রব্য থেকে নয়; আসাম, বিহার, ত্রিপুরা এবং আরও অন্যান্য রাজ্যের উৎপন্ন দ্রব্য কলকাতার বাজার ও বন্দর দিয়ে যায় এবং কলকাতায় অবস্থিত অফিসের খাতায় তা' জমা দেখানো হয়।

যদি বিহার, আসাম প্রভৃতি রাজ্য তাদের আলাদা হিসাব দেখাবার অনুমতি পায়—তাহলে দেখা যাবে বৈদেশিক অর্থ, বাণিজ্যশুল্ক বা আয়কর বাংলার

অংশে অনেক কমে যাবে। পাট পশ্চিম বাংলায় যতটা হয়—হয়ত প্রায় ততটা বা কিছু বেশি আসামে, ত্রিপুরায়, বিহারে ও অন্যান্যস্থানে হয়। তেমনি—আসামে এবং ত্রিপুরাতে যা চা হয় তার হিসাব ত' বাংলার ভাগে পড়বে না। একটা পূর্ণ অর্থনীতি (complete economy) বিচার করলে দেখা যাবে বহু প্রয়োজনীয় দ্রব্যের জন্য বাংলাকে অন্য রাজ্যের ওপর নির্ভর করতে হয়। প্রধান হল—খাদ্যশস্য। খাদ্যশস্যের উৎপাদন পশ্চিম বাংলায় যে পরিমাণ বৃদ্ধি পাচ্ছে তার চেয়ে বেশি হারে বৃদ্ধি পাচ্ছে লোকসংখ্যা। আমাদের হিসাবে অদূর ভবিষ্যতে পশ্চিম বাংলাকে খাদ্যশস্য বিষয়ে স্বয়ম্ভর হবার সম্ভাবনা দেখা যায় না। দ্বিতীয় প্রয়োজনীয় দ্রব্য হল বস্ত্র। সে বিষয়েও বাংলা অন্য রাজ্যের ওপর নির্ভরশীল। হয়ত কেউ বলবেন—কয়েকটা কাপড়ের কল বসালেই ত' কাপড়ের যোগান বেড়ে যাবে। এটা ঠিক নয়; কারণ বাংলা দেশে বা তার আশে-পাশের কোন অঞ্চলে তুলোর উৎপাদন নেই। কাপড়ের কল-ও বাংলায় গত বছরে প্রায় একটি-ও দাঁড়াতে পারল না কেন—তা-ও ভাবতে হবে। এমনি আরও বহু জিনিস আছে, যাতে কেন্দ্রের শক্তি খর্ব করলে পশ্চিম বাংলার বা বিভিন্ন রাজ্যের দাবির ও প্রয়োজনের সমন্বয় সম্ভব নয়।

এসব কারণে পশ্চিম বাংলার সঙ্কীর্ণ স্বার্থের দিক থেকে হিসাব করলেও কেন্দ্রের সাহায্য ও সহযোগিতার প্রয়োজন আছে। তা ছাড়া—ভারতবর্ষের বৃহত্তর স্বার্থ ও মংগলও আমাদের দেখতে হবে। কারণ ভারতের সংহতি ও উন্নয়নের মধ্যেই বাংলার ও অন্যান্য রাজ্যের সত্যিকার মঙ্গল নিহিত আছে। যাঁরা কেন্দ্রকে দুর্বল করতে চান—তাঁদের প্রেরণা হল রাজনৈতিক উদ্দেশ্য সাধন। পূর্বাঞ্চলকে নিয়ে আলাদা রাষ্ট্র গঠন করার কথাও উঠেছে। এ সব হল আত্মঘাতী নীতি। আজ অনেক রাজ্যের সরকার প্রকাশ্যেই কেন্দ্রের নির্দেশকে অগ্রাহ্য করছে। এর ফলে ভারতের প্রতিরক্ষা ও বৈষয়িক উন্নয়ন সমস্যা যে কত কঠিন হবে—তা' যে কোন বিচারশীল লোক বুঝতে পারবেন। যাঁরা কেন্দ্রকে দুর্বল করতে চান, তাঁরা উদ্দেশ্যমূলকভাবেই হ'ক বা পরোক্ষেই হ'ক—বহিঃশত্রুর আক্রমণ থেকে ভারতের প্রতিরক্ষা ক্ষমতাকে খর্ব করতে চান। এর বিপদ সকলেরই স্মরণ রাখা উচিত।

আমাদের সংবিধান ব্যক্তিস্বাধীনতা দিয়েছে; মত প্রকাশের, সংঘবদ্ধ হবার, সভা-সমিতি করার, ধর্ম আচরণের প্রভৃতি বহু বিষয়ে স্বাধীনতা দিয়েছে। সবচেয়ে বড় স্বাধীনতা হল—বিভিন্ন রাজনৈতিক দল গঠন করার ও দলগতভাবে নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার। রুশে কয়েকজন বিদগ্ধ লোক রুশ সরকারের পররাষ্ট্রীয় নীতিসূচক একটা কাজের নিন্দা করেছিলেন। এই অপরাধে তাঁদের দীর্ঘকালের জন্য নির্বাসন দণ্ড দেওয়া হল। আর আমাদের দেশে সরকারের বহু কাজের ও সরকারের প্রধান নেতাদের বিরুদ্ধে নানা প্রকার সমালোচনা করা হচ্ছে; বিক্ষোভ প্রদর্শন, হাঙ্গামা সৃষ্টি, জাতীয় সম্পত্তি নষ্ট প্রভৃতি বহু সমাজদ্রোহী কাজ করেও কারোর নির্বাসনদণ্ড ত' দূরের কথা প্রায় ক্ষেত্রে কোন শাস্তিই দেওয়া হয় না। ব্যক্তিস্বাধীনতার অপব্যবহার পর্যন্ত এখানে সহ্য করা হয়। এসব কাজের দোহাই আমি দিতে চাই না; কিন্তু নিজের মত প্রকাশের ও বিভিন্ন রাজনৈতিক দল গড়ার অধিকার ও নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার অধিকার হয়ত কেউই হারাতে চাইবেন না। নির্বাচনের সময় সে দিকে খেয়াল রাখা দরকার। পরিণামে স্বাধীন নির্বাচনের অধিকার হারাতে ভোটারগণ চাইবেন না—বলেই আমার বিশ্বাস।

আজ বাংলাদেশে সাধারণ নাগরিক-জীবন বিপন্ন হয়ে উঠেছে। আইন-শৃঙ্খলার দোহাই আমি দিতে চাই না। কিন্তু তা' হলেও সমাজের সুষ্ঠু উন্নয়ন সাধন করতে হলে, সমাজজীবনে একটা সাধারণ নিরাপত্তাবোধ থাকা দরকার। সাধারণ কেরানি বা শ্রমিক, ব্যবসায়ী—বাড়ি থেকে কাজে বেরিয়ে গেলে—তার বাড়ির লোকদের সাধারণত উৎকণ্ঠায় সময় গুণতে হয়—কখন সংসারের উপার্জনশীল লোকটি ফিরে আসবে। কোথাও কিছু হল; আর কলকাতার রাস্তায় ট্রাম-বাস-চলাচল বন্ধ হল; যান-বাহনের ওপর হামলা হল—বোমা বা পটকা পড়ল—বা আগুন লাগিয়ে দেওয়া হল। ফলে নিরীহ যাত্রী নিহত, আহত বা অন্ততপক্ষে অনর্থক হয়রানির শিকার হল। চাষী ক্ষেতে চাষ করে ফসল তোলার সময় ভয়ে ভয়ে থাকে—কোন দল কখন এসে তার শ্রমের ফল লুঠ করে নিয়ে যায় এবং ঐ সব দলকে সমর্থন করার রাজনৈতিক দলও থাকে। আমি মানছি—জোতদার ও ভূমিহীন চাষী বা ভাগচাষীর সমস্যা মীমাংসা এখনও হয় নি; বা—যে ভূমিবণ্টন সংস্কার হওয়া দরকার—তা' এখনও হয় নি। কিন্তু তা' করার জন্য জনসাধারণের নির্বাচিত সরকার আছে। বহু সংস্কার ন্যায়সঙ্গত বলে স্বীকৃত হওয়ার পরও, তা' কার্যে পরিণত হতে দেরি হয়—আমাদের দেশেও হয়েছে রাশিয়াতেও হয়েছে—অন্য সব দেশেই হয়। বাস্তব অবস্থা বা বাস্তবতার বাধ্যবাধকতা (compulsion of reality) সকলকেই স্বীকার করতে হয়। সেজন্য লেনিন—এক পা এগিয়ে দু'পা পিছোবার নীতি (One step forward, two steps backward) অবলম্বনের প্রয়োজনীয়তা বোধ করেছিলেন; এবং এজন্যই তিনি অতি উৎসাহীদের তিরস্কার করেছিলেন—বালসুলভ উগ্রতা (infantile leftism) বলে। হঠকারিতা বলে আজ যার তিরস্কার করা হচ্ছে, তার প্রবর্তনের বা তাতে উস্কানী দেবার দায়িত্ব কার, তা' আজ বিচার করা দরকার। এবং পরে ঐসব হঠকারী কাজ ব্যাপকভাবে যাতে না আসতে পারে বা এলে পর যাতে যথোপযুক্ত ব্যবস্থা অবলম্বন করা হয়—এ নির্বাচনের মাধ্যমে তা' নির্ণীত হওয়া দরকার।

আজ বাংলার সমাজের দিকে তাকিয়ে বিচার করতে হবে—আমাদের সমাজ-ব্যাধি কি এবং তার প্রতিকার কি করে হতে পারে। বাংলার বহু কল-কারখানা আজ বন্ধ—কতক অবশ্য গত এক বছরের মধ্যে খুলেছে। যারা কল-কারখানা চালায় তারা আজ ভীত ও সন্ত্রস্ত। অনেক বাঙালী উদ্যোগিক বা ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানও তাদের প্রসার স্থগিত রেখেছে বা বাংলার বাইরে প্রসার করছে—নতুন কারখানা স্থাপন করে। তাতে বাঙালীর ও বাংলার আর্থিক ও সামাজিক সমস্যা আরো জটিল হবে। বাপ-মা'র আশা-ভরসা তাদের পুত্র-কন্যা;—অনেক পিতা-মাতাই অতি কষ্টে সন্তানদের বিদ্যালয়ে পাঠান। কিন্তু সেখানে যদি বিদ্যা অর্জনের চেয়ে অসামাজিক কাজের দিকেই তাদের আগ্রহ বেশি প্রকাশ পায়—তা হলে পিতা-মাতার ভবিষ্যৎ আশা নষ্ট হয়। এসব কাজের ফলে তাদের কেউ আহত হয়—কেউ নিহত হয়; আবার কেউ অন্যকে আহত বা নিহত করে। ছাত্রে ছাত্রে সংঘর্ষে বহু ছাত্রের জীবন নষ্ট হচ্ছে। হয়ত এর জবাবে কেউ বলবে—এটা আজ বিশ্বজোড়া সমস্যা। এতে আমাদের সমস্যা মিটল না—বা আমাদের দুঃখও ঘুচল না; কেবল আত্মসন্তোষ লাভের জন্য আত্ম-প্রতারণা করলাম। কলকাতায় দু'টি বড় কলেজের বি· এ· ও বি· এসসি পরীক্ষার সময় সবগুলি ছাত্র পড়ল 'আর-এ'—পর্যায় অর্থাৎ সবাই পরীক্ষার জবাব দিতে গিয়ে অসদুপায় অবলম্বন করেছে—তার ফলে এরা সবাই হল রিপোর্টেড এগেনস্ট। আর· এ। আমাদের ছাত্র অবস্থায় জান-তাম—পরীক্ষার কক্ষে গার্ড বা পাহারাদার রাখার দরকার হলে—কলেজ বা স্কুল কর্তৃপক্ষ লজ্জিত হতেন। আজ ছাত্ররা

কয়েকটি নির্বাচনী সমাবেশ

গার্ডদের প্রহার করে পরীক্ষার ঘরে অসদুপায় অবলম্বন করতে-ও কুণ্ঠিত হয় না। ছাত্রদের এসব অন্যায় আচরণের জন্য কেউ লজ্জিত নয়; বরং এর পিছনে উৎসাহ যোগাচ্ছে—বড়দের আচরণ। শিক্ষক, রাজনৈতিক নেতা বা দল—সবাই এদের এ পথে চালিত করার পক্ষে প্রেরণা যুগিয়েছে। এ ব্যাপারে কোন দলকে বাদ দিয়ে আমি বলতে চাই না। দায়িত্বের তারতম্য অবশ্য দলবিশেষে আছে; বাংলার ভবিষ্যৎ এসব ছাত্রদের ওপর নির্ভর করছে। —তিরস্কার করা বা শাস্তি দেওয়া হয়ত সহজ। কিন্তু নিজেদের আচরণ দিয়ে এদের সুপথে চালিত করতে পারে এমন লোকের হাতে যদি শাসন ক্ষমতা না যায়—তবে সবই যে ব্যর্থ হবে। আজ নির্বাচনের সময় প্রত্যেক ভোটারের খেয়াল রাখা দরকার—কে তার সন্তানকে নিজের আচরণ দিয়ে—নিজের মত দিয়ে নিজের দৃষ্টান্ত দিয়ে সৎপথে চালিত করবে। এর মধ্যে ব্যক্তিগত আচরণের কথাও যেমন বিচার করতে হবে—দলগত মতের ও কর্মনীতির কথাও তেমনি বিচার করতে হবে। সন্তানদের, যুবকদের সৎপথগামী করাই যে কোন সমাজের প্রধান সমস্যা ও কর্তব্য। আপনার সন্তান যদি সত্যিকার মানুষ না হয়—আপনার ধন-দৌলত, রাস্তা-ঘাট, স্কুল-কলেজ, কল-কারখানা সবই ব্যর্থ।

ওপরে মোটের ওপর বাংলার বিশেষ দায়িত্ব ও সমস্যা সম্বন্ধে বলেছি। বাংলার গত ২০ বছরের ইতিহাস একটু দেখা দরকার। এর মধ্যে ভুলভ্রান্তি, ত্রুটি-বিচ্যুতি বহু হয়েছে। কিন্তু এর অপর দিক-ও আছে। ২০ বছরে পশ্চিম বাংলায় পূর্ব-বাংলা থেকে উদ্বাস্তু এসেছে ৪০ লক্ষর মতো। এখনও ক্ষীণ-ধারায় তা আসছে;—দরজা কার্যত বন্ধ—তাই বেশি আসতে পারছে না। যে কোন সময় আবার হয়ত প্রবল প্রবাহে তারা আসবে। তাদের জন্য ঘর খোলা রাখতে ন্যায়ত ও রাজনীতির দিক থেকে—ভারত ও পশ্চিমবাংলা বাধ্য। আড়াই কোটি লোক নিয়ে পশ্চিম বাংলার পত্তন হয়; আজ তার লোকসংখ্যা প্রায় চার কোটি। আয়তন, অবশ্য সামান্য বৃদ্ধি পেয়েছে। মোটের ওপর জমির ওপর বাংলার লোকের চাপ কেরলার পরই, এখন হয়ত প্রায় সমান। তাই জনসংখ্যার দিক থেকেও প্রতিবেশী অন্যান্য রাজ্য থেকে বাংলার সমস্যা একটা জটিল। গত ২০ বছরে শিক্ষা ও স্বাস্থ্য ব্যবস্থার প্রসার হয়েছে বহু; রাস্তা-ঘাট, পানীয় জলের ব্যবস্থার এখন গ্রাম অঞ্চলের বহু উন্নতি হয়েছে। ম্যালেরিয়া, কলেরা প্রভৃতি মহামারী প্রায় দূর হয়েছে। প্রতি হাজারে মৃত্যুর হার ভারতের মধ্যে বাংলাদেশে প্রায় সর্বনিম্ন। চাষের উৎপাদন ও কৃষিজ-দ্রব্যের মূল্য বহু বেড়েছে। তাতে মোটের ওপর বলা যায় গ্রামাঞ্চলে পূর্বের চেয়ে প্রায় ৮।১০ গুণ বেশি অর্থাগম হচ্ছে। এবং গ্রামাঞ্চলে জীবিকার মান পূর্বের চেয়ে অনেক উন্নত হয়েছে। শহরে একদিকে বিলাসিতা ও পরিহার্য (non essential) ব্যয় বহু বেড়েছে যেমন সিনেমা, প্রসাধন দ্রব্য, সাজ-সজ্জা প্রভৃতি। অপর দিকে—অপ্রচুর বাসস্থান, অস্বাস্থ্যকর বাস-ব্যবস্থা, পুষ্টিকর খাদ্যের অভাব এসবও দেখা দিয়েছে। সাধারণত নিম্ন-মধ্যবিত্ত শ্রেণীর যাদের বলে white-collared service men—অর্থাৎ অফিসের কেরানি জাতীয় কর্মচারীদের, জীবন পূর্বের চেয়ে দুর্বহ হয়েছে। শহরে পাশাপাশি এলাকায় থাকে বা একই বিদ্যালয়ে পড়াশুনা করে বা একই অফিসে কাজ করে। তাই নিম্ন-মধ্যবিত্ত এই শ্রেণীর লোকদের-ও উঁচু শ্রেণীর লোকদের কায়দা-কানুন ও ফ্যাশনের সঙ্গে তাল রেখে চলতে হয়। এই সব গরীব ঘরের ভদ্রশ্রেণীর সন্তানদের সামাজিক মর্যাদা ও বাইরের ঠাট বজায় রাখতে প্রাণ ওষ্ঠাগত হয়।

এই বিশ বছরে আর একটা জিনিস হয়েছে—সকলের মধ্যেই অধিকার-বোধ জেগেছে। নিজ নিজ দাবির কথা বলতে কারোর কোন ভয় নেই; বরং বেশ জোর

গলায় তা বলতে পারে। সকলেই আঙুল দেখায় —টাটা-বিড়লার দিকে। তাদের দাবি মুখর হয়ে উঠেছে—স্বাধীন দেশের নাগরিকদের সমান অধিকার ও সমান সম্ভোগ থাকবে। তার ফলে চারিদিক থেকে দাবি উঠছে—বেতন বাড়াতে হবে। সঙ্গে আসছে কাজ না করার প্রবৃত্তি। এদের মনে একটা ধারণা জন্মেছে—যে ওপরের শ্রেণীতে যারা আছে, ন্যায্য থেকে এদের বঞ্চিত করে, তারা আরামে আছে। তা থেকে খুব সহজ মীমাংসা—অতএব, আমরা কাজ করব কেন? তাদের বেতন বৃদ্ধি করতে হলে যে জাতির ও রাষ্ট্রের সম্পদ বাড়ানো দরকার—নইলে যে সরকার ও জাতি দেউলে হয়ে যাবে; ফলে তাদেরও দুর্ভোগ বাড়বে—এ কঠিন সত্যটা এদের কাছ থেকে গোপন রাখা হয়। এটাই হল রাজনীতির চাল; অর্থাৎ যে কোন প্রকারে অসন্তোষ সৃষ্টি করতে হবে। কিন্তু এটা জাতির পক্ষে আত্মঘাতী। কর বাড়াবো না, বা রেলের, ট্রাম-বাসের ভাড়া বাড়াবো না; স্কুল-কলেজে ছাত্রদের ফী বাড়াবো না। কিন্তু কর্মচারীদের বেতন বাড়াতে হবে; রেল, ট্রাম-বাসের কর্মীদের বেতন বাড়াতে হবে, শিক্ষকদের বেতন বাড়াতে হবে;—এ দুই দাবির অর্থ যে কাঁচির দুদিকের ধারালো ছুরির চাপের নিচে জাতির গলাকে ফেলে দেওয়া—সে শিক্ষা তাদের হাতে দেয় নি। তার ফলে বাংলার নিম্নমধ্যবিত্ত শ্রেণীর মনে কর্মবিমুখতা একটা সামাজিক অধিকারের আসন দখল করেছে। রাজকোষে ২৫ কোটি মজুদ টাকা নিয়ে সুরু করে, ৯ মাস শাসনের পর ২৫ কোটি টাকা দেনা যদি জমে যায় তাহলে সে শাসন সম্বন্ধে লোককে সতর্ক হতে হয়। গত ৩।৪ বছরে বাংলার সরকারী কর্মচারীদের যে মাগ্গীভাতা বাড়ানো হয়েছে —তার ফলে মোট বাৎসরিক ব্যয় সরকারের বেড়েছে প্রায় ৪৫ কোটি টাকা। এতে কর্মচারীদের কতটা লাভ হয়েছে জানি না—কিন্তু আজ বাংলা সরকার প্রায় দেউলে। উন্নয়ন কাজের জন্য কোনই পয়সা তাদের নেই। নতুন কর ধার্য করাও আজ কঠিন।

খাদ্যশস্য আমাদের সাধারণ লোকদের প্রধান খরচের বিষয়, তার পর অন্যান্য খাদ্যদ্রব্য। সাধারণ লোকের মাসিক আয়ের ৭০% বা ৮০% খাদ্য সংগ্রহের জন্য ব্যয় হয়। এর যোগান ও মূল্য সাধারণ লোকের প্রধান বিচারের বিষয়। আগামী ৩ বছরের জন্য যাদের হাতে শাসনক্ষমতা ন্যস্ত হবে—তাদের সম্বন্ধে এ ভরসা সাধারণ লোকের থাকা দরকার যে—খাদ্যশস্য ও অন্যান্য খাদ্যদ্রব্যের যোগান ও সাধারণ মানুষের আয়ত্তাধীন মূল্য, সম্ভব হবে কি-না। সাধারণ মানুষকে এ-ও ভাবতে হবে—তার নাগরিক জীবনের নিরাপত্তা ব্যাহত হবে—কিংবা সুরক্ষিত হবে। সাধারণ মানুষকে আরও ভাবতে হবে—তাদের ভবিষ্যৎ নির্ভর করছে—সন্তানদের সুশিক্ষা ও সদাচরণের ওপর। এ নির্বাচনের ফলে—তার কোন সুব্যবস্থা হবে কি-না।

এ নিবন্ধের প্রথমেই বলেছি—পশ্চিম বাংলা একটি সীমান্ত রাজ্য; তার দুদিকে দুটি শত্রুভাবাপন্ন রাষ্ট্র। তাদের গুপ্তচর শুধু দেশের সীমান্তে নয় দেশের ভেতরেও যে বিচরণ করে তার বহু নিদর্শন পাওয়া গিয়েছে। জাতির স্বাধীনতা ও নিরাপত্তা রক্ষার জন্য পশ্চিম বাংলায় দেশ-প্রেমে উদ্বুদ্ধ শাসন দরকার—যে শাসনের কর্ণধারের নিকট জাতীয়তাবাদী বা দেশপ্রেমিক নিন্দাসূচক পরিচয় বলে গণ্য হবে না। কারণ বাংলার শাসকদের মনোভাবের ও দেশের নিরাপত্তা রক্ষায় তাদের আগ্রহের ওপর, সমগ্র ভারতের স্বাধীনতা ও জনসাধারণের নিরাপত্তা নির্ভর করছে। অন্যান্য সামাজিক সমস্যা ও আর্থিক সমস্যা সম্বন্ধেও অবহিত হতে হবে। যাতে কল-কারখানা ঠিকমতো চলে—যাতে কর্মসংস্থানের সুযোগ সঙ্কুচিত না হয়ে আরো প্রসারিত হয়—তাও সাধারণ মানুষের বিশেষ ভাবনার কথা। পশ্চিম বাংলা একটি গুরুত্বপূর্ণ রাজ্য। ভারতের প্রতিরক্ষা ও ভারতের অর্থনীতির দিক থেকে পশ্চিম বাংলার একটা বিশেষ গুরুত্ব আছে।

এ অবস্থায় মধ্যবর্তী নির্বাচনের মাধ্যমে বাংলার ভবিষ্যৎ শাসনযন্ত্র নির্ধারিত হবে। কেন্দ্রের অকৃপণ সহযোগিতা ও সাহায্য ভিন্ন বাংলার সমস্যা লাঘব করা শুধু কঠিন নয়—বলা যায় অসম্ভব। গত তিনটি যোজনায়—বাংলা সরকারের মোট খরচের অর্ধেকের বেশি কেন্দ্র থেকে দিয়েছে। এ ছাড়া কেন্দ্রীয় পরিকল্পনায় বহু উন্নয়ন কাজ বাংলায় হয়েছে—যেমন ডি-ভি-সি, দুর্গাপুর ইস্পাত কারখানা, হলদিয়া, ফারাক্কা প্রভৃতি। তৃতীয় যোজনার পর যে তিন বছর যাচ্ছে তাতেও রাজ্যের পরিকল্পনার ব্যয়ের প্রায় ৬০% বা তার চেয়েও বেশি কেন্দ্র থেকে দিয়েছে। চতুর্থ যোজনায় হয়ত কেন্দ্রের পক্ষে পর্যাপ্ত অর্থ সাহায্য করা সম্ভব হবে না। সব রাজ্যের প্রতিই তাকে এবার কৃপণ হস্তে সাহায্য বিতরণ করতে হবে। কারণ—কেন্দ্রের আজ অর্থসঙ্গতি খুবই সংকীর্ণ। এ নিয়ে কেন্দ্রের বিরুদ্ধে অভিযোগের মনোভাব সৃষ্টি করা বাংলার পক্ষেও ক্ষতিকর—সর্বভারতীয় সংহতির পক্ষেও তেমনি অনিষ্টকর। এ সব বিষয়েও সাধারণ লোককে সতর্ক হতে হবে—যাতে সস্তা বোলচাল দিয়ে কেউ তাদের বিভ্রান্ত করতে না পারে।

আজ বাংলাদেশে, কম হলেও ২৫।৩০টি রাজনৈতিক দল নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছে। ২ বছর পূর্বে ১৯৬৭ অব্দে সাধারণ নির্বাচনের সময় ২০।২৫টা দল ছিল, তার পর আরও ৫।৬টা দল গঠিত হয়েছে; এবং তারাও নির্বাচনে প্রার্থী দাঁড়ও করাচ্ছে। এর মধ্যে ২০।২২টি দল এককাট্টা হয়ে একটি গোষ্ঠী হিসাবে নির্বাচনে প্রার্থী দিচ্ছে। এ সব দলের মধ্যে মতের কোন সাম্য বা মিল নেই। যুক্ত-গোষ্ঠীর মন্ত্রিসভা অনেক রাজ্যে স্থাপিত হয়েছিল, পশ্চিম বাংলায়ও হয়েছিল। কিন্তু এর কোন রাজ্যেই মন্ত্রিসভা কোন সময়েই সুপ্রতিষ্ঠিত বা টেকসই ছিল না—বা হয় নি। এদের সকলের মধ্যে অন্তর্দ্বন্দ্ব প্রায় সব সময়েই লেগে আছে। গত ২ বছরে দেখেছি এসব মন্ত্রিসভা প্রায়ই পড়-পড় হয়েছে, আবার জোড়াতালি দিয়ে কিছুদিন টিকেছে। প্রত্যেক দলের প্রধান চেষ্টা হল মন্ত্রিসভার সুযোগ-সুবিধা দিয়ে নিজ দলের প্রভাব ও শক্তি কতটা বাড়ানো যায়। অনেক সময় প্রকাশ্যভাবেই যুক্ত-গোষ্ঠীর অন্তর্গত এক দল অপর দলের নিন্দা করেছে। পশ্চিম বাংলায়ও তা' দেখা গিয়েছে। এ ধরণের মন্ত্রিসভা কোন সুচিন্তিত কার্যক্রম নিয়ে চলতে পারে না। পূর্বে যেখানে ছিল ১৮-দফার কার্যসূচী, এখন তাকে দ্বিগুণ করলে, পূর্বেকার নিষ্ফলতার ক্ষতিপূরণ হবে না। নিজ নিজ সুনির্দিষ্ট কার্যসূচী নিয়ে যদি কয়েকটি দল দাঁড়ায়, তাহলে ভোটারদের পক্ষে নির্ভরশীল ও আস্থাযোগ্য দল বেছে নেওয়া সহজ হয়। এ সব অন্তর্দ্বন্দ্বের ফলে ও ছোট ছোট বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের পদ-লালসার ফলে—একটা উৎকট ব্যাধির সৃষ্টি হয়েছে; —এক দলের লোকের অপর দলে যাওয়া এখন যেন একটা সাধারণভাবে দৈনিক বস্ত্র পরিবর্তনের মতো সহজ হয়ে দাঁড়িয়েছে। অথচ এটা জাতীয় চরিত্রের বিশেষ অবনতির পরিচয় দিচ্ছে।

এ মনোভাবের প্রশ্রয় বিভিন্ন দল থেকে দেওয়া হয়—যখন এ-সব দলত্যাগ নিজেদের দল পুষ্টির সাহায্য করে। কিন্তু যদি এটা নিজেদের শক্তি হ্রাসের কারণ হয়, তখন অনেক বড় বড় নীতির কথা বলে উষ্ণ আবহাওয়া সৃষ্টি করা হয়। এ অবস্থা গণতন্ত্রের পক্ষে অত্যন্ত হানিকর; প্রকৃতপক্ষে এতে গণতন্ত্রের ভিত ভেঙে দেওয়া হয়। অনেক দল আছে—যারা মূলত গণতন্ত্রে বা ব্যক্তিস্বাধীনতায় বা রাজনৈতিক দল গঠনের স্বাধীনতায়

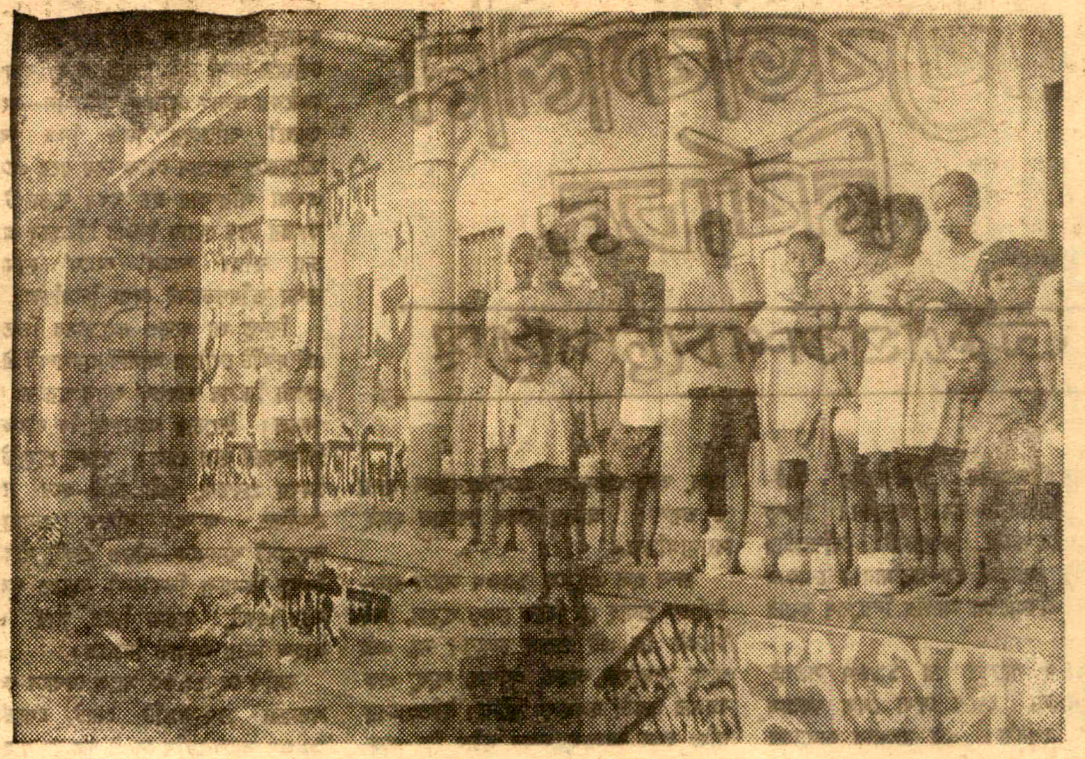

গ্রামে গ্রামেও নির্বাচনী আসর জোর জমে উঠেছে। দুগ্ধ-বিতরণ কেন্দ্রটির দেওয়ালে দেওয়ালে তাই আর প্রচারে কোনো দলই পিছিয়ে নেই। আমতার এই জায়গা নেই—

ফটো : অসীম মুখোপাধ্যায়

বিশ্বাসী নয়। তারাও ভবিষ্যতে বল সঞ্চয় ও ক্ষমতা দখলের উদ্দেশ্যে, গণতন্ত্রের কথা বলছে। নির্বাচনের সময় তাদের সম্বন্ধেও হুঁশিয়ার হতে হবে। কারণ গণতান্ত্রিক অধিকার—অর্থাৎ ব্যক্তি-স্বাধীনতা ও রাজনৈতিক মতামতের স্বাধীনতা হারালে আমাদের অনেক যুগ পিছিয়ে যেতে হবে। সে অবস্থা নিশ্চয়ই ভোটাররা পছন্দ করবেন না।

শেষ বক্তব্য হিসাবে কয়েকটি কথা বলছি। দল নির্বিশেষে প্রতিনিধি নির্বাচনের অধিকার গণতন্ত্রের মূল কথা। অনেক সামরিক ও আঞ্চলিক দুঃখ-দৈন্য —অভাব-অভিযোগ লোকের আছে। আমাদের দেশ অনুন্নত—কিন্তু উন্নতিশীল। উন্নতির গতি অব্যাহত রাখতে চাই শৃঙ্খলাবদ্ধ সমাজ—যেখানে রাষ্ট্রশাসন একটা উন্নয়নমূলক কার্যক্রম নিয়ে চলতে পারে। কার্যক্রমের একটা লম্বা ফিরিস্তি বা বড় বড় কথা দিয়েই শাসক-দলের যোগ্যতার পরিমাপ করা যায় না। যে কার্যক্রম দেওয়া হবে—তা' কার্যে রূপান্তরিত করার কর্ম-যোগ্যতা এবং আভ্যন্তরীণ সংহতি তার আছে কি-না তা বিচার করা বিশেষ দরকার। ফানুস-বাজি দেওয়ালীর অন্ধকার রাতে খুবই শোভন—কিন্তু বাস্তব রাজনীতিতে কথার ফানুস দিয়ে কাজ চলে না—এবং সমাজ ও তার ওপর নির্ভর করে উঁচুতে উঠতে পারে না। কাজেই নির্বাচনের মুখে কোন্ দল কি বলে—তা দিয়ে যেন ভোটারগণ বিচলিত না হয়। তাদের বিচার করতে হবে—প্রত্যেক দলের অতীতের কার্য দেখে এবং তাদের রাজনৈতিক ও সামাজিক দর্শন (Political and Social Philosophy) হিসাব করে এবং তাদের কার্যদক্ষতা দেখে। সে সঙ্গে আর একটা কথাও বিচার করে দেখতে হবে—যে শাসক-দলকে তারা ক্ষমতায় বসাবে—তাদের আভ্যন্তরীণ সংহতি আছে কি না এবং তাদের শাসন টেকসই হবে—কি প্রতিদিন সামান্য হাওয়াতেই নড়বড়ে হয়ে উঠবে।

ভোটের অধিকার নাগরিক জীবনের সবচেয়ে বড় অধিকার। যে অধিকার তারা প্রয়োগ করার বিস্তৃত ক্ষেত্র পাচ্ছে; ২৫।৩০টি দল তাদের কাছে ভোট-ভিক্ষা করছে। কেবল একটি দলের একটি করে প্রার্থীই নির্বাচন ক্ষেত্রে নেই;—প্রতি ক্ষেত্রেই ৩, ৪ বা ৫জন প্রার্থী হয়ত থাকবে। প্রত্যেক প্রার্থী নিজ নিজ বুলি বলবে। এর ভেতর থেকে বেছে নেবার অধিকার নাগরিকদের সামনে উপস্থিত। ভুল করে বেছে নিয়ে, পরে যাতে পস্তাতে না হয়—সে বিষয়ে প্রত্যেক নাগরিককে সতর্ক হতে হবে। আর একটা বিষয়েও সতর্ক হতে হবে—প্রত্যেক ভোটারকে দেখতে হবে—তার নাম করে যেন অপরে এসে তার ভোট দিয়ে না যায়,—বা ভয়ে প্রলোভনের বশেও যেন কোন ভোটার তার ভোটের অপব্যবহার না করে। এই মহামূল্য অধিকারের সৎ ও সুষ্ঠু প্রয়োগের ওপরই আমাদের গণতন্ত্রের ভবিষ্যৎ ও পশ্চিম বাংলার ভবিষ্যৎ নির্ভর করছে।

মধ্যবর্তীকালীন নির্বাচন

অরুণপ্রকাশ চট্টোপাধ্যায়

মধ্যবর্তীকালীন নির্বাচনের পটভূমিকা মোটামুটি সবাই জানেন। কিন্তু এর পশ্চাদ্‌পটের কয়েকটি বৈশিষ্ট্যের পুনরুক্তি করতেই হয় বর্তমানকে বোঝার জন্য ও ভবিষ্যতের আকার নিরূপণ করার জন্য।

১৯৪৭ সালের পর ১৯৬৭ সালেই প্রথম বাংলা দেশে দেখা গেল কংগ্রেস পার্টির বিপর্যয়। এই রাজ্যের মানুষের মনে একটা মোহমুক্তি ঘটল। এর পূর্বে একটা ধারণা কিছু লোকের মনে বদ্ধমূল হয়ে গিয়েছিল যে, কংগ্রেস ছাড়া দেশ শাসন চলবে না। ১৯৬৭ সালের নির্বাচন জানিয়ে দিল যে, অন্য পার্টিরাও সরকার গঠন করতে পারে। শুধু তাই নয়, কম্যুনিস্ট পার্টি যে সরকার গঠন করতে পারবে বাংলা দেশে—এটাও ছিল অন্তত বছর কয়েক আগেও অবিশ্বাস্য। কিন্তু তাও ঘটল। এই যে কংগ্রেস থেকে সরে আসা—এটা বাংলা দেশের রাজনৈতিক জীবনে একটা গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। আমি বলব ভারতের রাজনৈতিক জীবনেও এটা ছিল অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। দেশী ও বিদেশী পুঁজিপতিদের ঘাঁটি এই বাংলা দেশ—এখানে কম্যুনিস্ট পার্টি অর্থদপ্তর হাতে নিয়ে যুক্তফ্রন্টে যোগ দেবে, এ ঘটনা যেমন একদল লোকের মনে সন্ত্রাস এনেছিল, আর একদলের মনে এনেছিল আশা ও ভরসা। আমরা বলব শেষোক্ত দলই সংখ্যাগরিষ্ঠ।

প্রশ্ন হল এই যে, ১৯৬৭ সালে রাজনৈতিক প্রবাহ যে দিকে মোড় ঘুরল, সেই দিকেই কি এই প্রবাহ চলবে? না, এটা শুধু সাময়িক অথবা ক্ষণিক, শুধু এক বছরের একটা ছন্নছাড়া ঘটনা। ইতিহাসের গতি যখন বদলায়, তখন হঠাৎ কি একেবারেই নতুন মোড় নেয়—না, বাঁদিক ডানদিক অদল-বদল করতে করতে শেষে একটা নিজস্ব দিক বেছে নেয়?

নিষ্ফল তর্কের নৈরাজ্যে না গিয়ে একথা বলা যেতে পারে যে, ১৯৬৭ সালের নির্বাচন বাংলা দেশের রাজনৈতিক জীবনে একটা সুস্পষ্ট দিকনির্দেশ করছে। এ রাজ্যের রাজনৈতিক প্রস্ফুটন এই দিকেই অবশ্যম্ভাবী।

তলিয়ে দেখলে দেখা যাবে যে, ১৯৬৭ সালের নির্বাচনের ফলাফল মোটেই অপ্রত্যাশিত ছিল না। কংগ্রেসকে একটা ভয়ঙ্কর শক্তি হিসাবে দেখাটায় আমাদের একটা দূরদৃষ্টির অভাব ছিল। আমরা সহজেই ভুলতুম যে, কংগ্রেস, এই বাংলা দেশে যেমন বেশির ভাগ অন্যান্য রাজ্যে ও সারা ভারতবর্ষেও—সংখ্যালঘু ভোটে রাজত্ব করে গেছে—সব সময়ই এই পার্টি শতকরা পঞ্চাশের নিচে ভোট পেয়েছে। কিন্তু তা সত্ত্বেও কংগ্রেস রাজত্ব করতে পেরেছে, তার কারণ দুটি—(১) আনুপাতিক নির্বাচন প্রথার অভাব, (২) কংগ্রেস-বিরোধী শক্তির মধ্যে অনৈক্য।

প্রথম কারণটি থেকেই যাচ্ছে—কাজেই ঐ নিয়ে আলোচনা বৃথা।

দ্বিতীয় কারণটির অবসান ঘটল যুক্তফ্রন্ট গঠনের মধ্য দিয়ে। বলা যেতে পারে যে, ১৯৬৭ সালের পূর্বেও তো এই বামপন্থী ঐক্য সংগঠন করা হয়েছে। কিন্তু ঐসব বামপন্থী ঐক্য সংগঠন ও বর্তমানকালের যুক্তফ্রন্টের মধ্যে এক গুণগত প্রভেদ দেখা যায়। এই যুক্তফ্রন্টে প্রথম আমরা দেখলুম যে কংগ্রেসের ভিতরকার একটা দল কংগ্রেস থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে বেরিয়ে এল এবং বামপন্থীদের সঙ্গে একজোট হবার ইচ্ছা প্রকাশ করল। কংগ্রেস থেকে বেরিয়ে-আসা এই দলটি শুধু বামপন্থী ঝোঁকের জন্যই বেরিয়ে আসে নি—কংগ্রেস-ত্যাগী ব্যক্তিদের নিজ নিজ স্বার্থও তাঁদেরকে কংগ্রেস থেকে বের করে এনেছে। একথা পরিষ্কার হয় যখন যুক্তফ্রন্ট সরকারের শেষ কয়েক দিনের ইতিহাস আলোচনা করি। স্বার্থে স্বার্থে হানাহানি তখন ভীষণভাবেই দেখা দিয়েছিল।

কিন্তু তা সত্ত্বেও কংগ্রেসের ভিতরকার এই দলটি বেরিয়ে আসায় বামপন্থী ঐক্যের একটা বিশেষ তাৎপর্য জনসাধারণের চোখে পড়ল। দৈত্যের আভ্যন্তরীণ দুর্বলতাটা পরিষ্কার হয়ে গেল। তার ভ্রূকুটি যে-মিথ্যা প্রবঞ্চনা, এটা স্বচ্ছ হয়ে গেল। শোষিত, ক্ষুব্ধ, বঞ্চিত জনসাধারণ কংগ্রেসী শাসনকে—যদিও একটু সাবধানে, কিন্তু অন্যান্য নির্বাচনী বছরের তুলনায় আর একটু ভরসা নিয়ে, আর একটু সাহস নিয়ে আঘাত দিয়েছে।

দেখি যে, ১৯৬২ সালে যেখানে কংগ্রেস শতকরা ৪৭·২৯টি ভোট পেয়েছিল, ১৯৬৭ সালে দেখি যে ঐ দল পেয়েছে মাত্র ৪১·১৩টি।

ভোটপ্রাপ্তির শতকরা হিসাব দেখলে কিন্তু দেখা যায় যে, কংগ্রেসের হারানো ভোট বৃহৎ বামপন্থী দলগুলির মধ্যে ভাগ হয় নি। কেন না ১৯৬২ সালে সোস্যালিস্ট পার্টিরা পেয়েছে সাকুল্যে শতকরা ৫·০২ ভোট। কম্যুনিস্ট পার্টি ২৪·৯৬, ফরওয়ার্ড ব্লক ৪·৬১, অন্যান্য পার্টি ৫·৩০ ও নির্দলীয় ১০·৯৮। ১৯৬৭ সালে সংযুক্ত সোস্যালিস্ট পার্টি ও প্রজা সোস্যালিস্ট পার্টি মাত্র শতকরা ৪·০১, দুই কম্যুনিস্ট পার্টি শতকরা ২৪·৬৪, ফরওয়ার্ড ব্লক ৪·৪৩, বাংলা কংগ্রেস ১০·১৩ ও নির্দলীয় ও অন্যান্য বামপন্থী দল ১৩·৪৯। কাজেই কংগ্রেসের ভোট খোয়া গেছে মুখ্যত বাংলা কংগ্রেস ও নির্দলীয় ও অন্যান্য ছোট ছোট বামপন্থী দলের কাছে।

তর্কের খাতিরে যদি ধরাও যায় যে, যেসব ক্ষুব্ধ কংগ্রেসী গতবারে বাংলা কংগ্রেসের মারফৎ কংগ্রেসের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছিলেন তাঁরা আবার পুরনো দলে ফেরৎ যাবেন, তাহলেও এর ফলে বাংলা কংগ্রেসের শতকরা ১০·১৩ ভোট হয়ত শতকরা ৫·০৮ ভাগে নেমে যেতে পারে, কিন্তু তাতেও কংগ্রেসের ভোটের শতকরা হার ৪৬·২১-এর বেশি হতে পারে না। হয়ত এর চাইতে অনেক কমই হবে। নির্দলীয় প্রার্থীদের ভোট প্রায় সবটাই কংগ্রেস-বিরোধী ভোট, কেন না বিশ্লেষণে দেখা যায় এর বেশির ভাগটাই ইলেকশান কমিশন কর্তৃক অননুমোদিত

কিস্তিতে ট্রানজিস্টর

মাসিক ১০৲ কিস্তিতে ৩২০৲ মূল্যের বিশ্ববিখ্যাত "এস-কর্ট" ৩ ব্যাণ্ড অল ওয়ার্ল্ড পোর্টেবল ট্রানজিস্টর লাভ করুন। প্রতি গ্রাম ও শহরে প্রেরণের যোগ্য।

আবেদন করুন :—
Japan Agencies (B.W.C—10)
Post Box 1194, Delhi—6.

বামপন্থী পার্টির ভোট অথবা বামপন্থী সমর্থিত ব্যক্তিদের ভোট।

ফলত, যেসব বর্ণচোরা কংগ্রেসী বাংলা কংগ্রেসের মাধ্যমে তাঁদের ক্ষোভ প্রকাশ করেছিলেন, তাঁরা তাঁদের পুরনো দলে ফেরৎ গেলেও কংগ্রেসের ভাগ্য পরিবর্তনের আশা খুবই কম। অনেকে ভুল করে মনে করেন যে, বাংলা কংগ্রেসের জন্যই কংগ্রেসের বিপর্যয় হয়েছিল এবং তাঁদের মতে বাংলা কংগ্রেসের ভোটটা মোটামুটি কংগ্রেসের স্বপক্ষের ভোট এবং কংগ্রেস নিজের আভ্যন্তরীণ সংগঠন ঠিক করে নিতে পারলেই ও বিদ্রোহী কংগ্রেসীদের স্বদলে নিয়ে আসতে পারলেই বা কোণঠাসা করতে পারলেই কংগ্রেসের জয় অবশ্যম্ভাবী। পরিসংখ্যান কিন্তু এঁদের মত সমর্থন করে না। কংগ্রেস বিগত নির্বাচনে বর্ণ-চোরা কিন্তু বিদ্রোহী কংগ্রেসীদের জন্য হারে নি—হেরেছে, কারণ জনসাধারণ বেশি করে ও অধিক সংখ্যায় বামপন্থীদের ভোট দিয়েছে। বাংলা দেশের জনসাধারণের স্পষ্টত বামপন্থী ঝোঁক কংগ্রেসের পরাজয়ের জন্য দায়ী।

কিন্তু উপক্রান্ত হিসাব কংগ্রেসী-প্রভাব বাংলা দেশে বেশি এই ধরে নিয়েই করা হয়েছে। কংগ্রেসী-প্রভাব এত বেশি ধরার কোনও কারণ নেই। বাংলা কংগ্রেসকে যাঁরা ভোট দিয়েছেন, তাঁরা মনে-প্রাণে কংগ্রেসী ঐকথা মনে করার কোনও কারণ নেই। বরং একথা মনে করার সঙ্গত কারণ আছে যে, যাঁরা বাংলা কংগ্রেসকে ভোট দিয়েছিলেন তাঁরা মনে-প্রাণে কংগ্রেস-বিরোধী, শুধুমাত্র কংগ্রেস-সংস্কারের মনোবৃত্তি নিয়েই বাংলা কংগ্রেসকে ভোট দেন নি। হয়ত বৃহৎ, সুপরিচিত বামপন্থী দলগুলির সঙ্গে একমুহূর্তেই ভাগ্য-সংযোজন করতে তাঁরা সাময়িকভাবে নারাজ ছিলেন। কিন্তু পথচলার নিয়মেই তাঁরা এগিয়ে যাবেন—এবং এই ভোট অবিসম্বাদীভাবেই বামপন্থীদেরই পক্ষে যাবে। উদাহরণস্বরূপ বলা যেতে পারে—যেমন কেরালা কংগ্রেস। কেরালা কংগ্রেসও প্রথমে জনসাধারণের বামপন্থী ঝোঁকের সুযোগ নিয়ে গঠিত হয়েছিল—ভোটও পেয়েছিল কপেন্ট। ১৯৬৭ সালের নির্বাচনে কিন্তু দেখি যে জনসাধারণ আরও এগিয়ে গেছেন এবং বামপন্থী দলগুলির প্রতি তাঁদের আনুগত্য প্রকাশ করেছেন।

তাছাড়া কংগ্রেস তার সাংগঠনিক সবলতা ফিরে পাবে, একথা মনে করারও কোন কারণ নেই। শাসক পার্টি যখন ভাঙনের মুখে পড়ে, তখন তাকে শুধরে তুলে আবার পাকা ভিতের উপর ইমারত গঠন করা একেবারেই অসম্ভব। শাসক-শ্রেণী তখন অন্য দল গঠন করার কথা ভাবে—"বাসাংসি জীর্ণানি যথা বিহায়।" এই জন্যই দেখি যে, পুঁজিপতি শ্রেণী কংগ্রেসের পাল্টা জনসঙ্ঘ ও স্বতন্ত্র পার্টির উপর আস্থা রাখতে শুরু করছে এবং তাদের বদান্যতার ঢেউ যেন এই দলগুলির কোলেই এসে পড়ার ইঙ্গিত দিচ্ছে।

গত নির্বাচনের আর একটি তাৎপর্য-পূর্ণ ঘটনা লক্ষ্য করা যেতে পারে। হুগলী নদীর দুই তীরেই যে শ্রমিক অঞ্চল সেখানে কম্যুনিস্ট পার্টি অভূতপূর্ব সাফল্য অর্জন করেছে। বিশেষ করে হুগলী নদীর ২৪ পরগনার দিকের শ্রমিক অঞ্চলে প্রায় প্রত্যেক নির্বাচনী কেন্দ্রে মার্ক্সবাদী কম্যুনিস্ট পার্টির সাফল্য অভূতপূর্ব। বিজপুর থেকে বরানগর পর্যন্ত ১০টি কেন্দ্রে মার্ক্সবাদী কম্যুনিস্ট পার্টি ৬টি আসন দখল করেছে। নৈহাটী, নোয়াপাড়া ও টিটাগড়-এ যদিও কংগ্রেস প্রার্থীর জয় হয়েছে, কিন্তু ভোট গণনা করলে দেখা যায় যে, দুই কম্যুনিস্ট পার্টির ভোট কংগ্রেস প্রার্থীর ভোটের চাইতে অনেক বেশি—বিশেষ করে নৈহাটী ও টিটাগড়ে। কাজেই এই তিন কেন্দ্রেও কংগ্রেস-বিরোধী ভোটই বেশি সংখ্যায়, এবং এবারকার নির্বাচনে দুই কম্যুনিস্ট পার্টির নির্বাচনী ঐক্যের ফলে এই তিন কেন্দ্রেই যুক্তফ্রন্টের জয় অবশ্যম্ভাবী।

এখানেই বলে রাখা ভাল যে, ১৯৬৭ সালে বাংলা দেশের বহু কেন্দ্রেই এই রকম বামপন্থী দলগুলির পরস্পর-বিরোধের ফলে বহু আসনই কংগ্রেস জিতেছিল। যুক্তফ্রন্টের মধ্যে বামপন্থী দলগুলির ঐক্য সাধিত হওয়ায় এবারকার মধ্যবর্তীকালীন নির্বাচনে যুক্তফ্রন্টের আরও অনেক বেশি আসন পাওয়া উচিত।

এখন যে কথা বলছিলুম সে কথায় ফিরে আসা যাক। শ্রমিক অঞ্চলে মার্ক্স-বাদী কম্যুনিস্ট পার্টির উল্লেখযোগ্য প্রভাব ১৯৬৭ সালের নির্বাচনের একটা গুরুত্ব-পূর্ণ ঘটনা। হুগলী নদীর ধার বরাবর এই প্রভাব বিজপুর থেকে দমদম পর্যন্ত—এবং আরও দক্ষিণে বিস্তৃত। শহরের দক্ষিণাঞ্চলে যাদবপুর, বেহালা ও মহেশ-তলা কেন্দ্রগুলিও মার্ক্সবাদী কম্যুনিস্ট পার্টি দখল করেছে গত ১৯৬৭ সালের নির্বাচনে। এই শেষোক্ত তিনটি কেন্দ্র-গুলির বৈশিষ্ট্য এই যে, এইগুলি নিম্ন-মধ্যবিত্ত ও শ্রমজীবী কর্মচারী অধ্যুষিত।

খাস কলকাতাতেও কম্যুনিস্ট ও বাম-পন্থী প্রভাব অব্যাহত ছিল। ১৯৫৭ সালে কলকাতার ২৬টি আসনের মধ্যে বামপন্থীরা দখল করেছিলেন ১৯টি সীট এবং ১৯৬২ সালে 'সেটা' নেমে গিয়ে দাঁড়িয়েছিল ১২টিতে। কিন্তু ১৯৬৭ সালে মোট ২৩টি কলকাতার আসনের মধ্যে বামপন্থীরা পেয়েছেন ১২টি, অর্থাৎ ঠিক অর্ধেক।

আসানসোল শ্রমিক এলাকাগুলিতে বামপন্থীরা তাঁদের প্রভাব বজায় রেখেছেন এবং ১৯৬২ ও ১৯৬৭ উভয় সালেই অর্ধেক আসন কংগ্রেসীরা পেয়েছেন এবং অর্ধেক আসন বামপন্থীরা পেয়েছেন।

উপরের আলোচনা থেকে একথা পরিষ্কার যে শ্রমিক ও মধ্যবিত্ত অঞ্চলে বামপন্থী-প্রভাব আরও বেড়েছে এবং কৃষক এলাকায় বামপন্থী প্রভাব নতুন করে অনুপ্রবেশ করে উল্লেখযোগ্য সাফল্য অর্জন করেছে। নদীয়া, হুগলী, মেদিনীপুর ও ২৪ পরগনায় ১৯৬৭ সালে কংগ্রেসের পরাজয় এই তথ্যই সূচিত করে। ২৪ পরগনায় কংগ্রেসের পরাজয় বিপর্যয়ের আকার ধারণ করেছিল। মোট ৪৯ আসনের মধ্যে ২৪ পরগনায় বামপন্থীরা ১৯৬৭ সালে পেয়েছিলেন ৩২টা ও কংগ্রেসীরা পেয়েছেন মাত্র ১৭টা।

ভবিষ্যতের ইঙ্গিত ও নির্দেশ বর্ত-মানেই পাওয়া যায়। ইতিহাস প্রমাণ করে যে, গণ-চেতনার গতি একেবারে উল্টো মোড় কখনও নেয় না। তার পথ বাঁকা-চোরা হতে পারে, কিন্তু তার গতি সব সময় সামনের দিকে। ভবিষ্যদ্বাণী যদি করতে হয়, তাহলে বলব যে, আগামী মধ্য-বর্তীকালীন নির্বাচনে কংগ্রেসের পরাজয় অবশ্যম্ভাবী।

১৯৬৯তে আপনার ভাগ্য

যে-কোন একটি ফুলের নাম লিখিয়া আপনার ঠিকানাসহ একটি পোস্টকার্ড আমাদের কাছে পাঠান। আগামী বারমাসে আপনার ভাগ্যের বিস্তারিত বিবরণ আমরা আপনাকে পাঠাইব, ইহাতে পাইবেন ব্যবসায়ে লাভ লোকসান, চাকুরিতে উন্নতি, বদলী, জন্ম, বিবাহ ও সুখ-সমৃদ্ধির বিবরণ; আর থাকিবে দুষ্ট-গ্রহের প্রকোপ হইতে আত্মরক্ষার নির্দেশ। একবার পরীক্ষা করিলেই বুঝিতে পারিবেন।

PT. DEV DUTT SHASTRI
RAJ JYOTISHI (B. M. W)
P. B. 86, JULLUNDUR CITY

ভোট ফর ভোট ফর ভোট ফর...

ভোট ফর
ভোট ফর

সমীর মুখোপাধ্যায়

মঞ্চের মাথার দিকটায় আকাশ দেখা যাচ্ছিলো। অল্প অল্প কুয়াশা পড়েছে। নিয়ন লাইটের লাঠিগুলি মঞ্চের মাথার দিকে না দিয়ে তলার দিকে ফিট করা হয়েছে। ফলে মুখে সরাসরি আলো এসে পড়ছে না অথচ নেতাদের দূর থেকে পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে।

বক্তৃতা চলছে এমন সময় সভার দক্ষিণ কি বাম প্রান্ত থেকে একটা ঢেউ উঠলো। শোনা গেল ইট পড়ছে। বক্তা একটু ক্ষণের জন্যে গুলিবর্ষণ থামালেন। একটু ইতস্তত ভাব। তারপর সজোরে মাইক চেপে ধরে তদ্দর ভাষায় গর্জে উঠলেন, 'এসব ওদের কাজ। ওরা প্যাচার জাত। অন্ধকারে থাকে। ওখান থেকে ইট ছুড়ছে। যুক্তিকে ওরা ভয় পায়। ইট তাই ওদের একমাত্র অবলম্বন। আপনারা বসুন। আমাদের ভলান্টিয়াররা এক্ষুণি ওদের ব্যবস্থা করছেন। আমাদের কর্মীরা বেশ শক্ত হাতেই কান্ডা ধরেন।"

এই হচ্ছে এবারকার নির্বাচন। এই হচ্ছে প্রায় প্রত্যেক জায়গার ব্যাপার। একটু কারখানা-টারখানা কাছে থাকলে আর দেখতে হবে না।

কতকগুলি ধারণাকে অলংঘনীয় নীতি হিসাবে ধরে সব পার্টিই এখন দাবি করছেন তাঁরাই একমাত্র ধন্বন্তরী বৈদ্য।

নকশালপন্থী বন্ধুরা ত' বলেছেন, 'শোষক শ্রেণীর দুই ফ্রন্ট। কংগ্রেস আর যুক্তফ্রন্ট। ভোট বর্জন করুন। সশস্ত্র কৃষিবিপ্লব গড়ে তুলুন।'

চারিদিকের এই অস্থির বিভ্রান্তিকর আবহাওয়ায়, 'তাহলে হ্যাঁ মশাই, একজন আমাকে বললেন, কি করি বলুন ত'? কংগ্রেস বলেছেন, যুক্তফ্রন্ট যুক্তফ্রন্ট নয়। অভিযুক্ত ফ্রন্ট। আর যুক্তফ্রন্ট বলছেন কংগ্রেস হচ্ছে সব রকমের সন্দেহজনক ব্যক্তিদের একটা জোট। আমার ত' মশাই বুদ্ধি গুলিয়ে যাচ্ছে। কে সত্যি বলছে বলুন ত'? ঐ নকশালরা যা বলছেন ঐ মশাই ঠিক। আমি মশাই ভোট-ফোটে নেই। আপনি কি বলেন?'

আমি সহাস্যে বলি 'আপনার অনাবিল বিবেক যা বলে তাই করুন না কে কি বলল তাতে কি এসে যায়।'

উনি যাই বলুন, আমি সঠিক জানি, সেতোই উনি ভাব দেখান যেই জিতুক আমার অবস্থা সেই একই থোড়-বড়ি-খাড়া। ভোটের দিন জমিয়ে বন্ধুর বাড়িতে তাস পিটবো অথবা পাশের পর পর যে চারটে

ভোট গণনার সাথে-সাথে নির্বাচন প্রার্থীর প্রেসারও বাড়তে থাকে।

হল হাউস গর্জিয়েছে ভোটের দিন ওদেরই একটার খোলের মধ্যে মুখে কাপড় চাপা দিয়ে ঢুকে পড়বো, আসলে উনি এর একটাও করবেন না, ইলেকশনের উত্তেজনা ঐসব বর্ণহীন, রক্তহীন, উত্তাপ-হীন ধূসর ব্যক্তিরা কি ছেড়ে দিতে পারেন, এমন র‍্যালা, এমন মজা!

না। তা পারেন না। ইলেকশনের আগুনে ঠান্ডা হয়ে যাওয়া হাত-পা কে না সেঁকে নিতে চান। বৃদ্ধদের কাছে ইলেকশন ত' টনিকের কাজ করে।

রাতারাতি ওঁরা আবিষ্কার করেন, বয়েস ওঁদের অনেক ঝরে গেছে।

আমাকে এক তেড়েল বলেছিলো, 'রস গেঁজে গিয়ে তাড়ি, সে মশাই যারোটা লাগাদ হুই য্যাখন সুর্য্যি মাতার ওপর মানে টাটে গিয়ে বসে।'

নির্বাচনের রস এখনো গেঁজে গিয়ে বিশুদ্ধ তাড়িতে পরিণত হতে কিছু বিলম্ব আছে বটে তবে ফোঁটায় ফোঁটায় মেটে কলসীতে রস ঝরা অলরেডি শুরু হয়ে গেছে অনেকদিন। আরম্ভটা বলতে গেলে ভালোই। মারপিট, টিটকারি, শিস্ নির্বাচনের প্রয়োজনীয় অনুষংগগুলি যথারীতি আরম্ভ হয়ে গেছে।

দু-চারটে খুনও দিব্যি চোখের সামনে ঘটে গেল। লাসও গায়েব হয়ে গেছে এধার-ওধার। বাড়ি বাড়ি গিয়ে খবরের কাগজগুলি 'বুক' করে আমার কাজটি ইতিমধ্যেই বিভিন্ন পার্টির করিৎকর্মা ছেলেরা করে ফেলেছে।

নবযুগের নববংগের চালকেরা যাঁরা 'দেশহিতে চাহিছে সঁপিতে আপন রক্তমাংস', তাঁরা চাংগা হয়ে উঠেছেন। 'কচ্ছপেরা ধীরে, রৌদ্র পোহায় তীরে' ভুলে নির্বাচনী অফিসগুলি একে একে খুলে যাচ্ছে।

কিন্তু সেই বিখ্যাত দেয়াল-কবিদের তন্দ্রা এখনো ভাঙে নি। অবশ্য দেয়ালের তাতে ক্ষতি নেই। দেয়াল-কবিদের গত নির্বাচনের প্রতিভার পতাকা এখনো সূর্যকরোজ্জ্বল আকাশের নিচে জ্বল জ্বল করছে।

ভাবতে হয় না, চিন্তা করতে হয় না, ধন্য এ দেশের মাটির গুণ আর ধন্য ধন্য রবীন্দ্রনাথ, মেয়েদের আবাঁধা চুলের মত এদেশের হাওয়ায় উড়ছে কবিতা।

থাক্ না একটু ব্যক্তিগত কটাক্ষের গঞ্জনধ্বনি। যে কথা চুপিচুপি বাতাসে বাতাসে ফেরে সে কথাই যদি হেসে ফিরে চায়, তাতে কার ক্ষতি!

দলাদলি আর অহংকারের কলরবে তখন কান পাতা দায় হবে যদি ওঁরা গান বন্ধ করেন, কলমের কালি মুছে ফেলেন।

না। দেয়াল-কবিরা এখনো তেমন দেখা দেন নি। কল্পনা করছি সেই সব অসংখ্য, অনামী, নির্মোহ, চিন্ত-উদাস দেয়াল-কবির দল যাঁরা দাড়ি-সমাকীর্ণ মুখ ঈষৎ আনত করে, চোখের প্রান্তে কৌতুক আর চাপা ওষ্ঠাধরে বিদ্রূপ রেখে ইতিমধ্যেই সচকিত, দ্রুত কলমে বচন-রচনে বসে গেছেন।

'আংকেল' বললে আমাদের পাড়ায় সকলেই তাকে চিনবে। ফ্রম হীরে টু জিরে সকলের কাছেই 'আংকেল'। নির্বাচনের সময় যতো এগিয়ে আসছে ততোই 'আংকেল'-এর কদর বাড়ছে।

'আংকেল' আমাকে বলল, 'সব কাজ শেষ হয়ে গেছে। এখন বাকী ঠিকমত লিস্ট তৈরি করা।'

'তোমার ত' সবই মুখস্থ। অসুবিধের কি আছে?'

'লিস্ট ত' কোনদিন তোমাকে করতে হল না। চিরদিন কলম কামড়ে থাকলে বুঝতে ঠেলা লিস্ট তৈরি করা কি ঝকমারি।'

বাজারী হিন্দীতে বললাম, 'খোল্‌কে কহো।'

'লিস্ট দু'টো, বুঝলে ব্রাদার। একটা 'তরল'দের নিয়ে। আরেকটা 'কঠিন'দের নিয়ে।'

কিছু না বুঝে বললাম, 'আর বারবীয়?'

'কোথাকার মাকড়া? অমন চোলাই থাকতে গাঁজা টানবে কোন উল্লুক?'

'তাই বলো। 'তরল' মানে চোলাই? কম্পানী?

'এ্যাতোক্ষণে ধরা হ্যায়।' মুগ্ধদৃষ্টিতে ক্ষণিক আমার দিকে তাকিয়ে 'আংকেল' বলল, 'ইলেকশন এই তরল আর কঠিন—দু'টো গ্রুপেরই দরকার। এই যারা টিটকিরি দেয় বড়োদের টিকি ধরে, চলন্ত মেয়েদের হাতে জ্বলন্ত সিগারেট ধরিয়ে দেয়, অন্য কান্ডার লীডারগোছের ছেলের পিঠে 'স্যাট' করে চুমু খেয়ে দেয়, খিস্তির ফুলঝুরি ছোটায় বিপক্ষের মিছিল দেখলে, তারাই আমার 'তরল' গ্রুপ আলো করে আছে। চোলাই এদের ধ্যান-জ্ঞান।

'প্রথম প্রথম আমি এদের গ্যাঁটের পয়সা খরচ করে খেতে শেখাই। তারপর নেতাদের ধরে দু'-একজনের টেম্পরারি কাজ জুটিয়ে যেই দিই অমনি কৃতজ্ঞতায় গলে গিয়ে ওরা হপ্তা বা মাসের তলব আমারই হাতে তুলে দেয়. আমি নিজে কিংবা ওদের কাউকে 'ড্রাই' থাকতে দিই না। মাসের প্রায় প্রত্যেক দিন তখন আমার বাড়িতে মচ্ছব। এদের গায়ে শক্তি নেই একরত্তি। কিন্তু চোলাই টেনে হাফ-বেহুঁশ এরা হৈ-চৈ বাধাতে ওস্তাদ। সটাসট সিটি মারতে ওস্তাদ। রাত ন'টার পর প্রায়ই রাস্তায় মাথা সোজা করে চলতে পারে না। ঘাড় কাৎ করে যদি কাউকে এখান দিয়ে রাত ন'টার পর চলতে দেখ বুঝবে এরা আমার লোক।'

'ঘাড় কাৎ কেন?'

'আশ্চর্য, এই বুদ্ধি নিয়ে'...বলে বাক্যটা শেষ করা 'আংকেল' অনর্থক ভাবলো, তারপর ডান হাতখানা নাক পর্যন্ত তুলে 'আংকেল' বলল, 'ঘাড় কাৎ হবে না? ততোক্ষণে যে এতোখানি পর্যন্ত হুঁস গেছে রসে টইটুম্বুর।'

'তরল' গ্রুপের পরিচয়টা ত' দিলে। এবারে 'কঠিন' সম্বন্ধে কিছু জ্ঞান দাও।'

হ্যাঁ। এই 'কঠিন' গ্রুপই আসল। রাতে এ্যান্টি-পার্টির মিছিল যাচ্ছে হয়তো দাপাতে দাপ্পতে, শালারা আবার মশাল মিছিল বার করে, তখন কী করে 'তরল' গ্রুপের কোন ছেলে হয়তো সোডার বোতল দোকান থেকে নিয়ে ছুঁড়ে বাতাস গরম ক'রে ফেলেছে, শুরু হয়ে গেছে রৈ-রৈ কান্ড, 'কান্ডা'র ভেতর থেকে লাঠি বেরিয়েছে সকলের, অনেকেই এদিক-ওদিক পালাচ্ছে, হঠাৎ কারেন্টের তার ঝুলে গেল, রাস্তা অন্ধকার, তখন ওদের দলের রইস আদ্‌মিদের ধরে ধরে সুযোগ তেমন পেলে হয় ফাঁসিয়ে দেবে 'কঠিন' গ্রুপের ছেলেরা না হয়তো দশ-বিশটি দড়াদ্দম নক-আউট ঝেড়ে চোখে সর্ষেফুল দেখিয়ে ছাড়বে। এরাই 'বীর', 'বোম্বাই হীরো', 'মস্তান'—তুমি যাই বলো।'

এমন উত্তেজক আলোচনার ফাঁকে ফাঁকেই 'আংকেল' কেমন বিমর্ষ হয়ে যাচ্ছিলো। আমার সতর্ক চোখকে ফাঁকি দিতে পারছিলো না। আমি লক্ষ্য করছিলাম ছোট ছেলে যেমন মাঝরাত্রে চমকে চমকে ওঠে 'আংকেল'ও কথার ফাঁকে ফাঁকে চমকে চমকে উঠছিলো।

'কি ব্যাপার? তোমার পুরস্টু গোঁফ চমকে চমকে উঠছে কেন? গোঁফে ভূমিকম্প লেগেছে নাকি? তোমার মুখে দার্জিলিং-এর 'ধস' নামলো শেষ পর্যন্ত?'

'আংকেল' ম্লানমুখে বলল, 'কঠিন' গ্রুপই আমার মাথায় মুকুট পরিয়েছে। এদেরই দৌলতে ইলেকশনের বাজারে দাঁও মেরে খাই। কিন্তু এ মুকুট কাঁটার মুকুট। যতো দিন যাচ্ছে ততো কাঁটা বেড়ে যাচ্ছে।'

'কেন?'

'এই 'কঠিন' গ্রুপের ছেলেরা ঠিক চোলাই খায় না। অকেশানালি খেতে পারে, গডেস কালীর দিন একটু-আধটু পান করতে পারে কিন্তু চোলাই-এ মুখ ডুবিয়ে পড়ে থাকে না। ডান হাতে বালা, বাঁ হাতে ঘড়ি, কোমরের খাপেভরা সাপের জিভের মত সাত ইঞ্চি ছুরি, দেখলেই বুকের ভেতরটা মাইরি গড়গড়ে করে, বলে দিয়েছে সেদিন, ইলেকশনে জান দোব 'আংকেল' লেকিন 'দুস্টু' করে চাকরি না দিয়ে ভোগা দিলে 'চাক্কা গাড্ডামে'—হুঁশিয়ার। পুরো রুটি, পুরা কাম—নেহি ত' বিজনেস জাম্প সমঝে? আমাকেই শালারা ফাঁসিয়ে দেবে যদি কথার খেলাপ করি। কিন্তু এ্যাডো চাকরি যদি আমিই দিতে পারবো তাহলে আমিই

ত' একটা কারখানা খুলতাম ছোটো-খাটো।'

হ্যাঁ, যতো ইলেকশন এগিয়ে আসে ততোই এদের দেখা যায় গণ্ডায় গণ্ডায়। লক্ষ্মীপুজোর দিন দেখেছি কালী ফট্‌কায় বান্ডিল হাতে নিয়ে অবলীলায় পর পর ফুটিয়ে যাচ্ছে। এক পাউণ্ডের বড়ো বড় বোমা—সকলেই দূরে থেকে প্যাকাটি ক'রে ঠেকিয়ে সরে পড়ে। এরা হাতের ওপরই বোমটা তুলে নেয়। সল্‌তেটা পুরো যতোক্ষণ না ধরে ততোক্ষণ হাতে রেখে দেয়। তারপর চারদিকের বিস্ফারিত দৃষ্টির সামনে হাসতে হাসতে দেয়ালে প্রচণ্ড শক্তিতে ছুঁড়ে মারে।

এরা সব জানে। শালকে থেকে এক 'মস্তান' এসে, দোকানের গন্ধ শুঁকে বুঝে নিয়ে, চেয়ারে সম্রাটের মত হেলান দিয়ে বসে, টেবিলে ছুরির ফলাটা গেঁথে রেখে, হুকুম দিলো, 'এ্যাই কমবক্ত, মাংস লাও আর এক পাউণ্ড রোটি। আউর দড়ি মার্কা এক লম্বর দিশি।'

আমি দশ বছর ওই দোকানে নির্বিবাদে চা খেয়ে যাচ্ছি। আমি জানতাম না ওখানে চোলাই পাওয়া যায়। শালকের ছয়টি একদিন এসেই কেমন টের পেয়ে গেল! এসব অনেকটাই হয়েছে ইলেকশনের মহিমায়!

স্কুল-কলেজ সবই বন্ধ। খুললেই সামনে পরীক্ষা। অনেকেই হয়তো ইলেকশনের 'র‍্যালা'য় যোগ দিতে পারবে না। কিন্তু আফশোষে আফশোষে বুক ওদের ফেটে যাবে। ভাবুন একবার, কতোদিন পর, জোলুস, আর কি যেমন-তেমন জোলুস, বোম্বাই সিনেমার ফার্টাটিং পিকচার অমন দু'-দশখানা হার মেনে যায়, যখন এসেই গেল তখন তাতে যোগ না দেবার দুঃখ, এ বলে বোঝানো যায় না, এ শোকের সান্ত্বনা নেই।

দিনের বেলায় বিশেষ স্ফূর্তি নেই। সব স্ফূর্তি রাতে। এই এদেরি কে এক-জন বলেছিলো, 'বেশ হয় না রে, যদি দু' ঘণ্টায় দিন কাবার হয়ে যায়, আর বাকী সময়ের সবটাই হয় রাত!'

দিনের বেলা লরী কিংবা 'ভাড়েকা ট্রক'-এ ওঠো। দংগল জোটাও। তারপর গাড়ির বনেটে ঝাণ্ডা ঝুলিয়ে টুইস্ট দিতে দিতে শ্লোগান ওড়াও।

আসল কাজ রাত্তিরে। সটাসট এ ওর পোস্টার ছেঁড়ো আর তার ওপর নিজেদের পোস্টার সেঁটে দাও।

বেশির ভাগ মারপিট ত' পোস্টার ছেঁড়া-ছেঁড়ি থেকে আসে। আর মারপিট হলেই স্ফূর্তি। মানুষের গাঁদি লেগে যায়। উত্তেজনায় সকলের মুখে ফেনা। সেই সময় ভালো 'গদি' অর্থাৎ মোটা-সোটা দেখে যাকে হাতের কাছে পাও তাকে পিটিয়ে সুখ ক'রে নাও। তবেই না মজা!

ইলেকশনের দিন দু'-তিনটে পার্টির ব্যাজ লাগিয়ে নাও। যেখানে যেমন জোটে। গরীব পার্টি চা-বিস্কুট দেবে। তাও লোটো। আর বড়লোক পার্টির কায়দাই আলাদা। গরম গরম চপ আর অঢেল লুচি। খেয়ে শেষ করতে পারবে না। শীতকালের রাত্তিরে, টেবো টেবো রসে টইটুম্বুর বোঁদে, কড়াই বোঝাই, তাতে আবার 'ভাপ' উঠছে। বোঝা যাচ্ছে উনুন থেকে এই-মাত্র নামানো হল, সোজা চলে এসো পার্টি অফিসে, ভাবতেই নোলা সক সক করে, তারপর হাযড়ে বোঁদে খেয়ে, যখন বড়োরা কেউ নেই, তখন ওদেরি কালি ওদেরি কাগজ নিয়ে শালা ওদেরি বিরুদ্ধে লিখে দেয়াল লাল ক'রে দাও।

এসব যে এরা ভেবে-চিন্তে করে তা নয়। এরা অতো পার্টি-ফার্টি বোঝে না। বোঝাতে গেলে বলে, 'গুলিয়ে যাচ্ছে মাইরী। আমায় ছেড়ে দে। না হলে কেঁদে ফেলবো।' কোথাও একটা চাপা রাগ থাকে বুকের ভেতরে, হয়তো ভাবে এই এ্যাতোসব রক্ততামাসা ক'রেও বিধু গয়লার ছেলে তুমি বিধু গয়লার ছেলেই থেকে গেলে, ভবিষ্যতে জুটবে না চাকরি, বিয়ে ত' সাত হাত জলের মধ্যে, মনে পড়ে বাড়ির কথা, হাঁফানী-গ্রস্ত বাবা মার অক্ষম মায়ের কথা আর সোমত্ত, আইবুড়ো বোন যার সংগে দু'বেলা 'লভ' ক'রে যাচ্ছে লোফার লোকটা, একটা গণ্ডগোল করবেই কিন্তু সব জেনেও কিছুই করা যাবে না, এই সব পরের দেওয়া পড়ে পাওয়া বোঁদে চিবোতে চিবোতেও মনে পড়ে যায় বৈকি, তারপর ওরা যেন কেমন হয়ে যায়, দাঁতে দাঁতে কড়মড় করে ওঠে, মনে হয় সামনের দেয়ালটা ঘুসি মেরে ফাটিয়ে এফোঁড় ওফোঁড় করে দি, অথচ তা' অসম্ভব, তখনি ঐসব বাঁদরামি, ঐ ওর খেয়ে ওকেই ঘাঁশ দেবার দারুণ প্রলোভনটা আর জয় করতে পারে না। দারুণ আক্রোশে নিষ্ঠুর আনন্দে বুক ফাটিয়ে হাসে হা হা করে।

ইলেকশনের দিন বলে দেওয়া হয়েছে, এ রাস্তা দিয়ে যে লরী বা ট্রাক যাক তাকে ব্যাজ দেখালেই সে থামবে, তোমরা তাতে চেপে ভোটার নিয়ে আসবে। কোই বাত নেহি। ছেলেরা দু-দশটা ভোটার এনে তারপর ব্যাজ দেখিয়ে এন্তার লরী থামাচ্ছে আর লরীতে উঠে একবার যাচ্ছে ও-মুড়ো তারপর ও-মুড়ো থেকে আবার তেমনি ব্যাজ দেখিয়ে লরী থামিয়ে চলে আসছে এ-মুড়ো, ভোটার-ফোটার নেই, শুধু লরী বা ট্রাকে ক'রে যাতায়াত।

কতোই বা বয়েস এদের, রাজনীতি কিই বা বোঝে, জীবনে কতোটুকু পেয়েছে স্ফূর্তির সুযোগ, এই যে অনাবৃত একদিনের জন্যে ফ্রিতে লরী বা ট্রাক চাপবার সুযোগ পেয়েছে, এই-টুকু সুযোগের শুধু শাঁসটুকু চুষলেই হবে না, আঁটি চিবিয়ে ছিবড়ে করা চাই।

কে জিতবে তাই কি কেউ জোর ক'রে বলতে পারে? না, পারে না। সবাই চায় ভাবী এম, এল, এ, একবার এ সময় এসে দেখা করুক। এম, এল, এ, হলে ত' বুড়ো আঙুল দেখাবে। এ সময়ে এলে তবু দু'-চারটি বাছা বাছা মিষ্টি মিষ্টি কথা শোনানো যাবে।

অন্য সময় যে ধরণের হাসিই হাসুক, ভাবী এম, এল, এ, অন্তত মাস চারেক থেকে অন্য ধরণের হাসি আয়নার সামনে ঠোঁট ফাঁক ক'রে হেসে রপ্ত ক'রে নেয়। এ হাসির নাম ইলেকশন স্পেশাল হাসি। শত্রু-মিত্র নির্বিশেষে এই হাসি সকলের সামনে হাসতে হবে। রিকসায় বসেই হোক, সাইকেলেই হোক অথবা পদব্রজে ভাবী এম, এল, এ, সাহেব যেখানেই তুমি যাও তোমার ঠোঁটে আটার মত লেপ্টে রেখেছো ত' মরণজয়ী হাসি? না হলেই গেলে। পা পিছলে আলুর দম। আমি একবার একজন এম, এল, এ,-কে গাধার দিকে তাকিয়েও ইলেকশন স্পেশ্যাল হাসি হাসতে দেখেছিলাম। এইরকম অদ্ভুত আচরণ করার কারণ জিজ্ঞেস করাতে ভদ্রলোক অপ্রতিভ হয়ে বলে-ছিলেন, 'হেসে হেসে এমন অভ্যেস হয়ে গেছে যে গাধা আর মানুষ দু'জনের তফাৎ মাথায় ঠিক রাখতে পারি নি।'

এ গ্রাম নয় যে প্রার্থী নারায়ণশিলা হাতে ঠেকিয়ে, পৈতে ছুঁইয়ে শপথ করিয়ে তরে যাবে বৈতরণী। এ শহর। প্রতিটি লোকের মন এখানে ছুঁচলো। তেকোণা পাথরের মত। ইনফিরিয়রিটি আর সুপিরিয়রিটি কমপ্লেকসে ভোগা এক-একজন অদ্ভুত অনুভূতি-শীল জীব। এরা সাংঘাতিক, এরা ভণ্ড, অসম্ভব চুলকাম-করা। তাই প্রার্থী যখন 'আমি চাহিতে এসেছি শুধু একখানি ভোট' এই কথা বলে সকাতর, ম্লান ছলছল ভংগীতে হতাশ প্রেমিকের মত দুয়ারপ্রান্তে এসে দাঁড়ান তখন ভাবী ভোটার চোখের কোণে ঝিলিক মেরে যতোই বলুক নাকি সুরে, 'আমি তোমারি, আমি তোমারি, আমি তোমারি', হতাশপ্রেমিক প্রার্থীর হতাশা তবু যাবার নয়, 'আমায় যদি মনটি দেবে দিয়ো দিয়ো মন, মনের মধ্যে

জানো, রাস্তাঘাটে
আমার দিকে
তাকিয়ে কারো
পলক পড়েনা...

তোমার দিকে না হাতি,
তোমার পোশাকের দিকে।
নির্মল বার সাবানে কাচা জামাকাপড়
নিখুঁত নতুনের মতো ধবধবে দেখায়
আর তাইতেই সবার তাক লেগে যায়।
আসলে, কেরামতি তোমার নয়—
নির্মল আর আমার।

পূর্ব ভারতে বার সাবান হিসেবে
কাটতিতে সবার উপরে—সবার সেরা বলেই।

কুসুম প্রোডাক্টস লিমিটেড, কলিকাতা-১

KPN 4622

যাদুর খেলা

সনাতন কবিয়াল

কোন কোন দাগী আসামীকে চিনে রাখুন।
অনেক ডাকাতি রাহাজানি খুন
করেছিল এরা। খোলস ছেড়েই আরও ধূর্ত
হয়েছে। মুখোশ পরেছে মূর্ত
শয়তানরা।

বাছারা ভাবছে, চিনবে সাধ্য কার!

বিনয়াবনত, কুম্ভীরাশ্রু চোখে—
দুয়ারে দুয়ারে ভিক্ষার ঝুলি
এগিয়ে ধরেছে। রক্তের দাগ
এখনো লুকাতে পারে নি। মুখের বুলি
নরম হলেও নিষ্ঠুর হাসি
হেসে উপহাস করছে। ভাবছে,
কেউ পারবে না ধরতে।

লাগরে ভেল্কি লাগ—
ফুস মন্তর ফু—ফুটুক চোখ।
ঝাঁকে নড়ছে মড়ার মাথার খুলি।
যাদুর খেলা—
দাগী আসামীরা যতই সেয়ানা হোক
কোথায় পালাবে? যাদুকরের
জালে পড়বেই ধরা।

ভাবনা কিন্তু রেখো সারাক্ষণ', এই গুরুবাক্যের সারাংশ মনে রাখতেই হয়। 'এ শালা নির্ঘাৎ আমায় ভোট দেবে না' জেনেও ইলেকশন স্পেশ্যাল হাসিটি ঠোঁটে ঝুলিয়ে রাখতে হয় সর্বদা। চটে গেলে সব গেল এমনি যদি বা আশা থাকে।

অবশ্য সব প্রার্থীই কিছু এমন নয়। সেইসব আশ্চর্য প্রার্থীরা বাজার সরগরম রাখেন কৃত্যের বোলে ব্যক্তিগত স্ক্যান্ডালের তেজপাতা ছেড়ে। এমন একটা ভাবকে সকলের মধ্যে সিমেন্টের মত গেঁথে দিতে চান যে দুপক্ষের লড়ায়ের ফাঁক দিয়ে উনি ঠিক বেরিয়ে যাবেন, এই আশ্বাস সংখ্যাতত্ত্ব সহযোগে এমনভাবে জাহির করেন যেন মনে হয় জিতলেও জিতে যেতে পারেন অমূল্যদা।

তারপর জামানত জব্দ হলেও অমূল্যদার কচটা। কেন না ওনার কাজ হয়ে গেছে। উনি এতোদিন ভাড়া বাড়িতে বাস করছিলেন। ইলেকশন হয়ে যেতেই দেখা গেল অমূল্যদা ওনার পাকা বাড়ি তৈরির কাজ আরম্ভ করে দিয়েছেন মহা সমারোহে। বুঝে সাধু যে জান সন্ধান।

অমূল্যদার মত প্রার্থী ত' সবাই নয়। ওঁদের দাঁড়ানো নিয়েই কথা। অন্যদের বেলাতে ত' তা' নয়। শুধু দাঁড়ালেই অন্যদের চলে না। সুতরাং ভোটগণনার দিন একদিন আসে। একটু একটু করে ভোটগণনা কেন্দ্রের চারপাশে ভিড় জমা হয়। সেই ভিড় জমতে জমতে হয় সমুদ্র। তারপর শুরু হয়। আশেপাশে কিছিন্ন প্রার্থীর জরী জমা হয়। সে এক বিচিত্র ব্যাপার।

যে প্রার্থী জানেন হার নির্ঘাৎ তিনি বেলা দশটার মধ্যেই চম্পট। কিন্তু কাটা কই-এর মত যিনি ছটফট করছেন জয় না পরাজয়, এই আলফা না এই গামা, এই বিগনিং না এই এন্ড—এই চিন্তায়, ঘন্টায় ঘন্টায় ফোনে কান রাখছেন বাড়িতে বসে, 'কি হল! কি হল! হ্যালো, হ্যালো'.....

পার্টির অফিস থেকে ভেসে আসছে খালি আশাব্যঞ্জক কথাবার্তা, 'আপনি অমুক জায়গায় এ্যাতো ভোট পেয়েছেন, অমুক জায়গায় এ্যাতো, আপনি জিতছেন জিতছেন জিতছেন..., কোন শালা আপনাকে হারাবে, আমরা কুড়িটা পাঁঠা রেডি রেখেছি মা কালীর নামে সব জবাই-এর অপেক্ষা, আপনি জিতেই গেছেন ধরে রাখুন তবু যতোক্ষণ না ফাইন্যাল রেজাল্ট বার হচ্ছে ততক্ষণ...' কলেজ স্ট্রীট থেকে মেহবুব পার্টিকে ব্যান্ডের জন্যে অর্ডার দিয়ে রেখেছি, এসে গেল বলে, আপনি জিতলেই লরীতে আপনাকে তুলে গলায় গামছার মত গ্যাঁদাফুল চড়িয়ে, জয় জোকার দিতে দিতে, খিস্তির ফোয়ারা ছোটাতে ছোটাতে, সে যা না একটা কান্ড করবো, দু' শো' বোম তৈরি রেখেছি, কিন্তু এখনো কিছু দেবি, আপনি ঘাবড়াবেন না, এইমাত্র অমুক কেন্দ্রে ভোটগণনা হল, যদিও একটাও ভোট সেখানে পান নি, আর একটা...এইমাত্র খবর পেলুম, না, না ঘাবড়াবার কিছু নেই, আমাদের এলাকাগুলো এখনো গোণা হয় নি. এখানেও বিশেষ ভোট পান নি আপনি, দাঁড়ান, ফোনটা রেখে দেবেন না. একটু ধরে রাখুন', দু'-চার মিনিট নীরবতা, প্রার্থীর কাছে মনে হচ্ছে দু'-চার ঘন্টা, 'হ্যালো, হ্যালো'...

'হ্যাঁ, এই মাত্র খবর পেলাম আমাদের বুথের, সব গোলমাল হয়ে গেছে মনে হয়, শালারা টাকা খেয়ে শেষে, আমরা হেরে যাবো না ত', কি রকম এ্যালার্মিং নিউজ বলুন'...

কট্ করে ফোন নামিয়ে রাখার শব্দ হল। আর কিছু ঠিকমত বোঝবার আগেই প্রার্থীর বাড়ির পাশেই বিকট একটা উল্লাস ফেটে পড়লো। আর দুম্ দাম্ বোম। সাঁ সাঁ করে উঠে যাচ্ছে আকাশে গ্যাস বেলুন। ঐ ঐ উড়ে যাচ্ছে। জানলার ফাঁক দিয়ে দেখা যাচ্ছে। ফুলঝুরি আর রং-মশাল জ্বলছে শত শত, ততক্ষণে প্রার্থীটি বুঝে ফেলেছেন যা হবার তা' হয়ে গেছে, পরবর্তী স্টেপগুলোও ভেবে নিয়েছেন, উঃ, বেইমান বেইমান সব, অতো আশা দিয়ে অতো কথা দিয়ে শেষে হারামজাদারা ডোবালো? নইলে ডোবার ত' কথা নয় হিসেব যা পেয়েছিলেন! না, পালাতে হবে, পালাতে হবে এখান থেকে, অন্তত মাসখানেকের জন্যে, কোন ফরেস্ট-টরেস্টে চলে যেতে হবে. এই সব ভেবে পরাজিত প্রার্থী সেই হ্যান্ডলুমের ব্যাগটি হাতড়াতে যাবেন অমনি সদরে প্রবল কড়ানাড়া আর 'দরজা খুলুন, দরজা খুলুন', জগঝম্প আর ঢাকঢোল।

দরজা খুলতে হল না হলে ওরা ভেঙে ফেলবে দরজা জেতার আনন্দে। হাতখানাও বাড়িয়ে দিতে হল ওরই কালো কুচ্ছিত হাতে। দু'-চারটে ভালো ভালো কথাও বলতে হল ওকে মনে মনে ওর মুন্ডু চিবিয়ে খেতে খেতে। হাসতে যে এ্যাতো কষ্ট তা' এর আগে জানা ছিলো না. দাঁত চেপে চেপে একটু হাসতেও হল। বুক ফেটে যাচ্ছে, বুক শুকিয়ে যাচ্ছে, উঃ. হাতের কাছে যদি কেউ একটা সোডার বোতলও দিতো, সব...সব গেল কোথায়, এই ত' একটু আগেও ফোনে কতো রঙ-বেরঙের কথা, কতো মেহবুব পার্টি, কতো পাঁঠা বলি, কোথায় কি গেল, সব ফাঁকা. উঃ, ইলেকশনে এ্যাতো জ্বালা, শালা, কে জানিত আগে.....

গ্রামবাংলায় নির্বাচন

অরুণমুখোপাধ্যায়

দু'পা এগিয়ে, দু'পা পিছিয়ে নির্বাচন আবার এসে হাজির হোল। শহরে তো বটেই, গাঁয়ে গাঁয়েও ঢাকে কাঠি পড়েছে। মিছিল বার হচ্ছে, জনসভা বসছে, নির্বাচনী কার্যালয়ে চলছে গোপন শলা-পরামর্শ,—আর এ-দল, ও-দলের উৎসাহী কর্মীরা পাল্লা দিয়ে পোস্টার মারছে, যখন-তখন, যেখানে-সেখানে,—যেমন খুশি, যত খুশি! অর্থাৎ ভোট-রঙ্গের ষোলকলা আয়োজন সম্পূর্ণ, এবার বারাসতের ইয়াসিন মোল্লার ভাষায়, "ন্যাতাদের ফাইনেল নেত্যটাই" দেখা বাকী।

এই ফাইনেল নেত্যর মহড়া দেখতেই গিয়েছিলুম কলকাতার বাইরে। বাইরে বলতে দশ-বিশ মাইল দূরের আধা-শহর-গুলোতে নয়; আরও অনেক দূরে, যেখানে ষড়ৈশ্বর্যময়ী প্রকৃতির বুকে, কিন্তু, ছন্নছাড়া মানুষগুলো থাকে, সেইখানে। চিরদিনের ভিক্ষুক আর ক্ষণিকের সম্রাট যারা, যারা রোজ কাঁদে, রোজ পাত কুড়োয় অথচ একটি দিন, কেবল একটি দিন অযাচিত এবং অপ্রত্যাশিত আদর পায়, আমি সেই হতভাগ্যদের কাছেই গিয়েছিলুম। ওরা কি ভাবছে, ওরা কি বলছে, ওরা কি করবে আগামী নির্বাচনে তা জানাই ছিল আমার উদ্দেশ্য। আর তার সঙ্গে ওদের মন ভোলানোর জন্য ন্যাতাদের নেত্যটা দেখারও ইচ্ছে ছিল। বারাসতের ইয়াসিনকে আবার মনে পড়ছে। সে বলেছিল,—"আমরা মানুষ না, আমরা ভোটার। মানুষ যারা তারা ভাল খায়, ভাল পরে, গাড়ি দৌড়ায় আর চক্ষু রাঙায়, আমরা হইলাম ভোটার, আমাগো খাতির একদিন আর মাইর-ধইর হাজার দিন।" তা, ইয়াসিনদের খাতির-পরিচিতির দিন এসে গেল বলে। খাতির বেশি দেখাচ্ছে তারাই, যাদের হারার ভয়টা বেশি। তারা বুঝেছে যে তাদের আসল রূপটা ধরা পড়ে গেছে, সবাই জেনে গেছে যে "কেন্টা বেটাই চোর"। অতএব ভয় না করেই বা উপায় কি?

"গত নির্বাচনে" কেন্টারা হারল কেন? বিভিন্ন মানুষের সাথে মিশেছি, ওরা যা বলেছে তাই বলছি।

পশ্চিম বাংলার মুসলমানরা, যাদের কেন্টারা "খাস-তালুকের প্রজা" ছাড়া আর কিছুই ভাবত না বা ভাবতে পারত না, তারাও মরিয়া হয়ে, প্রাণ হারানোর ঝুঁকি নিয়ে, ইজ্জৎ খোয়াবার ঝুঁকি নিয়ে ফ্রন্টের পক্ষে রায় দিয়েছিল। দেবে নাই বা কেন? ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্রে ধর্মরক্ষার অজুহাতে হিন্দু-মুসলমানের সাম্প্রদায়িক লড়াই-বাঁধিয়ে দেয় তো কেন্টারাই। রাম-রহিম কাটা-কাটি করে, একে অপরকে আঘাত হানে আর সেই সুযোগে কেন্টারা শাক দিয়ে মাছ ঢাকে। '৬৪ সালের দাঙ্গার কথা জানি। যারা শুধু নামে মুসলমান আর সব কিছুতেই অবিকল আমাদের মত, যারা হিন্দুস্থান, পাকিস্তানের মন-কষাকষির খবর রাখে না, যাদের কাছে হজরতের দাড়ি আর মহাদেবের ভুঁড়ি, দু'টোই সমান অর্থহীন, তারা হাত-পা বাঁধা জানোয়ারের মত মরেছে! পাল্টা জবাব এসেছে ওপার থেকে। শান্তিপ্রিয় বাঙালী হিন্দুরা প্রাণ হারিয়েছে ঢাকায়, নারায়ণগঞ্জে। চব্বিশ পরগনার ঘুটিয়ারী শরিফ মুসলমান প্রধান অঞ্চল। আসাদুল্লা সেখানকারই লোক। ওর বাড়িতে উঠেছি দু-এক বার। তফাৎ কিছুই খুঁজে পাই নি। হিন্দু বা মুসলমান হয়ে ওর বা আমার কারোরই লেজ গজায় নি, কিন্তু লেজ খুঁজে বার করে কেন্টারা। আসাদুল্লার কথা লিখতে বসে সরফতুল্লার মুখটাও ভেসে উঠছে সামনে। যেন বলছে "বাপজান, তুই দু'দিন না খেয়ে হাওড়ার গাঁয়ে গাঁয়ে ঘুরেছিস? আয়, আয়, আমার সাথে চাট্টি খেয়ে নিবি।" শ্যামপুরের দেউলির হাটে দর্জির দোকান আছে সরফতুল্লার,—কেমন আছে সে এখন কে জানে! মুসলমানদের বেঁকে বসার আরও কারণ আছে। '৬৫ সালের লড়াই যখন শুরু হোল, তখন থেকেই "ভারত রক্ষা আইনে"র দড়িটি তাদের নাকে পরিয়ে দিল কেন্টারা। আয়ুব খাঁ যা করেছেন, তার জবাবে রহিম বা গফুরের দাড়ি ওপড়ানো ঠিক নয়, কিন্তু কেন্টারা তাই করল, ফলও পেল মাত্র দু'টি বছর পরেই! নির্বাচনের খবরাখবর বার হওয়ার পর কেন্টাদের এক পাণ্ডা তো ফুঁসে উঠলেন,—"মুসলমানরা আমাকে ভোট দেয় নি, ওরা —বেইমানি করেছে! ওদের মাত্র ৯০০ ভোট পেয়েছি আমি,—বাদ বাকী ৯০০৭ পেয়েছে ফ্রন্ট। হুগলীর এক মুসলমান সব্জীওয়ালার সাথে আলাপ হোল সেদিন হরিপালের পথে। লোকটি রসিক বেশ। বলল, "অমুকবাবু বোধ হয় ভোজবাজী জানেন, হাওয়া হয়ে ভোটের বাক্সের সামনে দাঁড়িয়ে দেখছিলেন কে ভোট দিল আর কে দিল না।"

গাঁয়ের মুসলমানদের কথা তো খানিক হোল। এবার অন্য কথায় আসা যাক। গত বিশ বছরে কেন্টারা যা দিয়েছে দেশের মানুষকে তা আর বলার মত নয়। তবুও একটি উদাহরণ দিচ্ছি। বিদেশী মানুষের কাছে আজ ভারতবাসী মানেই হোল আন্তর্জাতিক ভিখারী। কুড়ি বছর প্ল্যান করে, পরিশ্রম করে কেন্টারা আমাদের কেমন চমৎকার সম্মান এনে দিয়েছে! গত নির্বাচনে পশ্চিম বাংলার সাধারণ মানুষ তাই ফ্রন্টকে ভোট দিয়েছিল। ফ্রন্টকে তারা কতটা ভালবাসে তা বলা না গেলেও এটা ঠিক যে তারা পরিবর্তন চেয়েছিল

ভোটযুদ্ধ —গাড়িয়া

এবং এ-চাওয়ার পেছনে সঙ্গত কারণও ছিল যথেষ্ট।

কেষ্টাদের হারের জন্য তাদের লালিত-পালিত আমলা শ্রেণীও কম দায়ী ছিল না। দেশ-গাঁয়ে আমলা মানেই এস-ডি'ও বি-ডি-ও, ব্লক-কৃষি অফিসার ইত্যাদি। গরীব চাষী এদের কাছে যা আশা করেছিল, যতটা আশা করেছিল তার সিকি ভাগও পায় নি। সুতরাং তাদের মানসিক অবস্থাটা সহজেই অনুমেয়। এস-ডি-ও বা বি-ডি-ও দেবতা যে নিষ্কলঙ্ক চাঁদ হবে, এমনটি আশা করা নিশ্চয় অন্যায়, কিন্তু গাঁয়ের মানুষের কথা তারা দরদী মন নিয়ে ভাববে এটা আশা করা বোধ হয় অন্যায় নয়! '৪৭ থেকে '৬২, এই ১৫ বছর গ্রাম-বাংলার মানুষ দাঁতে দাঁত চেপে সহ্য করেছে, তারপর ৬৭-তে করেছে বিদ্রোহ। গাঁয়ের "সাহব"দের দৌলতে কেষ্টারা খেয়েছে "সেম সাইড গোল।" বি-ডি-ও, এস-ডি-ও করা উচিত তাদের, যারা গাঁয়ের ছেলে, মাটির সাথে যাদের আছে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ অথচ যারা বড় জোতদারের ছেলে বা নাতি নয়। গাঁয়ের সরকারী চাকরীর যোগ্যতা উচ্চশিক্ষা নয় আন্তরিকতা, কিন্তু কেষ্টাদের সেটা বোঝাবে কে?

কায়েমী স্বার্থসর্বস্ব মধ্যবিত্ত এবং উচ্চমধ্যবিত্তদের ভূমিকাও এই হার-জিতের কারণ নির্দেশ করে। গ্রামাঞ্চলে এই দুটি শ্রেণীর ছেলেমেয়েরাই যাবতীয় সুযোগ-সুবিধা ভোগ করছে, তারা ভাল খাচ্ছে, ভাল পরছে, চাকরিও পাচ্ছে ভাল, তাদের বাপ-খুড়োরা আজ এখানে জমি কিনছেন, কাল লাটে জমি কিনছেন, পরশু কিনছেন বালেশ্বরে, সুতরাং যাঁদের কল্যাণে তাঁদের এমন বাড়-বাড়ন্ত সেই কেষ্টাদের তো তাঁরা ভোট দেবেনই! চাষী মজুররা এই পক্ষপাতিত্বের যোগ্য উত্তর দিয়েছে। মেদিনীপুর, নদীয়া, চব্বিশ পরগনা, হুগলী এবং হাওড়াতে আমরা এর প্রমাণ পেয়েছি। তবে একটা কথা এখানে থেকে যায়। উত্তরবঙ্গ, বর্ধমান, বাঁকুড়া, মুর্শীদাবাদ ইত্যাদি জেলাতেও তো শোষণ ও নির্যাতনের চেহারা একই, তবুও গত নির্বাচনে কেষ্টারা এ-সব জায়গায় বেশি ভোট পেল কেন? জনসাধারণ কি সচেতন ছিল না, তারা কি মেদিনীপুর বা চব্বিশ পরগনার চাষী-মজুরদের তুলনায় আরও বেশি অজ্ঞ, উদাসীন? এ প্রশ্নের উত্তর কিন্তু ফ্রন্টের সংগঠনের প্রকৃতির মধ্যেই আছে। যে নিষ্ঠা ও পারস্পরিক নির্ভরতা নিয়ে পশ্চিম বাংলার বিরোধী দলগুলি '৬৬ সালের খাদ্য-আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল সে নিষ্ঠা ও নির্ভরতা গত সাধারণ নির্বাচনে তাদের ছিল না। পি ইউ এল এফ এবং ইউ এল এফে-র মমকষাকষি আর আসন বাছাব কোঁদল শত্রুপক্ষের সুবিধেই করে দিয়েছিল। দু' দলেব এই মতবিরোধের দবুণ সি পি এম, সি পি আই, বাংলা কংগ্রেস, ফরওযার্ড ব্লক, প্রত্যেকেই কিছু কিছু আসন হারাল। সি পি এম, সি পি আই তো গহবিবাদ করে কমপক্ষে ১০টি আসন কেষ্টাদের হাতে তুলে দিল। অনেক ক্ষেত্রেই দেখা গেছে যে মাত্র সামান্য কিছু ভোটের ব্যবধানে বিরোধী দলের মনোনীত প্রার্থীরা জয়ী হতে পারেন নি। পি ইউ এল এফ আর ইউ এল এফ-এর মধ্যে একতা থাকলে এই পরাজয় এড়ানো যেত না কি? এই অন্তর্দ্বন্দ্ব থাকার জনাই বর্ধমান, বাঁকুড়া বা মুর্শীদাবাদে বিরোধী নেতারা আশানুরূপ সাফল্য লাভ করেন নি। যেখানে অনেক শরিক সেখানে মতবিরোধ হবেই। কিন্তু তা বলে সাফাই গাওয়া চলবে না। জোটও বাঁধব, কোঁদলও করব, তা হলে আর নির্বাচনে নামা কেন?

ফ্রন্টের শাসনতান্ত্রিক ব্যর্থতার মূলেও ছিল এই মতবিরোধ ও অসহযোগিতা। তার শরিকদের বোঝা উচিত ছিল যে দেশের অর্থনীতির যারা পবিচালক সেই বাঙালী জোতদার ও অবাঙালী ব্যবসায়ীরা তাদের বিপক্ষে, আমলারাও তাদের সাথে হাত মিলিয়ে কাজ করবে না আর সর্বোপরি কেন্টাদের সদর দপ্তর দিল্লী থেকেও আসবে না কোনও সাহায্য। এ হেন প্রতিকূল পরিবেশে আভ্যন্তরীণ দলাদলির সৃষ্টি হলে বিপদ বাড়বেই, কমবে না। কিন্তু সব জেনে-শুনেও কি ফ্রন্টের শরিকরা সাবধান হয়েছিলেন?

আসন্ন নির্বাচনের ফল কি হবে? গ্রামবাংলার মানুষের মতামতই আবার তুলে ধরছি। চব্বিশ পরগনার সুন্দরবন অঞ্চল নিয়ে শুরু করা যাক। গোসাবা এবং হাসানাবাদ কেন্দ্রে এবার ফ্রন্টের অবস্থা সুবিধেজনক নয়, কিন্তু অপর-পক্ষেরও দুশ্চিন্তার কারণ কিছু আছে। কেষ্টাদের এক স্থানীয় মাতব্বর প্রথমে যাঁদের মনোনীত করেছিলেন পরে তাঁদের বসিয়ে দিয়েছেন। এর ফলে ঘরোয়া বিবাদের সূত্রপাত হয়েছে। বরাতের জোর থাকলে আসন দুটি জুটবে, নচেৎ নয়। সন্দেশখালিতে স্থানীয় অধিবাসীদের মনে একটা মিশ্র প্রতিক্রিয়া দেখা দিয়েছে, আদিবাসী প্রধান এই অঞ্চলে সি পি এম একজন আদিবাসী নেতাকে মনোনীত করেছে। নির্বাচনী কূটনীতি খানিকটা তারা দেখিয়েছে বটে, তবে শেষ রক্ষা করতে পারবে কি না তা নির্ভর করছে আদিবাসীদের মধ্যে তাদের প্রচারের সাফল্যের ওপর।

ক্যানিং অঞ্চলের উত্তেজনাও কিছু কম নয়। কেষ্টার দল, ফ্রন্ট এবং আই এন ডি এফ-এর মধ্যে এখানে উল্লেখযোগ্য প্রতিদ্বন্দ্বিতা হবে বলে মনে হয়। তবে অবস্থা ফ্রন্টের খুব অনুকূলে নয়।

সোনারপুরে গতবারের বিজয়ী সি পি এম নেতা এবার অপেক্ষাকৃত দুর্বল হয়ে পড়েছেন। কেষ্টাদের দুই স্থানীয় নেতা যাঁরা গতবার নির্বাচনে দাঁড়িয়েছিলেন এ বছর তাঁরা আবার দলে ভিড়ে গেছেন; ফলে সি পি এম-এর বিরুদ্ধে বেশ কয়েক হাজার ভোট জমা হোল। বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ এ আসনটি রাখতে হলে যা করা উচিত স্থানীয় সি পি এম কর্মীরা তা করছেন না! বলশেভিক, সি পি আই, এস ইউ সি ইত্যাদি অন্যান্য দলগুলির কর্মীরা দুঃখ প্রকাশ করেছেন যে, সি পি এম তাদের সাথে ভাল ব্যবহার

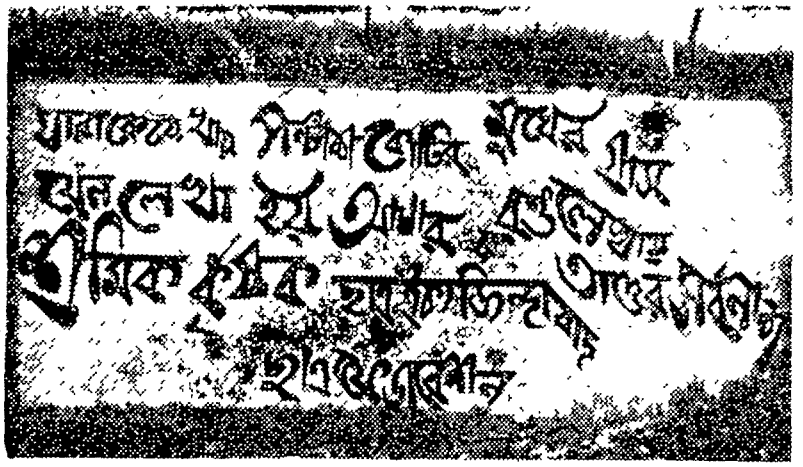

ভোটযুদ্ধ—গড়িয়া

করছে না। আফশোষ করে লাভ নেই। কয়লা ধুলেও কয়লাই থাকে। কম্যুনিজমই করুক আর চাঁদেই যাক বাঙালী বাঙালীই আছে!

হাওড়া অঞ্চলে ফরওয়ার্ড ব্লকের অবস্থা মোটামুটি ভাল, বিশেষ করে শ্যামপুর অঞ্চলের মানুষ তো গতবারের বিজয়ী ফরওয়ার্ড ব্লক নেতাকেই আবার নির্বাচিত করবে মনে হচ্ছে। হুগলী সি পি এম-এর শক্ত ঘাঁটি, এবারও তাই থাকবে কিন্তু শ্রীরামপুর অঞ্চল ফ্রন্টের হাত ছাড়া হয়ে যেতে পারে বলে আশঙ্কা হচ্ছে।

মেদিনীপুরের ঘাটাল, তমলুক, পূর্ব ও পশ্চিম পাঁশকুড়া এবং মহিষাদলে ফ্রন্টের অবস্থা আশাপ্রদ। গত পরশু পাঁশকুড়ার গাড়িতে বসে আলাপ হয়েছিল মহিষাদলের শ্রীকান্ত অধিকারীর সাথে। তিনি বললেন, "একমাত্র গোঁড়া কংগ্রেসী আর কায়েমী স্বার্থ ছাড়া আর কেউ কংগ্রেসকে ভোট দেবে না। তাঁর কথাটা একদিক থেকে সত্য আবার আর একদিক থেকে মিথ্যে। শহরাঞ্চলে বা বর্ধিষ্ণু গ্রামে যে-সব শিক্ষিত ও ধনীরা কংগ্রেসকে ভোট দেয় তাদের গোঁড়া বা সুবিধেবাদী বলা যেতে পারে কিন্তু গণ্ড-গ্রামাঞ্চলের সাধারণ চাষী, ক্ষেতমজুর ও তাদের বউ-ঝিরাও তো কংগ্রেসকে ভোট দেয়! তারা এমনটি করে কেন? তাদের তো চাল-চুলো কিছুই নেই। এ রহস্যটা পরিষ্কার হয়ে যাবে গাঁয়ে গাঁয়ে ঘুরলে। অবাক কাণ্ড বৈকি! স্বাধীনতালাভের পর দীর্ঘ কুড়ি বছর কেটে গেল। গাঁয়ের মানুষ যে তিমিরে ছিল, সে তিমিরেই পড়ে আছে। ওদের উন্নতির জন্য কিছুই করা হয় নি, বরং ওদের বঞ্চিত করা হচ্ছে, প্রতিদিন, প্রতি মুহূর্তে ওদের শোষণ করা হচ্ছে "ন্যাতারা" জানেন, ভালভাবেই জানেন ভোটের বাজারে এমন আদর্শ কাঁচা মাল আর কোনও দেশেই মিলবে না। যেমন শেখাও, তেমনি শিখবে, যেমন চালাও তেমনি চলবে। ওদের কাছে কংগ্রেস, কম্যুনিস্ট উভয়ই সমান অর্থহীন। নির্বাচনের গুরুত্ব পর্যন্ত ভাল করে বোঝে না ওরা। সামান্যতম লাভ-লোকসানের মাপকাঠিতে বিচার করে ওরা ভোট দেয়। লাভ অবশ্য কখনই হয় না, কেন না "ন্যাতারা" নির্বাচনের পরেই অদৃশ্য হন, অর্থাৎ "খেল খতম, টোপ হজম"।

আজগুবী প্রচার বা ভাঁওতা দিয়ে ভোট আদায় করতে অনেক দলই পটু। চব্বিশ পরগনার মহেশপুরের কয়েকটি বেকার যুবক চাকরি পাবার আশায় স্থানীয় কংগ্রেস প্রার্থীকে বহু ভোট জোগাড় করে দিল কিন্তু প্রার্থীটি কার্যকালে তাদের অঙ্গুষ্ঠপ্রদর্শন দেখালেন। গত বার মহেশপুরের মানুষ ফ্রন্টকে ভোট দিয়েছে, কিন্তু ফলের কোনও পরিবর্তন হয় নি। এবার তারা কাদের ভোট দেবে? কেন? আরও বেশি যুৎসই ভাঁওতা যারা দেবে তাদের?

একটি আজগুবী প্রচারের উদাহরণ দিচ্ছি।

কংগ্রেসের উদ্যোগে একটি ছোট সভা —স্থান : বারাসত আমডাঙা (চব্বিশ পরগনা)। একজন বক্তা সমানে বলে চলেছেন :

"ভাইছাব-হকল, জেহদিন কম্যুনিস্টরা মক্কা-মদিনাব উপ্রে বোমা ফেলাইতে আইছিল, হেইদিন বুক পাইত্তা কে আটকাইয়াছিল—হেইতে জওহরলাল।"

ফ্রন্ট যদি গ্রামবাংলার সহজ, সরল মানুষগুলোকে পাশে টেনে নিতে পারে, তবে তার জয় সুনিশ্চিত। কিন্তু ভাঁওতা বা অন্যায়ের আশ্রয় নেওয়া কখনই ঠিক হবে না। নির্বাচনের কয়েক মাস আগে থেকে মগজ ধোলাই করে ক'টা ভোট পাওয়া যায় বটে, কিন্তু হৃদয় জয় করা যায় না। বাংলার গ্রামাঞ্চলে শক্ত ঘাঁটি গড়ে তোলার সুবিধে প্রচুর। শ্রম, ধৈর্য ও নিষ্ঠা থাকলে অক্ষয় ঘাঁটি বিরোধী দলগুলো গড়ে তুলতে পারে, নির্বাচনের আগে নিরাপদ আসনের জন্য হানাহানির প্রয়োজন হয় না। ফ্রন্টের বড় শরিক সি পি এম-এর ক্ষেত্রে এইভাবে গ্রামাঞ্চলে ব্যাপক সংগঠন গড়ে তোলার বিশেষ প্রয়োজন আছে। এখনও সি পি এম কম বেশি "আরবান প্রলেটারিয়েট"দের দল হয়ে আছে, গ্রামাঞ্চল থেকেও সে ভোট পায়, কিন্তু তা এমন কিছু উল্লেখযোগ্য নয়। ১৯৬২ সালে সি পি এম-এর অবস্থা যা ছিল ১৯৬৭'র নির্বাচনে তার খুব একটা হেরফের হয় নি। ছোট-চাষী ও ক্ষেতমজুররা যদি হাত মেলাত তবে তার প্রার্থীরা আরও কিছু নতুন আসন পেতেন। অবশ্য এটা একটা সফিস্টিকেশনের যুগ! সি পি এম-এর "পলিসি মেকার"রা বোধ হয় "রুরাল প্রলেটারিয়েট"-দের দলে টানা পছন্দ করেন না! *

আলোকচিত্র লেখক কর্তৃক গৃহীত।

আসন্ন মধ্যবর্তী নির্বাচন ও তার পরিপ্রেক্ষিত

সাগর বিশ্বাস

দ্বিতীয় পর্যায়ে পশ্চিমবাংলার মধ্যবর্তী নির্বাচনের প্রচার মাইক বেজে উঠেছে। প্রথম পর্যায়ে যখন নির্বাচনী প্রচার শুরু হয়েছিলো—সেই প্রারম্ভকালেই দুর্গাপূজার ঢাকের আওয়াজের মধ্যে ধীরে ধীরে নীরব হয়ে এসেছিলো নির্বাচনের প্রচার মাইক। কিন্তু বিসর্জনের রাজনার রেশ মেলাতে না মেলাতেই উত্তরবাংলায় নেমে এলো লক্ষ লক্ষ মানুষের সর্বনাশা বন্যা। সে বন্যাই হলো নভেম্বর মাসের নির্ধারিত তারিখে নির্বাচনের একমাত্র অন্তরায়। দুর্যোগ, দুর্বিপাক যত বড়োই হোক না কেন, শাসকগোষ্ঠী কখনো নিজেদের অসহায়তা কিংবা আইন-শৃংখলার অবনতির কথা স্বীকার করেন না। কিন্তু উত্তরবাংলায় ব্যাপারে কি প্রদেশ কংগ্রেস কমিটি, কি স্বয়ং রাজ্যপাল সকলেই সমস্বরে স্বীকার করলেন, প্রশাসনিক ব্যবস্থা অচল। তারপর অনেক চোখের জল, অনেক প্রতিশ্রুতি, অনেক দুর্গত অঞ্চল পরিদর্শন, অনেক রিলিফ ও পুনর্বাসনের একটানা গল্পের অবসান ঘটেছে। নতুন করে নির্বাচনের তারিখ ঘোষণা করা হয়েছে। এই দীর্ঘ তিন মাসের ইতিহাস সকলেরই জানা। তার পুনরালোচনা করা আমাদের উদ্দেশ্য নয়। তবু বিভিন্ন নির্বাচনী-এলাকা ভ্রমণ করতে গিয়ে নির্বাচনী হাওয়ার গতি-প্রকৃতির সমীক্ষা করতে বসে একটি কথা বার বার মনে হয়েছে যে, উত্তরবাংলাকে কেন্দ্র করে কংগ্রেস যে রাজনৈতিক ক্ষেত্র প্রস্তুত করতে চেয়েছিলো (যা হতে পারতো), তা কেন্দ্রীয় সরকারের কথা ও রাজ্যের আকাশ-পাতাল পার্থক্য এবং রাজ্য সরকারের একদেশদর্শী মনোভাব ব্যর্থ করে দিয়েছে।

নির্বাচন বরাবরই শহরের চেয়ে গ্রামেই বেশি প্রাণচাঞ্চল্য সৃষ্টি করে। ভোটব্রেগে মেতে ওঠে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের কর্মীরা। পাড়ায় পাড়ায়, পথে-ঘাটে, ক্ষেতে, বাজারে সর্বত্র কান পাতলে নির্বাচনের বিভিন্ন আলোচনা কানে আসতে থাকে। কিন্তু এবার যেন অন্যান্যবারের তুলনায় সাড়া অনেক কম। বিভিন্ন রাজনৈতিক দল প্রচারে নেমে পড়েছে সত্য কিন্তু গ্রামের চাষী, শ্রমজীবী মানুষের মনে এ-যেন আর আগের মতো তেমন সাড়া জাগিয়ে তুলছে না। কিন্তু কেন? এর এক কথায় যে উত্তর দেওয়া যায় তা হলো 'হতাশা'। প্রথম স্বাধীনতার উচ্ছ্বাসে জাতির চোখে যে স্বপ্ন আঁকা ছিলো তা আজ দুঃস্বপ্নে পরিণত হতে চলেছে। সুদীর্ঘ বাইশ বছরের স্বাধীন জীবনে চার-চারটি নির্বাচন মানুষ দেখেছে। দেখেছে আর বুঝেছে নির্বাচন একটি প্রহসন মাত্র। বাংলাদেশের মানুষও অনেক দেখলো। দেখলো কংগ্রেসের একটানা একচেটিয়া শাসন, দেখেছে যুক্তফ্রন্ট সরকারের শোচনীয় পতন, দেখলো কোয়ালিশন মন্ত্রিসভার কুক্রিয়া—দেখছে রাষ্ট্রপতির শাসন। কী বাকী রইলো? সম্ভবত সামরিক শাসন। এইটা দেখলেই চোখের সাধ মিটে যায়। তারা যে তিমিরে সেই তিমিরেই রয়ে গেলো। ভারতবর্ষ যে one nation, one-state হতে চেয়েছিলো—নানা দুষ্ট-চক্রের উল্লাসে সে স্বপ্নও দুঃস্বপ্নে পরিণত হতে চলেছে। দেশব্যাপী আজ প্রাদেশিকতা, আত্মসর্বস্বতা আর সাম্প্রদায়িকতার বিষবাষ্প ছড়িয়ে গেছে। এই সাম্প্রদায়িকতা নির্বাচনের ক্ষেত্রেও কিভাবে গণতন্ত্রকে ব্যংগ করছে তা ভাবলে অবাক হতে হয়। এই সব অস্থিরতাই যেন মানুষের চোখে নির্বাচনের রূপে বিবর্ণ করে তুলেছে। গ্রামের মানুষ যারা ভোটব্রেগে মেতে উঠতো —তাদের চোখে আজ যেন নির্বাচন একটা অর্থহীন ব্যাপার হতে বসেছে।

তবু নির্বাচন হবে—বাঙালী তাতে অংশগ্রহণও করবে। দিকে দিকে তারই প্রস্তুতি শুরু হয়েছে। ওটা শুধু গ্রামের বহু মানুষের একটি মানসিক প্রতিক্রিয়ার ছবি—বহিরংগ জীবনে এর প্রভাব খুব একটা বেশি হয়ে ওঠে নি। কিন্তু গান ভানতে শিবের গীত বিস্তর গাইবো না। আমরা কিছু নির্বাচনী কেন্দ্রের আবহাওয়া সমীক্ষা করতে বসেছি। কিন্তু তার আগে কয়েকটি কথা মনে রাখতে হবে। প্রথমত আসন্ন মধ্যবর্তী নির্বাচন অন্যান্যবারের নির্বাচন থেকে অনেকাংশে বৈশিষ্ট্যপূর্ণ। দ্বিতীয়ত বহু দল থাকা সত্ত্বেও এই নির্বাচনী যুদ্ধ প্রধানত সংঘটিত হবে দুটি প্রতিপক্ষ শক্তির সংগে—একটি কংগ্রেস, অপরটি যুক্তফ্রন্ট। তৃতীয়ত উভয় পক্ষের স্বপক্ষে ও বিপক্ষে এমন কিছু কিছু বিরাট ঘটনা ঘটেছে যা জনমতের ওপর প্রভাব বিস্তার করে এই যুদ্ধকে যেন অনেকাংশে মর্যাদার লড়াই করে তুলেছে। (প্রসংগত, আমরা যথাস্থানে সেগুলি মাঝে মাঝে উল্লেখ করবার চেষ্টা করবো)। শুধু পশ্চিমবাংলায় নয়, একই সংগে পাঞ্জাব, উত্তর প্রদেশ ও বিহারে মধ্যবর্তী নির্বাচন অনুষ্ঠিত হতে চলেছে। ভারতবর্ষের ১৬ কোটি নির্বাচকের মধ্যে ১০ কোটি নির্বাচক ফেব্রুয়ারীতে দ্বিতীয়বার তাঁদের রায় দিতে চলেছেন। এটা যথার্থই "a miniature general election." কংগ্রেসের পক্ষ থেকে এই সকল রাজ্যে জোর নির্বাচনী মহড়া শুরু হয়েছে। দেখেশুনে অনেকে বলছেন কংগ্রেসের না কি integrity কিছুটা বেড়েছে। কংগ্রেস পুনর্গঠন কমিটি কি সত্যই সেই ইংগিত বহন করছে? পশ্চিমবাংলার দিকে কেন্দ্রীয় কংগ্রেস সরকারের নজর বেশ সজাগ মনে হচ্ছে। স্বয়ং প্রধানমন্ত্রী একবার নির্বাচনী প্রচার করে গেলেন—শোনা যাচ্ছে আবার আসছেন। এসেছেন উপ-প্রধানমন্ত্রীও। কংগ্রেস সভাপতিও ঘুরে গেলেন। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীও গত ২ জানুয়ারী শহর থেকে দূরে বাংলার ছায়া সুনিবিড় শান্তির নীড় গ্রামাঞ্চলে জোর দাপটে নির্বাচনী প্রচার চালিয়ে গেলেন। কোথাও কোথাও গ্রামের শান্ত পরিবেশ অশান্ত হয়ে উঠেছিলো বলে প্রকাশ। বারাসাতের কলোনীর মধ্যে সংঘটিত হাঙ্গামার কথা ত সকলেরই জানা। এই প্রসংগে আমরা আসল বক্তব্যের মধ্যে প্রবেশ করি। বারাসত নির্বাচনী কেন্দ্র নিয়েই আমাদের সমীক্ষা শুরু করা যাক। বর্তমান সমীক্ষার মধ্যে আমরা হাবড়া ও গাইঘাটা দুটি উল্লেখযোগ্য এবং বিতর্কিত নির্বাচন কেন্দ্রকেও গ্রহণ করবো। উল্লেখযোগ্য এই কারণে যে, এ দুটি কেন্দ্র দু'জন যুক্তফ্রন্টত্যাগী defector-এর কেন্দ্র।

বারাসাত

চব্বিশ পরগনা জেলার বারাসাত মহকুমায় নির্বাচন কেন্দ্রের সংখ্যা পাঁচটি; বারাসাত, দেগঙ্গা, হাবড়া, অশোকনগর এবং রাজারহাট। বারাসাত মিউনিসিপ্যালিটি এলাকার পনেরোটি ওয়ার্ড এবং সদর ও আমডাঙা থানার ১৪টি অঞ্চল নিয়েই বারাসাত নির্বাচনী কেন্দ্র গঠিত। মোট ভোটারের সংখ্যা ৮৬ হাজারের মতো। গত নির্বাচনের সময় ছিলো ৮৩ হাজারের মতো। গত নির্বাচনে এই কেন্দ্রে প্রার্থী ছিলেন তিনজন। কংগ্রেসের শ্রীঅশোককৃষ্ণ দত্ত, ফরোয়ার্ড ব্লকের শ্রীহেমন্ত বসু এবং নির্দলীয় প্রার্থী শ্রীঅপূর্ব চ্যাটার্জী। শ্রীদত্ত এবারেও এখানে কংগ্রেসপ্রার্থী। শ্রীচ্যাটার্জী অবশ্য এবার আর নির্দলীয়

হয়ে দাঁড়ান নি। তিনি আশু ঘোষের আই এন ডি এফ থেকে মনোনয়ন নিয়েছেন। হেমন্ত বসু এবার আর দুটি কেন্দ্রে দাঁড়ান নি। যুক্তফ্রন্টের ফরোয়ার্ড ব্লক এখানে প্রার্থী দিয়েছেন শ্রীসরল দেবকে। এ ছাড়া আছেন জাতীয় দলের শ্রীপ্রিয়ব্রত চ্যাটার্জী এবং প্রগ্রেসিভ মুসলিম লীগের মোহাম্মদ আহসান।

পাঁচটি দলই নির্বাচনী প্রচারে নেমে পড়েছে। তবে কংগ্রেস এবং যুক্তফ্রন্টের প্রচার যত সরব, বাকী দলগুলির তা নয়। গত ২ জানুয়ারী কংগ্রেসের বিরাট নির্বাচনী জনসভা অনুষ্ঠিত হয়ে গেলো স্থানীয় সুভাষ ময়দানে। দিল্লী থেকে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী স্বয়ং এসে সভায় কংগ্রেসের সমর্থনে দারুণ বক্তৃতা করে গেলেন। দেশে স্থায়ী সরকার গঠনের প্রয়োজনে কংগ্রেসের অপরিহার্যতা ব্যাখ্যা করলেন। সভায় জনসমাবেশও খারাপ ছিলো না। অবশ্য শেষ দিকে যে সকল হাঙ্গামা হয়েছিলো সে সম্পর্কে নানা বিপরীত মন্তব্য শোনা যায়। কারো মতে মিছিলকারীরা দায়ী, আবার কারো মতে গোটা অঘটনগুলির জন্য পুলিশ তথা কংগ্রেস কর্তৃপক্ষই দায়ী। বারাসাতে একটা জিনিস বেশ স্পষ্ট বোঝা গেছে যে নির্বাচনে জয়লাভ করবার জন্য কংগ্রেস এবার গতবারের চেয়ে অনেক বেশি পরিমাণে সচেষ্ট হয়েছে। গত নির্বাচনে শ্রীদত্ত প্রায় দশ হাজার ভোটের ব্যবধানে হেমন্ত বসুর নিকট পরাজিত হয়েছিলেন। অবশ্য গতবারের সেই পরাজয়ের শোধ কংগ্রেস এবার তুলতে বদ্ধপরিকর। কংগ্রেস মনে করে যে, জনসাধারণের গত নির্বাচনের সেই কংগ্রেস-বিরোধী মনোভাবের পরিবর্তন ঘটেছে। তা যদি হয়ে থাকে তবে হয়তো কংগ্রেস তার হৃতসম্মান পুনরুদ্ধার করবে। কিন্তু মিউনিসিপ্যালিটির নির্বাচনে সাধারণের এই মনোভাব পরিলক্ষিত হয় নি। বরং ঠিক উল্টোটিই ঘটেছে। ১৫টি ওয়ার্ডের মধ্যে ১৩টি ওয়ার্ডেই কংগ্রেস-বিরোধী প্রার্থী জয়লাভ করেছেন এবং বারাসাত মিউনিসিপ্যালিটি এই বিরোধীদের দ্বারাই পরিচালিত। কাজেই আবহাওয়ার পরিবর্তন ঘটেছে বলে উল্লসিত হবার অবকাশ তেমন আছে বলেও মনে হয় না।

জাতীয় দল এবং আই এন ডি এফ এখানে বিশেষ প্রভাব বিস্তার করতে পারে নি। পর্যবেক্ষকদের মতে, নবগঠিত মুসলিম লীগের প্রার্থী অন্ততপক্ষে ২২ হাজার মুসলিম ভোটের একটা বড় অংশ লাভ করতে সক্ষম হবেন। তা যদি হয় তবে এতে কংগ্রেসেরই ক্ষতি হবে। অবশ্য নবগঠিত এই দলটিকে চিন্তাশীল মুসলিম সমাজ কিভাবে গ্রহণ করবেন তা এক্ষুণি বলা মুস্কিল। তবে অপেক্ষাকৃত অশিক্ষিত মুসলিম সম্প্রদায়ের নিছক জাতীয় ফ্যানাটিসিজম অস্বীকার করা যায় না। কাজেই মুসলিম লীগের প্রার্থী মুসলিম ভোটের একটা অংশ লাভ করবেন—এতে সন্দেহ নেই।

যুক্তফ্রন্ট প্রার্থী শ্রীসরল দেবের সঙ্গে দেখা হয়েছিলো। যুক্তফ্রন্ট দাবি করেন যে, নির্বাচনের আবহাওয়া গত সাধারণ নির্বাচনের মতোই তাঁদের অনুকূলে। গত নির্বাচনে জনগণের যে কংগ্রেস-বিরোধী মনোভাব গড়ে উঠেছিলো—তার কিছু কিছু তারতম্য কোথাও কোথাও যে হয় নি তা নয়, তবু গত নির্বাচনের সময় যুক্তফ্রন্ট গঠিত না হওয়া সত্ত্বেও কংগ্রেসের ব্যাপক পরাজয় ঘটেছিলো। এবার গতবারের ইউ এল এফ এবং পি ইউ এল এফ যুক্ত মোর্চা গঠন করায় নিঃসন্দেহে তাঁদের শক্তি ও একতা বৃদ্ধি পেয়েছে। তাছাড়া গত নির্বাচনের ফলাফল মানুষকে যে নতুন শিক্ষা দিয়েছে তাতে তাঁদের রাজনৈতিক চেতনা বৃদ্ধি পেয়েছে। কংগ্রেস ভিন্ন রাজ্যে কোনো বিকল্প সরকার গঠিত হতে পারে না বলে সাধারণ মানুষের এতকালের যে অন্ধবিশ্বাস ছিলো—তারও পরিবর্তন ঘটেছে। সাধারণ গ্রাম্য লোকও বুঝেছে যে জনগণ ইচ্ছা করলেই যে কোনো সরকারের পতন ঘটাতে পারে, তার জন্য রাষ্ট্রপতির প্রয়োজন হয় না। শ্রীদেব আরো জানালেন, "নির্বাচনের এখনো মাসাধিককাল বিলম্ব আছে, কাজেই সুষ্ঠু সমীক্ষা এখনো করা চলে না—নিশ্চয় করে কিছু বলাও সঙ্গত হবে না—তবু কংগ্রেসের বিভিন্ন অপপ্রচার সত্ত্বেও এখনো পরিস্থিতি আমাদেরই অনুকূলে।" অবশ্য শ্রীদেবের প্রতি স্থানীয় লোকেরও কিছু ভালো ধারণা আছে দেখেছি। কারণ, প্রথমত তিনি স্থানীয় প্রার্থী, দ্বিতীয়ত স্থানীয় নানা ব্যাপারে তাঁর অবদানও কম নয়।

দেখা করেছিলাম কংগ্রেসপ্রার্থীর সঙ্গেও। সাধারণ সম্পাদক (কংগ্রেসের আঞ্চলিক নির্বাচন কমিটির) শ্রীমোহনলাল ঘোষ যথেষ্ট আশাবাদী মানুষ। তাঁর ধারণা, কংগ্রেসের খাদ্যাবস্থা, স্থায়ী মন্ত্রিসভা প্রভৃতি সংক্রান্ত শ্লোগানগুলি যথেষ্ট effective হচ্ছে। প্রার্থী শ্রীদত্ত মনে করেন, শুধু বারাসাতই নয়, বারাসাত মহকুমার পাঁচটি কেন্দ্রেই কংগ্রেসপ্রার্থীরা জয়লাভ করবেন। এবং বনগাঁ মহকুমার তিনটি কেন্দ্রের দুটি কেন্দ্রেও কংগ্রেসপ্রার্থী বিজয়ী হবেন। অর্থাৎ গত নির্বাচনের সম্পূর্ণ বিপরীত ফল ঘটবে বলে তিনি মনে করেন। গত নির্বাচনে বারাসাত মহকুমায় কংগ্রেস একটি কেন্দ্রেও জয়লাভ করে নি—বনগাঁ মহকুমার শুধুমাত্র বনগাঁ কেন্দ্রে কংগ্রেসপ্রার্থী জয়লাভ করেন। তাঁর মুখেই শুনেছি বারাসাত কেন্দ্রে একবার অন্তর একবার কংগ্রেসপ্রার্থীর জয়লাভ করবার রেওয়াজ আছে। সেদিক থেকে এবার কংগ্রেসেরই জয়লাভ করার কথা। কংগ্রেস সেজন্য ঝাঁপিয়েও পড়েছে। কিন্তু আদহাটা চন্ডীগড় প্রভৃতি অঞ্চলে যেখানে গত নির্বাচনে কংগ্রেসের পক্ষে সর্বাধিক ভোট পড়েছিলো সে-সব অঞ্চলের আবহাওয়া এবার কিছুটা প্রতিকূল বলে মনে হয়। আদহাটা স্কুলকে কেন্দ্র করে কংগ্রেস তার দলীয় কলহকে জনসমক্ষে তুলে ধরে জনপ্রিয়তা হারাচ্ছে। নির্বাচনের মুখে এইসব ছোটখাট ঘটনা উপেক্ষণীয় নয়—কারণ এগুলি একেবারে বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয়।

দেগঙ্গা

বাংলা জাতীয় দলের নেতা শ্রীজাহাঙ্গীর কবির এবং আই এন ডি এফ নেতা শ্রীআশুতোষ ঘোষকে নিয়ে এই কেন্দ্রেও প্রার্থী সংখ্যা পাঁচ। শ্রীজাহাঙ্গীর কবির গত নির্বাচনে কংগ্রেসপ্রার্থীকে প্রায় একুশ হাজার ভোটের ব্যবধানে পরাজিত করেছিলেন। তবু রাজনীতির জটিলতায় একথা জোর করে বলার উপায় নেই যে তিনি এবারেও এখান থেকে জয়লাভ করবেন। প্রতি কেন্দ্রেই এবার সংগ্রামের যে তীব্রতা তা কংগ্রেস এবং যুক্তফ্রন্টের মধ্যেই কেন্দ্রীভূত হয়েছে। সেখানে বাকী দলগুলি হয়ে পড়েছে গৌণ। কিন্তু এটা হলো রাজনৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে দেখা সত্য। গণতান্ত্রিক ভোটাধিকারে ব্যক্তি, গোষ্ঠী বা সম্প্রদায়গত স্বার্থ যে বহুক্ষেত্রে রাজনৈতিক চেতনাকে হত্যা করে থাকে এ কথাও সর্বজনস্বীকৃত। গত নির্বাচনে কংগ্রেস ও বাংলা কংগ্রেসের দুজন প্রার্থীই মুসলিম ছিলেন। কিন্তু একদিকে শ্রীকবিরের জনপ্রিয়তা অন্যদিকে জনতার কংগ্রেস-বিরোধী মনোভাবের ফলে কংগ্রেস-প্রার্থী ৩৬ হাজার মুসলিম ভোটের কুড়ি শতাংশও পেয়েছেন কিনা সন্দেহ। এবারে কংগ্রেসপ্রার্থী শ্রীমোশারফ হোসেন ছাড়াও প্রগ্রেসিভ মুসলিম লীগের প্রার্থী শ্রীহারুন অল রশীদকে নিয়ে এখানে মুসলিম প্রার্থীর সংখ্যা তিন। একদিকে কংগ্রেসের প্রতি আনুগত্য, আর একদিকে জাহাঙ্গীর কবিরের জনপ্রিয়তা, অন্যদিকে সংকীর্ণ জাতীয়তার প্রতি ফ্যানাটিক মনোভাব সমস্ত মুসলিম ভোটকে ত্রিধাবিভক্ত করে দেবে। অবশ্য যুক্তফ্রন্টের কিছু রাজনৈতিক ভোট আছে যা হয়ত এর মধ্যে পড়বে না। যুক্তফ্রন্টের বাংলা কংগ্রেস প্রার্থী শ্রীশান্তিময় মুখার্জীকে নিয়ে মোট

পাঁচজন প্রার্থী এই কেন্দ্রে নির্বাচনে দাঁড়িয়েছেন। এঁদের মধ্যে আর্থিক দিক থেকে শ্রীআশুতোষ ঘোষ এবং কংগ্রেস বিশেষ শক্তিশালী। তাঁদের প্রচারও ব্যাপক। কংগ্রেসপ্রার্থী অবশ্য মনে করেন, এখানে আশু ঘোষ বা যুক্তফ্রন্ট কিংবা জাহাঙ্গীর কবির কোনো 'factor' নন। তাঁর ধারণা প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে হবে মুসলিম লীগ প্রার্থীর সঙ্গে। মুসলিম লীগ যে চাঁদ-তারা-কে নির্বাচনী প্রতীক হিসাবে অনুমোদন পান নি এটা তাঁর কাছে প্রগতির লক্ষণ। কারণ চাঁদ-তারা মুসলিম জীবনে একটি বিশেষ ধর্মীয় প্রতীক। কাজেই একে যাঁরা নির্বাচনী প্রতীক করতে চেয়েছিলেন তাঁরা বাস্তবিক কতটা progressive তাতে সন্দেহ জাগে। তবু দেগঙ্গা কেন্দ্রে অধিকাংশ অশিক্ষিত মুসলিমদের যে একটি রক্ষণশীল মনোভাব থাকবে এটা স্বাভাবিক বলে ধরে নেওয়া যায়। গোলাবাড়ি, কদম্বগাছি প্রভৃতি অঞ্চলে মুসলিম লীগের যথেষ্ট প্রভাব পড়েছে মনে হয়। তাই কংগ্রেসপ্রার্থী আসলে লীগ প্রার্থীকেই তার প্রতিদ্বন্দ্বী বলে মনে করেন। অথচ অস্বীকার করা যায় না শ্রীকবিরের জনপ্রিয়তা—যুক্তফ্রন্টের রাজনৈতিক ক্ষেত্রের কথা, আশুতোষ ঘোষকেও উপেক্ষা করা চলে না। নানা কারণে দেগঙ্গা নির্বাচনী কেন্দ্রের আবহাওয়া এখনো অস্পষ্টতার মধ্যে।

হাবড়া

একটি defector's constituency. কিন্তু দলত্যাগীদের সম্পর্কে জনমত যেমন গড়ে উঠেছে তারই ফলে হয়তো এবার একদিকে যেমন নির্দলীয় প্রার্থীদের সংখ্যা কমেছে, অন্যদিকে অনেক ভূঁইফোঁড় রাজনৈতিক দলের আবির্ভাব ঘটেছে। গত নির্বাচনে এই কেন্দ্রের বিজয়ী প্রার্থী শ্রীজয়ন্তীপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায় (বাংলা কংগ্রেস) যুক্তফ্রন্ট থেকে সরে গিয়ে পি ডি এফ-এ যোগদান করেছিলেন। তিনি এবারেও প্রার্থী। লোকদলের। গত নির্বাচনে কংগ্রেসপ্রার্থী শ্রীতরুণকান্তি ঘোষ এই জয়ন্তীবাবুর কাছেই সাড়ে তিন হাজার ভোটের ব্যবধানে পরাজিত হয়েছিলেন। অথচ মাত্র দুটি বছর—এরই মধ্যে তিনি 'no-where' হতে চলেছেন। এই হলো রাজনীতির খেলা—Irony of Politics.

মোট ১৩টি অঞ্চলে মোটামুটি ৮২ হাজার নির্বাচক নিয়ে হাবড়া নির্বাচনী কেন্দ্র। প্রার্থীসংখ্যা পাঁচ। গত নির্বাচনে ছিলেন তিনজন। কংগ্রেস, বাংলা কংগ্রেস ছাড়া একজন এস এস পি প্রার্থী ছিলেন। কংগ্রেসপ্রার্থী ২৩ হাজার, বাংলা কংগ্রেস-প্রার্থী সাড়ে ২৬ হাজার এবং এস এস পি প্রার্থী পেয়েছিলেন প্রায় চার হাজার ভোট। এস এস পি এবার যুক্তফ্রন্টের শরিক থাকায় প্রার্থী দেন নি। যুক্তফ্রন্টের বাংলা কংগ্রেসের প্রার্থী এখানে শ্রীশ্বিজেশ চ্যাটার্জি। গত নির্বাচনে যে অঞ্চলে ফ্রন্টের অবস্থা সবচেয়ে খারাপ ছিলো সেই মছলন্দপুরের মোট ৬ হাজার ভোটের মধ্যে কংগ্রেস ২৭০০, এস এস পি ১৭০০, এবং বাংলা কংগ্রেস পেয়েছিলো ১০০০ ভোট। এবারে অবশ্য এস এস পি ফ্রন্টের মধ্যে থাকায় ভারসাম্য সমান হবার কথা। কিন্তু অন্তর্বর্তী যুদ্ধের দুই প্রবল প্রতিপক্ষ ছাড়াও এখানে আছে আই এন ডি এফ, লোকদল এবং মুসলিম লীগ দল। এ ছোট দলগুলিই প্রকৃতপক্ষে যুদ্ধের গতিবেগ নিয়ন্ত্রিত করবে। গত নির্বাচনের পরিপ্রেক্ষিতে একথা বলা খুবই সহজ এবং সঙ্গত যে এখানে যুক্তফ্রন্টপ্রার্থী অবশ্যই জয়লাভ করবেন। কিন্তু অনেকের মনে একটি প্রশ্ন যে কংগ্রেসের বিরাট প্রচার-যজ্ঞের মধ্যে, বহু মোটর গাড়ির ধুলি-, সমুদ্রের মধ্যে ফ্রন্টের একখানা মোটর ভেহিকল কি পথ খুঁজে পাবে? কেউ কেউ অবশ্য তাদের সামনে গত নির্বাচনে আরাম-বাগের চিত্র তুলে ধরছেন।

কংগ্রেস তার সকল শক্তি নিয়োগ করবে এই নির্বাচনে। ঘরে ঘরে চলছে তাই প্রার্থীর উপস্থিতি। আশীর্বাদ চাইছেন তাঁরা নারীশক্তির।

জনৈক শ্রীচক্রবর্তী আলোচনা প্রসঙ্গে বলেছিলেন—"কংগ্রেস আজ যেভাবে আবেদন জানাচ্ছে মানুষের কাছে, সেভাবে কখনো আগে জানায় নি। আজ এর প্রয়োজন হয়েছে। এ প্রয়োজন তখনই হয় যখন পায়ের তলা থেকে মাটি সরে যায়। ভারতবর্ষে কংগ্রেসের পায়ের তলা থেকে মাটি সরে গেছে দু'বছর আগে। পশ্চিম বাংলা কোনো বিচ্ছিন্ন এলাকা নয়। কিন্তু হাবড়ার প্রগতিশীল মানুষ—সুস্থ চিন্তা দিয়ে সব বিবেচনা করবেন। তাঁরা সহজ সস্তা ভাষণে যদি মুগ্ধ হন তবে সেটা যুক্তফ্রন্টের নয়—সমগ্র জনসাধারণেরই হবে সমূহ ক্ষতি। অশোকনগরের হাওয়া হাবড়াকে আঘাত না করে পারে না—দেখে নেবেন।" বলতে বলতে ভদ্রলোক উত্তেজিত হয়ে পড়েছিলেন এবং রক্তের চাপ থাকায় সেখানেই মূর্ছিত হয়ে পড়েছিলেন। শ্রীচক্রবর্তীর বক্তব্য নিশ্চয়ই হাবড়ার সমস্ত জনসাধারণের বক্তব্য নয়। কিন্তু এ বক্তব্য যদি সত্যি হয়, অশোকনগরের প্রভাব (অশোকনগর পার্শ্ববর্তী নির্বাচন কেন্দ্রে, এখানে কংগ্রেসপ্রার্থীর পরাজয় অনেকটা নিশ্চিত) যদি সত্যিই হাবড়াকে প্রভাবিত করে তবে নিঃসন্দেহে কংগ্রেসের সমূহ বিপদ। কিন্তু নির্বাচনের এখনো এক মাস দেরি আছে। হাওয়া কোন্‌দিকে কি গতিতে বইবে তার ইঙ্গিত পাওয়া গেলেও পরিচয় ভবিষ্যতের গর্ভে।

গাইঘাটা

আর একটি defector's constituency. শ্রীচণ্ডীপদ মিত্র ২৫৯২ ভোটের ব্যবধানে কংগ্রেসপ্রার্থী শ্রীশ্যামানন্দ কিবাসকে (১৬,৩২৪) পরাজিত করে বিধানসভায় নির্বাচিত হয়েছিলেন ১৯৬৭ সালে। কিন্তু যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রিসভায় তিনি স্থান পান নি। পরবর্তীকালে প্রফুল্ল ঘোষের সঙ্গে হাত মিলিয়ে যাঁরা পি ডি এফ সরকার গঠন করেছিলেন ইনি তাঁদের অন্যতম ছিলেন।

পি ডি এফ মন্ত্রিসভায় ইনি হয়েছিলেন সমবায় মন্ত্রী। কিন্তু এই দু'দিনের মন্ত্রিত্ব তাঁকে হয়ত অনেককিছু দিয়েছে, তথাপি আজ হারাতেও হচ্ছে অনেককিছু। সেই দু'দিনের মন্ত্রিত্বই আজ তাঁর কণ্ঠে কাঁটার মালা হয়ে দাঁড়িয়েছে। আজ কংগ্রেসের প্রার্থী হয়ে তিনি নির্বাচনে দাঁড়িয়েছেন। কিন্তু একথা কি সত্য নয় যে, জনতার সামনে আজ তাঁর পরিচয় 'দলত্যাগী' ছাড়া আর কিছু নয়? একথা কি সত্য নয়—তাঁর মনোনয়নে স্থানীয় কংগ্রেস সংস্থার অনেকেই কংগ্রেস হাই-ক্যামাণ্ডের ওপর বিক্ষুব্ধ? যে ব্যক্তি গত নির্বাচনে কংগ্রেস-বিরোধী বক্তৃতা করেছেন পঞ্চমুখে, আজ তিনিই যদি প্রয়োজন ও স্বার্থের তাগিদে কংগ্রেসের তোষামোদ করেন—এবং কংগ্রেস কমিটি যদি এমনি একজন লোককেই মনোনয়ন দেয় তাহলে যাঁরা কংগ্রেসের অকৃত্রিম সেবক তাঁদের ক্ষুব্ধ হওয়া অসঙ্গত নয়। তাই গাইঘাটা কংগ্রেস সংস্থার মধ্যে অসন্তোষ পুঞ্জীভূত

হয়ে থাকা একেবারেই অসঙ্গত নয়। যদিও শ্রীমিত্র তাঁর সমস্ত শক্তি নিয়ে নির্বাচনী যুদ্ধে অবতীর্ণ হয়েছেন, তথাপি এক বিরাট অনিশ্চয়তার মধ্য দিয়েই তাঁকে অন্ধের মতো এগিয়ে যেতে হবে। তাই তিনি চলেছেন। এই সেদিনও খড়েরমাঠ অঞ্চলে তাঁর বিরুদ্ধে বিরাট বিক্ষোভ-মিছিল হয়ে গেলো। বহুক্ষেত্রেই তিনি বিরূপ সম্বর্ধনা লাভ করেছেন। কাজেই একথা বলা অসঙ্গত হবে না, যদি কংগ্রেস এখানে পরাজিত হয় তবে তার জন্য প্রার্থী মনোনয়নের ব্যাপারটাও অনেকাংশে দায়ী হবে। কংগ্রেসমহল থেকেই এমন কথা শোনা গেছে।

যুক্তফ্রন্টের বিরুদ্ধে প্রচুর প্রচার সত্ত্বেও—গ্রামের মানুষের সামনে একটি প্রশ্ন বেশ বড় হয়ে দেখা দিচ্ছে। তা হলো, যুক্তফ্রন্টের আমলে চালের দাম অস্বাভাবিক হয়েছিলো। কিন্তু রাজ্যপালের প্রশাসনে, বছরের যে সময়টা সবচেয়ে সঙ্কটের সময় (lean months) সেই শ্রাবণ-ভাদ্র মাসে অন্যান্য মাসের তুলনায় চালের দাম কম থাকাটাও কি অস্বাভাবিক নয়? গ্রাম্য-চাষীরাও আজ যেন এই প্রশ্নের জবাব খুঁজে পেতে চায়। যুক্তফ্রন্টের সময়ের হাঁটাই লক-আউটের শ্লোগানটিও যেন খুব effective নয়। অনেকের মুখেই পাল্টা উত্তর যে, এ ব্যাপারে রাজ্যপালই নাকি রেকর্ড তৈরি করেছেন। কি ইঞ্জিনীয়ারিং শিল্পে, কি পাটশিল্পে, কি রবার শিল্পে, কি সিনেমা শিল্পে সর্বত্রই পূর্বের সকল রেকর্ড ম্লান হয়ে গেছে। আর আইন-শৃঙ্খলার গঙ্গাযাত্রা তো ঘটেছেই!

এই বাস্তব পরিপ্রেক্ষিতে গাইঘাটা নির্বাচনী কেন্দ্রের আবহাওয়া অনেকটা যুক্তফ্রন্টের অনুকূলে বলেই মনে হয়। তবু এখানে বহু দলের বহু প্রার্থী অবস্থাকে জটিল করে তুলেছে। এখানে যুক্তফ্রন্টের বাংলা কংগ্রেস প্রার্থী শ্রীমতী পারুল সাহা। এ ছাড়াও আছেন লোকদল, রিপাবলিকান প্রার্থী, আছেন আনন্দ-মার্গের আমরা বাঙালী, আছেন জনসঙ্ঘ নেতা হরিপদ ভারতীর মতো প্রার্থীও। জনসঙ্ঘ গত নির্বাচনেও ছিলেন। তাঁদের গতবারের প্রার্থী শ্রীজিতেন বিশ্বাসের জামানত জব্দ হয়েছিলো। এবার শ্রীবিশ্বাস জনসঙ্ঘের স্থানীয় শাখার প্রেসিডেন্ট। সঙ্ঘের মধ্যে শোনা যাচ্ছে সম্প্রতি বেশ ত্রিপদলীয় কলহ শুরু হয়েছে। শ্রীবিশ্বাসের প্রতি নানা কারণে অনেকেরই মনোভাব ভালো নয়। বস্তুত গাইঘাটায় জনসঙ্ঘের কোনো সংগঠন ইতিপূর্বে ছিল না, এখনো নেই। যেটুকু হয়েছে সে কেবল লোক-দেখানোর জন্যই। মোটের ওপর, শ্রীভারতী যেখানে প্রার্থী সেখানে একটা অফিস থাকবে না, সে তো হয় না। তাই ফেস্টুন সহ একটি অফিসের পত্তন হয়েছে। কাজেই যেখানে দলের সংগঠন নেই, যেখানে প্রার্থীর জামানত জব্দ হয়, সেখানে দলের নেতা দাঁড়িয়ে ভাবালু বক্তৃতার মাধ্যমে জয়-মাল্য অর্জন করবেন এ স্বপ্ন আঞ্চলিক শাখার কর্মকর্তারা দেখালেও—জনসাধারণ একে দিবাস্বপ্ন বলেই ধরে নিয়েছে।

সারা ভারতবর্ষে সাম্প্রদায়িক ভিত্তিতে প্রার্থী নির্বাচন এবং সম্প্রদায়কেন্দ্রিক ভোটদানের প্রবণতা যে সংসদীয় গণতন্ত্রকে আজ ব্যঙ্গ করছে—আমাদের আলোচ্য নির্বাচন কেন্দ্রটিও সেই দুষ্টিশক্তি থেকে মুক্ত নয়। কিন্তু সেগুলি ওই ছোট ছোট দলগুলিকে যতটা পৃষ্ঠপোষকতা করবে—সংগ্রামের আসল অংশে তেমন প্রভাব ফেলতে পারবে না। কারণ আজ একটি বিশেষ সম্প্রদায় একটি বিশেষ প্রার্থীকে জয়ী করে তুলতে পারে না, যদি না সেই বিশেষ সম্প্রদায় নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠ হয়। প্রতি সম্প্রদায়ের মধ্যে কিছু না কিছু ভিন্নমত ও পথাবলম্বী মানুষ থাকেই। তবু নির্বাচনে সাম্প্রদায়িক ভিত্তি অবাঞ্ছিত ও ক্ষতিকর হলেও ভারত-বর্ষের বর্তমান সামাজিক পরিপ্রেক্ষিতে অবাস্তব নয়।

একটা ব্যাপার উল্লেখযোগ্য যে, গত নির্বাচনে বামপন্থী দলের পূর্ণ ঐক্য না হওয়ায় গাইঘাটায় বাম কম্যুনিস্ট পার্টি কোনো প্রার্থী না দিলেও রিপাবলিকান প্রার্থীকে সমর্থন করেছিলেন। রিপাবলি-কান প্রার্থী ফলে প্রায় ১১ হাজার ভোট পেয়েছিলেন। এবার এই কম্যুনিস্ট ভোটগুলি যুক্তফ্রন্ট প্রার্থীর পক্ষে এসে পরিবেশ অধিকতর অনুকূল করে তুলবে যুক্তফ্রন্টের।

বনগাঁ ও বাগদা

গাইঘাটা ছাড়া বনগাঁ মহকুমায় আর দুটি কেন্দ্র আছে। এই দুটি কেন্দ্র (বনগাঁ ও বাগদা) সম্পর্কে তেমন স্থি-মতের অবকাশ নেই। তাই আমরা এর বিস্তৃত আলোচনা করলাম না। প্রায় সকলেরই মুখে এককথা—এই দুটি কেন্দ্রে ফ্রন্ট প্রার্থীরাই জিতবেন। বনগাঁতে গত নির্বাচনে দুই কম্যুনিস্ট দলের প্রার্থী থাকায় ত্রিকোণ যুদ্ধে কংগ্রেসপ্রার্থী জয়-লাভ করেছিলেন। এবারে সরাসরি লড়াই-এ নিশ্চয় ফল অন্য হবে। রিপাবলিকান প্রার্থী একজন আছেন বটে কিন্তু অনেকের মতে তাঁর ভূমিকা হবে গতবারের নির্দলীয় প্রার্থীর মতোই।

আর বাগদা সম্পর্কে একজন কংগ্রেস-কর্মী এবং প্রাক্তন বিধানসভার সদস্যের মন্তব্য উল্লেখ করে আমাদের বর্তমান প্রসঙ্গ সমাপ্ত করবো। তাঁর মতে, "বাগদার কংগ্রেস কোনো factor নয়। Contest হবে যুক্তফ্রন্ট প্রার্থীর সঙ্গে রিপাবলিকান প্রার্থীর।" এই উক্তিটি খুবই তাৎপর্যপূর্ণ এইজন্য যে, এ মন্তব্য কোনো রিপাবলিকান কর্মী কিংবা কংগ্রেস-বিরোধী লোকের মন্তব্য নয়। এই মন্তব্য করেছেন প্রাক্তন কংগ্রেসী এম-এল-এ অধ্যাপক মণিভূষণ বিশ্বাস। বর্তমান যুক্তফ্রন্ট প্রার্থী শ্রীঅপূর্বলাল মজুমদারের নিকট শ্রীবিশ্বাস গত নির্বাচনে প্রায় বিশ হাজার ভোটের ব্যবধানে পরাজিত হয়েছিলেন। এবার তিনি দাঁড়ান নি।

বনগাঁতে চেকোশ্লোভাকিয়ার ঘটনা নিয়ে কংগ্রেস বিভিন্ন পোস্টারের মাধ্যমে কম্যুনিস্ট পার্টিকে ব্যাপকভাবে আক্রমণ করেছিলো। কিন্তু এদিক থেকেও আশা-নুরূপ ক্ষেত্র প্রস্তুত করতে তারা ব্যর্থ হয়েছে। জনসাধারণের মনে তেমন রেখা-পাত করতে পারে নি। জনৈক দোকানদার প্রশ্ন করেছিলো "আচ্ছা, রাশিয়া ও ভারতের খুব বন্ধু। তাহলে কংগ্রেস রাশিয়াকে অমন করে গালাগালি দিচ্ছে কেন?" তার এ প্রশ্নের উত্তর না দিয়েই চলে এসেছিলাম।

আসন্ন অন্তর্বর্তী নির্বাচনের প্রয়োজনের সমস্যার ভিতর দিয়ে তার সমাধানের সন্ধান খুঁজে নিতে হবে। যে রাজনৈতিক ধ্বস্তাধ্বস্তির মধ্যে, দল ভাঙাভাঙির প্রক্রিয়ার ভিতর দিয়ে বর্তমান নির্বাচনের কারণ উদ্ভব হয়েছে, সেইখানেই খুঁজতে হবে তার সমাধান। মানুষের ব্যক্তিগত জীবন বিকাশের মধ্য দিয়েই তার সামাজিক ও রাজনৈতিক ইঙ্গিত থাকে। ভারতবর্ষ স্বাধীন হবার পরে গণতন্ত্রের ভিত্তিরূপে তার স্বাধীনতার বুনিয়াদ খাড়া করা হয়েছে এবং এই গণতান্ত্রিক স্বপ্ন বা সঙ্গতি ভারতের রাজনীতিতে নিতান্ত আকস্মিক নয়। ইংরেজের দেওয়া বহুবিধ ন্যায়-অন্যায়ের মধ্যে গণতন্ত্রের নির্দেশ ভারতের জাতীয় জীবনকে পরিচালিত করবার ইঙ্গিত বহন করে এনেছিল। স্বাধীন ভারতের তৎকালীন কর্ণধারগণ সেই গণতান্ত্রিক নির্দেশের প্রতি জাতিকে পরিচালিত করতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হয়ে এসে গণতান্ত্রিক সংবিধান রচনা করেছেন। রাজনৈতিক ক্ষেত্রে গণতন্ত্রের পরীক্ষা ইউরোপ ও আমেরিকায় সাফল্যমণ্ডিত হলেও এশিয়ার বুকে ভারতবর্ষই তার পথপ্রদর্শক। ভারতের জাতীয় কংগ্রেস এই গণতন্ত্রকে রূপায়িত করবার প্রতিশ্রুতি নিয়েই নতুন ভারত গড়ে তোলবার পরীক্ষাক্ষেত্রে অগ্রসর হয়েছে।

আশেপাশে চীন ও রাশিয়া দুই বিরাট মহাদেশ এই জাতীয় গণতন্ত্রে সম্পূর্ণ অবিশ্বাসী। ভারতের বুকে আজ এক মহাপরীক্ষার প্রত্যক্ষ সংগ্রাম আরম্ভ হয়েছে। রাশিয়া বা চীনের চিন্তাধারায় পরিপুষ্ট কমিউনিস্ট পার্টি ভারতীয় গণতন্ত্রের পরিপূর্ণ বিরোধী। তারা ভারতের স্বাধীনতা বা সংবিধানকে মর্যাদা দিতে অসম্মত। তাই চীনের নির্দেশে বাম কমিউনিস্ট পার্টি "এ আজাদী ঝুঠা হ্যায়" বলে এর বিরোধিতা করবার জন্য বদ্ধপরিকর হয়ে প্রতিক্ষেত্রে বিরোধিতার সঙ্কল্প নিয়ে অগ্রসর হচ্ছে। তাদের সঙ্কল্পসিদ্ধির পথে জাতীয় জীবনের প্রতিক্ষেত্রে প্রশাসন, field, factory, school, college, সৈন্য ও পুলিশ সর্বত্র তাদের চিন্তাধারাপুষ্ট লোক দিয়ে ভিতর থেকে এক সুচিন্তিত অভিযান পরিচালনার আয়োজন প্রায় সম্পূর্ণ করে ফেলেছে। বাইরে থেকে নির্বাচনের পথে নির্বাচিত হয়ে এসে সংবিধানকে অচল করে দেবার যে অভিযান তারা চালিয়েছিল এবং যে বে-আইনী তাণ্ডবতার ফলে স্বাভাবিক সংবিধানীয় পন্থার পরিবর্তে এই অন্তর্বর্তী নির্বাচন অনুষ্ঠিত হতে চলেছে, সে ইতিহাস হয়তো কেউ ভুলে যায় নি। চীনা কমিউনিস্ট পার্টির এই ঘরপোড়া নীতির সঙ্গে ডান কমিউনিস্টদের পন্থার সামান্য পার্থক্য থাকলেও উদ্দেশ্যের কোন অমিল নেই। বাকী যেসব তথাকথিত বামপন্থী দল এদের সঙ্গে হাত মিলিয়ে যুক্তফ্রন্ট তৈরি করেছে তারা প্রায় সকলেই কংগ্রেসের ভাঙাদল, এই কথা বললে কিছুমাত্র অত্যুক্তি হবে বলে মনে হয় না। কংগ্রেসের বিরোধিতা করতে গিয়ে তারা হয়তো সংবিধানকে অস্বীকার বা অপমান করতে চায় না; কিন্তু তাদের দলের প্রধান শরিক চীনা কমিউনিস্টদের সঙ্গে সুর মেলাতে গিয়ে একই পন্থায় সংবিধানবিরোধী শ্লোগান ও নর্তনকুর্দন করতে বাধ্য হচ্ছে। অন্যথায় বামপন্থী পন্থায় মানুষ হয়তো তাদের প্রতি সন্দিহান হয়ে উঠবে। সেই জন্যই চোদ্দ রকমের চোদ্দটা পার্টিকে আলাই করে যুক্তফ্রন্ট নাম দিয়ে খাড়া করতে বাধ্য হচ্ছে। এদের সুর এক নয়। আদর্শ বিভিন্ন। পতাকা পৃথক। কিন্তু কংগ্রসকে গালাগালির সুর ও শব্দ সমকণ্ঠে উচ্চারিত হচ্ছে। কমিউনিস্ট পার্টি ও তাদের দল ভারতের স্বাধীনতায় বিশ্বাসী কিম্বা স্বাধীনতার পতাকায় শ্রদ্ধাশীল নয়। ভিন্ন দেশীয় পতাকা হস্তে ভিন্ন দেশীয় নির্দেশে অবনত মস্তকে তারা নিজের দেশের স্বাধীনতার পতাকা রাস্তার ধুলায় ফেলে দিতে চায়। ভারতীয় সংবিধানকে আবর্জনার স্তূপের মধ্যে ছুঁড়ে ফেলে দেবার অত্যুগ্র আগ্রহে ভিন্ন দেশের অর্থপুষ্ট হয়ে এগিয়ে আসছে। একমাত্র কংগ্রেসই সংগ্রামের মধ্য দিয়ে ভারতের স্বাধীনতা অর্জন ও তার সংরক্ষণ ও বিবর্ধনের কার্যে নীতি ও আদর্শের নির্দেশে এগিয়ে চলেছে। কুড়ি বৎসরের কংগ্রেস আয়োজনে শিল্প, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, খাদ্য ও আত্মরক্ষা প্রভৃতি সমস্ত দিকে বিরাট অগ্রগমনে বিশ্বের বিস্ময় উৎপাদন করেছে। ২০ বৎসরের সাধনায় জাতীয় জীবনের সমস্ত প্রয়োজন সুষ্ঠুভাবে আয়োজন করতে না পারলেও ভারতে প্রস্তুত রপ্তানী-শিল্পের অভিযান পৃথিবীর নানা দেশে ও দিগন্তে দৃঢ় পদক্ষেপে এগিয়ে চলেছে। রেলের ইঞ্জিন, লাইন ও বগি বা সেদিন বিদেশ থেকে আমদানী করা ছাড়া উপায় ছিল না, তা আজ নিজের দেশের চাহিদা মিটিয়েও বাইরে রপ্তানী করবার শক্তি ও সামর্থ্য নিয়ে দাঁড়িয়েছে। দেশের সমস্ত নদী-বন্ধনীর আবেষ্টনে বন্ধন করে সেচ ও বিদ্যুতের বিরাট আয়োজন প্রায় সম্পূর্ণ। ভারতের এক-তৃতীয়াংশ গ্রাম এই কয়েক বৎসরে বিদ্যুতের আলোয় উদ্ভাসিত হয়েছে, যে বিদ্যুতের সহায়তায় অফুরন্ত কুটীরশিল্প আয়োজনের অভিযান চলেছে।

খাদ্যে পরিপূর্ণ স্বাবলম্বী হতে না পারলেও এই কয়েক বৎসরের প্রচেষ্টায় খাদ্যের ফলন বহুগুণ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়েছে। স্বাধীনতার প্রথম দিনে ইংরেজ যাবার সময় এদেশে যুদ্ধসম্ভারের নামে একটা ভাঙা জাহাজ বা একটি ভাঙা এরোপ্লেনও ফেলে যায় নি। ১৯৬২ সালে চীনা আক্রমণে আমরা আমাদের সামরিক দুর্বলতার বীভৎস চিত্র দেখে আতঙ্কে আঁতকে উঠেছিলাম। আর সেই ভারত ১৯৬৫ সালে পাকিস্তান আক্রমণের দিনে নিজের ঘরের তৈরি বাঘা ট্যাঙ্ক দিয়ে আমেরিকার প্যাটন ট্যাঙ্ক পিটিয়ে ভেঙে বিশ্বের কাছে একটা সামরিক অভিযানের সততা ও দৃঢ়তার পরিচয় দিয়ে গর্বোন্নত বক্ষে দাঁড়াতে সাহসী হয়েছিল। ইংরেজ চলে যাবার সময় যে দেশে বড় নৌকা তৈরি করবার আয়োজন ও সঙ্গতি ছিল না, আজ সেখানে ফ্রেটবোট, ডেস্ট্রোয়ার তৈরি হচ্ছে। সাবমেরিনের কারখানা স্থাপিত হচ্ছে। মিগ বিমান এবং অন্যান্য যুদ্ধসম্ভার প্রস্তুতির আয়োজন পূর্ণোদ্যমে চলেছে। এই কুড়ি বৎসরে জাতীয় কংগ্রেস জলে-স্থলে-অন্তরীক্ষে একটা শক্তিশালী ভারতবর্ষ প্রস্তুত করবার আয়োজন সম্পন্ন করেছে।

শিল্পোন্নত দেশের সমপর্যায়ে ভারতীয় জীবনের মানকে উন্নত করবার প্রচেষ্টায় শিল্পের প্রথম ও প্রধান উপাদান ইস্পাত

তৈরির পাঁচটি কারখানা খুলে নিজের দেশের প্রয়োজন মিটিয়েও বাইরের রপ্তানীর সামর্থ্য নিয়ে দাঁড়িয়েছে। এখন-কার হেভী-ইঞ্জিনীয়ারিং কারখানায় নানা শিল্পের উপযোগী নানাবিধ মেশিনারী তৈরি হচ্ছে। জাতীয় জীবনকে শক্ত ভিতের উপরে প্রতিষ্ঠিত করবার এই বিরাট প্রাথমিক আয়োজনের দৃঢ়তার কাছে সমস্ত বিশ্ব শ্রদ্ধায় মস্তক অবনত করেছে। সকল দিকে সংগঠনের বিরাট আয়োজনের মধ্যেও খাদ্য ও দৈনন্দিন জীবনের কৃচ্ছ্রতার হাত থেকে জাতিকে মুক্ত করবার আয়োজন এখনও পরিপূর্ণ সাফল্যমণ্ডিত হয় নি সত্য—কিন্তু তার প্রাথমিক বুনিয়াদ সংগঠনের প্রায় সম্পূর্ণ। সেভাবে সতর্কতার দৃঢ় পদক্ষেপে এগিয়ে যেতে পারলে এই সমস্যার সমাধানের দিন খুব দূরে নয়, অবিমৃষ্যকারিতা ও অবিবেচনার ফলে এই আয়োজনের অগ্রগতি ব্যাহত হতে পারে। অথবা দেশের ভিতরে অরাজকতা সৃষ্টির জন্য এর ধ্বংস সাধনের প্রচেষ্টাও খুব অস্বাভাবিক নয়। গত নয় মাসে যুক্তফ্রন্টের এই অরাজকতা সৃষ্টির আয়োজন জনজীবনকে বিক্ষুব্ধ ও বিচলিত করে তুলেছিল। যে অব্যবস্থার ফলে চালের দাম সাড়ে চার টাকা, পাঁচ টাকা উঠেছিল, সেই আয়োজনের মাধ্যমেই সেই চালের দাম দেড় টাকা কিলোয় নামিয়ে দেওয়া অসম্ভব হয় নি। জনগণের শান্তি বিধানের প্রচেষ্টায় ঐকান্তিকতায় এটা একটা প্রকৃষ্ট নিদর্শন।

আইন ভাঙার উন্মত্ত আগ্রহে উন্মত্ত অভিযানে সকল নীতি ও বিধি-নিয়মের গণ্ডি ভেঙে দিলে মানুষের ব্যক্তিগত স্বার্থই তাকে নীতিশূন্য পথে পরিচালিত করে। প্রত্যেকটি দল যদি তাদের নিজেদের দলগত নীতি, বিধি-নিষেধের উপরে যথেষ্ট শ্রদ্ধাশীল হয় তবে সে দলের সভ্যদের পক্ষে দল ভেঙে অন্য দলে যাওয়া খুব সহজসাধ্য নয়। যখন মূলনীতি বা নির্দেশের উপরে মানুষ শ্রদ্ধাহীন হয়ে পড়ে, তখনই তার ভিতরের বাঁধন-ছেঁড়া মন দিগ্বিদিক জ্ঞানশূন্য হয়ে ছুটতে থাকে। নীতিজ্ঞানহীন এই মনোভাবই স্বার্থের আহ্বানে মানুষকে দিয়ে অনেক অকর্ম ও দুষ্কর্ম করাতে লজ্জিত হয় না। দলত্যাগের মূল সমস্যা সন্ধান করতে হলে দলের নৈতিক কাঠামো ও ভিত্তি দৃঢ়তার উপরে নিজের বিশেষভাবে নজর রাখতে হয়। যতক্ষণ পর্যন্ত বিভিন্ন দলের নীতিগত আদর্শের ভিত্তিভূমি রচিত না হবে, ততক্ষণ পর্যন্ত এই দলত্যাগ বন্ধ করা ব্যবহারিক আইনের পক্ষে সম্ভব হবে না। কংগ্রেসের অতীত ঐতিহ্যময় ভিত্তিভূমিতে দাঁড়িয়ে একজন সভ্যের পক্ষে দলত্যাগ করে যাওয়া খুব সহজসাধ্য নয়। কারণ অতীতের ইতিহাস ও আদর্শের সহস্র বাধা-নিষেধ তার স্বার্থপর মনকে সংযত ও সংহত করে রাখবে। কংগ্রেসের আদর্শে অবিশ্বাসী হয়ে কোন স্বার্থান্ধ ব্যক্তি নানা যোগাযোগের যোগে যদি কংগ্রেসের মনোনয়ন পেয়ে নির্বাচিত হয়ে থাকে, তবে তার বা তাদের পক্ষে কংগ্রেস ত্যাগ করে স্বার্থসিদ্ধির উদ্দেশ্যে অন্য দলে যোগদান সম্ভব হলেও কংগ্রেসের আদর্শে বিশ্বাসী লোকের পক্ষে সে ঐতিহাসিক ভূমি ত্যাগ করে যাওয়া খুব সহজসাধ্য নয়। সমস্ত নৈতিক আদর্শে মূর্তিমান বিরোধরূপে সভ্যদের পক্ষে দলত্যাগ খুবই সহজ এবং সেই হিসাবেই এই দল ভেঙে ঐ দল গড়ার সহজাত আকাঙ্ক্ষাই এই দল ভাঙাভাঙির মূল কারণ। এই আক্রমণের হাত থেকে রাজনীতিকে বাঁচাতে হলে যে আদর্শের ভিত্তিরূপে রাজনৈতিক দলকে প্রতিষ্ঠিত করা প্রয়োজন, সমস্ত আদর্শের বেড়া ভেঙে ধূলায় অন্ধকার করে দেশের ভিতরে অরাজকতার সৃষ্টি তাদের কাম্য। তাদের পক্ষে আদর্শের বুনিয়াদ তৈরি করে দল তৈরি করে কোন সুনির্দিষ্ট পথে নিয়ন্ত্রণ একেবারেই অসম্ভব। এর অবশ্যম্ভাবী উপসর্গ মারামারি, ছুরি ও বোমা মারা।

আইন করে অপরাধীর শাস্তিবিধান করা সম্ভব হতে পারে। কিন্তু দলত্যাগে বাধা প্রদান সম্ভব কি না, তা গভীরভাবে চিন্তার বিষয়। দেশের জনসাধারণ যখন কোন নির্দিষ্ট আদর্শের অনুসরণে নিজেদের জাতীয় জীবন নিয়ন্ত্রণে অভ্যস্ত হয়, তখন সে আদর্শের বুনিয়াদের উপর যে দল বা সম্প্রদায় গড়ে উঠবে, সে দলের প্রতিশ্রুতি অমান্য করে সভ্যের পক্ষে দলত্যাগ সহজসাধ্য হবে না। জনগণের সমর্থনে দল বা সম্প্রদায় শক্তির ভিত্তি। জনমন যতক্ষণ পরিষ্কারভাবে কোন নির্দিষ্ট আদর্শের অনুসরণে সমর্থ না হবে ততক্ষণ পর্যন্ত সুবিধাবাদী উচ্ছৃঙ্খল সভ্যদিগকে দলত্যাগে বাধা দেওয়া সম্ভব হবে না।

যে আদর্শের ভিত্তির উপর দাঁড়িয়ে ভারতের স্বাধীনতার বনিয়াদ গড়ে উঠেছে, সেখানে সুপরিচালিত গণতন্ত্রের পরিচালনার মধ্য দিয়েই জাতির ভবিষ্যৎ নিয়ন্ত্রিত হবে। তার জন্যে যে সংযত ও সংহত পদবিক্ষেপ প্রয়োজন উচ্ছৃঙ্খল পথে তা সম্ভব নয়। কংগ্রেস একথা বিশেষভাবে বিবেচনা করেই জাতীয় সংবিধান রচনার মধ্য দিয়ে গণতন্ত্রের বনিয়াদ তৈরি করতে আরম্ভ করেছে। কংগ্রেসই ভারতবর্ষকে এক সংযত অভিযানের পথে ঝঞ্ঝাবিক্ষুব্ধ জগতে অগ্রগমনের পতাকা বহন করে জাতিকে শ্রেষ্ঠত্বের আসনের দিকে নিয়ে যেতে চাইছে। ২০ বছরে নতুন গঠনতন্ত্রের অশ্রান্ত কর্মপ্রচেষ্টার মধ্য দিয়ে সে অভিযানকে সার্থকতার পথে নিয়ে যাচ্ছে দেখেই একনায়কত্বে জাতির রক্ত চঞ্চল হয়ে ওঠে এবং যে কোনও উপায়ে তার অগ্রগমনে বাধা প্রদানের ব্যবস্থায় অস্থির হয়ে উঠেছে। কাজেই অন্তর্বর্তী নির্বাচনের প্রাক্কালে আজ চিন্তা করার সময় এসেছে যে, সুনিয়ন্ত্রিত পন্থায় গণতন্ত্র স্থাপন অথবা উচ্ছৃঙ্খলতার সহায়তায় শ্রেণী-সংগ্রামের মধ্য দিয়ে দেশের মধ্যে অরাজকতা সৃষ্টি করে একনায়কত্বে প্রতিষ্ঠা প্রচেষ্টা—কোন্‌টা প্রয়োজন? যদি দেশকে গণতন্ত্রের পথে বিকাশের দিকে নিয়ে যেতে হয় তবে কংগ্রেস প্রদর্শিত পথে পরিচালিত হওয়া ভিন্ন গত্যন্তর নেই। আর যদি অরাজকতা সৃষ্টির সহায়তায় বিদেশের ইঙ্গিতে ও পয়সায় নবলব্ধ স্বাধীনতাকে বিকিয়ে দিতে আপত্তি না থাকে, তবে দেশের স্বাধীনতার প্রতিবাদে বৈদেশিক সাহায্যপুষ্ট সুবিধাবাদীদের হাতের ক্রীড়নক হতে হবে। গত কয়েক মাসের যুক্তফ্রন্টের কার্যকারিতার মধ্য দিয়ে সে ভয়াবহ ভবিষ্যতের বিশেষ চিত্র বিশেষভাবে প্রত্যক্ষ করবার সুবিধা হওয়ার পরেও অন্তর্বর্তী নির্বাচনে ইতস্তত করবার কারণ আছে বলে আমি মনে করি না।

কংগ্রেসের পতাকাতলে দাঁড়িয়ে জাতিকে গণতন্ত্রের পথে অভিযানের সহায়তা করাই একমাত্র কর্তব্য, তদ্বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। কিন্তু কংগ্রেসের মধ্যেও আজ আত্মতুষ্টির ব্যবস্থায় বিশেষভাবে সজাগ হতে হবে। যে ত্যাগের ভিত্তির উপরে কংগ্রেসের বনিয়াদ খাড়া করা হয়েছে, তার উপরে আত্মসম্ভোগের আস্থা খাড়া না করে জাতীয়তার মন্দির গড়তে হলে অতীতের শিক্ষার নির্দেশে বর্তমানের রূপ নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা করতে হবে। দল ও সরকারের মধ্যে যোগাযোগ আরও গভীর করে তুলতে হবে, কর্মীদের সঙ্গে কর্তাদের মেলামেশা আরও সহজ ও সরল করতে না পারলে প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে জনযোগ নষ্ট হয়ে গিয়ে যে অনর্থের ক্ষেত্রে উপস্থিত হতে হবে, ১৯৬৭ সালের নির্বাচন তার ইঙ্গিত বহন করে এনেছে। মন্ত্রী ও কর্মীর পার্থক্য সঙ্কুচিত করে পরস্পর সহকর্মী সম্বন্ধ স্থাপন করতে না পারলে শিকড়হীন গাছের মত সমস্ত আয়োজন শুকিয়ে মরে যাবে। সরকারের মাথায় বসে প্রতিষ্ঠানকে অবজ্ঞা করা চলবে না। প্রতিষ্ঠান প্রাণশক্তি, সরকার তার অভিব্যক্তি মাত্র—এই সাধারণ সত্য বিস্মৃত হয়ে কংগ্রেস আজ এই পরীক্ষার সম্মুখীন হয়েছে, অত্যন্ত সতর্কতার সঙ্গে কংগ্রেসের সমস্ত শক্তি সংহত করার কালে ভুল পথে পদবিক্ষেপের ভবিষ্যৎ ভয়াবহ।

ঝড়।

ঝড় আসছে। বহুদূর-দিগন্ত থেকে শোনা যাচ্ছে গুরুগুরু মেঘের ডাক। দেশের দিকে দিকে আসন্ন প্রলয়ের আভাস ঘনিয়ে আসছে।

দ্রুত এগিয়ে আসছে ৯ই ফেব্রুয়ারী! এই দিনে সারা পশ্চিমবঙ্গে অন্তর্বর্তী নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে।

টনক নড়ে উঠেছে প্রার্থীদের আর তাদের সমর্থকদের। পার্টি অফিসে অফিসে আসর সরগরম হয়ে উঠেছে। আবার ময়দার আঠা, কাগজ, কালি, ইস্তাহার, ঝাই, বাঁশ নিয়ে চেলাচামুণ্ডারা রণাঙ্গনে নামছে। চারিদিকে 'সাজো সাজো' রব পড়ে গেছে।

দেখতে দেখতে দিন কেটে যাবে। ঝড়ের মত এসে পড়বে ৯ই ফেব্রুয়ারী। কলকাতার পথঘাট ফুটপাথ, বাড়ির প্রাচীর যেদিকে তাকাবে দেখবে অসংখ্য——অসংখ্য পোস্টার ঝুলছে। সার্কাসের জোকার যেমন নানা বর্ণের কিম্ভূতকিমাকার পোষাক পরে দর্শকদের হাসায় তেমনি ভাঁড় সাজবে শহর কলকাতা।

'পোস্টার প্যামফ্লেটের কথাতেই একটা কথা মনে পড়ে গেল। এইবার 'ইন্টারিম ইলেকশান' যেন ভেল্কা নাচ নাচাচ্ছে পলিটিক্সের কুশীলবদের।

প্রথমে সেনবর্মা মশায় ঘোষণা করেছিলেন গত ১৭ই নভেম্বর ইলেকশান হবে। সঙ্গে সঙ্গে দাদারা জীপ নিয়ে নামলেন রাস্তায়। গ্যালন গ্যালন তেল পুড়ল। চিত্র-বিচিত্র হয়ে উঠল বড় বড় বাড়ির প্রাচীর ঘরের দেওয়াল, মোটা গাছের গুঁড়ি আর স্টেট ও প্রাইভেট বাসের বহিরঙ্গ।

হঠাৎ তিস্তায় নামল চল। পাহাড়ে নামল ধস। গোটা উত্তরবঙ্গ জুড়ে যেন প্রলয় নেমে এল। সেই দুঃখ-দুর্যোগের ইতিহাস কারো অজানা নেই।

গেল ইলেকশান পেছিয়ে। মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়ল দাদারা। ভাইদের চোখের সামনে ঘনিয়ে এল ঘন অন্ধকার। বেশ 'টু পাইস' আমদানী হচ্ছিল। মোড়ের দোকানে হাফ কাপ চা আর তার সঙ্গে এটা-ওটা চলছিল মন্দ নয়। সব স্টপ হয়ে গেল।

হঠাৎ ইলেকশান 'পোস্টপণ্ড' হয়ে যাওয়ায় কি রকম প্রতিক্রিয়া হয়েছিল তার একটা সমীক্ষা বেরিয়েছিল কলকাতার একটি বিখ্যাত দৈনিকে। তার হেডিং ছিল "সভা-সমিতি পোস্টার, লিফলেট কমিয়ে দিন"—

নির্বাচনী আসর আবার ঝিমিয়ে পড়েছে। প্রত্যেক জেলায় জেলায় পার্টি অফিসে-হেডকোয়ার্টার থেকে নির্দেশ গেল, সভা-সমিতি, পোস্টার লিফলেট কমিয়ে দিন। নতুন করে নির্বাচনী অফিসও খোলার কোন প্রয়োজন নেই।

ডিসেম্বরের দ্বিতীয় সপ্তাহের আগে কোন দলই নির্বাচনী প্রচারের আসরে নামতে রাজী নন। যত আগে নামা যাবে তত বেশি খরচের ধাক্কা।.....আরও খবর দিয়েছে—

যুক্তফ্রন্টের এক নেতা আক্ষেপ করে বলেছেন—শুধু পোস্টার ছাপাতেই প্রত্যেক ফ্রন্টের খুব কম করে দেড় হাজার টাকার মত খরচ হয়ে গিয়েছে। এই খরচটা একেবারে বরবাদ হয়ে গেল.....

ইলেকশানের বাজনা একবার বেজে উঠলে আরও কত চমকপ্রদ এবং কখনো করুণ, কখনো হাসির কত ঘটনা যে দেশের কত দিকে ঘটে যায়, তা আমরা জানতেও পারি না। জানা সম্ভবও নয়—

তবুও কানে শোনা যায়। চোখের নজরে পড়ে যায় দু-একটা বিচিত্র ঘটনা।

সেই অক্টোবরের প্রথম সপ্তাহে যখন অবিবেচক বিলাসী এবং দায়িত্বজ্ঞানহীন শাসকদের অসতর্ক ভুলে জলপাইগুড়ির সেই চরম সর্বনাশ হয় নি, যখন তিস্তার চরের হাজার হাজার বাস্তুত্যাগী মানুষ আবার নতুন করে বাস্তুহারা হয়ে জলের তোড়ে প্রাণ দেয় নি সেই সময়—সেই সময় একদিন কলেজ স্ট্রীট দিয়ে হন হন করে যাচ্ছি।

হাওয়া গরম। না, অক্টোবরে অত উত্তাপ ছিল না। ইলেকশানের আগ্নেয় পরিবেশ ছিল দিকে দিকে। ১৭ই নভেম্বরের বাজনা বাজছিল। দেশের দিকে দিকে গাজনের নৃত্য শুরু হয়ে গিয়েছিল। আরে সুবোধ যে! কোথায় চললি?

ক্লাসফ্রেন্ড। বালাবন্ধু। বর্ধমান ইউনিভার্সিটিতে কাজ করে সুবোধ। দেখলাম, মুখখানা কালো। চোখে দুশ্চিন্তার ছায়া।

কি রে—কি হয়েছে তোর বল তো!

আর বলিস কেন, শালা এই ইলেকশান একেবারে ডুবিয়ে দিল—

আমি বিস্মিত। বলাবাহুল্য, জিজ্ঞাসু-দৃষ্টিতে তাকাতেই বুঝিয়ে বলল এবং মনের অবরুদ্ধ দুঃখের ভার একেবারে উজাড় করে দিল।

যে মেয়েটিকে সে ভালবাসে এবং বিয়ে করবে বলে ঠিক করেছে তিনি ডালহৌসিতে দশটা-পাঁচটা করেন।

অফিসটা আবার হেজিপেজির কোন একটা মার্চেন্ট অফিস নয়। অফিস তো

অফিস—একেবারে মোক্ষম অফিস—ক্যালকাটা কালেক্টরী। ইলেকশান ডিপার্টমেন্ট।

ইলেকশান বলে ছুটি পায় নি শ্রীমতী। বিয়ে, পেছিয়ে দিতে হবে সেই ডিসেম্বরে।

এই কথা শুনে আমি হো হো করে ওর দুর্ভাবনা উড়িয়ে দেবার চেষ্টা করে বললাম—উসমে কিয়া হ্যায়? বিয়ে না হোক—রেজিস্ট্রি করতে ক্ষতি কি! যাবি দুজনে ট্যাক্সি করে। খাতায় নাম লেখাবি। শপথ নিবি। চলে আসবি। পয়সা থাকলে স্যারিকের সন্দেশ খাবি—না থাকলে খাবি না—

—কি ফজুড়ি করছিস? এসব বলেছিলাম—সে রাজী নয়—রেজিস্ট্রিও করবে না এখন।

কেন? তাহলে তিনি তোর ভেতরে কোন ইনসিকিওরিটি—

আরে না—না রেজিস্ট্রি বিয়েতে যে নিয়ম আছে রেজিস্ট্রেশানের পর দুজনে একসঙ্গে অন্তত ছমাস থাকতে হয়। কিন্তু ইলেকশানের ব্যালট বক্স নিয়ে কোন ধাপধাড়া গোবিন্দপুর পাঠিয়ে দেবে ওকে কে জানে—

আমি আর কোন কথা খুঁজে পেলাম না। সেই ১৭ই নভেম্বর সব বৈশিষ্ট্য হারিয়ে একটা সাধারণ দিন হয়ে গেল। গঙ্গায় স্রোতও বইতে লাগল। সূর্যও উঠল। ডুবল—সব—সব হলো। কিন্তু—

সুবোধ আর বিয়ে করতে পারল কি না আর সে খবর পাই নি।

আরো একটি ঘটনা।

ধর্মতলার মোড়ে (যেখানে চৌরঙ্গী রোডে পড়েছে) একটি সিগারেটের দোকান আছে। দোকানের মালিকের দাদা পশ্চিম দিনাজপুরের একটি কনস্টিটুয়েন্সিতে দাঁড়িয়েছেন।

দোকানে গিয়ে দেখি, পোস্টারের স্তূপ। কি ব্যাপার?

আরে বলো কেন ভাই, দাদার জন্য ছাপা হয়েছিল এগুলো। উনি খবর পাঠিয়েছেন—আর আপাতত পোস্টারের দরকার নেই—ইলেকশান পেছিয়ে গেছে—একটা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বলল—আমার সমস্ত খরচটাই একেবারে মাঠে মারা গেল—সহযোগী "লিঙ্ক" মন্তব্য করেছেন—The floods and landslides in North Bengal, the severest in living memory came as a blessing for the Congress. অর্থাৎ উত্তরবঙ্গের বন্যা আর ধস কংগ্রেসের কাছে আশীর্বাদের মত.....নিজেদের তৈরি করার অনেক সুযোগ পাবেন ওঁরা।

উত্তরবঙ্গের বন্যা! বন্যার ঢেউ যে কি আনন্দের ঢেউ তুলেছে দাদাদের মনে তা একেবারে স্বচক্ষে দেখে এসেছি।

শহরের সব রাস্তায়, প্রত্যেক বাড়িতে জল। চারিদিকে হাহাকার, কলকাতাটি আমরা কলাগাছের ভেলা বানিয়ে নৌকো করে যতদূর সম্ভব ত্রাণকার্য করছি—তার ভেতরে হঠাৎ শুনতে পেলাম চাপা গলার ফিসফিসানি।

—আরে এই চান্স বুঝলে। ভাল করে চর্ব-চোষ্য খাওয়ানোর ব্যবস্থা করো—

—সে আর আপনাকে বলতে হবে না—আমাদের ক্লাবঘরে মেঝেতে উনান খুঁড়ে 'অলরেডি' খিচুড়ি বসিয়ে দিয়েছি—

সেই করুণ আর্তনাদ আর কান্নাকাটির ভেতরে দাঁড়িয়ে গুরুশিষ্যের সলাপরামর্শ চলছে! আমার মনে হল—জনসেবা, রাজনীতি কী ভয়ঙ্কর!

বন্যার সঙ্গে সঙ্গে কত রকমের স্বার্থের বন্যা যে চলেছে তা চোখে না দেখলে বিশ্বাস করা যায় না।

রিলিফে তিন বস্তা গম, এক বস্তা গুঁড়ো দুধ, আর এক বস্তা চাল দেওয়া হবে একটা পাড়ায়। রিলিফের ইন্সপেক্টারের ওপর নির্দেশ হয়েছে—সাহায্য করার সময় স্থানীয় কোন লোকের উপস্থিতি এবং তার পরামর্শে যেন করা হয়।

কার সাধ্য স্থানীয় লোক ঠিক করে!

আমি স্থানীয় লোক—

আমিও—

আস্তিন গুটিয়ে চলে এল ছ'-সাতটি যুবক। সকলেই গভর্নমেন্ট রিলিফ অর্থাৎ G.R.-এর কাজে সঙ্গী হতে চায়।

কোন পাড়ায় বড় কথা নয়। বড় হচ্ছে দল, গ্রুপ। রিলিফটাকে যেন তাদের ইনফ্লুয়েন্সে তাদের তত্ত্বাবধানে করতে হবে।

সেই ঝগড়া বহু কষ্টে থামিয়ে কেমন করে সেই রিলিফ অফিসার নিরাপদে কাজ করে স্বস্থানে ফিরে এসেছিল—সে আর এক ইতিহাস!

ইলেকশান! শুধু যে স্বার্থ, আর বিদ্বেষ ও নিচ-হীনতাকেই প্রকট করে তোলে তা নয়—ভোটের দিন একটা আনন্দের দিনও বটে। মনে হয়, যেন একটা জাতীয় উৎসব!

'উৎসব' বলতে রবীন্দ্রনাথ যা একদিন বোঝাতে চেয়েছিলেন; বলেছিলেন উৎসব বলতে আমার মনে হয়, একটা সর্বব্যাপী ভাবের টানে সবাই অর্থাৎ নারী পুরুষ বৃদ্ধ শিশু নির্বিশেষে প্রত্যেকে কেমন অস্থির হয়ে ওঠে, হয়ে ওঠে আনন্দ-টলোমলো.....

ইলেকশানের দিন সকালে একবার দয়া করে রাস্তায় বেরিয়ে আসুন। দেখবেন চারিদিকে একটা উৎসবমুখর পরিবেশ। 'পোলিং বুথ' থেকে শুরু করে 'ক্যানভাসিং সেন্টার' পর্যন্ত দড়িতে বাঁধা লাল ফেস্টুন, প্রার্থীর সিম্বলের ছবি!

হাস্যোজ্জ্বল তরুণ-তরুণীরা রঙিন প্রজাপতির মত যেন হাওয়ার ওপর পা ফেলে এখানে-সেখানে ঘুরছে!

ইলেকশানের এই ডামাডোলের ভেতরই কত রকমের রোমান্টিক ব্যাপার যে ঘটে যায়।

১৯৬৭ সালের ১৯শে ফেব্রুয়ারীতে সেই সাধারণ নির্বাচনের সময় হঠাৎ অরিন্দমের সঙ্গে দেখা।

অরিন্দম বাল্যবন্ধু। ওর বিয়ে হবে। সেই মেয়ে দেখতে ওর সঙ্গে যাওয়ার কথা। অথচ সেসব ভুলে সে 'ক্যানভাসিং' নিয়ে মেতে রয়েছে—

সে কি রে ভোটের ক্যানভাসিং করছিস! তুই বলে মেয়ে দেখতে যাবি—

যাবি আর কোথায়!-

মানে?

মাসিক ১০ টাকা কিস্তিতে
ট্রানজিস্টার লউন

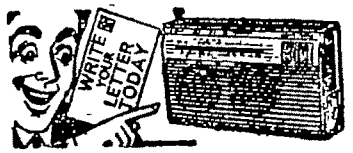

বিশ্ববিখ্যাত সর্বাধুনিক জাপান মডেল, চিত্তাকর্ষক শক্তিশালী, গ্যারান্টিযুক্ত "ওয়ার্ল্ডভয়েস" ৩ ব্যান্ড অল ওয়ার্ল্ড আশ্চর্যজনক নাইট ল্যাম্পযুক্ত। প্রত্যেক গ্রামে ও শহরে পাঠানো যায়।
Write to :—
ALL WORLD AGENCY,
(B.W.) Kalyanpura, Delhi-6.

শিবেন্দ্রকুমার বসুমল্লিক

যাকে দেখতে যাবি সে তো এখানে—

আমার হাত ধরে টেনে নিয়ে গেল পোলিং বুথের দিকে। বুথের মুখে বেশ ভিড়। সেই ভিড়ের ভেতরে দাঁড়িয়ে লম্বা ছিপছিপে চেহারার একটা মেয়ে খুব ক্যানভাস করছে। কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম জমেছে। শাড়ির আঁচল ঝুলেছে মরা একটা সাপের মত।

ইনিই আমার ভাবী পত্নী। অরিন্দম হেসে বলল।

মনে মনে ইলেকশানের জয়ধ্বনি দিলাম। বিয়ে, মেয়ে দেখা, সামাজিকতা সব এখন একটি বিন্দুতে কেন্দ্রীভূত হয়েছে। সে বিন্দু ইলেকশান। ইলেকশানের সময় মেয়ে দেখার উপযুক্ত জায়গা পোলিং বুথ!

গণতন্ত্রের যুগের সবচেয়ে বড় অবদান —প্রাপ্তবয়স্কের ভোটাধিকার—এ্যাডাল্ট ফ্রাঞ্চাইজ। এইদিন বাড়ির যে সবচেয়ে অযোগ্য লোকটি পরিবারের ভার বিশেষ —একেবারে অবাঞ্ছিত জীব। তারও সেদিন কত আদর! তাকে পোলিং বুথে নিয়ে যেতে বাড়িতে এ্যাম্বাসাডার আসে!

পরিবার পরিকল্পনার সব নির্দেশ অমান্য করে যে বারোটি সন্তানের জনক— যাকে প্রত্যেকে গালাগাল করে সে আজ

ক্যান্ডিডেটদের সবচেয়ে প্রিয়। কেন না তিনি একটি-দুটি নয় বারোটি ভোটের মালিক।

ইলেকশান যেন মায়া-কাজল পরিয়ে ভানুমতীর কুহকের মত সব পাল্টে দেয়।

জন কেনেডি গুলী খেয়ে মারা গেলেন। মিসেস কেনেডির সঙ্গে সারা পৃথিবীর মানুষ চোখের জল ফেলল। সমবেদনা জানালো। তরুণ প্রেসিডেন্ট আততায়ীর হাতে নিহত হয়ে মিসেস কেনেডিকে পৃথিবীর মানুষের মনে রাণীর মহিমায় প্রতিষ্ঠিত করে গেলেন।

সেই জ্যাকলিন হঠাৎ স্বামীর পারিবারিক ঐতিহ্য, বংশমর্যাদা, প্রিয়তম এবং আদর্শবাদী সেই স্বামীর স্মৃতি সব—সব ভুলে হঠাৎ দুম করে বিয়ে করে বসলেন এক জাহাজব্যবসায়ী কোটিপতিকে।

বিদেশের পত্র-পত্রিকা নানা মন্তব্য করল। এক আমেরিকান সাংবাদিক বললেন, কিছুই নয়। এসব হলো, She is preparing herself for next President election! আগামী প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের জন্য প্রস্তুতি। অঢেল টাকা-পয়সার দরকার। কোটিপতিকে বিয়ে না করলে চলবে কি করে.....

অতবড় স্বামীর স্মৃতিও ভুলিয়ে দেয় ইলেকশান। কত প্রেমের বিচ্ছেদ ঘটায়— কত প্রেমকে মহৎ করে, উজ্জ্বল করে ইলেকশান!

দুটি ছেলেমেয়ে। খুব ভাব। পরস্পরের জন্য প্রাণ দিতে পারে এমন সনিষ্ঠতা। ধরুন, ছেলেটির নাম বিকাশ, মেয়েটির নাম ছন্দা।

বিকাশ আর ছন্দা দুজনেই ইলেকশান ক্যাম্পেন করতে গ্রামে গেছে। বিকাশ ঘুরবে পুরুষদের ভেতরে। ছন্দা ঘুরবে মেয়েদের কাছে।

হঠাৎ ছন্দার নজরে পড়ল, বিকাশ অন্য দলের ছেলেদের সঙ্গে রসে আয়ের দোকানে আড্ডা দিচ্ছে। চা খাচ্ছে। কি ব্যাপার! তুমি কি বিট্রে করছো না কি!

—আরে কি যে বলো—আমি স্পায়িং করছি। ওদের সঙ্গে মিশে ভেতরের খবর বের করার চেষ্টা করছি—

খুব খুশি হলো ছন্দা। গ্রাম ছাড়িয়ে দূর-দিগন্তের পারে চাঁদ উঠল।

রাস্তার কালচারটার ওপরে বসল ওরা। ঝিরি ঝিরি বাতাস বইছে। বিকাশ বলল, আমাদের ক্যান্ডিডেট শ্রী——জিততে পারলে নির্ঘাৎ মন্ত্রী হবে—

—তাই তো আশা করা যাচ্ছে—

—মন্ত্রী হলে আমি চাকরি পাবো। আর এরকম বাউন্ডুলে হয়ে ঘুরতে হবে না—ঘর বাঁধবো। সংসার করবো—

ছন্দার মনে হল কথা নয়, যেন গান শুনছে। ওর চোখ দুটো কেমন স্বপ্নাচ্ছন্ন ও সুদূর হয়ে উঠল।

পরদিন সন্ধ্যার পর ছন্দা যখন 'ক্যাম্পেন' শেষ করে ফিরছিল তখন হঠাৎ কানে এল রাস্তার ধারে ঝোপের ভেতরে ফিস ফিস কথা—

পাঁচশো টাকা পেলে আমি বিট্রে করতে পারি—

দেব—দেব ভাই টাকা—

সঙ্গে সঙ্গে হিংস্র বাঘিনীর মত সামনে এসে দাঁড়াল ছন্দা। দাঁতে দাঁত চেপে ধরে বলল, ছিঃ ছিঃ তুমি ঘুষ নিয়ে আমাদের ক্যান্ডিডেটের বিরোধিতা করছো—

শোন শোন ছন্দা—

না—না টাকা দিয়ে যাকে কেনা যায় তার সঙ্গে আমি কোন কথা বলি না—

আর কখনো বিকাশের মুখ দেখে নি সে। 'এ্যাকটিভ পলিটিক্স' এখনও আছে মেয়েটির। আর কোন বিকাশকে নিয়ে আবার কোন স্বপ্ন দেখছে কি-না, তা জানা যায় না—

আবার এও দেখেছি, ছেলেমেয়ে দু-জনেই এক দলভুক্ত। দলের মনোনীত প্রার্থীর হয়ে ভোট ক্যানভাস করছে। ছেলেটি বলেছে—আচ্ছা আমি যদি কখনো দলছাড়া হই—

আমিও তোমার সঙ্গে সেই দলে যাবো—

তাহলে তোমার 'পলিটিক্যাল ইডিওলজি' বলে কিছু নেই?

আছে—

কি সেটা?

আমার ইডিওলজি—বলেই মাথা নিচু করল মেয়েটি। বিচিত্র লজ্জায় রূপবতী হয়ে উঠে বলল অস্ফুটস্বরে—তুমি—তুমিই আমার ইডিওলজি—

সদ্য বিকশিত গোলাপের মত সুন্দর আনন ও
কুসুম কোমল
পাপড়ি পেলব তনু

সাধনা বিউটি ক্রীম-এর
এইতো সবচেয়ে বড় অবদান!
নিজেদের সৌন্দর্য্য সম্পর্কে
সচেতন আধুনিকারা তাই
এর প্রশংসায় মুখর।

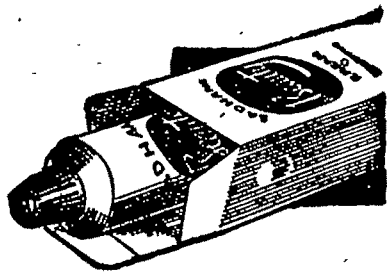

সাধনা
বিউটি
ক্রীম

রূপসাধনার অপরিহার্য
অতি আধুনিক অঙ্গরাগ

সাধনা ঔষধালয়-ঢাকা কলিকাতা-৪৯

ইলেকশানের আড়ালে এইসব মন দেওয়া-নেওয়ার ব্যাপার ছাড়াও আরও কত মজার ব্যাপার যে হয়!

একবার এক ভোটগ্রহণ কেন্দ্রে এক অতি বৃদ্ধ ভোটারকে নিয়ে আসা হলো ডুলিতে করে। বছর বিরানব্বই বয়স হবে সেই বৃদ্ধের। সোজা হয়ে দাঁড়াতে পারে না। কোমর পড়ে গেছে অনেকদিন আগে। চোখে পড়েছে ছানি।

তাকে কালো পর্দা ঘেরা ব্যালট বক্সের ঘরে ঢুকিয়ে দেওয়া হলো। আর বেরিয়ে আসার নাম নেই। প্রিজাইডিং অফিসার থেকে শুরু করে পোলিং এজেন্ট, ভলান্টিয়াররা পর্যন্ত খুব ব্যস্ত হয়ে উঠল।

তাড়াতাড়ি করে ঘরে ঢুকে দেখল, বুড়ো ব্যালটবক্সের টেবিলের নিচে কম্বল মুড়ি দিয়ে ঘুমোচ্ছে!

ধাক্কা দিয়ে জাগানো হলো। বলল—এত নিরিবিলি, নিস্তব্ধ ঘর। চারিদিকে অন্ধকার! আমার কেমন ঘুম পেয়ে গেল।

অপ্রাপ্ত একটা কেন্দ্র ভোট দিতে এল এক আঁওতাল দম্পতি। 'পুরুষ' ও 'মহিলা' লেখা দুটো প্ল্যাকার্ড লাগানো আছে বুথের দু'দিকে। যেই পুরুষটিকে বলা হলো, তোমাকে একলা যেতে হবে—জেনানাকে সঙ্গে নিতে পারবে না—

না, বাবু, তাহলে হামি ভুট দিমো না—একেবারে ঘাড় বেঁকিয়ে বসল। বৌয়ের হাত ধরে হিড়হিড় করে টেনে নিয়ে চলল গ্রামের দিকে। দুটো ভোট হাতছাড়া হচ্ছে যায় দেখে ভলান্টিয়াররা ছুটল তাদের দিকে। শেষ পর্যন্ত প্রিজাইডিং অফিসার তাদের একসঙ্গে ভোট দিতে যেতে রাজী হয়েছিলেন।

ডাক-বাক্স, কাস্তে-হাতুড়ি, জোড়াবলদ, ছাতি, পাখীর খাঁচা ইত্যাদি প্রতীক-গুলোকে এত বেশি করে, এতবার নানা-ভাবে বোঝানো হয় যে, সেগুলোকে কেন্দ্র করে কোন গোলমাল হওয়াটা মোটেই অস্বাভাবিক নয়।

এক কৃষক ভোট দিতে এসে ব্যালট-বক্সের সেই 'সিক্রেট' ঘরে ঢুকে রেগেই চিৎকার করতে করতে বেরিয়ে এল—আমি ভোট দেব না—কিছুতেই দেব না—

কেন? —কেন—কি হলো? দৌড়ে এল প্রিজাইডিং অফিসার—এল পোলিং এজেন্ট।

কই আমাকে যে বাবুরা বলেছিল—ভোট দিবা গেলে, মুই একজোড়া পামু (পাবো)!

স্তব্ধ হয়ে গেল প্রিজাইডিং অফিসার। অতি উৎসাহী কোন ভলান্টিয়ার হয়তো মিথ্যা আশ্বাস দিয়েছে—লোভ দেখিয়ে বলেছে ভোট দিলে একজোড়া বলদ দিবে—

শুধু বলদ নয়। 'কাস্তে-হাতুড়ি' প্রতীক এবং আরও অন্যান্য প্রতীক নিয়েও এরকম ঘটনা ঘটেছে। ক্যানভাস করার সময় কোন দলের ভলান্টিয়ারেরই কোন জ্ঞান থাকে না। আবেগের বশে, তারা অসম্ভব কথা, অস্বাভাবিক কোন প্রতি-শ্রুতিও করে ফেলে।

গণতন্ত্রের এই যুগে এ ধরণের অজ্ঞতা খুবই শোকাবহ। আমরা যে কোথায় আছি, ভেবে মন বিষাদাচ্ছন্ন হয়ে ওঠে। কিন্তু—

সেদিন চায়ের দোকানে বসে ফটিকদা যখন বললেন, এ্যাডাল্ট ফ্র্যাঞ্চাইজের সব-চেয়ে বড় অবদান হলো—সেন্স অফ ইণ্ডি-ভিজুয়ালিটি। অর্থাৎ প্রত্যেকের মনে ব্যক্তিত্ববোধ জাগিয়েছে, তখন বিস্মিত হলাম। বললাম, কেমন করে দাদা?

শোন তবে, একটিপ নস্যি নিয়ে বললেন—তোদের বৌদির অন্য কোন সত্তা যে কোনদিন আছে তা কল্পনাও করতে পারি নি। বরাবর আমি যদি নদী কাত বলেছি তো—সেও তাই বলেছে। একেবারে অভিন্ন আত্মা—একেবারে যাকে বলে অর্ধাঙ্গিনী, ট্রুয়েস্ট সেন্স অফ দি টার্মস.....

কিন্তু রাত্রে যখন জিজ্ঞাসা করলাম, কি গো—ভোটটা কাকে দিচ্ছ?

তার উত্তরে আমাকে বিস্মিত করে দিয়ে বলল—ওটা সিক্রেট! —ওটা সম্পূর্ণ আমার ব্যক্তিগত ব্যাপার!

৯ই ফেব্রুয়ারী দ্রুত এগিয়ে আসছে। আমার সহধর্মিণীর অন্তত একটা ভোট আমার ক্যান্ডিডেট পাবে ভেবেছিলাম। ফটিকদার কথা শুনে সে আশাও নির্মূল হয়ে যাচ্ছে।

জয় হোক গণতন্ত্রের—জয় হোক সাধারণ নির্বাচনের। মনে রাখবেন—এই একটি দিন প্রতিটি মানুষ তার মূল্যবোধ সম্বন্ধে সচেতন হয়ে ওঠে; এই একটি দিন অতি তুচ্ছ দীনাতিদীন মানুষও মহৎ হয়ে ওঠে আর—জেগে ওঠে তার মনের ভেতরে একটা স্বাতন্ত্র্যবোধ।

মনোবিজ্ঞানীরা মনের বহু ভাগ দেখিয়েছেন যেমন মন, চেতন, অধিচেতন, ইত্যাদি সে এক কুয়াশাচ্ছন্ন জটিল গোলক-ধাঁধা!

এই নীহারিকাপুঞ্জের মত ছায়াচ্ছন্ন মুসর মনোজগতের ঠিক কোন্‌খানে তার পছন্দসই ক্যান্ডিডেট নক্ষত্রের মত জ্বল-জ্বল করছে তা পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ মনস্তত্ত্ব-বিদও বলতে পারবেন না।

সেখানে প্রত্যেকেই ফটিকদার স্ত্রীর মত বলবে—ওটা সিক্রেট! অতএব—

পাঠক বন্ধুরা সাবধান। ৯ই ফেব্রু-য়ারীতে কাউকে বিশ্বাস করবেন না।

চলুন, ভোটকেন্দ্রে পৌঁছে দিচ্ছি।

রঙ্গরাগ

রবীন্দ্রসদনে নাট্যোৎসব

রবীন্দ্রসদনে কার্যনির্ধারক সমিতির উদ্যোগে এক প্রশংসনীয় নাট্যোৎসব শুরু হয়েছে গত ৬ই জানুয়ারী থেকে। অবশ্য আমাদের কাছে আমন্ত্রণপত্র এসে পৌঁচেছে ৭ তারিখে। রবীন্দ্রসদন নির্মাণের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল জাতীয় নাট্যশালা। অনেক কাঠ-খড় পোড়াবার পর এই ভবনটির উদ্বোধন সম্ভব হয়েছে। ভবনের কাজ ত্বরান্বিত করা, জাতীয় নাট্যশালা করা, পরিচালনায় গণতান্ত্রিক অধিকার ইত্যাদির দাবিতে কয়েকবার বিক্ষোভ প্রদর্শন করতে হয়েছে। এই বিক্ষোভে বিশিষ্ট সাহিত্যিক, শিল্পী থেকে সংস্কৃতিকর্মীরা যোগ দিয়েছিলেন। এমন কি উদ্বোধনী দিনে পুলিশের 'মৃদু লাঠি' চালনা এবং গুণ্ডাদের বোমায় মিছিল ভাঙার চেষ্টাও হয়েছিল। সেই স্মৃতি দেশবাসী ভোলে নি। উদ্বোধনের পরে জাতীয় নাট্যশালা হওয়া দূরের কথা ক্রমে ক্রমে দেখা গেল রবীন্দ্রসদনে ফ্যাশন প্যারেড, ভ্যারাইটি শো থেকে প্রতিক্রিয়াশীল হিন্দী নাটক পর্যন্ত অভিনীত হচ্ছে। রবীন্দ্রনাথের নামাঙ্কিত ভবনকে এভাবে ভাড়াটে মঞ্চে পরিণত করাতে সংস্কৃতিকর্মীরা মোটেই খুশি ছিলেন না।

যুক্তফ্রন্ট সরকারের সময় পরিচালন সমিতিকে কিছুটা গণতান্ত্রিক করার ইচ্ছা প্রকাশ করা হয়। কার্যনির্ধারক সমিতিকে পুনর্গঠিতও করা হয়। কিন্তু এই পুনর্গঠন কোন গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে সম্পন্ন হয় নি। কয়েকজন নতুন লোক এসেছেন মাত্র। যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রিসভা খারিজের পর রাজ্যপাল রাতারাতি আরো কিছু নতুন লোক ঢোকালেন কার্যকরী সমিতিতে প্রাধান্য রক্ষার জন্য। কিন্তু জাতীয় নাট্যশালার কথা এখনো অন্ধকারের অতলে।

বর্তমান কার্যনির্ধারক সমিতি এই নাট্যোৎসবের আয়োজন কি উদ্দেশ্যে করেছে আমরা জানি না। কারণ সাংবাদিক সম্মেলনে আমাদের আমন্ত্রণ করা হয় নি কিন্তু যে-সব নাটক ও নাট্যসংস্থার নাম দেখছি তাতে নানা প্রশ্ন উদয় হচ্ছে। যেমন বহুরূপী, রূপকার, অভ্যুদয়, গণনাট্যসঙ্ঘ ইত্যাদির মত সংস্থাগুলি অংশ গ্রহণ করে নি কেন? নাটকগুলি কি কোন নির্দিষ্ট আদর্শে বাছাই করা হয়েছে? রবীন্দ্রসদনে নাট্যোৎসব হচ্ছে অথচ বহুরূপী, রূপকার, গণনাট্যসঙ্ঘ নেই কেন বাস্তবিকই তা বিস্ময়ের কথা। রবীন্দ্র সদনে নাট্যোৎসব বলতে পশ্চিমবঙ্গের প্রতিনিধিস্থানীয় নাট্যসংস্থাগুলির একত্র সমাবেশের কথা মনে আসে। নাট্যরসিকরা উৎসাহবোধ করেন—প্রথম শ্রেণীর সংস্থাগুলির বাছাই করা নাটক দেখবার জন্য। স্বভাবতই মনে আসে এতে দেখা যাবে বিভিন্ন আঙ্গিক, শিল্পরীতি ও বক্তব্যের নাটক। যে উৎসবের মধ্য দিয়ে পশ্চিমবঙ্গের নাট্যজগতের ছবি স্পষ্ট হয়ে উঠবে। কিন্তু কার্যনির্ধারক সমিতি কেন যে সকলকে সমবেত করতে পারলেন না বোঝা যাচ্ছে না। গণনাট্যসঙ্ঘে এক প্রতিনিধির সঙ্গে আলোচনায় জানা গেল উৎসবে যোগদানের জন্য তাঁদের ডাকাই হয় নি। সাংবাদিক সম্মেলনে জনৈক সাংবাদিক না কি এই প্রশ্ন করেছিলেন কিন্তু কর্মকর্তারা সে প্রশ্নের জবাব দেন নি। অথচ কার্যনির্ধারক সমিতিতে রয়েছেন গণনাট্যসঙ্ঘের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা সদস্য এবং আরো কয়েকজন যাঁরা যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রিসভার আমলে সমিতিতে মনোনীত হয়েছেন। —সুজন।

শ্রীমতী সরযূবালা দেবী বিশ্বরূপা পুরস্কার পেয়েছেন।

চিত্রআলোচনা

সাবরমতী

শ্রীলোকনাথ চিত্রমন্দিরের 'সাবরমতী' মুক্তিলাভ করেছে। সাহিত্যিক আশুতোষ মুখোপাধ্যায় রচিত কাহিনী এই ছবির চিত্রনাট্যের অবলম্বন। চিত্রনাট্য রচনা কাহিনীকার নিজেই করেছেন। পরিচালনা করেছেন হীরেন নাগ।

'সাবরমতী' কাহিনী চিত্রের পটভূমি আমেদাবাদ। পাত্র-পাত্রীরা গুজরাটি। আমেদাবাদের শ্রেষ্ঠতম শিল্পপতির কন্যা যশোমতী আত্মমর্যাদাবোধে বাড়ি থেকে চলে গিয়ে এক উচ্চাকাঙ্ক্ষী যুবক শংকর সারাভাই-এর সঙ্গে পরিচিত হয়েছিল এবং এই পরিচয় থেকে সাবরমতী নদী-তীরে তাদের পরস্পরের হৃদয় বিনিময় ঘটেছিল। যশোমতী চেয়েছিল তার জীবন-সঙ্গীকে সে নিজে বেছে নেবে—সে পুরুষ হবে আত্মবিশ্বাসী ও পৌরুষদীপ্ত। কিন্তু শংকর দরিদ্র। কাজেই পারিবারিক

বাধা দেখা দিল। কিন্তু নিজের কর্মশক্তির জোরে শংকর একদিন এমন এক কৃতীপুরুষে হয়ে উঠল যে তার সঙ্গে প্রতিযোগিতায় যশোমতীর বাবার ব্যবসা পিছিয়ে পড়ল। কৃতিত্বের পুরস্কার নিতে এসে আবার তার সঙ্গে যশোমতীর দেখা হল। দু-টি জীবন এবার নির্বিঘ্নে এক হল। এই হল 'সাবরমতী'র কাহিনী।

সাবরমতী নামের সঙ্গে স্বদেশী আন্দোলনের স্মৃতি জড়িত। তাই প্রথমে মনে হয়েছিল হয়ত বা অসহযোগ আন্দোলনের কোন ঘটনার অবলম্বনে ছবিটির চিত্রনাট্য। ছবিতে দেখা গেল ভারতীয় বস্ত্র শিল্পের কথা। আমেদাবাদেই ভারতীয় বস্ত্রশিল্প সমৃদ্ধি লাভ করেছে। সাম্রাজ্যবাদী আমলে এই স্বদেশী বস্ত্রশিল্পের জন্য দেশবাসীর যে গর্ব ছিল, স্বাধীনতার কালে সে রকম নেই। কারণ মিল মালিকরা স্বদেশী হলেও শোষণে বিদেশীর চেয়ে বেশি ছাড়া কম যায় না। কাহিনীতে রয়েছে ব্যক্তিগত উদ্যোগে শিল্প গড়ে তোলার—ধনী হবার বাসনায় প্রেরণা। যখন দেশবাসী চায় সমবায় ব্যবস্থা, রাষ্ট্রীয় মালিকানা, সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতি। সামান্য জমি বেচার টাকায় রাতারাতি বিরাট কারখানা গড়ে তোলার জলবৎতরলম দৃষ্টান্ত দেখিয়েছেন কাহিনীকার ও চিত্রনাট্যকার। বস্ত্রশিল্পের মনোপলি ক্যাপিট্যালের নিষ্পেষণে ছোট তাঁতশিল্পগুলি যে দিন দিন উঠে যাচ্ছে, এবং প্রতিবন্ধকতার সম্মুখীন হতে হচ্ছে সে কথা একবারও উল্লেখ করেন নি। বরঞ্চ ছোট শিল্পের উৎকর্ষে বড় শিল্পের মন্দা দেখিয়ে ভুল ধারণা সৃষ্টি করেছেন।

ছবির পটভূমি গুজরাট। নারীচরিত্রগুলির কাপড় পরার ধরণ, আর একটি প্যাটেলের চরিত্রের জামাটি ছাড়া গুজরাটের জীবন ছবিতে আসে নি। গুজরাটের গণজীবন, উৎসব, বা বৈশিষ্ট্য ছবিতে প্রতিফলিত হয় নি। যা থেকে গুজরাটকে অনুভব করা যেত। যশোমতী হয়েছেন সুপ্রিয়া দেবী, আর শংকর উত্তমকুমার। এই দুটি মুখ্যচরিত্রের সঙ্গে কমল মিত্র, ছায়া দেবী, দীপ্তি রায়, পদ্মা দেবী, তরুণকুমার, ভানু ব্যানার্জী, পাহাড়ী সান্যাল, জহর রায়, প্রশান্তকুমার, শ্যামল ঘোষ প্রমুখ বিভিন্ন ভূমিকায় রয়েছেন। এঁদের সকলের অভিনয়ে এই কাহিনীটি পরিচালক যথার্থভাবে প্রকাশ করেছেন। যদিও ফটোগ্রাফির দিক খুব উন্নত নয় (সাবরমতীর দৃশ্যটি) তথাপি সাধারণ দর্শকরা কাহিনী এবং জনপ্রিয় অভিনেতাদের উপস্থিতির জন্যে ছবিটি উপভোগ করবেন।

সংবাদকণা

জাপানী ছবি

ইন্দো-জাপানীজ এ সো সি য়ে শ ন, জাপানের কনসাল জেনারেল এবং সিনে সেন্ট্রাল অব ক্যালকাটার উদ্যোগে গত ৫ই জানুয়ারী ম্যাজেস্টিক সিনেমায় জাপানী ছবি দেখান হয়েছে। অনুষ্ঠান উদ্বোধন করেন রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ডঃ রমা চৌধুরী, সভাপতিত্ব করেন শ্রীমধু বসু। জাপানের কনসাল জেনারেল মিঃ কাতাকামি সমাগতদের অভ্যর্থনা করেন। এই দিন বিখ্যাত জাপানী ছবি "এ্যাগারী সী" দেখান হয়েছে।

গিরিশ নাট্য প্রতিযোগিতার ফলাফল

গত ৪ঠা জানুয়ারী বিশ্বরূপা নাট্য উন্নয়ন পরিষদ আয়োজিত গিরিশ নাট্য প্রতিযোগিতার ফলাফল ঘোষণা করা হয়েছে। ২৪টি সংস্থার মধ্যে ৬টি সংস্থা চূড়ান্ত বিচারের জন্য নির্বাচিত হয়েছিল।

শ্রেষ্ঠ পুরস্কার লাভ করেছে 'ডেথ অর মার্ডার'। অভিনয় করে অগ্রণী সংস্থা। কেন্দ্রী'র 'অতি নাটকীয়' দ্বিতীয় পুরস্কার লাভ করেছে। অভিজ্ঞানপত্র দেওয়া হয়েছে নাট্যকার স্নিগ্ধ বন্দ্যোপাধ্যায়, গঙ্গাপদ বসু, রমেন লাহিড়ী ও মধু বন্দ্যোপাধ্যায়। পরিচালনার জন্য অভিজ্ঞানপত্র পেয়েছেন সুধাংশু মুখোপাধ্যায়।

অভিনেতা ও অভিনেত্রীদের মধ্যে অভিজ্ঞানপত্র পেয়েছেন যূথিকা ভট্টাচার্য, চিত্রিতা মণ্ডল, রমেন লাহিড়ী, সবিতা মুখার্জী, আশিষকুমার মজুমদার।

গর্কি'র মা

রঙ্গশ্রী গোষ্ঠী ম্যাক্সিম গর্কি'র 'মাদার' উপন্যাস অবলম্বনে রমেন লাহিড়ী রচিত নাটক 'মা' মঞ্চস্থ করবেন ১৮ই জানুয়ারী শনিবার দুপুর আড়াইটায় বিশ্বরূপা রঙ্গমঞ্চে। নামভূমিকায় আছেন সাজেদা আসাদ। নির্দেশনা নাট্যকারের।

চলচ্চিত্র সংরক্ষণ সমিতির বক্তব্য

গত ৬ই জানুয়ারী অরোরা ফিল্ম কর্পোরেশনের পেছনের উঠানে প্রায় সভার অনুরূপ আয়োজিত এক সাংবাদিক সম্মেলনে চলচ্চিত্র সংরক্ষণ সমিতির বক্তব্য সাংবাদিকদের কাছে উপস্থিত করা হয়েছে। সত্যজিৎ রায় সহ বিশিষ্ট পরিচালকরা সমিতির বিরুদ্ধে যে অভিযোগ করেছেন সেই অভিযোগের উত্তর দেবার জন্য এই সাংবাদিক সম্মেলনের আয়োজন করা হয়েছিল। ফুলস্কেপ কাগজের সাত পৃষ্ঠা দীর্ঘ লিপিবদ্ধ বক্তব্যে তাঁরা কোন অভিযোগ অস্বীকার করেন, কোনটির জবাব দেন।

ছবির ব্যাপারে শিল্পী, টেকনিশিয়ান নির্বাচন ইত্যাদি ব্যাপারে বাধা আরোপ করেছে, সমিতির যারা মেম্বার নয় তাদের ওপর চাপ সৃষ্টি করা হচ্ছে, স্টুডিওর অভ্যন্তরে নৈরাজ্যমূলক অবস্থা সৃষ্টি হয়েছে, কাউন্সিল সভায় স্বাধীন মত প্রকাশের স্বাধীনতা নেই ইত্যাদি অভিযোগের সত্যতা সমিতি অস্বীকার করে। ছবির মুক্তির ব্যাপারে নিয়ন্ত্রণ করা হচ্ছে বলে যে অভিযোগ করা হয়েছে তার জবাবে বলা হয় সমিতি 'ভাল' আর 'খারাপ' ছবির তারতম্য করতে চায় না। সেটা করবে দর্শকরা। সমিতি সেন্সার সার্টিফিকেটের তারিখ অনুযায়ী মুক্তির ব্যবস্থা করতে চায়। সমিতির এই চেষ্টায় অনেকদিন পড়ে থাকা ছবির মুক্তি সম্ভব হয়েছে। সমিতির কর্মকর্তারা বলেন : তাঁদের চেষ্টায় আজ বারীন সাহার 'তের নদীর পারে' মুক্তি পাবার পথে এসেছে।

বাধাতামূলকভাবে বাংলা ছবি প্রদর্শনের ব্যাপারে তাঁরা 'প্রিয়া' সিনেমায় অসহযোগিতার কথা এবং হিন্দী সিনেমাওয়ালাদের দিক থেকে অসহযোগিতামূলক মনোভাবের কথা বলেন। তবে এই ব্যাপারে তাঁরা 'রিলিজ চেন' শীঘ্রই কার্যকরী করার আশা রাখেন।

অভিনেতৃসংঘ ভাঙার ব্যাপারে সমিতির বক্তব্য—সংরক্ষণ সমিতির আন্দোলনে অভিনেতৃসংঘের সম্পাদক সহ এক দল যোগদান করে নি এবং কিছু সর্ত উপস্থিত করে। এতে বিরক্ত হয়ে বড় একটা অংশ অভিনেতৃসংঘ ত্যাগ করে শিল্পীসংসদ গঠন করে।

সমিতির বিবৃতিতে সত্যজিৎ রায় সহ যাঁরা সমিতির সম্পর্ক ত্যাগ করেছেন তাঁদের প্রদর্শক বা প্রেক্ষাগৃহের মালিকের অনুগৃহীত হিসাবে পরিচয় দেওয়া হয়েছে এবং তাঁদের সম্পর্কে লিখিত মন্তব্যে কিছুটা সংযমের অভাব দেখা গেছে। বক্তব্যে পাল্টা অভিযোগও করা হয়েছে যাঁরা রবীন্দ্রসদন-এর জন্য অস্থির, 'স্টেটসম্যান' ধর্মঘটে বক্তৃতা দেন, সেই 'সর্বহারা'র প্রতি সহানুভূতিশীলরা চলচ্চিত্র সংরক্ষণ আন্দোলনে এগিয়ে এলেন না কেন?

খেলার মেলা

ইডেন গার্ডেন এখন জমজমাট। ক্রিকেটের আসর এখন কলকাতার বাজার মাত্ করেছে। ক্রিকেটের নন্দনকানন ইডেন উদ্যানে রবিবার দিন বসেছিল অভিনব এক খেলার মেলা। খেলা নয়—মেলা বলাই ভালো। সেই মেলায় মিলেছিল কলকাতা আর বম্বের চিত্রতারকাদের দুটি দল। কলকাতা বনাম বম্বে। নায়কদের সংগে নায়িকারাও হাজির হয়েছিলেন মাঠে। তাই শহর ঝেঁটিয়ে এসেছিলেন লোক। ভিড় আর ভিড়। তবে খেলা দেখতে কেউ আসেন নি। এসেছিলেন সিনেমার নায়ক-নায়িকাদের দেখতে। কারণ এ-তো খেলা নয়—ছেলেখেলা। তবে কি না উদ্দেশ্যটা ছিল মহৎ। বন্যাত্রাণে অর্থ সংগ্রহই ছিল খেলাটার লক্ষ্য। সেদিকদিয়ে যথেষ্ট সাফল্যলাভ করেছে খেলাটা। অনেক টাকা উঠেছে। এখন এই টাকাটা ঠিকমতো বিতরণ হলে হয়। আর শুধু বিতরণ করা হলেই হবে না—এ বিষয়ে একটু তৎপর হওয়ার দরকার। কারণ যাঁদের লক্ষ্য করে বসছে এতো সব আনন্দ-অনুষ্ঠানের আসর, সময়মত তাঁদের কথাটা ঠিক যেন আর সকলের মনে পড়েও পড়ছে না। তাই আমরা চাই যে, তারকাদের খেলা থেকে যে টাকা পাওয়া গেছে সেই টাকা এখনই বন্যাত্রাণে ঠিকভাবে বিতরণ করা হোক। তা যদি হয় তাহলেই বুঝতে হবে যে ইডেনের ঐ খেলার আসর হয়েছে সার্থক।

খেলার মেলার পরই ইডেনে বসবে সত্যিকারের খেলার আসর। প্রথমে দলীপ ট্রফির খেলা তারপর রাজ্যপাল বনাম প্রধানমন্ত্রী একাদশের মধ্যে প্রদর্শনী খেলা। এই দুটি খেলার প্রথমটা খুব সম্ভব হবে তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতাপূর্ণ আর দ্বিতীয়টায় থাকবে প্রদর্শনী খেলার মেজাজ। সে খেলায় খেলবেন ভারতের নামকরা সব টেস্ট খেলোয়াড়রা আর পুরোন-দিনের কয়েকজন। তাই মনে হয় যে, ঐ খেলাটায় আকর্ষণ উঠবে তুঙ্গে। খুব সম্ভব পতৌদির ওপর পড়বে প্রধানমন্ত্রী একাদশের নেতৃত্বের ভার। রাজ্যপালের দলের অধিনায়ক যে কে হবেন তা এখনও ঠিক হয় নি। যাই হোক শেষ পর্যন্ত যদি এই খেলাটা অনুষ্ঠিত হয় তাহলে এবারের শূন্য ক্রিকেট মরশুমটা আনন্দ-হাসি-গানে অন্তত কিছুটা জমে উঠবে। এর ওপর যদি অতীতের নাম-করা খেলোয়াড়রা ঐ খেলায় যোগদান করেন তাহলে হবে সোনায় সোহাগা। এখনকার নামী খেলোয়াড়দের চেয়ে অতীতের ক্রিকেটারদের খেলা দেখার আকর্ষণ আমাদের কাছে অনেক বেশি। এখনো যদি আমরা দেখতে পাই হাজারেকে লেগ স্টাম্পে বল কভারে ড্রাইভ করতে, মুস্তাক আলীকে প্রথম বলটাই বাউন্ডারী করতে, উমরিগড়কে কব্জির জোরে ব্যাক ফুটে ড্রাইভ করতে, মানকাদকে কব্জি আর আঙুলের কায়দায় বন বন করে লাট্টুর মতো বল ঘোরাতে তাহলে তার-চেয়ে আনন্দের বিষয় আমাদের কাছে আর কি হতে পারে। ক্রিকেট খেলার আনন্দে আমরা যে তখন সত্যিই মেতে উঠবো...। দেখা যাক শেষ পর্যন্ত ইডেনের মাটিতে এ বছর আমরা ওঁদের খেলা দেখার সুযোগ পাই কি না...! —শান্তিপ্রিয়।

ক্রিকেটের খবর

ক্রিকেটের খবর বলতে এখন ওয়েস্ট ইণ্ডিজ-অস্ট্রেলিয়ার খেলার কথাই বোঝায়। কিন্তু পর পর দ্বিতীয় ও তৃতীয় টেস্টে অস্ট্রেলিয়ার হাতে ওয়েস্ট ইণ্ডিজের গো-হারা হার ক্রিকেটরসিকদের ভীষণ অবাক করে দিয়েছে।

প্রথম টেস্টে অস্ট্রেলিয়াকে হারিয়ে দিয়েছিল ওয়েস্ট ইণ্ডিজ। দ্বিতীয় টেস্টে খেলার ফলাফল গেল উল্টে। ইনিংসে হেরে গেলো ওয়েস্ট ইণ্ডিজ! কিন্তু টেস্টের পর তৃতীয় টেস্টে ওয়েস্ট ইণ্ডিজ আবার হেরে গেলো ১০ উইকেটে।

ওয়েস্ট ইণ্ডিজের এই পরাজয় ক্রিকেট-রসিকদের বিস্ময়ে থ করে দিয়েছে। কারণ শুধু পরাজয়ই নয়—কি ব্যাটিং, কি বোলিং কোন বিষয়েই ওয়েস্ট ইণ্ডিজের খেলোয়াড়রা দিতে পারছেন না কৃতিত্বের পরিচয়। বরঞ্চ সে দিক দিয়ে অস্ট্রেলিয়ার খেলোয়াড়রা লাভ করেছেন অনেক বেশি সাফল্য।

এই মরশুমের আর মাত্র দু'টি টেস্ট বাকী আছে। এডিলেডের চতুর্থ আর সিডনির পঞ্চম ও শেষ টেস্টের ওপর এখন নির্ভর করছে ফ্রাঙ্ক ওরেল ট্রফির ভাগ্য।

তৃতীয় টেস্টে টসে জিতে প্রথমে ব্যাটিং করার সুযোগলাভ করেছিল ওয়েস্ট ইণ্ডিজ। কিন্তু তাতে কি হবে। প্রথম ইনিংসে তারা করলো ২৬৪ রান আর দ্বিতীয় ইনিংসে ৩২৪। দু' ইনিংসের মধ্যে একমাত্র বুচার দ্বিতীয় ইনিংসে করেছিলেন সেঞ্চুরী। এ ছাড়া লয়েড, কানহাই আর সোবার্স মোটামুটি খেলেছিলেন।

অস্ট্রেলিয়া প্রথম ইনিংসে করেছিল ৫৪৭ রান। সেঞ্চুরী ছিল একটা—করেছিলেন ওয়ালটারস। আর দ্বিতীয় ইনিংসে কোন উইকেট না হারিয়ে অস্ট্রেলিয়া করেছিল জয়লাভের জন্য প্রয়োজনীয় ৪২ রান।

কিন্তু ওয়েস্ট ইণ্ডিজের হলোটা কি? এভাবে যে ওয়েস্ট ইণ্ডিজ হারবে তা তো কেউ কল্পনাও করতে পারেন নি। ওয়েস্ট ইণ্ডিজের এই শোচনীয় ফলাফল আজ তাই গবেষণার বস্তু। কেন যে ওয়েস্ট ইণ্ডিজের খেলোয়াড়রা খেলতে পারছেন না কে জানে। তবে কি ওয়েস্ট ইণ্ডিজের খেলার মান নেমে গেছে? কে জানে! দেখা যাক শেষ পর্যন্ত বাকী দু'টো টেস্টে ওয়েস্ট ইণ্ডিজ কি করে। কারণ অস্ট্রেলিয়া তো এখনই ২—১ টেস্টে এগিয়ে আছে.....!

সমাচারদর্পণ

শেষ পর্যন্ত ডুরাণ্ড কাপ আর এলো না কলকাতার। ইস্টবেঙ্গল ক্লাব এক গোলে হেরে গেলো বর্ডার সিকিউরিটি ফোর্সের কাছে। বর্ডার সিকিউরিটি ফোর্স মোহনবাগানকে হারিয়ে উঠেছিল ফাইন্যালে আর ইস্টবেঙ্গল উঠেছিল লীডার্সকে হারিয়ে। তাই আশা ছিল যে, ইস্টবেঙ্গল এবার ডুরাণ্ড কাপ পাবে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত সে গুড়ে বালি দিয়ে বর্ডার সিকিউরিটি ফোর্স দল ডুরাণ্ড কাপ জয় করলো ইস্টবেঙ্গলকে হারিয়ে দিয়ে।

নয়াদিল্লীতে অনুষ্ঠিত ডুরাণ্ড কাপ ফুটবল প্রতিযোগিতার সেমি-ফাইন্যালে ইস্টবেঙ্গল দলের গোলরক্ষক থঙ্গরাজ আহত অধিনায়ক শান্ত মিত্রকে কোলে নিয়ে বাইরে যাচ্ছেন। এই খেলায় ইস্টবেঙ্গল ১—০ গোলে লীডার্স ক্লাবকে পরাজিত করে।

সম্পাদিকা—জয়ন্তী সেন
বসুমতী (প্রাঃ) লিঃ-এর পক্ষে ১৬৬, বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী স্ট্রীটস্থ কলিকাতা-১২
বসুমতী প্রেস হইতে শ্রীসুকুমার গুহমজুমদার কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

দুইটি বা তিনটি সন্তানের পরিবারই আদর্শ পরিবার

জেনে রাখুন :

- পরিবারকল্যাণই পরিবার পরিকল্পনা
- যে কোন পরিবার পরিকল্পনাকেন্দ্রেই বিনামূল্যে নিরোধ এবং যাবতীয় পরামর্শ পাওয়া যায়
- হিন্দুস্থান লিভারে উৎপাদিত দ্রব্যাদি যে সব দোকানে বিক্রী হয় সেই সব দোকানে মাত্র ১৫ পয়সায় তিনটি করে নিরোধ কিনতে পাওয়া যায়
- তিনটি সন্তান না হওয়া পর্য্যন্ত নিরোধ ব্যবহার করে দুই সন্তানের জন্মের মধ্যবর্ত্তী সময়ের ব্যবধান বাড়ান সম্ভব
- তিনটি সন্তানলাভের পর স্থায়ীভাবে জন্মনিরোধের জন্যে অস্ত্রোপচারই শ্রেষ্ঠ পদ্ধতি

আজই আপনার নিকটবর্তী যে কোন পরিবার পরিকল্পনাকেন্দ্র বা স্বাস্থ্যকেন্দ্রে যোগাযোগ করে বিনামূল্যে অভিজ্ঞ চিকিৎসকের পরামর্শ নিন।

(পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পরিবার পরিকল্পনা সংস্থা কর্তৃক প্রচারিত)

Thursday, 16th January, 1969 SAPTAHIK BASUMATI Regd. No. C 71
Price : 30 Paise Gram : "Basumati" Phone : 34-7771, 72, 73, 74

17 JAN 1969

বিভিন্ন রুচিবিধি মেয়েদের:

কোথাও কাঁচা
গোটা মশলা
চলে →

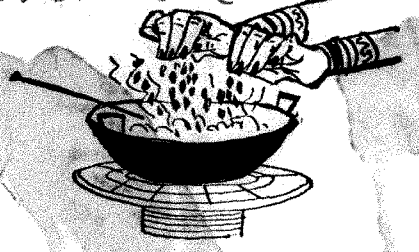

কোথাও চলে
বাটা মশলা →

আরো
দেবো
ঠাকুমা ?

কোথাও
অতিরিক্ত →

ভাইলে
কয় গণ্ডা লঙ্কা দিছ ?

কোথাও
না
নামমাত্র →

ছালন কো
পকায় কে
পকায় কে-বস,
ইত্তি মসালা !

কিন্তু সবার রুচিকেই
কুকমী পরিতৃপ্ত করে !

গ্রাম : "স্পাইসমার্ট" মিল—কাশীপুর

শিশুর খাদ্যে ও রুগীর পথ্যে নির্ভয়ে ব্যবহৃত হয়
'কুকমী'—সর্বাধিক বিক্রীত গুঁড়ো মশলা
পনের লক্ষ প্যাকেট মাসিক বিক্রয়
১২০ বৎসরের অধিক প্রাচীন ও বর্তমানে মশলার বৃহত্তম প্রতিষ্ঠান

কৃষ্ণচন্দ্র দত্ত (স্পাইস) প্রাঃ লিঃ

২৩৫ নং মহর্ষি দেবেন্দ্র রোড, পোস্তা, কলিকাতা-৭

সাপ্তাহিক বসুমতী

"একটা নীতিকে কেন্দ্র করেই আমি বেঁচে ছিলাম, একটা আদর্শের যূপকাষ্ঠেই আমার জীবনকে আমি বলি দিয়েছি, এর চাইতে বড় সান্ত্বনা আর মানুষের কী থাকতে পারে? .....আদর্শের বেদীমূলে নিরুদ্বেগ আত্মবিসর্জন অপেক্ষা জীবনের বৃহত্তর সার্থকতা আর কিছুই নেই—কিছু থাকতে পারে না"।

—সুভাষচন্দ্র

বর্ষ ঃ ৩১শ সংখ্যা, বৃহস্পতিবার, ৯ই মাঘ, ১৩৭৫ বঙ্গাব্দ] OLDEST WEEKLY OF NORTH INDIA [73rd year, No. 31, 23rd Jan. 1969

লাক্স
প্রতিদিন
বোরোলীন ব্যবহার করুন
আপনার শুষ্ক ও বিদীর্ণ ত্বকের অস্বস্তি দূর করবে
এই অ্যান্টিসেপ্টিক সুরভিত ক্রীম।

সূচীপত্র

বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা
সম্পাদকীয়		১৯২৩
আজকের মানুষ		১৯২৪
রবীন্দ্রনাথ ও সুভাষচন্দ্র (ধারাবাহিক প্রবন্ধ)	— শঙ্করীপ্রসাদ বসু	১৯২৫
আন্তর্জাতিক রাজনীতি ও নেতাজী (প্রবন্ধ)	— শ্রীনরেন্দ্রনারায়ণ চক্রবর্তী	১৯৩২
অন্যদর্শন		১৯৩৫
ভারতদর্শন		১৯৩৮
আন্তর্জাতিক		১৯৪১
নিকট-দূরে	— কৌশিক বসু	১৯৪৪
সুভাষচন্দ্রের রাষ্ট্রচিন্তার ভূমিকা (প্রবন্ধ)	— নির্মল বসু	১৯৪৬
কবি মনোমোহন ঘোষ সম্পর্কে কয়েকটি কথা		১৯৪৮
পথ কে রুখবে ? (ধারাবাহিক উপন্যাস)	— মনোজ বসু	১৯৫০
বার্লিনে নেতাজী (প্রবন্ধ)	— অশোক সেন	১৯৫৩
চতুর্থ সাধারণ নির্বাচন : দেশের পট-পরিবর্তন	— পর্যবেক্ষক	১৯৫৫

যে কোন
গয়না
আর
আসল
গহরত্ন
কেনার
দক্ষিণ কোলকাতায়
নামকরা প্রতিষ্ঠান

ফোন : ৪৬-৬২৫৮

সব অ্যাণ্ড গ্র্যাণ্ডসন্স অব লেট
এম. বি. সরকার

এম.সরকার
এণ্ড সন্স

সূচীপত্র

বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা
ইতিহাস-পুরুষ সুভাষচন্দ্র (প্রবন্ধ)	— শিশির দাশ	১৯৫৭
আজকের বিজ্ঞান	— ডঃ বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য	১৯৫৯
শিল্প-বাণিজ্য-অর্থনীতি	— শ্রীসওদাগর	১৯৬২
দাঁড়কাক (গল্প)	— দিলীপকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়	১৯৬৪
প্রতিমা দেবীর প্রতিমা	—ভক্তিপ্রসাদ মল্লিক	১৯৭৬
চিরন্তনী (অনুবাদ কবিতা)	—পল্লব সেনগুপ্ত	১৯৬৮
পাঠকমন		১৯৬৯
লোকসঙ্গীতের একাল না আকাল	— হুরেশিদ	১৯৭২
মুশায়েরা	—	১৯৭৫
খেলাধুলো	—শান্তিপ্রিয়	১৯৮০

—সদ্য প্রকাশিত হইয়াছে।।—

বহুকাল পরে পুনর্মুদ্রণ

"নবীনবাবু বর্ণনা এবং গীতিতে একপ্রকার মন্ত্রসিদ্ধ।..... এই সকল বিষয়ে তাঁহার লিপিপ্রণালীর সঙ্গে বায়রনের লিপি-প্রণালীর বিশেষ সাদৃশ্য দেখা যায়।..... বায়রনের ন্যায় নবীনবাবু বর্ণনায় অত্যন্ত ক্ষমতাশালী।..... নবীনবাবুর যখন স্বদেশ-বাৎসল্য স্রোতঃ উচ্ছলিত হয়, তখন তিনিও রাখিয়া ঢাকিয়া বলিতে জানেন না।"—বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

মহাকবি

নবীনচন্দ্র সেনের গ্রন্থাবলী

রৈবতক কাব্য ।। কুরুক্ষেত্র প্রভাস

গ্রন্থের পৃষ্ঠা সংখ্যা ৩০৮।

মূল্য মাত্র সাত টাকা।০

বসুমতী প্রাইভেট লিমিটেড ঃ ১৬৬, বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী ষ্ট্রীট, কলিকাতা—১২

৭৩ বর্ষ ঃ ৩১শ সংখ্যা—মূল্য ঃ ৩০ পয়সা
বৃহস্পতিবার, ৯ই মাঘ, ১৩৭৫ বঙ্গাব্দ

বাংলা ভাষায় দ্বিতীয় সর্বাধিক প্রচারিত সাপ্তাহিক পত্রিকা

Price : 30 Paise
Thursday, 23rd January, 1969

সুভাষচন্দ্রের জন্মদিনে

আজ নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসুর জন্মদিন। তাই এই দিন আত্মত্যাগের দিন, আমাদের আকাঙ্ক্ষা পূরণের দিন।

নেতাজী বেঁচে আছেন কি না, এ প্রশ্ন অহরহ এখন ওঠে না। কিন্তু জনসাধারণ তাদের চিন্তায় ও চিত্তে নেতাজীকে প্রতিষ্ঠিত করেও তাঁর আবির্ভাব কামনা করে এই কারণে যে, দীর্ঘ একুশ বছর স্বাধীনতা লাভ করেও দেশের যা অবস্থা—তাতে নেতাজীর মতো সর্বত্যাগী অথচ সর্বজনের সার্বিক কল্যাণের জন্য উৎসর্গীকৃতপুরুষই দেশ থেকে দূর করতে পারেন দৈন্য, সাম্প্রদায়িকতার বিদ্বেষ, ভাষার কোন্দল এবং বিদেশের কাছে প্রমাণ করতে পারেন—আমরা ঋণগ্রস্ত নাগরিক নই, সার্বভৌমত্ব রক্ষায় সদা সচেতন আমরা দেশপ্রেমিক স্বাধীন মানুষ। দুই দশক ধরে অর্থনৈতিক বৈষম্যপীড়িত যে দরিদ্র জনসাধারণ এই দেশের ওপর তাদের অধিকার এখনো অনুভব করতে দ্বিধাবোধ করে, নেতাজীর দেশপ্রেমের মহৎ আদর্শে তারাই হবে সম্পূর্ণরূপে দেশসেবক।

একালে দেশসেবক যেন তাঁরাই যাঁরা রাজনীতি করেন আর দল গড়েন। নেতাজীর কাছে রাজনীতির অর্থ ছিল দেশকে ভালোবাসা। তাই দেশের মুক্তি ছিল সেদিন তাঁর জীবনের কাম্য। এবং দেশের একদল লোক, যাঁরা সুভাষচন্দ্রের আদর্শ কি তা উপলব্ধি করতে সক্ষম হন নি, তাঁরাই নিজেদের স্বার্থসিদ্ধির উদ্দেশ্যে তাঁকে লাঞ্ছনা করেছিলেন। হয়তো তাঁদের কেউ কেউ আজ দেশনায়ক হবার বাসনা রাখেন—কিন্তু তাঁদেরই চক্রান্তে যে তাঁকে ত্রিপুরী কংগ্রেস থেকে বিতাড়িত করা হয়েছিল—একথা দেশের সাধারণ মানুষ ভুলে যায় নি, ভুলে যেতে পারে না। কিন্তু সুভাষচন্দ্রকে নিয়ে লাঞ্ছনার শেষ এখানেই নয়। তদানীন্তন দেশনায়কেরা, যাঁরা আপোষনীতিকেই জীবনের পরম পুণ্য বলে মনে করেছিলেন, তাঁদের কাছ থেকে কোনোরকম সমর্থন বা সহানুভূতি পাবার আশা তিনি করেন নি বলেই তাঁকে দেশের স্বাধীনতা অর্জন করার জন্য দেশত্যাগ করতে হয়েছিল। এবং ইতিহাসে একথা রক্তাক্ষরে লিখিত থাকবে যে, তিনিই প্রথম ভারতের সার্বভৌম স্বাধীন রাষ্ট্র গঠন করেছিলেন।

বর্তমান বছরটি অত্যন্ত প্রশ্নসূচক অন্তর্বর্তী নির্বাচনী বছর। সুতরাং নেতাজীর জন্মদিনটিকে উপলক্ষ করে অনেকেই নির্বাচনে লক্ষ্যভেদ করতে চাইবেন। কিন্তু দেশের সাধারণ মানুষ, যারা এই দেশে নেতাজী সম্বন্ধে সরকারের ও নানা দলের নীতি লক্ষ্য করে আসছে, তারা হয়তো কারো কারো মুখে নেতাজীর নাম শুনে আজ বিস্মিত হবে। প্রসঙ্গত, একথা আমরা সবিনয়ে বলতে বাধ্য যে, বিশ বছরে কেন্দ্রীয় সরকার আজাদ হিন্দ সরকারের প্রতিষ্ঠা দিবসের উপর কোনোরকম করুণা প্রদর্শন করেন নি। হঠাৎ গত ২১শে অক্টোবর আজাদ হিন্দ সরকারের রজতজয়ন্তী দিবস উপলক্ষে কেন্দ্রীয় মন্ত্রীরা পশ্চিমবঙ্গে এসে নেতাজীর জয়গান করে গেছেন। অবশ্য স্বর্গত প্রধানমন্ত্রী লালবাহাদুর শাস্ত্রী ছিলেন ভিন্ন ধাতে গড়া মানুষ—তাই একমাত্র তিনিই রেড রোডে নেতাজীর মূর্তি প্রতিষ্ঠার দিনে অহিংসার বুলি না আওড়ে, নেতাজীর বীরত্বকাহিনী শ্রদ্ধা ও গর্বের সঙ্গে উচ্চারণ করেছিলেন। আমরা বলতে চাই, নিজেদের পূর্বতন ভুল-ত্রুটি প্রকাশ্যে কেউ স্বীকার করে যদি নেতাজীর আদর্শকে গ্রহণ করতে এগিয়ে আসেন, জনগণ হয়তো তাঁকে ক্ষমা করতে পারেন, কিন্তু অতীতে অহিংসার নামে নেতাজীর বিরুদ্ধাচরণ করে, আজ যদি কেউ তা গোপন রেখে নেতাজীর জয়গান করেন—তাহলে তাঁর প্রতি ধিক। তেমনি দুঃখজনক, দ্বিমুখী সরকারী নীতিকে। দীর্ঘকাল ধরে, ২৩শে জানুয়ারী দিবসটিকে জাতীয় দিবস হিসেবে গণ্য করে ছুটি ঘোষণার জন্য আবেদন করা হলেও কেন্দ্রীয় সরকার সে কথায় কর্ণপাত করেন নি। এমন কি, ইতিহাসপুরুষ নেতাজীকে সরকারী তত্ত্বাবধানে লিখিত ইতিহাসে যোগ্য মর্যাদা দেওয়া হয় নি বলেও কোনো কোনো প্রখ্যাত ঐতিহাসিকের মধ্যে বিক্ষোভ পুঞ্জীভূত হয়ে আছে।

এতদ্‌সত্ত্বেও বলা নিষ্প্রয়োজন, নেতাজীর আদর্শই সাধারণ মানুষ আজো মনে-প্রাণে কামনা করে। তাঁর শৌর্য-বীর্যের কাহিনী একালের দেশবাসীকে যেমন অনুপ্রাণিত করছে, তেমনি আগামীদিনের যুবচিত্তকেও উদ্দীপিত ও উৎসাহিত করবে। তাই আমরা মনে করি, রাজনীতির কুজ্ঝটিকায় নেতাজীর নাম শুনেই আজ আর জনসাধারণ বিভ্রান্ত হবে না, তারা দেশের বর্তমান বিপাকের মধ্যেও নেতাজীর আত্মত্যাগ ও দেশপ্রেমের আদর্শ গ্রহণ করে দেশের বুক থেকে ভ্রান্তি, মূঢ়তা ও লোলুপতা দূর করবে—এতে কোনো আপোষ নেই, তাতে যে কোনো বিপদই আসুক না কেন।

সম্পাদকীয়

আজকের মানুষ

স্বাগতম।

প্রবেশ-পথে সাদর আহ্বান জানানো এ-লেখাটি দেখলে কার না ইচ্ছে হবে সে-বাড়িতে ঢোকার? দরজার দুদিকে দুই ইয়া বড় বড় শেকল-খোলা এ্যাল-সেশিয়ান দেখতে পেলেও মন তবু আন-চান করে উঠবে ওই আহ্বানে সানন্দ সাড়া দেবার জন্যে। কিন্তু মহাকাশে, পৃথিবী থেকে ১৩০ মাইল ওপর থেকে যদি সুদূরের আহ্বান আসে, তবে মনের ভাবখানা কী হয়? ভ্লাডিমির শাটালভ তাঁর ঘরের সামনে তেমনি একখানা আমন্ত্রণলিপিই সেঁটে দিয়েছিলেন। বিশেষ ধরণের তৈরি মহাজাগতিক বল পেন-এ তিনি তাঁর আজব ঘর সোয়ুজ-৪ মহাকাশ-যানের দরজায় লিখে রেখেছিলেন 'স্বাগতম!' আর তাই দেখে দুই নভশ্চর সোয়ুজ-৫ মহাকাশযান থেকে টুপ্ করে শাটালভের ঘরে ঢুকে পড়েছিলেন।

অদ্ভুত কাণ্ড করলেন চার রুশ নভশ্চারী: ভ্লাডিমির শাটালভ, বোরিস ভলিনভ, আলেক্সি ইয়েলিসিয়েভ এবং ইয়েভগেনি খ্রুনভ। মহাকাশে স্টেশন তৈরির ভিত্ পুজো করে এলেন ধরাতলের চার মানুষ। মঙ্গলবার ভারতীয় সময় দুপুর একটায় লেফটেনান্ট কর্নেল ভ্লাডিমির শাটালভ সোয়ুজ-৪ মহাকাশ-যানে চেপে শূন্যযাত্রা করলেন। তিনি যখন ৮৮ মিনিটে একবার করে ১৫ বার পৃথিবীকে চক্কর দিয়েছেন, তখন একই মহাকাশ-উৎক্ষেপণকেন্দ্র কাজাখস্তানের বৈকানুর থেকে আর একখানা মহাকাশ-যান মহাকাশে উৎক্ষিপ্ত হলো—তার বুকে তিনজন প্রাণী। তিন নভশ্চরকে নিয়ে সোয়ুজ-৫ ধাওয়া করলো সোয়ুজ-৪-কে, শাটালভকে।

রুশ শব্দ সোয়ুজ-এর অর্থ যদি হয় মিলন, তবে দুই সোয়ুজে মিলন হবেই। হলোও তাই। লাখ লাখ সোভিয়েট তরুণ-তরুণী, বৃদ্ধ-বৃদ্ধা, ছেলে-মেয়ে টেলি-ভিসন সেটে অভাবনীয় দৃশ্য দেখতে পেলো। সোয়ুজ-৫ ধীরে ধীরে সোয়ুজ-৪-এর দিকে এগিয়ে চলেছে—মর্তলোকের প্রেমিক যেমন প্রেম নিবেদন করার জন্যে দুরুদুরু বক্ষে প্রেমিকার কাছে যায় তেমনি ঢঙে। প্রেমিকার মন গলাবার

শাটালভ

জন্যে প্রেমিক-প্রবরটির হাতে একগুচ্ছ ফুল ছিলো কি? না, তা অবশ্যি ছিলো না, তবে অন্য কিছু, আরো লোভনীয় কিছু অবশ্যই ছিলো দুই নভশ্চরের সঙ্গে। সখা শাটালভের জন্যে।

দুই মহাকাশযানের মহাশূন্যে মিলনের ঘটনা অবশ্যি এই প্রথম নয়, গত অক্টোবরেই আর দুটো মহাকাশযান সোয়ুজ-২ আর সোয়ুজ-৩ মিলিত হয়েছিল। তবে সেবারকার মিলনে মানুষ ছিলো একটি মহাকাশযানেই, অপরটি ছিলো ফাঁপা। শাটালভেরা তাই এবার রেকর্ড স্থাপন করলেন এ কারণেই, দুই মহাকাশযানের চারজন মানুষ একত্র হলেন। দু বন্ধু মিলিত হলো দীর্ঘ ২৪টি ঘণ্টার অদর্শনের পর, আনন্দে আত্মহারা তাঁরা হবেন নাই বা কেন? তাই দুজনে ঘাঁটিছড়া বেঁধে প্রায় সাড়ে চারঘণ্টা ধরে পৃথিবীর চারদিকে পরমানন্দে নেচে বেড়ালেন। মনুষ্যবাহী দুই মহাকাশযানের সংযুক্তি পৃথিবীতে এই প্রথম। ভারতীয় সময় বৃহস্পতিবার বেলা ১টা ৫০ মিনিট ছিলো মিলনের মাহেন্দ্রক্ষণ, দুই সখার মিলন ঘটলো সেই পরম মুহূর্তে।

আরো তাজ্জব। দুই নভশ্চর খ্রুনভ আর আলেক্সি তাঁদের সোয়ুজ-৫ মহাকাশ-যানের জানলা গলে কুপ করে পড়লেন মহাশূন্যের ভারহীনতার মহাসমুদ্রে। স্বচ্ছন্দ বিচরণ করলেন সেখানে ক্ষণকাল। তারপর দেখতে পেলেন সোয়ুজ-৪-এর দরজায় শাটালভের আঁটা আহ্বানলিপি: 'স্বাগতম'। কালবিলম্ব না করে তাঁরা সটান ঢুকে পড়লেন সোয়ুজ-৪ মহাকাশ-যানে। এ এক বিস্ময়কর, অভূতপূর্ব ঘটনা। এক মহাকাশযান থেকে অন্য মহাকাশযানে চলে যাওয়ার ঘটনা ইতিপূর্বে আর ঘটে নি। শাটালভ এতক্ষণ বিরহী যক্ষের মত নিঃসঙ্গ জীবন কাটাচ্ছিলেন। দু বন্ধু গিয়ে তাঁর সঙ্গে মিলিত হলেন, তাঁর দু হাত ভরে দিলেন মর্তলোক থেকে আগত প্রিয় আত্মীয়ের মহামূল্যবান পত্র। পুনর্মিলন উৎসবকে সাফল্যমণ্ডিত করার উদ্দেশ্যে—না, ভডকা নয়, তিন বন্ধুতে তিন টিউব ফলের রস টানলেন।

উত্তর কাজাখস্তানের পেট্রোপাভলভস্ক-এ ৪১ বছর আগে শাটালভের জন্ম। কাচিনোয় তাঁর স্কুলের পড়া শেষ করে তিনি ১৯৪৯ সালে বিমান বাহিনীতে যোগ দেন। মস্কোর বিমান বাহিনী একাডেমিতে চার বছর শিক্ষাগ্রহণ করার পর তিনি বৈমানিক হিসেবে বিভিন্ন দায়িত্বপূর্ণ পদে কাজ করেছেন। মহাকাশচারীর শিক্ষা নিচ্ছিলেন তিনি '৬৩ সনের গোড়া থেকে।

শাটালভের বুড়ো বাপ-মা এখনো বেঁচে—লেনিনগ্রাদে তাঁরা সরকারী পেন্সন-ভোগী। শাটালভের স্ত্রী মুজি আইয়োনোভা কৃষিবিজ্ঞানের এম-এ; ইনি কৃষি-দপ্তরে চাকরী করেন। শাটালভদের দুই ছেলেমেয়ে—আইগট আর ইয়েলিনা।

রবীন্দ্রনাথ ও সুভাষচন্দ্র

শঙ্করীপ্রসাদ বসু

[পূর্ব-প্রকাশিতের পর]

বন্দেমাতরম্—জনগণমন (২)

জহরলালের বক্তব্য স্বভাবতই বন্দেমাতরমভক্ত ভারতবাসীর বিশেষত বাঙালীর কাছে অশুভ সংকেত এনেছিল। বাংলা দেশে অন্তত কিছু সময়ের জন্য নেহরু-উচ্ছ্বাসে ভাটা পড়েছিল। কংগ্রেসী সংবাদপত্র আনন্দবাজার নেহরু-বন্দনা স্থগিত রেখে ২১ সেপ্টেম্বরের সম্পাদকীয় নিবন্ধে লিখল—

> "সম্প্রতি প্রকাশিত এক পত্রে বন্দেমাতরম সঙ্গীতকে অন্যান্য অনুমোদিত সঙ্গীতের সমশ্রেণীভুক্ত করিয়া পণ্ডিত জহরলালের যে অভিমত প্রকাশিত হইয়াছে, উহাকে আমরা গ্রহণ করিতে পারিতেছি না। বন্দেমাতরম উচ্চারণে গুরু শব্দ আছে বলিয়াই উহা জাতীয় সঙ্গীতের পক্ষে যোগ্য নহে, পণ্ডিতজীর এই মতেরও কোনো মূল্য নাই। পণ্ডিতজী ভুলিয়া গিয়াছেন, জাতীয় সঙ্গীত হুকুমমাফিক তৈয়ারী হয় না, নানা ঘটনা, স্থান, কাল, পাত্রের যোগাযোগে এক-একটা সঙ্গীত জাতীয় সঙ্গীতরূপে চলিয়া যায়।.....
>
> পণ্ডিতজীর মতামত যাহাই হউক, যে-সকল ইংরাজাশ্রিত সাম্প্রদায়িকতাবাদী বন্দেমাতরমের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ জাগাইবার চেষ্টা করিয়াছে, এবং জাতীয়তাবাদীদের হৃদয়ে আঘাত দিবার জন্যই আনন্দমঠের বিরুদ্ধে কলুষ হস্ত প্রসারিত করিয়াছে, বাংলা কংগ্রেসের নেতৃবৃন্দের ঔদাসীন্য পরিত্যাগপূর্বক তাহাদের কৃত অন্যাচারের প্রতিকারের চেষ্টা করিতে হইবে।"

কংগ্রেস সভাপতির মনোভাব যেখানে প্রতিকূল, সেখানে দাবির বাতাস কোনদিকে বইছে সহজেই ধরে নেওয়া যায়। স্মরণ করিয়ে দিতে পারি, ভারতীয় ঐতিহ্যসন্ধী সংস্কৃতি সম্বন্ধে পণ্ডিত জহরলাল তাঁর সুমহৎ ঔদাসীন্য এইকালে নিয়মিত প্রকাশ করে যাচ্ছেন গান্ধীজীর অহিংসা ও সত্যাগ্রহ-সংস্কৃতির আশ্রয়ে থেকে। পণ্ডিত নেহরু তখনো ভারত আবিষ্কার করে ফেলেন নি, সুতরাং ভারতবর্ষীয় সংস্কৃতির বিভিন্ন শিকড়কে উপড়ে ফেলতে পারলে তিনি খুবই খুশি বোধ করেন, 'বিশেষত বাংলা দেশের রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত ব্যাপার সম্বন্ধে তাঁর বিতৃষ্ণার যখন সীমা নেই।' পণ্ডিত নেহরু তাঁর ধারণার পক্ষে লোক সংগ্রহে নিশ্চয় সমর্থ, সেহেতু অবশ্যই তাঁর জনপ্রিয়তা আছে, এবং যেহেতু তিনি ব্যস্ত কর্মী, তাই অবিলম্বে নিজ ধারণাকে কার্যকরী করতে উদ্যোগী, যদি না সেই কার্য কোনো প্রতিষ্ঠিত স্বার্থকে বিশেষভাবে নাড়া দেয়। বন্দেমাতরমের পক্ষে সেন্টিমেন্ট তো ভাবের ব্যাপার, তার সঙ্গে মস্তিষ্কাদি ব্যাপারের কোনো সম্পর্ক নেই।

বন্দেমাতরম প্রশ্নে বাংলা দেশ অতিশয় বিক্ষুব্ধ হয়েছিল। বহু বক্তৃতায়, লেখায় সেই অন্তর্জ্বালা প্রকাশ পায়। আন্দোলনের চেষ্টাও হয়েছিল, যদিও তা ব্যাপক হয় নি। না হবার কারণ এই নয়, বাঙালীর অভিযোগ কম ছিল, আসল কথা, তখন নতুন করে আন্দোলন সৃষ্টির ক্ষমতা বাংলা দেশের নেই; নিয়মতান্ত্রিক আন্দোলনের পথ সে পরিহার করেছে, অপরদিকে বেনিয়মের আন্দোলনের অনৌচিত্যকে তার বিপ্লবী সন্তানেরা মেনে নিয়েছে। তাছাড়া জাতীয় সঙ্গীতের প্রশ্নে তো খুন-জখম করা চলে না! এবং যদি ভারতের অপর অংশের দেশপ্রেমিকেরা বাংলার প্রেরণায় চালিত হয়েও পরবর্তীকালে ঋণ স্বীকারে অনিচ্ছুক হয়, তাহলে সেই অকৃতজ্ঞতার বিরুদ্ধে মৌলিক অভিযোগের বেশি কিছু করার কী আছে? বাংলা দেশ সত্যই কিছু করতে পারত যদি সে ফাঁসির বা দ্বীপান্তরের দেশপ্রেমিক সংখ্যায় কিছু কম সরবরাহ করে আবেদনপত্রের বেশি মাথা নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটিতে পাঠাতে পারত।

বন্দেমাতরম বাংলা ও ভারতের রাজনৈতিক জীবনে যতখানি স্থান অধিকার করেছিল, সেই পরিবেশের সঙ্গে

কিছুটা পরিচিত না হলে কারো পক্ষে সম্পূর্ণ বোঝা সম্ভব নয়। স্বাধীনতাপূর্বকালের কিছু স্মৃতি আমার আছে। বন্দেমাতরম সঙ্গীত কিভাবে সমস্ত চেতনাকে শিহরিত করে তুলত, তা এখনো স্মরণ করতে পারি। স্বাধীনতার পূর্বে বা পরে নানাপ্রকার দেশাত্মবোধক সঙ্গীত শুনবার সৌভাগ্য আমাদের হয়েছে, কিন্তু বন্দেমাতরমের মধ্যে যে শক্তির স্পর্শ অনুভব করেছি, সে শক্তি অন্য কোনো সঙ্গীতে পাই নি, একথা দ্বিধাহীনচিত্তে বলতে পারি। মৃত মানুষকেও জাগাতে পারত সেই সঙ্গীত, জাগিয়েছিল, তাকে ভয় ত বর্জন করে আমরা মৃত্যুর অধিকার অর্জন করেছি।

বন্দেমাতরমের ইতিহাসের মধ্যে সংক্ষেপে প্রবেশ করা যাক। সঙ্গীতটি, আগেই বলা হয়েছে, আনন্দমঠের অন্তর্ভুক্ত হলেও স্বতন্ত্রভাবে রচিত হয়েছিল। এ বিষয়ে ললিতচন্দ্র মিত্র ১২৯৭ সালের সাহিত্য-পত্রিকায় লেখেন—"বন্দেমাতরম রচিত হইবার পরে বঙ্কিমচন্দ্রের গৃহে তদানীন্তন সুকণ্ঠগায়ক ভাটপাড়ার স্বর্গীয় যদুনাথ ভট্টাচার্য মহাশয় ইহাকে সুর-তাল সংযুক্ত করিয়া প্রথম গাহিয়াছিলেন। সেইদিন বিখ্যাত বঙ্গদর্শন পত্রিকার কার্যাধ্যক্ষ পণ্ডিত শ্রীযুক্ত রামচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের কিসে বঙ্গদর্শনের পুষ্ঠা সত্বর পূরিত হয়, সেইদিকেই লক্ষ্য ছিল। তিনি বঙ্কিমচন্দ্রকে বলিয়াছিলেন, গান যাহাই হউক, বন্দেমাতরম দ্বারা বঙ্গদর্শনের পেট ভরিবে না; আপনি একখানা উপন্যাস লিখিতে আরম্ভ করুন। তদুত্তরে বঙ্কিমচন্দ্র বলিয়াছিলেন, এগানের মর্ম তোমরা এখন বুঝিতে পারিবে না; যদি পঁচিশ বৎসর জীবিত থাক তখন দেখিবে—এইগানে বঙ্গদেশ মাতিয়া উঠিবে।" *

বঙ্গদর্শনে আনন্দমঠ ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয়েছিল চৈত্র ১২৮৭—জ্যৈষ্ঠ ১২৮৯। 'শেষোক্ত সালেই, ইং ১৮৮২ সনে আনন্দমঠ পুস্তকাকারে বাহির হয়।'১ বঙ্গদর্শনে প্রকাশকালেই বাঙালী নিশ্চয় বন্দেমাতরম সঙ্গীতটি লক্ষ্য করেছিলেন। বঙ্কিমের জীবিতকালে আনন্দমঠের পাঁচটি সংস্করণ হয়। আনন্দমঠের সঙ্গে সঙ্গে এই সঙ্গীতটিও স্বতন্ত্রভাবে পঠিত হয়েছিল ধরে নিতে পারি। কিন্তু আমাদের জাতীয় জীবনে অর্থাৎ জাতীয় আন্দোলনে এই সঙ্গীতটি ঠিক কোন্ সময় থেকে গুরুত্বলাভ করতে আরম্ভ করে, তার ইতিহাস আমাদের কাছে স্পষ্ট নয়।২ ১৯০৫ সালে বঙ্গবিভাগের প্রতিরোধে যে স্বদেশী আন্দোলন হয়, সেই আন্দোলনকালেই বন্দেমাতরম সংগীত ব্যাপক জনপ্রিয়তা লাভ করে তাতে সন্দেহ নেই, কিন্তু তার অনেক আগে থেকেই গানটি জাতীয় জীবনে প্রবেশ করেছে। কংগ্রেসের কলকাতা অধিবেশনে বন্দেমাতরম প্রথম গীত হয় ১৮৯৬ সালে। বঙ্কিমের মৃত্যুর দু' বৎসর পরে অনুষ্ঠিত এই কংগ্রেসে রবীন্দ্রনাথ নিজে সুর দিয়ে গানটি গেয়েছিলেন অন্য গায়কদের সঙ্গে সমবেতভাবে। গানটির গুরুত্ব ক্রমেই স্বীকৃত হতে থাকে, বঙ্গভঙ্গের পরে স্বদেশী আন্দোলনে এটি রণধ্বনি হয়ে দাঁড়ায়।

সত্যই রণধ্বনি হয়েছিল। বন্দেমাতরম মিশে গিয়েছিল রক্তের সঙ্গে, আক্ষরিকভাবে। সে এক অপূর্ব ইতিহাস, ১৯০৬ সালের বরিশাল প্রাদেশিক সম্মেলনের সময়ে যা রচিত হয়েছিল, তার কথা সুরেন্দ্রনাথের বর্ণনা থেকে উদ্ধৃত করছি। প্রসঙ্গত বলে নিই, এর আগে বাংলা দেশ বিভক্ত হয়েছে, পূর্ববঙ্গের প্রথম লেফটেন্যান্ট গভর্নর বমফিল্ড ফুলারের নির্দেশে সেখানকার চীফ সেক্রেটারী এক সার্কুলার জারি করেছেন, যার দ্বারা প্রকাশ্য পথে বন্দেমাতরম ধ্বনি নিষিদ্ধ। এই পরিস্থিতির মধ্যে বরিশাল সম্মেলন হচ্ছে। সুরেন্দ্রনাথ লিখেছেন—

> "সম্মেলনের কয়েকদিন আগে কিছু বন্ধুর সঙ্গে আমি ঢাকায় গিয়েছিলাম।.....সেখানকার কাজ শেষ হলে আমরা ঢাকা থেকে বরিশালে স্টিমারে যাত্রা করলাম। সন্ধ্যায় সেখানে পৌঁছে দেখি কলকাতা ও অন্যান্য স্থানের প্রতিনিধিরা ইতিমধ্যেই এসে গেছেন, কিন্তু নামেন নি, আমাদের আগমন প্রতীক্ষা করে স্টিমারেই আছেন। কয়েকটি গুরুতর প্রশ্ন দেখা গেছে, অবতরণের আগে আমার সঙ্গে তাঁরা সে বিষয়ে পরামর্শ করে নিতে চান। বরিশালের পথে বন্দেমাতরম ধ্বনি নিষিদ্ধ করে দেওয়া হয়েছে, পূর্ববঙ্গের সমস্ত শহরেও তাই। আমাদের মতে আদেশটি বেআইনি, সে সম্বন্ধে আমরা উপযুক্ত আইনগত পরামর্শও নিয়েছিলাম। এক্ষেত্রে আমরা কি স্বেচ্ছাচারী কর্তৃপক্ষের বেআইনি নির্দেশের কাছে মাথা নত করব? আমাদের আত্মমর্যাদায় বাধল। কিন্তু বরিশালের নেতারা কর্তৃপক্ষের সঙ্গে ইতিমধ্যে একটা বোঝাপড়া করে ফেলেছিলেন—প্রতিনিধিদের অভ্যর্থনা জানাবার সময়ে তাঁরা প্রকাশ্য

---

* ২৪ অক্টোবর, ১৯০৭, আনন্দবাজার থেকে উদ্ধৃত।

১ বঙ্কিম রচনাবলী, ১ম, শ্রীযোগেশচন্দ্র বাগলের ভূমিকা।

২ জাতীয় ধ্বনিরূপে বন্দেমাতরমের ব্যবহার সম্বন্ধে রবীন্দ্র-জীবনীকার একটি মূল্যবান টীকা দিয়েছেন—

"১৮৯০ সালে যোগেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ ম্যাটসিনী ও গ্যারিবল্ডীর জীবনচরিত লেখেন। গ্যারিবল্ডীর জীবনবৃত্তের 'উদ্বোধনা'র উপসংহারে তিনি লিখিয়াছিলেন, "সকলে গগন বিদারিয়া গাও বন্দেমাতরম্, বন্দে হরিচরণারবিন্দম্। স্বদেশানুরাগ ভগবদ্ভক্তির সহিত মিশ্রিত হইয়া নবযুগের উৎপত্তি করুক।" আমাদের মনে হয়, বাংলা ভাষায় আনন্দমঠের বাহিরে বন্দেমাতরমকে জাতীয় ধ্বনিরূপে স্বীকৃতি এই প্রথম। আনন্দমঠ গ্রন্থাকারে মুদ্রিত হয় ১২৮৯ পৌষ (১৮৮০)।" (র, জী, ৪র্থ, ১০১)

পক্ষে বন্দেমাতরম্ ধ্বনি তুলবেন না। এই চুক্তি কি আমরা মানতে বাধ্য? প্রতিনিধিদের মধ্যে তরুণরা উগ্র দল চুক্তি সত্ত্বেও বন্দেমাতরম্ ধ্বনি তুলতে চাইল। আলোচনার মধ্য দিয়ে সকলের পক্ষে গ্রহণযোগ্য সিদ্ধান্তে আসা গেল। আমরা যেহেতু বরিশালের অতিথি, আমাদের পক্ষে এমন কিছু করা উচিত হবে না যাতে তাঁদের বিপাকে পড়তে হয়। কর্তৃপক্ষের সঙ্গে তাঁদের চুক্তিক্রমে মর্যাদা দেবার কিন্তু একই সঙ্গে, প্রকাশ্য পথে বন্দেমাতরম্ ধ্বনি তোলার বিষয়ে। পূর্ববঙ্গ সরকারের স্বেচ্ছাচারী নির্দেশের বিরুদ্ধে আইনগত অধিকার প্রতিষ্ঠার অধিকারও প্রতিনিধিদের আছে। বরিশালের নেতাদের সঙ্গে শাসনকর্তাদের চুক্তি—প্রতিনিধিদের অভ্যর্থনাকালে বন্দেমাতরম্ ধ্বনি দেওয়া হবে না, কিন্তু তার বাইরে চুক্তি বিস্তৃত নয়। সুতরাং দ্বিতীয়ের বসে তাঁদের পূর্ণ সম্মতিতে স্থির হল, বরিশাল নেতাদের সঙ্গে দেখা করে আমরা মানব কিন্তু সম্মেলন চলা কালে সর্বাবস্থায় আমরা বন্দেমাতরম ধ্বনি তুলব। ধ্বনি নিষিদ্ধ করার যে কোনো আদেশ জারি করা হয়েছে, তা যেন আমরা মানিই না। এইমত স্থির হওয়ার পরে সন্ধ্যায় প্রতিনিধিরা অবতরণ করলেন।

১৪ই এপ্রিল শনিবার প্রাদেশিক সম্মেলন হবে। সেদিন সকালে শ্রীবিহারীলাল রায়ের বাড়িতে যেখানে আমি ছিলাম, সকলে আলোচনার জন্য সমবেত হলেন। সকল নেতৃস্থানীয় প্রতিনিধিই উপস্থিত।.....স্থির হল, প্রতিনিধিরা রাজার হাভেলীতে সমবেত হয়ে প্রাদেশিক সম্মেলনের সভাস্থলে যাত্রা করবেন, পথে বন্দেমাতরম ধ্বনি দিতে দিতে যাবেন। পুলিশ বাধা দিতে পারে, এমন কি বলপ্রয়োগও করতে পারে সে আশঙ্কা সত্ত্বেও কঠোরভাবে জানানো হল, কোনোক্ষেত্রেই প্রতিনিধিরা প্রতিশোধ নেবেন না, কোনো লাঠি নিয়ে তাঁরা যাবেন না, এমনকি হাঁটবার ছড়িও নয়।

দুপুর দুটোয় সময়ে শোভাযাত্রা আরম্ভের কথা। তার আধ ঘণ্টা আগে আমি সেখানে গেলাম। যথাসময়ে সজ্জিত শোভাযাত্রা চলতে শুরু করল। সভাপতি মিঃ এ রসুলকে তাঁর ইংরাজ পত্নী একটি গাড়িতে করে শোভাযাত্রার অগ্রে রইলেন। তারপরেই প্রথম সারিতে আমরা ছিলাম—অমৃতবাজার পত্রিকার সম্পাদক বাবু মতিলাল ঘোষ, বাবু ভূপেন্দ্রনাথ বসু এবং আমি। তরুণদল পিছনে রইল। বিরাট পুলিশবাহিনী দেখা গেল। তারা রেগুলেশন লাঠিতে সজ্জিত। পুলিশের একজন এ্যাসিস্ট্যান্ট সুপারিনটেনডেন্ট ঘোড়ার পিঠে। কিন্তু এহেন শক্তির খেলা দেখাবার কোনো কারণই ছিল না। মনে হল একেবারেই অপ্রয়োজনীয় আয়োজন, দুর্বোধ্য ব্যবস্থা, যদিও পরবর্তী ঘটনার আলোকে ব্যাপারটার ব্যাখ্যা পাওয়া যায়।

আমাদের উপর কোনো আক্রমণ করা হল না, আমরা এগিয়ে গেলাম। কিন্তু যখন তরুণ প্রতিনিধিরা, অ্যাংলো-সাকুলার সোসাইটির সভ্যরা হাভেলী থেকে বেরিয়ে সদর রাস্তায় পড়ল, তখন পুলিশের সমস্ত মতলব খুলে গেল—শুরু হল আক্রমণ। রেগুলেশন লাঠি (বেশ মোটা ৬ ফুট লম্বা লাঠি) দিয়ে পেটানো হল, বন্দেমাতরম্ ব্যাজ কেড়ে নেওয়া হল। কয়েকজন প্রচণ্ড আঘাত পেলেন, তার মধ্যে সুপরিচিত স্বদেশী কর্মী ও বক্তা বাবু মনোরঞ্জন গুহের (এঁকে পরে দ্বীপান্তরে পাঠানো হয়) পুত্র চিত্তরঞ্জন গুহ ছিল—তাকে মেরে পুকুরে ফেলে দেওয়া হল, যদি না সেখান থেকে তাকে উদ্ধার করে আনা হত, তাহলে নিশ্চিত সলিল সমাধি ঘটত।

এই তরুণের দলে কোনো দোষই করে নি, এমন কি মার খাওয়ার আগে পর্যন্ত পূর্ববঙ্গ সরকারের কাছে জয়লাভের শব্দ, বন্দেমাতরম পর্যন্ত উচ্চারণ করে নি। তাদের একমাত্র অপরাধ তারা রাজপথে কারো চোখানো অসুবিধা না ঘটিয়ে শোভাযাত্রা করে যাচ্ছিল। আক্রান্ত হবার পরেই তারা সোৎসাহে বন্দেমাতরম ধ্বনি তুলেছিল আকাশবাতাসে তাই প্রতিধ্বনি বেজেছিল। যে আক্রমণ চালানো হয়েছিল, তার থেকে অকারণ যথেচ্ছ আক্রমণ সম্ভব নয়। শোভাযাত্রীরা যদি সত্যই কোনো আইনভঙ্গ করে থাকে, তাদের গ্রেপ্তার করা চলত, যদি শোভাযাত্রা অবাঞ্ছিত মনে হয় তা ভেঙে দেওয়া যেত। কিন্তু কর্তৃপক্ষের সেটা মনঃপূত ছিল না, এবং এরূপ দ্বিধাহীনভাবে বলতে পারি সমসাময়িক অভিমতও তাই ছিল—পূর্বাহ্নে প্রস্তুত পরিকল্পনা অনুযায়ী কাজ করা হয়েছিল; পূর্ববঙ্গে পরে ধারাবাহিকভাবে যে সন্ত্রাসের রাজত্ব চালানো হবে, বর্তমান কাজটি তারই অংশ; উদ্দেশ্য—বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনকে চূর্ণ করে দেওয়া। কিন্তু বৃথা আশা। নিপীড়ন এখানে ব্যর্থ হল, যেমন অন্যত্রও হয়েছিল।...

এই সমস্ত ঘটনা যখন চলেছে তখন আমরা পুলিশের অসাধু কর্ম সম্বন্ধে অনবহিত থেকে পরমানন্দে এগিয়ে চলেছি। কলকাতার একজন প্রতিনিধি, শ্রীযুক্ত ললিতমোহন ঘোষাল, দু হাত তুলে দৌড়ে এসে বললেন—"কি করছেন! আর এগোবেন না; পিছনে অন্য প্রতিনিধিদের ধরে পুলিশ মারছে।" তৎক্ষণাৎ আমি ঘুরে দাঁড়ালাম, সেই সঙ্গে বাবু মতিলাল ঘোষও আরও দু-একজন। ঘটনাস্থলের দিকে যখন যাচ্ছি, পুলিশ সুপারিনটেনডেন্ট মিঃ কেম্প-এর সঙ্গে দেখা। তাঁকে বললাম, "আমাদের লোকজনকে এভাবে মারছেন কেন? যদি তারা কিছু করে থাকে তার জন্য আমি দায়ী, আমাকে শাস্তি দিন; যদি চান গ্রেপ্তার করুন।" "মহাশয়, আপনি এখন বন্দী", ঘুরিতে তিনি উত্তর দিলেন। শ্রীযুক্ত মতিলাল ঘোষ এগিয়ে এসে বললেন, "আমাকেও গ্রেপ্তার করুন।" মিঃ কেম্প উত্তর দিলেন, "মিঃ ব্যানার্জিকেই গ্রেপ্তার করার নির্দেশ আছে।" স্পষ্টই বোঝা গেল, আমার গ্রেপ্তারও পূর্বনির্ধারিত।..

আমার গ্রেপ্তারের সঙ্গে সঙ্গে ঘটনার এই অধ্যায়ের

সমাপ্তি। আমি এখন পুলিশের তত্ত্বাবধানে। নিকটবর্তী শ্রীযুক্ত ভূপেন্দ্রনাথ বসুর দিকে ফিরে বললাম, "আপনারা আমাকে বাদ দিয়েই সম্মেলনের কাজ চালিয়ে যান। সম্মেলন যেন স্থগিত বা বন্ধ না হয়।" আমার নির্দেশ সযত্নে পালন করা হয়েছিল। সেখানে প্রবল উত্তেজনা, ঘৃণা ও ক্ষোভ, তা সত্ত্বেও সম্মেলনের পূর্বনির্ধারিত কাজ চালিয়ে যাওয়া হয়, যেন কিছুই হয় নি এইভাবে।.....

[সুরেন্দ্রনাথকে আদালতে নিয়ে গিয়ে ফাইন করা হয়। তিনি ফাইন দিয়ে দেন। তারপরে—]

সম্মেলনে যখন বন্ধুগণসহ প্রবেশ করলাম তখন সে এক অভূতপূর্ব দৃশ্য। সভাস্থ সকলে উৎক্ষণাৎ দণ্ডায়মান—যত জোরে সম্ভব ধ্বনি তুলল—বন্দেমাতরম্। কয়েক মিনিট সভার কাজ স্থগিত রইল, আমরা মঞ্চে উঠে বসবার পরে আবার কাজ আরম্ভ হল।.....

এই সময়ে মঞ্চে এসে হাজির হলেন বাবু মনোরঞ্জন গুহ, সঙ্গে মাথায় ব্যাণ্ডেজ-বাঁধা তাঁর পুত্র চিত্তরঞ্জন গুহ, প্রতিনিধিদের তিনি বলতে এসেছেন এই বালকটির উপর পুলিশ কী অত্যাচার করেছে। আমাদের মাতৃভাষার শক্তিকে অপূর্বভাবে আকর্ষণ করে অননুকরণীয় ভঙ্গিতে পুত্রের উপর নিষ্ঠুর আক্রমণের কাহিনী পিতা বলে গেলেন, একেবারে স্তব্ধ হয়ে সকলে শুনল। পুলিশ রেগুলেশন লাঠি নিয়ে বালককে আক্রমণ করে এক ভরা পুকুরে ফেলে দেয়; তার অসহায় অবস্থা, তবু আক্রমণ চলতে থাকে, কোনো প্রতিরোধই সে করে নি, লাঠির প্রতিটি আঘাতের সঙ্গে বন্দেমাতরম বলেছে উচ্চৈস্বরে। বিনা প্রতিরোধে, বিনা প্রশ্নে পাশব বলের সম্মুখীন হবার এ এক আশ্চর্য প্রয়াস। মঞ্চে দণ্ডায়মান পিতা ও পুত্র—কাহিনী বলে যাচ্ছেন পিতা, পুত্রের সর্বাঙ্গে হিংস্র অত্যাচারের জাজ্বল্যমান সাক্ষ্যচিহ্ন—সে এক অবিস্মরণীয় দৃশ্য।....."

এই ঘটনার প্রতিক্রিয়া হয়েছিল, তা বর্ণনার প্রয়োজন এখানে নেই। এইটুকু বললেই যথেষ্ট হবে, ভারতভূমিতে এই ঘটনাটি সম্ভবত নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধের প্রথম উল্লেখযোগ্য দৃষ্টান্ত। রক্তমূল্যে সেদিন বাঙালী বন্দেমাতরম ধ্বনির মর্যাদা রক্ষা করেছিল, কারণ তার মনে হয়েছিল, বঙ্গভঙ্গ মাতৃহত্যার তুল্য, এবং তার প্রতিরোধে এই মন্ত্রই উচ্চার্য। ১৯৩৭ সালে দ্বিতীয় বঙ্গভঙ্গের ছায়া যখন অলক্ষ্যে ঘনিয়েছে, তখন তার বিরুদ্ধে কংগ্রেসের কোনো আহ্বান ছিল না, দেশবিভাগকে কংগ্রেস নেতারা অতখানি নৈতিক বা আধ্যাত্মিক দৃষ্টিতে দেখতে প্রস্তুত ছিলেন না, তাঁরা ব্যবহারিক সুখ-সুবিধা নিয়েই ব্যস্ত ছিলেন—বৃদ্ধ নেতারা ব্যস্ত ছিলেন একটি পায়া বাদ দিয়ে তেপায়া সিংহাসনে আরোহণ করতে।

বরিশাল ঘটনার অভিনন্দন চিত্তরঞ্জন গুহ ১৯৩৭ সালে দরিদ্র বৃদ্ধ, তিনি দুঃখীর অন্ধকার কুটীর থেকে বেরিয়ে এসে বিবৃতি দিলেন, ইতিহাসের ক্রন্দন শোনা গেল তাঁর কণ্ঠে। তাঁর বিবৃতির বিষয়বস্তু আগে অনেকটা বলে নেওয়া হলেও ইতিহাসের প্রয়োজনে মূল বিবৃতি উদ্ধৃত করছি—পাঠকগণ অপ্রয়োজনবোধে অংশটি পরিহার করতে পারেন।

"Bande Mataram—It is a great mantra of every Indian. There is no malice in it.

I have been highly delighted to read the article Bande Mataram of Sj. Khitish Chandra Das Gupta that appeared in the Calcutta papers. Bande Mataram is the song of adoration of our Motherland and as such it is the national song of every Indian, whether Hindu, Mahomedan or Christian or any other community. An Indian who does not feel it to be a great Mantra does not know the real mantra of the worship of our dear Motherland...Mr. Das Gupta has mentioned about the Barisal Conference incident of 1906 in which we defied the Government circular prohibiting shouting of Bande Mataram in the public street of Barisal. Hundreds of Gurkha soldiers with rifles and hundreds of police constables with regulation lathis stood on the road near Raja Bahadur's 'Hoveli' from where we started shouting Bande Mataram and it was declared that anybody shouting Bande Mataram flouting the Government Order would be shot dead at once. In spite of this declaration when my most revered father the late Monoranjan Guha Thakurta said to me, 'It is my earnest desire that you defy this unjust Order of the Government and shout Bande Mataram in the street." His burning patriotism put in me a great strength. So great was his love for the Motherland that he not in the least hesitated to send his son, who was dearer than his own life, to the clutches of death

in order to uphold the honour of the Great Mantra Bande Mataram. When I first shouted Bande Mataram I was quite ready to be shot dead by the Gurkhas but instead of that lathies after lathies began to fall on my body like hailstones. The police constables began to belabour me most mercifully with regulation lathies. As soon as I shouted Bande Mataram, I felt a great power passing through my veins. The shower of lathi blows that fell on every part of my body seemed to me to be the blessing of my Motherland. Though my body was flooded with blood and though a part of the pond into which I was thrown became red with blood, the severe physical sufferings could not demoralise me—so great was the force of the Mantra—Bande Mataram. The more the constables belaboured me and bade 'stop stop', I shouted Bande Mataram loudly and with more vigour due to the influence of this great Mantra. Another noble immotion arose in my mind. I felt no anger against those that were most cruelly belabouring me. I had so much bodily strength in me then that I could easily snatch a lathi and beat down several constables to the ground but not even for a moment did I feel inclined to do so. It was the great Mantra that kept my mind free from malice or anger. The spirit of non-violence prevailed in my mind all along, although I was most inhumanly beanten..." *

জাতীয় আন্দোলনে আনন্দমঠ ও বন্দেমাতরমের ভূমিকা সম্বন্ধে প্রচুর কথা লেখা যায়। এখানে তার প্রয়োজন নেই। কেবল ডঃ বিমানবিহারী মজুমদার এ বিষয়ে মূল কথা যা লিখেছেন উদ্ধৃত করছি—

"Bankim Chandra Chatterjee's *Ananda Math* is as an epoch-making work as Roussean's *Social Contract and* Karl Marx's *Das Capital*.* The Secret Societies', writes Lord Ronaldsay, 'modelled themselves closely upon the society of the children of Ananda Math. Bande Mataram, the battle cry of the *Children* became the war cry, not only the revolutionary societies, but the whole of nationalist Bengal.' "

যে ইতিহাসের খণ্ডাংশ উপস্থিত করলাম, তাকে মনে রাখলে বুঝতে পারা যাবে জাতীয়তাবাদী বাঙালীর কাছে বন্দেমাতরম সঙ্গীত বিষয়ে কংগ্রেসের পুনর্বিবেচনার কথাটা কতখানি বেদনাদায়ক ঠেকেছিল; মনে হয়েছিল, এটা বিশ্বাসঘাতন ছাড়া কিছু নয়। এই উপলক্ষে একটা আন্দোলন গড়ে ওঠে, বহু দেশপ্রেমিক বুদ্ধিজীবী তাতে যোগ দেন। জাতীয়তাবাদী সংবাদপত্রগুলির ভূমিকা এক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ। বিশেষ শ্রদ্ধার সঙ্গে রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের নাম স্মরণ করছি, কারণ বুদ্ধিজীবীদের প্রতিবাদের নেতৃত্ব তিনিই নিয়েছিলেন।১ এইকালের দৈনিকপত্র ও অন্য সাময়িকপত্রসমূহ এই বিষয়ক রচনায় পূর্ণ।২ প্রচারপদ্ধতি হিসেবে একদিকে বন্দেমাতরমকে

---

* চিত্তরঞ্জন গুহঠাকুরতা ১ নভেম্বরে অমৃতবাজারে প্রকাশিত আর একটি বিবৃতিতে পিতার প্রতি শ্রদ্ধা জানান।

*ডঃ মজুমদারের কথা আংশিকভাবে গ্রাহ্য। 'সোস্যাল কনট্রাক্ট' বা 'দাস ক্যাপিটালের' মত আনন্দমঠ ইতিহাস সৃষ্টি করেছিল সন্দেহ নেই, কিন্তু পূর্বোক্ত গ্রন্থ দুটির প্রভাব দেশসীমা অতিক্রম করেছে, বিশেষত ক্যাপিটালের প্রভাব, যা আনন্দমঠ সম্বন্ধে বলা যায় না।

১ প্রবাসীতে ও মডার্ন রিভিউয়ে রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় এ ব্যাপারে অনেক লেখা লেখেন, সেগুলি অন্যান্য সাময়িকপত্রে উদ্ধৃত হয়েছিল। প্রবাসীতে ১৩৪৪ সালের আষাঢ় মাসে 'পদ্মফুলের ছবি ও শ্রী' এবং 'শ্রী' এই দুটি টীকা, ভাদ্র মাসে 'বঙ্গের বাহিরে বন্দেমাতরম্', বঙ্গে গন্ধে কাতরম্', আশ্বিন মাসে 'আবার শ্রী ও সরোজ', কার্তিক মাসে 'পদ্ম ও শ্রী' এবং 'আনন্দমঠ দাহন', অগ্রহায়ণ মাসে 'আনন্দমঠ ও রাজসিংহ', 'বন্দেমাতরম্', ফাল্গুন মাসে 'বন্দেমাতরম্ সঙ্গীতের অঙ্গচ্ছেদ' প্রভৃতি সম্পাদকীয় রচনা প্রকাশিত হয়।

২ আনন্দবাজার, অমৃতবাজার, হিন্দুস্থান স্ট্যাণ্ডার্ড প্রভৃতি পত্রিকায় অনেক প্রবন্ধ, ভাষণ বিবৃতি প্রকাশিত হয়েছে এইকালে। হিন্দুস্থান স্ট্যাণ্ডার্ডে (অমৃতবাজারেও) বন্দেমাতরমের অনেকগুলি সুন্দর ইংরাজী অনুবাদ বেরিয়েছিল। হিন্দুস্থান স্ট্যাণ্ডার্ডে ১ অক্টোবর বন্দেমাতরম্ পত্রিকার ইতিহাস, ২০ অক্টোবর বঙ্কিম সম্বন্ধে অরবিন্দের রচনা, ২১ অক্টোবর বন্দেমাতরম্ সম্বন্ধে বিপিনচন্দ্র পাল, ২২ অক্টোবর বন্দেমাতরম্ সম্বন্ধে নিবারণ

কেন্দ্র করে যে ঐতিহ্য গড়ে উঠেছিল, তার স্মৃতির অনুধ্যান করা হয়, অন্যদিকে বন্দেমাতরম-বিরোধী যুক্তি সকলকেও খণ্ডনের চেষ্টা করা হয়। সেই সঙ্গে বাংলা ছিন্ন অন্য প্রদেশে বন্দেমাতরমের প্রতি অনুরাগের নমুনাও দেওয়া হয়। এই সূত্রে তিলক বা গান্ধীর বন্দেমাতরম-ভক্তির উল্লেখ করা হয়েছিল। কোনো কোনো ভদ্র ইউরোপীয় কিভাবে বন্দেমাতরমের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়েছিলেন, তাও জানানো হয়েছিল। যেমন স্যার হেনরী কটন বন্দেমাতরম সম্বন্ধে ভ্রান্ত ধারণা দূর করতে এগিয়ে এসেছিলেন।*১ কিংবা মিঃ মন্টেগু ভূপেন্দ্রনাথ বসুর বাড়িতে বন্দেমাতরম শুনে উঠে দাঁড়িয়েছিলেন।*২ এই সঙ্গে সাম্প্রদায়িকদের কাছে আত্মসমর্পণের শোচনীয় পরিণতি সম্বন্ধে জ্বলন্ত ভাষায় বহু কিছু লেখা হয়। জাতীয়তাবাদী মুসলমানেরা যে বন্দেমাতরমের বিরোধী নন, অতীতে বা বর্তমানে, নানা দৃষ্টান্তযোগে বোঝাবার চেষ্টাও করা হয়।*৩

আনন্দবাজার পত্রিকায় ২৬শে সেপ্টেম্বর অধ্যাপক প্রবোধচন্দ্র সেন তিন কলম দীর্ঘ এক প্রবন্ধে বন্দেমাতরমের ঐতিহ্য ও অপরিহার্যতার কথা আবেগের সঙ্গে লিখেছিলেন। সেই সঙ্গে পণ্ডিত জহরলালের অহেতুক বন্দেমাতরম-বিরাগের সমালোচনাও তিনি করেন। তাঁর প্রবন্ধের অংশ—

> "……তাই দেখতে পাই, বহু জাতির ইতিহাসে যেমন জাতীয় পতাকার মর্যাদারক্ষার জন্য বহু বীর প্রাণ দিয়েছে, আমাদের দেশেও তেমনি ওই বন্দেমাতরম ধ্বনির মর্যাদারক্ষার জন্য জীবন বিসর্জন করেছে, এমন স্বদেশভক্তের অভাব হয় নি। কংগ্রেস সভাপতির অভিপ্রায়মতে যদি বন্দেমাতরম সঙ্গীতটি জাতীয় সঙ্গীতের মর্যাদাচ্যুত হয়, তাহলে বন্দেমাতরম ধ্বনিটিকেও অপাংক্তেয় করতে হবে। কিন্তু জাতির মর্ম থেকে তাকে উন্মূলিত ও উৎপাটিত করা কি কারও সাধ্য হবে? বন্দেমাতরম বাণীকে অপসারিত করার অসাধ্য চেষ্টায় জাতির মর্মমূল ছিন্ন হয়ে সমগ্র জাতীয় জীবনই যে রক্তাক্ত হয়ে উঠবে।

"আজকাল ইনক্লাব জিন্দাবাদ, কি, অমুক কি জয় ধ্বনির ছড়াছড়ি হয়ে পড়েছে। কিন্তু বন্দেমাতরম ধ্বনির মধ্যে যে গভীর নিষ্ঠা, ঐকান্তিকতা ও পবিত্রতা আছে, অন্যান্য ধ্বনির মধ্যে তার পরিচয় কোথায়? আমরা জানি পণ্ডিত জহরলাল ইনক্লাব জিন্দাবাদ ধ্বনির বিশেষ অনুরাগী। কিন্তু ভাষার দুর্বোধ্যতার অপরাধে যদি বন্দেমাতরমকে বিদায় গ্রহণ করতে হয়, তাহলে বৈদেশিক উত্তেজনায় শ্লোগানটির উর্দু অনুবাদরূপী ইনক্লাব জিন্দাবাদই কোন্ মহিমায় জাতীয় ধ্বনির মর্যাদা গ্রহণ করার উপযোগী?"

"মোটি কথা কংগ্রেস ও জাতীয়-পতাকা আমাদের জাতীয় জীবনে যে প্রতিষ্ঠালাভ করেছে, বন্দেমাতরম সঙ্গীত ও বন্দেমাতরম ধ্বনিও জাতির চিত্তে ঠিক ততখানি শ্রদ্ধার আসন অধিকার করেছে। ঐ আসন থেকে তাদের স্থানান্তরিত করা সম্ভবপরও নয়, এবং ঐরকম চেষ্টা করা হবে জাতীয় আত্মহত্যারই নামান্তর।"

বন্দেমাতরম সম্বন্ধে পুনর্বিবেচনার ব্যাপারটিকে ঘোড়াসে-ভাসা আশঙ্কা বলে গোড়ায় মনে হয়েছিল, অক্টোবরের মাঝামাঝি থেকে স্পষ্টই বোঝা গেল কংগ্রেস-কর্তারা ব্যাপারটা নিয়ে সরকারিভাবে নাড়াচাড়া করতে চান। তখন ভারতবর্ষের দুটি প্রদেশ বিক্ষোভে একত্র হল, স্বদেশী আন্দোলনের সময় থেকে ত্যাগে ও সংগ্রামে যারা হাত ধরাধরি করে এগিয়েছে বাংলা ও মহারাষ্ট্র। 'মারহাট্টা' পত্রিকায় সম্পাদকীয় রচনায় বন্দেমাতরম সঙ্গীতের ঐতিহ্যের আলোচনা করার পরে বিরোধীপক্ষের যুক্তি-গুলিকে খণ্ডন করা হয়; তিলকের নেতৃত্বে মহারাষ্ট্র স্বদেশী যুগ থেকে বন্দেমাতরমকে গ্রহণ করেছিল; বন্দে-মাতরম সম্বন্ধে কংগ্রেস কর্তৃপক্ষের কুমতলবের বিষয়ে তিলক জয়ন্তী উৎসবে ভাষণ দেবার সময়ে আগেই সাভারকর ইঙ্গিত করেছেন, ইত্যাদি।* ২২ অক্টোবরের আনন্দবাজার পত্রিকার মূল সম্পাদকীয় "বন্দেমাতরম-বিরোধী ষড়যন্ত্রের রহস্য", এবং একটি সংবাদের শিরোনামা এই রকম:

দাশগুপ্তের প্রবন্ধ, সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের গ্রন্থ থেকে উদ্ধৃতি, ২৪ অক্টোবর ডাঃ ইন্দ্রনারায়ণ সেনগুপ্তের রচনা, ২৬ অক্টোবর ডাঃ সুন্দরীমোহন দাশের রচনা, ২৭ অক্টোবর বন্দেমাতরম সঙ্গীতের ইতিহাস প্রভৃতি। আনন্দবাজারে ২২ অক্টোবর বিপিনচন্দ্র পালের প্রবন্ধ, ২৪ অক্টোবর বন্দেমাতরম সঙ্গীতের ইতিহাস, রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী ও অশোকনাথ শাস্ত্রীর প্রবন্ধ, ২৬ অক্টোবর সরলাবালা সরকার, ডাঃ ইন্দ্রনারায়ণ সেনগুপ্ত, চিত্তরঞ্জন গুহের প্রবন্ধ, ২৯ অক্টোবর নগেন্দ্রনাথ গুপ্তর রচনা। এসব ছাড়া আরো কিছু প্রকাশিত রচনার উল্লেখ মূল লেখায় করেছি। বন্দে-মাতরমের সমর্থনে কয়েকজন জাতীয়তাবাদী মুসলমানের বিবৃতি এবং কিছু মুসলিম পত্রিকার রচনা উপস্থিত করা হয়েছিল।

*১ হিন্দুস্থান স্ট্যান্ডার্ড, ২৩ অক্টোবর।

*২ হিন্দুস্থান স্ট্যান্ডার্ড, ৯ নভেম্বর।

*৩ যেমন ধরা যাক, বন্দেমাতরমের ও হিন্দু সংস্কৃতির বিরুদ্ধে কাগজী জেহাদ ঘোষণায় যিনি অগ্রণী ভূমিকা নিয়েছিলেন সেই মৌলনা আক্রাম খাঁর পূর্বতন বিপরীত ভূমিকার কথা হিন্দুস্থান স্ট্যান্ডার্ড ও আনন্দবাজারে তুলে ধরা হয়। ১৯০৬ সালের সঞ্জীবনী পত্রিকা থেকে রিপোর্ট উদ্ধৃত করা হয়েছিল, যাতে আক্রাম খাঁর বন্দেমাতরম-প্রীতির কথা উল্লিখিত ছিল। (হিন্দুস্থান স্ট্যান্ডার্ড, ৩ অক্টোবর ২৮, ১৯৩৭)

* ২৯ অক্টোবরের হিন্দুস্থান স্ট্যান্ডার্ডে উদ্ধৃত।

বন্দেমাতরম সঙ্গীতের বিরুদ্ধে অভিযান

সাম্প্রদায়িকতাবাদী মুসলমানদের আন্দোলন সম্পর্কে

মাহারাষ্ট্রীয় নেতৃবৃন্দ

জাতীয় সঙ্গীত বলিয়া ঘোষণার দাবী

সুভাষচন্দ্র ও কংগ্রেস সভাপতির নিকট পত্র

"বন্দেমাতরম-বিরোধী ষড়যন্ত্র" কিন্তু চলতেই থাকল, বাংলা ও মহারাষ্ট্রের আন্দোলন সত্ত্বেও। পুনায় 'বন্দে-মাতরম-দিবস' পালিত হল; সাভারকার সেখানে বললেন, "let Bengal remember the partition days. I assure Bengal that Maharastra stands by her side in the fight for Bande Mataram". (অমৃতবাজার, ২৭ অক্টোবর)। কিন্তু যার উদ্দেশ্যে এই আহ্বান, সে বাংলা দেশ বন্দেমাতরম প্রশ্নে মর্মপীড়িত হয়েও প্রকাশ্য ব্যাপক আন্দোলন গড়ে তুলতে চায় নি। কেন চায় নি, তার কারণ আগেই জানিয়েছি। কংগ্রেসের সমর্থন ছাড়া তখন কোনো আন্দোলন করা সম্ভব নয়, এবং এই সময়ে বিদ্রোহী বাংলা দেশের কংগ্রেস নানা কারণে কংগ্রেসের ঊর্ধ্ব-নেতৃবৃন্দের বিশেষ অনুগত।

কিছু আশার আলো দেখা গেল, শোনা গেল যে, গান্ধীজী বন্দেমাতরম রক্ষার পক্ষপাতী। জহরলালের উদ্গত জনপ্রিয়তা সত্ত্বেও তখনো কংগ্রেস বলতে গান্ধীজীকেই বোঝাত। ২৭শে অক্টোবরের আনন্দবাজারে বড় অক্ষরে ছাপা হল—

বন্দেমাতরম ও মহাত্মা গান্ধী

আনন্দবাজার পত্রিকা বিশ্বস্তসূত্রে অবগত হইয়াছেন যে, বন্দেমাতরমকে জাতীয় সঙ্গীতরূপে ব্যবহার করার অনুকূলে মহাত্মা গান্ধী দৃঢ় মত পোষণ করেন। মনে হয়, সাম্প্রদায়িকতাবাদীদের চীৎকার মহাত্মাজীর মনের উপর বিন্দুমাত্র রেখাপাত করিতে পারে নাই।

এর কয়েকদিন আগে জনমত সংগঠন, ও সম্ভবত গান্ধীজীর স্মৃতি-উদ্বোধনের জন্য বন্দেমাতরম সম্বন্ধে মান্দ্রাজে ছাত্রদের অভিনন্দনের উত্তরে ১৯১৫ সালের ২৭শে এপ্রিলে তিনি যা বলেছিলেন, তা আনন্দবাজার ও হিন্দুস্থান ষ্ট্যান্ডার্ডে উদ্ধৃত হয়েছিল:

"ঐ সুন্দর জাতীয় সঙ্গীত তোমরা আমাকে শোনালে, শুনে আমরা সকলেই খাড়া দাঁড়িয়ে উঠলাম। ভারতমাতার বর্ণনায় কবি যত বিশেষণ সম্ভব সকলই উজাড় করে দিয়েছেন। তাঁর বিষয়ে কবি বলেছেন, সুবাসিনী, সুহাসিনী, সুমধুরভাষিণী; তিনি সর্ব-শক্তি, সর্বসত্য, চিরকল্যাণময়ী; তিনি সুজলা সুফলা, মলয়জশীতলা, শ্যামলা, সরলা, সুস্মিতা, ভূষিতা; সে এমন দেশ, এমন অপরূপ তার অধিবাসীরা, যা কেবল সুবর্ণ যুগেই সম্ভবপর। কবি সেই দেশেরই ছবি এঁকেছেন—যে-দেশ সমস্ত পৃথিবীকে, সমগ্র মানব-জাতিকে আলিঙ্গন করে নিজ অধিকারের মধ্যে গ্রহণ করবে সবলে, শরীরের বলে নয়, আত্মার বলে। এ গান কি আমরা গাইবার যোগ্য? আমি নিজেকেই প্রশ্ন করি, এ গান শুনে উঠে দাঁড়াবার অধিকার কি আমার আছে? কবি নিঃসন্দেহে আমাদের কাছে ধ্যানের ও সাধনার ভারতবর্ষকে তুলে ধরেছেন; তাঁর কণ্ঠে ঋষিরই বাণী। ছাত্রগণ, তোমরাই ভারতের আশাভরসা, কবির প্রতিটি শব্দকে সার্থক করে তুলবার দায়িত্ব তোমাদেরই।"

কলকাতা শহর কংগ্রেসের সভা উপলক্ষে সরগরম হয়ে উঠল অক্টোবরের তৃতীয় সপ্তাহ থেকে। গান্ধীজী এলেন, সুভাষচন্দ্রও এলেন। ঘরের ছেলে সুভাষচন্দ্র সম্বন্ধে 'এলেন' কথাটি প্রযোজ্য, কারণ নানা কারণে ঘরে থাকা তাঁর পক্ষে প্রায়ই সম্ভব হয় না। সেই সঙ্গে চিকিৎসার কারণে রবীন্দ্রনাথও কলকাতায় এসেছেন। বন্দেমাতরম প্রশ্নে এই চার প্রধান কাছাকাছি হলেন, তবে সংবাদপত্রে উল্লেখের ব্যাপারে সুভাষচন্দ্রের নাম কিছু অল্প থাকত, তিনি নিজেকে ঈষৎ সরিয়েও রেখেছিলেন। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের পক্ষে নিজেকে সরিয়ে রাখা সম্ভব হয় নি, অন্তত তাঁকে সরে থাকতে দেওয়া হয় নি। সঙ্গীত ব্যাপারটার সঙ্গে সাহিত্যের যোগ আছে; সে সঙ্গীত আবার যখন জাতীয় সঙ্গীত তখন দেশের সবচেয়ে বড় কবি ও সঙ্গীতকার, একইসঙ্গে মহান দেশপ্রেমিক, তাঁকে বাদ দেওয়া সম্ভব ছিল না, সে ইচ্ছাও ছিল না কংগ্রেস-কর্তৃপক্ষের, যেহেতু তাঁরা নিজেদের সিদ্ধান্তের পক্ষে এক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথের সম্মতি-আশা করেছিলেনই। রবীন্দ্রনাথের ধারণা কি হবে, সে সম্বন্ধে ঈষৎ সন্দেহ যে বাংলা দেশে ছিল না তা নয়, কবি নানাসূত্রে, কথায় বার্তায় 'মা মা করা' দেশপ্রেমকে আঘাত করছিলেন। আলোচ্য ঘটনার ৬ বছরের বেশি আগে, ১৯৩১, ৯ই মে তারিখে অমৃতবাজার পত্রিকায় কবির সঙ্গে মহীতোষ রায়চৌধুরীর আলোচনার একটি বিবরণ বেরিয়েছিল। কবির কাছে বাণী চাওয়া হলে তিনি অস্বীকার করে বলেন, আমি কবি, রাজনীতিক নই। অন্যান্য কথার সঙ্গে তিনি বলেন—

"আমি জানি না কি বলব; শুধু সেইটুকুর বিষয়ে বলতে পারি, যাকে নিজে বিশ্বাস করেছি ও কর্মে পরিণত করতে চেষ্টা করেছি।...আমি শুধু এইটুকু জানি যে, ভারতবাসী হিসেবে আমার শক্তি যেন ভারতের দেবীমূর্তি তৈরী করে তাঁর উদ্দেশ্যে বস্তু-সম্পর্কহীন ভাবাবেগপূর্ণ স্তুতিবর্ষণে ব্যয়িত না হয়, তা যেন যত বেশি সংখ্যায় সম্ভব আমার দেশবাসীর মঙ্গল করতে, তাদের জীবন উন্নত করতে যথাসাধ্য নিযুক্ত থাকে। 'বাণী দেওয়া' কথাটাকে আমি ঘৃণা করি। তবু যদি 'বাণী' বলতে চাও বলো। সে বাণী হল—"সমস্ত শক্তি যেন বৃথা ভাবোচ্ছ্বাসে নষ্ট না হয়, তাকে কাজে রূপান্তরিত করো। যথেষ্ট 'বন্দেমাতরম' হয়েছে, এখন বন্দেমাতরমকে বদলে 'বন্দেভ্রাতরম' কর। জাতীয় পতাকা নাড়িয়ে কিংবা মাথাপিছু বরাদ্দ তুলো কাটবার জন্য চরকার চাকা ঘুরিয়ে স্বরাজ অর্জন করতে পারবে না। সে স্বরাজ জনগণের মধ্যে গঠন-মূলক কাজের মধ্য দিয়েই মাত্র আসতে পারে, দেশ-বাসীর বাস্তব সেবার মধ্য দিয়েই তাকে আনা সম্ভবপর।" [ক্রমশঃ]

আন্তর্জাতিক রাজনীতি ও নেতাজী

॥ শ্রীনরেন্দ্রনারায়ণ চক্রবর্তী ॥

স্বাধীনতাপূর্ব ভারতবর্ষের রাজনীতিবিদ্‌দের আন্তর্জাতিক রাজনীতি সম্পর্কে বিশেষ কোন ধারণা ছিল না, যদি হলেও কথাটা সত্য। মুলত মাত্র তিনজন ব্যক্তির মধ্যেই আন্তর্জাতিক রাজনীতির চর্চা ছিল এবং এঁরাই এ-সম্বন্ধে মাঝে-মধ্যে আলোচনা করেছেন। এম এন রায়, জহরলাল ও নেতাজী। এঁদের মধ্যে এম এন রায়ের প্রগাঢ় পাণ্ডিত্য থাকা সত্ত্বেও এ-দেশীয় রাজনৈতিক পটভূমিকায় তাঁর প্রজ্ঞা ও অভিজ্ঞতা জাতির কল্যাণে কাজে লাগে নি। আন্তর্জাতিক রাজনীতিক্ষেত্রে জহরলালের ভূমিকা ছিল, কিন্তু সে তথ্য বর্তমান প্রবন্ধের আলোচ্য বিষয় নয়।

১৯২১-এর সামান্য কয়েকটি দিন প্রত্যক্ষ রাজনীতির সঙ্গে জড়িত থাকলেও দেশবন্ধুর আহ্বানে সুভাষচন্দ্রকে ১৯২৪ পর্যন্ত রাজনীতির বাইরের কাজেই নিযোজিত থাকতে হয়েছে বেশি। তারপরই সুদীর্ঘ কারাদণ্ড। ফিরে এলেন ১৯২৭-এ। তখন দেশবন্ধু গত। ব্যক্তিগতভাবে দেশবন্ধু স্নেহ, মমতা ও রাজনৈতিক শিক্ষা উজাড় করে সুভাষচন্দ্রকে দান করেছিলেন। কিন্তু প্রত্যক্ষ প্রভাব দ্বারা সুভাষচন্দ্রের অগ্রগতির বিশেষ সাহায্য করবার তিনি অবকাশ পান নি। 'ইণ্ডিয়ান স্ট্রাগল্', লিখতে গিয়ে মুক্তকণ্ঠে সুভাষচন্দ্র স্বীকার করেছেন : "দেশবন্ধুই বৈদেশিক প্রচারকার্যে আমাকে সচেতন করেছেন সবচাইতে বেশি করে। স্বরাজ পার্টি গঠিত হলে বৈদেশিক প্রচার দপ্তর এবং 'প্যান এশিয়াটিক লীগ' গড়ে তোলবার ইচ্ছা তাঁর ছিল তীব্র।" ১৯২৭-এ কারাগার থেকে তিনি ফিরে এলেন, দেশ ও দেশবাসীকে তিনি দেখলেন; এবং সঙ্গে সঙ্গে দেশ ও জাতির অন্তরাত্মাকে জয়ও করে নিলেন। ১৯২৭-এর পূর্বে সুভাষচন্দ্র আন্তর্জাতিক রাজনীতি সম্পর্কে কোন কথা বলবার অবকাশ পান নি।

পেলেন ১৯২৮-এ। জাতীয় কংগ্রেসের অধিবেশন হয়েছিল কলকাতায়। মতিলাল নেহরু সভাপতি। এই অধিবেশনেই সর্বপ্রথম মহাত্মা গান্ধীর প্রস্তাব সমর্থন না করে বিকল্প সংশোধনী প্রস্তাব সুভাষচন্দ্র উত্থাপনা করেন। এবং এই প্রথম তাঁর বক্তৃতার মধ্যে আন্তর্জাতিক সমস্যার আলোচনা দেখতে পাওয়া যায়। স্বরাজ শব্দের অর্থ স্বাধীনতা, এই ছিল সুভাষচন্দ্রের বিকল্প প্রস্তাবের প্রতিপাদ্য কথা। (অধিবেশনের পূর্বে মতিলাল নেহরুকে সভাপতি করে একটি কমিটি গঠিত হয়েছিল এবং সেই কমিটি কংগ্রেসের দাবি সম্বলিত সে ভবিষ্যৎ ভারত শাসনতন্ত্র [Nehru Constitution] রচনা করেছিলেন, তার মূল প্রস্তাবনায় বলা হয়েছিল যে, কংগ্রেসের তৎকালীন দাবি 'ডমিনিয়ন স্টেটাস'; অর্থাৎ ইংরেজের পক্ষপুটের আশ্রয়ে স্বায়ত্তশাসন।) সুভাষচন্দ্র সেদিন বলেছিলেন :

"'ডমিনিয়ন স্টেটাস' অথবা স্বাধীনতা, এর কোন্‌টা ভারতবর্ষ কামনা করে, এ সম্বন্ধে স্বার্থহীন ভাষায় মত প্রকাশ করবার সময় এসেছে।...বর্তমান আন্তর্জাতিক ঘটনা আলোচনা করলেই এ-কথাটা স্পষ্ট হবে যে, আবার একটা মহাসমর আসন্ন হয়ে উঠেছে। যে যে কারণে যুদ্ধ অনিবার্য হয়ে দেখা দেয়, সে কারণগুলি দেখা দিয়েছে। ভার্সাই সন্ধি অনেকেরই মনঃপূত হয় নি। হয় নি ইটালির, বলকানের, রাশিয়ার, জার্মানীর, অস্ট্রিয়া-হাঙ্গেরির এবং আরো অনেকের। এশিয়ার কথা আজ বিশেষ করে লক্ষ্য করতে হবে। সোভিয়েট রাশিয়ার বিরুদ্ধে সমস্ত ধনতান্ত্রিক দেশ জোট বেঁধেছে। এর পরিণামই আর একটা মহাসমর। বিপ্লবের সবগুলি স্বাধীন দেশ আজ যুদ্ধের আয়োজনে ব্যস্ত। এরই পরিপ্রেক্ষিতে ভারতবর্ষের দাবি উপস্থাপিত করতে হবে। একটা আনকোরা নতুন মানসিকতা সৃষ্টি করতে হবে দেশবাসীর মনে। এই মানসভঙ্গীই চাইবে পূর্ণ স্বাধীনতা।"...

এর পর বেশিদিন সুভাষচন্দ্র কারাগৃহের বাইরে ছিলেন না। ১৯৩০ এবং '৩১-এও আবার কারাগারে তাঁর স্থান হয়। মাঝখানে কয়েকটি দিন তিনি বাইরে ছিলেন। এবং সে সময় তিনি ভারতবর্ষের সর্বত্র নিজের আদর্শ ও জাতির ভবিষ্যৎ লক্ষ্যের কথা প্রাণ নিঙড়ে বলে গেছেন।

এর পরই শুরু হল তাঁর সুদীর্ঘ নির্বাসনের জীবন। ইয়োরোপে। ইংরেজ হয়তো দণ্ড দেবার নিষ্ঠুর অভিপ্রায় নিয়েই রচনা করেছিল সুভাষচন্দ্রের জন্য এই নির্বাসন-পরিকল্পনা। সেও ভাবে নি যে, এই নির্বাসনের ভেতর দিয়েই একদিন এই মানুষটি আমূল আর অন্তহীন অন্তরদৃষ্টির অধিকারী হয়ে উঠবে ইয়োরোপের রাজনীতিমুখর সচেতন জীবনের সংস্পর্শে। বস্তুত ভবিষ্যৎ-নেতাজীর জীবনের বহু উপাদান সুভাষচন্দ্র ইয়োরোপের এই ভিন্নতর পরিবেশে শুধু সংগ্রহ করেই ক্ষান্ত হন নি, পরন্তু নিজের ও দেশের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে সবিশেষ পারঙ্গম হয়ে ওঠবার সুযোগও তিনি এইখানেই পেয়েছিলেন।

আমেরিকা, ইংলণ্ড, জার্মেনী এবং রাশিয়ায় যাবার তাঁর অনুমতি ছিল না। (পরবর্তীকালে জার্মেনীতে যাবার অনুমতি মিলেছিল।) এ ছাড়া ইয়োরোপের সর্বত্রই ছিল তাঁর অবাধ গতিবিধি। তাঁর এই পরিক্রমা ইংরেজ সুনজরে দেখে নি। তিনি যখন ইটালির মতো ফ্যাসিস্ট দেশে যেতেন, ইংরেজের প্রচার মহিমা তাঁকে পাক্কা কম্যুনিস্ট বলে চিহ্নিত করেছে; আবার পোল্যাণ্ড-চেকোশ্লোভাকিয়ায় গেলে তাঁকে চিহ্নিত করা হয়েছে কানু ফ্যাসিস্টরূপে। অর্থাৎ কম্যুনিস্ট সুভাষ বোস সম্পর্কে সতর্ক হবার ইঙ্গিত দেওয়া হয়েছে ইটালিকে; আবার পরক্ষণেই চেকোশ্লোভাকিয়া-পোল্যাণ্ডকে ফ্যাসিস্ট সুভাষ বোসকে প্রশ্রয় না দেবার জন্য উপদেশ ঝাড়া হয়েছে।

জেনেভা থেকে এর জবাব দেন সুভাষচন্দ্র। তিনি বলেন : "একটা পরাধীন দেশের পক্ষে বিভিন্ন রাষ্ট্র ও জাতির উত্থান-পতনের ইতিহাস জানা যেমন প্রয়োজনীয়, তাদের গঠন, শক্তি ও মতবাদও ঠিক তেমনি বিচার্য। বহু শতাব্দী ধরে ভারতবর্ষ আন্তর্জাতিক সম্পর্কশূন্য। তার বাণিজ্য, রাজনীতি, শিক্ষা-দীক্ষা সবই বিশ্বের অন্যান্য জাতির সঙ্গে সম্বন্ধ হারিয়ে নিজের ঘরে অবরুদ্ধ হয়ে পড়েছিল। আজ তার পরিবর্তন এসেছে।

তাই জানতে চাইবে, দেখতে চাইবে, বুঝতে চাইবে বিভিন্ন দেশের চিন্তাধারা ও কর্ম-প্রণালী। এবং এরই পরিপ্রেক্ষিতে ভারত-বর্ষের স্বরাষ্ট্র ও পররাষ্ট্রনীতি নির্ধারণ করতে হবে। যদিও বিশ্বে আজ দুটি মতবাদই প্রাধান্য লাভ করেছে, তবুও এ-কথা বলা মারাত্মক ভুল হবে যে, কম্যু-নিজম্ অথবা ফ্যাসিজিম্-এর মধ্যে যে-কোন-একটা ভারতবর্ষকে বেছে নিতেই হবে। সামাজিক ও রাজনৈতিক বিষয়ে কোন নীতিই শেষ কথা নয়। মানবের অপার অগাধ সৃজনীশক্তি আছে। তার প্রজ্ঞারও ইতি নেই। প্রত্যেক জাতি বা দেশ তার পারিপার্শ্বিকতা, তার অতীত ইতি-হাস, তার কৃষ্টি ও সংস্কৃতি অনুযায়ী তার সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় মতবাদ ও সংস্থা গড়ে তোলে।-মানবজীবনের ক্রমবিকাশের ন্যায় এরও পরিবর্তন আসতে পারে, আর আসেও।" সুভাষচন্দ্র শেষ করেছেন এই বলে : "বর্তমান জগতের প্রচলিত সকল মতবাদের মধ্যে যা সুন্দর, যা ভারতবর্ষের পক্ষে কল্যাণকর, যা কার্যকরী, তাই আমরা গ্রহণ করব। বিশ্বজোড়া চলেছে নানা মতবাদের পরীক্ষা আর নিরীক্ষা। এর কোন্‌টা টিকে থাকবে আর কোন্‌টা অবলুপ্ত হয়ে যাবে, তারও স্থিরতা নেই। পূর্বাহ্নে কোন নির্দিষ্ট মতবাদের কাছে আমাদের মস্তিষ্ক বন্ধক রাখতে আমার আপত্তি আছে।"

সুভাষচন্দ্রের এই কথা এত বেশি প্রাঞ্জল, অকুণ্ঠ এবং সাবলীল যে, এর কোন টীকা বা ভাষ্য একান্তই অনাবশ্যক। এইখানেই তাঁর বৈশিষ্ট্য। কোনদিন তিনি কারো কাছে দুর্বোধ্য হন নি। ধোঁয়া, ধোঁকা, কুয়াশা বা দ্ব্যর্থতা ছিল না তাঁর চরিত্র বা কথার গায়ে। একেবারে স্বতঃসিদ্ধ। ভাবের ঘরে চুরি করা তিনি সমগ্র অন্তর দিয়ে ঘৃণা করতেন।

এই বিবৃতি দেবার পূর্বেই বিলেতের নিমন্ত্রণ তিনি পেয়েছিলেন। কিন্তু ইংরেজ সরকার সেই সভায় উপস্থিত হওয়া দূরের কথা, সুভাষচন্দ্রকে ইংলণ্ডে যাবার অনুমতিই দিল না। পরমাশ্চর্যের কথা, এর সামান্য কয়েকটা দিন পূর্বেই জহর-লালকে ইংলণ্ডে যাবার ছাড়পত্র দিতে ওরা দ্বিধামাত্র করে নি। শুধু তাই নয়, জহরলালকে ও-দেশের রথী-মহারথীরা পর্যন্ত অপর্যাপ্ত হৃদ্যতার সঙ্গে গ্রহণও করেছে। সুভাষ তাঁর লিখিত অভিভাষণ পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। লণ্ডনের ফিরার্স হলে সভার অনুষ্ঠান হয়েছিল। (১০ই জুন, ১৯৩৩) এবং সভায় তাঁর লিখিত অভিভাষণ পঠিত হয়। এই অভিভাষণে সুভাষচন্দ্রের নবতম দৃষ্টিভঙ্গীর সুপ্রশস্ত পরিধি ও চিন্তার গাঢ়তা বিস্ময়কর। নানা সমস্যা আলোচনার পর অভিভাষণে বলা হয়েছে, "ইংরেজের এই মনোভাব আর তার অস্তিত্ব হয়তো আরো অনেকদিন এমনি অটুটই থাকবে, যদি আমরা অস্ত্রের সাহায্যে অথবা আর্থিক অবরোধের দ্বারা ইংরেজ সরকার আর তাদের পৃষ্ঠপোষকদের জীবন ভীতিপ্রদ, অচল আর অতিষ্ঠ করে তুলতে না পারি। অসহযোগিতা বা আইন অমান্য আন্দোলন এ কাজ করতে পারে নি।"

ভবিষ্যৎ নেতাজী-জীবনের সূত্ররূপ। এই রূপকে ইংরেজ সেদিন প্রসন্ন মনে সমাদর করতে কেন পারে নি, তার কারণ মোটেই দুর্বোধ্য নয়। বস্তুত নির্বাসনের এই রূঢ় পীড়নের মাধ্যমে সুভাষচন্দ্র সেদিন পরাধীন মাতৃভূমির একজন দরদী মুমুক্ষু সন্তান বা রাজনীতিবিদ্-এর গণ্ডী অতি-ক্রম করে আন্তর্জাতিক রাজনীতির চাক্ষুষ সংস্পর্শে যে জীবন পেলেন, তাঁর ভবিষৎ পরিকল্পনা ও নব দৃষ্টিভঙ্গী তাঁকে শুধু রূপান্তরিতই করে নি,—পরন্তু তাঁর এই নবার্জিত সম্পদের কল্যাণে উত্তরকালের ব্যক্তিজীবনও যথেষ্ট সমৃদ্ধ হবার সুযোগ পেয়েছিল।

নির্বাসিত জীবন শেষ করে ১৯৩৮-এ তিনি কংগ্রেসের সভাপতি নির্বাচিত হন। হরিপুরা কংগ্রেসের অভিভাষণে সুভাষ-চন্দ্রের আন্তর্জাতিক রাজনীতির সঙ্গে সঙ্গে ভারতবর্ষের তুলনামূলক পর্যালো-চনার যে অপরূপ ও সুগম্ভীর কারুকার্য রয়েছে, পরিচ্ছন্ন ও পর্যাপ্ত বলেই তা প্রাণকে সচকিত করে না, অধিকন্তু এর বিচিত্র বৈদগ্ধ্যরূপও ভোলবার নয়।

The British Empire at the present moment is suffering from strain at number of points within Empire, in the extreme West, is Irland and in the extreme East, is India. In the middle lies Palestine with the adjoining countries of Egypt and Iraq. Out side the empire, there is the pressure exerted by Italy in the mediterranean and Japan in the Far East, both the countries being militant, aggressive and imperialist. Against this background of unrest stands Soviet Russia whose very existence strikes terror into the hearts of the ruling classes in every Imperialist state. How long can the British Empire withstand the cumulative effect of this pressure and strain ?

১৯৩৮-এর অনুত্তেজিত দৃষ্টিপাতে যে সংশয় ও প্রশ্ন ফুটে উঠেছিল প্রাঞ্জল হয়ে, তার বাস্তব রূপ দেখা দিল অদূর ভবিষ্যতে। ইংলণ্ড তার অক্টোপাশের ক্ষুধা আর মুষ্টি সংযত ও শিথিল করতে বাধ্য হল।

এর পর ত্রিপুরী। গোড়াতেই সুভাষ-চন্দ্র বলে চলেছেন :

"Since we met at Haripura in February 1938, several significant events have taken place in the international spere. The most important of these is the Munick Pact of September, 1938, which implied an abject surrender to Nazi Germany on the part of Western powers, France and Great Britain. As the result of this, France ceased to be a dominant power in Europe and the hegemony passed into the hands of Germany without a shot being fired. In more recent times, the gradual collapse of the Republican Government of Spain sums to have added to the strength and prestige of Fascist Italy and Nazi Germany. The so-called democratic power, France and Great Britain, have joined Italy and Germany in conspiring to eliminate Soviet Russia from European politics for the time being. But how long will that be possible ? And what have France and Great Britain gained by trying to humiliate Russia ?

লাভ হয় নি ? যেদিন গণতন্ত্রী স্পেনের আর্তি ও দুর্ভাগ্য নিয়ে গণতন্ত্র-বাদের স্রষ্টা ও পরিপোষক ফ্রান্স ও ইংলণ্ড রাজনৈতিক জুয়া খেলেছিল এবং এক কৃতঘ্ন ষড়যন্ত্রের বিনিময়ে রাশিয়ার প্রভাব ও আদর্শ ইয়োরোপ থেকে নির্বাসিত করবার স্বপ্ন দেখেছিল,—বেশিদিন অপেক্ষা করতে হয় নি,—নিজেদের তৈরি বুমেরাং নিজেদের গলায় পরে আর্তকণ্ঠে পৃথিবীর সবাই-এর কাছে তো বটেই, সেই অবাঞ্ছিত রাশিয়ার সচেতন শক্তি, আত্মত্যাগ আর দুর্জয় স্বদেশপ্রেমের দরজায় মাথা কুটতে হয়েছে না ?

অদূরে দাঁড়িয়েছিল ১৯৪০। গভীর নিশীথে স্বদেশ ও স্বজনের আদর প্রেম আর মঙ্গলাশীষ সম্বল করে এই আত্ম-ভোলা দেশপ্রেমের মূর্তরূপ যেদিন আর

যে-মুহূর্তে ভারতভূমি পরিত্যাগ করে ইয়োরোপে পৌঁছুলেন, সেইদিন আর সেই মুহূর্তে সুভাষচন্দ্র রূপান্তরিত হয়ে আন্তর্জাতিক মানবপ্রধানদের অন্যতম হয়ে গেলেন। সেইদিন থেকে বাংলার সুভাষ হলেন ভারতবর্ষের নেতাজী।

অতি দীর্ঘদিন, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সমাপ্তি পর্যন্ত তো বটেই,—আরো দেড়শো বছর আগে থেকে, বিশ্বের দরবারে ভারতবর্ষের একটিমাত্র পরিচয় ছিল : পুরাতন ভৃত্য। ইংরেজের একান্ত বশংবদ দাস। বার্লিনের আজাদ হিন্দ রেডিও থেকে এই সর্বপ্রথম চার্চিলের জবাব দিলেন একজন ভারতবাসী সমানে সমানে। আগুনের ফুলকি সেদিন ছিটকে বেরিয়েছে নেতাজীর কণ্ঠ থেকে। বিশ্বের রাজনৈতিক পরিস্থিতি পর্যালোচনা করে দিনের পর দিন নেতাজী দেখিয়ে দিয়েছেন : "ইংরেজ যুদ্ধে জিতুক আর হারুক, তার সাধের সাম্রাজ্য দাঁড়িয়ে আছে একটা খাড়া পাহাড়ের তুঙ্গ শৃঙ্গের ওপর। (Precipice) যে কোন মুহূর্তে গভীর খাদে গড়িয়ে পড়ে চুরমার হয়ে যাবে।" যায় নি?

সেদিনের বিশ্বত্রাস জার্মেনীর ফুরার হিটলার, কিংবা ইটালির ডুসে মুসোলিনী, অথবা রিবেনট্রপ বা কাউন্ট শিয়ানো, কীভাবে ও কতখানি সম্মান ও শ্রদ্ধা জানিয়েছেন এই ভারতীয়ের প্রতি, সেটা খুব বড় কথা নয়; সেদিনের নেতাজী ইংরেজের ভীতির কারণ হয়েছিলেন, ইংরেজের মনের সেই সশঙ্ক কালো ছায়া সেদিনের পত্র-পত্রিকায় পরিস্ফুট।

"A wirless campaign of unprecedented vehemence", লণ্ডনের 'টাইমস' পত্রিকা সিঙ্গাপুরের নিজস্ব প্রতিনিধির তারবার্তা উদ্ধৃত করেছিল। "Indian revolution is on", লিখেছিল লণ্ডনের সাপ্তাহিক 'টিবিউন'। আর আমেরিকার বিখ্যাত সাপ্তাহিক 'নিউজ উইক' লিখেছিল :

"There is only one possible chance to make up-a little of the lost time to spike the guns of Bose opposition. Nehru must be asked to become Prime Minister and Minister for Defence ... Make no mistake. This is not opportunity knocking at our door, it is history battering down." (Leadership and Political Institution of India নামক আমেরিকা থেকে প্রকাশিত পুস্তক দ্রষ্টব্য)।

সেদিন পর্যন্ত নেতাজী সুভাষই কথা বলেছেন। এরপর যে ভূমিকায় দাঁড়িয়ে বিশ্বের রাজনীতির রূপ ও রীতি তিনি বিন্যাস করেছেন, তা বেরিয়েছিল অস্থায়ী স্বাধীন ভারত সরকারের সর্বাধিনায়কের মুখ থেকে। চার্চিল থেকে তোজো,—কেউ তাঁকে উপেক্ষা করতে পারেন নি। বিশ্বরাজনীতির ক্ষেত্রে ভারতবর্ষের স্বতন্ত্র স্বীকৃতি এই প্রথম। এবং বিশ্বজোড়া রণাঙ্গনে ভারতবর্ষের স্থান ও অংশ ছিল,—এই ঐতিহাসিক বিবৃতি ইতিহাসের বুকে অক্ষয় হয়ে থাকল।

বক্ষ্যমাণ নিবন্ধে নেতাজীর আন্তর্জাতিক ক্রিয়াকাণ্ড ও অভিমতের পূর্ণ আলোচনা সম্ভব নয়। শুধু শেষ পর্যায়ের কয়েকটি কথা উল্লেখ করে এই প্রসঙ্গ শেষ করতে হবে।

সমগ্র দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় সেদিন নেতাজীর সমকক্ষ আর কেউ ছিল না, একথা খুব বেশি চমকাবার মত নয়; সেদিনকার বিশ্বরাজনীতির সুগভীর প্রত্যন্ত তাঁর মতো আর কারো চোখেই পরিস্ফুট হয় নি, এই কথাটিই স্মরণীয়। অত্যাধুনিক বর্তমান যে সমস্যা ও পরিস্থিতির আলোচনায় মুখর ও অতিব্যস্ত, সেই সমস্যা ও পরিস্থিতির সম্ভাবনা ১৯৪৫ সনে নেতাজীর অজ্ঞাত ছিল না।

ব্যাংকক-এর সভায় (২১শে মে, ১৯৪৫) তিনি বলেছিলেন : "এ যুদ্ধের অনেক বিস্ময়ের সঙ্গে আপনাদের পরিচয় ঘটেছে, কিন্তু আরো বড় বিস্ময় অপেক্ষাও করছে। আর সেই অনাগত বিস্ময়গুলি আমাদের শত্রুপক্ষের খুব বেশি প্রিয় বলেও মনে হবে না। আমি অনেকবার বলেছি যে, জার্মেনীর পতনের সঙ্গে সঙ্গেই সোভিয়েট রাশিয়া ও ইঙ্গ-আমেরিকার সম্পর্কের মধ্যে বিলক্ষণ ফাটল দেখা দেবে। বলা বাহুল্য সে ফাটল দেখা দিয়েওছে।

দিন যাবে আর ফাটলের মুখ বিস্তৃত হতে থাকবে। সেদিন খুব বেশি দূরে নয়, যেদিন আমাদের শত্রুরা বুঝতে পারবে যে, যেদিন আর যে-মুহূর্তে জার্মেনীর পতন হয়েছে, সেইদিন আর সেই মুহূর্তে ইয়োরোপের অভ্যন্তরে জার্মেনীর চাইতেও আর এক প্রবলতর শক্তির প্রবেশ-পথ তারা উন্মুক্তও করে দিয়েছে। সেই শক্তি সোভিয়েট রাশিয়া। জার্মেনীর চাইতেও সোভিয়েট রাশিয়া ইঙ্গ-ইয়াঙ্কি সাম্রাজ্যবাদের বৃহত্তর শত্রু, একথাটা ওরা জানত না। অস্থায়ী আজাদ হিন্দ সরকার ক্রমবর্ধমান আন্তর্জাতিক ঘটনাপ্রবাহ লক্ষ্য করে চলেছে; এবং সময় ও সুযোগ মতো তার সদ্ব্যবহার করতে তারা ভুলবে না। আমাদের বৈদেশিক নীতির মৌল সিদ্ধান্ত একটিই এবং তা এই : বৃটেনের শত্রুই ভারতের বন্ধু।

"আমরা জানি যে, জার্মেনী ছিল সোভিয়েট রাশিয়া ও ইঙ্গ-আমেরিকার সাধারণ শত্রু (common enemy)। কিন্তু একথাও আমরা বিলক্ষণ জানি যে, সোভিয়েট রাশিয়ার যুদ্ধের নীতি ও কারণ ইঙ্গ-আমেরিকার নীতি ও কারণ অপেক্ষা সম্পূর্ণ পৃথক। একথা আরো পরিস্ফুট হয়ে উঠেছে সানফ্রান্সিসকো কনফারেন্সে। রাশিয়ার বৈদেশিক কমিসার মোলোটভ ভারতবর্ষ ও ফিলিপাইন-এর দুই পুতুল প্রতিনিধিকে আদৌ আমলই দেন নি। নস্যাৎ করে দিয়েছেন। ভবিষ্যতে আরো যে ব্যাপক ও গভীর সংঘাত ঘনীভূত হয়ে আসছে সোভিয়েট রাশিয়া আর ইঙ্গ-আমেরিকান গোষ্ঠীর মধ্যে, এ তারই অনাগত কিন্তু নিশ্চিত ইঙ্গিত। এই সংঘাত থাকবে এবং ক্রমশ বেড়েই যাবে। আমরাও আমাদের প্রধান শত্রু ইংরেজের অবস্থা পর্যবেক্ষণ করেই চলব।"

২৫শে মে (১৯৪৫) সিঙ্গাপুর থেকে নেতাজী যে রেডিও ভাষণ দেন, তাতে তিনি আরো পরিস্ফুট : ....."যুদ্ধোত্তর ইয়োরোপের পুনর্গঠনের নামে ইঙ্গ-আমেরিকান গোষ্ঠী উন্মুখ হয়ে উঠবে ইয়োরোপের অভ্যন্তরে প্রধান মুরুব্বির ভূমিকা অভিনয় করতে; কিন্তু সোভিয়েট রাশিয়া তা করতে দেবে না। বাধা দেবে।

"পরাজয়ের পূর্বে যুদ্ধোত্তর ইয়োরোপের জন্য জার্মেনীর একটা পরিকল্পনা ছিল। কিন্তু সে পরাজিত। আর একটি রাষ্ট্রেরও নতুন পরিকল্পনা আছে। রাশিয়ার।

"আমেরিকা চায়, যুদ্ধোত্তর পৃথিবীতে তার 'আমেরিকান শতাব্দী' চালু করতে। তার সে-চাওয়া কোনদিনই সফল হবে না। তাছাড়া ধনতন্ত্রী ও সাম্রাজ্যবাদী ইঙ্গ-আমেরিকান আদর্শ আজকের ইয়োরোপের কাম্যও নয়।

"মার্শাল স্টালিনের ওপর ইয়োরোপের দৃষ্টি আজ নিবদ্ধ। সাগ্রহে যুদ্ধোত্তর ইয়োরোপ দেখে চলবে স্টালিনের প্রতিটি পদক্ষেপ।"

এই নেতাজী। এবং নেতাজীর আন্তর্জাতিক রাজনীতিজ্ঞান। সস্তা ফেনায়িত চর্বিত-চর্বণ নয়। কিম্বা ভাবপ্রবণ উচ্ছ্বাসমাত্রও নয়। তাঁর বিশ্লেষণ বাস্তবানুগ। অভিনবত্বে সমুজ্জ্বল। প্রাজ্ঞ সিদ্ধান্তে দৃঢ়। আগামীকাল কোনদিনই তাঁর অচেনা ও অজানা ছিল না।

রণদর্শন

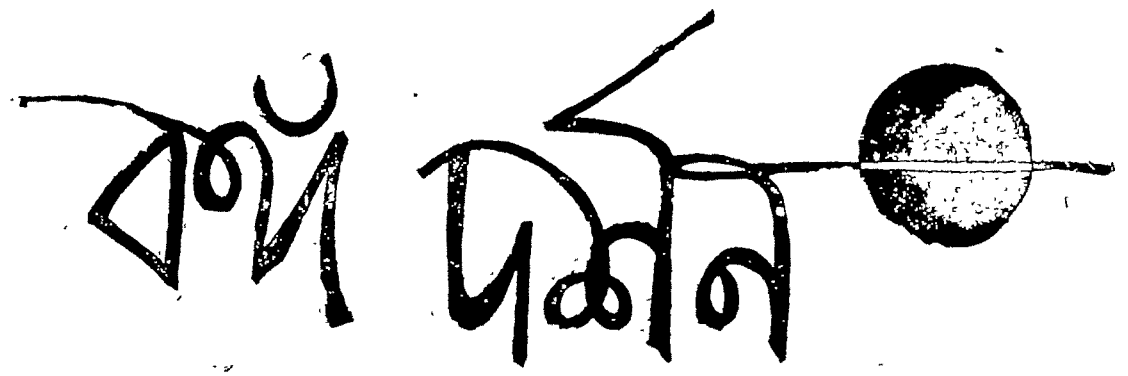

নির্বাচনী উত্তাপে বর্তমানে পশ্চিমবঙ্গ উত্তপ্ত হয়ে উঠেছে, তার প্রমাণ এখন হাতের কাছেই, জনজীবনে যে ধীরে ধীরে রীতিমত চাঞ্চল্য জেগে উঠেছে তার পরিচয় পারা পশ্চিমবঙ্গেই প্রকট। এই একটি বিষয় নিয়ে শহর ও গ্রামের কোন পার্থক্যই চোখে পড়ে না, সর্বত্রই একই উত্তেজনা, একই উত্তাপ। নেতৃবৃন্দ ঝটিকাবেগে সফর করছেন পশ্চিমবঙ্গের এ প্রান্ত থেকে ও প্রান্ত, এ ছাড়া পাড়ায় পাড়ায় চলছে নানান ধরণের প্রচার অভিযান। বিজ্ঞাপন ও পোস্টারে বোধহয় পশ্চিমবঙ্গের কোন দেওয়াল খালি নেই।

আপাতদৃষ্টিতে ভোটদাতারা একটি নির্লিপ্ততার ভান করে আছেন, যার প্রকাশ গতবারেও দেখা গিয়েছিল। পশ্চিমবঙ্গের জনসাধারণ ভারতের যে কোন অঞ্চলের তুলনায় অধিকতর রাজনীতি-সচেতন, কাজেই কার মনে কি আছে তা বাইরে থেকে বোঝবার উপায় নেই, সেটা আগামী ১৯ই ফেব্রুয়ারী পার না হলে বোঝা যাবে না। কিন্তু ঘটনাদৃষ্টে যা মনে হচ্ছে উদাসীন কেউই নন, আসন্ন মধ্যবর্তী নির্বাচনের গুরুত্ব সম্বন্ধে প্রত্যেকেই ওয়াকিবহাল, ভোটারকে একটু বেশি ধাতির করলেই যে সে কোন বিশেষ দলকে তার ভোটটা দিয়ে দেবে সেদিন অতীত হয়ে গেছে। বস্তুত নির্বাচন সম্পর্কে জনসাধারণ ভিতরে ভিতরে যে কতটা উৎসাহী, তার প্রমাণ আমাদের সাপ্তাহিক বসুমতীর গত সপ্তাহের বিশেষ নির্বাচন সংখ্যাটির রেকর্ড পরিমাণ বিক্রয়।

তথাপি জনসাধারণ মনের কথা খুলে না বললেও, তাঁদের সঙ্গে মেলামেশা করে কিছুটা ইঙ্গিত অন্তত পাওয়া যায়। সাপ্তাহিক বসুমতীর রাজনৈতিক পর্যবেক্ষকগণ বহু স্থানেই অনুসন্ধান চালিয়ে অবস্থার কিছু কিছু পরিচয় সংগ্রহ করতে পেরেছেন, যার আভাস আমরা বর্তমান নিবন্ধে দেবার চেষ্টা করব। একটা বিষয়ে আমাদের সকল পর্যবেক্ষকগণই একমত যে, এবারকার নির্বাচনে কংগ্রেস ও যুক্তফ্রন্ট ছাড়া অবশিষ্ট দলগুলির কোন আশাই নেই। হুমায়ুন কবির সাহেব সদর্পে বলেছিলেন যে, নভেম্বরে নির্বাচন হলে তাঁরা আশীটা কেন্দ্রে প্রার্থী দিয়ে ষাটটি কেন্দ্রে জয়লাভ করবেন, ফেব্রুয়ারীতে নির্বাচন হলে আরও বেশি আসনে প্রার্থী দিয়ে আরও বেশি কেন্দ্রে জয়লাভ করবেন। কিন্তু এ যে বাগাড়ম্বর, সে কথা ইতিমধ্যেই প্রমাণিত হয়ে গেছে, প্রতিশ্রুত কেন্দ্রগুলিতে তিনি প্রার্থী দিতে পারেন নি এবং যেখানে যেখানে লোকদলের প্রার্থী দাঁড়িয়েছেন, দু-একটি কেন্দ্র ছাড়া, তাঁদের নামও কেউ জানে না, জানাবার চেষ্টাও যে হয়েছে তারও কোন নিদর্শন নেই। অনুরূপ অবস্থা আশু ঘোষের আই-এন-ডি-এফ-এরও। আমাদের চুঁচুড়াস্থ সংবাদদাতা জানাচ্ছেন যে, সেখানে আই-এন-ডি-এফ-এর একজন প্রার্থীর নাম সংবাদপত্রে ঘোষিত হয়েছে বটে, কিন্তু কোন দেওয়ালেই সেই প্রার্থীর নাম নেই, একটা জনসভা পর্যন্ত কেউ করেন নি। একই অবস্থা অপরাপর দলগুলিরও। অথচ এঁদের কর্মকর্তারা দাবি করেন যে, তাঁরাই নাকি আগামী আইনসভার ব্যালান্সিং ফোর্স হবেন। বস্তুত এঁদের কোনই আশা নেই, কিছু ভোট ভাঙানো ছাড়া আর কিছুই এই দলগুলির দ্বারা সম্ভবপর হবে না, চার-পাঁচ জন হয়ত ব্যক্তিগত প্রচেষ্টায় বিধানসভায় আসতে পারেন দশটি দলের থেকে। তবে এই সব দলের মধ্যে কেউ কেউ নিছক সাম্প্রদায়িকতাকে পুঁজি করে নির্বাচন-বৈতরণী পার হবার দুরাশা এখনো পর্যন্ত পোষণ করছেন, কিন্তু পশ্চিমবঙ্গের মাটিতে ওই শ্লোগানে কোন কাজ হবে বলে মনে হয় না।

কংগ্রেস-যুক্তফ্রন্টের মূল লড়াই অবশ্য রাজনৈতিক লড়াই-এ পরিণত হয়েছে। এ লড়াই কংগ্রেসের পক্ষে যেন অস্তিত্ব রক্ষার লড়াই, কেন না এই নির্বাচনে কংগ্রেসের পরাজয় ঘটলে তার প্রভাব ভারতের আগামী দিনের রাজনীতির ওপর গভীর প্রভাব বিস্তার করবে। সর্বভারতীয় পরিস্থিতি তখন হয়ত পরিবর্তিত হয়ে যাবে। এবারের নির্বাচনী যুদ্ধে কংগ্রেসের ভূমিকা যেন আত্মরক্ষামূলক। বিভিন্ন নেতাদের যে সব বক্তৃতা সংবাদপত্রে প্রকাশিত হচ্ছে তা থেকে অনায়াসেই এই সিদ্ধান্তে আসা চলতে পারে। এবারের নির্বাচনী প্রচারে কংগ্রেস স্থায়ী সরকারের শ্লোগান দিচ্ছে। এ ছাড়া যুক্তফ্রন্টের ন মাস শাসনের সমালোচনাও এবারে কংগ্রেসী প্রচারের মূলধন হয়েছে। কিন্তু এ দৃষ্টিভঙ্গী নেগেটিভ, যুক্তফ্রন্টের শাসনকালের নিন্দা এবং স্থায়ী সরকারের প্রতিশ্রুতি জনমনে কতদূর প্রভাব বিস্তার করবে এ কথা বলা কঠিন। মনে রাখতে হবে গত নির্বাচনে জনসাধারণ যে কংগ্রেসকে পরাজিত করেছিল, তার পিছনে আসল কারণই হচ্ছে যে গত বিশ বছরে কংগ্রেস জনসাধারণের আশা-আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ করতে পারে নি। যদি ধরেও নেওয়া যায় যে, যুক্তফ্রন্টের ওপর জনসাধারণ আস্থা হারিয়েছে, তাহলেও সেই হারানো আস্থা যাতে কংগ্রেসের ওপর ফিরে আসে, এমন কোন পজিটিভ প্রোগ্রাম কি কংগ্রেসী নেতাদের নির্বাচনী বক্তৃতাসমূহে প্রকাশ পাচ্ছে? ঠিক এই কথা বলেই যুক্তফ্রন্টের নেতারা কংগ্রেসী নেতাদের বক্তব্যগুলিকে সহজেই খণ্ডন করছেন। যদি আগামী নির্বাচনে কংগ্রেসের পরাজয় হয় তার একটা বড় কারণ হবে এই ভ্রান্ত নির্বাচনী রণ-নীতি। পক্ষান্তরে যুক্তফ্রন্টের নেতাদের কাছে এই সমস্যাটা প্রবল নয়, কেন না তাঁরা কংগ্রেসী চক্রান্তের কথা বলে তাঁদের বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগগুলিকে খণ্ডন করছেন, এ ছাড়া পুনরায় ক্ষমতার অধিকারী হলে তাঁরা কি কি কাজ করবেন সে বিষয়ে সুস্পষ্ট বক্তব্য রাখছেন।

এবারের মধ্যবর্তী নির্বাচনের আরও একটি বড় বৈশিষ্ট্য হল যে, এই উপলক্ষে পশ্চিমবঙ্গে সর্বভারতীয় নেতারা হরদম পশ্চিমবঙ্গে যাওয়া-আসা করছেন। প্রধান-মন্ত্রী, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী কেউই বাকি নেই। কিন্তু এই উপলক্ষে এমন কয়েকটি বিষয় ঘটেছে, যা যুক্তফ্রন্টের হাতে প্রচারের একটা

নির্বাচনী উত্তাপে সারা পশ্চিমবঙ্গ উত্তপ্ত হয়ে উঠেছে

লাঘাতিক অস্ত্র তুলে দিয়েছে। কেন্দ্রীয় মন্ত্রিবর্গ যখন নির্বাচনের জন্য কোন বিশেষ জায়গায় যান, তা নিঃসন্দেহে দলীয় প্রয়োজনে। রাজ্য সরকার এঁদের নিরাপত্তাটুকু দেখতে পারেন, সেই হিসাবে সঙ্গে পুলিশ দিতে পারেন, কিন্তু নেতাদের নির্বাচনী সফরের ব্যয়ভার নিশ্চয়ই বহন করতে পারেন না। কিন্তু এখানে তাই ঘটেছে। সংবাদে প্রকাশ যে, প্রধানমন্ত্রী-স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী প্রমুখের নির্বাচনী সফরের জন্য পরিবহনের যা কিছু ব্যয় তা রাজ্য সরকার নির্বাহ করছেন, এবং রাজ্য সরকারও তা স্বীকার করেছেন। এখন যখন পশ্চিমবঙ্গে রাষ্ট্রপতির শাসন চলেছে, এবং সব বিভিন্ন দল নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় অবতীর্ণ হয়েছেন, এই রকম অবস্থায় একটি বিশেষ দলকে এইভাবে সুবিধা করে দেওয়াটা নিশ্চয়ই রাজ্য সরকারের পক্ষে পক্ষপাতমূলক কাজকর্মের পর্যায়ে পড়বে।

এম. ডি পরীক্ষা প্রসঙ্গে

কিছুকাল আগে আমরা একবার এম ডি পরীক্ষা সম্পর্কে বঙ্গদর্শনে একটি মন্তব্য প্রকাশ করেছিলাম। এর পর অবশ্য আমাদের তরফ থেকে এই বিষয় নিয়ে আর কোন আলোচনা করা হয় নি। আমাদের মন্তব্যটি প্রকাশিত হবার পর এম, ডি পাশ করা এবং এম, ডি পরীক্ষার্থীর একটি দল আমাদের বক্তব্যের প্রতিবাদে পর পর কয়েকটি পত্র পাঠান, যা পাঠকমনে ইতিপূর্বে প্রকাশিত হয়েছে। প্রত্যেকেরই নিজস্ব বক্তব্য পেশ করার নিশ্চয়ই অধিকার আছে এবং সেই হিসাবে আমরা তাঁদের পর্যাপ্ত সুযোগই বরাবর দিয়ে এসেছি, আশা করি তাঁরা নিশ্চয়ই এ কথাটাকে অস্বীকার করবেন না। কিন্তু তাঁরা বক্তব্য প্রকাশ করেই ক্ষান্ত হন নি, আমাদের বক্তব্যের সূত্রগুলি জানার জন্য তাঁরা ইনসিস্ট করতে থাকেন, শুধু তাই নয়, এককভাবে অথবা দলবদ্ধভাবে তাঁরা মাঝে মাঝে এখানে হামলাও করেছেন, টেলিফোনে কেউ কেউ আমাদের শাসিয়েছেন। সর্বাপেক্ষা পরিতাপের বিষয় হল, কয়েকজন বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক আমাদের কাছে অভিযোগ করেছেন যে, তাঁরা আমাদের তথ্য জুগিয়েছেন এই সন্দেহে তাঁদের অত্যন্ত বিরক্ত এবং বিব্রত করা হচ্ছে। একজন বিশেষজ্ঞ জানিয়েছেন যে, তাঁকে তথ্য সরবরাহকারী সন্দেহ করে টেলিফোনে রীতিমত শাসানি দেওয়া হয়েছে। আমরা নিশ্চয়ই একথা বলব না যে, এই সব কাজগুলি আমাদের পত্রদাতাদের ওই গ্রুপটিই করছেন, তবে এ রকম ব্যাপার কার্যত ঘটছে বলেই তার উল্লেখ এখানে অনিচ্ছাসত্ত্বেও করতে হল। এরও কয়েকটি কারণ আছে। আগেই বলেছি, এম. ডি পরীক্ষার বিষয়ে আমরা মন্তব্য করেছি মাত্র একবার। পত্রলেখকদের এটা বোঝা উচিত ছিল যে, বক্তব্য প্রকাশের অধিকারটা তাঁদেরই একচেটিয়া নয়, তাঁরা যা বলবেন, দল বেঁধে বলছেন বলেই যে

তা সত্য হবে তারও কোন অর্থ নেই। তাঁদের মতের বিরুদ্ধে আমাদের মতের পক্ষেও যে অনেক লোক আছেন এবং তাঁরাও পাল্টা পত্রাঘাত করবেন এবং তাঁদের সে অধিকারও আছে, এ কথাটা তাঁদের খেয়াল রাখা উচিত ছিল, কিন্তু কার্যত তাঁরা তা রাখেন নি। আমাদের বক্তব্যের সমর্থনে যখন রাশি রাশি পত্র প্রকাশিত হতে লাগল, তখনই তাঁরা প্রমাদ গণলেন। তাঁরা ভুলে গেলেন যে, তাঁদের বক্তব্যের বিরুদ্ধে কিছু পত্র প্রকাশিত হচ্ছে। তাঁদের সাধ্যে কুলোলে এই সব পত্রে প্রকাশিত বক্তব্যগুলিকে খণ্ডন করে তাঁরা পাল্টা চিঠি লিখতে পারতেন এবং তা প্রকাশিত হতেও কোন বাধা ছিল না, কিন্তু এই সরল পথে না গিয়ে তাঁরা উল্টে আমাদেরই উদ্দেশ্যে একটি অত্যন্ত কুরুচিপূর্ণ, অশিষ্ট ও অর্থহীন পত্র দিয়ে গেলেন, যা ছাপার অক্ষরে প্রকাশেরও অযোগ্য। সেই পত্রে আমাদের ফীচারের নাম বঙ্গ-দর্শনের বদলে পুত্রদর্শন রাখার উপদেশ দেওয়া হল এবং পত্রের বাকি অংশে আমাদের উদ্দেশ্যে গালিগালাজ করা হল। সেই পত্রের ভাব ও ভাষা দুই-ই এম ডি পরীক্ষার্থী বা এম ডি পাশের যোগ্য নয়; তদুপরি আমাদের নিকট পূর্বে প্রদত্ত পত্রগুলির স্বাক্ষরসমূহ এবং পৃথক-ভাবে আমাদের নিকটে প্রদত্ত ওঁদেরই দলের কয়েকজন চিকিৎসকের স্বাক্ষরের সঙ্গে, বর্তমান পত্রটির স্বাক্ষরগুলি মিলিয়ে দেখা গেল যে কয়েকটি স্বাক্ষরই জাল। কাজেই এ থেকেই এই সিদ্ধান্তে আসা যায় যে, পত্রদাতাদের যে গ্রুপটি আমাদের নিকট আমাদের প্রদত্ত সংবাদের সূত্র জানার জন্য ইনসিস্ট করেছেন, তাঁদেরই দলের লোকেরা শুধু আমাদেরই বিরক্ত করেন নি, বিশিষ্ট বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকদের ওপরেও হামলা করেছেন। এত কথার অবতারণা এই কারণেই করতে হল। কিন্তু পত্রদাতাদের ওই বিশেষ গ্রুপটির এটা স্মরণে রাখা প্রয়োজন যে, এই পল্থার আশ্রয়ে তাঁরা নিজের পায়ের তলায় মাটি ঠিক রাখতে পারবেন না। আমাদের অনুসন্ধানের ফলে ইতিমধ্যেই বহু তথ্যের নিদর্শন আমরা সংগ্রহ করেছি এবং যথাকালে তা প্রকাশিত হবে।

গঙ্গাসাগরে দুর্ঘটনা

প্রতি বছরের মত এবারেও গঙ্গাসাগরে তীর্থযাত্রার অভিলাষে বহু পুণ্যার্থী সমাগম ঘটেছিল, কিন্তু এবারের তীর্থ-যাত্রার সঙ্গে এমন একটি বিষাদময় কাহিনী যুক্ত হয়ে গেল যা অনেকেরই বহুদিন স্মরণে থাকবে। কয়েকশত তীর্থযাত্রী এবার গঙ্গাসাগরের বলি হয়েছেন। বলা বাহুল্য এঁরা কেউই নিজেদের প্রাণকে মানত করে আসেন নি। ভারতের বিভিন্ন জায়গা থেকে এঁরা এসেছিলেন সাগর-সঙ্গমে, কিন্তু কয়েকজন ব্যক্তির লোভের জন্য এতগুলি অমূল্য প্রাণের অন্ত হল। প্রাণহানি হয়েছে নৌকাডুবি আর লঞ্চডুবির ফলে। নদী মোটেই উগ্র বা ভীষণ ছিল না, আবহাওয়ারও কোন দোষ ছিল না, দোষ ছিল কতিপয় মানুষের যারা অতি অর্থলোভে মাত্রাধিক যাত্রী লঞ্চে বোঝাই করেছিল। প্রয়াগ বা গঙ্গাসাগর এই রকম সর্বভারতীয় মেলাগুলির ক্ষেত্রে রাজ্য সরকারগুলির কিছু ভূমিকা থাকে বলে আমরা জানি। প্রতিবারেই গঙ্গাসাগর মেলায় রাজ্য সরকারের তরফ থেকে দেখা-শোনা করা হয়। এ ছাড়া কোন নৌকা বা লঞ্চ অতিরিক্ত যাত্রী বহন করছে কি না সে বিষয়েও নজর রাখা রাজ্য সরকারেরই কাজ। কিন্তু দেখা যাচ্ছে এ ক্ষেত্রে রাজ্য সরকারের কোন ব্যবস্থাই ছিল না, জল-পুলিশও যথাযোগ্য কাজ করে নি। তা করলে নিশ্চয়ই মাত্রাধিক যাত্রী বোঝাই লঞ্চওয়ালাকে তাঁরা পাকড়াও করতেন এবং পুলিশী সতর্কতা থাকলে লঞ্চের মালিকও এত বেশি যাত্রী তুলতে সাহস করত না। শেষ পর্যন্ত ব্যাপারটি তাই প্রশাসনিক অযোগ্যতার ক্ষেত্রে গিয়েই দাঁড়াচ্ছে। মেলার ব্যবস্থাপনাতেও প্রচুর গোলমাল ছিল বলে রিপোর্ট এসেছে, যা আগের বছরগুলির তুলনায় অনেক বেশি। তাহলে কি এই সিদ্ধান্তই করতে হবে যে, রাজ্যপালের আমলে অযোগ্যতারই সমধিক বিকাশলাভ ঘটেছে? নিহত যাত্রীদের পরিজনদের নিকট আমরা আমাদের শোক জ্ঞাপন করছি, এবং এই সঙ্গে এটাও আশা করব যে, আগামী বছরগুলিতে যেন এই রকম প্রশাসনিক নিষ্ক্রিয়তার জন্য কোন দুর্ঘটনা না ঘটে।

নতুন আকর্ষণ

চিত্রশিল্পীদের সৃষ্টি ও তাঁদের ভূমিকা অবলম্বনে আগামী সংখ্যায় 'চিত্রলেখা' নামে একটি নতুন বিভাগ সাপ্তাহিক বসুমতীতে থাকছে। এই বিভাগটি সম্পাদনা করবেন প্রখ্যাত চিত্রশিল্পী শ্রীদেবব্রত মুখোপাধ্যায়।

২৩শে জানুয়ারী

নেতাজীর পুণ্য জন্মোৎসবের দিন-টিতেই এ সপ্তাহের সাপ্তাহিক বসুমতী প্রকাশিত হচ্ছে। বাঙালীর তথা ভারত-বাসীর যিনি একান্তই অতি আপনজন, সমগ্র জাতির পৌরুষের প্রকাশ যে নেতাজী তাঁর জন্মদিনটি যে দেশের জাতীয় উৎসবের দিনে পরিণত হবে এবং হয়েছে এ তো অতি স্বাভাবিক কথা। আজকের এই বন্ধ্যা নেতৃত্বের যুগে দেশবাসী যখন একান্তই অসহায়, আজ স্বাধীনতার বাইশ বছরেও যখন পিছিয়ে থাকা মানুষদের জীবনযন্ত্রণার বিন্দুমাত্র লাঘব হয় নি আজ দেশের যুবশক্তির যখন পরিচালনার অভাবে সম্পূর্ণ অপচয় ঘটছে, অর্থনৈতিক কাঠামো দেশে যখন একেবারেই বিপর্যস্ত, নৈতিক সকল মূল্যমান যখন ভেঙে পড়েছে, কৃষক-শ্রমিক-নিম্নমধ্যবিত্তের যখন নাভিশ্বাস ওঠার অবস্থা হয়েছে, রাজনীতি যখন দলভাঙানো কুটনীতিতে পর্যবসিত, তখন নেতাজীর মত পুরুষসিংহের কথা দেশ-বাসীর স্বাভাবিক নিয়মেই মনে পড়বে, যিনি অন্যায়ের নিকট, অত্যাচারের নিকট, দাসত্বের নিকট, সুবিধাবাদের নিকট কখনো আত্মসমর্পণ করেন নি, যিনি রাজনীতির ছদ্মবেশে সুবিধাবাদী আচরণ করেন নি, শাসকের অত্যাচার যিনি সগৌরবে সহ্য করেছেন, যাঁর শৃঙ্খলে যিনি দেশের মুক্তির স্বপ্ন দেখেছেন, যে স্বপ্ন সার্থক করার জন্য জীবনপণ করেছেন, সে কাহিনী আজ ইতিহাসে স্বর্ণাক্ষরে রচিত হয়েছে। আজ বাইশ বছর ধরে জীবনের সর্ব পর্যায়ে ভারতের যে ব্যর্থতা তার মূল কারণ নেতৃত্বের ব্যর্থতা। তা না হলে বাইশ বছরে সুযোগ বড় কম আসে নি অথচ বর্তমান নেতৃত্ব দেশবাসীর প্রাণে সাড়া জাগাতে পারে নি কেন? নেতা হিসাবে সুভাষচন্দ্র ছিলেন ভিন্ন ধাতুতে গড়া, তাঁর সমকালীনদের দেয় তাঁর উপাদানগুলি ছিল অনেক দৃঢ়, ভারতবাসী এই রকম নেতৃত্বের-পুনরভ্যুদয় দেখতে চায়, আর তা চায় বলেই নেতাজীকে মৃত বলে মনে করতে মন সরে না। জয়তু নেতাজী।

ভারত দর্শন

নেতাজী সুভাষচন্দ্র

যদিও নেতাজীর পর আর 'সুভাষচন্দ্র' লিখতে হয় না, কারণ ভারতবর্ষ একজনকেই 'নেতাজী' বলে মেনে নিয়েছে, ভারতীয় নেতাদের তরফে সুভাষচন্দ্রকে এড়িয়ে যাওয়ার প্রভূত প্রচেষ্টা সত্ত্বেও।

স্বামীজী যেমন, গুরুদেব যেমন নেতাজীও তেমনি জনগণের শ্রদ্ধা এবং ভালবাসার দেওয়া শ্রদ্ধাসূচক শব্দের দ্বারাই পরিচিত। ইতিহাসও ঐ শব্দত্রয়ের দ্বারাই তাঁদের ব্যক্তিত্বের ব্যাখ্যা করবে। দেশবন্ধু কিম্বা বিদ্যাসাগর এঁদেরও নামে আর কোন প্রয়োজন নেই। ওঁরা নামকে অতিক্রম করে নামাতীত; কালকে অতিক্রম করে কালাতীত ভাবনার রূপক হয়েছেন।

তবু নেতাজীর সঙ্গে সুভাষচন্দ্রকে সংযুক্ত করেই আমার এই সশ্রদ্ধ বাৎসরিক আলোচনার শিরোনামাঙ্কন করতে হল। কেন না যিনিই নেতাজী, তিনিই সুভাষচন্দ্র নন এবং যিনিই সুভাষচন্দ্র তিনিই নেতাজী নন। দুই শব্দ একই ব্যক্তির মহান জীবনকে দুইভাবে আমাদের সামনে তুলে ধরে। অথচ ও দুয়ের মাঝে কোনোখানে কোন অমিল ছিল না। আমাদের বোধ ও বুদ্ধির দোষে, আমাদের মনান্তর ও মতান্তরের জন্য আমরা একজনকে দেশান্তরী করেছিলাম অপরজনকে স্বর্ণসীতার মতো মূর্তি গড়ে সাজিয়ে রেখেছি ও রাখছি।

একজনকে হরিপুরার পর ত্রিপুরী কংগ্রেস থেকে জোট বেঁধে তাড়িয়ে আমরা তদানীন্তন ভারতবর্ষ থেকে বিপ্লবের স্ফুলিঙ্গকে সমবেত ফুৎকারে নিভিয়ে দেওয়ার ব্যর্থ প্রয়াস পেয়েছিলাম,—তিনি সুভাষচন্দ্র। অপরজনকে সময়কালে বিদেশী প্রবোচনার ছলে অবিশ্বাস করে দূরে ঠেলে রেখে অবশেষে তাঁকেই একমাত্র নেতাজী বলে বরণ করে নিতে একরকম বাধ্য হয়েছিলাম, কারণ কোটি কোটি মানুষের শ্রদ্ধা ও ভাবাবেগকে তখন আর ঠেকিয়ে রাখা সম্ভব হয় নি। সমুদ্রের মতো জনতা ভেঙে পড়েছিল। বিতাড়িত সুভাষচন্দ্র আর ফিরে আসেন নি। ফিরে এসেছিলেন নেতাজী প্রতিকৃতি মূর্তি ও কীর্তির অবলম্বনে।

জনসমুদ্রের কল্লোলিত রূপ, তার সেই বিরাট ব্যাপ্তি দেখে সুভাষচন্দ্র-বিরোধী এবং সুভাষ-ব্যক্তিত্বে ঈর্ষান্বিত ভারতীয় নেতারাও নেতাজীকীর্তনে নেমে পড়েছিলেন। ভারতের হৃদয়ে যে শ্রদ্ধা ছিল তাকে অবমাননা করার দুঃসাহস তখন আর কোনও নেতৃত্বাকাঙ্ক্ষী পুরুষের ছিল না। তাই স্রোতের মুখে অসহায় কুটোর মতো তাঁরাও নেতাজী নামকীর্তনে ঝাঁপ দিয়ে কোনরকমে জনপ্রিয়তা বা পপুলারিটি বজায় রাখবার অভূতপূর্ব কসরৎ দেখিয়েছিলেন, যদিও উন্মুক্ত তরবারি হাতে কিম্বা স্ফুটিত বন্দুক-গুলীর দ্বারা সুভাষচন্দ্রের সঙ্গে মোলাকাতের বাসনা তৎপূর্বে বিশিষ্ট ভারতীয় নেতাই প্রকাশ করে ফেলেছিলেন। মুস্কিল হয়েছিল এই যে, ব্রিটিশের অপপ্রচারের আড়ালে এবং ব্রিটিশের ক্ষমতার ছায়ায় সুভাষচন্দ্রকে উন্মুক্ত তরবারির মুখে আলিঙ্গন করার ইচ্ছা প্রকাশের সেই দুর্দান্ত সাহস, আই এন-এ ট্রায়ালের সময় পুনশ্চ প্রকাশের দুঃসাহস হওয়ার সুযোগ পায় নি। ফলে না যে রাজনীতি সুভাষচন্দ্রকে বিপদসঙ্কুল দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের অন্তস্তলে শূন্যহাতে নিক্ষিপ্ত করেছিল, সে রাজনীতি তখন উদ্বেলিত গণ-আবেগের মুখে পর্যুদস্ত হয়ে গেছে। রাজনীতিক হিসেবে কাজে কাজেই হাওয়া বুঝে তৎক্ষণাৎ ভোল পাল্টাতে হয়েছিল সুভাষ-বিরোধী নেতৃত্বকে। চতুর সেই রাজনীতি অবশ্যই জানত নেতাজী নিয়ে ভারতবর্ষের এই মাতামাতিও অত্যন্ত স্বল্পজীবী ক্ষণস্থায়ী উত্তেজনা, কালস্রোতে বিস্মরণশীল জনগণ তাদের প্রিয় নেতাজীকে নিশ্চয়ই ভুলবে। তখন তাবৎ নেতাকুলের আবার নিজমূর্তি ধারণ করার পথ কেউ আগলাবে না।

ধন্যবাদ সেই দূরদৃষ্টিসম্পন্ন রাজনীতিকে, ভুল হয় নি এক চুলে। নেতাজীকে আমরা ভুলেছি, সুভাষচন্দ্রের কোন আবেদনই আর আমাদের কাছে নেই। নেতাজী সম্পর্কে একটি নরম কোণ (সফট কর্নার) অধুনা একমাত্র বাংলা দেশেই তেল ফুরনো প্রদীপের সলতের মতো টিম টিম করে জ্বলছে। তবে তাও প্রায় নিভু নিভু। নেতাজী সম্পর্কে আজ আবার সেই 'চাপা দে' 'চাপা দে' ভাব। তামাম ভারতবর্ষে তাঁর কথা প্রায় চাপা পড়েই এসেছে, বাংলা দেশেই এখনও যা তেইশে জানুয়ারী দ্বিপ্রহরে কলকাতা শহরে শাঁখ বাজে, শোভাযাত্রা বের হয়। শ্যামবাজার পাঁচমাথার মোড়ে বহুকাল পর নেতাজীর একটি বীরত্বব্যঞ্জক মূর্তি (ডি আই পি রোড খুলে গেছে ইতিমধ্যে—সুতরাং.....) স্থাপনা করে তেইশে জানুয়ারী তা প্রদর্শন করা হবে। শ্যামবাজার পাঁচমাথার মোড় যেখানে পুলিশশোভিত ছিল সেখানে ঘোড়ার পিঠে নেতাজীর মূর্তিকে বসিয়ে অধিকতর শোভাবর্ধন হবে সন্দেহ নেই; কিন্তু তদ্দ্বারা একথা প্রমাণ করা যাবে না যে নেতাজীকে আমরা মনে রেখেছি।

ভারত যেদিন দ্বিধাবিভক্ত হয়েছিল কেবলমাত্র ক্ষমতা হস্তান্তরের জন্য, নেতাজীকে সেদিন আমরা প্রথম আঘাত করেছি। নেতাজী ছিলেন ঐক্য ও সংহতির প্রতীকস্বরূপ। তাঁর আহ্বানে জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে (সঙ্কীর্ণ প্রাদেশিকতা তো কোন ছার) সর্বস্ব ত্যাগ করে ভারতীয় স্বাধীনতা সেনা তেরঙ্গা পতাকার তলায় মিলিত হয়েছিল চোখে অখণ্ড মুক্ত ভারত রচনার স্বপ্ন নিয়ে। দ্বিধা বিখণ্ড ভারত ভিড়ি মেরে সে স্বপ্ন চুরমার করে দিয়েছিল।

নেতাজীর বাণী ছিল, তুমি আমাকে রক্ত দাও, আমি তোমাকে স্বাধীনতা দেব। ভারতবর্ষ বহু রক্ত নিয়ে অকাতরে হোলি খেলেছে। সাম্প্রদায়িকতার হোলি, কিন্তু রক্ত দান করতে পারে নি। পৌরুষসিংহকে বিদায় করে কাপুরুষের মতো বারম্বার রক্তের হোলি উৎসবে মেতে আমরা প্রতিষ্ঠা করতে পেরেছি, কাওয়ার্ডস ডাই মেনি টাইমস—প্রবন্ধটির অন্তর্নিহিত সত্যকে।

হিপোক্রিশি এবং দুর্নীতির বিরুদ্ধেই ছিল সুভাষচন্দ্রের সর্বহীন সংগ্রাম। নেতাজী সুভাষচন্দ্রের সেই স্বপ্ন ও সাধনাকে হাসতে হাসতে লাঞ্ছিত করেছি আমরা জীবনের প্রতিটি স্তরে সুনিপুণ হিপোক্রিশি এবং দুর্নীতির আবাদ করে। দোসরা নেতৃত্ব আমাদের অন্যতর

উত্তরাধিকারে সম্পদশালী করে যেতে পারে নি, পারছে না।

ভারতে পশ্চিমবঙ্গ ছাড়া নেতাজীকে বৎসরান্তে স্মরণের উৎসাহেও মন্দা পড়েছে। এ কোন ভয়ঙ্কর প্রাদেশিকতা কি না জানি না (নেতাজীকে নিয়ে প্রাদেশিকতা!) কিন্তু এ-ও লক্ষ্য করা যাচ্ছে যে ফেইশে জানুয়ারী অন্যান্য স্থানের দৈনিক পত্র-পত্রিকাগুলি নেতাজীর একটি এক কলমের ছবি কিম্বা তাঁর প্রতি কয়েক সি এম-এর শ্রদ্ধাঞ্জলিও চোখে পড়ে না। বাস্তবিক এই বিচিত্র দেশ ও দেশবাসীর মধ্যে নেতাজীর মতো এক মহান সর্বত্যাগী মুক্তিপিপাসু ব্যক্তিত্বের আবির্ভাবই একটি অত্যাশ্চর্য দুর্ঘটনা। তাঁর সেই মহত্ত্বের দ্যুতিকে সহ্য করার ক্ষমতা আমাদের ছিল না, নেই-ও। আমাদের মধ্যকার দারিদ্র্য তাই তাঁর প্রতি অত নিষ্ঠুর রকম ঈর্ষাপরায়ণতা আজও জীইয়ে রেখেছে।

আমরা নেতাজীকে এবং সুভাষ-চন্দ্রকে মূর্তি ও প্রতিকৃতির মধ্যে বাঁধতে পেরে হয়ত মনে মনে স্বস্তির নিশ্বাসই ফেলছি এবং নেতাজীও আমাদের বিষনিশ্বাসের থেকে তফাতে থেকেই মহত্তে অমর হয়ে গেছেন।

আর যেই চান, আমি চাই না, নেতাজী আবার ফিরে আসুন—এই, আমাদের মধ্যে, এই অযোগ্যের সভায়।

রাজনৈতিক হত্যা

গান্ধীজীর পর ভারতে প্রকৃতপক্ষে কোনো রাজনৈতিক হত্যা হয় নি; কেন না গান্ধী-নেহরুর বিদায়ের সঙ্গে সঙ্গে ভারতবর্ষ থেকে চিন্তাশীল রাজনীতিও বিদায় গ্রহণ করেছে। গান্ধীজীর পরে কিছু রাজনৈতিক কর্মী হত্যা হয়েছে এবং হচ্ছে, যাকে রাজনৈতিক হত্যার মর্যাদা দান করা হলে, পুস্তক ব্যবসায়ীকে পুস্তক রচয়িতার সম্মান দেওয়ার মতো একটা মস্ত ভুল করা হয়। যে রাজনীতিতেই তার পরিপক্বতা প্রমাণ করল না, রাজনৈতিক কারণে তাকে যখন মৃত্যুবরণ করতে হয় তখন ব্যাপারটিকে না-রাজনৈতিক না-গুণ্ডামী ঘটিত, ঠিক সংজ্ঞায় ব্যাখ্যা করাই মুশকিল হয়ে পড়ে।

ইদানীং এই বিড়ম্বনা দেখা দিয়েছে। নিহত এবং হননকারী; কোন পক্ষই পাকা রাজনীতির ফসল নন, কিন্তু আখছার মারা পড়ছেন এমনই সব লোক অমনই সব অপোগণ্ডের কুঠারে। একে বরং স্রেফ জায়গীরদারি গুণ্ডামী বলাই ভাল।

দে. ত্যাপী ল' এণ্ড অর্ডারের হাম্বি-তম্বির বহু আটুনির ফস্কিকারির মধ্যে গুণ্ডাদের মোচ্ছব সুরু হয়ে গেছে। কোথাও কোথাও গুণ্ডারাজই প্রতিষ্ঠিত হয়েছে এবং হচ্ছে।

সম্প্রতি কামরাজের নির্বাচনী এলাকা নাগেরকয়েলের গুণ্ডামীর খবর পেয়েছিলাম। তারপর রাজনৈতিক গুণ্ডার চাকু-চালনার সংবাদ পাওয়া গেছে উত্তরপ্রদেশের গোরক্ষপুর জেলা থেকে।

ঐ জেলার শ্যাম দেওরিয়া নির্বাচনী এলাকায় মজদুর পরিষদের প্রার্থী শ্রীবকশিস আলি শাণিত অস্ত্রের আঘাতে নিহত হয়েছেন কিন্তু রাজনৈতিক আততায়ীর খেয়ালে। স্পষ্টতই এই ঘটনা প্রমাণ করছে যে অতি সামান্য কারণে ভারতবর্ষে একে অপরের ওপর নৃশংসভাবে ছুরি চালাতে পারেন। যেহেতু ব্যাপারটা বিধানসভার আসন-হাতানোর ন্যক্কারজনক লালসার সঙ্গে জড়িত, সেজন্য এই গুণ্ডামীকেও 'রাজনৈতিক' আখ্যা দিয়ে ভারতের গুণ্ডা রাজনীতির চেহারাটা আজ ভারতবাসী হয়ে আমাদেরই তুলে ধরতে হচ্ছে। নিহত ব্যক্তির চেয়ে শোচনীয় অবস্থা তাই আজকের জীবিত ভারতবাসীর। তার মান-মর্যাদা ঐতিহ্য কতিপয় গদিলোভীর শকুন-লালসার মাকড়ের জালে শুকিয়ে মরছে।

মধ্যবর্তী নির্বাচনের আগেই দু'-একটি রাজ্যে দলীয় কর্মীদের ওপর প্রতিপক্ষীয় গুণ্ডাবাহিনীর আক্রমণ চলেছে অবাধে। বিভিন্নস্থানে সাধারণ কর্মীরা সেই গুণ্ডামীর শিকার হচ্ছেন। বেশ বোঝা যাচ্ছে, দেশটা নিয়ে কিছু গুণ্ডা জুয়ো খেলতে সুরু করেছে, এদের রাজনৈতিক কোন আদর্শের বালাই নেই, আছে অত্যুগ্র লোভ, জায়গীরদারী অধিকারের আকাঙ্ক্ষা যে কোনো পাপ মস্তানী এবং অত্যাচারের জন্য এরা মরিয়া আর উন্মাদ হয়ে উঠেছে। বকলস-বাঁধা কুকুর হঠাৎ ছাড়া পেলে যেমন ইদানো হয়ে লোকরা খুঁজে বেড়ায়, এই গুণ্ডা রাজনীতিও তেমনি হঠাৎ অবাধ প্রশ্রয়ে উদ্যন্যতম লোকরামির মধ্যে তলিয়ে যাচ্ছে।

শ্রীবকশিস আলি মনোনয়নপত্র দাখিল করে ঘরে ফেরার মুখে নির্মমভাবে নিহত হয়েছেন।

শ্রীআলি গত নির্বাচনে স্বতন্ত্র প্রার্থী হিসেবে কংগ্রেসপ্রার্থীর কাছে মাত্র হাজার ভোটে পরাজিত হয়েছিলেন। এবার তিনি কংগ্রেসের টিকিট চেয়ে প্রত্যাখ্যাত হন।

মজদুর পরিষদের সাধারণ সম্পাদক শ্রী পি এন সুকুল রাজ্য প্রশাসনের ব্যর্থতায় দুঃখ প্রকাশ করে বলেন, কেন্দ্রীয় সরকারের উচিত নির্বাচনে প্রার্থীদের রক্ষার ব্যবস্থা করা।

বি কে ডি-র সম্পাদক বলেছেন, রাজ্য প্রশাসন যদি বিশেষ কোনও রাজনৈতিক দলকে চালের আড়ালে রাখছেন এমন বদনাম দূর করতে চান, তবে অবিলম্বে ঘাতকদের খুঁজে বার করার দায়িত্ব গ্রহণ করতে হবে তাঁদের।

জেলা প্রশাসক হত্যাকারীর সন্ধান দিতে পারেন এমন লোককে পুরস্কৃত করবেন বলে ঘোষণা করেছেন।

মাদ্রাজে নির্বাচনী সংঘর্ষে ডি এম কে কর্মীকে হত্যা এবং উত্তরপ্রদেশে শ্রীআলির প্রাণ হরণ অতি স্বল্পকালের ব্যবধানে ঘটেছে। পশ্চিমবঙ্গে এমন হানাহানি তো এখন ডাল-ভাতের মতো দৈনন্দিন 'মেনু'র অন্তর্ভুক্ত।

মধ্যবর্তী নির্বাচনের প্রাক্কালে এই ঘটনা নির্বাচনের এক অন্ধকারময় চিত্রই জনসমক্ষে হাজির করছে।

পঞ্চরাজ্যে নির্বাচন

প্রায় দুই পঞ্চমাংশ ভারতীয় নাগরিক দ্বিতীয়বার সাধারণভাবে পাঁচটি রাজ্যের বিধানসভায় সদস্য নির্বাচনের সুযোগ পাচ্ছেন ১৯৬৭-র পর পুনরায় ১৯৬৯ খৃস্টাব্দের প্রথম ভাগে। পশ্চিমবঙ্গ, বিহার, উত্তরপ্রদেশ, পাঞ্জাব ও নাগাভূমি নির্বাচনে নামছে। নাগাভূমি বিধানসভার মেয়াদ শীঘ্রই শেষ হচ্ছে বলে অন্য চার রাজ্যের সঙ্গে এখানেও নির্বাচনের আয়োজন, যদিও চরিত্রগতভাবে অন্য চার রাজ্যের সঙ্গে নাগাভূমির পার্থক্য এই যে, অস্থায়ী সরকার, মুহুর্মুহু দল-বদল এবং অনিশ্চিত রাজনৈতিক অবস্থার শেষ পরিণতিতে এখানে অন্তর্বর্তী নির্বাচন আহ্বান করা হয় নি।

নাগাভূমিতে এই প্রথম দুজন নাগা মহিলা নির্বাচনপ্রার্থী হলেন। এঁদের অন্যতমা শ্রীমতী রাণো শাইজা আবার মিঃ ফিজোর আত্মীয়া। তিনি দাঁড়াচ্ছেন মুখ্যমন্ত্রী শ্রী টি এন অঙ্গামীর বিরুদ্ধে। নাগা বিধানসভার আটত্রিশটি নির্বাচিত আসনের জন্য এবার মনোনয়নপত্র দাখিল হয়েছে একশ' একচল্লিশটি। অর্থাৎ গত নির্বাচনে যেখানে কম করে চোদ্দজন নির্বাচনপ্রার্থীর বিরুদ্ধে কোন প্রতিদ্বন্দ্বীই ছিলেন না, এবার সেখানে প্রতিদ্বন্দ্বিতাহীন নির্বাচনের সম্ভাবনা নেই।

ক্ষমতাসীন নাগা জাতীয় সঙ্ঘ চল্লিশ আসনেই প্রার্থী দিয়েছেন, যুক্তফ্রন্ট লড়ছেন মাত্র ছত্রিশ আসনে।

পাঞ্জাবের একশ' চারটি আসনের জন্য আটশত উনআশিজন পেশ করেছেন মনোনয়নপত্র। গুরুদাসপুর জেলা ব্যতীত সর্বত্রই বহুমুখী প্রতিদ্বন্দ্বিতার সম্ভাবনা। গুরুদাসপুরে কংগ্রেস ও আকালি দলের সরাসরি প্রতিদ্বন্দ্বিতা হবে।

কংগ্রেস ১০৪ আসনেই প্রার্থী দিয়েছেন। আকালি ৬০ আসনে। জনসঙ্ঘ ও সি-পি-আই প্রত্যেকে ত্রিশটি আসনে এবং সি-পি-এম প্রতি-এলাকায় সি-পি-আই এবং সি-পি-এম উভয়েই প্রার্থী দিয়েছেন যার অর্থ উভয়কেই হতাশ হতে হবে দ্বিকোণ লড়াই-এ।

পাঞ্জাবে এবার লক্ষণীয় এই যে, গত বারের চেয়ে ঢের কম মনোনয়নপত্র পেশ করা হয়েছে এইবারেই। গত সাধারণ নির্বাচনে মনোনয়নপত্রের সংখ্যা ছিল হাজার যাহাতক, এবার সেই সংখ্যা আটশ' উনআশিতে নেমে এসেছে।

শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত বাম ফ্রন্ট গঠনের জন্য কম্যুনিস্ট দল তাঁদের প্রচেষ্টার ক্ষান্ত হননি বলে সংবাদ। কিন্তু এই রচনার সময়কাল পর্যন্ত বাম জোট গঠনের কোনও খবর নেই। কম্যুনিস্ট-আকালি সমঝোতা সম্ভব হয়েছে মাত্র ৬টি আসনে। সি-পি-আই ও সি-পি-এম আসন ভাগাভাগির সংকট থেকে মুক্ত হতে পারেন নি। অর্থাৎ গত নির্বাচনে পশ্চিমবঙ্গের প্রাক মুহূর্তকালীন অবস্থা আর কি। দু'জায়গায় এস-এস-পি এবং ছয়জন স্বতন্ত্র (ইণ্ডিপেণ্ডেণ্টস্) সি-পি-আইএর সমর্থন পাবেন। কিন্তু যুক্তফ্রন্ট ভাঙার মূলে যাঁরা ছিলেন, তাঁরা যে দলেই দাঁড়ান, সি-পি-আই-এর সাফ কথা—সমগ্র শক্তি নিয়োজিত করতে হবে তাঁদের পতনের জন্য।

দলত্যাগী জ্ঞান সিং রাড়েওয়ালা এবার আকালি টিকেটে নির্বাচনপ্রার্থী।

কংগ্রেস ১০৪ আসনেই প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবে। আকালিরা একাত্তর আসনে। অবশ্য ইতিমধ্যে সমঝোতা সম্ভব হলে ওঁরা ষাটটি আসনে নিজেদের প্রার্থী রাখতে পারেন। জনসঙ্ঘ ২১ টি আসনে আকালিদের সঙ্গে সমঝোতায় এসেছেন। প্রার্থী রাখছেন ৩৮ আসনে। অন্যান্য বাম দলের সংখ্যা : সি-পি-আই—২৪। সি-পি-এম—১০। আর পি-আই—৬ এবং এস-এস-পি—২। দশজন স্বতন্ত্র প্রার্থীকে সমর্থন জানাবেন বাম মার্গীয় রাজনৈতিক দলগুলি। এঁদের মধ্যে উল্লেখ্য হলেন, দরবারা সিং, হরবনস লাল এবং রাজিন্দর সিং।

পাঞ্জাবের এ-পর্যন্ত অবস্থায় দেখা যাচ্ছে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ত্রিমুখী প্রতি-দ্বন্দ্বিতার সম্ভাবনা।

বিহার রাজ্যে শেষ পর্যন্ত বাম ফ্রন্ট গঠন করা সম্ভব হ'ল না। লোকতান্ত্রিক কংগ্রেস—পি-এস-পি—এস-এস-পি একটি জোট তৈরি হয়েছে বটে, কিন্তু তাঁরা বিভিন্ন এলাকায় একে-অপরের বিরুদ্ধে প্রার্থী রেখেছেন যা এ-পর্যন্ত প্রত্যাহৃত হয় নি।

কংগ্রেস ৩১৮ আসনেই প্রার্থী দিয়েছেন। জনসঙ্ঘের প্রার্থীসংখ্যা—৩১৫। সি-পি-আই ১৫৮, সি-পি-এম—৩০। জনতা পার্টি—১৭০। লোকতান্ত্রিক দল—১১৪। বি-সি পার্টি—২০৬, স্বতন্ত্র—৬০ এবং বি-কে-ডি—১০০। রামরাজ্য পরিষদ ও হিন্দুমহাসভা যুক্তভাবে রেখেছেন—২০০। পি-বি-আই—২০০, শোষিত দল—১৬০। ৩১৮ আসনে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নামছেন তিন হাজার প্রার্থী। অর্থাৎ বিহারে বিভিন্নমুখী প্রতিদ্বন্দ্বিতায় জমজমাট অবস্থা।

বিহারের পূর্বতন যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রিসভার মুখ্যমন্ত্রী বি-কে-ডি নেতা মহামায়াপ্রসাদ দুটি অঞ্চলে প্রার্থী। জনতা দলনেতা রামগড় রাজও মনোনয়নপত্র দাখিল করেছেন। শোষিত দলের সেই বি, পি, মণ্ডল (প্রাক্তন-মুখ্যমন্ত্রী) নির্বাচনে দাঁড়ান নি। উনি লোকসভায় নির্বাচিত সদস্য আছেন। তবে, ওনার জন্য চারদিন মুখ্যমন্ত্রীর আসন আগলে যিনি বসেছিলেন, শোষিত দলের সেই দিন-চারেকের মুখ্যমন্ত্রী (প্রাক্তন) সতীশপ্রসাদ সিং নির্বাচনপ্রার্থী হয়েছেন মুঙ্গের জেলায়। শ্রীভোলা শাস্ত্রী (প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী) দাঁড়িয়েছেন পূর্ণিয়া জেলা থেকে। এস-এস-পির কর্পূরী ঠাকুর ও রামানন্দ তেওয়ারী লড়বেন তাঁদের পুরনো অঞ্চল থেকেই, তেজপুর ও শাহপুর থেকে।

উত্তরপ্রদেশে অ-কংগ্রেসীদের মধ্যে সমঝোতার অভাবে এবং এস-এস-পি ও জনসঙ্ঘের প্রতিবন্ধকতা কংগ্রেস-বিরোধী শক্তির ভবিষ্যৎ অন্ধকার করে তুলেছে। প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী কুখ্যাত গুপ্ত ফাণ্ডের মালিক শ্রীচন্দ্রভানু গুপ্তের বিরুদ্ধে সর্বসম্মত একজন অ-কংগ্রেসী প্রতিদ্বন্দ্বী খাড়া করতে অক্ষম হলেন অ-কংগ্রেসীরা। শ্রীগুপ্ত একাধারে সরোজিনী নগর ও রাণীক্ষেত থেকে দাঁড়িয়েছেন। এস-এস-পি সর্বসম্মত প্রার্থী খাড়া করায় বাধ সাধলেন। ওঁদের নেতা রাজনারায়ণ দলীয় প্রার্থীর নাম প্রত্যাহারে অসম্মত হয়ে শ্রীগুপ্তের নির্বাচনকে সহজতর করার পক্ষে সাহায্যের বাহু প্রসারিত করে ধরলেন। শ্রীগুপ্তের বিরুদ্ধে সি-পি-আই, বি-কে-ডি ও পি-এস-পি প্রমুখ দলগুলি প্রাক্তন স্বাস্থ্যমন্ত্রী মহাবীরপ্রসাদ শ্রীবাস্তবকে স্বতন্ত্র প্রার্থী হিসেবে দাঁড়াতে সম্মত করিয়েছিলেন। কিন্তু জনসঙ্ঘের আবার শ্রীবাস্তবকে অপছন্দ। সুতরাং এস-এস-পি ও জনসঙ্ঘের যুক্ত প্রচেষ্টায় শ্রীগুপ্তের পথ পরিষ্কৃত রইল।

রাণীক্ষেতেও এস-এস-পি তার প্রার্থী দিয়েছে সরাসরি প্রতিদ্বন্দ্বিতায় শ্রীগুপ্তের বিরুদ্ধে ছিলেন বি-কে-ডির শ্রীগোবিন্দ সিং মেহরা। ইনি গত নির্বাচনে মাত্র ৭০ ভোটের ব্যবধানে সরাসরি প্রতিদ্বন্দ্বিতায় শ্রীগুপ্তের কাছে পরাজিত হন। এস-এস-পি ও মজদুর পরিষদ এই অঞ্চলে প্রার্থী না দিলে শ্রীমেহরার জয়লাভের সম্ভাবনা থাকত।

শ্রীগুপ্তের দুটি ভিন্ন এলাকা থেকে নির্বাচনপ্রার্থী হওয়াটা অনেক কংগ্রেসীর অপছন্দ। তাঁরা মনে করেন এতে কংগ্রেসের মর্যাদা হানি হয়।

উত্তরপ্রদেশে প্রার্থীর সংখ্যা গত নির্বাচনের সংখ্যাকেও ছাড়িয়ে যেতে পারে। বিভিন্ন দলের প্রার্থীসংখ্যার প্রাপ্ত সংবাদ এই রকম :

কংগ্রেস—৫৮২। বি-কে-ডি—৫৩১। জনসঙ্ঘ—৪১৪। সি-পি-আই—১১২। সি-পি-এম—২১। এস-এস-পি—৩০০। পি-এস-পি—১৪। স্বতন্ত্র—১২ এবং স্বতন্ত্র প্রার্থিগণের সংখ্যা—৪৩০।

তরুণ জননেতা পি, এন, সুকুল সরকারী চাকুরে হওয়ায় মনোনয়ন পেলেন না।

বিভিন্ন রাজ্যের প্রাক নির্বাচনী চিত্র, বলা যায়, কিছুটা অপ্রত্যাশিত। গত চতুর্থ নির্বাচনে অনড় অটল কংগ্রেসী সাম্রাজ্য টলিয়ে দিয়ে রাজ্যে রাজ্যে ক্ষণস্থায়ী যুক্তফ্রন্ট সরকার গঠিত হয়েছিল। অ-কংগ্রেসী-মহলে এই পটপরিবর্তন যে নতুন উৎসাহ ও উদ্দীপনার সূত্রপাত করবে বলে ভাবা গেছল তা কিন্তু হয় নি। অ-কংগ্রেসীরা একজোট হতে পারেন নি। অ-কংগ্রেসী মাত্রেই অবশ্য কংগ্রেসকে কোণঠাসা করে কোনঠাসা রাখতে পারেন না, আদর্শগত অসুবিধা সেখানে বিরাট বাধা। (১৮।১।৬৯)

—নির্বাচনী প্রচারে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার অপব্যবহার বন্ধই হলো গণতন্ত্রের মূল কথা।

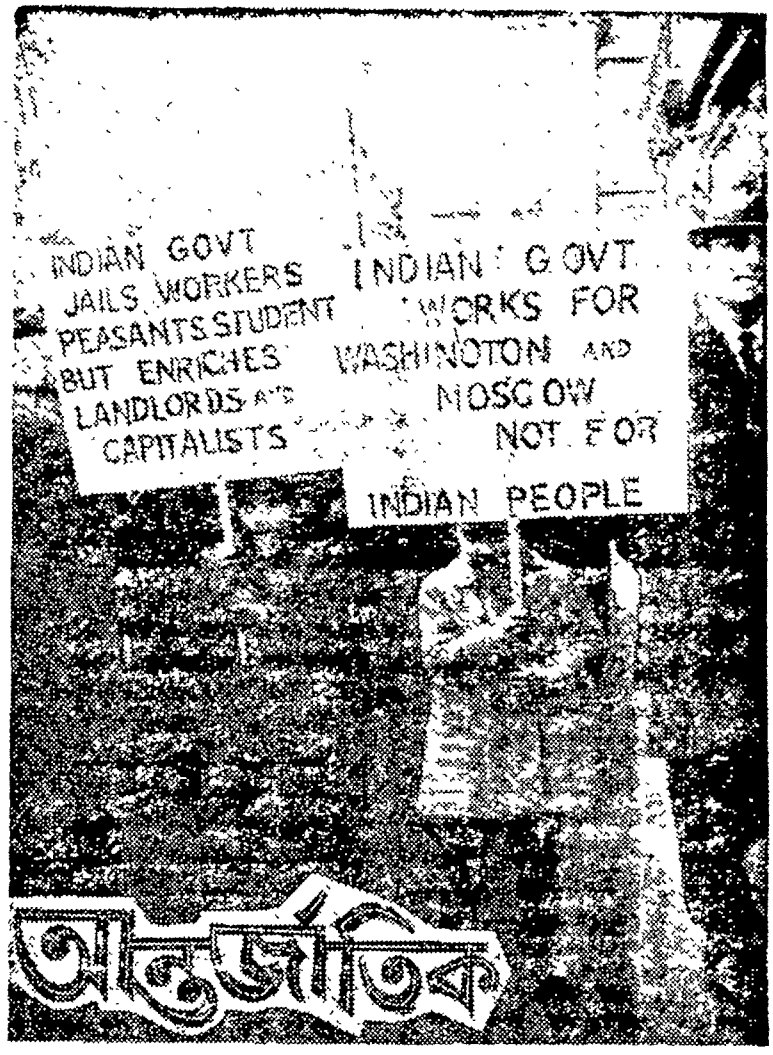

লন্ডনে কমনওয়েলথ প্রধানমন্ত্রী সম্মেলন চলাকালীন মার্লবরো হাউসের সামনে এই দু'টি কিশোর ভারত সরকারের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ প্রদর্শন করে।

দিন ধরে আলাপ-আলোচনার পর ১৫ই জানুয়ারী আনুষ্ঠানিকভাবে কমনওয়েলথ প্রধানমন্ত্রী সম্মেলনের সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়েছে। সম্মেলন শেষে প্রকাশিত এক যুক্ত ইস্তাহারে নেতৃবৃন্দ যথারীতি কমনওয়েলথের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে আশা প্রকাশ করেছেন।

৭ই জানুয়ারী লন্ডনে মার্লবরো হাউসে কমনওয়েলথ প্রধানমন্ত্রী সম্মেলন শুরু হয়েছিল। কমনওয়েলথভুক্ত মোট ২৮টি দেশের রাষ্ট্রপতি, প্রধানমন্ত্রী বা তাঁদের মনোনীত প্রতিনিধিরা এই সম্মেলনে যোগ দিয়েছেন। বিশ্বের মোট জনসংখ্যার এক-চতুর্থাংশ কমনওয়েলথের অন্তর্ভুক্ত দেশগুলিতে বাস করে।

সম্মেলন শুরু হবার দিন মার্লবরো হাউসের সম্মুখে নানা রকমের বিক্ষোভ প্রদর্শিত হয়। আফ্রিকীয় ছাত্ররা রোডেশিয়ায় শ্বেতাঙ্গ স্মিথ শাসনের অবসান ও সংখ্যাগুরু কৃষ্ণাঙ্গ শাসন প্রতিষ্ঠার দাবি জানায়। এশীয় ও আফ্রিকীয়রা বৃটেনের বর্ণবৈষম্যের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাবার জন্য মিছিল করে আসে। আবার একদল বর্ণবৈষম্যবাদী ইংরেজ কৃষ্ণাঙ্গদের বৃটেন থেকে বিতাড়নের দাবি জানিয়েও বিক্ষোভ প্রদর্শন করে। বায়ফ্রার স্বাধীনতার দাবিতে বায়ফ্রাবাসীরা বিক্ষোভ দেখায়—নাইজিরীয়রাও বায়ফ্রার বিচ্ছিন্নতার বিরুদ্ধে পাল্টা বিক্ষোভ দেখায়। বেশ কিছুসংখ্যক পাকিস্তানী ছাত্র ও শ্রমিক পাকিস্তানে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার দাবি জানাতে আসে। শ্রীমতী গান্ধীর বিরুদ্ধেও কয়েকজন বিক্ষোভ প্রদর্শন করে।

প্রধানমন্ত্রীরা অবশ্য এইসব বিক্ষোভ অগ্রাহ্য করেই তাঁদের আলোচনা শুরু করেন। রোডেশিয়ার প্রশ্নে বৃটিশ সরকারের নীতির তীব্র সমালোচনা করে আফ্রিকার নেতারা বক্তৃতা করেন। জাম্বিয়ার রাষ্ট্রপতি কেনেথ কাউন্ডা স্পষ্ট ভাষায় বলেন বেআইনী আযান স্মিথ সরকারের অবসানের জন্য বৃটেনকে অবশ্যই বলপ্রয়োগ করতে হবে। তিনি স্মিথ শাসনের বিরুদ্ধে পরিচালিত আফ্রিকীয় গেরিলা সংগ্রামকে সাহায্য করার জন্য কমনওয়েলথের রাষ্ট্রনেতাদের প্রতি আহ্বান জানান। মালাউই-এর রাষ্ট্রপতি হেস্টিংস বান্ডার মত দুই-একজন বলপ্রয়োগের দাবি সমর্থন না করলেও সম্মেলন এই বিষয়ে একমত যে, এখনই কার্যকরী কিছু করতে হবে।

উইলসন সরকারের নীতি কমনওয়েলথ রাষ্ট্রপ্রধানদের, বিশেষ করে আফ্রিকীয় ও এশীয় নেতাদের হতাশ করেছে। তাঁদের অভিযোগ, পূর্বঘোষিত 'নিবমার' (NIBMAR) নীতি, অর্থাৎ 'No Indenendence Before Majority African Rule' (সংখ্যাগরিষ্ঠ আফ্রিকীয় শাসন প্রতিষ্ঠার আগে স্বাধীনতা স্বীকার করা হবে না), এখন আর উইলসন সরকার মানতে চাইছেন না। তাঁরা স্মিথ সরকারের সঙ্গে একটা আপোষ-রফায় পৌঁছতে চান। দক্ষিণ রোডেশিয়ার 'একতরফা স্বাধীনতা' বা 'উডিকেই (UDI) অর্থাৎ 'Unilateral Declaration of Independence' তাঁরা সর্তসাপেক্ষে মেনে নিতে চাইছেন। গত অক্টোবর মাসে উইলসন জিব্রাল্টারের কাছে 'এইচ্‌ এম্‌ এম্‌ ফিয়ারলেস' জাহাজে দঃ রোডেশিয়ার বিদ্রোহী প্রধানমন্ত্রী আয়ান স্মিথের সঙ্গে আলোচনা করেছেন। এই আলোচনার ভিতরেই উইলসন এখন ছয়-দফা একটি মীমাংসা সূত্র নিয়ে আপোষের চেষ্টা করছেন। আফ্রিকীয় নেতারা এই 'ফিয়ারলেস' নীতির ঘোর বিরোধী। কিন্তু উইলসন সাফ বলে দিয়েছেন, তাঁর বলপ্রয়োগ করবেন না। আপোষের চেষ্টা করে যাবেন। শেষ পর্যন্ত কমনওয়েলথ সম্মেলন থেকে আফ্রিকীয় নেতারা অসন্তুষ্ট হয়ে ফিরেছেন। কিছুতেই তাঁরা বৃটেনের রোডেশিয়া নীতির পরিবর্তন করাতে পারেন নি।

বৃটেনের বর্ণবৈষম্য এবং আরও কয়েকটি দেশের বহিরাগতদের সমস্যা নিয়ে সংশ্লিষ্ট ১৭টি রাষ্ট্রের প্রতিনিধিরা পৃথকভাবে আলোচনা করেছেন। বৃটেনের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী জেমস কালাঘান বলে রেখেছেন, বৃটেনকে বহিরাগত আগমন নিয়ন্ত্রণে করার জন্য আরও কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। পূর্ব আফ্রিকার কয়েকটি দেশে, বিশেষ করে কেনিয়া ও উগাণ্ডায়, বৃটিশ পাশপোর্টধারী এশীয়দের

রোডেশিয়ায় শ্বেতাঙ্গ স্মিথ শাসনের অবসানের দাবিতে লণ্ডনে রোডেশিয়া হাউসের সম্মুখে বিক্ষোভরত আফ্রিকীয় ছাত্রদের সঙ্গে পুলিশের জোর সংঘর্ষ হয়।

বিতাড়ন করা হচ্ছে। বৃটেন এদের দায়িত্ব নিতে চাইছে না। এই প্রশ্নেও জটিলতার সৃষ্টি হয়েছে। কমনওয়েলথের সেক্রেটারী-জেনারেল আর্নল্ড স্মিথের নেতৃত্বে একটি সমীক্ষা দল গঠন করে মীমাংসার যে চেষ্টা হয়েছে তা বিশেষ ফলপ্রসূ হয় নি।

যুক্ত ইস্তাহারে কমনওয়েলথ দেশগুলির মধ্যে অর্থনৈতিক সহযোগিতার ওপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়। পশ্চিম এশিয়ার প্রশ্নে কমনওয়েলথ নেতৃবৃন্দ নিরাপত্তা পরিষদের ১৯৬৭-এর প্রস্তাবের ভিত্তিতে চতুঃশক্তি মীমাংসা প্রয়াসকে স্বাগত জানিয়েছেন।

পাকিস্তান যথারীতি এবারও কমনওয়েলথ সম্মেলনকে ভারত-বিরোধী প্রচারের মঞ্চ হিসাবে ব্যবহারের চেষ্টা করেছে। প্রতিটি প্রশ্নের আলোচনায় প্রায় 'ধান ভানতে শিবের গীতের' মত পাকিস্তান কাশ্মীর প্রসঙ্গ তুলে ভারতের বিরুদ্ধে কিবোশ্গার করেছে। যেমন, পশ্চিম এশিয়ার সঙ্কটের ওপর আলোচনায় পাকিস্তানের পররাষ্ট্রমন্ত্রী আরশাদ হোসেন বলেছেন, 'এই এলাকায়' উত্তেজনার প্রধান কারণ ভারত কর্তৃক কাশ্মীর দখল এবং চীন ও পাকিস্তানের বিরুদ্ধে ভারতের আক্রমণাত্মক মনোভাব! সভাপতি হ্যারল্ড উইলসন দু'-একবার আরশাদ হোসেনকে এরকম অপ্রাসঙ্গিক কথা বলতে বারণ করেছেন। কিন্তু হলে কি হবে, পাকিস্তানকে শিষ্টাচার শিক্ষা দেয়া কঠিন।

শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীকে এবার লণ্ডনে সংবাদপত্র তথা বৃটিশ জনমতের তীব্র বিক্ষোভের সম্মুখীন হতে হয়েছিল। শ্রীমতী গান্ধীর অপরাধ, তিনি নাকি লণ্ডন যাবার মুখে দিল্লীতে এক সাংবাদিক সম্মেলনে বলেছেন, কমনওয়েলথের সার্থকতা সম্পর্কে সন্দেহ দেখা দিয়েছে এবং ভারত প্রয়োজন বোধ করলে কমনওয়েলথ ত্যাগ করবে। ভারতের কোন সংবাদপত্রে এমন কোন মন্তব্য প্রকাশিত হয় নি। লণ্ডনের কোন কোন সংবাদপত্রে হয়েছে। শ্রীমতী গান্ধী লণ্ডনে পৌঁছবার সঙ্গে সঙ্গে ইংরেজ সাংবাদিকরা তাঁকে চেপে ধরেন। শ্রীমতী গান্ধী পরিষ্কার জবাব দেন, এরকম কোন কথা তিনি বলেন নি, সংবাদপত্র তাঁর মন্তব্যের ভুল বিবরণ ছেপেছে। বরং তিনি এর উল্টোটাই বিশ্বাস করেন। কমনওয়েলথের যথেষ্ট গুরুত্ব আছে। ভারত অবশ্যই কমনওয়েলথে থাকবে। আত্মরক্ষার তাগিদে শ্রীমতী গান্ধীকে কমনওয়েলথ প্রধানমন্ত্রী সম্মেলনেও সবিস্তারে কমনওয়েলথের গুণকীর্তন করতে হয়েছে। কমনওয়েলথের সপক্ষে পিতা জওহরলাল নেহরুর বহু উদ্ধৃতির উল্লেখ তিনি করেছেন। তবু ইংরাজরা সন্তুষ্ট নয়। ইন্দিরা কেন বলেছেন, কমনওয়েলথের সার্থকতা নেই! সর্বত্র কঠোর সমালোচনা, বিদ্রূপ, এমন কি ভীতি প্রদর্শনও পর্যন্ত হয়েছে। এমনই অপরাধ যে, ইন্দিরার মুণ্ডু চাই!

ব্যাপার মন্দ নয়। প্রতিবাদ করলেও শুনবে না। আর যদি এমন কোন কথা শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী বলেই থাকেন, তো অন্যায় কি হয়েছে? ভারত স্বাধীন রাষ্ট্র, ইংরেজের গোলাম নয়। ভারতের প্রধানমন্ত্রীকে রক্তচক্ষু দেখাবার স্পর্ধা ইংরেজ সংবাদপত্রগুলিকে কে দিয়েছে? আর, শ্রীমতী গান্ধী-ই বা এত করে সাফাই গাইছেন কেন? এও এক হীনমন্যতা।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র :

২০শে জানুয়ারী নবনির্বাচিত রাষ্ট্রপতি রিচার্ড নিকসন রাষ্ট্রপতির দায়িত্বভার গ্রহণ করছেন। এই দিনই লিনডন জনসনের পাঁচ বৎসরের শাসন শেষ হবে। নিকসনের হাতে দায়িত্বভার অর্পণ করে পরদিন জনসন হোয়াইট হাউস ত্যাগ করে যাবেন। নিকসনের শাসনভার গ্রহণের সঙ্গে সঙ্গে ডেমোক্রাটিক পার্টির আট বৎসরের একটানা শাসনের অবসান হল। ডুইট আইসেনহাওয়ারের পর আবার একজন রিপাবলিকান রাষ্ট্রপতির পদে আসীন হলেন।

রাষ্ট্রপতি-পদে রিপাবলিকান থাকলেও, আইনসভা কংগ্রেসের উভয় কক্ষেই কিন্তু ডেমোক্রাটিক পার্টির সংখ্যাধিক্য রয়েছে। নতুন ব্যবস্থায় রাষ্ট্রপতি-কংগ্রেসের মধ্যে সম্পর্ক কেমন হয়, তা লক্ষ্য করার বিষয় হবে।

১৫ই জানুয়ারী মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ৯১তম কংগ্রেসের উদ্বোধনী ভাষণে জনসন সেনেট ও প্রতিনিধিসভার সদস্যদের কাছে নিকসন প্রশাসনের সঙ্গে সহযোগিতা করার জন্য আহ্বান জানিয়েছেন।

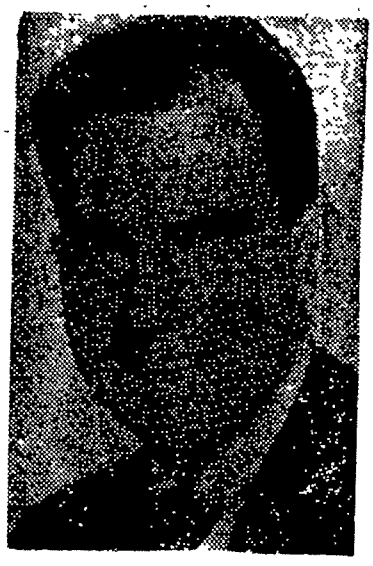

নিকসন

সাধারণত কংগ্রেসের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে রাষ্ট্রপতির পক্ষ থেকে যে 'স্টেট অব্ দি য়ুনিয়ন' ভাষণ দেয়া হয়, তা তাঁর লিখিত ভাষণ, তাঁর অনুপস্থিতিতে পাঠ করা হয়। কিন্তু প্রচলিত রীতি ভঙ্গ করে এবার জনসন নিজে অনুষ্ঠানে উপস্থিত হয়ে তাঁর ভাষণ দিয়েছেন। গত ৩৬ বৎসর ধরে নানাভাবে তিনি কংগ্রেসের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। এইবার তিনি বিদায় নিলেন। সুতরাং, আবেগের কারণ আছে বই কি।

জনসন তাঁর ভাষণে তাঁর আমলের পাঁচ বৎসরের শাসনের হিসাব-নিকাশ করতে গিয়ে বলেছেন, নিগ্রো, যুব, শিশু ও দরিদ্রের অবস্থার উন্নতি হয়েছে। তিনি আশা প্রকাশ করেছেন, দাঙ্গা-হাঙ্গামা ও বর্ণবৈষম্যের সমস্যা অতিক্রম করে মার্কিন জাতি সমৃদ্ধির পথে এগিয়ে যাবে। বিশ্বশান্তির প্রসঙ্গে তিনি বলেন, শান্তির সম্ভাবনা এত উজ্জ্বল এর আগে কখনও ছিল না।

চেকোশ্লোভাকিয়া :

১লা জানুয়ারী চেকোশ্লোভাকিয়া যুক্তরাষ্ট্রে পরিণত হয়েছে। চেক ও শ্লোভাক, এই দুই পৃথক প্রজাতন্ত্র, এবং দুই প্রজাতন্ত্র নিয়ে ঐক্যবদ্ধ চেকোশ্লোভাকিয়া যুক্তরাষ্ট্র। মোরাভিয়া ও বোহেমিয়া নিয়ে চেক প্রজাতন্ত্র গঠিত হল। আর শ্লোভাকিয়া অপর-প্রজাতন্ত্র।

প্রথম মহাযুদ্ধের পর জাতীয়তার ভিত্তিতে নতুন রাষ্ট্ররূপে চেকোশ্লোভাকিয়ার প্রতিষ্ঠা হয়। বর্তমানে পৃথক জাতিসত্তা স্বীকার করে দুই পৃথক প্রজাতন্ত্র স্থাপনের সিদ্ধান্ত জাতির আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকারেরই সার্থক পরিণতি।

যুক্তরাষ্ট্রে পরিণত হবার পর রাষ্ট্রকাঠামোর যেমন পরিবর্তন হয়েছে, তেমনি নেতৃত্বপর্যায়েও কিছু কিছু পরিবর্তন সাধিত হয়েছে। শ্লোভাকিয়া কমিউনিস্ট পার্টির প্রধান হয়েছেন গুস্তাভ হুজাক, আর চেক কমিউনিস্ট পার্টির প্রধান নুবোমির স্ট্রুগাল। যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনের নেতৃত্ব দুই প্রজাতন্ত্রের মধ্যে ভাগ করে নিতে হবে। লুডউইগ স্বোবোদাই আবার চেকোশ্লোভাকিয়া যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রপতি হয়েছেন। স্বোবোদা অলড্রিচ চারনিককে প্রধানমন্ত্রী পদে পুনর্নিয়োগ করেছেন। চারনিক যে নতুন মন্ত্রিসভার নাম ঘোষণা করেছেন তাতে সামান্য রদবদল করে মোটামুটি পুরনোদেরই রাখা হয়েছে। রাষ্ট্রপতি ও প্রধানমন্ত্রী দুজনেই হলেন চেক। তবে চেকোশ্লোভাকিয়া কমিউনিস্ট পার্টির প্রথম সম্পাদক পদে রয়ে গেলেন আলেকজান্ডার ডুবচেক। তিনি শ্লোভাক। আর এখানে দলের সম্পাদকই হলেন প্রধান।

নতুন যুক্তরাষ্ট্রীয় আইনসভার সভাপতি কে হবেন, এই নিয়ে কিছুটা বিভ্রান্তির সৃষ্টি হয়েছিল। পুরনো জাতীয় আইনসভার সভাপতি ছিলেন জোসেফ স্মরকোভস্কি। তিনি জাতিতে চেক। শ্লোভাক নেতাদের দাবি, রাষ্ট্রপতি ও প্রধানমন্ত্রী দুজনেই যখন চেক, তখন অন্তত আইনসভার সভাপতিপদে একজন শ্লোভাককে নিতে হবে।

এমনিতে এই দাবিটি খুবই সাধারণ। ন্যায়সঙ্গতও বটে। কিন্তু স্মরকোভস্কি ছাত্র, শিক্ষক, সাংবাদিক, সাহিত্যিকদের মধ্যে অত্যন্ত জনপ্রিয়। তিনি সংস্কার-আন্দোলনের অন্যতম নেতা। যাঁরা এখনও সোভিয়েট কর্তৃত্বের কাছে মাথা নত করে "বাস্তববাদী" হতে রাজী হন নি, স্মরকোভস্কি তাঁদের মধ্যে অগ্রগণ্য। তাই 'প্রগতিশীলদের' ধারণা, স্মরকোভস্কিকে রাজনীতি থেকে সরানোর জন্যই এই ফরমুলার কথা বলা হচ্ছে। তাঁরা হুমকী দিয়েছিলেন, স্মরকোভস্কিকে সরানো হলে সারা দেশে ধর্মঘট হবে। যাই হোক, শেষ পর্যন্ত উভয়পক্ষে একটা মীমাংসা হয়েছে। চেকোশ্লোভাকিয়ার কমিউনিস্ট পার্টির ঊর্ধতন নেতৃত্ব ঠিক করেছেন, যুক্তরাষ্ট্রীয় আইনসভার সভাপতি হবেন শ্লোভাকিয়ার সহকারী প্রধানমন্ত্রী পিটার কলোটোকা। তবে স্মরকোভস্কি আইনসভার প্রথম সহকারী সভাপতির পদে থাকবেন। তাছাড়া পার্টির প্রেসিডিয়ামের সর্বোচ্চ নীতি নির্ধারণ কমিটির আটজনের মধ্যেও থাকবেন স্মরকোভস্কি। তবু স্বীকার করতেই হবে, স্মরকোভস্কির 'ডিমোশন' হল।

চেকোশ্লোভাকিয়ার সবাই যে এখনও সোভিয়েট নিয়ন্ত্রণ মেনে নেয় নি, এখনও যে সেখানে 'সমাজতন্ত্রবিরোধী শক্তি' যথেষ্ট শক্তিশালী, সম্প্রতি 'প্রাভদা'র একটি প্রবন্ধ থেকে তা বোঝা যায়। সোভিয়েট কমিউনিস্ট পার্টির অন্যতম সম্পাদক কনস্টানটিন কাতুশেভের চেকোশ্লোভাকিয়া সফর উপলক্ষে য়ুরি জুকভ 'প্রাভদায়' লিখেছেন, সমাজতন্ত্রের শত্রুরা এখনও চেকোশ্লোভাকিয়ায় সক্রিয় রয়েছে। জুকভ তাঁর প্রবন্ধে চেকোশ্লোভাকিয়ার প্রাক্তন সহকারী প্রধানমন্ত্রী ও বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদ ওটা সিক ও তাঁর অনুগামীদের কাজের কঠোর সমালোচনা করেছেন। গণতন্ত্রীকরণের অর্থনীতির মূল প্রবক্তা ছিলেন ওটা সিক। বর্তমানে তিনি সুইজারল্যাণ্ডে।

পাকিস্তান :

আয়ুব খাঁ সম্প্রতি লাহোরে বলেছেন, ১৯৭০ সালের রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে তিনি প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবেন কি না, তা এখনও স্থির করেন নি। জানুয়ারীর শেষে ঢাকায় তাঁর মুসলিম লীগের কাউন্সিল অধিবেশনে এ বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হবে।

সম্প্রতি পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানে আয়ুব খাঁর বিরুদ্ধে যে প্রচণ্ড বিক্ষোভ প্রদর্শন করা হয়েছে, এবং যার জের এখনও শেষ হয় নি, তাতেই আয়ুব খাঁ ঘাবড়ে গেছেন। তাই তিনি দশবার ভাবছেন, দাঁড়াবেন কি না।

জুলফিকার আলি ভুট্টোর পিপলস পার্টি ইতিমধ্যে ঘোষণা করেছে, তাদের দলের পক্ষ থেকে ভুট্টো রাষ্ট্রপতি পদের জন্য প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবেন। ভুট্টো বর্তমানে জেলে।

পাকিস্তানের বিরোধী নেতারা চেষ্টা করছেন, একযোগে সম্মিলিতভাবে আয়ুবের বিরুদ্ধে, বা তিনি না দাঁড়ালে তাঁর মনোনীত ব্যক্তির বিরুদ্ধে, একজন প্রার্থী দাঁড় করাবার জন্য। পূর্ববঙ্গের কেউ প্রার্থী হলেই ভাল হয়, এমন কথাও অনেকে বলছেন।

এদিকে ঢাকায় আটটি বিরোধী দলের বৈঠকে আয়ুব শাসনের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ আন্দোলন পরিচালনার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে। বৈঠক-শেষে ৯ই জানুয়ারী ঘোষণা করা হয়েছে, বিরোধী দলগুলি যুক্তভাবে "গণতান্ত্রিক সংগ্রাম সমিতি" গঠন করেছেন। সমিতির পক্ষ থেকে যে ইস্তাহার প্রকাশ করা হয়েছে, তাতে পাকিস্তানের জন্য যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্থা ও সংসদীয় গণতন্ত্র দাবি করা হয়েছে। বিরোধী দলগুলির আরও দাবি: জরুরী অবস্থার অবসান, সকল রাজনৈতিক কর্মীর মুক্তি, নিয়ন্ত্রণমূলক ব্যবস্থা প্রত্যাহার, এবং সংবাদপত্রের ওপর থেকে যদি বিধিনিষেধ তুলে না নেওয়া হয়, তবে নির্বাচন প্রহসনে পরিণত হতে বাধ্য। তাই বর্তমান অবস্থা চলতে থাকলে, তাঁরা পাকিস্তানের আগামী রাষ্ট্রপতি নির্বাচন বয়কট করবেন। যে আটটি দল এই সংযুক্ত মোর্চায় যোগ দিয়েছে, তারা হল: ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি (রুশপন্থী), আওয়ামী লীগ (মুজিবর রহমান গ্রুপ), জমিয়তে ইসলাম, জমিয়ত উল্ উলেমা, আওয়ামী লীগ (নসরুল্লা খাঁ গ্রুপ), নিজামে ইসলাম, কাউন্সিলপন্থী মুসলিম লীগ ও জাতীয় গণতান্ত্রিক দল।

নবগঠিত সংযুক্ত ফ্রন্ট এই 'গণতান্ত্রিক সংগ্রাম সমিতি'র পক্ষ থেকেই ইতিমধ্যেই দেশব্যাপী আন্দোলনের আহ্বান জানানো হয়েছে। সমিতির ডাকে ১৭ই জানুয়ারী সর্বত্র দাবি দিবস উদ্‌যাপিত হয়েছে। দাবি দিবস উদ্‌যাপন উপলক্ষে ঢাকায় এই দিন পুলিশের সঙ্গে জনতার সংঘর্ষ হয়েছে। পুলিশের লাঠিচার্জে বেশ কয়েকজন আহত হয়েছেন।

(১৮-১-৬৯)

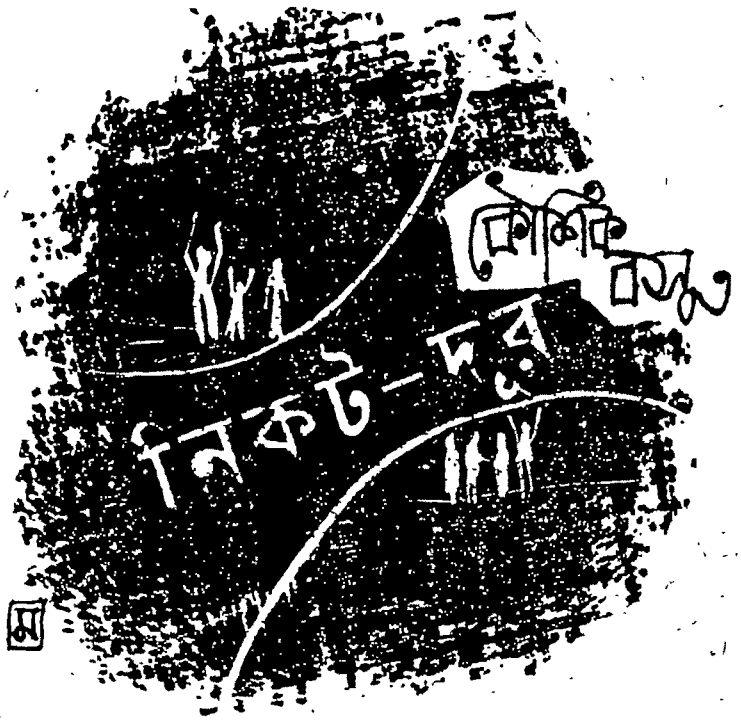

ইতিহাসের দিকে নেতাজী

গত চব্বিশ বছর তাঁর সঙ্গে আমাদের কোনো যোগাযোগ নেই। কোনো সংবাদপত্রে তাঁর কার্যকলাপ লিখিত হয় নি, রেডিওতে তাঁর কণ্ঠ শুনি নি, কোনো মন্ত্রীর পদ অলঙ্কৃত করে তিনি আমাদের সুভাষিতাবলী বিতরণ করেন নি। তাঁর চেহারাও হয়তো আমরা ভুলে যেতুম, যদি না ২৩শে জানুয়ারী একটি স্মরণীয় দিন হয়ে থাকতো আমাদের ক্যালেন্ডারে। কেন না ঐ দিন আমরা তাঁর জন্মোৎসব পালন করে থাকি—বাংলাদেশের ঘরে ঘরে শঙ্খধ্বনি ওঠে, তোপ পড়ে, মিছিল বেরোয় তাঁর প্রতিমূর্তিকে সামনে রেখে, স্কুল-কলেজের ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে যে উদ্দীপনা জাগে তার সঙ্গে তুলনা করা যায় পুজোর আনন্দকে। কোন্ নেতাজীকে আমরা স্মরণ করি? যে নেতাজী সম্প্রতি বাহান্তর বছরে পদার্পণ করলেন তাঁকে নিশ্চয়ই নয়, আমরা স্মরণ করি চব্বিশ বছর আগেকার কলদৃপ্ত নেতাজীকে, অসম্ভব ব্যক্তিত্বে ধনী, প্রবল পৌরুষে জ্বলন্ত, আই এন এ-র অধ্যক্ষ সুভাষচন্দ্র বসুকে। নেতাজীর সে যুগের ফটো সবাই দেখেছেন, ধুতি-পাঞ্জাবী এবং কাঁধে শাল কোনো বাঙালী ভদ্রলোক নন—পুরোপুরি সৈনিকের বেশ, খাকি পোষাক, পায়ে মিলিটারি বুট, দাঁড়ানোর ভঙ্গি অজু—মাথায় টুপি—সমস্ত শরীর থেকে ঝরে পড়ছে এমন এক তেজ যাকে প্রতিভাবানের স্পর্ধা বললে ভুল হবে না। বলা বাহুল্য, এই নেতাজীই লোকপ্রিয়, জনশ্রদ্ধেয়। ২৩শে জানুয়ারিতে আমরা তাঁরই ছবি মনে আনার চেষ্টা করি—এবং সেই চেষ্টার মধ্যে আন্তরিকতা থাকলেও, পরিণত বিচারবুদ্ধি যে বিশেষ থাকে না, অনেকটা বিগ্রহপূজার মতো হয়ে দাঁড়ায় সেই জন্মোৎসব, এ কথা আজ দুঃখের সঙ্গে স্বীকার্য।

আমরা একটা কথা প্রায়ই শুনে থাকি, নেতাজী থাকলে আজ দেশের অবস্থা এমন হতো না, আমাদের ক্রমবর্ধমান অভাব ঘুচতো, জাতিকে ঠিক পথে একমাত্র তিনিই পরিচালনা করতে পারতেন। আমার বিশ্বাস নেতাজীর ব্যক্তিত্ব ও চরিত্রকে এইভাবে দেখা ঠিক নয়। সম্ভবত উল্টো করে দেখা। নেতাজীর গৌরব ও কৃতিত্বকে আমরা তখনই ঠিকভাবে দেখবো, যখন তাঁকে আমরা ভারতীয় স্বাধীনতার কারণ হিসেবে বুঝতে চেষ্টা করবো, ফল হিসেবে নয়। স্বাধীনতার ফল প্রায়শই বিষবৎ হয়—আমাদের সাড়ে একুশ বছরের স্বাধীনতায় তা আমরা নিশ্চয়ই বুঝে গিয়েছি। স্বাধীন ভারত যদি গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে সুভাষচন্দ্র বসুকে প্রধানমন্ত্রী নির্বাচিত করতো, অর্থাৎ আমাদের লোকমান্য নেতাজী যদি স্বাধীনতার ফলভোগ করতেন ('ফলভোগ' শব্দটি কিঞ্চিৎ রূঢ়, পাঠক আমাকে মার্জনা করবেন) তাহলে দেশের ইতিহাস ও ভূগোল পাল্টাতো কি না—এ সম্পর্কে এক ভাবিকথক ছাড়া আর কেউই নির্দিষ্ট করে কিছু বলতে পারবেন না। যদি ধরেও নিই নেতাজীর ভারতবর্ষে আমাদের কোনো দুঃখ থাকতো না। তাতে আমাদের বর্তমান দুঃখ কমে কী? আর যদি তাঁর শাসনে আমাদের কষ্ট দ্বিগুণ হতো বলে আমরা মনে করি, তাতেও আমাদের বর্তমান কষ্ট কিছু কমে না, কিঞ্চিৎ সহনীয় হয়ে ওঠে মাত্র।

একথা অস্বীকার করে লাভ নেই যে, স্বাধীন ভারতের সঙ্গে নেতাজীর কোনো যোগ নেই, তাঁর যোগ ভারতীয় স্বাধীনতার সঙ্গে। যে অর্থে মহাত্মা গান্ধী এবং জবাহরলাল নেহরু স্বাধীন ভারতের রূপকার, সেই অর্থে তাঁকে আমরা রূপকার তো দূরের কথা, পরামর্শদাতা পর্যন্ত বলতে পারবো না। ভারতীয় সংবিধানে তাঁর কোনো ভূমিকা নেই, দেশের শাসনব্যবস্থা তাঁর আদর্শ থেকে কতো দূরে তাও বিশেষজ্ঞদের অজানা নয়, যোজনা কমিশনে তাঁর জন্যে কোনো আসন থাকে নি। তিনি টাটা-বিড়লা-ডালমিয়ার চেহারা দেখেন নি, দেশের অর্থনৈতিক অবস্থার অবনতি কত দূর হতে পারে তাও তাঁর ভাবিদৃষ্টিতে ধরা পড়ার কথা নয়। বস্তুত স্বাধীন ভারতবর্ষে আমরা নেতাজীকে বাদ দিয়েছি কর্ম থেকে, আদর্শ থেকে, তিনি শুধু আছেন আমাদের স্মৃতিতে। যেহেতু নেতাজী স্বাধীন ভারতবর্ষে উপস্থিত ছিলেন না, অতএব তাঁর পক্ষে সক্রিয় অংশ গ্রহণ অসম্ভব—এই সামান্য কথা জেনেও যে আমরা বারবার তাঁকে আমাদের আনুমানিক নেতা হিসেবে শ্রেষ্ঠ মর্যাদা দিতে চাই, তা অপরিণত বুদ্ধিরই পরিচায়ক। নেতাজীর কৃতিত্ব বুঝতে হলে তাঁকে ভারতীয় স্বাধীনতার অগ্রদূত হিসেবেই বিচার করতে হবে, যেমন গান্ধী বা নেহরুর কৃতিত্ব অনুধাবনের সময় আমাদের বুঝতে হবে তাঁরা কীভাবে এবং কতখানি স্বাধীন ভারতের রূপকার।

নেতাজীর আই, এন, এ প্রতিষ্ঠার ইতিহাস সবাই জানেন। ১৯৪২ সালের ১৫ই ফেব্রুয়ারি মালয়ের প্রায় পঁচিশ হাজার ইংরেজ সৈন্য জাপানীদের হাতে আত্মসমর্পণ করে। যে সমস্ত সৈন্য জাপানীদের হাতে বন্দী হয়েছিল, তাদের মধ্যে প্রায় ষাট হাজার ছিল ভারতীয়; এবং তাদের মধ্যে প্রায় পঁচিশ হাজার বন্দী সৈন্য ইংরেজের আনুগত্য অস্বীকার করে 'ইণ্ডিয়ান ন্যাশনাল আর্মি' বা আই, এন, এ-তে যোগদান করেছিল এবং আই, এন, এ'র প্রতিষ্ঠাতা হলেন সুভাষচন্দ্র বোস। সুভাষচন্দ্র এই সৈন্যদল ও জাপানীদের সহায়তায় স্বাধীন ভারতের সরকার গঠন করলেন। অসম্ভব উদ্দীপনায় তিনি প্রচারকার্য চালালেন, অর্থ ও মানুষ সংগ্রহ করতে লাগলেন এবং সঙ্কল্প করলেন জাপানীদের সহায়তায় আই, এন, এ-র প্রধান হয়ে ১৯৪৪ সালে ভারত আক্রমণের। ইম্ফলে তাঁর সৈন্যদলের একাংশ প্রায় নিশ্চিহ্ন হয়ে গেল। কিন্তু তাঁর সৈন্যদলের আরো দুটি ভাগের মধ্যে একটি বার্মার দিকে যাত্রা শুরু করলো এবং অপরটি জোহরে মিলিটারি শিক্ষায় তৈরি হতে লাগলো। এই দ্বিতীয় ভাগটি ১৯৪৫

সালে ইংরেজ-ভারতীয় চতুর্দশ সৈন্যদলের হাতে ছিন্নভিন্ন হলো। তৃতীয় ভাগটি মালয় রক্ষার জন্য তৎপর রইলো, এবং নেতাজী ১৯৪৫ সালে তাদের মধ্যে ফিরে এলেন তাঁর যুদ্ধাভিযান চালিয়ে যাবার জন্যে। এই সময়ে তিনি তাঁর কয়েকজন মন্ত্রীর সঙ্গে রাশিয়ার আশ্রয় নেবার কথা ভাবছিলেন। তৎপরবর্তী ঘটনা অস্পষ্ট যদিও শোনা যায় যে, মাত্র দু' মাস পরে ফরমোজায় এক বিমান দুর্ঘটনায় তিনি মারাত্মক আহত হয়ে মারা যান।

নেতাজীর অসাফল্যের কারণ কী, এ সম্পর্কে এখন আমি চিন্তিত হতে চাই না। আমাদের দেখতে হবে নেতাজীর এই অসাফল্য অন্যদের পক্ষে সাফল্যের সোপান হয়ে উঠেছে কি না। আমরা যারা মহাত্মা গান্ধী ভারতের জনক বলে মেনে নিয়েছি, তাদের পক্ষে নেতাজীকে ভারতীয় স্বাধীনতার অগ্রদূত হিসেবে মেনে নেওয়া একটু অসুবিধের ব্যাপার। উপরন্তু গান্ধী-নেতাজী মতান্তরও একটি ঐতিহাসিক ঘটনা। তাঁর বই The Indian Struggle-এ নেতাজী গান্ধীর ধীশক্তি সম্পর্কে প্রশ্ন তুলেছেন। তাঁর মতে গান্ধীর ব্যর্থতার কারণ পাঁচটি—প্রতিপক্ষের শক্তি না বোঝা, পরিকল্পনার অভাব, আন্তর্জাতিক সাহায্যে উদাসীনতা, ইংরেজ শক্তির ওপর আস্থা স্থাপন এবং রাজনৈতিক নেতা ও বিশ্ব-গুরুর দুই ভূমিকা গ্রহণ। ভারতীয় স্বাধীনতার জন্য 'মিলিটিক'দের দ্বারস্থ হওয়া মারাত্মক ভুল —গান্ধী প্রসঙ্গে একথা তিনি বুঝতেন। নেতাজী আরো বুঝতেন যে স্বাধীন ভারতের জন্য সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনার প্রয়োজন আছে—শুধু স্বাধীনতা অর্জন করলেই চলবে না। ভারতের অর্থনীতিকে সম্যক উপলব্ধি না করলে বা ভারতীয় সংবিধান প্রস্তুত না হলে স্বাধীনতার প্রকৃত স্বাদ দেশবাসী পাবে না। কিন্তু গান্ধীর মত ছিল ভিন্ন—তিনি স্বাধীন-ভারতের গঠন অন্য দল বা লোকের হাতে ছেড়ে দিতে প্রস্তুত ছিলেন; নেতাজী, প্রকৃত সমাজতন্ত্রী নেতার মতো ধনতন্ত্রের পথে দেশকে ত্যাগ করতে নারাজ ছিলেন—কেন না, তাহলে, ভারতের জনসাধারণ স্বাধীনতার প্রকৃত আস্বাদ থেকে বঞ্চিত হবে। গান্ধীর সঙ্গে এই মতান্তর থেকে নেতাজীর যে আদর্শ বেরিয়ে আসে, স্বাধীন ভারতে সে আদর্শ কতটা অনুসৃত হয়েছে, তা বোঝার জন্য নিদারুণ অভিজ্ঞতার কাছেই আমাদের ফিরে আসতে হব।

গান্ধীর কংগ্রেসে 'রাগী ছোকরা' নেতাজীর স্থান হলো না বলেই তাঁকে বেছে নিতে হলো রক্তাক্ত সংগ্রামের পথ। ব্যক্তিগত জীবনে যিনি ছিলেন মানবদরদী বন্ধু, তাঁকেই আমরা দেখতে পেলুম মারণাস্ত্র হাতে নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকতে। কেন সেই তরুণের স্বপ্ন বাস্তবে রূপায়িত হলো না? কেউ কেউ বলেছেন, অসম্ভব ক্ষমতা-লিপ্সাই তাঁকে কলুষিত করেছিল—কেউ বা মনে করেছেন গোঁয়ার্তুমি ও অসহিষ্ণুতাই তাঁর ব্যর্থতার কারণ। একথা অস্বীকার করার উপায় নেই যে, নেতাজী একনায়কত্ব পছন্দ করতেন, টোটালিটারিয়ান রাষ্ট্রের উন্নতিতে তিনি আস্থা রেখেছিলেন, মনে করেছিলেন যে, ভারতীয়দের পক্ষে স্বাধীনতার যোগ্য হয়ে ওঠাই প্রাথমিকভাবে প্রয়োজন। সমস্ত কিছুর পরেও একটি কথা থেকে যায় যে, তিনি স্বাধীন ভারত দেখে যেতে না পারলেও, ভারতের স্বাধীনতা তাঁর কাছে চির ঋণী। কী সেই ঋণ তা আমরা উপলব্ধি করি, হয়তো একদিন তা নিয়ে কেতাবি আলোচনাও শুরু হবে, ম্যুজিয়ামভুক্ত হবেন তিনি তাঁর ইতিহাস নিয়ে, ছোটোখাটো নেতাজীর উত্থান থেমে যাবে—ততোদিন কি আমরা ধৈর্য ধরে অপেক্ষা করবো? অবশ্য আমরা জানি না ইতিহাস নেতাজীর দিকে এগোবে, না নেতাজীই এগোবেন ইতিহাসের দিকে।

ভি-আই-পি'দের সঙ্গে—

সুভাষচন্দ্রের রাষ্ট্রচিন্তার ভূমিকা

নিমলেন্দু বসু

নেতাজী সুভাষচন্দ্রের রাষ্ট্রনৈতিক চিন্তাধারা সম্পর্কে আলোচনা করতে গেলে প্রথমেই মনে রাখতে হবে যে-তিনি ছিলেন প্রধানত কর্মনায়ক, চিন্তাবিদ নন। ভারতের মুক্তি সংগ্রামের প্রধান নেতারূপে সুভাষচন্দ্র আন্দোলন পরিচালনার কাজেই বিশেষভাবে ব্যস্ত ছিলেন। তবে এ কথা বলা যায় না যে, তাঁর কোন স্পষ্ট রাজনৈতিক চিন্তা ছিল না। একটা রাজনৈতিক আদর্শ ভিন্ন রাজনৈতিক আন্দোলনের সার্থক পরিচালনা করা যায় না। সুভাষচন্দ্রেরও একটি স্পষ্ট রাজনৈতিক চিন্তা ছিল।

ছাত্রজীবন থেকেই সুভাষচন্দ্র বিভিন্ন রাষ্ট্রদর্শন নিয়ে চিন্তা করেছেন। বিশ্বের সকল দেশের ইতিহাস, সকল দার্শনিকের মতবাদ ও সকল রাজনৈতিক পরীক্ষা-নিরীক্ষা তিনি গভীরভাবে অনুধাবনের চেষ্টা করেছেন। সব কিছু জেনে তিনি তাঁর রাজনৈতিক বক্তব্য উপস্থিত করতে চেয়েছেন। তাঁর বিভিন্ন গ্রন্থ, প্রবন্ধ, পত্র, বক্তৃতা ও সাক্ষাৎকারের বিবরণী বিশ্লেষণ করলে সুভাষচন্দ্রের রাজনৈতিক চিন্তাধারার পরিচয় পাওয়া যায়। সুভাষচন্দ্রের ব্যক্ত মতের পাশাপাশি তাঁর কর্মজীবনকে রেখে তাঁর চিন্তাধারার পরিপূর্ণ রূপকে বুঝতে হবে। সুভাষচন্দ্রের ন্যায় মহান্ কর্মনায়কের কর্মকে বাদ দিয়ে কেবলমাত্র তাঁর লিখিত মতের ওপর জোর দিলে মূল্যায়ন ত্রুটিপূর্ণ হতে বাধ্য।

একটা জিনিষ লক্ষ্য করা যায়, অন্ধ গোড়ামীর মনোভাব নিয়ে তিনি কোন নির্দিষ্ট মতবাদ গ্রহণ করেন নি। প্রচলিত বিভিন্ন মতবাদের মধ্য থেকে গ্রহণযোগ্য ভাল অংশ নিয়ে তিনি তাঁর রাজনৈতিক মত তৈরি করতে চেয়েছেন। তদানীন্তন কালের দুটি প্রধান ব্যবহারিক রাষ্ট্রীয় মতবাদ জার্মানীর 'ন্যাশনাল সোস্যালিজম' ও সোভিয়েট ইউনিয়নের 'কমিউনিজম' তাঁকে বিশেষভাবে প্রভাবিত করেছিল। এই দুটি মতবাদের কোনটিকেই তিনি পুরোপুরি গ্রহণ করেন নি, এর কোনটিকেই তিনি আবার পুরোপুরি বর্জনও করেন নি। এই দুই-এর ভাল দিক নিয়ে ও তাদের খারাপ দিক বর্জন করে যে অবস্থা দাঁড়ায়, তাই তিনি কাম্য বলে গ্রহণ করেছেন। তিনি বলেছেন, "আমি বুঝে উঠতে পারি না, কেন আমরা এই দুই রাষ্ট্রদর্শনের মধ্যেকার ভাল দিকগুলি নিয়ে একটা সমন্বয় সাধন করতে পারব না। ...ন্যাশনাল সোস্যালিজম ও কমিউনিজমের সমন্বয়ই আমাদের রাষ্ট্রদর্শন হওয়া উচিত।" (চৌকিও বক্তৃতা, মুক্তি সংগ্রাম, পৃঃ ১০৬)। উভয় মতবাদের অন্তর্নিহিত ঐক্য, তথাকথিত গণতন্ত্রের অস্বীকৃতি, একনায়কত্ব ও পুঁজিবাদের বিরোধিতা, তিনি গ্রহণ করেছেন এবং তার সঙ্গে ন্যাশনাল সোস্যালিজমের জাতীয় ঐক্য ও সংহতিসাধন এবং কমিউনিজমের অর্থনৈতিক পরিকল্পনা নিয়ে সুভাষচন্দ্র যে সমন্বয়ের চিত্র কল্পনা করেছেন, তিনি তাঁর নাম দিয়েছেন 'সাম্যবাদ'। ভারতীয় সংস্কৃতির প্রতি লক্ষ্য রেখে, ভারতের অবস্থার উপযোগী এই আদর্শ তিনি গ্রহণ করতে চেয়েছেন।

কিন্তু সুভাষচন্দ্র পরিকল্পিত এই 'সাম্যবাদ'কে একটি পরিপূর্ণ ও অন্য মতবাদনিরপেক্ষ স্বতন্ত্র রাষ্ট্রদর্শন বলে মনে করলে ভুল করা হবে। একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ নবরাষ্ট্রদর্শনের যে বিস্তৃত বিশ্লেষণ ও রূপায়ণ প্রয়োজন, সুভাষচন্দ্র তাঁর নির্দেশিত 'সাম্যবাদে'র ক্ষেত্রে তা করেন নি, বা করে যাবার মত সময় পান নি। এই প্রসঙ্গে যে সব ইঙ্গিতের সন্ধান পাওয়া যায়, তার মধ্য থেকেও কোন একটি স্বয়ংনির্ভর নতুন অভূতপূর্ব রাষ্ট্রদর্শন পাওয়া যায় না।

ক্রিয়া ও প্রতিক্রিয়ার দ্বন্দ্ব এবং এই দ্বন্দ্বের নিবৃত্তিসাধনে সমন্বয়ের আবির্ভাব,—এটি একটি পদ্ধতি। কেবলমাত্র এই পদ্ধতিতে বিশ্বাসস্থাপনই কোন নতুন রাষ্ট্রদর্শনের ইঙ্গিত দেয় না। ন্যাশনাল সোস্যালিজম ও কমিউনিজমের সমন্বয়রূপে যে 'সাম্যবাদ', তাকেও তিনি স্বতন্ত্র রাষ্ট্রদর্শনরূপে কল্পনা করেছেন, এমন পরিচয় পাওয়া যায় না। জাতীয়তাবাদের আদর্শের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে ভারতের অবস্থার উপযোগী করে তিনি সমাজতন্ত্রকে ভারতে প্রয়োগ করতে চেয়েছেন। তাঁর মত জাতীয়তাবাদী ও ভারতের জাতীয় আন্দোলনের অগ্রবর্তী নেতার পক্ষে এ অত্যন্ত স্বাভাবিক। ভারতে কমিউনিস্ট পার্টির তদানীন্তন জাতীয়তাবিরোধী কার্যকলাপ তাঁর মনকে কমিউনিস্ট আন্দোলনের ভূমিকা সম্পর্কে সন্দিহান করে তুলেছে। 'সমন্বয়ে'র নামে তিনি কমিউনিজম বা সোস্যালিজমকে বর্জন করতে চান নি, জাতীয়তাবাদের সঙ্গে তার সামঞ্জস্য চেয়েছেন। আবার তাঁর 'সমন্বয়ে'র অর্থ 'ফ্যাসিবাদ' গ্রহণও নয়। এই প্রসঙ্গে ব্রিটিশ কমিউনিস্ট পার্টির মুখপত্র 'ডেলি ওয়ার্কার' পত্রিকার প্রতিনিধিরূপে বিখ্যাত কমিউনিস্ট নেতা রজনী পামি দত্তের সঙ্গে ২৪ জানুয়ারী, ১৯৩৮ তারিখে লন্ডন সাক্ষাৎকারে সুভাষচন্দ্র যা বলেছেন, তা উল্লেখযোগ্য: "আমি যা বলতে চেয়েছি তা হল, ভারতে আমরা জাতীয় স্বাধীনতা চাই, এবং স্বাধীনতা অর্জনের পর আমরা সমাজতন্ত্রের পথে অগ্রসর হব। সাম্যবাদ ও ফ্যাসিবাদের মধ্যে 'সমন্বয়ে'র কথা বলতে গিয়ে আমি এই কথাই বলতে চেয়েছি। সম্ভবত আমার শব্দচয়নটি খুব সঙ্গত হয় নি। কিন্তু এই কথা স্পষ্ট করে বলতে চাই, যখন আমি আমার বইটি লিখেছিলাম, তখন ফ্যাসিবাদ সাম্রাজ্যবাদী অভিযান শুরু করে নি—ফ্যাসিবাদকে আমি জাতীয়তাবাদের একটি উগ্র রূপ হিসাবেই মনে করেছিলাম। আমি এ কথাও বলতে চাই যে, ভারতে যাঁরা সাম্যবাদের বক্তব্য নিয়ে কাজ করেন তাঁদের জাতীয়তাবিরোধী বলে মনে হয়েছে এবং ভারতের

জাতীয় কংগ্রেসের বিরুদ্ধে তাঁদের বৈরী মনোভাবের ফলে এই ধারণা আরও দৃঢ় হয়েছে। কিন্তু বর্তমানে এই অবস্থার আমূল পরিবর্তন হয়েছে। আমি পরিষ্কার করেই বলতে চাই, আমি সাম্যবাদকে সর্বদা সম্যকভাবে উপলব্ধি করেছি, এবং মার্কস ও লেনিনের রচনাবলীতে এবং কমিউনিস্ট ইন্টারন্যাশনালের বক্তব্যে যেভাবে সাম্যবাদের বিশ্লেষণ করা হয়েছে, তা জাতীয় স্বাধীনতা সংগ্রামকে সর্বতোভাবে সমর্থন করে এবং জাতীয় আন্দোলনকে তার বিশ্ব-দৃষ্টিভঙ্গীর অবিচ্ছেদ্য অংশ রূপেই মনে করে।" (ব্লুশরোডস, পৃঃ ৩০)।

জাতীয়তাবাদের সঙ্গে প্রকৃতপক্ষে আন্তর্জাতিকতার কোন বিরোধ নেই এবং সমাজতন্ত্র ও জাতীয়তাবাদও কোন দিক থেকেই পরস্পরবিরোধী নয়। তাই নেতাজীর 'সাম্যবাদ' আসলে সমাজতন্ত্র। তবে জাতীয়তাবাদ ও সমাজতন্ত্রের বিভিন্ন বিকৃত প্রয়োগের ফলে যাতে কোনটারই প্রকৃত রূপ আমরা ভুলে না যাই, তার জন্যই সমন্বয় বা সাম্যবাদের কথা বলে তিনি এর প্রতি গুরুত্ব আরোপ করেছেন।

তা ছাড়া, সমন্বয় ও সাম্যবাদের উল্লেখ করে তিনি এই বিষয়ের প্রতিও সম্যক দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন যে, কোন মতবাদই দেশকালনিরপেক্ষভাবে অন্ধ গোঁড়ামীতে গ্রহণ করা উচিত নয়। সমাজতন্ত্রের আদর্শের সঙ্গে এই বক্তব্যেরও কোন বিরোধ নেই।

সুভাষচন্দ্র সমাজতন্ত্রে বিশ্বাসী। করাচীতে নওজোয়ান ভারতসভার সভাপতির অভিভাষণ (১৯৩১), নিখিল ভারত ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেস সম্মেলনের সভাপতির অভিভাষণ (১৯৩১), হরিপুরা কংগ্রেসে সভাপতির অভিভাষণ (১৯৩৮) এবং পরবর্তীকালেও, সর্বত্র তিনি অত্যন্ত স্পষ্টভাষায় সমাজতন্ত্রের কথা বলেছেন। 'ফরওয়ার্ড ব্লক' সম্পর্কে বলতে গিয়ে তিনি বলেছেন, "স্বাধীনতার পর এই দলের কাজ হবে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার জন্য চেষ্টা করা।" 'ফরওয়ার্ড ব্লক ও তার যৌক্তিকতা' প্রবন্ধে তিনি ফরওয়ার্ড ব্লকের আদর্শ বিশ্লেষণ করতে গিয়ে বলেছেন, দলের কাজ হবে "সম্পূর্ণরূপে আধুনিক ও সমাজবাদী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা" এবং "উৎপাদন ও বণ্টন ব্যবস্থার সামাজিক মালিকানা ও বণ্টন।" (মুক্তি সংগ্রাম, পৃঃ ৯০)।

সুভাষচন্দ্র সমাজতন্ত্রী ছিলেন। তাই বলে কি তাঁকে মার্কসবাদী বলা যায়? কাউকে কেবলমাত্র সমাজতন্ত্রী বলেই থেমে যাওয়া যায় না, কারণ সমাজতন্ত্র বলতে অনেক কিছুই বোঝায়। মার্কস-পূর্ববর্তী সমাজতন্ত্র মূলত ছিল কাল্পনিক এবং তার কোন সুস্পষ্ট প্রয়োগপদ্ধতি ছিল না। মার্কসীয় মতবাদেই প্রথম সমাজতন্ত্রের একটা স্পষ্ট বৈজ্ঞানিক প্রয়োগকৌশলের সন্ধান পাওয়া যায়।

সুভাষচন্দ্রের চিন্তাধারা বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, দার্শনিক চিন্তার দিক থেকে তিনি পুরোপুরি মার্কসবাদী ছিলেন না। মার্কসবাদের মূল বুনিয়াদ স্বরূপ দ্বন্দ্বাত্মক জড়বাদ বা ইতিহাসের অর্থনৈতিক ব্যাখ্যা তিনি গ্রহণ করেন নি। তিনি ভাববাদী দর্শনে বিশ্বাসী ছিলেন। 'ভারত পথিক' ও 'মুক্তি সংগ্রাম' গ্রন্থে এ সম্পর্কে তাঁর আলোচনা রয়েছে। মার্কস-লেনিনের ধর্মের বিরোধিতাকেও সুভাষচন্দ্র গ্রহণ করেন নি: তিনি ধর্ম ও ঈশ্বরের অস্তিত্বে বিশ্বাসী।

কিন্তু এ সত্ত্বেও সুভাষচন্দ্রকে মার্কসবাদবিরোধী বলা যায় না। তাঁর 'সাম্যবাদের' পরিকল্পনায় মার্কসবাদ বা কমিউনিজম গ্রহণের কথা আছে। কমিউনিস্ট আন্দোলনের তৎকালীন জাতীয়তাবিরোধী বিকৃতির ফলে তাঁর মনে যে কমিউনিজমবিরোধিতা দেখা দিয়েছিল, পরবর্তীকালে তাও দূর হয়েছিল। মার্কসবাদের প্রতি তাঁর অনুকূল মনোভাবের পরিচয় পাওয়া যায় ফরওয়ার্ড ব্লককে একটি খাঁটি মার্কসবাদী দলরূপে গড়ে তোলার জন্য তাঁর ইচ্ছাপ্রকাশের মধ্যে। (ফরওয়ার্ড ব্লক পত্রিকা, ১২ মার্চ, ১৯৩৯)।

দার্শনিক বিশ্বাসের দিক থেকে সুভাষচন্দ্র ষোল আনা মার্কসবাদী না হলেও, ব্যবহারিক প্রয়োগের দিক থেকে তিনি মার্কসবাদী প্রয়োগকৌশল গ্রহণ করেছেন। শ্রেণীসংগ্রামে বিশ্বাস, বিপ্লব-প্রচেষ্টা, সশস্ত্র অভ্যুত্থানের প্রয়াস, বিপ্লব-পরবর্তী পর্যায়ে সাময়িক একনায়কত্বের মাধ্যমে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা, এই সবই মার্কসবাদী পদ্ধতি। আর এগুলিই হল সুভাষচন্দ্রের চিন্তা ও কর্মপন্থার প্রধান অংশ। মার্কসবাদ ভিন্ন সমাজতন্ত্রের প্রচলিত অন্যান্য মতবাদে এই কার্যক্রমের সন্ধান মেলে না। ধীরে ধীরে, শান্তিপূর্ণ উপায়ে, নির্বাচনী পন্থায় সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা সম্ভব, সুভাষচন্দ্র তা একেবারেই বিশ্বাস করতেন না।

সুভাষচন্দ্র জাতীয়তাবাদের ওপর সর্বদা জোর দিয়েছেন বলে অনেক সময় মনে হয়েছে যে তিনি ব্যবহারিক ক্ষেত্রেও মার্কসবাদকে গ্রহণ করেন নি। মার্কসবাদ বা কমিউনিজমের সমালোচনা প্রসঙ্গে তিনি প্রথম দিকে এর জাতীয়তাবিরোধী ভূমিকার কথা বলেছেনও। কিন্তু পরবর্তীকালে প্রকাশিত হয়েছে, সুভাষচন্দ্র সে কথা বিশ্বাসও করেছেন যে, জাতীয়তাবাদ মার্কসবাদের মূল ধারণার বিরোধী নয়। সুতরাং, সুভাষচন্দ্রের জাতীয়তাবাদের সঙ্গে মার্কসবাদের সামঞ্জস্যবিধান সম্ভব।

সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার জন্য সুভাষচন্দ্রের কর্মসূচী এবং 'উৎপাদন ও বণ্টন ব্যবস্থার পূর্ণ সামাজিক মালিকানার ধারণা' পুরোপুরি মার্কসবাদসম্মত।

রুশ বিপ্লব ও তার পরবর্তীকালে বিভিন্ন দেশে মার্কসবাদের মূল নীতির প্রতি আনুগত্য প্রদর্শন করেও সমাজতন্ত্রের বিভিন্ন প্রকার প্রয়োগ এ কথাই প্রমাণ করে, দেশ ও কাল অনুযায়ী সমাজতন্ত্রের বিশেষ প্রয়োগ প্রয়োজন ও এই পদ্ধতি বিজ্ঞান-সম্মত। এই দিক থেকেও ভারতের অবস্থা অনুযায়ী সমাজতন্ত্র বা মার্কসবাদের বিশেষ প্রয়োগ সুভাষচন্দ্রের চিন্তাধারার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ।

ভাববাদ ও ধর্মে বিশ্বাস স্থাপন সত্ত্বেও সুভাষচন্দ্র এই সবই ব্যক্তিগত পর্যায়ে রেখেছেন, রাজনীতিক্ষেত্রে কখনও তিনি তা ব্যবহারের চেষ্টা করেন নি। তাই সুভাষচন্দ্রের মূল রাষ্ট্রচিন্তার ওপর এগুলির বিশেষ প্রভাব পড়ে নি।

১৯৬৯তে আপনার ভাগ্য

যে-কোন একটি ফুলের নাম লিখিয়া আপনার ঠিকানাসহ একটি পোস্টকার্ড আমাদের কাছে পাঠান। আগামী বারমাসে

আপনার ভাগ্যের বিস্তারিত বিবরণ আমরা আপনাকে পাঠাইব, ইহাতে পাইবেন ব্যবসায়ে লাভ লোকসান, চাকুরিতে উন্নতি, বদলী, জন্ম, বিবাহ ও সুখ-সমৃদ্ধির বিবরণ; আর থাকিবে দুষ্ট-গ্রহের প্রকোপ হইতে আত্মরক্ষার নির্দেশ। একবার পরীক্ষা করিলেই বুঝিতে পারিবেন।

PT. DEV DUTT SHASTRI
RAJ JYOTISHI (B. M. W)
P. B. 86, JULLUNDUR CITY

কবি মনোমোহন ঘোষ সম্পর্কে কয়েকটি কথা

ডঃ কৃষ্ণধন ঘোষ ১৮৬৪ খৃস্টাব্দে রাজনারায়ণ বসুর জ্যেষ্ঠা কন্যা স্বর্ণকুমারীকে বিবাহ করেন। কৃষ্ণধন ঘোষের দ্বিতীয় পুত্র মনোমোহন। মনোমোহন ১৮৬৯ খৃস্টাব্দের ১৯শে জানুয়ারী ভাগলপুরে জন্মগ্রহণ করেন। কৃষ্ণধন ঘোষ কে ডি ঘোষ নামেই সমধিক পরিচিত ছিলেন। কৃষ্ণধন ছিলেন ইংরেজী শিক্ষাদীক্ষার বিশেষ অনুরাগী। ফলত ১০ বৎসর বয়সে মনোমোহনকে বিলেতে পাঠান হয়। মনোমোহনের মত জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা বিনয়ভূষণ ও ভ্রাতা অরবিন্দ বিলেতেই পড়াশুনা করেন। মনোমোহন 'ম্যানচেস্টার গ্রামার স্কুল', 'সেন্টপলস স্কুল' এবং পরে অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের 'ক্রাইস্টচার্চ' কলেজে অধ্যয়ন করেন। মোট ১৪ বছর তিনি বিলেতে ছিলেন। দীর্ঘকাল বিলেতে থাকা সত্ত্বেও তাঁর কোনরূপ নেশা ছিল না—এমন কি জীবনে তিনি কখনও চুরুট পর্যন্ত স্পর্শ করেন নি।

মনোমোহনের কবি-প্রতিভা অল্প বয়সেই সমাদৃত হয়। 'Primavera' নামক কাব্যগ্রন্থ তৎকালীন চারজন তরুণ কবির রচনায় সমৃদ্ধ। মনোমোহন ঘোষ ছিলেন তাঁদের অন্যতম। অপর তিনজন হলেন যথাক্রমে, Laurence Binyon, Stephen Phillips এবং Arthur Cripps. ছাত্রজীবনের শেষ বছরগুলিতে বিদেশে প্রভূত অর্থকষ্ট পেয়েছেন মনোমোহন ও তাঁর ভ্রাতৃবর্গ। কৃষ্ণধন ছিলেন কিছুটা অমিতব্যয়ী। লোকের দুঃখ-দুর্দশা তিনি সহ্য করতে পারতেন না। কাজেই অনেককেই তিনি অর্থ-সাহায্য করেছেন; যার ফলে তিনি তাঁর পুত্রদের বিদেশে লেখাপড়ার জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ সরবরাহ করতে পারেন নি। বিনয়ভূষণ শিক্ষা সমাপ্ত হবার আগেই কলকাতায় ফিরে আসেন। মনোমোহন বি-এ পাশ করে দেশে ফিরলেন। দেশে ফিরে তিনি সরকারী শিক্ষাবিভাগে যোগদান করেন। প্রথমে ঢাকা কলেজে ইংরেজী সাহিত্যের অধ্যাপক-পদে ব্রতী হন। এখান থেকেই তাঁর অধ্যাপক-জীবনের খ্যাতির সূত্রপাত। এর পর তিনি কলকাতার প্রেসিডেন্সি কলেজের ইংরেজী সাহিত্যের অধ্যাপক-পদ অলংকৃত করেন। অধ্যাপক হিসাবে মনোমোহন ঘোষ যে অসাধারণ কৃতী ছিলেন, সে কথা তাঁর ছাত্ররা মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করে থাকেন।

খুব অল্পসংখ্যক ভারতীয়ই ইংরাজী ভাষার মাধ্যমে কাব্যলক্ষ্মীর চর্চা করে যশস্বী হয়েছেন। মনোমোহন ঘোষ সেই স্বল্পসংখ্যকদের অন্যতম। তিনি প্রচুর কবিতা লিখেছেন। কিছুসংখ্যক প্রকাশিত হলেও অধিকাংশই এখনও অপ্রকাশিত। প্রচারবিমুখ, জ্ঞানসাধক ও যথার্থ কবি মনোমোহনের প্রকাশিত রচনা শিক্ষিত সমাজে আজও বহুল পরিচিত নয়।

১৯২২ সালের ডিসেম্বর মাসে মনোমোহন সরকারী চাকুরী থেকে অবসর গ্রহণ করলেন। কবির শেষজীবন মোটেই সুখের ছিল না। স্ত্রীর মস্তিষ্ক বিকৃতি ঘটেছিল। কবি আপ্রাণ সেবা-যত্ন করে স্ত্রীকে বাঁচিয়ে রাখতে চেষ্টা করেছিলেন। স্ত্রীর মৃত্যুর পর তিনি অত্যন্ত কাতর হয়ে পড়েন। শেষ বয়সে তিনি চোখেও ভাল দেখতেন না। এই সময়েও কিন্তু তাঁর কবিতা লেখা বন্ধ হয় নি। অসংখ্য কবিতা লিখেছেন তিনি। ক্লান্ত, শ্রান্ত কবি ইংলণ্ডে ফিরে যেতে চেয়েছিলেন। বাসনা ছিল, অপ্রকাশিত কবিতাগুলিকে গ্রন্থবদ্ধ করার। কিন্তু সেই ইচ্ছা তাঁর পূর্ণ হয় নি। তিনি ৪ঠা জানুয়ারী, ১৯২৪ সালে তাঁর কলকাতার বাসভবনে দেহত্যাগ করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স ছিল মাত্র ৫৫ বৎসর।

ঐ বৎসর ৭ই মার্চ তারিখে 'ক্যালকাটা য়ুনিভার্সিটি ইনস্টিটিউট'-এ কবির মৃত্যুতে এক শোকসভা হয়। সভাপতিত্ব করেন কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ। সভাপতির ভাষণে রবীন্দ্রনাথ বলেন: তাঁহার কবিতা কেবল 'গৌড়জন যাহে আনন্দে করিবে পান সুধা নিরবধি' নয়, 'বিশ্বজন যাহে আনন্দে করিবে পান সুধা নিরবধি'।

এই সভায় তাঁর স্মৃতিরক্ষার্থে একটি কমিটি গঠিত হয়। স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায় হলেন এই কমিটির সভাপতি। কোষাধ্যক্ষ হলেন আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়। ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় ছিলেন এর সম্পাদক। দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ এই কমিটির একজন সদস্য ছিলেন।

অস্কার ওয়াইল্ড 'Primavera' কাব্যগ্রন্থের আলোচনায় বলেন: .....a young Indian of brilliant scholarship and high literary attainments who gives some culture to Christ Church. Particular interest attaches naturally to Mr. Ghose's work. * * * Mr. Ghose ought some day to make a name in our literature.

'হিতবাদী' পত্রিকায় ১১ই জানুয়ারীতে লেখা হল, "তাঁহার রচিত ইংরেজী কবিতা এতই সুন্দর যে, কিছুদিন পূর্বে তাঁহার ইংলণ্ডের রাজকবি হইবার সম্বন্ধেও জনরব শ্রুত হইয়াছিল। সাহিত্যে 'নোবেল প্রাইজ' প্রাপ্তি সম্বন্ধেও তাঁহার সম্ভাবনা ছিল বলিয়া অনেকেই মনে করেন।"

সুভাষচন্দ্র বসু ১০ই মার্চ 'ফরওয়ার্ড' পত্রিকায় একটি পত্র লেখেন। এই পত্রে তিনি অধ্যাপক ঘোষের উদ্দেশে তাঁর শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন করেন। পত্রের শেষ দুটি লাইন নিম্নরূপ: * * His very sight gave the impression of a scholar immersed in the study of his favourite books. যথার্থ জ্ঞান-সাধকের মূর্তিটি এই উক্তির মধ্যে প্রতিফলিত।

সুভাষচন্দ্র বলেছেন যে, জনহিতকর কাজে অধ্যাপক ঘোষ সর্বদাই সহযোগিতা করতেন। তিনি সরাসরি স্বদেশী আন্দোলনে

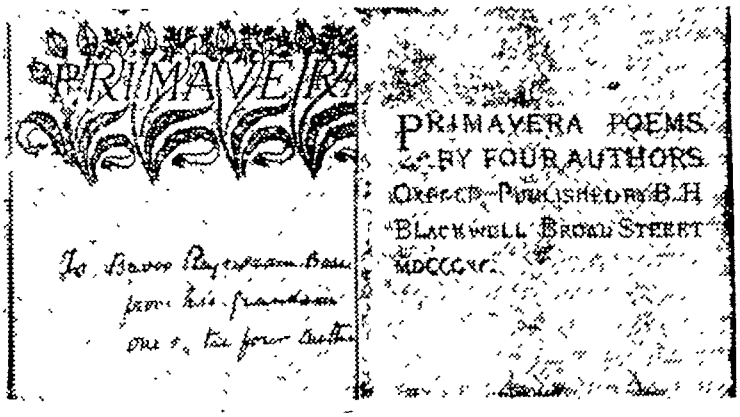

মাতামহ রাজনারায়ণ বসুকে প্রদত্ত গ্রন্থটির প্রথম পৃষ্ঠার ফটোস্টাট কপি

যোগ না দিলেও মানব-মুক্তির সংগ্রামে তাঁর সহানুভূতি ছিল অপরিসীম।

ঋষি অরবিন্দ, বিপ্লবী বারীন্দ্রকুমার যেমন বাংলার জাতীয় ইতিহাসে বিশেষ স্থানের অধিকারী, কবি মনোমোহনও কাব্যপিপাসুদের চিত্তে তেমনই গৌরবের আসনে অধিষ্ঠিত হবার দাবি রাখেন।

নিম্নে তাঁর কাব্যকৃতির কিঞ্চিৎ উদ্ধৃতি দেওয়া গেল :—

Heap ruby upon amethyst,
Exhaust the deep seas
of their pearl:
My lips are richer,
being kissed
By the sweet rose lips
of a girl.
Her heart is white
with angel truth,
Her heart is red
with love's own fire;
She is the snowdrop
of my youth,
She is the rose of my
desire.

(Love-Songs and Elegies—নামক কাব্যগ্রন্থের প্রথম কবিতা)।

'Tis my twentieth year: dim, now, youth
Stretches behind me;
Breaking fresh at my feet,
lies, like an ocean,
the world.
And despised seem, now,
those quiet fields I have travell'd,
Eager to thee I turn, Life,
and thy visions of joy.
* * *

(Primavera কাব্যগ্রন্থের মনোমোহনকৃত প্রথম কবিতার একাংশ)।

১৯৩৮ সালে অধ্যাপক ঘোষের কন্যাগণ তাঁর পাণ্ডুলিপিগুলি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়কে দান করেছেন। বিশ্ববিদ্যালয় এইগুলি প্রকাশের দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন।

কবির প্রকাশিত ও অপ্রকাশিত গ্রন্থের তালিকা দেওয়া হল :—

প্রকাশিত গ্রন্থসমূহ

1. (The) Garland of new poetry, by various writers, London, 1899.

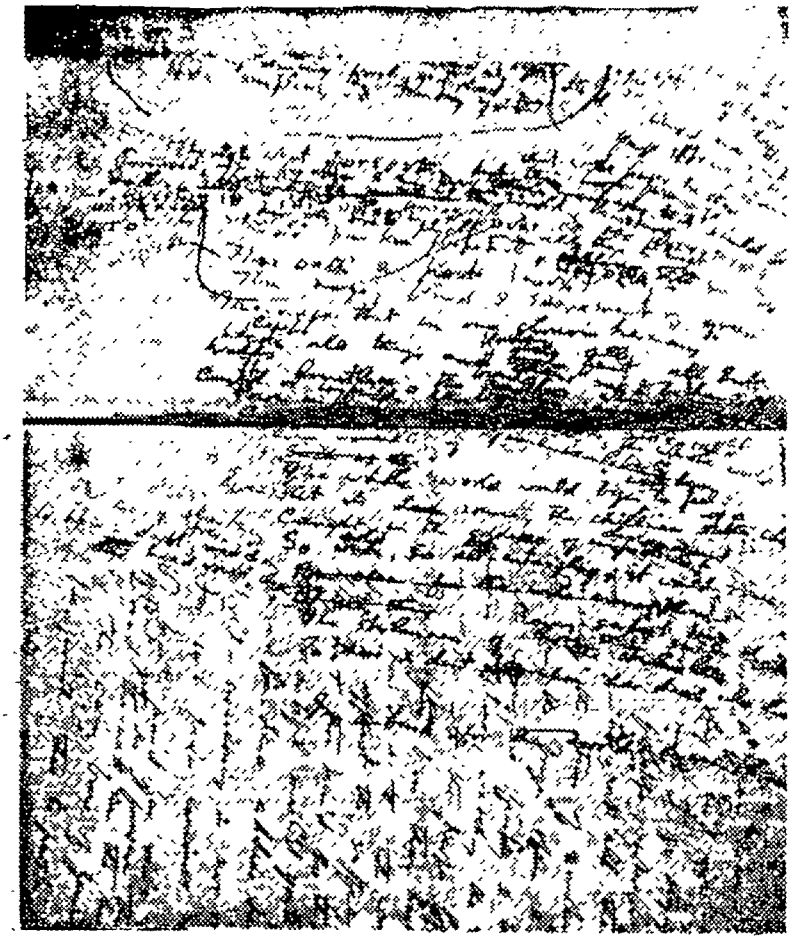

মূল পাণ্ডুলিপির ফটোস্টাট কপি

2. Primavera: poems, by four authors; 2nd ed. London, n.d.

3. Love-songs and Elegies, by M. Ghose. London, 1898.

4. Songs and love and death. Oxford, 1926.

অপ্রকাশিত পাণ্ডুলিপি

Adam alarmed	in 5 vols.
-do- type script	in 3 vols.
Early poems	in 10 vols.
Immortal eve	in 2 vols.
-do- type script	in 2 vols.
Immortal eve & Adam alarmed	in 1 vol.
Immortal eve & Orpheuic mysteries	in 1 vol.
Nala Damayanti	in 6 vols.
Notes on Vita nuova	in 1 vol.
Oenone	in 1 vol.
Orphic poems & mysteries	in 4 vols.
-do- type script	in 1 vol.
Orpheus poems, mysteries & immortal eve	in 1 vol.
Perseus	in 24 vols.
Pool of Narcissus & albion	in 1 vol.

—প্রদ্যোত রায়

পথ কি রুখবে?

মনোজ বসু

[পূর্ব-প্রকাশিতের পর]

॥ চৌত্রিশ ॥

ক্লান্ত অবসন্ন হরিহর টলতে টলতে বাড়ি ফিরলেন। দিনমানটা তবু যাহোক একরকম, রাত্রি একেবারে অসহ্য। চোখে ঘুমের চিহ্নমাত্র নেই, শয্যাতেও পড়ে থাকতে পারেন না—ঘরময় ছটফট করে বেড়ান। আপন-মানুষ কেউ নেই কোন দিকে। শত্রুর অঞ্চল—বাড়িটাও শত্রুপুরী। অন্ধকারে মনের কল্পনায় শত শত ছোরা-ছুরি ঝিলিক দিয়ে উঠছে।

নিজস্ব নৌকো আছে। ছোট লঞ্চও আছে একটা। লঞ্চের ড্রাইভার বয়সে ছোকরা, চুঙো-প্যান্ট পরে, চোখে-মুখে কথা বলে। ছোকরা-মানুষের উপর আস্থা করা চলে না। লঞ্চের উপর উঠে পড়লাম—তার পরে হয়তো কোন-এক অজুহাত দেখিয়ে পাড়ের উপর ধরল শত্রুর একেবারে ঘাঁটির মধ্যে। পালান সেদিক দিয়ে নির্ভরযোগ্য। বুড়োমানুষ—ঠাকুরদেবতা খুব মানে, মনে ধর্মভাব আছে। তবে যা দিনকাল, জোর করে কিছু বলবার জো নেই। চিরদিনের বিশ্বস্ত মাঝি সে কথা ঠিক, মনিবের জন্য প্রাণ দিতে পারত—কিন্তু আজ এই মুহূর্তে মনোভাব কী রকম দাঁড়িয়েছে, কে বলবে!

রাত পোহালে হরিহর পালানকে ডেকে পাঠালেন। দোতলায় একেবারে খাস-কামরায় নিয়ে তুললেন। বললেন, আমি শ্বশুরবাড়ি যাবো পালান, পৌঁছে দিয়ে আসবে।

পলায়ন ভাবছে নাকি মাঝি? কৈফিয়ৎ বানিয়ে তাড়াতাড়ি বললেন, তোমাদের ঠাকরুনের বাড়াবাড়ি অসুখ—শালামশায় লোক পাঠিয়েছে। না গেলে চলবে না।

পালান একটুখানি ভেবে ইতস্তত করে বলল, তাইতো! ওরা কি আর বিপদ-আপদ বুঝবে?

হরিহর তেলে-বেগুনে জ্বলে উঠলেন: আমার বাড়ি, আমার শ্বশুর-বাড়ি। ইচ্ছে হয়েছে, বাড়ি থেকে শ্বশুর-বাড়ি যাচ্ছি। কার কাছে সেজন্য কৈফিয়ৎ দিতে যাবো?

পালান বলল, কৈফিয়ৎ তো চাইতে আসবে না হুজুর। টের পেয়ে গেলে বিশ-পঁচিশ মরদ জুটে পড়ে মাঝ-গাঙে নৌকোই বা ডুবিয়ে দিল! ঠিক এমনি একটা ঘটেছে কালীগঞ্জ থানায়।

হরিহরের উল্টো সুর সঙ্গে সঙ্গে। বললেন, টের যাতে না পায় তাই করো তবে। বউয়ের এখন-তখন অবস্থা, যেতেই তো হবে। আর তুমি ছাড়া এ-কাজে অন্য কারো উপর ভরসা করতে পারি নে।

ভেবেচিন্তে পালান বলে, বাড়ির ঘাটে নয়, চেনা নৌকোতেও নয়। কড়া নজর রেখেছে। সেদিন তো তার পরখ হয়ে গেল।

তবে? হরিহরের কণ্ঠস্বর হাহাকারের মতন শোনায়।

এক হতে পারে, আমার দুই ছেলে ডিঙিনৌকো নিয়ে পাতি কাটতে গেছে। কষ্ট করে সেই অবধি যদি যেতে পারেন, টুক করে তারা পৌঁছে দিয়ে আসবে। জল্লাটের কাকপক্ষীও টের পাবে না।

হরিহর বলেন, কোথায় তোমার ছেলেরা?

বয়ারমারি।

হরিহর আঁতকে ওঠেন: সে তো অনেকখানি দূরে—

পালান ঘাড় নেড়ে সায় দিল: আজ্ঞে হ্যাঁ। ঘাটও তেমন-কিছু নয়, লোক-চলাচল নেই সেদিকটা। পাতিবন। বড় একটা শিমুলগাছ আছে, শিমুল-গাছ নিশানা। পাতি কাটতে গিয়ে ঐখানটা সবাই নৌকো বাঁধে।

আরও সামাল করে দিচ্ছে: দিনমানে বেরুতে যাবেন না হুজুর। খবরদার! আঁচ পেয়েছি, যাচ্ছেতাই কথাবার্তা কানে আসে। রাত্রিবেলা অন্ধকারে মুখ ঢেকে বাড়ি থেকে যদি বেরিয়ে পড়তে পারেন।

পরামর্শ পছন্দসই নয়। নিজের বাড়িতে আছেন—যা-হোক তবু চার-দেয়ালের ঘের মাথার উপরে ছাত। বাড়ি ছেড়ে পথে নেমে একলা প্রাণী তিন-চার মাইল মুখ ঢেকে চলে যাবেন—একটি মানুষ দেখতে পাবে না, দেখলেও চিনতে পারবে না। অবাস্তব জিনিষ এর চেয়ে আর হয় না। আর বেরুচ্ছেনই বা কেমন করে পথে? পুলিশের কনেস্টবল পেলে মাঝি যে একই সঙ্গে পাহারা দিচ্ছে আর ঘুমও দিচ্ছে লাঠি ঠেকনো দিয়ে? দিন আর রাত আলো আর অন্ধকারের বাছবিচার নেই ওদের কাছে। সেদিনই তো দেখলে তোমার ঠাকরুনের নৌকোয় উঠবার বেলা।

ভেবে কূল মেলে না। চুপচাপ আরও কিছুক্ষণ বসে পালান উঠে পড়ল।

আকস্মিকভাবে হরিহর পথ পেয়ে গেলেন—রাত্রিবেলা ও অন্ধকার অবধি অপেক্ষা করতে হল না। এক বিকালে রে-রে করে বাড়িতে মানুষ ঢুকে গেল। রাস্তার উপরেও প্রচণ্ড ভিড়। খবর ছড়িয়ে পড়তে নানা দিক দিয়ে আরও বিস্তর ছুটে আসছে। গিসগিস করছে মানুষ।

কিস্তিতে ট্রানজিস্টার

মাসিক মাত্র ১০৲ টাকা কিস্তিতে ৩২০৲ টাকা মূল্যের বিশ্ব-বিখ্যাত ৩ ব্যান্ড অল ওয়ার্ল্ড পোর্টেবল "টেলিকুইন" ট্রানজিস্টার কিনুন।

নিম্ন ঠিকানায় আবেদন করুন:—
ATLAS CO. (BC—22)
P.O. Box 1329, Delhi—6.

প্রতিবেশী বৃদ্ধ তারাবল্লভ বেড়াতে বেড়িয়েছেন। ভিড় ঠেলে যাওয়া অসম্ভব, দাঁড়িয়ে পড়লেন তিনি। একজনকে শুধালেন ঃ ব্যাপার কি পঞ্চানন?

পঞ্চানন দাঁত বের করে অকৃত্রিম উল্লাসে বড়লোকের লাঞ্ছনা দেখছে। জবাব না দিয়ে সে হি-হি করে হাসতে লাগল।

বৃদ্ধ জ্বলে উঠলেন ঃ হেসো না, হেসো না। ঘুটে পোড়ে, গোবর হাসে। শাঁ-চৌধুরীর বাড়ি লুঠ হচ্ছে, চোখে দেখে বড্ড সুখ। যেদিন তোমার আমার বাড়ি ঢুকে পড়বে? কিছু বিশ্বাস নেই। আবাদে দেখ নি—বাঁধ বেঁধে গাঙের জল আটকানো। এক মুখে একটুকু ভাঙন দেখা দিল—তক্ষুনি যদি মাটি ফেলে জলের তোড় রুখে না দাও, বাঁধের চিহ্নমাত্র থাকবে না।

চতুর্দিকে নজর ঘুরিয়ে দেখে বললেন, কোনো বেটা পুলিশের পাত্তা নেই। ঝিমুচ্ছে থানায় বসে বসে। কাজ-কর্ম সেরে চলে যাক, তখন একবার রীতরক্ষে করতে আসবে।

কোনদিক থেকে এক ছোকরা এসে মুখ বাড়িয়ে বলল, পুলিশ এই তো আমরাই সব—বেসরকারী পুলিশ।

তারাবল্লভ বললেন, তাই তো দেখছি ধাবাসকল। বয়স কম তোমাদের, রক্ত গরম। বাড়ি ঢুকে দলবদ্ধ হয়ে হামলা করা—কাজটা কিন্তু ঘোরতর বেআইনি।

ছোকরা বলল, ধানের খবর আছে, ধান মজুত করে রেখেছে। সেটা তো আরও বেআইনি। খুন করেছে, খুনি ধরতে বাড়ির মধ্যে ঢুকব—আইন দেখালে চলে তখন দাদু?

দোতলায় হরিহর পাগলের মতন ছুটোছুটি করছেন। কোথায় যাবেন কি করবেন, কিনারা পাচ্ছেন না। চোরকুঠুরি সিঁড়ির ধারে, বাতিল কাঠকুটো ও আজে-বাজে জিনিসে বোঝাই হয়ে আছে, গুটি-সুটি হয়ে তার মধ্যে বসে পড়লেন।

পেয়েছি, পেয়েছি—

কে হঠাৎ আকাশ-ফাটানো গলায় চেঁচিয়ে উঠল। সঙ্গে সঙ্গে বহু কণ্ঠের কলরোল। ঝোড়ো সমুদ্রের তরঙ্গ আছড়ে আছড়ে পড়ছে। বাইরে যারা আছে, তাদের মধ্যেও হুড়োহুড়ি—অনেকে ঢুকে পড়তে চায়। ধাক্কাধাক্কিতে কতজনা মাটিতে পড়ল। পদপিষ্ট হচ্ছে—কায়ক্লেশে উঠে পড়ে আবার ছুটছে। মণিমাণিক্যের ডাণ্ডার মিলে গেছে, ছুটে যাও, লুটে-পুটে নিয়ে নিল সকলে।

ধান, ধান, ধান!

প্রচণ্ড উল্লাস আর হাঁকডাকের মধ্যে হরিহর আর মাথা গুঁজে থাকতে পারেন না। জানলার কপাট ফাঁক করে দেখেন। দুরন্ত মচ্ছব ভিতর-উঠানে। সুলুক-সন্ধান নিয়ে দস্তুরমতো তৈরি হয়ে সব বাড়ি ঢুকেছে। দমাদম কুড়ালের ঘা পড়ছে ভল্টের কঠিন দরজায়। দু-দুটো বর-কন্দাজ এবং একগাদা চাকর-বাকর বাড়িতে পুষে আসছেন—এই চরমক্ষণে পুতুল হয়ে গেছে তারা সব। চক্ষু থেকেও দেখতে পাচ্ছে না যেন। মুখ থেকেও বাক্যস্ফূর্তি নেই, হাতখানা অবধি উঁচু করে তোলবার শক্তি হারিয়ে ফেলেছে। ওর মধ্যে দাঁত মেলে হাসছেও কেউ কেউ—এমনিধারা মনে হল। বিপদের মুখে আপন কেউ নয়, সবাই শত্রু। শৈশবে পদ্য পড়েছিলাম ঃ

সুসময়ে অমেকেই বন্ধু বটে হয়,
অসময়ে হায় হায় কেহ কারো নয়—

দেখ চেয়ে চোখের উপর তার জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত।

মানুষ হন্যে হয়েছে। বস্তা বস্তা ধান এনে উঠানে ফেলছে। বাধা-বন্ধ নেই, নিয়ে নিলেই হল। এরই মধ্যে জনকয়েক মাতব্বর হয়ে হাঁক পাড়ছে ঃ পেটের ক্ষিধে সকলের, সবাই প্রত্যাশী। ইচ্ছে মতন নিয়ে নিলে হবে না, বাঁটোয়ারা করতে হবে। সবাই যাতে চাট্টি চাট্টি পায়।

ইতিমধ্যে একজন ছোকরা জুটে গেছে, ভলান্টিয়ার হয়ে ভিড় নিয়ন্ত্রণ করছে তারা। হাতে হাতে শিকল বানিয়ে পথ করে দিয়েছে—এই পথ ভিতরে ঢুকবার, এই পথ বেরুনোর।

আপন বাড়িতে চোরকুঠুরির মধ্যে বন্দী থেকে হরিহর গজর-গজর করছেন ঃ উঃ, বাপের ধান দানখয়রাত করছে শালারা! কলজে খসে খান খান হয়ে যাচ্ছে, তবু কথা বলার জো নেই। এক্ষুনি কি, জানলা ফাঁক করে এই যে দেখছেন, নেহাৎ লুট-পাট নিয়ে মত্ত—নজরে পড়লে ক্ষুধার্ত নেকড়ের মতন ঝাঁপিয়ে পড়ে টুঁটি চেপে হাড়মাংস ছিঁড়েখুঁড়ে প্রতিহিংসা নেবে।

ধান নিয়ে পাগল—বিশাল জনতার সকলগুলো চোখ উঠানের ধানের দিকে। ঐ দিকটা চুকিয়ে-বুকিয়ে তারপর মজুতদারের খোঁজ পড়বে। সুযোগ এই-বারে। পাহারা এই মুহূর্তে ঢিলা—হেন মহেন্দ্রযোগ আর মিলবে না। পিছন-দিককার ঘোরানো-সিঁড়ি দিয়ে নেমে টিপিটিপি খিড়কি-দরজা খুলে হরিহর নদীকূলে এসে পড়লেন। কেউ নেই কোথাও। বনজঙ্গল অপথ-বিপথ ভেঙে ছুটলেন তিনি।

ভাগ্য ভাল, এই সন্ধ্যাবেলা পালান বাড়িতে। একলাই সে মাদুরে বসে জাল বুনছে। বাড়িটা দেখা ছিল, নৌকোয় যেতে যেতে হরিহর অনেকবার দেখেছেন। যেতে যেতে মিনিটখানেকের জন্য হয়তো পালান কলকে-তামাক কি বোঠে নিতে বাড়িতে নেমে পড়েছে। নড়বড়ে গোলপাতার ঘর—মহাধনী মহামানী মানুষটি চোরের বেহদ্দ হয়ে উঁকঝুঁকি দিয়ে সেই ঘরে ঢুকলেন। হাঁপাচ্ছেন উদ্বেগে আর ক্লান্তিতে। ছেঁড়া মাদুরের উপর পালানের পাশে ধপ করে বসে পড়লেন।

পালান স্তম্ভিত ঃ এলেন কেমন করে হুজুর?

ম্লান হেসে হরিহর বলেন, মোটরলঞ্চ-মোটরগাড়ি নয়, সাইকেল-রিক্সাও নয়। পায়ে হেঁটে এসেছি, তোমরা সব যেমন আসো।

আবার বললেন, ঠাকরুন তোমাদের আছে কি-নেই—উদ্বেগে ছুটে এসেছি। চলো পালান, বয়ারমারি না কোনু জায়গায় তোমাদের ভিঙি—নিয়ে চলো সেখানে। দেরি হলে হবে না, এক্ষুনি বেরুবে।

তবু দেরি। পালানের বউ পাড়ায় গেছে, ডেকে এনে তাকে ঘরে মোতায়েন করে তবে বেরুনো। হরিহর সতর্ক করে দেন ঃ দেখো হে—আমি এখানে, ঘুণাক্ষরে প্রকাশ না পায়।

পালান সবিনয়ে বলে, জানি হুজুর। দায় এখন আমারই। এইখানে বাড়ির উপরে যদি কেলেঙ্কারি ঘটে যায়, আপনার কাছে এর পরে মুখ দেখাবো কেমন করে? একা রইলেন, চট করে আমি আসছি।

যাবার মুখে পালান দুয়োর ভেজিয়ে দেয়। হরিহর বলেন, তা কেন। খিল দিয়ে যাও। হঠাৎ কেউ না ঢুকতে পারে। তুমি এসে ডাকলে খুলে দেবো।

সেই গেল পালান, আর আসে না। উদ্বেগে হরিহর বারম্বার হাতঘড়ি দেখছেন। কোথায় কত দূর বেরিয়েছে পালানের বউ—হনুলুহুলু না হাওয়াই দ্বীপে —এতক্ষণ কিসে লাগে জানি নে বাবা।

ঘড়িতে ঘণ্টা পুরতে যায়, তখন দরজায় টোকা। খিল খুলে হরিহর বলেন, এত দেরি?

বউকে তুলতে পারি নে, শনির শির্ণি দক্ষিণের বাড়ি। পুঁথিপাঠ সারা না হলে নড়বার উপায় নেই। কাঁচা-খেগো দেবতা যে শনিঠাকুর!

পালানের পাশ কাটিয়ে বউ এসে ঘরে

সর্দ্দি ও কাশিতে
রক্ষিতের
ভাল মিছরি
ফোন. ৫৫-৩০৮৫

উঠল। পালান বলে, দেরি হয়ে কাজের কিন্তু জুত হয়েছে। কী রকম ঘুটঘুটে অন্ধকার, বেরিয়ে দেখুন। নিজের হাত-পা ক'খানাই নজরে আসছে না।

খুব একটা অতিশয়োক্তি নয়। রাস্তা ছেড়ে পালান বাঁশবনে নিয়ে তুলল। পথ সংক্ষেপ হবে, লোকের মুখোমুখিও পড়তে হবে না ঝাড়ের পর ঝাড়—অনন্ত। ছড়িয়েপড়া কঞ্চিও গায়ে জড়িয়ে যাচ্ছে। তা হোক, তা হোক—ঝাড় সেই খরাব-মারি অবধি চললেই বা মন্দ কি! পালান আগে আগে যাচ্ছে পথের নিশানা দিয়ে। মানুষটা নজরে আসে না—শুকনো পাতা পায়ে পায়ে ছিটকে পড়ে, সেই খসখসানি। বেশ প্রখর আওয়াজ, ঝড় ছুটিয়ে চলেছে যেন।

হরিহর ডাকছেন : অত জোরে নয় পালান। আস্তে, আস্তে। অত আমি ছুটতে পারি নে।

জবাব আসে না। জোরও কমে নি। ওদের কি! চাষাভুষো মানুষ, অন্ধকারে বেশি করে নজর খুলে যায়। রাতে আলো জ্বালায় না—কেরোসিন কোথা? বিলাসিতার গরজটাই বা কি? ভাত খাওয়ার সময়েও আলো লাগে না—মাছের কাঁটা বাছবার সময় হয়তো বা একটু জ্বালিয়ে নেয়, পরক্ষণে ফুঁ দিয়ে নেভায়। প্রভুদের দয়ায় ও ব্যবস্থার গুণে আলোর খরচায় বিষম কড়াকড়ি। শ্বাপদ-সরী-সৃপের মতো অবাধ চলাচল—সাপের ভয় করে না, তারাও বোধহয় স্বজাতি ভেবে খাতির করে। আপনি-আমি হলে ফোঁস করে কেউটে ফণা তুলে ওঠে, ওদের বেলা কেঁচোর মতন সড়সড় করে পাশ কাটিয়ে চলে যায়।

পালান, ওরে পালান—

সাড়া মেলে না। অন্ধকার কালো কাদার মতন সর্বাঙ্গে লেপটে যাচ্ছে, এমনি একটা বিচিত্র অনুভূতি। অন্ধের মতো চলেছেন—সত্যি সত্যি চোখই বুজছেন ক্ষণে ক্ষণে। চোখ মেলে থেকে কিছুমাত্র ফয়দা নেই, সর্বক্ষণ চোখ খাটিয়ে তবে মুনাফাটা কি?

সর্বনাশ পিছু নিয়েছে, বুঝলেন এতক্ষণে। বাঁশপাতার খসখসানি সামনে ছিল গোড়ার দিকে, তেমনি আওয়াজ পিছনেও যেন পাওয়া যায়। ডাইনে, বাঁয়েও। সর্বত্র। চারিদিক দিয়ে ঘিরে ফেলেছে—জাল গুটিয়ে আনছে। দৃষ্টি প্রাণপণে বিসারিত করেও মানুষ দেখা যায় না—অশরীরী অলক্ষ্য শত্রুপক্ষ। ভয় পেয়ে হরিহর পালান মাঝিকে ডাকছেন, গলা শুকিয়ে কাঠ—আওয়াজ বেরুচ্ছে না। একেবারে কাছে পড়ল যেন।

হরিহর মর্মান্তিক চিৎকার করে উঠলেন : হাত ধরো এসে পালান। পথ ঠাহর পাচ্ছি নে, ঘুরে মরছি।

কা কস্য পরিবেদনা। পালান মাঝিও বিশ্বাসঘাতক। সরে পড়েছে, কিম্বা কাছে থেকেও কথা বলছে না। অন্ধকারের মধ্যে যেন ঘোরতর ব্যস্ততা, হুটোপাটি লেগেছে অনেকজনের মধ্যে। নজরে পাচ্ছেন না, কিন্তু স্পষ্ট উপলব্ধি। চোখে দেখার চেয়ে বেশি প্রকট।

গোলকধাঁধার মধ্যে এনে ফেলেছে চক্রান্ত করে। কোনো সন্দেহ নেই আর। পালাতে গিয়ে আছাড় খেয়ে পড়লেন। শুকনো বাঁশপাতা জমে গদির মতন—তার উপরে আঘাত লাগল না। কিন্তু অন্ধকার-চারী রসিকবৃন্দের হা-হা হি-হি হাসি। এদিকে-সেদিকে প্রতিধ্বনি—হাসিতে ফেটে পড়ছে যেন সারা বাঁশবন। নিঃসংশয় এখন, বহুজন চারিদিক দিয়ে ঘিরে ধরেছে, খেলাচ্ছে হরিহরকে। বিড়াল যেমন মুখের ইঁদুরকে ছেড়ে রেখে খেলায়। বঁড়শি-গাঁথা মাছ ডাঙায় তোলার আগে জলের মধ্যে খেলিয়ে নিয়ে বেড়ায়।

দু-হাতে ভর দিয়ে হরিহর উঠে পড়লেন। ছুটছেন প্রাণপণে—হাসির ব্যূহ ভেদ করে গোলকধাঁধা কাটিয়ে বেরুনোর প্রয়াস। এদিকে-সেদিকে আরও বিস্তর ছুটেছে পায়ে পায়ে বাঁশপাতা ছড়িয়ে—অনুভব করছেন সেটা। কখন রাস্তায় পড়বেন, আলোয় পৌঁছে যাবের অন্ধকার পাড়ি দিয়ে! এই অন্ধকার কূলহীন সমুদ্রের মতো—দিনরাত্রি ছুটেও বুঝি পাড়ে ওঠা যাবে না। চোখে না দেখেও হরিহর বুঝতে পারছেন, শতসহস্র কঙ্কাল-মানুষ চতুর্দিক ঘিরে অস্থিময় হাত বের করেছে তারা, অস্থিগুলো বুঝি দীর্ঘ থেকে দীর্ঘতর হচ্ছে। অস্থিসার আঙুলগুলো জিঘাংসার উত্তেজনায় আকুলিবিকুলি করছে—হাড়ে হাড়ে সেই খটখট বাজনা। সহস্র-খানা হাত গলা চেপে ধরতে আসছে, গলা ছুই-ছুই করেছে। সহস্র বুভুক্ষু বিশীর্ণ মুখের উপর দাঁত বের-করা উৎকট হাসি। আতঙ্কে হরিহর চেতনা হারিয়ে সেই বাঁশের জঙ্গলে লুটিয়ে পড়লেন। কায়দায় পেয়েছে—নিশ্চল দেহ ছিঁড়েখুঁড়ে আক্রোশের এইবারে শোধ তুলবে।

জওহরলাল বলে রেখেছেন, ল্যাম্প-পোস্টে ঝোলানো হবে কালোবাজারিদের। বিস্তর এমনি ভাল ভাল কথা বলে গেছেন স্বপ্নবিলাসী সদিচ্ছাবান শিক্ষিত ধনী-পুত্রটি। —সুভাষিতাবলী জীবৎকালে কাজে ফলাতে পারেন নি, মরার পরে এতদিনে বুঝি ফলে যায়। মহাজন-বাক্য ফলে এমনি উত্তর-কালে। কার্ল মার্ক্সের উক্তিও পথ করে নিল মৃত্যুর অনেক পরে। কিন্তু পালান মাঝে কী সর্বনেশে মানুষ—মুখ-ভরা সুমধুর 'আজ্ঞে' 'হুজুর', মনে মনে শয়তানি প্যাঁচ। চরমদিনে হরিহর খাঁয়ের পায়ের নিচে থেকে মাটি সরে যায়, নিশ্বাসের একটুকু বাতাস মেলে না এত বড় আকাশে।

[ক্রমশ]

পাঠক-পাঠিকাদের প্রতি নিবেদন

গত ষোলই জানুয়ারীতে প্রকাশিত সাপ্তাহিক বসুমতীর বিশেষ নির্বাচনী সংখ্যাটি ক্রয়ের জন্য বহু পাঠক-পাঠিকা এখনো আবেদন জানাচ্ছেন। আমরা সবিনয়ে জানাই, ঐ সংখ্যাটি সম্পূর্ণ নিঃশেষিত হওয়ায় আর এক কপিও সরবরাহ করা সম্ভব নয়! আমরা আশা করি, উক্ত সংখ্যাটি যাঁরা পেয়েছেন, তাঁদের কাছ থেকে আগ্রহী পাঠকরা সাময়িকভাবে সংগ্রহের চেষ্টা করবেন।

যাহোক, আগামী অন্তর্বর্তী নির্বাচনের পরিপ্রেক্ষিতে আরো বহু তথ্য, বিভিন্ন সম্ভাষনা এবং পূর্বে অনালোচিত ও অপ্রকাশিত খবরা-খবর নিয়ে কয়েকটি মূল্যবান লেখা সাপ্তাহিক বসুমতীতে বের হবে আগামী ৩০শে জানুয়ারী '৬৯। ঐ সব লেখা লিখবেন—কৃত্তিবাস ওঝা প্রদ্যোত রায়, সাংবাদিক সাগর বিশ্বাস ও অসীম মুখোপাধ্যায় প্রমুখ।

বার্লিনে নেতাজী

অলোক সেন

দেশ—শুধু বাংলা দেশ নয়, সারা ভারতবর্ষ—দেশগৌরব, স্বাধীনতার মূর্ত প্রতীক সুভাষচন্দ্রকে ঠিকমত বুঝেছিল—তাই স্বয়ং গান্ধিজীর বিরোধিতা সত্ত্বেও তিনি গান্ধিজীর মনোনীত ডাঃ পট্টভি সীতারামিয়াকে পরাজিত করে ১৯৩৯ সালে দ্বিতীয়বার কংগ্রেসের সভাপতি নির্বাচিত হতে পেরেছিলেন। কিন্তু কংগ্রেসের নেতারা তাঁর প্রতি বিরূপ—সুতরাং হোন্ না তিনি কংগ্রেসের নির্বাচিত সভাপতি, তবু তাঁকে সভাপতি পদে ইস্তফা দিয়ে সরে আসতে হল। এই প্রসঙ্গে Hugh Toye তাঁর Subhas Chandra Bose—The Springing Tiger বইতে লিখেছেন:

"He had been democratically elected in preference to Gandhi's nominee: he was President, leader, by the will of the people, in spite of the will of Gandhi. Those who had voted for him had known his views and had deliberately chosen them. His popular mandate had been denied by intrigue, intrigue not only against himself, but against the democracy which had elected him... In August he was suspended from Congress office for three years."

এর পর হল্‌ওয়েল মনুমেন্টের বিলোপসাধনের আন্দোলন এবং রাজদ্রোহের অপরাধে তাঁকে গ্রেপ্তার করা হল। ৫ই ডিসেম্বর থেকে নিজস্ব বাড়ি ৩৮।২, এলগিন রোডে তিনি বিচারাধীন বন্দী অবস্থায় ছিলেন। ১৯৪১-এর ১৫ই জানুয়ারী গভীর রাত্রে সুভাষচন্দ্র ছদ্মবেশে গৃহত্যাগ করেন। কাবুল হয়ে সুভাষচন্দ্র রাশিয়া এবং সেখান থেকে বার্লিনে যান।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধকালীন সুভাষচন্দ্রের দেশত্যাগ, এবং জাপানে আজাদ হিন্দ ফৌজ সংগঠন ও ভারতীয় স্বাধীনতা আন্দোলনে নেতাজী পরিচালিত আজাদ হিন্দ ফৌজের বিরাট অবদানের বিষয় বহু তথ্যপূর্ণ রচনা এ যাবৎ প্রকাশিত হয়েছে। কিন্তু বার্লিনে থাকাকালীন তাঁর কার্যধারা এবং হিটলারের গভর্নমেন্টের সঙ্গে তাঁর কি ধরণের সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল এ বিষয়ে খুব প্রামাণ্য তথ্য আমরা বিশেষ জানতে পারি নি। গত বছরের প্রথম দিকে বার্লিনার আসেম্বলের নিমন্ত্রণে আমি ব্রেশট্ ডায়লগে অংশ গ্রহণ করতে যাই। সে সময় ওখানে কিছু কিছু জার্মান স্কলারের সঙ্গে আমার পরিচয় হয় এবং তাঁরা দেখেছিলাম নেতাজীর বিষয় অনেক খোঁজখবর রাখেন। আমি লাইপজিগেও গিয়েছিলাম—ওখানকার কার্ল-মার্কস বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক সল্‌টার জার্মান ভাষায় একটি বই লিখেছেন বলে শুনছিলাম, যার বক্তব্য বিষয় হচ্ছে ভারতবর্ষ সম্পর্কে নাৎসী জার্মানীর আসল মনোভাব। বইটির নাম 'দি পলিসি অফ নাৎসী জার্মানী টুওয়ার্ডস ইণ্ডিয়া।' প্রফেসর সল্‌টারের সঙ্গে দেখা করবার সুবিধা করে উঠতে পারি নি, কিন্তু তাঁর এক ছাত্রের সঙ্গে আমার পরিচয় হয়েছিল। এই ছাত্রটি এবং বার্লিনের উপরি-উক্ত বন্ধুরা আমাকে নেতাজীর বার্লিনে থাকাকালীন তাঁর সম্পর্কিত যে সব খবরাখবর পাঠিয়েছেন সেই চমকপ্রদ বিবরণী একত্রিত করে এবং ধারাবাহিকভাবে তুলে দিচ্ছি:

এর বেশির ভাগ তথ্য পটস্‌ডামের জার্মান সেন্ট্রাল আরকাইভ্‌সে রক্ষিত ফ্যাসিস্ট পররাষ্ট্র দপ্তরের ফাইল থেকে উদ্ধার করা হয়েছে প্রচুর পরিশ্রম এবং গবেষণার সাহায্যে।

(১)

এস সি বোসের জার্মানীতে আগমন

এস সি বোস জার্মানীতে প্রবেশ করলেন ১৯৪১ সালের বসন্তকালে এবং বার্লিন পরিত্যাগ করে যান ১৯৪৩ সালে। ব্যক্তিগত নিরাপত্তার জন্য অরল্যাণ্ডো মাজোট্টা এই ছদ্মনাম তিনি গ্রহণ করেন।

এর দেড় বছর আগে থেকেই ফ্যাসিস্ট জার্মানী দ্বিতীয় বিশ্বমহাযুদ্ধ শুরু করে দিয়েছে। ১৯৩৯ সালেই জার্মান ইম্পিরিয়ালিজম পোল্যাণ্ড আক্রমণ করে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের অবতারণা করে। ১৯৪০ সালে জার্মানরা নেদারল্যাণ্ডস, বেলজিয়াম, ডেনমার্ক, নরওয়ে ও ফ্রান্সের ওপর তাদের আধিপত্য বিস্তার করে। এ ছাড়াও জার্মান সৈন্যদল তখন ইতালীয়ান ফ্যাসিস্টদের সাহায্য করবার জন্য পূর্ব আফ্রিকায় যুদ্ধ করছিল। ১৯৪১ সালে গ্রীস এবং ইউগোস্লাভিয়া জার্মানীর বশ্যতা স্বীকার করে নিল। ঐ সালের ২২শে জুন জার্মানরা সোভিয়েট রাশিয়া আক্রমণ করলো।

সে সব দেশ জার্মানরা অধিকার করে নিল সেখানে হিটলারের নাৎসী অনুচররা শুরু করলো বীভৎস হত্যা, অত্যাচার এবং ভয়াবহ বর্বরোচিত ব্যবহার। হিটলারের ফ্যাসিস্ট বর্ণসংক্রান্ত পাশবিক আইন-কানুনের ফলে লক্ষ লক্ষ ইহুদি, জিপ্‌সি এবং স্ল্যভদের নির্মমভাবে হত্যা করা হোল। যুদ্ধান্তে হিসাব করে দেখা গিয়েছিল, যে পঞ্চাশ লক্ষেরও বেশি ইহুদিকে নাৎসীরা ঠাণ্ডা মাথায় প্ল্যান করে মেরে ফেলেছে বিভিন্ন কনশেনট্রেশন ক্যাম্পে—হত্যা করা হয়েছে গ্যাস করে, ফাঁসিতে ঝুলিয়ে বা গুলি করে।

জার্মান সৈন্যরা যেরকম দ্রুতগতিতে দেশের পর দেশ জয় করে দুর্বার বেগে এগিয়ে চলেছিল তার ফলে উৎফুল্ল হয়ে হিটলার তাঁর নতুন আদেশ অর্থাৎ "ইন্সট্রাকশন নাম্বার থারটি টু" জারি করলেন। এতে বলা হয়েছিল যে, তাড়াতাড়ি সোভিয়েট ইউনিয়নকে পরাজিত করতে পারলে, জার্মানী নর্থ আফ্রিকায় সম্পূর্ণভাবে প্রভুত্ব বিস্তার করবে এবং নিয়ার ইস্ট জয় করে নেবার জন্য প্রস্তুত হবে।

এর পরই ভারত-বিজয়ের অভিযান শুরু হবে—আক্রমণ চালানো হবে তিনদিক থেকে: ঈজিপ্ট, বালোয়ানস এবং ককেশাস অঞ্চল থেকে। এ কথার সত্যতা যাচাই করা যায় একটি বিশেষ দলিল থেকে। এ দলিলটির শিরোনামা হচ্ছে "জার্মেনীজ এ্যাডভান্স অন দি এ্যারাব রিজিয়ন।" এটি রিবেনট্রপের কাছে পাঠিয়েছিলেন ফ্যাসিস্ট বৈদেশিক দপ্তর থেকে কূটনীতিক মন্ত্রিস্থানীয় গ্রোব্বা, ১৯৪২ সালের ৭ই

ফেরত্নয়ারা। এতে অন্যান্য কথার পর বলা হয়েছেঃ

"জার্মান অগ্রগতির লক্ষ্যস্থল হবে আরব অঞ্চলের সুয়েজ ক্যানাল এবং পারশিয়ান গালফ্। বাসরা পৌঁছিয়ে যোগাযোগ স্থাপন করতে হবে জাপানীদের সঙ্গে যারা সিলোনে এসে পড়েছে" (বনের পররাষ্ট্র দপ্তরের আট নম্বর দলিল)।

১৯৪২ সালের ৮ই জানুয়ারী জার্মানী, জাপান এবং ইতালীর যে চুক্তি হয়েছিল তার থেকেই প্রমাণিত হয় যে জার্মান ফ্যাসিস্টবাহিনী পার্শিয়া পর্যন্ত এসে তাদের গতি রুদ্ধ করবে এমন কোনও উদ্দেশ্য তাদের ছিল না। এর উল্টোটাই বরং ঐ চুক্তিতে স্থিরীকৃত হয়েছিল—পারস্কারভাবে ভাগ করে দেওয়া হয়েছিল জাপান, জার্মানী এবং ইতালীর স্বার্থের সঙ্গে জড়িত বিভিন্ন অঞ্চলগুলোকে। সত্তর ডিগ্রী দ্রাঘিমাংশের পূর্বের সমস্ত অঞ্চলগুলো পড়েছিল জাপানের ভাগে, পশ্চিমের সব অঞ্চল জার্মানী এবং ইতালীকে বণ্টন করে দেবার ব্যবস্থা ছিল। সুতরাং এই ব্যবস্থা অনুযায়ী ভারতভূমি ফ্যাসিস্ট সৈনিকদের পদাশ্রিত হবে এই স্থির করা হয়েছিল।

হিট্লারের জঙ্গীবাহিনী যখন ককেশাস পর্যন্ত এগিয়ে এল—১৯৪২ সালের ২১শে অগাস্ট এলবরাসে জার্মান যুদ্ধপতাকা উড্ডীন করা হয়—তখন হিটলারের ফ্যাসিস্টবাহিনীর ভারত আক্রমণের সম্ভাবনা আরও বৃদ্ধি পেল। কাবুলের জার্মান দূতাবাস এ সময় স্থির সিদ্ধান্তে এসেছিলেন যে, নাৎসীবাহিনী ভারতবর্ষের পূর্ব সীমান্তে এসে হানা দেবে। এ ছাড়াও ১৯৪১ সালের ডিসেম্বর ৯ই-এর কাবুল দূতাবাসের ভেরমাখট-এর গোয়েন্দা বিভাগের উদ্দেশ্যে তারবার্তা এবং অন্যান্য দলিলপত্র থেকেও প্রমাণিত হয় যে, হিটলার এবং তাঁর নাৎসীবাহিনীর লুব্ধদৃষ্টি পড়েছিল ভারতভূমির উপর। তা ছাড়া এই সময়েই জার্মান জঙ্গীবাহিনীর কিছু বিশেষজ্ঞ—যাঁরা এই সময় বিশেষ উদ্দেশ্যপ্রণোদিত হয়ে কাবুল দূতাবাসে এসেছিলেন—ভারত-আফগান সীমান্তে জার্মান "কনডোর" প্লেন থেকে সৈন্যদল নামিয়ে দেবার সুযোগ্য স্থান নির্বাচনের ব্যাপারে মাথা ঘামাচ্ছিলেন। এই বিশেষ ক্রিয়াপ্রণালীটির সংকেত-সংজ্ঞা ছিল "টাইগার"।

নেতাজীকে কাজে লাগিয়ে সুবিধা আদায়ের ফ্যাসিস্ট পরিকল্পনা

এই সময়ে হিটলারের নাৎসী সরকার ভারতবিরোধী প্রচার—বিশেষত রেডিওর মাধ্যমে অনেকগুণ বাড়িয়ে দিল। এর অনেক আগে থেকেই অবশ্য জার্মান সর্ট-ওয়েভ স্টেশন থেকে বিস্তৃতভাবে ফ্যাসিবাদের মহিমাকীর্তন করে জগদ্ব্যাপী প্রচারকার্য চালানো হোত। কিন্তু দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় থেকে এই প্রপাগাণ্ডার ধরণটা যেন আরও ভয়াবহ, কার্যকরী এবং প্রাণবন্ত হয়ে উঠল। রেডিও প্রচারকে নাৎসীরা এখন থেকে একটা নতুন ধরণের আক্রমণাত্মক অস্ত্রশক্তির মত ব্যবহার করতে শুরু করলো।

এ কথা বোধ হয় আজকের দিনেও অনেকেই বিস্মৃত হন নি যে, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় এক্সিসস পাওয়ার্সের প্রচারিত রেডিও সংবাদ শোনা ইংরাজ সরকার কর্তৃক নিষিদ্ধ থাকলেও আমাদের ঘরে ঘরে সবাই ব্যাকুল আগ্রহে হিন্দী এবং বাংলাতে জার্মানী থেকে ভারতের উদ্দেশ্যে প্রেরিত বেতারবার্তা শুনতেন। ইংরাজের কুশাসনে এবং অত্যাচারে আমরা তখন এতই জর্জরিত হয়ে পড়েছিলাম যে, ইংরাজের শত্রু জার্মানদের আমরা পরম মিত্র মনে করতাম। একবারও ভাবতাম না যে, ইংরাজের বদলে এদেশে জার্মান শাসক এলে আমাদের অবস্থা আরও কত শোচনীয় আকার ধারণ করবে।

[আগামী সংখ্যায় সমাপ্য]

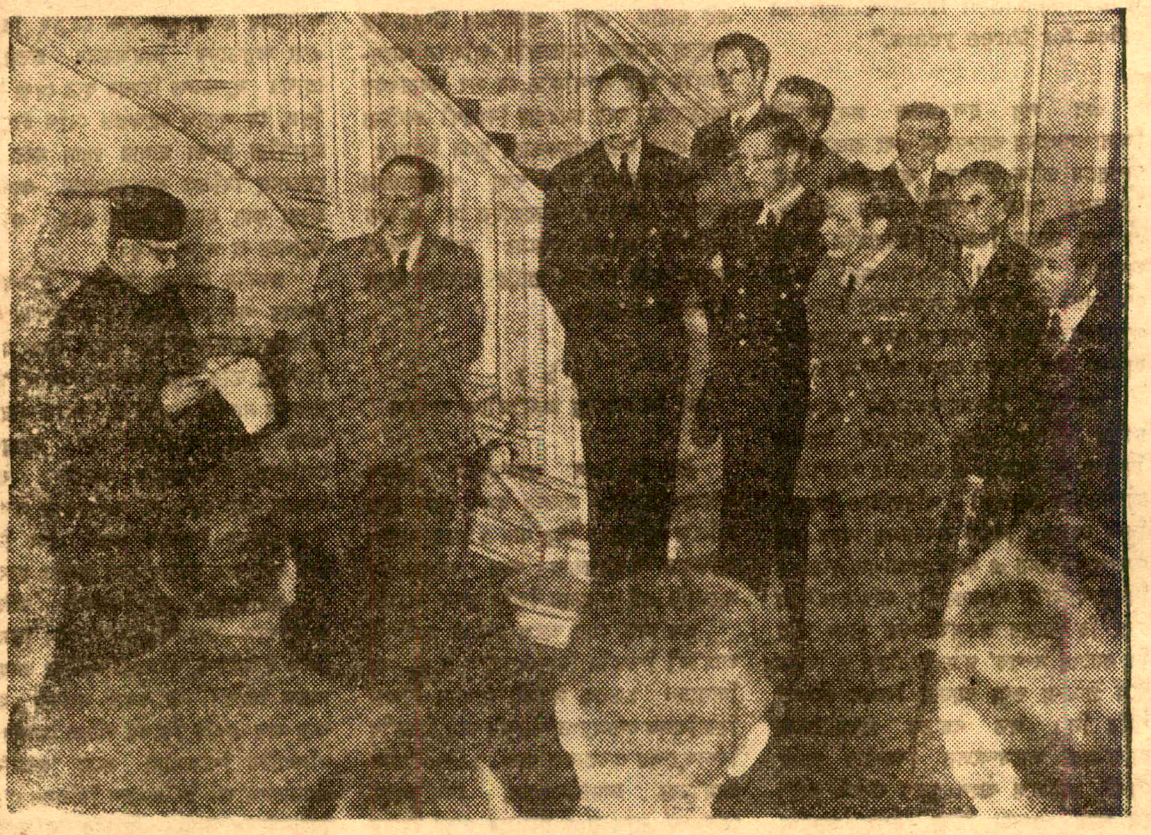

১৯৪২ সালের ১৪ই জুন, বার্লিনে নেতাজী সুভাষচন্দ্রকে ইণ্টারন্যাশনাল প্রেস ক্লাবে সম্বর্ধনা জানানো হয়। নেতাজীকে সম্বর্ধনার উত্তরে ভাষণ দিতে দেখা যাচ্ছে।

চতুর্থ সাধারণ নির্বাচনঃ দেশের পট-পরিবর্তন

পর্যবেক্ষক

১৫।১৬ বছর আগে একদিন লোকসভায় একজন বিরোধী সদস্যের মন্তব্যের জবাবে তদানীন্তন অর্থমন্ত্রী সি ডি দেশমুখ বলেছিলেন যে আগামী ২৫ বছরের মধ্যে কংগ্রেসের ক্ষমতা-প্রাধান্য চলে যাবার কোনো সম্ভাবনা নেই, সুতরাং বিরোধী সদস্যের আশা নিতান্ত কাল্পনিক। তখন কথাটাকে অস্বাভাবিক মনে হয় নি। বরং মনে হয়েছিল, সেই বিরোধী সদস্যের মন্তব্যই একটু বাড়াবাড়ি হয়ে গিয়েছে। কিন্তু ইতিহাস যে কত দ্রুত পরিবর্তিত হয়ে যায় তা সব সময় আগে থেকে হিসাব করতে পারা যায় না—ক্ষমতাসীন যারা, তারা তো এ-হিসাব করতে পারেই না, এমন কি পরিবর্তন যারা করতে চলেছে তারাও সঠিক হিসাব করতে পারে না। ২৫ বছরের অনেক আগেই, ১৯৬৭-তেই কংগ্রেসের ক্ষমতা-প্রাধান্য এমনভাবে হ্রাস পেয়েছে যে গোটা দেশের শক্তি-ভারসাম্যেরই পরিবর্তন হয়ে গিয়েছে।

১৯৬৭-র আগের পর্যায়ের সঙ্গে এ-পর্যায়ের তফাৎটা খুব স্পষ্ট। পূর্ব-পর্যায়ে কংগ্রেস-বিরোধী শক্তির ক্রমবৃদ্ধি হলেও কংগ্রেসের ক্ষমতা-প্রাধান্য ঠিকই ছিল।

১৯৫২-তে বিভিন্ন রাজ্যের আইনসভায় বিরোধী দল প্রতিষ্ঠিত হলেও, কংগ্রেসের সংখ্যাগরিষ্ঠতা ছিল অত্যন্ত নিশ্চিত। লোকসভায় ৫০০ সদস্যের মধ্যে ৪০০ ছিল কংগ্রেসের, সমস্ত বিরোধী সদস্য মিলিয়ে ১০০। ১৯৫৭-তে সামগ্রিক পরিস্থিতিতে বিরোধী শক্তির এক প্রচণ্ড অগ্রগতি দেখা গেল কেরালায় কমিউনিস্ট গভর্নমেণ্ট প্রতিষ্ঠিত হওয়ায়। ভারতের রাজনৈতিক গতির দিক থেকে এটা একটা দিক-নির্ণয়কারী ঘটনা নিশ্চয়ই। কিন্তু তবু সামগ্রিকভাবে কংগ্রেসের ক্ষমতা-প্রাধান্য থাকার ফলেই কেরালার কমিউনিস্ট গভর্নমেণ্টকে উৎখাত করার ষড়যন্ত্র সফল হতে পেরেছিল। মনে রাখতে হবে, সংখ্যাগরিষ্ঠতার মধ্যে কোনো অদল-বদলের ইঙ্গিত না থেকেও, কোনো দলত্যাগ না হওয়া সত্ত্বেও, সম্পূর্ণ ঐক্যবদ্ধ কেরালার সংখ্যাগরিষ্ঠের গভর্নমেণ্টকে উৎখাত করে কেন্দ্রীয় সরকার। তার আগে অন্ধ্রপ্রদেশ গঠনের পর অন্ধ্র-নির্বাচনেও কমিউনিস্ট গভর্নমেণ্ট হবার আশা দেখা দিয়েছিল। কিন্তু সে-আশাও পূরণ হয় নি, কেন না গোটা ভারতের শক্তির দিক থেকে কংগ্রেসের ক্ষমতা-প্রাধান্য ছিল নিরঙ্কুশ এবং তার প্রভাব অন্ধ্র অতিক্রম করতে পারে নি। ১৯৬২-তেও অবস্থার খুব একটা পরিবর্তন হয় নি। রাজস্থান ও মধ্যপ্রদেশে কংগ্রেসের ক্ষমতা খুব কমেছে বটে, কিন্তু এখানকার রাজনীতি কংগ্রেস ও রাজন্যবর্গের ক্ষমতার লড়াই বলে ঐ পরিবর্তনের প্রভাব বাইরে অনুভূত হয় নি। অন্যসব রাজ্যেই বিধানসভায় বিরোধী শক্তি কিছুটা বেড়েছে, কিন্তু নিরঙ্কুশ প্রাধান্য কংগ্রেসের হাতেই ছিল।

১৯৬৭-র সাধারণ নির্বাচনেই পট-পরিবর্তন হল। ৮টি রাজ্যে অ-কংগ্রেসী গভর্নমেণ্ট তৈরি হল। এই ৮টি রাজ্যের লোকসংখ্যা ভারতের মোট লোকসংখ্যার প্রায় ৬০ শতাংশ। শুধু সংখ্যার দিক থেকেই পরিবর্তনের গুরুত্ব নয়। এই আটটি রাজ্যের মধ্যে রয়েছে সেই সব রাজ্য যেগুলি কংগ্রেসের সর্বভারতীয় ক্ষমতার স্বম্ভস্বরূপ। যেমন পঃ বঙ্গ, বিহার, উত্তরপ্রদেশ।

বিহার ও উত্তরপ্রদেশের হাতেই তো বরাবর কংগ্রেস-হাইকমাণ্ডের চাবিকাঠি। এই নিয়ে কংগ্রেসের উচ্চ-মহলে আভ্যন্তরীণ বিরোধও কম নয়। একটা কথা কংগ্রেসের উচ্চ-মহলে চালু আছে যে, প্রধানমন্ত্রী হতে হবে উত্তরপ্রদেশ থেকেই। বিহারের হাতেও কংগ্রেসী শাসনব্যবস্থার অন্যতম চাবিকাঠি—পার্লামেণ্টারী দপ্তরের ভার। এই দপ্তরের ভার বরাবর নেহরুর বিশ্বাসভাজন বিহারের সত্যনারায়ণ সিংহের হাতে ছিল। ভিতরকার খবর যাঁরা রাখেন তাঁরাই জানেন যে এর জন্য লোকসভার কংগ্রেসী মহলে কত বিক্ষোভ। সত্যনারায়ণ সিংহের দাপটে তাঁরা নাজেহাল হতেন। সেই সত্যনারায়ণ সিংহ আজ সে-দায়িত্বে নেই বটে, তবে তাঁর জায়গায় এসেছেন বিহারেরই রামসুভগ সিং।

রাষ্ট্রপতি ও উপ-রাষ্ট্রপতি পদের ব্যাপারেও চিরকাল এই স্বল্প দক্ষিণ-ভারতের কংগ্রেস নেতাদের সঙ্গে। তাই দুই পদের একটা পদ নিয়ে দক্ষিণ-ভারতকে সন্তুষ্ট করার ব্যবস্থা হয়েছে প্রথম থেকেই। কিন্তু এক্ষেত্রেও বিহার ও উত্তরপ্রদেশই হচ্ছে নিয়ামক। কিছুটা অবান্তর প্রসঙ্গ এসে পড়লেও, কংগ্রেসী-ক্ষমতার স্তম্ভ হিসাবে বিহার ও উত্তরপ্রদেশের ভূমিকাটা এ থেকে আরো ভাল করে বোঝা যাবে। সেই বিহার ও উত্তরপ্রদেশ হাত ছাড়া হয়ে গেল।

পঃ বঙ্গ সম্বন্ধেও কংগ্রেস-হাইকমাণ্ড বরাবর নিশ্চিন্ত ছিলেন এখানকার 'আয়রন ম্যান' অতুল্য ঘোষের দিকে চেয়ে। এত প্রচণ্ড কংগ্রেস-বিরোধিতা সত্ত্বেও অতুল্য ঘোষের দক্ষতায় কংগ্রেস-তরী ঠিকমতো পার হয়ে যাওয়ায় তাঁর প্রতি কংগ্রেস-হাইকমাণ্ডের প্রচণ্ড নির্ভরতা এসেছিল এবং সেই জন্যই তাঁকে সর্বভারতীয় আসনে সুপ্রতিষ্ঠিত করে সর্বভারতীয় চাবিকাঠিও একটা তুলে দিয়েছেন তাঁর হাতে। কিন্তু সেই পঃ বাংলাও হাত ছাড়া হয়ে গেল।

কেরালা ছিল কংগ্রেসের দুর্বল জায়গা। দুর্বল হলেও সে-রাজ্যকে কংগ্রেস নিজের দখলে রাখার চেষ্টা করে আসছিল। চতুর্থ নির্বাচনের ভিতর দিয়ে সে-রাজ্যে কংগ্রেসের একেবারে কবর রচনা হয়ে গেল। সেখানে ১৯৫৭-এর কমিউনিস্ট মন্ত্রিত্বের সময়ও কংগ্রেসের ছিল ৪৩টি আসন, সেখানে ১৯৬৭-তে খাস কংগ্রেসের আসন দাঁড়াল মাত্র ৯টি। বিরোধী কংগ্রেসকে সঙ্গে নিতে পারলেও মোট আসন সংখ্যা ১৪-র বেশি হয় না। অর্থাৎ, কেরালা কংগ্রেসের হাত থেকে চিরকালের জন্য চলে গিয়ে বামপন্থীদের হাতে এসে গেল।

অন্য যে রাজ্যগুলি হাত ছাড়া হয়ে গেল তার মধ্যে মাদ্রাজ ও পাঞ্জাব ছাড়া উড়িষ্যা ও রাজস্থান অ-কংগ্রেসী হলেও স্বতন্ত্র চরিত্রের। রাজস্থানে কংগ্রেসের বিকল্প হিসেবে দাঁড়িয়েছে প্রগতিশীল শক্তি নয়, দেশীয় রাজন্যবর্গের শক্তি, যারা প্রধানত স্বতন্ত্র পার্টির মধ্যে এবং যাদের সঙ্গে মিলিত জনসংঘ। দুইয়ে মিলিয়েই আসল শক্তি। অবশ্য রাজস্থান পরে কংগ্রেসের হাতে চলে যায়। কিন্তু ক্ষমতা-দ্বন্দ্বটা থেকেই গিয়েছে এবং সেটা রাজন্যবর্গ বনাম কংগ্রেস দ্বন্দ্ব। উড়িষ্যার প্রধানশক্তিও স্বতন্ত্র পার্টির। অর্থাৎ এই দুটো রাজ্যই কংগ্রেসের আওতামুক্ত হলেও বামপন্থী গণতান্ত্রিক শক্তির দিকে না গিয়ে বরং উল্টো দিকে গিয়েছে। মাদ্রাজে স্বতন্ত্র পার্টির সংখ্যা উল্লেখযোগ্য হলেও শক্তি-

প্রাধান্য হচ্ছে ডি-এম-কের, যাদের নীতি অনেকাংশে বামপন্থীঘেঁষা। পাঞ্জাবে যুক্তফ্রন্টের মধ্যে কমিউনিস্টদের বিশিষ্ট স্থান থাকলেও, প্রধানশক্তি সন্ত আকালী দল, যাদের রাজনীতি আভ্যন্তরীণ সম্প্রদায়গত প্রশ্নের বাইরে কোনো দিন যায় না।

অন্যদিকে, লোকসভায় কংগ্রেসের এমন শক্তি হ্রাস হল যে, বিরোধীদের চেয়ে ব্যবধান দাঁড়াল মাত্র ৪৭। এই ব্যবধান নিয়ে সংবিধান-সংশোধনের জন্য প্রয়োজনীয় দুই-তৃতীয়াংশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা হয় না। অবশ্য বামপন্থী শক্তির চেয়ে স্বতন্ত্র ও জনসংঘের শক্তিই বেড়েছে লোকসভায়। তাদের মোট সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ৭৭।

সুতরাং ১৯৬৭-র সাধারণ নির্বাচনে দেশের রাজনৈতিক পট-পরিবর্তন হলেও, নতুন পটটি হল বহু রঙে চিত্রিত। বামপন্থী ও প্রগতিশীল শক্তির সঙ্গে সঙ্গে দক্ষিণ প্রতিক্রিয়ার নীতি অনুসরণকারী পার্টিগুলোর শক্তিও যথেষ্ট রয়েছে।

এই লক্ষণ দেখে কেউ কেউ প্রশ্ন তোলেন যে ১৯৬৭-র ক্ষমতা-ভারসাম্যের পরিবর্তনে আশান্বিত হওয়ার কি আছে? কংগ্রেসের জায়গায় যদি স্বতন্ত্র পার্টি, জনসংঘ প্রভৃতি এসে মাথায় চড়ে বসে এবং দেশীয় রাজন্যবর্গের ও সাম্প্রদায়িকতাবাদীর চক্রান্ত যদি বেড়ে যায়, তাহলে চতুর্থ-নির্বাচন ভালর চেয়ে তো মন্দই বেশি করেছে। এতদিন লোকসভায় বিরোধী পক্ষের প্রধান শক্তি ছিল বামপন্থীরা। এখন সে-শক্তি হয়েছে স্বতন্ত্র পার্টি ও জনসংঘ। এটা কি দেশের রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে পশ্চাদ্‌গতি নয়? অন্তত, অগ্রগতি যে নিশ্চিত নয়, সে-কথাই বলা উচিত নয় কি?

প্রশ্নটা অস্বাভাবিক নয়। কিন্তু দক্ষিণ-প্রতিক্রিয়ার পার্টির শক্তিবৃদ্ধি ও বামপন্থী প্রগতিশীল শক্তিবৃদ্ধির মধ্যে পার্থক্যটা দেখতে হবে। সে-পার্থক্য দুটো দিক দিয়ে। প্রথমত দেশের মূল বিরোধ যে শাসন-ব্যবস্থা ও রাজনৈতিক ভবিষ্যৎ নিয়ে, যে-বিরোধে শুধু বামপন্থী পার্টিগুলোর বিরোধিতাই প্রতিফলিত নয়, প্রতিফলিত সমগ্র দেশের জনসাধারণের ক্রমবর্ধমান সরকার-বিরোধী আন্দোলন ও সংগ্রাম, সেই বিরোধে প্রগতিশীল শক্তি এক পক্ষ, আর দক্ষিণ প্রতিক্রিয়াশীল শক্তি সমেত কংগ্রেস আর এক পক্ষ। এই বিরোধে প্রগতিশীল শক্তির অগ্রগতি শুধু পরিমাণগতভাবেই নয়, দুটো রাজ্যের রাজনৈতিক ভবিষ্যৎ প্রগতিশীল শক্তির হাতে চলে এসেছে এবং অন্য কয়েকটি অ-কংগ্রেসী রাজ্যেও, অর্থাৎ বিহার, উত্তরপ্রদেশ, মাদ্রাজ ও পাঞ্জাবেও প্রগতিশীল শক্তির হাতে এমন উদ্যোগ এসে গিয়েছে যাতে প্রতিক্রিয়ার পথ প্রতিপদে বাধাপ্রাপ্ত হচ্ছে। অধিকাংশ অ-কংগ্রেসী রাজ্যের এই বামমুখী গতিটাই হচ্ছে শক্তি-ভারসাম্য পরিবর্তনের আসল লক্ষণ।

দ্বিতীয়ত, স্বতন্ত্র পার্টি, জনসঙ্ঘ প্রভৃতির কংগ্রেস-বিরোধিতা তো আংশিক ও সাময়িক কংগ্রেস-বিরোধিতা। স্বতন্ত্র ও জনসংঘের দাবি এই যে, কেন কংগ্রেস আরো বেশি প্রতিক্রিয়াশীল পথ অনুসরণ করে না? এবং তার জন্য কংগ্রেসের ওপর চাপ সৃষ্টিই হচ্ছে তাদের কাজ। আর, চাপ সৃষ্টির মানেই হচ্ছে কংগ্রেসকে তারা আসল প্রতিপক্ষ মনে করে না, মনে করে মিত্র, যাকে একটু বদলে নিলেই পুরো সমর্থন করা যায়। সেই জন্যই বামপন্থী-বিরোধিতায় কংগ্রেসকে তারা সর্বদা সমর্থন করে। সমর্থন করে কংগ্রেসের গণ-আন্দোলন দমন, ধর্মঘট নিষিদ্ধকরণ, কমিউনিস্ট পার্টি-বিরোধী অভিযান। এবং সেই জন্যই মাঝে মাঝেই তারা প্রস্তাব দেয় যে বামপন্থার বিরুদ্ধে জবরদস্ত শাসনের জন্য কংগ্রেসের সঙ্গে তাদের কোয়ালিশনে সরকার গঠন করা হোক। এরা এবং কংগ্রেস এই দুইয়ের মধ্যে নীতিগত ও স্বার্থগত এই নৈকট্যের জন্য গভর্নমেন্টের অদল-বদলটাও ঘটে শুধু এম-এল-এ'দের নিয়েই, যার পিছনে কোনো গণ-আন্দোলন থাকে না। গণ-দাবিও থাকে না। রাজস্থান ও মধ্যপ্রদেশের গভর্নমেন্ট রদবদল সবই ঘটল ওপরতলার ব্যাপার হিসাবে। উড়িষ্যাতেও স্বতন্ত্র-শাসনের মুখপাত্র বলেন যে, কংগ্রেসের কাছ থেকে তাঁদের কোনো অসুবিধা নেই।

সুতরাং, দক্ষিণ প্রতিক্রিয়ার শক্তি বৃদ্ধি মানে দেশের শক্তি-ভারসাম্যে বামপন্থী শক্তির অবস্থানের দুর্বলতা বৃদ্ধি নয়, বরং সবলতা বৃদ্ধি, যার জন্যই দক্ষিণ-প্রতিক্রিয়ার হাত কংগ্রেসের হাতের সঙ্গে একযোগে উঠেছে বামপন্থী শক্তির প্রতিরোধকল্পে।

কিন্তু তার মানে বামপন্থী শক্তি দুর্বলতামুক্ত নয়। বরং যথেষ্ট দুর্বলতা রয়েছে তার মধ্যে। কেন না, জনসাধারণের কংগ্রেস-বিরোধিতার আশ্রয় লাভ করেই তো স্বতন্ত্র, জনসঙ্ঘ প্রভৃতি বাড়তে পেরেছে। জনসাধারণের কংগ্রেস-বিরোধিতাকে এত সহজে এই সব পার্টি ব্যবহার করতে পারল কি করে? এই দিক দিয়েই বামপন্থী শক্তির দুর্বলতা বিচার করতে হবে এবং সে-দুর্বলতা হচ্ছে এইখানেই যে, দেশের পরিস্থিতি যত দ্রুত কংগ্রেস-বিরোধিতার দিকে এগিয়ে চলেছে, তার সঙ্গে তাল রেখে তত দ্রুত বামপন্থী প্রগতিশীল শক্তি জনসাধারণকে টেনে নিতে পারছে না নিজের দিকে। এবং তাতেই এমন একটা ফাঁক সৃষ্টি হচ্ছে, যেখানে জনসাধারণের কংগ্রেস-বিরোধিতা প্রকৃত পথ দেখতে না পেয়ে আশ্রয় করছে সামনে যাকে পাচ্ছে তাকেই। এই-ফাঁকগুলোই দেশের বর্তমান পরিস্থিতির দুর্বলতা এবং এরই জন্য দেশের আজকের চিত্রপটে বহু রঙ।

একটু হিসাব করলেই দেখা যাবে যে যে-সমস্ত জায়গায় স্বতন্ত্র পার্টি, জনসংঘের বৃদ্ধি, সেই সব জায়গায় বামপন্থী আন্দোলন দুর্বল। রাজস্থান, মধ্যপ্রদেশ প্রভৃতি রাজ্যে বামপন্থী আন্দোলন অত্যন্ত দুর্বল। উড়িষ্যাতেও অপেক্ষাকৃত দুর্বল। পঃ বাংলা ও কেরালার বামপন্থী আন্দোলন অত্যন্ত সবল বলেই এই দুই জায়গায় জনসংঘ ও স্বতন্ত্র বিশেষ রেখাপাত করতে পারে নি। বিহার ও উত্তরপ্রদেশে বামপন্থী আন্দোলন থাকলেও, পঃ বঙ্গ ও কেরালার মতো সবল নয়। তাই সেখানে বামপন্থী শক্তির সঙ্গে সঙ্গে স্বতন্ত্র ও জনসংঘও রাজনীতিতে প্রভাব বিস্তার করতে পেরেছে। বোম্বাই-এ শ্রমিক-আন্দোলন বহুদিনের। তাই সেখানেও স্বতন্ত্র, জনসংঘ মাথা তুলতে পারে নি।

আবার, বামপন্থী শক্তির সবলতার দুর্বলতারও বাস্তব কারণ থাকে। ইতিহাসের ধারার অগ্রগতির সঙ্গেই বামপন্থী শক্তির উদ্ভব হয়। অর্থাৎ শিল্পবিকাশের পথে শ্রমিকশ্রেণীর উদ্ভব ও শ্রমিক-আন্দোলনের বিকাশই বামপন্থী চিন্তাধারার জন্ম দেয়। সেই জন্যই দেখি, যে-রাজ্যে শ্রমিক-আন্দোলন বহুদিনের ঐতিহ্য নিয়ে এগিয়েছে, যেমন পঃ বাংলা, বোম্বাই, উত্তরপ্রদেশ প্রভৃতি, সেখানেই বামপন্থী শক্তি হিসাবে কমিউনিস্ট পার্টি, সমাজতন্ত্রী দল প্রভৃতি গড়ে উঠেছে আগে। কেরালা, অন্ধ্র, মাদ্রাজ প্রভৃতি রাজ্যের বামপন্থী শক্তির উদ্ভবের কারণ কিছুটা শ্রমিক-আন্দোলনও বটে, কিন্তু বেশিটা শ্রমিক-আন্দোলন প্রভাবিত কৃষক-আন্দোলনই। আজকে প্রধান যে বামপন্থী দলগুলিকে আমরা দেখি, ক্ষু পার্টি, সমাজতন্ত্রী দল, ফরোয়ার্ড ব্লক, আর-এস-পি, এর সব কয়টিই শ্রমিক-আন্দোলনের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট।

সুতরাং দেশের কতকগুলি জায়গায় বামপন্থী শক্তি প্রবল, আর কতকগুলি জায়গায় দুর্বল, এটা মোটেই অস্বাভাবিক ঘটনা নয়। শ্রমিক-আন্দোলন বা তার প্রভাবিত কৃষক-আন্দোলন যেখানে ঠিক-

ইতিহাস-পুরুষ সুভাষচন্দ্র

শিশির দাশ

যে সমস্ত ত্যাগী, নির্ভীক কর্মবীরের দুঃসহ কৃচ্ছ্র-তপঃ-সাধনায় আজ ভারতবর্ষ অধীনতা-পাশমুক্ত হয়ে স্বাধীনতা লাভে সমর্থ হয়েছে, তাঁদের মধ্যে ইতিহাস-পুরুষ, আদর্শের পূজারী নেতাজী সুভাষচন্দ্রের নাম সকলের পুরোভাগে স্বর্ণাক্ষরে লিখিত থাকবে—তাতে সংশয়ের বিন্দুমাত্রও অবকাশ নেই। দেশসেবাকেই আদর্শ ধর্মরূপে গ্রহণ করেছিলেন সুভাষচন্দ্র। তাই তাঁর পক্ষে অনন্যচিত্তে দেশসেবা ছাড়া অন্য কিছু করা ছিল অসম্ভব। সেবাদলের ভলান্টিয়ার থেকে, কংগ্রেস সভাপতি ও আজাদ হিন্দ ফৌজের সর্বাধিনায়ক। যে কাজেই হাত দিয়েছেন তিনি, স্বহস্তে তা নিজেই তিনি সক্রিয়ভাবে করেছেন—করবার জন্য শূন্যগর্ভ উপদেশ দিয়ে নিজে কখনো ক্ষান্ত থাকেন নি। তাই তিনি আজ কর্মীর আদর্শ, নেতার আদর্শ, দেশসেবকের বিগ্রহমূর্তি—জন-গণ-মন-অধিনায়ক নেতাজী সুভাষচন্দ্র।

১৯৩৯ সাল। ত্রিপুরী কংগ্রেসের নির্বাচিত রাষ্ট্রপতি সুভাষচন্দ্র পারলেন না আর গান্ধী-জওহরলাল-পন্থ প্রমুখের সঙ্গে একযোগে কাজ করতে—পদত্যাগ করলেন তিনি। সেদিন থেকেই তাঁর জীবনের পথ হল ভিন্ন। তারপর থেকে অবিচলিত নিষ্ঠার সঙ্গে যে রোমাঞ্চকর পরিশ্রমে রাষ্ট্রপতি সুভাষ হলেন নেতাজী সুভাষচন্দ্র—সে সকল ঘটনাবলীই প্রমাণ করলো, আদর্শ ও শক্তি অঘটন-ঘটন-পটু। ভবিষ্যদ্দ্রষ্টা সুভাষচন্দ্র তাঁর জীবনস্বপ্নকে বাস্তবে রূপ দিতে অপরিসীম মনোবল এবং অসীম দৃঢ়তা নিয়ে রচনা করলেন বিশ্ব-ইতিহাসের এক নতুন অধ্যায়। বিপ্লবী সুভাষ—অত্যাচারী ও উৎকট সাম্রাজ্যবাদী ইংরেজের বেতনভুক সৈন্যদের ভারতের জাতীয়-সেনাদলে পরিবর্তিত করেন, আর সেই সেনাবাহিনীর সক্রিয় সংগ্রামের ফলেই অবসান ঘটলো ভারতে ইংরেজ-শাসনের—সেই মুক্তিসংগ্রামে নর-নারী নির্বিশেষে এশিয়ার প্রবাসী ভারতীয়দেরও ছিল বিশেষ অবদান। শুধু ভারতের স্বাধীনতাই নয়, গোটা এশিয়ার মানুষের স্বপ্ন সার্থক করে তোলবার গৌরব স্বাক্ষর ইতিহাস-পুরুষ মহানায়ক নেতাজী সুভাষচন্দ্রের অক্ষয় কীর্তি।

আজ থেকে পঁচিশ বছর পূর্বে ১৯৪৩ সালে নেতাজী সুভাষচন্দ্র ভারতের বাইরে কিন্তু এশিয়ার মাটিতেই 'আজাদ হিন্দ ফৌজ' ও 'অস্থায়ী আজাদ হিন্দ রাষ্ট্রের' প্রতিষ্ঠা করে দিয়েছিলেন তিনি সংগ্রামের ডাক—ভিত্তিস্থাপন করেছিলেন স্বাধীন ভারত রাষ্ট্রের। ভারতবর্ষের নবতম ইতিহাসের স্রষ্টা মহানায়ক নেতাজী সুভাষচন্দ্র 'অস্থায়ী আজাদ হিন্দ রাষ্ট্রের' সর্বাধিনায়করূপে শপথ গ্রহণ করলেন—"ভগবানের নামে আমি এই পবিত্র শপথ গ্রহণ করছি যে, আমি সুভাষচন্দ্র বসু, ভারতবর্ষ এবং আমার ৪০ কোটি দেশবাসীর মুক্তির জন্য জীবনের শেষ নিশ্বাস পর্যন্ত সংগ্রাম চালিয়ে যাব। ভারতের স্বাধীনতা লাভের পরেও সেই স্বাধীনতা অক্ষুণ্ণ রাখবার জন্য জীবনের শেষ রক্তবিন্দুটিও দিতে প্রস্তুত থাকব।" দেশমাতৃকার বন্ধনমোচনের দুর্জয় প্রতিজ্ঞা এবং জাতীয় স্বাধীনতা অর্জনের পর সেই স্বাধীনতায় পূর্ণরূপ দান করে তা অক্ষুণ্ণ রাখতে আত্মত্যাগের মহান সঙ্কল্পের জন্যই বন্দিত

মতো গড়ে ওঠে নি, সেখানে বামপন্থী শক্তি অত্যন্ত দুর্বল তো হবেই। আর সেই জন্যই সেই সব জায়গাতে কংগ্রেস-বিরোধিতার সামনে থেকে গিয়েছে ফাঁক, যা পূরণ করেছে দক্ষিণ প্রতিক্রিয়ার শক্তি কংগ্রেস-বিরোধিতার মুখোস পরে। নিশ্চয়ই জনসাধারণের পশ্চাদ্‌পদতার সুযোগ নেয় তারা। পশ্চাদ্‌পদতা না থাকলে জনসাধারণই বা তাদের চিনতে পারে না কেন? কিন্তু কৃষকসমাজ কি এখনও আমাদের দেশে যথেষ্ট পশ্চাদপদ মনোভাবে আচ্ছন্ন নয়? জমিদারের প্রতি মোহ, সামন্ত-নরপতির প্রতি মোহ, বহু প্রকার কুসংস্কার কি এখনও তাদের আচ্ছন্ন করে রাখে নি? শ্রমিক-আন্দোলনের প্রভাব বা শক্তিশালী কৃষক-আন্দোলন না থাকলে কৃষকসমাজের এ-পশ্চাদ্‌পদতা আপনা থেকেই চলে যেতে পারে না। এই সুযোগই নিয়েছে দক্ষিণ প্রতিক্রিয়ার পার্টিগুলি।

বামপন্থী শক্তি ও কংগ্রেসের মধ্যকার এই ফাঁকের জন্যই কংগ্রেসের ভাঙনটাও সব ক্ষেত্রে বামপন্থীমুখী হয় নি। কংগ্রেসের ভাঙনের অর্থ কী? পুরোপুরি দক্ষিণ প্রতিক্রিয়ার নীতি ও স্বার্থ নিয়ে যারা কংগ্রেস থেকে বেরিয়ে আসে, তারা সরাসরিই স্বতন্ত্র, জনসংঘ প্রভৃতিতে স্থান নেয়। কিন্তু কংগ্রেসের ভিতরকার গোষ্ঠী-প্রাধান্য, দুর্নীতি বরদাস্ত করতে না পেরে এবং কংগ্রেসের কর্মনীতির ব্যর্থতার প্রতিক্রিয়ায় যারা কংগ্রেস ছেড়ে বেরিয়ে আসতে বাধ্য হয়, তারা তো প্রতিক্রিয়াশীল হিসাবে বেরিয়ে আসে না। মধ্যবর্তী অবস্থানের লোক তারা। এবং মধ্যবর্তী অবস্থানের লোক বলেই বামপন্থী শক্তি প্রবল হলে সেই দিকে তারা ঝোঁকে, আর বামপন্থী শক্তির মধ্যে ভবিষ্যৎ-এর ভরসা দেখতে না পেলে দক্ষিণ প্রতিক্রিয়ার জালে আটকে যায়। এই জন্যই পঃ বাংলায় কংগ্রেসের ভাঙন প্রধানত বামপন্থীমুখী হয়েছে। কিন্তু অন্য জায়গায় অনেকাংশেই তা হয় নি।

বামপন্থী শক্তির এই দুর্বলতা বলতে আমি কোনো বামপন্থী পার্টির একক শক্তির দুর্বলতাকে বোঝাতে চাইছি না। বোঝাতে চাইছি বামপন্থী পার্টিসমূহের ঐক্যবদ্ধ না-হওয়াকে। কেন না, একক পার্টির দুর্বলতা যতই হোক না কেন, বামপন্থী ঐক্যের শক্তি সেই দুর্বলতা পূরণ করে দেয় তো বটেই, অধিকন্তু তার সঙ্গে মিলিত করে ঠিক বামপন্থী নয় এমন প্রগতিশীল শক্তিকেও এবং আকর্ষণ করে বিরাট সাধারণ জনতাকে। এই ঐক্যবদ্ধ শক্তিই কংগ্রেসের বিরুদ্ধে প্রকৃত বিকল্প হিসাবে দাঁড়াতে পারে এবং তা দেখে সাধারণ কংগ্রেস-বিরোধী মানুষ ভরসা পায়। এইখানটাতেই অসম্পূর্ণতা রয়ে গিয়েছে, দুর্বলতা রয়ে গিয়েছে, যার জের সামলাতে হচ্ছে সারা দেশকে।

হলেন সুভাষচন্দ্র মহানায়ক নেতাজী-রূপে। নেতাজী নাম নয় প্রতীক, জাতির মুক্তিদূতের স্মরণে সর্বোত্তম অর্ঘ্য।

অস্থায়ী আজাদ হিন্দ গভর্নমেণ্টের পক্ষে প্রচারিত ঘোষণাবাণীতে দিলেন তিনি সংগ্রামের ডাক—"ভগবানের নামে, অতীত যুগে যাঁরা ভারতীয় জনগণকে সংঘবদ্ধ করেছিলেন এবং যে সমস্ত পরলোকগত বীর আমাদের নিকট বীরত্ব ও আত্মত্যাগের আদর্শ স্থাপন করে গিয়েছেন, তাঁদের নামে আমরা ভারতীয় জনগণকে আমাদের পতাকাতলে সমবেত হয়ে ভারতের স্বাধীনতালাভের সংগ্রামে অস্ত্র ধারণের জন্য আহ্বান করছি। বৃটিশ এবং ভারতে অবস্থিত তার মিত্রদের বিরুদ্ধে চূড়ান্ত সংগ্রাম শুরু করতে এবং যতদিন না শত্রু ভারতভূমি হতে চিরদিনের জন্য বিতাড়িত হয়, ততদিন পর্যন্ত এই সংগ্রাম অদম্য সাহস, চরম অধ্যবসায় এবং জয়লাভের পূর্ণ বিশ্বাস নিয়ে চালিয়ে যেতে হবে।" নেতাজীর আহ্বানে সাড়া দিয়ে পাগল হয়ে উঠল দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার মানুষ—দলে দলে এগিয়ে এলো, হিন্দু-মুসলমান-শিখ-পার্শী-জৈন—সব মিলে-মিশে এক হয়ে গেলো। সর্বজাতির সমন্বয়ে গড়ে উঠলো এক মহাজাতি। ধর্ম ও রাজনীতির মধ্যে যে বিরোধ নেই, বরং তারা একে অপরের পরিপূরক—ভারতীয় ঐতিহ্যের এই গূঢ় সত্যটি আর একবার প্রমাণ করে দিলেন মহানায়ক সুভাষচন্দ্র।

অস্থায়ী আজাদ হিন্দ রাষ্ট্রের কর্তব্য জারিত্ব নির্দেশ করেও তিনি ঘোষণা করলেন—"এই অস্থায়ী গভর্নমেণ্টের কর্তব্য হবে স্বাধীন ভারতের ইচ্ছানুসারে তাদের বিশ্বাসভাজন একটি স্থায়ী সরকার গঠন করা এবং যতদিন না ভারতে স্থায়ী সরকার গঠিত হয়, ততদিন ভারতীয় জনগণের বিশ্বাসভাজন হয়ে দেশ শাসন করা। এই গভর্নমেণ্ট ভারতবাসীর আনুগত্য লাভ করার সম্পূর্ণ অধিকারী এবং সেই জন্যই সে আনুগত্য দাবি করে। এই গভর্নমেণ্ট প্রতিটি নাগরিকের সমান অধিকার, সুযোগ-সুবিধা এবং ধর্মগত স্বাধীনতার প্রতিশ্রুতি দিচ্ছে। এই গভর্নমেণ্ট ঘোষণা করে যে, বিদেশী গভর্নমেণ্টের ধূর্ত বুদ্ধির সৃষ্ট বিভেদ-নীতি দূর করে দেশের প্রতিটি সন্তানকে সমানভাবে পোষণ করবে।" স্বাধীন ভারতের অস্থায়ী সরকার গঠন করে অক্লান্তকর্মী শৌর্য-বীর্যের মূর্ত প্রতীক সর্বাধিনায়ক নেতাজী সুভাষচন্দ্র অপূর্ব দক্ষতার সঙ্গে সংগ্রাম চালিয়ে—আজাদ হিন্দ্ ফৌজের মরণজয়ী সমরাভিযানে ভারতের পূর্ব-সীমান্তের ত্রিশ হাজার বর্গমাইল ভারতীয় এলাকা থেকে বৃটিশ-সাম্রাজ্যবাদ নিশ্চিহ্ন করে দিয়ে স্বাধীন ভারতের জাতীয় পতাকা উড়িয়ে ভিত্তি-স্থাপন করে গেলেন স্বাধীন ভারত-রাষ্ট্রের।

সুদূরে অতীত—আজ ইতিহাস। ১৯৪৩-এর মহান ২১শে অক্টোবর। স্বাধীন ভারতের অস্থায়ী গভর্নমেণ্ট ঘোষণার ২৫ বছর পরে—ভারতবর্ষের নবতম ইতিহাসের স্রষ্টা নেতাজী সুভাষ-চন্দ্রের অক্ষয় কীর্তি 'অস্থায়ী আজাদ হিন্দ্ গভর্নমেণ্ট' প্রতিষ্ঠা দিবসের রজত-জয়ন্তী উপলক্ষে গত ২১শে অক্টোবর ১৯৬৮ তারিখে ভারত গভর্নমেণ্ট সরকারিভাবে স্বীকৃতি দিলেন ২১শে অক্টোবরকে—ইতিহাসের বাস্তবতায় স্বীকৃত হল অস্থায়ী আজাদ হিন্দ্ গভর্নমেণ্ট। ২৩শে জানুয়ারী নেতাজী সুভাষচন্দ্রের জন্মদিন—২১শে অক্টোবর তাঁর জীবনের মহান সার্থকতার দিন—এই দিন থেকেই নিঃশব্দ পদসঞ্চারে ভারতের স্বাধীনতা এগিয়ে এসেছে। মানুষ এ পর্যন্ত যা কল্পনা করতে পারে নি, তাই করলেন নেতাজী সুভাষচন্দ্র। স্বাধীন ভারতরাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার জন্য—সমগ্র এশিয়ার নিপীড়িত মানুষকে সাম্রাজ্যবাদের কবল থেকে মুক্তি দেবার জন্য—একাকী নিঃসম্বল হয়ে এসে জগতের সামনে প্রতিষ্ঠা করলেন স্বাধীন সার্বভৌম আজাদ হিন্দ্ রাষ্ট্র। অদ্ভুত বিস্ময়কর অথচ বাস্তব সত্য। ইতিহাসের ইতিহাসে তাই ভাবীকালের ঐতিহাসিকদের ভেবে দেখতে হবে স্বাধীন ভারতের প্রতিষ্ঠা দিবস—১৫ই আগস্ট না ২১শে অক্টোবর।

ভারতের স্বাধীনতা এসেছে—কিন্তু জাতীয় জীবনে আসে নি জাতির মুক্তি-সংগ্রামের অগ্রদূত নেতাজীর আদর্শের মূর্ত কামনা। গঠিত হয় নি অখণ্ড ভৌগোলিক ভারতবর্ষ—প্রতিষ্ঠিত হয় নি নেতাজীর ঈপ্সিত সাম্য, ভেদ-বিভেদ ও বন্ধনহীন ভারতবর্ষ। পরিবর্তে দানা বেঁধে উঠেছে সামাজিক, সাংস্কৃতিক, অর্থ-নৈতিক ও রাজনীতিক্ষেত্রে এক ভয়াবহ দুর্যোগ। জাতীয় চেতনা হয়েছে বিভ্রান্ত। বিকৃত হয়েছে জাতির দর্শন—জাতীয় সংহতিতে এসেছে ভাঙন। যুবচেতনা আজ হতাশ ও বিভ্রান্ত। নেতৃত্বের মান খুব নিম্নস্তরে নেমে এসেছে, তাদের জীবনে যার পরিমাণ এত বেশি যে প্রতি পদেই আজ নেতাজীর নাম স্মরণ করতে হয়। রাজনীতি যেন নীতিধর্ম-বর্জিত শক্তি ও স্বার্থের জন্য দল বা উপদলীয় খেলা—রাজনীতি সম্পর্কে এই ধারণা আজ জনমনে বদ্ধমূল। এই দুঃসহ পরিস্থিতিতে শ্রদ্ধাবনত চিত্তে অনুসরণ করতে হবে দেশ ও জাতির সেবায় আত্ম-নিবেদিত মহানায়ক নেতাজী সুভাষচন্দ্রের জীবন-দর্শন—নেতা ও কর্মী নির্বিশেষে সকলকেই উপলব্ধি করতে হবে তাঁর জীবনাদর্শকে, আর সেই বলিষ্ঠ আদর্শকে সঞ্চারিত ও পরিব্যাপ্ত করে দিতে হবে জনমানসে, বিশেষ করে যুবসমাজের মধ্যে—সেইটাই হবে সেই সর্বত্যাগী মহানায়কের প্রতি সত্যিকারের শ্রদ্ধাঞ্জলি।

আজকের নিদারুণ সঙ্কটের সময় বার বার মনে পড়ছে, নেতাজী সুভাষচন্দ্র চেয়েছিলেন এমন এক স্বাধীন ভারত—যেখানে মানুষের কোন অভাব থাকবে না, যেখানে সকলেই সুখে ও শান্তিতে জীবন কাটাতে পারবে এবং বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের শোষণ-রিক্তা স্বদেশ জননী আবার সগৌরবে বিশ্বসভায় তাঁর শ্রেষ্ঠ-আসন লাভে সক্ষম হবে। আদর্শের পূজারী সেই সর্বত্যাগী মহানায়ক নেতাজী সুভাষচন্দ্রের ৭৩তম জন্মদিবসের পবিত্র লগ্নে আজ জাতিকে শপথ নিতে হবে—অসাম্যের বিরুদ্ধে, অন্যায়ের বিরুদ্ধে সংগ্রাম চালিয়ে যাবার। শক্তি, সাম্য, শান্তি আর মৈত্রীর ভারতবর্ষ প্রতিষ্ঠা করে নেতাজী সুভাষচন্দ্রের আদর্শ ও স্বপ্নকে বাস্তবে রূপায়িত করবার—তবেই সার্থক হবে তাঁর জন্মতিথি উদ্‌যাপন। জয়হিন্দ্!

রিস্ট ওয়াচ

মাত্র ৬৲ টাকায়

আমাদের চেন পদ্ধতি স্কীমের মাধ্যমে মাত্র ৬৲ টাকায় ৫ বৎসরের গ্যারান্টী সমেত ৫ জুয়েল রিস্ট-ওয়াচ লাভ করুন। ডাকমাশুল ১/১৫ টাকা অতিরিক্ত। দ্রষ্টব্য : আমাদের মধু-চন্দ্রিমা সেল্সের বিক্রয় বৃদ্ধির জন্যই এই স্কীম চালু করা হইল। পছন্দ না হইলে মূল্য ফেরৎ।

SWISS WATCH
TRADING CO.
P. B. 87, (WBC) Jullundur City.

বিজ্ঞানের রূপরেখা

অ্যাপোলো-৮ সম্পর্কে বিশেষজ্ঞের সিদ্ধান্ত

ডঃ বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য

দুঃসাহসী ক্রেউ অভিযানে সফল হলে। হাততালি দেওয়া, এবং বিফল হলে তার জন্যে দু' ফোঁটা চোখের জল ফেলে। আবার নিজের কাজে মন দেওয়া। পৃথিবীর ধর্ম।

আপাতত হাততালি শোনা যাচ্ছে পৃথিবীতে। অ্যাপোলো-৮-এর অভিযাত্রীদের সাফল্যে, অনেককেই দেখা যাচ্ছে ফুলের মালা নিয়ে ছোটাছুটি করতে।

অনেকের হাতে আবার মালা। উঠছে না, তালি বাজছে না; অ্যাপোলো-৮কে ঘিরে বিচিত্র সব প্রশ্ন করতে শোনা যাচ্ছে ওঁদের। ওঁরা জানতে চাইছেন, কী করে এত বড় একটা কীর্তি গড়ে-তোলা সম্ভব হল? মাত্র ৬০ মাইল দূরে দাঁড়িয়ে চাঁদকে প্রদক্ষিণ করে আবার ফিরে আসা সম্ভব হল পৃথিবীতে?

বিশেষজ্ঞরা বলছেন, সম্ভব হল সেটার্ন সি-ফাইভ রকেট আমাদের হুকুম হুবহু তামিল করার ফলে। দুঃসাহসী অভিযাত্রীদের অনন্যসাধারণ কৃতিত্বের ফলে এবং রকেটের যাত্রা-সময় নির্ধারণের ও পৃথিবীর সঙ্গে তার যোগাযোগ-সংস্থাপনের নিখুঁত ব্যবস্থার ফলে।

সেটার্ন সি-ফাইভ ও তার আরোহী-অভিযাত্রীদের সম্পর্কে এরই মধ্যে অনেক কথা শুনেছি আমরা। কিন্তু আমরা খুব কম শুনেছি সেটার্ন-এর যাত্রা-সময় ও তার যোগাযোগ-ব্যবস্থা সম্পর্কে। অতএব, এখানে এ-দুটি প্রসঙ্গ নিয়ে আপাতত আলোচনা সুরু করা যাক।

সেটার্ন সি-ফাইভ-বাহিত অ্যাপোলো-৮-এর যাত্রা-সময় নির্ধারিত হয়েছিল ১৯৬৮ সালের ২১শে ডিসেম্বর, কেপ কেনেডীর সময় সকাল ৭টা ৪৫ মিনিটে; অর্থাৎ ঐ তারিখেরই ভারতীয় সময় সন্ধ্যে ৬টা ১৬ মিনিটে। এই বিশেষ সময়টাকে বেছে নেবার কারণ, নির্দিষ্ট গতিবেগ বজায় রেখে চললে চাঁদ-প্রদক্ষিণ-কালে নভশ্চররা লাভবান হবেন; চাঁদের দেশকে দেখে নেবার সবচেয়ে ভালো সুযোগ পাবেন ওঁরা।

অ্যাপোলো-৮-এর নভশ্চরদের একটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ ছিল কক্ষপথ ধরে চাঁদ-প্রদক্ষিণ করার সময় সে-দেশে অবতরণের উপযোগী অন্তত একটি স্থানকে বিশেষ-ভাবে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে নেওয়া।

বিজ্ঞানীরা অবিশ্যি ভবিষ্যৎ-অভিযাত্রীদের চাঁদে অবতরণের উপযোগী পাঁচটি স্থানকে অনেক আগে থাকতেই নির্বাচিত করে রেখেছিলেন; এবং রেখে-ছিলেন বলেই আগে থাকতেই স্থির ছিল যে, নভশ্চররা এমন এক সময়ে চাঁদ-প্রদক্ষিণ করবেন যখন নির্বাচিত পাঁচটি স্থানের অন্তত একটি চাঁদের আলোকিত অংশে থাকবে।

আলোকিত অংশ বলতে যেখানটায় চাঁদের দিন ঠিক সেখানটাকে বোঝাচ্ছে। এই দিনের দাক্ষিণ্য একবার হাতছাড়া হলে ক্ষতিটা হত অপূরণীয়; আলোকের প্রতীক্ষায় দিনের পর দিন ধরে চাঁদের কক্ষপথে অভিযাত্রীদের বসে থাকতে হত।

প্রশ্ন উঠবে, কেন বসে থাকতে হত?

উত্তর হল: থাকতে হত তার কারণ, চাঁদের একটি দিন আমাদের ১৪টি দিনের সমান বলে; চাঁদের একটি দিনরাত্রি আমাদের ২৮টি দিনরাত্রির সমষ্টি বলে এবং চাঁদ আমাদের পৃথিবীর মতো আপন কক্ষপথে লাটিমের মতো ঘুরপাক খায় না বলে; অর্থাৎ, চাঁদের আহ্নিক গতি নেই বলে।

চাঁদের আহ্নিক গতি নেই; এবং নেই বলেই তার একটি দিককে সে পৃথিবীর দৃষ্টিপথ থেকে চিরকালের মতো আড়াল করে রেখেছে।

দিনরাত্রি অবিশ্যি ঐ আড়াল-করা দিকটিতেও হয়; কিন্তু হয় ১৪ দিন পর পর। আর শুধু আড়াল-করা দিকটি কেন, চাঁদের দেশের প্রায় সর্বত্রই দিন বলতে আমাদের পৃথিবীর ১৪ দিন; এবং রাত্রি বলতেও ঠিক তাই। অতএব দেখা যাচ্ছে, অবতরণের উপযোগী স্থানগুলোর বেশির ভাগ অংশেই যখন দিন, তখন চাঁদ-প্রদক্ষিণ করে নভশ্চররা লাভবান হয়েছেন। ভবিষ্যতে চাঁদের যাত্রী হবেন যাঁরা তাঁদের ঘাঁটিগুলো সম্পর্কে যথাসম্ভব নতুন খবর সংগ্রহ করেছেন।

খবর সংগ্রহ করতে গিয়ে সূর্যদেব সম্পর্কেও সজাগ থাকতে হয়েছে ওঁদের। লক্ষ্য রাখতে হয়েছে, যাতে ঠিক এমন এক সময়ে চাঁদ-প্রদক্ষিণ করতে পারেন ওঁরা, যে-সময়ে সূর্যের কিরণ বিশেষ একটা কোণ সৃষ্টি করে চাঁদের গুরুত্বপূর্ণ কিছু কিছু জায়গার ওপর পড়ে। অর্থাৎ, যাতে ছায়া দেখে চাঁদের দেশের এবড়ো-খেবড়ো জায়গাগুলোর আসল চেহারা ঠাওর হয় ওঁদের।

এ ছাড়া অ্যাপোলো-৮-এর যাত্রাক্ষণ নির্ধারণে বিজ্ঞানীরা চাঁদ ও পৃথিবীর আপেক্ষিক দূরত্বের কথাও স্মরণে রেখে-ছিলেন। আর স্মরণে রেখেছিলেন, যাতে চন্দ্রলোকের দিকে রওনা হইয়া এবং চন্দ্র-লোক থেকে ফিরে আসা—উভয় কাজই দিনের আলোকে সেরে নেওয়া যায়।

বিজ্ঞানীদের হিসেব মতে ১৯৬৮ সালের ২১শে ডিসেম্বর কেপ কেনেডীর সময় সকাল ৭টা ৪৫ মিনিট থেকে দুপুর ১২টা ৪৫ মিনিট (ভারতীয় সময়—সন্ধ্যে ৬টা ১৫ মিনিট থেকে রাত্রি ১১টা ১৫ মিনিট) ছিল চন্দ্রলোক-যাত্রার পক্ষে একটি শুভ-লগ্ন। এই লগ্নটি পেরিয়ে গেলে পরের দিন অবধি অপেক্ষা করতে হত অভি-যাত্রীদের। আর যদি যাত্রা সুরু করতে করতে ২৭শে ডিসেম্বরও পেরিয়ে যেত তো ১৯৬৯ সালের ১৮ই থেকে ২৪শে জানুয়ারীর মধ্যবর্তী কোনো শুভলগ্নের জন্যে অপেক্ষা করা ছাড়া অভিযাত্রীদের কোনো উপায় থাকত না।

এদিকে অ্যাপোলো-৮-এর যোগা-যোগ-ব্যবস্থা সম্পর্কেও আশ্চর্য সব তথ্য কানে আসছে আমাদের। আমরা শুনেছি, কয়েক ঘন্টা মাত্র সময় বাদ দিয়ে ওই মহাকাশযানটির সঙ্গে পৃথিবীর বেতার-সংযোগ প্রায় বরাবরই অক্ষুণ্ণ ছিল।

কিন্তু কেন অক্ষুণ্ণ ছিল? কী করে ছিল?—শুধোচ্ছেন অনেকেই। অনেককেই প্রশ্ন করতে শোনা যাচ্ছে, কৃত্রিম উপগ্রহ পৃথিবী-প্রদক্ষিণ করবার সময় তো যোগা-যোগ এমন করে অক্ষুণ্ণ থাকে না?

আমরা বলি, ঠিক কথা; থাকে না। কৃত্রিম উপগ্রহ পৃথিবী-প্রদক্ষিণ করবার সময় প্রায় তিন ভাগের দু' ভাগ সময় ধরেই পৃথিবীর সঙ্গে তার যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন রাখে। প্রায় ৯০ মিনিটে একবার পৃথিবী-প্রদক্ষিণ করে সে; এবং এই ৯০ মিনিটের মধ্যে প্রায় ৬০ মিনিটই সে থাকে সব রকম যোগাযোগ-ব্যবস্থার সম্পূর্ণ বাইরে।

বিশেষজ্ঞদের ধারণা, কৃত্রিম উপগ্রহ যোগাযোগ-ব্যবস্থার বাইরে থাকে তখনই, যখন সে পৃথিবীর ওপরকার যোগাযোগ-কেন্দ্রগুলোর বহু দূরে দিয়ে যায়। মহা-শূন্যের সঙ্গে পৃথিবীর যোগাযোগ-ব্যবস্থা অক্ষুণ্ণ রাখতে হলে মহাকাশযান এবং পৃথিবীর যোগাযোগ-কেন্দ্রটিকে এক লাইনে রাখা চাই। কেন না, কোন মহাকাশযান পৃথিবীর কোন যোগাযোগ-কেন্দ্রের দিগন্ত-রেখার বাইরে চলে গেলে হাজার চেষ্টা করেও তার সঙ্গে আর বেতার-সংযোগ স্থাপন করা সম্ভব নয়।

এদিকে মজার কথা হল, অ্যাপোলো-৮-এর ক্ষেত্রে কিন্তু এ ধরণের কোন যোগাযোগ-সমস্যা দেখা দেয় নি। যে মুহূর্তে পৃথিবী ছাড়িয়ে ঠিক ৪,০০০

মাইল দূরে গেল অ্যাপোলো, ঠিক সে মুহূর্তেই পৃথিবীর বিরাট ও বিস্তৃত এক অঞ্চল থেকে দৃষ্টিগোচর হল সে। সে মুহূর্ত থেকেই পৃথিবীর কোন না কোন যোগাযোগ-কেন্দ্রের সঙ্গে তার অবস্থান এক লাইনে পড়ল। আর ওদিকে প্রায় দু'বার পৃথিবী-প্রদক্ষিণের পর চন্দ্রলোকের পথে যাত্রা করে পৃথিবী থেকে ৪,০০০ মাইল দূরে পৌঁছুতে অ্যাপোলোর কয়েক মিনিটও সময় লাগল না। কয়েক মিনিট বলছি এজন্যে যে, অ্যাপোলো-৮-এর পৃথিবী-প্রদক্ষিণের সময়টাকে এখানে ধরা হয় নি।

যাই হোক, চাঁদ-প্রদক্ষিণ করবার সময় কিন্তু পৃথিবীর সঙ্গে—তার বেতার-সংযোগ মাঝে মাঝে বিচ্ছিন্ন হল। যখনই চাঁদের আড়াল-করা দিকটিতে গেল সে, তখনই পৃথিবীর সঙ্গে তার আর কোন যোগাযোগ থাকল না। অর্থাৎ, প্রতি ২ ঘন্টায় একবার করে চাঁদ-প্রদক্ষিণ করবার সময় প্রতিবারই প্রায় ৪৫ মিনিট ধরে অ্যাপোলো-৮এর সঙ্গে পৃথিবীর কোন যোগসূত্র রইল না।

—কিন্তু কেন রইল না? জনসাধারণ প্রশ্ন করে থেকে থেকে।

বিশেষজ্ঞরা বুঝিয়ে দেন,—রইল না, তার কারণ, প্রতি দু' ঘন্টায় একবার করে চাঁদ-প্রদক্ষিণ করবার সময় ৪৫ মিনিট ধরে চাঁদ থাকল মহাকাশযান ও পৃথিবীর মধ্যে। অর্থাৎ, থাকল এমন একটা জায়গায়, যেখানে পৃথিবী থেকে মহাকাশযান বরাবর টানা কোন সরলরেখা এসে আটকে যাবে।

এ ছাড়া অ্যাপোলো-৮-এর যোগাযোগ-ব্যবস্থা সম্পর্কে আর একটা কৌতূহলোদ্দীপক—কথা বিশেষজ্ঞরা জানিয়েছেন। ওঁরা বলেছেন যে, কোনো মহাকাশযান পৃথিবী-প্রদক্ষিণ করবার সময় একে একে পৃথিবীর বিভিন্ন যোগাযোগ-কেন্দ্রের সঙ্গে সংযোগ স্থাপন করে। অর্থাৎ পৃথিবী-প্রদক্ষিণ করতে করতে যখন যে কেন্দ্রের ওপর দিয়ে যায় সে, তখন সে কেন্দ্রের সঙ্গে তার যোগাযোগ স্থাপিত হয়। কিন্তু অ্যাপোলো-৮-এর ক্ষেত্রে যোগাযোগ এভাবে স্থাপিত হয় নি। কেন না, এই মহাকাশযানটি যখন চাঁদের দিকে যাচ্ছে বা চাঁদ থেকে ফিরে আসছে, তখন পৃথিবীকে প্রদক্ষিণ করে নি সে, পৃথিবীই বরং তার অক্ষরেখার ওপর ঘুরপাক খেতে খেতে তার বিভিন্ন যোগাযোগ-কেন্দ্রগুলোকে একে একে অ্যাপোলো-৮-এর সঙ্গে এক লাইনে স্থাপন করেছে। অর্থাৎ, যেমন ঘুরেছে পৃথিবী, তার এক-একটি যোগাযোগ-কেন্দ্রও তেমনি মহাকাশ-যানের দৃষ্টিসীমার বাইরে চলে গেছে এবং তারপর তার অন্য একটি কেন্দ্র এসে দাঁড়িয়েছে এমন একটা জায়গায়, যে জায়গাটি থেকে মহাকাশযান অবাধ একটা সরলরেখা টানা যায়।

কিন্তু সরলরেখা যদি টানা না যেত? যদি তৃতীয় পর্যায়ে সেটার্ন-৫ রকেটের ইঞ্জিনকে প্রজ্বলিত করে পৃথিবীর কক্ষ-পথ থেকে চন্দ্রলোকের পথে পরিচালনা করা সম্ভব না হত?

বিশেষজ্ঞরা বলছেন, সে ক্ষেত্রে ১০ দিন ধরে পৃথিবী-পরিক্রমা করতেন মহা-কাশচারীরা এবং বিচিত্র সব বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা-নিরীক্ষার সাহায্যে আমাদের জ্ঞানভাণ্ডারকে ওঁরা সমৃদ্ধ করতেন।

এইখানে নতুন সমস্যার কথা ওঠে। অনেকেই শুধোন, তৃতীয় পর্যায়ে সেটার্ন-৫ রকেটের ইঞ্জিন আংশিকভাবে কার্যকরী হত যদি? যদি সে এমন একটা শক্তি লাভ করত, যার সাহায্যে ঠিক চন্দ্রলোকে পৌঁছনো যায় না, কিন্তু পৃথিবী থেকে অনেক দূর অবধি পৌঁছনো যায়?

বিজ্ঞানীরা বলছেন, এইরকম ক্ষেত্রেও ব্যবস্থা অবশ্য-অনুযায়ীই অবলম্বন করা হত। অর্থাৎ এক্ষেত্রে পৃথিবীকে ৪,০০০ মাইল দূর থেকে প্রদক্ষিণ করত অ্যাপোলো-৮ এবং এভাবে ৩—৪ বার প্রদক্ষিণ করার পর তাকে নামিয়ে আনা হত পৃথিবী থেকে ১০০—২০০ মাইল কোন দূরত্বে। সবাই জানি আমরা, এই দূরত্বটা মানুষবাহী মহাকাশযানে চেপে পৃথিবী প্রদক্ষিণের পক্ষে সুবিধেজনক।

এ ছাড়া বিপদ দেখা দিলে চাঁদের মাধ্যাকর্ষণ-এলাকা থেকেও অবিশ্যি পৃথিবীতে ফিরে আসার ব্যবস্থা ছিল।

কিন্তু বিপদ যে শেষ পর্যন্ত দেখা দেয় নি এবং মহাকাশচারীরা কাজ হাসিল করে নির্বিঘ্নেই যে ফিরে এসেছেন, তা' পৃথিবী-জোড়া হাততালির বহর দেখেই টের পাচ্ছি।

শুক্রলোকে অভিযান

আবার নতুন খবর এল সেদিন। শোনা গেল, শুকতারার দিকে রকেট পাঠিয়েছে রাশিয়া। ভেনাস-৫কে ওরা রহস্যময় শুক্রগ্রহের দিকে ছুঁড়ে দিয়েছে। ১৯৬৯ সালের ৫ই জানুয়ারী যে রকেট ওরা ছুঁড়েছে, প্রায় সাড়ে চার মাস ধরে মহাশূন্য-পরিক্রমার পর মে মাসের মাঝামাঝি তার গিয়ে শুক্রে পৌঁছুবার কথা। ভেনাস-৫ গ্রীনউইচ সময় সকাল ৭টা ৪৭ মিনিটে যাত্রা সুরু করে পৃথিবী-প্রদক্ষিণ-রত একটি 'পার্কিং প্ল্যাটফর্ম' থেকে। 'প্ল্যাট-ফর্ম'টি যখন দক্ষিণ আফ্রিকার ওপর দিয়ে যাচ্ছিল, তখন যাত্রা করে সে।

এই ভেনাস-৫ সম্পর্কে কৌতূহলোদ্দীপক কিছু খবর মুশ সংবাদ সরবরাহ প্রতিষ্ঠান 'তাস' আমাদের জানিয়েছেন। ওঁরা বলেছেন যে, এই মহাকাশযানটির ওজন হল ১,১৩০ কিলোগ্রাম এবং শুক্র-তারার দেশে এ গিয়ে যথাসময়ে ঠিক ঠিক অবতরণ করবে।

অবতরণ খুব ধীরে ধীরে করবে ভেনাস-৫ এবং তার পূর্বসূরী ভেনাস-৪-এর অসম্পূর্ণ কাজকে সে সম্পূর্ণ করবে। ভেনাস-৪ শুক্রগ্রহে পৌঁছুবার ঠিক পর-মুহূর্ত থেকেই পৃথিবীতে সংবাদ-পাঠানো বন্ধ করে দেয়। কিন্তু ভেনাস-৫ পৃথিবীর সঙ্গে এ-ধরণের বিশ্বাসঘাতকতা করবে না বলে বিশেষজ্ঞদের ধারণা।

বিশেষজ্ঞদের অনেককেই বলতে শোনা যাচ্ছে, শুক্রগ্রহের পৃষ্ঠদেশে নেমে আসার পরেও পৃথিবীতে সে সংবাদ পাঠাবে ঠিক; এবং ঠিক সে প্রতিবেশী গ্রহ সম্পর্কে উৎকণ্ঠিত পৃথিবীবাসীদের নতুন খবর দেবে।

এদিকে খবর নিয়ে এই সব জল্পনা-কল্পনা চলছে যখন, ভেনাস-৫ তখন দুরন্ত বেগে শুক্রের দিকে এগিয়ে চলেছে। ঠিক পথেই চলেছে সে এবং পথ যাতে সে ভুল না করে, সেদিকে লক্ষ্য রাখছেন বিশেষজ্ঞরা; ভেনাস-৫-এর চলার পথকে নিয়ন্ত্রিত করার জন্যে পৃথিবীর 'কন্ট্রোল-রুমে' ওরা প্রস্তুত হয়েই আছেন।

প্রস্তুতিটা অন্যান্য বারের তুলনায় এবার একটু বেশিরকমের করতে হয়েছে। কারণ, ভেনাস-৫ যাতে ধীরে-সুস্থে শুক্রে অবতরণ করে, অর্থাৎ যাতে 'সফট ল্যাণ্ডিং' করে সে, সেদিকে লক্ষ্য রাখা বড় দরকার।

শুক্রে বা মঙ্গলগ্রহে রকেট পাঠাতে গেলে লক্ষ্য অবিশ্যি আরও অনেক ব্যাপারেই রাখতে হয়। লক্ষ্য রাখতে হয়, সূর্য-প্রদক্ষিণ পথে গ্রহগুলোর দূরত্ব পৃথিবী থেকে কখন কীরকম দাঁড়াচ্ছে।

দূরত্বের প্রশ্ন কেন দাঁড়ায় এখানে?

বিজ্ঞানীরা বলেন,—দাঁড়ায়, তার কারণ, বুধ শুক্র পৃথিবী মঙ্গল প্রভৃতি সৌরজগতের প্রতিটি গ্রহই নিজ নিজ কক্ষ-পথে লাটিমের মতো ঘুরপাক খেতে খেতে সূর্য-প্রদক্ষিণ করছে এবং এই প্রদক্ষিণ করবার সময় এদের একের সঙ্গে অপরের দূরত্বের হেরফের ঘটছে। অতএব, গ্রহ-গুলোর অনুকূল-দূরত্বের দিকে লক্ষ্য রেখে যদি মহাকাশযান না পাঠাই আমরা, তবে সে যান আমাদের উদ্দিষ্ট গ্রহকে গিয়ে আঘাত করবে না, গ্রহটির অনেক দূর দিয়ে চলে যাবে।

শুক্রের বেলায় মহাকাশযান পাঠাবার মাহেন্দ্রক্ষণ আসে প্রতি ১৯ মাস পর

পর; আর মঙ্গলগ্রহের বেলায় তা' আসে প্রতি ২৫ মাসে একবার।

বলা বাহুল্য, মাহেন্দ্রক্ষণ বুঝেই শুক্রগ্রহের দিকে মহাকাশযান পাঠিয়েছেন সোভিয়েত বিজ্ঞানীরা; এবং এইভাবে শুক্রলোক-অভিযান ওঁরা সুরু করেছেন ১৯৬১ সালের ১২ই ফেব্রুয়ারী থেকে।

হ্যাঁ, ১২ই ফেব্রুয়ারী, ১৯৬১। ওই বিশেষ তারিখটিতেই প্রতিবেশী গ্রহের সঙ্গে সম্পর্ক-স্থাপনের আশায় মানুষ একটা কাজের মতো কাজ করল। সে ভেনাস-১ বা ভেনেরা-১কে পাঠাল শুক্র-লোকের দিকে।

কিন্তু ভাগ্য মন্দ মানুষের। ১৯৬১ সালের ২৭শে ফেব্রুয়ারী ভেনাস-১-এর সঙ্গে পৃথিবীর সংযোগ বিচ্ছিন্ন হল। ফলে, পৃথিবীতে বসে মহাকাশযানটির যাত্রাপথকে নিয়ন্ত্রিত করার কোনো পথ রইল না; এবং যানটিও শুক্রগ্রহকে পাশ কাটিয়ে সৌরজগতের নতুন একটি গ্রহ হিসেবে সূর্য-প্রদক্ষিণ সুরু করল।

কিন্তু এইভাবে কৃত্রিম গ্রহকে দিয়ে সূর্যপ্রণাম জানিয়ে মানুষের মন ভরলে তো! যে মানুষ চাইছে আসল গ্রহের সঙ্গে সম্পর্ক গড়ে তুলতে, মন ভরলে তো তার কৃত্রিমের এই সব কাণ্ডকারখানা দেখে।

মন সত্যি কিন্তু তার ভরল না। তাই এবার সে তাকাল রক্তাভ মঙ্গলগ্রহের দিকে। ১৯৬২ সালের নভেম্বর মাসে মহাকাশযান মারস্-১কে মঙ্গলগ্রহের দিকে পাঠাল সে।

মারস্-১ও বিশ্বাসঘাতকতা করল। মঙ্গলগ্রহে না পৌঁছে সে পৌঁছুল পৃথিবী থেকে ১০ কোটি ৬০ লক্ষ কিলোমিটার দূরবর্তী মহাশূন্যে।

মহাশূন্য সম্পর্কে অনেক নতুন খবর দিল মারস্-১; কিন্তু মঙ্গলগ্রহ সম্পর্কে খবর কিছু দিল না।

অগত্যা বিজ্ঞানীরা আবার তাকালেন শুক্রগ্রহের দিকে। ১৯৬৫ সালের ১২ই নভেম্বর ৯৬৩ কিলোগ্রাম ওজনের ভেনাস-২কে শুক্রের অভিমুখে পাঠালেন ওঁরা।

ভেনাস-২-এর কক্ষপথ তার পূর্ব-নির্দিষ্ট কক্ষপথের সঙ্গে প্রায় মিলে গেল, এবং সে কারণেই পৃথিবী কন্ট্রোল-রুমে বসে জোর করে তার দিক্-পরিবর্তনের কোনো আবশ্যকতা অনুভব করলেন না বিজ্ঞানীরা।

কিন্তু শেষ পর্যন্ত দেখা গেল, এবারেও বিধি বাম। দেখা গেল, ১৯৬৬ সালের ২৭শে ফেব্রুয়ারী শুক্রগ্রহের ভেনাস-২ শুক্রগ্রহ সম্বন্ধে নতুন কিছু খবর পাঠাল সত্যি; কিন্তু সে খবর এমন কিছু নয় যা' দিয়ে প্রতিবেশীর হাঁড়ির খবর আমরা পেতে পারি।

—হাঁড়ির খবর চাই। অনেক আগে থেকেই বলছিলেন বিজ্ঞানীরা; এবং ভেনাস-২কে শুক্রগ্রহের দিকে ছুঁড়েছিলেন।

ভেনাস-৩ শুক্রগ্রহ অভিমুখে যাত্রা সুরু করে ১৯৬৫ সালের ১৬ই নভেম্বর।

শুক্রলোক-অভিযানের এই বিশেষ পর্বে মহাকাশ-বিজ্ঞানীরা স্থির করেছিলেন, প্রায় ৯০০ মিলিমিটার ব্যাসযুক্ত একটি গোলাকার যন্ত্রকে শুক্রের পৃষ্ঠদেশে নামিয়ে দেওয়া হবে এবং সে যন্ত্রটাকে রাখা হবে তাপ-নিরোধক এমন কোনো আধারের মধ্যে, যাতে শুক্রের বায়ুমণ্ডল ভেদ করে যাবার সময় ঘর্ষণ-জনিত অতিরিক্ত উত্তাপের ফলে তার কোনো ক্ষতি না হয়।

ক্ষতির সম্ভাবনা দূর করার জন্যে আরও নানাভাবে সতর্ক ছিলেন বিজ্ঞানীরা। ১৯৬৫ সালের ২৬শে ডিসেম্বর ভেনাস-৩ যখন পৃথিবী থেকে ১২,৯০০,০০০ কিলোমিটার দূরে দিয়ে যাচ্ছিল, তখন কন্ট্রোল-রুমে বসে তার সামান্য কিছু দিক-পরিবর্তনও বিজ্ঞানীরা করেছিলেন।

কন্ট্রোল-রুমের কারিগরী ব্যর্থ হয় নি সেবার। যাত্রার সাড়ে তিন মাস পর ১৯৬৬ সালের ১লা মার্চ মস্কো সময় রাত্রি ৯টা ৫৬ মিনিটে ভেনাস-৩ শুক্রগ্রহের মাটি স্পর্শ করেছিল। প্রসঙ্গত মনে রাখা দরকার যে, এই হল মানুষের প্রেরিত প্রথম মহাকাশযান, যা' দূরের বা কাছের কোনো গ্রহের মাটি স্পর্শ করেছে।

ভেনাস-৩-এর এই সাফল্যে উজ্জ্বল হল বিজ্ঞানীদের মুখ; তাই ১৯৬৭ সালে দেখা গেল, রাশিয়া এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র—উভয় দেশই শুক্রগ্রহ অভিমুখে মহাকাশযান পাঠিয়েছে।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মহাকাশযানটি শুক্রগ্রহে পৌঁছুতে পারে নি। কিন্তু রাশিয়ার ভেনাস-৪ ১৯৬৭ সালের ১৮ই অক্টোবর শুক্রের বায়ুমণ্ডলে প্রবেশ করে।

প্রতিবেশী গ্রহের বায়ুমণ্ডল ভেদ করে যাবার সময় পৃথিবীতে মূল্যবান কিছু তথ্য পাঠায় ভেনাস-৪ এবং শুক্রের পৃষ্ঠ-দেশে সে যখন নেমে আসে তখন তার ১,১০৬ কিলোগ্রাম ওজন বিশিষ্ট কুঠুরির এবং ৩৮৩ কিলোগ্রাম ওজনের যন্ত্রপাতির কোনো ক্ষতি হয় নি।

এইখানে বলে রাখা ভালো যে, শুক্র-তারার দেশে প্যারাসুটে করে নামানো হয়েছিল ভেনাস-৪কে এবং বায়ুমণ্ডল ভেদ করে নামতে তার সময় লেগেছিল ৯০ মিনিট।

ভেনাস-৪ দেখতে দেখতে অনেক নতুন খবর পাঠাল পৃথিবীতে। এই সব খবরের মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হল, যে ধরণের জীবনের সঙ্গে পৃথিবীতে আমরা পরি-চিত, মেঘাচ্ছন্ন শুক্রগ্রহে সে ধরণের কোনো জীবন থাকা সম্ভব নয়। বড় জোর এককোষী কোনো জীব থাকলেও থাকতে পারে সেখানে।

এছাড়া শুক্রের বায়ুমণ্ডলের তলার দিকে উত্তাপ বড় বেশি। এত বেশি যে আমাদের চেনাজানা ধরণের কোনো জীব সে-গ্রহে থাকতে পারে না।

কিন্তু শুক্রের বায়ুমণ্ডল কেমনতরো?

ভেনাস-৪-এর দৌলতে আমরা জানলাম, এতকাল যেমনতরো আমরা ভেবে-ছিলাম ঠিক তেমনতরো নয়।

এতকাল আমরা জানতাম, শুক্রের বায়ুমণ্ডলের শুধুমাত্র উপরিভাগেই বুঝি কার্বন-ডাই-অক্সাইড্-এর ছড়াছড়ি। কিন্তু এইবার জানা গেল,—না, ঠিক তা' নয়। শুক্রের বায়ুমণ্ডলের নিচের দিকেও কার্বন-ডাই-অক্সাইড্ বড় কম নেই।

কার্বন-ডাই-অক্সাইড্ প্রচুর আছে সেখানে। কিন্তু অক্সিজেন এবং জলীয় বাষ্প আছে শতকরা মাত্র ১·৫ ভাগ। এ ছাড়া নাইট্রোজেনও খুব কম আছে শুক্রের বায়ুমণ্ডলে। ভেনাস-৪-এর রিপোর্ট অনুযায়ী আছে শতকরা মাত্র ৭ ভাগ।

সে-দেশে বায়ুর চাপ পৃথিবীর সমুদ্রপৃষ্ঠের বায়ুচাপের তুলনায় ২০ গুণ বেশি। এ ছাড়া ঠিক যে ধরণের বিকিরণ-বলয় পৃথিবীকে ঘিরে আছে, সেখানে তা নেই। আর নেই চুম্বকক্ষেত্র। ভেনাস-৪-এর রিপোর্ট থেকে বিজ্ঞানীরা অনুমান করছেন, পৃথিবীর মতো উল্লেখযোগ্য কোনো চুম্বকক্ষেত্র শুকতারার দেশে নেই বললেই হয়।

প্রশ্ন উঠবে, তবে কী আছে শুক্র-তারায়? এমন কী আছে সেখানে যে জন্যে সূর্য থেকে ৬ কোটি ৭২ লক্ষ মাইল দূরবর্তী (পৃথিবীর দূরত্ব ৯ কোটি ৩০ লক্ষ মাইল), ৭ হাজার ৭০০ মাইল ব্যাসযুক্ত (পৃথিবীর ব্যাস ৭,৯২৬ মাইল) এবং আপন কক্ষপথ ধরে সেকেণ্ডে প্রায় ২২ মাইল বেগে সূর্য-প্রদক্ষিণরত (পৃথিবীর সূর্য-প্রদক্ষিণবেগ সেকেণ্ডে ১৮½ মাইল) গ্রহটিকে জানবার জন্যে পৃথিবীর মানুষের এত আগ্রহ?

এ প্রশ্নের জবাব মানুষই একদিন দেবে; এবং হয়তো ভেনাস-৫-ই মে মাসের মাঝামাঝি নতুন খবর এনে দেবে আমাদের।

শিল্প বাণিজ্য অর্থনীতি

ব্যাঙ্কে দেবার টাকা/নেবার লোক নেই

১৯৬৮ সালে ভারতের অর্থনৈতিক জগতের অন্যতম আগ্রহ উদ্দীপক ঘটনা হচ্ছে ব্যাঙ্কের অস্বাভাবিক মেদ বৃদ্ধি। ব্যাঙ্কের প্রধান কাজ হচ্ছে জনসাধারণের কাছ থেকে উদ্বৃত্ত অর্থ সংগ্রহ করে বেশি সুদে সেই টাকা শিল্প-বাণিজ্যে নিয়োগের দ্বারা মুনাফা আদায় করা। এই মুনাফার একাংশ সুদ হিসাবে আমানতকারীদের (ডিপোজিটর্স) ফেরৎ দিতে হয়। বাকীটা ব্যাঙ্কের মালিকরা ভাগাভাগি করে নেন। সুতরাং এটুকু বুঝতে কারও কষ্ট নেই যে, যে ব্যাঙ্কে যত বেশি টাকা জমা (ডিপোজিট) পড়ে, সেই ব্যাঙ্কের সমৃদ্ধি তত বেশি। এতদিন এদেশে একশ কোটি টাকার বেশি আমানতের অধিকারী ব্যাঙ্কের সংখ্যা ছিল নগণ্য। গত কয়েক বছরে এরকমের ব্যাঙ্কের সংখ্যা বেড়ে ৯টিতে এসে পৌঁচেছিল। এবার তার সংখ্যা দাঁড়াচ্ছে ১০টিতে। এবার যে ব্যাঙ্কটি এ মর্যাদা লাভ করল, তার নাম সিণ্ডিকেট ব্যাঙ্ক।

সিণ্ডিকেট ব্যাঙ্কের আমানত বৃদ্ধির হার এক বছরে ৪১·২ শতাংশ। অর্থাৎ গত বছর তাদের ঘরে যত টাকা জমা পড়েছিল, এবার প্রায় তার দ্বিগুণ টাকা পড়ে মোট জমার পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ১১৩ কোটি টাকা। এদেশে ব্যাঙ্কিং-এর ইতিহাসে আমানত বৃদ্ধির এরকম অভাবনীয় হার আগে কখন কল্পনাও করা যায় নি, অন্যান্য ব্যাঙ্কে আমানতের হার কি হারে বেড়েছে, তার একটা হিসেব নিচে দেওয়া হল :—আমানত বৃদ্ধির হারে দ্বিতীয় স্থান অধিকারী ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়ার আমানত বৃদ্ধির হার ১৭ শতাংশ (মোট জমা—৩৯৫ কোটি); সেণ্ট্রাল ব্যাঙ্ক অফ ইণ্ডিয়ার আমানত বৃদ্ধির হার ৮·৯ শতাংশ (মোট জমা—৪৩০ কোটি টাকা); ব্যাঙ্ক অফ বরোদার আমানত বৃদ্ধির হার ৯·১ শতাংশ (মোট জমা ৩০০ কোটি টাকা); ক্যানাড়া ব্যাঙ্কের আমানত বৃদ্ধির হার ১৫ শতাংশ (মোট জমা—১৪৬ কোটি টাকা); দেনা ব্যাঙ্কের আমানত বৃদ্ধির হার ১৫·৭ শতাংশ (মোট জমা—১১৮ কোটি টাকা); ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক অফ ইণ্ডিয়ার আমানত বৃদ্ধির হার ৮ শতাংশ (মোট জমা—১০৮ কোটি টাকা)।

ব্যাঙ্কে জমা পড়ে দু'রকমের টাকা। একটাকে বলে টাইম ডিপোজিট অর্থাৎ মেয়াদী আমানত। অপরটার নাম ডিমাণ্ড ডিপোজিট অর্থাৎ সেই টাকা আমানতকারী যখন খুশি ব্যাঙ্ক থেকে তুলে নিতে পারেন। ব্যাঙ্কের আমানত এই যে অস্বাভাবিক হারে বৃদ্ধি পেয়েছে, তার বেশির ভাগটাই হচ্ছে টাইম ডিপোজিট। তার অর্থ ব্যাঙ্কগুলো এ বছর তাদের টাকা পুরোপুরি খাটাতে পারে নি।

ফলে এবার ব্যাঙ্কের গ্রস আয় বাড়লেও মুনাফার হার কমে যাবার আশঙ্কা আছে। ব্যাঙ্ক পরিচালনার ব্যয় নাকি তুলনায় অনেক বৃদ্ধি পেয়েছে। কোন কোন অগ্রাধিকার প্রাপ্ত শিল্প ব্যাঙ্ক কম হারে টাকা ঋণ দেয়। ১৯৬৮ সালে নাকি সেই ধরণের শিল্পে ব্যাঙ্ক বেশি টাকা ঋণ দিয়েছে। অথচ আমানত বৃদ্ধির ফলে আমানতকারীদের সুদ গুণতে হয়েছে অনেক বেশি।

সম্প্রতি দেনা ব্যাঙ্কের যে বার্ষিক রিপোর্ট বেরিয়েছে, তাতে দেখা যাচ্ছে যে, তাদের আমানত ১৮·৬ শতাংশ হারে বৃদ্ধি পেয়েছে কিন্তু ঋণদানের পরিমাণ গত বছরের তুলনায় বিশেষ কিছু বাড়ে নি। ফলে তাদের মুনাফা দেড় লাখ টাকা কমে গেছে।

ব্যাঙ্কের তহবিলে প্রচুর টাকা রয়েছে অথচ সেটা পুরোপুরি শিল্প-বাণিজ্য খাটতে পারছে না কেন, সে প্রশ্নের কোন জবাব অর্থনৈতিক জগতের হোমরা-চোমরাদের কাছ থেকে এখনও পাওয়া যায় নি। সম্ভবত শিল্প-বাণিজ্য মন্দাই তার প্রধান কারণ। ব্যাঙ্কগুলির রক্ষণশীল ঋণ প্রদান নীতি এই অবস্থার জন্য কতখানি দায়ী, সেটাও ভেবে দেখা দরকার।

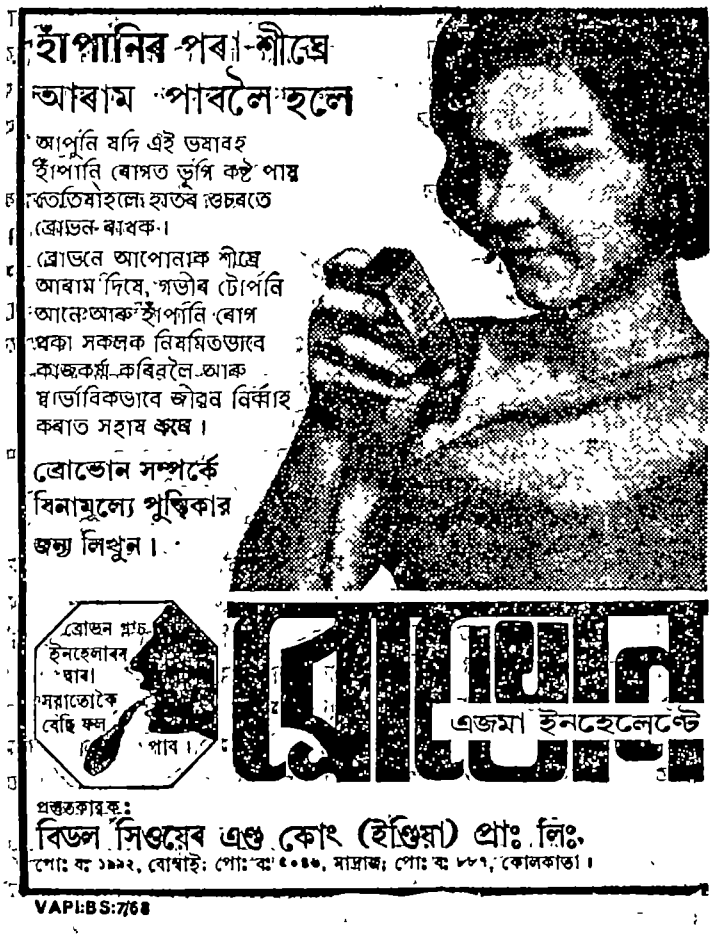

টাকা খাটাবার জায়গা না পেয়ে সব ব্যাঙ্কই এখন গৃহস্থালীর দ্রব্যাদি ক্রয়ের জন্য ব্যক্তিগত ঋণ প্রদানের আয়োজন করেছেন। গ্রামে কাবলীওয়ালা জাতীয় উত্তমর্ণ নিয়োগ করে ব্যাঙ্কের টাকা খাটাবার কথাও তাঁরা চিন্তা করেছেন। কোন কোন ব্যাঙ্ক ইতিমধ্যেই গৃহস্থালীর দ্রব্যাদি ক্রয়ের জন্য ব্যক্তিগত ঋণ প্রদানের ব্যবস্থা চালু করেছেন। এঁরা এই খাতে মাথা-পিছু ১ হাজার থেকে ১০ হাজার টাকা পর্যন্ত ঋণ দিচ্ছেন। রেফ্রিজারেটার, রেডিও সেট, মোটরগাড়ি, অথবা অন্যান্য সরঞ্জাম কেনবার জন্য এখন অনেক ব্যাঙ্কেই টাকা ধার পাওয়া যাচ্ছে। তার সুদ পড়ছে প্রায় সাড়ে ৯ শতাংশ। অপর দিকে হায়ার পারচেজের সুদ পড়ে প্রায় ১৫ থেকে ২৫ শতাংশ টাকা। কাজেই ব্যাঙ্কের এই নতুন ব্যবস্থা নিশ্চয়ই জনপ্রিয় হবে।

এদিকে ব্যাঙ্কে আমানত বাড়াবার জন্য আমানতকারীদের গচ্ছিত অর্থের ওপর সুদের হার বাড়াবার জন্য কোন কোন ব্যাঙ্ক দস্তরমত উদ্‌গ্রীব হয়ে উঠেছে। বর্তমান আন্তঃ ব্যাঙ্ক চুক্তি অনুযায়ী ব্যাঙ্কগুলো সমহারে তাদের আমানতকারীদের সুদ দিয়ে থাকে। যারা ঐ চুক্তির অংশীদার নয়, তারা অবশ্য চুক্তিটা মানতে বাধ্য নয়। তবে বড় বড় ব্যাঙ্ক সকলেই ঐ চুক্তির অংশীদার। তাদের মধ্যে কেউ কেউ চুক্তি থেকে বেরিয়ে এসে সুদের হার বাড়াবার চেষ্টা করছেন। তাতে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক বেশ উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েছেন। অন্যান্য ব্যাঙ্কের তরফ থেকে রিজার্ভ ব্যাঙ্ককে জানানো হয়েছে যে, কোন কোন ব্যাঙ্ক আমানতকারীদের সুদের হার বাড়িয়ে দিলে অন্যান্য ব্যাঙ্কের টাকা সব সেই ব্যাঙ্কে গিয়ে ঢুকবে। বেশি সুদের লোভে কোন নতুন টাকা ব্যাঙ্কে আসবে বলে তাঁরা মনে করেন না। পাঞ্জাবের উদাহরণ দিয়ে তাঁরা বলছেন যে, সেখানে গত বছর ব্যাঙ্কে আমানতের পরিমাণ হঠাৎ খুব বেড়ে যায়। তার কারণ, সেখানে ফলন বৃদ্ধির দরুণ কৃষকদের হাতে প্রচুর পয়সা এসেছিল। তার একটা অংশ তারা ব্যাঙ্কে জমা করে। সে জন্য তাদের বেশি সুদের লোভ দেখাতে হয় নি। অধিকাংশ ব্যাঙ্কের বক্তব্য হচ্ছে, আমানতকারীদের সুদের হার বাড়ালে ব্যাঙ্কের পরিচালন ব্যয় বৃদ্ধি পাবে এবং মুনাফার পরিমাণ কমে যাবে।

কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে, ব্যাঙ্কের ঘরে যখন প্রচুর টাকা তখন প্রয়োজনীয় ঋণের অভাবে ছোট ছোট বহু শিল্প মুমূর্ষু হয়ে উঠেছে কেন। এ সম্পর্কে ক্ষুদ্র শিল্পমহলে খোঁজ করে জানা গেল যে, ছোট ছোট শিল্পে অর্থ সাহায্য করবার জন্য সরকার যথেষ্ট চাপ দেওয়া সত্ত্বেও বড় বড় ব্যাঙ্ক তাদের টাকা ধার দিতে অনিচ্ছুক। ধার চাইতে গেলে এমন সব কঠিন কঠিন সর্ত তারা সামনে এনে হাজির করে যে, সেই সর্ত পূরণ করে ব্যবসা চালানো যায় না। ব্যাঙ্কের টাকা ধার নিলে সুদ তো দিতেই হয়, তার ওপর ব্যাঙ্কের একজন দারোয়ান পুষতে হয়। তার মাইনে মাসে আড়াই শ' টাকা। ব্যাঙ্কগুলো ক্ষুদ্র শিল্পে টাকা খাটাতে একেবারেই অনিচ্ছুক। তার চেয়ে ব্যক্তিগত ঋণ দিয়ে টাকা বাড়াতেই তাদের আগ্রহ বেশি। বৃহৎ শিল্প-বাণিজ্যে যে টাকাটা তারা খাটাতে পারছে না, সেই টাকাটা ক্ষুদ্র শিল্পে খাটিয়ে দিলে দেশে শিল্প সম্প্রসারণ ত্বরান্বিত হত। কিন্তু মনে হয়, একমাত্র মুনাফা ছাড়া আর কোন কিছুতেই তাদের আগ্রহ নেই। অন্তত বর্তমান পরিস্থিতিতে সেটাই প্রমাণ করছে।

এই প্রসঙ্গে স্টেট ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়ার ১৯৬৮ সালের হিসাবটা না প্রকাশ করে পারছি না। এ বছর স্টেট ব্যাঙ্কে নতুন আমানত জমা পড়েছে ১১০ কোটি ৬১ লক্ষ। এই নিয়ে ব্যাঙ্কের মোট আমানত দাঁড়িয়েছে ১০৭৯ কোটি ৫৬ লক্ষ টাকা। আমানত বৃদ্ধির হার ১১'৭ শতাংশ।

১৯৬৮ সালের ডিসেম্বরের শেষ তারিখ পর্যন্ত ভারতের তপশীলভুক্ত কমার্শিয়াল ব্যাঙ্কে মোট আমানতের পরিমাণ দাঁড়িয়েছিল ৪২০৫ কোটি ১ লক্ষ টাকা। গত বছরের তুলনায় এটা ৪৪২ কোটি ৪৭ লক্ষ টাকা বেশি।

—শ্রীসওদাগর

মুক্তার মত ঝকঝকে উজ্জ্বল...

আপনার দাঁত হবে সাদা ধবধবে, দাঁতের মাড়ী নীরোগ থাকবে আর মুখের দুর্গন্ধ দূর হবে, আপনি শুধু ডেণ্টনিক দিয়ে দাঁত মাজা অভ্যাস করুন।

ক্লোরোফিল মিশ্রিত ডেণ্টনিক পাইওরিয়া সারাতে সাহায্য করে।

যাঁরা টুথ পাউডারের জায়গায় পেষ্ট ব্যবহার পছন্দ করেন তাঁদের জন্য জনপ্রিয় ডেণ্টনিকের সমস্ত গুণসম্পন্ন টুথ পেষ্ট বাজারে প্রচলন করা হইয়াছে। ধবধবে দাঁত আর মনভোলান হাসি যাঁরা পছন্দ করেন তাঁরাই চান ডেণ্টনিক টুথ পেষ্ট।

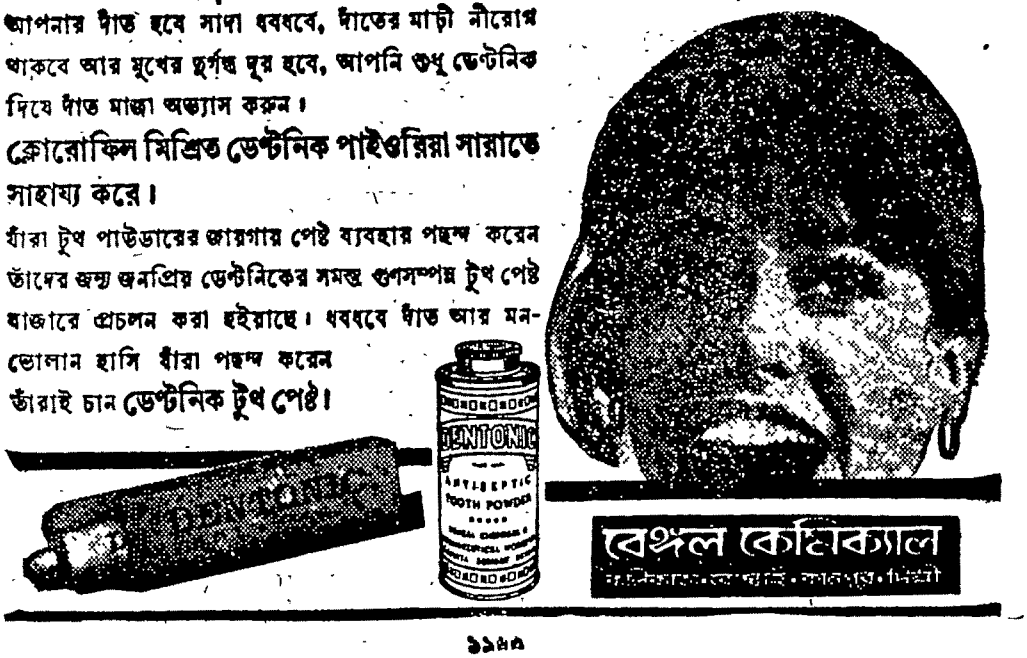

বেঙ্গল কেমিক্যাল

দিলীপকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

রতন ঠাকুর বাসস্টপে দাঁড়িয়ে ভাবছিল। একটার পর একটা বাস আসছে। কিন্তু বাসগুলিতে অসম্ভব ভিড়। তখন দুপুর প্রায় বারোটা। ভেবেছিল অফিসের ভিড় শেষ হয়ে যাবে। কিন্তু কলকাতার বাসগুলি কোনসময়েই ফাঁকা পাওয়া যায় না। তাই রতন ভাবছিল কি করবে। বাসে যাবে না ট্যাক্সিতে যাবে। ও যাবে ধর্মতলার গ্র্যান্ড হোটেলে,—লাঞ্চ খেতে। বাসে গেলে জামা প্যান্ট সব দুমড়ে যাবে, টাইটার ঝকঝকে ভাব আর থাকবে না। ভিড়ের মধ্যে হয়ত জুতোটাই কেউ মাড়িয়ে দেবে। এলোমেলো দোমড়ানো জামা প্যান্ট দেখলে কি আর দারোয়ান ঢুকতে দেবে? জীবনে এই প্রথম গ্র্যান্ড হোটেলে খেতে যাচ্ছে। সাহেবসুবোদের ব্যাপার, তাই রতনের বুকটা দুরদুর করছে। রতন মনে মনে হিসেব করে নিল। সারাজীবন ও হিসেব করে এসেছে, বাকী জীবনও হয়ত হিসেব করতে করতেই কেটে যাবে। শুধুমাত্র আজকের দিনে একটু বেহিসেবী হলে ক্ষতি কি? মহাত্মা গান্ধী রোডের মোড় থেকে গ্র্যান্ড হোটেলে বড়জোর দেড় টাকা উঠবে। পাইস হোটেলের রাঁধুনীর পক্ষে এ নিশ্চয়ই বিলাসিতা। কিন্তু তবু আজকের দিনের খাতিরেই এ বিলাসিতাকে প্রশ্রয় দেয় রতন। না হলে স্যুট-টাই পরা সাহেবদের সমগোত্রীয় হবে কি করে!

সামনে দিয়ে একটা ট্যাক্সি যাচ্ছিল। রতন ডাকল, 'এই ট্যাক্সি—' ট্যাক্সিটা কাছে এসে থামতেই ট্যাক্সিতে উঠে রতন বলল,—'আমি গ্র্যান্ড হোটেলে লাঞ্চ খেতে যাব, যাবেন তো?' বিস্ময়ের ভাব গোপন করে ড্রাইভার এ্যাকসিলেটরে চাপ দিল। নরম তুলতুলে ডানলোপিলোর গদির মধ্যে ডুবে গেল রতন। রতন কেমন যেন অস্বস্তিবোধ করল। মনে হল যেন রাস্তার প্রতিটি লোক তাকিয়ে তাকিয়ে কেবল রতনকেই দেখছে। দেখছে রতনের কোট, প্যান্ট, টাই। রতন মনে মনে ভাবল, কেন স্যুট-টাই কি আর কেউ পরে না, ট্যাক্সিতে চড়ে কি আর কেউ যায় না। তবু সবাই রতনকেই দেখছে কেন। রতন রাস্তা থেকে দৃষ্টি ফিরিয়ে নিল।

ভাবতে অবাক লাগে, সমস্ত ট্যাক্সিটার মধ্যে রতন একা। এই সময়টুকুর জন্য রতনই বলতে গেলে গাড়িটার মালিক। হঠাৎ রতনের নজরে পড়ল, সামনের সিটের পেছনদিকে লাগানো কিসের একটা পাত্র। কয়েকটি অবশিষ্ট সিগারেটের টুকরো দেখে বুঝতে পারল সিগারেটের ছাইদান। কোটের পকেটে হাত ঢুকিয়ে সদ্য কেনা লাইটার আর সিগারেটের প্যাকেটটা অনুভব করল। রতন বিড়িই খায়, ক্বচিৎ কালেভদ্রে সিগারেট খেয়ে দেখেছে। সত্যি কথা বলতে গেলে সিগারেট খেতে ওর ভাল লাগে না। কে জানে, ওখানে হয়ত বিড়ি খাওয়া বারণ। ওসব জায়গায় সিগারেট খাওয়াই নিয়ম।

রতন ভাবল, এখন একটা সিগারেট খেলে মন্দ হয় না। সিগারেট প্যাকেট থেকে একটা সিগারেট বের করে মুখে রাখল। লাইটার বের করে সিগারেট ধরাতে যাবে, এমনি সময়ে হঠাৎ জানলা দিয়ে জীর্ণ কংকালসার একটা হাত ভেতরে

গালে এল। রতন তাকিয়ে দেখল গাড়িটা লাল সিগন্যালের জন্য থেমে গেছে। ওর বাইরে থেকে শিশু কোলে নিয়ে একটি মেয়ে পয়সার জন্য আকুতি-মিনতি করছে। রতনের খুব খারাপ লাগল, ও গ্র্যান্ডে লাঞ্চ খেতে যাচ্ছে, এদিকে একটি শিশু তার সামান্য প্রয়োজনটুকু পর্যন্ত পাচ্ছে না। বিনা বাক্যব্যয়ে রতন একটি সিকি বের করে মেয়েটির হাতে দিল। রতন জানলা দিয়ে দেখল, এক ঝাঁক বলাকা শূন্যে পাখা মেলে দিয়েছে।

গ্র্যান্ড হোটেলের নিচে রতন ট্যাক্সি থেকে নামল। পাওনা মিটিয়ে গ্র্যান্ড হোটেলের গেটের দিকে এগিয়ে গেল। এই হোটেলটার নিচ দিয়ে অনেকবার গেছে রতন। কিন্তু কোনদিন রতনের নিজেকে এতখানি অসহায় মনে হয় নি। মনে হল ও যেন ধীরে ধীরে একটা পাথরের মূর্তিতে পরিণত হচ্ছে। গেটের কাছে দাঁড়ানো পাগড়ী পরিহিত দারোয়ানকে যমদূতের মত মনে হল। রতন কাছে গেলেই হয়ত ওকে লৌহবজ্রমুষ্টিতে চেপে ধরবে। ভাড়া করা স্যুট-টাই পরে গেটের কাছে দাঁড়িয়ে ডিসেম্বরের শীতেও ঘামতে সুরু করল। তারপর একসময় রতন আড়িয়ে দেখল, দেশী-বিদেশী সাহেব মেমদের দল ঝাঁক ঝাঁক প্রজাপতির মত হাসতে হাসতে বেরিয়ে আসছে। রতন ভাবল ওর এত ভয়ের কি আছে। ও তো আর বিনে পয়সায় খেতে যাচ্ছে না, দস্তুরমতো নিজের রক্তজল করে রোজগার করা পয়সা নিয়েই খেতে এসেছে। হাত দিয়ে টাইটাকে আর একবার ঠিক করে গেটের মধ্য দিয়ে হোটেলের ভেতরে ঢুকে গেল। কিন্তু কেউ এগিয়ে এসে ওর কলার চেপে ধরল না। নরম তুলতুলে গদির ওপর দিয়ে দোল খেতে খেতে রতন ওপরে উঠে এল। ভেতরে এসে রতন দেখল একটা ঘরের মধ্যে অনেক লোকজন বসে খাওয়া-দাওয়া করছে। রতন ঘরে ঢোকবার একটু পরেই স্যুট-টাই পরা এক সুবেশ ভদ্রলোক ওকে ইংরেজীতে কি যেন বললেন। রতন ইংরেজী জানে না, সামান্য দু-একটি ইংরেজী কথা পাইস হোটেলের একজন বোর্ডারের কাছ থেকে শিখেছে। রতনের আবার নিজেকে অত্যন্ত অসহায় বলে মনে হল। ও শুধু-মাত্র অস্ফুটস্বরে বলল, 'লাঞ্চ,—'। সেই ভদ্রলোক বোধহয় ওর অবস্থা বুঝতে পারলেন। ওকে অঙ্গুলিসংকেতে একটি জায়গায় বসতে বলে একজন বয়কে ডাকলেন। বয়টি এসে ওর কাছে এসে বলল, 'কি কি খাবেন বলুন।' রতন ওর বিনীত ভঙ্গিতে চমৎকৃত হল। টেবিলে রাখা মেনুতে সবকিছুই ইংরেজীতে লেখা। রতন লেখাগুলি পড়তে পারল না, শুধু-মাত্র দামগুলি অল্পবিস্তর বুঝতে পারল। কিন্তু ও যে পড়তে জানে না, সেকথা তো প্রকাশ করা চলে না। রতন আন্দাজে দু-তিন জায়গায় আঙুল রেখে বয়কে খাবারগুলো দিতে বলল, 'পোলাও বা ভাত কিছুই লাগবে না।' রতন বুঝতে পারল, মেনু থেকে খাবার দিতে বলায় নিশ্চয়ই কোথাও গলদ থেকে গেছে। নিজের বোকামি গোপন করবার জন্য তাড়াতাড়ি বলল, 'হ্যাঁ, পোলাও তো লাগবেই। চিংড়ির পোলাও আছে?' বয়টি ঘাড় নেড়ে ওর কাছ থেকে চলে গেল।

এতক্ষণে নিশ্চিন্ত হয়ে চারদিকে চেয়ে দেখবার সুযোগ পেল। চারদিকের জাঁক-জমকে রতন অবাক হল। বহুমূল্য ভালোপিলোর গদি আঁটা সমস্ত চেয়ার। অনেকদূরে একটা উঁচু প্ল্যাটফরম, সেখানে দাঁড়িয়ে একটি মেয়ে কোকিলকণ্ঠে গান করছে, সঙ্গে নানাধরণের বাজনা বাজিয়ে চলেছে কয়েকটি সুবেশ সুদর্শন তরুণ। সঙ্গীতের সুরের মূর্ছনায় মোহময় একটি পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছে। রতনের পরিচিত জগতের সঙ্গে কোন মিলই নেই। রতনের নজরে পড়ল, ওর পাশের টেবিলেই এক ভদ্রলোক তাঁর স্ত্রী আর মেয়েকে নিয়ে খেতে বসেছেন। হাসিতে, গল্পে ওরা উচ্ছল হয়ে উঠেছে। রতনের সেই মুহূর্তে মনে পড়ল স্ত্রী ভবানী আর মেয়ে মিনুর কথা। ওর মন চলে গেল মেদিনীপুরের এক অখ্যাত অজ্ঞাত গাঁয়ে। মুখে ক্ষণিকের জন্য কালো ছায়া পড়ল।

রতনের সম্বিৎ ফিরে এল বয়ের ডাকে। বয়টি এখন ওর টেবিলে পরিপাটি করে সাজিয়ে রাখছে ছুরি, কাঁটা, চামচ। তাছাড়া একটি প্লেটের ওপর সাজিয়ে রাখল সাদা পাগড়ীর মত কি একটা জিনিস। ওই পাগড়ী দিয়ে যে কি হবে তা বুঝতে পারল না রতন। কিছুক্ষণের মধ্যেই অর্ডার দেওয়া সমস্ত খাবার টেবিলে সাজিয়ে দিল। লোভনীয় আহার্য বস্তু, দেখলে রসনা সিক্ত হয়ে ওঠে। অনভ্যস্ত হাতে কাঁটা চামচ ধরে খাবার জন্য প্রস্তুত হল। কাঁটা চামচ দিয়ে কি করে খেতে হয় দেখবার জন্য পাশের টেবিলে তাকাল রতন। রতনের চোখ পড়ল বাচ্চা মেয়েটির দিকে। সুন্দর প্রাণোচ্ছল মেয়েটিকে সযত্নে খাইয়ে দিচ্ছে মেয়েটির বাবা। রতনের মনে পড়ল মিনু গতবছর খেজুর গুড় খেতে চেয়েছিল। মিনু খেজুর গুড় দিয়ে মুড়ি খেতে খুবই ভালবাসে। কিন্তু সেবার টাকার অভাবে খেজুর গুড় আর কিনতে পারে নি। মিনুর সেই অসহায় চোখের দৃষ্টি কিছুতেই ভুলতে পারে না রতন।

টেবিলের ওপর সাজানো পরম লোভনীয় খাবারগুলো আর আকর্ষণী করে না রতনকে। দূরে প্ল্যাটফরমের ওপর দাঁড়ানো মেয়েটির গান বেসুরো কর্কশ বলে মনে হয়। এই মুহূর্তে হোটেলের সমস্ত কিছুকে অত্যন্ত বিস্বাদ বলে মনে হয়। টেবিলের ওপর রাখা খাবারগুলো কোনমতে শেষ করেই বিল আনবার জন্য বলে দেয়। রতন শুনেছিল গ্র্যান্ড হোটেলের বেয়ারাদের না কি এক টাকা-দেড় টাকা বকশিস দিতে হয়। তাই সাড়ে তেইশ টাকা বিলের জন্য বয়ের হাতে গুণে গুণে পঁচিশ টাকা দিল। বকশিস পেয়ে বয়ের হাত সেলামের ভঙ্গিতে ওপরের দিকে উঠল। রতনের মুখে মৃদু ব্যঙ্গের হাসি ফুটে উঠল।

গ্র্যান্ডের বাইরে এসে পকেটে হাত দিয়ে দেখল ওর পকেটে মাত্র তিরিশ টাকা পড়ে আছে। এখনও মাস শেষ হতে প্রায় দিন কুড়ি বাকি রয়েছে। তারপর আজকের এই ব্যাপারটায় প্রায় পঁয়ত্রিশ টাকা বেরিয়ে গেল। রতন নিজের মূর্খামিতে নিজেকেই ধিক্কার দেয়। ভাড়া করা স্যুট-টাই তাকে সকলের সামনে যেন ব্যঙ্গ করতে থাকে।

ধর্মতলা থেকে চিত্তরঞ্জন এভিনিউ দিয়ে হাঁটতে থাকে রতন। এখন বাসে করে যাবার বিলাসিতাও ওর সাজে না। দশটা পয়সার মূল্য ওর কাছে চিরদিনই অনেক, এখন সেটা নতুন করে উপলব্ধি করে। আর মাত্র মাসখানেক পরেই পৌষ-সংক্রান্তি। ওকে তখন দেশের বাড়ি যেতে হবে। ভবানীর জন্য একখানা শাড়ি আর মিনুর জন্য একখানা ফ্রক কিনতেই হবে। তাছাড়া সাংসারিক টুকিটাকি তো রয়েছেই। গেলবার বর্ষায় ওদের শোবার ঘরের চাল ফুটো হয়ে অঝোরে জল ঝরেছে, এবার সে ঘরখানা ভাল করে খড় দিয়ে ছাইতে হবে। সামনের মাসে ওর অনেক খরচ। তাই ওকে আর বেহিসেবী হলে চলবে না। হঠাৎ রতনের মনের পর্দায় ভেসে ওঠে একটি ছবি,—মোলায়েম নাকে একটি আট বছরের মেয়ে—যেন বলছে, 'বাবা, এবার কলকাতা থেকে আসবার সময় আমার জন্য একটা কলের পুতুল নিয়ে আসবে। এমন পুতুল—যে কথা বলে, হাসে, গান গায়। কেমন—আনবে তো?' বলতে বলতে হাসিতে খুশিতে উজ্জ্বল হয়ে ওঠে একটি নিষ্পাপ মুখ আর তার পাশাপাশি নিজের দৈন্যদশা। রতনের বুকের কাছে কেমন একটা দুর্বোধ্য ব্যথা জেগে ওঠে। মনে হয় যেন ওর আত্মাভিমানের টাইটা ফাঁস হয়ে গলায় চেপে বসেছে। হঠাৎ মনে পড়ে যায় ছোটবেলায় পাঠশালায় পড়া সেই দাঁড়-কাকের গল্পটা।

প্রতিমাদেবীর প্রতিমা

ভক্তিপ্রসাদ মল্লিক

রবীন্দ্রোত্তর যুগে ঠাকুরবাড়ির কথা বলতে প্রথম যে-নামটি স্বভাবত মনে আসে সে-নামটি হলো প্রতিমাদেবী। শান্তিনিকেতনে বেড়াতে গিয়ে উত্তরায়ণে প্রবেশ করে পর্যটকরা যখন জেনেছেন যে, এর মধ্যে বাস করেন কবিপুত্রবধূ প্রতিমাদেবী, পর্যটকদের অনেকেই হয়তো তখন অনুভব করে থাকবেন কবির আত্মিক উপস্থিতির স্পর্শ। শান্তিনিকেতন আশ্রমে প্রতিমাদেবী ছিলেন কবির সিমবল। প্রতিমাদেবীকে যিনি দেখেছেন তা যত স্বল্পক্ষণের জন্য হোক না কেন, তাঁর ব্যবহারে তাঁকে মুগ্ধ হতে হয়েছে। তিনি ছিলেন সদা-মিষ্টভাষী, অমায়িক এবং বিনয়ী।

প্রতিমাদেবীর সঙ্গে লেখকের পরিচয় অল্পদিনের। ক'দিনে ওঁর ব্যক্তিত্বের যে পরিচয় পেয়েছি তা মন থেকে মুছে ফেলা সম্ভব নয়। মানুষ হিসাবে তাঁর প্রকৃতি কতো মহান্ ছিল তারই বর্ণনা দিতে দু-একটি ঘটনার উল্লেখ করছি।

শীতের সকাল। টেপরেকর্ডার হাতে কোণার্কবাড়ীর বসবার ঘরে হাজির হয়েছি। আমার আসার খবর ভেতরে চলে গেল। কিছুক্ষণ পর অতি ধীরে ধীরে সাঁওতালী পরিচারিকার সাহায্যে বসবার ঘরে প্রবেশ করে একটি সোফায় বসলেন। দেখে মনে হলো অসুস্থ এবং বয়সের ভারে একেবারে নুয়ে পড়ছেন। কানে শোনার যন্ত্র লাগিয়ে আমাকে জিজ্ঞেস করলেন, সত্যেনবাবু (বিজ্ঞানাচার্য) কেমন আছেন? আহা, এখানে একটি মানুষের মতো মানুষ এসেছিলেন। ওঁকে তুমি বলো, বর্তমান

প্রতিমা দেবী

উপাচার্য যাঁকে সত্যেনবাবু এখানে অধ্যাপক করে এনেছিলেন তিনি একজন যোগ্য-ব্যক্তি। আশা হয় ওঁর হাতে শান্তিনিকেতনের আদর্শ হয়তো রক্ষা পাবে।

সত্যেন্দ্রনাথ বসুর সঙ্গে আমার ব্যক্তিগত পরিচয় আছে জেনে কথাগুলি বলেছিলেন। কথার শেষে টেপরেকর্ডারটি দেখে শুধু একটু হাসলেন মাত্র, বললেন, আমি কি পারবো।

আমার আলোচনার বিষয়বস্তুটি কি জাতীয় সংক্ষেপে তা জেনে নিলেন। কবির পুষ্পপ্রীতি সম্পর্কে একনাগাড়ে দু' ঘণ্টার ওপর আলোচনা করলেন। বারকয় বিদ্যুৎ সরবরাহ বন্ধ হয়ে গেল, রেকর্ডিং-এ বাধা পড়লো। ধৈর্য ধরে অপেক্ষা করতে লাগলেন। চোখে-মুখে ক্লান্তির ছাপ পড়েছে, তবু কোথাও এতটুকু বিরক্তির চিহ্নমাত্র নেই। সকালের আলোচনা শেষে বললেন, বিকেলে আবার এসো। যেমন এসেছিলেন তেমনি ধীরে ধীরে পরিচারিকার হাত ধরে ফিরে চললেন। যাবার সময়ে মুখ ফিরিয়ে আমাকে লক্ষ্য করে আবার বললেন, বিকেলে এসো। দেখছো তো আমার শরীর কতো অপটু এক সঙ্গে বেশিক্ষণ ধরে আর কিছু করতে পারি না। কিছু মনে করো না, রাগ করো না যেন।

যা কিছু রেকর্ড করেছি তা বাজিয়ে শুনিয়ে দিলাম বিকেলে। শুনে ভারি আনন্দ। আমি বললাম, যখন-তখন এসে আপনার কথা রেকর্ড করে নিয়ে যাবো। উত্তরে বললেন, দশ বছর আগে যদি কেউ তোমার মতো বলতো হয়তো চেষ্টা করে দেখতাম; এখন বড়ো দেরি হয়ে গেছে। কোন কিছুই ভালো লাগে না আর স্মৃতিশক্তি একেবারে নষ্ট হয়ে গেছে শরীরে নানানখানা ব্যাধি।

একদিন বিকেলে চা খেতে বলেছেন। আমার ভাইঝি সেবার আমার সঙ্গে ছিল। প্রতিমাদেবীর সঙ্গে তার পরিচয় হলো। সেই সূত্রে চা-য়ে তারও নিমন্ত্রণ। বিকেলে নিমন্ত্রণ রাখতে অবশ্য আমাকে একাই যেতে হয়। ভাইঝি সিউড়ি বেড়াতে যায় গেস্ট হাউসের একটি পরিবারের সঙ্গে। প্রতিমাদেবী আমাকে বললেন, একটু অপেক্ষা করো মেয়েটা ফিরলে এক সঙ্গে খাবো। এদিকে বেলা পড়ে এলো, পাঁচটা থেকে ছটা বাজলো; ভাইঝির দেরি দেখে বললেন, এসো আমরা সুরু করি আশা করি এসে যাবে এবার। ঘড়ির কাঁটা এগিয়ে চলেছে প্রায় রাত আটটা বাজে অথচ প্রাপ্তবয়স্কা মহিলাটির তখনো ফেরার নামগন্ধ নেই। এবার বুঝতে পারছি প্রতিমাদেবী স্বয়ং ব্যস্ত হয়ে পড়ছেন। জিজ্ঞেস করলেন, যাদের সঙ্গে গেছে তাদের চেনো তো? বললাম, না। প্রায় আঁৎকে উঠে বললেন, করেছ কী। একটি বয়স্থা মেয়েকে সম্পূর্ণ অপরিচিত লোকের সঙ্গে ছেড়ে দিলে? এখখুনি

মনোরঞ্জন রায়

দর্শন কি ও কেন	১-৫০
ইতিহাস কি ও কেন	১-৫০
গেরিলা যুদ্ধ কি ও কেন	১-৫০
কমিউনিস্ট পার্টি কি ও কেন	১-৫০

Chen Po Ta

STALIN AND CHINESE REVOLUTION

প্রাপ্তিস্থান :—

অন্নপূর্ণা প্রকাশনী : ১/২ জ্যাকসন লেন, কলিকাতা—১

নরেন দত্ত, নিউবুক সেন্টার : ১১৫/১বি বিধান সরণী, কলিকাতা—৬

সদ্য বিকশিত গোলাপের মত সুন্দর আনন ও
কুসুম কোমল
পাপড়ি পেলব তনু

সাধনা বিউটি ক্রীম-এর
এইতো সবচেয়ে বড় অবদান।
নিজেদের সৌন্দর্য্য সম্পর্কে
সচেতন আধুনিকারা তাই
এর প্রশংসায় মুখর।

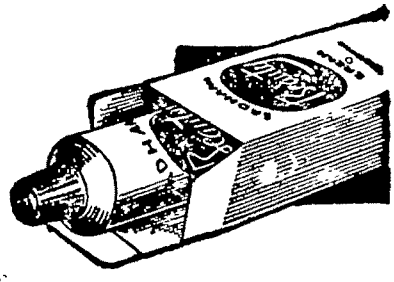

সাধনা
বিউটি
ক্রীম
প্রসাধনের অপরিহার্য্য
অতি আধুনিক অঙ্গরাগ

সাধনা ঔষধালয়-মাত্র কলিকাতা-৪৮

চিরন্তনী

মনোমোহন ঘোষ

সেই সব নায়িকার কথা, আহা, বোলো না আমাকে,
পৃথিবীর পাট সেরে যে নারীরা কবে চলে গেছে,
তাদের সমস্ত গুণ, রূপগুলি—সেও ঝাঁকে ঝাঁকে
তোমার শরীরে এসে, জড়ো হয়ে, মুখর হয়েছে।

এ চোখে যখনি দেখি তোমার ও রূপের উৎসব,
কবেকার রণবাদ্য, সুপ্রাচীন শস্ত্রের ঝঞ্ঝনি—
শোনা যায় কান ভ'রে, বীরদের দ্বন্দ্বের আহব,
শীতল অসির শব্দ, তা ছাড়াও অনুরূপ ধ্বনি।

তোমাকে পাবার জন্যে—বীর্যশুল্কে জয় করে নিতে—
ট্রয়ের মিনারগুলো দাউ দাউ জ্বলবেই ফের,
তুমি উপলক্ষ হয়ে দ্বন্দ্বযুদ্ধ বাধাবে চকিতে,
হেকটর, অ্যাকিলিস প্রাণ নেবে একে অপরের!

তোমার রূপের বাদ্য এ রকমই বিপর্যয়কারী—
ওই রূপে মেশে যত পুরনো যুদ্ধের জনশ্রুতি,
দ্বন্দ্ব আর বিবাদের কলরোল সেহেতু সোচ্চারী;
রক্তমাখা ক্ষতচিহ্নে আমি করি মৃত্যুর প্রস্তুতি॥

অনুবাদ : পল্লব সেনগুপ্ত

যাও খোঁজ করো। ভালো না বুঝলে আমাকে খবর দিও।

ভয়ে ভয়ে উঠে পড়লাম। তাড়াতাড়ি গেস্ট হাউসের দিকে চলেছি। অন্ধকার পথ নিস্তব্ধ নিঝুম শীতের রাত। নানান কুচিন্তা মনের মধ্যে তোলপাড় করছে। হাড় কাঁপানো ঠাণ্ডায় রীতিমতো ঘামছি। অন্ধকারে হেঁটে চলেছি, উত্তরায়ণের বাইরে ভাইঝির সঙ্গে দেখা। দেরি হওয়ার কারণ পথে বাস বিকল হয়েছিল। বীরভূমের ঠাণ্ডা বাতাস আবার গায়ে বিঁধতে লাগল। পরের দিন সকালে দেখা করে ভাইঝির খবর দিলাম। সব শোনার পর বললেন, কাল রাত্তির দুশ্চিন্তায় কেটেছে। বার বার মনে হয়েছে মেয়েটার কী হলো।

মাত্র কটি শব্দমাত্র। কথা কটা শুনে আমার বিস্ময়ের ঘোর কাটতে চায় না। বৃদ্ধা মহিলার কাছে মেয়েটি প্রায় অপরিচিতা। তা ছাড়া আমার সঙ্গে ওঁর সম্পর্কও তেমন ঘনিষ্ঠ নয়। অপরিচিতের জন্য এত দরদ কোথায় মেলে আজকের দিনে? ঘটনাগুলো ব্যক্তিগত তথ্যসত্ত্বেও প্রকাশ করার উদ্দেশ্য হচ্ছে ছোটখাটো জানার ভেতর দিয়েই তো আমরা অন্তর-লোকের মানুষটিকে জানতে পারি বুঝতে পারি। এমনিতরো সামান্য সামান্য ঘটনার কষ্টিপাথরে প্রতিমাদেবীর উজ্জ্বল প্রতিমা-খানি বারে বারে উদ্ভাসিত হতে দেখেছি। ঠাকুরবাড়ির সকলে এবং শান্তিনিকেতনে যাঁরা তাঁর সংস্পর্শে আসতে পেরেছেন আশা হয় তাঁদের অধিকাংশকে এই মহীয়সী মহিলার ব্যক্তিত্বের নির্যাস আকৃষ্ট করতে পেরেছিল।

শান্তিনিকেতন আশ্রমের তিনি ছিলেন সাক্ষাৎ মাতৃমূর্তি। ধনী বা অভিজাত পরিবারের মানুষদের মধ্যে দেখা যায় সদা-জাগ্রত আত্মাভিমান সাধারণ মানুষ সম্পর্কে একটা তাচ্ছিল্যের ভাব পোষণ করে। প্রতিমাদেবীর চরিত্রেও আত্মাভিমান লক্ষ্য করেছি, তবে তার স্বরূপ ছিল ভিন্ন ধরণের। সে-আত্মাভিমান পরকে আপন করে নেওয়ার স্বপক্ষে কাজ করেছে। কবির জীবনদর্শনের নিখুঁত অনুকরণ। এখানেই প্রতিমাদেবীর কৃতিত্ব এখানেই তাঁর ব্যক্তিত্ব। সকলকে আপন করে নেবার ক্ষমতা অথচ সকলের থেকে স্বতন্ত্র। নীরব নিস্পৃহ চরিত্রের মানুষ, হাততালির মোহ থেকে নিজেকে বহু দূরে রাখতে পেরেছিলেন বলেই হয়তো শান্তিনিকেতন গড়ার কাজে তাঁর নিষ্ঠা ও ত্যাগের কথা সকলের কাছে প্রকাশ পেলো না।

তিনি দুখানি বই লিখেছেন : নৃত্য এবং নির্বাণ। বাঙলা গদ্য সাহিত্য রচনায় তাঁর পাকা হাত ছিল। নন্দনতত্ত্বে তাঁর অনুরাগের কথা অনেকেই জানেন। শান্তি-নিকেতনে রবীন্দ্র গীতিনাট্য নৃত্যনাট্যের মঞ্চস্থের গোড়ার যুগে মঞ্চসজ্জা রূপ-সজ্জার তদারকি করতে হতো প্রতিমা-দেবীকে। মেয়েদের পোষাক ঠিক করে দেওয়া তাদের সাজসজ্জা সব কিছুর দায়িত্ব ছিল তাঁর ওপর। অভিনয় করতে শেখানোও বাদ থাকতো না। রবীন্দ্র-সংস্কৃতিতে তাঁর অবদান নিতান্ত সামান্য নয়। আধুনিক বাঙলার শ্রেষ্ঠ সংস্কৃতি রবীন্দ্রসংস্কৃতি এ-সংস্কৃতির প্রকাশে বিকাশে যাঁরা সাহায্য করেছেন তাঁদের আমরা প্রণাম জানাই। কবি পুত্রবধূর কাছে বাঙালি তার ঋণের কথা স্মরণ করতে যেন ভুলে না যায়।

শান্তিনিকেতনে আছে প্রতিমাদেবী নেই—যেন শীতের পাতাঝরা বিষাদমগ্ন বৃক্ষ।

পাঠক মত

পশ্চিমবঙ্গে অন্তর্বর্তী নির্বাচন প্রায় এসে পড়লো। আপনারা নানাজনের মতামত প্রকাশের আয়োজন করছেন, বিজ্ঞাপনে দেখলুম। সত্যি কথা বলতে কি ভারী ভারী নাম দেখে চমকে গেছি। বুদ্ধিমান নির্বাচকমণ্ডলী অনেক কিছুই জানতে পারবেন। তবে অন্তর্বর্তী নির্বাচন হলেও আয়োজন কম নেই। এ তো সাধারণ নির্বাচনের মতোই। শুধু তফাৎ, সারা ভারতে নয়, শুধু কয়েকটা রাজ্যে এখন নির্বাচন। সাধারণ নির্বাচন অপেক্ষা এবার অন্তর্বর্তী নির্বাচনে প্রধান যেটা নির্বাচকমণ্ডলীর জেনে রাখা দরকার—সেটা পণ্ডিতজন আলোচনা করেছেন কি না জানা নেই। তবে করা উচিত, হয়তো করেও থাকবেন। বিষয়টা হচ্ছে: নানা দলের শাখা-প্রশাখা এবার গজিয়েছে। নতুন সুবিধাবাদী দলও গড়ে উঠেছে রাতারাতি। এ যেন ব্যাঙের ছাতা। কিন্তু গতবারের সাধারণ নির্বাচনে দাঁড়িয়ে যাঁরা দলছুট হয়ে নির্বাচকমণ্ডলীর প্রতি বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ প্রদর্শন করেছিলেন—তাঁদের আসল স্বরূপ কি—তার আলোচনা কি কেউ করছেন? আমার তো মনে হয়, অন্তর্বর্তী নির্বাচনে দলছুটের সম্বন্ধে সজাগ থাকলেই যথোচিত কাজ হবে। কেন না দল ছাড়াছাড়ির ব্যাপারে আজ পর্যন্ত একটা আশাব্যঞ্জক ফয়সালা তো হোল না। তাঁরা ভোটে জিতলে ভবিষ্যতেও তরী ডোবাবেন।

যা হোক, এসব কথা যাঁদের ভাববার ভাবাই ভাবুন। ভোটে কে জিতবেন, কে হারবেন তার বিচার শিক্ষিত ভদ্র ব্যক্তিরা করুন, আমরা থাকি দূরে পাড়াগাঁয়ে। তবে হ্যাঁ, আমি শহরের মুখ দেখেছি। কাজে কর্মে শহরেই নিবাস। কিন্তু আমি যে গাঁয়ে বাস করি সেটি অজ পাড়াগাঁ। আমাদের গাঁ থেকে শহরে যেতে হলে পাক্কা পাঁচ ক্রোশ হাঁটতে হয়। এই ক্রোশ হচ্ছে ডাল ভাঙা ক্রোশ।

এ অঞ্চলের লেখাপড়া জানা ভদ্দর লোকদের দিন যেমন-তেমন চলে। কিন্তু হরিজনদের দিকে কে তাকাবে? হরিজন বলতে কিন্তু আমি মেথরদের বলছি না। ঐ হরিজনদের তো পুড়িয়েও মারা হয়েছে অন্ধ্র রাজ্যে ঘটি চুরির দায়ে। পশ্চিমবঙ্গের দক্ষিণাঞ্চলের হরিজন হচ্ছে মুচি, বাউরী, বাগ্দী, সাঁওতাল, মুণ্ডা প্রভৃতি শ্রেণীর লোক। এরা মাঠে খাটে এদের বাড়ীর বৌরাও মাঠে খাটে। বাচ্চারা করে 'বাগালী' (রাখালী), একটু বড়রা করে মান্দারী। বাকি সব মুনিষ-কামিনের দল। সাঁওতালরা অবশ্য মাঠেও খাটে, মাটিও কাটে। সত্যি কথা বলতে কি—এরাই এখন অস্পৃশ্য। কারণ এরা অনুন্নত হলেও কোনো সুযোগ এদের সামনে নেই। বিশ্বাস করুন আর নাই করুন, এদের অনেকে রেলগাড়ি দেখে নি, স্কুল দেখে নি। (কী আশ্চর্য, সংবিধানে নাকি আট বছরের মধ্যে সর্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষা সম্পূর্ণ করার বিধি আছে। অবশ্য তা থাকলে শুধু ছাপার অক্ষরেই আছে.

ভোটের সময় আমাদের গাঁয়ে শুধু নয় সব গাঁয়েই এখন হরিজনদের দর বেড়েছে। সংখ্যায় ওরা নেহাৎ নগণ্য নয়। তবে ওরা আগের মতোই অস্পৃশ্য। ওদের ছুঁলে বোতলে রাখা গঙ্গা জল স্পর্শ করে শুদ্ধ হতে হয়

অবশ্য এদের ভোটগুলো অস্পৃশ্য নয়। তাই ভোটের জন্য এদের কাছে জিপে চড়ে নেতাদের দু-একবার আসতে হয়। তবে বুঝতেই পারছেন। এদের ভোট কারা আশা করেন। এদের ভোট আশা করেন তিনি—যিনি ভোটের খাতায় এদের নাম লিখিয়েছেন। যাঁর হুকুমে ওরা গাঁয়ে ঘরে একেক ঘরের লাঙল রাখে আর যিনি মাগ্গী গণ্ডার দিনে দুনো বাড়তিতে ধান বা চাল দেন। দুনো বাড়তি কি? অর্থাৎ ওদের কেউ একসের চাল ধার নিলে ডবল ফেরৎ দিতে হবে। ওরা ৪।৫ টাকা কে জি চালের কথা বোঝে না। ওরা জানে বাবুর জমিতে চাষ করে ফসলে দেনা শোধ করা। তারপর একটা সপ্তাহ ধান তুলতে না তুলতে আবার দেনা। সেদিন একজন নেতা ধরণের লোক ওদের বুঝিয়ে গেলেন, জমিদারী দেশ থেকে চলে যাওয়াতে ওদের কতো উপকার হয়েছে। ওরা কিন্তু কিছুই বুঝলো না। কারণ জমিদারমশায়ের মুখ ওরা দেখে নি। ওদের সম্পর্ক মাঠের সঙ্গে, কিন্তু ফসলের সঙ্গে নয়। মাঠের সঙ্গে যে সম্পর্ক সে শুধু গায়ে গতরের খাটুনির সম্পর্ক। ওরা কাকে ভোট দেবে—এ কথা সেই নেতা মশায় মিটিং করে বোঝাচ্ছিলেন। কতো রকম কবেই না বোঝানো হোল। ভাগ্যিস ভাষা ছিল শহুরে। তাই আধা তো ওরা বোঝেই নি। আন্তর্জাতিক বিষয়টা যখন বোঝাচ্ছিলেন ওদের তখন রীতিমতো হাসি পাচ্ছিল। ঘেরাও-এর বিবরণ ওরা কস্মিনকালেও শোনে নি। সে কথাও ওদের শুনতে হোল। শেষ পর্যন্ত মিটিং শেষ। কিন্তু আমার কাহিনী ফুরোলো কই?

দুদিন আগে দীঘল গাঁয়ে গেছিলাম। যেতে যেতে ভূষণ বাউরীর সঙ্গে দেখা। দেখলাম ওর বেশভূষা পাল্টেছে। ও আমাকে দেখে পেন্নাম জানিয়ে একটি প্রচারপত্র দিল। (বলা বাহুল্য, ভূষণও পড়াশুনার মুখ দেখে নি কোনোদিন।) দেখলাম হাসি হাসি মুখ তার। প্রচারপত্রের তলে ভূষণের নামটা পড়ে বললাম, 'তুমি দেখছি একেবারে ক্ষেত্রপাল হয়ে গেছ? ভূষণ বললে: 'আমাকে ওরা মোড়ল করে দিয়ে গেছে। উঁদের দিবেক নাই ত কাদের দিবেক?'

তারপর ভূষণের কাছ থেকে যা শুনলাম, তাতে তো তাজ্জব বনে গেলাম। আগে ওদের লোকদের নেতারা বেশ বিশ্বাস করতেন। একবার ভোট হয়ে গেলে দু টাকা করে নাকি খোরাকী (!) পেয়েছিল। তারপর ভোটের শেষে হাঁড়িয়া। গত সাধারণ নির্বাচনে হাঁড়িয়া দেওয়ার ব্যবস্থা ছিল যে সর্দারের ওপর—সে ফাঁকি দিয়েছিল। এবার ইলেকশনের আগে নেতাদের কানে সে খবরটা যেতে তাঁরা আসল দোষীকে শায়েস্তা করে খাঁটি মোড়ল নির্বাচন করে দিয়ে গেছেন। আর নির্বাচন করেছেন তো আসলে গাঁয়ের সেই জোতদার বাবুটি—যিনি এদের ওপর পয়সার জোরে খবরদারী করেন। মনে মনে ভাবলুম—ভূষণও তাহলে ঐ দলে।

কিন্তু পাশের গাঁয়ের মোড়লের খবর পরে পেলাম। বুঝলুম, এবার তবে বেশ জমেছে। অথচ ওদের জিগ্যেস করুন—দেশের চারজন নেতার কেন শুধু দুজন নেতার নাম জিগ্যেস করলে ওরা বোকার মতো হাঁ করে তাকাবে। নানান পার্টির নাম শোনালে ওদের কানে তালা লাগে। আরো শুনলে অবাক হবেন, সন্ধ্যে বেলায় একটা পিদিম, তা নইলে বড় জোর একটা লম্ফ ওদের শেষ সম্বল—এ হেন দূর পাড়াগাঁয়ের লোকের একটা নেতার মাথায় কে ঢুকিয়ে দিয়েছে—ওদের ভোটের নাকি দাম আছে—। অর্থাৎ হাঁড়িয়ার নেশার ঘোরে কি না জানি না হঠাৎ ওদেরই মধ্যে একজন মোড়লের জ্ঞানের আলো গভীর অন্ধকারের মধ্যে প্রজ্বলিত হয়েছে। ওরা একুশ বছরের হিসেব-নিকেশ করে বুঝেছে—ওদের বেলায় শূন্য। ওদের জন্য সত্যিকারের যারা বলেছে তাদেরই ওরা ভুল বুঝেছে।

মাননীয়া সম্পাদিকা, এই অবস্থায় কি যে হবে কেউ কি বলতে পারেন? আর নকশালপন্থীরা যদি ওদের কাছে গিয়ে তত্ত্ব আওড়ায় ওরা কিই বা বুঝবে। বুঝুন তবে অবস্থা। তবে এইটুকু বলতে পারি দেশের এমন অশিক্ষিত নিরক্ষরদের সংখ্যা মোট জনসংখ্যার প্রায় পঁচাত্তর ভাগ। আর এই নিয়ে আমরা গণতন্ত্রের গঙ্গা যাত্রার ব্যবস্থা করছি কি না তা পণ্ডিতরাই বলতে পারেন।

জ্ঞানদাস দত্ত
সোনামুখী (বাঁকুড়া)

রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয় প্রসঙ্গে

সাপ্তাহিক বসুমতীর বঙ্গদর্শনে প্রকাশিত রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের দুর্নীতি শীর্ষক আলোচনাটির জন্য আন্তরিক অভিনন্দন গ্রহণ করুন। আপনাদের আলোচনার প্রতি পরিপূর্ণ সমর্থন জানিয়ে সকলের অবগতির জন্য জানাচ্ছি যে—

১। ফলাফল প্রকাশিত হবার সঙ্গে সঙ্গেই এম-এ পরীক্ষায় গৃহীত ত্রুটিপূর্ণ পদ্ধতির প্রতি উপাচার্যের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হলে তিনি সঙ্গে সঙ্গেই তা স্বীকার করে নেন।

২। ইউ জি সি বৃত্তি প্রদানের জন্য যে নিয়মমাফিক মৌখিক সাক্ষাৎকারের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছিল তাতে প্রার্থীদের যোগ্যতা বিচারের জন্য জনৈক ছাত্রকে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যে গবেষণার জন্য সংগীতের স্বরলিপি করতে বলা হয়েছিল। এ ছাড়া ঐ সাক্ষাৎকারে সংগীতের গবেষণার জন্য অন্যতম পরীক্ষক অধ্যাপিকা শ্রীমতী সুচিত্রা মিত্র অনুষ্ঠানস্থলে আসার পূর্বেই কয়েক সেকেণ্ডের মধ্যেই সংগীতের প্রার্থী নির্বাচনপর্ব শেষ হয়।

৩। গবেষণার জন্য যে "সিনপসিস ও বাও ডাটা" মৌখিক সাক্ষাৎকার অনুষ্ঠানে পেশ করার রীতি আছে বাংলা সাহিত্যের সংশ্লিষ্ট সেই ছাত্রীকে সেদিক থেকেও রেহাই দেওয়া হয়েছে। ঐ সাক্ষাৎকারে কয়েকজন ছাত্রছাত্রী কর্তৃক গবেষণার জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়বস্তুর উপস্থাপন করা সত্ত্বেও সেই ছাত্রীটিকে বাংলা সাহিত্যের এমন একটি বিষয়ের ওপর গবেষণার সুযোগ দেওয়া হয়েছে যা ইতিপূর্বে নানাজনে নানাভাবে আলোচনা করেছেন—অর্থাৎ বর্তমানক্ষেত্রে গবেষণার জন্য বিষয়বস্তুর নির্বাচনের চেয়েও প্রার্থী নির্বাচনের ব্যাপারেই সাক্ষাৎকারীগণ অধিক গুরুত্ব আরোপ করেছেন।

পরিশেষে বলি, বাইরে রবীন্দ্রভাবতীর যে পরিচয়ই দেওয়া হোক না কেন, ঘরে কিন্তু প্রতিনিয়তই অন্য নাটক অভিনীত হচ্ছে। মুখে রবীন্দ্রনাথ রবীন্দ্রনাথ বলে রবীন্দ্রানুরাগীর দল যতই নাচুন না কেন অন্তরে রবীন্দ্র-ভাবাদর্শকে মেনে চলার মত কোন মানসিকতা, রবীন্দ্রভারতীর কর্তব্যক্তিদের নেই। থাকলে 'গুরুদেবের শুভস্মৃতিবিজড়িত ঠাকুরবাড়িতে' ঐ ধরণের দুর্নীতি প্রশ্রয় পেত না। সমগ্র ব্যাপারটির একটি নিরপেক্ষ তদন্তের দাবি জানিয়ে আমরা আচার্য শ্রীধর্মবীরের নিকট একটি স্মারকলিপি পেশ করে তার প্রতিলিপি পাঠিয়েছিলাম ডক্টর ত্রিগুণা সেন, বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশনের সভাপতি এবং রাজ্যের শিক্ষাদপ্তরের নিকট। কিন্তু ওঁদের সকলের ভাবগতি দেখে মনে হচ্ছে যে ওঁরা কেউই এই তদন্তের দাবি মেনে নেবেন না' —অথচ আমি এখনও শপথ করে বলতে পারি যে, আচার্য শ্রীধর্মবীর এবং শিক্ষাদপ্তর তদন্তের দাবি মেনে নিলে আরও অনেক চাঞ্চল্যকর তথ্য ফাঁস হয়ে যাবে যা ছাত্রসমাজ ও শিক্ষাজগতের আদর্শ ও স্বার্থের পরিপন্থী।

—অভিজিৎ চট্টোপাধ্যায়, সভাপতি প্রাক্তন ছাত্র সম্মেলন (কলা), রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়।

*

গত ২রা জানুয়ারী, ১৯৬৯ তারিখের সাপ্তাহিক বসুমতীতে 'বঙ্গদর্শন' শিরোনামায় রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয় সম্পর্কে প্রকাশিত একটি সংবাদের প্রতি আমাদের দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়েছে। এ বিষয়ে নিম্নের তথ্যগুলি প্রকাশের জন্য অনুরোধ জানাই।

(১) বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন বর্তমান ১৯৬৮-৬৯ সালে এই বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য দুটি গবেষণাবৃত্তি মঞ্জুর করেন। এতদ্‌ব্যতীত বাংলা ও সংগীত বাতীত অপর কোন বিষয়ে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক এম-এ পরীক্ষা অনুষ্ঠিত না হওয়ার একটি বৃত্তি বাংলা বিভাগে এবং অপরটি সংগীত বিভাগে দেওয়া স্থির হয়।

(২) গবেষক নির্বাচনের জন্য মঞ্জুরী কমিশন কর্তৃক বিধিবদ্ধ নিয়ম অনুযায়ী প্রথম শ্রেণীর অথবা উচ্চ দ্বিতীয় শ্রেণীর এম-এ প্রার্থীদের ("First Class or high Second Class M.A.'s") নিকট হতে আবেদনপত্র আহ্বান করে সংবাদপত্রে বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়। বিশ্ববিদ্যালয়ের অপরাপর নিয়োগ সম্পর্কে প্রচলিত বিজ্ঞাপনরীতি এই বিজ্ঞাপনের ক্ষেত্রেও যথাযথরূপে অনুসৃত হয়।

(৩) তদানীন্তন উপাচার্য মহাশয় অসুস্থতা নিবন্ধন অনুপস্থিত থাকলেও তাঁরই অনুমোদিত নির্বাচন সমিতি সর্বসম্মতিক্রমে মঞ্জুরী কমিশন কর্তৃক নির্দিষ্ট সময়ে প্রার্থীদের যথারীতি মৌখিক পরীক্ষা অন্তে দুটি গবেষক—একটি বাংলায় ও অপরটি সঙ্গীতে নির্বাচন করেন। এই নির্বাচন যথাসময়ে উপাচার্য মহাশয় কর্তৃক এবং তৎপরে মঞ্জুরী কমিশন কর্তৃক অনুমোদিত হয়।

(৪) বাংলা বিভাগের বৃত্তির জন্য নির্বাচিত ছাত্রী পূর্বতন একাডেমি থেকে ত্রি-বার্ষিক সিনিয়র ডিপ্লোমাপ্রাপ্ত এবং তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতক পাঠক্রমের বিধান-এর ১৯ ধারার (নিম্নে উদ্ধৃত) ভিত্তিতে বি-এ পাঠক্রমে যোগদান করেন এবং সমপর্যায়ের অপর ছাত্র-ছাত্রীর ন্যায় প্রথম পাঠবর্ষ অন্তে বি-এ পার্ট-ওয়ান ও দ্বিতীয় বর্ষ অন্তে পার্ট-টু পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। তৎপরে তিনি এম-এ বাংলা পাঠক্রমে ভর্তি হন। যথারীতি দুটি পাঠবর্ষ সমাপন অন্তে এম-এ পরীক্ষায় দ্বিতীয় শ্রেণীতে প্রথম স্থান লাভ করে উত্তীর্ণ সকল ছাত্র-ছাত্রীর মধ্যে (কেহই প্রথম শ্রেণী লাভ না করায়) তিনিই শীর্ষস্থান অধিকার করেন। নিম্নে উদ্ধৃত বি-এ পাঠক্রম বিধানের ১৯ ধারা অনুযায়ী পূর্বতন একাডেমি অথবা বর্তমান বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিপ্লোমাপ্রাপ্ত অন্যান্য ছাত্র-ছাত্রী বি-এ পাঠক্রমের যেরূপ সুযোগ পেয়েছেন বা পেতে পারেন উল্লিখিত ছাত্রীও তদ্রূপ সুযোগই পেয়েছেন; তাঁর ক্ষেত্রে কোনরূপ ব্যতিক্রম করা হয় নি। পূর্বোক্ত বিধানের ১৯ ধারা উদ্ধৃত করা হোল :

Ord. 19. A student who has already passed the three-year Senior Diploma Course of the University or a similar course of the former Academy of Dance, Drama and Music which has since merged with the University will be eligible for admission to present course.

Such a student will get the following concessions :

He can appear in Part I of the examination after prosecution of studies at the University for a year and in Part II after another.

(৫) সংগীত বিভাগের বৃত্তির জন্য নির্বাচিত ছাত্রী সংগীতে প্রথম শ্রেণীর এম-এ এবং নির্বাচন সমিতি সর্বসম্মতিক্রমে তাঁহাকেই যোগ্যতম প্রার্থী বিবেচনা করেছেন।

(৬) বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুমোদিত নিয়ম অনুযায়ী প্রয়োজনীয় যে সব ক্ষেত্রে কোনও উত্তরপত্রের জন্য তৃতীয় পরীক্ষক নিযুক্ত করা হয়েছে, সে সকল তৃতীয় পরীক্ষক বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপনায় ও উত্তরপত্র পরীক্ষণে অভিজ্ঞতা-সম্পন্ন এবং তাঁদের নিয়োগ সম্পর্কে কোনোরূপ নিয়মের লঙ্ঘন ঘটে নি।

—ভবরঞ্জন দে (নিবন্ধক)

*

"সঙ্গীত-শিক্ষিকাশিক্ষণ মহাবিদ্যালয়" প্রসঙ্গে

সাপ্তাহিক বসুমতীতে (১২ই ডিসেম্বর, ১৯৬৮ সাল) সঙ্গীত-শিক্ষিকাশিক্ষণ মহাবিদ্যালয় সম্পর্কে আপনারা যাহা আলোচনা করিয়াছেন, একজন প্রাক্তনী ছাত্রী হিসাবে সেই বিষয়ে আমার আরও কিছু বলিবার আছে।

আপনাদের এই তথ্যমূলক সমালোচনায়

আপনারা বলিয়াছেন, ১৯৫৭ সালে ক্লাস হইত বেলা এগারোটা হইতে বেলা সাড়ে চারটে পর্যন্ত এবং অপরাহ্ণ পৌনে পাঁচটা হইতে রাত্রি আটটা পর্যন্ত। ইহা ঠিক নয়। সঙ্গীত-শিক্ষিকাশিক্ষণ মহাবিদ্যালয় স্থাপিত হয়-১৯৫৭ সালে এবং তখন ক্লাস হইত অপরাহ্ণ পৌনে পাঁচটা হইতে রাত্রি আটটা পর্যন্ত। আবার ১৯৬৫ হইতে ১৯৬৭ পর্যন্ত বেলা এগারোটা হইতে রাত্রি আটটা পর্যন্ত ক্লাস হইত। এখন ১৯৬৮-তে বেলা তিনটে হইতে রাত্রি আটটা পর্যন্ত ক্লাস হয়।

আপনার এই মহাবিদ্যালয়ের অব্যবস্থা সম্পর্কে যাহা বলিয়াছেন তাহাতে আমি একমত। দীর্ঘ এগারো বৎসর যাবৎ এই মহাবিদ্যালয়ে কোন সমাবর্তন উৎসব (Convocation) হয় নাই। যাহাদের একান্ত প্রয়োজন (Certificate-এর) তাহাদের অন্তত দু' সপ্তাহ ঘোরাঘুরি করিয়া Certificate সংগ্রহ করিতে হয়, কারণ অধ্যক্ষা মহাশয়া খুব কম সময়েই কলেজে উপস্থিত থাকেন এবং কেরানী মহাশয় মাত্র সন্ধ্যা সাড়ে ছ'টা হইতে সাতটা পর্যন্ত কলেজে থাকেন। সমাবর্তনের উৎসবের মাধ্যমে যদি Certificate বিতরণ করা হয়, তাহা হইলে Certificate লইবার জন্য ছাত্রীদের এত দুর্ভোগ ভোগ করিতে হয় না। বিগত তিন বৎসরের শিক্ষানুবর্তিতার রুটিনে অধ্যক্ষার ক্লাস থাকা সত্ত্বেও খুব কম দিনই আমাদের তাঁহার ক্লাস করিবার সৌভাগ্য হয়।

কিছুদিন আগেও আমি আমাদের মহাবিদ্যালয়ে গিয়াছিলাম এবং লক্ষ্য করি যে, রাত্রি আটটা অবধি ক্লাস থাকা সত্ত্বেও সাতটার সময়ে বিনা কারণে ক্লাস বন্ধ করে দেওয়া হয়।

আপনাদের সুচিন্তিত আলোচনায় আমার মত ছাত্রীরা সকলেই সত্যই খুশি হইয়াছে এবং ইহার ফলে যদি বর্তমান দুর্নীতির অবসান ঘটে, তাহা হইলে ভবিষ্যতের ছাত্রীদের আর দুর্ভোগ পোহাইতে হয় না।

—জনৈকা প্রাক্তন ছাত্রী

এম· ডি· পরীক্ষা প্রসঙ্গে

সাপ্তাহিক বসুমতীর 'বঙ্গদর্শনে' এম· ডি পরীক্ষা সম্পর্কে ও সেই প্রসঙ্গে কতকগুলি চিঠির বিরুদ্ধে আমার কিছু বক্তব্য আছে।

প্রথমত 'বঙ্গদর্শনে' বলা হয়েছে যে, কোন কোন চিকিৎসক যুগ যুগ ধরেই স্বস্থানে রয়ে গেছেন, বদলি হন না, সরানো যায় না, তাঁরা নাকি অপরিহার্য, "ইনডিসপেন্সিবল।" আমার মতে কিছু কিছু শিক্ষক মহাশয় আছেন যাঁরা সত্যিই অপরিহার্য ছাত্রদের কাছে। এই জন্যই অনারারী ভিজিটিং ভিজিশিয়ানের বয়স ৪০-এর কম হলে তাঁদের রাখা যাবে না, এই অজুহাতে মেডিক্যাল কলেজের দু'জন ছাত্রদরদী শিক্ষককে সরাবার চেষ্টা করা হলে শতকরা ১০০ জন ছাত্র অতি সঙ্গত কারণে প্রতিবাদমুখর হয়ে ওঠেন ও আন্দোলনে সাফল্য লাভ করেন। এই দু'জন শিক্ষক ছাত্রদের কাছে কতখানি 'অপরিহার্য'—তা যাঁরা তাঁদের সংস্পর্শে আসেন নি তাঁদের হৃদয়ঙ্গম করা সম্ভব নয়, এমন কি 'বঙ্গদর্শনের' লেখকের পক্ষেও নয়। মেডিক্যাল কলেজের ছাত্ররা শুধুমাত্র এই দু'জন ছাত্রদরদী শিক্ষককে নিজেদের কাছে পাবার জন্য আন্দোলন করেন নি, আরও অনেক লব্ধপ্রতিষ্ঠ শিক্ষক মহাশয়ের চাকুরিকাল বৃদ্ধির জন্য বা অবসরগ্রহণের পরেও অন্য পদে তাঁদের নিজেদের কাছে পাবার চেষ্টা করেছে।

'বঙ্গদর্শনে' আরও লেখা হয়েছে—"চিকিৎসা-শিক্ষা জগতের হর্তা-কর্তা-বিধাতার পুত্রের কোচিং ক্লাশে ভর্তি না হলে এম· ডি পাওয়া যায় না," ইত্যাদি। এই প্রসঙ্গে বলি "কোচিং ক্লাশে ভর্তি" কথাটিতে হাসির খোরাক আছে। কারণ যাঁকে উদ্দেশ্য করে এই কথা বলা হয়েছে তিনি নিজের প্র্যাকটিশ ক্ষুণ্ন করে ছাত্রদের সনির্বন্ধ অনুরোধে, বিনা স্বার্থে, কপর্দকমাত্র না নিয়ে বয় ও ধৈর্যের সঙ্গে শিক্ষাদান করেন। এই কোচিং ক্লাশের দ্বার কলেজ নির্বিশেষে যে কোন স্নাতকোত্তর ছাত্রের কাছে মুক্ত।

এবারে "জনৈক অকৃতকার্য এম· ডি পরীক্ষার্থীর" চিঠির উত্তরে জানাই যে, পরীক্ষা ব্যাপারটা মেশিনে জিনিস তৈরি নয়। কাজেই যাঁরা এম· বি· বি· এস পরীক্ষায় ভাল ফল করেন নি, তাঁরা এম· ডি পাবেন না বা যিনি এম· আর· সি·পি পাশ করেছেন, তিনি এখানে এম· ডি পান নি বলে পরীক্ষা ব্যবস্থা ত্রুটিপূর্ণ একথা বাস্তবে মেনে নেওয়া যায় না।

এঁর ২নং প্রশ্নের উত্তরে আমি জানতে চাই এ পর্যন্ত প্রাইভেট প্র্যাকটিশনারদের এম· ডি পরীক্ষায় পাশের পরিসংখ্যান কি?

৪, ৫, ৬, ৮নং প্রশ্নগুলি ছেলেমানুষী ছাড়া আর কিছু নয়। কারণ কাগজে বিভ্রান্তিকর, ভিত্তিহীন সংবাদ প্রকাশিত হলে বিবেকবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষ যে প্রতিবাদে মুখর হয়ে উঠবেন সে কথা বলাই বাহুল্য। তার জন্য কোন অর্গানাইজেশন, টেলিফোন বা চাপের প্রয়োজন হয় না। আর কারুর নামে কৃতজ্ঞতাস্বীকার করলে তাঁর আর মত প্রকাশের কোন অধিকার নেই, এ ধারণা সুচিন্তিত নয়।

১২নং প্রশ্নের উত্তরে বলি—"এম· ডি পরীক্ষার কর্তার ছেলের" শিক্ষাদানের ব্যাপারে কোন যুক্তিসঙ্গত বাধা থাকতে পারে তা কল্পনাই করা যায় না, বিশেষ করে ঐ ক্লাশ যখন যে কোন এম ডি পরীক্ষার্থীর কাছে উন্মুক্ত, এমন কি ঐ অকৃতকার্য এম· ডি পরীক্ষার্থীও ইচ্ছা হলে ঐ ক্লাশে যোগ দিতে পারেন বিনা খরচায়।

শ্রীমতী সুপ্রিয়া চক্রবর্তীর চিঠির উত্তরে বলি যে, শুধু মেডিক্যাল কলেজে পরীক্ষা হয় বলে এম· ডি-তে মেডিক্যাল কলেজের ছাত্ররা বেশি পাশ করে তা নয়, যে কোন পরীক্ষায়, তা যেখানেই হোক না কেন মেডিক্যাল কলেজের ছাত্ররা অন্যান্য কলেজের ছাত্রদের তুলনায় ভাল ফল লাভ করে। আবার এমন নজীরও আছে যে এম· ও পরীক্ষা মেডিক্যাল কলেজে হওয়া সত্ত্বেও মেডিক্যাল কলেজের ব্রিলিয়ান্ট স্কলার ও গোল্ড মেডালিস্ট পরীক্ষায় অকৃতকার্য হয়েছেন, মেডিক্যাল কলেজের প্রোফেসর ডিরেক্টর অফ মিডওয়াইফারী পরীক্ষার অন্যতম পরীক্ষক হওয়া সত্ত্বেও।

ডাঃ এস সেনের চিঠির উত্তরে বলি—তাঁর চিঠি হাল্কা 'জ্ঞান দেওয়া' বুলিতে ভরা। "আলোচ্য ব্যক্তির পুত্রের" ক্লাশ যখন এম· ডি'র Schedule ক্লাশ নয়, তখন তিনি তাঁর নিজের সুবিধামত মাঠে-ঘাটে, হাটে-বাজারে যেখানে খুশি ক্লাশ নেবেন, তাতে কারো কিছু বলার নেই। আর 'গুরু দক্ষিণা'র ব্যাপারে বলতে পারি যে, তাঁর সম্পর্কে মনে ও কাজে শ্রদ্ধার ভাব পোষণ করলে যথেষ্ট গুরু দক্ষিণা দেওয়া হয়।

এবার ডাঃ এ· কে· দাশের চিঠির উত্তরে জানাই—যে এম· ও ও এম· এস পরীক্ষায় কোন দুর্নীতি হয় না বলে জানিয়েছেন; কিন্তু উনি কি খবর রাখেন এম· ও-তে এক বিরাট দুর্নীতি হয়ে গেছে, যার জন্য মেডিক্যাল কলেজের এক শ্রেষ্ঠ ছাত্র গতবার এম· ও হতে পারেন নি। লেখক বোধহয় জানেন না যে, আর· জি· কর মেডিক্যাল কলেজের এক প্রাক্তন হর্তা-কর্তা-বিধাতা ও সুখলাল কার্নানী হাসপাতালের বর্তমান এক হর্তা-কর্তা-বিধাতার একটু কবুণায় কাতারে কাতারে উক্ত দুই হাসপাতালের বহু পরীক্ষার্থী পরীক্ষা বৈতরণী পার হয়ে গেছেন। আপনি কি মনে করেন এঁদের বেলায় নিশ্চি মেপে যোগ্যতা নির্ধারণ করা হয়েছে? আমার মতে নয়। আমার মতে স্ক্যান্ডাল এম· এস পরীক্ষায় ব্যাপক ও বহুদিন ধরে। দয়া করে এ বিষয়ে খোঁজ নিয়ে জানালে বাধিত হব।

—ডাঃ সুকুমার মিত্র

কলিকাতা—১২

লোকসঙ্গীতের একাল না আকাল?

মুরশিদ

মুরশিদের বউনি ভালই হয়েছে। আকাশবাণীর গায়ে আঁচড় লেগেছে কি-না জানি না, তবে পাঠকের মনে কিন্তু দাগ কেটেছে। ইতিমধ্যে দু'-তিনজন নামকরা পল্লীগীতি গায়ক মুরশিদকেই জিজ্ঞেস করেছেন, "দাদা মুরশিদ লোকটা কে? সে যে-ই হোক মোক্ষম বাণ ছেড়েছে।" পরের সংখ্যা সাপ্তাহিক বসুমতীতে ৭৩ বর্ষ, ২৬শ সংখ্যা মধ্যমগ্রাম থেকে লোকসঙ্গীতের একজন অনুরাগী শ্রীসুখেন মজুমদার চিঠি লিখেছেন। তিনি তাঁর চিঠি এই বলে ইতি টেনেছেন, "লোকসঙ্গীতের অনুরাগী শ্রোতা হিসাবে আমি মুরশিদকে ধন্যবাদ জানাই এবং সঙ্গে সঙ্গে তাঁর ওপর এই ভরসা পোষণ করি, তিনি যেন তাঁর নির্ভীক নিরপেক্ষ লেখনীর কশাঘাতে আকাশবাণী, গ্রামোফোন কোম্পানী, বিভিন্ন সাংস্কৃতিক সংস্থা ও শিল্পিসমাজের চেতনা উদ্বুদ্ধ করে পল্লীর স্বভাব-কবির রচনা ও সুরকে অবশ্যম্ভাবী অকালমৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা করার মহান ব্রত গ্রহণ করেন। এ ব্যাপারে মুরশিদকে বিন্দুমাত্র সহায়তা করতে পারলেও নিজেকে ধন্য মনে করব।"

এই চিঠিখানা মুরশিদের দিলে সত্যি জোশ পয়দা করেছে। এরকম উজান গুণ টানবার লোক পেলে মুরশিদ আজকের উল্টা হাওয়ায়ও 'হাইল' শক্ত করে ধরবার বল পাবে। এতো দু'-একজনের ব্যাপার নয়। বহু লোকে গুণ টানলে ও হৈঁয়া ধরলেই উল্টা হাওয়ায় উজান ঠেলে গঞ্জে পেঁছিন সম্ভব।

কিন্তু চিঠিতে কিছু অনুযোগও আছে। কিছু কিছু নাম বাদ পড়ার জন্য পত্রপ্রেরক ক্ষুব্ধ হয়েছেন। বাদপড়া গায়ক-গায়িকার নামের একটি লিস্টিও দিয়েছেন। প্রথমেই স্বীকার করি ভাল লোকশিল্পী হয়ত কয়েকজন বাদ পড়েছেন—কিন্তু গায়কদের নিয়ে আলোচনা আমার মূল উদ্দেশ্য ছিল না; আকাশবাণীর খাম-খেয়ালীর কীর্তিকলা সম্বন্ধে কিছু বলাই ছিল উদ্দেশ্য। জীবিকার ধান্দায় যাকে ঘুরতে হয় রেডিও শোনা তার সব সময় হয়ে ওঠে না। যেটুকু মাঝে মাঝে শুনি ভালমন্দ টুকে রাখবার চেষ্টা করি। অবশ্য এখন থেকে মুরশিদ চেষ্টা করবে যেসব নাম পত্রপ্রেরক উল্লেখ করেছেন প্রত্যেকের প্রোগ্রাম ভাল করে শুনতে এবং সে বিষয়ে মাঝে মাঝে আলোচনা করতে। মুরশিদ ভাল বলতে পারলেই খুশি। খারাপ বলতে খারাপ লাগে। তাছাড়া এই দুর্দিনে আকাশবাণীতে গান গেয়ে যাঁরা কমপক্ষে ত্রিশটি টাকা উপার্জন করেন তাঁদের কোনো ক্ষতি করতে মুরশিদের মন চায় না। কিন্তু আকাশবাণীর পোষ্য কোনো আধুনিক ষণ্ড যদি শিং নেড়ে লোকসঙ্গীতের বাগিচায় ফুল গ্রাস করার জন্য ঢোকে তখন লাঠি নিয়ে তাড়া করা ছাড়া উপায় থাকে না। ফুলমালীর কাজ শুধু জল দেওয়া নয়—লাঠি নিয়ে তাড়া করাও।

অনুরাগী হওয়া আর সমঝদার হওয়া এক জিনিস নয়

যখন লিখতে বসেছি, তখন পত্রপ্রেরকের লিস্টিভুক্ত শ্রীসুবোধ রায়ের লোকসঙ্গীতের প্রোগ্রাম হচ্ছিল (২৩।১২।৬৮) পুরনো দিনপঞ্জীর কোণায় সুবোধ রায় সম্বন্ধে আমার সংক্ষিপ্ত মন্তব্য কয়েকটা খুঁজে পেলাম: ১০।৪।৬৭ সকাল—সুবোধ রায় —প্রাচীন রচনা?—'মনরে আমার ঘুমাইও না', লোকসঙ্গীতের কিছু পেলাম না। শুদ্ধ ভৈরবীতে গাওয়া। লৌকিক ঢঙ এতটুকুও আসে নি। ১২।৭।৬৭ সকাল—সুবোধ রায়—গলা আছে গায়কী নেই। ভাওয়াইয়া বলে যে তিনটি গান প্রচারিত হল তা আর যা-ই হোক ভাওয়াইয়া হয় নি। ১২।২।৬৮-সুবোধ রায়—পাল্কী চলের গান—"হুহুম্ না, হুহুম্ না—পাল্কী চইড়া নয়া বউ শ্বশুরবাড়ি যায়—ছলছল নয়ন কন্যার বক্ষ ভাসে হায়—" আধুনিক রচনা—সুর ও গাইবার ঢঙ একেবারে নির্ভেজাল আধুনিক, অসহ্য। (এখানে একটু বলে রাখতে চাই—সত্যেন দত্তের পাল্কীর কবিতাটি সলিল চৌধুরীর সুরে জনপ্রিয় হওয়াতে কিছু আধুনিক পল্লীসঙ্গীত রচয়িতাও তার অনুকরণে গান লিখতে শুরু করেছেন। কিন্তু বাংলা দেশে পাল্কীর গান বলে কিছু নেই। কেবল আছে মধ্যযুগীয় এই বর্বর প্রথায় মানুষকে মানুষ বয়ে নিয়ে যাবার বেগার খাটুনির শ্রমকে লাঘব করার ও চলার গতির সময় মেলাবার জন্য কিছু স্পষ্ট আর্ত-ধ্বনি।) ৭।৪।৬৮ সকাল—সুবোধ রায়—'প্রাচীন রচনা দুটি';—আর ঘুমাইও না...ও শিব হে শিব...। প্রথম সাধনার লোকসঙ্গীতের কোন গন্ধই পেলাম না। দ্বিতীয়টিতে গম্ভীরায় একটু আমেজ পেলাম। এসব মন্তব্য পড়ার পর গত ২৩শে ডিসেম্বর সকালে সুবোধবাবুর গান আবার শুনলাম—মন দিয়েই শুনলাম—কারণ তাঁর নাম না থাকায় মুরশিদের কাছে নালিশ এসেছে। তিনটি গান তিনি গেয়েছেন—প্রথমটি "অ সোহাগী দুলালী"—যেমন তেমন, দ্বিতীয়টি 'মনরে আমার ঘুমাইও না'—গায়কের অতি প্রিয় কিন্তু খাঁটি লোকসঙ্গীত হলে আমারও প্রিয় হত। তৃতীয়টি এক ভয়ঙ্কর গীত—'বক্ষিলারে খা'—এ নাকি সাপুড়ের গান! ছোটবেলা থেকে পূর্ববঙ্গের বাদ্যার (বেদে) গান শুনেছি। বরিশালের এবং ময়মনসিংহের এসব বাদ্যারা অধিকাংশই ছিল আজীবন নৌকাবাসী। এরা মরুভূমির নয়—জলের ওপরের বেদুইন। সাপ খেলানো ছাড়াও কাচের চুড়ি, ওষুধপত্র ইত্যাদি ফেরি করা ছিল ওদের কাজ। গান গাইত বেহুলা লখীন্দরের এবং অন্যান্য। বিখ্যাত 'মহুয়া' গীতিনাট্য এই বাদ্যারি সুরেই গাওয়া হত। আজও সে সুরের রেশ কানে আসে। .....কিন্তু এ কোন সাপুড়ের গান? 'বক্ষিলারে খা' ছাড়া আর কোনো মিল নেই। এতো প্রাণফাটা হুল্লোড়ী চীৎকার, গান নয়। কোনো শহুরে সাপুড়ের রচনা!

আমার পুরনো দিনপঞ্জীতে পত্রপ্রেরকের লিস্টিভুক্ত আরেকটি নামের পাশে মন্তব্য দেখলাম। ২।১১।৬৭ সকাল—

গৌরচন্দ্র বসাক—ও চন্দনা নদীরে (ভাটিয়ালী?) জানি গো কন্যা (ভাওয়াইয়া?) সুরের ওপর ব্যভিচার রচনা বিদগ্ধ।

সুখেনবাবুকে বলি অনুরাগী হলেই চলবে না সমঝদারও হতে হবে। অবশ্য তা বলে আমি বলছি না যে সুবোধবাবু বা গৌরবাবুরা কোনদিনই ভাল গান গাইতে পারবেন না। আমার অনুরোধ তাঁরা যেন ধান আর তুঁষে মিশিয়ে না ফেলেন এবং মনে রাখেন আকাশবাণীতে ভেজাল বিক্রি হলেও এখনো খাঁটি জিনিস খাবার লোক দেশে অনেক আছে।

শ্রীমজুমদার আরেকটি প্রশ্ন তুলেছিলেন—কিন্তু আজ তার উত্তর না দিয়ে আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের অবতারণা করতে চাই।

বিচিত্রানুষ্ঠানের হুল্লোড়ী দর্শক

সাপুড়ের বাঁশী যখন বাজে—একটানা সুরে তিন-চারটি স্বরের স্বরসঙ্গতি এমন মাধুর্য, এমন মোহ সৃষ্টি করে যে, তার প্রধান শ্রোতা ফণামেলা বিষধরটিকেও তখন মনে হয় কী সুন্দর। আধুনিক 'ফাংশন' নামীয় বিচিত্রানুষ্ঠানের দর্শককে যদি সাপের সঙ্গে এবং শিল্পীকে সাপুড়ের সঙ্গে তুলনা করি তবে সুরপ্রেমী বিষধরকে অপমান করা হবে। আধুনিক শিল্পীকে বলতে পারেন 'জকি' এবং দর্শককে ঘোড়-দৌড়ের জুয়াড়ী। যে উপমাই দেন না কেন এ-দর্শকের সংজ্ঞা ঠিক করা কঠিন।

কিছুদিন আগে আমাকে কলকাতার একজন খ্যাতনামা গায়ক বলেছিলেন: কলকাতা এবং জেলা শহরের বিচিত্রানুষ্ঠানগুলির সংগঠক হল স্থানীয় মাস্তানরা কিংবা ঘুঘু ফড়েরা, শিল্পীকেও তাই তবলচী-'কাম' লড়াক বডিগার্ড একজনকে সঙ্গে নিয়ে যেতে হয়, কখন কি হয় বলা যায় না।' এতো হলো সংগঠকদের চরিত্র কিন্তু দর্শকের চরিত্রটা কি? এরা কেবল শুনতে আসে না দেখতেও আসে। তা না হলে ওদের শ্রোতাই বলতাম—দর্শক বলছি কেন? কাকে দেখতে আসে? তাদের প্রিয় স্টার শিল্পীকে। এই স্টাররা স্বকীয় গুণে ততটা ঝলসান না, যতটা ঝলসান ধারকরা রশ্মিতে। পাবলিসিটির ব্র্যান্ড কোবাসে—চলচ্চিত্রের নেপথ্যকণ্ঠ, বেতারের ইথরকণ্ঠ রেকর্ড কোম্পানীর ভৌতিককণ্ঠ সব মিলে কিছু নির্বাচিত কণ্ঠ মানুষের কানের ভিতর দিয়া দিনরাত মরমে বিদ্ধ হয়ে যায়, আর সেই বিশেষ বিমূর্তকণ্ঠগুলি বিচিত্রানুষ্ঠানে বিশেষ বিশেষ শিল্পীর আকারে বায়ুস্ফীত ব্যক্তিত্বের মূর্তিধারণ করে হাজির হয়। এদের দেখবার আনন্দ আছে—খালি শুনবার নয়। তখন কিন্তু কেউ ভাবে না এই বিড়ালই বনে গেলে বন-বিড়াল হয়।

স্টার লোকসঙ্গীত গায়ককেও ভেক ধারণ করেই হাজির হতে হয়, না হলে ভিখ মিলে না। কিন্তু কী গান দর্শক চায়? দর্শকের 'মুড্' সাধারণত কি থাকে এককথায় সে আসে ফুর্তি করতে। প্রেক্ষাগৃহের ভাটিখানায় সুরের সুরা পান করে মাতাল হয়ে নাচতে। যাঁরা গলা বেচে খান—অর্থাৎ শিল্পীরা হলেন সেখানে সুরাপাত্র হাতে সুরা-সাকী। কাজেই তাঁরা লয়ের খেল দেখিয়ে কণ্ঠনালী ও মিউজিকের মল্লযুদ্ধে আসর সরগরম করে তোলেন।

এই হুজ্জোড়বাজীতে লোকসঙ্গীতজ্ঞকেও এসে যোগ দিতে হয়। ভাবের চেয়ে ভঙ্গি সেখানে বড়,—মাথার চেয়ে বড় খোঁপা। ভঙ্গি মানে 'স্টাইল' অর্থে নয়—একেবারে অঙ্গভঙ্গি। একথায় আসার আগে মিউজিকের কথা একটু বলে নিই। নৃত্যসম্বলিত লোকসঙ্গীতে ঢাক-ঢোল কাড়া-নাকাড়াও বাজে। কিন্তু আমাদের শহুরে লোকশিল্পীরা দোতারা—একতারার গান গাইতে গিয়েও পারেন তো ঢাক-ঢোল কাড়া নাকাড়ার সাথে আফ্রিকান 'বঙ্গো, কঙ্গো'কে হাজির করেন। সে আবার অতি স্পর্শ-কাতর, দু'-তিনটা মাইকের সাথে একেবারে নরক গুলজারী ব্যাপার। এর মাঝে মাঝে বন্ধুরে—ভাইরে—ভোলামন বলে তারার পঞ্চমে প্রচণ্ড চীৎকার মারলেই হোল।

এতসব যদি বাদও দেন তবু এখন খমক আগে বাউল পরে। কোমরে বাঁধা ডুগী, পায়ে নূপুর আর এক হাতে একতারা, বাউলের সেই পুরাতন মোহন ছবিটি আর দেখি না। শহরে তা অচল। গুরু-গুরুরই জয়জয়কার। কোনো নিমীলিত নেত্র—রবীন্দ্রসঙ্গীতের পর ঝিমিয়ে পড়া দর্শক মাইকের মধ্যে গুরুগুরুর প্রচণ্ড আওয়াজে কোমর সিধা করে, কান খাড়া করে উঠে বসেন। এবার আসর জমবে। এর সাথে যদি থাকে নাচ, তবে তো গরম চায়ের সাথে তেলে ভাজা (ভেজাল তেলের হোক না)।

এবার ভঙ্গির কথায় আসা যাক।

"আকাশের বিজলী হানা
বুক হইলো মোর ফানা ফানা
বুকের কাপড় হাওয়ায় উড়াইয়া
নিলরে—"

লোকসঙ্গীতের এই সহজ কলি কয়টিতে বাংলার প্রান্তরের পল্লীমেয়ের যে অপূর্ব ছবিটি ভেসে ওঠে কোন্ শহুরে কাব্যে এর তুলনা মিলে? কিন্তু একেলে শহুরে লোকশিল্পী সেখানে হারমনিয়মের হুজ্জোড়ে আর তবলার চাঁটিতে অঙ্গভঙ্গি করে 'বুকের কাপড়' কথাটার সাথে বুক নাচানোমাত্র দর্শকের মধ্যে কী প্রচণ্ড আলোড়ন! সেই বুকের কাপড় খসে পড়ার কল্পিত অশ্লীলতায় কী মজা! গাঁয়ের মেয়েকে 'টপলেস' ভাবতে কী ভাল লাগে!

আরেকটি গানের কথা বলছি। লোকসঙ্গীতে বা লোকসংস্কৃতিতে সবকিছুই ভাল এমন নয়। লোকসাহিত্যে সামন্তযুগের অবক্ষয়ী ধ্যান-ধারণা বিদ্যমান। এ-গানটিও সেই অবক্ষয়ী ধারণাপ্রসূত, লোকসঙ্গীতের জীবনধর্মী ঐতিহ্য-বিরোধী। এক বিমর্ষ শ্মশান-বৈরাগ্যের গান—

আমি হারাইলাম দুকূল,
একূল আর ওকূল
কবে ফুটিবে মন তোর
বিয়ের ফুল।

এই 'বিয়ের ফুল' কথাটা শোনা, অমনি দর্শকের প্রাণ নেচে উঠলো। গায়কও এই শব্দটিকে কত ভঙ্গিতে পুনরাবৃত্তি করলেন। তারপরেই কিন্তু আছেঃ

যাব চলন করি বাঁশের দোলায় চড়ি
জাতবেহারার স্কন্ধে চড়ি
সকল হবে ভুল
আগেপাছে কাষ্ঠের বোঝা,
ছেড়ে দিয়ে ভবের মজা
শ্বশুরবাড়ি হবে রে তোর
নদীর কূল।

গানটার তারপরে আছে শবদাহের বর্ণনা।

.....কিন্তু কে তা শোনে? শ্মশানঘাটেই হোক বা যমরাজের বাড়িতেই হোক 'বিয়ের ফুল' ফুটলেই হলো!

আপনারা হয়ত বলবেন মুরশিদ বড্ড বাড়াবাড়ি করছেন। হ্যাঁ, মুরশিদ তিক্ত, একটু বেশি তিক্ত। কিন্তু 'সিনিক' নয়। তিক্ত, শহরের শিক্ষিত ভদ্রশ্রেণীর ওপর এমন অশিক্ষিত বিকৃত শ্রেণী দেশে আর কেউ নেই। আরেকটা দৃষ্টান্ত দিতে চাই। কিছুদিন আগে মুরশিদ মেডিকেল ছাত্রদের এক অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন। অনুষ্ঠানটির সংগঠক ছিলেন ছাত্র ফেডারেশন নিয়ন্ত্রিত কলেজ ইউনিয়ন। কাজেই কমিউনিস্ট বা কমিউনিস্ট সমর্থক ধরে নিতে পারি। তাও আবার মেডিকেল ছাত্র। কাজেই ছাত্রদের মধ্যে প্রগতিশীল রুচিবান অংশ এও ধরে নিতে পারি।

এক একেলে বাউল উঠলেন গান গাইতে। তাঁর কাছে অনুরোধ এলো "গোলেমালে পীরিত করো না।" এই গানটি নাকি 'নায়িকা সংবাদ' নামক এক চলচ্চিত্রের 'বক্স অফিস' বাউল। বাউল গলার বিভিন্ন কণ্ঠোলের প্যাঁচ কষে দুটি শব্দে ঘুরে-ফিরে আসছিলেন "পীরিত করো না।" ছাত্ররা কী খুশি! কিন্তু বাউল দেখলেন তাতেও ঠিক জমছে না। তখন তিনি নাচতে নাচতে একবার এসে মাইকের মুখে মুখ লাগিয়ে ফিসফিসানিতে পীরিত করো না বলেই একটা চোখ টিপে দিলেন। আর যায় কোথা। 'হল্' একেবারে ফেটে পড়লো। মঞ্চ থেকে বাউল নেমে এসে মুরশিদকে এক লম্বা সেলাম ঠুকে বললেনঃ 'দাদা, আপনার খারাপ লাগবে জানি, কিন্তু আপনার কথা শুনলে গরীব বেচারাকে না-খেয়ে মরতে হবে। দেখলেন তো মেডিকেল ছাত্ররা পর্যন্ত কেমন নিয়েছে?' (অবশ্য টাকাও পুরো পে করেছে)।

কোন উত্তর দিতে পারি নি তখন। কারণ তখন আমি বাউলের কথা ভাবছিলাম না। ইংরেজীতে যাকে বলে 'পেইড পাইপার' আজকের শিল্পী হলেন সেই 'কেনা গায়েন।' আমি ভাবছিলাম দর্শকের কথা। এই হল 'বিপ্লবী' ছাত্রদের রুচিবোধ। এই দেশের হবে কি?

আমি আগেই বলেছি সামন্ত প্রভাবে উচ্চশ্রেণীর ধ্যান-ধারণায় কোন কোন ক্ষেত্রে লোকসংস্কৃতিকেও আচ্ছন্ন না হতে দেখা যায়। কিন্তু তারও একটা প্রকৃতি আছে। তিন্নাথের কিংবা বাউল-আউলের গাঁজার আড্ডায় সবকিছুই ভাল নয়—কিন্তু মুরশিদ সেখানে বারে বারে যেতে রাজী। কারণ—সুর পাওয়া যায়, গান পাওয়া যায়, যার মধ্যে অনেক কিছু আছে। কিন্তু শহরের এই হাফ্-হিপিদের 'এল এস ডি' বা 'মারিজুয়ানার' আড্ডায় সুরের কিছুই নেই। আছে অসুরের হুল্লোড়।

এখানে আপনারা প্রশ্ন করতে পারেন—কে কাকে নষ্ট করছে? দর্শক শিল্পীকে, না শিল্পী দর্শককে? প্রশ্নটা বড়। পরে আলোচনা করবো। আজ এখানেই তবে ইতি টানি।

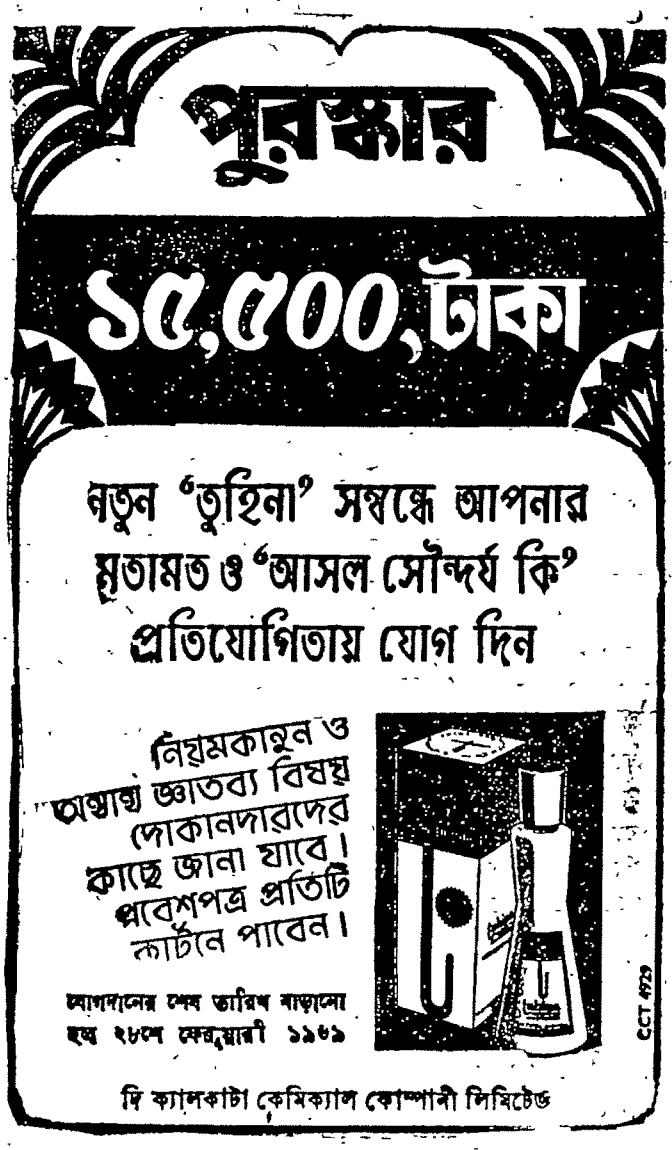

রঙ্গজগৎ

গত বছরের হিন্দী ছবি

১৯৬৮ সালে মাত্র ৫৪টি হিন্দী ছবি মুক্তিলাভ করেছে। তার মধ্যে ৩১টি রঙীন ছবি। ১৯৬৭ সালে কলকাতায় মুক্তিপ্রাপ্ত হিন্দী ছবির সংখ্যা ছিল ৭৬; তার মধ্যে ৩২টি রঙীন। ১৯৬৬ সালে মুক্তি পেয়েছিল ৮১ ও ২২।

এই সংখ্যা থেকে বোঝা যায় হিন্দী ছবির জগতেও একটা পরিবর্তন আসছে। পরিবর্তন না বলে সংকট বলাই ঠিক। হিন্দী ছবির জগতে ক্রমেই ছোট প্রযোজকদের সংখ্যা কমে যাচ্ছে; ৫।১০ লাখ টাকায় ছবি করাও এখন আর সম্ভব হচ্ছে না। ফলে বড় বড় প্রযোজক এবং ফিল্মের বড় কারবারী, যাদের হাতে স্টুডিও ও রিলিজ চেন আছে ছবি তাদেরই করতলগত হয়ে পড়েছে। হিন্দী ছবির জগতে এই সংকট শুরু হয়েছে সেদিন থেকে যেদিন 'বিগ বাজেট'-এ ছবি করা আরম্ভ হয়েছে। মুক্তিপ্রাপ্ত ছবিগুলির দিকে লক্ষ্য করলে দেখা যায় রঙীন ছবির সংখ্যা কিভাবে বাড়ছে। ছবির বাজেট লক্ষের ঘর ছাড়িয়ে কোটির ঘরে পৌঁচেছে। নির্মাতারা ক' বছর আগে ছবি করত ভারতের বিভিন্ন রাজ্যের ছবিগুলিকে কোণঠাসা করে হিন্দী ছবির বাজার দখলের জন্য। একমাত্র দক্ষিণ ভারত ছাড়া হিন্দী ছবি বাজার দখল করতে পেরেছে। এখন হিন্দীর প্রযোজকরা চায় ভারতের বাজারে আধিপত্য রেখে মধ্য এশিয়ায় বাজার সৃষ্টি করতে। মধ্য এশিয়ায় একদিকে হলিউড ছবির সঙ্গে প্রতিযোগিতা আর একদিকে স্থানীয় ছবিকে অঙ্কুরে দুর্বল করে রাখা। এই দুই উদ্দেশ্যে হিন্দীর প্রযোজকরা মোটা বাজেটের ছবি করছে, রঙীন ছবি করে ছোট বাজেটের ছবির প্রযোজকদের হটিয়ে দিচ্ছে। হিন্দী ছবির জগতে যে এরূপ অবস্থা হবে সে কথা আমরা পূর্বেই বলেছিলাম। আজ হিন্দী ছবি নিজের সংকট নিজে ডেকে এনেছে। যে সাম্রাজ্যবাদী মনোভাবের বিরুদ্ধে আমরা এতকাল লড়াই করেছি আজ হিন্দী ছবির মালিকরা, সেইরূপ 'কলোনিয়াল' মনোভাব নিয়ে নিজের দেশে এবং মধ্য এশিয়ায় প্রগতিশীল ছবির পথ রুদ্ধ করে দিচ্ছে। গত বছরে হিন্দী ছবির সংখ্যাল্পতা মুষ্টিমেয় প্রযোজকের শিল্পের ওপর একাধিপত্যের বিপদের সংকেত জানাচ্ছে। —সৃজন।

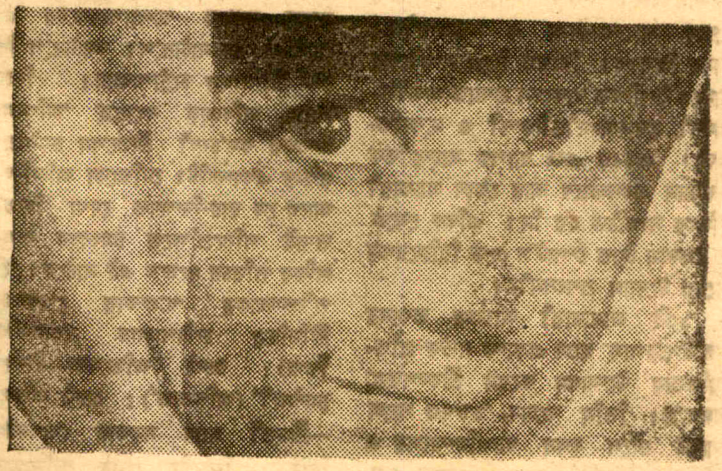

'কিডন্যাপিং ককেশিয়াল স্টাইল' ছবির নায়িকা নাটালিয়া ভারলেই

সংগীতাচার্য রমেশ বন্দ্যোপাধ্যায়

চিত্রআলোচনা

বোম্বাই স্টাইলের সোভিয়েত ছবি

জানুয়ারী মাসে কলকাতায় ফিল্ম সোসাইটিগুলির উদ্যোগে তিনটি দেশের চলচ্চিত্র সেসন হয়েছে। এই সেসনগুলিতে তিনটি ফরাসী ছবি, তিনটি জাপানী ছবি, এবং পাঁচটি সোভিয়েত ছবি প্রদর্শিত হয়েছে। জাপানী ও ফরাসী ছবি সম্পর্কে পরে আলোচনা করবার ইচ্ছা রইল।

গত ১২ই জানুয়ারী সিনে সেন্ট্রাল ক্যালকাটার উদ্যোগে সোসাইটি সিনেমায় সোভিয়েত ছবির সেসন শুরু হয়েছিল। উদ্বোধন অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন সিনে সেন্ট্রাল ক্যালকাটার সভাপতি শ্রীমধু বসু। উদ্বোধন করেন সোভিয়েত কনসাল জেনারেল মিঃ ভি এ ঝারকভ। প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন নাট্যকার শ্রীমন্মথ রায়। ১২ই থেকে ১৬ই জানুয়ারী এই

উৎসবে কিডন্যাপিং ককেশিয়ান স্টাইল, সাডেন এনকাউণ্টার, আই ব্যট এ ড্যাডি, থ্রি প্লাস টু, ইভানস চাউল্ডহুড ছবি পাঁচটি দেখান হয়েছে। এই উৎসব উপলক্ষে সোসাইটি সিনেমাকে লেনিনের প্রতিকৃতি, সোভিয়েত চিত্রতারকাদের ছবি, কাগজের ফুল ও বেলুন ইত্যাদি দিয়ে সুসজ্জিত করা হয়েছিল। হলের সম্মুখভাগে বিরাট এক বোর্ডের ওপরে লেখা ছিল 'অক্টোবর বিপ্লব দীর্ঘজীবী হোক'।

আজকে সোভিয়েতের যা কিছু উন্নতি দেখছি তা নভেম্বর বিপ্লবের অবদান। নভেম্বর বিপ্লবের পরে সোভিয়েত চলচ্চিত্র-শিল্প সারা জগৎকে বিস্মিত করেছিল। সেকালের প্রায় প্রতিটি ছবি আজো দেশ-বিদেশের মানুষ বিস্ময়মুগ্ধ হয়ে দেখে। সেকালে একই সময়ে ভার্টভ, আইজেনস্টাইন, পুডোভকিন, ডবঝেঙ্কো প্রমুখের মত চিত্রস্রষ্টারা বিশ্বের চলচ্চিত্রে বিপ্লব এনেছিলেন। সোভিয়েত বিপ্লবের ৫০ বছর পরে আজ আমরা দেখছি আইজেনস্টাইন প্রমুখের উত্তরপুরুষদের দ্বারা নির্মিত ছবি 'কিডন্যাপিং ককেশিয়ান স্টাইল'। ছবিটি দেখে হল থেকে বেরিয়ে আসার সময় লেনিনের ছবির দিকে আর একবার দেখলাম; রাস্তায় দাঁড়িয়ে 'লঙ লিভ অক্টোবর রিভলিউশন' কথাটিও আবার পড়লাম!

কিডন্যাপিং ককেশিয়ান স্টাইল ছবি দেখে মনে হল ৫০ বছরের সোভিয়েত জীবনের পরে আজ সমাজতান্ত্রিক বাস্তবতার শিল্পরীতি ত্যাগ করে সোভিয়েত তরুণ চিত্রনির্মাতারা চলেছে হলিউডের পথে। একটি মেয়েকে কিডন্যাপ করে বিয়ের ব্যবস্থার এক জবরদস্ত রীতির প্রতি শ্লেষাত্মক এই ছবির কাহিনী। আঙ্গিকে, অভিনয়ে চরম স্থূলতার নিদর্শন এতে রয়েছে। আগে টাইটেল না পড়লে বিশ্বাস করতাম না যে এটা সোভিয়েত ছবি। একেবারে বোম্বাই ছবি। টুইস্ট নাচ, হালফ্যাশনের তরুণ-তরুণী থেকে হলিউড অনুকরণে স্থূল রঙ্গরসের সব উপকরণ এতে আছে। ছবিটি দেখতে দেখতে বোম্বাই ছবির কমেডিয়ানদের নর্তন-কুর্দন চোখের সামনে ভেসে উঠছিল। সোভিয়েত চলচ্চিত্র উৎসবে যে ছবি স্থান পাবার যোগ্য নয়—সে ছবি উদ্বোধনের ছবি হিসাবে কেন বিবেচিত হল কে জানে!

পাঁচটি সোভিয়েত ছবির মধ্যে একমাত্র উল্লেখযোগ্য 'ইভানস্ চাউল্ডহুড'

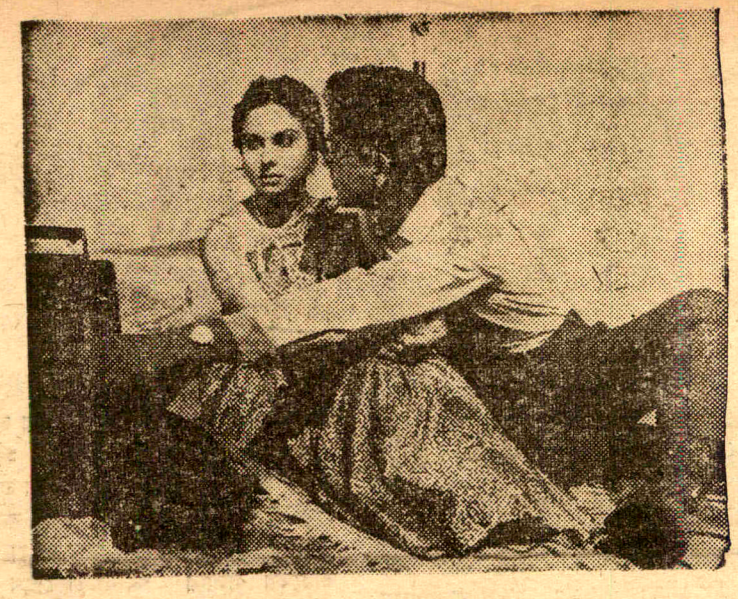

'দুরন্ত চড়াই' ছবিতে মাধবী মুখার্জী ও সোমেন চক্রবর্তী

নাটকের কথা

আয়কর ভবনে নাট্য প্রতিযোগিতা

চৌরঙ্গীস্থিত আয়কর ভবনে ১৩ই থেকে ২০শে পর্যন্ত নাট্য-সংস্কৃতি উৎসব অনুষ্ঠিত হয়েছে। উৎসবে নাটক, রবীন্দ্রসঙ্গীত, বিতর্ক ও আবৃত্তি প্রতিযোগিতার সঙ্গে রবীন্দ্রসঙ্গীতের আসর, দুই যুগের সংস্কৃতির আসর, গণসংস্কৃতির আসরের ব্যবস্থা ছিল। ২০শে জানুয়ারী নির্দিষ্ট হয়েছে পুরস্কারদান ও যন্ত্রসঙ্গীতের আসর হিসাবে। বিভিন্ন দিনে সঙ্গীতের আসরে উপস্থিত থাকছেন প্রখ্যাত সঙ্গীতশিল্পী, লোকসঙ্গীতশিল্পী ও মূকাভিনেতা। এতবড় এবং ব্যাপক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান এককভাবে আর কোন সরকারী অফিসে সংগঠিত হয় নি। এদিক থেকে দি ইনকাম ট্যাক্স স্পোর্টস এণ্ড রিক্রিয়েশন ক্লাবের উদ্যোগ প্রশংসনীয়।

১৩ই জানুয়ারী আয়কর ভবনের মালটিপারপাস্ হলে একাঙ্ক নাটক প্রতিযোগিতার উদ্বোধন করেন শ্রীকল্পতরু সেনগুপ্ত। তিনি বলেন, '১৮৭০ সালে ফরাসী দেশে যখন আত্মবিশ্বাসের ও মর্যাদাবোধের অভাব দেখা দিয়েছিল এবং যৌন-সাহিত্য ও নাটক প্রসার লাভ করেছিল—সে-সময় মনীষী রমাঁ রঁলা ফরাসী বিপ্লবের অনুপ্রেরণায় নাটক লিখেছিলেন এবং পিপলস থিয়েটার গঠন করে জাতিকে উদ্বুদ্ধ করতে চেয়েছিলেন। তাঁর মতে এমন নাটক চাই যে নাটক মর্যাদাবোধ জাগাবে, মহৎ হবার অনুপ্রেরণা দেবে এবং পৃথিবীতে যা মহৎ তার পক্ষ সমর্থন করতে উদ্বুদ্ধ করবে, মানুষকে চিন্তা করতে প্রেরণা দেবে।' শ্রীসেনগুপ্ত আয়কর কর্মচারীদের বলিষ্ঠ নাট্য-প্রয়াসের প্রশংসা করেন, এবং এই নাট্য-প্রচেষ্টাকে মানুষের বাঁচার সংগ্রামের শরিক করে তুলতে বলেন।

১৩, ১৪, ১৫ই জানুয়ারী তিনদিন একাঙ্ক নাটক প্রতিযোগিতায় যে আটটি নাটক অংশ গ্রহণ করেছিল তার মধ্যে প্রথম স্থান অধিকার করেছে 'বাগদীপাড়া দিয়ে' মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের একটি ছোট গল্পের নাট্যরূপ। নাট্যরূপ দিয়েছেন শ্রীমিহির চট্টোপাধ্যায়। দ্বিতীয় স্থান অধিকার করেছে 'অগ্নিগর্ভ'। আয়কর কর্মচারী শ্রীতপেন চট্টোপাধ্যায় রচিত একাঙ্কটি। মেক্সিকো অলিম্পিকের আগে যে ছাত্র-বিক্ষোভ দেখা দিয়েছিল তারই পরিপ্রেক্ষিতে চমৎকার কল্পনাশক্তির পরিচয় রয়েছে এই নাটকে। শ্রেষ্ঠ পরিচালকের পুরস্কার পেয়েছেন—শ্রীমিহির চট্টোপাধ্যায় (বাগদীপাড়া দিয়ে); শ্রেষ্ঠ অভিনেতা—শ্রীঅশোক চ্যাটার্জী (অগ্নিগর্ভ); শ্রেষ্ঠ অভিনেত্রী—শ্রীমতী মায়া সরকার (বাগদীপাড়া দিয়ে); দ্বিতীয় শ্রেষ্ঠ অভিনেতা—শ্রীবৈদ্যনাথ ব্যানার্জী (পুনর্জন্ম)।

বিচারকদের বিশেষ পুরস্কার লাভ করেছেন ঃ প্রযোজনার জন্য—'ভোরের স্বপ্ন' (বীরু মুখোপাধ্যায়) ; অভিনয়ে শ্রীমতী নিভা ঘোষ (অগ্নিগর্ভ) ; নাটক রচনা—শ্রীতপেন চট্টোপাধ্যায় (অগ্নিগর্ভ)।

শ্রেষ্ঠ নাটকের স্থানাধিকারী 'বাগদী-পাড়া দিয়ে' জমিদারের সঙ্গে বাগদীদের অধিকার রক্ষার সংগ্রাম। নটিকায় শ্রেণী-সংগ্রামের আলোতে চমৎকার সংলাপে শোষিত মানুষের বিজয়ের বাণীকে ঊর্ধ্বে তুলে ধরা হয়েছে সমাজতান্ত্রিক শিল্প-বোধে। অল্প সময়ে বহুসংখ্যক লোককে মঞ্চে উপস্থিত করে সংঘাতময় দৃশ্যের মধ্যে যে সংযম ও পারিকল্পনা ক্ষমতার পরিচয় পরিচালক দিয়েছেন তা বিস্ময়-কর। অপেশাদার পরিচালকের এত দক্ষতা কেউ আশা করতে পারে না। এরূপ দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন অগ্নি-গর্ভের পরিচালক সময়, শব্দ এবং অভিনয়ে সঙ্গতি রক্ষা করে।

এই নাটক প্রতিযোগিতায় বিচারক ছিলেন নাট্যসমালোচক ও নাট্যকার শ্রীঅশোক সেন, সুপরিচিত অভিনেতা শ্রীকুমার রায়, নাট্যকার শ্রীউমানাথ ভট্টাচার্য ও নাট্যসমালোচক শ্রীকল্পতরু সেনগুপ্ত।

এই প্রতিযোগিতায় অভিনীত নাটক-গুলির মধ্যে ভোরের স্বপ্ন, কালো আগ্নেয়গিরি, জ্বালা প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য।

সংগঠনী'র একাঙ্ক নাটক প্রতিযোগিতা

বেলঘরিয়ার উদয়পুরে সংগঠনী আয়োজিত একাঙ্ক নাটক প্রতিযোগিতার ফলাফল ঘোষিত হয়েছে। গত ২৫শে ডিসেম্বর সংগঠনীর মঞ্চে কৃতীসংস্থা ও শিল্পীদের পুরস্কার দান করা হয়েছে। প্রতিযোগিতায় সামগ্রিক নৈপুণ্যে ১ম, ২য় ও ৩য় স্থান অধিকার করেছে যথাক্রমে 'প্রস্তাবনা' (দমদমের করবী নাট্যসংস্থা), 'নানা রঙের দিন' (বিশ্বকর্মা কালচারাল ইউনিট—দুর্গাপুর), 'কেয়াকুঞ্জ' (পাঞ্জাব ন্যাশন্যাল ব্যাঙ্ক এমপ্লয়িজ রিক্রিয়েশন ক্লাব)।

ব্যক্তিগত নৈপুণ্যের জন্য পুরস্কার লাভ করেছেন ঃ শ্রেষ্ঠ পরিচালনা—নৃপেন দেব (প্রস্তাবনা), শ্রেষ্ঠ অভিনেতা—বিশ্বনাথ ঘটক (নানা রঙের দিন), শ্রেষ্ঠ অভিনেত্রী—সুপর্ণা চ্যাটার্জী (কেয়াকুঞ্জ), কৌতুকাভিনেতা—অমল গাঙ্গুলী (নকল হীরে), মৌলিক নাটক রচনা—শান্তি বর্ধন (নকল হীরে), টাইপ অভিনেতা—অমিতাভ সেনগুপ্ত (নানা রঙের দিন)।

প্রতিযোগিতায় ১৮টি দল অংশ গ্রহণ করেছিল।

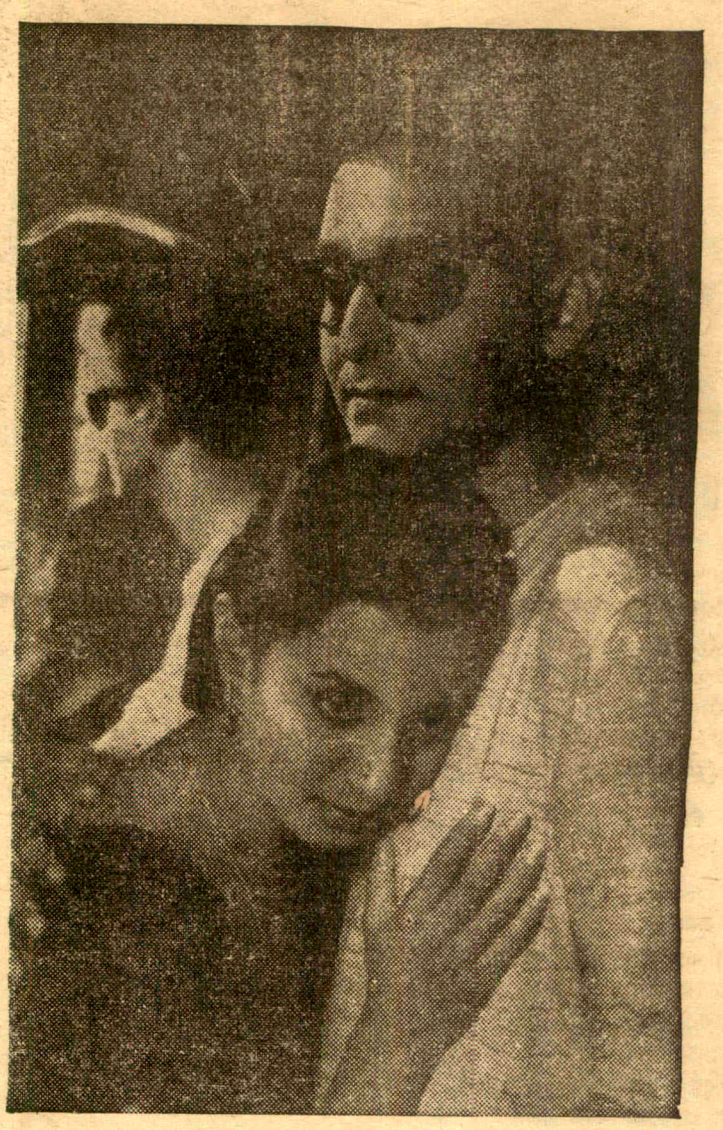

'তিনভুবনের পারে' ছবিতে সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায় ও তনুজা

বাংলায় ব্রেশ্‌ট

৩১শে ডিসেম্বর সকাল বেলায় মুক্তাঙ্গনে ঋত্বিক সংস্থা বেরটল্ট ব্রেশটের 'দি মেজার' নাটকের উৎপল দত্ত কৃত বাংলা অনুবাদ 'সমাধান' মঞ্চস্থ করে-ছিলেন। নাটকের পরিচালনার দায়িত্ব নিয়েছিলেন শ্রীপৃথ্বীশ ভট্টাচার্য। অভি-নয়, মুভমেণ্ট, লাইটিং সবই দর্শকদের প্রশংসা অর্জন করেছিল।

গতবছর ইনকাম ট্যাক্স স্পোর্টস রিক্রিয়েশন ক্লাবের সদস্যগণ এই নাটকটি মঞ্চস্থ করে প্রথম হয়েছিলেন। এছাড়া এঁরা আর একটি ব্রেশটের নাটকের সৌমিত্র চ্যাটার্জী কৃত বাংলা অনুবাদ 'ব্যবি ও ব্যতিক্রম' (দি একসেপ্‌শন এণ্ড দি রুল) সুন্দরভাবে অভিনয় করেছিলেন। পশ্চিম বাংলার বিভিন্ন জায়গায় কয়েক বছরে বেশ কয়েকটি ব্রেশ্‌ট নাটক বাংলায় অনু-দিত হয়ে অনবদ্যভাবে মঞ্চস্থ হয়েছে। যথা, 'গুড পার্সন অভ সেজুয়ান', 'গ্যালিলিও গ্যালিলাই', 'সমাধান', 'ব্যবি ও ব্যতিক্রম' ইত্যাদি। কিন্তু আমাদের বাংলা দেশের কাগজে এগুলোর ঠিকমত প্রচার হয় না। অথচ দিল্লী থেকে হিন্দীতে ব্রেশটের কোন অভিনয় কল-কাতায় হলে কিছু কিছু বাংলা কাগজে বিরাটভাবে তার সার্টিফিকেট দেওয়া হয়।

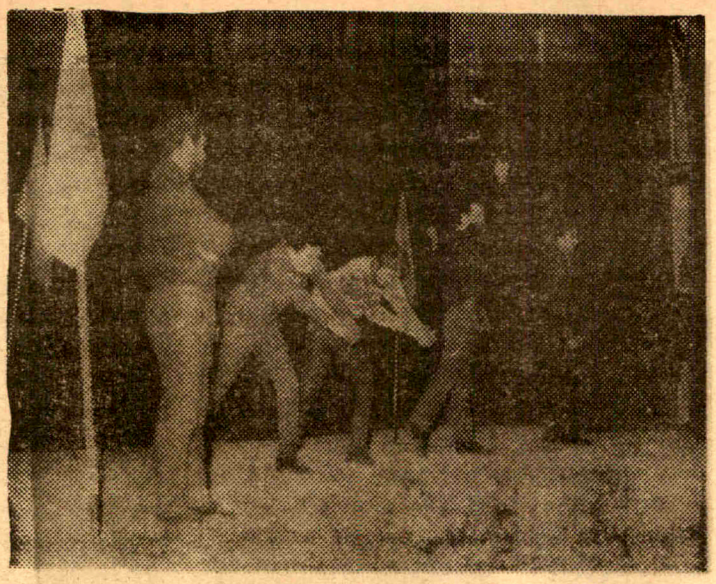

ঋত্বিক' পরিচালিত 'সমাধান' নাটকের একটি দৃশ্য। নাটকটি পরিচালনা করেছেন পৃথ্বীশ ভট্টাচার্য।

স্টুডিও খবর

"মায়া"

জয়া চিত্র প্রযোজিত নতুন আঙ্গিকের সামাজিক ছবি "মায়া" শ্রীশংকর চিত্রমের পরিবেশনায় আসন্ন মুক্তি প্রতীক্ষায় নির্মল সর্বজ্ঞ ছবির কাহিনী ও চিত্রনাট্য রচনা করেছেন এবং পরিচালনা ও তত্ত্বাবধানের দায়িত্ব নিয়েছেন। সুরের ইন্দ্রজাল সৃষ্টি করেছেন অনল চ্যাটার্জী। অসিতবরণ, অজয় গাঙ্গুলী, সতীন্দ্র ভট্টাচার্য, সুমিতা সান্যাল, অপর্ণা দেবী, শ্যামল ঘোষাল, চিত্রা মণ্ডল, সীতা দেবী, শিখা ভট্টাচার্য ও পারিজাত বসুকে ছবির মুখ্য চরিত্রে দেখা যাবে।

হেমন্ত মুখার্জী, আরতি মুখার্জী, প্রসূন ব্যানার্জী, মানব মুখার্জী ও শ্যামল মিত্র কণ্ঠসঙ্গীতে অংশ গ্রহণ করেছেন।

দুরন্ত চড়াই

ক্যাপিটল ফিল্মসের দুরন্ত যৌবনের ছবি "দুরন্ত চড়াই" রাধা, পূর্ণ ও অন্যান্য চিত্রগৃহের পরবর্তী আকর্ষণ। আজকের বিতর্কিত লেখক সমরেশ বসুর কাহিনী অবলম্বনে ছবিখানি জগন্নাথ চ্যাটার্জীর পরিচালনায় গৃহীত হয়েছে। ছবির সুর দিয়েছেন শ্যামল মিত্র। মাধবী মুখার্জী, অনুপকুমার, বিকাশ রায়, জহর রায়, দিলীপ রায়, হারাধন বন্দ্যোপাধ্যায়, সোমেন চক্রবর্তী, শিশির বটব্যাল, মাঃ মলয়, অপর্ণা দেবী, পদ্মা দেবী ও সবিতা চ্যাটার্জী (বম্বে) ছবির প্রধান চরিত্রে আছেন। নেপথ্য সঙ্গীতে আছেন—হেমন্ত মুখার্জী, শিপ্রা বসু ও শ্যামল মিত্র।

প্রতিমা চিত্রমন্দির ছবিটির পরিবেশন দায়িত্ব নিয়েছেন।

সংবাদকণা

বার্লিন উৎসবে "গুপী গাইন বাঘা বাইন"

সত্যজিৎ রায় পরিচালিত পূর্ণিমা পিকচার্সের 'গুপী গাইন বাঘা বাইন' আসন্ন বার্লিন আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবে আমন্ত্রিত হয়েছে। আগামী জুন মাসে বার্লিনে এই উৎসব অনুষ্ঠিত হবে। ছবিটির পরিচালক, চিত্রনাট্য রচনা ও গীত রচনা এবং সঙ্গীত পরিচালনা করেছেন শ্রীরায়। শিল্প-নির্দেশনা, চিত্রগ্রহণ সম্পাদনা করেছেন যথাক্রমে বংশী চন্দ্রগুপ্ত, সৌমেন্দু রায়, দুলাল দত্ত।

'গুপী গাইন বাঘা বাইন' সর্বজন প্রদর্শনের জন্য ছাড়পত্র লাভ করেছে। স্বর্গীয় উপেন্দ্রকিশোর রায়ের লেখা এই জনপ্রিয় কাহিনীর চিত্ররূপ প্রযোজনা করেছেন নেপাল দত্ত ও অসীম দত্ত।

মুক্তিপ্রাপ্ত ছবি

১৭ই জানুয়ারী কলকাতায় মুক্তি পেয়েছে : আউলাদ। পরিচালক কুন্দনকুমার। প্রধান চরিত্রে জীতেন্দ্র ও ববিতা।

ইংরেজী : পি, জে (মেট্রো)।

'সুভাষমঞ্চে' শিশির একাঙ্ক নাট্য প্রতিযোগিতা

ফিল্ম এ্যান্ড থিয়েটার আরকাইভস্ আয়োজিত শ্রীনাট্যম্ সুভাষমঞ্চ পরিচালিত একাঙ্ক নাটক প্রতিযোগিতা নাট্যাচার্য শিশিরকুমার ভাদুড়ীর নামে উৎসর্গ করা হয়েছে। দীর্ঘ ১২ দিনব্যাপী সুভাষমঞ্চে (বারাকপুর) অনুষ্ঠিত এই নাট্যোৎসবে পশ্চিমবঙ্গ ও বহির্বঙ্গের মোট ৬০টি সংস্থা অংশ গ্রহণ করেন। বিচারকমণ্ডলীর রায় নিম্নরূপ :

সর্বশ্রেষ্ঠ সংস্থা : মেরী ব্রাইট বয়েজ সোসাইটি, হাওড়া। নাটক : 'সমুদ্র সন্ধানে'।

দ্বিতীয় সংস্থা : নাট্যায়ণ, কলিকাতা—৩৬ নাটক : 'দ্বিতীয় বিশ্ব'।

শ্রেষ্ঠ নাটক (পাণ্ডুলিপি) : 'আমি থামবো না'। রচনা : সাধনবন্ধু চট্টোপাধ্যায় (মেটতীর্থম্)

শ্রেষ্ঠ পরিচালক : মন্টু গুপ্ত (পাঞ্চজন্য : 'অভিনয়')

শ্রেষ্ঠ অভিনেতা : রবীন্দ্র গোস্বামী (কুশীলব : 'কিউবা')

শ্রেষ্ঠ সহ-অভিনেতা : নিখিল ভট্টাচার্য (যান্ত্রিক : 'আমায় বাঁচতে দাও')

শ্রেষ্ঠা অভিনেত্রী : মিতা দাশগুপ্তা (আনন্দ পরিষদ : 'পঙ্গপাল')

শ্রেষ্ঠা সহ-অভিনেত্রী : মেনকা ব্যানার্জী (শিল্পায়ণ : 'মেতা')

শ্রেষ্ঠ চরিত্রাভিনেতা : রতন গাঙ্গুলী (কৃষ্ণচূড়া সংঘ : 'বলুন কি নাম দেব')

শ্রেষ্ঠ শিশু-অভিনেতা : গৌতম চট্টোপাধ্যায় (রামকৃষ্ণ সংসদ : 'চর')

শ্রেষ্ঠ সহ-শিশু-অভিনেতা : অভিজিৎ চক্রবর্তী (নটরাজ গ্রুপ : 'কলার ভেলা')

এ ছাড়া কয়েকটি বিশেষ ক্ষেত্রে আরকাইভস্ কর্তৃক সাতটি অতিরিক্ত পুরস্কার ও সম্মানসূচক অভিজ্ঞানপত্র প্রদান করবেন।

শোক-সংবাদ

সঙ্গীতাচার্য রমেশ বন্দ্যোপাধ্যায়

গত ১৪ই জানুয়ারী সন্ধ্যায় রামকৃষ্ণ মিশন সেবা প্রতিষ্ঠান হাসপাতালে সঙ্গীতাচার্য শ্রীরমেশ বন্দ্যোপাধ্যায়ের জীবনাবসান হয়েছে। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৬১ বছর। ভারতের বিখ্যাত সঙ্গীতজ্ঞ গোপেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়ের কৃতী সন্তান রমেশচন্দ্রও সারা ভারতে শাস্ত্রীয় সঙ্গীতজগতে বিশেষ খ্যাত ছিলেন। ১৯২৪ সালে তিনি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বি-এ পাশ করেন। রবীন্দ্রভারতী, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, বেনারস বিশ্ববিদ্যালয়, গৌহাটি বিশ্ববিদ্যালয় এবং রেডিও প্রভৃতির সঙ্গে তিনি যুক্ত ছিলেন। তিনি জার্মান প্রভৃতি দেশে আমন্ত্রিত হয়েছিলেন। তাঁর মৃত্যুতে সঙ্গীতজগতের অপূরণীয় ক্ষতি হল। বিশেষ করে ভারতের সঙ্গীতজগতে বাংলা দেশ এক যোগ্য প্রতিনিধিকে হারাল।

প্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের জীবনাবসান

চলচ্চিত্র অভিনেতা শ্রীপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় গত ১৪ই জানুয়ারী মঙ্গলবার হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে মারা গেছেন। ঐদিন সন্ধ্যায় বেলেঘাটায় 'কাবুলিওয়ালা' নাটকে অভিনয় করার সময় তিনি অসুস্থ হয়ে পড়লে তাঁকে এস এস কারনানি হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। সেখানেই তিনি শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করেন।

শ্রীমুখোপাধ্যায় সত্যজিৎ রায়ের ছবিতে বিশেষ পরিচিতি লাভ করেন। কাপুরুষ-মহাপুরুষ, গল্প হলেও সত্যি, বাক্স বদল, চিড়িয়াখানা, গুপী গাইন বাঘা বাইন সহ আরো অনেক ছবিতে তিনি অভিনয় করেছেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৬১ বছর। তিনি ৪ পুত্র ও ২ কন্যা রেখে গেছেন।

'এ ম্যানস ডেস্টিনি' ছবির দৃশ্য। আন্তর্জাতিক পুরস্কার প্রাপ্ত এই ছবিটি সোসাইটি সিনেমায় দেখান হচ্ছে।

সঙ্গীতকথা

মিতালী সুর-ছন্দম

মিতালী সুর-ছন্দমের প্রযোজনায় এবং সন্তোষ সেনগুপ্তের পরিচালনায় রবীন্দ্রনাথের শাপমোচন অনুষ্ঠিত হল রবীন্দ্রসদনে। সঙ্গীতে অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন : হেমন্ত মুখোপাধ্যায় ও কণিকা বন্দ্যোপাধ্যায়। এঁদের কণ্ঠের গানগুলি সুগীত হয়েছিল। কোরাস গানের সবগুলি আকর্ষণীয় হয়ে উঠতে পারে নি। নৃত্যে যাঁরা অংশ গ্রহণ করেছিলেন তাঁদের অনুশীলন আশানুরূপ হয় নি। তাছাড়া গানের সঙ্গে নাচের তাল ঠিক ছিল না। শাপমোচনের মূল সুরটিও সর্বত্র ঠিকমতো ফুটে উঠতে পারে নি। ছন্দপতনের অভাব সুরুর থেকে শেষ পর্যন্ত অনুভব করতে হয়েছে। এই প্রতিষ্ঠান কর্তৃক অতীতে অনুষ্ঠিত রবীন্দ্রগীতি এবং নৃত্যনাট্যগুলি অপেক্ষা আলোচ্য নাটোর মান আমাদের কিঞ্চিৎ আশাহত করেছে। মনে হয়, অনুশীলনের অভাবে হয়ত এমনতরো ঘটেছে। আশা করি উক্ত প্রতিষ্ঠান ভবিষ্যতে উচ্চমানের নৃত্যগীত পরিবেশন করতে সক্ষম হবেন।

মাসিক ১০৲ টাকা কিস্তিতে
ট্রানজিস্টার লউন

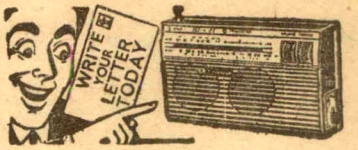

বিশ্ববিখ্যাত সর্বাধুনিক জাপান মডেল, চিত্তাকর্ষক শক্তিশালী, গ্যারাণ্টিযুক্ত "ওয়ার্ল্ডভয়েস" ৩ ব্যাণ্ড অল ওয়ার্ল্ড আশ্চর্যজনক নাইট ল্যাম্পযুক্ত। প্রত্যেক গ্রামে ও শহরে পাঠানো যায়।
Write to :—
ALL WORLD AGENCY,
(B.W.) Kalyanpura, Delhi–6.

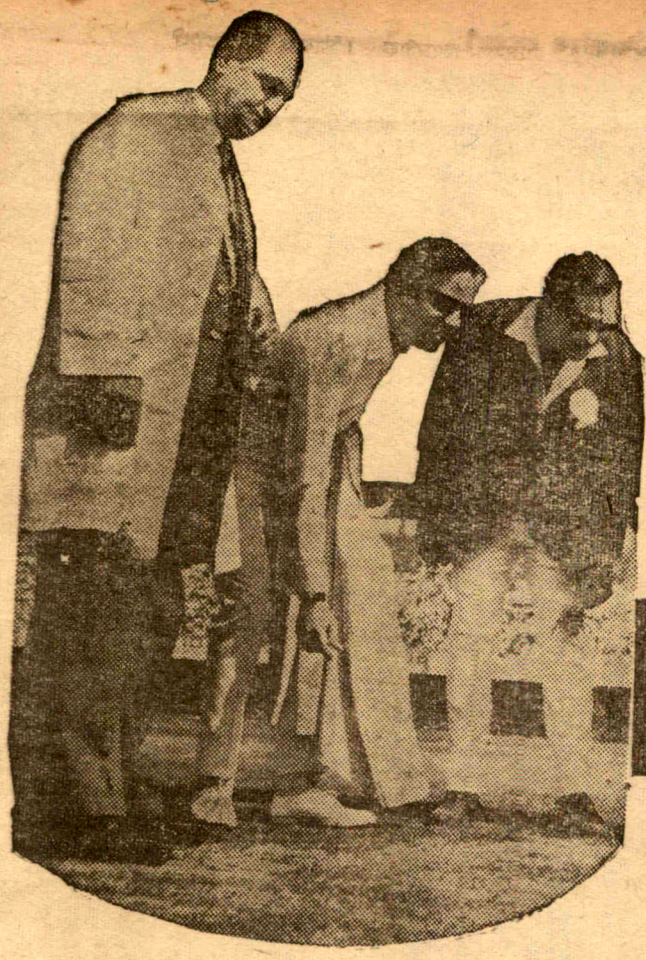

খেলাধুলা

খেলাও ছেলেখেলা

দিন কয়েক আগে ইডেন উদ্যানে খেলা নিয়ে বেশ খানিকটা ছেলেখেলা হয়ে গেলো। কারণ সেই রস-রঙ্গের আসরকে খেলার মর্যাদা দেওয়া যায় না কিছুতেই। তার ওপর আবার খেলার রাজা ক্রিকেটকে নিয়েই বসেছিল তামাসার আসরটা। তাই কলকাতার নতুন না হলেও চিত্রজগতের নায়ক-নায়িকাদের ঐ খেলাকে ছেলে-খেলা বলতেই হবে। সেই খেলায় ছেলেরা খেলেছেন, খেলেছেন মেয়েরাও। তবে ভারতীয় ক্রিকেটের ভাগ্য ভালো যে সত্যিকারের ক্রিকেটাররা ওঁদের সংগে খেলতে নামেন নি। তাহলে তাঁরা হয়তো সিলিতে ফিল্ডিং করতে গিয়ে সত্যি সিলি হয়ে উঠতেন। যাই হোক ইডেনে যে খেলার নামে ছেলেখেলার আসর বসেছিল তার উদ্দেশ্যটা কিন্তু মহৎই ছিল! উত্তরবঙ্গ বন্যাত্রাণ তহবিলে সাহায্যের জন্যে আয়োজন করা হয়েছিল ঐ খেলাটার। কিন্তু সব কিছু দেখে শুনে একটা কথাই শুধু মনে হয়েছে যে বন্যাত্রাণে সাহায্যের বিষয়টি একটা ছুতো। মাতামাতিটাই আসল। তা' নাহলে হাজার পঞ্চাশেক টাকা খরচ করা হতো না আনুষঙ্গিক ব্যয় হিসেবে আর কর্মপ্লিমেণ্টারি কার্ড আর ব্যাচের ছড়াছড়ি দেখা যেতো না মাঠে!

এই প্রসংগে আর একটা কথা না বলে পারছি নে। সেদিন যাঁরা মাঠে হাজির হয়েছিলেন তাঁদের অনেকে ইচ্ছে করলেই বেশ কয়েক হাজার টাকা ঐ তহবিলে দিতে পারতেন। সেটা অনেক বেশি শোভন হতো। আর বাঞ্ছনীয়ও ছিলো সেটাই। আমরা জানি যে ওঁদের অনেকের বিরুদ্ধেই আয়কর বিভাগের জোরালো রিপোর্ট আছে। সেদিক দিয়ে অপরাধী তাঁরা। সাধারণ লোক হলে ঐক্ষেত্রে নাকের জলে চোখের জলে এক হয়ে যেতো। কিন্তু ওঁদের যে সাতখুন মাপ। সুতরাং ওঁরা ভি· আই· পি'ই। এই প্রসংগে আর একটা কথা না বলে পারছি না। হয়তো শুনতে ভালো লাগবে না—তবু না বলেও উপায় নেই। উত্তরবঙ্গের বন্যার পর সাহায্য তহবিল নিয়ে তো অনেক হৈ-চৈ হলো। অনেক অনুষ্ঠান আর খেলার আসরও বসেছে। কিন্তু সেই সব আসর থেকে যে টাকা পাওয়া গেছে তা কি পাঠানো হচ্ছে তাঁদের কাছে যাঁদের কেন্দ্র করেই চলেছে ঐ সব আনন্দানুষ্ঠান। কারণ তাঁদের অতিবড় প্রয়োজনের সময় তাঁরা যদি কিছুই না পান তাহলে আর সে অর্থের দাম পরে তাঁদের কাছে থাকবে না এক কানা-কড়িও! তাই আজ আমরা জানতে চাই যে শিল্পীদের ক্রিকেট-রঙ্গ থেকে কতো টাকা পাওয়া গেলো, কতো টাকা খরচ হয়েছে ঐ খেলার আনুষঙ্গিক ব্যয় হিসেবে আর উত্তরবঙ্গে পাঠানো হয়েছে কতো টাকা এবং সে টাকা বিতরণ করা হয়েছে কিভাবে। আশা করি এ প্রশ্ন করার অধিকার বাংলাদেশের প্রতিটি ক্রীড়া-উৎসাহীর আছে.....!

—শান্তিপ্রিয়

ফুটবল-ফুটবল

এবার বাংলাদেশে ছোটদের জাতীয় ফুটবল ট্রফি এসেছে, এসেছে সুব্রত মুখার্জী কাপ, তারপর এলো রোভার্স কাপও। তাই সকলেই আশা করেছিলেন যে ডুরাণ্ড কাপটাও এবার বোধহয় কলকাতা তথা বাংলাদেশেই আসবে।

কিন্তু তাঁদের সেই আশার মুখে ছাই দিয়ে ডুরাণ্ড কাপ জিতে নিয়েছে বর্ডার সিকিউরিটি ফোর্স। ফাইন্যাল খেলায় তারা হারিয়ে দিয়েছে কলকাতার অন্যতম শ্রেষ্ঠ ও গত বছরের রোভার্স, ডুরাণ্ড কাপ বিজয়ী ইস্টবেঙ্গল ক্লাবকে।

বর্ডার সিকিউরিটি ফোর্স ফাইন্যালে উঠেছিল মোহনবাগানকে হারিয়ে আর ইস্টবেঙ্গল উঠেছিল জলন্ধরের লীডার্স ক্লাবকে পরাজিত করে। তবু ফাইন্যাল খেলায় ইস্টবেঙ্গলই ছিল ফেভারিট দল।

তাই বাংলাদেশের ফুটবল উৎসাহীদের বড় আশা ছিল যে, ডুরাণ্ড কাপ এবারও কলকাতায় আসবে। মোহনবাগান হেরে গেছে ঠিকই, কিন্তু ইস্টবেঙ্গল উঠেছে ফাইন্যালে। বর্ডার সিকিউরিটি ফোর্সকে হারিয়ে ইস্টবেঙ্গল নিশ্চয়ই ডুরাণ্ড কাপ লাভ করবে।

কিন্তু ফুটবল খেলায় বাংলাদেশের প্রাধান্য এখনো বজায় থাকলেও, অন্য রাজ্যগুলোও ফুটবল খেলায় কিছু আর পিছিয়ে নেই। তার প্রমাণ হলো বর্ডার সিকিউরিটি ফোর্স দলের ডুরাণ্ড কাপ লাভ, জলন্ধরের লীডার্স ক্লাবের উল্লেখযোগ্য ক্রীড়ানৈপুণ্য প্রদর্শন ও মোহনবাগান, ইস্টবেঙ্গল, মহামেডান স্পোর্টিং প্রভৃতির মতো নামকরা দলগুলোকে হারিয়ে দেওয়া প্রভৃতি।

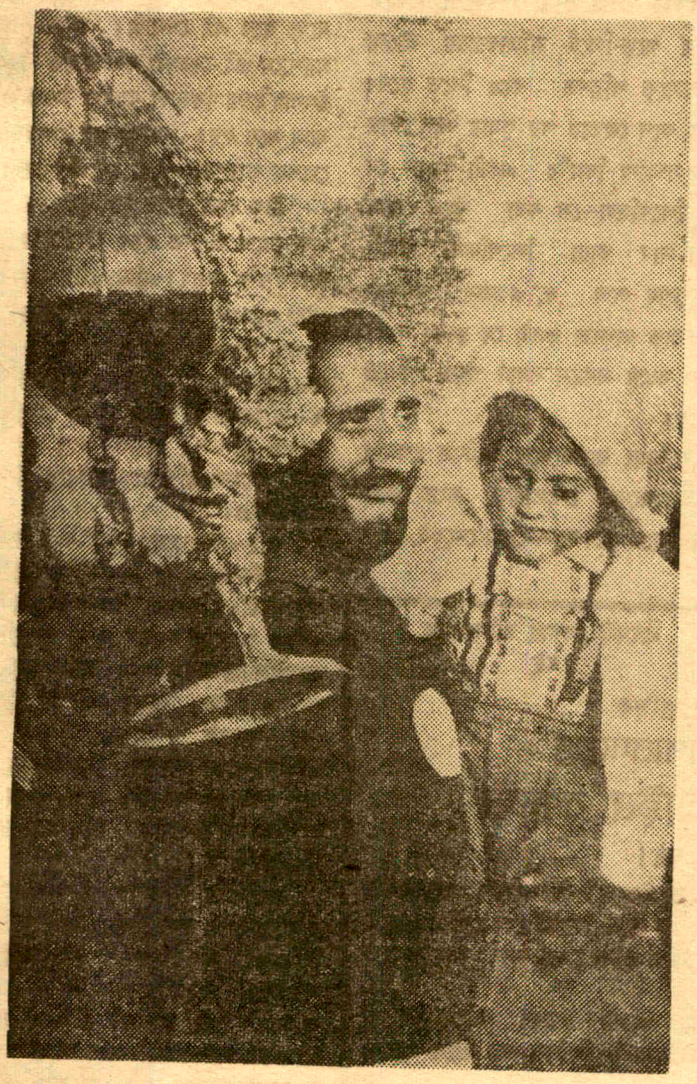

—জয়লাভের আনন্দে—

ডুরাণ্ড কাপ জেতার আনন্দে বিভোর জলন্ধরের বর্ডার সিকিউরিটি ফোর্স দলের গোলরক্ষক চরণজিৎ সিং সিমলা ট্রফি হাতে নিয়ে কোলে তুলে নিয়েছেন ছোট্ট মেয়েকে।

গল্পহলেও সত্যি

"একবার পেলের লেখা একখানি বই বাজারে ছাড়বার আগে প্রকাশক তাঁকে অনুরোধ করেন তাঁর লেখা বইগুলির প্রত্যেকটিতে তাঁর নিজের নাম সই করে দেবার জন্য। পেলে রাজী হলেন এবং প্রকাশককে জানিয়ে দিলেন যে, তিনি তাঁর দোকানে উপস্থিত হয়ে বইগুলিতে সই করে দেবেন। প্রকাশকের দোকানে পেলের আগমনের খবরটা যে কিভাবে ছড়িয়ে পড়েছিল! যেদিন পেলের আসার কথা সেই দিনই সকাল থেকে হাজার হাজার ক্রীড়ামোদী এসে হাজির হলো সেই প্রকাশকের দোকানের সামনে। লোকের ভিড় ক্রমে ক্রমে এত বেশি হতে লাগলো যে, দু'-তিন শো পুলিশও সেই জনতাকে ঠেকিয়ে রাখতে পারলো না। ফলে সুরু হলো ঠেলাঠেলি ও ধাক্কা-ধাক্কি।

সমস্ত বই সই করে পেলে যখন বেরিয়ে আসছিলেন তখন তাঁকে ঘিরে ধরলো সেই বিরাট জনতা। তাঁরা পেলের নিকট চাইলেন কিছু স্মৃতিচিহ্ন।

পেলে যখন জানালেন যে, তিনি খালি হাতেই প্রকাশকের দোকানে এসেছেন কোন কিছু স্মারক হিসেবে দিতে অক্ষম। তাতেও তাঁরা তাঁকে ছেড়ে দিলেন না। তাঁরা পেলের পরিহিত পোষাক থেকে টুকরো টুকরো অংশ কেটে নিয়ে তাঁকে প্রায় খালিগায়ে দাঁড় করিয়ে দিলেন। উপরন্তু তাঁরা খুলে নিয়ে গিয়েছিলেন পেলের মোটরগাড়ির বহু প্রয়োজনীয় সরঞ্জাম। আর সেই জন্যেই তাঁর গাড়ি ঠেলে বাড়ি পৌঁছে দিতে হয়েছিল সেই ভাগ্যবান প্রকাশকটিকে।

—এই মজার ঘটনার কথা লিখে পাঠিয়েছেন জলপাইগুড়ি থেকে শ্রীপরিতোষ নাগ।

॥ সুব্রত গুহ ॥

ইডেনের নতুন উইকেট থেকে দলীপ ট্রফির সেমিফাইন্যাল খেলায় সুব্রত অনেক সাহায্য পেলেও সমস্ত ইনিংসে তিনি সুন্দর বোলিং করেছিলেন।

তবে এ কথা আজ আর বোধহয় কেউই অস্বীকার করতে পারবেন না যে, ভারতের বিভিন্ন রাজ্যগুলির মধ্যে ফুটবল খেলায় পাঞ্জাব এবং পাঞ্জাবী খেলোয়াড়পুষ্ট দলগুলো যথেষ্ট এগিয়ে এসেছে।

কেউ কেউ হয়তো বলবেন যে, দিল্লীর হাড়-কাঁপানো ঠাণ্ডায় আর শুকনো মাঠ অর্থাৎ হার্ড গ্রাউণ্ডে খেলতে বাংলাদেশের খেলোয়াড়রা যথেষ্ট অসুবিধার সম্মুখীন হন। সে কথা ঠিকই। কিন্তু আজ আর শুধু ডুরাণ্ডে নয়, রোভার্স আর খোদ আই· এফ· এ শীল্ডের খেলাতেও লীডার্স ক্লাবের মতো দলগুলো উন্নত ধরণের ক্রীড়ানৈপুণ্যের পরিচয় দিতে সমর্থ হয়েছে এবং হচ্ছে।

যাই হোক আজ এই প্রসংগে একটা কথা বলার বড় বেশি প্রয়োজন—ভারতের অন্য রাজ্যগুলোর সংগে পাল্লা দিয়ে বাংলাও যদি ফুটবল খেলার উন্নতির জন্যে প্রচেষ্টা শুরু না করে তাহলে ভারতীয় ফুটবল জগতে আগামী কয়েক বছরের মধ্যে বাংলা যথেষ্ট পিছিয়ে পড়বে।

তাই আজ দরকার স্কুল থেকেই ছাত্র-খেলোয়াড় সংগ্রহ করে প্রশিক্ষণের মাধ্যমে তাদের গড়ে-পিটে সত্যিকারের ভালো খেলোয়াড়ে পরিণত করে নিতে হবে। সুব্রত কাপ জেতার পর কুমার আশুতোষ স্কুল সম্বন্ধে দিল্লীর একটা কাগজ যে কথা লিখেছিল—সে কথা ভুলে গেলে চলবে না। তারা লিখেছিল, কুমার আশুতোষ দলে দু'-একজন অভিজ্ঞ খেলোয়াড় থাকলে দলটা যে কোন নামী দলের সংগে সমানে সমান পাল্লা দিতে পারবে।

সুতরাং বাংলাদেশে ফুটবল খেলার উন্নতির জন্যে খেলোয়াড় সংগ্রহ করা শুরু করতে হবে স্কুলগুলো থেকেই...।

ক্রিকেটের খবর

কলকাতায় ক্রিকেটের আসর এখন জম-জমাট। এ লেখা যখন আপনাদের হাতে পৌঁছুবে ততদিন শেষ হয়ে যাবে দলীপ ট্রফির পূর্ব বনাম দক্ষিণ অঞ্চলের খেলা।

আর এখন বসছে প্রদর্শনী ক্রিকেটের আর এক মনভোলানো আসর। প্রধানমন্ত্রী একাদশ বনাম রাজ্যপালের দলের মধ্যে হবে এই খেলাটা। ফাঁকা ক্রিকেট মরশুমে এই খেলাটা কলকাতার ক্রিকেট-উৎসাহীদের কিছুটা আনন্দ দিতে পারবে বলে মনে হয়। কারণ এই খেলায় যোগ দেবেন ভারতের সেরা খেলোয়াড়রা।

ঠিক সেই সময় সাগরপারের আর এক দেশে আরম্ভ হচ্ছে টেস্ট ক্রিকেটের আকর্ষণীয় লড়াই। এডিলেডের মাঠে চতুর্থ টেস্ট ম্যাচকে কেন্দ্র করে অস্ট্রেলিয়া আর ওয়েস্ট ইণ্ডিজ মিলিত হচ্ছে সম্মুখ সমরে। অস্ট্রেলিয়া এখন এগিয়ে আছে ২—১ খেলায়। প্রথম টেস্টে জিতেছিল ওয়েস্ট ইণ্ডিজ তারপর পর পর দু'টি টেস্টে ওয়েস্ট ইণ্ডিজকে হারিয়ে দিয়েছে অস্ট্রেলিয়া।

তাই এডিলেডের চতুর্থ আর সিডনির পঞ্চম টেস্টের ওপর নির্ভর করছে ফ্রাঙ্ক ওরেল ট্রফির ভাগ্য। ফ্রাঙ্ক ওরেল ট্রফি ওরেল নিজের হাতেই তুলে দিয়েছিলেন অস্ট্রেলিয়ার তদানীন্তন অধিনায়ক রিচি বেনোর হাতে। এবার সেই ট্রফি নিজেদের আয়ত্তে রাখার জন্য তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতা চালাচ্ছেন বিল লরী। দেখা যাক শেষ পর্যন্ত টেস্ট যুদ্ধে সোবার্সকে হারিয়ে লরী ওরেল ট্রফি লাভ করতে পারেন কি না.....।

ভারতীয় স্কুল ক্রিকেট দলও ফিরে এলো দেশে। অস্ট্রেলিয়ার মাটিতে তারা দিয়ে এসেছে উন্নত ক্রীড়ানৈপুণ্যের পরিচয়। ভারতীয় স্কুল ক্রিকেট দলের অধিনায়ক রাজা মুখার্জী ও স্পিন বোলার দীপঙ্কর সরকারের নাম পূর্ব অঞ্চল দলের খেলোয়াড় তালিকায় আছে। আশা করা যায় সুদূর ভবিষ্যতে এঁরা দু'জন টেস্ট ক্রিকেটের আসরে ভারতের প্রতিনিধিত্ব করতে সক্ষম হবেন।

বাংলা ভাষায় প্রথম প্রকাশিত

ক্রিকেট খেলার অদ্বিতীয় বই

খ্যাতনামা ক্রীড়াসাংবাদিক

শান্তিপ্রিয় বন্দ্যোপাধ্যায়ের

ক্রিকেট খেলার আইন কানুন

[দাম—চার টাকা মাত্র]

গল্প উপন্যাসের চেয়েও আকর্ষণীয় ক্রিকেট উৎসাহীদের সবচেয়ে প্রয়োজনীয় বই। ক্রিকেট খেলা শিখতে হলে, ক্রিকেট খেলা জানতে হলে, ক্রিকেট খেলা বুঝতে হলে এই বইটি পড়তে হবে। শুধু বড়রাই নন, ছোটরাও হাতে পেলে বইটা আর ছাড়তে চাইবেন না।

অজস্র ছবি আর স্কেচে ভরা বইটির আর একটা বিশেষ আকর্ষণ হলো ক্রিকেটের অভিধান। আর কোন বইতে এতো প্রয়োজনীয় জিনিস এক সংগে পাওয়া যাবে না।

জ্ঞানতীর্থ

[১নং বিধান সরণী, কলকাতা—১২]

...থায় বলে, ভাগ্যবানের বোঝা ভগবানে বয়...!

খেলার মাঠের সাম্প্রতিক সেই ভাগ্যবানটি হলেন অস্ট্রেলিয়ার অধিনায়ক বিল লরী। কথাটা যে এতোটুকুও বাড়িয়ে বলা হচ্ছে না তার প্রমাণ হলো

পরিচীয়তে

অস্ট্রেলিয়া বনাম ওয়েস্ট ইণ্ডিজের সদ্য সমাপ্ত তিনটি টেস্ট ম্যাচ। প্রথম টেস্টে হেরে যাবার পর ওয়েস্ট ইণ্ডিজের মতো দলকে পর পর দু'টি টেস্টে হারানো আর যাই হোক খুব একটা সহজ কথা নয়।

অবশ্য অস্ট্রেলিয়ার ঐ জয়লাভের পেছনে ছিলো দলনায়ক বিল লরীর অনবদ্য অবদান। শুধুমাত্র দল পরিচালনাতেই নয়, ব্যাটিং-এও তিনি দিয়েছেন অভাবনীয় সাফল্যের পরিচয়। আর সেই সাফল্যই তাঁকে এনে দিয়েছে জয়লাভের পুরস্কার।

ওরেল নিজের নামের যে ট্রফি হাতে করে তুলে দিয়ে গিয়েছিলেন রিচি বেনোকে, সেই ফ্রাঙ্ক ওরেল ট্রফি যদি শেষ পর্যন্ত এবারও রাখতে পারেন নিজেদের করে, তাহলে সেইটাই হবে লরীর সব থেকে বড় পুরস্কার।

(পরিচীয়তের শেষাংশ পর পৃষ্ঠায়)

ফুটবলের মান কোন পথে?

• নীলিমেশ রায়চৌধুরী •
(সংকলক)

[ফুটবল খেলার মান ও সৌন্দর্য নিয়ে সমস্ত বিশ্ব এখন আলোচনায় মত্ত। সেই আলোচনার কিছু ভাগ আমাদের পাঠক-পাঠিকাদের কাছে বিগত কয়েক সংখ্যায় পরিবেশন করা হয়েছে। এই সংখ্যার শেষ কিস্তিতে আমরা প্রকাশ করছি ভারতের প্রাক্তন অধিনায়ক প্রদীপ ব্যানার্জীর মতামত। —ক্রীড়া সম্পাদক]

প্রদীপ ব্যানার্জী (রোম ওলিম্পিকে ভারতীয় ফুটবল দলের অধিনায়ক)

আগের দিন সব কিছু শুনে বলেছিলাম বিষয়বস্তুটা সহজ নয়। তার পর শুরু করলেন কথা বলতে। বিভিন্ন কথার মাঝে যে কথাটার উল্লেখ ছিল বেশি তাহ'ল—"গতির সাথে পাল্লা দিতে গিয়ে ফুটবল সবকিছু হারিয়ে ফেলেছে।"

"আজকাল সব খেলাই ধারা বদলেছে। প্রতিটি খেলার গতি বাড়ছে। ফুটবলও সেই পথে।

"কিন্তু ফুটবল খেলায় গতি বাড়ায় সেই গতির সাথে পাল্লা দেওয়ার মত খেলোয়াড় যে তৈরি হচ্ছে না। আগে বল আয়ত্তে রাখতে খেলোয়াড়েরা সময় পেতেন বেশি। কিন্তু আজ? বল পায়ে আসার আগেই ঘাড়ে নিশ্বাসের হাওয়া লাগতে শুরু করে—অতএব একটা খেলোয়াড়কে কতটা তৎপর হলে নিজেকে সামলে গোটা খেলা সামাল দিতে পারেন। কিন্তু সেই ধাঁচের খেলোয়াড় কই?

"তারপর আর একটা কথা হল যে, ফুটবল খেলতে হলে দৈহিক সক্ষমতা দরকার একথা হাজারো বার সত্য কিন্তু অহেতুক খেলার মাঝে দৈহিক বল প্রয়োগ নিশ্চয়ই ফুটবল খেলা নয়! বিশ্ব কাপের আসরেই দেখুন না দলে খেলোয়াড়কে নির্বাচনই করা হয়েছে বিপক্ষ দলের আর একজনকে ঘায়েল করার জন্যই—তার জ্বলজ্বলে দৃষ্টান্ত পেলে। অতদূরে কেন যাই—এশীয় দেশগুলির মধ্যে ইরানও ঐ ধরণের ফুটবল খেলে। তাই বলছি এই অহেতুক দৈহিকশক্তি প্রয়োগর ফলে ফুটবলের আসল সৌন্দর্যে টান পড়ছে। কারণ মান ও সৌন্দর্য দু'টোই খেলোয়াড়দের ওপর নির্ভর করে—সেক্ষেত্রে খেলোয়াড়রা যদি শিল্পীর আসল ছোঁয়া মাঠে রাখতে না পারেন এই দৈহিকশক্তির অপপ্রয়োগের জন্য তাহলে ও দুটোর কোনটারই উন্নতি হবে না। এক্ষেত্রে আইন আরও কড়া হওয়া দরকার।

"পরিসংখ্যান থেকে দেখা গেছে যে আজকাল প্রায় প্রতিটি বড়ো আসরে ৩ থেকে ৪টি গোলের সুযোগ সৃষ্টি হয় এবং তার থেকে ২টো কি ৩টে ক্ষেত্রে গোল হয়। খেলার ধারা এমন হয়ে গেছে যে, গোলের সংখ্যা এবং সুযোগ দুই-ই কমে আসছে। আসলে আজকালকার ফুটবল মূলত রক্ষণাত্মক হয়ে যাচ্ছে। কেউ আর কি হারতে চায় না। নইলে নতুন প্রথা চালু হচ্ছে কেন—চারজন ব্যাকের পেছনে আরও একজন 'সুইপার'? তাই এ ধরণের রক্ষণাত্মক ফুটবলে আক্রমণ গড়তে গেলে যে দক্ষ ফরোয়ার্ড বা অলরাউণ্ডারের দরকার তার অভাব আছে প্রচুর। অবশ্য 'বেকেনবায়ারের' মত সার্থক লিংকম্যান যদিও আজকের খেলোয়াড় তবুও এ জাতের খেলোয়াড় তো গোটা পৃথিবীতে হাতে গোণা যায়। পেলে-ইউসেবিওর মতো ফরোয়ার্ডও তো আছেন, তবে তাঁরা তো আজকের ব্যতিক্রম যেহেতু মুষ্টিমেয়।

"খেলার মাঝে খেলোয়াড় বদলেও খেলার সৌন্দর্যহানি হয়। হ্যাঁ—আহত খেলোয়াড়ের পরিবর্তে নতুন খেলোয়াড় নামানো তাও সমর্থন করা যায় কিন্তু আজকাল যখন-তখন যে কোন খেলোয়াড়কে বদল করা হচ্ছে, এর অর্থ? একজনের দম নষ্ট হয়ে যাওয়ার জন্য বিপক্ষ দল বাড়তি সুযোগ পাবে সেক্ষেত্রে খেলোয়াড় বদল কেন? আর তাছাড়া খেলার মাঝে ছন্দঃপতন ঘটে এই নতুন পরিবেশে নতুন খেলোয়াড়ের আগমনে। আসলে খেলোয়াড়েরা হলেন এক-একটা তার তাদের সংযোজনে তানের উদ্ভব হয়, বিভিন্ন তারের তানে ঐকতানের সৃষ্টি হয়। কিন্তু হঠাৎ যদি একটা তার খুলে আর একটা নতুন তার লাগানো হয় তবে যে সুরের মিষ্টতা ছিল এতক্ষণ তাতে টান পড়বে নিশ্চয়ই। এ ক্ষেত্রেও ঠিক তাই। আসলে এটা ফুটবল মাঠ সেটা ভুলে গেলে চলবে না।

হরিসাধন মুখোপাধ্যায় (উখরা, বর্ধমান)

প্রশ্ন : মোহনবাগান ক্লাব কোন্ কোন্ সালে ডুরাণ্ড ও রোভার্স কাপ জয় করেছেন জানাবেন কি?

উত্তর : ডুরাণ্ড কাপ জিতেছে ১৯৫৩ সালে, ১৯৫৯ সালে, ১৯৬৩ সালে ইস্টবেংগলের সংগে যুগ্ম আর ১৯৬৩ থেকে ৬৫ সাল পর্যন্ত।

রোভার্স কাপ জিতেছে ১৯৫৫ সালে, ১৯৬৬ সালে আর ১৯৬৮ সালে।

আপনার অপর প্রশ্নের উত্তরের জন্যে এবারের প্রথম উত্তরটা দেখুন।

সোমনাথ গঙ্গোপাধ্যায় (হালিসহর, গোলাবাড়ি, ২৪ পরগনা)

প্রশ্ন : বর্তমানে আপনার মতে ক্রিকেট জগতের শ্রেষ্ঠ ফাস্ট বোলার জুটি কে কে? তাঁরা কোন্ দেশের খেলোয়াড়?

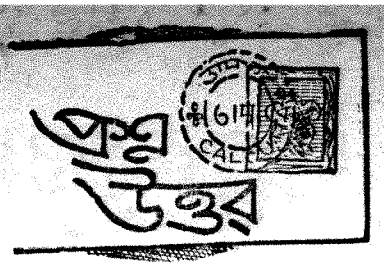

উত্তর : ঠিক এই মুহূর্তে এ প্রশ্নের উত্তর দিই কি করে? ক'দিন আগে হলেও বলতাম ওয়েস্ট ইণ্ডিজের হল আর গ্রিফিথের নাম! কিন্তু এখন.....! আর ক'টা দিন যাক—তারপর জানাবো!

আপনার আগের দুটো চিঠির একটাও পাই নি।

প্রবীরকুমার দাস (শান্তিনিকেতন, বিশ্বভারতী) ও **অসীমকুমার চট্টোপাধ্যায়** (চন্দননগর স্পোর্টিং এ্যাসোসিয়েশন, চন্দননগর, হুগলী)

উত্তর : আপনাদের চিঠির জন্যে ধন্যবাদ। মনে হয় প্রশ্ন দুটির উত্তর নিয়ে ভুল বোঝাবুঝি হয়েছে। কারণ একবার প্রশ্ন ছিল, ব্যাটসম্যান দ্বিতীয়-বার ব্যাট দিয়ে বল মারতে পারেন কি না। এর উত্তরে নিশ্চয়ই বলতে হবে পারেন না। দ্বিতীয় প্রশ্নটি ছিল যে ব্যাটসম্যান ব্যাট দিয়ে বলটা থামাতে গিয়ে যদি মেরে বসেন তাহলে তো তিনি আউট হবেন। সেক্ষেত্রে কি করা উচিত?

যাই হোক এই গোলমালের হাত থেকে রেহাই পাবার জন্যে ক্রিকেট খেলার আইন-কানুনের ৩৭নং নিয়মটি (ব্যাট দিয়ে বল দুবার আঘাত করা [হিট দি বল টোয়াইস]) তুলে দিলাম :

ব্যাটসম্যান বলে দুবার আঘাত করার জন্যে আউট হবে—যদি বলটি থেমে যাবার পর (যে কোনভাবেই হোক ব্যাটে লেগে কিম্বা ব্যাটসম্যানের শরীরে লেগে) ব্যাটসম্যান পুনরায় ইচ্ছে করে বলটি মারেন। কিন্তু উইকেট বাঁচানর জন্যে ব্যাটসম্যান ব্যাট দিয়ে কিম্বা দেহের যে কোন অংশ, শুধু হাত দিয়ে, বলটি মারতে বা থামাতে পারেন। এই রকম অবস্থায় অর্থাৎ ব্যাট দিয়ে বলটি দুবার মারলে একমাত্র 'ওভার থ্রো' ছাড়া আর কোন রান হবে না।

দ্রষ্টব্য :

(১) বলটা দ্বিতীয়বার মারা হয়েছে ইচ্ছে করে কিম্বা উইকেট বাঁচাবার জন্যে, তার বিচার একমাত্র আম্পায়ারই করবেন।

(২) বলটি খেলার পর, অপর পক্ষের অনুরোধ ব্যতিরেকে যদি ব্যাট দিয়ে বল মেরে ফেরত দেন তাহলেও এই নিয়ম কার্যকরী হবে।

(৩) এইভাবে আউট হলে ব্যাটসম্যানের পাশে স্কোর বোর্ডে 'হিট দি বল টোয়াইস' লেখা হবে এবং এই আউটে বোলারের কোন কৃতিত্ব নেই।

(৪) ব্যাটসম্যান কোনক্রমেই দ্বিতীয়বার বল মারতে সচেষ্ট হতেই পারেন না যার ফলে উইকেটরক্ষক বা কোন ফিল্ডসম্যানের ক্যাচ লোফার অসুবিধা বা বাধার সৃষ্টি হতে পারে।

নৃপেন্দ্রমোহন ভদ্র (বাসশ্রী, সুভাষ-পল্লী, শিলিগুড়ি)

প্রশ্ন : কোন ব্যাটসম্যানের মাথায় টুপি আছে। কিন্তু একটি রান করার সময় তার মাথার টুপি উড়ে গিয়ে পড়লো স্টাম্পের ওপর। বেলও পড়ে গেলো। ব্যাটসম্যান কি আউট হবে না নট আউট থাকবে।

উত্তর : ব্যাটসম্যান আউট হবে না।

শিপ্রা ও পিপড়া (রায়গঞ্জ, বীরনগর)

প্রশ্ন : "বর্তমান জগতে, ক্রিকেট ক্যাপ্টেনের সাথে (পতৌদি) সিনেমা জগতের অভিনেত্রী শর্মিলার সাথে শুভ পরিণয় হলো এর মধ্যে লাভবান কে?"

উত্তর : *Love* (বান) হলো যাদের...!

এস কলী (স্টেশনবাজার, ভদ্রক, দঃ পূঃ রেলওয়ে)

(পরিচায়কের শেষাংশ)

যাই হোক অস্ট্রেলিয়ার অধিনায়ক বিল লরীর বয়েস কিন্তু খুব একটা বেশি নয়। এই ফেব্রুয়ারীতে ৩২ বছরে পড়বেন লরী। জন্ম ১৯৩৭ সালের ১১ই ফেব্রুয়ারী।

চব্বিশ বছর বয়সে লরী প্রথম টেস্ট খেলার সুযোগ পান। এ সেই ১৯৬১ সালের কথা। সেবার লর্ডস টেস্টে ১৩০ আর ম্যাঞ্চেস্টার টেস্টে ১০২ রান করে লরী অস্ট্রেলিয়ান দলে নিজের স্থানটা পাকা করে নেন।

তারপর থেকে সমানে খেলে চলেছেন লরী। ১৯৬৪ সালে আবার সিম্পসনের সংগে একযোগে স্থাপন করেছিলেন একটি নতুন অস্ট্রেলিয়ান রেকর্ড। ইংলণ্ডের বিরুদ্ধে ট্রাফোর্ডের চতুর্থ টেস্টে লরী আর সিম্পসন ১ম উইকেটে ২০১ রান করে অস্ট্রেলিয়ার পক্ষে নতুন রেকর্ড প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। সেই টেস্টে লরী করে-ছিলেন ১০৬ রান। তবে সিম্পসন আউট হয়েছিলেন ৩১১ রান করার পর।

তারপর কেটে গেছে আরো কয়েকটা বছর। লরী এখন অস্ট্রেলিয়ার যোগ্য অধিনায়ক। লক্ষ্য তাঁর এখন একমাত্র ব্লাক ওরেল ট্রফি জয় করা। দেখা যাক শেষ পর্যন্ত লরী তাঁর লক্ষ্যে পৌঁছুতে পারেন কি না.....!

সম্পাদিকা—জয়ন্তী সেন

বসুমতী (প্রাঃ) লিঃ-এর পক্ষে ১৬৬, বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী স্ট্রীটস্থ কলিকাতা-১২

বসুমতী প্রেস হইতে শ্রীসুকুমার মুখোপাধ্যায় কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

১৯৮৪

দুইটি বা তিনটি সন্তানের পরিবারই আদর্শ পরিবার

জেনে রাখুন ঃ

- পরিবারকল্যাণই পরিবার পরিকল্পনা
- যে কোন পরিবার পরিকল্পনাকেন্দ্রেই বিনামূল্যে নিরোধ এবং যাবতীয় পরামর্শ পাওয়া যায়
- হিন্দুস্থান লিভারে উৎপাদিত দ্রব্যাদি যে সব দোকানে বিক্রী হয় সেই সব দোকানে মাত্র ১৫ পয়সায় তিনটি কণ্ডে নিরোধ কিনতে পাওয়া যায়
- তিনটি সন্তান না হওয়া পর্যন্ত নিরোধ ব্যবহার করে দুই সন্তানের জন্মের মধ্যবর্তী সময়ের ব্যবধান বাড়ান সম্ভব
- তিনটি সন্তানলাভের পর স্থায়ীভাবে জন্মনিরোধের জন্যে অস্ত্রোপচারই শ্রেষ্ঠ পদ্ধতি

আজই আপনার নিকটবর্তী যে কোন পরিবার পরিকল্পনাকেন্দ্র বা স্বাস্থ্যকেন্দ্রে যোগাযোগ করে বিনামূল্যে অভিজ্ঞ চিকিৎসকের পরামর্শ নিন।

(পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পরিবার পরিকল্পনা সংস্থা কর্তৃক প্রচারিত)

Thursday, 23rd January, 1969 SAPTAHIK BASUMATI Regd. No. C 71
Price : 30 Paise Gram : "Basumati" Phone : 34-7771, 72, 73, 74

F 3 FEB 1969

বিভিন্ন রুচিবিজ্ঞ মেয়েরাঃ

কিন্তু সবার রুচিকেই কুকমী পরিতৃপ্ত করে !

গ্রাম : 'স্পাইসমার্ট' মিল—কাশীপুর

শিশুর খাদ্যে ও রুগীর পথ্যে নির্ভয়ে ব্যবহৃত হয়
'কুকমী'—সর্বাধিক বিক্রীত গুঁড়ো মশলা
পনের লক্ষ প্যাকেট মাসিক বিক্রয়
১২০ বৎসরের অধিক প্রাচীন ও বর্তমানে মশলার বৃহত্তম প্রতিষ্ঠান

কৃষ্ণচন্দ্র দত্ত (স্পাইস) প্রাঃ লিঃ

১৩৫ নং মহর্ষি দেবেন্দ্র রোড, কলিকাতা-৭

সাপ্তাহিক বসুমতী

ভোটযুদ্ধে গ্রামবাংলায় পোস্টারের ছড়াছড়ি

৭৩ বর্ষ ঃ ৩২শ সংখ্যা, বৃহস্পতিবার, ১৬ই মাঘ, ১৩৭৫ বঙ্গাব্দ] OLDEST WEEKLY OF NORTH INDIA [73rd year, No. 32, 30th Jan. 1969

সূচীপত্র

বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা
সম্পাদকীয়		১৯৮৭
আজকের মানুষ		১৯৮৮
রবীন্দ্রনাথ ও সুভাষচন্দ্র (ধারাবাহিক প্রবন্ধ)	— শঙ্করীপ্রসাদ বসু	১৯৮৯
বঙ্গদর্শন		১৯৯৩
ভারতদর্শন		২০০০
আন্তর্জাতিক		২০০৩
কংগ্রেস ফ্রন্ট বনাম মহাফ্রন্ট	—প্রদ্যোত রায়	২০০৫
নদীয়ায় নির্বাচন	— অসীম মুখোপাধ্যায়	২০০৮
আসন্ন মধ্যবর্তী নির্বাচন ও তার পরিপ্রেক্ষিত	— সাগর বিশ্বাস	২০১২
কথায় কথায়	— নিবারণ মনেশী	২০১৭
চতুর্থ সাধারণ নির্বাচনের শিক্ষা	— পর্যবেক্ষক	২০১৯
বার্লিনে নেতাজী (প্রবন্ধ)	— অশোক সেন	২০২২

যে কোন
গয়না
আর
আসল
গহরত্ন
কেনার
দক্ষিণ কোলকাতায়
নামকরা প্রতিষ্ঠান

ফোন : ৪৬-৬২৫৮

সব অ্যাণ্ড গ্র্যাণ্ডসন্স অব লেট
এম. বি. সরকার

এম.সরকার
এণ্ড সন্স

সূচীপত্র

বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা
আনন্দের নাম (কবিতা)	— বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়	২০২৪
মধ্যবর্তী নির্বাচন ও বিভিন্ন সম্ভাবনা	— সাংবাদিক	২০২৫
পথ কে রুখবে? (ধারাবাহিক উপন্যাস)	— মনোজ বসু	২০২৭
পথে বিপথে (গল্প)	— হরেন ঘোষ	২০৩০
ঋত্বিকের দেশে	— গীতা বন্দ্যোপাধ্যায়	২০৩৩
চিত্রলেখা	— দেবব্রত মুখোপাধ্যায়	২০৩৫
গ্রন্থমেলা		২০৩৮
বৃদ্ধজগৎ		২০৩৯
খেলাধুলা	— শান্তিপ্রিয়	২০৪৪

কবিকঙ্কণ চণ্ডী

মুকুন্দরাম চক্রবর্তী

(কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতকোত্তর বিভাগের পাঠ্যপুস্তক)

মধ্যযুগের বঙ্গসাহিত্যে কবিকঙ্কণ মুকুন্দরাম চক্রবর্তীই সর্বশ্রেষ্ঠ কবি। তাঁহার চণ্ডীর কাহিনী বাঙ্গালার বিশিষ্ট জাতীয় জীবনের কাহিনী। তাঁহার কাব্যে পাই মধ্যযুগের বাঙ্গালার সমাজের সুস্পষ্ট আলেখ্য। শাসক সম্প্রদায়ের দ্বারা নির্যাতিত বাস্তুচ্যুত মুকুন্দরাম দুঃখ ও বেদনাক্লিষ্ট বাঙ্গালার প্রতিনিধি কবি—ব্যক্তির দুঃখ কি করিয়া সর্বজনের দুঃখ হইতে পারে বাঙ্গালা সাহিত্যে তাহা মুকুন্দরামই সর্বপ্রথম দেখাইয়াছেন। এই হিসাবে তিনি আধুনিক বাঙ্গালার রোমান্টিক সাহিত্যসাধনার অগ্রদূত।

—বর্তমান গ্রন্থে আছে—

১। মূল কাব্য, ২। সুবিস্তৃত ভূমিকা, ৩। কবির জীবনী, ৪। কাব্য-পরিচিতি ৫। কবিকঙ্কণচণ্ডীর বঙ্গভাষা (ঋষি বঙ্কিমচন্দ্র লিখিত), ৬। অধ্যাপক শ্রীবিজিতকুমার দত্তের সুলিখিত ভূমিকা, ৭। বিস্তৃত কাব্য সমালোচনা এবং ৮। অপ্রচলিত শব্দের অর্থ।

মূল্য সাড়ে চার টাকা

ভক্তসাধক, কবিরঞ্জন রামপ্রসাদ সেনের
ভক্তিমাধুরী-রঞ্জিত

রামপ্রসাদ গ্রন্থাবলী

শ্রীশ্রীকালী-কীর্তন, বিদ্যাসুন্দর, পদাবলী, শ্রীকৃষ্ণকীর্তন, সীতা-বিলাপ, আগমনী, বিজয়া, অপূর্ব প্রকাশিত কবিতাবলী, কবির জীবনী।

একত্রে মূল্য তিন টাকা

উজ্জয়িনীর সেই বিশ্ব-চিত্তজয়ী বিশ্ববিমোহন মহাকবি—
সারস্বতকুঞ্জের পুণ্যজ্যোৎস্না—সাহিত্য-জগজ্জ্যোতি—
প্রতিভা ও মনীষার অবতার—সরস্বতীর বরপুত্র—
সৌন্দর্যের মহাকবি—

কালিদাসের গ্রন্থাবলী

সর্বাঙ্গসুন্দর রাজাধিরাজ সংস্করণ

অনুবাদক—বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক সাহিত্য রস-সুরসিক
পণ্ডিত রাজেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ

প্রথম ভাগে :—রঘুবংশ, মালবিকাগ্নিমিত্র, ঋতুসংহার, পুষ্পবাণবিলাস, শৃঙ্গার-তিলক, শৃঙ্গার-রসাষ্টক। ৬·০০

দ্বিতীয় ভাগে :—কুমারসম্ভব, নলোদয়, মেঘদূত। ৬·০০

তৃতীয় ভাগে :—শকুন্তলা, বিক্রমোর্বশী, শ্রুতবোধ, দ্বাত্রিংশৎ-পুত্তলিকা, কালিদাস-প্রশস্তি। ৮·০০

প্রাচীন-সাহিত্যের-গৌরব-মুকুট—
সাহিত্যের চির-সমাদৃত কোকিল—
রায়গুণাকর

ভারতচন্দ্রের গ্রন্থাবলী

অন্নদামঙ্গল, বিদ্যাসুন্দর, মানসিংহ, চোরপঞ্চাশৎ, রসমঞ্জরী, সত্যপীর, ধেড়েভেড়ের কৌতুক, ফর্দরফৎ, হিন্দী কবিতালহরী, বলিরাজা, চণ্ডী, নাগাষ্টক, সংস্কৃত, পার্শী, হিন্দী নানা ভাষার কবিতাবলী, কবির জীবনী, ঋতু-বর্ণনা, রাধাকৃষ্ণের প্রেমালাপ, কবিতাবলী।

মূল্য তিন টাকা

বসুমতী প্রাইভেট লিমিটেড: ১৬৬, বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী স্ট্রীট, কলি-১২

৭৩ বর্ষ : ৩১শ সংখ্যা—মূল্য : ৩০ পয়সা
বৃহস্পতিবার, ১৬ই মাঘ, ১৩৭৫ বঙ্গাব্দ

বাংলা ভাষায় দ্বিতীয় সর্বাধিক প্রচারিত সাপ্তাহিক পত্রিকা

Price : 30 Paise
Thursday, 30th January, 1969

কর্পোরেশনের অতুলনীয় কীর্তি !

যে সুভাষচন্দ্র একদা কলকাতা কর্পোরেশনের সঙ্গে গভীরভাবে জড়িত ছিলেন, তাঁর মূর্তি স্থাপনের নামে শ্যামবাজারের পাঁচ মাথার মোড়ে কলকাতা কর্পোরেশনের কুকীর্তি ঘোষণার জন্য জনতার দরবারে দাঁড় করিয়েছেন স্বয়ং মেয়র এবং কাউন্সিলারদের স্পেশাল কমিটির নাম অশ্বের পদতলে অক্ষয় হয়ে থাকবে।

শ্যামবাজারের পাঁচ মাথার মোড়ে অশ্বারূঢ় নেতাজীর যে মূর্তি স্থাপিত হয়েছে তার মধ্যে বীরত্বব্যঞ্জক কোনো চিহ্ন তো নেই, বরং মনে হয় সুভাষচন্দ্রের আদলসদৃশ কোনো এক সার্কাসের ক্লাউন শ্যামবাজারের পাঁচ মাথার মোড়ে খেলা দেখাচ্ছে।

প্রায় সাড়ে দশ বছর আগে পাঁচ মাথার মোড়ে নেতাজীর মূর্তি স্থাপনের জন্য কলকাতা কর্পোরেশন পরিকল্পনা গ্রহণ করেছিলেন। তারপর তাড়াহুড়ো এমন কতকগুলি ঘটনা ঘটলো যা শুধু চমকপ্রদ-ই নয়, কারো কারো অভিমতে তা নাকি রাজনৈতিক জুয়া খেলার নামান্তর।

প্রথম ঘটনা এই যে, বোম্বাই-এর জনৈক শিল্পীকে নেতাজীর মূর্তি নির্মাণের ভার দেওয়া হয়। বলা বাহুল্য, তা টেন্ডার মারফৎ। এবং শিল্পী কর্তৃক প্রদত্ত মডেল মেয়র ও কাউন্সিলারদের স্পেশাল কমিটির অনুমোদন লাভ না করলে পাঁচ মাথার মোড়ে অশ্বারোহী নেতাজীর ঐ ধরণের বিসদৃশ মূর্তি জনসাধারণকে দেখতে হোত না।

দ্বিতীয় ঘটনা, যা গত এক বছরের মধ্যে কয়েকবার জনসাধারণ দৈনিক পত্রিকাগুলি মারফৎ জেনেছেন—বোম্বাই দেখার লোভে প্রথম শ্রেণীতে রেলগাড়ি চড়ার আনন্দে কোনো কোনো কাউন্সিলার নেতাজীর মূর্তি জুৎসই হচ্ছে কি না তা দেখার জন্য রীতিমতো প্রতিযোগিতা সুরু করেছিলেন।

তৃতীয় ঘটনা, যা সত্য কি না জানা নেই—আউটরাম ঘাটের অশ্বারূঢ় একটি স্ট্যাচুর নকল পর্যন্ত শিল্পীর কাছে পাঠানো হয়েছিল, যাতে নেতাজীর মূর্তি স্পেশাল কমিটির মনের মতো হয়।

চতুর্থ ঘটনা, স্পেশাল কমিটির কাউন্সিলাররা বোম্বাই যাবার জন্যে প্রতিযোগিতা করলেও তাঁরা শিল্পীকে মূর্তি স্থাপনস্থল দেখিয়েছিলেন কি না এবং কোন আকৃতির ও পরিমাপের মঞ্চে কতো ফুট উঁচু মূর্তি স্থাপন করা হবে—সে সম্বন্ধে শিল্পীকে অভিহিত করেছিলেন কি না ? কারণ, ১৫ ফুট ১ ইঞ্চি উঁচু মূর্তি ১৬ ফুট মঞ্চের ওপর বেমানান এবং পাঁচ মাথার মোড় ঐ মূর্তি স্থাপনের পক্ষে অনুপযুক্ত জায়গা—এই অভিমত লক্ষ লক্ষ দর্শকের।

পঞ্চম ঘটনা, মূর্তি স্থাপনে দ্রুততা দেখাতে গিয়ে কর্তারা প্রতিমূর্তি বানানেও ভুল করলেন !

এই তো হোল মূর্তি তৈরি ও মূর্তি স্থাপনের প্রথম কেলেঙ্কারী। দ্বিতীয় কেলেঙ্কারী যা ঘটেছে তা ২৩শে জানুয়ারী মূর্তির উদ্বোধন উৎসবকে কেন্দ্র করে। এই উৎসবে যাঁরা নিমন্ত্রিত হবার সৌভাগ্য লাভ করেছেন, তাঁদের অধিকাংশই হয় তো মহাজন। কিন্তু নেতাজীর সঙ্গে যাঁরা একদা ঘনিষ্ঠভাবে সংশ্লিষ্ট ছিলেন, তাঁদের অনেকেই এই উৎসবে যোগদানের আমন্ত্রণ থেকে বঞ্চিত হয়েছেন। বিশেষভাবে নেতাজীর সংগ্রামী সহকর্মী শ্রীহেমন্তকুমার বসুকে এই উৎসবে অংশ গ্রহণে ইচ্ছাকৃতভাবে বাদ দেওয়া হয়েছিল—এই কারণে যে, তিনি ঐ এলাকায় অন্তর্বর্তী নির্বাচনে মেয়রের প্রতিদ্বন্দ্বীরূপে একজন প্রার্থী। অবশ্য এ সব কথা আমাদের নয়, অনুষ্ঠানের দিন পথে দণ্ডায়মান হাজার হাজার মানুষ একথা উচ্চারণ করেছিল।

সর্বশেষ ঘটনা, আরো লজ্জাজনক। যে মঞ্চে নেতাজীর মূর্তি স্থাপন করা হয়েছে, সেখানে মেয়র এবং স্পেশাল কমিটির কাউন্সিলারদের নামের ফলক খোদিত করা হয়েছে; কিন্তু দেশবন্ধুর সহধর্মিণী শ্রদ্ধেয়া শ্রীবাসন্তী দেবীর টেপ রেকর্ড করা ভাষণ শোনানো হলেও তাঁর নাম মঞ্চের কোনো জায়গায় ঠাঁই পায় নি।

জানি না, নেতাজীর মূর্তি প্রতিষ্ঠাকে কেন্দ্র করে এই সব কেলেঙ্কারীর সদুত্তর কর্পোরেশন কিভাবে দেবেন। তবে শোনা যাচ্ছে, কিছুটা অবহিত হবার পর নাকি ঘোড়ার লেজ কাটার ব্যবস্থা হয়েছে এবং সেখানে উপযুক্ত লেজ বসানোর ব্যবস্থা হবে সাড়ে তিন লক্ষ টাকা ব্যয়ের পর আরো বেশ কিছু ব্যয়ে। কিন্তু ঘোড়ার লেজ কাটা বা সেখানে নতুন লেজ বসানোর পরও কি মেয়র এবং স্পেশাল কমিটির কাউন্সিলাররা মুখ রক্ষা করতে পারবেন—নিজেদের খোদিত নামের আড়ালে ?

সম্পাদকীয়

আজকের মানুষ

এই প্রথম নয়, এর আগেও একবার ভারতে এসেছিলেন—কিন্তু সেবার তাঁর সংগে ছিলেন ডঃ মার্টিন লুথার কিং। কিন্তু এবার এসেছেন একা। এসেছেন নিহত স্বামীর পক্ষে জহরলাল নেহরু পুরস্কার গ্রহণ করতে। ১৯৬৭ সালের নেহরু পুরস্কার বিজয়ী নিহত নায়ক মার্টিন লুথার কিং। আর সেই পুরস্কারই নিতে এসেছিলেন শ্রীমতী করেটা কিং।

তবু করেটার মুখ থেকে মিলিয়ে যায় নি হাসি। তবু তিনি ভারতের মাটিতে পা দেন নি দুঃখের প্রতিমূর্তি হয়ে। এখনো তিনি তাঁর সংকল্পে অটল। ধীর-স্থির দৃঢ়তার প্রতিমূর্তি। দু' চোখে আজো তাঁর উজ্জ্বল ভবিষ্যতের স্বপ্ন। যে স্বপ্ন একদিন দেখেছিলেন মার্টিন লুথার কিং।

যাঁরা ডঃ কিংকে চিনতেন, যাঁরা ডঃ কিংকে দেখেছিলেন খুব কাছে থেকে তাঁরাই আজ অবাক হয়ে দেখছেন করেটাকে। কি অদ্ভুত মিল। যেন কিংই দ্বিতীয়বার দেখা দিয়েছেন মিসেস করেটা কিং-এর মধ্যে। সেই অটল আত্মবিশ্বাস, ডঃ কিং-এরই মতো সেই গভীর আত্ম-প্রত্যয়ে ভরপুর মিসেস করেটা কিংও। আর করেটার গলায়, করেটার প্রতিটি বক্তৃতায় ডঃ কিং-এরই স্বপ্নের বাণী ধ্বনিত-প্রতিধ্বনিত হয়েছে।

আজ যেন মনে হয় ডঃ মার্টিন লুথার কিং আর মিসেস করেটা কিং-এর মধ্যে বিশেষ কোন পার্থক্য নেই। থাকবেই বা কি করে। করেটা যে ডঃ কিং-এর যোগ্য সহধর্মিণী।

আজো করেটার চোখের সামনে ভাসছে সেই ভয়ংকর দিনের দৃশ্য। মন্টেগোমারি শহরের ঐতিহাসিক বাস বয়কট আন্দোলনের অব্যবহিত পরেই ঘটেছিল সেই ঘটনা। ডঃ কিং তখন ছিলেন না বাড়িতে। তাঁদের প্রথম সন্তান তখন খুবই ছোট। তাকে কোলে নিয়ে এক বান্ধবীর সংগে গল্প করছিলেন করেটা। সেই সময় হঠাৎই কিং-এর বাড়িতে বোমা নিক্ষেপ করে পালিয়ে গেল একদল শ্বেতকায়। প্রাণে বেঁচে গিয়েছিলেন তিনজনেই। কিন্তু সেই বোমার শব্দে, ডঃ কিং-এর বাড়িতে আক্রমণের সংবাদে হাজার হাজার মারমুখী নিগ্রো এসে সমবেত হয়েছিল বিধ্বস্ত সেই বাড়ির সামনে।

আধ ঘন্টার মধ্যেই ফিরে এলেন কিং। সব শুনে তাড়াতাড়ি বাড়ির মধ্যে ঢুকে দেখে এলেন করেটা আর তাঁর শিশু-সন্তানকে। তারপর সেই মারমুখী জনতার সামনে দাঁড়িয়ে বললেন, "উত্তেজিত হলে চলবে না—এর চেয়ে অনেক বড় বিপদ আসবে আমাদের সামনে। তবু আমরা প্রতিহিংসার আগুনে পোড়াতে চাইবো না আমাদের সাদা ভাইদের ভালোবাসায়, ক্ষমায় আর মমতায় ভোলাতে হবে তাদের। আমরাই একদিন তাদের বুঝিয়ে দেবো যে,

শ্রীমতী করেটা কিং

যীশুর রাজ্যে সাদা-কালোয়-কোন ভেদাভেদ নেই। একদিন এই মন্টেগোমারি শহরেই সাদা আর কালোরা ভাই-ভাই-এর মতো বাস করবে।"

আশ্চর্য মাত্র আধঘন্টা আগে যাঁর স্ত্রী, যাঁর পুত্র মরতে বসেছিল যাদের দ্বারা, তাদেরই ভালোবাসতে চাইছেন তিনি! আর ডঃ মার্টিন লুথার কিং-এর সেই আদর্শ-কেই সামনে রেখে এগিয়ে চলেছেন মিসেস করেটা কিং। তিনি জানেন, সামনে তাঁর দুরন্ত মরু-প্রান্তর, কিন্তু তিনি এ কথাও বিশ্বাস করেন যে, সেই দুর্লঙ্ঘ্য বাধাকে একদিন তাঁরা পার হয়ে আসতে সক্ষম হবেন।

ডঃ কিং-এর আদর্শকে মাথায় তুলে নিয়েছিলেন করেটা সেইদিনই, যখন তাঁর সংগে সেই ১৯৫২ সালে প্রথম আলাপ হয়েছিল তরুণ রেভারেণ্ড মার্টিন লুথার কিং-এর। ...করেটা স্কটের তখন দু'চোখে ছিল নামকরা সংগীত-শিল্পী হবার স্বপ্ন। কিন্তু কিংকে দেখে সব ভুললেন তিনি। আঠারো মাস দু'জনে দু'জনকে চেনার পর বিয়ে করলেন তাঁরা। করেটা স্কট হয়ে গেলেন মিসেস মার্টিন লুথার কিং।

পড়াশোনায় কিং-এর মতোই তুখোড় ছিলেন করেটা। আলবামার স্কুল থেকে স্কলারশিপ পেয়ে ভর্তি হলেন এন্টওইচ কলেজে। আর সেই কলেজ থেকেই গ্র্যাজুয়েট হয়েছিলেন তিনি। আর তার-পরই বোস্টনের এক গানের সভায় মার্টিন লুথার কিং-এর সংগে হঠাৎ আলাপ হয়ে গেলো তাঁর। সেই আলাপই আজ তাঁকে এনে দিয়েছে বিশ্বের অন্যতম প্রধান মহিলার সম্মান।

ডঃ কিং-এর প্রতিটি কাজের পেছনে করেটা থাকলেও, ১৯৬৪ সালেই তিনি স্বামীর সংগে নিগ্রো-জনগণকে নেতৃত্ব দিতে এগিয়ে এসেছিলেন সর্বজনসমক্ষে। আজো করেটার চোখে ভাসছে নিউ ইয়র্ক টাউন হলের সেই মনোরম দৃশ্য—যেখানে ছিলেন তাঁর স্বামী ডঃ মার্টিন লুথার কিং, সেখানে গান গেয়েছিলেন তিনি নিজে। তারপরই করেটা তাঁর দল নিয়ে গিয়েছিলেন আমেরিকার প্রতিটি অঞ্চলে এস সি এল সি ফান্ডে অর্থ সংগ্রহের জন্যে।

দিনগুলো কাটছিলো ভালোই। একদিকে আমেরিকার চিরকালীন বর্ণবৈষম্য-নীতির বিরুদ্ধে তাঁর কিন্তু শান্তিপূর্ণ সংগ্রাম আর একদিকে ধর্মমন্ত্র প্রচার। আমেরিকা যুক্তরাজ্যের নিগ্রো জাতির অবিসংবাদী নেতা ডঃ মার্টিন লুথার কিং আর মিসেস করেটা কিং নিজেদের সংকল্পে ছিলেন অটল।

কিন্তু তারই মধ্যে হঠাৎ ১৯৬৮ সালের গ্রীষ্মের সন্ধ্যায় মেমফিস শহরের এক হোটেলে বড় অপ্রত্যাশিতভাবে নিহত হলেন শান্তির জন্যে নোবেল পুরস্কার বিজয়ী মার্টিন লুথার কিং। আততায়ীর গুলী পৃথিবীর বুক থেকে ছিনিয়ে নিলো শুধুমাত্র তাঁরই নন, সমগ্র নিগ্রো জাতির হৃদয়ের রাজাকে।

কিং-এর আদর্শই আজ তাঁর মন্ত্র। আর নেহরু পুরস্কার নিতে এসে সেই কথাই বলে গেছেন মিসেস করেটা কিং। তিনি বলেছেন, আমেরিকার বর্ণবৈষম্য-নীতির বিরুদ্ধে এই শান্তিপূর্ণ সংগ্রামে জয়ী তাঁরা হবেনই। কারণ ধর্মের পথে থেকে, সত্যের পথে থেকে যে-সংগ্রাম এগিয়ে চলে সে সংগ্রাম যে কিছুতেই বিফলে যেতে পারে না।

১৯৮৮

রবীন্দ্রনাথ ও বন্দেমাতরম্

শঙ্করীপ্রসাদ বসু

[পূর্ব-প্রকাশিতের পর]

বন্দেমাতরম্—জনমানস (৩)

বন্দেমাতরম প্রশ্ন উত্থাপিত হওয়ার বেশ কয়েক বৎসর আগে প্রকাশিত রবীন্দ্রনাথের এই অভিমত আলোচ্য প্রসঙ্গে বিশেষ মূল্যবান। রবীন্দ্রনাথের এই মনোভাব যাঁরা স্মরণে রেখেছিলেন, তাঁরা 'বিশ্বভারতী নিউজে'র ১৯৩৭, অক্টোবর সংখ্যায় কৃষ্ণ কৃপালনী 'বন্দেমাতরম অ্যান্ড ইণ্ডিয়ান ন্যাশন্যালিজম্' নামক প্রবন্ধ পড়ে আশ্চর্যান্বিত না হয়ে পারেন নি। মূল প্রবন্ধটি আমি পড়ি নি, তবে প্রভাতকুমারের রচনা থেকে অনুমান করতে পারছি, ঐ প্রবন্ধে কৃষ্ণ কৃপালনী বন্দেমাতরমের অংশচ্ছেদের প্রস্তাব সমর্থন করেছিলেন। কংগ্রেসের সেক্রেটারী ছে বি কৃপালনীর আত্মীয় এবং জহরলাল নেহরুর স্নেহভাজন, সেইসূত্রে তাঁদের মতের বাহক শ্রীকৃষ্ণ কৃপালনী কংগ্রেসের একাংশের মনোভাবকে উদ্ঘাটন করেছিলেন সন্দেহ নেই, আশঙ্কা করা হয়েছিল, বিশ্বভারতীর সরকারী মুখপত্রে যেহেতু রচনাটি প্রকাশিত হয়েছে, ওর মধ্যে বিশ্বভারতীর অর্থাৎ রবীন্দ্রনাথের মতের প্রতিধ্বনি আছে।

২৪শে অক্টোবর আনন্দবাজার ও হিন্দুস্থান স্ট্যাণ্ডার্ডে "রবীন্দ্রনাথ ও বন্দেমাতরম্" নামক সংবাদ থেকে দেখা গেল বন্দেমাতরমকে জাতীয় সঙ্গীত করা যায় কি না সে বিষয়ে কবির সঙ্গে নেতৃবৃন্দের আলোচনা চলেছে, আলোচনা শেষ হবার আগে তিনি কোনো বিবৃতি দেবেন না। কবি-পুত্র রথীন্দ্রনাথ এইসঙ্গে জানান, তাই বলে শ্রীকৃষ্ণ কৃপালনী প্রবন্ধের মত মোটেই কবির মত নয়। সংবাদপত্রের বিবরণ এইপ্রকার—

> "The Poet's presence in Calcutta at a time when distinguished leaders from all over country are coming here in connection with the ensuing meetings of the Congress Working Committee and the All India Congress Committee, will be taken advantage of by Mahatma Gandhi and other leaders to discuss with him various problems. The most vital question on which his advice will be sought is the one relating to Bande Mataram as the National Anthem of India. Pending his discussions with the leaders, the Poet is not issuing any statement to the Press.
>
> Correspondence however is going on between the Poet and different leaders on this question.
>
> Mr. Rathindra Nath Tagore, the Poet's son, told a reporter of Hindusthan Standard that the first stanza of the Bande Mataram song was first set to tune by the Poet himself and also sung by him for the first time at the Indian National Congress at the Calcutta Session in the nineties of the last century.
>
> Mr. Rathindra Nath Tagore further told the reporter that *the views on Bande Mataram that had found expression in Prof. Krishna Kripalini's article in the Viswabharati magazine published from Santiniketan, did not represent the official views of Viswabharati or of the Poet.*"

রবীন্দ্রনাথ কিভাবে এই সময়ে আলোচনার আবর্তকেন্দ্রে প্রবিষ্ট ছিলেন, তা বোঝা যায় সমকালীন সংবাদ থেকে। রথীন্দ্রনাথের বিবৃতি প্রকাশের দুদিন পরে ২৬শে অক্টোবরের সংবাদে জানা গেল, জহরলাল নেহরু কলকাতায় এসে সেইদিন বিকেলেই বেলঘরিয়ায় গিয়ে রবীন্দ্রসান্নিধ্যে বহুক্ষণ আলোচনা করে এসেছেন।

"ইউনাইটেড প্রেস জানতে পেরেছেন যে, পণ্ডিত জহরলাল নেহরু দেশের বর্তমান কিছু সমস্যা

সম্বন্ধে কবির সঙ্গে আলোচনা করেছেন। আলোচনা সমাপ্ত না হওয়ায় পণ্ডিতজী কবির সঙ্গে একই গাড়িতে বেলঘরিয়া থেকে চৌরঙ্গীতে আসেন; সেখানে কবি ক্যাপ্টেন মুখার্জির ক্লিনিকে আলট্রা-ভায়োলেট রশ্মি গ্রহণ করছেন।

বিশ্বাস করা যায় যে, আলোচনাকালে পণ্ডিতজী বর্তমানে দেশে বন্দেমাতরম সঙ্গীত নিয়ে যে বিতর্ক চলেছে সে বিষয়টি উত্থাপন করেছিলেন। কলিকাতায় অবস্থানকালে পণ্ডিতজী কর্তৃক এ বিষয়ে বিবৃতি-দানের সম্ভাবনা রয়েছে।"

উপরের সংবাদটি অমৃতবাজার পত্রিকার ২৬ অক্টোবর সংখ্যা থেকে গৃহীত। একই তারিখে হিন্দুস্থান স্ট্যান্ডার্ড ও আনন্দবাজারের প্রকাশিত সংবাদে অতিরিক্ত মূল্যবান কিছু তথ্য ছিল। আনন্দবাজারে রবীন্দ্রনাথের ছবি সহ সংবাদের শিরোনামা—

বন্দেমাতরমই ভারতের জাতীয় সঙ্গীত

কবীন্দ্র রবীন্দ্রনাথের সুস্পষ্ট অভিমত *

বন্দেমাতরম-পক্ষীয়দের পক্ষে অতীব উল্লাসের সংবাদ সন্দেহ নেই। ঠিক পরদিন গান্ধীজীর সমর্থনের কথা আনন্দবাজারে প্রকাশিত হল, যা আমরা আগেই উদ্ধৃত করেছি। ওয়ার্কিং কমিটির আলোচনাতেও বন্দেমাতরম সংরক্ষণের অনুকূলে মত আছে, এমন সংবাদ বেরুল।১

আন্দোলনের সাফল্য সম্ভাবনায় উল্লসিত আনন্দবাজার ঐদিন সম্পাদকীয় প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ এবং মহাত্মা গান্ধীকে গভীর কৃতজ্ঞতা জানিয়ে উচ্ছ্বাসভরে বহু কথা লিখল। রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধেই বেশি উচ্ছ্বাস। যথা—

"রবীন্দ্রনাথ কংগ্রেস সভাপতি পণ্ডিত জহরলালের নিকট সুস্পষ্টভাবে এই অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন যে, বন্দেমাতরম সঙ্গীতকেই ভারতের জাতীয় সঙ্গীতরূপে গণ্য করিতে হইবে। রবীন্দ্রনাথের এই অভিমতের গুরুত্ব যে অত্যন্ত বেশী তাহা বলা বাহুল্য মাত্র। রবীন্দ্রনাথ কেবল অলোকসামান্য প্রতিভাশালী কবি ও নব্যবঙ্গের সাহিত্যগুরু নহেন—তিনি নবীন বাংলার বিদ্যা ও সংস্কৃতির শ্রেষ্ঠ প্রতিনিধিও বটেন। সুতরাং বন্দেমাতরম সম্বন্ধে তিনি যে অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন, তাহাকে সমগ্র বাংলার অন্তরের প্রতিধ্বনি বলা যাইতে পারে। আরও এক দিক দিয়া বন্দেমাতরম সম্বন্ধে এই অভিমত প্রকাশ করিবার অধিকার রবীন্দ্রনাথের আছে। ১৮৯৬ সালে কলিকাতা বিডন স্কোয়ারে কংগ্রেসের যে অধিবেশন হয়, স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ বন্দেমাতরম সঙ্গীত গান করিয়া তাহার উদ্বোধন করেন। তৎপূর্বে কংগ্রেস বা কোনো সভাসমিতিতে জাতীয় সঙ্গীত হিসাবে বন্দেমাতরম গীত হয় নাই, জাতির চিত্তও তেমনভাবে আকর্ষণ করে নাই। তাহার কয়েক বৎসর পরেই বাংলাদেশে প্রবল বন্যার মত স্বদেশী আন্দোলন আরম্ভ হইল। বন্দেমাতরম বিদ্যুৎপ্রবাহের মত সমগ্র দেশে ছড়াইয়া পড়িল—যাহা ছিল বাংলার তাহাই সমগ্র ভারতের জাতীয় সঙ্গীতরূপে গৃহীত ও স্বীকৃত হইল। এই স্বদেশী আন্দোলনেও রবীন্দ্রনাথের দান সামান্য নহে। সুতরাং ঋষি বঙ্কিমের অমর মন্ত্র বন্দেমাতরমই যে ভারতের জাতীয় সঙ্গীতরূপে গণ্য হইবার অধিকারী, তাহা বলিবার দাবী রবীন্দ্রনাথের চেয়ে আর কাহার আছে?"

এই রচনার ঠিক পরদিন যে ঘটনা ঘটল, তার বিষয়ে কোন উপযুক্ত ভাষা প্রয়োগ করব? আশায় ছাই, অগ্নিতে জলাঞ্জলি, সকলি গরল ভেল—কোনো কিছুই সেই আঘাত, আশাভঙ্গ, ক্ষোভ ও জ্বালাকে প্রকাশ করতে পারবে না। বন্দেমাতরমের পক্ষে সর্বাধিক আন্দোলন যে-দুটি সংবাদপত্র

---

* ২৬ অক্টোবর হিন্দুস্থান স্ট্যান্ডার্ডের সংবাদ—

"Pandit Jawaharlal Nehru had a long interview with poet Rabindra Nath Tagore at the latter's residence in the suburbs of Calcutta on Monday evening.

It is understood that in course of discussions Panditji referred to the controversy about Bande Mataram as the National Anthem of India, and sought the Poet's advice in the matter.

Rabindranath, it is further understood, gave it definitely as his opinion that the Bande Mataram must be maintained as the National Anthem of India."

১ ২৭ অক্টোবরের আনন্দবাজারের একটি সংবাদ-শিরোনামা—

বন্দেমাতরমকে জাতীয় সঙ্গীত হিসাবে রাখিবার দাবী

ওয়ার্কিং কমিটিতে দীর্ঘকালব্যাপী তুমুল আলোচনা

অধিকাংশ সদস্যের অনুকূলে মত পোষণ

আলোচনায় গান্ধীজীর যোগদান ও মত প্রকাশ

বিস্তৃত সংবাদের মধ্যে ছিল—"যতদূর জানা গিয়াছে তাহাতে মনে হয় কমিটির অধিকাংশ সদস্যই বন্দেমাতরম ভারতের জাতীয় সঙ্গীতরূপে বজায় রাখিবার পক্ষপাতী। তবে তাঁহারা মুসলমান সম্প্রদায়ের যুক্তিসঙ্গত আপত্তি মিটাইতেও প্রস্তুত। জনৈক সদস্য না কি এইরূপ প্রস্তাব করেন যে, আগামী বৎসর হইতে কংগ্রেসের সভাসমিতিতে বন্দেমাতরম উদ্বোধন সঙ্গীত করার রীতি পরিত্যাগ করা হউক।"

এইদিনই অমৃতবাজারে রবীন্দ্র-গান্ধী মিলনের মর্মস্পর্শী দৃশ্য বর্ণিত হয়েছিল। তারপরে উভয়ের আলোচনার কথা বলতে গিয়ে লেখা হয়, তাঁরা বন্দেমাতরম, বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতীকে শ্রী ও পদ্ম প্রভৃতির বিরুদ্ধে মুসলমানদের আপত্তির বিষয়ে কথা বলেছিলেন।

করেছিল, সেই আনন্দবাজার ও হিন্দুস্থান স্ট্যান্ডার্ডের ২৯শে অক্টোবরের সংবাদ-শিরোনামা:

বন্দেমাতরম সঙ্গীতের সমাধি রচনায় কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির অপরিণামদর্শী সিদ্ধান্ত

সর্বজনানুমোদিত জাতীয় সঙ্গীতের অঙ্গচ্ছেদ

মাত্র প্রথম দুটি কলি গান করিবার অনুমতি

জাতীয় সঙ্গীত বিবেচনার জন্য সাবকমিটি গঠন

সাম্প্রদায়িকতাবাদীদের নিকট ওয়ার্কিং কমিটির আত্মসমর্পণ

Tragic decision of Congress Cabinet

Mutilation of Bande Mataram song

Surrender to Communalists' cry

ওয়ার্কিং কমিটি সর্বসম্মতিক্রমে বন্দেমাতরম বিষয়ক প্রস্তাব নিয়েছিল। প্রস্তাবটি সম্বন্ধে মন্তব্য করার আগে সেটি উদ্ধৃত করা যাক।

"বন্দেমাতরম সঙ্গীত সম্বন্ধে সম্প্রতি বিতর্ক সৃষ্টি হওয়ায় ওয়ার্কিং কমিটি গানটির তাৎপর্য ব্যাখ্যা করতে ইচ্ছুক। গানটি বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের আনন্দমঠ উপন্যাসের অন্তর্ভুক্ত, কিন্তু বঙ্কিমের জীবনীতে উল্লিখিত আছে যে, উপন্যাস রচিত হওয়ার বহু পূর্বে স্বতন্ত্রভাবে তা লিখিত হয়েছিল, পরে উপন্যাসের মধ্যে গৃহীত হয়। গানটিকে তাই উপন্যাস থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেখতে হবে। ১৮৯৬ সালে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এতে সুরদান করেন। বন্দেমাতরম গান এবং বন্দেমাতরম ধ্বনি, উভয়ই ইংরাজ সরকার কর্তৃক রাজদ্রোহকর বলে বিবেচিত হয়; শাসনে পীড়নে তার কণ্ঠরোধের চেষ্টা করা হয়। ১৯০৬, এপ্রিল মাসে মিঃ এ রসুলের সভাপতিত্বে বরিশালে অনুষ্ঠিত বিখ্যাত বঙ্গীয় প্রাদেশিক সম্মেলনে প্রতিনিধি ও স্বেচ্ছাসেবকদের উপর বর্বরের মত লাঠিচালনা করা হয় এবং তাদের গা থেকে সবলে বন্দেমাতরম ব্যাজ কেড়ে নেওয়া হয়। বন্দেমাতরম ধ্বনি তোলার জন্য কোনো কোনো প্রতিনিধিকে এমন প্রচণ্ড প্রহার করা হয় যে, তাঁরা অচৈতন্য হয়ে পড়েন। তারপর থেকে গত তিরিশ বছরে দেশের সর্বত্র অগণ্য আত্মত্যাগ ও যন্ত্রণাসহনের ঘটনা বন্দেমাতরমের সঙ্গে যুক্ত হয়ে আছে; নরনারী ঐ ধ্বনি কণ্ঠে নিয়ে মৃত্যুর মুখোমুখি দাঁড়াতেও দ্বিধা করেনি। তাই বন্দেমাতরম সঙ্গীত ও বন্দেমাতরম ধ্বনি ইংরাজ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ সংগ্রামের প্রতীকরূপ লাভ করে। বাংলা দেশের ক্ষেত্রে একথা বিশেষভাবে সত্য, ভারতের অন্যান্য অংশ সম্বন্ধেও সাধারণভাবে সত্য। 'বন্দেমাতরম' কথাটি শক্তির ধ্বনি হয়ে উঠেছে, আমাদের জনগণকে তা প্রেরণা দিয়েছে, আমাদের স্বাধীনতা সংগ্রামের তা চিরস্মরণীয় বন্দনা-মন্ত্র।

ক্রমে সঙ্গীতটির প্রথম দুটি স্তবক অপরাপর প্রদেশেও গীত হতে থাকে, এবং তার সঙ্গে এক ধরনের জাতীয় তাৎপর্য যুক্ত হতে আরম্ভ করে। গানের বাকি অংশ বিরল ক্ষেত্রেই ব্যবহৃত হয়, এমন কি এখনো পর্যন্ত খুব অল্প লোকই সে অংশটি জানেন। এই (প্রথম) দুটি স্তবক সুমধুর ভাষায় মাতৃভূমির সৌন্দর্য এবং তাঁর ঐশ্বর্যের প্রাচুর্যের কথাই বর্ণনা করেছে। তাদের মধ্যে এমন কিছু নেই যার বিরুদ্ধে ধর্মীয় বা অন্য আপত্তি উত্থাপন করা যায়। গানটি কখনই ভারতীয় কোনো গোষ্ঠী বা সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে চ্যালেঞ্জ হিসাবে গাওয়া হয়নি, সেভাবে কখনই একে দেখা হয়নি, কিংবা অন্য সম্প্রদায়ের অনুভূতিকে আঘাত করবার জন্যও প্রযুক্ত হয়নি। গানের মধ্যে ত্রিশ কোটি ভারতবাসীর উল্লেখ থেকে স্পষ্টই দেখা যায় সমগ্র ভারতবাসীই এর উদ্দিষ্ট। অবশ্য কোনো সময়েই এই গানটি বা অপর কোন গান কংগ্রেস কর্তৃক সরকারীভাবে জাতীয় সঙ্গীত হিসাবে গৃহীত হয়নি। কিন্তু সর্বজনীন ব্যবহার গানটিকে বিশেষ প্রকার জাতীয় গুরুত্ব দিয়েছে।

ওয়ার্কিং কমিটি অনুভব করে যে, অতীতের দীর্ঘ ত্যাগ ও সহনের ঐতিহ্য এবং সর্বজনীন ব্যবহারের জন্য গানটির প্রথম দুটি স্তবক আমাদের জাতীয় আন্দোলনের জীবন্ত ও অবিচ্ছেদ্য অংশ; সেহেতু তারা অবশ্যই আমাদের কাছ থেকে শ্রদ্ধা ও প্রীতি দাবী করতে পারে। এই স্তবক দুটিতে এমন কিছু নেই, যার বিরুদ্ধে কারো পক্ষে আপত্তি করা সম্ভব। গানের বাকি স্তবকগুলি প্রায় কারো জানাই নেই বা সেগুলি প্রায় গাওয়াই হয় না। তাদের মধ্যে এমন কতকগুলি ধর্মীয় ব্যাপারের ও ভাবের উল্লেখ রয়েছে, যা অপরাপর ধর্মীয় গোষ্ঠীসমূহের ধর্মভাবের সঙ্গে সুসঙ্গত নয়।

মুসলমান বন্ধুগণ গানটির কিছু কিছু অংশ সম্বন্ধে যে আপত্তি উত্থাপন করেছেন, ওয়ার্কিং কমিটি তার যৌক্তিকতা স্বীকার করে। আপত্তিগুলিতে যে পর্যন্ত যথার্থ মূল্য রয়েছে সে-পর্যন্ত কমিটি বিবেচনা করেও জানাতে চায় যে, জাতীয় সংগ্রাম নির্দিষ্ট আকার গ্রহণ করবার পূর্বে রচিত কোনো একটি ঐতিহাসিক উপন্যাসে গানটির স্থাপনা অপেক্ষা স্বাধীনতা সংগ্রামের মধ্য দিয়ে বিবর্তিত হয়ে গানটি যেভাবে জাতীয় জীবনের অংশস্বরূপ হয়েছে—তার মূল্য সীমাহীন পরিমাণে অধিক। সমস্ত দিক বিবেচনা করে তাই কমিটি সুপারিশ করছে যে, জাতীয় সম্মেলন সমূহে যেখানেই বন্দেমাতরম গীত হবে, সেখানে কেবল প্রথম দুটি স্তবকই গাওয়া চলবে; সেইসঙ্গে বন্দেমাতরমের অতিরিক্ত বা বন্দেমাতরমের স্থানে অপর আপত্তিহীন চরিত্রের গানের ব্যবস্থা করবার পরিপূর্ণ স্বাধীনতা সভা-সংগঠকদের থাকবে।

কিন্তু জাতীয় জীবনে বন্দেমাতরম যে স্থান অধিকার করেছে, সে সম্বন্ধে কোনো প্রশ্ন থাকলেও অপরাপর সঙ্গীত সম্বন্ধে সেকথা বলা যাবে না। জনগণ গুণাগুণের বিচার না করেই যথেচ্ছ সঙ্গীত নির্বাচন করেছে। (জাতীয়) সঙ্গীতের একটি প্রামাণ্য

সংকলনের প্রয়োজন দীর্ঘদিন ধরে বিশেষভাবে অনুভূত হয়েছে। ওয়ার্কিং কমিটি তাই এই উদ্দেশ্যে একটি সাবকমিটি গঠন করছে, যার সদস্য হবেন—মৌলনা আবুল কালাম আজাদ, শ্রীজহরলাল নেহরু, শ্রীসুভাষচন্দ্র বসু এবং শ্রীনরেন্দ্র দেব; এই সাবকমিটি বর্তমানে চলিত সকল জাতীয় সঙ্গীত, যেগুলি এর কাছে প্রেরিত হবে, পরীক্ষা করে দেখবে, এবং যাঁরা ইচ্ছুক তাঁরা যেন নিজেদের রচিত সঙ্গীত এই সাবকমিটির কাছে পাঠিয়ে দেন। এইভাবে প্রাপ্ত সঙ্গীতগুলির যেগুলি জাতীয় সঙ্গীত সংকলনের মধ্যে স্থানলাভের যোগ্য বলে সাবকমিটি বিবেচনা করবে, সেগুলি সে ওয়ার্কিং কমিটির কাছে পাঠিয়ে দেবে। যেসব সঙ্গীত সহজ হিন্দুস্থানীতে রচিত, কিংবা তাতে ভাষান্তরিত করা যাবে, এবং যাতে প্রেরণা ও উদ্দীপনাময় সুরসংযোগ করা যাবে, কেবল সেই সঙ্গীতগুলিকেই সাবকমিটি বিচার-বিবেচনার যোগ্য মনে করবে। সাবকমিটি কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সঙ্গে পরামর্শ করবে ও তাঁর উপদেশ গ্রহণ করবে।

ওয়ার্কিং কমিটি প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির কাছে প্রাদেশিক ভাষায় রচিত সঙ্গীতের ব্যাপারে অনুরূপ ব্যবস্থা অবলম্বনের সুপারিশ করছে।"

এই প্রস্তাব! যেমন দীর্ঘ তেমনি শিথিল, বিশৃঙ্খল। কংগ্রেসের ইতিহাসে এইরকম অপটু ভাষায় ও ভঙ্গিতে রচিত ক'টি প্রস্তাব আছে জানি না। প্রস্তাবের নামে একটি ক্ষুদ্র প্রবন্ধ হাজির করা হয়েছে, বক্তব্য নয়, বক্তব্যের অভাবই পুনরুক্তিযোগে যার অঙ্গস্ফীতি ঘটিয়েছে। এই অবধার্যিত আকার সচেতনভাবেই করা হয়েছে মনে হয়, শব্দাড়ম্বরের মধ্যে আসল অভিপ্রায় আবৃত। দুটি সম্পূর্ণ ভিন্ন বক্তব্য ও বাসনাকে পাশাপাশি রাখার উদ্দেশ্য, ভবিষ্যতে ইচ্ছামত ব্যাখ্যার সুযোগে শক্তিমান কেউ কার্যসিদ্ধি করতে পারবে, বর্তমানের জন্য সর্বসাধারণ আপ্তবাক্যের টীকাভাষ্যে ব্যাপৃত থাকুক। সন্দেহ নেই এই প্রস্তাব প্রস্তাব-বিশারদ (সুভাষচন্দ্রের উক্তি) পণ্ডিত জহরলালের কীর্তি, যিনি দীর্ঘ করে ভাবতে এবং লিখতে ভালবাসেন, এবং চিন্তাশীল মানুষ হিসেবে স্থির কথা বলতে একেবারে ভালবাসেন না।

প্রস্তাবটি সম্বন্ধে এখানে বেশি মন্তব্য করার প্রয়োজন নেই, শুধু একথা বললেই চলে, অবিরত গাছে তোলা ও মই কাড়ার এরকম দৃষ্টান্ত বেশি মিলবে না। বন্দেমাতরম জাতীয় জীবনে একটা বিরাট ব্যাপার শোনা গেল; বন্দেমাতরম না সত্ত্বেও টিকবে না, বোঝা গেল। প্রস্তাবটি পড়ে মনে হয়, ইতিহাস সৃষ্টি করে ফেলে বন্দেমাতরম যে ফ্যাসাদ বাধিয়েছে (সংবাদপত্রগুলি সেই ইতিহাসের বাজনা বাজিয়ে ফ্যাসাদ আরও বাড়িয়েছে), কংগ্রেসকে সেটা স্বীকার করতে হচ্ছেই, উপায় নেই, কিন্তু তাই বলে ঐ পুরনো ইতিহাস যেন কংগ্রেসের প্রচণ্ড গতিশীল দুর্ধর্ষ ঘোড়সওয়ারদের পায়ের শিকল না হয়—তাঁরা সরল হিন্দুস্থানীতে 'মার্চিং সঙ' শুনে ঊর্ধ্বশ্বাসে ধাবমান হবেন! তাই বলে তাঁরা কি ইতিহাসবোধহীন? ছি! বন্দেমাতরমকে মেরে তাঁরা অবশ্যই জয়স্তম্ভ নির্মাণ করবেন।

কিন্তু কংগ্রেস হাইকম্যান্ড মাত্র বুদ্ধিমান, দেশে আর কেউ বুদ্ধিমান নেই, দেশের এমন দুর্গতি হয় নি। বন্দেমাতরমের অঙ্গচ্ছেদ যে বন্দেমাতরম বিতাড়নের প্রথম পর্ব, একথা অনেকেরই চোখে পড়ল; না হলে, কংগ্রেস এখনো কেন সরকারীভাবে প্রথম দুটি স্তবককে জাতীয় সঙ্গীত বলে ঘোষণা করল না? কিংবা কংগ্রেসের সরকারী স্বীকৃতির কথাটা এত ফাঁপিয়ে তোলা হল কেন? কোনো বাড়ির ক্ষেত্রে বাড়ির ভিত্তিস্তম্ভকে স্বীকৃতি দানের আড়ম্বরের মতই কি বন্দেমাতরম সম্বন্ধে কংগ্রেসের স্বীকৃতি দানের ব্যাপারটি নয়?

বন্দেমাতরম সম্বন্ধে কংগ্রেসের অভিপ্রায়ের কথা বেরিয়েছিল ২৯শে অক্টোবর। বিরাট আকারের সংবাদের সঙ্গে সংবাদপত্রে বিখ্যাত পার্শী নারী-বিপ্লবী মাদাম কামার পরিকল্পিত পতাকার ছবিও সংবাদপত্রে ছাপা হয়েছিল। সে পতাকাও ত্রিবর্ণ, উপরে সবুজ, মধ্যে হলুদ এবং নিচে লাল। সবুজ অংশে ৮টি শ্বেতপদ্ম, আর লাল অংশে অর্ধচন্দ্র ও পূর্ণ সূর্য। মধ্য অংশে 'বন্দেমাতরম' শব্দ লিখিত। এই পতাকা ১৯০৬ সালে বার্লিনে সমাজতন্ত্রী বিপ্লবীদের এক সম্মেলনে মাদাম কামা উপস্থিত করে বলেন—

"This is the flag of Indian Independence. Behold! It is born! Gentlemen, stand up and salute it!"২

---

২ পতাকার চিত্র ও কিছু বিবরণ ২৯ অক্টোবরের অমৃতবাজার ও হিন্দুস্থান স্ট্যান্ডার্ডে প্রকাশিত হয়। ২ নভেম্বরের হিন্দুস্থান স্ট্যান্ডার্ডে আরও কিছু বিস্তারিত বিবরণ পাওয়া যায়। পতাকাটি পলাতক বিপ্লবী শ্যামজী কৃষ্ণবর্মা নিজের কাছে রেখে দিয়েছিলেন। ১৯৩০ খৃস্টাব্দে বার্লিনে তাঁর দেহত্যাগের পরে পতাকাটি আসে তাঁর সহকর্মী এস আর রানার কাছে। তিনিই মারহাট্টা পত্রিকার সম্পাদক জি ভি খোটকারের কাছে পতাকাটি পাঠিয়ে দেন।

দেখতে পাওয়া যাচ্ছে, বন্দেমাতরম শব্দটি পার্শী মাদাম কামার কাছে আপত্তিকর তো ঠেকেই নি, বরং এমন পবিত্র মনে হয়েছিল যে, তিনি তাঁর পরিকল্পিত জাতীয় পতাকার কেন্দ্রে স্থাপন করেছিলেন। ভগিনী নিবেদিতাও জাতীয় পতাকার পরিকল্পনা করেছিলেন, তারও মধ্যে বন্দেমাতরম লেখা ছিল। প্রব্রাজিকা আত্মপ্রাণার নিবেদিতা-জীবনীতে নিবেদিতা-পরিকল্পিত পতাকার ছবি আছে। ১৯০৫ সালে নিবেদিতা প্রথম যে পতাকা প্রস্তুত করেন, তার কেন্দ্রে ছিল বজ্রচিহ্ন, উপরে অর্ধচন্দ্রাকারে লেখা 'বন্দেমাতরম', তলায় একইভাবে, 'যতো ধর্ম স্ততো জয়ঃ'। ১৯০৬ সালে কংগ্রেস প্রদর্শনীতে তিনি যে পতাকা রেখেছিলেন, তার মধ্যে বজ্রচিহ্ন, এবং আড়াআড়ি করে লেখা 'বন্দেমাতরম।' দেখা যাচ্ছে, সেইকালে বাংলা দেশে বা বাংলা দেশের বাইরে, কারো পক্ষেই বন্দেমাতরম-কে বাদ দেওয়া সম্ভব হচ্ছে না, জাতীয় পতাকাতেও।

কংগ্রেসের প্রস্তাব পড়ে জাতীয়তাবাদী বাঙালীর মনের ভাব কি হয়েছিল অনুমান করা যায়। সেই বিক্ষোভ ও অন্তর্জ্বালার সামনে দাঁড়িয়ে প্রস্তাবের রচয়িতা এবং গোটা ঘটনাটির মুখ্য নায়ক পণ্ডিত জহরলাল নানা কথায় প্রস্তাবের সমর্থন করতে চাইলেন। ২৯ অক্টোবর নিখিল ভারত রাষ্ট্রীয় সমিতির অধিবেশনের উদ্বোধন করতে গিয়ে কংগ্রেস সভাপতি জহরলাল বন্দেমাতরমের উপরে অনেকখানি সময় ব্যয় করেছিলেন। তিনি জানিয়েছিলেন, এই সিদ্ধান্ত কলকাতায় এসে হঠাৎ করা হয় নি, বেশ কিছুদিন ধরেই ব্যাপারটা বিবেচনা করা হচ্ছে, অগ্রণী বাঙালী বন্ধুদের সঙ্গে আলোচনা করাও হয়েছে। সহসা এই বিবেচনার হেতু কি, মুসলিম সাম্প্রদায়িকদের প্রতিবাদ?—কদাপি নয়—পণ্ডিতজী জানালেন যে, ওসব প্রতিবাদ অগ্রাহ্য করার পক্ষে তাঁরা যথেষ্ট শক্তিশালী; আসলে দু'-একটি বিষয়ে সত্যই আপত্তি উঠতে পারে। ব্যাপারটা যে সর্বভারতীয়, কোনো প্রদেশের কিংবা কোনো একটি ধর্মের ব্যাপার যে নয়। তাই এক্ষেত্রে বহু বিবেচনা করতে হয়েছে, একটুও তাড়াহুড়া করা হয় নি। প্রস্তাবের বড় অংশ সর্বভারতকে লক্ষ্য করে রচিত যেখানকার জনগণ গানটির পটভূমিকা জানে না। বন্দেমাতরম কিভাবে জাতীয় জীবনের অংশ হয়েছে, তা সেখানে লেখা আছে। সংবাদপত্রের সম্পাদক ও লেখক, যাঁরা অযথা ঘোট পাকাচ্ছেন, তাঁদের উদ্দেশ্যে পণ্ডিতজী সদুপদেশ দিয়ে বললেন, তাঁরা যেন প্রস্তাবটি ভাল করে পড়ে দেখেন। "কংগ্রেসের ইতিহাসে আমরা এই সর্বপ্রথম গানটি নিয়ে মোটামুটি সরকারীভাবে বিবেচনা করলাম। একে কেন্দ্র করে দারুণ ভাবাবেগ এবং শ্রদ্ধার সৃষ্টি হলেও নিখিল রাষ্ট্রীয় সমিতি বা বৃহত্তর কংগ্রেস সরকারীভাবে গানটির বিচার-বিবেচনা করে নি। সুতরাং আমরা সর্বপ্রথম বহুভাবে গীত এই গানটির স্থান সরকারীভাবে স্বীকার করলাম। সরকারীভাবে বলতে গেলে, বন্দেমাতরম সঙ্গীত এখন আমাদের জাতীয় আন্দোলনের আরও বৃহৎ অংশ, যা পূর্বে কখনো ছিল না।" বন্দেমাতরমের জন্য 'সরকারীভাবে' কিছু করার গর্বে অস্থির পণ্ডিতজী নিজের কীর্তির গৌরবগান পুনঃপুনঃ করবার পরে পুরনো কথাটা আবার তুললেন, এই গানের কিছু অংশে এমন সব পৌরাণিক বা ধর্মীয় ভাব ও চিত্রাদি আছে, যাকে অন্য সম্প্রদায়ের পক্ষে গ্রহণ করা সম্ভব নয়। ভারত বহু ধর্ম ও সম্প্রদায়ের দেশ ইত্যাদি। "মনে রাখবেন, আমরা গোটা ভারতের কথা ভাবছি।" পণ্ডিতজী অবশ্য বন্দেমাতরমের প্রথম দুই স্তবককে ধর্মীয় গণ্ডগোল থেকে মুক্তি দিয়েছিলেন। "প্রথম দুটি স্তবক এমন যে, পূর্ব থেকে বিদ্বিষ্ট না হলে কারো পক্ষে তাদের বিরুদ্ধে আপত্তি করা সম্ভব নয়।" যাই হোক ধর্ম বা তত্ত্ব সম্বন্ধে এই দীর্ঘ চিন্তা পণ্ডিতজীর কাছে খুবই ক্লান্তিকর ঠেকেছিল। তিনি অতঃপর একেবারে ব্যক্তিগত কথায় নেমে পড়লেন, পাছে কেউ তাঁর ধর্মসম্পর্কহীন সমাজতন্ত্রে সন্দেহ করে। "ব্যক্তিগতভাবে বলতে পারি, আমি কদাপি ধর্ম-তত্ত্বাদির ব্যাপারে, তা হিন্দুর বা মুসলমানের যারই হোক, উৎসাহী হতে পারি না। যখন ধর্মীয় ব্যাপার এসে পড়ে আমি বন্দেমাতরম ভুলে যাই। জনগণের মন তখন অন্য চিন্তায় চলে যায়, তাদের মনে বিভ্রান্তি ঘটে, কেননা তাদের মনোযোগ কতকগুলি ভাব, তত্ত্ব বা পৌরাণিক কথার দিকে ছোটে যা অপর লোকের উপযোগী নয়।" বন্দেমাতরম গানের শেষাংশ অন্য কারো না হোক পণ্ডিত জহরলালের চিত্তকে যথেষ্ট বিশৃঙ্খল করে তুলেছিল তা তাঁর অসংলগ্ন কথাগুলি থেকে বেশ বোঝা যায়। তাই বলে স্ব-কীর্তিতে তিনি কদাপি আস্থা হারান না; সুতরাং শেষকালে দাপটের সঙ্গে বললেন, "আমার মনে হয় ওয়ার্কিং কমিটির সিদ্ধান্ত ঠিক সিদ্ধান্ত, ভালো সিদ্ধান্ত।"

৩০ তারিখের সংবাদপত্রে পণ্ডিতজীর এই সাফাই বেরুল। রবীন্দ্রনাথের বিবৃতিও একই দিনেই। সেটি ২৬শে অক্টোবর রচিত হয়েছিল, সেই দিনই জহরলালের হাতে দেওয়া হয়, কিন্তু প্রকাশ করা হয় নি, কেন, বিবৃতিটি পড়লেই বোঝা যাবে।

"জাতীয় সঙ্গীত হিসাবে বন্দেমাতরমের যোগ্যতা নিয়ে দুর্ভাগ্যজনক বিতর্ক চলেছে। এর বিষয়ে আমার নিজের মত জানাবার কালে আমার মনে পড়ছে, গানটির লেখকের জীবিতকালেই তার প্রথম স্তবকে সুরদান করবার সৌভাগ্য আমার হয়েছিল, এবং কলকাতায় কংগ্রেসের প্রথম দিকের এক অধিবেশনে আমিই প্রথম তা গান করি। গানটির প্রথম অংশে যে সুমধুর ভাব ও ভঙ্গি প্রকাশ পেয়েছে, আমাদের মাতৃভূমির শ্রীময়ী ও কল্যাণময়ী রূপের উপর যে গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে, তা আমার কাছে এমন বিশেষ আবেদন সৃষ্টি করেছিল যে, ঐ অংশটিকে গানের অবশিষ্ট অংশ থেকে, সেইসঙ্গে যে-গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত ঐ গানটি তার থেকে, বিশ্লিষ্ট করে নিতে কোনো অসুবিধা হয় নি; আমার পিতার একেশ্বরবাদের আদর্শে লালিত হওয়ার জন্য অবশ্য আমার পক্ষে গানের অবশিষ্ট অংশ এবং গ্রন্থটি সম্বন্ধে কোনো সহানুভূতি বোধ করা সম্ভব নয়।

"আমাদের প্রদেশের উপরে শাসকগণ যখন বিভাগের বিধান আরোপ করেছিলেন, তখন তার বিরুদ্ধে জনগণের অভিপ্রায়কে প্রকাশিত করার কঠোর সংগ্রামের তীব্র অধ্যায়ে উপযুক্ত জাতীয় সঙ্গীতরূপে এই গানটি প্রথম দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল। পরবর্তী পর্যায়ে যে-সকল ঘটনাধারার মধ্য দিয়ে বন্দেমাতরম জাতীয় ধ্বনিতে পরিণত হয়েছিল, তার পিছনে আমাদের বহু সংখ্যক শ্রেষ্ঠ তরুণ জীবনের যে বিপুল বলিদান ছিল, এই মুহূর্তে যখন আবার আমাদের লক্ষ্যসিদ্ধির জন্য আত্মবিশ্বাসের বিজয়নির্ঘোষ তোলার প্রয়োজন দেখা যাচ্ছে, তখন তাকে অবহেলা করা কখনই উচিত হবে না।

"খোলাখুলি আমি স্বীকার করছি যে, বন্দেমাতরম গানটি সম্পূর্ণভাবে ঔপন্যাসিক পটভূমিকাসুদ্ধ পড়লে তার এমন ব্যাখ্যা সম্ভব যা মুসলমানের অনুভূতিতে আঘাত করতে পারে। কিন্তু ঐ উপন্যাস থেকে গৃহীত হলেও, যদি কোনো জাতীয় সঙ্গীত কেবল দুটি স্তবক

নিয়ে স্বতঃস্ফূর্তভাবে সংগঠিত হয়, তাহলে তা প্রতি ক্ষেত্রে গোটা সঙ্গীতটির কথা আমাদের মনে না করালেও পারবে, যে-গল্পের সঙ্গে গানটি ঘটনাচক্রে যুক্ত হয়েছে, তার কথা তো দূরের ব্যাপার। ঐ অংশ একটি পৃথক ব্যক্তিত্ব, নিজস্ব প্রেরণাগত তাৎপর্য অর্জন করেছে, যার মধ্যে কোনো বিশেষ গোষ্ঠী বা সম্প্রদায়ের আঘাতের কারণ আছে বলে আমি মনে করি না।"

জহরলালের ব্যাখ্যান এবং রবীন্দ্রনাথের বিবৃতি বন্দেমাতরম ঐতিহ্যে, বিশ্বাসী বাঙালীকে ক্রোধে আত্মহারা করে দেবার পক্ষে যথেষ্ট। স্পষ্টই বোঝা গেল ওয়ার্কিং কমিটি বন্দেমাতরম সম্বন্ধে সিদ্ধান্ত করেছে রবীন্দ্রনাথের সম্মতি ও সমর্থন নিয়েই। রবীন্দ্রনাথের পত্রের ভাষা ও বক্তব্য বহুলাংশে ওয়ার্কিং কমিটির প্রস্তাবের মধ্যে ঢুকে গেছে। ওয়ার্কিং কমিটির সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে যদি প্রতিবাদ ওঠে তাকে শান্ত করার জন্য ২৬ তারিখে লিখিত রবীন্দ্রনাথের পত্র প্রকাশ করা হল ৩০ তারিখে। কিন্তু তাতে অভীপ্সিত ফল পাওয়া যায় নি। মর্যাদাশীল সংবাদপত্রগুলি এই সময়ে উভয়কে যে প্রচণ্ড আক্রমণ করেছিল (যে কাগজগুলি এঁদের প্রাপ্য মর্যাদাদানে কার্পণ্য করে নি), তার কোনো তুলনা আছে কি না সন্দেহ। সংবাদপত্রের পরিচালক বা লেখকগণ যদি বন্দেমাতরমের মর্যাদাকে রবীন্দ্রনাথ বা জহরলালের মর্যাদার চেয়ে কম মূল্যবান মনে করতেন, তাহলে কদাপি তাঁদের পক্ষে ঐ আক্রমণ করা সম্ভবপর হত না।

রবীন্দ্রনাথ ও জহরলাল-বিরোধী সমালোচনায় আসার আগে সংবাদপত্রগুলিতে ওয়ার্কিং কমিটির সিদ্ধান্তের প্রতিবাদে বেসুর কথা লেখা হয়েছিল, তার কিছু অংশের উল্লেখ করা যায়। ৩০ অক্টোবর অমৃতবাজারের প্রধান সম্পাদকীয় রচনার আরম্ভে ছিল—*Bande Mataram is dead! Long live Bande Mataram!* তারপরে বলা হয়, সমস্ত গানটি অখণ্ড, তার অঙ্গচ্ছেদ কখনো সম্ভব নয়। খিলাফতীরা বন্দেমাতরমের বিরুদ্ধে আপত্তি তোলে নি, অনেক নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মও আপত্তি করে নি বা করছে না, যাঁদের নেতৃত্ব করছেন রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়। তিনি বলেছেন, যদি দুর্গা ইত্যাদি প্রতীকের বিরুদ্ধে আপত্তি করতে হয়, 'শিবম'-এর বিরুদ্ধেও তাহলে আপত্তি উঠবে। তাছাড়া যদি মনে করা যায়, অঙ্গচ্ছেদ করলেই মুসলমান সাম্প্রদায়িকরা সন্তুষ্ট হবে, সে আশাতেও ছাই, কারণ মুসলমান সাম্প্রদায়িক পত্রিকা জানিয়ে দিয়েছে, আল্লা ভিন্ন কারো কাছে খাটি মুসলমান মাথা নামাতে পারে না। "দিব্য প্রেরণার সৃষ্টি" এই সঙ্গীতের ঐতিহ্যের দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করে সব শেষে লেখা হয়েছিল, "পুলিসের বেটন, সৈনিকের রাইফেল যাকে বিরণালে স্তব্ধ করতে পারে নি, তার কল্পনা আমাদের কিছু নেতার হাতের খেলনা হতে পারে না; ঐ সব নেতারা মনে করেন, কলমের এক আঁচড়ের দ্বারা তাঁরা সমগ্র জাতির আবেগকে নিয়ন্ত্রিত করতে পারেন।"

এই সময়ে মডার্ন রিভিউ পত্রিকায় রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের ধীর বিবেচনাপূর্ণ রচনাগুলি বন্দেমাতরমের পক্ষে সর্বাধিক যুক্তিসঞ্চার করেছিল। এ ব্যাপারে বাংলা দেশের সাহিত্যিকদের মুখপাত্ররূপে যে স্মারকলিপি তিনি গান্ধীজীর কাছে দিয়েছিলেন, তার মধ্যেও উৎকৃষ্ট যুক্তি-নিষ্ঠার ছিল। বন্দেমাতরমের বিরুদ্ধে চার অভিযোগ—তা মুসলিম-বিরোধী, পৌত্তলিকতাপূর্ণ, কঠিন শব্দে পূর্ণ এবং অহিংসাপূর্ণ নয়—সব কয়টিরই যথাসম্ভব উত্তর দেবার চেষ্টা তিনি করেছিলেন। জোর, যুক্তির পুনরুত্থাপনের প্রয়োজন এখন নেই, তবে রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় তাঁর সম্মানিত সুহৃদ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের পক্ষে বিশেষ অসুবিধাজনক হয়ে উঠেছিলেন, তাতে সন্দেহ নেই। সাধারণ ব্রাহ্মসমাজভুক্ত নিষ্ঠাবান রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় যখন বন্দেমাতরম সঙ্গীতে অতিরিক্ত পৌত্তলিকতার গন্ধ পান না, শুধু তাই নয়, কঠোর একেশ্বরবাদী কৃষ্ণকুমার মিত্রের বন্দেমাতরমভক্তির কথা জানান, অপরপক্ষে রবীন্দ্রনাথের স্বদেশী যুগের নানা পৌত্তলিক সঙ্গীতের দৃষ্টান্ত তুলে ধরেন, তখন রবীন্দ্রনাথকে প্রকাশ্যে না হলেও, অপ্রকাশ্যে বিব্রত হতে হয়েছিলই।[৩]

শুধু রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় নন, রবীন্দ্রনাথের আর এক বন্ধু, এক শ্রেষ্ঠ ভারতীয়, এবং সাধারণ ব্রাহ্মসমাজী, আচার্য জগদীশচন্দ্র বসুও বন্দেমাতরম বিষয়ে রবীন্দ্রনাথের অনুরূপ অভিমত রোধ করেন নি। বন্দেমাতরম নিয়ে যখন বেদনাদায়ক বিতর্ক চলেছে তখন মৃত্যুর ঠিক আগে, ডক্টর কবি সুধাংশুচন্দ্রকে মর্মস্পর্শী একটি চিঠি লিখেছিলেন। তাতে তিনি বলেন,

"বন্দেমাতরম! মাতৃকে বন্দনা করি। যে মাতৃভূমি আমাদের অন্ন দিয়েছে, লালন করেছে, তার সঙ্গে নিজের মায়ের তফাত করা কি কারো পক্ষে সম্ভব? এই সর্বজনীন আবেদনের জন্যই এই সঙ্গীতটি স্বতঃস্ফূর্তভাবে সমস্ত ভারতবর্ষে ছড়িয়ে পড়েছে। এই সর্বজনীন আবেদন স্পর্শ করেছে সমস্ত ভারতবাসীর অন্তরকে।"[৪]

৩—রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় স্বভাবতই কবির "ডান হাতে তোর খড়্গ জ্বলে" ইত্যাদি সঙ্গীতছত্রের উল্লেখ করেছিলেন। অন্যান্য দৃষ্টান্তও দেন।

৪—ইউনিভার্সিটি ইনস্টিটিউট: ১ ডিসেম্বর, ১৯৩৭, অনুষ্ঠিত জগদীশ স্মৃতিসভায় ডাঃ পি এন ব্যানার্জী সুধাংশুচন্দ্রকে লিখিত পত্র থেকে উপরের অংশটি পড়েন। ২ ডিসেম্বরের অমৃতবাজারে বেরিয়েছিল—

"It was pointed out by one of the speakers (Dr. P. N. Banerjee) that Sir Jagadish

আগেই বলেছি বন্দেমাতরমের পক্ষে প্রচারকার্যে বিশেষভাবে সচেষ্ট হয়েছিল আনন্দবাজার ও হিন্দুস্থান স্ট্যান্ডার্ড। বন্দেমাতরম বিষয়ে কংগ্রেসের প্রস্তাবের অন্তর্নিহিত উদ্দেশ্য অনেকের কাছেই ধরা পড়লেও অনেকেই তা ধরিয়ে দিতে চান নি। এই পত্রিকা দুটি কংগ্রেসভক্তি ত্যাগ করে নির্মমভাবে প্রস্তাবের ভিতরের কথাটা খুলে ধরেছিল। ৩০ অক্টোবরের আনন্দবাজারের সম্পাদকীয়ের অংশ—

"যে বিচার-মূঢ়তায় অন্ধ হইয়া কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটি সাম্প্রদায়িক সিদ্ধান্তের কঠোর নিন্দা করিয়াও শেষ পর্যন্ত উহা প্রকারান্তরে মঞ্জুর করিতে ইতস্ততঃ করেন নাই, এবং যে কর্তৃত্বাভিমানের বশবর্তী হইয়া জনমতের প্রবল আপত্তি সত্ত্বেও সেই বিজাতীয় সিদ্ধান্ত দেশের উপর চাপাইয়া দিতে চেষ্টার ত্রুটি করেন নাই—বন্দেমাতরম-বিরোধী প্রস্তাবের মধ্যে সেই বুদ্ধিভ্রংশতাই পুনরায় দেখা যাইতেছে।.....

"বন্দেমাতরম সম্বন্ধে ওয়ার্কিং কমিটির সিদ্ধান্তের নির্গলিতার্থ যাহা দাঁড়ায় তাহা এই—"যতক্ষণ না জাতীয় সঙ্গীত হইবার উপযোগী কোনো হিন্দুস্থানী গান পাওয়া যাইতেছে, ততক্ষণ বন্দেমাতরম গান চলিতে পারে, কিন্তু তাহাও প্রথম দুটি পদ্যাংশ মাত্র।" বন্দেমাতরমের এই খণ্ডিত অংশ এখন হইতে জাতীয় সঙ্গীত বলিয়া বিবেচিত ও সম্মানিত হইবে, এই আশ্বাসটুকুও ওয়ার্কিং কমিটির সুদীর্ঘ বিবৃতি অন্বেষণ করিয়া অনুসন্ধান করিয়া কোথাও পাওয়া গেল না। বরং ইহার বিপরীত এই কথাই আছে যে, জাতীয় অনুষ্ঠানসমূহে বন্দেমাতরমের পরিবর্তে অন্য যে কোনো আপত্তিশূন্য গানও গাওয়া যাইতে পারে।

"বঙ্কিমচন্দ্রের অমর রচনাকে খণ্ডিত করিবার সিদ্ধান্ত হইল, কিন্তু তথাপি উহাকে জাতীয় সঙ্গীত বলা হইল না।..... এই না-বলার পটভূমিকার উপরে বন্দেমাতরমের পরিবর্তে অন্য সঙ্গীত চালাইবার নির্দেশটা প্রকাণ্ড হইয়া দেখা দিয়াছে। সুতরাং এই সিদ্ধান্তই অপরিহার্য হইয়া উঠিতেছে যে, ওয়ার্কিং কমিটি বাংলা দেশে বসিয়া চক্ষুলজ্জার খাতিরে বন্দেমাতরমের যে-দুই ছত্র স্বীকার করিয়া লইলেন, সে দুই ছত্রও শেষ পর্যন্ত টিকিবে না। বন্দেমাতরম-সঙ্গীতকে খণ্ডিত করিতে বাঙালীদের আপত্তি নাই—ইহা প্রমাণ করিবার অত্যন্ত প্রয়োজনীয় প্রাথমিক কর্তব্যটুকু বাংলা দেশে বসিয়াই তাঁহারা সারিয়া গেলেন। এখন একটি হিন্দুস্থানী সঙ্গীত মনোনীত করিতে পারিলেই বন্দেমাতরম-বর্জনের বাকি কাজটুকু সংক্ষেপে নিষ্পন্ন হইবে, এবং আমাদের আশঙ্কা, শ্রীযুক্ত সুভাষবাবুকে সভাপতির পদে বসাইয়া এই মহৎ কার্য সম্পাদনের চেষ্টা হইবে।

"ওয়ার্কিং কমিটির এই সিদ্ধান্ত সম্বন্ধে জাতীয় সংবাদপত্রসমূহ বিরুদ্ধভাব অবলম্বন করায় পণ্ডিত জহরলাল উষ্মা প্রকাশ করিয়াছেন এবং ভারত রাষ্ট্রীয় সমিতির উদ্বোধনের সময়ে অসঙ্গত মন্তব্যও করিয়াছেন। ওয়ার্কিং কমিটির প্রস্তাবের সমালোচনা সম্বন্ধে এই ফাসিস্তসুলভ অসহিষ্ণুতা প্রদর্শনে আমরা বিস্মিত না হইয়া পারি নাই। সংবাদপত্রসেবকগণের ওয়ার্কিং কমিটির সদস্যদের মত পাণ্ডিত্য না থাকিতে পারে কিন্তু ওয়ার্কিং কমিটির বিবৃতি (তা পণ্ডিত জহরলালের রচনা হইলেও) বুঝিবার মত যোগ্যতা তাহারা রাখে এবং নানা শূন্যগর্ভ বাগাড়ম্বরের মধ্য হইতে আসল উদ্দেশ্যটা সহজেই বাহির করিয়া ফেলে। পণ্ডিতজীর নিকট ইহা অসহনীয় অপরাধ বলিয়া গণ্য হইলেও ইহার কোনো প্রতিকার নাই।.....

"বন্দেমাতরম সম্বন্ধীয় এই অপরিণামদর্শী সিদ্ধান্তের পরিণতি কি হইবে, সে সম্বন্ধে সংবাদপত্রখানি (স্টার অব ইণ্ডিয়া) আপনার দলভুক্তদের আশ্বাস দিয়া বলিয়াছেন—

'This is an early step towards the decent burial of Bande Mataram.'"

[ক্রমশঃ]

---

in the last days of his life expressed his deep concern at the agitation that was going on against Bande Mataram. He went so far as to write a letter to Sj. Subhas Ch. Bose on this subject .... The speaker quoted the following portion from the letter of Sir Jagadish ..."

মাতৃভূমি সম্বন্ধে জগদীশচন্দ্রের অনুভূতির অনুরূপ অনুভূতি রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়েরও ছিল। ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভার পাঞ্জাবী সদস্য মৌলনা জাফর আলি খাঁ বলেছিলেন, ইস্‌লাম আমাদের আসল মা, ভারত সৎ-মা। প্রবাসী-সম্পাদক সে বিষয়ে (শ্রাবণ, ১৩৪৪) লেখেন—

"দেশকেই কবিত্বের ভাষায় মাতৃসম্বোধন বা পিতৃসম্বোধন করা হয়, ধর্মকে নহে।..... আমরা যে ভারতবর্ষকে আমাদের মা বলি, তাহা নিতান্ত কবিকল্পনাও নহে। ভারতবর্ষের অন্নজলে, বাতাসে আমাদের দেহের পুষ্টি ও প্রাণরক্ষা হয়, এবং হৃদয়-মন-আত্মার খাদ্য প্রধানতঃ এইখানে থাকিয়া ও এই খান হইতেই আমরা পাই।..... এইজন্য ভারতবর্ষ আমাদের মা।"

বঙ্গ দর্শন

এবারের আসন্ন মধ্যবর্তী নির্বাচনে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের মধ্যে যে রাজনৈতিক সংগ্রাম শুরু হয়েছে, এমন তীব্র ও ব্যাপক সংগ্রাম অতীতে আর কখনো ঘটে নি। প্রত্যেকটি দলের কাছেই এ লড়াই বাঁচার লড়াই। প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী গান্ধী দু'-দু'বার এইজন্য পশ্চিমবঙ্গে ঘুরে গেছেন, আবার আসবেন শোনা যাচ্ছে। ঘুরে গেছেন অর্থমন্ত্রী মোরারজী দেশাই, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী যশোবন্ত চ্যবন, খাদ্যমন্ত্রী জগজীবন রাম। যুক্তফ্রন্টের তরফ থেকেও সর্বভারতীয় নেতারা আসছেন, কেরালার মুখ্যমন্ত্রী শ্রীনাম্বুদ্রিপাদ এই সেদিন ঘুরে গেলেন, কমিউনিস্ট নেতা শ্রীডাঙ্গেও কয়েকটি নির্বাচনী সমাবেশে বক্তৃতা দিয়েছেন।

কেন্দ্রীয় মন্ত্রীদের এই নির্বাচনী সফরগুলিকে উপলক্ষ করে কয়েকটি বিষয়ে অকংগ্রেসী রাজনৈতিক দলগুলি ক্ষুব্ধ হয়েছেন। এই ক্ষোভের কারণ হচ্ছে যে, কেন্দ্রীয় মন্ত্রীরা একটি বিশেষ দলের স্বার্থে নির্বাচনী সফরে আসছেন, এবং তাঁদের ভ্রমণব্যয় বহন করছে রাজ্য সরকার। দৃশ্যতই বিষয়টি পক্ষপাতিত্বমূলক। এই বিষয় অবশ্য বিহার সরকার একটি আদর্শ দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন, যা আমরা অভিনন্দনযোগ্য বলে মনে করি। প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীর বিহারে নির্বাচনী সফর সমাপ্ত হবার পরেই বিহার সরকারের তরফ থেকে বিহার কংগ্রেসের নামে সাড়ে তিন লক্ষ টাকার একটা বিল পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে। **পশ্চিমবঙ্গেও এতগুলি কেন্দ্রীয় মন্ত্রীর নির্বাচনী সফরের ব্যয়ভার রাজ্য সরকার কেন বহন করবেন? এবং তা করার ফলে যদি প্রতিপক্ষ পক্ষপাতিত্বের অভিযোগ আনেন সে অভিযোগের গুরুত্ব নিশ্চয়ই অস্বীকার করা যায় না। রাজ্যপালের প্রশাসনে একটি বিশেষ দলের প্রতিই বা লক্ষ লক্ষ টাকার এই অনুগ্রহ করা হবে কেন?**

আরও একটি কথা এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য। নির্বাচনী প্রচারে যে-কোন দলের বক্তব্যই যেন বিশুদ্ধ রাজনৈতিক বক্তব্য হয় সেটাই সকলের কাম্য। মিথ্যা কুৎসা ছড়ানো যেমন নির্বাচনী প্রচারের ক্ষেত্রে অত্যন্ত গর্হিত বিষয়, তদনুরূপ গর্হিত বিষয় হচ্ছে নির্বাচনী প্রচারের ক্ষেত্রে কোন রকম থ্রেট করা বা ভয় দেখানো, তা প্রত্যক্ষেই হোক বা পরোক্ষেই হোক।

উপ-প্রধানমন্ত্রী শ্রীমোরারজী দেশাই বিভিন্ন নির্বাচনী সভায় এই রকম কথা ইঙ্গিতে বলছেন যে, যদি কেন্দ্রে এবং রাজ্যে একই দলের সরকার না থাকে তাহলে রাজ্যগুলিকে ভুগতে হবে। অর্থাৎ সে রকম অবস্থা ঘটলে কেন্দ্র রাজ্যকে হাতে না মেরে ভাতে মারার চেষ্টা করবে। বস্তুত কেন্দ্রীয় সরকারের ঘোষণাতেই প্রকাশ যে, নির্বাচনমুখী রাজ্যগুলির বরাদ্দ অর্থ নির্বাচনের ফলাফল প্রকাশিত হওয়া পর্যন্ত আটকে রাখা আছে। অবস্থা যদি সত্যই এই হয়, যদি উপ-প্রধানমন্ত্রীর মত দায়িত্বশীল ব্যক্তি এ-রকম ঘোষণা করেন যে, তাঁর দলকে ভোট না দিলে পশ্চিমবঙ্গের উন্নয়নক্ষেত্রে ঢ্যারা পড়বে তাহলে গণতান্ত্রিক নির্বাচন কথাটির কোন তাৎপর্য থাকে না।

অর্ধসত্য তথ্য পরিবেশন করে জনসাধারণকে বিভ্রান্ত করাও সর্বাংশে নিন্দনীয়, বিশেষ করে তা যদি দায়িত্বশীল মহল থেকে প্রচারিত হয়। নির্বাচনের প্রাক্কালে কেন্দ্রীয় সরকারের তরফ থেকে ঘেরাও-এর নবমূল্যায়ন এবং তার জন্য বিগত যুক্তফ্রন্ট সরকারকে অসামীর কঠাগড়ায় দাঁড় করানো নিছকই উদ্দেশ্যমূলক বলে মনে হয়। ১৯৬৮ সালের ৩০শে মে তারিখে জাতীয় শ্রম কমিশনের সম্মুখে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের শ্রমদপ্তর যে সাক্ষ্য দিয়েছিলেন, তা সন্দেহাতীতভাবেই প্রমাণ করে যে, ঘেরাও-এর সাম্প্রতিক মূল্যায়ন নিতান্তই যুক্তিহীন। ওই রিপোর্টেই আছে, সময় মত বেতন পাবার ন্যূনতম অধিকার আদায়ের জন্যও শ্রমিকগণ অনেক সময় শেষ চেষ্টা হিসাবে ঘেরাও-এর পথ অবলম্বন করতে বাধ্য হয়েছেন। ওই রিপোর্টেই বলা হয়েছে যে ঘেরাও-এর জন্য একটি কারখানাও বন্ধ হয় নি।

অবশ্য আর দু' সপ্তাহের মধ্যেই সমস্ত জল্পনা-কল্পনার অবসান হবে বলে আশা করা যায়। নির্বাচনী কাজ সর্বত্রই জোর কদমে চলছে, শুধু রাজনৈতিক দলগুলিই নয়, যাঁরা নির্বাচন কন্ডাক্ট করবেন তাঁদেরও প্রস্তুতিপর্ব চলছে। এই প্রসঙ্গে আমাদের আরও একটি বক্তব্য আছে, যে সব সরকারী কর্মচারী নির্বাচন উপলক্ষে বিভিন্ন কেন্দ্রে প্রেরিত হন তাঁদের দিকটাও ভাবা দরকার। অনেক সরকারী কর্মচারী এমন অভিযোগ করেছেন যে, গতবারে তাঁরা নির্বাচন উপলক্ষে যে সকল স্থানে প্রেরিত হয়েছিলেন, সেখানে তাঁদের রাহা খরচের জন্য যা প্রাপ্য, তা তাঁরা আজও পর্যন্ত পান নি। আশা করি এবারে সে ঘটনার পুনরাবৃত্তি হবে না।

প্রজাতন্ত্র দিবসে

বিংশতিতম প্রজাতন্ত্র দিবস উদ্‌যাপিত হল। এই দিবসের তাৎপর্যের চেয়ে আনুষ্ঠানিক কর্তব্যই এখন প্রাধান্য লাভ করছে। প্রজাতন্ত্র দিবসে জনসাধারণের স্বতঃস্ফূর্ত আনন্দানুষ্ঠানের দেখা পাওয়া একালে প্রায় দুর্লভ হয়ে উঠেছে। আর সরকারী ব্যয়ে প্রজাতন্ত্র দিবসের যে অনুষ্ঠান হয় তাতে আমন্ত্রিতদের মধ্যে আমলাদেরই আড়ম্বর বড় বেশি।

পুরো উনিশটা বছরে এ দশা কেন হল? এ প্রশ্নের একমাত্র উত্তর, স্বাধীন ভারত প্রজাতন্ত্র রাষ্ট্র রূপে ঘোষিত হলেও এ রাষ্ট্রের প্রজাদের আশার আলো এখনো আলেয়ায় রূপায়িত। এ কথা হয়তো সত্য, দেশের সরকার পর পর তিনটি পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় অনেক অর্থ ঋণ করে ব্যয় করেছেন, দেশের কাছে তুলে ধরেছেন লাঞ্ছিত জীবনের মান উন্নয়নের অনেক রকম বিবরণ এবং তাদের দেখিয়েছেন বহু দুর্লভ স্বপ্ন, কিন্তু ফলাফলের হিসেব-নিকেশ করে জনসাধারণ যা পেয়েছেন তার নাম নৈরাশ্য, বেকারত্ব, ক্ষুধা ও পুলিশী-পীড়ন। দেশের অগ্রগতিতে কালে বাধা-বিঘ্ন উপস্থিত হলে, জনসাধারণ উপলব্ধি

করতে পারে সেই অগ্রগতি বিলম্বিত হওয়ার কারণ, কিন্তু তারা যদি দেখে, দেশের অগ্রগতি হচ্ছে বলে যা বলা হয়, তাতে জনসাধারণের কোনো উপকার হয় না, পরিবর্তে কোটিপতিদের প্রতি আরো সরকারী ঔদার্য প্রদর্শন করা হয়—তাহলে বৈষম্য-নিপীড়িত জনসাধারণ কি করে প্রজাতন্ত্র দিবসে সরকারী যন্ত্রে তৈল প্রদান করতে পারে?

তবু জনসাধারণ প্রজাতন্ত্র দিবসের প্রতি তাদের কৃতজ্ঞতা বিস্মৃত হতে পারে না। তারা জীবনে ধন-মান কিছু না পেলেও, যা পেয়েছে তা হচ্ছে দেশ চালনায় কাজে অধিকার প্রয়োগ করার ক্ষমতা। আর এই ক্ষমতা প্রয়োগ করা সম্ভব স্বাধীন এবং সচেতন মন নিয়ে ভোটদানের মাধ্যমে।

জনসাধারণ ভোটদানের অধিকার পেলেও এ-কথা অত্যন্ত বেদনা ও পরিতাপের সঙ্গে স্বীকার করতে হয় যে, এ-দেশের শতকরা পঁচাত্তর ভাগ মানুষ এখনো নিরক্ষর এবং অশিক্ষিত। সুতরাং এদেশে ভোটের নামে যে গণতন্ত্রের কথা বলা হয়, তা একান্ত হাস্যকর বলে কেউ কেউ মনে করলে তা খুব অন্যায় নয়। কারণ সচেতন মনে যে সব নাগরিক ভোট দিতে পারে না, তারা স্বৈরাচারীর খপ্পরে পড়ে এবং অর্থের দ্বারা প্রলুব্ধ হয়।

দীর্ঘ উনিশ বছরের মধ্যে দেশের বিরাট সংখ্যক নাগরিক নিরক্ষর, একথা কল্পনা করতেও লজ্জা ও দ্বিধা হয়। আমাদের সংবিধানে একথার উল্লেখ আছে যে, সংবিধান গৃহীত হবার পর আট বছরের মধ্যে সর্বজনীন শিক্ষার দ্বারা দেশ থেকে নিরক্ষরতা দূর করতে হবে। সংবিধানের এই মর্যাদা রক্ষার দায়িত্ব যাদের ওপর রয়েছে তারা এই বিধি দীর্ঘ একুশ বছরের শাসনে ফুৎকারে উড়িয়ে দিয়ে এখনো ভোটের জন্য কিভাবে দ্বারস্থ হয়?

সংবিধানের মর্যাদা কিভাবে রক্ষিত হচ্ছে তা নিয়ে গত বছরে কম আলোচনা হয় নি। কেন্দ্রীয় সরকার কতকগুলি রাজ্যের সরকার ওলট-পালটের ব্যাপারে এক এক বার এক এক রকম নীতি গ্রহণ করেছেন—যা নাকি, অনেকের মতে, দলগত সুবিধাবাদের আচরণ। তাছাড়া সম্মানিত স্পীকারের অধিকার নিয়েও বহু তর্ক-বিতর্ক হয়েছে। কিন্তু আজ পর্যন্ত এসব প্রশ্নের কোনো ফয়সালা হয় নি। অথচ বিভিন্ন দলগুলিকে আহ্বান জানিয়ে পরস্পর সহযোগিতামূলক আচরণের দ্বারা এসব প্রশ্নের সাংবিধানিক মীমাংসা হওয়া অসম্ভব ছিল না। কিন্তু কেন্দ্রীয় সরকার সে পথে অগ্রসর হন নি। উপরন্তু যে দলত্যাগের দ্বারা সংবিধানের ভোটাধিকারকে বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ প্রদর্শন করার ব্যবস্থা রয়েছে—তা থেকে উদ্ধার পাবার কোনো সর্বদলসম্মত পাকাপাকি ব্যবস্থা গ্রহণ করা আজো পর্যন্ত সম্ভব হয় নি। বলা বাহুল্য, কেন্দ্রীয় সরকারের পক্ষে উচিত ছিল, উপরি উক্ত সমস্যাগুলি সমাধানের পথ দ্রুত আবিষ্কার করা। দুর্ভাগ্যের কথা, কেন্দ্রীয় সরকার সে ব্যাপারে প্রায় ব্যর্থ হয়েছেন। সুতরাং অন্তর্বর্তী নির্বাচনের পর আবার যদি সাংবিধানিক সঙ্কটের সৃষ্টি হয়, তার জন্য কেন্দ্রীয় সরকার নিজের দায়িত্ব পালনের অক্ষমতা অস্বীকার করতে পারবেন না।

প্রজাতন্ত্র দিবসে জনসাধারণ এবার আর তেমন উৎফুল্ল না হওয়ার মূলে উপরি উক্ত কারণগুলি যে ক্রিয়া করে নি—তা বলা যায় না। তবে প্রজাতন্ত্র দিবসের মূল্যবোধ একদা জনসাধারণের সামগ্রিক কল্যাণের বাস্তব রূপায়ণের দ্বারা সম্ভব হবে, একথা আমরা মনে-প্রাণে স্বীকার করি।

স্টেট বাসের ভাড়া বাড়ছে

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের প্রাক-নির্বাচনী রসিকতা কিনা জানি না, তবে স্টেট বাসের ভাড়া বাড়ানোর সিদ্ধান্ত পাকা হয়ে গেছে, রাজ্যপাল স্বয়ং তা অনুমোদনও করেছেন। এটা যে করা হবে তা ট্রামের ভাড়া বাড়ানো দেখেই অনুমান করা গিয়েছিল। দশ পয়সায় টিকিটকে যাঁরা পনের পয়সায় বাড়িয়েছেন, অর্থাৎ শতকরা পঞ্চাশ ভাগ দাম যাঁরা বাড়িয়েছেন, তাঁদের এই নির্মম মুনাফাখোরী প্রবণতাকে নিন্দা করার ভাষা নেই। স্বয়ং সরকারই যদি এই রাস্তায় পা বাড়িয়ে থাকেন, তাহলে রাতারাতি যারা পণ্যের দাম বাড়িয়ে দ্বিগুণ মুনাফা পিটতে চায় তাদের আর নিন্দা করি কোন মুখে? এই কু-দৃষ্টান্তের তুলনা নেই, এবং বাঙালী কখনোই এই পীড়ন নির্দ্বিধায় মেনে নেবে না বলেই আমাদের বিশ্বাস। স্টেট বাসের ভাড়া বাড়ানো মানেই প্রাইভেট বাসের মালিকদের ভাড়া বাড়াতে উৎসাহিত করা। পরিবহন দপ্তরের নিকট আমাদের জিজ্ঞাসা, এই স্বার্থেই কি তাঁরা দাম বাড়াবার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন? রাষ্ট্রীয় পরিবহনের যা কিছু লোকসান তার মূল কারণ কু-পরিচালনা, তা যদি না হত তাহলে দফায় দফায় দাম চড়ানোর পরেও লোকসান হত না। এবং আজ যাঁরা শতকরা পঞ্চাশ ভাগ দাম বাড়াচ্ছেন, তাঁরা নিশ্চয়ই এই গ্যারাণ্টি দেবেন না যে, এর পরে রাষ্ট্রীয় পরিবহনের আর লোকসান হবে না।

আসল কথাটা স্থূল হলেও সত্য। সেই কথাটি হচ্ছে রাষ্ট্রীয় উদ্যোগে পরিচালিত সমস্ত প্রতিষ্ঠানই আজ নেগেটিভ বা নেতিবাদী দৃষ্টিভঙ্গী দ্বারা পরিচালিত হচ্ছে। পণ্ডিত নেহরু বা বিধানচন্দ্র রায়ের আমলে একটা সমাজতান্ত্রিক দৃষ্টিভঙ্গী তৎকালীন কংগ্রেস সরকার গ্রহণ করেছিল যার ফলে রাষ্ট্রীয় উদ্যোগের প্রকাশ বিভিন্ন ক্ষেত্রে দেখা গিয়েছিল এবং সীমাবদ্ধ ক্ষেত্রে হলেও তা কিছুটা প্রেরণা দিতে সক্ষম হয়েছিল। নেহরু আমলের পর সমাজতান্ত্রিক দৃষ্টিভঙ্গী পরিত্যক্ত হয় এবং এখনকার কংগ্রেসী নেতারা ভুলেও আর সমাজতন্ত্র শব্দটিও উচ্চারণ করেন না। ব্যক্তিগত উদ্যোগ ও বৈদেশিক লগ্নীর ওপরই এখন গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে এবং সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার পদক্ষেপ হিসাবে যে-সব রাষ্ট্রীয় উদ্যোগ করা হয়েছিল, সেগুলি ব্যক্তিগত মালিকানায় ফিরিয়ে দেবার চেষ্টা হচ্ছে। নতুবা কলকাতা উন্নয়নের মত ব্যাপারটিতেও রাজ্য সরকারের ভূমিকা নেই কেন? সে দায়িত্ব কেন মুষ্টিমেয় শিল্পপতির হাতে তুলে দেওয়া হচ্ছে? শাসন ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত নেতৃদের মুখ থেকেই বা কেন রাষ্ট্রীয় উদ্যোগের বিরুদ্ধে মন্তব্য প্রকাশিত হচ্ছে? অর্থাৎ নেহরুর মৃত্যুর পর থেকেই ভারতের রাষ্ট্রিক চরিত্রের পরিবর্তন হয়েছে। এই প্রবণতা দক্ষিণপন্থী, রাষ্ট্রীয় উদ্যোগের পরিবর্তে ব্যক্তিগত উদ্যোগ ও মালিকানা। সামগ্রিক অর্থনৈতিক প্রবণতা যখন এদিকেই, স্বাভাবিক নিয়মেই তখন রাষ্ট্রীয় উদ্যোগগুলিতে নেতিমূলক মনোভাবের অনুপ্রবেশ যে ঘটবে এটা বুঝে নিতে বিন্দুমাত্র বিলম্ব হবার কথা নয়। তাই স্টেট বাসকে ব্যক্তিগত মালিকানায় তুলে দেবার কথাই সরকারী স্তর থেকে মাঝে মাঝে শোনা যায়।

পরিচালনার ক্ষেত্রে যখন এই নেগেটিভ দৃষ্টিভঙ্গী বিরাজ করছে তখন গতানুগতিকভাবে কোনক্রমে কাজ চালিয়ে যাওয়া ছাড়া আর কোনই কর্তব্য নেই। কাজেই লোকসানের অঙ্ক দিনের পর দিন কমার পরিবর্তে বেড়েই যায় এবং জনসাধারণের পকেট কেটেই তা পূরণ করা হয়। এটাই চলছে এবং চলবে এণ্ড্ ইনফিনিটাম, যদি না পরিচালনার ক্ষেত্রে যোগ্যতর ব্যক্তিরা নতুন দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে আসেন। আমাদের মনে আছে কিভাবে যুক্তফ্রন্ট সরকারের আমলে যোগ্য ব্যক্তি শ্রীমুর্শেদের হাতে পড়ে ট্রাম কোম্পানীর ব্যয় সংক্ষেপ হয়েছিল এবং পরিচালনার ক্ষেত্রে উন্নতির লক্ষণ দেখা গিয়েছিল। কিন্তু এক বছরের মধ্যে অবস্থার কেন পরিবর্তন হল, কেন সেই যোগ্য অফিসারকে অন্যত্র বদলী করা হল, তার

পর থেকেই কেন হঠাৎ লোকসানের মাত্রা লাফিয়ে উঠল, সে রহস্যের সমাধান অদ্যাপি হল না, মাঝখান থেকে ট্রামের ভাড়া দেড়গুণ বাড়িয়ে দেওয়া হল। অনুরূপভাবে স্টেট বাসের ক্ষেত্রেও ভাড়া বাড়ানোর কোন যৌক্তিকতা নেই, কেন না তা করেও লোকসান এড়ানো যায় না।

প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য, যুক্তফ্রন্টের নেতারা ট্রামভাড়া বাড়া প্রসঙ্গে ঘোষণা করেছেন যে, যদি তাঁরা জয়যুক্ত হন তা হলে রাইটার্স বিল্ডিংসে প্রবেশ করা মাত্রই তাঁরা আদেশ দেবেন বর্ধিত ভাড়া প্রত্যাহার করার জন্য। স্টেট বাসের ভাড়া বৃদ্ধির ক্ষেত্র তাঁরা কি বলেন তার জন্য আমরা প্রতীক্ষায় রইলাম। কংগ্রেস কিন্তু ভাড়া বাড়ানো সম্বন্ধে কোনই মন্তব্য করে নি।

উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়

উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের দুর্নীতির কথা আমরা ইতিপূর্বে বঙ্গদর্শনে আলোচনা করেছিলাম। ব্যাপারটি একান্তই সাদামাটা এবং দুর্নীতির যে ধরণ তাতে কোন বিশেষ কায়দা নেই, তা একান্তই স্থূল। ওই বিশ্ববিদ্যালয়ের চত্বরে কয়েকটি বিল্ডিং তোলার জন্য হাওড়ার একটি প্রতিষ্ঠানকে কন্ট্রাক্ট দেওয়া হয়েছিল, বিশ্ববিদ্যালয়ের একজিকিউটিভ কাউন্সিলের কোন অনুমোদন না নিয়ে। দ্বিতীয়ত, যে প্রতিষ্ঠানটিকে ওই কন্ট্রাক্ট দেওয়া হয়েছে তার চেয়ারম্যান উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলারই স্বয়ং। তৃতীয়ত, এই কাজের জন্য কোন টেন্ডার আহ্বান করা হয় নি। চতুর্থত, এর জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের তরফ থেকে ওই প্রতিষ্ঠানকে টাকা অগ্রিম দেওয়া হয়েছে এবং পঞ্চমত, বিশ্ববিদ্যালয়ের বেতনভোগী মিস্ত্রী ও কারিগরেরা ওই প্রতিষ্ঠানের তরফে কাজ করেছেন, তাঁদের বেতন গুণতে হয়েছে বিশ্ববিদ্যালয়কেই।

আগেই বলেছি, এটা খুবই স্থূল ধরণের দুর্নীতি, সহজ, কথায় ভাইস চ্যান্সেলারই যখন উক্ত ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তা, তখন নিজের বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য তিনি ওই প্রতিষ্ঠানকে কিছু পাইয়ে দিতে চান, এবং সেই কারণেই একজিকিউটিভ কাউন্সিলকে না জানিয়েই লাখ লাখ টাকার কন্ট্রাক্ট উপাচার্য মশাই এদের দিয়েছেন। এখন কিন্তু উপাচার্য মশাই নিজ কর্মের সমর্থনে অদ্ভুত যুক্তিজাল বিস্তার করছেন। একজিকিউটিভ কাউন্সিলকে না জানানোর কারণ হিসাবে তিনি নিজের শারীরিক অসুস্থতার কথা বলছেন, বলছেন যে, হাওড়ার ওই প্রতিষ্ঠানটি বিজ্ঞানসম্মত পদ্ধতির কারবারী, কেন না স্বল্প বাযে বাড়ি তোলার এমন একটা কায়দা ওই প্রতিষ্ঠানটি গবেষণা করে বার করেছে, যে কায়দা অন্য কোন প্রতিষ্ঠান জানে না। অতএব ওদের কন্ট্রাক্ট দেওয়া ভিন্ন গতি কি? আবার যখনই কন্ট্রাক্ট ও টেন্ডারের কথা উঠল এবং সেই সঙ্গে উক্ত প্রতিষ্ঠানটিকে টাকা এ্যাডভান্স করার কথাও উঠল, তখন তিনি বললেন যে, ওটা একটা কো-অপারেটিভ প্রতিষ্ঠান, ওদের ঠিক কন্ট্রাক্টার মনে করলে ভুল হবে, আর সেই কারণেই টেন্ডার আহ্বান না করে তিনি বরং ওদের কিছু অগ্রিম দিয়েছেন।

কিন্তু এই কথাগুলি বলে কি কাটা কান চুল দিয়ে ঢাকা যায়? ভাইস চ্যান্সেলার মশাই যে রিপোর্ট দিয়েছেন তা থেকে নিম্নলিখিত তথ্যগুলি নির্গত হয়। প্রথমত এই কাজে নিযুক্ত একজন সুপারিন্টেন্ডেন্ট, একজন মিস্ত্রী-ইনস্ট্রাক্টর ও একজন স্থপতি বিশ্ববিদ্যালয়ের তরফ থেকেই নিযুক্ত এবং সেই জন্য তাঁদের বেতন দেওয়া হচ্ছে সুতরাং নির্মাণকার্যের জন্য আলাদা প্রতিষ্ঠানের প্রয়োজন কি? বলা হয়েছে যে, বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষে ওই প্রতিষ্ঠানটির কাজের বিশেষ প্রয়োজন। কিন্তু এই বিশেষ প্রয়োজনীয়তা কেন তা কোনদিন একজিকিউটিভ কাউন্সিলকে বোঝানোর চেষ্টা হয় নি। উপাচার্য জানিয়েছেন যে, বিল্ডিং খাতে ৪,৪০,০০০ টাকা তিনি একজিকিউটিভ কাউন্সিলকে দিয়ে মঞ্জুর করিয়ে নিয়েছেন, কিন্তু বাইরের একটি প্রতিষ্ঠানকে এই টাকা দেওয়া হচ্ছে সে তথ্য একজিকিউটিভ কাউন্সিলের নিকট গোপন রাখা হয়েছিল, বোঝান হয়েছিল যে, বিশ্ববিদ্যালয়ের বিল্ডিং বিভাগকেই যেন এই টাকাটা দেওয়া হবে। বলা হয়েছে যে, প্রতিষ্ঠানটি কন্ট্রাক্ট নিয়ে কাজ করছে না, কিন্তু প্রতিষ্ঠানটি বস্তুতই কন্ট্রাক্ট নিয়েছে, অথচ পার্শ্বোক্ত যুক্তির অজুহাতে টেন্ডার গ্রহণ ইত্যাদি নিয়মতান্ত্রিক ব্যাপার থেকে উক্ত প্রতিষ্ঠানটিকে অব্যাহতি দেওয়া হয়েছে। শুধু তাই নয়, যখন-তখন মোটা অঙ্কের টাকা অগ্রিম দেওয়া হয়েছে। এ ছাড়া উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের সংবিধান অনুযায়ী বিল্ডিং সংক্রান্ত বিষয়টি একান্তভাবেই একজিকিউটিভ কাউন্সিলের এক্তিয়ারে অথচ বিষয়টিকে সুকৌশলে ভাইস চ্যান্সেলার নাকি নিজের হাতেই রেখেছেন। এবং সর্বাপেক্ষা পরিতাপের বিষয় হল যে, উক্ত প্রতিষ্ঠানটির কর্মকর্তা এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্মকর্তা একই লোক।

তাহলে যা দেখা যাচ্ছে উপরি উক্ত বিষয়টি ক্ষমতার অপব্যবহারের একটি অতি স্থূল ও কদর্য দৃষ্টান্ত। অথচ এই রকম একটা বিষয়কে এখনো পর্যন্ত এভাবে যে কেন চেপে রাখা হয়েছে সেটাই বুঝে ওঠা দুষ্কর। এবং এই একটি উদাহরণই প্রমাণ করছে যে, আমাদের শিক্ষাব্যবস্থার চূড়ায় যাঁরা বসে আছেন তাঁরা কোন ধাতুতে গড়া।

বদলীর আদেশপ্রাপ্ত চিকিৎসকদের ক্ষোভ

স্বাস্থ্য অধিকর্তাকে ধন্যবাদ, তিনি আরও একটি কাজের কাজ করেছেন। বিভিন্ন মেডিক্যাল কলেজে কর্মরত কয়েকজন অধ্যাপককে বদলীর আদেশ দেওয়া হয়েছে এবং অপরাপর কয়েকজন চিকিৎসকও বদলী হতে চলেছেন। ধন্যবাদ আমরা এই কারণে দিচ্ছি যে, মেডিক্যাল কলেজের অধ্যাপকদের চাকরী বদলির (ট্রান্সফারের) যোগ্য হওয়া সত্ত্বেও কায়েমী স্বার্থের চাপের জন্য তাঁদের অন্যত্র সরানো প্রায় অসম্ভব হয়ে দাঁড়িয়েছিল।

বেশি দিন এক জায়গায় থাকলে স্বাভাবিক নিয়মেই কায়েমী স্বার্থ গজিয়ে ওঠে এবং দু-চারজন বাদে বেশির ভাগই এই চক্রের মধ্যে ঢুকে পড়েন। একটি মেডিক্যাল কলেজে দীর্ঘকাল অধ্যাপনা করার সুযোগে বাইরের প্র্যাকটিশকে বাড়বাড়ন্ত রাখা যায়, বিভিন্ন ক্লিনিক ও নার্সিং হোমে এ্যাটেন্ড করা যায় এবং তা ছাড়া আনুষঙ্গিক সুযোগ-সুবিধাও প্রচুর জোটে। একটা ফলোয়িং বা অনুগামী চক্র সৃষ্টি করা যায় এবং সেই সুবাদে বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে সম্রাটের মত রাজত্ব করার সুযোগও অনেকের ঘটে। কাজেই বদলীর প্রয়োজনীয়তা আছে। শুধু চিকিৎসাজগতে নয়, যে কোনো সরকারী চাকুরীতে বদলী একটা অলঙ্ঘনীয় শর্ত। অথচ কয়েক বছর যাবৎ প্রোমোশন, রিটায়ারমেন্ট-এর ব্যাপারে ছাড়া মেডিক্যাল কলেজসমূহের অধ্যাপকদের বদলীর রীতি প্রায় উঠেই গিয়েছিল, এবার স্বাস্থ্য-দপ্তর আইনমাফিক কাজ করে যথেষ্ট সুবুদ্ধির পরিচয় দিয়েছে।

কিছু সংখ্যক চিকিৎসক ও ছাত্র এই বদলীর বিষয়কে উপলক্ষ করে গণ্ডগোল পাকানোর তালে আছেন, তাঁরা বিভিন্ন পত্রিকা অফিসে ধাওয়া করেছেন এবং বদলীর আদেশপ্রাপ্ত অধ্যাপকদের স্বপক্ষে দু-চার কথা লিখিয়ে নিতে পেরেছেন। আমাদের এখানেও এসেছিলেন, কিন্তু বিশেষ সুবিধা হয় নি। ছাত্রদের অনেকের কাছে এটা নাইন্থ পেপার-এর একটা অল মওকা, তাই তাঁদের কেউ কেউ সোরগোল তুলেছেন যে, এই বদলীর ফলে বিভিন্ন মেডিক্যাল কলেজে শিক্ষা-ধারা ব্যাহত হবে, কারণ অধ্যাপকেরা নাকি বিভিন্ন

কলেজে নিজস্ব শিক্ষাসূচী তৈরি করে পড়ান। কিন্তু এ-আশঙ্কার কোন ভিত্তি নেই। কেউই কোন পদের জন্য ইন্‌ডিস্‌পেনসিব্‌ল নন, একের কাজ অপরকে দিয়ে না চলার কোন কারণই নেই।

যাঁরা বদলী হয়েছেন, অনুমান করতে অসুবিধা হয় না, তাঁদের কেউ কেউ চিকিৎসা-রাজ্যের রীতিমত প্রভাবশালী লোক। এ কথা বললে ভুল বা অন্যায় হবে না যে, তাঁদের অনেকেই এই ব্যাপারে সরকারের ওপর প্রভূত চাপের সৃষ্টি করে বদলীর আদেশগুলি এক-এক করে প্রত্যাহার করাতে পারবেন। ইতিমধ্যেই বদলীর আদেশপ্রাপ্ত কয়েকজন অধ্যাপক নাকি ছুটি নিয়েছেন, তাঁদের একজন তো স্পষ্ট করেই আমাকে বললেন—মধ্যবর্তী নির্বাচন শেষে নতুন প্রতিনিধিমূলক সরকার গঠিত হলেই তাঁদের বদলীর আদেশ বাতিল করানো হবে এবং খোদ স্বাস্থ্য অধিকর্তাকে বিদায় দেওয়ানো হবে। শেষের মন্তব্যটি বেশ দৃঢ়তার সঙ্গে করলেন উপরোক্ত অধ্যাপক ভদ্রলোক।

আশা করি রাজ্যের স্বাস্থ্যদপ্তর বদলীর আদেশপ্রাপ্ত অধ্যাপকদের বেপরোয়া আচরণ সম্পর্কে সম্যক অবহিত আছেন, কোন চাপের কাছে কোনক্রমেই নতি স্বীকার করা হচ্ছে না বা হবে না—এটাই আমরা দেখতে চাই।

অর্থ দপ্তরের খামখেয়ালী !

১৯৪১ সালে তৎকালীন বাংলা সরকার যখন সারা ভারতবর্ষে প্রথম একমুখী বিক্রয়কর চালু করেন, তখন এই কর নির্ধারণ ও আদায়ের মূল দায়িত্ব পড়ে কমার্শিয়াল ট্যাক্স অফিসারদের ওপর, যাঁদের জনসাধারণ জানেন সেলস্‌ট্যাক্স অফিসার নামে। দীর্ঘ নয়বছর সুষ্ঠুভাবে কাজ চলা সত্ত্বেও পশ্চিমবঙ্গ সরকার হঠাৎ ১৯৫০ সালে এই কমার্শিয়াল ট্যাক্স অফিসারদের অযৌক্তিকভাবে দুইভাগে ভাগ করে ফেলেন এবং নামকরণ করেন কমার্শিয়াল ট্যাক্স অফিসার (গ্রেড ওয়ান) ও কমার্শিয়াল ট্যাক্স অফিসার (গ্রেড টু)। এর ফলে যদিও বেতনের তারতম্য হয়ে গেল প্রচুর, কিন্তু অফিসারদের কাজ ও দায়িত্ব থেকে গেল একই। এই সিদ্ধান্তের কারণ আজও রহস্যাবৃত, কেন না সংশ্লিষ্ট কাগজপত্র নাকি রাইটার্স বিল্ডিংস-এ খুঁজে পাওয়া যায় নি। কিন্তু একটা বিষয়ে কোন সন্দেহের অবকাশ নেই যে, এই সিদ্ধান্ত তৎকালীন মন্ত্রিসভার অনুমোদন ছাড়াই নেওয়া হয়েছিল।

ওয়েস্ট বেঙ্গল জুনিয়র কমার্শিয়াল ট্যাক্স সার্ভিস এ্যাসোসিয়েশন সেই সময় থেকেই এই অযৌক্তিক সিদ্ধান্তের প্রতিবাদ করে আসছে। এই সমিতির সকল চেষ্টা যখন অরণ্যরোদনে পর্যবসিত, তখন ১৯৬৭ সালে সর্বপ্রথম বিভাগীয় মন্ত্রী সমিতির প্রতিনিধিদের অভিযোগ শোনার জন্য ডাকেন। এর পর ঘটনাবহুল কয়েকমাস ধরে বাদপ্রতিবাদ, বিতর্ক পরীক্ষা-নিরীক্ষা এবং শেষ পর্যন্ত প্রত্যক্ষ সংগ্রামের ফলশ্রুতি হিসাবে বিভাগীয় মন্ত্রীর ৬-১১-৬৭ তারিখের আদেশে কমার্শিয়াল ট্যাক্স অফিসারদের মধ্যে গ্রেড প্রথা ১-১২-৬৭ থেকে বিলোপ করতে বলা হল। ঐ আদেশে আরও বলা হয়েছে যে, গ্রেড টু অফিসাররা ঐ তারিখ থেকে এতদিনের গ্রেড ওয়ান অফিসারদের যা বেতন ছিল, সেই হারেই পাবেন। মন্ত্রীর এই আদেশ কার্যকরী করতে সরকারের প্রথম বছরে ত্রিশ হাজার টাকার বেশি খরচ হবার কথা নয়।

কয়েকদিন পর ঐ মন্ত্রিসভার (যুক্তফ্রন্ট) পতন হলে সমস্ত ব্যাপারটাই লাল-বাড়ির হিমঘরে ঠেলে দেওয়া হয়। আবার বহু প্রতিবেদন, আবেদন-নিবেদন এবং শেষ পর্যন্ত কয়েকদিনের প্রত্যক্ষ সংগ্রামের ফলে পরবর্তী কংগ্রেস-পি ডি এফ-এর বিভাগীয় মন্ত্রী ১৭-২-৬৮ তারিখে সমিতির প্রতিনিধিদের সাথে আলোচনায় বসেন এবং এই প্রতিশ্রুতি দেন যে, গ্রেড প্রথার ব্যাপারে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত না হওয়া পর্যন্ত স্থিতাবস্থা থাকবে। এই প্রতিশ্রুতিতে সমিতি তার প্রত্যক্ষ আন্দোলন তুলে নেয়। কয়েকদিন বাদে ঐ মন্ত্রিসভারও পতন ঘটে।

তারপর এই রাজ্যে রাষ্ট্রপতির শাসন চালু হয় এবং তার সঙ্গে সঙ্গেই নেমে আসে এক কঠিন অথচ অর্থপূর্ণ নীরবতা সমস্ত ব্যাপারটার ওপর। শেষে এই নীরবতার যবনিকা অর্ধোত্তোলিত হয় ২৮-১১-৬৮ তারিখে, যেদিন এই রাজ্যের রাজ্যপালের সঙ্গে সমিতির প্রতিনিধিদের সাক্ষাৎকার ঘটে। কিন্তু এর আগেই অর্থ-দপ্তরের জনৈক পদস্থ আমলা একটি কাজ করে বসে আছেন। কংগ্রেস-পি ডি এফ-এর মন্ত্রী স্থিতাবস্থা বজায় রাখার যে সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন, তাকে অত্যন্ত অন্যায়ভাবে অমান্য করে তিনি নাকি গ্রেড ওয়ান ক্যাডারে একতরফা প্রসারের ব্যবস্থা করেন। এটা স্বাভাবিক যে, যখন গ্রেড ওয়ান ক্যাডারে পদ সৃষ্টি করে গ্রেড টু ক্যাডার থেকে প্রায় ত্রিশ জনের প্রমোশন দেবার আদেশটি রাজ্যপালকে দিয়ে করান হয়, তখন রাজ্যপালকে মন্ত্রীর গ্রেড প্রথা বিলোপের আদেশটি দেখানো হয় নি। গ্রেড ওয়ান ক্যাডারে মোট নতুন পদের সৃষ্টি হয় ৪৬টি। এতে প্রথম বছরেই খরচ হবে আনুমানিক চার লক্ষ টাকা। গ্রেড প্রথা বিলোপ করতে যে ত্রিশ হাজার টাকা খরচ হবে, তা দিতে অর্থদপ্তর রাজী নন। অথচ রাজ্যের এই আর্থিক দুর্দিনে চার লক্ষ টাকা খরচ করতে উঠে পড়ে লেগেছে। শুধু গ্রেড ওয়ান অফিসার বাড়ানোই তো হবে না। তার সাথে এ্যাসিস্টান্ট কমিশনার, গ্রেড টু অফিসার, ইন্সপেক্টর এবং কেরাণীও নিতে হবে। তাহলে দেখা যাচ্ছে খরচ কোথায় গিয়ে দাঁড়াবে।

২৮শে নভেম্বর তারিখে রাজ্যপালের কাছে সমিতি দুটো দাবি রেখেছিলেন। গ্রেড প্রথা বিলোপের ব্যাপারে ৬-১১-৬৭ তারিখের মন্ত্রীর আদেশ কার্যকরী করা এবং গ্রেড ওয়ান ক্যাডার সম্প্রসারণের অবিবেচনাপ্রসূত সিদ্ধান্ত কার্যকরী না করা। প্রথম দাবির ব্যাপারে রাজ্যপাল পে কমিশনে পাঠাবার সিদ্ধান্ত নেন এবং কমিশনের রায় মেনে নেবেন বলে নাকি প্রতিশ্রুতি দেন। দ্বিতীয় দাবির ব্যাপারে রাজ্যপাল পুনরায় বিবেচনা করে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত সমিতিকে জানাবেন বলে নাকি কথা দেন। কিন্তু আজ পর্যন্ত কোন কিছুই জানানো হয় নি। এদিকে ওয়াকিবহাল মহলের খবরে প্রকাশ যে, অর্থদপ্তরের আমলারা পে কমিশনের কাছে এমন একটি পক্ষপাতদুষ্ট নির্দেশ পাঠিয়েছেন যাতে ৬-১১-৬৭ তারিখের আদেশকে নাকি নাকচ করতেই বলা হয়েছে। অন্যদিকে গ্রেড ওয়ান ক্যাডারকে প্রসারিত করার জন্য সরকারী মহলে এমন তৎপরতা দেখা যাচ্ছে, যার একমাত্র অর্থ দাঁড়ায় এই যে, আমলা-তন্ত্র কোন জনপ্রিয় সরকার আসার আগেই কাজটা করে ফেলতে চান।

পশ্চিম বাংলার জনসাধারণ যাঁরা এই বিক্রয়করের বোঝা বহন করেন, তাঁরা আজ ভেবে দেখবেন আমলাতন্ত্রের এই ধরনের কার্যকলাপ রাজ্যের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কর-বিভাগকে কোথায় ঠেলে দিচ্ছেন। পে কমিশনের কাছে খোলা মনে একটি বিষয় বিবেচনার জন্য পাঠানো এক জিনিস আর মন্ত্রী মহাশয়ের যে নির্দেশকে স্বয়ং রাজ্যপালও বাতিল করেন নি তাকে বাতিল করার জন্য পে কমিশনকে বলা সম্পূর্ণ ভিন্ন জিনিস। আমলাতন্ত্র যদি এই ধরণের উদ্দেশ্যপ্রণোদিত কার্যে লিপ্ত হন তবে তাঁরা তাঁদের অধীনস্থ অফিসার ও কর্মচারীদের কাছ থেকে শৃঙ্খলা ও আনুগত্য কী করে দাবি করেন?

এই বিক্রয়কর বিভাগ বিগত আর্থিক বছরে প্রায় ৫৭ কোটি টাকা আদায় করেছে। সুতরাং এই বিভাগের গুরুত্ব সহজেই উপলব্ধি করা যায়। রাইটার্স বিল্ডিংস-এর কিছু কর্মকর্তার খামখেয়াল ও ঔদ্ধত্যের জটিল আবর্তে পড়ে এ বিভাগের ওপর যদি আঘাত নেমে আসে তবে তা হবে এক ভয়াবহ পরিণতিরই পূর্বাভাস।

ভারত দর্শন

লাল দরওয়াজা

পৌর নির্বাচন এবং কংগ্রেস-জনসঙ্ঘ

দিল্লী মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশনের উপনির্বাচনে প্রগতিশীল দলগুলির সমর্থনে কংগ্রেস প্রার্থী ডঃ ভীমসেন বনশাল তাঁর নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী জনসঙ্ঘ প্রার্থীকে বিপুল ভোটের ব্যবধানে পরাজিত করে লাল দরওয়াজা আসনটি কংগ্রেসের অধিকারেই রক্ষা করতে সমর্থ হয়েছেন। দুই নিকট প্রতিদ্বন্দ্বীর ভোটের ব্যবধান দু' হাজার এগার। ১৯৫৮ সাল থেকে এই আসনটি অবশ্য কংগ্রেসেরই অধিকারে ছিল। কিন্তু সাম্প্রতিক নির্বাচনে ডঃ বনশালের জয় অন্যতর অর্থে উল্লেখযোগ্য। দিল্লী মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশনে বর্তমানে আর এস এস জনসঙ্ঘেরই প্রভাব। তাঁরাই ক্ষমতাসীন। ডঃ বনশালের জয় সেই অর্থে একথাই প্রমাণ করে যে, দিল্লীর নাগরিক সাধারণ আর এস এস জনসঙ্ঘের ওপর তাঁদের ন্যস্ত বিশ্বাস হারিয়ে ফেলেছেন। গত সাধারণ নির্বাচন অপেক্ষা এবার ভোটের ব্যবধান অনেক বেশি। গতবার ছিল দু'শ', এবার হয়েছে দু' হাজার।

আর এস এস জনসঙ্ঘের সঙ্কীর্ণ সাম্প্রদায়িক জিগির যে অধিককাল মানুষের মনকে মোহাচ্ছন্ন করে রাখতে অক্ষম, এই নির্বাচনের অন্যতম শিক্ষাও তাই। উত্তর ভারতে আর এস এস জনসঙ্ঘের দ্রুত প্রভাব বিস্তার অপ্রত্যাশিত হওয়ার দরুণই অকস্মাৎ সেই প্রভাবের সমাধি রচনাও স্বাভাবিক পরিণতির দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। কিন্তু কতিপয় ব্যক্তির ফ্যাসিস্ত মনোবাসনা এই সত্যকে যথার্থ উপলব্ধি করতে নারাজ। তাঁরা জনসঙ্ঘের দ্রুত প্রভাব ও আর এস এস-এর প্রতিপত্তিতে বড় বেশি আস্থাবান। প্রসঙ্গত কংগ্রেসী নেতা এস কে পাতিলকে মনে পড়ে। ইনি হামেশা জনসঙ্ঘের সঙ্গে গাঁটছড়া বেঁধে সন্ত্রাসময় শাসনের উচ্চাশা পোষণ করে থাকেন। শ্রীপাতিলের নেপথ্য আশীর্বাদেই আর এক সন্ত্রাসবাদীর উত্থান সম্ভব হয়েছিল মহারাষ্ট্রে। ইনি আজকের বহু বিতর্কিত মহারাষ্ট্রীয় ক্ষুদে হিটলার শ্রী বাল ঠকরে। লোকে বলেন, শিব সেনার ঐ ক্ষীণদেহী জেনেরাল শ্রীঠকরে এবং তাঁর দলীয় সন্ত্রাসবাদই গত সাধারণ নির্বাচনে শ্রীযুত কৃষ্ণ মেননের নির্বাচনে বিভীষিকার আবহ রচনা করেছিল কিছু নেপথ্যচারী কংগ্রেস নেতার প্রশ্রয়পুষ্ট হয়ে। শ্রীঠকরে তাঁর আপন পথে অগ্রসর হচ্ছেন এবং আর এস এস-এর সঙ্গে কব্জি মিলিয়ে তাঁর সন্ত্রাসবাদী পরিকল্পনাগুলিকে জোরদার করার স্বপ্ন দেখছেন। পাতিল প্রমুখ নেতারাও এঁদেরই পথের পথিক হতে চান। কিন্তু লাল দরওয়াজার রায় এ-পথকে অস্বীকার করেছে। হাওয়া ঘুরতে শুরু করছে। সন্ত্রাসবাদে মুগ্ধ শঙ্কিত মনের উচ্চাভিলাষীদের এই উপনির্বাচন কোন ইঙ্গিত-ইশারা দিয়ে যাবে কি না বলা যায় না, কারণ মোহ অন্ধ, কিন্তু এখনই উপযুক্ত সময় যখন হাওয়ার গতি স্থিরভাবে লক্ষ্য করা দরকার। কিন্তু যাঁরা এই মুহূর্তেও আর এস এস জনসঙ্ঘ শিব সেনার মতই সঙ্কীর্ণ দৃষ্টির মোহে আচ্ছন্ন হয়ে পড়ছেন, তাঁদের ভুল শুধরে নেওয়ার মতো সময়ও যে খুব বেশি মিলবে এমন মনে হয় না। সঙ্কীর্ণ সাম্প্রদায়িকতা ও আঞ্চলিকতার কাল আজ আর দীর্ঘজীবী হতে পারে না। চারিদিকে পৃথিবী সম্প্রসারণমুখী। মানুষ বৃহতের দিকে অভিযাত্রা শুরু করেছে। এখন ক্ষুদ্রতা এবং অন্ধ সংস্কারের মধ্যে সেই মানবিক সাফল্যকে পশ্চাদপসরণ করিয়ে নিয়ে যাওয়ার কল্পনা শুধু উদ্ভট নয় উন্মাদনাপ্রসূত। বরং আর এস এস জনসঙ্ঘ প্রভৃতির অস্তিত্বকেই আজ সংস্কারমুক্ত হয়ে টিকিয়ে রাখতে হবে।

জনসঙ্ঘের ভূমিকা সম্পর্কে প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী গান্ধীর হিসাব পরিষ্কার। বিহারে নির্বাচনী প্রচার-বক্তৃতায় তিনি বলেছেন, সঙ্ঘ ধর্ম-ভাষা ও গোষ্ঠীর ভিত্তিতে দেশকে ভাগ করতে চায়। তাঁদের না আছে কোনো ভূমিসংক্রান্ত নির্দিষ্ট নীতি, না আছে বেকারী সমস্যা সমাধানের বা দারিদ্র্য-মোচনের কোনও কার্যকরী পরিকল্পনা। জনসঙ্ঘের সংহতি বিনষ্টকারী চিন্তার প্রভাব থেকে তিনি সকলকে মুক্ত থাকতে আহ্বান জানিয়েছেন।

পাতিল প্রমুখ নেতৃবৃন্দের কাছে যে জনসঙ্ঘ বা স্বতন্ত্রদল সমধর্মী দল হিসেবে আলিঙ্গনযোগ্য প্রধানমন্ত্রীর কাছে তাই-ই বিচ্ছিন্নতাবাদী সঙ্কীর্ণ দৃষ্টির দল হিসেবে পরিত্যাজ্য।

কংগ্রেসের মধ্যে পাঁচমিশেলী ধ্যান-ধারণার স্বাবলম্বন বহুক্ষেত্রে স্বতন্ত্র জনসঙ্ঘ প্রভৃতি গোঁড়া দলগুলির উত্থানে সহায়তাই করে আসছে। ফলত আজ অনেকেরই বিশ্বাস, কালক্রমে এঁরা পরস্পরের সঙ্গে হাত মেলাবেন। কিন্তু তেমন দুর্দিন সত্যিই উপস্থিত হলে কংগ্রেসের সর্বভারতীয় মর্যাদাও ক্ষুণ্ণ হবে। ইতিমধ্যেই কংগ্রেসের কতিপয় নেতার স্বতন্ত্র জনসঙ্ঘের সঙ্গে গাঁটছড়া বাঁধার ইচ্ছা জনমনে কংগ্রেসের প্রতি শ্রদ্ধা চটিয়ে দিতে সহায়তা করেছে এবং করছে। যে নেতৃত্ব ক্ষণকালের ক্ষমতাচ্যুতিতে হতাশ হয়ে পড়ে, সেই জাতের নেতৃত্ব লাল দরওয়াজার সাফল্যকে বিশেষ তাৎপর্যে গণনা করে না। কিন্তু লাল দরওয়াজার সাফল্যই যে স্বাভাবিক পরিণতি এই বিশ্বাসে স্থির থাকলে এবং কংগ্রেসের বিভিন্ন নেতার ভিন্ন ভিন্ন মতাদর্শ ও পথের প্রতি আকর্ষণ কম হলে কংগ্রেসের প্রতি সাধারণের আস্থা পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হতে পারে। অবশ্য ক্ষমতাচ্যুতিতে যাঁরা আজ অপরিণামদর্শী, তাঁরা কল্পনায়ও সেই সমুজ্জ্বল চিত্রটি এঁকে নিতে অক্ষম। তাঁদের দ্বারাই কংগ্রেসও ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে।

প্রজাতন্ত্র দিবস

১৯৬৯ সালের প্রজাতন্ত্র দিবস আঞ্চলিক স্বাতন্ত্র্যের দাবি মুখরিত হয়ে দেখা দিয়েছে। মহারাষ্ট্রে শিব সেনাধিপতি বাল ঠকরে শুরু করছেন মহারাষ্ট্র-মহীশূর সীমান্ত বিরোধের নিষ্পত্তির দাবীতে এক অভূতপূর্ব আন্দোলন। তাঁর এস এস বাহিনী কেন্দ্রীয় নেতাদের বম্বে আগমনের পথ রুখে সমস্ত 'রুটে' শুয়ে পড়ার সঙ্কল্প গ্রহণ করেছে। ২৬শে জানুয়ারী

এই আন্দোলনের সূচনা। ওদিকে তেলেঙ্গানা নিয়ে বিক্ষোভ ইতিমধ্যেই শুরু হয়ে উত্তাপ বিকিরণ করতে আরম্ভ করেছে। শিব সেনা আন্দোলনকে বম্বে থেকে আরও কয়েকটি শহরে ছড়িয়ে দেওয়ার কথাও সেনাধিপতি ঘোষণা করেছেন। পুণা, নাসিক, কোলাপুরেও অনুরূপ আন্দোলনের আয়োজন চলছে। তেলেঙ্গানায় পুলিশী অত্যাচারের প্রতিবাদে রুখে উঠেছেন ছাত্র শিক্ষক ও বিশ্ববিদ্যালয় কর্মী সংসদ। বাল ঠকরে বলেছেন, বধির কেন্দ্রীয় ক্ষমতাকে নাড়া দিতে হলে চাই প্রচণ্ড গণ-বিক্ষোভ। জনতা যতক্ষণ না শক্তি প্রয়োগ করছেন ততক্ষণ সরকারের চেতনা সঞ্চারিত হয় না বলে শ্রীঠকরে মন্তব্য করেছেন।

বেলগাম ও তৎসন্নিহিত অঞ্চলের মারাঠী ভাষাভাষী (মহীশূরে) জনগণ গত বার বছর ধরে মহারাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্তি দাবি করে আসছেন। মহারাষ্ট্র-মহীশূর সীমানা নিষ্পত্তি আজও হয় নি। এবার ময়দানে নামলেন শিব সেনা। কংগ্রেস-শাসনে প্রশ্রয়পুষ্ট সেনানী (?) মণ্ডলীর হাতে অতঃপর মোটা রাজনীতি মর্দিত হতে আরম্ভ করবে। এই সব সেনাবাহিনীর জীবনদীপ জ্বালিয়ে রাখে আঞ্চলিকতার বহ্নি। শিব সেনা এখন যথার্থ মশালটিই হাতে তুলে নিয়েছে। মাদ্রাজের ডি এম কে ভাষার প্রশ্নকে ক্যাপিটল করে বিস্ময়কর অগ্রগতির ইতিহাস সৃষ্টি করেছে। আজ ক্রমশ প্রজাসাধারণ উপলব্ধি করছেন, ডি এম কে প্রমুখ আঞ্চলিকতাবাদী দলগুলি বিশেষ মুহূর্তে বিশেষ অঞ্চলে প্রচণ্ড নাড়া দিতে বস্তুতই সক্ষম। কিন্তু বৃহত্তর দৃষ্টিভঙ্গির অভাবে জাতির ভাগ্যনির্ধারণের ক্ষমতায় এরা একেবারেই অকৃতকার্য। শিব সেনা ক্ষুদ্র আঞ্চলিক দাবি-দাওয়া আদায়ের ক্ষেত্রে ডি এম কে'র মতোই জনমনে প্রভাব বিস্তার করবে সন্দেহ নেই, কিন্তু ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্বার্থের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত এই সব সঙ্কীর্ণচেতা দল গণতন্ত্রের সমূহ ক্ষতির কারণ হবে। প্রজাতন্ত্র দিবস সঙ্কীর্ণ চিন্তার বিষস্ফোটক বুকে নিয়ে বর্তমান বছরে অভ্যর্থিত হতে চলেছে।

তেলেঙ্গানায় গুলী লাঠি কাঁদানে গ্যাসের ধোঁয়া। কিন্তু সর্বদলীয় কমিটির সম্মেলনের পরেও অন্ধ্রপ্রদেশ থেকে তেলেঙ্গানাকে বিচ্ছিন্ন করার আন্দোলন ঐ বিচ্ছিন্নতাবাদী গোষ্ঠীর অহেতুক তৎপরতারই পরিচায়ক।

সর্বদলীয় কমিটি তেলেঙ্গানার জন্য কয়েকটি রক্ষাকবচের ব্যবস্থা করেছিলেন। কিন্তু আন্দোলনকারী দল সেগুলিকে যথেষ্ট বলে মনে করেন নি। ফলে আন্দোলনও চলেছে, পুলিশও অত্যাচারের মাত্রা অনর্গল করে সন্ত্রাসের রাজত্ব কায়েম করার সুযোগ পেয়েছে। অথচ এমন এক অবস্থার উত্তেজনা প্রশমনের ভূমিকা গ্রহণ করা রাজনৈতিক দলগুলির পক্ষে মুস্কিল হয়ে পড়েছিল।

প্রজাতন্ত্রে প্রজাকল্যাণের তৎপরতার চাইতে প্রজাদমনের তৎপরতার সঙ্গে একুশ বছর যাবৎ আমরা ঘনিষ্ঠভাবে পরিচিত হয়ে আসছি। ফলত স্বভাব এমন নষ্ট হয়ে গেছে যে, পুলিশী পদাঘাতের মাত্রা কোনোও ক্ষমতাসীন সরকার এসে কমিয়ে ফেলতে আগ্রহী হলে আমরাই অনেকে চোখে অন্ধকার দেখে থাকি এবং 'গেল গেল' রব তুলি। যেন পুলিশই আমাদের জীবন যৌবন ধনমান রক্ষা করে আসছে। অথচ বাস্তব ক্ষেত্রে ঠিক তার উল্টো। পুলিশ যত সহজে নিরস্ত্র নাগরিকের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ার ট্রেনিং নিয়েছে সশস্ত্র গুণ্ডা ও ডাকাতবাহিনীর মোকাবিলায় তত সহজেই হটে যাচ্ছে। পুলিশের সামনে নিরস্ত্র নাগরিকের সুশৃঙ্খল শোভাযাত্রা সাজিয়ে না ধরলে, নষ্ট-স্বভাব পুলিশ তার ট্রিগারের তাক খুঁজে পায় না। অর্থাৎ কর্তনের জন্য তাঁদের সামনে নিরীহ মানুষের সাজানো বাগান, স্কুল-কলেজের বন্ধ কম্পাউন্ড সাজিয়ে ধরতে হয়। পথেঘাটে গুণ্ডামী, অসামাজিকতা, ডাকাতি রাহাজানি পুলিশী সন্ত্রাসের আমলেই কিন্তু বৃদ্ধি পেয়ে থাকে। তেলেঙ্গানায় পুলিশ মারমুখী হওয়ার অবাধ স্বাধীনতা পেয়েছিল। আমাদের তথাকথিত প্রজাতন্ত্রের অন্যতম লক্ষণও এই পুলিশী নিপীড়ন, ঠিক যাকে বাদ দিলে গণতন্ত্র এবং স্বাভাবিক জীবনযাত্রা বানচাল হয়ে পড়ে বলে এক শ্রেণীর দৃঢ় বিশ্বাস। ভারতীয় প্রজাতন্ত্রের আর একটি বাস্তব লক্ষণ, নির্বাচন। তা তাও এবার ভারতের পাঁচ-পাঁচটি রাজ্যে অনুষ্ঠিত হতে চলেছে। প্রজাতন্ত্র দিবসের বাষ্পীসমূহ এই নির্বাচনকে লক্ষ্য করে এবার সোচ্চার হবে।

পুলিশ ও নির্বাচনের লক্ষণাক্রান্ত এই ভারতীয় প্রজাতন্ত্রে নতুন করে প্রজাসুখ বর্ণনার কোনও কারণ ঘটেছে বলে আজ একুশ বছর পরেও উল্লেখযোগ্য কিছু মনে পড়ছে না। প্রজাতন্ত্র দিবস উপলক্ষে তাই প্রতিবারের মতোই আমরা কিছু নেতৃস্থানীয় স্তোকবাক্য শুনতে পাবো আর ডিকেন্সের সেই আশাবাদী চরিত্রটির মতো দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করে বলব, একদিন না একদিন কিছু না কিছু ঘটবেই।

যথারীতি দিল্লী রাজধানী থেকে কিছু পুরস্কার বিতরণের আয়োজন হয়েছে। তবে 'ভারত রত্ন' খেতাব কেউ পাচ্ছেন না। নোবেল পুরস্কার বিজয়ী ডঃ খোরানা, স্বাধীন ভারতে যাঁর গবেষণার সুযোগ মেলে নি, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কল্যাণে আজ যিনি বিশ্ববিশ্রুত, শোনা যাচ্ছে, তাঁকে সাড়ম্বরে পদ্মবিভূষণ খেতাবে ভূষিত করা হবে।

বাঙলা দেশ থেকে এবার পদ্মভূষণের প্রাপক একাধিক। সাহিত্যিক তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, চিন্তাবিদ, বাগ্মী, ঐতিহাসিক, শিল্পি-সাহিত্যের গভীর রসবেত্তা এবং শিক্ষাব্রতী ডঃ নীহাররঞ্জন রায়-এর নাম পদ্মভূষণের জন্য পশ্চিমবঙ্গ সরকার কর্তৃক সুপারিশ করা হয়েছে। পশ্চিমবঙ্গ সরকার ডঃ আদিনাথ লাহিড়ীর এবং মহারাষ্ট্র সরকার প্রখ্যাত শল্য চিকিৎসক ডঃ পি কে সেনের নামও সুপারিশ করেছেন। ডঃ সেনই ভারতে সর্বপ্রথম হৃদ্‌যন্ত্র স্থানান্তরের কৃতিত্ব অর্জন করেন।

কিন্তু ১৯শ তম প্রজাতন্ত্র দিবসের সম্পর্কে কিছু লিখতে বসে আজও সেই একই হতাশার দীর্ঘশ্বাস মোচন করতে হয়। এই দীর্ঘ সময় আমরা প্রজা-কল্যাণের জন্যে উল্লেখযোগ্য তেমন কিছুই করে উঠতে পারি নি, প্রজাতন্ত্র দিবসের প্রাক্কালে যা স্মরণ করে গর্বিতবোধ করতে পারি। শিক্ষা নিকেতনের সংখ্যা বৃদ্ধি হয়েছে সত্যি, যদিও সময়ের সঙ্গে আনুপাতিক হারে তা যড় মুখ করে

১৯৬৯তে আপনার ভাগ্য

যে-কোন একটি ফুলের নাম লিখিয়া আপনার ঠিকানাসহ একটি পোস্টকার্ড আমাদের কাছে পাঠান। আগামী বারমাসে আপনার ভাগ্যের বিস্তারিত বিবরণ আমরা আপনাকে পাঠাইব, ইহাতে পাইবেন ব্যবসায়ে লাভ লোকসান, চাকুরিতে উন্নতি, বদলী, জন্ম, বিবাহ ও সুখ-সমৃদ্ধির বিবরণ: আর থাকিবে দুষ্টগ্রহের প্রকোপ হইতে আত্মরক্ষার নির্দেশ। একবার পরীক্ষা করিলেই বুঝিতে পারিবেন।

PT. DEV DUTT SHASTRI
RAJ JYOTISHI (B. M. W)
P.B. 86, JULLUNDUR CITY

উল্লেখ করার নয়। বাসস্থানের দুর্গতি মোচন করা সম্ভব হয় নি, যদিও আকাশ ছোঁয়া অফিসবাড়ির (ব্যবসায়ী) সংখ্যা-বৃদ্ধি চোখের সামনে ঘটছে। অন্ন সংস্থানে আমাদের সমস্যা এখনও একই তিমিরে। উনিশ বছর ধরে যা বেড়েছে তা হ'ল, বেকারী, হতাশা, দেনা, দ্বেষ, ঈর্ষা, বিচ্ছিন্নতাকামী মনোভাব, দুর্নীতি এবং পদলিপ্সা তৎপরতা। আমাদের দেশাত্মবোধ ব্যক্তিগত ভোগাকাঙ্ক্ষার তলায় নিষ্পিষ্ট হয়ে গেছে। শোষণ, এবং শাসনেই ক্ষমতাসীন নেতৃত্ব খুঁজে পেয়েছেন তাঁদের কর্তব্য সম্পাদনার তৃপ্তি। তাই প্রজাতন্ত্র দিবসকে সাধারণতন্ত্র দিবসরূপে আবাহন জানাতে বাধে। স্বাধীনতা সাধারণের সমস্যাপীড়িত জীবনে মুক্তির আলো বিচ্ছুরিত করতে পূর্ণভাবে সফল হয় নি। প্রজা সাধারণের প্রভু বদল হয়েছে মাত্র। আমরা সেই প্রজাতন্ত্র দিবসে প্রভু বদলের উৎসব পালন করে প্রতি বছরের মতো এবারও সুখী হয়েছি।

সরকারী কর্মচারীসমাজে হর্ষ ও বিষাদ

রাজস্থান

২৬শে জানুয়ারীর মধ্যে পে-কমিশনের সুপারিশ কার্যকর করতে রাজ্য সরকার ব্যর্থ হলে রাজস্থানের সরকারী কর্মচারিবৃন্দ রাজ্যব্যাপী আন্দোলনে নামবেন বলে চূড়ান্তলিপি প্রেরণ করেছেন। কমলী ফেডারেশন বলেছেন, সরকার অবজ্ঞার মনোভাব এবং বিভেদমূলক নীতি গ্রহণ করেছেন। মুখ্যমন্ত্রী শ্রীসুখাদিয়াকে চূড়ান্ত লিপিতে জানানো হয়েছে যে, ২৬শে তারিখের মধ্যে ব্যবস্থা গ্রহণ না করা হলে ২৭শে তারিখ থেকেই আন্দোলন শুরু হবে।

রাজ্যসরকার ব্যাপারটিকে অযথা গড়িমসির স্তরে রেখে বিক্ষোভকে প্রায় আমন্ত্রণ করে আনছেন। গত শীত অধিবেশনেই রাজ্য বিধানসভায় সরকার এই মর্মে আশ্বাস দিয়েছিলেন যে, বেতনক্রম পরিবর্তন সম্পর্কে কমিশনের সুপারিশ তাঁরা (গত) সেপ্টেম্বর মাসের মধ্যেই কার্যকর করবেন। কিন্তু আজও কর্মীদের ভাগ্য নির্ধারণে সরকার সময় করে উঠতে পারেন নি।

হরিয়ানা

হরিয়ানার রাজ্য সরকারী কর্মচারীগণের বেতনক্রম পে কমিটির সুপারিশ অনুসারে পরিবর্তিত হয়েছে। চতুর্থ শ্রেণীর প্রায় সকলেই এই পরিবর্তনের দ্বারা লাভবান হলেন। তাঁদের বেতনক্রম পাঞ্জাবের সঙ্গে সমতা রক্ষা করে স্থির করা হলো। ক্লার্ক ও টাইপিস্ট প্রমুখ মিনিসেটারিয়াল স্টাফের বেতন পাঞ্জাব অপেক্ষাও ভালো হয়েছে।

কর্মচারীরা চেয়েছিলেন পাঞ্জাবের বেতনক্রমের সঙ্গে সমতা। তাঁদের হতাশ হতে হয় নি।

গুজরাট

গুজরাট সরকারও পে কমিশনের সুপারিশ মেনে নিয়েছেন। এই বাবদ এক লক্ষ সাতাশ হাজার কর্মচারী। কমিশনকৃত সুপারিশের ফলভাগী হবেন। মুখ্যমন্ত্রী হিতেন্দ্র দেশাই জানিয়েছেন, মাহিনাদি জুন '৬৯ থেকেই নির্ধারিত হলো বটে, তবে ঐ সময়ের বকেয়া প্রদেয় বলে গণ্য হবে না। ১৯৬৮ থেকে বেতনের ব্যবধান কর্মচারীদের প্রভিডেন্ড ফান্ডে জমা হবে এবং বর্তমান বছরের ব্যবধানই প্রদেয় বলে গণ্য হবে।

সুপারিশের একটি ধারা ছিল, প্রতি দশ পয়েন্ট মূল্যবৃদ্ধির সঙ্গে মহার্ঘ ভাতা আপনি বাড়বে। সরকার এই ধারাটি গ্রহণ করতে অক্ষমতা প্রকাশ করেছেন।

পে কমিশনের প্রতিবেদন এখনও কয়েকটি রাজ্যে প্রকাশ অপেক্ষায়। পশ্চিমবঙ্গ তারই অন্যতম। যুক্তফ্রন্ট সরকারের আমলে পশ্চিমবঙ্গে এক ধাক্কায় মোটা টাকা কর্মীদের ভাগ্যে জুটেছিল; তবে কেন্দ্রীয় কর্মচারীদের সমহারে বেতন-বৃদ্ধির দাবি আজও গৃহীত হয় নি। কর্মচারী মহলে চাপা উত্তেজনা। তাঁরা সব সময়ই পে কমিটির প্রতিবেদন ঘোষণার অপেক্ষায় আছেন এবং তাঁদের সমস্যাপীড়িত জীবনে কিছু সুরাহা হবে বলে প্রতিক্ষণেই আশা করছেন।

সম্মানিত অতিথি

প্রজাতন্ত্র দিবসে ভারতে দুই সম্মানিত অতিথি উপস্থিত থাকছেন। মরণোত্তর নেহরু পুরস্কার বিজয়ী মানবিক অধিকার রক্ষা আন্দোলনের নায়ক স্বর্গত রেঃ ডঃ মার্টিন লুথার কিং এর পত্নী শ্রীমতী করেটা কিং এসেছেন ডঃ কিং-কে প্রদত্ত পুরস্কার গ্রহণ করতে।

২১শে জানুয়ারী দিল্লীতে পদার্পণ করলে ডঃ কিং-এর আরব্ধ কার্য সমাপনে কৃতসঙ্কল্প মিসেস কিংকে ভারতীয় জনগণ বিপুলভাবে অভ্যর্থনা জ্ঞাপন করেন। উত্তরে শ্রীমতী কিং বলেন, ভারতবাসী তাঁর ও তাঁর স্বর্গত স্বামীর প্রেরণার উৎসস্বরূপ। বাস্তবিক ডঃ কিং গান্ধীজীর অহিংস নীতিতে বিশ্বাসী ছিলেন। এবং গান্ধীজীর জীবন ও কর্মের সঙ্গে তাঁর ছিল গভীর অধ্যয়নজাত পরিচয়। ভারতের জনগণ ডঃ কিং-এর প্রতি যে গভীর শ্রদ্ধা পোষণ করতেন, নেহরু পুরস্কার তারই কিছু প্রকাশ। মিসেস কিং ডঃ কিং-এর সুযোগ্যা সহধর্মিণী। তিনিও তাই ভারতীয় জনগণের শ্রদ্ধা ও প্রীতির উত্তাপ নিশ্চয় অনুভব করবেন। তাঁর স্বর্গতা স্বামীর আরব্ধ কাজ সমাপনে মিসেস কিং-এর উদ্দীপনার পিছনে ভারতবাসীর শুভেচ্ছা সব সময়ই বর্তমান থাকবে।

বুলগেরিয়ার প্রধানমন্ত্রী শ্রীযুত টোডোর জিভকভ ভারত পরিদর্শনে এসেছেন ছয়দিনের জন্য। তিনি ভারতের প্রজাতন্ত্র দিবসের অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকছেন।

শ্রীযুত জিভকভ ভারত-বুলগেরিয়ার মৈত্রী সম্পর্ক উল্লেখ করে বন্ধুত্ব বর্ধনের আশা প্রকাশ করেন। তাঁকে পালাম এয়ার পোর্টে ভারতীয় রীতিতে দীপারতি দ্বারা অভ্যর্থনা জ্ঞাপন করা হয়।

(২৫।১।৬৯)

সাপ্তাহিক বসুমতীর চাঁদার হার

সাপ্তাহিক বসুমতীর বাৎসরিক চাঁদা সডাক ১৮ টাকা, ষাণ্মাসিক ৯ টাকা ও ত্রৈমাসিক ৪।৫০ টাকা। প্রতি সংখ্যা ৩০ পঃ।

তিন মাসের কমে গ্রাহক করা হয় না। গ্রাহক হতে হলে আগিমে অগ্রিম টাকা জমা দিতে কিংবা মনি অর্ডারে টাকা পাঠাতে হবে।

—কর্মাধ্যক্ষ, বসুমতী

ফ্রান্স ঃ

এরই নাম কূটনীতি! ভিয়েতনামের যুদ্ধে হাজার হাজার মানুষ মরছে, দেশ-জুড়ে আগুন জ্বলছে, আর 'শান্তি-প্রতিষ্ঠায় দৃঢ়প্রতিজ্ঞ' বিবদমান পক্ষের প্রতি-নিধিরা ন' মাস ধরে প্যারিসে বসে আলো-চনা করছেন, চূড়ান্ত শান্তি আলোচনার জন্য প্রতিনিধিরা কিভাবে বসবেন! আলোচনা-টেবিলের চেহারা কেমন হবে? —গোল, চৌকো, না ডিম্বাকৃতি? কে কোন্ দিকে বসবেন? কার পর কে বসবেন? টেবিলে কোথায় কার নাম কিভাবে লেখা থাকবে?

মে থেকে জানুয়ারী, এই ন' মাস দিনের-পর-দিন, ঘণ্টার-পর-ঘণ্টা আলো-চনার পর, গত সপ্তাহে সব পক্ষ একমত হয়ে সিদ্ধান্ত করেছেন—একটি গোলাকৃতি টেবিলের দুই পাশে প্রতিনিধিরা বসবেন। একদিকে থাকবেন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও দক্ষিণ ভিয়েতনামের প্রতিনিধিরা, আর একদিকে উত্তর ভিয়েতনাম ও জাতীয় মুক্তি ফ্রন্টের (এন-এল-এফ) প্রতিনিধি। দু' দিকে লম্বা চৌকো টেবিলে স্টেনোগ্রাফাররা বসবেন। কারও সম্মুখে নামাঙ্কিত প্লেট থাকবে না, পতাকা থাকবে না। বক্তৃতার সময় মার্কিন প্রতিনিধি বললে, তার পরই দক্ষিণ ভিয়েতনামকে বলতে হবে। আর উত্তর ভিয়েতনামের বলার পর বলবেন মুক্তি ফ্রন্টের প্রতিনিধি।

কেবল বসার ব্যবস্থা নয়, কোন্ দলে কতজন প্রতিনিধি থাকবেন এবং আলো-চনা চালাবার পদ্ধতি কি হবে, এ সম্পর্কেও প্রতিনিধিদের মধ্যে মতৈক্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

পদ্ধতিগত ব্যাপারে এই মতৈক্য

হেনরী ক্যাবট লজ

প্যারিসে প্রেস কনফারেন্সে দক্ষিণ ভিয়েতনাম ও উত্তর ভিয়েতনামের প্রতিনিধিবৃন্দ

চূড়ান্ত শান্তি আলোচনা শুরু করার পথে এক বড় পদক্ষেপ বলে মনে করা হচ্ছে। সব পক্ষই আশা করছেন, এবার শান্তির পথ খুঁজে পাওয়া যাবে। গত ১৮ই জানু-য়ারী নতুন ব্যবস্থা মত প্রথম বৈঠক বসেছিল। সহকারী নেতা পর্যায়ে এই বৈঠক হয়েছিল। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিনিধিদলের সহকারী নেতা সাইরাস ভান্স, দক্ষিণ ভিয়েতনামের নুয়েন জুয়ান ফুঙ, উত্তর ভিয়েতনামের হা ভান লাউ ও জাতীয় মুক্তি ফ্রন্টের শ্রীমতী নুয়েন থি বিন আলোচনায় এক টেবিলে মিলিত হয়েছিলেন। এই বৈঠকে ঠিক হয়েছে, কয়েক দিনের মধ্যেই চূড়ান্ত শান্তি আলোচনা শুরু হবে।

ইতিমধ্যে মার্কিন সরকারের পরিবর্তন এবং প্যারিস শান্তি আলোচনায় মার্কিন প্রতিনিধিদলের নেতৃত্ব পরিবর্তনের জন্য আলোচনা শুরু করতে কিছু দেরি হয়েছে। জনসনের প্রতিনিধি আভেরাল হ্যারিমানের পরিবর্তে নিক্সনের প্রতিনিধি-রূপে এবার মার্কিন দলের নেতা হয়ে এসেছেন হেনরী ক্যাবট লজ। সাইরাস ভান্সের জায়গায় হেনরী ক্যাবট লজের সহকারীরূপে এসেছেন সরেন্স ওয়াল্‌স্। ভিয়েতনাম প্রশ্নে নতুন রাষ্ট্রপতি রিচার্ড নিক্সন মোটামুটি লিন্ডন জনসনের নীতিই অনুসরণ করবেন বলে মনে হচ্ছে। তবে হ্যারিমান নিজে যতটা শান্তির ব্যাপারে আগ্রহী ছিলেন, লজ তা না-ও হতে পারেন। লজ সায়গনে মার্কিন রাষ্ট্রদূত ছিলেন এবং তিনি দক্ষিণ ভিয়েতনাম সরকারের বিশেষ আস্থাভাজন ব্যক্তি। সুতরাং, শেষ পর্যন্ত আলোচনা কোথায় গিয়ে দাঁড়াবে এখনই তা জোর করে বলা শক্ত।

২৫শে জানুয়ারী পূর্ণাঙ্গ শান্তি আলোচনা শুরু হবার কথা।

পশ্চিম এশিয়া ঃ

পশ্চিম এশিয়ার সমস্যা সমাধানের জন্য ফ্রান্সের চতঃশক্তি আলোচনার প্রস্তাবটি

রাষ্ট্রসঙ্ঘের ফরাসী চার্জ দ্য অ্যাফেয়ার্স ক্লড্ চায়েত্ আনুষ্ঠানিকভাবে ১৭ই জানুয়ারী রাষ্ট্রসঙ্ঘের সেক্রেটারী-জেনারেল উ থান্টের কাছে পেশ করেছেন। প্রস্তাব করা হয়েছে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, সোভিয়েট য়ুনিয়ন, বৃটেন ও ফ্রান্সের রাষ্ট্রসঙ্ঘ প্রতিনিধিরা অবিলম্বে পশ্চিম এশিয়ার সমস্যা সমাধানের সূত্র উদ্ভাবনের জন্য আলোচনায় বসুন। ফরাসীরা পশ্চিম এশিয়ার জন্য যে মীমাংসা প্রস্তাব উত্থাপন করতে চান, তাতে রয়েছে, ডঃ গানার জারিং-এর শান্তি প্রচেষ্টায় সহযোগিতা, জুন, ১৯৬৭ সংঘর্ষের পূর্বের অবস্থায় ফিরে গিয়ে ইজরায়েলী দখলদারদের আরব এলাকা ত্যাগ, আরব-ইজরায়েল বৈরিতার অবসান এবং সুয়েজ খাল ও আকাবা উপসাগর দিয়ে ইজরায়েলের জাহাজ চলাচলের সুযোগ।

সোভিয়েট য়ুনিয়ন ফরাসী চতুঃশক্তি বৈঠকের প্রস্তাব সমর্থন করেছে। সোভিয়েট কর্তৃপক্ষ পশ্চিম এশিয়ায় নতুন করে সংঘর্ষ বাধানোর বিরোধী। তাই যে-কোন মীমাংসা প্রচেষ্টাতেই তাঁদের সমর্থন আছে। তাঁরা সরাসরি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গেও কথা বলতে চান। নিজস্ব কাজ বুঝে নেবার পর এ ব্যাপারে উদ্যোগ গ্রহণ হয়তো সম্ভব হবে।

রাষ্ট্রসঙ্ঘের কূটনীতিকদের ধারণা, জানুয়ারীর শেষে না হলেও ফেব্রুয়ারীর প্রথম দিকে পশ্চিম এশিয়ার ব্যাপারে বৃহৎ শক্তিগুলির মধ্যে এক দফা আলোচনা শুরু করা সম্ভব হবে।

কিন্তু ইজরায়েলের পররাষ্ট্রমন্ত্রী আব্বা ইবান ইজরায়েলী পার্লামেন্ট নেসেটে ঘোষণা করেছেন, তাঁরা চতুঃশক্তি বৈঠকের ফরাসী প্রস্তাব সমর্থন করেন না। এই প্রস্তাব নাকি আরবদের স্বার্থে করা হয়েছে।

বেইরুটে ইজরায়েলী হানাদারদের হামলার পর অন্যান্য রাষ্ট্রনেতাদের মত ফরাসী রাষ্ট্রপতি দ্য গলও ইজরায়েলের তীব্র নিন্দা করেন এবং ফরাসী জাহাজে ইজরায়েলের জন্য অস্ত্রবহন নিষিদ্ধ বলে ঘোষণা করেন। এতে ইজরায়েল খুব চটেছে। ফ্রান্সের কোন শান্তি-উদ্যোগে তাদের সাড়া পাওয়া যাবে না। কিন্তু ফ্রান্স কেন, কারও কোন শান্তি প্রস্তাবেই ইজরায়েলের সমর্থন পাওয়া যাবে না। নিরাপত্তা পরিষদ ২২শে নভেম্বর, ১৯৬৭ তারিখে প্রস্তাব গ্রহণ করে অধিকৃত আরব এলাকা থেকে ইজরায়েলী সৈন্য প্রত্যাহারের নির্দেশ দিয়েছিল। ইজরায়েল তা অগ্রাহ্য করেছে।

চেকোশ্লোভাকিয়া:

একের-পর-এক যুবক আত্মাহুতির জন্য এগিয়ে আসছে। তাদের দাবি, সোভিয়েট নিয়ন্ত্রণের হাত থেকে চেকোশ্লোভাকিয়ার মুক্তি চাই। গণতন্ত্রীকরণের কাজে বাধা দেওয়া চলবে না।

২১ বৎসর বয়স্ক ছাত্র জান প্যালেচ্ ১৬ই জানুয়ারী প্রাগে বিখ্যাত উইনসেস্লাস স্কেয়ারে নিজের গায়ে গ্যাসোলিন ঢেলে তাতে আগুন লাগিয়ে মারা যান। অগ্নিদগ্ধ অবস্থায় চার দিন থাকার পর ১৯শে জানুয়ারী প্যালেচ্ মারা গিয়েছেন। প্যালেচ্ মৃত্যুর পূর্বে যে চিঠি লিখে রেখে গেছেন, তাতে বলেছেন, সংবাদপত্রের ওপর থেকে বিধিনিষেধ প্রত্যাহার এবং পূর্ব জার্মানী থেকে সোভিয়েট কর্তৃপক্ষের প্রকাশিত সংবাদপত্র জ্ব্দ্রাভি-র প্রচার বন্ধ করতে হবে। যতদিন এই কাজ না হবে, ততদিন চেকোশ্লোভাকিয়ার ছাত্র-যুবকেরা আন্দোলন চালিয়ে যাবে। বহু ছাত্র আত্মাহুতির জন্য প্রস্তুত।

প্যালেচের দেহে অগ্নিসংযোগ ও মৃত্যুর সংবাদ সমগ্র চেকোশ্লোভাকিয়ায়

লুডউইগ স্বোবোদা

বিরাট আলোড়নের সৃষ্টি করেছে। হাজারে হাজারে ছাত্র, যুবক, নর-নারী প্যালেচের স্মৃতির প্রতি সম্মান প্রদর্শনের জন্য এগিয়ে এসেছে। তাঁর অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ায় যে বিপুল জনসমাগম হয়েছে, তা মাসারিকের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। ছাত্ররা প্যালেচের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে, তাঁর ঘোষিত দাবির প্রতি সমর্থন জানিয়ে বিক্ষোভ-মিছিল পরিচালনা করেছে, অনশন ধর্মঘটে যোগ দিয়েছে।

কমিউনিস্ট পার্টির ঊর্ধ্বতন নেতৃত্বও এই আত্মাহুতি ও ছাত্রবিক্ষোভে বিচলিত। তাঁরা এইসব কাজের নিন্দা করছেন, ছাত্রদের এ-থেকে নিবৃত্ত করার চেষ্টা করছেন। সমাজতন্ত্র-বিরোধীরা অপপ্রচার ও প্রতিবিপ্লবী প্রচেষ্টার দ্বারা এক শ্রেণীর মানুষের মধ্যে যে বিকৃত মানসিকতার সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়েছে, এইসব কাণ্ড তারই ফল। স্বয়ং রাষ্ট্রপতি লুডউইগ স্বোবোদা রেডিও ও টেলিভিশন বক্তৃতায় এই সর্বনাশা পথ ত্যাগ করার জন্য ছাত্রদের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন। কিন্তু তা সত্ত্বেও নেতৃবৃন্দ ছাত্রদের সঙ্গে আলাপ-আলোচনাও শুরু করেছেন। তাঁরা বুঝেছেন, গণতন্ত্রীকরণের দাবিতে, সোভিয়েট হস্তক্ষেপের বিরুদ্ধে দেশবাসীর মনে যে গভীর অনুভূতি রয়েছে, এ তারই প্রকাশ। একে উপেক্ষা করা শক্ত। ছাত্ররা অবশ্য সাফ বলে দিয়েছে, তাদের দাবি না মানা পর্যন্ত আন্দোলন চলবে। তারা এখন স্বাধীন নির্বাচনের দাবি পর্যন্ত করছে।

জান প্যালেচের পর আরও তিনজন যুবক আত্মাহুতির চেষ্টায় দেহে অগ্নিসংযোগ করেছেন। তবে এঁরা কেউ-ই মারা যান নি। এই তিনজনের নাম—জোশেফ হ্যভাতি, ম্যালিনকভিই ও ফ্রান্ত্ টিসেক বোগি।

পাকিস্তান:

পাকিস্তানের সর্বত্র এখন দাউ-দাউ করে আগুন জ্বলছে। আয়ুবশাহীর শেষ সময় উপস্থিত।

ঢাকায় গুলী চলেছে, ময়মনসিংহে গুলী চলেছে। ওদিকে রাওয়ালপিণ্ডিতেও গুলী চলেছে। পাকিস্তানের পূর্ব ও পশ্চিম উভয় প্রান্তে প্রায় প্রতিটি শহরে আয়ুবের স্বৈরাচারী শাসনের উচ্ছেদের দাবিতে মিছিল ও জনসমাবেশ হচ্ছে। পুলিশের সঙ্গে বিক্ষোভকারীদের সংঘর্ষ হচ্ছে; পুলিশ লাঠি, গুলী, টিয়ারগ্যাস চালাচ্ছে। সৈন্যবাহিনী পর্যন্ত তলব করা হয়েছে।

২০শে জানুয়ারী ঢাকায় পুলিশের গুলীতে একজন ছাত্র নিহত হবার পরই দেশব্যাপী বিক্ষোভ চরম আকার ধারণ করে। ঢাকায় ইতিমধ্যে পাঁচজন মারা গিয়েছেন, ময়মনসিংহে দু'জন। পশ্চিম পাকিস্তানেও এর প্রতিবাদে বিক্ষোভ হচ্ছে।

পাকিস্তানের আটটি বিরোধী দলকে নিয়ে গঠিত 'গণতান্ত্রিক সংগ্রাম কমিটি'-র বৈঠক বসেছিল লাহোরে। কমিটি আগামী ১২ই ফেব্রুয়ারী সমগ্র পাকিস্তানে সাধারণ ধর্মঘটের আহ্বান দিয়েছেন। আয়ুব সরকারের সঙ্গে চূড়ান্ত শক্তিপরীক্ষার জন্য প্রস্তুত হচ্ছে বিরোধী পক্ষ।

২৫।১।৬৯

কংগ্রেস ফ্রন্ট বনাম যুক্তফ্রন্ট

প্রদ্যোত রায়

আগামী ৯ই ফেব্রুয়ারী মধ্যবর্তী নির্বাচন অনুষ্ঠিত হতে চলেছে। এই নির্বাচনে জনগণের তেমন উৎসাহ বা উদ্দীপনা দেখা যাচ্ছে না। বুদ্ধিজীবীদের মধ্যে অনেকেই গণতন্ত্রের প্রতি আস্থা হারিয়েছেন বলে মনে হয়। এখন প্রশ্ন, এই হতাশার উদ্ভব হল কি করে? ভারতবর্ষ দীর্ঘকাল ধরে (বিশেষত বাংলাদেশ) গণতান্ত্রিক সরকার প্রতিষ্ঠার জন্য সংগ্রাম করেছে এবং সংগ্রামের একটি বিশেষ পর্যায়ে ১৯৪৭ সালে ভারতবর্ষ স্বাধীন হয়েছে। অবশ্য আন্তর্জাতিক রাজনৈতিক অবস্থার বিরাট পরিবর্তন আসাতেই ইংরেজ সরকারকে ভারত ত্যাগের সঙ্কল্প গ্রহণ করতে হয়েছিল। ১৯৫০ সাল থেকে ভারতবর্ষ গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্ররূপে আত্মপ্রকাশ করল। কিন্তু মাত্র ১৯ বছরের মধ্যেই সমাজের চিন্তাশীল মানুষদের এক বিরাট অংশের মনে ভারতীয় গণতন্ত্রের প্রতি অশ্রদ্ধা এত প্রকট হয়ে উঠেছে, যার ফলে প্রবীণ সাহিত্যিক তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় পর্যন্ত বলছেন, "কেউ যদি বলেন যে, গণতন্ত্রের জন্য একটু কষ্ট ভোগ করা উচিত, তাহলে বলব রাজনৈতিক দলগুলির কষ্টভোগ করার ক্ষমতা থাকলেও সাধারণ মানুষের সে ক্ষমতা আর নেই।" এমনি উত্তর পাওয়া গেছে ঐতিহাসিক রমেশচন্দ্র মজুমদার, ডঃ নীহার মুন্সীর কাছ থেকে।

ভারতে প্রচলিত গণতন্ত্রের প্রতি বুদ্ধিজীবীদের এই অশ্রদ্ধার জন্যে দায়ী তাঁরা, যাঁরা এ-দেশকে দীর্ঘকাল ধরে শাসন করেছেন। জনসাধারণ পূর্ণ বিশ্বাসে কংগ্রেসের হাতেই এ-দেশকে গড়ে তোলার দায়িত্ব দিয়েছিলেন। কিন্তু এই দল গণতন্ত্রের মুখোশ পরে অতীত ঐতিহ্যকে ভাঙিয়ে ও পরলোকগত প্রধানমন্ত্রী পণ্ডিত নেহরুর জনপ্রিয়তাকে সম্বল করে প্রকৃতপক্ষে অগণতান্ত্রিক উপায়ে শাসন পরিচালনা করে সমাজের সর্বস্তরের মানুষের মনে এক গভীর হতাশার সৃষ্টি করেছেন। তারই প্রতিফলন দেখি বুদ্ধিজীবীদের চিন্তায়।

১৯৬৭ সালের নির্বাচনের ফলাফল কংগ্রেসী স্বৈরাচারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদস্বরূপ—আশা করি নৈষ্ঠিক কংগ্রেসকর্মিগণও আড়ালে একথা স্বীকার না করে পারবেন না। এ-দেশে স্বাধীনতা যে অল্পসংখ্যক মানুষের জন্য—জনসাধারণ সে কথা মর্মে মর্মে উপলব্ধি করেন। জনসাধারণের প্রতি শাসকশ্রেণীর অশ্রদ্ধা যে কত গভীর ছিল তার একটিমাত্র উদাহরণ দিচ্ছি। কিছুদিন আগেও বাংলার এক কংগ্রেসী নেতা অর্ধভুক্ত জনগণকে কাঁচকলা খেয়ে উদর পূর্তির উপদেশ দিতে দ্বিধা করেন নি। বাঙালী আত্মবিস্মৃত জাতি হলেও এত অল্প সময়ের মধ্যে এ হেন বিদ্রূপ ভুলে যেতে সক্ষম হবে কি না সে বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ আছে। সাধারণ মানুষের কথা ছেড়েই দিলাম। বুদ্ধিজীবীদের স্বাধীনতায় কংগ্রেসী শাসকশ্রেণী হস্তক্ষেপ করতে চেষ্টা করেছেন। ঐতিহাসিক রমেশচন্দ্র মজুমদার বললেন, "যুক্তফ্রন্টের সময় বুদ্ধিজীবীদের স্বাধীনতার ক্ষেত্রে কোনও বাধা দেখি নি। কংগ্রেস যথাসাধ্য চেষ্টা করেছে যাতে বুদ্ধিজীবিগণ কংগ্রেসের নীতির দ্বারা পরিচালিত হন। ১৮ বছরে এ ধরনের অন্যায়ের নমুনা পাওয়া গেছে।" আশা করি ঐতিহাসিক মজুমদারের পরম শত্রুও তাঁকে যুক্তফ্রন্টের সমর্থক বলে আখ্যা দিতে পারবেন না।

অনেকেই বিশ্বাস করেন যে, বাইরে থেকে জনগণের মধ্যে উৎসাহ-উদ্দীপনার অভাব দেখা গেলেও তাঁরা বর্তমান রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে তাঁদের কর্তব্য ঠিক করে ফেলেছেন। বাংলাদেশের রাজনীতি যে এখন অনেক বেশি পোলারাইজড হয়েছে, তা মোটামুটি সকলেই স্বীকার করছেন। নির্বাচকমণ্ডলীর কাছে এ-কথা স্পষ্ট যে, কংগ্রেস ফ্রন্ট ও যুক্তফ্রন্ট এই দুই ফ্রন্টের মধ্যে যে কোনও একটিকে তাদের বেছে নিতে হবে। এতকাল এক শ্রেণীর বুদ্ধিজীবীরাই কংগ্রেসকে ফ্রন্ট হিসেবে দেখতে অভ্যস্ত ছিলেন। কিন্তু এ ধারণা জনসাধারণের মধ্যে এখন বিশ্বাসে-রূপান্তরিত হয়েছে বলে অনেকেই মনে করেন। বর্তমানে সাধারণ চাষী বা কলকারখানার শ্রমিকও মোটামুটি ঐভাবে ভাবতে অভ্যস্ত হচ্ছেন। মোরারজী দেশাই ও ইন্দিরা গান্ধীর মতাদর্শের পার্থক্য আর ঢেকে রাখা সম্ভব নয়। বাংলাদেশের কংগ্রেসকে ঢেলে সাজবার চেষ্টায় মন্দজীর আগমন ও বিজয় সিং নাহার, তরুণকান্তি ঘোষ প্রমুখের চেষ্টায় 'এড্ হক্ কংগ্রেস কমিটি' গঠন যে অতুল্যবাবুর ভাল লাগে নি—এ কথাও কিন্তু দিবালোকের মত স্পষ্ট হয়ে গেছে। কিন্তু নাহার ও তাঁর সহকর্মী বন্ধুগণ কংগ্রেসের ছত্রচ্ছায়ায় আজও বিদ্যমান। এর অর্থ দাঁড়ায় এই যে, বিভিন্ন স্বার্থের প্রতিনিধি বা বিভিন্ন মতাদর্শে বিশ্বাসী কর্মিগণ কংগ্রেসের ঐতিহ্যকে যতটুকু সম্ভব ব্যবহার করতে চান। তারাশঙ্কর বললেন, "আমি এক সময়ে কংগ্রেসের সঙ্গে যুক্ত ছিলাম। পণ্ডিত জহরলালের তিরোধানের পর কংগ্রেসে যখন বিরোধ আরম্ভ হল এবং ঐ দলের মধ্যেই নানা উপদল সৃষ্টি হল, তখন দেখেছি ব্যক্তিস্বার্থ বা দলের স্বার্থই সেখানে বড় হয়ে ওঠে। দেশের স্বার্থ তখন শোচনীয়ভাবে উপেক্ষিত হয়।" অতএব পশ্চিমবঙ্গের কংগ্রেস দল (যেমন অন্যত্র) পরস্পরবিরোধী মতাদর্শে বিশ্বাসী কর্মীদের বা বিভিন্ন স্বার্থের প্রতিনিধিদের মিলনে গঠিত। এটাও একটি ফ্রন্ট, যার সুনির্দিষ্ট কোনও কর্মসূচী নেই, নির্দিষ্ট কোনও মতাদর্শ নেই।

কংগ্রেস ফ্রন্টের বিরোধিতা করছেন যুক্তফ্রন্ট। ১৯৬৭ সালের নির্বাচনের পর অপ্রত্যাশিতভাবে যুক্তফ্রন্ট গঠিত হল। নির্বাচনের পূর্বে ফ্রন্টের কোনও দলই সরকার গঠনের কথা কল্পনাও করেন নি। সরকার পরিচালনার দায়িত্ব গ্রহণ করার পর তাঁদের বিভিন্ন জরুরী সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়েছে। সমস্যাগুলি সমাধানের জন্য ফ্রন্টভুক্ত দলগুলি তাঁদের সুচিন্তিত বক্তব্য রেখেছেন। কিন্তু যে পদ্ধতিতে প্রতিটি দল তাঁদের বক্তব্য রেখেছিলেন, তা অনেকেরই পছন্দ হয় নি। যদি ঐ দলগুলি ঘরোয়াভাবে আলোচনার মাধ্যমে সিদ্ধান্তে এসে সেই গৃহীত সিদ্ধান্ত দেশবাসীকে জানাতেন, তবে সবদিক থেকেই তা শোভন ও সন্তোষজনক হত। ফ্রন্টের দলগুলির সংযমের কিছু অভাব মোটামুটি সকলেরই চোখে পড়েছে। তবে, এ কথাও ঠিক যে, আলোচনা বা যুক্তিতর্ক ছাড়া কোনও সমস্যারই প্রকৃষ্ট সমাধান সম্ভব নয়। বর্তমানে যুক্তফ্রন্ট যে অবস্থায় এসেছেন তাতে আশা করা যায় যে, এবার ফ্রন্টভুক্ত দলগুলি প্রয়োজনীয় সংযম বজায় রেখেই কাজ করতে সক্ষম হবেন। প্রাক্তন শিক্ষামন্ত্রী শ্রীজ্যোতি ভট্টাচার্য বললেন, "বর্তমানে যুক্তফ্রন্টের দলগুলি নির্বাচনের অনেক পূর্বেই বিভিন্ন সমস্যা নিয়ে দীর্ঘ আলোচনা করে পরস্পরের দৃষ্টিভঙ্গী, চিন্তা ও আদর্শ সম্বন্ধে অনেক বেশি ওয়াকিবহাল হয়েছেন। এবং সুস্পষ্ট সিদ্ধান্তের ভিত্তিতে একমত হয়েছেন। * * * বৃহৎ মতানৈক্যের ক্ষেত্রও প্রায় নেই।"

ফ্রন্টের অন্যান্য নেতৃবৃন্দের বক্তব্যও [illegible] ধরনের।

কাজেই দুই ফ্রন্টের মধ্যে যুক্তফ্রন্টের বক্তব্যে কোনও অস্পষ্টতা দেখি না। তাঁরা কখনই তাঁদের একটি রাজনৈতিক দল বলে ঘোষণা করছেন না। তাঁরা বলছেন যে, একটি নির্দিষ্ট কর্মসূচীর ভিত্তিতেই তাঁরা মিলিত হয়েছেন। এবং সরকার গঠনে সমর্থ হলে তাঁরা ঐ কর্মসূচী অনুযায়ী কাজ করবেন। অপর পক্ষে কংগ্রেস ফ্রন্ট সত্যকে গোপন করছেন, অর্থাৎ তাঁদের মধ্যে যে অনৈক্য আছে সে কথা তাঁরা জনসাধারণকে জানাতে রাজী নন। হরিয়ানার ঘটনার পরও বাংলা-দেশের প্রদেশ কংগ্রেসের সভাপতি ডঃ প্রতাপচন্দ্র চন্দ্র মনে করেন, "হরিয়ানা সারা ভারতবর্ষ নয়।" এ রাজ্যের কংগ্রেসে পরস্পরবিরোধী গোষ্ঠীর অস্তিত্ব যে আছে এবং সময়ে সুযোগে যে ঐ গোষ্ঠীবিরোধ আত্মপ্রকাশ করবে সে বিষয়ে বাংলার জনগণ সচেতন বলেই বিশ্বাস।

নির্বাচনী সভা-সমিতিতে কংগ্রেস নেতৃবৃন্দ ফ্রন্টের ব্যর্থতার কথা স্মরণ করিয়ে জনগণকে সতর্ক করে দিচ্ছেন। কিন্তু কংগ্রেস সরকার গঠনে সমর্থ হলে মহাত্মাজীর রামরাজ্য বাংলাদেশে প্রতি-ষ্ঠিত হবে কি না সে বিষয়ে তাঁরা কিছু বলছেন না। যুক্তফ্রন্টের শাসনে চালের সের পাঁচ টাকা হয়েছিল এ-কথা কংগ্রেস বললেও বাংলাদেশের মানুষ তা জানেন। তাঁরা আরও জানেন যে, ১৯৬৬ সালের ডিসেম্বর থেকে ১৯৬৭ সালের ফেব্রু-য়ারী মাস পর্যন্ত কংগ্রেস মন্ত্রিসভা চাল সংগ্রহের ব্যাপারে তাঁদের কর্তব্য পালন করেন নি। অবশ্য ডঃ প্রফুল্ল ঘোষ সম্পর্কে (এঁর সম্পর্কে শ্রীজাহাঙ্গীর কবিরের মন্তব্য স্মরণ করা যেতে পারে) ফ্রন্টের আরও সচেতন হওয়া উচিত ছিল। নির্বাচকমণ্ডলী এ-কথাও ভাবছেন যে, পাঁচ টাকা সের চাল হলেও বাংলাদেশে কোনও বিক্ষোভ হয় নি। জনসাধারণ মনে করতে পেরেছিলেন যে, যুক্তফ্রন্ট সরকার তাঁদের মঙ্গলের জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করছেন। প্রফুল্ল সেনের ন্যায় মিলিটারী ডেকে খাদ্য আন্দোলন বন্ধ করার প্রয়োজন বোধ করেন নি অজয়বাবু।

বাংলাদেশের কলকারখানা বন্ধের জন্য শ্রমনীতির সমালোচনা করা হচ্ছে। সর্বভারতীয় অর্থনৈতিক সঙ্কটের ফলে ঘেরাও নামক অস্ত্রের ব্যবহার না করলেও পশ্চিমবঙ্গের শ্রমিককুল কর্মচ্যুতির হাত থেকে রেহাই পেতেন না। তবে ঘেরাও নিয়ে যে বাড়াবাড়ি হয়েছে সে-কথা স্বয়ং প্রাক্তন শ্রমমন্ত্রী শ্রীবন্দ্যোপাধ্যায় নিজেও স্বীকার করেন। ফ্রন্টের নেতৃবৃন্দ মনে করেন যে, তাঁদের শ্রমনীতি যথার্থই ছিল। [illegible] নীতি না বুঝে অনেকক্ষেত্রে বাড়া-বাড়ি করা হয়েছে। শ্রীসুবোধ বন্দ্যো-পাধ্যায়ের বক্তব্য নিম্নরূপঃ নীতি না বুঝে যদি কেউ বাড়াবাড়ি করে তবে তার জন্য দায়ী তারা, যারা সে কাজ করেছে। এই নীতি অনুসারেই আমরা চলব। এবং যুক্তফ্রন্ট এই নীতিই তাঁর কর্মসূচীতে গ্রহণ করেছে।

এখানে স্মরণ করা যেতে পারে যে, যুক্তফ্রন্টের শাসনের শেষের দিকে ঘেরাও অনেক কমেছিল। দলগুলি বাস্তব অবস্থাকে অস্বীকার করেন নি বলেই এটা সম্ভব হয়েছিল। এবার সরকার গঠনে সমর্থ হলে আশা করা যায় যে, পূর্ব অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে যুক্তফ্রন্টের মধ্যে কোনও দলই ঘেরাও নিয়ে বাড়াবাড়ি না করে গৃহীত নীতিকে কার্যে রূপায়িত করতে চেষ্টা করবেন।

বর্তমানে প্রাদেশিকতা ও সাম্প্রদায়িকতার ভিত্তিতে বাংলাদেশে কতকগুলি নতুন নতুন রাজনৈতিক দলের আবির্ভাব ঘটেছে। এই দলগুলি শক্তি সঞ্চয় করতে পারবে না বলেই প্রতিষ্ঠিত রাজনৈতিক দলগুলির নেতৃবৃন্দের বিশ্বাস। তবে এদের আবির্ভাব দেশের বৃহত্তর স্বার্থের পরিপন্থী। মুসলিম লীগের নামে এখনও বাঙালী হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায়েরই মনে ঘৃণার সঞ্চার করে। শুধুমাত্র সাম্প্রদায়িকতার বিষ ছড়ানোই ছিল যে দলের কাজ, সেই জঘন্য ঐতি-হ্যময় নামটি আবার বাংলার রাজনীতিতে এসে হাজির হল। অত্যন্ত দুঃখের কথা প্রগ্রেসিভ মুসলিম লীগের এমন দু-চারজন নেতা আছেন, যাঁরা এক সময় প্রগতিশীল আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। এতগুলি রাজনৈতিক দল থাকা সত্ত্বেও মুসলমান সম্প্রদায়ের স্বার্থ রক্ষার জন্য 'প্রগ্রেসিভ মুসলিম লীগ'-এর সৃষ্টি করতে হল।

জনৈক রাজনৈতিক নেতার সঙ্গে 'প্রগ্রেসিভ মুসলিম লীগ' সম্বন্ধে কথা হয়েছিল। তিনি কেরলের 'মুসলিম লীগের' সঙ্গে বাংলার 'প্রগ্রেসিভ মুসলিম লীগ'কে এক করে দেখাতে চেষ্টা করলেন। তবে 'মুসলিম লীগ' এই কথাটি বাংলার মানুষকে যে আতঙ্কিত করে—এ-কথা তিনিও স্বীকার না করে পারেন নি।

বিশ্বনাথ মুখোপাধ্যায় বলেন, "যদিও 'লীগ' খুবই ক্ষুদ্রশক্তি, তথাপি লীগের আবির্ভাব সাম্প্রদায়িকতা বাড়তে সাহায্য করবে।" উক্তিটি যথার্থ। হিন্দু প্রতি-ক্রিয়াশীল শক্তি লীগের উদ্ভবে শক্তিশালী হতে পারে। আর সেই জন্যই সাধারণ মানুষের শঙ্কিত হবার যথেষ্ট কারণ রয়েছে। প্রাদেশিকতার ভিত্তিতে কোনও কোনও দল আত্মপ্রতিষ্ঠার চেষ্টা করছেন। বাংলাদেশে এদের প্রতিষ্ঠা বোধ করি অসম্ভব। তবে এদের আবির্ভাবও মারাত্মক।

দলত্যাগের প্রশ্ন প্রায় সকলের মনেই উঠছে। দলত্যাগ যে অপরাধ—এ-কথা নীতিগতভাবে সকল রাজনৈতিক দলই স্বীকার করেন। যুক্তফ্রন্টের নেতৃবৃন্দের দৃঢ় বিশ্বাস এই যে, এবার ফ্রন্ট থেকে দলত্যাগের সম্ভাবনা খুবই কম। তাঁদের বক্তব্য হল যে, যুক্তফ্রন্টের বিভিন্ন দল-গুলি প্রার্থী মনোনীত করলেও শেষ পর্যায়ে প্রার্থী বাছাই-এর দায়িত্ব ছিল ফ্রন্টের উপর। ফ্রন্ট তাঁদের মনোনীত করেছেন—যাঁদের রাজনৈতিক সততা ও নিষ্ঠা সম্বন্ধে ফ্রন্টের সন্দেহের কোনও অবকাশ নেই।

গতবার বাংলা কংগ্রেস থেকে দল-ত্যাগ ঘটেছিল। কাজেই বাংলা কংগ্রেসের এবারকার প্রার্থীদের সম্পর্কে ফ্রন্টের নেতৃবৃন্দকে প্রশ্ন করা হয়। নেতৃবৃন্দ বিশ্বাস করেন যে, বাংলা কংগ্রেস থেকে দক্ষিণপন্থী সদস্যগণ বেরিয়ে গেছেন। এবার ঐ দলের প্রার্থীদের মধ্যে অনেকেই পরীক্ষিত রাজনৈতিক কর্মী। কাজেই দলত্যাগের সম্ভাবনা নেই বললেই চলে।

গত নির্বাচনে সদ্যোজাত দল বাংলা কংগ্রেসের পক্ষে সঠিকভাবে প্রার্থী বাছাই করা সম্ভব হয় নি। যথেষ্ট সতর্কতা

সবিনয় নিবেদন

অনিবার্য কারণবশত এ সপ্তাহেও কৃত্তিবাস ওঝার 'সপ্তাহের বোঝা' প্রকাশ করা গেল না—এর জন্যে আমরা দুঃখিত।

আগামী সংখ্যা থেকে ফিচারটি যথা-রীতি প্রকাশিত হবে। —সম্পাদিকা

অবলম্বন না করেই কিছুসংখ্যক প্রতিক্রিয়াশীল আদর্শভ্রষ্ট লোককে দলভুক্ত করা হয়েছিল—যাঁরা দলত্যাগ করেছেন। তবে তাঁরা এখন বাংলা কংগ্রেস থেকেও বিদায় নিয়েছেন।

কংগ্রেসের বক্তব্য, ডঃ প্রতাপচন্দ্র চন্দ্রের ভাষায়, "গতবারে দলত্যাগের প্রশ্ন ঘড় করে দেখা দিল। এটা রোধ করার জন্য কংগ্রেসের কোনও দলত্যাগীকে আমরা মনোনয়ন দিই নি। * * * দলত্যাগ বন্ধের জন্য আমরা চেষ্টা করতে পারি। তবে ভবিষ্যতে কি হবে তা বলা যায় না। আমাদের বিশ্বাস কংগ্রেস থেকে কোনও দলত্যাগ হবে না।" কংগ্রেসের দলত্যাগীদের মনোনয়ন না দিলেও যুক্তফ্রন্ট-ত্যাগীকে ডঃ চন্দ্র মনোনয়ন দিয়েছেন। এই কাজটি নৈতিক গণতান্ত্রিক ধারায় লালিত কোনও দলের পক্ষে যথার্থ কি না—সে বিষয়ে অনেকেই প্রশ্ন তুলছেন। জানি না ডঃ চন্দ্র এর কী উত্তর দেবেন। তা ছাড়া এ রাজ্যের কংগ্রেসে বিরোধ থাকায় বর্তমান কংগ্রেস নেতৃত্বে অবিশ্বাসী উপদল সম্ভব হলে কংগ্রেসের মন্ত্রিত্ব করার বাসনায় বাদ সাধবেন না এমন, কোনও নিশ্চয়তা নেই। রাজনীতিতে প্রতিহিংসা গ্রহণের প্রবক্তা থেকে জাতির জনক স্বয়ং গান্ধীজীও মুক্ত ছিলেন না। অন্তত জনগণের মনে এ ধারণা বদ্ধমূল। কাজেই কংগ্রেসে দলত্যাগের সম্ভাবনা যথেষ্ট আছে। যদিও নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিগণ নির্বাচনের আসরে স্বাভাবিকভাবেই অত বড় সত্য কথাটা বলতে পারেন না।

দলত্যাগের প্রশ্নে যুক্তফ্রন্টের বক্তব্য যত বেশি স্পষ্ট, কংগ্রেসের বক্তব্য তা নয়। নির্বাচকমণ্ডলী এ দিকটাও ভেবে দেখবেন—এটাই আশা করা যায়। দলত্যাগের প্রশ্নের সঙ্গে আরেকটি প্রশ্ন এসে পড়ে। প্রশ্নটি হল, এবার এ রাজ্যে কোন্ ফ্রন্ট স্থায়ী সরকার গঠনে সমর্থ হবেন?" কংগ্রেস বলছেন, তাঁরাই স্থায়ী সরকার গঠনে সমর্থ। রমেশচন্দ্র মজুমদার, তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, ডঃ নীহার মুখার্জী বা নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় কংগ্রেসের এই বক্তব্যের মধ্যে কোনও যুক্তিই খুঁজে পান নি। নীহারবাবু তো স্পষ্টই বললেন, "কংগ্রেসের পক্ষে স্থায়ী সরকার গঠন সম্ভবই নয়।"

প্রাক্তন উপ-মুখ্যমন্ত্রী শ্রীজ্যোতি বসু বললেন: সরকার কীরকম হবে, সেটাই আসল কথা। সরকারের স্থায়িত্ব আসল কথা নয়। একনায়কত্ব পঞ্চাশ বৎসর স্থায়ী হতে পারে। তবে তাতে সাধারণ মানুষের কিছু যায় আসে কি?

শ্রীবসুর এই উক্তির মধ্যে মনে হয়, সাধারণ মানুষের জিজ্ঞাসার উত্তর মিলবে।

পাকিস্তানে আয়ুব সরকার বেশ কিছুকাল ধরে টিকে আছে। কিন্তু জনগণ ঐ সরকারের উচ্ছেদ কামনা করছেন প্রতি মুহূর্তে। কংগ্রেস আঠারো বছর ধরে বাংলাদেশে সরকার পরিচালনা করেছেন। সরকারের স্থায়িত্ব ছিল। কিন্তু তবুও জনগণ '৬৭-র নির্বাচনে কংগ্রেসকে বিতাড়িত করল কেন? এর উত্তরে বলা যায়, কংগ্রেস জনকল্যাণে অসমর্থ ছিলেন। জনগণের আশা-আকাঙ্ক্ষা পূরণে প্রতিশ্রুত হয়েও দল বা ব্যক্তিস্বার্থকেই কংগ্রেস বড় করে দেখেছেন; জনগণের স্বার্থকে শোচনীয়ভাবে উপেক্ষা করেছেন। এ প্রসঙ্গে একটি কথা বলা দরকার। ঘন-ঘন সরকারের পরিবর্তন হলে জন-মানসে প্রচলিত গণতন্ত্রের প্রতি বিশ্বাস কমে যাবে। এবং রাজনৈতিক অস্থিরতাকে উপলক্ষ করে দক্ষিণপন্থী প্রতিক্রিয়াশীল শক্তি ভারতে একনায়কত্ব প্রতিষ্ঠা করতে চেষ্টা করতে পারে। এমতাবস্থায় গণতন্ত্রে বিশ্বাসী রাজনৈতিক দলগুলির যথেষ্ট দায়িত্বশীল হবার প্রয়োজন আছে। গণতান্ত্রিক শক্তিকে বাঁচিয়ে রাখা এবং শক্তিশালী করার প্রয়োজনীয়তা যে বর্তমানে সর্বাধিক—বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের নেতৃবৃন্দ সে-কথা স্বীকার করেছেন।

ফ্রন্ট সরকারের নিকট সাধারণ মানুষের আশা ছিল অনেক। এবং সেটা কিছু অস্বাভাবিকও নয়। সে কারণেই হোক্ ফ্রন্ট সাধারণের আশা-আকাঙ্ক্ষাকে সর্বাংশে পূরণে সমর্থ হন নি। ফ্রন্ট সরকারের সমালোচনা করেও ডঃ নীহার মুখার্জী বললেন, "কংগ্রেস সমস্ত দিক থেকে ব্যর্থতার পরিচয় দিয়েছে। শুধু তাই নয়, মানুষের নৈতিক দিক সম্পূর্ণ ভেঙে দিয়েছে।"

রাষ্ট্রপতির শাসনের গুণ-গান অনেকে করেছেন। কিন্তু জলপাইগুড়ির শোচনীয় ঘটনার পর এই শাসন-ব্যবস্থাকে জনগণের মঙ্গলামঙ্গলের প্রতি নির্মম উদাসীন একটি শাসনযন্ত্র ছাড়া আর কিছুই বলা সঙ্গত নয়। বলা বাহুল্য রাষ্ট্রপতির শাসন কংগ্রেস-শাসনেরই নামান্তর।

আসন্ন অন্তর্বর্তী নির্বাচনের ফলাফল কী হবে, তাই নিয়ে রাজনৈতিক মহলে, জনসাধারণের মধ্যে জল্পনা-কল্পনার অন্ত নেই। সেদিন ডঃ নীহার মুখার্জীর বাড়ি থেকে নির্বাচন প্রসঙ্গে তাঁর বক্তব্য শুনে উঠে ছিলাম, শ্রীমতী মুখার্জী বললেন, "দেখুন, যুক্তফ্রন্টকে আমরা আরেকবার শাসন ক্ষমতায় বসাতে চাই। ওদের কর্মপন্থায় কিছু ত্রুটি-বিচ্যুতি ছিল। কিন্তু মানুষ যে ওদের কাছে অনেক চেয়েছিল—ওদের তো সময়ই দেওয়া হল না যথার্থ কিছু করবার।" কে জানে, শ্রীমতী মুখার্জীর বক্তব্যে আহত বাংলার প্রাণের কথা প্রকাশ পেয়েছে বাংলার প্রাণের কথা প্রকাশ পেয়েছে কি না!

অনল রায়ের অনবদ্য কাহিনী

যুগের আলো ১·০০

মার্কসবাদের গোড়ার কথা

জগদীশ চক্রবর্তীর উপন্যাস

স্বর্ণপাশ ৬·৫০

মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের রাহুগ্রাসে কিভাবে অর্থনৈতিক বিপর্যয় ঘটে তার অপূর্ব অধ্যায় রচিত হয়েছে উপন্যাসের যন্ত্রণাময় বিষয়বস্তুর মধ্যে।

মৈত্র প্রকাশনী: ২৬/২বি, বেনেটোলা লেন, কলি-৯।

নদীয়ায় নির্বাচন

অসীম মুখোপাধ্যায়

আসন্ন মধ্যবর্তী নির্বাচনের প্রস্তুতি-পর্বের সমীক্ষার জন্য নদীয়ায় গিয়েছিলুম। দেখলুম, মরণ-বাঁচনের কঠোর সংকল্প নিয়ে দুটি দল, ফ্রন্ট আর কংগ্রেস, মোকাবিলার দিন গুণছে। পথে-ঘাটে, যেখানেই একটু জমায়েত সেখানেই রকমারী গুজব, রকমারী খবর, সবকিছুই এই মোকাবিলাকে ঘিরে। উত্তেজনার আগুন জ্বলছে আর বাতাস ভারী হচ্ছে। কি ঘটবে, কেউ জানে না, একটা চাপা অস্থিরতায় লক্ষ মানুষের মন ছটফট করছে।

'৬৭-র নির্বাচনেও উত্তেজনা ছিল, অস্থিরতা ছিল। তখনও সবাই ছবি এঁকেছে, ছবি মুছেছে, হিসেব কষেছে, হিসেব কেটেছে, উড়ো খবর আর ভুয়ো ঘটনা নিয়ে আসর জমেছে কতবার! কিন্তু '৬৯ যেন একটু আলাদা। অসময়ের এই নির্বাচনী প্রতিদ্বন্দ্বিতা কেবল দুটি দলের ক্ষমতার লড়াই নয়, এক বনাম একশ'র বাঁচার লড়াইও বটে। দীর্ঘ কুড়ি বছর ধরে যারা দূরে দাঁড়িয়ে দেখছিল, ভাবছিল "নির্বাচন আমাদের নয়", '৬৭-র আহ্বানেও যারা সাড়া দেয় নি, তারা আজ অনেক কাছে এসেছে, ব্যক্তির বিরুদ্ধে, সমষ্টির আন্দোলন গড়ে তুলছে। এই দৃঢ়-প্রতিজ্ঞ, অপ্রতিরোধ্য জনশক্তির বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে কংগ্রেস নিশ্চয়ই তার নির্বাচনী রণনীতির যাবতীয় কলাকৌশল প্রয়োগ করবে। নদীয়া ছিল তার শক্ত ঘাঁটি, ফ্রন্টের আঘাতে সে ঘাঁটির পতন হয়। অস্তিত্বরক্ষার তাগিদে কংগ্রেসকে এই ঘাঁটি ফিরে পেতেই হবে। আগামী নির্বাচনে তাই তারও বাঁচার লড়াই।

কিন্তু এই বাঁচার লড়াইয়ে জিতবে কে? অন্তর্দ্বন্দ্ব—একই আসন নিয়ে একাধিক শক্তিশালী প্রার্থীর প্রতিদ্বন্দ্বিতা, দলত্যাগ, বিত্তবান রাজনীতিকদের গ্রাম-পিছু ভোট কেনার কারচুপি ইত্যাদি নানা কারণে নদীয়ার নির্বাচনী লড়াইয়ের ফলাফল অনিশ্চিত। তবে একটা কথা এই অনিশ্চয়তাই আসন্ন নির্বাচনকে আকর্ষণীয় করে তুলেছে। আশা-নিরাশার টানাপোড়েনে উভয় দলের কর্মীদেরই প্রেরণা যোগাচ্ছে। কংগ্রেস ও ফ্রন্ট দু' দলের বিভিন্ন প্রার্থীর সঙ্গেই আলাপ করেছি, তাঁরা প্রত্যেকেই বলেছেন, এই অনিশ্চয়তাটুকু থাকুক, এটাই নির্বাচনের প্রাণ। আমিও তাই বলি। এবার এই অনিশ্চয়তাটুকু সামনে রেখে বিভিন্ন অঞ্চলের যে সমীক্ষা করেছি, তা তুলে ধরছি।

চাকদহ

নদীয়ার এই শক্ত ঘাঁটিটি গত সাধারণ নির্বাচনে কংগ্রেসের হাতছাড়া হয়ে যায়। কংগ্রেসপ্রার্থী শান্তি দাস বাংলা কংগ্রেসের হরিদাস মিত্রের কাছে পরাজিত হন। আভ্যন্তরীণ অনৈক্যই এর জন্য দায়ী। কিন্তু এই অনৈক্য দূর হয় নি, বরং আরও বেড়েছে এবং জটিল রূপ নিয়েছে। কংগ্রেসের স্থানীয় সমর্থকরা আমাকে বলেছেন যে, এই গৃহবিবাদের জন্য কংগ্রেস চাকদহে আবার হারবে। চাকদহের কংগ্রেস প্রার্থী অসীম মজুমদার প্রকৃতপক্ষে রাণাঘাটের বাসিন্দা, নদীয়া কংগ্রেসের কর্ণধার জনাব ফজলুর রহমান তাঁকে চাকদহের আসনের জন্য মনোনয়ন দিয়েছেন। ফজলুর রহমানের এই পক্ষপাতিত্ব স্থানীয় কংগ্রেসী নেতা ও কর্মীমহলে অসন্তোষ সৃষ্টি করেছে। নারায়ণ বসু সহ ছ'জন স্থানীয় প্রার্থীকে বঞ্চিত করে অসীম মজুমদারের দাবিকে অগ্রাধিকার দেওয়ার ফলে চাকদহে কংগ্রেস আজ বিভিন্ন উপদলে বিভক্ত। দলাদলিটার বহিঃপ্রকাশ তেমনভাবে ঘটে নি একথা সত্য, কিন্তু এই দলাদলি নির্বাচনী সংগঠনের অনেক ক্ষতি করেছে এবং করবেও। চাকদহের গ্রামাঞ্চলে কংগ্রেসী সংগঠন '৬৭ অপেক্ষা কিছু দুর্বল হয়ে পড়েছে। দলাদলি ছাড়া আরও একটি বড় ত্রুটি চাকদহ কংগ্রেসের রাজনৈতিক ভবিষ্যৎ অনিশ্চিত করে তুলেছে। যে যুবশক্তি চাকদহে কংগ্রেসের হাত শক্ত করেছিল, তা আজ সরে দাঁড়িয়েছে। যোগেন্দ্রনাথ সরকার, যিনি মাত্র কিছুদিন আগেও চাকদহ যুব-কংগ্রেসের সম্পাদক ছিলেন, তিনি নির্বাচনে মনোনয়ন না পেয়ে দল থেকে বেরিয়ে এসেছেন, শুধু তাই নয়, তিনি আজ "আমরা বাঙালী"-র এক অন্যতম প্রার্থী। যে কংগ্রেসকে তিনি ও তাঁর কর্মীরা আন্তরিক নিষ্ঠা ও শ্রম দিয়ে শক্তিশালী করেছিলেন আজ সেই কংগ্রেসের প্রার্থীই তার প্রতিদ্বন্দ্বী। যোগেন্দ্রনাথ সরকারের সঙ্গে বহু তরুণ কর্মী দলত্যাগ করেছেন। ফলে কংগ্রেসের বেশ কিছু ভোট "আমরা বাঙালী" পাবে। ফ্রন্টের ভোটও যোগেন্দ্রনাথ কিছু পাবেন। কিন্তু ক্ষতি বেশি হবে কংগ্রেসের-ই। কেন না এখনও অনেক যুবক আছেন, যাঁরা আপাত-দৃষ্টিতে কংগ্রেস কর্মী হলেও প্রকৃতপক্ষে যোগেন্দ্রনাথের প্রতি সহানুভূতিসম্পন্ন। এঁদের ভোটগুলো 'আমরা বাঙালী'-র বাক্সই ভর্তি করবে। চাকদহের আর এক উল্লেখযোগ্য প্রার্থী হলেন আর, সি, পি, আই-এর সৌম্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর। এ পর্যন্ত কোনও নির্বাচনেই তিনি জয়লাভ করতে পারেন নি। কিন্তু তাহলেও চাকদহের নির্বাচনী উত্তেজনার প্রধান ইন্ধনের যোগান তিনিই দিয়ে থাকেন। সুবক্তা হিসেবে তাঁর সুনাম আছে, তাঁর ব্যক্তিত্বও অনন্যসাধারণ, কিন্তু তাঁর যা নেই তা হোল সংগঠন। অর্থবল থাকায় তিনি চাকদহের কয়েকটি উদ্বাস্তু পল্লীর ভোট এ-পর্যন্ত পেয়েছেন। হয়তো আবারও পাবেন। কিন্তু যেখানে সংগঠন নেই, বেতনভোগী কর্মীরা যেখানে নির্বাচনের প্রচারকার্য পরিচালনা করে, সেখানে জয়ের আশা বা সম্ভাবনা কমই থাকে, '৬৭-র নির্বাচনে কংগ্রেসের পরাজয় এই একই কারণে ঘটেছিল। চাকদহে সৌম্যেন্দ্রনাথ সম্প্রতি যে জনসভার আয়োজন করেছিলেন তা আশানুরূপ সাফল্য লাভ করে নি। তিনি ও তাঁর দল সম্বন্ধে নদীয়ার মানুষ আজ অনেক কথাই বলছে। বামপন্থী দলগুলি মনে করে যে সৌম্যেন্দ্রনাথ তাদের প্রভূত ক্ষতি করছেন। তিনি কোন নির্বাচনেই জয়ী হবেন না, বরং কংগ্রেস-বিরোধী ভোটের একটা বড় অংশ—যা কংগ্রেসের বিরুদ্ধে কাজে লাগান যেত, তিনি তা নিষ্ক্রিয় করে দিচ্ছেন। তাঁর উপস্থিতি পরোক্ষভাবে কংগ্রেসকেই সাহায্য করছে। চাকদহের সরকারী কর্মচারী, শিক্ষক ও শ্রমিকদের ভোটের অধিকাংশই ফ্রন্ট নিয়ন্ত্রণ করে থাকে। সৌম্যেন্দ্রনাথের অনুপস্থিতিতে তাঁর ভোটের একটা বড় অংশ নিশ্চয়ই ফ্রন্ট পেত। সরাসরি প্রতিদ্বন্দ্বিতা হলে চাকদহের নির্বাচনী লড়াই আরও আকর্ষণীয় হত।

নদীয়া

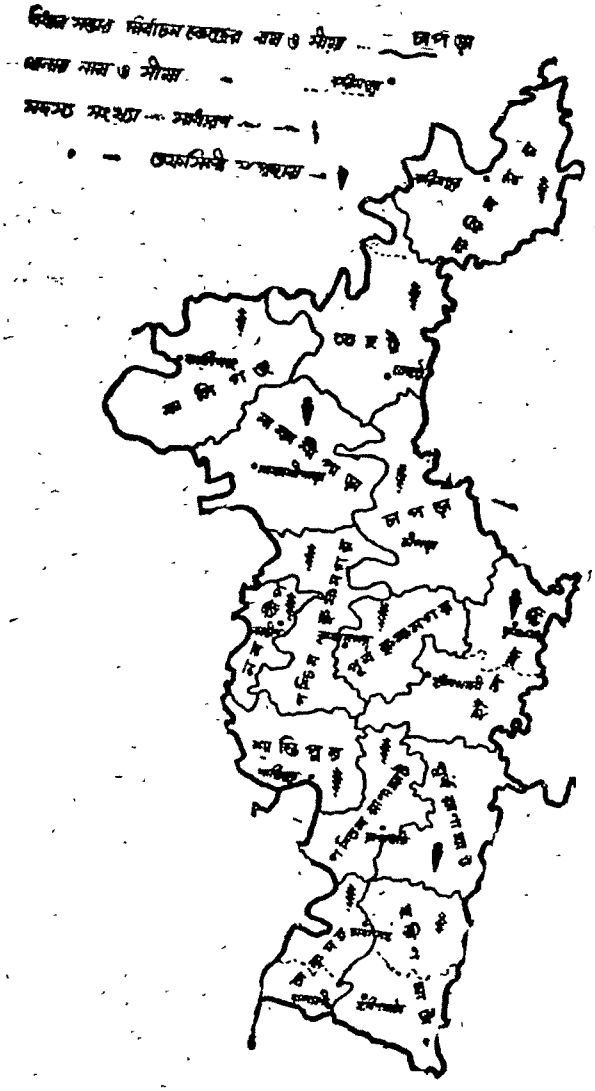

চাকদায় যুক্তফ্রন্ট তার বিজয়গৌরব অক্ষুন্ন রাখার জন্য নিঃসন্দেহে সচেষ্ট। সদর ও গ্রামাঞ্চলে যুক্তফ্রন্টের কর্মীরা গতবারের তুলনায় অধিকতর শক্তিশালী সংগঠন গড়ে তুলতে চাইছেন। উদ্বাস্তু উপনিবেশগুলি এবং চাকদহ সদর তাদের শক্তির উৎস। এসব অঞ্চলে সৌম্যেন্দ্রনাথের প্রভাব অনেক কমে এসেছে। যুক্তফ্রন্টের প্রার্থী সুবল মণ্ডল স্থানীয় অধিবাসীদের অনেকেরই প্রিয়পাত্র, সময়োচিত নেতৃত্ব দেবার যোগ্যতা তাঁর আছে।

উপযুক্ত নেতৃত্ব, ঐক্যবদ্ধ প্রচেষ্টা এবং জনসমর্থন—নির্বাচনে জয়লাভের জন্য প্রয়োজনীয় এই তিনটি গুণ নিরপেক্ষভাবে বলতে গেলে ফ্রন্টেরই আছে। চাকদহের ক্ষেত্রে একথা অতি সত্য। তবুও সঠিক কিছু বলা যায় না। নির্বাচনের আগের রাত্রেই হয়ত বেশ কিছু ভোট কেনা-বেচা হয়ে যাবে। '৬২-র নির্বাচনে কংগ্রেস এই কেন্দ্রে পেয়েছিল প্রায় বাইশ হাজার ভোট, কম্যুনিস্ট দল প্রায় এগার হাজার, সৌম্যেন্দ্রনাথ প্রায় আট হাজার এবং জনৈক নির্দলীয় প্রার্থী প্রায় পনের হাজার। '৬৭-র নির্বাচনে বাংলা কংগ্রেস একুশ হাজার ভোট পেয়ে জয়লাভ করে। কংগ্রেস পায় প্রায় বারো হাজার, সৌম্যেন্দ্রনাথ চোদ্দ হাজার এবং নির্দলীয় সাত হাজার পাঁচশ'। '৬৯-এর এই নির্বাচনে সৌম্যেন্দ্রনাথ সম্ভবত বারো হাজারের অনেক কম ভোট পাবেন। কেন পাবেন তার কারণ উল্লিখিত হয়েছে। কংগ্রেসও খুব বেশি ভোট পাবে না বলেই মনে হয়। যোগেন্দ্রনাথ সরকার ও অন্যান্য যুবক কর্মীরা দলে থাকলে এ আশঙ্কার প্রশ্ন ছিল না। আই, এন, ডি, এফ চাকদহে কোন সাড়াই জাগাতে পারছে না। সুতরাং বাংলা কংগ্রেস যদি তার একুশ হাজার ভোট (যা সে '৬৭-র নির্বাচনে পেয়েছিল) এবারও নিয়ন্ত্রণ করতে পারে তবে সম্ভবত সেই জয়লাভ করবে।

পূর্ব রাণাঘাট

এই আসনটি নিয়েও নির্বাচনী লড়াই জমে উঠেছে। গতবার কংগ্রেস প্রার্থী ডাঃ বিনয় চ্যাটার্জী, সি, পি, এম-এর গৌর কুণ্ডুকে পরাজিত করে আসনটি লাভ করেন। তার আগে '৬২-র নির্বাচনে গৌর কুণ্ডুই জয়লাভ করেন। সুতরাং এই দুই প্রার্থী পরস্পর পরিচিত এবং পুরনো প্রতিদ্বন্দ্বীও বটে।

গত নির্বাচনে গৌর কুণ্ডুর পরাজয় কি কারণে ঘটেছিল, তা বলতে গিয়ে যুক্তফ্রন্টের কর্মীরা একটি অপ্রীতিকর ঘটনার উল্লেখ করেন। তাহেরপুর উপনিবেশ আনুলিয়া এবং চূর্ণী নদীর অপর পারের কয়েকটি গ্রামে নির্বাচনের আগের রাত্রে ভোট কেনা-বেচা হয়েছিল। ফ্রন্টের কর্মী এবং স্থানীয় অধিবাসীদের সকলেরই ধারণা ছিল যে, ঐ অঞ্চলগুলির ভোট গৌর কুণ্ডু পাবেন, কিন্তু ভোট গণনার পর দেখা গেল যে ঐ অঞ্চলের মানুষ গৌর কুণ্ডুকে এবং তার সঙ্গে ফ্রন্টকে নিরাশ করেছে। কিন্তু এবার অবস্থার পরিবর্তন ঘটেছে। পূর্ব রাণাঘাটের সরকারী কর্মচারী এবং শিক্ষকবৃন্দ সমবেতভাবে ফ্রন্টকেই সমর্থন করছেন। গত ১৮ই জানুয়ারী রাণাঘাটের এক জনসভায় ছাত্র ও সরকারী কর্মচারীরা প্রকাশ্যে ঘোষণা করেন যে, কংগ্রেসের অচলায়তন ভাঙার জন্য আসন্ন নির্বাচনে তাঁরা ফ্রন্টকেই সমর্থন করবেন। এই শিক্ষক ও সরকারী কর্মচারীরাই পূর্ব রাণাঘাটে ফ্রন্টের শক্তির উৎস। প্রতিপত্তিশালী কংগ্রেস প্রার্থী ডাঃ বিনয় চ্যাটার্জীর বিরুদ্ধে উপযুক্ত সংগঠন গড়ে তোলার দৃঢ় সঙ্কল্প তাঁরা নিয়েছেন। ফ্রন্টের অনুকূলে আরও একটি অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে। সর্বেশ্বর ঘটক—যিনি লোকদলের প্রার্থী, তিনি সম্ভবত বেশ কিছু কংগ্রেসী ভোট পাবেন, যদিও সরাসরি প্রতিদ্বন্দ্বিতা ফ্রন্ট আর কংগ্রেসের মধ্যেই হবে।

পশ্চিম রাণাঘাট

কংগ্রেসের এই শক্ত ঘাঁটিটি গত সাধারণ নির্বাচনে ফ্রন্ট দখল করেছে। বিজয়ী নিতাইপদ সরকার, সি, পি, আই-এর তরফ থেকে আবার মনোনীত হয়েছেন। এই অঞ্চলের কংগ্রেস প্রার্থী সুশান্ত বিশ্বাস। অন্যান্য দলের প্রার্থীরাও আছেন, যেমন, আই, এন, ডি এফ-এর কৃষ্ণকান্ত দাস এবং 'আমরা বাঙালী'-র শচীন্দ্রনাথ সরকার। কিন্তু এই ছোট দলগুলির তেমন কোনও

গুরুত্ব নেই এবং আশঙ্কা হচ্ছে যে এদের প্রার্থীরা জামানত হারাবেন। কাজেই বলা যেতে পারে যে, এই অঞ্চলে ফ্রন্ট আর কংগ্রেস সরাসরি প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নেমেছে। ফলাফল এখানেও অনিশ্চিত। এই অনিশ্চয়তা থাকত না, যদি মাহিষ্য ভোটগুলি সম্পর্কে কোনও সঠিক ধারণা করা যেত। এই কেন্দ্রে প্রায় দশ হাজার মাহিষ্য ভোট আছে এবং মাহিষ্যদের মধ্যে কংগ্রেসের প্রভাবও কিছু কম নয়; কিন্তু এই ভোট ভাঙার জন্য লোকদল মাহিষ্য প্রার্থী গৌরীশঙ্কর দাসকে মনোনীত করেছে। তাদের উদ্দেশ্য কম-বেশি সফল হবে, সন্দেহ নেই। স্থানীয় এক কুশ্চ চমৎকার মন্তব্য করেছেন। তিনি বলেছেন যে, "মাহিষ্যরাই মাথা ব্যথার কারণ, কাকে রাখবে, কাকে ফেলবে, কিছু বুঝছি না।"

পূর্ব কৃষ্ণনগর

দুই প্রাক্তন মন্ত্রীর বোঝাপড়া এই কেন্দ্রে হবে। সুতরাং নির্বাচনের হাওয়া এখানে বেশ গরম হয়ে উঠেছে। প্রবীণ কংগ্রেস নেতা ও প্রাক্তন মন্ত্রী স্মরজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছেন এস, এস, পি-র তরুণ নেতা ও প্রাক্তন মন্ত্রী কাশীকান্ত মৈত্র। আরও কয়েকজন প্রার্থী আছেন যেমন দিলীপ দত্ত—ইনি নির্দলীয়, গীতা ঘোষ—আই, এন, ডি, এফ। ধীরেশচন্দ্র বসু—"আমরা বাঙালী" এবং ধীরেন্দ্রনাথ বিশ্বাস (ইনিও নির্দলীয়)।

কাশীকান্ত মৈত্র এই কেন্দ্রে অতি পরিচিত। কৃষ্ণনগরের অধিবাসীদের কাছে তিনি কেবল পণ্ডিত লক্ষ্মীকান্ত মৈত্রের পুত্র হিসেবেই সুপরিচিত নন, তাঁর অন্য পরিচয়ও আছে। তিনি সুবক্তা, নেতৃত্বের যোগ্যতা তাঁর আছে, গত দুই নির্বাচনে তিনি জয়লাভ করেছেন। তাঁর সমর্থকরা আশা করে যে, তিনি এবারও সফল হবেন। কাশীকান্ত মৈত্রের অনুকূলে যে অবস্থাগুলি সৃষ্টি হয়েছে তা নিয়ে আলোচনা করা যাক। স্মরজিৎবাবু এই অঞ্চলে নবাগত। শুধু তাই নয়, এই অঞ্চলের প্রার্থী তিনি হতেও চান নি, কিন্তু তাঁকে তাঁর ইচ্ছেমত আসন বাছার অধিকার দেওয়া হয় নি। তাঁর কর্মীরা মনে করেন যে, ফজলুর রহমান ও অন্যান্য কয়েকজন কংগ্রেসী নেতা তাঁর রাজনৈতিক ভবিষ্যৎ নষ্ট করার জন্যই তাঁকে পূর্ব কৃষ্ণনগর কেন্দ্রে মনোনয়ন দিয়েছেন। স্মরজিৎবাবুকে জব্দ করার আরও একটি ব্যবস্থা করেছেন তাঁর বিরুদ্ধবাদীরা। শোনা যাচ্ছে যে, এবারের অন্যতম নির্দলীয় প্রার্থী দিলীপ দত্তের পেছনে নাকি স্মরজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায়-বিরোধী কংগ্রেসী নেতাদের প্রচ্ছন্ন সহযোগিতা আছে। গতবারের কংগ্রেস প্রার্থী অজিত হালদার বা নেপালবাবু নাকি দিলীপ দত্তকে সমর্থন করছেন। এছাড়া স্থানীয় ব্যবসায়ীদের একটা অংশও দত্তমশাইকে সহানুভূতি দেখাচ্ছেন। ফলাফল তাই খানিকটা আন্দাজ করা যাচ্ছে। স্মরজিৎবাবুর ভোটের একটা উল্লেখযোগ্য অংশ দিলীপ দত্ত পাবেন, যার দরুণ, কাশীকান্ত মৈত্র অনেকটা এগিয়ে থাকবেন। 'আমরা বাঙালী' বা আই, এন, ডি, এফ-এর কথা আর বলছি না, কেন না তারা তেমন কিছুই করতে পারবে না। পূর্ব কৃষ্ণনগরের গুরুত্ব কংগ্রেস বোঝে। তাই প্রধানমন্ত্রীর জনসভা কৃষ্ণনগরে ডাকা হয়েছিল। হাওয়া ঘুরে গেছে কি না তা জানি না, কেন না অল্প সময়ের মধ্যে কোনও সুচিন্তিত বক্তব্য রাখা কখনই সম্ভব নয়। একথাও সত্য যে, যারা এই জনসভায় গিয়েছিল, তাদের অনেকেই রাজনীতি নিয়ে মাথা ঘামায় না। তারা কৃষ্ণনগরে গিয়েছিল ভারতের মহিলা প্রধানমন্ত্রীকে দেখতে। তাদেরই একজন মন্তব্য করেছে, "দেখেছি, ফুরিয়ে গেছে। কাকে ভোট দেব, তা ভোটের দিন ভাবব।" তবে প্রধানমন্ত্রীর এই জনসভাকে কেন্দ্র করে এমন একটি ঘটনা ঘটে গেছে, যা তলিয়ে দেখলে শুধু গুরুত্বপূর্ণ নয়, নির্বুদ্ধিতার পরিচায়কও বটে। ১৮ই জানুয়ারী আমি নদীয়ার গ্রামাঞ্চলে গিয়েছিলুম। দেখেছিলুম জীপে চড়ে কংগ্রেস কর্মীরা ছুটছেন, বলছেন, "মাননীয় জনসাধারণ, মাত্র অর্ধেক ভাড়ার বিনিময়ে কৃষ্ণনগরে ভারতের প্রধানমন্ত্রীকে আজ আপনারা দেখতে পাবেন, এ সুযোগ হারাবেন না।" বহু লোক হুজুগে মেতে উঠেছিল খবরটা পেয়ে। অর্ধেক ভাড়ায় কৃষ্ণগর যাওয়া এবং তার সাথে প্রধানমন্ত্রীকে দেখে আসা, সুযোগটা কেউ হারাতে চাইল না। বাস বোঝাই হয়ে সবাই ছুটল। আমিও উঠলুম একটি বাসে। অতঃপর যখন কৃষ্ণনগর এল—হায়! তখন কি অবস্থা! মাত্র কিছুক্ষণ আগেও যারা "মহামান্য" উপাধি পেয়েছিলেন, স্বেচ্ছাসেবকরা ও পুলিশ "সাহেবরা" তাঁদের ছাতা, ধুতি, ধুতির কোঁচা ইত্যাদি হাতড়াতে শুরু করে দিলেন—যদি বোমা থাকে! দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখছিলুম আর ভাবছিলুম, "এটা কেমন হোল। যাঁদের একরকম ডেকে আনা হোল, তাদের খোঁয়াড়ে ঢুকিয়ে আপাদমস্তক হাতড়ে বেড়ানোকি অভদ্রতা নয়?"

পশ্চিম কৃষ্ণনগর

এই কেন্দ্রটিও গত সাধারণ নির্বাচনে কংগ্রেস হারিয়েছে। সি, পি, এম-এর বিজয়ী প্রার্থী অমৃতেন্দু মুখোপাধ্যায়ের বিরোধিতা করছেন কংগ্রেস প্রার্থী চণ্ডীপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়। এই আসনটি ফিরে পাওয়ার জন্য কংগ্রেসকর্মীরা অক্লান্ত পরিশ্রম করছেন। "মুখুলিয়া ক্যাম্প", যা ফ্রন্টের একটি সুদৃঢ় ঘাঁটি, সেখানেও কংগ্রেস অন্যান্যবার অপেক্ষা অনেক বেশি মনোযোগ দিয়ে কাজ করছে। "আমরা বাঙালী" এবং মুসলিম লীগের প্রার্থীও আছেন এই কেন্দ্রে, কিন্তু প্রতিদ্বন্দ্বিতা মূলত কংগ্রেস আর ফ্রন্টের মধ্যেই সীমিত থাকবে। পূর্ব-কৃষ্ণনগরের তুলনায় এই কেন্দ্রের ফলাফল একটু বেশি অনিশ্চিত। বেশ কিছু মুসলিম ভোট আছে—যা ফ্রন্ট এতদিন নিয়ন্ত্রণ করছিল, কিন্তু মুসলিম লীগের প্রার্থী থাকায় ভোটগুলি নিঃসন্দেহে ভাগ হয়ে যাবে। বলা যেতে পারে যে, ফ্রন্টের পক্ষে অবস্থাটা সুবিধের নয়।

করিমপুর

আমার মতে নদীয়ার আসল ভোটযুদ্ধটি এই কেন্দ্রেই হবে। নলিনাক্ষ সান্যাল, যিনি দলবদলে অভিযোগ, শঙ্করদাস বন্দ্যোপাধ্যায় এবং সমরেন্দ্র সান্যাল—এই তিনজন হলেন করিমপুরের প্রধান প্রার্থী। নলিনাক্ষ সান্যাল বাংলা কংগ্রেস ছেড়ে কংগ্রেসে ঢুকেছেন, শঙ্করদাস বন্দ্যোপাধ্যায় নির্দলীয় আর সমরেন্দ্র সান্যাল সি, পি, এম-এর প্রতিনিধি। নলিনাক্ষবাবু স্থানীয় অধিবাসীদের মনে কোনও গভীর দাগ কেটেছেন বলে মনে হয় না। প্রচুর অর্থ ব্যয় হচ্ছে কিন্তু সবাই জানে যে, তিনি দলত্যাগী। যুক্তফ্রন্ট সরকারের পতন ঘটিয়ে তিনি পি, ডি, এফ-এ যোগ দিয়েছিলেন, এখন সুবিধে বুঝে কংগ্রেসে এসেছেন, পরে কি করবেন তা তিনিই একমাত্র জানেন। অর্থাৎ দলত্যাগের ইতিহাস ঘাঁটলে মোগলাই আমির-ওমরাহদের সাথে তাঁর মিল খুঁজে পাওয়া যাবে। শঙ্করদাস বন্দ্যোপাধ্যায় নলিনাক্ষ সান্যালের তুলনায় অনেক বেশি জনপ্রিয়। স্থানীয় কংগ্রেসী নেতা হিসেবে তাঁর খ্যাতিও যথেষ্ট। করিমপুরের মানুষ যেমন সচেতন, তাতে মনে হয় বাংলা কংগ্রেস কেন, কংগ্রেসের ভোটও নলিনাক্ষ পাবেন না। তাঁর বরাদ্দে ভাগ বসাবেন শঙ্করদাসবাবু। বাকী রইলেন সমরেন্দ্র সান্যাল। আশা করা যাচ্ছে যে, বামপন্থী, বিশেষ করে বাংলা কংগ্রেসের সমর্থকদের বেশ কিছু ভোট তিনি পাবেন। গতবার নলিনাক্ষ সান্যাল বাংলা কংগ্রেসের প্রার্থী ছিলেন এবং তিনি প্রায় তেইশ হাজার ভোটের ব্যবধানে কংগ্রেসের স্মরজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায়কে পরাজিত করেন। কংগ্রেসীদের ভোটগুলি যদি এবার শঙ্করদাস বন্দ্যোপাধ্যায় ও নলিনাক্ষ সান্যালের মধ্যে ভাগ হয়ে যায়, তাহলে বামপন্থী ভোটের জোরে সমরেন্দ্রবাবু

জয়ী হতে পারেন। কিন্তু করিমপুরের নির্বাচনী হাওয়া ভয়ানক অশান্ত। শঙ্করদাসবাবু যদি কংগ্রেসী ভোটের সাথে বাংলা কংগ্রেসের ভোট বেশ কিছু পান, তবে তাঁরই জয় হবে। মোটের ওপর বলা যেতে পারে যে, "ব্যালট বাক্স খোলার আগে করিমপুর সম্পর্কে কিছু বলা ঠিক হবে না।"

কালীগঞ্জ

কালীগঞ্জ ফজলুর রহমানের সাজানো বাগান। তবুও গত সাধারণ নির্বাচনে এই আসনটি তাঁর হাতছাড়া হয়ে যাচ্ছিল। এবার সমস্ত শক্তি দিয়ে কংগ্রেস এখানে লড়ছে। ফজলুর রহমানের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছেন তাঁরই আত্মীয় ডাঃ রফিউদ্দীন মণ্ডল, বাংলা কংগ্রেসের প্রার্থী। ফজলুর রহমানের প্রধান ভরসা তাঁর কর্মীরা। হিন্দু, মুসলমান নির্বিশেষে অনেককেই প্রাইমারী স্কুলের চাকরি পেয়েছেন। শিক্ষকরাই তাঁর আসল "প্রচার-মাইক"। কালীগঞ্জের অবাঙালী ঘণিক সম্প্রদায়ও তাঁর পক্ষে। গতবারের কথা কিছু বলছি, কেন না গতবারের ঘটনা আগামী নির্বাচনের পূর্বাভাষ দেবে। প্রথমেই বলেছি যে, গতবার ফজলুর রহমান তাঁর আসনটি অতি কষ্টে বজায় রেখেছেন, ফ্রন্টের প্রার্থী রমেন মুখোপাধ্যায় যে কেবল হিন্দু ভোটই পেয়েছিলেন তা নয়, মুসলমানদের অনেকেই তাঁকে সমর্থন করেছিলেন। ভোট গণনার প্রথম দিকে তিনিই এগিয়ে ছিলেন এবং সবাই ভেবেছিল যে, তাঁর জয় অনিবার্য। কিন্তু মাটিয়ারীর ভোট গণনার সময় দেখা গেল যে, রমেন মুখোপাধ্যায় যাদের ওপর নির্ভর করতেন, যাদের বিশ্বাস করতেন, সেই নমঃশূদ্র ও উদ্বাস্তুরা শেষ মুহূর্তে বিগড়ে গিয়ে প্রায় সবাই ফজলুর রহমানকেই ভোট দিয়েছে। মাটিয়ারীর ভোট-ই কালীগঞ্জের ভবিষ্যৎ নির্ধারণ করল।

হরিণঘাটা

এই কেন্দ্রের গতবারের বিজয়ী প্রার্থী জনাব করিম বক্স এবার ফ্রন্টের সমর্থন পেয়েছেন। তাঁর নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী হলেন কংগ্রেস নেতা নরেন সরকার। অন্যান্য দলের প্রার্থীরাও আছেন। যেমন লোকদলের মোহিত কুণ্ডু, আর সি পি আই-এর মনোহর রায়। তবে এঁরা তেমন শক্তিশালী নন এবং প্রতিদ্বন্দ্বিতা প্রকৃতপক্ষে করিম বক্স ও নরেন সরকারের মধ্যেই হবে। কিন্তু এই কেন্দ্রে কংগ্রেসের সংগঠন কয়েকটি কারণে দুর্বল হয়ে পড়েছে। প্রথমত নরেন সরকার কৃষ্ণনগরের অধিবাসী, স্থানীয় কংগ্রেস-কর্মীরা তাই তাঁর সঙ্গে হাত মিলিয়ে কাজ করতে খুব আগ্রহী নন। তা' ছাড়া যে সমবায় সমিতিগুলির মাধ্যমে নরেনবাবুর হরিণঘাটায় প্রভাব ছিল সেগুলির অধিকাংশই নাকি তাঁর প্রভাব-পরিধির বাইরে চলে এসেছে। পক্ষান্তরে, এই অঞ্চলে ফ্রন্ট কোনও অন্তর্দ্বন্দ্বে ভুগছে না এবং তার সংগঠনও বেশ সুশৃঙ্খল ও নির্ভরযোগ্য। সবকিছু বিচার করে দেখলে জনাব বক্সের জয়ের সম্ভাবনাই বেশি মনে হয়। কিন্তু "মাটিয়ারী"র ঘটনা চোখের সামনে ভাসছে, এখানেও যদি একই ঘটনা ঘটে, তাহলে?

শান্তিপুর

করিমপুর ও শান্তিপুরের নির্বাচনী লড়াই-এর প্রকৃতি প্রায় এক। এখানেও ত্রয়ীর প্রতিদ্বন্দ্বিতা হচ্ছে। কংগ্রেসের পক্ষে দাঁড়িয়েছেন হরিদাস দে, ফ্রন্টের পক্ষে মকশেদ আলী। গতবারের বিজয়ী কানাই পাল এবার ফ্রন্টের সমর্থন পান নি, তিনি তাই নির্দলীয় প্রার্থী। ফ্রন্টের স্থানীয় নেতাদের সঙ্গে মনোমালিন্য হওয়ায় দরুণ তাঁরা কানাই পালকে মনোনীত করেন নি, মনোনীত করেছেন মকশেদ আলীকে। এটাও এক ধরণের আন্তর্দ্বন্দ্ব এবং এই অন্তর্দ্বন্দ্বের জন্যই এই মূল্যবান আসনটি ফ্রন্টের হাতছাড়া হয়ে যেতে পারে। কেন না কানাই পাল যে কেবল শান্তিপুরের তাঁতী সম্প্রদায়ের ভোট পেতেন তাই নয়, মুসলিম ভোটের শকরা ৪০ ভাগও তিনি এতদিন পর্যন্ত নিয়ন্ত্রণ করছিলেন; কিন্তু মকশেদ আলীর আসরে নামার পর বহু মুসলমান এখন নতুন করে ভাবছেন, তাঁরা কোন্ দিকে যাবেন বা কাকে সমর্থন করবেন। কানাই পাল ও মকশেদ আলী ভোট ভাগ করে নিলে সুবিধে হবে হরিদাস দে'র। করিমপুরের রমেন্দ্রনাথ সান্যাল এবং শান্তিপুরের হরিদাস দে, উভয়ের অবস্থা প্রায় এক।

তেহট্ট

গত সাধারণ নির্বাচনে শঙ্করদাস বন্দ্যোপাধ্যায় (এখন এবার করিমপুর কেন্দ্রের নির্দলীয় প্রার্থী), এই আসনটি কংগ্রেসের পক্ষ থেকে জয় করেন। সি পি এম-এর মাধবেন্দ্র মোহান্ত মাত্র কয়েক শ' ভোটের ব্যবধানে পরাজিত হন। এবারও মাধবেন্দ্র ফ্রন্টের প্রার্থী। কংগ্রেসের পক্ষ থেকে দাঁড়িয়েছেন প্রবীণ কর্মী সুরত আলী খাঁ। 'আমরা বাঙালী' দলের প্রশান্ত বিশ্বাসও দাঁড়িয়েছেন। কিন্তু মূল প্রতিদ্বন্দ্বিতা ফ্রন্ট এবং কংগ্রেসের মধ্যেই হবে। আদিবাসী ও নমঃশূদ্র ভোটগুলি কংগ্রেস কিছু পাবে। তবে মুসলিম ভোটগুলি কোন্ দিকে যাবে, তা' ঠিক বোঝা যাচ্ছে না। নাজিরপুর, বেতাই, ফজিলনগর ইত্যাদি মুসলমান প্রধান গ্রামে সি পি এম-এর সংগঠন বরাবরই শক্তিশালী। কিন্তু এবার মুসলিম লীগের এক প্রার্থী উপস্থিত থাকায় কিছু মুসলিম ভোট সি পি এম প্রার্থী হারাতে পারেন। মাহিষ্য ভোটগুলির অধিকাংশই প্রশান্ত বিশ্বাস পাবেন মনে হচ্ছে। তা' হলে ফলাফল কি হবে? আদিবাসী, নমঃশূদ্র এবং মুসলিম ভোটের অধিকাংশ এবং তার সঙ্গে কিছু মাহিষ্য ভোট যিনি পাবেন তিনিই জয়ী হবেন।

চাপড়া

কংগ্রেস যদি চাপড়ায় ব্যর্থ হয় তবে তার জন্য আভ্যন্তরীণ অনৈক্যই হবে দায়ী। কংগ্রেসের প্রার্থী শিবশঙ্কর ব্যানার্জী কালিগঞ্জ থানার মাটিয়ারীর অধিবাসী। মনে রাখতে হবে যে, এই মাটিয়ারীই বিস্ময়করভাবে ফজলুর রহমান ও রমেন মুখোপাধ্যায়ের ভাগ্য নির্ধারণ করেছিল গত নির্বাচনে। স্থানীয় নেতাদের মনোনীত না করে অন্য থানার প্রার্থীকে মনোনয়ন দেওয়ায় চাকদহের মত এই অঞ্চলের কংগ্রেসকর্মীরাও অত্যন্ত ক্ষুব্ধ এবং যে নিষ্ঠা ও একাগ্রতার পরিচয় তাঁরা অন্যান্য বার দিয়েছিলেন, এবার তা' অনুপস্থিত। অর্থাৎ চাপড়ায় কংগ্রেসের সংগঠন দলীয় অনৈক্যের দরুণ দুর্বল হয়ে পড়েছে। ফ্রন্টের প্রার্থী সলিলবিহারী মণ্ডলের অবস্থা শিবশঙ্কর মুখোপাধ্যায়ের তুলনায় অনেক ভাল বলা যেতে পারে। তিনি চাপড়া হাই স্কুলের প্রধান শিক্ষক এবং সহকর্মী ও ছাত্রদের বিশেষ প্রিয়। শিক্ষিতদের ভোটের একটা বড় অংশ তিনি নিশ্চয়ই পাবেন। তা' ছাড়া খৃস্টান ভোটগুলির অধিকাংশই তিনি পাবেন। কেন না তিনি নিজেও খৃস্টধর্মাবলম্বী। এই কেন্দ্রে মুসলিম লীগও প্রার্থী মনোনীত করেছে। কিন্তু তাদের তেমন কোন ভূমিকাই নেই। সরাসরি প্রতিদ্বন্দ্বিতা হচ্ছে কংগ্রেস ও ফ্রন্টের মধ্যে এবং এখনও অবস্থা ফ্রন্টেরই অনুকূলে আছে বলা যেতে পারে।

নাকাশিপাড়া, নবদ্বীপ এবং হাঁসখালি কেন্দ্রেও তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতা হবে। শেষ পর্যন্ত এ জেলায় কোন দল সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করবে তা' এক্ষুণি বলা যাচ্ছে না *

---

* যে সব তথ্য তুলে ধরা হোল, তার সন্ধান নদীয়ার কয়েকজন বিশিষ্ট রাজনীতিজ্ঞ দিয়েছেন।

আসন্ন মধ্যবর্তী নির্বাচন ও তার পরিপ্রেক্ষিত

সাগর বিশ্বাস

বিগত ১৯৬৭ সালের সাধারণ নির্বাচনে পশ্চিমবাংলায় তিনটি জেলা বিশেষভাবে কংগ্রেসের পরাজয়ে একটি উল্লেখযোগ্য স্থান লাভ করেছিলো। সেই জেলা তিনটি হলো ২৪ পরগনা, মেদিনীপুর ও নদীয়া। এবারের মধ্যবর্তী নির্বাচনেও পর্যবেক্ষকদের বিশ্বাস, এই জেলাগুলিই প্রকৃতপক্ষে পশ্চিমবাংলার ভাগ্য নির্ধারণ করবে। কস্তুত চব্বিশ পরগনা (কলকাতা সহ) ও মেদিনীপুরের ইতিহাস সংগ্রামেরই ইতিহাস। গত নির্বাচনে সেই সংগ্রামেরই অভিব্যক্তি প্রকাশ পেয়েছিলো নির্বাচনের রায়ের মাধ্যমে। কিন্তু সারা পশ্চিমবাংলার মানুষের সেই রায় কেন্দ্রীয় সরকারের হস্তক্ষেপের ফলে অগ্রাহ্য শুধু নয়, অবমানিত হলো লোচনীয়ভাবে। সেই অঘটনেরই ফলশ্রুতি আগামী মধ্যবর্তী নির্বাচন। নির্বাচন শুধু নয়, নয় শুধু মর্যাদার লড়াই, সারা পশ্চিমবাংলার মানুষের এ এক অগ্নি-পরীক্ষা বলা যেতে পারে। অগ্নিপরীক্ষা বিশেষ করে চব্বিশ পরগনা, মেদিনীপুর ও নদীয়া জেলার। গত ১৬ই জানুয়ারীর বিশেষ নির্বাচনী সংখ্যা সাপ্তাহিক কসুমতীতে এ সম্পর্কে বিভিন্ন রচনায় যথেষ্ট আলোচনা করা হয়েছে। বিশেষ নির্বাচনী সংখ্যায় ২৪ পরগনা জেলার বারাসাত এবং বনগাঁ মহকুমার নির্বাচনী আবহাওয়ার পর্যালোচনা করতে গিয়ে দুটি কেন্দ্র বাকী রেখেছিলাম। বর্তমান সংখ্যায় সেই দুটি কেন্দ্র পর্যালোচনা প্রসঙ্গে বনগাঁ ও বাগদা সম্পর্কে কিছু বিস্তৃত আলোচনা রইলো। আগামী সংখ্যার আলোচ্য অঞ্চল হবে বসিরহাট মহকুমা।

অশোকনগর

বিশেষ নির্বাচনী সংখ্যায় বলেছিলাম হাবড়া কেন্দ্রে অশোকনগরের প্রভাব পড়বেই বলে অনেকের বিশ্বাস। অশোকনগরের সেই প্রভাবটা কি? স্থানীয় পত্রিকা 'নয়া দুনিয়া'র কথায় বলতে গেলে "এ অঞ্চলের ঐতিহ্যের ছবি আঁকতে হলে তা আঁকতে হয় কমিউনিস্ট পার্টির পতাকার রঙ দিয়ে। এ নির্বাচন কেন্দ্রের ইতিহাস রাজনৈতিক অর্থনৈতিক এবং গণতান্ত্রিক আন্দোলনের ইতিহাস। স্বাধীনতাপূর্বকালে যখন অশোকনগর কেন্দ্র বলে কিছু ছিলো না—মানচিত্রে ছিলো না অশোকনগর নাম, সেদিনও এই অঞ্চলে কৃষক আন্দোলন ছিলো—স্বাধীনতার পরে সে আন্দোলন আরো সংগঠিত হয়েছিলো।"

অশোকনগর-কল্যাণগড় সহ মোট ১১টি অঞ্চল নিয়ে অশোকনগর কেন্দ্র গঠিত। ভোটারের সংখ্যা ৭৫০৭৮ (কংগ্রেস ভবন থেকে প্রাপ্ত সংখ্যা ৮৪,৭৯২)। এর মধ্যে স্ত্রী-পুরুষের অনুপাত শতকরা ৪৮/৫২। এবং মুসলিম ভোটারের সংখ্যা ১৬,১৬৮ (কংগ্রেস ভবন মতে ২৩,৩০৩) জন। প্রার্থী সংখ্যা চার: (১) শ্রীকান্তি-রঞ্জন চ্যাটার্জি (কং), (২) ডাঃ সাধনকুমার সেন (যুক্তফ্রন্ট), (৩) শ্রীপরিতোষ সরকার (জাতীয় দল) এবং (৪) আবদুর রশীদ (প্রগ্রেসিভ মুসলিম লীগ)। ১৯৬৭-র নির্বাচনে প্রার্থী ছিলেন পাঁচজন। বামপন্থী দলগুলির সার্বিক ঐক্য না হওয়ায় কমিউনিস্ট প্রার্থী ছিলেন দুইজন—কমিউনিস্ট পার্টির ডাঃ সাধন সেন এবং বাম কমিউনিস্ট পার্টির শ্রীনিমাই বিশ্বাস। কংগ্রেস প্রার্থী শ্রীকান্তি চ্যাটার্জি ছাড়া একজন পি এস পি এবং একজন নির্দলীয় প্রার্থী ছিলেন। গত নির্বাচনের ফলাফল ছিলো এইরকম: কংগ্রেস ১৬,৭৮২, কমিউনিস্ট ১৭,৮৭৭, বাম কমিউনিস্ট ১৫,১২১, পি এস পি ২,১০৫ এবং নির্দলীয় প্রার্থী ৬২৪ ভোট।

কংগ্রেস মহল থেকে যদিও উচ্চাশার অসদ্ভাব নেই তথাপি অশোকনগর কেন্দ্রে সংগ্রামের রূপ অন্য রকম। কংগ্রেসের ধারণা—জাতীয় দল, প্রগ্রেসিভ মুসলিম লীগ এবং যুক্তফ্রন্টের টাগ অব ওয়ারের সুযোগে কংগ্রেস প্রার্থী জয়লাভ করবেন। কিন্তু সূক্ষ্ম দৃষ্টিকোণ থেকে দেখলে একে দুর্বল সমীক্ষাই বলতে হবে। কারণ জাতীয় দল এখানে তেমন প্রভাব বিস্তার করতে পারে নি। আর কংগ্রেসের ভুলে গেলে চলবে না প্রগ্রেসিভ মুসলিম লীগ ক্ষতি শুধু যুক্তফ্রন্টের করবে না—বরং অপেক্ষাকৃত বেশি ক্ষতি করবে কংগ্রেসেরই। সবচেয়ে যেটা গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন মনে রাখা দরকার তা হলো, গত নির্বাচনের অবস্থা এবারে নেই। প্রয়োজন এবং কর্মসূচী-ভিত্তিক মোর্চা গঠিত হবার ফলে এবার যুক্তফ্রন্ট প্রার্থী একজন এবং তিনি গত নির্বাচনেরই বিজয়ী প্রার্থী। কাজেই গত নির্বাচনের শুধুমাত্র দুই কমিউনিস্ট প্রার্থীর ভোট একত্রিত হলেই তাঁর পরিমাণ দাঁড়ায় তেত্রিশ হাজার, কংগ্রেসের প্রাপ্ত ভোটের দ্বিগুণ। বিভিন্ন রাজনৈতিক প্রভাবে কিছু ওলটপালট যে হবে না তা নয়—কারণ ভোটের ব্যাপারে ওলট পালট কমবেশি সর্বত্র সবসময়ই হয়। কিন্তু ক্ষতিগ্রস্ত করবে কেন? তুল্যভাবে তা কংগ্রেসকেও ক্ষতিগ্রস্ত করবে। উদাহরণ-স্বরূপ গুমা অঞ্চলের কথা ধরা যাক। অঞ্চলটি মুসলমানপ্রধান। গত নির্বাচনে ভোটের পরিমাণ ছিল কংগ্রেস ১,৪৩৫, কমিউনিস্ট ১,৭৬৪, বাম কমিউনিস্ট ১,৫০২, পি এস পি ৬৯ ভোট। এবারে কমিউনিস্ট ভোট একত্রিত করলে তার পরিমাণ দাঁড়ায় ৩,২৬৬। কিন্তু প্রগ্রেসিভ মুসলিম লীগ প্রার্থী নিছক কিছু মানুষের ফ্যানাটিক মনোভাবের জন্য হলেও কিছু ভোট পাবেন। কাজেই যুক্তফ্রন্টের ভোট কিছু কমবে। জাহাঙ্গীর কবিরের জাতীয় দল কিছু ভাঙলেও তার পরিমাণ হবে খুব কম। এঁরা শুধুমাত্র ফ্রন্ট প্রার্থীর ভোট ভাঙবেন তা নয়—সঙ্গে কংগ্রেস প্রার্থীরও ভাঙবেন। এই ভাঙাভাঙি যতই হোক না কেন, কংগ্রেসের ১,৪৩৫ এবং কমিউনিস্টদের ৩,২৬৬ ভোটের ব্যবধান নিশ্চয়ই বিলুপ্ত হতে পারে না। অবশ্য জনসাধারণ পুরোপুরি কমিউনিস্ট তথা যুক্তফ্রন্ট-বিরোধী হয়ে পড়লে সে কথা আলাদা। সেক্ষেত্রে কংগ্রেস যেটা বলতে চায় 'one sided play'—তা হতে কোনো বাধা থাকে না। কিন্তু কংগ্রেস যেটা প্রথমদিকে ভেবেছিলো যে, দুই কমিউনিস্ট দল বন্ধুত্বপূর্ণভাবে নির্বাচনী প্রচারে নামতে পারবে না, ফলে যুক্তফ্রন্টের বিযুক্তির প্রচারটা এই কেন্দ্রে তীব্রতর করা যাবে; সেদিক থেকেও কংগ্রেসের তেমন সুবিধা হয় নি। 'নয়া দুনিয়া'র সম্পাদক লিখছেন, "বিগত ২৯শে ডিসেম্বর অশোকনগরের বুকে যুক্তফ্রন্টের যে বিশাল ও বলিষ্ঠ মিছিল আত্মপ্রকাশ করিয়াছিলো সেই স্মরণীয় মিছিলের যুক্ত-ফ্রন্ট শরিক পার্টিগুলির পায়ে পায়ে চলার পদধ্বনি আজ গ্রাম হইতে গ্রামান্তরে ছড়াইয়া পড়িয়াছে। গ্রাম ও শহর যুক্ত নির্বাচনী অভিযানের এক নূতন জোয়ার সৃষ্টি করিয়াছে।"

কংগ্রেস শিবির অবশ্য মনে করেন, শহরাঞ্চলে তাঁদের অবস্থা কিছুটা খারাপ হলেও গ্রামে তাঁদের প্রভাব অনেক বেশি। গ্রামের মানুষ যুক্তফ্রন্টের অপশাসন আর চান না। তাঁরা স্থায়িত্ব চান। আর এই

স্থায়িত্ব কেবল কংগ্রেসই দিতে পারে অবশ্য একথা সত্য যে, স্থায়িত্ব কংগ্রেস দিতে পারে একথা ১৯৬৭-র নির্বাচনের ফলাফলের দিকে তাকিয়ে নিশ্চয়ই বলা যায় না। আর গত নির্বাচনে এই কেন্দ্রের গ্রামাঞ্চলেও কংগ্রেসের বিপর্যয় হয়েছে। এগারোটি অঞ্চলের গোটা তিনেক অঞ্চল ছাড়া বাকী সমস্ত অঞ্চলেই কংগ্রেসের অবস্থা খারাপ। স্বয়ং কংগ্রেস প্রার্থীর নিজের এলাকাতেই ভোটের চিত্র এই রকম —কংগ্রেস ১,৮০৮, কমিউনিস্ট ২,৮৩৬, বাম কমিউনিস্ট ১,০৩৪।

একটা কথা বোধ হয় সত্য যে, কংগ্রেসের বড় শক্তি ধনী এবং জোতদার এই কেন্দ্রে নেই বললেই চলে। ভোটারদের অধিকাংশই উদ্বাস্তু শ্রমিক, কৃষক, শিক্ষক, কর্মচারী এবং ছোট ব্যবসায়ী। চারদিক থেকে মারখাওয়া এবং অভাবে-অনটনে শোষণে-ত্রাসনে জর্জরিত মানুষেরাই এখানকার পনেরো আনা। এ সব ক্ষেত্রে কংগ্রেসের (যা ধনিকশ্রেণীর সংগঠনে পরিণত) বিপর্যয় অস্বাভাবিক বা অসম্ভব তো নয়ই, বরং খুবই স্বাভাবিক। হয়তো এর জন্য দায়ী কেবলমাত্র স্বাধীনতোত্তর ভারতবর্ষের কংগ্রেস সংগঠনের একদেশদর্শী মনোবৃত্তি। আজ সারা ভারত জুড়ে কংগ্রেসের তারই খেসারত দেবার পর্ব চলছে। যদিও নির্বাচন এমন একটা জিনিষ—বিশেষ করে ভারতবর্ষের মতো অনগ্রসর দেশে—যা যে-কোন সমীক্ষাকেই মিথ্যে প্রমাণিত করতে পারে, তথাপি উপরোক্ত বাস্তব পরিপ্রেক্ষিতে অশোকনগর কেন্দ্রে কংগ্রেস প্রার্থীর জয়লাভের কল্পনা করতে গেলে সম্ভবত সেটা কষ্টকল্পনা হবে। ফলাফল যা-ই হোক, এ-কথা সত্য কংগ্রেস তার ক্ষেত্র হারিয়ে ফেলছে। 'নয়া দুনিয়া'র মতে—"...কংগ্রেস জানে না যে রাজনীতিতে দেউলে থাকলে জনসাধারণের ভোট পাওয়া যায় না। এ কেন্দ্রের মানুষের রাজনৈতিক চাহিদা মিটিয়ে এসেছে দিনের পর দিন কমিউনিস্ট পার্টি। জনসাধারণের দুঃখ দৈন্য ক্ষুধার আর স্বৈরাচারের বিরুদ্ধে প্রতিদিনের সংগ্রামে নেতৃত্ব দিয়েছে—কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে থেকেছে কমিউনিস্ট পার্টি। তাই গত সাধারণ নির্বাচনে কমিউনিস্ট প্রার্থীর জয় কোন আকস্মিক ঘটনা নয়, এ নিরবিচ্ছিন্নভাবে গণ-আন্দোলনের ফলশ্রুতি। জনগণের রাজনৈতিক শিক্ষার মানোন্নয়নের ফলে সুচিন্তিত রায়।"।

রাজারহাট

ঘটনাটি ঘটলো ট্রেনের মধ্যে। তিনটি যুবক গাড়ির মধ্যে উঠে বসার জায়গা না পেয়ে একটি কোণ ঘেঁসে দাঁড়ালো। একজনের হাতে একটি কাগজের মোড়ক ছিল—অনেকটা ক্যালেন্ডারের মতো রোল করে পাকানো। হঠাৎ মোড়কটি খুলে সে দুখানি ছাপানো কাগজ বাকী দুজনের চোখের উপর মেলে ধরে বললো—এই নে, দেখ, panic সৃষ্টি করা কাকে বলে। আমরা দেখলাম—দুখানি পোস্টার। তার একটিতে লেখা : "রাশিয়ার প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় পঞ্চাশ লক্ষ কৃষক হত্যা। কম্যুনিস্ট চীনের প্রথম পরিকল্পনায় দুই কোটি কৃষক হত্যা। ১৯৬৭ যুক্তফ্রন্ট সরকারের শ্রমবিপ্লবে দেড় লক্ষ মেহনতী মানুষ বেকার। ১৯৬৯ যুক্ত-যুক্তফ্রন্ট নূতন কৃষিবিপ্লব ? বাংলার কৃষক সাবধান।" আর একটিতে লেখা : "রাশিয়ার তিনজন মন্ত্রীকে হত্যা করলো কে ? গণতন্ত্রে বিশ্বাসী সাধারণ মানুষদের চেকোশ্লোভাকিয়ার পথে পথে হত্যা করলো কারা? ঐ কম্যুনিস্ট রাশিয়ার সরকারী ফৌজ। কম্যুনিস্ট তাঁবেদার যুক্তফ্রন্ট থেকে দূরে থাকুন। ওরা ক্ষমতায় এলে ভারতের গণতন্ত্রকে হত্যা করবে।" দুটি পোস্টারের তলায়ই—'প্রচার বিভাগ —লোকদল' কথা কটি লেখা ছিলো। অতঃপর ওদের মধ্যে রাজনৈতিক বিতর্ক শুরু হতে দেরি হলো না। কিন্তু আমাদের স্টেশন এসে পড়ায় উঠে পড়তে হলো। উঠতে উঠতে শুনছিলাম—ছেলেটি বলে চলেছে—চেকোশ্লোভাকিয়ায় মন্ত্রী আর সাধারণ মানুষকে হত্যা করা হয়েছে —সে বুঝি তোর ঘোষ মশাই আর কবির সাহেব দেখে এসেছেন? গণতন্ত্র? গণতন্ত্রের বড়াই আর করিসনে। ও বস্তু আর যেখানে থাক—এ দেশে নেই। তা যদি থাকতো তাহলে আর '৬৭ সালে অমন করে কংগ্রেসের কপাল পুড়তো না। নামতে নামতেও ছেলেটির উত্তেজিত কণ্ঠ শুনতে পাচ্ছিলাম—শোন শোন চীন রাশিয়ার গায়ে কাদা ছুঁড়ে লাভ কী? ওদের গায়ে অন্ধভাবে কাদা ছোঁড়ার অর্থ ওদের সম্পর্কে হয় অজ্ঞতা না হয় বিদ্বেষ। আর বেকারত্বের কথা! কিন্তু আর শুনতে পেলাম না—আমাদের নামতে হলো। এমন ঘটনার সঙ্গে পথে-ঘাটে হামেশাই পরিচয় হচ্ছে—এমন কিছু নতুন ঘটনা নয়। ভাবতে ভাবতে আসছিলাম— সত্যি অপূর্ব কায়দা বিজ্ঞাপনের। মানুষের sentiment-এর উপরে কত সহজে আঘাত করা যায় এ-ভাবে। বেকারত্ব সম্পর্কে ছেলেটির জবাব শুনতে পাই নি বটে, তবে আমার মনে ভেসে উঠলো রাষ্ট্রপতির আমলের বাংলাদেশের বেকারত্বের গ্লানিময় রেকর্ডের কথা। ইঞ্জিনিয়ারিং শিল্পে ১ লক্ষ ২০ হাজার, পাট শিল্পে পঞ্চাশ হাজার, রবার শিল্পে ৩০ হাজার—আরো নানা শিল্প সমেত লক্ষ লক্ষ বেকারের দেশ বাংলার কথাও একবার চকিতে মনে পড়লো। অথচ রাজস্থানের বেকার সমস্যার সমাধান হয় এই বাংলাতেই। তবু ওই সস্তা ও ভীতিকর প্রচারও যে লোকদলকে মানুষের কাছে টেনে আনতে পারে—রাজারহাট কেন্দ্রের বাগজোলা অঞ্চলে গেলে তা মনে হয়। উদ্বাস্তু জীবনে লোকদল বেশ খানিকটা প্রভাব বিস্তার করেছে। অবশ্য একথা সত্য, জয়লাভ করবার মতো ক্ষমতা লোকদল অর্জন করতে পারে নি। পারে নি রিপাবলিকান দলও। আর নির্দলীয় প্রার্থীর তো কোনো প্রচারই নেই বলা চলে। অতএব রাজারহাট কেন্দ্রেও সংগ্রাম যুক্তফ্রন্ট বনাম কংগ্রেস। প্রায় আশী হাজার ভোটারের এই কেন্দ্র ১১টি অঞ্চল নিয়ে গঠিত। কংগ্রেসেরই আসন এটা বরাবর ছিলো। কিন্তু গত '৬৭ সালের নির্বাচনেই কংগ্রেসকে সর্বপ্রথম এই আসনটি হারাতে হলো ত্রিকোণ যুদ্ধের মাধ্যমে। কংগ্রেসের সেই হৃতসম্মান পুনরুদ্ধারকল্পে তাই মধ্যবর্তী নির্বাচনে চেষ্টার অন্ত নেই। মধ্যমগ্রাম আফজলপুরের মুসলমান সংখ্যাগরিষ্ঠ অঞ্চলে কংগ্রেসের ক্ষেত্র কিছুটা উন্নততর মনে হয়। শেখ ফকীর আলীর মুখে শুনেছি কোনো রাজনৈতিক প্রশ্ন নয় —সাধারণ নিম্ন ও মধ্যবিত্ত মানুষের সামনে একটি প্রশ্নই বড় হয়ে উঠেছে—সে হলো যুক্তফ্রন্ট সরকারের আমলে নিদারুণ খাদ্যাবস্থা। কেন খাদ্যাবস্থা তেমন হলো, কেন পি ডি এফ সরকারের সঙ্গে সঙ্গে খাদ্যাবস্থার উন্নতি হলো—কেন রাজ্যপালের আমলে বর্ষাকালেও খাদ্যমূল্য অস্বাভাবিকভাবে কমে রইলো এ প্রশ্ন নিয়ে তাঁরা মাথা ঘামাতে চান না। সেই বিভীষিকার দিনগুলিই তাঁদের আশঙ্কিত করে তুলছে। তাঁদের ধারণা যুক্তফ্রন্ট ক্ষমতায় এলে যে কারণেই হোক আবার সেই অবস্থার পুনরাবৃত্তি হবে। লোকদল তাদের প্রচারে এই দুর্বল অংশে আঘাত করছে বেশি। প্রকৃতপক্ষে কংগ্রেস এবং লোকদলের প্রচার ব্যবস্থায় এবং বিষয়বস্তুতে পার্থক্য তেমন নেই। প্রার্থী শ্রীশচীন রায় শুধুমাত্র উদ্বাস্তু এলাকায় একটু প্রভাব ফেললেও সামগ্রিকভাবে এই কেন্দ্রে তাঁর প্রভাব খুব কম। উদ্বাস্তু অঞ্চলে প্রভাব ফেলবার একটা বড় কারণ সম্ভবত এই যে, তিনি নিজে একজন উদ্বাস্তু। এই সঙ্গে আছে হুমায়ুন কবিরের কিছু প্রভাব। তবু পাশাপাশি আর একটি মন্তব্য প্রণিধানযোগ্য। জনৈক চাষী বলছিলেন—বাবু, ছেলে একবার পরীক্ষায় ফেল করলে মা-বাপ কি তার লেখাপড়া বন্ধ করে দ্যায় ? তাকে আবার পরীক্ষা দিতে পাঠাতে হয়। বলা বাহুল্য এই বিপরীত মনোভাবই এবারের মধ্যবর্তী নির্বাচনকে এত গুরুত্বপূর্ণ এবং অভূতপূর্ব করে তুলেছে।

যুক্তফ্রন্টের বাম কমিউনিস্ট প্রার্থী শ্রীরবীন মণ্ডল ব্যক্তিগতভাবে মানুষের কাছে বেশ পরিচিত। শিল্পাঞ্চলে যুক্তফ্রন্টের অবস্থা খারাপ নয়। আর গ্রামাঞ্চলে যুক্তফ্রন্টের যে রাজনৈতিক ক্ষেত্র আছে তাতে যুক্তফ্রন্ট প্রার্থীর বিপর্যয়ের কারণ আছে বলে মনে হয় না। এখানে কংগ্রেস প্রার্থী শ্রীখগেন্দ্রনাথ মণ্ডল। কংগ্রেসের ধারণা অবশ্য খুবই উচ্চ। অনেক কংগ্রেস কর্মীর ধারণা—লোকদল, রিপাবলিকান দল ও নির্দলীয় প্রার্থীর জামানত বাজেয়াপ্ত হতে পারে। যুক্তফ্রন্ট প্রার্থীকে এই তালিকা থেকে তাঁরা বাদ রেখেছেন। অবশ্য কংগ্রেস কর্মীদের এইসব কল্পনা কেবল উচ্চাশা প্রকাশ নয়—দায়িত্বহীন প্রলাপ। জনৈক মণ্ডল কংগ্রেসের সভাপতি এবং অঞ্চল-প্রধানের সরকার-প্রীতি—নিষ্ঠা ও দায়িত্বের যে পরিচয় পেয়েছিলাম—তা সত্যি বিস্ময়কর। তাঁর বক্তব্য হলো, নির্বাচনের খবর একজন সাংবাদিককে দিয়ে তাঁর কী লাভ? কেন তিনি বলবেন সব কথা? আমরা সবিনয়ে জানালাম,

—সে আপনার অভিরুচি। তবে আপনাদের চরম গোপনীয় খবর তো আর আমরা জানতে চাইলেও জানাবেন না। আমরা কেবল—

—কেন? গোপনীয় খবর জানাবো না? তাতে যদি আমার এবং দেশবাসীর উপকার হয় তবে কেন জানাবো না? নিশ্চয়ই জানাবো। দেশের উপকারের জন্য সবই করতে হয়।

—যাকগে। কেমন বুঝছেন আব-হাওয়া? আমরা কথার মোড় ঘুরানোর চেষ্টা করলাম।

—গণতন্ত্রের দিকে ঝুঁকেছে।

—সে তো গত নির্বাচনেই দেখা গেছে যে ঝুঁকেছে।

—না না, ওটা মোটেই গণতন্ত্র নয়। ওটা একটা ঝোঁকমাত্র। গণতন্ত্রে এইবার ঝুঁকেছে ঠ্যালায় পড়ে।

বেশিক্ষণ আর ঘাঁটালাম না। ভাবতে ভাবতে এলাম—এই তো আসল বুঝা যে, আমার কি লাভ? পৃথিবীতে আমি না হইলে আর রইলো কি? বিশ বছরে কংগ্রেস আর কিছু না বুঝুক এই উত্তম-পুরুষ-মধ্যমপুরুষ অবস্থাটা বেশ ভাল করেই আয়ত্ত করেছে। তাই তো লড়াই আজ তার প্রগতির সঙ্গেই। কি নির্মম পরিহাস। কিন্তু এই 'ঠ্যালায় পড়ার' কথাটা জিজ্ঞেস করেছিলাম। তাঁর মতে গত নির্বাচনে জনসাধারণ একটা আবেগের ঝোঁকেই কংগ্রেস-বিরোধী শক্তিকে ক্ষমতায় এনেছিলো। তারপর নয় মাসের বিভীষিকার মধ্যে সেই ঝোঁকের মোহ থেকে তারা মুক্ত হয়েছে এবং এবার গণতন্ত্রকেই আবার প্রতিষ্ঠা করবে কংগ্রেসকে ভোট দিয়ে। গণতন্ত্রের ব্যাখ্যা অনেক শুনেছি, কিন্তু এমন অভিনব ব্যাখ্যা ইতিপূর্বে শুনি নি। অথচ এইসব অপূর্ব ব্যাখ্যা, দায়িত্বহীন উক্তি যেন কংগ্রেস কর্মীদের আজ সম্বল হয়ে দাঁড়িয়েছে। ভাবতে সত্যি অবাক লাগে এতবড়ো সর্বভারতীয় সংগঠন আজ কিভাবে এক-পা এক-পা করে অবলুপ্তির পথে এগিয়ে চলেছে।

বনগাঁ

সেদিন প্রাক্তন যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রী শ্রীসোমনাথ লাহিড়ী বলছিলেন যে, কেউ যদি কল্পনায় স্বর্গে যেতে চায়, তবে পুরোপুরি যাওয়াই ভালো। (অনেকটা সেই গল্পের মতো: একটি ছোটছেলে ঘুম থেকে উঠে বাবাকে বলছে, জানো বাবা, আমি স্বপ্ন দেখলাম যে আমি খুব করে জিলিপি খাচ্ছি। শুনে বাবা ভদ্রলোকটি তেলে-বেগুনে জ্বলে উঠে ছেলেটির মুখে ঠাস করে এক চড় বসিয়ে দিয়ে বললেন, 'হতভাগা, স্বপ্নেই যখন খেলি, তখন জিলিপি বাদ দিয়ে সন্দেশ খেতে পারলি না?) সোমনাথবাবু কল্পনায় স্বর্গে যাবার কথা বলেছিলেন আসন্ন নির্বাচনে রাজ্যের কংগ্রেস নেতৃত্বের সীমাহীন আশার কথা প্রসঙ্গে। পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভার ২৮০টি আসনেই কংগ্রেস প্রার্থীরা জয়লাভ করতে পারেন বলে নেতারা যেসব বক্তব্য রেখেছেন—সংবাদপত্রের মারফৎ তা সকলেরই নজরে এসেছে। বড় নেতাদের কথা ছেড়ে দিলেও ছোট নেতারাও কিছু কম যান না। বিভিন্ন স্থানে পরিভ্রমণ করতে গিয়ে একটা জিনিস লক্ষ্য করেছি যে, উদ্ভট কল্পনা এবং আশাতীত আশা করতে কংগ্রেস কর্মীরা এবং আঞ্চলিক নেতারা, এমন কি প্রার্থীরাও যত পারদর্শী তত আর কোন দলের মানুষই নয়। বাংলা দেশ তথা ভারতবর্ষের বর্তমান রাজনৈতিক বাস্তব-পটভূমিকাকে উপেক্ষা করে যাঁরা সমস্ত আসনে জয়লাভ করার কথা ভাবতে পারেন, যাঁরা ছোট ছোট দলগুলি বাদ দিয়ে যুক্তফ্রন্ট প্রার্থীর জামানত বাজেয়াপ্ত করার কথা বলতে দুবার ভাবেন না, তাঁদের মস্তিষ্ক ও মানসিক সুস্থতা সম্পর্কে প্রশ্ন ওঠা খুবই স্বাভাবিক। বিগত সাধারণ নির্বাচনে বামপন্থী দলগুলি তথা আজকের যুক্তফ্রন্ট যে রাজনৈতিক ক্ষমতার স্বাক্ষর বহন করছে সেই ক্ষমতার যথার্থ মূল্যায়ন না করে, শুধুমাত্র দলীয় বৈরিতার অনুরোধে যাঁরা এই ধরণের দায়িত্বহীন মন্তব্য করতে পারেন, তাঁরা আর যা-ই হোন রাজনৈতিক দূরদৃষ্টিসম্পন্ন নন। অথচ আজ কংগ্রেসের নিচুতলা থেকে চিলেকোঠা পর্যন্ত সকলেই শুধু বড় বড় কথা বলতেই অভ্যস্ত। যেখানেই গেছি, সেখানেই দেখেছি দায়িত্বহীন, নির্বিকার, আজগুবী মন্তব্য করতে যুক্তফ্রন্ট কর্মীদের থেকে কংগ্রেস কর্মীরা বহুলাংশে পারদর্শী। একটি অঞ্চলে কংগ্রেসের জনৈক আঞ্চলিক কমিটির সেক্রেটারীমশাই তো একদিন আমাকে তাঁর কেন্দ্রের জনৈক প্রার্থীর নামই বলতে পারলেন না—একটি ভুল নাম বলে দিলেন। এঁরাই আবার যুক্তফ্রন্টের জামানত জব্দ হবার কথা বেশ বলতে পারেন। বস্তুত, কথাটা নির্মম হলেও সত্য যে, এই-ই হয়েছে আজকের কংগ্রেসের চেহারা।

বনগাঁ কেন্দ্রে যে চারজন প্রার্থী দাঁড়িয়েছেন—দলীয় রাজনীতির কথা ছেড়ে শুধুমাত্র ব্যক্তি হিসাবে দেখলেও দেখা যাবে, যুক্তফ্রন্ট প্রার্থীর জনপ্রিয়তা প্রত্যেকের চেয়ে অনেক বেশি। রাজনৈতিক নেতাদের অনেক 'ভালো'র সঙ্গে কিছু কিছু 'মন্দ'ও সাধারণত থাকে। অথচ এই একটি লোক যাঁর সম্পর্কে কোনো কংগ্রেস কর্মীকেও বিরূপ মন্তব্য করতে শুনি নি। অথচ মজা হলো, মানুষ হিসেবে তাঁর যথার্থ মূল্যায়ন যাঁরা করতে পারলেন—তাঁরাই জামানত বাজেয়াপ্ত হবার কথা বলতে গিয়ে দুবার ভাবলেন না। এ যেন সেই গত নির্বাচনে সোমনাথ লাহিড়ী সম্পর্কে প্রমোদ দাশগুপ্তের মন্তব্যের মতো অর্থহীন। অথচ গত সাধারণ নির্বাচনে এই কেন্দ্রের ফলাফল মোটামুটি এই রকম ছিলো—

কংগ্রেস—সাড়ে সতেরো হাজার
কমিউনিস্ট—সাড়ে তেরো হাজার
বাম কমিউনিস্ট—বারো হাজার
নির্দল—সাড়ে ছ' হাজার এবং
হিন্দু মহাসভা—আটশত ভোট।

এবারে প্রার্থী চারজন। কংগ্রেসের গত নির্বাচনেরই বিজয়ী প্রার্থী শ্রীকালিপদ ভৌমিক, যুক্তফ্রন্টের গতবারেরই কমিউনিস্ট প্রার্থী শ্রীঅজিত গাঙ্গুলী, রিপাবলিকান দলের শ্রীকৃষ্ণপদ মণ্ডল এবং আমরা বাঙালীর শ্রীকৃষ্ণপদ মুখার্জী। শেষোক্ত প্রার্থীর দুজন যদি অ-কংগ্রেসী ও অ-কমিউনিস্ট ভোটই লাভ করে, তাহলে গত নির্বাচনের দুই কমিউনিস্ট প্রার্থীর প্রাপ্ত ভোট এবার যুক্তফ্রন্ট প্রার্থীরই লাভ করার কথা। এবং তা যদি হয় তাহলে কংগ্রেস প্রার্থীর চেয়ে অনেক বেশি ভোট তাঁর লাভ করার সম্ভাবনা। সেদিক থেকে যুক্তফ্রন্টের অবস্থা এখানে নিঃসন্দেহে উজ্জ্বল। কিন্তু কংগ্রেসের বক্তব্য হলো, এবারে আবহাওয়ার পরিবর্তন ঘটেছে। যুক্তফ্রন্ট সরকারের ব্যর্থতার নানা বিভীষিকা তুলে মানুষের মনে ভীতির (panic) সঞ্চার করা হচ্ছে। কিন্তু অস্ত্র তো আজ দু পক্ষেরই হাতে অনেক। রাজ্যপালের শাসনে শিল্পে মন্দা, বেকারী, ছাঁটাই, আইন-শৃঙ্খলা, খাদ্যশস্যের অস্বাভাবিক মূল্যহ্রাসজনিত প্রশ্নগুলিও তো মানুষকে

কম নাড়া দিচ্ছে না? মোটের উপর যুক্তফ্রন্ট প্রার্থীর অবস্থা যে এখানে জামানতের প্রশ্নে পড়ে না, সে কথা সম্ভবত একটি বাচ্চাকেও বুঝবে।

মিউনিসিপ্যালিটি অঞ্চল নিয়ে কংগ্রেস মহল যথেষ্ট উদ্বিগ্ন। ২, ৩, ৪ ও ৭ নম্বর ওয়ার্ড ছাড়া বাকী ১৬টি ওয়ার্ডেই যুক্তফ্রন্টের অবস্থা ভালো। যদিও কংগ্রেস মহলে আশার অনটন নেই। যে ১০নং ওয়ার্ডে কংগ্রেসের শোচনীয় অবস্থা হয়েছিলো গত নির্বাচনে সেই ১০নং ওয়ার্ডেও নাকি কংগ্রেস বিপুল ভোটাধিক্যে জয়লাভ করবে। ১০নং ওয়ার্ডের আঠারো শ ভোটের মধ্যে গত নির্বাচনে ভোট পড়েছিলো মোট ১৪৭২টি। পরিসংখ্যানটি এই রকম:

শ্রীঅজিত গাঙ্গুলী (কমিউনিস্ট) ৫৫৪
„ শান্তিময় ঘোষ (বাম কমিউনিস্ট) ৪০১
„ কালিপদ ভৌমিক (কং) ৩৮০
„ নির্মল রায়চৌধুরী (নিঃ) ১২২
„ জগদীশ চক্রবর্তী (হি-ম) ২৫

এই পরিপ্রেক্ষিতে কংগ্রেসের আশা করবার কারণ থাকে না। অবশ্য এই ওয়ার্ডের গতবারের কমিশনারমশাই (যিনি গত নির্বাচনে নির্দলপন্থী ছিলেন বলে শোনা গেল) এবার নাকি কংগ্রেসকে সমর্থন করছেন। এটাই কংগ্রেসের একটা আশার কথা। কিন্তু কমিশনার কংগ্রেসকে সমর্থন করলেই সাধারণ ভোটারেরাও সঙ্গে সঙ্গে সেই পথ লক্ষ্য করে অগ্রসর হবেন এ থিয়োরীকে সত্য বলে গ্রহণ করলে গত নির্বাচনে নির্দলীয় প্রার্থীরই এই ওয়ার্ডে সর্বাধিক ভোট পাবার কথা নয় কি?

তবে একটি ব্যাপার উল্লেখযোগ্য যে, কয়েক বছর আগেও বনগাঁতে 'সুভাষবাদী জনতা' বলে একটি আধা-সংগঠনের অস্তিত্ব ছিলো। 'আনন্দ মার্গের' spiritual power এদের উপর কিছুটা প্রভাব ফেলেছে বলে মনে হয়। তবে 'আমরা বাঙালী'র প্রার্থী শ্রীকৃষ্ণপদ মুখার্জীর মধ্যে যে স্ববিরোধিতা তা মানুষকে আকর্ষণ করতে পারে না। শ্রীমুখার্জী একদা কমিউনিস্ট পার্টির সদস্য ছিলেন। বছর পাঁচেক আগে তাঁকে পার্টি থেকে বহিষ্কার করা হয় বলে শুনেছি। এই ব্যাপারটাকে নির্বাচনী প্রচারে হয়তো কাজে লাগানো যেতো। কিন্তু সম্ভবত কোঁচো খুঁড়তে সাপ বেরিয়ে যাবার আশঙ্কায় দলীয় প্রচার সেদিকে যাচ্ছে না, যাবে না। পেশাগত দিক থেকে শ্রীমুখার্জী মোক্তার। 'বাঙালীকে চায় না কারা? বাংলা দেশের শত্রু যারা', 'হিন্দী তাড়াও, বাংলা বাড়াও' প্রভৃতি শ্লোগানে কিছু মানুষকে কাছে টানবে এ সম্পর্কে সন্দেহ করা চলে না। কারণ জাতীয়তা আন্তর্জাতিকতা থেকে বড় এবং প্রাদেশিকতা জাতীয়তা থেকে আরো বড়। শুধু-মাত্র আগুন জ্বালানোর অপেক্ষা। ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে জ্বলেছে—ভবিষ্যতে হয়তো বাংলা দেশও বাদ যাবে না। 'আমরা বাঙালীর' সবচেয়ে অসুবিধা হলো—প্রথমত নতুন দল, দ্বিতীয়ত spiritual দিক থেকে হঠাৎ পলিটিক্যাল ক্ষেত্রে এর আত্মপ্রকাশকে মানুষ সহজভাবে গ্রহণ করতে পারছে না।

এইসব ঘটনা এবং নানা ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার মধ্যে এই কেন্দ্রে যুক্তফ্রন্ট ও কংগ্রেসের নির্বাচনী সংগ্রাম তীব্র থেকে তীব্রতর হয়ে চলেছে। বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে দেখলে যুক্তফ্রন্ট প্রার্থীর পরাজয়ের তেমন কারণ দেখা যায় না (জামানত জব্দ হওয়া দূরের কথা)। তবে উল্লেখ্য যে সারা বারাসাত এবং বনগাঁ মহকুমার আটটি নির্বাচনী কেন্দ্রের মধ্যে এই একমাত্র কেন্দ্র যেখানে গত নির্বাচনে কংগ্রেস প্রার্থী জয়লাভ করেছিলেন। কিভাবে করেছিলেন সেকথা আগেই বলেছি। সেজন্য অবশ্য কংগ্রেস শিবিরের আশা একটু বেশি হলেও তাঁদের দোষ দেওয়া চলে না। তবে আবহাওয়া গত নির্বাচনের মতো যে তাঁদের অনুকূলে নয়, একথা বোধ করি তাঁরাও মনে-প্রাণে অস্বীকার করতে পারবেন না।

বাগদা

বনগাঁ থেকে বাগদা। প্রায় পনেরো মাইল পথ। হেলেঞ্চা, বাগদা নির্বাচনী কেন্দ্রের রাজধানী বলা চলে। গত সাধারণ নির্বাচনে ফরোয়ার্ড ব্লকের প্রার্থী শ্রীঅপূর্বলাল মজুমদার একই সঙ্গে উলুবেড়িয়া এবং উত্তর চব্বিশ পরগনার এই বাগদা কেন্দ্রে জয়লাভ করেছিলেন। এই বাগদা কেন্দ্রেই কংগ্রেস প্রার্থী প্রাক্তন এম-এল-এ শ্রীমণিভূষণ বিশ্বাসকে প্রায় বিশ হাজার ভোটের ব্যবধানে পরাজিত করেছিলেন। কংগ্রেস প্রার্থীর প্রাপ্ত ভোটের আড়াই গুণ ভোট তিনি পেয়েছিলেন। কিন্তু এ মাসের একেবারে গোড়াতেও বনগাঁ থেকে হেলেঞ্চা পর্যন্ত গত নির্বাচনের সেই বিজয়ী এবং এবারের মধ্যবর্তী নির্বাচনের যুক্তফ্রন্টের ফরোয়ার্ড ব্লক প্রার্থী সেই অপূর্ব মজুমদারের নামে একটিও পোস্টার না দেখে কেবল বিস্ময় লাগে নি—ব্যাপারটা অপূর্ব লেগেছিলো। যেখানে প্রতিদ্বন্দ্বী দুই দল রীতিমতো যুদ্ধক্ষেত্রে নেমে পড়েছে, সেখানে যুক্তফ্রন্ট কর্মীদের এই নিশ্চেষ্টতা সত্যি অবাক লাগবার কথা। এই কেন্দ্রে প্রার্থীর সংখ্যা তিনজন। যুক্তফ্রন্ট ছাড়া কংগ্রেসের শ্রীচিত্তরঞ্জন রায় এবং রিপাবলিকান দলের শ্রীখগেন্দ্রনাথ বিশ্বাস। এঁদের উভয়েরই স্বপক্ষে প্রচুর পোস্টার, ফেস্টুন দেখা গেলো। কংগ্রেসের প্রচারও খুব সরব মনে হয়েছে। ঠিক এই কারণেই জনৈক যুক্তফ্রন্ট সমর্থক অভিমানে ফেটে পড়েছিলেন। তাঁর অভিমানের উৎস-সন্ধানে তৎপর হয়ে যে রূপ-চিত্র আমার চোখে ধরা পড়েছে, তা হতাশাব্যঞ্জক না হলেও একথা অস্বীকার করে লাভ নেই যে, যুক্তফ্রন্টের সাংগঠনিক দুর্বলতা এখানে একদিকে যেমন অভিমান পুঞ্জীভূত করে তুলেছে, অন্যদিকে তেমনি উৎফুল্লতার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। বিশ্বাস-অবিশ্বাসের প্রশ্ন তুলছি না—সে প্রসঙ্গে পরেই আমাদের যেতে হবে। কিন্তু এই অভিমান যে নিছক উপেক্ষার বস্তু নয়—একথা সকলের মনে রাখা ভালো। যুক্তফ্রন্টের তিনটি শরিকদল (কমিউনিস্ট, বাম কমিউনিস্ট এবং ফরোয়ার্ড ব্লক)-এর অস্তিত্ব আছে বটে, কিন্তু কোনো কার্যালয় খুঁজে পাই নি। তবে অনেক কর্মীর সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়েছে। আর কংগ্রেসের কার্যালয় পেয়েছিলাম (কারণ অফিস-ঘরের তুলনায় সাইনবোর্ডটি নেহাৎ ছোট ছিলো না) বটে, কিন্তু কর্মী দেখি নি। সদা-উন্মুক্ত অফিস-ঘরের মধ্যে মানুষ তো দূরের কথা, দুটি চেয়ার-বেঞ্চিও ছিলো না। কিন্তু একটি লোভনীয় জিনিস ছিলো—সে হলো এক-জোড়া তাজা পুরুষ্ট লাউ। (হাটবার—হবে হয়তো কেউ কিনে রেখেছিলো)। কিন্তু বড় চকচকে সাইনবোর্ডটাকে লজ্জা দিয়ে ওরা নির্লজ্জের মতোই মানুষের চোখের সামনে প্রকাশ্য দিবালোকে পাশাপাশি বসেছিলো।

অবশ্য এ চিত্র এখন আর নেই। সকল দলই এখন নির্বাচনী আসরে তাঁদের যথাসাধ্য শক্তি নিয়ে নেমে এসেছে। সেই প্রসঙ্গেই এবার আমরা আসবো—তাকিয়ে দেখবো রাজনৈতিক-পর্দার অন্তরালে। গত নির্বাচনে যাঁরা কংগ্রেস প্রার্থীকে পরাজিত করবার জন্য খেটেছিলেন—তাঁদের কেউ কেউ এবার কংগ্রেস—কেউ বা রিপাবলিকান দলের হয়ে কাজকর্ম করে চলেছেন। তবুও গত নির্বাচন যতটা ব্যক্তি-কেন্দ্রিক ছিলো, এবার ঠিক ততটাই দল-কেন্দ্রিক বলে মনে হয়।

গত নির্বাচনে অধ্যাপক মণি বিশ্বাসের প্রতি সাধারণের পুঞ্জীভূত নানা অসন্তোষ কংগ্রেসের পরাজয়ের সহায়তা করেছিলো। এবারের কংগ্রেস প্রার্থী যোগ্যতার দিক থেকে খুবই অনুপযুক্ত বলে অনেককেই মন্তব্য করতে শুনেছি। প্রাক্তন এম-এল-এ, শ্রী এ ভি রায়ের ছেলে—কিন্তু সুজেকে পরিচিত করতে বাপ-মার দেওয়া আদুরে নামের দরকার পড়েছে পোষাকী নামের পাশে বন্ধনীর মধ্যে। শ্রীচিত্তরঞ্জন রায় (ডল)। শিক্ষাগত যোগ্যতা নাকি জুনিয়র হাই স্কুল পর্যন্ত। তবু নির্বাচনী সনাতন কৌশল মোটামুটি আয়ত্তাধীন। ইতিমধ্যেই গ্রামে গ্রামে, বাড়ি বাড়ি, ব্যক্তিগতভাবে

ঘোরাঘুরি শুরু করেছেন। কামডানস্ত (উভয় দল) কর্মীদের সঙ্গেও দেখা হয়েছে—তাঁরা স্বার্থহীন ভাষায় ফ্রন্ট প্রার্থীর জয়লাভের কথা জানিয়ে দিয়েছেন। মোট ১৪টি অঞ্চলের ৬৩ হাজার ভোটের মধ্যে গত নির্বাচনে পড়েছিলো ৪৬ হাজার ভোট। শ্রীমজুমদার পেয়েছিলেন তার মধ্যে তেত্রিশ হাজার। পরিসংখ্যান থেকে দেখা যায়, যে অঞ্চলে ফ্রন্টের অবস্থা সবচেয়ে খারাপ সেই গঙ্গানন্দপুরেই যেখানে কংগ্রেস পেয়েছে দেড় হাজার সেখানে ফ্রন্ট পেয়েছে দু'হাজার ভোট। এই রাস্তবচিত্র সত্ত্বেও কংগ্রেস আশা করছে জয়লাভ করার, ত্রিকোণ যুদ্ধের সুযোগে বেরিয়ে আসার আশা পোষণ করছেন রিপাবলিকান দলও। অন্তত দলের জনৈক ভারপ্রাপ্ত কর্মীর তাই মত। আষাঢ়ুর অঞ্চলপ্রধান (যিনি গত নির্বাচনে ফ্রন্টের পক্ষে কাজ করেছেন) এবার কংগ্রেসের হয়ে কাজ করছেন এবং তাঁর বিশ্বাস কংগ্রেস জিতবে। যদিও বিভিন্ন সূত্রে যে খবর পাওয়া গেল তাতে তাঁর নিজের অঞ্চলেই (আষাঢ়ু) কংগ্রেসের অবস্থা অনুকূল নয়!

আমডোব অঞ্চলের জনৈক মুসলমান ছাত্রের মুখে শুনেছি তাঁরা যুক্তফ্রন্টের শাসনকাল সম্পর্কে কংগ্রেসী প্রচারের বিরুদ্ধে গ্রামবাসীদের সচেতন করবার চেষ্টা করছেন। প্রায় ১২ হাজার মুসলিম ভোটারের মধ্যে এখন মোটামুটি হাজার ছয়েক ভোটার আছেন। এই মুসলিম ভোটারদের একটি বড় অংশ গত নির্বাচনে কংগ্রেসকে সমর্থন করেন নি। কিন্তু যুক্তফ্রন্ট সম্পর্কে নানা ভ্রান্ত ধারণা এদের মনে প্রবেশ করিয়ে দেবার চেষ্টা চলছে। উক্ত ছাত্রটি মনে করেন, এ সম্পর্কে জনসভা হওয়া দরকার, মুসলিম নেতাদের সেই জনসভায় যোগদান করা দরকার।

মোটামুটি বাগদা কেন্দ্রের নির্বাচনী হাওয়া গতবারের মতো সহজ একমুখীন নয়। যদিও শ্রীবিশ্বাসের মতে, এই কেন্দ্রে এবার কংগ্রেস কোন factor নয়—contest হবে রিপাবলিকান প্রার্থী এবং যুক্তফ্রন্ট প্রার্থীর মধ্যে। তবুও মনে রাখা দরকার, এই সমীক্ষা রিপাবলিকান কিংবা যুক্তফ্রন্ট দলের কোন কর্মীর নয়। এই সমীক্ষা করেছেন শ্রীবিশ্বাসের মতো একজন অভিজ্ঞ রাজনৈতিক কর্মী। তাঁর ধারণা, প্রার্থী হিসাবে শ্রীমজুমদারের সঙ্গে বাকী দুজনের কোন তুলনাই হয় না। তবু যোগেন্দ্র মণ্ডলের যে Political base-টুকু এখানে বিদ্যমান, তার সঙ্গে স্থানীয় রেজেস্ট্রি অফিস প্রতিষ্ঠা এবং সিন্দ্রাণী বাওড় সংক্রান্ত ব্যাপারে শ্রীমজুমদারের প্রতি কিছু কিছু মানুষের অসন্তোষ যুক্ত হয়ে রিপাবলিকান প্রার্থীকেই কংগ্রেস থেকেও প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বী করে দাঁড় করাবে মধ্যবর্তী নির্বাচনে। অবশ্য এটা শ্রীবিশ্বাসের অনুমান হলেও রাজনৈতিক ক্ষেত্রে এ অনুমানের সম্ভাব্যতাকেও উড়িয়ে দেওয়া যায় না। বাগদা পৌঁছে আমরা একটি গুজব শুনেছিলাম, শ্রীবিশ্বাস রিপাবলিকান দলের হয়ে কাজকর্ম করছেন। শুনেছিলাম, কংগ্রেসের একটা অংশ রিপাবলিকান দলের প্রতি মদৎ যোগাচ্ছে, একথা কতদূর সত্য আমরা জানি না, তবু রাজনীতিতে যেহেতু সবই সম্ভব—তাই পুরোপুরি অবিশ্বাস করারও প্রশ্ন ওঠে না। রিপাবলিকান দলের পূর্বোল্লিখিত কর্মীও একথা বলেছেন যে, এ পর্যন্ত রিপাবলিকান দলের যত ঘরোয়া বৈঠক এবং পরামর্শসভা সব শ্রীবিশ্বাসের বাড়িতেই হয়েছে। হয়তো কংগ্রেস তার পরিণামের কথা ভেবে শংকিত হয়ে 'কমিউনিস্ট প্রভাবিত ফ্রন্ট'কে প্রতিরোধ করতে বিকল্প এক ব্যবস্থার আশ্রয় নিয়েছে। কাজেই 'কংগ্রেস কোন factor নয়, contest হবে রিপাবলিকান প্রার্থীর সঙ্গে যুক্তফ্রন্ট প্রার্থীর' এ কথার সত্যতা ও সম্ভাব্যতাকে অস্বীকার করা সঙ্গত হবে না।—কিন্তু পরেরটুকু শ্রীবিশ্বাস বলেন নি। আমরা বলতে চাই। বাগদার রাজনৈতিক আবহাওয়া যুক্তফ্রন্টের প্রতিকূলে নয়। প্রার্থী হিসেবে শুধু নয়, কোন বিশেষ দলের নেতা হিসেবেও নয়, ব্যক্তি হিসেবে সাধারণের প্রাণের রাজ্যে শ্রীমজুমদারের যে স্থান পাতা রয়েছে দেখেছি, প্রবল প্রাণবন্যায় তা প্রকাশিত হয়ে পড়তে চাইছে। সেই প্রাণবন্যাই হয়ত প্রমাণ করে দেবে তেরো আর তেত্রিশের ব্যবধান বড় সহজে বিলুপ্ত হতে পারে না। এই হলো দেওয়ালের লিখন। এই হলো তার এপিলোগ—এই হবে তার এপিস্টাফ।

"জীবন যখন শুকায়ে যায় করুণাধারায় এসো"। জীবনের যন্ত্রণায় পুড়ে চিরদিনই মানুষ এই করুণাধারার সন্ধান করেছে। আজও জীবনযন্ত্রণায় কাতর মানুষের প্রার্থনায় কোন ব্যতিক্রম নেই। ব্যতিক্রম শুধু যে উৎসের কাছে সে করুণাধারা পেতে চায় সেই উৎসের।

মানুষ গোড়া থেকেই ছিল ঈশ্বর-ভক্ত। জীবনের অসহনীয় যন্ত্রণার মুহূর্তে সে তাই আকাশের দিকে মুখ তুলেছে, নিজের মনগড়া ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করেছে জীবন জুড়ানো করুণাধারার জন্য।

এ যুগের মানুষের কাছে ঈশ্বর সম্ভবত অভ্যাস মাত্র। উত্তরাধিকারসূত্রে পাওয়া প্রপিতামহের যুগের সচ্ছলতার স্মৃতির মতই স্বপ্নের সে ঈশ্বর। এ যুগের মানুষ ঈশ্বরকে করুণাধারার জন্য যতবার ডাকে, তার চেয়েও অনেক বেশিবার সে তার নিতান্ত পার্থিব শপথবাক্যে ব্যবহার করে ঈশ্বরের নাম। ভগবানের দোহাই দিয়ে মানুষ যখন তার কাজ হাসিল করে তখন সে মোটেই আধ্যাত্মিক মানুষ নয়, নিতান্তই সুবিধাবাদী, ব্যবহারিক মানুষ। ঈশ্বর আজকের মানুষের কাছে নিতান্তই শপথবাক্যে পরিণত হয়েছে।

মানুষের জীবন থেকে ঈশ্বরের ভূমিকা বহুলাংশে পরিবর্তিত হলেও তার জীবনে করুণাধারার প্রয়োজন কমে নি। বরং আরও তীব্র হয়ে দেখা দিয়েছে। আজকের মানুষের জীবনের যন্ত্রণা তার প্রপিতামহের জীবনের যন্ত্রণার চেয়ে অনেক বেশি তীব্র। যারা অতীতের, অথবা আগামীকালের, তারা কেউ উপলব্ধি করতেই পারবে না আমাদের যুগের মানুষের জীবনের যন্ত্রণাকে।

এ এক অদ্ভুত যুগ। এ যুগের সুখ অথবা বেদনা, যন্ত্রণা অথবা নিবৃত্তি কোনটাই চিরাচরিত মাপকাঠিতে মাপা যায় না। একই যুগে, একই মুহূর্তে, পৃথিবীর মানুষ যখন এই গ্রহের অভিকর্ষ বন্ধন ছিন্ন করে মহাকাশের উপগ্রহে ছুটে চলেছে, সেই দিগ্বিজয়ের যুগেও, সেই বিরাট এক সম্ভাবনার সামনে দাঁড়িয়েও, অনাহারে ও ক্ষুধায় একই পৃথিবীর মানুষকে মৃত্যুবরণ করতে হয়—এই স্ববিরোধিতার সমাধান কোথায়? আকাশে না মাটিতে? আগামী যুগের মানুষ যত এ সব কথা ভাববে ততই সে বিস্মিত হবে, বিমূঢ় হবে। জীবন ও মৃত্যুর এমন প্রকট বৈষম্য, এমন বিস্ময়কর সহাবস্থান কেমন করে সম্ভব সে ভেবেই উঠতে পারবে না।

কথায় কথায় অনেক দূরে এসে পড়েছি। আগামী যুগের মানুষের বিস্ময় নিয়ে ভাবনা আমার নয়। আগামীকালের মানুষের জন্য দুশ্চিন্তার কোন কারণই হয়তো আমরা রেখে যাব না। আমরাই হয়তো শেষ মানুষ, যারা পৃথিবীর সমস্ত দুশ্চিন্তা ও চোখের জল সঙ্গে নিয়ে যাব, পরবর্তীদের জন্য পৃথিবীকে যোগ্য বাসভূমিতে পরিণত করে।

যাই হোক আবার ফিরে আসা যাক প্রসঙ্গের চৌহদ্দিতে। আমাদেরও জীবন থেকে করুণাধারার সন্ধান শেষ হয় নি। গ্রীষ্মের সুবর্ণরেখার মতই ঈশ্বর যখন আমাদের জীবন থেকে আত্মগোপন করলেন তখন করুণাধারার সন্ধানে আমরাও ফিরে তাকালাম ভিন্নতর উৎসের দিকে। প্রাত্যহিক জীবনের গনগনে আগুনের আঁচ থেকে সাময়িক মুক্তি পাওয়ার জন্য আমরা, এ যুগের মানুষরা, গির্জা অথবা মন্দিরে, মসজিদে যাই না। যাই প্রেক্ষাগৃহে, যাই ছবির প্রদর্শনীতে, যাই খেলার মাঠে কিংবা পকেটের শেষ কপর্দকটি দিয়েও কিনে ফেলি বই।

* * *

আমি সেই দর্শক যে ছবিতে তুলির টান বোঝে না, রেখার বৈশিষ্ট্য বোঝে না কিন্তু গোটা ছবিটা দেখে বিস্মিত হয়। আমি ছবির সমঝদার নই, সাধারণ দর্শক মাত্র। চিত্র প্রদর্শনীতে গেলে আমার মন ভাল হয়। অর্থাৎ জীবনের যন্ত্রণা থেকে মুহূর্তের জন্য হলেও রেহাই পাই, করুণাধারার সন্ধান পাই।

শ্রদ্ধার কোন বয়স নেই। অতি আধুনিক, সমসাময়িক যুগের শিল্পীরা অনেকেই আমার বয়সে ছোট হলেও আমি তাদের শ্রদ্ধা করি। উদ্দাম কোন তরুণ শিল্পী যখন জীবনের নিতান্ত স্থূল উপাদানের মধ্যে শিল্পের সৌন্দর্য না খুঁজে রং ও রেখায় এক প্রচণ্ড বিমূর্ততাকে ধরার চেষ্টা করেন—তখন তা আমাকে বিস্মিত করে। অতি-সাধারণ এক নগণ্য নাগরিক হলেও শিল্পে ও সাহিত্যে এ্যাবস্ট্রাকশনের বিরুদ্ধে আমার কোন অভিযোগ নেই। অভিযোগ নেই এই কারণে যে, ছোটবেলা থেকেই জীবনে আমার এ্যাবস্ট্রাকশনের সঙ্গে পরিচয়। ক্ষদবচন্দ্রের পাটিগণিতের অঙ্কে যে বাঁদরটা তেলমাখানো বাঁশের কিছুদূর উঠেই আবার নেমে আসতে বাধ্য হয়, যে চৌবাচ্চায় সারাদিন ধরে জল পড়ে ও অন্য দিক দিয়ে জল বেরিয়ে যায়, পাঠ্য বইয়ের যে বালক চুরি করে ফাঁসি যায় এবং ফাঁসির প্রাক্কালে মাসীর কান কামড়ে নেয়, সেই সব অঙ্ক সেই সব পাঠ কোন দিনই আমার কাছে কখনও খুব কংক্রিট বলে মনে হয় নি। সুতরাং এ্যাবস্ট্রাকশনে আঁৎকে ওঠার জন্য আমার মন তৈরি হয় নি।

তথাপি এ বছর শীতে কলকাতায় আধুনিক ও তরুণ শিল্পীদের কয়েকটি চিত্র প্রদর্শনী দেখতে গিয়ে আমার মনে একটা ভয় দেখা দিয়েছে। কোন শিল্পী অথবা কোন প্রদর্শনীর নাম আমি করব না, কারণ নাম ধরে সমালোচনার সময় এসেছে বলে আমি মনে করি না। সে অবস্থায় সমালোচনায় শিল্পের শত্রুরাই লাভবান হবে বেশি। তাদের আমি লাভবান হতে দেব না। নাম না করেও বলতে পারি বছরকয়েক আগেও বাংলা দেশের যে সব তরুণ শিল্পী সম্ভাবনা নিয়ে দেখা দিয়েছিলেন তাঁদের অনেকেই আজ এক পৌনঃপুনিক আবর্তের মধ্যে পড়ে গেছেন। দু' বছর আগে তাঁরা যে ছবি এঁকেছেন তাঁদের অনেকেই আজও দু' বছর বাদেও সেই এক ছবি মনে হয় কপি করে যাচ্ছেন। কতকগুলি বিশেষ রেখা, বিশেষ রং যেন তাঁদের মুখস্থ হয়ে গেছে। অভিজ্ঞ অধ্যাপক ক্লাসে পাঠ দিতে এসে যেমন সেই কবেকার পুরনো পাঠ গড়-গড়িয়ে মুখস্থ বলে যান, বাংলা দেশের আধুনিক শিল্পীরাও কয়েক বছর ধরে

যেন তাই করছেন। নতুনতর সৃষ্টির দিকে এঁদের অনুশীলনের চেষ্টা যদি মুখ না, ফেরায়, তাহলে আমি নিশ্চিত বলতে পারি এই শিল্পীদের অনেকেই আর বেশি দিন টিকে থাকতে পারবেন না। সেদিন হয়তো প্রদর্শনী গৃহগুলিও একে একে ঝাঁপ বন্ধ করে দেবে। আর না হয় কুৎসিত, স্থূল ছবির যুগ আবার ফিরে আসবে। আমার ভয় এইখানেই। দেশের কোন রাজনৈতিক নেতা বা রাজনৈতিক দলের ব্যবহারে নাবালকত্ব দেখে আমি যত-খানি ভয় পাই, তার চেয়েও বেশি ভয় পাই শিল্পী অথবা সাহিত্যিকদের, শিল্পে অথবা সাহিত্যে, অপ্রাপ্তবয়স্কতার, অথবা অচলায়তনের ছায়া দেখে। কারণ শিল্প ও সাহিত্যের কাছেই আমার করুণাধারার জন্য প্রার্থনা। এ ছাড়া আমার অন্য কোন ঈশ্বর নেই।

ছোটবেলা থেকে সাধনা দশন ব্যবহার করলে

বৃদ্ধ বয়স পর্যন্ত দাঁত সুস্থ, সবল, সুন্দর ও মাড়ি সুদৃঢ় থাকে। মুখ স্বচ্ছ ও দুর্গন্ধমুক্ত হয়।

সাধনা দশন

একটি আদর্শ দাঁতের মাজন

সাধনা ঔষধালয়-ঢাকা
কলিকাতা-১৮
প্রণেতা ডাঃ যোগেশ চন্দ্র ঘোষ, এম.এ
আয়ুর্বেদ-শাস্ত্রী, এফ.সি.এস. (লণ্ডন)
এম.সি.এস. (আমেরিকা) ভাগলপুর কলেজের রসায়ন শাস্ত্রের ভূতপূর্ব অধ্যাপক।

কলিকাতা কেন্দ্র :
ডাঃ নরেশ চন্দ্র ঘোষ, এম.বি.বি.এস. (কোল্ড আয়ুর্বেদাচার্য)

৩০.২/৫৪

চতুর্থ সাধারণ নির্বাচনের শিক্ষা

পর্যবেক্ষক

নির্বাচন এলেই এবং ফুরুলেই আসন-বণ্টনের সময় আমরা শুনি বিভিন্ন পার্টির শক্তির পরিমাণ নিয়ে তর্ক, শক্তির অনুপাতে সেই পার্টিকে উপযুক্ত সংখ্যক আসন দেওয়া হচ্ছে কি না। প্রত্যেক পার্টির শক্তির প্রশ্নটাও অবান্তর প্রশ্ন নয়। প্রত্যেক পার্টিরই একটা নীতি ও বক্তব্য আছে এবং সেই নীতি ও বক্তব্যের ভিত্তিতে নিজের দিকে যত বেশি সম্ভব মানুষকে আকৃষ্ট করবার চেষ্টাও স্বাভাবিক। এবং এইজন্য এটাও অস্বাভাবিক নয় যে বিভিন্ন পার্টির মধ্যে শক্তির একটা প্রতিযোগিতা সর্বদাই থাকে এবং প্রত্যেক পার্টিই নিজের দিক থেকে মনে করে যে সেই পার্টিই দেশের ভবিষ্যৎ রচনার প্রধান দায়িত্ব পালন করবে। শুনতে যতই খারাপ লাগুক না কেন, অনেক পার্টি থাকলে এরকম মানসিকতার সঙ্গে খাপ খাইয়ে চলতেই হবে। কিন্তু সমস্যা দাঁড়ায় তখনই, যখন এই মানসিকতা দেশের বাস্তব অবস্থায় সবচেয়ে জরুরী বাস্তব প্রশ্নটিকে উপেক্ষা করে বসে। তখনই এই মানসিকতা হয়ে দাঁড়ায় প্রতিবন্ধক।

যে পার্টির যত শক্তিই থাকুক না কেন, আজকের ভারতে কোনো পার্টিই কি এককভাবে কংগ্রেসের বিকল্প হতে পারে? ১৯৪৭-র সাধারণ নির্বাচনে তো কংগ্রেসের শক্তি-ভারসাম্য প্রতিকূল হয়ে গিয়েছে। কিন্তু এককভাবে কংগ্রেস-বিরোধী পার্টির শক্তি হিসাব করলে কি দাঁড়ায়? যে কোনো একক পার্টির চেয়ে কংগ্রেসের শক্তি অনেক বেশি। ১৯৪৭-এর নির্বাচনের পরের অবস্থাটার সর্বভারতীয় হিসাব দিচ্ছি। সবগুলি রাজ্যের বিধানসভার মোট সভ্যসংখ্যার হিসাব এই রকম :—

কংগ্রেস—১৪৬০, স্বতন্ত্র পার্টি—২৫৬, জনসংঘ—২৫০, পি-এস-পি—১০৫, এস-এস-পি—১৭৪, কমিউনিস্ট পার্টি—১১৮, মার্কসবাদী কঃ পার্টি—১২৫, অন্যান্য ৭৩৩। এ থেকেই বোঝা যায় কংগ্রেসের পাশে পার্টিগুলির একক শক্তি কত কম। লোকসভার সভ্যসংখ্যার হিসাব :—কংগ্রেস ২৮১, সমস্ত বিরোধী সদস্য মিলিয়ে ২৩৮। এর মধ্যে স্বতন্ত্র—৪৪, জনসংঘ—৩৭, কমিউনিস্ট—২৫, মাঃ কমিউনিস্ট—২০, পি-এস-পি—১৪, এস-এস-পি—৩২।

এক-একটা রাজ্যের হিসাবে সর্বভারতীয় পার্টির একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা একমাত্র কেরালায় এবং স্থানীয় পার্টির একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা হিসাবে মাদ্রাজ ছাড়া অন্য রাজ্যগুলির অবস্থা উপরি উল্লিখিত রূপেই। পঃ বাংলা :—কংগ্রেস—১২৭, কঃ পার্টি—১৬, মাঃ কঃ পার্টি—৪৪, বাংলা কংগ্রেস—৩৪, ফরোয়ার্ড ব্লক—১৩ ইত্যাদি। বিহার :—কংগ্রেস—১১৮, স্বতন্ত্র—৪, জনসংঘ—২৬, পি-এস-পি—১৮, এস-এস-পি—৬৭, কমিউনিস্ট—২৪, মার্কসবাদী কমিউনিস্ট—৪, নির্দলীয় ও অন্যান্য—৪৭। উত্তরপ্রদেশ :—কংগ্রেস—১৯৮, স্বতন্ত্র—১২, জনসংঘ—৯৭, পি-এস-পি—১১, এস-এস-পি—৪৩, কমিউনিস্ট (মার্কসবাদী সহ)—১৫, অন্যান্য—৪৬। রাজস্থান ও মধ্যপ্রদেশে স্বতন্ত্র পার্টি ও জনসংঘের শক্তি খুব বেশি, কিন্তু তবু কংগ্রেসের চেয়ে একক শক্তি অনেক কম। রাজস্থান :—কংগ্রেস—৮৯, স্বতন্ত্র—৪৯, জনসংঘ—২২। মধ্যপ্রদেশ :—কংগ্রেস—১৬৭, জনসংঘ—৭৮, স্বতন্ত্র—৭, পি-এস-পি—১০।

সব রাজ্যের হিসাবের কোনো প্রয়োজন নেই। মোটের উপর খুব শক্তিশালী হয়েও কোনো পার্টি এককভাবে কংগ্রেসকে সংখ্যালঘুতে পরিণত করতে পারে না। কংগ্রেস-বিরোধী পার্টিগুলির মিলিত শক্তিই কংগ্রেসের সামনে প্রকৃত চ্যালেঞ্জ।

এটা এমন একটা সত্য, এমন একটা বাস্তব, যা অনেকদিন আগে থেকেই জনসাধারণের সামনে প্রকট হয়ে উঠেছে। বামপন্থী, দক্ষিণপন্থী পার্টির তারতম্য বিচারের আগেই এই সাধারণ সত্যটা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে জনজীবনে। ঐক্যবদ্ধ না হলে কংগ্রেসকে হারাতে পারা যাবে না, এই কথাটা কংগ্রেস-বিরোধী অভিযানের starting point এবং এই সহজ অনুধাবনের জন্যই অনেক সময় সাধারণ লোকে বামপন্থী, দক্ষিণপন্থী বিচার না করে ঐক্যবদ্ধ কংগ্রেস-বিরোধিতার কথা বলে থাকে। তাদের সে-বলার মধ্যে সঠিক রাজনৈতিক চেতনার অভাব যতই থাকুক, মূল সত্যটা ধরতে পারার লক্ষণই এটা। এবং কংগ্রেস-বিরোধী ঐক্যের এই আগ্রহ থেকেই তো বামপন্থী ঐক্যের আগ্রহ সৃষ্টি হয়েছে জনসাধারণের মধ্যে। জনজীবনের সমস্যা নিয়ে চিন্তা করে ও সে-সমস্যা সমাধানের জন্য সংগ্রাম করে কারা, দক্ষিণপন্থী পার্টিগুলো, বা বামপন্থী পার্টিগুলো, অভিজ্ঞতার ভিতর দিয়ে যখনই এটা চিনতে পেরেছে জনসাধারণ, তখনই বামপন্থী পার্টিগুলোকেই তারা প্রকৃত জনসেবার পার্টি হিসাবে স্বীকার করেছে এবং কংগ্রেস-বিরোধী ঐক্য বলতেও তখন প্রধানত বামপন্থী ঐক্যকেই বুঝেছে। অনেক বামপন্থী পার্টি থাকায় সাধারণ লোকে বিরক্তি প্রকাশ করে, এটা যেমন সত্য, তেমনি আরো বড় সত্য হচ্ছে যে, বামপন্থী পার্টিগুলি মিলিত হলে সাধারণ লোকে বিপুল উৎসাহ পায়।

কিন্তু প্রশ্ন এই যে, এই জনসাধারণ-স্বীকৃত, জনসাধারণ-অনুভূত বাস্তব সত্যটাকে কি যথোচিত গুরুত্ব দিয়ে উপস্থিত করেছে বামপন্থী দলগুলি? পার্টির এক্য শক্তির দিকে নজর যত বেশি, এক্য শক্তিবৃদ্ধির প্রশ্নে আগ্রহ যত বেশি, ঠিক ততটাই নজর ও আগ্রহ কি বামপন্থী ঐক্যের জন্য প্রকটিত হয়েছে? তা যদি হত, তাহলে ইতিমধ্যেই দেশের অনেকাংশে বামপন্থী ঐক্য এমন একটা শক্তি হিসাবে দাঁড়াত, যা আকৃষ্ট করত জনসাধারণের সমস্ত প্রগতিশীল অংশকে এবং প্রভাব বিস্তার করত অন্য অংশের উপরও, এবং তার ফলে একদিকে দক্ষিণী রাজনীতি গোড়া থেকেই বাধা পেত, অন্যদিকে কংগ্রেস আরো দৃঢ় চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হত।

পঃ বাংলায় ১৯৫২-র আগে থেকেই বামপন্থী ঐক্যের বা কংগ্রেস-বিরোধী প্রগতিশীল ঐক্যের কথা উঠেছে বামপন্থী দলগুলির পক্ষ থেকেই। পঃ বাংলায় ঐক্যের এই আওয়াজ এখানকার বিশেষ অবস্থার জন্যই তো ওঠে নি, উঠেছিল দেশের সামগ্রিক অবস্থার দিকে চেয়েই। কিন্তু সামগ্রিকভাবে দেশের মধ্যে সে-ঐক্যের কথা তখন বিশেষ গুরুত্ব পায় নি। অন্তত পঃ বাংলার মতো গুরুত্ব যে পায় নি, তাতে কোনো সন্দেহ নেই।

ঠিক সেইজন্যই পঃ বাংলার বিকাশ-ধারার থেকে কেরালা ও অন্ধ্রের বিকাশ-ধারাও হয়েছে ভিন্ন। কেরালায় ১৯৫৭-তেই কমিউনিস্ট গভর্নমেণ্ট প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। কমিউনিস্ট শক্তির বিপুল প্রভাবের পরিচয় এটা। কিন্তু

তার পরের অবস্থা আবার উল্টে গেল কেন? কেন্দ্রের চক্রান্ত যেমনই হোক না কেন, যদি কমিউনিস্ট-শক্তি বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে কেরালায় বামপন্থী ঐক্যের দিকে অধিক নজর থাকত, যদি কংগ্রেস-বিরোধী প্রগতিশীল ঐক্যকেই কংগ্রেসের প্রধান বিকল্প হিসাবে দাঁড় করানো হত, তাহলে কেন্দ্রের চক্রান্ত সফল হওয়া কঠিন হত। এক দশক পরে আবার কেরালার অবস্থার মোড় ঘোরাতে পারা গিয়েছিল বামপন্থী ঐক্যের জোরেই।

অন্ধ্রের উদাহরণ আরো বেশি শিক্ষণীয়। ১৯৫৫-তে অন্ধ্রে নির্বাচনের সময় সারা দেশেই ধারণা হয়েছিল যে সেখানে কমিউনিস্ট সংখ্যাগরিষ্ঠতা হতে চলেছে। শুধু কমিউনিস্ট মহলেই নয়, কংগ্রেসী মহলেও সেইরকম ধারণা হয়েছিল। কিন্তু দেখা গেল, অন্ধ্রে কমিউনিস্ট পার্টির শক্তি যত বেশিই হোক না কেন, এককভাবে কংগ্রেসকে চ্যালেঞ্জ করার মতো শক্তি সেটা নয়, এককভাবে দাঁড়াতে গেলে তাতে সাফল্য মোটেই আসে না। সেই নির্বাচনের ফল কমিউনিস্টদের দিক থেকে আগের চেয়ে খারাপই হল। এবং তখনকার ক্ষতি আজ পর্যন্ত পূরণ করা যায় নি। ১৯৬৭-তে অন্ধ্রে দুই কমিউনিস্ট পার্টি মিলিয়েও ১১টির বেশি আসন পায় নি। অন্য বামপন্থী দল অন্ধ্রে নগণ্য। কংগ্রেস-বিরোধী প্রগতিশীল ঐক্যের আহ্বান সাধারণ মানুষের উপর প্রভাব বিস্তার করত এবং তার ফলশ্রুতি ভালই হত।

এই সব উদাহরণের পাশে আবার পঃ বাংলার উদাহরণ রাখি। বামপন্থী ঐক্যের মধ্যে পঃ বাংলায় ত্রুটি ও ফাটল কম নেই। প্রথম থেকেই বামপন্থী ঐক্যের অনেক সমস্যা ও ত্রুটি নিয়েই পঃ বাংলা চলেছে। কিন্তু তবু মোটামুটিভাবে বামপন্থী ঐক্যের নীতিকে বরাবর পঃ বাংলা আঁকড়ে ধরে আছে। তাই ধাপে ধাপে এখানে বিধানসভায় বামপন্থীরা এগিয়েছে এবং ১৯৬৭-তে দুটি বামপন্থী ফ্রন্ট হওয়া সত্ত্বেও কংগ্রেস সংখ্যালঘু হয়ে গিয়েছে। ১৯৬৭-তে একটি বামপন্থী ফ্রন্ট হলে এখানে কংগ্রেস যে ৫০।৬০-এর বেশি আসন লাভ করতে পারত না, এ কথা সকলেই বলে থাকেন। আসল কথা, বামপন্থী ঐক্যের নীতিটা যেন পঃ বাংলার মাটির সঙ্গে মিশে গিয়েছে। জনসাধারণের বোধের সঙ্গে এক হয়ে গিয়েছে, শুধু পার্টির মধ্যে তা আর সীমাবদ্ধ নেই। সেইজন্যই এখানের বিকাশ-ধারাকে কোনো দলগত সংকীর্ণতাও আটকাতে পারে নি।

আগের কথা ছেড়ে দিলেও, ১৯৬৭-র সাধারণ নির্বাচনের পূর্বাহ্নেও যে বামপন্থী ঐক্যের প্রশ্ন উপযুক্ত গুরুত্ব পায় নি তা ঘটনাবলীর মধ্যেই প্রমাণিত। নির্বাচনের আগে একাধিকবার সর্বভারতীয় বামপন্থী দলগুলি আলোচনা করে এবং শেষ পর্যন্ত বামপন্থী ঐক্যের প্রয়োজন সম্বন্ধে সিদ্ধান্তও গ্রহণ করে। কিন্তু সে-সিদ্ধান্তের মধ্যে সব রাজ্যের প্রতি একটা সাধারণ আবেদন ছাড়া আর কিছু ছিল না। এমন কোনো সিদ্ধান্ত ছিল না যাতে ঐক্যগঠনের জন্য সমবেত প্রচেষ্টা হতে পারে এবং এমন কোনো সিদ্ধান্তও ছিল না যার দ্বারা বিভিন্ন রাজ্যের ঐক্য-সংক্রান্ত বাধা ও সমস্যাগুলি অতিক্রম করার ব্যবস্থা করা যায়। এইরকম কার্যকর কোনো সিদ্ধান্তের অভাবে রাজ্যগুলির উপরই সব দায়িত্ব ছেড়ে দেওয়ার অর্থ হচ্ছে রাজ্যস্থ দলগুলির প্রবণতার উপরই যুক্তফ্রন্ট হওয়া না-হওয়া নির্ভরশীল করে রাখা। তার স্বাভাবিক পরিণতি যা হবার তাই হল। কয়েকটি জায়গায় যুক্তফ্রন্ট ঠিকমতো হল, আর বেশির ভাগ জায়গাতেই প্রকৃত যুক্তফ্রন্ট হল না। কেরালা, মহারাষ্ট্র ও ত্রিপুরায় যুক্তফ্রন্ট গড়ে উঠেছিল। পাঞ্জাবেও মোটামুটিভাবে গড়ে উঠেছিল। পঃ বাংলা ও অন্ধ্রে, যেখানে বামপন্থীরা বেশ প্রবল, সেখানে পরস্পর-বিরোধিতাই প্রবল হয়ে উঠলো। বিহার ও আসামে আংশিক ঐক্য হয়। উত্তরপ্রদেশ, মাদ্রাজ, উড়িষ্যা প্রভৃতি রাজ্যে যুক্তফ্রন্ট গড়ে তোলার চেষ্টা ব্যর্থ হয়। এই সব ব্যর্থতার প্রত্যেকটারই বাস্তব কারণ আছে নিশ্চয়ই। শুধু রাজ্যভিত্তিক দৃষ্টি দিয়ে দেখলে সে-ব্যর্থতাকে হয়ত অপরিহার্য মনে হবে। কিন্তু প্রশ্ন এই, দেশের সামগ্রিক ক্ষমতা-ভারসাম্যকে কংগ্রেসের প্রতিকূল করে তোলার দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে যদি বামপন্থী দলগুলি দৃঢ়সংকল্প প্রচেষ্টা চালিয়ে যেতেন, তাহলে হয়ত অনেক জায়গাতেই আভ্যন্তরীণ সমস্যার সমাধান করা যেত। নির্বাচনের পরে যদি যুক্তফ্রন্ট গভর্নমেন্ট হতে পারে অধিকতর দায়িত্ব পালনের জন্য, তা হলে তার ভিত্তি নিশ্চয়ই আগে থেকেই রচিত হয়েছিল। সেই ভিত্তিটাকেই বামপন্থী দলগুলি দেখতে পায় নি আগে।

যুক্তফ্রন্ট গঠনের পথে বাস্তব বাধা আসে কোন্ কোন্ দিক থেকে? সকলেই জানেন, প্রধান বাধা আসে আসন বণ্টনের প্রশ্নে। এই বাধার জন্যই মিলিত হওয়ার শুভ ইচ্ছা প্রকাশ করেও বামপন্থী দলগুলি এক মোর্চা গঠন করতে পারে না। এবং আগেই বলা হয়েছে এই বাধা আসে পার্টিগুলির নিজ নিজ শক্তি সম্পর্কে প্রতিযোগিতামূলক মনোভাবের অতিশয্যের থেকেই। দ্বিতীয় বাধা আসে, বামপন্থী না হলেও প্রগতিশীল শক্তি হিসাবে কংগ্রেস-বিরোধী ফ্রন্টে কাদের নেওয়া উচিত, সেই বিচার করবার সময়ে। এই বিচারে বামপন্থী দলগুলির মধ্যেই মতপার্থক্য দেখা দেয়। অথচ এটা পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে যে কংগ্রেস সংখ্যালঘু হয়ে যাওয়ার পর এই দুই বাধাকেই অতিক্রম্য বলেই সকলে মনে করেন। এ কথার দ্বারা আমি এটা বলতে চাইছি না যে, যে-সব রাজ্যে স্বতন্ত্র পার্টি, জনসংঘ প্রভৃতির সঙ্গেও একত্র গভর্নমেন্ট গঠন করতে হয়েছে, সেখানে আগে থেকেই তাদের সঙ্গেও এক নির্বাচনী ফ্রন্ট করা উচিত ছিল। গভর্নমেন্ট গঠনে তাদের সঙ্গে মিলিত হলেও, যথেষ্ট reservation রেখেই কি বামপন্থী দলগুলি তা করে নি? অন্তত কমিউনিস্টদের দিক থেকে reservation রেখেই তাদের সঙ্গে যোগ দেওয়া হয়েছে। কিন্তু ঐ সব পার্টির প্রতি বামপন্থীদের মনোভাব, আর অন্যদের প্রতি মনোভাব কি এক? অন্যদের বলতে আমি উল্লেখ করছি কংগ্রেস থেকে নতুন বেরিয়ে আসা শক্তিগুলির বিষয়ে। পঃ বাংলা, বিহার, উত্তরপ্রদেশ, পাঞ্জাব প্রভৃতি রাজ্যে তাদেরই নেতাদের মুখ্যমন্ত্রিত্ব দিতেও তো বামপন্থীদের আপত্তি হয় নি। এ-থেকেই বোঝা যায় যে এই শক্তিগুলিকে বামপন্থী মনে না করলেও প্রগতিশীল মনে করা হয়। পঃ বাংলার বাংলা কংগ্রেসের মতো সকলে না হলেও, প্রগতির অনুকূলেই তাদের ব্যবহার করা যায়। এবং স্বতন্ত্র, জনসংঘের প্রভাব থেকে এদের রক্ষা করার চেষ্টাও যে বামপন্থীরা করে, তার পরিচয়ও বিহার, উত্তরপ্রদেশ প্রভৃতির

মাসিক ১০ টাকা কিস্তিতে
ট্রানজিস্টার রেডিও

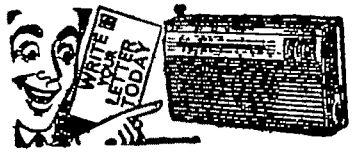

বিশ্ববিখ্যাত সর্বাধুনিক জাপান মডেল, চিত্তাকর্ষক শক্তিশালী, গ্যারান্টিযুক্ত "ওয়ার্ল্ডভয়েস" ৩ ব্যান্ড অল ওয়ার্ল্ড আশ্চর্যজনক নাইট ল্যাম্পযুক্ত, প্রত্যেক গ্রামে ও শহরে পাঠানো যায়।
Write to :—
ALL WORLD AGENCY,
(B. W.) Kalyanpur, Delhi-6

ক্ষেত্রে দেখা গিয়েছে। নির্বাচন-সংগ্রামে এই শক্তিগুলিকেই বামপন্থী মোর্চায় আনা যেত। কিন্তু আসন বণ্টনের সমস্যাই হোক আর এই শক্তিগুলিকে মিলিত করার প্রশ্নই হোক, কোনো প্রশ্নেরই সমাধান হতে পারে না, যদি যুক্তফ্রন্ট গঠনের নীতিকে যথোচিত রাজনৈতিক গুরুত্ব দিয়ে না গ্রহণ করা হয় নির্বাচনের আগে।

সব জায়গায় যুক্তফ্রন্ট গড়ে তোলার দৃঢ়সংকল্প চেষ্টা হলে সামগ্রিক পরিস্থিতি কত উন্নত হত, তা হিসাব করে দেখলেই বোঝা যাবে। উন্নতির সাধারণ দিক হচ্ছে এই যে, প্রথমত, দুই কমিউনিস্ট পার্টি মিলিত হলে শুধু কমিউনিস্ট আসনের সংখ্যাই অনেক বাড়ত তাই নয়, মিলিত কমিউনিস্ট শক্তির প্রভাব গিয়ে পড়ত অন্য বামপন্থী দলগুলির উপরও এবং তার ফলে বামপন্থী ঐক্য অত্যন্ত জমাট হয়ে উঠত। সকলেই জানেন যে, প্রধানত কমিউনিস্ট পার্টিদ্বয় মিলিত হতে না পারার জন্যই বামপন্থী দলগুলির মধ্যেও অনৈক্যের ঝোঁক বেড়েছিল। দ্বিতীয়ত, কমিউনিস্ট-শক্তির দৃঢ় ঐক্যের ভিত্তির উপর দাঁড়িয়ে যে বামপন্থী ঐক্য হত, তাতে জনসাধারণ এমনভাবে উৎসাহিত হত যে, সে-উৎসাহের প্রভাব এসে পড়ত কংগ্রেস থেকে ভেঙে আসা মধ্যবর্তী অবস্থানের শক্তিগুলির উপর এবং তাদের বামপন্থী মোর্চার দিকে ঝোঁক বাড়ত। তখন তাদের এক মোর্চায় পাওয়া অনেক সহজ হত। এবং গভর্নমেন্ট গঠনের পর তাদের দোদুল্যমানতাও তার ফলে অনেক কম হত, তাদের উপর দক্ষিণী পার্টিগুলির চাপও অনেক পরিমাণে অকেজো হয়ে যেত। আর, এই অবস্থার একটা সামগ্রিক প্রভাব পড়ত সারা দেশেই, যে সব রাজ্যে দক্ষিণী পার্টির প্রাধান্য, সেখানেও।

তথ্য দিয়ে হিসাব করলে উন্নতিটা আরো স্পষ্ট বোঝা যাবে। প্রথমত, লোকসভায় কংগ্রেসের সংখ্যাগরিষ্ঠতার ব্যবধান ৪৭-এর অনেক কম হত, এমন কি সংখ্যাগরিষ্ঠতা হারানটাও অসম্ভব ছিল না। সেরকম হলে তো কংগ্রেসের হাত থেকে কেন্দ্রটাই চলে যাবার অবস্থায় আসত। আর তা যদি নাও হত, তবু বামপন্থী সদস্যসংখ্যা যথেষ্ট বাড়ত, বিশেষ করে দুই কমিউনিস্ট পার্টি মিলিয়ে স্বতন্ত্র পার্টির সদস্যসংখ্যার চেয়ে বেশি হত নিশ্চিত। লোকসভার চরিত্রেই তাতে যথেষ্ট পরিবর্তন আসত। রাজ্য হিসাবে দেখতে গেলে, পঃ বাংলা দাঁড়িয়ে যেত ঠিক কেরালার মতো এবং তা হলে এখানে কায়েমী স্বার্থের চক্রান্ত সফল হতে তো পারতই না, উপরন্তু সারা ভারতে পঃ বাংলা ও কেরালার বিপুল প্রভাব পড়ত। মাদ্রাজে কমিউনিস্ট সদস্যসংখ্যা আরো বাড়ত এবং তাতে ডি-এম-কের উপর বামপন্থী রাজনীতির প্রভাবও বাড়ত। অল্পে স্বতন্ত্র পার্টির শক্তিবৃদ্ধি হয়েছে কমিউনিস্ট শক্তিদ্বয়ের পরস্পর-বিরোধিতার সুযোগেই। তা না হলে স্বতন্ত্র পার্টিও এত বাড়ত না এবং কমিউনিস্ট শক্তিও ১৯৬২-র মতো তো হতই, বরং তার বেশি হওয়াই সম্ভব ছিল। আর, বিহার, উত্তরপ্রদেশ ও পাঞ্জাবের ক্ষেত্রে কমপক্ষে-এইটুকু হত যে, বামপন্থী সদস্যসংখ্যা আরো বেশি হওয়ার ফলে রাজনৈতিক উদ্যোগও তাদের হাতে যেমন বেশি আসত, তেমনি দলত্যাগ-জনিত মন্ত্রিত্ব-সংকটও এত বাড়ত না। এ ছাড়া, বামপন্থী ঐক্যের এমন একটা সর্বভারতীয় প্রভাব পড়ত যে, দুর্বল জায়গাগুলিতেও বামপন্থী রাজনীতির দিকে জনসাধারণ ঝুঁকত। এককথায়, শুধু কংগ্রেসের পরাজয় আরো বেশি হত তাই নয়, দক্ষিণী-প্রতিক্রিয়ার শক্তিবৃদ্ধিও অনেক পরিমাণে প্রতিহত হত।

বাস্তব সম্ভাবনা ছিল এটাই। এই সম্ভাবনা কাজে পরিণত হয় নি তা ঠিক, কিন্তু সম্ভাবনা থেকেই গিয়েছে। তা না হলে এতগুলি রাজ্যে কংগ্রেস সংখ্যালঘু হয়ে যেত না, বর্ধিতশক্তি হয়েও দক্ষিণী-প্রতিক্রিয়ার পার্টিগুলি দেশের রাজনীতির মোড় ঘোরাতে ব্যর্থ হত না। পাঞ্জাব, বিহার, উত্তরপ্রদেশ যে মধ্যপ্রদেশ ও রাজস্থানের মতো হয়ে গেল না, যুক্তফ্রন্ট-সরকারের স্থায়িত্ব না হলেও যে বামমুখী ও দক্ষিণমুখী গতির প্রবল সংঘাতের মধ্য দিয়ে চলতে হয়েছে এ-রাজ্যগুলিকে এবং এই সংঘাতই যে শেষ পর্যন্ত মধ্যবর্তীদের নির্বাচন করতে বাধ্য করেছে, এটাই তো প্রমাণ করে সম্ভাবনার শক্তি কত প্রবল।

অর্থাৎ, ইতিহাসের শিক্ষা ব্যর্থ হবার নয়। তাই নির্বাচনের আগে যে ঐক্য গড়ে ওঠে নি, নির্বাচন-ফলাফল সেই ঐক্য গড়ে তুলল। কিন্তু এক পর্যায়ের ক্ষতি হঠাৎ পূরণ হয়ে যেতে পারে না, অন্য পর্যায়ে এসেই। ক্ষতির জের সামলে চলতেই হয়। নির্বাচন-পরবর্তী যুক্তফ্রন্ট-গভর্নমেন্টগুলি হল এই ক্ষতির বোঝা নিয়েই। যেরকম নিশ্চিত সংখ্যাগরিষ্ঠতা হতে পারত, তা না হয়ে হল কোনরকম সংখ্যাগরিষ্ঠতা। ঐক্যবদ্ধ সংগ্রামের মধ্য দিয়ে গেলে যেরকম নীতি-নিষ্ঠা ও অভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গি গড়ে ওঠে, তা না হয়ে হল শুধু প্রয়োজন-ভিত্তিক ঐক্য, যার মধ্যে অজস্র দুর্বলতা ও গোঁজামিল থাকবেই তজ্জনিত সমস্যাও থাকবেই। এগুলিই হল ক্ষতির বোঝা। কিন্তু বোঝা সত্ত্বেও চলা থামে নি, বরং চলার গতিবেগ বেড়েছে। এবং চলার গতিবেগই বোঝাকে ক্রমশ হাল্কা করে ফেলবে, বোঝা কমিয়ে দেবে, অগ্রগতিকে বাধামুক্ত করবে।

ভারতের
আদিতম
রসায়ন

চ্যবনপ্রাশ

আয়ুর্বেদোক্ত বিশুদ্ধ উপাদানে প্রস্তুত

চ্যবনপ্রাশ নূতন ও পুরাতন সর্দ্দি কাশি, স্বরভঙ্গ ও শ্বাসযন্ত্রের পীড়ায় বিশেষ উপকারী।

টনিক হিসাবে নিয়মিত ব্যবহারে দেহের দৌর্ব্বল্য ও রুগ্নতা দূর করে ও শরীরের পুষ্টি সাধন করিয়া স্বাস্থ্যশ্রীর পুনরুদ্ধার করে।

বেঙ্গল কেমিক্যাল

কলিকাতা বোম্বাই কানপুর

বার্লিনে নেতাজী

অশোক সেন

[পূর্ব-প্রকাশিতের পর]

১৯৩৩ সালে হার্বার্ট স্রোডার—ইনি ছিলেন 'জার্মান শর্টওয়েভ স্টেশনের' প্রধান বিভাগের সব থেকে বড়কর্তা—এই সম্পর্কে লিখলেনঃ "এইবার যুদ্ধের একটি চতুর্থ রণাঙ্গন খোলা হোল। জলে, স্থলে এবং নভোমণ্ডলেই এ পর্যন্ত যুদ্ধ ব্যাপারটাকে আবদ্ধ রাখা হয়েছিল—এখন থেকে ইথারের ভেতর দিয়েও যুদ্ধের পরিকল্পনা চলবে—" (এইচ স্রোডার রচিত "এ স্টেশন কল্‌করস্ দি হার্টস অভ্ দি ওয়ার্ল্ড", ১৯৪০, পৃষ্ঠা ১২)। এর অল্প পরেই ফ্যাসিস্ট বৈদেশিক প্রপাগাণ্ডার জন্য একটি বিশেষ সমিতি স্থাপিত হয়—এর নাম ছিল 'জার্মান ফরিন রেডিও সোসাইটি, ইণ্টার-রেডিও এজি'। এর ১৯৪১-এর নির্ধারিত কার্যতালিকায় লেখা ছিল—"বর্তমান যুদ্ধে—যেমনটা আগেকার কোন যুদ্ধের সময় হয় নি—কণ্টিনেণ্টের সব দেশগুলোতে "জনমত" অনেক কিছুই নির্ধারণ করছে। অভিজ্ঞতা থেকে প্রমাণিত হয়েছে যে রেডিও হচ্ছে সর্বাধুনিক এবং পৃথিবীব্যাপী প্রচারের মাধ্যম—বিভিন্ন দেশের বিভিন্ন জাতির উপর রেডিও-র যে প্রভাব বিস্তার করবার ক্ষমতা, তার কোন সীমা-পরিসীমা নেই। শত্রুর শৃঙ্খলা ও আত্মবিশ্বাসের নৈতিক শক্তি, অন্তরের অদম্য তেজ সব কিছুই নষ্ট করে দেওয়া যায় এই বেতার-অস্ত্রের সাহায্যে। বেতারকে এমন ভয়াবহভাবে কাজে লাগানো যায় যার ফলে শত্রুপক্ষকে সম্পূর্ণভাবে ধ্বংস করা যেতে পারে—বেতার সৈন্যবাহিনীর প্রধান সহায়ক হিসাবে কাজ করছে এই যুদ্ধে (ফ্রম দি রিনবনট্রপ মিনিস্ট্রি টু দি ফেডারেল চান্সেল্লারস অফিস, ডকুমেণ্টেশন অন দি পেস অভ্ কিসিঙ্গার, ডকুমেণ্ট বাম্বার এইট)।"

হিটলার এবং রিবেনট্রপ রেডিও ব্রডকাস্টের সাহায্যে ভারত আক্রমণের আগে এ বিষয়ে প্রস্তুতিপর্ব সমাধা করবার ব্যবস্থা করেছিলেন। জার্মান নাৎসী শাসকেরা তাঁদের এই পরিকল্পনাকে সাফল্যমণ্ডিত করবার জন্য নেতাজীকে কাজে লাগাতে চাইছিলেন। কিন্তু সুভাষচন্দ্র বেশ ভালভাবেই জানতেন যে ফ্যাসিস্টদের নিজস্ব পরিকল্পনা হচ্ছে অন্যের রাজ্য অন্যায়ভাবে পশুশক্তির দ্বারা অধিকার করে নিয়ে, নিজেদের রাজ্যবিস্তার করা। এও তাঁর অজ্ঞাত ছিল না যে ১৯১৪ সালে জার্মান শিল্পপতি টিসেন দাবি জানিয়েছিলেন ভারত বিজয়ের এবং ১৯১৮ সালে ইস্টার্ন এশিয়াটিক সোসাইটি গোয়া, দমন, দিউকে জার্মানীর কবলে আনবার জন্য উঠে-পড়ে লেগেছিল। একথাও নেতাজীর জানা ছিল যে হিটলার এবং তাঁর সাঙ্গপাঙ্গের দল ভারতীয়দের সঙ্গে অত্যন্ত ঘৃণিত ব্যবহার করে। বৃটিশের শাসনের কবল থেকে স্বদেশভূমি এবং স্বদেশবাসীকে মুক্ত করবার জন্য নেতাজী নিজের জীবনকে সম্পূর্ণভাবে উৎসর্গ করেছিলেন। দেশের স্বাধীনতা আনবার জন্যই তিনি স্বদেশ ত্যাগ করে চলে এসেছিলেন—জার্মানীতে থেকে কিভাবে সেই পবিত্র স্বপ্নকে সফল করে তোলা যায় এই চিন্তাই হল তাঁর দিনরাতের ধ্যানের মত। কিন্তু নেতাজীর আদর্শ এবং অভিসন্ধির সঙ্গে ফ্যাসিস্টদের চিন্তাধারার এবং মতামতের এত বৈষম্য ছিল যে একথা তখন থেকেই বোঝা যাচ্ছিল যে, তিনি ওদের সঙ্গে মিলেমিশে কাজ করতে পারবেন না।

৩—জার্মানীতে নেতাজীর কাজের বিবরণীঃ (ক) গুপ্ত রেডিও স্টেশন কঙ্করডিয়া এইচ এ—প্রথমটায় অবশ্য নাৎসীনায়কদের সঙ্গে নেতাজীর মতের গরমিল এতটা চূড়ান্ত আকার ধারণ করে নি। ১৯৪১ সালের ২৪শে ডিসেম্বর রিবেনট্রপ অনুমতি দিলেন যে ভারতবর্ষে গুপ্ত বেতারবার্তা পাঠাবার ব্যবস্থা শুরু করা হোক। এর এক সপ্তাহ বাদে রিবেনট্রপের মিনিস্ট্রিতে একটি সভার অধিবেশন হয়। এই সভাতে উপস্থিত ছিলেন কূটনীতিক দপ্তরের কাউন্সিলর সোহিরমের, আইনজ্ঞ কিসিঙ্গার এবং অন্যান্য অনেকে। সভায় সবাই একমত হলেন যে একটি গুপ্ত রেডিও স্টেশন থেকে সপ্তাহে তিনবার নেতাজীকে ভারতবাসীদের উদ্দেশ্যে বক্তৃতা দিতে হবে। প্রথমে তাঁর বক্তৃতাকে রেকর্ড করে নেওয়া হবে এবং পরে বিকেল ৫-১৫ থেকে ৫-৪৫ মিনিট সে বক্তৃতা ব্রডকাস্ট করা হবে পাডিল্যাড স্টেশন থেকে।

গুপ্ত বেতার দপ্তর "আজাদ হিন্দুস্থান" ১৯৪২-এর ৭ই জানুয়ারী থেকে বার্তা পাঠাতে শুরু করলো। ১৯৪২ সালের ৭ই ফেব্রুয়ারী বার্লিন স্টেশন থেকে নেতাজী ভারতবাসীদের আহ্বান করে মুক্তি-সংগ্রাম শুরু করতে বললেন। অন্যান্য কথার ভেতর তিনি বলেছিলেন—"বৃটিশ এম্পায়ার গড়ে উঠেছে দস্যুবৃত্তি এবং লোভের উপর ভিত্তি করে—এখনও এই বৃটিশ সাম্রাজ্য বেঁচে আছে অন্যায় এবং অত্যাচারের উপর নির্ভর করে—এ সাম্রাজ্য যতকাল বেঁচে থাকবে একটানাভাবে অপরকে ভয় দেখিয়ে এবং শোষণ করে চলবে। ভারতীয়রা যদি নিজের দেশকে এই যুদ্ধের আওতার বাইরে রাখতে ইচ্ছা করে, তাহলে প্রথমেই তাদের নিজেদের দেশের বুকের উপর থেকে বৃটিশ মিলিটারী বেসের বিলোপসাধন ঘটাতে হবে। আরও দেখতে হবে যাতে কোনরকমেই বৃটিশেরা ভারতভূমিকে এই সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধের অনুকূলে কাজে লাগাতে না পারে (কিসিংস্ আরকাইভস্ অভ্ দি প্রেজেন্ট টাইম, ১৯৪২, ডকুমেণ্ট ৫৪২৯—ডি—)।

এই বেতারবার্তাটি ভারতে প্রেরিত হয়েছিল ১৯৪২ সালের ১৮ই মার্চ। এই গুপ্ত বেতারকেন্দ্র থেকে বৃটিশ আর্মির যুদ্ধরত ভারতীয় সৈনিকদের উদ্দেশ্যেও ভাষণ দেওয়া হোত। দলিলপত্র থেকে জানা যায় ১৯৪২ সালের অক্টোবরের মাঝামাঝি ভারতীয় সৈনিকদের তিনটি উপায়ে প্রপাগাণ্ডার দ্বারা প্রভাবিত করার প্রচেষ্টা করা হয়েছিল—

১। বৃটিশরা যুদ্ধবন্দীদের উপর কি অমানুষিক দুর্ব্যবহার করে তার বিবরণী দিয়ে।

২। বৃটিশ সরকার সম্পর্কীয় ভেতরকার নানা সত্যিকার ঘটনা এবং গুপ্ত দলিলপত্রের ভেতরকার কথা রেডিওর মাধ্যমে প্রচার করে বৃটিশ প্রেস্টিজের ক্ষতি করার প্রচেষ্টা করা হোত।

৩। ক্রমাগত ভারতীয় সৈনিকদের এবং পুলিশের লোকেদের কাছে আবেদন জানানো হোত; তারা যেন ইংলণ্ডের প্রতি বিরূপতা জানিয়ে ভারতের

জাতীয় আন্দোলনের অগ্রগতিতে সাহায্য করে।

উদাহরণস্বরূপ এই জাতীয় একটি ভারতে-প্রেরিত বেতারবার্তার অনুবাদ নিচে তুলে দেওয়া হোল :

"ভারতীয় সৈন্যদল!

স্বদেশের মহত্ত্ববর্ধন বা স্বজাতির ঔৎকর্ষ সাধনের জন্য যাঁরা প্রাণ উৎসর্গ করেন মৃত্যুর পর তাঁদের স্থান হয় স্বর্গোদ্যানে। কিন্তু স্বদেশের শত্রুর জন্য যুদ্ধ করতে গিয়ে যারা প্রাণ বিসর্জন করে তাদের স্থান হয় নরকে। এ ধরণের ঘৃণিত মৃত্যুর কথা কেউ কি ভাবতেও পারে.....আমাদের শমনরূপী শত্রু হল ইংরাজরা—বিগত দুশো বছর ধরে এরা আমাদের দাসানুদাস করে রেখেছে। এই ঘৃণিত শত্রু চিরটাকাল আমাদের দেশের সব কিছু লুণ্ঠন করেছে, আমাদের দেশের মানুষগুলোর রক্ত শোষণ করতে করতে তাদের জীবন্মৃত অবস্থার মধ্যে এনে দাঁড় করিয়েছে। ভারতীয় ভাইসব, ইংরাজরা সামান্য টাকার বেতন দিয়ে তোমাদের কেনা গোলাম করেছে। ইংরাজদের স্বার্থ সিদ্ধির জন্য তোমরা তোমাদের অমূল্য জীবন বিসর্জন দিও না —ওরা তোমাদের দেশের এবং জাতির মারাত্মক শত্রু, ওদের জন্য মরে নরকের গর্ভে গিয়ে লাভ কি.....আজাদ হিন্দুস্থান দীর্ঘজীবী হোক! হিন্দুস্থানের শত্রুদের উপর মৃত্যু বর্ষিত হোক। ভারতের বিভীষণরা এবং ইংলণ্ড নিপাতে যাক।"—আজাদ হিন্দুস্থান।

১৯৪২ সালের এপ্রিল মাস থেকে আজাদ হিন্দুস্থানের ভারতে বার্তাপ্রেরণ শুরু হয়। এর জার্মান সাংকেতিক নামকরণ হয়েছিল "কল্কোরাডিয়া এইচ"। প্রতিদিন দু' ঘণ্টা করে ওরা বার্তা পাঠাতো ভারতে, পরে আরও দুটি ট্রান্সমিটার বসানো হয়—ফলে ১৯৪২ সালের অক্টোবর মাস থেকে নিম্নলিখিত গুপ্ত ফ্যাসিস্ট স্টেশন থেকে ভারতে খবর প্রচার করা হোত :

১। কল্কোরাডিয়া এইচ বা "আজাদ হিন্দুস্থান", বিকাল চারটে থেকে ছ'টা পর্যন্ত। প্রত্যহ ইংরাজী, হিন্দী, বাংলা পার্শিয়ান, পুস্তু ও তামিল ভাষায় বেতারে বলা হোত। আর মাঝে মাঝে গুজরাটি, মারাঠী এবং তেলেগুতেও বেতার ভাষণ দেওয়া হোত। এই বার্তা প্রেরণ করা হোত শর্ট ওয়েভে ১৯·৭১ মিটারে হুইজেন থেকে এবং ২০·৩৪ মিটারে পডিব্র্যাড স্টেশন থেকে। আবার পরদিন সকালে ঐ একই খবরের পুনরাবৃত্তিও করা হোত ২০·৩৪ মিটারের ওয়েভ লেংথে পডিব্র্যাড থেকে সকাল ৩-৩০ মিনিট থেকে ৫-৩০ মিনিট অবধি।

২। কল্কোরাডিয়া এম বা "আজাদ মুসলিম"—বিকেল ৩-৩০ থেকে চারটে পর্যন্ত প্রত্যহ হিন্দীতে ভাষণ দেওয়া হোত। এর ওয়েভ লেংথ ছিল ১৯·৭১ এবং বেতারবার্তা প্রেরিত হোত হুইজেন থেকে।

৩। কল্কোরাডিয়া সি বা "ন্যাশনাল কংগ্রেস"—ইংরাজী, হিন্দী এবং বাংলাতে খবর বলা এবং প্রচার চালানো হোত হুইজেন থেকে শর্ট-ওয়েভে ১৯·৭১ মিটারে এবং পডিব্র্যাড থেকে ২০·৩৪ মিটারে।

খ—সেন্ট্রাল অফিস ফ্রি ইণ্ডিয়াতে নেতাজীর কর্মবিবরণী

জার্মানীতে নেতাজী উপরোক্ত অফিসের কর্মকর্তা ছিলেন। বার্লিনে এই অফিসের হেডকোয়ার্টার্স ছিল ২নং লিশটেন্সটাইনেলীতে (Berlin No. 2 Lichtensteinallea)। এদের কাজকর্ম শুরু হয় ১৯৪২ সালের জানুয়ারী মাসে। ১৯৪২ সালের অক্টোবর মাসে এদের অফিসে ২৫ জন ভারতীয় কর্মচারী ছিল এবং দশজন জার্মান সহকারী হিসাবে কাজ করতো।

Zentrale Freics Indien বা সেন্ট্রাল অফিস ফ্রি ইণ্ডিয়া অন্যান্য বিষয় ছাড়াও নিম্নোক্ত ব্যাপারগুলিতে খুবই সক্রিয় ছিল :

১। লিফলেট রচনা করা, অনুবাদ করা—এই সব প্রচারপত্র নর্থ আফ্রিকা, মিডল এবং নিয়ার ইস্টে বিলি করা হোত।

২। "ফ্রি ইণ্ডিয়া" সৈন্যবাহিনীর খবরদারি করা।

৩। ভারতীয় সংবাদপত্র "আজাদ হিন্দের" পাবলিকেশন করা।

৪। "ইণ্ডিয়া টু-ডে" নামে ধারাবাহিক প্রচার-পুস্তিকার প্রকাশ করা।

৫। জার্মানীর ভেতরের এবং বাইরের সমস্ত ভারতীয়দের মঙ্গলাচরণ করা।

নেতাজীর জার্মানী ত্যাগের পর মিস্টার নাম্বিয়ার Zentrale Freics Indien-এর প্রধান কর্মকর্তার দায়িত্ব গ্রহণ করেন।

৪—জার্মানীতে নেতাজীর উপর গোয়েন্দাগিরি

প্রথম থেকেই নাৎসীরা নেতাজী এবং তাঁর সহযোদ্ধাদের প্রতি মনে মনে অবিশ্বাস পোষণ করতো। নেতাজীর প্রতি পদক্ষেপের উপর কড়া নজর রাখা হোতো। তাঁর প্রতিটি চিঠি সেন্সর না করে বিলি করা হোত না। ভাবতে যে বার্তা প্রেরণ করা হোত তাও সেন্সারের আওতার বাইরে ছিল না। এমন কি ১৯৪২ সালে নেতাজী ক্রিপসের উদ্দেশ্যে যে খোলা চিঠি লেখেন তাও রিবেনট্রপের অনুমোদন নিয়ে তবেই প্রকাশিত হয়েছিল।

এমন কি জার্মানীতে প্রবাসী সমস্ত ভারতীয় দেশভক্তদের উপর নজর রাখবার জন্য বৈদেশিক দপ্তরের সংবাদ সংগ্রহ বিভাগে একটি বিশেষ ভারতীয় বিভাগ খোলা হয়েছিল। এই সময় উইলহেলম কেপলার ছিলেন 'স্টেট সেক্রেটারী ফর স্পেশাল ডিউটি'—এঁরই অধীনে ছিল উপরে বর্ণিত 'স্পেশাল সেকসন ইণ্ডিয়া'। ১৯৪২ সালের ১৩ই নভেম্বর কেপলারের বিভাগ থেকে যে 'ওয়ার্কিং সেডিউল ফর প্রপাগাণ্ডা টু-ওয়ার্ডস ইণ্ডিয়া' প্রকাশিত হয় তা থেকে জানা যায় এই বিভাগ 'সেন্ট্রাল অফিস ফ্রি ইণ্ডিয়ার' প্রচার সংক্রান্ত সমস্ত কার্যধারার উপর নজর রাখতেন এবং ভারতবর্ষে প্রেস এবং রেডিওর মাধ্যমে যা কিছু প্রপাগাণ্ডা করা হোত তার উপর তদারকি করতেন।

স্পেশাল সেক্সন ইণ্ডিয়ার কর্মচারীরা

মানুষের নাম

ধীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

বেঁচে থাকলে যাকে কুকুরের মত গুলী করতে
মৃত্যুর পর তাঁকে নিয়ে সভা করো!
তাঁর জন্মভূমিকে দু-আধখানা করে আজ তোমরা দিল্লীর
সিংহাসনে;
এখন চাও খি-খণ্ডিত বাংলাদেশের গভীরতর সর্বনাশ!
যেন তোমরা শেয়াল আর শকুন; সুভাষচন্দ্রের মৃতদেহ খুঁটে খেয়ে,
স্বপ্ন দেখছো, তারাই থেকে বঙ্গোপসাগর পর্যন্ত শুধু শ্মশান
আর ভূতের নাচ!

পরপর দু'বছর যে মানুষ ভারতীয় কংগ্রেসের সভাপতি
নির্বাচিত হয়েছিলেন,
তোমাদের শ্রদ্ধেয় নেতারা তাঁকে অনায়াসে ধুলোয় মিশিয়ে
দিতে চেয়েছিল!
যে আদর্শবাদী ষোল্ধা বয়কট ও অসহযোগ আন্দোলনের
রকমসকম দেখে
নচিকেতার মতই বিরক্ত হয়ে স্বয়ং নিজেকে যজ্ঞের দান হিসেবে
উৎসর্গ করেছিলেন;
তোমাদের মনে হয়েছিল তাঁকে জীবিত অবস্থায় পেলে
আসামীর কাঠগড়ায় দাঁড় করিয়ে তাঁর ফাঁসির হুকুম দিতে।

আজ বাংলাদেশের নির্বাচনী সভাগুলিতে
চারিদিকে পুলিশ পাহারা নিয়ে তোমরা ভোট ভিক্ষা চাও,
আর আমরা অবাক হয়ে শুনি!
তোমাদের মুখে নেতাজী সুভাষচন্দ্রের জয়ধ্বনি!
তোমরা কি ভাবো বাংলাদেশের মানুষকে, দু'দিন আগেও
তিস্তার বন্যায় যাদের তোমরা যমের দুয়ারে ভেসে যেতে
দিয়েছিলে?
যে বাংলাদেশের মুখের রক্ত আর বুকচেরা হাহাকার নিয়ে
তোমাদের প্রতিটি পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা,
তোমরা কি ভাবো, তোমাদের মুখে সুভাষচন্দ্রের নাম শুনে
সেই দেশ তোমাদের মত পিশাচদের ভোটের থালায়
নিজেদের সর্বনাশ ছুঁড়ে দেবে?

যদি তোমরা মহাভারতের সত্যিকারের নায়ক হতে;
আজ এই উলঙ্গ, বুভুক্ষ মহাদেশের কল্যাণ কামনায়
নিজেদের শরীর থেকে হাড় কখানা খুলে দিতে রাজী থাকতে,
তোমাদের অতীত অপরাধ বাংলার মানুষ ক্ষমা করতো।
কিন্তু তোমরা কেউ শ্মশানের অধিক নও, তোমরা শুধুই
শৃগাল আর শকুন
মিছেই মানুষের নামে সভা করো, মিছেই পুলিশ-
পাহারায় যাত্রাদলের রাজা সাজো!

ছাড়াও আরও কয়েকজন জাঁদরেল নাৎসী এই বিভাগের সঙ্গে সক্রিয় সভ্য হিসাবে যুক্ত ছিলেন।

বর্তমান বিভক্ত জার্মানীর একটি অংশের অন্যতম প্রধান কর্ণধার—ইনি সে সময় ছিলেন একজন যুবক আইনজ্ঞ—রিবেনট্রপের বৈদেশিক দপ্তরে সায়েন্টিফিক এ্যাসিসট্যান্টের কাজ নিয়েছিলেন। এঁর আসল নামটা না বলাই ভাল—ধরুণ এঁর নাম ছিল মিস্টার কি। বৈদেশিক দপ্তরের নতুন বেতার বিভাগের ইনি ছিলেন ডেপুটি হেড.....

রিবেনট্রপ এবং গোয়েবলসের ভেতর যোগাযোগ রাখবার ভার ছিল এই মিস্টার কি'র উপর। তিনিই ছিলেন রিবেনট্রপের কন্ট্যাক্টম্যান—তাই তিনি প্রপাগাণ্ডা মিনিস্ট্রির গুপ্ত অধিবেশনগুলোতে প্রত্যহ যোগ দিতেন—এই সব অধিবেশনে খুব নামজাদা কয়েকজন সভ্যেরই যোগ দেবার অধিকার ছিল। এ থেকে পরিষ্কার বোঝা যায় যে বৈদেশিক প্রচারের ব্যাপারে মিস্টার কি'র ক্ষমতা ছিল অপরিসীম। গোয়েবলস পর্যন্ত এঁর প্রশংসায় পঞ্চমুখ হয়ে উঠেছিলেন। পরে মিস্টার কি হেটার জার্মান রেডিওর ডিরেক্টর ফর এক্সটার্নেল ব্রডকাস্টিং পদে উন্নীত হন।

নেতাজীর রেডিও ভাষণের সেন্সারশিপের অর্ডার দিয়েছিলেন মিস্টার কি নিজে—তাছাড়া এ ব্যাপারে সময় সময় তিনি নিজেও কাজ করতেন। ১৯৪১ সালের ৩০শে ডিসেম্বর পররাষ্ট্রদপ্তরের একটি মিটিং-এ মিস্টার কি অংশ গ্রহণ করেছিলেন। এ মিটিং-এর মিনিটসে বলা হয়েছিল: "There was agreement that supervision of the broadcasts should be carried out, unnoticeable for Mazolta (i.e. Netaji), by playing back the gramophone recordings." বেতার ভাষণের সমস্ত বিষয়বস্তু বার বার ব্রডকাস্টিং পলিসি ডিপার্টমেণ্টে পাঠাতে হোত। মিনিস্ট্রি ফর দি এনলাইটেনমেণ্ট অভ দি পিপল এণ্ড প্রপাগাণ্ডাতে (গোয়েবলসের মিনিস্ট্রি) আর একটি অধিবেশন হয়—এতে আলোচনার বিষয় ছিল—"নেতাজীর উপর গোয়েন্দাগিরি চালাবার সব থেকে সেরা উপায় কি হতে পারে।" এই অধিবেশনে অংশগ্রহণ করেছিলেন ফরেন অফিসের তরফে মিস্টার কি, সিনিয়ার গভর্নমেণ্ট কাউন্সিলর মিস্টার সাউডিন (গোয়েবলের দপ্তর), জার্মান শর্টওয়েভ স্টেশনের মিস্টার ক্লাইনো এবং অন্যান্য কয়েকজন।

এই মিটিং সংক্রান্ত একটি নোটে বলা হয়: The censorship of the broadcasts is to be carried out extremely, cautiously, so that B (Bose) does not by any means become aware of it."

নেতাজীর উপর এই গোয়েন্দাগিরির ব্যাপার থেকেই স্পষ্ট বোঝা যায় দেশভক্ত প্রবাসী ভারতীয়দের সঙ্গে নাৎসীদের আসলে কোন আন্তরিক সদ্ভাব ছিল না। ১৯৪২ সালের শেষ দিকে নাৎসীরা নেতাজীকে তাদের হাতের কলের পুতুলের মত চালাবার জন্য যথেষ্ট চেষ্টা করেছিল। নেতাজী দেখলেন এই অবস্থায় তাঁকে হয় ফ্যাসিস্টদের হাতের যন্ত্র হয়ে চলতে হয়, অথবা প্রকাশ্যভাবে তাদের সঙ্গে সম্পর্কচ্ছেদ করতে হয়। কিন্তু এই দ্বিতীয় পন্থা অবলম্বন করলে নাৎসীরা তাঁকে কনসেনট্রেশান ক্যাম্পে পাঠিয়ে দেবে একথাও তিনি বেশ ভালভাবেই জানতেন। সেক্ষেত্রে তাঁর জীবনের স্বপ্ন, অর্থাৎ ভারতের স্বাধীনতার সংগ্রামকে সঠিকভাবে পরিচালিত করবার মত নেতাও কেউ থাকবে না। ধীরমস্তিষ্কে তিনি নাৎসীদের কবলমুক্ত হবার জন্য এক উপায় ঠিক করে নিলেন। দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়াতে জাপানের অগ্রগতিকে উপলক্ষ করে ১৯৪৩ সালের ৮ই ফেব্রুয়ারী একটি সাবমেরিনে তিনি বার্লিন থেকে জাপান অভিমুখে রওনা হলেন।

এই সময় নেতাজী যদি বার্লিন ত্যাগ না করতেন, তবে পরে নিশ্চয় নাৎসী বর্বরেরা তাঁকে হত্যা করতো।

॥ সমাপ্ত ॥

মধ্যবর্তী নির্বাচন ও বিভিন্ন সম্ভাবনা

সাংবাদিক

বাংলা দেশে মধ্যবর্তী নির্বাচনে কী ঘটবে তা নিয়ে গবেষণার শেষ নেই। সবাই বুঝতে চাইছেন, নির্বাচনের ফল কী দাঁড়াবে; অনেকেই বুঝতে পারছেন না। অল্প কিছু রাজনৈতিক উন্মাদ আছেন যাঁরা নির্বাচন বর্জনের আওয়াজ তুলে আলস্যের একটি অঙ্গুহাত বার করেছেন। আর সবাই ব্যস্ত; কেউ একটু বেশি, কেউ বা একটু কম।

১৯৬৯ সালে যখন নির্বাচন হচ্ছে সেই সময়ে রাজ্যে কোন দলীয় মন্ত্রিসভা নেই। এমনটি বাংলা দেশে এর আগে আর কখনো হয় নি। সবচেয়ে সাধারণ নির্বাচন হয়েছে কংগ্রেসের মন্ত্রিসভার আমলে। ১৯৬৭ সালের পূর্বে লোকের প্রায় একটি বদ্ধমূল ধারণা হয়ে গিয়েছিল, যা কিছুই হোক না কেন, কংগ্রেস তো ক্ষমতায় আসবেই—দুটো আসন কম বা বেশি, তাতে কোনো ইতরবিশেষ হবে না। চতুর্থ নির্বাচনের পরে জনমনের এই বিশ্বাস ভেঙে গেছে। সুতরাং মধ্যবর্তী নির্বাচনের আগে এই প্রশ্নটিই প্রধান : কে ক্ষমতায় আসবে—কংগ্রেস, না যুক্তফ্রন্ট?

নির্বাচনের আলোচনায় রাজনৈতিক মতপার্থক্য থাকবেই। যতটা সম্ভব রাজনৈতিক মত প্রকাশ সংযত রেখে বাস্তব ঘটনার উল্লেখ করে বিশ্লেষণ করলে সম্ভবত কেউ আপত্তি করতে পারবেন না। বাস্তব ঘটনায় দেখা যাচ্ছে, বাংলা দেশে কংগ্রেসের প্রভাব ক্রমান্বয়ে হ্রাস পাচ্ছে। ১৯৫২ থেকে ১৯৬৭ সাল পর্যন্ত দেখা গেল, নির্বাচনে কংগ্রেস যত বেশি আসন লাভ করেছে তদনুপাতে ভোট পায় নি। ১৯৬২ সাল পর্যন্ত কংগ্রেস কখনো প্রদত্ত ভোটের শতকরা ৫০ ভাগও লাভ করতে পারে নি। কিন্তু আসনের ভাগ নিয়েছে ৬০ শতাংশ, কিংবা তারও বেশি। এমন কি ১৯৬৭ সালেও দেখা গেছে, কংগ্রেস নির্বাচনে পরাজিত হওয়া সত্ত্বেও আসন পেয়েছে ১২৭টি অর্থাৎ ৪৫ শতাংশের কিছু বেশি; অথচ কংগ্রেসের প্রাপ্ত ভোট ছিল মোট প্রদত্ত ভোটের শতকরা ৪০ ভাগ।

এই বাস্তব ঘটনার তাৎপর্য হল, কংগ্রেস এই রাজ্যে সব থেকে বেশি লাভবান হয়েছে বরাবর বিরোধী ভোট ভাগ হয়ে যাবার ফলে। ১৯৬৭ সালেও কংগ্রেসবিরোধী ভোট ভাগ হয়েছিল। কিন্তু এখন কংগ্রেস আর পরাজয় এড়াতে পারে নি। তার কারণ সামগ্রিকভাবে কংগ্রেসের প্রভাব হ্রাস পেয়েছে।

আর একটি বাস্তব তথ্যের পরিবেশনে এই কথার প্রমাণ পাওয়া যায়। ১৯৫৭ সালে কংগ্রেস প্রতি আসনে ভোট পেয়েছিল গড়ে ১৯ হাজারের কিছু বেশি। ১৯৬২ সালে এই ভোট সংখ্যা কমে দাঁড়ায় ১৮ হাজারের কিছু বেশি। ১৯৬৭ সালে কংগ্রেস আসন পিছু ভোট পায় ১৭৭৫১।

১৯৬২ সালে কংগ্রেস বেশি আসন পেয়ে জয়ী হয়। কিন্তু কংগ্রেস প্রদত্ত ভোটের শতকরা ৫০টি কিংবা তার বেশি পেয়েছিল ১০৩টি আসনে। ১৯৬৭ সালে কংগ্রেস এরকম বেশি ভোট পেয়ে জয়ী হয়েছিল মাত্র ৩৯টি আসনে। এই ঘটনা থেকেও কংগ্রেসের প্রভাব হ্রাস পাবার প্রমাণ পাওয়া যায়।

বিরোধী ভোট ভাগাভাগি না হলে কিংবা কম ভাগাভাগি হলে কংগ্রেসের অবস্থা খুব কাহিল হয়ে পড়ে। ১৯৬৭ সালে ৩৬টি আসনে কংগ্রেসের সরাসরি প্রতিদ্বন্দ্বিতা হয়েছিল; এর মধ্যে কংগ্রেস পেয়েছিল মাত্র ৭টি আসন। ত্রিকোণ প্রতিদ্বন্দ্বিতা হয়েছিল ৮১টি কেন্দ্রে; তার মধ্যে কংগ্রেস পেয়েছিল ৩৯টি আসন। অর্থাৎ ১১৭টি আসনের মধ্যে কংগ্রেস পেয়েছিল ৪৬টি; আর বাকী ১৬৩টি কেন্দ্রে বহুমুখী প্রতিদ্বন্দ্বিতার দৌলতে কংগ্রেস পেয়ে গেল ৮১টি আসন।

১৯৬৯ সালে সরাসরি প্রতিদ্বন্দ্বিতা হচ্ছে ৬৪টি কেন্দ্রে আর ত্রিকোণ প্রতিযোগিতা ৮১টি কেন্দ্রে। ৬৭ টির অনুপাত অনুসারে কংগ্রেসের প্রাপ্য হয় ১৪৫টি আসনের মধ্যে ৫১টি এবং বাকি ১৩৫টি আসনের মধ্যে ৬৭টি; অর্থাৎ ২৮০ আসনের মধ্যে কংগ্রেসের থাকে ১১৮টি।

অঙ্কের হিসাবে মধ্যবর্তী নির্বাচনের ফল এই রকম হবার কথা। কিন্তু নির্বাচন ঠিক অঙ্কমাত্র নয়। আরো অনেক ঘটনার হিসাব করতে হয় নির্বাচনে।

প্রথম কথা, ১৯৬৯ সাল আর ১৯৬৭ এক নয়। ১৯৬৭ সালে সারা রাজ্য জুড়ে যে প্রবল কংগ্রেস-বিরোধী হাওয়া ছিল, এখন তা নেই। এইটি কংগ্রেসের পক্ষে অনুকূল ঘটনা। অন্যদিকে বামপন্থীরা ১৯৬৭ সালে দুইটি প্রবল বিরোধী শিবিরে বিভক্ত ছিল, এবার সকলে ঐক্যবদ্ধ। এইটি যুক্তফ্রন্টের পক্ষে অনুকূল ঘটনা।

দ্বিতীয়ত, এতাবৎকাল যাবতীয় প্রশাসনিক কাজ বা অকাজের কৈফিয়ৎ দিতে হয়েছে কেবল কংগ্রেসকে। এবার যুক্তফ্রন্টেরও সে দায় আছে। যদিও ২৪০ মাস আর ৯ মাস সমান নয়।

তৃতীয়ত, এবারে একটি বড় প্রশ্ন লোককে নাড়া দিচ্ছে। সে হল রাজ্যে সরকারের স্থায়িত্বের প্রশ্ন। যুক্তফ্রন্ট যে-হেতু অনেক দলের সমষ্টি, সুতরাং ফ্রন্ট স্থায়ী সরকার গঠন করতে পারবে না সম্ভবত। কংগ্রেস একদল। অতএব স্থায়িত্ব আনতে পারে কংগ্রেসই। ১৯৬৭-তে দেখা গেল, যুক্তফ্রন্ট সরকার ৯ মাসের বেশি টিকতে পারল না।

বিশ্লেষণ করলে এই যুক্তির ত্রুটি ধরা পড়ে। সারা ভারতে একমাত্র মহারাষ্ট্র মহীশূর ও গুজরাট ছাড়া আর কোথায় স্থায়িত্বের কথা জোর করে বলা যায়? ১৯৬৭ সালের নির্বাচনের পর উত্তরপ্রদেশ কংগ্রেসই মন্ত্রিসভা গঠন করেছিল। স্থায়ী হল? হল না। হরিয়ানায় ঠিক তাই। সেখানে অন্তর্বর্তী নির্বাচনের পরেও মন্ত্রিসভা গঠন করেছে কংগ্রেসই; কিন্তু তা এখন টলমল করছে। মধ্যপ্রদেশের ইতিহাসও তো তাই। রাজস্থানেও কংগ্রেস সরকারী ক্ষমতা দখলে রাখতে পেরেছে মন্ত্রীর সংখ্যা প্রচুর বাড়িয়ে দিয়ে। স্থায়িত্বের প্রশ্নে এই সব রাজ্যের চেয়ে যুক্তফ্রন্ট সরকারের অধীনে কেরালার অবস্থা অনেক ভালো; কিংবা ডি-এম-কে শাসনের অধীন তামিলনাড়ু রাজ্যে।

তাছাড়া, পশ্চিমবঙ্গে যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রিসভা অপসারণের ব্যাপারে কংগ্রেসের ভূমিকা ঠিক ধোয়া তুলসীপাতা গঙ্গাজলের মতো ছিল কি? এই রাজ্যে দলত্যাগের যে হিড়িক পড়েছিল সে ব্যাপারে কংগ্রেসের ভূমিকা ছিল মুখ্য। শেষ পর্যন্ত দলত্যাগের ব্যাধি কংগ্রেসের ঘরেও ঢুকে পড়ে সমস্ত ব্যবস্থাটাকেই তছনছ করে দিয়েছে।

কংগ্রেসের হায়দ্রাবাদ অধিবেশনে প্রকাশ্যে বলা হয়েছিল, অ-কংগ্রেসী মন্ত্রিসভাগুলিকে উৎখাত করার জন্য চেষ্টা

করতে হবে। এই প্রশ্নে প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী গান্ধীর সঙ্গে অন্যান্য কংগ্রেস নেতার মতান্তরের ঘটনাও গোপন থাকে নি।

সমগ্র ঘটনার বিচার-বিশ্লেষণ করলে এই যুক্তি বরং কংগ্রেসের প্রতিকূল হতে পারে, অনুকূল তো নয়ই।

আর বিরোধের কথা? যুক্তফ্রন্টে যে বিরোধ আছে কংগ্রেসের মধ্যে বিরোধ কি তার থেকে কম?

চতুর্থ প্রশ্ন বাংলা দেশের উন্নয়নের প্রশ্ন। এ রাজ্যে যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রিসভা গঠন করলে কেন্দ্রের সঙ্গে বিবাদ-বিরোধ অনিবার্য। আর তার ফলে বাংলা দেশের উন্নয়ন ব্যাহত হবে।

পাল্টা প্রশ্ন করা যায়ঃ ১৯৬৭ সালের আগের বছর পর্যন্ত তা হলে কী হয়েছে? ১৯৫৩ সাল থেকেই বাংলা দেশ অন্যান্য রাজ্য থেকে পেছিয়ে পড়তে লাগল কেন? ১৯৪৭ সালে বাংলা দেশ ছিল ভারতের অন্য সকল রাজ্য থেকে শিল্পে সর্বাগ্রগণ্য। ১৯৬৬ সালে বাংলা দেশ শিল্পে চতুর্থ স্থানে গিয়ে পড়ল কেন? তখন পর্যন্ত তো এ রাজ্যে একটানা কংগ্রেস শাসনই বহাল ছিল।

কংগ্রেসের শাসন বহাল থাকা সত্ত্বেও এ রাজ্যে কৃষি কেন সঙ্কটাপন্ন হয়েছিল? ১৯৬৬ সাল পর্যন্ত এ রাজ্যে বিঘাপ্রতি ফলন ক্রমশ হ্রাস পেয়েছে। রাজ্যের ১৩৪ লক্ষ একর কৃষিজমি; তার মধ্যে ১৯৬৬ সাল পর্যন্ত মাত্র ২০ শতাংশে সেচের ব্যবস্থা ছিল। কেন?

শুধু বাংলা দেশ নয়, সমগ্র পূর্বাঞ্চলকে কেন্দ্রীয় সরকার বরাবর উপেক্ষা করে এসেছেন। অথচ এই অঞ্চল থেকেই দেশের প্রয়োজনীয় বৈদেশিক মুদ্রার বেশির ভাগ আয় হয়ে থাকে।

এই ব্যাপারটা কেবল কংগ্রেস বা যুক্তফ্রন্টের তলনাব ব্যাপার নয়। এর সঙ্গে জড়িত রয়েছে কেন্দ্রীয় সরকারের সমগ্র নীতির প্রশ্ন, কেন্দ্র-রাজ্য সম্পর্কের প্রশ্ন। বাংলা দেশ সমেত সমগ্র পূর্বাঞ্চলের ক্রমোন্নতির স্বার্থে কেন্দ্রীয় নীতির পরিবর্তন প্রয়োজন আছে। রাজ্যের কংগ্রেস এই নিয়ে কেন্দ্রের মুখোমুখি দাঁড়াতে পারবেন কি? বিশ বছরের অভিজ্ঞতা থেকে ওরকম কিছু আশা করার কারণ খুঁজে পাওয়া যায় না।

পঞ্চম প্রশ্ন হল অরাজকতা, আইন-শৃঙ্খলা ইত্যাদি। যে যাই বলুক, অরাজকতা দেশের সব জায়গায়ই প্রায় সমান। এক্ষেত্রে কংগ্রেসরাজ্য আর অ-কংগ্রেস-রাজ্যে কোনো বিশেষ পার্থক্য নেই। কোনো কোনো ক্ষেত্রে খবরের কাগজে ফলাও করে ঘটনার অতিরঞ্জিত বিবরণ ছাপা হয়, আবার কোনো কোনো ক্ষেত্রে তা চেপে যাওয়া হয়।

একটি উদাহরণ উল্লেখ করছি। এই সেদিন—নভেম্বর মাসে—সৌরাষ্ট্রে গোলমালের ফলে একটি কারখানা সম্পূর্ণ ভস্মীভূত হয়ে যায়, ক্ষতির পরিমাণ এক কোটি টাকারও বেশি। অথচ খবরের কাগজে এই ঘটনার তেমন কোনো উল্লেখযোগ্য বিবরণ প্রকাশিত হয় নি। কলকাতায় বা পশ্চিমবাংলার কোনো এলাকায় এর সিকি পরিমাণ ঘটনা ঘটলেও দেখা যেত দেশ-বিদেশের কাগজে কাগজে কী তুমুল কাণ্ড।

বাংলা দেশে নির্বাচনী আলোচনার মধ্যে কিন্তু অরাজকতার প্রশ্নটি রয়েছে। এ রাজ্যের বিধানসভার ২৮০টি আসনের মধ্যে শতকরা ৭০টির সদস্য নির্বাচিত হয়ে আসেন গ্রামাঞ্চল থেকে। রাজ্যে মোট ভোটদাতা ২ কোটির কিছু বেশি। তার মধ্যে গ্রামাঞ্চলের ভোটদাতার সংখ্যা প্রায় দেড় কোটি। এর মধ্যে কম-বেশি জমির মালিকের সংখ্যা ৩৪ লক্ষ আর প্রায় ১৬ লক্ষ হল ক্ষেতমজুর। জমি আছে এমন চাষীরা অরাজকতার ভয়ে খানিকটা ভীত। এদের মধ্যে এমন একটি ধারণা সৃষ্টি করা হচ্ছে যে, যুক্তফ্রন্ট জিতলে 'গণ কমিটি' করে চাষীর জমি কেড়ে নেবে। এতে কৃষকসমাজ ভয় পাচ্ছে। এই ঘটনা কংগ্রেসের অনুকূলে কাজ করছে।

কিন্তু এরও অন্য একটি দিক আছে। গ্রামাঞ্চলে এবার দেখা যাচ্ছে, কৃষি-পণ্যের—ধান, আলু প্রভৃতির দর অস্বাভাবিক রকম কম। পণ্য বিক্রয় করে চাষীর কৃষি-ব্যয় পোষাচ্ছে না। এই ঘটনাও কৃষককে চঞ্চল করে তুলেছে। অনেকের যুক্তফ্রন্টের আমলে দর রক্ষার ঘটনার কথা মনে আছে। এই ঘটনা যুক্তফ্রন্টের অনুকূলে।

অবশ্য কৃষকসমাজ কাকে সমর্থন করবে সে কথা বোঝা যাচ্ছে না। এবারের নির্বাচনে এইটি একটি অনিশ্চয়তার প্রতীক।

দ্বিতীয় অনিশ্চয়তা হল মুসলমান ভোটদাতার মনোভাব। রাজ্য বিধানসভায় প্রায় ৩৫টি আসন আছে যার ফলাফল নির্ধারিত হয় মুসলমান ভোটে। ১৯৬৭ সালে পশ্চিম দিনাজপুর এবং মুর্শিদাবাদ ছাড়া আর প্রায় সব জায়গায় মুসলমান ভোট বেশির ভাগ পড়েছিল কংগ্রেসের বিরুদ্ধে। এবার মুর্শিদাবাদে এবং পশ্চিম দিনাজপুরে কংগ্রেসের ক্ষতির আশঙ্কা আছে। অন্যান্য এলাকা থেকে কংগ্রেসের ক্ষতিপূরণের সম্ভাবনা কম। সে সব জায়গায় প্রগ্রেসিভ মুসলিম লীগ এবং লোকদল ব্যাপকভাবে মুসলমান ভোট বিভক্ত করবে বলে মনে হয়।

বাংলা দেশে মধ্যবর্তী নির্বাচনে মোট ২৮টি দল ও গোষ্ঠী প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছে। কিন্তু প্রধান প্রতিযোগিতা হবে কংগ্রেস আর যুক্তফ্রন্টের মধ্যে। বেশির ভাগ দল ও গোষ্ঠীর মধ্যেই যুক্তফ্রন্টের বিরোধী মনোভাব প্রবল। ১৯৬৭ সালে প্রবল ছিল কংগ্রেস-বিরোধী মনোভাব।

কিন্তু দল হিসাবে কংগ্রেসের একটি বিশেষ অসুবিধা আছে। পশ্চিমবঙ্গে কংগ্রেস অন্তর্দ্বন্দ্বে দুর্বল হয়ে পড়েছে এবং আরও দুর্বল হচ্ছে। এখনি কংগ্রেস এই দুর্বলতা কাটিয়ে উঠতে পারবে বলে মনে হয় না।

কংগ্রেসের ভেতরকার বিবাদ সব থেকে তীব্র এবং তিক্ত হল উত্তরবঙ্গে, পুরুলিয়ায়, বাঁকুড়ায়, বীরভূমে, বর্ধমানে, ২৪ পরগনায় এবং কলকাতায়। বিরোধ কম মেদিনীপুরে, হুগলীতে এবং হাওড়ায়।

রাজ্যের ষোলটি জেলার পুঙ্খানুপুঙ্খ বিশ্লেষণ না করেও বলা যায়, এবার কংগ্রেসের ক্ষতি হবে উত্তরবঙ্গের ৫টি জেলায়, পুরুলিয়ায়, বীরভূমে, বর্ধমানে, হাওড়ায়, কলকাতায় এবং মুর্শিদাবাদে। হুগলীতে কংগ্রেসের কিছু লাভ হতে পারে। নদীয়ায় অবস্থা প্রায় সমান সমানই থাকবে বলে মনে হয়। বাঁকুড়াতে অবস্থার তেমন বড় রকমের পরিবর্তন হবে না।

অর্থাৎ শেষ পর্যন্ত ফলাফল নির্ধারিত হবে দুটি জেলা দিয়ে। সেই জেলা ২৪ পরগনা এবং মেদিনীপুর। ১৯৬৭ সালে কংগ্রেস এই দুটি জেলার ৮৫টি আসনের মধ্যে পেয়েছিল ২৪টি। এবার মেদিনীপুরে কংগ্রেস তার আসন বাড়াতে পারবে বলে মনে হয়। কিন্তু তা মোট আসনের (৩৫) শতকরা ৫০ ভাগ হবে না।

বাকী রইল ২৪ পরগনা (আসন ৫০টি)। ১৯৬৭ সালে কংগ্রেস পেয়েছিল ১২টি। এবার?

এ প্রশ্নের জবাব আমি দিতে পারব না। এই প্রশ্নটির জবাব পেলেই মধ্যবর্তী নির্বাচনের ফলাফল ঘোষণা করে দেওয়া যেতে পারে।

অবশ্য সমগ্র পরিস্থিতি একেবারে বদলে যেতে পারে, যদি গ্রামাঞ্চলের মাঝারী কৃষক কোনো রকমে দিক পরিবর্তন করে। যেদিকে তাঁরা ঝুঁকবেন সেদিকে ভোটের প্লাবন আসবে।

কোন্ দিকে ঝুঁকবেন মাঝারী কৃষক? এ প্রশ্নেরও জবাব আমি দিতে পারছি না।

(২১-১-৬৯)

পথ কোথায়?

মনোজ বসু

[পূর্ব-প্রকাশিতের পর]

॥ পঞ্চত্রিংশ ॥

মল্লিকঘাটে শ্রীধর মল্লিকের বৈঠকখানা-ঘর জমজমাট। বক্তা সেই নীলকণ্ঠ বর্মা—যাত্রাওয়ালা প্রমথ বিশ্বাস ও অন্য সকলে শ্রোতা।

বলছেন, এমনিই হয়। রুশ-বিপ্লবের আমলে ঠিক এই জিনিস। জারের এত প্রভাব-প্রতিপত্তি ছায়ার মতন মিলিয়ে গেছে। পায়ের নিচে মাটি পাচ্ছেন না নিকোলাস। দুনিয়ার মধ্যে আপন বলতে রানী আর গুটিকয়েক পরিচারক। রাজকীয় শক্তির মূলাধার হল সৈন্য-পুলিশ—তাদের বন্দুকের নল। সেই নল উল্টো দিকে ঘুরে যায় এবার।

জার নিকোলাস বুঝেছেন অবস্থা। সর্ববস্তুর অনটন চলছে—দিনের পরে দিন বছরের পর বছর কিউ দিয়ে দিয়ে ঐ কর্মে মানুষ নিরতিশয় পটু। রুটির জন্য দুধের জন্য কয়লার জন্য মানুষ বরাবর কিউ দিয়ে এসেছে—কিউয়ে দাঁড়িয়ে এখন আর ছিঁটে-ফোঁটাও মেলে না, সমস্ত কালো-বাজারে ঢুকে গেছে। তার জন্যে আলাদা তদ্বির। কিউয়ের অভ্যাসটা লোকে তবু ছাড়ে নি। কিউ দিয়ে দাঁড়ায় এখন গরম গরম রাজনৈতিক বক্তৃতা শোনার জন্য। সকলের মনের উত্তপ্ত ফুলকি বক্তৃতার ভাষায় আগুন হয়ে দাউদাউ করে জ্বলে।

উদাসীন জার। সমস্ত ছেড়েছুড়ে গাঁ-গ্রামের ভদ্রলোকের মতন নিরিবিলি থাকতে চান। যত-কিছু দায়দায়িত্ব রানী নিয়ে নিয়েছেন। জর্মন-কন্যা তিনি, লড়াইটা আবার জর্মানের সঙ্গেই। রাস-পুটিন নামে এক গেঁয়ো দৈবজ্ঞ ত্রাণকর্তা হয়ে প্যালেসে চেপে বসেছে— রানী তাঁর কথায় ওঠেন-বসেন। লোক দু-চক্ষে দেখতে পারে না রানীকে। যত অপদার্থ লোক নিয়ে তাঁর সরকার—আগুনে ফুলে তারা কলাগাছ হয়ে পড়েছে। মারাত্মক রক-মের অযোগ্যতা, তার উপর ঈর্ষা-বিদ্বেষ পরস্পরের মধ্যে। জনসাধারণ এত দুঃখ সয়ে আসছে এযাবৎ, সৈন্যরাও সাহসী সুচতুর—তবু কিন্তু লড়াই জেতার বিন্দুমাত্র আশা নেই। চতুর্দিকে বিশৃঙ্খলা। সেনাপতিরা উপরের কম্যাণ্ড গ্রাহ্যের মধ্যে না এনে নিজ নিজ বুদ্ধি-মতো সৈন্য চালনা করেন। সৈন্য, ওদিকে হাজারে হাজারে তৈরি হয়ে ক্যাম্পে দিন কাটাচ্ছে—ফ্রন্টে পাঠানো যাচ্ছে না যেহেতু রাইফেলের অভাব। লড়তে লড়তে হঠাৎ যা দেখা গেল গুলি-গোলা বিলকুল বাড়ন্ত, পৈতৃক প্রাণ নিয়ে পলায়ন ছাড়া তখন আর উপায় থাকে না। আহতেরা পড়ে পড়ে আর্তনাদ করে, হাসপাতালে পাঠানোর ব্যবস্থা নেই। রসদ বিহনে সৈন্যসামন্তের উপোস যাচ্ছে, আর সাই-বেরিয়ায় ওদিকে মাংস ডাঁই হয়ে পচছে, ওয়াগনের অভাবে চালান দেওয়া যাচ্ছে না।

সৈন্যদের মতিগতি ভাল নয় : দেশের জন্য আমরা মরতে রাজি, কিন্তু হামবড়া জেনারেলদের খেয়াল-খুশির বলি হতে পারব না।

চরম দিন দ্রুত ঘনিয়ে আসে। রাসপুটিনকে বিষ- খাইয়েছিল, তাতে মরে নি। বিস্তর কৌশলে অবশেষে হত্যা করল। কৃষকেরা বিক্ষুব্ধ : আমাদের একজন প্যালেসে জমিয়ে নিয়েছিল, কিছুতে ওরা সইতে পারল না— খুন করে নিশ্চিন্ত হল। জারিনা অবসাদে ভেঙে পড়ছেন। তাঁকে চাঙ্গা করবার জন্য জাল-চিঠি পাঠানো হচ্ছে জন-সাধারণের নামে : এমন মহীয়সী সেবা-ব্রতা রানী ভবনে আর দ্বিতীয় নেই। হত্যার হুমকি দিয়ে তেমনি আবার পালটা চিঠি আসছে : রাসপুটিন বিহনে তার অনুগতদের ডেকে ডেকে চাকরি দিচ্ছে। রাসপুটিনের পরিণাম তোমারও, তার বেশি দেরি নেই।

ক্ষ্যা-র শলা-পরামর্শ। দুশ্চারিণী জারিনার সামনে মাথা নোয়াবো না— সেনাপতিরা তড়পাচ্ছে। বিপ্লবের পূর্বাভাস। আসন্ন বিপদ জারকে শোনাতে যায় কেউ কেউ। নিস্পৃহ নিকোলাস—কে যেন কী বলছে কার সঙ্গে। এতটুকু চাঞ্চল্য নেই। জানলায় বসে দূরের অরণ্যে একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকেন। আঙুল দেখিয়ে বলছেন, জানো, ঐ বনের মধ্যে হাঁটতে হাঁটতে আজ চলে গিয়েছিলাম। দলবল নিয়ে নয়, একেবারে একলা। একলা যাওয়ার দিন পেলাম প্রথম আজ জীবনে। কী শান্তি, কী শান্তি? প্রাসাদের চক্রান্ত, অঞ্চলে অঞ্চলে অশান্তি, ফ্রন্টের গোলমাল— ভাবনা-চিন্তা সমস্ত ভুলে থাকা যায়। জীবনের নতুন আস্বাদ বনের মধ্যে।

ডায়রিতে এই সময়টা নিকোলাসের লেখা : ফাঁক পেলেই আমি তাস খেলতে চাই।

পেট্রোগ্রাডে প্রথম শুরু—রুটি পাচ্ছে না, তাই নিয়ে। (পরে জানা গিয়েছিল, রুটি প্রচুর ছিল—বিতরণে অব্যবস্থা।) শত শত কণ্ঠে চেঁচাচ্ছে : জর্মন স্ত্রীলোকটা (জারিনা) নিপাত যাক।

তারপর একদিন জনতার রায় এসে পৌঁছল : ছাড়ো সিংহাসন—

নিকোলাস হাউহাউ করে কাঁদেন রানীকে জড়িয়ে ধরে। চারিদিকে তাকান— এতটুকু দরদ নেই কোন মুখে, হাসি ছলছল করছে। প্রাসাদ থেকে বেরুলেন— ছ'টা সৈন্য বন্দুকে বাগিয়ে পিছনে। কুঁদো দিয়ে পিঠে ঠোক্কর দিল : ওপথে নয়, ওদিকে যাওয়া মানা।

জারিনা জানলা দিয়ে দেখতে পাচ্ছেন।

রাজা বন্দী। এ মূল্যবান মাল কোথায় নিয়ে রাখা যায়—মাথায় রাখলে উকুনে খায়, মাটিতে রাখলে পিঁপড়ে ধরবে? নিকোলাসকে মুক্ত করে আবার মসনদে বসাবে, একদলের চেষ্টা। ষড়যন্ত্র ফাঁস হয়ে গেল। ফরাসী বিপ্লবের শেষে যা ঘটেছিল, তেমনটি না হয়— রামচন্দ্র ফিরে না আসে!

সসম্ভ্রমে জারকে আহ্বান করে : একবারটি নিচে আসতে হবে যে হুজুর!

জার এখন নীরব, উদাসীন—কলের পুতুলের মতো যা বলে তাই করেন।

চেয়ার দিল বসতে। একজন লোক

অনতিদূরে কফির পাত্র রেখে উঠে এলো। বলে, হুজুরকে মুক্ত করবার জন্য নানা কলকৌশল খাটাচ্ছিল। অত হ্যাঙ্গামের দরকারটা কি? খুব সহজে আমি মুক্ত করে দিচ্ছি।

হতভম্ব জার বললেন, কি করবে?

এই যে, দেখুন না—

বন্দুক তুলে নিয়ে লোকটা গুলী করল। বুকের মাঝখানটায়। চেয়ার থেকে জার মাটিতে গড়িয়ে পড়লেন।

লোকটা নিজের জায়গায় ফিরে গিয়ে সামোভার থেকে কফি ঢেলে নিল পাত্রে। কিছুই নয়—যেন একটা পাগলা-কুকুর মেরে নির্ঝঞ্ঝাট হয়ে বসল। হাতে একটু রক্তের দাগ লাগে নি। মন প্রসন্ন।

তারপর একে একে সকলের ডাক পড়ল। জারের ঘরের প্রতিটি জন। ছেলে মেয়ে কাউকে বাদ রাখল না বংশে বাতি দেবার জন্য। মায় রাঁধুনি ও ডাক্তার। জারিনা বুকের উপর দুই হাতে ক্রশ করলেন—গুলি সেই ক্রশের উপরে।

তবু তারা বলে, অগুন্তি বাদ রয়ে গেছে। ক্ষুদে জার-জারিনা দুনিয়ার দেশে দেশে। সবাই নিপাত হয়ে যাবে।

আমাদের হরিহর খাঁ চৌধুরি একটা বুঝি তার মধ্যে।

একটুকু তন্দ্রা এসেছে, দেয়ালে ঠেস দিয়ে বীরেশ্বর চোখ বুজেছেন। আনোয়ার এসে ডাকল, উঠুন সার—

ধড়মড় করে উঠে বীরেশ্বর সুটকেস হাতে তুলে নিলেন।

আনোয়ার বলল, যাওয়া নয়। খিচুড়ি রান্না করেছে, আমায় ডাকতে পাঠাল।

বীরেশ্বর অবাক হয়ে বললেন, পথের উপর রান্নাবান্না? তা-ও তো সহজ রাজপথ নয়, চোরাই পথ।

আনোয়ার হেসে বলেন, আর বলেন কেন। বিদ্যে শিখুক আর ফ্যাসন করে বেড়াক, মেয়েছেলের স্বভাব যাবে কোথা? হাতা-বেড়ি দেখলেই হাত নিশপিশ করে। তার উপর একবয়সী দুটি জুটেছেন।

আমার তো চলবে না, বলোগে ওদের। রাত্রিবেলা খাই-ই না আমি প্রায়। বুড়ো হয়ে পেটের ক্ষিধে মরে গেছে।

পা ছড়িয়ে বীরেশ্বর বসে পড়লেন আবার।

তারাফুলি কোমর বেঁধে এলো ঃ খাবেন না কেন বলছেন দাদু? রাতে আপনি রুটি খান, ফুল্লরা বলল। একেবারে 'না' কেন বলে দিলেন? রুটি করে দিচ্ছি, এক্ষুণি হয়ে যাবে।

ভারি মিষ্টি মেয়ে। 'দাদু' বলে ঝগড়া করতে এসে লহমায় কেমন আপন হয়ে গেল। বীরেশ্বর স্নেহকণ্ঠে বললেন, রুটির ঝামেলায় যেতে হবে না দিদি।

ঝামেলা কোথা? খিচুড়ি হতে পারল, দু'খানা রুটিও হবে। দু'খানার বেশি খান না তো আপনি। আমার ভাইয়ের বাড়ি, জানেন। ভাবী নেই, আমায় দেখতে হচ্ছে। বাড়ির উপর উপোসি থাকা চলবে না।

জজ সাহেবের মতন রায় দিয়ে গট-গট করে চলে যায়। বীরেশ্বর ডেকে বললেন, শোন, রুটি লাগবে না। খিচুড়িই বাক্সে চাট্টি।

না, শরীর খারাপ করবে আপনার।

করবে না—প্রতিবাদ করে বীরেশ্বর বললেন, বুড়ো মানুষের খিচুড়ি খেতে ইচ্ছে হয়েছে কেন বঞ্চিত করবে? আমার কথা মানবে না বুঝতে পারছি। বেশ, ফুল্লরা দোসর তোমার—তার কাছে শুনে নাও। দায়ে-বেদায়ে ভাতও যে না খাই, এমন নয়। একটি হাতা দিও আমার, ব্যস।

ফুলি বলে, এক হাতা, দু'-হাতা সকলেরই—তার বেশি পাচ্ছি কোথা। আগে তো আন্দাজ হয় না—পরে আরও এসে পড়েছেন। এখনও আসছেন।

রান্নাঘরের দাওয়ায় লম্বা সপ পেতে দিয়েছে, এক সপে পাশাপাশি সকলের বসা। সামনে কলাপাতা। আনোয়ার, অমলেশ, আবুল হাসিম এবং আরও ক'জন বসে গেছে, বীরেশ্বরকেও পাশে গিয়ে বসতে হল।

খাসা লাগছে। পথ চলতি নানান জায়গায় রকমারি মানুষ রাত্রিবেলা এক জায়গায় এসে জমেছে, আলাপ-পরিচয় গল্পগাছা পরস্পরের মধ্যে, পাশাপাশি বসে খাওয়া, ঢালা-বিছানায় শুয়ে পড়া—সেকালে পায়ে-হাঁটার আমলে এইসব ছিল, বাপ-দাদাদের মুখে শুনেছি। রেল-মোটরের তাড়াহুড়োয় উঠে গিয়েছিল—রাকের পথে আবার এখন চালু হল। দুই বাংলার ভেরো শ' মাইল বর্ডারের উপর কম-সে-কম শ' পাঁচেক ঘাট। এই রাতে প্রতি ঘাটের এপারে ওপারে ঘুরে দেখে এসো, ক্ষণ-পরিচিত মানুষেরা চাঁদের হাট জমিয়ে নিয়েছে।

একটি গ্রাস বীরেশ্বর মুখে তুলেছেন কি না—তারাফুলি সামনে এসে বসে পড়ল ঃ কেমন রান্না হয়েছে দাদু?

পিঠ পিঠ ফুল্লরার আবির্ভাব ঃ ভাল হয়েছে—তাই না?

সত্যি রে, চমৎকার!

মুখ তুলে ফুল্লরার দিকে চেয়ে বীরেশ্বর বললেন, রান্নায় তুই-ও আছিস—রান্না তুই শিখলি কবে দিদিমণি?

ফুল্লরা ভ্রূভঙ্গি করে বলে, কী এমন জিনিস যে—তাই আবার ঘণ্টা করে শিখতে হবে। তবু তো একটিপ গরম-মশলা পড়ে নি খিচুড়িতে, একফোঁটা ঘি-ও নয়।

তারাফুলি কৈফিয়তের সুরে বলে, ঘরে ছিল না। ভাইজানকে দিয়ে আনিয়ে নেবো ভেবেছিলাম। তাতে দেরি হয়ে যায়। কখন সিগন্যাল এসে পড়ে, খাওয়া ফেলেই ছুটতে হবে তখন।

অমলেশ বলে, সিগন্যাল তার এখন কি। হিসেবের ব্যাপার। দশমীতে বিশ দণ্ড জ্যোৎস্না। তার মানে রাত দুটোর আগে তো নয়ই—

আগে—অনেক আগে। কপাল বস্ত ভালো আজ। আঁচানোর সময় উপরমুখো তাকিয়ে দেখবেন একবার।

যেই মাত্র বলা, আকাশের দিকে সব-গুলো চোখ। দাওয়া থেকে ভাল দেখা যায় না তো উঠানে নেমে পড়ল কেউ কেউ। খাওয়া অন্তে আঁচানোর সময় আকাশে তাকাবে, অতখানি সবুর সয় না। সত্যিই তো, আকাশ জুড়ে কালো মেঘের নিঃশব্দ দ্রুত আয়োজন—ঝড়-ঝাপটা বৃষ্টি-বাদলা না হয়ে যায় না। রাত দুটো হিসাব করে এতগুলো মানুষ নিশ্চিন্ত আছি, মাথার উপরে কেউ একবার তাকিয়ে দেখি নি।

তারাফুলি খিল-খিল করে হাসে ঃ দায়ে না পড়লে কে উপরমুখো তাকাতে যায়। লড়াইয়ের সেই ক'টা দিন হরদম আকাশে তাকাতাম—বোমা-টোমা মারে নাকি! আর রাকের পথে এখন তাকাচ্ছি—অন্ধকার কতদূর?

ক'দিন আগেও নাকি ভারি খাসা এক রাত্রি এসেছিল। কী অন্ধকার, কী রকম ঘন কালো মেঘ! দু'-পাঁচ মিনিট অন্তর মেঘের এপ্রান্ত থেকে ওপ্রান্ত বিদ্যুতের ফলায় চিরে চিরে যাচ্ছে, আর চড়-চড়-চড়াৎ দেয়ার ডাক। ঝেঁপে বৃষ্টি এলো তারপর, ঝড় উঠল। বর্ডার এলাকার ঝুটি ধরে নেড়ে জলে চুবানি দিচ্ছে। ফৌজের দল কম্বল মুড়ি দিয়ে পড়েছে—আহা কী মজা, কী মজা! দুর্যোগের ফাঁক বুঝে হিন্দুস্থান-পাকিস্তান ওদিকে একাকার হয়ে গেল—ফৌজ-পুলিশ তবু মুখ বের করছে না আরামের কম্বল থেকে। ঝড়-বৃষ্টি থামুক, রাত পোহায়ে সূর্য উঠুক—ধীরে-সুস্থে তখন লণ্ডভণ্ড ঘর গুছিয়ে আইন আবার চাঙ্গা করে তুলবে।

বর্ডারবাসীরা মানবজাতিকে দুই দলে ভাগ করেছে। এক দল ওৎ পেতে আছে, সহজ কাজকর্মে বাধা দিয়ে জীবন কিসে দুর্বহ করে তোলা যায়। অপর দলের চেষ্টা, ওদের কলা দেখিয়ে সহজ পথে কাজকর্ম চালু রাখা আগেকার মতন। সে রাত্রে দ্বিতীয় দলের জিত। আকাশের দেবতা সদয় হয়ে হঠাৎ যেন মুক্তিপত্র দিয়ে দিলেন ঃ বিস্তর ভুগছিস মানবপুত্রেরা—

যা, তোদের ছাড় করে দিলাম। একটা রাত্রি হিন্দুস্থান-পাকিস্তানের বিভেদ-আইনটা মুলতুবি রইল। আঠারো বছর যেরকম ছিলি, তাই হয়ে গেলি তোরা এই মুহূর্তে।

একাকার সত্যিই। কিছুমাত্র গরজ নেই, তেমনি লোকও ঝড়-বৃষ্টির মধ্যে মনের সুখে এপার-ওপার করে এলো। খালি হাতে খালি মাথায় যাচ্ছে কটা লোকই বা! ওপারের গাদা গাদা জিনিস এপারে চলে এলো, এপারের জিনিসও চালান হয়ে ওপারে গেল। ইচ্ছা মতন চলাচল, কারো চোখ গরমের ধার ধারি নে—এ-একটা বড় দুর্যোগ সুলগ্ন এমনি ধারা মাথায় বয়ে আনে। হে ভগবান, হে খোদাতালাহ্, মানুষের ধড়ে হৃৎপিণ্ড আছে হৃদয় বলে বস্তু নেই—তোমার করুণাই বর্ডারের মানুষের ভরসা। জ্যোৎস্না রাত তুমি একেবারে তুলে দাও, চাঁদ যেন ওঠে না আমাদের আকাশে। সন্ধ্যা-সকাল ঘনঘোর দুর্যোগ চলবে নিত্যিদিন। তোমার ভাণ্ডারের কৃষ্ণতম অন্ধকার উপুড় করে করে দিয়ে একাকার করে দাও এপার আর ওপার।

[ক্রমশঃ]

লিনটাস-SU. 55-140 BG

পথে বিপথে

হরেন ঘোষ

প্রতিদিনের মত আজও ভোরে ঘুম ভেঙেছে বলবীরের। এ ঘুম ভাঙার পর বিছানায় জড়তা ভাঙার দরকার করে না। তড়াক করে লাফিয়ে ওঠে বলবীর। শক্ত বেঞ্চে মাথার নিচে কোট সোয়েটারের বালিশ করে রাত কাটায়। তবু প্রথম দিকে ঘুম আসে না মশার কামড়ে আর গরমে। তারপর কোন সময় ঘুমিয়ে পড়ে প্রচণ্ড ক্লান্তিতে।

বাড়িতে নিশ্চিন্ত বিশ্রাম আর কদিন কপালে জোটে। ভালোও লাগে না। তার চেয়ে এই ভালো। উদ্দামতা আছে, একটা অভিনবত্ব আছে। দীর্ঘদিনের অভ্যাসে এই জীবনটাই কেমন ভালো লেগে গিয়েছে তার। অনেক ঝক্কি-ঝামেলা কম।

ঘড়ি দেখল বলবীর। পাঁচটা। এখনো শহর জাগে নি। তবে চা তৈরি হয়ে গেছে বাউনবাজের। পেতলের ওয়ান গেলাশটা এগিয়ে দিল বলবীরের দিকে।

বাইরে এল বলবীর। ট্রাকের সীটে দলা পাকিয়ে ঘুমোচ্ছে তোরমে। এক গুঁতো দিল—এই ওঠ, চা খেতে আয়, ভোর হয়ে গেছে। ধড়মড় করে উঠে চোখ কচকাল তোরমে। এবার দুচোখ বুজে হাসল। লাফিয়ে নেমে দোকানে ঢুকল। খালিপেটে গোলমরিচ, তেজপাতা দেওয়া চা গিললেই মেজাজ খুশ হয়ে যাবে।

খালপাড়ার গলিতে এসে মাল বোঝাই করতে খুব বেশি সময় লাগল না বলবীরের। ওজনমত মাল তুলে বাড়তি কিছু চাপাবার পর ত্রিপল দড়ি দিয়ে ভালো করে বাঁধা হয়ে গেল। তোরমে এরই মধ্যে প্যাসেঞ্জার পাকড়াও করেছে। ড্রাইভারের পাশে কম করে তিনজনকে নেয়া যাবে, সে পেছনে মালপত্রের মাঝখানে আরাম করে ঘুমোবে।

দিনে অন্তত চার ট্রিপ দিতেই হয়। পঞ্চাশ মাইল পথ চারবার পাড়ি দেওয়া—সমতলে এই দুশ' মাইল গাড়ি চালান এমন কিছু নয়, কিন্তু পাহাড়ের আঁকাবাঁকা পথে দশগুণ পরিশ্রম। একটু এদিক-ওদিক হলেই ব্যস—অতল গহ্বরে, কোনমতে রক্ষা পাবার উপায় নেই। শহর ছাড়িয়ে গাড়ি ছুটল। সবে জাগতে আরম্ভ করেছে শহর। মহানন্দা ব্রীজ পার হল। হাত উঁচু করেছে একজন প্যাসেঞ্জার। —খরসান্। ঘাড় নেড়ে হাসল বলবীর। কোটা ভরে গেছে। আগে দুজন পেয়েছে ঘুমের, এবার একজন কাশিয়াং যাত্রী। এরাই লক্ষ্মী। পুরোপুরি বাড়তি আয়। মালিককে দিতে হয় না। তবে এই টাকার ভাগ পুলিশকে দিতে হয়। দু-তিন জায়গায় দাঁড়িয়ে থাকে তারা, নির্বিকার পাথরের মূর্তির মত। নোট দলা পাকিয়ে চলতি গাড়ি থেকেই টুপ করে ফেলে দেয় ওরা। না দিলেই সর্বনাশ। কেস ঠুকে দেবে। ঠ্যালা সামলাতে প্রাণ যাবে।

তীরবেগে চালিয়ে শুকনা পর্যন্ত এল। সহজ-সরল রাস্তা, বাঁক নেই। মাইলির দোকান জমজমাট। ভেতরে ঢুকলো বলবীর, তোরমে বাইরে বেঞ্চে বসেছে। গরম ছোলা ভাজা, রুটি, রাই শাকের তরকারি গিলতে আরম্ভ করল ওরা। এবার পাশের

বাতলাটা টেনে নিল বলবীর। প্রায় সবটুকু একবারে ঢেলে দিল গলায়। মেজাজ আসবে না গলা না ভেজালে। তোরমে গলা বাড়িয়ে তাকাচ্ছে জুলজুলে চোখে। যদি একটু প্রসাদ মেলে। চোখ বড় বড় করল বলবীর। মিটিমিটি হাসল তোরমে। এবার রুমালে মুখ মুছে বাইরে এল বলবীর। প্যাসেঞ্জাররা অধৈর্য হয়ে উঠেছে। হোক গে। আমি তো সেধে আনি নি, ওরাই আসছে। অত তাড়া থাকে ট্যাক্সিতে যাক। আসি ইচ্ছেমত হেলেদুলে যখন খুশি যাব। চারটে ট্রিপ আমায় দিতে হবে। সারা দিনরাত সময় আছে। তাড়াহুড়ো করলে মাথা গরম হবে, শরীর ক্লান্ত হবে, যে-কোন মুহূর্তে অ্যাক্সিডেন্ট হয়ে যাবে।

স্টকনার পরই যত চিন্তা। একে পাহাড়ে ওঠা, তার ওপর আঁকাবাঁকা পথ —প্রতিটি বাঁকের আড়াল অদৃশ্য মরণফাঁদ। হাতের মুঠোর প্রাণ নিয়ে গাড়ি চালাতে হয়। ওপর থেকে যখন-তখন গাড়ি এসে যেতে পারে। অতি সতর্ক না হলে ভাল সামলান কঠিন। স্টিয়ারিং আর ব্রেক তো হামেশাই বিশ্বাসঘাতকতা করে। তার ওপর স্পীড চেক করা যায় না। মনে হয় আরো চাপ দিই অ্যাকসিলেটরে। মাথার ভেতরটা যত ঝিমঝিম করে হাত-পাগুলো তত অবাধ্য হতে চায়। রাশ টানা কঠিন হয়ে পড়ে।

গত বছর এই পাঁচকিলা সাইডিং-এই ঘটেছিল ঘটনাটা। তার গাড়ির আগেই যাচ্ছিল সাত শ' একুশ, মতিলাল লিমবুর গাড়ি। মাঝে মাঝেই স্পীড অস্বাভাবিক বাড়াচ্ছিল মতিলাল। ভয়ে ওর বুক কেঁপে উঠেছিল। বৃষ্টির পর পথ ভিজে, স্কীড করতে পারে গাড়ি, আর যদি ওপর থেকে কোন গাড়ি এসে পড়ে তাহলে সাইড দেওয়া কঠিন। তাছাড়া জায়গা খারাপ, অজস্র লেভেল ক্রশিং, ট্রেন আসতে পারে যখন-তখন। দু'-তিনবার পেছন থেকে হর্ন বাজিয়ে সাবধান করে দিয়েছিল মতিলালকে। কিন্তু নিয়তির টান। হঠাৎ চোখের সামনে থেকে অদৃশ্য হয়ে গেল গাড়িটা। বাঁ দিকের খাদে পড়ে দু'-তিন পাক খেল। প্রচণ্ড গর্জনে কেঁপে উঠল জনভূমি। ভয়ে চোখ বুজেছিল প্রথমে বলবীর। সঙ্গে সঙ্গে গাড়ি থামিয়ে হুমড়ি খেয়ে লাফিয়ে পড়ল। বড় একটা সেগুন-গাছে আটকিয়ে গিয়েছে ট্রাকটা। দু'জন প্যাসেঞ্জারও তাকে অনুসরণ করেছে। প্রথমে চোখে পড়ল মতিলালের ক্লিনারের ছিন্নভিন্ন দেহ, আর একটু পরই পেল মতিলালকে। সংজ্ঞাহীন, একটি হাত বাহুমূল থেকে কাটা। কাঁধে তুলে অনেক কষ্টে ওপরে তুলেছিল ওদের। তারপর তার গাড়িতে করে এনেছিল তিনধারিয়া হাসপাতালে। দু'জনের কেউই বাঁচে নি। এ তো হামেশাই হচ্ছে। একটু অসাবধান হলেই।

গোঁ গোঁ শব্দ করে ছুটছে গাড়ি। বাঁকের পর বাঁক পেরিয়ে চলেছে বলবীর। রঙটঙ পেরিয়ে এসে থামল। এবার জল ঢালতে হবে। গাড়ি গরম হয়ে গিয়েছে। লাফিয়ে নামল তোরমে। জলের টিন নিয়ে ছুটল ঝর্ণায় জল ভরতে।

লুপ টু ছাড়িয়ে চুণাভাটি, বাঁক পেরিয়ে লালমাটি, সতের মাইল, তিনধারিয়া। থামল ট্রাক। দু'বোঝা জ্বালানি কাঠ তুলে দিল ধনমায়া সর্দারনি। তার আত্মীয়কে দিতে হবে কার্শিয়াং-এ। হাসল বলবীর, সারা বছর এমনি অজস্র ব্যাপার খাটতে হয় তাকে।

তিনধারিয়া ছাড়িয়ে ছুটে চলেছে গাড়ি। এবার গয়াবাড়ি। কালামাটির বাঁকের মুখ ঘুরতেই দেখল হাসিমুখে দাঁড়িয়ে আছে নেউরি। হাতে খাবারের ঠোঙা, চায়ের বোতল। গাড়ি থামিয়ে নামল বলবীর। প্যাসেঞ্জাররা জানে এভাবে থামতে থামতেই যাবে এরা। প্রতিবাদ করে না, বিরক্ত হলেও প্রকাশ করে না। ওরাও নেমে পায়চারি করে দেহের জড়তা ভাঙে।

সেবার বর্ষায় দারুণ ধস নেমেছিল পাগলাঝোরায়। দিনরাত শাবল গাঁইতির আওয়াজ, হুস-হাস জল ঝরছে, মাটি-পাথর গড়িয়ে পড়ছে, পাহাড় কাটা হচ্ছে, রাস্তা তৈরি চলছে। ওর গাড়িতে দল বেঁধে ঘরে ফেরে ছেলেমেয়েরা। গান গায়, হৈ-চৈ করে নেমে যায়। তখন ট্রান্সশিপমেন্ট প্রায়ই খালি গাড়ি ফিরতো। কাজ সেরে ওরা দাঁড়িয়ে থাকত, হুড়মুড় করে উঠে পড়ত ওর গাড়িতে। এমনি অনেকের গাড়িতেই উঠত ওরা।

তখনই পরিচয় নেউরির সঙ্গে। ওর চেহারাটা বিশেষ করে চোখে পড়ত। হাসি-খুশি উচ্ছল, অটুট স্বাস্থ্য। চোখে চোখে মন দেওয়া-নেওয়ার সময় লাগে নি। সম্পর্ক আরো ঘনিষ্ঠ হয়েছে। পথ তৈরি হয়ে গিয়েছে, কাজ শেষ। যাতায়াতের পথের ধারে দাঁড়িয়ে থাকে নেউরি। দু'দণ্ড গল্প করে, হাসে, কখনো বা বলবীর যায় ওর সঙ্গে ওর বাসায়। দশ-পনের মিনিট কাটিয়ে আসে। কাগজের প্যাকেট এগিয়ে দিল বলবীর—তোর জন্যে শাড়ি ব্লাউজ এনেছি।

হাত বাড়িয়ে নিল নেউরি—তুমি আজ-কাল কেমন কেমন হয়ে গেছ, আমায় আগের মত ভালোবাস না। অনেকদিন শিলিগুড়ি যাই নি। বাজারে ঘোরা হয় নি, সিনেমা দেখি নি।

—রবিবারে নিয়ে যাব, কম ট্রিপ দেব। খুব বেড়াব, ফূর্তি করব দু'জনে। চোখ টিপল বলবীর। হেসে মুখ নিচু করল নেউরি।

প্যাঁক প্যাঁক হর্ন বাজাচ্ছে তোরমে। ঘাসের বিছানা ছেড়ে উঠল বলবীর—ছোঁড়াটা ভারি তাঁদড়।

ফিসফিস করে বলল নেউরি—বাড়িতে কেউ নেই এখন।

—আজ থাক, কাল যাব।

এই এক অদ্ভুত অভিসার। মুক্তি নেই এর হাত থেকে। কি এর পরিণাম জানে না এরা। চিন্তাও করে না। চলছে চলুক।

পাগলাঝোরা ছাড়িয়ে মহানদী এল। চলতি নাম ঘুমতি। গতি কমাল কিছুটা। পথের পাশে পরিচিত লোকজন চলছে, হাসল, মাথা নাড়ল, হাত নাড়ল। আবার ছুটে চলল। গিদ্দাপাহাড় ছাড়িয়ে কার্শিয়াং।

হাতে টাকা গুঁজে দিয়ে চলে গেল একজন প্যাসেঞ্জার। দু'জন রইল, ওরা ঘুমে নামবে। এগিয়ে গিয়ে মায়া রেস্টু-রেন্টে ঢুকল বলবীর, সঙ্গে তোরমে—ভোখ লাগেও। তা খিদে লাগার কথা। মুখোমুখি বসল ওরা।

—এবার দশাইতে আমায় একটা বাঁশি দিতে হবে, জামাকাপড় বাদে।

—এখন ঢের দেরি, মন দিয়ে ভালো-ভাবে কাজ কর, তখন দেখা যাবে।

কে ওর বাবা, কে ওর মা, জানে না তোরমে, বলবীরও জানে না। পথের ছেলে। এমনি অনেক আছে এখানে। পথের লোকই নামকরণ করে এদের, পথেই বড় হয়। একদিন বলবীরও এমনি ক্লিনার ছিল। কত অপমান, অনাদর সহ্য করতে হয়! কত জ্বালা-যন্ত্রণা, কিল-চড়, গালাগাল। পেটে ভাত জোটে না, ঘুমোবার জায়গা থাকে না, পরণের কাপড় নেই—তবু তারা বেঁচে থাকে, দিন গোণে আর কাজ করে। একদিন এই তোরমেও ড্রাইভার হবে।

টাকা ওরা জমাতে পারে না। উপার্জন তো কম করে না। মাইনে আর খোরাকি ছাড়া বাড়তি রোজগার কম হয় না। কিন্তু টাকা রাখতে পারে না, জমাতে পারে না। মাঝে মাঝে ইচ্ছে হয়, স্বপ্ন দেখে কিন্তু মদ সব ভুলিয়ে দেয়। ষাঁড়-রক্‌শি তাদের

সর্দ্দি ও কাশিতে
রক্ষিতের
তাল মিছরি
ফোন ৫৫-৩০৮৫

নির্বাচনী সভা-সমাবেশে সরগরম পশ্চিমবঙ্গ

শেষ করে দেয়। পরিশ্রম কম করে না। সারা বছরই কাজ আর কাজ। চার ট্রিপ করে দৈনিক যাতায়াত। ছুটি শুধু দশাই-তেওয়ারে। দুর্গাপুজোর সময় দুচার দিন, আর কালীপুজোয় দিন সাতেক। তখন মনের আনন্দে মদ গেলো, নতুন জামাকাপড়ে সেজেগুজে মেলায় ঘোরো, জিনিস কেনো, জুয়া খেলো, সারারাত ফুর্তি কর। তখন কোন কাজ নেই, দায়-দায়িত্ব নেই।

ছোট্ট একটা বাড়ি করতে পেরেছে বলবীর। চারিপাশে বাগানের জমি আছে। বুদ্ধি তার নয়, বৌ কামিনীর। সেই জোর করে টাকা-পয়সা কেড়ে রাখে, জমায়. — না হলে সব ফুঁকে দিত ও। আর একটি সাধ আছে ওর মনে। একটা ট্রাক কেনা। পরের চাকরি আর ভালো লাগে না। মনে মনে হিসেব কষে বলবীর। সেকেণ্ডহ্যাণ্ড গাড়ি কিনতে হলেও আরো অন্তত দু' বছর। তখন আমায় পায় কে! আমি নিজেই মালিক।

তোরমে চেষ্টা করেছিল, প্যাসেঞ্জার জোটে নি। না জুটুক। জোরে চালাল বলবীর। টুং সোনাদা ছাড়িয়ে ঘুম। নেমে গেল ওরা দু'জন। এবার গাড়ি ঢালু পথে নামবে। আর কতক্ষণই বা।

সোজা বাজারে গিয়ে দাঁড়াল গাড়ি। কাগজপত্র এগিয়ে দিল বলবীর। আপাতত ডিউটি শেষ। তোরমে থাকবে এখানে। গাড়ি মুছবে, জল দেবে। ওরা মাল খালাস করুক। আর দাঁড়াবে না বলবীর। ছেলে-মেয়েরা স্কুলে গেছে ছোটটি শুধু বাড়িতে। কামিনী রান্না করে প্রতীক্ষা করছে। নিজের সাধের ছোট ঘরের দিকে পা বাড়াল বল-বীর। এখন আরাম, এখন বিশ্রাম। অন্তত দু' ঘণ্টার জন্যে। এখন আর অন্য কিছু ভাববে না সে, মনে পড়বে না পথের কথা। এখন আর সে পথে নয়, ঘরে।

কিন্তু এরপরই তো আছে সেকেণ্ড ট্রিপ। তবু যতক্ষণ ভুলে থাকা যায়।

ফুচকের দেশে

গীতা বন্দ্যোপাধ্যায়

[পূর্ব-প্রকাশিতের পর]

বাঙালীর চোখে পাহাড়ের সৌন্দর্য এক বিশেষ রূপে ধরা দেয়। যদিও কাঞ্চনজঙ্ঘা আমাদেরই মাথার ওপর রয়েছে তবু সাধারণ বাঙালীর জীবনে পাহাড় আর ঢল, চড়াই আর উৎরাই দেখার অভিজ্ঞতা খুব কম।

চেকোশ্লোভাকিয়া আগাগোড়াই পাহাড়ী। প্রাগকে বলা হয়—'সাত পাহাড় চড়া শহর'। বোহেমিয়ার যেদিকেই তাকাও —পাহাড়ী ঢাল, ফুলে ফুলে, বোলে মুকুলে 'ম ম' করছে। এপ্রিল, মে মাসের বোহেমিয়া খুবই বোহেমিয়ান হয়ে ওঠে। কেন্দ্রীয় বোহেমিয়ান পর্বতমালার কোল ঘেঁষে ভারি আহ্লাদীগোছের নামওয়ালা কয়েকটা শহর আছে—স্লানি, লুনি আর বিলিনা।

গল্প আছে, দক্ষিণ বোহেমিয়ার উর্বর সমতলভূমি এলব-এর বুকে হঠাৎ যে পাহাড় বা টিলাটা গজিয়ে উঠেছিল, সেটার ওপর দাঁড়িয়ে চেক নামে এক ব্যক্তি (চেকোশ্লোভাকদের পূর্বপুরুষ) নাকি মুগ্ধ হয়ে চারিদিক এক নজরে দেখে নিয়ে বলেছিলেন—'এখানে এমন একটা লোকালয় গড়ে তোলো যেখানে দুধ আর মধুর ধারা বয়ে যাবে।'

বহু বছর আগেকার গল্প। দুধ আর মধু বইয়ে দেবার স্বপ্ন সফল হতে আমরাও দেখি নি। তবে সফলতার দিকে এগিয়ে যাবার পদক্ষেপগুলো লক্ষ্য করেছি। চেকোশ্লোভাকিয়ার গ্রামাঞ্চল যেমন সুন্দর, তার কাহিনী তেমনি করুণ (অবশ্য আমাদের চাইতে নিশ্চয় নয়)। ছোট দেশ হওয়া সত্ত্বেও চেকোশ্লোভাকিয়া যে নিজস্ব অস্তিত্ব আর তেজ বজায় রাখতে পেরেছিল, তার কারণ বোধ হয়—ঐ দুধ-মধুর নদী বওয়াবার স্বপ্ন দেখে।

বোহেমিয়ার এক চাষীর কাছে শোনা গল্প।

"আমাদের দেশটাকে সবাই বলত—সব দেশের জেলখানা। অস্ট্রো-হাঙ্গেরিয়ান রাজাদের রাজত্ব ছিল ভয়ানক ব্যাপার। দাসপ্রথা চলত। সব সম্পত্তি ছিল—রাজা, জমিদার আর চার্চের। আমার ঠাকুর্দাও ভূমিদাস ছিলেন। বাবাও দাসত্বের বোঝা বয়েছেন ১৯১৯ পর্যন্ত। তারপর লড়াই চলেছে ১৯৩৭ তক। এর পরই হিটলারী হামলা। যা কিছু উন্নতি হয়েছিল তা যেন এক শ' বছর পিছিয়ে গেল। শেষে হিটলার হারলে তবে এই প্রথম আমরা সত্যিকারের ভূমিসংস্কারের স্বাদ পেলাম।"

দো-ভাষীর সাহায্যে কিছুটা ইতিহাস সংগ্রহ করা গেল। এদের চাষীদের জীবনে অত্যাচার চরম সীমায় উঠেছিল সপ্তদশ খৃস্টাব্দে। তিরিশ বছর ধরে দাসপ্রথার বিরুদ্ধে শ্বেত পাহাড়ের লড়াই চলে। ১৬১৮ খৃস্টাব্দে ক্যাথলিক ছাড়া আর সমস্ত চেক অভিজাত সম্প্রদায় জার্মান সাম্রাজ্যের বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা করে দেয়। সাহসের সঙ্গে লড়েও তারা জার্মান সম্রাটের কাছে হেরে যায়। প্রাগ আর গোটা বোহেমিয়া জুড়ে জার্মান আর চেক সামন্ততন্ত্রের অত্যাচার চলে আরও কয়েক শ' বছর ধরে।

কিন্তু বিদ্রোহের সূচনা একবার হলে তার বীজ পুরো নষ্ট হয় না। চাষীরা এখানে-ওখানে সংগঠন বাঁচিয়ে রাখল। ছাড়া ছাড়া বিদ্রোহ দেখা দিল। ক্যাথলিক চার্চ আর বিদেশী (জার্মান, অস্ট্রিয়ান আর হাঙ্গেরিয়ান) অভিজাত সম্প্রদায় হাতে হাত মিলিয়ে সমস্ত গ্রামাঞ্চলে সব চাইতে ভাল জমিগুলো দখল করে, চাষীদের একটা চিরস্থায়ী দারিদ্র্য আর বেগার খাটার জ্বালার মধ্যে ফেলে দিল। সহ্যের সীমা পেরুলেই দেখা দিত চাষী বিদ্রোহ। দেখতে গেলে সব দেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাস যেন একই গতিতে চলে বলে মনে হয়। বিশেষ করে গ্রামাঞ্চলের ব্যথা, বেদনা, সাধ, আহ্লাদের চেহারা যেন পৃথিবীর সব জায়গায় এক।

জমির ক্ষুধা! চাষী—সে চীনেরই হোক, ভারতবর্ষেরই হোক, আর চেকোশ্লোভাকিয়ারই হোক, বহু বহু বছরের ক্ষুধা আগে তার মিটলে তবে সে আধুনিক যৌথখামার বা কো-অপারেটিভের কথা ভাবতে পারে।

১৯৪৫ সালের স্বাধীনতার পর নব্য-গণতন্ত্রের আওতায় এই প্রথম এক নতুন ধরণের ভূমিসংস্কার চাষীর জমির ক্ষুধা মেটাবার সত্যিকারের চেষ্টা করল।

চেকোশ্লোভাকিয়ায় গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হবার পর দেশের রাজনৈতিক অবস্থা বেজায় ঘোলাটে হয়ে উঠেছিল বটে কিন্তু তবু শেষ পর্যন্ত সমাজতন্ত্রের পাল্লা ভারী করে তোলা সম্ভব হয়েছিল। প্রথম দিকে যদিও মজুর চাষীদের স্বাধীনতার ইচ্ছার প্রাবল্যে চারিদিক গমগম করছিল, তবু চেকোশ্লোভাকিয়ার ধনিকশ্রেণীই গ্রামাঞ্চল আর শহরের সমস্ত সরকারী সংগঠনে জরুরী ঘাঁটিগুলো আগলে ছিল। এমত অবস্থায় চেকোশ্লোভাকিয়ার রাজনীতি ভীষণ গোলমেলে হয়ে ওঠে বিশেষ করে মাজারিকের নেতৃত্বে। কেন না, যদিও মাজারিক ছিলেন নব্য-গণতন্ত্রের সভাপতি, তবু তিনি ধনিকশ্রেণী-ঘেঁষা অর্থনৈতিক আর রাজনৈতিক পন্থা ধরে চলেছিলেন। খুব সাবধানে চলা সত্ত্বেও ধনিকশ্রেণী ১৯৪৮ সালে খোলাখুলিভাবে মজুর-চাষীদের যৌথ ইচ্ছার সামনে হার মানতে বাধ্য হয়। এই তিন বছরে (১৯৪৫—১৯৪৮) যে দুরন্ত জাতীয় শক্তি গড়ে উঠেছিল তারই পরিণামে চেকোশ্লোভাকিয়ার ভূমিসংস্কার চাষীদের পুরোপুরি স্বাধীনতার স্বাদ পাবার ভিত্তি গড়ে দেয়।

১৯৪৫-৪৮-এ যে ভূমিসংস্কার আনা হল—তা দফে দফে কার্যকরী করা

কিস্তিতে ট্রানজিস্টর

মাসিক ১০৲ কিস্তিতে ৩২০৲ মূল্যের বিশ্ববিখ্যাত "এস-কর্ট" ৩ ব্যাণ্ড অল ওয়ার্ল্ড পোর্টেবল ট্রানজিস্টর লাভ করুন। প্রতি গ্রাম ও শহরে প্রেরণের যোগ্য।

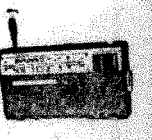

আবেদন করুন :-
Japan Agencies (B.W.C—10)
Post Box 1194, Delhi—6.

হয়েছিল। 'জমি চষে যে, জমির মালিক সে'—এই নীতি অনুসারে সমস্ত বড় বড় জমিদার আর ধনী চাষীর (১২০ একরের বেশি জমি যাদের ছিল) জমি বাজেয়াপ্ত করে তা ভূমিহীন আর মধ্যচাষীদের মধ্যে বিলিয়ে দেওয়া হয়। কোনো রকমের খেসারত না দিয়ে প্রায় ৪,২০১,০০০ একর জমি এইভাবে বিলিয়ে দেওয়া হয়। খুব বড় জমিদারদের বা অভিজাত সম্প্রদায়ের বিশাল ভূ-সম্পত্তিগুলো সরকারী খামারে পরিণত করা হয়।

এই সময়ে গড়ে ওঠে চেকোশ্লোভাকিয়ার বিখ্যাত কো-অপারেটিভ আন্দোলন। এই আন্দোলন গড়ে তোলার অন্যতম কারণ হল যৌথখামারের প্রয়োজনীয়তা আর চাষীর জীবনে তার লাভ বোঝানো। গোড়ার দিকে চাষীরা কিছু কিছু কৃষি-যন্ত্রপাতি নিজেদের মধ্যে যৌথ-প্রয়োজনে ভাগাভাগি করে নিত। জিনিসগুলো যার তারই থাকত। শুধু ব্যবহার হত যৌথ-ভাবে। পরে কো-অপারেটিভ আন্দোলন বাড়তে বাড়তে সব প্রয়োজনীয় কৃষি-উৎপাদনের জিনিসপত্র কো-অপারেটিভে একত্রিত হয়। কেবল জমি আর বাসগৃহ কো-অপারেটিভ সভ্যদের ব্যক্তিগত সম্পত্তি হিসেবে থাকে। ১·২৪ একরের বেশি জমি কোনো কো-অপারেটিভের সভ্য ব্যক্তিগত সম্পত্তি হিসেবে রাখতে পারেন না। প্রত্যেক কো-অপারেটিভের সভ্য যেমন কাজ করেন সেইমত মজুরী পান। মাসে মাসে লভ্যাংশের ভাগ সভ্যদের দেওয়া হয়। বছরের শেষে হিসেব-নিকেশ পুরো হলে চাষীরা বাড়তি মজুরী পেয়ে যান।

এইসব সিদ্ধান্তই সাধারণ সভ্যদের সভায় আদ্যোপান্ত আলোচনা করে তবে নেওয়া হয়। আজকের চেকোশ্লোভাকিয়া দেশের শতকরা ৯০ ভাগ চাষের জমি কো-অপারেটিভ আর যৌথখামারের আওতায় পড়ে। বাকি দশ ভাগ ব্যক্তিগতভাবে চাষীরা আবাদ করে থাকেন।

আমরা বেশ লক্ষ্য করতাম, নয়া গণ-তন্ত্রের দেশগুলোয় খাবার-দাবারের প্রাচুর্য কিছু কম। চেকোশ্লোভাকিয়াতে যে অনুপাতে শিল্প বেড়েছে—কৃষির উন্নতি হয় নি। একে চাষের উপযুক্ত জমি খুব বেশি নয়, তায় আজও কৃষির এমন উন্নতি হয় নি যার ফলে আবাদের জমির আমূল উন্নতি করা যেতে পারে। খাদ্যের জন্যে আজও তাই চেকোশ্লোভাকিয়াকে খানিকটা বিদেশের দিকে তাকাতে হয়। শিল্পজাত জিনিসের অভাব নেই। ব্যবসায়িক ভিত্তিতে তাই যে আদান-প্রদান চলে তাতে দেশের ভেতর খাদ্যাভাব বলে কিছু নেই।

খাদ্যাভাব কাকে বলে তা আমরা ছাড়া পৃথিবীর অন্য কোনো দেশ সঠিক জানে কি না জানি না। আমাদের খাদ্যাভাবের সঙ্গে কোনো দেশের তুলনা করা চলে না। চেকোশ্লোভাকিয়ায় যে সামান্য ঘাটতি তা প্রাচুর্যের দৃষ্টিভঙ্গি থেকে—অভাবের দিক থেকে নয়। এসব দেশে অভাব বলতে আমরা যা বুঝি তা সত্যিই নেই। জলের বদলে এরা বিয়ার খায়। প্রচুর বিয়ারের সংগতি এদের আছে। উপকারীও।

একদিন এক চাষীকে জিজ্ঞেস করেছিলাম—'সে কি, জল খান না? তেষ্টা মেটে?'

ভদ্রলোক তো হেসেই আকুল। বললেন—

'আরে কাঁচা জল তো শুয়োরে খায়। আমরা কি শুয়োর?'

এর পর আর বলতে পারলাম না যে আমরা কাঁচা জল ছাড়া আর বিশেষ কোনো পানীয়তে তেষ্টা মেটাতে জানি না।

[ক্রমশঃ]

বর্তমান কথাসাহিত্যে সর্বাধিক জনপ্রিয় লেখিকা

আশাপূর্ণা দেবীর

গ্রন্থাবলী

আবার একখণ্ড প্রকাশিত হয়েছে!

তিনখানি সম্পূর্ণ উপন্যাস। সাতটি বড় গল্প

১। বলয়গ্রাস ২। প্রেম ও প্রয়োজন

৩। দুনবার ৪। এক গুচ্ছ গল্প

মূল্য মাত্র সাড়ে ছয় টাকা

আগেই বেরিয়েছে আর এক খণ্ড

গ্রন্থাবলী

১। জহুরী ২। অনির্বাণ

৩। সোনালী দিনের মন

৪। এক গুচ্ছ গল্প

মূল্য মাত্র পাঁচ টাকা

বসুমতী (প্রাঃ) লিঃ
কলিকাতা-১২

সম্পাদনা ঃ দেবব্রত মুখোপাধ্যায়

"প্রস্তাবনা"

ভারতের জাতীয় চেতনাকে উদ্বুদ্ধ করে বাংলাদেশ। এ-কথা যেমন সত্য তেমনি নব্যভারতীয় চিত্র-আন্দোলনের হোতাও এই বাংলা। সেই কারণে বাংলার শিল্পরসিক মন সুকুমার কলার রস আস্বাদনে আগ্রহী এবং আনুপাতিকভাবে অন্যান্য প্রদেশের ইতরজনের চেয়েও বঙ্গেতর রসিকরা সংখ্যাগরিষ্ঠ। এ বিশ্বাসের প্রমাণ পাওয়া সম্ভব সৌখিন ও আনুষ্ঠানিকভাবে আয়োজিত শিল্পসংস্থাগুলির চিত্র-প্রদর্শনীর আওতা ছাড়িয়ে পূজা-পার্বণ বা সাংস্কৃতিক উৎসব উপলক্ষে, নিদেনপক্ষে রাজনৈতিক প্রচার প্রেরণায় আয়োজিত পাড়ায় পাড়ায় গঞ্জে-গ্রামে অনুষ্ঠিত বিভিন্ন চিত্র বা প্রাচীরচিত্র প্রদর্শনীর ভিড়ের দিকে তাকালে।

সুকুমার কলার এই জনপ্রিয়তা যেমন প্রধানত কৃত-কৌশলী স্রষ্টাদের ওপর নির্ভরশীল তেমনি এই সীমিত-প্রচার সম্ভাবনাযুক্ত প্রকাশ মাধ্যমটির যথাযথ প্রচারের দায়িত্ব নিয়েছিলেন সেই দিনের প্রায় প্রতিটি সংস্কৃতিবান পত্র-পত্রিকা। অবশ্য এই ক্ষেত্রে রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত "প্রবাসী"র ভূমিকাই অনবদ্য। এ ছাড়া, বাংলাদেশে বারে বারে বিভিন্ন শিল্প-শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, জনপ্রিয় শিল্পী বা রসিক পরিচালিত বিভিন্ন পত্র-পত্রিকা প্রকাশিত হয়ে চলেছিল সেদিন; আজ বাংলাদেশ থেকে তেমন জাঁকজমকপূর্ণ শিল্প-পত্রিকা প্রকাশ সম্ভব না হলেও ছোটখাট শিল্প বিষয়ক ত্রৈমাসিক, মাসিক পত্রিকা প্রকাশের চেষ্টা নিয়মিত চলছে শহরে শহরে। এমন কি ভারতের একমাত্র শিল্প ও সংস্কৃতির পাক্ষিক পত্রিকাটি গত নয় বছর ধরে কলকাতা থেকেই নিয়মিত প্রকাশ হয়ে চলেছে।

এই শতাব্দীর শেষার্ধে এ-দেশে সাংস্কৃতিক পত্র-পত্রিকার কাল শেষ হয়ে ব্যবসায়িক পত্র-পত্রিকার যুগ সুরু হয়েছে। স্বভাবতই—ব্যবসায়ী পত্র-পত্রিকার মালিকগোষ্ঠী বাজারের চাহিদা ও পত্রিকার কাটতি অনুসারে সংস্কৃতি বেচাকেনা করে থাকেন। এমন দিনেও বিভিন্ন পত্র-পত্রিকার নিয়মিত বিভাগগুলিতে "সুকুমার কলার" বিভাগটি নিয়মিত প্রকাশিত হয়ে সংস্কৃতির বাজারদরের নির্ভর-যোগ্যতা প্রমাণ করছে। বাজারে যখন চাহিদা আছে তখন সুকুমার কলার আলোচনারও প্রয়োজন আছে, এবং সে প্রয়োজন মেটাবার জন্য বাজারে সমালোচকও যখন দক্ষিণার বিনিময়ে পাওয়া সম্ভব, তখন আজকের প্রায় সবকটি দৈনিক, সাপ্তাহিক, মাসিক পত্র-পত্রিকায় মাসোহারা বন্দোবস্তে পেশাদার সমালোচক নিযুক্ত হয়েছে। তারা বাজারের টান অনুসরণে চিত্র, ভাস্কর্যের প্রচার ও আলোচনা করে হাটুরে চিত্রকরদের বাজার ও আপন পত্রিকার খদ্দেরদের মনস্তুষ্টি করে চলেছে দিনের পর দিন।

'সাপ্তাহিক বসুমতী' বিলম্বে হলেও সংস্কৃতির এই শক্তিমান প্রকাশ মাধ্যমটির আলাপ-আলোচনা, প্রচার, প্রকাশ, এমন কি লেনদেনের বাজারেও শেষ পর্যন্ত অনুপ্রবেশ করলো এই সংখ্যা থেকে। বাজারের চাহিদা অনুসরণের প্রয়োজন এক্ষেত্রেও নিশ্চয়ই কার্যকরী তবে সম্ভবত এদের কাছে সুকুমার কলার বাজারদর সংস্কৃতির ওজনে নির্ভরশীল তাই প্রথা অনুসরণে পেশাদারী। সমালোচনা বাজার থেকে কিনে প্রকাশ না করে বিশেষজ্ঞদের সহযোগিতায়, যথাযোগ্য গুরুত্ব সহ বিভাগটি পরিচালনার চেষ্টা করছেন। সমকালীন অবস্থা অনুসরণে এই সম্ভবনা কতটা সার্থক হবে তা ধারণা করা এখনি সম্ভব হচ্ছে না কারণ এ রীতিটিও একটি বিশেষ পরীক্ষার বস্তু। কৃত-কৌশলী শিল্পী বা রসবেত্তা সমালোচক পত্র-পত্রিকার প্রয়োজন অনুসরণে নির্ধারিত সময়ে নিয়মিত শিল্প আলোচনা বা সমালোচনা কতদিন বা কতক্ষণ করে যেতে পারবে তা যেমন সঠিক বলা সম্ভব নয় তেমনি এইসব শিল্পী বা রসিকদের সুস্পষ্ট আলোচনা বা প্রত্যক্ষ সমালোচনা আলোচ্য শিল্পী, সংগঠক, বা গোষ্ঠী অথবা এ পত্রিকার কর্তৃপক্ষের পক্ষে

রিস্ট ওয়াচ
মাত্র ৬৲ টাকায়

আমাদের চেন পদ্ধতি স্কীমের মাধ্যমে মাত্র ৬৲ টাকায় ৫ বৎসরের গ্যারান্টী সমেত ৫ জুয়েল রিস্ট-ওয়াচ লাভ করুন। ডাকমাশুল ১/১৫ টাকা অতিরিক্ত।

দ্রষ্টব্য ঃ আমাদের মধু-চন্দ্রিমা সেন্টের বিক্রয় বৃদ্ধির জন্যই এই স্কীম চালু করা হইল। পছন্দ না হইলে মূল্য ফেরৎ।

SWISS WATCH
TRADING CO.
P. B. 87, (WBC) Jullundur City.

কতদিন সহ্য করা সম্ভব হবে তাও দ্রষ্টব্য।

বর্তমানে যে ব্যক্তির সম্পাদনায় এ বিভাগটি পরিচালিত হতে চলেছে তিনি ব্যক্তিগতভাবে চিত্রকর, শিল্পবেত্তা ও শিল্প-ঐতিহাসিকরূপে পরিচিত। বিষয়ান্তরে ব্যস্ত থাকায় তাঁর পক্ষে ব্যক্তিগতভাবে নিয়মিত সমালোচনা বা রচনা প্রকাশ সম্ভব হবে না তাই আরও দু'-একজন বিশিষ্ট রসবেত্তা এবং চিত্রকরদের সহযোগিতায় এ বিভাগটি পরিচালিত হবে। তবে এই বিশেষজ্ঞদের আলোচনার দায়িত্ব স্বভাবতই বিভাগীয় সম্পাদকের ওপর বর্তাবে।

এ বিভাগে নিয়মিত শিল্প আলোচনা এবং কিছু কিছু সমালোচনা প্রকাশের চেষ্টা করা হবে প্রধানত। এই সমালোচনা ও আলোচনার প্রমাণসূত্র হবে জীবনবোধ অনুপ্রাণিত, বাস্তবানুগ, শুভবুদ্ধিজাত সুকুমার বৃত্তি।

জীবনরসে উদ্ভূত, শুভবুদ্ধিজাত এবং বাস্তব অনুপ্রাণিত শিল্পবস্তুই দেশকাল ও সমাজের পক্ষে কল্যাণকর। তাই তারই পুনঃপ্রতিষ্ঠা আজকের ঝঞ্ঝাবিক্ষুব্ধ, আত্মবিস্মৃত পৃথিবীতে অগ্রাধিকার পেয়েছে। ব্যক্তিকেন্দ্রিক ক্ষুদ্রতা বা মানসিক বৈকল্যজাত, বিচ্ছিন্নতা অনুপ্রাণিত, "রঙবাজি" বা বিকৃত মানসজাত, আত্মরতি পরিতৃপ্তিকারী বীভৎসতা সমকালের বাজারে শিল্পবস্তুর আদলে চলে গেলেও অদূর ভবিষ্যতে, বিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে প্রবাহিত মহাযুদ্ধজাত মহাভয় ও নৈরাশ্যের সংক্রামক মানসিক ব্যাধির প্রমাণ চিত্ররূপে আগামী মনোবিজ্ঞানীদের সংগ্রহশালার শোভা বৃদ্ধি করবে, এমন হদিশ এখনি পাওয়া গেছে। এ অবস্থা থেকে পরিত্রাণের এক এবং একমাত্র পথ জীবন ও শুভবুদ্ধিজাত সাংস্কৃতিক চর্চা ও আত্মপ্রত্যয়। বর্তমানে, এই পত্রিকার এ বিভাগ তাই বর্তমান পরিচালকের তরফ থেকে প্রতিশ্রুতি দিচ্ছে যে, এখানে প্রকাশিত প্রতিটি আলোচনা বা সমালোচনা ওপরের কথামত উদ্দেশ্যমূলক হবে এবং কোন ব্যক্তিস্বার্থ বা গোষ্ঠীস্বার্থ নিরপেক্ষ হবে।

"নবীনের অভিযান"

কলকাতার সরকারী চারু ও কারুকলা মহাবিদ্যালয় ভারতীয় চিত্র-আন্দোলনে অন্যতম প্রাচীন ও গুরুত্বপূর্ণ শিল্প-শিক্ষায়তন। নব্যভারতীয় চিত্র-আন্দোলনের পীঠস্থান কলকাতায় সরকারী এ-প্রতিষ্ঠানটি সীমিত হলেও এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে চলেছে এতদিন। এখানে কর্মরত শিক্ষানবীশ চিত্রকরদের অধীত বিদ্যার বাৎসরিক ফলাফল ও অগ্র-পশ্চাৎ গমনাগমনের হিসাব-নিকাশ উপস্থিত করা হয় এদের বাৎসরিক প্রদর্শনী মারফৎ কলকাতার শিল্পরসিকদের সামনে।

প্রতিবারের মত এবারও কলকাতার সরকারী চারু ও কারুকলা মহাবিদ্যালয় তাদের প্রদর্শনীর আসর সাজিয়ে বসেছিলেন গত ১৮ই ডিসেম্বর থেকে ১লা জানুয়ারী '৬৯ পর্যন্ত। কলকাতার কলারসিকরা সাধারণত যে-ক'টি চিত্র-প্রদর্শনী দেখে থাকেন তন্মধ্যে এটি অন্যতম। কারণ—দেশের ভবিষ্যৎ শিল্পীদের বেশ বড় একটা অংশের শিল্প-অনুসন্ধিৎসার সঙ্গে সরাসরি পরিচয় ঘটে এখানে। এ থেকে মোটামুটি একটা আন্দাজ পাওয়া যায় ভবিষ্যৎ চিত্রচর্চা কিভাবে, কোন্ রীতিতে গড়ে উঠবে বা উঠতে পারে। বলা যায় না হয়তো বা দেখার আনন্দেই আমরা হঠাৎ আবিষ্কার করে বসবো এইসব নবীনের মাঝে আগামী কোন প্রতিভাকে।

এবারের প্রদর্শনীতে মোট প্রদর্শিত শিল্পবস্তু হলো ৬৫৫টি। তন্মধ্যে জলরঙ ৩৮টি, রেখাচিত্র ও আভাষচিত্র ৬৯টি, ভিত্তিচিত্র ১০টি, ভারতীয় শৈলী ৫৭টি, ভাস্কর্য ১৪টি, চিত্র ও তৈলচিত্র ৩৮টি, ব্যবহারিক চিত্র ১১৪টি, কারুশিল্পবিভাগে চামড়ার কাজ ৭৯টি, বাটিক ১১৪টি, কাঠের কাজ ৪২টি।

অন্যান্যবারের তুলনায় এবারের প্রদর্শনীতে যে বৈশিষ্ট্যটুকু প্রতিভাত তা হলো শিক্ষানবীশ চিত্রকরদের অবশ্য করণীয় মহৎ-শিল্পীদের রচনার অনুলিপি এবং তাঁদের অনুপ্রেরণাজাত রচনাগুলির প্রাত্যহিক অনুশীলন, সেই আদর্শের অনুলিপি এবং স্থির বস্তুর চিত্রাবলী রচনা। স্বভাবতই এগুলির অনুশীলনে, এসব বিভাগে বিদ্যালয়টির পাঠক্রম ও শিক্ষকদের যোগ্যতা এবং শিক্ষানবীশ চিত্রকরদের প্রেরণালব্ধ সততার প্রমাণ পাওয়া যায় এ প্রদর্শনী মারফৎ। সেই দিক থেকে এবারের শিল্পবস্তু নির্বাচনে কর্তৃপক্ষের বিচক্ষণতা প্রকাশ পেয়েছে।

জলরঙের ছবির মধ্যে সব্যসাচী দত্তের "হলুদ নৌকা" (১৫) কাজটির সাবলীল বর্ণপ্রয়োগ বিচিত্র হয়ে উঠলেও চিত্রভূমির ওপরের আকাশ অপরিচ্ছন্ন হওয়ায় ছবিটি উৎরোতে পারে নি। সুব্রত দাশের "টাটার কারখানার অভ্যন্তর" (১৭) চিত্রটি রুক্ষসাধ্য অনুস্থাপনায়, সাবধানী বর্ণবিন্যাসে ছাত্রশিল্পীর কৃত-কৌশল প্রয়োগের তৎপরতা প্রকাশ করেছে। মাধবী ভকৎ-এর "বান্ধবী সুনন্দা" (৬৫) আভাষ-চিত্রটি সহজ, সরল বর্ণপ্রয়োগ ও হিসাবী রেখার ব্যবহারে একটি মনোহর চিত্র হয়ে উঠেছে। সুধীর বন্দ্যোপাধ্যায়-এর ফতেপুর-সিক্রির "পুরনো কেল্লা" (১০৫) আভাষচিত্রটি লাল রঙের বৈচিত্র্যপূর্ণ ব্যবহারে বিচিত্র হয়ে উঠলেও অসাবধান চিত্রসীমা রচনা (ড্রইং) একটি সুষ্ঠু প্রয়াসকে বিকৃত করে দিয়েছে।

ভারতীয়-শৈলীবিভাগের কাজগুলি এবার অনেক উন্নত, বিশেষত ছাত্রশিল্পীদের যথাযোগ্য অনুশীলন প্রয়াসের প্রমাণস্বরূপ কয়েকটি প্রাচীন ভারতীয় শৈলীর অনুলিপি, অনুকরণ, অনুসরণজাত চিত্র আছে এখানে। মোগল চিত্রশৈলীর অনবদ্য প্রতিদান—জাহাঙ্গীর দরবারের শিল্পীদের রচিত ভারতীয় পশুপক্ষীর চিত্রাবলী যে বিস্ময়কর শিল্পমান রচনা করতে সম্ভব হয়েছিল, আজকের চিত্রকরদের কাছে তা প্রায় অজানা বস্তু। তাই এবার এ প্রদর্শনীতে চম্পা রায়চৌধুরী রচিত "পাখীর অনুলিপি" (১৪৭) প্রাথমিক প্রয়াস হলেও সুপ্রচেষ্টা। সিংহলের জগৎখ্যাত

একটি ঘোষণা

আগামী সংখ্যায় মধ্যবর্তী নির্বাচনে বিভিন্ন দলের ধারণা, লোক-জিজ্ঞাসা ও সম্ভাব্য ফলাফলের ওপর যুক্তিনিষ্ঠ ও তথ্যপূর্ণ আলোচনা করছেন কুমুদ দাশগুপ্ত, প্রদীপ চক্রবর্তী, পর্যবেক্ষক, সাগর বিশ্বাস ও আরো অনেকে।

গুহা-চিত্রাবলী "শিলিগিরিয়া" ভিত্তি-চিত্রের (১৩৮)-টি ব্যর্থ অনুকরণ প্রয়াস। তাই এটি এক্ষেত্রে শিক্ষক ও নির্বাচক-মণ্ডলীর অনবধানতার সাক্ষ্য দিচ্ছে। লীলিমা মুখোপাধ্যায়-এর (১৪৫) অজন্তার অনুলিপি ছবিটি, যেটি অজন্তা গুহা সংখ্যা ১৭-র অন্যতম উজ্জ্বল নিদর্শন সেই অপ্সরাটি থেকে রচিত হয়েছে সেটি সম্বন্ধে শিল্পীর যথেষ্ট সাবধানতা অবলম্বন করা উচিত ছিল। মৃণালকান্তি সেনগুপ্তের "অনুস্থাপন" (১৫৮)-টি জৈন কল্পসূত্রের পুঁথিচিত্রের অনুপ্রেরণায় রচিত এবং ঐ শিল্পীর "অনুস্থাপন" (১৫৯)-টি পাহাড়ী শৈলীর অনুপ্রেরণায় সুরচিত, শুক্তিশুভ্র বন্দ্যোপাধ্যায়-এর (১৫৬) চিত্রটি রাজস্থানী রাগমালা চিত্রের তোড়ি রাগিণীর অনুপ্রেরণায় সুরচিত। সুবীর বন্দ্যোপাধ্যায়-এর অনুস্থাপন নং ৩ (১৬৬) ছবিটিতে দিল্লীর বিগত শিল্পী শৈলজ মুখোপাধ্যায়-এর প্রভাব পরিলক্ষিত হলেও সুরচিত চিত্র বলা যায়।

তেলরঙ বিভাগে এবার কয়েকটি প্রথাসিদ্ধ চিত্রকলার সমাবেশ দেখলাম। সেই সঙ্গে কয়েকটি বহির্মুখী অবচেতন মনের ভণিতাজনিত চিত্রপ্রচেষ্টাও রয়েছে। শিক্ষারত শিল্পীদের পক্ষে আয়াসসাধ্য প্রথাসিদ্ধ শিল্প-শৈলীগুলির অনুধাবন অবশ্যকরণীয়, সেদিক থেকে এবারের প্রদর্শনীতে প্রদর্শিত চিত্রাবলী নির্বাচকদের সুবিবেচনার পরিচয় দিয়েছে আর একবার। কিংবদন্তি মাইতির (১৯০) "প্রধান গীর্জা" ছবিটিতে কলকাতার সুউচ্চ সেণ্ট পলস্ ক্যাথিড্রালটির পরিবেশ রচনা ও সীমারেখা রচনায় 'ক্ষয়-বৃদ্ধি' ব্যবহার বিচিত্র। বর্ণ সমাবেশও উচ্চাঙ্গের, বস্তুবিশেষের "ভর" প্রকাশ সুষ্ঠু, তবে গীর্জার বাগানের গাছগুলির ক্ষেত্রে পর্বতপ্রমাণ "ভর" প্রকাশিত হওয়ায় এই সুন্দর ছবিটির উদ্দেশ্য ব্যাহত হয়েছে। কাঞ্চন দাশগুপ্তের (১৯২) স্থির-বস্তু চিত্রটির প্রয়াস ভাল হলেও পেছনের কাপড়ের অংশ এবং ওপরের নক্সা রচনার চেষ্টা সহজিয়াকরণের প্রেরণায় ব্যর্থ হয়েছে। এই শিল্পীর আঁকা "বাগান" ছবিটি সুপ্রচেষ্টা হলেও পশ্চাদপটের অপরিচ্ছন্ন বর্ণ-প্রয়োগ ব্যাহত করেছে চিত্রটির সাফল্যকে। গীতা ভট্টাচার্যের "দিবা-শেষের আলো" (৪০) কয়েকটি গাদা-বোটের ওপর প্রতিভাত হয়ে দিন শেষের পরিবেশকে সুন্দর প্রকাশ করেছে। শিল্পী যদি প্রত্যক্ষ আভাষ-চিত্র রূপে এটি রচনা করে থাকেন তবে এই শিক্ষার্থীর মধ্যে সার্থক শিল্পীর সম্ভাবনা অঙ্কুরিত।

ব্যবহারিক শিল্প বিভাগে এক ইতর-প্রিয়, বাজারে, ব্যবহারিক চিত্রকরকে শিক্ষকরূপে নিয়োগের কাল থেকেই এ শিক্ষায়তনে দেখা যাচ্ছে যে বিদেশ থেকে প্রত্যক্ষ আমদানী করা ব্যবহারিক কলার হুবহু প্রয়োগ ও অনুকরণজাত চিত্র নির্মাণ প্রচেষ্টা, সেই যুগ থেকেই এ প্রদর্শনীর নির্বাচকমণ্ডলী নির্লজ্জভাবে এই বিদেশী ব্যবহারিক শিল্পভাষাকে নির্বিবাদে প্রদর্শন করে চলেছেন বছরের পর বছর। এবারেও তার ব্যতিক্রম ঘটে নি। বাজারের চাহিদা পূরণের প্রেরণাই এই বিভাগের শিক্ষকমণ্ডলীকে হিতাহিত জ্ঞানশূন্য করে দিয়েছে। যেমন নাকি সরিষার তেলের চাহিদা মেটাতে তেলে শিয়ালকাঁটার বিষ মিশিয়ে চলেছেন "খুনী" বাজারে ব্যবসায়ীরা। নবীন শিক্ষার্থী শিল্পীর সহজাত অনুসন্ধান প্রেরণা, নতুন সৃষ্টির আবেগকে যথাযথ পরিচালিত করতে না পারলে বিপথগামী সেই শিল্প-প্রচেষ্টাগুলি বাজারের চাহিদা মেটাতে পারলেও জাতীয় সাংস্কৃতিক চেতনাকে "খুন" করতে পারে। এইসব শিল্প-বিদ্যালয়জাত ব্যবহারিক শিল্পীদের রচিত শিল্পকর্ম তাই প্রতিদিনই জানিতে বা অজানিতে বাজারের চাহিদা মেটাবার প্রয়াসে যে সব আমদানীজাত বীভৎসরস পরিবেশন করে চলেছে বিভিন্ন পত্র-পত্রিকা বা প্রাচীরচিত্র, দেওয়ালপঞ্জীর মাধ্যমে তার মারাত্মক বিষক্রিয়া আজকের সমাজের প্রতি স্তরেই অতীব প্রত্যক্ষ বস্তু। এবারের এ প্রদর্শনীতে সেই বিকৃত শিক্ষাদান প্রচেষ্টাই প্রতিভাত হয়েছে।

হস্তশিল্প বিভাগের ক্রিয়াকর্মগুলির সঙ্গে পরম্পরার কোন যোগাযোগ পরিলক্ষিত হয় না। দেশ-বিদেশের বিভিন্ন হস্তশিল্প নির্মাণের কৃত-কৌশলগুলি আহরণ করে, পরিবেশ ও পরিকল্পনার কথা চিন্তা না করেই যে-কোন বিষয়-বস্তুর ওপর প্রয়োগ করে রচিত হচ্ছে এখানের দ্রব্যসামগ্রী। রুক্ষ মরুভূমির পরিবেশজাত জয়পুরী সাঙ্গানের গ্রামের বিশিষ্ট বস্ত্র অলংকরণরীতির প্রচলিত দুটি পদ্ধতি "টাই এণ্ড ডাই" একটি পদ্ধতি টেবিল প্রসাধনের জন্য প্রয়োগ করা হয়েছে। রচনাটি সুষ্ঠু হলেও বস্তুটিতে বিপরীত পরিবেশ রচনার সম্ভাবনা রয়েছে। তেমনি বাটিকের ছবিতে আরব্য উপন্যাসের চিত্রায়ণ বা কাঠের কাজের সহজিয়া আসবাব বা পুতুল নির্মাণ প্রচেষ্টাগুলি অতি-সাধারণের পর্যায় কাটিয়ে উঠতে পারে নি। তবু এ প্রদর্শনীর এই হস্তশিল্প বিভাগটির জনপ্রিয়তা রয়েছে। বিশেষ করে শীতের মরশুমে কলকাতায় জমায়েত দেশ-বিদেশের "বিটলেদের" কাছে এই বিভাগের উদ্ভটতম উদ্ভবগুলির চাহিদা অন্যান্য বিভাগের চাহিদার চেয়েও আশাপ্রদ।

শিক্ষার্থী শিল্পীদের এই সুষ্ঠু প্রদর্শনীটি আগামী দিনের সম্ভাবনাপূর্ণ শিল্পীদের কর্মক্ষেত্র রচনা করে চলেছে আশাপ্রদভাবে। বিগত কয়েক বছরের প্রচেষ্টাগুলি বিপথগামী হয়েছিল তার পরিণতিতেই আজ সুকুমার কলার পীঠস্থান বাংলার শিল্পকলায় বীভৎসরসের প্লাবন বয়ে চলেছে। গত বছর থেকে এখানের দুটি শিল্পকলা-শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে "নব প্রেরণা" কার্যকরী রয়েছে। এই সুষ্ঠু শিল্পচেতনা আরও প্রত্যক্ষ হয়ে কার্যকরী হোক আজকের নবীন শিল্পীদের মধ্যে, তবেই আবার সম্ভাবনাময় শিল্প-পরিবেশ রচনা সম্ভব হয়ে উঠবে এদেশে—তথা ভারতে।

—শিলাদিত্য

বিনামূল্যে টেরিন প্যাণ্ট পীস

মাসিক ১০৲ কিস্তিতে অল ওয়ার্ল্ড ন্যাশন্যাল প্যানাসোনিক জাপান মডেল পোর্টেবল ট্রান-জিস্টারের সহিত পাই-বেন। ডাকযোগে যেখানে খুশি পাবেন।

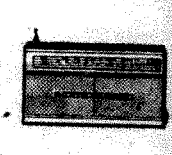

Coopex India (B.W.C.—32)
P. Box 1616, Delhi

গ্রন্থমেলা

পশ্চিম বাংলার সাধারণ নির্বাচন (চারটি নির্বাচনের সমীক্ষা)—বাসব সরকার। প্রকাশক ঃ শতরূপা প্রকাশনী, ২০।এ বলাই সিংহ লেন, কলকাতা—৯। মূল্য ঃ দেড় টাকা।

আসন্ন মধ্যবর্তী নির্বাচনের প্রাক্কালে শ্রীবাসব সরকারের এই সমীক্ষা পুস্তিকাখানি সাংবাদিক, রাজনৈতিক কর্মী এবং সমাজবিজ্ঞানীদের প্রচুর সাহায্য করবে। প্রথম তিনটি সাধারণ নির্বাচনের সংক্ষিপ্ত সমীক্ষা এবং চতুর্থ সাধারণ নির্বাচনের দলগত ও জেলাগত ব্যাপক সমীক্ষা একটি পুস্তিকার মধ্যেই আহরণ করে লেখক সকলের-ই ধন্যবাদার্হ। নির্বাচনে কোন্ প্রার্থী এবং কোন্ দল কত ভোট পেয়েছিল তার বিস্তৃত তথ্যাদি উপস্থাপিত করার সঙ্গে সঙ্গে লেখক দলগত ভোটের তারতম্যের কারণ উপস্থাপিত করেছেন বিজ্ঞানীর অনুসন্ধিৎসা নিয়ে। অত্যন্ত সময়োপযোগী এই পুস্তিকাখানি প্রকাশ করার জন্য শতরূপা প্রকাশনীরও ধন্যবাদ প্রাপ্য।

সোনামুখে রক্ত ছিটোয় ঃ (১৩৭৫, আষাঢ়) বেণু দত্তরায়। সিগনেট বুক শপ, ১২, বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট, কলকাতা-১২। মূল্য ঃ দুই টাকা পঞ্চাশ পয়সা।

শব্দচয়নে আপাত অন্যমনস্কতা, অসংলগ্নতা ও অসংবদ্ধতা, ছোট ছোট ভাঙাচোরা বাক্য, কবিতায় শব্দের পুনরাবৃত্তি, এইসব নিজস্ব স্বতন্ত্র বিশিষ্ট লক্ষণ দেখে সহজেই বেণু দত্তরায়ের কবিতা চিনে নিতে বিন্দুমাত্র অসুবিধা হয় না। অসহ্য আবেগে অভিসিঞ্চিত হয়ে তাঁর কবিতাগুলি পাঠকচিত্তে অনুরণন তোলে। কবি অধিকাংশ সময়ে আত্মগত একাকীত্বে মুহ্যমান ['এই খালি বাড়িটাতে একা একা/ আশৈশব একা-একা থাকি।' (খালি বাড়িতে একা) অথবা 'কাচের শার্সি বন্ধ। বাংলোয় নির্জন একাকীত্ব' (বাঘ ডাকে)] কি যেন পেতে চান—কিন্তু একটা অভাব, না পাওয়ার বেদনাবোধ সদা জাগ্রত—'জীবন অভাবগ্রস্ত অভাব মনের মধ্যে/পুষে রাখছি।' (আজন্ম অভাবের মধ্যে) খুন গায়েব হত্যা ইত্যাদি কথা একাধিক কবিতায় ছড়ানো রয়েছে। তাহলেও ভয়ানক রসের কবিতা নয় এগুলি। আধুনিক সভ্যতার বেদীমূলে আমরা কি সত্যিই বলি হয়েছি? বেণু দত্তরায় সিনিক কবি। যুগের অবশ্যম্ভাবী জীবন-যন্ত্রণায় কবির অন্তর মথিত, তিনি দেখছেন, 'বনেদী বিশ্বাসগুলি টাল-মাটাল' (বড্ড বেশি র‍্যাগিং হচ্ছে) অথবা 'দক্ষিণ দুয়ারে প্রেম এসেছিল/স্বপ্নভঙ্গ মনস্তাপ/এখন হাঁটুর মধ্যে যন্ত্রে বিঁধে আছে' (এই শতকে কখনো)। একটি সুন্দর কবিতা "ঠিকানা জানা নেই"-তে মানুষ যে বহিরঙ্গসর্বস্ব হয়ে পড়েছে, আন্তরিকতা নেই, তা যথাযথ চিত্রিত। "পাশের ঘরে কে হাসছে", "লটারীর টিকিট", "বড্ড বেশ র‍্যাগিং হচ্ছে", "নিরাপত্তার অভাব খুব" ইত্যাদি কবিতার মধ্যে দিয়ে ঘুণধরা আধুনিক সমাজব্যবস্থার চিত্র ফুটে উঠেছে। অথচ "হিংসা না থাকলে অসুখী মনে হয়" ও "ভালবাসলে, না বাসলে" এই দুটি কবিতায় ভালবাসার কি অপূর্ব ব্যঞ্জনাই না কবি দিয়েছেন!

আপাত অসংবদ্ধ মনে হলেও, শব্দচয়নে যেমন তাঁর নিষ্ঠা, কবিত্বও তাঁর তেমনই। 'ভিনিগার দিয়ে সন্ধ্যায় সকালে/ হৃদয় ভিজিয়ে রাখি' (রাত্রে ঘুমালে), 'জেগে/হিংসাই ভীষণ ভালবাসা' (হিংসা না থাকলে অসুখী মনে হয়), 'ঘাতকের হাসিগুলি যেন সব ফুল হয়ে থাকে' (জ্যোৎস্নায় বাগানে নারী), 'বুকের মধ্যে হামাগুড়ি দিয়ে কেউ/একরাশ রক্ত এলো করে' (বাঘ ডাকে) প্রভৃতি বাক্য বা বাক্যাংশগুলি অনায়াসে উল্লেখ করা যেতে পারে। একটি সুন্দর অনুপ্রাস—'কাঁকন বাজান ছল করে এলোচুলে মধুমাস ভালো না' (ভালবাসলে, না বাসলে)। এই রকম একটি উপমা—'পাশের ঘরে অদ্ভুত স্খলিত স্বরে কেউ হেসে উঠেছে/যেন মাখনের দলা গলে যাচ্ছে'...(পাশের ঘরে কে হাসছে)। "হলুদ নীল রাত্রি", ফুলন্ত রেলিঙে (হত্যাকারী কে), 'জল্লাদ আঁধারে' (আমি খুন হয়েছি) ইত্যাদি রূপকল্প প্রশংসনীয়।

ছাপা ও বাঁধাই সুন্দর। প্রচ্ছদপট ভাল —তবে আধুনিক চিত্রকলার বৈশিষ্ট্য কিনা জানি না—"ছিটোয়" শব্দটি ছবিতে ছিটিয়ে গেছে।

একাঙ্ক ঃ প্রশান্ত মৈত্র। ডিলাইট বুক কোং, ১৭৩/৩, বিধান সরণি, কলকাতা—৬, দাম ১ টাকা ৫০ পয়সা।

২৯টি কবিতার সঙ্কলন নিয়ে প্রশান্ত মৈত্রের কাব্যগ্রন্থ একাঙ্ক। ক্লান্তি ও নৈরাশ্যের সুর অনেকগুলি কবিতায় কিন্তু অন্ধকার এবং হতাশা জয় করতে হবে এযুগে। 'কোন এক মেয়েকে', 'নিকট-দূর', 'যখন ছিলেম অন্ধ' প্রভৃতি কতকগুলি কবিতা উল্লেখ্য।

"ফসল" (অক্টোবর, ১৯৬২) ও "মনে পড়ে" (মার্চ, ১৯৬৩), মিলনকুসুম ভট্টাচার্য। তপেন্দ্র স্মৃতি আসর ১১/১, বৈঠকখানা ফার্স্ট লেন, কলকাতা—৯। দাম যথাক্রমে ২৫ পয়সা ও ৫০ পয়সা।

ষাটের দশকে রচিত মিলনকুসুম ভট্টাচার্যের আলোচ্য কবিতাপুস্তিকা দুটিতে যথাক্রমে ১৬টি ও ১২টি কবিতা স্থান পেয়েছে। প্রথম পুস্তিকাটিতে কবির যুগোপযোগী দৃষ্টিভঙ্গীর পরিচয় পাই আমরা 'আবর্তন', 'ক্ষুধা', 'ট্র্যাজেডি' প্রভৃতি কবিতার মধ্যে। দ্বিতীয় কাব্যগ্রন্থে আবেগপ্রধান কবি আপন বেদনা পাঠকমনেও সঞ্চারিত করতে পেরেছেন। চিন্তায় এবং প্রকাশভঙ্গীতে কবির আন্তরিকতা লক্ষণীয়।

ছায়াপথ ঃ বিমলচন্দ্র বেদজ্ঞ। ১৯।২৩, মল রোড, কলকাতা—২৮। দাম—তিন টাকা।

মোট ১০০টি কবিতা নিয়ে বিমলচন্দ্র বেদজ্ঞ মহাশয়ের কাব্যগ্রন্থ "ছায়াপথ"। কবিতাগুলি সহজবোধ্য, কষ্ট-কল্পনা বর্জিত এবং আবেগপূর্ণ। কবিতার আঙ্গিকের দিক থেকে প্রাচীনপন্থী হলেও ভারতীয় সেনা বাহিনীর কর্মচারী এই কবি প্রগতিবাদী। 'পবিত্র দীপ', 'রসভঙ্গ', 'উল্টারথ', 'পাকিস্তান' 'বলিদান' প্রভৃতি কবিতা এইদিক দিয়ে উল্লেখযোগ্য। প্রেমের কবিতাগুলিতে পবিত্রতাই তাঁর মূলধন। আমরা কবির কাব্য সাধনার সাফল্য কামনা করি।

ডাড়ুমডুম। অমরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, মিত্তিরিট, ৬১, সেলিমপুর রোড, কলকাতা—৩১। দাম ১·৫০ মাত্র।

শিশুর দুনিয়া খেয়ালখুশির বিচিত্র এক রাজ্য। সেই বিচিত্র খেলাঘরে শিশু যেমন নানা কল্পনার স্বপ্ন গড়ে আনন্দ পায়, তেমনি তার আনন্দকে ভাষা দেয় আধো-আধো বোলের নানা ছড়া ও ছন্দ। নানা সুরেলা ধ্বনিতরঙ্গ তার মনকে মুক্তি দেয়, অপ্রকাশকে করে মুখর। তাই শিশুর খেয়াল-খেলাকে পরিতৃপ্ত করবার ভার যিনি নেন, তিনি শুধু লেখক নন, তিনিও যথার্থ শিশু। অবাক মনের স্বপ্নভরা আনন্দকে দুলিয়ে তুলে তার বাণীময় ছন্দকে অপরূপ করে ছড়িয়েছেন আলোচ্য গ্রন্থটির লেখক। নানারঙা ছবিগুলি এটিকে আরো সুন্দর করেছে, মজাদার করেছে কল্পলোককে। বইটি শিশুদের আদর কাড়বে বলে বিশ্বাস করি।

রঙ্গজগৎ

মেলা আর মেলা

কলকাতায় এবার মেলার ধুম পড়েছে। যত মেলা তত বাহার। মান্দার ফুলের মত রঙ ছড়িয়েছে; রূপ আছে গন্ধ নেই, ঢঙ আছে গুণ নেই। মরশুমি ফ্যাসানের মত এই মেলা। একটি হল রাজ্যপালের মেলা। যদিও ক্রিকেট খেলার নামে তামাম বাংলা বোম্বাই-এর চিত্রাকাশের তারকারা কলকাতার মাঠে নেমেছিলেন এবং উপলক্ষ ছিল উত্তরবঙ্গের বন্যার্তদের সাহায্য করা। অন্তত খবরের কাগজের মারফৎ মানুষের কাছে এই কথাই ত' ছড়িয়েছে। (একথা শুনে উত্তরবঙ্গের বন্যার্ত দীনতম মানুষটিও হয়ত অসম্মানকর মনে করবেন।) কিন্তু আসলে ত' তামাসা; একটা মজা লুটবার ব্যাপার। আমাদের দেশের জনগণের টাকায় হাওয়াই জাহাজে করে আসা, গ্রেট ইস্টার্ন হোটেলে খানা-পিনা, থাকা। ক্রিকেট ব্যাট হাতে নিয়ে কায়দা করে মাঠে নেমে এক রাউন্ড পাবলিসিটি পাওয়া আর যাঁরা দু'বছরে একটা ছবিতে দু'-এক মিনিট মুখ দেখাবার মত একটা ভূমিকায় অভিনয় করেন তাঁরাও রঙ-বেরঙের শাড়ি পরে প্রজাপতির মত মাঠ চষে বেড়ান। তারকার সাইনবোর্ডের নিচে দাঁড়াবার জীবনে হয়ত এই শেষ সুযোগ! এই ক্রিকেট খেলায় দর্শক এসেছেন অনেক—পকেটের টাকা ঝেড়ে। প্রজাপতিরা কাছে এলে আরো দিচ্ছে, একটু হাসি, একটু চাহনী, তাও বা কম কি! বন্যার্তদের জন্য? সে ত' পাড়ায় পাড়ায় ছেলে-মেয়েরা গিয়েছে, তাদের লোকে দিয়েছেও। সে দেওয়ায় ছিল আন্তরিকতা। এখানে একটু তামাসা, ক্রিকেট খেলা কে আর এদের কাছে দেখতে চায়! যারা এই মেলার উদ্যোক্তা তারা কিন্তু খলিফা ব্যক্তি। কারণ পরের পয়সায় মজা, আর রাজ্য-পালকে তুষ্ট করা দুটো কাজ এক সঙ্গে হচ্ছে। বন্যার্ত। ওদের নাম করে না হয় দু'-পেগ মদ বেশি খাওয়া যাবে।

আর একটা মেলা বসেছিল পৌর-ভবনে। মেয়রের মেলা। উপলক্ষ : উত্তমকুমারকে সম্বর্ধনা জানানো। যেমন তারকার গ্ল্যামার—তেমনি সম্বর্ধনা। দেশ-বিদেশের কোন বিজ্ঞানী, সাহিত্যিক ও রাষ্ট্রনেতার বরাতেও বুঝি এমন আয়োজন জোটে নি। চিত্রতারকা উত্তম-কুমার, গণেশ দর্শকদের কথায় 'গুরু' সম্বর্ধনা গ্রহণ করতে গিয়েছিলেন সম্বর্ধনার সময়েই এ নিয়ে কথা উঠেছে—উনি কে, স্ত্রীর সঙ্গে উনি কেন, ইত্যাদি। থাক সে কথা, সাবাস উত্তম-কুমার, তিনি মহাসমারোহে নাগরিক সম্বর্ধনা লাভ করেছেন ভারতের বৃহত্তম নগরীর। এই মেলায় অনেক খ্যাত-অখ্যাতজনের ভিড়ে গিজগিজ করছিল। আমন্ত্রণের ঢালাও ব্যবস্থার মধ্যে কিন্তু সাপ্তাহিক বসুমতীর রঙ্গজগৎ বিভাগ বাদ গেছে। সম্ভবত ও-রসে আসক্তি নেই বলে।

এবার বলছি তৃতীয় মেলার কথা। এ মেলা মুক্ত মেলা। এখানে নাকি যা খুশি বলা যায়, যা খুশি করা যায়। এতদিন জানতাম শেষের দুটো কথা তাদের পক্ষে প্রযোজ্য—যাদের স্থান হয় মানসিক রোগীর হাসপাতালে। এখন দেখছি তার একটা সাহিত্যিক অর্থ আছে। বিশেষ করে সমরেশ বসু, শম্ভু মিত্র এবং কিছু বাজারী কবি সাহিত্যিক-কেও আর মানসিক রোগী বলে উড়িয়ে দিতে পারি না! এখানে জড় হয় বড়-লোকের ডেঁপো ছেলেদের সঙ্গে কিছু মেয়েও। ওরা হাত-পা ছুঁড়ে গান গায়, কবিতা আবৃত্তি করে, ছবি টাঙায়, ফুচকা খায়, আবছা আঁধারে ফিস ফিস কথা কয়,—মাঠের মধ্যে হারিয়ে যায়। গানে

চেকোশ্লোভাক ছবি 'লেফ্‌ট উইথ ফাইভ গার্লস'-এর একজন

কবিতায়, ছবিতে আদিরসের প্রকাশ; পরিবেশনে বাধা নেই। তাই এটা মুক্ত মেলা। কাগজে পড়েছি এমন মুক্ত মেলা আমেরিকায় হিপিরা করে; আরো কোথাও নাকি বেলাভূমিতে চাঁদনী রাতে এরকম মুক্ত মেলা বসছে। সেখানে যা খুশি বল, যা খুশি কর। পোষাক-পরিচ্ছদেও নাকি মুক্তির ডাক পৌঁচেছে, তাই কেউ কেউ লেঙট মাত্র সম্বল করে মেলায় হাজির হয়। এখানেও হয়ত সুইমিং কস্ট্যুম পরা মেয়ে আর লেঙট পরা ছেলেকে দেখা যাবে দু-দিন পরে। এখন ত' সবে সন্ধ্যে, আসরে গৌরচন্দ্রিকা হচ্ছে। আসল ভূমিকাভিনেতাদের চেহারা দেখা যাবে পরে। মেলার কলকাঠির সুতো কার হাতে—সে কথা কিন্তু নজর রাখলেই জানা যায়।

—সুজন।

জাপানী ছবি 'দি জাপান'-এর দু' বোন

চিত্র আলোচনা

কুরোসাওয়ার ছবি 'রেড বিয়ার্ড'

সিনেসেণ্ট্রাল ক্যালকাটা, জাপানী দূতাবাস এবং ইণ্ডো-জাপানীজ এসোসিয়েশনের যুক্ত উদ্যোগে সম্প্রতি কলকাতায় জাপানী চলচ্চিত্র উৎসব অনুষ্ঠিত হয়েছে। গত ৫ই জানুয়ারী ম্যাজেস্টিক সিনেমায় চিত্র-পরিচালক শ্রীমধু বসুর সভাপতিত্বে এই উৎসব উদ্বোধন করেন রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ডঃ রমা চৌধুরী। ম্যাজেস্টিক এবং সোসাইটি সিনেমায় 'এ্যাঙ্গরী সী', 'দি দাপনে', 'আওয়ার সাইলেণ্ট লাভ' এবং বিশ্ববিখ্যাত পরিচালক কুরোসাওয়ার 'রেড বিয়ার্ড' দেখান হয়েছে। 'রেড বিয়ার্ড' ছবিটি নর্থ ক্যালকাটা ফিল্ম সোসাইটি, ক্যালকাটা ফিল্ম সোসাইটি সহ আরো কয়েকটি সোসাইটি দেখিয়েছে।

এই উৎসবে একমাত্র উল্লেখযোগ্য ছবি ছিল 'রেড বিয়ার্ড'। এই ছবিটি মস্কো চলচ্চিত্র উৎসবে লেবার ইউনিয়ন প্রাইজ, ভেনিস উৎসবে সিটি অব ভেনিস প্রাইজ, ক্যাথলিক ইণ্টারন্যাশনাল প্রাইজ এবং শ্রেষ্ঠ অভিনেতার পুরস্কার লাভ করেছে 'রেড বিয়ার্ড'—ভূমিকাভিনেতা তোসিরো মিফুনে।

'রেড বিয়ার্ড'-এর বক্তব্য

বিখ্যাত বিপ্লবী-কবি ও রাজনীতিক আর্নেস্ট টলার বলেছিলেন, "দারিদ্র্য মানুষকে নির্বোধ করে।" কুরোসাওয়ার কাহিনীর সূত্রপাত এখান থেকে। আরো তিনি প্রেরণা লাভ করেছেন গর্কির 'লোয়ার ডেপথ' থেকে। কুরোসাওয়ার ওপর যে গর্কির প্রভাব আছে সে কথা ছবিগুলি দেখলে বোঝা যায়। তবে গর্কি সাহিত্যের দিক-নির্দেশ বিপ্লবী মানবিকতায়, কুরোসাওয়ার উদার মানবিকতায়। সব রোগের মূল (রোগ দারিদ্র্য; দারিদ্র্য মানুষের আত্মাকে হত্যা করে, নির্বোধ ও অসহায় করে তোলে: এ কথা বলেই কুরোসাওয়া সমাধানে যেতে চেয়েছেন সততা ও মহত্ত্বের পথে। সততা ও মহত্ত্ব দিয়ে জয় করার কথা তিনি বলেছেন; তিনি আরো বলেছেন আত্মজিজ্ঞাসার কথা। এ কথার সমর্থন ডস্টয়েভস্কির সাহিত্যে পাওয়া যাবে। কিন্তু গর্কি বলেছেন এই পাপের জগৎকে দারিদ্র্যের অভিশাপকে শুধু সততা ও মহত্ত্ব দিয়ে জয় করা যাবে না। দেখতে হবে তার মূল কোথায়? মূল হচ্ছে শ্রেণী-শোষণ; মানুষ যদি মানুষকে শোষণ না করে তবে এই দারিদ্র্যের পাপ ও মনের পঙ্কিলতা সৃষ্টি হতে পারে না। তাই শোষণের অবসান ঘটাতে হবে, যারা শোষণ করে তাদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করতে হবে, শোষকদের প্রতি ঘৃণা জাগাতে হবে। কুরোসাওয়ার 'রেড বিয়ার্ড'-এ গরীবদের প্রতি সহানুভূতি ও আত্মজিজ্ঞাসা আছে কিন্তু শোষকদের প্রতি ঘৃণা নেই, মূলেও তিনি যান নি।

তথাপি 'রেড বিয়ার্ড' জগতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ ছবি। অন্তত সাহসের সঙ্গে কুরোসাওয়ার দারিদ্র্যের অভিশাপকে প্রকাশ করেছেন—আত্মবিশ্লেষণের দৃষ্টিতে। যা মানুষের চেনাকে জাগিয়ে তুলতে সাহায্য করে।

ডাঃ কয়জো নাইডে তাঁর লালচে দাড়ির জন্য রেড বিয়ার্ড নামে পরিচিত। দরিদ্র অঞ্চলে একটা হাসপাতাল করেছেন। সেখানে অসহায় ভিখারী, বেশ্যা থেকে

জুয়াড়ী গুণ্ডারা চিকিৎসিত হয়। এই হাসপাতালে এল সদ্য পাশ করা ইয়াসুমোতো। তার চোখে দর্শকরা দেখলো হাসপাতালের 'ভয়ঙ্কর' রোগীদের—কোন ডাক্তার যাদের দেখে উৎসাহিত হবে না বরঞ্চ ডাক্তারী করাকে অভিশাপ মনে করবে। তারপরে দেখা গেল ডাঃ নাইডে বা রেড বিয়ার্ডকে, লোকটিকে দেখে মনে হবে দাম্ভিক, উদ্ধত স্বভাবের মানুষ। ইয়াসুমোতোর মন বিদ্রোহী হয়ে ওঠে। সে হাসপাতালের নিয়মশৃংখলা ভংগ করে এখান থেকে তাকে চলে যেতে বাধ্য করতে চায়। এই মানসিক অস্থিরতার মধ্যে তার প্রথম অভিজ্ঞতা সুন্দরী মস্তিষ্ক বিকৃত রোগিণীর ব্যাপারে। সুন্দরী তাকে সহজেই দেহ ভোগে সম্মত করে—যখন হত্যা করতে উদ্যত, ঠিক সে মুহূর্তে 'রেড বিয়ার্ড' এসে তাকে বাঁচায়। ১১ বছর বয়সে এই তরুণীকে এক দোকানদার বলাৎকার করেছিল। তাকে হত্যা করার প্রতিশোধস্পৃহায় তরুণী এ-পর্যন্ত কয়েকজনকে দেহ নিবেদন করে হত্যা করেছে। ইয়াসুমোতোর আর এক অভিজ্ঞতা গণিকালয়ের সেই মেয়েটি। যার বিবেক ও বুদ্ধি মরে গেছে। রেড বিয়ার্ড শারীরিক শক্তি প্রয়োগ করে মেয়েটিকে উদ্ধার করে এনে ইয়াসুমোতোকে দিল চিকিৎসার ভার। আস্তে আস্তে মেয়েটি সুস্থ হল, স্নেহ, মমতা, প্রীতি জন্মাল তার মনে। ইয়াসুমোতোর তৃতীয় অভিজ্ঞতা জন্মাল এক সাধুপুরুষের মৃত্যুকালীন জবানবন্দী শুনে। লোকটিকে সবাই সৎ বলে সম্মান করত; সে জানিয়ে গেল কি করে তার প্রেমিকাকে সে হত্যা করে মাটির নিচে কবর দিয়েছিল এবং তারই ওপর কারখানা করে—মানুষের মংগলের জন্য কাজ করেছে। এই জবানবন্দী শোনার আগে সে দেখেছে এক বৃদ্ধের মৃত্যুকে; যে মৃত্যু দেখে তার মনে হয়েছে মৃত্যু কেবল ডাক্তারী শাস্ত্রানুযায়ী হৃদ-যন্ত্র বা মস্তিষ্কের কাজ বন্ধ হয়ে যাওয়া নয়, আরো কিছু বেশি এবং তা ভয়ঙ্কর। এই সংগে সে দেখেছে দারিদ্র্য যেখানে জীবনকে নরকতুল্য করে রেখেছে; সেই একই সমাজে বড়লোকের রোগ হচ্ছে বেশি খেয়ে। একদিকে অনটন—আর একদিকে অপচয়। এই অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে তার নতুন উপলব্ধি জন্মাল। সে বুঝল স্বার্থ-পরতা, ব্যক্তিকেন্দ্রিকতা এবং মহত্ত্বের অভাবে ডাক্তার হয়ে সে নিজেও পীড়িত-দেরই একজন। এতদিন তার প্রেমিকার বিরুদ্ধে অবিশ্বাসিনী বলে যে অভিযোগ পোষণ করেছে, সুন্দরী পাগল মেয়েটির আহ্বানে সাড়া দিয়ে নিজেকেও সে একই দোষে দোষী করেছে। এই অনুভূতি থেকে সে স্থির করল এই হাসপাতাল ছেড়ে যাবে না, এখানে থেকে মানব সেবা করবে। তার ডাক্তার হওয়ার সার্থকতা মানবপ্রেম ও সেবায়।

শিল্পী কুরোসাওয়া

কুরোসাওয়া টুকরো টুকরো জীবন ও কাহিনী উপস্থিত করে এই বিরাট কাহিনীচিত্র উপস্থিত করেছেন। তিনি পট-ভূমি রচনা করেছেন বহু অতীতের জাপান থেকে। যখন টোকিওর নাম ছিল এডো। কাহিনীকে অতীতে নিয়ে যাওয়ার কারণ সহজেই অনুমেয়। দেশ সামরিক ও রাজ-তন্ত্রের সমন্বয় করে চলেছিল, আজো সামন্ত-তন্ত্রের প্রভাব কম নয়। সুতরাং শিল্পীর স্বাধীনতার প্রশ্ন আছে। তবে পটভূমি যতই অতীতের হোক পৃথিবীর অধিকাংশ দেশে দারিদ্র্য আজো মানবজীবনের অভি-শাপ এবং দারিদ্র্যেই মানুষকে পীড়িত করে রেখেছে। সুতরাং কাহিনীর আবেদন সর্বকালীন। ছবিটির আঙ্গিক আশ্চর্য শিল্পীবোধে রচিত। নিপুণ শিল্পীর তুলির টানের মত তিনি এক-একটি চরিত্র উপস্থিত করেছেন। দৃশ্যগুলি পুঙ্খানু-পুঙ্খভাবে নিখুঁত পরিবেশে রচনা করেছে, এবং প্রতিটি দৃশ্য অর্থবহ হয়ে উঠেছে। কুরোসাওয়া প্রচলিত অর্থে পরিচালক কেবল নন, তিনি যে একজন জাত শিল্পী সে পরিচয় ছবিতে রয়েছে।

কুরোসাওয়ার পরিচয়

আকিরা কুরোসাওয়ার জন্ম ২৩শে মার্চ, ১৯১০ সালে। টোকিওর এক অভি-জাত পরিবারে তাঁর জন্ম; যে পরি-বারের লোকজন সামরিকবাহিনীর কাজ বেশি পছন্দ করে। কুরোসাওয়া একমাত্র ব্যতিক্রম—যিনি শিল্পী হতে চেয়েছিলেন। তিনি পশ্চিমীরীতির শিল্প-কলেজে শিক্ষালাভ করেন। ২৭ বছর বয়সে তিনি মনে করেন স্থির চিত্র অপেক্ষা চলচ্চিত্র তাঁর চিন্তাধারা প্রকাশের বেশি সহায়ক হবে। পরিচালক ইয়ামামোতোর সহকারী-রূপে শিক্ষাগ্রহণ করেন। তাঁর প্রথম ছবি 'সানশিরো সুগত' (১৯৪৩)। পরবর্তী ছবিগুলির মধ্যে আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি লাভ করেছে রাশোমন, সেভেন সামুরাই, লোয়ার ডেপথ, হাই এণ্ড লো, রেড বিয়ার্ড (১৯৬৫)। ম্যাকবেথের জাপানী ভাষ্য সহ তিনি আরো অনেক ছবি করেছেন।

নাটকের কথা

নাট্যোৎসবের পুরস্কার দান

গত আগস্ট-সেপ্টেম্বর মাসে কেন্দ্রীয় সরকারী কর্মচারীদের যে নাটক প্রতি-যোগিতা হয়েছিল ২১শে জানুয়ারী মহা-জাতি সদনে আনুষ্ঠানিকভাবে তার জন্য পুরস্কার দান করা হয়েছে। প্রতি-যোগিতায় ১ম ও ২য় স্থানাধিকারী সংস্থা এবং অভিনয় ও পরিচালনা কৃতিত্বের জন্য কর্মচারিগণ পুরস্কার লাভ করেন। এই অনুষ্ঠানে প্রতিযোগিতায় দ্বিতীয় স্থানাধিকারী নাটক 'সমাধান' আয়কর কর্মচারীদের দ্বারা অভিনীত হয়; জিওলজিক্যাল সার্ভে অব ইণ্ডিয়ার কর্ম-চারীরা অভিনয় করেন 'হৃদ বদলের পালা'। এই সঙ্গে সঙ্গীতানুষ্ঠান হয়।

জাপানী ছবি 'দ জাপান'-এর দু বোন

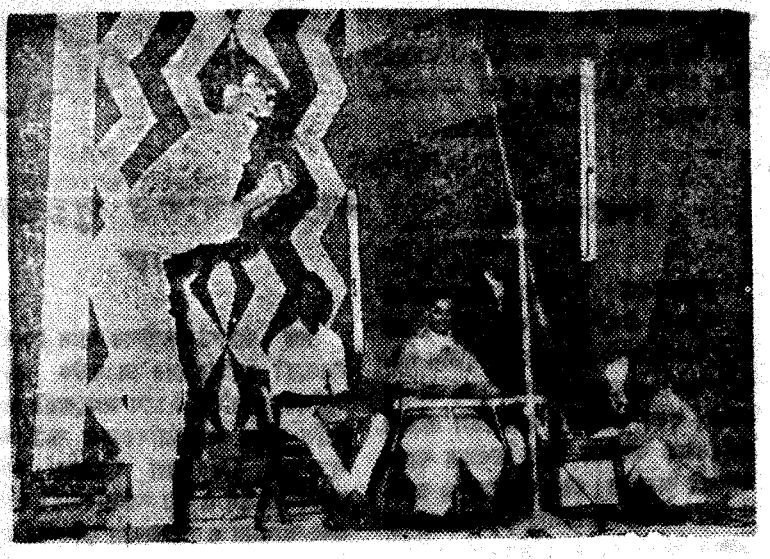

একক অভিনয়ে গাহাদাৎ হোসেন

লোকায়ন

লোকায়ন নাট্য সংস্থা আগামী ৩১শে জানুয়ারী মুক্ত অঙ্গন মঞ্চে 'দ্বীপের রাজা' নাটক অভিনয় করবে। শ্রীমোহিত চট্টোপাধ্যায় রচিত এই নাটকের নির্দেশনায় আছেন শ্রীঅরুণ রায়। মঞ্চ নির্দেশনা ও পরিকল্পনা—শ্রীরাজেন তরফদার। নৃত্য-পরিকল্পনা ও সঙ্গীত পরিচালনায় আছেন যথাক্রমে শ্রীশক্তি নাগ ও শ্রীভূপেন হাজারিকা।

গর্কির মা

আগামী ২৯শে জানুয়ারী বিশ্বরূপা মঞ্চে টেলিফোন ভবন ইউনিট প্রযোজিত 'গর্কির মা' নাটকটি মঞ্চস্থ হবে। পরিচালনায় আছেন জ্ঞানেশ মুখার্জী।

স্টুডিও খবর

দুটি নতুন মুখ

অজয় সাহনী.....

কলরাজ সাহনীর পুত্র অজয় চলচ্চিত্র অভিনেতারূপে আত্মপ্রকাশ করছে। অজয় মস্কোতে শিক্ষা গ্রহণ করেছে এবং এক আদর্শবাদের পরিবেশে মানুষ হয়েছে। এখন সে বাবার পথে জীবনকে বিকশিত করতে চায়। সে হবে চলচ্চিত্র অভিনেতা। তার প্রথম অভিনয় এল বি ফিল্মসের 'অনোখী রাত' ছবিতে। এই ছবি পরিচালনা করেছেন অসিত সেন। বাংলার সুপরিচিত পরিচালক অসিত সেন। প্রথম ছবিতে অভিনয় করেই এরই মধ্যে অজয় আরো কয়েকটি ছবিতে অভিনয়ের প্রস্তাব পেয়েছে।

জাহিদা.....

আর একজন নতুন মুখ হিন্দী ছবির জগতে দেখা দিচ্ছে। নাম তার জাহিদা। প্রযোজক আখতার হোসেনের কন্যা; অভিনেতা আনোয়ার হোসেনের ভ্রাতুষ্পুত্রী। আরো বড় পরিচয় জাহিদার পিসিমা নার্গিস। জাহিদা কিন্তু ছোটকাল থেকে অভিনয় করার প্রতি অনিচ্ছা জানিয়ে এসেছে। অথচ সেই আজ গ্রহণ করেছে অভিনয়কলা। জাহিদার প্রথম ছবি 'অনোখী রাত'। সঞ্জীবকুমার আর অজয় সাহনীর সঙ্গে এই ছবিতে সে অভিনয় করেছে।

দুরন্ত চড়াই

জগন্নাথ চ্যাটার্জী পরিচালিত 'দুরন্ত চড়াই' রাধা, পূর্ণ প্রভৃতিতে মুক্তি প্রতীক্ষায়। সমরেশ বসু রচিত এই কাহিনীচিত্রে সঙ্গীত পরিচালনা করেছেন শ্যামল মিত্র।

মুক্তিপ্রাপ্ত ছবি

২৪শে জানুয়ারী কলকাতার রূপবাণী, অরুণা, ভারতীতে মুক্তি লাভ করেছে অগ্রণী চিত্র মন্দিরের 'চিরদিনের'। পরিচালক : অগ্রদূত।

'খিলাড়ী' হিন্দী ছবি। পরিচালক হোমী ওয়াদিয়া।

'দি ওয়ে ওয়েস্ট'—গ্লোব সিনেমা।

সংবাদকণা

চেকোশ্লোভাক চলচ্চিত্র সেসন

সিনে ক্লাব অব ক্যালকাটা চেকোশ্লোভাক দূতাবাসের সহযোগিতায় ২৭শে জানুয়ারী থেকে এক চেক চলচ্চিত্র সেসন শুরু করছেন। ২রা ফেব্রুয়ারী পর্যন্ত এই সেসনে সাতটি ছবি দেখান হবে। ছবিগুলি : রিপোর্ট ফ্রম দি পার্টি এন্ড গেস্ট; ফ্লাইট; স্ট্রিক্টলি ফার্স্ট পারফরমেন্স; লেফট উইথ ফাইভ গার্লস; সপ অন দি মেইন স্ট্রীট; উল্ফ ট্রাপ; ক্যাপ্রিসাস সামার।

এই সেসন উপলক্ষে চেক দূতাবাসে এক সাংবাদিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছে।

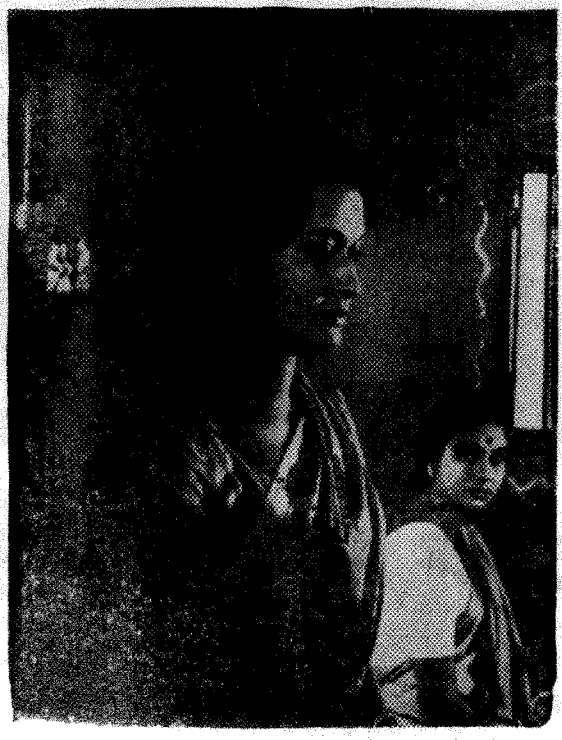

'দিবারাত্রির কাব্য' ছবিতে অঞ্জনা ভৌমিক ও মাধবী মুখার্জী

সুরবাহার

দক্ষিণ কলকাতার "সুরবাহার" সঙ্গীত শিক্ষায়তনটি কয়েকটি বিশেষ কারণে সঙ্গীত শিক্ষার ক্ষেত্রে নিজেদের সুনাম ও খ্যাতি লাভ করেছে। এই ক্রমবর্ধমান খ্যাতির মূলে বাংলার লব্ধপ্রতিষ্ঠ কলা-রসিক ও শিল্পীর অকুণ্ঠ সমর্থন। বিভিন্ন বিভাগে শিক্ষার সুমহান দায়িত্বে আছেন যথাক্রমে বিমলকুমার মিত্র, কৃষ্ণগোপাল ঘোষ, রবীন্দ্র জৈন, প্রবীর মজুমদার, পঞ্চানন ভট্টাচার্য, সমরেশ মুখার্জী, ত্রিদিব বন্দ্যোপাধ্যায়, বলরাম পাঠক, কমলেশ মৈত্র, শ্যামল বসু ও কৃষ্ণা সমাদ্দার।

সোভিয়েত চলচ্চিত্র উৎসব

গত ১৭ই জানুয়ারী চিত্রপট-এর উদ্যোগে সোসাইটি সিনেমায় সপ্তাহব্যাপী সোভিয়েত চলচ্চিত্র উৎসবের উদ্বোধন করেন শ্রীতুষারকান্তি ঘোষ। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন প্রধান বিচারপতি শ্রী ডি এন সিনহা। উৎসব শুরু হয় গান্ধী শতবার্ষিকীর জন্য নির্মিত 'মহাত্মা' এবং 'লিও টলস্টয়' ছবি দেখিয়ে। তারপরে দেখান হয় "লাভ এণ্ড ওয়ার"।

২৩শে জানুয়ারী পর্যন্ত দেখান হয়েছে ক্রাইম আণ্ডার ওয়াটার, ওথেলো, ব্যালাড অব এ সোলজার, এস্কেপড ইন রাশিয়া, এ ম্যানস ডেস্টিনি, গ্রেট রাশিয়ান সার্কাস।

বিচিত্রানুষ্ঠান

গত ১৭ই জানুয়ারী সাতগাছি যুবক-বৃন্দের পরিচালনায় দমদমে নগেন্দ্রনাথ রোডে এক বিচিত্রানুষ্ঠান হয়েছে। উক্ত অনুষ্ঠানে অংশ গ্রহণ করেন সুবীর সেন, দ্বিজেন মুখোপাধ্যায়, দিলীপ চক্রবর্তী, বাঁশরী মিত্র, প্রার্থনা মুখোপাধ্যায়, ধ্রুব মিত্র, গোরাচাঁদ মুখোপাধ্যায় ও মূকাভিনয়ে তপন দত্ত।

পশ্চিমবঙ্গে সিনেমার সংখ্যাবৃদ্ধি

১৯৬৬ সালের ৩০শে ডিসেম্বর পর্যন্ত পশ্চিমবঙ্গে স্থায়ী সিনেমা ছিল: ৩১৭; অস্থায়ী ১২০।

১৯৬৭ সালের ১২ই ডিসেম্বর পর্যন্ত সিনেমার সংখ্যা দাঁড়িয়েছে: স্থায়ী ৩২৭; অস্থায়ী ১৬৩।

১৯৬৮ সালের জুন মাস পর্যন্ত স্থায়ী সিনেমার সংখ্যা হয়েছে ৩৩৭; অস্থায়ী ২৬১।

বাংলা ভাষায় প্রথম প্রকাশিত

ক্রিকেট খেলার অপরিহার্য বই

খ্যাতনামা ক্রীড়াসাংবাদিক

শান্তিপ্রিয় বন্দ্যোপাধ্যায়ের

ক্রিকেট খেলার আইন কানুন

[দাম—চার টাকা মাত্র]

গল্প উপন্যাসের চেয়েও আকর্ষণীয় ক্রিকেট উৎসাহীদের সবচেয়ে প্রয়োজনীয় বই। ক্রিকেট খেলা শিখতে হলে, ক্রিকেট খেলা জানতে হলে, ক্রিকেট খেলা বুঝতে হলে এই বইটি পড়তে হবে। শুধু বড়রাই নন, ছোটরাও হাতে পেলে বইটা আর ছাড়তে চাইবেন না।

অজস্র ছবি আর স্কেচে ভরা বইটির আর একটা বিশেষ আকর্ষণ হলো ক্রিকেটের অভিধান। আর কোন বইতে এতো প্রয়োজনীয় জিনিস এক সঙ্গে পাওয়া যাবে না।

জ্ঞা ন তী র্থ

[১নং বিধান সরণী, কলকাতা—১২]

—স্টেজে মারা—

'স্টেজে মারা' কথাটা যে কতোবড় সত্য আর ব্যাপারটা যে কতো মারাত্মক তার প্রমাণ আর একবার হাতে-নাতে পাওয়া গেলো দলীপ ট্রফির ক্রিকেট প্রতিযোগিতার সেমিফাইন্যালে পূর্ব বনাম দক্ষিণ অঞ্চলের খেলায়। 'স্টেজে মারতে' গিয়েই পূর্ব অঞ্চলের ব্যাটসম্যানদের অমন দশা হয়েছিল—এ-কথা বললে হয়তো খেলোয়াড়দের সঙ্গে আরো অনেকেই আপত্তি জানাবেন। কিন্তু তলিয়ে দেখলে এ-সত্য বোঝা যাবে যে ব্যাপারটা আসলে তাই-ই। অবশ্য তার জন্যে শুধু মাত্র খেলোয়াড়দের দায়ী করা চলে না। দোষের ভাগী বাংলা দেশের ক্রিকেট কর্তৃপক্ষ, দোষ সি এ বি-র, দোষ কলকাতার নামী আর দামী ক্লাবগুলোরও। কারণ এঁরা যদি একটু চেষ্টা করতেন আর সে চেষ্টা যদি ঐকান্তিক হতো তাহলে সারা বছর ক্রিকেট খেলার ও অনুশীলন করার সুযোগ পেয়ে খেলোয়াড়রা বাংলা দেশের ক্রিকেট খেলার মান অনেক উঁচুতে নিয়ে যেতে সমর্থ হতেন। ভারতীয় ফুটবলে বাংলার স্থানের মত অতটা না হলেও ভারতীয় ক্রিকেটের ক্ষেত্রে বাংলা দেশই নয় সমস্ত পূর্ব অঞ্চলটাই যে কতো পিছিয়ে আছে তার প্রমাণ সম্প্রতি পাওয়া গেছে দলীপ ট্রফির খেলায়।

সেই খেলায় পূর্ব অঞ্চল দল গো-হারা হেরেছে। পূর্ব অঞ্চলের কোন ব্যাটসম্যানই পারেন নি মাথা তুলে দাঁড়াতে। কেউ কেউ হয়তো বলবেন যে দক্ষিণ অঞ্চল দলে সাতজন টেস্ট প্লেয়ার ছিলেন। আর ছিল প্রসন্ন, ভেঙ্কটরাঘবন, আবিদ আলী, জয়সীমা প্রমুখের মতো নাম করা বোলাররা। তাতে কি হয়েছে? বোলার যতোই ভালো বোলিং করুন না কেন, মাঝে-সাঝে তাঁকে এমন বল দিতেই হবে যে বল মেরে ব্যাটসম্যান খুব সহজেই রান করতে পারেন। কিন্তু পূর্ব অঞ্চলের ব্যাটসম্যান-দের শোচনীয় অবস্থা দেখে এ-কথা কি একবারও মনে হয় নি যে এঁরা ঠিক মতো ব্যাটিং করতে পারেন নি! পারবেনই বা কি করে? ক্রিকেট খেলাটা যথেষ্ট অংশে নির্ভর করে অনুশীলনের ওপর। আর আমাদের দেশের খেলোয়াড়দের অনুশীলনের অভাবটাই সব থেকে বেশি, সে-কথা বোধহয় আর নতুন করে বলতে হবে না। অথচ সে-দিকে নজর নেই কারো। লেখার মাধ্যমে আমরা সি এ বি কর্তৃপক্ষের কাছে অনেকবার আবেদন জানিয়েছি যাতে ক্রিকেট অনুশীলনের জন্যে একটা ইনডোর স্টেডিয়াম তৈরি করা হয়। খেলোয়াড়রা সেই স্টেডিয়ামে সারা বছর এমন কি রাত্তিরেও যাতে অনুশীলন করতে পারেন সেদিকে নজর রাখার প্রয়োজনই সব থেকে বেশি। কিন্তু ঐ আবেদন-নিবেদনই সার হলো। কাজের কাজ আজো কিছুই হয় নি। আর না হওয়ার ফলটাই আমরা দেখতে পেলাম দক্ষিণাঞ্চলের বিরুদ্ধে খেলায়। অত্যন্ত দুঃখ আর পরিতাপের বিষয় এই যে, এতেও সি এ বি কর্তৃপক্ষের ঘুম ভাঙবে না। যেমন ছিল তেমনি থাকবে সব কিছু। আর শেষ পর্যন্ত স্টেজে মারতে গিয়ে বাংলা দেশের খেলোয়াড়রা হয়তো বা আবার মরমে মরবেন.....!! —শান্তিপ্রিয়

ক্রিকেটের খবর

এডিলেডে অস্ট্রেলিয়া বনাম ওয়েস্ট ইণ্ডিজের চতুর্থ টেস্ট ম্যাচ শুরু হয়ে গেলো। অবশ্য এ লেখা যখন আপনাদের হাতে পৌঁছবে, ততদিনে শেষ হয়ে আসবে চতুর্থ টেস্ট। সেই সংগে হয়তো বা নির্ধারিত হয়ে যাবে ফ্রাঙ্ক ওরেল ট্রফির ভাগ্য।

অস্ট্রেলিয়া এখন ২—১ টেস্টে এগিয়ে আছে। চতুর্থ টেস্টেও যদি তারা জেতে অহলে রাবার চলে যাবে তাদের হাতের

॥ সোবার্স ॥

এডিলেড টেস্টে ওয়েস্ট ইণ্ডিজের অধিনায়ক ব্যাটিং-এ অসামান্য কৃতিত্ব দেখালেও, তিনি যদি আরো আগে খেলতে নামতেন তাহ'লে দলের রান-সংখ্যা মনে হয় আরো কিছু বেশিই হতো!

মুঠোর মধ্যে আর ফ্রাঙ্ক ওরেল ট্রফি থেকে যাবে তাদেরই হাতে। কিন্তু খেলা যদি ড্র হয় কিম্বা ওয়েস্ট ইণ্ডিজ জেতে, তাহলে ওরেল ট্রফির ভাগ্য নির্ধারিত হবে সিডনির পঞ্চম ও শেষ টেস্ট ম্যাচ খেলার সময়।

তাই এডিলেডের চতুর্থ টেস্ট ম্যাচের গুরুত্ব অপরিসীম। এই টেস্টে জয়লাভের জন্যে দু' দলই আপ্রাণ চেষ্টা করবে। ফ্রাঙ্ক ওরেল ট্রফি তথা রাবার লাভের অনুপ্রেরণায় অস্ট্রেলিয়ার খেলোয়াড়রা সাধ্যাতীত চেষ্টা করবেন আর অন্যদিকে ওয়েস্ট ইণ্ডিজ নিজেদের সুনাম রক্ষা করার জন্যে খেলবে জান লড়িয়ে।

সেদিক দিয়ে মনে হয় খেলাটা জমবে খুব। জমাটি ঐ ক্রিকেটাসরকে কেন্দ্র করে শুধু এডিলেডই নয়, সমস্ত ক্রিকেট বিশ্ব আজ সরগরম হয়ে উঠেছে।

*

কলকাতার ইডেন উদ্যানে উত্তরবঙ্গ বন্যাত্রাণ ভাণ্ডারে সাহায্যের জন্যে আবার বসেছিল ক্রিকেট খেলার আসর। প্রদর্শনী সেই খেলার একদিকে ছিল প্রধানমন্ত্রী একাদশ আর অন্যদিকে রাজ্যপালের দল। পতৌদির নবাব ছিলেন প্রধানমন্ত্রী একাদশের অধিনায়ক, আর পঙ্কজ রায়ের ওপরে ছিল রাজ্যপালের দল পরিচালনার ভার।

দু' দলেই ছিলেন ভারতীয় ক্রিকেট দলের ও পূর্বাঞ্চলের খেলোয়াড়রা। ছিলেন পতৌদি, জয়সীমা, মঞ্জরেকার, বোরদে, ওয়াদেকার, সারদেশাই, ডুরানী প্রমুখের মতো খেলোয়াড়রা। তবু যতোটা আশা করা গিয়েছিল ঠিক ততো দর্শক সমাগম হয় নি মাঠে।

আছাড়া প্রথমে ঠিক হয়েছিল যে, খেলাটা চার দিন ধরে হবে—কিন্তু ২৬শে জানুয়ারী প্রজাতন্ত্র দিবসে পুলিশ পাওয়া যাবে না বলে সেদিন আর খেলা হলো না। ফলে চার দিনের খেলা কমে গিয়ে দাঁড়িয়েছিল তিন দিনে।

॥ হল ॥

আবার সংবাদের শিরোনামায় এসেছেন ওয়েসলি। কাঁচের বন্ধ দরজা খোলা ভেবে ঢুকতে গিয়ে কপাল কেটে একাকার কাণ্ড। একটুর জন্যে বেঁচে গেছে তাঁর চোখ।.....অবাক কাণ্ডই বটে.....

গল্পহলেও সত্যি

ক্রিকেট খেলার প্রথমাবস্থায় অর্থাৎ ক্রিকেট খেলা যখন হাঁটি-হাঁটি পা-পা করছিল, তখনকার উইকেটগুলো ছিল একটু অন্য ধরণের। তখন স্টাম্প থাকতো মাত্র দু'টি, আর স্টাম্প দু'টির মাথায় থাকতো একটি বেল। ফলে স্টাম্প দু'টির মধ্যিখানটা থাকতো একদম ফাঁকা।

সেই সময় অর্থাৎ ১৭৭৫-৭৬ সালের কোন এক সময় বিলেতের আর্টিলারী মাঠে হ্যাম্বলডন ক্লাবের সংগে ম্যাচ হচ্ছিল কেন্ট দলের। কেন্ট তখন সুযোগ পেয়েছিল জেতার। হ্যাম্বলডন ক্লাবের শেষ ব্যাটসম্যান ব্যাট করতে এসেছে। তবে তখনো তারা চোদ্দ রানে পিছিয়ে। কেন্ট দলে ভালো বোলার আছে, সুতরাং তাদের জেতার সম্ভাবনা খুব। কেন্টের ফাস্ট বোলার স্টিভেন্স জয়লাভের অনুপ্রেরণায় খুব জোরে বল করতে শুরু করলেন।

স্টিভেন্সের বল যেমন জোরালো তেমনি সোজা। কিন্তু স্টিভেন্সের সেই মারাত্মক সোজা বলগুলো পর পর তিনবার দু' স্টাম্পের মধ্যে দিয়ে চলে গেলো। ফলে না পড়লো বেল, না ভাঙল স্টাম্প। শেষ পর্যন্ত আউটও হলেন না ব্যাটসম্যান। আর করেও ফেললেন জয়লাভের জন্য প্রয়োজনীয় রানগুলো। হ্যাম্বলডন ক্লাবের কাছে হেরে গেলো কেন্ট।

বোলার বেচারাদের দুঃখ দেখে শেষ পর্যন্ত টনক নড়লো কর্তৃপক্ষের। সত্যিই তো! সব থেকে ভালো বলগুলো চলে যাচ্ছে দু' স্টাম্পের মধ্যে দিয়ে। তাই বোলার বেচারার ভাগ্যে আর জুটছে না উইকেট। ভালো বলগুলো চলে যাচ্ছে বিফলে। তাই ক্রিকেট কর্তৃপক্ষ অনেক ভেবেচিন্তে দু' স্টাম্পের মধ্যিখানে পুঁতে দিলেন আর একটা স্টাম্প। সেই তখন থেকে চালু হলো তিন স্টাম্প আর দু' বেলের উইকেট।

সমাচারদর্পণ

জাতীয় মুষ্টিযুদ্ধ প্রতিযোগিতায় এবারও সার্ভিসেস দল চ্যাম্পিয়ানশীপ

॥ জয়সীমা ॥

প্রদর্শনী খেলায় মারের খেলা খেলে দর্শকদের দিয়েছিলেন প্রভূত আনন্দ।

লাভ করেছে। এবার তারা প্রতিযোগিতার সব ক'টি অর্থাৎ ন'টি বিষয়েই বিজয়ীর সম্মান অর্জন করে লাভ করেছে ৫৫ পয়েণ্ট। দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্থান লাভ করেছে রেলওয়ে আর মহারাষ্ট্র। তাদের পয়েণ্ট সংখ্যা যথাক্রমে ২০ ও ১০। এই প্রতিযোগিতার শ্রেষ্ঠ মুষ্টিযোদ্ধার সম্মান অর্জন করেছেন সার্ভিসেস দলের ডি স্বামী।

* * *

আগামী ৫ই ফেব্রুয়ারী থেকে বোম্বাই-এ আরম্ভ হচ্ছে জাতীয় ভারোত্তোলন ও ভারতশ্রী দেহসৌষ্ঠব প্রতিযোগিতা। এই প্রতিযোগিতায় যোগদান করার জন্যে পশ্চিমবঙ্গ থেকে যাচ্ছেন দু'জন ভারোত্তোলক আর ন'জন দেহী। দেখা যাক এবারও বাংলার প্রতিযোগীদের মধ্যে কেউ 'ভারতশ্রী' আখ্যা লাভ করতে পারেন কি না...!

* * *

এবারের নেহরু হকি প্রতিযোগিতার পুরস্কারটা সর্বভারতীয় পুলিশ দল ও ইণ্ডিয়ান এয়ারলাইন্স দল ভাগ করে নিয়েছে। খেলাটা পর পর দু'দিন অমীমাংসিতভাবে শেষ হবার পর দু'দলকেই যুগ্ম বিজয়ী বলে ঘোষণা করা হয়। তবে টসে জয়ী হওয়ায় ইণ্ডিয়ান এয়ারলাইন্স দল প্রথম ছ' মাস ট্রফিটা নিজেদের কাছে রাখার সুযোগ পাবেন। রাষ্ট্রপতি ডঃ জাকির হোসেন মাঠে উপস্থিত ছিলেন আর খেলার শেষে পুরস্কার প্রদান করেন তিনিই।

* * *

আগামী ৯ই ফেব্রুয়ারী থেকে এরনাকুলামে আরম্ভ হচ্ছে এবারের জাতীয় হকি প্রতিযোগিতা। ভারতের

॥ পতৌদি ॥

প্রধানমন্ত্রী একাদশের অধিনায়ক মনসুর চালে খেলে ইডেন উদ্যানকে মাতিয়ে তুলেছিলেন আনন্দ-হাসি-গানে।

বিভিন্ন রাজ্যগুলো যোগদান করবে এই প্রতিযোগিতায়। প্রতিযোগী রাজ্যগুলির তালিকায় পশ্চিমবঙ্গও আছে। পশ্চিমবঙ্গ দলের প্রথম খেলার তারিখ পড়ছে ১২ই ফেব্রুয়ারী। কিন্তু পশ্চিমবঙ্গ নাকি ১৯ তারিখের আগে খেলতে পারবে না। দেখা যাক শেষ পর্যন্ত কি হয়...!

* * *

এবারের জাতীয় স্কুল ক্রিকেট প্রতিযোগিতার সি. কে. নাইডু ট্রফির খেলাগুলো কলকাতায় আরম্ভ হয়ে গেছে। ভবানীপুর, ওয়াই. এম. সি. এ,

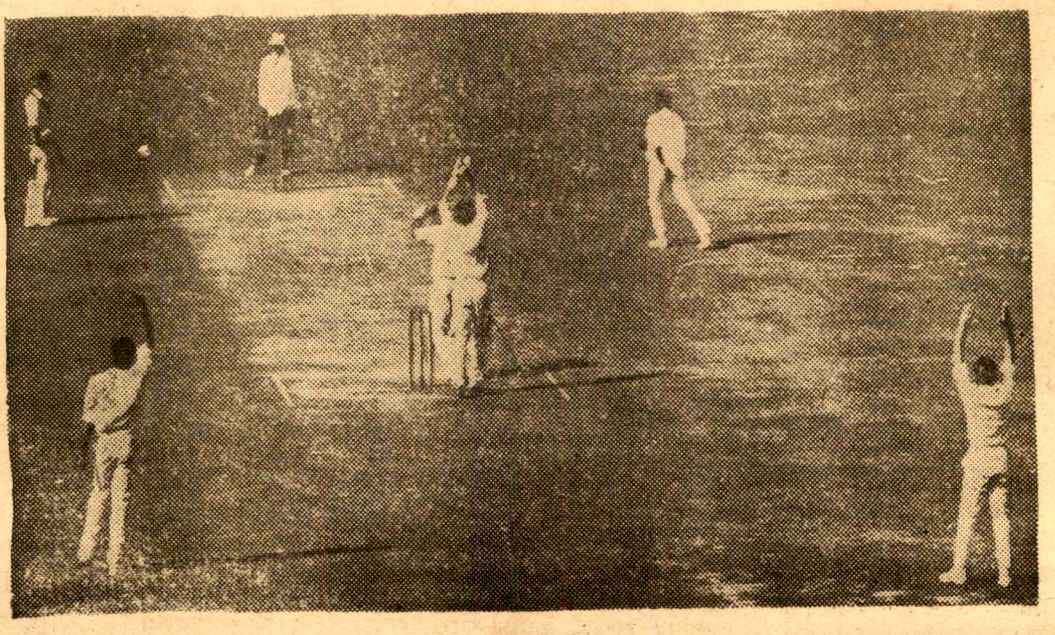

উত্তরবঙ্গ বন্যাত্রাণ ভাণ্ডারে সাহায্যের জন্যে আয়োজিত প্রদর্শনী খেলায় রাজ্যপাল দলের উইকেটরক্ষক ইন্দ্রজিৎ সিংজীর গোবিন্দরাজের বলে আউট হয়ে যাবার দৃশ্য।

ডালহোসী আর বিশ্ববিদ্যালয় মাঠে নক আউট প্রথায় খেলাগুলো হবার পর ফাইন্যাল খেলা হবে ইডেন উদ্যানে। প্রতিযোগী রাজ্যগুলো হলো—গুজরাট, দিল্লী, মধ্যপ্রদেশ, মহারাষ্ট্র, অন্ধ্র, পাঞ্জাব, আসাম ও পশ্চিমবঙ্গ। পশ্চিমবঙ্গ স্কুল দলের অধিনায়ক মনোনীত হয়েছেন জগদ্বন্ধু স্কুলের রাজা মুখার্জী।

* * *

জয়সীমাও এবার চললেন ল্যাংকাশায়ার ক্রিকেট লীগে খেলতে। এই মরশুমে জয়সীমা খেলবেন রিশটন ক্লাবের পক্ষে। এই জন্যে তিনি পাবেন একুশ হাজার টাকা। আগামী এপ্রিল মাসে তিনি লণ্ডনে চলে যাবেন।

॥ অম্বর রায় ॥

বাংলার নতুন অধিনায়ক প্রদর্শনী খেলার রাজ্যপাল দলের পক্ষে প্রধানমন্ত্রী একাদশের বিপক্ষে দু' ইনিংসেই দিয়েছেন উন্নত ব্যাটিং নৈপুণ্যের পরিচয়।

পরিচীয়তে

ব্যারিংটন আর খেলবেন না। টেস্ট খেলবেন না, প্রথম শ্রেণীর খেলাও না। ধরতে গেলে আর ক্রিকেট খেলবেন না ব্যারিংটন। অবসর গ্রহণ করলেন ইংলণ্ডের তথা বিশ্বের অন্যতম শ্রেষ্ঠ ব্যাটসম্যান কেন ব্যারিংটন। অবসর গ্রহণের কারণটা কিন্তু বড় বিশ্রী, বড়ই অপ্রত্যাশিত। মাস দুই-তিন আগে অস্ট্রেলিয়ায় বিশ্ব ডবল-ক্রিকেট প্রতিযোগিতায় খেলতে গিয়ে ব্যারিংটন হঠাৎ হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে পড়েছিলেন। আর আরই ফলশ্রুতি হিসেবে ব্যারিংটনকে ছাড়তে হল ক্রিকেট খেলা।

খেলোয়াড় হিসেবে বয়েস অবশ্য ব্যারিংটনের খুব একটা কম নয়। এখন না হলেও হয়তো ব্যারিংটন বছর কয়েকের মধ্যেই খেলা থেকে অবসর গ্রহণ করতেন। জন্ম তাঁর ১৯৩০ সালের ২৪শে নভেম্বর। কিন্তু আটত্রিশ বছর বয়সেও ব্যারিংটন ছিলেন তাঁর খেলোয়াড় জীবনের তুঙ্গে।

ব্যারিংটন তাঁর টেস্ট খেলোয়াড় জীবন শুরু করেন ২৫ বছর বয়সে। ১৯৫৫ সালে সাউথ আফ্রিকার বিরুদ্ধে প্রথম টেস্ট খেলার সুযোগ পান ব্যারিংটন। কিন্তু জীবনের প্রথম টেস্ট ইনিংসে ০ (শূন্য) রান করলেও পরবর্তী ইনিংসগুলোতে তাঁর দৃঢ় পদক্ষেপ ব্যারিংটনকে স্মরণীয় করে রেখেছে।

ব্যারিংটন খেলেছেন পৃথিবীর প্রায় প্রত্যেকটি দেশের বিরুদ্ধে। খেলেছেন অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে, ওয়েস্ট ইণ্ডিজের বিরুদ্ধে, সাউথ আফ্রিকা, ভারত, পাকিস্তান ও নিউজিল্যাণ্ডের বিরুদ্ধে। ১৯৫৫ সাল থেকে ১৯৬৮ সাল পর্যন্ত ব্যারিংটনের দীর্ঘ টেস্ট খেলোয়াড় জীবনে ব্যারিংটন খেলেছেন ৮২টি টেস্ট, করেছেন ৬,৮০৬ রান, শতরানের মুখ দেখেছেন, ২০ বার, গড়ে ইনিংস প্রতি তাঁর রান দাঁড়িয়েছে ৫৮·৬৭। ক্যাচ ধরেছেন ৫৮টি আর গড়ে ৪৪·৮২ রানের হিসেবে পেয়েছেন মোট ২৯টি উইকেট। আর প্রথম শ্রেণীর খেলায় ৭৬টি শতরান সহ করেছেন মোট ৩১,৭১৪ রান।

মানুষ হিসেবে ব্যারিংটনের জুড়ি মেলা ভার। গাঁট্টা-গোট্টা চেহারার ব্যারিংটন কিন্তু সদা হাসি-খুশি। সহজ-সরল লোক। খেলোয়াড় হিসেবেও তিনি ছিলেন অনন্য। ব্যাট হাতে উইকেটের সামনে দাঁড়ালে যে-কোন বোলারই একটু যেন সমীহ করে বোলিং করতেন। কারণ ব্যারিংটনের কাছে কোন বাছ-বিচার ছিল না। সব বলেই তিনি পারতেন সমানভাবে মারতে। এ কথা যে কত সত্যি তা তাঁর সংগৃহীত রানের দিকে তাকালেই বোঝা যাবে। বোলার আর দক্ষ ফিল্ডসম্যান হিসেবেও ব্যারিংটন দিয়েছিলেন অসামান্য কৃতিত্বের পরিচয়। তাই রেকর্ড ঘাঁটলে দেখা যাবে যে প্রথম শ্রেণীর খেলায় ব্যারিংটন পেয়েছেন ২৭৩টি উইকেট। আর ক্যাচ লুফে আউট করেছেন ৫১১ জন খেলোয়াড়কে।

ক্রিকেট মাঠের মানুষ ব্যারিংটন শেষ পর্যন্ত সরে এলেন ক্রিকেট মাঠ থেকে। সরে এলেন বলা অবশ্য ভুল হবে—সরে আসতে বাধ্য হয়েছেন তিনি। ব্যারিংটন এখন পুরোপুরি সুস্থ। তাই আশা করা যায় হয়তো ক্রিকেট মাঠের আশে-পাশেই কাটবে তাঁর সময়। ব্যারিংটন ক্রিকেট খেলা ছেড়ে দিলেও, ক্রিকেট কিন্তু ব্যারিংটনকে ছাড়বে বলে মনে হয় না.....!

প্রদীপকুমার বিশ্বাস (গুলমা চা বাগান, দার্জিলিং)

প্রশ্ন : কোন ক্রিকেট খেলোয়াড় টেস্ট ম্যাচে প্রথম সেঞ্চুরী করেন—কোন সালে এবং কোন দলের বিরুদ্ধে?

উত্তর : ১৮৭৬—'৭৭ সালে প্রথম টেস্ট ম্যাচ খেলা হয় মেলবোর্ন মাঠে ইংলণ্ড বনাম অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে। এই খেলায় অস্ট্রেলিয়া ৪৫ রানে জিতেছিল। চালর্স ব্যানারম্যান ১৬৫ রান করে প্রথম টেস্ট সেঞ্চুরী করার কৃতিত্ব অর্জন করেন।

পরিতোষ নাগ (বেলাকোবা, জলপাইগুড়ি)

প্রশ্ন : আপনাকে যদি প্রশ্ন করা হয় যে ভারতের শ্রেষ্ঠ দলগুলোর নাম জানাবেন। আপনি তাহলে বলেন মোহনবাগান, ইস্টবেঙ্গল, মহামেডান প্রভৃতি দলগুলোর কিন্তু এটা ঠিক নয়! জলন্ধরের লীডার্স ক্লাবেরও নাম বলা উচিত এখন! আপনি কি বলেন?

উত্তর : আপনিই বলুন, লীডার্স ক্লাব কি এখনো মোহনবাগান, ইস্টবেঙ্গল কিম্বা মহামেডান স্পোর্টিং প্রভৃতি দলগুলোর মতো ঐতিহ্যের অধিকারী হয়েছে কি না? আপনার রিপ্লাই কার্ডের উত্তর দিয়েছি। আশা করি পেয়েছেন।

প্রশ্ন : ফ্রাঙ্ক ওরেল, সোবার্স আর বোরদের ব্যাটিং এ্যাভারেজ জানতে চাই।

উত্তর : সোবার্স ও বোরদের এ্যাভারেজ 'আপ-টু-ডেট' করে জানাবো।

	টেস্ট	ইনিংস	নঃ আঃ
ওরেল—	৫১	৮৭	৯

হীরেন্দ্রমোহন ভদ্র (সুভাষপল্লী, শিলিগুড়ি)

প্রশ্ন : টেস্ট ক্রিকেটে পল্সফোর্ড, ম্যাকেব হ্যাসেট ও কিপ্যাক্সের ব্যাটিং এ্যাভারেজ জানতে চাই।

উত্তর :

	টেস্ট	ইনিংস	নঃ আঃ
পল্সফোর্ড—	২৯	৪৮	৪
ম্যাকেব—	৩৯	৬২	৫
হ্যাসেট—	৩৯	৬৯	৩

কিপ্যাক্সের এ্যাভারেজ আমার কাছে নেই।

মনোজকুমার দাস (নামবাড়ী রেলওয়ে কলোনী, গৌহাটী, কামরূপ, আসাম)

প্রশ্ন : একটি খেলায় বোলার বল করার পরই মাটিতে পড়েই বলটা দু'টুকরো হয়ে গেলো। এক টুকরো উইকেট ভেঙে দিল আর অন্য টুকরোটা ব্যাটসম্যান মেরে বাউণ্ডারীতে পাঠিয়ে দিলেন। এক্ষেত্রে ব্যাটসম্যান কি আউট হবেন? না আম্পায়ার ব্যাটসম্যানকে চার রান দেবেন অথবা বলটি বাতিল করে দেবেন?

উত্তর : বলটা বাতিলই করে দেবেন আম্পায়ার।

হীরেন্দ্রমোহন ভদ্র (সুভাষপল্লী, শিলিগুড়ি)

প্রশ্ন : ক্রিকেটের 'আউট' এবং 'রান আউটের' বাংলা প্রতিশব্দ কি?

উত্তর : বাংলাতেও ঐ আউট আর রান আউটই লেখা হয়। প্রতিশব্দ আছে কি না জানি না।

সুকুমার সরকার (ব্রাউন হোস্টেল, বাঁকুড়া খৃশ্চান কলেজ)

উত্তর : আপনার রিপ্লাই কার্ড পেয়েছি। ব্যক্তিগতভাবে উত্তরও দেওয়া হয়েছে।

অরুণকুমার গুহকর্মকার (তেজগঞ্জ, বর্ধমান)

প্রশ্ন : বোলার বল করার পর ব্যাটসম্যান যদি নিজেকে রক্ষার জন্য বা ইচ্ছাকৃত-

রান	সর্বোচ্চ	শত রান	গড়
৩৮৬০	২৬১	৯	৪৯·৪৮

ভাবেই ব্যাট দিয়ে না খেলে তার হাত দিয়ে বল স্পর্শ করে তবে ব্যাটসম্যান কি আউট হবে?

উত্তর : খেলার সময় ব্যাটসম্যান কোন সময়ই বলে হাত দিয়ে পারে না।

রান	সর্বোচ্চ	শত রান	গড়
২১২২	২৬৬	৭	৪৮·২২
২৭৪৮	২৩২	৬	৪৮·২১
৩০৭৩	১৯৮*	১০	৪৬·৫৬

তবে ঐ সব ক্ষেত্রে অর্থাৎ ব্যাটসম্যান যখন আত্মরক্ষার জন্যে হাত দিয়ে বল আটকান, তখন খেলোয়াড়সুলভ মনোভাবের জন্যে প্রতিপক্ষ দল সাধারণত আবেদন জানান না।

প্রবীরকুমার নন্দী (৪৪৮/৮ কল্যাণগড়)

প্রশ্ন : টেস্ট খেলায় পলি উমরিগড় কোন দলের বিরুদ্ধে এবং কোন্ সালে শতরান করেছিলেন জানতে চাই।

উত্তর : পাকিস্তানের বিরুদ্ধে ৫টি সেঞ্চুরী

সাল		রান
১৯৫২-৫৩	বম্বে টেস্টে	১০২
১৯৫৪-৫৫	পেশোয়ার টেস্টে	১০৮
১৯৬০-৬১	কানপুর টেস্টে	১১৫
১৯৬০-৬১	মাদ্রাজ টেস্টে	১১২
১৯৬০-৬১	দিল্লী টেস্টে	১১২

ইংলণ্ডের বিরুদ্ধে ৩টি সেঞ্চুরী

সাল		রান
১৯৫১-৫২	মাদ্রাজ টেস্টে	১৩০*
১৯৫৯	ম্যানচেস্টার টেস্টে	১১৮
১৯৬১-৬২	কানপুর টেস্টে	১৪৭*

ওয়েষ্ট ইণ্ডিজের বিরুদ্ধে ৩টি সেঞ্চুরী

সাল		রান
১৯৫২-৫৩	পোর্ট অফ স্পেনে	১৩০
১৯৫২-৫৩	কিংসটনে	১১৭
১৯৬১-৬২	ত্রিনিদাদে	১৭২*

নিউজিল্যাণ্ডের বিরুদ্ধে ১টি সেঞ্চুরী

সাল		রান
১৯৫৫-৫৬	হায়দ্রাবাদে	২২৩

সোমেশ্বর ঘোষ (শ্রীরামপুর)

প্রশ্ন : "আমি জানতে চাই ভলি খেলায় কে ভলি চাপ মারতে পারে?"

উত্তর : সবাই পারেন। তবে যে দু'জন মেটে থাকেন সাধারণত চাপ তাঁরাই মেরে থাকেন।

সুখময় কুণ্ডু ও সমর দাশ (হাসপাতাল রোড, টাংলা, দুরং, আসাম)

প্রশ্ন : রাজা মুখার্জীর আগে ভারতীয় স্কুল ক্রিকেট দলের কোন বাঙালী অধিনায়ক ছিল কি? তাদের নাম কি?

পাতৌদি নবাব কি বাঙালী মুসলমান?

উত্তর : যতোদূর মনে পড়ছে রাজার আগে বোধ হয় একমাত্র অম্বর রায়ই বাংলার খেলোয়াড় হিসেবে ভারতীয় স্কুল দলের অধিনায়ক হয়েছিলেন।

না পাতৌদি বাঙালী মুসলমান নন।

বিধানচন্দ্র ঘোষ ও নীলকমল সরকার (মুনসেফডাঙা, পুরুলিয়া)

উত্তর : ভারতীয় স্কুল ক্রিকেট দলের অধিনায়ক রাজা মুখার্জীকে তোমাদের অভিনন্দন জানানো হলো।

তোমাদের অন্য প্রশ্ন দু'টির উত্তর খেলাধুলার পাতায় দেখতে পাবে।

সম্পাদিকা—জয়ন্তী সেন
বসুমতী (প্রাঃ) লিঃ-এর পক্ষে ১৬৬, বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী স্ট্রীটস্থ কলিকাতা-১২
বসুমতী প্রেস হইতে শ্রীসুকুমার মুখোপাধ্যায় কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

দুইটি বা তিনটি সন্তানের পরিবারই আদর্শ পরিবার

জেনে রাখুন ঃ

- পরিবারকল্যাণই পরিবার পরিকল্পনা
- যে কোন পরিবার পরিকল্পনাকেন্দ্রেই বিনামূল্যে নিরোধ এবং যাবতীয় পরামর্শ পাওয়া যায়
- হিন্দুস্থান লিভারে উৎপাদিত দ্রব্যাদি যে সব দোকানে বিক্রী হয় সেই সব দোকানে মাত্র ১৫ পয়সায় তিনটি করে নিরোধ কিনতে পাওয়া যায়
- তিনটি সন্তান না হওয়া পর্যন্ত নিরোধ ব্যবহার করে দুই সন্তানের জন্মের মধ্যবর্তী সময়ের ব্যবধান বাড়ান সম্ভব
- তিনটি সন্তানলাভের পর স্থায়ীভাবে জন্মনিরোধের জন্যে অস্ত্রোপচারই শ্রেষ্ঠ পদ্ধতি

আজই আপনার নিকটবর্তী যে কোন পরিবার পরিকল্পনাকেন্দ্র বা স্বাস্থ্যকেন্দ্রে যোগাযোগ করে বিনামূল্যে অভিজ্ঞ চিকিৎসকের পরামর্শ নিন।

(পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পরিবার পরিকল্পনা সংঘ কর্তৃক প্রচারিত)

Thursday, 30th January, 1969 SAPTAHIK BASUMATI Regd. No. C 71
Price : 30 Paise Gram : "Basumati" Phone : 34-7771, 72, 73, 74

বিভিন্ন রুচিবিশ্ব মেয়েরা:

কিন্তু সবার রুচিকেই কুকমী পরিতৃপ্ত করে !

গ্রাম : "স্পাইসমার্ট" মিল—কাশীপুর

শিশুর খাদ্যে ও রুগীর পথ্যে নির্ভয়ে ব্যবহৃত হয়
'কুকমী'—সর্বাধিক বিক্রীত গুঁড়ো মশলা
পনের লক্ষ প্যাকেট মাসিক বিক্রয়
১২০ বৎসরের অধিক প্রাচীন ও বর্তমানে মশলার বৃহত্তম প্রতিষ্ঠান

কৃষ্ণচন্দ্র দত্ত (স্পাইস) প্রাঃ লিঃ

১৩৫ নং মহর্ষি দেবেন্দ্র রোড, পোস্তা, কলিকাতা-৭

সাপ্তাহিক বসুমতী

প্রচার-বৈচিত্র্যে উত্তপ্ত মহানগরী

৭৩ বর্ষ ঃ ৩৩শ সংখ্যা, বৃহস্পতিবার, ২৩শে মাঘ, ১৩৭৫ বঙ্গাব্দ] OLDEST WEEKLY OF NORTH INDIA [73 year, No. 33, 6th Feb. 1969

সাথী
প্রতিদিন
বোরোলীন
ব্যবহার করুন
আপনার শুষ্ক ও বিদীর্ণ ত্বকের অস্বস্তি দূর করবে
এই অ্যান্টিসেপ্টিক সুরভিত ক্রীম।
বোরোলীন হাউস, কলিকাতা-৩

সূচীপত্র

বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা
সম্পাদকীয়		২০৫১
আজকের মানুষ		২০৫২
রবীন্দ্রনাথ ও সুভাষচন্দ্র (ধারাবাহিক প্রবন্ধ)	— শঙ্করীপ্রসাদ বসু	২০৫৩
বিশ্বদর্শন		২০৫৮
ভারতদর্শন		২০৬১
আন্তর্জাতিক		২০৬৩
আগামী মধ্যবর্তী নির্বাচনে কে কোন্ পক্ষে	— কুমুদ দাশগুপ্ত	২০৬৫
পাঁচে পঞ্চবাণ (কবিতা)	— গোবিন্দ চক্রবর্তী	২০৬৬
আপনার সম্পর্কে সাবধানে (কবিতা)	— বেণু দত্তরায়	২০৬৬
আসন্ন মধ্যবর্তী নির্বাচন ও তার পরিপ্রেক্ষিত	— সাগর বিশ্বাস	২০৬৭
আমি দিবাস্বপ্ন দেখি (কবিতা)	— তপেশ লাহিড়ী	২০৭০
সপ্তাহের বোঝা	— কৃত্তিবাস ওঝা	২০৭১
নিকট-দূরে	— কৌশিক বসু	২০৭৩

যে কোন
গয়না
আর
আসল
গ্রহরত্ন
কেনার
দক্ষিণ কোলকাতায়
নামকরা প্রতিষ্ঠান

ফোন : ৪৬-৬২৫৮

সন অ্যাণ্ড জ্যাণ্ডসন্স অব লেট
এস. বি. সরকার

এস.সরকার
এণ্ড সন্স

৩১।১এ রাসবিহারী এভিন্যু, কলিকাতা-২৯

সূচীপত্র

বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা
গ্রন্থমেলা		২০৭৫
জনমতের আলোয়	শিশির গুহ	২০৭৬
ভাঙা-গড়ার দু' বছর ঃ এই নির্বাচনের পশ্চাদ্‌পট	পর্যবেক্ষক	২০৭৭
পাঠকমন		২০৮০
সুদানের চিঠি		২০৮১
কলকাতার নির্বাচন		২০৮৫
রুচিকের দেশে	গীতা বন্দ্যোপাধ্যায়	২০৮৮
তিমিরপ্রান্ত ভয়েস	অগ্নিবর্ণ	২০৯৫
জালের গাড়ি (গল্প)	সমীর মুখোপাধ্যায়	২০৯৫
ক্রীড়াজগৎ		২১০৪
বলাবলি	শান্তিপ্রিয়	২১০৮

॥ নাটক ॥ নাটক ॥ নাটক ॥ নাটক ॥ নাটক ॥

বহুকাল পরে আবার পাওয়া যাচ্ছে॥

ম হা ক বি

গিরিশচন্দ্র ঘোষের রচনাবলী

প্রথম খণ্ড ঃ প্রফুল্ল, ম্যাকবেথ, ঠাকুর শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেব ও স্বামী বিবেকানন্দ সম্পর্কে চারটি প্রবন্ধ, তিনখানি গীতিনাট্য ও গ্রন্থপরিচয়। পৃষ্ঠা সংখ্যা ৪১২। মূল্য দশ টাকা।

দ্বিতীয় খণ্ড ঃ সিরাজউদ্দৌলা ; ষ্যায়সা কা ত্যায়সা ; জনা ; দোললীলা ও গ্রন্থপরিচয়। পৃষ্ঠা সংখ্যা ৩৫৮। মূল্য দশ টাকা।

তৃতীয় খণ্ড ঃ পাণ্ডবগৌরব, বলিদান, আবুহোসেন ও গ্রন্থপরিচয়। পৃষ্ঠা সংখ্যা ৩৫২। মূল্য দশ টাকা।

চতুর্থ খণ্ড ঃ চৈতন্যলীলা, ভ্রান্তি, মলিনাবিকাশ, হীরার ফুল, বিবিধ রচনা ও গ্রন্থপরিচয়। পৃষ্ঠা সংখ্যা ৩০২। মূল্য দশ টাকা।

পরমহংসদেব শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁর ভক্ত-শিরোমণি অতি প্রিয় নোটো গিরিশকে বলেছিলেন, —"অভিনয়ের প্রয়োজন আছে বৈ-কি—ওতে লোকশিক্ষা হবে। আর তোমার লেখা—ও যে ভারি ভাল হয়েছে।"

প্রতিটি খণ্ড বোর্ডে বাঁধাই। মূল্যবান কাগজে ছাপা।

রচনাবলী সম্পাদনা ঃ শ্রীরমেন চৌধুরী

আবলম্বে অর্ডার পেশ করুন।

বসুমতী প্রাইভেট লিমিটেড ঃ ১৬৬, বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী স্ট্রীট, কলি-১২

৭৩ বর্ষ : ৩৩শ সংখ্যা—মূল্য : ৩০ পয়সা
বৃহস্পতিবার, ২৩শে মাঘ, ১৩৭৫ বঙ্গাব্দ

বাংলা ভাষায় দ্বিতীয় সর্বাধিক প্রচারিত সাপ্তাহিক পত্রিকা

Price : 30 Paise
Thursday, 6th February, 1969

নির্বাচকমণ্ডলীর দায়িত্ব

অন্তর্বর্তী নির্বাচনের আর বিলম্ব নেই। এই নির্বাচনের গুরুত্ব সাধারণ নির্বাচনেরই সমতুল্য।

নানা দল, নানা মত। দলগুলি রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গিতে তাঁদের বক্তব্য জনসমক্ষে উপস্থাপিত করবেন—এটাই স্বাভাবিক। তবু দুঃখের সঙ্গে স্বীকার করতে হয়, স্বাধীনতা লাভের একুশ বছর পরেও কিছু দল গণতন্ত্রের পেছন দরজা দিয়ে অত্যন্ত সুবিধাবাদের নীতিতে সাম্প্রদায়িকতা বা প্রাদেশিকতাকে তাদের মূলধন হিসেবে ব্যবহার করে রাজনীতির রাস্তায় নামে। এর দ্বারাই প্রমাণ হয়, এই দেশ অশিক্ষা ও নিরক্ষরতার জন্যে মানসিকতার ক্ষেত্রে কতোটা অনগ্রসর। যার ফলে সরল ভোটারদের বেয়াকুফ বানানো সম্ভব হয়।

এবার অন্তর্বর্তী নির্বাচনের সময় দু'একটা বাধার সম্মুখীন হবেন নির্বাচকমণ্ডলী, এমন ধারণা কেউ কেউ পোষণ করেছিলেন এবং এখনো যে করেন না তা-ও বলছি না। সেই কারণে নির্বাচনের সময় এমন পুলিশী ব্যবস্থা করা হবে, যা এর আগে কখনো করা হয় নি। কিন্তু এখনো পর্যন্ত যে-খবর পাওয়া গেছে, তাতে দেখা যাচ্ছে যে, ভোটাররা ভোট দেবার ব্যাপারে খুব বিরোধিতার সম্মুখীন হন নি। এখন নির্বাচকমণ্ডলীর ওপর নির্ভর করছে তাঁদের বহুকথিত দৈন্যকে দূর করতে পারবেন এবং কার প্রতি তাঁরা প্রসন্ন হবেন। ভোট দেওয়া সাঙ্গ হলেই তথাকথিত জনপ্রতিনিধির সঙ্গে ভোটারদের সম্পর্ক বিলীন হয় এবং তাঁদের সমস্ত আশা এক নিমেষেই ভঙ্গ হয়। তাই নির্বাচকমণ্ডলীকে ঠিক করে নিতে হবে, কার দ্বার হবে তাঁদের জন্য অবারিত এবং কে তাঁদের নৈরাশ্য থেকে উদ্ধার করতে পারবেন। মোট কথা, ভোট ভিক্ষার জিনিস নয়, ভোট হচ্ছে প্রতিটি ভোটারের মূলধন। তাকে নিপুণভাবে কাজে লাগাতে পারলে, সুফল লাভ অবশ্যম্ভাবী।

তবু কোনো কোনো ভোটার সরল বুদ্ধিতেই ভাবাবেগে চালিত হন, অত্যন্ত সাময়িক ও ঠুনকো সুবিধা বা স্বার্থের দ্বারা পরিচালিত হয়ে নিজেদের মূলধনকে যথাস্থানে বিনিয়োগ করতে ভুল করেন। এবং এই ভুলের শিকার হন অধিকাংশ ক্ষেত্রে অশিক্ষিত নাগরিকবৃন্দ এবং সাম্প্রদায়িক ও প্রাদেশিক মনোভাবসম্পন্ন এক শ্রেণীর মানুষ, যাঁরা পাকে-বিপাকে পথভ্রষ্ট। চতুর ও ছদ্মবেশী এক শ্রেণীর নেতাই এর জন্য দায়ী। সমগ্র জনসাধারণ সচেতন হলে এরা কখনোই রাজনৈতিক মঞ্চে অবতীর্ণ হতে পারতো না, দেশের বর্তমান অবস্থা এতো খারাপের দিকে যেতে পারতো না। তাই দেশের মঙ্গলামঙ্গল নির্ভর করছে নির্বাচকমণ্ডলীরই ওপর। পশ্চিমবঙ্গে চোরঙ্গী এলাকায় বিগত সপ্তাহে একটি ঘটনাকে কেন্দ্র করে যা ঘটে গেল, তার ইতিবৃত্ত যাঁরা জানেন, তাঁরা স্বীকার করবেন যে, ধর্মীয় ভাবাবেগকে কিভাবে রাজনীতির দ্বারা চাঙ্গা করে তোলার চেষ্টা হয়েছিল। বলা বাহুল্য, পশ্চিমবঙ্গের সচেতন জনসাধারণ এখন অনেক বেশি হুঁশিয়ার। প্রায় আগত অন্তর্বর্তী নির্বাচন যাতে নির্বিঘ্নে সুসম্পন্ন হয়, সেই কারণে কুমতলবে তাঁরা সাড়া দেন নি।

নিঃসন্দেহে এসব ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে আমাদের মনে হয়, জনসাধারণ আরো বেশি সচেতন হয়েছেন। অন্তর্বর্তী নির্বাচনের প্রাক্কালে বা সময়ে কোনো রকম বিভ্রান্তির সৃষ্টি হলে নির্বাচকমণ্ডলী অবহেলায় তা অগ্রাহ্য করতে পারবেন। কারণ সাময়িক কোনো অশান্তিতে তাঁরা মনোযোগ দান করলে—তাঁদের ভবিষ্যৎ অন্ধকার হয়ে যাবে।

সম্পাদকীয়

আজকের মানুষ

পুরুষস্য ভাগ্যং—দেবা ন জানন্তি। নিস্তরঙ্গ নিরবচ্ছিন্ন শান্তিপূর্ণ জীবন পুরুষের জন্যে নয়, তার জন্যে খোলা রয়েছে পতন-অভ্যুদয়ের বন্ধুর পন্থা। মোহন রানাডেকে যখন আমরা চোখের জলে বিদায় দিয়েছিলাম, তখন ধরেই নিয়েছিলাম ফিরে আর তাঁকে পাবো না, কিম্বা যখন ফিরবেন তিনি তখন দেশকে দেবার মত শক্তি বা সামর্থ্য আর তাঁর কিছুই অবশিষ্ট থাকবে না।

ছাব্বিশ বছর জেল! কল্পনা করা যায় একটানা শতাব্দীর এক-চতুর্থাংশ সময় কারান্তরালে কাটানো! কিন্তু তবুও সেদিন উদ্বেগাকুল সকলেই স্বস্তির নিশ্বাস ফেলেছিল : যাক, প্রাণদণ্ড তো দেয় নি, প্রাণে তো মোহন বেঁচে থাকবেন।

কী অপরাধ সেদিন মোহন রানাডে করেছিলেন যে, পর্তুগীজ সরকার তাঁকে ছাব্বিশ বছরের সশ্রম কারাদণ্ড দিলেন? মোহন ভারতের মাটিতে পর্তুগীজ শাসনের ভিত কাঁপিয়ে দিয়েছিলেন। পর্তুগীজ সরকারের কাছে তিনি ছিলেন আতঙ্ক-বিশেষ, সরকার ঘোষণা করেছিলেন জীবিত কিম্বা মৃত যে অবস্থাতেই মোহন রানাডেকে যে ধরে দিতে পারবে, তাকে মোটা পুরস্কার দেওয়া হবে। কিন্তু তাদের প্রিয় নেতাকে ধরিয়ে দেবার জন্যে কোনো কুইসলিং সেদিন এগিয়ে আসে নি, মোহনকে শত্রুর হাতে তুলে দেবার জন্যে কোনো জুডাসের সন্ধান সেদিন পাওয়া যায় নি।

মহারাষ্ট্রের তরুণ মোহন রানাডে। তরুণ তো নয় যেন ইস্পাতের ফলা, এক-খানা জ্বলন্ত অগ্নিশলাকা। ছাত্রাবস্থাতেই দেশপ্রেমের আগুনটি মোহন সযত্নে জেবলেছিলেন বুকে। প্রথম স্ফুলিঙ্গ দেখা গিয়েছিল হায়দ্রাবাদে যখন কুখ্যাত রাজাকারদের অকথ্য অত্যাচারের বিরুদ্ধে মোহন রানাডে লড়াইয়ে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন।

কিন্তু সংগ্রামী পুরুষসিংহের পক্ষে রণক্ষেত্র হিসেবে হায়দ্রাবাদের দেশীয় রাজ্য ছিল তুচ্ছ। তাঁর জন্যে অপেক্ষা করছিল বৃহত্তর রণক্ষেত্রের লাখো মানুষের জনতা। মোহন গেলেন পর্তুগীজ গোয়ায়। এখানে হিন্দী ও মারাঠী শেখাবার মাস্টারি নিলেন তিনি, কিন্তু সেটা যেন ছিল তাঁর পার্টটাইম কাজ, মাস্টারি করার ফাঁকে ফাঁকে তিনি গোয়ার সাধারণ মানুষের সঙ্গে সেতু রচনা করলেন, মন্ত্রণা দিতে লাগলেন তিনি কী করে পর্তুগীজ উপ-নিবেশবাদের লৌহশৃঙ্খল থেকে ভারতের এই অবিচ্ছেদ্য অংশটিকে মুক্ত করা যায়। কুশলী সমরনায়কের মত সাবধানে পা ফেলে চললেন মোহন, রাতারাতি গোয়ার সালাজারী ডিক্টেটরশিপের অবসান ঘটানোর স্বপ্ন তিনি রচনা করেন নি। সুসংযোগের জন্যে তিনি প্রথম বড় রকমের

মোহন রানাডে

গণ-আন্দোলনে যোগ দিলেন ভূদান পদ-যাত্রায় অংশ নিয়ে। তারপর শুরু করলেন বয়স্ক শিক্ষা কর্মসূচী।

গোয়া দমন দিউ ইত্যাদি ভারতস্থ পর্তুগীজ উপনিবেশগুলি ছেড়ে চলে যাবার জন্যে এবং সেগুলিকে ভারত সরকারের হাতে ফিরিয়ে দেবার জন্যে ভারত সরকার পর্তুগীজ সরকারকে বহু অনুরোধ-উপরোধ করেছিলেন, কিন্তু ক্ষমতাগর্বী প্রধানমন্ত্রী ডঃ সালাজার তাতে কর্ণপাত করেন নি। তারপর এলো ১৯৫৪ সালের সেই রোমাঞ্চকর দিনগুলি। এ বছরের জুলাই মাসে মহারাষ্ট্রের এক দল যুবক গঠন করলো আজাদ গোমন্তক দল এবং জুলাই মাসে তারা আক্রমণ করলো দাদরা, নগরহাভেলি দুই পর্তুগীজ ছিটমহল। সেই শুরু, সেই মোহনের সংকেত। ছিটমহল দুটি অনায়াসে দখল করে নিলেন তাঁরা, তারপর মোহন অপেক্ষা করতে থাকলেন মূল গোয়াকে পর্তুগাল শাসন-মুক্ত করার জন্যে।

স্বভাবতই গোয়ার শাসক কর্তৃপক্ষকে প্রমাদ গুণতে হলো, তাঁরা রানাডেরা কার্য-কলাপ সম্পর্কে সচেতন হতে চাইলেন। বিপদ বুঝতে পেরে রানাডেও গা-ঢাকা দিলেন, তারপর চললো মোহনের অজ্ঞাত-বাস। সে সময়েই পর্তুগীজ সরকার মোহন রানাডেকে ধরবার জন্যে পুরস্কার ঘোষণা করেছিলেন। কিন্তু মোহনের কর্মতৎপরতা তাতে কিছু ব্যাহত হয় নি বরং বেড়েছে। মোহনকে কখনো বনে-জঙ্গলে কখনো উপকণ্ঠে কাটাতে হয়েছে। দিনের পর দিন তাঁকে অনাহারে অনিদ্রায় কাটাতে হয়েছে, কিন্তু এত প্রতিকূলতা সত্ত্বেও তিনি পিছিয়ে পড়েন নি। আক্রমণ করলেন একদিন থানা, দলের অস্ত্র চাই। পুলিশের আক্রমণে আহত হলেন মোহন, ধরা পড়লেন শত্রুর হাতে ১৯৫৬ সালে।

তারপরেই শুরু হলো মোহন রানাডের ওপর অকথ্য নির্যাতন। সামরিক ট্রাইব্যুনাল তাঁকে ছাব্বিশ বছরের সশ্রম কারাদণ্ড দিয়েছিলেন। ছ' মাস তাঁকে হাতে হাতকড়া এবং পায়ে বেড়ি পরিয়ে রাখা হয়েছিল, নির্জন কারাকক্ষে একাকী থাকতে দেওয়া হয়েছিল, এমন খাদ্য দেওয়া হয়েছিল জেলে যা রাস্তার কুকুরকেও দেওয়া যায় না, ফলে মোহনকে বহু দিন না খেয়েই কাটাতে হয়েছিল। কিন্তু তাতেও যেন পর্তুগীজ সরকারের শান্তি নেই। তিন বছর বাদে মোহনকে পর্তুগালের রাজধানী লিসবনে নিয়ে যাওয়া হল।

আজ মোহন রানাডেকে ফিরে পেয়ে বোম্বাইয়ের হাজার হাজার লোক বীরের সম্বর্ধনা জানালেন, মুক্ত গোয়ার মুখ্যমন্ত্রী তাঁকে স্বাগত জানালেন বিমানবন্দরে, মেয়েরা মারাঠী কায়দায় এই বীরের ললাটে কুঙ্কুমের টিপ দিয়ে আরতি করলেন। ছাব্বিশ বছর তাঁকে কারান্তরালে থাকতে হয় নি, বার বছর বাদে তিনি ফিরে এলেন তাঁর ৬৫ বছরের প্রায় অন্ধা মায়ের কোলে।

রবীন্দ্রনাথ ও শঙ্করীপ্রসাদ বসু

[পূর্ব-প্রকাশিতের পর]

বন্দেমাতরম্ ও জনগণমন (৪)

এই সম্পাদকীয়টি লিখবার সময়ে স্বয়ং বিধাতাপুরুষ বোধহয় আনন্দবাজারের সম্পাদকের হাত ধরেছিলেন, নচেৎ এমন অক্ষরে অক্ষরে ভবিষ্যদ্বাণী কি করে সম্ভব ? পণ্ডিত জহরলালের গোটা চেহারা এমনভাবে উন্মোচিত খুব অল্প-ক্ষেত্রেই দেখা গেছে। এ বিষয়ে পরে আমরা আরও কিছু বলব, বর্তমানে ঠিক পরদিন আনন্দবাজার যে সম্পাদকীয় লেখে তার থেকে অংশ উদ্ধৃত করা যাক—

"প্রতিক্রিয়াশীল, জাতীয়তাদ্রোহী সাম্প্রদায়িক দ্বিধাবাদীদের বিদ্বেষদুষ্ট অভিসন্ধিপূর্ণ বিকৃত সমালোচনাকে কেন যে মহামান্য নেতৃবৃন্দ এতখানি গুরুত্ব দিতেছেন, আমরা তাহা বুঝিতে অক্ষম। সভাপতি জহরলাল বক্তৃতামুখে কার্যকরী সমিতির সিদ্ধান্ত সমর্থন করিতে গিয়া যে সকল যুক্তি দেখাইয়াছেন, এবং যেভাবে উহা ব্যাখ্যা করিয়াছেন, তাহাতে তাঁহার একদেশদর্শিতায় আমরা ক্ষুব্ধচিত্তে ভাবিতেছি, কংগ্রেসের নেতৃবৃন্দ অতিমাত্রায় সমালোচনা-অসহিষ্ণু হইয়া উঠিতেছেন।.....

"বন্দেমাতরম সঙ্গীতের বিরুদ্ধে উত্থিত কৃত্রিম ও স্বার্থসংশ্লিষ্ট আন্দোলনকে কংগ্রেসের উপেক্ষা করাই উচিত ছিল। কংগ্রেস বা নিখিল ভারত রাষ্ট্রীয় সমিতি কোনোদিন সরকারিভাবে বন্দেমাতরম সঙ্গীতকে জাতীয় সঙ্গীত বলিয়া গ্রহণ করে নাই—এই অনাবশ্যক কথাটা জহরলাল স্মরণ না করাইয়া দিলেও পারিতেন। মুক্তিকামী রাষ্ট্রীয় আন্দোলনের কণ্ঠে এই ধ্বনি ও সঙ্গীত এক ঐতিহাসিক মহাবীর্যকে আশ্রয় করিয়া কেন উদ্গীত হইল, কেন লক্ষ কোটি কণ্ঠ হইতে সমুৎসারিত এই সঙ্গীত ভারতের প্রান্ত হইতে প্রান্তান্তরে ধ্বনিত হইয়া দেশাভিমানের দিব্য প্রেরণা জাগ্রত করিল, এই অফুরন্ত প্রাণশক্তির প্রেরণা এই সঙ্গীতের মধ্য দিয়া কেন প্রকাশ পাইল—ভোট দ্বারা তাহা কোনদিনই নিরূপিত হইবে না—হইতে পারে না।..... সার্বভৌমক আদর্শবাদের জন্যই যদি ইহা সমগ্র ভারতে জয়হুঙ্কার, জয়ধ্বনি এবং জননী জন্মভূমির প্রতি অনুরাগের নিদর্শন, ইহা যদি সত্য হয়, তাহা হইলে কার্যকরী সমিতির বিবৃতির শেষ অংশে এমন ভীরু দৌর্বল্যে এলাইয়া পড়িলেন কেন ? মুসলিম বন্ধুদের আপত্তি—অপ্রকাশ্য গোপন আপত্তি পূরণ করিবার জন্য এবং ভারতের সর্ববিধ ধর্মসম্প্রদায়ের বুক হইতে বেদনাশেল্য তুলিয়া লইবার জন্য এত পরামর্শ, এত দুশ্চিন্তা—এমন কি বৃদ্ধ কবিবরের সার্টিফিকেট সংগ্রহ করিবার পরও, তাঁহাদের পছন্দসই অংশটুকুকে প্রত্যেক জাতীয় সম্মেলনে এবং কংগ্রেসে আবশ্যিক জাতীয় সঙ্গীতরূপে গ্রহণ করিবার পরামর্শ দিলেন না কেন—কিংবা দিতে কুণ্ঠিত হইলেন কেন ? যে-সঙ্গীত স্বাভাবিকরূপেই জাতীয় সঙ্গীতরূপে পরিণত এবং ভারতের প্রত্যেক প্রদেশে গৃহীত—তাহার পরিবর্তে অন্য সঙ্গীতও চলিবে বলিয়া, বন্দেমাতরমকে ঐচ্ছিক করিবার মূলে কী মনোভাব রহিয়াছে ? কার্যকরী সমিতির মহানুভব সদস্যবৃন্দকে ধন্যবাদ, তাহাও তাঁহারা গোপন করেন নাই। খাঁটি জনপ্রিয় 'সহজ হিন্দুস্থানী ভাষায় রচিত' জাতীয় সঙ্গীত সংগ্রহ করিবার এবং অনুমোদন করিবার জন্য এক কমিটি নিযুক্ত হইয়াছে।"

এই সম্পাদকীয়ের মধ্যেই দেখা গেল, আনন্দবাজার গান্ধীজীর অহিংসানীতির মহিমা সম্বন্ধেও কিছু আস্থা হারিয়েছে; সেটা যে নিতান্ত মধ্যযুগীয় ব্যাপার তা ধরা পড়েছে।

"বাংলার জাতীয়তাবাদী স্বদেশসেবকগণ কোনো প্রাদেশিক অদূরদর্শিতা দ্বারা চালিত হইয়া এই সিদ্ধান্তের প্রতিবাদ করিতেছেন, সভাপতি জহরলালের এই প্রকার অসঙ্গত ইঙ্গিতেরও আমরা প্রতিবাদ করিতেছি।

বাংলার নব্য জাতীয়তাবাদীদের অগ্রগামী চিন্তাধারাও তাঁহারই মত দূর ভাবীকালের দিকে প্রসারিত; কোনো অতীতকে আঁকড়িয়া ধরিয়া গণ্ডী রচনার তাঁহারা বিরোধী। সুতরাং কংগ্রেসের মডারেটীয় দৃষ্টিভঙ্গি, ও ঊনবিংশ শতাব্দীর জাতীয়তাবাদ ও ধর্মনৈতিক অহিংসাবাদের মিলিত মিশ্রিত আদর্শে অনুপ্রাণিত কার্যকরী সমিতির সেই সকল প্রাচীনপন্থী প্রবীণ নেতা—যাঁহারা অগ্রগামী চিন্তা ও কর্মধারাকে কংগ্রেসে প্রবেশ করিতে দিতে একান্ত অনিচ্ছুক, তাঁহারা বন্দেমাতরমের ভয়ে ভীত হইলেন, না, সাম্প্রদায়িকতাবাদী, জাতীয়তাদ্রোহী বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের ভিক্ষোপজীবী-শ্রেণীর মুসলমান রাজনৈতিকগণের প্রতি তাঁহাদের চরিত্রগত স্বাভাবিক ভীতির জন্য বেসামাল হইলেন—এ রহস্যের কিনারা বাংলার নব্য জাতীয়তাবাদীরা পাইতেছেন না। জহরলাল জানিতে না পারেন, কিন্তু সুভাষচন্দ্র জানেন, বাঙালী বঙ্কিমের পর বিবেকানন্দের নিকট স্বদেশপ্রেমের দীক্ষা লইয়াছিল, এবং সেই সিংহগ্রীব সন্ন্যাসীর নিকট শুনিয়াছিল—"আগামী পঞ্চাশ বৎসরকাল জননী জন্মভূমিই তোমাদের উপাস্য দেবতা হউন, অন্যান্য অকোজো দেবতাকে কিছুদিনের জন্য ভুলিলে ক্ষতি নাই।" কাজেই রাষ্ট্রীয় আন্দোলনে জাতীয় সঙ্গীতের বকলমে বাংলার জাতীয়তাবাদীরা দেবদেবীর বন্দনা চালাইতে চাহে, এইরূপ অপবাদ, আশঙ্কা ও বক্রোক্তির বাঙালীমাত্রেই প্রতিবাদ করিবে।"

কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির সিদ্ধান্ত এবং সেই সিদ্ধান্ত গ্রহণে জহরলালের ভূমিকা সম্বন্ধে কঠিনতম বক্তব্য হিন্দুস্থান স্ট্যান্ডার্ডেই বেরিয়েছিল। তার ৩০ অক্টোবরের সম্পাদকীয়ের নাম ছিল Sacrilage. 'স্যাক্রিলেজ' যারা করতে পারে, তারা ক্ষমার যোগ্য নয়। সুতরাং ওয়ার্কিং কমিটির অনুচিত সিদ্ধান্ত যদি নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটি মেনে নেয়, সে কাজ হবে—

> "A base betrayal of the high trust which people have hitherto reposed on them, a gross and wanton outrage upon a deeply nursed and proudly cherished sentiment of Bengal."

এর পরে যা লেখা হয়েছিল সেই ভয়ঙ্কর আক্রমণের মূল লক্ষ্য পণ্ডিত জহরলাল তাতে, সন্দেহ নেই, যদিও লেখায় স্পষ্ট করে তাঁর নাম করা হয় নি। জহরলাল যে এই কাণ্ডের নায়ক তা সংবাদপত্রের কর্তৃপক্ষের জানা থাকলেও সিদ্ধান্ত ওয়ার্কিং কমিটির নামেই বেরিয়েছিল। পরদিন যখন জহরলাল ঐ প্রস্তাবের সমর্থনে এগিয়ে আসবেন, তখন সরাসরি তাঁকে আক্রমণ করা হবে। "কংগ্রেস হাইকম্যাণ্ডে কিছু লোক আছেন, অতীতের প্রতি যাঁদের চরম অশ্রদ্ধা। তাঁরা কিছুতে ভাবতে পারেন না অতীতের মধ্যে বস্তু কিছু আছে, এমন কি কংগ্রেসের অতীত ইতিহাসের মধ্যেও, যার সম্বন্ধে প্রীতি বা শ্রদ্ধাবোধ করা যায়। তাঁদের ধারণা, ইতিহাসের শুরু তাঁদের থেকেই এবং যখন থেকে তাঁরা প্রাপ্তবয়স্ক হয়েছেন তখন থেকেই নবযুগোদয় নির্ঘাত গণনা করতে হবে। বন্দেমাতরম এঁদের কাছে অতীতের চিরজাগ্রত স্মৃতি, সুতরাং নিষিদ্ধ, অভিশপ্ত। .....বন্দেমাতরমের বিরুদ্ধে মিঃ জিন্নার অসাধু, ধূর্ত, কপট আক্রমণ এঁদের সুবিধাজনক অজুহাত দিয়েছে।" এই অংশ থেকে জহরলালের আকার যথেষ্টই স্পষ্ট হয়েছে, স্পষ্টতর হয়েছে পরবর্তী অংশে:

> "But it is not the past alone which is the object of their supreme scorn and contempt. They have the some insolent disregard—the same lofty disdain—for the cherished ideals and traditions of a great, ancient and proud race. A great Frenchman, one of the finest spirits of his age, but a man of narrow and bigoted prejudices, used to say, 'Liberalism was the enemy.' Some men of the Congress High Command are of a coarser, commoner clay: but with them it is Hinduism which is the enemy. Many of them are deeply anglicised at heart; it is their English background and culture which is their chief claim of distinction, both in their own eyes and in the eyes of the English-speaking community; and to this borrowed anglicised culture they have added a veneer of spurious, initiative cosmopolitanism which is very much in fashion at the present day. The result is a poisonous product—a curious, hybrid mentality which, with the cant of patriotism upon its lips, has nothing but the most supreme and absolute contempt for every cherished instinct, tradition and sentiment of their race. They must build up all things anew; they must erect upon a basis of vacuum—after the approved pattern of Moscow."

তারপরে বাংলার বিরুদ্ধে এই সকল নেতাদের চরম ঘৃণা ও আক্রোশের কথা বলা হয়েছিল, কারণ বাংলাদেশ

ঐসব দেশের দ্বারা প্রচারিত বর্ণহীন, প্রাণহীন, ঐতিহ্যের সঙ্গে সম্পর্কহীন দেশাত্মবোধের পরিবর্তে প্রাণে ও স্বাস্থ্যে সমুজ্জ্বল, ইতিহাসের আলোকে স্বর্ণরঞ্জিত দেশাত্মবোধের জন্ম দিয়েছিল। সবশেষে বলা হয়—

> "Of Bande Mataram, it may be said that to mutilate is to murder ; .... To tamper with this glory of a song is to kill the soul of a nation. Let vandals beware !"

নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটিতে অঙ্গচ্ছেদ প্রস্তাবের পক্ষে জহরলাল খোলাখুলি বক্তৃতা করলে ৩১ অক্টোবরের সম্পাদকীয়তে জহরলালের নাম ধরে সমালোচনা করা হল। সম্পাদকীয়ের নাম—*"Pandit Jawaharlal Explains."* জহরলালের সেই ব্যাখ্যা, এই সংবাদপত্রের মতে, নিতান্ত তুচ্ছ প্রয়াস; তার মধ্যে আছে সস্তা যুক্তি, সস্তাতর চালাকি আর ক্লান্তিকর পুনরুক্তি। অগণ্য আজেবাজে কথা বকে গেছেন তিনি, সেই হাভভালি-কাড়া বচনের মূল কথা—আমাদের কেবল বাংলার কথা ভাবলেই চলবে না, ৩৫ কোটি ভারতবাসীর কথা ভাবতে হবে, ভাবতে হবে সকল ধর্ম ও সম্প্রদায়ের কথা; বিরোধিতায় কংগ্রেস ভীত নয়, ইত্যাদি। জহরলাল যেসব যুক্তি উত্থাপন করেছিলেন, সেগুলি ধরে-ধরে খণ্ডন করা হয়েছিল, এবং ধর্ম সম্বন্ধে জহরলালের দেখানো-ঔদাসীন্যকে প্রচণ্ড ঘৃণা করা হয়েছিল :

> "In one part of his speech Pandit Nehru indulged in that cheap sneer at religion which is now becoming an integral part of his speeches. "I am not a man of religion", he said (evidently, priding himself on the fact); and he went on to say that religions ideology diverted his mind from contemplation of the pure, rational beauty of the Motherland ... May we humbly point out that this kind of cheap sneer has not even the merit of novelty about it. They used to do it even in the far-off days of king Solomon. But the wisest of kings has judged the matter for all time to come."

পণ্ডিত জহরলাল কবি হলেও হতে পারতেন কিন্তু তিনি কবি নন, তদুপরি রাজনৈতিক, সুতরাং কার্যগতিকে তাঁর মনের চামড়া কিছুটা পুরু হয়েছিলই; কিন্তু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর অন্য সকল ভূমিকা সত্ত্বেও কবি এবং কবি ছাড়া কিছু নন। অতি-স্পর্শকাতর তাঁর মন। সেই স্পর্শকাতরতাই দেশ ও দেশবাসীর প্রয়োজনে তাঁকে রাজনীতির আবর্তের মধ্যে আকর্ষণ করেছে; তিনি এসেছেন কিন্তু অনেক সময়েই অনভ্যস্ত ভূমিকার বিড়ম্বনা তাঁকে ভোগ করতে হয়েছে। তাঁকে আঘাত সহ্য করতে হয়েছে। একথা কিছুতে বলতে পারব না সেই সকল আঘাতই আঘাতকারীদের অথবা বিদ্বেষবুদ্ধি থেকে এসেছে; বহুক্ষেত্রেই রবীন্দ্রনাথের সমালোচকদের বক্তব্যে যুক্তি ছিল। তাহলেও সে কথাগুলি কবিকে ব্যথা দিয়েছে—অন্যের তুলনায় বেশি যাতনা তিনি পেয়েছেন কারণ অন্যের তুলনায় বেশি অনুভূতিশীল মন নিয়ে তিনি পৃথিবীতে এসেছেন।

বন্দেমাতরম সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ যে বিবৃতি দেন, তার মধ্যে সত্যই দুর্বলতা ছিল। প্রায় আশী বছরের কোনো মানুষের পক্ষে নিজ কার্য সমর্থনে পিতার আদর্শের উল্লেখ করা মানায় না। এক্ষেত্রে রোমা রোলাঁর কঠিন কথাটা মনে পড়ছে; তিনি বলেছিলেন, ইউরোপে যখন আমরা কিছু করি বা কিছু বলি, তখন বলি যে, দায়িত্ব আমারই। বন্দেমাতরম বিষয়ে মতের দায়িত্ব রবীন্দ্রনাথের নিজেরই নেওয়া উচিত ছিল। বন্দেমাতরম-ভক্ত বাঙালী সকিসময়ে দেখল, বন্দেমাতরমের শেষাংশ সম্বন্ধে এবং গোটা আনন্দমঠ সম্বন্ধে কতখানি বিরক্তি ও বিতৃষ্ণা কবির মনে জমে আছে। ধর্মের সঙ্গে সম্পর্ক আছে, পৃথিবীতে এমন সাহিত্য বহু সৃষ্টি হয়েছে, কিন্তু যেহেতু সেই ধর্ম বা মত আমার নয়, তার বিষয়ে এতখানি বিরাগ থাকবে। তা থাকা যদি উচিত হয়, তাহলে মূর্তিপূজায় বিশ্বাসী বাঙালী বা ভারতবাসী রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যের বহু অংশ সম্বন্ধে আবশ্যিক বিদ্বেষ বোধ করবে। এর ঠিক উল্টো দিকে আছে রবীন্দ্রনাথের প্রতীক-ভাবাশ্রিত রচনাগুলি, যা তাঁর বিরুদ্ধে সমালোচনাকে প্রখর করে তুলেছিল। ১৯০৫ সালে দেশকে দেশমাতারূপে রবীন্দ্রনাথ এতবেশি দেখেছেন এবং দেখাবার চেষ্টা করেছেন যে, তার স্মৃতি যাঁদের মনে ছিল, তাঁরা এগিয়ে এসে কবির দুই ভূমিকার কথা জানাতে ভুললেন না। ১৯০৫ সালে ৪৪ বছরে কবি যে-কাজ করেছেন, ১৯৩৭ সালে ৭৭ বৎসর বয়সে তিনি বলতে পারতেন, সে-পথ বা মত তিনি ত্যাগ করেছেন; সেই সহজ কথাটা না বলার জন্য সমালোচকেরা তাঁর কাজের অসঙ্গতির দিকটি বড় করে তোলার সুযোগ পেলেন।

ওয়ার্কিং কমিটির সিদ্ধান্ত ঘোষিত হবার আগে আনন্দবাজারে যখন বেরিয়েছিল রবীন্দ্রনাথ বন্দেমাতরম সংরক্ষণের পক্ষপাতী, তখন ঐ পত্রিকা কবির কী অজস্র প্রশস্তি করেছিল, তা আমরা আগেই দেখেছি। এই সময়ে কবি-পুত্র রথীন্দ্রনাথের উক্তি যথেষ্ট বিভ্রান্তিকর। তিনি বলেছিলেন, শ্রীকৃষ্ণ কৃপালনীর মত রবীন্দ্রনাথের মত নয়। ২৩শে অক্টোবর এই কথা তিনি বলেন, ২৬শে অক্টোবর বন্দেমাতরমের অঙ্গচ্ছেদ সমর্থন করে কবির বিবৃতি কংগ্রেস-সভাপতিকে দেওয়া হয়। ঐদিনই আবার রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে জহরলালের সুদীর্ঘ আলোচনা হয়। এক্ষেত্রে একটি মাত্র সন্দেহই সম্ভব-

পর, এবং সেই সন্দেহই সকলে করেছিল—রবীন্দ্রনাথ জহর-লালের দ্বারা চালিত হয়েছিলেন।*

যাই হোক, পূর্বতন প্রশস্তির পটভূমিকায় আনন্দ-বাজারের রবীন্দ্র-সমালোচনা অতি কঠোর হতে পারে নি। কবির বিবৃতিকে মূল্য দিয়ে ছাপা হয় নি, সেই অবজ্ঞার দ্বারাই মনোভাব প্রকাশিত হয়েছিল। ৩১শে অক্টোবরের সম্পাদকীয়তে একবার "বৃদ্ধ কবিবরের সার্টিফিকেটের" উল্লেখ করা হয়েছিল, এবং ভিন্ন প্রসঙ্গে লেখা হয়েছিল—"বন্দেমাতরম ব্যতীত বহু জনপ্রিয় জাতীয় সঙ্গীত প্রত্যেক প্রদেশে আছে। একালের জনপ্রিয় সঙ্গীত, কিছুদিন পরে অপ্রচলিত হইয়াছে। বাংলার প্রাক্-স্বদেশী যুগের এবং স্বদেশী যুগের অনেক জনপ্রিয় সঙ্গীত অসহযোগের যুগে বা আইন অমান্যের যুগে চলে নাই। রাষ্ট্রীয় আন্দোলনের গতিভঙ্গির পরিবর্তনে ঐগুলির ভাব ও প্রেরণা সামঞ্জস্যহীন বলিয়াই চলে নাই। রবীন্দ্রনাথের বহু সুরচিত সঙ্গীতও এইরূপে মরিয়াছে।"

স্বদেশী আন্দোলনকালের দুই বিশিষ্ট ব্যক্তি রবীন্দ্র-নাথের পূর্ব ভূমিকার সঙ্গে বর্তমান আচরণের তুলনা না করে পারেন নি। শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রনাথ শেঠ স্বদেশী যুগের "বন্দেমাতরম সম্প্রদায়ের" সভ্য, রবীন্দ্রনাথ যার সহ-সভাপতি। ৩১ অক্টোবর অমৃতবাজারে প্রকাশিত বিবৃতিতে তিনি বললেন, বন্দেমাতরম মুসলমানের অনুভূতিতে আঘাত করে, একথা সত্য নয়, কারণ গোড়ায় মুসলমান মৌলবী লিয়াকত হোসেন হিন্দু ছেলেদের পর্যন্ত ধমকাতেন যদি না তারা বন্দেমাতরম ধ্বনিতে যোগ দিত।

"Men live to learn. To-day, only to-day I have learnt that there are objectionable passages in that song and Vice-President Tagore has discovered" etc.

রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং অখণ্ড বন্দেমাতরম গাইতে গাইতে পথ পরিক্রমা করেছিলেন, ইনি তাও জানালেন—

"Poet Tagore accompanied us, the *Sampradaya*, to the Prosanna Kumar Tagore Ghat on the first *Rakhi Bandhan* day singing as well with us, of course. Moulana Saheb is dead and the Poet has discovered the path after enlightening discussions with the President of the Congress and Mr. Gandhi."

নরেন্দ্রনাথ শেঠের লেখায় যা ছিল চাপা বিদ্রূপ, তা মুক্ত আক্রমণ হয়ে দাঁড়াল হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষের লেখায়। বন্দে-মাতরম সম্প্রদায়ের ইনি সম্পাদক ছিলেন; মারাত্মক স্মরণশক্তি ও সংগ্রহের জন্য ইনি বিখ্যাত; বন্দেমাতরম সম্প্রদায়ের উদ্ভব ও তার সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের যোগের কথা ইনি কিছু স্বাদ নিয়ে জানালেন—১

"ভরসা করি ডঃ টেগোর বন্দেমাতরম সম্প্রদায়ের সঙ্গে তাঁর যোগের কথা স্মরণ করতে পারেন, যার সভ্যেরা জাতীয় কংগ্রেসের ১৯০৬ সালের অধিবেশনে গোটা বন্দেমাতরম গানটিই গেয়েছিলেন।...সম্প্রদায়ের সম্পাদক হিসেবে ডঃ টেগোর এবং অন্যান্য সদস্যদের সঙ্গে কলকাতার রাস্তায় দ্বারে দ্বারে আমাদের সকলের মাতৃভূমির ঐ বন্দনাগান গেয়ে বেড়াবার সুযোগ আমার হয়েছিল। সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠাতা-সদস্যদের খুব অল্প-জনই আজ আমাদের মধ্যে বর্তমান আছেন। যাঁরা পার্থিব জগৎ ত্যাগ করে গেছেন, তাঁদের মধ্যে দিনেন্দ্র-নাথ ঠাকুর, সুরেশচন্দ্র সমাজপতি, তাঁর ভাই জ্যোতিষ-চন্দ্র সমাজপতি, শ্যামপুকুরের কুমার মন্মথনাথ মিত্র, পাইকপাড়ার কুমার সতীশচন্দ্র সিংহ, হেমচন্দ্র মল্লিক, যোগেন্দ্রকুমার বসুর কথা মনে ভেসে ওঠে।

"বন্দেমাতরম সম্প্রদায় স্বতঃস্ফূর্তভাবে সংগঠিত হয়। ১৯০৫ সালের ১৬ই অক্টোবর, যেদিন বঙ্গবিভাগ শাসনতান্ত্রিকভাবে কার্যকর করা হয়, সেদিন কয়েকজন বন্ধু স্বর্গত পশুপতিনাথ বসুর বাড়িতে বন্দেমাতরম গাইতে গাইতে গিয়ে হাজির হন; সেখানে রাখীবন্ধনের অনুষ্ঠান হয়।

"তৎকালীন প্রেরণায় চালিত হয়ে বন্ধুরা স্থির করেন তাঁরা একটি সংঘ গঠন করবেন, যার অন্যতম উদ্দেশ্য সমগ্র কলকাতায় গানটিকে জনপ্রিয় করে তোলা। প্রতি রবিবার তাঁরা কলকাতার রাস্তায় বন্দে-মাতরম গাইতে গাইতে যেতেন। সেইসব কালে উপস্থিত থাকবার সৌভাগ্য যাঁদের হয়েছিল, তাঁরা অনুভব করতেন বঙ্কিমচন্দ্রের কল্পনায় উদ্ভাসিত হয়েছেন যিনি, সেই মাতৃভূমি যেন সশরীরে সম্মুখে বিরাজ করছেন। .....এঁদের মধ্যে ডঃ টেগোর একজন, বিধাতা যাঁকে এখনো আমাদের মধ্যে বর্তমান রেখেছেন। এই সকল ঘটনাকালে রবীন্দ্রনাথের কণ্ঠ যখন সকলের গলাকে ছাড়িয়ে উপরে উঠত, তখন কি তিনি অনুভব করতেন যে, তিনি একেশ্বরবাদী এবং আদি ব্রাহ্মসমাজের প্রতিষ্ঠাতা মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের পুত্র? তিনি কি অনুভব করতেন যে, তেত্রিশ কোটি হিন্দু দেবদেবীর অন্তর্ভুক্ত দুর্গা, লক্ষ্মী, সরস্বতীর উদ্দেশ্যে পূজা নিবেদন করছেন? সেই দিনগুলির

* রবীন্দ্রনাথ বন্দেমাতরম সংরক্ষণের পক্ষপাতী এবং রবীন্দ্রনাথ বন্দেমাতরমের অঙ্গচ্ছেদের পক্ষপাতী—এই দুইয়ের মধ্যে সত্যই কোনো বিরোধ না থাকতে পারে, যদি মনে করা যায়, কংগ্রেস হাইকম্যাণ্ড তখনি বন্দেমাতরম বর্জনের মতলব করে ফেলেছিলেন। তা হওয়াও অসম্ভব নয়। কে জানে রবীন্দ্রনাথ সেই আপৎ নিবারণ করেছিলেন কি না। এসব ব্যাপারে যাঁরা প্রত্যক্ষ ধারণা রাখেন, তাঁরা কিছু আলোকপাত করতে পারেন।

১—১ নভেম্বরের হিন্দুস্থান স্ট্যাণ্ডার্ড থেকে।

অপরূপ প্রেরণার আলোকোদ্ভাস আমাদের জাতি-বর্ণের পার্থক্যসীমার উপরে উন্নীত করত, সেই প্রেরণা ও আলোকের দিক দিয়েই বন্দেমাতরমের তাৎপর্য বুঝতে হবে, পরিপক্ক বিবেচনাবুদ্ধির মারপ্যাঁচ দিয়ে নয়, যা আজকে গানটির ভ্রান্ত ব্যাখ্যায় প্রণোদিত করছে। ডঃ টেগোর আজ সেই প্রেরণা ও আলোক ফিরে অনুভব করতে পারছেন না বলেই একেশ্বরবাদের আলোকে লালিত হওয়া বা পিতার আদর্শের কথা তুললেন; যে-সব বস্তু বহুদিন বিস্মৃত, তাকেই ৩২ বছর পরে ঘষে-মেজে এনে "পৌত্তলিকতা" সম্বন্ধে নতুন স্পর্শ-কাতরতা দেখাচ্ছেন।.....

"ডঃ টেগোরকে আমার স্মরণ করাবার প্রয়োজন নেই যে, ভারতীয় জাতীয়তার এই রণধ্বনি কৃষ্ণকুমার মিত্র ও অন্যান্য সাধারণ ব্রাহ্মসমাজীদের দ্বারা উচ্চারিত হয়েছিল, যাঁরা তাঁদের একেশ্বরবাদের জন্য নিজের পিতামাতাকে ত্যাগ করে এসেছিলেন, নিজেদের বিশ্বাসের জন্য জীবনের সুখ-সুবিধা স্বাচ্ছন্দ্যকে বর্জন করেছিলেন।..... ,

"বহুদিন আগে, তিরিশ বছর হয়ে গেছে, ডঃ টেগোর তাঁর বিখ্যাত কবিতায় অরবিন্দের উদ্দেশ্যে শ্রদ্ধানিবেদন করেছিলেন—'অরবিন্দ, রবীন্দ্রের লহ নমস্কার!' তাঁর স্মরণের সুবিধার্থে আমি বন্দেমাতরম ও বঙ্কিমচন্দ্র সম্বন্ধে অরবিন্দ কি লিখেছিলেন, তুলে ধরছি—

"সুদীর্ঘ মোহাচ্ছন্নতার অন্তে বাঙালী যখন সত্যের জন্য আকাঙ্ক্ষিত হয়ে দৃষ্টিপাত করল, তখন কে যেন গেয়ে উঠল বন্দেমাতরম। 'মন্ত্র' এসে গেল। এবং এক-দিনেই সমগ্র জাতি দীক্ষিত হয়ে গেল। দেশপ্রেমের ধর্মে। মাতা আবির্ভূত হয়েছেন স্বরূপে। জনগণের কাছে সে 'দর্শন' আসার পরে বিশ্রাম নেই, শান্তি নেই, নিদ্রা অসম্ভব, যতক্ষণ না মন্দির নির্মিত হচ্ছে মূর্তি প্রতিষ্ঠিত হচ্ছে, আত্মবলিদান করা হচ্ছে। কোনো বিরাট জাতি যখন ও হেন দর্শন লাভ করে, সে আর কখনো বিজয়ীর পদতলে থাকতে পারে না।"

"সে দর্শন আজ আমাদের চোখে ম্লান হয়ে গেছে; আমাদের দুর্বলতাই আজ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কণ্ঠে ভাষা পেয়েছে—রবীন্দ্রনাথের বিবৃতির মধ্যে—যা তিনি নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির ওয়ার্কিং কমিটির হাতে কৃতার্থচিত্তে অর্পণ করেছেন।"

কথাগুলিকে মৃদু বলা চলে না, মৃদু কথা বলতেও জানে নি, সঞ্চিত ক্ষোভ উদ্গিরণ করে দিয়েছেন পংক্তিতে পংক্তিতে।

হেমেন্দ্রপ্রসাদের রচনা সম্বন্ধে যে কথা সত্য, তা বহুগুণে অধিক সত্য হিন্দুস্থান স্ট্যান্ডার্ডের ৩১শে অক্টোবর তারিখের সম্পাদকীয় সম্বন্ধে, যার শিরোনামা—*Rabindranath falters.*" ঐ দিনই জহরলালের ভূমিকা সম্বন্ধে লেখা সম্পাদকীয়তেও কিছু রবীন্দ্র-প্রসঙ্গ ছিল। জহরলাল বলে-ছিলেন, অঙ্গচ্ছেদ করার আগে তাঁরা নানা জনের সঙ্গে পরামর্শ করেছিলেন। সংবাদপত্রটি প্রশ্ন করল—কাদের সঙ্গে পরামর্শ করা হয়েছে—প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটি? জেলা কংগ্রেস কমিটি?— "অহো, তিনি রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে পরামর্শ করেছেন এবং স্বপক্ষে কবির কাছ থেকে একটি আদেশনামা পেয়েছেন, হাঁ হাঁ!..... আমরা কি জিজ্ঞাসা করতে পারি, এই আদেশনামাটি কখন তিনি আদায় করলেন, এ আই সি সি'র মিটিংয়ের ঠিক আগে নয় কি? এবং কি উদ্দেশ্যে এটি আদায় করা হল? তা কি বহু সপ্তাহ, বহু মাসের 'সুগভীর' চিন্তায় বিপর্যস্ত কংগ্রেস-সভাপতির বিভ্রান্ত আঁধারমনে আলোকসম্পাত করতে, না কি পূর্বেই গৃহীত সিদ্ধান্তকে ঢেকা দিতে হাইকম্যাণ্ডের মুখরক্ষা করতে?"

হিন্দুস্থান স্ট্যান্ডার্ডের এই কঠিনতম সম্পাদকীয়টি আমি অনুবাদ করে বহুলাংশে উপস্থিত করব; তার ভাষার তীব্রতায় পাঠক হয়ত শিহরিত হবেন। কিন্তু একটি বিষয় পরিষ্কার করে নেওয়ার প্রয়োজন—নিছক গাল দেওয়ার সুখ পেতে বাংলার সর্বোচ্চ জীবিত প্রতিভাকে বাঙালীর সংবাদ-পত্র আক্রমণ করে নি। যাঁরা আঘাত করেছিলেন, তাঁরা কেউ রবীন্দ্রভক্ত নন, কিন্তু তাঁদের ভক্তি রবীন্দ্রনাথেই সমাপ্ত হয় নি। রবীন্দ্রনাথের নিন্দা করে জনপ্রিয়তাবৃদ্ধির সম্ভাবনা তখন নেই, বরং বিপরীতটাই সত্য। অতিবড় দুঃখ না পেলে, সহসা আঘাতে (কেন সহসা তা আমরা আগে ব্যাখ্যা করে এসেছি) উদ্ভ্রান্ত না হলে, বৃদ্ধ অসুস্থ মহাপ্রতিভাকে, জাতির মহাগৌরবকে, এভাবে সমালোচনার লক্ষ্য করা হয় না।

এইখানে আমাদের আরও কয়েকটি জিনিস বিবেচনা করতে হবে। আমরা যে বন্দেমাতরম প্রসঙ্গে এতখানি সময় নিয়েছি, তার কারণ, এই সঙ্গীত সম্বন্ধে মনোভাবের পরিবর্তনের মধ্যে জাতীয় জীবনের খাতবদলের ইঙ্গিত রয়েছে। বন্দে-মাতরমের অঙ্গচ্ছেদ অবশ্যই ঐতিহ্যের সঙ্গে আংশিক বিচ্ছেদ। সেই বিচ্ছেদের মূলে যদি নতুন বলিষ্ঠ কোনো জীবনদর্শন থাকত তাহলে আশঙ্কার কারণ ছিল না, কিন্তু ব্যাপারটা দুর্বলতা ও আপোষের রূপ নিয়েই হাজির হয়ে-ছিল। সুভাষচন্দ্রের মনোভাবের আলোচনায় যখন আসব, তখন ওরই মধ্যে শক্তির সম্ভাবনা দেখব, কিন্তু কংগ্রেস নেতৃবৃন্দের ক্ষেত্রে তা দেখা যায় নি, পরবর্তী ইতিহাস তাই প্রমাণ করে। ব্যক্তিগতভাবে আমার বিশ্বাস, রবীন্দ্রনাথ এ-ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় রাজনৈতিক বুদ্ধি দেখিয়েছিলেন, কিন্তু রাজনৈতিক বিবৃতির সঙ্গে কতকগুলি ব্যক্তিগত কথা জুড়ে দেওয়ায় বিপদ সৃষ্টি হয়েছিল। বৃদ্ধ কবির দুর্ভাগ্য, যে-নিন্দা কংগ্রেস হাইকম্যাণ্ডের প্রাপ্য, তার বড় অংশ কাছের মানুষ হিসাবে তাঁকে নিতে হয়েছে—এবং তারও মূলে তাঁর অনভ্যস্ত রাজনৈতিক ভূমিকা (আসলে রাজনৈতিক বিবৃতি-দাতার ভূমিকা), যা অনেক সময়েই তাঁকে বিপাকে ফেলেছে। পুনশ্চ রোমা রোলাঁর কথা স্মরণ করছি; তিনি আক্ষেপ করে বলেছিলেন, রবীন্দ্রনাথের আশেপাশে উপযুক্ত মাপের পরামর্শদাতা কেউ ছিল না।

[ক্রমশঃ]

কণ্ঠ দর্শন

মধ্যবর্তী নির্বাচনের প্রাক্‌মুহূর্তেই এই সংখ্যার সাপ্তাহিক বসুমতী পাঠকদের হাতে গিয়ে পড়বে। সমগ্র দেশবাসী তথা আমাদের জল্পনা-কল্পনার অবসান ঘটতে আর বেশিদিন নেই। প্রাক্‌-নির্বাচনীয় সকল আলোচনা এই সংখ্যাতেই আপাতত শেষ। আমরা ইতিপূর্বে একটি বিশেষ নির্বাচন-সংখ্যা প্রকাশ করেছিলাম, যা পাঠকমনে প্রভূত পরিমাণে সাড়া জাগাতে সক্ষম হয়েছিল। পরবর্তী সংখ্যাগুলিতেও নির্বাচন সংক্রান্ত বহু প্রবন্ধ ও সমীক্ষা প্রকাশিত হয়েছে, বর্তমান সংখ্যাতেও কয়েকটি প্রকাশিত হচ্ছে, কাজেই এখানে নির্বাচন সংক্রান্ত আলোচনা বাহুল্য মাত্র।

তথাপি যেহেতু পশ্চিমবঙ্গে নির্বাচন ছাড়া আপাতত আর কোন সংবাদ নেই এবং যেহেতু পশ্চিমবঙ্গ তথা ভারতের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ভবিষ্যৎ এই মধ্যবর্তী নির্বাচনের ওপরই একান্তভাবে নির্ভরশীল, অতএব এ-সংখ্যার বঙ্গদর্শনও বিষয়টিকে একেবারে অবহেলা করতে পারে না। সাপ্তাহিক বসুমতীতে যাঁরা আসন্ন নির্বাচন সম্পর্কে বিভিন্ন সমীক্ষা করেছেন ও বিভিন্ন সম্ভাবনার কথা উল্লেখ করেছেন, তাঁরা প্রত্যেকেই বিভিন্ন অঞ্চলে ব্যাপক পরিভ্রমণ ও পর্যবেক্ষণের ফলে নিজেদের সিদ্ধান্তে এসেছেন। এই কথাটা উল্লেখ করার বিশেষ প্রয়োজন আছে, কেন না লক্ষ্য করা গেছে যে, কয়েকটি পত্র-পত্রিকায় কিছু কিছু উদ্দেশ্যমূলক, নির্বাচনী সমীক্ষা প্রকাশ করা হচ্ছে বিশেষ কোন কোন রাজনৈতিক দলের স্বার্থের মুখ চেয়ে।

অবশ্য নির্বাচন সম্পর্কে কোন কিছুই বিশেষ জোর দিয়ে বলা সম্ভবপর নয়। তাছাড়া পশ্চিমবঙ্গের জনসাধারণ নির্বাচনের ক্ষেত্রে মনের কথা যে খুলে বলেন না, গতবারের নির্বাচনেই তা প্রমাণ হয়েছে। কোন কংগ্রেস নেতা-ই বোধ হয় ভাবতে পারেন নি যে, চতুর্থ নির্বাচনের ফলাফল এমন হবে। পক্ষান্তরে সেদিনের যুক্তফ্রন্টের শরিক রাজনৈতিক দলগুলিও বুঝতে পারেন নি যে তাঁরা নিজেরা গত নির্বাচনে যতটা কংগ্রেস-বিরোধী ছিলেন, তার চেয়েও জনসাধারণ অনেক বেশি কংগ্রেস-বিরোধিতা ব্যালট বাক্স মারফৎ প্রকাশ করেছিলেন।

অবশ্য পশ্চিমবঙ্গের নির্বাচনে অবতীর্ণ সকল দলই দাবি করছেন যে, অবস্থা তাঁদের অনুকূলে এবং সেক্ষেত্রে তাঁরা যুক্তি-সুযুক্তি-কুযুক্তি উত্থাপন করতে ক্লান্ত হচ্ছেন না। কবির সাহেব-আশু ঘোষেরা ভাবছেন যে এবারে কংগ্রেস বা যুক্তফ্রন্ট, কোন তরফই একতরফা নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা পাবেন না এবং অগত্যা তাঁরাই হবেন আগামী দিনের রাজনীতির নিয়ামক। কিন্তু এই একটি ক্ষেত্রে আমরা নিশ্চয়তা সহকারে বলতে পারি যে, এই জাতীয় চিন্তা "স্বপ্নমাত্র মনের বিকার" ছাড়া কিছুই নয়। লোকদল বা আই-এন-ডি-এফ বা অনুরূপ রাতারাতি গজিয়ে-ওঠা দলগুলির বিভিন্ন নির্বাচন কেন্দ্রে যে সংগঠনের পরিচয় পাওয়া গেছে তাতে দলপিছু যে দু'-একটা করেও সীট মিলবে তারও কোন নিশ্চয়তা নেই।

লড়াই-এর দুই ফ্রন্ট আসলে কংগ্রেস ও যুক্তফ্রন্ট। উভয়েই দাবি করেছেন যে, তাঁরাই বিধানসভায় সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করবেন। তবে কংগ্রেসী কোন কোন নেতার বক্তব্য থেকে তাঁদের বিশ্বাসের দোদুল্যমানতার কিছুটা আভাস মেলে। সম্প্রতি উপ-প্রধানমন্ত্রী শ্রীমোরারজী দেশাই ঘোষণা করেছেন যে, তেমন পরিস্থিতির উদ্ভব হলে কংগ্রেস কোয়ালিশন মন্ত্রিসভা গঠনেও রাজী। এই জাতীয় মন্তব্য আরও কেউ কেউ করেছেন, যা থেকে ধারণা হওয়া সম্ভব যে, সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ সম্বন্ধে দ্বিধার মনোভাব কংগ্রেসের কোন কোন মহলে প্রবেশ করেছে।

নিজেদের জয়লাভের স্বপক্ষে কংগ্রেসের জোরালো যুক্তি হচ্ছে এই যে, যুক্তফ্রন্ট তার ন'মাসের শাসনে ব্যর্থ হয়েছে এবং এই কারণেই কংগ্রেস ক্ষমতায় আসীন হবেই। যুক্তফ্রন্ট আমলের চালের মূল্যবৃদ্ধি, ঘেরাও প্রভৃতির কথা বিশেষ করে ঘোষণা করা হচ্ছে। এবং কংগ্রেসের তরফ থেকে স্থায়ী সরকারের প্রতিশ্রুতি দেওয়া হচ্ছে। পক্ষান্তরে নানা যুক্তি দিয়ে যুক্তফ্রন্টের পক্ষ থেকে কংগ্রেসী বক্তব্যসমূহকে খণ্ডন করার চেষ্টা চলেছে। যুক্তফ্রন্টের ন'মাসের শাসনের সঙ্গে কংগ্রেসের বিশ বছরের তুলনা করা হয়েছে, চালের মূল্যবৃদ্ধির প্রসঙ্গে কংগ্রেসী আমলেও যে মূল্যবৃদ্ধি হয়েছিল সেকথা বলা হচ্ছে, এবং এ-ও বলা হচ্ছে যে, ক্ষমতায় আসার পর যথেষ্ট সংগ্রহ করার সময় ছিল না, পূর্ববর্তী কংগ্রেসী মন্ত্রিসভা কোনরূপ সংগ্রহ করে নি, কেন্দ্রও অসহযোগিতা করেছে। ঘেরাও প্রসঙ্গে যুক্তফ্রন্ট এই বক্তব্য রাখছেন যে, ঘেরাও-এর ফলে একটি কারখানাও বন্ধ হয় নি, এবং যুক্তফ্রন্ট আমলে যত ছাঁটাই, লক-আউট, লে-অফ হয়েছিল, পরবর্তীকালে সেগুলি দ্বিগুণ হয়েছে।

যুক্তফ্রন্টের ধারণা গত বন্যার পর উত্তরবঙ্গে কংগ্রেস প্রভূত জনপ্রিয়তা হারিয়েছে, কেন না রাজ্যপালের প্রশাসনের ওই অবস্থায় অকর্মণ্যতার দায়িত্ব কংগ্রেসের ওপরেই বর্তেছে, কেন না রাজ্যপালের প্রশাসন যে কংগ্রেসের শাসন সে-কথা সকলেই বোঝেন। দ্বিতীয়ত, গ্রামাঞ্চলের ভোট আগে কংগ্রেসের একচেটিয়া ছিল। মূলত গ্রামবাসীরা স্থানীয় জোতদার-মহাজন ইত্যাদির ওপর নির্ভরশীল থাকায় তাদেরই কথা ও নির্দেশমত ভোট প্রদানকার্য চলত, কিন্তু বর্তমানে এই অবস্থার পরিবর্তন হয়েছে। ভূমি-শ্রমিক ও ভাগচাষীদের ওপর বামপন্থী শক্তিগুলির প্রভাব আগের চেয়ে বেড়েছে। যুক্তফ্রন্টের আমলে কিছু জমি ভূমিহীনদের মধ্যে বিতরণ করা হয়েছিল এবং গ্রামাঞ্চলে নির্বাচনী প্রচারে যুক্তফ্রন্টের তরফ থেকে বিশেষ করে বলা হচ্ছে যে, ফ্রন্ট ক্ষমতায় এলে আরও বহু লোককে কিছু কিছু জমি দেওয়া সম্ভবপর হবে। এ ছাড়া পূর্বে গ্রামাঞ্চলে কংগ্রেসের ভোট পাবার আরও একটা বড় কারণ ছিল, তা হচ্ছে বামপন্থী দলসমূহের কোন সংগঠন অধিকাংশ গ্রামেই ছিল না। যুক্তফ্রন্টের মতে এবারে গ্রাম থেকে কংগ্রেসের প্রাপ্তব্য ভোটগুলির কিছু অংশ আই-এন-ডি-এফ, লোকদল ইত্যাদি ভাগিয়ে নেবে, এক্ষেত্রে ত্রিপাক্ষিক সংগ্রামে তাঁদেরই অনুকূল অবস্থা হবে।

অবশ্য এখনো পর্যন্ত সবই ভাবনার স্তরে। এবং বিজয়লক্ষ্মী কোন্ পক্ষকে

বরমাল্য দেবেন সেটা নির্ধারিত হবে ১৯ ফেব্রুয়ারীর পর, তাই সারা ভারতেরই আজ পশ্চিমবঙ্গের ওপর নিবন্ধ।

নজরুল ভবন

একদা যাঁর কবিতা ও সঙ্গীতে গোটা বাংলা দেশ প্রাণ পেয়েছিল সেই বিদ্রোহী কবি নজরুল আজ জনমানস থেকে প্রায় নির্বাসিত, ব্যক্তিগত অবস্থায় জীবন্মৃত, এবং সরকার ও জাতির কাছে প্রায় উপেক্ষিত। কবির প্রতি বাঙালীর যদি কোন কৃতজ্ঞতা থাকে, কবির জন্য সত্যই যদি কিছু করতে হয়, তাহলে তাঁকে জনজীবনে পুনরায় ফিরিয়ে আনতে হবে, অর্থাৎ তাঁর কবিতা ও সঙ্গীতের ব্যাপক অনুশীলন করতে হবে। এই উদ্দেশ্যেই কয়েক বছর পূর্বে নজরুল একাডেমি প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল, যার উদ্দেশ্য শুধু কবির জন্মদিবসই পালন করা নয়, কবির সৃষ্টির প্রতি জনসাধারণের দৃষ্টি গভীরভাবে ও ব্যাপকভাবে আকৃষ্ট কবা, নজরুল সাহিত্য ও সঙ্গীত সম্পর্কে ব্যাপক অনুশীলন ও গবেষণার ব্যবস্থা করা, কবি রচিত অধুনালুপ্ত সঙ্গীতগুলিকে পুনরাবিষ্কার করা এবং সর্বোপরি কপিরাইট আইনের আওতা থেকে কবিকে বার করে আনার জন্য সরকারকে চাপ দেওয়া। কবি অর্থাভাবে তাঁর রচনাসমূহের গ্রন্থস্বত্ব নামমাত্র মূল্যে বাজারেব প্রকাশকদের নিকট বিক্রয় করে দিয়েছিলেন এবং তারা এর দ্বারা শতগুণ মুনাফা লুটেছে, কবি কিছুই পান নি। এই কারণেই নজরুল রচনাবলীর জাতীয়করণ দাবি করা হয়েছে, এবং সরকারী প্রচেষ্টায় তাঁর রচনাবলী প্রকাশেরও দাবি জানানো হয়েছে। নজরুল একাডেমির আরও দাবি ছিল কবির জন্য একটি 'নজরুল ভবনের' যেখানে কবি তাঁর মৃত্যু পর্যন্ত বাস করবেন এবং তারপর যা জাতীয় সম্পত্তিতে পরিণত হয়ে নজরুল-অনুশীলনের একটি সুমহান কেন্দ্রে পরিণত হবে।

গত বিশ বছরে কবির জন্য কিছুই করা হয় নি। যুক্তফ্রন্ট সরকার প্রতিষ্ঠিত হবার পর নজরুল একাডেমির পক্ষ থেকে তৎকালীন শিক্ষামন্ত্রীর নিকট যে স্মারকলিপি পেশ করা হয়, তাতে উপরি উক্ত দাবিগুলিই বিবৃত ছিল। যুক্তফ্রন্ট সরকার বিষয়টি খুব সহানুভূতি ও তৎপরতার সঙ্গেই বিচার করেন এবং তৎ দণ্ডেই কবির মাসোহারা একশো টাকা বাড়িয়ে দেন এবং প্রস্তাবিত নজরুল ভবনের জন্য জমির বন্দোবস্ত করেন, সেই জমিই সম্প্রতি রাজ্যপাল কবিকে পনের বছরের জন্য লিজ দিয়েছেন।

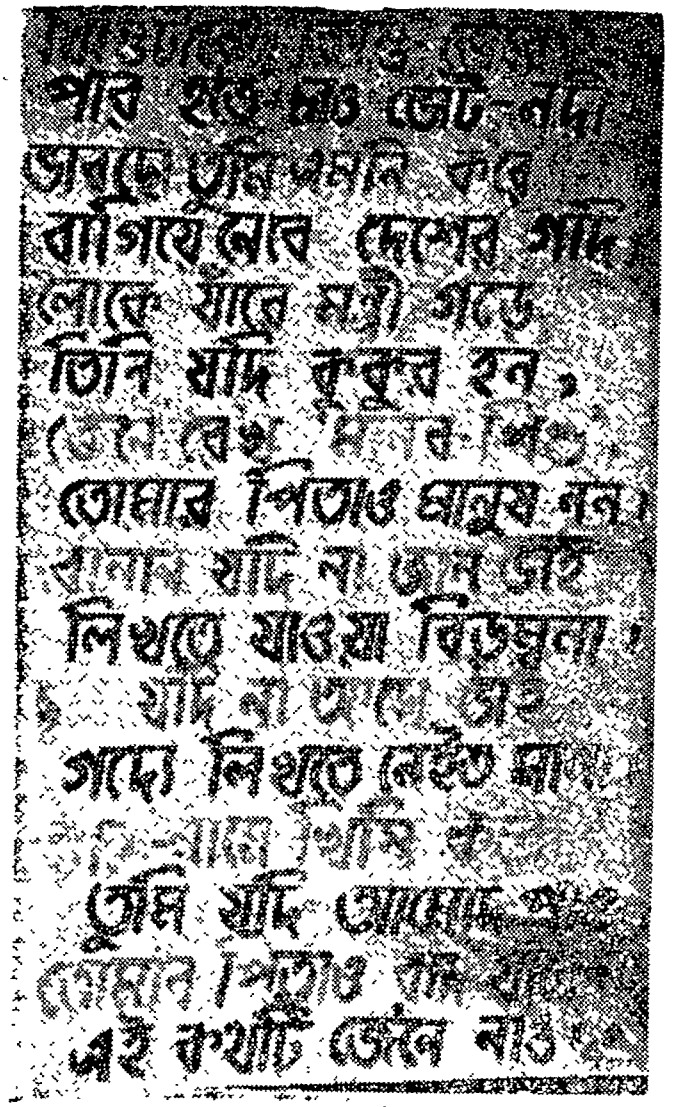

নদীয়া জেলার কালিগঞ্জ কেন্দ্রে একটি ভোট-পোস্টার

কিন্তু নেপথ্যে আরও একটি নাটক আছে, যার কিছু পরিচয় সাপ্তাহিক বসুমতীর পাঠকগণ পূর্বে পেয়েছেন, আবার তা সংক্ষেপে বিবৃত করা দরকার। কবিকে জনজীবনে ফিরিয়ে আনার জন্য যে প্রচেষ্টা, সাপ্তাহিক বসুমতীও যার শরিক, তার পাশাপাশি আরও একটি প্রচেষ্টা সমানে কাজ করে গেছে যা ঘৃণ্য ও ব্যবসায়িক। বাংলা দেশে কাজী নজরুল ইসলাম একটি স্পর্শকাতর নাম, বিশেষ করে স্মৃতিলুপ্ত কবির বর্তমান দৈন্যদশা বাঙালী মাত্রের নিকটই পীড়াদায়ক। অবশ্য কবির দৈন্যদশা থাকা উচিত নয়, কেন না কেন্দ্রীয় সরকার, রাজ্য সরকার ও পূর্বে পাকিস্তান সরকার কবিকে যা সাহায্য করেন, তার পরিমাণ সাড়ে সাতশো টাকার মত, এছাড়া বই-এর কিছু রয়ালটিও কবি পেয়ে থাকেন। একজন মানুষের মোটামুটি স্বচ্ছন্দভাবে চলার পক্ষে এই অর্থ যথেষ্ট, অথচ কবিকে যেভাবে রাখা হয় তাতে জনসাধারণের পক্ষে বিরূপ ধারণা হওয়াই স্বাভাবিক। মনে আছে সাপ্তাহিক বসুমতীর উত্তরবঙ্গ বন্যাত্রাণ কমিটির উদ্যোগে সাহায্য সংগ্রহের উদ্দেশ্যে যখন সাহিত্যিক-শিল্পী পথপরিক্রমায় বেরিয়েছিলেন, তখন কবিব বাসভবনের সামনে এলে অকস্মাৎ কবি অলিন্দে এসে দাঁড়ান এবং তাঁর জীর্ণ পরিচ্ছদ দেখে অনেকেই অশ্রু সংবরণ কবতে পারেন নি। কবির দারিদ্র্য থাকার কোন কারণ নেই, তথাপি স্মৃতিভ্রংশ কবি আজ দারিদ্র্যের শিকার এ তো প্রত্যক্ষ ব্যাপার। কবির প্রতি জনসাধারণের যে মমত্ব তাকে এক-প্রয়েট করার মতও দু'-চারটি প্রতিষ্ঠান

নজরুল একাডেমির পাশাপাশি গজিয়ে উঠেছে এবং নজরুল সঙ্গীতের জলসা ইত্যাদি মারফৎ এরা টিকিট বিক্রয় করে প্রচুর অর্থ উপার্জন করেছে, এখনো করছে। এইসব প্রতিষ্ঠানের উপদেষ্টা-মণ্ডলী ইত্যাদির মধ্যে দু'-একজন সাহিত্যিক ও বুদ্ধিজীবীর নাম আছে, কবির কোন কোন আত্মীয় ও বন্ধুর নামও আছে।

এই কারণেই আমরা পূর্বে বক্তব্য লিখেছিলাম যে, কবি নজরুল বাংলা দেশের জাতীয় সম্পদ এবং যাঁরা এইভাবে কবির প্রতি বাঙালীর মমত্বকে ব্যবসায়িক প্রয়োজনে লাগাচ্ছেন, তাঁরা কার্যত কবিকে সম্মান দেখানোর পরিবর্তে ভিক্ষুকের পর্যায়ে নামিয়ে এনেছেন। অথচ এরকমটি হবার কোন কারণ ছিল না, কেন না নিজের ভরণপোষণের উপযোগী অর্থ কবি বরাবরই পান। সেই প্রসঙ্গেই আমরা বলেছিলাম যে, যদি কবির জন্য কোন নজরুল ভবন তৈরি করা হয়, তা হোক প্রত্যক্ষ সরকারী তত্ত্বাবধানে এবং তার পরিচালনভার একটি ট্রাস্টির ওপর ন্যস্ত থাক, কবির অবর্তমানে যাঁরা ওই ভবনের দেখাশোনা করবেন, এবং যেখানে নজরুলচর্চার কেন্দ্র গড়ে উঠবে। তখনই আমরা মন্তব্য করেছিলাম যে কবি কারুর ব্যক্তিগত সম্পত্তি নন, দেশের সম্পত্তি এবং তাঁর ঘনিষ্ঠতম পরিজন বা বন্ধুর চেয়েও দেশের মানুষের দাবি তাঁর ওপর অনেক বেশি।

আমাদের সেই মন্তব্য প্রকাশিত হবার পর কেউ কেউ আমাদের ভুল বোঝেন এবং আমরা অনাবশ্যক চিন্তিত হচ্ছি এই কথা বলে শ্রদ্ধেয় বসুধা চক্রবর্তী আমাদের একটি পত্রাঘাত করেন। তার উত্তরে আমরা একটি দীর্ঘ নিবন্ধে আমাদের আশঙ্কার কথা ব্যক্ত করি যা পাঠ করে বসুধাবাবু আমাদের বক্তব্যের যথার্থতা সম্বন্ধে নিঃসংশয় হন এবং পুনরপি আমাদের একটি পত্র দিয়ে জানান যে সাপ্তাহিক বসুমতী এই ক্ষেত্রে যথার্থ ভূমিকা গ্রহণ করেছে। সেই পত্রটিও যথাকালে প্রকাশিত হয়। এতে ক্ষিপ্ত হয়ে একটি প্রতিষ্ঠান, যাদের আমরা নজরুল-ব্যবসায়ী বলে মনে করি, আমাদের নিকট একটি অশিষ্ট ও অশ্লীল চিঠি পাঠান, তা আমরা সযতনে রেখে দিয়েছি, দরকার হলে প্রকাশ করে দেখাবো। আমরা এই কারণেই আশঙ্কা করেছিলাম যে, কবিকে ভাঙিয়ে খাবার লোকের অভাব নেই, এবং এই কারণেই বক্তব্য রেখেছিলাম যে কবির জন্য যা কিছু করা হবে তা যেন করা হয় একান্তই সরকারী উদ্যোগে।

কবিকে যে দশ কাঠা জমি পনের বছরের জন্য লিজ দেওয়া হয়েছে, এটা আমরা যথার্থ মনে করি, যদিও জমিটা একেবারে কেন দান করা হয় নি তা নিয়ে কেউ কেউ ক্ষুব্ধ হয়েছেন। কবির পক্ষে জমির চিরন্তন স্বত্ব পাবার কোন অর্থই হয় না, কেন না কবি স্বাভাবিক নন এবং সে অবস্থায় কোনদিনই ফিরে আসবেন না। চিরকালীন স্বত্বে উত্তরাধিকার বর্তাবে, উত্তরাধিকারের উত্তরাধিকার বর্তাবে, সম্পত্তি একান্তই কয়েক ব্যক্তির সম্পত্তিতে পরিণত হবে, কবির স্মৃতিও কয়েক পুরুষ পরে আর থাকবে না। এই কারণেই আমরা বলছি যে, কবির মাথা গোঁজার জন্য অবিলম্বে একটি আস্তানার যেমন দরকার, তেমনি দরকার কবির স্মৃতি চিরকালীন করার জন্য প্রচেষ্টা এবং যদি নজরুল ভবন সরকারী উদ্যোগে গড়ে ওঠে, তা জনসাধারণের সম্পত্তি হয়ে চিরকাল থাকবে, কবির দেহান্তের পরেও তা কবিতীর্থরূপে অবস্থান করবে, সর্বসাধারণের জন্য, ব্যক্তিবিশেষের জন্য নয়।

যেভাবে কবিকে জমি লিজ দেওয়া হল, তা আমাদের কাছে রীতিমত আপত্তিকর ও অশোভন বলে মনে হয়েছে। খোলা আকাশের নিচে কবিকে টেনে বার করার কোনই প্রয়োজন ছিল না, বিশেষ করে কবি যখন মোটেই সুস্থ নন, এবং বিশেষ করে যখন তিনি জনারণ্যে অত্যন্ত শারীরিক কষ্টবোধ করেন। আমাদের মনে আছে যে গতবারে কবির জন্মদিনে ক্যামেরার ফ্ল্যাশে কবি অসুস্থ হয়ে অজ্ঞান হয়ে পড়েছিলেন। দ্বিতীয়ত, এমন একটি অনুষ্ঠানে যাঁরা সত্যই আনন্দিত হতেন তাঁদের অনেককেই আহ্বান করা হয় নি, অশোভন দ্রুততার সঙ্গে বিষয়টিকে সম্পন্ন করা হয়েছে এবং কবির যাঁরা সত্যই আপনজন, যেমন পবিত্র গঙ্গোপাধ্যায়, মুজাফ্‌ফর আহমদ প্রমুখের নাম নিমন্ত্রিতদের তালিকা থেকে সযত্নে পরিহার করা হয়েছে এবং এই জন্যই ব্যাপারটা আমাদের কাছে উদ্দেশ্যমূলক বলে মনে হয়েছে। কবির অন্তরঙ্গ সুহৃদ মুজাফ্‌ফর আহমদকে, যিনি আজও অসুস্থ শরীরে বারবার কবিকে দেখতে যান, তাঁর মত মানুষকে যখন এই রকম অনুষ্ঠান থেকে বাদ দেওয়া হয়, তখন মনের কোণে নানারকম সন্দেহ জাগাই স্বাভাবিক। সে যাই হোক, আমরা আশা করব নজরুল ভবন অচিরেই যেন গড়ে ওঠে, এবং সেখানে শুধু কবির অবশিষ্ট দিনগুলি কাটা ছাড়াও তাঁর স্মৃতিরক্ষার পাকাপাকি ব্যবস্থা থাকে।

(১।২।৬৯)

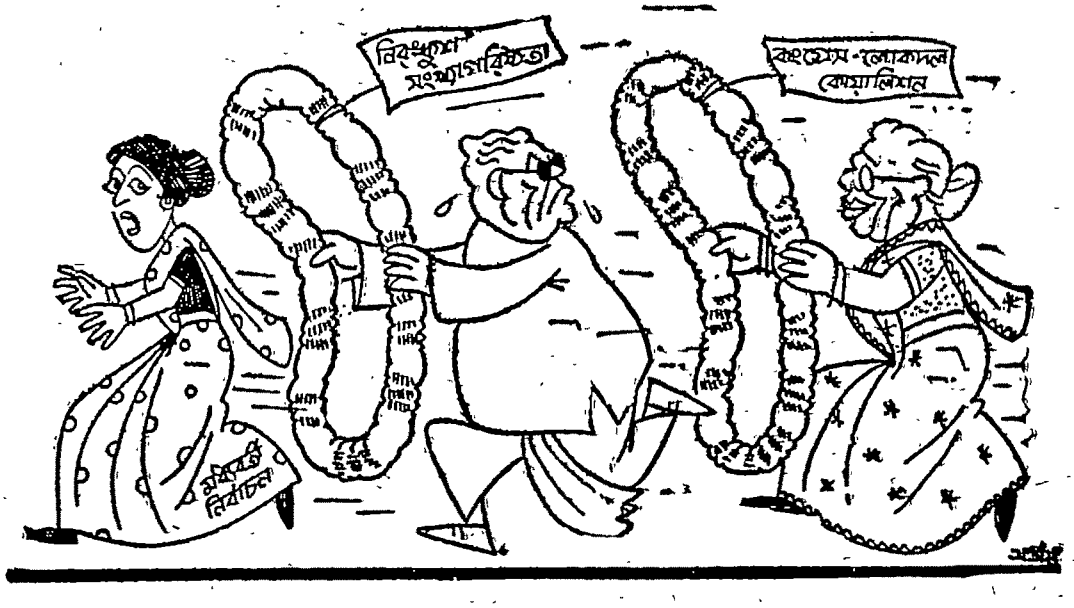

ভারত দর্শন

এশীয় শ্রমমন্ত্রী সম্মেলন

এশীয় শ্রমমন্ত্রী সম্মেলনে শ্রীহাতির মোদ্দা বাণী হল, শ্রমিকের আত্মরক্ষার সব ক'টি অধিকার কেড়ে নিতে না পারলে তাঁরা দেশের উৎপাদন বৃদ্ধিতে সক্ষম হতে পারছেন না। শ্রমমন্ত্রী সাহেব শ্রমিকদের হয়ত উৎপাদনের উপাদান হিসেবেই গণ্য করেন না। করলে শ্রমিক সম্প্রদায়কে নিঃসম্বল করে উৎপাদন বাড়াবার অদ্ভুত পরিকল্পনা পেশ করে বসতেন না। উৎপাদনের উপাদানই দুর্বল হলে উৎপাদন যে বাড়ে না, মালিক-স্বার্থ পরিপোষক চিন্তাধারা ওই সত্য হৃদয়ঙ্গমে অক্ষম।

শ্রীহাতির বাণী সুস্পষ্টভাবে বলতে চেয়েছে, এশীয় মহাদেশের সরকারসমূহকে উৎপাদন বাড়াতে হলে কয়েকটি সিধে কাজ করতে হবে। যেমন ঃ

রাষ্ট্র একটা ছক বেঁধে দেবে যার আওতায় ট্রেড য়ুনিয়নগুলি কাজ করবে। এই ছক বাঁধার ব্যাপারে তিনি প্রশ্ন তুলেছেন, শ্রমিকের ধর্মঘটে যোগদানের অধিকার সম্পর্কে। বলছেন, ট্রেড য়ুনিয়ন আন্দোলনের মুক্তি বলতে যা বোঝায় অতঃপর তা সুনিয়ন্ত্রিত হওয়া দরকার। উপরাষ্ট্রপতি ভি ভি গিরিও বলেছেন, একটি সংস্থায় বিভিন্ন ট্রেড য়ুনিয়নের অধিকার খর্বিত হওয়া উচিত এবং একটিই মাত্র য়ুনিয়ন স্বীকৃত হওয়া দরকার শ্রমিক কল্যাণের জন্যই। তাঁর কথা অবশ্য বোঝা যায়, কারণ তাঁর উদ্দেশ্য সাধু। তিনি ট্রেড য়ুনিয়ন আন্দোলনের সম্প্রসারণ তো চান-ই, ক্ষেতমজুরদের মধ্যেও ট্রেড য়ুনিয়ন গড়ে ওঠা উচিত বলে মনে করেন। কিন্তু হাতি সাহেব হাত বাড়িয়েছেন শুধু ট্রেড য়ুনিয়ন অধিকার খর্ব করার জন্যই। তাঁর বক্তব্য, ট্রেড য়ুনিয়নসমূহে বাইরের লোক ঢুকে পড়ে খুবই গণ্ডগোল সৃষ্টি করেন। এঁদের প্রবেশ বন্ধ করতে হবে। বিভিন্ন ট্রেড য়ুনিয়নের স্বীকৃতি দানও চলবে না। খুব ভালো কথা। বস্তুতই বহিরাগতদের হস্তক্ষেপে ট্রেড য়ুনিয়নকে নির্ভর করে কিছু সুযোগ-সন্ধানী পেশাদার ট্রেড য়ুনিয়ন লীডার বা নেতা শ্রমিকের ঘাড়ে চেপে বাড়ি গাড়ি করে খান। সত্য কথা। এবং তাঁদের এই 'বানরের পিঠে ভাগে'র চতুরালি যে বন্ধ হওয়া বিশেষ দরকার তাতে আপত্তির কারণ দেখি না। কিন্তু তার সঙ্গে হাতিজী-ভাবিত ধর্মঘটের অধিকার কেড়ে নেওয়া এবং মুনাফাশিকারীদের রাক্ষুসে গ্রাস থেকে দরিদ্র শ্রমিকদের রক্ষার, যদি কোনো ব্যবস্থা কোথাও থেকে থাকে (ভারতে নেই নিশ্চয়) তা প্রত্যাহার করার কী যুক্তি থাকতে পারে বুঝলাম না। হাতি সাহেব কিন্তু ঐ দুটি কালা-দাবিই সরাসরি উপস্থাপিত করেছেন। সংবাদপত্রের বিবরণ এইরকম ঃ

He even suggested that workers did not require protection against exploitation by employers alone and that outside political influences also acted as vested interests.

শ্রমিক-মালিক সম্পর্ক এক জিনিস আর বহিরাগত রাজনৈতিক সুবিধাবাদ আর এক জিনিস। এই দুটি বিষয় একই ভাবে পরিপাক করার মধ্যে শ্রীহাতির শ্রমিকদরদের বিশেষ পরিচয় পাওয়া গেল না।

ধর্মঘটের অধিকার কেন স্বীকার করতে জনদরদী সরকারের গণদরদী শ্রমমন্ত্রীর বাধছে এ প্রসঙ্গে শ্রীহাতির বক্তব্য হল ঃ সমাজের শান্তি এর দ্বারা বিঘ্নিত হতে পারে!

শ্রীহাতিদের সমাজ কোনটা, শ্রমহীন আরামের সমাজ? তা যদি হয় তবে অবশ্যই ধর্মঘটের ফলে তাঁদের শান্তি বিঘ্নিত হওয়াই স্বাভাবিক। দুর্ভিক্ষপীড়িতের গলায় ক্ষুধার অন্নাভিক্ষা শুনলেও 'কেকভোগী' সমাজের কপাল কুঞ্চিত হয়ে ওঠে। কিন্তু এই কেকভোগী সমাজ যেহেতু দেশের অগণিত জনসাধারণের একটি অতি সামান্য মুষ্টিমেয় অংশ, সুতরাং তাঁদের আরামকেদারার শান্তি নিয়ে গণদরদী জনসেবক মন্ত্রীদের কি দুশ্চিন্তা করা সাজে।

শ্রীহাতির মজুরী সম্বন্ধেও নির্দিষ্ট পলিসি আছে। তিনি বলেছেন ঃ অধিকতর মজুরী ও প্রয়োজনভিত্তিক মজুরী যদি সমাজের বিশেষ শ্রেণী দাবি করে বসে তবে তা দেওয়া যায় না।

বলা বাহুল্য, এ ক্ষেত্রেও হাতি সাহেব নতুন কিছু বলেন নি। এ হল আমাদের অন্যতম শক্ত মানুষ মোরারজী ভাইসাহেবের প্রিয় শব্দাবলী।

সমাজের এক শ্রেণী বলতে আবারও একই ভুল। দাবিটা সমাজের সেই শোষিত মেজরিটির, সুতরাং এ দাবির মোকাবিলা সমাজ সংসার দেখে করা যাবে না।

সমাজে যাঁরা হস্তীবিশেষ, যাঁদের পরিপোষণই হস্তীপোষণেরই নামান্তর, সরকার তাঁদের জন্য যতই বিনিদ্র চিন্তায় কাতর হন, সহস্র সহস্র নিপীড়িত সাধারণ তাঁদের ক্ষুধার অন্ন চাইবেনই এবং সরকারকে তার ব্যবস্থাও করতে হবে।

মনে রাখতে হবে। সেই মুষ্টিমেয় শোষণকারী সমাজও দিয়ে-থুয়েই বেঁচে থাকতে পারেন। বিলকুল শোষণ চালিয়ে নয়। আখের সমস্ত রস নিঙড়ে নিলে অতঃপর কি হবে? স্বর্ণডিম্ব প্রসবিনীকে জীইয়ে রাখলেই না তথাকথিত উৎপাদন ও ব্যবসা এবং সমাজোন্নয়ন।

সিধে কথা সিধে করে বোঝাই ভাল। আজকের শোষণবাদী মার্কিন সমাজও এই কথাটা উপলব্ধি করেন। ওয়েলফেয়ার স্টেট বা কল্যাণব্রতী সরকারের ছাড়টুকুও ঐ শোষণবাদী সমাজেরই সৃষ্টি। কল্যাণব্রতী সরকারের লক্ষ্য হল জীইয়ে রেখে দুইয়ে নেওয়া। শ্রীহাতির এ্যাপ্রোচটা একেবারেই এক কোপে কাটার। মনে হয়, অধিকতর পরিপক্ক মাথা এমন প্রস্তাবে সায় দেবেন না।

কিন্তু সংশ্লিষ্ট সরকারগুলি তাৎক্ষণিকভাবে আপন আপন শ্রমিক কর্মচারীদের অধিকার হরণে কে কতদূর ব্যস্ততা দেখাবেন বলা না গেলেও দেখা যাচ্ছে, ভারত সরকার চৌকাঠের বাইরে সুসজ্জিত অবস্থায় অপেক্ষাতুর ছিলেন মাত্র। সম্মেলনের শেষে জানা গেল, ভারত সরকার আর তিলমাত্র দেরি করতে নারাজ। আগামী বাজেট অধিবেশনেই কেন্দ্রীয় কর্মচারীদের ধর্মঘট নিষিদ্ধ করে একটি বিল আনা হবে।

ট্রেড য়ুনিয়ন ও শিল্প-সম্পর্কিত ঘোষণায় বলা হয়েছে, অত্যাবশ্যকীয় শিল্প সংস্থায় সরকার কর্মী ধর্মঘট নিষিদ্ধ করতে বা ধর্মঘটের অধিকারের ওপর বাধানিষেধ আরোপ করতে পারবেন।

বলা বাহুল্য ইতিপূর্বেও এ বিষয়ে তীব্র প্রতিবাদ দেখা দিয়েছিল এই কারণে যে, অত্যাবশ্যকীয় শব্দটির আড়ালে সরকার যে কোন সংস্থায় শ্রমিকদের দরকষাকষির অধিকার হরণ করতে অগ্রসর হতে পারেন। এবং যে ক্ষেত্রে শ্রমিকদের অধিকার হরণের প্রতিই আগ্রহ সবিশেষ লক্ষিত হয়, সে ক্ষেত্রে যে শ্রমিক দমনের জন্য সামান্যতম ছুতোনাতাও গ্রহণ করা হবে তাতে সন্দেহের অবকাশ থাকে না। সাধারণের স্বার্থ বলতে শ্রমিক কর্মচারীদের স্বার্থ যে বাদ পড়তে পারে না, মালিকী-স্বার্থ একথা কখনো স্বীকার করবেন না, এও এক বাস্তব অবস্থা যা বিবেচনা করতে হবে।

শ্রমমন্ত্রী সম্মেলনে শ্রমিক অধিকার হরণ সম্মেলনে পর্যবসিত হয়েছে এবং ভারতের মাটিতে এই অপূর্ব সম্মেলনটি যথাসম্ভব মদত পেয়েছে।

তবে এই সম্মেলনের দুটি গুরুত্বপূর্ণ অভিনন্দনযোগ্য ঘোষণা আছে। এক, কৃষিক্ষেত্রে নিযুক্ত শ্রমিকসহ সর্বশ্রেণীর শ্রমিকদের মধ্যে ট্রেড য়ুনিয়ন আন্দোলন প্রসারের যৌক্তিকতা স্বীকার এবং দুই, দ্বিপাক্ষিক চুক্তি রেজিস্ট্রি করে চুক্তি মানতে অনিচ্ছুক পক্ষকে বাধ্য করানোর ব্যবস্থা করা।

অবশ্য শ্রমিক-মালিক বিরোধে এবং সরকার যেখানে নিয়োগকারী প্রতিষ্ঠান, সেখানেও, সমগ্র ব্যাপারটি নিয়োগকারীর খুশির ওপরই নির্ভরশীল হয়ে পড়ে শেষ পর্যন্ত। তখন শ্রমিক-কর্মচারীদের পক্ষে আন্দোলন ছাড়া উপায় থাকে না। অথচ মালিক ও নিয়োগকারী পক্ষ চুক্তি মেনে চললে বহু ক্ষেত্রেই বিক্ষোভ আন্দোলনকে আইন না করেই এড়ানো যায়। কিন্তু তা হবার নয়। তবে যত যাই হোক, ভোটাধিক্যে আইন পাশ করিয়ে নেওয়ার ক্ষমতা যাঁদের হাতে তাঁরা যে পক্ষের পরিপোষণা করেন সেই পক্ষের স্বার্থের অনুকূলে আইন অবশ্যই পাশ করিয়ে নিতে পারেন, কিন্তু কেবলমাত্র আইনই মানুষের প্রয়োজন নিয়ন্ত্রণ করে না, প্রয়োজনই সৃষ্টি করে সত্যকার সমাজহিতৈষী আইনের।

সরকারের আইন যদি সত্যিই জনহিতকর হয় তবে বিক্ষোভ আন্দোলনের অবসান হবে। অন্যথা, 'বাঁধন যত শক্ত হবে তত বাঁধন টুটবে'। (২।২।৬৯)

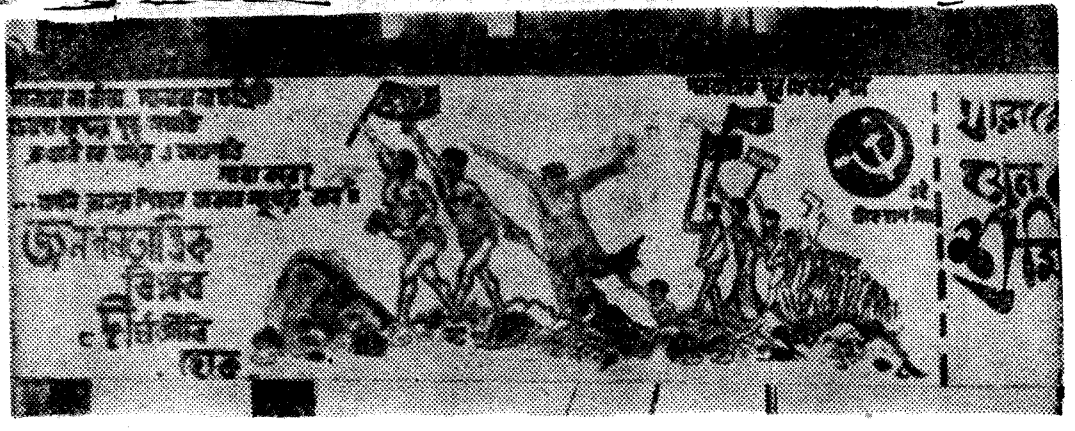

নির্বাচনী প্রচার শেষ রাউণ্ডে জোর জমে উঠেছে

ফ্রান্স ঃ

ভিয়েৎনাম প্রসঙ্গে প্যারিস শান্তি আলোচনা কি গোড়াতেই খোঁড়া হলো? যাও-বা আলোচনার টেবিলের আকৃতি নিয়ে সংশ্লিষ্ট চারটি পক্ষ শেষ পর্যন্ত সমঝোতায় এসেছিলেন, তাতেও দেখা যাচ্ছে আসল সমস্যা সামনে রয়েই গিয়েছে। অবশ্য সমস্যাটা জটিল, কাজেই রাতারাতি এর সমাধান আশা করা বাতুলতা। তবে ইতিমধ্যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে মিঃ নিক্সন নতুন প্রেসিডেন্টের কর্মভার নিয়েছেন। তাই মার্কিন পক্ষের কাছ থেকে শান্তি স্থাপনের বিষয়ে নতুন উদ্যম আশা করা অন্যায় হবে না।

হোয়াইট হাউসে অনুষ্ঠিত তাঁর প্রথম সাংবাদিক সম্মেলনে প্রেসিডেন্ট নিক্সন বলেওছেন যে, ভিয়েৎনামে শান্তি প্রতিষ্ঠাকল্পে তিনি 'নতুন কৌশল' গ্রহণ করবেন। মিঃ নিক্সন অবশ্য একথাও বলেছেন যে, সম্মেলনে একটা বোঝাপড়ায় আসতে ছ'মাসও লাগতে পারে, আবার তিন বছরও লাগতে পারে। তবে এবার দেশে নতুন সরকার প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, শান্তি সম্মেলনেও নতুন দল গিয়েছেন আলোচনায় অংশ গ্রহণের জন্য। তাঁদের নতুন নির্দেশও দেওয়া হয়েছে, নয়া কায়দায় আলোচনা চালাবার নয়া ফতোয়া। মিঃ নিক্সন বলেছেন ধোপার লিস্টের মতো একগাদা বিষয় নিয়ে আলোচনা করার কোনো প্রয়োজন নেই, নির্দিষ্ট কয়েকটি বিষয়ই আলোচ্যসূচীর অন্তর্ভুক্ত হতে পারে।

কিন্তু সে-নির্দিষ্ট বিষয়টি কি? মার্কিন পক্ষের নতুন ভারপ্রাপ্ত নেতা হেনরি ক্যাবট লজ সম্মেলনে বলেছেন যে, দক্ষিণ ভিয়েৎনাম থেকে সমস্ত বিদেশী সৈন্যকে সরিয়ে নেওয়াই হলো ভিয়েৎনাম শান্তির চাবিকাঠি। আর সৈন্য প্রত্যাহার করতে হলে আগে চাই উত্তর ও দক্ষিণ ভিয়েৎনামের মধ্যবর্তী এলাকাকে যুদ্ধমুক্ত অঞ্চলে পরিণত করা।

নিক্সন

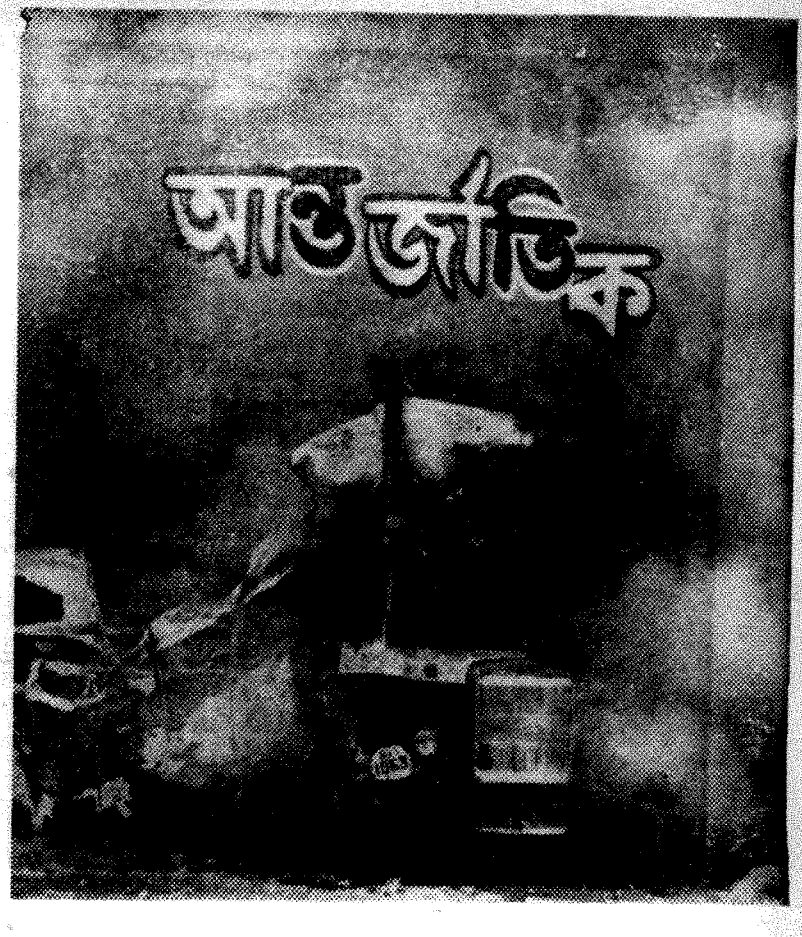

আয়ুব-বিরোধী বিক্ষোভের জের

কিন্তু ভিয়েৎনাম সমস্যার এই সামরিক সমাধানপ্রস্তাব জাতীয় মুক্তি-ফৌজের প্রতিনিধি মেনে নিতে পারেন নি। হ্যানয়ও এই মার্কিন প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেছে। সংক্ষেপে এঁদের বক্তব্য হলো ঃ সামরিক কায়দার নয়, ভিয়েৎনাম সমস্যার রাজনৈতিক সমাধান দরকার। তাঁদের মতে উত্তর ও দক্ষিণ ভিয়েৎনামের মধ্যে বাহিনীমুক্ত এলাকা গঠনের উদ্দেশ্য লোকের মনে এ-ভ্রান্ত ধারণারই উৎপাদন করা যেন যুদ্ধটা উত্তর ও দক্ষিণ ভিয়েৎনামের মধ্যে চলছে। আসলে যুদ্ধের দুই প্রধান দল হচ্ছে একদিকে মার্কিন সাহায্যপুষ্ট দক্ষিণ ভিয়েৎনাম সরকার, আমেরিকা ও তার মিত্র রাষ্ট্র এবং অন্যদিকে ভিয়েৎ কংদের মধ্যে। হ্যানয়ের প্রতিনিধি একথাও স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন যে, বাহিনীমুক্ত অঞ্চল গঠনের মার্কিন প্রস্তাব ইতিপূর্বে তাঁরা বহুবার অবাস্তব বলে প্রত্যাখ্যান করেছেন।

জাতীয় মুক্তি-ফৌজের প্রস্তাব হলো ভিয়েৎনামে শান্তি স্থাপনের জন্য প্রাথমিক প্রয়োজন হচ্ছে এখানে একটা শান্তি ক্যাবিনেট গঠন করা, যে-সরকারে মুক্তি-ফৌজের প্রতিনিধিরাও থাকবেন এবং এই মন্ত্রিসভাই এখানে নতুন নির্বাচনের ব্যবস্থা করবেন। ইতিমধ্যে ভিয়েৎ কংরা নতুন চান্দ্র বৎসর উপলক্ষে একতরফাভাবে ৭ দিনের যুদ্ধবিরতি ঘোষণা করেছেন। তা নয় হলো, কিন্তু শান্তি আলোচনায় যদি বাস্তব কৌশল অবলম্বিত না হয়, তবে নয়া কৌশলে কি লক্ষ্যে পৌঁছুনো সম্ভব হবে?

পাকিস্তান ঃ

উগ্রচণ্ড আয়ুবের সুর নরম হয়েছে। ১লা ফেব্রুয়ারী তিনি জাতির উদ্দেশে যে মাস-পয়লা বেতার ভাষণ দিয়েছেন তাতে তিনি দায়িত্বশীল বিরোধী দলগুলির সঙ্গে আলোচনায় বসতে রাজী হয়েছেন। প্রেসিডেন্ট আয়ুব দার্শনিকের মতো আবিষ্কার করেছেন যে, সংবিধান কিছু আল্লাহ্‌র বাণী নয় যে তাকে পরিবর্তন করা যাবে না। মনুষ্যরচিত সংবিধানের ভুলত্রুটি থাকতেই পারে, সেগুলির সংশোধন করে সংবিধানের উন্নতি সম্ভব।

প্রেসিডেন্ট আয়ুব তাঁর বারো মিনিটের বেতার ভাষণে আরো বলেছেন যে, দেশের সার্বভৌমত্ব ক্ষুণ্ন না করে এবং দেশের জনসাধারণের স্বার্থে যে কোন ভালো পরামর্শ গ্রহণ করতে তিনি প্রস্তুত রয়েছেন।

আয়ুবের বিরুদ্ধে জনতার রুদ্ররোষ ফেটে পড়েছে ঢাকায়—সেক্রেটারিয়েট ভবনের ওপর পড়ছে ক্রুদ্ধ জনতার ইট-পাটকেল। পরে এই ভবনটিতে আগুনও লাগিয়ে দেওয়া হয়।

গত ১০ দিন ধরে পাকিস্তানের উভয় অংশে যে প্রচণ্ড গণ-আন্দোলনের ঢেউ উঠেছে এতদিন আয়ুবশাহী তা কঠোর হস্তে দমন করার জন্যে নানান রকমের অস্ত্রই প্রয়োগ করেছেন। যেহেতু বিরোধী রাজনৈতিক দল ছাড়াও দেশের সকল স্তরের মানুষই আয়ুব-বিরোধী আন্দোলনে এই প্রথমবারের মত সামিল হয়েছে, সেহেতু আয়ুব খাঁকেও প্রমাদ গুণতে হয়েছে। গত ১০ দিনে পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানে পুলিশের গুলীতে বা হাঙ্গামায় এ-পর্যন্ত ৩১ জন প্রাণ হারিয়েছে, পাঁচটি শহরে সেনাবাহিনীকে তলব করা হয়েছে। এ সমস্ত শহরে ১৪৪ ধারা এবং সান্ধ্য আইনও জারী করা হয়েছিল।

পূর্ব পাকিস্তানের ঢাকা, নারায়ণগঞ্জ, চট্টগ্রাম, বরিশাল ইত্যাদি জেলার শহরে-শহরে যে ধরণের ঐক্যবদ্ধ আয়ুব-বিরোধী আন্দোলন দেখা গিয়েছে তা প্রায় অভূতপূর্ব। পুলিশ পূর্ব পাকিস্তানের ৮২ বছরের বৃদ্ধ জননেতা মৌলানা ভাসানী সমেত সহস্রাধিক লোককে গ্রেপ্তার করেছে। জাতীয় পরিষদের অধিবেশনে পাকিস্তানের সাম্প্রতিক ঘটনাবলী নিয়ে যখন আলোচনা হয়, তখন বিরোধীপক্ষের নেতা নুরুল আমিন দেশের গুরুতর পরিস্থিতির জন্যে কঠোর ভাষায় সরকারের নিন্দা করেন। তিনি বলেন, বর্তমান হাঙ্গামা এবং অসন্তোষের জন্যে সরকারই দায়ী। দেশের লোক যদি হিংসার আশ্রয় গ্রহণ করে থাকে তো তার দায়িত্ব সরকারেরই। কারণ সরকার জনগণের ন্যায্য দাবি-দাওয়া অস্বীকার করেছেন। হতাশা থেকেই বিক্ষোভের জন্ম।

জননেতা নুরুল আমিন আরো বলেছেন যে, পাকিস্তানের জনসাধারণ চায় বয়স্কের ভোটাধিকার, অবাধ রাজনৈতিক কার্যকলাপের সুযোগ, সংবাদপত্রের স্বাধীনতা, সমস্ত রাজনৈতিক বন্দীর মুক্তি, জরুরী অবস্থার অবসান ঘোষণা এবং পাকিস্তান রক্ষা আইনের প্রত্যাহার।

নুরুল আমিন এই বলে সরকারকে সাবধান করে দিয়েছেন যে, আয়ুবশাহীর প্রতি পাকিস্তানের জনসাধারণের সমস্ত শ্রদ্ধা লোপ পেয়েছে। আয়ুবশাহীর অবসান ঘটানোর জন্যে পাকিস্তানের শ্রমিক, বুদ্ধিজীবী, কৃষক, ছাত্র সকলেই এককাট্টা হয়েছেন এবং লক্ষ্যে না পৌঁছুনো পর্যন্ত গণ-আন্দোলন চলতেই থাকবে।

এ-চ্যালেঞ্জের সামনে নতি স্বীকার না করে আয়ুব খাঁর উপায়ান্তর কী ছিল? তাই তিনি স্বীকৃত হয়েছেন সমস্ত বিষয় বিরোধী দলনেতাদের সঙ্গে গোলটেবিল বৈঠকে বসে আলোচনা করতে, মীমাংসায় পৌঁছুতে। পাকিস্তানের ৮টি বিরোধী দল একত্র হয়ে যে গণতান্ত্রিক সংগ্রাম পরিষদ গঠিত হয়েছে, মনে হয় ঢাকা বা রাওয়ালপিণ্ডিতে এ-মাসেই তার প্রতিনিধিরা প্রেসিডেন্ট আয়ুবের সঙ্গে মিলিত হবেন। এ পর্যন্ত যেটুকু খবর পাওয়া গিয়েছে তাতে অনুমিত হচ্ছে যে, গণতান্ত্রিক সংগ্রাম পরিষদ প্রধানত ৮টি মূল দাবিই পাক প্রেসিডেন্টের কাছে পেশ করবেন যার মধ্যে থাকবে ফেডারেল পার্লামেন্টারী সরকার গঠন, বয়স্ক ভোটাধিকারের ভিত্তিতে প্রত্যক্ষ নির্বাচন ইত্যাদি।

প্রেসিডেন্ট আয়ুব তাঁর ভাষণে অবশ্য পাকিস্তানের সাম্প্রতিক অশান্তির জন্যে যথারীতি বামপন্থী দলগুলির নিন্দা করেছেন। তাঁর সঙ্গে আলোচনার আগে পাকিস্তানের স্থায়ী সরকার বজায় রাখার কথাও তিনি বিরোধীপক্ষকে স্মরণে রাখতে বলেছেন।

স্পষ্টত বিরোধীপক্ষ প্রেসিডেন্টের বিরুদ্ধে তাঁদের গণতান্ত্রিক লড়াইয়ের প্রথম রাউণ্ডে জয়লাভ করেছেন। দেখা যাক এবার, গোলটেবিল বৈঠক কী ফল উৎপাদন করে। (২-২-৬৯)

আগামী মধ্যবর্তী নির্বাচনে কে কোন পক্ষে

কুমুদ দাশগুপ্ত

মধ্যবর্তী নির্বাচনের আর মাত্র দিন তিনেক বাকী। সব পক্ষই প্রচারপর্ব শেষ করে এখন নির্বাচনী সংগঠনকে পাকাপোক্ত করে তুলছেন। ভোটদাতাদেরও মানসিক প্রস্তুতি প্রায় শেষ। অল্প কিছু-সংখ্যক ফ্লোটিং ভোটার ছাড়া বাকী সকলেই মনস্থির করে ফেলেছেন। প্রধান দুই প্রতিপক্ষ কংগ্রেস ও যুক্তফ্রন্টের নেতৃবৃন্দ-ও বলছেন ভোটারগণ পক্ষ বেছে নিয়েছেন।

প্রশ্নটা হোল কে কোন্ পক্ষ বেছে নিয়েছেন? কংগ্রেস নেতা শ্রীঅতুল্য ঘোষ বলছেন, ভোটারদের মধ্যে 'পোলারাইজেসন' হয়ে গেছে। কোন কোন যুক্তফ্রন্ট নেতাও তাই বলছেন। সত্যি কি তাই? আর তাহলে কোন্ সীমান্তে কারা আছেন?

উভয়পক্ষই দাবি করেন তাঁরা জনগণের প্রতিনিধি। কংগ্রেস সর্বস্তরের জনসাধারণের প্রতিনিধি বলে নিজেদের দাবি করে থাকেন। তাহলে পোলারাইজেসন অর্থে তাঁরা কি বলতে চান যে, যুক্তফ্রন্টের পক্ষে কোন লোক নেই। না তাঁদের মতে যুক্তফ্রন্ট বিশৃংখলা, দেশদ্রোহিতা, অরাজকতার প্রতীক। তাই যুক্তফ্রন্টের পক্ষে যাঁরা মনস্থির করে ফেলেছেন তাঁরাও তাহলে স্বাভাবিকভাবেই ঐ সমস্ত দোষে দুষ্ট হয়। কংগ্রেস নেতৃবৃন্দ কিন্তু পুরোপুরি এ কথা বলছেন না।

অপরদিকে যুক্তফ্রন্টের নেতৃবৃন্দ বলে থাকেন যে, তাঁরা মেহনতী মানুষের প্রতিনিধি, শ্রমিক, কৃষক, নিম্নবিত্ত মানুষেরা তাঁদের পক্ষে। তাহলে কি বলতে হবে কংগ্রেসকে যাঁরা ভোট দেবেন তাঁরা সকলেই ধনিক শ্রেণীর বা ধনিক শ্রেণীর দালালদের সমর্থক। যুক্তফ্রন্টের নেতৃবৃন্দ কিন্তু তাও পুরোপুরি বলতে পারেন না। তাহলে পোলারাইজেসন অভিমুখী।

আজো পশ্চিম বাংলার সমস্ত মানুষ শ্রেণীভিত্তিক সংগঠনের মধ্যে যুক্ত নয়। তবে শ্রেণী-সংঘর্ষ পূর্বাপেক্ষা বাড়ছে বলে দেশের রাজনীতির গতি নিঃসন্দেহে পোলারইজেসন অভিমুখী।

কিন্তু এ সব সত্ত্বেও ভোটারদের মনস্থির করার ব্যাপারে এখনো অন্যান্য বহু বিষয়ের প্রভাবকে অতিক্রম করা সম্ভব হয় নি। সম্প্রদায়, জাতি, বর্ণ এখনো অনেক ক্ষেত্রেই প্রভাব বিস্তার করে। তারপর বিভিন্ন এলাকার বিশেষ বিশেষ সমস্যা, অনেক ক্ষেত্রে ব্যক্তিগত প্রার্থীর গুণাগুণও ভোটারদের প্রভাবিত করে থাকে —সেই প্রভাব অতিক্রম করা কোন রাজনৈতিক দলের পক্ষেই এখনো সম্ভবপর হয় নি।

সাধারণভাবে যুক্তফ্রন্টের ন'মাসের শাসনকালকে ব্যর্থতার ইতিহাস বলে ধরা হয়ে থাকে। কিন্তু যুক্তফ্রন্টের শাসনকালের খুব গৌরবদীপ্ত ইতিহাস না থাকলেও তাঁদের শাসনকালের সমর্থকের সংখ্যা যে নেই তা বললে অত্যুক্তি করা হবে। যুক্তফ্রন্টের অন্তর্ভুক্ত বিভিন্ন বামপন্থী দলের গোঁড়া সমর্থকদের কথা বাদ দিলেও বিভিন্ন শ্রেণীর মানুষের মধ্যেও যুক্তফ্রন্টের শাসনের সমর্থনও পাওয়া যায়। সাধারণ সরকারী ও বেসরকারী কর্মচারীদের মধ্যে স্বাভাবিক কারণেই ফ্রন্টের পক্ষে সমর্থন বেশি।

এই বিষয়ে কোন সংবাদপত্রেই কোন কথা বলা হয় নি বলে কয়েকটি উদাহরণ দেওয়া যেতে পারে। সুদূর উত্তর বাংলার কোন একটি গঞ্জের একজন বর্ষিষ্ণু দোকানদারের সঙ্গে কথা হচ্ছিল। অনেক কথাবার্তার পর তিনি বললেন, যুক্তফ্রন্টের সরকারের অনেক দোষ ছিল। কিন্তু তাঁদের শাসনকালে পুলিশের কাছ থেকে হয়রান হতে হয় নি। তাঁর নিজের অভিজ্ঞতা বর্ণনা করে তিনি বললেন যে, ঐ ন'মাস ছাড়া তাঁর ব্যবসায়ী জীবনের প্রত্যেক মাসে পুলিশকে একটা বরাদ্দ মাসোহারা দিতে হোত। এটা যেন একটা অলিখিত নিয়মে পরিণতি হয়েছিল। যুক্তফ্রন্টের নয় মাস শাসনকালে পুলিস সে টাকা নিতে আসে নি। এই একটি কারণেই তিনি যুক্তফ্রন্টের পক্ষে।

আর একজন সাংবাদিক বন্ধুর অভিজ্ঞতার কথা বলছি। জনৈক বিত্তবান ব্যক্তির সঙ্গে তাঁর আলাপ হচ্ছিল। ঐ ভদ্রলোকের জমিদারী সরকারী আইনে উচ্ছেদ হয়েছে। প্রায় লক্ষাধিক টাকা তাঁর ক্ষতিপূরণ প্রাপ্য। তিনি বললেন, গত দশ বছরে তিনি ক্ষতিপূরণের টাকা পান নি। বরং এই সময়কাল ধরে তার পিছনে একজন দালাল লেগেছিল। সে আশ্বাস দেয় যে দশ হাজার টাকা প্রণামী দিতে পারলেই ক্ষতিপূরণের সব টাকা আদায় হয়ে যাবে। তিনি ঐ টাকা দেন নি—ফলে লেখালেখি করেও কিছু আদায় করতে পারেন নি। তারপর ভদ্রলোক বললেন, অথচ যে হরেকৃষ্ণ কোঙারকে সকলে কট্টর কম্যুনিস্ট বলে থাকেন তাঁর আমলে অন্তত একটা নিয়ম চালু করা হয়। সেই নিয়মানুসারে তিনি ক্ষতিপূরণের কিস্তির টাকা পেয়েছেন। এজন্য কাকেও কোন প্রণামী দিতে হয় নি। শেষ মন্তব্য করে তিনি জানান—আমার তো ফ্রন্টের বিপক্ষেই যাওয়ার কথা। কিন্তু এই একটি কারণেই ফ্রন্টকে ভোট দেব।

কয়েকদিন আগে একজন খ্যাতিমান ডাক্তারের সঙ্গে কথা হচ্ছিল। তিনি ফ্রন্টের ঘেরাও প্রভৃতির বিরুদ্ধে অনেক কথা বলে শেষে জানালেন, যাই বলুন ফ্রন্টের আমলে স্বাস্থ্যমন্ত্রী হিসেবে ননী ভট্টাচার্য এই দপ্তরের অনেক আবর্জনা সাফ করে একটা নিয়ম প্রবর্তনের প্রয়াস পেয়েছিলেন। সেই নিয়মের হয়তো কিছু ত্রুটি-বিচ্যুতি থাকতে পারে, কিন্তু মেডিক্যাল কলেজগুলিতে ছাত্র ভর্তি থেকে সুরু করে চিকিৎসা বিভাগে বদলী, প্রমোশন, গ্রামাঞ্চলে বা মফস্বলে বদলীর বাধ্যতামূলক ব্যবস্থা করে একটা অরাজক অবস্থার অবসান ঘটানোর চেষ্টা ছিল।

আবার বিপরীত দিকও আছে। নদীয়া জেলার অতি সাধারণ এক তাঁতী ক্ষোভের সঙ্গে বললেন, চিরদিন বামপন্থীদের সমর্থন করেছি। কিন্তু ফ্রন্টের শাসনের অন্তত একটি দিনের কথা ভেবে এখনো হৃৎকম্প হয়। কাহিনীটি তাঁর মুখেই শোনা। তিনি বললেন, নিজের একক পরিশ্রমে তিনি তাঁর ঘরে তাঁতের সংখ্যা বাড়িয়েছেন। এখন তাঁর দশটা তাঁত। দিন-মজুরী হিসাবে তাঁরই কয়েকজন প্রতিবেশী তাঁর কাছে কাজ করতো। কিন্তু তাঁরাই মজুরীবৃদ্ধির দাবিতে তাঁকে একদিন তাঁর কুঁড়ে ঘরের মধ্যে শিকল দিয়ে আটকে রেখেছিল সারাদিন। এই নাকি ঘেরাও।

ফ্রন্টের বিরুদ্ধে বক্তব্য অজস্র প্রকাশিত হয়েছে বলে তার বেশি উদাহরণ উপস্থাপিত করলাম না। ফ্রন্টের বিরুদ্ধে প্রধান অভিযোগ পাঁচ টাকা কিলো চালের দর উঠেছিল। সব জেলাতেই নাকি একই অভিযোগ। অথচ সকলেই জানেন কলকাতা ও শহরতলী ছাড়া আর কোথাও চালের দর অত ওঠে নি। সারা বীরভূম জেলায় কখনো ২ টাকা ৫০ পয়সার বেশি দাম ওঠে নি। তেমনি উত্তরবঙ্গেও দাম চড়ে নি। কাজেই কলকাতায় বসে চালের দাম পাঁচ টাকা হওয়ায় যতটা ফ্রন্ট-বিরোধী মনোভাবের কথা চিন্তা করা হচ্ছে আসলে ততটা হয় নি।

সামগ্রিকভাবে বিচার করতে গেলে উভয়পক্ষেই নানা শ্রেণীর লোক এসেছে। ফ্রন্ট জমি কেড়ে নেয় বলে যে প্রচার চালানো হয়েছে তারও কোন বাস্তব প্রমাণ নেই। ফ্রন্ট সরকার খাস জমি কিংবা বেনামী জমি পুনরুদ্ধার করে বিলি করা ছাড়া এক কাঠা জমিও দখল করে নি। বরং ফ্রন্টের ভূমিরাজস্বমন্ত্রীর বিরুদ্ধে ফ্রন্টের কোন কোন দলের উল্টো অভিযোগ ছিল যে, তিনি বৈপ্লবিক কোন পরিবর্তন ঘটাতে চান নি।

পাঁচে পঞ্চবাণ

গোবিন্দ চক্রবর্তী

১। ট্রামে-বাসে
দিনকাল ঢের পালটে গেছে,
মুখে লাগাম কষবেন?
দেখছেন ত' অবস্থাটা,
কোনখানটায় বসবেন?
তাই ত', আরে, পলটুদা যে!
বলুন না তাই বলুন।
তা' ভিড় আছে ত' কী হয়েছে।
যাহোক করেই গলুন।

২। পথেঘাটে
পথ চলবেন আগুপিছু, সামাল দিয়ে, তাল রেখে।
বাঁক ঘুরবেন শেষাশেষি 'ইলেকশনের' হাল দেখে।

৩। কাজে-কথায়
পিস্তল তুললেই গুলি করা হয় কি?
পেয়ে গিয়ে নাগালে,
তাক সই লাগালে—
হাসি-হাসি কথাটাও ফাঁসি ঠিক নয় কি?

৪। স্বপ্নবিলাসে
চাকরি মেলা শক্ত জেনে, ভাবছি যখন সদ্য
নেহাৎ পুঁজি থাকত যদি হাজার বারো-চোদ্দও.....
পটলা এসে মিলিয়ে দিল পদ্য অনবদ্য :
লাখ-বেলাখই মিলতে পারে 'জ্যাকপটে'তেই অদ্য!

৫। মনস্তত্ত্বে
বাবুরা বরুম বরুম যে-নাটক দেন মহড়া।
বিবিরা দেখান রকম না-কিছুই বোঝেন ওঁরা।
বাবুরা যতই ভাবুন ওঁরা সব যুদ্ধ জাহাজ।
বিবিরা টর্পেডো বোট মুখে তাই নেইক আওয়াজ।
ওঁরা যেই ভাসান ভেলা।
এঁরা সে-ই দেখান খেলা!

আপনার সম্পর্কে সাবধানে

বেণু দত্তরায়

মাপ করবেন মহাশয়। আপনার মুখ দেখা
পাপ। খুব পাপ। বাংলাদেশে দুর্বৎসরে
আপনার মুখের হাসি দেখে
শবলুব্ধ শকুনের মুখ মনে আসে।
তাই ভয়ে ভয়ে থাকি। তাই ভোরে
ঘুম ভাঙে না কখনো। খবর কাগজ পড়া
ছেড়ে দিতে হয়। পাছে আপনার ছবি
চোখে পড়ে যায়। তাই খুব বেলা করে উঠি।

মশাই কি দেওয়ান ছিলেন? হাজার বৎসর
গোরস্তানে ছিলেন কি? হাড়ের ফসফেট সার নিয়ে
গবেষণা আপনার কতযুগ বলতে পারেন?
আপনার দাড়ি ও চুলে খুব আঠা হয়? খুব
ঘন আঠা? প্রত্যহ গোলাপজলে হাত
ধোবার অভ্যেস আছে তো? আপনার বাড়ির
নাম জাহান্নাম্ দিলে ভালো হয়।
চার দেয়ালে চারজন পণ্ডিত রাখবেন। আর
ব্যাংকের বইটইগুলো খুবই গোপনে
হৃদয়হরণ কোনো লকারে রাখবেন। গ্রহ-
নক্ষত্রগুলি সব সময়-সময়
ভীষণ শত্রুতা করে। অর্থনাশ মনস্তাপ—

কিন্তু আপনাকে দেখে খানিকটা তফাতে
থাকাই আমি উপযুক্ত বিবেচনা করেছি।
আপনার হাসির খুব কাছে থাকা পাপ।
তাই ভয়ে-ভয়ে থাকি। জলের অতটা কাছে
অতটা অতল জলে পা ধরে কামড়ে নিতে
হিংস্রতম জলস্রোতে কামটও জানে না।

তাই ভয়ে ভয়ে থাকি। সাবধানে থাকতে হয়।

কোন্ পক্ষে এবার কারা গেছেন তার বিচার করা এজন্যই সহজ নয়। সহজ অঙ্কের হিসাবে এই তথ্য দেখানো যায় না। তবে ১৯৬৭ সালের পূর্বে কংগ্রেসের পক্ষে যে সব শ্রেণীর লোক ছিলেন তাঁরা যে পক্ষ ত্যাগ করেছিলেন তার প্রমাণ গত নির্বাচনের ফলাফল। গত দুই বৎসরে অনেক ঘটনা ঘটে যাওয়া সত্ত্বেও অল্প কয়েকটি এলাকা ছাড়া শ্রেণীভিত্তিক ভোটদাতার ক্ষেত্রে ১৯৬৭ সালের মোট ফলাফলের বিরাট পরিবর্তন ঘটবে না বলে অনেকের ধারণা।

এছাড়া অন্য আর একটি বিষয় বিশেষ-ভাবে উল্লেখযোগ্য। পশ্চিম বাংলার সংখ্যা-লঘু সম্প্রদায় সাধারণভাবে কংগ্রেসের পক্ষে ভোট দিত। ১৯৬৭ সালে ২৪ পরগনা ও নদীয়া জেলা ছাড়া অন্য কোথাও ঐ অবস্থার পরিবর্তন ঘটে নি। ঠিক তেমনি অসংগঠিত অবাঙালী ভোটও কংগ্রেসের পক্ষে আসতো। তার কারণ বিহার, উত্তর-প্রদেশ প্রভৃতি রাজ্যে কংগ্রেসের ছিল একাধিপত্য—তার প্রভাব এখানেও পড়তো। ১৯৬৭ সালের নির্বাচনে স্বর্গত যোগেন মণ্ডল এবং পি আর ঠাকুরের সমর্থন কংগ্রেসের বিরুদ্ধে যাওয়ায় ২৪ পরগনা ও নদীয়া জেলায় তার প্রভাব কংগ্রেসের বিরুদ্ধে যায়।

আসন্ন মধ্যবর্তী নির্বাচনে প্রোগ্রেসিভ মুসলিম লীগ ও লোকদলের সৃষ্টি হওয়ায় সংখ্যালঘু ভোট এবার কংগ্রেসের বিরুদ্ধে যাওয়ার সম্ভাবনা অনেক বেশি। তেমনি রিপাবলিকান দল আসরে নামায় ২৪ পরগনা ও নদীয়া জেলার তপশীলী ভোট যুক্তফ্রন্ট গতবারের মত পাবে না। এছাড়া ক্ষেত্র বিশেষে বিভিন্ন জাতিগত প্রার্থীর প্রভাবের কথাও ধরতে হবে। ১৯৬৭ সালের সারা ভারতের নির্বাচনী ফলাফল এবং তার পরবর্তী ঘটনা থেকে বোঝা যায় যে, অবাঙালী ভোটের বেশ একটা অংশ এবার কংগ্রেস বিরোধীদের ভাগে আসবে।

পৃথক পৃথক জেলা হিসাবে এই সব শক্তির পরিমাপ করে জেলা ভিত্তিক সমীক্ষা একটি প্রবন্ধের সীমিত সুযোগে দেওয়া সম্ভব নয়। কিন্তু সব দিক বিবেচনা করলে দেখা যাবে সমগ্র পশ্চিম বাংলায় ১৯৬৭ সালে কংগ্রেস যে পরিমাণ ভোট পেয়েছিল এবার তাঁরা তা থেকে কম ভোট পাবেন। অবশ্য কংগ্রেসের এই শক্তিক্ষয় যুক্তফ্রন্টের শক্তি বৃদ্ধি বোঝায় না।

আর একটি প্রশ্নও বিবেচ্য। সারা পশ্চিমবাংলার ইতিহাসে যুক্তফ্রন্ট এবারের মত কোনদিনই যুক্তভাবে লড়ে নি—আর অন্যদিকে শ্রীঅজয় মুখার্জি যে ভাঙন কংগ্রেসে সৃষ্টি করেছিলেন এবার অতটা না হলেও বিভিন্ন জেলাতেই কংগ্রেসের ভাঙন ঘটেছে।

এই সব অবস্থার বিচার করলে মনে হয় কংগ্রেস এবার চব্বিশ পরগনা ও নদীয়া জেলায় ১৯৬৭ সালের অবস্থার পরিবর্তন ঘটিয়ে নিজেদের শক্তিবৃদ্ধি করতে পারবে। সামগ্রিকভাবে কলকাতা, মুর্শিদাবাদ, উত্তরবঙ্গে শক্তি হ্রাসের সম্ভাবনা। বর্ধমান, হাওড়া, হুগলীর অবস্থার ইতরবিশেষ হওয়ার সম্ভাবনা কম। বীরভূম, বাঁকুড়া ও পুরুলিয়ার ফলাফলের সামান্য হেরফের ফ্রন্টের পক্ষে যাবে। মেদিনীপুর নির্ধারণ করবে ভাগ্য। কংগ্রেস যদি মেদিনীপুরে বিরাট কোন পরিবর্তন না ঘটাতে পারে তাহলে কংগ্রেসের ক্ষমতায় ফিরে আসা সম্ভব নয়।

পোলারাইজেসনের কথা দিয়ে সুরু করেছিলাম। একমাত্র একটি ক্ষেত্রে পোলারাইজেসন পুরোপুরি ঘটেছে। তা হোল ব্যক্তিগত মালিকানাধীন দৈনিক সংবাদপত্র।

আসন্ন মধ্যবর্তী নির্বাচন ও তার পরিপ্রেক্ষিত

সাগর বিশ্বাস

অবশেষে পশ্চিমবাংলার আসন্ন মধ্যবর্তী নির্বাচন অত্যাসন্ন হয়ে এলো। আর মাত্র কয়েকটি দিন বাকী। মাত্র তিন দিন পরেই পশ্চিমবাংলার বিগত দুবছরের রাজনৈতিক অস্থিরতার অবসান ঘটাবার জন্য রাজ্যের দু কোটি ছাব্বিশ লক্ষ নির্বাচক দ্বিতীয়বার তাঁদের রায় দিতে চলেছেন। অবশ্য অস্থিরতা কাটবে কিনা সেটা আলাদা প্রশ্ন। তবু এই নির্বাচন যেন শুধুমাত্র সরকার গঠনের প্রতিযোগিতাই নয়—নানা রাজনৈতিক চাপ, উত্তাপ ও আবর্তের মাধ্যমে দুই প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বী কংগ্রেস ও যুক্তফ্রন্ট আজ যেখানে এসে দাঁড়িয়েছে, সেখানে মর্যাদার লড়াইটাই যেন প্রধান হয়ে উঠেছে। এই লড়াই-এর ফলাফল রাজ্য রাজনীতির ওপর সুদূরপ্রসারী প্রভাব বিস্তার করবে বলে পর্যবেক্ষকদের ধারণা। এই নির্বাচনই প্রমাণ করবে যে ১৯৬৭ সালের নির্বাচনের রায় জনগণের সুচিন্তিত অভিব্যক্তি, না নিছক একটি আকস্মিক tension-এর ফলশ্রুতি? কংগ্রেস জানে যদি অন্তর্বর্তী নির্বাচনে তারা সরকার গঠন করতে না পারে, তবে পশ্চিমবাংলা থেকে অবিলম্বে তাদের বিদায় নিতে হবে। পশ্চিমবাংলা হবে আর একটি কেরালা। পক্ষান্তরে, যুক্তফ্রন্ট যদি নির্বাচনে ব্যর্থ হয়, তাহলে জনসাধারণের অনাস্থাভাজন তাদের হতেই হবে এবং যুক্তফ্রন্ট বিশেষ করে বাম কমিউনিস্ট পার্টির মধ্যে অবিলম্বে যে ভাঙন আসবে, সে ভাঙন রোধ করা কষ্টকর হয়ে উঠবে। কাজেই এই নির্বাচনের সংগে জড়িয়ে আছে কংগ্রেস এবং যুক্তফ্রন্টের অস্তিত্ব রক্ষার বাঁচার প্রশ্ন। তাই এ এক অগ্নিপরীক্ষা—অগ্নিপরীক্ষা কেবল কংগ্রেস-যুক্তফ্রন্টের নয়, অগ্নিপরীক্ষা পশ্চিমবাংলার দু কোটি ছাব্বিশ লক্ষ ভোটদাতার, অগ্নিপরীক্ষা কংগ্রেস এবং বামপন্থী শক্তির। এই পরীক্ষার সংযোগে দক্ষিণপন্থী প্রতিক্রিয়াশীল শক্তিও (যেমন, জনসঙ্ঘ, লোকদল, রিপাবলিকান, আই. এন. ডি. এফ. পি. এম. এল., আমরা বাঙালী প্রভৃতি) নেমেছে তাদের ভাগ্য পরীক্ষা করতে। তাদের কপালে অবশ্য তৃতীয় গ্রুপ হিসাবে শিকে ছেঁড়বার কোনোই সম্ভাবনা নেই। তবে কোয়ালিশনের প্রশ্ন আলাদা। এদের দৃষ্টি অবশ্য সেদিকেই।

নির্বাচন অত্যাসন্ন হয়ে আসার সংগে সংগে গ্রামে শহরে ইতিপূর্বে যে চাঞ্চল্য লক্ষ্য করা যায় নি, ধীরে ধীরে সেই চাঞ্চল্যই চরম পর্যায়ে উঠেছে। এতদিন মানুষের মনে নির্বাচন কেবল বহিরঙ্গ দিক থেকেই আঘাত করছিলো—অন্তরঙ্গ দিক থেকে তা নিয়ে মাথা ঘামাবার প্রশ্নকে অনেকেই এড়িয়ে যাচ্ছিলেন। ভাবটা এই, যথাসময়ে যা হোক ভাবলেই চলবে। কিন্তু অবশেষে সেই সময় এসে গেলো। অতএব আর চুপ করে থাকা নয়—এবার সিদ্ধান্ত নেবার পালা। রাজনৈতিক দলগুলির প্রচারযন্ত্র চড়ান্ত ক্ষমতায় কাজ শুরু করেছে। সংবাদপত্রও বসে নেই। সংবাদপত্রের প্রচার-সীমা কতোটা হবে বা হওয়া উচিত সেটা অবশ্য অনুশাসনের প্রশ্ন। তবু এদেশের সংবাদপত্র দলীয় রাজনীতি থেকে মুক্ত নয়।

সেদিন বসেছিলাম হঠাৎগঞ্জ বাজারে। ছোট্ট একটি চায়ের দোকান। জন পাঁচেক লোক বসেছিলেন। কথায় কথায় জিজ্ঞেস করলাম—ভোট ত' এসে গেলো—আপনারা কি ভাবছেন? দোকানদার বললেন—আমাদের এখান থেকে যুক্তফ্রন্টেরই জেতার লক্ষণ দেখা যাচ্ছে। কারো কোনো ভাবনায় তার হেরফের হবে না। গেলবারেও এই যামিনীবাবু জিতেছিলেন।

জিজ্ঞেস করলাম—কিন্তু গতবারের মতো অবস্থা কি এবারেও আছে? জবাব দিলেন নিতাইবাবু—না, তা নেই। তার জন্য দায়ী কতকগুলো ভাঁইফোঁড় দল, কিন্তু মানুষ কংগ্রেসকে চায় না, একথা গতবারেও সত্য ছিলো, এবারেও সত্য।

আমার প্রশ্ন : কেন কংগ্রেসকে চায় না? কংগ্রেস ছাড়া অন্য কোনো দল কি স্থায়ী সরকার গঠন করতে পারবে?

—কেন পারবে না? কেরালায় পারছে না? আর দেশের লোক যদি বাঁচতে না পেলো তবে স্থায়ী সরকার নিয়ে কী করবে? উত্তর দিলেন বৃদ্ধ মাস্টারমশাই বলে পরিচিত ভদ্রলোক। সংগে সংগে কোণে বসে থাকা লুঙ্গি পরা লোকটি বলে উঠলেন—আমরা ত' বাবু একটা কথা বুঝি—কংগ্রেস বড়লোকের পার্টি আর গরীব লোকের পার্টি হলো যুক্তফ্রন্ট? কি বলো শুকদেব? শুকদেব —সে তো সকলেই জানে। অথচ স্বাধীনতার পরে এঁরাও দেশ-গঠনের ভার কংগ্রেসের হাতেই দিয়েছিলেন। মাত্র বিশ বছরে সেই জাতীয় কংগ্রেস এঁদের কাছ থেকে কোথায় সরে গেছে। এ সত্যকে কংগ্রেস অস্বীকার করতে পারে না।

স্বরূপনগর কেন্দ্রে তবু যুক্তফ্রন্ট নিষ্কণ্টক নয়। ১৫টি অঞ্চলের প্রায় ৭৫০০০ হাজার ভোটার নিয়ে এই কেন্দ্র। গত নির্বাচনে একজন নির্দলীয় প্রার্থী থাকা সত্ত্বেও লড়াইটা প্রধানত সরাসরিভাবে কংগ্রেস-কমিউনিস্টেই হয়েছিলো। কমিউনিস্ট প্রার্থী শ্রীযামিনী সেন প্রায় ১০ হাজার ভোটের ব্যবধানে কংগ্রেসপ্রার্থীকে পরাজিত করেছিলেন। এবারে অতিরিক্ত তিনজন প্রার্থী আছেন—লোকদল, আই. এন. ডি. এফ এবং প্রগ্রেসিভ মুসলিম লীগ। এঁরা যথাক্রমে সর্বশ্রী হরেন্দ্রনাথ রায়, আজিজার রহমান এবং ইউনুস্ আলী। আর আছেন কংগ্রেসপ্রার্থী শ্রীচন্দ্রনাথ মিশ্র এবং যুক্তফ্রন্টের কমিউনিস্ট প্রার্থী শ্রীযামিনী সেন। আই. এন. ডি. এফ, এ অঞ্চলে তেমন প্রভাব বিস্তার করতে পারে নি। তবে প্রগ্রেসিভ মুসলিম লীগ কিছুটা প্রভাব বিস্তার করেছে। গ্রামের ছায়াঘেরা রাস্তার মধ্যেও ঘোয়ান ঘোয়ান ছেলেদের দেখা গেলো মুসলিম লীগের ফেস্টুন বাঁধতে। স্বরূপনগর মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ অঞ্চল না হলেও মুসলিম ভোটারের সংখ্যা কম নয়—প্রায় ২৭ হাজার। আর এই ভোটের একটা অংশ যে মুসলিম লীগ প্রার্থী লাভ করতে সমর্থ হবেন এতে দ্বিমতের অবকাশ থাকতে পারে না। আর একটা ব্যাপার হলো শ্রীহুমায়ুন কবিরের প্রভাব কমে গেলেও লোকদলের প্রার্থীকে পর্দার অন্তরালে ঠেলে দেওয়াও সহজ নয়। আপাতদৃষ্টিতে এগুলি কংগ্রেসের ক্ষতিকর-শক্তি বলে মনে হলেও একথা অস্বীকার করার উপায় নেই যে, এঁরা যুক্তফ্রন্টেরও ক্ষতিকর। পশ্চিমবঙ্গে মুসলিম লীগ পুনঃপ্রতিষ্ঠার প্রয়োজন ছিলো কি না সে বিতর্কের মধ্যে না গিয়ে একটি সহজ কথা বলা যায় যে কংগ্রেস-বিরোধী অথচ অ-কমিউ-

নিস্টপন্থী মুসলিম সম্প্রদায় কমিউনিস্ট প্রভাবিত যুক্তফ্রন্টকে মেনে নেবার বিড়ম্বনা থেকে আপাতত একটি মুক্তির পথ পেয়ে বেঁচেছেন।

তবে এখানে শ্রীযামিনী সেনের তথা কমিউনিস্ট পার্টির রাজনৈতিক ক্ষেত্র এবং জনপ্রিয়তার কথা যাঁরা উপেক্ষা করবেন তাঁরা সত্যকেই উপেক্ষা করবেন। এখানকার নির্বাচনী আসরে ৩১শে জানুয়ারী শ্রীজগজীবন রামের আবির্ভাব তাৎপর্যপূর্ণ। কংগ্রেস তার সমস্ত শক্তি নিয়োগ করেছে মধ্যবর্তী এই নির্বাচনে।

বাদুড়িয়ার চিত্র একটু ভিন্নতর। গত সাধারণ নির্বাচনে বসিরহাট মহকুমার আটটি নির্বাচনী কেন্দ্রের মধ্যে বাদুড়িয়াই একমাত্র কেন্দ্র যেখানে কংগ্রেস আসন হারায় নি। স্বাধীনতোত্তর নির্বাচনে কখনোই কংগ্রেসকে এখানে আসন হারাতে হয় নি—এমন কি '৬৭-র অতবড়ো বিপর্যয়ের মধ্যেও না। কাজেই এই কেন্দ্রে জয়লাভ করার আশাকে অসংগত বলে উপেক্ষা করা চলে না। গত নির্বাচনে এই কেন্দ্রে তিনজন প্রার্থীর মধ্যে ত্রিকোণযুদ্ধ সংঘটিত হয়েছিলো। প্রায় ৭৫০০০ ভোটের মধ্যে ভোট পড়েছিলো প্রায় ৫৪০০০। তার মধ্যে মোটামুটি আব্দুল গফুফার (কং) কুড়ি হাজার, আবদুস সাইদ (বাম কমিউনিস্ট) আঠারো হাজার এবং কিশোরীমোহন দাশ (বাং কং) পেয়েছিলেন ষোল হাজার ভোট। এবারে প্রার্থীর সংখ্যা পাঁচ। কংগ্রেস ও বাম কমিউনিস্ট (যুক্তফ্রন্ট)-এর উক্ত প্রার্থীদ্বয় ছাড়া আছেন—আই· এন· ডি· এফ-এর আবদুস সুলাম, প্রগ্রেসিভ মুসলিম লীগের চিশ্‌তী এমদাদ হোসেন এবং লোকদলের শচীন বৈদ্য। মোট ভোটারের প্রায় ৫৫% মুসলিম। এই জন্যই বোধহয় পাঁচজন প্রার্থীর চারজনই মুসলিম। এই ত' আমাদের গণতন্ত্র এবং রাজনৈতিক চেতনার চেহারা। একুশ বছরের স্বাধীন দেশে এই সাম্প্রদায়িক চেতনা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেয়েছে বই কমে নি।

এই প্রসঙ্গে এখানকার কংগ্রেস প্রার্থী স্থানীয় মিউনিসিপ্যালিটির চেয়ারম্যান এবং জনৈক কংগ্রেস কর্মীর মতামত উল্লেখ করছি। তাঁদের বিশ্বাস জনসাধারণ conscious হয়ে গেছে, তাঁদের আর সোকাবার দরকার নেই, কোনো সস্তা কথায় তাঁরা ভুলবেন না। কংগ্রেসের জয় এখানে এত নিশ্চিত যে অন্য প্রার্থীদের জামানত নিয়েই টানাটানি পড়ে যেতে পারে। জামানত বাজেয়াপ্ত কার হবে বা না হবে সেটা আমাদের দেখবার কথা নয়। কিন্তু যে দেশে শতকরা ৭৫ জন মানুষ অশিক্ষিত, যে দেশে অর্থের বিনিময়ে ভোট কিনতে পাওয়া যায় সে দেশে আর যা-ই হোক ; জনগণ রাজনৈতিক দিক থেকে সচেতন এ কথা বলা যায় কি? ভারতবর্ষের জনসাধারণ Politically conscious এ কথা ত' হালে প্রচারিত হয়েছে। তবে কি ১৯৬৭ সালের রায় সেই conscious-এর অভিব্যক্তি? তাই যদি ধরে নেওয়া যায় তাহলে উল্লসিত হবার কী আছে? তা যদি না হয়, আসল consciousness-এর জন্য যদি জয় অবশ্যম্ভাবী বলে মনে হয়, তবে নির্বাচনী প্রচারের এই 'নয়া রেকর্ড' তৈরি করবার কী প্রয়োজন ছিল? বরং একথা বলা চলে যে, পশ্চিমবাংলার মানুষ কতটা রাজনীতি সচেতন হয়েছেন, এই মধ্যবর্তী নির্বাচনেই মিলবে তার সত্যিকার পরিচয়। এই মধ্যবর্তী নির্বাচনের ফলাফলই প্রমাণ করবে—১৯৬৭ সালের রায় কি জনগণের সুচিন্তিত অভিমত না নিছক একটি সাময়িক উত্তেজনা?

এই বাস্তব দিকের প্রতি দৃষ্টি রাখলে উল্লাসের তেমন কিছু থাকে না। তাছাড়া গত নির্বাচনের মতো এবারে অবস্থা সহজসরল নয়। প্রগ্রেসিভ মুসলিম লীগ, কংগ্রেস, আই এন ডি এফ এবং যুক্তফ্রন্টের প্রার্থী মুসলিম। একমাত্র লোকদলের প্রার্থী হিন্দু। প্রগ্রেসিভ মুসলিম লীগ যদি একটি action হয় লোকদলের এই কেন্দ্রে একটি reaction হতে বাধা নেই। মোট ভোটারের শতকরা ৪৫ জন হিন্দু। সংকীর্ণ জাতীয়তাবোধ হিন্দু-সমাজে নেই, এ কথা ত' বলা যায় না। কাজেই শুধুমাত্র জাতীয়তার টানে লোকদল কিছু ভোট টানবে এতে সন্দেহের তেমন কিছু থাকে না। লোকদল মুসলিম ভোটও কিছু পাবে। কারণ হলো হুমায়ুন কবীরের প্রভাব। আই এন ডি এফ অবশ্য তেমন কোনো প্রভাব বিস্তার করতে পারে নি। তবুও যেটুকু ক্ষতি করবে সে কংগ্রেসেরই করবে।

যুক্তফ্রন্ট প্রার্থীর অসুবিধা দেখেছি—সেটা কিছুসংখ্যক কর্মী নিয়ে। কিছু কিছু কর্মী সম্পর্কে অনেকের ধারণা তেমন ভালো নয়। স্বয়ং প্রার্থীকে নিয়ে কোন অভিযোগের ব্যাপার নেই। গত নির্বাচনে কংগ্রেস প্রার্থীর কুড়ি হাজারের পাশে তিনি পেয়েছিলেন আঠারো হাজার ভোট। এবং বাংলা কংগ্রেস ষোলো হাজার। এই আঠারো এবং ষোলো—মোট ৩৪ হাজার ভোট আসলে কংগ্রেস-বিরোধী ভোট। কংগ্রেসের প্রাপ্ত ২০ হাজারের সংগে তার তফাৎ অনেক। লোকদল, আই এন ডি এফ এবং বিশেষ করে প্রগ্রেসিভ মুসলিম লীগ কংগ্রেসের ক্ষতি করতে পারে। পশ্চিমবাংলায় প্রগ্রেসিভ মুসলিম লীগের আবির্ভাব প্রকৃতপক্ষে একটি বুমেরাং। সবদিক বিবেচনা করলে কংগ্রেসের পক্ষে এই আসনটি এবার গতবারের (১৯৬৭) মতো নিরাপদ বলে মনে করা যায় না।

বসিরহাট মহকুমাতে মোট ৮টি নির্বাচন কেন্দ্র : বসিরহাট, হাসনাবাদ, স্বরূপনগর, বাদুড়িয়া হাড়োয়া, হিঙ্গলগঞ্জ, গোসাবা এবং সন্দেশখালি। গত সাধারণ নির্বাচনে কংগ্রেস এর মধ্যে মাত্র একটি আসন লাভ করেছিল, সেটি বাদুড়িয়া কেন্দ্র। বসিরহাট কেন্দ্রে অধ্যক্ষ অমিয় বন্দ্যোপাধ্যায় (কমিউনিস্ট) দ্বিগুণ ভোটে কংগ্রেস প্রার্থী শ্রীবীজেশ সেনকে পরাজিত করেছিলেন। এছাড়াও বাম কমিউনিস্ট পার্টির প্রার্থী ছিলেন শ্রীরাসবিহারী ঘোষ। এই ত্রিকোণ যুদ্ধের মধ্যেও দ্বিগুণ ভোটে জয়লাভ করার ঘটনাকে বাদ দিয়ে এই নির্বাচনের সমীক্ষা করা ঠিক হবে না। উল্লেখ্য ঘটনার মধ্যে শ্রীসেন এবার প্রার্থী নন। তাঁর স্থলে কংগ্রেসপ্রার্থী শ্রীবাধাকিশোর ঘোষ। আর গত নির্বাচনের বাম কমিউনিস্ট প্রার্থী শ্রীরাসবিহারী ঘোষ এবারে নির্বাচনে সক্রিয় নন। অনেকের ধারণা, তিনি অতি বিপ্লবী শিবিরে প্রবেশ করেছেন। বসিরহাটে অতি বাম কমিউনিস্টদের প্রভাব নির্বাচনে তেমন প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করবে না বলেই বিশ্বাস।

এখানে আরো আছেন লোকদলের শ্রীহাবিবুস রহমান, প্রগ্রেসিভ মুসলিম লীগের শ্রীমোসলেমউদ্দীন মণ্ডল এবং

—গাঁয়ে কলেজ, হাসপাতাল হবে, বিনামূল্যে সেচের জল, ঘরে ঘরে বিদ্যুৎ, টেলিভিশন,...

দীঘা

ঢেউয়ের কলতান ও ঝাউবনের মর্মর···নির্জন সোনালি
সৈকতে আলস্যমন্থর মন্থর উজ্জ্বল প্রহর উদ্‌যাপন···
অথবা গম্ভীর সাগর-সংগীতের তালে তালে সমুদ্রস্নান···।
'লাক্সারি ট্যুরিস্ট লজ' অথবা 'সৈকতাবাস' অথবা
'চীপ ক্যান্টিনে' উঠতে পারেন।

'লাক্সারি ট্যুরিস্ট লজ' ও 'সৈকতাবাসে'র জন্য ট্যুরিস্ট ব্যুরোতে
অগ্রিম বুকিং যাত্রার তিনদিন আগে বন্ধ হয়।

ট্যুরিস্ট ব্যুরো পশ্চিমবঙ্গ সরকার
৬/২ ডালহৌসি স্কোয়ার ইস্ট, কলিকাতা-১ ফোন : ২৩-৮২৭১ গ্রাম : TRAVELTIPS

BKT 8/73

আমি দিবাস্বপ্ন দেখি

তপেশ লাহিড়ী

আমি দিবাস্বপ্ন দেখি।
অতিপ্রাকৃত এক বিচিত্র
কল্পলোক। প্রাসাদের সিংদরজায় লেখা—মৃত্যুভয়ে
অবনত বিশ্ব পৃথিবী আজ উদ্ভাসিত
হোক।

আমি দিবাস্বপ্ন দেখি।
প্রাগৈতিহাসিক কোনো বিচিত্র
সমাবেশ। মুখর প্রভাতের মহাকোলাহলে
চক্রব্যূহ সপ্তরথী সমস্ত
নিঃশেষ;

বাস্তববাদী সফল ব্যক্তিরা মৃদুহাস্যে বলেন
এ আমার পলায়নী মনোবৃত্তি;
থোড়াই কেয়ার। চেতনার স্তরে স্তরে প্রতি কোষে
শুনি,—শত আলোকবর্ষ দূর সমুদ্রের শব্দহীন
মহাধ্বনি—
"নামছি আবার
অদূর ভবিষ্যতের সেই মহাযুদ্ধে
যে যুদ্ধে আমাদের অবশ্যম্ভাবী
জয়"।

এবং
আমি দিবাস্বপ্ন দেখি মধ্যরাত্রে
হাজার হাজার।

'আমরা বাঙালী'র শ্রীঅনাদি মুখার্জী। কংগ্রেস-বিরোধী ভোট যত কম কাটে যুক্তফ্রন্টের ততই সুবিধা। লোকদলের প্রচার ব্যবস্থায় যেরকম কমিউনিস্ট বিরোধিতার প্রাবল্য, তাতে যুক্তফ্রন্টের কিছু ক্ষতি সে করবে। কিন্তু প্রগ্রেসিভ মুসলিম লীগ? প্রগ্রেসিভ মুসলিম লীগ কংগ্রেসের যথেষ্ট ক্ষতি করবে। 'আমরা বাঙালী' আগেই বলেছি তেমন প্রভাব ফেলতে পারে নি। 'আমরা বাঙালী'র অন্য একটি কেন্দ্রের জনৈক প্রার্থীর সঙ্গে কথা বলেছিলাম। তাঁর বক্তব্য হলো, 'আমরা বাঙালী' নির্বাচনে জয়লাভ করবে এমন বিশ্বাস তাঁরাও আপাতত করছেন না। 'আনন্দমার্গে'র পলিটিক্স তথাকথিত পলিটিক্স নয়। যে-সকল রাজ্যে অন্তর্বর্তী নির্বাচন হচ্ছে সেখানে আনন্দমার্গের এ হচ্ছে নির্বাচনী ট্রায়াল এবং ট্রায়াল-এর মাধ্যমেই আনন্দমার্গ আগামী সাধারণ নির্বাচনের ক্ষেত্র প্রস্তুত করতে চায়।

যা হোক, বসিরহাট কেন্দ্রে নানা প্রতিক্রিয়ার চাপে ভোট ভাঙাভাঙি হবে হয়ত ঠিক, কিন্তু তাতে কংগ্রেসের ষোলো হাজারের সঙ্গে কমিউনিস্ট-এর বত্রিশ হাজার ভোটের এত বড়ো ব্যবধান ঘুচবে কি? মিউনিসিপ্যালিটি এলাকাতেও কংগ্রেস ও কমিউনিস্টের ভোটের ব্যবধান ছিলো সাত হাজার। যদিও কংগ্রেস অফিস এবং কমিউনিস্ট অফিস থেকে প্রাপ্ত পরিসংখ্যান ঠিক মিলছে না, তবু মোটামুটি ব্যবধানটা ওই রকম। অবশ্য এই না-মেলার অর্থ খুঁজে পাই নি।

হাসনাবাদ একটি defector's constituency. বাংলা কংগ্রেসের গত নির্বাচনে বিজয়ী প্রার্থী শ্রীহরেন্দ্রনাথ মজুমদার দলত্যাগ করে এবার কংগ্রেসের টিকিটে এসে দাঁড়িয়েছেন।

লোকদল, আই-এন-ডি-এফ, 'আমরা বাঙালী'রা এখানেও আছেন। টাকী মিউনিসিপ্যালিটির নির্বাচনের ফলাফল যুক্তফ্রন্টের অনুকূলে। যুক্তফ্রন্টের প্রার্থী এখানে শ্রীআবদুর রজ্জাক (কমিউনিস্ট)। কংগ্রেস কর্মীরা অবশ্য এ-কেন্দ্রে তাঁদের জয় সুনিশ্চিত বলেই ঘোষণা করলেন।

হিঙ্গলগঞ্জ বিভিন্ন যুক্তফ্রন্ট ইউনিটের মতে নাকি তাদের সিওর সীট আর কংগ্রেসের মতে সন্দেহজনক। এই একটি কেন্দ্র নিয়ে কোনো কংগ্রেস কর্মীকে over-estimate করতে শুনি নি। সুদূর বাদুড়িয়া-বসিরহাটেও নয়। বাদুড়িয়ার কংগ্রেসপ্রার্থীও এই কেন্দ্রটি, শুধু এই কেন্দ্রটি নিয়ে সন্দেহ প্রকাশ করলেন।

গোসাবার চিত্র কিন্তু অন্যরকম। পশ্চিম বাংলায় ১৯৬৭ সালের সাধারণ নির্বাচনে জনসঙ্ঘ যে বিধানসভার একটি আসন লাভ করেছিলো সেটা এই গোসাবার আসন। কংগ্রেস প্রার্থী শ্রীঅনন্ত বৈদ্যকে হাজার চারেক ভোটের ব্যবধানে জনসঙ্ঘ প্রার্থী শ্রীগিরিন মণ্ডল পরাজিত করেছিলেন। এবারে এই আসনটিতে জনসঙ্ঘের প্রার্থী না দেওয়ার কারণ বোঝা গেলো না। অথচ এমন স্থান আছে যেখানে গত নির্বাচনে জনসঙ্ঘের জামানত জব্দ হয়েছিলো, সেখানে জনসঙ্ঘ প্রার্থী দিয়েছে। এবারে এখানে কংগ্রেস প্রার্থী শ্রীহাজারীলাল মণ্ডলের বিপক্ষে যুক্তফ্রন্টের আর-এস-পি প্রার্থী শ্রীগণেশচন্দ্র মণ্ডল। আছেন অনুন্নত সম্প্রদায় লীগের শ্রীচন্দ্রকান্ত সরকার। মোট ভোটারের শতকরা ৫৫ ভাগই অনুন্নত তপশীল সম্প্রদায়। তবে সাম্প্রদায়িক প্রভাবটি প্রবল হয়ে উঠবে না এইজন্য যে, প্রার্থীরা কেউই ভিন্ন সম্প্রদায়ের মানুষ নন। সুতরাং সম্প্রদায়-চেতনা এখানে সক্রিয় হবার সম্ভাবনা নেই। কাজেই রাজনৈতিক চেতনাই এখানে কাজ করবে অধিক। কংগ্রেস প্রার্থীর নিজের যথেষ্ট প্রভাব এখানে বিদ্যমান। কংগ্রেসমহল মনে করেন, তাঁরা বিপুল ভোটাধিক্যে এখানে জয়লাভ করবেন। জনৈক আর-এস-পি কর্মীর মুখে তাঁদের প্রার্থী সম্পর্কে কেমন যেন একটা হতাশার ছায়া দেখেছি। বাসন্তী (ডায়মণ্ডহারবার) কেন্দ্রের তরুণ কর্মী শ্রীখাতের আলীর জয়নগর কেন্দ্রে আই-এন-ডি-এফ'এর মনোনয়নে দাঁড়াবার ঘটনায় তিনি অভিমানে ফেটে পড়েছিলেন। প্রার্থী মনোনয়নের ব্যাপারে যুক্তফ্রন্টের ব্যবস্থা ত্রুটিমুক্ত নয়। কোথাও কোথাও প্রার্থী সম্পর্কে যুক্তফ্রন্টের শরিকেরাই তেমন খুশি নন। ক্যানিং কেন্দ্রে এমন একটি প্রার্থীকে তাঁরা মনোনয় দিলেন যিনি একবার নয়, বারকয়েক নাকি এদল-ওদল করে এসেছেন।

গোসাবা কেন্দ্রের আলোচনা প্রসঙ্গে কিছুটা প্রসঙ্গান্তরে এসে পড়েছি। গোসাবার আবহাওয়া আপাতত যুক্তফ্রন্টের অনুকূলে নয়। কিন্তু গোসাবা-ই গোটা বসিরহাট মহকুমা নয়। নয় গোটা চব্বিশ পরগনা-ও।

সপ্তাহের বোঝা

কৃত্তিবাস ওঝা

পশ্চিমবাংলায় যাঁরা রাজনীতি করেন অথবা কোন দলের না হয়েও রাজনীতি নিয়ে গবেষণা করেন, তাঁরা বড়ই বিপাকে পড়েছেন। রাজ্যের সাধারণ মানুষ যারা এখনো আঙুল না গুণে পয়সার হিসাব করতে পারে না বা যারা এখনো নয়া-পয়সার হিসাব করতে গেলে পুরাতন পয়সার সঙ্গে গোল করে ফেলে, তাদের হিসাবী মনোভাবই রাজনৈতিক দল কর্মী ও নেতাদের বিপাকের কারণ হয়েছে। ভোটের দিন এসে গেছে, মাত্র কয়েক দিন পরে ভোট হবে, অথচ ভোটার নামের মানুষগুলি—যাদের মন-তুষ্টির জন্য সব দল থেকেই অজস্র উপচার সাজানো হয়েছে, কত ফুলে কত মধু রাখা হয়েছে, তারা কেউ একটুকুও ধরা দিচ্ছে না। পুজামণ্ডপে আসে, ঢাক-ঢোলের বাজনা শোনে, দরকারমত নৈবেদ্য-ভোগ-উপচার উপভোগ করে, মধুভরা ফুলের ওপর এসে গুনগুন করে, কিন্তু কোনপ্রকারে ধরাটি দেয় না। তাই রাজনৈতিক দলগুলি হিমসিম খেয়ে যাচ্ছেন ভোটারদের মন বুঝতে, আসলে কি চায় সেটা বুঝতে, কিন্তু শেষ কথাটি আজও বোঝা হল না কারো পক্ষে। তাই সব দলই এলো-পাথাড়ি বলে যাচ্ছেন, আমরা এত আসন পাবো। কিন্তু যদি জিজ্ঞাসা করেন—কেন পাবেন, কিভাবে ভাবেন, আর পাবেন যে সেই কথাটা বুঝলেন কি করে, তার জবাব নিশ্চয়ই একটা করে পাওয়া যাবে। কিন্তু সেটা হল সাত আর পাঁচ-এ চৌদ্দ অঙ্কের হিসাব—সেই হিসাবে সাত আর পাঁচ-এ বার কখনই হবে না।

মুস্কিল কি শুধু রাজনৈতিক নেতা-দের, মুস্কিল হয়েছে রাজনৈতিক ভাষ্যকার আর গণৎকারদেরও। যে-কোন নির্বাচনের আগে বাজারে বেশ কিছু পণ্ডিত ব্যক্তির আবির্ভাব ঘটে, যাঁরা যারা বৎসরে সব ক'টি রাজনৈতিক দলের নাম একসঙ্গে বলতে পারেন না, কোন দলের সদর দপ্তর কলকাতার কোথায় সেই কথা বলতে পারেন না—সারা বাংলা-দেশের কথা বাদই দিলাম, তাঁরা নির্বা-চনের সময় বিরাট বিরাট নিবন্ধ লিখে কাগজের পৃষ্ঠা ভরে ফেলেন জয়-পরাজয়ের হিসাব কষে। কিন্তু তাঁদেরও এবার খুবই বিপদ হয়েছে। সংবাদপত্র খুললে প্রত্যহই চোখে পড়ে জেলায় জেলায় নির্বাচনী প্রস্তুতি আর সমীক্ষা, তাঁরা অনেক কথাই লিখে ফেলেছেন ইতিমধ্যে, কিন্তু শুধু লিখতে পারেন নি—এবার নির্বাচনে হবেটা কি? জয়ী হবে কে? কিছুদিন আগেও যাঁরা অতি উচ্চৈঃস্বরে বলতেন—কংগ্রেস এত আসন পেয়ে জয়ী হবে, অথবা যুক্তফ্রন্ট এত আসন পেয়ে সরকার গঠন করবে—তাঁরা এখন শুধু একটি কথাই বলছেন—জোর লড়াই হবে। জোর লড়াই যে হবে—কেমন করে হবে? এত-দিন তো শোনা যাচ্ছিল—অমুকেরা প্রায় দু'শ আসন পাবে, অর্থাৎ সেই অমুকের বিপরীতরা কোন শক্তিই নয় এ কথাটাই প্রকারান্তরে বলছেন, আজ শুধু বলছেন জোর লড়াই হবে। জোর লড়াই তো হয় তখনই, যখন দু'পক্ষের শক্তি সমান হয়—তবে বুঝতে হবে কিছুদিন আগেও যারা শক্তিতে দুর্বল ছিল—তারা সবল হয়েছে, জোর লড়াই-এর শক্তি অর্জন করেছে—কিন্তু এই শক্তি অর্জন করে কে দুর্বল থেকে সবল হল সেই কথা কিন্তু অনেকেই বলতে পারছেন না।

কিন্তু রাজনৈতিক নেতা বা নিবন্ধ-কারদের কথা বাদ দিলেও—একটা কৌতূহল বা প্রশ্ন মনে জাগে—সেটা হল কেন এইবার মধ্যবর্তী নির্বাচনে যাকে বলে টেম্পো, সেই টেম্পো উঠল না। সবরকম সড়সুড়ি দিয়েও ভোটারদের কাছ থেকে হাসিমুখে শোনা গেল না জয় আপনার—আপনাকেই জয়ী করবো। অথচ শ্রীঅজয় মুখার্জী, শ্রীজ্যোতি বসু বলুন, শ্রীঅতুল্য ঘোষ, শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র সেনই বলুন, তাঁরা বাদ নি এমন কেন্দ্র নেই, কংগ্রেস সভাপতি শ্রীনিজলিঙ্গাপ্পা অথবা কেরলের মুখ্যমন্ত্রী শ্রীনাম্বুদ্রীপাদ বলুন—কতবার এলেন, কত সভা করলেন। প্রধানমন্ত্রী তিনিও দু-দুবার পশ্চিমবঙ্গে এলেন, অন্য কেন্দ্রীয় মন্ত্রী-দের তো কথাই নেই, পশ্চিমবঙ্গের ভোটাররা নেতৃসন্দর্শনের এমন দুর্লভ সৌভাগ্য কখনও কোন দিন অর্জন করেন নি। কুলপি অথবা মছলন্দপুরে কোন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী যাবেন এই কথা কেউ স্বপ্নেও ভাবতে পারে নি, হাজিনগর ছাইগাদা থেকে সুরু করে তারকেশ্বরের বাবার স্থান পর্যন্ত ধর্ণা দিতে বাকী থাকে নি কোন স্থান। কিন্তু আসলে যাঁদের মুখের মিষ্টি হাসিটুকু দেখবার জন্য এত উদ্যোগ, তাঁরা কিন্তু চুপটি করে বসে আছেন যা শব্দটি উচ্চারণ করছেন না। ভোট বন্দনার সব পর্ব শেষে এখন শেষ ভাবনায় এসে পৌঁচেছেন সবাই—আর নতুন করে গবেষণা সুরু করেছেন এই মূক মানুষগুলির মুখের কথা না হয় শোনা না গেল কিন্তু বুকের কথাটি কি?

কিন্তু আসলে ঘটনাটি খুবই সহজ এবং এর মধ্যে দুর্বোধ্য কিছু আছে মনে করার কারণ থাকতে পারে না। সম্প্রতি পশ্চিমবাংলার বিভিন্ন জেলা ভ্রমণকালে যে অভিজ্ঞতা হয়েছে তাতে এইটুকু বলা যায় যে, রাজনৈতিক নেতারা ধরে নিয়ে ছিলেন—তাঁদেরই শুধু বয়স বাড়বে, অভিজ্ঞতা বাড়বে আর গ্রামের মানুষ ১৯৫২ বা ১৯৫৭ সালে যা ছিল তাই থাকবে—কিন্তু বাস্তবে বিপরীত হয়েছে। রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দও যেভাবে নিজেদের অভিজ্ঞতার মান উন্নত করেছেন, জন-গণও তেমনি তাঁদের চেতনার মানকে উন্নত করেছেন। ভুল বোঝাবুঝি সুরু হয়েছে এইখানেই, রাজনৈতিক দল ও নেতারা ভাবছেন কেন ভোটাররা অন্য-বারের মত হাউমাউ করে নিজেদের কথা বলছে না, কেন তারা কোন পক্ষে সেই কথা সোচ্চারে ঘোষণা করছে না—সেই হারিয়ে যাচ্ছে এইখানে।

গোলমালের আরো একটা কারণ ঘটে গেছে। শহরের কথা পরে বলছি, গ্রামের কথা আগে বলে নিই। গ্রামে এতদিন ভোট সংগ্রহ করার একমাত্র রেওয়াজ ছিল গ্রামের মাতব্বর, জোতদার, এদের পাকড়াও করতে হবে, তারা যাদের হাতে ধরা দেবে বা যাদের কথা দেবে, সেই কথা হবে সারা গ্রামের মানুষের কথা।

—ফটো বিউটি স্টুডিও—
সুন্দর ছবি তোলাতে হ'লে
ফটো বিউটিতে আসুন
৪৩, নেতাজী সুভাষ রোড
কালী বাবুর বাজার
হাওড়া
(ইণ্ডিয়ান ওভারসীজ ব্যাঙ্কের নীচে)

এই জোতদার বা মাতব্বর, প্রার্থীর সঙ্গে সবরকম হিসাব-নিকাশ করে প্রার্থীকে নিয়ে হয়ত একদিন গ্রামের কোথাও মিলিত হয়ে গ্রামবাসীকে বলে দিলেন, এইবার এই বাবুকে ভোট দিতে হবে, ভোটের দিন সব এই চিহ্নে ভোট দিস। এর চেয়ে বেশি দরকার হত না। এই জোতদার ও মাতব্বররা পরে একটা রাজনৈতিক তকমা পায়। সেই তকমা হল আঞ্চলিক পরিষদের সদস্যপদ, গ্রাম সভা অঞ্চল পরিষদের সভাপতি পদ। অর্থাৎ যে কাজ একদা জোতদার, মাতব্বর করতেন, সেই কাজ পেলেন অঞ্চল পরিষদের কর্মকর্তারা।

কিন্তু হাওয়া ঘুরে গেল '৬৭ সালে। কোন একদিনের ঘটনায় নয়, শ্রেণী-সংগ্রামের ভাবধারায় উদ্বুদ্ধ গ্রামের মানুষ ধীরে ধীরে এই মাতব্বর তথা অঞ্চলপ্রধানদের বাঁধন থেকে বেরিয়ে আসতে সুরু করে। '৬৭ সালের নির্বাচনে কংগ্রেসের গ্রামে যে পরাজয় হয়, তার মূলে ছিল গ্রামের মানুষের শ্রেণী-চেতনা বৃদ্ধি। ১৯৬৭ সালে বাঁকুড়া-পুরুলিয়াতে শ্রীঅতুল্য ঘোষ পরাজিত হলেন, অখ্যাত এক শ্রী জে. এম. বিশ্বাসের কাছে, এর কারণ ছিল এই যে,—কংগ্রেসের পক্ষে ছিল সব গ্রামের মাতব্বর আর অঞ্চলপ্রধানরা, কংগ্রেসের পক্ষে কাজ করতো অনেক জীপ, অনেক গাড়ি, কলকাতা থেকে যাওয়া অনেক তরুণ-তরুণী স্বেচ্ছাসেবক। সেই তুলনায় শ্রী জে. এম. বিশ্বাস বেশি সময় ভ্রমণ করলেন সাইকেলে। জীপ ছিল না এমন নয়, কিন্তু বেশি সময়েই মানুষ দেখতো প্রার্থী সাইকেলে ঘুরে বেড়াচ্ছেন। শ্রীঅতুল্য ঘোষ সর্বভারতীয় নেতা—তাঁর পক্ষে নিজের কেন্দ্রে শ্রীবিশ্বাসের মত পড়ে থাকা সম্ভব ছিল না।

এরই ফল হ'ল শ্রীঘোষের পরাজয়। এইবার এই চেতনা আরো বেড়েছে। ফল হয়েছে এই মোটরে ও জীপে কেউ গ্রামে ভোট ভিক্ষা করতে গেলে সাধারণ ভোটাররা প্রথমেই বিরূপ হয়ে ওঠেন। আগে গ্রামের মধ্যে একখানি মোটর প্রবেশ করলে গ্রামের মোটরের টায়ারে জল দিয়ে পুণ্য অর্জন করতো—আজ কিন্তু মোটরে আসা মানুষগুলিকে দেখলে যতটা পারে সরে যায়। আর যদি ঐ অঞ্চলপ্রধান জাতীয় কাউকে নিয়ে যাওয়া যায়, তবে অবস্থা সুরুতেই খারাপ হবে। পঞ্চায়েৎ আইন চালু হবার পর যে ব্যক্তিরা ৮ বছর এক-নাগাড়ে অঞ্চল পরিষদের সভাপতি আছেন, সেই ব্যক্তি সম্পর্কে সাধারণ মানুষের ধারণা—সেই ব্যক্তি হলেন ভেস্টেড্ ইন্টারেস্টের প্রতিনিধি, যিনি ভোল, রিলিফ, সার্টিফিকেট প্রভৃতি দেওয়ার ক্ষেত্রে সব সময় তাঁদের স্বার্থ না দেখে অন্যের স্বার্থ দেখেন; তাই সেই ব্যক্তিও যেমন ত্যাজ্য, তেমনি সেই ব্যক্তির সঙ্গের প্রার্থীও বেশির ভাগ সময় ত্যাজ্য হন। আজ ভোট পেতে হলে গ্রামে পায়ে হেঁটে যেতে হবে, মাঠের আলে বসে চাষীর সঙ্গে দরকার হলে খেলো হুঁকোর তামাকু সেবন করতে হবে, বাড়ির রকে ছেঁড়া চাটাইতে বসতে হবে, পিপাসা না লাগলেও একগ্লাস জল চেয়ে খেতে হবে, ধুলো-কাদা মাখা চাষীর শিশুটিকে কোলে তুলে নিতে না পারুন, একটু আদর করতে হবে, তবে ভোটারের মন পাবেন, তবেই সেই ভোটার আপনার হয়ে সোচ্চার হবে, তার মত সবুরে আপনার পক্ষে প্রচার করবে।

কিন্তু গ্রাম না হয় গেল, শহরে কি হচ্ছে, শহরে টেম্পো উঠল না কেন? গ্রামের অবস্থা আর শহরের অবস্থা এক নয়, কিন্তু ভোটের বাজারে শহরে যে জৌলুস সৃষ্টি হয়—সেই জৌলুস কোথায়? শহরে টেম্পো না ওঠার অনেক কারণের মধ্যে প্রধান কারণ হল প্রার্থীদের টাকার অভাব। দু'-চারজন ছাড়া সব প্রার্থীই নির্বাচনে দল ও অন্যান্য সমর্থকের টাকায় কাজ করে থাকেন। নিজেদের টাকায় নির্বাচন করেন এমন লোকের সংখ্যা খুব বেশি নয়। কিন্তু এইবার কোন প্রার্থীর টাকা নেই। মাত্র দু' বছর আগে নির্বাচনে টাকা খরচ শেষ করে নতুন নির্বাচনে টাকা খরচ করার মত টাকাওয়ালা প্রার্থী খুব বেশি নেই। সব দলেরই টাকার অবস্থা প্রায় এক। কংগ্রেসই বলুন আর বাম-পন্থীই বলুন, কোন দল থেকেই এবার নির্বাচন প্রার্থীদের চাহিদা পুরণের মত টাকা দেওয়া সম্ভব হয় নি। কাজেই মূলে টাকাই যদি না থাকে, তবে জৌলুস আসবে কোথা থেকে। টাকা ছাড়া আর যে কাজ হোক, নির্বাচনের কাজ হয় না। ঘন ঘন জীপের আনা-গোনা, সেই জীপে বোঝাই থাকবে তরুণ-তরুণীর দল—তাদের হল্লা-চিৎকার পাড়ার মানুষকে বুঝিয়ে দেবে নির্বাচনের উত্তাপ। কিন্তু এইবার সেই জীপই নেই। কোন দল তাঁদের কোটা-মত জীপ তাঁদের প্রার্থীদের দিতে পারেন নি। তার পর পাড়ায় পাড়ায় নির্বাচনী অফিস খোলা—এইবার সেই সংখ্যাও কম। গতবারের তুলনায় এইবার অর্ধেকেরও কম নির্বাচনী দপ্তর খোলা হয়েছে। সর্বশেষে নির্বাচনী কাজের স্বেচ্ছাসেবকও কম। স্বেচ্ছাসেবক হ্রাসের প্রধান কারণ হয়েছে নির্বাচনের সময় বেশ কিছু হাফ-বেকার, বেকার নির্বাচনের কার্যে সর্বশক্তি নিয়োগ করে—কিন্তু এইবার তারা নিজেদের সরিয়ে রেখেছে, দলগুলিও এই সব অরাজনৈতিক কর্মীদের খুব বেশি আমল দিচ্ছেন না। এ ছাড়া অন্য একটি ঘটনাও খুবই তাৎপর্যপূর্ণ। শুধু বেকার, হাফ-বেকার বা সমাজবিরোধীরা নয়, শিক্ষিত কর্মীদেরও এক অংশ নিজেদের নির্বাচন থেকে সরিয়ে নিয়েছেন। কোন একটি দৈনিক পত্রিকার জনৈক প্রবীণ সাংবাদিক তাঁর অভিজ্ঞতা বর্ণনা করে সেইদিন বলেছিলেন—অন্যবার পাড়ার যে সব ভাল ছেলে বা সকলের স্নেহের পাত্র বলে পরিচিত, তাদের কাউকেই ভোটের কাজে দেখা যাচ্ছে না। এর জবাব পাওয়া গেল কোন এক দলের নামকরা মহিলা কর্মী শিক্ষয়িত্রী শ্রীমতী মঞ্জুশ্রী মুখোপাধ্যায়ের কাছ থেকে। শ্রীমতী মুখোপাধ্যায় বললেন—গত সব নির্বাচনে আমি আমার সহকর্মী বন্ধু আরো অনেককে নিয়ে নির্বাচনের কাজ করেছি, কিন্তু এইবার আর ঘরের বার হব না। দাদারা অনেকে এসেছেন, টেলিফোনেও ডাকছেন বার বার, কিন্তু আমি বলে দিয়েছি—না আমার দ্বারা সম্ভব নয়।

প্রশ্ন—কেন?

উত্তর—নির্বাচন মানে রাজনৈতিক লড়াই। সেই লড়াইতে অংশ গ্রহণ করতে কোন বাধা থাকতে পারে না, কিন্তু রাজনৈতিক লড়াই যদি হয় ব্যক্তিগত কুৎসা, গালাগালি, খিস্তি-খেউড়, তবে তার মধ্যে যেতে রুচিতে বাধে, আর তাছাড়া মান-সম্মান এবং নিরাপত্তার কথাও আছে। তাই এই অনিশ্চিত অবস্থায় মহিলা কর্মী হিসাবে কাজ করতে যাই কিভাবে।

এই কথা একজন মহিলা কর্মীর নয়, এইবার নির্বাচনে সব দলেরই মহিলা কর্মীদের অনুপস্থিতি লক্ষ্য করা যাচ্ছে—তার অন্যতম কারণ হল এই।

কিস্তিতে ট্রানজিস্টর

"ন্যাশন্যাল ডিলাক্স"

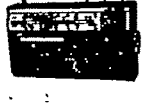

১০, মাসিক কিস্তিতে ৩ ব্যান্ড অল ওয়ার্ল্ড পোর্টেবল ট্রানজিস্টর লাভ করুন। প্রতি গ্রাম ও শহরে প্রেরণের যোগ্য। আবেদন করুন:

Music & Sound (B.W.C.—10)
Post Box 1576, Delhi—6.

এস্‌প্লানেডে জট

ট্রামে বা বাসে উঠে যখন কন্ডাকটরের হাতে পয়সা দিয়ে বলি 'এস্‌প্লানেড', (অনেকে আবার কায়দা করে 'স্‌প্লানেড'ও বলেন) তখন লক্ষ করে দেখেছি গলা দিয়ে একটা আলাদা স্বর বেরিয়ে আসে। যেন ভাবখানা এই, আমার গন্তব্যস্থল আমাকে অভিজাত করে দিলো—তোমরা যাও মশার জন্মভূমি বেহালায়, চাঁৎপুরের সুড়ঙ্গে কিংবা ভিড় ও আবর্জনায় প্রথম বৌবাজার এবং শিয়ালদায়, আমার পথ আলাদা, আমি যাচ্ছি আলোর আলোকময় সাহেবদের পদধূলিধন্য কলকাতা তথা ভারতবর্ষের এক নম্বর অঞ্চল এস্‌-প্লানেডে। এস্‌প্লানেড শব্দটি গালভরা উচ্চারণের সঙ্গে সঙ্গে জিহ্বা এমন এক তৃপ্তি পায়, যা 'ধর্মতলা' দিতে পারে না। ধর্মতলা সাধারণ শব্দ, গণতন্ত্রদুষ্ট, কিন্তু এস্‌প্লানেড ইংরেজি কৌলীন্যে ধন্য, যেন মাত্র কয়েকজনের জিহ্বায় উচ্চার্য। একই অঞ্চলের দুটি নাম, এস্‌প্লানেড ও ধর্ম-তলা (অন্তত আজকাল লোকে তাই বোঝে) —কিন্তু তবুও তফাৎ অনেক-খানি, এবং সেই তফাৎ বলা বাহুল্য আঞ্চলিক নয়, আন্তরিক। বস্তুত, গড়িয়ার সঙ্গে গড়িয়াহাট এবং বালীর সঙ্গে বালীগঞ্জের যে তফাৎ, এস্‌প্লানে-ডের সঙ্গে ধর্মতলার তফাৎ-ও প্রায় ততোখানিই। এস্‌প্লানেড বললেই মনে পড়ে গ্র্যান্ড হোটেলের অর্কিড, নিউ মার্কেটে টাকার অফুরন্ত ওড়াউড়ি, সিনেমা হলের সামনে খুশির বন্যা, গাড়ির মধ্যে শিষ্ট আর সুখী মানুষ; আর ধর্মতলা মানেই, ট্র্যাফিক জ্যাম, বিক্ষোভ মিছিল, হকারের চিৎকার, নোংরা রাস্তা, সারিবদ্ধ ফুচকাওয়ালা, ছুটন্ত মানুষ এবং তৎপর পকেটমার।

তবু তারা একই জায়গা, ধর্মতলা ও এস্‌প্লানেড, যেন পরস্পরের গায়ে লেপ্টে আছে। যে ব্যক্তির সাধারণ জ্ঞান খুব কম, সেও জানে যে, পৃথিবীর একমাত্র যে শহরে উল্টো জিনিস পাশাপাশি চলে, সেই শহরের নামই কলকাতা। এস্‌প্লানেড কলকাতার এই ভুবনবিদিত বৈশিষ্ট্যের প্রতিনিধি। কিছুকাল আগে পর্যন্ত নেহরুর সেই অমরবাণী 'বিদেশীকে অতিথি ও বন্ধু হিসেবে অভ্যর্থনা করো' যে এই অঞ্চলেই শোভা পেতো, এটা খুবই আজব। আমাদের বিদেশী অতিথি এই অঞ্চলে কী দেখতে পান, জানতে ইচ্ছে হয়। এবং তিনি এস্‌প্লানেড বলতে যা বোঝেন, তৃণাচ্ছাদিত ভূমি, যার একদিকে দুর্গের গোপনতা অন্যদিকে শহরের কোলাহল এবং যে ভূমির উপর দিয়ে আনন্দে পদচারণা করা যায়—তাঁর সেই ধারণা কতটুকু মেটায় কলকাতার এসপ্লানেড? আজ থেকে একশ' বছর আগে মহারাণী ভিক্টোরিয়ার আমলে হয়তো তাঁরই কোন পূর্বপুরুষ প্রেয়সীর হাত ধরে পরম নিশ্চিন্তে ঘুরে বেড়াতো এই অঞ্চলে, কিংবা বগি ছোটাতো গড়ের মাঠে; তখন এস্‌প্লানেড বলতে বাংলা-দেশেরই প্রায় একটি গ্রাম বোঝাতো, যে গ্রামের মাটি আর হাওয়া ছিল সাহেবদের ভোগ্য। সেই গ্রাম ইতিমধ্যে আবহাওয়ার পরিবর্তনে নিরন্ন অঞ্চলে পরিণত হয়েছে,

জানি না, আমার মতো অনেকের কাছে এস্‌প্লানেডে ঘুরে বেড়ানো একটি সর্বনেশে কথা কি না। চার-পাঁচ বছর আগেও যে ব্যাপারটি ছিল অতীব কাম্য, মনোরঞ্জক আজকাল তাই হয়ে উঠেছে, পদে পদে বিপদসঙ্কুল ও মারাত্মক। তবু জীবন ও জীবিকার তাগিদে প্রতিদিন হাজার হাজার মানুষকে এখানে আসতে হয়, অনেকের জীবিকার স্থায়ী ক্ষেত্রও বটে এই অঞ্চল। এবং এই তাগিদে কলকাতার একটি বিশিষ্ট এলাকাকে স্থায়ী ক্ষেত্রে পরিণত করতে গিয়ে, রাস্তায় যতো নোংরা এখন জমে উঠেছে তার বোধ হয় কোনো তুলনা নেই। আমার বিশ্বাস, যে কোন ব্যক্তি বিকেলবেলা গ্র্যান্ড হোটেল থেকে ধর্মতলা স্ট্রীটের মোড় পর্যন্ত হেঁটে যাওয়াকে স্নায়ুর চরম পরীক্ষা বলেই মনে করেন। জমাট ভিড়,

সবিনয় নিবেদন

গত সংখ্যায় সম্পাদকীয় নিবন্ধের তৃতীয় স্তম্ভের ষষ্ঠ পঙক্তিতে ছাপা হয়েছে 'নেই—আউটরাম ঘাটের অশ্বারূঢ় একটি'। ঐ পঙক্তিটির যথাযথ রূপ হবে 'নেই—আউটরামের অশ্বারূঢ়'।

পূর্বপুরুষের ভ্রমণের আনন্দ আর নেই, অতিথিদের মনে এখন হারিয়ে যাবার ভয়। সাহেবরা তবু এই অঞ্চলের মায়া কাটাতে পারেন না, কারণ এখানেই আছে তাঁদের উপযোগী হোটেল আর বাড়ি, আর তাঁদের জ্ঞাতব্য ভারতীয় দারিদ্র্য ও নোংরামি।

রাণী ধূপ
কাকার প্রডাক্টস

পা ফেলার জায়গা পর্যন্ত নেই, মানুষ স্তব্ধ, ভিড়ই চলেছে—একবার সেদিকে তাকালেই মহাকবি দান্তের সেই লাইনটি মনে পড়ে নরকভোগী অজস্র অসুখী মানুষের মিছিল দেখে যখন তিনি লিখেছিলেন, 'আমি তো কখনো ভাবিনি মৃত্যু এতো মানুষকে রেহাই দিয়েছে।'

কলকাতা শহরে প্রতি বছর হাজার হাজার লোক প্রবেশ করছে দু'পয়সা রোজগারের জন্য; আর এই শহরের এমন মজা যে, এখানকার মাটিতে পয়সা ছড়ানো আছে, শুধু একটু কুঁজো হতে পারলেই তা হাতের মুঠোয় আসে। আপনি শুধু এস্‌প্লানেড অঞ্চলে বিভিন্ন ধরণের হকার-দের কথা ভাববার চেষ্টা করুন, সেখানে একজনও বাঙালিকে খুঁজে পাবেন না আপনি। বিভিন্ন প্রদেশের লোক, কেউ তাদের কানে কলকাতার কথা তুলে দিয়েছে, আর পায় কে—কিছু জিনিস, ধরা যাক সস্তার জামাকাপড়, বিচিত্র পুতুল, আট আনা দামের ফাউন্টেন পেন বা ঐ ধরণের কিছু সাজিয়ে তারা বসে গেল আপনার রাস্তা আটকে। কিছু বলতে পারবেন না, যদিও অসীম বিরক্তিতে আপনার বারবার ইচ্ছে করবে পদাঘাতে রাস্তা পরিষ্কার করতে। আমি জানি এমন কথা বলাও মহাপাপ, কেন না তা হলে আমাকে প্রাদেশিক বলে শাস্তি দেওয়া হবে। বাংলা দেশের বাবুরা কাজ করেন না, সেজেগুজে বসে থাকেন, কলকাতা চালায় অবাঙালিরা—এই রকম একটি মৌলিক কথা সম্প্রতি দিল্লীর একজন নেতা বলে ফেলেছেন। সেই পূজনীয় নেতাকে আমাদের প্রশ্ন—কলকাতা নোংরা করে কারা এ সম্পর্কে তার মৌলিক চিন্তা কী বলে? এস্‌প্লানেডে যে এতো নোংরা, আখের ছোবড়া, চেটে ফেলে দেওয়া শাল-পাতা, কলার খোসা, পানের পিকের গড়িয়ে যাওয়া—এ সমস্তের জন্য তিনি কোন্ ঘৃণ্যতকারী কারণ উপস্থিত করবেন? তাঁকে চিন্তায় সুযোগ দিয়ে আমাদের বক্তব্য জানিয়ে দেওয়া যাক—এবং সেই বক্তব্য অনুসারে কলকাতা নোংরা করে তারাই যারা কলকাতায় পরবাসী, যাদের এই মহানগরীর সৌন্দর্য-রক্ষার প্রতি কোন দায়িত্ব নেই, কোনক্রমে দু'পয়সা শুষে নিতেই যাদের আগমন, আমাদের ঠকাতে পারলেই যারা মোক্ষ লাভ হয়েছে বলে মনে করে।

কলকাতার রাস্তাঘাটের দুরবস্থা সম্পর্কে কর্পোরেশনকে দায়ী করা আমাদের অনেক দিনের অভ্যাস। কিন্তু শুদ্ধ মানুষ মাত্রই স্বীকার করবেন যে, এই নগরীর হাল এখন এমন যে, তাকে পরিচ্ছন্ন আবর্জনামুক্ত রাখা একা কর্পো-রেশনের পক্ষে দুঃসাধ্য। সুখের বিষয় বিশ্বব্যাঙ্কের প্রেসিডেন্ট ম্যাকনামারার আগমনের পর থেকে কলকাতার ভবিষ্যৎ সম্পর্কে নেতারা খুব চিন্তিত হয়ে পড়েছেন—কেউ বলছেন, কলকাতার জন-সংখ্যা কমিয়ে পাঁচিশ লক্ষে আনতে, কেউ বলছেন জন-আগমন নিয়ন্ত্রণ করার জন্য 'প্রবেশ কর' বসাতে। প্রথমটি যদি কলকাতার পক্ষে মারাত্মক হয়, তবে দ্বিতীয়টি অবাস্তব। কলকাতা এখন ভারতবর্ষে তথা বিশ্বে এমন এক স্থান গ্রহণ করে আছে যে তার লোকসংখ্যা বা তাকে বন্ধ নগরী ঘোষণা করা মানে ভারতভূমিরই ক্ষতি করা। একমাত্র কল-কাতা উন্নয়নের দ্বারাই এই নগরীর সমস্যার সমাধান সম্ভব, কিন্তু যেখানে কোটি কোটি টাকার খেলা, মন্ত্রী এবং মতের যে ঘন ঘন পরিবর্তন সেখানে হবে তাতে আর আশ্চর্য কী?

সম্পদের সঙ্গে শ্রী আর দারিদ্র্যের সঙ্গে নোংরামির সহাবস্থান সর্ববিদিত। কিন্তু এ কথাও ঠিক, সৌন্দর্যবোধকে পয়সা দিয়ে কেনা যায় না, শেষ পর্যন্ত তা রুচি আর মনোভঙ্গীর ব্যাপার। এমন ঘটা খুবই সম্ভব যে কলকাতায় যখন জলনিষ্কাশী ব্যবস্থা উন্নততর হবে, বাজারের মধ্যে আবর্জনা জমানোর জায়গা নির্দিষ্ট থাকবে না, রাস্তাঘাট ভালো হবে। সব মিলিয়ে তিলোত্তমা না হলেও মনোরমা হবে কলকাতা, তখনও এসপ্লানেডে ট্রাম লাইনের ধারে ধারে বাঁদরনাচ দেখানো হবে, দাঁতের স্বাস্থ্য রক্ষার জন্য বক্তৃতা চলবে, হকারদের প্রতিপত্তি অব্যাহত থাকবে—এমন ঘটা খুবই সম্ভব। এ কথা আমাদের বলা সাজে না যে চোখকে তৃপ্তি আর পা-কে স্বচ্ছন্দ গতি দেবার জন্য গরীব লোকের রুটি কেড়ে নাও; কিন্তু এ কথা নিশ্চয়ই বলবো যে, শহরের কোন কোন অঞ্চলে যেন বিনা শর্তে ফেরিওয়ালাদের হাতে ছেড়ে দেওয়া না হয়। শুনেছি ফেরি-ওয়ালারা খুব উপযোগী—তাদের কাছ থেকে সস্তায় জিনিস পাওয়া যায়, তারাই গরীব ক্রেতার ভগবান। তারা বিদায় নিক, এ কথা উচ্চারণ করা তাই আমার পক্ষে স্পর্ধা। এমন কি যে মধ্যপ্রদেশী ব্যক্তি রাস্তায় অধের মতো থুথু ফেলেন, তিনিও মানুষ সুতরাং বিশ্বাসযোগ্য, যাঁরা রাস্তায় কলার খোসা ফেলেন তাঁরাও পথচারীর পায়ের হাড় ভাঙতে চান না নিশ্চয়ই এবং তজ্জন্য ক্ষমার্হ। আসলে কার দোষে আমাদের এই শহরের সুন্দর স্থলগুলি অকুস্থলে পরিণত হচ্ছে আমরা জানি না, আমাদের জানা উচিত নয়। এ বিষয়ে আমরা শুধু একটি কাজই করতে পারি—তা হচ্ছে প্রশাসনের বিরুদ্ধে শুনো কিছু মন্তব্য ছুঁড়ে দেওয়া, কিংবা, এই আমার মতো, সমস্ত রাগ আর আক্রোশকে সরল গদ্যে তরল করে দেওয়া।

শ্রীরামচরিত-মানস

ভক্তকবি তুলসীদাস

অধ্যাপক শিবপ্রসাদ গঙ্গোপাধ্যায় কর্তৃক বঙ্গানুবাদ

শ্রীরামচন্দ্রের বন্দনা-গানে ভারতবর্ষের বহু গুণী ও জ্ঞানীজন লেখনী ধারণ করিয়া আত্মোৎকর্ষ করিয়াছেন। সেই সকল অমর লেখনী প্রতিভা-নির্ঝরে ভারতবর্ষের মহাকাব্য পৃথিবীর সাহিত্যে স্বীয় বৈশিষ্ট্যে সমুজ্জ্বল। ভক্তকবি গোস্বামী তুলসীদাস তন্মধ্যে অন্যতম—যিনি সহজ সরল ভাষায় পতিতপাবন সীতা-রামের চরিত্র বর্ণনা করিয়াছেন সুমধুর সঙ্গীতের মাধ্যমে। তুলসীদাসের জীবনসর্বস্ব মহামানব শ্রীরাম-চন্দ্রের সেই বন্দনা-গানের সুললিত বাংলা অনুবাদ এই প্রথম—বসুমতী সাহিত্য মন্দিরের অপূর্ব কীর্তির নূতন এক পরিচয়। এই শ্রীরামচরিত-মানস। বহু রঙীন চিত্রে সুশোভিত।

মূল্য—১ম খণ্ড তিন টাকা, ২য় খণ্ড তিন টাকা

বসুমতী প্রাইভেট লিমিটেড: ১৬৬, বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী স্ট্রীট, কলি-১২

গ্রন্থমেলা

সমাজ-সাহিত্য-সংস্কৃতি ঃ রণজিৎকুমার সেন। মোহন লাইব্রেরী ঃ ৩৫/এ, সূর্য সেন স্ট্রীট, কলকাতা—৯। দাম—৮ টাকা।

সমাজের সঙ্গে সাহিত্য ও সংস্কৃতি ওতপ্রোতভাবে জড়িত। কিন্তু এর প্রতিটি বিষয়ই এত ব্যাপক ও জটিল যে, এক কথায় তাদের সংজ্ঞা নিরূপণ করা সহজসাধ্য নয়। সমাজসম্পর্কিত বহু কথা প্রায়শই আলোচিত হয় বটে, কিন্তু সমাজের মূল বিষয় সম্পর্কে অনেকেই সচেতন নয়। সাহিত্য ও সংস্কৃতি সম্পর্কেও তাই। আলোচ্য গ্রন্থে এই বিষয়গুলির প্রাঞ্জল বিন্যাস লক্ষ্য করে আমরা তাই আশ্বস্ত হই। মোট ছত্রিশটি অধ্যায়ে গ্রন্থখানি সম্পূর্ণ। গ্রন্থের নামানুসারে বিষয়গুলিও নানা বর্ণনাবৈচিত্র্যে সুবিন্যস্ত। বাংলার সুবর্ণযুগের সঙ্গে অধুনাতন বিবর্তনকালের পার্থক্য—সর্বভারতীয় ভাষা-সমস্যার সঙ্গে শিক্ষা, সংস্কৃতি, সাহিত্য, লোকাচার প্রভৃতির তুলনামূলক বিচার—বাঙালী হিন্দু নারীর সমস্যা, যুব-সমাজের সমস্যা ও সামাজিক বিবর্তনের ধারা থেকে শুরু করে কেশবচন্দ্র, জগদীশ বসু, গিরিশ ঘোষ, রবীন্দ্রনাথ, প্রফুল্লচন্দ্র, বিবেকানন্দ, অশ্বিনী দত্ত, নবীন সেন, হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, প্রমথ চৌধুরী, দীনেশ সেন, রামেন্দ্রসুন্দর, গ্রন্থাগার বিজ্ঞান, চলচ্চিত্র ও সাহিত্য। জীবন ও জীবিকাসমস্যা, রাষ্ট্র ও সামাজিক সমুন্নতি, ধর্ম ও দর্শন—এমন বিষয় নেই, যা প্রজ্ঞাবান শিল্পীর মরমী লেখনীতে বিস্তৃতভাবে রূপ পায় নি। লেখকের দৃষ্টি সমাজতন্ত্রবাদী দৃষ্টি এবং বলতে বাধা নেই যে, এই সমাজ-তন্ত্রবাদ সাম্যবাদমুখি। সমাজে ব্যক্তি-বিবর্তন ও ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের সূত্রে এই সমাজতন্ত্রবাদের সঙ্গে পাঠক নতুন করে পরিচিত হবার অবকাশ পাবে। গ্রন্থভুক্ত 'প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্যে চীন প্রসঙ্গ' এমন একটি বিষয়—যা ইতিপূর্বে সমকালীন কোনো সাহিত্যে আমরা পাই নি। মহাভারত, পুলকেশীর শিলালিপি, ললিত বিস্তর, কথাসরিৎসাগর, ভাব-প্রকাশ, বৈদ্যকশাস্ত্র, দশকুমারচরিত প্রভৃতি ভারতীয় গ্রন্থ উদ্ঘাটন করে লেখক যেভাবে চীন প্রসঙ্গ বর্তমান-কালের পরিপ্রেক্ষিতে তুলে ধরেছেন, তা শুধু প্রশংসারই দাবি রাখে না, সেই সঙ্গে লেখকের পাণ্ডিত্যও প্রমাণিত হয়। বর্তমানকালীন রাষ্ট্রিক অসন্তোষ, যুবক সম্প্রদায়ের উদ্দামতা ও নানাবিষয়ক সামাজিক ব্যাধিগুলিও লেখক নিপুণভাবে বিচার করে দেখিয়েছেন—একটা বিরাট বিপুল বিপ্লবাত্মক পরিবর্তন অবশ্যই কাম্য—যার মধ্য দিয়ে মানবাত্মা এবং সেই সঙ্গে তার সুকুমার বৃত্তিনিচয়ের সার্থক স্ফুরণ সম্ভব। সেই সম্ভাব্যতার প্রত্যাশাই একালের প্রতিটি বুদ্ধিবাদী মানুষের প্রত্যাশা, এবং এই প্রত্যাশার জন্যেই তার সংগ্রাম। সমাজ, সাহিত্য ও সংস্কৃতির ধারাবাহিক ইতিহাস না হয়েও ঐতিহাসিক মর্যাদায় গ্রন্থখানি উজ্জ্বল।

একটি দিনের জন্মদিনে (জ্যৈষ্ঠ, ১৩৭৫) ঃ কল্যাণকুমার দাশগুপ্ত। পিলগ্রিম পাবলিশার্স, ১৮বি/১বি টেমার লেন, কলকাতা-৯। দাম সাড়ে তিন টাকা।

শ্রীকল্যাণকুমার দাশগুপ্তের দ্বিতীয় কাব্যগ্রন্থ "একটি দিনের জন্মদিনে"-তে গীতিকবিতার সহজ স্বচ্ছন্দ সুরটি সাবলীল ধারায় প্রবাহিত। 'জলের ভাপে', 'অচিন পাখি', 'মেঘলা অপেক্ষা', 'কাছে দূরে', 'নদীকে', 'শাশ্বতী' প্রভৃতি কবিতা তাই যে কোন কবিতা পাঠকেরই ভাল লাগবে। 'ট্রেনে যেতে যেতে' কবিতায় গ্রামবাংলার পরিচিত দৃশ্যপটের সঙ্গে আমাদের নতুনভাবে দৃষ্টিবিনিময় হয়। ভগিনী নিবেদিতাকে নিবেদিত 'অমর্ত্যের আবেদন' এবং মার্টিন লুথার কিং-এর স্মরণে লেখা 'অমৃত প্রার্থনা' দুটি আলোকিত রচনা। জওহরলাল নেহরুর উদ্দেশ্যেও তিনি কবিতা লিখেছেন। ২১শে ফেব্রুয়ারীর ১৯৫২-র পূর্ববঙ্গের ভাষা শহীদদের স্মরণে লেখা 'প্রতিদিন আমি', 'পায়ে পায়ে' ইত্যাদি কবিতায় কবির প্রগতিশীল মনের পরিচয় পাই। যুগযন্ত্রণা একটি কবিতায় প্রকাশ করেছেন কবি—

'অন্ধকার তাড়াতে তাড়াতে ভোর
চারটেয় এনে ফেললুম।
...আমার গলিটা—ভোরের রাস্তায় গিয়ে
কবে সমুদ্র হবে?
(ভোরের রাস্তায়)।

সংশয়-সন্দেহ-প্রশ্ন জেগেছে কবির মনে—'ভালবাসা ধ্রুব' এই স্বর্গীয় মিথ্যার উচ্চারণ / সাম্প্রত সত্যের মর্ত্যে কারো মুখে আদৌ কি সম্ভবে?' (প্রেম, মৃত্যু, প্রার্থনা)।

কয়েকটি অন্ত্যমিল উল্লেখ করার মত—যেমন "আশ্চর্য" কবিতায়—'রোজ' এর সঙ্গে 'সহজ'; "দুপুর-সন্ধ্যা" কবিতায় 'প্রাণ-মন তো' এর সঙ্গে 'আদ্যন্ত'; "অমর্ত্যের নিবেদন"-এ 'মৌসুমী' এর সঙ্গে 'কুসুমই'। একটি উপমা সবারই ভাল লাগবে—'কাক ডাকা ভোরে শিশুকে মায়ের মতো রাস্তাকে স্নান করাচ্ছে / দুই ওড়িশী মজুর।' (ভোরের রাস্তায়)। অনেক সময় অত্যধিক অন্ত্যমিলের ঝোঁক শ্রুতিকটু, যেমন দেখি "নগ্ন-সত্ব" ও "ত্রিওলেত" কবিতায়। "মধ্যরাত্রে অন্ধ-কারে" কবিতায় কাঁদলাম, ছাড়লাম, হলাম, করলাম ইত্যাদির ব্যবহার শ্রুতি-সুখকর নয়। 'সূর্যিত হাত' (অনন্য) 'বিজ্ঞতার ক্যান্টিলেভার ব্রিজে' (দুপুর-সন্ধ্যায়), 'সূর্য বৈশাখী/দীঘির আয়নাকে দিয়েছে ভেঙে নাকি!' (হাইফু) ইত্যাদি রূপকল্প সুপ্রযুক্ত।

'একটি দিনের জন্মদিনে' কাব্যগ্রন্থটি আধুনিক কাব্যপিপাসুদের দৃষ্টি আকর্ষণ করবে বলে মনে করি।

ধ্রুব রায় অঙ্কিত প্রচ্ছদটি সুন্দর। ছাপা ও বাঁধাইও ভাল।

আধুনিক পোলট্রি পালন (৪র্থ সংস্করণ) ঃ শ্রীশান্ত ঃ প্রকাশক—শ্রীতপন-কান্তি দত্ত, ১৭৮, মহারাজা নন্দকুমার রোড, সাউথ, বরাহনগর, কলকাতা—৩৬। মূল্য ঃ ৬ টাকা।

পারিবারিক প্রয়োজনে হাঁস-মুরগী পালনকে সহজতর এবং বিজ্ঞানসম্মত করে তোলবার জন্য শ্রীশান্ত এই বইটি লিখেছিলেন। এটির ৪র্থ সংস্করণ প্রকাশনার মধ্যে দিয়েই বোঝা যাচ্ছে যে, বিগত কয়েক বছরের মধ্যে বইটি যথেষ্ট জনপ্রিয়তা অর্জন করেছে। আমাদের দেশে গত কয়েক বছরের মধ্যে পোলট্রি বিষয়ে বেশ কিছু উৎসাহ সঞ্চারিত হয়েছে। এ ব্যাপারে যাঁরা আগ্রহী পোলট্রি সংক্রান্ত সমস্ত বিষয়গুলি তাঁদের বিশদভাবে জানা প্রয়োজন। পালিত হাঁস-মুরগীর সংক্রামক ব্যাধিতে মৃত্যু পোলট্রির মালিককে সবচেয়ে হতোদ্যম করে তোলে, এবং এর জন্য বহু প্রতিষ্ঠান পাখী-পালনের ব্যবসা বন্ধও করে দেন। তাই এদেশের আবহাওয়ায় নানা জাতের পাখীর রোগের কারণ, তার সঠিক চিকিৎসা এবং সাধারণভাবে সেগুলিকে ঠেকিয়ে রাখবার বহু প্রকৃষ্ট প্রথাই গ্রন্থ-টিতে আলোচনা করা হয়েছে। এ ছাড়াও পোলট্রি ব্যবসা চালাতে গেলে কিভাবে সে কাজে হাত দেওয়া উচিত তার বিভিন্ন দিক অতি সুন্দরভাবে বর্ণিত হয়েছে। আমরা বিনা দ্বিধায় মন্তব্য করতে পারি যে, এই গ্রন্থটি বাংলা ভাষায় একটি অতি প্রয়োজনীয় সংযোজন।

জনমতের আলোয়

শিশির গুহ

আর ক'দিন পরই বাংলা দেশের ভাগ্য নির্ধারিত হয়ে যাবে। নীতির লড়াই, আদর্শের সংঘাত, রাজনৈতিক চেতনার উন্মেষ, প্রেস্টিজ সীট্ ইত্যাদি বড় বড় কথাগুলিও থেমে যাবে আপাতত, থেমে যাবে 'ভোট ফর, ভোট নট'-এর হাজার মিনতি, রাস্তা বন্ধ করে বড় বড় মিছিল। আর নয়ন-লোভন পোস্টারে শহর, নগরের সর্বত্র ছয়লাপ হতে দেখা যাবে না। কাগজ কুড়ানেওয়ালাদের চেষ্টায় অসীম পরিতৃপ্তিতে কোটি কোটি পোস্টারে উচ্চকিত দেশসেবার আবেদন মুহূর্তে বস্তাবন্দী হয়ে যাবে।

তবু নির্বাচনের প্রাক্-মুহূর্তে সাধারণ মানুষ সহস্র জল্পনা-কল্পনার আমেজী উত্তেজনায় এক অদ্ভুত স্বাদের অংশীদার হয়ে আছেন। আগের নির্বাচনগুলিতে মূলত রাজনৈতিক নামধারী দলগুলি নির্বাচনী আসর সরগরম করে রাখতো কিন্তু এবার অনেক নতুন আনকোরা দল, উপদল, বিরোধী গোষ্ঠী, বিখ্যাত, কুখ্যাত নেতা, হবু-নেতা সবাই কোমর বেঁধে দেশসেবার মহান ব্রতে নেমেছেন। এই সমস্ত বাক্‌সর্বস্ব সবজান্তা নেতৃবৃন্দ কিছুতেই দেশসেবা না করে ছাড়বেন না, তাই সর্বত্র দিস্তে দিস্তে হাজার দফা কাজের ফিরিস্তি আর কোটি কোটি সুললিত শ্রবণসুখকর মধুর বাণী।

গণতন্ত্রের সবচেয়ে বড় দাওয়াই এই নির্বাচন। গুলী, লাঠি, হত্যা, অত্যাচার, বন্যা, মহামারী সব কিছুকেই নির্বাচনী স্রোত ধুয়ে মুছে সাফ করে দেয়। নির্বাচন যেন 'কিছুই যাবে না ফেলা' কথাটা মনে রেখে জোর কদমে অশ্বমেধের ঘোড়ার মত ছুটে চলেছে।

তাই অগুণতি শহীদের নাম স্মরণ করে জাতি, দেশ, প্রদেশের নাম উল্লেখ করে দেশবরেণ্য নেতার নাম ভাঙিয়ে চলেছে নির্বাচনী নাটক, তাই ভাঁওতা, যুক্ত-বিযুক্ত, কোয়ালিশন, দলছুট্ ঠেকা-দেওয়া পার্টি ফথাগুলি এখন মুখে মুখে প্রচারিত। প্রার্থীদের কোটি কোটি বক্তৃতার পরেও বাঘা বাঘা নেতৃবৃন্দের বেশ কয়েক রাউন্ড ঘুরে ফুলমালায় নিত্য ও প্রত্যহ আকাশ-বাতাস মুখরিত। কাশ্মীর থেকে কন্যাকুমারিকা যেন একাকার হয়ে গেছে এ রাজ্যে। গানের মূল কথা 'আমরা ভাল—আমি ভাল', আর এই ভালত্ব প্রমাণ করার জন্যই সমস্ত বুদ্ধিকে একত্রিত করে ভোট শিকারের ফাঁদ সর্বত্র।

এ তো হোল শিকারীদের কথা, আর যাঁরা শিকার হতে চলেছেন তাঁরা। সহস্র ভাবনা-চিন্তার বেড়াজালে তাঁরা মুহ্যমান। স্বাধীনতার স্বাদ কি অপূর্ব, পর পর কোটি কোটি টাকা ব্যয় করে নির্বাচন যজ্ঞ অনুষ্ঠিত হয়ে চলেছে, কিন্তু তিমির রাত্রির শেষ কোথায়? তবুও এ বলে আমায় দ্যাখ, ও বলে আমায় দ্যাখ।

আজও সেই চিরাচরিত পুরনো দিনগুলোর মত গ্রামের মানুষরা দু' মুঠো ভাতের কাঙাল, সেই ভাঙা ঘরে বসে আগামীকালের চিন্তা। জগতের কোথায় কোন ভি-আই-পি কোন চিত্রগৃহের দ্বার উন্মোচন করলেন এ-খবর তাদের জীবনে নিতান্তই গৌণ। সারা জীবন গাঁয়ের জোতদারের কাছে মাথা বিকিয়ে দেড়গুণে-দুগুণ সুদে ধান, টাকা নিয়ে যাদের দিন গুজরান, তাদের কাছে নির্বাচনের সুফল, কুফল একসুরে বাঁধা।

নির্বাচনের কথা উঠতেই পশ্চিম দিনাজপুরের অখ্যাত গ্রামের সমাই হাঁসদা বলছিল—বাবু, কিসের ভুট দিবি হামরা? ভুখে জান চলি যায়, তুখন কি ই বাবুরা হামাক দিখ্‌বা আসে? ইখন খালি মিছি-মিছি ভুট-ভুট বুলে। এই সরল সহজ মানুষগুলোর চোখের দিকে তকালে গণতন্ত্র, নির্বাচন, সভ্যতা সব কিছু যেন ব্যর্থ মনে হয়, মনে হয় আমরা যারা সার্থক গণতন্ত্রের দোহাই দিই তারা এই অগণিত অশিক্ষিত, নিরক্ষ মানুষের দারিদ্র্যের সুযোগে তাদের শুধু বঞ্চিতই করি, এ বঞ্চনা থেকে মুক্তির পথ কোথায়?

মালদার এক কেন্দ্রে ধর্মীয় ধুয়া তুলে নির্বাচনী বক্তৃতা চলছিল। শুনছিলাম জনৈক বক্তার ভাষণ—জাতি ও ধর্মের বিরুদ্ধে কি অদ্ভুত মস্তিষ্ক পরিকল্পিত অত্যাচারের কাহিনী, যদি শোনেন তবে এ দেশের উদ্ভট আজগুবি সিরিজের লেখকরাও লজ্জা পাবেন। ধর্মীয় জিগীরের বিষক্রিয়া কি সুন্দরভাবে ছড়াচ্ছে নির্বাচনের মাধ্যমে। আর তাতে মদৎ জোগাচ্ছেন তাঁরা যাঁরা অন্য একটি রাজনৈতিক দলকে নিত্যদিন কবর দেবার স্বপ্ন দেখছেন। প্রাচীরে প্রাচীরে বিপ্লবের বান ডেকেছে, কত অসংখ্য জায়গায় যে পরস্পর পরস্পরকে কবর দিচ্ছেন তার শেষ নেই।

সমান তালে পাল্লা দিচ্ছে কবিকুল। গংগারামপুর, ইটাহার কুশমণ্ডীতে কবিতার ছড়াছড়ি, ছোট ছোট ছড়ার বই, নির্বাচনী ভাঁওতা—লে-লে বাবু ছ' আনা। এবারের নির্বাচন অদ্ভুত সংযোজনের বিচিত্র সমাহার। মিটিং-এর একনিষ্ঠ শ্রোতা গ্রামের কৃষক দিলজান মণ্ডলকে জিজ্ঞেস করলাম—কেমন মনে হয় এবার? হাসলো মণ্ডল সাহেব—হু, সব সমান, কংগ্রেস-কম্যুনিস্ট সবার চোখেই ছানি পুরিছে, গরীব দ্যাখবার কেও নাই। তা হলে মিটিং শুনতে কেন! মাথা দুলিয়ে বললেন বৃদ্ধ—ইটা তো গাওনার মতন, আলকাপ, গম্ভীরা যেমন শুনি ইটাও তেমনি শুনতে মজা লাগে। অবাক চোখে ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে ফিরে আসতেই আলাপ হোল প্রেমগোপাল প্রধানের সাথে। মঙ্গোলিয়ান রক্তের মানুষ এরা, শক্ত সবল দেহে উদয়াস্ত জমিতে খেটে-খাওয়া মানুষ। একদা তেভাগা আন্দোলনের শরিক হয়েছিলেন শ্রীপ্রধান।

নির্বাচনের কথা উঠতেই তিনি বললেন, হামার দ্যাশে কংগ্রেস ছাড়া আর দল কই? কম্যুনিস্টরা তো খালি ভাঙি যাচ্ছে, ওসমাক ভোট দিলে বেবাক পয়মাল্ হবেক, হামার কংগ্রেসই ভাল, ওসমাকেই দিবা হবি।

প্রধানের পাশে দাঁড়িয়ে বৃদ্ধ দরবারী মণ্ডল কথা শুনছিল, হঠাৎ বলে উঠলো—আচ্ছা বাবু, তুমরা তো সব জানেন, আচ্ছা কহেন তো লীগ পার্টিটা কেমন? ওরা ভেলে হামাক জমিন বাড়ি, ঘর তামান ব্যবস্থা করি দিবি? আচ্ছা কংগ্রেস তো মেলায় দিন রাজা থাকিও কিছু কুইরবা পারলি না তাহলে কি লীগ পার্টি পারবি, কহেন তো?

অখ্যাত দৌলতপুর গ্রামের মানুষ দরবারী মণ্ডলের কথার উত্তর দিতে পারি নি। নিরসন করতে পারি নি ওর মনের সন্দেহ, সত্যি তো বিশ বছরের স্বাধীনতা-লব্ধ দেশ আজও যখন সাধারণ মানুষকে আশার আলো দেখাতে পারে নি, তখন দরবারী মণ্ডলের মত মানুষগুলোর প্রশ্নের কি উত্তর দেওয়া যায়।

গ্রামে গ্রামে ঘুরছিলাম, বার বার মনে হচ্ছিল দেশের সর্বত্র মহা সমারোহে প্রজাতন্ত্র দিবস উদ্‌যাপিত হচ্ছে, আর গ্রামের মানুষদের চোখে দু'মুঠো ভাতের স্বপ্ন।

ভাঙা-গড়ার দু বছর : এই নির্বাচনের পশ্চাদপট

পর্যবেক্ষক

[মতামত লেখকের]

মধ্যবর্তী নির্বাচনের একেবারে মুখে দাঁড়িয়েও পিছনের দিকে তাকাতে হচ্ছে। কেন না, পিছনের দু'-বছরের ভাঙা-গড়ার জের হিসাবেই তো হচ্ছে এই মধ্যবর্তী নির্বাচন। এই দু'-বছরের রাজনৈতিক সমস্যা ও সম্ভাবনাই এখনকার মতো একটা পরিণতিতে পৌঁছতে চলেছে এই নির্বাচনে। সুতরাং দু'-বছরের ঘটনাবলীর সঙ্গে মিল রেখেই দেখতে হবে এই মধ্যবর্তী নির্বাচনকে।

১৯৬৭-র সাধারণ নির্বাচনের পর থেকে ১৯৬৮-র শেষ পর্যন্ত প্রায় এই দু'-বছর ধরে দেশের শাসন-ব্যবস্থার চিত্রটি হচ্ছে একটা ভাঙা-গড়ার চিত্র। মোট দশটি রাজ্য এই ভাঙা-গড়ার মধ্যে এসে পড়েছে। এর মধ্যে কেরালা, মাদ্রাজ ও উড়িষ্যার অ-কংগ্রেসী গভর্নমেণ্ট থেকে গিয়েছে; কিন্তু মধ্যপ্রদেশ, রাজস্থান, হরিয়ানা, পাঞ্জাব, উত্তরপ্রদেশ, বিহার ও পঃ বাংলা চলেছে ওলট-পালটের মধ্য দিয়ে। এই ওলট-পালটের বাহ্য কারণ হচ্ছে দলত্যাগ। হয় কংগ্রেস থেকে দলত্যাগ হয়ে কংগ্রেস-বিরোধী পক্ষের সংখ্যাগরিষ্ঠ হয়ে যাওয়া, আর না হয় বিরোধী পক্ষ থেকে দলত্যাগ হয়ে কংগ্রেসের—সংখ্যাগরিষ্ঠতায় আসা। এবং এই টানা-পোড়েনের মধ্যেই রাজ্যে রাজ্যে অচল অবস্থা সৃষ্টি ও নতুন করে নির্বাচন ঘোষণা।

কিন্তু শুধু দলত্যাগ বললেই এই ভাঙা-গড়ার প্রকৃত রূপটি বোঝা যায় না। দলত্যাগের চরিত্র বিবিধ, তার রাজনৈতিক পটভূমিও বিবিধ। প্রথম; দলত্যাগকে দু'ভাগে ভাগ করা যেতে পারে—কংগ্রেস থেকে দলত্যাগ ও কংগ্রেস-বিরোধী পক্ষ থেকে দলত্যাগ। এই বিভাগ করলে একথা বলা যায় যে কংগ্রেস থেকে দলত্যাগই হচ্ছে এই পর্যায়ের পথপ্রদর্শক। মধ্যপ্রদেশ, হরিয়ানা ও উত্তরপ্রদেশে চতুর্থ সাধারণ নির্বাচনের পরের অবস্থা ছিল কংগ্রেসেরই সংখ্যাগরিষ্ঠতা। কিন্তু অচিরেই কংগ্রেস থেকে দলত্যাগ হওয়ার ফলে এই তিনটি রাজ্যে কংগ্রেস সংখ্যালঘু হয়ে গেল এবং বিরোধী পক্ষ সরকার গঠন করল। হরিয়ানায় পরে আবার ওলট-পালট হয় এবং মধ্যবর্তী নির্বাচনে কংগ্রেস সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করে। কিন্তু আবার কংগ্রেস থেকে দলত্যাগ হয়ে সে-মন্ত্রিত্বও ভেঙে গেল ও আবার মধ্যবর্তী নির্বাচনের ব্যবস্থা হচ্ছে।

কংগ্রেস-বিরোধী পক্ষ থেকে দলত্যাগ না হলে পঃ বঙ্গ, বিহার, উত্তরপ্রদেশ ও পাঞ্জাবে অ-কংগ্রেসী সরকারের পতন হত না। কিন্তু এই দলত্যাগের মধ্যেও প্রধান অংশে তো আরাই যারা আগে কংগ্রেস থেকে দলত্যাগ করে কংগ্রেস-বিরোধী হয়েছিল এবং এখন সুযোগ বুঝে আবার হয় পুরো কংগ্রেসী অথবা কংগ্রেসেরই সাহায্যকারী হয়ে দাঁড়িয়েছে। অর্থাৎ, দলত্যাগের যে প্রবণতা, তার মূল উৎস হচ্ছে কংগ্রেসই। তার অর্থ এই যে, কংগ্রেসের ক্ষমতা-প্রাধান্য কমে যাওয়ার অবস্থাটাই সৃষ্টি করেছে দলত্যাগের রাজনীতি। কেন্দ্রীয় সরকারের দিক থেকে আজকে উদ্বেগ প্রকাশ করা হচ্ছে এই রকম দলত্যাগে। দলত্যাগ বন্ধ করার জন্য কতকগুলি শর্ত আরোপ করার কথা উঠেছে দলত্যাগী এম-এল-এ প্রভৃতির ওপর। কিন্তু দলত্যাগের কারণ তো শুধু ব্যক্তির সুবিধাবাদই নয়, তার ভিত্তি তৈরি করে দিয়েছে কংগ্রেসেরই অনিশ্চিত অবস্থা, কোনো শর্ত আরোপ করে যা ঠেকানো যায় না।

দ্বিতীয়ত, রাজনৈতিক সংঘাতের দিক থেকেও দলত্যাগের ঘটনাগুলির দু'-রকম পটভূমি আছে। মধ্যপ্রদেশ, রাজস্থান এবং কিছুটা হরিয়ানাতেও দলত্যাগের ফলে গভর্নমেণ্টের যে অদল-বদল হয়েছে, তার পিছনে বামপন্থী বনাম কংগ্রেস সংঘাত নেই বলা চলে। মধ্যপ্রদেশ ও রাজস্থানে কংগ্রেস বনাম কংগ্রেস-বিরোধী সংঘাত মানে প্রধানত রাজন্যবর্গ ও কংগ্রেসের সংঘাত এবং তা সীমাবদ্ধ ব্যক্তি-প্রাধান্যের মধ্যেই। তাই এই দুটো জায়গাতেই কংগ্রেসও যেমন রাজন্যবর্গকে হাত করার চেষ্টা করেছে, তেমনি রাজন্যবর্গও চেষ্টা করেছে কংগ্রেসকে তাদের প্রভাবাধীন করতে। এবং দুই-ই হয়েছে নিছক ক্ষমতা-প্রাধান্যের জন্য, কোনো জন-নীতির সম্পর্ক তার সঙ্গে বিশেষ নেই। সেই জন্যই দেখা গেল যে, এই দুই রাজ্যের গভর্নমেণ্ট অদল-বদলের কোনো প্রতিক্রিয়া জনসাধারণের মধ্যেও এল না, বাইরেও তার জের পৌঁছল না। যেন একই দলের লোকদের মধ্যে কিছু ভাগ-বাঁটোয়ারা হয়ে সব ঠিক হয়ে গেল। হরিয়ানাতে ঠিক সেরকমটা না হলেও, খুব একটা দুশ্চিন্তাও নেই কংগ্রেসের হরিয়ানা সম্বন্ধে, কেন না, সেখানেও সংঘাতটা নিছক ক্ষমতার অংশলোভীদের মধ্যেই।

কিন্তু পঃ বঙ্গ, বিহার, উত্তরপ্রদেশ ও পাঞ্জাবের দলত্যাগের পরিপ্রেক্ষিতটাই আলাদা। কম হোক আর বেশি হোক, বামপন্থী শক্তির ভূমিকা এইসব রাজ্যের রাজনীতির গতি নির্ধারণ করছে। পঃ বঙ্গের যুক্তফ্রণ্টের মধ্যে বামপন্থী শক্তিই প্রধান। বিহারেও যথেষ্ট। কমিউনিস্ট, এস-এস-পি ও পি-এস-পি মিলে বিহারে প্রায় ১১৫। যুক্তফ্রণ্ট সরকারের নীতি-নির্ধারণের দিক থেকে তাই বামপন্থী শক্তির উদ্যোগ যথেষ্ট। উত্তরপ্রদেশে কমিউনিস্ট, এস-এস-পি, পি-এস-পি মিলে প্রায় ৭০। সেখানে জনসঙ্ঘ বড় শক্তি হলেও বামপন্থী শক্তির ভূমিকাও উল্লেখযোগ্য। পাঞ্জাবে কমিউনিস্ট ও এস-এস-পি মিলে মাত্র ৯ জন হলেও, এ-শক্তিকে উপেক্ষা করে অ-কংগ্রেসী সরকার হয় না এবং তাই এক-জন কমিউনিস্টকেও মন্ত্রী করতে হল। সুতরাং এইসব রাজ্যে কংগ্রেসের সঙ্গে কংগ্রেস-বিরোধিতার সংঘাত মধ্যপ্রদেশ, রাজস্থান প্রভৃতির সংঘাতের চেয়ে অনেক বেশি গভীর। বামপন্থী রাজনীতিকে বাধা দেওয়াই হচ্ছে এখানের সংঘাতের মূল চরিত্র। আর, বামপন্থী শক্তির প্রাধান্য যেখানে যত বেশি হবে, সেখানে তার ওপর আঘাতটাও হবে তত প্রত্যক্ষ। পঃ বাংলা ও বিহারের দলত্যাগ এই সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য নিয়েই। এবং সেই জন্যই সাংবিধানিক রীতিনীতিকে উপেক্ষা করেও দলত্যাগীদের সংখ্যালঘু গভর্নমেণ্টকে যুক্তফ্রণ্টের জায়গায় জোর করে প্রতিষ্ঠিত করার চেষ্টা কংগ্রেসের পক্ষ থেকে হয়েছে এই দুই জায়গায়। পঃ বঙ্গের ডঃ প্রফুল্ল ঘোষের দল ও বিহারের বি, পি, মণ্ডলের শোষিত দল, এই দুইয়েরই উদ্ভব হয়েছে প্রধানত বামপন্থী-বিরোধিতার জন্য। পঃ বঙ্গে জোর করে এই সংখ্যালঘু মন্ত্রিত্বকে বসানোর ফলে যে প্রতিকূল প্রতিক্রিয়া হয় সারা দেশে, সেই পরিপ্রেক্ষিতে বিহারে এই কৌশল ঠিক মতো সফল হল না বটে; কিন্তু তবু যুক্তফ্রণ্ট সরকারকে রক্ষা করা গেল না। পাঞ্জাবে দলত্যাগী সংখ্যালঘু গভর্নমেণ্ট বসানোর কৌশল সফল হল, কেন না অন্য রাজ্যগুলির তুলনায় সেখানে বামপন্থী শক্তি দুর্বল।

উত্তরপ্রদেশের চিত্রটা একটু স্বতন্ত্র।

কেন না, সেখানে যুক্তফ্রন্টের মধ্যেই বাম-পন্থী বনাম অ-বামপন্থীর প্রবল বিরোধ বেধে গিয়েছে। জনসঙ্ঘই সেখানে যুক্ত-ফ্রন্টের প্রধান শক্তি হওয়ায় বি-কে-ডি'র ওপর তাদের চাপ এবং মুখ্যমন্ত্রী বি-কে-ডি নেতা চরণ সিং-এর তাদের কাছে আত্ম-সমর্পণ এমন একটা অবস্থার সৃষ্টি করল যে, কমিউনিস্ট ও সোস্যালিস্ট মন্ত্রীরা পদ-ত্যাগ করতে বাধ্য হয়। যুক্তফ্রন্টের মধ্যেই যদি এমন বামপন্থী-দক্ষিণপন্থী বিরোধ জেগে ওঠে তাহলে কংগ্রেসের বামপন্থী-বিরোধী অভিযানকে তা সাহায্য তো করবেই। এই পরিপ্রেক্ষিতেই সেখানের দলত্যাগগুলি ঘটে, যার ফলে যুক্তফ্রন্ট সরকার টিকতে পারল না।

দলত্যাগের এই চিত্র দেখে কেউ কেউ হতাশ হল। তাঁরা বলেন, দলত্যাগ যদি এমনিভাবে হতে থাকে তবে প্রগতিশীল শক্তি এগোবে কি করে? আগেই বলেছি, দলত্যাগের প্রবণতা এসেছে কংগ্রেস থেকেই এবং কংগ্রেসের ভাঙনের অবস্থা থেকেই। কংগ্রেসের অনিশ্চিত অবস্থাকে যারা জন-সাধারণের দিক থেকে প্রকৃত নিশ্চিত অবস্থায় রূপান্তরিত করতে বদ্ধপরিকর এবং সে-সম্ভাবনায় বিশ্বাসী, অর্থাৎ প্রকৃত বামপন্থী শক্তি যারা, তারা কখনই দল-ত্যাগের ফাঁদে পড়ে না। দলত্যাগের ফাঁদে পড়ে তারাই যাদের রাজনীতি দোদুল্যমান, যাদের দৃষ্টি জনসাধারণের দিক থেকে সরে গিয়ে শুধু ব্যক্তিগত ও গোষ্ঠীগত ক্ষমতা-লোভেই নিবদ্ধ। অনিশ্চিত অবস্থা দেখলে এরাই চেষ্টা করে পাল্লা যেদিকে ভারী হচ্ছে সেই দিকেই ঝুঁকে পড়ার। ক্ষমতা-ভারসাম্যের বিপুল পরিবর্তন না হওয়া পর্যন্ত এবং বামপন্থী রাজনীতির প্রভাব এসে দোদুল্যমান রাজনীতিকে স্থির রাজনীতিতে পরিণত না করা পর্যন্ত এই ধরণের দলত্যাগের বিপদ থাকবেই। কিন্তু পরিবর্তনের পথে একটা স্তর তো থাকবেই যখন ভারসাম্যের পাল্লা খুব কাছাকাছি ওঠানামা করে। এ-স্তর পার না হয়ে হঠাৎ ভারসাম্যের বিপুল পরিবর্তন তো হতে পারে না। সুতরাং বিপদটা অস্বাভাবিক কিছু নয় এবং তার মোকাবিলা করেই চলতে হবে। এবং আগের বিপরীত ভার-সাম্যের স্তর থেকে এই স্তরে আসাটা যে-শক্তির জোরে সম্ভব হয়েছে, এই স্তর অতিক্রম করে বিরাট পরিবর্তনটাও সম্ভব হবে সেই শক্তির জোরেই। কেরালাকে দেখেই কি তা বোঝা যায় না? একদিন কেরালায় কংগ্রেস ও বামপন্থী শক্তির মধ্যে ভারসাম্য ছিল অত্যন্ত কাছাকাছি, আজ সেখানে ভারসাম্যের আমূল পরিবর্তন হয়েছে বামপন্থীদের অনুকূলে

কিন্তু এ তো গেল শুধু দলত্যাগ নিয়ে কথা। এইসব দলত্যাগের ঘটনা কোনটাই তো বিচ্ছিন্ন ঘটনা হিসাবে ঘটে নি, ঘটেছে দেশের সামগ্রিক রাজনৈতিক পরিস্থিতির অংশ হিসাবেই। অর্থাৎ, এই ভাঙা-গড়া সবকিছুই হচ্ছে কংগ্রেসের হাত থেকে দেশের শাসন-ক্ষমতার এক বড় অংশ চলে যাওয়ার প্রতিক্রিয়া। কংগ্রেসের সামগ্রিক নীতির দিক থেকে এ-প্রতিক্রিয়ার রূপ ঠিক কী, তা বোঝা দরকার।

যদি দু'-একটি মাত্র রাজ্যে কংগ্রেস সংখ্যালঘু হয়ে অ-কংগ্রেসী গভর্নমেণ্ট তৈরি হত, তাহলে প্রতিক্রিয়াটা হত কম। তাহলে অ-কংগ্রেসী শাসনের সঙ্গে সহ-অবস্থানের মনোভাব কংগ্রেসের থাকতে পারত। ১৯৫৭-তে কেরালায় কমিউনিস্ট গভর্নমেণ্ট তৈরি হলেও দু'-বছর তো সে-গভর্নমেণ্টকে কেন্দ্রীয় কংগ্রেস সরকার সহ্য করেছে। কিন্তু এবার পরিবর্তন তো একটা-দুটো রাজ্যে নয়, সারা দেশের জন-সংখ্যার অর্ধেক বা তারও বেশি চলে গিয়েছে কংগ্রেসী শাসনের বাইরে। কেন্দ্রেও কংগ্রেস-শক্তি যথেষ্ট হ্রাস পেয়েছে। এ অবস্থা সমগ্রভাবে কংগ্রেসের ক্ষমতা চলে যাওয়ার একটা স্পষ্ট পূর্বাভাষ। এই অবস্থার সঙ্গে সহ-অবস্থান মানে চলে-যাওয়া অবস্থাটাকেই স্বীকার করে নেওয়া। সেটা কংগ্রেস স্বীকার করে নিতে পারে কি? যদি কেরালা ও মাদ্রাজের মতো সর্বত্র প্রচণ্ডভাবে সংখ্যালঘু হয়ে যেত কংগ্রেস, তাহলে এই চলে-যাওয়া অবস্থাটা স্বীকার করা ছাড়া গত্যন্তর ছিল না। তখন দেখা যেত যে, একদিকে কংগ্রেসের আরো বেশি অংশ সেই পথ ধরেই কংগ্রেস ত্যাগ করে চলেছে, অন্য দিকে একটা ছোট অংশ কংগ্রেস-ক্ষমতা রাখবার জন্য এক চূড়ান্ত অথচ ব্যর্থ আত্মরক্ষার সংগ্রামে অবতীর্ণ হয়েছে, যে-সংগ্রামের রূপ হত চরম স্বৈরাচারেরই রূপ। কিন্তু অবস্থাটা সেরকম নয় আজকে। চলে-যাওয়া অবস্থার মধ্যেও কংগ্রেসের দিক থেকে এখনও রয়েছে আশা। কেন না, অধিকাংশ রাজ্যে কংগ্রেস ও কংগ্রেস-বিরোধী শক্তির মধ্যে ব্যবধান অত্যন্ত কম। এই কম ব্যবধানের সূত্র ধরে ক্ষমতায় ফিরে আসার প্রাণপণ প্রচেষ্টা তাই '৬৭-র নির্বাচনের পরমুহূর্ত থেকেই কংগ্রেস শুরু করে দিয়েছে। দলত্যাগ ঘটানো দিয়েই তাই নির্বাচন-পরবর্তী সপ্তাহটা আরম্ভ হল। আর, দলত্যাগ ঘটানোই যখন শাসন-ক্ষমতা দখলের এক-মাত্র পদ্ধতি হয়ে দাঁড়ায়, তখন সে-পদ্ধতি সুবিধাও করে যেমন, তেমনি তা বুমেরাঙ-এর মতো ফিরে আঘাত করেও বসে। রাজ-স্থানে দলত্যাগ ঘটিয়ে কংগ্রেস সংখ্যাগরিষ্ঠ হল, কিন্তু মধ্যপ্রদেশ ও উত্তরপ্রদেশে দল-ত্যাগই কংগ্রেসকে সংখ্যালঘু করে দিল। পরবর্তী পর্যায়ে পঃ বাংলা, বিহার, উত্তর-প্রদেশ, পাঞ্জাব, হরিয়ানাতেও দলত্যাগ ঘটিয়ে কংগ্রেস সাময়িক সুবিধা লাভ করলেও শেষ রক্ষা করতে পারে নি।

এই অবস্থার মধ্যেই ১৯৬৮-র জানু-য়ারীতে কংগ্রেসের হায়দ্রাবাদ-নীতি তৈরি হল যার মধ্যে দুটো কথা অত্যন্ত স্পষ্ট। এক: অ-কংগ্রেসী সরকারগুলিকে উল্টে দেবার নীতি, দুই: কোয়ালিশন সরকার গঠনে মঞ্জুরী দান। এখানে মনে রাখতে হবে যে, যে অ-কংগ্রেসী সরকারগুলির প্রতি কংগ্রেসের দৃষ্টি নিবদ্ধ হল তা প্রধানত সেইগুলিই যাতে বামপন্থীরা আছে, অর্থাৎ, পঃ বঙ্গ, বিহার, উঃ প্রদেশ ও পাঞ্জাব। মধ্যপ্রদেশ ও রাজস্থান নিয়ে কংগ্রেস দুশ্চিন্তাগ্রস্ত নয়, কেন না সেখানে বামপন্থার সম্ভাবনা কম। উড়িষ্যা নিয়েও মাথাব্যথা নেই বিশেষ, কেন না সেখানেও সরকারী নীতি বামপন্থা-ঘেঁষা মোটেই নয়। এইসব সরকারের সঙ্গে সহ-অবস্থানে কংগ্রেসের আপত্তি হবার কথা নয়। কিন্তু বামপন্থী শক্তির রাজ্যগুলোকে ফেরাতে না পারলে অবস্থা পরিবর্তনের কোনো আশা নেই কংগ্রেসের।

কংগ্রেসের হায়দ্রাবাদ-নীতি তৈরি হয় পঃ বাংলায় কেন্দ্র কর্তৃক দলত্যাগী সংখ্যা-লঘু গভর্নমেণ্টকে জোর করে প্রতিষ্ঠিত করার ব্যর্থ কৌশলেরই পরে। বামপন্থী সরকারকে উৎখাত করার অত্যুগ্র আগ্রহে প্রথমটা কংগ্রেস চলেছিল একটা জবরদস্ত নীতি নিয়ে। কিন্তু দেখা গেল, সে-নীতির ফল শুধু পঃ বাংলার দিক থেকেই খারাপ হল তাই নয়, সর্বভারতে তার প্রতিক্রিয়া কংগ্রেসকে অসুবিধায় ফেলল। সেই জন্যই হায়দ্রাবাদ কংগ্রেস থেকে তৈরি হল এমন এক নীতি যা দেখতে জবরদস্ত নয়, অথচ যার ফল অনেক বেশি স্থায়ী হবে। হায়দ্রা-বাদ কংগ্রেস জানিয়ে দিল, সংখ্যালঘু গভর্নমেণ্টকে সমর্থন করার বিসদৃশ পদ্ধতিটিই যে কংগ্রেস আঁকড়ে ধরে থাকতে চায় তা নয়। দরকার হলে কংগ্রেস অন্য পার্টির সঙ্গে মিলে কোয়ালিশন করতেও প্রস্তুত। স্পষ্টতই এর মধ্যে অনেক হিসাব আছে। প্রথমত, দলত্যাগীদের ওপর সম্পূর্ণ ভরসা কংগ্রেস করতে পারছে না। দ্বিতীয়ত, আজকের কংগ্রেস-বিরোধী আবহাওয়ার মধ্যে দলত্যাগীরাও সরাসরি কংগ্রেসে ফিরে আসতে সাহস করে না। এদের সাহায্যকে স্থায়ী করতে হলে অ-কংগ্রেসী দল হিসাবেই এদের সঙ্গে কোয়ালিশন করা দরকার। তৃতীয়ত, অনেক জায়গায় যুক্তফ্রন্টে এমন সব দল ও লোক আছে যাদের মধ্যে প্রবল কমিউনিস্ট-বিরোধী প্রবণতা রয়েছে। কোয়ালিশনের ভরসা দিলে হয়ত এদের কিছু কিছু যুক্ত-ফ্রন্ট ছেড়ে দিতেও পারে। একক শক্তি দিয়ে কংগ্রেস যখন আজ ভারসাম্য ফিরিয়ে আনতে কিছুতেই পারছে না, তখন তার

পক্ষে এইভাবে একটা যুক্তশক্তি তৈরির চেষ্টা ছাড়া আর পথ কি?

হায়দ্রাবাদ কংগ্রেস কোয়ালিশন-নীতিকে একেবারে নির্দিষ্ট করে দিয়েছে তা ঠিক বলা চলে না। কিন্তু পথটা উন্মুক্ত করা হয়েছে। এবং সঙ্গে সঙ্গে নানাভাবে মধ্যবর্তী অবস্থানের দলগুলির কাছে কমিউনিস্ট সংস্রব ত্যাগ করার আহ্বান জানান হয়েছে। এর ফলও কিছুটা ফলতে দেখা গেল। হায়দ্রাবাদ কংগ্রেসের পর থেকেই ভারতীয় ক্রান্তি দল, পি-এস-পি প্রভৃতি একটা তৃতীয় শিবির গঠনের দিকে ঝুঁকল। যেখানে যুক্তফ্রন্ট খুব ঐক্যবদ্ধ এবং বামপন্থী শক্তির প্রভাব খুব বেশি (যেমন পঃ বঙ্গ), সেখানে তৃতীয় শিবিরের আহ্বান বিশেষ কার্যকরী হল না, বরং ঐসব দলের মধ্যেই ভাঙন দেখা দিল এই প্রশ্ন নিয়ে। কিন্তু যেখানে সেরকম অবস্থা নয়, সেখানে (যেমন উঃ প্রদেশে, পাঞ্জাবে এবং বিহারে) এই প্রবণতা কমবেশি থেকেই গেল। অন্য দিকে, স্বতন্ত্র পার্টি তো অনুকূল সময় বুঝে নিজে থেকেই কংগ্রেসের কাছে কোয়ালিশন প্রস্তাব জানিয়ে রেখেছে। আর, দলত্যাগীদের ছোট ছোট গোষ্ঠীগুলি তো কোয়ালিশনের সম্ভাবনায় এমন উৎফুল্ল হয়ে উঠল যে, নিজেদের নগণ্য শক্তির কথা ভুলে গিয়ে প্রায় সরকার-গঠনকারী শক্তির মতো দাপট নিয়ে লোকের সামনে দাঁড়াতে চেষ্টা করছে। মোটের ওপর, ঠিক তৃতীয় শিবির বলতে যা বোঝায় সেরকম কিছু গড়ে না উঠলেও, কংগ্রেসের কোয়ালিশন-নীতি অগ্রসর হওয়ার খানিকটা অনকূল অবস্থা তৈরি হল।

এই পরিস্থিতি মানেই হচ্ছে যুক্তফ্রন্টের সামনে একটা নতুন চ্যালেঞ্জ এসে উপস্থিত হওয়া, যার মোকাবিলা করতে পারা যায় একমাত্র যুক্তফ্রন্টের ঐক্য দিয়েই। পঃ বাংলায় যুক্তফ্রন্টের যে সংগ্রামী ঐতিহ্য গড়ে উঠেছে এবং তার মধ্য দিয়ে যুক্তফ্রন্টের ঐক্য যেমন দৃঢ় হয়েছে তাতে এখানে এ-চ্যালেঞ্জকে বড় বলে মনে করার কোনো কারণ নেই। এখানে যাদের নিয়ে কংগ্রেস-কোয়ালিশন হতে পারে তারা কেউ যুক্তফ্রন্টের শক্তি নয়, অনেক আগেই তারা কংগ্রেসের অনুচর বলে জনসাধারণের কাছে গণ্য হয়ে গিয়েছে। কিন্তু বিহার, উত্তরপ্রদেশ ও পাঞ্জাবে ঠিক সেরকম অবস্থা নয়, আর যুক্তফ্রন্টের শরিকদের মধ্যেও রয়েছে এমন সব দল যাদের বামপন্থী-বিরোধী প্রবণতা যথেষ্ট। সুতরাং সে-সব জায়গায় এ-চ্যালেঞ্জ একটা বড় চ্যালেঞ্জ নিশ্চয়ই এবং সেই কারণে অ-বামপন্থীদের ওপর তার প্রতিক্রিয়াও বেশ কিছুটা আছে। সেজন্যই মধ্যবর্তী নির্বাচনের সামনে দাঁড়িয়েও বিহার, উত্তরপ্রদেশ ও পাঞ্জাবে পঃ বাংলার মতো ঐক্যবদ্ধ যুক্তফ্রন্ট গড়ে উঠতে পারে নি।

রাজনীতির এই গতি-প্রতিগতির প্রতিফলন মধ্যবর্তী নির্বাচনের ফলাফলের মধ্যে দেখা যাবে নিশ্চয়ই। সুতরাং আজই নিশ্চিত করে বলা যায় না যে, চারটি রাজ্যেই কংগ্রেস-বিরোধী শক্তি এই নির্বাচনের মধ্য দিয়ে আরো একধাপ এগিয়ে যাবে কি না। কিন্তু সব রাজ্যে যদি তা না-ও হয়, তবু আমি বলব যে আজকের পরিস্থিতির নির্ধারক শক্তি হিসাবে কংগ্রেস আর ফিরে আসতে পারবে না। কেন না, একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা নষ্ট হওয়ার ফলে কংগ্রেসের হাত থেকে যে-উদ্যোগ খসে পড়েছে, কোনো কোনো রাজ্যে কোয়ালিশন তৈরি করতে পারলেও সে-উদ্যোগ কংগ্রেস ফিরে পেতে পারে না। বরং যত বেশি কোয়ালিশনের আশ্রয়ে গিয়ে কংগ্রেস বাঁচতে চাইবে তত বেশিই কোয়ালিশনের আভ্যন্তরীণ সংঘাতের জালে জড়িয়ে পড়বে ও তত বেশিই উদ্যোগহীন ও ক্ষমতাহীন হয়ে পড়বে। মনে রাখতে হবে, যুক্তফ্রন্টের কোয়ালিশন আর কংগ্রেসের কোয়ালিশনে মূলগত তফাৎ আছে। যত সমস্যা নিয়েই চলুক না কেন, যুক্তফ্রন্টের কোয়ালিশন জনসাধারণের সঙ্গেই যুক্ত থাকতে চেষ্টা করে এবং তা থেকেই তার শক্তি ও অগ্রগতি। আর, কংগ্রেস-কোয়ালিশন হলে, তা হবে জনসাধারণ-বর্জিত কোয়ালিশন, যাকে চলতে হবে শুধু আভ্যন্তরীণ সমস্যার বোঝা নিয়েই, যার ফলে তার অগ্রগতি রুদ্ধ হবে তো বটেই, দাঁড়িয়ে থাকাও অনেক সময় কঠিন হতে পারে।

আর, পঃ বাংলার দিকে তাকিয়ে একথা জোর করেই বলা যায় যে, এখানে ঐক্যবদ্ধ যুক্তফ্রন্টের পিছনে জনসাধারণ আজ যে-ভাবে সংহত, তাতে যুক্তফ্রন্টের আরো একধাপ এগিয়ে যাওয়া প্রায় নিশ্চিত। কংগ্রেস যত প্রচণ্ডভাবেই লড়ুক না কেন, আর তার সাহায্যকারী গোষ্ঠীগুলি কংগ্রেস-বিরোধী ভোট ভাগিয়ে দেবার যত চেষ্টাই করুক না কেন, জনসাধারণের এই সংহতি নষ্ট করা সহজ নয়। কেন না, এ-সংহতি গড়ে উঠেছে কোনো অনুশাসনের দ্বারা নয়, কোনো লাভ-লোকসানের হিসাবের ভিত্তিতে নয়, গড়ে উঠেছে যুক্তফ্রন্টের সঙ্গে জনসাধারণের আত্মিক যোগসূত্রের ফলেই। পঃ বাংলার মতো গুরুত্বপূর্ণ রাজ্যে যদি যুক্তফ্রন্ট আরো একধাপ এগিয়ে যেতে পারে, তবে সমস্ত দেশের দিক থেকেই সেটা একটা বিরাট ঘটনা হবে।

সাহিত্য সংসদের

অভিধান সিরিজ

SAMSAD LITTLE ENGLISH-BENGALI DICTIONARY

অহরহ ব্যবহারের জন্য সহজ বহনীয় আকারে ছাত্র ও অফিস কর্মচারীদের বিশেষ উপযোগী। অধুনা প্রচলিত শব্দের প্রাধান্য ও শব্দের প্রয়োগের উদাহরণ। ৮২০+১২ পৃঃ, ৪½″ × ৬¾″ × ১″ আকার। শক্ত বাইবেল কাগজ। [বোর্ড বাঁধাই —৭·৫০। সাধারণ বাঁধাই ৫·০০]

SAMSAD ENGLISH-BENGALI DICTIONARY

পূর্ণাঙ্গ শব্দকোষ। সর্বস্তরের সর্ববৃত্তিধারীর প্রয়োজনের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া শব্দচয়ন, শব্দার্থ বিন্যাস ও অধুনা প্রচলিত শব্দাবলী সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। শব্দের ব্যুৎপত্তি ও উচ্চারণ-সঙ্কেত। ১২০৮+৮ পৃঃ, ডিমাই অক্টেভো আকার। বোর্ড বাঁধাই। [১২·৫০]

SAMSAD BENGALI-ENGLISH DICTIONARY

সর্ববৃত্তিধারীর বিশেষ করিয়া ছাত্রদের উপযোগী পূর্ণাঙ্গ শব্দকোষ। বিশিষ্টার্থ-প্রকাশক শব্দসমষ্টির ইংরেজি। ১২৭৮+ ১৬ পৃঃ ক্রাউন অক্টেভো আকার। বোর্ড বাঁধাই [১২·০০]

অভিধান তিনটির সংকলক ঃ শ্রীশৈলেন্দ্র বিশ্বাস ও সংশোধক ঃ ডঃ সুবোধচন্দ্র সেনগুপ্ত

সংসদ বাঙ্গালা অভিধান

৪৩,০০০-এর অধিক শব্দসংখ্যা। ছাত্রদের সুবিধার্থে শব্দের পদপরিচয়, ব্যুৎপত্তি, সমাস প্রভৃতি এবং পারিভাষিক শব্দাবলীর তালিকা। শ্রীশৈলেন্দ্র বিশ্বাস সঙ্কলিত ও ডঃ শশিভূষণ দাশগুপ্ত সংশোধিত। ৯৩৬+১৬ পৃঃ ক্রাউন অক্টেভো আকার লাইনো হরফে ছাপা। বোর্ড বাঁধাই। [৮·৫০]

সাহিত্য সংসদ

৩২এ, আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড ঃ কলিকাতা-৯

সাপ্তাহিক বসুমতী প্রসঙ্গে

সাপ্তাহিক বসুমতীর ১৬ই জানুয়ারী সংখ্যাটি পড়ে আনন্দ পেলাম। সেজন্য কর্তৃপক্ষকে প্রথমেই ধন্যবাদ জানাই।

নির্বাচনের প্রাক্কালে ভোট দেওয়া নিয়ে যখন সাধারণ মানুষ দ্বিধাজড়িত, তখন সাপ্তাহিক বসুমতীর এই সংখ্যাটি ভোটার-দের সামনে ভোট বিষয়ে অসামান্য আলোকপাত করেছে।

এই সংখ্যাটিতে নির্বাচনের বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনার ফলে জনসাধারণ নির্বাচনের অনেক গুরুত্বপূর্ণ বিষয় জানতে পারল। সবচেয়ে ভাল লাগল প্রশ্ন এবং উত্তর বিভাগটি। ভবিষ্যতে নির্বাচনের ন্যায় অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে যদি পত্রিকা কর্তৃপক্ষ এমনি দৃষ্টি দেন, তবে আমাদের মত সাধারণ লোকের অনেক উপকার হবে।

—শ্রীউৎপল সরকার
ফ্যাকালটি অফ এগ্রিকালচার,
কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়।
হরিণঘাটা, নদীয়া

*

রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয় প্রসঙ্গে

গত ২রা জানুয়ারী তারিখের সাপ্তাহিক বসুমতীতে বঙ্গদর্শন বিভাগে প্রকাশিত রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের উপর সময়োচিত আলোচনা এবং ২৩শে জানুয়ারী সংখ্যায় প্রকাশিত দুখানি পত্র পাঠ করলুম। আমিও ওই বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতকোত্তর বিভাগের একজন ছাত্রী, (অবশ্য বাংলা বিভাগের নই), এ বিষয়ে আমারও কিছু বক্তব্য আছে। আশা করি প্রকাশ করে বাধিত করবেন।

(১) যে অর্ডিন্যান্স বলে সেই নন্-ম্যাট্রিক ছাত্রীটিকে একাডেমিক কোর্সে পড়ার সুযোগ দেওয়া হয়েছিল, তা পরে কোন্ কারণে বাতিল করা হলো?

(২) নিবন্ধক মহাশয় তাঁর জবানীতে বলেছেন যে, গবেষণা বিষয়ক নির্বাচন উপাচার্য কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে। অথচ যত দূর জানি উপাচার্য শ্রীহিরণ্ময় বন্দ্যো-পাধ্যায় ছাত্র-প্রতিনিধিদলকে এই অনু-মোদনের কথা অস্বীকার করেছিলেন।

(৩) "তৃতীয় পরীক্ষক" নির্বাচনের ব্যাপারে যদি কোন রকম নিয়ম লঙ্ঘন না-ই ঘটে থাকে, তবে শিক্ষক সমিতি কেন প্রতিবাদ করেছিলেন, আর এ বিষয়ে শিক্ষক সমিতির মধ্যে দারুণ প্রতিক্রিয়াই বা দেখা দিয়েছিল কেন?

(৪) নিবন্ধক মহাশয় যে পত্রটি লিখে-ছেন, তা কূটনৈতিক সুকৌশলে রচিত, মূল ঘটনা এবং সমস্যার পাশ কাটিয়ে যাওয়ার ঘৃণ্যতম প্রচেষ্টা ছাড়া আর কিছু নয়।

(৫) এত রকম প্রতিবাদ সত্ত্বেও, দুর্নীতি ও স্বজনপোষণ নীতির দায়ে অভিযুক্ত হয়েও বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ এ বৎসরেও দুজন নন্-ম্যাট্রিক ছাত্রছাত্রীকে এম-এ পরীক্ষা দেবার সুযোগ করে দিয়েছেন।

এখন প্রশ্ন হলো, নন্-ম্যাট্রিক প্রার্থীরা যখন অবাধে এম-এ পরীক্ষা দেবার এবং গবেষণা করার সুযোগ পাচ্ছেন, তখন বাইরে আমাদের চাকুরী ও গবেষণার ব্যাপারে রবীন্দ্রভারতীর এম-এ ডিগ্রীকে কেউ অস্বীকার করলে রবীন্দ্রভারতীর কিছু বলার আছে কি?

—মধুরিমা বন্দ্যোপাধ্যায়
১১০, আলিপুর রোড,
কলকাতা-২৭

*

এম ডি পরীক্ষা প্রসঙ্গে

আপনাদের পত্রিকায় এম ডি পরীক্ষা সম্বন্ধে লেখার জন্য বঙ্গদর্শনের লেখককে ধন্যবাদ। এ প্রসঙ্গে আমি আপনাদের একটা সামান্য তথ্য দিতে পারি, আশা করি আপনাদের লেখার প্রতিবাদে যাঁরা মুখর, তাঁদের কিছুটা ব্রহ্মজ্ঞান লাভ হতে পারে এবং তাঁরা সেই পরোপকারী শিক্ষকের যিনি নিঃস্বার্থভাবে জ্ঞান বিতরণ করছেন, তাঁর সম্পর্কে কিছু তথ্যও সংগ্রহ করতে পারবেন। আমার এই ছোট্ট তথ্য-টুকু আপনাদের পত্রিকায় প্রকাশিত হলে কৃতজ্ঞ থাকবো।

প্রথমেই বলে রাখছি আমি চিকিৎসক নই, কাজেই এম ডি পরীক্ষার্থী নই—আমি কিন্তু চিকিৎসকদের সম্বন্ধে শ্রদ্ধা-শীল এবং তাঁদেরই কাছে আমার আনা-গোনা। এঁদেরই কারো কাছ থেকে আমার জানা এই তথ্যটি অনেকেরই জানা নেই। অথচ সেই সব এম ডি লোভী চিকিৎসকের দল, যাঁরা নিজেদের মানমর্যাদা বিসর্জন দিয়ে শুধু ঐ ডিগ্রীটা পাবার জন্য হন্যে হয়ে বসুমতীতে ছুটছেন আর যাঁরা বঙ্গ-দর্শনে প্রকাশিত তথ্য সম্বন্ধে সমর্থন করছেন, তাঁদের মস্তক চর্বণ করছেন—তাঁদের বলি বিচার-বিভাগীয় তদন্তের জন্যে হামলা করতে এবং তারই পরি-প্রেক্ষিতে আমার এই ক্ষুদ্র তথ্য ঘোটা সেদিন আমার মনে হয় বিরাট কাজ করতে পারবে।

বর্তমান কর্তাব্যক্তির পুত্র কি বিলেত থেকেই ফিরেই প্রথমে কিছুদিনের জন্য S.S.K.M. হাসপাতালে জুনিয়র ভিজিটিং (সাম্মানিক) হিসাবে যোগ দেন এবং তার কিছুদিনের মধ্যেই কি তিনি মেডিক্যাল কলেজে জুনিয়র ভিজিটিং ফিজিসিয়ান (সাম্মানিক) হিসাবে নিযুক্ত হন? কথাটা এখানেই শেষ করতে পারলে সুন্দর হোত। কিন্তু ভিতরের রহস্যটা অত্যন্ত গভীর। নিয়মমাফিক যাঁরা সাম্মানিক পদে থাকেন তাঁরা বদলী হন না। এ ক্ষেত্রে নিয়ম লঙ্ঘন হল—কেন না এই ব্যক্তিটির পুত্র যদিও S.S.K.M. Hospital-এ চাকরী ছেড়ে Medical College-এ নতুন চাকরী পেলেন, কিন্তু এই চাকরী পাবার জন্য তাঁকে কোন Selection-এর through দিয়ে আসতে হয় নি বা Postটির জন্য leading newspaper-এ কোন বিজ্ঞাপনই দেওয়া হয় নি। আর আরও মজার ব্যাপার এই Postটি আদৌ ছিল না এবং এই কর্তাব্যক্তিটির পুত্রের জন্য নাকি সৃষ্টি করা হয়েছিল। এ প্রসঙ্গে আর একটি কথা বলা প্রয়োজন, নিয়মমাফিক teaching hospital-এ কোন নতুন ব্যক্তি নির্বাচিত হবে না—এই ছিল Government policy. কিন্তু সরকার তো হাতধরা ব্যক্তি। কাজেই এই ভাগ্যবান ব্যক্তিটি পিতার কাঁধ ধরেই তরতর করে উঠে গেলেন ব্যবসার ক্ষেত্রে। আমি এমন ঘটনাও জানি যে Non-teaching hospital-এ বছরের পর বছর মাথা খুঁড়ছেন অনেক চিকিৎসক শুধু teaching hospital-এ আসার জন্য, কিন্তু তাঁদের ডিঙিয়ে তাঁদের চাইতে অনেক জুনিয়র এই ভাগ্যবান ভদ্রলোকটি কেমন করে যে নয়কে ছয় করলেন সে একটি রহস্য। ভাগ্যবান পিতার ভাগ্যবান সন্তানের বহু কথা আপনাদের পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে। এ ব্যাপারে আবার আপনাদের ধন্যবাদ জানিয়ে শুধু এই প্রার্থনা করবো—আপনারা সমাজের এই সব ব্যক্তিদের যাঁরা নিজেদের জন্য যে কোন নীচ কাজ করতেও পেছপা হন না, তাঁদের তুলে ধরুন। এতে সাপ্তাহিক বসুমতীর ঐতিহ্য বাড়বে বই কমবে না। মিথ্যা বেশিদিন টেকে না—কাজেই জয় আপনাদের হবেই। রক্তচক্ষুকে যে আপনারা ভয় পান না তা আপনাদের কাগজই স্বাক্ষ্য দেয়।

—শ্রীঅনিমেষ চক্রবর্তী
১৮।২, রাজাবাগান লেন
কলকাতা—৩২

সুদানের চিঠি

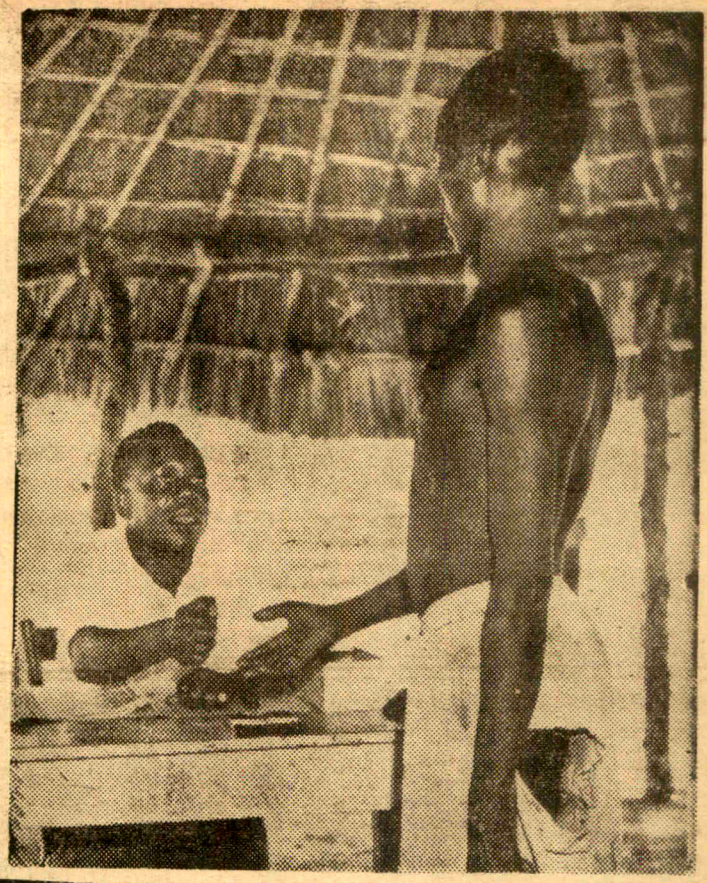

জাননীয়া সম্পাদিকা মহোদয়া সমীপে,
সবিনয় নিবেদন,

সাপ্তাহিক বসুমতীর সুপরিকল্পিত নির্বাচন সংখ্যাটি পাঠ করার সৌভাগ্য হয়েছে। অমন একটি সর্বাঙ্গসুন্দর পরিকল্পনার জন্য সর্বাগ্রে ধন্যবাদ জানাই। প্রসঙ্গত নির্বাচন সংখ্যা সম্পর্কে অধীনের কিছু বক্তব্য রাখতে চাই, প্রকাশযোগ্য বিবেচিত হলে আপনার বহুল প্রচারিত পত্রিকায় তাকে স্থান দিয়ে বাধিত করবেন।

নিজে লেখক নই, অতি সাধারণ একজন ভারতীয়। কিন্তু আপনাদের নির্বাচন সংখ্যা দেখে মনে হল, ঐ সংখ্যায় কিছু অপূর্ণতা রয়ে গেছে। আমি শুধু তারই উল্লেখের অধিকার চাইছি জনৈক ভারতীয় হিসেবে। কারণ আমার বিশ্বাস, আপনার পত্রিকাটি কোনো রকম গোঁড়ামীর দ্বারা পরিচালিত নয় এবং আপনারা স্বজাতির গর্বে গর্বিত। এই পত্রিকায় কখনো লক্ষ্য করি নি যে, দেশের কৃতী সন্তানদের আপনারা কখনো ছোট করেছেন পণ্ডিতমন্য প্রবন্ধ ফেঁদে, যেমন আজকাল বহু ক্ষেত্রেই তা করা হয়ে থাকে, যে পণ্ডিতীয়ানার প্রকোপ থেকে স্বয়ং রবীন্দ্রনাথও বাদ পড়েন না। তাই আশা করেছিলাম সুযোগমাত্র আপনারা সেই কৃতী ভারতীয়কে স্মরণ করবেন নির্বাচনের সঙ্গে যাঁর নাম বিজড়িত।

তাই বলছিলাম, নির্বাচন সংখ্যাটি অপূর্ণ। অন্তত আমার তাই মনে হল; কারণ নানা জাতি ও গোষ্ঠী অধ্যুষিত বিরাট জনসংখ্যা সম্বলিত ভারতবর্ষে, যেখানে অধিকাংশ মানুষই অশিক্ষিত এমন কি নিরক্ষর, কোথাও কোথাও আদিবাসীরা মধ্যযুগীয় অন্ধকারে নিমজ্জিত, সেই বিচিত্র দেশে যিনি প্রথম বিরাট এক সাধারণ নির্বাচনের সামগ্রিক সুষ্ঠু পরিকল্পনা তৈরি করেছিলেন এবং তাকে বাস্তবে রূপ দান করেছিলেন, আপনার নির্বাচনী সংখ্যায় তাঁর উদ্দেশ্যে শ্রদ্ধাঞ্জলি থাকলে সংখ্যাটি পূর্ণাঙ্গ হতো বলে আমার বিশ্বাস।

আমি স্বর্গত সুকুমার সেনের কথা বলছি, যিনি নিজের দেশে প্রকাণ্ড কীর্তি স্থাপনা করেও উপযুক্ত মর্যাদা পেলেন না (জানি না, বাঙালী বলেই তাঁর সম্পর্কে এ বিস্মরণশীলতা কি না)। কিন্তু সুদূর সুদানের নির্বাচন অনুষ্ঠানের জন্য সুদানীরা স্বর্গত সুকুমার সেনকে আজও কেমনভাবে স্মরণীয় করে রেখেছেন ভাবলে ভারতে আমরা যে তাঁর প্রতি আমাদের অবশ্য-কর্তব্য পালন করি নি তা উপলব্ধ হবে। ভেবেছিলাম, 'সাপ্তাহিক বসুমতী' তার নির্বাচনী সংখ্যায় সেই ত্রুটি হয়ত সংশোধন করে নেবে, কিন্তু দুঃখের সঙ্গে লক্ষ্য করলাম, সুকুমার সেনকে আজ আর কেউ স্মরণ করার মতো কষ্ট স্বীকার করেন না। মাফ করবেন এই রূঢ়তার জন্য। আমি সৌভাগ্যবান, শ্রীসেনকে খুব কাছ থেকে দেখবার সুযোগ পেয়েছিলাম এবং তাঁর ব্যক্তিত্বে মুগ্ধ হয়েছিলাম।

তিনি তখন সুদানের প্রথম সাধারণ নির্বাচন পরিচালনা করতে আমন্ত্রিত হয়ে গেছেন। আমি খার্তুমে। সুদানের নির্বাচন দেখেছি, সেই সঙ্গে দেখেছি, ভারত-গৌরব সুকুমার সেনকে।

ভারতে সুকুমার সেন আজ বিস্মৃত, কিন্তু সুদান সরকারের প্রচার পুস্তিকায় তাঁর সম্বন্ধে এইভাবে শ্রদ্ধা নিবেদন করা হয়েছিল ঃ

"Mr. Sukumar Sen

"The Cairo Agreement (Article 7) continues"

"The Indian Member shall be Chairman of the Commission."

"In this position the Sudanese are indeed fortunate in having the services of His Excellency Mr. Sukumar Sen, *who organised with a degree of success now historic the first General Election among the three hundred and fifty-seven million people of the Republic of India.* . . . . (ইটালিক টাইপ আমার)।

" * B.A. (Calcutta)
* Born 2nd January, 1898.
* Son of A. K. Sen of the Bengal Civil Service.
* Educated at the Presidency College, Calcutta and University College, London.
* Joined the Indian Civil Service, 1922 : was a District and Sessions Judge from 1928 to 1947.
* Chief Secretary, West Bengal 1947 to 1950

* Chief Election Commissioner, Government of India 1950 to 1953."

সুদানীরা বস্তুতই শ্রীসেনকে পেয়ে নিজেদের কৃতজ্ঞ মনে করেছিলেন, তারই নিদর্শনস্বরূপ তাঁরা তাঁদের প্রধান একটি রাজপথ সুকুমার সেনের নামাঙ্কিত করেছেন। ভারতে তাঁর নামে কোন গলি আছে কি না আমার জানা নেই। ভারতের সাধারণ মানুষও আজ বাদে কাল তাঁদের প্রথম নির্বাচনের আর্কিটেক্টকে ভুলে যাবে, অথচ বস্তুতই তিনি এক অসাধ্যসাধনই করেছিলেন সেদিন। আমরা বিস্মরণশীল জাতি, সেই কীর্তিকে স্মরণীয় করে রাখার কোনো আবেগই অনুভব করি না।

অশিক্ষিত ও অর্ধশিক্ষিত মানুষের মধ্যে নির্বাচন পরিচালনা করা যে কত বড় বিড়ম্বনা সুদানের অভিজ্ঞতায় সে সম্পর্কে একটা ধারণা আমার হয়েছে। ভারতেও এমন বহু অঞ্চল রয়েছে যেখানে শিক্ষা ও সভ্যতার আলো ক্ষীণ শিখায় প্রবেশ করেছে মাত্র। সেই ভারতে সুস্থ নির্বাচন অনুষ্ঠানের বিস্ময়কর কীর্তিই শুধু নয়, এ কীর্তি যে বিশ্ববিশ্রুত তারই প্রমাণ সুদানের নির্বাচনে মিশ্র নির্বাচনী কমিশনের নেতৃত্ব করার জন্য সুকুমার সেনকে আমন্ত্রণ জানানো। ভারতবাসী হিসেবে আমি সেজন্য গর্বিত। এই গর্বই আপনাদের নির্বাচনী সংখ্যা হাতে পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আমাকে সুকুমার সেনের কীর্তির কথা স্মরণ করিয়েছে। বিশেষ করে, সুদানে সব রকমের প্রতিকূল পরিবেশের মধ্যে স্থির প্রজ্ঞার সঙ্গে তিনি যে অসাধ্যসাধন করেছিলেন, তারই কিছুটা বর্তমান আলোচনায় তুলে ধরার জন্য আগ্রহ বোধ করছি। আশা করি, সুদানে সুকুমার সেনকে যেমন দেখেছি তারই এই অক্ষম বর্ণনা উপস্থিত করার সুযোগ আপনি মঞ্জুর করবেন।

সুদানে সেদিন শিক্ষার আলো অতি নগণ্য সংখ্যক নাগরিককে স্পর্শ করেছে মাত্র। চরম দারিদ্র্য এবং দীর্ঘদিনের শোষণ সে দেশের নাগরিকদের মধ্যযুগের অন্ধকারেই নিমজ্জিত রেখেছিল। সঙ্গের ছবিতে দেখবেন, তাঁদের মধ্যে সম্পূর্ণ বিবস্ত্র ভোটদাতার সংখ্যাও কম নয়। এঁদের মধ্যে নির্বাচন! আর সেই নির্বাচনের সামগ্রিক দায়িত্ব একজন ভারতীয়ের ওপরই ন্যস্ত। সমস্ত পৃথিবীর দৃষ্টি সেদিকে নিবদ্ধ।

সুকুমার সেন ঠিক ভারতেরই আদর্শে সুদানের নির্বাচন পরিচালনা করেছিলেন। কিন্তু নির্বাচনের সমস্ত আঙ্গিকগুলিকে বোঝানোর জন্য সেখানে তাঁকে ঢের বেশি পরিশ্রম করতে হয়েছিল বলে আমার ধারণা। পোলিং-এর ব্যাপারটা আনুপূর্বিক মহড়া অনুষ্ঠান করে বুঝিয়ে দিতে হয়েছিল নাগরিকদের।

১৯৫৩ সালে বৃটেন ও ইজিপ্টের মধ্যে কায়রো চুক্তির ফলে সুদানে সর্বপ্রথম সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় ঐ বছরের নভেম্বর ডিসেম্বর মাসে। এই নির্বাচন তদারকী করেন একটি মিশ্র কমিশন। সদস্য ছিলেন সাতজন। একজন বৃটিশ, একজন আমেরিকান, একজন ইজিপশিয়ান তিনজন সুদানী, অন্যজন ভারতীয়। সদস্যবর্গের শিরোমণি চেয়ারম্যান হিজ এক্সেলেন্সি মিঃ সুকুমার সেন।

কমিশনের আকৃতি যেদিন প্রকাশিত হয়েছিল, সেদিন ভারতীয় নাগরিককে সুদানের প্রথম নির্বাচন পরিচালক কমিশনের চেয়ারম্যানস্বরূপ দেখে, বুঝতেই পারছেন, প্রবাসী ভারতবাসী হিসেবে কতদূর আনন্দ ও গর্বে বুক আমার স্ফীত হয়ে উঠেছিল। সেই তো সবে ভারতে প্রজাতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা হয়েছে। টাটকা স্বাধীনতা তখনও আমরা, প্রবাসীরা অনুভবেই বুঝি নি। আমাদের মনে বৃটিশই তখনও রাজার জাতের ঐশ্বত্য নিয়ে প্রতিষ্ঠিত। সে সময় ভারতের প্রথম নির্বাচন কমিশনারকে দেখলাম মার্কিন ও বৃটিশ সদস্যদের মধ্যে চেয়ারম্যানের আসন গ্রহণ করতে। শুধু তাই নয়, শ্রীসেনের ব্যক্তিত্বের আড়ালে তাঁরা ক্রমেই চাপা পড়ে গেলেন, তা-ও জানলাম। কিন্তু সেটাই বড় কথা নয়। সবচেয়ে বিস্মিত শ্রদ্ধার কারণ ছিল আরও গভীরে। সুকুমার সেনের বিরাট ব্যক্তিত্বের সংবাদ যখন ছড়িয়ে পড়তে আরম্ভ করল, এবং কট্টর রাজনীতিতে যেমন হয়ে থাকে, তাঁকে রীতিমত বেকায়দায় ফেলার জন্য যখন তাঁর বিরুদ্ধে প্রচার-ও শুরু হয়ে গেল অথচ তিনি দ্বিতীয় ভারতীয় সহযোগী ছাড়াই সে সমস্ত কিছুকেই যখন সুন্দরভাবে আয়ত্তে নিয়ে এলেন, তখন হিজ এক্সেলেন্সি শ্রীসেনকে নিয়ে হৈ-চৈ পড়ে গেছল চতুর্দিকে। সুদানে যাঁরা ব্যাপারটা বুঝলেন তাঁরা তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞতায় আনম্র হলেন। কেন না তাঁরা বুঝেছিলেন শ্রীসেনের জন্যই সুদানের নির্বাচন সেদিন সুষ্ঠুভাবে সাফল্যে উত্তীর্ণ হতে পেরেছিল কিছু কিছু নেপথ্য ষড়যন্ত্র বানচাল করে দিয়ে। অথচ অত্যন্ত দুঃখ ও লজ্জার কথা এই যে, ঐ সময় কলকাতার একটি বিশিষ্ট (?) বাংলা দৈনিক শ্রীসেনের বিরুদ্ধে ভিত্তিহীন এক অভিযোগ উত্থাপন করে বলতে চেয়েছিলেন, শ্রীসেন বৃটিশ স্বার্থের পরিপোষণা করতেই সুদানে উপস্থিত হয়েছেন। কিন্তু যাঁদের দেশে নির্বাচন, শ্রীসেনের প্রতি তাঁদের ভক্তি ও শ্রদ্ধার অকৃত্রিম রূপটিই সুকুমার সেনের স্বদেশী পত্রিকায় তুলে ধরার কথা। আমাদের কপাল মন্দ, আমরা ভারতীয়ের গর্বে গর্ববোধ না করে, তাঁকে জগৎ সমক্ষে তুলে ধরার চেষ্টা না করে বরং ছোট করতে পারলেই যেন সুখী হই। অথচ অন্যান্য দেশ তার স্বদেশবাসীর সামান্যতম কৃতিত্বকেও নানাভাবে তুলে ধরেন। সে কৃতিত্ব যে দেশেরই গৌরব, এই কথাটা তাঁদের মতো আমরা ভাবতে শিখি নি।

আগেই বলেছি, সেদিন সুকুমার সেন যা করে গেছেন তার জন্য আমরা তাঁর প্রতি সমুচিত কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করি নি, তাঁর স্মৃতিকে উত্তরপুরুষের মধ্যে ধরে রাখার কোন আয়োজন করি নি। অথচ বিদেশী সুদানীরা তাঁর মর্যাদার স্বীকৃতি দিয়েছেন। ভারতবর্ষের এই অবহেলায় অবশ্য সুকুমার সেনের ব্যক্তিত্ব ছোট হয়ে যায় না, আমাদেরই বিস্মরণশীলতার পরিচয় প্রকাশ পায়।

আমি একজন সামান্য প্রবাসী ভারতীয়। কিন্তু ভারতীয় বলেই জানি, সুদান সেদিন সুকুমার সেনকে কিভাবে বরণ করে নিয়েছিল।

ওদেশের মানুষ দারিদ্র্যের তাড়নায় প্রায় বিবস্ত্রই থাকতেন। বিভিন্ন গোষ্ঠী

কর্মব্যস্ত মিশ্র নির্বাচনী কমিশনের কয়েক জন : বাম দিক থেকে চেয়ারম্যান সুকুমার সেন, ইজিপশিয়ান সদস্য কল : অব্দ এল ফাত্তাহ, মার্কিন সদস্য ওয়ারউইক পার্কিনস এবং কাসালা প্রদেশের প্রধান নির্বাচনী অফিসর।

এবং অশিক্ষার শিকার এই কালো মানুষেরা মধ্যযুগের অন্ধ-কুসংস্কারে আচ্ছন্ন। বোধ হয় সেজন্যই আর কিছু না বুঝুন এটুকু তাঁরা বুঝেছিলেন যে, সেন তাঁদের দেশে কিছু একটা ভালো কাজ করতে গেছেন। তাই শ্রীসেন ও শ্রীমতী সেন যেখানেই গেছেন ঐ নিষ্পাপ প্রকৃতিলালিত ঈর্ষা-কুটিলতাহীন মানুষগুলি তাঁদের সাদরে বরণ করে নিয়েছেন।

সম্পদ বলতে তাঁদের ছিল কতকগুলি গবাদি পশু। মনে পড়ে এক জায়গায় এক গোষ্ঠীপ্রধান কৃতজ্ঞতার চিহ্নস্বরূপ গরু ও ছাগল এনে উপহার দিয়েছিলেন ওঁদের। আর গোষ্ঠীপ্রধানের উপহার মানে সাংঘাতিক ব্যাপার, প্রত্যাখ্যান করলে প্রধানের অপমান, হুলুস্থুল ব্যাপার। কি মুস্কিল ভাবুন। কিন্তু কৃতজ্ঞতার এমনতর বোঝাও শ্রীসেনকে কৌশল করে নামিয়ে রেখে যেতে দেখেছি। তিনি তাঁর অমায়িক সস্নেহ ব্যবহার দিয়ে প্রধানকে মুগ্ধ করে বুঝিয়েছেন, গাড়ি বা প্লেনে জায়গার অভাব। পশুগুলিকে ধন্যবাদের সঙ্গে গ্রহণ করে তিনি প্রধানের কাছেই জিম্মা করে যাচ্ছেন।

উপরোক্ত ঘটনার বিবরণেই বুঝছেন শ্রীসেনকে এমন একটি দেশে প্রথম নির্বাচনের ব্যবস্থা করতে হয়েছিল যেখানে মধ্যযুগীয় নিশ্ছিদ্র অন্ধকার বর্তমান। তাই তাঁরা সাধারণ নির্বাচনকে প্রথম অবস্থায় সহজভাবে মেনে নিতে পারেন নি। দ্বন্দ্বদোলা এবং সন্দেহ তাঁদের আলোড়িত করেছে। গোষ্ঠীগত বিভেদ-বিসম্বাদ তীর-ধনুকের লড়াইয়ে পর্যবসিত হয়েছে। এবং ডাকিনীবিদ্যায় গভীর বিশ্বাসী দুর্গম গ্রামাঞ্চলবাসীরা ব্যালট বাক্সকে ডাকনীবিদ্যার যাদু সম্বলিত ভেবে ব্যালট বাক্সের সামনে গিয়ে দাঁড়িয়েছেন তীর-ধনুক হাতে। এই নাঙ্গা মধ্যযুগীয় এক জনসমাজে নির্বাচন পরিচালনা তাই কতকগুলি মামুলি নিয়মের মাধ্যমেই সম্ভব ছিল না।

শ্রীসেনের বিশিষ্ট উদ্ভাবনীশক্তি কিন্তু এতেও বিচলিত বোধ করে নি। শ্রীসেন মুষড়ে পড়েছিলেন অন্যতর কারণে। আমি যতদূর জানি, শ্রীসেন সুদানের নির্বাচনে কিছু অন্তর্ঘাতী ষড়যন্ত্রের (বিশিষ্ট স্বার্থচক্রের দ্বারা) আশঙ্কা করেছিলেন। কেন না কাজে নেমে তিনি কমিশনের বিদেশী সদস্যদের সাহায্য অপেক্ষা নিজের ওপরই অধিকতরভাবে নির্ভর করতে বাধ্য হয়েছেন। তাঁর সঙ্গে উপযুক্ত সেক্রেটারী না থাকায় তাঁকে কঠোর পরিশ্রমও করতে হয় সুষ্ঠু নির্বাচনের জন্য। তিনি গোপনীয় চিঠিপত্র নিজেই টাইপ করতেন, পাছে কোনো অপ্রীতিকর প্রভাব নির্বাচনের ওপর চক্রান্তের জাল বিছিয়ে বসে এই আশঙ্কায়! এ সমস্ত ঘটনা আমি খুব নির্ভরযোগ্য সূত্র থেকেই সংগ্রহ করেছিলাম, আর ভেবে আশ্চর্য হয়েছিলাম যে, যে ভারতবর্ষ থেকে তিনদিন অন্তর মন্ত্রীরা বিদেশ ভ্রমণে বেরিয়ে সাধারণের অর্থ পর্যাপ্তভাবে খরচ করতে পারেন, সেই ভারতেরই মুখ উজ্জ্বল করতে যিনি বিদেশীর আমন্ত্রণে অত বড় একটা কাজ করতে গেলেন, তাঁর সঙ্গে উপযুক্ত একটি সাহায্যকারী অফিসারের ব্যবস্থা পর্যন্ত ভারত সরকার করে উঠতে পারেন নি।

সবচেয়ে মুস্কিল ছিল বোধহয় এই যে, ওখানে অতি মুষ্টিমেয় সাধারণই ইংরেজী বুঝতেন। মূলত তাই দোভাষী নির্ভর করেই কাজ চালাতে হত ওঁদের। কিন্তু সেটাও খুব একটা বড় বাধা নয়, বাধা ছিল এই যে, একুশ বছরের সুস্থ পুরুষ নাগরিকমাত্রেরই ভোটাধিকার স্বীকৃত হলেও নির্বাচন বস্তুটা তাঁদের উপলব্ধির স্তরে পৌঁছে দেওয়া। নিরক্ষর গোষ্ঠী-প্রধান অঞ্চল তো মধ্যযুগের অন্ধকারে। প্রতীকের ব্যবহারও তাঁদের বোধের বাইরে। এমন কি সাদা কালো ও লাল ব্যতীত অন্যান্য রঙ পর্যন্ত চিনে নিতে ওঁরা অক্ষম। এমন একদলকে প্রতিনিধি নির্বাচনের শিক্ষা দেওয়া কি সহজ কথা। কিন্তু শ্রীসেন এমন অনেক দুর্গম ও সভ্যতার আলোকবঞ্চিত অঞ্চলে গিয়ে নিজে তদারকী করেছেন। যখন অন্য কোন পদ্ধতিই কার্যকরী হয় নি তখন প্রার্থীদের দাঁড় করিয়ে সমর্থকদের বলা হয়েছে যে যার প্রার্থীর পেছনে সারিবদ্ধভাবে দাঁড়িয়ে সমর্থন জানাতে। তারপর বিজয়ী প্রার্থীর নাম ঘোষণা করা হয়েছে বিপুল হর্ষধ্বনির মধ্যে।

কিন্তু এমনভাবে যিনি অসম্ভবকে সম্ভব করতে প্রায় এককভাবে স্থির প্রজ্ঞায় রাত্রিদিন কর্মব্যস্ত ছিলেন, সেই সুকুমার সেনের বিরুদ্ধেও স্বার্থান্বেষী চক্র বিরূপ প্রচারে নেমেছেন। উদ্দেশ্য, সুস্থ নির্বাচন বানচাল করে দেওয়া। কোন কোন চক্র থেকে এমন দাবিও উঠল যে, শ্রীসেনকে প্রত্যাহার করে নিয়ে ভারত দ্বিতীয় কোন ব্যক্তিকে নিযুক্ত করুক। এই সময় ভারতের তদানীন্তন প্রধানমন্ত্রী শ্রীজওহরলাল নেহরু কায়রোয় উপস্থিত হলেন। তাঁকে অনুরূপ প্রস্তাব জানানো হলে তিনি সাফ জবাব দিয়েছিলেন: ভারতে অন্যতর কোন ব্যক্তি নেই যিনি সুকুমার সেনের স্থান

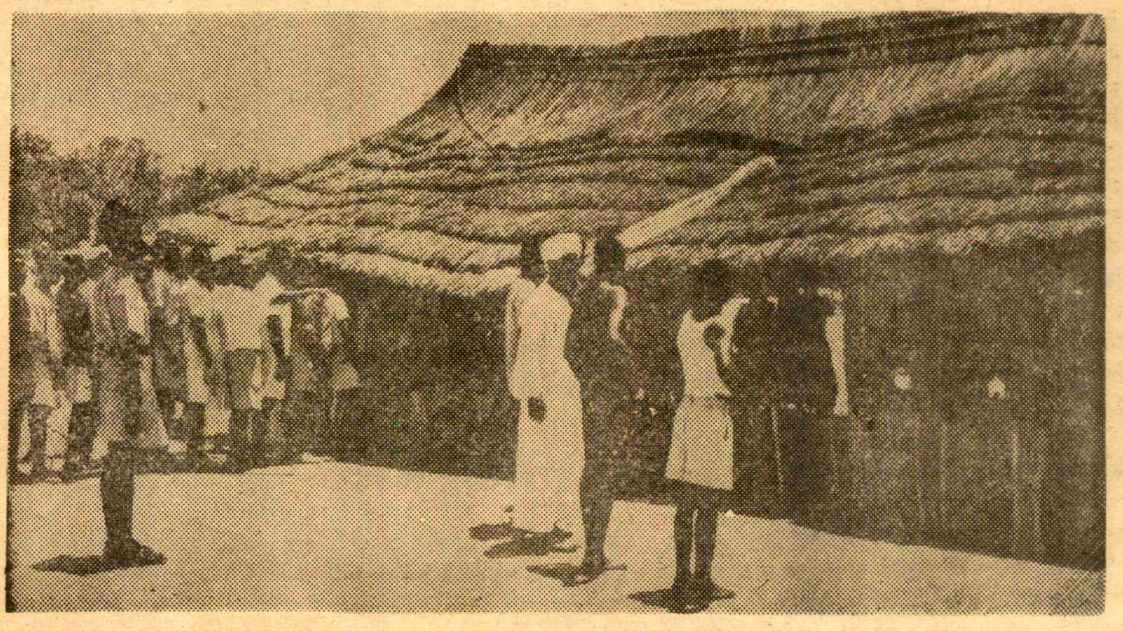

একটি পোলিং বুথের দৃশ্য। বিবস্ত্র নাগরিক তাঁর প্রতিনিধি নির্বাচনে অংশ গ্রহণ করতে এসেছেন।

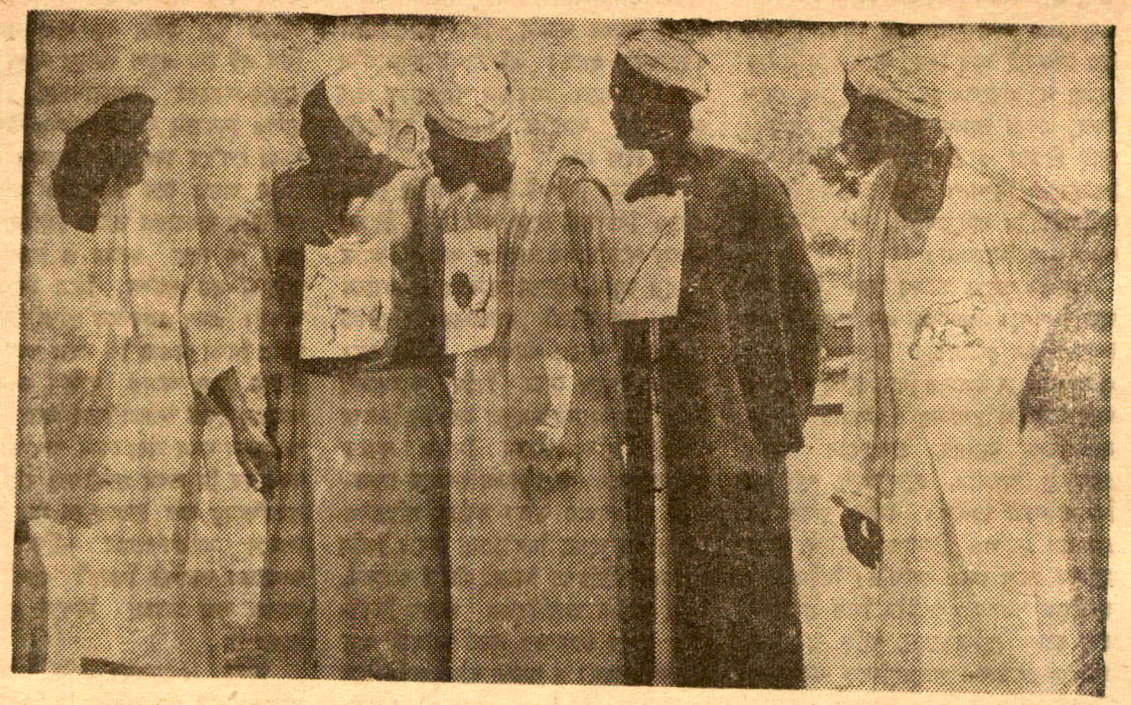

প্রতীকের সঙ্গে পরিচিত করানোর জন্য অবলম্বিত অভিনব পদ্ধতি। প্রার্থীর বুকে তাঁর প্রতীক চিহ্ন।

পূরণ করতে পারেন। শ্রীসেন সুদানবাসীর মঙ্গলের জন্যই কর্তব্যরত। সুস্থ নির্বাচন চাইলে তাঁকেই মেনে নিতে হবে।

সুদানীরা অন্তর থেকেই শ্রীসেনকে মেনে নিয়েছিলেন, মানতে চান নি সুদানী স্বার্থ-বিরোধীরাই। কিন্তু বিরোধিতা সত্ত্বেও শ্রীসেন একাকী (কারণ বিদেশী সদস্যদের তিনি প্রায় গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপারে হস্তক্ষেপে বিরতই রেখেছিলেন। তাঁর ওপর অর্পিত মহান দায়িত্ব নির্বিঘ্নে সম্পন্ন করেছেন। এতৎসত্ত্বেও সুচারুভাবে নির্বাচনপর্ব সমাধার পর তদানীন্তন বৃটিশ প্রধানমন্ত্রী তাঁকে অভিনন্দন জ্ঞাপন করতে পেরেছিলেন শুধু ইংরেজদের বিশ্ব-বিশ্রুত স্পোর্টসম্যান স্পিরিটের জন্যই। ॥ হলে সুদানের নির্বাচনে শ্রীসেন বৃটিশ প্রাধান্য একরকম খর্বিতই করেন। তবুও বৃটিশ প্রধানমন্ত্রীর পক্ষে তাঁকে অভিনন্দন জানাতে এতোটুকু দ্বিধা দেখা দেয় নি। কিন্তু শ্রীসেনের লোকান্তরের পর ভারত সরকার তাঁর জন্য একটি কণ্ডোলেন্সও জানাতে কার্পণ্য বোধ করেন। অথচ শ্রীসেনের দক্ষতা জগৎ সমক্ষে সেদিন ভারতের মর্যাদাকেই তুলে ধরতে পেরেছিল।

ভারতেও অনুন্নত আদিবাসীদের নির্বাচনে অংশ গ্রহণ করানো কম পরিশ্রম-সাধ্য ব্যাপার ছিল না। ব্যালট বাক্সকে যাঁরা প্রণাম করে ব্যালট পেপার ফেলে গেছলেন, তাঁরা ভেবেছিলেন ঐ বাক্সের মধ্যেই আছে সেই শক্তি যে শক্তি তাঁদের এবার যুগ যুগ শোষণের অবসান ঘটাবে। সুদানের আদি-বাসীরা ছিলেন ততোধিক অন্ধকারে নিমজ্জিত। তাঁরা ব্যালট বাক্সকে যাদু-বিদ্যায় মন্ত্রপূত কোন বিশেষ বস্তু বলে তার প্রতি স্থানবিশেষে এতোদূর বিরূপতা পোষণ করেন যে, রীতিমত সশস্ত্র হয়ে নির্বাচনের মোকাবিলা করতে এসেছিলেন দলবেঁধে। সঙ্গে ছিল তাঁদের সবচেয়ে বিশ্বস্ত সহচর গরু-বাছুর ছাগল। গবাদি পশু সমস্ত অকল্যাণের হাত থেকে তাঁদের রক্ষা করে বলে ওখানে ধারণা প্রচলিত আছে।

এমনতর দেশে সাধারণ নির্বাচনকে সফল করে তোলার যে অঘটন-ঘটন-পটীয়সী ক্ষমতার প্রমাণ রাখলেন একজন সদ্যমুক্ত ভারতের নাগরিক, দুঃখের বিষয় ভারতবর্ষ তাঁর স্মৃতিকে অম্লান করে রাখবার জন্য কিছু করল না।

আপনাদের পত্রিকাটি সত্য কথা সহজ-ভাবে উত্থাপনের ক্ষমতা রাখে বলে মনে হল। তাছাড়া দেশবাসীর গর্বে গর্বিত হওয়ার যে মনোভাবকে স্বদেশহিতৈষণা বলে, মনে হয়, আপনার পত্রিকায় তার অভাব নেই। তাই ভরসা করে, আমি যেমনভাবে সুকুমার সেনকে দেখেছিলাম লিখে পাঠালাম।

আমার একটিই মাত্র বক্তব্য, তা হল, ভারতের কৃতী সন্তানদের স্মরণীয় করে রাখার দায়িত্ব কি ভারতবাসীরই নয়? তাতে কি ভারতেরই মর্যাদা বৃদ্ধি পায় না? যদি তাই হয়, তবে সুকুমার সেনকে স্মরণীয় করে রাখবার জন্য আমরা কতটুকু কর্তব্য পালন করেছি। ভারতের যে নির্বাচন নিয়ে আজ পৃথিবীব্যাপী বিস্ময়, সেই নির্বাচনের মূল কাঠামো যিনি রচনা করে গেলেন তাঁর প্রতি আমাদের কি কোনই কর্তব্য নেই!

সুদান তাঁকে সর্বপ্রকারে সম্মান জানিয়ে প্রধান রাজপথ তাঁর নামাঙ্কিত করেছিল। আমরা তাঁর ঋণ স্বীকারে কৃপণতা করে ভারতেরই কৃতিত্বকে লঘু করে দেখছি। অনেকের গলায়ই আজ রাষ্ট্রপতি-প্রদত্ত মর্যাদার মালা দুলছে, সুকুমার সেন কি তেমনতর মর্যাদার ঊর্ধ্বে! আপনার কাছে আমার অনুরোধ ভারতগৌরব সুকুমার সেন সম্পর্কে আপনার জাতীয়তাবাদী পত্রিকায় বিস্তৃত আলোচনা রেখে তাঁর প্রতি আমাদের প্রদেয় শ্রদ্ধা নিবেদনের সুযোগ রাখুন! সুকুমার সেনের প্রতি ভারত সরকারেরও বিশিষ্ট কর্তব্য ছিল, সরকারের বিস্মরণশীল মনে সেই বোধটুকু জাগ্রত করার দায়িত্ব আর কেউ পালন করুন বা না করুন, অন্তত বাংলা দেশের একটি পত্রিকা সেই অসমাপ্ত দায়িত্ব পালন করুক। অনেক অজ্ঞাত-পরিচয় ব্যক্তিকেই তো আজ ঢাক পিটিয়ে তুলে ধরা হচ্ছে, বাঙালী বলেই কি আমরা সুকুমার সেনকে ভুলতে দেব? এ দায়িত্ব আমাদের আমাদেরই তা পালন করতে হবে।

বিনীত নমস্কারান্তে—
জনৈক প্রবাসী ভারতীয়
খার্তুম, সুদান।

কলকাতার নির্বাচন

কয়েক সপ্তাহ আগে বোম্বাইয়ে এক সম্বর্ধনা সভায় ভারতের পয়লা নম্বরের শিল্পপতি জি ডি বিড়লা বলেছিলেন, বোম্বাই হচ্ছে স্বর্গ এবং কলকাতাটা যাচ্ছে-তাই (অর্থাৎ নরক?)। চোখ ধাঁধানো ধাবুয়ানার দিক দিয়ে কলকাতা অধুনা নরক বলে প্রতিপন্ন হলেও এ নরকে মধু আছে। জি ডি বিড়লার পিতামহ বোম্বাইতে প্রথম ব্যবসা শুরু করলেও বেশিদূর এগোতে পারেন নি। তাই এই শতাব্দীর গোড়ার দিকে মধুর লোভে বিড়লারা স্বর্গ ছেড়ে কলকাতা নামক নরকে এসে আস্তানা নিলেন এবং পূর্বাঞ্চলের মধু আহরণ করে যে মৌচাক গড়ে তুললেন, তার মূল্য কয়েক শ' কোটি টাকা।

বিড়লার অনেক আগে ইংরাজ বণিকরাই প্রথম এই মধুর সন্ধান পায়। ভারতের প্রাকৃতিক সম্পদের সিংহভাগটাই যে বাংলা-বিহার-আসাম-উড়িষ্যায় সীমাবদ্ধ সেটা অনুধাবন করে বৃটিশ সাম্রাজ্য-বাদীরা কলকাতায় তাদের শাসন এবং শোষণের সদর দপ্তর খাড়া করেছিল।

ইংরাজদের সংস্পর্শে এসে ইংরাজী শিক্ষার গুণে নতুন পৃথিবীর ভাবধারা কলকাতার পথেই সারা ভারতবর্ষে ছড়িয়ে পড়েছিল। কলকাতা হচ্ছে ভারতের নব-জাগরণের পথিকৃৎ। ইংরাজ, মারোয়াড়ী, ইহুদী, গুজরাটী,, পার্শি, ভাটিয়া বণিকেরা যখন কলকাতায় বসে সারা ভারতের সম্পদ শোষণের কাজে আত্মহারা হয়েছিল, তখন কলকাতার নতুন ভাবধারায় সমৃদ্ধ গরীব ও মধ্যবিত্ত দেশের মুক্তির পথ প্রশস্ত করছিলেন। দেশের সমস্ত প্রগতিমুখী সামাজিক, রাজনৈতিক এবং সাংস্কৃতিক আন্দোলনের প্রাণকেন্দ্র হচ্ছে কলকাতা। এই মহানগরী ভারত ইতি-হাসের অগ্রদূত। কেন্দ্রীয় সরকারের নিষ্পেষণ, বণিক সম্প্রদায়ের নির্মম অব-হেলা এবং জাতীয় নেতৃবৃন্দের উগ্র প্রাদেশিক সঙ্কীর্ণতা কলকাতার বহিরঙ্গে যতই কালিমা লেপন করুক তার অমর আত্মাকে এতটুকু দমিত করতে পারে নি। তার দেহ যতই শীর্ণ হোক, বস্ত্র যতই জীর্ণ হোক ভারতের বুকে কলকাতা আজও সগৌরবে মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে আছে। ভারত ইতিহাসের দিক-নির্ণয়ের দায়িত্ব আজও তার ওপর ন্যস্ত। দেশের সমস্ত শোষিত, অবদমিত মানুষ গভীর আশা নিয়ে পথনির্দেশের অপেক্ষায় কলকাতার দিকেই তাকিয়ে আছে। আমাদের এ মহা-নগরী হচ্ছে এক-জাতি এক-প্রাণ একতার মূর্ত প্রতীক। কলকাতা হচ্ছে ভারতীয় সংহতির উজ্জ্বলতম নিদর্শন। ভারতের প্রত্যেকটি রাজ্যের মানুষ তাদের শ্রম দিয়ে, ভালবাসা দিয়ে, বুকের রক্ত দিয়ে এই শহর গড়ে তুলেছেন। জাতীয়তাবাদের উদার আহ্বানে উদ্বুদ্ধ বাঙালীরা এই সার্বজনীন শহর সৃষ্টি করেছেন। এখানে অবাঙালীর সংখ্যা বাঙালীর চেয়ে খুব কম না হলেও শহরের আত্মাটা এখনও তার বাঙালীয়ানা বজায় রাখতে পেরেছে। কলকাতা হল মৌলিক। কারও অনুকরণ করে চলার অভ্যাস তার নেই। সে নিজের খেয়ালে, নিজের পথে ক্রমাগত সামনে এগিয়ে যেতে চাইছে। পদে পদে তার ভুল-ভ্রান্তি হওয়া অস্বাভাবিক নয়। কিন্তু সে কখনও মুক্তি প্রগতি শান্তির লক্ষ্য থেকে বিচ্যুত হয় নি।

এহেন কলকাতা আগামী মধ্যবর্তী নির্বাচনে কিভাবে সাড়া দেবে, তা নিয়ে লোকের মনে আগ্রহ জাগা স্বাভাবিক। এ শহর থেকে বিধানসভায় সদস্য নির্বাচিত হবেন ২৩ জন। গত চারটি সাধারণ নির্বাচনে লক্ষ্য করা গেছে যে, এ শহরের ভোটাররা কংগ্রেস এবং বামপন্থীদের মধ্যে ৫০:৫০ হারে বিভক্ত। কয়েকটি আসন একনাগাড়ে বামপন্থী প্রার্থীরাই জয়লাভ করে আসছেন, আর কয়েকটি আসনে কংগ্রেস প্রার্থীরা। বাকী আসনগুলোকে মার্জিনাল আখ্যা দেওয়া যায়। সেখানে সামান্য ভোটের ব্যবধানে কখনও কংগ্রেস আবার কখনও বা বামপন্থীরা জয়লাভ করেন। কলকাতার ভোটার জাতিভেদ অথবা সাম্প্রদায়িকতার দ্বারা কখনও প্রভাবান্বিত হন না। তবে কোন কোন ভাষাভাষী-গোষ্ঠী কখনও কখনও দলবদ্ধভাবে ভোট দিয়ে কোন কোন এলাকার নির্বাচনে যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করেন। যেমন বড়-বাজার, জোড়াসাঁকো এবং চৌরঙ্গী এলাকার হিন্দীভাষী ভোটাররা অধিকাংশ সময় দল-বদ্ধভাবে কংগ্রেসের পক্ষে ভোট দিয়ে এযাবৎকাল ঐ তিনটি আসনে কংগ্রেসের সাফল্য প্রায় সুনিশ্চিত করে রেখেছেন। কলকাতার মানুষ এত রাজনীতি-সচেতন যে, রাজনৈতিক দলের সমর্থনবিহীন কোন প্রার্থীকে তাঁরা কখনও আমল দেন নি। এমন কি ছোট ছোট রাজনৈতিক দলের (জোটবদ্ধ না হলে) প্রতিও তাঁদের কোন মোহ নেই। কলকাতায় নির্বাচনী ব্যয় গ্রামাঞ্চলের তুলনায় অনেক কম। কারণ এখানে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র এলাকায় অসংখ্য লোক বাস করেন। প্রার্থীরা পায়ে হেঁটেই ভোটারের দ্বারে দ্বারে ঘুরতে পারেন। জীপ এবং গাড়ি না পেলেও কোন ক্ষতি হয় না। পোলিং বুথে ভোটার আনা-নেওয়াও মোটেই কষ্টসাধ্য নয়। কারণ পোলিং বুথগুলো ভোটারের বাসস্থানের কাছাকাছি পড়ে যায়।

এবার কলকাতায় ২৩টি আসনের জন্য প্রার্থী আছেন ৮৯ জন। গতবার ছিলেন ১১৬ জন। অর্থাৎ প্রার্থীর সংখ্যা প্রায় ২৩ শতাংশ হ্রাস পেয়েছে। কংগ্রেস এবং যুক্তফ্রন্ট নির্বাচনে প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বী হলেও তাদের সঙ্গে আরও ৭টা রাজনৈতিক দল আছে—তারা হচ্ছে আই-এন-ডি-এফ (৫) জনসঙ্ঘ (৪), প্রাউডিস্ট (৩), পি-এস-পি (২), লোকদল (১) এবং রিপাবলিকান (১)।

কলকাতায় গত ৪টি নির্বাচনের ফলাফল

দল	১৯৫২	১৯৫৭	১৯৬২	১৯৬৭
কংগ্রেস	১৭	৮	১৪	১১
কম্যুনিস্ট	৪	১০	৮	৪
কম্যুঃ (মাঃ)	—	—	—	৫
ফঃ ব্লক	২	১	১	০
পি-এস-পি	০	৪	০	০
আর-এস-পি	০	১	১	১
অন্যান্য ও নির্দলীয়	৩	২	২	২

কংগ্রেস এবং যুক্তফ্রন্ট ছাড়া অন্য কোন দলের প্রার্থীর পক্ষে কলকাতায় নির্বাচনে জয়লাভ করা খুব কঠিন। বিগত নির্বা-চনে সেটা বেশ স্পষ্ট হয়ে গেছে। সুতরাং তাঁদের জয়লাভের সম্ভাবনা-অসম্ভাবনা নিয়ে আলোচনা করে কোন লাভ নেই। কলকাতার বড়বাজার, জোড়াসাঁকো, বৌ-বাজার আর চৌরঙ্গী কেন্দ্র কখনও কংগ্রেসের হাতছাড়া হয় নি। অপর দিকে টালিগঞ্জ, বিদ্যাসাগর, মাণিকতলা, উত্তর বেলেঘাটা, বটতলা এবং বেলগাছিয়া কখনও বামপন্থীদের (যুক্তফ্রন্ট) হাতছাড়া হয় নি। কিন্তু ১৫টি আসনে এক হাজার থেকে পাঁচ হাজার ভোটের ব্যবধানে কখনও বামপন্থীরা এবং কখনও কংগ্রেসীরা জয়ী হয়েছেন। কলকাতায় প্রতি কেন্দ্রে গড়ে ৬০ হাজার ভোটদাতা আছেন। কাজেই এই মার্জিনাল আসনগুলো কে কত বেশি হস্তগত করতে পারবেন, তার ওপরই দুই পক্ষের সার্বিক সাফল্য নির্ভর করছে।

গত সাধারণ নির্বাচনে কলকাতার ২৩টি

আসনের মধ্যে কংগ্রেস পেয়েছিল এগারটি, মার্কসবাদী কম্যুনিস্ট পার্টি পাঁচটি, কম্যুনিস্ট পার্টি চারটি, আর-এস-পি একটি, ওয়ার্কার্স পার্টি একটি (এঁরা সবাই যুক্তফ্রন্টের শরিক) এবং বামপন্থীদের সমর্থিত একটি (প্রাক্তন স্পীকার শ্রীবিজয়কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়) গতবার সরাসরি প্রতিদ্বন্দ্বিতা হয়েছিল তিনটি আসনে। তার মধ্যে বামপন্থীরা পেয়েছিলেন দুটি আর কংগ্রেস পেয়েছিল একটি আসন। এবার সরাসরি প্রতিদ্বন্দ্বিতা হচ্ছে সাতটি আসনে। যথা চৌরঙ্গী, কালীঘাট, রাসবিহারী, ঢাকুরিয়া, শিয়ালদহ, বটতলা এবং বেলগাছিয়া।

ত্রিমুখী প্রতিদ্বন্দ্বিতা হচ্ছে সাতটি আসনে। যথা কাশীপুর, শ্যামপুকুর, বালিগঞ্জ, এন্টালী, উত্তর বেলেঘাটা, বিদ্যাসাগর এবং মাণিকতলা। গতবার ত্রিমুখী লড়াই হয়েছিল ন'টি আসনে। তার মধ্যে কংগ্রেস পেয়েছিল দুটি। কংগ্রেসের গতবারের এগারটি আসনের মধ্যে আটটিতে প্রার্থীসংখ্যা ছিল চার থেকে ন'জন। গতবার তালতলায় এবং বড়বাজারে প্রার্থী ছিলেন ন'জন করে। গতবার কলকাতায় সবচেয়ে বেশি ভোট পেয়ে জিতেছিলেন শ্রীমতী ইলা মিত্র (কম্যুনিস্ট—মাণিকতলা)। তিনি পেয়েছিলেন ৩০,৩৮০ ভোট। গত চার বার সাধারণ নির্বাচনে দাঁড়িয়ে বেলগাছিয়া কেন্দ্রে কম্যুনিস্ট পার্টির কাছে পরাজয় বরণ করার পর এবার গণপতি সুর (কংগ্রেস) অবসর গ্রহণ করেছেন। বড়বাজার কেন্দ্রের গতবারের বিজয়ী প্রার্থী প্রাক্তন মন্ত্রী শ্রীঈশ্বরদাস জালানও এবার অসুস্থতাবশত নির্বাচনে দাঁড়ান নি। বালিগঞ্জের অনিল মৈত্রের মৃত্যু হওয়ায় তাঁর জায়গায় এবার কংগ্রেস প্রার্থী হয়েছেন বর্ণদেব চৌধুরী। বিদ্যাসাগর কেন্দ্রের বিজয়ী প্রার্থী ডাঃ নারায়ণ রায় (বাম কম্যুনিস্ট) এবার নির্বাচনে নামেন নি। তাঁর জায়গায় দাঁড়িয়েছেন কাউন্সিলর সমর রুদ্র। কংগ্রেসের ১৯৬৭ সালের প্রার্থীদের মধ্যে আর যাঁরা বসে গেছেন, তাঁদের মধ্যে আছেন জোড়াসাঁকোর রাজেন পোদ্দার (ইনি বিহার থেকে রাজ্যসভার সদস্য নির্বাচিত হয়েছেন), কবিতীর্থের অমলাইভূষণ পাল, রাসবিহারীর গীতা মুখার্জী, এন্টালীর গোলাম গৌস, বিদ্যাসাগরের দেবেন্দ্রলাল দত্ত এবং মাণিকতলার নরেন সেন।

মধ্যবর্তী নির্বাচনে কলকাতার ২৩টি কেন্দ্র থেকে যাঁরা প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন তার একটি কেন্দ্রভিত্তিক তালিকা দেওয়া হল। বন্ধনীর ভিতরের সংখ্যা কেন্দ্রের নম্বর।

কাশীপুর (১২৮)—রামশঙ্কর পান্ডে (নিঃ), কৃষ্ণগোপাল বসু (মাঃ কম্যুঃ—যুক্তফ্রন্ট), সুশীলকুমার পাল (কং)।

শ্যামপুকুর (১২৯)—হেমন্তকুমার বসু (ফঃ বঃ—যুক্তফ্রন্ট), গোবিন্দ দে (কং), ইন্দুভূষণ মিত্র (নিঃ)।

জোড়াবাগান (১৩০) — হরপ্রসাদ চ্যাটার্জী (মাঃ কম্যুঃ—যুক্তফ্রন্ট), নেপালচন্দ্র রায় (কং), হরিকৃষ্ণ ট্যান্ডন (নিঃ), অমরচাঁদ লাগোটিয়া (আমরা বাঙালী)।

জোড়াসাঁকো (১৩১)—শ্যামসুন্দর গুপ্ত (ফঃ বঃ—যুক্তফ্রন্ট), পুরুষোত্তমদাস হালয়াসিয়া (জনসঙ্ঘ), ডঃ পি, কে, আচার্য (আই, এন, ডি, এফ), দেবকিনন্দন পোদ্দার (কং) কানাইলাল মান্না (নিঃ)।

বড়বাজার (১৩২)—রামকিষণ লাখোটিয়া (জনসঙ্ঘ), রবিশঙ্কর পান্ডে (এস, এস, পি), রামকৃষ্ণ সারোগি (কং), ইয়াকুব আলি খান্ডার (নিঃ), বিপ্রদাস রাঘবজী কুন্দলিয়া (নিঃ), বিজয়কৃষ্ণ চনটনিয়া (এস, এস, পি—যুক্তফ্রন্ট), চোপদার নাগির (নিঃ), কানাইলাল পাঠক (পি, এস, পি), নজরুল হোসেন (নিঃ)।

বৌবাজার (১৩৩)—বিজয়সিং নাহার (কং), ধীরেন্দ্রচন্দ্র ভৌমিক (ফঃ বঃ—যুক্তফ্রন্ট), কার্তার সাধু সিং ভুটানি (জনসঙ্ঘ), আজিজুল হক (নিঃ)।

চৌরঙ্গী (১৩৪)—সিদ্ধার্থশঙ্কর রায় (কং), অনন্তলাল সিংহ (নিঃ)।

কবিতীর্থ (১৩৫)—সত্যনারায়ণ ঘোষাল (কং), কলিমুদ্দিন শামস (ফঃ বঃ—যুক্তফ্রন্ট), কালিকা উপাধ্যায় (নিঃ), রামচৈত রাম (রিপাবলিকান), সৈয়দ আতাউস্রেবি হাসনি (পি, এস, পি), অরুপমোহন সেন (নিঃ)।

আলিপুর (১৩৬)—মণি সান্যাল (কম্যুঃ—যুক্তফ্রন্ট), নরেন্দ্রনাথ সেন (কং), শ্যামনারায়ণ মিশ্র (আই, এন, ডি, এফ), চন্ডীপ্রসাদ কেডিয়া (নিঃ)।

কালীঘাট (১৩৭)—বিভা মিত্র (কং), সাধন গুপ্ত (মাঃ কম্যুঃ—যুক্তফ্রন্ট)।

রাসবিহারী এভেন্যু (১৩৮)—বিজয় ব্যানার্জী (নিঃ), হরেন ঘোষ (কং)।

বালিগঞ্জ (১৩৯)—নিরঞ্জন সেনগুপ্ত (মাঃ কম্যুঃ—যুক্তফ্রন্ট), ডাঃ অরবিন্দপ্রসাদ দাশগুপ্ত (কং), হীরেন্দ্রনাথ গুহরায় (নিঃ), শচীন্দ্রনাথ গাঙ্গুলী (জনসঙ্ঘ) গোপালকৃষ্ণ ফৌজদার (নিঃ)।

ঢাকুরিয়া (১৪০)—দেবপ্রসাদ চ্যাটার্জী (কং), সোমনাথ লাহিড়ী (কম্যুঃ—যুক্তফ্রন্ট)।

বালিগঞ্জ (১৪১)—জ্যোতিভূষণ ভট্টাচার্য (ওয়ার্কার্স পার্টি—যুক্তফ্রন্ট), রণদেব চৌধুরী (কং), জাহাঙ্গীর আলম (আই, এন, ডি, এফ)।

বেলেঘাটা দক্ষিণ (তফঃ) (১৪২)—গণেশপ্রসাদ রায় (কং), মনোরঞ্জন বড়াল (মাঃ কম্যুঃ—যুক্তফ্রন্ট) দীননাথ চৌধুরী (জনসঙ্ঘ), সুধানন্দ ধুগো (আই, এন, ডি, এফ), মল্লপ্প খটিক (লোকদল)।

এন্টালী (১৪৩)—অমরেন্দ্রনাথ দাস (আমরা বাঙালী), ডঃ এ, এম, গণি (কম্যুঃ—যুক্তফ্রন্ট), এম, ডি, জাহেদ (কং), আশুতোষ ঘোষ (আই, এন, ডি, এফ)।

তালতলা (১৪৪)—আবুল ফজল সিদ্দিকি (সংখ্যালঘু লীগ), সত্যেন্দ্রনাথ রায় (আমরা বাঙালী), করম হোসেন (কং), আবুল হুসেন (মাঃ কম্যুঃ—যুক্তফ্রন্ট)।

শিয়ালদহ (১৪৫)—ডঃ প্রতাপচন্দ্র চন্দ্র (কং), যতীন চক্রবর্তী (আর, এস, পি,—যুক্তফ্রন্ট)।

বিদ্যাসাগর (১৪৬)—সমর রুদ্র (মাঃ কম্যুঃ—যুক্তফ্রন্ট), মৃণাল সর্বাধিকারী (কং), দেবলকুমার গুপ্ত (নিঃ)।

বেলেঘাটা উত্তর (১৪৭)—কৃষ্ণপদ ঘোষ (মাঃ কম্যুঃ—যুক্তফ্রন্ট), শংকুলাল বিশ্বাস (কং), শৈলেন মুখার্জি (নিঃ)।

মাণিকতলা (১৪৮) — প্রদীপকুমার সরকার (কং), ইলা মিত্র (কম্যুঃ—যুক্তফ্রন্ট), নিমাই দাস (নিঃ)।

বড়তলা (১৪৯)—নিখিল দাস (আর, এস, পি,—যুক্তফ্রন্ট), অজিতকুমার পাঁজা (কং)।

বেলগাছিয়া (১৫০)—লক্ষ্মীচরণ সেন (মাঃ কম্যুঃ—যুক্তফ্রন্ট), সুচিত সুর (কং)।

কলকাতার নির্বাচনে কোন পক্ষের গলায় বিজয়লক্ষ্মী বরমাল্য অর্পণ করবেন, সে সম্পর্কে সঠিক ভবিষ্যদ্বাণী করা কোন সময়ই সম্ভব নয়। কারণ সার্বিক জয়-পরাজয় যে মার্জিনাল আসনগুলোর ওপর নির্ভরশীল, সেখানকার প্রাক্-নির্বাচন মুডের গতিবিধি নির্ণয় করা খুব কঠিন। কলকাতার ভোটারদের মধ্যে কল-কারখানা, অফিস-আদালতে খেটে-খাওয়া শ্রমজীবীর সংখ্যা বেশি হলেও ব্যবসা-বাণিজ্য এবং ছোট-বড় সম্পত্তির মালিকের সংখ্যাও কম নয়। গত দু' বছর যাবৎ দেশে যে মন্দা চলছে তার প্রায় পুরো সঙ্কটটা পশ্চিমবঙ্গ তথা কলকাতার ঘাড়ে এসেই চেপেছে। তার কারণ, এই শহরে শিক্ষিত-অশিক্ষিত বেকারের সংখ্যা ভীষণভাবে বেড়ে গেছে। ইঞ্জিনীয়ারিং শিল্পের সঙ্কটের জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের কাঁচামাল (লৌহেতর ধাতু) বণ্টন নীতির পক্ষপাতিত্বকে দায়ী করা হচ্ছে। ফলে বর্তমান শাসকগোষ্ঠীর বিরুদ্ধে সমগ্র রাজ্যে যথেষ্ট অসন্তোষ বিদ্যমান। শিল্প-বাণিজ্যে কলকাতার অবনতি এবং সেই তুলনায় মহারাষ্ট্র, গুজরাট, মাদ্রাজ প্রভৃতি রাজ্যের অস্বাভাবিক সমৃদ্ধিও লোকে খুব সহজ মনে গ্রহণ করছে না। ভিন্ন রাজ্যের শিল্পপতিদের দপ্তরগুলোয় বাঙালী কর্মচারী বর্জন নীতিও মধ্যবিত্তের মনে যথেষ্ট বিক্ষোভের সঞ্চার করেছে। জনমানসের এই অসন্তোষ যে কংগ্রেসের বিরুদ্ধেই কাজ করবে তাতে কোন সন্দেহ নেই। বিশেষ

করে কলকাতায় নাগরিক সুযোগ-সুবিধার অভাব এবং অর্থনৈতিক দৈন্যের ফলে খাস কলকাতা থেকে অতি দ্রুত বাঙালী-দের অন্তর্ধানও যথেষ্ট উদ্বেগের কারণ ঘটিয়েছে। অপর দিকে যুক্তফ্রন্টের ৯ মাসের শাসনকালে খাদ্যশস্যের অস্বাভাবিক মূল্যবৃদ্ধি এবং ঘেরাও কংগ্রেসী, প্রচারের সহায়তা করবে। কলকাতার নির্বাচনে যুক্ত-ফ্রন্টের সবচেয়ে বড় সহায় ড্যালহৌসি এলাকার শ্রমিক কর্মচারী এবং স্কুল-কলেজের শিক্ষকবৃন্দ। কংগ্রেসের বড় সহায় বিষয়-সম্পত্তির অবস্থাপন্ন মালিক সম্প্রদায় আর অঞ্চল বিশেষের স্বচ্ছল হিন্দীভাষী ভোটারবৃন্দ। দুই পরস্পরবিরোধী শিবিরে বিভক্ত কলকাতার ভোটাররা লোকচক্ষুর অন্তরালে কোন্ শিবিরের পাল্লা ভারী করছেন, তা ৯ই ফেব্রুয়ারীর আগে সঠিক ভাবে নির্ণয় করা সত্যিই কঠিন।

—বিশেষ প্রতিনিধি

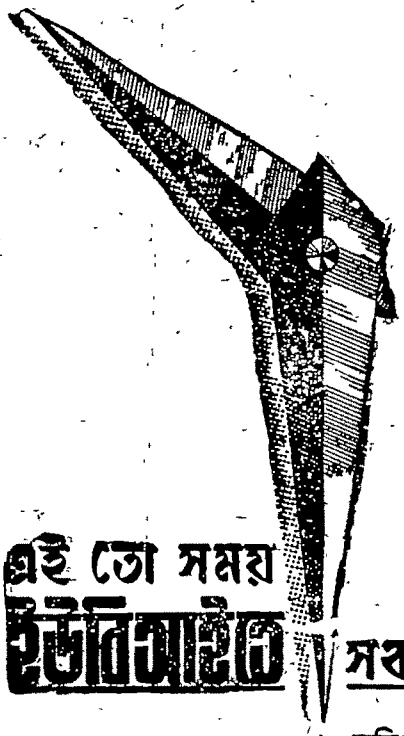

এই তো সময়
ইউনাইটেডে সঞ্চয় করার

- সেভিংস অ্যাকাউন্টে বছরে শতকরা ৩½ টাকা সুদ।
- মাত্র ৫৲ টাকা জমা দিয়ে হিসেব খুলতে পারেন।
- চেকবই ব্যবহার করা যায়।
- মাসে পাঁচবার টাকা তোলা চলে।
- মেয়াদী আমানতে মেয়াদ অনুসারে সর্বাধিক শতকরা ৬½ টাকা পর্যন্ত সুদ।
- পৌনঃপুনিক আমানতের (রেকারিং ডিপোজিট) শর্তাদি সুবিধাজনক।

আসুন···আমাদের এখানেই সঞ্চয় করুন

ইউনাইটেড ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়া লিঃ
রেজিস্টার্ড ও হেড অফিস ঃ ৪ ক্লাইভ ঘাট ষ্ট্রীট,
কলিকাতা-১

পশ্চিমবঙ্গে ১০৫টিরও অধিক শাখা অফিস আছে

ফুচিকের দেশে

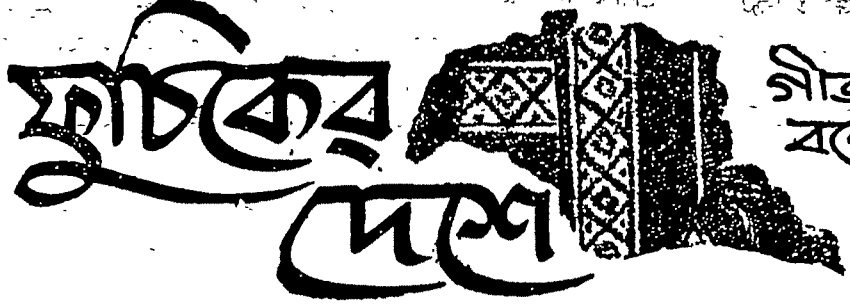

গীতা বন্দ্যোপাধ্যায়

[পূর্ব-প্রকাশিতের পর]

পাঁচবার হালচাল দেখে মনে হয়, নতুন কিছুর সন্ধান বোধ হয় ছোট কোনো দেশেই পাওয়া যাবে। বড় দেশগুলো সত্যি বলতে কি, আর আকর্ষণ করে না। ঠকপ্রীভূত বড় বড় সংগঠনের যা দোষ, তা সর্বত্রই চোখে পড়ে। যত বড় সরকার, তত তার হামলাবাজি। আরও ক্ষমতা, আরও সর্দারী, আরও নাম আর প্রতিপত্তি। ছোট দেশের এসব অহমিকার সুযোগ নেই। তাই তাদের কপালে হয় অন্যের সর্দারী, নয় বিদ্রোহ।

চেকোশ্লোভাকিয়ায় থাকা কালে একটা জিনিষ বুঝেছিলাম—একটা স্বাভাবিক তেজে এ দেশ তেজিয়ান। উৎস বলতে পারব না। হয়তো বোহেমিয়ার আবহাওয়া, অথবা বহুদিন যন্ত্রণায় ভোগা দেশের রোগমুক্তির চিহ্ন। আজ এখানে কিছু গড়ে উঠছে। কাল ওদিকটা বেড়ে উঠল। থিয়েটার হল তৈরি রাস্তার ধারে নতুন ধরণের পুতুল নাচের আয়োজনেরও ত্রুটি নেই। ছিমছাম ছবির মত শহর বটে কিন্তু তাই বলে স্ক্যান্ডিনেভিয়া বা সুইট্‌জারল্যাণ্ডের মত নিষ্প্রাণ নয়। এটাই চেকোশ্লোভাকিয়ার বিশেষত্ব বলে মনে হয়েছিল।

চেকোশ্লোভাকিয়ায় যা কিছু বাড়ছিল, তার মধ্যে সব চাইতে বেশি বাড়ছিল তার শিল্প। আর এইভাবে বুঝে শিল্প বেড়ে ওঠায় কোনো কোনো ক্ষেত্রে কৃষি অবহেলিত হয়েছিল বলে পরবর্তী সময়ে এরা আত্ম-সমালোচনা করে। চেকোশ্লোভাকিয়ার কৃষির সমস্যা অবিশ্যি তখন শিল্পের সমস্যার চাইতে অনেক বেশি জটিল ছিল। পরে ভূমিসংস্কারের সাফল্যের প্রয়োগের ফলে ১৯৪৮ সালে চাষীর জীবন অনেকটা সহজ হয়ে উঠেছিল।

কিন্তু তবু চেকোশ্লোভাকিয়া শিল্পের ক্ষেত্রে সমস্ত পূর্ব-গণতন্ত্রগুলোর মধ্যে সব চাইতে বেশি এগিয়ে আছে। আর এই এগিয়ে থাকার পেছনে আছে এখানকার ট্রেড্ ইউনিয়ন আন্দোলনের শক্তি। ট্রেড্ ইউনিয়ন আন্দোলন আবার তার ক্ষমতার উৎস খুঁজে পেয়েছে চেক্ গণতন্ত্রের রাজনৈতিক ভিত্তির ভেতরে।

তলিয়ে দেখতে গেলে সব দেশই তার নিজের নিজের জটিলতায় হয়রান হয়ে আছে। সমস্ত রকম আন্দোলনের মূলে মন্ত্রই খানিকটা এই জট ছাড়ানোর মধ্যে বন্দী হয়ে থাকে।

আমি যখন চেকোশ্লোভাকিয়ায়, তখন লড়াইটা ছিল প্রধানত এই জট ছাড়ানোর লড়াই। মজুররা এই আন্দোলনের একেবারে প্রাণ ছিল বললে ঠিক বলা হবে না। এরই ফলে চেকোশ্লোভাকিয়ায় শ্রমিক-আন্দোলন একটা নতুন চেহারা নেয়।

গোড়াতে ওদের শ্রমিক-আন্দোলনের অসুবিধে কি ছিল জানতে চাওয়ায় এক মজুর নেতা ভারি চমৎকার উত্তর দিয়েছিলেন—

'প্রথম মুশ্‌কিল হয়েছিল অনুভূতির দিক থেকে। কোনো মালিক বা ব্যাঙ্ক পুঁজিপতির হেপাজতে কারখানাগুলো নেই ভাবতেও অবাক লাগতো। ফ্রান্স বা ইতালির শ্রমিক-আন্দোলন খুব জোরদার সন্দেহ নেই—কিন্তু তারা এই অনুভূতির স্বাদ পায় নি। এর দায়িত্বও মারাত্মক। শুধু তো অর্থনৈতিক নয়—এক বিরাট রাজনৈতিক দায়িত্ব আমাদের মজুর আন্দোলনের ওপর এসে পড়েছে।'

চেকোশ্লোভাকিয়ার শিল্পোন্নতির ক্ষেত্রে সোভিয়েত ইউনিয়ন আর পূর্ব-গণতন্ত্রের অন্যান্য দেশগুলোর অবদানও খুব কম ছিল তা নয়। তখন সব দিকেই একটা—মহৎ—হ্যাঁ মহৎ-ই বলব—মহৎ ভ্রাতৃভাব দেখতে পেতাম। শুধু জিনিস-পত্রের আদানপ্রদানে নয়, সাংস্কৃতিক বিনিময়, যাওয়া-আসা—সবতাতেই ভাব-ভালবাসার জায়গাটা কিছু জোরাল ছিল।

চেকোশ্লোভাক সোস্যালিস্ট রিপাব্লিক তৈরি হয়েছে কয়েকটি রাজনৈতিক সংগঠনের ভিত্তিতে। এই জোটকে বলা হয়—জাতীয় ফ্রন্ট। এই জাতীয় ফ্রন্টে যেসব রাজনৈতিক পার্টি বা সংগঠন আছে তার মধ্যে সব চাইতে জোরদার হল এদের ১৯২১ সালে প্রতিষ্ঠিত কমিউনিস্ট পার্টি। কমিউনিস্ট পার্টির সদস্যরা চেকোশ্লোভাকিয়ার মুক্তি আন্দোলনে এমন হিম্মৎ দেখিয়েছিলেন যে তার গল্প শুনে গায়ে কাঁটা দিত। ফুচিক (উনি শুধু লেখকই ছিলেন না—চেক্ কমিউনিস্টদের নেতাও ছিলেন) তাঁর শেষ উইলে লিখেছিলেন—

'লাইব্রেরী ছাড়া আমার আর কিছু ছিল না। গেস্টাপোর লোকেরা তা নষ্ট করে দেয়।—আমাদের সময়ের মানুষগুলোকে নিয়ে একটা উপন্যাস শুরু করেছিলাম। দুটি অধ্যায় আমার বাবা মা'র কাছে আছে। বাদবাকি সম্ভবত নষ্ট হয়ে গেছে। আমার অনেক গল্পের পাণ্ডুলিপি আমি আমার গেস্টাপো ফাইলে দেখেছি।

'আমি আমার ভালবাসা দিয়ে উইল করে যাচ্ছি ইয়ান নেরুদাকে—সাহিত্যের না জন্মানো ঐতিহাসিক। তিনি ছিলেন আমাদের সব চাইতে বড় কবি; তিনি আমাদের চাইতে অনেক সুদূর ভবিষ্যৎকে দেখতে পেতেন। আজ পর্যন্ত তাঁকে পুরোপুরি বুঝে-সমঝে কেউ কিছু লেখে নি। নেরুদার সর্বহারা রূপ আঁকা হয় নি.....'

ফুচিকের সেই সর্বহারা কবির স্বপ্ন, তার সুদূরপ্রসারী দৃষ্টির ভেতর দিয়েই আজকের আধুনিক চেকোশ্লোভাকিয়া গড়ে উঠেছে।

চেকোশ্লোভাকিয়ার জাতীয় ফ্রন্টে যে সব পার্টি আছে তার মধ্যে রয়েছে : চেকোশ্লোভাক সোস্যালিস্ট পার্টি, চেকোশ্লোভাক গণ পার্টি, শ্লোভাক পুনর্গঠন পার্টি এবং শ্লোভাক মুক্তি পার্টি।

গণ সংগঠনের মধ্যে সব চাইতে বড় হল এর ট্রেড্ ইউনিয়ন (৪,০০০,০০০ স্বেচ্ছা-সভ্য)। ট্রেড্ ইউনিয়নগুলো একদিকে শ্রমিকদের ভালমন্দ দেখে আর অন্যদিকে তারা জাতীয় অর্থনীতিকে জোরদার করার দায়িত্ব নেয়। খুব শ্রমিকদের (১৫ থেকে ২৬ বছর পর্যন্ত) আলাদা

সংগঠন আছে—চেকোশ্লোভাক যুব ইউনিয়ন। এই ইউনিয়নের আবার বালক-বালিকা বিভাগ আছে—ইয়ং পাইয়োনিয়াস'। স্কুলের ছেলেমেয়েরা এর সভ্য।

১৯৬৪ স.লের নির্বাচনে জাতীয় সরকারের সমস্ত স্তরে ২৪০,৪২৩ জন সভ্য নির্বাচিত হয়েছিলেন। এছাড়া ৫২০,০০০ নাগরিক বিভিন্ন সরকারী কমিশন এবং ছোট-খাট কমিটিতে কাজ করেন। অর্থাৎ প্রত্যেক ২২ জনে একজন নাগরিক চেকোশ্লোভাকিয়ার সরকারী কাজে অংশ নিচ্ছেন।

স্কোডা কারখানা না দেখলে যেন ঠিক বোঝা যায় না—কি বিশাল চেকোশ্লোভাকিয়ার শিল্পোন্নতির পরিধি।

জাতীয় আয়ের শতকরা ৭০% ভাগ আসে শিল্প থেকে। আর দেশের তিন ভাগের এক ভাগ লোকের আয় নির্ভর করে এই শিল্পের ওপর।

চেকোশ্লোভাকিয়ার শিল্প যে তার লোক-সংখ্যার তুলনায় কত উন্নত তা বোঝা যায় নিচের পরিসংখ্যান থেকে—

পৃথিবীর শিল্পজাত দ্রব্যের শতকরা ২% ভাগ তৈরি হয় চেকোশ্লোভাকিয়ায় আর পৃথিবীর লোকসংখ্যার মাত্র ০,৫ ভাগ হল—চেকোশ্লোভাক।

যুদ্ধের আগেও চেকোশ্লোভাকিয়ার শিল্প উন্নত ছিল। বোহেমিয়ায় যে কেমিকেল কারখানাটি আছে তা তৈরি হয়েছিল ১০০ বছর আগে। আগে বেশি তৈরি হত কাপড়-চোপড়, কাচ আর খাদ্য-জাতীয় জিনিস। এখন লোহালক্কড় ইনজিনিয়ারিং জিনিসপত্র তৈরি হচ্ছে বেশি করে।

চেকোশ্লোভাকিয়ার মজুরেরা যে কত এগিয়ে গেছে তা বোঝা যায় ওদের সাংস্কৃতিক জীবনে অংশ গ্রহণ দেখলে। পূর্বে বোহেমিয়ায় একটা মজার সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান এরা করে থাকে। অপেশাদারী অভিনেতা-অভিনেত্রীরা আগস্ট মাসে 'হোনোভ' বলে জায়গায় জড় হয়। (১৯৩১ সালে প্রতিষ্ঠিত) এক সপ্তাহ ধরে সবাইকে 'পাগলামী'-তে ধরে। চব্বিশ ঘণ্টা না খেয়ে, না অন্য কিছু করে হয় হাজার হাজার লোক নাটক দেখে, কিম্বা নাটক প্রযোজনা করে অথবা নাটকে অংশ নেয়। জিরাসেক থিয়েটারে এর আরম্ভ। তারপর পার্কে, ময়দানে, ইস্কুলবাড়িতে, রেস্টুরেন্টে, আপিসে—সর্বত্র অভিনয় চলে। এই সব হাজার হাজার থিয়েটার পাগলাদের যদি জিজ্ঞেস করা যায়, এদের খরচ কে দিচ্ছে—এরা হেসে উঠে বলবে—সব নিজের হে, সব নিজের। কিন্তু কেন? কেন না, এ তার সখ। থিয়েটার তার 'হবি', তার জীবন, তার অন্তরের স্বাধীনতার প্রতীক, তার দুর্দান্ত প্রাণশক্তির আশ্রয়স্থল—আদর্শবাদ—সব, সব!

একজন হেসে অস্থির হয়ে বলেছিলেন—

'এই শহরের ১০ মাইলের মধ্যে পৌঁছলে প্রত্যেকটি অপেশাদারী অভিনেতার হৃদ্‌স্পন্দন ভীষণভাবে বেড়ে যায়। ঠাট্টা নয়—রিসার্চ হয়েছে—ডাক্তাররা আমাদের রীতিমত পরিক্ষা করে দেখেছেন—প্রত্যেকটি অভিনেতার হৃদয় পাগলের মত ধড়ফড় করছে। বিশ্বাস কর—একেবারে খাঁটি সত্যি।' [ক্রমশঃ]

কলগেট ব্যবহার করে মুখের দুর্গন্ধ দূর করুন 3 সাধারণ দন্তক্ষয় রোধ করুন!

কারণঃ একবার মাত্র কলগেট ডেন্টাল ক্রীম দিয়ে দাঁত ব্রাশ করলেই দুর্গন্ধ ১ ঘন্টার জন্য দায়ী বীজাণুর শতকরা ৮৫ ভাগ পর্যন্ত দূর হয়ে যাবে।

বৈজ্ঞানিক পরীক্ষায় প্রমাণিত হয়েছে যে কলগেট প্রতি ১০ জনের মধ্যে ৭ জনের মুখের দুর্গন্ধ সঙ্গে সঙ্গেই দূর করে এবং কলগেট প্রক্রিয়ায় খাওয়ার ঠিক পরেই দাঁত ব্রাশ করলে বেশীর ভাগ লোকের দন্তক্ষয় রোধ করা যায়—আজ পর্যন্ত দন্ত-চিকিৎসার ইতিহাসে যেমনটি আর কখনো দেখা যায়নি! আর একমাত্র কলগেটই এর সেই প্রমাণ আছে।

যদি পাউডার পছন্দ করেন, কলগেট টুথ পাউডারে এ সব গুণই পাবেন। এক কৌটো পাউডার অনেক মাস চলবে।

কী সুন্দর এর পিপারমেন্টের স্বাদ—তাই ছেলেমেয়েরা কলগেট ডেন্টাল ক্রীম দিয়ে নিয়মিত দাঁত ব্রাশ করতে ভালবাসে!

পরিচ্ছন্ন নির্মল শ্বাসপ্রশ্বাস নিতে এবং দাঁতকে উজ্জ্বল সাদা করতে...পৃথিবীর অন্য যে কোন টুথপেষ্টের চেয়ে কলগেট অনেক বেশী লোক কেনেন।

এখন! সুপার সাইজ কিনে ...পয়সা বাঁচান!

DC-73 BN

তিমিরপ্রান্ত ডুয়ার্স

॥ অগ্নিবর্ণ ॥

(এক)

ডুয়ার্স।

পশ্চিমবাংলার উত্তরপ্রান্তের এক পাণ্ডববর্জিত দেশ। মহাভারতবর্ষ পরিক্রমায় পাণ্ডবরা দিগ্বিজয়ে বেরিয়েছিলেন নানা দেশে সে-কথা আমরা জানি, কিন্তু ভারতবর্ষের পূর্বপ্রান্তের এই দেশটিতে পদার্পণ করেছিলেন কি না সন্দেহ। তাই পাণ্ডবর্বর্জিত দেশ বলে এখানটা কৌলীন্য দাবি করতে পারে। পাণ্ডবরা অনেক জায়গায় গিয়েছিলেন, আসামের মণিপুর পর্যন্ত যে গিয়েছিলেন তার প্রমাণ তো অর্জুন-চিত্রাঙ্গদার কাহিনীতেই পাই। যে-জায়গাটিকে আমরা ডুয়ার্স বলি, তার তখনও সৃষ্টিই হয় নি বলা চলে। ডুয়ার্স-এর পরিচয় এবং খ্যাতি-অখ্যাতি যাই বলুন সবটাই আধুনিককালের। এই ডুয়ার্সের নাম বর্তমানকালে যতই মানুষের মুখে মুখে ফিরুক, আসলে ডুয়ার্সের অতীত এখনো অনেক মানুষের কাছেই অন্ধকারাচ্ছন্ন। কলকাতা থেকে দার্জিলিং মেলে ফিরছিলাম। অনেক চেষ্টা সত্ত্বেও রিজার্ভেশ্যন পাই নি। বসেছি অনেক কষ্টে একটুখানি জায়গা করে। গাড়ি ছাড়বার আগে আগে পার্শ্ববর্তী ভদ্রলোকটি বললেন, আপনি কোথায় যাবেন? বললাম, উত্তরবাংলা।

বলার অবশ্য প্রয়োজন ছিল না। সঙ্গে মোটঘাট প্রচুর রয়েছে। তাছাড়া দার্জিলিং মেলের যাত্রী। ভদ্রলোকের অনুমান-করা উচিত ছিল। কিন্তু তবু তাঁর প্রশ্নে খানিকটা অবাক হয়েছিলাম।

ভদ্রলোক নাছোড়বান্দা। এইমাত্র চারমিনার সিগারেটের সদ্যকেনা প্যাকেট থেকে একটি সিগারেট বার করে ঠোঁটে চাপতে চাপতে তিনি আমার দিকে তাকিয়ে প্রশ্নটা করলেন, অবশ্য ইংরাজি-ভাষায়, নর্থবেঙ্গল? আমি তাঁর বিস্ময় উপলব্ধি করে একটু হেসে বললাম, কেন, নর্থবেঙ্গলে যেতে নেই বুঝি?

ভদ্রলোক একটা ঢোক গিলে ফেললেন হঠাৎ। তারপর ঠোঁটে-লাগানো সিগারেট-টা অদ্ভুত কায়দায় ধরিয়ে ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে বললেন, না, তা কেন? তবে কি না ক'দিন আগে একটা ভয়ংকর বিপর্যয় ঘটে গেল বলে—

বুঝলাম তিনি জলপাইগুড়ির বন্যার কথা বলছেন। আমি বললাম, না জলপাইগুড়ি যাচ্ছি না। অবশ্য বন্যা জলপাইগুড়ির বাইরেও কোন কোন জেলায় হয়েছে।

তাহলে?

আমি যাচ্ছি ডুয়ার্স।

শুনে ভদ্রলোক যে প্রসন্ন হলেন না তা বলাই বাহুল্য। অতঃপর সারা রাস্তাটা প্রায় বিষন্নবদনেই কাটালেন। একসময় শুধু বললেন, ডুয়ার্স শুনেছি না কি ভয়ংকর সাপ-বাঘ আর ভালুকের রাজত্ব।

বললাম, শুধু সাপ-বাঘ আর ভালুকের রাজত্বই নয়, এককালে ভয়ংকর বাঘা ব্ল্যাকওয়াটার ফিভারের এলাকাও ছিল এখানটা। তবে এখন আর আগের মত নেই। অবস্থার অনেক পরিবর্তন হয়েছে।

ভদ্রলোকের দোষ ছিল না। আমি জানি ভারতবর্ষ ত দূরস্থান, এই বাংলা দেশেরই দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের অনেক মানুষের চোখে ভয়ে ও দুঃস্বপ্নে ডুয়ার্সের নামে লাফিয়ে কপালে উঠে পড়বে। কারণ ডুয়ার্স সম্পর্কে মানুষের ভীতি ও উৎকণ্ঠার অন্ত নেই। বাংলা দেশের উত্তরতম প্রান্তে সে কোন্ দেশ, যেখানে ঘন গভীর অরণ্য ছায়ায় দিনের আলো চমকে উঠে পথ হারায়। দীর্ঘ শালের ঘনের আড়ালে দিবাভাগেও আদিমযুগের প্রাকারচ্ছায়ার অন্ধকার জমে থাকে। আর সেই অন্ধকারে পাথরের মত ঠাণ্ডা শীতল মাটির বুকে গা এলিয়ে নিঃশব্দ শুয়ে থাকে অতিকায় পাইথন—চোখ তার জ্বলে ভয়ংকর বিষের উগ্র জ্বালায়। গাছের শাখা পল্লবলতা বেষ্টন করে ঝুলে থাকে হিংস্র আরো অসংখ্য নাগ-নাগিনী। হিংস্র ফুঁসে-ওঠা হাওয়ায় হাওয়ায় গাছ থেকে ঝরে ঝরে পড়ে অগণ্য শুকনো-পাতার রাশি। অন্ধকার রাত্রে শিকার-সন্ধানে ধূর্ত চিতা ঘাসের ওপরে পা-ফেলে ফেলে সন্তর্পণে নেমে আসে ঝোরা বা ঝিলের ধারে। অতিকায় বাঘের রেশমের মত মোলায়েম ডোরা-কাটা কাটা চামড়ায় পিছলে পড়ে জ্যোৎস্নারাত্রির রুপালি আলোর ছটা। ভয়াল গর্জনে আর লেজের দুরন্ত মোচড়ে আদিম রাত্রির অন্ধকার ক্ষুরধার হয়ে ওঠে আর পাখিদের কল-কাকলি পর্যন্ত স্তব্ধ হয়ে যায়। কাঁটা-বনের ধারে প্রায় শুকনো নদীর বালুচরের প্রান্তে ঘাসের বনের গর্ভে দুরু দুরু ভয়ে বুক লুকিয়ে থাকে সশঙ্ক খরগোসের দল। পাহাড়ে যখন বরফ ঝরতে থাকে, হাওয়া তখন শীতের রাত্রের কাঁপন জড়ো করে দাঁচিয়ে ফেলে পুঞ্জীভূত শুকনো-পাতা। আর দুর্দান্ত দামাল হাতীর দল তখনই নেমে আসে অপেক্ষাকৃত সমতলের দিকে।

এই তো গেল ডুয়ার্সের একদিকের চিত্র। অন্যদিকে ডুয়ার্স এক মোহময়ী সুন্দরী রূপসী। তার অরণ্যমায়ায় ক্ষুব্ধমতার চোখ-ধাঁধানো বিলাসের কোনো চিহ্ন নেই। মাইলের পর মাইল, যোজনের পর যোজন বিস্তার সবুজ অরণ্যের শ্যামলিমা। তার ঘাসেই বা কত রঙদার মখমলের কারুকার্য। তার পাতায় পাতায় ফুলে শাখায় প্রশাখায় সতেজ স্বাস্থ্যের দীপ্তি। নির্জন বুনো রাত্রির অন্ধকার শিয়রে দূর শিখরমালার উপরে হঠাৎ যখন হলুদ রক্তের চাঁদ ওঠে, তখন চারদিকটা আরবীয় উপকথা-লোকের মত স্বপ্নময় হয়ে ওঠে। হয়তো সেই মোহ-মায়ায় ক্ষণিকের জন্যে বিচলিত হয় সোনালী রঙ হরিণ। ঝরণার ধারে বা ঝিলে জল খেতে এসে দাঁড়িয়ে যায় ছবির মত। আবার কোথাও বর্ষারাত্রির মাদকতাময় অন্ধকারে নির্জন কদমশিখর থেকে কদম্বরেণু চূর্ণ চূর্ণ ছড়িয়ে দেয়, কদমপুষ্পগন্ধ ছড়ায় বাতাসে। দিনের বেলায় শালমঞ্জরীর উতলা আত্মনিবেদনে বিহ্বল হয় বনপথ। তার সবুজ পাতার আঁচলে সোনালী তন্তু ছড়িয়ে নির্ভরে হেড়ে ওঠে মাকড়সা। আর তার নীচে আকাশের গায় পিঠ দিয়ে দাঁড়ায় আরছায়া-রঙ পাহাড়। দূরে হিমালয়ের বিলীয়মান দিগন্তরেখা। ভোরের সূর্যের আলোয় রাজার মত মহিমান্বিত প্রতাপে ঝকঝক করে জ্বলে দূর কাঞ্চন-জঙ্ঘার চূড়া।

সংক্ষেপে এই হল ডুয়ার্স। ডুয়ার্স এক আশ্চর্য প্রান্তর। আশ্চর্য এলাকা। কোমলে-কঠিনে মেশা; ভয়ংকরে-মালিন্যে মেশা এক আশ্চর্য দেশ বলে এর তুলনা নেই। যাঁরা কাছে থেকে এর রূপ দেখেন নি, তাঁরা কল্পনাই করতে পারবেন না ডুয়ার্স সম্পর্কে। ডুয়ার্সকে কাছে থেকে যে দেখেছে, তার পক্ষে এর মায়া ত্যাগ করা ভীষণ কঠিন। এ-হেন রূপময়

সদ্য বিকশিত গোলাপের মত সুন্দর আনন ও
কুসুম কোমল
পাপড়ি পেলব তনু

সাধনা বিউটি ক্রীম-এর
এইতো সবচেয়ে বড় অবদান।
নিজেদের সৌন্দর্য্য সম্পর্কে
সচেতন আধুনিকারা তাই
এর প্রশংসায় মুখর।

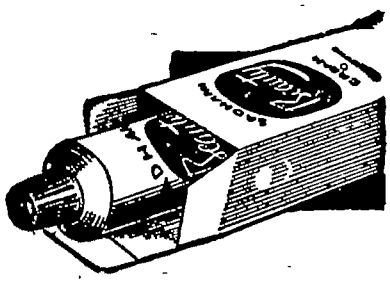

সাধনা
বিউটি
ক্রীম

অপরিহার্য্য
অতি আধুনিক অলঙ্কার

সাধনা ঔষধালয়-ঢাকা কলিকাতা-এলাঃ

সৌন্দর্যক্ষেত্র কিন্তু এখনও অসংখ্য মানুষের কাছে ভয়ের পাত্র, ত্রাসের পাত্র। ডুয়ার্সকে ঘিরে তাঁদের মা-দেখা মনের সন্দেহ-অবিশ্বাস-ভয়, উদ্বেগ এবং উৎকণ্ঠা। তাই ডুয়ার্সে আছি শুনে অনেককেই ক্ষণকালের জন্য মুখ ফিরিয়ে একবার তাকাতে হয় আমাদের দিকে। বরং মহানগরী কলকাতার পক্ষপুটে অজস্র সয়স্যার ঘেরাটোপে নাজেহাল জীবন ভালো লাগবে, কিন্তু সর্বনাশ, কাউকে যেন ভুলেও ডুয়ার্সে না যেতে হয়।

একটা গল্প বলি এই প্রসঙ্গে। আমার এক বন্ধুর চাকরি হয়েছিল এদিকে। আমিই চেষ্টা করেছিলাম যাতে বন্ধুটির চাকরি হয়। কারণ অনেকদিন চেষ্টা করেও বন্ধুটি একটি চাকরির ব্যবস্থা করতে পারেন নি ওদিকে। হয়তো ওঁর মামার অভাব ছিল। মামা না-থাকলে চাকরি হয় না একালে। যতই না শিক্ষা-দীক্ষা যোগ্যতা থাক। বন্ধুটি অঙ্কের এম-এসসি। প্রথম শ্রেণীতে না হোক অন্তত দ্বিতীয় শ্রেণীর প্রথম সারির দিকে জায়গা পেয়েছিলেন। কিন্তু তবু তাঁর কোয়ালিফিকেশনে কুলোয় নি। আমি তার ব্যবস্থা করেছিলাম এখনকার একটি স্কুলে। হায়ার সেকেন্ডারী স্কুল। বেতনের স্কেল সব জায়গাতেই এক। স্কুলের সেক্রেটারী বলছিলেন, উনি কি আসবেন?

আমি বলেছিলাম, কেন আসবেন না? নিশ্চয়ই আসবেন। কিন্তু তখনও আমার জানতে বাকি ছিল। বন্ধুটি আসেন নি। নির্দিষ্ট সময় টেলিগ্রাম-মারফৎ জবাব এসেছিল আরো কিছু সময় দেবার কথা।

সেক্রেটারী প্রবীণ মানুষ। টেলিগ্রামটা আমার হাতে তুলে দিতে দিতে তিনি হাসছিলেন, দেখুন, আপনার বন্ধু, আপনিই বুঝুন।

বন্ধুটি অবশ্য আসেন নি। পরে শুনেছিলাম তাঁর নিজের আগ্রহ অবশ্য যথেষ্ট ছিল (তাঁর নিজেরই কথায়) কিন্তু তাঁর যুবতী স্ত্রী এবং শ্বশুরমশাই দু'জনেই একসঙ্গে এ-ব্যাপারে বেঁকে বসেছিলেন। শ্বশুরমশায়ের যাই হোক, নবপরিণীতা স্ত্রী-র অসহযোগিতার কথা কল্পনামাত্রেও আনবার নয়।—ডুয়ার্সের বাঘ-ভালুকের আলিঙ্গনের চাইতে বেকার যুবকের স্ত্রী-রত্নবন্দনা কি ঢের বেশি কাম্য নয়? শুনতে শুনতে আমি হাসছিলাম।

(দুই)

জানলা বন্ধ করে দিয়েছি।

অনেকক্ষণ কম্বলের মধ্যে আপাদ-মস্তক জড়িয়ে নিয়ে কুঁকড়ে ছোট হয়ে বসেছি। অন্যান্য আরও সব যাত্রীদের মত। কিন্তু ঠাণ্ডা হাওয়ার বিরাম নেই। বাইরে চলন্ত ট্রেনের চাকায় চাকায় দুরন্ত ধাতব শব্দ ও গতির উল্লাস। তার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে ছুটেছে অস্থির দুর্দান্ত শীত-রাত্রির ক্ষ্যাপা হাওয়া। গাড়ির দ্রুত ধাবমানতার উল্লাস ছাপিয়েও হু-হু-হু-হু সেই হাওয়ার একটানা দীর্ঘশ্বাস কানে আসছে। সুবিধে এই যে, আমি গাড়ির কামরার মধ্যে বসে আছি। জানলাগুলি তুলে দেওয়া আছে। নইলে এই হাড়-কনকনে শীতরাত্রির হাওয়া হয়তো আমাকে উড়িয়ে নিয়ে ফেলত বরফ-প্রান্তরের মধ্যে। নিজেও যে বরফের টুকরো হয়ে যেতাম কি না সন্দেহ।

আমরা যে গঙ্গা পেরিয়ে উত্তরবঙ্গের সীমানায় এসে গেছি, তাতে আর কোনও ভুল নেই। আজ দুপুরবেলা যখন শেয়ালদা থেকে ট্রেনে চাপি, তখন সমীর আমাকে তুলে দিতে এসেছিল। সমীর আশৈশব কলকাতার ছেলে। বলছিল, বেশ গরম-গরম লাগছে কাল থেকে। সমীর রুমাল দিয়ে গালে-গলায় ঘাম মুছছিল। আর ঘণ্টা দশেকের ব্যবধানে খেজুরিয়াঘাট থেকে ট্রেনে উঠে ছুটতে না ছুটতেই শীতরাত্রির হাওয়া জমিয়ে দিচ্ছে, এটা শীতকাল।

আমাদের ছোটবেলার দিনগুলি মনে আসে। মাঘের শীতে বাঘ কাবু হয় বলে একটা কথা আছে। ছেলেবেলায় ঠাকুমা-ঠাকুর্দার মুখে শোনা কথা। কবে থেকে যে কথাটা শুরু তা অবশ্য বলা কঠিন। ঠাকুমা-ঠাকুর্দাদেরও আগের যুগে সত্যি সত্যি কোন বাঘ কিংবা ব্যাঘ্রবাহিনী দুরন্ত শীত ঋতুর হাওয়া এবং তুষার বর্ষণে পালিয়ে সমতলে চলে এসেছিল কি না বলতে পারি না। ঠিক জানি কথাটার এভাবে সৃষ্টি না-হওয়াই সম্ভব। অন্যান্য অনেক প্রবাদ-প্রবচনের মতই এ উষ্ণ জীবন-সম্পর্কিত অভিজ্ঞতা ও প্রজ্ঞা থেকেই এসেছে। মাঘের দুরন্ত শীত-প্রাবল্য বর্ণনা করতেই কথাটির সৃষ্টি।

কিন্তু এ তো মাঘ নয়, পৌষ। পৌষেরও মাঝামাঝি। ইংরাজি জানুয়ারী মাসের শুধু সূচনা মাত্র। তা পৌষেরই যদি এই চেহারা, মাঘের চেহারাটা কেমন দেখা দেবে সত্যি-সত্যি অকল্পনীয়। পৌষ বাঙালীর প্রিয় মাস। পৌষলক্ষ্মীর অধিষ্ঠান এই মাসে। কার্তিক-অঘ্রাণে দুই মাস ভরে মাঠের অঙ্গনে যে সোনার ফসলের জন্ম হয়েছে তা গোলাজাত হয়েছে মানুষের ঘরে-ঘরে। "মাঠের শস্য গৃহে এল, স্তোত্র রচনা কর কবি"—প্রেমেন্দ্র মিত্রের এই অবিস্মরণীয় লাইন দু'টোর কথা মনে হয়। মাঠের শস্য গৃহে এলে শুধু কি গোলা ভরে? কে না জানে যে, ফলানোর সঙ্গে সঙ্গে আমাদের মনও ভরে। শরতে-হেমন্তে শুধু তার শুভ সূচনা। আর পৌষে তার যথার্থ আস্বাদন। নতুন ধান্যে শুধু আর "হবে নবান্ন" বলে কবির আশা নয়, একেবারে চক্ষু-কর্ণের বিবাদ মিটিয়ে ঘরে-ঘরের আঙিনায় এসে উপস্থিত। একেবারে পাতে মিলবার আয়োজন। ষোড়শ-উপচারের ব্যবস্থা। পোলাও-ঘৃতে, সাদাভাতে, ঘৃতে, ভোজ্য ভাজাভুজি টক-ঝাল-তিক্ত-স্বাদু চর্ব-চোষ্য লেহ্য-পেয় ইত্যাদিতে। তার সঙ্গে পৌষ সংক্রান্তিতে কত না পিঠে-পুলি-পরমান্নের আয়োজন। পৌষ উদর-প্রেমিক বাঙালীর উদর ধরে এমন উদারভাবে টান দিতে পেরেছিল বলেই সে বাঙালীর প্রিয় মাস। কারু কারুর সর্বনাশ থাকা সত্ত্বেও পৌষকে বাঙালী হৃদয়ের কাছে স্থান দিয়েছে।

আজ সে-রামও নেই সে-অযোধ্যাও নেই। সেই সঙ্গে বলি, বাঙালীর সেই প্রিয় ঠাকুমাও নেই। সেই সব ঠাকুমারা গত হয়েছেন অনেককাল। অথবা গত হতে হতে কোনক্রমে টিকে আছেন, যে-হাতগুলি স্বাদু অমৃত-পরিবেষণ করত, তাদের ধারা লোপ পাচ্ছে। সমস্যার চাপে, অভাববোধের তাড়নায় রুচির পরিবর্তনে প্রাণেরও পরিবর্তন দেখা যাচ্ছে। সেই সঙ্গে সঙ্গে পৌষেরও দাম কমে যাচ্ছে। ভেবে আফশোষ করে অবশ্য লাভ নেই। পৌষের শুভ-সূচনার সঙ্গে সঙ্গে গ্রামে গ্রামে বুড়োদের সেই ব্রাহ্মমুহূর্তে পুকুরের জলে দাঁড়িয়ে স্পষ্টকণ্ঠে সূর্য-স্তোত্র উচ্চারণ আজও মনে পড়ে। জলে কুয়াশা উঠছে। সূর্যটি উঠি-উঠি, পরিপূর্ণ এক আশ্চর্য স্নিগ্ধতা চারদিকে। গাছের ডালে পাখির পাখালির কলকাকলি। তারপর সংক্রান্তির দিনগুলিতে ভোরবেলা উঠে ঠাকুর্দাদের সঙ্গে চান করে কাঁপতে কাঁপতে শুকনো কাঠের আগুন তাপানো। একটু বেলা হতে মা-ঠাকুমাদের হাতে-বানানো মোলায়েম মোলাম পিঠে-পুলি। চন্দ্রপুলি, গোকুল-পিঠে, নারকেলের পায়েস, পাটিসাপটা, চিড়ে এবং ডালবাটারই বা কত রকমারী পিঠে। খেজুর রস হেঁকে যেত ভোর-বেলা। জলের মত টলটলে। মাটির ভাঁড় থেকে প্রয়োজন মত ঢেলে ঢেলে নাও। পাটালি তৈরি হচ্ছে। চিনির তৈরি কদমা-বাতাসা। ক্ষমলালেবু। কত কী!

এই সব দিনগুলি আর কোনদিনও আসবে কি না সন্দেহ। কলকাতা শহরে অবশ্য ঋতুর হিসেবে পৌষ ততটা আন্দাজ করা না গেলেও নতুন পাটালি, বিশেষত বিখ্যাত নলেন গুড়ের সন্দেশের কল্যাণে,

জয়নগরের নতুন মোয়ার পৌষের আমেজ আসে। সেই সঙ্গে সঙ্গে কিন্তু এসে পড়ে বড়দিনের উৎসব। বাতাসে একাধটু ঠাণ্ডা হাওয়ার আমেজ আসতে-না-আসতেই রাজধানীর মানুষ সচেতন হয়ে ওঠেন। একশ' বছরের ওপার থেকে গুপ্ত কবির বড়দিনের উৎসব নিয়ে ব্যঙ্গ-চতুর কণ্ঠ একালে আর মনেও পড়ে না। "বিড়ালাক্ষী-মধুমক্ষী মুখে গন্ধ ছুটে"—চেহারাটি একালেও আছে বরং আরো তাৎপর্যপূর্ণ। পার্ক স্ট্রীট চৌরঙ্গীপাড়ার হোটেলগুলি আকর্ষণীয় রঙের জেল্লায়-জৌলুষে যেমন আড়ম্বরপূর্ণ হয়ে ওঠে, তেমনি নানা সুদৃশ্য মোড়কের ও বোতলের আহ্বানই বা কত। কোথাকার কেক ভালো, তার জন্যে কতদিন আগে থেকে প্রস্তুতি, সেই বিশেষ দিনটিতেই বা কত উদ্যোগ-আয়োজন, পিকনিকের কত কি ব্যবস্থা!

বলতে কি, পৌষের সেই আসন অবহেলিত বলেই কি না একালে পৌষের শীত প্রতিশোধ নিচ্ছে তার। বিপুল দাপটে। উত্তরবঙ্গ অবশ্য শীতেরই রাজ্য। বলা যেতে পারে এখানে দুটি মাত্র ঋতু। একটি বর্ষা, অন্যটি শীত। আশ্বিনে-কার্তিকেই মোটামুটি শীত নামতে শুরু করে। বাইরে রাত যত বাড়ে, ততই পায়ের কাছে রক্ষিত কম্বলের বিরহ-বিচ্ছেদ যাতনার কারণ হয়। তার চাইতে ঘুম-জড়িত-চক্ষে ঈষৎ গাত্রোত্তোলনপূর্বক কম্বলটি গায়ের ওপর টেনে নিন, মৃদু সুখানুভূতি হবে। বরঞ্চ এইসব ঋতুগুলিতে প্রিয়সুখ-স্পর্শও এত রোমাঞ্চকর হবে কি না সন্দেহ। তারপর অকাতরে কান পর্যন্ত তাকে টেনে দিয়ে ঘুমোন। দার্জিলিং-এর ঠাণ্ডার সঙ্গে তুলনা করছি না। তবু ডুয়ার্সে মূলত এই প্রকৃতি। শীতের আগমনের আগে-আগেই পর্বত-প্রান্তরে দিনরাত সামাল বাতাস বইতে শুরু করবে। শুকনোপাতা ঝরিয়ে ঝরিয়ে সে-প্রকৃতির দামালপনার দস্যিপনার আর শেষ নেই। গাছ থেকে যে-সব পাতার দল শুকনো হয়ে হয়ে পাহাড়ে-প্রান্তরে ঝরেছে, হাওয়া তাদের তাড়িয়ে নিয়ে ফিরবে এ-উপত্যকা থেকে ও-উপত্যকা। যেন ক্ষেপেছে শীত বুড়ি। আর, তারও পরে পাহাড়ে যত বরফ পড়তে শুরু করবে, দূরে-কাছে বরফ-জমা পাহাড়চূড়াগুলিকে ঝকঝকে দেখাবে, ততই ঠাণ্ডা খেয়ে আসবে সমতলের দিকে। সেই সঙ্গে সঙ্গে নিচের দিকে নেমে আসবে হিংস্র দাঁতালো শুওর, বুনো হাতীর দল, এমন কি বাঘ-ভালুকেরা পর্যন্ত। বাঘ-ভালুকের আক্রমণে মানুষের মৃত্যু-সংবাদ কাগজে যা-ই থাক, দাঁতালো হাতীর অত্যাচারে শান্তিপ্রিয় মানুষদের লোকসান হয় সব চাইতে বেশি। এইসব হাতী দলে দলে নেমে এসে ক্ষেত-খামার ও ফসলের লোকসান করে। ফলে পাহাড়ের নিকটবর্তী অঞ্চলের মানুষদের বাড়ি করতে হয় কাঠের মাচানের ওপরে। ক্ষেত-খামার রক্ষে করতে আগুন জ্বেলে রাখতে হয়। দূরে দূরে বেঁধে রাখতে হয় টিনের বাক্স। কোন উঁচু জায়গায় বসে প্রহরীকে মাঝে মাঝে হস্তধৃত দড়িতে টান দিতে হয়। তার সঙ্গে সঙ্গে দূরে দূরে টিনগুলি বেজে উঠতেই হাতীরা সাবধান হয়।

কি দাদা, শীত করছে না? পাশের বেঞ্চে গুড়িসুড়ি মেরে শুয়ে থাকা ভদ্রলোকের প্রশ্নে সচেতন হয়ে উঠলাম সহসা। বললাম, তা আর বলতে। ভদ্রলোক বোধ করি জলপাইগুড়ি-যাত্রী। ট্রেনে উঠে একপলকের জন্যে আলাপ হয়েছিল। এবার তিনি বললেন, জলপাইগুড়িতে বোধ হয় শীতটা এবার বেশি পড়বে।

তাঁর অনুমানে সন্দেহ থাকবার কথা নয়। কিছুদিন আগেই বিধ্বংসী বন্যা হয়ে গেছে সেখানে। বন্যাবিধ্বস্ত এলাকাতে শীতও কিছু বেশি হবারই কথা। চোখ বুজে বুজে সেই কথাটাই ভাবতে চেষ্টা করলাম নিজের মনে। শুধু জলপাইগুড়িতেই নয়। বন্যা নেমেছিল ডুয়ার্সেও। ক্ষিপ্ত তিস্রোতার পার্বত্য-প্রবাহের ঢল বিভিন্ন শাখা-প্রশাখা-সূত্রে বেয়ে এসেছিল ডুয়ার্সেও। কুচবিহারের বুনো নদী তোরসার প্লাবন থেকে শহর রক্ষে পেলেও নিকটবর্তী গ্রাম-গ্রামান্তরের ক্ষতি হয়েছে বিপুল। ঢল এসেছিল আলিপুরদুয়ারেও। মাঝের ডাবরি-কুমারগ্রাম দুয়ারের অনেক অঞ্চল জলে ভেসেছে। লোকসানও হয়েছে সুপ্রচুর। সেই ক্ষতি-ক্ষয়ের শ্মশানের ওপর দিয়ে এবারে নেমেছে ভয়ংকর তেজালো শীতের হাওয়া। চুলো যেমন ভেসেছে, মাথার ওপরের চালাও গেছে ধুয়ে। আচ্ছাদনহীন শীতরাত্রির এই ভয়ংকর অবস্থাটি কল্পনা করাও কঠিন। শত শত শিশু-নারী বৃদ্ধ-বৃদ্ধা যুবক-যুবতীর অনিশ্চয়তাভরা দিনরাত্রিগুলির অবস্থা ওপরে ভগবান দূরে থাক, আমলাতান্ত্রিক রাষ্ট্রের কর্ণধারদের মনের একটি কোণেও ঠাঁই পেয়েছে কি না সন্দেহ। বন্যাকালীন রাজ্যপালের দার্জিলিং-উৎসব মনে আসছে। সঙ্গে সঙ্গে গাড়ির দোলার ঝাঁকুনির শব্দে বাঙালীর প্রিয় নাট্যকার দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের সেই বিখ্যাত লাইনটি মনে আসছিল, সত্য সেলুকাস কী বিচিত্র এই দেশ!

দ্বিজেন্দ্রলাল বোধ হয় অতকিছু না-ভেবেই লাইনগুলি লিখেছিলেন। একেক সময় একাধটি লাইন কী আশ্চর্য সত্য হয়ে দাঁড়ায় মানুষ এবং জাতির জীবনে!

(তিন)

নিতাইপদ-র সঙ্গে দেখা। তার পরিচয় কি দেব? নিতাই একজন অলরাউণ্ডার। সে না জানে এমন কিছু নেই। ফুটবল-ক্রিকেটের আইন-কানুন তার নখদর্পণে। কলকাতায় কতগুলি হাউস আছে, কত-গুলিতে নিয়মিত বাংলা সিনেমা দেখান হয়, ডুয়ার্সের কোন্ সীজনে কোথায় কোন্ কোন্ বাগানের ইংরাজ ম্যানেজার সাহেবদের দেখা যায়, ভুটানের রাজাসাহেব কোন্ ঋতুতে কী খানা খান, কবে কবে কোথায় ট্রেন দুর্ঘটনা হয়েছিল ইত্যাদি নানা প্রসঙ্গ থেকে প্রসঙ্গান্তরে তার সহজ অনায়াস বিচরণ। সময়টা মধ্যবর্তী নির্বাচনের কাল। তাই তার আবির্ভাব ঘটতেই প্রসঙ্গটা কোন্ দিকে যাবে খানিকটা অনুমান করতে পারছিলাম। তাকে খাতির-যত্ন করে বসান গেল।

নিতাইকে বললাম, নির্বাচনের হালের খবর কিছু বল।

নিতাই বলল, তার আগে বৌদিকে বলুন এককাপ চা দিতে।

অবশ্যই, অবশ্যই। বৌদি তাঁর কর্তব্য নিশ্চয়ই করবেন। তোমার ব্যাপারটা তত-ক্ষণ শুরু হোক।

নিতাই বলল, এবার ধানচালের খুব দুর্দিন যাবে।

আমি বললাম, কেন, ধানচালের তো মোটামুটি এবার বেশ ফলন হয়েছে।

নিতাই মুখ থেকে কথা কেড়ে নিয়ে বলল, সে হোক দাদা। কে না জানে অসুবিধের সবটুকুই কৃত্রিম। অর্থাৎ চির-কাল যা হয়, কিছু সংখ্যক মানুষ যারা সুযোগ নেয়—ধূর্ত সুযোগসন্ধানী মানুষেরা একটা কৃত্রিম আকালের সৃষ্টি করবে।

নিতাই-এর কথার অনুমানটার সমর্থন আরো কজনের মুখে পাওয়া গেল। অর্থাৎ উত্তর বাংলার এ-অঞ্চলের আরো অনেক মানুষের মনের মধ্যে এই ধারণা পুঞ্জীভূত হয়ে আছে। সবাই দস্তুরমত ভাবিত। মোটামুটিভাবে সকলেরই মনের মধ্যে এই দুশ্চিন্তা উঁকি দিচ্ছে দেখলাম। যারা এবার নির্বাচনে হারবে। তাদের যোগসাজসে বিশেষ বিশেষ ব্যবসায়ীরা ধানচাল গুপ্ত আড়তে ও গুদামে সরিয়ে ফেলবে। বাজারে আর চালধান কিনতে পাওয়া যাবে কি না সন্দেহ।

সন্দেহটি অমূলক কি না সে সম্পর্কে চিন্তার প্রয়োজন আছে। অন্তত আমাদের গেলবারের অভিজ্ঞতা থেকে জানছি জোড়-

দারেরা এরকম একটা প্রচেষ্টা যে না চালাবে তা বলা যায় না। মানুষের রক্তের স্বাদ যে-সব প্রাণীরা একবার পেয়েছে, তারা যে তাদের লাভের ও লোভের হাত প্রসারিত করবে না তা বলা সহজ। আমাদের দুর্ভাগ্য যে, সমাজবিরোধীরা এইরকম গুপ্ত ষড়যন্ত্র ও চক্রান্ত চালাবেই চালাবে।

নিতাইকে জিজ্ঞাসা করলাম—এবার কে ক্ষমতায় আসবে?

নিতাই বলল, শুনুন তবে, বলছি। ইতিমধ্যে নিতাইকে চা দেওয়া হয়ে গিয়েছিল। পেয়ালায় শব্দ করে একটা চুমুক দিয়ে ফেলতে ফেলতে নিতাই বলল, বিশ বছরের কংগ্রেসী শাসনে মার খেতে খেতে সাধারণ মানুষের দল জেনে গেছে কংগ্রেসের হাতে শাসনক্ষমতা থাকলে আর যাই হোক, সাধারণ মানুষের মুক্তি আসবে না। অন্তত যারা মধ্যবিত্ত সাধারণ মানুষ, কৃষক এবং মজুর তাদের যে অনেকটা মোহমুক্তি ঘটেছে তা বলাই বাহুল্য। পরিকল্পনার পর পরিকল্পনা এগিয়েছে, অথচ সাধারণ মানুষের জীবনে আজো পুঞ্জীভূত দুরাশা এবং হতাশা। বেকারীর পর বেকারী বেড়েছে। এই উত্তর বাংলার ছেলেদের কথাই ধরুন। বছরের পর বছর যারা পাশ করে বেরোচ্ছে তাদের রুজি-রোজগারের কোন ব্যবস্থাই হয় নি। তারা আজো পথে-প্রান্তরে হা-চাকরি হা-চাকরি করে হন্যে হয়ে বেড়াচ্ছে।

নিতাই বলল, আরো একটা কারণ দেখুন। সারা ভারতবর্ষ যা-ই ভাবুক, যেভাবেই ভাবুক উত্তর বাংলার মানুষগুলি যে এতদিন পর্যন্ত অন্যভাবে চিন্তা করেছে তার প্রমাণ অন্যান্য নির্বাচনগুলিতে পেয়েছি। এবারে রাজ্যপালের রাজত্বে আসাটাকেও সাধারণ মানুষ তেমনভাবে নিতে পারে নি। রাজ্যপালের ক্ষমতায় আসার ব্যাপারটাই যে জোর করে একদল রাজনৈতিক নেতার চক্রান্তে তা মানুষের চোখের আড়ালে থাকে নি। যুক্তফ্রন্টের মধ্যে হয়তো নানা দ্বিমত ও মতবিরোধিতা ছিল। তা কি খুব একটা বিস্ময়ের ব্যাপার? বিভিন্ন দলগুলি বিভিন্ন মতাদর্শের প্রমাণ রাখবেই। কিন্তু তারা যে মিলেছিল তার মধ্যে তাদের প্রগতিশীল মনোভাবই প্রাধান্য পেয়েছিল। তারা আলাদাভাবে জিততে পারত না, শাসনক্ষমতায় আসা তো দুরূহ ব্যাপার। তবু সমবেতভাবে তারা এতদিনকার কংগ্রেস-শাসনের গলদ-দুর্নীতি দূর করে মানুষদের সামনে একটা দৃষ্টান্ত রাখতে চেয়েছিল। তা হচ্ছে এই যে, আমরা তোমাদের আশা-আকাঙ্ক্ষাগুলি সম্পর্কে সচেতন।

নিতাইকে আমি বললাম, কিন্তু কার্যক্ষেত্রে কি হয়েছে?

কার্যক্ষেত্রে যা হবার তাই হয়েছে। এতগুলি দলের মধ্যে একটা সুনির্দিষ্ট পথ নিতে গিয়ে হয়তো পরস্পরের মধ্যে তর্ক-বিতর্ক হয়েছে। কিন্তু সেটা তেমন কিছু বড়ো ব্যাপার নয়। আসলে সাধারণ মানুষদের জন্য কিছু একটা করতে চাওয়ার আগ্রহটাই ছিল প্রবল। তারা একটা সকলের গ্রহণযোগ্য পথ খুঁজে বার করতে চেয়েছিল। আর সেইটেকে চেপে বড় বড় কাগজগুলি সামান্য মতবিরোধগুলিকেই বড়ো-বড়ো হরফে ছেপে প্রকাশ করেছে। মানুষকে ঘুরিয়ে দিতে চেয়েছে। দলগুলির মধ্যে যে আন্তরিকতার অভাব ছিল না, জোর করে তাদের হাত থেকে ক্ষমতা কেড়ে নেবার আগ্রহেই তার প্রমাণ। আসলে রাজ্যপালের হাতে যেদিন শাসন তুলে দেওয়া হল, জনসাধারণ সেদিন থেকেই মনে মনে কেন্দ্রীয় শাসনের বিরোধী হয়ে পড়েছিল। তৃতীয় কথা, কেন্দ্র কর্তৃক চাল দেওয়ার দায়িত্ব অস্বীকার, প্রফুল্ল ঘোষের নেতৃত্বে একটা ঠুঁটো মন্ত্রিসভা গঠন—সবকিছুর পিছনেই কেন্দ্রীয় শাসকচক্রের হাত সক্রিয় ছিল মানুষ তা বুঝতে পেরেছিল। তারপর রাজ্যপালের শাসনের আমলে কেন্দ্রীয় সরকারী বিভাগের কর্মচারীদের আন্দোলন দমানোর নামে তাদের উপরে অত্যাচার ভোলা যায় কি? এক আলিপুরদুয়ার জংশন এলাকাতেই পুলিশ হ্রাসের সৃষ্টি করেছিল। ইস্কুল-কলেজের ছেলেদের ধরে ধরে মার দেওয়া হচ্ছিল, জেলের ভিতরে পোরা হচ্ছিল। আর বন্যা যখন এল, তখন উত্তর বাংলার কপাল পুড়ল। প্রতি বছরেই এই চেহারা। এবারে তার চেহারা দাঁড়াল শোচনীয়। বানে যখন জলপাইগুড়ি তলিয়ে তখন রাজ্যপাল ভোজন-উৎসবের ব্যবস্থা করে দার্জিলিং-এর সুরম্য প্রাসাদপুরীতে বসে রইলেন। আমাদের মাননীয় নেতা একজন শিলিগুড়িতে এক বাগানের অতিথিশালায় বসে বসে বড়ো-বড়ো বাণীর বিবৃতি ছড়ালেন। কেন্দ্রীয় নেতাদের দু'-একজন এলেন অনেক পরে। যা বললেন, তা মুখেও করলেন না। ক্ষতিগ্রস্ত লোকদের পুনর্বাসনের ব্যবস্থা হল না। এখনো তারা অনেকেই ত্রিপল খাটিয়ে—অথচ ভোট এসে পড়তেই তাদের গ্রামে-গ্রামান্তরের দিকে আদর বেড়ে গেছে।

এই পর্যন্ত বলে নিতাই চা-র পেয়ালায় আবার মনোনিবেশ করল। এতক্ষণ নজর দিবার সময় হয় নি। ঠাণ্ডা চা-টুকুই অক্লেশে গলাধঃকরণ করে মুখ মুছতে মুছতে জোরালোভাবে তার বক্তব্য রেখে দ্রুতভাবে বেরিয়ে গেল। যাবার আগে যা বলে গেল, তা হচ্ছে এই। নির্বাচন আর দূরে নেই। কাছিয়ে এসেছে। জেলার এগারটি বিধানসভা কেন্দ্রে এখন দ্রুত উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়েছে। জলপাইগুড়ি জেলার মধ্যে চারটি সাধারণ আসন, তিনটি তপশীলী আর চারটি উপজাতি আসন। আলিপুরদুয়ারে সেদিন বক্তৃতা করে গেলেন যুক্তফ্রন্টের নেতা অজয় মুখোপাধ্যায়। হাজার হাজার লোক প্রবল ঠাণ্ডায় স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে তাঁর বক্তৃতা শুনেছে। অজয় মুখার্জীর বক্তৃতা প্রমাণ করে দিয়েছে হাস্যযুক্ত পরিহাসিকতায় বক্তব্য কত জোরালো হতে পারে। তারপর কুমারগ্রামে এসে গেলেন যুক্তফ্রন্টের অন্য নেতা জ্যোতি বসু। আলিপুরদুয়ার থেকে অগণিত মানুষ এই বক্তৃতা শুনতে গেছেন। কলেজের ক'জন অধ্যাপককেও তাদের মধ্যে দেখা গেছে। সাধারণ মানুষ অনেক আগ্রহ নিয়েছিলেন। কৃষক-মজুরেরাও ছিলেন। নিতাইদের বক্তব্য যাই হোক, এ অঞ্চলে একটি জিনিস অনুমান করতে পারছি। সাধারণ অধিবাসীরা রাজনীতি নিয়ে এদিকে কোনদিনই তেমন ভাবেন নি। কিন্তু এবারে তাঁদের মধ্যে বিস্তর আগ্রহ-চেতনা লক্ষ্য করা যাচ্ছে। ভোট তাঁরা যাকেই দিন, তাঁরা যে উত্তর বাংলার মানুষ হিসেবে অবহেলিত ও শোষিত এই ধারণাটি তাঁদের মধ্যে বদ্ধমূল। এখানকার প্রাকৃতিক অবস্থার অনুকূলতা সত্ত্বেও আজ পর্যন্ত এখানে কোন স্থায়ী শিল্প-পরিকল্পনা চালু করা হয় নি যাতে এ-অঞ্চলের ছেলেরা হাতে-কলমে কাজ শিখতে ও করতে পারে। এ-

১৯৬৯তে আপনার ভাগ্য

যে-কোন একটি ফুলের নাম লিখিয়া আপনার ঠিকানাসহ একটি পোস্টকার্ড আমাদের কাছে পাঠান। আগামী বারমাসে আপনার ভাগ্যের বিস্তারিত বিবরণ আমরা আপনাকে পাঠাইব, ইহাতে পাইবেন ব্যবসায়ে লাভ, লোকসান, চাকুরিতে উন্নতি, বদলী, জন্ম, বিবাহ ও সুখ-সমৃদ্ধির বিবরণ: আর থাকিবে দুষ্ট-গ্রহের প্রকোপ হইতে আত্মরক্ষার নির্দেশ। একবার পরীক্ষা করিলেই বুঝিতে পারিবেন।

PT. DEV DUTT SHASTRI
RAJ JYOTISHI (B. M. W)
P.B. 86, JULLUNDUR CITY

অঞ্চলের একটি মাত্র কলেজে অনেক ছেলে-মেয়েরাই পড়তে আসে। বি-এ, বি-এসসি এবং বি-কম পাশ করেও অসংখ্য ছেলে বছরের পর বছর স্থায়ী বেকার রয়ে যাচ্ছে। অথচ কেন্দ্রের সহানুভূতি ও প্রদেশের শাসকদের দৃষ্টি এদের দিকে আজো পড়ে নি। এখানকার নদীগুলির বালু থেকে কাচ-কল, বাঁশ ও অন্যান্য গাছ থেকে কাগজের কল, দেশলাই-কল, তামাকজাত শিল্প, আখ থেকে চিনির কল অনায়াসেই সৃষ্টি হতে পারে। বন্যায় কৃষকরা সর্বহারা হয়ে রয়েছেন। বহু তামাকের জমি বানের জলের বালিতে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। যোগাযোগের অভাব ও সরকারী আনুকূল্যের অভাবে কাঁচামালের বাজারও নেই। তাই শুধুমাত্র নির্বাচনের গালভরা প্রচারে পুরাতন অস্ত্রে আর যুদ্ধজয় সম্ভব হবে কি না সন্দেহ।

সানলাইটে

প্রতিবার

আপনার জামাকাপড়

আরো ঝলমলে ক'রে কাচে

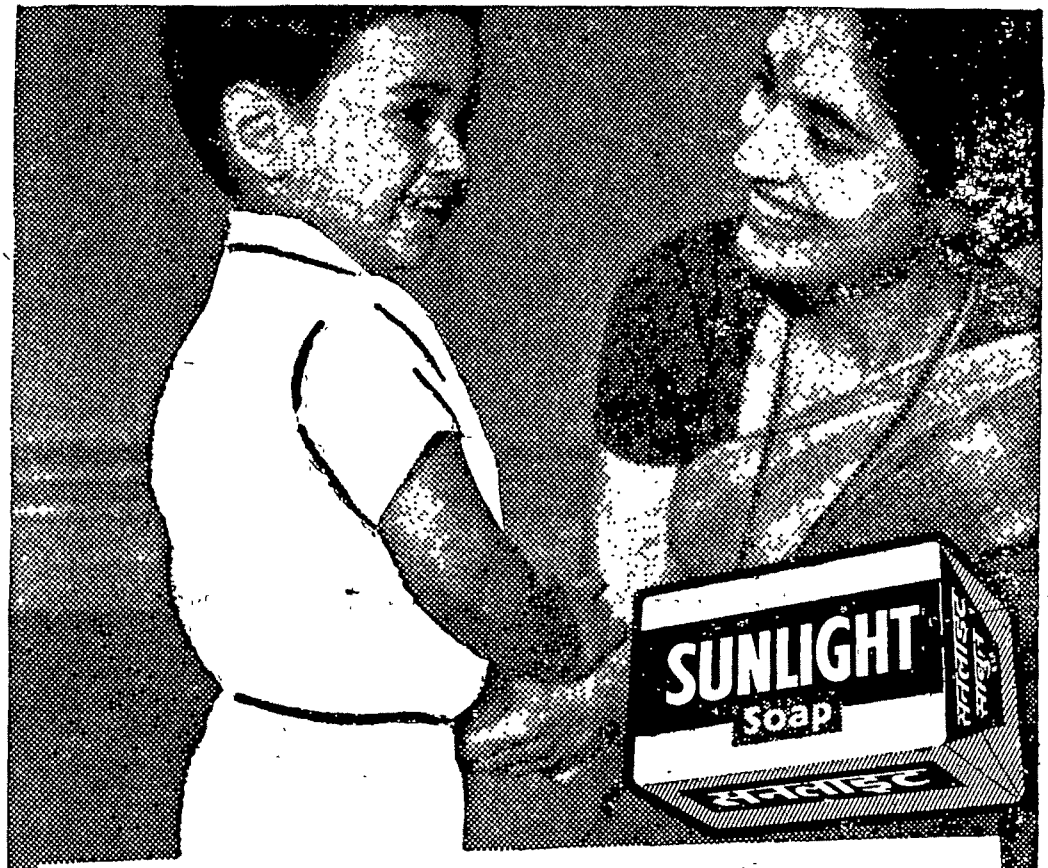

সানলাইট সাবান একবার নিজেই ব্যবহার ক'রে দেখুন···কী চমৎকার ঝলমলে হয় কাপড়চোপড়। দেখবেন, প্রতিবার কাচার সঙ্গে সঙ্গে আপনার জামাকাপড় কেমন আরো বেশী উজ্জ্বল হ'য়ে ওঠে। অল্প একটু ঘষলেই অজস্র ফেনা হয়ে, আর সেই ফেনা কাপড়চোপড় অনায়াসে সুন্দর পরিষ্কার ঝলমলে ক'রে দেবে। বাড়ীতে সব কাপড়চোপড়ই সানলাইটে কাচুন।

সানলাইটে আপনার

প্রতিদিনের সব জামাকাপড় কাচুন

লিনটাস-S. GL-140 BG (B)

হিন্দুস্থান লিভারের তৈরী

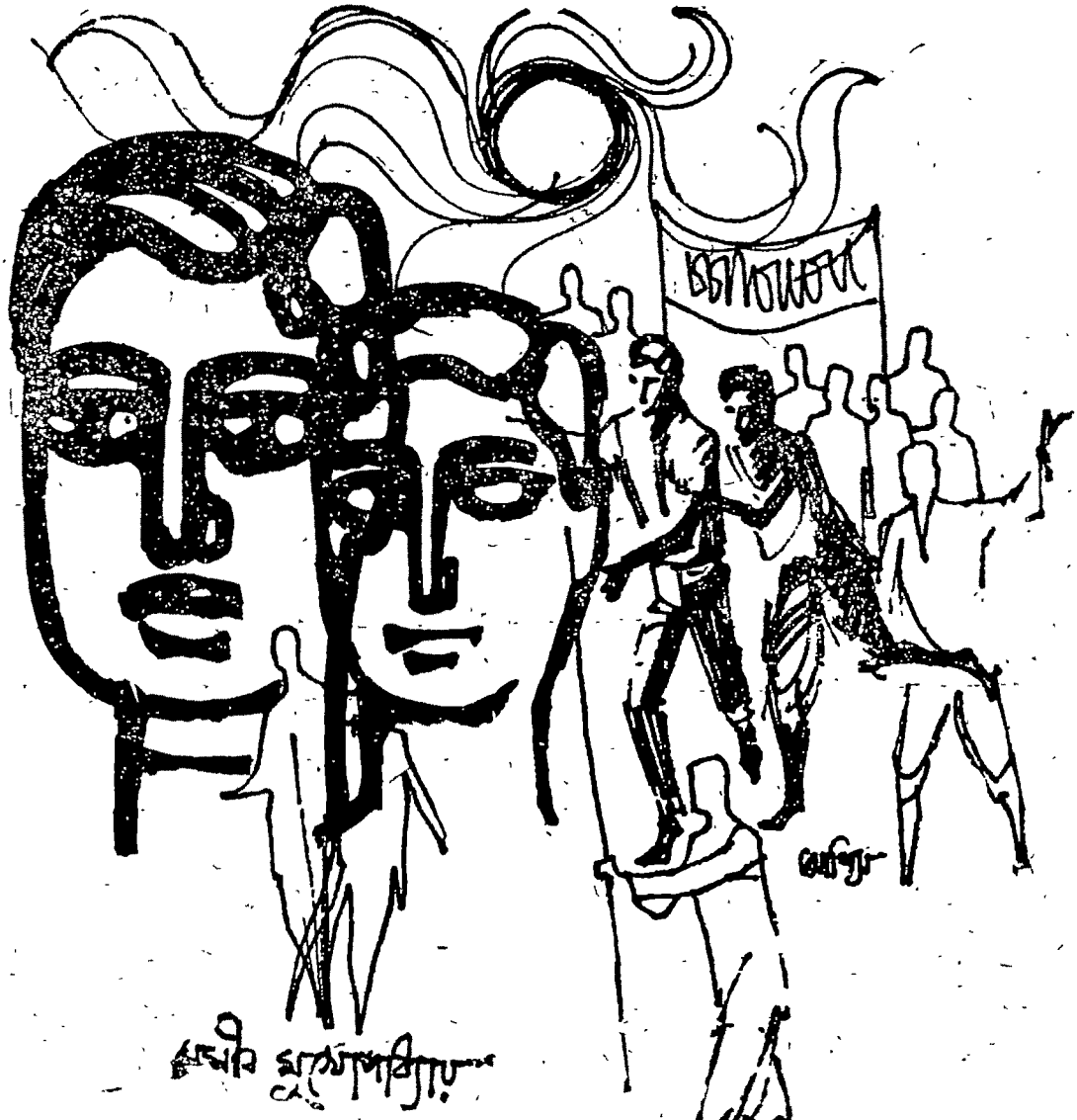

জালের গাড়ি

তেজ নেই বটে তবু তখনো আকাশে ঝুলছে প্রকাণ্ড তালশাঁসের মত ভরাট, নধরকান্তি চাঁদ। ছায়াচ্ছন্ন গলিতে ইলেকট্রিক আলো গম্ভীরভাবে ডিউটি দিয়ে যাচ্ছে। কুকুরের চমকা চমকা আওয়াজ বলে দিচ্ছে অন্ধকার ভালো করে কাটে নি। দুপাশের নিশ্চুপ আর থমথমে বাড়িগুলি অটুট শান্তির মধ্যে ঘুমোচ্ছে তখনো।

ঠিক সেই সময় জাল-দেওয়া, মার্কা-মারা সেই গাড়িটা হর্নের আওয়াজে বাতাস চিরে বড় রাস্তা থেকে গলিতে ঢুকলো। তারপর গাড়োলের মত ব্রেক করে এক জায়গায় দাঁড়িয়ে গেল। বিষণ্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে তাকিয়ে আমি দেখলাম, দুজনকে গাড়ি থেকে জন্তুর মত লাফিয়ে পড়তে।

কাল সন্ধ্যের সময় এখান থেকে একটা মিছিল যাবে বলে বিকেল থেকে নানা অঞ্চলের গুণ্ডারা জমা হচ্ছিলো। সেই একই মার্কামারা চেহারা। সেই একই ভঙ্গি। কেবল মুখগুলি অপরিচিত। খানিক পর ভট ভট করে মোটর সাইকেল ছুটে এলো খানচারেক। সঙ্গে সঙ্গে এক-একজনকে ঘিরে রিং তৈরি হয়ে গেল।

'আজ দারুণ কাণ্ড হবে দেখিস', কে একজন বলল। কে একজন স্ট্রীট কর্নার মিটিং করছিলো, 'শহরের তরুণ যোদ্ধারা.....' এইটুকু মাত্র শোনা গেল। হাততালিতে বাকীটা শোনা গেল না। চামড়ার জ্যাকেট পরা ভয়ংকর চেহারার

'তরুণ যোদ্ধা' একজন মাথার দু'পাশে দুটি বড় বড় কান ঝুলিয়ে আমি যে দোকানে বসে চা খাচ্ছিলাম সেখানে হড়-বড় করে ঢুকে, আমার সম্পূর্ণ অজানা, দুর্বোধ্য আওয়াজ করে বলল, 'মাল বের কর। নইলে তোর রিব-বক্সের ভেতর হাত ঢুকিয়ে দেব।'

অবাক হয়ে দেখলাম, কিংবা অবাক হবারই বা কী আছে, আজীবন যে দোকানের বেঞ্চিতে পা ঝুলিয়ে চা খেয়ে যাচ্ছি, সে দোকান থেকে চোলাই-এর গুটি চারেক বোতল বেরিয়ে গেল। তারপর সকলের সামনেই ওরা পা ফাঁক করে, খোলা রাস্তায় সোডা খাবার মত ঢক্ ঢক্ করে মদ খেয়ে হাতের উল্টো পিঠ দিয়ে ফেনা মুছে অস্বাভাবিক ভঙ্গিতে ওদেরই ভেতর একজন চেঁচিয়ে বলল, 'হ্যাঁ রে, বোমাটোমা সব তাজা আছে ত'!'

তারপর মশাল মিছিল যখন নানা-রকম ধ্বনি দিতে দিতে, ঝোড়ো হাওয়ার মত বয়ে যেতে লাগলো, তরংগের পর তরংগ, তারপর আরো আরো তরংগ, পতাকা আর ফ্লেক্সটুন, আর গর্জন, সমুদ্রের মত ভরাট, ভয়ংকর, যেন হৃদয় উন্মুক্ত করে বেরিয়ে পড়েছে এক উন্মাদ সুর, ঝড়-বিক্ষুব্ধ মানুষ-গুলি যখন মিছিলের তরংগে দুলতে দুলতে সেই সুরে গলা ভিজিয়ে, চকচকে চোখে কদম কদম চলেছে তখন হঠাৎ চারিদিক অন্ধকার হয়ে গেল। মুহূর্তে একটা বিকট জলোচ্ছ্বাসের মত হৈ-হৈ। কে যেন বলল, ইলেকট্রিকের তার ছিঁড়ে দিয়েছে গুণ্ডারা, 'হুঁশিয়ার!' 'সাথী জোট বাঁধো', 'শ্রেণী সংগ্রাম'—এসব কথার ফাঁকে ফাঁকে 'ভালো গদি, মার শালাকে', 'শালা ভিয়েতনাম করবে? ভিয়েতনাম শালা তোমার ইয়ের মধ্যে দিয়ে'....., 'বিপ্লব মানে ত' যুদ্ধ, মৃত্যু, বন্দীশালা, চল এই বেলা কেটে পড়ি'—এসব টুক্‌রো টুক্‌রো কথা, প্রচণ্ড হাতাহাতি, ঐখানে একটা বোমার বিকট শব্দ, 'ওরে বাব্বা, মাইরী শেষ হয়ে গেলাম, আমার ডানহাতখানা কোথায় গেল', 'সত্যি, মারধর একটা আর্ট', রীতিমত স্থাপত্য, মেরে ফ্ল্যাট করে, কিংবা ভুঁড়ি ফাঁসিয়ে দিয়ে কেটে পড়া, নয় কি?'—এসবের ওপর হঠাৎ দুটি প্রকাণ্ড পুলিশ ভ্যানের সার্চলাইটের মত আলো এসে পড়ায় মুহূর্তে যে-যেখানে ছিলো লোপাট।

তারপর অনেকক্ষণ আমি চলে এসেছি বাড়িতে।

কিছুক্ষণ পর 'অরুণদা, অরুণদা,' শুনে বেরিয়ে এসে 'কি ভাই' বলতে, ওরা বলল, 'এই শেতলা মায়ের চাঁদার জন্যে।' আমি ছেলেগুলোকে চিনি। অন্য পাড়ার। তবে নাম জানি না। বললাম, 'তোমাদের পাড়ার পুজোয় ত' ভাই আমি কখনো চাঁদা দিই না। কেউ চাইতেও আসে না।'

'আমরা ঠিক জানতাম না।' ওরা চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলো। আমার খোলা দরজা দিয়ে ভেতর দিকে উঁকি দিতে লাগলো। কিছু না বুঝে বললাম, 'যাই?' 'আচ্ছা, আচ্ছা', ওরা হঠাৎ খুব ব্যস্ত হয়ে গেল আর তারপর নিজেদের মধ্যে গলা নামিয়ে কি সব বলাবলি করতে করতে চলে গেল। খানিক পর শতদলদা এলেন। চোখের দৃষ্টি ঈষৎ ঘোলাটে, উঁচু নাকে বিন্দু বিন্দু ঘাম, মুখে অবশ্য সেই নির্ভীক, মরণজয়ী হাসি, বললেন, 'তোমার এখানে আজ শোবো। কেন জানোই ত'। আজ তিনদিন আমি ঘর-ছাড়া। ইনফরমারদের তাড়ায় আজ এখানে কাল ওখানে।'

হঠাৎ চাঁদা-চাইতে আসার সস্তা ফিকিরটা কেমন বুঝে ফেললাম। সংগে সংগে বললাম, 'আমার বাড়িটাও আর নিরাপদ নয়। আপনি বরং অন্য জায়গায় দেখুন।'

কি ভাবলেন শতদলদা জানি না। হয়তো ভাবলেন ভীরু, কাপুরুষ, এ অবস্থায় সকলেই যা ভেবে থাকে তাই। 'আচ্ছা', বলে সেইরকমই হাসি একটুকরো মুখ ঝুলিয়ে উনি অন্ধকারে নেবে গেলেন। আর ঘরের পাল্লাটা শক্ত করে ধরে আমাকে ভাবতে হল, আমারই চেনা ছেলে, যাদের নামটাই হয়তো জানি না, একই সংগে ফুটবল খেলা দেখি, সিনেমায় বসি, চায়ের দোকানে আড্ডা দিই, বাজারে গিয়ে একই কপির দর-দস্তুর করি, তারা এসেছিলো আমার বাড়িতে চাঁদা চাইতে নয়, এখানে কে আশ্রয় নিলো তার তদা-রক করতে। সোজা কথায়, ইনফরমার। ঘৃণায়, দুঃখে, ক্ষোভে আমি কেঁদে ফেললাম।

দেখতে দেখতে কাল রাত্রের সেই অদ্ভুত, অবুঝ কষ্টটা আবার এই ভোর-বেলায় বুকের কোটরে এসে গেল। মার্কামারা, জাল-দেওয়া গাড়ি থেকে আমি যাদের জন্তুর মত লাফিয়ে নামতে দেখলাম সেই দু'জনের মধ্যে একজন নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে থেকে হাতের জ্বলন্ত সিগারেটটা পুড়তে দিলো কিছু সময়। আর একজন যেন অন্তহীন প্রতীক্ষার পর দ্রুত, ন্যস্ত ভংগিতে সিঁড়িভেঙে উঠে তোবড়ানো বাড়িটার কড়া নাড়তে লাগলো অসহিষ্ণুভাবে। হে ভগবান, শতদলদা যেন এ সময় বাড়ি না থাকে। হে ভগবান, শতদলদাকে যেন ওরা ধরতে না পারে। ধরা পড়লে আমার অনুশোচ-নার শেষ নেই। প্রকারান্তরে আমিই কি তাহলে ধরিয়ে দিলাম না? হে ভগবান। কয়েক মুহূর্তে নীরবতা। প্রথমে বেরিয়ে এলো আমার অত্যন্ত পরিচিত ডিমের খোলার মত মাথাটা। তারপর দোমড়ানো ইস্পাতের মত সেই জংধরা কাঠামো। তারপর, তারপর দেখলাম, সেই মরণজয়ী, নির্ভীক, শব্দহীন, শান্ত হাসি। কণ্ঠস্বর থেকে ঘৃণা, বিদ্বেষ, হিংসা কিছুই ঝরে পড়লো না। যেন পুরনো একটা রগড়কে ফিরে পাওয়ার আহ্লাদ। চোখে তাই খুশির সেই পরিচিত ঝিলিক।

'কি, এসে গেছেন?'

'হ্যাঁ। আপনারা ত' শান্তিতে থাকতে দেবেন না।'

'তা ধরছেন কেন? ওয়ারেণ্ট এনেছেন?'

'ওয়ারেণ্ট আবার কি? আপনি ত' সবই জানেন। পি ডি অ্যাক্ট। ধরেছি গুণ্ডামী করেছেন বলে কাল।' ওরা দু'জন পচা, পুরনো রসিকতা নিয়ে হাসতে লাগলো।

'বারে বাঃ। গুণ্ডামী করলো যারা তাদের ধরলেন না আর আমি গুণ্ডামী থামাতে গেলাম বলে আমাকে গ্রেপ্তার করছেন?'

'আপনি ত' সবই জানেন। আমাদের কাজটাই জঘন্য।' আবার সেই নির্দয় মাছির মত নোংরা, চিটচিটে হাসি। তারপর আরো একটু ব্যস্ততা, 'আসুন'। যেন আহ্বান। যেন নিমন্ত্রণ কোন ভোজসভায়। মাইরী, কতো ঠাটই জানে।

'চলুন।'

সচরাচর যেমন করেন, চোখের ভারী পাওয়ারের চশমাটা হাতে নেন, তেমনি চোখ থেকে নাবিয়ে হাতে নিলেন শত-দলদা। কাউকেই উদ্দেশ্য করে নয়, যেন এ পথে এ বিড়ম্বনা ত' অনিবার্য, সেটা মনে করে সেই হাসি, শান্ত, নির্ভীক আর শব্দহীন। তারপর বিপন্ন পকেটে অপ্রস্তুত কোঁচাটি ঢোকাতে ঢোকাতে সোজা, দৃঢ়, সবল পায়ে গাড়িতে গিয়ে উঠলেন।

লজ্জায়, কিসের যেন মর্মান্তিক অপ-মানে, দারুণ সংকোচে পাছে শতদলদা আমাকে দেখতে পান তাই দস্তদের তিন-পুরুষের ফাটল-ধরা ভিটের থামের আড়ালে গিয়ে দাঁড়ালাম। কিন্তু শতদল-দার চোখ সর্বত্রগামী। উনি ঠিক আমাকে আবিষ্কার করলেন। চলন্ত গাড়ি থেকে মুখ বাড়িয়ে শক্ত হেসে বললেন, 'কি, আপনাদের মত যুবক থাকতে আমরাই খালি যাবো? কই, এবারেও ত' এলেন না!'

আপনার গাড়িতে আমারও জায়গা হবে একদিন শতদলদা। আমি অভ্যস্ত নিয়মে গাড়িটার পিছু পিছু জোরে জোরে হাঁটতে হাঁটতে মনে মনে বলতে থাকলাম, কিন্তু সেদিন আজ নয়। মানুষের মুক্তির কথা আমি ভুলি নি। ঠোঁট দুটো কিছু একটা বলবার জন্যে, ভয়ংকর কিছু একটা বলবার জন্যে নড়ে উঠছে। তবু সাংঘাতিক রক্তাক্ত সেই শব্দটা উচ্চারণ করতে পারছি না শতদলদা, ওয়ার্কার্স এ্যান্ড টয়লার্স অফ দি হোল ওয়ার্ল্ড এ্যারাইজ, দেশ দেশ নন্দিত করি মন্দ্রিত তব ভেরী, রেড ফ্লেন ইজ কামিং, ইউ এস এস আর, ইউ এস এস আর...এসব ছাপিয়ে 'হুঁশিয়ার হো জানা বাচ্চে', ছোটেবেলাকার রাস্তা এলোমেলোভাবে পার হওয়ার সময় পাহারাদারের সেই রাজকীয় নিষেধাজ্ঞা, 'হুঁশিয়ার, হুঁশিয়ার হো জানা বাচ্চেলোক', আমার এই শীর্ণ বুকের ভেতর অনবরত বাজে। আমি কি এখনো বাচ্চা আছি? কে জানে তবু বুকের ভেতর এক অজানা পাহারাওলা অনবরত নিষেধ করে যায়। বলে, হুঁশিয়ার, হুঁশিয়ার। কি করবো? কোন যে উপায় নেই শতদলদা। আগে একটা চাকরি, যেমন-তেমন, যে কোন ধরণের, ব্যস, তারপরেই দেখবেন একই মিছিলে, একই ঝাণ্ডার তলায় আপনার পাশে আমি, একই গাড়িতে আপনার পাশে আমি, একই সেলে পাশাপাশি কম্বলে আপনার সঙ্গে আমি, লাঠি, টিয়ার গ্যাস, গুলী দেখবেন তখন কিছুই আমাকে ছিন্ন করতে পারবে না।

দুঃখে, ক্ষোভে, গাড়িটা যখন চলে গেছে, তখন তার উদ্দেশ্যে হাতের একটা রুদ্ধ ভংগি করে ইঁট ছুঁড়ে মারলাম। মার্কামারা জালের সেই গাড়িটায় কে আর যাবে শতদলদা ছাড়া? ঠিকই হয়েছে।

জেলে বসে বসে যে ইকনমিক্সে এম-এ পরীক্ষা দেয় আবার ভালোভাবে পাশও করে, প্রেসিডেন্সী কলেজ থেকে অমন্ত্রণ এলে যে সবিনয়ে তা প্রত্যাখ্যান করতে পারে সে যদি জেলে না যাবে ত আমি যাবো? পাছে ক্যারিয়ারিস্ট হয়ে যায়, তৈরি হয় ভদ্দরলোক বিপ্লবী, তাই যে কৃচ্ছ্রসাধনার মত নিয়ম করে বিড়ি মজুরদের মাঝখানে গিয়ে বসে, খিস্তি করে, একটু-আধটু এদের সঙ্গে 'পান'ও করে, সে যদি জেলে না যায় ত কে যাবে জেলে? যার কাছে দ্বিতীয় জীবনটা এতো স্পষ্ট হয়ে গেছে যে, গলায় বড়লোকের মেয়ের রোমান্টিক প্রেম যে জড়াতে চায় না সাপের মত, শুধু দেশ দেশ করে যে লোকটা ক্ষেপে গেল, চোখের চশমাটা যে চোখে দিতে ভুলে যায় উত্তেজনার মাথায়, হাতে নিয়ে রাখে, উত্তেজিত হয়ে যে একই কৌচা অনবরত পকেটে ঢোকায় আর খোলে, জং-ধরা ইস্পাতের মত যার কাঠামো, ডিমের খোলার মত মাথা যার, যার উঁচু নাকে বিন্দু বিন্দু ঘাম, আর মুখে নির্ভীক, শব্দহীন, শান্ত হাসি, সে যদি জেলে না যায় ত কে যাবে আর!

যান শতদলদা জেলে যান। আজ আপনি একাই যান। দাঁড়ান, একটু সবুর করুন। আমাকে একটা চাকরি যোগাড় করতে দিন তারপর, তারপর, দেশ শুদ্ধই একা আপনি ভালোবাসেন না, ভোর থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত রঙীন এই শহর আমাকে ঘিরে আছে, আমি জানি কতো লোক নিঃশব্দে এ শহরে কতো রকমের দুঃখ বহন করে চলেছে, একটু আমায় গুছিয়ে নিতে দিন শতদলদা, তারপর, তারপর দেখবেন.....।

যেভাবে আজকাল কেউ কেউ চাকরি আদায় করে আমি ত সেভাবে পারি না। এই সেদিন নাগরমল ফ্যাক্টরীর ইউনিয়নের প্রেসিডেন্টকে আমাদের পাড়ার পচা তেলকালি লাগানো ছেঁড়া-খোঁড়া জামা গায়ে একেবারে একশাদা লোকের মাঝখানে গিয়ে বলল, 'দেখুন অমূল্যদা, আপনি যদি আমাকে চাকরি দেন তাহলে আপনার কেনা গোলাম হয়ে থাকবো আজীবন। কুকুর বলতে যা বোঝায় ঠিক তাই, কিন্তু চাকরি যদি না দেন মাইরী বলছি তাহলে এখান দিয়ে আপনার রিক্সা যেতে দোব না, হুঁশিয়ার।' সেই পচার চাকরি হয়ে গেল ফ্যাক্টরীতে। আমি ওভাবে চাকরি নিতে চাই না। কাউকে ওভাবে চোখ রাঙাতেও পারবো না আর চাকরি পাবো বলে কারুর পায়ে দাসখত লিখে দিতেও পারবো না আজীবন। কিন্তু আমি ত জানি, চাকরি, একটা যেমন-তেমন চাকরি আমার কতো দরকার। না হলে না খেতে পেয়ে মারা যাবো। না খেতে পেয়ে মারা যাবার কথা ভাবতেই পারি না। খিদে কি প্রচণ্ড আমি একদিন তা হঠাৎ দেখে ফেলেছিলাম।

সেদিনও একটা কিসের মিছিল, সম্ভবত খাদ্যের দাবিতে, চলেছিলো কোর্টের দিকে। খানিকটা কাছে যেতেই পুলিশের কড়নিং। দূরে বার লাইব্রেরী থেকে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ভাবছিলাম দেশটার হল কি। মানুষের খিদে পেয়েছে, সে খেতে পাচ্ছে না, এই কথাটা আবার মিছিল করে জানাতে হবে, এতই সব কানে দিয়েছে তুলো!

হঠাৎ কি যে হল কিছুই বেশ ভালো করে বোঝবার আগেই একটা বিরাট হৈ-চৈ। 'এই, এই, উস্‌কো পাকড়ো', 'মার শালেকো', 'শালা, ভাগতা হ্যায়'—এই সব টুকরো টুকরো মন্তব্য আর মারের পর মার। 'বাবাগো', 'মাগো', বিকট চীৎকার। হঠাৎ এলোপাতাড়ি ছুটন্ত মিছিলের মধ্যে একটা স্থিরচিত্রের ওপর চোখ দুটো গিয়ে বসলো। একটা বুড়ি মেকেতে থেবড়ে বসে গেছে। মাথায় সে নির্ঘাত ডাণ্ডা খেয়েছে। একটা হাত সে দিয়েছে মাথার ওপর রক্তের ফোয়ারাটা থামাবার জন্যে আর অবিশ্বাস্য হলেও সত্যি সেই অমানুষিক দৃশ্য, থানের খুঁটে বেঁধে এনেছিলো বোধহয় চিঁড়ে একমুঠো, মারের চোটে সেই চিঁড়ে ছড়িয়ে পড়েছে একদলা রক্তের মধ্যে, বুড়িটা অপর হাতে সেই রক্তেভেজা চিঁড়েগুলো খুঁটে খুঁটে তুলতে তুলতে তারস্বরে চেঁচাচ্ছে।

বুড়িটা হয়তো আবার লাঠি খেতে পারে, কিন্তু তাতে কি, সমস্ত ক'টা চিঁড়ে সে ঐ একদলা রক্তের ভেতর থেকে একটা একটা করে তুলবেই।

না না খেয়ে আমি মরতে চাই না তিলে তিলে। সেইজন্যে চাই চাকরি। আর সেই জন্যে একটু হুঁশিয়ার হতে হয়েছে আমাকে।

আমি জানি রাত ন'টার পর মফস্বলের রাস্তায় একটা কুকুর সম্পূর্ণ দলছাড়া হয়ে বিপন্নমুখে রাস্তার মাঝখানে অনেকক্ষণ কেন ঠায় দাঁড়িয়ে থাকে। আমি জানি বাড়ির অনেক জানলায় আলো জ্বলছে বটে, কিন্তু মাঝেরটা কেন অন্ধকার। আমি জানি সব ল্যাম্পপোস্টে আলো জ্বলে বটে, কিন্তু একটার না একটার ডুম কে বা কারা যেন লাটিয়ে দিয়ে যায়।

॥ দুই ॥

বছর দুয়েক পর চাকরি একটা পেয়ে গেলাম শেষ পর্যন্ত। এক দুপুরেরেক্সিন সুইংডোরটা ঠেলে ইন্টারভিয়ুর জন্যে যখন ঢুকলাম ভেতরে তখন আমার সার্টিফিকেট ইত্যাদি চেক করার পর মধ্যবয়স্ক আসল লোকটি মৃদু হেসে আমার দিকে অর্থপূর্ণ চোখ টিপলেন।

'রাজনীতি করা হয় না কি?'

এরকম প্রশ্ন সম্বন্ধে বন্ধুরা আগেই আমাকে সতর্ক করে দিয়েছিলো। কিন্তু আমি সর্বদাই অসতর্ক। আর তাই স্বচ্ছন্দে ওঁর পাতা ফাঁদে আমার পা পড়ে গেল।

মৃদু হেসে যথোচিত বিনয় সহকারে বললাম, করি। ভারতীয় সংবিধানে তা না করার ব্যাপারে কোন বিধি নেই।'

সঙ্গে সঙ্গে সেক্রেটারিয়েট টেবিলে প্রবল একটি মুষ্ট্যাঘাত হল। দুলে উঠলো টেবিলটা। ঝাপসা আলোয় ঘরের দমবন্ধ বাতাস কেঁপে উঠলো। টেরিলিন, টেরিকটের জংগল থেকে একটা নেকড়ে হঠাৎ গরর.....গরর..... করে উঠলো।

হ্যাং ইয়ের পবিত্র ভারতীয়

"দিলীপের মুখ থেকে খবরটা শুনে আমার যে কি আনন্দ হল! ওকে দুহাতে বুকে টেনে নিলাম। ও যথেষ্ট অনুশীলন করেছে, খেটেছে। তবুও বলবো এর জন্য যে-বাড়তি শক্তি-সামর্থ্যের প্রয়োজন তার সবটুকুই ও পেয়েছে বোর্নভিটা থেকে। দুধের সঙ্গে মিশিয়ে বোর্নভিটা খেতে ও বরাবরই বড্ড ভালোবাসে। শরীর সুস্থ-সবল রাখতে যে পুষ্টি, শক্তি ও সামর্থ্যের প্রয়োজন বোর্নভিটায় তা পুরোমাত্রায় রয়েছে ব'লে ওকে আমি নিয়মিত বোর্নভিটা খাওয়াই। তাই কি খেলাধুলায়, কি পড়াশুনায় সবদিকেই ছেলে আমার সমান তালে চলে।"

বোর্নভিটা পুষ্টিকর, শক্তিদায়ক সুষম পরিমাণে কোকো, দুধ, চিনি ও মল্ট মিশিয়ে এটি তৈরি করেছেন ক্যাডবেরি—প্রাণোচ্ছল শালীন প্রস্তুতে বিশেষজ্ঞ ব'লে যাঁদের খ্যাতি একশ বছরেরও বেশি। এর কোকো-সমৃদ্ধ স্বাদ ছেলেমেয়েদের ভারী পছন্দ।

ক্যাডবেরির বোর্নভিটা খাবেন—
শক্তি, উদ্যম—এবং স্বাদের জন্যে

সংবিধান। স্পষ্ট করে বলুন, কোন পার্টিতে আপনি বিলং করেন?' প্রশ্নের ধরণে আমি একটু ঘাবড়ে গেছি বৈকি। কিন্তু ওটা যে খড়ের নেকড়ে তা বুঝে গিয়েছিলাম। তাই আগেকার মতই মৃদু হেসে কিন্তু যেন অনেকটাই ভয় পেয়ে বলি, 'কংগ্রেস। কংগ্রেস করি।'

ক্লাইমেক্স থেকে অত্যন্ত শান্তভাবে ঘটনা এ্যান্টি ক্লাইমেক্সে নেবে আসায় ঘরের ভেতরের আরো দু'টি ছায়া ঘর ফাটিয়ে হেসে উঠলো। আর টেরিলিন, টেরিকটের জংগলে আবদ্ধ সেই নেকড়ে দ্রুত এই হতবুদ্ধিকর অবস্থা কাটিয়ে ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায়ের গল্পের সেই বাঘের মত প্রায় সহৃদয় হয়ে উঠলেন।

'ইউ আর ভেরি নটি। ইজ ইনট্ ইট?'

এসবের কি উত্তর দোব আমি? আপাতত ভারতীয় সংবিধানের পবিত্রতা রক্ষা করা গেছে। হাতের আস্তিন দিয়ে হাসিটাকে গোপন করলাম। তারপর চাকরিটা আদায় করে বাড়ি এলাম চীনে-মুচির চটি বাজিয়ে।

॥ তিন ॥

দুপুর ফুরিয়ে গেছে কখন। বিকেলও যায় যায়। ক্ষিপ্র খুশির হাওয়া লেগেছে মুচকুন্দ গাছের ডালে ডালে। অবিস্মরণীয় হয়ে উঠেছে সূর্যাস্তের মেঘ। মনীষার শ্লেটে আমার নাম লিখে দিয়েছি সেদিন। আমার ভয় ছিলো মনীষা হাত দিয়ে সে নাম অক্লেশে মুছে ফেলবে। সাড়ি বদলাবার মত প্রেমিক বদল না করলে মনীষার চলবে কেন? নদীই পারে এঁকেবেঁকে চলতে। নারী ত' নদীই। বিশেষ মনীষার মত নারী। সে কেন এঁকেবেঁকে চলবে না?

রিস্ট ওয়াচ

মাত্র ৬৲ টাকায়

আমাদের চেন পদ্ধতি স্কীমের মাধ্যমে মাত্র ৬৲ টাকায় ৫ বৎসরের গ্যারান্টী সমেত ৫ জুয়েল রিস্ট-ওয়াচ লাভ করুন। ডাকমাশুল ১/১৫ টাকা অতিরিক্ত।

দ্রষ্টব্য : আমাদের মধু-চন্দ্রিমা সেন্টের বিক্রয় বৃদ্ধির জন্যই এই স্কীম চালু করা হইল। পছন্দ না হইলে মূল্য ফেরৎ।

SWISS WATCH TRADING CO.
P. B. 87, (WBC) Jullundur City.

দুপুর ফুরিয়ে গেছে কবে। বিকেলও যায় যায়। অবিস্মরণীয় হয়ে উঠেছে সূর্যাস্তের মেঘ। এই বেলা মনীষার কাছে আমি যাই। ফটা শালিখ মাথার ওপর দিয়ে উড়ে যাচ্ছে। আমিও যাই মনীষা তোমার কাছে। প্রসারিত জীবনের মেলায় তুমি হারিয়ে যেও না।

একদিন খেলাচ্ছলে একটা দড়ির ফাঁস তৈরি করে কফি হাউসে চেয়ার নিয়ে মুখোমুখি বসেছিলাম। কিছুই ভাবি নি। মনীষার সঙ্গ ভালো লাগতো এই পর্যন্ত। যেমন সিগারেট ভালো লাগে। যেমন ভালো লাগে শব্দহীন রোদ বা নিস্তব্ধ বৃষ্টি। ওরা আমার সমস্ত সত্তাকে আচ্ছন্ন করে। তখনো পর্যন্ত প্রেম ছিলো বিলুপ্ত ভাষায় লেখা অনাবিষ্কৃত এক শিলালিপি। জীবনের রহস্য, বেদনা, রোমাঞ্চ কিছুই জানতাম না আমি। কিন্তু কি যে হল! কোথা থেকে কি যে হয়ে যায় জীবনের! রহস্যের যেন শেষ নেই। এমনি ছোটছেলে যেমন নালায় ভাসিয়ে দেয় কাগজের নৌকা, তেমনিভাবেই ত', ঠিক তেমনি কিছু না ভেবেই, দড়ির ফাঁস তৈরি করে ওকে বললাম, 'তোমার হাতটা এর ভেতরে দাও ত' দেখি!'

মনীষাও নিতান্ত খেলাচ্ছলেই, কেন না এ খেলা ছাড়া আর কী, হাতটা ঢুকিয়ে দিলো দড়ির প্যাঁচের মধ্যে। আমি প্যাঁচটা আটকে দিলাম। সঙ্গে সঙ্গে রহস্যময় জীবন তার কাজ আরম্ভ করে দিলো। কি বলবো একে, ম্যাজিক! অকস্মাৎ মনীষা চোখ তুলে আমার দিকে তাকালো এক পলক। আমিও কিছু না জেনে উৎসুক দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলাম। আমার সমস্ত দেহে মনে আমি স্পষ্ট রূপান্তর লক্ষ্য করলাম। আমার বুকের আনন্দিত রক্তধারা, সে আমার কথা শুনলো না। আমার ক্লান্ত, ক্ষতবিক্ষত বর্তমান দূরে চলে গেল ভাঙা ডানা নিয়ে। সামনে এসে দাঁড়ালো সম্রাটের মত গর্বোন্নত, সব সীমানা মাড়িয়ে চলা নির্ভীক ভবিষ্যৎ। আমি সঙ্গে সঙ্গে, সেইদিনই মনীষাকে বিয়ে করার দুর্লভ স্বপ্ন দেখলাম।

মনীষার চোখেও দেখেছিলাম চকিত বিদ্যুৎ। কোন কথাই তারপর আমরা বলি নি। দু-কাপ কফি দু'জনে নিঃশব্দে পান করে একটা দারুণ বিস্ময়ের তোল-পাড় রোমাঞ্চ নিয়ে যে-যার পথ ধরে-ছিলাম। ও গিয়েছিলো ট্রামে। আমি গিয়েছিলাম বাসে। কিন্তু আমরা যেন মনে মনে তখন জেনেছিলাম আমরা একই ঠিকানায় যাচ্ছি। তখন মনে হয়েছিলো যেমন-তেমন একটা চাকরি পেলেই ভালো-বাসার নিজস্ব জোরে ওকে টেনে নেব। আজ এতদিন পর সেই যেমন-তেমন চাকরি পেয়েছি। কিন্তু এখন সংশয় দেখা দিচ্ছে। চাকরিটাকে মনীষার তুলনায় সামান্য, অতি সামান্য মনে হচ্ছে। আজই প্রথম সেই কথা বলবো, যে কথা সবার শেষে বলতে হয়, সেই শেষের কথাটি বলবো কিন্তু কার ওপর দাঁড়িয়ে? নিয়তি কি একচুলও নড়বে না? সে কি কীটের মত কেটে নেবে পাণ্ডুলিপি? আমার চাকরি হয়তো সামান্য কিন্তু আমি কি আজো মনীষার কাছে অসামান্য নই?

কিন্তু চলতে চলতে এ আমি কোথায় এলাম? অন্য কোন্ দ্বীপে ঠেকে গেলাম? শংকায়, সংশয়ে বিহ্বল হয়েও যে এত-রূপ মাধুর্যের ধারায় স্নিগ্ধ হচ্ছিলাম। হঠাৎ যখন বিকেল শেষ হয় হয়, সূর্যাস্তের মেঘ যখন পড়ন্ত রোদ্দুরে একটা বিশাল বিভ্রম ছড়িয়ে দিয়েছে, একটা চোরাই সুখে আচ্ছন্ন হয়ে আছি, হঠাৎ চোখের সামনে গ্রাহাজানি কিংবা খুনের মত ঘটনা দেখলে মানুষ যেমন আতংকিত হয় তেমনি অকস্মাৎ সেই কালো, কুখ্যাত জাল দেওয়া মার্কামারা গাড়িটাকে গলির মুখে ঢুকতে দেখে আমি মনে মনে দু' হাতে মুখ ঢাকলাম। আর সঙ্গে সঙ্গে ছেলেটাকে আমি দেখতে পেলাম। হ্যাঁ, এখানেই ত' এই ত' এখানেই ছেলেটা গুলী খেয়ে মরেছিলো পরশু। রক্তের স্রোত হরিণের মত ছুটে গিয়ে এখন জমাট, কালো, আলকাতরার মত শক্ত হয়ে গেছে।

দেশ যেন ঝড়ের চূড়োয় দাঁড়িয়ে আছে। ইতিহাস তার রোমাঞ্চকর বাঘনখে লিখে যাচ্ছে নতুন কালের শিলালিপি। বাজে কলসে উঠেছে মানুষ। সময় তার অক্লান্ত কলমে রচনা করে চলেছে বিপ্লবের পটভূমি। এমনি তাকালে মনে হবে বোধ হয় জীবন চলছে যেমন এতকাল চলে-ছিলো তেমনিভাবেই।

ভোরবেলার গংগায় স্নান সেরে উঠলে এক অপরূপ মাধুর্যে মনটা আগের মতই ভরে ওঠে। বিশ্বসংসারে এক অখণ্ড শান্তি। সে শান্তি মৃদু মৃদু উত্তাপ উঠতে থাকা নদীর বুকে। সে শান্তি দিগন্তের কিনারে নয়, সুন্দর রক্তাভায়। সে শান্তি ছড়ানো শিশিরে চিকচিকে ঘাসের ডগায় ডগায়। সমস্তটা আরো ছবির মত সম্পূর্ণ মনে হয় যখন সেই নিস্তব্ধ, শান্ত, অগাধ শান্তির ভোরের মধ্যে গলা ডুবিয়ে দেখা যায় খালি গায়ে, কোমরে একটা নেংটির মত কাপড় জড়িয়ে বুড়ো মাঝি ঘোলা চোখে নৌকো হাতুড়ি আর পেরেকে ঠক ঠক করে মেরামত করে চলেছে। ঐ ঠক ঠক শব্দে মনে হবে যেন অদৃশ্য মধুচক্র থেকে মধু ঝরে ঝরে পড়ছে ফোঁটায় ফোঁটায়।

সমস্ত মন স্নিগ্ধ, সুমিষ্ট রসে ভরে যায়, তারপর সেই কানায় কানায় ভরা মন নিয়ে ঘাট ছেড়ে ঢালু পথ বেয়ে রাস্তায় উঠতেই চোখে খোঁচা লাগার মত অনিবার্য পোস্টার: বিপ্লব অপেক্ষা প্রতিক্রিয়ার হাতেই বেশি রক্ত ঝরে। সুতরাং বিপ্লবের জন্য প্রস্তুত হোন। 'দিক থেকে দিকে বিদ্রোহ ছোটে, বসে থাকবার বেলা নেই মোটে।'

শীতের সময় ভালো রোদ্দুরে যে মাঠে ছেলেরা, যুবকেরা মজা করে ক্রিকেট খেলছে, শীতের রোদ্দুর যখন মাঠের প্রত্যেকটি ঘাস ছুঁয়েছে, পরিতৃপ্ত গরুর পিঠের ওপর অচঞ্চল একটি কাক, সেই মাঠেই কখন শকুনির পালের মত দলে দলে নেবে পড়ছে মানুষ পতাকা আর ফেস্টুন নিয়ে। এ কোন্ কালকে বহন করে নিয়ে আসছে তারা? যে যুবক এইমাত্র রেস্টুরেন্টের সিঁড়ি বেয়ে নেবে, ঝলমল দড়িতে সিগারেট ধরিয়ে, একটা সম্পূর্ণ অজানা কিন্তু অসামান্য সুন্দরীকে রিক্সায় উঠে হুড খুলে চলতে দেখে হঠাৎ এমনি এমনি, 'গুড ইভনিং ম্যাডাম' বলে দীর্ঘ একটি শিস টানলো সেই যুবকই হয়তো রাত বারোটায় অন্ধকূপের মত গলিতে দাঁড়িয়ে অন্য একজন অস্থির যুবককে ভিয়েতনাম বোঝাতে বোঝাতে গলা ভেঙে ফেলছে।

পৃথিবী রসাতলে যাক, একদল তবু থাকবেই যাঁরা অবিচলিত স্থৈর্যে সবকিছুর মধ্যেই ধ্বংস আর উচ্ছৃঙ্খলতা আবিষ্কার করছেন এমন একজন মাস্টারমশাই যখন বলছেন, 'কিসানু হবে না এ জাতের। সেদিন এক ছোকরা এসে চোখ ঘুরিয়ে বলে গেল, আমি তখন গিয়ে হলে গার্ড দিচ্ছিলাম, কি উচ্চারণের ভঙ্গি; আহা কি বাহারে অঙ্গভঙ্গি, মাস্টার মশা, আপনাকে সাফ জানিয়ে দিচ্ছি মাইরী, শেষে বলবেন ভোঁদা বাপের কুপুত্তুর সেটি হবে না, এই আমার শেষ ব্যাচ ক্লাবের, ওদের যা ইচ্ছে তাই করতে দেবেন, আপনাকে কিছু করতে হবে না, স্রেফ মুখ ফিরিয়ে থাকবেন। বোঝ ব্যাপারটা। এ জাতের কিসানু হবে? ছেলে তৈরি হচ্ছে না। হচ্ছে কালসাপের বাচ্চা।'

তখন ঐ রকমের এক কালসাপের বাচ্চা নিরঞ্জু এখানে গুলী খেয়ে মরলো। পাড়ারই ছেলে, হয়তো আরো দু'-তিনটে পাড়া তার নাম জানে, হঠাৎ তার নাম ছড়ায় বাংলা দেশের দেয়ালে দেয়ালে রটে গেল।

তারই জের টেনেই কি আজ, এখন ওই কালো, কুখ্যাত গাড়িটা এলো? কাছে গিয়ে দাঁড়ালাম। সবই বুঝতে পারছি। আর অনুশোচনায়, দুঃখে আমার ডাক ছেড়ে কাঁদতে ইচ্ছে করছে। বুঝেছি, ডাক এসেছে। এ পোড়া ডাকের শেষ আর হবে না। এই চললো এখন। তাকালাম কার দিকে আর? শতদলদা এই দু' বছরেই একটু যেন বৃদ্ধ হয়েছেন। চোখের ভ্রূ দুটো একটু কুঁকে পড়েছে। সেবার জেলে গিয়ে শক্ত একটা অসুখ নিয়ে এসেছিলেন। এখনো ভাল করে সারে নি দেখলেই বোঝা যায়। হাসলেন। লক্ষ্য করে দেখলাম নিচের পাটির দুটি দাঁত নেই। জেলের মধ্যে পুলিশের বেটনে নাকি গেছে। চোখের ভারী চশমাটা অবধারিতভাবে চোখে নেই। এটা হাতে উঠে এসেছে অভ্যস্ত নিয়মে। আর অপ্রস্তুত কোঁচাটি বিপক্ষ পকেটে ঢোকাবার ব্যর্থ চেষ্টা করছেন শতদলদা কথা বলতে বলতে।

'কি, এসে গেছেন?' আবার সেই একই প্রশ্ন। অঙ্কের নির্ভুল নিয়মে। চোখের দৃষ্টি এই দু' বছরেই কিছু ক্ষীণ। তবু সেই একই, পুরনো খুশির ঝলক। যেন সবটাই রঙ্গ।

'হ্যাঁ।' ও-সি একগাল হাসলেন। সেই একই নোংরা, চিটচিটে হাসি।

'ওয়ারেন্ট এনেছেন?' আবার সেই অবান্তর পুরনো, পচা প্রশ্ন।

'ওয়ারেন্ট কি মশাই? পি-ডি এ্যাক্ট ভুলে যাচ্ছেন?' তারপর একটু থেমে 'আসুন', যেন আহ্বান। যেন নিমন্ত্রণ কোন ভোজসভার।

শতদলদা সকলের দিকে তাকালেন। একটু হাসলেন শান্ত, স্নিগ্ধ, উত্তাপবিহীন। তারপর ধূসর রঙের গাড়িতে উঠে, যেমন প্রতিবারই হয়, যেতে যেতে আমাকে দেখতে পেলেন। তারপর একটু শক্ত হেসে বললেন, 'এবারেও ত' আপনি এলেন না অরুণবাবু। আপনাদের মত যুবক থাকতে আমাদের মত'.....কি উত্তর দেব আমি? লজ্জায়, দুঃখে কোথায় যে এ-পোড়ামুখ লুকোবো জানি না। চাকরি একটা পেয়েছি বটে আজই, কিন্তু মনীষার প্রেম, সে 'কাঁকন কন কন কেন বাজায়?' ওর সঙ্গে আমার এখন যে সম্পর্ক তাতে একটা ব্যবস্থা না করা পর্যন্ত ত' কিছুই যে পারি না। মিটে যাক ব্যাপারটা। মনে মনে আশ্বস্ত হয়ে উঠি, মিটে গেলেই তারপর শতদলদা দেখবেন একই মিছিলে, একই ঝাণ্ডার তলায় আপনার পাশে আমি, একই গাড়িতে আপনার পাশে আমি, একই সেলে পাশাপাশি কম্বলে আপনার সঙ্গে আমি, লাঠি, গুলী, টিয়ার গ্যাস, দেখবেন শতদলদা, কিছুই আমাকে সেদিন ছিন্ন করতে পারবে না।

॥ চার ॥

আমি যখন মনীষার চাকরির জন্যে হন্যে হয়ে এ-দোর ও-দোর করছি তখন দেশ কিন্তু থেমে নেই। কেমন অদ্ভুত লাগে। কী দ্রুত তফাৎ হয়ে যাচ্ছে সবকিছুর। এ-রোয়াকে যে ছেলেরা বসে তারা ও-রোয়াকের ছেলেদের সঙ্গে কথা বলে না। শুধু মাঝে মাঝে গালাগাল দেবার দরকার হয়। আশ্চর্য, সে গালাগালও রাজনীতির ভাষায় রচিত। 'শালা বুর্জোয়া', 'চুপ শালা চীনের দালাল'—এইসব কথারই তুবড়িবাজী। একই চায়ের টেবিলের দু'ধারে দু'জন বসে আছে, এক সময় খুবই বন্ধু ছিলো, আজ কিন্তু দু'জনেই নীরব, পাথরের স্ট্যাচু। দু'জন দু'জনকে নিরাসক্ত দৃষ্টিতে তাকিয়ে জরীপ করে নেয়। তারপর হাই তোলে প্রকাণ্ড করে।

মাঝে মাঝে গভীর, গভীর ক্লান্তি সিফিলিসের মত রক্তে মিশে যায়। তখন এ শহর মাথা নিচু করে দু-পাশে ক্লান্ত, লম্বা হাত ঝুলিয়ে বিষণ্ণ ভংগিতে হাঁটে। আবার কখন বন্ধ জানলার খড়খড়ি চুইয়ে আলো এসে পড়ে। আন্দোলনের পেণ্ডুলাম দুলতে থাকে ঘন ঘন বাঁদিকে। তখন আবার মিছিল, এমন দিন একটাও থাকে না যেদিন মিছিল দেখা যায় না। কাতারে কাতারে মানুষ চলেছে, পিঁপড়ের সারির মত, উদ্বাস্তু মেয়েরা চলেছে পেছনে রুগ্ন শিশুকে কাঁধার সংগে জড়িয়ে খালি পায়ে পিচ-গলা রাস্তায় পানে দোক্তার ঘামে মাখামাখি মুখে, মাঝে আছে রুগ্ন যুবক—হাতখানাকে হাতুড়ির মত তুলে স্লোগান দেওয়া যার কাজ। সামনের সারিতে নতমস্তক আধবুড়োর দল, জীবনের সব আশা যারা খুইয়েছে। একেবারে প্রথমে দলের ঝাণ্ডা, ছেঁড়া পায়জামা আর অল্প-গেরুয়া রঙের জামা গায়ে, মুখে দাড়ি, চোঙা হাতে নেতা। রোজই আসছে, রোজই আসছে পিলপিল করে। এ আসার যেন বিরাম নেই। বিশ্রাম নেই। 'বিপ্লব' এই কথাটা যুবকদের ভীষণ উৎকণ্ঠিত করে তুলছে। পার্টি সেল থেকে 'বিপ্লব' কবে বেরিয়ে আসবে, বন্দুকের নলের ভেতর দিয়ে স্বপ্ন দেখে সেই সব যুবক আর বুলি কপচায়, একান্তে, কানের কাছে মুখ নিয়ে বলে, 'আমাদের সবই গোপন রাখতে হয়। আমরা প্রস্তুত হচ্ছি। ঠিক সময় বোমা বার্স্ট করবে।'

মাঝে মাঝেই শতদলদাকে দেখি।

'কোথায় যাচ্ছেন?'

কাঁধের হ্যাণ্ডলুমের ব্যাগটা নেড়ে বলেন

সর্দি ও কাশিতে
রক্ষিতের
তাল মিছরি
ফোন ৫৫-৩০৮৫

হেসে বলেন, 'এই সরকারী কর্মচারীদের একটা ব্যাপার আছে, তাই।'

তাকিয়ে দেখি ও'কে। কাঠামোটা এবার আরো একটু ভেঙেছে। হঠাৎ আবিষ্কার করলাম ডিমের খোলার মত মাথাটায় আর একটা চুলও কালো নেই।

গলায় চামড়াটা বয়েস হয়ে যাওয়া গাছের মত খসখসে হয়ে গেছে। এমনি দেখলে মনে হবে এইবার বুঝি ভেঙে পড়বেন। কিন্তু চোখের দিকে তাকালে এখনো মনের ভুল ভাঙে। সেখানে এখনো রয়েছে কৌতুকের ঝলক। মুখের হাসি তেমনি অদ্ভুত প্রশান্ত।

কি ভেবে বলি, 'বিকেলে কখন থাকবেন বাড়িতে?'

'বিকেলে?' একটু হাসলেন শতদলদা, 'বিকেলে ডালচরে একটা গ্রুপ মিটিং আছে।'

'রাত্রে?'

'রাত ৮টায় বিড়ি মজুর নিয়ে বসতে হবে।'

'কখন ফিরবেন?'

'দশটা এগারোটার কমে বাড়ি ঢুকি না।'

'একটু রেস্টও ত' আপনার দরকার।'

'রেস্ট?' শতদলদা এবার একটু শব্দ করে হাসলেন, 'রেস্ট আর নিতে দিলেন কই?'

হঠাৎ বাসটা এসে গেল। উনি বাসে উঠে পড়ে বললেন, 'চলি।'

রেস্ট? রেস্ট আপনাকে দোব শতদলদা, দাঁড়ান। অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করেছেন। আর একটু করুন। তারপর সত্যিই তো আমি থাকতে আপনি কেন উঠবেন জালের গাড়িতে, আর একটু অপেক্ষা করুন, আমি মনে মনে বলি।

ঠিক সেই সময় জালের গাড়িটা গাড়োলের মত ব্রেক করে যেন দাঁড়ালো।

'কি? এসে গেছেন?' শতদলদার মত উচ্ছল ভংগিতে বলি। যেন কৌতুক। যেন পুরনো কোন রংগ।

'আমাদের কাজটাই খুব জঘন্য। আপনি ত' সবই জানেন।'

উত্তরে ও-সি'র সেই নোংরা মাছির মত চিটচিটে হাসি।

না। সত্যি সত্যি জালের গাড়ি এখনো আসে নি আমাকে নিতে। এখনো আমি ঠিক প্রস্তুত নই। অনেক অসুবিধে আমার ঘরে গেছে বটে, তবু এখনো কিছু কপাট, এখনো কিছু বখেরা.....

না। জালের গাড়ি আমার জন্যে এখনো নয়।

তবু বিশ্বাস করুন শতদলদা, আমার চোখ দুটো এখনো অন্ধ হয়ে যায় নি। আমি সব দেখতে পাই। আমার দুখানা হাত আছে। সেগুলো কোনদিন কাজে আসতে পারে।

আমার দুটো পা আছে সে দুটো এখনো অকর্মণ্য হয়ে যায় নি।

দাঁড়ান, বাকি বখেরাগুলো সব মিটলো বলে।

মিটলেই তারপর.....জালের সেই গাড়িতে...নিশ্চয়...এখনো শুধু কথাই, তখন কথার সংগে রক্ত মিশবে।

॥ পাঁচ ॥

ছ' মাস পর চাকরি একটা মনীষার জুটে গেল। একটা নতুন ইস্কুল স্টার্ট হচ্ছে। ছাত্রছাত্রী কম। মাইনে যখন যেমন জোটে এখনকার মত তাই নিয়ে সন্তুষ্ট থাকতে হবে। অবশ্য ডি-এ'টা ঠিক ঠিক পাওয়া যাবে। ইস্কুলের ক্লাস নাইন টেনে উঠলে, বোর্ড থেকে পারমিশন এলে তখন ঠিক ঠিক মাইনে হবে।

'সেটা হবেও', শতদলদা বললেন, 'বছরখানেকের বেশি দেরি হবে না।'

এত কাজের মধ্যেও শতদলদা আমার কথা ভোলেন নি। উনি ওখানেই গেছলেন একটা মিটিং করতে। তারপর রথও দেখলেন কলাও বেচলেন।

মনীষা খুবই খুশি। দিনরাত বাড়িতে একা একা বসে বসে ওর হাঁটুতে বাত ধরে গিয়েছিল। তা ছাড়া এক বছর পর ত' মাইনের পাকা বন্দোবস্ত। অন্তত ঘরের খেয়ে ত' বনের মোষ তাড়াতে হচ্ছে না। যে মাইনে পাওয়া যাবে তাতে আপাতত ঘরে কিছু আসবে না বটে, তবে ঘর থেকেও কিছু দিতে হবে না। মাঝখান থেকে ডি-এ'র টাকাটাও পাওয়া যাবে। এই বা মন্দ কি!

মনীষা বলল, 'যাও, শতদলদাকে ডেকে নিয়ে এসো। তুমি কি বল তো? এটাও কি আমাকে বলে দিতে হবে? উনি যেমনই হোক একটা চাকরি জুটিয়ে দিলেন আর তুমি এক-কাপ চা খাবারও নেমন্তন্ন করলে না? ছিঃ!'

কে যে 'ছিঃ'-এর পাত্র কে কাকে বোঝায়। এটা কি তাই হল না, তুমি আমার জন্যে চাকরির ব্যবস্থা করলে এসো একটু মিষ্টিমুখ করে যাও? আমি কেমন করে অতো নির্লজ্জ হই? কিন্তু ঐ যে, আমি জেনে গেছি মেয়েদের কাছে 'সারেন্ডার' করলে সবকিছু পাওয়া যায়। অতএব দুঃখিত মনে শতদলদাকে নেমন্তন্ন করতে গেলাম।

পথে পা দিয়েই বুঝলাম আবার শহর অস্থির হয়ে উঠেছে। রাস্তায়, প্রত্যেক মোড়ে মোড়ে কিসের চাপা উত্তেজনা। আনাচে-কানাচে উঁচু-নিচু ঢেউ। অসহ্য রকমের উজ্জ্বল আলো আচমকা যেন সকলের মুখে এসে পড়েছে। যেন সকলেই চীৎকার করে ভয়ঙ্কর কিছু একটা বলতে চায়। রুদ্ধস্বরে কে একজন যুবক হাত দুটিকে চোঙার মত করে বলেছে, 'কোটের বোতামও বন্ধুগণ এক আঙুলে খোলা যায় না। এমন কি যে পেরেকটা আপনার জুতোর সোলের ভেতর ঢুকে আছে তাকেও তৈরি করতে হয় মেহনত করে। বিপ্লবও তৈরি করতে হয়। বন্ধুগণ আমি...'

'তৈরি করা অবশ্য খুবই কঠিন।' কে একজন ভিড়ের মধ্যে থেকে, তার নিচের ঠোঁটে বিড়ির টুকরো, কোঁচকানো ঠোঁটে হেসে উঠলো।

'এ্যাই চোপ।' বিকট বাজখাঁই গলায় অন্য একজন তাকে থামিয়ে দিলো। কেউ কেউ ভীষণ উদ্দীপ্ত। কিছু মানুষ জুটেছে ওর চারপাশে। গভীর প্রত্যাশা নিয়ে ওরা ওর প্রত্যেকটি শব্দ গিলে যাচ্ছে গোগ্রাসে। হতাশায় কারুর মুখে ম্লান ছায়া। হঠাৎ, আকস্মিকভাবে প্রচণ্ড হাততালিতে বক্তৃতা থেমে গেল।

পাশের দোকানে দু'-চারজন হামলা করছে।

'দোকান কেন বন্ধ পণ্ডুদা? আপনাকে ত' আমাদের দলেই জানতাম।'

'আমি কোন দলাদলির মধ্যে নেই। দোকান যদি লুঠ হয় তাই বন্ধ করেছি।'

'এ শালাও লালের দলে ভিড়েছে।

বাজারে একটি সাড়াজাগানো নতুন বই বেরিয়েছে

অমরেন্দ্রকুমার ঘোষের

মহাজীবন—টাঃ ১৮·০০

৮০০ পৃষ্ঠার ওপরে বহু দুষ্প্রাপ্য ছবিসহ একটি অমূল্য গ্রন্থ

প্রকাশক—মোহন লাইব্রেরী, ৩৫-এ, সূর্য সেন স্ট্রীট, কলিকাতা-৯

ফোন : ৩৪-১৮০৮

ঠিক আছে পন্টু। ফিন দেখা হোগা।' ওরা চলে গেল খিস্তি করতে করতে। বাড়াবাড়ি করলো না মানুষের মেজাজ দেখে। একটা জীপ আসছে ছাই রঙের। মুহূর্তে ভিড় পাতলা হয়ে গেল।

কোন একটা বাড়ির অদৃশ্য কোণ থেকে হঠাৎ একটা বোমা ছিটকে পড়লো রাস্তায়। প্রচণ্ড শব্দে পাশের দোকানের টিনের চালটা থর থর করে নড়ে উঠলো।

ছুটতে ছুটতে শতদলদার বাড়ির দিকে গেলাম। এবার আমি ফ্রি। আমার চাকরি হয়ে গেছে। মনীষার সংগে সেদিন আমার একটা ব্যাপার চলছিল। সেটা ভালোয় ভালোয় মিটে গেছে। বাকী ছিল মনীষার চাকরি। যেমনই হোক তা'ও একটা জুটে গেল। সব দিক দিয়ে আমি এবার নিশ্চিন্ত। আমি মুক্ত। সম্পূর্ণ মুক্ত। দেশ শুধু একা আপনারই নয় শতদলদা। দেশ আমারও। সকাল থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত রঙীন এ শহর ঘিরে আছে আমার সমস্ত চেতনা। ঠোঁট আমার নড়ে উঠছে শতদলদা। ভয়ানক রক্তাক্ত মারাত্মক একটা শব্দ উচ্চারণ করবার জন্যে ঠোঁট দুটো আমার প্রবল আবেগে নড়ে উঠছে। রেড ইজ কামিং, ইউ এস এস আর, ইউ এস এস আর...দেশ দেশ নন্দিত করি মন্দ্রিত তব ভেরী.....

ভয়ানক মারাত্মক একটা শব্দ উচ্চারণ করবার জন্যে, মারাত্মক শব্দটা কি, আপনি, আপনি নিশ্চয় আন্দাজ করতে পারেন শতদলদা, হ্যাঁ, বিপ্লব, ঠিক তাই।

শতদলদার বাড়ির কাছাকাছি আসতেই দেখলাম আমার সেই অতি পরিচিত মার্কামারা, জালের গাড়ি ঢুকছে গলিতে হর্নের আওয়াজ করতে করতে। তারপর গাড়োলের মত ব্রেক করে এক জায়গায় দাঁড়িয়ে গেল। দুজন জন্তুর মত লাফিয়ে পড়লো গাড়ি থেকে।

সেই দুজনের মধ্যে একজন, যেমন হয় প্রত্যেকবার, নিঃশব্দে হাতের সিগারেটটি জ্বলতে দিল। একজন গিয়ে, কোথায় আর যাবে, আমার সেই একান্ত পরিচিত দরজায় কড়া নাড়লো।

প্রথমে বেরিয়ে এলো ডিমের খোলার মত মাথাটা। তারপর দোমড়ানো ইস্পাতের জংধরা কাঠামো। তারপর, তারপর দেখলাম সেই মরণজয়ী নির্ভীক, শান্ত, শব্দহীন হাসি। কণ্ঠস্বর থেকে ঘৃণা বা বিদ্বেষ কিছুই ধরে পড়লো না। যেন পুরনো রগড় ফিরে পাওয়া। চোখে সেই পুরনো কৌতুকের ঝলক। 'কি এসে গেছেন?'

'হ্যাঁ।'

'ওয়ারেন্ট এনেছেন?'

'আপনি ত' সবই জানেন। আমাদের কাজটাই জঘন্য।' আবার সেই নর্দমার মাছির মত চিটচিটে, নোংরা হাসি। তার পর আরো একটু ব্যস্ততা, 'আসুন।' যেন আমন্ত্রণ কোন ভোজসভায়। শতদলদা তারপর সচরাচর যা' করেন, চোখের ভারী পাওয়ারের চশমাটা হাতে নিলেন, কাউকেই উদ্দেশ্য করে নয়, যেন এ-পথে এ-বিড়ম্বনা অনিবার্য, এমনি করেই যেতে হবে দিনের পর দিন। হয়তো আরো কোন ভয়ংকর পরিণতি অপেক্ষায় ওৎ পেতে আছে সেটা মনে করেই সেই হাসি শান্ত, নির্ভীক, শব্দহীন। তারপর বিপক্ষ পকেটে অপ্রস্তুত কোঁচাটি ঢোকাতে ঢোকাতে সোজা, দৃঢ় পায়ে গাড়িতে গিয়ে উঠলেন।

সেই পুরোন দৃশ্য তখনো শেষ হয় নি। আরো কিছু বাকি ছিল। হঠাৎ গাড়ি থেকে শতদলদা আমাকে দেখতে পেলেন।

সেই পুরনো দৃশ্য তখনো শেষ হয় আপনাদের মত যুবক থাকতে আমাদের মত বৃদ্ধদের'.....

'যাচ্ছি, যাচ্ছি।' আমি চেঁচিয়ে গলা ফাটিয়ে বলতে গেলাম আমার এতদিনের জমা করে রাখা সমস্ত আন্তরিকতা নিয়ে। কিন্তু এ কি, গলা দিয়ে একটা শব্দও বার হল না কেন? কেন আমার গলা আমাকে বিট্রে করছে? কি হল আমার? কে আমার গলা টিপে ধরলো। আমি কি সত্যিই মুক্ত? সম্পূর্ণ মুক্ত? আমি কি সত্যিই নিরাপদ?

না। গভীর দুঃখের সংগে এ সত্য আমাকে স্বীকার করতেই হল, না আমি সম্পূর্ণ নিরাপদ কেন, কিছুমাত্র নিরাপদ এখনো নই।

মনীষা আর আমার চাকরি বজায় রাখতে গেলে, হায়, আমার মতো দীর্ঘ-শ্বাসই ঝরুক, কিছুতেই জালের গাড়িতে আমার যাওয়া চলে না।

জালের গাড়িটা আমাকে না নিয়ে কেমন স্বচ্ছন্দে পাশ দিয়ে দ্রুত চলে গেল অন্য কোন্ দিগন্তের দিকে।

রঙ্গজগৎ

তেলা মাথায় তেল

পুণায় ফিল্ম ইনস্টিটিউট পরিদর্শনে গিয়ে চলচ্চিত্র পরিচালক শ্রীসত্যজিৎ রায় বলেছেন, সরকারী ফিল্ম ফাইন্যান্স কর্পোরেশন ধনী চিত্র প্রযোজকদের সাহায্যদান করে, নতুন প্রতিভার বিকাশে কর্পোরেশন সাহায্য করে না। যে প্রযোজকরা মোটা অংকের সিকিউরিটি জমা দিতে পারে তারাই কেবল ঋণ পায়। যাদের মোটা টাকা ব্যয় করার মত সামর্থ্য নেই, তাদের যদি প্রতিভা থাকেও তারা ঋণ পায় না।

তেলা মাথায় তেল ঢালা সর্বক্ষেত্রেই সরকারী নীতি হয়ে দাঁড়িয়েছে। ফিল্ম ফাইন্যান্স কর্পোরেশনের মত সংস্থার দেশে প্রয়োজন ছিল। এই সংস্থা যখন গঠিত হল তখন নতুন ও প্রতিভাবান চিত্রনির্মাতারা আশার আলো দেখেছিলেন। কিন্তু আজ তাঁদের আশা নিরাশায় পরিণত হয়েছে। তিনি যত প্রতিভারই অধিকারী হোন না কেন, সিকিউরিটি জমা রাখলে এবং নামী তারকাদের নিয়ে ছবির ব্যবসাগত সাফল্যের সম্ভাবনা দেখাতে না পারলে ঋণ যোগাড় করা সম্ভব নয়। প্রকারান্তরে ফিল্ম ফাইন্যান্স কর্পোরেশন এখন একটা মহাজনী ব্যবসায়ে দাঁড়িয়ে গেছে। সাধারণ মহাজনের সংগে তফাৎ কেবল সুদের হার কিছুটা কম। কিন্তু সিকিউরিটির ঝামেলায় ধনী প্রযোজক ছাড়া আর কারো পক্ষে এগোনো সম্ভব নয়। এই কর্পোরেশনের কার্যকলাপ ও তেলা মাথায় তেল ঢালার কথা ইতিপূর্বে 'রঙ্গজগৎ' কয়েকবার দৃষ্টি আকর্ষণ করার চেষ্টা করেছে, হয়ত পাঠকদের স্মরণে আছে।

নামী তারকাহীন শিল্প-শোভন চিত্রের ব্যবসায়ী সাফল্য কম কি না এই প্রশ্নের উত্তর দিতে গিয়ে শ্রীরায় বলেছেন: এই ধরণের ছবি অনেকক্ষেত্রে নামী তারকা-চিহ্নিত ছবি অপেক্ষা বেশি লাভজনক। এ ছাড়া এরকম ছবির বাজার কেবল দেশেই সীমাবদ্ধ থাকে না—বিদেশেও চাহিদা থাকে। উদাহরণস্বরূপ তিনি 'অপুর সংসার' ও 'থাইসিকল থীফ' ছবির নাম উল্লেখ করেন। চলচ্চিত্র দর্শকরা নিজেদের অভিজ্ঞতায় দেখেছেন সত্যজিৎ রায়ের 'পথের পাঁচালী'তে কোন নামী শিল্পী ছিল না। পরিচালক শ্রীরায়ও তখন নবাগত। সে সময় পশ্চিমবংগ সরকার যদি অর্থ লগ্নী না করত, তবে 'পথের পাঁচালী' যেমন বিশ্বের দর্শকরা দেখতে পেত না, তেমনি সত্যজিৎ রায়ের মত প্রতিভার বিকাশও দেখা যেত না। এই অভিজ্ঞতা দেশবাসীর থাকলেও মহাজনী-বুদ্ধির ফিল্ম ফাইন্যান্স কর্পোরেশনের নেই। না থাকার দরুণ বহু নতুন প্রতিভা নিজেদের বুদ্ধি ও শিল্প-চিন্তাকে বিসর্জন দিচ্ছে পণ্যচিত্রের প্রযোজকদের পায়ে। যারা নিজেদের প্রতিভার পরিচয় দিয়েছে সেরকম চিত্রস্রষ্টাও টাকার অভাবে ছবি করতে পারছে না। অথবা সাধারণ পণ্যচিত্র করে নিজেদের প্রতিভার অপমৃত্যু ডেকে আনছে। ফিল্ম ফাইন্যান্স কর্পোরেশনের

শুকসারী ছবির নায়িকা অঞ্জনা ভৌমিক

এই নীতির ফলে দেশে হালউড অনুকরণে স্থূল পণ্যচিত্রের প্রভাব যেরকম বাড়ছে সে তুলনায় শিল্প-শোভন ছবির সংখ্যা বাড়তে পারছে না। ফলে বিশ্বের বাজারে গর্ব করে দেখাবার মত ভারতের ছবির সংখ্যা দিন-দিনই কমছে। আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবসমূহে প্রতিনিধিত্ব করছে স্থূল পণ্যচিত্রগুলিকে। ফলে ভারতে শিল্প-শোভন ছবির জমিদার দিন দিন বাড়ছে, কিন্তু আমাদের ছবি দেখে ধারণা হবে আমরা হলিউডের নকলনবীশ মাত্র।

প্রসঙ্গত শ্রীরায় চলচ্চিত্র প্রযোজনায় 'সমবায়'-এর হাতে টাকা দেবার সুপারিশ করেছেন। এই প্রস্তাব অভিনন্দনীয়। আমরাও ইতিপূর্বে এরূপ মন্তব্য করেছিলাম। ব্যক্তিগতভাবে ঋণদান অপেক্ষা সমবায় ভিত্তিতে ঋণদানে সমষ্টিগত উদ্যোগে ভাল ছবি নির্মিত হবে। এবং ছবির বাজারে রাতারাতি বড়লোক হবার প্রলোভন কমবে। কলাকুশলী এবং শিল্পীরা মিলিতভাবে যদি সমবায় গঠন করেন এবং তাঁদের যদি ঋণ দেওয়া হয় তাহলে শিল্পের উন্নতির সঙ্গে পেশায় টিকে থাকতেও সাহায্য করা হবে। শ্রীরায় এক্ষেত্রে স্পষ্ট বলেছেন, তবে লক্ষ্য রাখতে হবে সমবায় প্রযোজিত ছবি যেন শিল্প-শোভন হয়। এই মন্তব্য আমরা আন্তরিকভাবে সমর্থন করি। কারণ হাণ্টারওয়ালী বা সঙ্গম-এর মত ছবি যদি সমবায় ভিত্তিতে হয় সেরূপ ক্ষেত্রে ঋণদানের প্রশ্ন না ওঠা উচিত। সমবায় এবং ঋণদান দুয়ের ক্ষেত্রে উদ্দেশ্য হওয়া উচিত মহৎ চিত্র তৈরি করা, শিল্প-শোভন ছবি তৈরি করা।

সুতরাং আমরা আশা করব অনতিবিলম্বে ফিল্ম ফাইন্যান্স কর্পোরেশন তেলা মাথায় তেল দেওয়ার নীতি পরিহার করবে।

—সুজন

চেকোশ্লোভাক ছবি 'অন দি রান'-এ আইভান ভ্যাসকোটিল

চিত্রআলোচনা

চিরদিনের

[অগ্রদূত]

শিল্পপতির একমাত্র কন্যা ইন্দ্রাণী দুরাশিল্পী। যখন সে বিশিষ্ট শিল্পিরূপে প্রতিষ্ঠালাভ করেছে সে সময় তার জীবনে তাপসের আবির্ভাব। ইন্দ্রাণী গিয়েছিল বিশ্রামের জন্য পলাশপুরে, সেখানে দু-জনের পরিচয় ও অন্তরঙ্গতা সৃষ্টি হয়। তাপসের আসল পরিচয় জানা না থাকলেও সুরের মেলায় গানে গানে তাদের মন দেয়া-নেয়া চলে। ইন্দ্রাণী মনে করে সে এক বিস্ময়কর প্রতিভাকে আবিষ্কার করেছে। সে তাপসকে এনে তুলল তাদের প্রাসাদোপম বাড়িতে। গোপনে তারা বিবাহ করল। শিল্পপতি পিতা রুষ্ট হয়ে তাকে অপমান করল। বিতাড়িত হয়ে সে নিরুদ্দিষ্ট হল। ইন্দ্রাণীরও এতে বিরোধিতা ছিল না। কিন্তু মনে মনে সে আহত। পরে অনেক চেষ্টা করেও তাপসের সন্ধান পাওয়া গেল না। অনেক পরে তাদের পুত্র তাপসের সন্ধান এনে দু-জনের পুনর্মিলন ঘটাল। তখন তারা যৌবনের সীমা পেরিয়ে গেলেও মনের দিক থেকে পরস্পরকে কাছে পেল।

ছবিটি গানের। ছবির কাহিনীকার ভোলানাথ দর্শকদের মুখের দিকে চেয়ে (কাহিনীকার : গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার) কাহিনী রচনা করেছেন। তাই এই কাহিনী অনেকক্ষেত্রে যৌক্তিকতাচ্ছিন্ন এবং ফরমায়েসী ছকে চলেছে। অথবা বোম্বাই ঢংয়ের চাল-চলন, গান ও ঘটনায় মনোরঞ্জনের চেষ্টা করেছে।

ছবিটির প্রধান চরিত্র দু'টিতে অভিনয় করেছেন উত্তমকুমার এবং সুপ্রিয়া দেবী। শিল্পপতি হয়েছেন কমল মিত্র। নবাগত অরূপ বিশ্বাস ইন্দ্রাণী-তাপসের পুত্রের ভূমিকায় অভিনয় করেছে। অন্যান্য চরিত্রে রয়েছেন সুমিতা সান্যাল, গীতা দে, বঙ্কিম ঘোষ, মৃণাল মুখার্জী, রূপক মজুমদার। সঙ্গীত পরিচালনা করেছেন নচিকেতা ঘোষ।

নাটকের কথা

আয়না

সম্প্রতি আয়না গোষ্ঠী মুক্তাঙ্গনে দু'টি নাটক মঞ্চস্থ করলেন। প্রথমটি "গিলহারা ছন্দ"। নাট্যকার জতু বন্দ্যোপাধ্যায়। শম্ভু বন্দ্যোপাধ্যায় (জগাই), চিত্রা মুখোপাধ্যায় (রাঙাদি)-এর অভিনয়ে নাটকীয় মুহূর্ত প্রাণবন্ত। সুভাষ রায় (কার্তিক মুদি) ও হিমাংশু দাশের (গোয়ালা) অভিনয়ে চরিত্রের সুস্পষ্ট রূপায়ণ আনন্দদায়ক। এ ছাড়া দিলীপ বন্দ্যোপাধ্যায়, সতীকান্ত ঘোষ, অজিত সরকার, অমলেন্দু মজুমদার, রঞ্জন মুখোপাধ্যায় সু-অভিনয় করেছেন। দ্বিতীয় নাটকটি জগমোহন মজুমদারের "পাখীর বাসা" বলিষ্ঠ ও বাস্তবধর্মী। মূল চরিত্র রূপায়ণে নির্মল ঘোষ (শেখরনাথ) ও শম্ভু বন্দ্যোপাধ্যায় (মোহন) উল্লেখযোগ্য। সংলাপ প্রকাশের নৈপুণ্য ও চরিত্রানুগ দৃঢ়তা প্রকাশের বৈশিষ্ট্যে নির্মল ঘোষ বিশেষ প্রশংসা পাবার যোগ্য। শম্ভু বন্দ্যোপাধ্যায় সুন্দর পরিস্ফুট করেছেন নাটকীয় বিচ্ছেদ ও সংঘাতের মুহূর্তগুলি। এ ছাড়া সতীকান্ত ঘোষ, অসীম প্রমাণিক শিখা ভট্টাচার্যের অভিনয় প্রশংসনীয়। সর্বশেষ উল্লেখ্য, দলগত অভিনয়দক্ষতা। আলোকসম্পাত সাধারণ।

শ্যামা নৃত্যনাট্য

গত ২১শে জানুয়ারী বাটানগর নিউল্যাণ্ড সরস্বতী পূজামণ্ডপে নিউল্যাণ্ড পূজা কমিটির ব্যবস্থাপনায় রাত্রি ৭টায় নৃত্যবিদ্ নীরেন্দ্রনাথ সেনগুপ্তের পরিচালনায় ভারতীয় নৃত্যকলা মন্দিরের শ্যামা নৃত্যনাট্য, রাবণ বধ নৃত্যনাট্য ও নৃত্যবিচিত্রা মহা সমারোহে অনুষ্ঠিত হয়। শ্যামা নৃত্যনাট্যে উমা দত্ত (শ্যামা), কানাই মজুমদার (বজ্রসেন), সুতপা দত্ত (উত্তীয়), অনুপশঙ্কর (কোটাল) সু-অভিনয় করেন। অন্যান্য ভূমিকায়—কঙ্কণ বসু, ইন্দ্রাণী দাশগুপ্তা, অরুণা দে, ববী ভট্টাচার্য, সুচরিতা ঘোষ, কৃষ্ণা হালদার, শেলী দাস, মানসী ঘোষ ও অরুণিমা সেনের নৃত্যকলার দর্শকবৃন্দ প্রশংসা করেন। সংগীত পরিচালনায় ছিলেন—শ্রীবিপুল ঘোষ। বিপ্লব বক্সী ও শ্রীকুহকিনী চক্রবর্তী শ্যামা নৃত্যনাট্য সংগীতে দর্শকবৃন্দের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন।

হরবোলা

অজয় গঙ্গোপাধ্যায় গোচরণ-এ নিখিল বঙ্গ শিক্ষক শিক্ষণ শিবিরে হরবোলা অনুষ্ঠান করে সকলের প্রশংসা লাভ করেছে। শিবিরাধ্যক্ষ পরিচালিত দুটি নাটকেও এই তরুণ হরবোলা বিভিন্ন ধ্বনি সৃষ্টি করেছে।

স্টুডিও খবর

"কলঙ্কিত নায়ক" ছবির শুভ মহরৎ

গত ২৬শে জানুয়ারী প্রজাতন্ত্র-দিবসে ক্যালকাটা মুভিটোন স্টুডিওতে বেবী জুন প্রোডাকসন্সের পতাকাতলে নির্মীয়মাণ "কলঙ্কিত নায়ক" ছবির শুভ মহরৎ সাড়ম্বরে অনুষ্ঠিত হয়েছে।

ডাঃ বিশ্বনাথ রায় রচিত কাহিনী অবলম্বনে উক্ত ছবিটির পরিচালনার দায়িত্ব নিয়েছেন—চিত্রপরিচালক সলিল দত্ত এবং সুরসৃষ্টির দায়িত্ব অর্পিত হয়েছে সুরকার রবীন চ্যাটার্জীর ওপর।

চিত্র, মঞ্চ ও সংবাদপত্র জগতের বহু বিশিষ্ট ব্যক্তির উপস্থিতিধন্য এই অনুষ্ঠানে ছবির যাত্রা শুরু হয়।

উত্তমকুমার, অপর্ণা সেন ও অঞ্জনা ভৌমিক প্রমুখ শিল্পিবৃন্দ ছবিটির মুখ্য চরিত্রগুলি রূপায়িত করবেন।

নতুন পাতা

গোরা পিকচার্সের 'নতুন পাতা' ছবি বীণা, বসুশ্রী এবং অন্যান্য ছবিঘরে মুক্তি প্রতীক্ষায় রয়েছে। ছবিটি পরিচালনা করেছেন ক্যামেরাম্যান দীনেন গুপ্ত। প্রতিভা বসুর লেখা গল্প অবলম্বনে ছবির চিত্রনাট্য লেখা হয়েছে। এক ষোড়শী বালিকার সমস্যাকে নিয়ে ছবির কাহিনী। ছবিতে অভিনয়াংশে দেখা যাবে নব্যাগতা আরতি গাঙ্গুলীকে

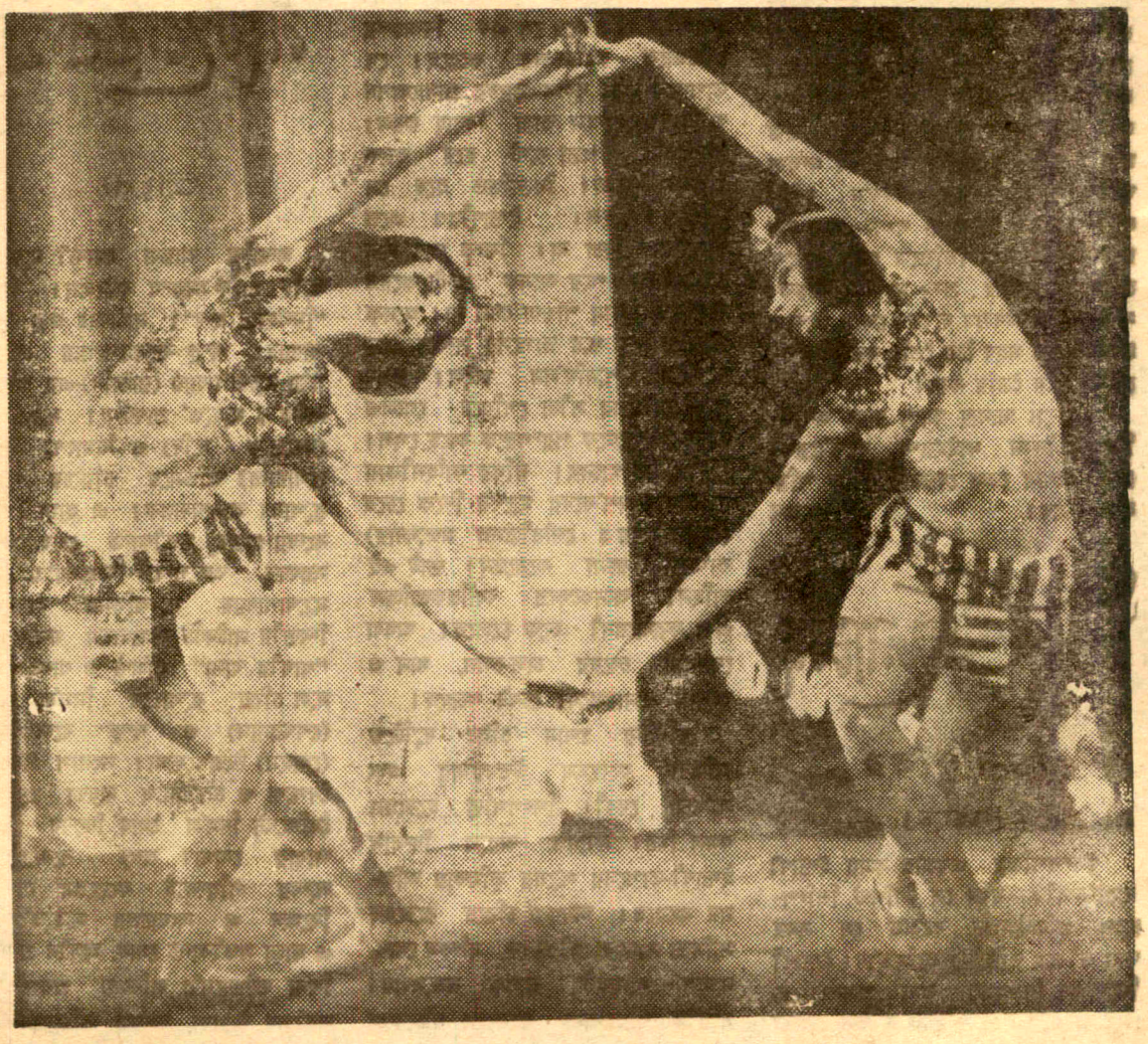

সোভিয়েতের ইয়ং ব্যালে অ্যান্সেম্বল-এর স্প্লাণ্টকাল নৃত্যনাট্যে এন ডানিলোভা ও জেড মামেডোভ

নায়িকার ভূমিকায়। অন্যান্য চরিত্রে কাজল গুপ্ত, শিখা রায়চৌধুরী, শিপ্রা মিত্র, নিনা সেনগুপ্ত, আশা দেবী, গীতা দে, অজিতেশ ব্যানার্জী, সমিত ভঞ্জ, শম্ভু মিত্র, চিন্ময় রায়, উমানাথ ভট্টাচার্য। ছবিতে সঙ্গীতাংশ যোজনা করেছেন বাহাদুর খান। পিয়ালী ফিল্মসের পরিবেশনায় ছবিটি মুক্তি পাবে।

চৈতালী

আর· ডি· বনশালের 'চৈতালী' ছবির চিত্রগ্রহণ চলছে নিউ থিয়েটার্স স্টুডিও এক নম্বরে। এই ছবিতে বিশ্বজিতের সঙ্গে বোম্বাই-এর মনোমোহনও অভিনয় করেছেন। অন্যান্যদের মধ্যে আছেন তরুণকুমার, সুনীলেশ ভট্টাচার্য প্রমুখ। গত ২০শে জানুয়ারী প্রথম চিত্রগ্রহণে ক্ল্যাপস্টিক দেন শ্রীমতী রাণী বনশাল। ছবিটি পরিচালনা করছেন সুধীর মুখার্জী।

'চৈতালী'র নায়িকার ভূমিকায় অভিনয় করছেন তনুজা। শচীন দেববর্মণ সঙ্গীত পরিচালনা করছেন। বোম্বাইতে এই ছবির জন্য লতা মুঙ্গেশকর, মান্না দে, ঊষা মুঙ্গেশকর প্রমুখের গান রেকর্ড করা হয়েছে। কিশোরকুমার, হেমন্তকুমার এবং শচীনদেব বর্মণের গানও ছবিতে থাকবে।

সম্রাট অশোক

সম্রাট অশোকের জীবনকথার চলচ্চিত্রে রূপ দিচ্ছেন সোরাব মোদী। তিনি নামভূমিকায় অভিনয় করছেন।

শুকশারী

বি· কে· প্রোডাকসন্সের 'শুকশারী'র (তারাশঙ্কর রচিত) চিত্রগ্রহণ দ্রুতগতিতে অগ্রসর হচ্ছে। ছবিটি পরিচালনা করছেন সুশীল মজুমদার। প্রধান দু'টি ভূমিকায় অভিনয় করছেন উত্তমকুমার ও অঞ্জনা ভৌমিক। সম্প্রতি জয়নগরে বহির্দৃশ্যের চিত্রগ্রহণ করা হয়েছে।

সংরক্ষণ সমিতির বিরুদ্ধে কলা-কুশলীদের বক্তব্য

গত শুক্রবার নিউ থিয়েটার্স দু' নম্বর স্টুডিওতে এক সাংবাদিক বৈঠকে বাংলা চলচ্চিত্রের কয়েকজন বিশিষ্ট কলা-কুশলী পশ্চিমবঙ্গ চলচ্চিত্র সংরক্ষণ সমিতি আয়োজিত মিছিলে কেন যোগ দেবেন না এবং তাঁরা কেন উক্ত সমিতির সঙ্গে নেই তার কারণ বর্ণনা করেন। তাঁরা বলেন, রবিবার উত্তমকুমারের নেতৃত্বে সংরক্ষণ সমিতির যে মিছিল হবার কথা তাতে তাঁরা যোগ দেবেন না।

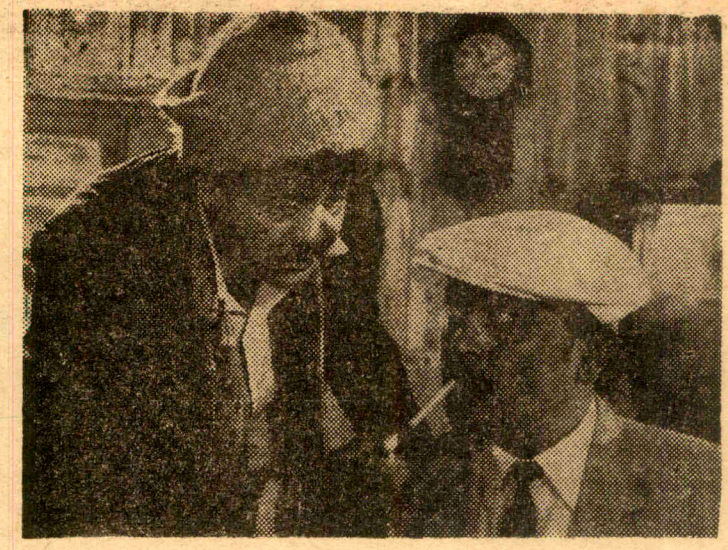

'চিত্রালী' ছবির একটি দৃশ্যে তরুণকুমার ও মনোমোহন

তাঁরা সমিতির কাজে তীব্র সমালোচনা করে বলেন, সমিতি চলচ্চিত্র শিল্পে এক অচল অবস্থা সৃষ্টি করছে এবং বিরোধ বাড়িয়ে বাংলা ছবিকে ক্ষতিগ্রস্ত করছে। প্রারম্ভে লিখিত ভাষণ পাঠ করেন শ্রীবলাই সেন। পরে কলা-কুশলী ও শিল্পিবৃন্দের বক্তব্য পড়ে শোনান শ্রীসৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়।

সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তরে তাঁরা বলেন ঃ সংরক্ষণ সমিতির আন্দোলন শুধুমাত্র চিত্র প্রদর্শকদের বিরুদ্ধে। একই কারণে এই আন্দোলন চিত্র পরিবেশকদের বিরুদ্ধে হওয়া উচিত। কলা-কুশলীদের এতে লাভের কোন আশা নেই। শ্রীসৌমিত্র চট্টোপাধ্যায় বলেন সমিতিতে যোগদানের ব্যাপারে অভিনেতৃ সঙ্ঘের কয়েকটি সর্ত ছিল। প্রধান দুই সর্ত ঃ সমিতি রেজিস্ট্রি করতে হবে, কলা-কুশলীদের ন্যূনতম বেতনের আশ্বাস দিতে হবে। এই দু' বিষয়ে সমিতি নীরব। অভিনেতৃ সঙ্ঘ কেন সমিতিতে নেই এবং কি করে একদল শিল্পী অভিনেতৃ সঙ্ঘ থেকে বেরিয়ে গিয়ে আলাদা সংসদ গঠন করল সে সম্বন্ধে বিস্তারিতভাবে বলেন শ্রীভানু বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীশুভেন্দু চ্যাটার্জী ও শ্রীদিলীপ রায়। শ্রীবিমল মুখোপাধ্যায় সংবাদপত্রে প্রকাশিত সমিতির বক্তব্যগুলি খণ্ডন করে কয়েকটি ঘটনার উল্লেখ করেন। তিনি বলেন, চলচ্চিত্র শিল্পে স্বাধীনভাবে কাজ করা এখন প্রায় অসম্ভব হয়ে উঠেছে। সকল সংস্থা ও সকল শ্রেণীর লোকদের ডেকে চলচ্চিত্র শিল্পের সামগ্রিক উন্নতির জন্যে যদি কোন সংস্থা তৈরি হয় কিম্বা আলোচনা সভা ডাকা হয় তাতে তাঁরা নিশ্চয়ই যোগ দেবেন। শুধু সংরক্ষণ সমিতির কথা মেনে চলতে হবে তার কারণ কি?

সরকারী প্রামাণিক চিত্র নির্মাণ করে যাঁরা অন্ন সংস্থান করেন সংরক্ষণ সমিতির চাপে তাঁরা কি পরিমাণ ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন সে কথা জানান শ্রীমণি অধিকারী ও শ্রীজ্ঞান কুণ্ডু। শ্রীদিলীপ রায় বলেন, সমিতির রেজিস্ট্রেশন চলছে। 'শান্তি' নামক একটি ছবিতে আমি কাজ করেছি। এখন শুনছি যে পরিবেশক ছবিটি নেবেন স্থির করেছিলেন এখন তিনি ছবিটি নিতে অস্বীকার করছেন, কারণ ছবিতে এমন শিল্পী আছেন যাঁরা সংরক্ষণ সমিতি-বিরোধী।

শ্রীসবিতাব্রত দত্ত বলেন, সংরক্ষণ সমিতি যদি এভাবে চলেন তবে বাংলা চলচ্চিত্রের উন্নতি হবে না। যদিও আমি সমিতিতে আছি এবং রবিবারে মিছিলে যাব, তবু আমার মনে সংশয় আছে।

পরিশেষে কলা-কুশলীরা জানান, সত্যজিৎ রায়ের "গুপী গাইন বাঘা বাইন" যাতে জনসাধারণ দেখতে পান সে বিষয়ে তাঁরা সচেষ্ট থাকবেন। এই ছবির 'শো' বন্ধ করার চেষ্টা চলছে। এতে বাংলা ছবির ক্ষতি ছাড়া লাভ কিছু হবে না।

মুক্তিপ্রাপ্ত ছবি

শুক্রবার ৩১শে জানুয়ারী কলকাতায় মুক্তি পেয়েছে ঃ

দুনিয়া (টাইম ফিল্মস)। প্রধান চরিত্রে বৈজয়ন্তীমালা ও দেব আনন্দ। পরিচালনা ঃ টি, রাও।

বিদেশী ছবি ঃ ক্যাপ্রিস ঃ রিচার্ড হ্যারিস ও ডোরিস ডে অভিনীত; গ্লোব। দি অড ক্যুপল—জ্যাক লেমন, ওয়াল্টার ম্যাথু; এলিট।

খেলাধূলা ও পুরস্কার

আজ কাল দেখা যাচ্ছে যে খেলাধূলায় পুরস্কারের দিকে সকলে যেন একটু বেশিই নজর দিচ্ছেন। অর্থাৎ মাঠে-ময়দানে আজকাল সকলেরই ধান্দা এক, লক্ষ্যও একই দিকে। আর ঐ পুরস্কারের দিকে নজর রেখে বর্তমান ক্রীড়াজগতের সমস্ত পরিবেশটাই যেন এগিয়ে চলেছে আপন গতিতে। অন্য কোন দিকে এতটুকুও দৃষ্টি নেই কারো, নেই এতোটুকুও মাথা ব্যথা। সবাই ব্যস্ত যে যার কাজে অর্থাৎ পুরস্কার সংগ্রহের দিকে চোখ রেখে সবাই গুছোচ্ছেন যে যার কাজ। এই পুরস্কার তালিকায় পদ্মশ্রী, পদ্মভূষণ থেকে আরম্ভ করে শীল্ডকাপগুলো পর্যন্ত সবই আছে। আর এই কাজগুলো সারাও হচ্ছে ভারি অদ্ভুতভাবে। ক্লাবগুলো সব আছে ট্রফি আদায়ের ধান্দায়। কি করে ত্রিমুকুট লাভ করা যায়, কি করে আই· এফ· এ শীল্ড, লীগ, রোভার্স কাপ কিম্বা ডুরাণ্ড কাপ লাভ করা যায় এই নিয়ে চিন্তায় ভাবনায় তাঁরা অস্থির। ফলে খেলাধূলার উন্নতির সামান্য বিষয়ের ওপর নজর দেবার মতো অবসর তাঁদের কোথায়? ক্লাবগুলোর এই রোগ সংক্রামিত হয়েছে খেলোয়াড়দের মধ্যে! ফলে তাঁদের মধ্যে থেকে দিনের পর দিন কমে যাচ্ছে আন্তরিকতা। খেলাতে হয় খেলা গোছের খেলে ব্যক্তিগত নৈপুণ্যতার দিকেই ঝোঁকেন বেশি। তাঁদেরই বা দোষ কোথায়? বলা তো যায় না—এতগুলো পুরস্কার ছড়ানো আছে বাজারে। পদ্মশ্রী, পদ্মভূষণের কথা না হয় ছেড়েই দিলাম। কিন্তু এ ছাড়া আছে অর্জুন পুরস্কার, আছে বছরের সেরা খেলোয়াড় হবার সম্ভাবনা—আরো কতো কি! তাই ক্লাবগুলোর মতো খেলোয়াড়রাও ঝোঁকেন সেই দিকেই। হাজার হলেও পুরস্কার বলে কথা—তার ওপর অমন একটা স্বীকৃতির লাভ! সোজা ব্যাপার তো নয়। সুতরাং.....!

সুতরাং খেলাধূলার আসল বিষয় আর উদ্দেশ্যটাই যে অবহেলিত হবে সে কথা না লিখলেও চলে। কারণ সকলেই তো এখন চোখের সামনে তাই দেখছেন। দেখছেন দিনের পর দিন খেলাধূলার মান নেমে যাচ্ছে নিচের দিকে। পুরস্কারের মোহে ডুবতে বসেছে আসল দিকটাই। সত্যিকারের খেলার জন্যে আজকাল খেলা হয় না। আজকালকার খেলা কোন বিশেষ একটা কিছুর জন্যে। আর এই বিশেষ একটা কিছু যে পুরস্কার সে কথা বোধহয় বলে না দিলেও চলবে। ছলে বলে কৌশলে কোন রকমে পুরস্কারটা হাতাবার জন্যে কেউই আর আজকাল এতোটুকুও চিন্তা করেন না। ফলে পুরস্কার সম্বলিত খেলাধূলা এখন পুরোপুরি ব্যর্থতায় পর্যবসিত হচ্ছে। তাই উন্নতি তো হচ্ছেই না—দিনের পর দিন অবনতি ঘটছে খেলাধূলায়। খেলাধূলার জগৎটাই আজকাল যেন কেমন হয়ে গেছে। সেই আগেকার মতো জৌলুসে আগেকার মতো উৎসাহ-উদ্দীপনায় ভরা নয় এখনকার খেলাগুলো! এখনকার সমস্ত উৎসাহ-উদ্দীপনা হলো কোনরকমে খেলায় জয়লাভ করে পুরস্কারলাভের দিকে এগিয়ে যাওয়ায়। সুতরাং যা হবার হচ্ছেও তাই। দিনকে দিন আমরা আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতার ক্ষেত্রে পিছিয়ে পড়ছি। প্রায় সব খেলাতেই আজ আমরা অনেকের চেয়েও পেছনে—তা সে হকি, ক্রিকেট, ফুটবল কিম্বা অন্য কোন বিষয়েই বলুন না কেন। তবে একটা বিষয়ে আমরা সকলের চেয়ে বেশি আগুয়ান। সে হলো ঐ পুরস্কারের মোহ। সে হলো ঐ পুরস্কারলাভের জন্যে অন্ধ প্রতিদ্বন্দ্বিতা। ফলে খেলাধূলার উন্নতির জন্যে কিছুই করা হচ্ছে না। আমরা তাই যেখানে ছিলাম সেখান থেকেও পিছিয়ে পড়েছি আমরা। তবু লজ্জা হয় না আমাদের.....! —শান্তিপ্রিয়।

ক্রিকেটের খবর

এডিলেডের চতুর্থ টেস্ট ম্যাচটা শেষ পর্যন্ত জমে উঠেছিল খুব। ফ্রাঙ্ক ওরেল ট্রফির অনেকখানিই নির্ভর করছিল চতুর্থ টেস্টের ফলাফলের ওপর। বর্তমান মরশুমের টেস্ট লড়াই-এ ২—১ টেস্টে এগিয়ে থেকে অস্ট্রেলিয়ার খেলোয়াড়রা জয়লাভের জন্যে চালিয়েছিলেন আপ্রাণ সংগ্রাম। অন্যদিকে ওয়েস্ট ইণ্ডিজও ছেড়ে কথা কয় নি। তারাও ফ্রাঙ্ক ওরেল ট্রফি ফিরে পাবার জন্যে পাল্লা দিয়েছিল সমানে-সমানে।

॥ সোবার্স ॥

রেডপাথের রান-আউট প্রসঙ্গে গ্রিফথের আচরণ সম্বন্ধে লরীর কাছে ক্ষমা চেয়েছেন ওয়েস্ট ইণ্ডিজের অধিনায়ক।

তবু শেষ পর্যন্ত আর শেষরক্ষা হলো না। মাত্র ২০ রানের জন্যে অস্ট্রেলিয়া যেমন জিততে পারলো না, তেমনি আর মাত্র একজনকে আউট করতে পারলেই ওয়েস্ট ইণ্ডিজ জিতে যেতো এডিলেডের চতুর্থ টেস্ট ম্যাচে। খেলার ফলাফল তাহলে হয়ে যেতো সমান সমান। আর সিডনির পঞ্চম ও শেষ

॥ গ্রিফিথ ॥

আলোচনার শিরোনামায় এসেছেন আবার, কারণ রেডপাথের রান-আউট।

গল্প হলেও সত্যি

১৯২৫ সালের কথা। বিলেতে একটা ম্যাচ খেলার সময় বলটা মেপে দেখা গেলো যে বলের পরিধি ন' ইঞ্চিরও কম। এর পর শুরু হলো বিভিন্ন খেলায় বল মাপা। কিন্তু দেখা গেলো যে বেশির ভাগ বলই ছোট।

এম· সি· সি কর্তৃপক্ষ তখন ভাবলেন যে বলের পরিধি সওয়া ন' ইঞ্চি হওয়া উচিত। তাই বল মেপে দেওয়ার জন্যে তাঁরা একটা ফ্রেম বানাতে চাইলেন। বোলাররা দেখলেন, মহা মুশকিল। এই ছোট বলেই যখন ব্যাটসম্যানরা দুম-দুড়াক্কা পিটোচ্ছেন, হাঁকাচ্ছেন সেঞ্চুরীর পর সেঞ্চুরী, তখন বল যদি আরো বড় করা হয় তাহ'লে আর দেখতে হবে না। ব্যাটস-ম্যানদের খুব সুবিধে হয়ে যাবে। বোলারদের পক্ষে তাঁদের আউট করা তখন আরো কঠিন হয়ে যাবে

তাই বল বড় করার সংবাদ শুনে বোলাররা সব হা-হা করে উঠলেন। শেষ পর্যন্ত বোলারদের দিকে তাকিয়ে এম· সি· সি কর্তৃপক্ষ আর আপত্তি করলেন না। বোলারদের কথাই মেনে নিলেন। বলের মাপ রইলো ন' ইঞ্চি।

ঠিক হলো যে ক্রিকেট ম্যাচ খেলার বলের ওজন ৫½ আউন্সের কম ও ৫¾ আউন্সের বেশি করা চলবে না আর পরিধিতে ৮¾ ইঞ্চির কম ও ৯ ইঞ্চির বেশি হবে না।

টেস্ট ম্যাচকে কেন্দ্র করে জমে উঠতে টেস্ট লড়াই-এর আসর।

চতুর্থ টেস্টের প্রথম দিকে কিন্তু ওয়েস্ট ইণ্ডিজের হাল হয়েছিল বড়ই শোচনীয়। প্রথমে ব্যাটিং করার সুযোগ পেয়ে ওয়েস্ট ইণ্ডিজ কুড়িয়ে-বাড়িয়ে করতে পারলো মাত্র ২৭৬ রান। এর মধ্যে ওয়েস্ট ইণ্ডিজের অধিনায়ক সোবার্স একাই করেছিলেন ১১০ রান। অর্থাৎ সোবার্স ছাড়া ওয়েস্ট ইণ্ডিজের বাকী ৯ জন খেলোয়াড় যোগ করেছিলেন মাত্র ১৬৬ রান। এর মধ্যে ছিলো বুচারের ৫২ আর কেন্দ্রর ৩৬ রান। আর বোলিং-এ অস্ট্রেলিয়ার ফ্রিম্যান পেয়ে-ছিলেন ৫২ রানে ৪টি ও গিলসন ৯১ রানের বিনিময়ে ৩টি উইকেট।

এডিলেডের রানে ভরা পিচে যে ওয়েস্ট ইণ্ডিজের ব্যাটসম্যানরা একটুও খেলতে পারেন নি তার প্রমাণ পাওয়া গেলো অস্ট্রেলিয়ার ইনিংসের সময়েই। ডগ ওয়ালটারস করলেন সেঞ্চুরী। আর

॥ লরী ॥

ফ্রাঙ্ক ওরেল ট্রফি এবারও রাখতে পেরেছেন অস্ট্রেলিয়ার হাতেই। বাকী আছে সিডনির পঞ্চম টেস্ট। কিন্তু অস্ট্রেলিয়া এখনো ২—১ টেস্টে এগিয়ে আছে।

বাকী সব খেলোয়াড়দের প্রত্যেকেই কিছু না কিছু রান করায় অস্ট্রেলিয়ার ইনিংস শেষ হলো ৫৩৩ রানের মাথায়। এর

মধ্যে ওয়ালটারস করেছিলেন ১১০ রান, স্টাকপোল ৬২, বোলিং-এ ল্যান্স গিবস ৪৫ রানের বিনিময়ে পেয়েছিলেন ৪টি উইকেট।

অস্ট্রেলিয়ার ইনিংস শেষে সকলেরই এমন ধারণা হয়েছিল যে চতুর্থ টেস্টে ওয়েস্ট ইণ্ডিজ নির্ঘাত হারবে। ২৫৭ রানে এগিয়ে আছে অস্ট্রেলিয়া। অর্থাৎ ঐ ২৫৭ রান করতে পারলেই ওয়েস্ট ইণ্ডিজ রেহাই পাবে ইনিংসে পরাজয়ের হাত থেকে।

কিন্তু খেলার মোড় ঘুরতে খুব একটা বেশি দেরি হলো না। অল্প সময়ের মধ্যেই পাল্টে গেলো খেলার ধারা। রানের বন্যা বইতে শুরু করলো মাঠে। অনেকদিন বাদে ওয়েস্ট ইণ্ডিজের ব্যাটস-ম্যানরা যেন ফিরে পেয়েছিলেন নিজেদের। মেরে খেলে প্রত্যেকেই রান তুলতে লাগলেন তাড়াতাড়ি!

বুচার করলেন ১১৮, কেরু করলেন ৯০, কানহাই ৮০, সোবার্স ৫২, হল-ফোর্ড ৮০ রান। আর সকলেও করলেন মোটামুটি একটা ভদ্রগোছের রান। নবম উইকেটে হলফোর্ড আর হেনড্রিকস ১২২ রান যোগ করে খেলার ধারা দিলেন পাল্টে।

খেলার শেষ দিন সকালে ৬১৬ রানে শেষ হয়ে গেলো ওয়েস্ট ইণ্ডিজের ইনিংস। অস্ট্রেলিয়ার বোলারদের মধ্যে কনোলী লাভ করেছিলেন সব থেকে বেশি সাফল্য। ১২২ রান দিয়ে তিনি পেয়েছিলেন ৫টা উইকেট, আর ম্যাকেঞ্জ ৩টি উইকেট লাভ করেছিলেন ৯০ রানের বিনিময়ে।

৩৪৪ মিনিটে ৩৬০ রান করলে জিতবে এমন অবস্থায় খেলা শুরু করেও অস্ট্রেলিয়া ছাড়ে নি জয়লাভের সুযোগ নিতে। আর সে লক্ষ্যে তারা প্রায় পৌঁছে গিয়েছিল। কিন্তু শেষ পর্যন্ত মাত্র ২১ রানের জন্যে জিততে পারলো না তারা সময়ের অভাবে। অবশ্য হারতেও পারতো। কারণ হাতে তাদের ছিলো মাত্র একটা উইকেট। তাড়াতাড়ি রান করতে যাওয়ায় ওদিকে অবশ্য অস্ট্রে-লিয়ার চারজন ব্যাটসম্যান রান-আউট হয়ে গিয়েছিলেন।

অস্ট্রেলিয়ার ব্যাটসম্যানদের মধ্যে লরী করেছিলেন ৮৯, চ্যাপেল ৯৬ আর স্টাকপোল ও ওয়ালটারস ৫০ রান করে। রান-আউট হয়ে গিয়েছিলেন রেডপাথ, ওয়ালটারস, ফ্রিম্যান ও জারম্যান। বোলিং-এ গিবস ৭৯ রানে ৩টি ও গ্রিফিথ ৭৩ রানে ২টি উইকেট লাভ করেন।

তাই চতুর্থ টেস্ট শেষ হলো অমীমাংসিতভাবে। আগেকার তিনটি টেস্টের প্রথমটিতে ওয়েস্ট ইণ্ডিজ আর বাকী দু'টিতে জিতেছে অস্ট্রেলিয়া। তাই

॥ সুব্রত গুহ ॥

বাংলা তথা ভারতের পেস বোলার সুব্রত শুধু আর বোলিং-এই নয় ব্যাটিং-এও দিচ্ছেন অভাবনীয় নৈপুণ্যের পরিচয়।

শেষ টেস্টে ওয়েস্ট ইণ্ডিজ যদি জেতে তাহলেও ফ্রাঙ্ক ওরেল ট্রফি থেকে যাবে অস্ট্রেলিয়ার হাতে। তাই বলা যায় যে ফ্রাঙ্ক ওরেল ট্রফির ভাগ্য মোটামুটি নির্ধারিত হয়ে গেছে। বাকী শুধু সিডনির পঞ্চম টেস্ট ম্যাচ। সব দিক দেখে মনে হয় যে শেষ টেস্ট ম্যাচ জমবে খুব। দেখ যাক শেষ পর্যন্ত কি হয়.....!

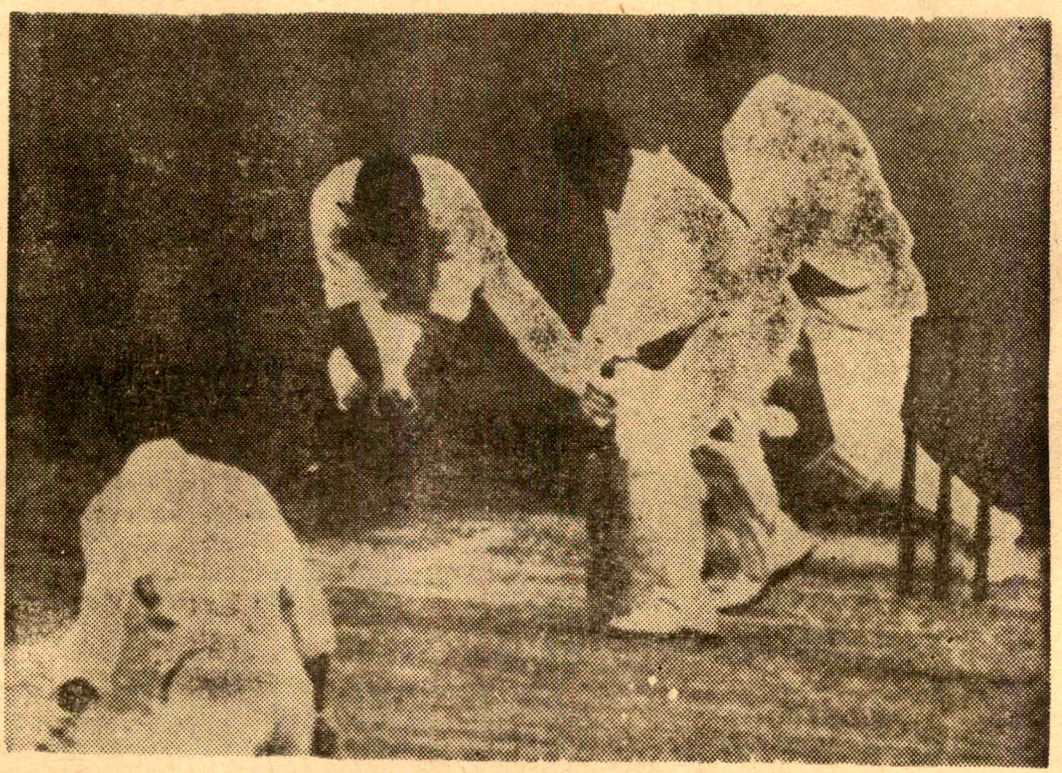

অস্ট্রেলিয়া বনাম ওয়েস্ট ইণ্ডিজের চতুর্থ টেস্টে বুচার দিয়েছেন ব্যাটিং-এ নৈ[illegible] পরিচয়। ছবিতে গিলস্ বলে বুচার ক্যাচ তুললে স্লিপে চ্যাপেলকে দেখা যাচ্ছে সেই ক্যাচ ধরে ফেলতে।

সমাচারদর্পণ

পাকিস্তানে অনুষ্ঠিত আন্তর্জাতিক হকি প্রতিযোগিতায় ভারতীয় হকি দল যোগদান করবে। মার্চ মাসের ৮ তারিখ থেকে ১৬ তারিখ পর্যন্ত ভারতীয় দল পাকিস্তানে খেলবে। জানা গেছে যে পাকিস্তান দল পাল্টা ভারত সফরেও আসবে।

॥ বোরদে ॥

ভারতের খ্যাতনামা ক্রিকেটার বোরদে এবারের প্রজাতন্ত্র দিবসে রাষ্ট্রপতির কাছ থেকে পেয়েছেন পদ্মশ্রী খেতাব। গত বছর ভারতীয় দলের অস্ট্রেলিয়া ও নিউজিল্যাণ্ড সফরে বোরদে ছিলেন ভারতের সহ-অধিনায়ক।

এই বছরের শেষ দিকে অস্ট্রেলিয়া আসছে ভারত সফরে। ভারতের বিরুদ্ধে তারা খেলবে পাঁচটা টেস্ট ম্যাচ। ভারত সফর শেষে অস্ট্রেলিয়া যাবে সাউথ আফ্রিকা ভ্রমণে। আর অস্ট্রেলিয়া ভারত ভ্রমণের কিছুদিন পরেই নিউজিল্যাণ্ড দল আসবে ভারত সফরে। তাই মনে হয় ১৯৬৯-৭০ সালের ক্রিকেট মরশুমটা জমবে খুব।

পাকিস্তানে এখন যে-রেটে গোলমাল হচ্ছে তাতে এম-সি-সি দলের খেলোয়াড়রা পাকিস্তান ভ্রমণে ঠিক যেন উৎসাহ পাচ্ছেন না। ফেব্রুয়ারী মাসের প্রথম সপ্তাহে ঢাকায় প্রথম টেস্ট ম্যাচ আরম্ভ হবার কথা ছিল। কিন্তু শেষ পর্যন্ত কি হবে কে জানে.....।

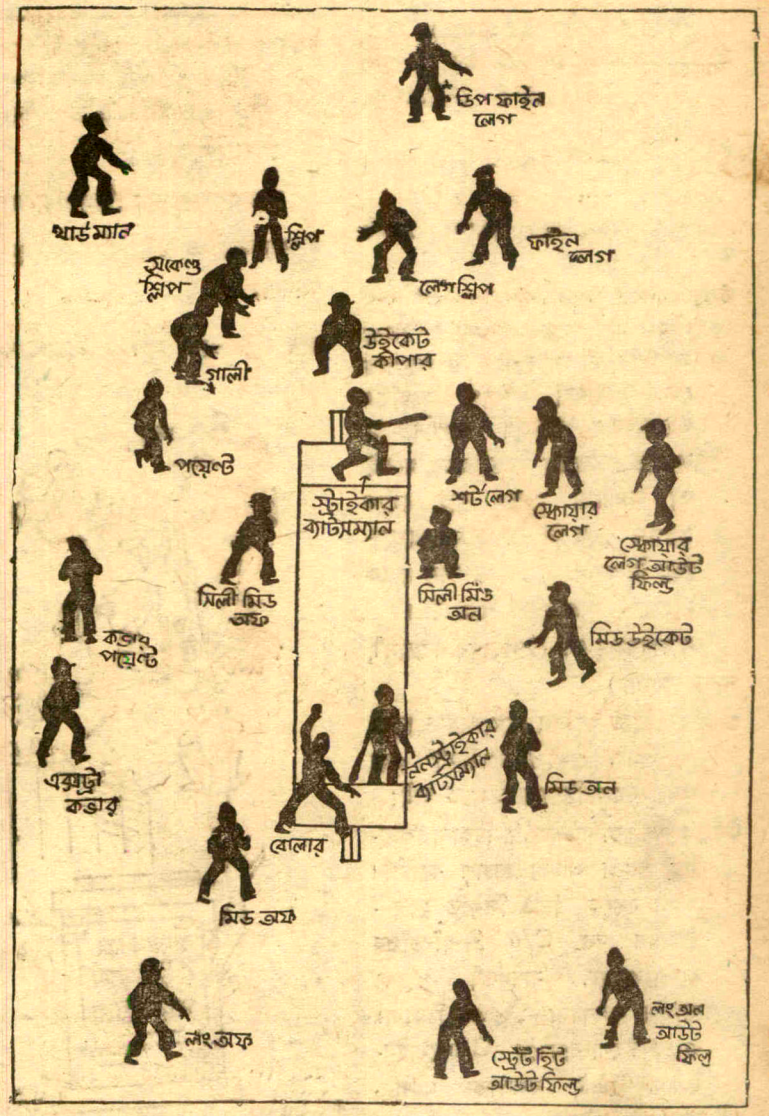

ক্রিকেটমাঠে কে কোথায় দাঁড়ায়—বিষয়টি খুবই গোলমেলে আর সবার ধারণাও এই বিষয়ে স্পষ্ট নয়। কোনটা সিলি মিড অফ কিম্বা সিলি মিড অন, মিড উইকেট, কভার পয়েণ্ট, এক্সট্রা কভার কিম্বা পয়েণ্ট—এই জায়গাগুলো না চিনলে ক্রিকেট খেলা যেমন অসম্ভব তেমনি ক্রিকেট রীলে শুনতেও ভালো লাগবে না। অনেকদিন ধরে আমাদের অনেক পাঠক-পাঠিকা এই বিষয়টির ওপর প্রশ্ন করছেন। কিন্তু স্থানাভাব হেতু প্রশ্ন-উত্তরের পাতায় ছবি দিয়ে মাঠে কে কোথায় দাঁড়ায় বিষয়টি বোঝানো সম্ভব নয়। তাই আলাদাভাবে ছবির সাহায্যে বিষয়টি বুঝিয়ে দেওয়া হলো।

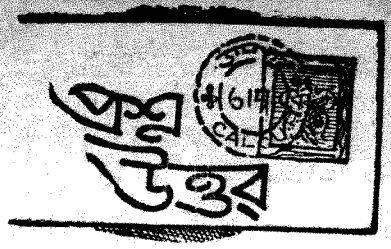

পরিতোষ নাগ (বেলাকোবা, জলপাইগুড়ি)

প্রশ্ন : স্কোয়ারজ, আর্থার মেইলী ও ডগলাস রাইটের বোলিং এ্যাভারেজ জানতে চাই।

উত্তর : স্কোয়ারজ সম্বন্ধে জানি না বিশেষ কিছু।

টেস্ট	রান	উইকেট	এ্যাভারেজ
আর্থার মেইলী—২১	৩৩৫৮	৯৯	৩৩·৯১
ডি রাইট —৩৪	৪২২৪	১০৮	৩৯·১১

নরেন রায় (শিবপুর হাওড়া)

প্রশ্ন : কলকাতার দ্বিতীয় সেতু তো হবে হবে হচ্ছে। কিন্তু স্টেডিয়ামের খবর কি?

উত্তর : অথৈ জলে! অবশ্য ক্ষতি নেই। কারণ.....

জীতেশরঞ্জন দত্ত (লংকা, নওগাঁ, আসাম)

উত্তর : 'গল্প হলেও সত্যি' ও 'ফুটবলের মান কোন্ পথে' এই দুটি লেখা আপনার ভালো লাগছে ও লেগেছে জেনে আমরা খুশি হয়েছি। উইম্বেলডন সম্বন্ধে আপনি যা জানতে চেয়েছেন কিছুদিনের মধ্যেই তা জানানো হবে। যাই হোক ১৮৭৭ সালে উইম্বেলডনের পুরুষদের সিঙ্গলস ও ১৮৮৪ সাল থেকে মহিলা সিঙ্গল খেলা শুরু হয়।

সুভাষরঞ্জন দত্ত (ট্রাংগুলোর কলোনী, পান্ডু, আসাম)

প্রশ্ন : প্রখ্যাত ফুটবল খেলোয়াড় চুনী গোস্বামী, প্রদীপ ব্যানার্জী এবং অমল দত্তর ঠিকানা জানতে চাই।

উত্তর : পি. কে. ব্যানার্জীর ঠিকানা কিছুদিন আগে আমরা প্রকাশ করেছি। অমল দত্তকে চিঠি লিখতে হলে—শ্রীঅমল দত্ত C/o শ্রীশান্তিপ্রিয় বন্দ্যোপাধ্যায়, বসুমতী পত্রিকা অফিস, কলকাতা—১২ এই ঠিকানায় ও চুনী গোস্বামীকে C/o মোহনবাগান টেন্ট, কলকাতা ময়দান, কলকাতা, এই ঠিকানায় চিঠি লিখতে পারেন।

হীরেন্দ্রমোহন ভদ্র (সুভাষপল্লী, শিলিগুড়ি)

উত্তর : আশা করি ব্যারিংটন সম্বন্ধে আপনি সব কিছু জানতে পেরেছেন আমাদের পরিচীয়তে বিভাগের লেখা থেকে।

কাজলকুমার পান (দিগপাড়া, বাঁকুড়া) ও **শ্যামলকান্তি ভট্টাচার্য** (হালতু ২৪ পরগনা)

প্রশ্ন : রোভার্স কাপ ও ডুরান্ড কাপের খেলা কোন্ সাল থেকে আরম্ভ হয়?

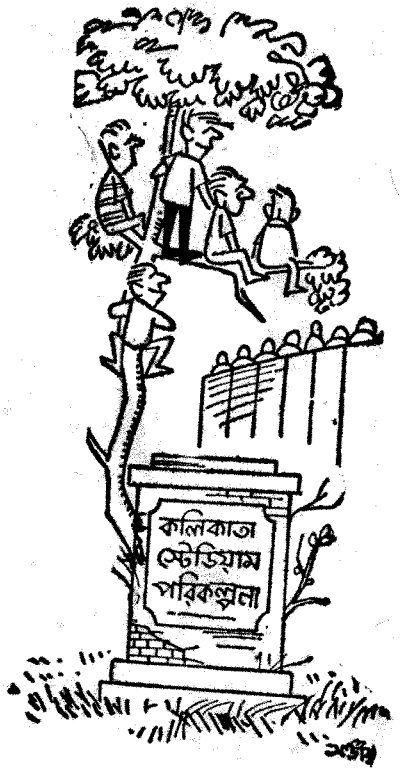

উত্তর : রোভার্স কাপ ১৮৯১ ও ডুরান্ড কাপের খেলা ১৮৮৮ সাল থেকে আরম্ভ হয়।

মনোজকুমার দাশ (নামবাড়ি রেল ওয়ে কলোনী, গৌহাটি, আসাম)

প্রশ্ন : টেস্ট খেলায় দ্রুততম সেঞ্চুরী কে করেছেন? কতো মিনিটে?

উত্তর : সারে বনাম নর্দামটনশায়ার দলের (১৯২০ সালের) একটি খেলায় সারের জি এইচ ফেনডার ৩৫ মিনিটে শতরান পূর্ণ করেছিলেন।

এ ছাড়া 'গল্প হলেও সত্যি' বিভাগে ব্রাডম্যানের সেঞ্চুরীর কথা লেখা হয়েছে দ্রুততম সেঞ্চুরীর বিষয়ে। আশা করি আপনি তা দেখেছেন।

সত্যগোপাল ঘোষ (জামালপুর, বৈদ্যপাড়া, বিহার)

প্রশ্ন : কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে খেলাধুলো বিষয়ে যাঁরা রু হন তাঁদের কি কি যোগ্যতা থাকা বাঞ্ছনীয়? আর শিক্ষাগত যোগ্যতা তাঁদের কতোটা থাকা উচিত?

উত্তর : কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে ফুটবল, ক্রিকেট, হকি প্রভৃতি দলের খেলোয়াড়রাই বিশ্ববিদ্যালয় রু পান। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে যে কোন কলেজের ছাত্ররাই এই রু পাবার যোগ্য।

পরিতোষ নাগ (বেলাকোবা, জলপাইগুড়ি)

উত্তর : কাউপার যে কেন খেলছেন না ঠিক জানি না। হয় তো অসুস্থ, না হয় তো লেগেছে-টেগেছে। খেলাধুলো শেখার বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আলোচনা করার ইচ্ছে আছে।

রণজিৎকুমার সিংহ (গোদাপিয়াশাল, মেদিনীপুর)

উত্তর : আপনি যাঁদের ব্যাটিং এ্যাভারেজ জানতে চেয়েছেন তাঁদের মধ্যে দুজন এখন খেলছেন ফ্রাঙ্ক ওরেল ট্রফির টেস্ট লড়াই-এ তাই ঐ টেস্ট মরশুম শেষ হবার পর আপনার প্রশ্নের উত্তর দেওয়া হবে।

সম্পাদিকা—জয়ন্তী সেন
বসুমতী (প্রাঃ) লিঃ-এর পক্ষে ১৬৬, বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী স্ট্রীটস্থ কলিকাতা-১২
বসুমতী প্রেস হইতে শ্রীসুকুমার গুহমজুমদার কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

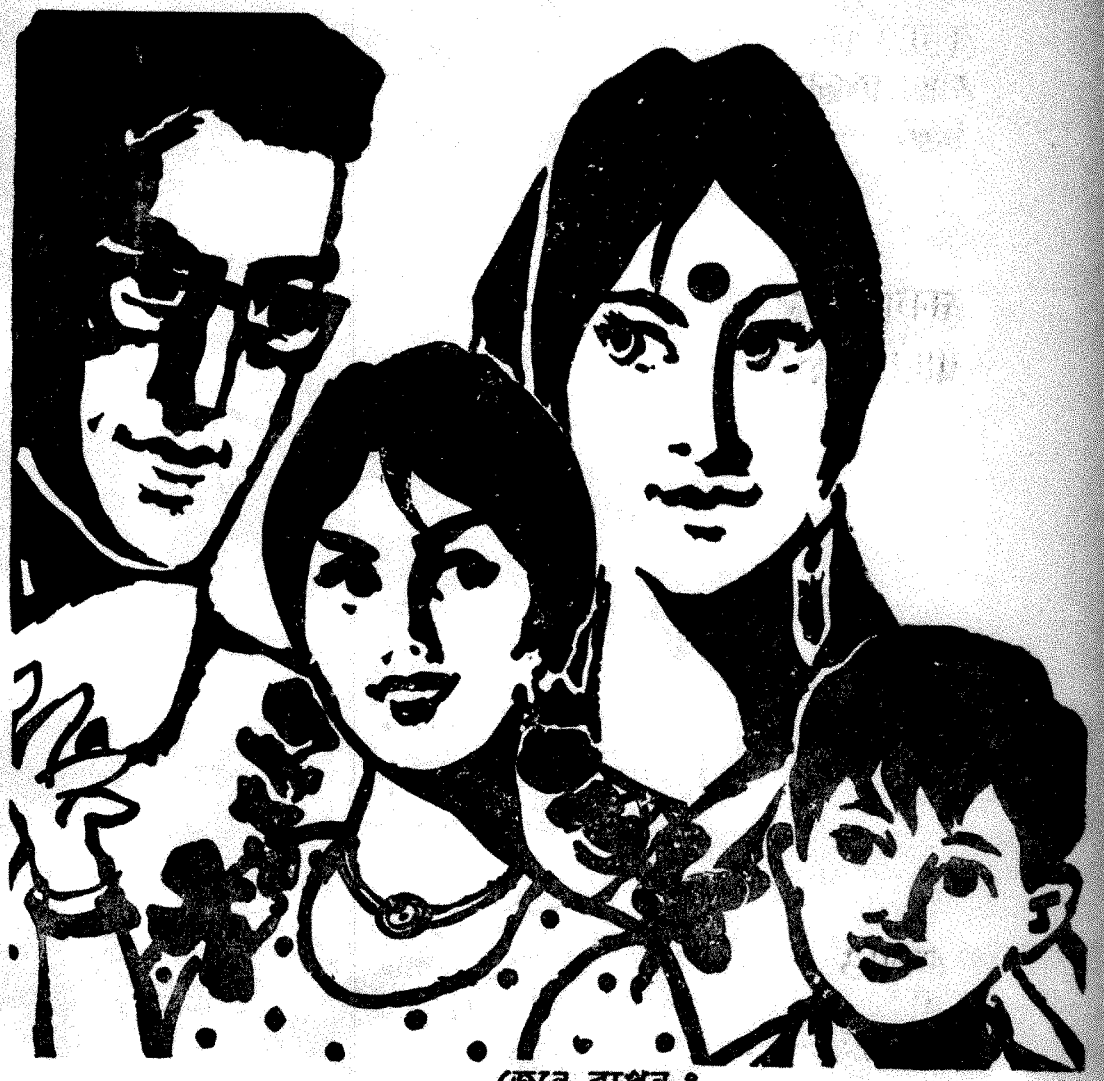

দুইটি বা তিনটি সন্তানের পরিবারই আদর্শ পরিবার

জেনে রাখুন :

- পরিবারকল্যাণই পরিবার পরিকল্পনা
- যে কোন পরিবার পরিকল্পনাকেন্দ্রেই বিনামূল্যে নিরোধ এবং যাবতীয় পরামর্শ পাওয়া যায়
- হিন্দুস্থান লিভারে উৎপাদিত প্রত্যাশি এর সব দোকানে যেখানে নিরোধ বিক্রী হয় সেই সব দোকানে মাত্র ১৫ পয়সায় তিনটি করে নিরোধ কিনতে পাওয়া যায়
- তিনটি সন্তান না হওয়া পর্যন্ত নিরোধ ব্যবহার করে দুই সন্তানের জন্মের মধ্যবর্তী সময়ের ব্যবধান বাড়ান সম্ভব
- তিনটি সন্তানলাভের পর স্থায়ীভাবে জন্মনিরোধের জন্যে অস্ত্রোপচারই শ্রেষ্ঠ পদ্ধতি

আজই আপনার নিকটবর্তী যে কোন পরিবার পরিকল্পনাকেন্দ্র বা স্বাস্থ্যকেন্দ্রে যোগাযোগ করে বিনামূল্যে অভিজ্ঞ চিকিৎসকের পরামর্শ নিন।

(পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পরিবার পরিকল্পনা সংস্থা কর্তৃক প্রচারিত)

Thursday, 6th February, 1969 SAPTAHIK BASUMATI Regd. No. C 71
Price : 30 Paise Gram : "Basumati" Phone : 34-7771, 72, 73, 74

7 FEB 1969

বিভিন্ন রুচিবৈচিত্র্য লোনাস:

কোথাও কাঁচা বাটা মশলা চলে →

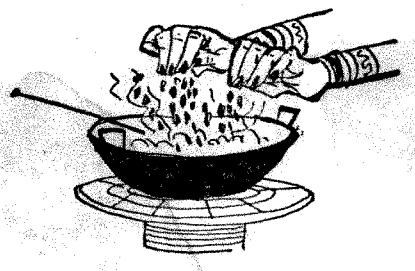

কোথাও চলে বাটা মশলা →

কোথাও অতিরিক্ত →

কোথাও বা নামমাত্র →

কিন্তু সবার রুচিকেই কুকমী পরিতৃপ্ত করে !

গ্রাম : 'স্পাইসমার্ট'

ফিল্ম—কাশীপুর

শিশুর খাদ্যে ও রুগীর পথ্যে নির্ভয়ে ব্যবহৃত হয়

'কুকমী'—সর্বাধিক বিক্রীত গুঁড়ো মশলা

পনের লক্ষ প্যাকেট মাসিক বিক্রয়

১২০ বৎসরের অধিক প্রাচীন ও বর্তমানে মশলার বৃহত্তম প্রতিষ্ঠান

কৃষ্ণচন্দ্র দত্ত (স্পাইস) প্রাঃ লিঃ

২৩৫ নং মহর্ষি দেবেন্দ্র রোড, পোস্তা, কলিকাতা-৭

সাপ্তাহিক
বসুমতী

পাকিস্তানে জরুরী অবস্থা প্রত্যাহারের সম্ভাবনা ঃ গণবিক্ষোভের চাপে আয়ুবের নতি স্বীকার

বর্ষ ঃ ৩৪শ সংখ্যা, বৃহস্পতিবার, ১লা ফাল্গুন, ১৩৭৫ বঙ্গাব্দ] OLDEST WEEKLY OF NORTH INDIA [73 year, No. 34, 13th Feb. 1969

সূচীপত্র

বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা
সম্পাদকীয়		২১১৫
আজকের মানুষ		২১১৬
রবীন্দ্রনাথ ও সুভাষচন্দ্র (ধারাবাহিক প্রবন্ধ)	— শঙ্করীপ্রসাদ বসু	২১১৭
বঙ্গদর্শন		২১২৫
গ্রাম-গ্রামান্তরে	— সমর চট্টোপাধ্যায়	২১২৯
ভারতদর্শন		২১৩০
আন্তর্জাতিক		২১৩২
কথায় কথায়	— নিবারণ মুন্সী	২১৩৫
গ্রন্থমেলা		২১৩৭
সপ্তাহের বোঝা	— কৃত্তিবাস ওঝা	২১৪০
প্রেম ও অপ্রেমের কবি সঞ্জয় ভট্টাচার্য (প্রবন্ধ)	— বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়	২১৪২
ছোড়দাকে বাঁচাতে হবে (কবিতা)	— সুশীলকুমার গুপ্ত	২১৪৪
আসুন নিয়ে খেলা (গল্প)	— রবীন্দ্র গুহ	২১৪৫

যে কোন
গয়না
আর
আসল
গ্রহরত্ন
কেনার
দক্ষিণ কোলকাতায়
নামকরা প্রতিষ্ঠান

ফোন : ৪৬-৬২৫৮

সন অ্যাণ্ড ব্র্যাণ্ডসন্স অব লেট
এস. বি. সরকার

সূচীপত্র

বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা
ইয়োরোপা	হিরণ্ময় ভট্টাচার্য	২১৫০
বিংশ শতাব্দীর মার্কিন সাহিত্য	শমীক বন্দ্যোপাধ্যায়	২১৫২
নীল কমল, লাল কমল (কবিতা)	রাণী দেবী	২১৫৪
শব্দ ওঠে না (কবিতা)	সত্যানন্দ মণ্ডল	২১৫৪
সর্বাত্মক গণতান্ত্রিক সংগ্রামের পথে পাকিস্তান	...	২১৫৫
পথ কে রুখবে? (ধারাবাহিক উপন্যাস)	মনোজ বসু	২১৫৭
লোকসঙ্গীতের একাল না আকাল?	মুরশিদ	২১৬০
পাঠকমন	...	২১৬৩
রূপমঞ্চ ওদেশে এবং এদেশে	শিলালি	২১৬৫
রূপজগৎ	...	২১৬৭
খেলাধূলা	শান্তিপ্রিয়	২১৭২

—সদ্য প্রকাশিত হইয়াছে!!—

বহুকাল পরে পুনর্মুদ্রণ

"নবীনবাবু বর্ণনা এবং গীতিতে একপ্রকার মন্ত্রসিদ্ধ।..... এই সকল বিষয়ে তাঁহার লিপিপ্রণালীর সঙ্গে বায়রনের লিপি-প্রণালীর বিশেষ সাদৃশ্য দেখা যায়।..... বায়রনের ন্যায় নবীনবাবু বর্ণনায় অত্যন্ত ক্ষমতাশালী।..... নবীনবাবুর যখন স্বদেশ-বাৎসল্য স্রোতঃ উচ্ছলিত হয়, তখন তিনিও রাখিয়া ঢাকিয়া বলিতে জানেন না।"—বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।

মহাকাব

নবীনচন্দ্র সেনের গ্রন্থাবলী

রৈবতক কাব্য ॥ কুরুক্ষেত্র প্রভাস

গ্রন্থের পৃষ্ঠা সংখ্যা ৩০৮।

মূল্য মাত্র সাত টাকা।

বসুমতী প্রাইভেট লিমিটেড: ১৬৬, বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী ষ্ট্রীট, কলিকাতা—১২

৫৩ বর্ষ : ৩৪শ সংখ্যা—মূল্য : ৩০ পয়সা বাংলা ভাষায় দ্বিতীয় সর্বাধিক প্রচারিত সাপ্তাহিক পত্রিকা PRICE : 30 Paise
বৃহস্পতিবার, ১লা ফাল্গুন, ১৩৭৫ বঙ্গাব্দ Thursday, 13th February, 1969

বিজয়ী ও বিজিত

অন্তর্বর্তী নির্বাচনের ভোটপর্ব সমাপ্ত হয়েছে। এবং তা প্রায় নির্বিঘ্নভাবেই। এখনো পর্যন্ত ভোটপত্র গণনা চলছে। আগামীকাল ভোটপত্র গণনার কাজ সম্পন্ন হবে। দীর্ঘকাল ধরে যে উদগ্র কৌতূহল অপেক্ষা করছিল, এবার তার অবসান হবে বলে আশা করি। নির্বাচনের মাধ্যমে বিজয়লক্ষ্মী যে দলের প্রতি প্রসন্ন হোক না কেন, বিজয়গর্বে তিনি ও সেই দল আত্মহারা হবে না। কারণ জনসাধারণ এবার অত্যন্ত ধীর-মস্তকে তাঁদের ভোটপত্র প্রদান করেছে দীর্ঘদিনের যন্ত্রণা থেকে মুক্তি পাবার জন্য তারা মনোমত সরকার বেছে নিতে চেয়েছে। তাই বিজয়ী দলের কর্তব্য হবে, জনসাধারণের আশা-আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ করার জন্য সমগ্র শক্তি নিয়োগ করা এবং দলীয় কোন্দলে এক মুহূর্তও অপব্যয় না করা। ঐ দলের অন্যতম কর্তব্য হবে বিজিত দলের বিরুদ্ধে কোনোরকম বিরূপ মনোভাব পোষণ না করা। কারো পক্ষে এমন মনোভাব পোষণ করা উচিত নয় বে, তারাই অপরিহার্য। জনসাধারণের শক্তিই সব। যে দল দু'দিন পরে জনসাধারণের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করবে—সে দলকে জনসাধারণই চিরকালের মতো অপসৃত করে দেবে। হয়তো আমাদের দুর্ভাগ্যের জন্য এখনো পর্যন্ত অর্থলোভ দেখিয়ে সাম্প্রদায়িকতা বা প্রাদেশিকতা প্রচার করে ভোটে জেতা এদেশে সম্ভব হয়। কারণ স্বার্থপর এক শ্রেণীর লেখাপড়া জানা মানুষও এখনো নিরক্ষর এবং অশিক্ষিতদের ভোট বিপথে চালিত করে। কিন্তু ক্রমাগত নিরক্ষর এবং অশিক্ষিতরা-ও বিভিন্ন দলের প্রচারের ফলে সচেতন হয়ে উঠছে। স্বভাবতই এমন দিন আসবে, যখন এই সব সরল মানুষগুলির ভোট তখন আর বিপথে চালিত করা সম্ভব হবে না। আর তখনি এদেশে সত্যিকারের গণতন্ত্রের ভিত প্রতিষ্ঠিত হবে। সংসদীয় গণতন্ত্রও সেদিন সাফল্যে উজ্জীবিত হবে বলে মনে করি। সেই দিনই দেখা যাবে, নির্বাচনের পূর্বে বিভিন্ন দল পরস্পর পড়াই' সুরু করলেও বিজিত দল বিজয়ী দলকে অভিনন্দন জ্ঞাপন করছে আর বিজিত দলকে বিরোধী দল রূপে যথার্থ মূল্য গভীর মর্যাদার সঙ্গেই দান করছে। বলা বাহুল্য, এদেশে এখনো পর্যন্ত এসব স্বপ্ন। এদেশে কে কাকে উৎখাত করবে সেটাই প্রাধান্য পায় এবং রাজনৈতিক প্রধান পাণ্ডারাই উৎখাতের কথা সগর্বে ঘোষণা করে। তখনো কিন্তু গণতন্ত্রের কথাও সাড়ম্বরে ঘোষণা করা হয়। বস্তুত শাসনতন্ত্রের প্রতি শ্রদ্ধার অভাবেই এ সব ঘটনার পুনরাবৃত্তি হতে বিলম্ব হয় না। অন্যত্র যেখানে শ্রদ্ধার অভাব, তা হচ্ছে জনগণের কাছে (ভোটের সময় যাদের কাছে করজোড়ে ভোটভিক্ষা করতে হয়)।

আমরা সবিনয়ে বিভিন্ন দলের প্রতি অনুরোধ জানাই, ভোটের সামগ্রিক ফলাফল আপনারা এমন শান্ত ও সংযত চিত্তে গ্রহণ করুন যদ্দ্বারা খেটে খাওয়া সাধারণ মানুষগুলিকে অকারণে আর বিব্রত হতে না হয়। গতবার জনসাধারণের রায়দানের পর মন্ত্রিত্বের লোভে তাদের প্রতি কিছু নির্বাচিত নেতা যেভাবে বিশ্বাসঘাতকতা করেছিল, আশা করি, এবার তার পুনরাবৃত্তি হবে না। ঐ বিশ্বাসঘাতকতার ফলে অন্তর্বর্তী নির্বাচনের ব্যবস্থা হয়েছিল এবং তার ব্যয় জনসাধারণকেই বহন করতে হয়েছে। সুতরাং জনসাধারণও ঐ ধরণের বিশ্বাসঘাতকতা সহ্য করবে না। মনে রাখতে হবে, গতবার—এবার নয়। কারণ জনসাধারণের প্রচুর শিক্ষা হয়েছে। আর অন্তর্বর্তী নির্বাচনের ফলাফল যাই হোক না কেন, বর্তমান নির্বাচনের ঐ শিক্ষাই বড় শিক্ষা। সেই কারণে অন্তর্বর্তী নির্বাচনের পুনরাবৃত্তি আর সম্ভব নয় বলেই আমাদের ধারণা। তবে, সরকার গঠনের সুযোগ যাঁরা পাবেন, তাঁদের প্রতি অযথা বিক্ষোভ বিরোধিতা বাঞ্ছনীয় নয়। মনে রাখতে হবে, জনসাধারণই সরকার গঠনের জন্য তাঁদের সুযোগ দিয়েছেন।

সম্পাদকীয়

আজকের মানুষ

মঞ্চ থেকে নায়কের অন্তর্ধান ঘটলে নাটক জমানো কষ্টসাধ্য হয়ে ওঠে। ভাঁড় বা কৌতুকাভিনেতাকে দিয়ে কিছুক্ষণ দর্শকদের মন ধরে রাখা যায় বটে, কিন্তু তারপরেই তাঁরা বিরক্ত হয়ে ওঠেন, প্রেক্ষাগৃহ ছেড়ে পালাতে পারলে বাঁচেন তাঁরা তখন। কিন্তু নায়কের আকস্মিক মৃত্যু ঘটলে দর্শকসাধারণ শোকে অবশ্যই বিহ্বল হবেন, কিন্তু যে-কাহিনীর সেখানেই সমাপ্তি নয়, সেখানে পার্শ্বচরিত্রগুলি মঞ্চে হাজির হয়ে দর্শকের দৃষ্টি কাড়তে চাইবেনা। নেতা ও নায়ক আন্নাদুরাইয়ের মৃত্যুতে সারা মাদ্রাজ রাজ্যে শোকের যে গভীর ছায়া নেমেছে এমন করুণ দৃশ্য এখানে আর কখনো দেখা গিয়েছে কি-না সন্দেহ।

কিন্তু কেবল শোক প্রকাশ করলেই নেতার প্রতি শ্রদ্ধা ও কর্তব্য শেষ হয়না। তাঁর আরব্ধ কাজকে এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে। তাই রাজ্য রাজনীতিতে এতদিন যাঁরা পার্শ্বচরিত্রের ভূমিকায় অভিনয় করছিলেন, তাঁদেরই দেখা যাচ্ছে মুখ্য ভূমিকা গ্রহণ করতে, আন্নাদুরাইয়ের আসনে নেদুনচেঞ্চিয়ানকে। পাদপ্রদীপের আলোয় এলেন করুণানিধি।

আন্নাদুরাই যদি আজকের তামিলনাড়ুর স্রষ্টা হন, তবে শ্রী ভি আর নেদুনচেঞ্চিয়ান তার প্রধান কারিগর। দেশের জন্যে স্বার্থ তিনি কম ত্যাগ করেননি। ছাত্র বয়েস থেকেই নেদুনচেঞ্চিয়ান সমাজ-উন্নয়ন আন্দোলনে অংশ নিতে থাকেন, মাদ্রাজের প্রবীণ সমাজনেতা রামস্বামী নাইকার যখন উত্তরাঞ্চল এবং ব্রাহ্মণ-বিরোধী আন্দোলন গড়ে তোলেন তখন আন্নাদুরাইয়ের পাশাপাশি নেদুনচেঞ্চিয়ানকেও সেই ১৯৪৪ সাল থেকে দ্রাবিড় কাজাগাম দলের উৎসাহী কর্মী হিসাবে দেখা গিয়েছিল। আবার পার্টি থেকে ১৯৪৯ সালে যখন তরুণ কর্মীরা বেরিয়ে এসে আন্নাদুরাইয়ের নেতৃত্বে নতুন দল দ্রাবিড় মুন্নেত্রা কাজাগাম (ডি-এম-কে) গঠন করলেন তখনও তাঁর পাশে ছিলেন নেদুনচেঞ্চিয়ান। বস্তুত দলে নেদুনচেঞ্চিয়ানের স্থান ছিল আন্নাদুরাইয়ের ঠিক পরেই।

আন্নাদুরাই ছিলেন দলের মধ্যমণি, তাঁর জনপ্রিয়তার কোনো তুলনা হয় না।

নেদুনচেঞ্চিয়ান

সে জনপ্রিয়তা সন্দেহাতীতরূপে প্রমাণিত হল যখন ১৯৬৭ সালের নির্বাচনে তিনি মাদ্রাজকে প্রথম অ-কংগ্রেসী সরকার উপহার দিলেন। যে-দলকে একটা রাজ্যের শাসনভার নিতে হবে তাকে সে রকম শক্ত মজবুত করে গড়ে না তুললে জনতা তাকে আপন করে নেবে কেন? সেই ডি-এম-কে দলের সংগঠনের গুরুদায়িত্ব পড়লো নেদুনচেঞ্চিয়ানের ওপর এবং দু দুবার তাঁকে সাধারণ সম্পাদকের দায়িত্ব পালন করতে হয়।

জাতীয় এবং আঞ্চলিক দাবিদাওয়ার জন্যে মুখর হবারা কারণে ডি-এম-কে শীঘ্রই শ্রদ্ধার আসন লাভ করল। দ্রব্যমূল্যবৃদ্ধি এবং হিন্দী-বিরোধী আন্দোলন পরিচালনার জন্যে তাঁকে বার দুয়েক কারাবরণও করতে হয়। নেদুনচেঞ্চিয়ান হলেন দলের প্রিয় 'নাভালার' বা বক্তা, তাঁর ওজস্বিনী বক্তৃতা জনতা মন্ত্রমুগ্ধ হয়ে ঘণ্টার পর ঘণ্টা শোনে। দলীয় সংগঠন দৃঢ় করার জন্যে নেদুনচেঞ্চিয়ানকে দলের নীতি নির্ধারণী সাধারণ পরিষদের চেয়ারম্যানের পদ দেওয়া হয়।

১৯৬২ সালের নির্বাচনে নির্বাচিত হবার পর নেদুনচেঞ্চিয়ান মাদ্রাজ বিধানসভার বিরোধী দলের নেতা হন। আন্নাদুরাই মন্ত্রিসভায় তিনি শিল্প ও শিক্ষামন্ত্রীর পদ পান।

নেদুনচেঞ্চিয়ান স্কুল-কলেজে ভাল ছাত্র বলে সম্মান ও শ্রদ্ধা লাভ করে এসেছেন। পাচুয়াপ্পাজ স্কুল এবং আন্নামালাই বিশ্ববিদ্যালয়ে তিনি পড়াশুনো করেছেন। নেদুনচেঞ্চিয়ান তামিল সাহিত্যের এম-এ। তিনি যেমন উচ্চাঙ্গের বক্তা তেমনি সাহিত্যিক হিসেবেও তামিল সাহিত্যে তাঁর খ্যাতি রয়েছে। তিনি কিছুকাল সাংবাদিকতাও করেছেন এবং দলের মুখপাত্র 'নাম নাদু'র সম্পাদক ছিলেন।

সুদর্শন, দীর্ঘদেহী, মৃদুভাষী নেদুনচেঞ্চিয়ানের সুনাম আছে দলাদলি বা অন্তর্কলহের ঊর্ধ্বে থাকার দরুণ। ডি-এম-কে দলে পূর্তমন্ত্রী এবং দলের কোষাধ্যক্ষ করুণানিধি বনাম খাদ্যমন্ত্রী মাধিয়াঝগণের বিরোধ দস্তুরমতো চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করেছে; কিন্তু নেদুনচেঞ্চিয়ানকে এ-সমস্ত ব্যক্তিগত স্বার্থ স্পর্শ করতে পারে নি। এরও নেদুনচেঞ্চিয়ান এ-সমস্ত সঙ্কীর্ণতার ওপরে, এবং কারো সঙ্গে উপদলবাজী করেন না বা কারোর বিরুদ্ধে নোংরামি করেন না বলেই তিনি দলের মধ্যে শ্রদ্ধাভাজন। তাই তাঁর অস্থায়ী মুখ্যমন্ত্রীর পদলাভ সহজ হয়েছে। কিন্তু সে আর কদিনের জন্যে? দলের সভায় শেষ পর্যন্ত করুণানিধিই নেতা নির্বাচিত হলেন সর্বসম্মতিক্রমে। ইনিই হবেন তামিলনাড়ুর নতুন মুখ্যমন্ত্রী। নেদুনচেঞ্চিয়ান সে মন্ত্রিসভার বাইরে থাকবেন, কারণ তিনি ছিলেন তিন নম্বর নেতা, তাঁর নিচে তিনি কাজ করতে নারাজ।

রবীন্দ্রনাথ ও শঙ্করীপ্রসাদ বসু

[পূর্ব-প্রকাশিতের পর]

বন্দেমাতরম—জনগণমন (৫)

হিন্দুস্থান স্ট্যান্ডার্ডের সম্পাদকীয়টি শুরু হয়েছিল কংগ্রেসী কর্তাদের চতুর বুদ্ধির প্রশংসা করে—

"রাজনৈতিক কৌশলে ওয়ার্কিং কমিটি অনবদ্য। বাংলার উপর দণ্ডঘোষণার কাজে তাঁরা একজন মাস্তালীকে সংগ্রহ করতে পেরেছেন। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর সানন্দে তাঁদের হাতে খেলেছেন; ওয়ার্কিং কমিটির পক্ষে প্রয়োজনীয় ছুতো তিনি তাদের হাতে তুলে দিয়েছেন।"

এর পরে কয়েক বছর ধরে রাজনৈতিক বিষয়ে মাথা গলিয়ে কবি যে গণ্ডগোল পাকাচ্ছেন, তার কথা—

"মাঝে-মধ্যে কবি রাজনীতিতে হস্তক্ষেপ করে এক্ষেত্রে সুদূরপ্রসারী ক্ষতি চালিত করছে। রাজনৈতিক ঘোষণাদি করার সময়ে কবি স্পষ্টতঃ দেখা যায় তাঁর অন্তরের বাণী বাইরের যুক্তি, কোনো কিছুর সঙ্গেই পরামর্শ করেন না। তাঁর একটি কান থাকে বহু সুদূরবর্তী জনসংঘটনের শব্দরাজির দিকে, এবং সর্বব্যাপী আওয়াজকেই তিনি ফাঁপিয়ে তোলেন। সব সময়ে যে তা করতে পারেন, তা নয়, যেমন দেখা গেছে, পুনা-প্যাক্টের ব্যাপারে তাঁর কুখ্যাত ডিগবাজিতে। মহাত্মা গান্ধীর অনশনকালে সারা-ভারত যখন মনে হল প্যাক্টের সমর্থক, তখন তিনিও তাকে সমর্থন করে আশীর্বাদ জানালেন, কিন্তু যখন গোটা বাংলাদেশ এ-ব্যাপারে কবির মনোভাবের নিন্দা করল, তিনি সত্বর নিজের কথাগুলি হজম করে ফেলে পূর্বে যাকে আশীর্বাদ করেছিলেন তাকেই অভিশাপ দিলেন, তার দ্বারা নিজের চতুর্দিকে বিভ্রান্তি ঘনিয়ে তুললেন, শত্রুরা পেল অপরিমেয় হাসি-তামাশার সুযোগ।"

অতঃপর বন্দেমাতরম সম্বন্ধে কবির বিবৃতির চেহারা—

"বন্দেমাতরম সম্বন্ধে তাঁর সর্বশেষ ঘোষণায় কবির একই বিচিত্র মনের ছবি। বিবৃতিটির মধ্যে এমন একটিও শব্দ নেই যাতে প্রাঞ্জলতা, সরলতা, প্রত্যক্ষতার নির্ভুল স্বাক্ষর মিলবে। কবি দ্বিধা করেছেন, খতিয়ে কথা বলেছেন; সন্দেহের, অবিশ্বাসের, প্রত্যয়হীনতার সুর তাঁর কণ্ঠে ফুটেছে; শব্দারণ্যের মধ্যে বড় কষ্টে তাঁকে পথ খুঁজে এগোতে হয়েছে; খুবই উদ্বেগাকুল, সত্যের জন্য নয়, ভয় পাছে এধারে ওধারে কারো অনুভূতিতে আঘাত করে ফেলেন। তাঁর পরিমাপিত, যত্নকৃত বাক্যগুলিতে পিচ্ছিলতা ও সর্পিলতা, পড়লে হতাশ হতে হয়। তিনি সাহস করেছেন, আবার করেন নি, ইচ্ছা করেছেন, আবার করেন নি। তিনি নিন্দা করবেন—সরাসরি—তাই ইচ্ছে, কিন্তু ভীত, পাছে জহরলাল দোষ ধরেন। হায় সেই কবি যিনি নিজের মনকে জানেন না! সুতরাং তিনি সীমানার উপরে দাঁড়িয়ে ইতস্ততঃ করতে থাকেন:

"আঘাত করতে চান
কিন্তু আঘাত করতে ভীত,
শ্লেষের ইঙ্গিত দেন
অথচ অপ্রচ্ছন্দে অসমর্থ।"

এর পরে লেখক কবির বিবৃতি থেকে দুটি মূল বক্তব্য উদ্ধার করেছেন। প্রথমটি, মুসলমানদের মনোভাবে আঘাত লাগতে পারে। এক্ষেত্রে উত্তরে বলা হয়েছে, বিকৃত দৃষ্টি ব্যাখ্যা যে-কোনো জিনিসেরই সম্ভব; "এই ধরনের নিন্দা-বিনোদনের শিকার স্বয়ং তাঁকেও হতে হয়েছে; তখন তিনি একটানা ক্রুদ্ধ তাঁক্ষ্ণ চীৎকার তুলেছেন। এসব সত্ত্বেও নিজের মহান পূর্বসূরীকে অসাধু, অযৌক্তিক ব্যাখ্যার মুখে ঠেলে দিয়েছেন।..... তাঁর মুখের একটি কথাতে আবহাওয়া পরিষ্কার হয়ে যেত, তাঁর মায়ায় ঊনবিংশ শতাব্দীর বাংলার মহত্তম কণ্ঠের মুক্ত স্বচ্ছ স্বরের উপরে জমে-ওঠা কুয়াশা ও দূষিত বাষ্প উড়ে যেত—কিন্তু সে শব্দটি উচ্চারিত হয়নি, কিংবা উচ্চৈস্বরে বলা হয়নি।"

পিতার একেশ্বরবাদের আদর্শে পালিত হওয়ার কথাটা যে অবিমিশ্র বিদ্রূপের লক্ষ্য হবে, সহজেই বোঝা যায়। প্রথমত একেশ্বরবাদের রবীন্দ্রনাথের আসক্তি ব্যাপারটায় মোটেই বেশি গুরুত্ব দেওয়া হল না। "বাংলাদেশে তাঁর আগেও একেশ্বরবাদী হয়েছেন; কবি যতখানি দাবি করেছেন বা ভঙ্গি করেছেন তার চেয়ে অনেক বড় কালাপাহাড় তাঁরা

ছিলেন, অনেক বেশী দৃঢ়-কঠোর, পৌত্তলিকতার গন্ধমাত্রে অস্থির।" কৃষ্ণকুমার মিত্র প্রমুখ এই ধরনের ব্রাহ্ম সেকথা বলার পরে,—"এইসব অনড়-অচল ব্রাহ্মদের তুলনায় রবীন্দ্রনাথের একেশ্বরবাদ খুবই শিথিল বস্তু। তাহলে হঠাৎ কবির একেশ্বরবাদের অভাবিত-সঞ্চয় মুক্ত হয়ে ঐ সব গোঁড়া ব্রাহ্মদের তুলনায় অনেক তীব্র ও গভীর নতুন চেহারা গ্রহণ করল কি করে?" মহর্ষির দোহাই দেওয়া সম্বন্ধে—"হাঁ, কথা হচ্ছে, কবি যখনই কোনো সন্দেহযোগ্য পথ ধরেন, যার জন্য সাফাই দরকার বা ব্যাখ্যা প্রয়োজন, তখনি তিনি কেন তাঁর ঋষি পিতার পবিত্র স্মৃতিকে টেনে আনেন? শান্তিনিকেতন থেকে ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়ের বিতাড়নকে সমর্থন করতে পিতার নাম একদা টেনে এনেছিলেন; এবারও বন্দেমাতরম প্রশ্নে নিজের অপকর্মের সমর্থনে পিতার নাম ব্যবহার করেছেন। কিন্তু মহর্ষির পবিত্র স্মৃতির মর্যাদা কোথায় রইল যখন তাঁর যত্নলালিত স্বপ্ন—ঈশ্বরসন্ধানীদের তাপিত হৃদয়ের শান্তির আশ্রয়-স্বর্গটি তাঁর সন্তানের দ্বারা মিউজিয়াম, মজার মেলা এবং পলিটেকনিকের মিশ্র বস্তুতে রূপান্তরিত হল?" বঙ্কিমের লেখায় যদি পৌত্তলিকতা থাকে, তাহলে "খোদ কংগ্রেস পৌত্তলিক, যার মন্দিরের প্রধান পুরোহিত গান্ধী, জহরলাল ও রবীন্দ্রনাথ।" "আমরা রবীন্দ্রনাথকে অন্য যে-কারো মতই পূজা করি, পৌত্তলিকের মতই। কিন্তু আমাদের সুস্পষ্ট অভিমত হল—লজ্জা ও বেদনার সঙ্গে সেকথা বলছি—তিনি নিজের প্রতি এবং নিজের মহান পূর্বসূরীর প্রতি সুবিচার করেন নি, নিজের অন্তর্দৃষ্টিও বিচারকে আচ্ছন্ন হতে দিয়েছেন জাগতিক বিবেচনাবুদ্ধির দ্বারা, সম্পূর্ণ সত্যের প্রতি আনুগত্য দেখান নি, যা সাহিত্য এবং জীবন উভয়েরই স্থায়ী আদর্শ হওয়া উচিত।" *

ঘটনাধারা আর একটু অনুসরণ করা যাক। বর্তমান অধ্যায়ের আরম্ভ করেছি যে দেবভোগ্য দৃশ্য দিয়ে সে দৃশ্য যে কেন তৎকালীন বাঙালীর পক্ষে বিশেষ আদরের দৃশ্য ছিল না, পাঠক এইবার নিশ্চয় বুঝেছেন। যেদিন হিন্দুস্থান স্ট্যান্ডার্ডের ঐ সম্পাদকীয়টি লেখা হয়, তার পরদিন গান্ধীজী কাজের চাপে মূর্ছিত হয়ে পড়েন এবং রবীন্দ্রনাথ তৎক্ষণাৎ ছুটে গিয়েছিলেন। মূর্ছা অবশ্য সাংঘাতিক পরিণতি নেয় নি। জহরলাল ২ নভেম্বর কলকাতা ত্যাগ করলেন। "যাওয়ার আগে পণ্ডিত নেহরু রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে তাঁর শহরতলীর বাসস্থানে গিয়ে দেখা করেন, তাঁরা প্রায় এক ঘণ্টা একসঙ্গে কাটান; অবস্থানকালে তাঁরা অন্যান্য জিনিসের সঙ্গে বন্দেমাতরম প্রস্তাব নিয়ে সংবাদপত্র ও জনগণের প্রতিক্রিয়ার বিষয়ে আলোচনা করেন।" ১ হাওড়া স্টেশনে ট্রেন ছাড়ার আগে পণ্ডিতজী বন্দেমাতরমকে সার্টিফিকেট দিয়ে গেলেন—তার প্রথম তিন ছত্র একেবারে নির্দোষ।

যাদের চাপের কাছে কংগ্রেস নতিস্বীকার করে বন্দেমাতরমের অঙ্গচ্ছেদ করেছিল বলে বাংলাদেশের সন্দেহ, সেই মুসলিম লীগ, কিংবা তার নেতা মিঃ জিন্না অত সামান্য ভোগে সন্তুষ্ট হবেন, বা সন্তুষ্ট হয়েছেন দেখাবেন, এমন

* এই সমালোচনা ব্যক্তিকে লক্ষ্য করেই, সুতরাং ব্যক্তিগত আঘাত দিলই। বন্দেমাতরম সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের আচরণের প্রতিবাদী তাঁর বন্ধু রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় সমালোচনায় ব্যক্তি-প্রসঙ্গের বিরুদ্ধে আপত্তি করেছিলেন। প্রবাসীতে ১৩৪৪ অগ্রহায়ণ সংখ্যায় বিবিধ প্রসঙ্গে তিনি লেখেন—

"বন্দেমাতরম গানটির বিরুদ্ধে অভিযান হওয়ায় এবং কংগ্রেসের কার্যনির্বাহক কমিটি ঐ গানটি সম্বন্ধে যেরূপ মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা প্রকাশিত হওয়ায় বাংলা দেশে প্রতিক্রিয়াজনিত যে বিক্ষোভ ও আন্দোলন দেখা যাইতেছে, তাহা অস্বাভাবিক নহে। দুঃখের সহিত ঐ আন্দোলনের একটি অবাঞ্ছনীয় বিশিষ্টতার উল্লেখ করিতে হইতেছে। কাহারও সহিত মতের অনৈক্য হইলে তাহার মতের বিরুদ্ধে যুক্তিপ্রয়োগ করা উচিত, ব্যক্তিগত আক্রমণ অনুচিত। হীন অভিসন্ধি আরোপ যদি অগত্যা করিতেই হয়, তাহা হইলে সেইরূপ অভিসন্ধি আরোপের অকাট্য প্রমাণ উপস্থিত করা কর্তব্য।.....

কংগ্রেসের কার্যনির্বাহক সভা যেরূপ মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন তাহার সহিত আমরা একমত নহি, কিন্তু আমরা মনে করি, তাঁহারা আন্তরিক বিশ্বাস বশতঃ কর্তব্যবোধে এইরূপ করিয়াছেন।

শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বন্দেমাতরম সম্বন্ধে পণ্ডিত জহরলাল নেহরুকে যে চিঠি লিখিয়াছিলেন, তাহার জন্য ব্যক্তিগত আক্রমণ ও হীন অভিসন্ধি আরো স্থলবিশেষে তর্কবিতর্কের রীতি লঙ্ঘন এবং শিষ্টাচারের সীমা অতিক্রম করিয়াছে। এরূপ আক্রমণে সত্যের মর্যাদা রক্ষিত হয় নাই। বলাবাহুল্য রবীন্দ্রনাথ যাহা বলিয়াছেন, তাহা তাঁহার আন্তরিক বিশ্বাস।"

আর একটি মন্তব্যে রামানন্দ বলেছিলেন—

"বন্দেমাতরম সম্বন্ধীয় আন্দোলন সম্পর্কে কেহ কেহ রবীন্দ্রনাথ বিরচিত জাতীয় সঙ্গীতগুলির বিরুদ্ধে এই মর্মের কথাও বলিয়াছেন যে, তাহাদের মধ্যে স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষা নাই, স্বাধীনতালাভচেষ্টার জন্য মানুষ সেগুলি হইতে কোনো প্রেরণা পায় না। রবীন্দ্রনাথ স্বাধীনতা চান না, কোনো সমালোচক যে এরূপ বলেন নাই, ইহাও সমালোচকদের দয়া বলিতে হইবে। উত্তেজনার সময়ে মানুষের মনের সত্যানুভূতির শক্তি হ্রাস পায়।"

রামানন্দের লেখা অন্যত্র যেমন তেমনি এখানেও যুক্তিপূর্ণ। উত্তেজনার হেতু থাকলেও উত্তেজিত হওয়া উচিত নয়, সর্বথা স্বীকার্য। তবে সর্বাবস্থায় সম্ভব কি না জানি না। এইকালে রবীন্দ্রনাথের নানা রচনা থেকে উদ্ধৃত করে তাঁর কথা ও কাজের মধ্যে অসংলগ্নতা দেখিয়ে রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় যা করেছিলেন, তাই যে সর্বশ্রেয় কাজ, তাতে সন্দেহ নেই।

১ অমৃতবাজার ৩ নভেম্বর।

জানাই যায় না। মিঃ জিন্না বন্দেমাতরম প্রস্তাব সম্বন্ধে বলেন,

"It (the resolution) breathes an arrogance and a patrionising spirit ... The mentality is in the song Bande Mataram that they would rather be slaves of the British than come to an honourable settlement with Muslims."২

এই সঙ্গে অক্টোবর মাসে মুসলিম লীগ সম্মেলনে মিঃ জিন্না ঘুণায় ফেটে পড়ে যা বলেছিলেন, তার কয়েক লাইন—

"Hindi is to be the national language of All-India and Bande Mataram is to be the national song and is to be forced upon all. The Congress flag is to be obeyed and revered by all and sundry. On the very threshold of what little power and responsibility is given, the majority community have clearly shown their hand that Hindustan is for the Hindus, only the Congress masquerades under the name of nationalism whereas the Hindu Mahasabha does not mince words."৩

কংগ্রেসের নতিস্বীকারে গোঁড়া মুসলমান সাম্প্রদায়িক পত্রিকা 'স্টার অব ইণ্ডিয়া' কিন্তু উল্লাস গোপন করতে পারে নি। পত্রিকাটি লিখেছিল, জাতীয় সঙ্গীত বাছবার জন্য কংগ্রেস সাবকমিটি করেছে, এর থেকেই বোঝা যায় বন্দেমাতরমের ঔচিত্য সম্বন্ধে কংগ্রেসের মনে সন্দেহ রয়েছে। "নিঃসন্দেহে এটা ভারতের মুসলমানদের নৈতিক বিজয়; এর দ্বারা আর কিছু না হোক স্পষ্ট বোঝা গেল, সংগঠিত মুসলমান জনমত ও মুসলমান সংবাদপত্রের অভিমতের মূল্য সে স্বীকার করে। ওয়েলিংটন স্কোয়ারে গত দিনের সিদ্ধান্ত মুসলিম লীগের ও মুসলিম সংবাদপত্রের পক্ষে বিরাট জয়; দেখা গেল, শক্তিশালী কংগ্রেসও নত হয়।" তাই বলে কেউ যদি মনে করে কংগ্রেস সেলাম করে মন ভেজাতে পেরেছিল, তা কদাপি সত্য নয়। পত্রিকাটির মতে, গোটা গানটিই দূষিত, কেন না শেষের দিকে দুর্গার ছোঁয়া রয়েছে—তার সংক্রমণ কি উপর দিকে ছড়ায় নি? "সুতরাং উদ্ভবর্ন পার্কে আস্তানা-নেওয়া কংগ্রেসী মহামন্ত্রেরা যদি মনে করে থাকেন, তাঁরা মুসলমানদের প্রতি বিরাট উদারতা দেখিয়েছেন, যাতে তারা খুবই সন্তোষ করবে, এবং গানটির বিরুদ্ধে আন্দোলনে ক্ষান্তি দেবে, তাহলে তাঁরা খুবই ভুল বুঝেছেন।" সব শেষে পরিতৃপ্ত পরিসমাপ্তি—

"We hope that this is an early step towards the decent burial of Bande Mataram."

সাম্প্রদায়িক মুসলমানদের এই আন্দোলনের জাতীয় সঙ্গীতের নানা নতুন দাবিদার যখন দেখা যেতে লাগল, তখন বাংলা দেশের জাতীয়তাবাদীরা ক্রমেই অধিক সন্দিগ্ধ হতে লাগলেন। মাদ্রাজ থেকে থিয়জফিক্যাল কলেজের অধ্যক্ষ জেমস এইচ কাজিনস রবীন্দ্রনাথের জনগণ-মন-অধিনায়ক গানের নাম প্রস্তাব করলেন। অন্যান্য প্রস্তাবও উঠল। ৪ অক্টোবরের সম্পাদকীয় নোটে আনন্দবাজার লিখল—

"বন্দেমাতরমকে জাতীয় সঙ্গীত বলিয়া ঘোষণা করাতে ইতস্ততঃ করা এবং তৎসহ জাতীয় সঙ্গীত নির্বাচনের জন্য কমিটি নিয়োগ করায় ওয়ার্কিং কমিটি যে কতদূর অপরিণামদর্শিতার পরিচয় দিয়াছেন, তাহা ক্রমশঃই স্পষ্ট হইয়া উঠিতেছে। যেক্ষেত্রে বন্দেমাতরমই জাতীয় সঙ্গীত বলিয়া লোকের একরূপ স্থির ধারণা হইয়া গিয়াছিল, সেইক্ষেত্রে এখন এক-একজন এক-একরকমের জাতীয় সঙ্গীতের ফরমাইস লইয়া হাজির হইতেছেন। সিন্ধু হইতে শেখ আবদুল মজিদ (যদিও ইনি কংগ্রেসের ঘোর বিরোধী) জানাইয়াছেন, ইকবালের সঙ্গীত বিশেষকে জাতীয় সঙ্গীত বলিয়া ঘোষণা করা হউক। মাদ্রাজ হইতে ডাঃ কাজিন্স বলিতেছেন যে, রবীন্দ্রনাথের জনগণমন গানকেই জাতীয় সঙ্গীত বলিয়া ঘোষণা করা হউক।*৩ বোম্বাই হইতে বম্বে ক্রনিকল পত্র সুপারিশ করিতেছেন, সীমার

২ অমৃতবাজার ৪ নভেম্বর।

৩ হিন্দুস্থান স্ট্যান্ডার্ড, ১৯ অক্টোবর।

*৩ বন্দেমাতরম পণ্ডিত জহরলালের (এবং মুসলিম লীগের) পছন্দসই না হবার পর থেকে নানা জাতীয় সঙ্গীতের সঙ্গে জনগণমন'র নাম প্রস্তাবিত হতে থাকে। প্রথম কবে প্রস্তাবিত হয় এবং কে প্রস্তাব করেন আমরা বলতে পারব না। তবে বিচিত্র কথা, বন্দেমাতরম সংরক্ষণের পক্ষে লেখায় এবং আন্দোলনে যিনি অগ্রণী ভূমিকা নিয়েছিলেন সেই রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় প্রথম পর্যায়ে বন্দেমাতরমের জায়গায় জন-গণমন'র নাম প্রস্তাব করেছিলেন। পূর্বে উল্লিখিত মুসলমান পত্রলেখকের উত্তরে জহরলালের পত্র উদ্ধৃত করার পরে মডার্ন রিভিউ পত্রিকার সম্পাদকীয় নোটে লেখা হয়েছিল (অক্টোবর, ১৯৩৭)—

"At the last Karachi session of the Indian National Congress, the opening song was Rabindra Nath Tagore's *Jana-Gana-Mana-Adhinayake Jaya Hey Bharata Bhagya Bidhata*. It was sung in chorus by Sindhi girls and ladies. We are told that it was very popular in Sindh. *Unless the objection be raised that it contains difficult words, it is perfectly fit to be a national anthem.* We have never raised or supported the

আকবরবাদীর (তিনি কে জানা নাই) 'কুয়ামী পাণ্ডেক গীত নামে যে সঙ্গীত আছে, তাহাকেই জাতীয় সঙ্গীত বলিয়া ঘোষণা করা হউক। যতদিন যাইবে, ততই এরূপ রকম-বেরকমের দাবি উঠিবে।"

রবীন্দ্রনাথের সমর্থন সত্ত্বেও বাংলার সাহিত্যসেবীরা কংগ্রেস-প্রস্তাব সমর্থন করেন নি। কবি যতীন্দ্রমোহন বাগচী প্রতিবাদ-সংগঠনে অগ্রণী হয়েছিলেন। দেশমাতার বন্দনাগানে পৌত্তলিকতা থাকতে পারে' সাহিত্যিকরা তা মানতে পারেন নি। কংগ্রেস প্রস্তাব এ'দের কাছে 'সাহিত্য-ক্ষেত্রে বাটোয়ারা' বলে মনে হয়েছিল। ১৬ নভেম্বর, এ-বিষয়ে আনন্দবাজার লিখেছিল—

"রবীন্দ্রনাথ বন্দেমাতরম সঙ্গীতের ব্যবচ্ছেদে সম্মতি দিলেও বাংলার অন্যান্য প্রবীণ সাহিত্যিকগণ স্বর্গগত বঙ্কিমচন্দ্রের অমর রচনার প্রতি এই অসম্মানের প্রতিকারার্থে সমবেত হইয়াছেন, ইহা আশার কথা। বঙ্কিমচন্দ্রের রচনায় হস্তক্ষেপ অনুমোদন করিয়া রবীন্দ্রনাথ যে দৃষ্টান্ত স্থাপন করিয়াছেন, তাহার ফুফল যে শেষ পর্যন্ত তাঁহার উপরে আসিয়াও বর্তাইতে পারে ইহা সম্ভবতঃ তিনি ভাবিয়া দেখেন নাই। টেক্সট্‌বুক কমিটি হইতে তাঁহার রচনার অংশ-বিশেষ পরিবর্তন ও পরিবর্জনের জন্য প্রস্তাব তিনি যে যুক্তি দেখাইয়া প্রবল প্রতিবাদ জানাইয়াছিলেন, বঙ্কিমচন্দ্রের রচনায় হস্তক্ষেপের বিরুদ্ধেও সেই যুক্তি এবং সেইরূপ প্রতিবাদই তিনি করিবেন, আশা করিয়াছিলাম। কিন্তু তিনি তা না করিলেও বাংলার অন্যান্য বিশিষ্ট সাহিত্যিকেরা সাহিত্যগুরুর সম্মানরক্ষায় সচেষ্ট হইলেও সে চেষ্টা সার্থক হইবে বলিয়া আমরা বিশ্বাস করি।"

বন্দেমাতরম প্রসঙ্গে সুদীর্ঘ আলোচনায় এখনো পর্যন্ত সুভাষচন্দ্রের ভূমিকার কথা আমরা বলি নি, ঠিকভাবে বলতে হলে, স্থগিত রেখেছিলাম। এক্ষেত্রে সুভাষচন্দ্রের যথেষ্ট দায়িত্ব ছিল। কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটি সর্বসম্মতিক্রমে বন্দেমাতরমের অঙ্গচ্ছেদ প্রস্তাব করে, সুভাষচন্দ্র সেই ওয়ার্কিং কমিটির অন্যতম সদস্য। তিনি কোনোদিনই বাধ্য মানুষ নন, সুতরাং আর কিছু না পারুন ব্যক্তিগত আপত্তি জানাতে পারতেন। ভিতরে ভিতরে জানিয়েছিলেন কি না, প্রস্তাবের মধ্যে বন্দেমাতরমের সুদীর্ঘ স্তুতিযোজনায় তাঁর হাত ছিল কি না, আমরা বলতে পারব না, কিন্তু বাহ্যত তার পক্ষে কোনো প্রমাণ নেই। দেশ পত্রিকার ১৫ জ্যৈষ্ঠ, ১৩৭২ সংখ্যায় রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়কে লেখা সুভাষচন্দ্রের একটি পত্রের প্রতিলিপি প্রকাশিত হয়েছে। ২০ অক্টোবর, ১৯৩৭ তারিখে কার্সিয়াং থেকে চিঠিটি লেখা। সুভাষচন্দ্রের ব্যক্তিগত মনোভাব জানার পক্ষে এটি অত্যন্ত মূল্যবান।

শ্রদ্ধাস্পদেষু,

আপনার পত্র এইমাত্র পাইয়া বিশেষ আনন্দিত হইলাম। আমি কলিকাতায় ২৪শে তারিখে পৌঁছিব এবং সেখানে এক সপ্তাহ থাকিব। আমার ঠিকানা 38/2 Elgin Road। মহাত্মাজী ও পণ্ডিত জহরলাল ২৬শে তারিখে কলিকাতায় পৌঁছিবেন এবং থাকিবেন 1 Woodburn Park-এ। আপনি যদি মহাত্মাজীকে "বন্দেমাতরম"-এর বিষয়ে লেখেন তাহা হইলে বড় ভাল হয়। আপনার সাহায্য এ বিষয়ে একান্ত দরকার। আমি জানি না "ওয়ার্কিং কমিটি" এ বিষয়ে কি করিয়া বসিবেন—কমিটিতে আমি একমাত্র বাঙ্গালী। যদি সম্ভব হয় তাহা হইলে কবিকে অনুরোধ করিবেন মহাত্মাজীকে লিখিবার জন্য। আমি কবিকে লিখিয়াছি কিন্তু কি ফল হইবে জানি না। অন্যান্য বিষয়ে আপনাকে পরে লিখিতেছি।

আমার বিজয়ার প্রণাম গ্রহণ করিবেন।

ইতি

বিনীত

শ্রীসুভাষচন্দ্র বসু

অজস্র আলোকবর্ষণ যাকে বলে, এই চিঠিটি তাই করেছে। রাজনৈতিক ঘটনাবলীতে নতুন করে নিমজ্জিত হন নি, সেই সময়ে সুভাষচন্দ্রের মনোভাব এই প্রকার। এই মনোভাব কিন্তু পরে কতখানি বজায় ছিল, তা প্রশ্নের অধীন, কারণ সুভাষচন্দ্রের পরবর্তী কার্যকলাপ ভিন্ন-জাতীয়। এই চিঠি থেকে দেখতে পাচ্ছি, বন্দেমাতরমের বিষয়ে ওয়ার্কিং কমিটির অভিপ্রায় সম্বন্ধে সুভাষচন্দ্র সন্দিহান; ওয়ার্কিং কমিটি যাতে খুব মন্দ কোনো সিদ্ধান্ত নিয়ে না ফেলে তার জন্য গান্ধীজী, জহরলাল প্রমুখের উপর প্রভাব আছে, এমন ব্যক্তিদের তিনি সাহায্যপ্রার্থী, যেমন রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় ও রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের সক্রিয় সাহায্য পাওয়া যাবে, সুভাষচন্দ্রের সে বিশ্বাস ছিল, কিন্তু রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে অতখানি নিশ্চিন্ত নন। সুভাষচন্দ্রের চিঠির সুর থেকে আরও বোঝা যায়, কংগ্রেস-কর্তারা বন্দেমাতরম-ঐতিহ্যকে বাংলাদেশের বলেই মনে করেন।

সুভাষচন্দ্রের আসল মনোভাব যাই হোক, বাইরে যা করেছিলেন, শ্রীযুক্ত দেবপ্রসাদ ঘোষ সুন্দরভাবে তার বিষয়ে লিখেছিলেন—"অনবদ্য নিষ্ক্রিয়তা"। উত্তর ও পশ্চিমভারত ভ্রমণ করে শ্রীযুক্ত ঘোষ বন্দেমাতরমের অঙ্গচ্ছেদে প্রবাসী বাঙালীদের মর্মবেদনার বিষয়ে লিখে পাঠিয়েছিলেন অমৃত-বাজারের ১৬ নভেম্বর সংখ্যায়। প্রবাসী বাঙালীরা জহর-লালের আচরণে বিস্মিত হয় নি, কারণ 'কালগতে অন্য যে গুণই তিনি অর্জন করে থাকুন, শ্রদ্ধা নামক বস্তুটি তার অন্তর্ভুক্ত নয়।' তাঁরা বিস্মিত হয়েছিলেন কয়েকজন বিশিষ্ট

objection that Bande Mataram is idolatrous. But those who have will be unable to discover the least trace of idolatry in Tagore's song. It is true, however, that it lacks the halo of association with the struggle for freedom which encircles Bande Mataram."

বাঙালীর সংকুচিত, ক্ষেত্রবিশেষে স্পষ্টই বিরোধী আচরণ দেখে। বিশিষ্ট বাঙালীদের মধ্যে তিনি রবীন্দ্রনাথ ও সুভাষচন্দ্রের কথা বলেছেন। "বাংলাদেশের সর্বশ্রেষ্ঠ জীবিত কবি, পৃথিবীবিখ্যাত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মাতৃভূমির পবিত্র স্তোত্রগীতির মধ্যে হিংসার বীজ এবং পৌত্তলিকতার কীট আবিষ্কার করে খণ্ডিত আকারে তার ব্যবহারের সুপারিশ করেছেন, তার পিছনে মনস্তত্ত্ব কী, তা আবিষ্কার করা দুরূহ নয়; সে যাই হোক, বাংলার নৈতিক পতন সম্পূর্ণ সন্দেহ নেই।" অপর বিশিষ্ট বাঙালী সুভাষচন্দ্র সম্বন্ধে তিনি লেখেন—

"এই ব্যাপারে দেশের সর্বত্র বাঙালীরা শ্রীযুক্ত সুভাষচন্দ্র বসুর অনবদ্য নিষ্ক্রিয়তায় ব্যথিত। শ্রীযুক্ত

আসুন...
ইউবিআইতেই সঞ্চয় করুন

- ইউবিআইতে আপনার সঞ্চয়ের বার্ষিক সুদ পাবেন সেভিংস অ্যাকাউন্টে শতকরা ৩½ টাকা, মেয়াদী আমানতে সর্বোচ্চ শতকরা ৬½ টাকা।
- ইউবিআইতে আপনার সঞ্চয়ের ফলে ঠিক প্রয়োজনের সময়টিতে আপনার টাকা খরচ করতে পারবেন।
- ইউবিআইতে আপনার ও আরও অনেকের সঞ্চয় একত্র করেই ব্যবসা-বাণিজ্যে, শিল্পে, কৃষিতে, রপ্তানীর জন্যে, আর বিভিন্ন উন্নয়নমূলক পরিকল্পনার জন্যে সরকারকে আমরা আরও বেশী ঋণ দিয়ে দেশের আর্থিক উন্নতিতে সাহায্য করব।

ইউবিআই
ইউনাইটেড ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়া লিঃ
রেজিস্টার্ড ও হেড অফিস : ৪, ক্লাইভ ঘাট স্ট্রীট, কলিকাতা-১

পশ্চিমবঙ্গে ১০৫টিরও অধিক শাখা আছে

বসু ওয়ার্কিং কমিটির সদস্য, যে-ওয়ার্কিং কমিটি প্রস্তাবের নামে অসংলগ্ন অসমঞ্জস, অসরল বাগাড়ম্বর হাজির করেছে, যার অস্পষ্ট প্রশংসায় অমর সঙ্গীতটি লাঞ্ছিত, যার শেষ হয়েছে সমুজ্জ্বল ভাবোদয়ে—এক সাবকমিটির পরিশ্রমে রাতারাতি জাতীয় সঙ্গীত সংগৃহীত হয়ে যাবে।' এই অমর্যাদাকর কাণ্ডের সঙ্গে শ্রীযুক্ত বসু সংযোগ রাখেন নি, এমন সংবাদ আমরা জানি না। তিনি বোধহয় কংগ্রেস সভাপতি-পদের প্রার্থীর দৌড়ে নেমে বীরত্বের অপেক্ষা বিবেচনাকেই মূল্যবান মনে করেছেন।"

একথা সত্য, বন্দেমাতরমের ব্যাপারে প্রত্যাশিত নেতৃত্ব বাঙালী হয়েও সুভাষচন্দ্র দেন নি। তার কারণ কি হতে পারে? প্রথমত, দীর্ঘদিন পরে কারামুক্ত সুভাষচন্দ্র ধীরে অগ্রসর হচ্ছিলেন; স্বাস্থ্যের কারণেও তাঁর পক্ষে আলোড়নকর কিছু করা সম্ভব ছিল না। ওয়ার্কিং কমিটির সভা উপলক্ষে কয়েকদিন কলকাতায় কাটিয়েছিলেন; তাই তাঁর স্বাস্থ্যের উপরে বথেষ্ট চাপ দিয়েছিল। রাজনৈতিক ব্যাপারে সুভাষচন্দ্রের দৃষ্টিভঙ্গিরও কিছুটা পরিবর্তন হয়েছিল। ১৯৩২-এর গোড়ায় জেলে যাবার সময়ে সর্বভারতীয় খ্যাতি সত্ত্বেও তিনি সর্বভারতীয় স্বীকৃতি পাবেন ১৯৩৭ সালে, সে অবস্থা সৃষ্টি হয়েছে; কংগ্রেস সভাপতিপদের জন্য তাঁর নাম উঠেছে এবং সভাপতি হবার সম্ভাবনা উজ্জ্বল। তাঁর সভাপতিত্বের অর্থ, দেশবন্ধুর পরে কংগ্রেসের বৃহৎ নেতৃত্বে বাঙালীর পুনঃপ্রবেশ। সেই নেতৃত্ব পাবার পরে বাংলার স্বার্থরক্ষায় যতখানি করা সম্ভবপর, তার আগে নিশ্চয় তা সম্ভব নয়। বাংলা দেশ বহুস্তর কংগ্রেসী আন্দোলন থেকে সরে থেকে ভারতবর্ষের স্বাধীনতা আন্দোলনে হয়ত বেগসঞ্চার করেছে কিন্তু গান্ধী-চালিত কংগ্রেসে প্রভাব হারিয়েছে। সেই প্রভাব ফিরিয়ে আনতে হলে কংগ্রেসের পরিচিত দৃষ্টিভঙ্গির সঙ্গে কিছুটা মিলিয়ে-মিশিয়ে চলা দরকার। ভারতের স্বাধীনতা-আন্দোলনের প্রয়োজনেও কংগ্রেসে তাঁর আধিপত্য দরকার—কেন, পরে তা আমরা বিস্তারিত ব্যাখ্যা করব। এক্ষেত্রে এই বলা চলে, সুভাষচন্দ্র বাংলার স্বার্থ বজায় রাখতে চেয়েছেন সর্বভারতীয় মনোভাবের সঙ্গে সামঞ্জস্য করে।

কিন্তু এই সামঞ্জস্যের মনোভাবই বা ঠিক কোন্ সময়ে তিনি অর্জন করলেন? ২৩ অক্টোবর তারিখে যখন রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়কে চিঠি লিখছেন, তখনো ব্যক্তিগতভাবে বন্দেমাতরম সম্বন্ধে ভাবাবেগ তাঁর প্রবল। কলকাতায় আসার পরে মনোভাবের কিছুটা বদল হয়, কিংবা বাস্তব পরিস্থিতি দেখে মনোভাব বদলাতে বাধ্য হন। বন্দেমাতরম সংরক্ষণের জন্য সুভাষচন্দ্রই একমাত্র শক্তিমান পুরুষ যিনি লড়াই করতে পারেন, একথা অনেকের কাছেই স্পষ্ট। মারাঠি নেতারা ও ডঃ জগদীশচন্দ্র বসু সুভাষচন্দ্রের কাছেই আবেদন করেছিলেন। কিন্তু শরৎচন্দ্র বসু সম্ভবত বাস্তব অবস্থার বিবেচনা করে বুঝেছিলেন, অঙ্গচ্ছেদ ভিন্ন উপায় নেই। ২৩ অক্টোবরের অমৃতবাজার পত্রিকায় বেরোয়, সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির জন্য শরৎচন্দ্র বসু মুসলমানদের আপত্তিগুলি অনুকূল মনে বিবেচনা করতে প্রস্তুত, কিন্তু সুভাষচন্দ্র এখনো মনস্থির করতে পারেন নি।[৪] শরৎচন্দ্র এই রিপোর্টের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানালেও দেখা যায়, তিনি বন্দেমাতরমের অঙ্গচ্ছেদ-প্রস্তাবের সপক্ষতা করে বলেছেন, কংগ্রেসে খণ্ডিত আকারে বন্দেমাতরম গীত হয়ে থাকে, ডাঃ ইন্দ্রনারায়ণ সেনগুপ্ত প্রমুখ যার প্রতিবাদ করে বলেন, ১৯৩৪ সালের কংগ্রেসেই গোটা বন্দেমাতরম গাওয়া হয়েছে।[৫]

কিন্তু সুভাষচন্দ্র শরৎচন্দ্রের দ্বারা চালিত হবেন একথা মনে করার কারণ নেই। বন্দেমাতরমের ব্যাপারে সবচেয়ে বড় ধাক্কা তিনি খেয়েছিলেন সাম্প্রদায়িক মুসলমানদের কাছ থেকে নয়, কংগ্রেসী মুসলমানদের কাছ থেকেই। বাংলার সংবাদপত্রগুলিতে যদিও অতীতের স্বদেশী মুসলমানের বন্দেমাতরমভক্তি, এবং বর্তমানের কিছু মুসলমানের বন্দেমাতরম-সমর্থনের কথা বড় করে প্রকাশ করা হয়েছিল, আসলে কিন্তু মুসলিম লীগের আক্রমণের সামনে জাতীয়তাবাদী মুসলমানেরা অসহায়বোধ করেছিলেন। বন্দেমাতরমের অঙ্গচ্ছেদে তাঁদের নিরেদনই শেষ আত্মঘাত। কংগ্রেসের পক্ষে এক্ষেত্রে বোধহয় উপায়ান্তরও ছিল না; অসাম্প্রদায়িকতায় চরিত্ররক্ষার জন্য অহেতুক সতীত্বের আড়ম্বর তাকে করতে হয়েছিল। তাছাড়া কংগ্রেস-সভাপতি পণ্ডিত জহরলালের ব্যক্তিগত বিরূপতার কথা তো আগেই বলে এসেছি।

সভাপতি মনোনীত হবার পরে সুভাষচন্দ্র যখন হরিপুরার পথে রায়পুরে পৌঁছান, তখন কয়েকজন কংগ্রেসী তাঁকে এ-বিষয়ে প্রশ্ন করেন। একজন তরুণ কংগ্রেসী তাঁকে বলেন, "কংগ্রেস মুসলিম লীগের কাছে নত হচ্ছে কেন?"

৪—"From the trend of correspondences which are understood to be passing between Mahatma Gandhi and Pandit Jawaharlal on the one hand and Sj. Subhas Chandra Bose and some other prominent Congress leaders of Bengal on the other over the question of using the Bande Mataram as the National Anthem of India. . . .

As it is gathered, Sj. Sarat Chandra Bose is prepared for the sake of communal amity, to favourably consider the Muslim objections. But the President of the Bengal Provincial Congress Committee, Sj. Subhas Chandra Bose has not yet been able to come to a decision. He it is understood, will have his opinion after holding consultations with prominent Bengal Congressmen." (Amrita Bazar, Oct., 23, 1937).

৫—৩০ অক্টোবরের হিন্দুস্থান স্ট্যাণ্ডার্ড।

সুভাষচন্দ্র প্রতিপ্রশ্ন করেন, "কী অর্থে নত হয়েছে?" প্রশ্নকর্তা—"বন্দেমাতরমের ব্যাপারে কংগ্রেস কি মুসলিম লীগের কাছে নত হয়নি?" সুভাষচন্দ্র বলেন, "জাতীয় প্রতিষ্ঠান হিসাবে কংগ্রেসকে ভারতের প্রতিটি সম্প্রদায়ের অনুভূতিকে মর্যাদা দিতে হবে। বন্দেমাতরম বিষয়ে বলতে পারি, জাতীয় সঙ্গীত এমন হওয়া উচিত যা দেশের সকল শ্রেণীর মানুষকে উদ্বুদ্ধ করবে।" জনতার ভিতর থেকে প্রশ্ন করা হয়—"কিন্তু বন্দেমাতরম তো অতীতে মুসলমানদের প্রেরণা দিয়েছে।" সুভাষচন্দ্র উত্তর দেন—"আপনারা কি মুসলমানদের মনের দিক দিয়ে বন্দেমাতরমকে বিচার করেছেন।" জনৈক প্রবীণ কংগ্রেসী তাতে বলেন—"জাতীয়তাবাদী মুসলমানেরা তো কখনই বন্দেমাতরমের বিরুদ্ধে আপত্তি করেনি।" তখন সুভাষচন্দ্র জানান—

"আমাকে বিশ্বাস করুন, জাতীয়তাবাদী মুসলমানদের পক্ষ থেকে আবেদন করা হয়েছে বলেই কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটি বন্দেমাতরম প্রশ্ন বিবেচনা করেছে।"৬

স্পষ্টই বোঝা যায়, জাতীয়তাবাদী মুসলমানেরা যখন বাঁকি ওঠালেন, তখন সুভাষচন্দ্রের পক্ষে অনিচ্ছাসত্ত্বেও মনোভাব কিছুটা বদলাতে হয়েছিল। ১৮ নভেম্বর, ১৯৩৭, তারিখে গান্ধীজী জহরলালকে লিখেছিলেন, "বন্দেমাতরম সম্বন্ধে বাকবিতণ্ডার আজও শেষ হয় নি। ওয়ার্কিং কমিটির সিদ্ধান্তে বাংলা দেশের অনেকেই ক্ষুব্ধ হয়েছে। সুভাষ আমাকে বলেছে যে, সে আবহাওয়াটা শান্ত করার চেষ্টা করছে।"।৭ সত্যই সুভাষ বন্দেমাতরম প্রশ্নে যথাসম্ভব নির্লিপ্ত ছিলেন, এবং প্রকাশ্যে যখনই তাঁকে জড়াবার চেষ্টা করা হয়েছে, ওয়ার্কিং কমিটির সিদ্ধান্তকে নম্রতার সঙ্গে সমর্থন করার চেষ্টা করেছেন। সুভাষচন্দ্রকে সত্যই জড়াবার চেষ্টা করা হয়েছিল। বঙ্গীয় কংগ্রেসের কার্যনির্বাহক সভায় প্রস্তাব নেওয়া হয়, ওয়ার্কিং কমিটির সিদ্ধান্তে তাঁদের অসন্তোষের কথা সুভাষচন্দ্র ওয়ার্কিং কমিটির গোচর করবেন। সাহিত্যিকরাও প্রতিবাদ সভায় তাঁকে আমন্ত্রণ করেন, সে আমন্ত্রণ স্বীকার না করে তিনি পারেন নি, কারণ, রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় ও যতীন্দ্রমোহন বাগচী তার উদ্যোক্তা ছিলেন। রামানন্দকে সুভাষচন্দ্র কী লিখেছিলেন আগেই দেখেছি এবং যতীন্দ্রমোহন সুভাষচন্দ্রকে বিশেষ স্নেহ করতেন।৮ ১৪ নভেম্বর তারিখে বহু সংখ্যক বিশিষ্ট বাঙালী সাহিত্যিক কবি যতীন্দ্রমোহন বাগচীর বাড়িতে ঘরোয়া সভায় মিলিত হয়ে স্বার্থহীন ভাষায় ওয়ার্কিং কমিটির প্রস্তাবের বিরুদ্ধে কঠিন প্রতিবাদ জানান।৯ তাঁরা স্থির করেন, মহাত্মা গান্ধীর কাছে ডেপুটেশন পাঠিয়ে জানাবেন, তাঁরা গানটিকে সম্পূর্ণত সংরক্ষণের পক্ষপাতী। সভায় উপস্থিত সকলে অধিকন্তু আশঙ্কা প্রকাশ করেন যে, কংগ্রেস কর্তৃক সঙ্গীত সংকলনের জন্য সাবকমিটি গঠনের উদ্দেশ্য—বন্দেমাতরমকে শেষ পর্যন্ত বাদ দেওয়া। সুভাষচন্দ্র ঐ সভায় মুখ্য অতিথি ছিলেন। তিনি ব্যাখ্যা করে বলেছিলেন, ওয়ার্কিং কমিটি সর্বভারতীয় দৃষ্টিভঙ্গিতে বিষয়টির বিচার করেছেন। কংগ্রেসের প্রবীণ ব্যক্তিরা বন্দেমাতরমকে ভারতের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ জাতীয় সঙ্গীত বিবেচনা করেন। সুভাষচন্দ্র আশ্বাস দিয়ে বলেছিলেন, বন্দেমাতরমকে হটিয়ে তার জায়গায় অন্য সঙ্গীত নেবার ইচ্ছা তাঁদের নেই। তিনি আরও বলেন, বন্দেমাতরম বাংলায় যতখানি পরিচিত ভারতের অন্য প্রদেশে ততখানি নয়, সে কারণে সেইসব জায়গায় গানটিকে জনপ্রিয় করার ব্যবস্থা নেওয়া দরকার, এবং সেখানকার জনগণ যাতে গানটির প্রেরণা ও অন্তর্নিহিত ভাবের সঙ্গে পরিচিত হয় তার চেষ্টা করাও দরকার।১০

বন্দেমাতরম অঙ্গচ্ছেদ প্রস্তাবে রবীন্দ্রনাথের সম্মতির জন্য বাংলা দেশে রবীন্দ্রনাথের বিরুদ্ধে কি ধরনের বিক্ষোভ সৃষ্টি হয়েছিল, তা যথেষ্টভাবে আমরা দেখেছি। বৃদ্ধ কবির উপর এই আক্রমণে সুভাষচন্দ্র নিশ্চয় ব্যথিত হয়েছিলেন। কার্সিয়াঙ থেকে ৬ই অক্টোবর ফিরে ১৭ই নভেম্বর পর্যন্ত তিনি কলকাতায় ছিলেন; এই সময়ের মধ্যে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে তাঁর কতবার সাক্ষাৎ হয়েছিল, তা সঠিক বলতে পারব না, তবে দু-বার সাক্ষাতের কথা আমরা জানি; একবার যখন মূর্ছিত গান্ধীকে দেখতে রবীন্দ্রনাথ উডবর্ন পার্কের বসুভবনে এসেছিলেন; সেবার সাধারণ শিষ্টাচারসম্মত

৬—১৫ ফেব্রুয়ারী, ১৯৩৮, হিন্দুস্থান স্ট্যান্ডার্ড।

৭—পত্রগুচ্ছ, ২২৭।

৮—সাবিত্রীপ্রসন্ন তাঁর গ্রন্থে সুভাষচন্দ্র ও যতীন্দ্রমোহনের পারস্পরিক শ্রদ্ধা ও স্নেহের কথা জানিয়েছেন।

৯—১৫ নভেম্বর, অমৃতবাজার। এই সূত্রে বলা প্রয়োজন সাহিত্যিকদের প্রতিনিধি দল কিন্তু গান্ধীজীর সাক্ষাৎ পায় নি, কারণ গান্ধীজীর শরীর ভাল ছিল না। অনেকেই মনে করেছিলেন, শরীরের অজুহাত দেখিয়ে গান্ধীজী এড়িয়ে গেলেন। সেই ভ্রান্ত ধারণা দূর করতে সুভাষচন্দ্র বিবৃতি দিয়েছিলেন। সাবিত্রীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায়ের "সুভাষচন্দ্র ও নেতাজী সুভাষচন্দ্র" বইয়ে পাই, কবি কালিদাস রায় সুভাষচন্দ্রকে প্রশ্ন করেছিলেন, 'বন্দেমাতরম গানটি আপনার সভাপতিত্বেই (আসলে জহরলালের সভাপতিত্বে) আংশিকভাবে বাদ দেওয়া হয়েছে—এতে অবশ্যই আপনার সম্মতি ছিল?' সুভাষচন্দ্র উত্তরে বলেছিলেন, 'হাঁ, আমার সম্মতি না থাকলে আমি নিশ্চয় তার প্রতিবাদ করতাম। শুধু বাংলার দিক থেকে বা বিশেষ কোনো ধর্ম বা জাতির দিক থেকে কোনো বিষয়ের বিচার কংগ্রেস করতে পারে না—আজ সমস্ত সমস্যাকে সর্বভারতীয় দৃষ্টিভঙ্গিতে বিচার করতে হবে। সেইজন্য সর্ববাদীসম্মতভাবে যে-অংশটুকু গৃহীত হয়েছে, তাতে বন্দেমাতরম সঙ্গীতের মর্যাদা কোনোমতে ক্ষুণ্ন হয়নি বলেই আমি মনে করি।'

১০ ঐ ঘরোয়া সভায় উপস্থিতদের মধ্যে ছিলেন, রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়, দীনেশচন্দ্র সেন, খগেন্দ্রনাথ মিত্র, ডাঃ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, যতীন্দ্রমোহন বাগচী, কালিদাস রায়, রমাপ্রসাদ চন্দ প্রমুখ।

দু-একটি কথার বেশি কিছু হওয়ার সম্ভাবনা নেই। দ্বিতীয় সাক্ষাৎ রবীন্দ্রনাথের অস্থায়ী আবাস বরাহনগরে—

> "কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর কলকাতায় আলমী চায়োলেট রশ্মি চিকিৎসা সমাপ্ত করে শুক্রবার সকালে শান্তিনিকেতনে প্রত্যাবর্তন করেছেন। শ্রীযুক্ত সুভাষচন্দ্র বসু কবির সঙ্গে তাঁর শহরতলীর বাসভবনে বুধবার দেখা করতে যান, এবং কবির সঙ্গে এক ঘণ্টা কাটান।১১১

নিঃসন্দেহে বলা যায়, অন্যান্য আলোচনার মধ্যে বন্দেমাতরম প্রসঙ্গও উঠেছিল। বন্দেমাতরম ব্যাপারে উদ্যোগী হতে কবিকে সুভাষচন্দ্র চিঠি লিখেছিলেন, তা আমরা আগে দেখেছি। সেই চিঠির মধ্যে ঠিক কি লেখা ছিল জানি না। পরবর্তীকালে বন্দেমাতরমের অল্পচ্ছেদের ব্যাপারে রবীন্দ্রনাথ ও সুভাষচন্দ্র একমত হয়েছিলেন। এই নিয়ে কবিকে যে সব কঠোর নিন্দা সহ্য করতে হয়েছে, সুভাষচন্দ্র তার জন্য নিশ্চয় দুঃখপ্রকাশ করেছিলেন এবং রবীন্দ্রনাথও নিশ্চয় সুভাষচন্দ্রের যুক্তিযুক্ত মনোভাবে সন্তুষ্ট হয়েছিলেন। বন্দেমাতরমের ব্যাপারে সুভাষচন্দ্রকে স্বমতে দেখতে পাবেন, নিশ্চয় তিনি আশা করেন নি।

আশা করা সম্ভবও ছিল না, সুভাষচন্দ্রের পূর্ব ভূমিকার কথা মনে রাখলে। ইতিপূর্বে অনুভূতিতে ও কর্মে সুভাষচন্দ্র একেবারেই বাঙালী। বাংলাদেশের মাতৃতান্ত্রিক ভাবধারায় তিনি পুষ্ট। তিনি অলজ্জভাবে পৌত্তলিক। সিটি কলেজে সরস্বতী পুজোর আন্দোলনে তাঁর অংশগ্রহণকে বা মান্দালয় জেলে দুর্গাপুজোর জন্য অনশনকে রবীন্দ্রনাথ কী চোখে দেখেছেন, তা অনেক আগে দেখেছি। সুভাষচন্দ্রের রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ-ভক্তি সর্বজ্ঞাত সংবাদ। বঙ্কিমচন্দ্রের সাহিত্যের ভাবে তিনি লালিত সন্তান। বঙ্কিমের রচনার অনুকরণে তিনি নিজের রচনা মক্স করেছেন।১২ তাই বন্দেমাতরম প্রশ্নে রবীন্দ্র-বিরোধিতা তাঁর পক্ষে স্বাভাবিক ছিল। বস্তুত তা হয় নি। রবীন্দ্রনাথ ও জহরলালের সঙ্গেই সুভাষচন্দ্রের মতের মিল দেখা গেল।

কিন্তু বাস্তবিক তা নয়। অনুভূতির ক্ষেত্রে সুভাষচন্দ্র বাকি দুইজনের সঙ্গে এক ভূমিতে ছিলেন না। রবীন্দ্রনাথ ও জহরলাল, তাঁদের উক্তি অনুযায়ী দেখা গেল, বন্দেমাতরমের মধ্যে পৌত্তলিকতা দেখেছেন। ধর্মের বিরুদ্ধে রবীন্দ্রনাথের আপত্তি ছিল না, আপত্তি মূর্তির বিরুদ্ধে। জহরলাল আরও এক কদম বেড়ে ধর্মের বিরুদ্ধেই তাঁর মনোভাবকে উঁচিয়ে ধরলেন। রবীন্দ্রনাথ ও জহরলাল উভয়েই এক্ষেত্রে ব্যক্তিগত কথা বলেছেন। রাজনৈতিক ক্ষেত্রে ব্যক্তিগত ব্যাপার, অন্য বাঞ্ছনীয় নয়, যদি আনা হয় তাহলে ব্যক্তিগত আক্রমণ কিংবা ব্যক্তিগত প্রশস্তি অনিবার্য হয়ে পড়ে। সুভাষচন্দ্র ব্যক্তি জীবনে ধর্ম বা মূর্তি পুজার বিরোধী তো নন-ই, বরং সক্রিয় ধার্মিক। কিন্তু রাষ্ট্রনৈতিক ক্ষেত্রে ধর্মকে টেনে আনতে অনিচ্ছুক। বন্দেমাতরমের অল্পচ্ছেদের সমর্থনে তিনি যে সব কথা বলেছেন (খুবই সংক্ষেপে বলেছেন), তার মধ্যে এক সম্প্রদায়ের অনুভূতির সম্মান রাখতে অন্য সম্প্রদায়ের অনুভূতিতে আঘাত লাগতে পারে, এমন কিছু বলেন নি; সর্বভারতের গ্রহণযোগ্যতার কথাই তুলেছেন। জাতীয় সঙ্গীতকে (এবং জাতীয় পতাকাকে) তিনি এমন পবিত্র 'মূর্তি' ভেবেছেন, পুরো মনের আবেগ নিয়ে যার সম্মুখীন না হলে তা কলুষিত হয়ে যায়।

একটি ক্ষেত্রে সুভাষচন্দ্র সমালোচনা এড়াতে পারবেন না। সংবাদপত্রের বিবরণ অনুযায়ী, তিনি সাহিত্যিকদের আশ্বাস দিয়ে বলেছিলেন, বন্দেমাতরমকে উৎখাত করবার কোনো অভিপ্রায় কংগ্রেস-কর্তাদের মনে নেই। অথচ পরবর্তীকালে দেখা যায়, কংগ্রেস-কর্তারা বন্দেমাতরমকে কার্যত উৎখাত করেছেন, কিংবা ঠিকভাবে বলতে গেলে, 'অন্যতম জাতীয় সঙ্গীত' নামের পেনশন দিয়ে অবসরের আসনে বসিয়ে দিয়েছেন। কংগ্রেস-কর্তারা সুভাষচন্দ্রের অশ্বাসমত পরবর্তীকালে কাজ করেন নি।

এক্ষেত্রে সুভাষচন্দ্রের পক্ষে কেউ হয়ত বলতে পারেন, স্বাধীন ভারতবর্ষে তিনি উপস্থিত ছিলেন না; যদি থাকতেন ও কংগ্রেস থেকে শাস্তিযোগ্যে বিতাড়িত ব্যক্তিটি আদৌ কংগ্রেস-কর্তাব্যক্তিরূপে উপস্থিত থাকতেন কি না সন্দেহ। আমার বিশ্বাস, সুভাষচন্দ্রের পরবর্তী কার্যাবলীর সঙ্গে পরিচিত কেউ ঐ ধরনের কথা বলবেন না, কারণ দেখা যাবে, সুভাষচন্দ্রের নেতৃত্বাধীন আজাদ হিন্দ সরকার বন্দেমাতরমকে জাতীয় সঙ্গীত করে নি। এক্ষেত্রে সুভাষচন্দ্রের কথায় ও কাজে যে ব্যবধান দেখা গেল, তার দায় একমাত্র চাপানো যায় বেচারা সংবাদপত্রের রিপোর্টারের উপরে, যিনি নিশ্চয় ঠিক কথাগুলি উপস্থিত করেন নি।

[ক্রমশঃ]

---

১১১ অমৃতবাজার, ৫ নভেম্বর।

১২ সাবিত্রীপ্রসন্ন তাঁর 'সুভাষচন্দ্র ও নেতাজী সুভাষচন্দ্র' গ্রন্থে নিখিল বঙ্গ যুবসম্মিলনীতে (১৩২৯) সুভাষচন্দ্র কর্তৃক পঠিত ভাষণ উদ্ধৃত করেছেন। তার কয়েক লাইন—

"এমন সুন্দর দেশ, এমন আলো, এমন বাতাস, এমন গান, এমন প্রাণ—আজ মা সত্যই বুঝি ডেকেছেন। ভাই, একবার ধ্যাননেত্রে চেয়ে দেখ, চারিদিকে ধ্বংসের স্তূপীভূত ভস্মরাশির উপর এক জ্যোতির্ময়ী মূর্তি। কি বিরাট, কি মহিমাময়।

শ্যামায়মান বনশ্রীতে নিবিড়কুন্তলা, নদীমেখলা, নীলাম্বর-পরিধানা, বরাভয়বিধায়িনী সর্বংসহা, সদা হাস্যময়ী, সেই ত আমার জননী। শারদ জ্যোৎস্না-মৌলি-মালিনী, শরদিন্দু নিভাননা, অসুরদর্প-খর্ব-কারিণী; মহাশক্তি, চৈতন্যরূপিণী জ্যোতির্ময়ী আজ আমাদের হৃদয়পাদপীঠে তাঁর অরুণরাগরঞ্জিত পাদদুখানি রেখে বলছেন—"মা ভৈঃ জাগ্রহি!"

তরুণের স্বপ্ন ধূলিলুণ্ঠিত এ রকম অনেক অংশই মিলবে।

বর্ণদর্শন

রাজ্যপাল প্রশাসনের ইতিবৃত্ত

আর মাত্র কয়েকদিন পরেই পশ্চিমবঙ্গে নির্বাচিত মন্ত্রিসভা গঠিত হবে। এই সংখ্যার সাপ্তাহিক বসুমতী যেদিন পাঠকদের হাতে পড়বে সেদিন নির্বাচনের ফলাফল প্রকাশিত হয়ে গেছে, এতদিনের বহু জল্পনা-কল্পনার অবসান ঘটেছে। ভারতবর্ষের আগামী ইতিহাস এই মধ্যবর্তী নির্বাচনের ফলাফলকে কেন্দ্র করেই গড়ে উঠবে।

তথাপি যে প্রায় এক বছর পশ্চিমবঙ্গে রাজ্যপালের প্রশাসন একটানা চলল তারও একটা হিসাব-নিকাশ নেওয়া দরকার। এই একটা বছর ধরমবীর অবাধে রাজত্ব করেছেন, পশ্চিমবঙ্গ তাঁর কাছে কি পেল, কি হারাল সে প্রশ্নটা অবশ্যই উঠবে। এবং এখনই হচ্ছে সেই আলোচনার প্রকৃষ্ট অবসর। আগামীকালের ঘটনাবলীতে ধরমবীর হারিয়ে যাবেন, যদি কিছু অঘটন না ঘটে।

একটা সিদ্ধান্তে গোড়া থেকে আসতে কোন বাধা নেই যে, রাজ্যপাল অশ্রু ও বেদনার মধ্য দিয়ে পশ্চিমবঙ্গ থেকে বিদায় নিচ্ছেন না। পশ্চিমবঙ্গবাসীর মধ্যে তিনি কোনই ছাপ রাখতে পারেন নি, দক্ষ প্রশাসকের কোন নিদর্শনই তাঁর শাসনকার্যে খুঁজে পাওয়া যায় নি, তাঁর ব্যক্তিত্বের ছাপও সর্বক্ষেত্রে একান্তই নিষ্প্রভরূপে প্রতিভাত হয়েছে। আসলে তিনি গতানুগতিকভাবে শাসনকার্য চালিয়েছেন, একান্তভাবেই অধীনস্থ আমলাদের ওপর নির্ভর করেছেন এবং সীমাবদ্ধ ক্ষেত্রেও যেটুকু করার ক্ষমতা তাঁর ছিল সেটুকুরও প্রয়োগ তিনি করতে পারেন নি।

ক্ষমতাশীল যুক্তফ্রন্ট সরকারকে উচ্ছেদ করার ব্যাপারে তাঁর ভূমিকা মোটেই পরিচ্ছন্ন ছিল না এবং সেই হিসাবে জনসাধারণের একটা মোটা অংশের কাছেই তাঁর ইমেজটা গোড়া থেকেই ফিকে ছিল। তথাপি রাষ্ট্রপতির শাসন প্রবর্তিত হবার পর কতকগুলি ক্ষেত্রে মানুষ তাঁর কাছ থেকে কিছু প্রত্যাশা করেছিল, বিশেষ করে প্রশাসনিক উৎকর্ষ। এটা আশা করা গিয়েছিল যে, রাজ্যপালের আমলে সরকারী আমলাতন্ত্র রাজনৈতিক দল বিশেষের প্রভাবাধীন না থাকার দরুণ স্বাধীনভাবে কাজ করে তাঁদের অস্তিত্বের যৌক্তিকতা প্রমাণ করতে পারবেন, কিন্তু কার্যত সে আশা পূর্ণ হয় নি।

আসলে রাজ্যপালের প্রশাসন পশ্চিমবঙ্গের রাষ্ট্রনৈতিক ইতিহাসে একটি নতুন পরীক্ষাও ছিল। যাঁরা বলেন একনায়কতন্ত্র বাস্তবক্ষেত্রে নানা সমস্যার দ্রুত সাফল্য নিয়ে আসে, তাঁদের বক্তব্য যে ভ্রান্ত সেকথা প্রতিপাদিত হয়েছে। রাজ্যপালকে অবশ্য একনায়ক বলে চিহ্নিত করতে বাধা আছে, যদিও কার্যত তিনি অনেকটা নিরঙ্কুশ ক্ষমতা ভোগ করার

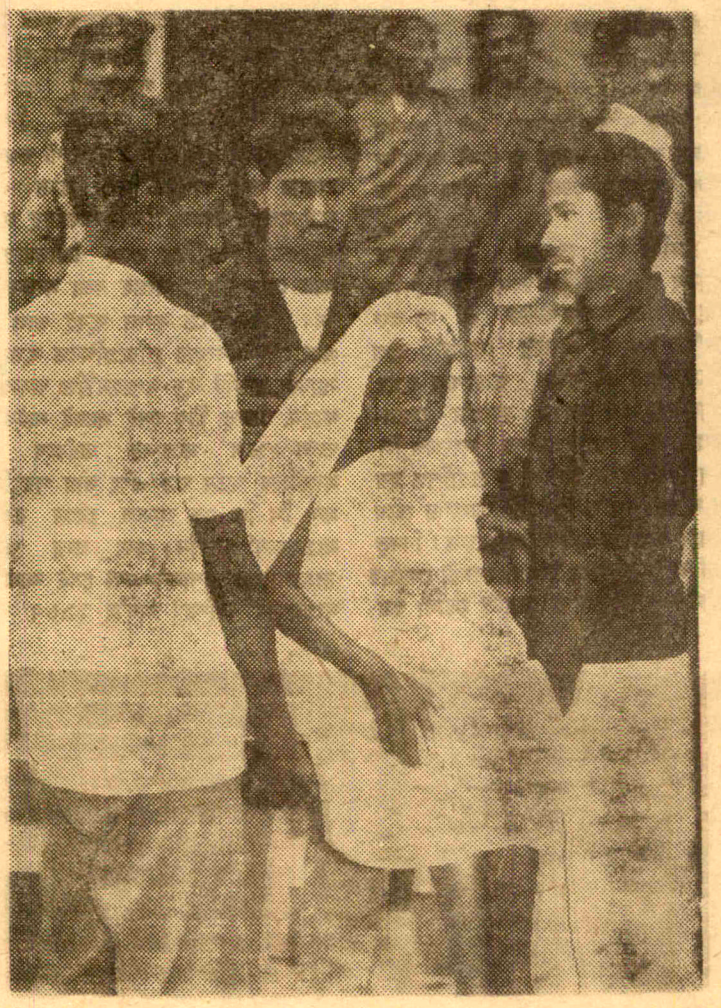

অন্তর্বর্তী নির্বাচনে শ্রীরামপুর কেন্দ্রের ২৫নং ওয়ার্ডে ভোট দিয়ে ফিরছেন ১০৮ বছরের জনৈকা বৃদ্ধা। স্থানীয় সেবচ্ছাসেবকরা একখানি চেয়ারের সাহায্যে তাঁকে ভোটগ্রহণ কেন্দ্রে নিয়ে আসেন।

সুযোগ পেয়েছিলেন যা নির্বাচিত মন্ত্রিসভার ক্ষেত্রে থাকে না। এই ক্ষমতার দ্বারা পশ্চিমবঙ্গকে হয়ত নতুন করে গড়া যেত না, কিন্তু যৎসামান্যও কিছু করা যেত।

আইন ও শৃংখলার ক্ষেত্রে সত্যই আশা করা গিয়েছিল যে, রাজ্যপালের প্রশাসনে অবস্থার উন্নতি হবে, কিন্তু সেই আশা সত্যই মরীচিকায় পরিণত হয়েছে। লুঠতরাজ, খুন, রাহাজানির ঘটনায় রাজ্যপালের প্রশাসন পূর্ববর্তী সকল রেকর্ডকেই ভংগ করেছে। কলকাতা শহরের সাম্প্রতিক যুগের সবচেয়ে চাঞ্চল্যকর ডাকাতির ঘটনা ঘটেছে একাধিক যার কোন কিনারা এখনো পর্যন্ত হয় নি। এ ছাড়া অপরাধমূলক অপরাপর অজস্র ঘটনাসমূহের কিনারা করতে পুলিশ ব্যর্থ হয়েছে। ফসল কাটার সময়ে প্রাপ্য ভাগ নিয়ে ক্ষেতমজুর বা ভাগচাষীর সংগে জোতদার বা জমির মালিকদের যে সব হাংগামা হয়েছে, সে ক্ষেত্রে রাজ্যপালের প্রশাসন খোলাখুলিভাবেই একটি পক্ষ অবলম্বন করেছে। পরিণামে হয়েছে এই যে, বহুক্ষেত্রেই ক্ষেতমজুর ও ভাগচাষীরা তাদের প্রাপ্য ভাগ থেকে বঞ্চিত হয়েছে, এই পর্যাপ্ত ফসলের বছরেও তাদের আগামী অন্নহীন দিনগুলির কথা ভেবে হাহাকার করতে হচ্ছে।

শ্রমশিল্পের ক্ষেত্রেও রাজ্যপালের প্রশাসন রীতিমত ব্যর্থতার নজির দেখিয়েছে। ছাঁটাই, লক-আউট ও লে-অফ পূর্ববর্তী সকল বছরের রেকর্ড ভংগ করেছে, তবে এ বিষয়ে রাজ্যপাল বৃহৎ সংবাদপত্রগুলির পর্যাপ্ত সমর্থন পেয়েছিলেন, শ্রমবিরোধ সংক্রান্ত সংবাদগুলি কোন দিনই বৃহৎ সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয় নি, যদিও কার্যত যুক্তফ্রন্ট আমলের চেয়ে দ্বিগুণ অশান্তি এই ক্ষেত্রে হয়েছে। কিন্তু এতে আইন-শৃংখলা বিপন্ন, দেশটা গোল্লায় যাচ্ছে বলে সোরগোল মোটেই তোলা হয় নি। যুক্তফ্রন্ট আমল হলে হয়ত এই বিষয়গুলিকে উপলক্ষ করে চেঁচিয়ে গগন বিদীর্ণ করা হত; বিভিন্ন ধর্মঘটের যে সব ঘটনা ঘটেছে সেগুলি দেশকে গোল্লায় নিয়ে যাচ্ছে বা সরকার ঐগুলিকে নৈতিক সমর্থন জানিয়ে পবিত্র আইন-শৃংখলার মূলে কুঠারাঘাত করছেন এই প্রচার জগৎ জুড়েই করা হত। রাজ্যপালের আমলে সরকারের শ্রমনীতি চক্ষুলজ্জাহীনভাবে মালিকশ্রেণীর পক্ষে গেছে। সিনেমাগৃহ কর্মীদের ধর্মঘট থেকেই একথা প্রমাণিত হয়। রাজ্যপাল ও তাঁর প্রশাসন এই ধর্মঘটের যৌক্তিকতা স্বীকার করেছিলেন, কিছু করবারও আশ্বাস দিয়েছিলেন, কিন্তু কর্মক্ষেত্রে দেখা গেল যে, তাঁরা হলওয়ালাদের পায়েই আত্মসমর্পণ করেছেন।

খাদ্যনীতির ক্ষেত্রেও ব্যর্থতার চিহ্ন সুস্পষ্ট। পর পর দু' বছর ভাল ফসল হয়েছে, অথচ রেশনে চালের কোটা বৃদ্ধি করতে রাজ্যপালের প্রশাসন সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয়েছে। ১৯৬৭-তে যখন যুক্তফ্রন্ট ক্ষমতায় এসেছিল তার আগের বছর ছিল খরার বছর, ফসলের উৎপাদন অত্যন্ত কম হয়েছিল, তা ছাড়া পূর্ববর্তী কংগ্রেসী শাসকগণ নির্বাচনের মুহূর্তে কিছুই সংগ্রহ করেন নি। কাজেই যুক্তফ্রন্ট ক্ষমতায় আসার সময় ভাণ্ডার ছিল শূন্য এবং যুক্তফ্রন্টের খাদ্যমন্ত্রী ডঃ ঘোষের হৃদয় পরিবর্তনের নীতির ফলে জোতদারদের কাছ থেকে কিছু সংগ্রহ করা সম্ভব হয় নি। ১৯৬৭-তে ফসল খুবই ভাল হয় এবং সেই অবস্থার প্রেক্ষিতে যুক্তফ্রন্ট সরকার একটি দৃঢ় সংগ্রহনীতি অবলম্বন করেন, কিন্তু ঠিক সেই সময়ই নাটকীয়ভাবে ২১শে নভেম্বর তারিখে ওই সরকারের পতন ঘটে এবং তার পর তিন মাস পি ডি এফ আমলে কোন রকমই সংগ্রহকার্য হয় নি। এবং তার পরেই রাজ্যপালের প্রশাসন এবং সেই আমলেও সংগ্রহকার্য নাস্তি। অর্থাৎ ১৯৬৭ সালে প্রচুর ফসল হওয়া সত্ত্বেও মানুষকে কালবাজার থেকে চাল কিনে খেতে হচ্ছে। প্রচুর উৎপাদনের ফলে কালোবাজারে চালের দাম কিছুটা কমে গেছে এবং তার কৃতিত্ব রাজ্যপাল ও তাঁর প্রশাসন কিন্তু দাবি করতে লাজ্জিত হচ্ছেন না। কিন্তু এ পর্যন্ত রেশনে মাথাপিছু চালের বরাদ্দ অপরিবর্তিতই রয়ে গেছে। ১৯৬৮ সালেও যাম্পার ফসল হয়েছে, কিন্তু তা সংগ্রহ করার কোন উৎসাহ রাজ্যপালের প্রশাসনের নেই। আগামী নির্বাচিত সরকারও গদিতে আসবার পর ভাণ্ডার শূন্য দেখবেন। এদিকে যারা ধান-চাল সরকারকে বিক্রয় করতে উদ্‌গ্রীব (যেহেতু একটা বাঁধা ও চলনসই দর পাওয়া যায়) তারাও মাথায় হাত দিয়ে বসেছে এবং জলের দামে মহাজনদের ধান-চাল বেচে দিতে বাধ্য হচ্ছে। রাজ্যপালের প্রশাসন আগামী মার্চ মাস পর্যন্ত খাদ্য সংগ্রহের যে টার্গেট নির্দিষ্ট করেছেন তাতে ভবিষ্যতে রেশনিং-এ চালের সরবরাহ অক্ষুণ্ণ রাখা যাবে না।

শিল্পপতি ও বিদেশী মূলধনের প্রতি রাজ্যপালের প্রশাসন অত্যধিক দরদ দেখিয়েছেন, রাজ্যপালের আমলেই ট্রাম কোম্পানী আগাম কিনে নেওয়ার প্রস্তাব তোলা হয়েছিল, যদিও ট্রাম কোম্পানীর সংগে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের চুক্তি অনুযায়ী কোম্পানীর টিকে থাকার মেয়াদ পূর্ণ হতে আর বেশি দেরি নেই। আগাম কোম্পানী কিনে নিয়ে বিদেশী মূলধনের প্রতি অনাবশ্যক অনুগ্রহ রাজ্যপালের সুনাম মোটেই বৃদ্ধি করে নি। যাই হোক শেষ পর্যন্ত অবশ্য এই প্রস্তাব কার্যকরী হয় নি, যদিও বিদেশী কোম্পানীকে লোকসানের দায় থেকে বাঁচানোর জন্য রাজ্যপালের প্রশাসন ট্রাম ভাড়া দেড়গুণ বর্ধিত করেছেন। ইতিমধ্যে আবার স্টেট বাসেরও ভাড়া বাড়ানো হবে, তার ঘোষণাও হয়ে গেছে। এগুলিই রাজ্যপাল প্রশাসনের পশ্চিমবঙ্গবাসীদের প্রতি বোধ হয় সর্বশেষ উপহার।

সরকারী অপদার্থতা ও নিষ্ক্রিয়তা রাজ্যপালের আমলে যে কিভাবে বর্ধিত হয়েছে তার প্রমাণ পাওয়া যায় বন্যাক্লিষ্ট অঞ্চলগুলিতে সরকারী ত্রাণকার্যের নিদর্শন দেখে। মেদিনীপুরের বন্যায় সরকার কার্যত ছিল নিষ্ক্রিয় দর্শক। দুর্গত এলাকাগুলিতে বন্যা ঘটে যাবার বেশ কিছুকাল পরে নজর দেওয়া হয়েছিল এবং ত্রাণকার্যের বদলে ত্রাণের প্রহসন ঘটেছিল। উত্তরবঙ্গের বন্যার সময় সরকারী নিষ্ক্রিয়তা ও অপদার্থতা সকল সীমা ছাড়িয়ে গেছে এবং এই বিষয়ে রাজ্যপালের ব্যক্তিগত ভূমিকাটাও রীতিমত সমালোচিত হয়েছে এবং তা হচ্ছে একান্তই সংগতভাবে। রাজ্যপালের প্রশাসন যে কার্যত

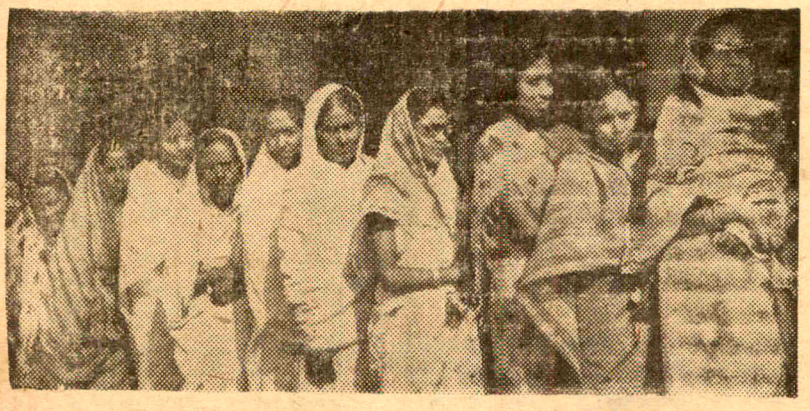

বরাহনগরে ভোটগ্রহণ কেন্দ্রের সামনে মহিলা ভোটারদের লাইন

ফাগুন লাগার দিনে

চলতে পায়ের আরাম, চমৎকার খোলামেলা গড়ন, ছিমছাম
মনোরম স্টাইল...বাটার এই সব স্যান্ডাল বা চপ্পলে নিজেকে
আপনি অনেক বেশি পরিচ্ছন্ন এবং স্বচ্ছন্দ বোধ করবেন।
ফোমের ওপর-চামড়া, তেমনি মোলায়েম আর মজবুত সোল—
প্রত্যেক পদক্ষেপে আশ্চর্য আরাম। স্টাইলের বহুমুখী
বৈচিত্র্য এদের আরেকটি বৈশিষ্ট্য। আজই এসে দেখে যান বাটার দোকানে
স্যান্ডাল ও চপ্পলের ন্যনাবিধ সুদর্শন নকশা।

Bata

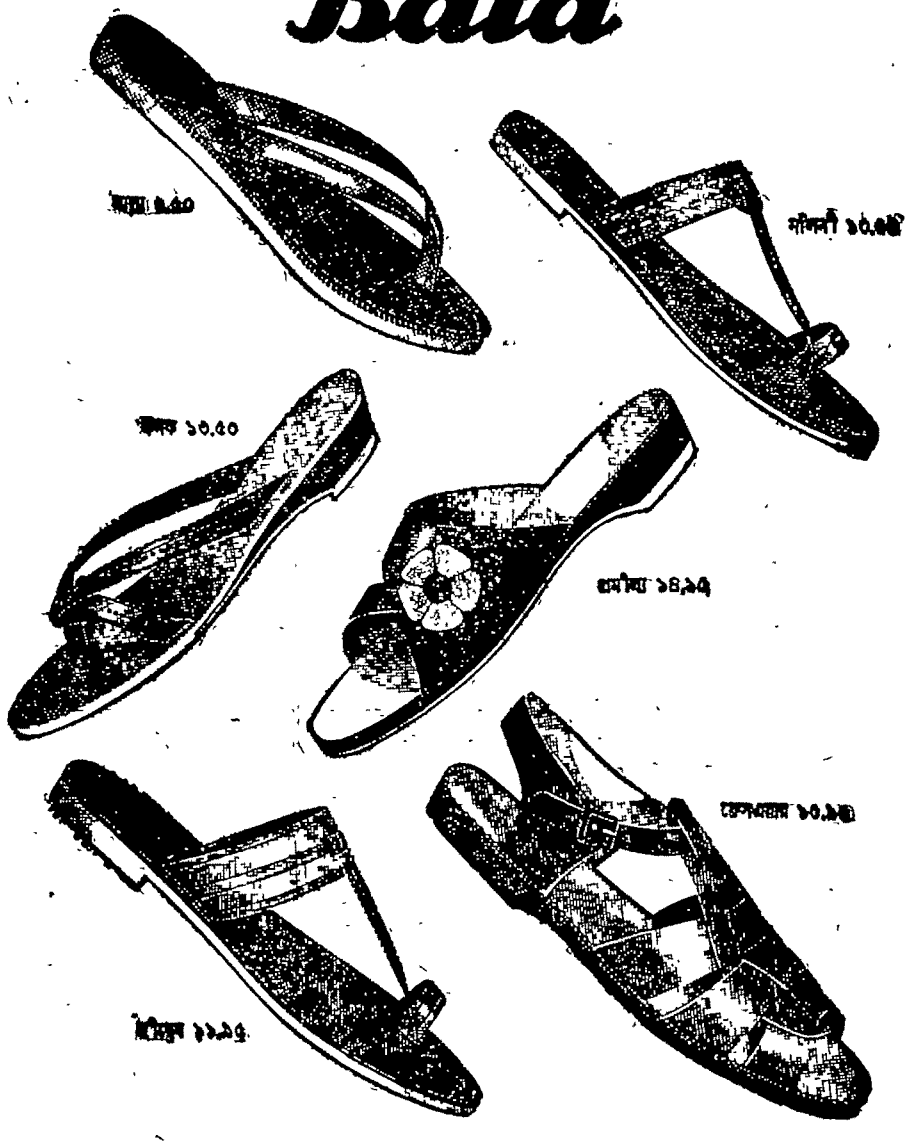

শূন্যগর্ভ কলস জলপাইগুড়িই তা প্রমাণ করে দিয়েছে। এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা নিরর্থক।

রাজ্যপালের সর্বশেষ বিষয়টি হচ্ছে কলকাতাকে অবাঙালী ব্যবসায়ীদের হাতে তুলে দেবার চক্রান্ত। কলকাতা উন্নয়নের নামে শিল্পপতিদের দ্বারা একটি ডেভালাপমেন্ট ব্যাঙ্ক গঠিত হতে চলেছে যে প্রতিষ্ঠান কলকাতার আশেপাশে উপনগর নির্মাণ করে কলকাতাকে হালকা করবে এবং এই উপনগরীগুলিতে সেই সকল ভাগ্যবান ব্যক্তিই বসবাসের উপযোগী বলে গণ্য হবেন যাঁরা এই ডেভালাপমেন্ট ব্যাঙ্কের মাধ্যমে আসবেন। এদিকে কলকাতা উন্নয়নের নাম করে কলকাতার দরিদ্র অঞ্চলগুলিকে অসুন্দরতার অপবাদে মাটিতে সমান করে দেওয়া হবে। ইতিমধ্যেই কলকাতা থেকে বাঙালী বিতাড়িত হতে চলেছে. এই প্রচেষ্টা সেই কাজকে আরও ত্বরান্বিত করবে। এবং এর পরেই কলকাতাকে কেন্দ্রের প্রত্যক্ষ শাসনাধীনে আনার চেষ্টা হবে। এই বিষয়টি আমরা ইতিমধ্যে বেশ কয়েকবার বঙ্গদর্শনে আলোচনা করেছি।

চূড়ান্ত বিশ্লেষণে দেখা যায় যে, ধরমবীর পশ্চিমবঙ্গে 'পুয়োর শো' দিয়েছেন। বস্তুত তাঁর কাছ থেকে পশ্চিমবঙ্গবাসী যা আশা করেছিল তা পূর্ণ করার তাঁর পক্ষে সম্ভব হয় নি এবং যেটুকুও সম্ভব ছিল তাও তিনি করতে অক্ষম হয়েছেন। প্রশাসনের ক্ষেত্রে তিনি প্রাণ ও গতিবেগের সঞ্চার করতে ব্যর্থ হয়েছেন। সেখানকার আবর্জনাও তিনি মুক্ত করতে পারেন নি। অপরাপর ক্ষেত্রেও তিনি গতানুগতিকভাবেই চলেছেন এবং সে চলাটাও আশানুরূপ নয়। বস্তুত এই শাসনের যৌক্তিকতা কি ছিল সেটাই বুঝে ওঠা দুষ্কর। রাজ্যপালের প্রশাসনের যে অভিজ্ঞতা পশ্চিমবঙ্গের হয়েছে তাতে মনে হয় যে এই রকম শাসন সম্পর্কে আর কোন মোহ জনসাধারণের নেই।

স্নাতকোত্তর পরীক্ষা

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতকোত্তর পরীক্ষাগুলি কয়েকদিন হল শুরু হয়েছে, কিন্তু ইতিমধ্যেই সেখানে কিছু অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটেছে যা ছাত্রসমাজের মোটেই মুখ উজ্জ্বল করে নি। কমার্স পরীক্ষার একটি পেপার কঠিন হবার অপরাধে পরীক্ষার্থীদের একটি শ্রেণী পরীক্ষা ভণ্ডুল করে দেয়। এম-এ ও এম-এসসির অঙ্কের একটি পেপারেরও পরীক্ষা এই কারণে ভণ্ডুল হয়ে যায়। পরীক্ষার্থীদের এই আচরণকে সমর্থন করার কোন কারণ আমরা দেখতে পাই না, বিশেষ করে স্নাতকোত্তর পরীক্ষাগুলির ক্ষেত্রে। কেন না আশা করা হয় যে, যাঁরা মাস্টার্স ডিগ্রি অর্জন করতে বসেছেন তাঁদের পাঠ্য বিষয়ের সবটুকুই জানা উচিত, কাঠিন্যের জন্য হল থেকে উঠে আসা বা পরীক্ষা ভণ্ডুল করে দেওয়া তাঁদের পক্ষে শোভা পায় না। সবচেয়ে দুঃখ ও লজ্জাজনক ব্যাপার হচ্ছে এই যে, মুষ্টিমেয় কয়েকজন ছাত্রের এই রকম দুর্বুদ্ধিতার জন্য কয়েক শত ছাত্র-ছাত্রীর একটা বছর নষ্ট হল, যাঁরা সত্যই পরীক্ষা দিতে চেয়েছিলেন। প্রশ্নপত্র যদি সত্যই উত্তর দেবার পক্ষে মারাত্মক কঠিন হয়ে থাকে তাহলে পরীক্ষার্থীরা ন্যায়সঙ্গতভাবে এই বিষয়ে কর্তৃপক্ষকে অবগত করাতে পারতেন, যার কিছু ফলও হত, হয়ত খাতাগুলি লিবারাল করে দেখার নির্দেশ দেওয়া হত এবং সামগ্রিকভাবে সকলেই উপকৃত হতেন। দুর্ভাগ্যের বিষয়, ঘটনা দৃষ্টে মনে হয় যে, কতিপয় ছাত্রের পরীক্ষা দেবার চেয়ে না দেবার প্রবণতাটাই বেশি ছিল এবং তারাই গুণ্ডামী করে শুধু নিজেদেরই নাক কাটে নি, পরেরও যাত্রাভঙ্গ করেছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে আমরা এ বিষয়ে কঠোর মনোভাব গ্রহণের দাবি জানাবো, যাতে এই পরীক্ষা ভণ্ডুলের পাপ চিরকালের জন্য বিদায় হয়।

এই পরীক্ষা ভণ্ডুলের মনস্তত্ত্বটাও আলোচনা করার প্রয়োজন আছে। একটা বিষয় পরিষ্কার যে প্রশ্নগুলি সত্যই কঠিন হয় নি. আসলে যা হয়েছে তা হচ্ছে এই যে, তৈরি করা প্রশ্নগুলি এবারে ওই পেপারগুলিতে আসে নি। বস্তুত স্নাতকোত্তর পরীক্ষায় কিছু প্রশ্ন তৈরি করে জুয়া খেলার প্রবৃত্তি বহু ছাত্রের মধ্যেই শিকড় গেড়ে বসেছে এবং এই প্রবৃত্তিতে ইন্ধন জুগিয়েছেন কিছু অলস প্রকৃতির অধ্যাপক যাঁরা পড়াশোনা করানোর চেয়ে অপরাপর বিষয়ে বেশি মনোযোগী এবং শেষ মুহূর্তে ছাত্রদের কিছু প্রশ্ন সাজেস্ট করে দিয়েই যাঁরা দায়িত্ব পালন করা হয়ে গেছে বলে মনে করেন। সেই প্রশ্নগুলি দৈবাৎ পরীক্ষায় না এলেই দক্ষযজ্ঞ ব্যাপার। সমস্যাটা এখানেই। বিশ্ববিদ্যালয়ের পঠন-পাঠনের ক্ষেত্রে মানের অবনতি হয়েছে, বাস্তবিকই কিছু সংখ্যক অধ্যাপক এর জন্য দায়ী। কাজেই যদি প্রতি বছরে এই একই পাপের পুনরাবৃত্তি রোধ করতে হয় তাহলে শিক্ষারীতির মধ্যে এই ফাঁকিবাজিটা বন্ধ করা প্রয়োজন।

ব্যাপারটা একতরফা না ঘটলেও ছাত্রদের পক্ষ থেকে এই অপকর্ম কিন্তু কোন যুক্তিতেই সমর্থন করা যায় না। আর তাছাড়া মাত্র কয়েকটি প্রশ্ন-মুখস্থ করে বরাত ঠুকে পরীক্ষায় বসব, লেগে গেল তো ভালই, না লাগলে পরীক্ষা ভণ্ডুল করে দেব, আশা করি কোন সুস্থ মস্তিষ্ক মানুষ এই রকম নীতিহীন ব্যাপারে সায় দেবেন না। এই ফাঁকি দিয়ে পাশ করার মনোবৃত্তি স্নাতকোত্তর পরীক্ষাগুলির সুনামও বহুলাংশে হ্রাস করছে। কাজেই এই মনোবৃত্তির যাতে বিস্তার না ঘটে সেদিকেও বিশেষ দৃষ্টি দেওয়া প্রয়োজন। পরীক্ষা আর যাই হোক জুয়া খেলা নয়। এই বোধটা যাতে প্রত্যেকেই উপলব্ধি করতে পারে প্রশ্নপত্রও সেইভাবে করা উচিত। একটি বছর নষ্ট হবার ক্ষতি বড় কম নয়। প্রশ্নপত্র কঠিন হয়েছে বলে যারা প্রশ্ন ভণ্ডুল করেছে তারা নিজেদের ক্ষতি করে নি, ক্ষতি করেছে সেই সব হতভাগ্যদের যারা সত্যই পড়াশোনা করেছিল। এই ঘটনার পুনরাবৃত্তি যে কোন ভাবেই হোক রোধ করতে হবে

বিশ্ববিশ্রুত বৈজ্ঞানিকের ওপর প্রতিহিংসা ?

সংবাদটি পাঠ করে আমরা ক্ষোভে, দুঃখে ও লজ্জায় মর্মাহত হয়েছি যে, বিজ্ঞানজগতের চিরকালীন গর্ব, বিশ্বদরবারে ভারতের মুখোজ্জ্বলকারী সন্তান, জাতীয় অধ্যাপক শ্রীসত্যেন বসুকে রাজনৈতিক প্রতিহিংসার বলি হতে হচ্ছে এবং এও আমাদের দেখতে হবে। অধ্যাপক সত্যেন বসুর ওপর রাজনৈতিক প্রতিহিংসা কথাটি ভাবতেই অনেকে বিস্ময়বোধ করবেন, কেন না অধ্যাপক বসু কোনদিনই রাজনীতির জগতের মানুষ নন, তিনি নিভৃত বিজ্ঞানসেবক মাত্র। তাঁর অপরাধ এই যে, তিনি নাকি ডঃ প্রফুল্ল ঘোষ মন্ত্রিসভার কাজকর্মের সমালোচনা করেছিলেন।

ফলে তাঁকে জাতীয় অধ্যাপকের পদ থেকে বিদায় নেওয়ানোর জন্য তৎপরতা চলছে এবং সে বন্দোবস্তও প্রায় পাকা। অধ্যাপক সত্যেন বসুর এই 'অপরাধ' এবং এই ঘটনার পরেও কি আমাদের বলতে হবে যে, আমাদের দেশে গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা চালু রয়েছে ? শুধু মাত্র সরকার-বিরোধী মত পোষণ করার জন্য জগদ্বিখ্যাত এই বিশ্ববরেণ্য বৈজ্ঞানিককে যদি ভাতে মারা হয় তাহলে আমাদের আগামী দিনগুলির কথা চিন্তা করতেও ভয় হয়। ভারতবর্ষে বোধ হয় ব্যাপকভাবে বুদ্ধিজীবী নিগ্রহের প্রচেষ্টা শুরু হচ্ছে এবং জাতীয় অধ্যাপক শ্রীসত্যেন বসুই বোধ হয় এই নিগ্রহের প্রথম বলি হতে চলেছেন। নির্বাচনের ফলাফল ঘোষিত হবার পরে যাঁরা সরকারের ধামাধরা লোক হবেন না, তাঁদের কপালে যে কি আছে তা ভাবতে গেলেও শিউরে উঠতে হয়।

গ্রাম-গ্রামান্তর

গাঁয়ের দিকে তাকান

গ্রাম-বাংলায় ভোটের ঘটা শেষ হয়েছে। গত কয়েক সপ্তাহ যাবৎ ভোটের প্রচার-যুদ্ধে গ্রাম-বাংলার সব সমস্যা ধামা চাপা পড়ে গিয়েছিল। কারণ ভোট নিয়ে প্রার্থীরা তো বটেই, তাঁদের অনুগামীরা এত ব্যস্ত ছিলেন যে, কোন সমস্যার কথা তাঁদের কাছে তুললেই তাঁরা পরিষ্কার ভাষায় জানিয়েছিলেন যে, তাঁদের হাতে ক্ষমতা এলে তাঁরা সে সমস্যা সমাধানে নিশ্চয়ই সচেষ্ট হবেন। প্রার্থীদের যে সব আশ্বাস বা প্রতিশ্রুতি আর যাঁরাই ভুলে যান না কেন, আমরা তো ভুলতে পারব না। কারণ আমরা ভোট দিয়েই যোগ্য প্রার্থীকে নির্বাচিত করে পাঠিয়েছি এবং প্রার্থীরা সকলেই গ্রামের হাওয়া এবারে নিশ্চয়ই মনেপ্রাণে উপলব্ধি করে গেছেন এবং গ্রামের মানুষ যে এবার খুবই সচেতন ও সজাগ তা তাঁরা নিশ্চয়ই প্রত্যক্ষ করেছেন। এ বিষয়ে কোন সন্দেহই নেই, অবহেলিত গ্রাম-বাংলার লক্ষ লক্ষ মানুষের দুর্দশা প্রতিকারের এখনও যদি কোন ব্যবস্থা না করা হয়, শিয়াল-কুকুরের মতো নিরীহ দরিদ্র মানুষগুলিকে আবার যদি মৃত্যুর মুখে ঠেলে দেওয়া হয়, তা হলে তার পরিণাম আগামী দিনে বিষময় হয়ে উঠবে। আশা করি গ্রাম-বাংলা থেকে নির্বাচিত প্রার্থীরা গ্রামের মানুষের কথা মনেপ্রাণে উপলব্ধি করে সরকারের নীতি ও কাজকে সত্য-সত্যই গ্রাম-মুখো করবার চেষ্টা করবেন।

এখনই যে সমস্যাটিতে দৃষ্টি দেওয়া উচিত সেটা নিয়েই আলোচনা করছি।

শীত শেষ হল। এর পর আসছে গ্রীষ্ম। গরমের দিনে গ্রাম-বাংলার মানুষকে যে জিনিষটার ওপর সবচেয়ে বেশি নির্ভর করতে হয় তা হলো—পানীয় জল। গ্রীষ্মের প্রচণ্ড উত্তাপে গ্রাম-বাংলার মাটি ফেটে চৌচির হয়ে যায় এ কথা বললে ভুল হবে না। গত বছর গ্রীষ্মে পুরুলিয়া ও বাঁকুড়া জেলার মানুষের যে দুর্গতি হয়েছিল তা আজও অনেকের স্মরণে আছে। ইতিমধ্যেই গ্রাম-বাংলার নদী-নালাগুলোর জল শুকতে আরম্ভ করেছে। কোন কোন জায়গায় মাটি খুঁড়ে জল বার করবার কাজ শুরু হয়ে গেছে। গ্রীষ্মের প্রচণ্ড উত্তাপে গ্রাম-বাংলার মানুষের কাছে পানীয় জল যেমন প্রয়োজন তেমনি প্রয়োজন সেচের জল। কারণ সেচব্যবস্থা ঠিক করে না হলে রবি শস্যের ফলন একেবারেই হবে না। তা ছাড়া রবিশস্যের মধ্যে গম চাষ বাংলা দেশে যে পরিমাণে বৃদ্ধি পাচ্ছে তাতে সেচের জল অবিলম্বে প্রয়োজন। গম চাষে অন্ততপক্ষে তিনবার সেচ ব্যবস্থা চালু রাখতে হয় তা না হলে গাছে ফল জন্মাবে না, ফলে গাছগুলো অকালে জলাভাবে মারা যাবে। গত বছর গ্রাম-বাংলার চাষী জলাভাবে যে জিনিষটায় সবচেয়ে বেশি মার খেয়েছে তা হলো পাট। পশ্চিম বাংলার কোন জেলাতেই পর্যাপ্ত পাট গত বছর উৎপন্ন হয় নি। চাষী পাট চাষ করে দুটো নগদ পয়সার মুখ দেখবার জন্য আশায় বুক বাঁধে। কারণ এই পাটের পয়সা থেকে চাষী আসন্ন দুর্গাপুজোয় ছেলে-মেয়ের জামা-কাপড় ইত্যাদি কেনে। কিন্তু গত বছর চাষীর সে আশা পূরণ হয় নি। পূরণ হয় নি তার জন্য অবশ্য পাট-চাষ হয় নি বলেই বলা চলে। তা ছাড়া ঐ সময় খাদ্যের ব্যাপারে গ্রাম-বাংলার মানুষকে যে অসুবিধা ভোগ করতে হয়েছে তাও নিরানন্দ জীবনের জন্য দায়ী।

এখন থেকে যদি খাল-বিল-পুকুর ইত্যাদির জল শুকাতে আরম্ভ করে তা হলে চৈত্র-বৈশাখ মাসে অবস্থা কি দাঁড়াবে তা এখন থেকে গ্রাম-বাংলার মানুষ ভাবতে শুরু করেছে।

গ্রামে নলকূপ বা কুয়োর সংখ্যা যা আছে তা প্রয়োজনের তুলনায় কম। কাজেই যখন জল শুকিয়ে যাবে তখন যে সমস্ত জায়গায় আজও নলকূপ বা অন্য কোন ব্যবস্থা হয় নি সেই সব এলাকার মানুষকে কিভাবে জীবন যাপন করতে হবে তাও এখন চিন্তার বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। অবশ্য যদি প্রকৃতি দেবী সদয় হন তাহলে আলাদা কথা। পাট চাষ না হলে দেশের অর্থনীতি কোন্ অবস্থায় গিয়ে দাঁড়াবে তাও চিন্তার বিষয়। আবার গম চাষ না হলে আমাদের খাদ্য সমস্যার সমাধান হবে কোন পথে তাও ভাববার কথা। রবিশস্য চাষের সেচের ব্যবস্থা করতে হলে এখন থেকেই গ্রাম-বাংলার বিভিন্ন মজে-যাওয়া খাল-বিল-নদী ইত্যাদির আশু সংস্কার করা প্রয়োজন। তা ছাড়া গ্রাম-বাংলার মানুষ যাতে প্রচণ্ড গ্রীষ্মে পানীয় জলের জন্য হাহাকার না করে তার জন্য প্রতি গ্রামে দুটি বা চারটি করে লোক সংখ্যা অনুপাতে নলকূপ স্থাপন করার কাজ এখন থেকেই শুরু করা দরকার, তাহলে গত বছরে বাঁকুড়া ও পুরুলিয়া জেলার মানুষ যে কষ্ট পেয়েছে তা দূর করা সম্ভব হবে।

গ্রাম-বাংলার অসংখ্য নদী আজ সংস্কারের অভাবে শুকিয়ে মরে যাচ্ছে। কোন কোন জায়গায় চাষীরা পাইপের সাহায্যে জল বার করবার চেষ্টা করছে। জলের জন্য এখন থেকেই যদি মাটি খুঁড়তে হয়, তা হলে আরো যখন দিন ঘনিয়ে আসবে তখন কি অবস্থা দাঁড়াবে তা ভাবতেও ভয় লাগে।

নির্বাচনের পর যে সরকারই হোক প্রথমে তাঁদের গ্রাম-বাংলার পানীয় জল ও সেচ ব্যবস্থার ব্যাপক উন্নয়ন করতে হবে। উন্নয়নের জন্য টাকা বরাদ্দ করলেই হবে না কাজ ঠিক সুষ্ঠুভাবে এগিয়ে চলছে কি না সেদিকেও সবিশেষ দৃষ্টি রাখতে হবে। তা না হলে একদিকে যেমন খাদ্যোৎপাদন ব্যাহত হবে, অপর দিকে তেমনি গ্রামের মানুষের দুর্দশার অন্ত থাকবে না।

—সমর মুখোপাধ্যায়

ভারত দর্শন

'কোয়ালিশন'—একটি অবস্থা বুঝে ব্যবস্থা

চতুর্থ নির্বাচনের আগে ব্যাপকভাবে ভারতবর্ষের বিভিন্ন রাজ্যে কোয়ালিশন সরকারের সম্ভাবনা কখনো দেখা দেয় নি। কিন্তু চতুর্থ নির্বাচনের নাসারিক রায়ে কংগ্রেসী মহীরুহ পতনের সঙ্গে সঙ্গে অভূতপূর্ব কোয়ালিশন সরকারের প্রশ্নটি কংগ্রেস দলকেও ভাবিত করে তুলেছিল। কংগ্রেস তার বনেদীয়ানা বজায় রাখার জন্য 'কোয়ালিশন' সরকার গড়বার না বলেও শেষ পর্যন্ত অনেকক্ষেত্রেই কথা রাখতে পারে নি। তাকেও সংখ্যালঘু মন্ত্রিসভার সঙ্গে কোয়ালিশনে বসতে হয়েছে কথার খেলাপ করে। এর দ্বারা কংগ্রেসের মর্যাদা যে ম্লান হয়েছে তাতে সন্দেহের অবকাশ নেই। তবে কংগ্রেস হয়ত বলবে দেশের বাস্তব অবস্থা বুঝেই তাকে ঐ ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হয়। অন্তত এ ছাড়া দ্বিতীয় বক্তব্য কংগ্রেসের নেই। তবে গত নির্বাচনের আগে ধাক্কাটা কেমন হবে কংগ্রেস তা সঠিক অনুমানে অপারগ ছিল বলেই 'কোয়ালিশন-এ বসব না' একথা যত সোচ্চারে বলতে পেরেছিলেন মধ্যবর্তী নির্বাচনের প্রাক্কালে কণ্ঠস্বরে অনুরূপ বল আর লক্ষ্য করা যাচ্ছে না। তথাপি কংগ্রেস সভাপতি বা অতুল্য ঘোষ প্রমুখ নেতৃবৃন্দ এবারও বলেছেন, কোয়ালিশন সরকার গঠন করা হবে না।

প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী গান্ধী কিন্তু অতটা সোচ্চার হতে দ্বিধা করেন। শ্রীমতী গান্ধীর বক্তব্য : ব্যাপারটা বাস্তব অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে বিচার্য। নীতির প্রশ্নেও তাই।

অবস্থা বুঝে ব্যবস্থা হিসেবে কোয়ালিশন সরকারের অর্থ অস্পষ্ট নয়। কিন্তু সাংবাদিকগণের প্রশ্ন ছিল : নীতির দিক দিয়ে কোয়ালিশনে প্রধানমন্ত্রীর সমর্থন আছে কি না। প্রধানমন্ত্রী বলেছেন, সেটা বাস্তব পরিস্থিতিনির্ভর। প্রশ্ন হল, বাস্তব রাজনৈতিক পরিস্থিতি কি নীতির ওপরও খবরদারি করবে! নীতি কি গদির সঙ্গে সমঝোতা করবে!

কংগ্রেস সভাপতি জোর দিয়ে বলেছেন, কোন অবস্থাতেই কংগ্রেস অন্য দলের সঙ্গে কোয়ালিশন করবে না।

কিন্তু ঠিক সেই মুহূর্তেই তিনি বলছেন, নির্বাচনের পর হাই কম্যাণ্ড এ বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবে।

কোয়ালিশনের ক্ষেত্রে সুতরাং ঠিক কোন নীতিকেই অবলম্বন বা অনুসরণ করা হবে, এমন কথা কেউ জোর দিয়ে বলতে অক্ষম। নির্বাচনের ফলাফল না জেনে গদি সম্পর্কিত কোন কথা দিয়ে রাখতে আজ আর ভরসা নেই কারও।

গদি-আকৃষ্ট রাজনীতিতে নীতির বালাই রাখলে, বস্তুতই বে-ফায়দা লোকসানের ভাগী হতে হয়। প্রধানমন্ত্রী তাই কোন ভবিষ্যদ্বাণীর ধার-কাছ ঘেঁষে যেতে চান নি। তিনি যথার্থ বাস্তব অবস্থার মর্যাদা বুঝেছেন। 'কোয়ালিশন' ব্যাপারে মধ্যেই যে সমঝোতার ঘ্রাণ আছে, তা সুবিধাবাদের অস্তিত্বই সপ্রমাণ করে। আজকে দেশব্যাপী বাস্তব অবস্থা হল সুবিধাবাদী। প্রধানমন্ত্রী নীতির প্রশ্নেও সেই বাস্তব অবস্থার ওপরই নির্ভর করতে চেয়ে অপ্রিয় সত্যকেও বিশেষ মর্যাদা দান করেছেন।

মাদ্রাজ :

দাদা আমার বিদায়

মাদ্রাজে ডি-এম-কে দল রাজ্যবাসীর মনে যে আসনই পেতে থাক, উত্তর-স্বাধীনতা যুগে স্বর্গত মাদ্রাজী নেতা সি· এন· আন্নাদুরাই-এর মত জনপ্রিয়তা এ পর্যন্ত আর কারও ভাগ্যে জোটে নি। মৃত্যুর সঙ্গে রীতিমত সংগ্রাম করেও সেই জনপ্রিয় দাদা আন্নাকে ধরে রাখা যায় নি। সাশ্রুনেত্রে অকুণ্ঠ মাদ্রাজবাসী তাঁকে যথারীতি সম্মানের সঙ্গে সমাধিস্থ করে তাঁর বিয়োগ-বেদনায় মুহ্যমান হয়ে পড়েছেন। সেই সঙ্গে প্রিয়জনবিয়োগের নিদারুণ আঘাত নেমে এসেছে আরও একাধিক পরিবারে। কেন না লোকান্তরিত প্রিয় নেতাকে শেষ শ্রদ্ধা নিবেদন করতে গিয়ে প্রাণ দিয়েছেন কমপক্ষে চল্লিশজন নর-নারী। কেউ জনস্রোতে পিষে মরেছেন, কেউ বা মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়েছেন পুলিশ বুলেটের আঘাতে।

একটিমাত্র নির্বাচনে সমগ্র রাজ্যে কংগ্রেসকে হটিয়ে দিয়ে সর্বাত্মকভাবে রাজ্যবাসীর ওপর প্রভাবের বাস্তব পরিচিতি রেখে গেছেন আন্না। প্রাথমিকভাবে তাঁর রাজনৈতিক মোহ ছিল সংকীর্ণ পরিসরের ওপর প্রতিষ্ঠিত। মাদ্রাজবাসীর মাতৃভাষার প্রতি বিস্ময়কর প্রীতি যা ভারতে অন্যত্র কোথাও পরিলক্ষিত হয় না। আন্নার এবং তাঁর দলের প্রতিষ্ঠার মূলে ছিল সেই মাতৃভাষা-প্রীতি। কিন্তু আন্নাদুরাই ক্ষমতালাভের পর কেবলমাত্র ভাষাকে আঁকড়েই পড়ে থাকতে পারেন নি, তাঁর কর্মক্ষেত্র বহত্তর এবং সর্বভারতীয় রাজনৈতিক অঙ্গনে প্রবেশের পথ খুঁজেছে। শাসনতান্ত্রিক এবং ভারতে যুক্তরাষ্ট্রীয় সমস্যাগুলি আন্নাদুরাই সরকারের দৃষ্টি আকৃষ্ট করেছে। আন্নাদুরাই-এর নেতৃত্বে ডি-এম-কে দল, জনপ্রিয়তার শীর্ষদেশে অত্যল্প কালের মধ্যে অতি দ্রুততার সঙ্গে অধিকার করেছে।

অথচ মুখ্যমন্ত্রীরূপে আন্নাদুরাই সুস্থ শরীরে রাজ্য পরিচালনার সুযোগ পেয়েছিলেন মাত্র বছরখানেক। তেইশটি দ্রুত পলাতক মাসের মধ্যে প্রায় অর্ধেকটাই অতিবাহিত হয়েছিল, ভগ্নস্বাস্থ্য পুনরুদ্ধারের প্রয়াসে। দলের ক্ষেত্রেও এই তেইশ মাস নিতান্তই স্বল্প সময়। বিশেষ যে দল বিশেষ কোনো রাজনৈতিক ভাবাদর্শ দ্বারা পরিচালিত নয়। সরকার স্থাপনাকালে আন্নাদুরাই নিজেই সকিনয়ে বলেছিলেন যে, সরকার পরিচালনার ব্যাপারে তাঁর দলের অভিজ্ঞতা কম। তাছাড়া তাঁর দলের নেতৃবৃন্দ অধিকাংশই অপেক্ষাকৃত তরুণ। বস্তুত

আন্নাই ছিলেন ডি-এম-কে দলের একমাত্র নেতা যাঁর মুখ চেয়ে সমগ্র দলটি ও সমুদয় রাজ্যবাসী নতুন পথে পা বাড়াতে সাহসী হয়েছেন। ১৯৬৭-র আগে মাদ্রাজের বাইরে সাধারণ মানুষ আন্নাদুরাইকে বিশেষ চিনতেন না, '৬৭-র নির্বাচনের পর ভারতের বাইরেও তাঁর ও তাঁর নেতৃত্বভোগী দলের নাম প্রচারিত হয়ে গেল। আজকের তামিলনাড়ুর সঙ্গে আন্না ও ডি-এম-কে ইতিহাসে স্থান পেয়ে গেলেন।

সেই এমন এক অস্বিতীয় নেতাকে হারিয়ে ডি-এম-কে তথা তামিলনাড়ু নিজেদের কতদূরে অসহায় বোধ করছেন, আমরা তা কল্পনায় অনুভব করার চেষ্টা করলে সে রাজ্যে আজ বস্তুত এক সঙ্কট মুহূর্ত উপস্থিত বলে ধারণা করা যায়। এই সঙ্কট প্রধানত ডি-এম-কে'র এবং ডি-এম-কেই যেহেতু রাজ্যের শাসক সেজন্য তামিলনাড়ুর রাজনৈতিক আকাশেও সংকটের আবির্ভাব হয়েছে বড়দা আন্নার মৃত্যুতে।

ডি-এম-কে'র সামনে এখনো সুদীর্ঘ তিন বছরের কঠিন দায়িত্ব যা রাজ্যবাসী '৬৭-র নির্বাচনে তাঁদের ওপর অর্পণ করেছেন। ভারতে একমাত্র তামিলনাড়ুই আজ সুস্থ ও স্থায়ী সরকারের নিদর্শন। জনগণ রাতারাতি এই সরকারকে গদি-নসীন করেছেন, গণতান্ত্রিক ভারতের ইতিহাসে এক অভূতপূর্ব নজীর সৃষ্টি করে।

আন্নার লোকান্তরে মুখ্যমন্ত্রীর শূন্য আসনে অস্থায়িভাবে শ্রীযুত নেডুনচেঝিয়ানের নির্বাচন আঞ্চলিক স্লোগানের ওপর প্রতিষ্ঠিত দলের আপাতত ভারসাম্য রক্ষারই লক্ষণ, কেন না শ্রীনেডুনচেঝিয়ান মডারেটপন্থীরূপেই পরিচিত। কিন্তু ডি-এম-কে দলে গোষ্ঠীমতবাদ প্রাধান্য অন্যতর সমস্যা। শ্রীনেডুনচেঝিয়ান তাঁর ভক্তবৃন্দের আস্থার ওপরই প্রধানত নির্ভরশীল। বয়সেও তিনি প্রবীণ এইমাত্র তাঁর ব্যক্তিগত সুযোগ। কিন্তু দলনেতৃত্বে সেই সাংগঠনিক ক্ষমতাই আসল যা একজনকে ক্ষমতার শীর্ষে প্রতিষ্ঠিত রাখে। এই সাংগঠনিক প্রতিভা যাঁর সর্বাপেক্ষা, দলনেতা হিসেবে ডি-এম-কে'কে তেমনই নেতা বরণ করে নিতে হবে। ভারতের রাজনীতিতে ব্যক্তিপ্রভাবও বিশেষ ক্রিয়াশীল। নেহরুর পর লালবাহাদুর এবং তারপর কংগ্রেসী নেতৃত্বে তেমন অবিসম্বাদিত ব্যক্তির অভাবই আজ কংগ্রেসের সাংগঠনিক দুর্বলতার অন্যতম কারণ। একই কারণ তামিলনাড়ুর শিশু রাজনৈতিক দল ডি-এম-কে'র মধ্যেও দেখা দিতে পারে। বিরাট ঐতিহ্য পেছনে থাকা সত্ত্বেও কংগ্রেস আজ ছিন্নভিন্ন, ভাষা-আন্দোলনের উত্তাপে লালিত ডি-এম-কে আন্নার অনুপস্থিতিতে কোন অবস্থার পরিণতি-লাভ করবে তা আশঙ্কার সঙ্গেই লক্ষণীয়।

ডি-এম-কে'র প্রধান অসুবিধা এই যে, বস্তুতপক্ষে তার কোনও রাজনৈতিক

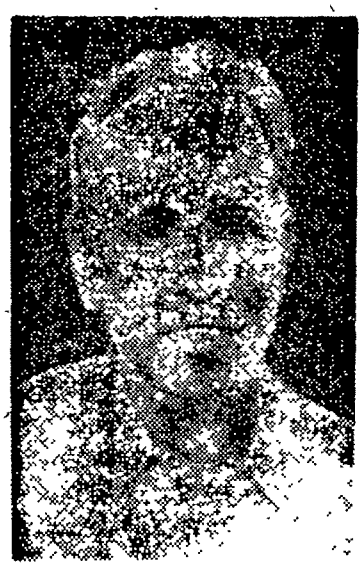

অন্নাদুরাই

বিশেষ দৃষ্টিকোণ গড়ে ওঠে নি এবং জনগণের জন্য বিশেষ কোনও কর্মসূচীও তার নেই।

টাকা টাকা ওজনের চাল কিম্বা মাদ্রাজের তামিলনাড়ু নামকরণ কোন বিশেষ কর্মসূচীর পরিচায়ক নয়। আন্না তাঁদের মধ্যে থাকলে ডি-এম-কে যে নেতৃত্ব পেতে পারত এবং একটি সুষ্ঠু কর্মসূচী গ্রহণ করতে পারত সেই সম্ভাবনারও ইতি হয়েছে। সুতরাং ডি-এম-কে'র সঙ্কট বড় তাড়াতাড়ি বড় নির্মমভাবে দেখা দিয়েছে।

অবশ্য আন্নাদুরাই-এর জীবৎকালেই তামিলনাড়ু সঙ্কটের আবর্তে গা ভাসাতে শুরু করে। অনিচ্ছাসত্ত্বেও জনদরদী আন্নাকে একরকম ব্যুরোক্রাটদের কবলেই প্রশাসনিক কর্তৃত্ব ছেড়ে দিতে হয়। তবু রাজ্যবাসীর মঙ্গলের জন্য আন্নাদুরাই-এর নিজস্ব সমবেদনা আপামর জনসাধারণ মর্মে মর্মে অনুভব করেছিলেন বলেই তাঁদের প্রিয় নেতার জন্য আজ তাঁরা অঝোরে অশ্রু বিসর্জন করছেন। আন্নাদুরাই প্রতিক্ষণে রাজ্যের মঙ্গল চিন্তায় ব্যস্ত ছিলেন। কেন্দ্রের কেন্দ্রীভবনের প্রশ্নে তাঁর সঙ্গে কেন্দ্রের সর্বগ্রাসী নীতির সংঘর্ষ বেধেছে। এইখানে ভারতের এ পর্যন্ত দক্ষিণপন্থী মুখ্যমন্ত্রীদের মধ্যে আন্নাদুরাই অনন্য। তাই তাঁর রাজ্যে তিনি সেই অস্বিতীয় নেতার শ্রদ্ধার আসনটি দখল করতে সমর্থও হয়েছেন।

কিন্তু অনভিজ্ঞ ডি-এম-কে সরকার একটি সার্বিক যুগোপযোগী নীতির অভাবে রাজ্যের সমস্যাদির যথোচিত মোকাবিলা করে উঠতে পারেন নি।

রাজ্যবাসীর অর্থনৈতিক দুরবস্থার অবসান ঘটে নি টাকা টাকা ওজনের চালের স্লোগান সত্ত্বেও। রাজ্যে শ্রমিক সমস্যা বেড়েছে বই কমে নি। প্রায় পঁচিশটি টেক্সটাইল মিল বন্ধ হয়ে গেছে। যদিও টেক্সটাইল মিল বন্ধ হওয়া মাদ্রাজের ক্ষেত্রে কোন একক সমস্যা নয়। মূলত এগুলি সর্বভারতীয় সমস্যা। এবং এই সমস্যা ক্রমেই সংকটাপন্ন অবস্থায় উপনীত হচ্ছে। রাজ্যে কৃষক অসন্তোষও বৃদ্ধি পেয়েছে কার্যকরী কৃষিনীতির অভাবই যার দ্বারা প্রমাণিত হয়। এ সমস্ত সত্ত্বেও রাজ্যবাসীর অকুণ্ঠ শ্রদ্ধা আন্নাদুরাইকে অতি অল্পকালে যে কোনও প্রকৃত নেতার একান্ত কাম্য বস্তুটি দান করেছিল, দেশবাসীর অকৃত্রিম ভালোবাসা।

আন্নাদুরাই-এর অবর্তমানে ডি-এম-কে নেতৃত্ব প্রায় বিপর্যস্ত। এখন দল ও সাধারণের প্রশ্ন, অতঃপর কে! অতঃপর কী!

সর্বশেষ প্রাপ্ত সংবাদে জানা গেল মাদ্রাজের পাবলিক ওয়ার্কস ও ট্রান্সপোর্ট-মন্ত্রী শ্রীকরুণানিধি সর্বসম্মতিক্রমে মাদ্রাজের মুখ্যমন্ত্রী নির্বাচিত হয়েছেন। তাঁর প্রতি দলের আস্থায় তিনি অভিভূত বোধ করেন এবং সর্বপ্রযত্নে স্বর্গত নেতার আরব্ধ কর্ম সমাপনের প্রতিশ্রুতি দেন। শ্রীকরুণানিধি অনুন্নত সম্প্রদায়ের প্রতিনিধি।

(৯।২।৬৯)

আয়ুব খাঁর বেতার ভাষণ

পাকিস্তান :

প্রেসিডেন্ট আয়ুবকে দেখে এখন করুণার উদ্রেক হচ্ছে কোনো কোনো হৃদয়ে। দম্ভের উচ্চ আসন থেকে তিনি ক্রমশ নিচে নামছেন, নামছেন জনতার দাবি মেটাতে। বিরোধীদের চাপের কাছে আয়ুব খাঁর নতি স্বীকারের সর্বশেষ নজির হল, পূর্ব পাকিস্তানের ১৪১ জন রাজনৈতিক বন্দীর মুক্তিদান। মুক্তিপ্রাপ্তদের মধ্যে রয়েছেন অধ্যাপক মুজাফ্‌ফর আহমেদ, দেওয়ান মেহবুব আলি এবং সৈয়দ আলতাফ হোসেন প্রমুখ জননেতারা।

আয়ুবশাহীর বিরুদ্ধে প্রবল গণ-অভ্যুত্থান দেখে প্রেসিডেন্ট আয়ুব এবং তাঁর উপদেষ্টারা স্বভাবতই শঙ্কিত হয়েছেন। দেশে যে-সংকট আজ উপস্থিত হয়েছে তা মোচনের উপায় ভাবছেন আয়ুব খাঁ, যদিও কোনো কূল-কিনারা তিনি দেখতে পাচ্ছেন কি না সন্দেহ। বিরোধীরা আয়ুবশাহীর উচ্ছেদের ডাক দিয়েছেন, কিন্তু ১০ বছর আগে "রক্তপাতহীন বিপ্লবের" মাধ্যমে যেভাবে আয়ুব খাঁ পাকিস্তানের ক্ষমতা দখল করেছিলেন ঠিক সেভাবে নিঃশব্দে তিনি গদি ত্যাগ করবেন—সে-বান্দা নিশ্চয়ই ফিল্ড মার্শাল আয়ুব খাঁ নন। আয়ুব খাঁ স্পষ্ট বুঝতে পারছেন, তাঁর পায়ের তলা থেকে দ্রুত মাটি সরে যাচ্ছে, শক্ত হয়ে তিনি আর বেশিদিন দাঁড়াতে পারবেন না। তাই সমুদ্রে নিমজ্জমান মানুষ যেমন বাঁচবার দুর্মর প্রচেষ্টায় খড়কুটো সামনে যা পায় তাই আঁকড়ে ধরে তীরে উঠতে চায় বা চায় ভেসে চলতে, তেমনি আয়ুব খাঁ খড়কুটোর সন্ধান করছেন।

অবশ্য গোড়ার দিকে আয়ুব খাঁ সারা পাকিস্তানে অস্ত্রানবদনে নির্যাতন, নিপীড়ন চালিয়েছেন, বিরোধীদের দাবি-দাওয়াকে তিনি ঘৃণাভরে উপেক্ষা করেছিলেন। তাই একদিকে দেখা গিয়েছে ছাত্র, আইনজীবী, বুদ্ধিজীবী, মহিলাদের মিছিল, শ্রমিকদের বিক্ষোভ প্রদর্শন অন্যদিকে পাক-পুলিশের অবাধে লাঠি, টিয়ার গ্যাস এবং গুলীবর্ষণ। এ পর্যন্ত পাকিস্তানের উভয় অংশের অন্তত ৫টি শহর সামরিক বাহিনীর হাতে সঁপে দেওয়া হয়েছে। সেখানে ১৪৪ ধারা এবং সান্ধ্য আইনও জারী করা হয়েছে। এ পর্যন্ত পুলিশের গুলীর আঘাতে এবং অন্যান্য হাঙ্গামায় প্রাণ দিয়েছেন ৩৪ জন। কিন্তু তাতেও গণবিক্ষোভের আগুন নেভে নি, বরং তা ছড়িয়ে পড়েছে আরো।

প্রেসিডেন্ট আয়ুব নামতে সুরু করেছেন ছাত্রদের দাবি প্রসঙ্গে। তিনি ছাত্রদের কয়েকটি দাবি মেনে নিতে সম্মত হয়েছেন। কিন্তু বলা বাহুল্য, ছিটেফোঁটা লাভে কি ছাত্র কি সাধারণ লোক সন্তুষ্ট নন, তাঁরা তাঁদের মূল দাবি আদায়ে বদ্ধপরিকর।

দ্বিতীয় দফায় আয়ুব খাঁ বললেন, পাক সংবিধান কিছু আল্লাহ্‌র অমোঘ বাণী নয় যে, তা পরিবর্তন করা যাবে না। অর্থাৎ আয়ুব খাঁর উদ্ভট মৌলিক গণতন্ত্র বরবাদ করার জন্যে যে দাবির ঝড় উঠেছে তারই পরিপ্রেক্ষিতে পাক প্রেসিডেন্ট সংবিধান সংশোধনের কথা তুলেছেন, যেকথা গত ১০ বছরে তাঁর মুখে কখনই শোনা যায় নি।

কিন্তু তাতেও যখন আয়ুব-বিরোধীদের মন পাওয়া গেল না, তখন সরকার আর একদফা অত্যাচারীর ভূমিকা নিলেন। পাক জনতা অবশ্য ইতিমধ্যে সরকারের বিরুদ্ধে তাদের রোষ জানাতে গিয়ে কিছু কিছু সরকারী সম্পত্তির বিনাশসাধন করেছে। তারই বদলা নিয়েছে আবার সরকার দুটো অংশে প্রায় দু হাজার লোককে গ্রেপ্তার এবং একটা সন্ত্রাসের রাজত্ব কায়েম করে।

সরকার যখন কিছুতেই অশান্ত জনতাকে বাগ মানাতে পারছেন না এবং বিরোধীপক্ষ আয়ুবশাহীর বিরুদ্ধে ক্রমশ শক্তি সঞ্চয় করতে লাগল তখন আয়ুব খাঁকে একটা গোলটেবিল বৈঠকের প্রস্তাব করতে হল। গোড়ার দিকে অবশ্য এ-বৈঠকে "দায়িত্বশীল" রাজনৈতিক দল-প্রতিনিধিদের আমন্ত্রণ করার কথা ছিল। কিন্তু যেহেতু তাতে দলহীন এয়ার মার্শাল আসগর খাঁ প্রমুখ নেতাদের বাদ পড়ার সম্ভাবনা রয়েছে সেহেতু বিরোধীরা এ-প্রস্তাব বাতিল

ভুট্টো

করার কথা ভাবছিলেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত আয়ুব খাঁ আসগর খাঁর সঙ্গেও মিলিত হবার ইচ্ছে প্রকাশ করেছেন।

কিন্তু আয়ুব খাঁর সামনে নতুন চ্যালেঞ্জ নিক্ষেপ করেছেন প্রাক্তন পররাষ্ট্রমন্ত্রী ভুট্টো, তিনি কারান্তরাল থেকে ঘোষণা করেছেন যে, এক সপ্তাহের মধ্যে জরুরী অবস্থা প্রত্যাহৃত না হলে তিনি আমরণ অনশন সুরু করবেন। ভুট্টো সহ সমস্ত রাজনৈতিক নেতার মুক্তির দাবিতে বেগম ভুট্টো ও বহু অভিজাত এবং মধ্যবিত্ত পাক মহিলা তাঁদের বোরখা ফেলে দিয়ে আয়ুবশাহীর বিরুদ্ধে বিক্ষোভ মিছিল করেছেন লাহোরের রাজপথে।

সানলাইটে প্রতিবার
আপনার জামাকাপড়
আরো ঝলমলে ক'রে কাচে

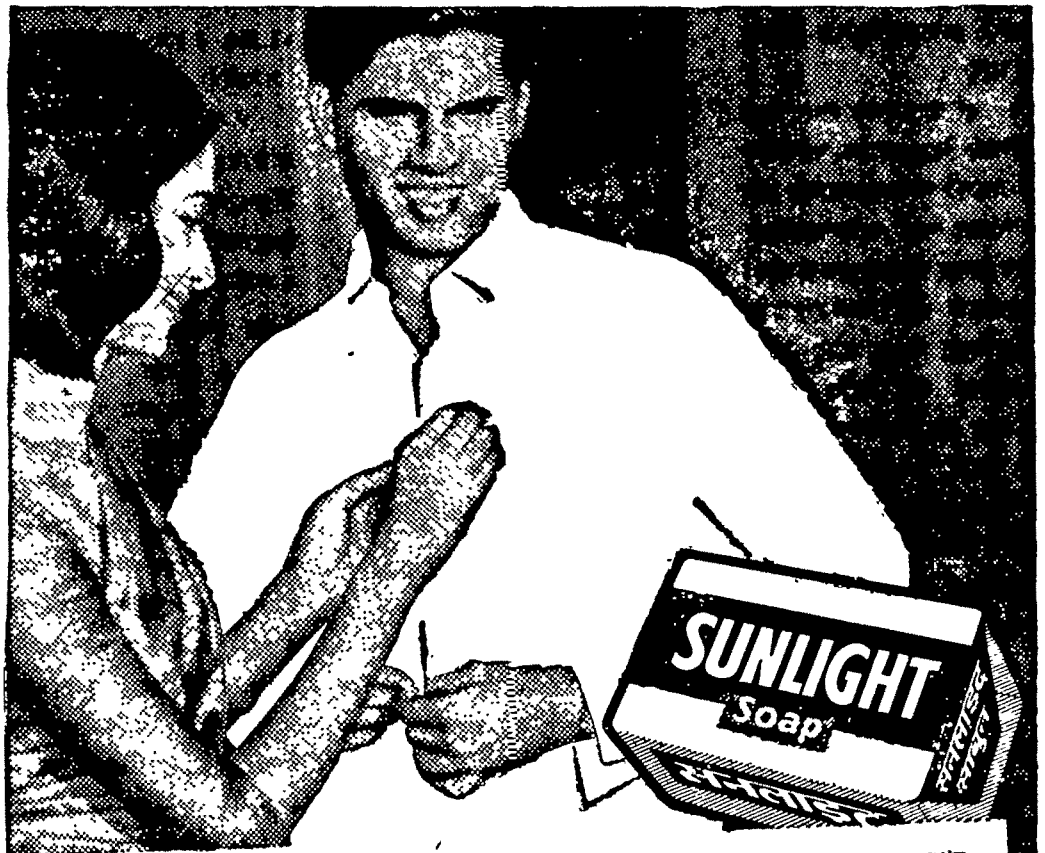

সানলাইট সাবান একবার নিজেই ব্যবহার ক'রে দেখুন—কী চমৎকার ঝলমলে হয় কাপড়চোপড়। দেখবেন, প্রতিবার কাচার সঙ্গে সঙ্গে আপনার জামাকাপড় কেমন আরো বেশী উজ্জ্বল হ'য়ে ওঠে। অল্প একটু ঘষলেই অজস্র ফেনা হবে, আর সেই ফেনা কাপড়চোপড় অনায়াসে সুন্দর পরিষ্কার ঝলমলে ক'রে দেবে। বাড়ীতে সব কাপড়চোপড়ই সানলাইটে কাচুন।

সানলাইটে আপনার
প্রতিদিনের সব জামাকাপড় কাচুন

হিন্দুস্থান লিভারের তৈরী

আগামী ১৭ই ফেব্রুয়ারী রাওয়ালপিণ্ডিতে প্রস্তাবিত গোলটেবিল বৈঠক অনুষ্ঠিত হবার কথা আছে। পাকিস্তানের ৮টি রাজনৈতিক দলের গণতান্ত্রিক সংগ্রাম পরিষদ সে-আমন্ত্রণ রক্ষা করবে কি না চিন্তা করছেন এবং বিরোধী নেতৃবৃন্দের সঙ্গে আলোচনা করার জন্যে পরিষদের চেয়ারম্যান খাবাজাদা নসরুল্লা খাঁ ঢাকা এসেছেন। ভুট্টোর পিপলস পার্টি অবশ্য এ-আলোচনায় অংশগ্রহণে সম্মত নয়, আওয়ামী দলের মধ্যেও 'কিন্তু কিন্তু' ভাব রয়েছে। পূর্ব পাকিস্তানের ১০ হাজার ছাত্র তো সঙ্কল্প গ্রহণ করেছে যে, তাদের দেহে শেষ রক্তবিন্দু থাকতে তারা আয়ুব খাঁর সঙ্গে বিরোধী নেতাদের বৈঠকে মিলিত হতে দেবে না।

আয়ুব খাঁ আরো এক ধাপ নিচে নেমে এ-ইঙ্গিত দিয়েছেন যে, অবিলম্বে দেশ থেকে জরুরী অবস্থা প্রত্যাহৃত হবে এবং দেশ শাসনে পূর্ব পাকিস্তানীদের বৃহত্তর অংশ নেবার সুযোগ দেওয়া হবে। কিন্তু বিরোধীপক্ষ এত অল্প পেয়ে কি সন্তুষ্ট হবার জন্যে সংগ্রাম সুরু করেছিলেন! তাঁদের মূল দাবি আটটি এবং তার মধ্যে জরুরী অবস্থার প্রত্যাহার থেকে সুরু করে বন্দীমুক্তি, ফেডারেল শাসন কাঠামোয় বয়স্ক ব্যক্তির ভোটাধিকারের ভিত্তিতে প্রত্যক্ষ নির্বাচন, পূর্ব পাকিস্তানের জন্যে স্বায়ত্তশাসন ইত্যাদি সবই রয়েছে। এ ছাড়া ছাত্রদেরও ১১ দফা দাবি রয়েছে। এ-অবস্থায় ১৭ই ফেব্রুয়ারী যদি গোলটেবিল বৈঠক হয়ও, তবে তাতে আয়ুব খাঁ বিরোধীদের ওপর টেক্কা দিতে পারবেন বলে মনে হয় না।

পশ্চিম এশিয়া ঃ

রাষ্ট্রসংঘের সেক্রেটারী জেনারেল উ থান্ট পশ্চিম এশিয়ায় শান্তি ফিরিয়ে আনার উপায় হিসেবে আবার চতুঃশক্তির কাছে আবেদন জানিয়েছেন।

উ থান্ট

উ থান্ট সম্প্রতি বৃটেনের পররাষ্ট্রসচিব মাইকেল স্টুয়ার্টের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছিলেন এবং তাঁরই কাছে উ থান্ট এ-ব্যাপারে একটা চতুঃশক্তি শীর্ষ সম্মেলনের প্রস্তাব করেছেন। সম্মেলনটি রাষ্ট্রসংঘের নিরাপত্তা পরিষদের সূত্র অনুযায়ী হবে, তবে যখন নেতাদের মধ্যে খানিকটা মতৈক্য উপস্থিত হবে, কেবল তখনই বিষয়টি পরিষদের আওতায় আনা হবে।

সেক্রেটারী জেনারেল মনে করেন রাষ্ট্রসংঘের বৃহৎ চতুঃশক্তি অর্থাৎ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, সোভিয়েট য়ুনিয়ন, বৃটেন এবং ফ্রান্সের দায়িত্ব রয়েছে পশ্চিম এশিয়ায় শান্তি স্থাপনে উদ্যোগ গ্রহণ করার। এই চারটি রাষ্ট্র একটা শীর্ষ সম্মেলনে মিলিত হয়ে শান্তির সূত্র সন্ধানে আত্মনিয়োগ করতে পারেন বলে উ থান্ট মন্তব্য করেছেন। অবশ্য রাষ্ট্রনেতারা প্রথমে দ্বিপাক্ষিক আলোচনাও করতে পারেন।

পশ্চিম এশিয়ার পরিস্থিতিকে একদিকে যেমন সহজ করার প্রচেষ্টা চলেছে তেমনি অন্যদিকে তাতে জটিলতার সৃষ্টি হচ্ছে। ইতিপূর্বে সোভিয়েট রাশিয়া এবং ফ্রান্স সংকট সমাধানে দুটো প্রস্তাব পেশ করেছিল। দুটো প্রস্তাবেরই মূল সুর একই, নতুন মার্কিন প্রেসিডেন্ট মিঃ নিকসন ফরাসী প্রস্তাব গ্রহণে আগ্রহও প্রকাশ করেছেন। কিন্তু ওই পর্যন্তই।

অথচ অন্যদিকে সঙ্কট উত্তরোত্তর জটিলতর হচ্ছে, জট বেশি করে পাকাচ্ছে। ইতিপূর্বে বেইরুট বিমানবন্দরে ইস্রায়েলী কম্যাণ্ডোদের হানা এবং ১৩খানি বিমানের ধ্বংসসাধন ইস্রায়েল-আরব সম্পর্কে নয়া তিক্ততার সৃষ্টি করেছে। ইরাক সরকার কর্তৃক ৯ জন ইহুদীসহ ১৪ জন গুপ্তচরের ফাঁসিদান দুপক্ষের মধ্যে উত্তেজনা বাড়িয়ে দিয়েছে। ইস্রায়েল অধিকৃত গাজা এলাকার তিনজন স্কুল ছাত্রীকে কারাদণ্ড এবং প্রায় শ'খানেক স্কুল ছাত্রী ইস্রায়েলী পুলিশের লাঠিতে আহত হবার ফলে এখানে আবহাওয়া আরো উত্তপ্ত হয়ে উঠেছে। অন্যদিকে প্যালেস্টাইন মুক্তি বাহিনীও নতুন উদ্যমে নিজেদের সংগঠিত করছে—প্যালেস্টাইনকে ইস্রায়েলমুক্ত এবং একটা বিপ্লবী সেনাবাহিনী গড়ে তোলাই এদের ঘোষিত উদ্দেশ্য। আবার একদিকে শান্তি আলোচনার কথা বললেও মিঃ নিকসন ইস্রায়েলকে জনসনের প্রতিশ্রুতিমত ৫০খানা ফ্যান্টম জেটবিমান দেবার কথা ঘোষণা করেছেন। কাজেই যুদ্ধের জন্যে যখন পুরো মদত দেওয়া হচ্ছে তখন শান্তির বুলি আওড়ানোর ভণ্ডামি কেন?

২।২-৬৯

সাপ্তাহিক বসুমতীর চাঁদার হার

সাপ্তাহিক বসুমতীর বাৎসরিক চাঁদা সডাক ১৮ টাকা, ষাণ্মাসিক ৯ টাকা ও ত্রৈমাসিক ৪·৫০ টাকা। প্রতি সংখ্যা ৩০ পঃ।

তিন মাসের কমে গ্রাহক করা হয় না। গ্রাহক হতে হলে আপিসে অগ্রিম টাকা জমা দিতে কিংবা মনি অর্ডারে টাকা পাঠাতে হবে।

—কর্মাধ্যক্ষ, বসুমতী

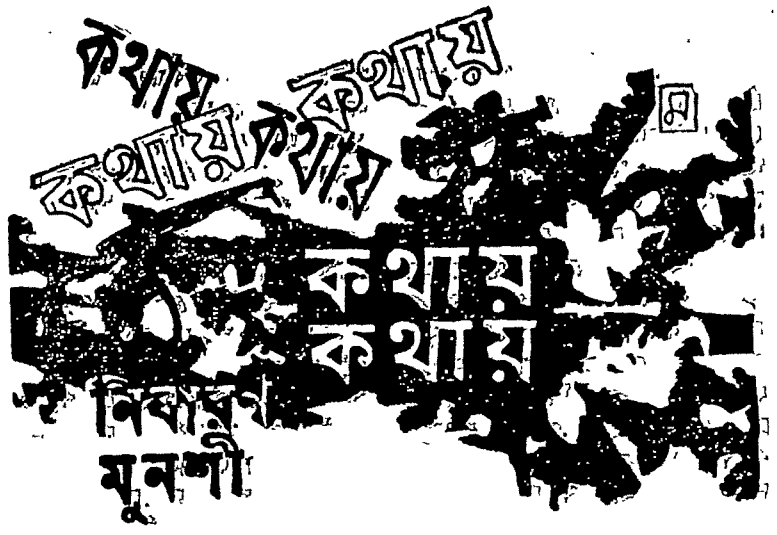

সেদিন বাংলাদেশের বহুল প্রচারিত একটি দৈনিকের পাত্রী চাই কলামে একটি বিজ্ঞাপন পড়েছিলাম। বিজ্ঞাপনদাতা, পাত্রীর অভিভাবক কন্যার গুণাবলী বর্ণনা প্রসঙ্গে, একটি অভিনব গুণের উল্লেখ করেছেন—পাত্রী এম.এ, বি.টি এবং ইংলিশ মিডিয়াম স্কুলের শিক্ষিকা। পাত্রী শিক্ষিকা—শুধু এটুকুর উল্লেখই নিঃসন্দেহে যথেষ্ট ছিল, বিদ্যালয়টি ইংরাজি মিডিয়াম না, বাংলা মিডিয়াম, তা নিশ্চয়ই অবান্তর।

কিন্তু আমার অথবা আপনার কাছে যা অবান্তর, দেখা যাচ্ছে, পাত্রীর অভিভাবক ও পরিবারের কাছে তা বিশেষ গর্বের বস্তু। নতুবা বিজ্ঞাপন দিয়ে সে কথা লোককে জানানর এই প্রয়াস কেন?

ঘটনাটি খুবই সামান্য হলেও সেদিন বিজ্ঞাপনটি পড়তে পড়তে আমার আর একবার নতুন করে মনে হল আমার বাংলাদেশকে আজও আমি সম্পূর্ণ চিনে উঠতে পারি নি। জানি না আপনারা, কেউ পেরেছেন কি না।

তিরিশের যুগে, কিংবা তারও আগে থেকে স্বাধীনতা প্রাপ্তির আগে পর্যন্ত বাংলাদেশে একশ্রেণীর বাঙালী ছিলেন যাঁদের বলা হত ইঙ্গ-বঙ্গ। মন, প্রাণ দেহ সবই এরা সঁপে দিয়েছিলেন ইংরেজের অনুকরণের ব্রতে। বাংলাদেশের সাহিত্যে, ব্যঙ্গ্যে, নাটকে ও ব্যঙ্গচিত্রে এই শ্রেণীর বাঙালীদের উপর এককালে যথেষ্ট রিদ্রূপ বর্ষিত হয়েছে। সে যুগের ইঙ্গ-বঙ্গের বর্তমান উত্তরাধিকারীরা আজও আছেন, তবে ভিন্ন রূপে। তাঁদের কথা আজ আমার আলোচ্য নয়।

কথায় কথায় আজ যাদের কথা উঠল তারা কেউ ইঙ্গ-বঙ্গ সমাজের উত্তরাধিকারী নয়। এরা খাঁটি বাঙালী এবং নিতান্তই মধ্যবিত্ত বাঙালী। উল্লিখিত বিজ্ঞাপন-দাতাও যে মনেপ্রাণে বাঙালী সেটা তাঁর বিজ্ঞাপনে পাত্রীর বংশকৌলীন্য ও গোত্র-পরিচয় সম্পর্কে সচেতনতা থেকে স্পষ্টই বোঝা যায়। কন্যা যদি 'মহাদেবী পাঠশালা' কিংবা 'ভবতারিণী বিদ্যামন্দির' ইত্যাদি কোন নামে কোন বিদ্যালয়ে কাজ করতেন তাহলে অভিভাবক নিশ্চয়ই তা উল্লেখ করা অবান্তর মনে করতেন। কিন্তু সেই শ্রীমতীই যখন 'প্রিসিলা' কিংবা 'লিটন' ফাওয়ার্স কর্নার' নামে কোন স্কুলে কিংবা কোন গির্জা সংশ্লিষ্ট স্কুলে চাকুরী করেন, সেখানে মাইনে যাই হোক না কেন এবং সেই স্কুল যে এঁদো গলিতেই হোক না কেন, অন্যার অভিভাবক সগর্বে তা ঘোষণা করে থাকবেন। অথচ এই শ্রেণীর অভিভাবকেরা যে সর্ববিষয়ে ইংরেজভক্ত তা কিন্তু নয়।

কলকাতার উপকণ্ঠে একটি নিতান্ত দরিদ্র বাস্তুহারা বালিকা বিদ্যালয়ে আমার শিক্ষকতা শুরু হয়েছিল। এই ধরণের বিদ্যালয়গুলিতে ইংরাজি শিক্ষার করুণ ও হৃদয়বিদারক চেহারা আমি প্রত্যক্ষ করেছি। কিন্তু শুধু ইংরাজি ভাষা শিক্ষার ক্ষেত্রে নয়, একই বীভৎস অবস্থা এই সব স্কুল-গুলিতে মাতৃভাষা শিক্ষার ক্ষেত্রেও দেখা যায়। বাংলাদেশের অধিকাংশ বিদ্যালয়েই এই চেহারা। শিক্ষায়তনগুলির অবস্থা, শিক্ষক-শিক্ষিকাদের শিক্ষাদান পদ্ধতি থেকে শুরু করে শিক্ষকতার বৃত্তি সম্পর্কে তাদের মনোভঙ্গি, এবং সর্বোপরি সরকারী অপদার্থতা—এ সব কিছু, যতদিন পর্যন্ত আগাগোড়া না বদলাবে ততদিন এই সব শিক্ষায়তনগুলির কোন ভবিষ্যৎ আছে বলে আমার মনে হয় না। ইংরাজি ভাষার কথা তো ছেড়েই দিলাম, এমন কি মাতৃ-ভাষাতেও এই সব অধিকাংশ শিক্ষায়তনে যেভাবে শিক্ষাদান চলে তা বীভৎস।

কলকাতার একটি নামডাকওয়ালা ইংরাজি মিডিয়াম স্কুলে কাজ করার সৌভাগ্য আমার কিছুদিন হয়েছিল। বাইরে অনেকের কাছেই শুনেছিলাম—"অমুক স্কুল, ও তো বড়লোকের ছেলে-মেয়েদের জন্য।" কিন্তু স্কুলে ঢুকে আমার ছাত্র-ছাত্রীদের দেখে আমার কিঞ্চিৎ নতুন জ্ঞান লাভ হয়েছিল।

আমার ক্লাসে একদল ছাত্রছাত্রী ছিল যারা অবাঙালী এবং ইংরাজি মিডিয়াম স্কুলে ছাড়া লেখাপড়া শেখার তাদের অন্য কোন ভাল কিংবা মন্দ ব্যবস্থা নেই। আর একদল ছাত্রছাত্রী ছিল যাদের অভিভাবকেরা বাঙালী হলেও বদলীর চাকরীতে তাদের আজ বোম্বাই, কাল কলকাতা, পরশু দিল্লী ঘুরে বেড়াতে হয়। এদেরও একমাত্র ভরসা ইংরাজি মিডিয়াম স্কুল। এই সব অভি-ভাবকদের মধ্যে উচ্চপদস্থ কর্মচারী থেকে শুরু করে সামান্য কেরানী পর্যন্ত রয়েছেন; সুতরাং এঁরা যে সবাই খুব বড়লোক তা নন; চাকুরীর যাযাবর চরিত্রের জন্যই এঁরা এঁদের ছেলেমেয়েদের ইংরাজি মিডিয়াম স্কুলে পড়াতে বাধ্য হন। তৃতীয় এক শ্রেণীর অভিভাবক আছেন যাঁরা সত্যিই বিত্তবান এবং তাঁরা ইংরাজি মাধ্যম স্কুল ছাড়া, অন্য স্কুলে ছেলেমেয়েদের পড়ানোটাকে সামাজিক পদমর্যাদা ও অন্যান্য সব দিক দিয়ে ক্ষতিকর বলে মনে করেন। এঁরা সংখ্যায় খুব বেশি নন। চতুর্থ শ্রেণীর অভিভাবকেরাই সংখ্যায়ধিষ্ঠ এবং এঁরা কেউ বিত্তবান নন, নিতান্তই বাঙালী মধ্যবিত্ত। বাবা হয়তো কলেজের অধ্যাপক অথবা মা স্কুলের শিক্ষিকা। তিরিশ কিংবা চল্লিশ টাকা মাইনে দিয়ে ছেলেমেয়েদের স্কুলে পড়াতে এঁদের কী মর্মান্তিক কষ্ট হয় তথাপি এঁরা ইংরাজি মিডিয়াম স্কুল ছাড়া ছেলেমেয়েদের পড়াতে চান না। বাংলা-দেশের ইংরাজি মিডিয়াম স্কুলগুলির দরজায় এঁরাই লাইন দিয়ে দাঁড়িয়ে থাকেন তীর্থের কাকের মত। এই অভিভাবকেরাই গর্ববোধ করেন—'আমার ছেলে অথবা আমার মেয়ে ইংলিশ মিডিয়াম স্কুলে পড়ে', এই কথা বলতে। কন্যা বড় হলে এই শ্রেণীর অভিভাবকেরাই পাত্রের সন্ধানে বিজ্ঞাপন দেন—আমার কন্যা ইংলিশ মিডিয়াম স্কুলের শিক্ষিকা। কিন্তু মাতৃ-ভাষার চর্চা যে এঁরা পছন্দ করেন না তা নয়। এই পিতামাতারাই যথেষ্ট শিক্ষিত ও দায়িত্বসম্পন্ন। এঁরা নিজেরাও শিক্ষালাভ করেছেন সাধারণ স্কুলে এবং মাতৃভাষায়। সুতরাং মাতৃভাষাকে ঘৃণা করতে হলে তাঁদের নিজেদেরই ঘৃণা করতে হয়।

সর্দ্দি ও কাশিতে
রক্ষিতের
তাল মিছরি
ফোন ৫৫-৩০৮৫

মাতৃভাষার প্রতি সর্বপ্রকার আনুগত্য জানাতে রাজী হয়েও এঁরা নিজেদের ছেলে-মেয়েদের ইংরাজি মিডিয়াম স্কুল ছাড়া পড়াতে রাজী নন। আর্থিক সঙ্গতি থাক বা না থাক। এই শ্রেণীর অভিভাবকদের এ ধরণের মনোভঙ্গীর সমর্থন করা যায় না বটে, তথাপি এই মনোভঙ্গীর পিছনের একটি কারণকেও সম্ভবত উপেক্ষা করা যায় না। ইংরাজি মিডিয়াম স্কুল সম্পর্কে এই সব অভিভাবকদের ধারণা এই যে, একমাত্র এই স্কুলগুলিতেই লেখাপড়া ভাল হয় এবং ছাত্রছাত্রীদের শৃঙ্খলাবোধ শেখান হয়। সমস্ত ইংরাজি মাধ্যম স্কুল সম্পর্কেই এই অভিভাবকদের এ ধারণার মধ্যে কোন সত্যতা নেই। এ দেশের ইংরাজি মাধ্যম অনেক স্কুলকেই স্কুল না বলে ব্যবসায় কেন্দ্র বলা চলে। কিন্তু তথাপি অভিভাবকেরা ইংরাজি মাধ্যম স্কুল-গুলির প্রতি আকৃষ্ট হন, কারণ মাতৃভাষায় শিক্ষাদানরত অধিকাংশ স্কুলের শিক্ষাদান পদ্ধতি এবং শৃঙ্খলার অবস্থা অত্যন্ত চরাবহ। মিশনারী স্কুলগুলির কড়া শাসন ও ব্যবস্থা দেখে যে সব অভিভাবক ইংরাজি মিডিয়াম স্কুলগুলির প্রতি অশোভন আনুকূল্য দেখান তাঁদের মনো-ভঙ্গীর পরিবর্তন করতে হলে মাতৃভাষায় স্কুলগুলিতে লেখাপড়া ও শৃঙ্খলার উন্নতি সাধন প্রয়োজন। একমাত্র এই উন্নতি দেখেই অভিভাবকদের দৃষ্টি মাতৃভাষার স্কুলগুলির দিকে আকৃষ্ট হতে পারে। কেবল মাতৃভাষার গৌরব ও মর্যাদা নিয়ে লাফালাফি করে ও বক্তৃতা দিয়ে এ কাজ সম্ভব নয়। মাতৃভাষার ভাল স্কুল গড়ে তোলা দরকার।

আর একটি সামান্য উদাহরণ দিয়ে আমি আমার আজকের কথা শেষ করব। এই কলকাতাতেই শিক্ষক-শিক্ষিকা ও অভিভাবকদের পরিশ্রমে ও যত্নে গড়ে ওঠা একটি স্কুলের কথা মনে পড়ল। পাশা-পাশি ইংরাজি ও বাংলা উভয় মাধ্যমেই এই স্কুলে শিক্ষা দেওয়া হয়। এই বিদ্যা-লয়ের এক অভিজ্ঞা শিক্ষিকাকে একদিন দেখেছিলাম জনৈক অভিভাবককে প্রায় ঘন্টাখানের ধরে বোঝাচ্ছেন তাঁর মেয়েকে বাংলা মিডিয়াম ক্লাসে দেবার জন্য। শিক্ষিকার বক্তব্য—বাংলা মিডিয়াম ক্লাসে পড়লে মেয়েটি উন্নতি করতে পারে, যে উন্নতি ইংরাজি মিডিয়াম ক্লাসে তার পক্ষে সম্ভব নয়। অভিভাবক নাছোড়বান্দা, মেয়েকে তিনি ইংরাজি মিডিয়াম ক্লাসেই পড়াবেন। শেষ পর্যন্ত সম্ভবত সামনা-সামনি সেই শিক্ষিকার যুক্তিকে খণ্ডন করতে না পেরেই অভিভাবক সম্মত হয়ে চলে যান এবং শিক্ষিকা মহোদয়াও চোখে মুখে একটা দুঃসাধ্য সংগ্রামে জয়ের আনন্দ নিয়ে উঠে আসেন।

ঘটনাটি যদি এইখানেই শেষ হত তাহলে এ ঘটনার উল্লেখ প্রয়োজন হত না। কিন্তু এর পরেও আছে। বাড়ি ফিরে গিয়ে সেই অভিভাবক চিঠি দিয়ে স্কুলকে জানিয়েছিলেন যে তিনি তাঁর মেয়েকে ইংরাজি মিডিয়াম ক্লাসেই ভর্তি করবেন, কারণ বাংলাটা বাড়িতেই শেখা যায়, ইংরাজিটাই ভাল করে শেখার জন্য মেয়েকে স্কুলে দেওয়া। উক্ত অভিভাবক কোন বড় চাকুরে নন, বিত্তবানও নন। নিতান্তই সাধারণ ঘরের বাঙালী মধ্যবিত্ত। সর্বশেষে এ খবরটুকুও সম্ভবত পাঠক-পাঠিকাদের জানা ভাল যে, উক্ত শিক্ষিকা যিনি ঐ অভিভাবককে বাংলা ক্লাসে মেয়েকে পড়ানোর জন্য বোঝাতে গিয়ে গলদঘর্ম হয়েছিলেন, তিনি স্বয়ং উক্ত স্কুলের ইংরাজির শিক্ষিকা। ভাল পড়ানোর ব্যাপারে ছাত্র-ছাত্রী মহলে তাঁর যথেষ্ট নাম-ডাক রয়েছে।

তাই বলছিলাম আমারই বাংলাদেশকে আজও পর্যন্ত আমি চিনে উঠতে পারলাম না। ভাল মন্দ উভয় দিক থেকে, অন্ধকার ও আলো উভয় প্রান্ত থেকে বিচারেই আমার কাছে এই স্বীকারোক্তি একটা বিরাট সত্য বলেই মনে হয়।

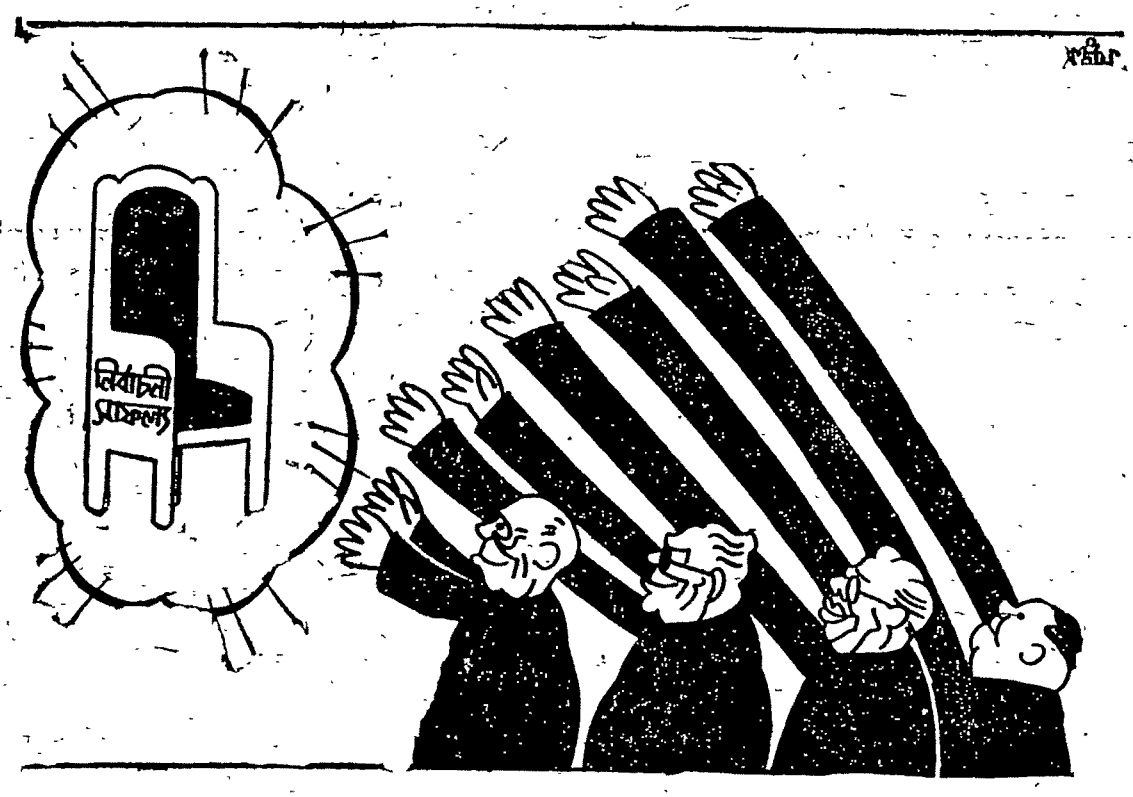

গ্রন্থমেলা

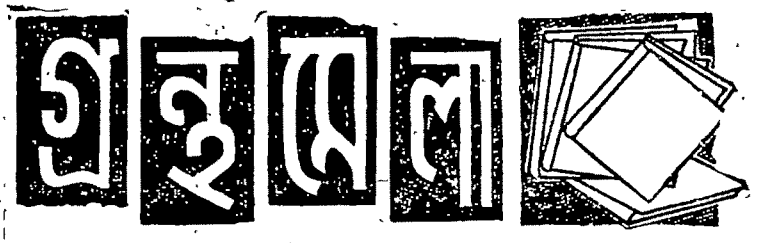

বিবেকানন্দের সাহিত্য ও সমাজচিন্তা (আষাঢ়, ১৩৭৫)—ডক্টর হরপ্রসাদ মিত্র। বেঙ্গল পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, ১৪, বঙ্কিম চাটুয্যে স্ট্রীট, কলকাতা-১২। দাম ছয় টাকা।

চিন্তার দীনতার জন্যে বাংলা দেশে একদিকে যেমন সাহিত্যে ও সমাজজীবনে হতাশা, বিশৃঙ্খলা ও অন্ধকার পসারীদের বিষবন্যা এসেছে, অন্যদিকে তেমনই বুদ্ধিজীবীদের এক বৃহদংশ বাংলার অদূর অতীতের স্মৃতিচারণ করছেন, সেদিনের সাহিত্য ও সমাজে যাঁরা যুগবিপ্লব এনেছিলেন, তাঁদের স্মরণ, মাহাত্ম্যকীর্তন এবং নতুন করে মূল্যায়ন করছেন। "বিবেকানন্দের সাহিত্য ও সমাজচিন্তা" শীর্ষক গ্রন্থে হরপ্রসাদ মিত্র বিবেকানন্দের সাহিত্য ও সমাজচিন্তা সম্বন্ধে যে মনোজ্ঞ প্রাঞ্জল আলোচনা করেছেন, বহু মূল্যবান তথ্য সমাবেশে তা একদিকে যেমন চিত্তাকর্ষক, অন্যদিকে তেমনই বুদ্ধিজীবীর চিন্তা ও চেতনাকে, সন্দেহ নেই, নতুন করে আলোড়িত করবে।

শ্রদ্ধাবান গ্রন্থকার প্রচুর শ্রম ও নিষ্ঠার সঙ্গে অতীত-বর্তমান-ভবিষ্যতের বৃহত্তর পটভূমিকায় সন্ন্যাসী বিবেকানন্দের যে মূর্তিটি অঙ্কন করেছেন, যে স্বরূপ উদ্‌ঘাটন করেছেন, তার সঙ্গে অল্পবিস্তর পরিচয় থাকলেও সম্যক্ জানতে গেলে, গভীরে প্রবেশ করতে হলে ১২টি সুচিন্তিত ও সুপরিকল্পিত অধ্যায়ে, নির্ঘণ্ট সমেত ২০৪ পৃষ্ঠার মধ্যে সম্পূর্ণ আলোচ্য গ্রন্থটি আমাদের কাছে, ভবিষ্যৎ গবেষক ও ছাত্রদের কাছে অপরিহার্য বিবেচিত হবে।

বিবেকানন্দ ছিলেন মুখ্যত বেদান্তবাদী সন্ন্যাসী। গৌণত তিনি লেখক। গ্রন্থকারের কথায় বলতে গেলে, 'সন্ন্যাসী হয়েও অতি তীব্রভাবে তিনি সাধারণ মানুষের জীবন অভিজ্ঞতার যে বেদনা বোধ করে গেছেন এবং সেই সঙ্গে যে উৎসাহ তাঁর সারা জীবনের অবলম্বন ছিল, সেই বেদনা এবং উৎসাহই তাঁর সাহিত্য প্রয়াসের প্রধান কথা।'

প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের সাহিত্যের সুধী বোদ্ধা ছিলেন বিবেকানন্দ। ইংরাজী ও সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্যে ছিল তাঁর অবাধ অধিকার। গীতা, উপনিষদ, জন স্টুয়ার্ট মিলের 'Three essays on religion', মিল্টনের 'Paradise Lost', মাইকেল মধুসূদনের 'মেঘনাদবধ কাব্য' প্রভৃতি বিবেকানন্দের খুব প্রিয় গ্রন্থ ছিল। স্বামীজী হার্বার্ট স্পেন্সারের উল্লেখ করেছেন। (পৃঃ ২৪) মোহিতলাল আমেরিকার কবি ওয়াল্ট হুইটম্যানের ভাষাদর্শের সঙ্গে বিবেকানন্দের বেদান্ত ধ্যানের সাদৃশ্যের উল্লেখ করে তিনি হুইটম্যানের বন্ধু অজ্ঞেয়বাদী ও জড়বাদী গ্রন্থকার রবার্ট ইঙ্গারসোলের সঙ্গে বিবেকানন্দের এক আলোচনারও উল্লেখ করেছেন (পৃঃ ১৭১)। টমাস আ কেম্পিস লিখিত 'ইমিটেশন অব ক্রাইস্ট' তাঁর একখানা প্রিয় গ্রন্থ—তার অনুবাদ শুরু করেছিলেন 'ঈশা অনুসরণ' নামে। এন্‌সাইক্লোপেডিয়া ব্রিটানিকা রশদ খণ্ড পড়ে ফেলেছিলেন, শিষ্যকে বলেছিলেন, 'এই দশখানি বই থেকে আমায় যা ইচ্ছা জিজ্ঞেস কর—সব বলে দেবো।' (পৃঃ ১১০) তাঁর লেখায় ভলতেয়ার, ডারুইন, বুকনার, ফ্লমারিওঁ, ভিক্টর হুগোর উল্লেখ আছে। (পৃঃ ১৬১)। ম্যাক্সমুলার, টলস্টয়, উইলিয়াম জেমস স্বামীজীর লেখা সম্বন্ধে সচেতন ও মুগ্ধ ছিলেন (পৃঃ ২১)।

গ্রন্থকার অত্যন্ত সুন্দরভাবে সেকালের বাঙালীর নবজাগরণ, তার রেনেসাঁসের কথা, তৎকালীন গুণিজনের মত ও পথের বৈচিত্র্যের দিকটি আলোচনা করেছেন। বিবেকানন্দের সাহিত্য ও সমাজচিন্তার এই পশ্চাৎপট হিসাবে রামমোহন, কেশবচন্দ্র, বিদ্যাসাগর, রামকৃষ্ণ পরমহংস, ভূদেব বঙ্কিমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ প্রমুখ উনিশ শতকের বঙ্গমনীষার ভাস্বরতার রেখাচিত্র অঙ্কন করেছেন।

বিবেকানন্দের গদ্য রচনাবলী 'ভাববার কথা', 'বর্তমান ভারত', 'পরিব্রাজক' এবং 'প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য'র সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিতে গিয়ে তাঁর রচনারীতির প্রাঞ্জলতা, বল এবং সৌন্দর্য, তাঁর ভাব ও ভাষার অকপট তেজস্বিতার উল্লেখ করেছেন। বিবেকানন্দই বাংলা চলিত ভাষাকে সাহিত্যের শ্রী ও মর্যাদা দিয়েছিলেন। তাঁর রচনায় 'আটপৌরে রীতি' (পৃঃ ১৪৮) লক্ষণীয়। সরসতাও তাঁর রীতির অন্যতম বৈশিষ্ট্য। একদিকে বিষাদ ধিক্কার ক্রোধ, অন্যদিকে সারল্য ও সুস্পষ্টতা রক্ষার দিকে আগ্রহ বিবেকানন্দের বাংলা গদ্যে একযোগে এই দুটি বিশেষত্বই চোখে পড়ে (পৃঃ ৮৪)। আবার আছে ভিন্ন প্রসঙ্গে ভিন্ন জাতীয় অভিব্যক্তি (পৃঃ ৪৬)।

বঙ্কিমচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথের রচনানীতির সঙ্গে, তাঁদের আদর্শের সঙ্গে বিবেকানন্দের রচনানীতি ও আদর্শের তুলনামূলক আলোচনা করেছেন লেখক। পরিপূর্ণ কর্মযোগের সঙ্গে পরিপূর্ণ বৈরাগ্যে বিশ্বাস ছিল দুজনেরই (রবীন্দ্রনাথ ও বিবেকানন্দ) মনোধর্মের মূলকথা (পৃঃ ৫৫) বিশ্বমানবের কল্যাণই ছিল দুজনের সাধনা। জীবনসাধনার পূর্বে পূর্বে নির্ভয়ের মন্ত্রই ছিল বিবেকানন্দের প্রধান কথা। রবীন্দ্রনাথও ছিলেন সেই অভয় মন্ত্রের সাধক (পৃঃ ৭৩)। ব্যক্তিনিরপেক্ষ বৃহৎ ন্যায়াদর্শের ঔচিত্যের দিকেই বঙ্কিমচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথের মতন বিবেকানন্দেরও নজর পড়েছিল (পৃঃ ৭৩)। গ্রন্থকার- বিবেকানন্দের লেখা বাংলা কবিতা 'সখার প্রতি', 'নাচুক তাহাতে শ্যামা'; ইংরাজী কবিতা 'কালী দি মাদার', সঙ্ অব সন্ন্যাসীন, টু দি এ্যাওকেন্ড ইণ্ডিয়া, ব্লেড হার্ট প্রভৃতির আলোচনা করেছেন। বিবেকানন্দের সংস্কৃত রচনার আলোচনাও এই গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত হওয়া উচিত ছিল বলে মনে করি।

বিবেকানন্দের সম্বন্ধে নিবেদিতা বলেছেন, 'Verily our great national hero' (পৃঃ ১৩৩)। বিদেশে তিনি ছিলেন ভারতকথার প্রচারক, এবং দেশে হন আধুনিক ভারতচিন্তার সংগঠক। (পৃঃ ১৩১)। বিবেকানন্দ শুধু 'হিন্দু রিভাইভ্যালিস্ট' না জাতীয়তাবাদী দেশপ্রেমিক, কিম্বা তারও বড় : এই নিয়ে গবেষণার বোধকরি এখনও শেষ হয় নি। প্রবন্ধকার কিন্তু বিভিন্ন অধ্যায়ে বিবেকানন্দের সমাজচিন্তা সম্বন্ধে তাঁর সুচিন্তিত মতামত লিপিবদ্ধ করেছেন। 'তাঁর সমাজচিন্তার মূলকথা সহিষ্ণুতা ও সর্বগ্রাহিতা' (পৃঃ ১৮৬)। 'স্বামীজী সমকালীন ভারতবর্ষের দিশারী...নতুন জ্ঞান কর্মযোগে স্বদেশবাসীকে দীক্ষা দিলেন' (পৃঃ ১৯১)। 'মনুষ্যত্বের শ্রেষ্ঠ উপাদানগুলি জাগিয়ে তোলবার ব্যাকুলতাই তাঁর সারা জীবনের বৈশিষ্ট্য।' (পৃঃ ১৯১)। 'পৃথিবীর নানা অঞ্চলের... সনবেদের বিরুদ্ধেই তিনি যুদ্ধ করে গেছেন।' (পৃঃ ১৯২)। তাঁর ভাষণে রামমোহনের উল্লেখ পাই—'আপনারা সকলেই জানেন, যেদিন হইতে রাজা রামমোহন রায় এই সঙ্কীর্ণতার বেড়া ভাঙিলেন, সেইদিন হইতেই ভারতের সর্বত্র আজ যে একটু স্পন্দন, একটু জীবন অনুভূত হইতেছে, তাহার আরম্ভ হইয়াছে।' তিনি ইসলামের প্রশংসা করেছেন (পৃঃ ১৬২), বলেছেন, 'ভারতবর্ষ বৈদান্তিক মস্তিষ্ক ও ইসলামের দেহ ধারণ করে উজ্জ্বল হয়ে উঠবে।' (পৃঃ ১৬৭)।

খ্রীষ্টপূর্ব সম্বন্ধে তাঁর উক্তি—যীশু-খৃষ্টের সময় আমি জীবিত থাকলে আমি আমার চোখের জলে নয়, রক্তের স্রোত দিয়ে তাঁর পা ধুইয়ে দিতাম।' (পৃঃ ১৬৮)। দিগ্বিজয়ী চিন্তানায়ক, এক-ছত্র সম্রাটের মতই তিনি বলতে পারেন—ভারতকে অবশ্যই পৃথিবী জয় করিতে হইবে—ইহা অপেক্ষা নিম্নতর আদর্শে আমি কখনই সন্তুষ্ট হইতে পারি না... আমাদিগকে হয় সমগ্র জগৎ জয় করিতে হইবে, নতুবা মরিতে হইবে; ইহা ছাড়া আর কোন পথ নাই।' (পৃঃ ১৭৯)

বিদগ্ধ প্রবন্ধকার কোথাও অতিরিক্ত আবেগের বশবর্তী হন নি। বুদ্ধিদীপ্ত, মননশীল, সাবলীল রচনাশৈলী। বিশ্লেষণভঙ্গী অতি চমৎকার। 'বিবেকানন্দের সাহিত্য ও সমাজচিন্তা' নিঃসন্দেহে একটি মূল্যবান গ্রন্থ—প্রতিটি বাঙালী বুদ্ধিজীবীর ঘরে রাখার সামগ্রী।

আধুনিক ভারতীয় কাব্য পরিক্রমা—ডঃ অনিলবরণ গঙ্গোপাধ্যায়ঃ মোহন লাইব্রেরী, ৩৫-এ, সূর্য সেন স্ট্রীট, কলকাতা—৯। মূল্য—৫ টাকা।

কবিতা সম্পর্কে বাংলা দেশের পাঠক সম্প্রদায় চিরদিনই খুব উৎসাহী। তাই বাংলা ছাড়া ভারতের অন্যান্য আঞ্চলিক ভাষায় রচিত কবিতার গতি, প্রকৃতি, বৈচিত্র্য ও আঙ্গিক ঠিক কি ধরণের তা বাঙালী পাঠককে জানাবার মত একখানি পুস্তকের বিশেষ প্রয়োজন ছিল। ডঃ অনিলবরণ গঙ্গোপাধ্যায়ের এই গ্রন্থটি সে অভাব অনেকটা পূর্ণ করল।

লেখক দিল্লীর আকাশবাণীর সাহিত্য বিভাগের উচ্চপদস্থ কর্মচারী। ১৯৫৬ খৃস্টাব্দ থেকে আকাশবাণীর কর্তৃপক্ষ এদেশের সংবিধানস্বীকৃত আঞ্চলিক ভাষাগুলিতে, একজন করে প্রখ্যাতনামা কবিকে এক সর্বভাষা কবি-সম্মেলনের আসরে স্বরচিত কবিতা পাঠের আমন্ত্রণ করে, তাঁদের কবিতা পাঠের সামগ্রিক অনুষ্ঠান সম্প্রচার করার আয়োজন করেছেন। সেই সময় থেকেই এই সব কবিতার আলোচনা করে, আমাদের দেশের সাহিত্যিক প্রগতি ও কবি-চৈতন্যের যে বিশ্লেষণ লেখক করেছেন তা তাঁর সত্যদৃষ্টি ও বিচারশক্তির পরিচায়ক। সাহিত্যরসিক সব পাঠকই এই বইটি পড়ে অনেক নতুন তথ্য পাবেন এবং সেই দিক থেকেই এটির যা কিছু সার্থকতা।

বাবরনামায় ভারত-কথাঃ শচীন্দ্রলাল রায়ঃ ডি এম লাইব্রেরী—৪২ কর্নওয়ালিস স্ট্রীট, কলকাতা-৩ ঃ দাম—পাঁচ টাকা।

বাবর তাঁর আত্মচরিত লিখেছিলেন তুর্কি ভাষায়। এর অনুবাদ হয়েছিল ফার্সিতে। পানিপথের যুদ্ধ পর্যন্ত বাবরের জীবনকাহিনী শচীন্দ্রবাবুর 'বাবরের আত্মকথা' গ্রন্থে প্রকাশিত হয়েছে। পানিপথের যুদ্ধের পর থেকে 'বাবরনামার অনুবাদ বর্তমান গ্রন্থে প্রকাশিত হয়েছে। এটিকে তাঁর ভারত-কথা হিসাবে বর্ণনা করা যেতে পারে।

এদেশের শাসকবর্গের দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে বাবর তাঁর ভারত অভিযানে সফল হয়েছিলেন। কিন্তু এরপর আর পাঁচজন বিজয়ী রাজপুরুষের মত আমোদ-প্রমোদ অথবা ভোগ-বিলাসে নিমগ্ন থেকে তিনি কালাতিপাত করেন নি। তাঁর মত উচ্চাঙ্গের মননশীলতা, সৌভাগ্যে ও দুর্ভাগ্যে অচঞ্চল মানসিকতা ও ধৈর্য, সদাপ্রফুল্ল মনোভাব, পুরুষোচিত গুণাবলী, জ্ঞানার্জনের আগ্রহ, বিদ্যাচর্চা, সঙ্গীতানুরাগ, উদ্যান রচনায় উৎসাহ ইত্যাদি গুণ একাধারে এশিয়া মহাদেশের অন্য কোন রাজপুরুষের মধ্যে দেখা যায় না। বাবরের আত্মকথাটি পড়ে বোঝা যায় কি অদ্ভুত পর্যবেক্ষণ শক্তির তিনি অধিকারী ছিলেন।

তাঁর 'হিন্দুস্থানের বিবরণ অত্যন্ত চিত্তাকর্ষক। এদেশের ঋতু, এদেশের সামাজিক এবং অর্থনৈতিক কাঠামো, এদেশের পশুপাখী, কৃষি-বিজ্ঞান ইত্যাদি বহু গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের সমীক্ষা তিনি করে গিয়েছেন। কিন্তু বিজয়ী রাজ-পুরুষের বিজিত দেশের প্রতি সাধারণত যে অবজ্ঞার ভাবটি ফুটে ওঠে বাবরের রচনাও সে দোষ থেকে মুক্ত নয়। ভারত-বর্ষের স্থাপত্য, এদেশের শিল্পীর নিপুণতা এবং আমাদের দার্শনিক ঐতিহ্যের বিরুদ্ধে তিনি যেসব মন্তব্য করেছেন, তা প্রধানত অজ্ঞতাজনিত কিম্বা বিদ্বেষপ্রসূত এবং বহু ক্ষেত্রে সর্বৈব মিথ্যা। তবুও একথা অনস্বীকার্য যে, সে যুগের রাজপুরুষদের সীমিত চিন্তার দিগন্তকে তিনি বহুলাংশেই অতিক্রম করতে পেরেছিলেন। তাঁর আত্মকথার আর একটি উল্লেখযোগ্য দিক হল তিনি নিজের দোষগুণ অকপটে ব্যক্ত করেছেন।

শচীন্দ্রবাবুর অনুবাদ খুবই সুন্দর হয়েছে। আমরা আশা করি ইতিহাস সন্ধানী পাঠকেরা তাঁর এই লেখাটি পড়ে আনন্দলাভ করবেন।

কালের পদধ্বনিঃ শিপ্রা দত্তঃ ডি এম লাইব্রেরী—৪২, কর্নওয়ালিশ স্ট্রীট, কলকাতা-৩ ঃ দাম—ছয় টাকা।

কালের পদধ্বনি একখানি উপন্যাস। ভারতবর্ষের স্বাধীনতা সংগ্রামের প্রায় শেষ পর্যায় থেকে বর্তমানকালের অনিশ্চয়তার দিনগুলি অবধি এর ঘটনার বিন্যাস। এক আদর্শবাদী আই সি এস ভদ্রলোক, তাঁর স্ত্রী, দুই ছেলে, ভাসুর এবং ভাইপোকে নিয়েই প্রধানত এই কাহিনী গড়ে উঠেছে। লেখিকা তাঁর সমাজ-সচেতনতা এবং রাজ-নৈতিক বিচারশক্তির সুস্পষ্ট পরিচয় দিলেও কাহিনীটি মৌলিকত্বের অভাবে জমে ওঠে নি। সত্যনিষ্ঠ আই সি এস অফিসার সমরবাবু এবং তাঁর আদর্শবাদী পত্নী সুতারার চরিত্র দুটিকে ঠিকমত ফুটিয়ে তুলতে যে মুন্সীয়ানার প্রয়োজন তার অভাব আগাগোড়াই অনুভূত হয়। তাই কাহিনীটিও জমে উঠতে পারে নি। তবে লেখিকা যে সুস্থ মন ও পরিচ্ছন্ন দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে আজকের সমাজকে বিশ্লেষণ করেছেন তা সত্যিই প্রশংসনীয়।

শ্রীহরিদাস পরিক্রমা (দ্বিতীয় খণ্ড, অগ্রহায়ণ, ১৩৭৫) পথিক। ৬৮/৪, যোগীপাড়া রোড। কলকাতা—২৮। দাম—দু টাকা পঞ্চাশ পয়সা।

মহাপ্রভুর অসীম কৃপাধন্য ভক্ত হরিদাস-এর জীবনকাহিনী যেমন বিচিত্র, তেমনই পবিত্র। ভক্তের আবেগ-পূর্ণ প্রাণস্পর্শী লেখনীতে তাঁর এই জীবনচরিতটি মধুর, আস্বাদ্য, সর্বদা স্মরণ ও মননের উপযোগী। শ্রীহরিদাস পরিক্রমার প্রথম খণ্ডে হরিদাসের আবির্ভাব, প্রকাশ ও পরীক্ষণপর্ব কীর্তিত হয়েছিল। আলোচ্য দ্বিতীয় খণ্ডে শ্রীচৈতন্যের সঙ্গে হরিদাসের মিলন, নিত্যানন্দের সঙ্গে তাঁর যোগাযোগ, জগাই-মাধাই উদ্ধার, মহাপ্রভু সমভিব্যা-হারে নীলাচলে আগমন ও বকুল-বৃক্ষতলে অবস্থিতি, নামব্রতে অপরিসীম নিষ্ঠা, প্রভুর চরণ বক্ষে ধারণ করে মহাপ্রয়াণ—ইত্যাদি কীর্তি-কাহিনী উপস্থাপিত করেছেন ভক্ত লেখক। শ্রীহরেকৃষ্ণ মুখো-পাধ্যায় লিখিত নাতিদীর্ঘ ভূমিকাটি মূল্যবান।

সূর্যগ্রহণ—সত্যদর্শী ঃ প্রাপ্তিস্থান—ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েটেড পাবলিশিং কোং প্রাইভেট লিঃ, ৯৩, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলকাতা—৭ ঃ মূল্য— তিন টাকা।

দেশের বর্তমান রাজনৈতিক পরি-স্থিতিতে সর্বত্র যে অশান্তি এবং অনিশ্চয়তার ভাবটি দেখা দিয়েছে 'সূর্যগ্রহণ' সেই পরিপ্রেক্ষিতে রচিত একটি বড় গল্প। লেখক দেশের বিভিন্ন রাজনৈতিক দলগুলি, বিশেষত বামপন্থী দলগুলিকে নামভাবে বিদ্রূপ এবং সমালোচনা করেছেন। গল্পের শেষ পরিণতিতে দেখা যায় অপরিপক্ক বুদ্ধি এক শিশু কেমন করে এমনই একটি দলের প্ররোচনায় শেষ পর্যন্ত নিজের জীবন বিসর্জন দিতে বাধ্য হল। পরিশেষে তিনি এমন এক অন্ধকারে

ঘর্ণনা-করবার চেষ্টা করেছেন যার কাছে—'ভগবান নেই—শয়তান নেই—ভারতবর্ষ নেই—পৃথিবী নেই—সৃষ্টি নেই!' সমালোচকের কোন অবস্থাতেই মনের আবেগকে যুক্তির উপরে স্থান দেওয়া উচিত নয়। সেদিক থেকে বিচার করতে গেলে এ কথাই বলা যায় যে, লেখক সমাজের একটি বাস্তব চিত্র আঁকতে গিয়ে তাঁর শিল্পীসুলভ নিরপেক্ষতাটুকুও বজায় রাখতে পারেন নি। কাহিনীর স্থানে স্থানে এত বেশি ইংরিজি শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে যে, গ্রন্থটিকে বাংলা না বলে 'বাই লিঙ্গুয়াল' বললেই বোধ হয় ঠিক হবে।

টি. বি. সম্বন্ধে (অগ্রহায়ণ, ১৩৬৫ প্রথম প্রকাশ) ভোলানাথ মুখোপাধ্যায়। মিত্রালয়, ১২, বঙ্কিম চাটুয্যে স্ট্রীট, কলকাতা—১২। দাম : চার টাকা।

আলোচ্য পুস্তকে বিশেষ করে ফুসফুসের ক্ষয় রোগ বা টি. বি. সম্বন্ধে জ্ঞাতব্য বহু তথ্য সর্বসাধারণের উপযোগী করে পরিবেশন করা হয়েছে। বাংলা ভাষায় লিখিত এই ধরণের বই-এর সংখ্যা খুবই কম। দু'-একটি তথ্যগত ভুল অবশ্য উল্লেখ করা দরকার। আধুনিক চিকিৎসা-বিজ্ঞান দ্রুত বদলে যাচ্ছে। লেখক যে বলেছেন, 'এ রোগে রাজকীয় আহার একেবারে অপরিহার্য', সেটা কিন্তু সঠিক নয় বলে আধুনিক বিশেষজ্ঞদের অভিমত। বিশ্রামের ব্যাপারেও খুব বাড়িয়ে বলা হয়েছে, যদিও রোগ দূরীকরণের জন্য পর্যাপ্ত বিশ্রামের প্রয়োজন আছে। গ্রন্থটির ভাষা ঝরঝরে। বিষয়-বস্তু এবং বক্তব্য উপস্থাপন পদ্ধতি সুন্দর। আমরা পুস্তকটির বহুল প্রচার কামনা করি।

পারিবারিক পোশাক ধোলাই পদ্ধতি : শ্রীশান্ত : প্রকাশক—শ্রীতপনকান্তি দত্ত, ১৭৮, মহারাজা নন্দকুমার রোড, সাউথ, বরাহনগর, কলকাতা—৩৬। মূল্য : ৩ টাকা।

বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে কাপড় কাচতে হলে একদিকে যেমন সময় এবং অর্থের মিতব্যয়িতার কথা চিন্তা করা প্রয়োজন, অপরদিকে কেমন করে কাপড়-চোপড় দীর্ঘদিন টিকিয়ে রাখা যায় সে কথাও বিবেচনা করা প্রয়োজন। পরিষ্কার করবার পর পোশাক যেন নতুনের মত চকচকে ও উজ্জ্বল হয় এটা সকলেই চান, আবার সেই সঙ্গে চান তার সুতোর যেন কোন ক্ষতি না হয়, পশম বস্ত্রের কোন অংশ যেন কুঁচকে না যায় ইত্যাদি। আমাদের দেশে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে পোশাক পরিষ্কার পদ্ধতি শিক্ষা দেবার বিশেষ কোন বন্দোবস্ত নেই। সেই দিক থেকে বিচার করতে গেলে একথা মানতেই হবে যে, লেখক বাংলার সাধারণ গৃহস্থ পরিবারের খুবই উপকার করেছেন। কাপড় পরিষ্কার করা ছাড়াও, ইস্ত্রি ও ইস্ত্রি করার পদ্ধতি, রিপু করা, মাড় দেওয়া, পোকার হাত থেকে গরম কাপড় রক্ষা করা, এবং কাপড় থেকে নানাপ্রকার বিশ্রী দাগ কেমন করে তুলে ফেলা যায় এসব বিষয়ে শ্রীশান্ত যেসব নির্দেশ দিয়েছেন সেগুলি এ দেশের ঘরে ঘরে গৃহস্থালীর কাজকে সহজতর করে তুলবে বলে আমরা মনে করি।

পোলট্রী—সম্পাদক : শম্ভুনাথ মুখোপাধ্যায়, ৫০-এ, সুরি লেন, কলিকাতা-১২। মূল্য : প্রতি সংখ্যা এক টাকা।

বাংলাদেশে বহু রকম পত্রপত্রিকা হামেশাই বের হচ্ছে, কিন্তু বর্তমান অর্থনৈতিক দুরবস্থার বাজারে মধ্যবিত্ত বাঙালীকে সক্ষম ও স্বাবলম্বী হবার পথ দেখাতে পারে—এমন পত্রিকা নেই বললেই চলে। এই অবস্থায় সদ্য প্রকাশিত হাঁস-মুরগী পালনের একমাত্র মুখপত্র 'পোলট্রী' আমাদের মনে গভীর আশার সঞ্চার করেছে। কারণ গার্হস্থ্য শিল্প হিসেবে হাঁস-মুরগী যাঁরা পালন করেন অথবা পালন করতে ইচ্ছুক তাঁরা এই পত্রিকা থেকে প্রভূত পরিমাণে সাহায্য পাবেন। সম্পাদকীয় প্রবন্ধে বলা হয়েছে : "আধুনিক পদ্ধতিতে ছোট ছোট হাঁস-মুরগী খামার তৈরি করে যাতে বেকার মানুষের কর্মসংস্থান হয়, লক্ষ লক্ষ মধ্যবিত্তের সংসারে যাতে একদিকে আয়ের আর একদিকে প্রোটিন জাতীয় খাদ্যের ব্যবস্থা হয়, তার জন্য সঠিক পথের সন্ধান দেবার চেষ্টা করার ব্রত নিয়েছে পোলট্রী।" পত্রিকাটির সমস্ত লেখার মধ্য দিয়ে সেই পথের সন্ধান দেবার মহতী প্রচেষ্টায় সম্পাদক সার্থক হয়েছেন। পোলট্রী পত্রিকার সফলতার জন্যে যে সব ব্যক্তি আন্তরিক সমর্থন ও শুভেচ্ছা জানিয়েছেন তাঁদের মধ্যে আছেন শ্রীবিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায়, শ্রীঅশোককুমার সেন ও ফণীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়।

পত্রিকাটিতে এমন কতকগুলি জ্ঞাতব্য বিষয় জানা যাবে যা মুরগী পালনের ক্ষেত্রে অপরিহার্য এবং অন্যত্র দুর্লভ। লেখকেরা প্রায় প্রত্যেকেই স্বীয় অভিজ্ঞতা ও দীর্ঘ পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর এই গার্হস্থ্য শিল্পের বৃদ্ধি ও উন্নতির জন্য অনেক খবর জানিয়েছেন। তারপর আর একটি জিনিস যা পত্রিকায় লেখার পাশাপাশি দেওয়া হচ্ছে—তা ঐ শিল্পের উৎসাহী ব্যক্তিদের খুব উপকার সাধন করবে। সেই জিনিসটি হচ্ছে গার্হস্থ্য শিল্পে মুরগী পালন সংক্রান্ত এক এক পয়সায়ের বহু রকম ফটো ও ছবি। বর্তমান সংখ্যায় ডাঃ সন্তোষকুমার মুখোপাধ্যায় দিয়েছেন 'মুরগীর বাচ্চা পালন' সংক্রান্ত নানান তথ্য। শম্ভুনাথ মুখোপাধ্যায় "ডীপ লিটার' কি ও কেন ?"-তে লিখেছেন মুরগী পালন বা মুরগীর খামারের আধুনিক অথচ কম পরিশ্রম সাপেক্ষ ব্যবস্থার বহু বিবরণ। অন্যান্য রচনাগুলিও মুরগী পালনের ব্যাপারে যথেষ্ট সহায়ক। যেমন, ভূপেশচন্দ্র দত্তের মুরগী পালনে ব্যবহারিক পদ্ধতি প্রকল্প, মুনজচন্দ্র সর্বাধিকারীর মুরগী অস্পৃশ্য নয়, সত্যেন্দ্রনাথ বিশ্বাসের ভারতের পোলট্রী শিল্পের ক্রমবিকাশ, শ্রীশান্তর পোলট্রী পালনে পুরাতন মুখ, অমলকুমার রুদ্রর পোলট্রী ফার্মিং-এর গোড়ার কথা, দেবীপ্রসাদ নাগের পোলট্রী উন্নয়নে সরকারের করণীয় কি ? কল্যাণকুমার চক্রবর্তীর পশ্চিমবাংলায় মুরগী পালনে পশুচিকিৎসা অধিকারের অবদান। প্রশ্নোত্তর অন্যান্য সংবাদে ভরপুর লেখাগুলিও আকর্ষণীয়। পত্রিকার শেষাংশে ইংরেজিতে লিখেছেন শ্যামল মাইতি ডাঃ এ পি সচদেব, এ মুখার্জি ও সমরেন্দ্রনাথ রায়। পত্রিকাটি মাসিক হিসেবে প্রকাশিত হওয়া বাঞ্ছনীয়। বাংলাদেশের ঘরে ঘরে এ পত্রিকার সমাদর হওয়া অবশ্যই উচিত।

রেখালেখা (চতুর্দশ বর্ষ ১৯৬৮)—সোদপুর উচ্চতর মাধ্যমিক বহুমুখী বিদ্যালয় মুখপত্র। সম্পাদনায় চন্দ্রশেখর চট্টোপাধ্যায়, সনৎ বন্দ্যোপাধ্যায়, বীরেন্দ্রকিশোর ভট্টাচার্য, রামানুজ ভট্টাচার্য ও সুশান্ত গঙ্গোপাধ্যায়।

সোদপুর উচ্চতর মাধ্যমিক বহুমুখী বিদ্যালয় মুখপত্রটি—সুপরিকল্পিত প্রবন্ধ, ভ্রমণকাহিনী, নাটিকা, গল্প ও কবিতার সংকলনে সুধীজনের দৃষ্টি আকর্ষণ করার মতো একটি পত্রিকা। 'ভারতে গণতন্ত্র কি বিপন্ন ?' (অর্ধেন্দুশেখর রায়, একাদশ, কলা), 'দর্শনের ভূমিকা' (মিলনকুসুম ভট্টাচার্য, শিক্ষক) 'Hindi and three language formula' (H. D.—Teacher), 'Literature and its interpretation in life, (Dipak Bandopadhyay—Teacher) ইত্যাদি রচনা বৈশিষ্ট্যপূর্ণ। ম্যাক্সিম গোর্কির জন্ম-শতবার্ষিকী উপলক্ষে একাদশ বিজ্ঞানের ছাত্র কল্যাণ দাস কর্তৃক অঙ্কিত চিত্রটি প্রশংসনীয়।

সপ্তাহের বোঝা

কৃত্তিবাস ওঝা

এই সপ্তাহের বোঝা যখন প্রকাশিত হবে, তখন জনসাধারণ তাঁদের মনোনীত প্রার্থীদের ভোট দিয়ে বোঝা মুক্ত হয়েছেন। এই লেখা সব পাঠকের পড়া শেষ হবার আগেই হয়ত নির্বাচনী রায় প্রকাশ হয়ে যাবে এবং রাজ্যের নির্বাচনী ভাগ্য নির্ধারিত হয়ে যাবে। কে জিতবেন আর কে হারবেন, এই কথা বলার জন্য আমার কোন মাথাব্যথা নেই—কারণ আমার কাছে জনসাধারণের রায়-ই বড় কথা, সেই রায়ে কেউ হারলে আমি ব্যথা পাব না। আমি সব সময়েই বিজয়ের আনন্দে নিজেকে তুষ্ট রাখি—কারণ আমার কাছে জনগণই শেষ কথা, দল বা প্রার্থী নয়। কিন্তু এই জয়-পরাজয়ের কথা ভাবতে গিয়ে আমার মনে অনেকগুলি প্রশ্ন উঁকি মারছে। কাজেই আমি যেমন সব মনের কথা পাঠকদের কাছে তুলে ধরি, এই ক্ষেত্রেও তুলে ধরছি। ভাবনাটা হল—রাজ্যে নির্বাচনের পর কোন পক্ষের জয়-পরাজয়ের মধ্যেই কি নির্বাচনী উত্তাপ শেষ হবে? জয়-পরাজয়ের মধ্য দিয়েই কি রাজ্যে গণতান্ত্রিক সরকার প্রতিষ্ঠার পর শান্তি ফিরে আসবে? কেউ বলতে পারেন—হঠাৎ এই প্রশ্ন কেন? নির্বাচনই শেষ হোক আগে—দেখা যাক কোন্ পক্ষ জয়ী হয়, আর তাছাড়া কোন একদল সংখ্যাগরিষ্ঠতা না পেলে অবস্থা তো অন্য রকম হবে। আমি একটা কথা স্পষ্ট করে বলতে চাই, সেই কথাটা হল শেষের ভাবনাটা বোধ হয় না করলেও চলে—কারণ একটা কথা সম্ভবত সত্য, যে রাজ্যে যে পক্ষই হোক—কংগ্রেস অথবা যুক্তফ্রন্ট একজনই সংখ্যাগরিষ্ঠতা পাবে। মাঝপথের যাত্রীদের নিয়ে কোন সমস্যা হবে না। আর তাছাড়া আজ যাদের দেখছেন মাঝপথের যাত্রী হিসাবে, নির্বাচনের পর রাতারাতি দেখা যাবে অনেক পাখি কুলায় ফিরে গেছেন। কাজেই মাঝপথের যাত্রীদের নিয়ে কোন সমস্যাই হবে না। কিন্তু সমস্যা রয়েছে অন্যত্র—আমি সেই সমস্যাটি সম্পর্কে একটু হুঁশিয়ারী দিতে চাই। আমার চোখের সামনে একটি দৃশ্য আজো খুব স্পষ্ট ভাসছে। দৃশ্যটি হল ২২শে নভেম্বর ১৯৬৭ সালের অপরাহ্নে ব্রিগেড প্যারেড গ্রাউণ্ডের দৃশ্য। ২১শে রাত্রে যুক্তফ্রন্ট সরকারের পতন হয়েছে—শহরে ১৪৪ ধারা জারি করা হয়েছে—পূর্ব নির্ধারিত যুক্তফ্রন্টের ময়দানের সভা পুলিশ বাতিল করে দিয়েছে, কিন্তু যুক্তফ্রন্ট নেতৃবৃন্দ ঘোষণা করেছেন—তাঁরা ১৪৪ ধারা অমান্য করে সভা করবেন। দুপুর থেকেই সেদিন ময়দানে পুলিশ ভরে গেল, শুধু বন্দুক আর ঢালধারী পুলিশ নয়, ঘোড়সোয়ার পুলিশবাহিনী ময়দান কাঁপিয়ে পাহারা দিতে লাগলো—কোন পথে সভা করার উদ্যোক্তারা যাতে ময়দানে প্রবেশ করতে না পারে। সন্ধ্যা আগতপ্রায়, এমন সময় প্রথমে একখানা জীপ গাড়ি চক্কর মেরে যায়—পরে একখানা জীপে শ্রীবিশ্বনাথ মুখার্জী শ্রীঅমর চক্রবর্তী, শ্রীসুকুমার রায়, শ্রীনরেন দাশ, শ্রীঅরুণ ঘোষ প্রমুখ আসেন। পুলিশ তাঁদের কিভাবে অভ্যর্থনা করেছিল সেই কথা নিশ্চয়ই অনেকের স্মরণ আছে। শ্রীঅমর চক্রবর্তী মৃতপ্রায় পড়ে আছেন, শ্রীঅরুণ ঘোষ পাথর হয়ে গেছেন, শ্রীসুকুমার রায় তথৈবচ। কিন্তু রক্তাক্ত দেহে গর্জন করে চলেছেন একজন—তিনি হলেন শ্রীবিশ্বনাথ মুখার্জী। শ্রীমুখার্জীর সেই চিৎকার আজো কানে বাজে। পুলিশবাহিনীর উদ্দেশ্যে বলছেন—শুনে রাখো তোমরা, আমরা আবার ফিরে আসছি—তোমাদের এত বড় স্পর্ধা, কাল অমরবাবু মন্ত্রী ছিলেন—তাঁকে স্যালুট করেছ, আজ তাঁকে মেরে ফেললে। (অমরবাবু মারা যান নি, কিন্তু বহু মাস হাসপাতালে ছিলেন এবং তিনি কংগ্রেস-পি-ডি-এফ কোয়ালিশন সরকার দেখতে পান নি—মুক্ত হয়েছিলেন রাষ্ট্রপতি শাসনের আমলে)। আজ আমার প্রশ্ন—আবার আমরা ফিরে আসছি, তাঁরা যদি ফিরে আসেন—তবে? অবশ্য সেই দিনের সেই পুলিশ অফিসার, যিনি ময়দানের দায়িত্বে ছিলেন তিনি আর পুলিশের চাকরীতে নেই। চাকরী ছেড়ে অন্য চাকরীতে গেছেন। কিন্তু শ্রীবিশ্বনাথ মুখার্জী বা শ্রীঅমর চক্রবর্তী যদি আবার মন্ত্রী হয়ে আসেন, তবে এই পুলিশের সঙ্গে তাঁদের সম্পর্ক কেমন হবে? শ্রীবিশ্বনাথ মুখার্জী বা শ্রীঅমর চক্রবর্তী সেইদিন যে প্রথম পুলিশের কাছে মার খেলেন এমন নয়—জীবনে বহুবার তাঁরা জেলে গেছেন, বহু নির্যাতন ভোগ করেছেন—এমন কি একজন তো প্রায় ফাঁসির দড়ি পরতে গিয়েছিলেন, কিন্তু সেই অভিজ্ঞতা আর এই অভিজ্ঞতা এক নয়। কিন্তু এই আশঙ্কা হয়ত নিতান্তই অমূলক। কারণ যাঁরা মন্ত্রী হবেন, তাঁরা নিশ্চয়ই কোন প্রতিহিংসাপরায়ণ মনোবৃত্তি আঁকড়ে থাকবেন না, কিন্তু ভয় হল সভা, সমর্থক আর অনুরাগীদের নিয়ে। গতবার যুক্তফ্রন্ট জয়ী হলে জনতা শুধু জয়ের আনন্দে উদ্বেল হয়েছিল, কিন্তু এইবার শুধু জয়ের আনন্দে উদ্বেল হওয়া নয়, সেই সঙ্গে তাঁদের বিরুদ্ধবাদীদের প্রতি প্রতিহিংসাপরায়ণ হয়ে উঠতে পারে। আশঙ্কা একেবারে অমূলক নয়। কারণ কোন একটা শ্রেণীর মনে এই ধারণা হতে পারে যে বিরোধী আর ষড়যন্ত্রকারীদের শায়েস্তা করার দায়িত্ব তাদেরই নিতে হবে। এই ভাব যদি জয়ের আনন্দের সঙ্গে তাদের সরকার রক্ষার দায়িত্ব পালনের অজুহাতে নিজেরা শান্তি রক্ষার দায়িত্ব নেয়, তবে সেটা হবে সবচেয়ে বড় বিপদের কথা।

একই কথা সত্য হবে, যদি কংগ্রেস একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করে। কংগ্রেস সরকারের বা কোয়ালিশন সরকারের পতন ঘটাতে যারা দলত্যাগ করেছিল অথবা তাঁদের নেতাদের বিরুদ্ধে নানা অভিযোগ তুলে বাজার গরম করেছিল অথবা যারা সরকার হাতে পেয়ে গণকমিটি করে কংগ্রেস কর্মী সমর্থকদের নির্যাতন করেছিল—তাদের বিরুদ্ধে যদি কংগ্রেস কর্মী ও সমর্থকরা পথে এসে জয়ের আনন্দের সঙ্গে সঙ্গে "কবর দাও" ধ্বনি কার্যকরী করতে শুরু করেন, তবে সেটা হবে বিপদের আর এক দিক। সর্বোপরি এই দুই শক্তির মাঝে রয়েছে রাজ্যের পুলিশবাহিনী। পুলিশ সম্পর্কে

কিন্তু দুই পক্ষেরই অভিযোগ প্রায় সমান—কারণ আজ অনেক দলের কাছে পুলিশ বা সরকারী কর্মচারী শুধু প্রশাসনের অঙ্গ নয়—অনেকের সম্পর্কে একটা ধারণা সৃষ্টি হয়েছে অমুক অমুক দলের সমর্থক বা সহানুভূতিশীল।

চীনে সংস্কৃতি বিপ্লবের নামে যে কাজ চলে, আমাদের রাজ্যেও তার নতুন ফরম দেখা দেবে যদি জনসাধারণ শুধুমাত্র তাদের ভোটাধিকার প্রয়োগ করে সরকার গঠন করে দায়িত্ব শেষ না করে। সব দলেরই কর্মীরা যদি সরকার গঠনের পর সরকার রক্ষার দায়িত্ব নিজের হাতে তুলে নেয় বা সরকার-বিরোধীদের শায়েস্তা করার দায়িত্ব নিজেরা গ্রহণ করে, তবে দেখা যাবে আমাদেরও দেশেও সংস্কৃতি বিপ্লব শুরু হয়ে গেছে। আর এই বিপ্লব শুরু হলে শুধু মন্ত্রীরা বা পুলিশ অফিসাররা এই বিপ্লবীদের মাথা ঠাণ্ডা করতে পারবেন না। আমি যে বিপদের ইঙ্গিত দিচ্ছি সেটা হল—নির্বাচনের পর জয়ের আনন্দে বেশ কিছু লোকের মাথা গরম হয়ে যাবে। তারা চাইবে তক্ষুণি তাদের বিরুদ্ধে যেসকল অন্যায় অত্যাচার অবিচার হয়েছে, তার প্রতিকার করতে অথবা যে হাতে এই অন্যায় অত্যাচারের পিছনে আছে, সেই হাতখানিকে অকেজো করে দিতে। এই কথা একই রকম সত্য কংগ্রেসের পক্ষে, সত্য একইভাবে যুক্তফ্রন্টের পক্ষেও। কিন্তু পরিষদীয় গণতান্ত্রিক শাসনে মাথা গরমের কোন স্থান নেই। ছকবাঁধা পথে নির্দিষ্ট গতিপথে পরিষদীয় গণতন্ত্রের কাজ চলবে—সেই নির্দিষ্ট গণ্ডী বা পথের বাইরে যাবার কারো অধিকার থাকতে পারে না। কারো পছন্দ হোক বা না হোক, পরিষদীয় গণতন্ত্রকে সোনার গহনা বলে অঙ্গে ধারণ করলে সোনার মর্যাদায় গ্রহণ করতে হবে, আর যদি গিল্টি সোনা বলেও মনে হয়, তবু সেই গিল্টি-সোনাকেও নিখাদ সোনার মর্যাদা দিতে হবে। কারো অধিকার নেই সেই সোনাকে গিল্টিতে পরিণত করার অথবা গিল্টিকে নিখাদ সোনায় পরিণত করার। একটি পয়সা দিয়ে অক্রূর সংবাদ গান শুনবেন আবার সেই গানে আপনাকে যা কাঁদাতে পারলে পয়সা ফেরৎ চাইবেন—তা চলবে না। এক পয়সার গান এক পয়সার গানই হবে—আপনি খুশিমত পালা বদল করে শুনতে পাবেন না। কিন্তু আমার আশঙ্কাটা এইখান থেকে শুরু হচ্ছে, যে, গানের শ্রোতাদের মধ্যে অনেকে আছেন—যাঁরা যে পয়সার গান, তার চেয়ে বেশি কিছু চেয়ে বসবেন এবং সেই প্রত্যাশা পূরণের জন্য অনাসৃষ্টির পথে যাবেন। বিপদের আবার আর একটা দিক আছে—সেটা কর্মীদের নিয়ে নয়, নেতাদের নিয়ে। কোন কোন নির্বাচন-প্রার্থী নেতা পরাজয়ের পর আবিষ্কার করবেন যে, অমুকের সহযোগিতার অভাবে বা অমুকের বিশ্বাসঘাতকতায় তাঁর পরাজয় হল। অতএব রাতারাতি নকশালপন্থী হয়ে যাও অথবা রাতারাতি বিক্ষুব্ধ কংগ্রেসী শিবিরে নাম লেখাও আর তারপর তারই সহকর্মীদের দ্বারা গঠিত সরকারের যত শীঘ্র পতন ঘটানো যায় তার চেষ্টা করো। এই ঘটনা অতীতে এত বেশি মনে পড়ে নি কারো—কারণ তখন পশ্চিমবঙ্গের কারো ধারণা ছিল না, ষড়যন্ত্র করলে যুক্তফ্রন্ট সরকারের পতন হয় বা ষড়যন্ত্র করলে কংগ্রেস কোয়ালিশন সরকারেরও পতন হয়। তাই কিছু নেতা বুঝে নিয়েছেন ঠিকমত ষড়যন্ত্র করতে পারলে সরকারের পতন ঘটানো যেতে পারে—হয়ত বা সেই কাজের মধ্যে দিয়ে বেশ সুখ্যাতি বা কুখ্যাতির পথে খবরের কাগজের হেডিং হওয়া যেতে পারে। তাই আগামী দিনের বিপদ হবে, কর্মীরা যদি নিজেরা প্রতিহিংসা চরিতার্থ করতে আইন-শৃঙ্খলা রক্ষার ভার বা কাউকে শায়েস্তা করার ভার নিজেদের হাতে তুলে নেয় অথবা নেতারা যদি রাতারাতি হিরো হবার আশায় অথবা নিজেকে ভাসাতে নিজের দলকেই ডুবাতে চান। এই পথই পরিষদীয় গণতন্ত্রের বিপদ ডেকে আনবে। সব বিপদ সব সময় সাদা চোখে দেখা যায় না, কিন্তু সাধুরা শয়তানকে জাগতে দেখলেই সাবধান হন। পশ্চিমবঙ্গের গণতন্ত্রপ্রিয় সাধু ব্যক্তিরা নিশ্চয়ই শয়তানের চোখ মেলা দেখেই সাবধান হবেন। সাবধান হতে হবে অতি দ্রুত, কারণ রাজ্য রাজনীতিতে যে নতুন পাঠ শুরু হচ্ছে, সেই পাঠে জনসাধারণের সতর্ক প্রহরা চাই সব দিকে সর্ববিষয়ে।

—আটই ফেব্রুয়ারী, ১৯৬৯

বৈষ্ণব-সাহিত্যের অমূল্য অবদান

ভক্তিজগতের কৌস্তুভরত্ন, ভগবদ্ভক্তগণের সাধনার ধন, ভক্তের তুলসী-মালার সদৃশ মহাপবিত্র ভক্তিশাস্ত্র সমন্বয়।

বৈষ্ণব গ্রন্থাবলী

শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রলাপ ও শিক্ষাষ্টক

শ্রীচৈতন্যদেবের শ্রীকৃষ্ণলাভের জন্য যে উৎকণ্ঠা, এই 'প্রলাপে' তাহা অভিব্যক্ত। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শ্রীমুখনিঃসৃত 'শিক্ষাষ্টক শ্লোকই' তাঁহার একমাত্র রচনা। শ্রীল কৃষ্ণদাস গোস্বামীর সুললিত পদ্যানুবাদে এই অমিয় মাধুরী লীলায়িত।

নরোত্তম বিলাস

বৈষ্ণবগণের পরম উপভোগ্য উপজীব্য ভক্তিচারিতামৃত।

দুর্লভসার

শ্রীচৈতন্যমঙ্গল-রচয়িতা শ্রীল লোচনদাস বিরচিত, বৈষ্ণবগণের সংপূজিত।

আত্মতত্ত্ব

বৈষ্ণব দর্শনের সূক্ষ্মতম অনুসরণ।

মনঃশিক্ষা

শ্রীপ্রেমানন্দ দাস ঠাকুর বিরচিত। বৈষ্ণব-সিদ্ধান্ত সাধন-ভজনের নিগূঢ় মর্মসমাহিত।

শ্রীচমৎকার চন্দ্রিকা

পরম পণ্ডিত শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী প্রণীত. সংস্কৃত গ্রন্থ হইতে তাঁহার সুযোগ্য শিষ্য পরম বৈষ্ণব শ্রীল কৃষ্ণদাসের সুললিত পদ্যানুবাদ।

পাষণ্ড-দলন

মূর্তিমান বৈরাগ্য শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর বিরচিত প্রেমভক্তির লহর-লীলা।

ভক্তিতত্ত্বসার

হাটপত্তন, শ্রীশ্রীগুরুবন্দনা, নামসংকীর্তন, চৌত্রিশ পদাবলী, শ্রীকৃষ্ণের অষ্টোত্তর শতনাম, নরোত্তম দাসের প্রার্থনা, প্রেমভক্তি চন্দ্রিকা। সুলভে নামমাত্র মূল্যে বিতরিত।

মূল্য ঃ ৬·৫০

বসুমতী প্রাইভেট লিমিটেড ঃ ১৬৬, বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী স্ট্রীট, কলি-১২

প্রেম ও অপ্রেমের কবি সঞ্জয় ভট্টাচার্য

বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

"পৃথিবীর বেদনার মত ম্লান দাঁড়ালাম।
হাতে মৃত সূর্যের শিখা;
প্রেমের খাবার হাতে ডাকিলাম;
অঘ্রাণের মাঠের মৃত্তিকা
হয়ে গেল;
নাই জ্যোৎস্না—নাইক' মল্লিকা।"
—জীবনানন্দ দাশ

আমারই এক সমবয়েসী বন্ধু প্রায় এক যুগ আগে তাঁর প্রথম প্রকাশিত কাব্যগ্রন্থটি সঞ্জয় ভট্টাচার্যকে নিবেদন করেছিলেন। পূর্বসূরী কবির নামের সঙ্গে তিনি একটি বিশেষণও প্রয়োগ করেছিলেন, যার অর্থ হলো প্রাজ্ঞ। একজন মানুষকে হৃদয়ের প্রীতি ও শ্রদ্ধা নিবেদন করতে হলে সকল সময়ে যে তাঁর নামের পিছনে নির্ভুল বিশেষণটিকেই প্রয়োগ করতে হবে, এমন কোনো নিয়ম নেই। সঞ্জয় ভট্টাচার্য প্রচুর পড়াশুনা করেছিলেন; পূর্বাশা পত্রিকায় এবং বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় তার উদাহরণ আজো ছড়িয়ে আছে। কিন্তু তাঁর পাণ্ডিত্যের ভিত্তি ছিল পিছল; তিনি অস্থির প্রকৃতির মানুষ ছিলেন। রবীন্দ্রনাথ থেকে শুরু করে বাংলা দেশের প্রায় প্রতিটি পণ্ডিত ব্যক্তির সঙ্গে তাঁর সামাজিক সম্পর্ক ছিল; কিন্তু জীবনের শেষ দশকে তিনি ছিলেন সম্পূর্ণ একক; সকল সম্পর্কই তখন ছিন্ন হয়ে গেছে। এর কারণ, তিনি মানিয়ে চলতে জানতেন না; যে সূর্যের শিখা হাতে করে তিনি একদিন পূর্বাশার সভায় দীপ্ত হয়েছিলেন, তা সময়ে মৃত ও ম্লান হয়ে গিয়েছিল। প্রেমের খাবার হাতে তিনি বাংলা দেশের কবি, সাহিত্যিক, শিল্পীদের ঠিকই আহ্বান করেছিলেন; কিন্তু একদিন তা অঘ্রাণের মাঠের মৃত্তিকা হয়ে যেতে পারে, যদি তিনি প্রাজ্ঞ মনীষীর মত সামনের সমস্ত, কঠিন আঘাতকে হাসিমুখে সহ্য করতে না শেখেন, এই বোধ তাঁর ছিল না।

কতিপয় স্বদেশী নেতার অদূরদর্শিতা ও অতিলোভের ফলে ভারতবর্ষ যেদিন দ্বিখণ্ডিত হয়ে গেল, সেইদিন পূর্বাশা প্রেস এবং পূর্বাশা পত্রিকার কপাল ভাঙলো। সঞ্জয় ভট্টাচার্য তাঁর রাজসিংহাসন থেকে পথে নেমে এলেন; সঙ্গে ভিক্ষার ঝুলি ছাড়া সেদিন আর কিছুই নেই। পূর্বাশার দরজায় এককণা দক্ষিণার জন্য যাঁরা সমস্ত দিন, সমস্ত রাত ঘুরঘুর করতেন; তাঁদের একজনও এই দুর্দিনে সামনে এসে তাঁর হাত ধরলেন না। সবাই তাঁকে পরিত্যাগ করলেন। একমাত্র উৎসবের দিন থেকে শ্মশানযাত্রার দিনটিতেও অটল ধৈর্য ও প্রেমের শিখাটি একজন মানুষ জ্বালিয়ে রেখেছিলেন; তিনি পূর্বাশার এককালীন 'বড় বন্ধু' শ্রীসত্যপ্রসন্ন দত্ত। কিন্তু তিনি নিজেই ম্লান হয়ে গেছেন; বন্ধুকে

সঞ্জয় ভট্টাচার্য
(আলোকচিত্র মানস গুহর সৌজন্যে)

কোনো রকমে বাঁচিয়ে রাখার তপস্যা ছাড়া তাঁর করার কিছুই ছিল না।

এতবড় আঘাত সঞ্জয় ভট্টাচার্য সহ্য করতে পারেন নি। তিনি আত্মহত্যার চেষ্টা করলেন; তারপর উন্মাদ হয়ে গেলেন। কোনো স্থিরচিত্ত মানুষের জীবনে এই সব ঘটনা সম্ভব হয় না। প্রচণ্ড অভিমান ও অস্তিত্বের যন্ত্রণা তাঁকে প্রেমের পথ থেকে এক ধাক্কায় আত্মহননের পথে ছুঁড়ে দিল। সেই সময় যদি চল্লিশের মুষ্টিমেয় কবি ও কলাসাহিত্যিক কাছে এসে তাঁর হাত না ধরতেন, আজ থেকে এক যুগ আগেই তিনি বোবা ও অন্ধ হয়ে যেতেন। দাদা বিজয় ভট্টাচার্যের বাড়িতে তিনি তখন প্রচণ্ড রুগ্ন জীবন বহন করছেন। চোখে দেখেন না; কোনো বইয়ের এক লাইন পড়তে পারেন না; হাতে করে কিছু স্পর্শ করতে পারেন না; সমস্ত শরীর তাঁর থরথর করে কাঁপে। এমন সময়ে তাঁকে চল্লিশের জনৈক কবি তাঁর সদ্য-প্রকাশিত কাব্যগ্রন্থটি উৎসর্গ করলেন। সত্যবাবু বললেন, 'কাকে বই দিতে যাচ্ছো? সঞ্জয় হাতে করে বই ধরতে পারে না পর্যন্ত; চোখেও দেখে না।'

কিন্তু সেই বই তিনি হাতে করে ধরেছিলেন; পড়তে চেষ্টা করেছিলেন। এর কিছুদিন পর তাঁকে যখন কবিতা-মেলার পক্ষ থেকে মানপত্র অর্পণ করা হয়, তখন সঞ্জয় ভট্টাচার্য প্রায় সুস্থ হয়ে উঠেছেন; সভায় একটি সংক্ষিপ্ত ভাষণও দিলেন তিনি। এর পর দীর্ঘদিন যদিও তিনি নিজের কবিতার বিচার করতে পারতেন না, কিন্তু অজস্র কবিতা লিখতে সুরু করলেন। সেই সব কবিতা দেশ, আনন্দবাজার এবং অন্যান্য পত্রিকার জন্য অপর কবিকে নির্বাচন করে দিতে হতো। তিনি শুধু একদিন বলেছিলেন, 'দ্যাখো! যেন খারাপ কবিতা দিও না।'

তারপর একদিন সঞ্জয় ভট্টাচার্য সম্পূর্ণ ভাল হয়ে গেলেন। যাঁরা দুর্দিনে তাঁর সঙ্গ ত্যাগ করেন নি, যদিও তাঁরা সংখ্যায় পাঁচজনও ছিলেন না, এই সময় অনুভব করতে পেরেছিলেন, সঞ্জয়বাবুর আসল রোগটা কোথায়? একদিন তিনি প্রেমের খাবার হাতে সবাইকে ডেকেছিলেন; সেদিন হাতের সেই অন্ন অঘ্রাণের মৃত্তিকা হয়ে গিয়েছিল। আবার তিনি জ্যোৎস্না হয়ে মল্লিকা হয়ে ফুটে উঠতে চেয়েছিলেন; কিন্তু সেদিন কেউ প্রেমের খাবার নিয়ে তাঁকে কাছে ডাকে নি। মাত্র কয়েকজন উত্তরসূরী, যাঁরা তাঁর কাছে একদিন বালক ছিলেন, সঞ্জয় ভট্টাচার্যকে তাঁদের হৃদয়ের উত্তাপ দিয়ে বাঁচিয়ে রাখতে চেয়েছিলেন। সঞ্জয় ভট্টাচার্য তাই কবিতার জ্যোৎস্নায় আবার পথ হাঁটতে পেরেছিলেন।

কিন্তু এই বালকদের সঙ্গেও তিনি নিজেকে মেলাতে পারেন নি। আংশিক সুস্থ হয়ে ওঠার পর, তিনি যখন চাকুরিয়ার স্থায়ী বাসিন্দা, আবার ঠিক করলেন পূর্বাশা বের করবেন। পত্রিকা বের হলো; আর সুরু হলো নতুন করে বন্ধু-বিচ্ছেদ। কারা কমিউনিস্ট হয়ে গেছে, আর কারা অশ্লীল সাহিত্য রচনা করছে, তা নিয়ে যেন একমাত্র তাঁরই মাথাব্যথা; এবং যেন হঠাৎ তিনি এই সত্য আবিষ্কার করলেন; বাংলা দেশের অনেক কবি-সাহিত্যিকের সঙ্গেই আর কোনরূপ সামাজিক যোগাযোগ রাখা তাঁর পক্ষে সম্ভব নয়। এর ফলে তিনি ক্রমেই বিচ্ছিন্ন হয়ে যেতে সুরু করলেন, যাঁরা তাঁকে কোনোদিনই ত্যাগ করেন নি তাঁদের কাছ থেকেও। নকল-বন্ধুরা

সদ্য বিকশিত গোলাপের মত সুন্দর আনন ও
কুসুম কোমল
পাপড়ি পেলব তনু

সাধনা বিউটি ক্রীম-এর
এইতো সবচেয়ে বড় অবদান।
নিজেদের সৌন্দর্য্য সম্পর্কে
সচেতন আধুনিকারা তাই
এর প্রশংসায় মুখর।

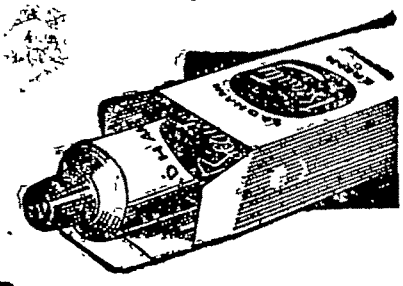

সাধনা
বিউটি
ক্রীম
অপরিহার্য
অতি আধুনিক অঙ্গরাগ

সাধনা ঔষধালয়-চাকা কলিকাতা-৪০

ছোড়দাকে বাঁচাতে হবে

সুশীলকুমার গুপ্ত

ছোড়দাকে বাঁচাতে হবে।
ছোড়দা আজ বন্দী হ'য়ে আছে
স্কুল অফ ট্রপিকাল মেডিসিনে দোতলার ঘরে,
যুগের যন্ত্রণা রোগবিষাদের সঙ্গে মুখোমুখি
বোঝাপড়া ক'রে নেবে বলে
শতাব্দীর শর্তহীন নায়কের মতো।

ছোড়দা আমাদের
এখনো কবিতা পড়ে, সবচেয়ে সুগন্ধ সবুজ
ধূপকাঠি জেবলে দেয়, গাঢ়তম নির্মল গোলাপে
ফুলদানি সাজায়, মাকে রোজ
আকাশের কথা লেখে, ছোট বোন গেলে তার হাতে
লেবু খায়, বলে, "বাঁশী, বল,
কবে যাব মা'র কাছে, কবে
মা'র কোলে মাথা গুঁজে ঘুমব, সকালে
খাবার টেবিলে বসে কফি খেতে খেতে
ডুবে যাব দৈনিক কাগজে, কিংবা রাতে
অন্ধকার বারান্দায় চোখ জেবলে ঘনিষ্ঠ তারায়
বসব নীলবৃক্ষ হ'য়ে।...আমি বাড়ি যাব,
এখনো আমার বহু নদী
মধ্যপথে।"...ছোড়দার গলায়
পৃথিবীর সবচেয়ে গভীর নদীর
পবিত্র কল্লোল কাঁপে, সবচেয়ে উঁচু শিখরের
ছায়া পড়ে চোখের চাতালে, প্রিয়তম
পাখির গায়ের রঙ ফুটে ওঠে অমল ঠোঁটের
আত্মস্থ পল্লবে, দুই হাতে
ধরা দেয় দূরতম বন্দরের হাত, রক্তে দোলে
দ্রুততম জাহাজের পুরাতন ঘণ্টার আহ্বান।
ছোড়দাকে বাঁচাতে হবে।
যত রক্ত চাই দেব,
ছোড়দাকে বাঁচাতে হবে,
সেই সঙ্গে বাঁচাব আমরা
আমাদের সবচেয়ে যা স্বকীয়, একান্ত, গহন।

মাঝে-মধ্যে এসে দরজায় কড়া নাড়তেন, যখন দীর্ঘকাল বন্ধ থাকার পর এক সংখ্যা পূর্বাশা বেরুতো তখনই। অন্য সময় তাঁদের দেখা মিলতো না। সত্য-প্রসন্নবাবু এবং ঢাকুরিয়ার সামান্য কয়েকজন বালক-বালিকা তাঁদের সমস্ত স্নেহ দিয়ে তখনও সঞ্জয় ভট্টাচার্যকে সমস্ত বিপদ থেকে আড়াল করতে চেষ্টা করছেন। আর যাঁরা তাঁরই সমান অভিমানী, তাঁরা নিজেদের দূরে সরিয়ে রাখছে।

মানাতে না পারার, বিচ্ছিন্ন হ'য়ে থাকার প্রচণ্ড যন্ত্রণায় বাংলা দেশে সঞ্জয় ভট্টাচার্যই একক কবি ছিলেন না। তাঁর আগে, জীবনানন্দ দাশকেও আমরা একই যন্ত্রণায় ভুগতে দেখেছি। সুধীন্দ্রনাথ ভুগতেন, কিন্তু তিনি, মানাতে পারতেন। সঞ্জয় ভট্টাচার্য কিন্তু এই একাকীত্বে সবাইকে ছাড়িয়ে গিয়েছিলেন ; এর ওপর ছিল চরম অর্থকষ্ট। তবু অস্তিত্বের এই ভয়ঙ্কর বিপর্যয়ের মধ্যেও তিনি অনবদ্য, অজস্র প্রেমের কবিতা রচনা করে গিয়েছেন। যখন সুখে ছিলেন, পূর্বাশার সম্পাদক হিসেবে হাতে সূর্যের শিখাকে ধারণ করে-ছিলেন, কবি-সাহিত্যিক-প্রাবন্ধিক হিসেবে তিনি নামী ছিলেন। কিন্তু পরবর্তী অধ্যায়ে, একবার মৃত্যুর হাত থেকে এবং দু'বার মানসিক ব্যাধির হাসপাতাল থেকে ঘুরে আসার পর তিনি যেসব আশ্চর্য প্রেমের কবিতা রচনা করেছিলেন তারাই বাংলা সাহিত্যে তাঁকে কিছুদিনের জন্যও অমর করে রাখবে। তাঁর অন্যান্য সমস্ত পাণ্ডিত্য, যা শেষ পর্যন্ত কমিউনিস্ট-বিরোধিতার মত অন্ধকার অপ্রেমের মধ্যেও কানামাছি খেলেছিলো, আমার কাছে অনেকটাই মূল্যহীন। বাংলা দেশে তাঁর তুলনায় দীপ্ত কথাসাহিত্যিকের সংখ্যা কম নয়। কিন্তু আধুনিক বাংলা কবিতায় তাঁর মত আরেকজন সৎ ও হৃদয়বান কবিকে খুঁজে পাওয়া আজকের দিনে খুবই কঠিন কাজ।

এক যুগেরও বেশিদিন ধ'রে বাংলা-সাহিত্যে, অথবা বাংলা কবিতায় সঞ্জয় ভট্টাচার্য পৃথিবীর বেদনার মত স্লান দাঁড়িয়েছিলেন। আমরা এই সময় তাঁর কাছ থেকে ক্রমেই বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ছিলাম ; কেন না রাজনৈতিক চেতনার দিক থেকে আমাদের কেউ কেউ ছিলাম তাঁর বিরোধী শিবিরের ; আর এই বিরোধকে তিনি মোটেই সহজভাবে নিতেন না। কিন্তু তবু, সঞ্জয় ভট্টাচার্যকে এই সময়েই আমরা সবচেয়ে বেশি ভালবেসেছিলাম। মানুষ হিসেবে কোথাও তিনি ভয়ানক একগুঁয়ে কিন্তু শিশুর মত সৎ ও সরল ছিলেন। হয় তো আমাদের ভালবাসার কারণও এখানেই। *

আমার ইউরোপ ভ্রমণ

ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায়

বিখ্যাত ভূতের গল্প আর রূপকথার অবিস্মরণীয় লেখক ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায়ের নাম সবাই জানলেও তাঁর বিস্ময়কর জীবনকথা ক'জনই বা জানেন? বই-এর নাম A VISIT TO EUROPE—এই বইতে তাঁর দেশপ্রেমের যে আশ্চর্য পরিচয় আছে, তাঁর বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি (যা আজও প্রায় বিরল) যে কত গভীর তার সকল পরিচয় আছে এ বইতে। এই দুষ্প্রাপ্য বইখানির অনুবাদ ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হবে সাপ্তাহিক বসুমতীতে আগামী সংখ্যা (২০-২-৬৯) থেকে। অনুবাদ করেছেন : শ্রীপরিমল গোস্বামী।

---

* সঞ্জয় ভট্টাচার্যর জন্মতারিখটি ঠিক জানা যায় নি। ঘনিষ্ঠ বন্ধুবান্ধবেরা ৪ ফেব্রুয়ারী তাঁর জন্মদিন পালন করতেন। তাঁর মৃত্যুর দিনটিও ৪ ফেব্রুয়ারী, ঠিক যেদিন তাঁর ষাট বছর পূর্ণ হবার কথা।

আগুন নিয়ে খেলা

রবীন্দ্রগুহ

আফিস থেকে ফিরে সবে হাতমুখ ধুতে যাবো এমন সময় শংকর হাঁপাতে হাঁপাতে এসে খবর দিল—'দাদা, আগুন লেগেছে, আগুন।'

ছুটে বাইরে এলাম। সরকারদের বাড়ির মাথার ওপর তখন আকাশ জুড়ে যেন সূর্যাস্তের রঙ লেগেছে। ধূম্র বানরের মতন আগুন লাফিয়ে লাফিয়ে চতুর্দিককে ছত্রাকার হয়ে পড়ছে। দেখতে দেখতে ফায়ার ব্রিগেডের লোকেরা এসে গেল। চোখেমুখে মুখোস এঁটে জনকয়েক লোক হুড়মুড় করে ঢুকে পড়ল জ্বলন্ত বাড়িটার ভেতর।

যারা সময় মত ফুরসৎ পেয়ে ভেতর থেকে বেরিয়ে আসতে পেরেছিল, তারা একজোট হয়ে চোখ মুচছে।

কিছুক্ষণের মধ্যেই রাশি রাশি মালপত্রের সঙ্গে দুটো অগ্নিদগ্ধ মৃতদেহ টেনে বার করা হল। চামড়া চেঁছে নেওয়া ঝলসানো শুয়োরের মতন দেখতে। বীভৎস নাকমুখ, গোলগর্ত চোখের মধ্যে রাজ্যের অঙ্গার। ওরই মধ্যে একজনার বুকখানা থির থির করে কাঁপছিল। ক্রমশ ভিড় জমে উঠছিল বলে করিৎকর্মা যুবকেরা কর্ডন বেঁধে দিল চারদিকে।

একজন বয়স্ক লোক ক্রমাগত আপশোষ করছিল—'ইস, সাত পুরুষের ভিটে, কত কষ্টের ধন, আহা—'

'জিনিস-পত্তর কিছু বাঁচাতে পারল?'

'আর জিনিস-পত্তর, মানুষই বাঁচল না, দু'-দুটো প্রাণ, ইস—'

'কিন্তু লাগল কি করে আগুন?'

কে একজন ভিড়ের ভিতর থেকে দাঁতমুখ খিঁচিয়ে উঠল—'বুকের পাশ থেকে চোর পালাচ্ছে মশাই, আগে জাপ্টে ধরুন, সিঁধকাঠি কোথায় পেয়েছে পরে শুনবেন।'

ভদ্রলোক বড় লজ্জা পেলেন। সসঙ্কোচে কয়েকবার এদিক-ওদিক তাকিয়ে নিয়ে সন্তর্পণে ভিড়ের মধ্যে মিশে গেলেন। কিন্তু কথাটা উড়িয়ে দেবার মতন নয়। যা ঘটার তা ত' ঘটছেই। এ অবস্থায় আমরা আর পাঁচজন অকর্মণ্য লোক কি করতে পারি। যারা করবার, অর্থাৎ পাড়ার করিৎকর্মা ছেলেরা, ফায়ার ব্রিগেডের লোকেরা তো করছেনই প্রাণপণ। আগুনটা হঠাৎ লাগল কিভাবে তা জানা দরকার বৈকি। আর ঠিক লেগেইছে যে, তাই বলা যায় কি করে, কেউ লাগিয়েছে এমনও তো হতে পারে? কার শত্রু কে মুখ দেখে তা টের পাওয়ার উপায় আছে নাকি?

তবু ভিড়ের মধ্য থেকে দু'-একটা কানাঘুষা কানে এলো। কেউ বলল—ভাইয়ে ভাইয়ে ঝগড়া বেধেছিল, ছোটজন রাগ সামলাতে না পেরে আগুন ধরিয়ে দিয়েছে বাড়িটায়।'

নিন্দুকরা বলল—'না হে না, ওসব কিছু নয়। ঝগড়া হয়েছিল সত্যি, কিন্তু ভাইয়ে ভাইয়ে নয়, ভাইয়ে ভাদ্রবৌয়ে। সেই যে সুন্দরী কলাবতী হে, পাখির মতন উড়ে-উড়ে চলত, রাস্তা দিয়ে। কিছু-মিছু ঘটেছিল নাকি একটা—সে ভারি লজ্জার কথা—সেই লজ্জা লুকোতে শরীরে আগুন ধরিয়ে দিয়েছিল। মেয়েটাও পুড়ে মরল, বাড়িটাও জ্বলে ছারখার—'

একটা বাচ্চা ছেলে লাটিমে সুতো জড়াতে জড়াতে বলল—'উঁহুঁ, ওসব কিছু নয়, আমি জানি কে লাগিয়েছে।'

রসের আলোচনায় বাধা পড়ায় চটে উঠল বয়স্ক লোকেরা। তারা দাবড়ি দিয়ে উঠল—'যা যা, ভাগ্। ডেঁপো কোথাকার।'

ছেলেটা বিরস মুখে সরে গেল সেখান থেকে। আগুনের দাপট ততক্ষণে পুরোপুরি আয়ত্তে এনে ফেলেছিল ফায়ার ব্রিগেডের লোকেরা। বিশাল পোড়া খাঁচাটা ঘিরে এখন শুধু অনর্গল ধোঁয়ার কুণ্ডলি উঠছে পাকিয়ে পাকিয়ে।

নানা কথা ভাবতে ভাবতে বাড়ি ফিরছিলাম, হঠাৎ সদর রোডের মোড়ে পৌঁছতেই নজর পড়ল গৌরকেষ্টবাবুর চায়ের দোকানটার দিকে। দুটি পরিচিত মুখ পাশাপাশি বসে উচ্চরোলে হাসাহাসি করছে। একজন বৃদ্ধ অবসরপ্রাপ্ত আইনবিদ্ বটুকেশ্বর চক্রবর্তী, অন্যজন আমার ভাইরস শংকর। তার বাঁ হাতের আঙুলের ফাঁকে জ্বলন্ত সিগ্রেট।

বটুকেশ্বরবাবুর সঙ্গে শংকরের হৃদ্যতা বড় বেমানান, ঠেকল আমার চোখে। প্রথমত বয়সের তফাৎ, একজন ষাটের কাছাকাছি, অন্যজন পনেরো-ষোল। বয়োজ্যেষ্ঠ ব্যক্তির সামনে বসে ওভাবে বিড়ি-সিগ্রেট খাওয়া দৃষ্টিকটু বৈকি! তাছাড়া আলোচনাটাও যে সম্মানজনক কোন বিষয় নিয়ে হচ্ছিল তা নয়। ওরা বেশ রসিয়ে রসিয়ে কথা বলছিল, আর হেসে উঠছিল জোরে জোরে। কিন্তু কি নিয়ে আলোচনা হচ্ছিল তা সঠিক আঁচ করতে পারলাম না। হঠাৎ শংকর আমাকে দেখতে পেয়ে বটুকবাবুকে আড়াল করে ঘুরে বসল। আমি এমন একটা ভাব দেখিয়ে হেঁটে চলে এলাম যেন কিছুই দৃষ্টিগোচর হয় নি। বা হলেও বিন্দুমাত্র ক্রুদ্ধ বা রাগান্বিত হই নি। অথচ ব্যাপারটা আমাকে রীতিমত উত্তেজিত করে তুলল।

বাড়ি ফিরে হাতমুখ ধুয়ে শংকরের জন্য অপেক্ষা করতে লাগলাম। ব্যাপারটা বুঝতে পেরেই হোক কিম্বা যে-কোন কারণেই হোক রোজ গভীর রাত করে বাড়ি ফিরল শংকর। নিঃশব্দে খাওয়া-দাওয়া সেরে পড়ার ঘরে গিয়ে ঢুকল।

ছোট্ট একটা খুপরি, আগে এটাকে স্টোররুম হিসাবে ব্যবহার করা হত। পড়াশুনার চাপ বাড়তে এটাকে নিজের জন্য বেছে নিয়েছে। একদিকে ছোট্ট একটা তক্তাপোশ, অন্যদিকে টেবিল-চেয়ার। ময়লা দেয়াল, বিবর্ণ। একটাও জানালা নেই কোনদিকে। ইলেকট্রিকের গণ্ডগোলের জন্য বিজলিবাতিরও বন্দোবস্ত নেই। ভাঙা একটা কৌটোর মাথায় মোমবাতি জ্বলছিল। একখানা মোটা বই খোলা ছিল টেবিলের ওপর, অথচ শংকরের সেদিকে দৃষ্টি নেই। নিথর হয়ে তাকিয়ে আছে সে দেয়ালের দিকে।

দরজার কাছাকাছি এসে আমি থমকে দাঁড়ালাম। বুকের মধ্যের সমস্ত রাগ জ্বালা ভুলে গিয়ে অবাক হয়ে ওর কাণ্ড লক্ষ্য করছিলাম।

দেয়ালের ওপর থমকে বসে থাকা একটা পোকার দিকে তাক করে প্রথমে সে হাতের আঙুলে টিপ করল, তারপর ঘাড়টা সোজা করল, বেশ দ্রুত হয়ে নড়েচড়ে বসল। দেয়ালের ওপর একটা ছায়া পড়ল, ছায়াটা সাপের মতন স্থির হয়ে রইল কিছুক্ষণ, তারপর অল্পস্বল্প কেঁপে উঠল, সতর্কভাবে এগুতে লাগল সামনের দিকে। কিন্তু অত সতর্কতা সত্ত্বেও পোকাটা ফুড়ুৎ করে উড়ে গিয়ে অন্যদিকে সরে বসল। শংকর ব্যর্থ হয়েও দমল না। ঘাড়ে গলায় ঝাঁকি দিয়ে পুনরায় সাবধান হয়ে বসল। হাতের আঙুলে টিপ ধরল। আবার ছায়া পড়ল দেয়ালে, কিছুক্ষণ স্থির হয়ে রইল সাপের মতন, তারপর অল্পস্বল্প কেঁপে উঠল, সতর্ক হয়ে এগুতে লাগল সামনের দিকে। এইভাবে এগুতে হঠাৎ ল্যাজের দিকটা খপ করে চেপে ধরল। এবং হাত দুটো মাথার ওপর তুলে উল্লাসে ডিগবাজি খাওয়ার মতন ভঙ্গি করল। তারপর সরে এলো আলোর দিকে। পোকাটার দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে সারা মুখখানা হাসিতে উদ্ভাসিত হয়ে উঠল। প্রথমে মোমবাতির হলুদ শিখাটার চতুর্দিকে হাত ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে পোকাটার সারা শরীর তদন্ত করল, সবুজনীল ডানায় আঙুল ছুঁইয়ে আদর করল, তারপর হঠাৎ ধাঁই করে মুখটা চেপে ধরল আগুনের ওপর। চচ্চড় করে শব্দ হতে থাকল। মোমবাতির হলুদ শিখাটা দপদপিয়ে উঠল।

আমি শিউরে উঠলাম। কি নির্মম। ইচ্ছা হল ছুটে গিয়ে ঠাস করে একটা চড় বসিয়ে দিই ওর গালে। কিন্তু এই সময় একটা কাণ্ড ঘটল, হঠাৎ কৌটোর মাথার ওপর থেকে মোমবাতিটা ছিটকে পড়ল মাটিতে। ঘর অন্ধকার হল। আর সেই অন্ধকারের মধ্যে ক্ষুধ ইঁদুরের মতন লাফাতে লাগল শংকর।

সেদিন আর কোন কথাবার্তা হল না। পরদিন আবার যথারীতি বটুকবাবুর সঙ্গে ঘুরতে ঘুরতে শংকর এলো সরকারদের সেই পোড়া বাড়িটার দিকে। লোকে ওদের গল্পটল্প করতে দেখল ত্রিকোণ পার্কের রেলিঙে বসে। শংকরের আঙুলের ফাঁকে জ্বলন্ত সিগ্রেট। বটুকবাবুর সিগারে তেমন লোভ নেই। তবু তাঁর হাতে প্রায় সব সময়ই সিগ্রেট লাইটার থাকে। চৌকো চ্যাপ্টা সোনার মত চকচকে।

বটুবাবু তাঁর বাঁকানো ছড়িটা কোলের মধ্যে কাত করে রেখে ঈষৎ ঝুঁকে বসেছিলেন। মাঝে মাঝে কাৎলামাছের মতন মস্ত মুখখানা গোল করে ফুঁ দিচ্ছিলেন আগুনের শিখাটার ওপর। শিখাটা সেই সেই হয়ে কাঁপছিল।

শংকরের সঙ্গে বটুকবাবুর হৃদ্যতার প্রসঙ্গ তুলে একদিন মাকে বললাম কথাটা। মা তেমন আমল দিলেন না। বোনেদের সঙ্গে আলোচনা করতে গেলুম, ওরাও তত সিরিয়াস হল না। টুকু, যে গত বছর মেডিকেলে ভর্তি হয়েছে, সে বললে—'বলো কি দাদা, শংকরের তা হলে তারিফ করতে হয় খুব। ষাট বছরের বুড়োর সঙ্গে বন্ধুত্ব পাতিয়েছে, যোলতেই ষাটের ম্যাচুরিটি!'

—'না রে, হাসির কথা নয় টুকু'—আমি গম্ভীর হতে চাইলাম—'শোন, এটাকে ঠিক বন্ধুত্ব বলা চলে না। একজন ষাট বছরের বুড়োর সঙ্গে ষোল বছরের ছেলের কখনো বন্ধুত্ব হতে পারে না। ওদের মধ্যে একটা গোপন আঁতাত আছে।'

টুকু অবাক হয়ে কয়েক মুহূর্ত আমার মুখের দিকে তাকিয়ে রইল। তারপর হঠাৎ লজ্জা পেয়ে বলল—ধ্যাত, তা কি করে হয়। কি যে বলো!'

টুকু আর বসল না আমার সামনে। দারুণ অস্বস্তিতে আমি ছটফট করতে লাগলাম। কথাটা ওভাবে বলতে চাই নি আমি। অথচ কি বুঝতে কি বুঝল টুকু।

দেখতে দেখতে দোলপূর্ণিমা এসে গেল। রাস্তার মোড়ে মোড়ে ছেলেরা বুড়ির-ঘর বানাল। শংকরও তার বন্ধুবান্ধবদের নিয়ে, মস্ত একটা দুর্গ বানাল সদর পার্কের মধ্যিখানে। তিন-চার দিন আগে থেকে ওরা তার প্রস্তুতিতে মেতে থাকল। বিস্মিত হয়ে লক্ষ্য করলাম, বটুকবাবুই দলের পাণ্ডা। কাঠকুটো কেনার জন্য, এরাই তিনি চাঁদা দিয়েছেন বিশ টাকা। ছেলেরা ত মহা খুশি, সবাই বটুকদাদু বলতে অজ্ঞান। বটুকবাবুও নাওয়া-খাওয়া ভুলে সকাল-সন্ধ্যা ঘুরছেন বাচ্চাদের সঙ্গে টই-টই করে।

সন্ধ্যার সময় বাড়ির মেয়েদের নিয়ে বুড়ি-পোড়ানো দেখতে বেরিয়েছিলাম। আমাদের বাড়ির ঠিক সামনেই একটা বুড়ির ঘর, এবং সদর রোডের কাছে খোলা মাঠের মধ্যে, পর পর আরো অনেকগুলি। সবার আগ্রহ দেখলাম, ওই বড় বুড়িটার দিকে।

বেশি রাত হয়ে যাচ্ছিল বলে আমরা ফিরে আসছিলাম। হঠাৎ পার্কের কাছাকাছি কর্পোরেশনের স্কুলের পাশে যেখানটায় আগে নার্শারী ছিল, সেখানে অন্ধকারের মধ্যে দুটি ছায়ামূর্তি দেখে আমার কেমন সন্দেহ হল। মেয়েদের এগোতে বলে আমি সরে এলাম। ওরা ফিসফিস করে কথা কইছিল। আরো কয়েক পা সামনে এগোতেই আমি ওদের চিনতে পারলাম। ঠোঁটের সিগ্রেট নামিয়ে নিয়ে শংকর ফুড়ুৎ করে সরে এলো এক পাশে। তারপর কোন শব্দ না করে একরকম হঠাৎ ও ছুটতে সুরু করল। সিজন ক্লাওয়ারের ঝোপের মধ্যে খস খস শব্দ জাগল।

এক রোমাঞ্চকর অভিনব অবদান

ন্যাশনাল এক্কো

সিলিকন ৩২১

২ ব্যাণ্ড'এর সেট, যাতে পাবেন অতি আধুনিক সলিড স্টেট কারিগরী ব্যবস্থা।

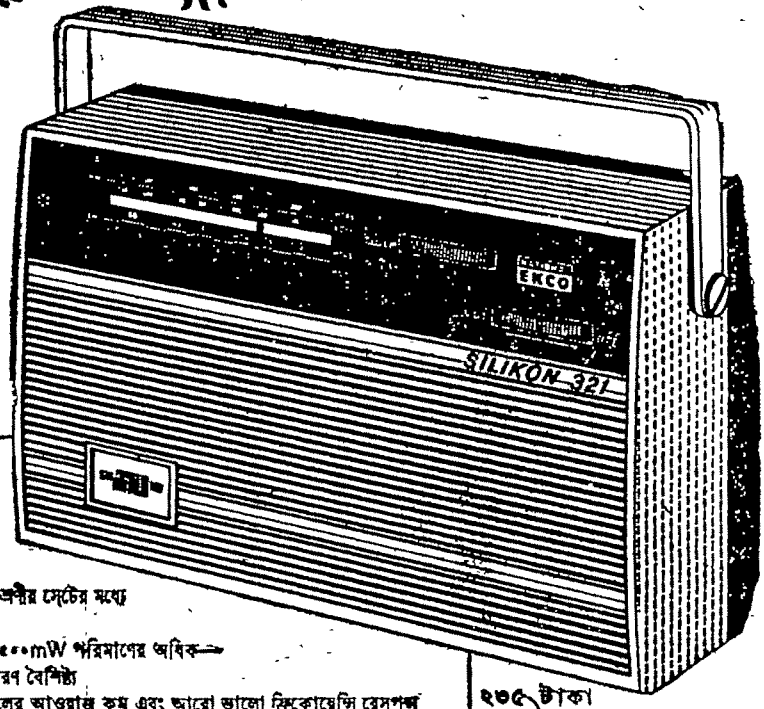

বিশেষ সুবিধাসমূহ

- ন্যাশনাল-এক্কো সিলিকন ৩২১ সবচেয়ে আধুনিক লক-ফিট এপক্সি, সিলিকন প্লানার ট্র্যানজিস্টর ব্যবহার করে
- অল্প ব্যাটারি খরচের কারণে এই শ্রেণীর সেটের মধ্যে সবচেয়ে খরচ কম
- এর অবিকৃত বিদ্যুৎশক্তি উৎপাদন ৫০০mW পরিমাণের অধিক— অল্প ব্যাটারি খরচ সহ এক অসাধারণ বৈশিষ্ট্য
- ষ্টেশন স্পষ্টভাবে ধরা যায়, গোলমালের আওয়াজ কম এবং আরো ভালো ফ্রিকোয়েন্সি রেসপন্স
- নির্ভরযোগ্য—দীর্ঘকাল নির্ঝঞ্ঝাটে কাজ দেয়।

২৩৫৲ টাকা
(এক্সাইজ ডিউটি সমেত। ট্যাক্স আলাদা)

GRA জেনারেল রেডিও অ্যাণ্ড অ্যাপ্লায়েন্সেজ

এ ডিভিসন অফ দি ন্যাশনাল এক্কো, রেডিও এণ্ড এঞ্জিনীয়ারিং কোং লিমিটেড।
বোম্বাই . কলিকাতা . মাদ্রাজ . দিল্লী . বাঙ্গালোর . সেকেন্দ্রাবাদ . পাটনা . এর্ণাকুলম।

ন্যাশনাল-এক্কো সিলিকন ৩২১-এর অতুলনীয় কাজে আপনি অবাক হয়ে যাবেন।

এইভাবে কাটল কয়েক সেকেণ্ড। বটুকবাবু তখনো অন্ধকারের মধ্যে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে। আমি ওঁর চোখমুখের অভিব্যক্তি ছুঁতে পারছিলাম না, লোকটা হাসছিল কি দারুণ দুর্ভাবনায় উদ্বিগ্ন ছিল বুঝতে পারছিলাম না। তবে, কিছুক্ষণের মধ্যেই যে ভয়ংকর একটা ঘটনা ঘটতে যাচ্ছে, তা আঁচ করতে পারছিলাম।

এইরকমভাবে কতক্ষণ দাঁড়িয়েছিলাম সেখানে ঠিক খেয়াল নেই। হঠাৎ পার্কের ধ্যের বুড়ির ঘরটা জ্বলে উঠতেই চমকে উঠলাম।

আমি যেহেতু বহুদূরে স্কুলবাড়ির দেয়াল ছুঁয়ে দাঁড়িয়ে ছিলাম, আগুনটা হঠাৎ কে জ্বালিয়ে দিল কিছুই স্পষ্ট দেখতে পেলাম না। ছেলেরা ভয়ার্তকণ্ঠে গেল গেল' বলে চিৎকার করে উঠল। এই সময় অন্ধকার চিরে বিস্ময়করভাবে দৌড় দিলেন বটুকবাবু। আমিও তাঁকে অনুসরণ করলাম। ধূর্ত হরিণশাবকের মতন ছোট ছোট ঝোপঝাড়, নার্শারীর দেয়াল টপকে ছুটতে লাগলেন তিনি। এই বয়সেও লোকটা এমন দ্রুত ছুটতে পারে দেখে অবাক হয়ে গেলাম।

অল্পক্ষণের মধ্যেই পার্কভর্তি লোক গিসগিস করতে লাগল। অধিকাংশই বাচ্চা ছেলেমেয়ে, চোখেমুখে তাদের হতাশ বিষণ্ণতার ছাপ। যারা সকাল থেকে খেটেখুটে বুড়িটা তৈরি করেছিল তারা বিস্ময়ে থ হয়ে আছে। কেউ কেউ চাপাকণ্ঠে ঝগড়া করছে।

শংকরকে কোন দলে দেখলাম না। সে আপনমনে পরমানন্দে দৌড়ে-ছুটে নাচানাচি করছে দাউ দাউ আগুন ঘিরে। মাঝে মাঝে টুকরো কাঠকুটো ছুঁড়ে ছুঁড়ে দিচ্ছে। চেড় শব্দ করে আগুন লাফিয়ে উঠছে। ।ই দেখে আনন্দে লাফিয়ে উঠছেন, হাসছেন বটুকবাবু। ওদের কাণ্ডজ্ঞানহীন াদ ব্যবহারে আমি বিস্মিত হয়ে ।চ্ছিলাম।

বটুকবাবু ছুটে-ছুটে এক সময় আমার পাশে এসে দাঁড়ালেন। আমি তাঁর আনন্দে আত্মহারা মুখখানার দিকে তাকালাম। চাপা চোয়াল ফাঁক করে তিনি সহসা একটা আওয়াজ তুললেন—'আহা, আ! কি—কি অপূর্ব!'

শংকর সম্বন্ধে আবার একদিন মা'র সঙ্গে আলোচনায় বসলাম। মা রেগে উঠলেন—'কি যা-তা বলিস, শঙ্কু আমার অমন ছেলেই নয়।'

আমি বোঝাতে চাইলাম—'নিজের চোখে আমি দেখেছি মা, তুমি বিশ্বাস করো।'

মা আরো চটে উঠলেন—'তোর কি মাথার গোলমাল হয়েছে, না হলে অতটুকুন একটা ছেলের পিছনে লাগতে যাস কেন রে!

আমি নিরাশ হয়ে দীর্ঘনিশ্বাস ফেললাম।

আরো কয়েকটা দিন কাটল এই রকম অস্বস্তির মধ্যে। শেষে উপায়ান্তর না দেখে আবার একদিন ধরলাম টুকুকে। সব শুনে টুকু বুঝল ব্যাপারটা। দুর্ভাবনার ছায়া ফুটল ওর চোখেমুখে। অনেকক্ষণ চুপ করে থেকে বলল—ব্যাপারটা নিয়ে সত্যিই ভাবা উচিত আমাদের—'

ওর আগ্রহ দেখে খুশি হলাম। সমস্ত ব্যাপারটা নিয়ে অনেক আলাপ-আলোচনা হল আমাদের মধ্যে। একদিন কোন খবর-টবর না দিয়ে বটুকবাবুর বাড়িতেও হাজির হলাম গিয়ে। তখন সবে সন্ধ্যা। বটুকবাবু জামাকাপড় পরে বাইরে বেরোবার জন্য তৈরি হচ্ছিলেন। তাঁর নিজস্ব বৈঠকখানা ঘরে বসালেন আমাদের। ভেতরে পা দিয়েই চমকে উঠলাম। হঠাৎ মনে হল, আমার সারা শরীরে আগুন ধরে গেছে। দাউ দাউ জ্বলে-ওঠা একটা ঘরের মধ্যে বসে আছি আমি। আমার অসম্ভব কষ্ট হচ্ছে। হাত পুড়ছে, মা পুড়ছে, চোখ পুড়ছে। আর তাই দেখে বৃষ্টি-ভেজা শিশুর মতন আনন্দে খিলখিল দিয়ে হাসছেন বটুকবাবু।

কিন্তু অল্পক্ষণের মধ্যেই আমার ভ্রম ভাঙল। আসলে ঘরটা জ্বলে ওঠে নি, অসম্ভব চড়া পাওয়ারের আলো জ্বালিয়ে আগুনের মতন উজ্জ্বল করে রাখা হয়েছে চতুর্দিক। আমার দিকে তাকিয়ে মুচকি মুচকি হাসছিলেন বটুকবাবু—'এ তো আলো ভাল লাগছে না?'

আমি ব্যস্ত হয়ে বললাম—'না না, তা কেন। আলো কখনো বেশি হয় না।'

বটুকবাবু উৎসাহিত হয়ে উঠলেন—'ঠিক বলছেন, আলো কখনো বেশি হয় না। চতুর্দিকে আলো জ্বালিয়ে দিন তবু কোথাও না কোথাও অন্ধকার রয়েই যাবে।' তাঁর চোখেমুখে অসম্ভব উত্তেজনা।

আমি নিবিড় হবার ভঙ্গি করলাম—'কিন্তু দুর্ভাগ্য কি জানেন, যদিও সবাই আমরা অসম্ভব আলোর প্রত্যাশী, চতুর্দিক আলোয় আলোময় দেখতে চাই সর্বদা, কিন্তু নিজের হাতে সে আলো জ্বালাতে কি অসম্ভব দ্বিধা।'

বটুকবাবু হাসছিলেন। চেপে চেপে শান্ত অনুত্তেজিতকণ্ঠে কথা বলছিলাম আমি। তিনি বিন্দুমাত্র আঁচ করতে পারছিলেন না আমার আসল বক্তব্য কি। অবশেষে, একরকম হঠাৎই শুধালাম 'এই ধরুন না, আপনি যেমন এতো বেশি আলো ভালবাসেন—আপনি কি পারেন নিজের হাতে নিজের বাড়িটা জ্বালিয়ে দিতে?'

বটুকবাবু দ্রুত ভঙ্গিতে মুখ উঠে কি যেন বলতে গিয়েও থেমে গেলেন। আমার মুখের দিকে তাকালেন। তাকিয়েই রইলেন।

আমি ফের তাড়াতাড়ি বললাম—'পারেন না। কেউ তা পারে না। তবে, সব কাজ নিজেই যে করতে হবে তারই বা কি মানে আছে—'

বটুকবাবু চুপ করে রইলেন। তখন আমি তাঁর ঠিক চোখের ওপর চোখ রেখে বললাম—'আপনি যা পারেন না অন্যকে দিয়ে তা—'

'আঃ, থামুন আপনি'—সহসা চিৎকার করে উঠলেন বটুকবাবু। এই সময় তাঁর ডান হাতের মুঠোয় ধরা পেতলের লাইটারটায় রক্তাঘাত চাপ পড়ছিল। এবং হাত কাঁপছিল। কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম।

দৃশ্যটা দেখতে ভীষণ মজা লাগছিল। অবিকল আঁচড়ে পোড়া একটা জন্তু যেন।

সেদিন বাড়ি ফিরে অনেক আলাপ-আলোচনার পর আমরা স্থির করলাম যে-করেই হোক শংকরকে সরিয়ে আনতে হবে বটুকবাবুর কবল থেকে। এবং সেইমত সন্ধ্যার পর মেজদার শোবার ঘরে ডাকা হল ওকে। শংকর সেদিন খুব খুশি-খুশি ছিল। হো-হো শব্দে হাসতে হাসতে ঘরে ঢুকল। সদর পার্কে এবছর কিরকম মজার একজিবিশান হবে তাই নিয়ে কথা সুরু করল—'জানো রাঙাদা, এবছর একজিবিশনের জন্য বটুক জ্যাঠা না'—

টুকু বাধা দিল—'বটুকবাবুর সঙ্গে রোজ দেখা হয় বুঝি তোর?'

প্রশ্নটা শোনামাত্র সঙ্গে সঙ্গে চোখেমুখে অন্ধকার ঘনাল শংকরের।

টুকু ফের শুধাল—'কি রে, উত্তর দিচ্ছিস না যে?'

শংকর নিঃশব্দ।

আমি হঠাৎ উত্তেজিতকণ্ঠে দাবড়ি দিলাম—'চুপ করে থেকো না, জবাব দাও।'

তবু কোন সাড়া নেই।

এবার আমার ধৈর্যচ্যুতি ঘটল। কঠিনকণ্ঠে বললাম—'শোন শংকর, মিছিমিছি লুকোবার চেষ্টা কোর না, আমরা সব জানি। বটুকবাবু তোমাকে দিয়ে নানারকম অন্যায় কাজ করিয়ে নেয়, তার পরামর্শে তুমি—'

সহসা সবাইকে অবাক করে দিয়ে শংকর কেঁদে উঠল—'তোমরা আমাকে ভয় দেখাচ্ছ কেন? আমি তোমাদের কি করেছি—কি করেছি আমি?'

শংকর ছুটে ঘর থেকে বেরিয়ে যাচ্ছিল, আমি খপ্ করে ওর একখানা হাত চেপে ধরলাম। এবার আরো ভয় পেল ও, স্বিগুণ জোরে চিৎকার করে বলতে লাগল—'আমাকে মিথ্যে

মিথ্যে ভয় দেখাচ্ছ তোমরা—আমি জানি না—আমি জানি না কিছু'—

হৈ-চৈ চিৎকার শুনে মা ছুটে এলেন। শংকরকে বুকে জড়িয়ে ধরে আমাদের তিরস্কার সুরু করলেন—'ছিঃ ছিঃ, তোরা কি ভেবেছিস বল্ ভো? দিনরাত একটা কচি ছেলেকে জেরা—ত্রাস করছিস্, শাসাচ্ছিস্, কি পেয়েছিস্ কি তোরা?'

বুঝলাম মাকে কোন কথা বোঝাতে যাওয়া বৃথা।

পরদিন আর একটা ঘটনা ঘটল। আফিস যাবার জন্য সদর পার্কের মোড়ে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করছিলাম, হঠাৎ দেখলাম ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটে পালাচ্ছে শংকর। দু' কদম এগুতেই নজরে পড়ল বিনি কর্মকারের লোহা-লক্কড়ের দোকানটার দিকে—দাউদাউ করে আগুন জ্বলছে সেখানে। আশেপাশে দাঁড়িয়ে থাকা লোকেরা চিৎকার করছে ভয়ার্তকণ্ঠে। কপালা ভালো, পাশেই একটা মজা পুকুর ছিল। প্রচুর জল ঢেলে কোনমতে আগুনের বেগ থামানো গেল। ফেরার পথে হরিদাসের চায়ের দোকানে যথারীতি বটুকবাবুকে দেখতে পেলাম। লোকটা হিংস্র জানোয়ারের মত জ্বলজ্বলে চোখে তাকিয়ে ছিল আমার দিকে।

সেদিন আর আপিসে যাওয়া হল না। বাড়ি ফিরে শংকরের খোঁজ করলাম। মা অবজ্ঞার কণ্ঠে বললেন—'এই তো ছিল এখানে, দ্যাখ্ আছে কোথাও।'

যথা নিয়মে মার্চ মাসের শেষাশেষি সদর পার্কে মস্ত একজিবিশন বসল। বড় বড় দোকানপাট, দোলনা, যাদুঘর, চা-জলখাবারের স্টল—আরো কত কি! চতুর্দিকে থৈ-থৈ ভিড়।

দিনগুলি কাটতে লাগল নানা উত্তেজনার মধ্যে। সন্ধ্যার পর দল বেঁধে রোজ একজিবিশন দেখতে যাই। ভালোই লাগে, একদিকে নিয়ন আলোর নিচে বাচ্চাদের ভিড়, অন্যদিকে বেঞ্চির ওপর বৃদ্ধদের জটলা। ফাঁকা বলতে শুধু ন্যাশনালীর 'গা-ছোঁয়া ভাঙা স্কুল-বাড়িটার উঠোন। হাঁটতে হাঁটতে সেদিকে গিয়ে দাঁড়াতেই দপ্ করে জ্বলে-ওঠা একটুকরো আলো নজরে পড়ল। তাড়াতাড়ি একটা গাছের আড়ালে সরে এলাম। আলোটা চিনতে অসুবিধা হল না। এ ঠিক বটুকবাবুর সেই আশ্চর্য লাইটারটা।

ওরা খুব নিচু গলায় ফিসফিস করে কথা বলাবলি করছিল। বটুকবাবু বলছিলেন—'তোর দাদা, বুঝলি কি না, একটা মস্ত চিনেজোঁক, হারামজাদাকে আচ্ছা করে দাবড়ে দেব একদিন।' নে, ধর'—

শংকরের হাতে একটা সিগ্রেট গুঁজে দিলেন বটুকবাবু। আলোটা লেই-লেই হয়ে দুলতে লাগল মুখের ওপর। —'লা বাড়িতেও সারাক্ষণ পিছু লেগে থাকে। আমাকে রীতিমত সন্দেহ করছে আজকাল'—বটুকবাবুর দিকে ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে বলল শংকর।

আগুনের গায়ে আলতো একটা ফুঁ দিয়ে হেসে উঠলেন বটুকবাবু—'দূর দূর, আহাম্মক কোথাকার। সন্দেহ করলেই হল, তুই ভাবিস নে।'

'না না, ভাববো কেনো! শ্লার আমি কাউকে পরোয়া করি নাকি! মাকে পটিয়ে রেখেছি।'

আবার হাসি। বটুকবাবু খুশি হয়ে শংকরের গালে একটা টোকা দিলেন—সাবাস, মাণিক। তাহলে আজকের কাজটা—

কষে সিগ্রেটে টান দিতে দিতে শংকর বলল—'ভাবছেন কেন, জ্বালিয়ে খাক্ করে দেবো না, শ্লার ইস্কুলটাও যাবে'—

'আহা, যাক না'—বটুকবাবু গলার স্বর খাটো করলেন—পুরো পট্টিটাই ধুলো হয়ে যাবে তায় ইস্কুল! শোন্, সেই যে তোকে গল্পটা বলেছিলাম, তেমনি একটা কাণ্ড বাধা দিকি'—

শংকর অবাক হল—'কোন্ গল্পটা?'

'সেই যে রে'—বটুকবাবু উৎসাহিত হলেন—'বিশাল সমুদ্র, অন্ধকার গমগম করছে চতুর্দিকে—আমি অপেক্ষা করছিলাম জেটিতে দাঁড়িয়ে—এমন সময়—'

শংকর খুশিতে লাফিয়ে উঠল—'হ্যাঁ হ্যাঁ, মনে পড়েছে, এমন সময় সেই জাহাজটা'—

আর দাঁড়িয়ে থাকতে পারলাম না, দ্রুত সরে এলাম সেখান থেকে। গল্প শোনার মত মনের অবস্থা নয় তখন। মাথার মধ্যে এলোমেলো চিন্তার ঝাপটা। এখন কি করা উচিত আমার? এই ভয়ংকর সর্বনেশে অপকর্ম থেকে ওদের বিরত থাকতে অনুরোধ করব? নাকি দৌড়ে গিয়ে সাবধান করে দিয়ে আসব পাড়ার লোকদের

কি যে করব স্থির করতে না পেরে অস্থিরভাবে ছটফট করতে লাগলাম। আর ঠিক তখনই হঠাৎ মনে পড়ল পুলিশ স্টেশনের কথা। ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটতে সুরু করলাম সদরবাজারের দিকে।

একজিবিশনের গেটের মুখে গাদাগাদি ভিড়। দলে দলে লোক ঢুকছে ভেতরে, বেরিয়ে আসছে। নাগরদোলার আশেপাশে বাচ্চা ছেলেদের জটলা। বটুকবাবু হয়ত এতক্ষণে ওরই কাছাকাছি কোথাও এসে দাঁড়িয়েছেন। তাঁর হাতের মধ্যেই লেই-লেই করে জ্বলছে পেতলের সেই লাইটারটা।

কাছেই পুলিশ ফাঁড়ি। খবর পেয়েই সদলবলে ছুটে এলেন ইন্সপেক্টর রাধেশ্যামবাবু। সতর্ক শিকারীর মতন হানা দিয়ে খুঁজে বার করলেন শংকর এবং বটুকেশ্বরবাবুকে।

হঠাৎ এভাবে আক্রান্ত হয়ে হতভম্ব হয়ে পড়ল শংকর। কিন্তু আশ্চর্য, বটুকবাবুর চোখেমুখে ভয়ভীতির চিহ্নমাত্র নেই। পুলিশের গাড়িতে ওঠার আগে সবাইকে অবাক করে দিয়ে হেসে উঠলেন তিনি। উল্লসিতকণ্ঠে আকাশের দিকে আঙুল তুলে বলতে লাগলেন—'ওই যে, ওই—দ্যাখো দ্যাখো, কি আগুন। আশ্চর্য, চারদিকে কি বিচিত্র আগুন!'

পুলিশের লোক ধাক্কা দিতে দিতে তাঁকে ভ্যানের মধ্যে টেনে তুলল। শংকরের জন্য আমাকে সঙ্গে যেতে হল। গাড়িতে বসেও আনন্দে খলবল করছিলেন বটুকবাবু। এক সময় শংকরের কানের কাছে মুখ নিয়ে বলতে শুনলুম—'কি মজা—এ্যাঁ—কি, মজা দ্যাখ্ না—সেই গল্পের মতন দাউ-দাউ আগুন'—

শংকর এক পাশে নিঝুম হয়ে বসেছিল। বটুকবাবু দ্বিগুণ উৎসাহ নিয়ে বলতে লাগলেন—'সেই যে—সেই বিশাল সমুদ্র, অন্ধকার গমগম করছে চতুর্দিকে—এমন সময়—'

সহসা তাঁর গলার স্বর কেঁপে উঠল। হাঁপানী রোগীর মতন বার কয়েক নিশ্বাস টেনে ফের বলতে লাগলেন—'এমন সময় সেই অন্ধকার সমুদ্র জুড়ে হঠাৎ একটা ভয়ঙ্কর বিস্ফোরণ ঘটল—দাউ দাউ করে জ্বলে উঠল জাহাজটা! উঃ, সেকি ভয়ানক দৃশ্য—কি ভয়ানক!'

বটুকবাবু মাথা নিচু করলেন; দু'হাতের থাবার মধ্যে মুখটা চেপে ধরে কাঁপতে লাগলেন থরথর করে।

রাণী ধূপ
কাকার প্রডাক্টস

ইয়োরোপা / হিরণ্ময় ভট্টাচার্য

আগে কমনওয়েলথ কনফারেন্সের কথা শুনলেই চাংগা হয়ে উঠতাম। কাগজে কাগজে ভারত-বিরোধী প্রবন্ধ ছাপা হত। 'ডেলি টেলিগ্রাফ', 'ডেলি একসপ্রেস', 'ডেলি মেল' কেউ বাদ যেত না। 'গার্ডিয়ান' বা 'অবসারভার'-এর মত কাগজও সুযোগ-সুবিধা বুঝে হুল ফোটাত। বুঝতাম এ ইংরেজের গাত্রদাহ। আসলে তখন ভারতের দাপট ছিল। নেহরুর খ্যাতি ছিল আন্তর্জাতিক। নেহরু কোথাও গেলেই সর্বত্র সাড়া পড়ে যেত। নেহরু তখন ছিলেন তৃতীয় বিশ্বশক্তির নেতা। আমেরিকা ও রাশিয়ার পরেই ভারতের আসন। সমগ্র এশিয়া ও আফ্রিকার কর্ণধার। এমন কি প্রয়োজন হলে আমেরিকা ও রাশিয়াকেও উপদেশ দিতে ছাড়ে না। সেদিন ভারত সম্বন্ধে মনে একটা গর্ব ছিল। সে রাম নেই সে অযোধ্যাও নেই।

হয়ত এর মূলে আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি। না চীন বে-আইনীভাবে এসে এক ঘুসিতে নক আউট করে দিয়েছে। আজ যুদ্ধের সাজ-সরঞ্জাম তৈরি করতেই ভারত কাহিল। পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা শিকেয় তোলা আছে। অস্ত্র-শস্ত্রের প্রডাক্‌শন বেড়েছে আর প্রডাকশনস বেড়েছে মিছিলের ও বেকারের সংখ্যায়। এখন আর ভারতকে কেউ তেমন পরোয়া করে না। আগের দিনে গালাগাল খেলেও খুশি হতাম, হিংসে করার মত ঐশ্বর্য আমাদের আছে। নীরব অবহেলা মরমে মেরে ফেলে।

না একেবারে নিরাশ হতে হয় নি। কনফারেন্সের ঠিক আগে ডেলি এক্সপ্রেস সম্পাদকীয় স্তম্ভে লিখল, "One Way Traffic" মিসেস গান্ধী বলেছেন, দরকার হলে কমনওয়েলথ ছেড়ে দেবেন। ছেড়ে দিলে আক্ষেপের কিছু নেই। ভারত চিরকাল ইংরেজকে নাজেহাল করার তালে আছে। সুয়েজ হাংগামা থেকে রোডেশিয়া সমস্যায় আমাদের বিরুদ্ধতা করেছে। জিব্রাল্টার নিয়ে আন্তর্জাতিক সংঘে যে বিতর্ক হয় তাতেও আমাদের সমর্থন করে নি। আমরা ভারত থেকে দিন দিন বেশি জিনিষ কিনছি ভারত তত কম কিনছে। অথচ ডোল নেবার বেলায় সিংহভাগ আদায় করে। এ দু' তরফের সহযোগিতা নয়, একতরফা সুবিধা নেওয়া। সুতরাং ভারত কমনওয়েলথ ছেড়ে দিলেই মংগল।

আর হৈ-হৈ চলেছে কানাডার প্রধানমন্ত্রী ট্রুডোকে নিয়ে। বৃটেনের চেষ্টা, ইয়োরোপের প্রতিরক্ষা ব্যাপারে কানাডা যাতে তৎপর হয়। বৃটেন জার্মানিতে সৈন্য মোতায়েন রাখে, তাতে বৈদেশিক মুদ্রা খরচ হয়। তা নিয়ে ইংরেজের বরাবর আক্ষেপ। এখন ট্রুডোর মাথায় হাত বুলিয়ে যদি কাজ হাসিল করা যায়। কানাডা যদি আংশিক ভার গ্রহণ করে। তাই ট্রুডোকে নিয়ে মাতামাতি। তিনি হলেন অবিবাহিত Swinging প্রধানমন্ত্রী। ভাবছি কি বলে বিবরণ দেব। সিনেমার নায়ক। ঠিক হল না। এদেশে বলে প্লেবয়। বিদ্যুদ্‌গতি স্পোর্টস কার ভালবাসেন। ক্লাবে যান।

হিরণ্ময় ভট্টাচার্যের (রম্যরচনা)
ইয়োরোপের পটভূমিকায় লেখা
মন্দ মধুর
ভাব গম্ভীর অথচ হাসিতে ভরা
মিত্র ঘোষ
১০ নং শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট
কলিকাতা-১২

সুন্দরী মহিলাদের সংগে ঘুরতে ফিরতে দেখা যায়।

প্রেস কনফারেন্সে এক সুন্দরী মহিলা তাঁকে প্রশ্ন করেন—১৯৬৮ সালে প্রধানমন্ত্রী হিসেবে সুন্দরী মহিলার বিশেষ দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন কি না?

প্রধানমন্ত্রী ট্রুডো উত্তর দেন।

—হাঁ করেছেন। এ বিষয়ে আশাপ্রদ আলোড়ন পেয়েছেন। যেমন প্রধানমন্ত্রী হবার আগে ১৯৬৭ এবং ১৯৬৬ সালে পেয়েছিলেন।

কিন্তু ইংরেজ সাংবাদিকরা শেষ বেশ রক্ষা করতে পারে নি। বাড়াবাড়ি করেছে। ট্রুডোর বান্ধবীদের সম্বন্ধেও বড় বড় ফাইল তৈরি হয়েছে। তাই বিদায় বেলায় ট্রুডো বলেছেন: বৃটেনের সাংবাদিকরা 'Pretty lousy lot—একেবারে হতভাগা।

খোসামোদ করে মাথায় তুলতে যাওয়ায় বিপদ। কাজ হাসিল তো হলই না অধিকন্তু মন কষাকষি।

সাধারণ লোকের কমনওয়েলথ সম্বন্ধে কি মতামত। ডেলি স্কেচের সম্পাদকীয় মন্তব্য তুলে ধরি। বলা যায়, এইটেই এদেশের লোকের মনের কথা।

কমনওয়েলথ টিকিয়ে রাখার কোন যুক্তি নেই। আমদানি রপ্তানির খতিয়ান দেখা যাক। বছরে ৪৫০ মিলিয়ন পাউন্ডের ক্ষতি। তার ওপর বিষফোড়া আছে ২০০ মিলিয়ন পাউন্ডের দাদন। ভারত দু' বছর আগে ১৪০ মিলিয়ন পাউন্ডের জিনিস কিনেছে। গত বছর কিনেছে ৮০ মিলিয়ন পাউন্ডের। তা ছাড়া সাহায্য নিয়েছে ৪০ মিলিয়ন পাউন্ড। কাটা ঘায়ে নুনের ছিটে ছাড়া কি বলা যায়। বৃটেনের দেওয়া বৈদেশিক মুদ্রা দিয়ে বৃটেনের প্রতিদ্বন্দ্বীর কাছে জিনিস কিনেছে।

আফ্রিকানদের মন রাখার জন্যে আমরা রোডেশিয়ার সংগে ব্যবসা-বাণিজ্য বন্ধ করেছি। কেন আমরা এই ১০০ মিলিয়ন পাউন্ডের ব্যবসা হারাব। আমাদের বড় খরিদ্দার দক্ষিণ আফ্রিকা কমনওয়েলথে মন যোগাতে গিয়ে তাকে চটাব? অথচ কমনওয়েলথের দশটা দেশ আন্তর্জাতিক সংঘে জিব্রালটার নিয়ে বৃটেনের বিরুদ্ধে ভোট দিয়েছে, কিম্বা ভোটদানে বিরত থেকেছে।

কমনওয়েলথের মিল কোথায়? পাকিস্তানে ডিক্টেটর। সিংহলে racialist, কেনিয়া হাজার হাজার লোককে বাস্তুহারা করতে চলেছে। তারা আবার বৃটেনকে ইমিগ্রেশন নিয়ে উপদেশ দেয়। সিংগাপুরে রাজনৈতিক নেতারা বন্দী। তানজানিয়ায় এক পার্টির রাজত্ব। জ্যাম্বিয়া, তানজানিয়া বৃটেন থেকে অস্ত্রশস্ত্র নিচ্ছে অথচ নাইজিরিয়ার বিয়াফ্রাকে অনুমোদন করেছে। আসলে কমনওয়েলথের 'কমন' বলে কিছু নেই। যে যার স্বার্থ বজায় রাখতে ব্যস্ত। এ কমনওয়েলথকে দুধ কলা দিয়ে পুষে রাখার মানে হয় না। বরং কানাডা, অস্ট্রেলিয়া, নিউজিল্যান্ড যাদের সংগে বৃটেনের সামঞ্জস্য আছে, তাদের নিয়ে সুখে স্বচ্ছন্দে ঘর করা উচিত।

কমনওয়েলথ কনফারেন্সের একটা বদনাম আছে। এ নাকি নিতান্ত পানসে। ঝগড়াঝাঁটি নেই, দর কষাকষি নেই, টেবল চাপড়ে মেজাজ দেখাবার সুযোগ নেই। একজনের মনের মত না হলে অনাজন

সামলে নেবে। তার চেয়ে ভারলেশশূন্য হয় সম্মেলনের শেষে কমিউনিকে। পাকা হাতে লেখা। কুল মান সব থাকবে। কেউ চটবে না।

এবার তার ব্যতিক্রম হল। বিবাদ বাধল রোডেশিয়া নিয়ে। অধিকাংশ সদস্য বৃটেনের রোডেশিয়া নীতি সমর্থন করেন নি NIBMAR-এর সংগে লড়াই বেধেছে "ফিয়ারলেসে"র। নিবমার হল No independence before majority African rule— যা এককালে লেবার পার্টি বা উইলসনের নীতি ছিল।

১৯৬৬ সালের কমনওয়েলথ সম্মেলনে তিনি নিবমার নীতি সমর্থন করেছিলেন। রোডেশিয়ার সংগে জিনিস লেনদেন বন্ধ করে বলেছিলেন, কয়েক সপ্তাহের মধ্যে রোডেশিয়া কাবু হয়ে যাবে। হাঁটু গেড়ে আত্মসমর্পণ করবে। উইলসনই কাবু হলেন। রোডেশিয়ার পতন হয় নি। বহাল তবিয়তে না হলেও মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে আছে। দক্ষিণ আফ্রিকা বড় ভাই-এর মত পাশে দাঁড়িয়েছে। ঝড় ঝাপ্টা এলে বুক দিয়ে রুখবে।

লেবার পার্টি এদেশের বিরোধী দল থাকাকালীন দক্ষিণ আফ্রিকার জিনিস বয়কটের আন্দোলন করে। বর্ণবৈষম্য নীতির বিরোধী তারা। ভোটে জিতে গদি দখল করল লেবার পার্টি। তারপরই দেখা গেল, এদেশের অর্থনীতি মুষড়ে পড়েছে। দক্ষিণ আফ্রিকার সংগে এদেশের খুব লাভজনক ব্যবসা। সুতরাং দক্ষিণ আফ্রিকা যদি বেঁকে বসে এদেশের অর্থনীতি একেবারে মুখ থুবড়ে পড়বে। সুতরাং ইংলন্ড দক্ষিণ আফ্রিকার ভয়ে জুজু। দক্ষিণ আফ্রিকাকে চটাবে তেমন দাপট বৃটিশ সিংহের আর নেই। এখন তো মনে হয়, রোডেশিয়ার চেয়ে ইংলন্ডের বেশি দায় একটা ফয়সালা করার।

"ফিয়ারলেস" জাহাজে কিছুদিন আগে মিঃ উইলসনের সংগে রোডেশিয়ার প্রধানমন্ত্রী ইয়ান স্মিথের আলোচনা হয়। মিটমাটের একটা খসড়া তৈরি হয়। স্মিথ অবশ্য সে প্রস্তাব মেনে নেন নি। ফিয়ারলেস প্রস্তাবে উইলসন নিবমার থেকে বিচ্যুত হয়েছেন। কমনওয়েলথের অধিকাংশ সভ্য চায় সে প্রস্তাব নাকচ করা হোক। নিবমার হবে স্বাধীনতা দেবার মাপকাঠি। উইলসন ফিয়ারলেস-এর প্রস্তাব তুলে নিতে অস্বীকার করেছেন। আর সৈন্যসামন্ত পাঠিয়ে রোডেশিয়া দখলের কথা যাঁরা ভাবছেন, শূন্যে সৌধ গড়ছেন। প্রথম কারণ স্বাধীন আফ্রিকান রাষ্ট্র কালোদের প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠা করার জন্যে নিরংকুশ হয়ে উঠেছে। দ্বিতীয় গণতন্ত্রে জনসাধারণের মতামতকে সমীহ করতে হয়। এদেশের অধিকাংশ লোক তো রোডেশিয়ার ইয়ান স্মিথের সমর্থক।

নাইজিরিয়ার বিয়াফ্রা নিয়েও কথা উঠেছিল। নাইজিরিয়ার মত, বিয়াফ্রা তার অংগ রাজ্য। সুতরাং সে ঘরোয়া সমস্যা। তাতে মাথা গলাবার এক্তিয়ার কারও নেই। আইনগতভাবে তা সত্যি। সুতরাং মেনে নিতে বাধ্য হয়েছে। তবে চেষ্টা হয়েছে যাতে নাইজিরিয়া ও বিয়াফ্রার প্রতিনিধি মিলিত হয়ে সমস্যার সমাধানের কথা আলোচনা করতে পারে। দু'পক্ষের মুখ দেখাদেখি ছিল না। এখন মোলাকাৎ হয়েছে। তবে সমাধান বহু দূর।

আর জটলা হয়েছে ইমিগ্রেশন নিয়ে। পূর্ব আফ্রিকায় ভারতবাসীরা প্রথম যায় রেলওয়ে তৈরি করতে। কিম্বা বলা যায় ইংরেজ তাদের নিয়ে যায়। তারপর স্বেচ্ছায়ও অনেকে গিয়েছে। একে একে ওদেশের ব্যবসা-বাণিজ্যে একচেটিয়া প্রভাব বিস্তার করেছে। ইংরেজের আশ্রয়ে ভালই কেটেছে তাদের। কিন্তু আফ্রিকা স্বাধীন হয়েছে। কেনিয়া, উগাণ্ডা, তানজানিয়া, জ্যাম্বিয়া এখন আফ্রিকানদের হাতে। দেশ স্বাধীন হবার সময় ভারতবাসীরা আফ্রিকার নাগরিক হতে পারত। কিন্তু কংগোর অবস্থা দেখে ঘাবড়ে যায়। Stability-র কথাও ভাবে। শেষ পর্যন্ত অধিকাংশ বৃটেনের নাগরিকতা নেয়। ইংরেজ সম্প্রতি আইন করেছে, বৃটিশ পাসপোর্ট থাকলেই অবাধে তারা বৃটেনে ঢুকতে পারবে না। আফ্রিকার এই সব এশিয়ানদের মধ্যে বছরে মাত্র দেড় হাজার লোককে আসতে অনুমতি দেওয়া হবে। অথচ তাদের সংখ্যা ১০০ হাজারের ওপর। এদিকে আফ্রিকা তাদের ব্যবসায়ের লাইসেন্স নাকচ করে দিচ্ছে। রাতারাতি দোকানের পাটা তুলে দিতে হচ্ছে। বাঁচবার অধিকার তাদের কাছ থেকে কেড়ে নেওয়া হচ্ছে। আফ্রিকান নেতারা কেউ বা তাদের বলছে লোফার, কেউ বলছে আবর্জনা। যে সব ভারতবাসী আফ্রিকার নাগরিকতা নিয়েছে তারা সবাই যে তোফা আছে তা নয়। মিশ কালো রঙের লোক না হলে আর সেখানে সুবিধে নেই।

আর এক দল নতুন ইহুদীর সৃষ্টি হচ্ছে। ভারতের সহানুভূতি তাদের ওপর তেমন নেই। আফ্রিকা থল্লহস্ত। ইংরেজ বলছে আমাকে সময় দেওয়া হোক ধীরে-সুস্থে ব্যবস্থা করব। কেনিয়া, উগাণ্ডা, তানজানিয়া, জ্যাম্বিয়া সব দায়িত্ব ইংরেজের মাথায় চাপিয়ে বলতে চায় ইংরেজ racialist, আফ্রিকা কম যায় কোথায়? মানবিকতার দিক থেকেও আফ্রিকা পরম অন্যায় করে চলেছে। এ কথা বুঝিয়ে দেবার দিন এসেছে।

সম্মেলন শেষ হল। ইন্দিরা গান্ধী তো আগেই পাড়ি দিয়েছেন। কিন্তু ফলাফল কি হল? ইংরেজের কয়েকটা কাগজের মন্তব্য তুলে ধরি: নীরস। এর কোন মূল্য নেই। ইংরেজের বুকে জগদ্দল পাথরের মত বসে আছে। রোডেশিয়া সমস্যার সমাধান করতে দিচ্ছে না। 'ফিনানশিয়াল টাইমস' বলেছে রোডেশিয়ার সমাধান দরকার, তার জন্যে কমনওয়েলথ ভেঙে গেলে ক্ষতি নেই। স্পেক্টর বলেছে, Hypocracy by the champagne bucketful. এত শ্যাম্পেন নাকে আগে কোনদিন লাগে নি।

তবু মনে হয় এর প্রয়োজনীয়তা আছে। নাইজিরিয়া ও বিয়াফ্রা সমস্যা সমাধানের শুভ সূচনা হয়েছে। রোডেশিয়াকে স্বাধীনতা দিতে হলে বৃটেন একবার ভেবে দেখবে। কেনিয়ার ভারতবাসীরা আরও সময় পাবে যাতে ধীরে সুস্থে কোথাও যেতে পারে। এই কটা জিনিসের সুষ্ঠু সমাধান হলে বুঝতে হবে কমনওয়েলথ সম্মেলনের সার্থকতা আছে।

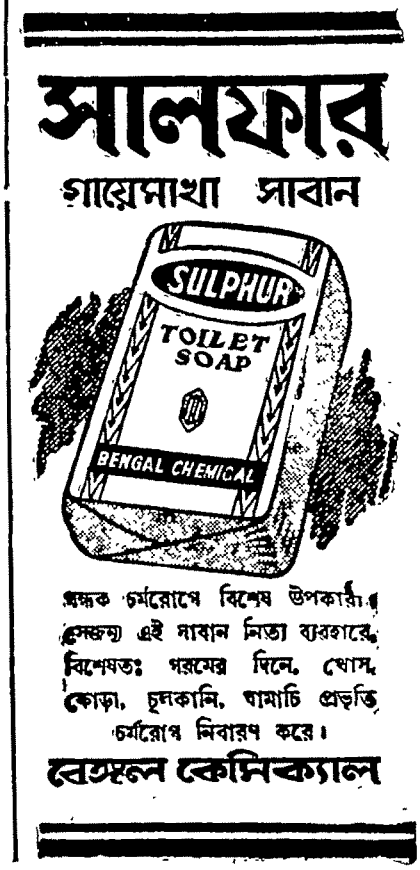

বিংশ শতাব্দীর মার্কিন সাহিত্য

শ্যামলী বন্দ্যোপাধ্যায়

[পূর্ব-প্রকাশিতের পর]

১১. মার্কিন নাটক : ১৯৫০—৬৮

শুধু নাট্যের প্রয়োগকলায় নয়, থিয়েটার ও দর্শকমণ্ডলীর মধ্যে যে সংযোগ, সেই সংযোগ আরো অন্তরঙ্গ আরো তাৎপর্যবহ করে তোলার তাগিদে রঙ্গালয়ের চার দেয়াল ভেঙে নাটককে খোলা আলোয় জনজীবনের দৈনন্দিনতার সঙ্গে যুক্ত করার চেষ্টায় গত কয়েক বছর ধরে মার্কিন নাট্যকর্মীদের প্রাণান্ত প্রয়াসের যে খবরাখবর আমরা পেয়ে আসছি, তার পরিপ্রেক্ষিতে (এবং পৃথিবীর অন্য দেশে রচিত অসামান্য কিছু নাটককে পাশাপাশি) এই পর্বের মার্কিন নাটকের দীনতাই বিস্ময়কর। নাটকের সাহিত্যমূল্যের কথাই শুধু বলছি না, নাট্যমূল্যের কথাও বলছি। এই দীনতাই বড় করে চোখে পড়ে। অথচ ভিয়েতনামে মার্কিন হস্তক্ষেপের বিরুদ্ধে কিংবা কৃষ্ণাঙ্গ সমাজের নাগরিক অধিকারের দাবিতে সারা দেশব্যাপী যে আন্দোলন, তারই প্রেরণায় নাট্য আন্দোলনের অভূতপূর্ব বিকাশ ঘটেছে। রাস্তার মোড়ে থিয়েটার, ক্যাবারে ও কফি হাউসে থিয়েটার, শহর থেকে দূরে গ্রামে গিয়ে থিয়েটার—অব্যবসায়িক থিয়েটার এমনি নানাভাবে নিজেকে আরো ব্যাপ্ত করেছে। এই পর্বের মার্কিন জীবনে প্রতিবাদী চেতনার যে সৃষ্টিশীল ভূমিকা, মার্কিন নাটকেও তার হাওয়া লেগেছে। কিন্তু তার বেশি এখনও কিছু চোখে পড়ে নি। বারবারা গারসনের 'ম্যাকবার্ড' নাটকে (১৯৬৬) শেক্‌স্‌পীয়রের কাব্যরীতির প্রয়োগে 'ম্যাকবেথ' নাটকের আদলে একটি সমকালীন ঘটনার বিবৃতি এবং সেই বিবৃতির মধ্য দিয়ে রাষ্ট্রপতি জন এফ. কেনেডির হত্যাপরাধে রাষ্ট্রপতি লিনডন জনসনকে সরাসরি অভিযুক্ত করার মুক্তবুদ্ধির প্রবল সাহসের পরিচয় পাওয়া যায়, জায়গায় জায়গায় শেক্‌স্‌পীয়রের সংলাপের অংশ সামান্য রূপান্তরেই যখন অর্থপূর্ণ হয়ে ওঠে, শেক্‌স্‌পীয়রের নাটকের পরিস্থিতি ও ঘটনা যখন প্রায় খাপে খাপে মিলে যায়, তখন মজা লাগে। কিন্তু সেই মজাও কখনই ব্যঙ্গের তিক্ত কৌতুকের ধার পায় না। লেখিকা এক সাক্ষাৎকারে বলেছেন, "আমি একটা কথা বলতে পারি। এই নাটক লিখতে গিয়ে আমি এতটুকু কষ্ট পাই নি...নিজে এতটুকু বিচলিত হই নি। সবটাই খুব সহজ লেগেছে।" এই সহজ লাগাটাই শেষ পর্যন্ত কেমন যেন প্রাণহীন মনে হয়, একটা নিষ্করুণ রসিকতা মনে হয়। তার চেয়ে ঢের দামী মনে হয় প্রত্যক্ষ সাক্ষ্যনির্ভর বিবরণের ভিত্তিতে লেখা ভিয়েতনাম সম্পর্কে একাধিক 'ডকুমেনটারি' নাটক।

পঞ্চাশের দশকের শুরুতে অবশ্য মার্কিন নাট্যসাহিত্যের দশা আরো শোচনীয় ছিল। তখন নতুন নাট্যকার বলতে একমাত্র উইলিয়ম ইনজ (১৯১৩—) টেনেসি উইলিয়মসের দুর্বল অনুসারী। মঞ্চ ও চিত্রের অত্যন্ত পরিচিত টাইপগুলিকে নিয়েই তাঁর কাজ। তাদের কোন একটা সংকটকে—যেমন ধরুন এক কোমলপ্রকৃতি তরুণীর সঙ্গে এক দুর্দান্ত জোয়ানের প্রেম—প্রচণ্ড একটা আবেগের স্তরে নিয়ে যেতে পারলেই ইনজ খুশি হন। তাঁর ফ্রয়েডিয় মনস্তত্ত্বকে কাজে লাগাবার ছেলেমানুষি চেষ্টাও বিরক্তিকর ঠেকে। একমাত্র 'দ ডার্ক অ্যাট দ টপ অফ দ স্টেয়ার্স' নাটকেই ইনজ খানিকটা এগিয়েছিলেন। একটি ছোট ছেলে সিঁড়ি দিয়ে উপরে উঠতে ভয় পায়; সিঁড়ির উপরে যে অন্ধকার, তাতেই তার ভয়। এই পরিবারের প্রত্যেকেরই এমনি একএকটা ভয়। আসলে ছেলেটির বাবা ভবিষ্যৎ সম্পর্কে তার ঘোর অনিশ্চয়তাবোধ তার স্ত্রীকে বোঝাতে পারে না, তার স্ত্রী যেন বুঝতেও চায় না। স্বামী স্ত্রীর মধ্যে যে দূরত্ব গড়ে ওঠে, তারই ছায়া পড়ে ছেলেমেয়ের উপর। তারা বোঝে না, তাদের মাতাপিতার সম্পর্কে কোথায় কেন কতটা চিড় লেগেছে; আর বোঝে না বলেই যেন আরো ভয় পায়, সব কিছুতেই ভয়। এই ভয়ের ভয়ংকরতা রচনায় ইনজ যেমন সার্থক, শেষ পর্যন্ত মিলনাত্মক পরিণতি রচনা করতে গিয়ে তেমনিই হাস্যকর করে তোলেন। ব্যবসায়িক চলচ্চিত্র, সংবাদপত্রের খ্যাতি ইত্যাদি প্রলোভনে ইনজ ইদানীং প্রায় হারিয়ে গেছেন।

এই পর্বের সত্যিই নতুন যে তিনজন নাট্যকার, এডওয়ার্ড অ্যালবি (১৯২৮—), আর্থার এল কোপিট (১৯৩৭—) এবং জ্যাক রিচার্ডসন, এঁরাও যে কতদিন জনপ্রিয়তার দাবি না মিটিয়ে থাকতে পারবেন জানি না। এঁদের মধ্যে অ্যালবিকে 'অ্যাবসার্ড' ধারার নাট্যকার বলে বর্ণনা করায় তিনি বিরক্তি প্রকাশ করেছেন। তিনি লিখেছেন : "আসলে আমি কোন লেবেল লাগানোই অপছন্দ করে থাকি। এ জাতীয় লেবেলমাত্রই প্রায়শ বড়ই নিরর্থক এবং জনগণকে চিন্তাবিমুখ করে তোলে।" অবশ্য 'অ্যাবসার্ড'পন্থী নাট্যকারদের মতই অ্যালবিও মানেন, "মানুষ নিজেকে 'মোহাবেশে' আচ্ছন্ন করে রাখবার উদ্দেশ্যে নৈতিক, ধর্মীয়, রাজনৈতিক ও সামাজিক যে যাবতীয় কাঠামো এতকাল ধরে রচনা করে এসেছে, তার সবই ভেঙে পড়েছে।" এমনি এক অবস্থায় নির্ভরহীন লক্ষ্যহীন আশ্রয়হীন মানুষের নিজের পরিস্থিতি বুঝবার, নিজেকে উপলব্ধি করার চেষ্টা, এই সার্বিক অর্থহীনতাকে স্বীকার করবার সংসাহস যদি 'অ্যাবসার্ড' নাট্যরীতির ধর্ম হয়, তবে অ্যালবি-র 'দ জু স্টোরি'কে হয়ত সেই জাতেরই অন্তর্গত ধরা যায়। এই একাঙ্কিকার দুটি চরিত্রের মধ্যে পীটার সমাজে প্রতিষ্ঠিত, সমাজের চিরাচরিত শপথসাধ ও ধ্যানধারণায় সে পরম নিশ্চিন্ত; হতভাগ্য যারা, তাদেরও দুঃখদুর্দশা সম্পর্কে সে সচেতন, তবে সে সচেতনতাও নিতান্তই নির্বস্তুক এক বায়বীয় স্তরে। জেরি জীবনসংগ্রামে ব্যর্থ, তার ব্যক্তিত্ব যেন "এক প্রচণ্ড শ্রান্তিতে অবসন্ন"। এদের দেখা হয় এক পার্কে। এরা যেন প্রায় দুই ভিন্ন গ্রহের মানুষ। জেরি চেষ্টা করে তার তীব্রতর আবেগে অনুভবে পীটারকে জড়িয়ে ফেলতে। কিন্তু পীটারের স্থৈর্য অবিচল। এই দুটি মানুষের মধ্যে যে ব্যবধান, তা যেন কিছুতেই ভাঙতে পারে না। জেরি শেষ পর্যন্ত পীটারকে অপমান করে, ভয় দেখায়, দূরত্ব যেন বাড়তেই থাকে। জেরি পীটারের

হাতে ছুরি তুলে দিয়ে পীটারকে আক্রমণ করে। পীটার নিজেকে রক্ষা করবার জন্যই ছুরি ধরে থাকে, সেই ছুরি বিদ্ধ হয়ে জেবি মরে; মরবার আগে পীটারকে বলে: "ধন্যবাদ, পীটার। আমি সত্যিই বলছি, ধন্যবাদ।" এই মারণ স্পর্শে, আঘাতে, রক্তপাতে, অপরাধবোধে তারা যেন শেষ পর্যন্ত মিলতে পেরেছে। এই নাটকে আলবি বেভাবে কথাকে প্রায় শব্দমাত্রে ধ্বনিমাত্রে পরিণত করেছেন, অথচ একটা দম আটকে আসা পরিবেশ রচনা করেছেন, পরবর্তীকালের 'হুজ অ্যাফ্রেড অফ ভর্জিনিয়া উলফ' (১৯৬২) বা 'এ ডেলিকেট ব্যালেন্স' (১৯৬৬) নাটকেও তেমনি কথার অর্থে ততটা নয়, যতটা তার ধ্বনি বা ছন্দে এক-একটা নাটকীয় মুহূর্ত গড়ে ওঠে। এই দুটি নাটকে অবশ্য 'দ জু স্টোরি'র পরিবেশগত শূন্যতা নেই, বরং পরিবারচক্রের ঘরোয়া সীমার মধ্যেই মানুষের পরস্পরকে বুঝতে না পারার সংকট প্রকাশ পায়। একটি পরিবার যতদিন পারে তার নিজের মধ্যেকার বিরোধ ও ঘোর অসঙ্গতি বাইরের লোকের চোখ থেকে গোপন রাখবার চেষ্টা করে যায়, কিন্তু তারপর হঠাৎ একদিন আর পারে না, নিজেদের সাজানো ছাঁদটাকে নিজেরাই টুকরো টুকরো করে ভেঙে ছিঁড়ে নিজেদের মর্ম করে প্রকাশ করে। আলবি এক সাক্ষাৎকারে বলেছেন, "আঁচড়ে কামড়েই আমাদের সমমর্মিতায় পৌঁছতে হয়।" এই দুটি নাটকেই মানুষ প্রায় জন্তু হয়ে উঠে পরস্পরকে মর্মান্তিকভাবে আঘাত করে। 'ভর্জিনিয়া উলফ' নাটকে জর্জ ও মার্থা বাস্তবে যে সন্তান পায় নি, কল্পনায় তাকে লালন করে জীবনের একটা ফাঁক যেন এক মিথ্যা মোহে দীর্ঘকাল ভরাট করে রেখেছে। আজ অতিথি নিক ও হানির সামনে তারা প্রচণ্ড যন্ত্রণায় সেই কল্পনাটাকেই ছিঁড়ে উড়িয়ে দেয়, তরুণতর-অতিথি দম্পতির জীবনের ফাঁকিটাও তখন যেন ধরা পড়ে যায়। অথচ শেষ পর্যন্ত তারা পৌঁছে যায় এমন এক ত্রাসের ভয়ংকরতার মধ্যে, যেখানে পরস্পরকে আঁকড়ে ধরেই তাদের বাঁচতে হবে। 'এ ডেলিকেট ব্যালেন্স' নাটকেও একই পরিবারের অন্তর্গত কয়েকটি মানুষ ঐক্যবোধে ভদ্রতা সৌজন্যের যাবতীয় সামাজিক ভঙ্গি পরিহার করে প্রায় জন্তুর মত হয়ে উঠেও যেন নিজেদের শেষ পর্যন্ত চিনতে পারে।

আলবি-র মতই কোপিট-ও 'অ্যাব-সার্ডে'র ধারার অনুসারী নন। তাঁর নাটকের স্পষ্ট ক্ষোভগুলিও ধরতে কষ্ট হয় না। তবে কোপিট সব সময়েই একটা আপাত উদ্ভট মজার পরিবেশ রচনা করে থাকেন, তাতে যেন জীবনের কষ্টটাই আরো তিক্ত মনে হয়। কোপিট বোধ হয় এই-ভাবেই জীবনের আত্মপ্রবঞ্চনার ইঙ্গিত দেন। 'ও ড্যাড, পুওর ড্যাড, মামা'জ হাঙ ইউ ইন দ ক্লোজেট অ্যান্ড আই'ম ফীলিং সো ব্যাড' (কোপিট সাধারণত এমনি অস্বাভাবিক দীর্ঘ নামে মজা পান) নাটকে ম্যাডাম রোজপেটল তাঁর ছেলেকে দুর্লভ মুদ্রা, ডাকটিকিট, বইয়ের সংগ্রহে ঘিরে, নিয়ম ও নির্দেশের কঠোর শাসনে বেঁধে জীবনের সত্য ও প্রেম থেকে বাঁচিয়ে রাখতে চান। নিজেও তিনি প্রেম পান নি, যাকে বিবাহ করেছিলেন, তার মৃতদেহ তিনি আলমারীর মধ্যে ঝুলিয়ে রেখেছেন। ছেলেটির জীবনেও একটি মেয়ে আসে। ছেলেটি তাকে গলা টিপে মারে, তারপর ডাকটিকিট, মুদ্রা আর বইয়ের স্তূপে তাকে সমাধিস্থ করে, তার বাবার মৃতদেহও আলমারী খুলে মাটিতে পড়ে যায়। স্বভাবতই এই নাটকের ঘটনাবলী বাস্তব-সম্মত নয়, বরং স্বপ্ন বা কল্পনারই অন্তর্গত। ফলে যেহেতু ঘটনাবলী বিশ্বাস করবার কোন কারণই নেই, পুরো ব্যাপার-টায় (প্রায় রাক্ষস-খোক্কসের গল্পের মতই) একটা হিংস্র মজা পাওয়া যায়। অথচ জীবনের দু-একটা ফাঁকিরও আভাস পাওয়া যায়। সাম্প্রতিকতম 'ইনডিয়ানস' নাটকে কোপিট শ্বেতাঙ্গদের অত্যাচারে আমেরিকার আদি অধিবাসী তথাকথিত রেড ইনডিয়ান-দের নিধনের মধ্যে "যুক্তরাষ্ট্রের বর্তমান সামাজিক ব্যাধিগুলির প্রতিরূপ" খুঁজে পেয়েছেন। সাম্প্রতিক এক সাক্ষাৎকারে (দ্রঃ 'ট্রান্স-অ্যাটল্যান্টিক রিভিউ', শরৎ-কালীন সংখ্যা, ১৯৬৮) ব্রেনডান হেনেসি কোপিটকে জিজ্ঞাসা করেন: "আপনার অধিকাংশ নাটকেই ওপরের স্তরে কৌতুকের প্রাচুর্য, অথচ গভীরে ভয় ও মারণপ্রবৃত্তি। আপনি কি প্রথমে সব কিছুকে কৌতুককর দেখেন, তারপর ভাবতে গিয়ে তার ভিতরের বিকার লক্ষ করেন?" কোপিট উত্তরে বলেন, "যুক্তরাষ্ট্রে মারণপ্রবৃত্তি সাধারণত নিজেকে গোপন রাখে, অন্য কিছু বলে ভান করে। কোন দক্ষিণী মার্কিনির মুখের হাসির কথাই ভেবে দেখুন। মারণ-প্রয়াসও এক ধরনের কঠিন কৌতুক হয়ে উঠতে পারে।" 'ও ড্যাড, পুওর ড্যাড' নাটকের কথা বলতে গিয়ে কোপিট বলেন, "ম্যাডাম রোজপেটল-এর মধ্যে মাতৃত্বেরই বিকার।...তিনিও পুত্রের মঙ্গলই চান, যেমন চায় আমেরিকা, ভিয়েতনামের শহরে শহরে বোমাবর্ষণ করে ভিয়েতনামেরই মঙ্গল। যদি চান, ম্যাডাম রোজপেটল-এর জায়গায় 'আমেরিকার' নাম পড়তে পাবেন, তার নিপীড়িত পুত্রে জনাথানের জায়গায় ভিয়েতনাম।" উদ্ভট প্রহসনের কৌতুকের মধ্যে কোপিট এইভাবেই অন্য তাৎপর্য আনেন।

'অ্যাবসার্ড'-এর দিশাহীন নৈরাশ্য মার্কিন নাটকে আসে নি, কিন্তু সাবেকি নাটকের সোজাসুজি গল্প বলার ঢঙ বা সংলাপের মধ্য দিয়ে কাহিনীকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া ও চরিত্রের আত্মপ্রকাশের আদি প্রথা ভেঙে ঘটনা ও কথায় জটিল প্রতীকের ব্যঞ্জনা যোগ করার যে প্রবণতা অ্যালবি ও কোপিট-এ লক্ষণীয়, তার পেছনে 'অ্যাব-সার্ড' নাটকের ফলারূপের প্রভাব বর্তমান। অবশ্য এই ধারার পাশাপাশি জ্যাক বিচার্ড-সন আপাত সাবেকি ধরনই ধরে রেখেছেন। 'গ্যালোজ হিউমর' নাটকের দুটি অঙ্ককে দুটি একাঙ্কিকা বলে বর্ণনা করা যায়। প্রথম অঙ্কে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত এক খুনীর কারাগারে শেষ খানিকক্ষণ, দ্বিতীয় অঙ্কে এক জহ্লাদের প্রাণদণ্ডদানে বেরোবার আগে কিছুক্ষণ। দুটি অঙ্কেরই আগে মৃত্যুর আবির্ভাব ঘটে, এক চরিত্রের রূপসজ্জায়। তার ক্ষোভ, সে এই নাটকে প্রবেশাধিকার পায় নি: "গত কয়েক বছরে আমি অজান্তেই আমার ক্রিয়াকর্ম এতই বিস্তৃত করেছি যে তার সীমাপরিসীমা মিলিয়ে যেতে বসেছে। শ্বাসরোধের যে লক্ষণ এতকাল অপরিহার্য ছিল সেই লক্ষণাক্রান্ত নয় এমন প্রাণীও আজ সমাধির অধিকার-চ্যুত। যারা গানের তালে মাচছে কুঁদছে, বউদের চুমু খাচ্ছে, তর্জনী তুলে তাদের জীবনের পরম সত্যগুলি ঘোষণা করছে, আমি তাদেরও মধ্যে অনুপ্রবেশ করেছি। এরা কি সত্যিই বেঁচে আছে?" প্রথম অঙ্কের মৃত্যুপথযাত্রী আসামী তার জীবনে অভ্যাসের পৌনঃপুনিকতায় হাঁপিয়ে উঠে একদা স্ত্রীকে হত্যা করে একটা প্রচণ্ড অনিয়ম ঘটিয়ে ফেলেছিল, তারপর কারাগারের নিয়মানুবর্তিতায় সে আবার তার আগের জীবনের বাস্তিক শান্তি খুঁজে

১৯৬৯তে আপনার ভাগ্য

যে-কোন একটি ফুলের নাম লিখিয়া আপনার ঠিকানাসহ একটি পোস্টকার্ড আমাদের কাছে পাঠান। আগামী বছরমাসে আপনার ভাগ্যের বিস্তারিত বিবরণ আমরা আপনাকে পাঠাইব, ইহাতে পাইবেন ব্যবসায়ে লাভ লোকসান, চাকুরিতে উন্নতি, বদলী, জন্ম, বিবাহ ও সুখ-সমৃদ্ধির বিবরণ; আর থাকিবে দুষ্ট-গ্রহের প্রকোপ হইতে আত্মরক্ষার নির্দেশ। একবার পরীক্ষা করিলেই বুঝিতে পারিবেন।

PT. DEV DUTT SHASTRI
RAJ JYOTISHI (B. M. W)
P.B. 86, JULLUNDUR CITY

নীল কমল, লাল কমল

রাণী দেবী

ফুল ফুটুক, তবেই বসন্ত;
তবেই শ্যামা চন্দনার আলোয়
ভালবাসার পাপড়িগুলি যেন রে মন্দার...
ফুল ফুটুক, আমার জন্মভূমির রক্তকমল দিক রাঙিয়ে
তিন ভুবন।

শীতের রাত বিশ বছর ছেঁড়া কাঁথায় শরীর ঢেকে
উলঙ্গের এই মিছিল...
মানুষখেকো অন্ধকার কেবল মারে, সূর্য অস্ত না যেতে
তাই দুয়ারে দেয় খিল
হায় রে আমার রক্তভাসা আধখানা দেশ, এই
গায়ঃ 'বর্গী এলো দেশে!'
হায়রে আমার রক্তভাসা আধখানা দেশ, এই
নরকে ফুল ফোটে না।

ফুল ফোটাও, নীল কমল! লাল কমল! রূপকথার
আগুনে দাও ঝাঁপ; হও অমল—
এই দারুণ শীত, বিশ বছরের অন্ধকার শ্মশান হও পার।

শব্দ ওঠে না

সত্যানন্দ মণ্ডল

ক্লাচে ভর করে দাঁড়িয়ে দেখা সকাল মেঘের মধ্যে আকাশ
চোখের সামনে
লক্ষকোটি মানুষের উত্তোলিত হাত
আমার বুকের নিচে এক হাহাকার
ক্রমশ দীর্ঘ ক্রমশ দীর্ঘ হয়
সারা রাস্তায় কতোকাল মানুষের পদযাত্রা
রাত্রির হিম ঝরানো আকাশ কতোকাল
স্টেশনে পড়ে-থাকা নিঃসাড় মা-বোন কত ক্লান্ত অসহায়
অবেলায় তদন্ত করতে এসে ফিরে যায় কারা
শুধু ভুলে যাওয়া নিরন্তর আচ্ছন্ন রাত্রির ঘুমে
গঙ্গার ঘোলা জলে ভেসে-ওঠা কোন মৃত বিধবার মুখ
এইভাবে চলে দিন শীতল জ্যোৎস্নার মত
ক্লান্তি নিয়ে পৃথিবী আমার শেষরাতে
নীরব প্রহার থেকে গলা ছেড়ে চীৎকার
শব্দ ওঠে না
মানুষের চোখের তারায় তবু সহস্রটি সূর্য জ্বলে যায়
চেয়ে থাকি এই রাত্রির অন্ধকারে কারা হেঁটে যায়।

পেয়েছে। এখানে কারাগারের জানলা দিয়ে দেখা "আকাশটাও নটি নিখুঁতে চতুষ্কোণে খণ্ডিত। রাত্রি পরিষ্কার থাকলে দেখা যায় প্রতিটি চতুষ্কোণের মধ্যে ঠিক পাঁচটি তারা. আর মাঝখানের চতুষ্কোণটির মধ্যে একটি গ্রহ।" মৃত্যুর খানিকক্ষণ আগেও ঘরটা পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখা. জামার সঙ্গে নম্বর লেখা কাপড়ের ফালিটা সেলাই করে রাখা ওয়ালটারের প্রধান দায়। শেষ সময়ে কিছুটা আনন্দ দেবার জন্য সরকারি উদ্যোগে প্রেরিতা এক গণিকা ওয়ালটারের নিয়মের আশ্রয় ভেঙে দেয়, মরতে গিয়েও ওয়ালটার যেন আবার অনিয়মের মধ্যে খানিকক্ষণ বেঁচে নেয়। অথচ দ্বিতীয় অঙ্কের ফিলিপ, অনাঙ্কে মৃত্যুতে পৌঁছে দেওয়াই যার কাজ, সে কিন্তু ঐটুকুও বাঁচবার সংযোগ পায় না। কোন নিয়ম-রহিত শব্দই সে পূর্ণ করতে পারে না। এমন কি স্ত্রীকে অন্যের কণ্ঠলগ্না দেখে অপমানবোধে বাড়ি ছেড়ে বেরিয়ে যেতে গিয়ে সে রান্নাঘরের দরজাটাই খুলতে পারে না, অথচ কাজে বেরোবার সময় হলেই সেই দরজাটাই কী স্বচ্ছন্দে খুলে যায়! ফিলিপ একবার বলবার চেষ্টা করে, "আমি একটা কিছু হতে..." মার্থা বলে, "তুমি পারো নি, ফিলিপ। কিছু কিছু ব্যাপার আছে, ক্ষমাও ভাঙা যায় না। বাইরে শীত লাগিয়ো না। ওসব কথা ভুলে যাও। আমাকে চুমু খাও।" ফিলিপ আবার বলে : "আমি কি কিছুতেই পারব না?" মার্থা গাল বাড়িয়ে দিয়ে বলে : "চুমু খাও। ঠাণ্ডা লাগিয়ো না, লক্ষ্মীটি। বেশি খেটো না। আজ রাত্রে—আজ রাত্রে আলো কিছু রাঁধব। যা তুমি সত্যিই ভালোবাসো, লক্ষ্মীটি, সত্যি-সত্যিই ভালোবাসো।"

নিয়ম, আচার ও অভ্যাসের এই অমানুষের শাসনের নির্মমতা জ্যাক গেলবার 'দ কানেকশন' নাটকে ও কেনেথ ন্যাচ ব্রাউন 'দ বিগ' নাটকে প্রকাশ করেছেন। প্রথমোক্ত নাটকে হেরোইনের নেশার শিকার একদল মানুষ, দ্বিতীয়োক্ত নাটকে সেনা-বাহিনীর কারাগারে বন্দী একদল অপরাধী মার্কিন নৌসেনানী, প্রায় গাণিতিক যান্ত্রিকতায় তাদের যাবতীয় অনুভূতি ভুলে যায়। দুটি নাটকেরই আঁটোসাঁটো গঠনে মানুষের এই অদ্ভুত অমানুষিক রূপান্তর প্রত্যক্ষ হয়ে ওঠে। দুটি নাটকই একই সম্প্রদায়, জুলিয়ান বেক ও জুডিথ মালিনার 'দ লিভিং থিয়েটার' মঞ্চস্থ করেছিলেন, যথাক্রমে ১৯৫৯ ও ১৯৩৬ সালে। প্রথম নাটকটি দেখে ইংরেজ সমালোচক কেনেথ টাইনানের গর্কির 'নিচের মহল' নাটকটির কথা মনে পড়েছিল, বাস্তবানুকৃতি ও একই অন্ধকার নরকে কিছু মানুষের এই একই যন্ত্রণাভোগের অবিবর্তনীয় রূপায়ণের কারণে। 'দ বিগ' পড়েও গর্কির ঐ নাটকের কথা মনে পড়ে। মারে শিসগাল আরো হালকা চালে আরো শান্ত বিষণ্ণতায় 'দ টাইপিস্টস' নাটকে ঐ একই প্রসঙ্গ তুলেছেন। 'দ নাইগার' নাটকে (এই নাটক স্মরণ করেই লীরোদল সরকার 'বাঘ' নাটক রচনা করেছেন) অবশ্য শিসগাল শেষ পর্যন্ত একটা সংঘবদ্ধ পরিণতি ঘটিয়েছেন। এঁরা সকলেই সতর্জ-তর রূপের আশ্রয়ে যা প্রকাশ করতে গেছেন, জঁ ক্লদ ভান ইতালি মংখোশ, অতিকায় পুতুল ও সামগ্রিক প্রতীকধর্মের নানা বৈচিত্র্যে 'অ্যামেরিকা হুরা' নামধেয় নাটক সংগ্রহে তা-ই প্রকাশ করেছেন। মানসিকতার আড়ষ্ট নির্জীবতায় মার্কিন দর্শকসমাজের বহুদংশই যেমন মননবিমুখ হয়ে উঠছেন, উদ্ভ্রান্ত উত্তেজনার প্রবল আঘাত ছাড়া যখন তাদের ঘুম ভাঙানো প্রায় অসম্ভব হয়ে উঠছে, তখন নাটককেও উপকরণ ও আঙ্গিককৌশলের প্রাবল্যে মানুষের মনে স্থান করে নিতে হচ্ছে। ফলে মার্কিন নাটক ক্রমশই সাহিত্যগুণবাচ্য নাটকের স্তর থেকে দৃশ্যকাব্যের স্তরে গিয়ে পৌঁছচ্ছে। এই নাটক প্রায়শই সাহিত্যবিচারের সীমা পেরিয়ে এতদূরে চলে যাচ্ছে যে, সাহিত্যালোচনায় সেই নাটক নিয়ে আলোচনা অসাধ্য হয়ে ওঠে। তার যাবতীয় তাৎপর্য তার নাট্যমূল্যেই নিহিত। সমকালীন মার্কিন নাটক, বলা যায়, অনাটকের দিকে এগোচ্ছে, না কি শুদ্ধ থিয়েটারের বা নাট্যের দিকেই?

সর্বাত্মক গণতান্ত্রিক সংগ্রামের পথে পাকিস্তান

ফেব্রুয়ারীর পদ্ধতির পার্লামেন্টারী কাঠামো সহ জনগণের পূর্ণ গণতান্ত্রিক অধিকার কায়েমের জন্যে সংগ্রাম চালাবার উদ্দেশ্যে ৮ পার্টির সমন্বয়ে যে "গণতান্ত্রিক সংগ্রাম পরিষদ" গঠিত হয়েছে, তা নিঃসন্দেহে সর্বাত্মক গণতান্ত্রিক সংগ্রাম গড়ে তোলার পথে এক গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ বলে বিবেচিত হবে। স্মরণ রাখা দরকার যে, একনায়কত্ববাদী শাসনের অবসানের উদ্দেশ্য এই সর্বপ্রথম প্রায় সব কয়টি বিরোধী দল নিম্নতম কর্মসূচীর ভিত্তিতে 'আন্দোলনের জন্যে' ঐক্যবদ্ধ হলেন। কেবলমাত্র মওলানা ভাসানীর নেতৃত্বে চালিত ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি এবং জনাব ভুট্টোর পিপল্‌স পার্টি এখনও পর্যন্ত এই ঐক্য ফ্রন্টে যোগ দেন নি। পিপল্‌স পার্টি নির্বাচনে অংশ গ্রহণের সিদ্ধান্তে অটল থাকায় নির্বাচন-বিরোধী ঐক্য ফ্রন্টে তার যোগদানের সম্ভাবনা আপাতত নাও থাকতে পারে। কিন্তু মওলানা ভাসানী নির্বাচন বয়কটের সিদ্ধান্ত নিয়ে "গণতন্ত্রের জন্যে সংগ্রাম চালিয়ে যাবার" সংকল্প ঘোষণা করায় তাঁর দলের এই ঐক্য ফ্রন্টে যোগ না দেয়ার কোন কারণ দেখা যাচ্ছে না। মওলানা সাহেব ঢাকা উপস্থিতির পর ৮ পার্টির নেতাদের সাথে আলোচনা করে এ ব্যাপারে শীঘ্রই চূড়ান্ত সিদ্ধান্তে আসবেন বলে পর্যবেক্ষক মহল আশা করছেন।

গত দশ বছর যাবৎ একনায়কত্ববাদী শাসনের যে জগদ্দল পাথর দেশবাসীর বুকের উপর চেপে রয়েছে, কোন দলের একক প্রচেষ্টায় তাকে অপসারণ করা যে সম্ভব নয়, সে সম্পর্কে কোথাও কোন দ্বিমত নেই। পর্যবেক্ষক মহল ছাড়াও সব দলের নেতারা বরাবর স্বীকার করে এসেছেন যে, গণতন্ত্র কায়েমের জন্যে সর্বদলীয় ঐক্য অবশ্য প্রয়োজন কিন্তু বিভিন্ন দলের অতিরিক্ত গোঁড়ামী, সংকীর্ণতা এবং বিজ্ঞানসম্মত দৃষ্টির নিরিখে বাস্তবকে যাচাই করতে অক্ষমতার দরুণ সর্বাত্মক গণতান্ত্রিক ঐক্য এতদিন সম্ভব হয়ে ওঠে নি। বিরোধী দলগুলোর রাজনৈতিক বিচক্ষণতার এই অভাবের জন্য ক্ষমতাসীন একনায়কত্ববাদী সরকারই শুধু লাভবান হয়েছে। কেন না এর ফলে সর্বাত্মক গণতান্ত্রিক ঐক্য যত বিলম্বিত হয়েছে, ক্ষমতাসীন সরকারের ভিত ততই মজবুত হয়েছে এবং বিরোধী শিবিরের অনৈক্য ও পারস্পরিক হানাহানির পূর্ণ সুযোগ গ্রহণ করে সরকার আরো বেশি করে শোষণ-পীড়ন চালাতে পেরেছেন। গণতন্ত্রের জন্যে সংগ্রামের উদ্দেশ্য নিয়ে বিরোধী দলগুলি ঐক্যবদ্ধ হতে পারলে তাতে স্বৈরতন্ত্রের ভিত্তি কিভাবে টলে ওঠে সে আলামত আমরা এখনই দেখতে পাচ্ছি। কেন না মওলানা ভাসানীর ন্যাপ এখনও আনুষ্ঠানিকভাবে সর্বদলীয় 'গণতান্ত্রিক সংগ্রাম পরিষদে' যোগ না দেওয়া সত্ত্বেও অন্যান্য ৮টি রাজনৈতিক দলকে নিয়ে যুক্ত সংগ্রাম কমিটি গঠনের সিদ্ধান্ত প্রচারিত হবার সাথে সাথেই সরকার দলীয় নেতাদের হাঁটু কাপতে শুরু করেছে। সর্বাত্মক ঐক্য ছাড়াই গত দু' মাস যাবৎ দেশের উভয় অংশে কেবল দু-একটি রাজনৈতিক দল এবং ছাত্র, আইনজীবী ও ভদ্রমহিলারা বিক্ষিপ্তভাবে যেটুকু আন্দোলন করেছেন তাতেই শাসক মহলের নাভিশ্বাস শুরু হয়ে গেছে। অতএব, মওলানা ভাসানীর ন্যাপ সর্বদলীয় সংগ্রাম পরিষদে যোগদানের সিদ্ধান্ত নিলে যে সর্বাত্মক গণতান্ত্রিক সংগ্রাম শুরু হবে, তার ফলে জনগণের গণতান্ত্রিক অধিকার এবং রাজবন্দীদের মুক্তি সহ অন্যান্য জরুরী দাবী পূরণ যে কত ত্বরান্বিত হবে তা যে কোন রাজনৈতিক পর্যবেক্ষকই বুঝতে সক্ষম।

কোন কোন বামপন্থী মহল থেকে প্রশ্ন উঠেছে, জামাতে ইসলামী ও কাউন্সিল মুসলিম লীগের মত পাঁড় দক্ষিণপন্থী দল যে ঐক্যফ্রন্টে রয়েছে, শ্রমিক-কৃষকের মিত্র সাচ্চা বামপন্থীরা তাতে যোগ দিতে পারে কি না। এই মুহূর্তে একরকম প্রশ্ন যাঁরা তুলছেন তাঁরা ঘটনার ঐতিহাসিক বাস্তবতা সম্পর্কে যথেষ্ট সচেতন নন। ইতিহাসের বাস্তবতা সম্পর্কে সচেতনতার অভাবের জন্যই তাঁরা তাঁদের চলার পথের 'রাজনৈতিক বাধ্যবাধকতাগুলো' বুঝবার ব্যাপারেও বিচক্ষণতার পরিচয় দিতে পারছেন না। সেই জন্য দেখতে পাই, শ্রমিক-কৃষকের অর্থনৈতিক মুক্তির জন্য অপরিহার্য জঙ্গী শ্রেণী-সংগঠন গড়ে তোলা যে সামন্তবাদ ও একচেটিয়া পুঁজির স্বৈরতান্ত্রিক শাসনে কিছুতেই সম্ভব নয়, গত দশ বছরের তিক্ত অভিজ্ঞতার পরেও সে সম্পর্কে তাঁরা সচেতন হতে পারেন নি। এমন কি জনগণের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক মুক্তি সংগ্রাম এগিয়ে নেয়ার ঐতিহাসিক যাত্রাপথের কোন্ স্তরে মাও সে-তুং "জাতীয় বুর্জোয়া, মধ্যম বুর্জোয়া, শ্রমিক ও কৃষক শ্রেণীর সমন্বয়ে" নয়া গণতান্ত্রিক মোর্চা গঠনের উদ্যোগ নিয়েছিলেন সে সম্পর্কে এই বন্ধুরা যথেষ্ট ওয়াকিবহাল নন। তাঁরা রুশ বিপ্লবের ইতিহাস এবং লেনিনের রাজনৈতিক স্ট্রাটেজীর ধাপগুলোর ঐতিহাসিক তাৎপর্য কখনও গুরুত্বের সাথে বিশ্লেষণ করে দেখেছেন কি না সে বিষয়েও সন্দেহের কারণ দেখা দিয়েছে। কেন না সামন্তবাদ ও বড় পুঁজির স্বৈরতান্ত্রিক শাসনের আওতায় শ্রমিক-কৃষকের জঙ্গী শ্রেণী সংগঠন গড়া যে কোনক্রমেই সম্ভব নয় এবং সে জন্য বুর্জোয়া স্বৈরতন্ত্রের জায়গায় বুর্জোয়া গণতন্ত্র অথবা ত্রিশের দশকের জাতীয় বুর্জোয়া সহ প্রধান চার শ্রেণীর গণতান্ত্রিক কোয়ালিশনের অনুরূপ ব্যবস্থা কায়েম যে সহস্রগুণে শ্রেয় ও সুবিধাজনক, পাকিস্তানের সমকালীন রাজনৈতিক বাস্তবতার নিরিখে এই বন্ধুরা তা উপলব্ধি করতে পেরেছেন কি না সে পরিচয় এখনও পাওয়া যায় নি। আর সেই জন্য তাঁরা জাতীয় বুর্জোয়াদের অংশীদারিত্বে অন্যান্য শ্রেণীর গণতান্ত্রিক কোয়ালিশন কায়েমের সম্ভাবনাকে ভীতির চোখে দেখে একচেটিয়া পুঁজির স্বৈরতান্ত্রিক একনায়কত্ববাদের আওতায় শুধু জেল খেটে কিংবা 'আত্মগোপনের রোমাঞ্চকর' জীবন যাপন করে 'মহান বিপ্লবী দায়িত্ব' পালন করা হচ্ছে বলে আত্মপ্রসাদ অনুভব করছেন। সংশ্লিষ্ট বন্ধুরা সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবকে রোমান্টিকতার দৃষ্টিতে দেখতে অভ্যস্ত হয়ে পড়েছেন বলেই দেশের সমকালীন রাজনীতির বিষয়গত বাস্তবতা বিচক্ষণতার নিরিখে বিচার করে গণতান্ত্রিক সংগ্রামের যাত্রাপথে নিজেদের রাজনৈতিক বাধ্যবাধকতাগুলো উপলব্ধি করতে পারছেন না। বামপন্থী রাজনীতিতে অনুরূপ প্রবণতার অনিবার্য পরিণতি হচ্ছে অ্যাডভেঞ্চারিজম, যা শুধু আত্মহননের

রিস্ট ওয়াচ

মাত্র ৬৲ টাকায়

আমাদের চেন পদ্ধতি স্কীমের মাধ্যমে মাত্র ৬৲ টাকায় ৫ বৎসরের গ্যারান্টী সমেত ৫ জুয়েল রিস্ট-ওয়াচ লাভ করুন। ডাকমাশুল ১/১৫ টাকা অতিরিক্ত।

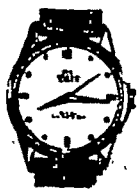

দ্রষ্টব্য ঃ আমাদের মধু-চন্দ্রিমা সেন্টের বিক্রয় বৃদ্ধির জন্যই এই স্কীম চালু করা হইল। পছন্দ না হইলে মূল্য ফেরৎ।

SWISS WATCH
TRADING CO.
P. B. 87, (WBC) Jullundur City.

পথকেই প্রশস্ত করে। কিন্তু অ্যাড-ভেঞ্চারিজম যখন আন্তর্জাতিক অনুধ্যানকে আশ্রয় করে লক্ষ্যে পৌঁছাবার স্বপ্ন দেখে তখন আভ্যন্তরীণ রাজনীতির বাস্তব দিকগুলো স্বীকার করার বুদ্ধি নির্ভর ক্ষমতাও তার থাকে না। বাম-পন্থী রাজনীতিতে এই মনোভাবের পরিণতি অতি ভয়াবহ; অতএব এ সম্পর্কে কর্মীদের এই মুহূর্তে সচেতন হওয়া দরকার।

পূর্ব পাকিস্তানের সাম্প্রতিক গণ-তান্ত্রিক সংগ্রাম মওলানা ভাসানীর নেতৃত্বেই শুরু হয়েছে বললে অত্যুক্তি হবে না। তিনিই প্রথম এগিয়ে এসে অস্বস্তি-কর গুমোট অবস্থার বাঁধে ফাটল ধরিয়ে গণতান্ত্রিক আন্দোলনের স্রোতকে অবরোধ থেকে মুক্ত করে দিয়েছেন। তারপর অবরোধের বাঁধে আরো ফাটল সৃষ্টি হয়ে বিভিন্ন দিক থেকে স্রোত বইতে শুরু করেছে। এই সব বিভিন্নমুখী স্রোতকে এক সাথে এক খাতে মিলিত করে গণ-তান্ত্রিক সংগ্রামের গতিবেগকে দুর্বার করে তোলার মুখ্য ভূমিকাও মওলানা সাহেবকেই নিতে হবে। কিন্তু সর্বদলীয় গণতান্ত্রিক সংগ্রাম পরিষদে তিনি এখনও পর্যন্ত যোগ না দেওয়ায় গণতন্ত্রকামী জনগণ নিশ্চিন্ত হতে পারছেন না। তিনি কেন যোগ দিতে ইতস্তত করছেন এবং সর্বদলীয় নেতৃবৈঠকে শরিক হবার জন্যে কেন ঢাকায় এলেন না, এসব নিয়ে মানুষের মনে নানা প্রশ্ন জাগছে। এসব প্রশ্ন নিরসন করার দায়িত্ব মওলানা সাহেবের। তবে এই মুহূর্তে আমরা যা পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছি তা এই যে, দেশ-বাসীর নিরঙ্কুশ গণতান্ত্রিক অধিকার এবং রাজবন্দীদের মুক্তি সহ অন্যান্য জরুরী দাবি বাস্তবায়নের জন্যে ৮ পার্টির সমন্বয়ে গঠিত গণতান্ত্রিক সংগ্রাম পরিষদে শরিক হয়ে গণতান্ত্রিক আন্দোলনকে প্রচন্ড বেগে এগিয়ে নেবার দায়িত্ব কেউ অস্বীকার করতে পারেন না। সাম্প্রতিক এক বক্তৃতায় মওলানা ভাসানী নিজেও এই দায়িত্বের কথা সবাইকে স্মরণ করিয়ে দিয়ে বলে-ছেন: "নির্বাচনের জন্য ঐক্য চাই না, কিন্তু গণতান্ত্রিক অধিকার কায়েমের জন্য সংগ্রামী ঐক্য যদি হয়, তবে তাতে যোগ দিতে রাজী আছি।" মওলানা সাহেবের কথা অনুযায়ী নির্বাচনী প্রহসন বর্জন করে গণতন্ত্র কায়েমের জন্য সংগ্রামী ঐক্য এখন গঠিত হয়েছে। সুতরাং এই ঐক্য ফ্রন্টে যোগ দেওয়া তাঁর পক্ষে অপরিহার্য হয়ে পড়েছে।

শুধু মাওলানা ভাসানীই নয়, সর্ব-দলীয় গণতান্ত্রিক সংগ্রাম পরিষদে যোগ দিয়ে গণ-সংগ্রামকে এগিয়ে নেওয়ার দায়িত্ব সবার এবং সকল গণতান্ত্রিক দল ও ব্যক্তিকে এই দায়িত্ব সাহসিকতার সঙ্গে পালন করতে হবে। এই দায়িত্ব থেকে দূরে পালিয়ে থাকার, কিংবা নীতিগত তর্ক তুলে একলা চলার আত্মঘাতী পথে পা বাড়াবার কোন সুযোগই আর নেই। গণতান্ত্রিক দলগুলোর সামনে পাকিস্তানের বর্তমান বাস্তব পরিস্থিতির এটাই হচ্ছে অনিবার্য রাজনৈতিক বাধ্যবাধকতা। জন-গণের রাজনৈতিক অধিকারগুলো কায়েমের জরুরী লক্ষ্যে পৌঁছাবার স্বার্থে এই বাধ্য-বাধকতাকে স্বীকার করে নেয়ার মত রাজ-নৈতিক বিচক্ষণতার পরিচয় সবাই দেবেন এই আশা আমরা পোষণ করতে চাই।*

* জনতা, ১২ই জানুয়ারী থেকে সংকলিত। স্থানাভাবের জন্য এটি বিলম্বে প্রকাশিত হোল।

বর্তমান বঙ্গসাহিত্যে সর্বাধিক জনপ্রিয় লেখিকা

আশাপূর্ণা দেবীর

গ্রন্থাবলী

আবার একখণ্ড প্রকাশিত হয়েছে!

তিনখানি সম্পূর্ণ উপন্যাস। সাতটি বড় গল্প

১। বলয়গ্রাস ২। প্রেম ও প্রয়োজন

৩। দুনিবার ৪। এক গুচ্ছ গল্প

মূল্য মাত্র সাড়ে ছয় টাকা

আগেই বেরিয়েছে আর এক খণ্ড

গ্রন্থাবলী

১। জরুরী ২। অনির্বাণ

৩। সোনালী দিনের মন

৪। এক গুচ্ছ গল্প

মূল্য মাত্র পাঁচ টাকা

বসুমতী (প্রাঃ) লিঃ
কলিকাতা-১২

পথ কি কথা?

মনোজ বসু

[পূর্ব-প্রকাশিতের পর]

॥ ছত্রিশ ॥

রোয়াকে উঠে বৃদ্ধ একজন বৈঠকা নামালেন। ধনাই মিঞা, চেনা মানুষ। ঘরের মধ্যে জমিয়ে বসে সকলে জ্বরের পরিণাম শুনছে। শ্রীধর মল্লিক বেরিয়ে এসে সবিস্ময়ে বললেন, কী ব্যাপার, ক'দিন আগেই তো ওপার থেকে এলেন। আবার চললেন যে আজ?

ধনাই মিঞা বেজার মুখে বলেন, মানুষ আর নেই মল্লিক মশায়। ভাঁতের মাকু হয়ে টানা-পোড়েন করে বেড়াচ্ছি। গণ্ডগোল দেখে ছেলেপুলে ওপারে পাঠিয়ে দিয়েছি—বেঁচে তো থাকুক প্রাণে প্রাণে। আমার জমিজিরেত ধান-চাল সমস্ত এপারে—যা খেয়ে ওরা বেঁচে থাকবে। এই বয়সে আমি একবার ওপারে যাচ্ছি ছেলেপুলে দেখতে, আবার এপারে আসছি ধান-চাল দেখতে।

শ্রীধর প্রবোধ দিয়ে বলেন, গণ্ডগোল, সরকারের সঙ্গে লেগেছে। তাতে ছেলে-পুলে সরানোর কি হল?

ধনাই তিক্তকণ্ঠে বলেন, এখন তাই বটে—ঘুরিয়ে দিতে কতক্ষণ?, পুলিশে পাবলিকে চলছে—রাত পোহালে দেখব হিন্দু-মুসলমানে ধুন্দুমার, পুলিশ ফ্যা-ফ্যা করে হাসছে। এ খেলা কতবারই তো হল—সোনার দেশ ছারখারে দিল মত-লববাজ পাঁচ খেলে খেলে।

হুঁকো-বিলাসী মানুষ ধনাই। এক কলকে সারা হলে কলকে ঢেলে ফেলে নতুন করে সাজবেন। হুঁকো-কলকে টিকে-তামাক বৈঠকায় ভরে কাঁধে নিয়ে ঘোরেন। চেন-স্মোকার সিগারেটখোর দেখেন, ধনাই মিঞা হুঁকোর বাবদে প্রায় তাই।

আকাশে মেঘ—দেখতে দেখতে গাঢ় হয়ে উঠল। চমকিত শ্রীধর উঠানে নেমে তীক্ষ্ণচোখে দেখছেন। নন্দ রাউত ও আরাপদকে ডাকাডাকি করতে লাগলেন: বেরিয়ে আয় রে। কাজ বুঝি শুধু নিজেই—উপর দিকে তাকাবি নে একবার? মানুষ-জন আসছেন, তাঁদের নিয়ে আমি ব্যস্ত, তোরা কোথায় হুঁশ করে দিবি, তা নয়—আমিই ডেকে মরছি তোদের। আলো-টালো বের করে ফেল, এক্ষুনি হয়তো লাগবে।

ভুড়ুক-ভুড়ুক মৃদু আওয়াজ রোয়াকের দিকে। প্রথম বিশ্বাস কান খাড়া করে শুনল কয়েক সেকেণ্ড। সাঁ করে বেরিয়ে এলো। বেঞ্চির উপর উবু হয়ে বসে ধনাই মিঞা হুঁকো টানছেন।

কদমতলায় কালার বংশী। মন উচাটন মিঞা সাহেব, আসর ভেঙে বেরিয়ে পড়েছি।

হুঁকো থেকে মুখ তুলে ধনাই একদৃষ্টে প্রমথর দিকে তাকিয়ে আছেন। প্রমথ বলে, ওস্তাদ গুড়ুকখোর আপনি—হুঁকো নিয়ে পথে বেরিয়েছেন। ঠিক বটে, ওস্তাদেই এ জিনিসের মাহাত্ম্য বোঝেন। বিড়ি বলুন চারমিনার বলুন, হুঁকোর কাছে কিছুই নয়—

পাশে গিয়ে ঘনিষ্ঠ হয়ে বসল। হাত বাড়িয়ে বলে, কলকেটা দিন মিঞাভাই, দু-টান টেনে যাই। জমাটি আসর থেকে চলে এসেছি।

হুঁকোর মাথা থেকে কলকে নামিয়ে দিয়ে বৃদ্ধ বলেন, আপনাকে চিনি কিন্তু আমি।

তা হবে—

কষে একটা দম দিয়ে নাকে-মুখে ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে নিরুত্তাপকণ্ঠে প্রমথ বলে, এদেশ-সেদেশ পালা গেয়ে বেড়াই। আমায় চিনবেন সে আর কত বড় কথা।

ধনাই ঘাড় নেড়ে বলেন, সে চেনা নয়। পালা গেয়ে প্রাণদান দিয়েছিলেন আপনি আমার।

সকৌতুকে প্রমথ ধনাইয়ের দিকে তাকিয়ে পড়ে: আছে বটে একটা পালা, —লক্ষ্মণের শক্তিশেল। কিন্তু প্রাণদান আপনার কিসে হবে, সে তো লক্ষ্মণের।

ধনাই বলে, সেই যে সেবারে, খড়কে-ডাঙার মেলার মধ্যে—মনে পড়ছে না? জান-প্রাণ গিয়েছিল আর কি, ঠেকানোর কোন আশা ছিল না—ধাক্কা দিতে দিতে আপনি তখন কালী-দালানের ভিতরে ঢুকিয়ে দিলেন।

মনে পড়ল। দুই প্রাণী—ভয়ে থরথর কাঁপছিল। এই লোক তার একটি। তখন কি তাকিয়ে দেখেছি ছাই! দেখার ফুরসত কোথা?

মেলায় পালা গাইতে গিয়েছিল। ইস্কুল-বাড়িতে বাসা দিয়েছে যাত্রাওয়ালাদের। কী নিয়ে দাঙ্গা বেধে গেল। মার-ধর-কাট, দোকানপাট পুড়ে ছাই। তখন তো আখ-চার এমনি হত। মেলা বরবাদ। দাঙ্গায় তবু ইতি পড়ে নি—কায়দায় পেলে কোন পক্ষ ছেড়ে কথা কইবে না।

এরা দুজন দলছাড়া হয়ে বিপক্ষের ঘেরের মধ্যে পড়ে গেছে। তীরবেগে ছুটে এসে ইস্কুলবাড়ি ঢুকে পড়ল—যে ঘরে প্রমথ বিশ্বাসের আস্তানা।

বুঝেছে প্রমথ। গর্জে উঠল: আমার খোপে মরতে এসেছ কেন, আর জায়গা পেলে না? এঘরে আরও তিনজন আছে—এসে পড়লে অন্য লোক লাগবে না, তারা খতম করবে। তোমরা যাবে, আমিও যাবো সেই সঙ্গে। মায়ের আমি একলা ছেলে—বেরিয়ে যাও, এক্ষুনি বেরোও বলছি।

ঘাড় ধাক্কা দিয়ে বের করল। ধাক্কা দিতে দিতে কালী-দালানের ভিতর। বিগ্রহের পিছনে বেদীর আড়ালে ঠেলে দিল। যারা তাড়া করেছে তারাও এসে পড়ল। ঘর পুড়েছে তাদের, খুন-জখম হয়েছে—আক্রোশে ফুঁসছে।

গেল কোথায়?

প্রমথ বিশ্বাস একেবারে ভিজে-বেড়ালটি: এদিকে আসে নি, ভুল দেখেছ তোমরা। আমি তো আছি সর্বক্ষণ। আসে নি।

তন্ন-তন্ন করে খুঁজল। বিশেষ করে

ইস্কুলবাড়িটা—এরই কোনখানে ঘাপটি মেরে আছে। কালী-দালানে ঢুকে যাবে, এতখানি সাহস ভাবতে পারা যায় না। তা-ও কি করত বলা যায় না। ইতিমধ্যে মন্দিরের নাটমন্ডপে প্রমথ বিশ্বাস গান জুড়ে দিয়েছে। নিমাই-সন্ন্যাস পালায় শচীমাতার গান। ছেলে নেই, মায়ের ব্যাকুল খোঁজাখুঁজি। খোঁজাখুঁজি মুলতুবি রেখে গানের টানে লোকগুলোও দাঁড়িয়ে পড়ল। খানিক পরে বসল এসে নাটমন্ডপের ভিতরে।

বড্ড জমেছিল সেদিন। গান গেয়ে প্রমথ বিস্তর আসর মাত করেছে, কিন্তু এদিনের বুঝি জুড়ি নেই। নিজেও মেতে গিয়েছে। একের পর এক গেয়ে যাচ্ছে বিস্তর ক্ষণ ধরে। চোখ বোজা—দু-চোখে শোকাশ্রুর ধারা। শ্রোতাদেরও চোখ ভিজে—গানের শেষে নিঃশব্দে তারা ঘরে চলল, প্রতিহিংসার কথা মনে নেই। আক্রোশ নিভে গেছে চোখের জলে। সামান্য কয়েক হাত দূরে মন্দিরগর্ভে ঐ দু'জন—প্রাণের আতঙ্ক ভুলে গিয়ে তারাও কি কেঁদেছিল সেদিন?

মাঝরাত্রে উঠে টিপিটিপি মন্দিরে ঢুকে সেই দু'জনকে প্রমথ সরিয়ে দিয়েছিল। বেহালাদার হীরু হালদার টের পেয়েছিল, চলনের ভঙ্গিমা দেখে প্রমথর পিছু নিয়েছিল সে। লোক দুটো অন্ধকারে তো ছুটে পালাল। হীরু খপ করে হাত এঁটে ধরে প্রমথর: কী সর্বনাশ করেছিস তুই।

থতমত খেয়ে প্রমথ বলেছিল, কেন?

মা-কালী উনি, কাঁচাখেগো দেবতা। মন্দিরে অজাত-কুজাত নিয়ে ঢোকালি—দেখিস কী হয়। মুখ দিয়ে গল-গল করে রক্ত বেরুবে, আসরে আসরে এমন আর গান গেয়ে বেড়াতে হবে না।

সেই রাতে ইস্কুলঘরে শুয়ে শুয়ে নানা ভয়ঙ্কর কাহিনী শোনাচ্ছে হীরালাল। খড়কেডাঙার কালীমায়ের জাগ্রত মহিমা। ভক্তজনের উপর অশেষ কৃপা, কিন্তু তিলেকের অনাচারে রক্ষে নেই। বলির পাঁঠা বেঁধে গিয়েছিল, একবার, রাতটুকুও রেহাই হল না—পাঁঠাকাটা কামারের শেষরাত্রে কলেরা।

শুনতে শুনতে প্রমথ হেন দুর্ষর্ষেরও গায়ে কাঁটা দিয়ে ওঠে। সকালে যাত্রাওয়ালারা চলে যাবে—প্রমথ রাতারাতি পুরুতের কাছে গিয়ে এক টাকা দক্ষিণা কবুল করল, মায়ের চরণে তার নামে রক্তজবা দিয়ে ক্রোধ শান্তি করতে হবে। ভয়ে ভয়ে পুরুতের সঙ্গে কালী-দালানে ঢুকল। রক্তজবা পড়ে নি এখনো, মা-জননী তবু ভারি যে প্রসন্ন! কাল দেখেছে, আবার এখন এই দেখছে। পাষাণ-বিগ্রহও বুঝি প্রমথর গানে বিভোর হয়েছিলেন, অনাচার ধরতে পারেন নি। গায়ককে পেয়ে হাসি দু-চোখ উছলে পড়ছে, ঐ দেখ।

দুই বিপক্ষের একটি নাকি এই ধনাই মিঞা। বিস্তর কাল হয়ে গেল, চেহারা বিলকুল বদলে গেছে—প্রমথ চিনতে পারল না। "প্রাণদাতাকে ধনাই চিনেছে—চিনতে পেরে গদ-গদ।

বাত ঝিমঝিম করছে। আকাশে ঘনঘটা, চাঁদের চিহ্নমাত্র নেই। নিঃশব্দ, গাছের পাতাটি অবধি নড়ে না।

বর্ডার-লাইন—বাংলার ঘাড়ে কোপ পড়ল এই লাইন ধরে। শহর কলকাতা থেকে কতই বা দূরে! আলো-ঝলমল প্রাসাদনগরী, যেখানে সুধীরা সব থাকেন—শিক্ষিত সংস্কৃতিবান ধনী মানী সেরা সেরা নাগরিক। জানি না, ক'জনে তাঁদের মধ্যে এই বিচিত্র ভূমির খোঁজখবর রাখেন। দেশভাই ভিটামাটি আত্মীয়-পড়শি থেকে বঞ্চিত হতে হয় নি—গরজটাই বা কি খোঁজাখুঁজির! ভূগোলে ডক্টরেট প্রাপ্ত দিক্‌পালেরাও জানেন না, ষাট-সত্তর কি একশ' মাইলের ভিতর—অর্থাৎ নাকের ডগার উপরেই সুদীর্ঘ এক রহস্য-এলাকা। মানুষজন সেখানে হিন্দুস্থান ও পাকিস্তানের কড়া কড়া আইনকে অবাধে কলা দেখিয়ে বেড়ায়। শিশু জ্ঞান হওয়া ইস্তক শিক্ষা পাচ্ছে: মিথ্যা বই সত্যকথা বলিবে না, অ-সরল পথে অন্ধকারে কেন্নো-কেঁচোর মত চলিবে। নতুন নীতিপাঠ—বহুদর্শীদের হাতে-কলমের অভিজ্ঞতা। মানুষ ও মাল পাচারের হরেক তন্ত্র-মন্ত্র কায়দা-কানুন। দুই পারের দুই সরকারের সতর্ক চোখ মন্ত্রের গুণে ঠিক সময়টিতে ঘুমিয়ে যায়। ভয় কে? কোথায় থাকেন ভয় নামক সেই ভদ্রলোকটি?—নেলসন শৈশবে নাকি দিদিমাকে শুধিয়েছিলেন। উপাখ্যানটা শিশু-পাঠ্য বইয়ে আছে। তেমনি অগুন্তি নেলসন দুই বাংলার বর্ডার জুড়ে। ভয় কাকে বলে, শেখার ফুরসত পায় নি। প্রাণ বুকের নিচে নয়, হাতের মুঠোর মধ্যে—যখন খুশি ছুঁড়ে দিতে পারে। দুরন্ত গতির ধাবমান ট্রেন—কামরার তলায় চাকার মধ্যে উঁকি দিয়ে দেখুন, নেংটি-ইঁদুরের মতন বাচ্চারা দু-হাতে রড আঁকড়ে আরামে ঝুলতে ঝুলতে যাচ্ছে। এক-আধটা নয়, শয়ে শয়ে—এই পথেই রুজি-রোজগার, এই পথেই পেটের ভাত। বাপ-দাদারা ধর্মভীরু সৎগৃহস্থ ছিল—পুরানো কালের ছেঁদো কথা কী হবে আর ভেবে?

আজকেও বর্ডারের জোর কপাল। চাঁদ ডুববার আগে দুর্যোগ এসে পড়বে। আকাশের দুর্যোগ মানে মাহেন্দ্রযোগ বর্ডার-মুলুকে। ফৌজের দল কম্বলের নিচে হাত-পা ঢুকিয়েছে। স্ফূর্তি লাগাও—খাড়া হয়ে বুক ফুলিয়ে স্ফূর্তি ভরে আজকের পারাপার। যেন এপাড়া থেকে ওপাড়ায় যাচ্ছি—সেকালে যেমন চলে যেতাম। সিগন্যালের অপেক্ষা এখন শুধু। চারিদিকের খবরাখবর নিয়ে অগ্রপশ্চাৎ ভাবনাচিন্তা করে মল্লিকমশায় সিগন্যাল দেবেন, নিশ্চিন্তে নেমে পড়া তখন মাঠে। ওপার থেকেও নামবে। ঘনান্ধকারে আবছা দেখবেন, বিশাল মাঠ জুড়ে ছায়ামূর্তিরা কিলবিল করছে। নিশ্চুতি ধরিত্রী সুখের ঘুম ঘুমাচ্ছে, ভূত-প্রেতের দল সেই ফাঁকে গোপন ডেরা থেকে চুপিসারে বেরিয়ে পড়েছে।

আগে-ভাগে যাত্রা, পঞ্জিকার হিসাবের আগেই। হরবখত যাদের চলাচল, তারা সব জানে বোঝে। এই এতক্ষণ গোণাগণতি এরা কয়েকটি ছিল, কোথা থেকে কারা সব এসে উঠান ভরে ফেলল! পারে যাবার মানুষই নয়, ভিন্ন কাজের মানুষ এক দঙ্গল। পার হবে না এরা, কিঞ্চিৎ ব্যাপার-বাণিজ্য করবে। রাজ্যময় মাথা খুঁড়ে যে জিনিষ পেলেন না, খোঁজ করে দেখুন দিকি, সে জিনিষ এখানেই পেয়ে যেতে পারেন। বাংলাদেশ বলে নয়, ভারত নয়, দুনিয়ার মধ্যে যত দেশ আছে সর্বত্র এই ব্যাপার। দেশের চৌহদ্দির মধ্যে না পেলে বর্ডারে গিয়ে খোঁজে। কী চাই বলুন না। তারাফুলি ফুল্লরাকে যেমন হাতঘড়ির কথা বলছিল—লেডিজ জেন্টস যে প্যাটার্নের যেমন মূল্যের অভিরুচি। অথবা জার্মানির ক্যামেরা, জাপানের ট্রানজিস্টার, ফ্রান্সের সেন্ট, চীনের ফাউন্টেনপেন। ভাগ্যবান-ভাগ্যবতীদের শখ মেটানোর জিনিষই শুধু নয়, ঘরব্যাভারি নিত্যদিনের যতেক জিনিষপত্র। যথা: সুপারি পাট হলুদ লবঙ্গ বিড়িপাতা ধান-চাল—মণ ও কুইন্টাল হিসাবে—গাড়ি ভর্তি যার চলাচল। সেজন্য অবশ্য মল্লিকঘাট নয়—ভিন্ন স্থান, আলাদা মানুষ, পৃথক ধরনের বন্দোবস্ত।

কী পেতে চান, বলেই দেখুন না। আকাশের চাঁদ, কোহিনূর মণি, বাঘের দুধ এমনি গণ্ডা তিন-চার জিনিষ বাদ দিয়ে বলবেন। আবছা আঁধারে ব্যাপারীরা দেখুন খদ্দের শুঁকে শুঁকে বেড়াচ্ছে। হাত

বিনামূল্যে টেরিন প্যান্ট পীস

মাসিক ১০৲ কিস্তিতে অল ওয়ার্ল্ড ন্যাশন্যাল প্যানাসোনিক জাপান মডেল পোর্টেবল ট্রানজিস্টারের সহিত পাইবেন। ডাকযোগে যেখানে খুশি পাবেন।

Coopex India (B.W.C.—32)
P. Box 1616, Delhi

তুলুন, তা-ই বা কেন—চোখই টিপে দিন একটার দিকে। আপনি আমি অন্ধকারে টর্চ পেলাম না—ওরা কিন্তু ঠিক বুঝে নিয়েছে। যেন মাটিতে হেঁটে নয়, বাতাসের উপর ভেসে নিঃসাড়ে কাছে এসে দাঁড়াল। জিনিষ বলে দিন ফিস-ফিসিয়ে—জোব্বার কোন-একটি ছিদ্রে হাত ঢুকিয়ে ম্যাজিকের মতন বের করে দেবে। নিতান্ত হাতে-হাতে না পারলে দশ-বিশ মিনিটের সময় চেয়ে নিয়ে খন্তা হাতে খনি খুঁড়তে ছুটল। মাটির নিচে এখানে-ওখানে খনি—দুর্লভ জিনিষপত্র মাটির নিচে গোপন রেখেছে।

কাণ্ডবাণ্ড দেখে এক মজার ভাবনা মনে আসে। ধরুন, বোমা-টোমা পড়ে আমরা সব খতম হয়ে গেছি। এক-শ দু-শ বছর কেটে গেছে। দেশের মাটির উপর দিয়ে একদা বাঁটোয়ারার লাইন টেনেছিলাম, ইতিহাসের পাতা ছাড়া কোথাও তার চিহ্নমাত্র নেই। চাষার লাঙলের ফলায় অথবা ঘরবাড়ি বানানোর ভিত খুঁড়তে গিয়ে দামি দামি মাল উঠে পড়ছে। এক গাঁটরি সিল্ক, পাঁচ গ্রোস হাতঘড়ি, সাত বাক্স ফাউন্টেনপেন—যত বেরুচ্ছে অবাক হয়ে যাচ্ছে মানুষ, চারি-দিক খুঁড়ে খুঁড়ে আর রাখল না—

ঘমঘমে ভাব চারিদিকে, মেঘ চিরে হঠাৎ একবার বিদ্যুতের ঝিলিক। দিবি ছোটখাট এক জনতা—মানুষগুলোর মুখ দেখা গেল এতক্ষণে। কড়-কড় কড়াৎ দেয়া ডাকল। বাতাস উঠেছে, তালপালার মধ্যে বাতাসের দাপাদাপি। নিঃশব্দতা চুরমার হয়ে গেল। বৃষ্টিও হচ্ছে কোনদিকে, জোলো-হাওয়া দিয়েছে। আর কি, তৈরি হও পারে-যাবার মানুষ, বেরিয়ে এসো। সঙ্কেত এসে গেল, সকল দিকে শুভ।

আবুল হাসিম এ-হাতে গুড়ের ভাঁড় ও-হাতে পোঁটলা ঝুলিয়ে উঠানে নেমে পড়লেন। নেবার জন্য হচ্ছে না তো পোঁটলা কাঁধে তুললেন।

ফুলি বলে, ঘাড়ে নিয়ে কতক্ষণ থাকবে মামা? হুকুম না পেঁছিলে তো রওনা হতে পারছি নে। ছুঁয়ে নামিয়ে রাখো ওসব।

আবুল হাসিম এ লাইনে আনকোরা নতুন। প্রশ্ন করেন : হুকুম কোত্থেকে আসবে?

ওপাড়ের হেড-অফিস থেকে। আলোর সিগন্যাল আসবে। মাল্লিকমশায় নিজ হাতে পাঠাবেন। পা বাড়ানোর উপায় নেই ততক্ষণ।

হেসে আবার বলে, মিলিটারি চলা-চল্লা থেকে সিগন্যালিং জিনিষটা রপ্ত হয়েছে খুব। ভাল হয়েছে। কোন একটা অঘটন ঘটলে দায়টা শেষ অবধি মাল্লিক-মশায়ের উপর তো অর্শাবে। চরেরা ঘুরছে—তাদের কাছে পাকা-খবর নিয়ে আঁটঘাঁট বেঁধে মানুষজন তবেই তিনি পথে ছাড়বেন।

গুড় ও পোঁটলা আবুল হাসিম নামিয়ে রেখেছেন। নেড়েচেড়ে দেখে ফুলি বলে, ও মামা, কত পথ হাঁটতে হবে হিসেব আছে? পার হয়ে গিয়ে বাস-রিক্সার জায়গায় পৌঁছতে আরও মাইলখানেক। একলা দুটো মাল বয়ে পারবে কেন?

তাচ্ছিল্যভরে আবুল হাসিম বলেন, পারব রে পারব। খেটে খাই আমরা, গদিতে শুয়ে-বসে থাকার মানুষ নই।

পারলেও তুমি একলা বোঝা বইবে, ঘুমসি ভাগনিটা খালি হাতে যাবে, সেই বা কেমন? আলের পথে হোঁচট খেলে কি পা পিছলে পড়লে তো চিত্তির, তোমার গুড়ের ভাঁড় ভেঙে চুরমার হবে। কাজ কি মামা, আমি পুঁটলিটা নিয়ে নিলাম।

বলে দখল হিসাবে চালের পুঁটলি তারাফুলি সামনে সরিয়ে আনল।

পাশ থেকে বীরেশ্বর প্রশ্ন করেন : তোমরা যাবে কোথায় নতুন-দিদি?

ফুল্লরাকে দিদি বলেন, তারাফুলি এই একটু আগে নতুন-দিদি হয়েছে। মায়া-বিনী মেয়েটা—এরই মধ্যে সে যেন চির-কালের আপন।

যাবে কতদূরে তোমরা?

জগন্নাথপুর।

চমক খেলেন বীরেশ্বর ফুল্লরা দুজনেই।

আমরাও যাচ্ছি সেই গাঁয়ে। জগন্নাথপুর হেমকান্ত ঘোষের বাড়ি।

আমরাও তো সেই বাড়ি।

ফুল্লরা তারাফুলিকে জিজ্ঞাসা করে : কেন, সেখানে কি তোমাদের?

তারাফুলি দেমাক দেখিয়ে বলে, আমার মামার-বাড়ি।

মামার-বাড়ি আমারই তো।

অবাক হয়ে গেছে ফুল্লরা। বলে, হেমকান্ত ঘোষ আমার ছোটমামা।

আবুল হাসিমের গায়ে হাত দিয়ে তারাফুলি বলে, আমার মামা এই যে ইনি। বাড়ি এঁদেরই।

আবুল হাসিম ফোঁস করে দীর্ঘশ্বাস ফেললেন। ভিজে গলায় বলেন, ছিল বটে, এখন আর নেই। সম্বন্ধ চুকিয়ে-বুকিয়ে দিয়ে বিনিময় করে পাকিস্তানে চলে আসতে হল।

এ কণ্ঠ বীরেশ্বরের বড় চেনা। ডাক্তার খলিলুর রহমানের কণ্ঠে অনেক-দিন শুনেছেন। আমৃত্যু নিশ্বাস ফেলে গেছেন তিনি। শান্ত প্রত্যয়-ভরা বীরে-শ্বর আশ্বাস দিচ্ছেন : কলমের দুটো আঁচড় দিলেই কি চিরকালের সম্বন্ধ চুকে-বুকে যায় বাবা। বিনিময় না বলে গচ্ছিত বলবেন,—আশা আঁকড়ে ধরে থাকবেন। দুঃসময়ে টিকে থাকতে পারেন নি, সাহসে কুলিয়ে ওঠে নি—আপনজনের কাছে তাই গচ্ছিত রেখে এসেছেন। সুদিনে যে-যার কোটে আবার সবাই ফিরবে।

ফুল্লরা গাঢ়স্বরে বলল, আপনজন না-ই যদি ভাববেন, এত কষ্ট করে পিঠের চাল-গুড় বয়ে নিয়ে যাওয়ার দায়টা কি ছিল শুনি?

[ক্রমশঃ]

কর্মখালি

মাসিক ৬৫০, বেতনে বা উচ্চ কমিশনে জাপান আর্ট শাড়ী, টেরিলীন স্যুটিং, তৈরী পোষাক, শাল, নাইলনের মোজার অর্ডার সংগ্রহের জন্য সেলসম্যানের পদ। নমুনার জন্য আবেদন করুন।

Foreign Agencies (66)
Box 1456, Delhi—6.

লোকসঙ্গীতের একাল না আকাল?

মুরশিদ

আকাশবাণীর বেহালার পাচন

এক গ্রাম্য কবিরাজ নাকি খবরের কাগজে 'বেহালার পাচনে'র বিজ্ঞাপন দেখে বিস্ময়ে মন্তব্য করেছিলেন "আয়ুর্বেদ শাস্ত্রে অনেক পাচনেরই নাম আছে কিন্তু বেহালার পাচনের কোনো উল্লেখ তো পাই নি। চরক, সুশ্রুতের আমলে বেহালা ছিল কি না জানি না, অন্তত সংগীতশাস্ত্রে তার কোনো উল্লেখ নেই। কিন্তু এ যুগে আকাশবাণীর রসের ভিয়ানে যে বেহালার পাচন তৈরি হচ্ছে—তার আস্বাদ সংগীতাক্রান্তরা প্রায়ই পেয়ে থাকেন।

একজন নতুন লোকসঙ্গীতশিল্পী একদিন আমাকে বলছিলেন, আকাশবাণীর বাদ্যযন্ত্রীদের খেয়ালের কথা। তিনি চাইছিলেন 'খমক'। খমক বাজিয়ে সেদিন নাকি অনুপস্থিতি কিন্তু আকাশবাণীর একজন যাদুকর-যন্ত্রী নাকি বলে উঠলেন "তাতে কি যায় আসে, বেহালা দিয়েই আমি খমকের 'এফেক্ট' দিতে পারি। বিশ্বাস করুন আর না করুন বেচারা নতুন শিল্পীটি সেদিন বেহালার খমকেই বাউল গাইলেন। এরই নাম 'বেহালার পাচন'। বিশেষ করে নিরীহ নতুন শিল্পীদের জন্য এই পাচনের ব্যবস্থা। শুধু বেহালা নয়, কান খাড়া করে শুনবেন, হামেশা দোতারার প্রক্সি দিচ্ছে মেন্ডোলিন কিংবা স্বরোদ, বাঁশের বাঁশীর প্রক্সি দিচ্ছে—সানাই, আর ঢোলের কাজ করছে ডগী-তবলায়। এই প্রক্রিয়ায় যে সুর-সালসা তৈরি হচ্ছে আধুনিক ভাষায় একে বলে 'প্যাশিং'। সংবাদজগতে নাকি প্যাশিংটা একটা মস্ত বড় আর্ট। সুরজগতেও তাই। আকাশবাণীর কর্তৃপক্ষের মধ্যে শ্রীসুধীর সরকার মহাশয় হয়ত অতশত বোঝেন না কিন্তু যশস্বী সঙ্গীতবিদ শ্রীজ্ঞানপ্রকাশ ঘোষ মশাইকে বললে তিনি হয়ত বলবেন—বেহালা, সানাই, স্বরোদ এরা তো উচ্চবর্ণের যন্ত্র, অন্ত্যজ লোকসঙ্গীতের সাথে যদি ওদের পরিণয় ঘটানো যায়, তাতে ওরাই তো জাতে উঠলো। সুর-শঙ্কর সৃষ্টি হলেও এতে ওদের আপত্তির কি আছে?

মুরশিদের শাস্ত্রজ্ঞান বিশেষ নেই, কিন্তু ভারতের বিভিন্ন রাজ্যের লোকগীতির সঙ্গে বিশেষ ধরণের লৌকিক বাদ্যযন্ত্রের প্রয়োগের পিছনে যে লোকজীবনের বিবর্তনের প্রকৃতি, ইতিহাস এবং ভাবানুষঙ্গ জড়িত তা উপলব্ধি করার মত কান, মন ও চোখ তার আছে।

আমাদের প্রাচীন সঙ্গীতশাস্ত্রকাররা বাদ্যযন্ত্রগুলিকে চার ভাগে ভাগ করেছেন যথা তত, বিতত, ঘন, সুষির। তত অর্থাৎ তারের যন্ত্র যথা বীণা, তম্বুরা ইত্যাদি। বিতত—চামড়ার ছাওয়া তাল-যন্ত্র যথা ঢাক, ঢোল, মৃদঙ্গ, তবলা ইত্যাদি। ঘন—ধাতুনির্মিত তাল রাখার যন্ত্রাদি—যথা কাঁসর, করতাল মন্দিরা ইত্যাদি। সুষির—মানুষের মুখের ফুৎকারে যে যন্ত্রগুলি বাজানো হয় যথা শিঙা, মুরলী, সানাই ইত্যাদি। আমাদের শাস্ত্রকাররা এইগুলি নিয়ে বিশদ আলোচনা করে গেছেন। ইদানীং কলকাতার যাদুঘরে বাদ্যযন্ত্র সংগ্রহশালার বিভাগ খোলা হয়েছে। কিন্তু লৌকিক বাদ্যযন্ত্রগুলি নিয়ে কোনো বৈজ্ঞানিক আলোচনা কেউ করেন নি। লোকসঙ্গীত যদি উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের আদিমাতা হয়ে থাকে, তবে লৌকিক বাদ্যের বিশ্লেষণে আমরা বর্তমান বহু উচ্চাঙ্গ বাদ্যযন্ত্রের জন্মকাহিনীও পাব। সে যা হোক, লোকসঙ্গীতে লৌকিক বাদ্যের ভূমিকা নিয়েই আমি কিছু আলোচনা করতে চাই।

কিছুদিন আগে দিল্লীতে ভারতবর্ষের ৫০০টি লৌকিক বাদ্যযন্ত্রের এক প্রদর্শনীর আয়োজন করা হয়। সঙ্গীত নাটক একাডেমী এই প্রদর্শনী সংগঠিত করেন। (সঙ্গীত নাটক একাডেমী মাঝে মাঝে হঠাৎ কিছু ভাল কাজ করে বসেন)। সেইখানে "সেমিনারে" যেসব "পেপার" পড়া হয়েছিল—মুরশিদের তা হস্তগত হয়েছে। কিন্তু দুঃখের বিষয়—সেখানে বিশেষজ্ঞরা আজকের সমস্যার দৃষ্টিতে লোকসঙ্গীতে সেই বাদ্যযন্ত্রগুলির ব্যবহারের তাৎপর্য নিয়ে কোনো আলোচনা করেন নি। তা করলে আকাশবাণীর খামখেয়ালীর কথাও উঠতো এবং আকাশবাণীতে সেই সব বাদ্য যন্ত্র কিভাবে কতটা ব্যবহার করা যায় তারও উপায় বাৎলাবার চেষ্টা হতো।

বিশেষ বাদ্যযন্ত্র বিশেষ কোনো লোকসঙ্গীতে—জাতি বা উপজাতির গীতে যে বিশেষ পরিবেশ বা মুড্ সৃষ্টি করে—বা সেই গানের ছন্দ ও চলনে সাহায্য করে, তা আমাদের উপলব্ধি করতে হবে। লৌকিক যন্ত্রকে কেবল সুরের 'একস্পেনিমেণ্ট' ভাবলে ভুল হবে। সুরের প্রাণভোমরার প্রথম পক্ষসঞ্চালন হয় তারের যন্ত্রে কিংবা বাঁশী ইত্যাদি যন্ত্রে। ধরুন একতারের যন্ত্র, পূর্ববঙ্গের 'লাউয়া' পূর্ববঙ্গের বৈরাগী বা বাউল জাতীয় গানের সঙ্গে এর যে একেবারে হরিহরাত্মা ভাবটি তাতে পশ্চিমবঙ্গের বাউলের একতারা দিলে সেই ভাবের বিচ্ছেদ ঘটে যাবে। অন্তত মনের অমিল ঘটবে। পূর্ববঙ্গের লাউয়াটিতে দুপাশের দুটি বাঁশে অঙ্গুলির চাপে যে গমক ও ছন্দ তোলা যায় পশ্চিমবঙ্গের একতারায় তা সম্ভব নয়। একটি দণ্ডে বাঁধা শুধু একটি স্বরের গুঞ্জন পশ্চিমবঙ্গের একতারায়। তার মেজাজের প্রকৃতি আলাদা। সেই একতারা বা তুনতুনিতে যখন শুনি মাদ্রাজের "হরিকথা" বা মহারাষ্ট্রের "গাউনি" তখন তারা আরেক কথা বলে। কিংবা ধরুন চামড়ার ছাওয়া যন্ত্র। পূর্ববঙ্গের ঢোলক এবং ঢোল, বিহারের ঢোলক, আসামের বিহুর ঢোল কিংবা আদিবাসীর মাদল, নেপালীদের ছোট্ট মাদল, সবকিছুরই মেজাজ সেই বিশেষ বিশেষ জাতির গীতের প্রকৃতির সঙ্গে যেন ওতপ্রোতভাবে মিশে আছে। এদের মধ্যে আবার কোনো অঞ্চলে তার কলাকৌশল এতো উচ্চপর্যায়ের যে কোনো শহুরে বড় তবলচীকে তাক লাগিয়ে দেয়। জ্ঞানপ্রকাশবাবু তো বাংলার ক্ষীরোদ নট এবং আসামের মঘাইওজার ঢোল শুনেছেন, তিনি কি পারবেন তাঁর তবলায় সেই জনসাধারণের শিল্পীর জটিল বোলকানী তুলতে? ঐসব শিল্পীর ঘরানা স্বতন্ত্র। ওরা কোনো শাস্ত্রীয় পদ্ধতিতে এই দক্ষতা

অর্জন করে নি। ওদের পদ্ধতি স্বতন্ত্র। যা হোক আমার বক্তব্য হলো আকাশবাণীতে তবলা দিয়ে লৌকিক ঢোলকের 'এফেক্ট' সম্ভব নয়। শুধু তাই নয়। লোকসঙ্গীতের ছন্দ ও চলন স্বতন্ত্র। দোতারা আর স্বরোদে পার্থক্য বিশেষ নেই। তা বলে আকাশবাণীর কোনো ওস্তাদ যাঁর লোকসঙ্গীত সম্বন্ধে কোনো জ্ঞান নেই, যদি তিনি দোতারার কাজ স্বরোদে করতে যান তবে শিল্পীর গলাতে প্রতি মুহূর্তে ফাঁস লাগাবেন তিনি। কারণ দোতারার "ভ্যাম্প" হলো আমাদের লোকগীতের ছন্দ ও লয়ের প্রথম পথপ্রদর্শক। লৌকিক আড়াচলনটি স্বরোদীর 'ভ্যাম্পে' পাওয়া যাবে না—যদি না সেই স্বরোদী লোকসঙ্গীতকে পুরোদস্তুর রপ্ত করে থাকেন। আবার আকাশবাণীর কর্তা ও ওস্তাদজীরা কি জানেন পূর্ববঙ্গের ইস্পাতের তারের দোতারা এবং উত্তরবঙ্গের মুগার সুতোর দোতারার পার্থক্যটা কি? ভাওয়াইয়ার সঙ্গে ঐ মুগার সুতোল দোতারা না দিলে আকাশবাণীর মহাভারত হয়ত অশুদ্ধ হয় না, কিন্তু ভাওয়াইয়া সত্যি অশুদ্ধ হয়। এবং বাজানোর ধরনও ইস্পাতের দোতারার থেকে আলাদা। আকাশবাণীর স্টাফে লৌকিক যন্ত্রশিল্পী আরো কিছু নিযুক্ত করা আজ অবশ্য প্রয়োজনীয় হয়ে পড়েছে।

প্রগ্রাম পর্যালোচনা

এবার গত দু' মাসের বেতারী লোকসঙ্গীতের জগতে পরিভ্রমণ করে আসা যাক। প্রথমেই বলে রাখি সকলের গান, সকল সময়ে শোনা সম্ভব নয়। এই ফাঁকে হয়ত অনেক ভাল প্রগ্রামও শুনতে পাই নি। এতে মূল্যায়নও হয়ত সম্পূর্ণ হয় নি। প্রচলিত ধারণায় সকাল ৮টায় এবং রাত ১০টার পর যাঁরা প্রগ্রাম পান তাঁরা "সিনিয়র গায়ক"। কিন্তু অনেক সময় দেখা গেছে দুপুর ২টায় বা ৬টায় যে সব নতুন শিল্পীদের ঠেলে দেওয়া হয় তাদের গলা ও গায়কী আকাশবাণীর প্রসাদধন্য কোন কোন সিনিয়র গায়কদের চেয়ে অনেক ভাল।

প্রথমেই ক্যালকাটা ইউথ কোয়ার সম্বন্ধে দু-একটি কথা বলব। গত ২৬শে জানুয়ারী সকালে ওঁদের প্রগ্রাম বেশ ভাল লাগলো। যিনি বিখ্যাত সনাতন বাউলের গানটি গেয়েছেন তাঁর পরিবেশনা অনবদ্য। দ্বিতীয় গানটি, গৌরীপুরের মাহুতের গানটিও ভালো হয়েছে। গৌরীপুরের গানের শ্রেষ্ঠ আধবক্তা হলেন প্রতিমা বড়ুয়া। তাঁর কণ্ঠে যাঁরা মাহুতের গান শুনেছেন তাঁরা হয়ত খুশি হবেন না। কিন্তু শহরের গায়িকার কণ্ঠে সেই গানের কোনো বিকৃতি ঘটে নি এবং আবেদন অক্ষুণ্ণ রয়েছে—এটা বড় কথা। মনে হয় ক্যালকাটা ইউথ কোয়ার নতুন গান সংগ্রহে মন দিয়েছেন। আমার অনুরোধ তাঁরা যেন কিছু খাঁটি গ্রাম্যশিল্পী সংগ্রহেও মন দেন। কারণ ইতিপূর্বে তাঁদের প্রগ্রামগুলিতে ঐকান্তিকতার অভাব দেখেছি। গত ২৪শে ডিসেম্বরে ওঁদের প্রগ্রামে বাংলার লোকসঙ্গীতের একটি চিরউজ্জ্বল মণি "ফান্দে পড়িয়া বগাই কান্দেরে" এমন একজনকে দিয়ে গাওয়ানো হয়েছে যার গলায় ভাওয়াইয়ার 'ভ'ও খুঁজে পাওয়া গেল না। ভাওয়াইয়ার স্বতঃস্ফূর্ত গলাভাঙার নকল করতে গিয়ে তার ক্যারিকেচার করা হয়েছে। দ্বিতীয় গানটি ছিল ধামাইল নৃত্যের "আমি কি হেরিলাম জলের ঘাটে গিয়া"। কিন্তু বহুকণ্ঠের হুলুস্থুলে এবং যাঁদ্যযন্ত্রের হুল্লোড়ে তার স্বাভাবিক ছন্দ ও স্বরের আবেগ শ্বাসরুদ্ধ হয়ে যায়। এরও আগে এক প্রগ্রামে এঁরা সলিল চৌধুরীর "কিছু মনের আশা, কিছু ভালবাসা..." এই গানটিকে লোকসঙ্গীত বলে চালিয়েছিলেন। যা হোক এবারকার প্রগ্রামে যে আন্তরিকতা পেলাম—আশা করি তাঁরা তা বজায় রাখবেন।

আরেকটি বড় দল হলো ন্যাশনাল ইউথ কোয়ার। এঁদের প্রগ্রাম কোনো সময় ভাল কোন সময় আবার একেবারে খারাপ। তার মানে এঁদের পরিচালকের লোকসঙ্গীত সম্বন্ধে কোনো স্পষ্ট ধারণা নেই। আমাদের লোকসঙ্গীত কোয়ার পদ্ধতিতে গাইবার কোন স্থান নেই। আমাদের যে সব 'কমিউনিটি' গান সকলে গায় কিংবা ধুয়া ধরে—সেগুলিকে কোয়ার বলে না। তাছাড়া আমাদের অধিকাংশ গীত একক কণ্ঠের। তাকে সমবেত কণ্ঠে ফেললে হবে অপমৃত্যু। সেদিন তাঁরা উত্তরবঙ্গের একটি অতি বিখ্যাত গানকে সমবেতভাবে গলা টিপে মেরেছেন। সেই বেদনার্ত করুণ গানটি হলো "একবার আসিয়া সোনার চান্দ মোর যাও দেখিয়ারে", পরিচালক মনে হয় গানের অর্থই বুঝতে পারেন নি। "বাপোমায়ে বেচেয়া খাইছে, সোয়ামী পাগেলারে"; বর্ণাশ্রমী সমাজে পল্লীমেয়ের পাগলা স্বামীর সঙ্গে বিয়ে হওয়ার বেদনা অনুভব করতে পারলে—'ভয়েস-ডিভিসনের' কায়দা করে এবং মাঝে মাঝে হৈ-হৈ করে (হৈ হৈ না করলে আজকাল লোকগীত হয় না) পরিচালক এই গানটির ওপর দিয়ে এভাবে নির্মম স্টীমরোলার চালাতেন না। পরিচালক হয়ত বলবেন—সকলের গলা না রাখলে দল রাখব কি করে? তার উত্তর মুরশিদের জানা নেই।

আরেকটি গোষ্ঠী হলেন, বুদ্ধদেব রায় ও সহশিল্পিবৃন্দ। এঁরা উপরের দুটি গোষ্ঠীর মত "বিদগ্ধ" নন। তাছাড়া বুদ্ধদেববাবু নিজে লোকসঙ্গীতের বিষয়ে মাঝে মাঝে কাগজেপত্রে প্রবন্ধ লিখে থাকেন। কিন্তু তাঁর প্রগ্রামে (৯ই ডিসেম্বর, সকাল) মোটেই খুশি হতে পারলাম না। মনে হয় তিনি নিজেই অধিকাংশ গান রচনা করেন। একটা 'থিমে' সেই গানগুলি গাইতে চান। যেমন "নবান্ন"। তাতে আপত্তি ছিল না যদি রচনা সার্থক হত। কিন্তু "স্যাকরা বুঝি বসে আছে পাকা ধানের ক্ষেতে" কিংবা হেই ধান কাটি কাটি ধান, প্রভৃতি গানের রচনা সুর ও পরিবেশনা একেবারে শহুরে। বিশেষ করে ধান কাটি কাটি ধান—গণনাট্যের মরশুমে এই ধরণের বহু গানের জন্ম হয়েছিল। তার চেয়ে রবীন্দ্রনাথের "পৌষ তোদের ডাক দিয়েছে" কিংবা "আয় রে মোরা ফসল কাটি" প্রভৃতি গান তো অনেক সার্থক লোকসঙ্গীত হিসাবে চলতে পারে।

অবশ্য 'যুগান্তরে' এক প্রবন্ধে বুদ্ধদেববাবু যা বলতে চেয়েছিলেন তার ভাবার্থ হল আজকাল শিল্পায়নের জন্য, গ্রামে দ্রুত যানবাহনের, সিনেমা ইত্যাদির প্রবেশের জন্য লোকসঙ্গীতেও পরিবর্তন আসবে এবং আনতে হবে। আসলে এ হলো বিকৃতির ওকালতি। এই উদ্ভট থিওরিকে উদ্ঘাটিত করে ভবিষ্যতে লেখবার ইচ্ছা রইলো।

গুঞ্জন গোষ্ঠী কারা জানি না। তবে তাঁদের অনুষ্ঠানে (১০ই জানুয়ারী, সকাল) গুঞ্জনে মহানগরের মোটরের হর্ন এতো শুনতে পেলাম যে, লোকসঙ্গীত শুনছি বলে মনে হয় নি।

শ্রীসুরেন চক্রবর্তী ও সহশিল্পিবৃন্দ আকাশবাণীর প্রাচীনতম শিল্পীগোষ্ঠীর অন্যতম। সুরেনবাবু এ যুগে কলকাতায় লোকসঙ্গীত পরিবেশনের একজন পুরোধা। তাঁর অনুষ্ঠানে (৭ই ডিসেম্বর, সকাল) তিনি তাঁর ঐতিহ্য বজায় রেখেছেন। গুণীলোক বলেই পরিমিতিজ্ঞান আছে—যদিও তাঁর নিজের কণ্ঠ দুর্বল হয়ে এসেছে। অযথা প্যাঁচ কষার প্রলোভন তাঁর নেই। পূর্ববঙ্গের লোক হয়ে সেই অঞ্চলের বৈশিষ্ট্যকেই তিনি তুলে ধরতে চান। অন্যান্য অঞ্চলে বেশি ঘোরফেরা করতে চান না।

এবার কিছু ব্যক্তিশিল্পীর কথা

কর্মখালি

আমাদের বিশ্ববিখ্যাত জাপান মডেল পকেট ট্রানজিস্টারের অর্ডার সংগ্রহ করিবার জন্য পুরা বা আংশিক সময়ে মাসিক ৪৫০৲ টাকা অথবা শতকরা ৩৫৲ কমিশনে সারা ভারতে স্ত্রী বা পুরুষ প্রার্থী আবশ্যক। স্যাম্পেল সেটের জন্য নিম্নঠিকানায় আবেদন করুন।

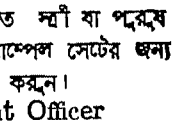

Employment Officer
(B.W.C.—88) Box 1564 Delhi-6

বলবো। পূর্ণদাস বাউলকে দিয়েই শুরু করা যাক। বীরভূমের ভৈরবীঘেঁষা বাউলই তিনি গেয়ে থাকেন। মধ্যবঙ্গের লালন-শাহী বাউল তাঁর আসে না। তাতে আপত্তি নেই। কিন্তু তিনি তাঁর গানে (৪ঠা ডিসেম্বর) ভৈরবীতে এমন ধরণের তান ও বিস্তার করেন যে, গুরুগুরীর আওয়াজ সঙ্গে না থাকলে মনে হতো রাগপ্রধান গান শুনছি। আবার এই গুরুগুরীটি—যা তাঁর পাবলিক অনুষ্ঠানে একটি হাতিয়ার —বেতারের প্রোগ্রামে এটি একটি উপদ্রব বিশেষ। সমস্ত গান ছাপিয়ে ওঠে একটি যন্ত্রের দাপট। আরেকটি কথা "ও মন ধোসনা—কৃষ্ণকথা কভু ভুলো না" এটি খাঁটি বাউল দর্শনের কথা নয়। বাউলের উপর পরবর্তী সময়ে বৈষ্ণবী ভক্তিগীতের প্রভাবে এই ধরণের অনেক বাউল গানের উৎপত্তি হয়েছে। কিন্তু খাঁটি বাউল রচনার কি তাঁর অভাব ঘটেছে?

আরেকজন বিখ্যাত গায়ক মণীন্দ্র দাস, যাঁর গানে আমরা একটা মৌলিকতা পেতাম —ইদানীং ভোল বদলিয়ে বীরভূমী বাউল সাজবার চেষ্টা করছেন। নিজের প্রতিষ্ঠিত অঞ্চল ছেড়ে যত্রতত্র ঘোরাফেরা শুরু করেছেন। তিনি নিজে ভাল দোতারা বাজাতে পারেন, কিন্তু তিনি এখন (৫ই ডিসেম্বর) দোতারা ছেড়ে গুরুগুরী ধরেছেন এবং পূর্ণদাস বাউলের অনুকরণের চেষ্টা করছেন। গুরুগুরী কি ব্যবসায়িক সাফল্যের ট্রেড মার্ক? ভাওয়াইয়া ও চটকা হলো তার প্রাণ, কিন্তু এখন পাঁচমিশেলীর পাল্লায় ও ধান্দায় তিনি ঘুরছেন। আরেক-জন বিশিষ্ট গায়ক শশাঙ্কমোহন সিংহের গলার সুরের দানাগুলি যেন সব শুকিয়ে আসছে। তিনি (১২ই ডিসেম্বর, সকাল) কংস নদীর পারে বগাবগীর কাহিনী শোনালেন, কিন্তু উচ্চারণ এমন অস্পষ্ট যে কিছুই বুঝতে পারলাম না।

যশস্বী পদাবলীকীর্তন গাইয়ে রাধা-রাণী, লোকসঙ্গীতও করে থাকেন (৩১শে জানুয়ারী) তাঁর সুকণ্ঠ শুনতে ভালই লাগে। কিন্তু কীর্তনের রেওয়াজী মার্জিত অলঙ্কার লোকসঙ্গীতের কোণা-গুলিকে মসৃণ করে দেয়—ঢঙটি ঠিক ওঠে না। ঠিক এই কথাটি কল্যাণী মজুমদার (৩রা জানুয়ারী) সম্বন্ধেও খাটে। তাঁর গলা আরো জোরালো এবং লোকসঙ্গীতের খুব উপযোগী, কিন্তু তিনিও পদাবলী গাইতে গাইতে তাঁর অজ্ঞাতেই লোক-সঙ্গীতের গায়কীতে বেশি মাত্রায় মসৃণতা এসে যায়। অবশ্য আমাদের লোকসঙ্গীতে কীর্তনের প্রভাব যথেষ্ট তবু গায়কীর পার্থক্য আছে।

এবার সন্তোষকুমার ঘোষ-এর (৩১শে ডিসেম্বর) গান খুব ভাল লাগলো। তাঁর কণ্ঠের সংযত মাধুর্যের আবেদন আছে। মনে হলো ভাওয়াইয়া ঢঙই তাঁর ভাল আসে। তিনি যদি উত্তরবঙ্গের লোক হয়ে থাকেন, তবে ভাওয়াইয়াতেই বিশেষজ্ঞতা অর্জন করার যেন চেষ্টা করেন এই অনু-রোধ। প্রাচীন শিল্পী সিন্ধুরাণী ধর (২০শে জানুয়ারী) এবার যেন কোনরকমে পালা রক্ষা করলেন। গলায় আবেগ অনুপস্থিত। সকালবেলার দ্বিতীয় গানটায় আধুনিকতার স্পর্শ সুস্পষ্ট। ভবিষ্যতে ভালো প্রগ্রাম আশা করি। মেয়েদের মধ্যে এবার খুব ভাল উৎরেছেন গীতা চৌধুরী (১৬ই জানুয়ারী)। তাঁর সকাল ও রাত্রের দুটো প্রগ্রামেই সুর-সংযম, লয় ও ভাবা-বেগ ভাল ছিল। যদিও ভাওয়াইয়া পুরো রপ্ত হয় নি, তবু এই শিল্পীর সম্ভাবনা আছে।

শ্রীপূরবী চট্টোপাধ্যায় (১৪ই জানু-য়ারী) যদি ভেবে থাকেন যে তিনি এক-সাথে আধুনিক, ভজন, রবীন্দ্রসঙ্গীত, লোকসঙ্গীত সবই গাইবেন তাহলে ভুল করেছেন। সে একদিন ছিল যখন ওস্তাদ গায়ক কিম্বা গায়িকা খেয়াল গাইতে বসে—ঠুংরী, গজল, ভজন, রবীন্দ্রসঙ্গীত গেয়ে তাঁর বহুমুখী প্রতিভার পরিচয় দিয়ে আসর থেকে সগর্বে নেমে আসতেন। আজ আর সেদিন নেই। এটা "স্পেশালাইজে-শনের" যুগ। শ্রীমতী চট্টোপাধ্যায় যতটা লোকসঙ্গীত জানেন সেটুকুও গলায় প্যাঁচ কষে তেতো করে ফেলেন।

দীনেন্দ্র চৌধুরী ও রাণা চৌধুরী (১লা জানুয়ারী) দুজনেরই সহজ দরদী-কণ্ঠ ভালো লাগলো। প্রাচীন গায়ক রাজেন্দ্রনারায়ণ বর্মণের (২২শে ডিসেম্বর) "পাইয়াছ দুনিয়ার মজা খোদাকে ভুলিয়া" চমৎকার গেয়েছেন। পূর্ববঙ্গের মুসল-মানী প্রভাবের এইসব গান কাউকে গাইতে বড় শোনা যায় না। সেদিক দিয়ে তিনি ধন্যবাদার্হ। কিন্তু তাঁর "খোদা খোদা আল্লা রাধা"-কে লোকসঙ্গীত বলা যায় না। গ্রামের লোকের রচনা মাত্রই লোক-সঙ্গীত নয়। পূর্ববঙ্গে মনোমোহন এবং দ্বিজদাসের গান খুব জনপ্রিয়, কিন্তু তাঁদের রচনাকে লোকসঙ্গীত বলা চলে না। মনোমোহন রচনা করতেন আর তাতে সুর সংযোজনা করতেন আলাউদ্দীন খাঁ-র ভ্রাতা আবতাউদ্দীন খাঁ। দুজনেই ছিলেন সাধক। বিদগ্ধ রচনা ও সুর সংযোজনার জন্য এগুলিকে লোকসঙ্গীত পর্যায়ে ফেলা যায় না।

মঞ্জু দাস (২৩শে জানুয়ারী সকাল) গৌরীপুর অঞ্চলের তিনখানা গান করেন। এই গানগুলি মুরশিদ গৌরীপুরের অতুলনীয় লোকশিল্পী প্রতিমা বড়ুয়ার কণ্ঠে অনেকবার শুনেছেন। মনে হয় মঞ্জু দাস তাড়াহুড়োয় এই গানগুলি শিখে বেতারে কিস্তিমাৎ করতে চেয়েছিলেন, ফল হয়েছে উল্টো। না হয়েছে ঢঙ, না হয়েছে উচ্চারণ। 'অবলার ভৈরবচান্দ নয় 'অভলা'র ভৈরবচান্দ। অভলা-র স্থানীয় অর্থটি 'নির্বোহ-বোকা'। ধগুলী নয়—ধওলী মোরে মাই 'ইত্যাদি। শ্রীমঞ্জু দাসকে অনুরোধ, আত্মসাৎ না করে আত্মস্থ করার সাধনা যেন তিনি করেন। ফাঁকি দিয়ে ফাঁক পূরণ করা যায় না।

এবার আকাশবাণীর 'খাঁতিরে অডিশন পাশ করা' কিছু বেসুরো গলার উল্লেখ করতে চাই—কারও বিরুদ্ধে ব্যক্তিগত আক্রোশে নয়—লোকসঙ্গীতকে ভালবেসে।

নীরেন্দু চৌধুরী (২৯শে জানুয়ারী), সুধীন মৈত্র (২২শে জানুয়ারী), রমা চট্টো-পাধ্যায় (২১শে জানুয়ারী), কানাইলাল দাস (১৭ই জানুয়ারী), বীণা নন্দী (২রা জানুয়ারী), সন্ধ্যা চট্টোপাধ্যায় (১লা ফেব্রু-য়ারী), মহম্মদ হাসান আলি (২৭শে জানু-য়ারী) প্রমুখ।...পরে হয়ত লিস্ট আরো দীর্ঘ করতে হবে।

এবার দু-একটি খাঁটি নির্ভেজাল মাটির গলার উল্লেখ করতে চাই। তাঁরা হলেন বৃন্দাবনদাস বৈষ্ণব (৩০শে ডিসে-ম্বর), হরেকৃষ্ণ দাস (১৮ই জানুয়ারী), সুধীর দাস বাউল (১৩ই ডিসেম্বর)।

এঁরা হলেন খাঁটি জাতবাউল। ভদ্র শিল্পীদের কমিয়ে এঁদের আরো বেশি পরিমাণে স্থান করে দিতে দাবি জানাচ্ছেন মুরশিদ।

অনেক ভাল ও খারাপ গায়কের নাম আলোচনায় হয়ত বাদ পড়ে গেছে, তবে ভবিষ্যতে তাঁদের সঙ্গে নিশ্চয়ই দেখা হবে।

উপসংহারে আজ একবল দুজন শিল্পীর নাম করবো। একজন হলেন কবিয়াল সুবেন সরকার (২৪শে জানুয়ারী)। তিনি তথাকথিত লোকসঙ্গীতজ্ঞ নন, কিন্তু সেদিন গান্ধীজীর বিষয়ে তরজা গাইতে গিয়ে যুগোপযোগী যে অপরূপ ভাটিয়ালীর ব্যঞ্জনা করছিলেন, তাতে বহুদিন আগেকার পূর্ব-বঙ্গের কবিয়ালদের গৌরবময় দিনগুলির কথা মনে করিয়ে দিল। আরেকজন শিল্পী হলেন অমর পাল (২৭শে জানুয়ারী) সাড়ে দশটায় তালহীন ভাটিয়ালী "গুরু ও দয়াল গুরু ভবপারের নাইয়া"—আবেগ ও বিলম্বিত সুরের অপূর্ব মাধুর্যে পরি-বেশন করেন। এরকম ভাটিয়ালী বহুদিন শুনি নি। মহানগরের চারদিকে উত্তেজনা ও অধৈর্য অস্থিরতার মাঝখানে বাংলার শ্যামল নদী ও প্রান্তরের মন্থর শীতল হাওয়া যেন এই ভাটিয়ালী বয়ে আনলো। এই পুরনো শিল্পীর গানে এখনো ব্যব-সায়ী বুদ্ধির সংক্রমণ হয় নি—এজন্য তাঁকে সাধুবাদ জানাই।

পাঠকমন

রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের দুর্নীতি প্রসঙ্গে

২৩শে জানুয়ারী ১৯৬৯ তারিখের "সাপ্তাহিক বসুমতী"তে পাঠকমন অংশে রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের নিবন্ধক মহাশয়ের প্রেরিত "তথ্যগুলি" পড়লাম। আপনার পত্রিকার ২রা জানুয়ারী, ১৯৬৯ সংখ্যায় রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের দুর্নীতির যে ঘটনাটি উল্লেখ করেছিলেন তার প্রতিবাদে তিনি উক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের বি· এ· পাঠক্রম বিধানের ১১নং ধারার অপূর্ব বিধানটি জনসমক্ষে পেশ করেছেন।

বি· এ· ক্লাসে ভর্তি হওয়ার যোগ্যতা সম্পর্কে এই অপূর্ব বিধানটি আর কোন বিশ্ববিদ্যালয়ে আছে কি না জানি না। রবীন্দ্রনাথ প্রতিষ্ঠিত বিশ্বভারতীতেও এরূপ অপূর্ব বিধান আছে কি না জানালে বাধিত হব।

রবীন্দ্রনাথের জন্মভিটায় তাঁর স্মৃতির উদ্দেশ্যে প্রতিষ্ঠিত বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়বার আকাঙ্ক্ষা নিয়ে ১৯৬৫ সালে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বি· এ· পাশ করে এম· এ· (বাংলা সাহিত্য ও সংস্কৃতি) ক্লাসে ভর্তি হয়েছিলাম।

হায়! তখন কি জানতাম বিশ্ববিদ্যালয়ের ১১ সংখ্যক অপূর্ব বিধানটি!! যাতে অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুরূপ পাঠক্রম হওয়া সত্ত্বেও, স্কুল-ফাইন্যাল, হায়ার সেকেণ্ডারী প্রভৃতি পরীক্ষা পাশ না করেও শুধু সংগীত, নাটক আর নৃত্যে ডিপ্লোমা লাভের ভিত্তিতে বি· এ· ডিগ্রী ক্লাসে ভর্তি হওয়া যায়! এই অপূর্ব বিধানটির ফলে রবীন্দ্রভারতীর বি· এ· পরীক্ষার মান কি অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয়ের চাইতে হীনতার প্রমাণ করে না? আশা করি সংশ্লিষ্ট ছাত্রীটির স্বার্থে এই বিধানটি রচিত হয়েছিল এবং আজ যখন প্রয়োজন মিটে গেছে তখন এটা সংশোধন করা হবে।

২রা জানুয়ারী সংখ্যায় আপনারা এই বিষয়ে তদন্ত দাবি করেছিলেন। ২৩শে জানুয়ারী সংখ্যায় শ্রীঅনিমেষ চট্টোপাধ্যায়ও তদন্ত চেয়েছেন।

চলতি বৎসরের প্রজাতন্ত্র দিবসে রাষ্ট্রপতি জাকির হোসেন, যিনি শিক্ষাব্রতী হিসাবে সুপ্রতিষ্ঠ, তাঁর বাণীতে ছাত্র-অশান্তির কথা উল্লেখ করেছেন। ছাত্র-অশান্তি কেন হয় "রবীন্দ্রভারতী"র ঘটনাবলীই প্রমাণ করে।

—অমতা চৌধুরী
পি ৫৫৪, পণ্ডিতিয়া রোড এক্সটেনশন,
কলিকাতা—২৯

এম· ডি· পরীক্ষা প্রসঙ্গে

সাপ্তাহিক বসুমতীর গত ৫ই ডিসেম্বর সংখ্যায় চিকিৎসাজগতে কায়েমী স্বার্থের যে ছোট্ট অথচ অভীব গুরুত্বপূর্ণ দু-একটি উদাহরণ পেশ করেছেন এবং তার ফলে স্বার্থান্বেষী-মহলে যে তুলকালাম কাণ্ড বেধে গেছে তার প্রমাণ 'পাঠকমন' বিভাগ। এই ধরনের গুরুত্বপূর্ণ তথ্য ফাঁস করার জন্য সাপ্তাহিক বসুমতীর বলিষ্ঠ কলমের প্রশংসা করি।

স্বার্থ, স্বজনপোষণতা, তোষামোদ, ভয় যত প্রকার বিষয়ের অবতারণাই করা হোক না কেন, এর প্রতিটির পেছনে কাজ করছে বর্তমান সমাজব্যবস্থা ও অর্থনৈতিক দুরবস্থা। অবশ্য এ দুটি একে-অপরের সাথে এমনভাবে জড়িত যে এ দুটিকে আলাদা ভাবা চলে না। এর জালে জড়িয়ে আজ সুস্থ সমাজ-জীবন এক ভয়াবহ পরিস্থিতির মধ্যে এসে দাঁড়িয়েছে। মানুষ একদিকে যেমন পরিস্থিতির দাস ঠিক অপরদিকে তেমনি সেই পরিস্থিতিকে আবার মানুষেই বদলায়, তাকেই বদলাতে হয়। না হলে সমাজ টিকে থাকতো না। গতানুগতিকতায় গা ভাসিয়ে দেওয়া সুস্থ মানবজীবনের ধর্ম নয়। সমাজকে বাঁচান মানুষের ধর্ম এবং তাকে বাঁচাতে হলে প্রতিটি মানুষকে লড়তে হবে স্বার্থান্বেষী কায়েমী শোষণবাদীদের বিরুদ্ধে। হয়তো এ লড়াইতে সাময়িক পরাজয় অসম্ভব নয়, তবুও এর মধ্যে জয়ের বীজ নিহিত থাকে।

জাতীয় প্রশাসকবর্গের হাতে আজ আমরা প্রতি পদে পদে মার খাচ্ছি। অথচ তা' বলার উপায় নেই। বললেই স্বার্থান্বেষীমহল তেড়ে আসবে দলবদ্ধভাবে। তাদের অবৈধ সাধের সাজান বাগানে কারোও ঢোকার অধিকার বা উপায় নেই। এমনভাবে চতুর্দিকে লক্ষ্য ব্যূহ রচনা করেছে, যে ঢুকবে সেই মরবে। এই সব কায়েমী স্বার্থবাজরা তাদের নির্বংশ করার সব ব্যবস্থাই ঠিক করে রেখেছে। প্রতিক্ষেত্রে এরূপ সমাজের দৃষ্টান্ত। এদের সমূলে ধ্বংস করতে না পারলে জাতির ধ্বংস অনিবার্য।

ভাবতে অবাক লাগে বৃহত্তর জনজীবনের সাথে প্রত্যক্ষভাবে জড়িত যে চিকিৎসাজগৎ সেখানেও এরা এমনভাবে জটিল জাল বিস্তার করে রেখেছে যে তার থেকে নিরীহ, শোষিত, গরীব অবহেলিত অশিক্ষিত সমাজের বাঁচার কোন রাস্তা খোলা নেই।

অতীব আশ্চর্যের কথা। চিকিৎসা-জগৎ সম্বন্ধে যেখানে একটি চরম দুর্নীতির কথা বসুমতীর পৃষ্ঠায় উত্থাপিত হয়েছে, তার উপযুক্ত তদন্তের কথা বলা দূরে থাক উপরন্তু কায়েমী-স্বার্থবাদী চেলাচামুণ্ডার দল কর্তা-ব্যক্তিদের গুণগান জয়ঢাকসহকারে পেটাতে সুরু করেছেন। শুধু জয়ঢাক বললে ঠিক হবে না, তাদের কেউ কেউ আবার ক্ষেপেও গেছেন। যাঁরা এই দুর্নীতির প্রতিকার দাবি করে পত্র দিয়েছেন তাঁদের প্রতি এইসব স্বার্থান্বেষী চিকিৎসকবর্গের কি বক্রোক্তি, কি উৎকট ভাষা, যা সাধারণত যুক্তি হারালে বা স্বার্থে আঘাত লাগলে মুখ ফস্‌কে বেরিয়ে পড়ে। কাউকে এরা "গর্ত" থেকে বেরিয়ে আসতে বলছেন, কাউকে বা বলছেন কুলবধূর আঁচলের আড়াল থেকে ফিস্‌ফিস্ না করতে। বুঝি না এঁদের অপরাধটা কি। এতটা ধৈর্য হারালে কি চলে? একজোট করতে এসে উকিলসাহেবই যদি ধৈর্য হারান তবে মামলা জেতা মুস্কিল বৈকি! যে ধরনের দুর্নীতির কথা প্রকাশ পেয়েছে তার সত্য-মিথ্যা যাচাই অবশ্য কর্তব্য। স্বার্থান্বেষীমহলের স্বার্থে যতই ঘা লাগুক না কেন এর উপযুক্ত তদন্ত ছাড়া অন্য কোন পথ খোলা নেই।

শুধু বসুমতীর পৃষ্ঠাতেই এর সমালোচনা সীমাবদ্ধ থাকা উচিত নয়। উপযুক্ত ন্যায়িক তদন্ত ছাড়া এর মীমাংসা সম্ভব নয়। শুধু এম-ডি পরীক্ষার্থী বা পরীক্ষার ব্যাপারই নয় এর সাথে রাজ্য তথা ভারতের চিকিৎসাজগতের প্রশাসন ব্যবস্থার প্রশ্ন ওতপ্রোতভাবে জড়িত। তাছাড়া কায়েমী স্বার্থান্বেষী মহামানবগণের হাত থেকে সমাজকে বাঁচানোর প্রশ্নও আছে বৈকি।

—শ্রীরামেশ্বর সাহা, বড়পেটা রোড, আসাম।

এম ডি প্রসঙ্গে সাপ্তাহিক বসুমতীতে আপনার যে মন্তব্য এবং তার স্বপক্ষে ও বিপক্ষে যেসব চিঠিপত্র পর পর প্রকাশিত হয়েছে সে সবই আমি বিশেষভাবে লক্ষ্য করেছি। এর মধ্যে দৈনিক বসুমতীতে দেববাণীর মাধ্যমে এম-এসসি (মেড) ও বেসিক পরীক্ষার দুর্নীতি এবং কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কলেজ অফ মেডিসিনে অন্যায়ভাবে কয়েকটা উচ্চপদ প্রদানের যে রোমাঞ্চকর কাহিনী প্রকাশিত

হয়েছে তাও আমার নজর এড়ায় নি। সমস্ত প্রকাশনের সূক্ষ্ম বিচারে বেশ বোঝা যায় যে, অভিযোগকারীদের মতে এই সব দুর্নীতির নায়ক এক চিকিৎসক এবং বিরাট স্বার্থচক্র আবর্তনের তিনি মূল যন্ত্র। সমস্ত লেখনীর সংযোজনে এই স্বার্থচক্র আমার কাছে যেভাবে প্রতিভাত হয়েছে তা নিম্নরূপ।

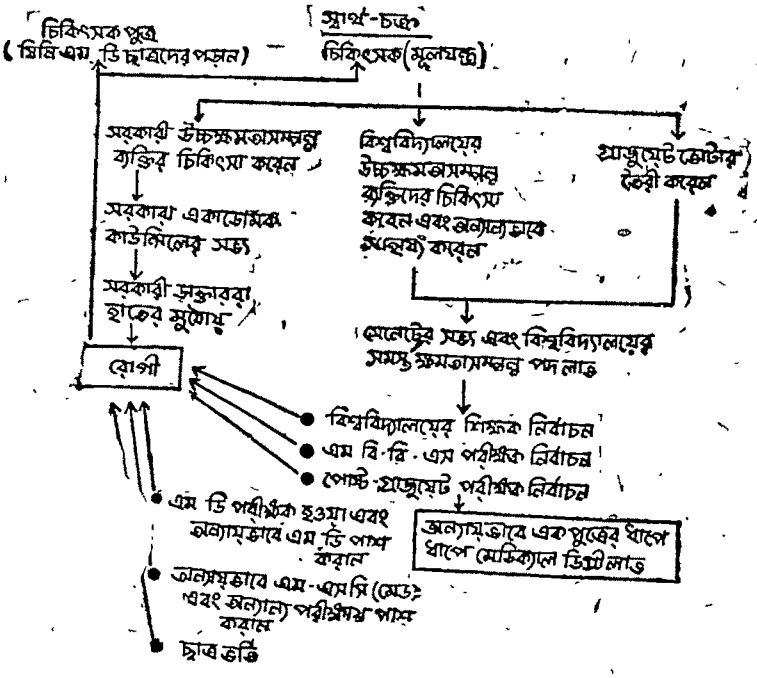

আবার এম ডি পরীক্ষার বিষয়ে আপনার মন্তব্যের বিরুদ্ধে যাঁরা লিখেছেন তাঁদের মতামতও উপেক্ষা করা যায় না। কারণ প্রকৃত গুণীলোকের বিরুদ্ধেও কুৎসা রটনার উদাহরণ সর্বযুগে সর্বকালে বিদ্যমান। বিরুদ্ধবাদীদের মতে দুর্নীতির অভিযোগ উদ্দেশ্যপ্রণোদিত অপপ্রচার। তাঁদের মতামতের সমষ্টি নিম্নরূপ।

একজন নিরপেক্ষ নাগরিক হিসাবে সবকিছু পর্যালোচনা করে আমার মনে হয় যে, আপনার স্বপক্ষে যাঁরা লিখেছেন তাঁদের কথাও ঠিক হতে পারে। আবার আপনার বিপক্ষে যাঁরা লিখেছেন তাঁদের কথাও ঠিক হতে পারে। আপনার মন্তব্য, 'দূরবীণের চোখে'-র লেখকের প্রকাশনী এবং আপনার স্বপক্ষে পত্রদাতাদের উক্তি যদি সত্যই ঠিক হয়, তবে নিঃসন্দেহে বলা যায় যে, পশ্চিমবঙ্গের চিকিৎসাবিদ্যা শিক্ষার ব্যবস্থা ও জনস্বাস্থ্য আজ ঘোরতর বিপদের সম্মুখীন। আর যদি আপনার বিরুদ্ধবাদীদের কথা সত্য হয়, তবে উপযুক্ত চিকিৎসক ও নিঃস্বার্থ শিক্ষাবিদদের অন্যায়ভাবে অপসারণের চেষ্টাপ্রসূত ক্ষতির বিপুলতাও সহজেই অনুমেয়। আমার আন্তরিক কামনা, অচিরে চিকিৎসাবিদ্যা শিক্ষা ও জনস্বাস্থ্যের এই অনিশ্চিত অবস্থার অবসান হোক। বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ প্রাদেশিক শিক্ষা ও স্বাস্থ্য দপ্তর, ইউনিভারসিটি গ্রান্টস কমিশন এবং কেন্দ্রীয় শিক্ষা ও স্বাস্থ্য দপ্তরের কাছে আমার আবেদন যে, তাঁরা যেন অবিলম্বে এক নিরপেক্ষ আইনবিভাগীয় তদন্তের ব্যবস্থা করে প্রকৃত সত্য উদ্‌ঘাটিত করেন।

—জনৈক চিকিৎসক

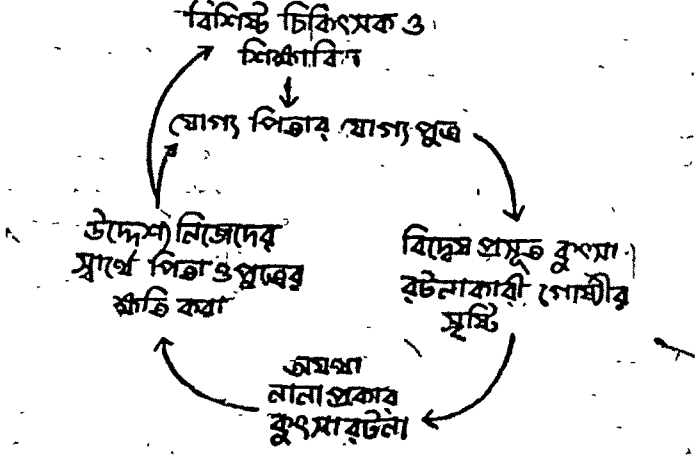

রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয় প্রসঙ্গে

২রা জানুয়ারীর সাপ্তাহিক বসুমতীর বঙ্গদর্শনে রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের দুর্নীতি শীর্ষক যে সংবাদ প্রকাশ করেছেন তার জন্য আমার সমর্থনসহ আপনাদের অশেষ ধন্যবাদ জানাই। আমি ঐ বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন প্রাক্তন ছাত্রী। শিক্ষাক্ষেত্রে এ-জাতীয় দুর্নীতি সত্যনিষ্ঠ রবীন্দ্রনাথের ন্যায়বোধের সম্পূর্ণ বিপরীত। স্কুল ফাইন্যাল বা মেট্রিক পরীক্ষায় যিনি পাশ করেন নি তাঁকে বি-এ ও এম-এ ডিগ্রীসহ গবেষণার সুযোগ করে দিয়ে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ প্রকারান্তরে আমার মত অনেক ছাত্র-ছাত্রীকে বঞ্চনা করেছেন বলব। কারণ প্রাথমিক শিক্ষা স্তর থেকে এম-এ পর্যন্ত আমরা বিভিন্ন পরীক্ষার স্তর অতিক্রম করে এসেছি। বলা বাহুল্য সঙ্গীতে তিন বছরের সিনিয়র ডিপ্লোমা পাওয়ার পর কোন্ যুক্তিতে উক্ত নন-মেট্রিক ছাত্রীটিকে একেবারে দু' বছরে বি-এ পরীক্ষার বসার সুযোগ দেওয়া হয়। প্রথমত গত ২৩শে জানুয়ারীর পাঠক্রমে বিশ্ববিদ্যালয়ের নিবন্ধক মহাশয় যে তথ্য জানিয়েছেন তাতে বিতর্কিত ছাত্রীটির ন্যূনতম শিক্ষাগত যোগ্যতা কি তা খুব কৌশলপূর্বক এড়িয়ে যাওয়া হয়েছে এবং স্পষ্টত, ছাত্রীটির ন্যূনতম শিক্ষাগত যোগ্যতা সম্পর্কে অভিযোগের সত্যতা প্রকারান্তরে স্বীকার করে নেওয়াই হয়েছে। এমতাবস্থায় রবীন্দ্রনাথের বাসগৃহে অবস্থিত তাঁরই বিশ্ববিদ্যালয়ে এ-জাতীয় দুর্নীতিগ্রস্ত শিক্ষানীতির বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানানোর জন্য দেশের শিক্ষানুরাগী ও শিক্ষাবিদ্‌দের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি।

—আরতি দাস
(প্রাক্তন ছাত্রী—বাংলা সাহিত্য)

বসবাস ও অভিনয় *

মিলনলাল ও দাশগুপ্ত

[পূর্ব-প্রকাশিতের পর]

ইংলিশ থিয়েটার : দি লিরিক হ্যামার স্মিথ এবং নিগেল প্লেফেয়ার—নর্মান মার্শাল তাঁর 'দি আদার থিয়েটারের' তৃতীয় পরিচ্ছদে লিখছেন : ১৯২৫ সালে অক্সফোর্ড ছেড়ে যাই, ভবিষ্যতে কি করতে চাই তা বেশ ভালভাবেই ঠিক করে ফেলেছিলাম, কিন্তু কিভাবে মনের ইচ্ছাকে কাজে পরিণত করবো তার কোন উপায় ঠিক করতে পারছিলাম না। আমি প্রডিউসার হতে চাইছিলাম। অভিনয় করবার, নাটক লেখবার বা সিন ডিজাইন করবার এতটুকু ইচ্ছা আমার মনে ছিল না। আমি শুধু নাটক প্রডিউস করবার জন্য ব্যগ্র হয়ে উঠেছিলাম।

অনেক সময়েই আশ্চর্য হয়ে ভাবতাম অন্যান্য প্রডিউসাররা কিভাবে এই পেশাতে এসেছিলেন। কেউ কেউ ছিলেন ব্যর্থ অভিনেতা বা অসফল নাট্যকার। এ-জাতীয় প্রডিউসাররা নাট্যকার এবং নট-নটীর কাজের সহায়ক তো হনই না, বরং একজন প্রধান বিঘ্নকারক। আর এক শ্রেণীর পরিচালক আছেন যাঁরা আলোকনিয়ন্ত্রণ এবং মঞ্চসজ্জার ওপরেই সমধিক নজর দেন—নাটক এবং অভিনেতারা তাঁদের চোখে গৌণস্থানের অধিকারী। এঁরা আগের শ্রেণীর তুলনায় কম ক্ষতিকারক—তবে সত্যিকার ভাল প্রডাকসনও এঁরা করতে পারেন না।

আমার মনে হয় ভাল প্রডিউসাররা সাধারণতই নম্র স্বভাবের মানুষ হয়ে থাকেন—নিজেরা কিছু সৃষ্টি করবো এ ধরণের মানসিক আবেগ তাঁদের ভেতর দেখা যায় না। কিন্তু সত্যিকার স্রষ্টা অর্থাৎ যে নাট্যকারের নাটক নিয়ে তাঁরা কাজ করেন তাঁর প্রতি তাঁদের মনে থাকে অসীম শ্রদ্ধা।

[নর্মান মার্শাল বোধহয় এখানে এই কথাটাই বোঝাতে চেয়েছেন যে নাট্যকারের আসল বক্তব্যটাকেই মঞ্চরূপায়ণে সঠিকভাবে ফুটিয়ে তোলেন ভাল প্রডিউসার। নিজের সৃষ্টি করবার উদগ্র বাসনায় নাটকের ভেতর নতুন কিছু ঢুকিয়ে নাটকের বক্তব্যকে ঘোলা করে তোলেন না। স্তানিসলাভস্কিও বারবার বলেছেন প্রডিউসারের কাজ হল নাটকের রুলিং আইডিয়া বা মূল বক্তব্যকে ফুটিয়ে তোলা।—লেখক]

নাটক দেখে প্রচুর আনন্দ পেতাম—নাটকের মঞ্চরূপায়ণ বিষয়ে তীব্র কৌতূহল মনে মনে পোষণ করতাম—এবং তার ফলেই প্রডিউসার হবার উচ্চাকাঙ্ক্ষা আমার মনের কোণায় ভেসে উঠেছিল। যে-সব নাটক ফ্যাগান প্লে' হাউসে প্রডিউস করতেন—প্রডাকসনের আগে এবং পরে সেগুলো খুব ভালভাবে পড়তাম।

[স্যার হেনরী আরভিংও তাঁর একটি বক্তৃতায়—পরে এই বক্তৃতাটি ছাপার অক্ষরে প্রকাশিত হয়—বলেছেন যে ছেলেবেলা থেকেই শেক্সপীয়ারের কোন নাটকের প্রডাকসন দেখতে যাবার আগে তিনি নাটকটি ভালভাবে অধ্যয়ন করতেন এবং মনে মনে ছকে নিতেন তিনি নিজে হলে কিভাবে নাটকটির মঞ্চরূপ দিতেন। এর ফলে আসল প্রডাকসন দেখতে গিয়ে তিনি বুঝতে পারতেন কোথায় কোথায় তাঁর ভুল হয়েছিল।—লেখক]

ফ্যাগানের প্রডাকসন দেখে অনেক সময়েই আমার মনে হোতো নাটকের গল্পাংশ সঠিকভাবে ফুটিয়ে তোলা হয় নি। কল্পনার পটভূমিকায় নাটকটিকে আমি নিজে আবার প্রডিউস করবার চেষ্টা করতাম। আসলে প্রডিউস করবার সময় যে সব বাধা-বিপত্তির মুখোমুখি হতে হয় সে বিষয়ে আমার কোনই ধারণা তখন ছিল না। রেপারটরী পদ্ধতি যে এক অসুবিধার সৃষ্টি করে তাও জানতাম না। প্লে' হাউসে প্রডাকসন দেখতে গিয়ে বিজ্ঞজনোচিত মনোভাব অবলম্বন করে ভাবতাম—এরা অনেক নাটককেই সঠিকভাবে বিকশিত করে তুলতে পারে না—সময় সময় চরিত্রগুলোরও ঠিকমত ভাষ্য দেওয়া হয় না।

যৌবনের বাতুল-আত্মবিশ্বাসের দ্বারা উদ্বুদ্ধ হয়ে আমি ভাবলাম যে প্রযোজনার অভিজ্ঞতা থাকলে আমি ঐ সব নাটক ফ্যাগানের থেকে ভালভাবেই প্রডিউস করতে পারতাম। এই সময়েই ঠিক করে ফেললাম যে প্রডিউসারের বৃত্তিকে গ্রহণ করবো।

থিয়েটারের সঙ্গে জড়িত কোন লোকের সঙ্গে আমার পরিচয় ছিল না। এটুকু বুদ্ধি অবশ্য আমার ছিল যে, এ-লাইনে কাজ করতে হলে আমাকে শুরু করতে হবে ছোট ভূমিকায় অভিনেতা বা সহকারী স্টেজ ম্যানেজার হিসাবে। কিন্তু কিভাবে ও ধরণের কাজ যোগাড় করবো সে বিষয়ে আমার কোন ধারণাই ছিল না। শেষ পর্যন্ত নিগেল প্লেফেয়ারের কাছে যাবার জন্য একটি পরিচয়পত্র পাওয়া গেল।

প্লেফেয়ার অত্যন্ত সহৃদয়তার সঙ্গে আমার উচ্চাকাঙ্ক্ষার কথা মনোযোগ দিয়ে শুনলেন এবং ইঙ্গিত দিলেন যে, তিনি আমাকে সহকারী স্টেজ ম্যানেজারের একটি চাকরী যোগাড় করে দিতে পারেন। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে একথাও বললেন স্টেজকে আমার জীবনের পেশা হিসাবে নেব কি-না এ-বিষয়ে চরম সিদ্ধান্তে আসবার আগে আমার পক্ষে উচিত হবে তাঁর স্টেজ ডিরেক্টর স্টিফেন টমাসের সঙ্গে একবার আলোচনা করা। থিয়েটার ব্যবসায়ের লোকেদের একটা বৈশিষ্ট্য হল—এমন কি যাঁরা এই ব্যবসায়ে প্রচুর সাফল্য, অর্থ, যশ, মান-প্রতিপত্তি সবই পেয়েছেন তাঁরাও এ নিয়মের ব্যতিরেক নন—কেউ তাঁদের পেশাতে যোগ দিতে এলে প্রথমেই তাঁরা নবাগতকে এ লাইনে না আসবার জন্য যুক্তি দিয়ে বোঝাতে চেষ্টা করেন। স্টিফেন টমাসও ঠিক তাই করলেন। আমার ভবিষ্যৎ কি রকম অন্ধকারাবৃত হতে পারে তিনি তার একটা ছবি আমার সামনে তুলে ধরলেন। বহুদিন সহকারী ম্যানেজার হিসাবে এ্যাপ্রেন্টেসী করবার পর হয়তো একটা সুযোগ আমি পেতে পারি কোন সফররত দলের স্টেজ ম্যানেজার হবার। বছরের পর বছর প্রভিন্সেসে কাটাবার পর হয়তো লণ্ডনের কোন থিয়েটারে শেষ পর্যন্ত স্টেজ ম্যানেজারের পদ পাব। তারপর যদি ভাগ্য সুপ্রসন্ন হয়—অবশ্য এ ধরণের ভাগ্য ক্বচিৎ-কদাচিৎ কারও জীবনে আসে—দু'-এক সময় কোন নামহীন গোষ্ঠীর রবিবারের নাটক প্রডাকসনের দায়িত্ব আমার ওপর আসতে পারে। এর থেকে পরে—যদিও সেটা প্রায় অসম্ভব বলেই মনে হয়—কোন ওয়েস্ট এণ্ড থিয়েটার আমাকে প্রডিউসারের কাজে নিয়োগ করতে পারে। হিসাব করে দেখলাম এই রকম একটা সম্ভাবনা দেখা দেবার সময় আমার বয়স হবে অন্তত চল্লিশ বছর। ঐ বয়সে পৌঁছিয়ে যদি আবিষ্কার করতে হয় যে, আমার নাটক প্রডিউস করবার যোগ্যতা আছে কি না—তাহলে ব্যাপারটা সত্যিই মারাত্মক হয়ে দাঁড়াবে। স্টিফেন টমাসের ব্যক্তিত্ব ছিল অসাধারণ—অত্যন্ত ভারিক্কী চালে এবং বিজ্ঞভাবে তিনি কথা বলতেন। তাঁর বক্তব্যের ওপর আমি খুব গুরুত্ব আরোপ করেছিলাম—অতটা সিরিয়াসলি তাঁর মন্তামতটা আমি গ্রহণ করব এটা বোধহয় তিনি চানও নি এবং ভাবতেও পারেন নি। বিমর্ষ মনে—এবং তখন মনে

হয়েছিল এটাই সুবুদ্ধির কাজ—আমার প্রডাকসন সম্পর্কে উচ্চাশাকে পরিত্যাগ করে—পরের বছরটা এ্যাডভারটাইজিং এবং জার্নালিজম নিয়ে কাটালাম।

ভবিষ্যৎ জীবনে অনেক সময়েই খেদ করেছি সুযোগ পেয়েও কেন লিরিকের কাজে ঢুকি নি। আমার নিশ্চিত ধারণা যে, তখন নিগেল প্লেফেয়ারের কাছে কাজ শিখলে আমি আজ আরও উন্নত ধরণের প্রডিউসার হতে পারতাম। এমনিতেও তাঁর কাছ থেকে অনেক কিছু শিখেছি—এই শিক্ষালাভ হয়েছে তাঁর থিয়েটারের দর্শক হিসাবে। লিরিকে তাঁর প্রথম দুটি নাটক বাদে আর সব প্রডাকসনই আমি দেখেছিলাম। পরে তাঁর সঙ্গে আমার ব্যক্তিগত পরিচয় হয়। তাঁর সম্পর্কে আরও অনেক কিছু জানতে পারি তাঁর এ্যাক্টরদের নিগেল-সম্বন্ধে আলাপ-আলোচনা থেকে এবং নিগেল রচিত বইগুলো পড়ে।

[প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে নাট্যাচার্য শিশিরকুমারও সহজে কাউকে অভিনয়-শিল্পকে পেশা হিসাবে নিতে উপদেশ দিতেন না। অনেক সময়েই আমাকে বলেছেন এ শিল্পে সাফল্যলাভ করতে হলে রক্ত দিয়ে সাধনা করতে হয়। তারপর শুধুমাত্র সাধনার দ্বারাই সিদ্ধিলাভ হয় না। প্রতিভা না থাকলে বহু সাধনার পরও দেখা যায় অভিনেতা মঞ্চে কিছুই এগোতে পারলেন না। সেক্ষেত্রে ঐ অভিনেতার সমস্ত জীবনটাই ব্যর্থ হয়ে গেল। তার থেকে সে যদি প্রথম থেকেই অন্য বৃত্তি নিত তাহলে জীবনে হয়তো যশ, অর্থ, সাফল্য সবই পেত। আমাদের দেশে আবার প্রতিভা থাকলেও সব সময় সাফল্য আসে না। এদেশে ভাল অভিনেতারাই বা থিয়েটার থেকে কত টাকা উপায় করেন? শিশির-যুগে তো প্রতিভাবান অভিনেতা বা অভিনেত্রীর অভাব ছিল না। রাধিকাবাবু বা ভূমেন রায় ভাল চাকরী ছেড়ে নটের বৃত্তি গ্রহণ করেছিলেন—মঞ্চাভিনেতা হিসাবে যশের চরম শিখরেও উঠেছিলেন। কিন্তু শেষ জীবনটা তাঁদের চরম দারিদ্র্যের ভেতর কেটেছিল। মনোরঞ্জনবাবু, নরেশবাবু বা নাট্যাচার্য শিশিরকুমার—এঁরাই বা কি স্বীকৃতি পেয়েছেন আমাদের দেশের কর্তৃপক্ষের কাছে? এঁদের জীবিতকালেই কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় গিরিশ লেকচারার করলেন অহীন্দ্র চৌধুরী মহাশয়কে। তবে আসল সম্মান থেকে এঁদের কেউ বঞ্চিত করতে পারে নি—সেই সম্মান এসেছে জনগণের তরফ থেকে। তাই অশীতিপর বয়সেও মৃত্যুর কয়েকদিন আগে পর্যন্ত নরেশবাবুকে বিভিন্ন ভূমিকায় নামতে হয়েছে মঞ্চে জনগণের দাবিতে—তাঁরা তাঁকে দেখতে চান বলে। সরকারী বা আধা-সরকারী তরফ থেকে আমাদের বাংলা দেশের শিল্পীদের প্রকৃত গুণের স্বীকৃতি দেওয়ার কথাটা এই রকম আকাশকুসুম কল্পনারই সামিল।]

[ক্রমশঃ]

দৃশ্যকাব্য-পরিচয়

সত্যজীবন মুখোপাধ্যায়

দাম ঃ দশ টাকা

বাংলা নাট্যসাহিত্যের প্রাচীন ও আধুনিক-কালের সম্পূর্ণ ইতিহাস, প্রাচ্য ও প্রতীচ্য মনীষীর তুলাদণ্ডে বিচারিত। বি-এ ও এম-এ পরীক্ষার্থীর অবশ্য পাঠ্য গ্রন্থ।

লব্ধপ্রতিষ্ঠ সাহিত্যিক ও নাট্যসমালোচক শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্রকুমার রায় এই গ্রন্থখানি সম্বন্ধে বলেছেন ঃ—

* * তথাকথিত জ্যেষ্ঠতাত জাতীয় অকাল-পক্ক এবং বিচারশক্তিহীন আত্মহারা ও প্রিয়-ভাষী সমালোচকদের নিয়ে এতদিন বড়ই অস্বস্তি বোধ করছিলুম। এতদিন পরে এই বিভাগে দুইখানি অমূল্য গ্রন্থ আমাদের হস্তগত হয়েছে। প্রথমখানির কথা দৈনিক বসুমতীতে ইতিমধ্যেই আলোচনা হয়ে গেছে * * দ্বিতীয়খানির নাম 'দৃশ্যকাব্য-পরিচয়' রচনা করেছেন শ্রীযুক্ত সত্যজীবন মুখোপাধ্যায়। বইখানির আকার বিপুল। বাংলা নাটক নিয়ে এমনভাবে মস্তিষ্কচালনা করবার মানুষ যে আমাদের দেশে আছেন, এ তথ্য আমার কাছে ছিল সম্পূর্ণ অজ্ঞাত। সুদীর্ঘকালের সাধনা ছাড়া এমন গ্রন্থ কেউ রচনা করতে পারেন না। * * অথচ বাঙালীর সৃষ্ট নাট্যসাহিত্যের সম্পূর্ণ ইতিহাস এতদিন কেউ রচনা করেন নি। হালে শ্রীযুক্ত মন্মথমোহন বসু সেই চেষ্টা করেছেন এবং দৃশ্যকাব্যের পরিচয় দিতে গিয়ে সত্য-জীবনবাবু অগ্রসর হয়েছেন অধিকতর। * * যাঁরা জ্যেষ্ঠতাতের ভূমিকায় অভিনয় করতে ইচ্ছুক নন, এই পুস্তকখানি পাঠ করলে তাঁরা বাংলা দেশের সমগ্র নাট্যসাহিত্য সম্বন্ধে একটি বিশদ ধারণা করতে পারবেন। এত খুঁটিয়া খুঁটিয়া আর কোন লেখকই বাঙালীর নাট্যসাহিত্য নিয়ে আলোচনা করতে পরেন নি। এইটিই হ'ল আলোচ্য গ্রন্থের প্রধান গৌরব। * * তাঁর সমালোচনাও পরম উপভোগ্য। সমালোচকের উপযোগী সূক্ষ্ম দৃষ্টি, নিরপেক্ষতা ও যুক্তিযুক্ত মনের পরিচয় দিয়ে তিনি আমাদের আনন্দিত করেছেন। তিনি কেবল গুণই দেখেন নি, দোষও দেখেছেন। কোথাও তিনি উচ্ছ্বসিত হয়ে অতিরিক্ত বাক্য ব্যয় ক'রে বক্তব্য-বিষয়কে কলুষ তোলেন নি ধোঁয়াটে। * * যাঁরা বাংলা নাটকের ইতিহাস নিয়ে আলোচনা করবেন, এই গ্রন্থখানি তাঁদের পক্ষে অবশ্য পাঠ্য। * * যাঁদের লাইব্রেরী আছে, এই বইখানি না থাকলে তাঁদের সংগ্রহ অসম্পূর্ণ থেকে যাবে। * *

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের বাংলা অনুবাদক সুপণ্ডিত শ্রীযুক্ত পতঞ্জলি ভট্টাচার্য এম-এ মহোদয় এই গ্রন্থখানি সম্বন্ধে স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া লিখিয়াছেন—

* * বাংলা নাটকের ইতিহাস সম্বন্ধে এই ধরণের বই বাংলা ভাষায় আর আছে কিনা জানি না, থাকিলেও খুব কমই আছে। গ্রন্থকার শুধু ঐতিহাসিকের দৃষ্টি দিয়াই তাঁহার আলোচ্য বিষয় দেখেন নাই। সঙ্গে সঙ্গে তিনি তাঁহার সমালোচনা-শক্তিরও পূর্ণ ব্যবহার করিয়াছেন। প্রত্যেকটি উল্লেখযোগ্য নাটকের গুণাগুণ তিনি বিচার করিয়াছেন। প্রাচ্য ও প্রতীচ্য এই উভয় নাট্যাদর্শ সম্মুখে রাখিয়া তিনি এই বিচার করিয়াছেন। বইখানিতে যেমন তাঁহার অসাধারণ পরিশ্রম ও অধ্যবসায়, তেমন তাঁহার গভীর পাণ্ডিত্যের পরিচয় পাওয়া যায়। শিক্ষার্থীদের পক্ষে এই বই অবশ্য পাঠ্য। অন্য সাহিত্য-পিপাসুরাও এই বই হইতে বহু জ্ঞাতব্য বিষয় জানিতে পারিবেন। ভাষা এই ধরণের বই-এর সম্পূর্ণ উপযোগী—গাম্ভীর্য-পূর্ণ ও প্রাঞ্জল।"

বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের বর্তমান সম্পাদক, নাট্যশালার ইতিহাসলেখক ও নাটকীয় পরিসংখ্যানবিদ শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছেন ঃ—

— "এই বিরাট গ্রন্থে বাংলা দৃশ্যকাব্যগুলির ইতিহাস সঙ্কলিত হইয়াছে। কেবল জীবিত লেখকগণকে বাদ দেওয়া হইয়াছে। * * সত্যজীবনবাবুর পক্ষে শ্লাঘার বিষয় এই যে, তাঁহারই অক্লান্ত পরিশ্রমের ফলে অভিনীত দৃশ্যকাব্যগুলির সমালোচনা একত্রে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হইল। * * 'দৃশ্যকাব্য-পরিচয়' বাস্তবিকই আমাদের একটা বহুদিনের অভাব বিদূরিত করিয়াছে। এজন্য লেখক সাহিত্যামোদিগণের কৃতজ্ঞতা দাবী করিতে পারেন।"

বসুমতী প্রাইভেট লিমিটেডঃ ১৬৬, বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী স্ট্রীট, কলি-১২

চলচ্চিত্র সংরক্ষণের প্রাথমিক প্রয়োজন—ঐক্য

সংকটের ওপর সংকটে বাংলা চলচ্চিত্র-শিল্পে অন্ধকার ভারী হয়ে উঠছে। ১৯৬৮ সালটা ধর্মঘট, লক-আউট, পিকেটিং-এর বছর ছিল। এ বছরের সূচনায় যেভাবে বিবৃতি আর পাল্টা বিবৃতি চলছে তাতে মনে হয় সংকট আরো গভীরতর হবে। এখন চলচ্চিত্র-শিল্পে গুরুতর রকমের একটা বিবাদ চলছে। এই বিবাদের সূত্রপাত চলচ্চিত্র সংরক্ষণ সমিতি থেকে। চলচ্চিত্র সংরক্ষণ সমিতি যখন গঠিত হয় তখন সমিতির দাবি-দাওয়া দেখে অনেকেই সমিতির সমর্থনে ছিলেন। কিন্তু ক্রমে ক্রমে সমিতির কার্যকলাপে তাঁরা সমিতির প্রতি সমর্থন প্রত্যাহার করছেন।

নিউ জার্মান সিরিজের ছবি 'দি পারপেট্রেটর অব আর্টিস্ট ইন দি সার্কাস ডোম' ছবির নায়িকা হান্সেলোর হোগার।

কিছুদিন আগে সত্যজিৎ রায়, তপন সিংহ, অজয় কর, তরুণ মজুমদার, হেমন্ত মুখার্জী প্রমুখ চলচ্চিত্র সংরক্ষণ সমিতির বিরুদ্ধে অনেক অভিযোগ প্রকাশ করেছেন। চলচ্চিত্র সংরক্ষণ সমিতি সাংবাদিক সম্মেলনে তার জবাব দিতে চেষ্টা করেছেন, আবার পাল্টা অভিযোগ তুলেছেন। সর্বশেষ টেকনিশিয়ানস্ ইউনিয়ন ও অভিনেতৃ সংঘ যুক্তভাবে স্টুডিও চত্বরে এক সাংবাদিক সম্মেলনে সংরক্ষণ সমিতির বিরুদ্ধে বক্তব্য প্রকাশ করেছেন। এই সঙ্গে সংরক্ষণ সমিতির মিছিলে তাঁরা যোগ দেবেন না সে কথাও জানিয়ে দিয়েছেন।

অভিযোগ আর পাল্টা অভিযোগে এ পর্যন্ত আমরা যা জেনেছি তাতে দেখা যাচ্ছে, সংরক্ষণ সমিতির বিরুদ্ধে বলার লোক বেশি। সংরক্ষণ সমিতির দাবিগুলি যদিও যুক্তিপূর্ণ কিন্তু এই দাবি সত্ত্বেও তাঁরা কেন সকলকে ঐক্যবদ্ধ করতে পারছেন না সেটা ভাববার কথা।

উত্তমকুমার প্রসঙ্গত সংরক্ষণ বিরোধীদের বাইরের রাজনীতির সঙ্গে জড়িত বলে অভিযোগ করেছেন। এই অভিযোগের আমরা কোন যৌক্তিকতা খুঁজে পাচ্ছি না, বরঞ্চ মনে হচ্ছে উত্তমকুমারদের এরূপ মনোভাব ঐক্যের পথে বড় রকমের বাধা। আমরা যতদূর জানি সত্যজিৎ রায়, তপন সিংহ, অজয় কর প্রমুখের রাজনীতি সম্পর্কিত চিন্তায় কোন সমতা নেই। অভিনেতৃ সংঘের মধ্যেও বিভিন্ন চিন্তার এবং রাজনীতি নিরাসক্ত লোক রয়েছে। টেকনিশিয়ানদের মধ্যেও একই অবস্থা। তা হলে বার বার একই কথা বলা হয় কেন?

সংরক্ষণ সমিতি কিছু সংখ্যক আর্টিস্ট এবং টেকনিশিয়ানদের কোণঠাসা করার চেষ্টা করছেন বলে যে অভিযোগ করা হয়, এরূপ উক্তির ফলে সে-কথার সত্যতা প্রমাণিত হয় মাত্র। ব্যক্তিগতভাবে কোন শিল্পী যদি রাজনৈতিকসচেতন হন তাতে বাধা দেওয়ার চিন্তা করাটাই অগণতান্ত্রিক ব্যাপার। আমরা শুনেছি বিকাশ রায়, তরুণ রায় এবং আরো কয়েকজন কংগ্রেসের সঙ্গে যুক্ত। উত্তমকুমার এঁদের উপলক্ষ করে নিশ্চয় অভিযোগ করছেন না, কারণ, এঁদের নিয়েই ত' তিনি অভিনেতৃ সংঘ থেকে বেরিয়ে এসেছেন। আমরা বিশ্বাস

করি সংরক্ষণ সমিতি ঐক্যে বিশ্বাসী; তবে এ ধরণের মানসিককে দীনতা থেকে তাঁদের মুক্ত হওয়া দরকার।

কারো দোষ বা গুণ বিচার না করেও আমরা চলচ্চিত্র-শিল্পের সর্বস্তরের মানুষের ঐক্যের প্রয়োজন অনুভব করি। বিশেষ করে যে তিন পক্ষের সাংবাদিক সম্মেলনে আমরা উপস্থিত ছিলাম—সেই তিন পক্ষই ঐক্যে আগ্রহ প্রকাশ করেছেন। সুতরাং চলচ্চিত্র-শিল্পের স্বার্থে তিন পক্ষের প্রতিনিধিদের একসঙ্গে বসে আলোচনা করতে আপত্তির কোন কারণ আমরা দেখি না। পরস্পর-বিরোধী সাংবাদিক সম্মেলন না করে এবং অনর্থক জিদ প্রকাশ বা রাজনীতির ভূত না দেখে কি করে সকলকে নিয়ে বাংলা চলচ্চিত্রের স্বার্থরক্ষা করা যায় সেকথা ভাবা উচিত।

এরূপ পদক্ষেপের জন্য সর্বস্তরের কর্মী ও শিল্পীর স্বার্থ ও সম্মান রক্ষার কথাই ভাবতে হবে। সর্বস্তরের কর্মীদের স্বার্থের কথা না ভাবলে যথার্থ ঐক্য গঠন সম্ভব হয় না। এ বিষয়ে সংরক্ষণ সমিতির অগ্রণী হওয়া উচিত এবং এতে তাঁদের আন্তরিকতা প্রকাশ পাবে।

—সুজন

নাটকের কথা

বৈশাখীর "সংকেত"

সম্প্রতি বৈশাখী সংস্থা গাঙ্গুলী-বাগান রোডে সরস্বতী পূজা উপলক্ষে শ্রীকিরণ মৈত্রের নাটক 'সংকেত' অভিনয় করে প্রশংসা লাভ করেছেন। এই নাটকের দয়াময়, ডাঃ সফল রায় ও স্বপ্নার চরিত্রে যথাক্রমে পৃথ্বীশ গুহনিয়োগী, পার্থ-সারথি সেনগুপ্ত ও কল্যাণী মুখোপাধ্যায় সহজ-সরল অভিনয়ে চরিত্রগুলিকে যথা-যথ রূপদানে সক্ষম হয়েছেন। অন্যান্য চরিত্রে শঙ্কর, কল্যাণ, চন্দন, কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়, নিত্যানন্দ, প্রলয় এবং স্ত্রী-চরিত্রে গোপা ও অদিতি যথাযথ। নাটকটি পরিচালনা করেছেন অমিতাভ অধিকারী।

নবীন সন্ন্যাসী

ক্যালকাটা মিউজিক এন্ড আর্ট সেন্টারের একাদশ বার্ষিক উৎসব অনুষ্ঠিত হল সম্প্রতি মিনার্ভা রঙ্গমঞ্চে। আনুষ্ঠানিক উদ্বোধনের পর বিদ্যালয়ের ছাত্রীরা একক সঙ্গীত ও নৃত্য পরিবেশন করেন। সুস্মিতা ঘোষের 'ভরত নাট্যম' প্রশংসনীয়। অনিতা রায়ের 'সূর্য প্রণাম' নৃত্য দর্শকদের উপভোগ্য হয়ে ওঠে। কণ্ঠসঙ্গীতে পারদর্শিতা দেখান রমা ব্যানার্জী, ইলা মজুমদার, মণিদীপা দাস ও মিনতি মুখার্জী।

অনুষ্ঠানের প্রধান আকর্ষণ ছিল "নবীন সন্ন্যাসী" নাটক। পুরুষ চরিত্র-গুলিতে নারীরা রূপদান করেন। অপূর্ব এঁদের দলগত অভিনয়। বিভিন্ন চরিত্রে প্রতিভার স্বাক্ষর রাখেন অনিতা ঘোষ, দেবী দাস, বাণী ঘোষ, শম্পা পাল, গোপা পাল ও আরতি পাল।

শিবাজী সঙ্ঘ

গত ২৮শে জানুয়ারী শিবাজী সঙ্ঘের সদস্যগণ সঙ্ঘের বার্ষিক উৎসব উপলক্ষে দিলীপ বসাকের 'পদ্মপাতার জল' এবং দীপ্তিকুমার শীলের 'ঘেরাও' একাঙ্কিকা অভিনয় করেন। অভিনয়ে ছিলেন দীপ্তিকুমার শীল, দিলীপ বসাক, সুচেতা সেনগুপ্ত, অসীম সরকার, মিহির চন্দ্র, প্রশান্ত মজুমদার, অশোক চন্দ্র, সুশীল দে, মাঃ প্রদীপ শীল, ব্যোমকেশ ঘোষ, ডাঃ বিমল চন্দ্র। সঙ্গীতাংশে অংশ গ্রহণ করেন 'ঋতুরাজ' শিল্পী-গোষ্ঠী।

ওয়ালফোর্ড রিক্রিয়েশন ক্লাব

সম্প্রতি ওয়ালফোর্ড রিক্রিয়েশন ক্লাব স্টার রঙ্গমঞ্চে রমেশ গোস্বামীর নাটক "বেকার রায়" অভিনয় করলেন।

নাটকের বিভিন্ন চরিত্রে যাঁরা অংশ গ্রহণ করেছেন, তাঁদের নিজ নিজ চরিত্র প্রস্ফুটনে একাগ্রতা লক্ষ্য করা গেল এবং টিম-ওয়ার্ক মাঝে মাঝে ছন্দঃপতন ঘটিয়েছে ও সর্বোপরি সংলাপের অস্পষ্টতা কিছুটা থাকলেও নির্দেশকের দক্ষতায় তা অনেকাংশে দূরীভূত হয়েছে। নাটকটি পরিচালনা করেন অনাদিনাথ বসু এবং এই উপলক্ষে শশিভূষণ ও বারিদবরণ মুখোপাধ্যায় একটি স্মারকগ্রন্থ প্রকাশ করে তাঁদের সুরুচির পরিচয় দিয়েছেন, যার সম্পাদনায় ছিলেন সুশীল বন্দ্যোপাধ্যায়।

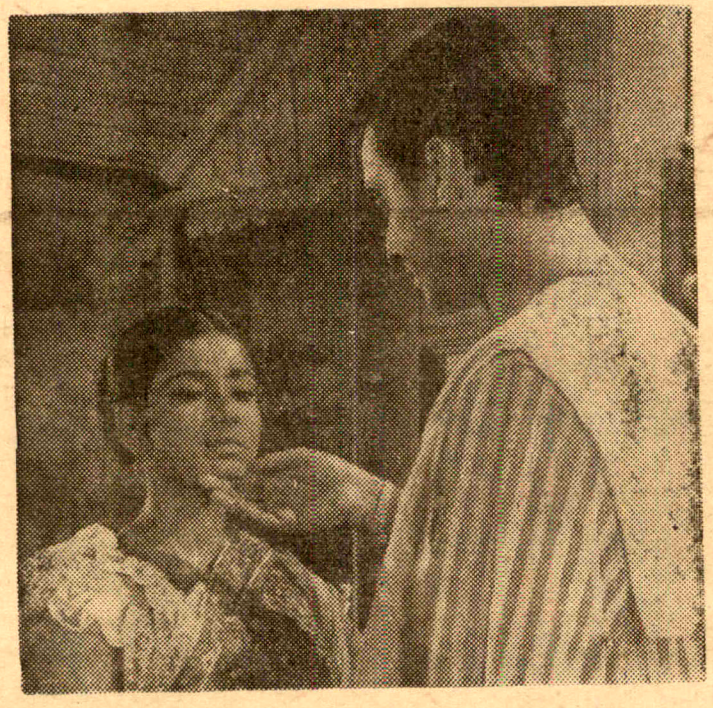

অজয় কর পরিচালিত 'পরিণীতা' ছবিতে মৌসুমি চট্টোপাধ্যায় ও সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়।

স্টুডিও খবর

দুরন্ত চড়াই

আগামী শুক্রবার ১৪ই ফেব্রুয়ারী রাধা, পূর্ণ ও আলোছায়ায় আসছে

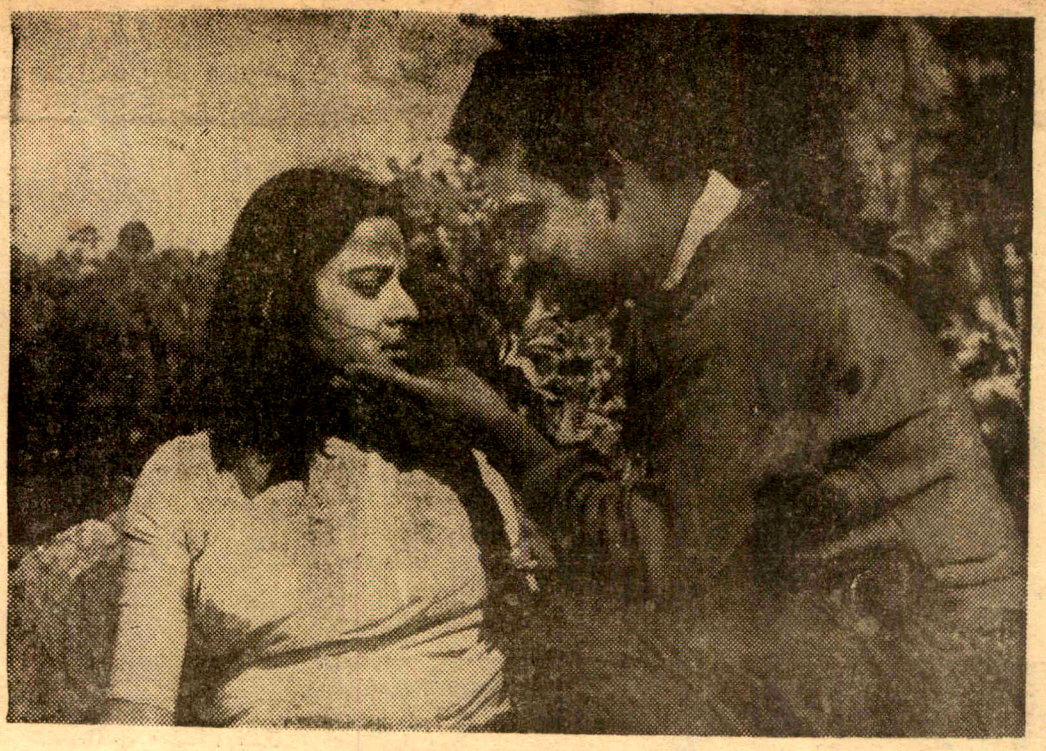

'দুরন্ত চড়াই' ছবিতে মাধবী মুখার্জী ও অনুপকুমার

ক্যাপিটল ফিল্মসের নতুন সুরের ছবি "দুরন্ত চড়াই"। ছবিখানি বহির্দৃশ্য প্রধান। বর্তমানকালের বহু বিতর্কিত কাহিনী-কার সমরেশ বসুর কাহিনী অবলম্বনে ছবিখানি তোলা হয়েছে। সুর দিয়েছেন —শ্যামল মিত্র। চিত্রনাট্য ও পরিচালনা করেছেন—জগন্নাথ চ্যাটার্জী। চিত্রগ্রহণে —শক্তি ব্যানার্জী। সম্পাদনায়—অনিল সরকার। ছবির প্রধান চরিত্রে আছেন—মাধবী মুখার্জী, অনুপকুমার, সবিতা চ্যাটার্জী (বম্বে), বিকাশ রায়, দিলীপ রায়, জহর রায়, হারাধন বন্দ্যোপাধ্যায়

শুক্রবার ১৪ই ফেব্রুয়ারী

রাধা • পূর্ণ • আলোছায়া

পদ্মশ্রী ০ মায়া ০ জয়া ০ নিউতরুণ ০ শ্রীমা ০ অন্নপূর্ণা ০ শ্রীকৃষ্ণ ও অন্যত্র

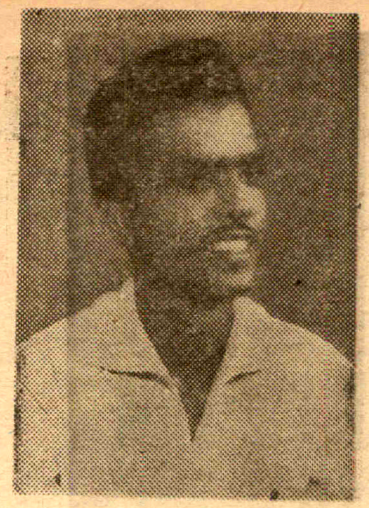

সঙ্গীতশিল্পী দিলীপ চক্রবর্তী সম্প্রতি আসাম, বিহার, উড়িষ্যার বিভিন্ন শহরে সঙ্গীত পরিবেশন করেছেন।

সোমেন চক্রবর্তী, অপর্ণা দেবী, শিশির বটব্যাল প্রমুখ। নেপথ্য সঙ্গীতে আছেন —হেমন্ত মুখার্জী, শিপ্রা বসু, শ্যামল মিত্র। পরিবেশনায় দায়িত্ব নিয়েছেন—প্রতিমা চিত্র মন্দির।

সংবাদকণা

কিউবার চলচ্চিত্র

বিপ্লবের পরে কিউবার চলচ্চিত্র-শিল্প বিস্ময়কররূপে বিকাশ লাভ করেছে। বিপ্লবপূর্ব কিউবার নিজস্ব চলচ্চিত্র-শিল্প ছিলই না বলা চলে। কিউবা ছিল হলিউড ছবির মুক্ত বাজার। যৌনধর্মী ও অপরাধমূলক ছবিতে হল-গুলি ভর্তি থাকত। কিউবানদের নিজস্ব চিন্তাধারায় চলচ্চিত্র নির্মাণের ও ছবি দেখাবার সুযোগ মিলত না। বিপ্লবের পরে গঠিত হয় দি কিউবান ইনস্টিটিউট অব সিনেমা আর্ট (আই-সি-এ-আই-সি)। ১৯৬০-৬৮ সাল, এই ক'বছরে আই-সি-এ-আই-সি-র উদ্যোগে পূর্ণাঙ্গ ছবি নির্মিত হয়েছে ৪৪টি ; প্রামাণিক চিত্র ২০৪ ; শিক্ষামূলক ছবি ৭৭ ; এ্যানিমেটেড কার্টুন ৪৯ ; লোকবিজ্ঞান ও লোকশিক্ষামূলক ছবি ৯৪টি এবং সংবাদচিত্র ৪৩৫টি। এই সঙ্গে ভ্রাম্যমাণ সিনেমা হয়েছে ৮১টি ইউনিট ; সিনেমার সংখ্যা বর্তমানে দাঁড়িয়েছে ১০৩টি, নির্মীয়মাণ রয়েছে ১৯টি। আরো ১৭টির কাজ আরম্ভ হয়েছে। উল্লেখযোগ্য যে, কিউবায় চলচ্চিত্র-শিল্পকে জাতীয় শিল্প করা হয়েছে।

গত ক'বছরে নির্মিত ছবিগুলির মধ্যে টুয়েল্ভ চেয়ারস্, দি এ্যাডভেঞ্চার অব জোয়ান কুইকুইন, লুসিয়া প্রভৃতি ছবি অসাধারণ জনপ্রিয় হয়েছে দেশে-বিদেশে। কিউবান চলচ্চিত্র নির্মাতারা সর্বাধিক কৃতিত্ব দেখিয়েছেন প্রামাণিক চিত্র নির্মাণে। তাঁদের খ্যাতি এত স্বীকৃতি পেয়েছে যে, বিভিন্ন দেশ থেকেও ছবি করার জন্য তাঁদের ডাক আসছে। ইতিমধ্যে কয়েকজন ভিয়েৎনাম, পর্তুগীজ গিনি, উরুগুয়ে, ব্রেজিল, আর্জেন্টিনা প্রভৃতি দেশে গিয়ে ছবি নির্মাণ করেছেন।

আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবে কিউবার স্থান উল্লেখযোগ্য। এ পর্যন্ত লিপজিগ, লন্ডন, কার্লোবিভ্যারি, মস্কো, ইতালীর সেসত্রি লেভেন্টে অনুষ্ঠিত লাতিন-আমেরিকান চলচ্চিত্র উৎসবে কিউবার ছবি পুরস্কার লাভ করেছে। কিউবানরা মনে করে এর মধ্যে চিলিতে অনুষ্ঠিত নতুন লাতিন আমেরিকান চলচ্চিত্র উৎসবে অর্জিত প্রথম পুরস্কারটি তাঁদের কাছে বেশি সম্মানের।

কিউবার বিপ্লব ও বিপ্লবের দ্বারা পরিবর্তনকে দেখান হয়েছে নিম্নোক্ত ছবি-গুলিতে ; দিস ল্যান্ড অব আওয়ার্স, ফরগটেন ল্যান্ড, রিলাংগো-১৮, লা ভিক্তিয়েন্ডা, হিস্ট্রি অব এ ব্যাটল, এন্ড আই বিকেম এ টিচার, স্টোরিজ অব রিভলিউশন, দি ইয়ং রেবেল। প্রামাণিক ছবিগুলির মধ্যে সর্বাধিক উল্লেখযোগ্য হয়েছে চে গুয়েভারার জীবন এবং সংগ্রামকে নিয়ে হাস্টা লা ভিকটোরিয়া সিয়েম প্রে, অর্থাৎ বিজয়ের পথে এগিয়ে যাও।

নাট্য প্রতিযোগিতা

পলতার প্রতিরূপ নাট্য প্রতিযোগিতা গত ১০ই হতে ২৩শে জানুয়ারী অনুষ্ঠিত হয়েছে। একাঙ্ক নাটকে প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্থান অধিকার করেছে যথাক্রমে বাণীরূপা (যখন বৃষ্টি নামল), কুশীলব (কিউবা), পঞ্চপ্রদীপ (কেয়াকুঞ্জ) ও নটরাজ (কলার ভেলা)। শ্রেষ্ঠ অভি-নেতা ও অভিনেত্রীর পুরস্কার পেয়েছেন—রবীন গোস্বামী (কিউবা) এবং শ্বেতা গুহ (সংক্ষিপ্ত সমাচার)।

পূর্ণাঙ্গ নাটকে প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্থান অধিকার করেছে নান্দনিক (রজনীগন্ধা), কুশীলব (অয়ন), পথিকৃৎ (একটি ঘোষণা)। শ্রেষ্ঠ অভিনেতা অলোক চট্টোপাধ্যায় (ফেরা), শ্রেষ্ঠা অভি-নেত্রী শিপ্রা সাহা (রজনীগন্ধা)।

সঙ্গীতকথা

সঙ্গীতানুষ্ঠান

গত ২৪শে জানুয়ারী তারাসুন্দরী পার্কে রবীন্দ্র ফুটবল এসোসিয়েশনের উদ্যোগে রণজিৎ সাহার পরিচালনায় এক

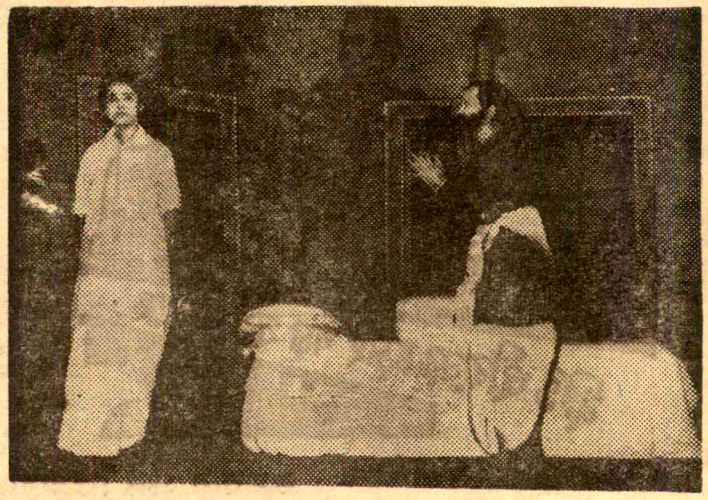

ক্যালকাটা মিউজিক এন্ড আর্ট সেন্টারের 'রবীন সন্ন্যাসী' নাটকে কুমারী বাণী মুখার্জী ও আরতি পাল।

সঙ্গীতানুষ্ঠান হয়েছে। এই অনুষ্ঠানে সঙ্গীত পরিবেশন করেন কিশোরকুমার (বম্বে), নির্মলেন্দু চৌধুরী, দ্বিজেন মুখার্জী, ইলা বসু, মীরা বিশ্বাস, অনু দত্ত, দিলীপ চক্রবর্তী।

এভারগ্রীন ক্লাব

এভারগ্রীন ক্লাবের উদ্যোগে নেপাল ভট্টাচার্য স্ট্রীটে গত ২৫শে জানুয়ারী এক সঙ্গীতানুষ্ঠান হয়েছে। অনুষ্ঠানে অংশ গ্রহণ করেন হেমন্ত মুখার্জী, নির্মলেন্দু চৌধুরী, পিন্টু ভট্টাচার্য, হিমাংশু বিশ্বাস, লক্ষ্মীকান্ত গাঙ্গুলী, যোগেশ দত্ত, ভানু ও রবি ঘোষ, অনুপ মুখার্জী, প্রতিমা বন্দ্যোপাধ্যায়, আরতি মুখার্জী।

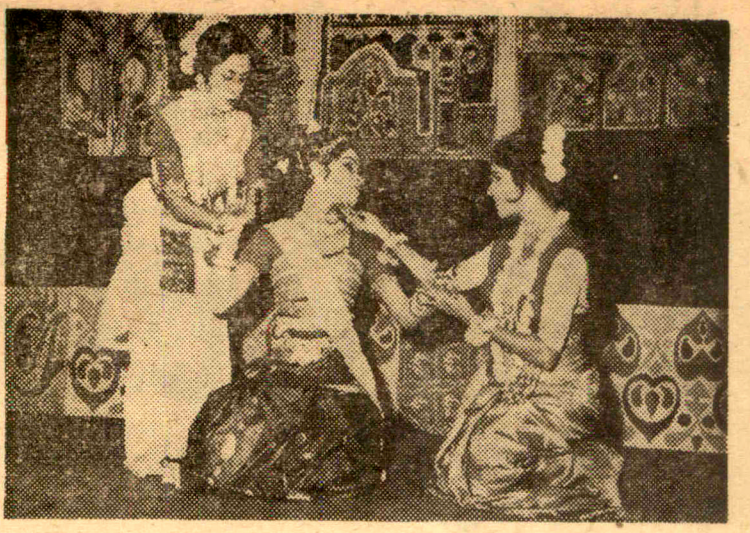

গান্ধর্বী প্রযোজিত রবীন্দ্র নাট্যোৎসবে 'শাপমোচন'-এর একটি দৃশ্য। পরিচালনা। শ্রীসন্তোষ ঠাকুর।

শোক-সংবাদ

বরিস কার্লোফের জীবনাবসান

বরিস কার্লোফের জীবনাবসান হয়েছে ৮১ বছর বয়সে। ত্রিশ দশকের চলচ্চিত্র দর্শকদের কাছে বরিস কার্লোফ একটি বিশেষ নাম। এই নামটির কথা মনে পড়লেই চোখের সামনে ভেসে ওঠে 'ফ্রাংকেনস্টাইন'-এর ভূত। দম বন্ধ করা এক ত্রাসের ছবি। 'ফ্রাংকেনস্টাইন' কথাটা সেই থেকে লোকের কাছে এবং সাহিত্যে ছড়িয়ে পড়েছে। এক নিষ্ঠুর দানব চরিত্রের সঙ্গে তাঁর নামটা এত জড়িয়ে পড়েছিল যে, বরিস কার্লোফের নাম করতেই একটা দানব চরিত্রের কথা লোকে মনে করে। অথচ তিনি আরো অনেক, প্রায় শ'খানেক চরিত্রে অভিনয় করেও ফ্রাংকেনস্টাইনকে ছাড়াতে পারেন নি। অভিনীত চরিত্রের সঙ্গে এমনভাবে নিজের নামটা জড়িয়ে যাওয়া কম সংখ্যক অভিনেতার জীবনে ঘটেছে। অথচ ব্যক্তি-জীবনে তিনি ছিলেন খুব সহৃদয়। সেই সহৃদয়তার পরিচয় তাঁর নিজের কথাতেই প্রকাশ পেয়েছে। যেমন, ফ্রাংকেনস্টাইন ছবির একটি দৃশ্যে আছে দানবকে দেখে যখন সবাই ভয়ে পালাচ্ছে একটি ছোট্ট মেয়ে তখন তাকে খেলার সাথী করে নিয়েছে। ফুলের পাপড়ি ছিঁড়ে ছিঁড়ে তারা জলে ভাসিয়ে দিচ্ছে। যখন সব পাপড়ি শেষ হয়ে গেল তখন ফ্রাংকেনস্টাইন রেগে-মেগে মেয়েটিকে মেরে ফেলল। ব্যাপারটি কার্লোফের ভাল মনে হয় নি। তিনি ছবির পরিচালককে বলেছিলেন মেয়েটিকে ওভাবে মেরে না ফেলে ফুলের পাপড়ি ফুরিয়ে গেলে দানব মেয়েটিকে জলে ভাসিয়ে দেবে এবং মেয়েটি যখন ডুবে যাবে তখন সে বিস্ময়বোধ করবে। কিন্তু পরিচালক এই প্রস্তাব গ্রহণ করেন নি। বরিস কার্লোফ তার জন্য দুঃখ প্রকাশ করেছেন।

বরিস কার্লোফের অভিনয়-জীবন শুরু হয় ১৯০৯ সালে রঙ্গমঞ্চের অভিনেতা হিসাবে। ১৯১৮-১৯-এর দিকে তিনি ছায়াচিত্রে আসেন। ফ্রাংকেনস্টাইন তোলা হয়েছিল ১৯৩১ সালে। এই সিরিজের দানব চরিত্রে তিনি মাত্র তিনটি ছবিতে অভিনয় করেছিলেন। চলচ্চিত্র, টেলিভিশন এবং মঞ্চে তিনি অন্য যেসব চরিত্রে অভিনয় করেছেন সেগুলি সামাজিক চরিত্র।

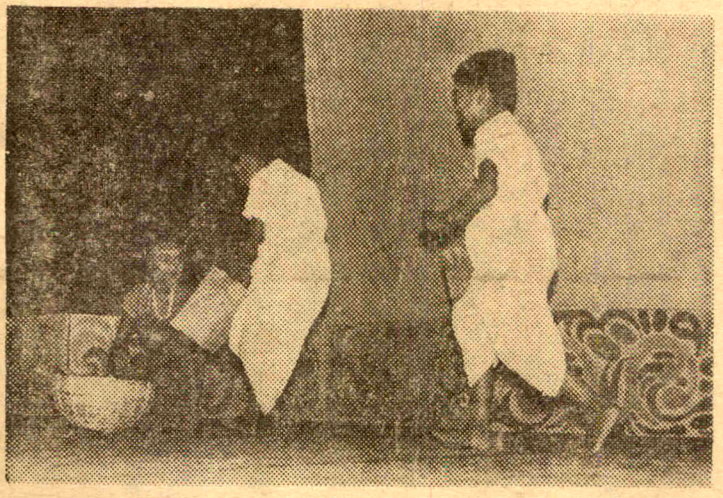

পূজারিণী আসর আয়োজিত শিশু উৎসবে জ্যোতিভূষণ চাকী রচিত 'ছড়ার দেশে চলো'র একটি দৃশ্যে।

কিস্তিতে ট্রানজিস্টর
"ন্যাশন্যাল ডিলুক্স"
১০ মাসিক কিস্তিতে ৩ ব্যান্ড অল ওয়ার্ল্ড পোর্টেবল ট্রানজিস্টর লাভ করুন। প্রতি গ্রাম ও শহরে প্রেরণের যোগ্য। আবেদন করুনঃ
Music & Sound (B.W.C.—10)
Post Box 1576, Delhi—6.

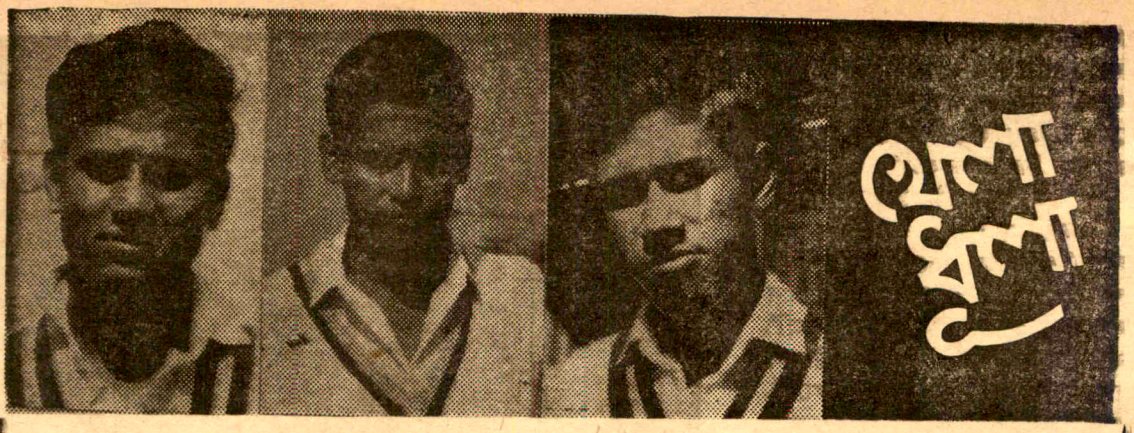

ক্রিকেট ও বাংলা দেশ ॥ আজ যদি বলা হয় যে, ক্রিকেট খেলায় বাংলা দেশ অনেক পিছিয়ে আছে, তাহলে অনেকেই হয়তো উপেক্ষার হাসি হাসবেন। কারণ ক্রিকেট খেলায় বাংলা দেশ যে সত্যি সত্যিই পিছিয়ে নেই তার প্রমাণ সম্প্রতি দিয়েছেন বাংলা দেশের ছোট ও বড় ক্রিকেট খেলোয়াড়রা। সর্বভারতীয় স্কুল ক্রিকেট প্রতিযোগিতার ফাইন্যালে অন্ধ্র-প্রদেশকে হারিয়ে দিয়ে বাংলা দেশের ছাত্র-খেলোয়াড়রা জয় করেছেন সি কে নাইডু ট্রফি। আর দীর্ঘ দশ বছর পরে বড়রা অর্থাৎ বাংলা ক্রিকেট দল উঠেছে রণজী ট্রফি ক্রিকেট প্রতি যোগিতার ফাইন্যালে। ফাইন্যাল খেলায় বম্বের বিরুদ্ধে খেলতে হবে বাংলাকে। এরপরেও যদি কেউ বলেন যে, ক্রিকেট খেলায় বাংলা দেশ যথেষ্ট পিছিয়ে আছে—তাহলে সেটি হবে হয়তো বা হাসির কথাই। কিন্তু সত্যিই কি তাই? সত্যিই কি ক্রি কেট খেলায় বাংলা দেশ অনেক এগিয়ে গেছে? মনে হয় বাংলা দেশের অতি বড় ক্রিকেট উৎসাহীও এ-কথা বলবেন না। ফুটবল খেলার মতো ক্রিকেট খেলাতেও বাংলা দেশ এখনো অসামান্য নৈপুণ্য দেখাতে পারে নি। কারণ দশ বছর পরে বাংলা এবার উঠেছে ফাইন্যালে আর সেই কবে, কতো বছর আগে একবারই বেড়ালের ভাগ্যে শিকে ছেঁড়ার মতো বাংলা লাভ করেছিল রণজী ট্রফি। সুতরাং...! না ও কথা না হয় আজ থাক। তবে আজ আর এ-কথা কেউই অস্বীকার করতে পারবেন না যে খেলাধূলার ক্ষেত্রে বাংলা দেশের ছোটরা অর্থাৎ ছাত্র খেলোয়াড়রা অনেক এগিয়ে গেছেন। ফুটবল প্রতিযোগিতায় এবার তাঁরা দিয়েছিলেন অসামান্য কৃতিত্বের পরিচয়—ক্রিকেটেও পিছিয়ে নেই তাঁরা। সি কে নাইডু ট্রফি জয় করাই তার সব চেয়ে বড় প্রমাণ। তাই আজ আর বলতে বাধা নেই যে স্কুলের ছাত্র খেলোয়াড়রাই বাংলা দেশের ভবিষ্যৎ। এখন সব থেকে বড় প্রয়োজন হলো, এই সব ছাত্র খেলোয়াড়দের গড়ে-পিঠে সত্যিকারের ভালো খেলোয়াড় হিসেবে তৈরি করে নেবার। আর তা যদি সম্ভব হয় তাহলে বলতে বাধা নেই যে খেলাধূলার ক্ষেত্রে বাংলা দেশের ভবিষ্যৎ সত্যিই উজ্জ্বল। আজ তাই বাংলা দেশের ক্রীড়াকর্তৃপক্ষদের কাছে বিনীত অনুরোধ, তাঁরা এগিয়ে এসে ভার নিন ভবিষ্যতের উজ্জ্বল সম্ভাবনার ভাস্বর এই সব ছাত্র খেলোয়াড়দের.....।

—শান্তিপ্রিয়

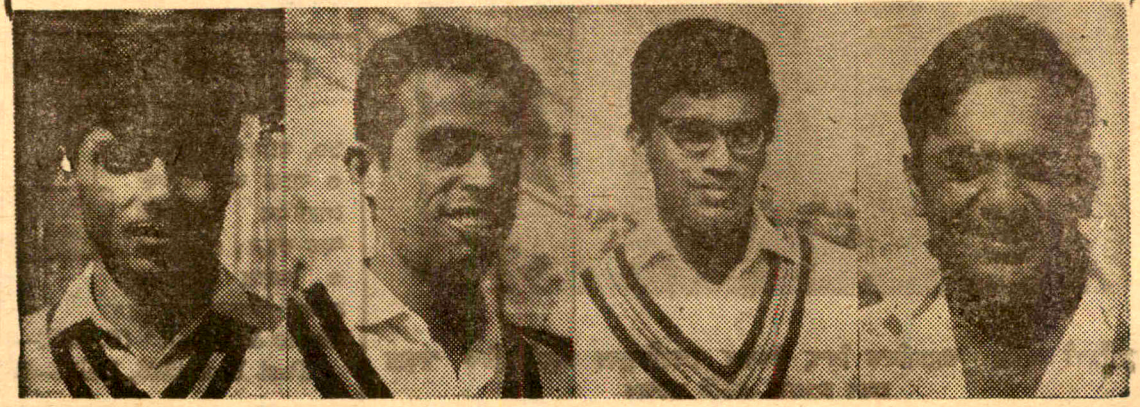

ক্রিকেটের খবর

অনেকদিন বাদে বাংলা আবার রণজী ট্রফির ফাইন্যালে উঠলো। দীর্ঘ দশ বছর পরে...। তবে এবার সেমি-ফাইন্যাল খেলায় মহীশূরকে ১৫৫ রানে হারিয়ে দিয়ে বাংলা যথেষ্ট কৃতিত্ব প্রদর্শন করেছে সত্য—কিন্তু এ-কথা আজ আর অস্বীকার করা যায় না এই খেলাটিতে বাংলার জয়লাভের পেছনে ছিলো বোলার-দের অভাবনীয় সাফল্য লাভ।

শুধু বোলিং-এই নয় ব্যাটিং-এতেও বাংলার পেস বোলার সুব্রত গুহ যে নৈপুণ্যের পরিচয় দিয়েছেন তার তুলনা মেলা ভার। প্রথম ইনিংসে বাংলার ব্যাটিং বিপর্যয়ের সময় অধিনায়ক অম্বর রায়ের সংগে যেভাবে সুব্রত গুহ খেলে-ছিলেন অমন অবস্থায় অনেক নামী ব্যাটসম্যানরাও ঠিক সেই রকমটি পারতেন কি না সন্দেহ। সত্যি কথা বলতে কি অম্বর রায় আর সুব্রত গুহই খেলার ধারা পাল্টে দিয়েছিলেন পুরোপুরি।

২৫১ রানের মাথায় শেষ হয়ে গিয়ে-ছিল বাংলার প্রথম ইনিংস। এর মধ্যে সুব্রত গুহ আর অম্বর রায় করেছিলেন যথাক্রমে ৭৫ ও ৭৬ রান। বোলিং-এ রাজাপ্পা ৩৩ রানে ৩টি উইকেট পান।

১৮৮ রানে শেষ হয়ে গেলো মহী-শূরের প্রথম ইনিংস। ফলে প্রথম ইনিংসের ফলাফলেই বাংলা এগিয়ে গেলো ৬৩ রানে। মহীশূরের সুব্রাহ্মনিয়াম ৫১ ও রঘুনাথ ৪৯ রান করা ছাড়া আর কেউ বিশেষ কিছু করতে পারেন নি। বোলিং-এ দিলীপ দোসী ও গোপাল বসু ৪টি করে আর সুব্রত গুহ পেয়ে-ছিলেন ২টি উইকেট।

দ্বিতীয় ইনিংসে বাংলা করলো ১৫৮ রান। এর মধ্যে আর মুখার্জী ২৩, ডি মুখার্জী ২৯ ও চুনী গোস্বামীর ২৬ রান ছিল। বোলিং-এ প্রসন্ন পেয়ে-ছিলেন ৬টি উইকেট ৪১ রানের বিনিময়ে।

কিন্তু তারপর দ্বিতীয় ইনিংস শুরু করে মাত্র ২০ রানের মধ্যে মহীশূর ৬টি উইকেট হারালে বাংগালোরের দর্শকরা ক্ষেপে গিয়ে মাঠে শুরু করলেন লঙ্কা-কাণ্ড। আগুন লাগলো মাঠে, ভাঙলো চেয়ার-বেঞ্চি ক্ষতি হলো পিচের। সেই সংগে বন্ধ হয়ে গেলো খেলা।

যাই হোক পরের দিন খেলা আরম্ভের এক ঘণ্টার মধ্যে আউট হয়ে গেলেন মহী-শূরের ব্যাটসম্যানরা। দ্বিতীয় ইনিংস-এ

গল্পছলেও সাত্তি

১৯৫৫ সালের কথা। দক্ষিণ আফ্রিকা তখন গিয়েছে ইংলণ্ড সফরে। লাঙ্কাশায়ার কাউণ্টি দলের বিরুদ্ধে খেলার সময় পল উইনসলো নামে দক্ষিণ আফ্রিকার একজন ব্যাটসম্যান লাঙ্কাশায়ার দলের বোলার এ্যাস্টনকে মেরে ছাতু করে দিয়েছিলেন।

এ্যাস্টনের এক ওভারে উইন-সলো করলেন ৩০ রান। রানগুলো হয়েছিল এইভাবে—৪, ৪, ৬, ৬, ৪, ও ৬।

তবে ১৯৩৫ সালে সি স্মার্ট নামে আর একজন খেলোয়াড় উইনসলো থেকেও করেছিলেন আরো দু'রান বেশি। তিনি জি হিল নামে একজন বোলারের এক ওভারের ছ'টা বলের মধ্যে ৪টি পাঠিয়েছিলেন ওভার বাউণ্ডারীতে আর বাকী দু'টো বাউণ্ডারীতে। মেরেছিলেন এইভাবে—৬, ৬, ৪, ৬, ৬ ও ৪=৩২ রান।

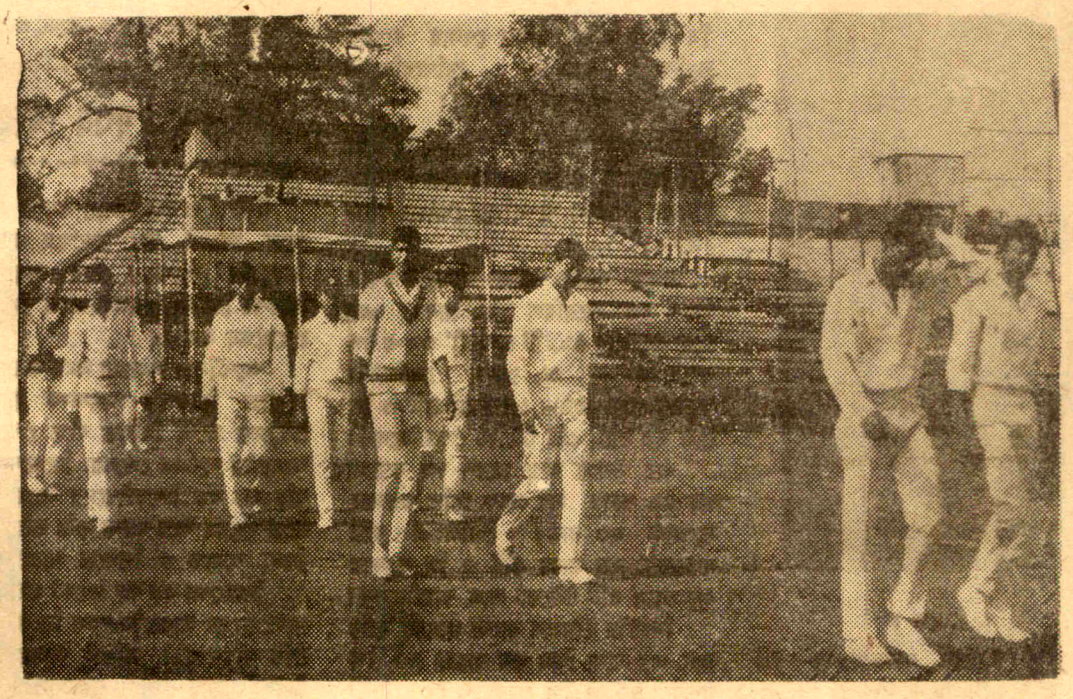

নিখিল ভারত আন্তঃরাজ্য স্কুল ক্রিকেট প্রতিযোগিতা সি· কে· নাইডু ট্রফির ফাইন্যালে বাংলার বিরুদ্ধে অন্ধ্রের খেলোয়াড়রা ফিল্ডিং করতে যাচ্ছেন।

১০৬ রানের বেশি করতে পারলেন না তাঁরা। একমাত্র প্রসন্ন মেরে খেলে করেছিলেন ৪৯ রান। বোলিং-এ সুব্রত গুহ ৭টি উইকেট পেয়েছিলেন ৩৪ রানের বিনিময়ে ও দোসী পেয়েছিলেন ৫টি উইকেট ২৬ রান দিয়ে।

ফলে রণজী ট্রফি ক্রিকেট প্রতিযোগিতার সেমিফাইন্যালে মহীশূরকে ১১৫ রানে হারিয়ে দিয়ে বাংলা দল উঠলো ফাইন্যালে। ওদিক থেকে উঠেছে বম্বে। বাংলা আর বম্বে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় অবতীর্ণ হবে এই সপ্তাহেই। খেলাটি হবে বম্বেতেই। ফাইন্যাল খেলায় বম্বের কাছে সম্ভবত বাংলা হারবে। তবে দেখার বিষয় হলো যে খেলাটা শেষ পর্যন্ত আকর্ষণীয় হয়ে ওঠে কি না.....! ।

॥ দুমকে ॥

মহারাষ্ট্রের দুমকে সর্বভারতীয় স্কুল ক্রিকেট প্রতিযোগিতায় সুন্দরভাবে বোলিং করে আকর্ষণ করেছিলেন সকলের দৃষ্টি।

বাংলা এবার সর্বভারতীয় স্কুল ক্রিকেট প্রতিযোগিতায় বিজয়ীর পুরস্কার হিসেবে লাভ করলো সি কে নাইডু ট্রফি। ফাইন্যালে তাঁরা ৩১৯ রানে হারিয়ে দিয়েছেন অন্ধ্রকে।

সত্যি কথা বলতে কি, খেলাটি হয়েছে একতরফা। কারণ বাংলার বোলারদের বিরুদ্ধে অন্ধ্র প্রদেশের ব্যাটসম্যানরা মোটে দাঁড়াতেই পারেন নি। দু'ইনিংস মিলেও তাঁদের রান সংখ্যা একশ' পোরে নি। অবশ্য এর পেছনে ছিলো বাংলা বোলার-

॥ নরসিং রাও ॥

সি· কে· নাইডু ট্রফির খেলায় অন্ধ্রের নরসিং ব্যাটিং-এ দেখিয়েছিলেন অভাবনীয় কৃতিত্ব।

দের মারাত্মক বোলিং। প্রথম ইনিংসে আর ব্যানার্জী ও ডি সরকার আর দ্বিতীয় ইনিংসে পি চেল সাঙ্ঘাতিক বোলিং করেছিলেন।

প্রথমে ব্যাটিং করার সুযোগ পেয়ে বাংলা দল করেছিল ১৬৯ রান। এর মধ্যে এস রায় ৫১, টি চক্রবর্তী ৩২ ও পি নন্দী করলেন ৩১ রান। বোলিং-এ অন্ধ্রের জেড রহমান ৬৪ রানে ৪টি ও সি রাজ ২০ রানে ৩টি উইকেট পেয়েছিলেন।

এর উত্তরে অন্ধ্র প্রদেশ দল করলো মাত্র ৫৯ রান। সব থেকে বেশি করলেন মুস্তাক ২০ রান। বোলিং-এ আর ব্যানার্জী ২৪ রানে ৫টি ও ডি সরকার ২০ রানে ৩টি উইকেট লাভ করেছিলেন।

দ্বিতীয় ইনিংসে বাংলা করলো ২৪৬ রান, এর মধ্যে ছিল এস রায়ের ৫৩, পি নন্দীর ৪৬ ও পি চেলের ৩০ রান। বোলিং-এ জেড রহমান ৬৯ রানে ৫টি ও চন্দ্ররাজ ৭৮ রানে ৩টি উইকেট পান।

বাংলার স্কুল দলের ওপনিং ব্যাটসম্যান জুটী সমীর ভট্টাচার্য ও পলাশ নন্দী দ্বিতীয় দফায় ইনিংস শুরু করতে যাচ্ছেন।

অন্ধ্রের দ্বিতীয় ইনিংস শেষ হলো মাত্র ৩৭ রানে। পি চেল ৬ ওভার বল করে ৩টি মেডেন দিয়ে ১২ রানের বিনিময়ে পেয়েছিলেন ৭টা উইকেট।

ফলে ৩১৯ রানে অন্ধ্রকে হারিয়ে দিয়ে বাংলা স্কুল দল লাভ করলো সর্বভারতীয় স্কুল ক্রিকেট প্রতিযোগিতায় বিজয়ীর সম্মান সি কে নাইডু ট্রফি।

পাঠকের কলম থেকে

ইংলণ্ড ও অস্ট্রেলিয়া সফরে ভারতীয় স্কুল ক্রিকেট দল রেখেছে এক উন্নত ক্রিকেটের স্বাক্ষর। যার জন্য তাঁরা বিদেশী ক্রিকেট সমালোচকদের কাছ থেকে পেয়েছেন বাহবা।

অস্ট্রেলিয়া সফরের সময় তাঁরা বিশ্ববিখ্যাত ক্রিকেটার ডোনাল্ড ব্র্যাডম্যান প্রমুখের সঙ্গে মিলিত হতে পেরেছেন। আমাদের স্কুলের ছেলেরা বিদেশে গিয়ে যদি বড় বড় ক্রিকেটারদের সাথে মিলিত হতে পারেন তবে আশা করি তাঁরা অনেক কিছু বুঝতে ও শিখতে পারবেন।

বিদেশের বড় বড় ক্রিকেট মহারথীরাই বলেছেন যে ভারতীয় স্কুল ক্রিকেট দলটি বেশ শক্তিশালী। সত্যিই আমাদের স্কুল ক্রিকেট দলটি বেশ শক্তিশালী। কিন্তু দুঃখের বিষয় ভারতের মতো এতবড় একটি দেশে আজ পর্যন্ত একটি ফার্স্ট

॥ জারম্যান ॥

অস্ট্রেলিয়ার ১২ং উইকেটরক্ষক বেরী জারম্যান ওয়েস্ট ইণ্ডিজের বিরুদ্ধে শেষ টেস্টে খেলার সুযোগ পেলেন না। এ খবর পাবার পরই জারম্যান জানিয়েছেন যে, এ বছরের শেষে তিনি অস্ট্রেলিয়া দলের সংগে ভারত ভ্রমণে আসতে পারবেন না। কারণ হিসেবে তিনি অবশ্য ব্যক্তিগত অসুবিধার কথা জানিয়েছেন।

বোলারের মুখ দেখা গেল না। একথা শুধু হেমু অধিকারীই বলেন নি, একথা বলেছেন প্রতিটি ক্রিকেট অনুরাগী। ভারতীয় টেস্ট ক্রিকেট দল যখন বিদেশে যায় ক্রিকেট অনুরাগীরা তখন আশা তো দূরের কথা হতাশামগ্ন হয়ে থাকেন কি জানি কখন কি হয়। ক্রিকেট খেলায় যদি জিততে হয় তবে ফাস্ট বোলার একান্ত প্রয়োজন। কিন্তু আমাদের দেশে আজ পর্যন্ত কোন ফাস্ট বোলার তৈরি হলো না। এ ব্যাপারে ভারতীয় ক্রিকেট কণ্ট্রোল বোর্ডকে আরও বেশি করে সক্রিয় হতে হবে। ক্রিকেট খেলা প্রতিটি স্কুলে প্রসারিত করবার জন্য তাঁদের এগিয়ে আসতে হবে।

স্কুল ক্রিকেট দলের ম্যানেজার হেমু অধিকারী বলেছেন যে, অস্ট্রেলিয়ার স্কুলের ছেলেরা ফাস্ট বোলিং ব্যাটিং এবং ফিল্ডিং-এ বেশ উন্নত।

তাঁদের উন্নতির মূলে নিশ্চয়ই কারণ আছে।

অস্ট্রেলিয়ার প্রতিটি স্কুলের নিজের ভাল মাঠ এবং ক্রিকেট খেলার যাবতীয় সরঞ্জাম আছে। এবং স্কুলের ছেলেরা ১০-১২ বৎসর থেকেই নিয়মিত অনুশীলন করে। অস্ট্রেলিয়ার ক্রিকেট সংস্থা এ ব্যাপারে প্রতিটি স্কুলকে সাহায্য করে থাকেন। আমাদেরও উচিত এদিকে নজর দেওয়া।

আশা করা যায় যে, ভবিষ্যতে স্কুল দলের খেলোয়াড়েরাই ভারতীয় টেস্ট ক্রিকেট দলের হয়ে খেলবেন। সুতরাং তাঁদের এখন থেকেই ঠিকমতো গড়ে তোলা দরকার। স্কুল ক্রিকেট দল বিদেশে পাঠিয়ে ভারতীয় ক্রিকেট সংস্থা বেশ ভাল কাজ করেছেন। কারণ যদি এখন থেকেই তাঁরা বিদেশে গিয়ে বিদেশের আবহাওয়া অনুভব করতে পারেন, তবে আশা করি পরবর্তী সময়ে বিদেশে গিয়ে তাঁরা আরও ভাল নজীর গড়ে তুলবেন।

বিদেশ সফর শেষে তাঁরা যখন দেশে ফিরে এলেন তখন তাঁদের বক্তব্য শুনতে হবে এবং তাঁরা যে মত দেবেন সেভাবে আমাদের এগিয়ে যাওয়া দরকার।

ভারতীয় স্কুলের ছেলেদের জন্য শুধু একটিমাত্র সর্বভারতীয় প্রতিযোগিতা প্রচলিত আছে তা হলো সি·কে· নাইডু ট্রফি ক্রিকেট প্রতিযোগিতা।

কিন্তু দুঃখের বিষয় এবারকার প্রতিযোগিতায় একটি অভিযোগ উঠেছে। যে অভিযোগ করা হয়েছে বাংলা স্কুল ক্রিকেট দলের অধিনায়ক রাজা মুখার্জী এবং স্পিন বোলার দীপঙ্কর সরকারের বিরুদ্ধে। যেহেতু তাঁরা রণজী ট্রফি প্রতিযোগিতায় বাংলা দলের প্রতিনিধিত্ব করেছেন তাই তাঁদের বাংলা স্কুল ক্রিকেট দলের হয়ে খেলা নাকি অবৈধ। এটা নাকি একটা নিয়ম।

একটি স্কুলের ছেলে যদি খেলায় দক্ষতার জন্য তাঁর প্রদেশের হয়ে রণজী ট্রফিতে খেলেন তবে তাঁকে স্কুল ক্রিকেট প্রতিযোগিতায় কেন খেলতে দেওয়া হবে না। এটা তরুণ ছেলেদের প্রতিভা প্রকাশের পক্ষে বাধা বলে আমি মনে করি।

রাজা ও দীপঙ্কর তো গতবারও রণজী ক্রিকেট প্রতিযোগিতায় বাংলার হয়ে খেলেছিলেন। তবে তাঁদের ভারতীয় স্কুল ক্রিকেট দলে কেন নেওয়া হয়েছিল?

আর বাংলার স্কুল ক্রিকেট দলের খেলোয়াড়দের নাম তো অনেক আগেই ঘোষণা করা হয়েছিল। তবে তাঁদের অভিযোগ খেলার আগে কেন উত্থাপন করেন নি।

—ধূমকেতু

বেলাকোবা, জলপাইগুড়ি।

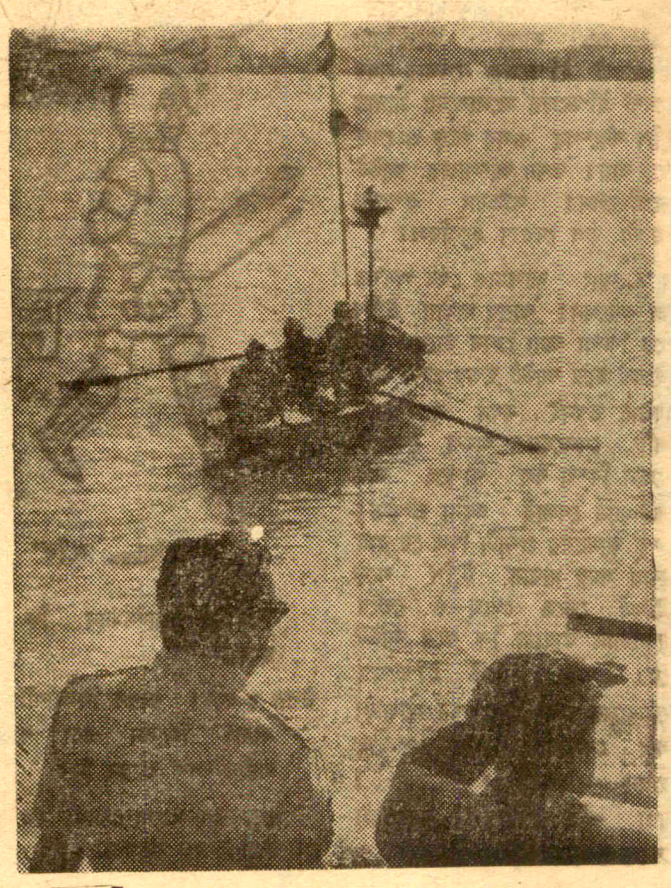

ম্যাল-ও-ওয়র জেটি থেকে যাত্রা শুরু করে আর শহর কলকাতাকে পেছনে ফেলে এগিয়ে চলেছে ক্ষুদ্র তরণী 'কানোজী আংরে'। লেঃ জর্জ ডিউক আর পিনাকীরঞ্জন চ্যাটার্জীকে নিয়ে সাগরের বুক চিরে এই তরণী গিয়ে পৌঁছবে আন্দামানের তীরে। দুঃসাহসী এই প্রচেষ্টায় সাফল্যের আশায় সকলেই আজ প্রহর গুণছেন।

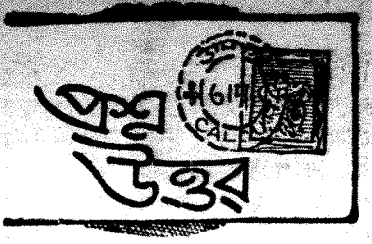

শুশান্ত দে, (নাটাগড়, ২৪ পরগনা)

প্রশ্ন : ক্রিকেট ব্যাটের দৈর্ঘ্য কতো? দুই উইকেটের মধ্যে দূরত্ব কতো? উইকেট কতো চওড়া? মাটির ওপর থেকে উইকেট কতো উঁচু হবে?

উত্তর : ক্রিকেট ব্যাট চওড়ায় ৪¼ ইঞ্চি ও ৩৮ ইঞ্চির বেশি লম্বায় হবে না। উইকেট ৯ ইঞ্চি চওড়া হবে। মাটির ওপর থেকে স্টাম্পগুলো ২৮ ইঞ্চি উঁচু হবে।

হীরেন্দ্রমোহন ভদ্র (সুভাষপল্লী, শিলিগুড়ি)

প্রশ্ন : ৩১শ সংখ্যার সাপ্তাহিক বসুমতীতে একটা প্রশ্নের উত্তর বের হয়েছিল—প্রশ্নটা ছিল· "কোন ব্যাটসম্যানের মাথায় টুপি আছে। কিন্তু একটি রান করার সময় তার মাথার টুপি উড়ে গিয়ে পড়লো স্টাম্পের ওপর। বেলও পড়ে গেলো। ব্যাটসম্যান কি আউট হবে না 'নট আউট' থাকবে? এই প্রশ্নের উত্তরে বলা হয়েছিল যে "ব্যাটসম্যান আউট হবে না।"

কিন্তু এই উত্তরটা ভুল। কারণ ১৯৬০-৬১ সালে অস্ট্রেলিয়া ও ওয়েস্ট ইণ্ডিজের খেলার সময় ওয়েস্ট ইণ্ডিজের সলোমনের মাথার টুপি স্টাম্পের ওপর পড়ে ও বেল পড়ে যায়। তখন আম্পায়ার আউট দিয়েছিলেন। সুতরাং ওপরের উত্তরটা ভুল দেওয়া হয়েছিল।

উত্তর : সুতরাং আপনিও শেষ পর্যন্ত ভুল করলেন! কারণ মাথার টুপি পড়ে কিম্বা অন্য কোন ভাবে হিট উইকেট হয়ে আউট হবার প্রশ্ন ওঠে একমাত্র তখনই যখন ব্যাটসম্যান বলটি খেলছেন অথবা খেলতে যাচ্ছেন কিম্বা বল আসছে আর ব্যাটসম্যান খেলার জন্যে প্রস্তুত। কিন্তু আমাদের প্রশ্নটা ছিল যে রান নেবার সময় মাথার টুপি পড়ে উইকেট ভেঙে গেছে—ও ক্ষেত্রে ব্যাটসম্যান তাহলে কি করে আউট হবে। আর ওয়েস্ট ইণ্ডিজের সলোমনের ঘটনা ছিল যখন সলোমন বলটা খেলছেন কিম্বা খেলতে যাচ্ছেন — তখনই...। সুতরাং...! আশা করি আপনি ব্যাপারটা বুঝতে পেরেছেন।

সংঘশ্রী ভদ্র (সংঘশ্রী ক্লাব, সুভাষপল্লী, শিলিগুড়ি)

প্রশ্ন : বাউণ্ডারী সীমানার কাছে একজন ফিল্ডার ফিল্ডিং করছেন। সেই সময় ব্যাটসম্যান উঁচু করে একটা বল মারলেন। বলটা শূন্যে বাউণ্ডারী লাইন পার হয়েছিল। কিন্তু ফিল্ডারটি লাইনের মধ্যে থেকে ঝুঁকে পড়ে ক্যাচটা লুফে

"বাংগালোরের স্মৃতি"

নিলেন। ব্যাটসম্যান কি আউট হবে?

উত্তর : হবে। কারণ ফিল্ডারটি মাঠের মধ্যেই ছিলেন এবং বাউণ্ডারী লাইন স্পর্শ করেন নি।

সোমনাথ গঙ্গোপাধ্যায় (হালিসহর, গোলাবাড়ি, ২৪ পরগনা)

প্রশ্ন : বর্তমানে অস্ট্রেলিয়া সফরকারী ওয়েস্ট ইণ্ডিজ দলের ব্যর্থতার মূল কারণ কি বলে আপনি মনে করেন?

উত্তর : আমার মনে হয় খেলোয়াড়দের উদ্দাম আচরণই এর মূল কারণ। আরো একটা বিষয় হলো, অস্ট্রেলিয়া দলে প্রতি বছরই একজন-আধজন নতুন কিন্তু সত্যিকারের ভালো খেলোয়াড় দেখা যায়। কিন্তু ওয়েস্ট ইণ্ডিজ দলটি হলো সেই পুরনো খেলোয়াড় সম্বলিত। তার ওপর ওয়েস্ট ইণ্ডিজের হল-গ্রিফিথের দিনও শেষ হয়ে এসেছে। মনে হয় ওয়েস্ট ইণ্ডিজ দলের ব্যর্থতার মূল কারণ হলো—এইগুলিই...।

সুভাষচন্দ্র শীল (ঘুটিয়াবাজার, হুগলী)

উত্তর : আপনি ঐ সব আসরের জন্যে C/o. আকাশবাণী কলকাতা কেন্দ্র, ইডেন গার্ডেনস, কলকাতা—এই ঠিকানায় যোগাযোগ করতে পারেন।

পরিতোষ নাগ (বেলাকোবা, জলপাইগুড়ি)

॥ চিত্র পরিচয় (২১৭২ পৃঃ) ॥
ওপরে বাঁ দিক থেকে : সুব্রত গুহ, অম্বর রায়, দীপঙ্কর সরকার।
নিচে বাঁ দিক থেকে : রাজা মুখার্জী, সুব্রহ্মনিয়ম, দিলীপ দোসী ও ই প্রসন্ন।
ছবিগুলো তুলেছেন : সুধীর মল্লিক ॥

উত্তর : তোমার লেখাটা তো ছাপা হলো। রিপ্লাই কার্ডও পেয়েছি। শীঘ্রই তোমায় চিঠি দিচ্ছি।

অরুণকুমার গুহকর্মকার (তেজগঞ্জ, বর্ধমান)

প্রশ্ন : কোন্ ভারতীয় খেলোয়াড় একই টেস্টের দু' ইনিংসেই সেঞ্চুরী করেছেন?

উত্তর : বিজয় হাজারে অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে ১৯৪৭-৪৮ সালে দু' ইনিংসেই সেঞ্চুরী করেছিলেন।

রাজিৎকুমার চন্দ (এইচ· বি· টাউন, সোদপুর)

প্রশ্ন : চুনী গোস্বামী কি কোন অলিম্পিক খেলেছেন, প্রদীপ ব্যানার্জী কি ১৯৬৬ সালে ফুটবলে ভারতের প্রতিনিধিত্ব করেছিলেন?

উত্তর : হ্যাঁ খেলেছেন। করেছিলেন।

সম্পাদিকা—জয়ন্তী সেন
বসুমতী (প্রাঃ) লিঃ-এর পক্ষে ১৬৬, বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী স্ট্রীটস্থ কলিকাতা-১২
বসুমতী প্রেস হইতে শ্রীসুকুমার গুহমজুমদার কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

দুইটি বা তিনটি সন্তানের পরিবারই আদর্শ পরিবার

জেনে রাখুন :

- পরিবারকল্যাণই পরিবার পরিকল্পনা
- যে কোন পরিবার পরিকল্পনাকেন্দ্রেই বিনামূল্যে নিরোধ এবং যাবতীয় পরামর্শ পাওয়া যায়
- হিন্দুস্থান লিভারে উৎপাদিত দ্রব্যাদি যে সব দোকানে বিক্রী হয় সেই সব দোকানে মাত্র ১৫ পয়সায় তিনটি করে নিরোধ কিনতে পাওয়া যায়
- তিনটি সন্তান না হওয়া পর্য্যন্ত নিরোধ ব্যবহার করে দুই সন্তানের জন্মের মধ্যবর্ত্তী সময়ের ব্যবধান বাড়ান সম্ভব
- তিনটি সন্তানলাভের পর স্থায়ীভাবে জন্মনিরোধের জন্যে অস্ত্রোপচারই শ্রেষ্ঠ পদ্ধতি

আজই আপনার নিকটবর্তী যে কোন পরিবার পরিকল্পনাকেন্দ্র বা স্বাস্থ্যকেন্দ্রে যোগাযোগ করে বিনামূল্যে অভিজ্ঞ চিকিৎসকের পরামর্শ নিন।

(পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পরিবার পরিকল্পনা সংস্থা কর্তৃক প্রচারিত)

Thursday, 13th February, 1969 SAPTAHIK BASUMATI Regd. No. C 71
Price : 30 Paise Gram : "Basumati" Phone : 34-7771, 72, 73, 74

বিভিন্ন রুচিবৈচিত্র্যে কুকমা :

কিন্তু সবার রুচিকেই কুকমা পরিতৃপ্ত করে !

গ্রাম : 'স্পাইসমার্ট'

মিল—কাশীপুর

শিশুর খাদ্যে ও রুগীর পথ্যে নির্ভয়ে ব্যবহৃত হয়
'কুকমা'—সর্বাধিক বিক্রীত গুঁড়ো মশলা
পনের লক্ষ প্যাকেট মাসিক বিক্রয়
১২০ বৎসরের অধিক প্রাচীন ও বর্তমানে মশলার বৃহত্তম প্রতিষ্ঠান

কৃষ্ণচন্দ্র দত্ত (স্পাইস) প্রাঃ লিঃ

২৩৫ নং মহর্ষি দেবেন্দ্র রোড, পোস্তা, কলিকাতা-৭

সাপ্তাহিক বসুমতী

জনতার রায়ে পশ্চিমবঙ্গে আবার যুক্তফ্রন্ট সরকার

বর্ষঃ ৩৫শ সংখ্যা, বৃহস্পতিবার, ৮ই ফাল্গুন, ১৩৭৫ বঙ্গাব্দ] OLDEST WEEKLY OF NORTH INDIA [73 year, No. 35, 20th Feb. 1969

সূচীপত্র

বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা
সম্পাদকীয়		২১৭৯
আজকের মানুষ		২১৮০
রবীন্দ্রনাথ ও সুভাষচন্দ্র (ধারাবাহিক প্রবন্ধ)	— শঙ্করীপ্রসাদ বসু	২১৮১
বঙ্গদর্শন		২১৮৭
ভারতদর্শন		২১৯০
কর্মযজ্ঞের সুরু হোক (প্রবন্ধ)	— প্রদ্যোত রায়	২১৯৪
জন্মদিনে (কবিতা)	— দুর্গাদাস সরকার	২১৯৫
নিকট দূরে	— কৌশিক বসু	২১৯৬
সপ্তাহের বোঝা	— কৃত্তিবাস ওঝা	২১৯৮
এই নির্বাচন : পশ্চিমবাংলায় নব ইতিহাস সৃষ্টি	— পর্যবেক্ষক	২২০১
রঙ্ বদলের পালা	— কুমুদ দাশগুপ্ত	২২০৪
২১শে ফেব্রুয়ারীর প্রজ্বলিত অগ্নিশিখা ছড়িয়ে পড়েছে	— কল্পতরু সেনগুপ্ত	২২০৫

যে কোন
গয়না
আর
আসল
গ্রহরত্ন
কেনার
দক্ষিণ কোলকাতায়
নামকরা প্রতিষ্ঠান

ফোন : ৪৬-৬২৫৮

সন অ্যাণ্ড গ্র্যাণ্ডসন অব লেট
এম. বি. সরকার

সূচীপত্র

বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা
বসন্ত আসে	— বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়	২২০৯
প্রবন কি সাঁতার কাটবে (কবিতা)	— শরৎসুনীল নন্দী	২২১০
বীজ্ঞা গালিব	— অমিয়কুমার হাটি	২২১১
পিতা-পুত্র (গল্প)	— রণজিৎকুমার সেন	২২১৩
মধ্যবর্তী নির্বাচন ও সাপ্তাহিক বসুমতী	— সাগর বিশ্বাস	২২১৪
কলকাতার পথনির্দেশ	— রেণু ঘোষ	২২২০
চিরঞ্জীব	— বেলা দেবী	২২২২
বাবলা কাঁটা বিঁধে গেছে (কবিতা)	— জয়ন্ত সাহা	২২২৪
পথ কে রুখবে? (ধারাবাহিক উপন্যাস)	— মনোজ বসু	২২২৫
বৃদ্ধমণ্ড ওদেশে এক	— শিলালি	২২২৮
খবর বলছি		২২৩১
বৃদ্ধজগৎ		২২৩২
খেলাধুলো	—শান্তিপ্রিয়	২২৩৫

॥ নাটক ॥ নাটক ॥ নাটক ॥ নাটক ॥ নাটক ॥

বহুকাল পরে আবার পাওয়া যাচ্ছে।

ম হা ক বি

গিরিশচন্দ্র ঘোষের রচনাবলী

প্রথম খণ্ড : প্রফুল্ল, ম্যাকবেথ, ঠাকুর শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেব ও স্বামী বিবেকানন্দ সম্পর্কে চারটি প্রবন্ধ, তিনখানি গীতিনাট্য ও গ্রন্থপরিচয়। পৃষ্ঠা সংখ্যা ৪১২। মূল্য দশ টাকা।

দ্বিতীয় খণ্ড : সিরাজউদ্দৌলা ; ষ্যায়সা কা ত্যায়সা ; জনা ; দোললীলা ও গ্রন্থপরিচয়। পৃষ্ঠা সংখ্যা ৩৫৮। মূল্য দশ টাকা।

তৃতীয় খণ্ড : পাণ্ডবগৌরব, বলিদান, আবুহোসেন ও গ্রন্থপরিচয়। পৃষ্ঠা সংখ্যা ৩৫২। মূল্য দশ টাকা।

চতুর্থ খণ্ড : চৈতন্যলীলা, শ্রান্তি, মলিনারিকাশ, হীরার ফুল, বিবিধ রচনা ও গ্রন্থপরিচয়। পৃষ্ঠা সংখ্যা ৩০২। মূল্য দশ টাকা।

পরমহংসদেব শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁর ভক্ত-শিরোমণি অতি প্রিয় নোটো গিরিশকে বলেছিলেন, —"অভিনয়ের প্রয়োজন আছে বৈ-কি—ওতে লোকশিক্ষা হবে। আর তোমার লেখা—ও যে ভারি ভাল হয়েছে।"

প্রতিটি খণ্ড বোর্ডে বাঁধাই। মূল্যবান কাগজে ছাপা।

রচনাবলী সম্পাদনা : শ্রীরমেন চৌধুরী

আবলম্বে অর্ডার পেশ করুন

বসুমতী প্রাইভেট লিমিটেড : ১৬৬, বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী স্ট্রীট, কলি-১২

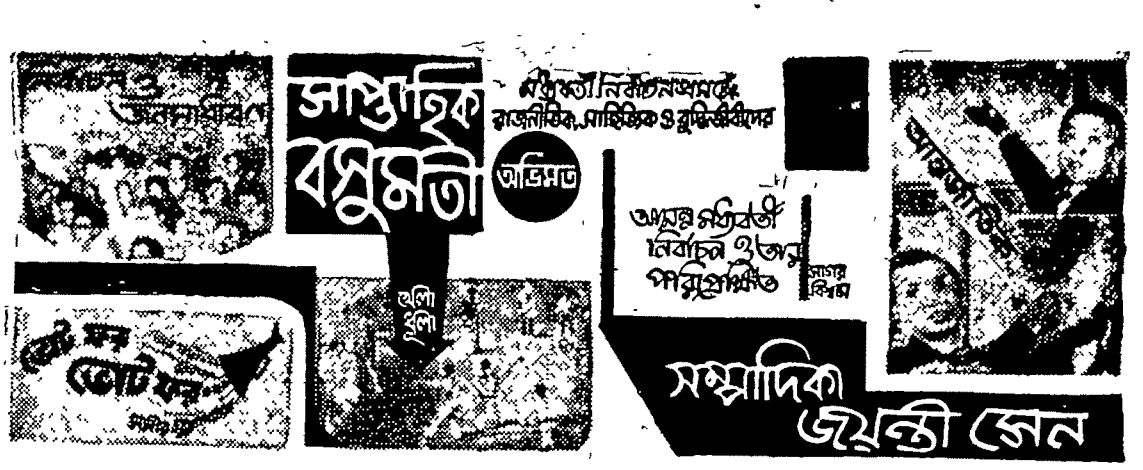

৭৩ বর্ষ : ৩৫শ সংখ্যা—মূল্য : ৩০ পয়সা বাংলা ভাষায় দ্বিতীয় সর্বাধিক প্রচারিত সাপ্তাহিক পত্রিকা
বৃহস্পতিবার, ৮ই ফাল্গুন, ১৩৭৫ বঙ্গাব্দ
PRICE : 30 Paise
Thursday, 20th February, 1969

কংগ্রেসের পরাজয় কেন ?

অন্তর্বর্তী নির্বাচনের ফলাফলে পশ্চিমবঙ্গে যুক্তফ্রন্টের বিজয় যেমন বিস্ময়কর, তেমান কংগ্রেসের নিদারুণ বিপর্যয় অনেকের কাছে অবিশ্বাস্য। বস্তুত কোনো পক্ষের কোনো নেতাই তাঁদের ভবিষ্যদ্বাণীতে—প্রকাশিত ফলাফলের কাছা-কাছি পর্যন্ত যেতে পারেন নি। তবে কংগ্রেস পক্ষের আশা ছিল হিমালয়তুল্য উচ্চ, দৈনিক পত্রিকাগুলিও সেই আশাকে আরও তীব্র করে তুলেছিল। অপরপক্ষে যুক্তফ্রন্ট জয়ী হবার আশা রাখলেও, এমন অকল্পনীয় ব্যবধানে কংগ্রেস পরাজিত হবে, যুক্তফ্রন্টের নেতারা তা নিয়ে কিন্তু বাগাড়ম্বর করেন নি। অর যে সব ছুটকো বা খুচরো দল নির্বাচনে বাজিমাৎ করতে চেয়েছিল, সেই সব দলের নেতারা বিবৃতিতে বা বাণীতে পশ্চিমবঙ্গের জনগণের ভাগ্যবিধাতা হবার সঙ্কল্প প্রকাশ করলেও জনগণ তাঁদের ঝেঁটিয়ে বিদায় করে দিয়েছে। এবারের নির্বাচনী ফলাফলে যুক্তফ্রন্টের জয়জয়কার, কংগ্রেসের অস্তিত্ব টিকে থাকলো, তৃতীয় ফ্রন্টের অবাস্তব স্বপ্ন সম্পূর্ণ বিলীন এবং বিগত যুক্তফ্রন্ট সরকারের বিরুদ্ধে যেসব নেতা চরম বিশ্বাসঘাতকতা করেছে তারা প্রায় নির্বাসিত।

অথচ প্রায় কেউই কল্পনা করতে পারেন নি যে, এমন ঘটনা পশ্চিমবঙ্গে ঘটতে পারে। কারণ নির্বাচনের প্রাক্কালে জনগণকে বিভ্রান্ত করার জন্য সব রকম উপায়ই অবলম্বন করা হয়ে থাকে। ভোটের জন্য ভেট দেওয়া ছাড়া প্রাদেশিকতা, সাম্প্রদায়িকতা ও প্রাকৃতিক বিপর্যয় নাকি অনেক ক্ষেত্রে কিছুটা জেতার পথ প্রশস্ত করে। এইসব ব্যাপারে তথাকথিত অশিক্ষিত ও দরিদ্র জনসাধারণের বিরুদ্ধে চাপা অভিযোগ থাকলেও দেখা গেল তারা সঠিক পথে যাবার জন্যে তৃতীয় পক্ষকে সম্পূর্ণ বিদায় দান করছে, বিশ্বাসঘাতকদের নির্বাসন দিয়েছে এবং ছুটকো, উটকো ও খুচরো দলগুলিকে ত্যাগ করেছে। প্রচণ্ড রকমের রাজনৈতিক চেতনা ভোটারদের মধ্যে না থাকলে—এমন ঘটনা কখনোই সম্ভব হোত না।

সর্বভারতীয় দল জাতীয় কংগ্রেসের এ রকম পরাজয় পশ্চিমবঙ্গে ঘটলো কেন—এ সম্পর্কে অনেকেই প্রশ্ন তুলেছেন। কংগ্রেসের বিপর্যয়ের মূলে যা রয়েছে—কংগ্রেসের নেতিবাচক আদর্শ। আদর্শের কথা যেটুকু তাঁরা বলেছেন, তা কার্যকর করতে একেবারেই সক্ষম হন নি। জহরলাল নেহরুর আমল পর্যন্ত সমাজবাদের কথা যদি বা শোনা যেত, তাঁর মৃত্যুর পর সেই সমাজবাদ কথাটিও ভুলে ফেলা হয়েছে। আর কংগ্রেসী শাসনের গণতন্ত্রে ধনী আরো ধনী এবং দরিদ্র আরো দরিদ্র হয়েছে। তিনটি পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার পরও মধ্যবিত্ত, শ্রমিক ও কৃষক সমাজের জীবনযাত্রার মান উন্নত করা সম্ভব হয় নি। বরং জনসাধারণের দাবি দাবিয়ে দেওয়ার চেষ্টায় লাঠি ও গুলীর আশ্রয় এমনভাবে নেওয়া হয়েছে, যাতে মনে হয়েছে

[illegible] রাষ্ট্র পুলিশী রাষ্ট্রে রূপান্তরিত। এছাড়া ব্যাপক দুর্নীতি, চোরাবাজারী ও মজুতদারীর বিরুদ্ধে কংগ্রেস পরিচালিত সরকার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা করতে পারে নি। উপরন্তু নেতারাও আপনি আচরি ধর্ম—এই ধর্মে জনসাধারণকে দীক্ষিত করতে পারেন নি। যেসব নেতা ইংরেজ রাজশক্তির হাত থেকে শক্তি ছিনিয়ে নেবার জন্য সংগ্রাম করেছেন—পরিবর্তিত কালে তাঁদের অনেকেই কী রকম বিলাসী হয়ে পড়েছিলেন—তা কংগ্রেস অধিবেশনে উপস্থিত নেতাদের ছবি দেখলেই বোঝা যেত। আর ভি আই পি-রা আপন মাহাত্ম্যে জনগণকে একেবারেই বর্জন করে দিয়েছেন বলা যেতে পারে। এইসব কারণেই আমরা বলতে পারি, কংগ্রেসের ইমেজ ঐ দলের নেতারাই নষ্ট করে দিয়েছেন এবং তাঁরাই জনগণকে ধীরে ধীরে কংগ্রেস-বিরোধী হতে বাধ্য করেছেন। মানুষ যতই মূর্খ বা দরিদ্র হোক না কেন—নিদারুণ বৈষম্যে ভুগতে ভুগতে একদিন তার জ্ঞানচক্ষু উন্মীলিত হয়ও অন্তত ইতিহাস সে কথাই বলে। বর্তমান নির্বাচনের পর নিজেদের দোষত্রুটি ঢাকা দিতে দায়িত্বশীল নেতারাও এমন সব কথা বলছেন যা শুধুমাত্র হাস্যকরই নয়, মনে হয়, পার্টি অপেক্ষা নিজেদের ব্যক্তিগত জিদ ও সম্মান বড় হওয়ায় তাঁরা আবোল-তাবোল বলছেন। আর নেতাদের এই ধরণের আচরণেই জনগণ কংগ্রেসের প্রতি বিমুখ। চতুর্থ নির্বাচনের পর জনগণের তাগিদেই যুক্তফ্রন্ট সরকারের সৃষ্টি হয়েছিল। কিন্তু পদাকাঙ্ক্ষী নেতারা যুক্তফ্রন্ট সরকারকে সহ্য করতে না পেরে কেন্দ্রীয় সরকার ও গভর্নরের অন্যায় হস্তক্ষেপ ঘটিয়ে ঐ সরকারের পতন ঘটালেন। তখনো কংগ্রেসী নেতৃবৃন্দ জনগণের 'পালস' বুঝতে সম্পূর্ণ অক্ষম হয়েছিলেন বলেই নির্বাচনী ফলাফলে কংগ্রেসের আজ এমন পরাজয়। গত বারো বছরের মধ্যে নির্বাচনী ফলাফলের শতকরা হার লক্ষ্য করলেই দেখা যাবে যে, কংগ্রেস এতোকাল জনসাধারণের এক লক্ষিষ্ঠ অংশেরই ভোট পেয়ে শাসনকার্য চালিয়ে এসেছে। বিরোধী দলগুলির মধ্যে তখন ঐক্য প্রতিষ্ঠিত না হওয়ায় কংগ্রেস দেশ শাসনের সুবিধা ভোগ করতে পেরেছে। তখনো কিন্তু দেয়ালের স্পষ্ট লিখনের প্রতি কংগ্রেস শাসকসুলভ মনোভাবে নিজেদের গলদের প্রতি ভ্রুক্ষেপ করে নি। আজ প্রগতিবাদী অকংগ্রেসী দলগুলি এক হওয়ায় কংগ্রেসের সর্বনাশ হলেও—এ সর্বনাশের ইঙ্গিত তো বারো বছর আগেই পাওয়া গেছিল। এই ঘটনার পর কংগ্রেসের নেতৃবৃন্দের চৈতন্যের উদ্রেক হবার আশা রাখা নিরর্থক মনে করি।

সম্পাদকীয়

আজকের মানুষ

প্রতিবাদ শোনা যাচ্ছে গোড়া থেকেই, '৬৭ সনের জুন মাসে যখন রাজ্যপালের পদ নিয়ে শ্রীধরমবীর এ-রাজ্যে আসেন। কিন্তু সে-আপত্তি কেন্দ্রীয় সরকার গ্রাহ্য করেন নি। শ্রীধরমবীরও হয়তো সেদিন সবার অলক্ষ্যে কেবল মুচকি হেসেছিলেন মাত্র। অপেক্ষা করছিলেন সেই চরম মুহূর্তটির জন্যে যখন তাঁর ঝুলি থেকে মোক্ষম দাওয়াইটি বার করবেন। রাজ্যে যুক্তফ্রন্ট সরকারের বয়স তখন মাত্র তিন মাস। রাজ্যপাল হিসেবে শ্রীধরমবীরের নিয়োগে সেদিনকার প্রধান আপত্তি ছিল বোধ হয় এখানে যে, তিনি রাজনীতিক নন, একজন সিভিলিয়ান মাত্র। বিরুদ্ধবাদীদের আশঙ্কা ছিল রাজনৈতিক জীবনের পশ্চাৎপট যাঁর নেই, সাধারণ মানুষের সঙ্গে যে-আমলার কোন সম্পর্ক নেই, তিনি সাধারণ মানুষের আশা-আকাঙ্ক্ষায় ধার ধারবেন না; তিনি নিস্পৃহ আপন খেয়ালখুশি মাফিক সরকার চালাতে চাইবেন।

শ্রীধরমবীর একজন দুঁদে আমলাই বটেন। প্রশাসক হিসেবে তাঁর অভিজ্ঞতা যেমন দীর্ঘদিনের তেমনি বিচিত্র স্তরের। লক্ষ্ণৌ এবং এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ে কলেজী শিক্ষা শেষ করে শ্রীধরমবীর যান বিলেতের বিখ্যাত লন্ডন স্কুল অফ ইকনমিক্স-এ। দেশে যখন জোর স্বাধীনতা আন্দোলন চলছে, যখন ভারতের এ-প্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত আইন অমান্য আন্দোলনের ঢেউয়ে আন্দোলিত হচ্ছে, যখন ইংরেজ শাসনের ভিত ভারতবাসী ঘন ঘন কাঁপিয়ে তুলছে, তখন শ্রীধরমবীর নিজেকে তৈরি করছিলেন এই বিদেশী শাসনের অন্যতম জবরদস্ত খুঁটি হয়ে ওঠার জন্যে।

আই-সি-এস হয়ে শ্রীধরমবীর দেশে ফিরলেন ১৯৩০ সালে। দেশব্যাপী আইন অমান্য আন্দোলনের সেই রোমাঞ্চকর দিনগুলিতে তিনি আলিগড়ের যুক্ত জেলাশাসকের পদে ছিলেন। প্রশাসনিক দক্ষতা অবশ্যই দেখিয়েছেন, তার সঙ্গে সঙ্গে সঞ্চয় করেছেন মূল্যবান অভিজ্ঞতা, ভারত সরকারের বিভিন্ন দপ্তরে যুগ্ম সচিব হয়ে কাজ করার দৌলতে।

গুরুত্বপূর্ণ দপ্তরে কাজ করার সুযোগ পেলেন ধরমবীর; ১৯৫০ সনে যখন প্রধানমন্ত্রী নেহরু তাঁকে তাঁর প্রধান একান্ত সচিব করলেন। বছরখানেক এ-পদে কাজ করার পর শ্রীধরমবীরের ডাক পড়লো আবার অন্যত্র, অন্য দেশে। বৃটেনে ভারতীয় হাই কমিশনারের বাণিজ্য উপদেষ্টা হয়ে

ধরমবীর

তিনি লন্ডন গেলেন '৫১ সালে, এবং এ-দায়িত্ব নিয়ে সেখানে রইলেন দু'বছর। পরের বছর উচ্চতর পদ পেলেন তিনি, চেকোশ্লোভাকিয়ায় ভারতের রাষ্ট্রদূতের সম্মানজনক পদে।

সিভিলিয়ান হিসেবে এবং ক্যাবেনের খাতিরে জনসাধারণের সঙ্গে তাঁর প্রথম পরিচয় ঘটে '৫৬ সনে যখন তিনি কেন্দ্রীয় পুনর্বাসন দপ্তরের সেক্রেটারীর পদ নিয়ে দণ্ডকারণ্য যান এবং পূর্ববঙ্গের হাজার হাজার ছিন্নমূল উদ্বাস্তু পরিবারের সমস্যা সমাধানে আত্মনিয়োগ করেন। সেই সুবাদে ইতিপূর্বে পশ্চিমবঙ্গে বা কলকাতায়ও তখন আসতে হয়েছিল, সাময়িকভাবে কাজও করেছেন এখানে। বছর দুয়েক উদ্বাস্তুদের নিয়ে নিজেকে ব্যস্ত রাখার পর শ্রীধরমবীর দপ্তরান্তরে বদলি হলেন : পূর্ত দপ্তরের সেক্রেটারী হলেন।

দিল্লীতে একটা বড় রকমের কাজ জুটে গেল তাঁর এরপর, কেন্দ্রশাসিত দিল্লীর চীফ কমিশনার। অবশ্য বেশিদিন এ-পদে গৌরব নিয়ে থাকার সুযোগ তাঁর ঘটে নি, '৬৩ সনের আগস্টে ঢুকে পরের বছরের নভেম্বর মাসেই তিনি বেরিয়ে এসেছেন ক্যাবিনেট সেক্রেটারীর দায়িত্বভার নেবার জন্যে। এখানে আরো বছর দুয়েক কাটল, '৬৬ সন পর্যন্ত। পারমাণবিক শক্তি কমিশনের সেক্রেটারী হিসেবে কিছুদিন কাজ করার পর তিনি পাঞ্জাব গেলেন রাজ্যপাল হয়ে।

পাঞ্জাবের রাজ্যপাল হিসেবে শ্রীধরমবীর সংবাদের শিরোনাম হলেন। রাজ্য জুড়ে দুর্নীতি, চোরাকারবার। রাজ্যপাল চোরাকারবারী মজুতদারদের গ্রেপ্তার করলেন, তাদের কোমরে দড়ি বেঁধে প্রকাশ্য রাজপথে প্যারেড করালেন।

'৬৭ সালের জুন মাসের যে দিনটিতে শ্রীধরমবীর পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপাল হয়ে কলকাতার মাটিতে পা রাখলেন সেদিন থেকেই যেন তাঁর পেছনে শনি লেগে আছে। যুক্তফ্রন্ট নেতা বা বামপন্থী রাজনৈতিক পর্যবেক্ষকরা প্রকাশ্যে বললেন যুক্তফ্রন্ট সরকারকে নাজেহাল করার জন্যেই কেন্দ্রীয় সরকার এই দুঁদে আই-সি-এসটিকে পাঠিয়েছেন। সেদিন থেকেই শ্লোগান উঠেছে, 'ধরমবীর, ফিরে যাও'। যে আশঙ্কা ধরমবীর সম্পর্কে করা হয়েছিল অবাক বিস্ময়ে রাজ্যবাসী দেখল তাকেই সত্যে পরিণত হতে ছ'মাসের মধ্যে। রাজ্যপাল দলত্যাগী ডঃ প্রফুল্ল ঘোষকে দিয়ে বৈধ ও গণতান্ত্রিক যুক্তফ্রন্ট সরকারের পতন ঘটিয়েছেন—এ-অভিযোগ তখন বাংলার আকাশে-বাতাসে বিশাল শব্দতরঙ্গ তুলেছে। মধ্যবর্তী নির্বাচনে অভাবনীয় সাফল্য অর্জন করে যুক্তফ্রন্ট তাই অপমানের প্রতিশোধ নিতে আজ কৃতসঙ্কল্প। কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে যুক্তফ্রন্ট নেতারা দাবি করেছেন রাজ্যপাল শ্রীধরমবীরকে সরিয়ে নিতে। শ্রীধরমবীর অবশ্য যুক্তফ্রন্ট সরকারের সঙ্গে পূর্ণ সহযোগিতার আশ্বাস দিয়েছেন। কিন্তু ষড়যন্ত্রের নায়ক হিসাবে বর্ণিত ব্যক্তির সহযোগিতার তোয়াক্কা করে কে ?

রবীন্দ্রনাথ ও সুভাষচন্দ্র

শঙ্করীপ্রসাদ বসু

[পূর্ব-প্রকাশিতের পর]

বন্দেমাতরম্ ও জনগণমন (৬)

ইতিহাসের বিচিত্র বিধান, বন্দেমাতরমের ভক্ত সুভাষচন্দ্র এবং বন্দেমাতরমের উপর বিরক্ত জহরলাল—এই দুই নেতা বন্দেমাতরমের *Decent Burial*-এর ব্যবস্থা করেছিলেন, স্টার অব ইণ্ডিয়া' পত্রিকার কথার সত্যতাকে প্রমাণ করতে!!!

স্বাধীনতা-প্রাপ্তির পরে জাতীয় সঙ্গীত কি হবে তা নিয়ে যখন নতুন করে বিতর্ক শুরু হল (যার বিস্তারিত ইতিহাসে যাবার প্রয়োজন নেই), তখন যাঁরা বন্দেমাতরমের পরিবর্তে জনগণমনকে সমর্থন করেছিলেন, তাঁরা আজাদ হিন্দ সরকার রবীন্দ্রনাথের জনগণমন সঙ্গীতকে রূপান্তরিত আকারে জাতীয় সঙ্গীত করেছিল, এবং তা প্রভূত জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিল—এই তথ্যের বিষয়ে বিশেষভাবে দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলেন। জনগণমন'র সমর্থনে লিখিত শ্রীপ্রবোধচন্দ্র সেনের উল্লেখযোগ্য পুস্তিকা 'ভারতবর্ষের জাতীয় সঙ্গীত' থেকে উদ্ধৃত করছি—

> "সুভাষচন্দ্র জর্মনিতে যে আজাদ হিন্দ্ বাহিনী গঠন করেন, জনগণমন'ই তার জাতীয় সঙ্গীত বলে স্বীকৃত হয়। অতঃপর পূর্ব এশিয়ায় আজাদ হিন্দ সরকার প্রতিষ্ঠাকালেও এই গানটিই জাতীয় সঙ্গীতের মর্যাদা পায়। সে সময়ে সুভাষচন্দ্রের নির্দেশে গানটি হিন্দুস্থানীতে রূপান্তরিত হয়। রূপান্তর করার সময়ে গানটি ঈষৎ পরিবর্তিত হলেও এটিতে মূল গানের ভাবাদর্শ বজায় আছে, এবং মূলের সুরও অব্যাহত আছে। বস্তুত আজাদ হিন্দ সরকার এই হিন্দুস্থানী রূপটি বাংলা জনগণমন থেকে অভিন্নই মনে করতেন। তাই আরজি হুকুমত-ই-আজাদ হিন্দের নির্দেশনামাতে বলা হয়েছিল,
>
> Tagore's song *Jaya-ho* has become our National Anthem"

প্রবোধচন্দ্র আরও লিখেছেন—

> "ভাবাদর্শ ও সুরের বিচারে কোনো যোগ্যতর গান পাওয়া গেলে বন্দেমাতরমের পরিবর্তে সেটিকে জাতীয় সঙ্গীত বলে স্বীকার করতে তাঁর (সুভাষচন্দ্রের) অসম্মতি ছিল না। আজাদ হিন্দ সরকার প্রতিষ্ঠাকালে দেখি তিনি কংগ্রেসের চরকালাঞ্ছন জাতীয় পতাকাকে স্বীকার করলেন, অথচ খণ্ডিত বন্দেমাতরমকেও মেনে নিতে পারেন নি। রবীন্দ্রনাথের ভারত-জয়গাথাটিকেই তিনি জাতীয় সঙ্গীত বলে বরণ করে নিলেন। এর থেকে নিঃসন্দেহে বোঝা যায়, সর্বভারতীয় রাষ্ট্রসঙ্গীত হিসাবে তিনি জনগণমনকেই সবচেয়ে উপযোগী মনে করতেন। আজাদ হিন্দ সরকারের সচিব মর্যাদাধিকারী সম্পাদক আনন্দমোহন সহায়ের বিবৃতি থেকেও এই অনুমান সমর্থিত হয়।"

প্রবোধচন্দ্র তাঁর পুস্তিকায় আনন্দমোহন সহায়ের যে-বিবৃতি উদ্ধৃত করেছেন, তার মধ্যে নানা বিচিত্র কথা আছে।*

---

* যেমন, "বন্দেমাতরম ধ্বনি যত জনপ্রিয়, গান তত নয়। বন্দেমাতরম ধ্বনি উচ্চারণ করে অনেকে প্রাণ দিয়েছে একথা সত্য, কিন্তু তার অর্থ এই নয় যে, জনগণমন বা তার হিন্দী রূপ শুভসুখ যাঁদের আত্মত্যাগে উদ্বুদ্ধ করেছে তাঁরা সংখ্যায় হীন।" অদ্ভুত এইসব কথা, যার বিষয়ে বেশি কিছু না লেখাই উচিত। গানের থেকে ধ্বনি চিরকালই বেশি জনপ্রিয় হয়। এবং আত্মত্যাগের ক্ষেত্রে সংখ্যাতত্ত্ব না আনাই ভাল। জনগণমন একটি অসাধারণ সঙ্গীত, তার প্রেরণা উচ্চ হওয়াই স্বাভাবিক, কিন্তু আগামীকাল যদি ক-খ-গ-ঘ ভারতের জাতীয় সঙ্গীত হয় এবং সেটি গেয়ে যদি কোনো যুদ্ধে ভারতীয় সেনাবাহিনীর কয়েক লক্ষ সৈন্য বীরের মত প্রাণবিসর্জন করে, সেই গান কি জনগণমনের চেয়ে

যাই হোক আনন্দমোহন সহায় সুভাষচন্দ্রের সঙ্গে এই গানটির সম্পর্কের বিষয়ে যা বলেছেন, তা এই—

"নেতাজীর আজাদ হিন্দ সরকারের জাতীয় সঙ্গীত নির্বাচনের ব্যাপারে আমি ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত ছিলাম। .....এই গানটির একটি হিন্দী রূপ সংকলনের ভার আমার উপর পড়ে। আমাদের তরুণ কবি হুসেনের সহযোগিতায় জনগণমন গানের হিন্দী রূপ শুভসুখ রচনা করবার সৌভাগ্য আমার হয়েছিল।

"একথাও এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য যে, শুভসুখ গানটি প্রবর্তনের পূর্বে তার মূলস্বরূপ যে জনগণমন গান, নেতাজীর নেতৃত্বে জার্মানীতে ভারতীয়রা সেই গানটিই করতেন। নেতাজী স্বয়ং আজাদ হিন্দ বাহিনীর ব্যাণ্ডমাস্টারকে নির্দেশ দিতেন জনগণমনর সুর বিষয়ে। একলা যখন থাকতেন তখন তিনি উৎসাহ-ভরে এই গানটি করতেন।

নেতাজী আমাকে বলেছেন যে, জার্মানীতে অনেক জার্মান তাঁকে বলতেন যে, তাঁদের জাতীয় সঙ্গীত অবশ্য সর্বশ্রেষ্ঠ, তবু প্রেরণা জাগাবার শক্তিতে আমাদের জাতীয় সঙ্গীত তাঁদের সঙ্গীতের চেয়ে বড় যদি না হয় তো সমান।"

জনগণমন সঙ্গীতের সঙ্গে জয় হিন্দ ধ্বনির তাৎপর্য দেখিয়ে প্রবোধচন্দ্র চমৎকারভাবে যা লিখেছেন, তাও উদ্ধৃত করছি।

"এই প্রসঙ্গে জয়হিন্দ ধ্বনিটি সম্পর্কেও দু-একটি কথা বলা প্রয়োজন। বিশেষভাবে ভারতবিধাতা-রূপে ভগবানের জয়ঘোষণার মধ্যে নিহিত রয়েছে সমগ্রভাবে (প্রদেশ ও সম্প্রদায়নির্বিশেষে) ভারত-বর্ষেরই জয়কামনা; সমগ্র গানটিতেই এই কামনা সংশয়াতীতরূপে ব্যক্ত হয়েছে। এই জন্যই দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন এই গানটিকে Song of the victory of India১ অর্থাৎ ভারতবর্ষের জয়গাথা বলে বর্ণনা করেছিলেন। আর এই জয়কামনার দ্বারা প্রণোদিত হয়েছিলেন বলেই নেতাজী সুভাষচন্দ্র এই জয়গানের সঙ্গে জয়হিন্দ ধ্বনিটিকেও যুক্ত করে নিয়েছিলেন। বস্তুত বন্দেমাতরম ধ্বনিটি যেমন বন্দেমাতরম গানের প্রাণবস্তু বলে স্বীকৃত, তেমনি জয়হিন্দ ধ্বনিটিকেও এই জয়গানের মর্মবস্তু বলে স্বীকার করা যায়। এই-ভাবে উক্ত জয়গান এবং জয়ধ্বনিকে যুক্তভাবে গ্রহণ করলে শুধু যে পারস্পরিক সঙ্গতি রক্ষা হয় তা নয়, নেতাজী-চালিত আজাদ হিন্দ বাহিনীর চরম আত্ম-বলিদানব্রতের প্রতি যথোচিত শ্রদ্ধাও দেখানো হয়।"

যে-সব তথ্য উপস্থিত করলাম, তার থেকে স্পষ্টই বোঝা যায়, জনগণমন সঙ্গীতের উপরে সংগ্রামী ঐতিহ্য আরোপের সম্পূর্ণ গৌরব সুভাষচন্দ্রের। এবং জনগণমনকে ভারতের জাতীয় সঙ্গীত হিসাবে স্বীকৃত করানোর পিছনে তাঁর প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ দান অবশ্য স্বীকার্য। সুভাষচন্দ্র একদা রবীন্দ্রনাথের কাছ থেকে দেশগৌরব ও দেশনায়ক আখ্যার আশীর্বাদ পেয়েছিলেন, জনগণমনকে রূপান্তরিত আকারে জাতীয় সঙ্গীতরূপে বরণ করে সুভাষচন্দ্র ফিরে [illegible] করেছিলেন। জনগণমন গানের প্রতি সুভাষচন্দ্রের অনুরাগ স্বাভাবিক—কেন্ বাঙালীর সেই অনুরাগ নেই। এমন উদার মহান্ ধ্বনি-গরীয়ান্ বাণী মহাকবির কণ্ঠ ভিন্ন উৎসারিত হয় না। কিন্তু প্রবোধচন্দ্র যে বলেছেন, 'ভাবাদর্শ ও সুরের বিচারে' বন্দেমাতরমের চেয়ে যোগ্যতর বিবেচনা করেছিলেন বলেই সুভাষচন্দ্র জনগণমনকে গ্রহণ করেছিলেন, তা আমরা মানতে পারছি না, কারণ তার পক্ষে কোনো প্রমাণ নেই। ব্যাপারটা সত্য হতে পারে নাও পারে, আসল প্রশ্ন, সুভাষচন্দ্র কোন্ বিচারে জনগণমনকে নিলেন? জনগণমন গৃহীত হবার পরে অভারতীয়দের দ্বারা তার সুর প্রশংসিত হওয়ায় সুভাষচন্দ্র খুশি হয়েছিলেন, এর দ্বারা এইটুকু মাত্র প্রমাণ হয়, জনগণমন'র সুর উচ্চস্তরের। আমাদের বিবেচনায় জনগণমনকে সুভাষ-চন্দ্রের গ্রহণের পিছনে ইতিবাচক কারণের তুলনায় নেতি-বাচক কারণ অল্প ছিল না। তিনি বুঝেছিলেন, বন্দে মাতরমকে সর্বজনের স্বেচ্ছাগ্রাহ্য করা যাবে না। উচিত বা অনুচিত কারণে (বর্তমান লেখকের বিবেচনায় অনুচিত কারণে) মুসলমানেরা খণ্ডিত বন্দেমাতরমকেও স্বীকার করবে না। অথচ জাতীয় সঙ্গীত যদি সমগ্র জাতি সমগ্র মনপ্রাণ দিয়ে গান না করে, সে তো অভিশপ্ত ব্যাপার। বন্দেমাতরম মন্ত্র জপ করে যিনি বড় হয়েছেন, বন্দে-মাতরমের খণ্ডনে সম্মতি দিতে তিনি দুঃখ পেয়েছেন, তাকে একেবারে বর্জন করতে নিশ্চয় অধিকতর বেদনা পেয়ে-

---

বড় হয়ে উঠবে? শ্রীযুক্ত সহায় লিখেছেন, বিশেষভাবে "হিন্দুমনোভাবসম্পন্ন যাঁরা নন, তাঁদের পক্ষে এর (বন্দে-মাতরমের) সুরও যে খুব প্রেরণাদায়ক তা নয়।" এক্ষেত্রে একটা নতুন জিনিস আমরা শিখলুম, সুরের মধ্যেও হিন্দু-গন্ধ থাকে! দেখা যাচ্ছে, সুরবিচারের সময়ে কানের সঙ্গে নাকও খাড়া করা দরকার। কিন্তু তর্ক করছি; আনন্দমোহন সহায় বিরাট কোনো চিন্তাশীল ব্যক্তি একথা জানার আগে সময়ক্ষয় করা উচিত নয়। তিনি আরও যেসব কথা বলেছেন, তা জহরলালের প্রতিধ্বনি বলে, জহরলালের মূল উক্তি আলো চনাকালেই আমাদের বক্তব্য জানাবো।

১—১৯১৭ সালের কলকাতা কংগ্রেসে দেশবন্ধু চিত্ত রঞ্জন জনগণমন গানের প্রশংসা করে বলেন,

"Brother delegates, at the very outset I desire to refer to the song to which you have just listened. It is a song of the glory and victory of India. We stand here to-day, on this platform for the glory and victory of India." ('ভারতবর্ষের জাতীয় সঙ্গীত')

0772-Bcs

"দিলীপের মুখ থেকে খবরটা শুনে আমার যে কি আনন্দ হল! ওকে দুহাতে বুকে টেনে নিলাম। ও প্রচণ্ড অনুশীলন করেছে, খেটেছে। তবুও বলবো এর জন্য যে-বাড়তি শক্তি-সামর্থ্যের প্রয়োজন তার সবটুকুই ও পেয়েছে বোর্নভিটা থেকে। দুধের সঙ্গে মিশিয়ে বোর্নভিটা খেতে ও-বয়সেরই বড্ড ভালোবাসে। শরীর সুস্থ-সবল রাখতে যে পুষ্টি, শক্তি ও সামর্থ্যের প্রয়োজন বোর্নভিটায় তা পুরোমাত্রায় রয়েছে ব'লে ওকে আমি নিয়মিত বোর্নভিটা খাওয়াই। তাই কি খেলাধুলায়, কি পড়াশুনায় সবদিকেই ছেলে আমার সমান চৌকশ।"

বোর্নভিটা পুষ্টিকর, শক্তিদায়ক সুষম পরিমাণে কোকো, দুগ্ধ চিনি ও মল্ট মিশিয়ে এটি তৈরি করেছেন ক্যাডবেরি—প্রাণোচ্ছল পানীয় প্রস্তুতে বিশেষজ্ঞ ব'লে যাঁদের খ্যাতি একশ বছরেরও বেশি। এর কোকো-সমৃদ্ধ স্বাদ ছেলেমেয়েদের ভারী পছন্দ।

ক্যাডবেরির বোর্নভিটা খাবেন—
শক্তি, উদ্যম—এবং স্বাদের জন্যে

ছিলেন; তিনি মনে করেছিলেন, মানুষকে বৃহত্তর প্রয়োজনে বহু জিনিস বলি দিতে হয়; এক্ষেত্রে তিনি নিজের গভীর পবিত্র ভাবানুভূতির কণ্ঠরোধ করলেন। বন্দেমাতরমকে যখন রাখা গেল না, তখন দ্বিতীয় জাতীয় সঙ্গীত জনগণমন'র স্বীকৃতি অপরিহার্য হয়ে পড়ল। এইখানে বাড়তি লাভ—সঙ্গীতটি ভারতবর্ষের শ্রেষ্ঠ কবির রচনা, এবং অসাধারণ রচনা। সুভাষচন্দ্র জনগ্রণমনকে গ্রহণ করে একটি বৃহৎ উপকার করেছিলেন,—কোনো তৃতীয় শ্রেণীর সঙ্গীত ভোটের জোরে ভারতের জাতীয় সঙ্গীত হয়ে ওঠার সম্ভাবনাকে খানিকটা আটকেছিলেন।

জনগণমনকে নির্বাচনের ক্ষেত্রে সুভাষচন্দ্র সর্বভারতীয় দৃষ্টিতে চালিত হয়েছিলেন, সন্দেহ নেই, এবং কঠোর-ভাবেই তা হয়েছিলেন, যতটা হয়ত জনগণমন সঙ্গীতের অনুরাগীদের ভালো না লাগতে পারে। জনগণমনকে নয়, তার হিন্দুস্থানী রূপান্তরকেই তিনি জাতীয় সঙ্গীত করেছিলেন। উভয় সঙ্গীতের সুর মোটামুটি এক থাকলেও বিষয়বস্তুব্যে বহু প্রভেদ আছে। 'শুভসুখ' গানটি এই প্রকার—

শুভ সুখ চৈন কী বরখা বরষে ভারত ভাগ হৈ জা গা
পঞ্জাব সিন্ধ গুজরাট মারাঠা দ্রাবিড় উৎকল বঙ্গা
চঞ্চল সাগর বিন্ধ্য হিমালয় নীলা যমুনা গঙ্গা
তেরে নিত গুণ গায়
তুঝ সে জীবন পায়
সব জন পায়ে আশা;
সুরজ বনকর জগপর চমকে ভারত নাম সুভাগ
জয়হো জয়হো জয়হো
জয় জয় জয় জয় হো।
সবকে দিলমে' প্রীত বসায়ে তেরী মীঠী বাণী
হর সুবে-কে রহনেওয়ালে হর মজ্ হব-কে প্রাণী।
সব ভেদ-ও ফারাক মিটাকে
সব গোদমে তেরি আকে
গ'থে প্রেম-কী মালা;
সুরজ বনকর.....
সুবাহ সুবেরে পন্থ্ পথেরু তেরিহী গুণ গায়ে
আসভারী ভরপুর বাঁয়ে জীবন সে যুত-নায়ে।
সব মিল কর হিন্দ পুকারে
জয় আজাদ হিন্দ কে নারে
প্যারা দেশ হামারা।
সুরজ বনকর.....

শুভসুখ গানটির প্রতি আমি এখানে শ্রদ্ধা নিবেদন করছি। নেতাজী ও আজাদ হিন্দ সরকারের সঙ্গে সংযুক্তির জন্য গানটি স্বতঃই মর্যাদাযোগ্য। কিন্তু প্রথম স্তবক বাদ দিলে জনগণমন'র সঙ্গে সুরটুকু ছাড়া এর যোগ কতটুকু? গানটিকে আমরা খাতির করছি, তার সংগ্রামী ঐতিহ্যের জন্য, আনন্দমোহন সহায় বা তরুণ কবি হুসেনের কবি-প্রতিভায় মুগ্ধ হয়ে নয়। নচেৎ যে কেউ জনগণমন'র সঙ্গে তুলনা করে দেখবেন, এই গানটির সাহিত্যমূল্য নগণ্য এবং তা কত বেশি সাময়িক প্রয়োজনে সীমাবদ্ধ। ভারতীয় জনগণের ঐক্যের বাণীই এতে প্রাধান্য পেয়েছে, এবং ছত্রে ছত্রে স্বাধীনতার জয়ধ্বনি। স্বাধীনতার পরে এইসব কথার শক্তি হ্রাস পায়। 'ভারতের ভাগ্য জাগ্রত হয়েছে'—একথা ভাগ্য জাগ্রত হওয়ার পরে কিছুদিন পর্যন্ত বলা যায়, চিরদিন নয়। রবীন্দ্রনাথের 'দেশ দেশ নন্দিত করি' গানটির মত সত্যকার উদ্দীপক সঙ্গীত পর্যন্ত এখন বাতিল হয়ে গেছে কারণ তার মূল কথা—'দিন আগত ঐ, ভারত তবু কই?' কোনই সন্দেহ নেই, শুভসুখ গানটি অস্থায়ী জাতীয় সরকারের অস্থায়ী সঙ্গীত, যা জনগণমন'র সুর নিয়ে কিছুটা অনুকরণে রচিত হয়েছিল।

গানটিতে আর একটি বৈশিষ্ট্য আছে একটু লক্ষ্য করলে বোঝা যাবে। গানটি মোটেই জনগণমনের অধিনায়ক ভারতের ভাগ্যবিধাতার জয়ধ্বনি নয়—ভারতের ভাগ্যবিধাতা ব্যাপারটিকে এখানে একেবারে বাদ দেওয়া হয়েছে। জয়ধ্বনির লক্ষ্য ভারতবর্ষ—তার বিধাতা নন। এবং এই মৌল পরিবর্তন সুভাষচন্দ্রই করিয়েছিলেন, যা তাঁর সম্মতিতে হয়েছিল। যে-মন নিয়ে তিনি বন্দেমাতরমের বদলে জনগণমনকে নিয়েছিলেন, সেই মন ঐ পরিবর্তন না ঘটিয়ে পারে নি। কথাটা একটু ব্যাখ্যা করে বলা দরকার।

তার আগে জনগণমন গানটির অন্তর্নিহিত ভাব সম্বন্ধে কিছু আলোচনা করা যাক। এই গানটির বিষয়ে ভিত্তিহীন কুৎসা প্রচার করে বলা হয়েছিল, এটি পঞ্চম জর্জের উদ্দেশ্যে রচিত। কথাটা যে কত মিথ্যা, উৎকৃষ্ট গবেষণাযোগে শ্রীযুক্ত প্রবোধচন্দ্র সেন তা প্রমাণ করেছেন। রবীন্দ্রনাথকে এ বিষয়ে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি জানিয়েছিলেন, বিপরীতটাই সত্য। তাঁর জনৈক রাজভক্ত বন্ধু 'সম্রাটের জয়গান রচনার জন্য' তাঁকে অনুরোধ করলে তাঁর মনে বিস্ময় ও উত্তাপের সঞ্চার হয়, তারই প্রতিক্রিয়ায় তিনি জনগণমন গানটি লেখেন, যার মধ্যে ভারতভাগ্য-বিধাতার জয়ঘোষণা করেছিলেন, "পতন-অভ্যুদয়-বন্ধুর পন্থায় যুগযুগধাবিত যাত্রীদের যিনি চিরসারথি, যিনি জনগণের অন্তর্যামী পথপরিচায়ক", যিনি "যুগ-যুগান্তরের মানবভাগ্যরথচালক।" প্রবোধচন্দ্রের রচনা মারফৎ আমরা জেনেছি, গানটিকে রবীন্দ্রনাথ ব্রহ্মসঙ্গীতের অন্তর্ভুক্ত করেছিলেন এবং ১৯১১ সালের ২৭শে ডিসেম্বর "কংগ্রেসে (প্রথম) গীত হবার পর একমাস পরে কলকাতায় মহর্ষি-ভবনে মাঘোৎসব সভায় এই গানটি গাওয়া হয় স্বয়ং রবীন্দ্রনাথের পরিচালনায়।" সুতরাং প্রবোধচন্দ্রের সিদ্ধান্ত—'গানটির লক্ষ্য যে স্বয়ং পরব্রহ্ম.....তাতে সন্দেহ থাকে না।'

নিজ ধারণার পক্ষে সমকালীন (১৩১৮ মাঘ) ভারতী পত্রিকা থেকে তিনি জনগণমন গানটির ব্যাখ্যা উদ্ধৃত করেছেন—

> "দ্বিতীয় দিন মানবজাতির অদৃষ্টবিধাতা যিনি
> পরিত্রাণায় সাধূনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম
> ধর্মসংস্থাপনার্থায় যুগে যুগে
> আত্মপ্রকাশ করেন সেই ত্রিলোকনাথের.....
> বন্দনাগান হইয়াছিল।"

প্রবোধচন্দ্র আরও বলেছেন—

> "ব্রহ্মসঙ্গীত বা ধর্মসঙ্গীতের পর্যায়ভুক্ত হলেও গানটির ভাবদ্যোতনা যে দেশভক্তি সে বিষয়েও সন্দেহ নেই। রবীন্দ্রনাথের স্বদেশপ্রীতি যে ধর্মনিরপেক্ষ নয়, একথা সুবিদিত।.....এই গানটি যে কংগ্রেস এবং মাঘোৎসবের উভয়ত্রই গাওয়া হয়েছিল তার কারণ এই যে, দুই জায়গায় গাওয়ার উপযোগিতাই এটির আছে। অর্থাৎ এটি যুগপৎ জাতীয় সঙ্গীত এবং ভগবৎ সঙ্গীত। এ গানের মূল প্রেরণা 'দেশাত্মবোধ' অথচ এর লক্ষ্য বিশ্ববিধাতা বা ঈশ্বর।"

বন্দেমাতরম সঙ্গীতের ধর্মপ্রেরণার সঙ্গে জনগণমন-র প্রেরণার পার্থক্য লেখক এইভাবে করেছেন—

> "বস্তুত বন্দেমাতরমের মতই জনগণমন-অধিনায়ক গানেও ধর্মের প্রেরণাকেই দেশপ্রীতির প্রেরণায় রূপান্তরিত করা হয়েছে। পার্থক্য এই যে, দ্বিতীয়টির ধর্ম অসাম্প্রদায়িক বা সর্বসাম্প্রদায়িক, প্রথমটির সম্বন্ধে একথা বলা যায় না।"

বন্দেমাতরম গানের মধ্যে ধর্মীয় সাম্প্রদায়িকতা আছে কিনা তার বিষয়ে বহু তর্ক হয়েছে, আমরা সেগুলির উল্লেখও করেছি। রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় যুক্তিপূর্ণ উৎকৃষ্ট রচনায় বন্দেমাতরমে সাম্প্রদায়িকতা আছে, এই প্রচারকে খণ্ডন করেছেন। বন্দেমাতরমে হিন্দু ইমেজ আছে কিন্তু সাম্প্রদায়িকতা নেই। দেশকে যদি পিতা-দেবতা করায় দোষ না থাকে, মাতা-দেবী করাতেও দোষ থাকা উচিত নয়। অপরপক্ষে কোনো ধার্মিক হিন্দু স্বদেশই দুর্গা লক্ষ্মী সরস্বতী হয়েছেন বলায় আপত্তি করেন নি কেন জানি না; বঙ্কিমের বিরুদ্ধে সহজেই বলা যায়, বন্দেমাতরম গানে স্বদেশের মাহাত্ম্য হয়ত বেড়েছে কিন্তু দেবীদের ঐশ্বরিক মাহাত্ম্য নিশ্চয় কমেছে। তাছাড়া বন্দেমাতরমের প্রথম অংশ, যাকে কংগ্রেস জাতীয় সঙ্গীত হিসাবে গ্রহণ করেছিল, তার মধ্যে মাতৃভূমির আদর্শায়িত রূপেরই বর্ণনা পাই। সেই অংশ অন্যের কথা দূরে থাক, জহরলাল নেহরুর মতেও অসাম্প্রদায়িক।

অপরদিকে জনগণমন গানটির ভিতরে দৃষ্টিপাত করলেও হিন্দু ইমেজ যথেষ্ট দেখা যায়। ভারতী পত্রিকায়, ধর্মসংস্থাপনার্থায় যুগে যুগে অবতীর্ণ ত্রিলোকনাথকে যে জনগণমন গানের ভারতভাগ্যবিধাতার মধ্যে দেখা হয়েছে, তা অকারণে নয়—সেই পাঞ্চজন্যধারী কৃষ্ণের স্পষ্ট ইমেজ রয়েছে 'হে চিরসারথি তব রথচক্রে মুখরিত পথ দিনরাত্রি' এবং 'দারুণ বিপ্লব-মাঝে তব শঙ্খধ্বনি বাজে'র মধ্যে। তাছাড়া এই ভাগ্যবিধাতাকে নারীরূপেও কবি না দেখে পারেন নি, তা দেখা যায় যখন লিখেছেন—'স্নেহময়ী তুমি মাতা।'

রবীন্দ্রনাথ বেঁচে গিয়েছেন, পরাধীন ভারতবর্ষে তাঁর গানটি কংগ্রেস কর্তৃক জাতীয় সঙ্গীতরূপে মনোনীত হয় নি। যদি হত, তাহলে যে-সমালোচনা বন্দেমাতরম পেয়েছে, ততখানি না হলেও অনেকখানি সমালোচনা লীগপন্থী মুসলমানদের হাত থেকে জনগণমন পেত। ১৯৩৭ সালে আজাদ এবং 'মোহম্মদী' কিভাবে তাঁর সাহিত্য মন্থন করে হিন্দুত্ব উদ্ধার করছিল, ঐ সময়ের ইতিহাসের সঙ্গে পরিচিতজনেরা জানেন। সিংহাসনে আসীন কোনো ঈশ্বরকে ("পূরব পশ্চিম আসে তব সিংহাসন পাশে")—যিনি রথ-সারথি এবং শঙ্খধারী, সেই সঙ্গে স্নেহময়ী মাতাও বটেন—লীগপন্থীরা কি জাতীয় সঙ্গীতে সহ্য করত?

জাতীয় সঙ্গীতের ক্ষেত্রে সঙ্গীতের পশ্চাদ্‌বর্তী সংগ্রামী ঐতিহ্যের কথা বিস্মৃত হয়ে অলঙ্কার বা রূপচিত্র নিয়ে ব্যস্ত হওয়ার বিপদ আছে। জনগণমন তার রচয়িতার উক্তি অনুযায়ী ভারতের ঈশ্বরের অর্থাৎ সকলের ঈশ্বরের বন্দনাগান। এটা কি ধর্মনিরপেক্ষতা? ভারতবর্ষে নিশ্চয় নাস্তিক মানুষ আছেন, তাঁদের সংখ্যা ভবিষ্যতে বাড়তে পারে—জনগণমন সম্বন্ধে তাঁদের মনোভাব কি হবে? ধরা যাক, যদি নিরীশ্বরবাদীরা দলগতভাবে ভারতের রাজ-নৈতিক ক্ষমতা অধিকার করে বসেন, তখন কি ঐ গানটিকে তাঁরা তাঁদের অনুভূতিতে আঘাত করছে বলে বর্জন করবেন?

সুভাষচন্দ্র এক্ষেত্রে কোনো ঝুঁকি নিতে চান নি। জাতীয় সঙ্গীতকে তিনি একেবারে ধর্মনিরপেক্ষ করে ছেড়েছিলেন। 'শুভসুখ' গানের মধ্যে তাই ভারতের ভাগ্য-বিধাতার নয়, ভারতেরই জয়গান। শ্রেষ্ঠ সাহিত্যের অঙ্গে অস্ত্রোপচারের পাতক-কাজ তিনি অনুমোদন করেছিলেন। রবীন্দ্রসাহিত্যের অনুরাগীরা তাঁর এই অন্যায় কার্যের সমালোচনা কেন করেন নি জানি না। করলেও তিনি বিচলিত হতেন কি না সন্দেহ। বঙ্কিমচন্দ্রের স্মৃতি তাঁর কাছে অন্য কোনো স্মৃতি বা ইতিহাসের চেয়ে কম মূল্যবান নয়। বঙ্কিমকে যদি প্রয়োজনে আঘাত করতে পারেন, সেই একই প্রয়োজনে রবীন্দ্রনাথকেও আঘাত করতে তাঁর বাধবে না, বাধেও নি।

সুভাষচন্দ্র যে সত্যই বিপ্লবী স্বভাবের মানুষ ছিলেন তাও এখানে বোঝা যায়। বিপ্লবীরা একাগ্র-লক্ষ্য, সেই লক্ষ্য গতিপথে তাঁরা যে-কোনো বাধার সঙ্গে লড়াই করতে প্রস্তুত। বৃহত্তর প্রয়োজনে অস্ত্রোপচার বা অঙ্গচ্ছেদে তাঁরা পেছপাও নন। সুতরাং সুভাষচন্দ্র সাহিত্যের বিশুদ্ধি লাঞ্ছিত হবে জেনেও জনগণমন'র ভাষান্তর করিয়েছিলেন। বাঙালী তিনি রবীন্দ্রনাথের ভাষায় মহিমা সম্বন্ধে নিশ্চয় সচেতন ছিলেন,

কিন্তু যেহেতু হিন্দুস্থানীকে রাষ্ট্রভাষা বলে মেনে নিয়েছেন, তাঁর বিবেচনায় জাতীয় সঙ্গীতকেও রাষ্ট্রভাষাতেই রচিত হতে হবে। মহাকবিরা রচনাও যদি গ্রহণ করেন, ভাষান্তরিত করেই নেবেন। হিন্দুস্থানী জাতীয় সঙ্গীত সংকলনের জন্য কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটি যে সাবকমিটি করেছিল, তিনি তার অন্যতম স্বেচ্ছাসদস্য ছিলেন তা ভুলে যান নি।

জহরলালের ভূমিকা ভিন্নতর। যথারীতি তিনি দ্বিধান্বিত, ব্যক্তিগত অভিরুচির দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। বন্দেমাতরমের বিরুদ্ধে তিনি বিরক্ত ছিলেন; তিনি মনে করেছিলেন, গানটির মধ্যে ধর্ম আছে এবং হিন্দুধর্ম—স্বতঃই সেটা তাঁর মনঃপূত নয়। রাষ্ট্রক্ষমতা হস্তগত হওয়ার পরেই বন্দেমাতরমকে বর্জন করে পরিবর্তে নিলেন জনগণমনকে। রবীন্দ্রনাথের প্রতি কৃতজ্ঞতায়, কিংবা বন্দেমাতরমের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় দাঁড় করাবার মত গান জনগণমন ভিন্ন আর কিছু না থাকায়, অথবা জনগণমন'র সাহিত্যিক সৌন্দর্যে অভিভূত হয়ে; যে-কোনো কারণেই হোক, ঐ গানটিকেই জাতীয় সঙ্গীত করেছিলেন। তবে যেহেতু তিনি জহরলাল নেহরু, রাজনৈতিকদের মধ্যে সাহিত্যিক; তাই রবীন্দ্রনাথের গানের ভাষায় হস্তক্ষেপের চিন্তা করতেই পারলেন না।

কংগ্রেস সভাপতি হিসাবে জহরলাল বন্দেমাতরমের গোড়ার অংশকে নির্দোষ বলে যে সার্টিফিকেট দিয়েছিলেন, বন্দেমাতরমকে বাদ দেবার সময়ে ১০ বছর আগেকার সেই কথাগুলি ভুলে যাবার মত তাঁর স্মৃতি দুর্বল হয় নি। সুতরাং বন্দেমাতরমকে বাদ দেবার জন্য (মনে রাখতে হবে, ব্যাপারটা দাঁড়িয়েছিল জনগণমনকে গ্রহণ করা নয়, বন্দেমাতরমকে বাদ দেওয়া) নতুন যুক্তি জোগাড় করতে হল। কিন্তু জহরলালের প্রদীপ্ত প্রতিভাও উপযুক্ত অজুহাত আবিষ্কার করতে পারে নি। ভারতীয় লোকসভায় তিনি ২৩শে আগস্ট, ১৯৪৮ তারিখে যে বিবৃতি দেন,২ তার মধ্যে আজাদ হিন্দ সরকারের কীর্তিকথা স্মরণ করেছিলেন, বিপাকে না পড়লে যা তিনি কদাপি করতেন না—

> "জনগণমনর সুর ঈষৎ পরিবর্তিত আকারে আই. এন এ. কর্তৃক দক্ষিণপূর্ব এশিয়ায় জাতীয় সঙ্গীত হিসাবে গৃহীত হয়েছিল, ফলে পরবর্তীকালে ভারতেও কিছু পরিমাণে জনপ্রিয়তা অর্জন করে।"

না, এই জন্যই জনগণমনকে জাতীয় সঙ্গীত করা হয় নি। পৃথিবীর জাতীয় সঙ্গীতের ইতিহাসে লিখে রাখবার মত একটি ঘটনা ইতিমধ্যে ঘটে গিয়েছিল, যা প্রমাণ করে ছিল অ্যাকসিডেন্টই আবিষ্কারের জননী। পণ্ডিতজীর মুখেই সে কাহিনী শোনা যাক—

> "(জাতীয় সঙ্গীত নির্বাচনের) ব্যাপারটা শিয়রে এসে দাঁড়াল ১৯৪৭ সালে নিউইয়র্কে রাষ্ট্রপুঞ্জের সাধারণ অধিবেশন কালে। এক বিশেষ ক্ষেত্রে আমাদের প্রতিনিধিদের৩ অর্কেস্ট্রায় জাতীয় সঙ্গীত বাজাবার জন্য বলা হয়। প্রতিনিধিদের কাছে জনগণমন'র একটি রেকর্ড ছিল, তাঁরা সেটিকে দেন, এবং অর্কেস্ট্রায় তার অনুশীলন করা হয়। পরে বৃহৎ সমাবেশে সেটি বাজানো হলে তা অভাব সমাদৃত হয়। অনেক দেশের প্রতিনিধিই এর স্বরলিপি চেয়ে নেন, যা তাঁদের কাছে বৈশিষ্ট্যপূর্ণ ও মর্যাদায়ুক্ত বলে মনে হয়েছিল। জনগণমনর অর্কেস্ট্রা-সুরে রেকর্ডে তুলে নেওয়া হয় ও ভারতে পাঠিয়ে দেওয়া হয়। আমাদের সামরিক বাহিনী তা বাজাতে আরম্ভ করে; দেশের বাইরে ভারতীয় দূতাবাসগুলিও প্রয়োজনের ক্ষেত্রে বাজাতে থাকে। নানা দেশ থেকে এই সুরসঙ্গীতের জন্য সমাদরবাণী ও অভিনন্দন পেতে থাকি; বিশেষজ্ঞগণ ও অন্যান্যরা তাঁদের শোনা অধিকাংশ জাতীয় সঙ্গীতের সুরের তুলনায় এর শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকার করেন।.....
>
> এই সুর সাধারণভাবে সমাদরলাভ করেছিল, সেকথা ছেড়ে দিলেও; তখন আমাদের পক্ষে গত্যন্তর ছিল না, কারণ তখন অপর কোনো জাতীয় সঙ্গীতের উপযুক্ত সুরসঙ্গীত আমাদের কাছে নেই যা বাইরে পাঠানো যায়। সেই পরিস্থিতিতে আমি সকল প্রাদেশিক গভর্নরকে জনগণমন অথবা অপর কোনো সঙ্গীত; জাতীয় সঙ্গীত হিসাবে কাকে গ্রহণ করা যায় সে-বিষয়ে চিঠি লিখি। তাঁদের বলি, তাঁরা যেন মুখ্যমন্ত্রীদের সঙ্গে পরামর্শ করে উত্তর দেন। আমি তাঁদের পরিষ্কার জানিয়ে দিই, এ বিষয়ে শেষ সিদ্ধান্ত করবে গণপরিষদ, তবে বাইরের দূতাবাস যা সামরিক বিভাগের জন্য অবিলম্বে অস্থায়ী কিছু সিদ্ধান্ত করা দরকার। একজন গভর্নর বাদে (মধ্য প্রদেশের গভর্নর) সকলেই জনগণমন'র পক্ষে বলেন। তদনুযায়ী কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভা স্থির করে যে, যতক্ষণ পর্যন্ত না গণপরিষদ স্থির সিদ্ধান্ত করছে, ততক্ষণ পর্যন্ত জনগণমনই জাতীয় সঙ্গীতরূপে ব্যবহৃত হবে।.....
>
> পরে পশ্চিমবঙ্গের নতুন মুখ্যমন্ত্রী আমাদের জানিয়েছেন তিনি ও তাঁর সরকার বন্দেমাতরমেরই পক্ষপাতী।"

[ক্রমশঃ]

২—২৬শে আগস্ট, ১৯৪৮, হিন্দুস্থান স্ট্যান্ডার্ড তা বেরোয়। ('ভারতবর্ষের জাতীয় সঙ্গীত')।
৩—শোনা যায় প্রতিনিধিদের অন্যতম ছিলেন শ্রীমতী বিজয়লক্ষ্মী পণ্ডিত।

বর্ণদর্শন

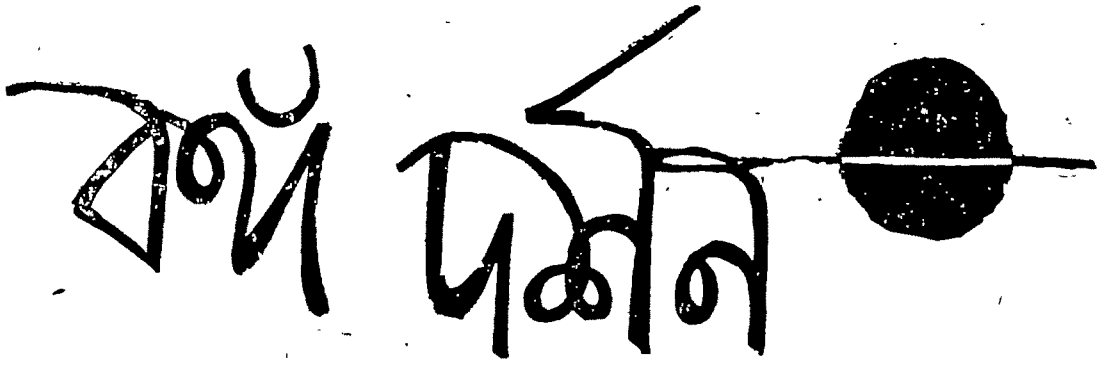

মধ্যবর্তী নির্বাচনে পশ্চিমবঙ্গের জনসাধারণ অতুলনীয় রাজনৈতিক সচেতনতার পরিচয় দিয়েছেন যুক্তফ্রন্টকে বিপুলভাবে জয়ী করে। পশ্চিমবঙ্গের নির্বাচনে যুক্তফ্রন্টের জয়যাত্রা শুধু অভূতপূর্বই নয়, এতটা সাফল্য যেন কল্পনারও অতীত ছিল। সমস্ত জল্পনা-কল্পনা হিসাব-নিকাশকে ব্যর্থ করে দিয়ে যুক্তফ্রন্টের জয়যাত্রা বিস্ময়করভাবে ঘটেছে, ২৮০টি আসনের মধ্যে যুক্তফ্রন্ট একাই ২১৪টি দখল করেছে। প্রবল বন্যার তোড়ে কংগ্রেস ভেসে গেছে, অবস্থা যা দাঁড়িয়েছে তা হচ্ছে এই যে, বোধ হয় পশ্চিমবঙ্গ থেকে কংগ্রেস চিরকালের জন্যই অবলুপ্ত হতে চলেছে। শুধু তাই নয়, পশ্চিমবঙ্গের নির্বাচকমণ্ডলী সমস্ত ছোট ছোট দল ও ভাঁইফোঁড় গ্রুপগুলিকে একেবারে কাচকাটা করে দিয়েছেন। আরও আনন্দের কথা প্রাদেশিকতা ও সংকীর্ণতাবাদী এবং সাম্প্রদায়িকতাবাদী শক্তিগুলিকেও নির্বাচকমণ্ডলী মাথা তুলতে দেন নি। সমস্ত অশুভ শক্তিকে পশ্চিমবঙ্গ হতে বিতাড়নের জন্য ব্যালট বাক্সের মাধ্যমে নিঃশব্দ যে বিপ্লব ঘটে গেল তার প্রতিক্রিয়া আগামী দিনের ইতিহাসে সুগভীর।

যুক্তফ্রন্টের এই বিপুল সাফল্য নিঃসন্দেহে, অপ্রত্যাশিত হলেও, এবারকার নির্বাচনে যে ফ্রন্ট জয়লাভ করবে সেটা আগে থেকেই উপলব্ধি করা গিয়েছিল। কেন না সাপ্তাহিক বসুমতীর ৬ই ফেব্রুয়ারীর সংখ্যায় "ভাঙা-গড়ার দু'বছর" নামক প্রবন্ধে আমাদের রাজনৈতিক পর্যবেক্ষক লিখেছিলেন : "আজকের পরিস্থিতির নিরীক্ষক শক্তি হিসাবে কংগ্রেস আর ফিরে আসতে পারবে না। কেন না, ওরকম সংখ্যাগরিষ্ঠতা মন্ত্রী জনার ফলে কংগ্রেসের হাত থেকে যে উদ্যোগ খসে পড়েছে, কোন কোন রাজ্যে কোয়ালিশন গঠিত করতে পারলেও সে-উদ্যোগ কংগ্রেস ফিরিয়ে পাবে না। বরং যত বেশি কোয়ালিশনের আশ্রয়ে গিয়ে কংগ্রেস রাষ্ট্রিক চালনার ভার নেবে তত বেশিই কোয়ালিশনের আভ্যন্তরীণ সংঘাতের জালে জড়িয়ে পড়বে ও তত বেশি উদ্যোগহীন ও ক্ষমতাহীন হয়ে পড়বে। মনে রাখতে হবে, যুক্তফ্রন্টের কোয়ালিশন ও কংগ্রেসের কোয়ালিশনে মূলগত তফাৎ আছে। যত সমস্যা নিয়েই চলুক না কেন, যুক্তফ্রন্টের কোয়ালিশন জনসাধারণের সঙ্গে যুক্ত থাকতে চেষ্টা করে এবং তা থেকেই তার শক্তি ও অগ্রগতি .....আর পশ্চিম বাংলার দিকে তাকিয়ে এ কথা জোর করেই বলা যায় যে, এখানে ঐক্যবদ্ধ যুক্তফ্রন্টের পিছনে জনসাধারণ আজ যেভাবে সংহত, তাতে যুক্তফ্রন্টের আরও একধাপ এগিয়ে যাওয়া সুনিশ্চিত। কংগ্রেস যত প্রচণ্ডভাবেই লড়ুক না কেন আর তার সাহায্যকারী গোষ্ঠীগুলি কংগ্রেসবিরোধী ভোট ভাঙিয়ে নেবার যত চেষ্টাই করুক না কেন, জনসাধারণের এই সংহতি নষ্ট করা সহজ নয়। কেন না এ সংহতি গড়ে উঠেছে কোন অল্প-শাসনের দ্বারা নয়, কোন লাভ-লোকসানের হিসাবের ভিত্তিতে নয়, গড়ে উঠেছে যুক্তফ্রন্টের সঙ্গে জনসাধারণের আত্মিক যোগসূত্রের ফলেই।"

এইখানেই যুক্তফ্রন্টের এই বিপুল সাফল্যের মূল কথা। তার বিগত নয়মাসের শাসন যে রকমই হোক না কেন, যুক্তফ্রন্ট এটাকে প্রমাণ করতে সক্ষম হয়েছিল যে তার সঙ্গে জনসাধারণের সম্পর্কটা নিছক শাসক ও শাসিতের সম্পর্ক নয়। পক্ষান্তরে কংগ্রেস এইখানেই ব্যর্থ হয়েছিল। যাদের সঙ্গে কংগ্রেসের মেলামেশা দহরম-মহরম তারা একটি বিশেষ শ্রেণী, অধিকাংশ যাদের ভিক্ষোজীবীর বলা যায় করা। আমাদের গত বিশেষ নির্বাচন সংখ্যায় মধ্যবর্তী নির্বাচনের পশ্চাৎপট নামক প্রবন্ধে ডঃ নরেন ভট্টাচার্য যে মন্তব্য করেছিলেন তাও বিশেষ প্রণিধানযোগ্য। তিনি লিখেছিলেন "সপ্তম নির্বাচন পরাজয়ের পর বিরোধীপক্ষ হিসাবে কংগ্রেসের যা করণীয় ছিল, অর্থাৎ জনসাধারণের অভাব-অভিযোগকে জোর ধরা, নানা বিষয়ে গণ উদ্যোগের সৃষ্টি করা, তার একটা কাজও কংগ্রেস করে নি। কংগ্রেসী নেতারা অবিস্ময়ে লক্ষ্য করেছিলেন যে যুক্তফ্রন্ট শাসন ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত থাকা সত্ত্বেও সংশ্লিষ্ট দলগুলি খাদ্যের দাবিতে, মজুরী বৃদ্ধির দাবিতে দিনের পর দিন মিছিল বার করেছে, আইনসভা অভিযান করেছে, তৎকালীন খাদ্যমন্ত্রীর বিরুদ্ধে বিক্ষোভ প্রকাশ করেছে, অর্থাৎ ক্ষমতায় থাকা ও না থাকা উভয় অবস্থাতেই তাদের ভূমিকা একই রকম রয়ে গেছে। পক্ষান্তরে চালের দর পাঁচ টাকা কিলোতে উঠলেও সেই বিষয়টিকে উপলক্ষ করে কংগ্রেস যুক্তফ্রন্ট সরকারের বিরুদ্ধে কোন গণ-আন্দোলন গড়ে তুলতে পারে নি, এবং তা করা তাদের পক্ষে সম্ভবও ছিল না।

কংগ্রেসের ব্যর্থতার কারণ এখানেই। কংগ্রেস এটা বুঝতে চায় নি যে মানুষের দৈনন্দিন জীবনের অভিজ্ঞতাই নিরক্ষর সাধারণ মানুষকে রাজনীতি-সচেতন করে তুলেছে, সে চিনতে শিখেছে কে তার স্বজন, কে তার পর। এই প্রসঙ্গে উক্ত সংখ্যায় প্রকাশিত ডঃ নরেন ভট্টাচার্যের আরও একটি মন্তব্য স্মরণীয় : রাজনৈতিক শিক্ষালাভের যদি আদৌ কোন প্রয়োজন থাকে, সে শিক্ষাটা নেতাদেরই গ্রহণ করা উচিত, সাধারণ মানুষ নিজ অভিজ্ঞতাতেই নিজের কর্তব্য ঠিক করে নেবে। মধ্যবর্তী নির্বাচন একথা নিঃসংশয়ে প্রমাণ করেছে যে সাধারণ মানুষ তার বাস্তব অভিজ্ঞতালব্ধ সঠিক রাজনৈতিক মতামতটি জানাতে গতবারের মত এবারেও দ্বিধা করে নি। লক্ষণীয় যে এবারে বাতিল ভোটের সংখ্যা নগণ্য, এবং ভোটদাতাগণ অপাত্রে দয়া করেন নি, বরং নির্মমভাবে সুবিধাবাদী ভোটের আগে গজিয়ে-ওঠা রাজনৈতিক দলগুলিকে বাতিল করেছেন। ভোটদাতাদের মনের এ-রকম স্পষ্ট অভিব্যক্তি আগে আর কোথাও পাওয়া গেছে কি না সন্দেহ।

যুক্তফ্রন্টের দুই স্তম্ভ

সংবাদপত্রের ভূমিকা

কিন্তু সত্যই কি মধ্যবর্তী নির্বাচনের বিভিন্ন সম্ভাবনাগুলি ধারণার অতীত ছিল? আমাদের মনে হয় তা ছিল না। এ কথা বলতে কোন দ্বিধা নেই যে, বৃহৎ সংবাদপত্রগুলি একযোগে কংগ্রেসের ঢাকের কাঠি হিসাবে কাজ করেছিলেন। কংগ্রেসের নির্বাচনী সভাগুলির বিশদ বিবরণ দিয়ে পাতা ভরানো হয়েছে, আভাসে-ইঙ্গিতে কংগ্রেসকেই সমর্থন জানাতে জনসাধারণকে আহ্বান করা হয়েছে এবং তথাকথিত জ্ঞানগর্ভ প্রাক্-নির্বাচনী সমীক্ষা গণ্ডায় গণ্ডায় প্রকাশ করে বোঝানোর চেষ্টা করা হয়েছে যে, এবারের নির্বাচনে আর যুক্তফ্রন্টের কোন আশা নেই। বিশ্বাস করার সঙ্গত কারণ আছে যে সমীক্ষাগুলি অফিসের টেবিলেই প্রস্তুত করা হয়েছে, এবং যাঁরা সত্যই ভ্রাম্যমাণ হয়েছিলেন, তাঁরাও বোধহয় গ্রামের কোন চায়ের দোকানে বসে মতামত সংগ্রহ করেছেন, এবং স্বকপোলকল্পিত ভাষ্য দিয়েছেন কাগজের পলিসির সঙ্গে সঙ্গতি রেখে। নতুবা তাঁদের সমীক্ষা বাস্তবের সঙ্গে মিললো না কেন? না মেলার তো কোন কারণ নেই। কোন কোন সাংবাদিক বন্ধু জানিয়েছিলেন যে, হাওয়া যুক্তফ্রন্টের অনুকূলে তা তাঁরা সহজেই বুঝতে পেরেছিলেন, কিন্তু সত্যকথা লিখতে বাধা ছিল!

এবং আরও লক্ষণীয় এই যে, বৃহৎ সংবাদপত্রগুলি ফ্রন্টের বিজয়লাভের পরেই রাতারাতি ভোল বদলে ফেলেছেন। যে সংবাদপত্র ৯ই ফেব্রুয়ারীর সম্পাদকীয়তে স্থায়ী সরকার গঠনে সক্ষম পার্টিকে ভোট দিতে দৃপ্ত আহ্বান জানিয়েছিলেন ওজস্বিনী ভাষায় (কংগ্রেসের ওইটাই প্রধান নির্বাচনী শ্লোগান ছিল), ফলাফল প্রকাশের পরে সেই সংবাদপত্রই "নূতনেরে করি আহ্বান" বলে রাতারাতি ডিগবাজি খেয়ে গেলেন। এখন দেখা যাচ্ছে "কেবা আগে প্রাণ করিবেক দান" তা নিয়ে যুক্ত-ফ্রন্ট বন্দনার কম্পিটিশান পড়ে গেছে। সাধু সাবধান!

এবং কিছু কবি-সাহিত্যিক আছেন, তাঁদের কথা না বললে ষোলকলা পূর্ণ হয় না, যাঁরা কংগ্রেসী আমলে প্রকাশ্যে বা অপ্রকাশ্যে নানা ধরণের লাভের আশায় কংগ্রেসের সঙ্গে দহরম-মহরম করেছেন, আবার যুক্তফ্রন্ট স্থাপিত হলে রাতারাতি ভোল বদলে নিখাদ সমাজতন্ত্রী সাহিত্যিক হয়ে গেছেন, মন্ত্রীদের সম্বর্ধনার জন্য লাফালাফি করেছেন, এবং ডঃ ঘোষের চণ্ড রাজত্ব শুরু হলে নিরাপদ বিবরের মধ্যে মুখ ঢুকিয়েছেন। শুনেছি আমাদের দেশে ঘোরতর বামপন্থী সাহিত্যিক অনেক আছেন, যাঁদের চুরুটের ধোঁয়ার মধ্য দিয়ে প্রতি মুহূর্তে মার্কসবাদ নির্গত হয়। কিন্তু ঘোষ-শাসনের সেই ভয়ংকর দিনগুলিতে তাঁরা কোথায় ছিলেন? ক'জন সাহিত্যিক প্রকাশ্যে বিবৃতি দিয়েছিলেন? ক'জন সাহিত্যিক সেই বিশ্বাস-ঘাতকতামূলক কর্মের বিরুদ্ধে লেখনী ধারণ করেছিলেন? ক'জন সাহিত্যিক আইন অমান্য আন্দোলন করে জেলে গিয়েছিলেন? এঁরা হয়ত আবার সুসজ্জিত মঞ্চে অভিনন্দনের তোড়া নিয়ে যুক্তফ্রন্ট সম্বর্ধনায় এগিয়ে আসবেন। হয়ত তা দেখে কোন কোন মন্ত্রী ভিজেও যেতে পারেন। তাই আবার বলছি সাধু সাবধান।

যাঁরা চরম শিক্ষা পেলেন

"নেতাদের রাজনৈতিক শিক্ষার প্রয়োজন" আমাদের জনৈক প্রবন্ধলেখকের এই উক্তিটির আমরা কিছু আগেই পুনরুক্তি করেছি। কি রকম শিক্ষার প্রয়োজন এবং কারা নেতাদের সেই শিক্ষা দেবেন সেই বিষয়ে অবশ্য উক্ত প্রবন্ধ লেখক কিছু বলেন নি। সেই শিক্ষা দিয়েছেন জনগণ, চূড়ান্তভাবেই। "ক্ষমতার মূল উৎস জনগণ" এই যে কথাটি আজকাল বিভিন্ন দেওয়ালে প্রায়ই লেখা থাকে, এই দেওয়ালে লিখনের প্রতি যদি কংগ্রেসের দৃষ্টি আকৃষ্ট হয় তবেই তার রাজনৈতিক শিক্ষা পুরো হবে। এ শিক্ষা গান্ধীজী বহু আগে দেবার চেষ্টা করেছিলেন, কিন্তু

কৃতকার্য হন নি, এবারে পশ্চিমবঙ্গের ভোটাররা ভাল করেই তা শিখিয়ে দিয়েছেন।

চূড়ান্ত শিক্ষা হয়েছে কবির সাহেবের। ভদ্রলোক স্বপ্ন দেখেছিলেন অনেক। তিনি এবং তাঁর লোকদলই হবে না কি পশ্চিমবঙ্গের রাজনীতির নিয়ামক, ব্যালান্সিং ফোর্স। তাঁর সাধের স্বপ্ন যে ব্যর্থ হবে সেকথা আমরা আগে বহুবার বলেছি। নির্বাচকমণ্ডলী শ্রীকবির ও তাঁর লোকদলকে আবর্জনার পঙ্ককুণ্ডে নিক্ষিপ্ত করেছেন। তাঁর সাধের লোকদল একটা আসনও পায় নি। এই সঙ্গে কবির সাহেবের রাজনৈতিক জীবনেরও ইতি হল। আর একজনেরও রাজনৈতিক মৃত্যু হল, যিনি হচ্ছেন আশু ঘোষ। কবির সাহেবের মত তিনিও অনেক স্বপ্ন দেখেছিলেন, শুধু দেখতে চান নি মানুষকে, বুঝতে পারেন নি এটা পশ্চিমবঙ্গ, শুধু হরিয়ানা নয়, বোধ হয় জানতেন না পশ্চিমবঙ্গের তথা বাংলা দেশেরই একটা সংগ্রামী ঐতিহ্য আছে, এখানে সুবিধাবাদের স্থান নেই। তিনটি কেন্দ্র থেকে তিনি দাঁড়িয়েছিলেন এবং সর্বত্রই তাঁর জামানত বাজেয়াপ্ত হয়েছে। হরিপদ ভারতী ও সৌমেন্দ্রনাথ ঠাকুরের কথাও একটুখানি এসে পড়ে এই প্রসঙ্গে। এঁরা তো প্রতিটি নির্বাচনেই প্রত্যাখ্যাত হয়ে এসেছেন, তবু কেন চূড়ান্ত শিক্ষা এঁদের হল না সেইটাই গবেষণা করার বিষয়।

এবং সবচেয়ে বড় শিক্ষা হয়েছে বিশ্বাসঘাতকদের। বাংলা দেশের জনগণ প্রমাণ করে দিয়েছে যে এখানে বিশ্বাসঘাতকদের কোন স্থান নেই। বহুদিনের সাধনায় সিদ্ধ ডঃ ঘোষ বৃদ্ধ বয়সে লাঞ্ছনা এবং অপযশ ভিন্ন আর কিছুই কুড়োতে পারেন নি। পাঁচজনের সঙ্গে একসঙ্গে কাজ করতে গেলে যে টীম স্পিরিট থাকার প্রয়োজন তা তাঁর ছিল না, অতিরিক্ত ক্ষমতালোভের উদগ্র আগ্রহে তিনি ফ্রন্টের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করেছিলেন, এবং তার প্রায়শ্চিত্ত বৃদ্ধ বয়সে তাঁকে করতে হল। অপরাপর দলত্যাগীরাও নিস্তার পান নি, জনতার রুদ্ররোষে বিস্মৃতির অতলে সকলেই তলিয়ে যেতে বাধ্য হলেন। ডিফেকশানের রাজনীতি পশ্চিমবঙ্গ থেকে চিরকালের জন্য বন্ধ হল। কেন্দ্রীয় নেতারা যাঁরা আইন প্রণয়ন করে দলত্যাগ বন্ধ করতে চান তাঁরাও শিখুন, অজয় মুখোপাধ্যায় যা বলেন, জনসাধারণই সুপ্রীম কোর্ট, সেইটাই ধ্রুব সত্য, এবং জনসাধারণের রাজনৈতিক সচেতনতাই বহু অন্যায়ের প্রতিকার করতে সক্ষম।

মন্ত্রিসভার উদ্দেশ্যে

এই বঙ্গদর্শন লেখার সময় পর্যন্ত মন্ত্রিসভার সদস্য কে কে হবেন সে বিষয়ে কিছু জানা যায় নি। এ সংখ্যায় সাপ্তাহিক বসুমতী প্রকাশের সময় অবশ্য নতুন মন্ত্রিসভা শপথ গ্রহণ করে ফেলবেন। যতদূর মনে হয়, পুরাতন যুক্তফ্রন্টের মন্ত্রীদের অনেকেই নতুন মন্ত্রিসভায় থাকছেন। অবশ্য এবার তাঁরা যাচ্ছেন পূর্বের তুলনায় অনেক বেশি প্রজ্ঞা ও অভিজ্ঞতা নিয়ে। গতবারে কাজ করার সময় তাঁরা আমলাতন্ত্র ও কায়েমী স্বার্থের কাছে কি রকম বাধাপ্রাপ্ত হয়েছিলেন সে অভিজ্ঞতা তাঁদের আছে। কাজেই সে বিষয়ে তাঁদের ওয়াকিবহাল করা নিষ্প্রয়োজন।

বর্তমান প্রশাসন যখন একান্তই আমলাতন্ত্র নির্ভর তখন এই সংগঠনটিকেই যতদূর সম্ভব কর্মক্ষম করে নিতে হবে, এবং সেজন্য প্রয়োজন ব্যাপক রদবদলের। আমলাতন্ত্রের তরুণতর এবং প্রগতিবাদী শক্তিগুলির ওপরই বিশেষ করে জোর দিতে হবে। দু-একজন বড় আমলার বদলি বা অবসর গ্রহণের দ্বারা এ কাজ সিদ্ধ হবে না, চাই ব্যাপক রদবদল। জনসাধারণের এ দাবিটা করার নিশ্চয়ই অধিকার রয়েছে। বুড়ো ঘোড়া ছুটতে পারে না এবং তার ওপর আরোহণ করলে আরোহী ও বুড়ো ঘোড়া উভয়ের পক্ষেই বিড়ম্বনা। যে সব আমলারা নতুন চিন্তা ও কর্মের সঙ্গে নিজেদের খাপ খাওয়াতে পারবেন না, তাঁদের মানে মানে বিদায় নেওয়াটাই ভাল।

সমাজদেহে আজ যে নানা ধরণের ব্যাধির অনুপ্রবেশ ঘটেছে তার সম্পূর্ণ চিকিৎসা সম্ভবপর না হলেও নতুন মন্ত্রিসভার কাছে আমরা এ বিষয়ে অনেক কিছুই আশা করি। বিগত যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রিসভার আমলে আমরা নানা বিষয়ে দুর্নীতি এবং অপকর্মের কিছু কিছু তথ্য তাঁদের সরবরাহ করেছিলাম, এবং আমরা যা ইতিপূর্বে বহুবার স্বীকার করেছি, বহুক্ষেত্রেই তাঁরা যথোপযুক্ত ব্যবস্থা অবলম্বন করেছিলেন। এবারেও আমরা সেই সহযোগিতা করতে প্রস্তুত। দৃষ্টান্তস্বরূপ, আমাদের কাছে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের এম ডি পরীক্ষার ব্যাপারে বহু দুর্নীতি ও অনাচারের তথ্য আছে, যেগুলি আমরা যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রিসভার শিক্ষা ও স্বাস্থ্যমন্ত্রীদ্বয়ের সামনে পেশ করব। যদিও বিশ্ববিদ্যালয় একটা স্বয়ংশাসিত সংস্থা, তথাপি আশা করব সত্য ও ন্যায়ের খাতিরে ওই বিষয় সম্বন্ধে যেন একটি পূর্ণাঙ্গ তদন্ত করা হয়, এবং দোষী ব্যক্তিদের শাস্তি দেওয়া হয়।

অগণিত জনসাধারণের শুভেচ্ছা নিয়ে যুক্তফ্রন্ট আবার ক্ষমতাসীন হলেন, আমাদেরও অভিনন্দন এই প্রসঙ্গে জানাই। তবে যুক্তফ্রন্টের পথ কুসুমাস্তীর্ণ নয়, নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা থাকলেও নয়। আমলাতন্ত্রের অসহযোগিতা, সহকারী কর্মীদের চিরন্তন ক্ষমতা এবং কেন্দ্রের অসহযোগিতা যুক্তফ্রন্টকে প্রতিমুহূর্তেই বিপদে ফেলার চেষ্টা করবে। নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা থাকা সত্ত্বেও কেরলের কমিউনিস্ট সরকারকে উৎখাত করতে কেন্দ্রের বাধে নি, সে ইতিহাস ভুলে গেলে চলবে না। এই কারণেই প্রয়োজন ঐক্য ও সংহতি। যুক্তফ্রন্ট ঐক্যবদ্ধ ছিল বলেই এই অভাবনীয় সাফল্য অর্জিত হয়েছে এ এ কথাটা ভুলে গেলে চলবে না। মন্ত্রীদের কিছুটা বাক্‌সংযমেরও প্রয়োজন আছে, উল্টোপাল্টা বিবৃতির মূল্য গতবারে বড় কম দিতে হয় নি। তৃতীয়ত, যুক্তফ্রন্ট সরকারের প্রচার ব্যবস্থাটা ভাল হওয়া দরকার। বৃহৎ সংবাদপত্রগুলির একটিও যুক্তফ্রন্টের আয়ত্তে নেই, আকাশবাণীর সঙ্গেও গতবারে যুক্তফ্রন্ট সরকারের সুসম্পর্ক ছিল না, যুক্তফ্রন্টের নিজস্ব কোন সংবাদপত্র ছিল না। অথচ আজকের যুগে প্রচারের মহিমাকে অগ্রাহ্য করলে চলে না। যুক্তফ্রন্টের যাত্রাপথ শুভ হোক এই কামনা করেই এবারের বঙ্গদর্শন শেষ হল।

(১৫-২-৬৯)

বিবাহ রেজিস্ট্রেশন অফিস
(স্পেশাল ম্যারেজ অ্যাক্ট—১৯৫৪)
শ্রীগিরিজাশঙ্কর ভাদুড়ী
ম্যারেজ অফিসার
কলিকাতা ও ২৪ পরগণা
১/১এ মহাত্মা গান্ধী রোড (শিয়ালদহ)
ফোন নং : ৩৫-৪৬১৭
বাড়ী : ২৩।১, নন্দলাল দত্ত ষ্ট্রীট, কলি-৬

ভারত দর্শন

অন্তর্বর্তী নির্বাচন

১৯৬৭ সালের চতুর্থ সাধারণ নির্বাচনে সর্বপ্রথম যে নাগরিক চেতনার স্ফুরণ দেখা গেছল তাকেই বানচাল ও পর্যুদস্ত করার জন্য বিভিন্ন পক্ষ থেকে বিভিন্ন আঘাত নেমে আসতে থাকে বিভিন্ন রাজ্যে ভিন্ন ভিন্ন চেহারা নিয়ে। এবং সংখ্যা-গরিষ্ঠতার নিশ্চিন্তি নিয়ে যে কংগ্রেস ভারতবর্ষব্যাপী জনসংযোগ ছিন্ন করে গদিবিলাসী শাসকমাত্রে পরিণত হয়েছিলেন, সেই কংগ্রেসীরাও ১৯৬৭-র গণ-রায়কে যথেষ্ট আমল দিতে চান নি। শাসকের দুটি বদগুণ কংগ্রেসী ঘরে আসর জাঁকিয়ে বসেছিল, অন্ধত্ব ও বধিরতা। কংগ্রেসের প্রতি জনগণের ব্যাপক বীভ-শ্রদ্ধাকে কেন্দ্রের কংগ্রেসী নেতৃত্ব ভেবে-ছিলেন রাজনীতির কাটকাবাজারে এম-এল-এ কেনা-বেচা করে বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ প্রদর্শন করবেন, ব্যর্থ হলে, কেন্দ্রীয় লগুড় অর্থাৎ রাষ্ট্রপতির শাসন চাপিয়ে স্ফুরিত গণ-বিদ্বেষকে দমন করবেন। সাময়িকভাবে এই দুটি অস্ত্র প্রয়োগ করে রাজ্যে রাজ্যে অ-কংগ্রেসী সরকার তাঁরা ফেলেও দিয়ে-ছিলেন। কিন্তু তার ফল যে কী শোচনীয় রূপ পরিগ্রহ করতে পারে, কেন্দ্রের তথা-কথিত শক্ত-মানুষরা এবং ইন্দিরা-সরকার তা সঠিক গণনা করতে পারেন নি। তাঁদের ভ্রান্ত গণ-সংযোগছিন্ন নীতির ফলে পশ্চিমবঙ্গ কংগ্রেসী প্রত্যাশার জাল ছিন্ন করে আজ বেরিয়ে আসতে পেরেছে। অন্যান্য রাজ্যে যেহেতু অধিকতর দক্ষিণী-প্রীতি রাজ্যগুলিকে অপেক্ষাকৃত অন্ধকারে নিক্ষিপ্ত করেছিল, সেকারণ সেখানে মধ্য-বর্তী নির্বাচনের পূর্ণ সুযোগের সদ্ব্যবহার নাগরিকবৃন্দ ১৯৬৯ সালেও করে উঠতে পারেন নি; তবে সেখানেও আঁধিয়ার ঝড় পাতলা হয়ে এসেছে স্পষ্টতই।

কংগ্রেসের একশ বছরের দীর্ঘ একটানা শাসনে জনগণ কেবলমাত্র শাসিত সম্প্রদায়ে পরিণত হয়েছিলেন। চতুর্থ নির্বাচনকালে সেই ধীরগতি গণ-ঈশ যখন নড়ে উঠলেন, কংগ্রেসের মধ্যেও তখন, সঠিক রাজনীতি বজায় থাকলে, নাড়া জাগত। কিন্তু বৃদ্ধ জগদ্দল পাশ ফিরে তাকাতেও অক্ষম হয়ে পড়েছে। কংগ্রেসে নাড়া জাগে নি, জেগেছিল অক্ষম বৃদ্ধের আক্রোশ। বলা বাহুল্য, অক্ষমের আক্রোশ মন্দ ছাড়া ভালো করে না। কংগ্রেসেরও মন্দ ছাড়া ভালো হয় নি, হওয়ার কথাও নয়।

কংগ্রেসী নেতৃত্ব থেকে বৃদ্ধদের বিদায় করতে না পারলে ক্ষয়িষ্ণু কংগ্রেসের আত্ম-প্রসাদ শাসক রাজনীতির সমূহ বিপর্যয় ভবিষ্যতে আর কেউ রোধ করতে পারবে না।

ক্ষমতাসীন কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব এবারেও অন্তর্বর্তী নির্বাচনের ফলাফল লক্ষ্য করে ঐ সাফা সত্যটি হৃদয়ঙ্গম করতে পেরে-ছেন এমন মনে হল না। কংগ্রেস সভাপতি নিজলিঙ্গাপ্পা এখনও ভোটের অঙ্ক নিয়ে ব্যস্ত। তিনি ভোটের পারসেন্টেজ দেখেই আত্মপ্রসাদ লাভের মোহটি পূর্ববৎ লালন করার উৎসাহ পেয়েছেন। বলেছেন, অন্ত-র্বর্তী নির্বাচনের ফলাফল কেন্দ্রের ওপর বিশেষ প্রভাব বিস্তার করবে না। কেন না তাঁর বিশ্বাস, বাস্তব বিচারে কংগ্রেস ১৯৬৭ সালের ভিত্তির ওপরই সমানভাবে প্রতিষ্ঠিত আছে। কিছু হেরফের হয় নি। এই মসনদী আত্মতুষ্টিই কংগ্রেসকে জন-সংযোগ ছিন্ন করে মসনদবিলাসী করেছে। উপর্যুপরি বিপর্যয়ের পরেও সেই বিলা-সিতায় ছেদ পড়ল না এটাই আশ্চর্য!

কংগ্রেসী মনের আসনে জনগণের স্থান ক্রমেই যে সঙ্কুচিত হয়ে আসছিল, পশ্চিম-বঙ্গে কংগ্রেসের শোচনীয় পতনের মাঝখানে পরাজিত প্রাক্তন কংগ্রেসী মুখ্যমন্ত্রী প্রফুল্ল-চন্দ্র সেনের ব্যক্তিগত পুনরুত্থানের পর প্রফুল্লবাবুর উক্তিই তার জাজ্বল্যমান প্রমাণ রেখেছে।

কংগ্রেস সংগঠন সম্পর্কে কৌতূহলী সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তরে মুমূর্ষু কংগ্রেসকে পুনর্জীবিত করার ব্যাপারে প্রফুল্লবাবু বলেন, "এখন আমাদের আবার নিচের দিকে নেমে যেতে হবে। নিচে অর্থাৎ যেখানে সাধারণ মানুষের স্পর্শ ছড়ানো।"

সাধারণ মানুষকে কংগ্রেসী নেতারা যে কতদূরে তাচ্ছিল্যভাবে 'নিচতলার' মানুষ করে রেখেছেন প্রফুল্লচন্দ্র সেন তা অসতর্ক মুহূর্তে স্বীকার পেলেন। সৌভাগ্য বলতে হবে, জনগণের দরবারে নির্মম বিচারের পর জনৈক কংগ্রেসী নেতা সেই 'নিচে' নামার কষ্টটুকু স্বীকার করতে কাজে-কাজেই প্রায়-মনস্থ হয়ে উঠেছেন। কষ্ট হবে সন্দেহ নেই। তবু এবার 'নিচে' না নেমে উপায়ও নেই তাঁদের।

অন্তর্বর্তী নির্বাচনে পশ্চিমবঙ্গের মত অন্যত্র কিন্তু সুস্পষ্ট গণ-নির্দেশ ভোটের মাধ্যমে দেখা দেয় নি। পশ্চিমবঙ্গ স্থায়ী সরকার প্রতিষ্ঠার সুস্পষ্ট নির্দেশ দিয়েছে, ফ্রন্টের হাতে রাজ্যের আশা-আকাঙ্ক্ষাকে তুলে দিয়ে। অন্য রাজ্যে দ্বিধা অশক্ত সরকারের জন্য আবারও দুর্বল আসন সাজিয়ে দিয়েছে। পশ্চিমবঙ্গে এই সুস্পষ্ট গণ-রায়ের পরেও যদি ফ্রন্টে শরিকী বিবাদ অনিবার্য হয়ে পড়ে, তবে স্পর্শকাতর বাঙালীমনে ফ্রন্টের প্রতি যে বীতশ্রদ্ধা জন্মলাভ করবে তার প্রতিক্রিয়া কিন্তু অধিকতর নির্মম হয়ে উঠতে পারে। ফ্রন্টে থাকার জন্যই আজ অনেকগুলি দলই আশাতীত সংখ্যক আসন লাভে সমর্থ হয়েছেন।

গণরায়কে উপেক্ষা করলে নির্বাচনে ছোট দলের তৃতীয় শক্তি আজ যেভাবে জন-গণের দ্বারা প্রত্যাখ্যাত হয়েছে এবং দল-ছুটরা যেভাবে নিক্ষিপ্ত হয়েছেন, উপেক্ষা-কারী দল বা ব্যক্তি ঠিক সেইভাবেই জবাব পাবেন, মধ্যবর্তী নির্বাচন তারও সুস্পষ্ট ইঙ্গিত শুধু পশ্চিমবঙ্গেই নয়, অন্যত্রও রেখেছে। এই ইঙ্গিত হরিয়ানায় প্রথম লক্ষিত হয়। এবার চার রাজ্যেই সে ইঙ্গিত সুস্পষ্ট।

কিন্তু পশ্চিমবঙ্গে জনতার জয় যেমন সুস্পষ্ট আকৃতি গ্রহণ করেছে, অন্যত্র তেমন আকার নেয় নি। সেখানে সঠিক পোলারাইজেশনের জন্য বোধহয় আরও দুই একটি নির্বাচনের শিক্ষা প্রয়োজন হবে।

পশ্চিমবঙ্গের আলোচনা যেহেতু স্থানা-ন্তরে উপস্থাপিত করা হয় সেজন্য সমগ্র ভারতের অন্য কয়টি রাজ্যের আলোচনায় বর্তমান নিবন্ধকে সীমিত করছি। পরবর্তী সংখ্যায় অপেক্ষাকৃত বিস্তৃত আলোচনায় যেসব আমরা রাজ্যওয়ারী বিস্তারিত আলোচনা। কিন্তু তারও আগে মধ্যবর্তী নির্বাচনে পরিলক্ষিত কয়েকটি সাধারণ লক্ষণকে এখানে ক্রমান্বয়ে সাজিয়ে দিতে চাই।

একনজরে অন্তর্বর্তী নির্বাচনের কয়েকটি সাধারণ লক্ষণ

১। অন্তর্বর্তী নির্বাচনে সর্বপ্রথম সাধারণ লক্ষণটি এবার স্পষ্ট হয়ে উঠেছে, তা হল, ভারতের জনগণ অপেক্ষাকৃতভাবে

তাঁদের নাগরিক অধিকার সম্বন্ধে সচেতন হয়েছেন। এবার ভোটবাক্সে ভোট পড়েছে অনেক বেশি। সাধারণ নাগরিকবৃন্দ নির্বাচন বরকটের সস্তা শ্লোগানের জবাব দেওয়ার জন্যই যেন শতকরা প্রদত্ত ভোটের সংখ্যাকে বাড়িয়ে দিয়েছেন। মানুষ গণতন্ত্র-সচেতন হয়েছেন।

২। সাম্প্রদায়িক জিগির তুলে নাগরিকবৃন্দকে বিভ্রান্ত করার রাজনৈতিক চাতুরী এবার কোথাও-ই বিশেষ কল্কে পায় নি। পশ্চিমবঙ্গে এ-জাতীয় সস্তা রাজনীতির চটক জনগণ একেবারেই বরদাস্ত করেন নি।

৩। সুস্থ গণতন্ত্রে যে পোলারাইজেশন একান্ত কাম্য, পশ্চিমবঙ্গে তা পূর্ণাকার আকৃতি গ্রহণ করেছে।

৪। পাঞ্জাব ও পশ্চিমবঙ্গের রাজনীতিতে নির্দলের স্থান বাজেয়াপ্ত হয়েছে। নির্দলীয় যাঁরা বেরিয়ে এসেছেন, তাঁদের অধিকাংশই রাজনৈতিক দলের সমর্থিত প্রার্থী। পাঞ্জাব নির্দলদের জামানত একধার থেকে জব্দ করেছে।

৫। ব্যক্তির প্রতি মোহও উল্লেখযোগ্যভাবে কমে এসেছে।

৬। ছোট দলগুলি বিশেষ পাত্তা পায় নি।

৭। নির্বাচনী অপপ্রচারে জনগণকে প্রত্যাশিতভাবে প্রভাবিত করা সম্ভব হয় নি।

৮। নির্বাচনী রায় বহু ক্ষেত্রেই হিসাব-নিকাশের বাইরে চলে গেছে। যার দ্বারা প্রমাণিত হয় নির্বাচকমণ্ডলীর মানসিকতায় দ্রুত পরিবর্তন শুরু হয়েছে। তাঁরা কেবলমাত্র কয়েকটি গোষ্ঠীগত, এলাকাগত সংখ্যামাত্র নন, রাজনৈতিক ফাটকাবাজির কমোডিটিও নন, মর্যাদাবান নাগরিক হিসেবে প্রতিষ্ঠা পেয়েছেন (এই লক্ষণটি পশ্চিমবঙ্গে বিশেষভাবে পরিস্ফুট)।

৯। নির্বাচনকে কেন্দ্র করে দুষ্কৃতকারীরা দাঙ্গা করে স্থানীয় প্রভাব বিস্তারের চেষ্টায় ব্যর্থ প্রতিপন্ন হয়েছেন।

১০। এবং দলত্যাগীদের জনগণ সঘৃণায় পরিত্যাগ করে গণরায় হেরফের করার পাল্টা জবাব দিয়েছেন। পাল্টা জবাব দিয়েছেন গণতন্ত্রকে নিহত করার সবরকম কৌশলী প্রয়াসেরও।

মোটামুটি এই দশ দফা লক্ষণ বিনা গবেষণায়ই হাতের কাছে পাচ্ছি। এর পর গভীর বিশ্লেষণে আরও গূঢ় লক্ষণ ধরা পড়বে। তবে তাও ঐ দশ দফারই প্রশাখা-বিশেষ ভিন্ন অন্য কিছু হবে না বলেই বিশ্বাস।

এবারে নির্বাচনের প্রাক্কালে উত্তর ভারতে যে ধরণের উচ্ছৃঙ্খলতা ও প্রাণহানি ঘটেছে, পশ্চিমবঙ্গে ঠিক সেই তুলনায়ই আশ্চর্যরকম প্রশান্তি বিরাজ করেছে। এর দ্বারা আর একটি সহজ উপসংহারে আসা যায় এই যে, যেখানে নাগরিকগণের মধ্যে বস্তুত গণতান্ত্রিক চেতনা দেখা দেয়, সেখানে দাঙ্গাবাজির আর স্থান থাকে না। নাগরিক সাধারণ যতক্ষণ অন্ধকারে নিমজ্জিত, রাজনৈতিক ফাটকাবাজরা ততক্ষণ সাধারণ মানুষের রক্তে হোলি খেলে মসনদ অধিকারের প্রয়াস পেয়ে থাকেন ও সুযোগ লাভ করেন। পশ্চিমবঙ্গ রাজনৈতিক গুণ্ডাদের হাতে সেই সুযোগ তুলে দেয় নি। তত্রাচ পশ্চিমবঙ্গে ইতস্তত যে দাঙ্গাবাজি ও গুণ্ডামীর স্ফুরণ দেখা দিয়েছে, জনসাধারণের কাছে সেই দাঙ্গাবাজির নেপথ্যচারী গুণ্ডারা প্রায় ক্ষেত্রে ধরা পড়ে যাওয়ায় তা বৃহদাকারে ছড়িয়ে পড়ার পথ পায় নি। সচেতন ও দায়িত্বশীল নাগরিকচেতনা ভবিষ্যতে রাজনৈতিক গুণ্ডামী বরদাস্ত করবেন না। ও জিনিসটা অশিক্ষার উপহার এবং জন-আস্থাহীন দুর্বলের শেষ হাতিয়ার, একথা জনসাধারণ উপলব্ধি করতে পেরেছেন।

পাঞ্জাবে ফ্রন্ট মন্ত্রিসভা

পাঞ্জাবে কোন দলই নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করতে না পারলেও অ-কংগ্রেসী ফ্রন্টের হাতে রাজ্যের ভাগ্য পুনশ্চ অর্পিত হয়েছে। বিধানসভায় একক সংখ্যাগরিষ্ঠ দল আকালী আসন টেনেছে তেতাল্লিশটি এবং দ্বিতীয় দল হিসেবে স্থান করে নিয়েছে কংগ্রেস তার আটত্রিশটি আসন নিয়ে। মোট একশ' চার আসনের সভায় তাই কেউই পান নি নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা। আকালী পরিষদীয় দলের নেতা হিসেবে নির্বাচিত হবার পরই শ্রীগুরনাম সিং ঘোষণা করেছেন যে, তিনি অ-কংগ্রেসী প্রত্যেকটি দলকেই একত্রে মন্ত্রিসভা গঠনের জন্য আহ্বান জানাবেন, যে আমন্ত্রণে দল হিসেবে সি পি আই-ও বাদ পড়বে না। আকালী দল-নেতার আশা অন্তত তেষট্টি জন সদস্যই ফ্রন্ট মন্ত্রিসভাকে সমর্থন জানাবেন। নির্দলীয় দরবারা সিং ও বলবীর সিং নাকি ইতিমধ্যেই আকালী দলে যোগদানের অনুমতি প্রার্থনা করেছেন বলে গুরনাম সিং দাবি করছেন।

পাঞ্জাব বিধানসভার বর্তমান চেহারা নিম্নরূপ :

মোট আসন	১০৪
প্রাপ্ত সংখ্যা	১০৩
কংগ্রেস	৩৮
আকালী	৪৩
জনসঙ্ঘ	৮
সি-পি-আই	৩
সি-পি-এম	২
এস-এস-পি	২

এছাড়া পি-এস-পি, স্বতন্ত্র ও জনতা পার্টি প্রত্যেকে একটি করে এবং নির্দল ও খুচরো মিলে চারটি।

জামানত জব্দের বহর

দলত্যাগী লছমন সিং গিল দুই জায়গায় দাঁড়িয়ে এক জায়গায় নির্বাচিত হলেও তাঁর জনতা পার্টির বাকি সব ক'জন প্রার্থীই পরাজিত হয়েছেন। দলের মোট প্রার্থী সংখ্যা ছিল চোদ্দ। এর মধ্যে এগারো জনেরই জামানত জব্দ হয়েছে।

রিপাবলিকান পার্টি খাড়া করেছিল বিয়াল্লিশ জন প্রার্থী। জনগণ তাঁদের জামানত জব্দ করে সবসুদ্ধ বিদায় করেছেন। এই দলের নেতৃত্বে অন্যতম ছিলেন পাঞ্জাবের প্রাক্তন শ্রমমন্ত্রী পীযূষবালাল ধানোয়ালি।

জামানত বাজেয়াপ্তকরণে পাঞ্জাবী নাগরিকগণ উল্লেখযোগ্য কৃতিত্বের দাবি রাখেন। তিনশ' ছত্রিশ জন প্রার্থীর মধ্যে সেখানে জামানত খুইয়েছেন দু'শ সাঁইত্রিশ জন। একশ' বাষট্টি জন নির্দল প্রার্থীর মধ্যে জামানত জব্দ হয়েছে একশ' চুয়ান্ন জনেরই। বড় দলের মধ্যে কংগ্রেসের একশ' দু'জনের চারজন এবং আকালী দলের বাষট্টির মধ্যে দু'জনের জামানত গেছে।

সি-পি-আই-এর আটাশের মধ্যে সতের, এস-এস-পি'র সাতের মধ্যে পাঁচ, পি-এস-পি'র তিনের মধ্যে দু' জনেরই জামানত জব্দ হয়েছে। সে তুলনায় মার্ক্সবাদী কম্যুনিস্ট দলের দশজন প্রার্থীর মধ্যে জামানত খুইয়েছেন মাত্র দু'জন। এই মার্ক্সবাদী কম্যুনিস্ট দলের নেতা গুরুচরণ সিং বলেছেন, তাঁর দল মন্ত্রিসভার বাইরেই থাকবেন এবং সর্বপ্রযত্নে দেখবেন যেন কংগ্রেস পুনরায় গদিতে প্রত্যাবর্তন করতে না পারে।

মার্ক্সবাদীদের পক্ষে ধনকুবের ও ভূস্বামীপ্রধান আকালী জনসঙ্ঘ মন্ত্রিসভায় গদিনসীন হওয়া যে শুধু অশোভন তাই নয়, নীতিবিগর্হিতও বটে। মার্ক্সবাদীরা বাইরে থাকলে বরং দলের সংগঠনকে আরও জোরদার করারই সুযোগ পাবেন এবং সেই হিসেবে সি পি এম নেতার বক্তব্য সুচিন্তিতও বটে।

কংগ্রেসী বিপর্যয়

দ্বিতীয় দল হিসেবে বিধানসভায় স্থান করে নিলেও মধ্যবর্তী নির্বাচনে কংগ্রেস বিশেষভাবে বিপর্যয়ের সম্মুখীন হয়েছে। দলের প্রতিষ্ঠিত নেতারা টপ টপ করে পড়ে গেছেন, যাঁদের মধ্যে প্রাক্তন মন্ত্রীরাও আছেন। এঁদেরই কয়েকজন হলেন : দরবারা সিং এবং বৃষভাণ, কাপুর সিং ও মোহনলাল (উভয়েই প্রাক্তন অর্থমন্ত্রী) এবং প্রবোধচন্দ্রের মতো নেতা (প্রাক্তন শিক্ষামন্ত্রী)।

বিভিন্ন দলের হারানো প্রাপ্তি

বিভিন্ন দলের ভাগ্য বিপর্যয়কে সংক্ষেপে এইভাবে সাজিয়ে ধরা যায়।

দল	আসন লাভ	আসন খোয়া	আসন অধিকারে	মোট
		দেল	রইল	
কংগ্রেস	ছাব্বিশ	ছত্রিশ	বারো	৩৮
আকালি	উনত্রিশ	বারো	চোদ্দ	৪৩
জনসঙ্ঘ	পাঁচটি	ছয়টি	তিনটি	৮
সি পি আই	দুটি	চারটি	একটি	৩
এস এস পি	একটি	—	একটি	২
স্বতন্ত্র	একটি	—	—	১
জনতা পার্টি	একটি	—	—	১

লক্ষ্যহীন গতি

কিন্তু কেবলমাত্র কংগ্রেসের বিকল্প খুঁজে নেওয়ার মধ্যে জনগণ কোন লক্ষ্যে উপনীত হতে চান পাঞ্জাব রাজ্যে তা অপরিস্ফুট। আজকের পৃথিবীটাই প্রধানত দু'ভাগে বিভক্ত। তরুণতর জনজীবন কল্লোলিত নদীর মতো ধেয়ে চলেছে সমৃদ্ধ— সমাজতন্ত্রের সাগরসঙ্গমের উদ্দেশ্যে। ঠিক এই মুহূর্তে সীমান্তরাজ্য পাঞ্জাব বেছে নিয়েছে জনসঙ্ঘ আকালি দলের মতো (আকালি দল বর্তমানে বিচ্ছিন্নবাদী তারা সিং গোষ্ঠী-পুষ্ট) অধিকতর দক্ষিণপন্থী এবং ক্ষুদ্র সাম্প্রদায়িক মনোভাবাপন্ন আদর্শকে। সেখানে সমাজতন্ত্রীরা দূরের কথা চলমান বিশ্বের সঙ্গে তাল রেখে সমঝোতা করতে চান এমন আপাত সমাজতন্ত্রীদেরও স্থান দেন নি পাঞ্জাবের নাগরিকবৃন্দ।

বিহারে রাজনৈতিক অনিশ্চিতি

পাঞ্জাব ও উত্তরপ্রদেশের চেয়ে বিহারের রাজনৈতিক পরিস্থিতি অনেক বেশি অনিশ্চিত। তিনশ' আঠার আসন বিশিষ্ট বিহার বিধানসভায় কোন দলই উপযুক্ত সংখ্যাগরিষ্ঠতা নিয়ে সভায় প্রত্যাবর্তন করতে সক্ষম হন নি। রাজ্যের নাগরিকবৃন্দ বাখেন নি কোনও স্পষ্ট চৌহদ্দি যার দ্বারা স্থায়ী সরকার গঠনে সহায্য হয়। কংগ্রেসকে সুতরাং কোয়ালিশনের কথা চিন্তা করতে হচ্ছে। যদিও একক সংখ্যাগরিষ্ঠ দল হিসেবে কংগ্রেস টেনেছে দেড়শ' আসন। কিন্তু এই আসন সংখ্যার দ্বারা তিনশ' আঠার আসনের সভায় নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জিত হয় না। কংগ্রেস অবশ্য নির্বাচনের প্রাক্কাল থেকেই এবার অস্পষ্ট স্বরে কোয়ালিশনের ইচ্ছা প্রকাশ করে আসছিল।

বিহারে শ্রীচাবন যাচ্ছেন মন্ত্রিসভা গঠার ব্যাপারে সব গোছগাছ করে তুলতে। ওদিকে পাঞ্জাবে যাচ্ছেন দেশাই। উত্তরপ্রদেশ আর পশ্চিম বাংলায় কোন কেন্দ্রীয় নেতা অভিভাবকের দায়িত্ব পালন করতে আসবেন না বলে কংগ্রেস সভাপতি জানিয়ে দিয়েছেন।

এ পর্যন্ত প্রাপ্ত বিহার বিধানসভার বর্তমান চিত্রটি এইরকম:

কংগ্রেস—১১৮, এস এস পি—৫২, সি পি আই—২৫, জনসঙ্ঘ—৩৪, জনতা পার্টি—১৪, পি এস পি—১৭, ঝাড়খণ্ড—১০, লোকতান্ত্রিক কং—৮, শোষিত দল—৫, বি কে ডি—৬, সি পি এম—৩, এফ বি—১, স্বতন্ত্র—৩ এবং নির্দল—১৯।

বিহারে এস এস পি দল প্রথমে কংগ্রেসকেই মন্ত্রিসভা গঠনের জন্য যাতে রাজ্যপাল সুযোগ দেন সেটাই কামনা করছেন। অন্য উপায় সামনে নেই। কারণ চট করে ফ্রন্ট গঠন করা এবার মুস্কিল। নির্বাচনের আগে উল্টোপাল্টা ঘোষণা হয়ে গেছে। কংগ্রেস নির্দলীয় এবং সমমনোভাবাপন্নদের নিয়ে অবশ্যই মন্ত্রিসভা গঠন করতে পারেন। কিন্তু পরে যে সেই মন্ত্রিসভা পুনশ্চ টলমল করে উঠবে না, এমন গ্যারান্টিও কেউ দিতে পারেন না। সুতরাং বিহারের নাগরিকবৃন্দ যেমন শূন্যে সভা গড়ার নির্দেশ দিয়েছেন, মন্ত্রিসভাকেও কাজে-কাজেই ঝুলন্ত অবস্থায় শপথ গ্রহণ করতে হবে। এই রাজ্যের অনিশ্চিত ভাগ্য লক্ষ্য করে বস্তুত কে যে স্থায়ী সরকার গড়ে উঠতে পারবেন এখনই তা বলা যায় না।

বারান্তরে বিহার নিয়ে বিস্তৃত আলোচনার তাই সুযোগ রাখলাম এইখানেই শেষ করে।

উত্তরপ্রদেশেও কংগ্রেস বে-কায়দা

উত্তরপ্রদেশের চারশ' পঁচিশ আসনে কংগ্রেসই প্রধান দল। যে চারশ' আটটি আসনের ফলাফল এ পর্যন্ত পাচ্ছি তাকে সাজিয়ে ধরলে দাঁড়ায়: কংগ্রেস—২০৮, ক্রান্তিদল—৯৮, জনসঙ্ঘ—৪৮, এস এস পি—৩৩, স্বতন্ত্র—৫, সি পি আই—৪, সি পি এম—১, পি এস পি—৩, নির্দল—৬, রিপাবলিকান—১ এবং অন্যান্য—১৮।

সি ডব্লু সির মিটিং-এ কংগ্রেস নেতা সি বি গুপ্তকে মন্ত্রিসভা গঠনের জন্য সবুজ সঙ্কেত দেওয়া হয়েছে এবং তিনি দিল্লী রওয়ানা হয়ে গেছেন প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি শ্রীকমলাপতি ত্রিপাঠীর সঙ্গে। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে অ-কংগ্রেসী দলগুলির মধ্যেও জোর তৎপরতা পরিলক্ষিত হচ্ছে এবং শেষ পর্যন্ত একথা বলা খুবই শক্ত যে, উত্তরপ্রদেশে কংগ্রেসী শাসনই অনিবার্য।

উত্তরপ্রদেশে দ্বিতীয় বৃহত্তম দল হল প্রাক্তন মন্ত্রী চরণ সিং-এর বি কে ডি। এই দলের আসন সংখ্যা—৯৮। চরণ সিং নিজে বিরোধীপক্ষ বসতে চান বলে ঘোষণা করলেও সঠিক বলতে পারছেন না যে, তিনি মন্ত্রিসভা গঠন করবেন কি না।

অন্যদিকে কংগ্রেস নির্দলদের দলে টেনে মন্ত্রিসভার স্থায়িত্ব সম্পর্কে নিশ্চিন্ত হতে চায়। প্রদেশ কংগ্রেস সাধারণ সম্পাদক বলেছেন, গণতন্ত্রে জনগণের দ্বারা অর্পিত কার্যভার তাঁদের মাথায় তুলে নিতেই হবে। দলে ভারী হওয়া সত্ত্বেও সুতরাং কংগ্রেস খুব স্বস্তির মধ্যে নেই উত্তরপ্রদেশেও। এই রাজ্য সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনার জন্য তাই আর কয়েকটা দিন অপেক্ষা করাই শ্রেয়।

কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভায় রদবদল

প্রশাসনিক সংস্কার কমিশনের পরামর্শাদি মনে রেখে প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী গান্ধী তাঁর মন্ত্রিসভায় এতদিনে বহু-বিলম্বিত যে রদবদল করলেন তার দ্বারা নতুন কোন মুখের আমদানি ঘটে নি, কেবলমাত্র পোর্টফোলিয়োর পরিবর্তন হয়েছে। মন্ত্রিসভা যেভাবে পুনর্গঠিত হল তাতে মন্ত্রীর সংখ্যা কমছে বই বাড়ছে না। শ্রীকামরাজ নাদার মন্ত্রিসভায় যোগদান করবেন কি না তাও এ পর্যন্ত স্থির হয় নি। তবে প্রধানমন্ত্রী যে তাঁকে মন্ত্রিসভায় পেতে একান্ত আগ্রহী এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। কামরাজকে নাগের কোয়েলের উপনির্বাচনে দাঁড় করানোয় প্রধানমন্ত্রীরও কিছু কার্যকরী ভূমিকা ছিল এবং অর্থমূল্য হ্রাসের ব্যাপারে তাঁদের উভয়ের মধ্যে মনকষাকষি হলেও আজ সেই ফাটলে নতুন সিমেন্টের প্লাস্টারের জোড় লেগেছে। শ্রীকামরাজ মন্ত্রিসভায় না এলে বিশিষ্ট দপ্তরগুলিতে কোন পরিবর্তনের আশা নেই। প্রভাবান্বিত কংগ্রেসী শক্ত নেতারা একই আসনে যথাপূর্বং রয়ে যেতে পারবেন। যেমন স্বরাষ্ট্রদপ্তরে বলবন্ত চ্যবন সাহেব এবং অর্থদপ্তরে উপ-প্রধান মোরারজী দেশাই এখনো চালিয়ে যাচ্ছেন। যেমন খাদ্য ও কৃষিদপ্তর পূর্ববৎ জগজীবন রাম এবং প্রতিরক্ষা স্বর্ণ সিং-এরই দখলে রইল।

গুরুত্বপূর্ণ দপ্তর পেলেন দীনেশ সিং। পররাষ্ট্রদপ্তরটি তাঁর হাতে তুলে দেওয়া হল। এই দপ্তর প্রধানমন্ত্রীর হাতেই ছিল। '৬৬ সালের নভেম্বর মাসে ঐ দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী ছিলেন শ্রী এম সি চাগলা। কিন্তু তাঁকে পদত্যাগ করতে হয় নীতির প্রশ্নে, সরকারের শিক্ষানীতির প্রতিবাদে। নেহরুজীর সময়কালে পররাষ্ট্র তাঁর হাতেই ছিল। শাস্ত্রীজীর আমলেই প্রথম এই দপ্তরে নতুন মন্ত্রী নিযুক্ত হন, তিনি স্বর্ণ সিং। চাগলার পূর্বসূরী হিসেবে তিনিই ছিলেন। চাগলার পর ঐ দপ্তর দীর্ঘকাল প্রধানমন্ত্রী নিজের দায়িত্বে রেখে দেন। দীনেশ সিং অবশ্য এই দপ্তরে নতুন নন। পররাষ্ট্রদপ্তরের উপমন্ত্রী ও রাষ্ট্রমন্ত্রী হিসেবে তিনি অভিজ্ঞ হয়েছেন।

বাণিজ্যমন্ত্রকের নামেও রদবদল হয়েছে। এখন থেকে ঐ দপ্তর বৈদেশিক বাণিজ্য এবং যোগান দপ্তররূপে অভিহিত হবে। এই দপ্তরে প্রমোশন পেলেন

শ্রীবলীরাম ভগত। শিল্পদপ্তরের সঙ্গে আভ্যন্তরীণ বাণিজ্যকে যুক্ত করে শ্রীফকরুদ্দীন আলি আমেদের দায়িত্বেই রাখা হল।

বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ ডঃ ত্রিগুণা সেনকে শিক্ষাদপ্তর থেকে সরিয়ে নিয়ে পেট্রো-কেমিক্যাল, খনি ও ধাতু দপ্তরে বদলী করা হল এবং শিক্ষাদপ্তরে আনা হল পরিবহন ও জাহাজ দপ্তর থেকে শিক্ষাবিদ ডঃ ভি কে আর ভি রাওকে। শিক্ষাদপ্তরের সঙ্গে এবার ইয়ুথ সার্ভিসেস বিভাগটিও যুক্ত করা হয়েছে। ডঃ ত্রিগুণা সেনকে একজন অভিজ্ঞ টেকনলজিস্ট হিসেবে প্রশাসনিক সংস্কার কমিশনের সুপারিশের ভিত্তিতেই ভিন্ন দপ্তরে টেনে নেওয়া হয়েছে বলে প্রকাশ।

ডঃ পুনাচার হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে একটি নতুন মন্ত্রক—ইস্পাত ও ভারী শিল্প। কয়েকটি রেল দুর্ঘটনার সঙ্গে ডঃ পুনাচার দায়িত্ব জড়িয়ে পড়েছিল ঐ দপ্তরের মন্ত্রী রূপে। এখন তিনি অব্যাহতি পেলেন। ঐ মরণফাঁদ দপ্তরটির ভার নিলেন ডঃ রাম সুভগ সিং। ডঃ সিং তাঁর নতুন দায়িত্ব সম্পর্কে চমৎকার মন্তব্য করেছেন। তিনি দুর্ঘটনা হ্রাস করতে পারবেন কি না এই প্রশ্নের উত্তরে ডঃ সিং বলেন, রেলমন্ত্রী হওয়াটাই একটা মারাত্মক দুর্ঘটনা। তাঁকে যখন এই দপ্তরই দেওয়া হল, তখন বেশি দুর্ঘটনা হলে তাঁর নিয়োগকারী প্রধানমন্ত্রীরই পদত্যাগ করা উচিত।

প্রচারমন্ত্রী শ্রী কে কে শাহকে স্বাস্থ্য এবং পরিবার পরিকল্পনা সহ গৃহনির্মাণ ও পাবলিক ওয়ার্কস দপ্তর দেওয়া হয়েছে। বেতার ও প্রচারের ভার নিচ্ছেন শ্রীসত্য-নারায়ণ সিংহ। তিনি এই সঙ্গে পরি-বহন যোগাযোগও দেখবেন।

বর্তমান ক্যাবিনেটে রইলেন সতের-জন। আগে ছিলেন উনিশ। চাগলা ও অশোক মেহতার পদত্যাগে (ইনি চেকো-শ্লোভাকিয়া সংক্রান্ত ভারত সরকারের নীতির প্রতিবাদে পদত্যাগ করেন) এবং ইস্পাতমন্ত্রী ডঃ চেন্না রেড্ডির নির্বাচন বাতিল ঘোষিত হওয়ায় তিনটি পদ শূন্য হয়ে যায়। ফলে সংখ্যা দাঁড়ায় সোলয়। প্রধানমন্ত্রী অন্তত আরো দুজনকে জায়গা দিতে পারতেন। কিন্তু তা করা হয় নি। শ্রীকামরাজ মন্ত্রিসভায় যোগদান করলে আর একটি সংখ্যা সহজেই বাড়তে পারে। মনে হয় প্রশাসনিক সংস্কার কমিশনের পরামর্শ মনে রেখেই প্রধানমন্ত্রী তাঁর ক্যাবিনেট সম্প্রসারণে বিরত থেকেছেন।

নাগাভূমির সাধারণ নির্বাচন

নাগাভূমিতে যে সাধারণ নির্বাচন হয়ে গেল তাতে জনগণ জাতীয় নাগা দলকেই মন্ত্রিসভা গঠনের নির্দেশ দিয়েছেন। এন এন ও নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা নিয়ে মন্ত্রিসভা গঠনের জন্য প্রস্তুত।

নাগাভূমির বাহাত্তর সদস্যক বিধান-সভায় মনোনীত বারজন সহ এন এন ও-র অবস্থা বাইশ যুক্ত বারো সমান চৌত্রিশ। যুক্তফ্রন্ট টেনেছেন নটি আসন এবং নির্দল আট। একটি আসনের সংবাদ রচনাকাল পর্যন্ত পাওয়া না গেলেও ক্ষমতাসীন জাতীয় দলই যে ক্ষমতার প্রত্যাবর্তনের পরওয়ানা পেয়ে গেছেন এই প্রশ্ন এখন সন্দেহাতীত।

নাগাভূমির দুটি জেলায়, কোহিমা ও মকোকচুঙ্গে প্রত্যক্ষ নির্বাচন হয়েছে। সরাসরি নির্বাচিত আসন চল্লিশ। পরোক্ষ নির্বাচন হয় তুয়েনসাঙ-এ। আঞ্চলিক জেলা পরিষদ সেখানে বারটি আসনে প্রতিনিধি মনোনীত করেন।

এই মনোনীত সদস্যগণ সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের সঙ্গেই যোগদান করবেন বলে আশা করা যায়।

নির্বাচনে ক্ষমতাসীন দলের মুখ্য-মন্ত্রী শ্রী টি এন অঙ্গামী, ক্যাবিনেট মন্ত্রিগণ এবং সভাধ্যক্ষ ও উপাধ্যক্ষ পুনর্নির্বাচিত হয়েছেন বটে, কিন্তু ফ্রন্টের কাছে আসন ছেড়ে দিতে হয়েছে একজন রাষ্ট্রমন্ত্রীকে। জনৈক নির্দলীয়র সঙ্গে নির্বাচনী লড়াইয়ে আসন খুইয়েছেন আর একজন উপমন্ত্রী।

নির্বাচনোত্তর অবস্থায় একটা জিনিস ক্রমশ পরিষ্কার হয়ে আসছে এই যে, আত্মগোপনকারী নাগারা যুক্তফ্রন্টকেই জোরদার হতে সাহায্য করলেও, গণ-তান্ত্রিক নির্বাচনের মাধ্যমে শাসন-তান্ত্রিক পরিবর্তন যে সম্ভব, তা তাঁরা একরকম স্বীকার পেয়েছেন। মুখ্যমন্ত্রী অঙ্গামীও এই লক্ষণটির ওপর জোর দেন।

তাছাড়া অতীতের তুলনায় এই নির্বা-চন শান্তিপূর্ণ হওয়ায়ও বোঝা যাচ্ছে আত্মগোপনকারী বিচ্ছিন্নতাকামী বিপ্ল-বীরা তাঁদের অনুগামীদের মধ্যেই ফাটল লক্ষ্য করে নির্বাচনকে মেনে নিয়েছেন। সাধারণ মানুষও অ-গণতান্ত্রিক পথকে বিশেষ আমল দেন নি।

এই নির্বাচনের দিকে তাকিয়ে অবশ্যই এমন ভবিষ্যদ্বাণী করা চলে না যে, নাগাভূমিতে কাঙ্ক্ষিত শান্তি পুনঃ-প্রতিষ্ঠিত হল। তবে উত্তেজনা সৃষ্টি-কারী পর্দার আড়ালের মানুষরা তাঁদের যথেচ্ছ বিনাশক্রীড়ায় এবার ক্ষান্ত হবেন কি না একথা চিন্তা করতে যে বাধ্য হবেন তাতে সন্দেহ নেই। সাধারণ মানুষ যেভাবে নির্বাচনে সাড়া দিয়েছেন তাতে এই পথেই তাঁদের আস্থা একথা স্পষ্ট-ভাবে ঘোষিত হয়েছে আজ।

দিল্লীর সাহিত্য অকাদেমির অবিচার

সাহিত্য অকাদেমি দিল্লী প্রতি বৎসর ভারতে বিভিন্ন ভাষায় রচিত সাহিত্যের জন্য পাঁচ হাজার টাকা পুরস্কার দানের ব্যবস্থা রেখেছেন। ঐ পুরস্কার দেওয়া হয় সেই সাহিত্যিককেই যিনি তিন বছরের মধ্যে পুরস্কারযোগ্য গ্রন্থ রচনা করেছেন।

সম্প্রতি সাহিত্য অকাদেমি প্রদত্ত পুরস্কারের খবর বের হয়েছে। এবং ঐ খবরের মধ্যে সর্বাপেক্ষা যে ব্যাপার আমা-দের নিদারুণ আঘাত করেছে তা হচ্ছে, বাংলা ভাষায় রচিত কোনো গ্রন্থের জন্য অকাদেমির পুরস্কার বিবেচিত না হওয়া। শুধু বাংলা ভাষা-ভাষীরাই নয়, বাংলা সাহিত্যের ওপর এবার তাঁরা ভালভাবেই জানেন যে, বাংলা ভাষায় প্রতি বছরই একটা-না-একটা উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ বের হয়। অকাদেমি বাংলা সাহিত্যের উপর এবার যে রকম আচরণ করেছেন, তাতে মনে হয়, অকাদেমির পুরস্কার প্রদানের সঙ্গে যাঁরা সংশ্লিষ্ট তাঁরা বাংলা সাহিত্যের কোনো খবর রাখেন না। অথবা, বাংলা ভাষায় রচিত সাহিত্যের প্রতি কোনো মূল্য আরোপ না করাই তাঁদের স্বার্থদুষ্ট সাম্প্রতিক উদ্দেশ্য। একথা মনে হওয়ার কারণই এই যে, পুরস্কার দেওয়ার দায়িত্ব যখন অকাদেমির ওপর রয়েছে, তখন তার পক্ষ থেকে নামোল্লেখ সহ জানানো উচিত যে, অকাদেমি কর্তৃক ভারপ্রাপ্ত কারা কী বই সুপারিশ করেছেন অথবা করেন নি। অন্তত এবার, বাংলা সাহিত্যের প্রতি বিরাট অবিচার করার পর সাহিত্য অকাদেমি সে দায়িত্ব কোনো-মতেই এড়াতে পারেন না। আশা করি, অকাদেমি স্বকলঙ্ক আপনোদনের জন্যই সে কাজ করবেন। আর তা করতে ব্যর্থ হলে ধরে নিতে হবে যে, প্রতিষ্ঠানটি নিরপেক্ষ নয়, বরং কায়েমী স্বার্থের আড্ডাখানা। এই রকম ধরে নেবার ব্যাপারে এবার আর একটি ঘটনা হচ্ছে এই : অকাদেমি যে সভায় পুরস্কার দানের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন, তাতে না কি মূল সভাপতি উপস্থিত না থাকায়, এমন একজন ব্যক্তিকে সভাপতি করা হয় যিনি নিজের উন্নতির স্বার্থে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের বিরোধিতা করতে কখনো কুণ্ঠিত হন নি। অতীতেও তিনি এ হেন দুষ্কার্য করেছেন।

তাই সাহিত্য অকাদেমির (দিল্লী) প্রতি আমাদের অনুরোধ, পুরস্কার প্রদানের ঘটনায় বাংলা দেশের জনসাধারণ ও বিদগ্ধজনের মধ্যে যে তীব্র বিক্ষোভের সৃষ্টি হয়েছে, তার অবসানের জন্য অকাদেমি অনতিবিলম্বে উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করুন। (১৫।১।৬৯)

কর্মযজ্ঞের সুরু হোক

প্রদ্যোত রায়

গত ১৬ই জানুয়ারী এই পত্রিকায় বিভিন্ন রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের মতামত প্রকাশিত হয়েছিল। কংগ্রেসী চক্রের শেষ যে অবশ্যম্ভাবী, সে-কথা যুক্তফ্রন্টভুক্ত দলগুলির নেতৃবৃন্দ একবাক্যে ঘোষণা করেছিলেন। প্রশ্ন করেছিলাম, মধ্যবর্তী নির্বাচনের পর তাঁরা সরকার গঠনে সমর্থ হবেন কি না। অজয়বাবুর উত্তর, "আমি নির্বাচন উপলক্ষে পশ্চিমবঙ্গের সকল জেলায় একাধিকবার ব্যাপক পরিক্রমা করেছি। আমার মনে হয়, যুক্তফ্রন্ট এবার নিরাপদ সংখ্যাগরিষ্ঠতা পাবে।"

ঐ একই প্রশ্নের উত্তরে জ্যোতিবাবুর বক্তব্য ছিল সংক্ষিপ্ত, কিন্তু জোরালো। তিনি বললেন, "নিশ্চয়ই।"

বিশ্বনাথ মুখোপাধ্যায়, সুবোধ বন্দ্যোপাধ্যায়, জ্যোতি ভট্টাচার্য, অশোক ঘোষ, সুকুমার রায়, মাখন পাল সকলেই ঐ একই কথা বলেছেন। নির্বাচনের ফলাফল ঘোষণার পর এখন মিলিয়ে দেখুন, ওঁদের বক্তব্যের সত্যতা কতখানি। যুক্তফ্রন্টের নেতৃবৃন্দের সঙ্গে জনগণের যোগাযোগ প্রত্যক্ষ। কাজেই গণ-মনের খবর ওঁদের বক্তব্যে ধরা পড়বে—এতে অবাক হবার কিছু নেই। আর সেই কারণেই ওঁদের বক্তব্য যথাযথভাবে পরিবেশন করতে চেষ্টা করা হয়েছে। ওঁদের বিশ্বাস যে আজ বাস্তবসত্যে রূপায়িত হয়েছে—সেকথা বলাই বাহুল্য।

কংগ্রেস সভাপতি ডঃ প্রতাপচন্দ্র চন্দ্র তাঁর দলের জন্ম সম্পর্কে নিশ্চিত ছিলেন। তাঁর ধারণা যে সম্পূর্ণ ভুল, গণ-আদালতের রায়-ই সেকথা প্রমাণ করেছে। জনগণের থেকে অনেক দূরে, ঐশ্বর্যভরা চৌরঙ্গীতে বসে কল্পনায় যদি কেউ রামরাজ্যের ছবি আঁকেন, তাহলে তাঁকে বাধা দেবার কিছু নেই। তবে প্রতাপবাবুর এই অবাস্তব হিসাবের জন্য দুঃখ প্রকাশ করা যেতে পারে।

ডঃ চন্দ্র পশ্চিমবঙ্গ কংগ্রেসের অভিভাবকের আশীর্বাদের জোরেই কংগ্রেসের সভাপতির আসনে বসেছেন। তিনি বাংলা দেশের বিভিন্ন স্থানে নির্বাচন উপলক্ষে কথার ফুলঝুরিও উড়িয়েছেন। কিন্তু একটু অবসর করে যদি জনগণের কাছে যেতেন—তাহলে বুঝতেন বাংলা দেশ কায়মনোবাক্যে কংগ্রেসের চক্রের হাত থেকে মুক্তির প্রার্থনা জানাচ্ছে।

বাংলা দেশে কংগ্রেসের হয়ে গলাবাজি করতে এসেছেন দেশাইজী, চ্যবন সাহেব প্রমুখ অনেকে। যদি এই শ্রেণীর সর্বভারতীয় খ্যাতিসম্পন্ন নেতৃবৃন্দ আরও কয়েকবার এসে বাংলা দেশে বক্তৃতার আসর জমাতেন, তাহলে এ রাজ্যের নবপ্রতিষ্ঠিত বিধানসভায় বিরোধী পক্ষ বলে কিছু থাকত কি না সন্দেহ।

কংগ্রেসের মুখপাত্র হয়ে এদেশের সংবাদপত্রগুলি তারস্বরে চীৎকার শুরু করেছিল। তাদের বক্তব্য এমন সুন্দরভাবে কংগ্রেসের ভরাডুবি করতে সাহায্য করেছে যে-কথা ভাবলে বিস্মিত হতে হয়। স্থায়ী সরকার গঠন করুন, কংগ্রেসকে ভোট দিন—শুধু এই কথা কটিই কাগজের প্রথম পৃষ্ঠায় বড় বড় করে লেখা ছাড়া পত্রিকাগুলির মালিকগোষ্ঠী তাঁদের অভিভাবকদের সন্তুষ্ট করার জন্য আর কিছুই বাকি রাখেন নি। প্রচুর বুদ্ধির খেলা দেখিয়ে এই পত্রিকাগোষ্ঠী কংগ্রেসের জয় অবশ্যম্ভাবী—একথাই প্রতিদিন জনসাধারণের কর্ণকুহরে প্রবেশ করাতে ত্রুটি করেন নি। এর ফলে সংবাদপত্রের উপর মানুষের বিশ্বাস যে একদম থাকছে না—মানুষ যে এ-ধরণের সংবাদপত্রগুলিকে কোনও একটি বিশেষ রাজনৈতিক দলের প্রচারপত্র হিসাবে মনে করছে—এই অতি সত্য কথাটি মালিকগোষ্ঠীর বোধগম্য হল না। এত যাঁদের বুদ্ধিমত্তা, ওসব কথা তাঁরা নিশ্চয়ই ভেবেছেন; কিন্তু সেই সঙ্গে ভেবেছেন যে এদেশে বুদ্ধিজীবীরা তাঁদের পদলেহন করতে বাধ্য। পাষসার জোরে আজ সংবাদপত্রজগতে এমন এক নৈরাজ্যের সৃষ্টি হয়েছে যার জন্য বিশের বিশেষ সংবাদপত্রগোষ্ঠীকে জনগণ দায়ী করতে বাধ্য। সত্যের কণ্ঠরোধ করতে এদেশের সংবাদপত্রের অসাধারণ ভূমিকা বিস্ময়ের সঙ্গে স্মরণ করতে হয়। এই সব পত্রিকাগুলির ধারণা যে গণতন্ত্রকে রক্ষা করার পবিত্র কর্তব্য শুধুমাত্র তাঁদেরই; আর সেই কর্তব্য পালন করতে গিয়ে গণতন্ত্রের মামাবলী জড়িয়ে প্রকৃত সত্যকে পদদলিত করে কায়েমী স্বার্থ রক্ষার জন্য এই পত্রিকাগুলি সদা সচেষ্ট। গণতন্ত্রের দোহাই দিয়ে যে কাজ তাঁরা প্রতিদিন করেছেন—তা এক অপরিসীম নির্লজ্জতার উদাহরণ। জানি না আমাদের তথাকথিত সংবাদপত্রগুলিতে কতকালে জনমতের প্রতিফলন পড়বে।

বেতনভোগী সংবাদপত্রসেবীদের কথা তুলছি না। জানি তাঁরা নিরুপায়। হুকুম তামিল করাই তাঁদের কর্তব্য। কিন্তু সেই সব ব্যক্তি যাঁরা নিজেদের বুদ্ধিজীবী বলে জাহির করেন এবং গণমতের খবর রাখেন বলে দাবি করেন, তাঁরাও এই উন্মত্ত প্রচারে যোগ দিলেন কেমন করে? একবারও কি মনে হয় নি, সত্যকে মিথ্যা দিয়ে ঢেকে রাখা যাবে না? মিথ্যা ও অপপ্রচারের দ্বারা জনমতের মোড় ঘোরানো অসম্ভব। মানুষ কাজ চায়। বক্তৃতা তারা অনেক শুনেছে। যে-দেশে বেকারী, খাদ্যাভাব, দুঃসহ আকার নিয়েছে, সেখানে বক্তৃতা শুনে মানুষ নিশ্চিন্ত থাকতে চায় না। বাংলা দেশের মানুষের দাবি খুবই স্বাভাবিক। দারিদ্র্যের হাত থেকে, অশিক্ষার হাত থেকে তারা মুক্তি চায়। চোখ-কান খুলে যাঁরাই পথ চলেছেন, তাঁরাই মানুষের এই নূনতম আকাঙ্ক্ষার খবর রাখেন। সুখের কথা, চোখ রাঙানীকে উপেক্ষা করেও কোন কোন পত্র-পত্রিকা সৎ সাংবাদিকতার ধারাকে বজায় রাখতে নির্বাচনের প্রাক্কালে এদেশের মানুষের মনোভাবকে যথাযথভাবে জনসমক্ষে পেশ করতে চেষ্টা করেছেন।

এ-রাজ্যের কংগ্রেসের নায়কগণ নির্বাচনের ফলাফল জানার পর একে একে স্ব স্ব পদ থেকে ইস্তফা দিচ্ছেন। দেশের মানুষ অনেক নতুন ভোজবাজি দেখছেন—এইসব নেতারা যেমন ছিলেন, ঠিক তেমনি স্ব স্ব পদে বহাল থাকবেন। তবে তাঁদের অপকীর্তি জনগণ এমনভাবে ফাঁস করে দেওয়ায় একটু অভিমান হয় বৈ কি! নন্দঙ্কীর বাঁকা হাসি, অতুল্যবাবুর হুঙ্কার করা একটু শক্ত হবে—তবে উপায় নেই।

থাক সে কথা, কবির ভ্রাতৃস্বয় রাজনীতি থেকে বিদায় নিতে বাধ্য হয়েছেন। আশুবাবু, যাঁর তুলনা নেই, তিনিও একরারে খতম। বাংলা দেশের ধর্মপুত্র ডঃ প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ কাষ্ঠখণ্ডের আঘাতের পরেও, ঝাড়গ্রামের আঘাতের অপেক্ষায় ছিলেন। প্রাদেশিকতা ও সাম্প্রদায়িকতার ভিত্তিভূমে যাঁরা রাজনৈতিক জীবনে সুপ্রতিষ্ঠিত থাকতে চেয়েছিলেন, সচেতন গণমত তাঁদের স্বপাক্ষরে বিতাড়িত করেছে। অধ্যাপক কবির এতকাল বাদে এখন বুঝলেন, বাংলার জনগণ তাঁকে চায় না। দার্শনিক কবির সাহেব এই সহজ সত্যটি একটু লেটে বুঝলেন মাত্র।

কংগ্রেসের এই বিপর্যয়ের কারণ কি—তা নিয়ে অনেক জল্পনা-কল্পনা চলছে। অসংখ্য কারণের মধ্যে একটি অত্যন্ত সকলের কাছেই স্পষ্ট। কংগ্রেসের নেতৃবৃন্দ অনেক শ্রুতিমধুর কথা বললেও কাজে ঠিক তার উল্টোটি করেছেন, যার ফলে জনসাধারণের ওপর, বিশেষ করে ছাত্রমহলে কংগ্রেসের কোনও প্রভাব নেই। অধিকাংশ লোক বিশ্বাস করছেন যে, যাঁরা ধনী বা ধনী হতে চান, কংগ্রেসকে বাঁচিয়ে রাখার দায়িত্ব তাঁদেরই। কংগ্রেস গরীবের প্রতিষ্ঠান নয়। নির্বাচনের ফলাফল সেই সত্যই ঘোষণা করছে।

জন্মদিনে

দুর্গাদাস সরকার

অন্ধকারে কে জেবলে দেয় আলো?
এখনো দূর দিগন্তে রোদ্দুর

খবর আসে ছোট্ট গাঁটি থেকে :
জেগে আছি—দ্যাখো সবাই জাগে।
রক্তলোলুপ রেখেছে মুখ ঢেকে,
এটকাবে ঘাড় যখন পাবে বাগে।

জিরিয়ে নেওয়ার একটুও নেই সময়,
পোড়া মাঠে খাটছি নতুন করে।
ভয় জানে না হাজার চোখের অভয়,
দিন গুণেছি অনেক বছর ধরে।

ফলের বাঁশি রাত বারোটায় বাজে,
শুনতে পাচ্ছি নদীরও এপারে।
জ্যান্ত লোকের চামড়া যারা ভাজে
তারা কি সব দিন গোণে এবারে?

শূন্য হাত এখন। শুধু শক্ত কোট মুঠি
অন্ধকারে কে জেবলে দেয় আলো?
আজকে তার জন্মদিনে কেউ নিও না ছুটি,
এখনো দূর দিগন্তে রোদ্দুর।

কংগ্রেসী কর্তাদের কাজ হয়ে উঠেছিল জোতদার, জমিদার, শিল্পপতি ও সর্বোপরি ব্যক্তি বা উপদলের স্বার্থরক্ষা। আর এই অপকর্মের সঙ্গী ছিলেন অনেকে, যাঁদের খোঁজ মিলবে রাজভবন, রাইটার্স বিল্ডিংস, লালবাজার থেকে শুরু করে বিশ্ববিদ্যালয়, কলেজ, স্কুল সর্বত্র। সরকারী ও আধা-সরকারী প্রতিষ্ঠানগুলিতে এমন সব ব্যক্তি আছেন, যাঁরা রক্তচক্ষু দেখিয়ে সাধারণ মানুষের মনে ভীতির সঞ্চার করতে দ্বিধা করেন না। এই প্রতিষ্ঠানগুলিতে তাঁরা তাঁদের অভিভাবকদের খেয়ালখুশি মেটাতে সাহায্য করেছেন ও করছেন। সেই সঙ্গে আত্মীয়-পোষণ নীতির মাধ্যমে শাসন ব্যবস্থায় এমন এক অবস্থার সৃষ্টি করেছেন—যার ফলে প্রকৃতপক্ষে শাসন ব্যবস্থা একটি শোষণযন্ত্রে রূপায়িত হয়েছে। অযোগ্য লোকের ভিড়ে সৎ ও উৎসাহী কর্মীরা হতাশায় অন্ধকারে নিমজ্জিত। এই সব প্রতিষ্ঠানগুলির কর্তৃপক্ষের মধ্যে অনেকে কংগ্রেসী আমলের প্রচলিত তৈলদান নীতিতে অত্যন্ত আস্থাশীল। তাঁরা মনে করেন কাজ নয়, তোষণনীতিই জীবনের উন্নতির পথে একমাত্র পাথেয়। একটি উদাহরণ দিচ্ছি। পশ্চিমবঙ্গের শিক্ষা-ব্যবস্থার এই দুরবস্থার জন্য যে ব্যক্তিটিকে সর্বাগ্রে দায়ী করা যায়, তিনি সরকারী চাকুরী থেকে অবসর গ্রহণ করার পরও কোনও একটি বিশ্ববিদ্যালয়ে শ্রেষ্ঠ আসন পেয়েছেন। সরকারী বিভাগগুলির মধ্যে পুলিশ বিভাগ যেমন কুখ্যাত, শিক্ষাজগতে তেমনি এই বিশ্ববিদ্যালয়গুলি। দলের স্বার্থে কোথাও কোথাও এমন সব অযোগ্য অসৎ ও অপদার্থ লোকের নিয়োগ হয়েছে—যার ফলে বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিচালন ব্যবস্থায় বিপর্যয় দেখা দিয়েছে। দেশের অর্থের কী নিদারুণ অপচয়। এমনি ধারা উদাহরণ মিলবে জনজীবনের প্রতিটি স্তরে।

এসব কথা বলার প্রয়োজন এই কারণে যে, ডঃ বিধানচন্দ্র রায়ের মৃত্যুর পর বাংলা-দেশে যথার্থ কোনও গঠনমূলক কাজ হয় নি। কংগ্রেসী নেতৃবৃন্দ অধিকাংশই ক্ষুদ্র স্বার্থে সামগ্রিক স্বার্থকে অবহেলা করেছেন। প্রশাসনিকযন্ত্রকে পেষণযন্ত্রে রূপায়িত করেছেন। যুক্তফ্রন্টকে সমর্থন জানিয়ে জনগণ প্রকৃতপক্ষে এই অবাঞ্ছিত অবস্থার পরিসমাপ্তি চেয়েছেন।

বাংলা দেশের বস্তুতার দিন শেষ হল আশা করি। কাজের যুগের শুরু করতে মানুষ যুক্তফ্রন্টকে শাসনক্ষমতায় বসিয়েছেন। যুক্তফ্রন্টের কার্যসূচীকে যথাযথ-ভাবে কার্যে রূপায়িত করতে হলে সর্বাগ্রে মরচেধরা শাসনযন্ত্রের রদবদল প্রয়োজন। আর এ-কাজটি করতে হবে যথেষ্ট দৃঢ়তার সঙ্গে। দেশ গড়ার কাজে প্রকৃত কর্মীর প্রয়োজন। এই কর্মী খুঁজে বের করার দায়িত্ব ফ্রন্টের। কর্মী বাছাই-এর কাজ সবচেয়ে শক্ত। রাজনীতির ঊর্ধ্বে উঠে দেশ গঠনের আহ্বান আসুক ফ্রন্টের নেতৃবৃন্দের কাছ থেকে। মানুষ যেমন দৃঢ়তার সঙ্গে নিজের ভালমন্দ বিচার করে ভোটের মাধ্যমে কংগ্রেসী চক্রকে বাংলার রাজনীতি থেকে বিদায় করেছে—ঠিক তেমনি দৃঢ়-তার সাথেই তারা দেশ গঠনের কাজে আত্ম-নিয়োগ করবে বলেই বিশ্বাস করি। কর্ম-যজ্ঞের শুরু হোক্।

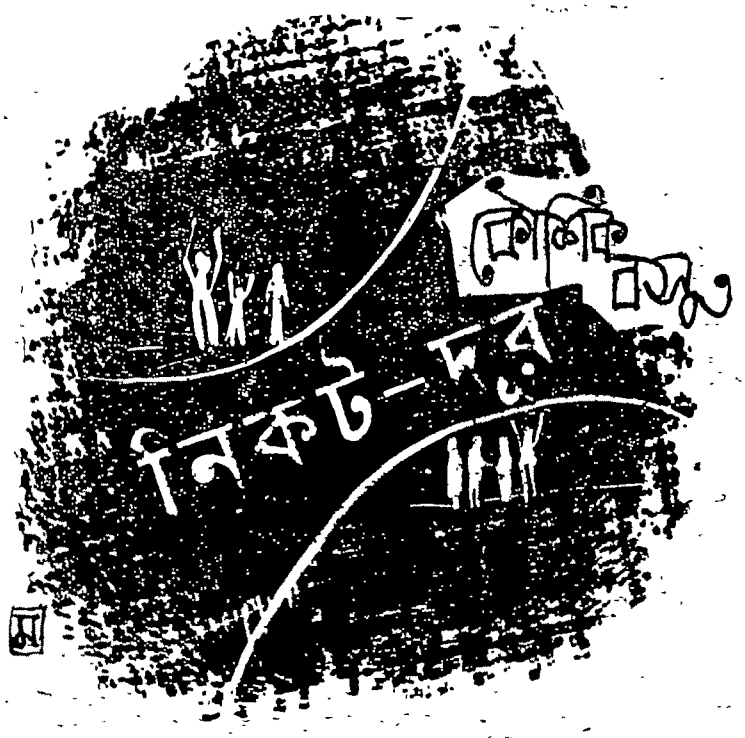

অন্ধকার থেকে আলোর দিকে

আমি কথা-চিত্রকর পটে।
সে পট ফুরোলে
যাত্রা শুরু করে যদি এই শবাধার
আমি সার্থ, পৃথিবীর স্নিগ্ধ কলরোলে
হরত বা ফিরব আবার
আমার হারানো পাত্রপাত্রীদের নাটে
উত্তরে দক্ষিণে চেয়ে আজ বেলা কাটে।

ওপরের কবিতাংশটি যাঁর রচনা, অধিকাংশ বাঙালী পাঠক তাঁকে কবি হিসেবে চেনেন কি না আমি নিশ্চিত করে বলতে পারবো না। এই কবিতার লেখক সঞ্জয় ভট্টাচার্য, মাত্র কয়েকদিন আগে যাঁকে আমরা হারিয়েছি। এ কথা কে না জানে যে বাংলাদেশ কবিতার দেশ, কিন্তু হায়, একমাত্র কবিই জানেন, বাংলাদেশ কবিকে যতোটা উপেক্ষা করে, পৃথিবীর অন্য কোন দেশই বোধহয় ততোটা করে না। মৃত্যুর কিছুদিন আগে একটি পত্রিকায় প্রকাশিত সাক্ষাৎকারে তিনি কোন অবসন্ন সুরেই বলেছিলেন—'আমার একটা দুর্নাম আছে প্রথম থেকেই—আমি দুর্বোধ্য, আমি মোটেও প্রাঞ্জল নই, আমায় বোঝা যায় না। এটা হচ্ছে যারা আমার প্রতি, যাকে বলে আক্রমণাত্মক, তাদের কথা। আর যারা বন্ধু হয়ে আমাকে বিপন্ন করেছে, তারা বলেছে যে, ওসব ইনটেলেকচুয়াল লেখা। ফলে আমার একেবারে কোনো পাঠক নেই। এবং আমার সাহিত্য সম্বন্ধে আমার শেষ কথাটা আমি বলে নিই। আমার শেষ কথা এই : হয় আমি সাহিত্য সম্পর্কে সম্পূর্ণ অজ্ঞ, না-হয় বাংলাদেশের পাঠক এবং সমালোচকেরা সাহিত্য বিষয়ে নেহাৎ নির্বোধ। এই সিদ্ধান্তে আমি উপনীত হয়েছি, আমার ষাট বছর বয়সে। আর এক ছত্রও লিখতে ইচ্ছে করে না আমার।'

প্রথমটি আধুনিক কবিতার বিরুদ্ধে একটি সার্বজনীন অভিযোগ—শুধু সঞ্জয় ভট্টাচার্যের কবিতার বিরুদ্ধে নয়। যে দুর্বোধ্যতার জন্ম পাঠকের আলস্যে তার জন্য কবির ওপর দোষারোপ করা অবান্তর —একথা সুধীন্দ্রনাথ দত্ত বহুদিন আগেই বুঝতে পেরেছিলেন। আসলে, আধুনিক কবিতা দুর্বোধ্য নয়, দুরূহ এবং সব ভালো কবির মতো সঞ্জয় ভট্টাচার্যও দুরূহ ও অস্পষ্ট কবি। দ্বিতীয় অভিযোগটি একেবারেই বাজে, শুনলেই বলতে ইচ্ছে করে 'বাংলা দেশের পাঠক এবং সমালোচকেরা সাহিত্য বিষয়ে নেহাৎ নির্বোধ।' তাদের প্রতি অভিমান করে যদি সঞ্জয় ভট্টাচার্য একছত্রও না লেখার প্রতিজ্ঞা নিয়ে থাকেন, তবে তাতে পাঠককুলেরই ক্ষতি। সুতরাং পাঠকদের ক্ষতিপূরণের আশায় আমি সবিনয়ে তাদের মনোযোগকে সঞ্জয় ভট্টাচার্যের কবিতার দিকে ফিরিয়ে আনতে চাই।

কোনো কোনো কবিকে সারাজীবন অপেক্ষা করতে হয় সংবেদনশীল পাঠকের জন্য, মৃত্যুর পরেও বহুদিন শান্তিতে ঘুমিয়ে থাকতে হয়। সঞ্জয় ভট্টাচার্য সেই ধরণের কবি নন। সেই ধরণের কবি হপকিন্স—মৃত্যুর পর যাঁকে প্রায় তিরিশ বছর অপেক্ষা করতে হয়েছিল পাঠকের কাছে পৌঁছনোর জন্যে। কিন্তু তবু তাঁর নিশ্চিত ছিলেন নিজের সম্পর্কে, নিজের কবিতার বিরুদ্ধে দুর্বোধ্যতার অভিযোগ খুব শক্ত হাতে কেটে বলতে পেরেছিলেন—Obscurity I do and will try to avoid so far as is consistent with excellences higher than clearness at a first reading. (ভাবানুবাদ : প্রথম পাঠেই আমার লেখা পরিষ্কার বোঝা যাবে। এই উদ্দেশ্যে আমি দুরূহতা পরিহার করবো না; কিন্তু দুরূহতা আমি পরিহার করে থাকি এবং করবোও মহত্তর কোনো সিদ্ধির প্রয়োজনে)। হপকিন্সের কবিতার মহৎ সিদ্ধি ভিক্টোরিয়ান পাঠক বুঝতে পারে নি, পেরেছে বিংশ শতাব্দীর আধুনিক মন। কিন্তু সঞ্জয় ভট্টাচার্যের কবিতার শ্রেষ্ঠত্ব বোঝার জন্য অপেক্ষা করার কোনো প্রয়োজন নেই; তাঁর কবিতা হয় পাঠককে নাড়া দেবে, নয়তো তা একেবারেই হারিয়ে গেল। সুতরাং পাঠকের অভাবে তিনি যে বেদনাবোধ করেছিলেন, তার কোনো সমাধান নেই—তাঁর কবিতা এমন নয় যে, তাঁকে আমরা ভাবীকালের জন্য সংরক্ষিত বলে ভাবতে পারি।

সঞ্জয় ভট্টাচার্য বহুমুখী লেখক ছিলেন। কবি, ঔপন্যাসিক এবং প্রাবন্ধিক, তাঁর সঙ্গে একমাত্র তুলনীয় বুদ্ধদেব বসু। এ ছাড়াও তাঁর একটি বড় পরিচয় আছে —তিনি 'পূর্বাশার' সম্পাদক, ১৩৪৫ সালে প্রথম প্রকাশিত হয়ে ১৩৭৫ পর্যন্ত তিনি এ-পত্রিকাকে চালিয়ে গেছেন, মাঝে মাঝে যদিও পত্রিকার প্রকাশ ব্যাহত হয়েছে নানা কারণে। 'পূর্বাশা' আজকের দিনের অনেক যশস্বী কবি, গল্পলেখক ও ঔপন্যাসিকের ধাত্রী, এ কথার মধ্যে কোনো বাড়াবাড়ি নেই। সম্পাদক হিসেবে তাঁর নাম সুধীন্দ্রনাথ দত্ত ও বুদ্ধদেব বসুর সঙ্গে উচ্চার্য। তিনি ছিলেন বাঁশক্তি-সম্পন্ন মনস্বী সম্পাদক, লেখা চেনার দুর্লভ ক্ষমতা যুক্ত হয়েছে তাঁর সাহিত্য-ক্ষমতার সঙ্গে।

সাহিত্যের বিভিন্ন বিভাগে তাঁর দখল অনায়াস হওয়া সত্ত্বেও, কবি-ই তাঁর যোগ্য পদবী। তিনি কোন্ মানসের কবি ছিলেন, কী তাঁর কবিতার বিশেষ চরিত্রলক্ষণ, এই প্রশ্নের বিস্তৃত আলোচনায় না গিয়েও আমরা অল্প কথায় বলতে পারি যে, তিনি ছিলেন লিরিক মেজাজের কবি এবং তাঁর কবিতার প্রধান গুণ প্রফুল্লতার অভাব। এ কথার মানে এই নয় যে, তাঁর কবিতায় প্রাণ নেই,—তাঁর রচনা বিষাদেই সজীব। অর্থাৎ যাকে সাধারণভাবে বলা হয়ে থাকে নৈরাশ্যবাদ, তিনি তার ধারাই চিহ্নিত ছিলেন। কিন্তু তাঁর কবিতায় নৈরাশ্যকে তিনি বাল্বিষে গেছেন আঙ্গিকের এক বিশিষ্ট ধরণে, স্বতন্ত্র কাব্যস্পন্দনে। তাঁর কবিতার শরীর ছোটো গানের মতো সেখানে

চরণ ফিরে ফিরে আসে, মিলগুলি আবর্তিত হয়, একটি প্রধান শব্দকে ঘিরে তাঁর আবেগ ক্রমশ দানা বাঁধতে থাকে। মৃত্যুর কিছুদিন আগে জীবনানন্দ সম্পর্কে তিনি যে আলোচনা করেছেন, তাতে একটি কথা তিনি বলেছেন—'কবি মাত্রেরই স্বতন্ত্র কাব্যভঙ্গী থাকে, যাঁর থাকে না তিনি কবি নন, অনুকারক'। এই কথার মধ্যে এমন একটি নিখুঁত সত্য আছে, যা হেত্বাভাস সত্ত্বেও, আমরা মানতে বাধ্য। অন্তত সঞ্জয় ভট্টাচার্য যে স্বতন্ত্র কাব্যভঙ্গীর অধিকারী সে বিষয়ে সমালোচকেরও কোনো সংশয় নেই এবং এই স্মরণীয় কবিতাই সেই স্বাতন্ত্র্যের শ্রেষ্ঠ অভিজ্ঞান:

সাহস হলো না।
বস্তুত সাহসী নই রৌদ্রের মতন
খুব অন্ধকারে চলে যেতে।
যতো কাছে এসে তুমি ততো যেন
বেশি অন্ধকার।
স্বচ্ছ করে দিয়ে যাবো তোমাকে তেমন
সাহস হলো না।
ভীরু দীপ নিবে যাবে, ভয়ে—
চোখ অন্ধ হয়ে যাবে, ভয়ে—
একটি মুহূর্ত স্থির হয়ে যাবে, ভয়ে—
তোমাকে ছুঁতেই আর সাহস হলো না।

(আলো-অন্ধকারের কবিতা)

সুপার সার্ফের রয়েছে অনুপম ধোওয়ার ক্ষমতা! সুপার সার্ফ দিয়ে ধুলে আপনার সব জামাকাপড়ের ময়লা একেবারে সাফ হয়ে যায়—তা সে যত পুরু ময়লাই হোক না কেন। চোখে দেখা যায় না এমন সব ময়লাও সুপার সার্ফ দিয়ে ধুলে স্বচ্ছন্দে উঠে যায়। তাছাড়া এতে আপনার সব জামাকাপড় একেবারে ধবধবে পরিষ্কার হয়ে যায়। নীল প্রভৃতি অন্য কোন পাউডার মেশাবার প্রয়োজন নেই। সুপার সার্ফ গাদা গাদা জামাকাপড় ধোওয়ার বোঝা হাল্কা করে দেয়। আর কী মনোরম এর তাজা সুগন্ধ। অন্য কোন্ কাপড় কাচার পাউডার থেকে কি এত কিছু পাওয়া যায়!

হিন্দুস্থান লিভারের একটি উৎকৃষ্ট উৎপাদন

লিনটাস-SU. 35-140 BG

সপ্তাহের বোঝা

কৃত্তিবাস ওঝা

সম্মুখ সমরে পড়ি বীর চূড়ামণি
বীরবাহু চলি যবে গেলা যমপুরে
অকালে,

আমি মাইকেল রচনাসম্ভারখানি হাতে নিয়ে বসেছি খবরের কাগজ পড়া বন্ধ করে। কারণ কাগজের খবর আর মাইকেলের মেঘনাদবধ কাব্য আজ অভিন্ন হয়ে গেছে। তাই পড়তেই যদি হয় ক্লাসিক পড়াই ভাল। খবরের কাগজে জনজীবনের স্পন্দন বোধে অক্ষম রাজনৈতিক সংবাদদাতার সংবাদ পড়ে কি লাভ। বরং মেঘনাদবধ কাব্য পড়লে সত্য খবরটুকু জানা যাবে। খবরের কাগজের রাজনৈতিক সংবাদদাতারা তো দুই দিন আগেও লিখেছিল সীতা উদ্ধারের যুদ্ধে রাবণ জয়ী হবে, শক্তিশেলে নিহত লক্ষ্মণ আর প্রাণ পাবে না, সীতা অশোকবনে চেড়িদের নিগ্রহে থাকবে, এমন কি সূর্পনখা লক্ষ্মণকে প্রাণপতি হিসাবে পাবে। কিন্তু মাইকেল মধুসূদনের কাব্যে সেই ভুল নেই। তাই ১১ই ফেব্রুয়ারী রাত থেকে আমি মেঘনাদবধ কাব্য পড়তে শুরু করেছি। কাব্যের শুরু হয়েছে ঐ ১১ই তারিখের রাত্রি থেকেই—যেখানে আছে বীরবাহু চলি যবে গেলা যমপুরে। ১৩ই ফেব্রুয়ারী আমার মেঘনাদবধ কাব্য পড়া শেষ হল। ১৩ই রাত্রিতে পড়লাম—

"অগ্রসরি রক্ষোরাজ কহিলা কাতরে,
ছিল আশা, মেঘনাদ, মৃদিব অন্তিমে
এ নয়নদ্বয় আমি তোমার সম্মুখে!—
সঁপি রাজ্যভার, পুত্র, তোমায়, করিব
মহাযাত্রা। কিন্তু বিধি—বুঝিব কেমনে
তাঁর লীলা? ভাড়াইলা সে সুখ
আমারে।
ছিল আশা, রক্ষঃকুল-রাজ-সিংহাসনে
জুড়াইব আঁখি, বৎস, দেখিয়া তোমারে,
বামে রক্ষঃকুললক্ষ্মী রক্ষোরাণীরূপে
পুত্রবধূ! বৃথা আশা! পূর্বজন্মফলে
হেরি তোমা দোঁহে আজি এ কাল-
আসনে!
কর্বুর-গৌরব-রবি চির রাহুগ্রাসে।
সৌমিত্রি শিবিরে আমি বহু যত্ন করি,
লভিতে কি এই ফল! কেমনে ফিরিব,—
হায় রে, কে কবে মোরে, ফিরিব কেমনে
শূন্য লঙ্কাধামে আর? কি সান্ত্বনা
ছলে
সান্ত্বনিব মায়ে তব, কে কবে আমারে
'কোথা পুত্র কোথা পুত্রবধূ আমার?'
সুধিবে
যবে রাণী মন্দোদরী—'কি সুখে আইলে
রাখি দোঁহে সিন্ধুতীরে রক্ষঃ
কুলপতি?
কি কয়ে বুঝাব তারে? হায় রে,
কি কয়ে?
হা পুত্র! হা বীরশ্রেষ্ঠ! চিরজয়ী
রণে!
হা মাতঃ রাক্ষসলক্ষ্মি! কি পাপে
লিখিলা,
এ পীড়া দারুণ বিধি রাবণের ভালে!"

পশ্চিমবঙ্গের মধ্যবর্তী নির্বাচনের ফলাফল প্রকাশ যখন শেষ হয়ে গেল—তখন আমার মেঘনাদবধ কাব্য পাঠও শেষ হয়েছে। আমি মেঘনাদ বধের কাব্যে আর সংবাদপত্রের পৃষ্ঠায় একই রাবণের বিলাপ—একই শোক—একই আর্তনাদ। পশ্চিম বাংলার কংগ্রেস আর লঙ্কাধাম এক হয়ে গেছে। রাবণের মত রাজ্য কংগ্রেস নেতৃত্ব একই বিলাপ করছেন—হা মাতঃ রাক্ষসলক্ষ্মি কি পাপে লিখিলা এ পীড়া দারুণ বিধি রাবণের ভালে। আজ রাজ্য কংগ্রেসের দৃশ্য আর কাব্যের শেষ ছত্র এক অভিন্ন সুরে লেখা হয়েছে।

করি স্নান সিন্ধুনীরে, রক্ষোদল এবে
ফিরিলা লঙ্কার পানে, আর্দ্র অশ্রু
নীরে—
বিসর্জি প্রতিমা যেন দশমী দিবসে।

ধন্য কবি মাইকেল মধুসূদন—তুমি ছিলে সবচেয়ে বড় রাজনৈতিক সংবাদদাতা—তাই প্রায় একশত বৎসর পূর্বে পশ্চিমবঙ্গ কংগ্রেসের পতন সম্পর্কে এমন মহাকাব্য রচনা করতে পেরেছিলে। যুগসন্ধিক্ষণ ছাড়া যথার্থ মহাকাব্য লিখিত হয় না, যুগসন্ধিক্ষণের গুরুত্বের উপরেই মহাকাব্যের গৌরব নির্ভর করে। বাল্মীকি, ব্যাস, হোমার, ভার্জিল, দান্তে, মিল্টন থেকে শুরু করে হেমচন্দ্র-নবীনচন্দ্র, মাইকেল যে রচনা লিখে গেছেন এই যুগের রিপোর্টাররা তা পারবে এই কথা বিশ্বাস করা যায় না। মিল্টনের প্যারাডাইস লস্ট, ভার্জিলের ঈনিড, দান্তের ডিভাইন কমেডি বা এ-যুগের হেমচন্দ্রের বৃত্র সংহার, নবীনচন্দ্রের পলাশির যুদ্ধ আর মাইকেলের মেঘনাদবধ কাব্য প্রভৃতি যে যুগসন্ধিক্ষণের মহাকাব্য সেই কাব্য কি কোন রাজনৈতিক সংবাদদাতার লেখনী থেকে আশা করা সম্ভব? কোন যুগসন্ধিক্ষণের বাণীরূপ কেউ যদি লিখতে পারেন, তবে তিনিই লিখতে পারবেন ১৯৬৯ সালের নির্বাচনী ফলাফলকে। ১৯৬৭ সাল থেকে ১৯৬৯ সাল নিয়ে নব্য বাংলার চিত্ত সংঘর্ষকে রূপদান করা সম্ভবত একমাত্র মহাকাব্যে সম্ভব, সংবাদপত্রের সংবাদে সম্ভব নয়।

কিন্তু কাব্য আর মহাকাব্যের কথা থাক—থাক দান্তে, মিল্টন, হেমচন্দ্র, নবীনচন্দ্র, মাইকেল মধুসূদনের কথা। নির্বাচন ও নির্বাচনী ফলাফল প্রকাশ শেষ হয়ে গেছে তাই আবার নিত্যদিনের সংবাদপত্রের মধ্যেই মহাকাব্যের স্বাদ খুঁজতে শুরু করেছি। আঠারো পয়সা মূল্যে মহাকাব্য পড়ছি। মধ্যবর্তী নির্বাচন শেষ হয়ে গেছে। আস্তাকুঁড়ে চলে গেছে খবরের কাগজে দেওয়া মূল্যবান বাণীগুলি—যে বাণীগুলি গত দুই মাস বিতরণ করেছিলেন সারা ভারতের কংগ্রেস নেতৃবৃন্দ থেকে শুরু করে শ্রীঅতুল্য ঘোষ, শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র সেন, শ্রীহুমায়ুন কবির, শ্রীআশু ঘোষ, শ্রীজাহাঙ্গীর কবির আর ডঃ প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ। শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র সেন, শ্রীঅতুল্য ঘোষ আর শ্রীঅজয় মুখোপাধ্যায় ইতিমধ্যে কিছু কথা বলেছেন, কিন্তু অন্যদের খবর পাওয়া যাচ্ছে না। অধ্যাপক কবির—যাঁর লম্ফ-ঝম্পর শেষ ছিল না,

কিস্তিতে ট্রানজিস্টর
"ন্যাশন্যাল ডিলাক্স"
১০ মাসিক কিস্তিতে ৩ ব্যান্ড অল ওয়ার্ল্ড পোর্টেবল ট্রানজিস্টর লাভ করুন। প্রতি গ্রাম ও শহরে প্রেরণের যোগ্য। আবেদন করুন:
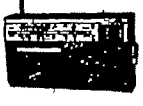
Music & Sound (B.W.C.—10)
Post Box 1576, Delhi—6.

ঐ সুন্দর
কেশ বিন্যাস
অতি দীর্ঘকাল
সুন্দর থাকবে
না - - -

শেলাক ব্যতীত

চুল আটকাবার প্রসাধন সামগ্রীতে, এরোসলযুক্ত ও এরোসলহীন কেশ সিঞ্চনে উভয়তই শেলাকই প্রাথমিক আঠা।

শেলাকসমূহ গ্রেডোগ্রাফিক কালি, শেষাই কলা, সিল, কনফেকশনারী, জলীয় বাষ্প সেট করা কালি, প্রসাধন, বৈদ্যুতিক ইনসুলেটর, কোল্ড টপ এনামেল ইত্যাদিতে বিভিন্ন প্রান্তিক ব্যবহার সামগ্রী পছন্দমত প্রস্তুত হয় পৃথিবীর বৃহত্তম শেলাক প্রস্তুতকারক, এঞ্জেলো ব্রাদার্স কর্তৃক। তাহারা নিখুঁতভাবে স্পেসিফিকেশন অনুযায়ী প্রস্তুত হয়। সমুদয় এঞ্জেলো গ্রেডই আই-এস-আই স্ট্যান্ডার্ড ও এতদ্ব্যতীত কঠোরতর এঞ্জেলো স্পেসিফিকেশন মত। সবচেয়ে বড় কথা এই যে, এঞ্জেলো ব্রাদার্স গুণের সমতা রক্ষা করেন।

Angelo Shellacs

এঞ্জেলো ব্রাদার্স লিমিটেড, কাশীপুর, কলিকাতা-২

মাথার ফেট্টি বেঁধে শেষ দিন পর্যন্ত বলে এসেছেন কংগ্রেস নয়, যুক্তফ্রন্ট নয়—তিনিই সব। খবর নেই আশু ঘোষের, যিনি শেষ দিনও বলে এসেছেন—দেশের আসল ক্ষমতা তাঁর কাছে। কারণ তিনিই হবেন ব্যালান্সিং পাওয়ার। শ্রীজাহাঙ্গীর অবশ্য কম কথা বলেন, কিন্তু তাঁরও আশা কম ছিল না। খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না ডঃ প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষকে, যিনি নিজেকে ত্রাতা হিসাবে কল্পনা করছিলেন। তিনিই বা আজ কোথায়? ঝাড়গ্রামে ভোট গণনার দিনে তিনি ঝাড়গ্রামের আশেপাশে ছিলেন। আশা ছিল যদি জয়যুক্ত হন, তবে তাড়াতাড়ি ঝাড়গ্রামে গিয়ে বিজয়মাল্য পরবেন। কিন্তু পরাজিত হয়ে ঠিক করলেন মেদিনীপুরে শহরে যাবেন। কিন্তু পুলিশ খবর দিল মেদিনীপুরে তাঁর যাবার খবর পেয়ে ছেলেরা জড়ো হচ্ছে, তাদের মতলব বোঝা যাচ্ছে না। খবর পেয়ে ডঃ ঘোষ আর মেদিনীপুর গেলেন না, চলে এলেন কলকাতায়। কিন্তু তারপর তাঁর খোঁজ কেউ জানে না।

ইতিমধ্যে যাঁরা কথা বলেছেন তার মধ্যে কংগ্রেস দলের শ্রীঅতুল্য ঘোষ, শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র সেন দুইজনেই সব বুঝতে পেরেছেন, শুধু বুঝতে পারেন নি এমন হল কি করে। অবশ্য শেষকালে দুইজনই একটা কথা বুঝেছেন। সেটা হল একটা সাবোতাজ হয়েছে এবং সেটা সম্ভবত করেছে সরকারী কর্মচারীরা। কিন্তু সেই সব কথায় না গিয়ে এখন শুধু তাঁদের মুখের কথায় শুনে নিতে চাই তাঁরা কি ভাবছেন। শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র সেন আর শ্রীঅতুল্য ঘোষ দুইজনেই বলেছেন—জনগণ আমাদের সঙ্গে আছে। নির্বাচনে যা ঘটে থাকুক না কেন, ভোট আমরা বেশি পেয়েছি, কাজেই জনসমর্থন আমাদের হ্রাস পায় নি। শ্রীঅজয় মুখোপাধ্যায় বলেছেন, জনগণ ওঁদের আস্তাকুঁড়ে ফেলে দিয়েছে। এই একই কথা বলেছেন শ্রীপ্রমোদ দাশগুপ্ত ও শ্রীজ্যোতি বসু। কিন্তু আজ আর কারো মুখের কথায় কোন সত্য যাচাই হবে না, আর নেতাদের কথা তো নয়ই—কারণ নেতাদের কথা সত্য হলে আজ যে সত্য হত সেই সত্য তলিয়ে গেছে অতলে। কালের যাত্রার কোনো নেতাই একক কণ্ঠস্বরের মালিক নন। সকলের কণ্ঠের ওপরে রয়েছে এক মূক জনতার কণ্ঠস্বর। তাদের কণ্ঠস্বর শোনা যায় না, কিন্তু সময়মত তাদের কণ্ঠের অমোঘ বাণী সব কথাকে ছাপিয়ে যায়। তাই তো রাজ্যের মধ্যবর্তী নির্বাচনে কেউ শুনতে পায় নি—বুঝতে পারে নি সেই জনগণের কথা। আর তাদের কথা বাদ দিয়ে যারা কথা বলার চেষ্টা করেছে, তারাই নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে। সেই নতুন কণ্ঠস্বর আজ শুনতে হবে, বুঝতে হবে। সেই কণ্ঠস্বর যাঁরা বুঝতে পারবেন, তাঁরাই লিখতে পারবেন মহাকাব্য—সে মহাকাব্য মেঘনাদবধ কাব্য বা বৃত্রসংহার হোক। আজকে সেই মহাকাব্য লেখার ক্ষমতা যদি কারো থাকে, তবে তিনিই আজকের নতুন দিনের কথা লিখতে পারবেন, অন্যথায় সবই হবে বুজরুকি। আসুন সেই নতুন দিনের দিনলিপি পড়বার চেষ্টা করি।

সবচেয়ে আগে একটা প্রশ্ন সামনে আসে—কংগ্রেসের কি হল? এক কথা আজ শুধু কংগ্রেস নয়—কংগ্রেস-বিরোধীদেরও প্রশ্ন। এই কথার উত্তর পাবার আগে আর একটা প্রশ্নের জবাব জানতে ইচ্ছা করে। প্রশ্নটি করেছিলেন একজন বন্ধু। তাঁর প্রশ্ন ছিল—আজ একটা কথা বলতে পারেন, গত বিশ বছরে বাংলা দেশের কেউ কি তাদের ছেলে বা নাতির নাম আদর করে 'অতুল্য' বা 'প্রফুল্ল' রেখেছে? কত আদরে মানুষ তার আদরের সন্তানের নাম রাখে রবীন্দ্র, চিত্ত, সুভাষ। কিন্তু বাংলা দেশে কেউ তাদের সন্তানের নাম রাখে না অতুল্য বা প্রফুল্ল। কেন?

(১৬।২।৬৯)

[চলবে]

এই নির্বাচনঃ পশ্চিম বাংলায় নব ইতিহাস সৃষ্টি

পর্যবেক্ষক

আগের প্রবন্ধে চারটি রাজ্যের মধ্যবর্তী নির্বাচনের ফলাফল সম্বন্ধে আমি এই মন্তব্য করেছিলাম যে, পাঞ্জাব, উত্তরপ্রদেশ ও বিহারে বামপন্থী শক্তি এক ধাপ এগিয়ে যেতে না পারলেও, পঃ বাংলায় বামপন্থী শক্তির অগ্রগতি প্রায় নিশ্চিত। পঃ বাংলার মধ্যবর্তী নির্বাচনের ফলাফল দেখার পর আমি নিঃসংকোচে স্বীকার করব যে, ঐ প্রবন্ধ লেখার সময় বামপন্থী শক্তির এত বিপুল অগ্রগতি আমারও অপ্রত্যাশিত ছিল। যুক্তফ্রন্ট জয়ী হবে এ কথা বুঝতে পারলেও, কংগ্রেস যে এমন শোচনীয়ভাবে পরাজিত হবে তা ধারণাও করতে পারি নি। আমার কথা স্বতন্ত্র, কোনো বামপন্থী দলই কি ভাবতে পেরেছিল এত বিরাট জয় তাঁদের হবে? ইতিহাস যে কত দ্রুত এগিয়ে যাচ্ছে, জনসাধারণ যে ইতিহাস-রচনায় কত বেশি উদ্যোগী, তা আর একবার প্রমাণিত হল। ১৯৬৭-র নির্বাচনে বামপন্থীদের মধ্যকার অনৈক্যকে অতিক্রম করে জনসাধারণই সৃষ্টি করেছিল নতুন ইতিহাস; সেই জনসাধারণই এই ফেব্রুয়ারীতেও আর একবার সৃষ্টি করল আরো নতুন ইতিহাস।

পঃ বাংলার এই নির্বাচনের ফলাফলের মধ্যে কতকগুলি লক্ষণ উল্লেখযোগ্য। সর্বপ্রথম উল্লেখ করতে হয় জনসাধারণের ভোট দেওয়ার আগ্রহ ও উৎসাহের বিষয়। নির্বাচনের আগে অনেকে বলেছিলেন, এবারে ভোটের ব্যাপারে লোকের তেমন উৎসাহ নেই। একটা অ-স্থায়িত্বের অবস্থার প্রতিক্রিয়া, তার উপর যুক্তফ্রন্ট সরকারের দ্বারা মানুষের জীবন-সমস্যার আশু সমাধানের কোনো ভরসা না দেখতে পাওয়া —এই দুই মিলিয়ে নির্বাচন সম্বন্ধে খানিকটা উদাসীনতা দেখা গিয়েছিল লোকের মধ্যে। এ উদাসীনতা যুক্তফ্রন্ট-বিরোধিতা না হলেও, এর স্বাভাবিক ফল হচ্ছে কম ভোট দান। তার উপর ছিল নকশালপন্থীদের প্রচণ্ড নির্বাচন-বয়কট প্রচার। এই সব মিলিয়ে একটা আশঙ্কা ছিল যে, আগের বারের তুলনায় ভোটদানের হার কম হবে এবার। কিন্তু ঘটনা হয়ে গেল একেবারে উল্টো। আগের সব নির্বাচনের তুলনায় ভোটদানের শতকরা অনুপাত অনেক বেশি। এ থেকে প্রমাণ হয় যে, পঃ বাংলার জনসাধারণের রাজনৈতিক চেতনা যথেষ্টই বেড়েছে, যার জন্য তাঁদের আপাত-উদাসীনতা বা আপাত সন্দিগ্ধ মনোভাব রাজনৈতিক দায়িত্ব পালনের পথ রোধ করতে পারে নি।

দ্বিতীয়ত, শুধু আসন-সংখ্যার দিক থেকেই যুক্তফ্রন্টের বিপুল জয় নয়, অধিকাংশ জয়ই এত বিপুল ভোটাধিক্যে জয় যে তা কংগ্রেসের বিরুদ্ধে জনসাধারণের এক অভ্যুত্থানের (upsurge) মতো রূপ নিয়েছে। নির্বাচনের আগে অনেক কেন্দ্রের সংগঠকদের সঙ্গে কথা বলে দেখেছি, তাঁরা জয়ের আশা করলেও সর্বক্ষেত্রে সুনিশ্চিত আশা পোষণ করেন নি বা বিপুল ভোটাধিক্যে জয় হবে এরকম আশাও করেন নি। কিন্তু দেখা গেল, জনসাধারণ সংগঠক ও নেতাদের আশার অতিরিক্ত পূরণ করে দিয়েছে। ১০ হাজার থেকে ২০ হাজার ভোটাধিক্যে জয় যেন এই জয়ের সাধারণ চরিত্র। এটাও প্রমাণ করে জনসাধারণ কতটা এগিয়েছে।

কংগ্রেসের পরাজয়টাও এমন সামগ্রিক যে অধিকাংশ জেলাতেই দু-তিনটের বেশি আসন কংগ্রেস পায় নি। ২৪ পরগনা, বর্ধমান, হুগলী, হাওড়া, মেদিনীপুর প্রভৃতি যে জেলাগুলি পঃ বঙ্গের রাজনীতির গতি নির্ধারণ করে, সেই জেলাগুলিতেই কংগ্রেসের পরাজয় সবচেয়ে বেশি শোচনীয়। রাজধানী কলকাতাতে কংগ্রেস কোনরকমে টিকে আছে চৌরঙ্গী, বড়বাজার, বহুবাজার প্রভৃতি অঞ্চলে যেখানে যুক্তফ্রন্ট কোনদিনই সাফল্য আশা করে নি। ব্যতিক্রম হিসাবে হয়েছে শুধু জোড়াবাগান, জোড়াসাঁকো। মোটের উপর কলকাতার জনসাধারণ কংগ্রেসকে ভালভাবেই পরিত্যাগ করেছে।

কংগ্রেসের সঙ্গে জনসাধারণ ভালভাবেই পরিত্যাগ করেছে দলত্যাগীদেরও। ডঃ প্রফুল্ল ঘোষ, দাশরথি তা, গঙ্গাধর প্রামাণিক প্রমুখ যাঁরা যুক্তফ্রন্ট গভর্নমেন্ট উৎখাতের চক্রান্তকারী তাঁদের পরাজিত করেছে জনসাধারণ। তার সঙ্গে সঙ্গে পরাজিত করেছেন, যুক্তফ্রন্ট-ত্যাগী জাহাঙ্গীর কবিরকে। নিশিথ কুণ্ডু প্রমুখকেও। আশুতোষের মতো সুযোগসন্ধানী লোককেও উপযুক্ত শিক্ষা দিয়েছে জনসাধারণ। কংগ্রেস-বিরোধী মুখোস পরে নানা আকর্ষণীয় বুলির জোরে জনসাধারণকে আকৃষ্ট করার চেষ্টা করেছে যে জনসঙ্ঘ, 'আমরা বাঙালী' প্রভৃতি গোষ্ঠী, তাদেরও শোচনীয়ভাবে হঠিয়ে দিয়েছে জনসাধারণ। এক কথায়, যুক্তফ্রন্টের পক্ষে যে কোনো বাধা দেখেছে, তাকেই সজোরে সরিয়ে দিয়েছে জনগণ।

যুক্তফ্রন্টের বিরাট সাফল্য শুধু মোট আসন-সংখ্যার দিক থেকেই নয়, যুক্তফ্রন্টের অন্তর্ভুক্ত প্রায় সব দলই যথেষ্ট অগ্রগতি সাধন করেছে আসন লাভের দিক থেকে। মার্ক্সবাদী কমিউনিস্টরা গতবারের ৪৪-এর জায়গায় এবারে পেয়েছেন ৮০, কমিউনিস্ট পার্টি ১৬ থেকে ৩০-এ দাঁড়িয়েছে, ফরোয়ার্ড ব্লক ২৩ থেকে ২১-এ দাঁড়িয়েছে, আর-এস-পি ৬ থেকে ১২, এস-এস-পি ৭ থেকে ৯, এস-ইউ-সি ৪ থেকে ৭ ইত্যাদি। বড় দল হিসাবে একমাত্র বাংলা কংগ্রেস যেখানে ছিল মোটামুটি সেখানেই রয়েছে, আগে তাঁদের ছিল ৩৪, এখন ৩৩। দাঁড় করানো প্রার্থী-সংখ্যার তুলনায় জয়ের সংখ্যাও অধিকাংশ ক্ষেত্রে শতকরা ৮০ ভাগেরও বেশি এবং কোনো কোনো ক্ষেত্রে শতকরা ১০০ ভাগ। আজ পর্যন্ত কোনো নির্বাচনে বামপন্থীদের সাফল্য এরকম হয় নি।

দলীয় শক্তি বৃদ্ধির এই দৃষ্টান্ত থেকে এই সত্যটাই স্পষ্ট হয়ে ওঠে যে, বামপন্থী ঐক্য হলে তাতে কোনো পার্টির লোকসান তো হয়ই না, বরং প্রত্যেকেরই হয় লাভ। ভোট-সংখ্যার বিপুল বৃদ্ধির কারণও হচ্ছে এই ঐক্য, যা জনসাধারণকে উৎসাহিত করে, সক্রিয় ও উদ্যোগী করে তোলে। গত নির্বাচনে বামপন্থী ঐক্য না হবার ফলে শুধু ভোট ভাগাভাগি হয়েছিল তাই নয়, অনেক মানুষের ভোটস্পৃহা কমে গিয়েছিল এবং আরো অনেক মানুষ বামপন্থীদের উপর বিরক্ত হয়ে কংগ্রেসকে ভোট দিয়েছিল। এমন দু-একটি কেন্দ্রের ত্রিমুখী প্রতিদ্বন্দ্বিতার ফলে বামপন্থী প্রার্থীরা এত কম ভোট পেয়েছিলেন যে, দু'জনের ভোট একত্রিত হলেও কংগ্রেসের সমান হয় না। ঠিক সেই কেন্দ্রেই এবার বিপুল ভোটাধিক্যে যুক্তফ্রন্ট প্রার্থী জয়লাভ করেছেন। এত ভোট পাওয়ায় অনেকে অবাক হয়ে গিয়েছেন। কিন্তু এতে অবাক হবার কিছু নেই। বামপন্থী ঐক্য এবার শুধু ভোট ভাগাভাগিই বন্ধ করে নি, হাজার হাজার নতুন ভোট এনে

দিয়েছে উৎসাহী জনসাধারণের কাছ থেকে। তাই এবারে সাফল্য এত বিরাট।

আর একটা সত্যও স্পষ্ট হয়ে গিয়েছে এই নির্বাচন-ফলাফলের মধ্য দিয়ে। জনসাধারণ সত্যই Stable Govt. চায়। কংগ্রেস ভেবেছিল জনসাধারণের এই Stable Govt.-এর চাহিদাকে তাদের পক্ষে কাজে লাগাতে পারবে। কিন্তু পঃ বাংলার সচেতন জনসাধারণ কংগ্রেসের Stable Govt.-এর আবেদনের মোক্ষম জবাব দিয়েছে কংগ্রেস-বিরোধী Stable Govt. তৈরির ব্যবস্থা করে। জনসাধারণ বুঝেছে যে, একমাত্র বামপন্থী প্রগতিশীল শক্তির ভিত্তিতে গঠিত Stable Govt.-ই জনজীবনে স্থায়িত্ব ফিরিয়ে আনার প্রকৃত পথ খুলে দিতে পারে, যে-পথ এই ২০ বছরে কংগ্রেস ধীরে ধীরে বন্ধ করে দিয়ে সমগ্র সমাজজীবনকে এক ভাঙনের অবস্থায় টেনে নামিয়েছে। পঃ বাংলার কংগ্রেসের শেষ ভরসা ছিল এই Stable Govt.-এর আওয়াজ দিয়ে লোকের মন ভোলানো। কিন্তু সেই আওয়াজটাই যে এখানে বুমেরাং-এর মতো তাকেই ফিরে আঘাত করে এমনভাবে ধরাশায়ী করবে, তা কংগ্রেস কল্পনাও করতে পারে নি। এই জন্যই কংগ্রেস-ক্যাম্প একেবারে মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়েছে।

কিন্তু এই নির্বাচন-ফলাফলের মধ্য দিয়ে সবচেয়ে বড় কথা যেটা আজ সামনে এসে দাঁড়িয়েছে তা হচ্ছে, যে বিরাট সাফল্য জনসাধারণ এনে দিয়েছে যুক্তফ্রন্টের হাতে, তাকে কার্যকর করে তোলার যোগ্য হতে হবে যুক্তফ্রন্টকে। সে-যোগ্যতা বলতে সব সমস্যার সহজ সমাধান জনসাধারণ মনে করে না। জনসাধারণ জানে কত প্রতিবন্ধকতা ও বাধার মধ্যে যুক্তফ্রন্ট সরকারকে কাজ করতে হয়েছে ও হবে, তাই অসম্ভব প্রত্যাশা নিয়ে কেউ আর দিকে তাকায় না। যুক্তফ্রন্ট সরকারের যোগ্যতা বলতে জনসাধারণ এটাই বোঝে যে, প্রথমত, যে-ঐক্যের জোরে এই সরকার প্রতিষ্ঠিত হয়েছে বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠতা নিয়ে, সেই ঐক্যকে সর্বদা রক্ষা করতে হবে। দ্বিতীয়ত, যে-কর্মসূচী জনসাধারণের সামনে উপস্থিত করেছে তা রূপায়িত করার জন্য সর্বতোভাবে চেষ্টা করবে এবং তৃতীয়ত, জনসাধারণের সামনে সমস্ত সুবিধা-অসুবিধা ও সমস্যা উন্মুক্ত করে ধরে জনসাধারণের সহযোগিতা গ্রহণ করবে। এই তিনটি স্তম্ভের উপর দাঁড়িয়েই এ সরকার দেখাতে পারবে যে, তার stability কংগ্রেসের stability-র অসার ও মিথ্যা আস্ফালনের মতো নয়, তার stability হচ্ছে সমাজজীবনে stability ফিরিয়ে আনার সত্যকার প্রচেষ্টার stability.

পঃ বাংলার কথা দিয়েই শেষ করা চলে না। বিহার, উত্তরপ্রদেশ ও পাঞ্জাবের নির্বাচন-ফলাফলও আমাদের সামনে রয়েছে। এই তিনটা রাজ্যের নির্বাচন-ফলাফল থেকে কী দেখতে পাচ্ছি? পূর্বকার প্রবন্ধে আমি যে ইঙ্গিত করেছিলাম, অনেক পরিমাণে সেই রকমই অবস্থা দেখা যাচ্ছে। এই তিনটি রাজ্যে বামপন্থী শক্তি এক ধাপ এগোতে পারে নি, ফলে পরিস্থিতি আগে যেখানে ছিল প্রায় সেখানেই আছে। অর্থাৎ কংগ্রেসের হাতে ক্ষমতা ফিরে আসে নি বটে, কিন্তু অগ্রগামী শক্তি রাজনীতির গতি-নির্ধারক হয়ে উঠতে অক্ষম হয়েছে। পাঞ্জাবে আকালী দল সরকার গঠনের প্রধান শক্তি হয়ে উঠলেও, তার রাজনীতি আঞ্চলিক স্বার্থের উর্ধ্বে নয়। উত্তরপ্রদেশে কংগ্রেসকে যদি সরকার গঠন করতে হয়, তবে অন্য দু-একটি দলের সঙ্গে কোয়ালিশন না করলে সে সরকার টিকতে পারবে না। আর বিহারে অ-বামপন্থী শক্তিসমূহের ভাগাভাগিটা এত বেশি যে কাদের নিয়ে কংগ্রেস নির্ভরযোগ্য কোয়ালিশন করতে পারবে, সেটাই একটা সমস্যা।

বামপন্থী শক্তি একধাপ এগোতে পারে নি শুধু তাই নয়, বরং তিনটি রাজ্যেই বামপন্থী আসনের সংখ্যার হ্রাসই হয়েছে। দুই কমিউনিস্ট পার্টি, এস-এস-পি ও পি-এস-পি মিলিয়ে দেখলে অবস্থাটা এইরকম: পাঞ্জাবে ১৯৬৭-তে ছিল ৯, এখন হয়েছে ৮, উঃ প্রদেশে ৬৭-তে ছিল ৭০, এখন হয়েছে ৪২, বিহারে ৬৭-তে ছিল ১১০, এখন হয়েছে ৯৬। বলা বাহুল্য, যুক্তফ্রন্ট, এমন কি বামপন্থী ঐক্য গড়ে তুলতে না পারার ফলেই বামপন্থী শক্তির এই ক্ষতি হয়েছে। পাঞ্জাবে যুক্তফ্রন্ট গড়ে ওঠা দূরে থাক, দুই কমিউনিস্ট পার্টির মধ্যেই অনেক জায়গায় প্রতিদ্বন্দ্বিতা হয়েছে এবং তার ফল হয়েছে কমিউনিস্ট শক্তি হ্রাস। অন্তত দুই কমিউনিস্ট পার্টি মিলিত হতে পারলে কমিউনিস্ট আসনসংখ্যা কিছুটা বাড়ত। উঃ প্রদেশেও সেই অবস্থা, তার উপর এখানে রয়েছে বি-কে-ডির শক্তিমান তৃতীয় শিবির হিসাবে উদ্ভব। কমিউনিস্ট আসন এখানে যথেষ্ট হ্রাস পেয়েছে। একমাত্র বিহারে যুক্তফ্রন্ট না হলেও দুই কমিউনিস্ট পার্টি যুক্তভাবে নির্বাচন করতে পেরেছিল এবং তাই পি-এস-পি, এস-এস-পি ও লোকতান্ত্রি দলের trippl alliance-এর প্রতিবন্ধকতা সত্ত্বেও দুই কমিউনিস্ট পার্টি মিলিয়ে পুরনো অবস্থা বজায় রাখতে পেরেছে। সি-পি-আই পেয়েছে ২৫টি আসন এবং মার্ক্সিস্ট কমিউনিস্ট পেয়েছে ৩টি আসন।

যুক্তফ্রন্ট না হবার ফলে উল্লেখযোগ্য শক্তি হ্রাস হয়েছে এস-এস-পির। উত্তরপ্রদেশে ৬৭-তে এস-এস-পি ছিল ৩৩, এবারে মাত্র ৩০; বিহারে ৬৭-তে এস-এস-পি ছিল ৬৫; এবারে ৫১। পি-এস-পিও উঃ প্রদেশে ১১ থেকে ৩-এ নেমে গিয়েছে। অন্যদিকে বামপন্থী ঐক্য না হওয়ার সুযোগে জনসঙ্ঘ বিহারে এগিয়েছে, ৬৭-তে তাদের ছিল ২৬, এবার হয়েছে ৩৪। উঃ প্রদেশে বি-কে-ডির স্বতন্ত্র শক্তি হিসাবে উদ্ভবের ফলে জনসঙ্ঘই বিশেষভাবে মার খেয়েছে। ৬৭-তে তাদের আসন ছিল ১৭, এবারে তা হয়েছে ৪৮।

পঃ বাংলার উদাহরণের পাশে বিহার ও উত্তরপ্রদেশের অবস্থা নৈরাশ্যজনক নিশ্চয়ই। কিন্তু তবু কংগ্রেসের দিক থেকে আশা পূরণ হয় নি। বিহারে কংগ্রেস-আসন ১৯৬৭-র চেয়েও কমেছে। এখানে কংগ্রেস যদি শোষিত দল, বি-কে-ডি, জনতা পার্টি প্রভৃতির সঙ্গেও মিলতে পারে, তাহলেও তার কোয়ালিশন সরকার গঠন হয় না। একমাত্র জনসঙ্ঘকে সঙ্গে নিতে পারলেই তা হতে পারে। জনসঙ্ঘকে বাদ দিলে পি-এস-পি, এস-এস-পি, লোকতান্ত্রিক দলের trippl alliance-এর দিকেই কংগ্রেসকে তাকাতে হবে। কিন্তু এই দলগুলির নেতারা ইতিপূর্বেই যে ঘোষণা করেছিলেন তাতে কংগ্রেসের সঙ্গে তাঁদের কোয়ালিশন করার কোনো আগ্রহ দেখা যায় নি। নির্বাচনের পরে একজন এস-এস-পি নেতার কথা থেকেও সেই মনোভাব বোঝা যায়। অন্যদিকে উত্তরপ্রদেশে নির্বাচন বাকী সে পাঁচটি আসনে, সেগুলি কংগ্রেস দখল করতে পারলেও তারা নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা হয় না। সুতরাং কোয়ালিশন করতে হলে তাকে চাইতে হবে হয় সামান্য সংখ্যক নির্দলীয়দের দিকে, আর না হয় নির্ভরযোগ্য শক্তি হিসাবে বি-কে-ডির দিকে অথবা জনসঙ্ঘের দিকে। মোটের উপর কংগ্রেস কোয়ালিশন গভর্নমেন্ট গঠন উত্তরপ্রদেশে যত সহজ বলে দেখানো হচ্ছে, তত সহজ নয়।

বিহারে কংগ্রেসের আসন-সংখ্যা আগের বারের চেয়ে হ্রাস পেলেও কি গতবারের মতো অ-কংগ্রেসী সরকার গঠন সম্ভব? সম্ভব হত, যদি কোনো রকমভাবে একটা অ-কংগ্রেসী যুক্তফ্রন্ট হত নির্বাচনের আগে। কিন্তু বেভাবে বিভিন্ন শক্তি স্বতন্ত্রভাবে এই নির্বাচন লড়েছে এবং তার মধ্য দিয়ে বিভিন্ন অ-কংগ্রেসী শক্তির মধ্যকার ব্যবধান যেরকম আরো বেড়ে গিয়েছে তাতে মনে সন্দেহ আসে, অ-কংগ্রেসী সরকার গঠনের সম্ভাবনা খুব উজ্জ্বল কি না। বিশেষ করে জনসঙ্ঘের একক শক্তি হিসাবে পরিমাণ এবং তার নীতির সঙ্গে প্রগতিশীল দলগুলির নীতির যে

বিরাট ব্যবধান দিনে দিনে বেড়ে উঠছে, তাতে জনসঙ্ঘকে সঙ্গে নিয়ে সরকার গঠন করার বিষয়ে রাজী হওয়া বামপন্থীদের পক্ষে কঠিন। সুতরাং বিহারের পরিস্থিতিটা উত্তরপ্রদেশের চেয়েও অনেক বেশি জটিল হয়ে উঠেছে। কংগ্রেস কোয়ালিশন হওয়াও সহজ নয়, আবার কংগ্রেস-বিরোধী কোয়ালিশন হওয়াও কঠিন।

এই পরিস্থিতিতেই আমরা দেখতে পাচ্ছি একদিকে কংগ্রেস ও অন্যদিকে জনসঙ্ঘ কোয়ালিশন সরকার গঠনের মনোভাব ব্যক্ত করছে। কংগ্রেস গ্রীন সিগ্‌নাল দিয়েছে উত্তরপ্রদেশে কোয়ালিশন গঠনের জন্য এবং বিহারের সম্বন্ধেও আলোচনা চলছে। অন্যদিকে বিহারের ক্ষেত্রে জনসঙ্ঘ-নেতা বাজপেয়ী ঘোষণা করেছেন যে, তাঁরা হয় কংগ্রেস, না হয় এস-এস-পির সঙ্গে কোয়ালিশন করতে প্রস্তুত।

এই অস্থির অবস্থার মধ্যে বামপন্থী পার্টিগুলির ভূমিকা হবে উল্লেখযোগ্য। আজকের এই অস্থির অবস্থাটাই শেষ নয়, নতুন পরিবর্তন আসবে পরবর্তী পর্যায়ে। যাতে সেই পরিবর্তনটা প্রগতিশীলতার দিকেই হতে পারে, সেদিকে নজর রেখেই আজকের কর্তব্য নির্ধারণ করতে হবে বামপন্থী দলগুলিকে।

(১৫।২।৬৯)

রঙ বদলের পালা

কুমুদ দাশগুপ্ত

সেদিন কলকাতার একজন খ্যাতিমান [illegible] জনগণের ওপর আদৌ কোন প্রভাব আছে বলে মনে মনেও স্বীকার করেন না, হঠাৎ তাঁর মুখ থেকে যুক্তফ্রন্টের সুখ্যাতি শুনে চমকে যেতে হোল। শুধু সুখ্যাতি নয়, তিনি বললেন তিনি নাকি গ্রামে গ্রামে যে অবস্থা দেখেছিলেন তাতে তাঁর মনে হয়েছে যে, "গ্রামের মানুষ একজোট—যুক্তফ্রন্টকে সব ভোট।"

তাঁর কথা শুনে চমকে উঠেছিলাম এজন্য নয় যে, তিনি তাঁর নিজের সংবাদপত্রে যে সব বিবরণ লিখেছিলেন তাতে যুক্তফ্রন্টের পক্ষে একটি কথাও ছিল না। সকলেই জানেন সংবাদপত্রে কোন সাংবাদিকই নিজের বক্তব্য অবিকৃত রেখে প্রকাশ করতে পারেন না। বিস্মিত হয়েছিলাম এজন্য যে, আলাপ-আলোচনায় ঘুণাক্ষরেও তিনি এইরূপ আভাস দেন নি। বরং তিনি কংগ্রেসকে নিরাপদ ১৬০টি আসন দিয়ে রেখেছিলেন। আর তাঁর ধারণা যারা পশ্চিম বাংলার গ্রামাঞ্চলের মানুষ যুক্তফ্রন্ট আমলের পাঁচ টাকা কিলো চালের দামে আর গণকমিটির অত্যাচারে একেবারে ত্যক্ত-বিরক্ত। গ্রামের শান্তিপ্রিয় মানুষ একেবারে যুক্তফ্রন্টের বিরুদ্ধে চলে গেছে।

শুধু কি একজন সাংবাদিকেরই রাতারাতি মতটা পাল্টে গেল। তা নয়। এবারের মধ্যবর্তী নির্বাচনে নাম-করা দৈনিক, সাপ্তাহিক (একমাত্র সাপ্তাহিক বসুমতী বাদে) উঠে পড়ে লেগেছিল যুক্তফ্রন্টের পরাজয়ের জন্য। বিভিন্ন সংবাদপত্রের জেলা সমীক্ষা দেখেও মনে হয়েছে সব মানুষ যুক্তফ্রন্টের বিরুদ্ধে চলে গেছে—কংগ্রেসের অপরিসীম প্রভাব বেড়েছে। সংবাদপত্রের এই সব বিবরণ জনসাধারণকে প্রভাবিত করতে পারলো না। বরং উল্টো ফল হয়ে গেল। সঙ্গে সঙ্গে সংবাদপত্রগুলোর রঙ বদলে গেল। রাতারাতি সব সংবাদপত্রই যেন মার্ক্সবাদী কমুনিস্ট পার্টির মুখপত্রে পরিণত হয়েছে।

সাংবাদিকদের মধ্যে যাঁরা ছিলেন সর্বাপেক্ষা বেশি যুক্তফ্রন্ট বিরোধী, তাঁরাই এখন সর্বাপেক্ষা যুক্তফ্রন্টের ভক্ত। সব দলের সব নেতারাই আজ তাঁদের দাদা।

শুধু সাংবাদিকদের দোষ দিলে চলবে না। রাইটার্স বিল্ডিংসের বহিরঙ্গের যে রকম বদল হয়েছে তেমনি রাইটার্স বিল্ডিংসের অফিসারদের রঙও বদলে যাচ্ছে। এই রঙ বদল একেবারে অনভ্যস্ত চক্ষুতেও ধরা পড়ে। নির্বাচনের ফল প্রকাশের দিনেও যে সব অফিসাররা বারংবার কংগ্রেস কত ভোটে জিতছেন বলে খোঁজ নিচ্ছিলেন, একদিন পরেই সকলকে দেখিয়ে কংগ্রেস কত ভোটে হারছে জানতে চেয়েছেন। এক-একজন ফ্রন্ট প্রার্থীর জয়লাভের সংবাদের সঙ্গে সঙ্গে তাঁরা হর্ষধ্বনি করে উঠেছেন। অথচ যুক্তফ্রন্ট সরকারের আমলে সেই সরকারকে হঠানোর চক্রান্তে এই সব অফিসারদের অনেকেই সানন্দে যোগ দিয়েছিলেন।

পাড়ায় পাড়ায় বস্তীতে বস্তীতে লাঠি নিয়ে যাঁরা যুক্তফ্রন্ট কর্মীদের ওপর হামলা করতেন, তাঁদের অনেককে এখন গলায় লাল রুমাল বাঁধতে দেখা যাচ্ছে।

যুক্তফ্রন্টের সমর্থক হাজার হাজার কর্মী রাজপথের আলোগুলোকে লাল রঙে রাঙিয়ে দিচ্ছেন—আবিরের রঙে শোভাযাত্রা লাল। এই লালের ছোঁয়াচ সর্বত্র। কিন্তু আসল আর মেকি লাল ধরা পড়তে বেশি দিন সময় লাগবে না। আজ যে সাংবাদিক নিজের প্রয়োজনে যুক্তফ্রন্টের জয়ধ্বনি করছেন, যে সব সংবাদপত্র হঠাৎ লালের ভক্ত হয়ে পড়েছেন, যে সব অফিসার সব বামপন্থীদলের নেতাদের বাড়ির খোঁজ-খবর নিতে সুরু করেছেন, তাঁরা সবাই সুযোগ পেলেই আবার স্বমূর্তি ধারণ করবেন। আজকের রঙ বদলের এই পালা সাময়িক—নকল রঙ লাগানো। এ রঙ অনুকূল পরিবেশে ঘুমে-মুছে যাবে। ইতিহাসের তাই শিক্ষা।

২১শে ফেব্রুয়ারীর প্রজ্বলিত অগ্নিশিখা ছড়িয়ে পড়েছে...

॥ কল্পতরু সেনগুপ্ত ॥

২১শে ফেব্রুয়ারী পূর্ববঙ্গের ভাষা আন্দোলনের শহীদ দিবস। শুধু পূর্ববঙ্গের নয়, এই দিনটি সকল বাঙালীর স্মরণীয়। দুই বাংলার জাতীয় দিবস। ১৯৫২ সালে এই দিনে বরকত, সালাম, রফিক, জব্বার, সফিউর রহমান প্রমুখ ৩৯ জন (বে-সরকারী মতে) শহীদ হন মাতৃভাষা বাংলার মর্যাদা রক্ষার জন্য ও বাংলাকে অন্যতম রাষ্ট্রভাষা—সকল ভাষার সমান অধিকার দাবিতে। সদ্য বিভক্ত পূর্ব বাংলায় মাতৃভাষার জন্য এই সংগ্রাম বিভক্ত বাঙালীকে এক নতুন উপলব্ধি দান করেছে। এই দিনকে উপলক্ষ করে দুই বাংলার বাঙালী পরস্পরকে যেন দেখতে পায়।

প্রজ্বলিত অগ্নিশিখা

সেদিন ১৯৫২ সালে দেখেছিলাম; আজ আবার দেখছি ১৯৬৯ সালে। আবার ২১শে ফেব্রুয়ারী ফিরে এসেছে প্রজ্বলিত অগ্নিশিখা নিয়ে। সতের বছর পরে আবার পূর্ব বাংলা জ্বলছে; বিক্ষুব্ধ পূর্ব বাংলায় আজ শ্রমিক, কৃষক, ছাত্র, নারী দলে দলে রাস্তায় নেমেছে। এতবড় বিক্ষোভ, এত ব্যাপক সংগ্রাম আগে আর সারা পাকিস্তানে হয় নি। এবার শুধু পূর্ববঙ্গ নয়—সারা পাকিস্তান বিক্ষুব্ধ হয়ে উঠেছে। এই বিক্ষোভের সূচনা হয়েছে ৬ই ডিসেম্বর (১৯৬৮) থেকে। ন্যাপ-এর (ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি) নেতা মওলানা ভাসানীর নেতৃত্বে। আন্দোলনের যুক্তভাবে আহ্বান দিয়েছিল শ্রমিক ফেডারেশন, কৃষক সমিতি, ছাত্র ইউনিয়ন (সেনন দল)। এই আন্দোলনের শুরু ঢাকা শহরে। শ্রমিক ফেডারেশন ও কৃষক সমিতি যুক্তভাবে সভা করে গণ-স্বাক্ষর সংগ্রহ করে। ৫০ হাজার গণ-স্বাক্ষর নিয়ে গভর্নরের নিকট ডেপুটেশন যায়—জনগণের দাবি আদায়ের জন্য। ৬ই ডিসেম্বর দেশব্যাপী দাবিদিবস পালিত হয়; ঢাকায় ৬০ হাজার মানুষের জমায়েতে মওলানা ভাসানী বক্তৃতা করেন। তিনি আয়ুবের বেসিক ডেমোক্রেসির মুখোস খুলে দিয়ে বলেন যে-দেশে জনগণের ভোটাধিকার নেই, সেদেশে বেসিক ডেমোক্রেসি একটা ভাঁওতা মাত্র। শ্রমিক, কৃষক, ছাত্রদের দাবির সঙ্গে তিনি (১) জনগণের ভোটাধিকার, (২) ব্যক্তি-স্বাধীনতা, (৩) রাজনৈতিক বন্দীদের মুক্তি, (৪) পূর্ব বঙ্গ সহ পাকিস্তানের সকল জাতির আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসনের অধিকার দাবি করেন। ৭ই ডিসেম্বর আহ্বান করা হয়েছিল সাধারণ ধর্মঘট। এই ধর্মঘট পূর্ণ সাফল্য লাভ করে। আয়ুবশাহীর পুলিশ গুলী চালিয়ে দুজনকে হত্যা করলে বিক্ষোভের আগুন জ্বলে ওঠে। ৮ই ডিসেম্বর আবার হরতাল হয়। আয়ুবের পুলিশ ক্ষিপ্ত কুকুরের মত দমননীতি নিয়ে রাস্তায় বেরিয়ে পড়ে। জনসাধারণ তার মোকাবিলা করে। ১০ই ডিসেম্বর মফস্বল শহরে প্রতিবাদ হরতাল, সভা ও মিছিলের আহ্বান জানানো হলে তাতে সর্বশ্রেণীর মানুষ সাড়া দেয়। এবার ন্যাপের পক্ষ থেকে ভাসানী আন্দোলনকে আরো ছড়িয়ে দেবার উদ্দেশ্যে ২৯শে ডিসেম্বর গ্রামাঞ্চলে সভা, মিছিল ও হরতাল করার আহ্বান জানান। এই আহ্বানে জনসাধারণ যথা-যথভাবে সাড়া দিয়েছে। উত্তর থেকে দক্ষিণ বঙ্গোপসাগরের উপকূল জেলা চট্টগ্রাম পর্যন্ত সকল মানুষ এই আন্দোলনে সমবেত হয়েছে।

সূচনায় যেমন আয়ুবশাহী আন্দোলনকে ধ্বংস করতে চেয়েছে, আন্দোলনের গতি বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে শাসকশ্রেণী আরো বেশি ক্ষিপ্ত হয়ে উঠেছে। কারফিউ, লাঠি, গুলী, গ্রেপ্তার, টিয়ার গ্যাস চালিয়েও যখন পেরে ওঠা যায় নি তখন রাস্তায় মিলিটারি নামিয়েছে। কয়েকটি শহর, বিশ্ববিদ্যালয় মিলিটারির দখলে দেওয়া হয়েছে। এ পর্যন্ত ৩৬ জনের মত নিহত হয়েছেন; গ্রেপ্তার হয়েছেন প্রায় চার হাজার। এই আন্দোলনের সর্বাধিক বড় বৈশিষ্ট্য আন্দোলন কেবল শহরে সীমাবদ্ধ নয়, শহর গ্রামে সমানভাবে ছড়িয়ে পড়েছে; শ্রমিক, কৃষক, ছাত্রের সঙ্গে মেয়েরাও পুলিশী অত্যাচারের মোকাবিলা করছেন।

এই আন্দোলনের দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্য আন্দোলন পূর্ববঙ্গে সীমাবদ্ধ নেই, পশ্চিম পাকিস্তানে বিস্তৃত হয়েছে। পশ্চিম পাকিস্তানের শহরে শহরে গুলী, লাঠি চলছে, সরকারী অফিস পুড়ছে। পাকিস্তান হবার পর এই প্রথম পাকিস্তানের দুই অংশ একই সঙ্গে আন্দোলনে নেমেছে এবং আন্দোলন একই জঙ্গী রূপ ধারণ করেছে। ১৪ই ফেব্রুয়ারী গোটা পাকিস্তান জুড়ে যে হরতাল হয়েছে পাকিস্তানের ইতিহাসে এ-ও এক নতুন ঘটনা। দুই অংশের সংগ্রামী মানুষ ইতিপূর্বে এমনভাবে এক হতে পারে নি।

কেন এই সংগ্রাম

উল্লেখ করা প্রয়োজন যে পাকিস্তানে সংবিধানগত গণতন্ত্রের অস্তিত্ব নেই। ১৯৫৪ সালে জনগণের ভোটে যুক্তফ্রন্ট ক্ষমতায় আসে; এবং জননেতা এ, কে, ফজলুল হকের নেতৃত্বে যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রিসভা গঠিত হয়। কিন্তু কেন্দ্র তা সহ্য করে না। কিছুদিনের মধ্যে সেই মন্ত্রিসভা বাতিল করে দিয়ে রাজ্যপালের শাসন প্রবর্তন করা হয়। এই স্বেচ্ছাচারের বিরুদ্ধে অসন্তোষ ব্যাপক হয়ে উঠলে ১৯৫৭ সালে শাসকশ্রেণীর বশম্বদ আওয়ামী লীগের আতাউর রহমানকে দিয়ে মন্ত্রিসভা গঠন করে। কিন্তু জনসাধারণ সেই চালাকি ধরে ফেলে। তারা এই মন্ত্রিসভাকে পুতুল মন্ত্রিসভা মনে করে প্রবল বিক্ষোভ জানায়। এসময় পাকিস্তানের শাসকগোষ্ঠী একটা সংবিধান রচনা করতে বাধ্য হয়। এই সংবিধানে সার্বজনীন ভোটাধিকারের ভিত্তিতে ফেডারেল ধরণের একটি পার্লামেন্টারী শাসনব্যবস্থার প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছিল। এই সংবিধানের ভিত্তিতে ১৯৫৮ সালে পাকিস্তানের জনসাধারণ তখন আসন্ন সাধারণ নির্বাচনের স্বপ্ন দেখছিল, সেই সময় অক্টোবর মাসে আকস্মিকভাবে একটা ষড়যন্ত্রমূলক পদ্ধতিতে আয়ুব খান শাসনক্ষমতা দখল করে; এবং সংবিধান, পার্লামেন্ট, মন্ত্রিসভা সবই বাতিল করে দিয়ে মিলিটারী শাসন প্রবর্তন করে। আয়ুবের প্রতিপক্ষ, বিশেষ করে কমিউনিস্ট চিন্তাধারার মানুষমাত্রকেই জেলে আটক করে। সংবাদপত্র থেকে সভা, কোথাও কোন কথা বলার অধিকার পর্যন্ত থাকে না।

কিন্তু চতুর আয়ুব বেশিদিন মিলিটারী শাসন জারী রাখার বিপদ জানে; জানে যে বিদেশে তার প্রতিক্রিয়া হবে; গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের মর্যাদা পাবে না। তাই গণতন্ত্রের একটা পোষাক পরান দরকার। এই গণতন্ত্রের পোষাকটাই হল

বেসিক ডেমোক্রেসি বা বুনিয়াদী গণতন্ত্র। এই ছদ্মবেশী গণতন্ত্রে ৮ কোটি মানুষের দেশ পাকিস্তানে পূর্বাঞ্চলে ৬০ হাজার আর পশ্চিমাঞ্চলে ৬০ হাজার মোট ১২০ হাজার মানুষ ইউনিয়ন কাউন্সিল বা বেসিক ইউনিটের সদস্য হবেন। তাঁরা নির্বাচিত হবেন জনসাধারণের দ্বারা। এই এক লক্ষ কুড়ি হাজার মৌল গণতন্ত্রী বা বেসিক ডেমোক্রাটরা নির্বাচন করবেন প্রাদেশিক পরিষদ, জাতীয় পরিষদ এবং প্রেসিডেন্ট। ইউনিয়ন কাউন্সিল সদস্য বা মৌল গণতন্ত্রীরা সার্বজনীন ভোটে নির্বাচিত বলা হলেও গ্রামাঞ্চলে স্বাধীনমতে ভোট দেওয়া সম্ভব হয় না। গ্রামের জোতদার, মহাজন, প্রতিক্রিয়াশীল শ্রেণীই হয়েছে মৌল গণতন্ত্রী। তাদের ভোটে প্রদেশ ও জাতীয় কাউন্সিলে প্রতিক্রিয়াশীলদের আসার পথ নির্বিঘ্নে থাকছে; আরো বেশি নিরাপদ থাকছে আয়ুবের প্রেসিডেন্টগিরি। সুতরাং বোঝা যাচ্ছে বুনিয়াদী গণতন্ত্র একটা লোকভোলানো কথা মাত্র, এতে পরোক্ষ ভোটাধিকার ছাড়া জনসাধারণের কোন অধিকার থাকছে না।

বেসিক ডেমোক্রেসিতে নির্বাচন যে কত বড় একটা ভাঁওতা তা বোঝা গেছে মিস ফাতেমা জিন্নার প্রতিদ্বন্দ্বিতার সময়। ফাতেমা জিন্না—পাকিস্তানের প্রতিষ্ঠাতা মিঃ জিন্নার সহোদরা এবং সর্বজনপরিচিতা। কিন্তু তিনি প্রেসিডেন্ট পদের জন্য প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে পরাজিত হন। কারণ জনসমর্থন থাকলেও প্রতিক্রিয়াশীল ভোটাররা তাঁকে ভোট দেয় নি আয়ুবের ইচ্ছার বিরুদ্ধে।

জনগণের দাবি

এই পরিস্থিতিতে ন্যাপের পক্ষ হতে ভাসানীর মওলানা বেসিক ডেমোক্রেসির নির্বাচন বয়কট করার আহ্বান জানিয়েছেন। এবং জনগণের ভোটাধিকার সহ সাংবিধানিক ভিত্তিতে নির্বাচন দাবি করেছেন।

আয়ুবশাহীর দশ বছরের অভিজ্ঞতায় জনগণ বুঝেছে স্বায়ত্তশাসন ছাড়া পূর্ববঙ্গের বাঁচার পথ নেই। হয় স্বায়ত্তশাসন আদায় করতে হবে, নয় ত' পশ্চিম পাকিস্তানের মনোপলি ক্যাপিটালিস্টদের কলোনীর মত থাকতে হবে। এই আন্দোলনে শ্রমিকদের দাবি : বাঁচার মত মজুরী ও ট্রেড ইউনিয়ন গড়ার অধিকার। কৃষকের দাবি : স্থায়িভাবে বন্যা নিয়ন্ত্রণ, খাজনা ট্যাক্স হ্রাস, সার্টিফিকেট প্রথা রহিত, পাটের দর ৪০ টাকা মণ, ঘুষ দুর্নীতি বন্ধ করা। ছাত্রদের দাবি : বিশ্ববিদ্যালয় অর্ডিন্যান্স বাতিল করা, গণতান্ত্রিক শিক্ষা ব্যবস্থা, শিক্ষা সংকোচন নীতি বন্ধ করা। এই ভাবেই ছাত্রদের ১১ দফা দাবি হয়েছে। শ্রমিক-কৃষকের নিজ নিজ দাবি ছাড়াও ছাত্ররা ১১ দফা দাবি নিয়ে আন্দোলনে সামিল হয়েছে।

আয়ুব শাসনের দশ বছর

আয়ুব শাসনে বাস্তবিকপক্ষে পূর্ববঙ্গ মনোপলি ক্যাপিট্যালিস্টদের শিকারভূমিতে পরিণত হয়েছে। সামন্ততান্ত্রিক শোষণ ও জোতদারদের প্রতিপত্তি বেড়েছে। আগে যেখানে জমির সিলিং বাঁধা ছিল ১ শত বিঘা, আয়ুব শাসনে সিলিং হয়েছে ৩৭৫ বিঘা। খাজনা ও ট্যাক্সের হার দ্বিগুণ হয়েছে। ঘুষ ও দুর্নীতি বেড়েছে। জীবনযাত্রার ব্যয় বেড়েছে। ক্রয়ক্ষমতা কমে গেছে। গ্রামাঞ্চলে ভূমিহীন কৃষকের সংখ্যা বাড়ছে। প্রধান অর্থকরী ফসল পাটের দর কমে গেছে, ২০।২৫ টাকা মণ দরে বিক্রয় হচ্ছে। শিল্পে শ্রমিক কর্মচারীদের গড়পড়তা বেতন মাত্র ৮০ টাকা। বিদেশী লগ্নি বাড়ছে। দুই হাজার কোটি টাকা বিদেশী পুঁজির মধ্যে এক হাজার পাঁচ শ' কোটি টাকা আমেরিকার পুঁজি খাটছে।

এরই সঙ্গে চলছে শিক্ষা-সংকোচ, সংস্কৃতির ওপর খবরদারী বিশ্ববিদ্যালয় অর্ডিন্যান্স জারী করে শিক্ষার ক্ষেত্রে সরকারী আধিপত্যকে বাড়ান হয়েছে। থার্ড ডিভিশনে যারা পাশ করে তাদের কলেজে ভর্তির পথ বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র পড়বার জন্য আন্দোলন করতে হচ্ছে। নজরুলের গান ও কবিতা বিকৃত করা হয়েছে। বর্ণমালা সংস্কারের নামে বাংলা ভাষা ও বানান বিকৃত করার চেষ্টা হচ্ছে। সর্বস্তরে বাংলা ভাষা চালু করা হয় নি। ইসলামের দোহাই দিয়ে বাংলা ভাষা ও বাঙালীর জাতীয়তাবোধের বিকাশ রোধ করার জন্য চেষ্টা হচ্ছে। সরকারিভাবে সাম্প্রদায়িকতা প্রশ্রয় দেওয়া হয়। চাকুরির ক্ষেত্রে বৈষম্য নীতি রয়েছে। বাঙালী অপেক্ষা অবাঙালীদের বেশি চাকরি দিয়ে প্রাদেশিকতা জিইয়ে রাখা হচ্ছে। পুলিশ ও মিলিটারির দাপট বেড়েছে।

এই পরিস্থিতিতেই এসেছে ছাত্রদের ১১ দফা দাবি; ন্যাপের নির্বাচন বয়কট এবং তিনটি মূল দাবির সঙ্গে সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী পররাষ্ট্রনীতি ও স্বায়ত্তশাসনের দাবি। আওয়ামী লীগের ছয় দফা স্বায়ত্তশাসনের দাবি।

যে অভিজ্ঞতায় পূর্ববঙ্গে স্বায়ত্তশাসনের দাবি উঠেছে, সেই একই অভিজ্ঞতায় বেলুচ, সিন্ধি, পাখতুন প্রভৃতি জাতিগুলি এক ইউনিট থাকার বিরোধিতা করে স্বায়ত্তশাসনের কথা বলছে। এতদিন তাদের অধিকার বঞ্চিত করে জোর করে এক ইউনিটে রাখা হয়েছে। ওদের জাতীয় সত্তা অস্বীকার করা হয়েছে। বেলুচ, পাখতুন, সিন্ধিকে পশ্চিম পাকিস্তানীতে পরিণত করা হয়েছে। তাই পূর্ববঙ্গে এখন ছাত্রসমাজ পূর্ব পাকিস্তান শব্দটা উচ্চারণ করতে ঘৃণা বোধ করে। তেমনি পশ্চিম পাকিস্তানে নিজেদের জাতীয় পরিচয় প্রকাশের জন্য মানুষ অধীর। তার সঙ্গে রয়েছে অর্থনৈতিক সংকট ও ব্যক্তি-স্বাধীনতার অভাবের জন্য অসন্তোষ।

শ্রীরামচরিত-মানস

ভক্তকবি তুলসীদাস

অধ্যাপক শিবপ্রসাদ ভট্টাচার্য্য কর্তৃক বঙ্গানুবাদ

শ্রীরামচন্দ্রের বন্দনা-গানে ভারতবর্ষের বহু গুণী ও জ্ঞানীজন লেখনী ধারণ করিয়া আত্মোৎসর্গ করিয়াছেন। সেই সকল অমর লেখনীর প্রতিভা-নির্ঝরে ভারতবর্ষের মহাকাব্য পৃথিবীর সাহিত্যে স্বীয় বৈশিষ্ট্যে সমুজ্জ্বল। ভক্তকবি গোস্বামী তুলসীদাস তন্মধ্যে অন্যতম—যিনি সহজ সরল ভাষায় পতিতপাবন সীতা-রামের চরিত বর্ণনা করিয়াছেন সুমধুর সঙ্গীতের মাধ্যমে। তুলসীদাসের জীবনসর্বস্ব মহামানব শ্রীরামচন্দ্রের সেই বন্দনা-গানের সুললিত বাংলা অনুবাদ এই প্রথম—বসুমতী সাহিত্য মন্দিরের অপূর্ব কীর্তির নূতন এক পরিচয় এই শ্রীরামচরিত-মানস। বহু রঙীন চিত্রে সুশোভিত।

মূল্য—১ম খণ্ড তিন টাকা, ২য় খণ্ড তিন টাকা

বসুমতী প্রাইভেট লিমিটেড: ১৪৬ বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী স্ট্রীট, কলি-১২

আপনার কষ্টোপার্জিত সঞ্চয় রাখবার জন্য কোন ব্যাঙ্কটি ভাল তা সিদ্ধান্ত করবার আগে...

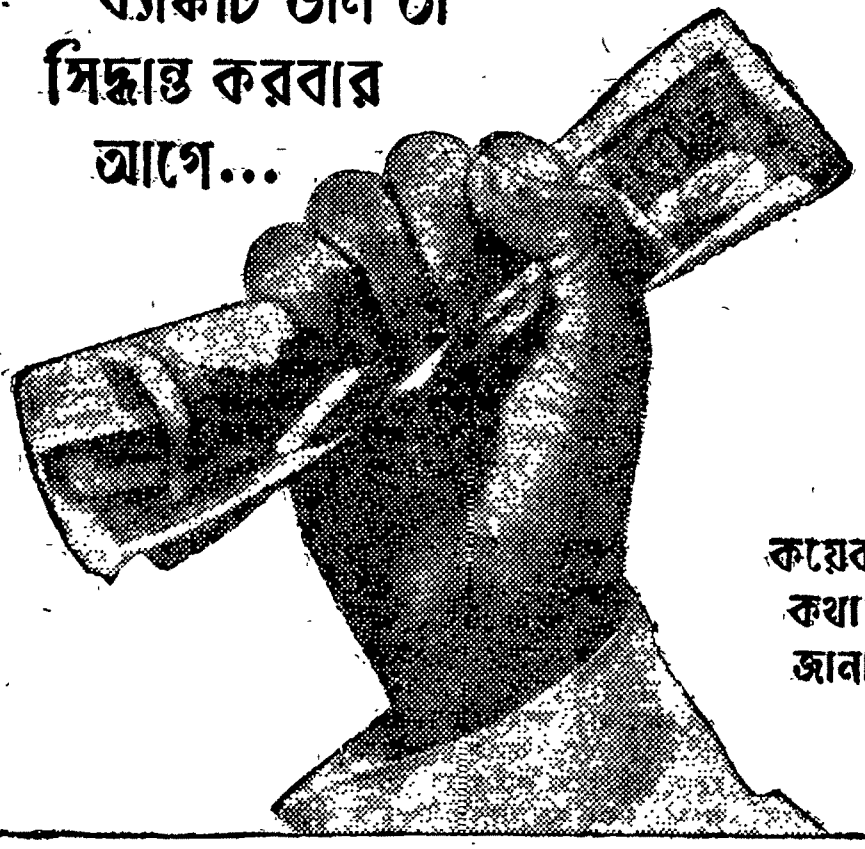

কয়েকটি খাঁটি কথা আপনার জানা দরকার

- স্টেট ব্যাঙ্ক আপনার সঞ্চয়ের জন্য সবচেয়ে বেশী নিরাপত্তা দেয়।
- দেশময় এর ১৫০০-রও বেশী অফিস আছে। আপনি যেখানেই যান, এদের কাছ থেকে সাহায্য পাবেন।
- দেশের মধ্যে এটি সবচেয়ে বড় ব্যাঙ্ক। ব্যাঙ্কের সমুদয় সহায়সম্বল তুলনাহীন শক্তি জোগায়।
- আপনারই মতন ১৮,০০,০০০-এরও বেশী লোক স্টেট ব্যাঙ্কে টাকা রেখেছেন।

সকলের সেবায় স্টেট ব্যাঙ্ক

SBI/66 BN

পূর্ববঙ্গের রাজনৈতিক দল

মওলানা ভাসানীর ন্যাপ যখন ডিসেম্বর মাসে আন্দোলন শুরু করেছিল তখন আর কোন রাজনৈতিক দল আন্দোলনে অংশ গ্রহণ করে নি। বিশেষ করে নির্বাচন বয়কটের প্রশ্নে সব দলগুলি অনেক দূরে ছিল, অন্যান্য দলগুলি আয়ুবের বিরুদ্ধে প্রার্থী দাঁড় করাবার কথাই চিন্তা করছিল। কেবলমাত্র ছয় দফা আওয়ামী লীগের সদস্যরা সমর্থন করছিল, কিন্তু দলগতভাবে কোন ঘোষণা ছিল না। আন্দোলন ব্যাপক হয়ে উঠলে রিকুইজিশনিস্ট ন্যাপ সহ কয়েকটি দল স্বতন্ত্রভাবে সংযুক্ত বিরোধী ফ্রন্ট গঠন করে এবং ১০ই ডিসেম্বর হরতাল আহবান করে। ভাসানীর ন্যাপ এই হরতাল সমর্থন করলেও সংযুক্ত বিরোধী ফ্রন্টে যোগদান করে না। না করার কারণ মওলানা ভাসানীর মতে সংযুক্ত বিরোধী ফ্রন্ট স্পষ্টভাবে সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী দাবি উপস্থিত করে নি এবং আয়ুবের শ্রেণী-চরিত্র সম্পর্কে স্পষ্ট কথা বলে নি। আরো পরে যখন ডেমোক্রেটিক একশন কমিটি গঠিত হয়েছে তাতেও ভাসানীর ন্যাপ যোগ দেয় নি। না দেবার উপরোক্ত একই কারণ ছাড়া—আরো আছে যে, এমন অনেক দল বা ব্যক্তি এই কমিটিতে রয়েছে যারা প্রগতিশীল নয় বরং বুর্জোয়া-সামন্তদের সঙ্গে আপোষ করে চলার পক্ষপাতী, এমন কি আন্দোলনকে আপোষের পথে টেনে নামাবার উদ্দেশেই এসেছে।

পাকিস্তানের রাজনৈতিক দলগুলির পরিচয় জানা থাকলে ভাসানীর এরূপ মানসিকতার কারণ কিছুটা বোঝা যেতে পারে। যদিও ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি মূলত একটি পার্টি কিন্তু বর্তমানে দুটি পার্টিতে পরিণত হয়েছে। ভাসানীর ন্যাপ ও রিকুইজিশনিস্ট ন্যাপ নামে এই দুই দল পরিচিত। অথবা চীনপন্থী ন্যাপ ও মস্কোপন্থী ন্যাপও বলা হয়। পূর্ববঙ্গে কমিউনিস্ট পার্টি বে-আইনী ঘোষিত। কমিউনিস্ট পার্টি প্রকাশ্যে না থাকলেও কমিউনিস্টরা জনগণের সঙ্গে থেকে কাজ করছেন। তাঁদের মধ্যে এমন অনেক নেতা ও কর্মী আছেন যাঁরা ২০ বছর পর্যন্ত আত্মগোপন করে কাজ করছেন। বর্তমানে আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলায় বিচারাধীন বন্দী মুজিবর রহমানের নেতৃত্বে গঠিত ছয় দফা আওয়ামী লীগ ভাসানীর নেতৃত্বে এই আন্দোলনকে গোড়া থেকে সমর্থন জানিয়েছে। রিকুইজিশনিস্ট ন্যাপ বা মস্কোপন্থী ন্যাপ প্রথমে নির্বাচন বয়কট সমর্থন করে নি; কিন্তু ১০ই ডিসেম্বর থেকে আন্দোলনে যোগ দিয়েছে। সম্প্রতি নির্বাচন বয়কটের দাবি সমর্থন করছে। পূর্ববঙ্গে মোটামুটি এই দলগুলিকে বলা হয় প্রগতিশীল দল, এদের গণতান্ত্রিক কার্যসূচী রয়েছে এবং গণসংগ্রাম এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে।

অন্যান্য দলগুলি : আওয়ামী লীগ (সালাম খান), পিপলস ডেমোক্রেটিক লীগ, কাউন্সিল মুসলিম লীগ, জমায়েতে ইসলাম, নিজামে ইসলাম প্রভৃতি দল আয়ুব-বিরোধী হলেও সাম্রাজ্যবাদ ও সামন্তবাদ বিরোধী নয়। প্রতিক্রিয়াশীলতার পোষাক। কোন-কোনটি উগ্র প্রতিক্রিয়াশীল।

গণবিক্ষোভ যখন শ্রেণীসংগ্রামের পথে যাচ্ছে তখন বিক্ষোভের গতি নিয়ন্ত্রণ করার জন্য এই দলগুলি আসরে নেমেছে। এদের সঙ্গে আসরে নেমেছেন মিলিটারি চিফ্ আসগর খাঁ, আজম খাঁ এবং প্রাক্তন মন্ত্রী ভুট্টো প্রমুখ। এঁরা গণতন্ত্রের বুলি নিয়ে উপস্থিত হলেও আসলে আয়ুবের সঙ্গে ক্ষমতার দ্বন্দ্বই এঁদের প্রধান কথা। তার সঙ্গে রয়েছে আন্দোলন যাতে কমিউনিস্টদের হাতে গিয়ে না পড়ে, এবং ভাসানীর মওলানার একচ্ছত্র নেতৃত্ব যাতে প্রতিষ্ঠিত হতে না পারে তার জন্য অধীরতা।

সাম্রাজ্যবাদের খেলা?

এঁদের আন্দোলনে নামাকে অনেকে মনে করছেন সাম্রাজ্যবাদের খেলা। জনগণকে ভাঁওতা দেবার ক্ষমতা আয়ুবের শেষ হয়েছে; বেসিক ডেমোক্রেসিও আর চলছে না। জনগণকে ভোটাধিকার যদি দিতে হয় তাহলে নির্বাচিত সরকার এমন লোক দিয়ে গঠিত হওয়া দরকার যারা সাম্রাজ্যবাদী শিবিরের স্বার্থরক্ষা করবে। আমেরিকা চেয়েছিল পূর্ব পাকিস্তানে ঘাঁটি করবে; ভারত-পাকিস্তানে যুদ্ধ কমিউনিস্ট বিরোধী ফ্রন্ট করবে; চীন বিরোধী পাক-ভারত ডিফেন্স গঠন করবে। এই ছিল আমেরিকার ওয়ার স্ট্রাটেজী। কিন্তু সাম্রাজ্যবাদী শিবিরের সহযোগী হয়েও আয়ুব চীনের সঙ্গে ব্যবসা-চুক্তিতে প্রবেশ করেছে, চীনের সাহায্যগ্রহণ করছে। সোভিয়েটের প্রতিও হাত বাড়াচ্ছে এবং সোভিয়েটও ধীরে ধীরে হাত বাড়াচ্ছে। আয়ুবের এই সমাজতান্ত্রিক দেশগুলির প্রতি প্রীতির (!) কারণ ভারতীয় বুর্জোয়াদের সঙ্গে দ্বন্দ্ব। এ ছাড়া আমেরিকার সাহায্যের সর্ত দিন দিন কড়া হওয়ায় এবং ভারতের দিকে আমেরিকার ঝোঁকটা বাড়ায় আয়ুব কিছুটা দর কষাকষির সুযোগ নিতে চেয়েছে। এই পরিস্থিতিতে মিলিটারী পোষাক ছাড়িয়ে সাদা পোষাকের মিলিটারি দিয়ে কাজ চালাবার মতলবে আমেরিকা সুযোগ সন্ধানে আছে মনে করা হচ্ছে। এই অবস্থা বুঝে প্রাক্তন মিলিটারীরা গণতন্ত্রী হয়েছেন। তাঁরা যে জনগণের স্বার্থরক্ষা করবেন এমন মনে করার কারণ নেই। শ্রেণীস্বার্থ যাঁদের কাছে জনস্বার্থের চেয়ে বড়। এ অবস্থায় মওলানা ভাসানী যদি এঁদের সঙ্গে এক পাতে বসতে না চান এবং সন্দেহ করেন যে, এঁরা আয়ুবের সঙ্গে আপোষ করার সুযোগ খুঁজছেন তা হলে দোষ দেওয়া যাবে কি?

বিভ্রান্ত করতে পারবে না

ইতিমধ্যে আয়ুব খান বিরোধী দলগুলির সঙ্গে মিলিত হবার আহবান জানিয়েছেন। বিরোধী দল বলতে বিশেষণ প্রয়োগ করে 'দায়িত্বশীল বিরোধী' দল বলেছেন। এই আহবানে রিকুইজিশনিস্ট ন্যাপ সহ অন্য পার্টিগুলি সাড়া দিলেও ভাসানীর মওলানা এবং তাঁর ন্যাপ স্বীকৃত হন নি। তিনি বলেছেন আগে মূল দাবি স্বীকার কর, তার পরে আলোচনায় বসব। আলোচনার নামে যাতে আন্দোলন ভেঙে দেওয়া না যায় তার প্রতি তিনি সতর্ক রয়েছেন। আসগর, আজম খাঁ এবং কয়েকটি দল মীমাংসার সূত্র আবিষ্কারের চেষ্টায় আয়ুবের সঙ্গে কথাবার্তা চালিয়েছেন গোপনে। এই সংবাদ প্রকাশিত হয়েছে। মওলানা ভাসানী এই পরিস্থিতিতে ছাত্রদের আহবান জানিয়েছেন ১১ দফা দাবি না মানা পর্যন্ত আন্দোলন যেন বন্ধ না হয়। ছাত্রসমাজ দৃঢ়প্রতিজ্ঞ, ১১ দফা দাবি আদায় না হওয়া পর্যন্ত তারা আন্দোলনকে আপোষের পথে নামতে দেবে না।

এই জনবিক্ষোভের আগুনে আয়ুবকে নতি স্বীকার করতেই হবে। সংগ্রামী জনগণের জয় অবশ্যই হবে। এই সংগ্রামের অভিজ্ঞতার আগুনে প্রতিক্রিয়াশীল-বিরোধী এক প্রগতির শক্তি জেগে উঠছে। ভাষা-আন্দোলনের আত্মদান যেমন বৃথা যায় নি, আজকের এই সংগ্রামের শহীদদের রক্তদান ব্যর্থ হবে না। ভাষা-আন্দোলনের সতের বছর পরে এক নতুন শক্তি জাগ্রত জনতাকে আমরা দেখতে পাচ্ছি।*

[* এই প্রবন্ধ রচনায় ঢাকা থেকে প্রকাশিত দৈনিক সংবাদ, সাপ্তাহিক জনতা এবং কলকাতার মাসিক নন্দন মাঘ সংখ্যা থেকে সাহায্য নেওয়া হয়েছে —লেখক।

বসন্ত আসে

বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

১৯৬৭ সালের ফেব্রুয়ারী বিদায় নিতে চাইছে। শীত তার রুদ্ধ বিষাক্ত দৃষ্টি নিয়ে তখনো আমাদের দরজায় দাঁড়িয়ে। সে চায় না, এই হতভাগা মার-খাওয়া বাংলা দেশে কোনোদিন বসন্তের ফুল ফুটুক। কিন্তু ফুল না ফুটলে বসন্তই বা আসবে কি করে। আর, বাংলা দেশ কি চিরদিন শুধু পড়ে পড়ে মারই খেতে জন্মেছে? ইতিহাস তো এমন কথা বলে নি।

১৯৬৭ সালের শীতশেষের ইতিহাস তাই রক্তচক্ষু স্পর্ধার বিরুদ্ধে বাংলার মানুষের রুখে দাঁড়ানোর ইতিহাস। দ্বিখণ্ডিত বাংলা দেশ একদিন তৎকালীন ভারতভাগ্যবিধাতাদের নির্দেশ মেনে নিয়েছিল এমন কথা ভেবে যে, ইংরেজরা তো এদেশ থেকে যাক, পরে ভাঙা বাংলার কপাল আবার জোড়া লাগবে। কিন্তু তারপর এই স্বাধীন রাজ্যের বিশ বছরের ইতিহাস শুধুই কণ্ঠনা আর গ্লানির কালিমায় কলঙ্কিত। পশ্চিম বাংলার মানুষ অতি অল্পদিনের মধ্যেই শাসকগোষ্ঠীকে চিনে নিয়েছিল; কিন্তু যে পৈশাচিক দুঃশাসন তাদের দু'পায়ে শিকল পরিয়ে, চোখে ঠুলি বেঁধে, অন্ধের মত নরকের দরজার দিকে ঠেলে দিচ্ছিল, তার বিরুদ্ধে সঙ্ঘবদ্ধ হওয়ার কোনো সুনির্দিষ্ট পথ তাদের জানা ছিল না। এই দুঃশাসনের কবল থেকে উদ্ধার পাওয়ার, সত্যিকারের স্বাধীন ও সুস্থ জীবনের মুখোমুখি হওয়ার যে রক্তাক্ত সংগ্রাম, যেন সেখান থেকে অনেক, অনেক দূরে তারা নিরাপদ আশ্রয় খুঁজছিল। যেন, বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের হাত থেকে মুক্ত হবার জন্য তারা যেটুকু রক্ত দিয়েছে, তার বেশি রক্ত আর তাদের শরীরে নেই, তারা ক্লান্ত। কিন্তু তথাপি অঘটন ঘটলো; যদিও রাইফেল হাতে কোনো সত্যিকারের লড়াই নয়, কিন্তু ভোটের যুদ্ধে তারা কংগ্রেসকে পরাজিত করলো। "এ লড়াই বাঁচার লড়াই, এ লড়াই জিততে হবে।" —এই ধ্বনিতে বাংলা দেশের আকাশ-বাতাস কিছুদিনের জন্যও কেঁপে উঠলো। বিশ বছরের বিভীষিকা মনে হলো এখন আর কোনো ভয় নয়, কেন না নরখাদক শত্রু এখন নিহত। কংগ্রেসবিরোধী নেতৃত্ব, যা এতদিন বিচ্ছিন্ন ও বিভক্ত, এবং কখনো বা আত্মহননের অভিশাপে এক উন্মাদ লক্ষ্যহীনতায় নিজেদের মধ্যেই কানামাছি খেলছিল, হঠাৎ যেন সামনে কোনো সত্যিকারের আলোর সন্ধান পেয়ে গেল। বাংলা দেশে কংগ্রেসকে হটিয়ে যুক্তফ্রন্টের সরকার প্রতিষ্ঠিত হলো। পুলিশী শাসন উঠে গেল। এই রাজ্যের শোষিত, শ্রমজীবী মানুষেরা এই প্রথম স্পর্ধার সঙ্গে এমন কথা উচ্চারণ করতে পারলো যে তাদেরও মানুষের মত বেঁচে থাকার অধিকার আছে, তাদের শ্রমের রক্ত মিলমালিক আর মজুতদারদের স্ফূর্তির চেয়ে অনেক অনেক বেশি দামী।

কিন্তু দিল্লীতে ভারতভাগ্যবিধাতারাও চুপ করে বসেছিলেন না; তাঁরা অন্ধকার গলি ও সুড়ঙ্গের মধ্য দিয়ে শ্বাপদের মতো তখন নিজেদের পথ খুঁজছেন, কোন্ পথ ধরে অগ্রসর হলে বাংলার জনপ্রিয় সরকারকে খতম করা যায়। এই পথে তাঁরা সঙ্গীও পেয়ে গেলেন। মজুতদার, কালোবাজারী, বাংলার পরাজিত কংগ্রেস এবং বহুরূপী সংবাদপত্রগুলি। কিন্তু এদের সহায়তায় যুক্তফ্রন্টকে এখানে-ওখানে কিছুটা আঘাত হানা যদিও সম্ভব হলো; প্রচণ্ডভাবে জখম করা গেল না। কিন্তু যুক্তফ্রন্টের মধ্যেই যে একটা বিরাট ফাটল ছিল, সেখানে সত্যিকারের বিষাক্ত সাপ আশ্রয়দাতাদের দুধকলা খেয়েই দিনে দিনে শশিকলার মতো বেড়ে উঠছিল, এ সংবাদও একদিন শত্রু-মিত্র উভয়পক্ষের কাছেই প্রচারিত হয়ে গেল। দেশের সাধারণ মানুষ কি চায়? তারা চায় স্বাধীনভাবে, সম্মানের সঙ্গে বেঁচে থাকতে আর দু'বেলা দু'মুঠো খেতে। যুক্তফ্রন্ট তাদের স্বাধীনতা ও সম্মান কিছুটা দিতে পেরেছিল সন্দেহ নেই; এমন কি সাম্প্রদায়িকতার যে বিষ শুধু পাকিস্তান নয়, স্বাধীন ভারতেরও অন্যতম অভিশাপ, সেই বিষ থেকে অন্তত বাংলা দেশের মানুষকে তারা মুক্ত ও

এখন কি সাঁতার কাটবে

শরৎসুনীল নন্দী

আমাদের দুঃখের দিন কি শেষ হল?
এখন কি সাঁতার কাটবে গোধূলির মাছ?

আমাদের সময় বড় বিষণ্ণতায় কাটছিল—
বৃক্ষ তার নিজের ছায়া দেখতে পাচ্ছিল না
কারণ আকাশে খুব মেঘ ছিল,
অথচ মেঘে বৃষ্টি ছিল না।

আমাদের বুকে অনেক কষ্ট জমে ছিল—
পাখি তার মাঠের গান ভুলে
অপ্রসন্ন চুপ ছিল—
কারণ গাছের পাতারা ঝরে গিয়েছিল,
অথচ কেউই মরে যায় নি।

আমাদের সেই দুঃখের দিন শেষ হয়ে
আমাদের সেই কষ্ট সেই দুঃসময় শেষ হয়ে
এখন কি বসন্ত শুরু হবে?
এখন কি মেঘের থেকে সূর্য নেমে এসে
নড়ে উঠবে পরিষ্কার জলের শরীরে
এবং সাঁতার কাটবে গোধূলির মাছ?

নির্মল করতে এগিয়ে এসেছিলো। কিন্তু অন্নের সমস্যা একই রকম রয়ে গেল; আর বেকার সমস্যা শুধু কেন্দ্রের বিরুদ্ধতার জন্যই নয়, নিজেদের আভ্যন্তরীণ ত্রুটির জন্যেও। স্বয়ং খাদ্যমন্ত্রীই যে গোপনে মজুতদার আর কালোবাজারীদের সঙ্গে হাত মিলিয়েছেন; চালের সংগ্রহে যুক্তফ্রন্টের যতটা তাড়া তাঁর যে সেই পরিমাণেই অনীহা এবং আপত্তি। কখন, কোন্ অন্ধকার গোপন পথে প্রফুল্ল ঘোষ-চ্যবন-ধরমবীর পশ্চিম বাংলাকে পুনরায় নরকের দিকে নিয়ে যাওয়ার ষড়যন্ত্রে মেতেছিলেন, তা ভবিষ্যৎ ঐতিহাসিকদের গবেষণার বিষয়। বাংলার মানুষ শুধু এই সত্যই অনুভব করলো যুক্তফ্রন্টের শাসনকালে চালের দাম হু-হু করে বাড়ছে এবং ফলে পেটের যন্ত্রণাও বাড়ছে। কিন্তু এই অনাহারও তারা সহ্য করলো, কেন না কংগ্রেস তাদের বন্ধু নয়, এবং যুক্তফ্রন্ট তাদের অনেক অক্ষমতা সত্ত্বেও এই রাজ্যের অসহনতী মানুষদের সুখ-দুঃখের অন্যতম অংশীদার। ত্রুটি যে কোথাও হয় নি, তা নয়, কিন্তু সে ত্রুটি কোথাও ইচ্ছাকৃত নয়, এজন্য যুক্তফ্রন্টের মন্ত্রী বা নেতাদের কোথাও কোন মুনাফা জোটে নি; সাধারণ মানুষের সঙ্গে তাদের ব্যবধান কোথাও রচিত হয় নি; তারাও দুর্ভিক্ষের অন্ন অপরের সঙ্গে ভাগ করে খেয়েছেন।

কিন্তু বাংলার মানুষ চ্যবন-ধরমবীরদের ফাঁদে পা না দিলেও, তাদেরই নির্বাচিত কয়েকজন ঘরের শত্রু বিভীষণ আবার বাংলার ভাগ্যকে কানাকড়ির দামে বিকিয়ে দিল। শুরু হলো প্রফুল্ল ঘোষের নারকীয় শাসনকাল, যার প্রথম চব্বিশ ঘণ্টা সময় না যেতেই এই রাজ্যের রাজধানীর রাস্তা মানুষের রক্তে লাল হয়ে গেল। সেদিন আহত মানুষের আর্তনাদ আর নরপশুদের তাণ্ডব উল্লাস একই সঙ্গে বাংলার মাটি এবং আকাশকে যেভাবে বিষিয়ে দিয়েছিল, তার তুলনা এই রাজ্যের দুশো বছরের ইতিহাসেও সহজে খুঁজে পাওয়া যাবে না।

তবু, বাংলার মানুষ তখন আরেক লড়াইয়ের স্বাদ পেয়েছে। প্রফুল্ল সেনের রাজত্বকালেই তারা পুলিশী হত্যাকাণ্ডের মুখোমুখি একাধিকবার বুক চিতিয়ে দিয়েছেঃ 'মারো! যত মারতে পারো!' এবারও তারা ভোটযুদ্ধের বাইরে এসে, বে-আইনী আইন ভাঙার লড়াইয়ে রাজপথে এগিয়ে এলোঃ এ লড়াই 'বাঁচার লড়াই!' প্রফুল্ল ঘোষও তাঁদের সমানে প্রহার করে চললেন, কেন না যুক্তফ্রন্ট মাথার ওপর না থাকায় তাঁর স্নেহের শান্তিরক্ষী পুলিশদের ক্ষমতাও এখন সীমাহীন, আর ইন্দিরা-মোরারজী-চ্যবনেরাও এই বিশ্রী, বে-আক্কেলে মুনোসধারী অমানুষটিকে সমানে বাহবা দিয়ে চলেছেন।

কিন্তু এবারেও শীতের শেষে বসন্ত আসার পালা। প্রফুল্ল ঘোষের রাজত্বও তাই ক্ষণিকের বিভীষিকা; রুখে দাঁড়ালেই তার শেষ। স্পীকার বিজয় বন্দ্যোপাধ্যায় উপলক্ষ মাত্র, অক্টোবরেই তিনি এই বিষফলের বিনাশ করেছেন। সমস্তটাই গণতন্ত্রের পথ ধরে হয়েছে; জানি না, এতে করে নরহন্তী প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষের কতখানি শিক্ষা হয়েছে। বাংলার মানুষ কিন্তু এতেই খুশি; কেন না, তারা সামনে বসন্তের আহ্বান শুনতে পাচ্ছে।

সেই আহ্বান হয়তো পশ্চিম বাংলায় আরেকবার কংগ্রেসের পরাজয়; যুক্তফ্রন্টের একক প্রচণ্ড সংখ্যাগরিষ্ঠতা। এবার আর প্রফুল্ল ঘোষদের মত বিভীষণ ব্যক্তিদের সঙ্গে একত্রে চলা নয়; আর দল ভেঙে ঘরের বিভীষণেরা যাবেনই বা কোথায়?

সমস্ত বাংলা দেশের আকাশ বসন্ত আসার আগেই আবিরে ভরে গেছে। যুক্তফ্রন্টের কাছে সমস্ত বাংলা দেশের অসীম প্রত্যাশা। পাঁচ টাকা কিলো দামে চাল খেয়ে আর বেকার সমস্যার কাঁটা বুকে বিঁধে থাকা সত্ত্বেও পশ্চিম বাংলার মানুষ আবার অজয় মুখার্জী-জ্যোতি বসুদের গলায় ফুলের মালা ছুঁড়ে দিয়েছে।

কিন্তু সত্যিই বসন্ত আসতে পারে কি? বাংলা কি দিল্লীর শাসন ও শোষণ থেকে এখন থেকেই নিজেকে নিরাপদ দূরত্বে রাখতে পারবে? কোন্ শক্তি দিয়ে সে তার নিজের ঘর বাঁধবে, যখন আইন আর মিলিটারীর জোরে দিল্লীর শাসনকর্তারা মুঘল সম্রাটদের মতই এখন পর্যন্ত গর্বিত; এবং যদিও তাঁদের মাথা কখনো নত হয়, সে শুধু সাম্রাজ্যবাদী ইয়াংকী প্রভুদের অথবা মুনাফার পাহাড় টাটা-বিড়লাদের কাছেই; ভোটের সংগ্রামে জয়ী কোনো রাজ্যের জনপ্রতিনিধিদের কাছে কখনই নয়।

ইতিহাস এই প্রশ্নের উত্তর দেবে। আমরা, যারা বাংলা দেশের সাধারণ বুদ্ধিজীবী মানুষ, যুক্তফ্রন্টের জয়লাভে শুধু এই কথাই উচ্চারণ করবো: বসন্ত এখনো আসে নি। আপনারা চেষ্টা করে দেখুন, সত্যিকারের ফুল ফোটাতে পারেন কি না। যদি পারেন, আমাদের সমস্ত রকম শুভেচ্ছা ও সমর্থন আপনাদের জন্যই তোলা রইলো।

মীর্জা গালিব

—অমিয়কুমার হাটি—

কালাতীত কবি অনির্বাণ প্রদীপ। শতাব্দী দীর্ঘ দুরূহ পদ পরিক্রমায় তারই দীপ্র আলোকে পথ দেখে। সকল কালের সকল দেশের সকল মানুষের তিনি আত্মার আত্মীয়। লোকান্তরিত হবার একশো বছর পর নতুন করে ভারতের এক খ্যাত-কীর্তি কবিসন্তানকে স্মরণ করার মধ্যে দিয়ে জাতি তার সুমহান অতীত ঐতিহ্যকে নৈবেদ্য নিবেদন করছে। মহান উর্দু কবি মীর্জা গালিব জিন্দাবাদ।

এক সম্ভ্রান্ত তুর্কোমান পরিবারে আসাদ উল্লা খান গালিব ১৭৯৭ সালের ২৭শে ডিসেম্বর আগ্রা নগরীতে জন্মগ্রহণ করেন। মধ্য এশিয়ার কোন এক স্থান থেকে তাঁর পিতামহ ভাগ্যান্বেষণে ভারতবর্ষে এসেছিলেন। লাহোরের শাসক মৈন-উল-মুল্ক বা মীর মান্নুর অধীনে প্রথমে তিনি চাকুরী গ্রহণ করেন। সেখান থেকে পরে দিল্লীতে—দ্বিতীয় শাহ আলমের দরবারে রাজকীয় কার্যে নিযুক্ত হন। কিছুদিন পর আগ্রায় বদলি হয়ে আসেন। তাঁর বড় ছেলে আব্দুল্লা বেগ খান-এর সঙ্গে বিয়ে দেন সেখানকার অবসরপ্রাপ্ত এক সেনানায়কের কন্যার। আসাদ উল্লা খান গালিব আব্দুল্লা বেগ খানের জ্যেষ্ঠপুত্র।

গালিব কৈশোরেই দিল্লীতে লোহারু রাজবংশের এক কন্যার পাণিগ্রহণ করলেন। লোহারুর নবাব আহম্মদ বক্স খান ছিলেন একজন বড়দরের কবি—দিল্লীর সাংস্কৃতিক সমাজে তাঁর খ্যাতি ও প্রতিপত্তি ছিল। তাঁরই এক ভাই, ইলাহি বক্স খান মারুফ হলেন মীর্জা গালিবের শ্বশুর। এঁদের জন্যে তিনিও দিল্লীর সারস্বত সমাজে আসন করে নিলেন, পরিচিত হলেন সমসাময়িক ফারসী ও উর্দু কবিদের সঙ্গে, নিজের প্রতিভার দীপ্তিতে দেদীপ্যমান হয়ে উঠলেন।

গালিব বিয়ে করে আগ্রা থেকে দিল্লী যান ১৮১২ খৃস্টাব্দে। এর আগে, ১৮১০ খৃস্টাব্দে ইরান থেকে আব্দুল সামাদ নামে এক পণ্ডিত পর্যটক হিসাবে ভারত ভ্রমণে এসে আগ্রায় তাঁদেরই পরিবারে আতিথ্য গ্রহণ করেন। গালিব এঁরই কাছে তাঁর কৈশোরেই ফারসী এবং আরবী শেখার সুযোগ পান। সন্দেহ নেই, আব্দুল সামাদ তাঁর চেতনা ও কল্পনাকে উদ্বুদ্ধ করেছিলেন।

কিশোর বয়সেই ফারসী ও উর্দুতে সাহিত্য সাধনার সূত্রপাত। দিল্লীতে এসে "আসাদ" এই ছদ্মনামে তিনি লিখতে শুরু করেন। ফারসী ছিল রাজদরবারের আশ্রিত কল্পনার ঐশ্বর্যে প্রাণবন্ত। এই সময় তাঁর কবিতায় কোন কোন ফারসী কবির প্রভাব দেখা যায়। এর মধ্যে বিশেষ করে উল্লেখযোগ্য বিখ্যাত ফারসী কবি, আওরঙ্গজেবের সমসাময়িক বেডিল-এর। ইনি ফারসী কাব্যে নতুন ধারার সূত্রপাত করেছিলেন।

ফারসী ভাষায় কাব্য রচনা করলেও উর্দু কাব্য-সাহিত্যেই তিনি সমধিক স্মরণীয়। সর্বযুগের সর্বকালের উর্দু কবিদের মধ্যে তিনি অন্যতম শ্রেষ্ঠ আসন পাবেন। পৃথিবীর আরো অনেকগুলি

মীর্জা গালিব

দেশ ভারতের এই প্রখ্যাত কবির স্মরণ-উদ্দেশ্যে শ্রদ্ধা নিবেদন করছে আজ। উর্দু ভাষাকে তিনি নতুন করে তৈরি করেছিলেন। উর্দু ছিল সেকালের বিকাশোন্মুখ ভাষা। ফারসী সাহিত্যের মতো ঐশ্বর্যশালী সে ছিল না। মীর্জা গালিব এক-কথায় উর্দু ভাষায় আনলেন যুগান্তর। গড়ে তুললেন নতুন বাগ্‌বিধি, শব্দশৈলী, শব্দভাণ্ডার। দিলেন গতি, প্রাণ। সাবলীল স্বচ্ছন্দ হয়ে উঠল সে ভাষা। তাঁর আবেগময় কাব্য জনজীবনের সঙ্গে নতুন যোগসূত্র গড়ে তুলল। গালিব তাঁর কাব্যে আবহমান কালের প্রচলিত ঐতিহ্যের ঊর্ধ্বে উঠলেন। ফারসী থেকে উর্দু পেয়েছিল প্রেম, সুরা আর অতীন্দ্রিয়বাদ। তাঁর পূর্বগামী উর্দু কবিদের অন্ধ অনুকরণ না করে নতুনত্ব আনলেন। গালিব জীবনের অন্য বাস্তব অবস্থাগুলি, যুগের বেদনা-যন্ত্রণা—তাঁর অমর কাব্যে রূপায়িত করলেন। এইভাবে যে নতুন সংস্কারের বন্যা আনলেন, তারই ঐতিহ্য বহন করলেন তাঁর উত্তরসূরী আজাদ, হালি, ইকবাল প্রমুখ।

গালিবের ভাগ্যে যশোলাভ একদিনেই হয় নি। তিনি ছিলেন এমন এক কবি, যিনি নিজেকে নিত্য নতুন করে গড়ে তোলবার সাধনা করতে পারতেন। উর্দু কবিদের সাহিত্যের মজলিশ মুশায়েরাতে তাঁর বন্ধু ও শত্রুরাও তাঁর কাব্য সম্বন্ধে খোলাখুলি সমালোচনা করেছেন। এতে তিনি মুষড়ে পড়েন নি—সেই সমালোচনা থেকে শিক্ষা গ্রহণ করেছেন, কাব্যের ত্রুটিগুলি দূর করবার জন্যে যত্নবান হয়েছেন, নতুন পথে চলবার চেষ্টা করেছেন।

এই সময়ে দিল্লীর সিংহাসনে ছিলেন শেষ মুঘল সম্রাট বাহাদুর শাহ। জাফর ছদ্মনামে তিনিও কবিতা লিখবেন। তিনিও বড়দরের কবি ছিলেন। মহম্মদ ইব্রাহিম জাউক ছিলেন তাঁর কাব্যগুরু। ইনি মারা যাবার পর মীর্জা গালিবই মুঘল রাজসভার সভাকবির পদ অলঙ্কৃত করেন। তাঁর আত্মীয়ের কাছ থেকে বার্ষিক ৭৫০ টাকা বার্ষিক বরাদ্দ ছাড়া আর ছিল বাহাদুর শাহ প্রদত্ত বৃত্তি বার্ষিক ৬০০ টাকা।

১৮৫৭ খৃস্টাব্দে ইংরাজ সাম্রাজ্যবাদের

বিরুদ্ধে ভারতের প্রথম স্বাধীনতা সংগ্রাম ব্যর্থ হল। শেষ পর্যন্ত বাহাদুর শাহ রেঙ্গুনে বিতাড়িত হলেন। গালিব এই সংগ্রামে অন্তত কোন সক্রিয় ভূমিকা নেন নি। কিন্তু মাতৃভূমির দুর্দশা তাঁর অন্তরে নিদারুণ আলোড়ন এনেছিল। যেহেতু তিনি ছিলেন বাহাদুর শাহের কাব্যগুরু, সেইহেতু ইংরাজ দস্যুরা তাঁকে সন্দেহ করল। তাঁর সমস্ত বৃত্তি বন্ধ করে দেওয়া হল। নিদারুণ অর্থকষ্টে পড়লেন কবি। ইতিমধ্যে তাঁর এ দুর্দশা দেখে রামপুরের নবাব ইউসুফ আলি খান ১৮৫৯ সালে কবিকে নিজের গুরুপদে বরণ করলেন এবং বার্ষিক ১২০০ টাকা বৃত্তি দেবার ব্যবস্থা করলেন। এরপর অনেক চেষ্টায় ১৮৬০ সালে আবার তিনি বৃত্তি পেতে আরম্ভ করেন। ১৮৬৯ সালের ১৫ই ফেব্রুয়ারী মৃত্যুকাল পর্যন্ত তিনি ঐ বৃত্তি ভোগ করেছেন।

মহান কবিরা জীবন ও যুগের যন্ত্রণায় আন্দোলিত হন। গালিবও এর থেকে মুক্ত ছিলেন না।

স্বল্পতম কথায় গভীরতম ভাবপ্রকাশে অনন্যসাধারণ কৃতিত্ব দেখিয়েছেন উর্দু কবি গালিব। গভীর জীবনবোধে উদ্বুদ্ধ তাঁর কবিতা আমাদের মনের গোপন প্রদেশে রেখাপাত করে। প্রেমের কবিতায় বিরহের শ্লোকেই তাঁর শ্রেষ্ঠত্ব। তিনি বলছেন,

"কার কাছে বলি বিরহ রজনী
কত জ্বালাময়!
মরণ তো আসে একবার,
তাকে ভাল মনে হয়!"

অন্যত্র—

"প্রেমের বাঁচায় প্রেমের মরায়
তফাৎ কোথায়!"

প্রেমিকাকে পাবার কোন আশাই যদি থাকত, তবে সেই আনন্দেই আত্মহারা হয়ে তিনি মরে যেতেন। মানসীকে পাবেন না, এই বোধই কবিকে বাঁচিয়ে রেখেছে—

"মানসী, মিলন আশায় বাঁচছি
এই ভুল তুমি ভেবো না আর
আশা যদি কোন থাকত আমার,
মরেই যেতাম খুশিতে তার।"

নিচের কবিতাটিতে তাঁর নিজের জীবনের অসীম বেদনা রূপায়িত হয়েছে। সম্ভবত কবিতাটি ১৮৫৭ খৃস্টাব্দের স্বাধীনতা সংগ্রামের পরাজয়ের পর দিল্লীকে নিয়ে লেখা—সেই দিল্লী যাকে কবি অত্যন্ত ভালবাসতেন, যার গৌরব হল অস্তমিত—। একটি মাত্র আলোকবর্তিকা নিভে গেছে, এই রূপকের ব্যঞ্জনা অনবদ্য :

হৃদয় বাসনা রাজ্যে তোমরা
নতুন আগন্তুক,
সুর ও সুরার মধ্যে ঝাঁপিয়ে পড়ার
আগে থামো একবার—
তাকাও আমার দিকে :
সঙ্কেতগুলো দেখতে পাচ্ছ, আর—
শোন বলি আমি : কান দিয়ে যারা
সাবধানবাণী শুনছ—
অদূরবর্তী পতাকাবাহীরা
শত্রু হয়েছে বিশ্বাস-চেতনার
ভারসাম্য ও সমস্ত বোধ করেছে
চুরি।
সেদিন রাত্রে দেখেছি আমরা
পুষ্পভূষিত মেঝের প্রতিটি কোণ।
পাত্র মধ্যে আনন্দ আর শব্দ গানের—
চোখ ও কানের সীমায় এনেছে
স্বর্গ ঠিকই,
এলো তারপর প্রভাতবেলা—
সঙ্গী ও সুর লুণ্ঠিত হ'ল
আনন্দ রাত—ফুরালো তাও—
নিঃশেষে পুড়ে নিভে বর্তিকা—
জ্বলছিল যেই একটি আলো—
এসব চিন্তা শূন্য হতেই
বিদ্ধ করেছে আমার মন।

قطعہ

اے تازہ وارد انِ بساطِ ہوائے دل
زنہار! اگر تمہیں ہوسِ ناؤ نوش ہے
دیکھو مجھے جو دیدۂ عبرت نگاہ ہو
میری سنو، جو گوشۂ نصیحت نیوش ہے
ساقی بجلوۂ دشمنِ ایمان و آگہی
مطرب، بہ نغمہ، رہزنِ تمکین و ہوش ہے
یا شب کو دیکھتے تھے، کہ ہر گوشۂ بساط
دامانِ باغباں و کفِ گل فروش ہے
لطفِ خرامِ ساقی و ذوقِ صدائے چنگ
یہ جنتِ نگاہ، وہ فردوسِ گوش ہے
یا صبح دم جو دیکھیے آکر، تو بزم میں
نہ وہ سرور و سوز نہ جوش و خروش ہے
داغِ فراقِ صحبتِ شب کی جلی ہوئی
اک شمع رہ گئی ہے سو وہ بھی خموش ہے
آتے ہیں غیب سے یہ مضامیں خیال میں
غالبؔ صریرِ خامہ نوائے سروش ہے

মীর্জা গালিবের মুদ্রিত একটি কবিতার প্রতিলিপি

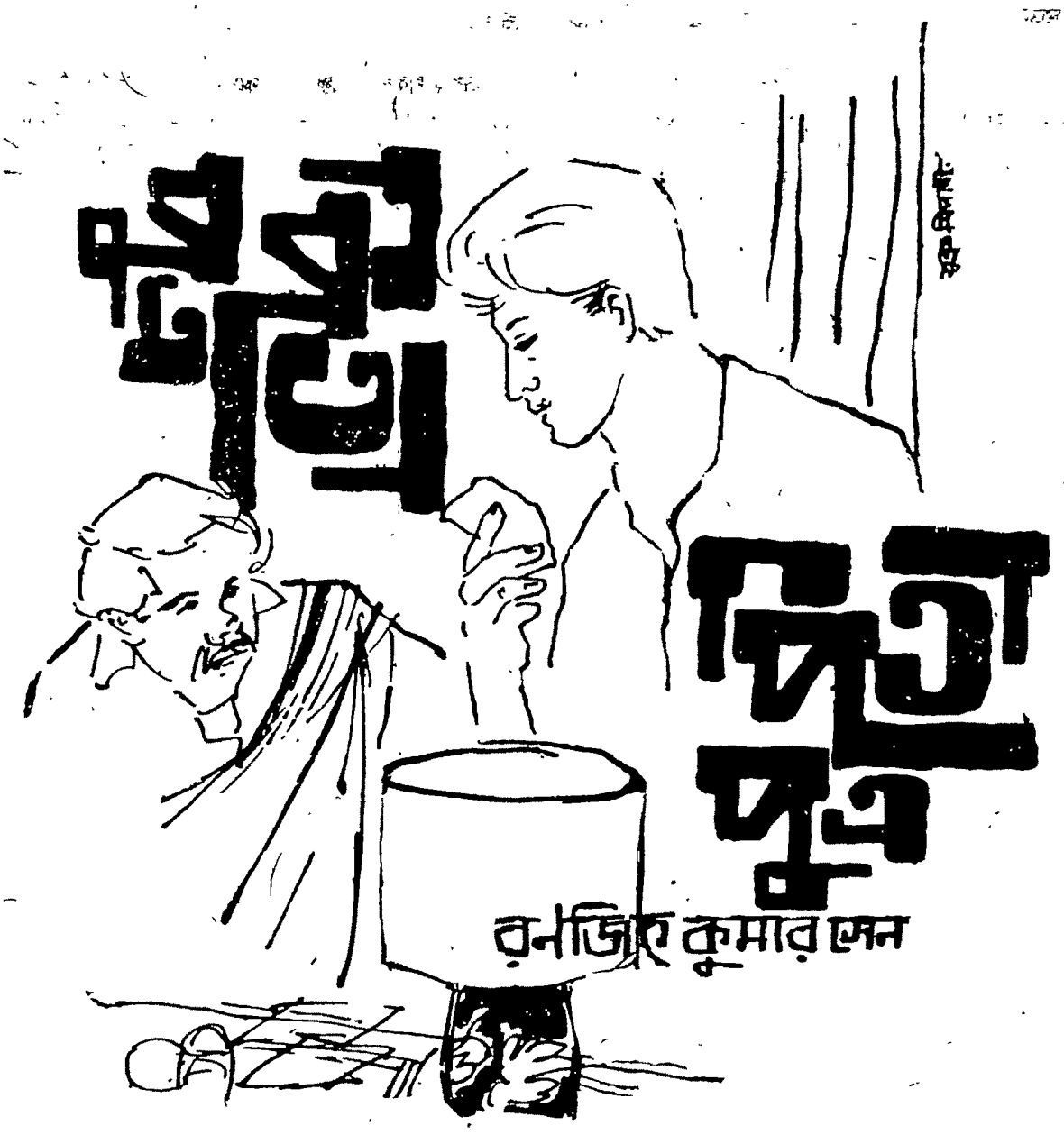

ভূদেববাবুর করকোষ্ঠী গণনা করতে বসে রাজজ্যোতিষীর চোখ দুটো হঠাৎ স্থির হয়ে গেল। আগামী চৈত্রে মঙ্গলের ঘরে শনি আসার ফলে ভূদেববাবুর জীবনসংশয় ঘটতে পারে। হাতের রেখায় যা বলে, তাতে ঘটাই স্বাভাবিক। নিজের অলক্ষ্যেই রাজজ্যোতিষীর চোখ দুটো একবার কুঞ্চিত হয়ে এলো। তাঁর গণনার অভ্রান্ততা সর্বজনস্বীকৃত। অতএব—

ভূদেববাবু প্রশ্ন করলেন : 'কি দেখলেন? দোহাই আপনার—যেন রেখে-ঢেকে কিছু বলবেন না। এই ভাদ্রে আমার পঁয়ষট্টি পূর্ণ হলো। এখন আর জীবনের উপর কোনো মোহ নেই; যত সত্বর সম্ভব সংসারের মায়া কাটিয়ে যেতে পারলেই ভালো।'

আর একবার চোখ কোঁচকালেন রাজজ্যোতিষী, তারপর বললেন : 'সারা জীবন যথেষ্ট তো ভোগ করলেন, আর কেন? এবারে বিষয়সম্পত্তি ছেলেদের নামে উইল করে দিয়ে কর্তব্য-মুক্ত হন। সামনের চৈত্রটা খুব ভালো নয়; আপনাকে একটি গ্রহশান্তি কবচ ধারণ করতে হবে, সেই সঙ্গে দেবার্চনায় কিছু দান-ধ্যান।'

ভূদেববাবু বললেন : 'আবার ওসব কেন? বললুম তো, বাঁচবার জন্যে আমার আর কোনো মোহ নেই। শুধু আনুমানিক সময়টা বলে দিন, সেইমতো তৈরি হই।'

—'তৈরি তো সব মানুষকেই হতে হবে, কিন্তু সেই তো সব নয়। তার পরেও আছে।' থেমে রাজজ্যোতিষী বললেন : 'ধরুন, ভগবান না করুন, হঠাৎ পঙ্গু হয়ে শয্যা নিলেন, কিম্বা এরকম অন্য কিছু। এই সব বিপর্যয় থেকে মুক্ত হতেও যে পুজো-আর্চা আর কবচ চাই।'

ভূদেববাবু এবারে আর দ্বিরুক্তি না করে রাজজ্যোতিষীর মুখের দিকে নীরবে বার্ধক্যপীড়িত চোখ দুটি তুলে ধরলেন।

এবারে বিদায় নিয়ে উঠতে উঠতে রাজজ্যোতিষী বললেন : 'জন্ম-মৃত্যুর উপর মানুষের হাত নেই। কিন্তু এ্যাস্ট্রনমি ও এ্যাস্ট্রলজি গণনার ব্যাপার। যদি দেখা যায়—বিপর্যয় আসতে পারে, তার জন্যে প্রত্যেককেই সতর্ক থাকতে হবে। সামনের চৈত্র-বৈশাখ কেটে গেলে আমার আর কিছু বলবার থাকবে না।

সময়টা আপনার মতো অনেকের পক্ষেই খুব খারাপ।'

এবারে ভূদেববাবুর মেজো ছেলে সুদেব তাঁকে বড় রাস্তা পর্যন্ত গিয়ে এগিয়ে দিয়ে এলো। আসলে সে-ই উদ্যোগ করে রাজজ্যোতিষী ভৈরবপ্রসাদ জ্যোতিষার্ণবকে খবর দিয়েছিল। পৈতৃক বিষয়সম্পত্তি সম্পর্কে সুদেব ইদানীং কিছু স্বার্থচিন্তার মানুষ হয়ে উঠেছিল। সংসারে তারা পাঁচ ভাই তিন বোন। বাবার হাত থেকে যদি সময়মতো সম্পত্তির একটা বড় অংশ সে না পায়, তবে ভবিষ্যতে এতগুলো ভাই-বোনের গ্রাস থেকে নিজের ইচ্ছেমতো ভাগ পাওয়া তার পক্ষে সম্ভব হবে না। এই উদ্দেশ্য নিয়েই কিছুকাল ধরে সে তার অগ্রজ বাসুদেব এবং অনুজ মহাদেব ও জয়দেবকে প্ররোচিত করছিল। কনিষ্ঠ সৌরভ নিতান্তই নাবালক বলে তাকে আর আলোচনায় টানে নি। অবিবাহিতদের মধ্যে জয়দেব ও সৌরভ। তিনটি বোন পূর্বেই পাত্রস্থ হয়েছিল। তিন বৌয়ের সংসারে ভূদেববাবু এখন একা। সংসারে তিন বৌয়েরই কিছু-না-কিছু দাপট আছে, কারণ তাদের শ্বশ্রূমাতা অর্থাৎ ভূদেববাবুর স্ত্রী সংসার থেকে গত হয়েছেন কমদিন হলো নয়। সেই থেকে ভূদেববাবু মোটামুটি পুত্র ও পুত্রবধূদের হাতের ক্রীড়নক। অথচ সারা জীবনে পিতৃধন এবং স্ব-ধন মিলিয়ে যে সম্পত্তি তিনি গড়ে তুলেছেন, তার তুলনা নেই। ইদানীং মাঝে মাঝেই তিনি অসুস্থ হয়ে পড়ে প্রমাদ গণছিলেন—ভবিষ্যতে এই সম্পত্তির কি হবে?

হবে ভাগ, এবং কালবিলম্ব না করে যত সত্বর হয়, ততই ভালো। এই কথাটা ভাইদের মনে স্পষ্ট ঢুকিয়ে দিয়েছিল সুদেব। কারণ পিতৃসম্পত্তি এবং নিজের অনিশ্চিত ভবিষ্যৎ সম্পর্কে সে-ই অধিক চিন্তিত।

বাসুদেব বললো : 'এ তুই এখনই কেমন করে দাবি করতে পারছিস? আর বাবাই বা তাতে কি মনে করবেন?'

—'কিছু মনে করবার নেই।' সুদেব বললো : 'বিষয় ভাগ করে দিলে বাবা বরং চিন্তারোগ থেকে মুক্ত হয়ে কিছুটা সুস্থ থাকবেন। তা ছাড়া যতদিন তিনি বেঁচে থাকবেন, ততদিন আমরাই তো বাবার সেবা-শুশ্রূষা করবো!'

বাসুদেবের অন্তত চক্ষুলজ্জা বলে একটা পদার্থ আছে, তাই কথাটা শুনে সে আমতা আমতা করতে লাগলো। কিন্তু রাজজ্যোতিষী যখন ভূদেববাবুর কররেখা বিচার করে বিধান দিয়ে উঠে গেলেন, তখন বাসুদেবই নিজে থেকে উপযাচক হয়ে বললো : 'উকিল ডেকে বাবাকে তাহলে এবারে সম্পত্তি ভাগের কথাটা বল্।'

একসময় সুদেব গিয়ে বাবাকে সেই প্রস্তাবই করলো। বললো : 'রাজজ্যোতিষী কথাটা মিথ্যা বলেন নি। আপনি যেভাবে অনবরত ভুগছেন, তাতে সময় থাকতে থাকতে বিষয়সম্পত্তি আমাদের নামে লিখে দিলে ভালো হয়; আমরাও আপনার বর্তমানে তা ভালোভাবে বুঝে নিতে পারি।'

ভূদেববাবু চিরকালের বিচক্ষণ মানুষ। বয়স হলেও সেই বিচক্ষণতা এখনও লুপ্ত হয় নি। সুদেবের প্রস্তাব শুনে মনে মনে তিনি একবার মৃত স্ত্রীকে স্মরণ করলেন, তারপর বললেন : 'বৌমার কি ইচ্ছা? না—তার ইচ্ছাটাই তোর মুখ দিয়ে ব্যক্ত হচ্ছে? তা—যাই হোক্, তোর ভাইদের একবার ডাক, যদি সকলেই তোরা চাস তো বিষয় ভাগ করতে আমার আর কতক্ষণ! বুঝতেই পারছি—আমার সময় ফুরিয়ে এসেছে। অতএব—'

অনেক ভেবেচিন্তে ছেলেদের মধ্যে সমান অংশে যাবতীয় বিষয় ভাগ করে দিলেন ভূদেববাবু। মেয়েরা এই ভাগাভাগিতে এলো না। তারা চিঠি দিয়ে জানিয়ে দিল—এতে তাদের কোনো লোভ নেই। ছোট ছেলে সৌরভের ব্যাপারেও তাই হলো। নাবালক বলে এ সব বিষয় সে কিছু বোঝে না। ভূদেববাবু তাই বললেন : 'ওকে আর এই নিয়ে মাথা খাওয়া দিয়ে দরকার নেই। আমার অবর্তমানে ওর ভাবনা তোরা চার ভাই ভাবিস, তা' হলেই হবে।'

কথাটা মন্দ নয়। এতো সম্পত্তির অংশটা আপাতত বাড়তিই থাকছে। সুদেব তাই সঙ্গে সঙ্গেই রাজী হয়ে বললো : 'আমরা থাকতে সৌরভের আবার আলাদা ভাগের দরকার কি! ও যেমন লেখাপড়া করছে, তেমনি করুক।'

শুনে মনে মনে একবার হাসলেন ভূদেববাবু। সেই সঙ্গে অলক্ষ্যে বোধ করি একবার ভাগ্যবিধাতাও হাসলেন। কত বড় মন নিয়ে কত পরিশ্রম করে কী বিপুল সম্পত্তি করেছেন জীবনে ভূদেববাবু, আর তাঁর ছেলেরা কত ছোট অন্তঃকরণের মানুষ হয়েছে! তাদের শিক্ষার কোনো ত্রুটি রাখেন নি তিনি, কিন্তু আজ তিনি অন্তর্দৃষ্টি প্রসারিত করে স্পষ্ট দেখতে পেলেন—ছেলেরা শুধু পুঁথি পড়েই পাশ করেছে, মানুষ হয় নি একটিও। ভবিষ্যতে সৌরভও হয়তো তার দাদাদের মতই গড়ে উঠবে! এই বয়সে এই জরাজীর্ণ দেহে সে সম্পর্কে নতুন করে কিছু করবার নেই ভূদেববাবুর। সৌরভ বড় হয়ে যখন বুঝতে শিখবে—তার বাবা তার ভাগে কিছু রেখে যান নি, তখন বাবাকেই কি ক্ষমার চোখে দেখতে পারবে সৌরভ? তখন যে পরলোকে প্রেতজীবনযাপন করেও শান্তি পাবেন না তিনি!

ভাবতে ভাবতে মাথাটা কিরকম গরম হয়ে উঠেছিল ভূদেববাবুর। নিজের অলক্ষ্যেই সৌরভকে একবার কাছে ডাকলেন তিনি। কনিষ্ঠ সন্তান। একরত্তি ছেলেকে স্বামীর কোলে ফেলে রেখে চোখ বুজে সংসার থেকে একদিন চলে গেলেন স্ত্রী বিভাবতী। সেই থেকে সৌরভ মাতৃহীন।

বাবার ডাকে একসময় কাছে এসে দাঁড়ালো সে।

ভূদেববাবু বললেন : 'আয়, দু'দণ্ড বস এসে আমার কাছে।'

সৌরভ তা-ই করলো। মোটামুটি বাবার কাছাকাছি থাকতে পারলে সে খুশি। এত খুশি সংসারে সে আর কিছুতে হয় না।

একসময় ভূদেববাবু জিজ্ঞেস করলেন : 'বড় হয়ে তুই কী হতে চাস বাবা?'

গভীর কিছু না ভেবে শান্তকণ্ঠেই সৌরভ বললো : 'আমি হবো ভ্রাম্যমাণ, দেশ-বিদেশ শুধু ঘুরে ঘুরে বেড়াবো। কত দেখবো, কত শিখবো, কী আনন্দ হবে!'

ভূদেববাবু বললেন : 'সত্যিই আনন্দ হবে; তাই বেড়াস বাবা।'

একসময় তিনি নিজেও চেয়েছিলেন সারা দুনিয়া ঘুরে বেড়াতে। কিন্তু পারেন নি। যতবার বেরোতে চেয়েছেন, ততবারই ব্যবসার জালে অতিমাত্রায় জড়িয়ে পড়েছেন। তাঁর সেদিনের আকাঙ্ক্ষা নিয়ে যদি কোনোদিন দৃপ্তপদে এগোতে পারে সৌরভ, তবে তৃপ্তি পাবেন বৈকি ভূদেববাবু? কিন্তু ভ্রাম্যমাণেরও তো অর্থের প্রয়োজন। সে অর্থ আসবে কোত্থেকে সৌরভের?

একটুকাল চুপ করে থেকে ছেলেকে আদরের স্পর্শ বুলিয়ে দিতে দিতে ভূদেববাবু বললেন : 'যা খেলতে যা।'

সৌরভ আর অপেক্ষা না করে ছুটে খেলতে বেরিয়ে গেল।

তার দায়িত্ব তার দাদাদের উপর বর্তালেও নিজের দায়িত্ব সম্পর্কে নিশ্চেষ্ট থাকতে পারলেন না ভূদেববাবু। তাঁর জীবিতকাল পর্যন্ত নিজের হাতখরচা ও সৌরভের পড়া খরচা বাবদ মাসিক মাত্র দু' হাজার টাকা বরাদ্দ রেখেছিলেন তিনি। ভেবে দেখলেন—এ টাকাটা পুরো ব্যয় হবে না। এ থেকে কমপক্ষে এক হাজার টাকা প্রতি মাসে তিনি সৌরভের নামে ব্যাঙ্কে ফিক্সড্ ডিপোজিট করে

নব্য বিকশিত গোলাপের মত সুন্দর আনন ও
কুসুম কোমল
পাপড়ি পেলব তনু

সাধনা বিউটি ক্রীম-এর
এইতো সবচেয়ে বড় অবদান।
নিজেদের সৌন্দর্য্য সম্পর্কে
সচেতন আধুনিকারা তাই
এর প্রশংসায় মুখর।

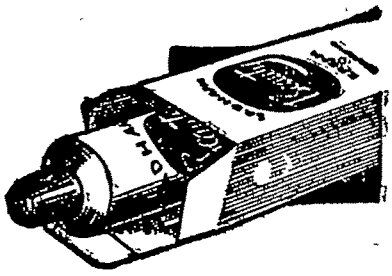

সাধনা
বিউটি
ক্রীম

অপরিহার্য
অতি আধুনিক অবশ্য

সাধনা ঔষধালয়-মকা কলিকাতা-৩৯

রাখতে পারেন। তাতে ভবিষ্যতে দাঁড়াবার পক্ষে সৌরভের সুবিধা হবে।

তাই করলেন তিনি। ছেলেদের কাছে এবারে সেবা-শুশ্রূষা বেড়ে গেল তাঁর। বিশেষ করে সুদেব ও সুদেবের স্ত্রী কী করবে-না-করবে, বুঝে উঠতে পারলো না। নিজেদের ভাগ হাতে পেয়ে বাসুদেব, জয়দেব ও মহাদেবও বাবার পরিচর্যায় দ্বিগুণ মন দিল। দেখে শুনে মনে মনে আর একবার হাসলেন ভূদেববাবু।

ইতিমধ্যে দিন কয়েকের জন্যে বড় মেয়ে রমলা এসে বাবার কাছে থেকে গেল। বললো : 'এখনই তোমার এমন সম্পত্তি ভাগের কী ঘটা পড়েছিল, বুঝতে পারলুম না। এমন কিছু তোমার বয়স হয় নি যে এখনই তুমি সংসার ছেড়ে যাবার আশঙ্কা করবে। দাদু নব্বই বছর অবধি বেঁচেছিলেন, তুমিও না হোক্ আশি বছর অবধি তো বাঁচবে! মাঝে-মধ্যে শরীর খারাপ না হয় কার? তাই নিয়ে এম্‌নি কেউ কখনও করে শুনেছো?'

শুনে হঠাৎ যেন ডাক্তারের ওষুধের কাজ করলো ভূদেববাবুর। ছেলেদের মধ্যে এমন কথা এতদিন কেউ বলে নি। রমলার কথা শুনে এখন মনে হচ্ছে—আরও অনেক—অনেক দিন বাঁচবেন তিনি। কিন্তু রাজজ্যোতিষী? তাঁর গণনা যদি অভ্রান্ত হয়, তবে আগামী চৈত্রে তাঁর জীবননাশ অবশ্যম্ভাবী হতে পারে।

একটুকাল থামলেন ভূদেববাবু, তারপর বললেন : 'নারে, বিষয়-সম্পত্তির ব্যাপার সময় থাকতে থাকতেই চুকিয়ে দেওয়া ভালো। বিশেষ করে তোর ভাইদের আর-তর সইছিল না।'

রমলার চোখ দুটো এবারে হঠাৎ কেমনই যেন করে উঠলো। বললো : 'তাই যদি হয়, তবে আর একটা দিনও আমি এখানে থাকবো না। ভাই আর ভাই বৌদের অনুগৃহীত অন্নের জন্যে আমি এখানে আসি নি। তুমি আর সৌরভও বরং আমার সঙ্গে চলো বাবা।'

—'না রে না, তা কি হয়! তোরা যে সবাই আমার কাছে সমান।' ভূদেববাবু বললেন : 'ভবিষ্যতে সৌরভকে বরং তোরা দেখিস।'

কিন্তু সে পরের কথা। আপাতত যাওবা আরও দু-একদিন থাকতো রমলা, এবারে তাও থাকলো না। দুবরাজপুর থেকে এসেছিল সে, আবার দুবরাজপুরেই ফিরে গেল। বলে গেল : 'খুব খুশি হয়েছি যে, ভাগ-বাটোয়ারার মধ্যে তুমি সৌরভকে রাখো নি। তবে আর সৌরভের ভাগ চোখে দেখা যেতো না।'

ভূদেববাবু বললেন : 'তা জানি না, তবে মনে হচ্ছে—আমি ওর ব্যাপারে অপরাধী থেকে গেলাম। এবারে এনুয়াল পরীক্ষার পর ও বরং তোর কাছে গিয়ে দিনকয়েক কাটিয়ে আসুক।'

রমলা বললো : 'পারলে সেই সঙ্গে তুমিও যেয়ো।' বলে গাড়ির ফুটবোর্ডে পা দিতেই গাড়ি স্টার্ট নিল।...

ঘরের দেয়ালে স্ত্রী বিভাবতীর তৈলচিত্র ঝুলছিল। এবারে সেই চিত্রের মুখোমুখি এসে বসে অনেকক্ষণ নীরবে একা কাটালেন ভূদেববাবু। আর একবার রাজজ্যোতিষীর কথা মনে হওয়াতেই যৌবনের এক হস্তরেখাবিদের কথা হঠাৎ তাঁর স্মৃতিতে ভেসে এলো। ব্যবসাজগতে তখন তিনি কেবল ঘোরা-ফেরায় নেমেছেন। এ সময়ে এক মাড়োয়ারী কুবেরের সংস্পর্শে জনৈক হস্তরেখাবিদের সামনে তাঁকে হাত মেলে ধরতে হয়েছিল। মুহূর্তমাত্র তাঁর হাতের রেখার দিকে তাকিয়ে থেকে হস্তরেখাবিদ বলেছিলেন : 'যার যেমন ভাবনা, তার তেমন সিদ্ধি। হাতের রেখা স্পষ্ট বলছে—ব্যবসায়ে তুমি রাজা হবে।' শুনে সেদিন ভূদেববাবুর বুক-খানি ফুলে উঠেছিল। মাড়োয়ারী কুবের লোকটি বোধ করি হস্তরেখাবিদের সেই কথা শুনেই তাঁর ওয়ার্কিংপার্টনার করে নিয়েছিল তাঁকে। তারপর দিনে দিনে তাঁর কপাল ফিরলো। পিতৃসম্পত্তি যা ছিল, তাকে শতগুণ বাড়িয়ে তুললেন তিনি। রাজা হলেন বৈ কি ভূদেববাবু! কিন্তু সেই রাজত্ব আজ কোথায় ভেসে গেল তাঁর? স্ত্রীর তৈলচিত্রের দিকে একবার মুখ তুলে তাকালেন তিনি, বললেন : 'তুমি রাণীর মতই চলে যেতে পেরেছ বিভা, কিন্তু আজ আর আমি রাজা নই। জানো তো, জীবনে স্বেচ্ছায় কোনোদিন ভাগ্যগণনায় বসি নি, আজ রাজজ্যোতিষীর গণনার পর মনে হচ্ছে—দরকার ছিল, সত্যিই দরকার ছিল গণনার। তাতে নিজেকে তৈরি করে নেবার অবকাশ পাবো।'

অবকাশই হয়তো খুঁজছিলেন ভূদেববাবু। খুঁজতে খুঁজতে কত বসন্ত কত চৈত্র পেরিয়ে গেল, হিসেব রাখলেন না তিনি। রাজজ্যোতিষীর গণনা কাজে আসে নি। ছোটখাটো পীড়া ছাড়া জীবন-সংশয় ঘটে নি ভূদেববাবুর।

ইতিমধ্যে একটার পর একটা পাশ করে সৌরভ গ্রাজুয়েট হয়ে বেরিয়েছে। দাদারা বললো : 'ঘরে বসে না খেয়ে এবারে দেখে-শুনে কিছু একটা কর।'

কথাটা অর্থবাচক। ভূদেববাবুর কানে আসতে মনে মনে তিনি প্রমাদ গণলেন। বললেন : 'ঠিকই তো, দাদাদের ঘাড়ে বসে খাবি কেন, তাতে ওদের ভাগে টান পড়বে যে। আমি তোকে হস্টেলে থাকবার ব্যবস্থা করে দিচ্ছি, সেখানে থেকে তুই বরং একটা ইণ্ডাস্ট্রিয়াল ট্রেনিং নিয়ে নে, তাতে কোনো ফ্যাক্টরীতে কখনও তোর একটা বড় জায়গা হয়ে যাবে।'

কিন্তু তাতেও সামনে এগিয়ে এসে টিপ্পনি কাটতে ছাড়লো না সুদেব। বললো : 'ভ্রাতা গ্রাজুয়েট হয়েছে, দাদা-দের সঙ্গে থাকতে এখন আর প্রবৃত্তি হবে কেন : তার চাইতে হস্টেলে থেকে বখে' যাওয়া অনেক ভালো।'

কিন্তু এ কথার জবাব না দিলেন ভূদেববাবু, না দিল সৌরভ। এক সময় সে হস্টেলে গিয়েই সিট নিল।

কিন্তু ভূদেববাবু এবারে যেভাবে অসুস্থ হয়ে পড়লেন, তাতে ডাক্তাররাও খুব একটা ভরসা পেলো না। আগে থেকেই ডায়াবেটিস ছিল, এবারে হাই ব্লাড প্রেসারে ফার্স্ট স্ট্রোক হয়ে গেল। শয্যা থেকে আর উঠতে পারলেন না ভূদেববাবু। বাসুদেব, সুদেব, মহাদেব এবং জয়দেব অত্যন্ত বিব্রত হয়ে পড়লো। তাদের এমন সময় নেই যে, বাবার পরিচর্যায় দিনরাত লেগে থাকতে পারে। বাধ্য হয়ে সৌরভকেই আবার ছুটে এসে বাবার শিয়রে বসতে হলো। ইতিমধ্যে তার ভাগ্য অত্যধিক সুপ্রসন্ন হওয়ার মানসিক বল তার চতুর্গুণ বেড়ে গেল। হস্টেলে থাকতেই অপর একটি বোর্ডারের দেখাদেখি লটারীর বই এনে অনেক টিকিট সে বিক্রি করেছিল। তার নিজের নামের টিকিটও কিছু কম ছিল না। খবর বেরোলো যথাদিনে কাগজ খুলে দেখলো—ফার্স্ট প্রাইজটা সে-ই পেয়েছে। শুনে শয্যায় শুয়েই ভূদেববাবু তাঁর রোগক্লান্ত হাড়-জিরজিরে বুক-খানির মধ্যে সৌরভকে চেপে ধরলেন, বললেন : 'আজ যদি তোর মা বেঁচে থেকে এতবড় সুসংবাদটা শুনতেন, তবে যে কী করতেন, জানি না।' এর পর আর দিন দুয়েকও কাটলো না। দ্বিতীয় বার স্ট্রোক হতেই দেহ থেকে প্রাণ বেরিয়ে গেল ভূদেববাবুর। সৌরভ না হলেও তার দাদারা এজন্যে প্রস্তুতই ছিল, তাই তাদের মনে এই মৃত্যু বড় একটা রেখাপাত করলো না।

যে নাটক অনেকদিন আগেই শুরু হয়েছিল, তা শেষ দৃশ্যে এসে পৌঁছবার আগেই সবার অলক্ষ্যে হঠাৎ ড্রপসীন পড়ে গেল। ভূদেব-পরিবারের ইতি-হাসও এখানেই শেষ হতে পারতো, কিন্তু

শেষেরও শেষ আছে। সেই শেষ দৃশ্যে এসে দেখা গেল—সুদেবের আগেকার ঠাট আর নেই। তলে তলে সে যে এতদিন ধরে অনেক গর্ত খুঁড়ে বসে আছে, ভাই-দের মহলে একথা একরকম অজানাই ছিল। হঠাৎ একদিন ভোরের দিকে সে কথা সাড়ম্বরে জানিয়ে দিল দু'জন কাবুলী। দরজায় দাঁড়িয়ে তারা হৈ-চৈ বাধিয়ে দিল। তাদের কাছে সুদেবের ঋণের পরিমাণ প্রায় কয়েক হাজার হবে। তার ভাগে পিতৃসম্পত্তি সে যা পেয়েছিল, তার কিছু গেছে রেসকোর্সে, কিছু গেছে মদে, বাকীটা বাড়ি মর্টগেজে ও ঋণে তলিয়ে আছে। তার স্ত্রী মালতী সেদিন এই প্রথম গিয়ে কেঁদে পড়লো বড়-জা সুমিত্রার কাছে : 'দিদি, এ অবস্থায় তোমরা যদি সবাই মিলে আমাদের না বাঁচাও, তবে তোমার দেওরের জেল-হাজত আর ঠেকানো যাবে না; ছেলে-পুলে নিয়ে আমাকে পথে দাঁড়াতে হবে।'

কিন্তু তাতে বড় একটা সাড়া দিল না সুমিত্রা। বাসুদেবও এ ব্যাপারে রীতিমতো উদাসীন হয়ে গেল। মহাদেব আর জয়দেব কিছুদিন একরকম গা ঢাকা দিয়েই রইল। সকলেরই ঘর-সংসার আছে; বাবার সম্পত্তির তারা ভাগ পেয়েছে বটে, কিন্তু নগদ টাকা কারুর নেই। অতএব—

বাধ্য হয়ে এবারে সকলের চোখ আড়াল করে সুদেব গিয়ে দাঁড়ালো সৌরভের কাছে। বললো : 'সংসারের প্রতিদিনের কাঁটা তোকে কুড়োতে হয় না, তুই ভাগ্যবান। তারপর লটারীতেও কত টাকা তুই পেয়ে গেলি; তোর কথাই আলাদা। একমাত্র তুই-ই পারিস আমাকে এই বিপদ থেকে উদ্ধার করতে।'

সৌরভ এবারে আকাশ থেকে পড়ে বললো : 'তুমি তো দু'খানা তিনতলা বাড়ি, একটি তাঁতের কারখানা আর ত্রিত্রিশ বিঘা ধানের জমি পেয়েছিলে। আমি জানতাম—ভবিষ্যতে ঐ থেকে তোমাকেও কিছু সাহায্য করতে পারো। তা—এই সবই তবে তোমার হাতছাড়া হতে বসেছে?'

—'হ্যাঁ রে, তোকে আর বলছি কি তবে!'

—'কিন্তু কি করে এভাবে রসাতলে গেল?' থেমে সৌরভ জিজ্ঞেস করলো : 'টাকা পেলেও কি এসব তুমি আর টেনে তুলতে পারবে?'

সুদেব বললো : 'অন্তত শেষ চেষ্টা করে তো দেখবো! নইলে পরিণামে আমাকে জেলে যেতে হবে, আর জেলে-যেদের নিয়ে তোর বৌদি কোথায় গিয়ে দাঁড়াবে, ঈশ্বরই জানেন।' কথা শেষ করতে গিয়ে এবারে গলাটা ভারী হয়ে উঠলো সুদেবের।

সৌরভের এবারে বুঝি মায়া হলো। মায়ারই হৃদয় তার। হাজার হোক দাদা, এক মায়ের পেটের ভাই, অগ্রজ, গুরুজন। সংসারে আগে দাদা-দিদিরা, তারপর সে। জ্যেষ্ঠ যদি কনিষ্ঠের কাছে এসে এমনি করে দাঁড়ায়, তবে কি ছোট ভাইয়ের পক্ষে মুখ ফিরিয়ে থাকা সম্ভব? যারা পারে, তাদের কথা স্বতন্ত্র, তাদের জগ-তের লোক নয় সৌরভ। লেখাপড়া শিখে নিজের পায়ে দাঁড়াবার মতো সে স্বাবলম্বী হয়েছে। কষ্টকে কষ্ট বলে গ্রাহ্য করতে কোনোদিন সে শেখে নি। তাই ঘুণাক্ষরে একবারও তার মনে পড়লো না—ভাইদের সঙ্গে কণ্ঠ মিলিয়ে এই দাদাই কবে তাকে বলেছিল : 'ঘরে বসে না খেয়ে এবার দেখে-শুনে কিছু একটা কর।' তা করতে গিয়েই দুঃখ, ব্যথা আর অভিমানকে সে জয় করে নিয়েছে। আজ আর তার কারুর উপর অভিমান নেই সংসারে। জিজ্ঞেস করলো : 'কত টাকা হলে তুমি ঋণমুক্ত হতে পারো, বলো।'

হিসেবটা মনে মনে করাই ছিল সুদেবের। বললো : 'তা—হাজার ত্রিশেক তো চাই-ই বটে।'

শুনে বুকের ভিতরটা হঠাৎ যেন একবার কেমন করে উঠলো সৌরভের। কিন্তু তা মুহূর্তমাত্র। দাদার রিক্ত মুখের উপর দিয়ে একবার দৃষ্টি বুলিয়ে নিয়ে বললো : 'বেশ, আমি চেক লিখে দিচ্ছি, সুবিধামতো তুমি ভাঙিয়ে নিয়ো।'

চেক হাতে নিয়ে টাকার অংকটার দিকে তির্যক দৃষ্টিতে একবার তাকিয়ে দেখলো সুদেব, ত্রিশ হাজার ঠিকই আছে। বললো : 'বাবার আশীর্বাদ রয়েছে তোর উপর। তোর মতো উপযুক্ত ভাই আমাদের আর কে আছে বল? এবারে লটারী খেলবার সময় প্যারিস তো একটা টিকিট আমাকেও দিস। জানি ভাগ্যে নেই, তবু একবার ঠুকে দেখবো।' বলে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল সুদেব।

সৌরভের এবারে ইচ্ছে হলো—প্রাণ খুলে হো-হো করে একবার হাসে, কিন্তু পারলো না, কোথায় যেন বাধলো। ঠিক করলো—কোনো অজানা দূর-দূরান্তে এবারে সে বেরিয়ে পড়বে; একেবারে নিশ্চিন্ত প্রস্থানমাণ যাযাবর। সংসারের ছোটখাটো সুখ-দুঃখের তরঙ্গ-বিক্ষেপের উপর সেই তো পরম আনন্দ ॥

ভারতকোষ

বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের ৭৫ বৎসর পূর্তি উপলক্ষে পুনরায় ভারতকোষ-এর এক হাজার গ্রাহক লওয়া শুরু হইয়াছে। গ্রাহকদের জন্য ভারতকোষ-এর চারিখণ্ডের মূল্য ৭০ (সত্তর) টাকা ধার্য হইয়াছে। গ্রাহক হওয়ামাত্র প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় খণ্ড ভারতকোষ রসিদসহ দেওয়া হইবে। মাত্র প্রথম ১০০০ আবেদনকারীকেই গ্রাহক শ্রেণীভুক্ত করা হইবে। কেবল বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদে প্রাপ্য মুদ্রিত ফর্মেই আবেদন করা যাইবে। আবেদনের সম্পূর্ণ ধার্য মূল্য না পাইলে তাহাকে গ্রাহক শ্রেণীভুক্ত করা যাইবে না।

প্রতি খণ্ড ২০ (কুড়ি) টাকা। প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় খণ্ড প্রকাশিত হইয়াছে। চতুর্থ খণ্ড যন্ত্রস্থ।

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদ

২৪৩।১ আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড, কলিকাতা-৬

(ফোন : ৩৫-৩৭৪৩)

মধ্যবর্তী নির্বাচন ও সাপ্তাহিক বসুমতী

সাগর বিশ্বাস

পশ্চিম বাংলার গণতন্ত্রপ্রিয় মানুষের বিপুল উৎসাহ ও উদ্দীপনার মধ্যে মধ্যবর্তী নির্বাচনে যুক্তফ্রন্ট বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠতা পেয়ে জয়লাভ করেছে। এই উৎসাহ ও উদ্দীপনা যে কতটা প্রাণচাঞ্চল্যে ভরপুর, তা কলকাতা তথা বাংলা দেশের জনতা মনে প্রাণে অনুভব করতে পারছেন। কিন্তু যাঁরা বাংলার বাইরে অবস্থান করছেন, তাঁরা হয়তো সম্যক উপলব্ধি করতে পারবেন না। কারণ মিছিল-নগরী কলকাতার এই ক'দিনের মিছিল, আলোকমালার রক্তাভ চেহারা, তোপধ্বনির সঙ্গে অবিরাম বিজয়োল্লাসের অভূতপূর্ব চিত্র চোখে না দেখলে ঠিক উপলব্ধি করা যায় না। তবু মধ্যবর্তী নির্বাচনের এই ফল পশ্চিম বাংলার মানুষের, গণতান্ত্রিক চেতনারই স্বাক্ষর বহন করছে। বাংলার অগণিত নিপীড়িত নিরক্ষর গণতান্ত্রিক মানুষ এই রায়ের মাধ্যমে প্রমাণ করে দিয়েছে যে, গত ১৯৬৭ সালের সাধারণ নির্বাচনে এই রাজ্যের নির্বাচকমণ্ডলীর রায় নিছক উত্তেজনার ফলশ্রুতি ছিল না —তা ছিল কংগ্রেসী স্বৈরাচারের বিরুদ্ধে তাঁদের সুচিন্তিত অভিমত। কিন্তু সেই সুচিন্তিত গণতান্ত্রিক অভিমতের কোনো ন্যায়সঙ্গত মূল্যই কেন্দ্রীয় কংগ্রেস মন্ত্রিসভা সেদিন দিতে চান নি। হায়দ্রাবাদ অধিবেশনেই কংগ্রেসের সেই বিমাতৃসুলভ মনোভাব প্রকাশ হয়ে পড়েছিল। তারই ফলশ্রুতি কয়েকটি রাজ্যে নানা সাংবিধানিক সংকট সৃষ্টি করে অকংগ্রেসী সরকারের পতন ঘটানো। এবং সেই পতনেরই অনিবার্য ফল হলো মধ্যবর্তী নির্বাচন। কিন্তু বাংলার গণতন্ত্রপ্রিয় মানুষ ভোলে নি সে কথা। ভোলে নি রাজ্যপালের 'pleasure' এবং স্পীকারের ঐতিহাসিক রুলিং-এর কথা। ভোলে নি প্রফুল্ল ঘোষ, চন্ডী মিত্র, হরেন মজুমদার, আমির আলী, গঙ্গাধর প্রমাণিকদের ইতিহাস, সৃষ্টির কথা; ভোলে নি লক্ষ লক্ষ মানুষের মুখের খাদ্য নিয়ে রাজনীতি করার কথা; ভোলে নি চল্লিশ হাজার মানুষের জেলে যাওয়া কিংবা উত্তরপাড়া কলেজে পৈশাচিক হত্যাকান্ডের কথা। মেদিনীপুর, উত্তর বাংলা ভুলে যায় নি বিপর্যয়কে, কেন্দ্রীয় কংগ্রেস সরকারের বদান্যতার লজ্জাকর কাহিনী। শ্রমিক কর্মচারী ভোলে নি ১১শে সেপ্টেম্বরের ধর্মঘটের পরিপ্রেক্ষিতে তৈরি কালা আইনের ইতিহাস। তাই ঘোষকবিরদের সকল আশা-আকাঙ্ক্ষা ব্যর্থ করে, খাদ্যসংকট, ঘেরাও, দলীয় কলহ প্রভৃতি ফ্রন্ট সরকারের ধ্বংসাত্মক কুশাসনের (?) প্রচারিত নজিরগুলি উপেক্ষা করে শত্রুর মুখে ছাই দিয়ে তারা সেই সর্বনেশে যুক্তফ্রন্টকেই সানন্দে বরণ করে এনেছে।

এই নির্বাচনের ফলাফল সম্পর্কে সকল রাজনৈতিক দূরদৃষ্টিসম্পন্ন মানুষই বক্তব্য রেখেছিলেন (অবশ্য ২৮০ আসনে জয়লাভ করার কংগ্রেসী উচ্চাশার কথা আলাদা)। সংবাদপত্রও চুপ করে ছিল না। কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রেই এই বক্তব্য নিছক উদ্দেশ্যপ্রণোদিত ছিল। কখনো কখনো সংবাদপত্রের বিশেষ ক্রোড়পত্র দলবিশেষের নির্বাচনী প্রচার সংখ্যারই নামান্তর হয়ে দাঁড়িয়েছে। এই নির্বাচনে তারা এক ধরণের type প্রজা সৃষ্টি করতে চেয়েছে। কিন্তু কিছুতেই কিছু হলো না। ইতিহাসের ধোপে সে মিথ্যাচার টেকে নি। রাজনৈতিক ক্ষেত্রকে তারা অস্বীকার করে মানুষের মনকে করায়ত্ত করতে চেয়েছিলো। কিন্তু তা কখনো সম্ভব নয়। বাস্তব পরিপ্রেক্ষিত আর মানব-মন পরস্পর সম্পর্কযুক্ত। এই সম্পর্ককে অস্বীকার করে ভাবাবেগ বক্তৃতা কিংবা প্রবন্ধ বা রিপোর্টাজ লিখে জনমত তৈরি করা আজ অসম্ভব। তাই '৬৭-র ইতিহাসের পুনরাবির্ভাবকে রোধ করতে কেউ পারে নি। বরং অনেক বেশি স্পষ্ট আজকের ইতিহাসের পাঠ।

সাতষট্টির নির্বাচন-পূর্ব সময়ের মতো এবারে 'সাপ্তাহিক বসুমতী' অনেক প্রতিকূলতার মধ্যেও তার মতামত তুলে ধরতে দ্বিধাগ্রস্ত হয় নি। বিভিন্ন সংখ্যায় বিভিন্ন প্রবন্ধে যে নির্বাচনী সমীক্ষা করেছেন কৃত্তিবাস ওঝা, পর্যবেক্ষক, কুমুদ দাশগুপ্ত, অসীম মুখোপাধ্যায়, সাগর বিশ্বাস, প্রদ্যোৎ রায়, সাংবাদিক এবং অন্যান্য লেখকেরা: সেগুলির যথার্থতা সম্পর্কে আজ আর প্রশ্নের অবকাশ নেই। তবু একথা সত্য, অনেকক্ষেত্রেই এঁদের কলম সংযত রাখতে হয়েছে—সম্পাদককেও কলম চালাতে হয়েছে। তবু ওই সীমিত বক্তব্যের মধ্যেও যে সত্যকে প্রতিফলিত করা হয়েছিল, তা সাপ্তাহিক বসুমতীর নিরপেক্ষ বলিষ্ঠতারই পরিচায়ক হয়ে থাক —সমীক্ষকেরা উপলক্ষ মাত্র।

চব্বিশ পরগনা জেলার ৩টি মহকুমার (বসিরহাট, বনগাঁ, বারাসাত) সম্ভাব্য নির্বাচনী ফলাফল সম্পর্কে বিভিন্ন সময়ে যে সমীক্ষা আমাকে করতে হয়েছে তা বিশেষ করে কংগ্রেস-মহলের সমীক্ষার সম্পূর্ণ পরিপন্থী। জনৈক কংগ্রেস প্রার্থী এই তিনটি মহকুমার মোট ১৮টি আসনের মধ্যে ১৩টিতেই কংগ্রেস প্রার্থীরা জয়লাভ করবেন বলে উচ্চাশা প্রকাশ করেছিলেন—একটি মহকুমা শহরে যুক্তফ্রন্ট প্রার্থীর জামানত বাজেয়াপ্ত হবার কথাও তাঁরা দৃঢ়তার সঙ্গে বলেছিলেন—সে সব কথা বিভিন্ন সময়ে প্রসঙ্গত উল্লেখ করেছিলাম। আমরা জানি, গর্জনের সঙ্গে বর্ষণের প্রায়ই কোনো সংগতি থাকে না। তবু আজ নতুন করে ভাবতে কৌতুক লাগছে যে, রাজনীতি-দেবতার নির্মম পরিহাসে এই মহকুমাগুলিতে ফল হলো একেবারে উল্টো এবং ঐ মহকুমা শহরের যুক্তফ্রন্ট প্রার্থী কংগ্রেস প্রার্থীকে এক বিরাট অংকের ভোটের ব্যবধানে হারিয়ে দিয়ে নির্বাচিত হলেন। এই জন্যই ৩২ সংখ্যায় বলেছিলাম, "বিগত সাধারণ নির্বাচনে বামপন্থী দলগুলি তথা আজকের যুক্তফ্রন্ট যে রাজনৈতিক ক্ষমতার স্বাক্ষর বহন করছে সেই ক্ষমতার যথার্থ মূল্যায়ন না করে শুধুমাত্র দলীয় বৈরিতার অনুরোধে যাঁরা এই ধরণের দায়িত্বহীন মন্তব্য করতে পারেন, তাঁরা আর যা-ই হোন রাজনৈতিক দূরদৃষ্টিসম্পন্ন নন। অথচ আজ কংগ্রেসের নিচুতলা থেকে চিলেকোঠা পর্যন্ত সকলেই শুধু বড় বড় কথা বলতেই অভ্যস্ত। যেখানেই গেছি, সেখানেই দেখেছি দায়িত্বহীন, নির্বিকার, আজগুবী মন্তব্য করতে যুক্তফ্রন্ট কর্মীদের থেকে কংগ্রেসকর্মীরা বহুলাংশে পারদর্শী।"

বারাসাত বসিরহাট, বনগাঁ মহকুমা সম্পর্কে আমাদের সমীক্ষার সত্যতা প্রমাণিত হয়েছে। আর এই সমীক্ষা আসলে সমগ্র বাংলাদেশ থেকে বিচ্ছিন্ন নয়। বাগদা সম্পর্কে লিখেছিলাম, "বাগদার রাজনৈতিক আবহাওয়া যুক্তফ্রন্টের প্রতিকূলে নয়। প্রার্থী হিসেবে শুধু নয়, কোনো বিশেষ

কর্মখালি

আমাদের বিশ্ববিখ্যাত জাপান মডেল পকেট ট্রানজিস্টারের অর্ডার সংগ্রহ করিবার জন্য পুরা বা আংশিক সময়ে মাসিক ৪৫০৲ টাকা অথবা শতকরা ৩৫৲ কমিশনে সারা ভারতে স্ত্রী বা পুরুষ প্রার্থী আবশ্যক। স্যাম্পেল সেটের জন্য নিম্নঠিকানায় আবেদন করুন।

Employment Officer
(B.W.C.—88) Box 1564 Delhi-6

দলের নেতা হিসেবেও নয়, ব্যক্তি হিসেবে সাধারণের প্রাণের রাজ্যে শ্রীমজুমদারের যে স্থান পাতা রয়েছে দেখেছি, প্রবল প্রাণ-বন্যায় তা প্রকাশিত হয়ে পড়তে চাইছে। ...এই হলো দেওয়ালের লিখন—এই হলো তার এপিলোগ, এই হবে তার এপিটাফ।"

বারাসাত মহকুমার হাবড়া সম্পর্কে আমরা যে সন্দেহ প্রকাশ করেছিলাম তা (শ্রীচক্রবর্তীর ভাষায় 'অশোকনগরের হাওয়া হাবড়াকেও আঘাত করবে' বলে ধারণা সত্ত্বেও) সত্যতায় পর্যবসিত হলো কংগ্রেস প্রার্থী শ্রীতরুণকান্তি ঘোষের জয়লাভের সঙ্গে। কিন্তু যে প্রার্থী এই মহকুমার পাঁচটি আসনই কংগ্রেস লাভ করবে বলে উল্লসিত হয়েছিলেন, তাঁর যে একটি বিরাট স্বপ্নভঙ্গ হলো সে কথা বলাই বাহুল্য। বসিরহাট মহকুমার চিত্রও যথাযথ বলা চলে যদিও এই অঞ্চলের অনেক কথাই স্পষ্ট করে বলতে পারা যায় নি। দল-ত্যাগীদের সম্পর্কে আমাদের ভবিষ্যদ্বাণী সফল। আমরা বলেছিলাম দলত্যাগীদের সম্পর্কে জনমত যেভাবে গড়ে উঠছে, তাতে কোনো আইন করে দলত্যাগ বন্ধ করবার প্রয়োজন হবে না। এই জনমতই জয়ন্তী-প্রসন্ন মুখার্জী থেকে খোদ প্রফুল্ল ঘোষ পর্যন্ত কর্তাব্যক্তিকেও ঘায়েল করেছে।

হুমায়ুন কবির তথা তৃতীয় শক্তির পৃষ্ঠপোষকদের সম্পর্কে ৩৩ সংখ্যায় মন্তব্য করেছিলাম কংগ্রেস এবং বামপন্থী শক্তির অগ্নিপরীক্ষায় "সুযোগে দক্ষিণ-পন্থী প্রতিক্রিয়াশীল শক্তিও (যেমন, জনসঙ্ঘ, লোকদল, রিপাবলিকান, আই এন ডি এফ, পি এম এল, আমরা বাঙালী প্রভৃতি) নেমেছে তাদের ভাগ্যপরীক্ষা করতে। তাদের কপালে অবশ্য তৃতীয় গ্রুপ হিসাবে শিকে ছেঁড়বার কোনোই সম্ভাবনা নেই।" শিকে এদের সত্যিই ছিঁড়লো না। জানি না কবির সাহেব অতঃপর মাথার চুল ছিঁড়ছেন কি না! যুক্তফ্রন্টের বিরুদ্ধে বিষোদ্গার করে তিনি স্বপ্ন দেখেছিলেন লোকদল-কংগ্রেস কোয়ালিশন সরকারের আর সেই সঙ্গে চেয়েছিলেন পূর্বাঞ্চল থেকে কমিউনিস্ট-দের ঝেঁটিয়ে বিদায় করে দিতে। শ্রীআশু ঘোষ এবং শ্রীজাহাঙ্গীর কবিরও এই মধ্যপন্থী নেতা। জনসঙ্ঘ-মুসলিম লীগের অবস্থাও বড় করুণ। আর 'বাঙালী জাগো' বলে যাঁরা গর্জন করেছিলেন, তাঁরা ভেবে-ছিলেন বাঙালী ঘুমিয়ে আছে। কিন্তু বাংলা দেশের মানুষ চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিয়েছে—তারা সজাগ আছে, বরং ওঁরাই দিবাস্বপ্ন দেখছেন।

প্রগ্রেসিভ মুসলিম লীগ সম্পর্কে আমরা ২৯ সংখ্যায় "রাইণ্ড কার্ড : জাতীয় জীবনে" রচনার মধ্যে স্পষ্ট বক্তব্য রেখেছিলাম। আমরা পশ্চিমবঙ্গের মুসলিম বন্ধুদের পূর্ব বাংলার জন-জাগরণের প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ করতে বলেছিলাম এবং স্পষ্টতই জানিয়েছিলাম "বাঙালীর অখণ্ড জাতীয় জীবনে আর ভেদবুদ্ধির প্রশ্রয় দিয়ে আমরা আত্মহত্যার খোলকলা পূর্ণ করতে চাই না। হিন্দু মহাসভা, জনসঙ্ঘ তাই বাঙালীর আনুকূল্য লাভ করতে পারে নি। পশ্চিম বাংলার বাঙালী মুসলমানের সামনে তাই আজ আর এক পরীক্ষা। মুসলিম লীগ যদি হিন্দু মহাসভার অবস্থাপ্রাপ্ত হয়, তাহলেই বাঙালী মুসলমানের সত্যিকার প্রগ্রেসিভ মনের পরিচয় মিলবে।" আমাদের সেই আকাঙ্ক্ষা নিষ্ফল হয় নি—এটা আনন্দের সংবাদ। সর্বশেষ-প্রাপ্ত সংবাদে দেখছি প্রগ্রেসিভ মুসলিম লীগ বিধানসভার তিনটি আসনে জয়লাভ করেছেন। এঁদের থেকে যুক্তফ্রন্টের মধ্যে অনেক অনেক গুণে বেশি মুসলিম প্রার্থী জয়লাভ করেছেন। কিন্তু এরও বোধ করি প্রয়োজন ছিলো। যাঁরা সংকীর্ণ জাতীয়তার টানে কিংবা সাম্প্রদায়িক ভেদবুদ্ধির প্রভাবে মুসলিম লীগকে সমর্থন করেছেন তাঁরা নিশ্চয়ই তাঁদের ভুল বুঝতে পেরেছেন যে, 'শোষণ-মুক্ত গণতান্ত্রিক প্রশাসন ব্যবস্থা' (যা মুসলিম লীগ কাগজে কলমে বলে) কোনো সংকীর্ণ চোরা পথে আসতে পারে না, তার জন্য প্রশস্ত রাজপথ চাই। সেই প্রশস্ত রাজপথই ত' প্রস্তুত করতে চেয়েছে শোষিত এবং নিপীড়িত মানুষের প্রতি-নিধি যুক্তফ্রন্ট দল। এবং সেই সর্বহারার প্রাণবন্যাই ত' আজ প্রতিক্রিয়ার দুর্গম ঘাঁটিগুলিও পর্যুদস্ত করে দিয়েছে। এ বিপ্লব ওই পনেরো আনা মানুষেরই—ওই পনেরো আনা মানুষ জাতিভেদে বিশ্বাস করে না। আজ কংগ্রেস সভাপতি পশ্চিম বাংলার এই বিপ্লবে হতচকিত হয়ে বলছেন, "বড় রহস্যময়, কারণটি বুঝতে পারছি না কেন এমন হলো।" কিন্তু শ্রীযুক্ত প্রফুল্ল-সেন বুঝেছেন। তিনি বলেছেন, "আমরা আবার নিচের দিকে গিয়ে সংগঠন করবো।" ওই নিচের ফাটলই মারাত্মক—তা ভিতসুদ্ধ ধূলিসাৎ করে দেয়। নিজলিঙ্গাপ্পারাও এ সত্য জানেন। কিন্তু ক্ষমতার গর্বে এই সত্যকে তথা ইতিহাসের লিখনকে তাঁরা মুছে দিতে চেয়েছিলেন। ১৯৬৭ সালের গণ-রায়কে তাঁরা কতকগুলি মিথ্যের তুবড়ি দিয়ে নস্যাৎ করতে চেয়ে-ছিলেন। যুক্তফ্রন্ট সরকার তথা জনতার প্রতি তাঁরা যতগুলি চোখা বাণ নিক্ষেপ করেছিলেন—ইতিহাসের নির্মম পরিহাসে আজ তারা প্রেরকেরই ললাট বিদ্ধ করেছে। কাজেই বাস্তব পরিপ্রেক্ষিতকে অস্বীকার করে রাজনীতিতে দেউলিয়া হয়ে থাকলে ইতিহাস কখনো ক্ষমতা করে না। বিশ বছরের মনোপলি শাসনে সারা দেশে যে দুর্নীতির স্রোত বয়েছে, সে স্রোত বন্ধ করতে ৮ মাসে বাঁধ নির্মাণ করাও যায় না —বাংলাদেশবাসী এ সত্য বুঝেছে। এই মনোভাবের ফলেই মধ্যবর্তী নির্বাচনে কংগ্রেসের 'একে একে নিভলো দেউটি'। সাপ্তাহিক বসুমতী এই বাস্তব পরি-প্রেক্ষিত এবং জনগণের মনোভাবকে উপেক্ষা করে নি। কোনো সৎ সংবাদপত্র তা বোধ করি পারে না। নির্বাচনের এক মাস আগেও পর্যবেক্ষক বলছেন, "আজকের অবস্থা কী? প্রায় নিশ্চিত কংগ্রেসী শাসন-অবসানের সম্ভাবনাই আজকের অবস্থার লক্ষণ। সংখ্যার হিসাব করে কংগ্রেসী শাসনের রাজ্য বেশি কি কম সেটা প্রধান বিচার্য নয়। কেন্দ্রে কংগ্রেস শাসন যে অপ্রতিহত সেটাও প্রধান বিচার্য নয়। অবস্থা যে ২ বছর আগে থেকে সম্পূর্ণ নতুন দিকে মোড় ঘুরেছে সেটাই প্রধান বিচার্য। নিশ্চিত ক্ষমতা কংগ্রেসের ভেঙে গিয়েছে এবং অনিশ্চিত অবস্থার ফাঁদ ক্রমশই বেশি করে ঘাড়ে চেপে বসেছে" (আসন্ন মধ্যবর্তী নির্বাচন ও তার পরি-প্রেক্ষিত)।

এ লেখা যখন সাধারণের হাতে পৌঁছবে তখন বিপুল উদ্দীপনার মধ্যে যুক্তফ্রন্টের মন্ত্রিসভা গঠিত হয়ে যাবে। পুনরাগত এই সরকারের সামনে তখন হাজারো সমস্যা—যার সমাধান বিশ বছরে হয় নি। সেই না-পাওয়ার বেদনার প্রতি তাঁদের দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখতে হবে। খাদ্য, কৃষি, শিক্ষা, যানবাহনের ভাড়াবৃদ্ধি প্রভৃতি সমস্যাগুলিকে সূক্ষ্ম বিবেচনা দিয়ে মোকাবিলা করতে হবে। এবং তা তাঁরা করবেন এ-বিশ্বাস জনসাধারণ রাখে। যুক্তফ্রন্টের অন্যতম নেতা শ্রীজ্যোতি বসু ইতিমধ্যেই বলেছেন যে, জনগণের চাহিদা সম্পর্কে তাঁরা অবহিত আছেন এবং সে জন্য তাঁরা সাধ্যমত প্রচেষ্টা চালিয়ে যাবেন। অবশ্য জনগণেরও সক্রিয় সহযোগিতা আবশ্যক।

(১৩-২-৬৭)

সর্দ্দি ও কাশিতে
রক্ষিতের
তাল মিছরি
ফোন ৫৫-৩০৮৫

কলকাতার পথনির্দেশ

বেণু ঘোষ

ভারতীয় মুক্তি সংগ্রামের পুরোধা, প্রগতিশীল গণ-আন্দোলনের অগ্রদূত কলকাতা মহানগরী বিগত নির্বাচনে তার চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য অক্ষুণ্ণ রেখে আবার এক নতুন ইতিহাস রচনা করেছে। শহরের ২৩টি আসনের মধ্যে ১৮টি যুক্তফ্রন্টের হস্তগত হয়েছে। হিন্দীভাষী অধ্যুষিত লাগোয়া ৫টি কেন্দ্র (বড়বাজার, জোড়াসাঁকো, জোড়াবাগান, বৌবাজার এবং চৌরঙ্গী) ছাড়া বাকী কলকাতা লালে লাল হয়ে গেছে। একদা পাঞ্জাবের রঞ্জিত সিং ভারতে বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদী শাসনের দ্রুত অগ্রগতি লক্ষ্য করে আক্ষেপের সুরে বলেছিলেন, সব লাল হো যায় গা। আজ ভারত ইতিহাসের পথিকৃৎ কলকাতা মহানগরী নিজের সর্বাঙ্গে রক্তরাঙা আবির মেখে স্মিতহাস্যে সারা ভারতের দিকে হাত তুলে বলছে, সব লাল হো যায় গা। এই লাল হল গণতন্ত্র, সমাজতন্ত্র এবং অগ্রগতির প্রতীকচিহ্ন। এই লাল জাতীয় সংহতি, সাম্প্রদায়িক ঐক্য এবং মহা-ভারতীয় মিলনমন্ত্রের প্রতীক।

কলকাতার নির্বাচনের সম্ভাব্য ফলাফল আলোচনার সময় আগের বার সাপ্তাহিক বসুমতীর পৃষ্ঠায় বিশেষ প্রতিনিধি লিখেছিলেন যে, এই শহরের ভোটাররা কংগ্রেস এবং বামপন্থীদের মধ্যে প্রায় ৫০ঃ৫০ হারে বিভক্ত। কয়েকটি আসন কংগ্রেসের বাঁধা এবং কয়েকটি আসন বামপন্থীদের। মধ্যিখানের ১৫টি আসন মার্জিনাল। সেখানকার ভোটাররা প্রাক্ নির্বাচন মুড অনুযায়ী কখনও বামপন্থীদের প্রতি, কখনও বা কংগ্রেসের প্রতি আনুকূল্য প্রদর্শন করেন। এবার একটি ছাড়া মার্জিনাল আসনগুলো সবই যুক্তফ্রন্ট পেয়ে গেছে। কংগ্রেসের দুর্গ বলে পরিচিত আসনগুলোতেও বামপন্থীদের সঙ্গে কংগ্রেসের ভোটের ব্যবধান অনেক কমে গেছে। গত বার বড়বাজার থেকে কংগ্রেস প্রার্থী শ্রীঈশ্বরদাস জালান পশ্চিমবঙ্গে সবচেয়ে বেশি ভোটের ব্যবধানে জয়লাভ করেছিলেন। এবার সে গৌরব লাভ করেছেন পানিহাটির গোপাল ভট্টাচার্য (যুক্তফ্রন্ট)। মার্জিনাল সীট-গুলোর মধ্যে জোড়াবাগানে কংগ্রেস প্রার্থী জয়লাভ করেছেন বটে, তবে সেখানে ভোটের ব্যবধান হাজারখানেক মাত্র।

এবার কলকাতার নির্বাচনে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ঘটনা হচ্ছে প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি শ্রীপ্রতাপচন্দ্র চন্দ্র এবং মেয়র শ্রীগোবিন্দ দের পরাজয়। শিয়ালদহ কেন্দ্রে প্রতাপবাবু রাষ্ট্রীয় সংগ্রাম সমিতির আহ্বায়ক এবং বিশিষ্ট ট্রেড ইউনিয়ন নেতা শ্রীযতীন চক্রবর্তীর কাছে ৪ হাজারের বেশি ভোটে পরাজিত হবার পর তিনি প্রদেশ কংগ্রেসের সভাপতিত্ব ত্যাগ করেছেন। গোবিন্দ দে হার মেনেছেন প্রবীণ ফঃ বঃ নেতা শ্রীহেমন্ত বসুর কাছে।

এই নির্বাচনে কলকাতার ভোটারদের মধ্যে ভোট দিয়েছেন ১১,০৪,২৬৬ জন (বাতিল ভোট বাদ দিয়ে)। তার মধ্যে যুক্তফ্রন্ট ৫,৭৬,৯৮১ ভোট পেয়ে ১৮টি আসন লাভ করেছে। আর কংগ্রেস ৪,৮০,০২৬ ভোট পেয়ে লাভ করেছে মাত্র মাত্র ৫টি আসন। কলকাতায় গড়ে প্রতি কেন্দ্রে ৬০ হাজার ভোটার ছিল এবং গড়ে প্রতি কেন্দ্রে যুক্তফ্রন্ট কংগ্রেসের চেয়ে সওয়া ৪ হাজার করে বেশি ভোট পেয়েছে। নির্দলীয় এবং অন্যান্য প্রার্থীরা মিলে পেয়েছে সর্বসমেত ৪৭ হাজার ভোট এবং তাঁদের অধিকাংশেরই জামানত বাজেয়াপ্ত হয়েছে। কলকাতার মানুষ যে কত রাজনীতি সচেতন এই ঘটনাই তার জ্বলন্ত নিদর্শন। কলকাতার নির্বাচনে জাতিভেদ, সাম্প্রদায়িকতা, প্রাদেশিকতা অথবা অপর কোন মধ্যযুগীয় কুসংস্কার কোনদিনই তেমন কোন কুপ্রভাব বিস্তার করতে পারে না। এবারও পারে নি। এখানে ভোট-দানের একমাত্র মানদণ্ড হচ্ছে রাজনৈতিক পার্টি। তাই হিন্দু এলাকা থেকে মুসলমান প্রার্থী এবং মুসলমান এলাকা থেকে হিন্দু প্রার্থী সকল সম্প্রদায়ের সম্মিলিত ভোটে অনায়াসে নির্বাচনে জয়ী হয়ে গেছেন।

কলকাতায় এবার মহিলা প্রার্থী ছিলেন দুজন। তার মধ্যে যুক্তফ্রন্ট প্রার্থী শ্রীমতী ইলা মিত্র মণিকতলা কেন্দ্র থেকে বিপুল ভোটাধিক্যে পুনর্নির্বাচিত হয়েছেন। কিন্তু কালীঘাট কেন্দ্রে কংগ্রেস প্রার্থী শ্রীমতী বিভা মিত্র যুক্তফ্রন্ট প্রার্থী সাধন গুপ্তের কাছে পরাজয় বরণ করেছেন।

এন্টালী, তালতলা এবং কবিতীর্থ কেন্দ্র থেকে যথাক্রমে ডাঃ গনি, আবুল হোসেন এবং কলিমুদ্দীন সামস্ যুক্তফ্রন্ট প্রার্থী হিসাবে বিধানসভায় নির্বাচিত

সবিনয় নিবেদন

স্থানাভাব বশত এ সংখ্যায় 'আন্তর্জাতিক', 'ফুচিকের দেশে', 'গ্রন্থমেলা' ও 'পাঠকমন' প্রকাশ করা গেল না।

হয়েছে। এই তিনটি কেন্দ্রে বহু মুসলমান বসবাস করেন বটে, তবে ভোটারদের মধ্যে হিন্দু সংখ্যাই বেশি। তাঁরা ভোট-প্রদানের ক্ষেত্রে কোনরকম সাম্প্রদায়িকতাকে প্রশ্রয় দেন নি।

নির্বাচনের ফলাফল ঘোষণার পর প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী শ্রীপ্রফুল্ল সেন কংগ্রেসের পরাজয়ের কারণ ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বলেছেন, যুক্তফ্রন্টের আমলে চালের দাম পাঁচ টাকা কিলোয় উঠেছিল। তাতে গ্রামে ধানজমির মালিকরা খুব লাভবান হয়। এবারও ধান-চালের দাম বাড়বে আশা করে গ্রামের লোকেরা যুক্তফ্রন্টকে জিতিয়ে দিয়েছে। প্রফুল্লবাবুর মত প্রবীণ ব্যক্তি এরকম অসতর্ক মন্তব্য করলেন কি করে তা অনুধাবন করা কঠিন। দেশে ফলন হ্রাস এবং কেন্দ্রীয় সরকারের অসহযোগিতার ফলে যুক্তফ্রন্টের আমলে ধান-চালের দাম যথেষ্ট বৃদ্ধি পেয়েছিল ঠিকই কিন্তু তার ফলে গ্রামের চেয়ে শহরের লোকেরাই বিপন্ন হয়েছিলেন বেশি। প্রফুল্লবাবুর যুক্তি মেনে নিলে কলকাতা এবং অন্যান্য শহরে কংগ্রেসের শোচনীয় পরাজয়ের কারণ খুঁজতে কোথায় যাওয়া হবে, তা আমাদের জানা নেই।

কলকাতাকে যাঁরা দুঃস্বপ্নের নগরী এবং বোম্বাইকে স্বর্গ আখ্যা দিয়ে গায়ের জ্বালা মেটাতে ভালবাসেন, তাঁদের অবগতির জন্য জানাচ্ছি, কলকাতার মানুষ যেদিন নিঃশব্দে পোলিং বুথে গিয়ে সমাজ-বিপ্লবের পথ প্রশস্ত করছিলেন, ঠিক সেই দিন চ্যবন-পাতিল-নায়েকের প্রশ্রয়পুষ্ট এবং পি-এস-পি দলের সঙ্গে নির্বাচনী গাঁটছড়ায় আবদ্ধ শিবসেনা বোম্বাইয়ে বসবাসকারী দক্ষিণ ভারতীয়দের ঘর-বাড়ি জ্বালিয়ে শ্মশানে পরিণত করছিল। তাদের উন্মত্ত তাণ্ডবে ইতিমধ্যেই ৫৩টি অমূল্য জীবন অকালে নষ্ট হয়েছে। কলকাতায় যেদিন আমরা সমস্ত প্রাদেশিক সঙ্কীর্ণতা চিরকালের মত বঙ্গোপসাগরে বিসর্জন দিলাম, সেদিন বোম্বাই থেকে অ-মহারাষ্ট্রীয়দের উচ্ছেদ করবার জন্য শিবসেনার ফ্যাসিস্ট চমুরা ছোরাছুরি বোমা বন্দুক হাতে নিয়ে রাস্তায় বেরিয়ে পড়ল। না, কলকাতা কোনদিনই বোম্বাইয়ের মত স্বর্গ হতে চায় না। কলকাতা কিছু ধান্দাবাজ লোকের দুঃস্বপ্ন হয়ে থাকে থাকুক, কিন্তু [illegible] মানুষ যেন চিরকাল কলকাতাকে তার নিজের দুর্গ বলে ভাবতে পারে। তাই বলছিলাম, এদিন এই মহানগরীর রাজা রামমোহন, ঈশ্বরচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ, স্বামী বিবেকানন্দ, বঙ্কিমচন্দ্র, শরৎচন্দ্র, আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র এবং আচার্য জগদীশচন্দ্র যেমন সারা ভারতকে মুক্তির পথনির্দেশ করেছিলেন, ১৯৬৯ সালে তেমনি কলকাতার ঐক্যবদ্ধ মানুষ সারা ভারতকে প্রগতির পথে এগিয়ে নিয়ে যাবার জন্য সামনে এসে দাঁড়িয়েছে। সমাজতন্ত্রের পথ থেকে দেশকে তারা আর কিছুতেই বিচ্যুত হতে দেবে না।

কলকাতার নির্বাচনের ফলাফল

দল	১৯৬৭	১৯৬৯
কংগ্রেস	১১	৫
কম্যুনিস্ট	৪	৪
কম্যুনিস্ট (মাঃ)	৫	৮
ফরওয়ার্ড ব্লক	০	২
আর-এস-পি	১	২
নির্দলীয়	১	১
ওয়ার্কার্স পার্টি	১	১

মুক্তার মত ঝকঝকে উজ্জ্বল...

আপনার দাঁত হবে সাদা ধবধবে, দাঁতের মাড়ী নীরোগ থাকবে আর মুখের দুর্গন্ধ দূর হবে, আপনি শুধু ডেন্টনিক দিয়ে দাঁত মাজা অভ্যাস করুন।

ক্লোরোফিল মিশ্রিত ডেন্টনিক পাইওরিয়া সারাতে সাহায্য করে।

যাঁরা টুথ পাউডারের জায়গায় পেষ্ট ব্যবহার পছন্দ করেন তাঁদের জন্য জনপ্রিয় ডেন্টনিকের সমস্ত গুণসম্পন্ন টুথ পেষ্ট বাজারে প্রচলন করা হইয়াছে। ধবধবে দাঁত আর মনভোলান হাসি যাঁরা পছন্দ করেন তাঁরাই চান ডেন্টনিক টুথ পেষ্ট।

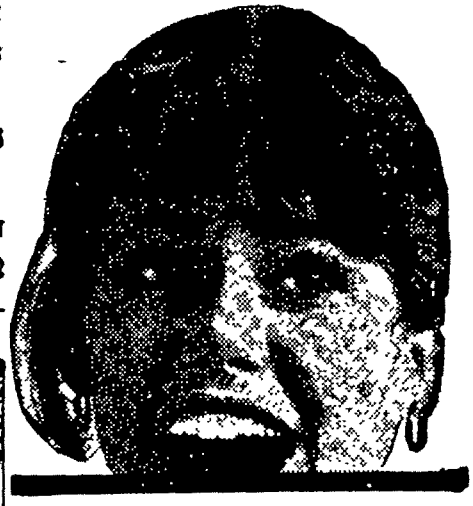

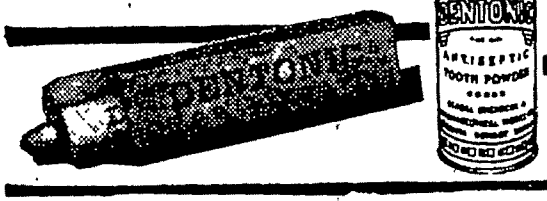

বেঙ্গল কেমিক্যাল

চিরঞ্জীব

বেলা দেবী

সন্ধ্যার ছায়া নেমে আসে। অন্ধকারের মুঠিতলে ঢাকা পড়ে পথের নিশানা। চোখের সামনে কালো মিশমিশে একটা পর্দা কেউ যেন টাঙিয়ে দেয়।

কালোর এক সমুদ্র। তারই মাঝখানে পীড়িত দেহ ও ক্লান্ত মন নিয়ে স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে জসীম। পিছনে কারাগৃহের লৌহকপাট সশব্দে বন্ধ হয়ে যায়। পা দুটো টলছে ওর, মাথায় অসহ্য যন্ত্রণা। মৃত্যুর পরওয়ানা নিয়ে রোগের বীজাণুরা ঘিরে ধরেছে ওকে। তাই দয়াপরবশ হয়ে সরকারী কর্তৃপক্ষ বন্ধনের পরওয়ানা তুলে নিয়েছেন ওর ওপর থেকে। দীর্ঘ তিনটি বছর পর জসীম মুক্তি পেল। এ দিনটির জন্য কী অসীম আগ্রহ আর উৎসাহ নিয়েই মা সে প্রতীক্ষা করে ছিল! কিন্তু সে দিন যদি এলোই, তবে এমন করে এলো কেন?

সামনে পথ। কিন্তু কোথায় যাবে সে? কোন্‌দিকে? কার কাছে? তিন বছর আগে ঠিক এই সময়ে, এই পথেরই উপর দাঁড়িয়ে মুখের ভাষাটুকুকে বাঁচানোর জন্য যারা হৃৎপিণ্ডের রক্ত ঢেলেছিলো তারা কেউ আজ আসে নি তাকে পথের নিশানা বলে দিতে। একা, অসুস্থ দেহে জসীমের কান্না পেতে থাকে। কিন্তু তিন বছর আগের দৃপ্ত দিনগুলি যে তার চোখের সামনে এসে দাঁড়িয়ে বলে—"মনে নেই, সেই যে জসীম নামে এক তরুণ গান গায় শহর গ্রামের পথে পথে, আশা উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ মানুষের সফলতার গান?" কেমন করে বল—কেমন করে সেই শিল্পী আজ বেদনায়, হতাশায় ভেঙে পড়বে?

জসীম অন্ধকারে পা ফেলে ফেলে এগোয়। আলোর ঠিকানা তার চাই-ই।

*** রাতের অন্ধকার ভেদ করে এক ঝলক তীব্র আলো পড়লো ওর পথের উপর। ঝড়ের বেগে বেরিয়ে গেল একটা পুলিশের ট্রাক ওকে পাশ কাটিয়ে। সহসা ওর সামনের কুয়াশার এক পর্দা যেন ছিঁড়ে পড়লো টুকরো টুকরো হয়ে। ওর হৃদয় কেঁপে উঠলো আবেগে। মনে পড়লো আজ ২০শে ফেব্রুয়ারী। ২০শে ফেব্রুয়ারীর রাত। একুশে ফেব্রুয়ারীর সকাল আসবে আগামী সূর্যোদয়ে। বিস্মৃতির সীমানা পেরিয়ে হারিয়ে যাওয়া সুর ফিরে আসে ওর কণ্ঠে—

"আমার ভাইয়ের রক্তে রাঙানো
একুশে ফেব্রুয়ারী
আমি কি ভুলতে পারি?"

১৯৫২-র একুশে ফেব্রুয়ারী। জসীম কি তাকে ভুলতে পারে? কেউ কি ভুলতে পারে সেই উজ্জ্বল চোখ, উচ্ছল হাসি, দীপ্ত হৃদয়গুলিকে?

* * *

সকালবেলা স্নান করে ঘরে ঢুকতে গিয়ে থমকে দাঁড়িয়ে পড়েছিলো মম্লান। ছোট্ট দোলায় দোল দিয়ে গান করছেন তার মা গুনগুন করে—"আয় রে ঘুম আয়!" খিলখিল করে হাসছে ছোট্ট ভাইটা, হাসছেন মা। কী সুন্দর লাগছে! মা-ও গান থামিয়ে তাকিয়ে রইলেন মম্লানের দিকে। কোঁকড়ানো এলোমেলো চুলগুলি কপালের উপর এসে পড়েছে। গা বেয়ে জল পড়ছে চুয়ে চুয়ে। গভীর স্নেহে তাকিয়ে থাকেন মা। খোকাটা আজও ছেলেমানুষ রয়ে গেল! কাছে এসে আঁচল দিয়ে গা মুছে দিতে দিতে প্রশ্ন করেন—"এখনই স্নান করলি যে? কোথাও বের হবি নাকি?"

কথার উত্তর না দিয়ে মা-র গলাটা ছোট খোকার মত জড়িয়ে ধরে সে বলে—"আচ্ছা আম্মা, ওরকম গান করে আমাকেও তুমি দোলা দিতে?" মা হাসতে থাকেন—"ওই গান গেয়েই তো আমার মা ঘুম পাড়িয়েছেন আমাকে। ওই গানটি দিয়েই তো তোদের সকলকে আমি ঘুম পাড়িয়েছি খোকা।"

মম্লান জসীমের দিকে তাকিয়ে বলেছিল—"দেখ তো ভাই, এই গানকে ভুলিয়ে দেওয়া কী সম্ভব?"

ছোট বোন জহুরা হেসেই সারা। বড় ভাই এক পাগল! এ গান কি মায়েরা কোনদিন ভোলে?" কী নির্মমভাবেই না তাদের সেদিন জানতে হয়েছিলো, বড় ভাই পাগল নয়; পাগল হয়ে উঠেছে তারাই। যারা বড় ভাই-এর বুকের রক্ত টেনে বার করেছিলো এ গান ভুলানোর জন্য।

*** জসীম দু'হাতে মুখ ঢাকে। মম্লান ভাই, এত অন্ধকার কেন? সে গান কি সবাই ভুলে গেল?

*** আকাশের বুকে একটা দপদপে তারার দিকে তাকিয়ে তরুণ ছাত্রটির জ্বলজ্বলে চোখ দুটিকে মনে পড়ে ওর। বুলেটের আঘাতে যার দেহ মেডিকেল কলেজের বারান্দা থেকে লুটিয়ে পড়লো পথে। প্রাণহীন দেহে স্বপ্নভরা চোখ দুটি একুশে ফেব্রুয়ারীর পানে চেয়ে রইলো অবাক বিস্ময়ে।

*** বেকার ছেলেটাও সেদিন সভায় যাওয়ার জন্য বের হয়েছিলো। ছেঁড়া জামাটায় তালি দিতে দিতে বৌ রাগ করছিলো—"চাকরি-বাকরির চেষ্টা থুইয়া কত্তা চললেন সভা কোরতে। পেটই যা ভরে কিসে, গতরই বা ঢাকি কোন্ কানিতে?"

কচি বৌটার মুখের সামনে মুখটা এনে মুচকি হেসে গান গেয়ে উঠেছিলো সে—

"তোমার জইন্য আইনবো কন্যা
মেঘ বরইন্যা শাড়ী।"

তিনদিন পর ওর সঙ্গী-সাথীরা অনেক চেষ্টায় ওর বুকের রক্তে রাঙানো তালিমারা সার্টটি ফিরিয়ে দিয়ে এসেছিলো বৌকে।

* * *

কোথায় তারা? কতদূরে? তারা কি হারিয়ে গেল? মিলিয়ে গেল? সত্যি সত্যিই মরে গেল? পথের প্রতিটি লোকের চোখের দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে খোঁজে। কোথায় সেই উজ্জ্বলতা, কোথায় সে দীপ্তি?.....বিরানব্বই ধারা জারী হয়েছে দেশের বুকে। নিপীড়ন আর নিষ্পেষণের স্টীম রোলার স্তব্ধ করতে চায় প্রাণের শেষ স্পন্দনটুকুকে। নিষেধাজ্ঞা জারী হয়েছে একুশে ফেব্রুয়ারীর উপর। কেউ যেন না বলে—"আমি বাঙালী, বাংলা দেশ আমার মা, বাংলা ভাষা আমার জীবনের সঞ্জীবনী সুধা, ভাষা আন্দোলনের শহীদেরা আমার ভাই।"

কিন্তু এই নিষেধাজ্ঞা, নিপীড়নই কী জয়লাভ কোরবে? কেউ আসবে না সদ্য-মুক্ত বন্দী জসীমকে অভিনন্দন জানাতে? কেউ মনে কোরবে না আগামীকাল একুশে ফেব্রুয়ারী? রুদ্ধ হয়ে গেছে মানুষের কণ্ঠ? হারিয়ে গেছে মম্লান ভাইয়েরা, তরুণ ছাত্র আর বেকার যুবক? তাদের ভাষার দাবি মিলিয়ে গেছে এই অন্ধকারের গহ্বরে? দুঃখে, ক্ষোভে, অপমানে, লজ্জায় ওর মুখ পাণ্ডুর হয়ে ওঠে। ধিক্কারে ভরে ওঠে মন। ছি, ছি, ছি, মানুষ কি অন্যায়ের কাছে এমনিভাবেই আত্মসমর্পণ কোরবে? তৃষ্ণায় ওর গলা শুকিয়ে ওঠে। পথের পাশে বসে ধুঁকতে থাকে। ক্লান্তিতে ওর চোখের পাতা ভারী হয়ে আসে। জড়ানো চোখের সামনে ভেসে ওঠে একটা ভারী বুটজুতো যার তলায় পড়ে থেঁৎলে যাচ্ছেন বঙ্কিমচন্দ্র মধুসূদন, আর্তনাদ কোরছেন রবীন্দ্রনাথ, নজরুল, মুখ থুবড়ে পড়ে আছে রসিদ, বরকত জব্বরেরা।

* * *

রাতের অন্ধকারের বুক চিরে ঊষার আলো তখন সবেমাত্র ফুটেছে। ঘুম ভেঙে চমকে ওঠে জসীম। চারদিকে তাকায় প্রচণ্ড বিস্ময়ে। জায়গাটা যে তার অত্যন্ত পরিচিত! চুম্বক যেমন করে টেনে নেয় লোহাকে—তেমনিভাবে কোন এক আকর্ষণ তাকে নিয়ে এসেছে এইখানে। এই তো সামনে ঢাকা মেডিকেল কলেজের হোস্টেল; আর সে শুয়ে আছে যেখানে, তার পাশেই তো তিন বছর আগে ভাষার দাবিতে নিহত

মা কলছিলেন,
আমায় নাকি
দিন-দিনই
কালচে দেখাচ্ছে...

মা তো ছেলের দিক
টেনে কথা কইবেনই।
আসলে কিন্তু নির্মল
আর আমার তারিফ করা
উচিত। তিনি তো জানেন না
ওঁর আদরের ছেলেটিকে
আমিই নির্মল বার সাবানে
কাচা ধবধবে পোশাক
পরিয়ে অমন থোকাটি
করে রেখেছি।

পূর্ব ভারতে বার সাবান
হিসেবে কাটতিতে
সবার উপরে
—সবার সেরা
বলেই।

কুসুম
প্রোডাক্টস লিমিটেড,
কলিকাতা-১

KPN 4812

বাবলা কাঁটা বিঁধে গেছে

জয়ন্ত সাহা

কেমন ছিলে ?

রাজা তুমি ভালই ছিলে খুব দয়ালু
তোমার দয়া তুলনাহীন
পিতার সামনে পুত্র হত্যার কোনই নজির নেই কো তোমার
তোমার বুলেট পিতার বুকে বিঁধিয়ে দিয়ে
তারপরেতে পুত্র হত্যা,—এই রীতিতে খুন করেছ
এখনও তার রক্তের দাগ বাংলা দেশের পথে ঘাটে
মায়ের কান্না স্ত্রীর কান্না শিশুর কান্না, চোখের জলে
পথের পাথর ক্ষয়ে গেছে তবু রক্তের দাগ ওঠে নি।

রাজা তুমি ভালই ছিলে খুব দয়ালু

কেমন আছ ?

এখন তুমি কেমন আছ ?

কুয়োতলায় পা পিছলে পড়ে গিয়ে কোমর ব্যথা ?
যাদুর লাঠি হারিয়ে গেছে ?
তাতে এমন কি হয়েছে; চলবে এবার ধান্দাবাজি
চাতাল জুড়ে নিত্য নতুন ফন্দিফিকির
অন্ধকারে কামড়ে দেবে হাঁটুর নিচে।

আচ্ছা বে তার হাড়ে বাতাস লেগেছে আজ।

কোথায় আছ ?
এখন তুমি কোথায় আছ ?
তোমার ঘরে রৌদ্র ভাসে, কালবৈশাখী বেদম নাচে
আষাঢ় শ্রাবণ ঝরণা ঝরে খিলখিলিয়ে খিলান হাসে
শীতের রাতের আয়েসটুকু অন্ধকারে ভেংচি কাটে ?

আচ্ছা বুড়ো সবাই মিলে ভাবছি বসে অষ্টপ্রহর
এখন তুমি কোথায় আছ কেমন আছ ?

কেন তোমার এমন হলো ?
ভেবেছিলে জনতা নেই রক্তের নেশায় মেতে ছিলে
কিলবিলে সব ইচ্ছে নিয়ে ভেবেছিলে
অট্টালিকার অট্টহাসি তোমার মুঠোয়
কৃপণ হাতে আলো হাওয়া কুক্ষিগত করেছিলে।

ঘড়ির কাঁটা বাবলা কাঁটা বিঁধে গেছে বুকের ভেতর।

শহীদ ভাইদের স্মৃতিস্তম্ভ তুলেছিলো তারা এক রাতের মধ্যে। চোখের জলে, বুকের আগুনে আর মনের শপথে গেঁথে-ছিলো তার ভিত। জায়গাটা বেড়া দিয়ে ঘেরা। সবুজ দূর্বায় ছেয়ে গেছে সেদিনের রক্তে রাঙানো ভূমি। আর তার মাঝখানে ফুটে উঠেছে একটা সূর্যমুখীর কুঁড়ি।

শিল্পী জসীম। ফুলটার দিকে তাকিয়ে গভীর আবেগে ভরে ওঠে ওর মন। ম্লান ভাইয়ের হাসি, ববকতের স্বপ্ন আর নাম না জানা বেকার ছেলের প্রয়াস নিয়ে ফুটে উঠেছে ছোট্ট এক কুঁড়ি। কখন এর পাপড়িগুলি একটা একটা করে খুলে যাবে ? পরিপূর্ণ গৌরবে ফুটে উঠবে কবে ?

একটা প্রচন্ড কোলাহলে ওর চেতনা ফিরে আসে। আশেপাশের বাড়ি, হোস্টেল, বোর্ডিং, মেসগুলির বারান্দায়, ছাদে জড়ো হয়ে মানুষ শ্লোগান দিচ্ছে—বাংলা ভাষার জয় হোক, শহীদ স্মৃতি অমর হোক। প্রত্যেকটা বাড়ির ছাদে ধিক্কারে, অপমানে মাথা নিচু করে আছে একটা করে অর্ধ-নমিত কালো পতাকা। বিস্ফারিত নয়নে তাকিয়ে দেখে জসীম—হিমালয়ের বরফ গলছে। ভিসুভিয়াস জাগছে।

আবার পথে পথে জমে ওঠে মানুষের ভিড়। প্রতিটি লোকের চোখের তারায় তারায় ভাসছে রফিক, জব্বর, সালাম। দু'জন, চারজন, দশজনকে গ্রেপ্তার করে ভ্যানে তোলে পুলিশ। পথে পথে জোট বাঁধে দুলো, চাবশোর জমায়েত। তীব্র আক্রোশে পুলিশবাহিনী পতাকাগুলিকে নামিয়ে ছিঁড়ে ফেলে টুকরো টুকরো করে, কোনোটায় আগুন ধরিয়ে দেয়।

জসীমের হৃদয় উদ্বেলিত হয়ে ওঠে। হারিয়ে যায় নি শহীদেরা, নীরব হয় নি বাংলার কণ্ঠ, মিলিয়ে যায় নি ভাষার দাবি। সমস্ত শক্তিটুকুকে সে জড়ো করে তার কণ্ঠে। তারপর দুরন্ত আবেগে চীৎকার করে গেয়ে ওঠে—

"ও আমার প্রাণের ভাষা, মনের আশা
সোনার বাংলা ভাষাগো!"

ঝাঁপিয়ে পড়ে ওর উপর রাষ্ট্রশক্তি। তবু আর থামে না সে গান। পদ্মা, মেঘনার ঢেউয়ে ঢেউয়ে সে গান ছড়িয়ে পড়ে গ্রাম হতে গ্রামান্তরে। বাতাসে বাতাসে সে গান ভেসে যায় পূর্ব বাংলার পথে প্রান্তরে। চমকে উঠছে ঘুমন্ত মানুষ, কেঁপে উঠছে উদ্যত প্রহরা, জাগছে রবীন্দ্রনাথ, নজরুলের বাংলা, বই বগলে তরুণ ছাত্রের বাংলা; সোনালী রোদ্দুরে ঝিকমিক করা ফসলের স্রষ্টা কিষাণের বাংলা।

আর নতুন সূর্যের লাল রশ্মি গায়ে মেখে দখিনা বাতাসে দুলছে সবুজ ঘাসের মাঝে সেই হলুদবরণ সূর্যমুখীর ফুল—ফুল তো নয়, অগণিত বাঙালীর আশা আর বিশ্বাসের প্রতীক।

পথের কুকুর?

মনোজ বসু

[পূর্ব-প্রকাশিতের পর]

॥ সাতাশ ॥

আনোয়ার কখন থেকে পাঁচিলের চৌকাঠে দাঁড়িয়ে মাঠপারে নিষ্পলক তাকিয়ে আছে। যেমন স্টিমারের সারেং তাকিয়ে থাকে। মাথার উপরের ঈশ্বরও নাকি—ধার্মিকেরা বলে থাকেন।

দেখা দিয়েছে আলো—ঐ যে! ঐ যে! চৌকাঠ থেকে আনোয়ার একলাফে মাঠে পড়ল। ডেকে বলে, আসুন সব, বেরিয়ে পড়ুন এইবারে।

চলেছে জোর পায়ে দস্তুরমতো। দৌড়নো বলতে পারেন। পিছনে কে-একজন মৃদুকণ্ঠে বলল, জয় হোক। ব্যাপারীদের কেউ হবে। হুড়োহুড়ির মধ্যে মিনমিনে কথা কারই বা কানে ঢোকে! আগে আগে আনোয়ার পথ দেখিয়ে নিয়ে চলল। তেপান্তরে মানুষ এমনি ছেড়ে দিলে দায়িত্ব শেষ হয় না, সাথেসঙ্গে থেকে ও-পারের ঘাটে তুলে দিয়ে আসতে হবে। তারপরে ছুটি।

লোকালয় সর্বনেশে জায়গা, মানুষের কাছেই মানুষের বেশি বিপদ। ভাগ্যবশে এ হেন বৃষ্টি-বাদলা ও অন্ধকার পেয়ে গেছ তো এক-ছুটে-লোকালয়-সীমা ছেড়ে মাঠে গিয়ে পড়ো। দাঁড়িয়ে, বসে, তারপর ইচ্ছা-মতন জিরিয়ে নিও।

তারাফুলির ডান হাতে চালের পুঁটলি, বাঁ-হাতটা ফুল্লরার হাতের সঙ্গে জড়িয়ে দিয়েছে। রঙ্গরসের বয়স ও-দুটির—ছুটোছুটি ও মনের উদ্বেগ হলেও বয়সের গুণ যাবে কোথা? ফুল্লরা বলে, কামানের গোলা-হয়ে ছুটেছি ভাই। ঘাটের উঠোন থেকে তেপান্তরের মাঠে আমাদের যেন এক ঝাঁক গোলা বানিয়ে ছুঁড়ে দিয়েছে।

গোলাই বটে! পরিপাটি উপমা। মানুষগুলোর ইচ্ছা-অনিচ্ছা বলে কিছু নেই, তাবৎ ইন্দ্রিয় বিশ্রামে রয়েছে। শুধুমাত্র পা দুটো—সেই পায়ের একমাত্র কাজ এখন দৌড়নো। তল্লাট ছেড়ে মাঠে গিয়ে পড়া। সেই মাঠ পার হয়ে গিয়ে পুনশ্চ লোকালয়—হিন্দুস্থানের এলাকা। সেখানেও বথারীতি বন্দুক উঁচিয়ে আছে জওয়ানে। তখন আবার গোলারূপে বাঁই-বাঁই করে ছুটবে, না কচ্ছপের রূপ নিয়ে খোলায় মুখ ঢুকিয়ে নিঃসাড় হবে—সেই সময়ের বিবেচনা। হামেশাই যারা এপার-ওপার করে, তারা রীতিমত দক্ষ—কোন সময়ের কী ব্যবস্থা, তাদের কিছু বলে দিতে হয় না। ভয়-ভাবনা নতুনদের নিয়ে, তাদেরই কারণে আনোয়ার যাচ্ছে। ঘাটোয়ালের চলাচলে নজর রাখো নতুনেরা—যখন যেমন করে, ঠিক ঠিক তেমনি করে যাও।

ছুটতে ছুটতে তারই মধ্যে তারাফুলি ফুল্লরাকে প্রবোধ দিচ্ছে : দাদুর পাশে পাশে, ঐ দেখ, আনোয়ার-ভাই। ভাবনা কোরো না, দাদুকে ঠিক নিয়ে পৌঁছে দেবে। আমি রয়েছি—নিজেকে নিয়েও ভাবনা নেই তোমার। আনোয়ার-ভাইয়ের চেয়ে আমিও নেহাৎ কম যাইনে।

ছুটছে, ছুটছে। বৃষ্টি বন্ধ হয়ে গেছে, বাতাস আছে। মেয়ে দুটো দল থেকে এগিয়ে পড়েছে বিস্তর। তারাফুলি একসময়ে থেমে দাঁড়াল। ফুল্লরার হাত ধরে টেনে বলে, থামো, হাঁপ ধরে গেছে। মামু-দাদুরা কত পিছনে। ভাবনা করছেন : সোমত্ত মেয়ে দুটো রাত দুপুরে মাঠের মধ্যে সরে পড়ল কোথায়।

ফুল্লরা বলে, গুণ্ডা-বদমাসে ধরে নিয়ে গেছে—তা-ই হয়তো ভাবছেন।

তারাফুলি জোরে জোরে ঘাড় নাড়ল : তা নয়—কক্ষণো নয়। আমায় ধরবে, তেমন গুণ্ডা আজও জন্মে নি। হাত মুচড়ে ভেঙে দেবো না?

খিলখিল করে হেসে উঠল। বলে, এই তো রূপের হাঁড়ি—ধরতে আসবেই বা কোন লোভে?

ফুল্লরা বলে, এটা তো আমারই কথা—তোমার মুখ দিয়ে বেরিয়ে গেল। ভাকসাইটে হতকুচ্ছিত আমি। দেখছ না, এত বড় পূর্ব-বাংলা ঢুঁড়ে বর জোটানো গেল না একটা—পাকিস্তান সারা করে হিন্দুস্থানে যাচ্ছি। বুড়োহাবড়া হাবাগবা অন্ধ-খঞ্জ বর একটা পেলেই হল—আঙুলে আঙুল জড়িয়ে কলাতলায় চুপ করে বসে পড়ব।

বেশ, যাচ্ছি তো জগন্নাথপুর এক-সঙ্গে। দুজনের কাউকে ওঁরা দেখেন নি—কে হারে কে জেতে বোঝা যাবে। নির্ঘাৎ আমার জিত—মুখের দিকে তাকিয়েই, দেখো, থুথু ফেলবেন ওঁরা।

এদিক-ওদিক তারাফুলি জায়গা খুঁজছে : বসা যায় কোনখানে? বসে একটু জিরিয়ে নিই। ততক্ষণে ওঁরা এসে পড়বেন।

কাদা প্যাচপ্যাচ করছে। আরও খানিক দূর এগিয়ে উঁচু জায়গা মিলল। ঝুপসি ঝুপসি জঙ্গল, ইট-ছড়ানো চতুর্দিকে—জোড়া-পিলপে। পিলপের ওপর পাশাপাশি দুজনে বসে পড়ল।

তারাফুলি বলে, কোথায় বসলে জানো? সীমানার পিলপে—তুমি পাকিস্তানের পিলপের উপর, আমি হিন্দুস্থানের পিলপের উপর।

ফুল্লরার সময়োচিত প্রস্তাব : ঘোর শত্রুতা দুই তরফে—লড়াই হোক তবে।

তারাফুলি সঙ্গে সঙ্গে রাজী : হোক না। নতুন আর কি—সেই তো বাইশ দিন জুড়ে সেবারে হয়েছিল।

বক্সিং-এর ভঙ্গিতে দু-হাত মুঠো করে এ-ওর দিকে কটমট চোখে তাকায়। ফিক করে হেসে ফেলল ফুল্লরা।

এইও—

ধমক দিল তারাফুলি ঃ লড়াই তোমার কম্ম নয়। ধরতাইয়ের মুখে দিলে পণ্ড করে। হাসবে তো বাইরের দল—হাতের কাছে হাতিয়ার এগিয়ে দিয়ে তারস্বরে বাহবা দেয়, আস্তিনে মুখ ঢেকে তারাই আবার হাসে। নিজেরা হাসলে জানমান বেহুদা ঢেলে দেবে কেমন করে?

ফুল্লরা ঘাট মেনে নিল ঃ আচ্ছা আচ্ছা, আর হবে না। আর হাসব না।

চতুর্দিকে একবার দৃষ্টি ঘুরিয়ে নিয়ে গম্ভীর কণ্ঠে বলে, দেব-দৈত্য যক্ষ-রক্ষ গন্ধর্ব-কিন্নর নাগ-নিষাদ সর্বভূতে চেয়ে দেখ, রাত দুপুরে মাঠের মধ্যে হিন্দুস্থান-পাকিস্তানের কী ভীষণ জেনানা-যুদ্ধ—

বাহু দিয়ে কঠিন পাকে গলা জড়িয়ে ধরল। তারাফুলি বলে, আঁ-আঁ, দম আটকে সত্যি সত্যি যে মারা যাই।

সত্যিই তো মারছি—

ধমকের পালা এবারে ফুল্লরার ঃ মুক্তমুখ-যুদ্ধে মরণ—সন্ন্যাসরি স্বর্গে চলে যাবে। তাই ভয় পেয়ে তুমি কাঁদতে লেগেছ। লড়াই তোমার কম্ম নয়।

পিছনের সকলে এসে পড়ল। এদিক-সেদিক বসে পড়েছে, বিশ্রাম নিচ্ছে। পরের পা যেখানে পড়বে সে হল আলাদা দেশ—হিন্দুস্থান। বাতাস রীতিমত খর—ঝোপের ডালপালা বাতাসের তোড়ে সপাং-সপাং করে গায়ের উপরে পড়ছে। আষ্টেপিষ্টে চাবকাচ্ছে মানুষগুলোকে।

তারাফুলি আঙুল তুলে দেখায় ঃ মাঠ-কিনারে কুপসি মতন ঐ যে—

মাঠ-পারে সমস্তটা অঞ্চল জুড়ে অন্ধকার হুমড়ি খেয়ে পড়েছে, আলাদা কিছু ফুল্লরার নজরে আসে না।

তারাফুলি বলে যাচ্ছে, মল্লিকমশায়ের তেঁতুলগাছ ঐ। পিছনে বাড়ি। আর কি, বেশি ভরের জায়গাটা কাটিয়ে এসেছি। মল্লিকমশায়ের খাস-এলাকা এবার—হেলে-দুলে যাওয়া যাবে।

বিশ্রাম নিয়ে স্ফূর্তিতে সব উঠে পড়ল। যাচ্ছে—যাচ্ছে—। মাঠ কোণাকুণি পাড়ি ধরল। বিস্তর পথ-সংক্ষেপ, তাড়াতাড়ি পৌঁছনো যাবে।

কিন্তু এ কী—আঁধার মাঠ চিকচিক করে উঠল যে হঠাৎ?

সর্বনাশ, এক-আকাশ মেঘ বাতাসে সমস্ত উড়িয়ে নিয়ে গেছে। পশ্চিম-আকাশে চাঁদও দেখ শয়তানি হাসি হাসছে। আধ ঘণ্টা আর চেপে থাকতে পারল না মেঘ? তা হলে তো পরে পৌঁছতাম। পৌঁছে গিয়ে কাঁকের-কই কাঁকে মিশেছি। সর্বনাশ এক আমরা—আলাদা বাছাই করবে তখন কোন কায়দায়?

কিন্তু হল কই সেটা—কূলে এসে ভরা ডুববার গতিক।

তারাফুলির কানে কানে ফুল্লরা বলে, কেন যে ওঠে চাঁদ বর্ডারে—সকলের গালি খেয়ে মরে।

বিপদটা আরো হয়েছে, দুর্যোগের উল্লাসে পথ-সংক্ষেপ করতে গিয়ে একেবারে জওয়ানদের ঘাঁটির সামনে পড়েছে। রাত দুপুরে দলবদ্ধ মানুষ মাঠ পার হয়ে মিলিটারির মুখোমুখি—আন্দাজ করুন অবস্থাটা।

সে যা-ই হোক, আনোয়ার ঘাবড়াবে কেন? রাজপথের উপরেই কতরকম ঝঞ্ঝাট, আর ব্লাকের পথ যখন একটু-আধটু এমন হবেই। সামাল দেবো বলেই তো সঙ্গে সঙ্গে আসা। ডাল-ভাত এ সমস্ত। ঘাটোয়ালের কাছে। অসুবিধা যত-কিছু, মেয়েলোক নিয়ে। আমাদের ফুলিকে নিয়েও নয়—আর, ঐ বিনি যাচ্ছেন। মাটির উপর, ঘাসের উপর কাদার উপর গড়াগড়ি খাওয়া—বুঝিয়ে দেরে ফুলি কায়দাটা ভাল করে।

ফুল্লরা রাগে গরগর করছে ঃ তুমি পারো আমার দাদুর মতো বুড়োমানুষও পারবেন, কাউকে নিয়ে কিছু নয়—কেবল ভাল করে বোঝাতে হবে আমাকেই? সেটা কোন বস্তু, শুনি?

ফুলি বলে, মাঠের উপর চাঁদের আলোয় খাড়া হয়ে চললে দূর থেকে নজরে আসতে পারে। মামা তাই বলছে, গড়িয়ে গড়িয়ে হাঁটলে কেমনটা হয়? চেষ্টা করে দেখ দিকি। আমায় দেখ—আমি যেমন যেমন করি।

লুফে নেয় ফুল্লরা, কথা শেষই করতে দেয় না ঃ খুব, খুব! কেন্নোয় পারে, বিছেয় পারে, আর জলজ্যান্ত মানুষ হয়ে সামান্য এইটুকু পারব না? এত অপদার্থ ভাবলে তোমরা—ছিঃ!

টুক করে মাটির উপর পড়ল। এদিক-ওদিক তাকিয়ে দেখে, একটা মানুষও খাড়া নেই। গড়াচ্ছে সবাই ছুমিলপন হয়ে।

ওপারেও এই। শ্রীধর মল্লিকের বাড়ি থেকে প্রকাণ্ড একটা দল বেরিয়েছে। নীলকণ্ঠ বর্মা, পাশে-পাশে প্রমথ বিশ্বাস। চিলেকুঠরির তরুণ-তরুণীদ্বয়ও আছে। আরও বিস্তর জন। দিব্যি হেলতে-দুলতে যাচ্ছিল, মেঘ কেটে চাঁদ বেরিয়ে পড়ল হঠাৎ।

আর কি, যে বিয়ের যে মন্তোর! লম্বা হয়ে পড়ুন সব মশায়রা—

এ-দলের দলপতি নন্দ রাউত। ফড়িঙের মতন মানুষ—তিড়িং-তিড়িং করে দলের সামনেটায় একবার চক্কোর দিয়ে এলো। ঠিক আছে, নন্দ প্রসন্ন।

আর কি, গুটিগুটি এগোন এবার মশায়রা। শব্দসাড়া নয়।

পারাপারের বিধিনিয়ম সব ঘাটেই মোটামুটি এক। বিস্তর ঘা খেয়ে বিজ্ঞেরা তরে নিয়ম বেঁধে দিয়েছেন। শুধু মল্লিকঘাট কেন—চাঁদের আলোয় দৃষ্টিটা লম্বা করতে পারেন তো দেখে নিন, অক্ষাটের ঘাটে ঘাটে অগুন্তি মানুষ মাটির উপরে গড়াচ্ছে।

নীলকণ্ঠ বর্মার ভারী দেহ, বিশাল উদর। গড়াতে কষ্ট হচ্ছে। প্রমথ বিশ্বাসকে বললেন, আস্তে চলো হে। সকলের পিছনে পড়ে গেলাম, অন্তত তুমি কাছাকাছি থাকো। খানাখন্দে পড়ে গেলে টেনে তুলতে পারবে।

পুরনো স্মৃতি প্রমথর মনে উঠছে। বহুকাল আগে ছোট্ট বয়সে এই পথেই বরযাত্রী হয়ে গিয়েছিল। মেজোমামার বিয়ের প্রমথ নিতবর। দাদামশায় বরকর্তা—সাদা দাড়ি-গোঁফ, যাত্রার মুনি-ঋষির মতন, চেহারার এই মাত্র মনে আছে। স্ফূর্তিবাজ মানুষ ছিলেন তিনি। বুড়োমানুষ বলে তিনিও পাল্কিতে যাচ্ছেন, বরের আগে আগে তাঁর পাল্কি। মাঠে নেমে সর্দার-বেহারার উপর বারম্বার হাঁক পাড়ছেন ঃ গলা ছাড়ুরে সাদার—চারদিকে বিশখানা গ্রামের শুনতে পাওয়া চাই। বলি, ভাত খাস নি, বার্লি-সাবু খেয়ে এসেছিস?

বাজনদারদের উপর তড়পাচ্ছেন ঃ আট-ঢোল আট-কাঁসিতে আকাশ এতক্ষণে চৌচির হয়ে ভেঙে পড়ার কথা। তা নয়, বাইজির যেন ঘুঙুর বাজানো হচ্ছে।

তা আকাশ না ভাঙুক, মানুষের কানের পর্দা ফেটে চৌচির হচ্ছে। দাদামশায়ের তবু সন্তোষ নেই—পাল্কি থেকে মুখ বাড়িয়ে বারম্বার চেঁচাচ্ছেন ঃ বাজা রে বাজা—

ফোঁস করে দীর্ঘশ্বাস ছাড়ল প্রমথ ঃ উঃ, কতদিনের কথা! একফোঁটা আমি তখন। আলোয় আলোয় দিনমান বানিয়ে এই মাঠ তোলপাড় করে চলেছিলাম। আর আজকে—

তিক্তকণ্ঠে নীলকণ্ঠ বললেন, খুব বেশি দিন আর কোথা! আঠারোটা বছর আগেও তাই চলত। এই তো সেদিন! আঠারো বছর কতটুকুই বা সময়। ইতিহাসের হিসাবে?

এই নিশিরাত্রে আরামের ঘুম ঘুমুচ্ছে বাংলা দেশের উভয় খণ্ড—পূর্ব-বাংলা আর পশ্চিম-বাংলা। মাঝ-বরাবর বর্ডার চলে গেছে দুস্তর নদীর মতন। আগে ছিল না, আইন করে বানিয়ে দিয়েছে আঠারোটা বছর আগে। হুদ্দুস না নামে কোনখানে, ঘোগ না দেখা দেয়—সীমানা অটুট, রাখবার জন্য অতন্দ্র উভয় পক্ষ। জওয়ানেরা

চব্বিশ ঘণ্টা পাহারায়, রাজকোষ জলের মতন অর্থ ঢালছে। ভাত জোটে না আমাদের, দায়ে পড়ে তবু বন্দুকের টাকা যোগাই।

সুখী মানুষেরা আছেন বই কি! দু-পারেই। গায়ে আঁচড়টি লাগে নি—স্বাধীনতা বিশেষ করে তাঁদেরই। কণিকামাত্র লোকসান ঘটে নি, পুরোপুরি মুনাফা। দিনমানে সমারোহে স্বাধীনতা ভোগ, নিশাকালে নিশ্ছিদ্র নিদ্রা। আনন্দ-যজ্ঞে আমাদের কে ডাকতে যাচ্ছে? উদ্বাস্তু আমরা—অন্ত্যজ। ভারবোঝা স্বরূপ—যাদের বাংলায় এসে আশ্রয় নিয়েছি তাদের কাছে। জনান্তিকে বলা-বলি হয়ঃ বেটারা মহাভারতের ঘটোৎকচ। নিজেরা তো মরবেই, আর দেখ কুরুকুল আমাদের চেপে নিয়ে পড়েছে—আমাদেরও না মেরে ছাড়বে না।

দিনমানটা অল্পচেষ্টায় কাটে, রাত হলে মুখ তুলে ওদিক পানে তাকানোর ফুরসত পাই—আমার বাপ-পিতামহের ভিটা যে-রাজ্যে পড়ে রয়েছে। স্বজনেরা কে কোন দিকে ছিটকে গেল—নিশ্বাস ফেলি তাদের কথা ভেবে। হিন্দু-মুসলমান বলে ফারাক নেই এ বাবদে। পাশপোর্ট-ভিসা জোটানো ক'জনেরই বা সাধ্যে কুলায়! তা-ও ইদানীং বন্ধ। মন মানে না, পাগল হয়ে বেরিয়ে পড়ছি। তার-পরে এই কাণ্ড দেখুন—কখনো ছুটে পালানো, কখনো বা ভুঁয়ে গড়ানো।

অপরাধ আমাদের কি বলুন দিকি। নেতামশায়দের প্রাণ ভরে বিশ্বাস করা, নেতার কথায় জান-মান কবুল করা আর নেতার নামে জয়ধ্বনি দিয়ে আকাশ ফাটানো? চাঁদ কি দেখতে পাচ্ছে আমাদের এই হাল? চাঁদ যেন কৌতুকী মানুষ—উপর দিকে তাকালে হঠাৎ মনে হতে পারে। কালো চাদরের মতো মেঘে ক্ষণে ক্ষণে মুখ ঢাকছে—টিপিটিপি মজা দেখছে আবার চাদরটা সরিয়ে দিয়ে। খাড়া খাড়া মানুষ, হায় হায়!—পলকে কেমন কচ্ছপ হয়ে গেল—কচ্ছপ হয়ে গুটেগুটে করে বর্ডার পার হচ্ছে। পনের-বিশটা ঘাটের এপারে-ওপারে দলের পর দল—বীরেশ্বরের মতন প্রবীণ অধ্যাপক এবং নীলকণ্ঠের মতন দিকপাল পণ্ডিতও আছেন, সবসুদ্ধ কচ্ছপ বানিয়ে ছাড়ল।

যাচ্ছে মানুষ গড়িয়ে গড়িয়ে। শ্রান্তিতে কাতর, তবু থামা চলবে না। বিপদের পথ সম্পূর্ণ কাটিয়ে তবে বিশ্রাম। অন্য কিছু পারে না তো গালিগালাজ করছে সাধ মিটিয়ে। আঙুল মটকে মটকে অভিশাপ দিচ্ছেঃ যাদের কারণে এই দুরবস্থা, বিচার কোরো তাদের খোদাতালা—এত পাপের রেহাই না-হয় যেন। অবিরাম এমনি সব কথা—মুখের কথাতেই মনের পরে প্রতিহিংসা নিচ্ছে।

গড়াতে গড়াতে নীলকণ্ঠ বর্মা এক-বার বলে উঠলেন, ভাল হচ্ছে—খুব ভাল। আবাল-বৃদ্ধ-বনিতার গেরিলা-লড়াই শেখা হয়ে যাচ্ছে। এরই তো দিনকাল। এত আয়োজন নিয়েও আমেরিকা নাজে-হাল হচ্ছে ভিয়েতনামে। মহাচীনেও একদা চিয়াং-কাইশেকের পিছনে আমেরিকা খুঁটি হয়ে দাঁড়িয়েছিল, দেশ ছেড়ে পালিয়ে চিয়াংকে তবু দ্বীপে এসে আশ্রয় নিতে হল। গেরিলা-লড়াইয়ের গুণে।

প্রমথ বিশ্বাস বলল, গেরিলা এমনি জিনিষ?

ঠিক এই। হাতে অস্ত্র-শস্ত্র নাও, বোমা নিয়ে নাও—পুরোপুরি লড়ুইয়ে সিপাই।

আর এপারে বীরেশ্বর বলছেন, দেখ, অতি-মন্দের মাঝেও ভাল দিক আছে। ঘনকালো মেঘের গায়ে রুপোলি রেখা। মতলবী নেতাদের উস্কানিতে জনতা ক্ষেপেছিল, অস্বীকার করি কেমন করে? —দাঙ্গা-হাঙ্গামায় ঝাঁপিয়ে পড়েছিল। দেড় যুগ যেতে না যেতেই চোখ ফুটে গেছে সকলের, কত ধানে কত চাল বুঝে নিয়েছে। ভাঙনের যাঁরা মূল-গোঁসাই তাদের ফুটেছিল সকলের আগে। কর্ম ফতে হতে না হতেই দিব্যজ্ঞান—পরিণামের আন্দাজ পেয়ে আঁতকে উঠেছিলেন। থুতু ফেলেছেন, গিলতে পারলে বেঁচে যেতেন, এমনি অবস্থা। শোনো— [ক্রমশঃ]

রঙ্গমঞ্চ ও দেশ ও বিদেশ

[পূর্ব-প্রকাশিতের পর]

লিরিক হ্যামারস্মিথ ঃ

নিগেল প্লেফেয়ার এবং লিরিক হ্যামারস্মিথ ঃ কিভাবে প্লেফেয়ার লিরিকে অভিনয় শুরু করলেন সে কাহিনী এবার বলছি। ১৯১৮ সালে—তিনি তখন ছোট ছোট ভূমিকায় অভিনয় করতেন—প্লেফেয়ার একদিন একটি চ্যারিটি ম্যাটিনি শোয়ের জন্য কিছু দৃশ্যপটের খোঁজে ঘুরতে ঘুরতে হ্যামারস্মিথের পুরনো কাপড়চোপড়ের এবং পোষাক-পত্তরের বাজারে একটি পরিত্যক্ত রঙ্গ-গৃহের সামনে এসে পড়লেন। এই রঙ্গগৃহের চারপাশে ছিল শামুক এবং ফিস এণ্ড চিপসের দোকান। রঙ্গগৃহ-টির পোষাকী নাম ছিল 'দি লিরিক ওপেরা হাউস', কিন্তু স্থানীয় লোকে-দের কাছে এটি 'দি ব্লাড এণ্ড ফ্লি-পিট্' হিসাবেই পরিচিতি লাভ করেছিল।

এদিকে অন্যের প্রডাকসনে ছোট-খাট ভূমিকায় অভিনয় করতে করতে প্লেফেয়ার যেন ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলেন—তাছাড়া তিনি মনে করছিলেন তাঁর মনে এমন কতকগুলো মজাদার আইডিয়াজ আছে—যেগুলো জনসাধারণের সামনে অভিনয়ের মাধ্যমে তুলে ধরা দরকার। এই সব সাত-পাঁচ ভেবেই তিনি ঐ পরিত্যক্ত রঙ্গগৃহটি কিনে ফেললেন। তাঁর প্রথম দিকের একটি নাটক এক বছর ধরে চলেছিল. এর অল্প পরেই আর একটি প্লে মঞ্চস্থ করলেন এবং এটি প্রদর্শিত হয়েছিল প্রায় ১৫০০ রজনী। চোদ্দ বছর ধরে প্রায় তিনি নাটক পরি-চালনা করেছিলেন এই লিরিক থিয়েটারে—শেরীডেন, গে, ড্রাইডেন, কনগ্রেভ, বিকারস্টাফে, মলিয়ের, শেক্সপীয়ার, গোল্ডস্মিথ, ওয়াইল্ড পিনেরো এবং পিরানদেল্লোর নাটকগুলোই তিনি প্রডিয়ুস করেছিলেন এই সময়ের ভেতর। ১৯৩২ সালে তিনি লিরিকের ম্যানেজ-মেণ্টের ভার পরিত্যাগ করেন এবং তার পরেই রঙ্গগৃহটি আবার বিস্মৃতির গর্ভে বিলীন হয়ে যায়। হ্যামারস্মিথের লিরিক থিয়েটারে নিগেল প্লেফেয়ারের নাটক প্রডাকসনের এই হল সংক্ষিপ্ত ইতিহাস।

থিয়েটারের ব্যবসায় যখন কোন জন-প্রিয় ম্যানেজার বেশ সাফল্যলাভ করেন তখন লোকে তাঁর বর্ণনা দিতে গিয়ে বলে 'হি ইজ হ্যাভিং এ ফ্লেয়ার'। ততোটা জনপ্রিয় না হতে পারলে পরিচালককে 'মিসারেবল লাকী' বলে অভিহিত করা হয়। প্লেফেয়ারকে সব সময়েই বলা হোত লাকী—অবশ্য তার কারণ এ নয় যে তিনি ব্যক্তিগতভাবে জনপ্রিয়তা অর্জন করতে পারেন নি—কিন্তু এই পেশার লোকেদের মনে বরাবরই একটা সন্দেহের ভাব ছিল যে, তিনি অব্যব-সায়িক মনোবৃত্তিসম্পন্ন প্রডিউসার। কারণ হ্যামারস্মিথে এই ঝুঁকিপূর্ণ থিয়েটার চালানোর ব্যাপারে প্লেফেয়ার কোনও রকমের পেশাদারী মনোবৃত্তির—যথা টাকা রোজগারের উচ্চাকাঙ্ক্ষা, নিজে ভাল ভাল ভূমিকায় অভিনয় করা,

আর্নল্ড বেনেট-ডেভিড লো'র ক্যারিকেচার

যে সব নাটক জনসাধারণ দেখতে চায় না অথচ যেগুলো তাদের দেখা উচিত সেই সব নাটকের মঞ্চরূপায়ণের দ্বারা দর্শক-শ্রেণীকে শিক্ষিত করে তোলার জন্য অনুপ্রাণিত হয়ে কাজে নামেন নি। তিনি খোলাখুলিভাবেই বলতেন—"আমি যে সব নাটক ভালবাসি, সেগুলো আমার পছন্দমত ধরণে প্রডিয়ুস করে এই থিয়েটারে আনন্দ উপভোগ করতে পারবো বলেই রঙ্গমঞ্চটি নিয়েছি।" থিয়েটারের পেশাদারগোষ্ঠী তাঁর এই মনোভাবকে স্বার্থপরতাদুষ্ট এবং কাণ্ড-জ্ঞানবর্জিত দৃষ্টিভঙ্গীর পরিচায়ক হিসেবে মনে করতো।

অথচ তাঁর এই প্রচেষ্টা প্রচণ্ড সাফল্যমণ্ডিত হল—এতে পেশাদার শ্রেণীর লোকেরা আরও বিরক্ত বোধ করতো। তিনি যদি আর একটু গুরু-গম্ভীর চালে নিজের কাজ সম্বন্ধে বড় বড় কথা বলতেন, তাঁর প্রচেষ্টার পেছনে একটা মহৎ উদ্দেশ্য আছে এইরকম একটা ভাব দেখাতেন, অন্যান্য নাট্য-ব্যবসায়ীরা নিশ্চয় তাঁকে নিজেদের একজন বলে গ্রহণ করে নিতেন। এই পরিস্থিতি আরও খারাপ হয়েছিল আর একটা কারণে। রঙ্গগৃহের বাইরে তিনি থিয়েটারের লোকেদের সঙ্গে প্রায় মিশতেনই না—**Talking shop frankly bored him.** নিজের আত্ম-জীবনীতে প্লেফেয়ার লিখেছেন—"থিয়েটারের বাইরে গিয়ে যে বিষয়ে আলোচনা করতে আমি সত্যিই ঘৃণা বোধ করি, সেটা হচ্ছে থিয়েটার এবং ঐ বিষয়ক কোনো কিছু। রঙ্গগৃহের দেয়ালের অভ্যন্তরে আমাকে রোজ পড়ে যার ঘণ্টা করে কাটাতে হয়—সেখান থেকে যখন হাঁফ ছেড়ে বাইরে আসতে পারি, তখন সেই সব ব্যাপার নিয়েই আলাপ-আলোচনা করতে ভাল লাগে যার বিষয়ে জ্ঞান আমার সীমিত—যেমন ব্যারোক আর্কিটেকচার, আইনস্টাইন বা প্রিজনার্স বেইথ।

প্লেফেয়ার নিজেও বেশ জানতেন যে, থিয়েটার মহলে অভিনয়শিল্প সম্বন্ধে তাঁর হাল্কা মনোভাব সম্পর্কে একটা দুর্নাম প্রচলিত আছে। এইজন্য তিনি যেন আরও বেশি মজা পেতেন যখন তাঁকে পেশাদারী অভিনয়শিল্পীদের সঙ্গে আলোচনা করতে হোত—ইচ্ছা করেই তিনি এমন ভাব দেখাতেন যাতে শ্রোতাদের মনে হোত যে অভিনয় এবং রঙ্গমঞ্চকে তিনি একটা বিরাট আমাসার মত মনে করেন।

থিয়েটারের প্রতি সমগ্রভাবে তাঁর অবশ্য সত্যিই একটা অপেশাদারী দৃষ্টি-ভঙ্গী ছিল। তাঁর প্রত্যেক নাটকের পরিবেশ সৃষ্টি করতে গিয়েই প্লেফেয়ার একটি রহস্যময়তার ভাব আনতেন। এ সম্বন্ধে যে সব দর্শকের রুচি তাঁর সঙ্গে মিলতো তাঁরাই তাঁর নাটকের প্রডাকসন পছন্দ করতেন—যারা ভিন্ন-রুচির তাদের প্লেফেয়ারের প্রডাকসন ভাল লাগতো না।

তাঁর পরিচালিত বাস্তববাদী নাটকের মঞ্চরূপায়ণ হত অত্যন্ত নিকৃষ্ট শ্রেণীর। রিয়ালিস্টিক প্লের সার্থক প্রডাকসন করতে হলে যে সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম ব্যাপারে নজর দিতে হয়, যে কারিগরী দক্ষতার প্রয়োজন তার জন্য অসীম ধৈর্য এবং দক্ষতার প্রয়োজন—নিগেল প্লেফে-য়ারের এসব গুণ ছিল না—এ জাতীয় কাজ তাঁর একঘেয়ে বোধ হত। যে সব নাটকে পরিচালক নিজের কল্পনাশক্তিকে রাশ আলগা করে ছেড়ে দিতে পারেন, যে সব প্রডাকসনে প্রডিউসারের নিজস্ব সৃষ্টি করবার অবকাশ আছে, সেই জাতীয় নাটক নিয়ে কাজ করতেই তিনি আনন্দ পেতেন। থিয়েটারের প্রতি একটা গভীর দায়িত্ববোধ—এই গুণটিই হচ্ছে পেশাদারী থিয়েটারওয়ালাদের প্রধান বৈশিষ্ট্য—নিগেল প্লেফেয়ারের এই জাতীয় দায়িত্ববোধ একেবারেই ছিল না। লিরিকের কাজ করতে করতে যখন তিনি ক্লান্ত হয়ে পড়লেন, অত্যন্ত সহজভাবেই তিনি থিয়েটারটি পরিত্যাগ করে সরে এলেন—যেমন শিশুরা কোন খেলনা নিয়ে খেলতে খেলতে কিছু সময় পর ঐ খেলনা সম্বন্ধে ক্লান্ত হয়ে পড়ে এবং অন্য বিষয়ে মন দেয়। নিজের থিয়েটারের মাধ্যমে হ্যামারস্মিথে প্লেফেয়ার যে ঐতিহ্য গড়ে তুললেন, সেটা যাতে সেখানে রক্ষিত হয় এবং এগিয়ে চলে এ বিষয়ে কোন প্রচেষ্টাই আর করলেন না। এ জায়গায় থিয়েটার তৈরি করে—তিনি যেন শুধুমাত্র নিজে আনন্দ পাবার জন্যই নাটক মঞ্চস্থ করছিলেন—সেই সে আনন্দ শেষ হয়ে এল সঙ্গে সঙ্গেই ব্যাপারটার পরিণতি ঘটল।

অন্তরে অপেশাদারী মনোবৃত্তির প্রাধান্য থাকলেও, থিয়েটারের পরিচালনা এবং নাটক প্রডিয়ুস করার ব্যাপারে তাঁর পেশাদারদের মতই দক্ষতা ছিল। অথচ বাইরে একটা ছাড়া ছাড়া ভাব দেখাতেন।

যে কোনও দল লিরিকে অভিনয় করতে এলে সাদরে অভ্যর্থনা লাভ করতেন প্লেফেয়ারের কাছ থেকে—অর্থাৎ হোস্ট হিসাবে তিনি ছিলেন আদর্শ শ্রেণীর. এমন একটা ভাব দেখাতেন যেন দলটির কাছ থেকে সত্যিকার একটা আনন্দপূর্ণ অনুষ্ঠান প্রত্যাশা করছেন ঐ সন্ধ্যার জন্য। নিজেদের দলের রিহার্সালের সময় এমন একটা উৎসাহ এবং উত্তেজনার ভাব দেখাতেন যে মনে হোত, যে নাটক নিয়ে মহলা করছেন সেটি লিরিকের অন্যতম মনোমুগ্ধকর প্রডাকসন হিসাবে প্রতিষ্ঠা লাভ করবে। পরিচালকের এই উৎসাহ এবং উত্তেজনার ভাবটা দলের অন্যান্য সবার ভেতরও সঞ্চালিত হত। অথচ সব ব্যাপারটাই হোত অত্যন্ত সহজ এবং স্বাভাবিকভাবে। প্রডাকসনের প্রস্তুতির সময় কোন দিক থেকেই তিনি নিজের পরিচালনার কাজটাকে প্রকট করে তুলতেন না। এর ফলে আপাতদৃষ্টিতে তাঁর অনেকগুলো মঞ্চসফল নাটক যেন পরিচালনা ছাড়াই সার্থকভাবে মঞ্চস্থ হয়েছে বলে মনে হোত। এই ভুল বোঝার ফলেই তাঁর কাছে যে সব অভিনেতা কাজ করতো, তাদের অনেকেই প্রডিউসার হিসাবে নিগেল প্লেফেয়ারকে সঠিক মর্যাদা দিতে পারে নি। তাদের মনে হোত নাটকের মঞ্চরূপায়ণে তিনি কাজের কাজ কিছুই করেন নি। মহলার সময় নিজেকে সব বিষয়ে প্রকট করে না তোলার জন্য এবং রিহার্সালের একঘেয়ে কাজের দিকটা সুযোগ্য স্টেজ ডিরেকটর স্টিফেন টমাসের ওপর ছেড়ে দেওয়াতে, দলের অনেকে ভাবতো তাঁর মনে প্রডাকসনটি সম্বন্ধে কোনও স্পষ্ট প্ল্যান বলে কিছু নেই। একথা তারা বুঝতো না যে নট-নটীদের মনে কাজের সম্বন্ধে একটা বিরাট আনন্দের ভাব সংক্রামিত করাটা —যা প্লেফেয়ার করতেন—প্রডিউসারের দক্ষতার সব থেকে বড় সার্টিফিকেট। প্লেফেয়ার না বুঝতে দিয়ে তাদের কাজে তাদের কন্ট্রোল করতেন, তাদের প্রাণে

১৯৬৯তে আপনার ভাগ্য

যে-কোন একটি ফুলের নাম লিখিয়া আপনার ঠিকানাসহ একটি পোস্টকার্ড আমাদের কাছে পাঠান। আগামী বারমাসে আপনার ভাগ্যের বিস্তারিত বিবরণ আমরা আপনাকে পাঠাইব. ইহাতে পাইবেন ব্যবসায়ে লাভ লোকসান, চাকুরীতে উন্নতি, বদলী, জন্ম, বিবাহ ও সুখ-সমৃদ্ধির বিবরণ : আর থাকিবে দুষ্ট-গ্রহের প্রকোপ হইতে আত্মরক্ষার নির্দেশ। একবার পরীক্ষা করিলেই বুঝিতে পারিবেন।

PT. DEV DUTT SHASTRI
RAJ JYOTISHI (B. M. W)
P.B. 86, JULLUNDUR CITY

উৎসাহ এবং উদ্দীপনা জাগাতেন অপ্রত্যক্ষ ভঙ্গীতে, ঐ একই ভাবে তাদের চিন্তা করতে, উদ্ভাবন করতে সাহায্য করতেন—আর এই সব গুণের জন্যই তাঁর পরিচালিত নাটকগুলো সত্যিকার সাফল্যের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে পেরেছিল। মহলার সময় তাঁর একটা আকস্মিক মন্তব্যের ফলে সমগ্র প্রডাকসনটির চেহারা আমূল পাল্টে যেত—একটু এদিক-ওদিক করে দিয়ে অতি সাধারণ নাটককেও প্লেফেয়ার অনেক সময় অসাধারণত্বের স্তরে উঠিয়ে নিয়ে এসেছেন।

নাটকাভিনয়ে ঠিকমত নট-নটীকে নির্বাচনের ব্যাপারে প্লেফেয়ার ছিলেন সত্যিকার প্রতিভাসম্পন্ন পরিচালক। সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ অভিনেতারও যদি ভেতরে অভিনয়ক্ষমতা থাকতো, তা তাঁর নজর এড়িয়ে যেতে পারতো না। উদাহরণ হিসাবে মিল্‌ন-এর 'মেক বিলিভ' নাটকটির নাম করা যেতে পারে—এটি দিয়েই প্লেফেয়ার লিরিক থিয়েটারের শুভ উদ্বোধন করেছিলেন। এ নাটকের বিভিন্ন ভূমিকায় নেমেছিলেন হার্বার্ট মার্শাল, এঞ্জেলা ব্যাডেলী, হারমিয়ন ব্যাডেলী এবং লেজলী ব্যাঙ্কস—সে সময় এঁরা সবাই ছিলেন অখ্যাত—কিন্তু পরে প্রত্যেকেই প্রখ্যাত অভিনেতা, অভিনেত্রী হিসাবে প্রতিষ্ঠালাভ করেছিলেন।

সুযোগ্য সহকারী নির্বাচনেও তাঁর যথেষ্ট কৃতিত্বের পরিচয় পাওয়া যায়। তাঁর নিজস্ব বিশেষ ভঙ্গীর প্রডাকসনে দরকার পড়তো এমন ধরণের ডিজাইনারদের যাদের চিন্তাধারার সঙ্গে তাঁর নিজের চিন্তাধারার মূল ঐক্য থাকবে।

রিস্ট ওয়াচ

মাত্র ৬৲ টাকায়

আমাদের চেন পদ্ধতি স্কীমের মাধ্যমে মাত্র ৬৲ টাকায় ৫ বৎসরের গ্যারান্টী সমেত ৫ জুয়েল রিস্ট-ওয়াচ লাভ করুন। ডাকমাশুল ১/১৫ টাকা অতিরিক্ত।

দ্রষ্টব্য : আমাদের মধুচন্দ্রিমা সেলের বিক্রয় বৃদ্ধির জন্যই এই স্কীম চালু করা হইল। পছন্দ না হইলে মূল্য ফেরৎ।

SWISS WATCH TRADING CO.
P. B. 87, (WBC) Jullundur City.

কম্পোজারস্‌-এর নির্বাচন ব্যাপারেও ঠিক এইরকমই যোগ্যতার পরিচয় দিয়ে গেছেন প্লেফেয়ার। তিনি 'দি বেগার্স ওপেরার' যে প্রডাকসন করেছিলেন তাতে থিয়েটারের বিভিন্ন বিভাগের পরিচালকদের যে সহযোগিতা দেখা গিয়েছিল তা ইংলিশ থিয়েটারেও সচরাচর দেখা যায় না।

প্লেফেয়ারের প্রডাকসনের একটা নিজস্ব ভঙ্গী এবং সার্থকতা ছিল—কিন্তু এজন্যই যে ওয়েস্ট এণ্ডের দর্শকরা হ্যামারস্মিথে এসে তাঁর এইটিনথ সেঞ্চুরির ক্ল্যাসিকস দেখবার জন্য ভিড় জমাতেন সেকথা বললে ঠিক হবে না। তখনকার দিনে লণ্ডনে একমাত্র শিল্প হিসাবে সার্থক হলেই থিয়েটার জমতো না। নাটকের সাফল্যের জন্য তাকে ফ্যাসনেবলও হতে হোত। লিরিক থিয়েটার হিসাবে ফ্যাসনেবল হয়েছিল—এর মূল কারণ ছিলেন আরনল্ড বেনেট। বেনেট সাত বছর লিরিকে প্লেফেয়ারের কো-ডিরেকটর হিসাবে কাজ করেছেন। থিয়েটার ডিরেকটর হিসেবে আরনল্ড বেনেটের অনেক দোষত্রুটি ছিল। তাঁর ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে মতামত বেশির ভাগই ভুল হোত, কোন্ নাটক সাফল্য অর্জন করবে, কোন্ নাটক তা পারবে না এ সব বিষয়েও তাঁর খুব সীমিত জ্ঞান ছিল। মানুষ হিসাবে ছিলেন বেশ অহঙ্কারী এবং একগুঁয়ে। নিজের ভুল বুঝতে পেরেও স্বীকার করতে চাইতেন না। আর একটা বড় দোষ ছিল—নিজের লেখা নাটক মঞ্চস্থ করবার জন্য জেদ করতেন। তবে তাঁর গুণও ছিল অনেক এবং তুলনায় দোষের দিকটাকে ছাপিয়ে গুণের দিকটাই ওজনে ভারী হোত। বেনেট থিয়েটারের ব্যবসার দিকটা সত্যিই ভাল বুঝতেন—সংখ্যাতত্ত্ব ছিল তাঁর হাতের মুঠোর ভেতর। যতদিন তাঁর ওপর কর্তৃত্ব ছিল, কোন কর্মচারী তার ন্যায্য পাওনা থেকে বঞ্চিত হোতো না। অথবা যা পাওয়া উচিত তার বেশিও কাউকে দেওয়ার উপায় ছিল না। এ ছাড়া প্রতিটি পেনী খরচ করা হত সত্যিকার কাজের জন্য। বেনেটের নজর এড়িয়ে বাজে পয়সা খরচ করবার কোন উপায় ছিল না। আর সব থেকে বড় কথা হল এই থিয়েটারটির ওপর তিনি নিজস্ব প্রভাবের ছাপ রাখতে পেরেছিলেন। সাফল্যের দায়িত্ব যেন বেনেটকে ঘিরে থাকতো—আর তিনি ছিলেন প্রচারের বিষয়ে সর্বজ্ঞ। নাটক অভিনয়ের প্রথম রাত্রিগুলোতে বক্স তাঁর উপস্থিতি যেন দর্শকদের এই থিয়েটারের স্থায়িত্ব এবং উন্নতির বিষয় নিঃসন্দেহ করে দিত। যতদিন তিনি এখানকার বোর্ড অভ ডিরেকটরস্‌-এর চেয়ারম্যান ছিলেন, সংবাদপত্রাদির রঙ্গালয় বিভাগের খবরাখবরে লিরিক থিয়েটারের কথা প্রায়ই উল্লেখ করা হোত।

লিরিককে ফ্যাসানেবল থিয়েটার হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করতে প্লেফেয়ারের অবদানও কম নয়। তাঁর ব্যক্তিত্ব ছিল অসাধারণ। থিয়েটারের বাইরেও তাঁর অগণিত বন্ধুবান্ধবের দল ছিল। অনেক বিষয়েই ওপর ওপর জানবার তাঁর একটা আন্তরিক আগ্রহ ছিল, তাছাড়া তাঁর তীক্ষ্ণ সেন্স অভ হিউমার থাকাতে আলাপচারী হিসাবেও তাঁর বিশেষ খ্যাতি ছিল। লণ্ডনে যে সব পার্টি তিনি দিতেন সেগুলোতে যোগ দিয়ে সবাই খুব আনন্দ পেত। লিরিকের পরিবেশটা ছিল অত্যন্ত বন্ধুত্বপূর্ণ—দর্শকদের বেশির ভাগই ব্যক্তিগতভাবে প্লেফেয়ারকে জানতেন—তাই এখানে থিয়েটার দেখাটা একটা ঘরোয়া উৎসবের অনুষ্ঠানের মত হয়ে দাঁড়িয়েছিল। কিন্তু তাই বলে গায়ে পড়ে দর্শকদের সঙ্গে মাখামাখি করবার একটা উৎকট প্রয়াস প্লেফেয়ার কখনও করতেন না।

নর্মান-মার্শাল ডিরেকটর হিসাবে প্লেফেয়ারের প্রশংসা করতে গিয়ে যে কথা বলেছেন, অর্থাৎ তিনি উগ্রভাবে নিজেকে পরিচালক হিসাবে জাহির করতে চাইতেন না—রিহার্সালে "he was so amiable about it that most of the cast were willing to join in and to think and invent on their own, perhaps seldom realising to what extent they were being controlled and inspired by the producer, or how much their performances owed to an occasional casual remark or to those touches of business with which Playfair could transform an ordinary performance into a first-rate one"—The Other Theatre : Norman Marshall—তা প্রত্যেকে নাট্যপরিচালকের ভেবে দেখা উচিত। ব্রেশ্‌টও অনেকটা এইভাবেই নাট্য পরিচালনা করতেন। প্রত্যেক নট-নটীকে নিজস্বভাবে ফুটে উঠতে দেওয়াই পরিচালকের কর্তব্য—এই ফুটে ওঠার ব্যাপারে পরিচালক সাহায্য করবেন, কিন্তু ডিকটেটরের মত তাদের যা কিছু করণীয় তা ডিকটেট করবেন না। ডিরেকশন দেওয়া আর ডিকটেট করা এক কথা নয়।

[ক্রমশঃ]

খবর বলছি

সমীক্ষা : ফেব্রুয়ারী ১৯৬৯ সালের বাংলা। অন্তর্বর্তীকালীন নির্বাচন অনুষ্ঠিত হলো। যুগান্তকারী ঐতিহাসিক নির্বাচন। বাংলাদেশের রায় এসে গেছে—প্রতিক্রিয়াশীলদের দুর্গ ব্যাসটাইল ভেঙে চুরমার। জনগণের হাতে পরাজিত রণক্লান্ত সেনাপতিরা পলায়নে ব্যস্ত। বিজয়-দর্পে আকাশে উড়ছে তারুণ্যের প্রতীক রক্তরাঙা নিশানা, আবিরের রাঙিমায় রক্তিম বাংলার মাটি। নতুন যুগের আলোর ছটায় আকাশ-বাতাস লাল হয়ে রয়েছে।

নির্বাচনপর্ব শেষ হয়েছে। নির্বাচনের দিনটি এবং পরবর্তী ক'টি দিন ভুলবার নয়। নির্বাচনের খবর জানতে মানুষ পাগল। কচি শিশু থেকে অশীতিপর বৃদ্ধ-বৃদ্ধা জয়-পরাজয়ের হিসেব-নিকেশ করছেন। মানুষ শুনতে চায় খবর—খবর—শুধুমাত্র খবর। রেডিওতে খবর শুনতে কাতারে কাতারে মানুষ দাঁড়িয়ে থেকেছে। বেতার কর্তৃপক্ষ নির্বাচনী সংবাদ মোটামুটি সুষ্ঠুভাবে জানিয়েছেন। অবশ্য সেই সঙ্গে নিজেদের কিছু কাজ গুছিয়ে নেবার ব্যবস্থাও করেছেন। গত ১২ই ও ১৩ই ফেব্রুয়ারীর সমীক্ষায় একজন সাংবাদিক নির্বাচন সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করলেন। সাংবাদিক বললেন,—গরীবের পার্টি যুক্তফ্রন্ট। ফ্রন্টের নেতারা অভিজ্ঞ ব্যক্তি। শ্রীজ্যোতি বসু অর্থমন্ত্রী ছিলেন সুতরাং ওই দপ্তরে ও'র অভিজ্ঞতা প্রশ্নাতীত। শ্রীসুবোধ ব্যানার্জীর শ্রমমন্ত্রিত্বের অভিজ্ঞতাও কম নয়, ইত্যাদি ইত্যাদি। সাংবাদিক যুক্তফ্রন্টের প্রশংসায় পঞ্চমুখ। অবশ্য স্তব-স্তুতির ফাঁকে সাংবাদিক ভদ্রলোক কংগ্রেস সম্পর্কে ভুল খবর দিয়ে জনসাধারণকে বিভ্রান্ত করতে কম চেষ্টা করেন নি। তিনি বলেন, নির্বাচনে কংগ্রেস শতকরা ৪৫টি ভোট পেয়েছে, যা গতবারের থেকে নিঃসন্দেহে বেশি। অথচ সাংবাদিক যে-দৈনিকের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট, সেই কাগজের খবর (১৫-২-৬৯) কংগ্রেস পেয়েছে শতকরা মাত্র ৪০·৪ ভোট। আমাদের বেতার কর্তৃপক্ষের কাছে অভিযোগ—জাতির জীবনের একটি পরমক্ষণে এমন একজন সাংবাদিককে বেছে নেওয়া হলো কেন? বাংলাদেশে নিরপেক্ষ সাংবাদিকের কি অভাব আছে?

শুনেছি ইনি নাকি একটি দৈনিক পত্রিকার দায়িত্বশীল কার্যে নিযুক্ত আছেন। যে-দৈনিক পত্রিকার ভূমিকা যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রিসভার অপসারণে প্রভূত সাহায্য করেছিল। এঁরা রাষ্ট্রপতির শাসনের প্রশংসাতেও পঞ্চমুখ। আজ বাতাস ঘুরেছে, প্রতিক্রিয়াশীল মানুষও ভোর হবার আগেই বিপ্লবী হয়ে পড়লেন। যাঁরা যুক্তফ্রন্ট নেতাদের মুণ্ডপাত করে এসেছেন, বেতার কর্তৃপক্ষ তাঁদেরই এক একজনকে দিয়ে ফ্রন্টের প্রশস্তি গাওয়াচ্ছেন।

অথচ নিরপেক্ষ ও অভিজ্ঞ সাংবাদিকদের হরিজন জ্ঞানে দূরে ঠেলে রাখবার চেষ্টা করছেন। স্বভাবতই মনে হচ্ছে, আকাশবাণীও বাজে লোকের বক্তৃতায় আড্ডাখানায় রূপান্তরিত হয়েছে।

আমরা কলকাতা এবং দিল্লীর ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে অনুরোধ করছি, বেতার কেন্দ্রের বিভিন্ন বিভাগ পরিচালকদের রদবদলের প্রয়োজন প্রকট হয়ে পড়েছে। বিশেষ করে বাংলা 'টক্‌স' বিভাগটি ঢেলে সাজানোর প্রয়োজন। ইতিমধ্যে অনেক দেরি হয়ে গেছে, আর নয়—আন্দোলন করে কর্তৃপক্ষের ঘুম ভাঙানোর প্রয়োজন না ঘটলেই ভালো।

আমাদের অভিযোগ বর্ণচোরা শ্রীমানদের বিরুদ্ধে। আজ এঁরা লভ্যাংশ পেতে রঙ পাল্টাচ্ছেন। জনসাধারণ আশা করি, এঁদের চিনে রেখেছেন। কলকাতা বেতার কর্তৃপক্ষ একটি চক্র সৃষ্টি করেছেন। এই চক্রের গুণাগুণতি ক'টি সভা টক্‌স, সমীক্ষা, পরিক্রমা, নাটক ও আলোচনার সর্বত্র বিচরণ করছেন। বেতারের যাবতীয় প্রোগ্রাম আলোচ্য ব্যক্তিদের এবং তাঁদের দলের হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে। এরা দু-তিনটি সংবাদপত্রগোষ্ঠীর মুখপাত্র। ঝোলে-ডালে-অম্বলে—সংবাদপত্রের পাতায় পাতায়, ময়দানের 'মুক্ত অঙ্গনে'র ন্যাকামিতে, লোক ঠকানোর বকানোর কবিতা উপন্যাস নাটক রচনায় যাঁরা তন্ত্রমন্ত্রসিদ্ধ বেতার তাঁদেরই করতলগত। কলকাতা বেতার কেন্দ্রের বারো আনা প্রোগ্রাম আজ এঁদের হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে। যাঁরা তুলে দিলেন ভাবগতিক দেখে মনে হয়, তাঁদের হয়তো ধারণা তাঁরা কর্মী নন, বেতার কেন্দ্র তাঁদের ব্যক্তিগত সম্পত্তি।

এ বিষয়ে তথ্য ও বেতারমন্ত্রী এবং ডিরেক্টর জেনারেলের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। কলকাতার বেতার কর্তৃপক্ষ এবং কয়েকটি বিভাগীয় পরিচালক ও সহ-পরিচালকদের পক্ষপাতিত্ব সমালোচনার ঊর্ধ্বে উঠে গেছে; এঁদের সম্পর্কে অতি শীঘ্র সাবধান হওয়া বাঞ্ছনীয়।

যাত্রায় ইতিহাস সৃষ্টিকারী নাটক তরুণ অপেরার

"হিটলার"

১১০নং রবীন্দ্র সরণী, কলিকাতা—৬। ফোন : ৫৫-৭১২১

বিশ্বজনের মতামত

যাত্রাশিল্পিগণ নির্বাচন এবং আঙ্গিক গঠনের দিক ইহাকে যুগোপযোগী করিয়া লইতে সক্ষম হইয়াছেন। তাহাতেই বাঙ্গালীর এই শ্রেষ্ঠ লৌকিক অনুষ্ঠানটি বিনাশের হাত হইতে রক্ষা পাইবে। **ডক্টর আশুতোষ ভট্টাচার্য**

যাত্রাভিনয় জগতে তরুণ অপেরার হিটলার নূতন ইতিহাসের গৌরব নিয়ে দর্শকদের সামনে উপস্থিত হইয়াছে। **বিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায়**

তরুণ অপেরার হিটলার যাত্রা নায়ক নাটকে এবং অভিনয়ে যুগান্তর আনিয়াছে। **ডক্টর সাধন ভট্টাচার্য**

তরুণ অপেরার হিটলার পালার মধ্যে ঘটনার তীব্র ঘাত-প্রতিঘাত ও শ্বাসরোধকারী উত্তেজনা সৃষ্টি করতে নাট্যকার সম্পূর্ণ সক্ষম হয়েছেন। একদিকে আক্রান্ত রাশিয়ার প্রবল জাতীয়তাবাদ অন্যদিকে দুর্ধর্ষ জাতির লৌহনায়ক হিটলারের গভীর ট্রেজেডি নাটক মূর্ত হয়ে উঠেছে। এরকম যুদ্ধ-নাটক যাত্রায় দেখেছি বলে মনে হয় না। **ডক্টর অজিত ঘোষ**

শক্তিশালী অভিনব প্রযোজনার ফসল তরুণ অপেরার হিটলার প্রচণ্ড আলোড়ন সৃষ্টি করেছে। **ডক্টর গৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্য**

তরুণ অপেরার হিটলার যাত্রাজগতে অনবদ্য অবদান। আধুনিক ইতিহাসকে অবলম্বন করে ২য় বিশ্বযুদ্ধের পটভূমিকায় এঁরা যে নূতন রীতির যাত্রার আয়োজন করেছেন তাতে মুগ্ধ হতে হয়। **হরেন ঘোষ, উপাধ্যক্ষ শিলিগুড়ি মাধ্য, কলেজ**

রঙ্গজগৎ

'গুপী গাইন' বিরোধ প্রসঙ্গ

এক সংবাদে প্রকাশ সত্যজিৎ রায়ের 'গুপী গাইন বাঘা বাইন' ছবিটির নিগেটিভ এখন বোম্বাইয়ের কোন ফিল্ম ল্যাবরেটরিতে রয়েছে। ছবিটির প্রিন্ট সেখানেই তৈরি হবে। ছবিটির প্রিন্ট ছিল কলকাতায় ইণ্ডিয়া ফিল্ম ল্যাবরেটরিতে। প্রকাশ যে গত ৫ই ফেব্রুয়ারী ওই ল্যাবরেটরির পক্ষ থেকে এক চিঠিতে প্রযোজক অসীম দত্তকে জানিয়ে দেওয়া হয় যে, বর্তমান অস্থির অবস্থার দরুণ উক্ত চিত্রের প্রিন্ট তৈরিতে দেরি হতে পারে। সুতরাং প্রিন্টের ডেলিভারির জন্য প্রযোজক যেন পীড়াপীড়ি না করেন। এই চিঠি পেয়ে প্রযোজক নিগেটিভ ফেরৎ চান, এবং সেটি বোম্বাইয়ের ফিল্মস ফিন্যান্স কর্পোরেশনের দপ্তরে পাঠিয়ে দেওয়া হয়। প্রকাশ, ওই সংস্থা ছবির প্রিন্ট করিয়ে দেবার ব্যবস্থা করছেন।

এই ছবিটি নিয়ে কিছুকাল থেকে নানা রকমের কথা শোনা যাচ্ছে। খবরের কাগজের পাতায় নানা চিঠিপত্রও প্রকাশিত হয়েছে। সাংবাদিক সম্মেলনে প্রযোজক অসীম দত্ত অভিযোগ করেছিলেন 'গুপী গাইন'-এর প্রিন্ট নষ্ট করার অথবা আটক রাখার হুমকী দেওয়া হয়েছে। সত্যজিৎ রায় বলেছিলেন—যদি তা' হয় তা' হলে তিনি বাংলাদেশে ছবি না করে অন্যত্র ছবি করার কথা ভাববেন। চলচ্চিত্র সংরক্ষণ সমিতির সঙ্গে এই ছবি নিয়ে একটা রিলিজ চেনের বিরোধ। সেই রিলিজ চেনে বর্তমানে 'আপনজন' ছবি চলছে। 'আপনজন'-এর পরে 'গুপী গাইন' দেখাবার জন্য প্রযোজকদের সঙ্গে সেই রিলিজ চেনের পূর্ব থেকে চুক্তি রয়েছে। সংরক্ষণ সমিতি বলছে 'আপনজন'-এর পরে অরোরা 'আরগ্য নিকেতন' দেখাতে হবে। রিলিজ চেনে এতে রাজী না হওয়ায় সংরক্ষণ সমিতি নাকি মুক্তির প্রতিবন্ধক সৃষ্টি করবে। এমন শোনা যাচ্ছে যে প্রিন্ট যদি যথাসময়ে এসে পড়ে তা' হলে পিকেটিং করে 'গুপী গাইন'-এর প্রদর্শনী বন্ধ করা হবে। অবশ্য সংরক্ষণ সমিতির পক্ষ থেকে এরকম কোন ঘোষণা এখনো করা হয় নি। তবে ইণ্ডিয়া ফিল্ম ল্যাবরেটরিতে মিনার বিজলী ছবিঘরের বিরুদ্ধে পোস্টার দেওয়া হয়েছে। পোস্টারগুলি দেখে মনে হচ্ছে ব্যাপারটা সংরক্ষণ সমিতি সহজে ছাড়বে না। 'আরোগ্য নিকেতন'-এর প্রযোজক সংরক্ষণ সমিতির নেতা। ওদিকে 'গুপী গাইন'-এর প্রযোজক দৃঢ়ভাবে মনে করেন সময়মত প্রিন্ট এসে গেলে 'আপনজন'-এর পরে 'গুপী গাইন' মুক্তি পাবেই।

সেন্সর সার্টিফিকেটের তারিখের অনুক্রম হিসাবে ছবি মুক্তি পাওয়ার ব্যবস্থা একদিকে ভাল। এতে সব প্রযোজকের ছবি মুক্তি পাবার গ্যারান্টি থাকে। কিন্তু যে সকল ক্ষেত্রে আগে থেকে রিলিজ চেনের চুক্তি হয়ে গেছে সে সকল ক্ষেত্রে ব্যতিক্রম না করলে রিলিজ চেন প্রযোজকের ক্ষতির সম্ভাবনা। এরকম দু-এক ক্ষেত্রে সংরক্ষণ সমিতি বিবেচনা করেছে যখন তখন এই ছবি নিয়ে বিরোধ বাড়িয়ে তুলবে না বলে আমরা মনে করি। অবশ্য এর মধ্যেও উত্তমকুমারের মত সংরক্ষণ নেতারা যদি বাইরের রাজনীতি দেখেন তবে ত' আপোষের সম্ভাবনাই থাকবে না। উপরন্তু অবস্থা আরও জটিল হবে। কারণ ছবির প্রযোজক ও প্রদর্শক কে সে কথা মানুষ ভাবে না ভাববে সত্যজিৎ রায়ের ছবি। সত্যজিৎ রায়ের ছবির মুক্তিতে বাধা দিলে মানুষ কি সহ্য করবে? ভুললে চলবে না যে, সত্যজিৎ রায় বাঙালীর কাছে শুধু চিত্র পরিচালক নন, একজন শ্রদ্ধেয় শিল্পস্রষ্টা। সুতরাং সংরক্ষণ সমিতিকে বর্তমান পরিস্থিতি বিবেচনা করে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে আমরা অনুরোধ করি। গত সংখ্যায় আপোষের কথা লিখেছিলাম, আবার সে কথাই বলছি। —সুজন।

সুচিত্রা সেন

চিত্রআলোচনা

দুরন্ত চড়াই

'দুরন্ত চড়াই' গত শুক্রবার মুক্তিলাভ করেছে। ছবিটি গতানুগতিক পর্যায়ের নয়; কিছুটা স্বতন্ত্র স্বাদের। পরিচালক জগন্নাথ চট্টোপাধ্যায় ছবির অংশবিশেষ শিল্প-শোভনতা ও কল্পনাশক্তির পরিচয় দিয়েছেন। এই শিল্প-কল্পনার প্রশংসা সবাই করবেন। ছবির আর একটি আকর্ষণ আউটডোর সুটিং; যার জন্যে ম্যাসানঝোর অঞ্চলের এবং উষ্ণী জলপ্রপাতের সৌন্দর্য দর্শকরা উপভোগ করবেন, এবং এই প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের পটভূমিতে কাহিনী গড়ে উঠেছে। 'দুরন্ত চড়াই'-এর কাহিনীকার সমরেশ বসু। চিত্রনাট্য রচনা করেছেন জগন্নাথ চট্টোপাধ্যায়।

এই কাহিনীর নায়িকা কৈশোর আর যৌবনের সন্ধিক্ষণে এক চরম ভুল করেছিল যে ভুলের মাশুল দিতে হয়েছে তাকে অনেকদিন। তার বিয়ের কথা হয় কিন্তু শেষ মুহূর্তে ভেঙে যায়। এ সময় ছোট ভাই সাধন বুদ্ধি খাটিয়ে দিদিকে ছোট বোন সাজিয়ে এক পাহাড়ী স্বাস্থ্যাবাসে নিয়ে এল। সেখানে তার বন্ধু বিনয় আসবে তার বোনকে নিয়ে। চারজনে কয়েকদিন আনন্দে থাকবে। এর মধ্যে যদি বিনয়ের পছন্দ হয়—তবে দিদির জীবনের একটা হিল্লে হয়। এই স্বাস্থ্যাবাসে

নানা রকমের লোক এসেছে, নানা বাতিকের মানুষ। তার মধ্যে রয়েছে এক প্রাণখোলা হাসি-উচ্ছ্বাসময় যুবক। পেশায় সে কারখানার মজুর। কাজেই কিছুটা অপাঙ্‌ক্তের এবং অন্যদের কাছে পাগল পর্যায়ের লোক। বিনয়রা অতি আধুনিক, তার বোন যৌবনসচেতন। সাধনের শিক্ষা ও মানসিকতা সেই চঞ্চলার সঙ্গে গতিবেগ রেখে চলার মত নয়। তাই এক দুর্বল মুহূর্তে সে বলে ফেলে যাকে সে ছোট বোন সাজিয়েছে আসলে সে তার দিদি। সমস্ত সাজানো নাটকের এখানেই ছেদ পড়ে। ইতিমধ্যে নায়িকার মনে একটা স্বপ্ন উঁকি মারছে—সে যেন মুক্তির রঙ দেখতে পাচ্ছে। এই ঘটনার পর সে মনস্থির করে ফেলে সমস্ত বাধা অতিক্রম করে সেই কারখানার শ্রমিক, উচ্ছ্বাসময় যুবকটির হাত ধরে দ্রুতবেগে এক্কা গাড়ি চালিয়ে এগিয়ে যায়। এতদিন পরে দুরন্ত চড়াই পেরিয়ে সে জীবনকে লাভ করল।

এই কাহিনী রূপায়ণে পরিচালক যথেষ্ট কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন। নায়িকার পূর্বস্মৃতি মনে করার ফ্ল্যাস-ব্যাকে তার জীবনের ভুলের মুহূর্ত এবং পরবর্তী পরিণতিগুলি দেখানো; আবার এক সময় যখন অতীতকে ভুলতে চেষ্টা করছে অথচ পারছে না—মনের সেই অবস্থায় তন্দ্রাচ্ছন্ন এক স্বপ্ন-মুহূর্তকে কেবলমাত্র নিগেটিভের সাহায্যে (ঘটনার পুনরাবৃত্তি) দেখান চমৎকার কল্পনা-শক্তির পরিচায়ক। এই শিল্প-শোভন মুহূর্ত রচনায় পরিচালক যে কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন তার তুলনা হয় না। ফ্ল্যাসব্যাকে সাঁওতালদের এক লোককথা রূপায়ণ যথেষ্ট উপভোগ্য এবং কৌতূহলোদ্দীপক। এ ছাড়া ঝরনার ধারে এবং স্থানে স্থানে কয়েকটি কম্পোজিশন চমৎকার। কিন্তু কাহিনীর পূর্ণতায় পরিচালক ও চিত্রনাট্যকার যথাযথ সমাজ-চেতনার পরিচয় দিতে পারেন নি। শ্রেণীচেতনা ত' নয়ই। বিনুর অতি আধুনিকা বোনকে দিয়ে পরিচালক চরম যৌনরস পরিবেশন করেছেন; তার একটা অর্থ হত যদি তার মধ্যে শ্লেষ থাকত। কিন্তু এক্ষেত্রে সাধন যত বোকা হয়েছে এই আধুনিকার শূন্যতার প্রতি ইঙ্গিত তেমন স্পষ্ট নয়। আবার সব জেনে-শুনে নায়িকাকে বিয়ে করতে বিনয়ের রাজী হয়ে যাওয়ায় কোথায় যেন সঙ্গতির অভাব। তার ক্লাশ পজিশন থেকে এত উদার হওয়ার কথা নয়। তাই মনে হয়েছে এ দুটি চরিত্র উপস্থাপনায় কাহিনীর নাটকীয় দ্বন্দ্ব পরিণতি লাভ করেছে সত্যি, কিন্তু পরিচালক ছন্দ ঠিক রাখতে পারেন নি। নায়কের ব্যাপারে অর্থাৎ শিক্ষা ও সংস্কারের দম্ভ-মুক্ত সে যে একজন মেহনতী মানুষ এবং এই মেহনতী মানুষের মধ্যেই নায়িকা মুক্তি পেয়েছে, তার উপর আরো জোর আরোপিত হলে ছবিটি একটা ভাল বক্তব্য নিয়ে বেরিয়ে আসতে পারত।

অভিনয়ে নায়িকারূপে মাধবী মুখার্জীকে খুবই স্বাভাবিক এবং সুন্দর মনে হয়েছে। এই সঙ্গে সহানুভূতিশীল ভাইরূপে দিলীপ রায় উপযুক্ত সঙ্গতি রেখে চরিত্রটি প্রকাশ করেছেন। এক অবসরপ্রাপ্ত আই-এ-এস এবং উদারচেতা শিল্পীর চরিত্রে অভিনয় করেছেন বিকাশ রায়; এবং সংকীর্ণমন-শিক্ষাগর্বী-অধ্যাপক হয়েছেন হারাধন বন্দ্যোপাধ্যায় এবং এক বাতিকগ্রস্ত স্বামী-স্ত্রী সেজে-ছেন জহর রায় ও পদ্মা দেবী। ছবি ও উপন্যাসের ছকবাঁধা এই চরিত্রগুলি যথা-যথ অভিনীত হয়েছে। নায়কের প্রতি দর্শকদের যথেষ্ট সহানুভূতি জাগাবে অনুপকুমারের অভিনয়; যদিও কিছুটা বাড়াবাড়ি আছে চরিত্রটিতে। বোম্বাই-এর সবিতা চট্টোপাধ্যায় এক বাধা-না-মানা যৌবন-উছলা যুবতীর ভূমিকা অভিনয় করেছেন। অন্যান্য চরিত্রে আছেন সোমেন চক্রবর্তী, শিশির বটব্যাল, অপর্ণা দেবী প্রমুখ।

শ্যামল মিত্র পরিচালিত সঙ্গীতাংশ সুরের দিক থেকে ভাল লাগলেও ওই পাহাড়ী প্রাকৃতিক পরিবেশে বিদেশী যন্ত্রের ব্যবহার পীড়াদায়ক মনে হয়েছে। শ্যামল মিত্রের পরিবেশজ্ঞান দুর্বল। চিত্র গ্রহণে শক্তি ব্যানার্জী কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন। ছবির উপভোগ্যতায় ক্যামেরার স্থান অনেক-খানি রয়েছে।

জগন্নাথ চ্যাটার্জী পরিচালিত 'দুরন্ত চড়াই' ছবিতে অনুপকুমার ও মাধবী মুখার্জী

'বিবাহ বিভ্রাট' ছবিতে অনুপকুমার ও লিলি চক্রবর্তী

চন্দ্রশেখর

নাট্যকার—অমৃতলাল বসু

ইংরেজের আইনে নিষিদ্ধ অংশগুলি নাট্যকারের মূল পাণ্ডুলিপি হইতে সংগৃহীত।

উদ্ধৃতি—

শৈবালিনী—ইংরেজ ধরে নে গেছল—

গুরগণ—ইংরেজ? একবার পেলে হয়—মীরকাশেম মসনদে থাক, তার সহায় হয়ে বাংলা হতে ইংরেজ নাম লোপ করব।—

মীরকাশেম—পাপাত্মা এই রাজ্য ইংরেজদের বিক্রয় করবে।

প্রতাপ—ইংরেজকে বাংলা থেকে তাড়াতে হবে—

অভিনব সংস্করণ—মূল্য ঃ দুই টাকা

বসুমতী প্রাইভেট লিমিটেড ঃ

১৬৬, বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী স্ট্রীট, কলিকাতা—১২

স্টুডিও খবর

প্রথম প্রেম

তুর্গেনেভের দেড় শত জন্মবর্ষ উপলক্ষে সোভিয়েট রাশিয়ায় মসফিল্ম স্টুডিও 'ফার্স্ট লাভ'-কে চিত্ররূপ দিচ্ছে। তুর্গেনেভের রচনা প্রথম প্রেমের এই কাব্যগাথা আমাদের দেশে অনূদিত হয়েছে। নিজের জীবনকে কেন্দ্র করে স্মৃতিকথামূলক রচনারীতিতে আইভান তুর্গেনেভ এই রোমাণ্টিক উপন্যাস রচনা করেছিলেন তার পরিণত বয়সে, যখন কৈশোর এবং যৌবনকে ব্যাখ্যা করার মত শক্তি তাঁর লাভ হয়েছে। মানুষের জীবনে প্রথম প্রেমের গুরুত্ব যে অপরিসীম; সুখ এবং দুঃখবোধ এই প্রেমের অভিজ্ঞতার সঙ্গে জড়িত। চিত্রনাট্যকার কাহিনীকে আধুনিক পটভূমিতে উপস্থিত করেন নি। গত শতাব্দীর ত্রিশ দশকের পটভূমিতে কাহিনী রূপায়িত হবে। নায়ক ভ্লাডিমিরের চরিত্রে এবং নায়িকা জিনাইদা জাসেকিনার চরিত্রে যথাক্রমে রূপ দেবে নিকোলাই বারলায়েভ এবং ইরিনা পেচেরনিকোভা। ছবিটি পরিচালনা করছে ভাসিলি অর্ভিনেস্কি।

হিন্দী ছবিতে কলকাতার শিল্পী

কলকাতার মঞ্চ ও চিত্রাভিনেতা অসীমকুমার বোম্বাইয়ের একটি ছবিতে অভিনয় করে যথেষ্ট নাম করেছেন। তবে নামটা অসীমকুমার না হয়ে হয়েছে মনীশ। কারণ বোম্বাইতে অসীমকুমার নামে একজন অভিনেতা রয়েছেন, তাই বাংলার অসীমকুমারকে মনীশ হতে হয়েছে। ছবির নাম 'সরস্বতী চন্দ্র'। গান্ধীজীর প্রিয় গুজরাটি উপন্যাস 'সরস্বতী চন্দ্র'-র চিত্ররূপে চিত্রতারকা নতুনের সঙ্গে অসীমকুমার নায়কের ভূমিকায় অভিনয় করেছেন। ছবিটি অসাধারণ জনপ্রিয় হয়েছে। ছবিটি পরিচালনা করেছেন শ্রীগোবিন্দ সারাইয়া। বাংলাদেশে অসীমকুমার 'নীলাচলে মহাপ্রভু', 'কিছুক্ষণ' ইত্যাদি ছবির এবং 'সেতু' 'দ্বিধা' প্রভৃতি নাটকের নায়ক।

কলকাতার সুমিতা সান্যাল একটি হিন্দী ছবিতে অভিনয় করার জন্য চুক্তিবদ্ধ হয়েছে। ছবির নাম 'আশীর্বাদ'।

ভারতীয় নৃত্যকলা মন্দিরের নৃত্যানুষ্ঠানে নৃত্যভঙ্গিমায় কানাই মজুমদার।

পরিচালক কুন্দনকুমার। বিশ্বজিতের সঙ্গে সুমিতা নায়িকারূপে অভিনয় করবে। ছবির প্রযোজক হৃষীকেশ মুখার্জী।

মুক্তিপ্রাপ্ত ছবি

১৪ই ফেব্রুয়ারী শহরের সিনেমায় মুক্তি পেয়েছে :

বাংলা : দুরন্ত চড়াই (জগন্নাথ চ্যাটার্জী)।
বিবাহ বিভ্রাট (অসীম বন্দ্যোপাধ্যায়)।

ইংরেজী : সার্জেন্ট রাইকের (মেট্রো)।
হাফ এ সিক্স পেন্স (এলিট)।

সংবাদিকী

বেতার ও যাত্রা আঙ্গিকের অভিনয়

গত ২৬শে ও ২৭শে জানুয়ারী বোম্বাই ক্রিশ্চিয়ান ক্লাব ও জুনিয়র আর্টিস্ট সেণ্টারের যুগ্ম প্রযোজনায় নেতাজী ও স্বদেশী আলেখ্য প্রদর্শনী এবং ইংরাজী ও বাংলা কয়েকটি বিশেষ আঙ্গিকের নাট্যোৎসব অনুষ্ঠিত হয়েছে। বোম্বাইয়ে এক সন্ধ্যায় এই অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন এম এন সুব্রহ্মানিয়ম।

প্রথম দিনের অনুষ্ঠানে চিত্র প্রদর্শনী, নাট্যালোচনা ছাড়া ছিল নেতাজী, বিবেকানন্দ জীবনালেখ্য সম্বলিত শ্রীসুমন্ত্র রচিত "দুই পুরুষ" ট্যাবলো অনুষ্ঠান। কিশোর শিল্পীদের দিয়ে এটি পরিচালনা করেন জয়ন্তি রায়।

দ্বিতীয় দিনের অনুষ্ঠানে ছিল— আমেরিকা রয়েল একাডেমীর নাট্যোত্তীর্ণা মিলি মনরো অনুদিত সুমন্ত্র রচিত "আলো আলো"-র ('Light Light') ইংরাজী মঞ্চরূপায়ণ। এবং বেতার ও চলচ্চিত্র আঙ্গিকে ফিল্ম স্টিল স্যাতে ও বিচিত্র শব্দ সহযোগে "কল্যাণী আসছে" ও "পয়েণ্টেড স্যু-র" (প্রহসন) বেতার নাট্যের অভিনব মঞ্চরূপায়ণ। পরিকল্পনা ও পরিচালনা করেছেন সুমন্ত্র চট্টোপাধ্যায়। সহযোগিতায় ছিলেন মিলি মনরো। সঙ্গীত পরিচালনায় মণিলাল নাগ।

"কল্যাণী আসছে" নাটিকাটি উত্তরপাড়া 'রূপকল্পের' শিল্পীদের দ্বারা টেপ সহযোগে পরিবেশিত।

স্বর্গ

আগামী ২৩শে ফেব্রুয়ারী মহাজাতি সদনে সকাল ন'টায় শিশু স্বর্গের অনুষ্ঠানে এবার যাদুকর এস কে সাহার যাদুবিদ্যা, নাটক 'আমরা সবাই ফুল' পরিবেশনা মৈত্রেয়ী ছোটদের সংস্থা এবং সঙ্গীত ও হাস্য-কৌতুক।

পশ্চিম জার্মানীর নৃত্যশিল্পী রেবেকে শেরলেট ... ...

খেলা ধূলা

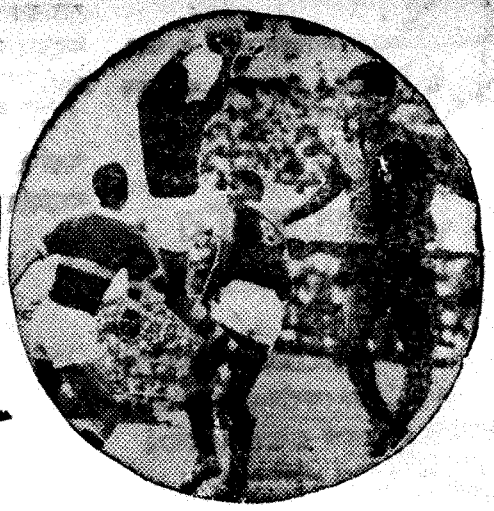

কম্পোজিট স্টেডিয়াম

কলকাতার ইডেন উদ্যানে কম্পোজিট স্টেডিয়াম তৈরি করার একটা প্রস্তাব বেশ কিছুদিন অনেকের মনেই ঘোরাফেরা করছে। আর এই প্রস্তাবটাও উঠেছে আই· এফ· এ'র এক সময়ের এক কর্তাব্যক্তির কাছ থেকেই। সংগে সংগে কথাটাও মনে ধরেছে অনেকের। ধরার কথাই বটে। এক ঢিলে দু' পাখী মারার প্রচেষ্টা কি আর সাধু না হয়ে যেতে পারে। কলকাতায় একটা পূর্ণাঙ্গ ফুটবল স্টেডিয়ামের দাবি কলকাতার ক্রীড়ারসিকদের অনেক দিনের পুরোন চাহিদা। জনমতের চাপে আর ফুটবল কর্তৃপক্ষের কৃপায় স্টেডিয়াম সম্বন্ধে নানা কথা শোনা যায়। এই হচ্ছে, এই তো কাজ আরম্ভ হলো বোলে—আরো কতো কি! কিন্তু হচ্ছে হচ্ছে করে আসলে কিন্তু শেষ পর্যন্ত আর কিছুই হয় না। আজ থেকে বছর দশেক আগে কলকাতার ফুটবল স্টেডিয়ামের বিষয়টি যে অবস্থায় ছিলো, এখনো রয়ে গেছে সেই তিমিরেই। আশার আলো অবশ্য আমরা অনেকবারই দেখেছি, কিন্তু হতাশায় ডুবে যেতে তারপর আর খুব একটা বেশি সময় লাগে নি। আর চিরকালের স্টেডিয়াম সমস্যা নিয়ে কেউ বেশি চিন্তাও করেন নি।

কিন্তু সেই স্টেডিয়াম সমস্যাই আজ আবার চিন্তার বিষয় হয়ে উঠেছে। কলকাতায় ফুটবল স্টেডিয়াম নেই তাই সকলের সংগে তাল দিয়ে আমরাও বার বার ঐ বিষয়টির ওপর কর্তাব্যক্তি এবং সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চেষ্টা করেছি। কিন্তু বাংলা দেশের ক্রীড়ামোদীদের সমস্ত আবেদন-নিবেদনই গেছে জলে। কিন্তু এতোদিন পরে হঠাৎ এক ঢিলে দু' পাখী মারার মতো—প্রস্তাবিত ইডেনে কম্পোজিট স্টেডিয়াম তৈরির বিষয়টি নিয়ে কর্তাব্যক্তিদের একটি মহল মেতে উঠেছেন। তাঁদের সংগে আবার আছেন, রাজ্যপালও। রাজ্যপালের নেতৃত্বে সরকার প্রথমে চাইছেন ইডেন উদ্যানের কর্তৃত্বভার নিজের হাতে নিতে। তারপর নাকি শুরু হবে ইডেনে কম্পোজিট স্টেডিয়াম তৈরির কাজ। অর্থাৎ ক্রিকেটের নন্দন-কানন ইডেন উদ্যানে আর শুধু মাত্র ক্রিকেট খেলাই হবে না—হবে ফুটবল, হকি হয় তো বা এ্যাথলেটিকস-এর আসরও বসবে। ফলে ইডেন উদ্যানের ঐতিহাসিক সুনাম ধুলোয় লুটোবে। সমস্ত ক্রিকেট বিশ্বে ইডেনের যে সুনাম আছে, যে ঐতিহ্য আছে আর তা' থাকবে না। ইডেন হারাবে তার শ্রেষ্ঠত্বের সম্মান। সুতরাং যে কোন উপায়েই হোক আমাদের বাধা দিতে হবে ইডেনে এই কম্পোজিট স্টেডিয়াম তৈরির প্রস্তাব রূপান্তরিত করার বিষয়টি। আমরা আশা করি, বাংলা দেশের প্রত্যেক ক্রীড়ামোদীই এই প্রস্তাবের বিরুদ্ধে দাঁড়াবেন। আর শেষ পর্যন্ত জনমতের চাপে বানচাল হয়ে যাবে এই অস্বাভাবিক প্রচেষ্টা। ইডেনের ইজ্জৎ রক্ষা করবার জন্যে শুধু মাত্র বাংলা দেশের ক্রিকেটরসিকরাই নন, সমস্ত ক্রীড়া-উৎসাহীরই এগিয়ে আসার প্রয়োজন আজ সব থেকে বেশি।

—শান্তিপ্রিয়।

ক্রিকেটের খবর

ক্রিকেট খেলার সব খবরই এখন সিডনি আর বম্বেকে নিয়েই। সিডনিতে আরম্ভ হয়েছে অস্ট্রেলিয়া-ওয়েস্ট ইণ্ডিজের পঞ্চম ও শেষ টেস্ট ম্যাচ। অস্ট্রেলিয়া এখনো পর্যন্ত ২—১ টেস্টে এগিয়ে থেকে ফ্রাঙ্ক ওরেল ট্রফি এবারও নিজেদের হাতে রাখা সম্বন্ধে নিশ্চিত। কারণ শেষ টেস্টে যদি ওয়েস্ট ইণ্ডিজ দল জয়লাভ করে, তাহলে আগের মরশুমে জয়লাভের সূত্রে অস্ট্রেলিয়ার হাত ছাড়া হবে না ফ্রাঙ্ক ওরেল ট্রফি।

তবে এবারকার এই মরশুমটা শেষ

॥ অম্বর রায় ॥
রনজী ট্রফির ফাইন্যালে বাংলার অধিনায়ক

তবে এবারকার এই মরশুমটা শেষ পর্যন্ত অমীমাংসিতভাবে শেষ হয় কি না সেটাই দেখার বিষয়। কারণ প্রথম টেস্টে ওয়েস্ট ইণ্ডিজ জিতেছিল। তারপর পর পর দুটো টেস্টে অস্ট্রেলিয়া হারিয়ে দিয়েছে তাদের। চতুর্থ টেস্ট ম্যাচে ওয়েস্ট ইণ্ডিজের খেলোয়াড়রা আবার ফিরে পেয়েছেন তাঁদের ক্রীড়াচাতুর্য।

চতুর্থ টেস্ট ম্যাচটা অমীমাংসিতভাবে শেষ হয়ে গেলেও—দু' দলই লাভ করেছিল জয়লাভের সুযোগ। তবে পাল্লা সেবার ভারী ছিল ওয়েস্ট ইণ্ডিজের দিকেই। কিন্তু শেষ পর্যন্ত সামান্যর জন্যে খেলার কোন মীমাংসা হলো না।

তাই মনে হয় পঞ্চম টেস্ট ম্যাচটা জমবে খুব। কারণ দু' দলই আপ্রাণ চেষ্টা করবে জয়লাভের জন্যে। এই টেস্টের ফলাফলের ওপরই যে নির্ভর করছে 'রাবারের' ভাগ্য!

তবে এ লেখা যখন আপনাদের হাতে পৌঁছবে ততদিনে শেষ হয়ে আসবে সিডনির অস্ট্রেলিয়া-ওয়েস্ট ইণ্ডিজের পঞ্চম টেস্ট ম্যাচ খেলা। তাই এ সংখ্যায় ঐ খেলার বিষয় আর বেশি কিছু আলোচনা না করাই ভালো.....।

সিডনির পরেই বলতে হবে বম্বের কথা। বম্বের ব্রাবোর্ন স্টেডিয়ামে বাংলা

গল্পহলেও সত্যি

একদিন রাত্তিরবেলায় কাতরানি শুনে ঘুম ভেঙে গেলো ডাক্তার ডব্লিউ· জি· গ্রেসের। উঠে যা দেখলেন তাতে তাঁর চোখ ছানাবড়া। একটা চোর চুরি করতে আসছিল। জানলা দিয়ে ঘরে ঢুকতে যাবার সময় ভারী জানলার একটা কপাট তার হাতের ওপর পড়েছে। ফলে চোরটি বেশ জখম হয়ে সেখান থেকে নড়তে পারছে না। যন্ত্রণায় ছটফট করে কাতরাচ্ছে সেখানে।

পরের দিন ঘটনাটা শুনে ভাই এম· ই· গ্রেস জিজ্ঞেস করলেন,

"তারপর তুই চোরটাকে নিয়ে কি করলি?"

ডব্লিউ· জি· গম্ভীরভাবে উত্তর দিলেন,

"চোরটার হাতে মলম লাগিয়ে ব্যাণ্ডেজ বেঁধে দিলাম। তারপর ঘাড় ধরে বাইরে নিয়ে গিয়ে বিদায় করে দিলাম পেছনে এক লাথি মেরে।"

"সে কি রে, তুই একটা বুদ্ধু। চোরটাকে হাতে পেয়েও পুলিশে দিলি না.....!"

ভাই-এর কথা শুনে গম্ভীর হয়ে গেলেন ডব্লিউ· জি। তারপর বললেন,

"রোগীকে পুলিশে দিতে নেই। মেডিকেল এটিকেট বলে একটা জিনিস আছে তো.....!"

রনজী ট্রফির ফাইন্যালে খেললো বম্বের বিরুদ্ধে। বহুদিন পরে বাংলা আবার উঠেছে রনজী ট্রফির ফাইন্যালে। এর আগে বাংলা ফাইন্যালে উঠেছিল বছর দশেক আগে। আর বহুকাল আগে একবার মাত্র—একবারই বেড়ালের ভাগ্যে শিকে ছেঁড়ার মতো বাংলা লাভ করেছিল রনজী ট্রফি বিজয়ীর সম্মান। কিন্তু সে সেই দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের আগের কথা।

যাই হোক ক্রিকেটে বাংলা কোনদিনই বিশেষ কিছু করতে পারে নি। চিরকালই মাঝারিয়ানার মধ্যে সীমাবদ্ধ বাংলা দেশের ক্রিকেট-মান। বিহার, উড়িষ্যা আর আসামকেই হারানো সার। এর ওপর প্রতি বছরই বাংলা খেলেছে ভারতের অন্য প্রদেশগুলোর সংগে। তার মধ্যে কখনো হেরেছে আর কখনো বা জিতেছে। তবে ফাইন্যালে ওঠে নি অনেকদিন।

তাই এ বছর অনেকের অনেক আশা বাংলা দলকে ঘিরে। ফাইন্যালে বম্বেকে হয়তো বাংলা হারাতে পারবে না। কারণ

॥ অজিত ওয়াদেকার ॥
রনজী ট্রফির ফাইন্যালে বম্বে দলের অধিনায়ক।

ভারতীয় ক্রিকেটে বম্বের প্রাধান্য আজো অসম্ভব। তবু বাংলাদেশের ক্রীড়া-উৎসাহীরা চান যে বম্বের বিরুদ্ধে বাংলা গড়ে তুলুক তীব্র সংগ্রামী মনোভাব। ব্যাটে-বলে বাংলার খেলোয়াড়রা বম্বের নামী খেলোয়াড়দের সংগে দিক সমানে সমান তাল।

আর যাই হোক, বম্বে যেন হেলায় হারাতে না পারে বাংলাকে। এবারও রনজী ট্রফি বম্বে পাক, ক্ষতি নেই তাতে—কিন্তু তারা যেন এবার খেলে জেতে। আর তার সবটাই নির্ভর করছে বাংলার খেলোয়াড়দের সংগ্রামী মনোভাব আর উন্নত ক্রীড়ানৈপুণ্যের ওপর। দেখা যাক শেষ পর্যন্ত কি হয়.....।

ওরা এগিয়ে চলেছে

পিনাকী আর ডিউক এগিয়ে চলেছে। বুকে তাদের দুর্জয় সাহস, চোখে অজানাকে জানার স্বপ্ন। কিন্তু মাত্র ক'দিন আগে ওদের জন্যে সমস্ত দেশের লোক পড়েছিলেন ভীষণ চিন্তায়। দিনের পর দিন পাওয়া যায় নি ওদের কোন খবর। ওরা বুঝি হারিয়ে গিয়েছিল ঝঞ্ঝা-বিক্ষুব্ধ সমুদ্রের বুকে। কিন্তু না, সমুদ্র ছিলো শান্ত, ধীর স্থির। আর স্থির সাগরের নোনাজলের মধ্যে দিয়ে ওরা এগিয়ে চলেছিলো ওদের লক্ষ্য পথে। একটার পর একটা দিন কাটছে আর নৌকোর গলুই-এ পড়ছে আর একটা দিন শুরুর দাগ। পিনাকী আর ডিউক সাগর পেরিয়ে পৌঁছুবে সেই সুদূর আন্দামানে। আন্দামান আজ আর দূর নয়। বিজ্ঞানের কল্যাণে ঘরের কোণে আন্দামান। কিন্তু জলের জাহাজ নয়, হাওয়াই জাহাজেও নয় মান্ধাতা আমলের সেই জলযান নৌকোয় চেপে আজ যারা সাগরে পাড়ি জমিয়েছে তাদের সাহস আর দুর্দান্ত মনোবলের প্রশংসা তাই সকলের মুখে মুখে। আমরা চাই পিনাকী আর ডিউক সাফল্যলাভ করে আমাদের মুখ উজ্জ্বল করবেন।

॥ বিল লরী ॥

লরীর সেঞ্চুরী আর ওয়ালটারস-এর ডাবল সেঞ্চুরী প্রথম ইনিংসে অস্ট্রেলিয়াকে এনে তুলেছে বেশ সুবিধেজনক অবস্থায়।

এ বছর বাংলা দলের পক্ষে যাঁদের খেলার সম্ভাবনা আছে—

গোল—বলাই দে (মোহনবাগান), কানাই সরকার (এরিয়ান্স)।

ব্যাক—শান্ত মিত্র (ইস্টবেঙ্গল), ভবানী রায়, নঈম (মোহনবাগান), এস কর্মকার (এরিয়ান্স), জন (মহঃ স্পোর্টিং)।

হাফব্যাক—কানন গুহ (ইস্টবেঙ্গল), কাজল মুখার্জী (ইঃ রেল), এণ্টনী এমব্রোজ (মহঃ স্পোর্টিং)।

ফরোয়ার্ড—হাবিব (মোহনবাগান), এস ভৌমিক (রাজস্থান,) এস ঘোষ দস্তিদার (রাজস্থান), সীতেশ দাস ও কানন (মোহনবাগান), পরিমল দে (ইস্টবেঙ্গল)।

॥ সোবার্স ॥

শেষ টেস্টে সোবার্সের অধিনায়কতায় ওয়েস্ট ইণ্ডিজ এখন কি করে সেইটাই দেখার বিষয়।

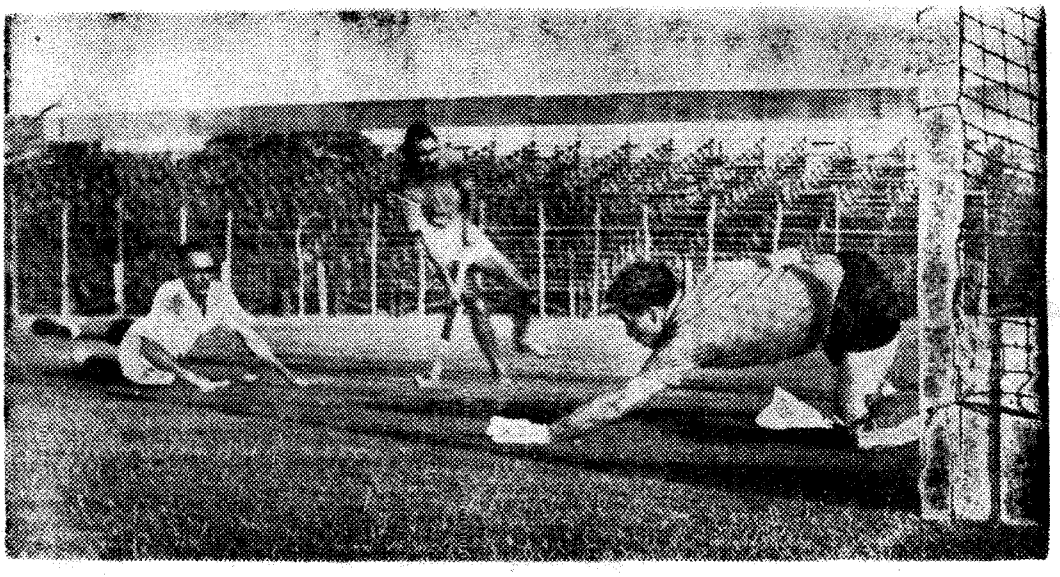

কলকাতার হকি মরশুম শুরু হলো। ক্রিকেটের শেষে হকির আগমনে শুরু হয় কলকাতা ময়দানের ফুটবল-প্রস্তুতি। এবারও সে আসর জমে উঠেছে এরই মধ্যে।

সন্তোষ ট্রফি ও বাংলা দলের অনুশীলন প্রসঙ্গে

— দিলীপ চট্টোপাধ্যায়

ফুটবল, ক্রিকেট, হকি প্রভৃতি খেলাধুলোর প্রতিটি আসরের সর্বভারতীয় মানোন্নয়নের লক্ষ্যকে ঘিরেই যে বিভিন্ন আন্তঃ প্রাদেশিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতার অনুষ্ঠান চলে আসছে একথা বোধহয় আজ আর কারো অজানা নেই। ফুটবলের সন্তোষ ট্রফির জন্ম এমনই এক উদ্দেশ্য চরিতার্থের তাগিদে। জন্মলগ্ন থেকেই বাংলাদেশ এই জাতীয় ফুটবলের জীবনের সুখ-দুঃখের ভাগীদার। উদ্বোধনী বছরে সন্তোষ ট্রফির বিজয়ীফলকে প্রথম নামই বাংলার। তাছাড়া বিজয়ী-পুরস্কার অর্জনের সংখ্যাতত্ত্ব বিচারেও বাংলার স্থান একেবারে ওপরে। কিন্তু সেদিনের বাংলার ফুটবল যশ যেন আজ অনেকটা অস্তমিত —গত কয়েক বছর সন্তোষ ট্রফির ধারে কাছে পৌঁছতে পারে নি বাংলা। মাত্র কয়েকটা দিনের ব্যবধানে বাঙ্গালোরের বুকে শুরু হতে চলেছে সন্তোষ ট্রফির এবারের আসর। এবারের দল গঠন ও অনুশীলনীতে যেন কিছুটা বাড়তি তোড়জোড়ের আভাষ দেখলাম এ বছরের নতুন কোচ শ্রীস্বরাজ ঘোষের অধীনে। শিবিরপুরের ঐ পুলিশ মাঠে যেদিন প্রথম গেলাম সেদিন অবশ্য উৎসাহিতবোধ করার মত তেমন কোন কিছু দেখি নি। ট্রায়ালে যোগদানকারী খেলোয়াড়দের মধ্যে মাত্র জনকয়েককে মাঠে দেখে বাংলা তথা ভারতীয় ট্রেনিং ক্যাম্পের চিরন্তন রূপটির কথাই মনে পড়ে গিয়েছিলো এর পরের দিনটা ছিল বেশ কয়েকটা দিন পিছিয়ে। কিন্তু সেদিন মাঠে গিয়ে যথেষ্ট উৎসাহব্যঞ্জক খেলোয়াড়েরই দেখা পেয়েছি।

শুধু খেলোয়াড় উপস্থিত নয়, কর্মকর্তাদের মধ্যেও অনেকেই ঐদিন মাঠে হাজির ছিলেন।

বাংলা ফুটবল দলের কোচিং দেওয়ার সুযোগ স্বরাজ ঘোষের এ বছরই প্রথম জুটলো। তাই ওঁকে ওঁর দল সম্পর্কে প্রশ্ন করায় জানতে পারি উনি যথেষ্ট আশাবাদী ওঁর দল সম্পর্কে, তবে ওঁর হাতে সময় মাত্র একুশ দিন। আর তাও এই একুশটা দিনের সম্পূর্ণটাই উনি পুরোপুরি একটা দলের পিছনে ব্যয় করতে পারছেন। সময়ও খুব অল্পমাত্র দেড় ঘণ্টা। সম্পূর্ণ সময় দিতে পারছেন না, কারণ এখনও 'স্ক্রীনিং' বাকী। সে কাজ সেরে আঠারো জনের একটি দল গড়ার পর সে দলকে তালিম দেওয়ার জন্য ওঁর সময় থাকবে মাত্র চার-পাঁচটা দিন। তাই এ বিষয়ে ওঁর বেশ কিছুটা ক্ষোভ লক্ষ্য করেছি। ওঁর বক্তব্য বাছাই-ছাঁটাই পর্ব শেষে অন্তত বেশ কিছুটা সময়ের দরকার দলীয় সমঝোতা-বোঝাপড়া সৃষ্টিতে। ছেলেরা ওঁর ক্যাম্পে যথেষ্ট আন্তরিকতার সাথে যোগ দিচ্ছেন। তাছাড়া শ্রীঘোষ কোচ হিসাবে আরো একটি জিনিষের সম্ভব করেছেন (এত তা প্রায় অসম্ভব ছিল)—তা' হলো অধিকাংশ খেলোয়াড়েরই ক্যাম্পে অংশ গ্রহণ। এ ব্যাপারে উনি যথেষ্ট দৃঢ়তা ও তৎপরতা দেখিয়েছেন। প্রয়োজন মত বল সরবরাহ, খেলোয়াড়দের পুষ্টিকর টিফিন প্রদান, প্রতিযোগিতা ও বোঝাপড়া বৃদ্ধিতে ম্যাচ খেলা প্রভৃতি যাবতীয় সুযোগগুলি নাকি কর্তৃপক্ষ এ বছর ওঁদের যথেষ্ট দিয়েছেন। তবে শ্রীঘোষের মুখে অভিযোগ শুনলাম —কোচিং-এর অর্থপথে এখন নাকি কর্তৃপক্ষস্থানীয় ব্যক্তিবর্গ নতুন নতুন দু'-একজন চোকানোর সুপারিশ করছেন।

সেদিন মাঠে বাংলা দলের সাথে এ. জি. বেঙ্গল দলের প্র্যাক্‌টিস-ম্যাচ চলছিল। বাংলা দলের পক্ষে সম্ভাব্য প্রায় সকল খেলোয়াড়ই হাজির ছিলেন। কিন্তু আক্রমণভাগের এমন শুটিং দুর্বলতা আপন দৈন্যতার কথাই প্রকাশ করেছে বলেই মনে হলো। এ সম্পর্কে কোচের বক্তব্যও একই। তবে উনি আশ্বাস দেন বাংলা দলের এ দুর্বলতাকে কাটিয়ে ওঠানোর জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করছেন নিয়মিত শুটিং অভ্যাসে। (শুটিং প্র্যাক্‌টিসে এমনও নাকি ঘটেছে পাঁচটি বল নির্দিষ্ট নিশানা থেকে গোলে মারতে গিয়ে একজনও বল গোলে ঢোকাতে পারে নি—ফাঁকা গোলেও।

জুনিয়র বাংলা দলের বেশ কয়েকজন খেলোয়াড় এবার সিনিয়র দলের ট্রায়ালে রয়েছেন। ওঁদের বাংলা দলে স্থান পাওয়ার প্রশ্নে শ্রীঘোষ জানান দল নির্বাচনের চরম ও সর্বোচ্চ ক্ষমতা ওঁর নেই। তবে ওঁর যে নিজস্ব দল গঠনের সুপারিশ তাতে অনেক ক্রীড়ামোদীই সুখী হতে পারছেন। সেটা হবে হয়তো একটা স্টান্ট—নিজের মত থেকে উনি না কি সরবেন না বলেই জানিয়েছেন—মেনে নেওয়া অথবা না নেওয়ার দায়িত্ব অবশ্য কর্তৃপক্ষের। এই প্রসঙ্গে উনি এও জানান জুনিয়র ও খোদ বাংলার খেলোয়াড়দের অনেকেই যথেষ্ট যোগ্যতার নিদর্শন রেখেছেন। বাংলার ফুটবল দল খোদ বাংলার মাটিতে গড়ে ওঠা খেলোয়াড়দের নিয়ে গড়ে তোলার যৌক্তিকতা যেমন ভারতীয় ফুটবল দলের জনৈক নির্ভরযোগ্য খেলোয়াড়ের বক্তব্যের সমর্থিত হয়েছে তেমন প্রকারান্তরে সমর্থন পেয়েছে কোচের কাছ থেকে। সেই ভারতীয় ফুটবলারের মতে—"দিল্লীর মাঠে বাংলার স্কুল দলের ক্ষুদে ফুটবলাররা যে ছাব এঁকে এসেছে তা থেকে আমরা এ ধারণা করলে কি ভুল করবো যে, আমাদের ছেলেদের গড়া দল জাতীয় ফুটবলে ভাল ফল দেখাতে পারবে?" আবার জুনিয়র বাংলা দলের কোচের বক্তব্যও ঠিকই তাই। ওঁর মতে, জব্বলপুরের মাঠে ভারতের নানা অঞ্চলের যুব দল হাজির ছিল। সে আসরে যদি বাংলার ছেলেরা সবাইকে হার মানাতে পারে তবে কেন সিনিয়র বাংলা দলের নতুন কোচ কিছুটা স্বাতন্ত্র্যের মাধ্যমেই আপন মত ব্যক্ত করেছেন। ওঁর মতে প্রাদেশিকতা নীচতা নিঃসন্দেহে। কিন্তু খেলাধুলোর ক্ষেত্রে যখন প্রদেশে প্রদেশে প্রতিদ্বন্দ্বিতার আয়োজন করা হয়েছে তখন আর সেক্ষেত্রে প্রাদেশিকতার প্রশ্ন ওঠে না। ওঁর মতে আন্তঃ প্রাদেশিক খেলার আসরে প্রতি প্রদেশ দলে শুধু সেই প্রদেশের খেলোয়াড়েরই স্থান পাওয়া উচিত। যেমন ঘটে থাকে ইংলণ্ডে। স্কটল্যাণ্ড, আয়ারল্যাণ্ড ও ইংলণ্ডের সব অঞ্চলের খেলোয়াড়ই টটেনহাম, চেলসা, আর্সেনাল প্রমুখ ক্লাবে অংশ নিয়ে থাকেন। সেখানে কোনপ্রকার স্থান বা প্রদেশ ভিত্তিক বাধাবিচার নেই। কিন্তু ইংলণ্ড বনাম আয়ারল্যাণ্ড অথবা স্কটল্যাণ্ডের খেলায় আপন আপন প্রদেশ দলে সেই সমস্ত খেলোয়াড়দের খেলতে হয়। বাংলা কোচের মতে তেমন কিছু করতে আমাদের দেশে বাধা কী? হায়দ্রাবাদ অথবা মহীশূরে অথবা কেরল যে কোন অঞ্চলের খেলোয়াড়ই আই এফ এ শীল্ড অথবা লীগ খেলুন না কেন—জাতীয় ফুটবলের আসরে ওঁরা যেন ওঁদের আপন আপন প্রদেশের প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন। তার ফলে সমস্ত প্রদেশ দলেরই খেলার মান অপেক্ষাকৃত উন্নত হবে। আর এর ফলে অপেক্ষাকৃত তরুণ খেলোয়াড়দের গড়ে ওঠার সুযোগও আসবে।

প্রশ্ন উত্তর

পারতোষ নাগ (বেলাকোবা, জলপাইগুড়ি)

প্রশ্ন : এক ইনিংসে ও একটি টেস্টে সর্বোচ্চ বল করার রেকর্ডটি জানাবেন। রেকর্ডকারীর নামটাও জানাবেন।

উত্তর : ১৯৫৭ সালে বার্মিংহাম টেস্টে ইংলণ্ডের বিরুদ্ধে ওয়েস্ট ইণ্ডিজের সনি রামাধীন ১২৯ ওভার অর্থাৎ ৭৭৪টি বল করেছিলেন। আর সেই খেলাতে এক ইনিংসে ৫৮৮টি বল করে এক ইনিংসে সর্বোচ্চ বল করার রেকর্ড স্থাপন করেছিলেন রামাধীন।

তবে প্রথম শ্রেণীর খেলায় সব থেকে বেশি বল করার রেকর্ডটি হলো ভারতের সি· এস· নাইডুর। হোলকারের পক্ষে বম্বের বিরুদ্ধে ১৯৪৪-৪৫ সালের খেলায় নাইডু ৯১৭টি বল দিয়েছিলেন।

সূর্যোদয় দেউরী (লখিমপুর, আসাম)

প্রশ্ন : টেস্ট ম্যাচে সবচেয়ে বেশি সেঞ্চুরী করার গৌরব কার? তাঁর এ্যাভারেজটা জানাবেন।

উত্তর : ডন ব্র্যাডম্যানের

টেস্ট	ইনিংস	নঃ আঃ	রান	সর্বোচ্চ	শতরান সংখ্যা	গড়
৫২	৮০	১০	৬৯৯৬	৩৩৪	২৯	৯৯·৯৪

হীরেন্দ্রমোহন ভদ্র (সুভাষপল্লী, শিলিগুড়ি)

প্রশ্ন : ক্রিকেট টেস্ট ম্যাচ খেলায় বিশ্বের সবচেয়ে দক্ষ ফিল্ডার কে এবং তিনি কোন্ দেশের খেলোয়াড়?

উত্তর : বড্ড মুশকিলে ফেললেন। কার নাম বলা সংগত বুঝতে পারছি নে। ভারতের খেলোয়াড়দের কথা হলে না হয় বলতাম পাতৌদির নাম। কিন্তু...না, আপনারাই না হয় ঠিক করে আমাদের জানান কাকে বর্তমান বিশ্বের শ্রেষ্ঠ ফিল্ডার বলা সংগত।

বসন্তকুমার নন্দী (সাহাগঞ্জ, ঝাঁপাপুকুর, হুগলী)

প্রশ্ন : একটি মরশুমে সর্বাধিক শতরান করার রেকর্ড কার? তিনি কোন দেশের খেলোয়াড়?

উত্তর : ১৯৪৭ সালের ক্রিকেট মরশুমে ইংলণ্ডের ডেনিস কম্পটন ১৮ বার শতরান করেছিলেন। এর মধ্যে ছিল সাউথ আফ্রিকার বিরুদ্ধে ৬টি সেঞ্চুরী—গড়ে ইনিংস প্রতি ৮৪·৭৮০ রান। সেই মরশুমে কম্পটন ৩,৮১৬ রান করেছিলেন। এটিও একটি রেকর্ড।

গুরুপদ মাইতি (পটলডাঙ্গা, কলকাতা-৯)।

প্রশ্ন : আমাদের স্কুলের স্পোর্টসে আমার নম্বর ছিলো চার আর আমার বন্ধুর ছিলো কুড়ি। আমরা দুজনে পাশাপাশি দৌড়েছিলাম বলে সকলেই হাসছিলেন, আর সেই জন্যেই আমরা কোন পুরস্কার পাই নি। কিন্তু আমরা আজো বুঝতে পারছি না কেন যে সকলে সেদিন হাসছিলেন আমাদের দেখে।

উত্তর : কেন জানেন? নিচে দেখুন..... এবার বুঝলেন তো.....?

সর্দার

দিলীপ চক্রবর্তী (কলকাতা—৫৩)

প্রশ্ন : প্রশ্ন-উত্তর বিভাগে আপনারা লিখেছেন চুনী গোস্বামী অলিম্পিকে খেলেছেন, কিন্তু সেটা ঠিক নয়—চুনী গোস্বামী শুধু প্রি-অলিম্পিকে খেলেছেন।

উত্তর : প্রি-অলিম্পিকের খেলাগুলোকে অলিম্পিক খেলা বলেই সাধারণত ধরে নেওয়া হয়।

সম্প্রতি হুগলী থেকে জনৈক ক্রীড়ামোদীর একটি চিঠি পেয়েছি। পত্রদাতার কোন নাম নেই, কিন্তু চিঠিতে আছে 'পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য ক্রীড়া পরিষদের' একটি কলঙ্ক কাহিনী। তাই চিঠিটা আমরা হুবহু তুলে দিলাম—

"আমার পত্রখানি যদি আপনি ছাপিবার মত বিবেচনা করেন তবে ছাপাবেন। কলকাতা রাজভবনের উত্তর-পূর্ব কোণে 'পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য ক্রীড়া পরিষদ' নামে একটি সংস্থা আছে। এ'দের কাজ হলো নানা বিষয়ে উদীয়মান তরুণ-তরুণীদের খুঁজে বার করা। সম্প্রতি এ'রা একটি ফুটবল প্রশিক্ষণ শিবিরের আয়োজন করেন। আমিও দরখাস্ত করেছিলাম এবং যথাসময়ে 'ইণ্টারভিউ'-এ আমাদের ডাকা হলো। কিন্তু এখানে শুধু মুখ দেখেই খেলোয়াড়রা নির্বাচিত হয়ে গেলেন। যদিও বলা হলো না কারা কারা নির্বাচিত হয়েছে। শুধু বলা হলো যারা মনোনীত হয়েছে তারা ১৫ দিনের মধ্যে চিঠি পাবে। তারপর কিছুদিন আগে কাগজে দেখলাম, যাঁরা শিক্ষালাভ করতে ইচ্ছুক তাঁরা যেন সেদিন সকাল ৬টার সময় বাগমারী পার্কে চলে আসেন। অর্থাৎ আমরা মফস্বলবাসীরা যখন সে খবর জানলাম তখন কোচিং শুরু হয়ে গেছে। শুধু আমিই নই রাণাঘাট, কৃষ্ণনগর থেকেও বহু ছেলে দরখাস্ত করেছিল। তাদের অবস্থা কি হয়েছে জানি না। যারা ফুটবল খেলা শিক্ষা পেতে আগ্রহী, কিন্তু সুযোগ যাদের কম তারা কি কোন দিনও সুযোগ পাবে না? আমি এই ব্যবস্থার প্রতিকার চাই...!"

সম্পাদিকা—জয়ন্তী সেন

বসুমতী (প্রাঃ) লিঃ-এর পক্ষে ১৬৬, বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী স্ট্রীটস্থ কলিকাতা-১২
বসুমতী প্রেস হইতে শ্রীসুকুমার মুখোপাধ্যায় কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

দুইটি বা তিনটি সন্তানের পরিবারই আদর্শ পরিবার

জেনে রাখুন ঃ

- পরিবারকল্যাণই পরিবার পরিকল্পনা
- যে কোন পরিবার পরিকল্পনাকেন্দ্রেই বিনামূল্যে নিরোধ এবং যাবতীয় পরামর্শ পাওয়া যায়
- হিন্দুস্থান লিভারে উৎপাদিত প্রত্যাদি যে সব দোকানে বিক্রী হয় সেই সব দোকানে মাত্র ১৫ পয়সায় তিনটি করে নিরোধ কিনতে পাওয়া যায়
- তিনটি সন্তান না হওয়া পর্যন্ত নিরোধ ব্যবহার করে দুই সন্তানের জন্মের মধ্যবর্তী সময়ের ব্যবধান বাড়ান সম্ভব
- তিনটি সন্তানলাভের পর স্থায়ীভাবে জন্মনিরোধের জন্যে অস্ত্রোপচারই শ্রেষ্ঠ পদ্ধতি

আজই আপনার নিকটবর্তী যে কোন পরিবার পরিকল্পনাকেন্দ্র বা স্বাস্থ্যকেন্দ্রে যোগাযোগ করে বিনামূল্যে অভিজ্ঞ চিকিৎসকের পরামর্শ নিন।

(পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পরিবার পরিকল্পনা সংস্থা কর্তৃক প্রচারিত)

rsday, 20th February, 1969 SAPTAHIK BASUMATI Regd. No. C 71
Price : 30 Paise Gram : "Basumati" Phone : 34-7771, 72, 73, 74

বিভিন্ন রুচির খেয়াল:

21 FEB 1969

কিন্তু সবার রুচিকেই কুকমা পরিতৃপ্ত করে !

গ্রাম : "স্পাইসমার্ট" মিল—কাশীপুর

শিশুর খাদ্যে ও রুগীর পথ্যে নির্ভয়ে ব্যবহৃত হয়
'কুকমা'—সর্বাধিক বিক্রীত গুঁড়ো মশলা
পনের লক্ষ প্যাকেট মাসিক বিক্রয়
১২০ বৎসরের অধিক প্রাচীন ও বর্তমানে মশলার বৃহত্তম প্রতিষ্ঠান
কৃষ্ণচন্দ্র দত্ত (স্পাইস) প্রাঃ লিঃ

সাপ্তাহিক বসুমতী

অজয় মুখোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে যুক্তফ্রন্টের নতুন মন্ত্রিসভা

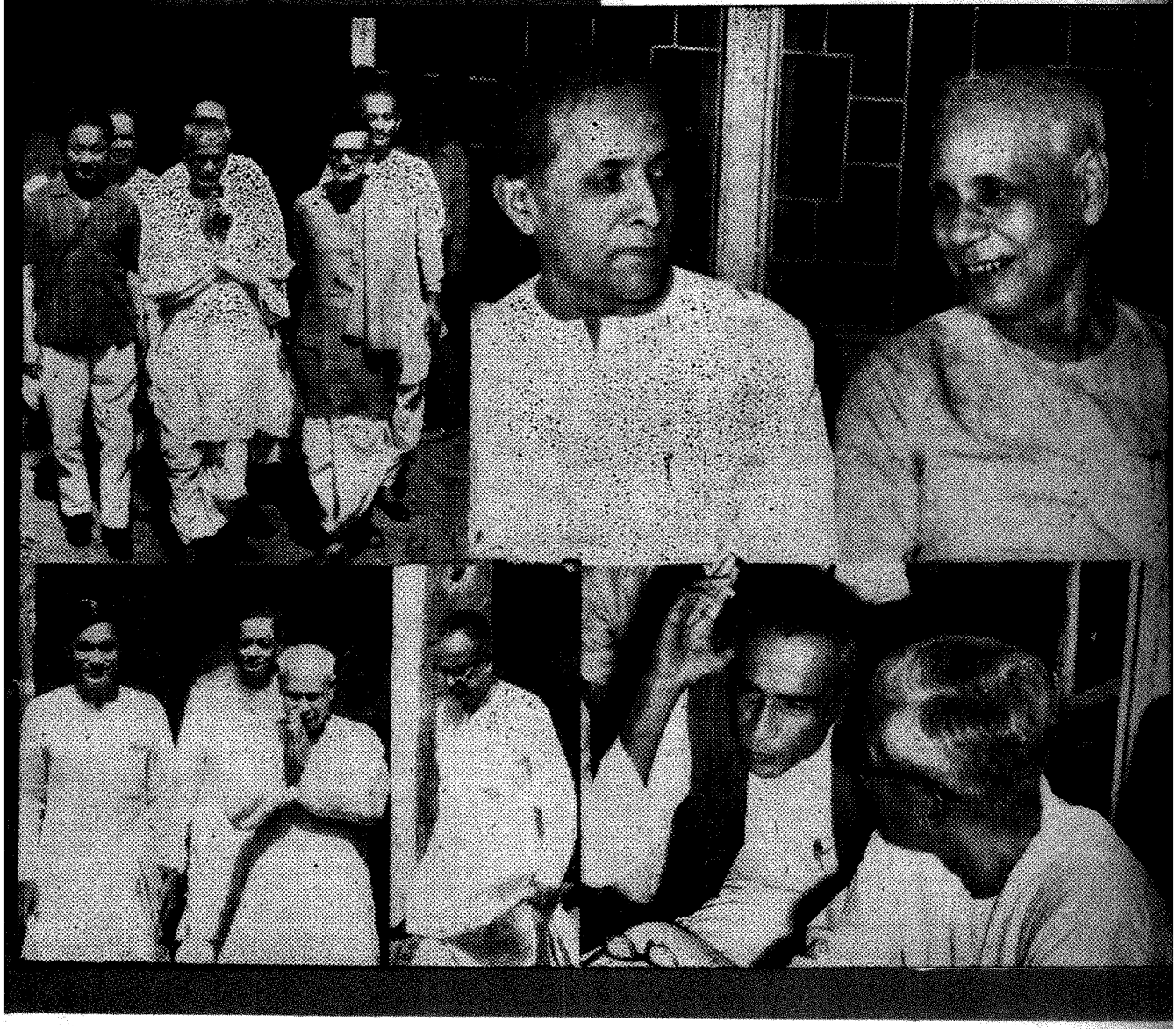

৭৩ বর্ষ ঃ ৩৬শ সংখ্যা, বৃহস্পতিবার, ১৫ই ফাল্গুন, ১৩৭৫ বঙ্গাব্দ] OLDEST WEEKLY OF NORTH INDIA [73 year, No. 36, 27th Feb. 1969

সূচীপত্র

বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা
সম্পাদকীয়		২২৪৩
আজকের মানুষ		২২৪৪
রবীন্দ্রনাথ ও সুভাষচন্দ্র (ধারাবাহিক প্রবন্ধ)	— শঙ্করীপ্রসাদ বসু	২২৪৫
বঙ্গদর্শন		২২৪৮
ভারতদর্শন		২২৫১
আন্তর্জাতিক		২২৫৫
কংগ্রেসের বিপর্যয়ের পূর্বাভাস কি আদৌ পাওয়া যায় নি? (প্রবন্ধ)	— কুমুদ দাশগুপ্ত	২২৫৮
অস্তিত্বের মানে (কবিতা)	অশোক ভট্টাচার্য	২২৫৯
কথায় কথায়	— নিবারণ মুনশী	২২৬০
সপ্তাহের বোঝা	— কৃত্তিবাস ওঝা	২২৬২
বাংলার বুদ্ধিজীবী সমাজ : একটি সমীক্ষা	— বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়	২২৬৪
শুভম রায়	— বহ্নি রায়	২২৬৫
গ্রন্থমেলা		২২৬৫
পথ কে রুখবে? (ধারাবাহিক উপন্যাস)	— মনোজ বসু	২২৬৭

যে কোন
গয়না
আর
আসল
গ্রহরত্ন
কেনার
দক্ষিণ কোলকাতায়
নামকরা প্রতিষ্ঠান

ফোন : ৪৬-৬২৫৮

সব অ্যাণ্ড অ্যাণ্ডসন্স অব লেট
এম. বি. সরকার

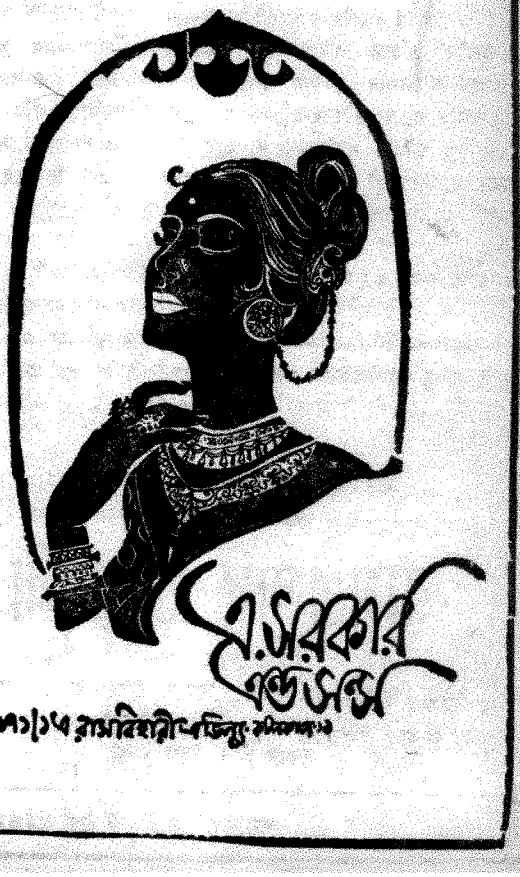

সূচীপত্র

বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা
আমার ইউরোপ ভ্রমণ	— ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায়	২২৭১
আলোয় আলোয় (কবিতা)	— সন্তোষকুমার অধিকারী	২২৭৪
তিমিরপ্রান্ত ড্রয়ার্স	— অগ্নিবর্ণ	২২৭৯
কবরের কান্না (গল্প)	— মনোরঞ্জন হাজরা	২২৮৩
পূর্ববঙ্গের সাম্প্রতিক বাংলাকাব্য আন্দোলনের রূপরেখা (প্রবন্ধ)	— অমিয়কুমার হাটি	২২৮৭
কাল রাত্রে বাবাকে হাসতে দেখলাম (কবিতা)	— বেণু দত্তরায়	২২৯০
পাঠকমন		২২৯১
রণাঙ্গণ ওদেশে এবং এদেশে	— শিলালি	২২৯৩
লোকসঙ্গীতের সংগ্রহ	— সুরেন্দ্রনাথ দাশ	২২৯৫
রঙ্গজগৎ		২২৯৬
খেলাধূলা	—শান্তিপ্রিয়	২৩০৫

কবিকঙ্কণ চণ্ডী

মুকুন্দরাম চক্রবর্তী

(কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতকোত্তর বিভাগের পাঠ্যপুস্তক)

মধ্যযুগের বঙ্গসাহিত্যে কবিকঙ্কণ মুকুন্দরাম চক্রবর্তীই সর্বশ্রেষ্ঠ কবি। তাঁহার চণ্ডীর কাহিনী বাঙ্গালার বিশিষ্ট জাতীয় জীবনের কাহিনী। তাঁহার কাব্যে পাই মধ্যযুগের বাঙ্গালার সমাজের সুস্পষ্ট আলেখ্য। শাসক সম্প্রদায়ের দ্বারা নির্যাতিত বাস্তুচ্যুত মুকুন্দরাম দুঃখ ও বেদনাক্লিষ্ট বাঙ্গালার প্রতিনিধি কবি—ব্যক্তির দুঃখ কি করিয়া সর্বজনের দুঃখ হইতে পারে বাঙ্গালা সাহিত্যে তাহা মুকুন্দরামই সর্বপ্রথম দেখাইয়াছেন। এই হিসাবে তিনি আধুনিক বাঙ্গালার রোমান্টিক সাহিত্যসাধনার অগ্রদূত।

—বর্তমান গ্রন্থে আছে—

১। মূল কাব্য, ২। সুবিস্তৃত ভূমিকা, ৩। কবির জীবনী, ৪। কাব্য-পরিচিতি ৫। কবিকঙ্কণ যুগের বঙ্গভাষা (ঋষি বঙ্কিমচন্দ্র লিখিত), ৬। অধ্যাপক শ্রীবিজিতকুমার দত্তের সুলিখিত ভূমিকা, ৭। বিস্তৃত কাব্য সমালোচনা এবং ৮। অপ্রচলিত শব্দের অর্থ।

মূল্য সাড়ে চার টাকা

ভক্তসাধক, কবিরঞ্জন রামপ্রসাদ সেনের
ভক্তিমাধুরী-রঞ্জিত

রামপ্রসাদ গ্রন্থাবলী

শ্রীশ্রীকালী-কীর্তন, বিদ্যাসুন্দর, পদাবলী, শ্রীকৃষ্ণকীর্তন, সীতা-বিলাপ, আগমনী, বিজয়া, অপূর্ব প্রকাশিত কবিতাবলী, কবির জীবনী।

একত্রে মূল্য তিন টাকা

উজ্জয়িনীর সেই বিশ্ব-চিত্তজয়ী বিশ্ববিমোহন মহাকবি-
সারস্বতকুঞ্জের পুণ্যজ্যোৎস্না—সাহিত্য-জগজ্জ্যোতি—
প্রতিভা ও মনীষার অবতার—সরস্বতীর বরপুত্র—
সৌন্দর্যের মহাকবি—

কালিদাসের গ্রন্থাবলী

সর্বাঙ্গসুন্দর রাজাধিরাজ সংস্করণ

অনুবাদক—বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক সাহিত্য রস-সুরসিক
পণ্ডিত রাজেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ

প্রথম ভাগে :—রঘুবংশ, মালবিকাগ্নিমিত্র, ঋতুসংহার, পুষ্পবাণবিলাস, শৃঙ্গার-তিলক, শৃঙ্গার-রসাষ্টক। ৬·০০

দ্বিতীয় ভাগে :—কুমারসম্ভব, নলোদয়, মেঘদূত। ৬·০০

তৃতীয় ভাগে :—শকুন্তলা, বিক্রমোর্বশী, শ্রুতবোধ, দ্বাত্রিংশৎ-পুত্তলিকা, কালিদাস-প্রশস্তি। ৮·০০

প্রাচীন-সাহিত্যের-গৌরব-মুকুট—
সাহিত্যের চির-সমাদৃত কোকিল—
রায়গুণাকর

ভারতচন্দ্রের গ্রন্থাবলী

অন্নদামঙ্গল, বিদ্যাসুন্দর, মানসিংহ, চোরপঞ্চাশৎ, রসমঞ্জরী, সত্যপীর, যেড়েভেড়ের কৌতুক, ফর্দরফৎ, হিন্দী কবিতালহরী, বলিরাজা, চণ্ডী, নাগাষ্টক, 'সংস্কৃত, পার্শী, হিন্দী' নানা ভাষার কবিতাবলী, কবির জীবনী, ঋতু-বর্ণনা, রাধাকৃষ্ণের প্রেমালাপ, কবিতাবলী।

মূল্য তিন টাকা

বসুমতী প্রাইভেট লিমিটেড: ১৬৬, বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী স্ট্রীট, কলি-১২

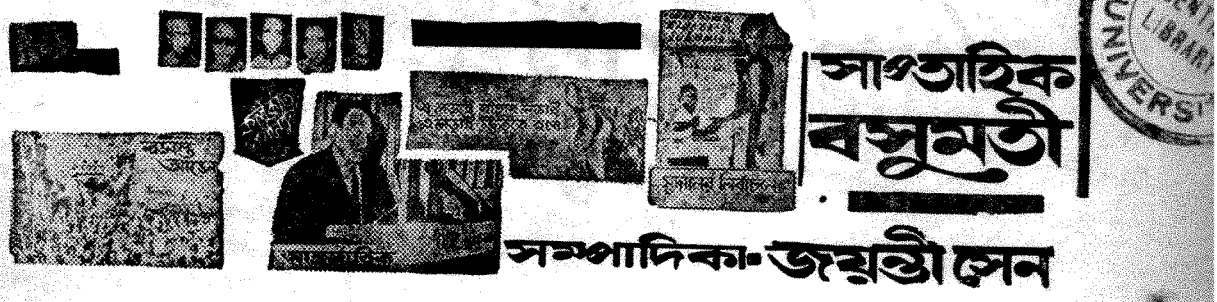

CAL
CENTRAL
LIBRARY
UNIVERSITY

৭৩ বর্ষ ঃ ৩৬শ সংখ্যা—মূল্য ঃ ৩০ পয়সা বাংলা ভাষায় দ্বিতীয় সর্বাধিক প্রচারিত সাপ্তাহিক পত্রিকা PRICE : 30 Paise
বৃহস্পতিবার, ১৫ই ফাল্গুন, ১৩৭৫ বঙ্গাব্দ Thursday, 27th February, 1969

আমলাতন্ত্র সম্পর্কে সাবধান

যুক্তফ্রন্ট-মন্ত্রীরা শপথ গ্রহণ করেছেন। এবার তাঁদের কঠিন দায়িত্ব পালনের সময়। দীর্ঘ একুশ বছর ধরে কংগ্রেসী শাসনের নামে জনসাধারণ যে নিদারুণ দুঃখ-যন্ত্রণা সহ্য করেছে—এই মুহূর্তেই যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রিসভা তার অবসান ঘটাতে পারবেন এরকম প্রত্যাশা অবান্তর ও অন্যায়। তবে ভরসা আছে, সেই দুঃখ-যন্ত্রণা যাতে বৃদ্ধি না পায়, মন্ত্রিসভা সেদিকে সম্পূর্ণ সজাগ থাকবেন।

জনসাধারণ এই মন্ত্রিসভার কাছে আকাশের চাঁদ চায় না। কংগ্রেসী দলের বিরুদ্ধে হাজার হাজার ভোটের ব্যবধানে বিজয়ী যুক্তফ্রন্টের ২১৮ জন বিধানসভার সদস্যদের প্রত্যেকের এবং সকলের ওপর যে দায়িত্ব দিয়েছে—তা পুরাতনের পুনরাবৃত্তি নয়। আবার সরকারী দলের সদস্যসংখ্যা বিরোধী দল অপেক্ষা অনেক বেশি হলেও তাঁদের পক্ষে নির্বিকার থাকার কোনো কারণ নেই। আপাত ব্যবহারে বিরুদ্ধ শক্তিগুলি আনুগত্যের ভাব প্রকাশ করলেও, গোপনে তারা নখদন্তহীন নয়। আমাদের একথার প্রমাণ এখনি মিলবে না, কারণ যুক্তফ্রন্ট দলের সদস্যসংখ্যা বহু গুণে বেশি থাকায় প্রতিক্রিয়াশীল শক্তি বন্ধু-জনোচিত মনোভাব দেখালেও, যুক্তফ্রন্টের সামান্যতম অসাবধানতাকে তারা মুহূর্তের সুযোগে সম্পূর্ণরূপে কাজে লাগাবে। যুক্তফ্রন্টের বিগত নয়মাসের শাসনে দল-বদলের সময় তাদের অশুভ শক্তিগুলির আসল স্বরূপ প্রকাশ হয়ে পড়েছিল। কিন্তু ছদ্মবেশ গ্রহণ করতে কতক্ষণ সময় লাগে। যুক্তফ্রন্ট সরকার যে মুহূর্তে কায়েমী স্বার্থের বিরুদ্ধে আইন প্রয়োগ করবেন, তখনই দেখা যাবে সামরিক লজ্জা-ভীতি ত্যাগ করে তারা অন্য মূর্তিতে প্রকটিত।

দীর্ঘ একুশ বছরের কংগ্রেসী শাসনে দুর্নীতি চোরাবাজারী, মজুতদারী এবং এমন কোনো অন্যায় নেই যা প্রকাশ্যেই ঘটে নি। অথচ নির্বাচনে জয়কে অনিবার্য ভেবে তদানীন্তন মন্ত্রীরা প্রভুসুলভ মনোভাবে সমস্ত কাজ-কর্মের ভার দিয়েছিলেন বড় বড় আমলাদের ওপর। আর এই আমলাদের ওপর মন্ত্রীরা নির্ভরশীল থাকার ফলে শাসনে না ছিল সংগতি, খেটে-খাওয়া সাধারণ মানুষের না ছিল কোনোরূপ সুখ বা শান্তি। অনেক সময় আমলাদের বিরুদ্ধে নিজ দলের কোনো সদস্য কিছু বললে মন্ত্রীমহোদয় তা স্বীকার করে নিলেও পরমুহূর্তেই দেখা যেত সেই আমলাদের দুষ্কার্য চাপা দিয়ে তিনি তাদের পরমপুরুষের সার্টিফিকেট দিচ্ছেন। বিধান-সভায় বা বিধান পরিষদে তাদের বিরুদ্ধে কোনো রকম অভিযোগ উত্থাপিত হলে তাকে একেবারেই আমল দেওয়া হোত না। ফলে কংগ্রেসের সোনার গম্বুজ তাসের মিনারে রূপায়িত।

এই সব দৃষ্টান্ত থেকে আমরা যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রিসভাকে হুঁশিয়ার করে দিতে চাই—তাঁরা যেন কোনো প্রকারেই আমলাদের শিকার না হন। আপাত ভালো মানুষের লক্ষণ আগামী দিনের ভালো মানুষের লক্ষণ কি? বিশেষত এক শ্রেণীর পদস্থ আমলাদের ধারণা গড়ে উঠেছে যে, তাঁরাই আসলে দেশ শাসন করেন। এবং বিগত কালে শুধু মন্ত্রীদের দুর্বলতার কথাই তাঁরা জানতেন না, তাঁরা এও জানতেন যে, পারমিট বা অন্যান্য কারণে সরকারী দলের লোক-জনকে তাঁদের কাছেই আসতে হয়—সুতরাং আমলারাও বল্গাহীনভাবে সুযোগ গ্রহণ করতেন। সেই সুযোগ থেকে বঞ্চিত হবার ভয়েই এক শ্রেণীর বড় বড় আমলা বিগত যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রিসভাকে অপদস্থ করার জন্য ষড়যন্ত্রের জাল বিস্তার করেছিল। বলা বাহুল্য, পুলিশ বিভাগের কর্তারাও আমলা-দের থেকে স্বতন্ত্র ধরনের জীব নয়। বিগত যুক্তফ্রন্ট সরকারের শাসন চলাকালীন সময় হাওড়া থানায় এবং যুক্তফ্রন্ট সরকারকে খারিজ করার পর ময়দানে পুলিশ কর্তাদের অনুষ্ঠিত বীভৎস অত্যাচারের ঘটনা সকলেরই স্মরণে আছে। জনসাধারণের আরো স্মরণে আছে আমলাদের অপদার্থ-তার জন্য কিভাবে চোরা-বাজারী, মজুতদারী প্রভৃতি দুর্নীতিমূলক কাজ চোখের ওপর ঘটেছিল। আমাদের এই পত্রিকায় শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও অর্থদপ্তরের পদস্থ আমলারা কিভাবে যুক্তফ্রন্টের কাজকে ব্যাহত করার জন্য অপকৌশলের সৃষ্টি করেছে সে সম্পর্কে বহু তথ্যনিষ্ঠ আলোচনা করা হয়েছে। বর্তমান সময়ে আমলারা অতটা সাহস লক্ষ্য না করলেও একথা ঠিক যে, তাদের মানসিক পরিবর্তন ঘটে নি, তাই তাদের কাছে অন্ধভাবে নিষ্ঠা, আন্তরিকতা ও সততার আশা করা বিপজ্জনক। অন্তত বিগতকালের ইতিহাস থেকে যুক্তফ্রন্টের মন্ত্রিসভাকে আমরা সেকথা স্মরণ করিয়ে দিতে চাই। মনে রাখা দরকার, ভোটদাতারা আমলাদের ভোট দেয় নি, আমলারা ভোট-দাতাদের ভেতনভোগী ভৃত্যমাত্র।

তাই অনতিবিলম্বে গ্রামের বি-ডি-ও থেকে সুরু করে রাইটার্স বিল্ডিংস-এর বড় বড় আমলাদের ব্যাপক রদবদল তথা পরিবর্তন একান্তই প্রয়োজন। জনসাধারণ দেখতে চায়, আমলাতন্ত্র থেকে মুক্তি দিয়ে যুক্তফ্রন্টই তাদের গণতন্ত্র দিয়েছে।

সম্পাদকীয়

আজকের মানুষ

কচ্ছপ নাক একবার কামড়ে ধরলে মেঘ না ডাকা অবধি সে-কামড় ছাড়তে জানে না। পাক প্রেসিডেন্ট আয়ুব খাঁর স্বৈরাচারী শাসনটাও ছিল যেন কচ্ছপের কামড়ের মত। সে-কামড় আলগা করতে রাজী হলেন কেবল তখনি যখন আকাশ-ফাটানো মেঘ-গর্জনের মত গোটা পাকিস্তানের মানুষ আয়ুবশাহীর বিরুদ্ধে গর্জে উঠেছে। প্রেসিডেন্ট পদে আসন্ন নির্বাচনে ফিল্ড মার্শাল মহম্মদ আয়ুব খাঁ নির্বাচনপ্রার্থী হবেন না বলে ঘোষণা করেছেন। তাঁর গোপন মতলব সম্পর্কে যাতে বিরোধীদের মনে কোনো সন্দেহই উঁকি না দিতে পারে সেজন্যে তিনি একথাও জানিয়ে দিয়েছেন যে, তাঁর সিদ্ধান্ত পাকা এবং অপরিবর্তনীয়।

কিন্তু আয়ুব খাঁ এখনো তাঁর সাধের গদিটি ছাড়েন নি, যদিও এ দাবিতে গত তিন মাস ধরে পাক-জনতা মুখর হয়ে আছে। তবে ক্ষমতা এবং দম্ভের উচ্চ আসন থেকে দ্রুত পায়ে নিচে নেমেছেন বলা চলে।

গত নভেম্বর থেকে পাকিস্তানে আয়ুব-বিরোধী বিক্ষোভ দানা বাঁধতে শুরু করে। পাকিস্তানে সরকার-বিরোধী আন্দোলন অবশ্য কিছু নতুন নয়, তবে এবারকার আন্দোলনের বৈশিষ্ট্য হলো পশ্চিম পাকিস্তানেই এই প্রথম আয়ুব-বিরোধী বিক্ষোভে ফেটে পড়লো। লাহোর, রাওয়ালপিণ্ডি, পেশোয়ার ইত্যাদি পশ্চিম পাকিস্তানের শহরগুলিতে ছাত্র যুবকেরা ভুট্টোর সমর্থনে এবং আয়ুবের বিপক্ষে প্রবল আন্দোলন গড়ে তুললো। সরকার সে আন্দোলনের মোকাবিলা করলেন বন্দুক, টিয়ার গ্যাস এবং লাঠির সাহায্যে। তাজা খুন ঝরলো পাকিস্তানের মাটিতে। যে আগুন পশ্চিম পাকিস্তানে জ্বলেছিলো শীগ্‌গিরই তা দাবানলের মত ছড়িয়ে পড়লো শহর থেকে শহরে। সিন্ধু নদের চঞ্চল তরঙ্গ যেন এসে আছড়ে পড়লো পদ্মার কোলে। পূর্ব পাকিস্তানকেও গ্রাস করলো আন্দোলনবহ্নির লেলিহান শিখা।

আয়ুব খাঁ এতটার জন্য মোটেই প্রস্তুত ছিলেন না, দীর্ঘকাল অবাধ ক্ষমতা ভোগ করার পর এ ধরণের স্বতঃস্ফূর্ত গণজাগরণ তিনি কখনো কল্পনাও করতে পারেন নি। আয়ুব-বিরোধী মিছিলে অংশ নিলেন কারা? এ প্রশ্ন তোলা হাস্যকর, বলা উচিত ছিলেন না কে? ব্যবহারজীবীরা শহরের রাজপথে শ্লোগান তুললেন, বোরখা ফেলে দিয়ে অভিজাত মহিলারা। ছাত্র, মজুর, কিষাণ তো কাতারে কাতারে রয়েছে।

১০ই নভেম্বর যেদিন প্রেসিডেন্ট

আয়ুব খাঁ

আয়ুবকে লক্ষ্য করে পেশোয়ারের এক ছাত্র গুলী নিক্ষেপ করে, সেদিনই বোঝা গিয়েছিলো যে প্রসিডেন্টের দিন ঘনিয়ে এসেছে। তার আগে হৃদরোগে আক্রান্ত হলে অবশ্য পাকিস্তান এ প্রশ্নে সরব হয়ে উঠেছিল: আয়ুবের পর কে?' তখন দেশে ক্ষমতার লড়াইও মোটামুটি শুরু হয়ে গিয়েছিলো কয়েকজন দাবিদারের মধ্যে। কিন্তু সেটা আর বেশি দূর এগোতে পারে নি, সামরিক পুরুষ আয়ুব শেষ পর্যন্ত সকল সামলে উঠেছিলেন। হায় আল্লাহ্, তখনো কি জানতেন যে প্রচণ্ডতর ধাক্কা তাঁর জন্যে শীগ্‌গিরই আসছে।

আয়ুব খাঁ যেহেতু রাজনীতির লোক নন, সামরিক বাহিনীর জঙ্গী আদমী, সেহেতু পাকিস্তানে উদ্ভূত গুরুতর সংকটের সমাধানেরও সামরিক সমাধান চাইলেন বেপরোয়াভাবে লাঠি, গুলী চালিয়ে, ভুট্টো, ভাসানী সমেত হাজার হাজার বিরোধীকে গ্রেপ্তার করে, শহরের পর শহর সেনাবাহিনীর হাতে তুলে দিয়ে সান্ধ্য আইন, ১৪৪ ধারা জারি করে। কিন্তু তাতে ফল ফললো ঠিক উল্টো, জনরোষকে তিনি দমাতে তো পারলেনই না, বরং তা জোয়ার জলের মতো বেড়ে যেতে লাগলো।

হ্যাঁ, নতি তাঁকে অবশ্যই স্বীকার করতে হয়েছে। বিরোধীদের দাবিমত জরুরী অবস্থা প্রত্যাহার করেছেন, রাজনৈতিক নেতাদের মুক্তি দিয়েছেন। কিন্তু ছিটেফোঁটা নিয়ে বিরোধীরা সন্তুষ্ট নন মোটেই। তাঁদের শক্তির পরিচয় তাঁরা পেয়ে গিয়েছেন। তাঁরা শেষ ফয়সালা করে নিতে চান, নইলে প্রস্তাবিত গোল টেবিল বৈঠকে আট দলের গণতান্ত্রিক সংগ্রাম পরিষদ অংশ নেবে না।

বিলেতের নামজাদা সামরিক কলেজ স্যাণ্ডহার্স্টে আয়ুব খাঁ ট্রেনিং নিয়েছিলেন। ১৯৫৮ সালের অক্টোবরে এক "রক্তপাতহীন বিপ্লবের" মধ্য দিয়ে ইস্কান্দার মির্জা যখন পাকিস্তানের প্রেসিডেন্টের গদি লাভ করেন আয়ুব খাঁ তখন ছিলেন তাঁর প্রধান অনুচর। তারপর গুরুকে হটিয়ে নিজেই গদি দখল করলেন। ১৯৬০ সনে এক নির্বাচনের অনুষ্ঠান করে আয়ুব খাঁই পাকিস্তানের প্রথম নির্বাচিত প্রেসিডেন্ট বলে জাহির করার অবকাশ পেলেন। ১৯৬৫ সালে দ্বিতীয়বার নির্বাচনে জিতলেন মিস ফতেমা জিন্নাকে পরাজিত করে। তিনিই কুখ্যাত 'এবডো' আইনের জনক যার দ্বারা রাজনৈতিক নেতাদের রাজনীতি থেকে নির্বাসিত করে অবাধ এবং নিরঙ্কুশ ক্ষমতা ভোগের রাস্তা তৈরি করেন।

কিন্তু আজ জনতা তাঁর বিদায়ের জন্যে সড়ক রচনা করেছে। ডিক্টেটরের পতন করুণ, মর্মান্তিক।

রবীন্দ্রনাথ ও সুভাষচন্দ্র

শঙ্করীপ্রসাদ বসু

[পূর্ব-প্রকাশিতের পর]

বন্দেমাতরম ও জনগণ মন—(৭)

পৃথিবীতে বহু আশ্চর্য বস্তু ঘটে, এবং যেহেতু ঘটে তাকে মেনে না নিয়ে উপায় থাকে না। তাহলে জনগণমন'র নির্বাচন তার ঐতিহ্যের বা ভাবমহিমার জন্য নয়, রাষ্ট্র-পুঞ্জে ভারতের হঠাৎ-প্রয়োজনে মুখরক্ষার জন্য!! বহু ত্যাগ ও সংগ্রামের দ্বারা স্বাধীনতা অর্জনকারী জাতির প্রথম প্রধানমন্ত্রীর জাতীয় সঙ্গীত সম্বন্ধে উপযুক্ত ভাষণ জুটে!

ঐতিহ্যের প্রতি নয়, সুরের প্রতি সুরবেত্তা প্রধানমন্ত্রীর প্রীতির আরও পরিচয় ঐ ভাষণে—

"জাতীয় সঙ্গীতবাদ্যের ক্ষেত্রে কথার চেয়ে সুরই অধিক গুরুত্বপূর্ণ, এবং সেই সুর এমন হওয়া চাই যা ভারতীয় সাঙ্গীতিক প্রতিভার প্রতিনিধিত্ব করবে, সেইসঙ্গে কিছু পরিমাণে পাশ্চাত্ত্য সঙ্গীতেরও (?), যার দ্বারা সেই সুর বাইরে বাজাবার জন্য অর্কেস্ট্রা ও ব্যাণ্ডের পক্ষে গ্রহণযোগ্য হয়। জাতীয় সঙ্গীত-বাদ্যের তাৎপর্য যতটা ঘরে, বাইরে ততোধিক। অতীত অভিজ্ঞতা থেকে দেখা গিয়েছে, বাইরে জনগণমন-সুর খুবই প্রশংসিত ও আদৃত। এর সুর বৈশিষ্ট্যপূর্ণ, তাতে বেশ প্রাণস্পন্দন ও গতিশক্তি রয়েছে। কোনো কোনো লোকের মতে, বন্দেমাতরম সুরের সকল গভীর আকর্ষণ ও ঐতিহাসিক পটভূমিকা সত্ত্বেও বিদেশে অর্কেস্ট্রায় সহজে বেজে ওঠার পক্ষে উপযোগী নয়, এবং তার মধ্যে যথেষ্ট গতি নেই।"

বন্দেমাতরম সম্বন্ধে আরও কিছু মৌলিক বক্তব্য প্রধান-মন্ত্রী ঐ ভাষণে দান করেছিলেন—

"বড়ই দুঃখের বিষয় বন্দেমাতরম ও জনগণমন নিয়ে এক ধরনের বিতর্কের সূত্রপাত হয়েছে। বন্দে-মাতরম অবিসংবাদিতভাবে ভারতের প্রথম জাতীয় সঙ্গীত, তার বিরাট ঐতিহ্য, আমাদের স্বাধীনতা সংগ্রামের সঙ্গে তা ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত। সেই স্থান তার চিরদিন বজায় থাকবে, সে স্থান থেকে কেউ তাকে টলাতে পারবে না। সংগ্রামের আবেগ ও তীব্রতার প্রতীক তা, কিন্তু সেই পরিমাণে পূর্ণতার নয়।"

শেষ বাক্যটি পড়বার পরে স্বতঃই চিন্তিত হতে হয়েছিল; পণ্ডিতজী কি বলতে চান? বন্দেমাতরমের প্রথম স্তবকে মাতৃভূমির পরম সুন্দর রূপের অফুরন্ত ঐশ্বর্যের বর্ণনাই রয়েছে—সে তো পূর্ণতারই চিত্র! মনে হয়, পণ্ডিতজী দ্বিতীয় স্তবকের দিকেই ইঙ্গিত করেছিলেন, যেখানে দেশমাতাকে রিপুদলবারিণী, বহুবলধারিণী বলা হয়েছে, এবং প্রশ্ন করা হয়েছে—ত্রিংশ কোটি কণ্ঠের কলকল করাল নিনাদ যিনি তুলতে সমর্থা, দ্বিত্রিংশ কোটি ভুজে যাঁর খরকরবাল ধরা আছে, তাঁকে কেন অবলা বলা হয়? এই অংশটি, আমরা জানি, অনেক অহিংস সৈনিকের প্রাণে আঘাত করেছিল—কেন না বড়ই হিংসার উত্তেজনা ওখানে। স্বাধীনতালাভের রক্তপ্রহরে দাঁড়িয়েও যদি পণ্ডিতজী ভেবে থাকেন, অস্ত্রধারণ বা শত্রুভঞ্জন ইত্যাদির প্রয়োজন কখনো ভারতের হবে না, সে স্বতন্ত্র কথা, কিংবা যদি মনে করে থাকেন, সবলা ভারতমাতা সম্বন্ধে 'অবলা' বিশেষণ মানানসই নয়, তাহলে নিশ্চয় আমরা তাঁর বীরভাবের প্রশংসা করব, কিন্তু একই সঙ্গে জানাবো, বন্দেমাতরমের ঐ দ্বিতীয় স্তবকটি বাদ দিয়ে প্রথম স্তবকটিকে জাতীয় সঙ্গীত করলেই বা কি ক্ষতি ছিল! প্রথম স্তবকটি যদি পরিমাণে অল্প মনে হয়ে থাকে (প্রয়োজনের তুলনায় তা অল্প নয়) তাহলে একেবারে শেষ দুটি লাইন তার সঙ্গে সহজেই যোগ করে দেওয়া যেত।

যাই হোক, সদ্য-স্বাধীনতাপ্রাপ্ত একটি জাতির জাতীয় সঙ্গীত সম্বন্ধে সিদ্ধান্তের ব্যাপারে প্রধানমন্ত্রী যেরকম লঘুভাবে কথা বলেছিলেন, তার তুলনা নেই। জাতীয় সঙ্গীতের ক্ষেত্রে ঐতিহ্য বড় নয়, সুর বড়, এ একটা অভি-নব সংবাদ। আবার সেই সুরকে বিশ্বরম্য হতে হবে!! শ্রীনেহরুর এই ভাষণ পড়বার পরে, পাঠক আমার লঘু উক্তি ক্ষমা করবেন, হিন্দী সিনেমার পরিচালকদের সম্বন্ধে সমস্ত অভিযোগ দূর হয়ে গিয়েছিল, যাঁরা আগে নাকি সুর ঠিক

করে ফেলেন, তারপরে গীতকারকে ডেকে বললেন সুরের উপর জল বসিয়ে দিতে। রবীন্দ্রনাথের কাছে আর একবার কৃতজ্ঞ বোধ করেছিলুম, যিনি এমন একটি সঙ্গীত রচনা করতে পেরেছিলেন, যার সুর দেশে-বিদেশে প্রশংসিত হবার যোগ্য; রাষ্ট্রপুঞ্জে সেই ভারতীয় প্রতিনিধিও আমাদের কাছে পূজার্হ, যিনি রবীন্দ্রনাথের রেকর্ডটি কাছে রেখেছিলেন।৪

না, সব শেষে আমাদের কঠিনভাবে বলতেই হবে, ঐ ভাষণ থেকে সবটুকু সত্য আমরা পাই নি। আসল কথা, জহরলাল বন্দেমাতরমকে বাদ দিতে চেয়েছিলেন। তা তিনি কোনো কারণ না দেখিয়েও করতে পারতেন, সে ক্ষমতা তখন তাঁর করায়ত্ত, তবু যেহেতু পণ্ডিত নেহরুর ধারণা অনুযায়ী ভারতবর্ষ গণতন্ত্র ছাড়া কিছু নয়, সে কারণে পার্লামেণ্টে দাঁড়িয়ে কতকগুলি অজুহাত তাঁকে তুলতে হয়েছিল। ভারতবর্ষ বিভক্ত হয়েছে, কোনো জিন্না বা মুসলিম লীগ উপস্থিত নেই যে, বন্দেমাতরমের বিরুদ্ধে কেউ বিক্ষোভ দেখায়—সেই বহির্গত কারণ-সুযোগের অভাবকে দূর করতে হয়েছে এলোমেলো কতকগুলি কথা বলে। নচেৎ কংগ্রেসের পুরনো প্রতীকচিহ্ন সবগুলিই প্রায় তিনি বজায় রেখেছিলেন; একই পতাকা ঈষৎ রূপান্তরে জাতীয় পতাকা হয়েছে (পরিবর্তনের গৌরবটুকু নিজের জন্য রেখেছেন), এবং হিন্দী হয়েছে রাষ্ট্রভাষা কংগ্রেস-প্রস্তাব অনুযায়ী, শুধু বন্দেমাতরমের ক্ষেত্রেই ব্যতিক্রম ঘটল, কারণ, বেদনার সঙ্গে ভাবতে হচ্ছে, বন্দেমাতরম বাঙালী জাতির দান ভারতবর্ষে অপরপক্ষে জাতীয় পতাকা বা রাষ্ট্রভাষা কংগ্রেস হাইকম্যাণ্ডের সিদ্ধান্তের ফসল।

বন্দেমাতরমের অঙ্গচ্ছেদ হবার পরেই বিষ্ণুপুরে প্রাদেশিক রাজনৈতিক সম্মেলন হয়েছিল। রাধাগোবিন্দ রায় তাঁর ভাষণে বেদনাহত কণ্ঠে বলেছিলেন—

> **"এহেন অপার্থিব সঙ্গীতের অঙ্গচ্ছেদ করিয়া নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির বর্তমান নায়কগণ যেন বঙ্গমাতা তথা ভারতমাতার অঙ্গচ্ছেদ করিয়াছেন। সাম্প্রদায়িক ভাবে আচ্ছন্ন মুসলমান ভাইগণ হিন্দু ভাইদের সহিত বিচ্ছিন্ন হওয়াতে বঙ্গমাতা যেন অঙ্গহীন হইয়াছেন—ইহা কি তাহারই দ্যোতক?"**

ক্রান্তিকালে কোনো কোনো মানুষের চেতনায় ইতিহাসের ছায়াপাত হয়। উপরের বক্তার ক্ষেত্রে তাই হয়েছিল। আর তা ধরা পড়েছিল সুভাষচন্দ্রের রাজনৈতিক বুদ্ধির কাছে। সেই অসহ্য ভবিষ্যৎকে তিনি কখনো মেনে নিতে পারেন না।

৪—বন্দেমাতরম যে শেষ পর্যন্ত সম্পূর্ণ সমাধিলাভ করে নি, অন্যতম জাতীয় সঙ্গীত হিসাবে থেকে গিয়েছে, তার মূল গৌরব সুরেশচন্দ্র মজুমদারের। তাঁর নেতৃত্বে আনন্দ বাজার পত্রিকা ও হিন্দুস্থান স্ট্যাণ্ডার্ড বন্দেমাতরমের পক্ষে প্রচণ্ড আন্দোলন করেছে, অঙ্গচ্ছেদ কালে, এবং স্বাধীনতার পরেও। শেষ পর্যায়ে যখন শ্রীনেহরুর কাছে জাতীয় সঙ্গীতের সুরই প্রধান হয়ে উঠল, তখন সুরেশচন্দ্র বন্দেমাতরমের পক্ষে ইতিহাসের শক্তি ও যুক্তির সঙ্গে কিছু সুরলিপিও সরবরাহ করেছিলেন। ***Letter to the Prime Minister*** নামক পুস্তিকায় (বন্ধুবর শ্রীচিত্তরঞ্জন দে'র কাছ থেকে এটি পেয়েছি) তিনি বন্দেমাতরমের অর্কেস্ট্রাযোগ্য সুরসঙ্গীতের বিষয়ে আলোচনা করেছিলেন। রবীন্দ্রনাথ বন্দেমাতরমের যে রাগপ্রধান সুর দিয়েছিলেন, তা এককভাবে গাইবার পক্ষে অপূর্ব হলেও যন্ত্রীসঙ্গীতের পক্ষে উপযোগী নয়। ১৯৩৭ সালের অক্টোবর মাসে জহরলাল সুরেশচন্দ্র মজুমদারকে বলেন, জনসভায় গাইবার এবং অর্কেস্ট্রায় বাজাবার মত উপযুক্ত সুর বন্দেমাতরমকে দেওয়া উচিত। তদনুযায়ী ১৯৩৯ সালের গোড়ার দিকে সুবিখ্যাত তিমিরবরণকে দিয়ে ইনি বন্দেমাতরমের সুর তৈরি করান, যার মধ্যে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্য সুরের সমন্বয় ঘটেছে, যা কুচকাওয়াজের উপযোগী এবং বীর ভাবের উদ্দীপক। ত্রিপুরী কংগ্রেসের ঠিক আগে বন্দেমাতরমের কণ্ঠসঙ্গীত ও যন্ত্রসঙ্গীতের রেকর্ড করা হয়। ত্রিপুরী থেকে ফেরার পথে এলাহাবাদে নেমে জহরলালকে ঐ রেকর্ড সুরেশচন্দ্র শোনান। জহরলালের তা ভাল লাগে এবং তিনি বলেন জনসাধারণের জন্য এই রেকর্ড বাজারে ছাড়া উচিত। সে রেকর্ড করা হয়, তা জনপ্রিয়তাও অর্জন করে। এরপরে যুদ্ধের জন্য ব্যাপারটা চাপা পড়ে। স্বাধীনতার পরে যখন জাতীয় সঙ্গীতের কথা আবার ওঠে তখন সুরেশচন্দ্র অরবিন্দ আশ্রমের মাদার কর্তৃক প্রেরিত বন্দেমাতরমের 'ইংলিশ নোটেশন' পান (যা তিমিরবরণের সুরেরই অনুরূপ); তার ফটোগ্রাফিক কপি সুরেশচন্দ্র জহরলালকে পাঠিয়ে দেন। সুরেশচন্দ্র এতেও থামেন নি, তিমিরবরণ ও দুজন চেক সঙ্গীতজ্ঞকে দিয়ে বন্দেমাতরমের সংশোধিত সুর রেকর্ড করিয়ে জহরলালের কাছে পাঠান।

বন্দেমাতরমের জন্য সুরেশচন্দ্রের এই অনলস নিঃস্বার্থ প্রয়াসের জন্য ঐতিহাসিক বোধসম্পন্ন বাঙালী ও ভারতবাসী তাঁকে শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করবে। জহরলালকে লেখা তাঁর খোলা চিঠির শেষের দিকে ছিল—

"ভারত ও ভারতের বাইরে যন্ত্রযোগে বাদিত হতে পারে, বন্দেমাতরমের সেইরকম উপযোগী সুরের সন্ধানে অনেক সময় দিয়েছি, বহু চেষ্টা করেছি। ইতিমধ্যে যে ফল লাভ হয়েছে তা উপযুক্ত মানে পৌঁছতে পেরেছে বা পারে নি। কিন্তু যে-বিষয়টিতে আমি জোর দিতে চাইছি তা হল, বন্দেমাতরমের পুরানো সুর আমাদের নতুন প্রয়োজন মেটাতে পারছে না, শুধু এই কারণের জন্যই যেন বন্দেমাতরমকে বাতিল না করা হয়। আমার স্থির বিশ্বাস, ভারতে যথেষ্ট সঙ্গীত-প্রতিভা আছে, যা সর্বাবস্থার উপযোগী সুর বন্দেমাতরমে দিতে পারবে। আপনাকে অনুনয়, সে প্রয়াস ছেড়ে দেবেন না।"

লোকসভার জনারণ্যে সুরেশচন্দ্র মজুমদার বৃথা কেঁদে ছেন। না শুনতে বদ্ধপরিকর কানে বন্দেমাতরমের সুর প্রবেশ করে নি—মরমে?—সে তো বহুদূর।

ভারতের পরাধীনতার মধ্যেই বিভক্ত ভারতের ভাবনার বিরুদ্ধেও তিনি অপোষবিরোধী। স্বাধীনতা সংগ্রামে তিনি আগেই ঝাঁপিয়ে পড়েছেন, দেশবিভাগের সম্ভাবনার সঙ্গে তিনি লড়াই করতে আরম্ভ করে দিয়েছিলেন ১৯৩৭ সাল থেকেই। সেই জন্যই বন্দেমাতরমের অংগচ্ছেদে তাঁর সম্মতি এবং পরবর্তীকালে কর্পোরেশনে মুসলিম লীগের সঙ্গে চুক্তি প্রভৃতি। বন্দেমাতরমের ভক্তদের কাছে সুভাষচন্দ্রের কাজ যদি অনুচিত মনেও হয়, শেষ পর্যন্ত ক্ষমার্হ মনে হবে। কিন্তু যিনি নিজের অজস্র পুরাতন হুঙ্কার ভুলে গিয়ে, দেশবিভাগে সম্মত হয়ে, সহস্র সহস্র নিরীহ মানুষের রক্তস্রোত পথের উপর দিয়ে হেঁটে গিয়ে পার্লামেণ্টে প্রবেশ করেছেন, সেই প্রথম প্রধানমন্ত্রী পণ্ডিত জহরলালের কিন্তু বন্দেমাতরম বর্জনে কোনো নৈতিক অধিকার ছিল না।

[ক্রমশঃ]

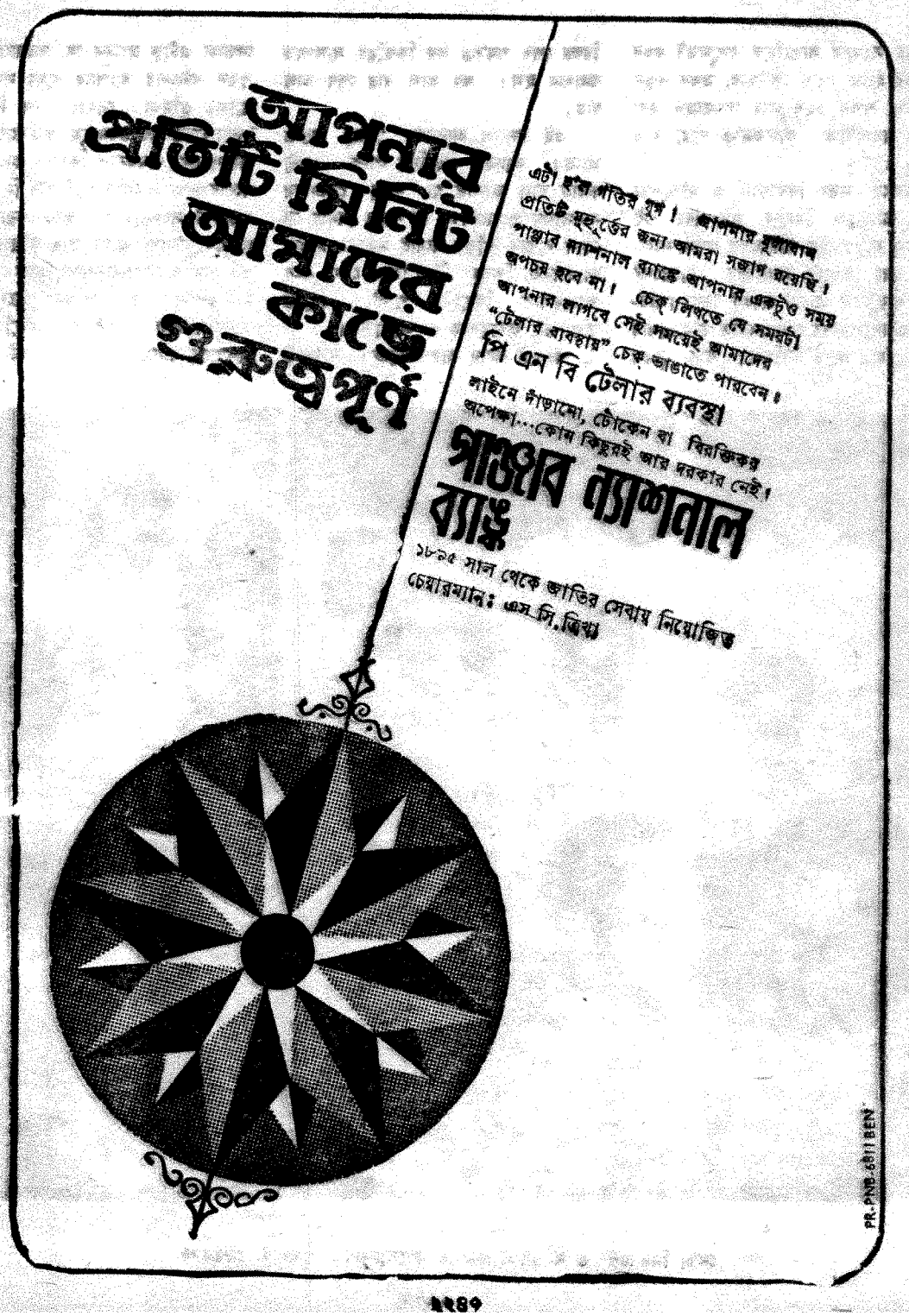

বঙ্গ দর্শন

এই সংখ্যার সাপ্তাহিক বসুমতী যখন পাঠকের হাতে গিয়ে পৌঁছবে, তখন নতুন মন্ত্রিসভা শপথ গ্রহণ করে ফেলেছেন এবং তাঁদের যথারীতি কাজকর্মও শুরু হয়ে গেছে।

এবারে নেতা নির্বাচনে ও মন্ত্রিসভা গঠনে অহেতুক বিলম্ব হল এবং এই উপলক্ষে যুক্তফ্রন্টের শরিকদের অযথা কাল-হরণ এবং কিছুটা অযৌক্তিক আচরণের জন্যে শুরুতেই একটি সংকট দেখা গিয়েছিল, জনসাধারণের মধ্যে বিরক্তি ও হতাশার লক্ষণগুলিও ফুটে উঠছিল। তবে সুখের বিষয় শেষ পর্যন্ত সব কিছুরই সুসঙ্গত সমাধান হল। সব ভাল যার শেষ ভাল যার।

এই প্রসঙ্গে আমাদের কিছু বক্তব্য আছে। আমরা বহুদিন থেকে একটা কথাই বলে আসছি যা হচ্ছে নেতাদের বাকসংযম প্রয়োজন। যে কোন বিষয়ে যে কোন দু'জন ব্যক্তির মধ্যেই মতভেদ হওয়া স্বাভাবিক, কিন্তু সেগুলিকে কেন্দ্র করে সংবাদপত্রে বিবৃতি, পাল্টা বিবৃতি একান্তই অনাবশ্যক ও অশোভন।

কথাটি বলার কারণ আছে। যুক্তফ্রন্ট নেতারা এটুকু জানেন যে, গতবারে তাঁদের পতন ঘটানোর ব্যাপারে বৃহৎ সংবাদপত্রগুলির ভূমিকা নেহাৎ কম ছিল না। মতাদর্শগত মতভেদসমূহ ফাঁপিয়ে-ফুলিয়ে প্রকাশ করে জনমনকে বিভ্রান্ত করতে বৃহৎ সংবাদপত্রগুলি কোন ত্রুটি করে নি। এবারে যুক্তফ্রন্ট সংখ্যাধিক্য লাভ করার সঙ্গে সঙ্গেই 'কেবা আগে প্রাণ করিবেক দান' এই মর্মে বৃহৎ সংবাদপত্রগুলিতে যেন যুক্তফ্রন্ট-বন্দনার প্রতিযোগিতা লেগে গেছে। অথচ সুযোগ পেলেই এরা বিবৃতি পাল্টা বিবৃতির সুযোগ নিয়ে যুক্তফ্রন্ট-বিরোধী

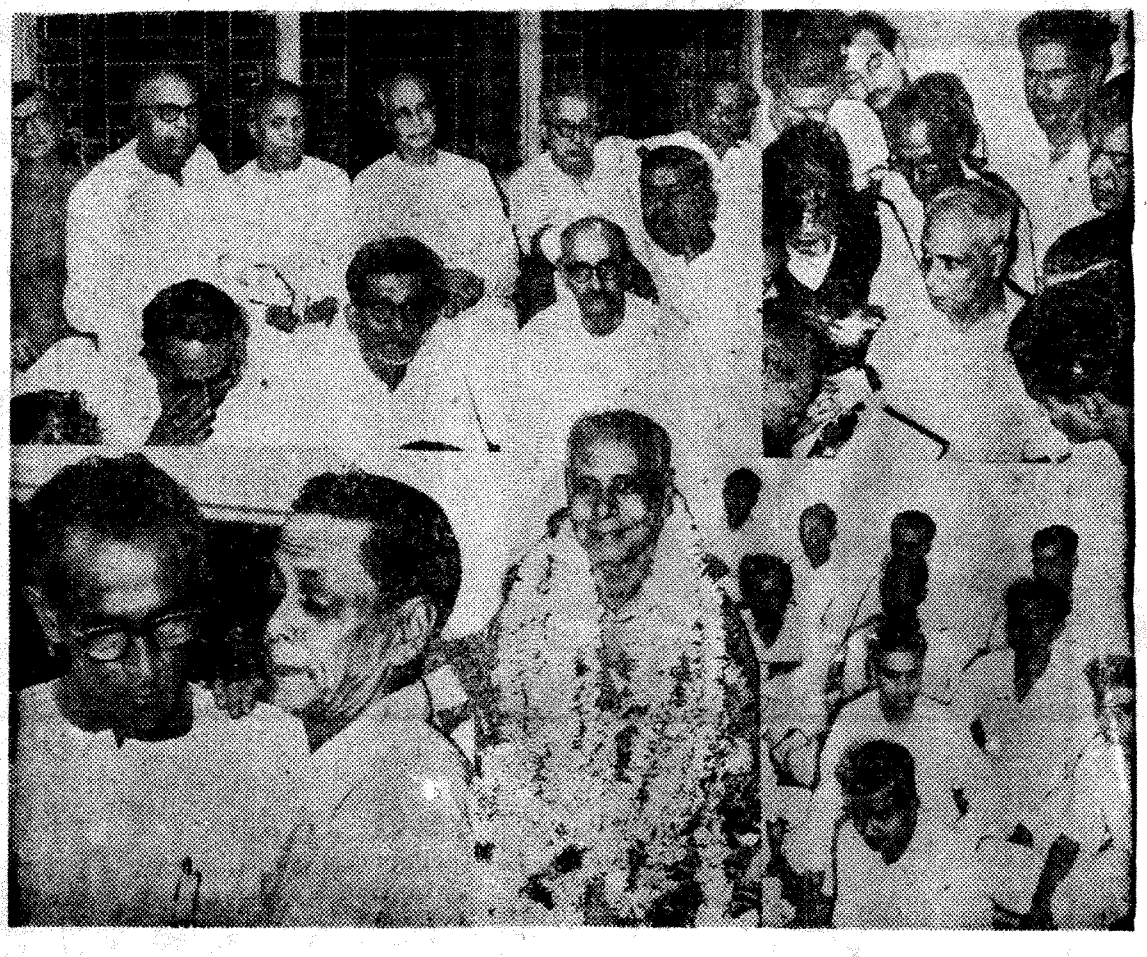

নেতা নির্বাচন ও মন্ত্রিসভা গঠনের আলোচনায় যুক্তফ্রন্ট নেতৃবৃন্দ

অপপ্রচার করতে শুরু করতে করবে না। সব জেনে-শুনেও ফ্রন্টের নেতারা এদেরই দ্বারস্থ হয়েছেন, কোন কোন নেতা রাত আড়াইটের সময়েও বিশেষ কোন সংবাদপত্রের বিশেষ কোন প্রতিনিধিকে ইন্টারভিউ দিয়েছেন। এগুলি অত্যন্ত অপ্রয়োজনীয় বলে মনে হচ্ছে। তা ছাড়া কোন বিষয়ে মতভেদ ঘটলেও, তা নিয়ে তৎক্ষণাৎ অপরকে দোষারোপ করে সংবাদপত্রে বিবৃতি দেওয়াটা অশোভন।

আমাদের এই ক্ষুদ্র পত্রিকার এ কথা বলার নিশ্চয়ই অধিকার আছে—কেন না ১৯৬৭ সালে যুক্তফ্রন্ট সরকার গঠিত হবার পর থেকে সাপ্তাহিক বসুমতীই বোধ হয় একমাত্র পত্রিকা, যা যুক্তফ্রন্ট সরকারকে সমর্থন করে এসেছে। ডঃ ঘোষ মন্ত্রিসভার আমলে আমাদের ওপর দারুণ চাপ এসেছিল, তথাপি পি ডি এফ সরকারের সমর্থনে একটি বাক্যও আমাদের দিয়ে লেখানো সম্ভব হয় নি। প্রাক-মধ্যবর্তী নির্বাচনী অবস্থায় প্রায় অকল সংবাদপত্রই

ছোটবেলা থেকে সাধনা দশন ব্যবহার করবে

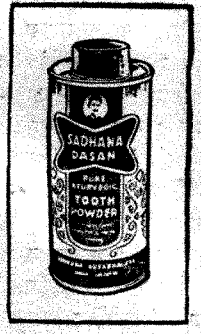

বৃদ্ধ বয়স পর্যন্ত দাঁত সুস্থ, সবল, সুন্দর ও মাড়ি সুদৃঢ় থাকে। মুখ স্বচ্ছ ও দুর্গন্ধমুক্ত হয়।

সাধনা দশন

একটি আদর্শ দাঁতের মাজন

সাধনা ঔষধালয়-ঢাকা
কলিকাতা-৪৮
অধ্যক্ষ ডাঃ যোগেশ চন্দ্র ঘোষ, এম.এ.
আয়ুর্বেদ-শাস্ত্রী, এফ.সি.এস. (লণ্ডন)
এম.সি.এস. (আমেরিকা) ভাগলপুর কলেজের
আয়ুর্বেদ শাস্ত্রের ভূতপূর্ব অধ্যাপক।

কলিকাতা কেন্দ্র :
ডাঃ নরেশ চন্দ্র ঘোষ, এম.বি.বি.এস. (ক্যাল) আয়ুর্বেদাচার্য

৫০-২/৬৮

স্থূলভাবে অথবা সূক্ষ্মভাবে কংগ্রেসের প্রচারে সহায়তা করেছিল, উদ্দেশ্যমূলক বিভিন্ন সমীক্ষা প্রকাশ করে কংগ্রেসের জন্য অনিবার্য এবং যুক্তফ্রন্টের কোন আশা নেই এই কথা প্রচারের চেষ্টা হয়েছিল। কিন্তু আমাদের সম্পাদকীয় ও বঙ্গদর্শনে চির-কালই, একটিও ব্যতিক্রম ব্যতিরেকে প্রগতিশীল শক্তিগুলিকে সমর্থন জানানো হয়েছে, তদুপরি বাস্তবানুগ অনুসন্ধানের ভিত্তিতে প্রকাশিত আমাদের প্রতিটি সমীক্ষাই অভ্রান্ত বলে প্রমাণিত হয়েছে, যে কোন ব্যক্তি নাম্বার ঘাঁটলেই তা দেখা যাবে। বাংলা ভাষায় প্রকাশিত দ্বিতীয় বৃহত্তম প্রচারিত সাপ্তাহিক হিসাবে জনমত গঠনে আমাদের পত্রিকাও কম সাহায্য করে নি।

এই নৈতিক অধিকারেই নেতাদের কর্ম ও আচরণের সমালোচনা করার অধিকার আমাদের বর্তেছে এবং সেই কারণেই তাঁদের উদ্দেশ্যে একটি বক্তব্যই রাখছি তা হচ্ছে এই যে, তাঁরা বাকসংযম অভ্যাস করুন। গত একশ বছর ধরে শুধু কথাই শুনে আসছি, পশ্চিমবঙ্গের জনসাধারণ পরস্পরবিরোধী বিবৃতি পাল্টা বিবৃতি চায় না। নেতাদের মতভেদ হবেই, তাতে আমরা আপত্তি করছি না, তবে তার প্রকাশ যেন কদাপি কোনভাবেই প্রোভোকেটিভ বা অপর শরিকের নিকট প্ররোচনামূলক না হয়। মন্ত্রীদেরও আমরা এই মর্মে জানাচ্ছি যে, কোন ইস্যুর ওপর তাঁরা যেন স্বতন্ত্রভাবে বিবৃতি না দিয়ে বসেন। সংবাদপত্রে প্রকাশিত বিবৃতিগুলি যেন মন্ত্রিসভার অনুমোদিত হয়। এইগুলিই গতবারে অনেক অনর্থ ঘটিয়েছে। মনে রাখতে হবে যুক্তফ্রন্টের কাছে এবারে পশ্চিমবঙ্গবাসীর প্রত্যাশা অনেক। কাজেই সকলেরই স্বার্থে মন্ত্রীদের এবং শরিক দলগুলির একটি সর্বজনগ্রাহ্য আচরণবিধি এই মুহূর্তেই গড়ে তোলা উচিত।

নেতা নির্বাচন

গত ২০শে ফেব্রুয়ারী বেকার রোডে শ্রীস্নেহাংশু আচার্যের বাড়িতে বৃহস্পতি-বারের বারবেলা শেষে যুক্তফ্রন্টের বৈঠক বসবার মাত্র কয়েক মিনিটের মধ্যেই সর্ব-সম্মতিক্রমে যুক্তফ্রন্ট পরিষদীয় দলের নেতা ও সহকারী নেতা নির্বাচন সম্পন্ন হয়। নেতা হিসাবে শ্রীঅজয় মুখোপাধ্যায়ের নাম প্রস্তাব করেন শ্রীজ্যোতি বসু এবং সহকারী নেতা হিসাবে শ্রীজ্যোতি বসুর নাম প্রস্তাব করেন শ্রীঅজয় মুখোপাধ্যায়। নেতা নির্বাচনের পর শ্রীমুখোপাধ্যায় এক সাক্ষাৎকারে বলেন : পশ্চিম বাংলার মানুষ অনেক ত্যাগ স্বীকার করে ও দুঃখ বরণ করে যুক্তফ্রন্টকে জয়-যুক্ত করেছে। ৩২ দফা কর্মসূচী রূপায়ণের মাধ্যমে তাঁদের সাহায্য করা এবং যুক্তফ্রন্ট ঐক্যকে সংহত ও শক্তিশালী করাই হবে যুক্তফ্রন্ট সরকারের মুখ্য কাজ।

রাজ্যের যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রিসভা গঠন সম্পর্কে স্বরাষ্ট্রদপ্তর নিয়ে বাংলা কংগ্রেস ও মার্কসবাদী কমিউনিস্ট পার্টির মধ্যে যে বিরোধকে কেন্দ্র করে অচলাবস্থার সৃষ্টি হয়েছিল তার অবসান কোন সূত্রে বা চুক্তির ভিত্তিতে হয় নি বরং তা অতি আকস্মিক মানসিক পরিবর্তনে হয়েছে বলা যায়। বুধবার রাত্রি থেকে বৃহস্পতিবার বেলা এগারোটা পর্যন্ত শ্রীপ্রমোদ দাশগুপ্ত, শ্রীহরেকৃষ্ণ কোঙার, শ্রীসুশীল ধাড়া, শ্রীসুকুমার রায়, শ্রীঅশোক ঘোষ প্রমুখ নেতারা যে আলোচনা করেন তার মধ্যে সকলেরই মূল কথা ছিল বৃহস্পতিবার সন্ধ্যার সভাতেই যেন একটা নিষ্পত্তি হয়ে যায়। অতঃপর শ্রীপ্রমোদ দাশগুপ্ত ও শ্রীসুকুমার রায়ের মধ্যে একটি দ্বিপাক্ষিক আলোচনায় স্বরাষ্ট্রদপ্তর সংক্রান্ত বিরোধ পাকাপাকিভাবেই মিটে যায় এবং ওদিন সন্ধ্যার স্বল্পস্থায়ী বৈঠকেই নেতা ও সহকারী নেতার নাম ঘোষণা করা হয়।

মুখ্যমন্ত্রী শ্রীঅজয় মুখোপাধ্যায় এক সাক্ষাৎকারে বলেন যে, কেন্দ্রের কাছ থেকে আরও ক্ষমতা ও অর্থ আদায়ের জন্য নতুন যুক্তফ্রন্ট সরকার দৃঢ় সঙ্কল্প নিয়ে কেন্দ্রের ওপর চাপ সৃষ্টি করে যাবেন। তিনি বলেন, কেন্দ্র যদি সহানুভূতির সঙ্গে আমাদের দাবি পূরণ করেন তাহলে তাঁদের সঙ্গে সংঘর্ষের কোন প্রশ্নই ওঠে না। তিনি বলেন যে রাজ্যের অর্থনৈতিক উন্নয়নে শিল্পপতি ও ব্যবসায়ীরা যুক্তফ্রন্ট সরকারের কাছ থেকে সর্বপ্রকার সাহায্য পাবেন। যুক্তফ্রন্ট সরকার দেশের একতা, সংহতি ও সার্বভৌমত্ব রক্ষার জন্য কাজ করবেন। যুক্তফ্রন্ট সরকার খাদ্য ও কৃষির ওপর দৃষ্টি দেবেন এবং আগামী দুই বছরের মধ্যে খাদ্যে স্বয়ম্ভর হবার চেষ্টা চালাবেন। নতুন সরকার দৃঢ়তার সঙ্গে আইন ও শৃঙ্খলা বজায় রাখবেন। তবে আইন ও শৃঙ্খলা বজায় রাখার মানে কঠোর হস্তে পুলিশ দিয়ে কোন গণ-আন্দোলন দমন নয়।

মন্ত্রিসভার উদ্দেশ্যে ঃ প্রথম কয়েকদিন হুঁশিয়ার

গত সংখ্যায় বঙ্গদর্শনে মন্ত্রিসভার উদ্দেশ্যে আমরা কয়েকটি বিষয় তুলে ধরে-ছিলাম। জানি না সেগুলি সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের দৃষ্টিপথে পড়েছে কি না। এই সংখ্যায় আমরা একটি বিশেষ বিষয়ের ওপরেই আমাদের বক্তব্যকে সীমাবদ্ধ রাখব।

অনভিজ্ঞ মন্ত্রীরা প্রথম কয়েকদিন দপ্তরে গিয়েই নানান ধরণের অস্বস্তিকর অবস্থার মুখোমুখি হন। এবং ঐ কয়েক-দিন এমন একটি সুযোগের সৃষ্টি করে, যা আমলাতন্ত্র নিজ স্বার্থের অনুকূলে কাজে লাগায়।

ব্যাপারটি আরও খুলে বলা যাক। প্রথম কয়েকদিনেই সংশ্লিষ্ট দপ্তরের সচিব ও অন্যান্য পদস্থ আমলারা অবশ্য সকল ক্ষেত্রে নয়, পেণ্ডিং ফাইল আখ্যায় কিছু ফাইলপত্র মন্ত্রী মহাশয়ের সামনে সই করার জন্য পেশ করেন এবং মন্ত্রীমশায় ধাতস্থ হবার আগেই সেগুলিতে মনস্তাত্ত্বিক কারণেই সই করতে বাধ্য হন।

এই ফাইলগুলিতে সাধারণত থাকে নিয়োগ, বদলী, প্রমোশন ইত্যাদি কয়েকটি বিষয়। যে-সকল ক্ষেত্রে বহু বিতর্কিত ব্যাপার আছে, নতুন মন্ত্রী সেগুলির গুরুত্ব না বুঝেই সই করে দেন, ফলে পরে আর কিছু করার থাকে না। উদাহরণ-স্বরূপ বলা যায় যে কোন অফিসারের বিরুদ্ধে হয়ত দুর্নীতির জন্য বদলীর আদেশ আছে। তিনি যথাস্থানে ধরাধরি করে ব্যবস্থা পাকা করলেন এবং তাঁর সেই ফাইলটি ঐ প্রথম দিনের মন্ত্রী মহো-দয়ের অনভিজ্ঞতার সুযোগে স্বাক্ষরিত করে নেওয়া হয়। কাজেই নবনিযুক্ত মন্ত্রীদের প্রতি আমাদের অনুরোধ তাঁরা যেন প্রথম দিন থেকেই চোখ-কান খোলা রাখেন।

কবি নবেন্দু চক্রবর্তী

কবি সঞ্জয় ভট্টাচার্য-র তিরোধানের পর আরো একটি অকালবিয়োগের শোক-সংবাদ আমাদের কাছে পৌঁচেছে। কবি নবেন্দু চক্রবর্তী, যিনি 'কবিতা মেলা'-র অন্যতম সংগঠক ছিলেন এবং কিছুকাল 'উত্তরা' মাসিক পত্রিকার সহ-সম্পাদনা করেন, একেবারেই অসময়ে তাঁর পরিচিত পৃথিবী থেকে বিদায় নিলেন। মৃত্যুর সময় পর্যন্ত তিনি অনেককাল ধরেই পরিচিত ছিলেন। কিন্তু তাঁর প্রধান নেশা ছিল কবিতার নির্মাণ নয়, কবিতার আন্দোলনকে প্রসারিত করা। তথাপি অল্প যে ক'টি কবিতা বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে, তাতে একটি সৎ ও স্বচ্ছ কবিমনের পরিচয় পাওয়া যায়। তিনি সম্প্রতি বিবাহ করেছিলেন এবং নিজের পরিবার ও বন্ধু-বান্ধবদের ভালবাসার পাত্র ছিলেন। সামাজিক দায়িত্ব পালনের ক্ষেত্রে এবং বাংলা দেশের শিল্প ও সংস্কৃতির রেনে-সাঁকে পুনরায় উজ্জীবিত করার কাজে তিনি ছিলেন একজন অক্লান্ত ও নিঃস্বার্থ কর্মী।

তাঁর মৃত্যু, যা ব্যক্তিগতভাবে 'উত্তরা' সম্পাদক শ্রীসুরেশচন্দ্র চক্রবর্তীর পুত্রশোক, আমাদের কাছেও সহোদর বিয়োগের মত বেদনাদায়ক।

৯২।২।৬৯)

ভারত দর্শন

রাষ্ট্রপতির উদ্বেগ ও আশাবাদ

তিন মাসের জন্য সংসদের অধিবেশন শুরু হল। বাজেট অধিবেশন। অধিবেশনের শুরুতে যথারীতি রাষ্ট্রপতির ভাষণটি এবার বিশেষ অন্যতর তাৎপর্যে মণ্ডিত এই কারণে যে, অধিবেশনের আগেকালে চার-চারটি রাজ্যে অন্তর্বর্তী নির্বাচন এবং নাগাভূমিতে সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়েছে এবং নির্বাচনে যতনোন্মুখ কংগ্রেসের কোথাও উজ্জ্বল সম্ভাবনা পরিস্ফুট হয় নি। সুতরাং কেন্দ্রে ক্ষমতাসীন কংগ্রেসী দলের অন্যতম নেতারূপে ডঃ জাকির হোসেন কিছুটা ভারাঘলা মন নিয়েই যে সংসদে উদ্বোধনী ভাষণ দিতে আসবেন তাতে সন্দেহ নেই। তবে রাষ্ট্রপতিরূপে যেহেতু তাঁর ভাষণ নিরপেক্ষতা বজায় রাখবে শোভনতার খাতিরে সেজন্য তিনি নিরপেক্ষভাবে দেশের সামাজিক আশা-নিরাশা ও উদ্বেগের কারণগুলি বিশ্লেষণ করার চেষ্টা করেছেন, যার মধ্যে রাজনৈতিক নিশ্চিত সম্পর্ক পরোক্ষে উদ্বেগ স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। বঙ্গ-বিহার-উত্তরপ্রদেশ ও গুজরাটের নির্বাচনোত্তর পরিস্থিতির প্রতি দৃকপাত করে রাষ্ট্রপতির ভাষণে যে উদ্বেগের রেশ প্রকাশ পেয়েছে সে উদ্বেগের কক্ষবিন্দু যে পশ্চিমবঙ্গ একথা বুঝিয়ে বলার অপেক্ষা রাখে না। তাঁর বিশেষ উল্লেখের মধ্যে সামাজিক, রাজনৈতিক কাঠামোর পরিবর্তন-প্রয়াসী কম্যুনিস্ট ভাবাদর্শের প্রতি হুঁসিয়ারী প্রাধান্য পেয়েছে। বলা বাহুল্য, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী শ্রীচ্যবন সাহেবের কল্যাণে যতক্ষণ ল' এণ্ড অর্ডারের মুদ্গর বিদারিত হবে ততক্ষণ রাষ্ট্রপতির উদ্বেগ থাকলেও সাধারণের উদ্বিগ্ন হওয়ার কারণ নেই। কেন না অতঃপর স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর কড়া দৃষ্টি পশ্চিমবঙ্গকে ঘিরে থাকবেই এবং পান থেকে চুনটি খসার ব্যাপারে তিনি যে আদিল্লী আকুল করে তুলতে সর্বপ্রযত্ন প্রয়োগ করবেন, তাতেও সন্দেহ নেই। সেইমত গাওনা এখনই শুরু হয়েছে দেখে ছা-পোষা সাধারণ সুখেই থাকবেন। তবে যেখানে শিবসেনা সদৃশ উৎপাত উগ্র আঞ্চলিকতার প্রকোপে জীবন ও ধনসম্পত্তি উৎখাত করতে উত্তেজিত হয়ে উঠবে সেখানে রাষ্ট্রপতির উদ্বেগ নিরসনের জন্য তাঁর স্বরাষ্ট্রদপ্তরীয় সেনাপতিগণ কতদূর তৎপর হতে পারবেন সে সম্পর্কে সাধারণে কোন গ্যারাণ্টি রাখার সাহস অধীনের নেই। একবার নয়, একাধিকবার ক্ষুদে হিটলার বাল ঠাকরের অশিব সেনা মহারাষ্ট্রে যে ধরণের অবাধ উৎপাত করে যেতে সুযোগ পেয়েছে তাতে পবিত্র সংবিধানে প্রদত্ত ধনসম্পত্তি ও জীবন রক্ষার প্রতিশ্রুতি কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকার রক্ষা করতে সক্ষম হয়েছেন বলে প্রমাণিত হয় নি। রাষ্ট্রপতি তাঁর মহান নিরপেক্ষতার দরুণ অবশ্যই এজাতীয় উৎপাতেরও উল্লেখ করেছেন। অমহারাষ্ট্রীয়দের ঐটুকুই যা সান্ত্বনা।

সুফলাং সুফলম্

দেশব্যাপী এবার কৃষিজাত পণ্যের উচ্ছ্বাস লক্ষ্য করে অধিক ফলনের মধ্যে দেশের সার্বিক সুফলের আশা রাষ্ট্রপতিকে উৎফুল্ল করেছে। এমন কি তাঁর বিশ্বাস আগামী কয়েক ক্ষেপ এমনি ফলন হলে দেশ খাদ্যে স্বয়ম্ভর হয়ে উঠবে। কিন্তু সুফলনে যা দেবে পঞ্চপালে যদি তাই নিঃশেষে উড়িয়ে দেয় তবে হতাশার অবসান নেই। সেই পঞ্চপালরূপে দেশের ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যাকে বহুল প্রচারিত 'লাল ত্রিকোণে'র সতর্কীকরণ দ্বারাও রোখা যাচ্ছে না। আশার শস্যকে ছাই ছিটোতে ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার আর জুড়ি নেই। একে তো দেশ বিভাগের ফলে জনসংখ্যার চাপে এতোকাল হিমসিম খেতে হয়েছে, এখন সেই সমুদয় জনসংখ্যাই চক্রাকারে প্রবর্ধিত হচ্ছে। সুতরাং বস্তুতক্ষেত্রে আপাত সুফলন কাজে আসছে না, রাষ্ট্রপতি সেই সমস্যার প্রতি বিমর্ষ ইঙ্গিত করতেও ভোলেন নি। এই প্রসঙ্গে ইতিপূর্বে ভারতদর্শনে বিস্তৃত আলোচনার মাধ্যমে দেখাবার চেষ্টা করেছি যে, 'লাল ত্রিকোণে'র গূঢ় সঙ্কেত জনসাধারণের সর্বস্তরে পৌঁছয় নি। এই 'লাল ত্রিকোণের রূপকল্পনাটি যাঁদের পণ্ডিতী-য়ানার গর্ভজাত, তাঁরা পণ্ডিতী সমাজে তাঁদের প্রচারকে যতদূর ফলপ্রদ করতে পেরেছেন, সমাজের অনালোকিত প্রদেশে এবং সুদূর গণ্ডগ্রামে ততদূর সফল হতে পারেন নি। মুস্কিল এই যে, মোটামুটিভাবে শিক্ষিত সাধারণ পরিবার পরিকল্পনা নিজ দায়িত্বেই গ্রহণ করছেন। আসল নজরটি রাখতে হবে তাঁদের ওপর অশিক্ষা যেখানে সমাজ-চেতনা ও ব্যক্তিচেতনা সৃষ্টিতে অক্ষম। যেখানে নিজের ভাল-মন্দ বোঝার ক্ষমতাই জন্মায় নি; প্রচারকে কেন্দ্রীভূত করতে হবে সেইখানে। নজর দিতে হবে সেই সব ক্রমবর্ধমান পথ-পরিবারের ওপর, যাদের প্রতি সমাজের বিন্দু-মাত্র দায়িত্বশীল নয়। দেশের এই বিরাট অন-প্রোডাক্টিভ জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণের প্রয়োজনকে অদ্যাবধি অবহেলা করে আসা হচ্ছে। অথচ দেশের খাদ্য-ভাণ্ডারের ওপর এদের দাবিকে সরকার অস্বীকার করলেও মানবিক চেতনার দরুণ সমাজ এদের অভুক্ত অবস্থায় অনশন-মৃত্যুর দিকে ঠেলে দিতে পারে না। জনসংখ্যা গণনায় এরা বাইরে পড়ে থাকলেও খাদ্যভাণ্ডারের ওপর দাবি নস্যাৎ হয়ে যায় না। এ বিষয়ে লাল ত্রিকোণের প্রচারক-বাহিনী দৃষ্টি দিলে অনেক কাজ হবে।

উৎপন্নের জন্য রাষ্ট্রপতির আশাবাদ খুবই সংগত। কিন্তু উৎপাদিত বস্তু-নিচয়ের সুসংগত বণ্টন না হলে, সাধারণ মানুষের ক্ষেত্রে তা 'গাছে কাঁঠাল গোঁফে তেল'-এর ন্যায় ব্যাপার হবে। অর্থাৎ বেল পাকছে জেনেও তীর্থের কাকের সুরাহা হবে না। বিভিন্ন রাজ্যের ক্ষেত্রেও একই ব্যাপার। ঘাটতি এলাকায় যদি কেন্দ্রীয় দৃকপাত কম পড়ে তবে দেশের খাদ্য-ভাণ্ডারের মজুত জেনে পুলকিত বোধ করার কারণ নেই সেইসব এলাকারও। দেশের কর্ণধারগণ যেন শুধু হিসেবের খাতায় চোখ রেখেই উৎফুল্ল হয়ে নিষ্ক্রিয় না হয়ে পড়েন। সংগত বণ্টনই আসল কথা। সেটা হলে সাধারণের মনে আশার আলো ঝলমলিয়ে উঠবে, নচেৎ জাতীয় আয়ের বৃদ্ধির মতোই এই উৎপন্ন বৃদ্ধি কেবলমাত্র হিসেবের খাতাই অলঙ্কৃত

করে থাকবে। সাধারণে তা কানেই শুনবেন, ভোগ করে ওঠা আর সম্ভব হবে না।

উৎপন্ন কাঁচা মালের সুফলনের দরুণ কাঁচা মাল ব্যবহারকারী শিল্প-সংস্থাগুলিও নতুন উদ্দীপনা লাভ করবে বলে রাষ্ট্রপতির ভাষণে আশা প্রকাশ করা হয়েছে।

রাষ্ট্রপতির নৈরাশ্য দেশের রাজনৈতিক অনিশ্চিতি লক্ষ্য করেই ব্যক্ত হয়েছে। আঞ্চলিকতা, সাম্প্রদায়িকতা, মন্ত্রিসভার স্থায়িত্বের প্রশ্ন, গদির লোভে দলত্যাগ প্রভৃতি রাষ্ট্রপতির মনকে ভারাক্রান্ত করে তুলেছে। এসব চিন্তা অবশ্যই রাষ্ট্রের প্রধানকে ভাবিত করবে। তবে সেই সঙ্গে রাষ্ট্রপতির নিশ্চয় একথাও মনে হয়েছে যে, তাঁরই সরকারের ভ্রান্ত-নীতির ফলেই রাজ্যে রাজ্যে কতিপয় নিধিরাম সর্দার সেনাপতির উত্থান ঘটছে যা ভারতের ভবিষ্যৎ অন্ধকার করার পক্ষে যথেষ্ট সক্রিয় হয়ে উঠেছে। রাষ্ট্রপতির এই উদ্বেগের ফলে যদি কেন্দ্রীয় সরকারের কিছুটা টনক নড়ে তবেই রাষ্ট্রপতির ভাষণের মর্যাদা যথাযথ রক্ষিত হয়।

শিব সেনার অশিব তাণ্ডব

কিন্তু সংসদে শিব সেনাকে কেন্দ্র করে যে বিতর্কের ঝড় উঠেছিল তাতে একচক্ষু হরিণীদের নর্তন-কুর্দনই সার হয়েছে, আসলে সমগ্র দেশের রসাতলগামী গতিবেগ ঠাণ্ডা করার জন্য কারও সবিশেষ মাথাব্যথা আছে বলে মনে হয় নি। প্রথমত বাল ঠাকরের সেনাবাহিনীকে প্রশ্রয় ও মদত দিয়ে চতুর্থ নির্বাচনের প্রাক্কাল থেকে রাজ্যে ও কেন্দ্রে ক্ষমতাসীন দল যে ভুল করেছিলেন, বোম্বাই-এ এই প্রশ্রয়পুষ্ট শিব সেনার সাম্প্রতিক তাণ্ডবে তারই প্রায়শ্চিত্ত হয়ে গেল বলে মনে করা হলেও ভুল হবে। কারণ বাল ঠাকরের সেনাবাহিনী চ্যবন বা দেশাইয়ের গাড়ি আটক করে প্রকারান্তরে চ্যবন সাহেবের সহায়তাই করেছে। কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী হিসেবে চ্যবন সাহেবকে মহাজন কমিশনের রিপোর্টটিকে বাস্তবায়িত করার দায়িত্ব গ্রহণ করতে হয়। কিন্তু মহারাষ্ট্র-মহীশূরে সীমানার প্রশ্নে মহারাষ্ট্রীয় হিসেবে এই প্রতিবেদনের সুপারিশ বাস্তবায়িত করা তাঁর পক্ষে রাজনৈতিক কারণেও অসুবিধাজনক। নিজ রাজ্যের জনপ্রিয় দাবির প্রতি ভোটনির্ভর নেতৃত্ব অবহেলা প্রদর্শন করতে পারে না। তাই চারদিনব্যাপী শিব সেনার অবাধ উচ্ছৃঙ্খল গুণ্ডামীতে যে সন্ত্রাসের কাল কায়েম হয়েছিল সেইদিকে আঙুল তুলে চ্যবন সাহেব এখন মহারাষ্ট্রীয় স্বার্থের পরিপন্থী কোনও কর্তব্য সম্পাদনে বিরত হওয়ার সুযোগ পেলেন। নয় ত' শক্ত মানুষ হিসেবে কথিত চ্যবন সাহেব যেক্ষেত্রে অন্য রাজ্যে একটি ধানি-পটকার শব্দ পেলেই উদ্বেগে আকুল হয়ে পড়েন, তিনি শিব সেনার অশিব তাণ্ডবে হাত-পা গুটিয়ে বসে থাকলেন কেন? তাঁর দলেরই সরকার যে রাজ্যে সমাসীন সেখানে ল' এণ্ড অর্ডারই শুধু পর্যুদস্ত হয় নি, সংবিধানে প্রদত্ত সকল নাগরিকের স্বাধীনতা ও ধন-প্রাণ রক্ষার প্রতিশ্রুতিও পদদলিত হয়েছে। কোথায় তখন কর্তব্যনিষ্ঠ পুলিশের গোলাবারুদ, লাঠি, গ্যাস! কংগ্রেসী রাজ্যে ল' এণ্ড অর্ডার কোটি কোটি টাকার সম্পত্তির বিনাশে এবং অর্ধশতাধিক নাগরিকের রক্তগঙ্গা বইয়েও যে দিব্যি বজায় থাকে বোম্বাই তারই এক ঐতিহাসিক নজির ধরে রাখল।

অশিব সেনা দমনে সরকার কী করেছেন এই সাদা প্রশ্নের উত্তরে অনাস্থা প্রস্তাব আলোচনাকালে না-প্রধানমন্ত্রী না-স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী কেউই সন্তোষজনক জবাব দিতে পারেন নি। বিরোধী পক্ষ থেকে তাই বলা হয়েছিল আসল প্রশ্ন এড়িয়ে গিয়ে প্রধানমন্ত্রী কেবলমাত্র দার্শনিক ব্যাখ্যা করছেন। বলা বাহুল্য বেকায়দা প্রধানমন্ত্রী এই প্রশ্নের উত্তরও দার্শনিকতার ধূম্রজালেই আচ্ছন্ন করে দেন।

কিন্তু ক্ষমতার অপব্যবহারে দেশের যে সর্বনাশ হতে চলেছে আজ কেন্দ্রে ক্ষমতাসীন দল যদি সেদিকে চোখ বুজে থাকেন তবে তার বিষময় প্রতিক্রিয়া পরে তাঁদের ক্ষমতার ভিত্তিতেই আঘাত করবে। দুশমন পোষণ করলে তার আঘাত শেষ পর্যন্ত পোষণকারীকেই আহত করে।

ভারতের রাজনীতিক নেতৃত্ব আজ এতো দুর্বল যে তা প্রয়োজনীয় দূরদৃষ্টি হারিয়ে ফেলেছে। তাৎক্ষণিক লাভালাভের জন্য দেশের সামগ্রিক সংহতিতে ফাটল সৃষ্টি করতেও কোন রাজনীতিকই আজ পিছপাও নন। যে যেখানে সুযোগ বোঝেন তিনিই গাঁটছড়া বেঁধে নেন উন্মাদ সঙ্কীর্ণতাবাদীদের সঙ্গে। তাতে সাময়িক লাভ হয়ত কিছু হয়, কিন্তু ভবিষ্যৎ বড় নির্মম। সেখানে কঠিন বিচারের সম্মুখীন এই তাৎক্ষণিকতাবাদীদের হতেই হবে, এ সত্যটাও ভুলে যাওয়া অনুচিত। ভোলা অনুচিত, ইতিহাস-পুরুষের বিচারালয়ে ক্ষণবাদী সুবিধাভোগের কখনো ক্ষমা নেই।

সবচেয়ে আতঙ্কের কথা এই যে, যে গুণ্ডামির ফলে বোম্বাই-এর সমস্ত কাজকর্ম ও ব্যবসায়-পত্তর পাঁচ দিন বন্ধ করে রাখতে হয় এবং তার দরুণ লোকসান হয় কয়েক কোটি টাকা, যে কারণে কুড়িটির অধিক ট্রান্সপোর্ট ও ইলেকট্রিক সাপ্লাই কর্পোরেশনের বাস খোয়া গেল কয়েক লক্ষ টাকা ক্ষতি টেনে এবং উৎপাদন ব্যাহত হল আরও কয়েক কোটি টাকার; যে উন্মাদ দস্যুবৃত্তির ফলশ্রুতিতে প্রাণ হারাল অর্ধশতাধিক মানুষ, আহত হল প্রায় পাঁচ শত নিরীহ এবং গুণ্ডা নাগরিক। সেই উন্মাদ উচ্ছৃঙ্খলতার পাণ্ডা বাল ঠাকরের সঙ্গে বোম্বাই-এর পুলিশ কমিশনার করেছিলেন বৈঠক। আশ্বাস চেয়েছিলেন, ঠাকরের দলবল যেন উপ-প্রধানমন্ত্রীকে খুব বিপাকে না ফেলে। শত শত মানুষের জীবন, কোটি কোটি টাকার জাতীয় সম্পত্তির জন্য এই পুলিশপ্রধানের যে কোনই মাথা ব্যথা ছিল না, ছিল না রাজ্য সরকারের কোন উদ্বেগ, পুলিশপ্রধানের জনৈক গুণ্ডা সর্দারের কাছে কেবলমাত্র উপ-প্রধানমন্ত্রীর মর্যাদা রক্ষার জন্য আশ্বাস ভিক্ষাই তার যথেষ্ট প্রমাণ। ল' এণ্ড অর্ডার কোন স্তরে পৌঁছলে শান্তিরক্ষক শান্তি বিঘ্নকারীর সঙ্গে চুক্তি করতে বসেন তাও সহজেই উপলব্ধি করা যায়।

রেল বাজেট

নতুন রেলমন্ত্রী ডঃ রামসুভগ সিং যে রেল বাজেট উপস্থিত করলেন তার বিশেষত্ব এই যে, এবারই প্রথম উদ্বৃত্ত বাজেট পেশ করা হল। ভাড়া বাড়ল না। আয়ের ঘরে ন'শ' ছেচল্লিশ কোটি আশি লক্ষ টাকা খরচ-খরচা হিসেবাদির পর রেলের নিট উদ্বৃত্ত অনুমিত হচ্ছে এক কোটি একানব্বই লক্ষ অর্থাৎ প্রায় দু'কোটি টাকার মত। অভিজ্ঞ অভিমত এই যে চলতি বছরে দেশের আর্থিক অবস্থার কিছু উন্নতিই এই উদ্বৃত্তের কারণ। দেশে কৃষিজ দ্রব্যের উৎপাদন এবার ভালই হয়েছে। আগের ক্ষরক্ষতির তুলনায় অপ্রত্যাশিত। শিল্পেও গড়ে প্রায় শতকরা ছয় ভাগ উৎপাদন বৃদ্ধি ঘটেছে। এই হিসেবে রেলে পণ্য চালানের ক্ষেত্রেও দেখা দিয়েছে উন্নতির লক্ষণ।

অবশ্য আশাবাদী বাজেট যে সত্যিই আশা পূরণ করে সবক্ষেত্রে এমন নয়। বাজেট উপস্থাপনার আগে আশা ছিল এক কোটি টাকার মত উদ্বৃত্ত হবে। কিন্তু সংশোধিত বাজেটে দেখা গেল উদ্বৃত্ত দেড়ে থাক ঘাটতির পরিমাণই দশ কোটি টাকা। রেলমন্ত্রীও তাই আশাবাদে উজ্জ্বসে পড়েন নি। তিনি জানেন উদ্বৃত্ত যদি হয়ও তবু সমস্যার সমাধান হচ্ছে না। রেলের ধারদেনা শোধ করে সাফা হতে হলে চাই উদ্বৃত্তের প্রয়োজন। যাত্রী পরিবহনের

ক্ষেত্রে উন্নতি দেখা দেয় নি। তাতে অবশ্য রেলমন্ত্রী সন্তোষ প্রকাশ করে বলেছেন যে, এর ফলে যাত্রীরা আরামে ভ্রমণ করতে পারবেন। কিন্তু এমন উক্তি 'আঙুর ফল টক' বিশেষ নয় কি? রেলে দুর্ঘটনা এবং অতিরিক্ত ভাড়া যাত্রীদের বিকর্ষিত করছে, টিকিটবিহীন যাত্রীরা ফালতু যাত্রীর সংখ্যা বৃদ্ধি করছে, এইসব কারণগুলি সম্পর্কে সচেতনতা প্রয়োজন।

রেল বিভাগে দুর্ঘটনাদি যেমনই বেড়ে থাক, পরিচালনার জন্য ব্যয় কিন্তু উত্তরোত্তর বেড়েই চলেছে। এই খাতে ব্যয় নিয়ন্ত্রণের দিকে নজর দেওয়ার খুব একটা প্রয়াস লক্ষ্য করা যাচ্ছে না। '৬৯-৭০ সালে এই খাতে খরচ এক কোটি টাকার মতো কমবে বলে অবশ্য আশা করা হয়েছে। তবে সেও ফলেন পরিচীয়তে।

ভাড়া বাড়ে নি এটাই সাধারণে সুখবর। কিন্তু ভাড়া যে বাড়বে না এমন গ্যারান্টি নেই। রেল বোর্ডের চেয়ারম্যান শ্রীথাণ্ডেলওয়ালার বিবৃতি অনুসারে বরং ছাড়া বাড়ার সম্ভাবনাই সমধিক। কেন না তিনি বলেছেন, ভাড়া ও মাশুল সঠিক অনুপাতে র‍্যাশনালাইজ করার প্রশ্ন এখনও বিবেচনা করা হচ্ছে। বিবেচনার পর বছরের শেষে ভাড়ার হার কেমন দাঁড়াবে তা সঠিক এখনই বলা যায় না। তাই ভাড়া একই রইল এই ভেবে কেউ যদি খুশি হয়ে থাকেন, তবে পুরো খুশি হওয়ার জন্য তাঁকে আরো কিছুকাল অপেক্ষা করতে হবে।

বিহার ঃ

কার দল ভারী?

বিহার রাজ্যে শেষ পর্যন্ত কংগ্রেস দলকেই মন্ত্রিসভা গড়ার জন্য আহ্বান জানালেন রাজ্যপাল কানুনগো। এই ব্যাপারে দ্বিদলীয় যুক্তফ্রন্টের (এস এস পি, পি এস পি ও লোকতান্ত্রিক) কংগ্রেসের নেতা শ্রীভোলা পাশওয়ান শাস্ত্রীর তাৎক্ষণিক মন্তব্য হল, দলে ভারী আমরাই। চূড়ান্তভাবে মন্ত্রিসভা গঠন করে সেকথা প্রমাণও করব। ওদিকে কংগ্রেস পরিষদীয় দলের নেতা সর্দার হরিহর সিং কম্যুনিস্ট আর এস এস পি ছাড়া অন্য যেকোনও দলকে কোয়ালিশন মন্ত্রিসভায় গ্রহণ করতে প্রস্তুত বলে এক ঘোষণা জারি করে দিয়েছেন। আশা করা যাচ্ছে এই চারে দুই-কাৎলা থেকে কয়েকটি চুনো-পুঁটিও নিশ্চয় টোপ গিলবে।

কম্যুনিস্ট শত্রু হরিহর কংগ্রেস দলের নবনেতা এই নামেই পরিচিত হওয়ার আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ করেছেন। বৃদ্ধ রাজাগোপালাচারীর মতো তিনিও নতুন ধরণে অক্ষমতা জানিয়ে বলেছেন যে, তাঁরও পয়লা শত্রু হলেন কম্যুনিস্টরা এবং তাঁদের সঙ্গে কোয়ালিশনে বসার চেয়ে হরিহর বরং বেরিয়ে যেতেও রাজী। হরিহর বরং জনসঙ্ঘকেই তাঁর মন্ত্রিসভায় হরিহর-আত্মা করতে পারলে খুব খুশি হতেন। কিন্তু কি আর করা যাবে, ওদিকে হাই কম্যাণ্ড উল্টো রকম প্রস্তাব নিয়ে বসে আছেন।

মহামায়ার বি কে ডি তাদের কংগ্রেস-বিরোধিতায় আর টিকে থাকতে পারছে না। হরিহর সিং-এর আশা ওঁরা কংগ্রেসী সভায় এইবার ডাকিলেই বসিতে আসিবেন। আসবে এস এস পি-ছুট শোষিতরা। সুতরাং যাকে বলে মন্ত্রিসভার জন্য মেজরিটি হরিহর এখন তাই-ই দাবি করছেন।

অপর পক্ষে দ্বিদলীয় ফ্রন্টের সহ-নেতা কর্পূরী ঠাকুর বলছেন, রাজ্যপাল হরিহরকে আহ্বান করে পাঁচ দিন সময় দিয়েছেন। অর্থাৎ ঐ পাঁচ দিনে প্রয়োজনীয় মেজরিটি যাতে তিনি সংগ্রহ করে নিতে পারেন। রাজ্যপালের এহেন কার্য নিন্দনীয়।

বস্তুতপক্ষে বি কে ডি এবং জনতা পার্টি ছাড়া অন্যান্য অ-কংগ্রেসী দল একবাক্যে বলছেন, কংগ্রেসকে মন্ত্রিসভা গঠনের আহ্বান জানিয়ে শাসনতন্ত্রের বিরুদ্ধাচরণ করে রাজ্যপাল তাঁর ক্ষমতার অপব্যবহার করেছেন।

এই অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে এখন বিহারের উত্তর নির্বাচনী অবস্থাটা লক্ষ্য করা যাক। বিহার বিধানসভায় মোট আসন ৩১৮টি। বিভিন্ন দলের অবস্থা নিম্নরূপ ঃ

কংগ্রেস—	১১৮
বি কে ডি—	৬
শোষিত দল—	৬
স্বতন্ত্র—	৩
জনতা পার্টি—	১৪
নির্দল ও অন্যান্য—	৩১
এস এস পি—	৫২
পি এস পি—	১৭
লোকতান্ত্রিক কং—	৮
জনসঙ্ঘ—	৩৪
সি পি আই—	২৫
সি পি এম—	৩
মোট—	৩১৭

বিহারে সর্বমোট পঁচিশটিরও বেশি দল নির্বাচনে নেমেছিলেন। এই দল সমূহের কোন দল কোন্ জোটে যোগ দেবেন এখনও তা নিশ্চিত নয়। যেমন হল ঝাড়খণ্ড দল (এঁদের ছ'টি আসন) রাজ্যপালকে পরিষ্কার জানিয়ে দিয়েছেন কংগ্রেসী কোয়ালিশন অপেক্ষা তাঁরা অ-কংগ্রেসী কোয়ালিশনে বসাই সমধিক পছন্দ করেন। এমনতর আর কোন ছোট দলের কী অভিরুচি কে তা বলবেন। রাজ্যপালই বা কেমন করে হরিহর সিং-কে সব ব্যাপার খতিয়ে না দেখে ডাকেন। এতে অনেকেই বিস্ময় প্রকাশ করেছেন যাঁদের মধ্যে জনসঙ্ঘ উল্লেখযোগ্য। এ ব্যাপারের ফয়সালা সভা না বসলে হবে না। সভা বসলে হয় কংগ্রেস রয়ে গেলো, নয় অ-কংগ্রেসী মন্ত্রিসভার পত্তন

কাহিনী ঃ প্রতিভা বসু
চিত্রনাট্য ঃ অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায়

বসুশ্রী ঃ বীণা

পদ্মশ্রী ০ পার্বতী ০ মায়াপুরী
মায়া ০ লীলা ০ জয়শ্রী
কল্যাণী ও অন্যান্য চিত্রগৃহে
পরিবেশনা ঃ পিয়ালী ফিল্মস

হল নতুবা পুনশ্চ দলত্যাগের হিড়িক শুরু হল—এই তিন অবস্থা দেখা দিতে পারে।

বিহারে ঘন ঘন দল বদলের রেওয়াজ তৈরিই আছে। স্বয়ং হরিহর সিং-ও দল বদলে প্রখ্যাত ব্যক্তি। তিনি ১৯৫৭ সালে কংগ্রেস ছাড়েন। ১৯৬৮ সালে এস এস পি-ছুট বি পি মণ্ডল সংখ্যালঘু মন্ত্রিসভা তৈরি করেন। পরে তাঁর সাধের আসনও টাল খায়। এই সুযোগে হরিহর সিং তাঁর পুরনো কংগ্রেসে প্রত্যাবর্তন করেন। কংগ্রেস দলছুটদের প্রতি কঠোর মনোভাব কতদূর পালন করেছেন হরিহর সিং-এর প্রত্যাবর্তন তারই নমুনা। পশ্চিমবঙ্গে যেমন ডঃ প্রফুল্ল ঘোষ। যাই হোক জনৈক দলছুট এবার দলের নেতা। সরকার কতদূর তল পাবেন তা-ও চিন্তা করারই কথা।

প্রসঙ্গত যদি নির্বাচকমণ্ডলীর তুলনামূলক পছন্দের একটি হিসেব নেওয়া যায়, তবে বলতে হবে বিহারে গণরায় কোন সুস্পষ্ট নির্দেশ না রাখলেও কংগ্রেসের প্রতি আস্থা স্থাপন করে নি। কংগ্রেস আগের তুলনায় জোর ধাক্কা খেয়েছে।

মন্ত্রিসভায় কংগ্রেসী আসন নিম্নরূপ ছিল

১৯৫৭-য়	২১০
১৯৬২	১৮৫
১৯৬৭	১২৮
১৯৬৯	১১৮

শুধু তাই নয়, রাজ্য কংগ্রেসী নেতাদের নিজস্ব জেলাগুলিতেই কংগ্রেসী হারের সংখ্যা হয়েছে বিপর্যয়কারী। রাজ্য কংগ্রেসের তিন প্রধান এম পি সিনহা, এস এন সিনহা এবং অম্বিকাশরণ সিনহা-র জেলাত্রয় মুজফ্‌ফরপুর, গয়া ও সাহাবাদে কংগ্রেস উল্লেখ্য সংখ্যক আসন হারিয়েছে। মুজফ্‌ফরপুরে ১৭টির মধ্যে ১২টি। অবশ্য লাভ করেছে ৫টি। গয়ায় পুরনো আসন বারটির মধ্যে এগারটিই খোয়া গেছে, নতুন এসেছে মাত্র ৪টি। সাহাবাদে ১২-র মধ্যে ১০টি হারিয়ে পেয়েছে ৪টি, ধানবাদের তিনটি আসনই গেছে। সিংভূমে ৭ টার মধ্যে ৬টা খোয়া গেছে, নতুন লাভ কিছুই হয় নি। পালামৌ-এ ৬টির মধ্যে ৪টি এবং রাঁচিতে ৯টির মধ্যে ৫টি হাতছাড়া। এস এন সিনহা ও অম্বিকা সিনহা তাঁদের আসন হারিয়েছেন, যে হার একরকম স্বয়ং এম পি সিনহার কারণ দু'জনই ছিলেন তাঁর মনোনীত।

বিহারের নাগরিক চেতনা পশ্চিমবঙ্গের মতো আলোকপ্রাপ্ত নয়। দারিদ্র্য, গোষ্ঠীমনোভাব ও অশিক্ষা এই রাজ্যে ঘাঁটি গেড়ে বসে আছে। এই অবস্থার প্রেক্ষাপটে বিচার করলে বলতে হয় কংগ্রেসের প্রতি জন-আস্থা ভীষণভাবে কমে এসেছে।

পক্ষান্তরে জনসঙ্ঘের শক্তি বৃদ্ধি হয়েছে। যদিও ১৯৬৭-তে অর্জিত ২৬টি আসনের ১৯টিতেই পরাজয় হয়েছে, কিন্তু দলের আসন সংখ্যা বেড়েছে নতুন ২৭টি আসন লাভ করায়। রাঁচিতেই এই দলের শক্তি বৃদ্ধি উল্লেখযোগ্য কিন্তু সাঁওতাল পরগনায় পাঁচটি আসনই হারাতে হয়েছে। টেনেছে নতুন একটি আসন। সিংভূমে যেখানে আদিবাসী প্রাধান্য সেখানে জনসঙ্ঘের ৩টি আসনই খোয়া গেছে। গয়ায় সেক্ষেত্রে ছিল এক হয়েছে ৬টি। পাটনা এবং পালামৌ-এও অবস্থা ভালো। তবে ভাগলপুরে ২টি আসন হারাতে হয়েছে মোট ৪টির মধ্যে।

জনসঙ্ঘ প্রথম আসন লাভ করে '৬২ সালে তিনটি। '৬৭ সালে তা এক লাফে ২৬-এ ওঠে এবং '৬৯-এ শক্তি বৃদ্ধি হয়ে আসন সংখ্যা দাঁড়ায় ৩৪টি।

এস এস পি'র মাত্র ১৯৬৭ সালে প্রথম আসন লাভ—অপ্রত্যাশিত অগ্রগতি। শূন্যস্থান থেকে একেবারে ৬৮টি। কিন্তু মধ্যবর্তী নির্বাচনে ১০টি আসন খুইয়ে এই দল এখন বাহান্নটি আসনের অধিকারী।

উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি দেখা যাচ্ছে সি পি আই-এর। সাতান্ন সাল থেকে চারটি নির্বাচনে এই দল ক্রমপর্যায়ে ৭, ১২, ২৪ এবং বর্তমানে ২৫টি আসনের অধিকারী। সেক্ষেত্রে সি পি এম-কে '৬৭-র নির্বাচনে বিজিত ৪টির মধ্যে একটি আসন হারাতে হয়েছে মধ্যবর্তী নির্বাচনে।

পি এস পি পতনোন্মুখ। ক্রমপর্যায়ে তার আসন সংখ্যা নেমে গেছে ৩১, ২৯, ১৮ থেকে ১৭-য়। একেবারেই পড়ে গেছে স্বতন্ত্র। '৬২-র ৫০টি আসনের মালিক আজ ৩টি আসনে টিম টিম করছে। জনতা পার্টি ১৯৬২-র পর আবার দাঁড়াল '৬৯-এ। আগে ছিল ২৩। হল এখন ১৪। বাকি সবই নতুন।

উপরোক্ত হারের দিকে তাকালেই বোঝা যাবে কংগ্রেস প্রত্যাখ্যাত। কেন না সব আসনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে তার আসন সংখ্যা উল্লেখযোগ্যভাবে পড়ে গেছে। ক্রমবিবর্তনের ক্ষেত্রে সেই তুলনায় স্থির উন্নতি সি পি আই-এর। পি এস পি স্বতন্ত্র হটে যাচ্ছে। এস এস পি থেকে বিপর্যয়কর দলছুট হওয়ায় পার্টির অবস্থা খারাপ। জনসঙ্ঘ তর তর করে এগচ্ছে। বিহারে ফরওয়ার্ড ব্লক একটি আসন লাভ করে এই প্রথম সভায় যাচ্ছে। কিন্তু আর এস পি তার একটি আসনই হারিয়েছে।

বিহারের বর্তমান চিত্রটি প্রমাণ করে জনসঙ্ঘকে বাদ দিয়ে কংগ্রেস কোয়ালিশন যথার্থ হবে না। হরিহরবাবু জনসঙ্ঘের সঙ্গে আঁতাতে রাজী। কংগ্রেসের একদল নেতাও জনসঙ্ঘের সঙ্গে গাঁটছড়া বাঁধার জন্য দ্বারদেশে ঘট সাজিয়ে শঙ্খ হাতে অপেক্ষায় আছেন। এক্ষেত্রে জনসঙ্ঘকে কোয়ালিশনে টানাই ছিল বাঞ্ছনীয়। কারণ রাজনীতিতে ইদানীং যেহেতু নীতির অপহ্নুতি ঘটেছে সে কারণে স্থায়ী মন্ত্রিসভা গড়ার জন্য এবং যেহেতু জনসঙ্ঘ কংগ্রেসের সমমনোভাবাপন্ন বলে সোচ্চারে উচ্চারিত, কোয়ালিশন করলে জনসঙ্ঘকে নিয়ে করাই ছিল উচিত কাজ। তাতে রাজ্য পাটোয়ারী তোফা সাজিয়ে বসা যেত।

উত্তর প্রদেশ :

সি বি গুপ্ত মন্ত্রিসভা গঠন করছেন

প্রবন্ধ প্রেসে যাওয়া পর্যন্ত কোন সঠিক খবর নেই। তবে কংগ্রেস দলের সর্বসম্মতিক্রমে নির্বাচিত নেতার ভাগ্য যে এবার সি বি গুপ্তের তা প্রায় পরিষ্কার। ২৬শে ফেব্রুয়ারীর মধ্যে সি বি গুপ্ত তাঁর মন্ত্রিসভার তালিকা রাজ্যপালের কাছে পেশ করতে পারবেন বলে আশা করা যায়।

মধ্যবর্তী নির্বাচনে রেকর্ড ভোট সংগ্রহকারী বিজয়ী নেতা চরণ সিং বি-কে-ডি'র পক্ষে রাজ্যপাল গোপালা রেড্ডির সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। শ্রীরেড্ডি জনসঙ্ঘ নেতার সঙ্গেও মিলিত হয়েছিলেন।

সি বি গুপ্ত ইতিমধ্যেই জানিয়ে দিয়েছেন যে কংগ্রেস কোনো কোয়ালিশন করছে না তবে অন্যান্য দলের সমর্থন আশা করছে।

সি বি গুপ্ত, যাঁকে উত্তর প্রদেশের শক্ত মানুষ বলা হয়, কংগ্রেস পক্ষে তাঁর জয় এবার বাস্তবিক উল্লেখযোগ্য। দু' জায়গায় দাঁড়িয়ে উভয় ক্ষেত্রেই তাঁর ভাগ্যে জুটেছে জয়মাল্য। এজন্য অবশ্য বিশেষভাবে দায়ী অ-কংগ্রেসী শক্তিগুলির যুক্তভাবে লড়ায়ে নামার অক্ষমতা। শ্রীগুপ্তের ঘাঁটি এবার উত্তর প্রদেশে শক্ত হয়ে বনিয়াদ গাড়ল। তবে শ্রীগুপ্ত যদি রাজ্যে কেবলমাত্র তাঁর মনোনীতদের নিয়ে একটি গুপ্ত মন্ত্রিসভা খাড়া করেন এবং বিক্ষুব্ধ কংগ্রেসীর সংখ্যা বাড়িয়ে তোলেন তবে কংগ্রেস মন্ত্রিসভায় পুনশ্চ ভাঙন ধরবে। আবার কোনও চরণ সিং-এর উত্থান ঘটবে।

এবার অবশ্য নির্বাচনের মাধ্যমে কট্টরপন্থী অনেকেই ধরাশায়ী হয়েছেন। শ্রীগুপ্তের নিজেরও যদি কিছু মানসিক পরিবর্তন ঘটে থাকে চতুর্থ নির্বাচনের ফলাফলগুলির পরিপ্রেক্ষিতে, তাহলে অবশ্যই উত্তর প্রদেশ জনস্বার্থের দিকে লক্ষ্য রেখে নতুন করে শুরু করতে পারে। অন্যথা পুনশ্চ রাজনৈতিক অনিশ্চিতি দ্রুত সৃষ্টি হওয়ার সম্ভাবনা দেখা দিতে পারে।

(২২।২।৬৯)

আন্তর্জাতিক

বীরবাহুর পতন ঘটেছে। আয়ুবের যুগের অবসান আসন্ন। এক বেতার ভাষণ মারফৎ পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট আয়ুব খাঁ জানিয়ে দিয়েছেন যে, প্রেসিডেন্ট পদে আসন্ন নির্বাচনে তিনি প্রার্থী দাঁড়াবেন না। তাঁর এ-সিদ্ধান্ত যে পাকা বা চূড়ান্ত এবং অপরিবর্তনীয় সেকথাও তিনি বলে দিয়েছেন।

ডিক্টেটরের এ পতন যে সশব্দ সে বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ কোথায়? পাকিস্তানের জাগ্রত জনমতের কাছে ফিল্ড মার্শাল আয়ুব খাঁকে নতজানু হতে হয়েছে। কিন্তু জনতার দাবি মতো গদি ছেড়েছেন কি তিনি? তা না ছাড়ুন, আয়ুবশাহীর এতোকাল যে একেবারে ঘনিয়ে এসেছে, তিনি যে পাকিস্তানের রাজনৈতিক রঙ্গমঞ্চ থেকে সরে যাচ্ছেন সে বিষয়টি তিনি নিজেই দ্ব্যর্থহীন ভাষায় উচ্চারণ করেছেন।

তবে দড়ি ধরে ঝুলে পড়ার মত খুব সহজে যে আয়ুব খাঁ ক্ষমতা এবং দম্ভের উচ্চ আসন থেকে নিচে নামেন নি, সে কে না জানে। প্রচণ্ড আন্দোলনের তোড়ে আয়ুব খাঁর সমস্ত গর্ব, সমস্ত অহংকার ভেসে গিয়েছে। গত তিন মাসেরও বেশি সময় ধরে সারা পাকিস্তানে তুমুল বিক্ষোভ চলেছে। এবারকার আন্দোলনের একটা লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য হল পশ্চিম পাকিস্তানও এই প্রথম আন্দোলনের নেতৃত্ব নিয়েছিল। ভুট্টোর সমর্থক ছাত্ররা যখন পশ্চিম পাকিস্তানের লাহোর, পেশোয়ার, রাওয়ালপিণ্ডি ইত্যাদি শহরে বিভিন্ন দাবিদাওয়ার ভিত্তিতে আন্দোলনে নামে তখন কেউ কি ভাবতে পেরেছিল যে সে স্ফুলিঙ্গ একদিন বিশাল দাবানলের সৃষ্টি করবে? আয়ুব খাঁর হঠকারিতার জন্যেই তাঁর সর্বনাশটি ত্বরান্বিত হয়েছে তাও তো দেখল সবাই। গত ১৪ই নভেম্বর পেশোয়ারের এক জনসভায় ভাষণ দিতে গেলে যখন আয়ুব খাঁকে লক্ষ্য করে এক ছাত্র গুলী ছোঁড়ে, তখন আয়ুব-এর জন্যে কার্যত জনপ্রিয় নেতা ভুট্টোকে সন্দেহ করে তাঁকে গ্রেপ্তার করালেন। তার মানে মৌচাকে ঢিল ছুঁড়লেন তিনি।

আয়ুব-বিরোধী আন্দোলন শীগগিরই পশ্চিম পাকিস্তান থেকে পূর্ব পাকিস্তানে ছড়িয়ে পড়ল। আয়ুব খাঁ ঠাণ্ডা মাথায় এ সমস্যার সমাধান করতে চাইলে হয়তো কবে বিরোধের নিষ্পত্তি হয়ে যেত, কিন্তু তা না করে তিনি শস্ত্রপাণির ভূমিকা নিলেন। আন্দোলন যত বাড়ছে পুলিশী নির্যাতনও তত বেড়ে যেতে লাগল। গুলী, টিয়ার গ্যাস, লাঠি কিছুই বাদ গেল না। শহরের পর শহর ছেড়ে দেওয়া হল সেনাবাহিনীর হাতে। সারা পাকিস্তানে গুলীর ঘায়ে প্রাণ হারিয়েছে প্রায় শ'খানেক মানুষ। আহত হয়েছে শত শত, গ্রেপ্তার করা হয়েছে হাজার ছয়েক লোক।

অর্থাৎ গোটা পাকিস্তানে একটা গভীর রাজনৈতিক সঙ্কট দেখা দিল। গোড়ার দিকে আয়ুব খাঁ রক্তচক্ষু দেখিয়ে জনতাকে শান্ত করতে পারবেন ভেবেছিলেন, কিন্তু বাস্তবে ফল ফললো উল্টো। আন্দোলনের পরিধি এবং তীব্রতা বেড়ে যেতে লাগলো। সুযোগ বুঝে রাজনৈতিক দলগুলিও এককাট্টা হল আয়ুব-বিরোধিতার মূল প্রশ্নে। আইনজীবী, চিকিৎসক, অধ্যাপক, মহিলা, ছাত্র, মজুর, কিষাণ সকলেই কণ্ঠ মেলাল ঃ আয়ুবশাহীর অবসান চাই। অবশ্য এছাড়া অন্যান্য দাবিও বিরোধী দলগুলির রয়েছে। তাদের মধ্যে প্রধান ছিল রাজনৈতিক বন্দীদের মুক্তি, জরুরী অবস্থার প্রত্যাহার, বয়স্ক ভোটাধিকারের ভিত্তিতে প্রত্যক্ষ নির্বাচন, ফেডারেল শাসনতন্ত্র, ইত্যাদি। ছাত্রদেরও ১১ দফা দাবি ছিল, মৌলনা ভাসানির আওয়ামী লীগের ১৪ দফা দাবি।

প্রেসিডেন্ট আয়ুব গোড়ার দিকে বিরোধী দলের দাবিগুলির ব্যাপারে উদাসীন বা টালবাহনা করলেও শেষ পর্যন্ত তাঁকে ধীরে ধীরে নতি স্বীকার করতে হচ্ছিল। প্রথমে তিনি ৮টি বিরোধী দলের গণতান্ত্রিক সংগ্রাম পরিষদের নেতাদের পাকিস্তানের রাজনৈতিক সঙ্কট সম্পর্কে এক গোলটেবিল বৈঠকে মিলিত হবার জন্যে আমন্ত্রণ জানালেন। কিন্তু সরকার কয়েকটি মূল দাবি মেনে না নিলে নেতারা যখন বৈঠকে যোগদানের মত আবহাওয়া সৃষ্টি হবে না বলে জানালেন, তখন আয়ুব খাঁকে বাধ্য হয়ে জরুরী অবস্থা প্রত্যাহার করে নিতে হল, ভুট্টো সহ রাজনৈতিক নেতাদেরও মুক্তি দিতে হল। এর পরে পূর্ব পাকিস্তানের নেতা শেখ মুজিবর রহমানকে

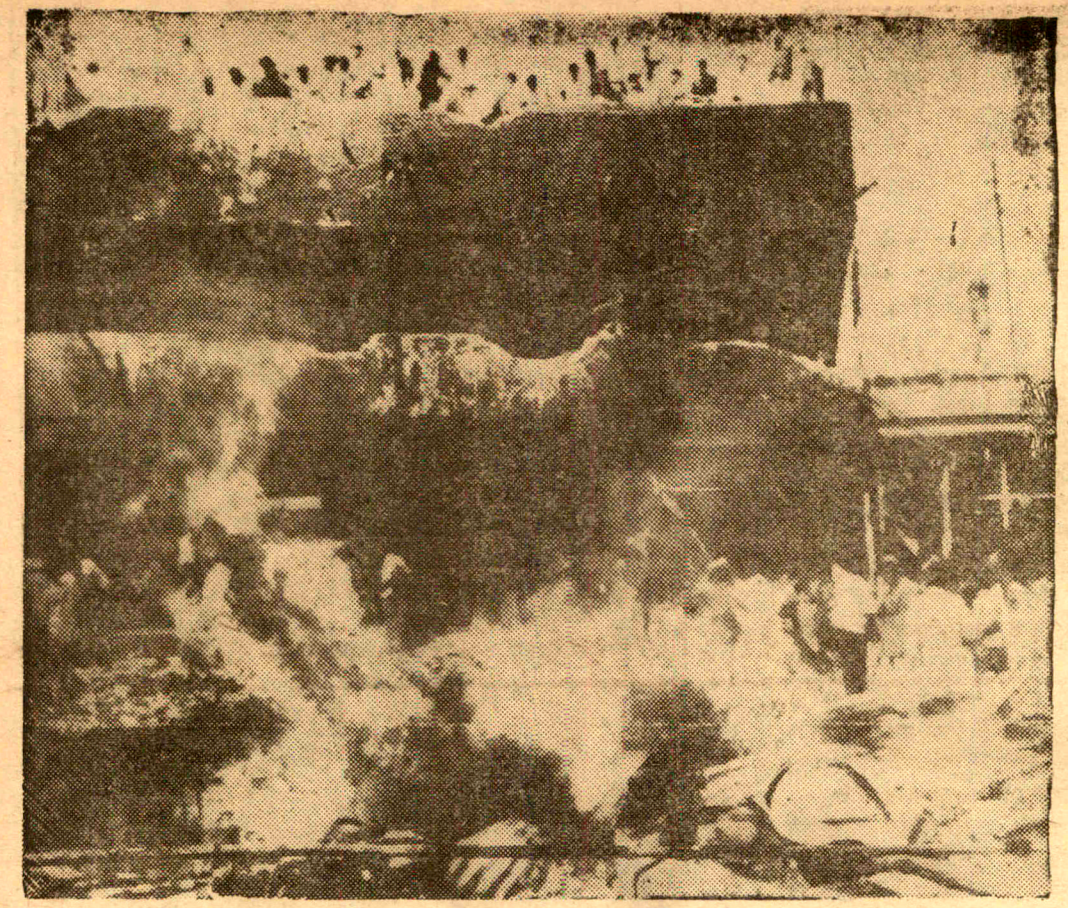

সাম্প্রতিক সাধারণ ধর্মঘটের দিনে করাচীতে জনতা জনৈক মুসলিম লীগ নেতার বাড়ি পুড়িয়ে দেয়

মুক্তি দেওয়া হল এবং আগরতলার ষড়যন্ত্রের জাল মামলা তুলে নেওয়া হল।

এ অবস্থায় আলোচনার জন্যে আবহাওয়া খানিকটা অনুকূল অবশ্যই হয়েছে, বিশেষত, আয়ুব খাঁ যখন নির্বাচন প্রার্থী হবেন না জানালেন, তখন বিরোধীরা স্বভাবতই দীর্ঘদিন পরে স্বস্তির নিশ্বাস ফেলতে পেরেছেন। এ মাসের শেষ নাগাদ হয়তো প্রস্তাবিত গোলটেবিল বৈঠক অনুষ্ঠিত হবে। কিন্তু আয়ুবকে সে বৈঠকে যে আরো নিচে নামতে হবে, সে ভবিষ্যদ্বাণী করা অন্যায় হবে না। বাস্তবিক আয়ুবের পক্ষে এখন সরে দাঁড়ানো ছাড়া গত্যন্তর কী আছে? ইতিমধ্যেই একটা কথা উঠেছে যে, আয়ুব সরে দাঁড়ালেও তাঁকে জনতা খতম করে দেবে। বিমান বাহিনীর প্রাক্তন অধ্যক্ষ আসগর খাঁ অবশ্য আয়ুব খাঁ স্বেচ্ছায় গদি ত্যাগ করলে তাঁর নিরাপত্তার ব্যবস্থা করবেন বলেছেন। কিন্তু গদি ছাড়ার সুবুদ্ধি কি তাঁর হবে। তাঁর পুত্রটি তো অবস্থা গুরুতর দেখে ইতিমধ্যেই দেশ ছেড়ে পালিয়েছেন। আয়ুবের কপালে যে কী আছে, কে জানে? কারণ, তাঁর নির্বাচন থেকে সরে দাঁড়ানোর কথা শুনেও পাকিস্তানের গণ-আন্দোলনে ভাঁটা পড়ে নি।

ফ্রান্স ঃ

ইঙ্গ-ফরাসী বিরোধ আবহমানকাল থেকে চলে আসছে। এ বিরোধ সম্প্রতি আবার মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছে কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়কে কেন্দ্র করে। ব্রিটেনের পররাষ্ট্রমন্ত্রণালয় সম্প্রতি কয়েকটি গোপন তথ্য প্রকাশ করে দিয়ে বিরোধের সূচনা করেছেন। ওই গোপন তথ্যে বলা হয়েছে যে, ফ্রান্সের প্রেসিডেণ্ট দ্য গল কয়েকদিন আগে প্যারিসের ব্রিটিশ রাষ্ট্রদূতের কাছে এমন কয়েকটি কথা বলে ফেলেছেন যার ফল সুদূরপ্রসারী হতে বাধ্য। এই গোপন তথ্য ব্রিটিশ বৈদেশিক মন্ত্রণালয় ফাঁস করে ফেলায় ফ্রান্স ব্রিটেনের ওপর আরো চটেছে। তবে তথ্যগুলি সম্পর্কে সরকারীভাবে ফ্রান্স অস্বীকারও করছে না কিম্বা পুরোপুরি সমর্থনও করছে না।

ওই আলোচনায় নাকি প্রেসিডেণ্ট দ্য গল য়ুরোপের পুনর্গঠন সম্পর্কে কয়েকটি নতুন ফরমুলা দিয়েছেন। সে সূত্রে বলা হয়েছে যে, পশ্চিম য়ুরোপীয় রাষ্ট্রগুলিকে নিয়ে এমন একটা জবরদস্ত সংগঠন গড়ে তুলতে হবে যার ফলে কমন মার্কেট এবং ন্যাটোর প্রয়োজন ফুরিয়ে যায়। অর্থাৎ অর্থনৈতিক সংস্থা হিসেবে কমন মার্কেটের জায়গায় নতুন সংস্থা গড়ে উঠবে এবং ন্যাটোর স্থলে নতুন সামরিক জোট। তবে এ সামরিক জোটে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কোন কর্তৃত্ব থাকবে না।

চার্লস দ্য গল নাকি ব্রিটিশ রাষ্ট্রদূতের কাছে আরো বলেছেন যে, এতদিন কোন সত্যিকারের পশ্চিম য়ুরোপীয় যৌথ প্রতিষ্ঠান গঠিত না হওয়ার মূল কারণ হল বেশির ভাগ রাষ্ট্রের মার্কিনী-ঘেঁষা নীতির দরুণ এবং এ ব্যাপারে ব্রিটেনকেই নাকি দ্য গল দোষী করেছেন সবচেয়ে বেশি। তাঁর মতে একমাত্র ফ্রান্সই স্বাধীন মতামত পোষণ করে এসেছে। যদি বিশ্ব রাজনীতিতে পশ্চিম য়ুরোপের রাষ্ট্রগুলি স্বাধীন নীতি অবলম্বন করে তবে ন্যাটোর আর প্রয়োজনই থাকবে না। অন্য দিকে কমন মার্কেটের জায়গায়ও একটা অর্থনৈতিক সহযোগিতামূলক সংগঠন গড়ে তোলা যাবে যে সংগঠন হবে ঢিলেঢালা এবং অবাধ বাণিজ্য হবে যার মূল নীতি। সে সংগঠনের আভ্যন্তরীণ পরিষদ গঠিত হবে ব্রিটেন, ফ্রান্স, পশ্চিম জার্মানী এবং ইতালিকে নিয়ে।

ব্রিটেন যে ফরাসী প্রস্তাব মানতে রাজী হবে না তার আঁচ পররাষ্ট্রমন্ত্রণালয়ের ভাষ্য থেকেই পাওয়া

দ্য গল

আছে। কারণ সে মনে করে যে, তার পশ্চিম য়ুরোপীয় সাথী-দের না জানিয়ে এমন একটা প্রস্তাবে সে সায় দিতে পারে না যার সঙ্গে তার নিরাপত্তা সমেত গুরুত্বপূর্ণ স্বার্থ জড়িয়ে রয়েছে। ব্রিটেন এ সম্পর্কে ফ্রান্সের সঙ্গে আলোচনা বৈঠকে বসতে রাজী, তবে তার সঙ্গীদেরও তা জানাতে হবে।

কিন্তু ব্রিটেনের এ মনোভাবে ফ্রান্স ক্ষুণ্ণ। তাদের আপত্তি গোপন তথ্য ফাঁস করার ব্যাপারে ততটা হয়তো নয়, যতটা বিষয়টিকে একটা চাঞ্চল্যকর সংবাদ হিসেবে পরিবেশন করার কারণে। ফ্রান্স বলেছে যে, কমন মার্কেটে ব্রিটেনের প্রবেশাধিকার এবং ন্যাটো সংস্থায় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নেতৃত্ব সম্পর্কে ফ্রান্সের আপত্তি বহুদিন থেকেই। কাজেই সংস্থা দুটিকে ঢেলে সাজানোর প্রস্তাব করে দ্য গল কিছু নতুন কথা বলেন নি। তবে ব্রিটেন এই নিয়ে এতটা হৈ-চৈ করছে কেন? করছে এজন্যে যে, নিক্সনের কান ভাঙানোর মতলবে। অর্থাৎ মিঃ নিক্সন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট হয়ে তাঁর প্রথম য়ুরোপ সফর করার আগে ফ্রান্সের প্রেসিডেন্ট দ্য গলের চরিত্র সম্বন্ধে যাতে সজাগ থাকেন তারই জন্যে ব্রিটেনের এই পায়ে পা লাগিয়ে ঝগড়া করা। ব্রিটেন মিঃ নিক্সনকে দেখাতে চায় যে, সমগ্র য়ুরোপে ব্রিটেনই একমাত্র তার নির্ভরযোগ্য সুহৃদ, ফ্রান্স সুযোগ পেলেই আমেরিকাকে বিপদে ফেলবে।

ফ্রান্স বা প্রেসিডেন্ট দ্য গলই বা কী, আমেরিকার সঙ্গে তার সত্যিকারের সম্পর্কই বা কী, তা প্রেসিডেন্ট নিক্সনের আজ অজানা নেই। প্রেসিডেন্ট জনসনের আমলে ফ্রান্স-আমেরিকা সম্পর্কে গভীর তিক্ততার সৃষ্টি হয়েছে। এর জন্যে একা দ্য গলকে দায়ী করলে মারাত্মক ভুল করা হবে, জনসনের হঠকারিতাও ফ্রান্সকে দূরে সরিয়েছে। কাজেই মিঃ নিক্সন যদি দ্য গলের সঙ্গে নতুন সুরে, নতুন করে পুরনো মৈত্রীর সম্পর্কটা পুনঃস্থাপিত করতে পারেন তবে তাতে ক্ষতি কী?

জার্মানী ঃ

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের বিষময় উপহার দ্বিখণ্ডিত জার্মানী। যেদিন য়ুরোপের এই পরাজিত দেশটি ভাগ করা হল, সেদিন থেকেই এখানে একটা প্রথম শ্রেণীর সমস্যার জন্ম দেওয়া হল। জার্মানীকে নিয়ে সৃষ্টি হল স্নায়ু-যুদ্ধের। পূর্ব-পশ্চিমের সে ঠাণ্ডা লড়াই কিছুদিন অন্তরই গরম লড়াইয়ে রূপ নেবার উপক্রম করেছে। গত ২১ বছরের মধ্যে জার্মানীকে কেন্দ্র করে য়ুরোপে সংকট সৃষ্টি হয়েছে বহুবার, আবার তাকে রাষ্ট্রনায়কেরা অতি কষ্টে আয়ত্তে এনেছেন। আজ আবার নতুন করে এখানে উত্তেজনার সঞ্চার হয়েছে।

উত্তেজনা দুই জার্মানীর মৌলিক অধিকারকে ঘিরে। আগামী ৫ই মার্চ পশ্চিম জার্মানীর প্রেসিডেন্ট পদে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে। বর্তমান প্রেসিডেন্ট হেনরিখ লুবকের জায়গায় নতুন প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হবেন দুজন প্রার্থী খৃস্টান ডেমোক্র্যাট দলের গেরহার্ড শ্রোয়ডার এবং সোশ্যাল ডেমোক্র্যাট দলের গুস্টাভ হাইন-ম্যানের মধ্যে। কিন্তু বিরোধ দুজন প্রার্থী বা দুই প্রতিদ্বন্দ্বী দলের মধ্যে নয়, বিরোধ দুই জার্মানীর মধ্যে। এবং এই দুই জার্মানীর সঙ্গে বহুৎ রাষ্ট্রগুলির স্বার্থ জড়িত রয়েছে বলে তারা এটাকে নিজেদের সমস্যা বলে মনে করছে।

পশ্চিম জার্মান সরকার ঘোষণা করে-ছেন যে, পশ্চিম বার্লিনের আইনসভার প্রেসিডেন্ট পদের নির্বাচনে ভোট দেবেন। আর এখানেই পূর্ব জার্মানীর প্রবল আপত্তি। তাদের যুক্তি হল, পশ্চিম বার্লিনের ভৌগোলিক অবস্থিতি পূর্ব জার্মানীর ১১০ মাইল অভ্যন্তরে এবং পশ্চিম বার্লিন কার্যত পূর্ব জার্মানীরই একটা অংশবিশেষ। কাজেই পশ্চিম জার্মানীর নির্বাচনে পূর্ব জার্মানীর শহর কী করে অংশ নিতে পারে? দ্বিতীয়ত, ফেডারেল এবং রাজ্য আইনসভার যে ১০৩৬ জন সদস্যের কাছে ভোটপত্র পৌঁছে দেওয়া হয়েছে, ফেডারেল এ্যাসেম্বলির সেই সদস্যদের কোনো ভোটাধিকারই নেই। সে যাই হোক, এগুলি পশ্চিম জার্মানীর ব্যাপার। কিন্তু পূর্ব জার্মানীর প্রধান-মন্ত্রী উলব্রিখট স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছেন যে, পূর্ব জার্মানীর ভেতর দিয়ে কোন ভোটারকেই পশ্চিম বার্লিনে যেতে দেওয়া হবে না। ইতিমধ্যেই পশ্চিম বার্লিনের পথে সমস্ত সড়ক হয় বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে নয়তো সেখানে সীমান্ত প্রহরী নিয়োগ করা হয়েছে।

পশ্চিম বার্লিনে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর মিত্রশক্তির কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হয় যার মধ্যে রয়েছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, সোভিয়েট রাশিয়া, ব্রিটেন এবং ফ্রান্স। যেহেতু পশ্চিম জার্মানীর সমর্থক মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ব্রিটেন এবং ফ্রান্স আর পূর্ব জার্মানীর পক্ষে রয়েছে সোভিয়েট রাশিয়া, সেহেতু সোভিয়েট রাশিয়া উলব্রিখটের কার্য সমর্থন করেছে এবং পশ্চিমী পক্ষ পশ্চিম বার্লিনে নির্বাচন অনুষ্ঠানের স্বপক্ষে মত দিয়েছে। তবে পূর্ব জার্মানীর এ আপত্তি বোধ হয় শেষ পর্যন্ত ধোপে টিকবে না যতই সোভিয়েট রাশিয়া বা ওয়ারশ চুক্তি-ভুক্ত দেশগুলি এর প্রতিবাদ করুক না কেন। কারণ, পূর্ব জার্মান সরকার পশ্চিম বার্লিনের রেলপথ এবং সড়ক বন্ধ করে দিলেও বিমানপথ বন্ধ করে দিতে পারেন না। আর বিমানপথে ভোটার-দের পশ্চিম বার্লিনে পৌঁছে দেবার জন্যে মার্কিন ও ব্রিটিশ জেট বিমানগুলো যে লাইন দিয়ে দাঁড়াবে, সে বিষয়েও কোন সন্দেহ নেই।

তবে ইতিমধ্যে ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী পশ্চিম জার্মানী সফরে গিয়ে কিসিং-গারের কার্য সমর্থন করলেও জনতা তাঁর প্রতি বিরূপ সম্বর্ধনা দেখিয়েছে। কয়েকদিন আমেরিকার নতুন প্রেসিডেন্ট মিঃ নিক্সনও পশ্চিম জার্মানী যাচ্ছেন। এই দুনেতার পশ্চিম জার্মান সফরের যে তাৎপর্য রয়েছে সে বিষয়ে কোন সন্দেহই নেই। এবং আগামী এই মার্চের নির্বাচনের ঠিক মুখেই এই দুই রাষ্ট্র-নায়ককে আমদানী করার অর্থ যে পূর্ব জার্মানী এবং সেই সঙ্গে সোভিয়েত য়ুনিয়নকে সমঝে দেওয়া তা বুঝতে কষ্ট হয় কার? জার্মানীকে কেন্দ্র করে আবার স্নায়ুর লড়াই সুরু হয়েছে, তবে তা যে বেশিদূরে এগোবে না সেটা প্রায় ধরে নেওয়া যায়।

বিবাহ রেজিষ্ট্রেশন অফিসার
(স্পেশাল ম্যারেজ আক্ট—১৯৫৪)
শ্রীগিরিজাশঙ্কর ভাদুড়ী
ম্যারেজ অফিসার
কলিকাতা ও ২৪ পরগণা
১/১এ মহাত্মা গান্ধী রোড (শিয়ালদহ)
ফোন নং: ৩৫-৪৬১৭
কল্যাণনগর, (হরড়া) ২৪ পরগণা

কংগ্রেসের বিপর্যয়ের পূর্বাভাস কি আদৌ পাওয়া যায়নি?

কুমুদ দাশগুপ্ত

টিটাগড়ের একচ্ছত্রাধিপতি শ্রী কে কে শুক্লা থেকে সুরু করে কংগ্রেস ভবনের ছোট-বড় সব কর্তা এমন কি নয়া দিল্লীর আমীর-ওমরাহ্-বাদশা, রাণী-মহারাণী সবাই ভাবছেন—পশ্চিমবঙ্গে এ-পরাজয় নাকি একেবারে অপ্রত্যাশিত। সবাই ভাবছেন আর ভাবছেন। ভেবে ভেবে কেউ কোন কূল-কিনারা করতে পারছেন না। এমন কি কেউ কেউ নাকি মনে করছেন—যুক্তফ্রন্টের এই বিজয় নাকি একেবারেই ভোজবাজি।

প্রাক্-নির্বাচনী পরিস্থিতি নাকি অনুকূলেই ছিল। যুক্তফ্রন্টের বিরুদ্ধে জনমনের বিক্ষোভের আর কংগ্রেসের প্রতি আস্থার অকাট্য সব প্রমাণ নাকি রাজ্য আর কেন্দ্রীয় কংগ্রেসী নেতাদের ছিল। শ্রীঅতুল্য ঘোষের জনসভায় জনতা ঢিল ছোঁড়ে নি, প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরাজীর দর্শনলাভের জন্য লক্ষ লক্ষ মানুষ এসেছে। কংগ্রেসের প্রতি জনসাধারণের আস্থার আর বড় প্রমাণ কি হতে পারে?

কিন্তু সত্যিই কি তাই! সত্যিই কংগ্রেস নেতৃত্ব এই বিপর্যয়ের কোন আভাসই কি পায় নি! সবটাই কি ভোজবাজি। কংগ্রেসের প্রতি আস্থাশীল মানুষ কি ব্যালট বাক্সের কাছে গিয়ে সম্মোহনী মন্ত্রের পাল্লায় যুক্তফ্রন্টের প্রতীকে ছাপ মেরে দিয়েছেন?

আসলে কিন্তু যাঁদের একটু চোখ খোলা ছিল, তাঁরা সকলেই কংগ্রেসের বিপর্যয়ের আভাস পেয়েছিলেন। একেবারে চোখ বুজে না থাকলে তার পরিচয় পাওয়ার যথেষ্ট সুযোগ ছিল। এতবড় ধস নামার আভাস অনেকে বুঝতে পারেন নি—সত্য। কিন্তু কংগ্রেসের বিপর্যয় যে ঘটবে তার আভাস ছিল স্পষ্ট।

নেহাৎ অন্ধ স্তাবকদের ওপর নির্ভর না করে প্রকৃত সংবাদ সংগ্রহের সামান্য একটু চেষ্টা থাকলেও কংগ্রেস নেতৃবৃন্দ টের পেতেন যে, এবার জনসাধারণ যুক্তফ্রন্টকে একটা দল হিসেবে গ্রহণ করেছেন। পশ্চিমবাংলার বামপন্থী দলগুলোর মধ্যে এত ঘনিষ্ঠতম ঐক্য ইতোপূর্বে আর কোনদিন গড়ে ওঠে নি এই সত্যকথাটা উপলব্ধি না করে বারো রাজপুতের তের হাঁড়ির তত্ত্ব নিজেদের মনের মধ্যে পোষণ করে কংগ্রেস নেতৃবৃন্দ বামপন্থীদের পরাজয়ের স্বপ্নে মশগুল ছিলেন। আর অন্যদিকে নিজেদের অনৈক্য যে ওপরতলা থেকে সুরু করে নিম্নতম পর্যায়ে ছড়িয়ে গেছে, সেই সত্যকথাটা একদল ভুলে গিয়েছিলেন। বাস্তব পরিবেশ বিচার করেন নি বলে তাঁরা বানানো কথায় বিশ্বাস করেছিলেন। না হলে শ্রীঅতুল্য ঘোষ নিজে কি টের পান নি যে, শহরে আর গ্রামে সর্বত্রই যুক্তফ্রন্টের ডাকে যে বিশাল সমাবেশ ঘটেছে তার তুলনায় কংগ্রেসের ডাকে জনসমাবেশ নগণ্য মাত্র। কলকাতা ময়দানে কংগ্রেস সভাপতি শ্রীনিজলিঙ্গাপ্পাকে যে ফাঁকা মাঠে বক্তৃতা করতে হয়েছে তা তো ভুলে যাওয়ার কথা নয়। দৈনিক সংবাদপত্রে কলমের পর কলম জুড়ে যত বড় বক্তৃতাই ছাপা হোক না কেন, ক্যামেরার মারপ্যাঁচে ২ শত লোকের জনসভাকে পাঁচ হাজারের সমাবেশ বানানোর যত চেষ্টাই হোক না কেন ঐ সব সভার উদ্যোক্তাদের প্রকৃত সত্য না জানার তো কোন কারণ ছিল না!

সংবাদপত্রের সমীক্ষার পিঞ্জনের ইতিহাস কি কংগ্রেস নেতৃবৃন্দ জানতেন না। নির্বাচকমণ্ডলী নীরব—তাঁদের কথা বোঝা যাচ্ছে না বা তাঁরা কিছু বলছেন না বলে যে কথাটা প্রচার করা হচ্ছিল তার অসারতা ধুরন্ধর রাজনৈতিক নেতাদের না জানার কথা নয়। বর্ধমানের যে কোন সাঁওতাল পল্লীতে ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা যে নিজেদের গবেষণায় পথে পথে কাগজ-কার্বন-তারা দিয়ে সাইকেল [illegible] চলার সময় কোন কংগ্রেস কর্মীর কি তা নজরে পড়ে নি কলকাতার শিয়ালদহ কেন্দ্রে শ্রীষতীন চক্রবর্তীর সমর্থনে যে বিরাট মিছিল বেরিয়েছিল তাতে যোগ দিয়েছিলেন কারা? ঐ পাড়ার পুরনো বাসিন্দা ডঃ প্রতাপচন্দ্র চন্দ্র কি বুঝতে পারেন নি ঐ মিছিলের যাত্রীদের ক'জন বাইরে থেকে আনা আর এলাকার কত মানুষ তাতে যোগ দিয়েছে। ডঃ চন্দ্রকে যাঁরা পূর্বেও সমর্থন করেছেন তাঁদের মধ্যে এই মিছিলে কারা এসে যোগ দিয়েছিল তা তো না জানার কথা নয়। বড়তলা কেন্দ্রে শ্রীঅজিত পাঁজার সমর্থনে শ' দুয়েক বাচ্চাকাচ্চার যে মিছিল বেরিয়েছিল ক্যামেরার কারদায় তাকে যত বড় করে দেখানোই হোক উত্তর কলকাতার খ্যাতিমান কংগ্রেস নেতা শ্রীঅপরেশ ভট্টাচার্য কি শ্রীনিখিল দাসের সমর্থনে যে বিরাট মিছিল বেরিয়েছিল তার সঙ্গে কংগ্রেসের মিছিলের কোন তুলনা করতে পারেন নি।

কেন্দ্রীয় মন্ত্রী শ্রী ওয়াই বি চ্যবন না জানতে পারেন, কিন্তু বারাকপুর শিল্পাঞ্চলের কংগ্রেস নেতৃবৃন্দ কি জানতেন না যে, শ্রী চ্যবনের হারিকেন টুরের সভাগুলিতে কারা যোগ দিয়েছিলেন। বিনা ভাড়ায় পাওয়া লরীতে নগদ পয়সা দিয়ে যাদের দর্শক সাজানো হয়েছিল তারাই যে শ্রী চ্যবনের দশটি সভারই শ্রোতা শ্রী চ্যবনের যাত্রাপথে বলদ-লাঞ্ছিত তোরণ যাঁরা তৈরি করেছিলেন তাঁরা কি তা টের পান নি? দু'দিন আগে বালুরঘাটের গ্রামাঞ্চলে যুক্তফ্রন্টের সভায় কম পক্ষে পাঁচ হাজার মানুষ যোগ দেয়—আর মাত্র দু'দিন পরে শ্রীসিদ্ধার্থশঙ্কর রায়ের ভাষণ শুনতে দুই শত লোক-ও হাজির হয় নি—এ কথা কি কংগ্রেস ভবনকে কেউ জানায় নি। যুক্তফ্রন্টের আমলে যুক্তফ্রন্টের স্বেচ্ছাসেবকরা বালুরঘাটকে কর্ডন করে রেখে সেখানকার চালের দাম এক টাকার ওপরে উঠতে দেয় নি—কলকাতার ব্যারিস্টার শ্রীসিদ্ধার্থশঙ্কর রায় একথা না জানতে পারেন, কিন্তু তিনি ঐ জনসভায় দাঁড়িয়ে যখন বললেন—যুক্তফ্রন্টের ঠেলায় চালের কিলো পাঁচ টাকায় উঠেছে তখন যে ঐ দুই শত মানুষ-ই বিদ্রূপের হাসিতে ফেটে পড়েছিলেন শ্রীরায়ের চোখ কি সেদিকে একবার-ও পড়ে নি!

বাঁকুড়া জেলার চিরদরিদ্র মানুষ ফ্রন্ট সরকারের আমলে চরম খরায় বিপর্যস্ত হয়ে যখন একমুঠো অন্নের জন্য কাতর—তখন ফ্রন্ট সরকারের মন্ত্রীরা নিজেরা এসে লঙ্গরখানা খুলে, কংগ্রেসী আমলের পুরনো টেস্ট রিলিফের নামে টাকা আত্মসাৎ না করে স্থানীয় কর্মীদের সাহায্যে অভুক্ত

অস্তিত্বের মানে

অশোক ভট্টাচার্য

তাঁদের দেখেছি দৃঢ়, ব্রতবন্ধ; আমাদের অশুভশংসিতা
মিলায় নিষ্ফল শূন্যে ঃ শ্রীফলে অদূরদর্শী কাকের যেমন—
কিংবা যীশু যা বললেন, রুটি ভিন্ন অন্য কিছু থাকে প্রয়োজন ঃ
অপ্রতিম জেনে তবু বক্ষস্থলী ভ'রে রাখা কোনো স্বর্ণসীতা।

আমৃত্যুপ্রত্যয়ী তাঁরা, জীবনের নিদর্শন সুস্থির প্রজ্ঞায়
লিপ্ত করে রেখেছেন; মেলালেও মেধাবী সংস্কারে
তাকে এক করে নিতে পারব কী; এবং যা শেষ নমস্কারে
পূর্ণ করে দেব ভাবি, তাঁরা তা-ই তিল তিল পুণ্য নিঃস্বতায়

কতকাল পড়লেন। যে ঊষার আবির্ভাবে এ মেঘাবরণ
অনুপম ছিঁড়ে গেল—বিশ্ব করে নীলিমা নিষ্ফল
অভ্যর্থনা তার ভাবি ঃ যেরকম অধঃপাতে সেই বর্ষাজল
ঊষরে নিষেক দেয় তারও বেশি স্বপ্নময় মঙ্গলাচরণ

অন্ধকারে, মন্দে ছিল; রাত্রি ভ'রে পুনরাবৃত্তিতে
দেখেছি শ্লোকেই তাঁরা, আর শোকে, হৃদয়ে, সংবিতে।

মানুষকে খাওয়ানোর ব্যবস্থা করেছিলেন। অন্ধ বিশ্বেষে এই সত্য অস্বীকার করা যায়। কিন্তু যুক্তফ্রন্টের লংগরখানাকে বিদ্রূপ করা কিংবা ঐ লঙ্গরখানার কাজে যে সব কর্মীরা সাহায্য করেছিলেন তাদের বর্গী বলে আখ্যাত করায় বাঁকুড়ার জনসাধারণের মধ্যে কি প্রতিক্রিয়া দেখা দিয়েছিল কোন সমীক্ষকের সমীক্ষায় তার উল্লেখ না থাকলেও কংগ্রেসের সিওর সিটের প্রার্থী শ্রীমতী মুখার্জি কিছু ভোট পান নি বললে শ্রীমতী মুখার্জির প্রতি অবিচার করা হবে। কলকাতার শ্যামপুকুর কেন্দ্রে শ্রীহেমন্ত বসুর নির্বাচনী প্রতীক সিংহের বড় বড় মূর্তি যারা বানিয়েছিল শ্রীবসু কেন কোন বামপন্থী নেতারাই তাঁদের চেনেন না। শ্রীহেমন্ত বসু হারছেন বলে যাঁরা রটিয়ে প্রার্থী শ্রীগোবিন্দ দে-কে নানাভাবে শোষণ করেছেন তাঁরা কি শ্যামপুকুর কেন্দ্রের ঐ মানুষদের চিনতেন না?

ভারতবর্ষের কংগ্রেসী রাজনীতির অন্যতম শ্রেষ্ঠ নায়ক শ্রীঅতুল্য ঘোষ বুঝতে পারেন নি যে, সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের গরীব মানুষেরা তাঁদের বিরুদ্ধে চলে গেছে কিংবা গ্রামের সাধারণ কৃষক-জোতদার-মহাজন-মোড়লদের বন্ধন ছিন্ন করে স্বতন্ত্র ভূমিকা গ্রহণ করেছেন—এ কথা কি বিশ্বাসযোগ্য? বীরভূম জেলায় নির্বাচনী প্রচারে কংগ্রেসের প্রথম সারির নেতাদের কেন কাজে লাগানো হয় নি চৌরঙ্গী ভবন তা জানে না বললে কি সত্যের অপলাপ করা হবে না? শ্রীবীজেশ সেন আহত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে যে কম্যুনিস্ট কর্মীরাও আহত হয়েছিল খবরের কাগজের রিপোর্টে তা না থাকলেও শ্রীবীজেশ সেনের নিশ্চয়ই তা অজানা ছিল না। চারদিকে যখন বীজপুরের ঘটনার জন্য ধিক্ ধিক্ পড়ে গেছে তখনো শ্রীভবানী সেনের জনসভায় পঁচিশ হাজার লোকের সমাবেশের সংবাদ কংগ্রেস নেতৃবৃন্দ জানেন না বললে নেতৃত্বের প্রতি কটাক্ষপাত করা হবে না কি?

মুর্শিদাবাদের মাটিতে পা দিলেই যে সেখানকার হাওয়া কোনদিকে বইছে তা যে ভোট পাওয়া গেছে শ্রীদুর্গাপদ সিংহকে চুপিচুপি জিজ্ঞাসা করলে আজ তিনি তা স্বীকার করবেন। বহরমপুর, সিউড়ি, কৃষ্ণনগরের যে কোন মানুষকে জিজ্ঞাসা করুন—জানতে পারবেন ইন্দিরাজীকে দেখতে লোকে ভিড় করেছিল, না কংগ্রেসকে সমর্থন জানাতে।

কংগ্রেসের বিপর্যয়ের আভাস বেশির ভাগ সংবাদপত্রে না থাকলেও 'সাপ্তাহিক বসুমতী' কিংবা 'দর্পণে' কিংবা দিল্লীর দৈনিক 'পেট্রিয়টের' কথা বাদই দিলাম, খ্যাতনামা দৈনিক ইকনমিক টাইমসের পাতায় কিংবা টাইমস অব ইণ্ডিয়ার রিপোর্টের লাইনগুলির মধ্যে চোখ বুলোলেই আসল সত্যটা প্রকাশ হয়ে পড়তো।

গোয়েন্দা রিপোর্টে যদি বলা হয়ে থাকে বাংলা কংগ্রেস মাত্র দুটি আসন পাবে তাতে কংগ্রেসকে ডোবানোর জন্যই করা হয়েছে এ সত্যটা কংগ্রেস নেতৃবৃন্দের বোঝার কোন অসুবিধা ছিল না। কংগ্রেস নেতৃবৃন্দ জানতেন-ও। আজ যতই তাঁরা ভাবনার অভিনয় করুন না, কংগ্রেসের আসল চাবিকাঠি যাঁদের হাতে তাঁরা প্রস্তুত ছিলেন। লোকদল—আই এন ডি এফ যে বামপন্থীদের ক্ষতি করবে না, তাঁরা তা নিশ্চয়ই বুঝতে পেরেছিলেন। কিন্তু কংগ্রেস নেতা যাঁদের সংগঠনের সঙ্গে যোগ নেই, যাঁরা অন্যের কথা শুনে বিশ্বাস করে চিরদিন ঠকেছেন তাঁরা ছাড়া কংগ্রেসের অন্য নেতারা সব বুঝতে পেরেছিলেন। তবু নির্বাচনী হাওয়া নেই, জ্যোতি বসু হারছে, ডঃ প্রফুল্ল ঘোষের জয় অবধারিত তথাকথিত নিরপেক্ষতার ঢং-এ এই প্রচার করা হয়েছে সংশয়াকুল শিল্পপতিদের মনে সাহস জুগিয়ে তাঁদের কাছ থেকে বহু লক্ষ টাকা আদায়ের জন্য। নির্বাচনে হারলেও তাঁদের আসল উদ্দেশ্য সফল হয়েছে।

সমস্ত কলকাতার মানুষ যখন নির্বাচনে যুক্তফ্রন্টের বিপুল জয়ের আনন্দে আত্মহারা, সেই সময়ে বঙ্গোপসাগরের বুকে দুটি ছেলে মোচার খোলের মত একটা নৌকোয় ক্রমাগত দাঁড় টেনে চলেছে। সমুদ্রের চিলেরা এখন আর ওদের মাস্তুলে এসে বসছে না। ওদের নীল রংয়ের নৌকোটা সমুদ্রের নীল রংয়ের সঙ্গে মিশে হারিয়ে গেছে। মোহনা থেকে ওরা এখনও অনেক দূরে। ওদের যাত্রার লক্ষ্যস্থল থেকেও ওরা এখন অনেক অনেক দূরে।

এ ক'দিনের এই নির্বাচনের বিজয় উল্লাসের মধ্যেও কিন্তু বাংলাদেশের মানুষ পিনাকী আর ডিউককে ভোলে নি। সেদিন কলকাতার এক বিখ্যাত দৈনিক পত্রিকার অফিসের সামনে ভিড় থই থই করছিল। অফিসের দোতলার বারান্দায় বিরাট বোর্ডে নির্বাচনের ফলাফল টাঙিয়ে দেওয়া হচ্ছে। কয়েক মিনিট অন্তর অন্তর যুক্তফ্রন্টের জয়ের খবর আসছে আর সঙ্গে সঙ্গে বিপুল উল্লাসে আনন্দ-ধ্বনি করে উঠছে সেই হাজার হাজার মানুষের সমুদ্র। কে নেই সেখানে? সব জাতের, সব শ্রেণীর মানুষের সে এক মহাসমুদ্র।

ভিড়ের মধ্যে একদিকে ফুটপাথের পাশে তিনকোণা পার্কটার রেলিংয়ে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে ছিলেন আমারই পাশে প্রায় বছর ষাট বয়সের এক বৃদ্ধ ভদ্রলোক। মনে হল কোন সওদাগরী অফিসের কেরানি। অফিস ছুটি হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে রোজ শেয়ালদার পথে দ্রুত পা চালিয়ে দেন তাড়াতাড়ি ঘরে ফেরার জন্য। আজ তাঁরও কোন তাড়া নেই। যুক্তফ্রন্টের জয়ের আনন্দে সেই বৃদ্ধও আজ বাড়ি-ঘর ভুলেছেন।

শুধু বাড়ি-ঘর নয়, ভদ্রলোক তাঁর দীর্ঘ কেরানি জীবনের প্রাত্যহিক অভ্যাস প্রতিদিনের টিফিনটিও খেতে ভুলে গিয়েছিলেন সেদিন। "এঃ হে ভুলেই মেরে দিয়েছিলাম একেবারে" বলে আমার সামনেই পকেট থেকে বের করলেন খবরের কাগজে মোড়া একটি টিফিন বাক্স। বাক্সের মধ্যে খানতিনেক হাতেগড়া রুটি আর তার পাশে একখাবলা তরকারি। সেই ভিড়ের মধ্যে পথের ওপর দাঁড়িয়ে গোধূলি আলোয় পরম তৃপ্তিতে ভদ্রলোক তাঁর ভুলে-যাওয়া টিফিন খেতে লাগলেন।

এক সময়ে আমার দিকে চোখ পড়তেই হেসে বললেন—"বেমালুম ভুলে গিয়েছিলাম মশাই আজ অফিসে টিফিন খেতে। মনে থাকবে কি করে বলুন, অফিসে কি আজ ইলেকশনের রেজাল্ট ছাড়া আর কোন কথা ছিল। সারাদিন প্রায় বলতে পারেন, রেডিওর কাছে হুমড়ি খেয়ে বসে আছে সব। তারপর ছুটি হতেই এই এখানে।"

এরপর আর এক ঢোক রুটি গিলে ভদ্রলোক আমায় লক্ষ্য করেই বললেন—"হ্যাঁ মশাই যুক্তফ্রন্টের খবর তো ভালই দেখছি, কিন্তু ওদের কোন খবর আছে, বলতে পারেন?"

"ওদের মানে?" জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে ভদ্রলোকের মুখের দিকে তাকালাম। ভদ্রলোক গলা ঝেড়ে জবাব দিলেন—"আরে ঐ যে মশাই পিনাকী। পিনাকী-দের কোন খবর পেলেন?"

* *

সেদিন সন্ধ্যায় চৌরঙ্গীর আলোকোজ্জ্বল তিন মাথার মোড়ে জনসমুদ্র যখন এক অপ্রত্যাশিত বিজয়ে বার বার দুলে উঠছিল সেই সময়েই বঙ্গোপসাগরের নীল বুকে একটা নীল নৌকোয় দাঁড় টেনে চলছিল ডিউক আর পিনাকী। তখন তিনদিন ধরে ওদের কোন খবর নেই।

শুধু ষাট বছরের বৃদ্ধ কেরানি নয়, স্কুল-ফেরতা আমার ছ' বছরের ছোট্ট ভাইটিও প্রত্যহ বাড়ি এসে জুতোর ফিতে খুলতে খুলতে জিজ্ঞেস করত "পিনাকী-দের কোন খবর পেয়েছো?"

পিনাকীদের খবর পাওয়া গেছে। আনন্দের মধ্যেও সমস্ত বাংলার উদ্বেগ কেটে গেছে। এখনও ওরা সমুদ্রে দাঁড় টেনে চলেছে। ওদের অভিযানের লক্ষ্য আন্দামান।

* * *

ওদের এই অভিযান নিয়ে এ পর্যন্ত কলকাতার সংবাদপত্রগুলি অনেক কাব্য করেছে। কলকাতার দৈনিক সংবাদপত্র-গুলির সাংবাদিকদের সেই সব কাঁচা হাতের স্যাঁতসেঁতে কাব্যিপনার পুনরা-বৃত্তি করার ইচ্ছে আমার নেই।

কথায় কথায় লিখতে বসে আজ আমার যে প্রসঙ্গে ওদের কথা মনে পড়ল সেটা সম্পূর্ণ এক স্বতন্ত্র প্রসঙ্গ—এই অভিযানের সার্থকতার প্রসঙ্গ।

শুরু করার আগে বাংলাদেশের ছেলে পিনাকী এবং তার সহযাত্রী ডিউকের দুঃসাহসের কাছে মাথা নত করছি। একটা জাতির জীবনের সর্বক্ষেত্রেই যে জিনিসটির ভূমিকা অপরি-হার্য সে হল সাহস, অদম্য সাহস। রাজনীতি থেকে শুরু করে আমাদের প্রাত্যহিক জীবনের চৌহদ্দির মধ্যে আজকে কোথাও এই সাহস বস্তুটির খোঁজ প্রায় পাওয়াই যায় না বলা চলে। তাই এই দুর্লভ গুণ কারোর মধ্যে একটু দেখতে পেলেই শ্রদ্ধায় মাথা নুয়ে আসে।

কিন্তু আমার প্রশ্ন তা নয়। উনিশ শো উনসত্তর সালের পৃথিবীতে মানুষ যখন চাঁদে পাক খেয়ে ফিরে এসেছে, মহাকাশে এক যান থেকে অন্য যানে আরোহী বদল হচ্ছে, এককথায় বিশ্বের জল-স্থল সম্পূর্ণ জয় করে মানুষ যখন মহাজগৎ জয় করতে চলেছে তখন ছোট্ট একটা ডিঙি নৌকোয় চড়ে কলকাতা থেকে আনন্দামান পর্যন্ত দুরন্ত সমুদ্রযাত্রার এই উদ্ভট অভিযানের পরিকল্পনার কে রচয়িতা, কার মস্তিষ্ক-প্রসূত এই পরিকল্পনা? কি তার সার্থকতা?

শুধু নৌকোয় চড়ে সাগরযাত্রার রোমাঞ্চকর, ভয়াবহ আনন্দ উপভোগের জন্য যদি এই অভিযান পরিকল্পিত হয়ে থাকে, তাহলে আমার কিছু বলার নেই। সব যুগেই তরুণেরা উদ্ভট আনন্দের খোঁজে ছোটে, আজও ছুটবে। এতে কোন কিন্তু বা জিজ্ঞাসা থাকতে পারে না।

শুধু এইটুকুর বাইরে আমি এ অভিযানের কোন সার্থকতা খুঁজে পাই না। খুঁজে পাই না, কারণ বঙ্গোপসাগরের পথে আন্দামান অজের সমুদ্র নয়। এ যদি পর্বতারোহণ হত তাহলে সেক্ষেত্রে কোন প্রশ্ন তুলতাম না। যে পর্বত একবার মানুষের পদ-লাঞ্ছিত হয়েছে, তাকে বার বার পায়ে হেঁটে নতুন করে জয় করার, তার প্রতিটি চড়াই প্রতিটি উৎরাই আর খাদকে চেনার প্রয়োজন বুঝি।

কিন্তু ডিঙি নৌকোয় চড়ে কলকাতা থেকে আন্দামান যাওয়া কোন অজানাকে জানার জন্য নয়। এবং এই অভিযান এই প্রথম এবং এইখানেই শেষ। এতে কোন রেকর্ড ভাঙা বা রেকর্ড করার প্রশ্ন নেই। এতে কোন নতুন আবিষ্কারের গন্ধ নেই। এ শুধু কাঁচা কিছু দুঃসাহসের পরিচয় দেবার জন্য অভিযান।

কিন্তু এ ছাড়াও এই অভিযানের পরিকল্পনার দায়িত্ব যাঁদের, ইতিমধ্যেই আমরা তাঁদের যথেষ্ট দায়িত্বহীনতার পরিচয় পেয়েছি। মোহনার মুখে দুটি দুঃসাহসী তরুণকে বিদায় দিয়ে উদ্যোক্তারা নিশ্চিন্তে দিন কাটাচ্ছিলেন। আটচল্লিশ ঘণ্টারও বেশি সমগ্র দেশ তাদের কোন সংবাদ পায় নি। এমন ক্ষেত্রে তাদের সংবাদ পাওয়ার দ্রুত কোন ব্যবস্থা, বিপদের সম্ভাবনা দেখা দিলে তাদের জীবন বাঁচানোর কোন ব্যবস্থা না করেই যাঁরা এই পরিকল্পনা রচনা করেছেন, তাঁদের দায়িত্বজ্ঞানের প্রশংসা করা যায় না।

নীল সমুদ্রে নীল রংয়ের নৌকো নিয়ে কাব্যি করা যায়, কিন্তু সেই নীল রংয়ের জন্যই সন্ধানী বিমান যখন মহাসমুদ্রের বুকে তাদের খুঁজে না পেয়ে ফিরে আসে, তখন দুটি তাজা তরুণের জন্য সমগ্র দেশের উদ্বেগের খেসারৎ কে দেবে?

ডিউক ও পিনাকী তাদের লক্ষ্যে পৌঁছে দুঃসাহসের বিজয় গৌরব মাথায় নিয়ে আসুক। বাংলাদেশের তরুণেরা চিরকাল জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে সাহস দেখিয়ে এসেছে। আজও তাদের সে সাহসে কোন ঘাটতি পড়েছে বলে আমার মনে হয় না। জীবনে ফলপ্রসূ সাহস দেখাবার জন্য অনেক প্রশস্ত ক্ষেত্র পড়ে আছে। দেশকে গড়ার জন্য সাহসের প্রয়োজন, স্বাধীনতাকে রক্ষার জন্য সাহসের প্রয়োজন, সমাজ ও মানুষের জীবনকে নির্ভয় ও সুন্দর করে গড়ে তোলার জন্য ত্যাগ ও দুঃসাহসের প্রয়োজন।

ডিঙি নৌকোয় কলকাতা থেকে আন্দামান অভিযানের মধ্য দিয়ে সাহসের মহড়া দেবার প্রয়োজন, সময় ও সার্থকতা বোধ হয় এ যুগে আর নেই।

দৃশ্যকাব্য-পরিচয়

সত্যজীবন মুখোপাধ্যায়

দাম ঃ দশ টাকা

বাংলা নাট্যসাহিত্যের প্রাচীন ও আধুনিককালের সম্পূর্ণ ইতিহাস, প্রাচ্য ও প্রতীচ্য মনীষীরা তুলাদণ্ডে বিচারিত। বি-এ ও এম-এ পরীক্ষার্থীর অবশ্য পাঠ্য গ্রন্থ।

লব্ধপ্রতিষ্ঠ সাহিত্যিক ও নাট্যসমালোচক শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্রকুমার রায় এই গ্রন্থখানি সম্বন্ধে বলেছেন ঃ —

* * তথাকথিত জ্যেষ্ঠতাত জাতীয় অকালপক্ক এবং বিচারশক্তিহীন আত্মহারা ও প্রিয়ভাষী সমালোচকদের নিয়ে এতদিন যাচ্ছই অস্বস্তি বোধ করছিলুম। এতদিন পরে এই বিভাগে দুইখানি অমূল্য গ্রন্থ আমাদের হস্তগত হয়েছে। প্রথমখানির কথা দৈনিক বসুমতীতে ইতিমধ্যেই আলোচনা হয়ে গেছে * *দ্বিতীয়খানির নাম 'দৃশ্যকাব্য-পরিচয়' রচনা করেছেন শ্রীযুক্ত সত্যজীবন মুখোপাধ্যায়। বইখানির আকার বিপুল। বাংলা নাটক নিয়ে এমনভাবে, মস্তিষ্কচালনা করবার মানুষ যে আমাদের দেশে আছেন, এ তথ্য আমার কাছে ছিল সম্পূর্ণ অজ্ঞাত। সুদীর্ঘকালের সাধনা ছাড়া এমন গ্রন্থ কেউ রচনা করতে পারেন না। * * অথচ বাঙালীর সৃষ্ট নাট্যসাহিত্যের সম্পূর্ণ ইতিহাস এতদিন কেউ রচনা করেন নি। হালে শ্রীযুক্ত ব্রজমোহন বসু সেই চেষ্টা করেছেন এবং দৃশ্যকাব্যের পরিচয় দিতে গিয়ে সত্যজীবনবাবু অগ্রসর হয়েছেন অধিকতর। * *যাঁরা জ্যেষ্ঠতাতের ভূমিকায় অভিনয় করতে ইচ্ছুক মন, এই পুস্তকখানি পাঠ করলে তাঁরা বাংলা দেশের সমগ্র নাট্যসাহিত্য সম্বন্ধে একটি বিশদ ধারণা করতে পারবেন। এত খুঁটিয়া খুঁটিয়া আর কোন লেখকই বাঙালীর নাট্যসাহিত্য নিয়ে আলোচনা করতে পরেন নি। এইটিই হ'ল আলোচ্য গ্রন্থের প্রধান গৌরব। * *তাঁর সমালোচনাও পরম উপভোগ্য। সমালোচকের উপযোগী সূক্ষ্ম দৃষ্টি, নিরপেক্ষতা ও যুক্তিযুক্ত মনের পরিচয় দিয়ে তিনি আমাদের আনন্দিত করেছেন। তিনি কেবল গুণই দেখেন নি, দোষও দেখেছেন। কোথাও তিনি উচ্ছ্বসিত হয়ে অতিরিক্ত বাক্য ব্যয় ক'রে বক্তব্য-বিষয়কে ক'রে তোলেন নি ঘোঁয়াটে। * *যাঁরা বাংলা নাটকের ইতিহাস নিয়ে আলোচনা করবেন, এই গ্রন্থখানি তাঁদের পক্ষে অবশ্য পাঠ্য। * * যাঁদের লাইব্রেরী আছে, এই বইখানি না থাকলে তাঁদের সংগ্রহ অসম্পূর্ণ থেকে যাবে। * *

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের বাংলা অনুবাদক সুপণ্ডিত শ্রীযুক্ত পশুপতি ভট্টাচার্য এম-এ মহোদয় এই গ্রন্থখানি সম্বন্ধে স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া লিখিয়াছেন—

* * বাংলা নাটকের ইতিহাস সম্বন্ধে এই ধরণের বই বাংলা ভাষায় আর আছে কিনা জানি না, থাকিলেও খুব কমই আছে। গ্রন্থকার শুধু ঐতিহাসিকের দৃষ্টি দিয়াই তাঁহার আলোচ্য বিষয় দেখেন নাই। সঙ্গে সঙ্গে তিনি তাঁহার সমালোচনা-শক্তিরও পূর্ণ ব্যবহার করিয়াছেন। প্রত্যেকটি উল্লেখযোগ্য নাটকের গুণাগুণ তিনি বিচার করিয়াছেন। প্রাচ্য ও প্রতীচ্য এই উভয় নাট্যাদর্শ সম্মুখে রাখিয়া তিনি এই বিচার করিয়াছেন। বইখানিতে যেমন তাঁহার অসাধারণ পরিশ্রম ও অধ্যবসায়, তেমন তাঁহার গভীর পাণ্ডিত্যের পরিচয় পাওয়া যায়। শিক্ষার্থীদের পক্ষে এই বই অবশ্য পাঠ্য। অন্য সাহিত্য-পিপাসুরাও এই বই হইতে জ্ঞাতব্য বিষয় জানিতে পারিবেন। আমরা এই ধরণের বই-এর সম্পূর্ণ উপযোগী—গাম্ভীর্য পূর্ণ ও প্রাঞ্জল।"

বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের বর্তমান সম্পাদক, নাট্যশালার ইতিহাসলেখক ও নাট্যতত্ত্ব পরিসংখ্যানবিদ শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছেন ঃ—

"এই বিরাট গ্রন্থে বাংলা দৃশ্যকাব্যগুলির ইতিহাস সঙ্কলিত হইয়াছে। কেবল জীবিত লেখকগণকে বাদ দেওয়া হইয়াছে। * * সত্যজীবনবাবুর পক্ষে শ্লাঘার বিষয় এই যে, তাঁহারই অক্লান্ত পরিশ্রমের ফলে অতিনীত দৃশ্যকাব্যগুলির সমালোচনা একত্রে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হইল। * * 'দৃশ্যকাব্য-পরিচয়' বাস্তবিকই আমাদের একটা বহুদিনের অভাব বিদূরিত করিয়াছে। এজন্য লেখক সাহিত্যামোদিগণের কৃতজ্ঞতা দাবী করিতে পারেন।"

বসুমতী প্রাইভেট লিমিটেডঃ ১৬৬, বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী ষ্ট্রীট, কলি-১২

সপ্তাহের বোঝা

কৃত্তিবাস ওঝা

দুই পরম বৈষ্ণবের পথ চলতে মুখোমুখি দেখা। মুখোমুখি হয়ে এক বৈষ্ণব আর এক বৈষ্ণবের পায়ে হাত দিয়ে নিবেদন করতে চাইলো আমি অধম। দুইজনই নিজেকে অধম প্রমাণ করতে পায়ে হাত দেবার চেষ্টা করেন। একজন বলেন, আমি অধম, অপরজন বলেন, না না আমি অধম। মুখে নিজেকে অধম বলে অপরের পায়ে হাত দিতে চেষ্টা করেন, কিন্তু কেউ কাউকে হারাতে পারেন না। ব্যস, এই অধম প্রমাণের চেষ্টায় দুইজন পথ ছেড়ে গিয়ে পড়লেন ধানক্ষেতে, ধানক্ষেতে গিয়েও সেই একই অবস্থা। দুইজন একে অপরের পায়ে হাত দিয়ে অধম প্রমাণের চেষ্টা করছেন। এই চেষ্টা করতে গিয়ে ধানক্ষেত নষ্ট হবার উপক্রম। ধানক্ষেতের মালিক চাষী সেই দৃশ্য দেখে দুই অধমকে লাঠি নিয়ে করলো তাড়া, আর লাঠির ঘা পিঠে পড়তেই দুই অধমের জ্ঞান ফিরলো আর তখন দে ছুট-দে ছুট। এই গল্পটা অনেকেরই জানা, কিন্তু অনেকেরই জানা নয় পশ্চিমবঙ্গের রাজ্য রাজনীতিতে মুখ্যমন্ত্রী নির্বাচন উপলক্ষ করে এই অধমাধমের কাহিনীর অতি নিপুণ পুনরাবৃত্তি ঘটে গেল।

গত সপ্তাহে 'সপ্তাহের বোঝা' লিখতে লিখতে লেখাটা অসমাপ্ত রেখেছিলাম কংগ্রেসের বিপর্যয় প্রসঙ্গ আলোচনা করতে গিয়ে। লেখা শেষ করেছিলাম এই বলে যে, বাংলা দেশে গত বিশ বৎসর কেউ তাদের আদরের সন্তানের নাম অতুল্য-প্রফুল্ল রাখে নি, তারপর গত ১৮ই ফেব্রুয়ারী কংগ্রেস ভবনে কংগ্রেসের সাধারণ কমিটির সভায় কংগ্রেস ভবনটি ভাড়া দেবার প্রস্তাব উঠেছে এবং এই প্রস্তাব রেখেছিলেন অন্য কেউ নয় স্বয়ং বিজয় সিংহ নাহার। কাজেই কংগ্রেস ভবন যখন ভাড়া দেবার কথা পর্যন্ত উঠেছে, তখন আর নতুন কিছু বলে কংগ্রেসের বিপর্যয়ের কথা বলার প্রয়োজন হয় না। তবু ভবিষ্যতে এই সম্পর্কে পরে আলোচনা করা যাবে, কিন্তু এই মুহূর্তে আরো জরুরী প্রশ্ন পাঠকদের সামনে পেশ করবার আকর্ষণ অনুভব করছি।

বৃহস্পতিবার পশ্চিম বাংলার যুক্তফ্রন্ট সরকারের মুখ্যমন্ত্রী-উপমুখ্যমন্ত্রী নির্বাচন অতি সংক্ষিপ্ত সময়ে শেষ হয়ে গেল আলিপুর বেকার রোডে শ্রীসেনহাংশু আচার্যের বাড়িতে। সভা বসেই পনেরো মিনিটে এই কাজ শেষ হল। কিন্তু এই পনেরো মিনিটের কর্মসূচীর পিছনে রয়েছে একটি দীর্ঘ কাহিনী—সেই কাহিনী হল ঐ প্রথমে বলা অধমাধমের গল্পটি আর চাষীর হাতে মার খাওয়ার ঘটনাটি। রাজ্যে মধ্যবর্তী নির্বাচনে যুক্তফ্রন্ট দলের বিপুল সাফল্যের পর প্রথমে একটি বিতর্ক উঠলো বাজারে, সেই বিতর্ক হল রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী কে হবেন? এই বিতর্কের মূল নায়ক হলেন দুইজন। একজন মার্কসবাদী কম্যুনিস্ট পার্টির সর্বোচ্চ কর্ণধার শ্রীপ্রমোদ দাশগুপ্ত, অপরজন হলেন ফরোয়ার্ড ব্লকের শ্রীঅশোক ঘোষ। শ্রীপ্রমোদ দাশগুপ্ত আর শ্রীঅশোক ঘোষের রাজা রাজনীতিতে কি পরিচয় সেই কথা অতীতে বহুবার বহুভাবে পাঠকদের জানিয়েছি। কাজেই সেই সম্পর্কে নতুন কিছু জানাবার নেই, তবু জানিয়ে রাখি—পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপাল শ্রীধরমবীর, লোকদলনেতা অধ্যাপক হুমায়ুন কবির আর ডঃ প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষের আকৃতিতে যেমন মিল আছে, তেমনি শ্রীদাশগুপ্ত ও শ্রীঘোষের মধ্যেও বেশ কিছু মিল আছে। ঘন কৃষ্ণবর্ণ চেহারায় সাদা পাঞ্জাবী। শুধু পরনের পোষাকে নয়—চোখের চশমার ফ্রেমেও মিল আছে আর পাওয়ারের লেন্সেও মিল আছে দুজনের। তথাকথিত সর্বদলীয় বড় জনসভায় এঁদের দেখা কম পাওয়া যায় অথবা দলকে প্রতিনিধিত্ব করবার সময়ও ওঁরা থাকেন অনুপস্থিত অথবা পিছনের সারিতে, কিন্তু বক্তা হিসাবে দুইজনই প্রথম সারির। কথা কম বলেন, কিন্তু যেটুকু বলেন সেইটুকু কাজের কথা। রাজ্য রাজনীতির অনেক বড় নেতা আছেন, যাঁদের দুই ঘণ্টা বক্তব্যে দুই লাইন নিউজ ভ্যালুর ম্যাটার পাওয়া যায়, কিন্তু শ্রীপ্রমোদ দাশগুপ্ত বা শ্রীঅশোক ঘোষ দুই লাইন কথা বললে সেই দুই লাইনই নিউজ। কাজেই এই দুইজন যখন আসরে নামলেন, তখন বিতর্কটা জমে উঠল অতি আকর্ষণীয়ভাবে। মধ্যবর্তী নির্বাচনের ফল প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে প্রায় একই সময়ে শ্রীপ্রমোদ দাশগুপ্ত বললেন—যুক্তফ্রন্টের মধ্যে বৃহত্তম দল হিসাবে মার্কসবাদী কম্যুনিস্ট পার্টির পক্ষে মুখ্যমন্ত্রিত্বের দাবি অনস্বীকার্য। এই কথা শুধু শ্রীপ্রমোদ দাশগুপ্ত নয়—মার্কসবাদী কম্যুনিস্ট পার্টির পলিট ব্যুরো, রাজ্য কমিটি সকলেই বললেন। শ্রীবাসব পুন্নিয়ার মত দুই-একজন অবশ্য শুধু দাবি জানিয়ে নয় আরো কড়া ভাষায় বললেন—কংগ্রেস হটিয়ে আমরা কি বাংলা কংগ্রেসকে গদিতে বসাবো? এই কথার জবাব দিলেন শ্রীঅশোক ঘোষ। শুধু কথার জবাব হিসাবে নয়, তিনিও নির্বাচনী ফল প্রকাশের প্রায় সঙ্গে সঙ্গে বললেন—রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী হবেন শ্রীঅজয় মুখোপাধ্যায়। পরে যখন বিতর্ক জমে উঠল, তখন তিনিও জনগণের রায় তুলে ধরে বললেন—জনগণের রায় হল রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী হবেন শ্রীঅজয় মুখোপাধ্যায়। মার্কসবাদী কম্যুনিস্ট পার্টির সব বক্তব্যের সার কথা ছিল—জনগণ কংগ্রেসকে উৎখাত করে যুক্তফ্রন্টের বিপুল জয়কে সম্ভব করেছেন। উপরন্তু জনগণ মার্কসবাদী কম্যুনিস্ট পার্টির ৮০ জন ও সমর্থিত তিনজনকে বিধানসভায় নির্বাচিত করে তাঁদের আস্থা ও বিশ্বাস মার্কসবাদী কম্যুনিস্ট পার্টির প্রতি ঘোষণা করেছেন। মার্কসবাদী কম্যুনিস্ট পার্টিকে যুক্তফ্রন্টের সর্ববৃহৎ দলে পরিণত করেছেন। সমগ্র অবস্থায় যুক্তফ্রন্ট সরকারকে সংগ্রামের হাতিয়ার করতে হলে এবং গণতান্ত্রিক পদ্ধতি ও নিয়মনীতির দিক থেকেও বৃহত্তম দল হিসাবে মুখ্যমন্ত্রিত্বের দাবি মার্কসবাদী কম্যুনিস্ট পার্টির পক্ষে অনস্বীকার্য। তাছাড়া জনগণের প্রতি দায়িত্ব ও ইচ্ছার প্রতি লক্ষ্য রেখে মন্ত্রিসভার অন্যান্য দপ্তর বণ্টনের কথা মার্কসবাদী কম্যুনিস্ট পার্টির পক্ষ থেকে বলা হয়েছে। শ্রীঅশোক ঘোষ এই বক্তব্যের জবাব দিলেন, তিনি বললেন—পশ্চিমবঙ্গের জনগণ কোন একক দলের প্রতিই আস্থা জানায় নি, আস্থা জানিয়েছে সমগ্র যুক্তফ্রন্টের ওপর। জনগণ মার্কসবাদী কম্যুনিস্ট পার্টির প্রায় একশত জন প্রার্থীর মধ্যে ৮৩ জনকে জয়ী করে যেমন তাঁদের আস্থার কথা জানিয়েছেন, তেমনি এস-ইউ-সি বা ওয়ার্কার্স পার্টির সাতজনের মধ্যে সাতজন বা দুইজনের মধ্যে দুইজনকে জয়ী করেও একই আস্থা প্রকাশ করেছেন। বেশি প্রার্থী ছিল বলে বেশি জয়ী হয়েছে এ যেমন আস্থার নিদর্শন, তেমনি যে কয়েকজন প্রার্থী ছিল সব কয়েকজন জয়ী হয়েছে, সেটাও আস্থার নিদর্শন। কাজেই

নির্বাচনী রায়ে কোন এক দলের প্রতি আস্থার প্রশ্ন ওঠে না। আস্থা যদি জনগণ প্রকাশ করে থাকেন, তবে করেছেন যুক্তফ্রন্টের প্রতি। তাছাড়া নির্বাচনের প্রচারে নেমে যুক্তফ্রন্ট তো সবচেয়ে বেশি করে এই কথাই বলেছে যে, যুক্তফ্রন্ট সরকারকে বে-আইনীভাবে অপসারণ করেছে রাজ্যপাল ধরমবীর জনগণের রায়কে অমর্যাদা করে। মধ্যবর্তী নির্বাচনে জনগণকে নতুন করে রায় দিয়ে সেই সরকারকে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করতে হবে। যুক্তফ্রন্ট তো মনে করে তাদের সরকারকে বে-আইনীভাবে গদিচ্যুত করা হয়েছে, তাই যদি জনগণের রায়ে সরকার পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হয়, তবে মুখ্যমন্ত্রী পরিবর্তনের প্রশ্ন আসে কিভাবে—স্পীকার পরিবর্তনের প্রশ্ন আসে কিভাবে, যেমন উপ-মুখ্যমন্ত্রী পরিবর্তনের প্রশ্নও ওঠে না। গত সরকারের নেতা ছিলেন অজয়বাবু, নির্বাচনী-যুদ্ধ পরিচালনায় নেতা ছিলেন অজয়বাবু, নতুন সরকার গঠনেও নেতা থাকবেন অজয়বাবু।

এই নেতা প্রসঙ্গের জবাব দিলেন শ্রীপ্রমোদ দাশগুপ্ত—নেতা, দুটো সভায় সভাপতিত্ব করলেই কি নেতা হওয়া যায়? দুর্ভিক্ষ প্রতিরোধ কমিটির সভায় সভাপতিত্ব করতেন ডাঃ সুরেশ বন্দ্যোপাধ্যায়, তাহলে তিনিই তো ছিলেন সবচেয়ে বড় নেতা।

শ্রীঅশোক ঘোষ আর শ্রীপ্রমোদ দাশগুপ্তের এই 'কবির লড়াই' কিন্তু জনগণ বেশ মনোযোগ দিয়ে শুনছিলেন। তাঁরা আরো শুনছিলেন যুক্তফ্রন্টের সভার আলোচনা। যেমন, দুইদিন ধরে যুক্তফ্রন্টে আলোচনা হল এবং মার্কসবাদী কম্যুনিস্ট পার্টি বলল—এত কিছুর দরকার নেই, আপনারা সরকার গঠন করুন, মুখ্যমন্ত্রী হন, আমরা সমর্থন করবো। বিপরীত পক্ষ থেকে জবাব এল—তা কেন, আপনারা বড় দল, জনগণের বেশি আস্থা পেয়েছেন, জনগণের প্রতি আপনাদের দায়িত্ব বেশি, অতএব আপনারা সরকার গঠন করুন—আমরা সমর্থন করবো।

আমি আগে যে অধমাধমের কথা বলেছি এই হল সেই অধমাধমপর্ব। একজন বলছে আমি অধম—অপরজন বলছে না না, আপনি কেন আমি অধম। দুই অধম যেমন এমনি করে অধম হতে চেয়ে ধানের ক্ষেতে গিয়ে পড়ে, যুক্তফ্রন্টের ঠিক সেই অবস্থা হল। এতদিন যুক্তফ্রন্টের সভা হচ্ছিল সি-পি-আই অফিসে। নেতারা দিনের পর দিন সভা করেন, কিন্তু কে অধম তার মীমাংসা হয় না। জনগণ বৌবাজার স্ট্রীটে দাঁড়িয়ে লক্ষ্য করে। ১৮ই ফেব্রুয়ারী অবস্থা এমন হল যে, সভার স্থান সরিয়ে লোয়ার সার্কুলার রোডের অফিসে নিয়ে যাওয়া হয়। কিন্তু সেখানেও জনগণ। অর্থাৎ চাষী এবার হাতে লাঠি নিয়ে তাড়া শুরু করেছে অধমদের। ১৮ই রাত্র আটটা বাজতে ২০ মিনিট বাকি থাকতে শ্রীহরেকৃষ্ণ কোঙার ফোন করলেন স্নেহাংশু আচার্যকে। শ্রীআচার্য তখন শ্রীগীতীন্দ্রনাথ ঠাকুরের (শর্মিলা ঠাকুরের তথা আয়েসা সুলতানার পিতা) সঙ্গে বসে একটু অবসর যাপন করছিলেন। তাঁকে ফোন করে বলা হল তাঁর বাড়িতে এক্ষুণি ৪০ জন লোক যাবেন, যুক্তফ্রন্টের সভা হবে। চাষীর লাঠির ভয়ে অধমরা ছুটে গিয়ে আশ্রয় নিলেন মধ্য কলকাতা ছেড়ে আলিপুরে—সকলের অজ্ঞাতে লোকচক্ষুর অন্তরালে। ২০শে ফেব্রুয়ারী এই আলিপুরেই ৭-১৫ মিনিটে চাষীর লাঠির ভয়ে পলাতক অধমরা ঘোষণা করলেন—না, আমরা দুইজনই উত্তম অথবা অধম। অর্থাৎ সর্বসম্মতিক্রমে শ্রীঅজয় মুখোপাধ্যায় ও শ্রীজ্যোতি বসু যুক্তফ্রন্টের নেতা ও সহকারী নেতা নির্বাচিত হলেন। এই নেতা নির্বাচনের দিন পর্যন্ত যুক্তফ্রন্টের সভা যেখানে হয়েছে, সেখানে দেখা যেত সমস্ত দিন শত শত মানুষ দাঁড়িয়ে আছে, খবরের কাগজে টেলিফোনের অন্ত নেই—কত কৌতূহল। কিন্তু নেতা ও সহকারী নেতা নির্বাচনে যখন ঐকমত হয়ে গেল, জনগণ তখন তাদের প্রহরা তুলে নিল। আর যুক্তফ্রন্টের সভাস্থলে কোন ভিড় হয় নি—আর কেউ খোঁজ করে নি শ্রীপ্রমোদ দাশগুপ্ত কি বলছেন, শ্রীঅশোক ঘোষ কি বলছেন। লাঠির তাড়ায় অধমদের ধানক্ষেত থেকে বের করে দিয়ে চাষী এখন নিশ্চিন্ত।

(২২।২।৬৯)

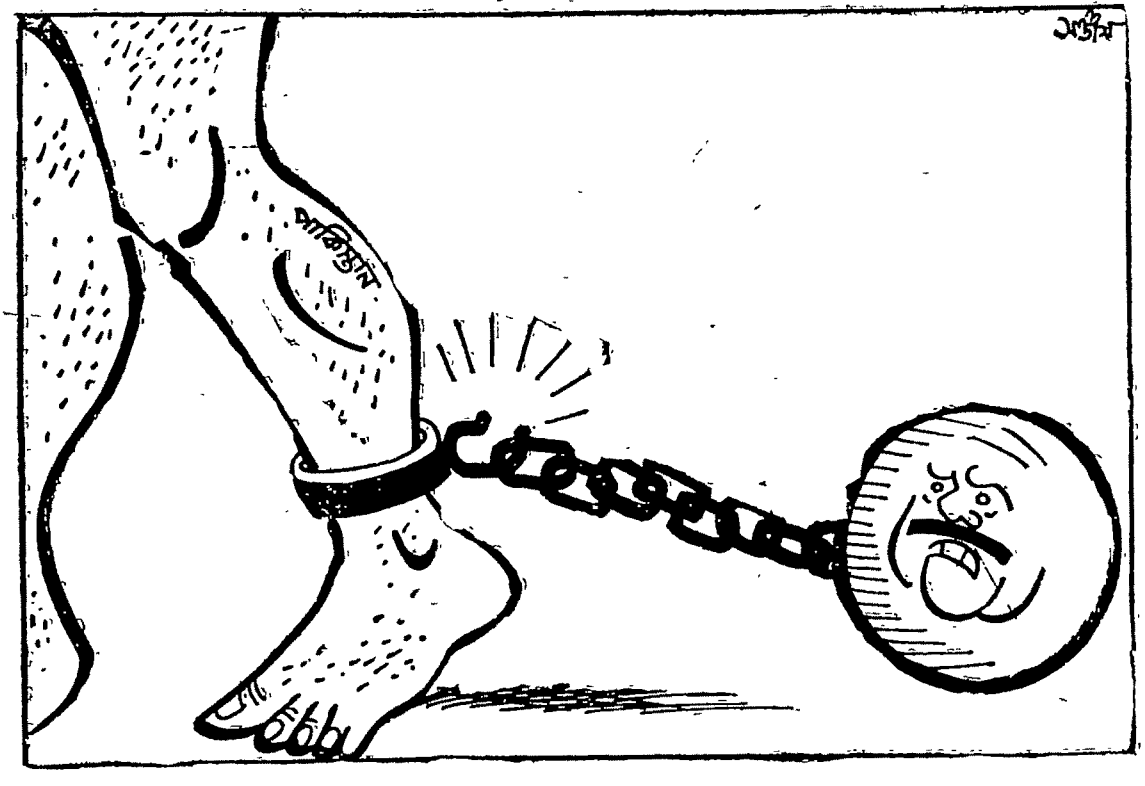

বাংলার বুদ্ধিজীবী সমাজঃ একটি সমীক্ষা

বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

পশ্চিমবঙ্গের মানুষ এবারকার নির্বাচনেও কংগ্রেস-বিরোধী বামপন্থী দলগুলিকে জয়যুক্ত করেছে। গতবার এই দলগুলি দু'ভাগে বিভক্ত ছিল, এবার তারা একটিই যুক্তফ্রন্টের শিবিরে সম্মিলিত হতে পেরেছেন। ফলে বিধানসভায় কংগ্রেসের সদস্য সংখ্যা এখন পর্যন্ত শূন্যে এসে দাঁড়ায় নি একথা যেমন সত্য, তেমনি, তারা যে একটি শক্তিশালী বিরোধী দলের সম্মানটুকু পর্যন্ত এবার খুইয়েছে, একথা আজ আসমুদ্র হিমাচল যে কোনো রাজনৈতিক চেতনাসম্পন্ন মানুষের জানা হয়ে গেছে। তেমনি, আরেকটি তথ্যও এখন আর কোথাও গোপন রাখা যাবে না, তা হলো, পশ্চিমবাংলা থেকে ডানপন্থী কোনো রাজনৈতিক দলের অস্তিত্ব এবার ধুয়ে মুছে গেল।

এ সকল কথা আমি সাধারণ মানুষের রাজনৈতিক চেতনা এবং শুভবুদ্ধির কথা মনে রেখেই লিখতে পারছি। কথাগুলি বাংলাদেশের বুদ্ধিজীবী সমাজ, বিশেষ করে কবি, সাহিত্যিক ও সাংবাদিকদের পক্ষে প্রযোজ্য নয়। তাঁদের যে কোনো রাজনৈতিক চেতনার অভাব আছে এমন কথা আমি বলি না; বরং তাঁদের রাজনীতি সাধারণ মানুষের রাজনীতির তুলনায় অনেক ঊর্ধ্বে অনেক বেশি কুটিল এবং সাধারণতই আমাদের সকলরকম ব্যাখ্যার অতীত। এবারকার নির্বাচনে আমাদের বুদ্ধিজীবীরা কী কী ভূমিকা পালন করেছেন, একবার সেই প্রসঙ্গে এলেই বিষয়টি পরিষ্কার হয়ে যাবে। প্রথমেই দৈনিক সংবাদপত্রগুলির, তাদের সম্পাদকীয় বিভাগ, রিপোর্টার দপ্তর ইত্যাদির কথা ভাবা যাক। এই নির্বাচনের আগেও অতি কুৎসিত, হীন ভাষায় এই সব দপ্তর থেকে কেউ স্বনামে কেউ বা বেনামে যুক্তফ্রন্ট অথবা তার শরীক কোনো কোনো বিশেষ দলের কুৎসা গেয়েছেন: তারপর এই নির্বাচনে তাদের পরাজয় কামনা করেছেন; তারা যে একটি স্থায়ী সরকার গঠন করতে পারবে না এবং ফলে তাদের জয়লাভ পশ্চিমবঙ্গের অমঙ্গলই ডেকে আনবে, এমন কথা কখনো গর্জন করে, কখনো সবিনয়ে যে যার পত্রিকা মারফৎ আমাদের কাছে নিবেদন করেছেন। আমাদের বিশিষ্ট কথাশিল্পী, যিনি তাঁর সাহিত্যিক কীর্তির জন্য সর্বত্র সম্মানীয়, যুক্তফ্রন্ট রাজত্বের তুলনায় রাষ্ট্রপতির শাসন পছন্দ করেন বলে প্রকাশ্যেই তাঁর অভিমত জানিয়েছেন। তিনি ধর্মবীরের শাসনের সময় 'ঘেরাও ইত্যাদির হাত থেকে এখন দেশ অনেক শান্তিতেই রয়েছে' এ ধরণের আত্মতৃপ্তি নিয়ে বেশ সুখেই ছিলেন। ভাল ছিলেন আমাদের বেশ কিছু কবি, সমালোচক, ফিচার লেখক ও অধ্যাপক; যাঁরা মনে করতেন সামাজিক দায়িত্ব পালন করার চেয়ে তাঁদের অন্যত্র অনেক বড় কাজ আছে। ঠিক নির্বাচনের মুহূর্তটিতে গড়ের মাঠে মুক্তমেলা করে সেখানে মহানন্দে নাচ-গানের আসর জমিয়ে তোলায় অপরিসীম তৃপ্তি ছিল তাঁদের।

দেখা গেল নির্বাচনের ফলাফল ঘোষণা করার সঙ্গে সঙ্গেই তাঁদের কী আশ্চর্য পরিবর্তন। রিপোর্টাররা এখন রাত-দুপুরে ফ্রন্ট নেতার একটি টেলিফোনের জন্য অপেক্ষা করেন, তাঁর জয়গান গান। রেডিওতে যুক্তফ্রন্টের নামকীর্তনে তাঁরা এখন কত না পঞ্চমুখ। দেশের সেরা সাহিত্যিক এখন ডাকলেই ফ্রন্টের হাতে খানা খেতে আসেন। ইতিমধ্যে একটি ইন্টারভিউ হয়ে গেছে তাঁর; সেখানে কত শুভেচ্ছার কথাই না তিনি আমাদের শুনিয়েছেন। যে সংবাদপত্র নির্বাচনের দিনটি পর্যন্ত ফ্রন্টের মুণ্ডুপাত করেছেন, নির্বাচনের সমস্ত ফলাফল জানার পর সেই পত্রিকাতেই কাঠের ব্লক করে বিরাট শিরোনামায় সংবাদ পরিবেশন করা হচ্ছে, 'এতদিনে বাংলার অপমানের শেষ হলো'।

এবার আমাদের বিশুদ্ধবাদী কবি, শিল্পী ইত্যাদির চরিত্র বদলের ব্যাপারটাই অনুধাবন করা যাক। নাচ-গানের পার্টির অবশ্য পরিবর্তন তেমন কিছু হয় নি, তাঁরা সমানেই উৎসব চালিয়ে যাচ্ছেন এবং যাবেন, কিন্তু তাঁদের মধ্যে কেউ কেউ রাতারাতি যুক্তফ্রন্টের প্রচণ্ড সমর্থক হয়ে উঠেছেন এবং তাঁরা যে এবারকার নির্বাচনে কেউ সোমনাথ লাহিড়ী কেউ যতীন চক্রবর্তী বা জ্যোতি বসুকে ভোটটি দিয়েছেন, সে কথা রাস্তাঘাটে প্রচার করে বেড়াচ্ছেন। মুখের সামনে একটি মাইক ধরে দিলে যুক্তফ্রন্টের জয়লাভে তাঁরা যে কী আহ্লাদে গর্বিত ও সম্মানিত, একটি স্বরচিত কবিতার দ্বারা এমন ঘোষণাও তাঁদের মুখ থেকে শোনা যাবে। চাই কি, একটি কবি সম্মেলন যদি এখন যুক্তফ্রন্টের পক্ষ থেকে ডাকা হয়, এবং সবাইকে যোগদান করার জন্য সেখানে আমন্ত্রণ জানানো হয়, তাহলে কয়েকশ তিরিশ-চল্লিশ-পঞ্চাশ-ষাটের কবির ভিড় জমে যাবে সেখানে।

অথচ এইসব কবি, সাহিত্যিক, সমালোচকেরাই দীর্ঘকাল ধরে তাঁদের রাজনৈতিক, সামাজিক, মানবিক কর্তব্য পালনে কত না নীরব ছিলেন। ঘরোয়া সভায়, বৈঠকে, রাস্তায় তাঁরা এই সব মূল্যবোধের প্রতি কী পরিমাণ ঘৃণাই না জানিয়ে এসেছেন!

অবশ্য এই চিত্রই বাংলাদেশের বুদ্ধিজীবী সমাজের সামগ্রিক চিত্র নয়। এঁদের বিপরীত প্রান্তেও আছেন বহু কবি, সাহিত্যিক, অধ্যাপক, সমালোচক এবং মুষ্টিমেয় সাময়িক পত্রিকার অক্লান্ত কর্মীরা। কিন্তু চারদিকের ঢাক-ঢোল-উৎসবের রকম দেখে এবং দেশদ্রোহী সমাজদ্রোহীদের মুখে যুক্তফ্রন্ট জিন্দাবাদ ধ্বনি শুনতে শুনতে তাঁদের যেন এখন কেমন ঘুম পাচ্ছে। তাঁরা তো এত আনন্দিত হতে পারছেন না: কেন না তাঁরা জানেন, উৎসবের দিন এখনো আসে নি, দায়িত্ব বেড়ে গেল, এই মাত্র। হয়তো এখন থেকে যুক্তফ্রন্টেরও সমালোচনা করতে হবে: কখনো কখনো বন্ধুদের সঙ্গেও তিক্ত লড়াই বেধে যাবে। আজ কোনো ঢাক-ঢোল বাজিয়ে ফুর্তি করার দিন নয়।

তাঁরা সুতরাং সমস্ত কাণ্ডকারখানাটাকেই আজ দুঃখ ও বিরক্তির সঙ্গে শুধু দেখে যাচ্ছেন। কিন্তু নিজেদের সমধর্মী বলে পরিচিত এই সব কিম্ভূতকিমাকার মানুষদের বাংলাদেশের প্রগতিশীল বুদ্ধিজীবীরা চেনেন, তাই এ সকলই স্বাভাবিক, তাঁদের মেনে নিতে হচ্ছে। কিন্তু তাঁদের তখনই সত্যিকারের বেদনা পেতে হয়, যখন দেখা যাচ্ছে যুক্তফ্রন্টের কোনো কোনো নেতা এই সব সমাজের আবর্জনাদের বড় বেশি প্রশ্রয় দিচ্ছেন; এদের কিঞ্চিৎ সহবৎ শিক্ষা না দিয়ে বরং ঘাড়ের ওপর চড়ে নৃত্য করতে দিচ্ছেন।

তখন শুভবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষ মাত্রেই প্রচণ্ড লজ্জা অনুভব করেন। কেন না, অসতের অতিরিক্ত মর্যাদা কোনোরকম সৎকর্মেরই একেবারে অচল; বিশেষ করে এই মর্যাদা যদি আসে তাঁদের নিজেদের শিবির থেকেই

পঞ্চম রায়

বহ্নি রায়

পশ্চিমবঙ্গের জনগণ পঞ্চমবার তাঁদের রায় দিলেন। রায় দিলেন, তাঁরা পরিষদীয় গণতন্ত্র চান। কংগ্রেস নয়, একটি বিকল্প সরকার। ঐক্যবদ্ধ ফ্রন্ট জনগণের মধ্যে বিশ্বাস ও আশার সঞ্চার করেছে। তাঁরা ফ্রন্টের সরকার চান।

মধ্যবর্তী নির্বাচনের মধ্য দিয়ে পশ্চিমবঙ্গের ভোটদাতারা আরো কয়েকটি বক্তব্য উপস্থিত করেছেন। প্রতিক্রিয়াশীল, দক্ষিণপন্থী, বিভেদকামী ও হঠাৎ গজিয়ে ওঠা স্বার্থান্বেষী দলগুলির কোন স্থান বাংলাদেশে নেই। দলত্যাগীদের বাংলাদেশ সহ্য করে না।

পঞ্চম রায় থেকে এটা সুস্পষ্ট হয়েছে যে, একশ্রেণীর নকশালপন্থীদের ভোট বয়কট আবেদন সম্পূর্ণ ব্যর্থ। কংগ্রেসের ভোট ১৯৬৭ সালের তুলনায় বিশেষ কমে নি। কেরলের ১৯৬৭ সালের নির্বাচন strategy অনুসরণ করে ফ্রন্ট কংগ্রেসকে কোণঠাসা করেছে।

ফ্রন্ট মন্ত্রিসভা বাতিল (১৯৬৭ সাল, ২১শে নভেম্বর) ও পি-ডি-এফ মন্ত্রিসভার নিয়োগকে সমর্থন করার জন্য যত শাসনতান্ত্রিক ব্যাখ্যা করা হোক না কেন, রাজ্যের জনগণ রাজ্যপালের সিদ্ধান্তকে স্বীকার করে নেয় নি। কেন্দ্রীয় সরকারের স্বরাষ্ট্রদপ্তরের নির্দেশের তারা প্রতিবাদ জানাতে পেরেছে। ভোটদাতারা মূর্খ নয় এবং সংবাদপত্রের প্রভাব জনগণের ওপর কত ক্ষীণ এবারের নির্বাচন তাও প্রমাণ করে দিয়েছে।

কংগ্রেস কোচবিহার, জলপাইগুড়ি ও নদীয়ার ১৯৬৭ সালের তুলনায় এবার সামান্য ভাল ফল দেখাতে পেরেছে। মালদা ও পুরুলিয়ায় তাদের পরাজয় সহনীয়। কিন্তু ২৪ পরগনা, মেদিনীপুর ও কলকাতায় কংগ্রেসের চূড়ান্ত পরাজয় হয়েছে। আর বীরভূম ও বাঁকুড়া থেকে কংগ্রেস নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে। প্রদেশ কংগ্রেসের সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক পরাজিত। এক আরামবাগে প্রফুল্ল সেন ছাড়া অধিকাংশ মর্যাদার লড়াইয়ে কংগ্রেস ভূলুণ্ঠিত হয়েছে। ফ্রন্টের উল্লেখযোগ্য পরাজয় শুধুমাত্র কমল গুহ (ফঃ বঃ) ও নারায়ণ চৌবে (ডান কম্যু)।

জনগণের রাজনৈতিক সচেতনতা যে বৃদ্ধি পেয়েছে তা ১০৬ জন নির্দলীয় প্রার্থীর মধ্যে মাত্র দুইজনের জয়লাভের ঘটনায় স্পষ্ট হয়েছে। হয় কংগ্রেস নয় ফ্রন্ট; ভাসমান ব্যক্তিদের তাঁরা চান না।

ফ্রন্ট সমর্থিত নির্দলীয় প্রার্থীরা তাঁদের রাজনৈতিক আনুগত্য প্রদর্শন করেছেন এবং জয়লাভ করেছেন। ফ্রন্ট বহির্ভূত পি-এস-পি, আই-এন-ডি-এফ, লোকদল, জাতীয় দল, জনসংঘ ও স্বতন্ত্র দলের পশ্চিমবঙ্গে যে রাজনৈতিক শক্তির কোন ভিত্ নেই এ নির্বাচন সে-কথাও প্রমাণ করে দিয়েছে। শুধু একটি অশুভ উপস্থিতি সংখ্যালঘু সাম্প্রদায়িক দল প্রগতিশীল মুসলিম লীগ মুর্শিদাবাদ থেকে ২টি এবং ২৪ পরগনা থেকে ১টি আসন ছিনিয়ে নিতে পেরেছে।

ফ্রন্ট বহির্ভূত পি-এস-পি ২০টি আসনে প্রার্থী দেয় মাত্র ১ জনকে; আই-এন-ডি-এফ ১৭টি আসনে প্রার্থী দিয়ে ১ জনকে, এবং প্রগতিশীল মুসলিম লীগ ৪০টি আসনে প্রার্থী দিয়ে ৩ জনকে বার করে আনতে পেরেছে। লোকদল ৫৮টি আসনে, জনসংঘ ৫০টি আসনে, জাতীয় দল ১৭টি আসনে, হিন্দু মহাসভা ৮টি আসনে, স্বতন্ত্র দল ৪টি আসনে ও প্রাউটিস্টরা ৬০টি আসনে প্রার্থী দিয়ে আসন পেয়েছে শূন্য।

গত নির্বাচনের পর যুক্তফ্রন্টের ভেতর থেকে এবং যুক্তফ্রন্ট থেকে বার হয়ে এসে যাঁরা ফ্রন্টের ক্ষতি করেছিলেন তাঁদের প্রায় সকলকে জনগণ বিদায় দিয়েছেন। প্রফুল্ল ঘোষ, হরেন মজুমদার, গঙ্গাধর প্রামাণিক, আমির আলি মোল্লা, নিশীথ কুণ্ডু—এঁরা সকলেই জনগণের আদালতে খারিজ হয়েছেন। অবশ্য নলিনাক্ষ সান্যাল মহাশয় ত্রিমুখী লড়াইয়ে ৫০ ভোটে জিতে এসেছেন। আর উত্তরবঙ্গ থেকে জিতে এসেছেন যজ্ঞেশ্বর রায় ও জগদানন্দ রায়।

পঃ বঙ্গ বিধানসভায় ১৯৫২ সালের পর থেকে কমুনিস্টদের শক্তি ক্রমশই প্রসারিত হচ্ছে।

১৯৫২ : ২৪টি আসন; ১৯৫৭ : ৪৬টি আসন; ১৯৬২ : ৫০টি আসন; ১৯৬৭ : ৪৩ + ১৬টি আসন; ১৯৬৯ : ৮০ + ৩০ আসন কমুনিস্টরা দখল করেছে। কংগ্রেসের প্রথমদিকে আসন বৃদ্ধি পেতে থাকলেও ১৯৬২-র পর থেকে আসন কমতে শুরু করেছে। ১৯৫৭ : ১৫২টি আসন, ১৯৬২ : ১৫৭টি আসন; ১৯৬৭ : ১২৭টি আসন ও ১৯৬৯ : ৫৫টি আসন কংগ্রেস পেয়েছে।

সংহতি এবং ঐক্য নির্বাচনে ফ্রন্টকে যে কতখানি লাভবান করেছে ফলাফল দেখলেই তা বোঝা যায়।

দল	প্রার্থী	নির্বাচিত
বাম কম্যু	৯৭	৮০
বাং কং	৪৯	৩৩
ডান কম্যু	৩৬	৩০
ফঃ বঃ	২৮	২১
আর-এস-পি	১৭	১২
এস-এস-পি	১৩	৯
এস-এউ-সি	৭	৭
গোর্খালীগ	৪	৪

মাত্র ৫৫ জন সদস্য নিয়ে বিরোধী দল কংগ্রেস নিজেকে দুর্বল মনে করলেও এটা মনে রাখতে হবে যে কংগ্রেস প্রদত্ত মোট বৈধ ভোটের ৪০·৪ শতাংশ পেয়েছে। ফ্রন্ট ২১৮টি আসন পেলেও জনগণের আশা-আকাঙ্ক্ষার দিকে তাঁদের লক্ষ্য রাখতে হবে। কারণ তাঁরা ভোট পেয়েছেন ৫১·০৯ শতাংশ।

ফ্রন্টের নেতা নির্বাচন ও স্বরাষ্ট্রদপ্তর নিয়ে সাতদিন ধরে যে টানা-হ্যাঁচড়া চলল, তাতে ফ্রন্টের মধ্যে দু' বছর পূর্বের ইউ· এল· এফ ও পি· ইউ· এল· এফ-এর ছায়ামূর্তিদের আনাগোনা জনগণ লক্ষ্য করেছে। ফ্রন্টের প্রতি জনগণের মাত্রাতিরিক্ত প্রীতি থাকলেও কোন অন্ধ মোহ না থাকাই বাঞ্ছনীয়। পশ্চিমবঙ্গের মানুষের এ সত্যটুকু জেনে নেওয়া ভাল যে, ফ্রন্টের মধ্যে স্বার্থের সংঘাত আছে এবং বিরোধ ভবিষ্যতেও দেখা দিতে পারে। কিন্তু ফ্রন্টের ঐক্য ভাঙার চেষ্টা জনগণ বরদাস্ত করবে না। তারা স্থায়ী সরকার চায়। টানা-হ্যাঁচড়া লক্ষ্য করে ফ্রন্ট সমর্থকদের মধ্যে কিছুটা বিভ্রান্তি দেখা দিয়েছিল। কিন্তু সরকার পরিচালনার আগেই দর কষাকষি শেষ হওয়া ভাল, যা তিক্ত তার বহিঃপ্রকাশ কাম্য।

ফ্রন্ট সরকার এখন একজন জনদরদী মুখ্যমন্ত্রী ও একজন দক্ষ উপ-মুখ্যমন্ত্রীকে পেয়েছে। সমস্যাকণ্টকিত পঃ বঙ্গের মানুষ আগামী দিনে ফ্রন্ট সরকারের পদক্ষেপ সাগ্রহে লক্ষ্য করছে।

গ্রন্থমেলা

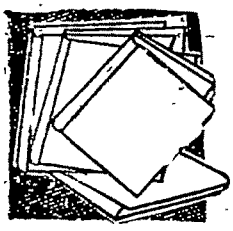

মরাগাঙে এল জোয়ার (ডিসেম্বর, ১৯৬৮) ঃ বারীণ ভাদুড়ী। ৪, মতিলাল রায় লেন, ভদ্রকালী, উত্তরপাড়া। দাম ঃ দুই টাকা।

বারীণ ভাদুড়ী তাঁর "মরা গাঙে এল জোয়ার" কাব্যে ৪০টি কবিতা উপহার দিয়েছেন। কবিতার আঙ্গিকের দিক দিয়ে তিনি প্রাচীনপন্থী। কবিতাগুলিতে দুরুচির ছাপ আছে। তোমায় খুঁজি আমার মনে', 'জীবনের অর্থ খুঁজি', 'জীবিত ও মৃত' ইত্যাদি কবিতাগুলি উল্লেখের দাবি রাখে। অন্ত্যমিল ও ছন্দে ত্রুটি দুর্লক্ষ্য নয়। কিঞ্চিদধিক ২০টি কবিতায় 'জীবন' বা 'জীবনের' শব্দটি প্রায় ৬২ বার ব্যবহৃত।

*

Report of the Calcutta School of Tropical Medicine and the Carmichael Hospital for Tropical Diseases—1966-1967 : পশ্চিমবঙ্গে চিকিৎসাশাস্ত্রের অধ্যয়ন এবং অধ্যাপনা সম্পর্কে একটি সুস্পষ্ট ধারণা এই সংস্থার ডিরেক্টর ডাঃ জে বি চ্যাটার্জির রিপোর্টটি পাঠ করে পাওয়া গেল। নদীয়া অঞ্চলে খারাপ চাল খেয়ে যে ব্যাধি দেখা দিয়েছিল সে সম্পর্কে গবেষণা, এছাড়া এই রাজ্যে কলেরা, টি-বি এবং নানাপ্রকার শরীর ক্ষয়কারী অসুখ সম্পর্কে যেসব তথ্য সংগ্রহ এঁরা করেছেন তাও এই রিপোর্টটিতে বিভিন্ন প্রবন্ধের মাধ্যমে বিস্তারিতভাবে বর্ণিত হয়েছে। স্নাতকোত্তর শিক্ষার অগ্রগতি, শিক্ষা এবং গবেষণামূলক কাজে এই সংস্থার পাঠাগারটির অবদান সম্পর্কেও তথ্যাদি পরিবেশন করা হয়েছে। সরকারী ও বে-সরকারী সূত্রে প্রাপ্ত অর্থ কিভাবে ব্যয় করা হয়েছে সেকথাও রিপোর্টটিতে বলা হয়েছে। বিভিন্ন বিভাগের অধ্যাপকদের রচিত প্রবন্ধাবলী প্রতিটি বিভাগের কার্যক্রম এবং অগ্রগতির সম্পর্কে আলোকপাত করেছে। পশ্চিমবঙ্গের চিকিৎসক এবং চিকিৎসাশাস্ত্রের ছাত্রেরা এটি পাঠ করে বহু প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহ করতে পারবেন।

"মানবমন" ঃ (অষ্টম বর্ষ, প্রথম সংখ্যা, জানুয়ারী, ১৯৬৯)। সম্পাদক—ধীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়। পাভলভ ইনস্টিটিউট। ১৩২।১এ বিধান সরণী, কলকাতা-৪। দাম ঃ একটাকা পঁচিশ পয়সা।

"মানরমন" মনোবিজ্ঞান, জীববিজ্ঞান, সমাজবিজ্ঞানের আধুনিক ধারা পরিচায়ক ত্রৈমাসিক পত্রিকা। বিজ্ঞান-চেতনা ও বিজ্ঞানমানসই আধুনিক সভ্যতার অগ্রগতিকে সুদৃঢ় ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত করতে পারে। "মানবমন" পত্রিকাটি সেই বিজ্ঞানমানস গঠনে ব্রতী।

ইদানীং সাইকোলজি, টোনবিজ্ঞান ইত্যাদির নামে এক ধরণের রাবিশ পত্র-পত্রিকাতে বাংলা দেশের বুক স্টলগুলি ছেয়ে গেছে—বিকৃত রুচির লেখক ও ব্যবসায়ী এবং প্রতিক্রিয়াশীল শক্তি রয়েছে এর পেছনে। সমস্ত দেশের সুস্থ বলিষ্ঠ মানসিকতার প্রতি এ এক অদ্ভুত অবজ্ঞা ও তাচ্ছিল্য—এক ধরণের চ্যালেঞ্জ।

'মানবমন'-এর মত পত্রিকা এই চ্যালেঞ্জের উত্তর দিতে পারবে বলে আশা করি। মননশীল এবং বুদ্ধিদীপ্ত ত্রৈমাসিকটির প্রতিটি রচনা পাঠকমনে চিন্তার উদ্রেক করবে, যুগ ও জীবনের পরিপ্রেক্ষিতে প্রগতির প্রেরণায় তাকে উদ্বুদ্ধ করবে।

আলোচ্য সংখ্যায় শিল্প-সাহিত্য-সংক্রান্ত যুগোপযোগী কয়েকটি প্রশ্নের উত্তর দিয়েছেন প্রখ্যাত সাহিত্যিক প্রেমেন্দ্র মিত্র এবং নারায়ণ চৌধুরী। প্রেমেন্দ্র মিত্র দ্ব্যর্থহীন ভাষায় বলেছেন, সুস্থ বলিষ্ঠ মানসিকতা গড়ে তোলার কাজ সৎ সাহিত্যিক ও বুদ্ধিজীবীর। নারায়ণ চৌধুরীও 'মাদকধর্মী', মৃত্যুরতিবাদ তত্ত্বে দীক্ষিত বিষণ্ণ সাহিত্যের ব্যাপক উৎপাদনের তীব্র বিরোধিতা করে সৃজনধর্মী রচনা ও সমালোচনা দুইকেই সৎসাহিত্যের আয়ুধে করে তোলার ওপর জোর দিয়েছেন। সম্মোহন প্রসঙ্গ—এই ধারাবাহিক প্রবন্ধে ধীরেন্দ্রলাল গঙ্গোপাধ্যায় ইয়ুং তত্ত্বের অন্তর্গত সমষ্টি-নির্জ্ঞান (Collective unconscious) ও আদিপ্রতিমা (Arche type) ব্যাখ্যা করেছেন। তরুণ চট্টোপাধ্যায় লিখেছেন সোভিয়েৎ শিল্পবিজ্ঞানী আন্তন সেমিয়নোভিচ মাকারেংকোর 'শিক্ষাদর্শ সমন্বিত প্রবন্ধ—'শিক্ষা সঙ্কট কেন এবং প্রতিকার কোথায়।' বিজ্ঞানের দৃষ্টিতে জন্মান্তরবাদ সম্বন্ধে সারগর্ভ মনোজ্ঞ আলোচনায় শ্রীকণাদ শর্মা দেখিয়েছেন যে, জন্মান্তরবাদকে বৈজ্ঞানিক একটি ভিত্তিভূমির ওপর দাঁড় করানোর চেষ্টা অভিসন্ধিপ্রসূত। জ্যোতির্ময় চট্টোপাধ্যায় নোবেল পুরস্কার বিজয়ী হরগোবিন্দ খোরানার গবেষণা বিষয়ে লিখেছেন।

পত্রিকাটি সম্বন্ধে এই বিশদ আলোচনার কারণ, এই ধরণের পত্রিকা পাঠে পাঠককে সচেতন ও অনুরাগী করে তোলা। প্রতিটি রচনাই স্পষ্টতই মননশীল, প্রগতিবাদী এবং অত্যন্ত বুদ্ধিদীপ্ত। আরও সরলভাবে বিষয়বস্তু পরিবেশিত হলে মনে হয় সাধারণ পাঠকের কাছে এই পত্রিকা অধিকতর চিত্তাকর্ষক হবে। এই ধরণের পত্রিকা বাংলা ভাষার একটি সম্পদ। এই রকম পত্রিকার প্রচার ও পত্রিকা সম্বন্ধে আগ্রহ বৃদ্ধি আমাদের দেশে আশানুরূপ হয় না। 'মানবমন' অষ্টম বর্ষে পদার্পণ করেছে। তার যাত্রাপথ নির্বিঘ্ন হোক আমরা এই চাই। আমরা 'মানবমন'-এর বহুল প্রচার কামনা করি।

ঈদ-এর 'সওগাত' (১৩৭৫) ঃ সম্পাদক ঃ মজহারুল ইসলাম। গ্রন্থলোক, কলেজ স্ট্রীট মার্কেট, কলকাতা-১২। দাম ঃ এক টাকা।

অন্যান্য বারের তুলনায় ক্ষীণ কলেবর হলেও 'ঈদ-এর সওগাত' তার নিজস্ব বৈশিষ্ট্যে সমুজ্জ্বল হয়েই আত্মপ্রকাশ করেছে। হিন্দু-মুসলমান সম্প্রীতির বার্তাবহ এই পত্রিকাটি বিদগ্ধজনের প্রশংসালাভ করবে। অন্নদাশঙ্কর রায় "আর কতকাল" প্রবন্ধে সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ ও হিংসার চিরতরে অবসান চেয়েছেন। 'আনোয়ারা' খ্যাত মুসলিম ঔপন্যাসিক "মোহাম্মদ নজিবর রহমান সাহিত্যরত্নের" সাহিত্য-কীর্তি সম্পর্কে দীর্ঘ বিতর্কমূলক আলোচনা করেছেন আজাহার উদ্দীন খান। এম আবদুর রহমান লিখেছেন, "দেশসেবিকা বেগম দৌলত উন্নিসা"র জীবন-কাহিনী। একটি চিন্তা উদ্রেককারী সময়োপযোগী রচনা মৈত্রেয়ী দেবীর "গণতন্ত্র ও সংরক্ষণশীলতা"। সাকসুদা রহমানের "নজরুলের দৃষ্টিতে নারী" প্রবন্ধটি অত্যন্ত মূল্যবান ও সুখপাঠ্য। এ ছাড়া যেসব প্রগতিবাদী কবি কতকগুলি সুন্দর কবিতা উপহার দিয়েছেন, তাঁদের মধ্যে আছেন—দুর্গাদাস সরকার, অমিয়কুমার হাটি, শৈলেন্দ্র বিশ্বাস, আবদুল মজিদ, এস এম এহিয়া, রণজিৎ সরকার, জিয়াদ আলি, আবদুল রব খান, কাজী আবু জাফর সিদ্দিকী প্রমুখ।

পথিক কথা কবে?

মনোজ বসু

[পূর্ব-প্রকাশিতের পর]

॥ আটত্রিশ ॥

শুনতে পাই, পৃথিবী এক হয়ে আসছে মানুষ বিশ্বনাগরিক। সে ভাবনা শিল্পীর সাহিত্যিকের বৈজ্ঞানিকের। ধড়িবাজ রাজনীতিকের নয়—খবরের-কাগজে নিত্য যাদের ছবি ওঠে, সভায় সভায় যাদের ডাক, ডাকটিকিটে যাদের মুণ্ড, নোটের উপর যাদের নাম-ছাপা। দু'-তরফে নিঃশব্দ লড়াই চলেছে যেন—ঐক্য এরা কত গড়তে পারে, ওরা কত ভাঙতে পারে। জিত আপাতত ও-পক্ষের। এক-ভিয়েৎনাম এক-কোরিয়া এক-জর্মনি কেটে কেটে দুখণ্ড করেছে। এবং আমাদের আঁতের ঘা যেখানে —এক-বাংলা কেটে দুই বাংলা। 'সোনার বাংলা তোমায় আমি ভালবাসি' স্থলে আইন মতে গাওয়া উচিত 'সোনার পশ্চিম-বাংলা তোমায় ভালবাসি'। আর ও'রা গাইবেন 'সোনার পূব-বাংলা—' উঁহুঁ, তা-ও বুঝি অচল—গাইতে হবে 'সোনার পূর্ব-পাকিস্তান—'

হিন্দু আর মুসলমান এক দেশের মানুষ, এক ভাষা তাদের মুখে, একই পরিবারে জন্ম কত কত জনার। তবু যেহেতু ধর্মটা আলাদা, তারা আলাদা দুই জাত। এরই নাম টু-নেশনস্ থিয়োরি, দ্বিজাতিতত্ত্ব। মুসলমানের আলাদা ভূমি চাই—বঙ্গভঙ্গ এই দাবির উপরে।

অবাস্তব জিনিস জবরদস্তিতে খাড়া করা হল। এক-বাংলা দুই বাংলা। র‍্যাড-ক্লিফ সাহেব সালিশী করলেন : মনে করো এই বরাবর পাঁচিল—

কোথায় সাহেব, কোন্‌খানটা?

যেমন যেমন দাগ কেটেছি ম্যাপের উপরে—

এটা আমার দলিচঘর, এটা আমার রসুইঘর—তারই মাঝ দিয়ে পাঁচিল চলে গেল?

হ্যাঁ, তাই।

বিচার অন্তে সাহেব স্বদেশে উড়লেন। সেকাল হলে এবং চীনের অধ্যবসায় থাকলে পাথুরে গাঁথনির মহাপ্রাচীর তোলা হত বোধহয় বেবাক তের-শ' মাইল জুড়ে। তাতেও কি ঠেকাত? চীনারা পারে নি কিন্তু। মোগলদের রুখবার জন্য মহাপ্রাচীর—তাদেরই বড়কর্তা কুবলাই খাঁ সদলবলে এসে চীনে দখল গাড়লেন। পাথরের পাঁচিলের অনুকল্পে পুলিশ আর ফৌজ দিয়ে এরা জ্যান্ত মানুষেরই পাঁচিল তুলে দিয়েছে—দেখুন দেখুন। বঙ্গবাসীকে ভাতে মেরে অন্ন দিয়েছে হাতে হাতে। ঘোড়ার ডিম করেছে, প্রয়োজনের পথ রুখতে পারে না কেউ। যাওয়া-আসা ঠিকই চলেছে—কখনো কচ্ছপের মতন গুটি-গুটি, কখনো কুরঙ্গের মতন ঊর্ধ্বশ্বাসে। লোকের হয়রানি ও অর্থব্যয়—মুনাফা এই মাত্র।

যাঁরা নাটের গুরু, এমনি তো তাঁরা বিচক্ষণ বুদ্ধিমান। কাজ হাসিল হতে না হাতেই আক্কেলগুড়ুম : কী সর্বনাশ করে বসলাম! গান্ধিজী তো সঙ্গে সঙ্গেই তোবা করলেন : আমি কিছু জানি নে। দেশ-খণ্ডনের সঙ্গে কেউ যেন কখনো গান্ধির নাম না জড়ায়। আমি আজ একেবারে একলা। জওহরলাল ও প্যাটেলের অবধি ধারণা, বুঝতে আমার বিলকুল ভুল হচ্ছে। এ-স্বাধীনতার ভবিষ্যৎ অন্ধকার, আজকে কেউ সেটা ধরতে পারছি নে। We may not feel the full effect immediately, but I can see clearly that the future of independence gained at this price is going to be dark.

দ্বিজাতি-তত্ত্বের মূল-গায়েন জিন্নাহ্-ও পরিষ্কার মালুম পেয়েছেন। খোলা-খুলি কোন্ লজ্জায় আর বলেন—জাঁদরেল ব্যারিস্টার-মানুষ কান ঘুরিয়ে নাক দেখালেন; মানেটা অবিশ্যি একই দাঁড়াল। পাকিস্তান কনস্টিটুয়েন্ট এ্যাসেমব্লির উদ্বোধনী বক্তৃতা—স্থান করাচি : অতীত ভুলে যাও। হিন্দু-মুসলমান ভেদাভেদ ভুলে এক হয়ে নবরাষ্ট্র গড়ে তোল। ধর্ম আচার-ব্যবহার যেমনই হোক, রাষ্ট্রের তা নিয়ে মাথাব্যথা নেই। You may belong to any religion or caste or creed, that has nothing to do with the business of the State.

একেবারে পদ্মার পানি! এত কাটাকুটি —মানুষ কাটা এবং দেশ কাটা—কিসের জন্য তবে শুনি?

জিন্নাহ্-র দুই পয়লা-নম্বুরি ছড়িদার —সারওয়ার্দি ও খলিকুজ্জমান। দিব্যজ্ঞান তাঁদেরও এসেছে, 'তাই তো' 'তাই তো' করছেন। খলিকুজ্জমানকে সারওয়ার্দি চিঠি দিলেন : দ্বিজাতি মেনে অন্যদের থেকে আলাদা হয়ে থাকব, আমি তার পক্ষপাতী নই। I am not in favour of adopting an aloofness dependent upon the Two-nation theory.

আর খলিকুজ্জমানও প্রায় এমনি কথাই কেতাবে লিখলেন : After the Partition it proved positively injurious to the Moslems of India and on a long view basis for Moslems everywhere.

ঠগ বাছতে গাঁ উজোড়। বড় পাণ্ডারাই সব ঘাবড়ে যাচ্ছেন। লাহোর অধিবেশনে পাকিস্তান প্রস্তাব এনেছিলেন ফজলুল হক। ভাগাভাগির পর সেই মানুষেরই মুখের উক্তি : ভারতের রাজনীতিক খণ্ডন আমি বিশ্বাস করি নে, ভারত-শত্রুদেরই এই কাজ। I do not believe in the political division of India, and it is the enemies of India who divided it.

গান্ধীজীর আরও কবুল জবাব : দেশ-বিভাগে বিশ্বাস নেই আমার। শিগগিরই হয়তো সীমান্ত-প্রদেশে যাবো, তার জন্যে পাশপোর্ট নেবো না।

নাথুরাম গডসে বাঁচতে দিলে যেতেনই হয়তো, খুব স্পষ্ট ভাষায় বলেছিলেন। আমার মৃতদেহের উপর দিয়ে দেশ ভাগ হবে, তা-ও অবশ্য বলেছিলেন এর আগে।

মল্লিকঘাট থেকে বেশ খানিকটা পথ হেঁটে গিয়ে বাসের লাইন। বাস থেকে নেমে আবার সাইকেল-রিক্সা। দুটো রিক্সা নিয়েছেন—এক রিক্সায় বীরেশ্বর ও আবুল হাসিম, অন্যখানায় মেয়ে দুটো। আবুল

হাসিমের নিজের জাত—তাঁদের রিক্সা আগে, তিনিই পথ দেখিয়ে নিয়ে যাচ্ছেন। গল্প আর গল্প—পথের দুধারে যা-কিছু দেখেন, তাই নিয়ে উচ্ছ্বসিত হয়ে গল্প জুড়ে দিন। কী সব দিন গিয়েছে! এই জগন্নাথপুরের মানুষজন ঘরবাড়ি তো বটেই, মাঠঘাট গরুবাছুর গাছগাছালি সব একেবারে মুখস্থ ছিল—গড়গড় করে এখনো বোধহয় নির্ভুল বলে যেতে পারেন।

গল্প করেন আবুল হাসিম, আর ফোঁস করে নিশ্বাস ফেলে নীরব হয়ে যান এক-একবার।

বাড়ি দেখা দিল। বাড়ি বিনিময়ের ব্যাপারে আবুল হাসিম যান নি, বিলি-ব্যবস্থা ভাইজানই সব করেছিলেন। হেমকান্তর দেওয়া বিজ্ঞাপন দেখিয়ে ভাই বলেছিলেন, বিনিময় করে কেলি তাঁর যদি পছন্দ হয়ে যায়। এপারে-ওপারে কখন কোথা হয়ে ওঠে—সর্বক্ষণ ভয়ে ভয়ে থেকে পারা যায় না। রাঁশতলি গ্রাম আমি জানি, ভাল জায়গা। কলকাতায় গিয়ে ভালরকম খবরাখবর নিইগে চলো—

আবুল হাসিম যান নি কলকাতায়। মুখফুটে বলেছিলেন, যা করতে হয় তুমি একলা করোগে। আমায় ওর মধ্যে টেনো না, আমি সইতে পারি নে। যেদিন বলবে, তোমাদের পিছন পিছন বেরিয়ে পড়ব। আর কিছু পারব না।

বড় ভাই একাই চললেন কলকাতা কৃপাসিন্ধু লেনে। কথাবার্তা হল। হেম-কান্ত ইতিমধ্যে পঙ্গু হয়ে পড়েছেন, তক্তাপোশ ছেড়ে নামতে পারেন না। প্রণব এল্লে জগন্নাথপুরের বাড়ি দেখতে, সঙ্গে এক প্রবীণ ব্যক্তি দুর্গাশঙ্কর দে। ওকালতি পাশ করেছিলেন, কিন্তু একদিনও প্রাক্-টিশ করেন নি—বিপ্লব-কর্মে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন। তাঁর দুঃখে এখন শিয়াল-কুকুর কাঁদে। বুড়োহাবড়া একদল নিয়ে হেমকান্ত বাড়িতে পিঁজরাপোল বানিয়ে তুলেছিলেন, ইনিও একটি তাঁদের মধ্যে। ন্যাস্টির উঠে গেছে—সরাই বিদায় হয়েছেন। নিরুপায় দুর্গাশঙ্করই কেবল আছেন চেপে। যেহেতু কোন এককালে আইন পাশ করেছিলেন, সেই সুবাদে দুর্গাশঙ্কর প্রণবের সঙ্গে সরেজমিনে চললেন।

কথাবার্তা পাকা হল। প্রণবকে বাড়ির কথল দিয়ে সবসুদ্ধ বিদায় হয়ে যাচ্ছেন। দরজার সামনে এই আজকের মতোই সাইকেল-রিক্সা এসে দাঁড়িয়েছিল। হাসিমের বউ সেই সময় এক কাণ্ড করে বসলেন। ছোট ছেলেটা মারা গেলে পিছনের চাঁপা-তলায় মাটি দিয়েছিল—সেই কবরের উপর আছড়ে পড়লেন তিনি। আর কুক ছেড়ে কান্না। ছেলে যেন একুণি মারা গেল, বিদায়ের এই সকাল বেলাতেই। কান্না সংক্রামক হল, অন্য যাঁরা আছেন সবাই কান্না জুড়ে দিলেন। বাড়ি ছাড়ার বেদনা, তার সঙ্গে পুরনোকে মিলে একাকার। বড়দের দেখে শিশুরাও হাউ-হাউ করে কাঁদছে। কান্নার তুফান বয়ে যায়। কাঁদতে কাঁদতে সকলে রাস্তায় নেমে পড়লেন।

কতদিন পরে আজ আবার বাড়ি এসেছেন। অন্যের বাড়ি এখন—আবুল হাসিম, ভাগনি তারাফুলি আগন্তুক, অতিথি। রিক্সা কিঁড়িং-কিঁড়িং করে ঘণ্টা দিচ্ছে। ডাকে, কে আছেন?

ভিতর থেকে বুক্ষকণ্ঠ এলো: যারা থাকবার, সবাই আছে। রাস্তায় দাঁড়িয়ে হুজ্জোড় কেন? দরজা ভেজানো, ঘরে এসো।

দরজা ঠেলে সকলে ভিতরে গেলেন। হেমকান্ত তক্তাপোশে আড় হয়ে আছেন যথারীতি। বীভৎস বিকৃত মুখ—একটা চোখ কানা, আর একটা চোখ কপালের থেকে বেরিয়ে এসেছে। দেখে শিরশির করে ওঠে সর্বদেহ।

হাসিমুখে হেমকান্ত বাঁহারেশ্বরের দিকে তাকিয়ে বললেন, চিনতে পারছেন না তো? কষ্ট পাবে না। আয়নায় দেখতে গিয়ে আমার নিজেরই বাঁধা লেগে যায়। আপনি কিন্তু দিব্যি আছেন। চেহারা খুব একটা বদলায় নি।

বাঁহারেশ্বর বললেন, দুর্ঘটনা হয়েছিল সে খবর জানি। কিন্তু এতখানি ভাঙতে পারি নি। বউমাকে নিয়ে যশোরের রাস্তায় গিয়েছিলে—অনেক দিন হলেও চেহারা চালচলন কথাবার্তা কিছুই ভুলতে পারি নি। যেন আগুন এক চাঙড়া।

আগুন নিভে গিয়ে এখন বিলকুল ছাই উড়ছে—

কী বিষম কৌতুকের ব্যাপার—বলা বলা করে হেমকান্ত হেসে উঠলেন: মুখপোড়া রাইরে থেকে দেখছেন, মনেরও ঠিক এই দশা। আগুনে চারিদিক পোড়াব ভেবে-ছিলাম—কারো কিছু হল না, নিজেই পুড়ে গিয়ে ছাই। চারদিকে যত আগুনের ছুটিয়েছিলাম, তারাও। আহা, আপনারা সব দাঁড়িয়ে রইলেন—দুটো চেয়ার আছে। মেয়েরা তক্তাপোশে এসে বোসো—

প্রণবকে ডাকছেন: এঘরে আয়, দেখ্‌গে এসে কারা সব এসেছেন।

ফুল্লরা ও তারাফুলি পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করল। আবুল হাসিম মুক্তকর কপালে তুললেন।

হেমকান্ত বললেন, আপনাকে চিনলাম না কিন্তু—পরিচয় দিন। লীলার চিঠি পেয়েছি, মেয়েদের একজন তো ভাগনি আমার। কোন্‌টি?

তারাফুলি তাড়াতাড়ি বলল, দু-জনেই। নাম বলা হবে না, বাদ দিয়ে দেবেন তখন একজনকে।

সহাস্যে হেমকান্ত বললেন, বোলো না তবে নাম। কী দরকার! একটি ভাগনি আসছে, খবর পেয়েছিলাম চিঠিতে। এক-জোড়া যদি পেয়ে যাই, লাভই তো আমার।

সেই ঘরে ঢুকে প্রণব পর্যন্ত অবাক। দরজা-জানলা সবগুলো খোলা, কত আলো এসেছে। বাবার মুখে হাসি। নিত্য-দিনের গুমোট ভাব ধুয়ে-মুছে সাফসাফাই হয়ে গেছে। হাসিখুশি সকলেই। ঘরময় মধুর প্রসন্নতা।

তারাফুলিকে নিয়ে ফুল্লরা উঠে দাঁড়াল: ঘট হয়ে বসে থাকব কেন? ভিতরে যাচ্ছি ছোটমামা।

প্রণবকে হেমকান্ত বললেন, তোর বোন এরা। মা'র কাছে নিয়ে যা।

তারাফুলি বলে, নিয়ে যেতে হবে কেন? যাচ্ছিই তো আমরা মামানির কাছে।

আবুল হাসিমকে প্রণব চেনে। বিনি-ময়ের সময় এই বাড়িতেই দেখেছিল। পুরুষমানুষ হয়েও মেয়েদের মতন চোখের জল মুছতে মুছতে রিক্সায় উঠেছিলেন। সামলে নিয়েছেন, হাসি-ভরা মুখ এখন। দেখে ভাল লাগল। বলে, বাঁশতলি থেকেই আসছেন? বাবা, হাসিম সাহেব ইনি—আমাদের দেখতে এসেছেন।

হেমকান্ত বললেন, আমাদের দেখবেন—নিজের ঘরবাড়ি ফেলে গেছেন, তা-ও দেখবেন। আলবত দেখবেন—সেই দেখার জন্যেই তো আসা। মন টেনেছে, পাগল হয়ে ছুটেছেন। যুক্তিতর্ক বাধাবিপদ এই পাগলামির মুখে কুটোর মতন ভেসে যায়। ভুক্তভোগী যে আমি, নিজেকে দিয়ে বুঝতে পারি। পাগল আমিও। অথচ ক'দিনই বা কেটেছে আমার বাঁশতলির বাড়িতে।

বাঁশতলির নামে উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠলেন: আপনি বাঁশতলি থেকে আসছেন—খবর শুনব আপনার মুখে। জষ্টি-মাসের আম-কাঁঠালের খবর, পৌষমাসের রস-গুড়ের খবর। ফাল্গুনে ফকিরবাড়ির মেলা আর চৈত্রে গাজনতলার মেলার খবর। মড়তে-চড়তে পারি নে, ও-তল্লাটের মানুষ দেখি নি কতদিন। ভাগ্য আজ বড় সুপ্রসন্ন—একসঙ্গে একেবারে চারজন পেলাম। জিজ্ঞাসা এই গলা অবধি জমে রয়েছে।

হঠাৎ সজাগ হয়ে উঠে নিজেকে সামলে নিলেন। প্রণবকে বললেন, আরোল-তারোল এক নাগাড় বকে যাচ্ছি দেখ্। নিয়ে যা এঁদের, হাত-পা ধুয়ে বিশ্রাম নিন গে। কথাবার্তা পরে।

পোঁটলা ও গুড়ের নাগরি দেখিয়ে হাসিম প্রণবকে বললেন, এই দুটো বাড়ির মধ্যে নিয়ে যাও।

হেমকান্তকে বললেন, আপনারই গাছের গুড়—যার কথা বললেন। আপনারই

ঐ সুন্দর
কেশ বিন্যাস
অতি দীর্ঘকাল
সুন্দর থাকবে
না - - -

শেলাক ব্যতীত

চুল আটকাবার প্রসাধন সামগ্রীতে, এরোসলবক্সে ও এরোসলহীন কেশ সিঞ্চনে উভয়তই শেলাকই প্রাথমিক আঠা।

শেলাকসমূহ ফ্লেক্সোগ্রাফিক কালি, পেষাই কল, পিল, কনফেকশনারী, জলীয় বাষ্প সেট করা কালি, প্রসাধন, বৈদ্যুতিক ইন-সুলেটর, কোল্ড টপ এনামেল ইত্যাদিতে বিভিন্ন প্রান্তিক ব্যবহার সামগ্রী পছন্দমত প্রস্তুত হয় পৃথিবীর বৃহত্তম শেলাক প্রস্তুতকারক, এঞ্জেলো ব্রাদার্স কর্তৃক। উহারা নিখুঁতভাবে স্পেসিফিকেশন অনুযায়ী প্রস্তুত হয়। সমুদয় এঞ্জেলো গ্রেডই আই-এস-আই স্ট্যান্ডার্ড ও এতদ্ব্যতীত কঠোরতর এঞ্জেলো স্পেসিফিকেশন মত। সবচেয়ে বড় কথা এই যে, এঞ্জেলো ব্রাদার্স গুণের সমতা রক্ষা করেন।

Angelo Shellacs

এঞ্জেলো ব্রাদার্স লিমিটেড, কাশীপুর, কলিকাতা-২

ক্ষেতের চাল। পিঠে খাবেন বলে মেয়েরা পাঠিয়েছেন।

মা-লক্ষ্মীরা পাঠিয়েছেন? এই দিকে প্রণব, আমার কাছে নিয়ে আয়। আমার বাড়ির জিনিস—

প্রণব শিয়রের কাছে নিয়ে এলো, হেমকান্ত গড়িয়ে এসে পুঁটলিতে মাথা রাখলেন। সে মাথা তোলেনই না আর। ক্ষণপরে দেখা গেল, দু-চোখে ধারা গড়াচ্ছে।

সন্ধ্যা। নিষ্প্রাণ বাড়িতে উৎসব জমেছে অনেক—অনেকদিন পরে ও-পারের চারটি মানুষ এসে পড়ে। উৎসবের মধ্যে ফুড়ুত করে দিনটা কেটে গেল। সন্ধ্যা-বেলা হেমকান্তর ঘরে আবার।

আবুল হাসিমের দিকে চেয়ে হেমকান্ত বলেন, বাড়ি-ঘরদোর ঘুরে দেখলেন? ঠিক আছে? চাঁপাতলায় গিয়েছিলেন তো?

শিশুর কবর চাঁপাতলায়। বাঁশ চিরে জাফরি করে ঘিরে দিয়েছেন এঁরা। স্বর্ণ-চাঁপা ফুল ফুটেছে ডালে ডালে। সুগন্ধে বাতাস মাতোয়ারা। ঠাণ্ডা ছায়া। এমন পরিচ্ছন্ন—একটা শুকনো পাতা কোথাও পড়ে নেই।

তারাফুলি বলল, মামানিকে ফাঁকি দিয়ে চলে এসেছেন—মামা তাই আচকাচ করছিলেন: ভুল করেছি—কেন আনলাম না রে! ঘরবাড়ি শুধু নয়, গোরস্থানেরই বা কী যত্ন! মামানি বড় শান্তি পেত।

হাসিম সাহেব তাড়াতাড়ি জুড়ে দেন: এত যত্ন আমরা করতে পারতাম না।

বাইরের বারান্দার একটা দিক দরমায় ঘেরা। দুর্গাশঙ্করের আস্তানা সেখানে। কাল থেকে তিনি অনুপস্থিত—কোন্ গাঁয়ে একটা বিয়ে হল, সেইখানে কাটিয়ে এলেন। এই তাঁর পেশা—এখানে-ওখানে খেয়ে বেড়ানো। নিমন্ত্রণ লাগে না, খবর শুঁকে শুঁকে গিয়ে হাজির হন। কোথাও সেদিন জুত হল না, অগতির গতি রান্নাঘর আছে এ বাড়ির। ঢপ করে পিঁড়ি একটা পেতে নিয়ে বসে পড়েন।

খানিক আগে দুর্গাশঙ্কর ফিরেছেন। প্রণব তাঁকে নিয়ে ঢুকল। হেমকান্ত পরিচয় দিয়ে দিলেন: দুর্গা-দা—আমার দাদার জুড়িদার। অ্যাকসনের সময় দু-জনে একত্র ছিলেন। এসে অবধি আমার এই ভাগনি দুটো ছটফট করছে তোমায় চোখে দেখার জন্য।

তরুণী মেয়ে দুটির দৃষ্টি দেখে বৃদ্ধ বিপ্লবী বুঝি লজ্জা পেয়ে যান। নস্যাৎ করে দিলেন একেবারে; জুড়িদার না হাতি। তা হলে তো কুলিয়ে দিত। সুখের প্রাণ নিয়ে ভোজ খেয়ে খেয়ে বেড়াতে হত না এরকম।

তবে কি?

আবদারের ভঙ্গিতে তারাফুলি বলল, উড়িয়ে দিলে ছাড়ছি নে। বলুন।

তল্পি বয়ে বেড়িয়েছি একটু-আধটু। নবকান্তও বয়েছে গোড়ায় গোড়ায়। দুজনে একই দাদার তাঁবে ছিলাম। সে দাদা ক্ষেপে হলেন তো নবকান্তই তখন দলের দাদা। আগে একজনের হুকুম তামিল করেছি—নবকান্ত দাদা হয়ে গিয়ে সে-ও হুকুম ঝাড়তে লাগল। আমার পোড়া-কপালে প্রোমোশান নেই।

দিলেও কি নেন আপনি প্রোমোশন? দেওয়া হয় নি?

কৌতুক কণ্ঠে হেমকান্ত বলেন, বলুন বলুন, শেষটুকুই বা চেপে যাচ্ছেন কেন? কর্তা হতে আমিই তো সাধাসাধি করে-ছিলাম। গ্রিলের কারখানার নামে যখন ছোটখাট এক আর্সেনাল গড়ে তুলছি। কিন্তু ঝামেলা এড়িয়ে কর্মী হয়ে খাটতেই তো আপনি মজা পান।

এতক্ষণ ধরে নিজের প্রসঙ্গ—দুর্গা-শঙ্কর আর সহ্য করতে পারেন না। সেকালের দাদাদের কাছে মন্ত্রগুপ্তির শিক্ষা। হেলাফেলায় আত্মদান করেছে—ছেলেটি কে, কোন দিন তার হদিস হল না। ক্ষুদিরাম-প্রফুল্ল চাকি এক সঙ্গে জীবন নিতে গেছেন, একই ধর্মশালায় পাশাপাশি শয্যা—কেউ কারো আসল নাম জানেন না। বলবার এক্তিয়ার নেই।

বিব্রত হয়ে দুর্গাশঙ্কর চাপা দিতে চান: যাকগে যাকগে, চুকেবুকে খতম হয়ে গেছে একেবারে—হেমকান্তর আর্সেনাল হেমকান্তই পোড়াল শুধু। পুরনো-কাসুন্দি এখন আর ঘেঁটে লাভটা কি?

লোকসানই বরঞ্চ। স্বাধীন দেশের ভিতরে এমনি সব কারসাজি—টের পেলে তোমার পেন্সন কেটে দেবে। সরকারের টাকা রমারম খরচ করতে হবে না এমনি।

একচক্ষু সকলের দিকে ঘুরিয়ে নিয়ে হেমকান্ত বললেন, দুর্গা-দা'র নামে কাগজে কবিতা বেরিয়েছে। পড়ে এঁদের শুনিয়ে দে প্রণব।

ইতিপূর্বেও প্রণবকে পড়তে হয়েছে। সেদিন বাইরের কেউ নয়—দুর্গাশঙ্কর আর কল্যাণী শ্রোতা। তাকের উপর থেকে ছাপা পত্রিকাটা নামিয়ে নিয়ে প্রণব কবিতা পড়ছে:

পেন্সনভোগী বিপ্লবী হাঁটে শিয়ালদহের মোড়েতে
মাসোহারা বিশ টাকা
অষ্টহাত ধুতি, ময়লা ফতুয়া, পায়ে
তার ছেঁড়া চটি।
হাঁটুর নিম্নে আজো গোল কালো ছ'টি
গুলীর চিহ্ন আঁকা।
হাঁটতে হাঁটতে কখনো কাশছে —
শ্বাস সে নিচ্ছে জোরে,
হাঁটছে হাঁটছে আশিটা বছর
বের হয়ে সেই নিষিদ্ধ নীল ভোরে!

সকল দৃষ্টি দুর্গাশঙ্করের দিকে তাকিয়ে পড়েছে। লজ্জায় এতটুকু তিনি। সকৌতুকে চেয়ে দেখে হেমকান্ত বললেন, সে কবি দুর্গা-দাকে ঠিক চেনে না—দু-চারটে ভুল করে বসেছে। বয়সটা কত হল দুর্গা-দা? জন্মদিনের মচ্ছব হবে না বলে বয়সের কেউ হিসাব রাখে না। তবে আশির বিস্তর নিচে, সেটা জানি। গুলীর দাগও ছ'টা মাত্র নয়—সর্বাঙ্গ চালুনির মতন ঝাঁঝরা করে দিয়েছে, উনি বলেই চলে ফিরে বেড়ান। চলাফেরাও শিয়ালদহের মোড়ে নয়—এ-গ্রামে সে-গ্রামে ভোজ খেয়ে খেয়ে বেড়ান—আর নয়তো এই গরিবখানার নুন-ভাত।

একটু হেসে আবার বললেন, বিশ টাকা পেন্সন—সে-ও মিথ্যে কথা। মহানুভব আমাদের স্বদেশী সরকার! বিশ টাকার অনেক বেশি—পঁচিশ।

দুর্গাশঙ্কর কখন ইতিমধ্যে চুপিসারে সরেছেন। হা-হা-হা—উচ্চহাসি হেসে হেমকান্ত বললেন, এই জিনিসটা দুর্গা-দা'র বড় রপ্ত। পালানোয় ওঁর জুড়ি নেই। দাদার অ্যাকসনের পর—পুলিশ গিজগিজ করছে—দাদা তারই মধ্যে কখন চোখ টিপে দিয়েছে, উনি সঙ্গে সঙ্গে হাওয়া। কেউ টেরই পেলো না, সাংঘাতিক মানুষ একটা সাংঘাতিক মাল কোমরে নিয়ে পালিয়ে গেল।

ফুলরা আবদার ধরে: মামার কথা শুনব। বলো আমায় ছোটমামা।

আমি কী জানি, কী তোকে বলব। উনি দাদা আমি ছোটভাই—এই সব তুচ্ছ সাংসারিক সম্পর্ক ওঁদের কাছে নেই। বয়সেও অনেক ছোট তখন। দুর্গা-দাকে ধরিস বরং নিরিবিলি, ছিটেফোঁটা উনি যদি বলেন। ঢের ঢের পুরনো হয়ে গেছে, দিনকাল ভিন্ন। বলতেও পারেন।

(আগামী সংখ্যায় সমাপ্য)

বিনামূল্যে টেরিলিন প্যান্ট পীস
মাসিক ১০৲ কিস্তিতে
প্রাপ্তব্য অল ওয়ার্ল্ড
ন্যাশনাল প্যানাসোনিক
জাপান মডেল পোর্টেবল ট্রানজিস্টরের
সহিত। ডাকযোগে যে-কোন স্থানে
পাবেন।
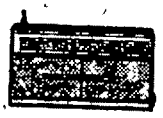
Coopex India (B.W.C.—33)
P. Box 1616, Delhi.

আমার ইউরোপ ভ্রমণ

ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায়

[পরিমল গোস্বামী কর্তৃক ১৮৮৯ সনে প্রকাশিত *A Visit to Europe* থেকে অনুবাদ]

॥ প্রথম অধ্যায় ॥

১৮৮৬ সনের ১২ই মার্চ তারিখে 'নেপাল' নামক জাহাজখানা বম্বে হইতে ইংল্যান্ড অভিমুখে যাত্রা করিল। সে দিনের সেই বসন্ত সন্ধ্যায় 'নেপাল' বেশ একটা গর্বিত ভঙ্গিতে ভারত সমুদ্র পাড়ি দিয়া এডেন বন্দরের দিকে চলিতেছিল, এবং সেদিন জাহাজখানা যতগুলি হিন্দুর মিলিত হৃৎস্পন্দন অনুভব করিয়াছিল এমন আর কখনও কোনও ডাকবাহী জাহাজ করে নাই। তাহার গর্ব অহেতুক ছিল না। কারণ, পৃথিবীর ইতিহাসে এক বৃহৎ পরিণাম সার্থক করিয়া তুলিতে ইংল্যান্ডের উপর যে দায়িত্ব ন্যস্ত ছিল, তাহা সে পালন করিয়াছে এই বাষ্পপোতের সাহায্যেই। সে তাহার সুবৃহৎ ভারত সাম্রাজ্যের উপর তাহার নৈতিক প্রভাব বিস্তার করিয়া বহু ভারত সন্তানকে জাতিভেদের বাধা ভাঙিয়া সংস্কার ও আচার সমূহের ঊর্ধ্বে উঠিতে সাহায্য করিয়াছে। এবং তাহাদিগকে বর্তমান সভ্যতার একেবারে উৎসমুখে আনিয়া নূতন শিক্ষা ও জ্ঞানালোক গ্রহণ করিতে উৎসাহী করিয়া তুলিয়াছে। জাহাজে কত জাতীয় মানুষ! স্ত্রী, ভগিনী ও শিশুসন্তানসহ এক দীর্ঘদেহ লাহোরের পঞ্জাবী, দিল্লীর দুইজন হিন্দু বণিক, উত্তর-পশ্চিম প্রদেশের এক লালা, আলিগড়ের জনৈক মুসলমান, দুইজন বাঙালী ব্রাহ্মণ, ওড়িসার এক কায়েথ, গোয়াবাসী দুইজন খ্রীস্টান—সবাই চলিয়াছেন ভারত ভাগ্য নিয়ন্তার দেশে, যদিও প্রত্যেকের লক্ষ্য পৃথক। ভারতের অনেকগুলি জাতিরই প্রতিনিধি সেদিন নেপালের ডেকে আসিয়া সমবেত হইয়াছিলেন। তাঁহারা সবাই দেখিতে লাগিলেন—ভারত সমুদ্রের জলরাশি কেমন করিয়া ধীরে ধীরে তাহার সবুজাভ বর্ণ হারাইয়া নীলে রূপান্তরিত হইতেছে. ক্রমে তাহাদের জন্মভূমি দৃশ্যের অন্তরালে চলিয়া যাইতেছে, মহালক্ষ্মী পাহাড়ে আছাড়-খাওয়া ঢেউগুলির শব্দ ক্রমে ক্ষীণ হইয়া আসিতেছে। সূর্য তাহার দিনের কর্তব্য শেষে বিদায় লইবার জন্য প্রস্তুত হইতেছিল। ক্রমে সে তাহার অধঃস্থিত জগতে চোখধাঁধানো আলোকপাত বন্ধ করিয়া দিল, তাহার বৃত্ত-দেহটি ক্রমে বড় হইতে লাগিল, ক্রমে তাহার তেজ মন্দ হইয়া আসিল এবং অবশেষে রক্তরাঙা আভরণ পরিয়া পশ্চিম আকাশ, গাঢ় রক্তিমার অপরূপ মহিমায় রঞ্জিত করিয়া দূর দিগন্তের নীল তরঙ্গে ডুবিয়া গেল। তার পর সন্ধ্যার ছায়া নামিয়া আসিল, পৃথিবীকে আচ্ছন্ন করিল, ক্রমে বিস্তীর্ণ সমুদ্রবক্ষে ঢেউয়ের দোলায় জাহাজের দোলনের সঙ্গে নক্ষত্ররাজির প্রতিবিম্ব দুলিতে লাগিল। তীরভূমি এক্ষণে অস্পষ্ট হইয়া আসিয়াছে কোলাবা আলোক-স্তম্ভের ঘূর্ণমান শীর্ষ হইতে আলোর ঝলকানি দেখা যাইতেছে, তাহার সাহায্যে দূরের নাবিকরা অ্যাপোলো-বন্দরের পথ চিনিয়া লইতেছে। আমরা সবাই এখন একসঙ্গে ডেকের উপর সমবেত হইয়া, আমাদের সম্মুখে এখন যে দৃশ্য উদ্ঘাটিত হইতেছে, তাহার দিকে চাহিয়া বিস্ময়ে স্তম্ভিতবৎ দাঁড়াইয়া আছি। অন্ধকার যত গাঢ় হইতেছে, ততই অনুপ্রভা বিশিষ্ট (ফস্‌ফোরিক) তরঙ্গের শাদা ফেনা ভিন্ন আর কিছুই দেখিতে পাইতেছি না। এই আলো ঝলমল তরঙ্গসমূহ আমাদের জাহাজের গায়ে অবিরাম আঘাত হানিতেছে। আমরা দেখিতেছি আর মৃদুস্বরে নানা বিষয়ে আলাপ করিতেছি। আলাপের বিষয়, কে কত দূরে যাইব, সমুদ্রযাত্রার বিপদ কি কি, সামুদ্রিক-পীড়ার দুঃখ, ইত্যাদি যখন যাহা আমাদের অনভিজ্ঞ মনে আসিতেছে, তাহা। ভারতীয় মহিলাগণ তাঁহাদের স্বভাবসিদ্ধ লাজুকতা ও শিশুসুলভ স্বভাব লইয়া এক কোণে জড়োসড়ো হইয়া দাঁড়াইয়া আছেন, তাঁহারা আমাদের চারিদিকের সীমাহীন সমুদ্র বিস্তারের দৃশ্যে কিছু ভীত হইয়া পড়িয়াছেন, এবং ইতিমধ্যেই মাথার মধ্যে কেমন যেন একটা দোলন অনুভব করিতেছেন।

ভারতীয়দের পরস্পর পরিচিত হইতে বিলম্ব হয় না। আমাদের সামাজিক অভ্যাস এমন যে আমরা পরস্পরের সাহায্য ভিন্ন চলিতে পারি না। আমরা আমাদের সুখ-দুঃখ আমাদের প্রতিবেশী আত্মীয় বন্ধুদের সঙ্গে ভাগ করিয়া লই। অপরিচিতের নাম, জাতি, কি করা হয়, কোথায় নিবাস, কোথায় যাইবেন, উপলক্ষ কি, ইত্যাদি জিজ্ঞাসা করা আমাদের বিবেচনায় অশিষ্টতা নহে। এক ভারতীয় অন্য ভারতীয়কে, দেখা হইতেই, "এই যে ভাই, কোথায় যাওয়া হচ্ছে?" এই প্রশ্নটাই প্রথমে করে—উভয়ে একই দিকের পথিক হইলে। আবার এই ঘনিষ্ঠতার সুযোগে ঠগেরাও তাহাদের দুষ্কার্য চালাইবার সুবিধা পায়, এবং এইভাবেই চোরেরাও সরলমতি লোকদিগকে ঔষধ প্রয়োগে অজ্ঞান করিয়া থাকে।

যাহা হউক জাহাজের বুকে, আধ ঘণ্টা সময়ের মধ্যে আমরা অল্পসংখ্যক ভারতীয় পরস্পর সেই অপরিচিত স্থানে, অপরিচিত মানুষদের মধ্যে যতটা সম্ভব পরিচিত হইলাম।

যাত্রীবাহী জাহাজের চরিত্র আমাদের অনেক যাত্রীরই জানা ছিল না। ইহাকে নানা বিলাস সামগ্রী ও ভোগ্য সম্পলিত একখানি প্রকাণ্ড ধনীগৃহের সঙ্গে তুলনা করা যাইতে পারে। প্রথমে ডেকের কথা ধরা যাউক। ডেক সুন্দরভাবে সংবিষ্ট কাঠের তক্তার পাটাতন, এবং তাহা দীর্ঘ রবারের নলের সাহায্যে প্রবল জলের ধারায় ধুইয়া পরিষ্কার করিবার পূর্বে প্রতিদিন সকালে বালি ও নারিকেলের ছোবড়ার সাহায্যে ঘষিয়া দেওয়া হয়। মাঝখানে কাটা দুই ভাগে ভাগকরা নারিকেলের মালাসমেত ছোবড়া ব্যবহার করা হয় এই কাজে। যাত্রীরা এখানে দুই পাশের দীর্ঘ খোলা পথে যাতায়াত করিয়া ভ্রমণ ব্যায়াম করিবার সুযোগ পাইয়া থাকে। অথবা ইচ্ছা হইলে ক্যানভাসে

আবৃত স্থানে বাসয়া দাবা অথবা ঐ জাতীয় কোনো বৈঠকি খেলা খেলা যাইতে পারে। সব আয়োজনই সেখানে উপস্থিত। কোনও কোনও জাহাজে ধূমপানের জন্য পৃথকভাবে সজ্জিত কক্ষ আছে। যখন সমুদ্রের দৃশ্য, উড়ন্ত মাছ ও অন্যান্য দর্শনীয়তে আর ততটা আকর্ষণ থাকে না, প্রথম দর্শনের উল্লাস কাটিয়া যায়, তখন দীর্ঘ সময়ের একটানা একঘেয়েমির ক্লান্তি দূর করার উদ্দেশ্যে অনেকে এই কক্ষে আসিয়া ক্লান্তি দূর করিয়া থাকে। আবহাওয়া অনুকূল থাকিলে মাঝে মাঝে ডেকের উপর পিয়ানো টানিয়া আনিয়া কোনো মহিলা বাজনার সাহায্যে যাত্রীদের মনোরঞ্জন করিয়া থাকেন। নিচে দুটি দীর্ঘ সারিতে জাহাজের দুই পাশে ক্যাবিন, প্রত্যেক ক্যাবিনে দুই তিন অথবা বেশি সংখ্যক যাত্রী বা ঘুমাইবার স্থান আছে। তবে অধিকাংশ যাত্রীই সমস্তটা দিন ডেকে কাটায়, অনেকে আবার রাত্রিও কাটায়, অবশ্য যদি ঠাণ্ডা না থাকে। অনেক জাহাজে ডাইনিং স্যালুন দুই সারি ক্যাবিনের মাঝামাঝি স্থানে অবস্থিত, আবার কোথাও একটা নির্দিষ্ট দূরত্ব পর্যন্ত চওড়া দিকের সবটাই ডাইনিং স্যালুনরূপে ব্যবহৃত হয়। এখানে খাওয়া শেষ হইলে স্থানটি বসিবার জন্য অথবা লেখাপড়া করিবার জন্য ব্যবহৃত হয়, বিশেষ করিয়া উপরের ডেক যদি প্রতিকূল আবহাওয়া অথবা গুমোট গরমে থাকিবার অযোগ্য হইয়া উঠে, তখন।

লোহিত সমুদ্রে অনেকের সর্দি-গর্মি হয়, কিন্তু তার কারণ অতিভোজন, এমন অনুমান করা হইয়াছে। সকালের চায়ের সময় ৬টা হইতে ৭টার মধ্যে। প্রাতরাশ ৮টা হইতে ৯টার মধ্যে। লাঞ্চ ১টা হইতে ২টার মধ্যে। অপরাহ্নের চা ৩টা হইতে ৪টার মধ্যে। ডিনার ৬টা হইতে ৭টার মধ্যে। ইহাই দৈনিক আহারের সময় তালিকা। সকাল ও বিকালের চা ব্যতীত অন্য সময়ের আহার বেশ পুষ্টিকর ও সারবান, এবং পদেও বহুবিধ। অবশ্য অধিকাংশ ডিশেরই প্রধান উপকরণ মাংস। রুটি, ভাত, আলু ও শাকসব্জীরও প্রচুর পরিবেশন। সুতরাং নিরামিষভোজীর অসুবিধা নাই কিছু। ইচ্ছা হইলে হিন্দু জাত বাঁচাইয়া চলিতে পারে পৃথক রান্না করিয়া। উনুন এবং পাত্রের ব্যবস্থাও অবশ্যই জাহাজের কর্মীরা করিয়া দিবে। এই জাতীয় যাত্রী-জাহাজে ছোটখাটো একটি লাইব্রেরি থাকে, সামান্য কিছু খরচ করিয়া বই পড়ার সুযোগ পাওয়া যায়। কোন কোন জাহাজে আবার 'লেডীজ রুম' থাকে, যাহারা ধূমপান করে না তাহারা সেখানে গিয়া বসিতে পারে,পিয়ানো সেই কক্ষেই থাকে। সুতরাং একটি প্রথম শ্রেণীর যাত্রী জাহাজ, কার্যত, সুসজ্জিত নানা বিলাসদ্রব্যে পূর্ণ এবং সভ্যজীবনের যাবতীয় উপভোগ্য আয়োজন পূর্ণ একটি প্রাসাদ বিশেষ।

জাহাজের দিনগুলিতে আর কোন বৈচিত্র্য নাই, সুতরাং উল্লেখযোগ্যও বিশেষ কিছু নাই। আমরা সব সময়েই ঘন নীল জলের বিরাট এক চক্রাকার বিস্তারের মধ্যে অবস্থান করিয়াছি, তাহার পরিধি রেখায় সমস্ত নীল আকাশখানি নত হইয়া তাহাকে স্পর্শ করিয়া আছে—যেন অতি বিরাট এবং উত্তাল এক কটাহ উল্টা হইয়া সমুদ্রকে ঢাকিয়া রাখিয়াছে। কোথাও জীবনের চিহ্ন নাই, মাঝে মাঝে দেখা যায়, শাদা রক্তের সামুদ্রিক চিল সহজে সমুদ্রের উপর নামিয়া বসিতেছে এবং ঢেউয়ের ওঠানামার সঙ্গে ওঠানামা করিতেছে। জাহাজ তাহার কাছে অগ্রসর হইলে আকাশে উড়িয়া কখনও জাহাজের এপাশে কখনও ওপাশে যাইতেছে। তাহাকে দেখিয়া শিকারপ্রিয় যাত্রী ক্যাবিনে ছুটিয়া গিয়া বন্দুক লইয়া আসিতে না আসিতে, জাহাজ পর্যবেক্ষণ শেষ করিয়া সে অন্যদিকে চলিয়া যাইতেছে। শিকারী দেখিতে পায় শুধু বহু দূরে একটি শ্বেত-বিন্দু শাদা ঢেউয়ের ফেনার মধ্যে কোথায় হারাইয়া যাইতেছে। মাঝে মাঝে উড়ন্ত মাছের ঝাঁক হঠাৎ জল থেকে কয়েক ফুট উঁচুতে উঠিয়া কে কতদূরে উড়িয়া যাইতে পারে তাহার পাল্লা চালায়। চলার পথে অনেকগুলি হার মানিয়া জলে পড়িয়া যায়, শেষ পর্যন্ত দুই তিনটি টিকিয়া থাকে, কিন্তু তাহারাও ক্লান্ত হইয়া হারিয়া যায়, একটি মাত্র শেষ পর্যন্ত জয়লাভ করে এবং তাহারও দৌড় শেষ হয়। কখনও হয় তো দিনের শেষে সেদিনের ঘটনা ডায়রিতে লিখিতে বসিয়াছি এমন সময় দূরাগত অন্য জাহাজের আবির্ভাব ঘোষণা করিয়া ঘণ্টা বাজিয়া উঠিল, আমরা ডায়ারি লেখা ফেলিয়া ডেকে ছুটিয়া আসিলাম। ডায়ারি আমরা অবশ্য প্রথম কয়েক দিন মাত্র লিখিয়াছিলাম, কিন্তু ক্রমেই অলসতাবশত বাকি পড়াতে শেষে লেখা ছাড়িয়া দিলাম। ডেকে ছুটিয়া আসিয়া কোথায় দূরে জাহাজের চিহ্ন সেই দিকে দৃষ্টি ফিরাইলাম। কেহ কেহ চোখে দূরবীণ লাগাইয়া দূরের কালো বিন্দু দেখিতে লাগিল। ক্রমে তাহার আকার বৃদ্ধি পাইয়া স্পষ্টতর হইয়া উঠিল। সেই জাহাজ ও আমাদের জাহাজের মধ্যে সঙ্কেত বিনিময় হইল, জাহাজের নাম ও গন্তব্যস্থল আমাদের জানা হইয়া গেল।

এইভাবে দিন কাটিবার পর, বম্বাই ছাড়িবার ছয় দিন পরে আমাদের দৃষ্টির সম্মুখে এডেন বন্দরের রুক্ষ পাহাড়গুলি প্রকাশিত হইল। চারিদিকে সবুজের মধ্যে বাস করিয়া অভ্যস্ত চোখে এই উলঙ্গ খাড়া পাহাড়গুলি অত্যন্ত প্রাণহীন এবং মরুভূমিতুল্য বোধ হইতে লাগিল। এগুলি আগ্নেয় গিরি জাত পাহাড়। সূর্য মাথার উপর উঠিতে লাগিল এবং সেই সঙ্গে ইহাদের গলিত লাভার গঠিত ধূসর ব্রাউন, ধূসর ঘন সবুজ প্রভৃতি বর্ণ প্রতিফলিত করিতে লাগিল। এই সব পাহাড়ে অগ্ন্যুৎপাতের পরে যে সব গহ্বর সৃষ্টি হইয়াছিল তাহার উপরে এডেন শহর। এটি অ্যারাবিয়া ফেলিক্স-এর অন্তর্ভুক্ত ইয়েমেনের দক্ষিণ উপকূলে ছোট্ট এডেন উপদ্বীপের অংশ। আমাদের জাহাজ ক্রমে অগভীর জলে অগ্রসর হইয়া আসিল। এবং বন্দরের কাছে আসিবার সময় জল খোলাটে হইয়া উঠিল। নোঙ্গর ফেলামাত্র ছোট ছোট নৌকা ও ক্যানু তীরভূমি হইতে আসিয়া আমাদের প্রায় ঘিরিয়া ধরিল। ছোট ছোট কৃষ্ণকায় বালক নৌকা হইতে জলে ঝাঁপাইয়া পড়িয়া "আমি ডুবছি" "আমি ডুবছি" বলিয়া অবিরাম চিৎকার করিতে লাগিল। তাহার অর্থ কেহ যদি দয়া করিয়া একটি দুআনি জলে ফেলিয়া দেন, তাহা হইলে তাহারা ডুবিয়া তাহা তুলিয়া লইবে। এ বিষয়ে তাহারা একেবারে পাকা ওস্তাদ। ডেকের দশ ফুট উচ্চতা হইতে একটি দুআনি ফেলিবামাত্র তাহারা উহা জলের ভিতর হইতে কুড়াইয়া লইবার জন্য ডুব মারিবে। জল স্বচ্ছ, মাটি পর্যন্ত দেখিতে কষ্ট হয় না, উহারা দুআনিটি ফেলিবামাত্র তাহাকে অনুসরণ করিয়া ডুবিতে থাকে, এবং মাটিতে পৌঁছিবার আগেই তাহা ধরিয়া ফেলে। ইহারা অধিকাংশই আফ্রিকার সন্তান, সোমালি উপকূল হইতে যাহারা কিছু রোজগারের আশায় আসিয়া থাকে ইহারা তাহাদেরই বংশধর। তাহারা এডেনে আসিয়া স্ত্রীলোকের সঙ্গে অস্থায়ীভাবে বসবাস করে এবং কিছু রোজগার হইলে স্ত্রী সন্তানাদি ফেলিয়া দেশে ফিরিয়া যায়। মায়েরা তখন আবার নতুন আগন্তুকের আশ্রয়ে যায়। এরাও সেই একই স্থানের বাসিন্দা। তাদের ছেলে-মেয়েরা ভিক্ষা, চুরি অথবা "ডাইভিং" দ্বারা জীবিকা নির্বাহ করে। অন্য মুসলমানেরা তাহাদের পুরুষদের প্রতি যেমন ব্যবহার করে, সোমালিরা তাহাদের স্ত্রীলোকদের প্রতি সেইরূপ ব্যবহার

করিয়া থাকে। এই অদ্ভুত রীতি কয়েকটি আরব উপজাতির মধ্যেও প্রচলিত। আমাদের জাহাজে অনেক ইহুদি ও আরব উটপাখীর পালক ও ডিম বিক্রয় করিবার জন্য আসিয়া উপস্থিত হইল। এডেন হইয়া যে সব যাত্রী যাতায়াত করে তাহারা এই পালক প্রচুর পরিমাণে কিনিয়া থাকে, স্ত্রীলোকের টুপির শোভাবর্ধনের জন্য এই পালক দরকার হয়। প্রধানত এই পালকগুলি সোমালি উপকূল হইতে আনা হইয়া থাকে। খুচরা বিক্রয়ের জন্য চারটি করিয়া পালকের এক একটি গোছা বাঁধা হয় এবং সর্বোৎকৃষ্টগুলি কুড়ি হইতে ত্রিশ টাকা দামে বিক্রয় হইয়া যায়। কালো পালক পছন্দসই নহে তাহার দাম এক টাকা হইতে আট টাকা। আফ্রিকায় উটপাখী শিকার করা হয় স্ত্রীপাখীর সাহায্যে। শিকারী তাহার পাখার আড়ালে থাকিয়া স্ত্রীপাখীটাকে বন্য উটপাখীর দিকে চালাইয়া লইয়া যায়, এবং যথেষ্ট কাছে আসিলে বিষাক্ত তীরের সাহায্যে তাহাকে মারিয়া ফেলে।

এডেনে আমরা জাহাজ হইতে তীরে নামিলাম, নামিবার পরে স্থানটিকে আরও বেশি নির্জীব বলিয়া বোধ হইল। মাঝিকদের মধ্যে একটি কৌতুক প্রচলিত আছে যে, এডেনের কোনো গাছের পাতা ছেঁড়া অথবা কোন গাছের ক্ষতি করা চরম অপরাধ বলিয়া গণ্য হয়। এটি হাসির ব্যাপার এই কারণে যে, এডেনে কোন গাছই নাই! ছোট ছোট গুল্ম কিছু কিছু দেখিয়াছি, কিন্তু শুষ্ক আবহাওয়া সেলিউলার টিস্যু বা কোষফলা কমাইয়া ছোট ছোট কাঁটা গাছ উৎপাদনে সাহায্য করিয়াছে। আরবদের শহর এখান হইতে প্রায় দুই মাইল দূরে, সেই শহর পাহাড়-ঘেরা, সেখানে ছোটখাটো একটি বাগান আছে, কিন্তু সেখানে একটিও বড় গাছ নাই। যে সব উদ্ভিদ ভারতবর্ষে বনস্পতিতে পরিণত হয়, এডেনে তাহা গুল্মের অপেক্ষা বড় হইতে পারে নাই। এই বাগানে দেখিলাম আমাদের বকফুলের গাছ (Sesbania grandiflora, Pers.) তাহাতে ফুলও ফুটিয়াছে কিন্তু গাছটি পাঁচ ফুট দীর্ঘও নহে। এডেনের সর্বাপেক্ষা মনোহর জিনিস জলাধারগুলি। এডেন বন্দরের পত্তনের সময় হইতে জল যোগানের প্রশ্নটি সব সময়ে কঠিন মনে হইয়াছে, এবং এই সমস্যা সমাধানের জন্য স্মরণাতীত কাল হইতে নানা চেষ্টাই হইয়াছে। বৃষ্টি যাহা হয় তাহা নিতান্তই তুচ্ছ, সমস্ত বৎসরে মাত্র তিন হইতে চারি ইঞ্চি! বহু পূর্ব হইতেই এই সামান্য বৃষ্টির জল ধরিয়া রাখিবার জন্য যথেষ্ট যত্ন লওয়া হইয়াছে। এবং তাহা শুধু এডেনের জন্য নহে, আরবের সকল অংশের জন্যই। ২৫০০ বৎসর পূর্বে মারেব-বাঁধ এই উদ্দেশ্যেই নির্মাণ করা হইয়াছিল। এরকম পঞ্চাশটির বেশি জলাধার রহিয়াছে, কিন্তু মেরামতের অভাবে তাহাদের মধ্যে মাত্র তেরটি ভিন্ন অন্য সমস্তগুলিই ব্যবহারের অযোগ্য হইয়া পড়িয়াছে। যে তেরোটি ব্যবহার্য আছে সেগুলি লাহেজের সুলতানের সহযোগিতায় ব্রিটিশ সরকার নূতন করিয়া নির্মাণ করিয়াছেন। এই জলাধারগুলি হইতে লোকেদের কাছে নির্দিষ্ট পরিমাণ জল প্রতি ১০০ গ্যালন এক টাকা হিসাবে বিক্রয় করা হয়। কিন্তু এই জল পানের উপযোগী নহে। সম্প্রতি সমুদ্রের লোনা জল পাতিত করিয়া তাহা হইতে বিশুদ্ধ পানীয় জল প্রস্তুত করিবার জন্য সরকার এবং প্রাইভেট কম্পানি উভয়েই কয়েকটি কনডেন্সার স্থাপন করিয়াছেন। ইহার সাহায্যে বাষ্প শীতলীকৃত হইয়া জলে পরিণত হয়। এডেনের বাজার ভারতের কোনও বাজার হইতে ভিন্ন নহে—সেই একই অপরিচ্ছন্নতা—একই অনিয়ম এখানেও। কিন্তু ইংরেজ যেখানেই গিয়াছে, সেইখানেই সঙ্গে আনিয়াছে বাণিজ্য, শান্তি এবং সমৃদ্ধি। পূর্বতন অত্যাচারী স্বভাবের শাসনকর্তাদের ব্যবহারে এবং গত শতকের অবিরাম ক্ষমতার লড়াইয়ের দরুন এডেনে তাহার প্রাচীন বাণিজ্য ধ্বংস হইয়াছিল, কিন্তু সে তাহার সেই বিনষ্ট বাণিজ্য পুনরুদ্ধার করিয়া লইয়াছে। আমরা এখানে অনেক কফি-হাউস দেখিলাম, সেখানে আরব ও সোমালিরা দিবারাত্র কফি পান করিতেছে। মহম্মদের সময় হইতে সুরা অথবা সুরাজাতীয় পানীয় নিষিদ্ধ হওয়াতে আরবগণ অন্য বিকল্প উত্তেজকের ব্যবস্থা করিয়া লইয়াছে। কফি তাহাদেরই আবিষ্কার। অন্য একটির নাম 'কাথ'—কাথা নামক একটি উদ্ভিদ হইতে প্রস্তুত। ইয়েমেনের পাহাড়ে ইহার জন্ম। আরবরা ইহা হইতে প্রস্তুত নেশার দ্রব্য চিবাইয়া খায়—খুব আনন্দদায়ক উত্তেজক এটি। এক সময়ে কথা উঠিয়াছিল, কফি ও কাথও তাহাদের খাওয়া উচিত কি না, কারণ পবিত্র কোরানের নির্দেশ "সুরা বা যে কোনও নেশার দ্রব্য ব্যবহার করিও না।" লব্ধপ্রতিষ্ঠ শাস্ত্রজ্ঞগণ এ বিষয়ে ভিন্ন মত প্রকাশ করিয়া ইহার পক্ষে ও বিপক্ষে কিছু দিন ধরিয়া বিতর্ক চালাইয়াছিলেন। কিন্তু ইহার শেষ মীমাংসা করিয়া দিলেন ফকরউদ্দীন মাক্কি ও অন্যান্য শাস্ত্র ব্যাখ্যাতাগণ। ফলে আজ কফি ও কাথ ব্যবহার ব্যাপক ভাবে প্রচলিত হইয়াছে।

প্রাচীন হিন্দুদের বিস্ময়কর সব ক্রিয়াকলাপ বা কীর্তি আবিষ্কারের জন্য আমার দেশের যাঁহারা কল্পনার বিস্তারে আনন্দলাভ করিয়া থাকেন, তাঁহারা শুনিয়া খুশি হইবেন, ইবন এল মোজাহির নামক জনৈক মুসলমান ঐতিহাসিক লিখিয়া গিয়াছেন, এডেন, দশশির নামক দানবরাজ কর্তৃক "আল্দামান" রূপে ব্যবহৃত হইত। দশশির—অর্থাৎ দশ মাথাওয়ালা রাবণ। এই রাবণ যাবজ্জীবন দণ্ডাজ্ঞাপ্রাপ্ত অপরাধীদের এডেনে নির্বাসনে পাঠাইত। কথিত আছে, এডেনের পাহাড়গুলির মধ্যে কোথাও একটি কূপ আছে, তাহার ভিতর দিয়া ভারতবর্ষের সঙ্গে যোগাযোগের উপযুক্ত একটি সুরঙ্গ-পথ আছে। এই সুরঙ্গ-পথ সম্পর্কে উক্ত ঐতিহাসিক বলিতেছেন, "মহম্মদ বিন মাসুদের পিতা মুবারক ইল শারোনি মোল্লা আমাকে বলিয়াছেন উক্ত দশশির দানব অযোধ্যা প্রদেশ হইতে রাম হায়দারের স্ত্রীকে খাট সমেত চুরি করিয়া আকাশ পথে চলিবার সময় জেবেলসিরা পাহাড়ের মাথায় বিশ্রাম করিবার সময় রাম হায়দারের স্ত্রীকে বলিয়াছিল, আমি তোমার মানুষের দেহটিকে একটি জিনে বদল করিব এমন ইচ্ছা। তাহাতে দুইজনের মধ্যে বচসা বাধিয়া উঠিল, তখন বানরবেশী হনুবীত নামক এক এফরীত তাহা শুনিতে পাইয়া একরাত্রির পরিশ্রমে উজ্জইন বিক্রম নামক নগর হইতে সমুদ্রের নিচে দিয়া সুরঙ্গ-পথ প্রস্তুত করিয়া জেবেল সিরার কেন্দ্রস্থল পর্যন্ত আসিয়া উপস্থিত হইল। তাহার পর সেখান হইতে বাহির হইয়া দেখিতে পাইল পাহাড়ের মাথায় একটি কাঁটাগাছের নিচে রাম হায়দারের স্ত্রী ঘুমাইতেছে। সে তৎক্ষণাৎ তাহাকে পিঠে তুলিয়া সেই সুরঙ্গ-পথে ভোরবেলা উজ্জইন বিক্রমিতে আসিয়া পৌঁছিল এবং তাহাকে তাহার স্বামী রাম হায়দারের হাতে সমর্পণ করিল। রাম হায়দারের দুইটি সন্তান হইল লথ (Luth) ও কুশ। রাম হায়দারের স্ত্রীর কাহিনী অতি দীর্ঘ, কিন্তু সেই সুরঙ্গ-পথ অদ্যাবধি বিদ্যমান আছে।"—প্রাচীনকালে ভারতবাসী ও আরবদের মধ্যে যে বাণিজ্যিক সংযোগ ছিল, এ বিষয়ে সন্দেহ নাই। উপরের বৃত্তান্তে সিংহলের দশমুণ্ড রাবণ কর্তৃক সীতা হরণ, বহু পরবর্তী যুগের বিক্রমাদিত্যের সঙ্গে একাকার হইয়া গিয়াছে, এবং সীতা উদ্ধারের কাহিনীটিও সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র।

শহর হইতে জাহাজে ফিরিয়া

আসিয়া দেখি জাহাজ নোঙ্গর তুলিয়া বন্দর ত্যাগের আয়োজন করিতেছে। এডেনের জন্য প্রেরিত মালসমূহ আগেই খালাস করা হইয়াছে, তোলা হইতেছে অধিকাংশই কফির চালান। আমাদের জাহাজের বার্জ-বোটসমূহে একটি স্টীম লঞ্চ আসিয়া ভিড়িয়াছে। তাহা হইতে কয়লা ও জল যথারীতি 'নেপাল'-এ তোলা হইল। যথাসময়ে নোঙ্গরের কাছে কর্মীরা যে যাহার স্থান গ্রহণ করিল। ক্যাপ্টেন জাহাজের ব্রিজে দাঁড়াইয়া হুকুম দিলেন—'হীভ আপ'—নোঙ্গর উঠাও। সব কাজ নীরবে সমাধা হইল, তাড়াহুড়া নাই ছুটাছুটি নাই, সবই শুধু কাজ, নিপুণ নিশ্চুতভাবে সম্পন্ন হইল। একটি মুহূর্ত বাজে নষ্ট হইল না। জাহাজের এই কর্মশৃঙ্খলা, এই ডিসিপলিন দেখিয়া আমাদের অবাক লাগে। প্রত্যেকে তাহার কর্তব্য বিষয়ে পূর্ণ সচেতন, সবই তাহারা স্বতঃস্ফূর্ত তৎপরতার সঙ্গে করিয়া গেল। এই শিক্ষার জন্যই ঝড়ের সময় উত্তাল তরঙ্গমালা পর্বত সমান উঁচু হইলেও কোথাও লেশমাত্র ভুলভ্রান্তি-বিশৃঙ্খলা ঘটে না।

আমরা ১৮ই মার্চের অপরাহ্নে এডেন ত্যাগ করিলাম। সেইদিনই সন্ধ্যার অন্ধকারে আমরা আরবদের বাব্-দরওয়াজা—বাবেল মান্ডেব প্রণালী অতিক্রম করিলাম। অল্প সময়ের মধ্যেই আমরা পেরিমের আলোক-স্তম্ভ দেখিতে পাইলাম। এটি লোহিত সমুদ্রমধ্যস্থ ছোট্ট একটি দ্বীপ। দ্বীপটির অবস্থান লোহিত সাগর ও ভারত মহাসাগরের মধ্যবর্তী স্থানে। এতকাল ইহাতে বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হয় নাই, ইহা কোনো দেশ কর্তৃক অধিকৃত হয় নাই, স্থায়ীভাবে কেহ ইহাতে বাসও করে নাই। অবশেষে ১৮৫৭ সনে ইংরেজরা এইখানে একটি আলোক-স্তম্ভ স্থাপন করে এবং অল্পসংখ্যক সৈন্য রাখিবারও ব্যবস্থা করা হয়। পর্টুগীজ সমুদ্র অভিযাত্রী আলবুকের্কে ১৫১৩ সনে এই দ্বীপে আসিয়াছিলেন, তিনি ইহার একটি পাহাড়ের চূড়ায় একটি ক্রস্ স্থাপন করিয়া যান। ১৭৯৯ সনে ইস্ট ইণ্ডিয়া কম্পানি অস্থায়ীভাবে দ্বীপটি দখল করে, এই সময়ে নেপোলিয়ন ঈজিপটের পথে ভারত আক্রমণের আয়োজন করিতেছিলেন। 'লেজ অভ ইণ্ড' (ভারত-গাথা) নামক কাহিনীতে ফরাসীরা যে এই দ্বীপটি দখল করিবার চেষ্টা করিয়াছিল এমন কথার উল্লেখ পাওয়া যায়, এইটি জানিতে পারিয়া ইংরেজরা দ্বীপটিকে স্থায়ীভাবে দখল করিয়া লয়। কথিত আছে একখানি ফরাসী যুদ্ধজাহাজ এই দ্বীপে ফরাসী পতাকা উড়াইবার গোপন নির্দেশসহ এডেনে আসিয়া পৌঁছিয়াছিল। এই জাহাজ এডেনে পৌঁছিলে তথাকার ব্রিটিশ রেসিডেন্ট ফরাসী যুদ্ধজাহাজের অফিসারদিগকে সৌজন্য-বিধি অনুযায়ী ডিনারে নিমন্ত্রণ করিয়াছিল। ডিনারের পরে যখন প্রচুর মদ্যপান আরম্ভ হইল তখন ফরাসী ক্যাপটেন ব্রিটিশ রেসিডেন্টকে গোপন কথাটি প্রকাশ করিয়া ফেলিলেন। একথা শুনিবামাত্র ব্রিটিশ রেসিডেন্ট এডেন হইতে গান-বোট পাঠাইয়া পেরিম দ্বীপটিকে দখল করিয়া লইলেন। আমাদের লোহিত সাগর পার হইতে চারি দিন লাগিল। শুনিলাম মাত্রাতিরিক্ত গরম বশতঃ সমুদ্রপথের এই অংশটি যাত্রীদের পক্ষে সব সময়েই বিশেষ ক্লেশকর হইয়া থাকে। কিন্তু সৌভাগ্যবশতঃ আমাদের যাইবার সময় উত্তর দিকের শীতল মৃদু হাওয়া বহিতেছিল, অতএব আমাদের বেশ আরামেই কয়টা দিন কাটিয়া গেল। যাইবার পথে আমরা অনেকগুলি পাথুরে দ্বীপ পার হইয়া গেলাম, ইহারা জলের উপরে মাথা তুলিয়া রহিয়াছে। একটা স্থানে এ রকম সাতটি দ্বীপ আছে, নাবিকরা এই দ্বীপগুলির নাম দিয়াছে 'সেভেন অ্যাপোসল্‌স' (খ্রীস্ট দূত)। লোহিত সাগরে অনেক শুশুক দেখা গেল, উহাদের স্ফূর্তির খেলায় আমরা বেশ আমোদ অনুভব করিতেছিলাম। দূর হইতে আমাদের দেখিয়া ছুটিয়া নিকটে চলিয়া আসে এবং আসিয়াই কত রকমভাবে খেলা করে! কখনও সাঁতার কাটে, কখনও লাফাইয়া শূন্যে উঠিয়া আবার ডুবিয়া যায়, কখনও ছুটাছুটি করে। এই সমুদ্রপথে যাইতে অনেক সময় তীরভূমি দেখা যায়, কখনও আফ্রিকার দিকের, কখনও আরবীয় দিকের। আফ্রিকার দিকের তীরভূমি প্রবাল-গঠিত নিমজ্জিত পাহাড়ের সারিতে ভরা, জাহাজ চলার পক্ষে তাহা বিপজ্জনক। আরও একটুখানি ভিতরের দিকে সমুদ্রের সমান্তরালভাবে উত্তর-দক্ষিণে বিস্তৃত উঁচু পাহাড়ের সারি। এগুলি মাসাওয়া ও সুদান পর্বতমালা। আঠা ও রঞ্জনের উৎপত্তিস্থল। পূর্ব উপকূলেও একই রকমের অসমান এবং এবড়ো-খেবড়ো। যতদূর দৃষ্টি যায়, উচ্চ পাহাড়শ্রেণীতে জমি বহুভাগে বিভক্ত দেখিতে পাওয়া যায়। পাহাড়গুলি দূর হইতে বড়ই শুষ্ক এবং রসহীন বলিয়া বোধ হয়। সুয়েজ খালের দিকে যতই অগ্রসর হইতেছি, ততই দু'পাশের দুটি তীরভূমি নিকটবর্তী হইতেছে। সম্ভবত এই স্থানেই বাইবেল-বর্ণিত মোজেস্-পীড়নকারী ফারাও-এর অধীন ঈজিপটের দুর্বৃত্ত দল কর্তৃক ইসরায়েল-বাসীরা যখন তাড়িত হইতেছিল, তখন তাহাদের পথ নিরাপদ করিবার জন্য লোহিত সাগর শুকাইয়া গিয়াছিল। সুয়েজের দিকে অগ্রসর হইবার সময় আমাদের জাহাজ আফ্রিকার কূল ঘেঁষিয়া যাইতেছিল। আমরা ২৩শে তারিখে বেলা ১০টায় সুয়েজে আসিয়া পৌঁছিলাম। এই-খানে "নেপাল" ভারতীয় ডাক ঈজিপটের রেল বিভাগে বিলি করিয়া দিল, সেখান হইতে উহা বম্বাপ পারে অ্যালেকজান্দ্রিয়ায় চলিয়া গেল। সেখানে পি অ্যান্ড ও কম্পানির আর একখানি জাহাজ সেই ডাক তুলিয়া লইবার জন্য অপেক্ষা করিতে-ছিল, সেখান হইতে উহা ব্রিন্দিসি নামক ইটালির বন্দরে পৌঁছাইয়া দিবে। সেখান হইতে রেলপথে পুনরায় উহা কালে বন্দরে, এবং কালে হইতে চ্যানেল পারে লণ্ডনে চলিয়া যাইবে। সুয়েজে আমরা জাহাজ হইতে নামি নাই, কারণ সময় খুব কম ছিল। ডাক বিলি হইবামাত্র আমরা যাত্রা করিয়া সুয়েজ খালে প্রবেশ করিলাম।

এই খালটি আধুনিক এনজিনিয়ারিং বিদ্যার একটি বৃহত্তম কৃতিত্ব। সুয়েজ যোজক নামক সঙ্কীর্ণ ভূখণ্ডটি এশিয়া ও আফ্রিকাকে যুক্ত রাখিয়াছিল, কিন্তু তাহা লোহিত সাগরকে ভূমধ্যসাগর হইতে পৃথক করিয়া রাখিয়াছিল। অতএব যে সব জাহাজ পূর্ব এশিয়া হইতে ইউরোপে যাইত, তাহা-দিগকে উত্তমাশা অন্তরীপ ঘুরিয়া যাইতে হইত। সুয়েজ খালের পথে কলিকাতা হইতে লণ্ডনের দূরত্ব ৭,৯৫০ মাইল, এবং উত্তমাশা অন্তরীপের পথে ১১,৪৫০ মাইল। সুতরাং যোজক কাটিয়া দেওয়াতে ৩,৫০০ মাইলের দূরত্ব কমিয়া গিয়াছে। প্রাচীনকাল হইতেই যোজক কাটিয়া পথ করিবার সুবিধার কথা চিন্তা করা হইয়াছে, এবং কাটিবার জন্য নানারূপ চেষ্টাও হইয়াছে। প্রায় ২৫০০ বৎসর আগে নাইল নদী হইতে লোহিত সমুদ্র পর্যন্ত একটি খাল কাটা হইয়াছিল, কিন্তু তাহা পলিমাটিতে ভরিয়া উঠিয়াছে, যদিও তাহার চিহ্ন এখনও বর্তমান। নেপোলিয়ান যখন ঈজিপটের প্রভু তখন তিনি একবার বড় জাহাজের পথ করিবার জন্য সুয়েজ যোজক কাটিবার উদ্দেশ্যে জমি জরিপ করাইয়াছিলেন, কিন্তু ফরাসীরা ওদেশ হইতে বিতাড়িত হওয়াতে সে পরিকল্পনা আর কাজে পরিণত হইতে পারে নাই। অবশেষে ডি লেসেপ্‌স নামক এক ফরাসী এনজিনিয়ার একাজ সাফল্যের সঙ্গে সমাধা করিলেন এবং তাহার ফলে সমগ্র মানবজাতির অশেষ উপকার সাধিত হইয়াছে, ইহাতে বাণিজ্যজগতে নতুন উদ্দীপনা জাগিয়াছে। ওখানকার জমি বালিপ্রধান, আদৌ নির্ভরযোগ্য নহে,

যাহার জন্য সারা দেশটাই একটা মরুভূমিতে পরিণত হইয়াছে, এবং পানীয় জলের অভাব ছিল, এবং তাহার পরেও—লোহিতসাগর ও ভূমধ্যসাগরের জলতলের লেভেল অসমান। এই সব অসুবিধার ভিতর কাজ করিতে হইয়াছে। দুইয়ের মধ্যবর্তী কয়েকটি ছোট ছোট হ্রদ ছিল, ডি লেসেপ্‌স তাহার সুবিধা গ্রহণ করিয়া খাল সেগুলির সঙ্গে যুক্ত করিয়াছিলেন। ঐ হ্রদের জল তিক্ত স্বাদের। তাই তিনি নাইল নদীর মিঠা জল পাইপের সাহায্যে আনাইয়া লইয়াছিলেন। খননের জন্য এবং জলের নিচের মাটি কাটিয়া তুলিবার জন্য নূতন নূতন যন্ত্র উদ্ভাবন করিয়া লইয়াছিলেন। এক কথায় অসীম ধৈর্য এবং বুদ্ধি-কৌশলে তিনি সকল অসুবিধাই দূর করিয়াছিলেন। তিনি এমন গভীরভাবে এই খালটি খনন করিলেন, যাহাতে পৃথিবীর বৃহত্তম যুদ্ধ জাহাজ ঐ খালের ভিতর দিয়া যাতায়াত করিতে পারে। তবে ইহা দুইটি জাহাজ পাশাপাশি চলিবার মত প্রশস্ত নহে। সেজন্য স্টেশনের স্থানে ইহা বেশি প্রশস্ত করা হইয়াছে। স্থলে যেমন সিংগল রেল লাইন হয়, এই খালও সেই রীতিতে প্রস্তুত। দ্বিতীয় আর একটি খাল ইহার পাশে কাটিয়া ডবল লাইন জাহাজপথ করিবার পরিকল্পনা করা হইতেছে। সুয়েজ খাল কাটিতে অনেক কোটি টাকা খরচ হইয়াছে। ডি লেসেপ্‌স একজন দরিদ্র ফরাসী এনজিনিয়ার। তিনি নিজে ইহার জন্য কোনও টাকা দিতে পারেন নাই, সে ক্ষমতাও তাঁহার ছিল না, তিনি টাকা সংগ্রহ করিয়াছিলেন জয়েন্ট স্টক রীতিতে শেয়ার বিক্রয় করিয়া। বুদ্ধি, শিক্ষা, ঠিক ক্ষমতা, সাহসিকতাপূর্ণ কর্মোদ্যম এবং কাজ আরম্ভ করিয়া শেষ পর্যন্ত তাহাতে লাগিয়া থাকা—এই গুণগুলি থাকিলে মানুষের অসাধ্য কিছুই থাকে না। যে সব ব্যক্তি সুয়েজ খাল কাটিবার মত কৃতিত্বের অধিকারী তাঁহাদের দ্বারা জাতির মুখ উজ্জ্বল হয়। জাতির মূল্য তাহার কৃতিত্বের দ্বারাই স্বীকৃত। এই কথাটা আমাদের অবশ্যই মনে রাখা উচিত। খালটিকে নৌবহনের উপযুক্ত রাখিতে বেশ কিছু অসুবিধা ভোগ করিতে হয়। কারণ আলগা বালি অবিরাম উপর হইতে পড়িয়া খালটি ভরিয়া তুলিবার চেষ্টা করিতেছে। কয়েকটি জায়গায় ইহার পার্শ্বদেশে পাথরের বাঁধনি দিয়া রক্ষা করিতে হইতেছে। অন্য কয়েকটি স্থানে আবার শরগাছ ও সেজ্‌গাছ রোপণ করিয়া তাহাদের শিকড়ের সাহায্যে মাটিকে ভাঙনের হাত হইতে রক্ষা করা হইয়াছে। কিন্তু তবু তলা হইতে মাটি তুলিয়া ফেলিবার জন্য ড্রেজার যন্ত্রকে সর্বদাই কাজে খাটাইতে হয়। রাত্রিকালে জাহাজ চলাচল করিতে দেওয়া হয় না। সে জন্য খাল পার হইয়া যাইতে আমাদের দুইটি দিন লাগিয়াছিল। তাহার পর পোর্ট সৈদ, খালের শেষ প্রান্তে অবস্থিত। বর্তমানে বিদ্যুতের আলো সম্বলিত জাহাজকে রাত্রিতেও খাল পার হইতে দেওয়া হয়।

আমরা পোর্ট সৈদে জাহাজ হইতে নামিলাম, কিন্তু তখন সন্ধ্যাকাল, অন্ধকার হইয়া আসিয়াছে, তাই বিশেষ কিছুই দেখা হইল না। কয়েকটি কফি-হাউস থিয়েটার গৃহ ও জুয়া খেলার আড্ডা মাত্র দেখা গেল। যাবতীয় ইউরোপীয় সমাজের নিচের তলার ওঁছা লোকেরা এইখানে আসিয়া সমবেত হয়। এই কারণে পোর্ট সৈদ দুর্নীতির জন্য কুখ্যাত। ২৫শে মার্চ রাত্রিকালে আমরা পোর্ট সৈদ ছাড়িয়া ভূমধ্যসাগরে আসিয়া প্রবেশ করিলাম। ইজিপ্টে অনেক নূতন যাত্রীর আগমন ঘটিয়াছিল, তাহার মধ্যে একজন বিশেষ মতবাদসম্পন্ন আমেরিকান মিশনারি ছিলেন। জাহাজে এত বড় একদল উচ্চাঙ্গের ধর্মজ্ঞানহীন লোককে দেখিয়া খুশি হইয়া উঠিলেন। তিনি অবিলম্বে আমাদের মধ্যে তাঁহার মতে ভজাইবার জন্য কাজ আরম্ভ করিয়া দিলেন। একেবারে গোড়া হইতে আরম্ভ করিলেন। প্রথমে সৃষ্টিতত্ত্ব বুঝাইলেন। তাহার পর স্বর্গের বিদ্রোহ-কথা এবং অ্যাডাম ও ঈভের জন্মবৃত্তান্ত, অর্থাৎ তাহাদের পতনকথা এবং তাহার ফলে পৃথিবীর কি অবস্থা হইল সে কথা। আমরাও পাল্‌টা আমাদের জন্মবৃত্তান্ত শুনাইতে লাগিলাম। আমরা ব্রাহ্মণেরা ব্রহ্মার মুখ হইতে জন্মগ্রহণ করিয়াছি, ক্ষত্রিয়রা আসিয়াছে তাঁহার হাত হইতে, বৈশ্যগণ আসিয়াছে তাঁহার জানু হইতে এবং আমাদের চাষবৃত্তিধারীরা আসিয়াছে তাঁহার পাদদেশ হইতে। আমাদের শাস্ত্রে যাহা আছে তাহা শুনিয়া তিনি খুব হাসিলেন, এবং বলিলেন ও শাস্ত্র কিম্ভূত এবং মিথ্যা। বলিলেন এরকম ছেলেমি গল্পে আমরা বিশ্বাস করি কি করিয়া। তিনি অতঃপর স্যাটান (শয়তান) সম্পর্কে আমাদিগকে সতর্ক করিয়া দিলেন এবং বলিলেন স্যাটানের আনন্দ সে যেখানে বাস করে সেইখানে মানুষের আত্মাকে লইয়া যাওয়ার কাজে, এবং সে স্থানটি খুব আরামের নয়, সে কথাও তিনি বলিলেন। তাঁহার দৃঢ় বিশ্বাস পৃথিবী পাঁচ বৎসরের ভিতরে ধ্বংস হইয়া যাইবে, এবং সেজন্য তিনি আমাদের সেই মহা ধ্বংসের জন্য প্রস্তুত থাকিতে বলিলেন। এই সব মনোহর আলোচনা সহসা বাধাপ্রাপ্ত হইল। বাহিরে হাওয়ার বেগ প্রবল হইয়া উঠিয়াছে, আবহাওয়া অস্বস্তিকর, উত্তাল তরঙ্গ জাহাজের গায়ে আঘাত হানিতেছে, জাহাজ বেশিরকম দুলিতেছে, এবং সমস্ত ডেক-খানাই শীকরসিক্ত হইতেছে। মিশনারি ও তাঁহার শ্রোতাগণ—সবারই পেটের ভিতর মোচড় দিয়া উঠিল। অধিকাংশ যাত্রী এইবার সামুদ্রিক পীড়ায় আক্রান্ত হইল, আমি কিন্তু রক্ষা পাইয়া গেলাম, অতএব অন্যেরা এই পীড়ার দরুন কি রকম বোধ করিয়াছিলেন, তাহা আমি বর্ণনা করিতে পারিব না।

২৮শে মার্চ রবিবার মল্‌টা দ্বীপ-পুঞ্জের প্রধান শহর ভালেট্টা বন্দরে প্রবেশ করিলাম। মল্‌টা ভূমধ্যসাগরস্থ ব্রিটিশ অধিকারভুক্ত স্থান। আফ্রিকা হইতে ইহার দূরত্ব ১৭৯ মাইল, ও সিসিলি হইতে ৫৮ মাইল। পরিষ্কার সকাল, আমরা মাউন্ট এটনার চূড়া দেখিতে পাইতেছিলাম, অথচ তাহার দূরত্ব ছিল ১২৮ মাইল। আমরা ভালেট্টার গভর্মেন্ট হাউস ও অন্যান্য দর্শনীয় বস্তু দেখিতে বাহির হইলাম। প্রথমোক্তটি শ্বেত মর্মরের প্রশস্ত সিঁড়ি সম্বলিত বৃহৎ সৌধ। ইহার একটি কক্ষে আমরা কারুকার্যখচিত মূল্যবান পর্দার বহু নমুনা দেখিতে পাইলাম। এগুলি পৃথিবীর নানা স্থান হইতে সংগৃহীত এবং দুইশত বৎসরের পুরাতন। গভর্মেন্ট হাউসের সঙ্গে সংলগ্ন একটি অস্ত্রাগার আছে, সেন্ট জনের নাইটগণ মুসলমানদের সঙ্গে সর্বদা লড়াই করিত। সেই সময় যে অস্ত্র তাহারা ব্যবহার করিত, তাহাও সযত্নে রক্ষা করা হইয়াছে। দুইটি দলিলও অক্ষত অবস্থায় রক্ষিত হইয়াছে। ইহার মধ্যে একটি ঘোষণাপত্র যাহার সাহায্যে সাত শত বৎসর পূর্বে জেরুসালেমের সেন্ট জনের অর্ডার অভ দি নাইটস্ গঠন করা হয়। অন্যটি একটি চুক্তিপত্র। ইহার তারিখ ৪ঠা মার্চ ১৫৩০। ইহার সাহায্যে

রিস্ট ওয়াচ

মাত্র ৬৲ টাকায়

আমাদের চেন পদ্ধতি স্কীমের মাধ্যমে মাত্র ৬৲ টাকায় ৫ বৎসরের গ্যারান্টী সমেত ৫ জুয়েল রিস্ট-ওয়াচ লাভ করুন। ডাকমাশুল ১/১৫ টাকা অতিরিক্ত।

দ্রষ্টব্য : আমাদের মধু-চন্দ্রিমা সেন্টের বিক্রয় বৃদ্ধির জন্যই এই স্কীম চালু করা হইল। পছন্দ না হইলে মূল্য ফেরৎ।

SWISS WATCH TRADING CO.
P. B. 87, (WBC) Jullundur City.

সম্রাট পঞ্চম চার্লস, রোডস্ হইতে তুর্কীগণ কর্তৃক বিতাড়িত বীর নাইটদিগকে মলটার স্বীপসমূহ দান করা হইল। সেন্ট জন ক্যাথীড্রালও দেখা হইল, সেখানে মূল্যবান অনেক কারুকার্যখচিত মর্মর প্রস্তরের নমুনা এবং ব্রাসেরাস-এ প্রস্তুত পরদার নমুনা সংগৃহীত আছে। এখান হইতে আমরা নাইটদের হাসপাতাল দেখিতে গেলাম, বেশ বৃহৎ অট্টালিকা এটি, ইহার একটি কক্ষ পাঁচশত ফুটের অধিক দীর্ঘ, অথচ তাহাকে ধরিয়া রাখিবার জন্য কোনও কড়িকাঠ অথবা কেন্দ্রে স্তম্ভ নাই। একটি গীর্জায় ভূগর্ভস্থ খিলান গৃহের এক দেয়ালের কোপে মৃত বা কৃচ্ছ্রসাধক সন্ন্যাসীদের শুষ্ক মৃতদেহ রক্ষিত আছে দেখিলাম। মোটের উপর মল্‌টা—অতীত ইতিহাসের দিক হইতেই হউক, অথবা ইংল্যাণ্ড ও ভারতের প্রধান পথের মধ্যবর্তী একটি গুরুত্বপূর্ণ আউট-পোস্ট রূপেই হউক—বর্তমান অবস্থানের দিক হইতেই হউক—খুবই আকর্ষক বলিতে হইবে। নাইটদের নির্মিত ইহার দুর্গসমূহ এখন বৃটিশ সরকার কর্তৃক রক্ষিত হইতেছে। এগুলি সম্পূর্ণরূপে দুর্ভেদ্য দুর্গ। কয়েকজন নাইটের বিশ্বাসঘাতকতার ফলে ভাগ্যান্বেষী নেপোলিয়নের দখলে আসিলে কাফ্‌ফারেল্লি নেপোলিয়নকে বলিয়াছিলেন, "জেনারেল, (নেপোলিয়ন তখন জেনারেল ছিলেন) ভিতর হইতে কেহ যদি দুর্গের দরজা খুলিয়া দেয়, তবেই আমরা ভিতরে প্রবেশ করিতে পারিব। আর দুর্গটি যদি সম্পূর্ণ শূন্য থাকে তবে আমরা বাহির হইতে সহজে প্রবেশ করিতে পারিব না।" মলটা-বাসীরা খুব শক্তসমর্থ, সাহসী এবং বোঝার মাথায় কাজ করায় অভ্যস্ত। ছোরা মারার দিকে এদের কিছু আকর্ষণ আছে, ইহারা গোঁড়া রোমান ক্যাথলিক। স্ত্রীলোক-দের অবয়ব সুন্দর এবং চোখ কালো। ইহাদের ভাষায় শতকরা ৫৪ ভাগ আরবী শব্দ আছে, তাহাতে মনে হয় ইহাদের পূর্বপুরুষ আরব হইতে আসিয়াছিল। কিন্তু পক্ষান্তরে একটি লোকেরও আরব-দের মত দীর্ঘাকৃতি মুখ দেখা যায় না। মলটা এমনই একটি পাথরের ছোট দ্বীপ যে, এখানে যে জমিতে চাষ হয় সেখানকার মাটি সিসিলি দ্বীপ হইতে আমদানি করিতে হইয়াছে। যাহাই হউক পাথরের ফাঁকে ফাঁকে যেখানে যেটুকু মাটি পাওয়া গিয়াছে সেখানেই তাহার সদ্ব্যবহার করা হইয়াছে। এবং তাহার ফলে সেখানে শস্য এবং ফলের গাছ জন্মান সহজ হইয়াছে, জলটার কমলালেবু সমগ্র ইউরোপে খ্যাতি-লাভ করিয়াছে।

সেইদিনই সন্ধ্যায় আমরা মলটা ত্যাগ করিলাম। আমাদের জাহাজের মুখ এখন জিব্রলটারের দিকে, সেইখানে আমাদের দ্বিতীয় বিরাম। আবহাওয়া শান্ত, জল যেন কাঁচের একটি আবরণ। আমৃত্যুর পীড়ার হাত হইতে আক্রান্তগণ এত দিনে নিষ্কৃতি পাইয়াছেন, এবং সেই সঙ্গে মিশনারিটিও তাঁহার ধর্ম দীক্ষার উদ্দেশ্যে বক্তৃতা আরম্ভ করিয়াছেন।

খৃষ্টান ধর্মের স্বপক্ষে তাঁহার যুক্তির উত্তরে আমাদের ভিতর হইতে এক বন্ধু তাঁহাকে বলিলেন, খৃষ্টান না হইলে লোকে সাধু হইতে পারে না, আপনার এ ধারণা ভুল। সব খৃষ্টান সৎ নহে, এবং সব হিন্দু অসাধু নহে। আর শুদ্ধু তাহাই নহে, পৃথিবীর অন্যান্য জাতির তুলনায় হিন্দুরা জাতি হিসাবে বেশি শান্তিপ্রিয়, বেশি করুণাবান, এবং বেশি ধর্মভীরু। এখন সৎ হিন্দুর খৃষ্টান হওয়ার অপেক্ষা অসৎ খৃষ্টানের সৎ হওয়া বেশি দরকার। খৃষ্টান ধর্ম 'প্রতিবেশীকে ভালবাস' এই শিক্ষা দেয়, আর হিন্দুধর্ম বলে, 'সবাই-কেই সকল প্রাণীকেই আত্মবৎ মান্য কর'। হিন্দু ধর্মে পাপ ও পুণ্যের সংজ্ঞা দিয়াছে এই—'সৎ কাজ করা পুণ্য, অসৎ কাজ করা পাপ'। কিন্তু মোটের উপর দেখিতে গেলে দেখা যায়, খৃষ্টানরাও খৃষ্ট ধর্মের সকল বিধি মানে না, হিন্দুরাও তাহাদের স্বধর্ম অনুসরণ করে না। এ বিষয়ে অবশ্য অপরাধের পাল্লাটা হিন্দুদের দিকেই বেশি ভারী। 'হিন্দু ধর্মে' এত দুর্নীতির অনুপ্রবেশ ঘটিয়াছে যাহাতে বাহিরের কেহ যদি হিন্দুদের সব যুক্তি-হীন এবং হাস্যকর আচার আচরণ দেখে, তাহা হইলে সে সে আহত হইবে ইহাতে আশ্চর্য হইবার কিছু নাই। বিধবাদাহ এবং শিশু হত্যা ভারতীয়দের একটি চিরস্থায়ী লজ্জা বলা যাইতে পারে। এবং একথা কৃতজ্ঞতার সঙ্গে স্বীকার করিতেই হইবে যে, এই সব নিষ্ঠুর প্রথা খৃষ্টিয়ান ধর্মের জন্যই—অথবা খৃষ্ট ধর্মে বিশ্বাসী ব্যক্তিদের উদার নীতির জন্যই রহিত হইতে পারিয়াছে। একজন ব্রাহ্মণকে অথবা দেবতা রূপে মান্য করা হয়—কিন্তু তাহা তাঁহার পবিত্রতা অথবা দেবত্বের জন্য নহে, সে ব্রাহ্মণ বংশে জন্মিয়াছে বলিয়া। মোটের উপর কতকগুলি বিশেষ খাদ্য না খাওয়াকেই এখন ধর্মপালন রূপে গণ্য করা হইয়া থাকে। চুরি, মিথ্যাভাষণ এবং নর-হত্যার চেয়েও নিষিদ্ধ বস্তু ভক্ষণ জঘন্যতর অপরাধ। এই সব পাপানুষ্ঠান হিন্দু জাতিচ্যুত হয় না, কিন্তু নিষিদ্ধ বস্তু ভক্ষণ করিলে হয়। নীচ জাতীয় কোনও ব্যক্তিকে হত্যা করা অপেক্ষা গো-হত্যা বড় পাপ। ভারতীয়দের অনেক সদ্‌গুণকেও মুচড়াইয়া দুমড়াইয়া এমন আকার দেওয়া হইয়াছে যাহাতে এখন তাহা অপরূপে গণ্য। সকল জীবের প্রতি করুণাপরায়ণ হইবার শিক্ষা তাহাদিগকে দেওয়া হইয়াছে, অতএব তাহারা অভাব-গ্রস্ত লোককে ভাড়া করিয়া আনিয়া হাসপাতালে জাতীয় কীট পোষা তাহার গুণ গান করায়। ইহাই যদি হিন্দু ধর্মের প্রথা হয় তাহা হইলে যত শীঘ্র সম্ভব তাহাদের খৃষ্টান অথবা মুসলমান হইয়া যাওয়া উচিত। কিন্তু একথা বিশ্বাস করা শক্ত হয়, প্রাচীন ভারতের প্রজ্ঞগণ, তাঁহাদের গভীর জ্ঞান ও বিদ্যা লইয়া বর্তমানের আচরিত নীতি, তাঁহাদের উত্তরপুরুষগণ কর্তৃক পালিত হইবে, এমন ইচ্ছা করিয়া-ছিলেন। বিশ্বাস করা যায় না। আমাদের বন্ধু বলিতে লাগিলেন, "মহাশয়, আপনি জিজ্ঞাসা করিতে পারেন, পাশ্চাত্য শিক্ষার দ্বারা এদেশে যাহাদের মন মুক্ত, তাহারা এই সব প্রথা নিশ্চয়ই পালন করে না। উত্তরে বলি, দুর্ভাগ্যবশতঃ তাহা সত্য নহে। আমাদের সমাজের গঠন এমন যে তাহা করা সহজ নহে। ইহার জন্য যে বৃহৎ ত্যাগ ও মনোবল দরকার তাহা আমাদের দেশের জনসাধারণের নাই। অন্তরে অন্তরে যাহা করণীয় বলিয়া বোধ হয়, তাহা সাহসের অভাবে করিতে না পারিয়া শেষ পর্যন্ত যা তা রীতির কুপ্রথারই তাহারা সমর্থক হইয়া পড়ে। অনুমান করে এই সব প্রথা পালন এবং তাহার সমর্থনই দেশপ্রেম। অতঃপর নিজেদের এবং নিজেদের অপেক্ষা অল্পশিক্ষিতজনের চিন্তাধারাকে বিভ্রান্ত এবং প্রতারিত করিবার জন্য এ সবের সূক্ষ্ম আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা দিতে আরম্ভ করে।

আমরা এক্ষণে আফ্রিকার উপকূল ঘেঁষিয়া চলিতেছি। জাহাজে একজন অনেকদিনের অন্ত্রাগার রক্ষক ছিল, সে বাল্যকাল হইতে এ পথে বহুবার যাতায়াত করিয়াছে। সে আমাদের ট্রিপোলি, টিউনিস ও মরোক্কো উপকূলের বিশেষ বিশেষ স্থল-চিহ্নগুলি চিনাইয়া দিতে লাগিল। পৃথিবীর সকল অংশে ধর্মের নামে কত নিষ্ঠুর কাজই না লোকে করিয়াছে! সম্ভবত মাল্টেস আয়ারাট ও পিলার্স অভ হারাকিউলিস পর্যন্ত যতগুলি দেশ ও সমুদ্র আছে সেই সব দেশে ধর্মের নামে লুণ্ঠন, নৃশংসতা হত্যা ইত্যাদি যত সংঘটিত হইয়াছে, এমন আর পৃথিবীর কোনও অংশে হয় নাই। ক্রুসেডের পরে ক্রুসেড—ক্রস্‌চিহ্নিত পতাকার আশ্রয়ে তুরস্কের কাছ হইতে খৃষ্টানদের পবিত্র ভূমি কাড়িয়া লইবার সামরিক অভিযান। মলটার নাইটগণ কয়েক শতাব্দী ধরিয়া মহম্মদের অনুগামীদের দেখিলেই তাহাদের হত্যা করিয়া নির্মূল করিয়াছে। এটি হইল ভূমধ্যসাগরের পূর্বদিকের ঘটনা। অপর পক্ষে পশ্চিম দিকে টিউনিসের ট্রিপোলির এবং মরোক্কোর মুয়ারগণ তিনশত বৎসর ধরিয়া তাহাদের অধরাজ্যের দস্যুজাহাজ-গুলির সাহায্যে তাহাদেরও ধর্মীয়

তৎপরতা প্রমাণের জন্য হাজার হাজার খ্রীস্টানকে দাস বানাইয়াছে, তাহাদের সর্বস্ব লুণ্ঠন করিয়াছে। হতভাগ্য শেখ সাদী তাঁহার গুলিস্তানে লিখিয়া গিয়াছেন—প্যালেস্টাইনের পাহাড়ে একটি নির্জন স্থানে তিনি নমাজ পড়িতেছিলেন, এমন সময় খ্রীস্টানেরা তাঁহাকে বন্দী করিয়া লইয়া গিয়া ট্রিপোলির হাটে ক্রীতদাসরূপে বিক্রয় করিয়া দিল। ঐ একই পদ্ধতিতে মুয়ার জলদস্যুরা জাহাজ আটক করিয়া প্রতি বৎসর হাজার হাজার খ্রীস্টানকে ধরিয়া লইয়া উত্তর আফ্রিকার বাজারে কেনা-বেচা করিয়াছে।

৩১শে মার্চ বুধবার সকালে স্পেনের পর্বতশ্রেণীর তুষারাবৃত চূড়া দেখা গেল। কিছুক্ষণের মধ্যেই আমরা গাটা অন্তরীপ পার হইয়া আসিলাম এবং সমস্ত দিন ধরিয়া স্পেনের উপকূল বরাবর চলিতে লাগিলাম। সন্ধ্যাবেলা আসিয়া পৌঁছিলাম জিব্রলটারে। জাহাজ নোঙর ফেলিল বিখ্যাত দুর্গের সম্মুখে। এখানে যখন পৌঁছিলাম তখন আকাশ মেঘে ঢাকা ছিল এবং বৃষ্টি পড়িতেছিল। তাই আমরা বাহির হইতে পারিলাম না। কিন্তু পরদিন সকালে আমরা ডেক হইতে, ভূমধ্যসাগরে সাগরে প্রবেশের চাবিকাঠি স্বরূপ এই জিব্রলটারের ক্ষমতাসীন অবস্থানটি দেখিতে পাইলাম। ইহার দুর্গের ফটকেও একটি চাবি ঝুলিতেছে। খাড়া পাহাড়ের উপর দুর্গটি নির্মিত। এই পাহাড় ও ইহার বিপরীত আবীলা নামক আফ্রিকার পাহাড়কে প্রাচীনকালে পিলার্স অভ হারকিউলিস বলা হইত। ভূমধ্যসাগর ও অ্যাটলান্টিকের মধ্যবর্তী সঙ্কীর্ণ জিব্রলটার প্রণালীর দুই বিপরীত দিকে এই দুই পাহাড় স্তম্ভের মতই অবস্থান করিতেছে। জিব্রলটার প্রায় একটি দ্বীপের মত। মূল স্পেন ভূখণ্ডের সঙ্গে ইহা সঙ্কীর্ণ বালুকাময় জমির দ্বারা যুক্ত। মনে হয় পূর্বে কোনওকালে এই অংশ জলে ঢাকা ছিল। প্রকৃতি হইতেই জিব্রলটারকে কঠিন করিয়া গড়া হইয়াছে, তদুপরি বর্তমান উন্নত সাজসরঞ্জামের সাহায্যে ইহাকে দুর্ভেদ্য করিয়া তোলা হইয়াছে। ১৭০৪ সনে ইংলিশ ও ডাচ নৌবহরের মিলিত আক্রমণে স্থানটি স্পেনের হস্তচ্যুত হয়। সেই সময় হইতে এটি ব্রিটিশ অধিকারভুক্ত হইয়া আছে, যদিও মাঝে মাঝে বলপ্রয়োগে অথবা কৌশলপ্রয়োগে ইহাকে পুনর্দখল করিবার চেষ্টা হইয়াছে। একবার ব্রিটিশরা এখানে যখন অবরুদ্ধ অবস্থায় ছিল, সেই সময়ে স্পেনের এক রাণী এইরূপ শপথ গ্রহণ করেন যে, যতদিন ঐ স্থানে ব্রিটিশ পতাকা উড্ডীন থাকিবে, ততদিন তিনি অন্নজল গ্রহণ করিবেন না। কিন্তু তাঁহার এই শপথ পালনের যোগ্য ছিল না। দুর্গের উপর বারংবার নিষ্ফল আক্রমণ করিয়া হাজার হাজার স্পেনীয় যোদ্ধা বৃথাই জীবন হারাইল। ব্রিটিশ পতাকা তবু উড্ডীন রহিল। অবশেষে ব্রিটিশ শাসক রানীর প্রতি করুণাবশতঃ সাময়িকভাবে পতাকাটি নামাইয়া লইলেন, যাহাতে তিনি অনশন ভঙ্গ করিয়া শপথ ভঙ্গের দায় হইতে মুক্তি পাইতে পারেন। ১৭৭৯ হইতে ১৭৮৩ সন পর্যন্ত এই পাঁচ বৎসর ধরিয়া জিব্রলটারের অবরোধ সময়ে ফরাসী ও স্পেনীয়গণ একযোগে এখানকার দুর্গ আক্রমণ করিতেছিল। যে জাহাজ হইতে তাহারা গোলাবর্ষণ করিতেছিল তাহার পার্শ্বদেশ পুরু করিয়া খড়ের গদিতে আবৃত রাখা হইয়াছিল যাহাতে প্রতিপক্ষের গোলা আসিয়া জাহাজের পার্শ্বভেদ না করিতে পারে। চারিশত অতি ভারী ওজনের কামান এই দুর্গের উপর আক্রমণ চালাইতেছিল। ইংরেজ সেনাবাহিনী বিব্রত হইয়া পড়িয়াছিল। শাসনকর্তা বুঝিতে পারিতেছিলেন না, কেমন করিয়া এই সব গদি-আঁটা জাহাজগুলিকে ধ্বংস অথবা বিতাড়িত করা যাইতে পারে। শোনা যায় এক মাতাল সৈন্য বলিয়াছিল, জ্বলন্ত গোলা কামানে পুরিয়া শত্রুকে ঘায়েল কর। শাসনকর্তা এ প্রস্তাব পছন্দ করিয়া তৎক্ষণাৎ কামানগুলিতে আগুন-রাঙা গোলা পুরিয়া শত্রু জাহাজগুলিতে নিক্ষেপের ব্যবস্থা করিলেন। সেই অতি তপ্ত গোলাগুলি খড়ের গদিতে গিয়া যুদ্ধ জাহাজগুলিতে আগুন ধরাইয়া দিতে লাগিল। অল্প সময়ের মধ্যেই বহু জাহাজ পুড়িয়া গেল, কিন্তু সমগ্র নৌবাহিনী তখনও ধ্বংস হয় নাই। তারপর যখন এইরূপ গোলা চারি হাজারেরও অধিক নিক্ষিপ্ত হইল, তখন সব শেষ হইয়া গেল। দুর্গের দৃঢ়তা কতখানি তাহা বুঝিতে পারা যায় উভয়পক্ষের হতাহতের সংখ্যা দেখিয়া। এই গোলা বিনিময়ে শত্রুপক্ষের ২০০০ এর উপরে লোকক্ষয় হইয়াছিল, ব্রিটিশপক্ষে হত ১৬ জন এবং আহত ৬৮ জন। ক্ষয়ক্ষতির এই অসমতার আরও কারণ দুর্গের কামানসমূহ পাহাড়ের গায়ে বহু সুরঙ্গ কাটিয়া সেই সব সুরঙ্গের মধ্যে স্থাপন করা হইয়াছিল। আমরা সেই সুরঙ্গগুলি হইতে কামানসমূহের মুখ একটুখানি করিয়া বাহির হইয়া আছে তাহা অস্পষ্টভাবে দেখিতে পাইতেছিলাম। ইউরোপ ও আফ্রিকার মধ্যবর্তী জিব্রলটার প্রণালী দৈর্ঘ্যে ১২ লীগ (১ লীগ=৩ মাইল), এবং প্রস্থে পশ্চিম দিকে ৮ লীগ ও পূর্ব দিকে ৫ লীগ।

১লা এপ্রিল তারিখে আমরা জিব্রলটার প্রণালী পার হইয়া আটলান্টিক মহাসমুদ্রে প্রবেশ করিলাম। আকাশ পরিষ্কার, সূর্যালোক উজ্জ্বল; তাই আমরা জলের মহাবিস্তার স্পষ্ট দেখিতে পাইতেছিলাম। মনে পড়িল মাত্র চারি শত বৎসর পূর্বে এই মহাসমুদ্রকে পৃথিবীর শেষ সীমা মনে করা হইত। এবং সর্বাপেক্ষা দুঃসাহসী নাবিকও এই মহাসমুদ্রে অভিযান চালাইতে সাহসী হইত না। কিন্তু তাহার পর হইতে জগতে কি পরিবর্তনটাই না ঘটিয়া গেল! সভ্য মানুষ এখন পৃথিবীর সকল অংশে তাহার প্রভুত্ব বিস্তার করিয়াছে। এক-ঠ্যাংওয়ালা মানুষের এবং লম্বা কানওয়ালা মানুষের জাতির লুপ্তি ঘটিয়াছে। এই মানুষেরা এক কান পাতিয়া শুইত আর এক কানে গা ঢাকিত! কিন্তু এই মহাসাগরের পারে যে অজানা মহাদেশ ছিল, তাহাতে যে পরিমাণ আশ্চর্যজনক সব পরিবর্তন ঘটিয়াছে, এমন আর কোথাও ঘটে নাই। চারি শত বৎসর পূর্বে যেখানে নিরেট ঘন অরণ্যের পথে পাইন গাছের পাতায় পাতায় শব্দ জাগাইয়া সান্ধ্য বায়ু প্রবাহিত হইতে বাধা পাইত, সেইখানে এখন বড় বড় শহর সৌধসমূহ স্বর্গের দিকে উচ্চ শির তুলিতেছে। শক্তিশালী রেল-এনজিন, আগের দিনের বাইসন এবং হরিণেরা যেখানে মধ্যাহ্ন ভোজনে পরিতৃপ্ত মনে অর্ধ-নিদ্রাচ্ছন্ন অবস্থায় শুইয়া শুইয়া জাবর কাটিত, সেইখানে এখন রাজকীয় বিলাস-পূর্ণ দরবার গৃহতুল্য কক্ষসমূহ নিম্ন-ভূমিতে এবং পাহাড় পথে টানিয়া লইয়া চলিতেছে। সেখানে মাটি এবং জল হইতে এখন কোটি কোটি মানুষের আহার বস্ত্র ও বিলাসিতার উপকরণ আহরিত হইতেছে, অথচ সেই একই স্থানে পূর্বে অল্পসংখ্যক আরণ্যক মানুষ শিকার করিয়া বা মাছ ধরিয়া কোনোরকমে বিপজ্জনক জীবন কাটাইত। যে মানুষ প্রাকৃতিক প্রাচুর্যের সদ্ব্যবহার জানে, প্রাচুর্য তাহার ভোগে আসে। যাহারা তাহা জানে না, তাহাদের উচিত সেই সব মনুষ্যকেই স্থান ছাড়িয়া দেওয়া, যাহারা তাহা জানে। অ্যামেরিকার এবং অস্ট্রেলিয়ায় তাহাই হইয়াছে, বর্মাতেও

কর্মখালি

আমাদের বিশ্ববিখ্যাত জাপান মডেল পকেট ট্রানজিস্টারের অর্ডার সংগ্রহ করিবার জন্য পুরা বা আংশিক সময়ে মাসিক ৪৫০৲ টাকা অথবা শতকরা ৩৫৲ কমিশনে সারা ভারতে স্ত্রী বা পুরুষ প্রার্থী আবশ্যক। স্যাম্পেল সেটের জন্য নিম্নঠিকানায় আবেদন করুন।

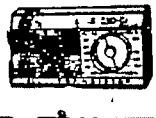

Employment Officer
(B.W.C.—88) Box 1564 Delhi-6

আলোয় আলোয়

সন্তোষকুমার অধিকারী

অট্টালিকার সেই কার্নিশটাই ভেঙে পড়লো আগে
খুলে গেল ভাঙা দেউড়ির পথটা।

বালখিল্য মানবকের দল আমরা
এতদিন শুধু দূর থেকেই
দুঃসহ এক কৌতূহল চোখে নিয়ে
দিনের পর দিন থেকেছি তাকিয়ে।
সেই উঁচু প্রাকারের কঠিন দেহ অতিক্রম করে
ভেতরে পৌঁছবার প্রচণ্ড ইচ্ছেটাকে
দমিত রেখেছি ভয়ে;
অথচ কি বিপুলে বিস্ময় ছিল মনে!

দেখলাম নড়বড় করছে ভিতগুলো
নোনা দেয়ালের গা-বেয়ে-ওঠা বটগাছের
শেকড় ছাড়াতে গিয়ে
ধসে পড়লো আস্তাবলের ছাদ।
ঘুলঘুলির ফোকর আশ্রয় করে থাকা—
পায়রার পাখায় বাতাস;
ফিকে হয়ে আসা অন্ধকার।

অতিকায় এক অজগরের মত বাড়িটাকে
ভেঙে ভেঙে টুকরো টুকরো করে
বাছাই করছে ভাবীকাল;
সময়ের জিভের বিষ মুছে
নির্মল হয়ে উঠছে অতীত।

আলোয় আলোয় আগুন হয়ে উঠছে আকাশ।

তাহাই হইবে, এবং পৃথিবীর অন্য সব স্থানেও তাহাই হইবে।

আবহাওয়া শান্ত ছিল, তথাপি পশ্চিম দিক হইতে বড় বড় ঢেউ আসিয়া জাহাজের পাশে আঘাত করিতে লাগিল, আর তাহার ফলে জাহাজটি বেজায় রকম দুলিতে লাগিল। প্রত্যেকটি দোলাতে জাহাজের একটা ধার কাত হইয়া পড়িতেছিল এবং এবং ডেক ঘিরিয়া যে উচ্চ বেষ্টনী থাকে জল প্রায় তাহা স্পর্শ করিতেছিল। তখন ডেকে হাঁটিয়া বেড়ান অসম্ভব, বসিয়াও স্বস্তি ছিল না, কারণ জাহাজ যখন তাহার একটি পাশের উপর ভর করিয়া কাত হইতেছিল, তখন আমাদের সমুদ্রে পড়িয়া যাইবার ভয় ছিল। বিছানায় শুইলে সেখান হইতে গড়াইয়া যাইবার ভয়। টেবিলে প্লেট ডিশ প্রভৃতি কাঠের এক-জাতীয় ফ্রেমে আটকান ছিল, অন্যথা সেগুলি নিচে পড়িয়া চূর্ণ হইত। এক ব্যক্তি জিজ্ঞাসা করিলেন শান্ত আবহাওয়া-তে এই, ঝড় উঠিলে জাহাজের কি অবস্থা হয়? আর একজন উত্তরে বলিলেন, তেমন অবস্থায় জাহাজ তাহার অক্ষের চতুর্দিকে ঘুরিতে থাকে। উপকূলের কাছে এমন অবস্থা হইলেও অ্যাটল্যান্টিক মহাসাগরের এই অংশে জাহাজ চলাচল, বিশেষ করিয়া ইউরোপ ও আমেরিকার মধ্যবর্তী পথে সব সময়েই সহজ এবং নিরাপদ থাকিয়াছে। স্থলভাগ হইতে কিছু দূরে ট্রেড উইন্ড বা আয়ন বায়ু সমভাবে বহিয়া থাকে। গ্রীষ্ম অঞ্চলের সমুদ্রে যেমন সাধারণত ঝড়ের আবহাওয়ার দেখা মেলে এখানে সেরকম নহে। পূর্ব দিনের পাল তোলা জাহাজে ভ্রমণের তুলনা করা হইত ধীরস্রোতা নদী-পথে চলার সঙ্গে। স্পেনবাসীরা খুব উচ্চকণ্ঠেই এই সমুদ্রের সদয় ব্যবহারের গুণগান করে, কারণ এই সমুদ্রই তাহাদের হঠাৎ একদিন বিজয়লক্ষ্মীর ক্রোড়ে তুলিয়া দিয়াছিল, ইহারই জন্য তাহাদের শক্তি সম্পদ এবং খ্যাতিলাভ হইয়াছে। তাহারা ইহার নাম দিয়াছে "লেডীজ সী"—মহিলা-দের সমুদ্র, কারণ এখানকার মন্দ বায়ু ইহার বুকে যে মনোহর চপল তরঙ্গ জাগায় তাহাতে সমুদ্রপ্রবরের এল ডোরাডোতে, অর্থাৎ স্পেনের অ্যামেরিকা বিজয়ীদের কাল্পনিক স্বর্ণভূমিতে, যাইবার জন্য অবলাদেরও মনে যথেষ্ট সাহস জাগে। হায়! Golfo de las damas! হায় মহিলাদের সমুদ্র! এককালে স্পেন-বাসীদের মনে কি মাদকতাই না জাগাইয়া-ছিল! আর আজ কি অধঃপতন! ভয়ের সমুদ্র বে অভ বিস্কেতে যখন প্রবেশ করিলাম তখন সমুদ্র শান্ত ছিল। এই উপসাগরটি যে কিরকম অস্থির এবং উদ্দাম যে বিষয়ে অনেক বৃত্তান্ত শুনিলাম। কিন্তু আমরা বেশ আরামেই এটি পার হইয়া গেলাম। বে অভ বিস্কেতে আমরা একটি তিমি দেখিলাম, সে তাহার নাক দিয়া ফোয়ারা উড়াইতেছিল। ইহা ভিন্ন কয়েকটি হাঙ্গরও আমাদের জাহাজের সঙ্গে সঙ্গে অনেক দূর আসিয়াছিল। ৫ই এপ্রিল ভোরবেলা আমরা এডিস্টোন আলোকস্তম্ভ ছাড়াইয়া গেলাম। এটি সমুদ্রের মাঝখানে নির্মিত। ইহার পরেই আমরা প্লিমাথ বন্দরে গিয়া পৌঁছিলাম। এটি ইংল্যান্ডের দক্ষিণে অবস্থিত। এইখানে আমাদের জাহাজ কয়েক ঘণ্টা কাটাইয়া মলটা ও জিব্রলটার হইতে প্রেরিত ডাক খালাস করিল। অনেক যাত্রী রেলপথে লণ্ডন যাইবার জন্য এইখানে নামিয়া গেল। আমরা জাহাজেই রহিলাম। জাহাজে প্লিমাথ হইতে লণ্ডন চব্বিশ ঘণ্টার পথ। ইংল্যান্ডের দক্ষিণ উপকূল বরাবর আমরা চলিতে লাগিলাম। ভারত সমুদ্রে অথবা লোহিতসাগরে আমরা অন্য জাহাজ কমই দেখিয়াছি। ভূমধ্যসাগরে এবং অ্যাট্লাণ্টিকে জাহাজের সংখ্যা অনেক বাড়িল, কিন্তু ইংলিশ চ্যানেলে দেখিলাম অসংখ্য জাহাজ চারিদিকে যাতায়াত করিতেছে, আমরা এখানে বাণিজ্যের বড় সড়কে উপস্থিত। ৬ই এপ্রিল সকাল বেলা আমরা টেমস নদীর মুখে আসিয়া পড়িলাম। মার্গেট গ্রেভ্‌স এণ্ড টিলবেরি ছাড়াইয়া গেলাম এবং দ্বিপ্রহরে লণ্ডনের নিকটস্থ আলবার্ট ডকে আসিয়া পৌঁছিলাম। [ক্রমশ]

তিমিরাভিসার

অগ্নিবর্ণা

[পূর্ব-প্রকাশিতের পর]

॥ চার ॥

ট্রেনেই ভদ্রলোকের সঙ্গে আলাপ হয়েছিল। বেশ স্মার্ট চকচকে চেহারা। মুখে রাত্রিজাগরণের খানিকটা ক্লান্তি। কিন্তু অবসাদ। কিন্তু ঠোঁটের ভঙ্গিমায় এতটুকু অতৃপ্তি নেই।

বেশ চঞ্চল ভাষাময় একজোড়া চোখ। জোড়া ভ্রু। নাকটি সুউন্নত না হলেও নিটোল বলতে বাধা নেই।

শেয়ালদা থেকেই একরাশ পত্র-পত্রিকা কিনে উঠেছিলেন গাড়িতে। ইভ্‌স উইকলি, কেমিনা, উল্টোরথ, সিনেমাজগৎ এবং সর্বোপরি ইলাস্ট্রেটেড উইক্‌লি। সব কটিই মূলত সিনেমাপত্র জাতীয়।

অবাক হই নি। সে-যুগ হয়েছে বাসি। যে-যুগে ট্রেনে বলে কথা নয়, সর্বদা সর্বত্র বিদ্বজ্জনের হাতে-হাতে শোভা পেত মূল্যবান পত্রিকাগুলি। আমাদের ছোটবেলায় দেখেছি বঙ্গবাণী, বিচিত্রা, ভারতবর্ষ, প্রবাসী জাতীয় কাগজ। বিচিত্রায় উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় রাজত্বে করছেন। ভারতবর্ষে জলধর সেন। প্রবাসীতে তো রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় কবলেন ডাবল সেঞ্চুরি। একদিকে রবীন্দ্রনাথ, অন্যদিকে শরৎচন্দ্র প্রমুখ লেখকদের সঙ্গে রামানন্দবাবুর কলম।

তার আগে ছিল সাধনা, ভারতী প্রভৃতি কাগজের যুগ। কিন্তু সে আরও আগের। বাবাদের আমলেই দেখেছি টেবিলে শোভা পাচ্ছে উত্তরা, সবুজপত্র মাসিকপত্র। এই সেদিনও রবীন্দ্র-আশীর্বাদধন্য পরিচয় পত্রিকা বেরিয়ে আসর মাৎ করেছে।

এখন পুরো সাহিত্যপত্রিকা আর চলেই না। বাঙালীর রুচি ও মেধা হয়েছে পরিবর্তিত। নতুন খাতে বইতে সুরু করেছে। এখন সংবাদ-সাহিত্য-চুটকি-সিনেমা-নাটক-সম্বলিত একটি সাড়ে বত্রিশ ভাজার আয়োজন।

জনৈক অধ্যাপকবন্ধুকে দুঃখ করতে শুনেছি এ নিয়ে। বলছিলেন, বাংলাদেশের এমন পরিবর্তন কল্পনা করা যায় না। রুচিত মান কতখানি নেমে গেছে। অধ্যাপকের দুঃখের কারণ অনুমান করতে পারি। শিক্ষিত সংস্কৃতিবান বাঙালী সাহিত্যের কদর বোঝে এ নিয়ে তার অভিমান ছিল। সে রবীন্দ্রনাথ-শরৎচন্দ্র-প্রমথ চৌধুরীর স্রষ্টা। একাধিক দুর্দান্তপ্রতাপ বাঙালী অধ্যাপক যুগযুগ ধরে এ মন লালন করেছেন। তৈরি করে তুলেছেন তাঁদের সাধনায়।

কিন্তু দুঃখ করেই বা লাভ কী। সবকিছুরই পরিবর্তন আছে। চক্রবৎ পরিবর্তন্তে সুখানি দুঃখানি চ। একটা চলমান জাতির জীবনে নানা ভাঙা-গড়া আছে। নানা বাঁক ফেরা আছে। একালের মনের মাটির মোড়ে সাহিত্য যেখানে বাঁক ফিরল, সেখানে হয়ত এই জাতীয় ফসলের সৃষ্টিই স্বাভাবিক। এ-যুগে লোকের মানসিকতা পরিবর্তিত হয়েছে। জীবনের নানা অর্থনৈতিক অবস্থার প্রভাবে এইটির সূচনা। আসলে মন-মেজাজ তো অর্থনৈতিক ব্যবস্থার হাতুড়িতে পিটেই তৈরি। সাহিত্যও অর্থনীতির সৃষ্টি এই কথা বলা চলে।

কাজেই এ-যুগের ইয়ংম্যান এবং যুবতীদের ট্রেনে-উঠে এ-জাতীয় পত্র-পত্রিকার সদ্ব্যবহারে মন খুশি হওয়া উচিত নয়। বরঞ্চ য়ুরোপ-আমেরিকা প্রভৃতি সুউন্নত দেশগুলির সঙ্গে আমাদের ছেলে-মেয়েরা কত না দ্রুতগতিতে পা ফেলে চলছে, সেইটি ভেবে উল্লসিত বোধ করি। আর বীরপূজা তো তবু একালে টিকে আছে জনপ্রিয় নটের প্রতি উচ্ছ্বসিত স্বতোৎসারিত ধারাস্রোতে। সিনেমা-হীরোদের যদি বীর বলি, তবে হীরোইনদের কি বলব? বীরাঙ্গনা? কিন্তু তাতেও আপত্তি উঠতে পারে। অঙ্গনা শব্দটির স্বাভাবিক অর্থে তাঁরা অনেকেই হয়ত ধর্তব্য নন। নহ বধূ নহ কন্যা সুন্দরী রূপসীদের যদি জীবনসঙ্গিনী বলতে আপত্তি, তবে হীরোইনদের না হয় যৌবনসঙ্গিনী বলে উল্লেখ করা যেতে পারে।

ভদ্রলোক একমনে কাগজ দেখে চলেছিলেন। ইভ্‌স ম্যাগাজিন।

বললাম, ইভ্‌সের ম্যাগাজিন লুকিয়ে পড়ছেন বুঝি? তারপর একটু হেসে কৃত্রিম গাম্ভীর্যে বললাম, ব্যাপারটা কিন্তু অন্যায়।

ভদ্রলোক পড়া থামিয়ে হো-হো শব্দ করে হেসে উঠলেন এত জোরে যে পার্শ্ববর্তী দু-একজন ভদ্রলোকের ট্রেনের দুলুনিতে আরামের ঘুমটি কেটে গেল। কিন্তু তিনি সেদিকে লক্ষ্যই করলেন না। বললেন, বেশ বলেছেন যা হোক। ইভ্‌সদের জন্য নির্ধারিত মহিলায় প্রবেশ করা সত্যিই আমাদের অপরাধ। জুড়ে দিলাম, এবং সেটা আইনের আওতায় পড়ে।

পড়ে না কি? উপস্থিত আপনি আইনের ধারা প্রয়োগ না করলেই বাঁচি।

ভদ্রলোক আবার হেসে উঠলেন। কাগজটি একপাশে রেখে দিতে দিতে বললেন, কিন্তু এই আলাদা আলাদা বাধা-নিষেধের জায়গাগুলিই সত্যি কথা বলতে ভয়ঙ্কর কৌতূহল উদ্দীপনার কারণ—আশা করি, একথা আপনি স্বীকার করবেন?

শীতের রাত্রি। বাইরে ঠাণ্ডা হাওয়ার অসহ্য দাপট। গাড়ির দুলুনিতে আরামদায়ক ঘুম একটু আগে যাঁদের ভেঙেছিল, তাঁরা আবার চোখ বুজেছেন। একটি বুড়ো মতন নাকে লোমওয়ালা ভদ্রলোক তো ঘুমে প্রায় দুলেদুলে পড়ছেন। কাউকে তুলতে হচ্ছে না। নিজেই অটোমেটিক-ব্যবস্থায় এক স্বয়ংক্রিয় তাগিদে মস্ত মাথাটা প্রায় হাঁটুর কাছ থেকে তুলে আনছেন। এই ঘুমভর্তি কামরার মধ্যে একা আমিই শুধু জেগে নেই, আরো একজন আছেন এবং যিনি বেশ ভালো রসিকতার প্রতি-উত্তর দিতে জানেন ভেবে ভালো লাগছিল।

গাড়িতে আমার ঘুম কোনদিনই আসে না। অনেককে দেখি গাড়িতে উঠেই ঘুমোবার জন্য ব্যগ্র হন। সহযাত্রীর মাথার ওপর দিয়ে বাংকের ওপর হোল্ড-অল তুলে দিতে তাঁদের পা মাড়িয়ে-ফাড়িয়ে একটা কুরুক্ষেত্র যুদ্ধোচিত কাণ্ড-কারখানা বাধিয়ে তোলেন। আসলে ঘুমুতে ঘুমুতে যাবেন বলে নয়, আমার তো মনে হয়, ঘুম দেবার জন্যেই এঁরা গাড়িতে ওঠেন। এবং অচিরাৎ শয্যাগত হবার পরে-পরেই নাসিকা-গর্জনের সূচনা।

গল্প-আলোচনা জমিয়ে বসতে চাইলাম ভদ্রলোকের সঙ্গে। বললাম, অনেকক্ষণ থেকে দেখছি আপনি একমনে পড়েই চলেছেন। ঘুম পাচ্ছে না বুঝি?

ভদ্রলোক বললেন, ঘুমোব কেন? এই হোল্ড-অল পেতেছি বলে? তারপরই বললেন, দেখুন, ঠিক ঘুমোব বলে নয়, আরাম করে বসব বলে এটি এনেছি।

আমি অবশ্য কম্বলটি জড়িয়ে আরাম করে বসেছি কাষ্ঠাসনে। বললাম, ঘুম অবশ্য এমনিতে আমারও আসে না। গাড়ির দোলায় যদি বা চোখ বুজতে চায় নাসিকা-গর্জনে মন বোজে না। মনে হয়

জন একটা হিংস্র জন্তু আক্রমণ করে ফিরছে আমাকে একাকী পেয়ে।

আলাপ জমে উঠল। আমি যাচ্ছি আলিপুরদুয়ারের দিকে। ব্রডগেজ লাইনের নতুন স্টেশনটির নাম অবশ্য নিউ আলিপুরদুয়ার। নিউ মানে নতুন। নতুনের কদর চিরকাল আছে। কিন্তু একালে এ অঞ্চলের স্টেশনগুলিতে বেছে-বেছে "নিউ" শব্দটির ব্যবহার দেখে মনে হয় যেন "নিউ"-এর কদর অসম্ভাবিতরূপে হ্রাস পাচ্ছে। তাই বারবার করে শব্দটির প্রয়োগ। নিউ জলপাইগুড়ি, নিউ বঙ্গাইগাঁও, নিউ মাল, নিউ কুচবিহার, নিউ আলিপুরদুয়ার ইত্যাদি। হয়ত নতুনত্বেরই মোহ।

উনি বললেন, নিউ আলিপুরদুয়ার যাচ্ছেন আপনি?

না, নিউ আলিপুরদুয়ারে অবশ্য বাড়িঘর বলতে কিছু নেই। ব্রডগেজ লাইনের সৃষ্টির কিছুদিন আগে পর্যন্ত ওখানে ছিল দীর্ঘ-প্রসারিত ধানক্ষেত। নতুন-আবাদের কচি-কচি সবুজ চারাগুলি যখন বাতাসে দুলত তখন মনে হ'ত একটা সবুজ সমুদ্র বুঝি আন্দোলিত হচ্ছে ঢেউয়ে। তারপর সেই ধান যখন পাকত আগাগোড়া দিগন্তব্যাপী স্বর্ণ-শস্যক্ষেত্রের অবাধ বিস্তার। ওইদিকে ছিল নুনাই নদীর পোল। আলিপুরদুয়ার জংশন থেকে আসামের দিকে যেতে একমাত্র মিটারগেজ লাইনে পড়ে। এখনো আছে ব্রীজ। সরু নদী এঁকে-বেঁকে এসেছে গ্রাম-জঙ্গল বনান্তরালের ফাঁকে-ফাঁকে। ডুয়ার্সডাবরি চা-বাগানের পিছনদিক দিয়ে ঘুরে প্রবাহিত হয়ে এসেছে এদিকে। মিষ্টি জল নুনাই। তীরে-তীরে শুধু জংলি ফুলগাছের মেলা। আর সেই তীরের ওপর থেকেই প্রসারিত সমতল ধানক্ষেত। শীতে পাহাড় থেকে নামত জংলি টিয়ের ঝাঁক। নাম-না-জানা অসংখ্য পাখি। বুনো কোপে-জঙ্গলে কিষাবনের ধারে ডাকত বন-মোরগের দল। রাত্রে সাঁ-সাঁ করে কাঁপত ঠাণ্ডা বাতাস। কচি বাঁশের বন নুইয়ে দিত হাওয়া। কুয়াশা মুঠি-মুঠি ঝরে পড়ত। দু'-চারটে কৃষকের বাড়িও ছিল। খড়োঘর। মাচায় লাউ, চালের ওপরে পুইডগা। উঠোনে সীমের ফুল ফুটত। সংক্রান্তির দিন চিনি-বাতাসা দিত মানুষে ঠাকুরকে। আর সকালের দিকে কোন কোনদিন সাতারা বাজিয়ে গাইত কোন গায়ক—

আজি ফান্দে পড়িয়া বগা কান্দেরে।
কান বসাইচে ফান্দি ভাইয়া পুটিমাছ দিয়া,
মাছের লোভে ওরে বগা পড়ে উয়াও দিয়ারে।
আজি ফান্দে পড়িয়া.....

ইত্যাদি ইত্যাদি। সেই গান শুনতে এদিক-ওদিকের দু'-চার-পাঁচজন মানুষে ভিড় করত। তারপর একদিন রেলের লাইন এল এগিয়ে। ধানক্ষেত মারা পড়ল, জনপদের কিছু চিহ্ন। অবশ্য রেল ক্ষতি-পূরণ দিল বিপুল হাতে। আর সেই ক্ষতিপূরণের লোভে দলে দলে জায়গা-জমির বিবরণ লেখাল। সুপারি-বাগান নারকেল-বাগান মূল্যবান গাছের আবাদ।

ভদ্রলোক বললেন, অফিসারকে হাত করে কিছু বেশি-বেশি লেখাল বলুন। জাতীয় সম্পদের একটা মোটা অংশ চলে গেল লোভী মানুষের ভোগে।

বললাম, আপনি কি করে জানলেন? গেছেন নাকি কখনো?

পরিচ্ছন্ন হাস্যে ভদ্রলোক বললেন, যেতে হবে কেন? ডুয়ার্স কি দেশের বাইরে নতুন কোন জায়গা? না-গিয়েও জানা যায়।

তাহলে আর কি বলছি আপনাকে বক-বক করে! সবই তো জেনে বসে আছেন দেখছি।

আরে না না—

না কি? বলুন দেখি আমি কোথায় যাচ্ছি?

আপনার নিজের মুখেই কবুল—সেটা আলিপুরদুয়ার।

কিন্তু আলিপুরদুয়ার সেখান থেকে বেশ দূরে। রেলের কিছু কোয়ার্টার ছাড়া ইস্কুল, বাজার-হাট, ডাকঘর সবকিছুই দূরে।

আপনি বুঝি সেখানেই থাকেন?

আজ্ঞে না। মাঝে মাঝেই ঘুরতে ফিরতে হয়।

জার্নালিস্টদের ঘোরাই কাজ।

সচমকে বলি, আপনি কি ওয়াচ-এ্যান্ড ওয়ার্ডের লোক মশাই? কে বলল আমি জার্নালিস্ট?

ওয়াচ এ্যান্ড ওয়ার্ড দূরে থাক, রহস্য-ভেদী কিরীটি রায় পর্যন্ত পড়ি নি।

তাহলে?

ভদ্রলোক আমার কৌতূহল নিরসন করলেন। বললেন, নেহাৎ গোবেচারা আপনার ওই ট্রাঙ্কের লেবেলটি দেখে।

অতঃপর দু'জনেরই একসঙ্গে হেসে ওঠবার পালা।

হাসি থামলে বললাম, ভারি খুশি হলাম আপনার সঙ্গে পরিচিত হয়ে। আপনার নামটি কি যদি জানতে পাই—

ভদ্রলোক অম্লানবদনে নাম বললেন, যদিও জার্নালিস্টকে নাম বলা উচিত নয়। তবু বলছি। দেখবেন যেন কোথাও উল্লেখ করবেন না।

নাম শুনে বিস্মিত। ভদ্রলোককে আমি বাঙালীতনয় ভেবেছিলাম। জলপাই-গুড়ি শহরের কোন মাড়োয়ারীর ছেলে। কিন্তু কে বলবে সে-কথা? চমৎকার বাংলা বলতে পারেন। হাবেভাবে চৌকশ বাঙালী-ঘরের যুবক। নাম বললেন, লক্ষ্মীকুমার আগরওয়ালা।

জিজ্ঞাসা করতে ইচ্ছে হচ্ছিল, লক্ষ্মী আবার কুমার হলেন কবে? কুমারী-ও তো নন। তবে নামের সঙ্গে কুমার শব্দটি তো বাঙালীরাই ব্যবহার করেন শুনেছি। মাড়োয়ারীরা লক্ষ্মীরই ভজনা করেন বিশেষভাবে, তবে নামের সঙ্গে তাঁরা প্রসাদ, লাল ইত্যাদি ব্যবহার করে থাকেন। তাই কিঞ্চিৎ হতচকিত।

আপনার নামটা কি জানতে পাই?

বললাম। তিনি বললেন, আমার নামটা শুনে আপনি একটু অবাক হচ্ছেন মনে হল। নামটা বাঙালী-বাঙালী ঠেকছে, না? আসলে পদবীটা ঠিকই আছে, স্বভাবত আমরা বাঙালী হয়ে গেছি। বাংলা দেশেই জন্ম। ডুয়ার্সের চা-বাগানে ব্যবসা নিয়ে আছি। আমরা চার ভাই। সবারই ওইরকম নাম। ছোট ভাইয়ের নাম বিমলকুমার। আর একমাত্র বোনের নামটি কি জানেন?

বললাম, কি?

লক্ষ্মীকুমার বললেন, লীনা।

পকেট থেকে সিগারেটের প্যাকেট বার করতে করতে হঠাৎই বললেন, ডুয়ার্সে এরকম নাম অনেক পাবেন আজকাল আমাদের মধ্যে। আচার-ব্যবহারেও। আসলে কি জানেন আমরা সবাই কসমোপলিটান হয়ে যাচ্ছি। আগের যুগের বিধি-বিধান আচার-আচরণে ভেঙে। টু এ সিংগল হোল।

ভদ্রলোক ব্যগ্রভাবে বললেন, বলুন এটা অত্যন্ত আশা-আনন্দের সংবাদ কি না? এ্যান্ড আই স্ট্রঙ্গ সে—দ্যাট্স সিওর টু কাম। মহাকালই প্রতিদিন নিজের হাতে ভেঙে দিচ্ছে। গড়ে তুলছে। এ ঝগড়া-ঝাঁটি করে হিন্দীভাষা চাপাবার মত নয়। যার যেটি ভাল, ফোর্সফুল—সেইটেই চলবে। সবাই মিলে তাই মেনে নেবে। ইজিস্ট্ ইট? নিন ধরুন। বলে খোলা ক্যাপস্টেনের প্যাকেটখানা আমার সামনে তুলে ধরলেন।

॥ পাঁচ ॥

ছেলেবেলায় একবার বোবায় ধরেছিল।

এই বোবায় ধরা জিনিসটি যে কী, যিনি দেখেন নি, তাঁকে বোঝাতে যাবার মত পণ্ডশ্রম আর কিছু নেই।

গলা আটকে গেছে। একটা কিছু ঘটে গেছে স্বপ্নের মধ্যে। এক আততায়ী তাড়া করেছে। প্রাণপণে তাড়া করেছে। দেয়ালের মধ্যে ঠেসে ধরেছে। অথবা আচমকা কুয়োর মধ্যে পড়ে গেছি। প্রাণপণে

সাহায্যের জন্য আর্ত চীৎকার করে চলেছি। গলা দিয়ে শব্দ বেরোচ্ছে না। শুধু একটা গোঁ-গোঁ আওয়াজ ঠেলে বেরুচ্ছে। ভয়ংকর অনুভূতি।

শব্দটা মা-ই প্রথম টের পেয়েছিলেন। যখন ব্যস্ত-সমস্ত হয়ে আমাকে জাগিয়ে দিলেন, তখন সর্বাঙ্গ ঘামে ভিজে যাচ্ছে। ভীষণ অবস্থা। এক গ্লাস ঠাণ্ডা জল সবটুকু নিঃশেষে পান করে কপালে কানে জল ছিটিয়ে তবে স্বস্তি পাওয়া গিয়েছিল।

আজও অন্ধকার রাত্রে দুর্জয় পাহাড়ি-শীতের হাওয়ায় সেই রকম একটা অনুভূতি বোধ করছিলাম। তবে তফাৎটা এই যে, সেরকম "বোবায় ধরা" আর এ-জাতীয় হাড়-কাঁপানো শীতের প্রাবল্যে সমস্ত দেহ সকল সত্তা কাঁপিয়ে গোঁ-গোঁ শব্দ বার হওয়ার মধ্যে অনেক পার্থক্য। সেটা ঘুমের মধ্যে। কিন্তু ঘুমলেও তো চেতনা ঠিকই থাকে মানুষের। তাকে অচেতন হওয়া বলে না। আর এ জাগ্রত অবস্থায়। জেগে-জেগেই আমি বোবায় ধরার মত শীতের হাওয়ার একটা অসহ্য কাঁপনে গোঁ-গোঁ শব্দ করে উঠছিলাম। নিজেরই অজান্তে। স্থান রাজাভাত-খাওয়া ও দমনপুরের মাঝামাঝি। দু'ধারে ঘন বিজার্ভ ফরেস্টের বিস্তার। অন্ধকার হয়ে গেছে অনেকক্ষণ। বনের ভেতর হাওয়া ছিল না এতক্ষণ। এইবারে হাওয়া দেখা দিতে জানুয়ারী-শেষের প্রচণ্ড শৈত্য অনিবার্য হয়ে উঠল।

রাজাভাত-খাওয়া গিয়েছিলাম এক জরুরী সাংসারিক প্রয়োজনে। সঙ্গে সাইকেল ছিল। বিকেলের মধ্যেই ফিরব কথা ছিল। তাই প্রয়োজন থাকলেও গরম কাপড় নিয়ে যাবার কথা মনে হয় নি। আসল কথা, কাজটায় আমার কিছু তাড়া ছিল। তাই অতশত ভেবে দেখবার সময় হয় নি।

কিন্তু কথায়-কথায় দেরি হয়ে গেল। এজন্যে অবশ্য কাউকে দোষ দেবার ছিল না। চিরকাল দেখেছি, কথা বলতে শুরু করলে ঠিক কোথায় থামতে হবে, সেটা ভুলে যাওয়াই আমার স্বভাব। আসলে এর চাইতে বড় দোষ আর কিছু আছে কি না সন্দেহ। সময় মত থামতে জানা চাই। অনেকে দেখেছি, সব ব্যাপারে বাড়াবাড়ি করতে গেলেও ঠিক সময় মত থামার কথাটি জানেন। অন্যদের ক্ষেত্রে কী হয় জানি না, বক্তাদের পক্ষে থামার নিয়ম পালনটি ঘোরতররূপে আচরণীয়। এমন হতে পারে যে, শ্রোতারা যখন বক্তার কথা শুনতে শুনতে দন্তবমত উত্তেজিত, তখন সময়-মাফিক পিঠটান দিতে না-পারার মত ভীষণতর ডিসকোয়ালিফিকেশন আর কিছু নেই।

আলোচনার একটা নির্দিষ্ট স্তরে আমাকে হঠাৎ থামিয়ে দিয়ে ভদ্রলোকটি বললেন, আপনি কি আজ ফিরতেই চান?

বলা বাহুল্য, আমাকে ফিরতেই হবে। ততক্ষণে বিকেল ছয়াধসর হয়ে গেছে। ভদ্রলোক বললেন, তাহলে আর বিলম্ব না করে ফিরতে হবে। সাইকেলে উঠে পড়ুন। আপনার সঙ্গে আমি একজন লোক দিয়ে দিচ্ছি।

ফিরছিলাম। কিন্তু কপালের দুঃখ খণ্ডাবে কে? শাস্ত্রেই যে বলেছে, যেখানে বাঘের ভয় সেইখানেই সন্ধ্যে হয়।

লালবাহাদুর পিছনে, আমি আগে আগে। দু'জনেই সাইকেলে। এমন সময় প্রায় অর্ধপথে আচম্বিতে দ্বি-চক্রযানের অসহযোগ। দেখা গেল, একটি চাকা পাংচার্ড হয়ে গেছে।

বনের পথ। শীতের রাত্রি সামনে। মুখ শুকোল।

বাহাদুর, এখান থেকে দমনপুর পর্যন্ত হাঁটতে কতক্ষণ লাগবে?

সাইকেল থেকে বাহাদুরও নেমেছে। বলল, তা লাগবে বাবু হাঁটাপথে।

তার মুখের ভঙ্গিতেই বুঝলাম বক্তব্য।

মনের মধ্যে ভয় যথেষ্টই ছিল। বললাম, বুঝতেই পারছ ত'। এখন আর হাঁটাপথ ছাড়া উপায় নেই। কোনো ভয়ভিত নেই ত'?

ভয় নিশ্চয়ই আছে। তবে দেখলাম লালবাহাদুর সে-সবের পরোয়া করে না। অচল গাড়িটা সে ঠেলতে ঠেলতে নিয়ে গেল নিকটবর্তী এক বাড়িতে। লোকটা পরিচিত লালবাহাদুরের। জাতিতেও নেপালী। ফরেস্ট বিভাগেরই লোক। তাদেরই জমিতে থাকে। একটেরে ঘর। কাঁটাতারের বেড়া। মকাই-এর ক্ষেত।

ব্যাপারটা বুঝিয়ে বলল লালবাহাদুর। গাড়ি দু'টো সে রাখতে চায়। কাল সকালের দিকে নিয়ে যাবে।—এখন ত' আর ঘণ্টা দুয়েকের আগে বাসও পাওয়া যাবে না। এতক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকবেন? আমার দিকে তাকিয়ে বলল।

লালবাহাদুরকে বললাম, গাড়িটা যদি এখানে থাকে আর তুমি বনের মধ্যে বাঘ-ভালুকের পেটে যাবার ভয় না পাও, তাহলে তোমার সঙ্গে আমিও পথটুকু হাঁটতে রাজী আছি।

অতঃপর হাঁটাপথ। কালো চকচকে পিচঢালা রাস্তা বনের মধ্যে দিয়ে। ইতিমধ্যে অন্ধকার হয়ে এসেছে। সহসা দেখা দিল হাওয়া। হাওয়ার প্রথম দমকেই চমকে উঠেছিলাম। ডানদিকের বনের গাছপালার ভেতর থেকে লাফিয়ে ঝাঁদিকে চলে গেল ক'টা বানর। আর, তার সঙ্গে-সঙ্গেই হাওয়ার শোঁ-শোঁ শব্দে ও কাঁপনে একরাশ শুকনো পাতা উড়িয়ে দিতে লাগল পথের মধ্যে।

পাঁজরের মধ্যে প্রবল আক্রোশে লম্ফ

ভারতের
আদিতম
স্বাস্থ্যসন্ধান

চ্যবনপ্রাশ

আয়ুর্বেদোক্ত বিশুদ্ধ উপাদানে প্রস্তুত

চ্যবনপ্রাশ নূতন ও পুরাতন সর্দ্দি কাশি, স্বরভঙ্গ ও শ্বাসযন্ত্রের পীড়ায় বিশেষ উপকারী। টনিক হিসাবে নিয়মিত ব্যবহারে দেহের দৌর্ব্বল্য ও রুগ্নতা দূর করে ও শরীরের পুষ্টি সাধন করিয়া স্বাস্থ্যশ্রীর পুনরুদ্ধার করে।

বেঙ্গল কেমিক্যাল

কলিকাতা বোম্বাই কানপুর

লক্ষ সূচ ফুটিয়ে দিচ্ছিল বাতাস। শঙ্কর মাছের লেজের চাবুকের মত সেই হাওয়ার ঝাপটা আমার পক্ষে সহ্য করা কঠিন হচ্ছিল। যতই অসহ্য হচ্ছিল, ততই যেন বাতাসের বেগ বাড়ছিল। শৈত্য-প্রবাহের অকল্পনীয় মারমূর্তিতে আমি ক্রমেই যেন চৈতন্য হারিয়ে হিমশীতল বরফের টুকরোর পরিণত হচ্ছিলাম। প্রথমে তবু জন্তু-জানোয়ারের ভয় ছিল। এখন আর তাও মনে ছিল না। শেষ-জানুয়ারীর শীতে আমার হাত-পা, শরীরের সমস্ত খিল সব গ্রন্থিগুলি ঠক্‌ঠক্ করে কাঁপছিল। আমি আর চলতে পারছিলাম না।

অবশেষে লালবাহাদুরই হাত ধরে আমাকে একটা বাড়ির মধ্যে ডেকে নিল। গলা দিয়ে বোবা-ধরার মত একটা অদ্ভুত শব্দ বেরোচ্ছিল আমার। মৃত্যু-যন্ত্রণার মত গোঁ-গোঁ শব্দ বেরিয়ে আসছিল গলা দিয়ে।

লালবাহাদুর বলল, কোনো ভয় নেই, বাবুজী। আমার হাতটা ধরে থাকুন। আসুন আমার সঙ্গে।

তার হাত কি করে ধরেছিলাম, অথবা সে নিজেই আমার হাত ধরে নিয়েছিল মনে নেই। তবে এইটুকু মনে আছে, একটা বাড়ির দরজার সামনে দাঁড়ান গেল। কার বাড়ি এই জঙ্গলের মধ্যে? আমি ভাবছিলাম না। কিছুই ভাববার অবস্থা ছিল না আমার। শুধু গোঁ-গোঁ শব্দটা উঠছিল।

একটা ছায়ামত লোক দরজা খুলে দাঁড়িয়েছিল। দরজাটা খুলে গেল মুহূর্তে। হাতের শব্দমাত্রেই। তিনজন লোক ঘরের মধ্যে গোল হয়ে বসেছিল। দুটি মেয়ে, ছোট একটি ছেলে।— মাঝখানে আগুন। মাটির মধ্যে গর্ত করে তাতে ঘুটের আগুন জ্বালানো হয়েছিল। পুরুষটি উঠে দরজা খুলেছিল। সারা গা খালি। মেয়ে দুটি এবং ছেলেটিরও তাই। গায়ে সামান্যমাত্রই আচ্ছাদন ছিল। মেয়ে দুটি জড়সড়ভাবে নিজেদের দেহে বস্ত্রাবরণের স্বল্প সম্বলটুকু টানছিল। একটা বোতল কাত হয়েছিল একদিকে। লালবাহাদুরের সঙ্গে পুরুষটির কী বাক্যবিনিময় হয়েছিল তা-ও আমার সম্পূর্ণ অজানা। লালবাহাদুর হয়ত নিজেদের ভাষায় তাকে আমার অবস্থার কথা বলেছিল। পুরুষটি আর কোনো কথা বলে নি। ঝাঁপের দরজাটা আবার বন্ধ হল পিছনে। বাইরে তখনও একটানা হাওয়ার শব্দটা চলছিলই। আমাকে দুজনে মিলে ধরে সেই আগুনের ধারে বসিয়ে দেওয়া হয়েছিল। লালবাহাদুর আমার হাতটা ধরে থাকল একদিকে। অন্যদিকে সেই পুরুষটি। একটি মেয়ে উঠে সেই বোতলটা নিয়ে এল। বাঁচবার এক প্রচণ্ড তাগিদে আমি হাঁ করছিলাম। আমাকে ভিতর থেকে কে যেন বলে দিয়েছিল আমি জানি না যে হাঁ করতে হবে।

খানিকটা তরল পদার্থ আমার মুখের মধ্যে পড়ল। মুখ পুড়িয়ে জিভে একটা আস্বাদ। অতঃপর সেটা গলা দিয়ে নামতে লাগল।

আমার জীবনে সে এক বিচিত্র রাত।

কত বছর আগের সে ঘটনা? চার বছর চলে গেছে ইতিমধ্যে? হিসেব করে দেখি মনে মনে। না, চার বছর তো নয়। পাক্কা ছটি বছর চলে গেছে এর মধ্যে। তখন আমি নতুন এসেছি এ অঞ্চলে। সকল অবস্থার সাথে পরিচয় নেই। একটা ব্যবসা-প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধি হয়ে। কিন্তু আজ মনে হয়, সেই রাত্রিটির কথা। নির্জন ডুয়ার্সের অন্ধকার শীতরাত্রির অরণ্যে প্রায়-নিঃস্ব একটি আদিবাসী পরিবার কত যে আন্তরিকতা নিয়ে আশ্রিত মানুষের সেবা করতে পারে, সেই রাত্রির ঘটনা আমাকে তাই স্মরণ করিয়ে দেয়। তাদের নিজেদেরই শীতের আবরণ দূরে থাক, লজ্জা নিবারণের সামান্য বস্ত্রটুকু পর্যন্ত ছিল না। সেই ভয়ংকরতম শীত সন্ধ্যায় নিষ্ঠুর পরিবেশে তারা তাদের দেহে উত্তাপ-সঞ্চারের জন্য হামাগুড়ির মত ঘুটিসুটি মেরে আদি অগ্নির কাছে বসেছিল। তা-ও গাছের কাণ্ড নয়, ঘুটের আগুন। বোধ করি, আদিম যুগের প্রাকার-ছায়ার গুহার মধ্যে এইরকম করে বসে থাকত আমাদের পূর্বপুরুষেরা। তারপরে সভ্যতা কত শতাব্দীর পর শতাব্দী হাঁটল। কত না উন্নতি, সভ্যতার কত উজ্জ্বল অগ্রগতির চূড়া স্পর্শ করল আকাশ! কিন্তু তবু মানুষজনের অভাব আজও মিটল না। আজো আগুনের ধারে নগ্ন মানব-সন্তান-দেরই বসে বসে শীতের হাত থেকে বাঁচবার জন্য উত্তাপ ভিক্ষা করতে হয়!

কিন্তু তবু তারা আমার জন্য যা করেছিল, সভ্য শিক্ষিত মানুষরা সে তুলনায় কিছুই করে না বলতে গেলে প্রতিবেশী-দের জন্য। নিজের পরিবারের মধ্যে হাত ধরে শুধু ডেকেই নেয় নি। তাদের সঙ্গে বসবার অধিকার দিয়েছিল আগুনের উত্তাপের ধারে। আর তাদের সামান্য সম্বল বোতলের বেশ খানিকটা অকাতরে আমার গলায় ঢেলে দিয়েছিল। তাদের দুঃখ ছিল না। ক্ষোভ ছিল না। সারা রাত কাটিয়ে ভোরে যখন উঠে আসি, তখন দেখি তাদের একটিমাত্র দড়ির খাটিয়ার একটা দড়ি পর্যন্ত নেই। আমি লাল-বাহাদুরের হাতে তাদের দেবার জন্য পকেট থেকে একটা পাঁচ টাকার নোট দিতে যাচ্ছিলাম, লোকটা আমার হাত ধরে ফেলল।

তোমার ছেলেকে একটা জামা কিনে দিও। আমি নিজেই তো খুশি হয়ে তোমাকে দিচ্ছি।

নোট-সুদ্ধ আমার হাতটা ঠেকিয়ে রাখছিল লোকটা। তার নিজেরও হাতটা থরথর করে কাঁপছিল। আমি বুঝতে পারছিলাম না। বললাম, তোমার আপত্তিটা কিসের?

লোকটা যা বলল, তার অর্থ এই যে, বাবু সাব আমি গরিব আছি। পাঁচটা টাকা নিলেও আমার অবস্থার কোন পরিবর্তনই হবে না। যে-গরিব আছি সেই গরিবই থাকব। তবে মিছে কেন কটা টাকা নিয়ে স্বভাব খারাপ করব?

স্বভাব খারাপ কেন?

সে আমার প্রশ্নের জবাব এড়িয়ে গেল। বলল, তুমি খুশি হয়ে দিচ্ছ জানি। কিন্তু আমরা খেটে খাই। মুফত্ কারুর পয়সা নিই না।

এ তো নেওয়া নয়। আমি খুশি হয়ে দিচ্ছি। দ্যাখ, তোমার ছেলেটিকে দেখে আমার বড় কষ্ট হয়েছে, তাই—

ছেলে বড় হয়েছে। আমরা চাই সে তার অবস্থা বুঝতে শিখুক।

কিন্তু তার অভাব দূর হোক, তোমরা চাও না?

অভাব চেয়ে দূর হয় না, বাবু। আমরা ছোটনাগপুর জেলার লোক। আমার বাবা অনেক দিন আগে রুজি-রোজগারের জন্য এখানে এসেছিল। কিন্তু কিছুই করতে পারল না। কুলিগিরি করেই মরে গেল। আমরাও তাই করছি। আমি, আমার আওরৎ-ও তাই করে। হাঁ, বাবু একটা কথা বলব? গরিব-রাজের কথা খুব শুনি। গরিব-রাজ কি সত্যি কোন-দিন হবে?

এক বন্ধুর কাছে গল্পটি বলছিলাম।

ঘরে আলো জ্বলছে।

ঘরের ভেতরে বসেছি নরম গদির চেয়ারে। সামনে ধূমায়মান কফির পেয়ালা। মুখোমুখি বন্ধুটি। গল্প শুনতে-শুনতে বন্ধুটি বললেন,—এই আগ্রহেই মস্ত শুভলক্ষণ।

শুভলক্ষণ?

বন্ধুটি বললেন, হাঁ, মস্ত শুভলক্ষণ বলতে হবে। অন্তত ডুয়ার্সের অবস্থার পরিবর্তন হচ্ছে এতেই তার প্রমাণ। কি ছিল ডুয়ার্স? কোথা থেকে এল? শুনবে তার গল্প? ডুয়ার্সের অতীত জানলে এই আগ্রহটুকুই মস্ত সম্পদ বলে গণ্য করতে।

আমি কফির পেয়ালায় একটা চুমুক দিয়ে গল্পের জন্য উৎসুক হয়ে উঠলাম।

কথরের কথা

মনোরঞ্জন হাজরা

অদ্ভুত লোকটা।

মাঝে মাঝে লোকটা 'আল্লা' 'আল্লা' বলে দীর্ঘশ্বাস ছাড়ে বলে লোকে তাকে মুসলমান বলে জানে। তার কথা শুনে কেউ তাকে মনে করবে না যে সে পাগল, তবু লোকে তাকে পাগল বলেই মনে করে। লোকের দেখাদেখি আমিও তাই মনে করতুম। দিব্যি লম্বাটে ছিপছিপে গড়ন লোকটার। গায়ের রংটাও পরিষ্কার, মাথার চুলগুলো ঘন আর কোঁকড়ানো, প্রায়ই থাকে অবিন্যস্ত। কিন্তু তাতেই যেন লোকটাকে সুন্দর দেখায় আরো। মাঝে মাঝে দাড়ি-গোঁফ জমে ওঠে দু-চার দিনের, তবে সে কামাতেও অভ্যস্ত। কাপড়-জামা যা পরে তা মোটেই নোংরা নয়, তবে তার কোণ-সেলাই পাঞ্জাবীটা জীর্ণতার দাবি রাখে। পায়ে একজোড়া চপ্পল। তার বয়স আনুমানিক তিরিশ। টাইপটা তার ভবঘুরের মত। সারাদিন টো-টো করে ঘোরে শুধু। মাঝে মাঝে তাকে পথের ধারে কোন গাছতলায়, কিম্বা রেলওয়ে স্টেশনের বেঞ্চেও দেখা যায়। লোকটার টাইপ ভবঘুরের মত হলেও কিন্তু ভিক্ষাবৃত্তিকে সে পরিহার করে চলে। বরং দেখা যায় আত্মসম্মান-জ্ঞান তার খুবই প্রখর। কোন লোক তাকে দয়াপরবশ হয়ে কিছু দিতে গেলে সে তা নেবে না তো বটেই উপরন্তু ক্ষীণ একটু হেসে বলবে, 'মাপ করবেন আমি ভিখিরী নই।'

কিন্তু তাহলে লোকটা কি? ওর চলেই বা কি করে? আমার পরিচিতেরা বলেছিলেন, সেইটেই আমাদের কাছে রহস্য। কিন্তু আমার খুব রহস্য বলে মনে হত না। লোকটার সঙ্গে আমার দেখা হলেই দু'জনে চোখোচোখি হত। দু'জনেই ঈষৎ হাসতুম। যেন পরস্পর পরস্পরের কাছে বহুদিনের চেনা।

নিজে তখন আত্মগোপন করে থাকি। মাথার ওপর আমার খাঁড়া ঝুলছিল। ধরা পড়লে হয় দ্বীপান্তর নয় ফাঁসি। এখানে আছি অন্য নামে। ইংরেজ রাজত্বের অবসান তখন আমার একমাত্র কাম্য। ৫ . কারখানার শ্রমিকদের মধ্যে শ্রমিক হয়ে বাস করছি। পনেরো টাকার মত হপ্তা পাই। একেবারে চটকলিয়া বনে গেছি। পুলিশের বাবার সাধ্যি নেই যে আমাকে খুঁজে পায়। হপ্তার দরুণ যা পাই তার কিছুটা গোপন কাগজপত্র ছাপাতে ব্যয় করি, কিছুটায় নানাজাতীয় বইপত্র কিনি। যেটুকু বাঁচে সেটুকুতে গ্রাসাচ্ছাদন চালাই। বাড়ির কথা—বলতে কি বাড়ির কথা আমি প্রায় ভুলেই গেছি। তাছাড়া বাড়ির লোকেও আমায় খরচের খাতায় তুলে রেখেছে।

এহেন অবস্থায় আমার নিজের মন প্রায়ই যেন আমায় বলে উঠত, 'তুমি এ্যাবসকণ্ডার, তোমার অত কৌতূহল ভাল নয়। মাথার ওপর তোমার খাঁড়া ঝুলছে।' হ্যাঁ, আমিও সেকথা জানি। লোকটা যদি গোয়েন্দা দপ্তরের কেউ হয় তবে আমার আর রক্ষা থাকবে না। কিন্তু আশ্চর্য, তবু আমি লোকটার কথা ভুলতে পারি না। তার মধ্যে আমাদের মত ঘরছাড়া পথের মানুষদের আকর্ষণ করবার এমন একটা দুর্নিবার শক্তি ছিল যা আমি প্রতিমুহূর্তেই অনুভব করতুম। লোকটা যদি গোয়েন্দা দপ্তরের কেউ হয় তাহলে আমার যে সর্বনাশ হয়ে যাবে তা আমি উপলব্ধি করলেও, তবু পথে-ঘাটে আমার দুটো চোখ যেন তাকেই খুঁজে বেড়াতো। মনে হত একবার যদি লোকটাকে আমি কিছুক্ষণের জন্যও কাছে পাই তাহলে তাকে আমি সঠিকভাবে জেনে নিতে পারব এবং কোন-না-কোনদিন তাকে আমি সকলের সামনে তুলে ধরতেও সক্ষম হব।

হঠাৎ-ই সেদিন একটা সুযোগ মিলে গেল।

কারখানা থেকে ফিরে হাতমুখ ধুয়ে হোটেলে খেতে যাই। সেদিন রাতে হোটেলে খেয়ে বেরিয়ে আসছি এমন সময়ে দেখলুম আমারই আগে আগে লোকটা পথ দিয়ে চলে যাচ্ছে। আমার কি মনে হল আমি দ্রুতপদে এগিয়ে গিয়ে তাকে ধরবার চেষ্টা করলুম। আমার উদ্দেশ্য সফলও হল। সোজাসুজি আমি তাকে প্রশ্ন করলুম, 'আচ্ছা আপনি আমায় বলুন তো ঠিক করে—কি আপনার পরিচয়?'

হঠাৎ এরকম একটা প্রশ্নের সম্মুখীন হয়ে পড়তে হবে এ বোধ হয় লোকটা কল্পনা করতে পারে নি। তাই কেমন যেন একটু থতমত খেয়ে বলে উঠল, 'আমি—মানে আমার পরিচয়!'

'হ্যাঁ হ্যাঁ আপনার পরিচয়', আমি প্রায় পিঠোপিঠি বলে উঠলুম।

লোকটা বললে, 'আমার নাম সেখ ইব্রাহিম বক্স।'

'বাড়ি কোথা আপনার ?'

'নদীয়ায়।'

'এখানে কোথায় থাকেন ?'

'পথে।'

'কেন ?'

'ঘর নেই বলে।'

'এই তো বললেন আপনার বাড়ি নদীয়ায়।'

'হ্যাঁ।'

'তা সেখানে আপনার ঘর নেই ?'

'ঘর কি শুধু ইট-পাথর চুণ-সুরকির গাঁথুনি করলেই হয় ?'

'তবে ?'

আমার তবে বলার সংগে সংগে সেখ ইব্রাহিম বক্স এবার উল্টে আমায় প্রশ্ন করলেন, 'কিন্তু আপনার বাড়ি কোথায় বলুন তো ?'

মিছেকথা বললুম। কারণ মিছেকথা বলা ছাড়া আমার কোন উপায় ছিল না।

ইব্রাহিম প্রশ্ন করলেন, 'এখানে আপনি কোথায় থাকেন ?'

'স্টকলেব লাইনে।'

'কি করেন ?'

'ভাইসম্যানী।'

'বাড়ি যান না ?'

'যাই।'

'কেন যান ?'

'সেখানে সবাই আছে বলে।'

এবার ইব্রাহিম বললেন, 'আপনার সবাই আছে বলে বাড়ি আপনার ভাল লাগে কিন্তু আমার কেউ নেই বলে বাড়ির কোন আকর্ষণই নেই আমার কাছে।'

অত্যন্ত সহজ-সরল কথা। কিন্তু তাতেই আমার মনটায় কেমন যেন একটা ধাক্কা লাগল। তবু নিশ্চিন্ত হবার জন্য বললুম, 'আপনার মা-বাবা নেই ?'

'না, তাঁদের এতেকাল হয়েছে।'

'ভাই-বোন ?'

'কোনদিনই ছিল না !'

'বিয়ে করেন নি আপনি ?'

'হ্যাঁ করেছিলাম কিন্তু তিনিও মাটির নিচে।' তাঁর কথায় কোথায় যেন একটা বেদনার সুর ধ্বনিত হয়ে উঠল।

সেদিনটা ছিল বৈশাখী পূর্ণিমা। রৌদ্রদগ্ধ দিনান্তে রাত্রির শীতল পরিবেশে আকাশে উঠেছে পূর্ণিমার চাঁদ। অপূর্ব লাগছিল আমার। একদিকে প্রকৃতির এই অকৃপণ রূপচিন্দিগন্ত সমারোহ, আরেকদিকে ইব্রাহিমের সহজ-সরল কথায় জীবনের মর্মকথার রহস্যোদ্ঘাটন—এ দুয়ের যুগপৎ চাপে আমি যেন কেমন বিহ্বল হয়ে গেলুম। আবেগকম্পিতকণ্ঠে বলে উঠলুম, 'অনেকদিন ধরে ভাবছিলুম আপনার সংগে দুদণ্ড বসে গল্প করব, গল্প করে জানব আপনার মনের গহনে কি দুঃখের কাহিনী লুকিয়ে আছে কিন্তু সে সুযোগ কখনো হয় নি। যদি কিছু মনে না করেন চলুন না গিয়ে বসি গঙ্গার ধারে।'

'আমার আর যেতে আপত্তি কি। এমনিতে পথই তো আমার সব।'

'তবে চলুন।'

বৈশাখী পূর্ণিমার শুভ্র-স্বচ্ছ জ্যোৎস্না-মায়ায় গঙ্গার নিস্তরঙ্গ শান্ত বুকখানা যেন স্বর্গাভ হয়ে উঠেছে সেদিন। সেদিন ইব্রাহিমের কাছে যা শুনেছিলাম তা আমি জীবনে কখনো ভুলব না। জীবনের রহস্য লোকটার পাগলামিতে নয়, ভবঘুরে বৃত্তিতেও নয়—জীবনের রহস্য তার ছিল ভালবাসায় অন্তঃসলিলা ফল্গুধারায়।

.....সৈয়দ গোলাম মোস্তাফা ছিল সেই অঞ্চলের মধ্যে সবচেয়ে বড় ধনী। ভূ-সম্পত্তি ছিল তাঁর প্রচুর। এমন কি অনেক জমিদারের চেয়েও বেশি। ভদ্রলোকের গোয়ালে গরু ছিল প্রায় শখানেক। নৌকোও ছিল প্রায় পঞ্চাশখানা। গঞ্জের খটিতে ধানের আড়ত ছিল প্রায় গোটাপাঁচেক। রকমারি ধানের রকমারি আড়ত। দশ-বিশখানা গ্রামের নমঃশূদ্র আর নিকারীরা ছিল তাঁর কেনা গোলাম। লাঠিয়াল, সরকার—সেও ছিল প্রায় শখানেক। এর ওপর ছিল তাঁর মহাজনী কারবার। তার সূত্র ধরেও জমি আর অর্থ আমদানীও কম হত না।

এদিক দিয়ে গোলাম মোস্তাফা যত-খানি ভাগ্যবান ছিলেন ততখানি ভাগ্যবান তিনি গার্হস্থ্য জীবনে ছিলেন না। তাঁর পত্নী নহিরণ বিবির একটি কন্যাসন্তান হয়েছিল—আদর করে তার নাম রেখে-ছিলেন মেহেরউন্নিসা। মেহেরউন্নিসা যখন পাঁচ বছরের হয়ে গেল তখনও কোন পুত্রসন্তান হল না দেখে গোলাম মোস্তাফা চিন্তিত হয়ে পড়লেন। এত যে বিরাট সম্পত্তি তাঁর—যদি পুত্রসন্তান না হয় তবে এসবের ভবিষ্যৎ কি ? পত্নী নহিরণ বিবিকে তিনি জানালেন সেকথা। নহিরণ বিবি বুঝলেন স্বামীর মনোবেদনার কথা। তিনি নিজেই স্বামীকে পুনরায় সাদী করতে বললেন। পত্নীর এই আশ্বাসে তিনি তাই করলেন। কিন্তু তারও পরে দেখা গেল মেহেরউন্নিসা দশ বছরে গিয়ে পৌঁছুল কিন্তু পুত্রসন্তান তবু তাঁর ঘর আলো করে এল না। মনে গোলাম মোস্তাফার আরও বয়ে যেতে লাগল। প্রথমা পত্নী নহিরণ বিবিই আবার বললেন, কি করবে বলো। তুমি যদি আবার সাদী করতে চাও আমি কোন আপত্তি করব না কিন্তু তার আগে একটা কাজ তুমি করো—'

গোলাম জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে নহিরণ বিবির দিকে তাকালেন। তিনি বললেন, 'মেহের বড় হচ্ছে—ওকে তুমি লেখাপড়ি করাও। ও-ই তোমার ছেলের কাজ করবে।'

'এটা তুমি মন্দ কথা বলো নি', গোলাম বললেন, 'তবে কি জানো নামজাদা সৈয়দ বংশ আমরা। পর্দাটা একেবারে তুলে দেবো ?'

'পর্দা তুলতে হবে কেন ?'

'লেখাপড়ি করলে ও-পর্দা আপনিই উঠে যাবে মেহেরের মা।'

'না না।' নহিরণ বিবি বললেন, 'তখন এমন হতে পারে খুব নামজাদা ঘরের ছেলের সংগে মেহেরের সাদী দিয়ে ঘরেই তাকে দামাদ করে রেখে দিলাম আমরা। তাতে মেহেরও আমার এখানে রইল, সম্পত্তিও আমার বে-হাত হল না।'

নহিরণের যুক্তিতে গোলাম যেন খানিকটা আশ্বস্ত হলেন। কিন্তু তৃতীয়বার বিয়ে না করে তিনি মেয়ের লেখাপড়ার কোন ব্যবস্থা করলেন না।

এই মেহেরউন্নিসার লেখাপড়া সম্পর্কেই ইব্রাহিম এ-বাড়ির সংগে জড়িয়ে পড়ল। কিন্তু সে-ও এক বিস্ময়কর ইতিহাস। বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ শেষ করে এসে ইব্রাহিম ভুলে যায় নি তার গ্রামের সাধারণ মানুষগুলিকে। অত্যন্ত চড়া সুদে ধার দিয়ে প্রায় দশ-বিশখানা গ্রামের দরিদ্র মানুষগুলির ভিটেমাটি সব হাতিয়ে নিচ্ছে তখন গোলাম মোস্তাফা। ইব্রাহিম দেখলে সেই নির্মম অত্যাচার। তার মন যেন বিদ্রোহ করে উঠল। সে গিয়ে দাঁড়ালো দরিদ্র মানুষগুলির পাশে। তুমুল আন্দোলন সৃষ্টি হল গোলামের বিরুদ্ধে। সাড়া পড়ে গেল চারিদিকে। গোলামও ছেড়ে দেওয়ার পাত্র নন। থানা-পুলিশ আইন-আদালত কিছু করতে বাকি রাখলেন না তিনি। মামলার পর মামলা দায়ের করলেন তিনি তাঁর খাতকদের বিরুদ্ধে এবং উস্কানি দেওয়ার অভিযোগ উপস্থাপিত করলেন ইব্রাহিমের বিরুদ্ধে। কিন্তু কপাল মন্দ গোলাম মোস্তাফার—সমস্ত গরীব লোক এককাট্টা হয়ে গেল। অবশ্য তিনি তবুও চেষ্টার ত্রুটি করলেন না। সে সময়টা ইংরেজরা সাম্প্রদায়িক বিষ ছড়াচ্ছিলো তাদের শাসনকে অব্যাহত রাখার জন্য। গোলাম মোস্তাফা তার সদ্ব্যবহার করলেন এই বলে যে, ইব্রাহিম লেখাপড়া শিখলে কি হবে, আসলে সে হিন্দুদের গুপ্তচর। মুসলমানদের সে কংগ্রেসে নিয়ে যাবার চেষ্টা করছে। কিন্তু তাতে কি হবে ! তৎকালীন কংগ্রেসও তো ছিল গোলাম মোস্তাফার মত জোতদার-জমিদার-মহাজন-দেরই লোকে ভর্তি। তাঁরাও এই আন্দোলনকে সমর্থন করলেন না। তাঁরা বললেন, 'এসব বৈদেশিক ভাবধারায় উদ্বুদ্ধ ভ্রান্ত যুবকদের জাতীয়তাবিরোধী কাজ।' সেজন্যে ইব্রাহিম তার কার্যকলাপকে সহজেই কংগ্রেসের গুপ্তচরের কাজ নয় বলে লোককে বোঝাতে সক্ষম হল। শেষ পর্যন্ত সব গরীব লোক এককাট্টা হয়ে গেল এবং

গোলাম মোস্তাফাকে বাধ্য করল অতিরিক্ত সুদ ছাড়তে, দেনার দায়ে লোকের ভিটে-মাটি নেওয়া থেকে বিরত্য করতে।

এই পরাজয়ের মধ্যে দিয়ে আবিষ্কার করলেন তিনি ইব্রাহিমকে। তাই তিনি আপোষ করলেন তার সংগে। সে লেখাপড়া জানা ছেলে অতএব তারই ওপর তিনি দিলেন মেহেরউন্নিসার শিক্ষার দায়িত্ব। দীর্ঘ আট-দশ বছর ধরে ইব্রাহিম তৈরি করল মেহেরউন্নিসাকে। শিক্ষায়-দীক্ষায় ভাবে-ভংগিতে আর অন্তর্লোকের ঐশ্বর্যতে মেয়েটি গরীয়ান হয়ে উঠল। আঠারো-উনিশ বছরের মেয়ে। যেন সদ্য-প্রস্ফুটিত প্রভাতী গোলাপ। কিন্তু কখন, অগোচরে মেহের ও ইব্রাহিমের মধ্যে মন দেওয়া-নেওয়ার খেলা শুরু হয়ে গিয়েছিল, তা তারা টেরও পায় নি। টের পেল সেদিন, যেদিন খবরটা শোনা গেল ফরিদপুরের বিরাট এক জমিদার বংশে মেহেরউন্নিসার বিয়ের ঠিক করেছে তার বাবা গোলাম মোস্তাফা।

মেহেরউন্নিসা ইব্রাহিমকে বললে, 'এবার বলো তুমি কি করবে?'

'আমার সংগে দারিদ্র্যকে বরণ করতে পারো যদি তাহলে, তুমি, যা বলবে আমি তাই করব।'

'আমি তোমার জন্যে সব পারব।'

'তাহলে আমিও তাই করব।'

এরপর মেহেরউন্নিসা বাবা-মাকে সবাইকে জানাল তার মনের কথা। বাবা বললেন, 'ও মেয়ের আমি মুখ দেখতে চাই না।'

না-ই বা বাবা মুখ দেখতে চাইলেন। মেহেরউন্নিসা যার শিক্ষার মানুষ হয়েছিল তারই শিক্ষার দীপ্ত আলোকে পথ চিনে নিয়ে চলে এল সেদিন পিত্রালয় থেকে। ইব্রাহিম লেখাপড়া শিখেছে কিন্তু দারিদ্র্যকে জয় করতে শেখে নি। নিজের জরাজীর্ণ সেকেলে বাড়িখানায় মেহেরকে নিয়ে এসে উঠল। বাড়িতে সঞ্চয় বলে তার কিছু ছিল না। সম্বল্য ছিল মেহের-উন্নিসারই কিছু অলংকার আর তার মায়ের লুকিয়ে দেওয়া কিছু টাকা। তাতেই আপাতত চলতে লাগল।

কিন্তু যে গোলাম মোস্তাফা একদিন উন্নিসার ঘটনায় কিছুতেই আর আপোষ করেছিলেন এবং ইব্রাহিমকে মেনে নিয়েছিলেন, সেই গোলাম মোস্তাফা মেহের-উন্নিসার ঘটনায় কিছুতেই আর আপোষ-মুখী হতে পারলেন না—তিনি যেন প্রতি-হিংসাপরায়ণ হয়ে উঠলেন। তাঁর উঁচু মাথাটা নিচু করে দিয়েছে মেয়ে। ফরিদ-পুরের জমিদার বংশের কাছে মাথা তাঁর একেবারে হেঁট হয়ে গেছে চিরদিনের জন্য। অবশ্য মেয়ের দোষের চাইতে দোষটা ইব্রাহিমেরই যে বেশি এ-বিষয়ে তাঁর কোন সন্দেহ ছিল না। তিনি বিশ্বাস করে মেয়েকে লেখাপড়া শিখতে দিয়েছিলেন তার কাছে। আর সেই ইব্রাহিম সুযোগ পেয়ে তাঁর সংগে বিশ্বাসঘাতকতা করেছে। কাজেই তার ওপর প্রতিহিংসাবশত তিনি তাকে জেলে পুরলেন। একশো দশ ধারায় গ্রামবাদী মামলা করে। ইব্রাহিমকে জেলে পুরে তিনি এলেন মেয়ের কাছে। বললেন তাকে, ইব্রাহিমকে ত্যাগ করে আসতে। কিন্তু মেয়ে রাজী হল না। বাপের মুখের ওপর সে বলে দিলে, 'না।'

ওদিকে তখন জেলের মধ্যে দিন কেটে চলেছে ইব্রাহিমের—দুশ্চিন্তা আর দুঃস্বপ্নের মধ্যে দিয়ে। এদিকে মেহের-উন্নিসারও তাই। ইব্রাহিম তবু জেল-খানায় দুটি খেতে পায় কিন্তু মেহের-উন্নিসার তাও জোটে না। অলংকার আর হাতের পয়সা কবে ফুরিয়ে গিয়েছিল। প্রতিবেশিবাও যে দু-একদিন দেখে নি তা নয় কিন্তু তারাই বা পাবে কোথায়—অবস্থা তো সকলেরই সমান। শেষে একদিন না-খাওয়ার ব্যাধি এসে গ্রাস করল মেহের-উন্নিসাকে। প্রভাতের সদ্য-প্রস্ফুটিত গোলাপ ম্লান হয়ে এল ধীরে ধীরে।

দিন আসে দিন যায়। জেলখানার গাছে গাছে ঝরে পড়ল একদিন জীর্ণ পাতা। তার জায়গায় হেসে উঠল নবীন কিশলয়ের দল। এমনি একটা দিনেই ইব্রাহিম এসেছিল জেলে। আবার যখন ঘুরে সেইদিন ফিরে এল তখন তাঁর মুক্তিও আসন্ন হয়ে উঠল। পাক খেয়ে গেল একটা বছর। এক বছর জেলে কাটিয়ে শ্বাসরোধী এক উত্তেগ নিয়ে মুক্তির সংগে সংগে ইব্রাহিম ছুটে এল বাড়িতে। এসে ঘরের ভিতরে ঢুকে সে যা দেখল তাতে তার বুকখানা যেন ফেটে গেল। এ কি হয়েছে—মেহের কংকালসার হয়ে একেবারে মিশিয়ে গেছে বিছানার সংগে। তাড়াতাড়ি সে তার পাশে গিয়ে বসে পড়ে বললে, 'মেহের!'

মেহের চি চি করে বললে, 'আর ভয় নেই। তুমি এসে পড়েছ!' আনন্দে তার শুকনো চোখ দুটো যেন সিক্ত হয়ে উঠল।

এরপর ইব্রাহিম ছুটল ডাক্তারের কাছে। ডাক্তার এসে বললেন, না খেয়ে খেয়ে মেয়েটার নাড়ী শুকিয়ে গেছে। ইব্রাহিম তবু চেষ্টার ত্রুটি করল না। কিন্তু একদিন তার সকল চেষ্টাকে ব্যর্থ করে দিয়ে বেহস্তের বাণী চলে গেল বেহস্তে।

সেদিন সেকথা বলতে বলতে টপ টপ করে ইব্রাহিমের চোখ থেকে ঝরে পড়তে লাগল অশ্রুর ফোঁটা। পূর্ণিমা রজনীর দীপ্তিতে সে অশ্রুবিন্দুকে মনে হল যেন স্খলিত একদল নক্ষত্র। বাস্তবিক পুরুষ মানুষের কান্না যে এমন মর্মান্তিক-সুন্দর হতে পারে এর আগে আমি যেন আর কখনো দেখি নি।

গঙ্গার ধারে সেদিন যেন আর কোন কথা হবার সুযোগ ছিল না। গভীর নৈঃশব্দের একটা হিম-শীতল প্রবাহধারা যেন আমাদের দুজনকেই আচ্ছন্ন করে দিয়েছিল। আমি বুঝেছিলুম যে, মানুষটার ভিতরে নিশ্চয়ই এই রকম একটা যন্ত্রণা আছে এবং এরই জন্য সে পথে পথে এমনি করে ঘুরে বেড়ায়। তারপর সেই রাতে গঙ্গার ধার থেকে দুজনে যখন দুজনের কাছ থেকে বিদায় নিলুম তখন একবার শুধু সে বলে উঠল, 'বন্ধু জীবনের এ কাহিনী আমি কাউকে বলি নি। কারণ কে বুঝবে আমার এ জ্বালা! কিন্তু আজও আমার সব বলা হল না। আবার যেদিন সময় আসবে সেদিন বাকিটা বলব। তুমি আমাকে তোমার ঠিকানাটা দিয়ে যাও।'

আমি বললুম, আমার নাম মৃত্যুঞ্জয়। চটকলের লাইনে বাহান্ন নম্বর ঘরে আমি থাকি।

সে এক রবিবারের কথা।

ভোরবেলাতেই অভ্যাসবশত ঘুম ভেঙে গিয়েছিল। শুয়ে শুয়ে ভাবছিলুম নিজের কথা। সন্ত্রাসবাদের পথ থেকে সর্বহারা শ্রেণীর বৈপ্লবিক পথেই মানুষের মুক্তি—এটুকু বুঝতে পেরে ধীরে ধীরে এ-পথে আসার চেষ্টা করছিলুম। তাই শ্রমিকদের মাঝে শ্রমিক হয়ে কাজও শুরু করে দিয়েছিলুম। কিন্তু মুস্কিল হয়েছিল অস্ত্র-শস্ত্র সংগ্রহ করে সম্রাটের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণার উদ্দেশ্যে পুরনো ষড়যন্ত্র মামলার ওয়াবেন্টটাকে নিয়ে। সেটার খড়্গ মাথার ওপর ঝুলছিল। তাই প্রকাশ্যে নিজের পরিচয় দিতে পারছিলুম না কোথাও। কাজেই কি নিষ্করুণ যে এই অবস্থা তা একমাত্র আত্মগোপনকারী ব্যক্তি ছাড়া বুঝতে পারবেন না। নিজের সমস্ত অতীতকে নিজের মধ্যে অক্ষত অবস্থায় রেখে, নতুন পরিচয়ে আত্মপ্রকাশ করতে হবে, টেনে নিয়ে যেতে হবে নিজের আসল জীবনটাকে নতুন-অবাস্তব জীবনের চাকার ওপরে ভর করে। কোথাও যদি এতটুকু ভুল হয় তাহলেই সর্বনাশ! এ জীবনের সৃষ্টিকর্তা মা-বাবা, ভাই-বোন, বন্ধুবান্ধব, এমন কি স্বয়ং ভগবানও নন—এ জীবনের সৃষ্টি-কর্তা হতে হয় নিজেকে।

সর্দি ও কাশিতে
রক্ষিতের
তাল মিছরি
ফোন ৫৫-৩০৮৫

মনে পড়ছিল ইব্রাহিমের কথা। দুর্গত খাতক-কৃষকদের নিয়ে একদিন সে আন্দোলন করত। আন্দোলন করা তার অভ্যাস আছে। বস্তুত সে আমারই পথের পথিক। তখন মার্টিন লরেন্সের প্রকাশিত কিছু কিছু বই আমি কিনে ছিলুম। তাকে এসব কিছু কিছু পড়াতে পারলে নিশ্চয়ই তার ভবঘুরে স্বভাবটাকে একটা নির্দিষ্ট পথে এনে দাঁড় করাতে পারব। নিজের মধ্যে তার যে অতীত সুপ্ত হয়ে আছে তা আবার জাগ্রত হয়ে উঠবে। লোকটার প্রতি মমতায় আমার মনটা ভরে উঠেছিল অনেক আগেই। এখন দিনে দিনে সেটা যেন আরও বেড়ে যাচ্ছে। সে আমায় বন্ধু বলে সম্বোধন করেছে। হ্যাঁ, আমি তাকে বন্ধুত্বের প্রতিদান দেবো।

আমার অতীতকে আমি টেনে নিয়ে চলেছি বর্তমানের পথে। ইব্রাহিম তা পারে না। অতীতের মধ্যে সে তার বর্তমানকে হারিয়ে ফেলেছে। ঠিক যখন আমি শুয়ে শুয়ে এইসব কথা ভাবছিলুম তখন বেশ একটু দূর থেকে কি যেন একটা গানের সুর ভেসে আসছিল। গানের সুরটা যেন ক্রমশ কাছাকাছি এগিয়ে আসছে বলে মনে হল। হ্যাঁ ঠিক তাই। আমি বিছানার ওপর উঠে বসলুম। গানের ভাষাটা কানে আসতেই চমকে উঠলুম। এমন করে কে গান গাইছে?

কত তাজমহল হয় নি গড়া
কে রাখে খবর,
কতজন যে দিল চোখের জলে
প্রিয়ারে কবর।
এই পৃথিবীর সকলি ধনীর
গরীব প্রেমিক ফেলে আঁখিনীর
তাজমহল তার হয় নি গড়া
—তবু সে অমর।

এ-গানের ভাষা, এ-গানের ব্যথা ও বেদনা এ তো ইব্রাহিমের ব্যথা ও বেদনার সঙ্গে মিলে যায়। তবে কি এই ভোরবেলা সে-ই এ গান গাইতে গাইতে আসছে? যতদূর লোকের কাছে শুনেছি সে তো কোনদিন এইভাবে পথে-ঘাটে গান গেয়ে বেড়িয়েছে বলে কেউ বলে নি। তবু আমি উঠে পড়ে ঘরের দরজা খুলে বাইরে বারান্দায় গিয়ে দাঁড়ালুম। হ্যাঁ, একটা লোক ঘরের দরজায় নম্বর দেখতে দেখতে এগিয়ে আসছে বটে। লাইনের ইলেকট্রিক লাইট তার মুখে পড়তেই আমি তাকে চিনতে পেরে চেঁচিয়ে উঠলুম, 'কে—ইব্রাহিম?'

'হ্যাঁ বন্ধু আমি।'

আমি ছুটে গেলুম। ইব্রাহিম বললে, সেই যে সেই পূর্ণিমা রাতে গঙ্গার ধারে বলেছিলাম যদি দিন আসে তো—'

'হ্যাঁ হ্যাঁ আমার মনে আছে। চলো তুমি আমার ঘরে চলো।'

'কিন্তু সময় পাবো কি আর?'

'কেন?

'ওরা আমার পেছনে লেগেছে। তাছাড়া ওরা আজ তৈরি হয়েই এসেছে।'

'কাদের কথা বলছ ইব্রাহিম?'

'শোনো বন্ধু সময় নেই', ইব্রাহিম যেন অত্যন্ত চঞ্চল হয়ে উঠল। তারপর আবেগ-কম্পিতকণ্ঠে বলতে লাগল, 'একটি কথা তোমাকে তাড়াতাড়ি বলে যাই। যদি আমার ফাঁসি হয় তাহলে তুমি আমার লাশটা চেয়ে নিও। তারপর এই ঠিকানা রইল আমার বাড়ির। আমার উঠোনের পাশেই আমাদের ঈদগা। একেবারে লাগোয়া বললেই হয়। সেখানে একটা ছোট্ট পিলার আছে। পিলারের পাশে আছে একটা শিউলিগাছ। সেই পিলারটার পশ্চিমদিকে ঘুমিয়ে আছে আমার মেহের, তুমি ঠিক তার পাশটিতেই আমাকে মাটি দিও বন্ধু।'

আমি অবাক বিস্ময়ে বলে উঠলুম, 'এসব কি বলছ ইব্রাহিম?'

'ঠিকই বলছি বন্ধু। আমার সময় নেই আর।'

ভোরের সেই ক্রমবর্ধমান আকাশের নিচে চটকল লাইনের বারান্দায় দাঁড়িয়ে আমি যেন কেমন ভয়াচ্ছন্ন হয়ে গেলুম। তবু ভয়ের আবেগেই জিজ্ঞাসা করলুম, 'কিন্তু তোমার ফাঁসি হবে কেন?'

'সেদিন বলি নি বন্ধু' ইব্রাহিম তেমনিই দ্রুত আর আবেগকম্পিতকণ্ঠে বলতে লাগল, 'মেহেরের বাবার অঢেল টাকা, অতো সম্পত্তি—তবু মেহের আমার না খেয়ে মরেছিল। —তাই তার বাবা, সেই গোলাম মোস্তাফা শয়তানটাকে আমি দুনিয়া থেকে সরিয়ে দিয়েছিলাম। সেই থেকে আমি ফেরার। বন্ধু, লোক আমাকে পাগল মনে করত, ভবঘুরে মনে করত—কিন্তু আমি পাগলও নই, ভবঘুরেও নই—আমি মানুষ, আমার ভালবাসার মধ্যে দিয়ে আমি বাঁচতে চেয়েছিলাম। কিন্তু কেউ তা দিলে না।' কথাগুলো বলতে বলতে সে যেন একটু হাঁপিয়ে উঠল। তারপর একটু দম নিয়ে বললে, 'বন্ধু, তুমি কিন্তু আমার এই শেষ অনুরোধটুকু রেখো। তোমাকে আমি হিন্দু বলে মনে করি নি, তোমাকে আমি মুসলমান বলেও মনে করি নি—তোমাকে আমি পেয়েছি মানুষের মত করে। কেউ আমার দুঃখের কাহিনী জানতে চায় নি একমাত্র তুমি ছাড়া। তাই তোমাকেই আজ আমার শেষ কথা বলে যাচ্ছি।'

ভয়াচ্ছন্ন ভাবটা তখন আমি কাটিয়ে তুলেছিলুম। আমি আফশোষের সুরে তাকে বলে উঠলুম, 'একথা তুমি আমায় আগে বলো নি কেন ইব্রাহিম। আমি যে তোমাকে অনন্তকাল লুকিয়ে রাখতে পারতুম!'

'দরকার নেই বন্ধু। আমি ভালবাসার মধ্যে দিয়ে বেঁচে থাকতে চেয়েছি বটে, কিন্তু আমি তো হত্যাকারী হত্যাকারীর সাজা হওয়া উচিত', কথাগুলো বলেই আর সে দাঁড়ালো না, দ্রুতপদে ফিরে পড়ল। আমি চীৎকার করে উঠলুম, 'ইব্রাহিম শোনো, ইব্রাহিম শোনো—ই—ব্রা—হি—ম.....'

সে শুধু দূর থেকে জবাব দিলে, 'বিদায়, বন্ধু বিদায়—'

*

তারপর দীর্ঘদিন কেটে গেছে।

অনেক পথ পার হয়ে ঘটনাচক্রে আমাকে ইব্রাহিমদেরই ঈদগার কাছে এসে বাঁধতে হয়েছে এক পর্ণকুটির। প্রতি বছর ফিরে ফিরে আসে শরৎকাল। দিনান্তে আসে সন্ধ্যা। সন্ধ্যা ক্রমশ হারিয়ে যায় রাত্রির বিশালতায়। বাতাসে আন্দোলিত হয়ে ওঠে ঈদগার সেই শিউলিগাছটা। একটানা সৌরভে আমোদিত হয়ে যায় আমার পর্ণকুটির।

মনের চোখে আমার ভেসে ওঠে পাশাপাশি দুটি কবর।

হ্যাঁ, বিপদের ঝুঁকি নিয়েও একদিন আমাকে বন্ধুত্বের মর্যাদা রাখতে হয়েছিল। আর সে মর্যাদা এমনি করে প্রতি সন্ধ্যায়, প্রতি রাত্রে আমাকে আজও রেখে যেতে হবে ঝরে-পড়া শিউলি ফুলের সৌরভে আক্রান্ত হয়ে, স্মৃতি-কণ্টকিত অশ্রুজলের মধ্যে দিয়ে। তবু মনে হয় সে অশ্রু শুধু আমারই নয়, কবরের কান্নাও বটে।

১৯৬৯ তে আপনার ভাগ্য

যে-কোন একটি ফুলের নাম লিখিয়া আপনার ঠিকানাসহ একটি পোস্টকার্ড আমাদের কাছে পাঠান। আগামী বারমাসে আপনার ভাগ্যের বিস্তারিত বিবরণ আমরা আপনাকে পাঠাইব, ইহাতে পাইবেন ব্যবসায়ে লাভ লোকসান, চাকুরিতে উন্নতি, বদলী, জন্ম, বিবাহ ও সুখ-সমৃদ্ধির বিবরণ; আর থাকিবে দুষ্ট-গ্রহের প্রকোপ হইতে আত্মরক্ষার নির্দেশ। একবার পরীক্ষা করিলেই বুঝিতে পারিবেন।

PT. DEV DUTT SHASTRI
RAJ JYOTISHI (B. M. W)
P. B. 86, JULLUNDUR CITY

পূর্ববঙ্গের সাম্প্রতিক বাংলাকাব্য আন্দোলনের রূপরেখা

অমিয়কুমার হাটি

কবিতা শুধু কবির অন্তরের আনন্দ-বেদনা সমুদ্রের শ্বেতপদ্ম-রক্তপদ্ম নয়, দেশ ও কালের দর্পণ—কবিতার মধ্যে যুগ ও জীবন তার সমস্ত পাওয়া না-পাওয়ার আশা উচ্ছ্বাস হাহাকার যন্ত্রণা নিয়ে প্রতিবিম্বিত।

পূর্ববঙ্গের সাম্প্রতিক বাংলা কাব্য আন্দোলনের গতি-প্রগতি নির্ণয় করা কিছুটা দুরূহ এই কারণে যে, যে দেশের সঙ্গে সাংস্কৃতিক সংযোগ প্রায় বিচ্ছিন্ন—পত্র-পত্রিকা এবং কবিদের কবিতার বই প্রায় দুর্লভ। কিন্তু কোনরকমের সঙ্কীর্ণ গণ্ডী দিয়েই সাহিত্যকে বন্দী করে রাখা যায় না। সাহিত্য সর্বকালের সকল মানুষের সম্পদ।

অথচ উন্নততর জীবন-চেতনায় উদ্বুদ্ধ উভয় বঙ্গের গণমানস চাইছে সাংস্কৃতিক সাযুজ্য। পৃথিবী আজ ছোট হয়ে এসেছে, কিন্তু অদৃষ্টের এমান পরিহাস যে, যাঁরা কিছুকাল আগেও আমাদের ভ্রাতৃপ্রতিম আত্মীয় ছিলেন, দেশ ভাগের সীমারেখা তাঁদের সঙ্গে দুস্তর ব্যবধান গড়ে তুলেছে।

পূর্ববঙ্গের সাম্প্রতিক বাংলা কাব্য আন্দোলনের রূপরেখা আলোচনা করার আগে স্মরণ করি একটি অমর তিথি—একুশে ফেব্রুয়ারী, ১৯৫২। পূর্ববঙ্গের ভাষা আন্দোলনের অগ্নিগর্ভ দিনগুলি প্রত্যক্ষ করেছে, মাতৃভাষার মর্যাদা আদায় জাতির মুক্তির সনদ। ভুলিনি আবদুল জব্বার, রফিকউদ্দীন, আবুল বরকত, শফিউর রহমান, আবদুস সালাম প্রভৃতি শহীদদের আত্মত্যাগ—যাঁরা বলেছিলেন, 'মাতৃভাষার অধিকার রক্ষার জন্য আমরা জান কোরবান করব।'

পশ্চিমবঙ্গের সঙ্গে তার রাজনৈতিক সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে গেলেও পূর্ববঙ্গের কাব্য আন্দোলন বাংলা সাহিত্যের কোন বিচ্ছিন্ন অধ্যায় নয় বলেই দৃঢ় অভিমত পোষণ করি। আমাদের ভাষা সাহিত্য পূর্ববঙ্গের শক্তিশালী কবিদের অবদানে সমৃদ্ধ ও বৈচিত্র্যপূর্ণ হয়ে উঠেছে—বিস্ততর গবেষণার পথ উন্মুক্ত করে দিয়েছে।

পূর্ববঙ্গ—পশ্চিমবঙ্গ—আমরা যেন পরস্পরের দর্পণ। সাহিত্যক্ষেত্রে অন্তত এ বড় কম লাভ নয়। পরস্পরের অভিজ্ঞতার আলোকে, এমন কি সুস্থ প্রতিযোগিতায় সাহিত্য আরো দীপ্তিমান হয়ে উঠবে।

পূর্ববঙ্গের আধুনিক কাব্য আন্দোলনের প্রধান গুণ তার স্পষ্টতা। ভাষার ঋজুতা একটা বড় সম্পদ। পূর্ববঙ্গের আধুনিক কবিদের একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য তাঁরা প্রায় সকলেই দুর্বোধ্যতা থেকে মুক্ত। একাশভঙ্গীতে বৈচিত্র্য রয়েছে, বৈচিত্র্য রয়েছে বিষয়বস্তুতে। কিন্তু ইউরোপের বিভিন্ন দেশের কবিদের মধ্যে বা একালের পশ্চিমবঙ্গের কোন কোন কবির কবিতায় যে অস্পষ্টতা, হেঁয়ালী, দুর্বোধ্যতা দেখা যায়, তাঁরা তা এড়িয়ে যেতে যথাসাধ্য চেষ্টা করেছেন। এই জন্যে তাঁদের কবিতা সাধারণের মনে বেশি করে দাগ কাটে।

শামসুর রহমান প্রতিষ্ঠিত নেতৃস্থানীয় কবি—পূর্ববঙ্গের কবিকুলের মধ্যমণি। তাঁর কবিতা ইসলাম আশ্রয়ী নয়, কোন ইজমও নেই। কবিতা তাঁর কাছে অমল শিল্প। শ্রেষ্ঠ কবিতার উজ্জ্বল পংক্তিগুলি দিয়ে তিনি চান স্মৃতির উদ্যানে ফুল ফোটাতে, পৃথিবীর ঠাণ্ডা যুদ্ধ থামিয়ে দিতে, সভ্যতাকে রক্ষা করতে। কত সহজ সরল প্রসাদগুণ সমন্বিত সুন্দর স্পষ্ট তাঁর ভাষা—

'সবকিছু যেন ভাঙছে শুধুই,
ভাঙছে ভাঙছে
লক্ষ লক্ষ ভয়ার্ত চোখ
ভাঙন দেখছে,
দেখছে পায়ের নির্ভরভূমি
সরছে কেবলি :
আস্থার সব স্তম্ভ চূর্ণ, আদর্শ প্রিয়
পাত্রমিত্র সুযোগ বুঝেই দিলো পিঠটান,
ভীষণ শূন্যে মৃত্যুই হলো
একা সম্রাট।'
('বিনষ্টির গান')

হীনমন্যতার বিরুদ্ধে, অত্যাচার অনাচার অপমানের বিরুদ্ধে, শোষক শাসকের বিরুদ্ধে, প্রতিক্রিয়াশীলতার বিরুদ্ধে সেখানকার কবিকণ্ঠ ক্ষমাহীন অগ্নি উদ্গার করেছে। আপোষহীন সংগ্রামের সে ভয় হীন উদাত্ত স্বর প্রেরণা জুগিয়েছে জনগণের অন্তরে। জঙ্গী শাসনের আওতায় থেকে কবিদের পক্ষে এই অসীম সাহস অকুণ্ঠ প্রশংসার দাবি রাখে। তুলনায় সময় বিশেষে আমাদের দেশের অনেক বিখ্যাত কবি ও সাহিত্যিকের বক্তব্য ধোঁয়াটে, অর্থাৎ অস্পষ্ট এবং সন্দেহ নেই, অনেক ক্ষেত্রে প্রতিক্রিয়াশীল শক্তিকে সমর্থন করে তাঁরা নিজেদের চামড়া বাঁচাতে চেয়েছেন। রবীন্দ্রনাথের মত নির্ভীক কণ্ঠ ইদানীং আমাদের দেশে দুর্লভ হলেও পূর্ববঙ্গে নয়। এদিক দিয়ে এদেশের সুবিধাবাদী কবি-সাহিত্যিকদের তাঁরা পথ দেখাবেন।

২১শে ফেব্রুয়ারীর রক্তরাঙা দিনগুলির কথা স্মরণ করে কবি আলাউদ্দিন আল আজাদ তাই বজ্রনিনাদে বলতে পারেন :

'হাজার মুঠির বজ্রশিখরে
সূর্যের মতো জ্বলে
শুধু এক শপথের ভাস্কর।'
('একুশের কবিতা')

অথবা, আব্দুল লতিফের 'একুশের গান'—

'দুইশ বছর ঘুমাইলি
আর কেন রে বাংগালি
জাগরে এবার সময় যে আর নাই
আইজো কি তুই বুঝবি নারে
বাংলা বিনে গতি নাই।'

২১শে ফেব্রুয়ারী সম্বন্ধে কবিতা লিখেছেন আবদুল গণি হাজারী। শোষক ও জুলুমবাজদের বিরুদ্ধে দৃপ্তকণ্ঠ আতাউর রহমান, এনামুল হক, আনিস চৌধুরী, আনিসুজ্জামান, আসাদ চৌধুরী প্রভৃতি কবিরা। এনামুল হক বয়সে প্রবীণ এবং সম্ভবত এখনো প্রবাসী। কসাক সৈনাদের মত যখন তিনি শীতের কাপড়ে আবৃত হয়ে বৃষ্টির মধ্যে দিয়ে পথ হাঁটেন, তখন তাঁর জন্মভূমির দিগ্বলয়ে বৃষ্টির ঠিক পরমুহূর্তের সেই রামধনুর বর্ণচ্ছটার সমারোহ মনে পড়ে যায়। ২১শে ফেব্রুয়ারীর শহীদদের স্মরণে হাসান হাফিজুর রহমানের কবিতাও আমাদের অভিভূত করে—

'কুয়াশ যেমন বর্ষার পলিসিক্ত মাঠে
রোয়া ধানের চারাগুলো
রেখে আসে সোনালী শস্যের
জন্মের আকাঙ্ক্ষায়
তেমনি আমার সরু সরু অনুভূতিগুলো
জনতার গভীরে বুনে এসেছি।'
('অমর একুশে')

বস্তুত জাগ্রত-চেতনা, জীবনবোধ এবং জীবন-বিশ্বাস সেখানকার প্রতিনিধি-স্থানীয় অনেক কবির কবিতায় পরিস্ফুট। যুগের হতাশা বেদনা ব্যর্থতা বিরূপতা নৈরাশ্য ও পলায়নপর মনোবৃত্তি যে একেবারে দুর্লভ তা বলছি না, কোন কোন কবির কবিতায় এসব ছাপ বেশ স্পষ্টই। কিন্তু বল-বিশ্বাস এবং বীর্য একটি অলোকিত প্রেরণায় উদ্দীপিত করেছে পূর্ববঙ্গের কাব্যলক্ষ্মীকে। তাই আলাউদ্দিন আল আজাদ বলেন—

'পাতাল থেকে আসছি
আমরা, পাতাল থেকে
আসছি
সূর্য জ্বালবার
সোপান খুঁজতে
পাতাল থেকে আসছি।'
(সূর্য জ্বালার সোপান)

অন্যত্র, সিলেটের কবি দিলওয়ার—

'একমুঠো রোদ্দুর কতোদূর যায়
নিশানা কি কেউ তার পায়?
সুমেরুর হাত ধরে কুমেরু কখন্
সেই রোদে করে আলাপন।
আকাশের মন নিয়ে রোদ্দুর তবে
আমার পৃথিবী জুড়ে রবো।'
('একমুঠো রোদ্দুর')

কিংবা, মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান—

'সভীর চেতনায় যে ঘণ্টাধ্বনি বাজছে
তাকে আমি কেমন করে ভুলব।
সবুজ আস্তরণটায় যে প্রশান্তি
নির্জন বটমূলে যে বাউল
গানের খিধায় উচ্চকিত যে বাঁশী
তার ছায়া
তার ধ্যান
তার গমক
আমার ব্যাকুলতার প্রিয়চর।'
('চেতনায় যে ধ্বনি')

সততা ও নিষ্ঠা না থাকলে এমনটি সম্ভব নয়। যে-দেশের যে-ভাষার কবিকুলে এমন সততা ও নিষ্ঠা বিদ্যমান, সে-দেশের সে-ভাষার কবিকুল ধন্য—সমগ্র মানবসমাজ তাঁদের কাছে আরো অনেক কিছুই আশা করবেন। কারণ কবিরা কখনো কোন দেশ-কালের গণ্ডীতে সীমাবদ্ধ থাকেন না।

সিকানদার আবু জাফর তাঁর 'রবীন্দ্রনাথ' নামক কবিতায় রবীন্দ্রপ্রভাব থেকে মুক্তির পথ খুঁজেছেন। যদিও তালিম হোসেন, রওশন আরা জামান প্রভৃতি কবি নজরুলকে নিয়ে কবিতা লিখেছেন, তাহলেও তাঁর প্রভাবে আধুনিক কবিরা প্রভাবান্বিত নন। জসীমুদ্দিনেরও প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ প্রভাব তাঁদের উপর তেমন বর্তায় নি—অপিচ বা গ্রামবাংলার শান্ত নিস্তরঙ্গ রূপমাধুর্য বর্ণনার তৃপ্তিতে ও সারল্যে কোন কবিই তাঁর অনুসরণ করেন নি। শহীদ কাদরীর প্রথম দিকের লেখায় অবশ্য সুধীন দত্তের সংহতি ও দার্ঢ্য লক্ষ্য করা যায়। পূর্ববঙ্গের আধুনিক কবির কবিতায় জীবনানন্দ ও বিষ্ণু দে-র প্রভাব সর্বাধিক। বাংলা কাব্যে রবীন্দ্রোত্তর যুগে, সকল আধুনিক কবির কাব্যভাবনায় তাঁদের ছায়াপাত হয়েছে, একথা অস্বীকার করা যায় না। একটি উদাহরণস্বরূপ অল্পখ্যাত কবি আজিজুল হক-এর 'স্খলিত প্রহর' কবিতায় জীবনানন্দের প্রভাব দেখি—

'যেন এক সমুদ্রের পাখী
সুনীল রৌদ্র ভেঙে সকালের
রুপালী ডানায়
উড়ে যেতে পারবে না আর
সারাদিনে ছড়িয়ে ডানা দেখবে না তার
নিটোল জলের কাছে কাছে
স্খলিত প্রহরে এক মুক্তাবতী
ঝিনুক রমণী শুয়ে আছে।'

পূর্ববঙ্গের কাব্য আন্দোলনের আর একটি বড় সম্পদ, কবির কাব্য প্রতিভাব সুস্থ ও সংগঠনমূলক সমালোচনা। আল মাহমুদ, মনিরুজ্জামান, শহীদ কাদরী, হায়াৎ মাহমুদ, মনসুরে মাওলা, জিয়া হায়দার প্রমুখ আটজন সুপরিচিত ও অল্পপরিচিত তরুণ দীপ্ত কবিকর্মীর তেত্রিশটি কবিতা সমন্বিত 'সপ্তক'-এর সমালোচনা করতে গিয়ে পূর্ববঙ্গের সমালোচক অভিযোগ তুলেছেন, সপ্তক-এর কবিতাবলী তিরিশের পুনরুক্তি, এই কবিবর্গ কোন বিশেষ জিজ্ঞাসায় উদ্দীপ্ত মন, পশ্চাদভূমি সম্পর্কে এঁদের ধারণা অস্পষ্ট, আন্তরিক তো নয়ই, এঁরা কেউ কেউ ক্ষমতাবান, কিন্তু সেক্ষেত্রেও সৎ কবিতা সৃজনের প্রেরণা থেকে বিচ্ছিন্ন, অকারণ যৌনবোধের বিকার এঁদের প্রায় সকলের সম্পত্তি, এই কবিকুলের মধ্যে যাঁরা পুরনো, তাঁদের কোন স্ব-ভাব এখনো স্পষ্ট নয়, তরুণদের কথা প্রশ্নাতীত। অতিরিক্ত যৌনতার চিত্রাঙ্কনে উৎসাহী রিলকে ভক্ত আল মাহমুদকে প্রশ্ন করেছেন—রিলকের কাব্যাদর্শে ১৯১১ থেকে ১৯২৩ খৃস্টাব্দের মধ্যে যে পরিবর্তন ঘটেছিল এবং বহির্জগতের পর্যায়ে এসে রিলকে যে অন্তরের উপলব্ধিতে বিশ্বকে, জীবনকে সৃষ্টি করলেন, আল মাহমুদ কি তার খোঁজ রাখেন না?

সমালোচক অত্যন্ত কঠোর বলেই মনে হয়। এঁরা শক্তিশালী কবি বলেই হয়ত এঁদের কাছ থেকে আরো বৃহৎ প্রত্যাশার দাবিতে সমালোচককণ্ঠ সোচ্চার। যুগ ও জীবনের হতাশা বিক্ষোভ যন্ত্রণায় কবি-হৃদয় মথিত বলেই জিয়া হায়দার হয়ত বলেন—

'বেঁচে থাকতে বন্ধু যার কখনো
ছিল না'
(মৃত্যুর পরে)

জিনাত আরা মালিকের কণ্ঠে শুনি,

অন্ততঃ মৃত্যু আছে—সর্বস্ব
সান্ত্বনা আমাদের
শেষ যবনিকা: ধূসর
বেগুনি রঙে আঁকা
অকলঙ্ক স্মিত সেই প্রিয়তম
মৃত্যু আমাদের।'
('মৃত্যু')

আল মাহমুদ লেখেন—

'মাংসের খোড়ল থেকে একে একে
উড়ে আসে আত্মার চড়ুই
সমস্ত ভূগোল দ্যাখো, কী বিপন্ন
শব্দে ভরে যায়
ভরে যায়, পূর্ণ হতে থাকে।'
('কালের জঠর')

হায়াৎ মামুদ বিলাপ করেন—

'প্রিয়তম, প্রিয়তম হে
জীবন তো পদ্মপত্রে জল
আয়ু কেবল গড়িয়ে পড়ে,
হয়ত বা তমসা, তমসাই প্রাণ।'
('বিলাপ')

এই আত্যন্তিক যন্ত্রণা বিষাদ ও বিলুপ্তির মোহ সত্ত্বেও হায়াৎ মামুদ বলেন—

'আমি মৃত্যু মানি না। নাস্তিতে
আমার আস্থা নেই।
হে সভ্যতা, হে প্রেম, বিবেক,
তুমি আমার পাশে থাকো।'

পূর্ববঙ্গের আধুনিক কবিতায় আর একটি প্রবণতা দেখা যায়—অনেক ক্ষেত্রে নাগরিকতা কৌলিন্য বিচারের মাপকাঠি হবার জন্যে ব্যস্ত হয়ে উঠেছে। নগরের কথা তার গায়ে বড় বেশি করে, চড়া করে লেখা থাকছে। বেদনার সঙ্গে আমরা দেখছি—

'হোটেলের চুপ চোষা ধূপ নীল ঠোঁট।'
(রাজিয়া খান—'বিশ বসন্তের গান')

অথবা শহীদ কাদরীর—

'টেলিফোনে আরক্ত প্রস্তাব'

কিম্বা রফিক আজাদ-এর কবিতায়—

ট্রাফিকের হর্ন, আজান, ব্যস্ততা,
মাইকের গলা'
(কবি)

অথচ শ্যামল-কোমল সুজল সরল নদীমাতৃক পূর্ববঙ্গের গ্রামাঞ্চলের অপরূপ রূপরাশি কবির কাব্যের চিরন্তন সম্পদ হয়ে থাকতে পারে। তাই, এরই পাশাপাশি এই নগরভিত্তিক সভ্যতার বিরুদ্ধে স্বকণ্ঠ বাণী উচ্চারণ করেছেন হাসান

হাফিজুর রহমান। শান্ত বিষণ্ণচিত্তের এই কবি বলছেন—

'গ্রহণগ্রস্ত চাঁদ এই নগরী
ঢেকে রাখা স্বপ্ন নীলাভ পাঁজরে
আগলিয়ে কেবলই হাতছানি দিয়ে
ডাকছে
.....কেবলই
স্বর্ণ শিকারের এক আবর্ত থেকে
আর এক
আর এক আবর্তে বয়ে যাচ্ছে
কাল যেন অপ্রাপনীয়া
উর্বশীর সর্বাঙ্গের ক্ষান্তিহীন
দোলা আর
আমার দুচোখে কেবলই লুপ্ত স্মৃতি
সুখী বর্ণচ্ছটা।'
('গ্রহণগ্রস্ত নগরী')

তাঁর কবিতায় গ্রামবাংলার রূপ দেখি—

'কতদিন হাঁটি না তো আমি
ধু ধু করা পথে
শুনি না নৌকোর মাঝি ডাকে
দূর থেকে তরল আঁধারে
হাট শেষে সঙ্গী সাথীদের সাথে
বাড়ী ফেরবার তাড়া
জাগে না চলায় কতদিন
কতদিন একা একা মাঠে জলে ভুলে
অজানায় কেঁপে হারাই না সন্ধ্যার
শ্যামলে
দেখি না দুচোখ ভরে শেফালির
বকুলের
ঝরেপড়া আর ভেজা শিশিরের পরে
শীতের সকালে
আহা মেলাই না বুক সাদা ও
সবুজ বুকে কতদিন অবাধ স্বভাবে,
ফাজের দাঁতের ভাঁড়ে আমি যেন
সময়ের খাদ্যকণা এক।'

এই কবির নগরজীবনের প্রতি অসন্তুষ্টির কারণ—ভিন্নতর অভিজ্ঞতার সম্পদ তাঁর আছে, স্মৃতি আছে তেমন জীবনের যেখানে 'থরে থরে ফুটে আছে ফুল', আছে চিরচেনা পাখি ওড়া আঁকা নদীটির বাঁকা ছবি; মায়ের মুখের মত 'শ্যামলিমা আয়ুষ্মতী'। হাসান হাফিজুর রহমান তাঁর স্বকীয় ওজস্বিতায় উজ্জ্বল। তাঁর অপরূপ কাব্যগ্রন্থ "বিমুখ প্রান্তর"-এর মধ্যে দিয়ে অনেক বড় আকাশ, খুব চওড়া মাঠ ও বেগবান নদীর কথা স্মরণ করিয়ে দেন। অথচ আত্মগত হয়েও তিনি চারপাশের মাটি ও মানুষকে আলিঙ্গন করেন।

অন্য এক কবি আল মাহমুদ-এর কবিতায় পল্লীবাংলার চিত্ররূপ—

'যদি যান,
কাউতলী রেলব্রীজ পেরুলেই দেখবেন
মানুষের সাধ্যমত
ঘরবাড়ী।
চাষা হাল বলদের গন্ধে থমথমে
হাওয়া।
কিষাণের ললাটে লেখার মত নদী,
সবুজ বিস্তীর্ণ দুঃখের সাম্রাজ্য।'
('রাস্তা')

জাগ্রত আত্মজিজ্ঞাসা জেগেছে কবিদের মনে। ধার করা সভ্যতার প্রতি বিরাগের নিদর্শন আছে নিম্নোক্ত কবিতায়—

'.....যদি না সুধার হত দশচক্রে
তবে ঐ সব যুবকেরা
মুক্তি পেত
হুলা-হুলা-র লজ্জা থেকে।
('চেতনায় যে ধ্বনি'
—মোহাম্মদ মনিরুজ্জমান)

মেহবুবা মোমলেস বলেন—

'নীল সমুদ্রের ডাকে ভুলে যায়
তার শ্যামল দেশকে
বিদেশী অঞ্চলে স্বপ্ন আচ্ছন্ন
ঠুনকো নেশায় নিজেরে বরেণ্য করে
তোলে'.....
('স্মৃতির আকাঙ্ক্ষা')

শুনতে পাই আত্মধিক্কার হাসান হাফিজুর রহমানের কণ্ঠেও—

'স্বনাম ভুলেছি আমি
স্বনাম ভুলেছি আমি
কৌতুকের পাশব খেলায়
জন্মমৃত্যু ঘুঁটি চালি
নিতান্ত হেলায়
দিন যাপনের কালে প্রাণ ধারণের
দেশে
বেলা বয়ে যায়।'
('স্বনাম ভুলেছি আমি')

পরীক্ষা-নিরীক্ষার নতুন নতুন ক্ষেত্রে আব্দুস সাত্তার, ইমরুল চৌধুরী, সানাউল হক, কায়সুল হক প্রভৃতি কবি তাঁদের প্রতিভার স্বাক্ষর রাখছেন। রওসন ইজদানী এবং আবদুল লতিফ কিছুটা স্থানীয় লোকগীতির ভাষা অনুসরণ করেছেন। ইমরুল চৌধুরীর সংস্কৃত শব্দবহুল ধ্বনিগম্ভীর একটি সনেটের কিয়দংশ—

উচ্ছ্বাসের কণা নই, স্ফীত নই
সমুদ্রে, রমণী
হে, তোমার সম্ভ্রমের অতি চিক্কণ
শরীর থেকে
শীতলপাটি সুখস্পর্শ বিলাস
অতি প্রয়োজন
থাবেয়ে প্রতিভার অর্চিচ্ছিরিতে,
নিবন্ধ বিসম
বাহু ত্রিভুজ, যেন বা নীলাচলে
ধাবমান রথ
দৃষ্টি অবধি তাড়ায় এ দেহ
জগন্নাদের চাবুক।
('জলাশয়ে মাছ')

আব্দুস সাত্তারের কণ্ঠে শুনি এক বহৎ উত্তরণের বাণী—

'পবিত্র বাণীর মন্ত্রে ভালোমন্দ
চিনেছি এখন
সত্তার অঙ্গনে হেঁটে; জীবনের
বাগানে একক
বসন্তের মুঞ্জরিত সকল ফুলের
ভালবাসা
নির্বিঘ্নে ফোটাই সুখে,
অবজ্ঞার আস্তাকুঁড়ে ফেলি
পঙ্কিল জীবনবৃত্তি অবারিত ইচ্ছার
বিলাসে।
এ শিক্ষার আলো জ্বলে উদয়াস্ত
পৃথিবীর ঘরে।'
('অন্তরঙ্গ ধ্বনি')

অন্যত্র, তাঁরি কবিতায়—

'সমস্ত দিনের আয়োজন শেষ।
বিকেলে লাল সূর্যের সিগন্যাল
জ্বলে উঠলো,
দিনটা রাত্রির ট্রেনে কোথায়
চলে গেলো।
আমি ডাকবাংলো থেকে দেখলাম।'
('আমার ডাকবাংলোর দিন')

'উল্টট' কবিতায় সানাউল হক-এর পরীক্ষা-নিরীক্ষার নমুনা—

'ঘরের পর্দায় হাওয়ার দৌরাত্ম্য:
ভেনাসের সে মূর্তিটা
সস্তা বাদামী মার্বেল দিয়ে তৈরী
আমার স্ত্রী স্বহস্তে যা দ্রাখ্‌মা
ভাঙিয়ে
এথেন্স থেকে কিনে এনেছিলেন
ভেঙে খানখান তেখণ্ডিতা।
(হাওয়ার সঙ্গে ফুলের ও সুন্দরীর,
কী যে বৈরিতা!)'—ইত্যাদি

কায়সুল হক-এ দেখি—

'আশ্বিন এসেছে
পাটের দাম না পাওয়া
হাড় জিরজিরে কৃষকের মত।
.....আশ্বিন এসেছে
বেকার যুবকের
মলিন পাৎলুন এঁটে।
পুজোর ঢাকে বুঝি,
তাই পড়ে না কাঠি।
('এবারের আশ্বিন')

ছন্দোবৈচিত্র্যে, চিত্রকল্পে, উপমায়, রূপকে, সমাসোক্তিতে পূর্ববঙ্গের কবিরাও কাব্যলক্ষ্মীর অঙ্গ অলঙ্করণে সমধিক যত্নবান। ফারুক আমেদ বাংলা ভাষায় কতকগুলি উজ্জ্বল সনেট উপহার দিয়েছেন। জিয়া হাযদার-এর 'একতারাতে কান্না' কাব্যগ্রন্থের একটি কবিতায় মিলের বৈচিত্র্য—

'তখুনি আমার রমণীয় আস্বাদে
পরস্পরকে দেখলাম পরিপূর্ণ
নিষ্পাপ যতো ইচ্ছার মতো
নাভের মতোন সাজলো পরম বস্তু,
অকৃপণ ধনী হলাম অলীক চিত্তে।'
('এবং তখুনি')

কাল রাত্রে বাবাকে হাসতে দেখলাম

বেণু দত্তরায়

কাল রাত্রে বাবাকে হাসতে দেখলাম। অনেকদিন পরে
যেন বাবাকে হাসতে দেখলাম। কাল রাত্রে
যেন অনেকদিন পরে বাবা হাসলেন।
অনেকদিন এমন করে তাঁকে হাসতে দেখি নি।
জানালার পাশে বসেছিলেন বৃদ্ধ উৎসুক মানুষটি
ঘাড় ফিরতে দেখলাম
কেরোসিন লণ্ঠনের কালি-পড়া চিমনির আলোয়
দেখলাম বাবা উঠে দাঁড়ালেন হাসলেন সেই এক
গর্বিত নির্ভর অগ্নিচূড়া
যেন করতলে সুখের গুটিগুলোকে পেয়ে গেছেন

বাবা অনেককাল পরাজিত
সংসারের রঙের চাকায় তাঁর পাঁজরগুলি গুঁড়িয়ে গেছে
আমরা জানি নি ভুইচাঁপার ডাল রক্তে মাখামাখি হয়
আমরা জানি নি ভুইচাঁপার ডাল রক্তে মাখামাখি হয়
জানতাম বাবা বুড়ো হয়ে গেছেন
কৌটরবন্দী ভয়ার্ত ফোলা ফোলা চোখ ভাঙা চোয়াল
আর কলঙ্কিত চিবুক নিয়ে
মানুষটি এমনভাবে তাকাতেন যে আমাদের রক্ত
হিম হয়ে যেত

আমরা কোনদিন গান শুনতে যাই নি
যেন বর্ণা নেই ঝাউতলা নেই নদী নেই মোরগঝুঁটি আকাশ—
শুধু বড়ো গরু আছে ধার-দেনা আছে
ভাঙা বাক্স সর্বস্বান্ত টিনের তোরঙ্গ আছে
হাতিলভাঙা কলাই-ওঠা পেয়ালায় চা-র স্বাদ
বাবার কাটা ঠোঁটে মাছি বসত, ভাঙা ছাড় ও
কেরোসিন কাঠের বাক্সে

আদিকালের দম-দী-লাগান ঘড়ি:
বাবা ধুঁকে ধুঁকে চলতেন তাঁর পিরাণের জেব জেল্‌জেলে হয়ে
গিয়েছিল

যেন বৃদ্ধ উট রণক্ষেত্রের সমাধি-পার্শ্বে রক্তগোলাপ
দাদা চাকরি পায় নি বলে গলায় দড়ি দিয়েছিল, ভাই-এরা
পলাতক
কন্ট্রাক্টরের নর্মসঙ্গিনী দিদিরা চলে গেছে সুখের ডিস্
আলো করতে
ছাইগাদার পাশে শ্মশানের হাঁড়িকুঁড়ি
ধনি-মঙ্গলের মানতে কুলুঙ্গির পাশে লক্ষ্মীর ব্রতকথার
ঝাঁপিতে
বৃদ্ধ মা-র ঘরকন্না

কাল অনেকদিন পরে বাবাকে হাসতে দেখলাম
রাত্রে বাড়ি ফিরে
ভাঙা লণ্ঠনের কালি-পড়া চিমনির আলোয়
বাবা উঠে দাঁড়ালেন; তাঁর ঠোঁট হাসছিল
যেন ছানি-পড়া চোখ দুটি জ্বলছিল
ভালোবাসায় বিশ্বাসে আগ্রহের আবেগে
যেন অন্ধকার ঠেলে উঠে দাঁড়িয়েছে বোবা পাহাড়
বাবা বিড়বিড় করে বললেন, আমরা জিতে গেছি...

বাইরে মিছিলের শব্দ লক্ষ লক্ষ মজুর, ছাত্র ও সংগ্রামী
জনতার শোভাযাত্রায় মিলিত এক নদী
ভোট গণনা শেষ হতে রাজপথের পাথরে নামছিল
মাইকে সর্বশেষ ফল ঘোষণা করছিল
আর যেন সত্যি সত্যি ভোর হয়ে গেছে, আর
কালি-পড়া লণ্ঠনের চিমনিটার দরকার নেই, ভেবে
আমি আকাশের দিকে তাকাচ্ছিলাম

বাবারই সেই ঠোঁট তাঁর চোখের সেই হাসি ফিরে ফিরে
কালপুরুষ-জ্বলা আগুনের অক্ষরে জ্বলছিল।

এখানে 'পরিপূর্ণ'-এর সঙ্গে মিল রক্ষায় 'ঊর্ণনাভ' শব্দটিকে সুন্দরভাবে ভেঙে সাজানো হয়েছে।

এবার হাসান হাফিজুর রহমান-এর কাব্যগ্রন্থ 'বিমুখ প্রান্তর' থেকে কতকগুলি চিত্রকল্প উপহার দিচ্ছি—

(ক) ঐ অন্ধকারের বন্যা পেরিয়ে
ধর্ম যে দ্বীপের মিনার জাগবে
(খ) কান্না দিয়ে চেরা
(গ) অজানা স্বপ্নের মুগ্ধ কবি
তোমার তিমিরে হারানো কি ভাড়ে
সাথী সম্পদের ফুল ফুটবে কি
ভারে ভারে?

(ঘ) আমার দুই হাত কেবলই নুহের
কাসেদ কবুতরের মতো আকাশকে ডাকে।

অপূর্ব সুন্দর একটি কাব্যগ্রন্থের নাম শামসুর রাহমান বিরচিত "রৌদ্র করোটিতে।" তাঁর অপরূপ চিত্রকল্পের নমুনা—

(১) 'তারপরো আমার আত্মার স্বর
বীক্ষণের প্রতিভা ছড়াবে
অমাবস্যা নিমন্ত্রণ প্রাণের
শিকড়ে শিকড়ে।'
('আর যেন না দেখি')

(২) 'যেখানে বাগানে গুচ্ছে গুচ্ছে
রক্ত গোলাপ
ফুটেছিলো সেই বিবেকী বুদ্ধের
সুখসন্ধ্যায়
সেখানে এখন শুকনো হাড়ের
সমবায়ী টিলা
চন্দ্রালোকের নিথর কুহকে
শিহরিত শুধু।'
(বিস্মৃতির গান)

আল মাহমুদ দেখেন—
'দৃশ্যপারী তৃষ্ণার লোচন।'
('কালের জঠর')

তেমনি কায়সুল হক-এর একটি সুন্দর সমাসোক্তি—
'কেবলি ইচ্ছারা যেন নড়ে চড়ে।'
('নিবিড় ইচ্ছার ডালে')

উপরোক্ত কবির উপমার নতুনত্ব—
শরৎ এসেছে
তিন দিনের দাড়ি না কামানো
ইস্কুল মাস্টারের চেহারা নিয়ে....
আশ্বিন এসেছে
অল্প বেতন কেরানীর নুন্যে
দেহের মতন।'
('এবারের আশ্বিন')

স্বভাবতই পূর্ববঙ্গের কবিকুল আজ উদ্বুদ্ধ। কাব্যের দরবারে তাঁদের অনেকেরই সততা ও নিষ্ঠা অবিসংবাদিত। তাঁদের অনুশীলনে বিশুদ্ধ বাংলা ভাষার মহিমা কীর্তিত হচ্ছে। প্রাণচাঞ্চল্যে, প্রগতিতে, প্রেরণায়, পরীক্ষা-নিরীক্ষায়, আত্ম-জিজ্ঞাসায়, জীবন-জিজ্ঞাসায়, চেতনার দীপ্তিতে, নব নব ভাবপ্রকাশে তাঁরা প্রাগ্রসর। তাঁদের পরিশীলিত প্রজ্ঞার আলোকে বঙ্গ-কাব্যভারতীর অপরূপ রাণী-মন্দির সন্দেহ নেই, উজ্জ্বল থেকে উজ্জ্বলতর হয়ে উঠবে।

মধ্যবর্তী নির্বাচন ও কংগ্রেস

পশ্চিমবঙ্গের সদ্য-সমাপ্ত মধ্যবর্তী নির্বাচনে যুক্তফ্রন্ট বিপুলভাবে জয়ী ও কংগ্রেস শোচনীয়ভাবে পরাজিত হয়েছে। ফল প্রকাশের পর প্রাদেশিক কংগ্রেস নেতৃবর্গ দিল্লীতে কংগ্রেসের এ অপঘাতের ময়না তদন্তে গিয়েছিলেন। আশা করেছিলাম অভিজ্ঞ চিকিৎসকমণ্ডলী সুরতহালে সঠিক-রোগ আবিষ্কারে সক্ষম হবেন। দীর্ঘদিন জনসংযোগ বিচ্ছিন্ন গদিনসীন সরকারী কংগ্রেসের রক্তশূন্য অবস্থায় অপমৃত্যু ঘটেছে প্রকাশ পাবে। কিন্তু কী আশ্চর্য, আমার অনুমান, প্রকাশিত ময়না তদন্ত রিপোর্টের ধারে-কাছেও ঘেঁষতে পারে নি। অভিজ্ঞ চিকিৎসকমণ্ডলী রায় দিয়েছেন—সরকারী কর্মীদের অন্তর্ঘাতই কংগ্রেসের অপমৃত্যুর কারণ।

বস্তুত আপনি লক্ষ্য করে থাকবেন, কংগ্রেস কখনই হাওয়ার অনুকূলে চলতে পারে নি। পরন্তু সে সব সময়েই প্রতিকূলে চলতে অভ্যস্ত। দীর্ঘ বিশ বৎসরের শাসনে যে জনমতকে কখনই শ্রদ্ধা করে নি। আজ পাকিস্তানে জবরদস্ত আয়ুবশাহী জনমতের চাপে নতিস্বীকার করছে। কিন্তু আমাদের দেশে কি কেন্দ্রীয় কি প্রাদেশিক কংগ্রেস সরকার জনতার কোন দাবি মেনে নিয়েছে এমন দৃষ্টান্ত একেবারেই বিরল। জনসাধারণের যে কোন ন্যায্য দাবি কমিউনিস্ট আন্দোলন আখ্যা দিয়ে কংগ্রেস সরকার লাঠি, বুলেট ও জেলের দরজা খুলে দিয়ে অভ্যর্থনা করেছে। এই প্রসঙ্গে ১৯৬৬ সালের খাদ্য-আন্দোলনের কথা স্মরণ করি। দেশের জনসাধারণ যখন একটু খাদ্য ও কেরোসিনের জন্য দাবি জানাচ্ছে তখন পুলিশকে যথেচ্ছ ক্ষমতা দিয়ে সেই নিরস্ত্র বুভুক্ষু জনতার মাঝে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে। সারা দেশ রক্তে ভেসে গেছে। কিন্তু তখনও আমাদের জনদরদী গান্ধীবাদী মুখ্যমন্ত্রী সাংবাদিকের কাছে দেশের শাসনকার্য 'ফার্স্ট ক্লাস' চলছে বলে সাফাই গেয়েছেন। শুধু এই নয়। স্বাধীনতা-প্রাপ্তির পর খণ্ডিত বাংলাদেশের প্রথম কংগ্রেসী মুখ্যমন্ত্রী ডঃ ঘোষ 'কলা কানুনের' সুবাদে সেই যে প্রথম রক্ত ঝরিয়েছিলেন—পরবর্তী বিশ বৎসরের শাসনও সেই রক্ত ঝরার ঘৃণিত ইতিহাস। এই সেদিনও ক্ষণস্থায়ী কংগ্রেস-নির্ভর পি-ডি-এফ শাসনে রিজার্ভ পুলিশের গ্রাউণ্ডেড সহকর্মী যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রী শ্রীঅমর চক্রবর্তীকে পুলিশ দিয়ে মারাত্মক আহত করেও গান্ধীবাদী ডঃ ঘোষ সোল্লাসে বলেছিলেন 'অমর তো মরে নাই'। আরো একটি ছবি মনে পড়ছে। হাজার হাজার সরকারী কর্মী গণডেপুটেশনে মুখ্যমন্ত্রীর কাছে তাঁদের অভাব জানাতে গিয়েছিলেন। রাজভবনের পাশে অঝোর বৃষ্টিধারায় তাঁরা

দাঁড়িয়ে ভিজেছেন। কিন্তু আমাদের জনদরদী মুখ্যমন্ত্রী 'শুভলক্ষ্মীর' গান শুনতে ব্যস্ত ছিলেন। ক্ষুধিত কর্মচারীদের অভাব শোনার অবকাশ তাঁর হয় নি। কংগ্রেসের এই জমিদারী চালে রাজ্যশাসন তাদের এই দম্ভ ও আত্মম্ভরিতাই কংগ্রেসের অপমৃত্যুর কারণ।

কংগ্রেস একেবারেই জনসংযোগ করে নি এ কথা সত্য নয়। গ্রামের ও শহরের মিল-মালিক, জোতদার, মোড়লশ্রেণীর লোকের সঙ্গে তার আঁতাত প্রবাদবাক্য। এই সূত্রেই আপামর জনসাধারণকে সে একটি পশুদল বলেই মনে করেছে। শুধু দলপতিকে রাস্তা ধরিয়ে দেওয়া। তাহলেই কাজ শেষ। সারা দল দলপতির পিছে চলবে। দলপতির জন্য অবশ্যই পারমিট, লাইসেন্সের ঢালাও ব্যবস্থা। এই করেই কংগ্রেস বিশ বৎসর নির্বাচনে জিতেছে। আর দেশের দরিদ্রশ্রেণী, খেটে-খাওয়া মানুষ ক্ষেতমজুর, অপিসকর্মী, শ্রমিক আকুল আগ্রহে অপেক্ষা করেছে। কখনও তারা শুনেছে শিশু রাষ্ট্রের কথা, কখনও শুনেছে পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার জয়গান। কিন্তু মাঝে-মধ্যে ছিঁটেফোঁটা ছাড়া অবস্থা তাদের যে তিমিরে সেই তিমিরে। অথচ এই নিরন্ন লোকগুলির পাশাপাশি হঠাৎ গজিয়ে-ওঠা স্ফীতকায় এক শ্রেণীর আবির্ভাব ঘটেছে এবং তাদের শ্রীবৃদ্ধি হয়েছে বিদ্যুৎ গতিতে।

যেহেতু এদেশের অধিকাংশ জনসাধারণ অত্যন্ত দরিদ্র সেহেতু তারা কিছুটা লোভীও। কংগ্রেস এই সুযোগ পূর্ণমাত্রায় গ্রহণ করেছে। সংকট সময়ে একটু পাউরুটি, এক কেজি ভুট্টা বা গুঁড়ো দুধ দিয়ে সে অনায়াসে এই দরিদ্রশ্রেণীর ভোটগুলি করায়ত্ত করেছে। এই লোভের ছবি আমি তথাকথিত শিক্ষিত শ্রেণীর মধ্যেও প্রত্যক্ষ করেছি। চাকরি, প্রমোশন, বদলী ছাড়াও সামান্য একটা ডায়েরী বা ক্যালেন্ডার দিয়েও ভোট সংগ্রহ করতে কংগ্রেসের অসুবিধা হয় নি। এর পর আছে দৈবদুর্বিপাক। দেশের একাংশ যখন বন্যার ভেসে গেছে—জনসাধারণ আতঙ্কগ্রস্ত, বাঁচার তাগিদে মরণপণ সংগ্রাম করছে, তখনও একশ্রেণী কংগ্রেসীর মধ্যে চাপা উল্লাস দেখেছি। রিলিফ দিয়ে ইলেকসান জেতার সেই পুরাতন কৌশল। ইলেকসানের বছরে এখানে বান হবে একথা প্রবাদ হয়ে গেছে।

মাননীয়া সম্পাদিকা, আমি আশা করেছিলাম সুরতহাল রিপোর্টে একথাগুলি অবশ্যই থাকবে। কারণ এগুলি কংগ্রেসের পুনরুজ্জীবনের পক্ষে একান্ত প্রয়োজন। কিন্তু এ প্রত্যাশা পূরণ হবার নয়।

কংগ্রেসের দম্ভই তার সঠিক রোগ নির্ণয়ে বাধা দিয়েছে। হতভাগ্য প্রশাসনিক কর্মীদের ওপরে দোষ চাপিয়ে কংগ্রেস হাত ধুয়ে পরিষ্কার করে ফেলেছে।

এই প্রসঙ্গে শান্তিনিকেতনে প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরাজীর একটি মন্তব্য স্মর্তব্য। তিনি যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রিসভার কাছে সবশ্রেণীর নাগরিকের সমান অধিকার প্রত্যাশা করেছেন। কিন্তু বিশ বৎসর কংগ্রেসী শাসনে সকল শ্রেণীর নাগরিক কি সমান অধিকার পেয়েছেন? কংগ্রেসী শাসনে অকংগ্রেসী জনসাধারণের জন্য কি বুলেট, লাঠি ও জেলের দরজা খোলা থাকে নি? অকংগ্রেসী বেকার কি সরকারী চাকরী পেয়েছেন? ব্যবসায়ী অকংগ্রেস হলে কি পারমিট, লাইসেন্স পাওয়ার সুবিধা হয়েছে। যদি হয় তবে তুলনায় কতটুকু? আমার তো মনে হয় কংগ্রেসী আমলে অকংগ্রেসী জনসাধারণ পাকিস্তানে হিন্দুর মতো দ্বিতীয় শ্রেণীর নাগরিক হয়ে জীবন কাটিয়েছেন। মাননীয়া সম্পাদিকা আপনি কী বলেন? —শ্রীঅমরেন্দ্রনাথ সিংহরায়

আরামবাগ (হুগলী)

'লোকসঙ্গীতের একাল না আকাল'? প্রসঙ্গ

সাপ্তাহিক বসুমতীর ৭৩ বর্ষ ঃ ৩৪শ সংখ্যায় মুতশিদ লিখিত 'লোকসঙ্গীতের একাল না আকাল' প্রবন্ধ সম্পর্কে আমার কিছু বক্তব্য আছে। পুরো প্রবন্ধটিতেই মুরশিদ সাহেব একে একে আকাশবাণীর ছোট-বড় প্রায় সব লোক-শিল্পীদের সমালোচনা করেছেন। কাউকে হরত বা মৃদুভাবে আবার কাউকে বা ব্যক্তিগত আক্রোশবশে শ্লেষ-সূচক অসংযত ভাষায়। ছদ্মনামের মুখোস পরে ব্যক্তিগত আক্রোশ জাহির করার জন্যই কি এই প্রবন্ধের অবতারণা? এ অধিকার তিনি পেলেন কোথায়?

মুরশিদ সাহেব লোকসঙ্গীত বিশারদ, তাই বোধ হয় তাঁর এই প্রবন্ধের গোড়ার দিকে লৌকিক বাদ্যযন্ত্রের থিওরির তথ্য প্রকাশে অবাঞ্ছিত ত্রুটি-বিচ্যুতি রয়ে গেছে। তিনি একজায়গায় বলেছেন, "দোতারার 'ভ্যাম্প' হল আমাদের লোকসঙ্গীতের ছন্দ ও লয়ের প্রথম পথ-প্রদর্শক। কিন্তু মুরশিদ সাহেব হয়ত জানেন না যে, তাঁর এই উক্তি বাংলাদেশের সব লোকসঙ্গীতের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়। কারণ দোতারার ব্যবহার উত্তরবাংলা এবং পূর্ববাংলার মধ্যেই সীমাবদ্ধ; পশ্চিম-

বাংলার প্রধান প্রধান প্রায় অধিকাংশ লোকগীতিতেই এর ব্যবহারের প্রচলন নেই। যেমন 'ধমক' বাদ্যযন্ত্রের ব্যবহার একমাত্র পশ্চিমবাংলার বাউল ও পূর্ব-বাংলার বৈষ্ণবী ও দেহতত্ত্বের গানের মধ্যেই সীমাবদ্ধ। তিনি তাঁর থিওরিতে চামড়ার যন্ত্র কোন্ প্রদেশে কি ব্যবহৃত হয় এ মন্তব্য করতে গিয়ে ঢোলক ও ঢোলকে পূর্ববাংলার বাদ্যযন্ত্র বলেছেন। এ মন্তব্য সম্পর্কে আমার ঘোরতর আপত্তি আছে। কারণ ঢোলক ও ঢোল পশ্চিমবাংলার তরজা গান ও অন্যান্য গান, যেমন 'গম্ভীরা' প্রভৃতির সাথে ব্যবহৃত হয়। লৌকিক বাদ্যযন্ত্র বিশেষ কোন্ পরিবেশের সৃষ্টি করে একথা আমি বিশ্বাস করি, তবে নদী-বক্ষে নৌকোয় মাঝির উদাত্ত কণ্ঠের ভাটিয়ালী গান পরিবেশ সৃষ্টির জন্য দোতারা বা বাঁশীর অপেক্ষায় বসে থাকে না। প্রাকৃতিক পরিবেশই ঐ বিশেষ ধরণের 'মুড' সৃষ্টির সহায়ক।

প্রবন্ধের শেষের দিকে আকাশবাণীর প্রোগ্রাম সমালোচনা প্রসঙ্গে আমার একটি অনুষ্ঠানের সমালোচনা করতে গিয়ে মুরশিদ সাহেব অনেক ক্ষেত্রেই শব্দ প্রয়োগের সংযম হারিয়ে ফেলেছেন তাতে দুঃখ নেই, তবে বাংলার লোকগীতি সম্পর্কে যে তাঁর জ্ঞান সীমিত সেটা ধরা পড়ে। তাই পরিচিত কয়েকটি গান বিশেষ করে যেগুলি রেকর্ড বা রেডিওতে বহুল প্রচলিত (যেগুলি তিনি জানেন) তাছাড়া অন্য লোকগীতিকে তিনি লোকগীতি বলে মানতে রাজী নন। তাই আমার উক্ত অনুষ্ঠানে দুটো প্রাচীন গানকে তিনি শিল্পীর স্বরচিত বলে মনে করেছেন এবং সেইখানেই আমার প্রতিবাদ। তিনি বোধ হয় জানেন না যে দ্বিতীয় গানটি "ধান কাটি কচাকচ" পূর্ব-বাংলার ঢাকা জেলার বিক্রমপুরে প্রচলিত একটি সারি গান। যে গানের উল্লেখ কবি জসিমুদ্দিন সাহেবের একটি প্রাচীন লোকগীতি সংকলনে আছে।

গানটির কয়েকটি পংক্তি হল :—

"ধান কাটি কচাকচ
মাথায় লইয়া ধানের আঁটি
ফিরব বাড়ী মচামচ ॥"

আর অপর গানটিও প্রাচীন। এটাও পূর্ববাংলার লোকগীতি। স্বনামধন্য লোকগীতিশিল্পী স্বর্গীয় গিরিন চক্রবর্তীর কাছে শেখা। যদিও মুরশিদ সাহেব গানের প্রথম পংক্তির উল্লেখ না করে মাঝের একটি পংক্তি অশুদ্ধভাবে প্রকাশ করেছেন। যেমন 'স্যাকরা বুঝি বসে আছে পাকা ধানের ক্ষেতে'। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে পংক্তিটি হল 'স্যাকরা বুঝি রাখছে মুইড়্যা ক্ষ্যাতটা সোনার পাতে।' হয়ত ঐকটা বিভ্রান্তি সৃষ্টি করার জন্যই মুরশিদ সাহেব ইচ্ছাকৃতভাবে ঐ পংক্তিটিকে বিকৃতভাবে উদ্ধৃত করেছেন।

তাই বলছিলাম বাংলার লোকসঙ্গীত সম্পর্কে সমালোচনা করতে হলে মুরশিদ সাহেবকে লোকসঙ্গীতের সংগ্রহের মূলধন আরও বাড়াতে হবে। তা নাহলে উনি পদে পদে ফ্যাসাদে পড়বেন। শুধু আলখাল্লা পরলেই মুরশিদ অর্থাৎ গুরু হওয়া যায় না। শুধুমাত্র মৌলভীর পোষাক পরে দাড়ি রাখলেই মোল্লা হওয়া যায় না আর কিছু লোকজন নিয়ে গাঁয়ে গিয়ে চিৎকার করলেই গাঁয়ের মোড়ল হওয়া যায় না। তার জন্য অধিকার অর্জন করতে হয়। আমার অনুষ্ঠানের সমালোচনা করতে গিয়ে মুরশিদ সাহেব 'যুগান্তরে' ২৬শে জানুয়ারী প্রকাশিত আমার একটি প্রবন্ধের উল্লেখ করে তার বিকৃত ভাবার্থ পাঠক-বর্গের কাছে তুলে ধরেছেন। প্রবন্ধটিতে আমি বলতে চেয়েছি শিল্পোন্নয়নের ফলে সিনেমা, রেডিওর গান সুদূর গ্রামাঞ্চলের অভ্যন্তরে প্রবেশ করার ফলে—শিক্ষার সম্প্রসারণের ফলে ও যান-বাহনের ক্রমোন্নতির ফলে বাংলার গ্রামের রূপান্তর ঘটতে চলেছে এবং যে গ্রাম্য পরিবেশ লোকসঙ্গীতের সৃষ্টির সহায়ক তার পারিপার্শ্বিকতার পরিবর্তন সাধিত হচ্ছে। ফলে লোকসঙ্গীতের নতুন সৃষ্টির ধারারও পরিবর্তন হতে আরম্ভ করেছে। এ শুধু আমাদের দেশেই নয়—সমগ্র ইউরোপেও লোকসঙ্গীতের রূপান্তর ঘটেছে। শিল্প-বিপ্লবোত্তর ইউরোপের লোকসঙ্গীত এবং শিল্প-বিপ্লবের পরের লোকসঙ্গীতের মধ্যে অনেক পার্থক্য লক্ষ্য করা যায়। ধীরে ধীরে এই রূপান্তর স্বাভাবিকভাবেই ঘটে চলেছে। একে জোর করে আনার প্রয়োজন হয় না। ইতিহাস এই কথাই বলে। মুরশিদ সাহেব পুরনো প্রতি-ক্রিয়াশীল মনোভাব নিয়ে বিরাজ করছেন তাই বৈজ্ঞানিক যুক্তি তাঁর কাছে "উদ্ভট" বলে মনে হয়। প্রবন্ধটিতে প্রাচীন লোকগীতির বিকৃতির একটা আশঙ্কা করা হয়েছে—কিন্তু বিকৃতির পক্ষে কোন ওকালতি করা হয় নি। আর তাছাড়া সাপ্তাহিক বসুমতীর নিয়মিত পাঠকেরা প্রাচীন লোকগীতিকে বাঁচানোর উদ্দেশ্যে যে কয়টি ধারাবাহিক প্রবন্ধ লিখেছি তা নিশ্চয়ই পড়ে থাকবেন এই পত্রিকার 'সঙ্গীতকথা' বিভাগে।

নদীর জীবনধর্ম হলো গতিশীলতা। নদী যেখানে এই গতি হারিয়েছে তার স্রোত থেমেছে, তার মৃত্যু সেখানেই। মানুষের জীবন, মানুষের সংস্কৃতি সম্পর্কেও এ কথাটা সত্য। সভ্যতার উষালগ্ন থেকেই মানব-সংস্কৃতির অভি-যান চলেছে এক রূপ থেকে অন্য রূপে, রূপান্তরের পথে। মানব-সংস্কৃতি পাথর হয়ে স্থাণুর মতো কোথাও দাঁড়িয়ে নেই। সে চলেছে, চলছে এবং চলবেও। মানব-ভাবনার পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে তার সংস্কৃতিরও রূপান্তর ঘটবে। কারণ মানবজীবনই হলো গতি-শীল। এই চলমানতাই তার জীবনধর্ম।

সঙ্গীত জীবনের সঙ্গেই অঙ্গাঙ্গি-ভাবে জড়িত। জীবনের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে তাই সঙ্গীতেরও রূপান্তর ঘটে। সঙ্গীত যেখানে চলমান জীবনের সঙ্গে যোগ রেখে চলতে জানে না, জীবনের মহাভোজে তার আমন্ত্রণ নেই, তার স্থান মিউজিয়ামে। তাকে আমরা অতীতের কংকাল বলে দেখতে পারি। জীবন দিয়ে গ্রহণ করতে পারি নে।

বস্তুত গতিশীলতাই হলো জীবন। স্বয়ং পরমেশ্বরও তাকে কোন একটি বিশেষ স্থানে থেমে থাকতে বললে সম্ভবত জীবন তার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করবে। কারণ থেমে থাকাটা মৃত্যু, চলমানতাই জীবন। ইতিহাসে সম্রাট ক্যানিউটের মতো অনেক দাম্ভিক ব্যক্তি অহঙ্কারের মদ গিলে মানব প্রগতিকে থামিয়ে রাখার চেষ্টা করেছে। কিন্তু মহাকালের ধাবমান রথ তাঁর নিষ্ঠুর চক্রের পেষণে সেই মূর্তিমান অহঙ্কারকে পিষে গুঁড়ো করে বর্জিত আবর্জনার মতো আঁস্তাকুড়ে নিক্ষেপ করেছেন।

মুরশিদ সাহেবও সম্ভবত সেই ক্যানিউটি অহঙ্কারেরই আধুনিক সংস্করণ। একথা আজ দিনের আলোর মতো সত্য যে, একশো বছর আগেও বাংলা দেশের গ্রামের যে চেহারা ছিল, গ্রামবাসীদের যে ভাবনা ছিল, বর্তমানে সেখানে রূপান্তরের ঢেউ লেগেছে। আর যেহেতু সঙ্গীত জীবনেরই সৃষ্টি সেই-জন্যই সঙ্গীতের রূপান্তরও অবশ্য-ম্ভাবী। যে সঙ্গীত এই ধাবমান জীবনের সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলতে পারবে না, জীবনের আনন্দের আসরে তার কোন স্থান নেই। একটা কথা এখানে স্মরণীয়, সঙ্গীতে গভীর দুঃখও পরিণতিতে আনন্দের স্পর্শ লাভ করে। কারণ সৃষ্টির ধর্মই হলো আনন্দের অনুসন্ধান।

পরিশেষে আমি মাননীয় সম্পা-দিকাকে অনুরোধ করব যে, বসুমতীর মত নিরপেক্ষ সাপ্তাহিকে ছদ্মনামের আড়ালে স্বার্থসিদ্ধির উদ্দেশ্যে এই ধরণের কোন লেখা ধারাবাহিকভাবে প্রকাশ আর যাতে না হয়। কারণ এ ধরণের প্রবন্ধ পত্রিকার মান বজায় রাখে না বরং অনেকাংশেই ক্ষুণ্ন করে

—বুদ্ধদেব রায়

উল্টাডাঙ্গা মেন রোড, কলিঃ ৪

রঙ্গমঞ্চ ও মঞ্চ নিয়ন্ত্রণ এবং বিদেশ

ইংলিশ থিয়েটার ঃ লিরিক থিয়েটারে তাঁর নিজের পরিকল্পনার প্রবর্তন করতে ভ্যানব্রুগারের কিছু সময় লেগেছিল। মিলন-এর 'মেক্ বিলিভ' দিয়ে থিয়েটারের দ্বারোদ্ঘাটন হয়। খ্রীসমাসের ছুটিতে অভিনয় শুরু করার দরকার—তাই খুবই তাড়াতাড়ি করে নাটকটি মঞ্চস্থ করতে হয়েছিল। এরপর যে তিনটি নাটক মঞ্চস্থ হয়েছিল সেগুলো হচ্ছে—স্ট্যানলি হাউটনের 'দি ইয়ঙ্গার জেনারেশন', জন ব্রিংকওয়াটারের 'এব্রাহাম লিঙ্কন' এবং সেন্ট জন আরভিলের 'জন ফারগুসন'। ভবিষ্যতের লিরিক-ট্র্যাডিসনের যে প্রতিষ্ঠা হয়েছিল তার সঙ্গে অবশ্য এই তিনটি নাটকের তেমন সাদৃশ্য ছিল না। উপরোক্ত প্রথম দুটি নাটক প্রডিয়ুস করেছিলেন স্ট্যানলি ড্রুয়িট। "দি ইয়ঙ্গার জেনারেশন" নাটকটি আগেই ম্যাঞ্চেস্টারের গেইটি থিয়েটারে মিসেস হর্নিম্যানের পরিচালনায় একটি সেরা নাটক হিসাবে পরিচিতি লাভ করেছিল। 'এব্রাহাম লিঙ্কন' বারমিংহাম রেপ্যুরটারিতে শত রজনী অভিনয়ের গৌরব অর্জন করবার পর লিরিকে এর মঞ্চাভিনয় শুরু হয়।

'দি ইয়ঙ্গার জেনারেশন'-এর সঙ্গে একটি একাঙ্ক ওপরেটাও মঞ্চস্থ হোত। এটি রচনা করেছিলেন পার্গোলেসি—লিরিকে পরে যে সব ওপরেটা মঞ্চস্থ হয়ে থিয়েটারটিকে বিখ্যাত করে তোলে তার পথিকৃৎ হিসাবেই পার্গোলেসির 'লা সার্ভা প্যাড্রোনার' খ্যাতি—এমনিতে এটি বিশেষ দর্শক আকর্ষণ করতে পারে নি। এর সেটিং এবং কসটিউমের দায়িত্ব ছিল লোভ্যাট ফ্রেজারের ওপর—থিয়েটারে এই তিনি প্রথম ডিজাইনার হিসাবে কাজ শুরু করলেন।

'জন ফারগুসনের' পর লিরিকে 'এ্যাজ ইউ লাইক ইট্' মঞ্চস্থ হল। ফ্রেজার এই নাটকে সত্যিকার কাজ দেখাবার সুযোগ পেলেন। প্রেফেয়ার সব সময়েই বলতেন, ভবিষ্যৎ রঙ্গরসিকেরা যেন এই নাটকটির প্রডাকসনের মাধ্যমে তাঁকে স্মরণ করে। অথচ হ্যামারস্মিথে মঞ্চস্থ হবার আগে নাটকটি যখন স্ট্র্যাটফোর্ডে অভিনীত হয়, লোকে এত বিরক্ত হয়েছিল যে, প্রেফেয়ার সে সময় ওখানে যে হোটেলে থাকতেন তার লাউঞ্জে তিনি ঢুকলেই অন্যান্য যারা সে লাউঞ্জে বসে থাকতো তারা উঠে উপেক্ষা-ভরে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে যেত। আধুনিক সেক্সপীরিয়ান প্রডাকসনের সঙ্গে তুলনায় প্রেফেয়ারের প্রডাকসনটি ছিল খুবই সহজ এবং অকপট। দর্শকেরা বিরক্ত হয়েছিল এই কারণে—সেক্সপীরিয়ান ভঙ্গীতে কাব্য-সংলাপের আবৃত্তি না করে নটনটীরা পার্ট বলেছিল দ্রুত এবং হাল্কাভাবে। আর তা ছাড়া তাদের মনে হয়েছিল নাটকের কসটিউম তৈরি করা হয়েছিল কিউবিস্ট এবং ফিউচারিস্ট স্টাইলে। অথচ পোষাক-আশাকের রং এবং ডিজাইন করা হয়েছিল চতুর্দশ শতাব্দীর ফরাসী ধর্মপুস্তকের নানারকম ছবি থেকে। স্ট্র্যাটফোর্ডের দর্শকেরা প্রেফেয়ারের ওপর সবথেকে বেশি রেগে গিয়েছিল আর একটি কারণে—ওখানে বহুকালের পুরনো একটি স্টাফড্ স্ট্যাগ্ মিউজিয়মে রক্ষিত ছিল। যাঁরাই এখানে 'এ্যাজ ইউ লাইক ইটের' অভিনয় করতেন ঐ স্ট্যাগটিকে ফরেস্ট সীন এনে ব্যবহার করতেন। প্রেফেয়ার তাঁর প্রডাক-সনে এই হরিণটিকে বাতিল করায় স্ট্রাট-ফোর্ডের দর্শক ভয়ানকরকম রেগে গিয়ে-ছিল। লণ্ডনেও প্রডাকসনটি দর্শক-মনকে আকৃষ্ট করতে পারে নি। লিরিকে এটি ছ'সপ্তাহ অভিনীত হয়েছিল। মোটের ওপর সমালোচকের দল প্রতিকূল মন্তব্যই করেছিলেন। কেই কেউ বলেছিলেন এটির অভিনয় হয়েছে আধুনিক ড্রয়িং রুম

জন গিলগুড

গড়ীর স্টাইলে—বেশির ভাগ ক্রিটিক পোষাকগুলো বেশি রঙচঙে বলে বিরক্তি প্রকাশ করেন—তাঁদের মতে সেক্সপীয়ারের নাটকের সঙ্গে এ জাতীয় পোষাকের সঙ্গতির অভাবটাই দর্শকদের চোখকে বিশেষভাবে পীড়া দিয়েছিল।

এখানকার এর পরের প্রডাকসন ছিল 'দি বেগার্স ওপেরা'। হ্যামারস্মিথে লোভ্যাট ফ্রেজার এই শেষবারের মত ডিজাইনারের কাজ করলেন। নাটকটি যখন চলছে সেই সময়েই তিনি মারা যান। ইংলিশ থিয়েটারে তাঁর প্রভাব এত বেশি যে, এ কথা অনেকেই জানেন না তিনি কত অল্পদিনের জন্য স্টেজ ডিজাইনার হিসাবে কাজ করে গেছেন। ওপরে বর্ণিত তিনটি প্রডাকসন ছাড়া কলিশিয়ামে কার্সা-ভিনার দুটি ব্যালের জন্য ডিজাইন করেছিলেন ফ্রেজার। তা ছাড়া হলস্টের সাবিত্রীর বিশেষ প্রদর্শনী এবং ডানসেনীর 'ইফের' ডিজাইনের দায়িত্বও ছিল তাঁর ওপর। যে সময় ফ্রেজার থিয়েটারের কাজে হাত দেন সে সময় ইংলিশ থিয়েটারের স্টেজ ডিজাইনের মান ছিল অত্যন্ত নিচু। দৃশ্যসজ্জায় অতি বাহুল্যপূর্ণ বাস্তবতার অবতারণা করতে গিয়ে একটা কিম্ভূত-কিমাকার কাণ্ড করা হোত। কসটিউমের রং হোত একঘেয়ে এবং ম্যাটমেটে, এগুলোর পারস্পরিক সম্বন্ধের দিকটায় কোন নজর দেওয়া হোত না। ভাল স্টেজ ডিজাইনার হতে গেলে সূক্ষ্ম মেকানিক্যাল সেন্স থাকা দরকার—ফ্রেজারের এ গুণটি ছিল পুরোমাত্রায়। তিনিই ইংলণ্ডের প্রথম ডিজাইনার যিনি ছোট স্টেজের ডিজাইনের সমস্যা নিয়ে গভীরভাবে চিন্তা করেছিলেন। আজকের দিনে ইংলণ্ডের প্রত্যেক রেপারটরি থিয়েটার সময় সময় ফ্রেজারের অনুকরণে আর্চেস এবং স্টেপস্-এর ব্যবস্থা করে স্টেজের ওপর—যাতে অতি সহজেই বাইরের দৃশ্য এবং ভেতরের দৃশ্যের সিফটিং-এর কাজটা সু-সম্পন্ন করা যায়। ফ্রেজার এই ধরণের আর্কিটেকচারেল সেটিং করেছিলেন 'দি বেগার্স ওপেরা' নাটকের জন্য। লোভ্যাট ফ্রেজারের স্টাইল অফ ডিজাইনের ক্রমাগত অনুন্নত ধরণের অনুকরণের ফলে আজকাল মঞ্চ-শিল্পী হিসাবে তাঁকে তাঁর যথাযোগ্য সম্মান দেওয়া হয় না। এর জন্য দায়ী তাঁর অনুকরণকারীরা—এঁরা শুধু তাঁর কাজের আপাত-সহজ দিকটাকে অনুকরণ করে চলেছেন—তাঁর ডিজাইনের সৌষ্ঠব এবং সৌন্দর্যের দিকগুলোকে কখনও নিজেদের কাজে ফুটিয়ে তুলতে বা প্রতিভাত করতে পারেন নি। অষ্টাদশ শতাব্দীর আর্কিটেক্চার সম্বন্ধে বিস্তৃত ধারণা ছিল ফ্রেজারের—এ সম্পর্কে একটা প্রশংসাপূর্ণ উপলব্ধির ভাবও তিনি মনে মনে পোষণ করতেন—তাই এরই ওপর ভিত্তি করে তিনি তাঁর সহজ, সরল সেটিংগুলো তৈরি করতেন। ফ্রেজারের বর্ণ-সমাবেশের বর্ণনা করতে গিয়ে নর্ম্যান মার্শাল বলেছেন :

His colour schemes, although superficially bold and brilliant, were actually so subtle and exact that often he was only able to achieve his effects by dyeing the materials himself. In the work of his imitators the freshness of his colour has been copied as if it were a mere obvious juxtaporition of primary colours.

'দি বেগার্স ওপেরা' হ্যামারস্মিথে ক্রমাগত তিন বছর ধরে প্রদর্শিত হয়েছিল। তা ছাড়া যখনই লিরিক থিয়েটারে আর্থিক সংকট দেখা দিত, এই ওপেরাটির পুনঃপ্রদর্শনী শুরু করে সেই দুর্গতির অবসানের প্রচেষ্টা করা হোত।

[পরে এই বেগার্স ওপেরার ওপর ভিত্তি করেই বেরটল্ট ব্রেশট তাঁর পৃথিবী-বিখ্যাত নাটক দি থ্রা পেনী ওপেরা রচনা করেছিলেন।]

অষ্টাদশ শতাব্দীর যে সব প্রডাকসন লিরিক থিয়েটারকে প্রতিষ্ঠিত করেছিল তার ভেতর ছিল—"দি ওয়ে অফ দি ওয়ার্ল্ড", "দি ডুয়েন্না", "দি রাইভ্যালস", "দি বো স্ট্র্যাটেজেম", "ম্যারেজ এ লা মোড", "লাওনেল এ্যান্ড ক্ল্যারিশা", "লাভ ইন এ ভিলেজ", "সি স্টুপস টু কংকার" এবং "দি ক্রিটিক"। অষ্টাদশ শতাব্দীর ক্ল্যাসিকস প্লেফেয়ারকে সুযোগ দিয়েছিল এমন এক ভঙ্গীতে নাটক প্রডিয়ুস করতে যে ভঙ্গীটা ছিল তাঁর মনোভাব এবং ব্যক্তিত্বকে ফুটিয়ে তোলবার পক্ষে অত্যন্ত স্বাভাবিক। অষ্টাদশ শতাব্দীকে দর্শকদের কাছে আকর্ষণীয় করে তোলবার জন্য প্লেফেয়ার গুরুত্ব আরোপ করেছিলেন on the decorative trimmings of the period, on its airs and graces and fopperies.

লিরিকের আর একটি বিখ্যাত প্রডাকসন হিসাবে ওয়াইল্ডের 'দি ইম্পরটেন্স অফ বিয়িং আরনেস্ট'-এর নাম করতে হয়—প্রধান ভূমিকায় অভিনয় করেছিলেন জন গিলগুড। বেশ ভাল টাকা হাতে এসেছিল এই নাটকটি থেকে। কিন্তু এর পরের নাটক ড্রাইডেনের "ম্যারেজ এ লা মোড" মঞ্চস্থ করতে গিয়ে সঞ্চিত টাকা সব নষ্ট হয়ে গেল। হ্যামারস্মিথে প্লেফেয়ারের শেষ নাটক ড্রাইডেনের "ম্যারেজ লা মোড" এবং প্লেফেয়ারকে এর পর থিয়েটার বন্ধ করতে হল।

লিরিককে বলা হোত প্রডিউসারস থিয়েটার। কারণ প্লেফেয়ার নিজস্ব বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গীর দ্বারা চালিত হয়ে নাটকের মঞ্চরূপায়ণ করতেন। নাটকের মূল বক্তব্যকে অভিনয়ের মাধ্যমে ফুটিয়ে তোলার ব্যাপারে প্লেফেয়ার খুব আগ্রহী ছিলেন বলে মনে হয় না। অর্থাৎ এককথায় তিনি ছিলেন অত্যন্ত সাব্‌জেকটিভ প্রডিয়ুসার। নাটকের ভাষ্য নিজের মতানুসারে ঠিক করে নিয়ে সেইভাবেই তার রূপায়ণ করতেন মঞ্চে। তাই যতদিন পর্যন্ত তাঁর চিন্তা ও কল্পনাশক্তি সতেজ এবং প্রাণবন্ত ছিল, ততদিন তাঁর প্রযোজিত নাটক দর্শকদের বিস্ময় এবং কৌতূহল উৎপাদন করতে সমর্থ হোত। বয়সের সঙ্গে সঙ্গে মনের সজীবতা নষ্ট হয়ে যাওয়াতে প্লেফেয়ারের প্রডাকসনগুলো ক্রমশ বিশেষত্বহীন এবং একঘেয়ে মনে হতে লাগল দর্শকদের—শেষে তাঁর নাটক দেখবার জন্য লিরিক থিয়েটারে আর বিশেষ দর্শক সমাগম হোতো না—ফলে থিয়েটার বন্ধ করতে তিনি বাধ্য হলেন।

[ক্রমশঃ]

কর্মখালি

মাসিক ৬৫০৲ বেতনে বা উচ্চ কমিশনে জাপান আর্ট শাড়ী, টেরিলীন সুটিং, তৈরী পোষাক, শাল, নাইলনের মোজার অর্ডার সংগ্রহের জন্য সেলসম্যানের পদ। নমুনার জন্য আবেদন করুন।

Foreign Agencies (66)
Box 1456, Delhi—6.

লোকসঙ্গীতের সংগ্রহ

সুরেন্দ্রনাথ দাশ

বর্তমানকালে নগরীতে এবং শহরে লোকসংগীতের নামে যে সকল পল্লীগীতি অনুষ্ঠিত হয়, অধিকাংশ স্থলেই সেগুলি বিকৃত, কৃত্রিম এবং ভেজাল। এই সব পল্লীগীতির মধ্যে খাঁটি লোকসংগীতের সুর ও ভাষা থাকে না। শহরাঞ্চলে প্রচারিত তথাকথিত পল্লীগীতির মধ্যে লোকসংগীতের সেই স্বতঃস্ফূর্ত সুর ও ভাষার প্রকাশ পায় না। শহর মার্কা লোকসংগীতে গ্রামের কৃষক, শ্রমিকের কথা থাকলেও, তাতে পাওয়া যায় শুধু ব্যর্থপ্রেমিকের হতাশা। এই ধরণের পল্লীগীতিতে লোকসংগীতের কিছু রেশ থাকলেও, সবটাই একটা পোষাকী ব্যাপারের মত। এগুলি একঘেয়ে গান। এতে পল্লীপ্রাণতার কোনও ছোঁয়াচ নেই।

লোকসংগীতের সত্যকার পরিচয় কি? লোকসংগীতে থাকে একটা জাতির জীবনের সমস্ত অভিব্যক্তি। একটা জাতির মানুষের ধর্ম, হৃদয়াবেগ, ভাবনা, সুখ-দুঃখের কাহিনী, প্রেম-প্রণয়, প্রাকৃতিক সৌন্দর্যানুভূতি, এমন কি, আনন্দ-উল্লাস প্রভৃতির ভিত্তিতে শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে লোকসংগীত গড়ে উঠেছে। লোকসংগীতের ভিতর দিয়ে অশিক্ষিত, নিরক্ষর পল্লীকবি জাতির লোক-জীবনের রূপান্তরের ইতিহাস রচনা করে। লোকসংগীতের ভিতর জাতির চরিত্রটি সহজভাবে প্রতিফলিত হয়। এক কথায় বলা যেতে পারে, বংশপরম্পরায় মুখে মুখে প্রচলিত লোকসংগীতের ভিতর একটা জাতির নিজস্ব পরিচয় অন্তর্নিহিত থাকে।

কাজেই লোকসংগীতের সংগ্রহ কাজ অতি দায়িত্বপূর্ণ। নগরীর উপকণ্ঠে বা শহরের নিকটবর্তী অঞ্চলে খাঁটি লোকসংগীত মেলে না। এসব অঞ্চলে বিকৃত, কৃত্রিম পল্লীগীতি পাওয়া যেতে পারে। আসল লোকসংগীত সংগ্রহ করতে হলে নগরী এবং শহর হতে বহু দূরবর্তী গ্রামে যেখানে আধুনিক যান্ত্রিক সভ্যতা প্রবিষ্ট হয় নি, সেখানে যেতে হয়। সেই সব স্থানে লোকসংগীত গ্রামের মানুষের পৃষ্ঠপোষকতায় অবলুপ্ত হয় নি। সে সব জায়গায় পদব্রজে যেতে হয় এবং পল্লীকবির সঙ্গে আন্তরিকভাবে মিশতে হয়। তাদের বিশ্বাসভাজন না হতে পারলে, তারা কিছুতেই লোক-সংগীত লিখে নিতে দেয় না। এ সব অঞ্চলের বৃদ্ধ কৃষক বা বৃদ্ধা কৃষাণীর নিকট লোকসংগীত লুকায়িত রয়েছে। সেই রত্নখনিতে হস্তক্ষেপ করা দুষ্কর কাজ। এটা সাধনাসাপেক্ষ। পাকা জহুরী ছাড়া এ মণি-মুক্তা সংগ্রহ করা অসম্ভব। অনেক সময় সংগ্রহে হতাশ হয়ে ফিরতে হয়।

এমনও হয়েছে, মূল্যবান লোক-সংগীতের সন্ধান পেয়ে শহর হতে ৩০।৪০ মাইল দূরে গেলাম, কিন্তু লোক-সংগীত সংগ্রহ করতে সমর্থ হই নি। একনিষ্ঠতা এবং অধ্যবসায় না থাকলে, লোকসংগীত সংগ্রহ করা যায় না। এক-বারের একটা ঘটনা বলি। রাজসাহী শহর হতে ৪০ মাইল দূরে অবস্থিত একটি গ্রামের একজন বাউলের খোঁজ পেলাম। পায়ে হেঁটে সেখানে গেলাম। তখন বাউল আখড়ায় নেই। বাউলের ফিরতে ৩।৪ দিন দেরি রয়েছে। আখড়ায় তাঁর কয়েকজন শিষ্য এবং শিষ্যা রয়েছেন। তাঁদের অতিথি হলাম। ৩।৪ দিন পরে বাউল গুরু ফিরলেন। তাঁকে আমার উদ্দেশ্য বললাম। কিন্তু তিনি আমাকে বিশ্বাস করতে চান না। একজন শিক্ষিত যুবক গান সংগ্রহ করছে। আগে এমন ত' কেউ কখনও আসে নি। কোনও বিপদ হবে না ত'? এমনি নানা কথা বাউল ভাবতে লাগলেন। কাজেই আমা-কেও তাঁদের সঙ্গে একেবারে মিশে যেতে হলো। আখড়ায় তাঁদের সঙ্গে আমার আহার, বিহার, শয়ন, স্বপ্ন, সব ভাবনা একাকার হয়ে গেল। বসন-ভূষণ মলিন হলো, চুল-দাড়ি বাড়ল। এক তরুণ বাউলে রূপান্তরিত হলাম। আমার উদ্দেশ্য সিদ্ধ হলো। কয় মাস পরে রাজসাহীতে ফিরে এলাম। আত্মীয়, বন্ধু কেউ চিনতে পারে না। তাই বলছিলাম, এমনি করে পল্লীকবিদের বিশ্বাস অর্জন করতে পারলে, তবেই তাঁরা রত্নের ভাগ দেন।

লোকসংগীতের মধ্যে থাকে বালক-বালিকাদের খেলার গান, উৎসবের গান, যা অধিকাংশ স্থলেই ধর্মীয় বা পৌরাণিক, প্রকৃতির কথা, বিবাহের গান, ঐতিহাসিক কথা, বীরগাথা, লোক-গাথা, ছেলে ভোলানো ছড়া, ঘুমপাড়ানী গান এবং প্রেমগাথা। লোকসংগীত সংগ্রহে দুটি কাজ বিশেষ দরকার—প্রথমটি হচ্ছে সংরক্ষণ; দ্বিতীয়টি হচ্ছে গবেষণা। সংরক্ষণ প্রয়াসে পড়ে লোক-সংগীতের সুরটি ধরে রাখার জন্যে টেপ রেকর্ডিং করায় এবং গবেষণা প্রয়াসে আগে লোকসংগীতের সংগ্রহ, গবেষণা এবং সংকলন গ্রন্থ প্রকাশনে।

লোকসংগীতের সংগ্রহ সময়ে—একটি বিষয়ের প্রতি সজাগ থাকা দরকার। বর্তমানকালে যান্ত্রিক-সভ্যতা গ্রামের দিকে ছুটেছে, যন্ত্রশিল্পের প্রভাব গ্রামে প্রসার লাভ করছে। তার ফলে প্রাচীন লোকসংগীত অবহেলিত হচ্ছে, কিন্তু সেই স্থানে এক নতুন পল্লীসংগীতের সৃষ্টি হচ্ছে, যাতে থাকে রেল, জাহাজ, উড়োজাহাজ, কল-কারখানা, শহুরে বাবু ও বিবিদের কাহিনী। এই আধুনিক পল্লীসংগীত বর্তমানকালের অল্পশিক্ষিত বা অর্ধ-শিক্ষিত পল্লীকবিদের রচনা, যাতে পাওয়া যায় হাস্য-কৌতুক বা ব্যঙ্গ রচনা। এই নতুন পল্লীগীতির সুর ও ভাষায় না আছে নাগরিক সংগীতের সুর ও বাণী, না আছে গ্রামীণ লোকসংগীতের সুর ও ভাষা। এক কথায়, এই নতুন পল্লী-সংগীত না নগরের, না গ্রামের। এটি হচ্ছে একটি মিশ্রসংগীত ও সাহিত্যের ধারা—যার জন্ম পরিবর্তনের যুগেই সম্ভব হয়—যেমনটি হয়েছিল সহজ সাহিত্যের পরে এবং আধুনিক ভারতীয় সাহিত্যের উৎপত্তির আগে, যাকে বলা হতো প্রাকৃত সাহিত্য। এই আধুনিক পল্লীসাহিত্যের ভবিষ্যৎ নেই—যান্ত্রিক সংস্কৃতির চাপে এটি নাগরিক সাহিত্যের গর্ভে বিলীন হয়ে যাবে।

রঙ্গজগৎ

শিল্পীর ভূমিকা

বাংলাদেশের রাজনৈতিক আন্দোলনে সংস্কৃতির একটা বিশেষ ভূমিকা আছে। ১৯০৫-এ যেমন রবীন্দ্রনাথ সভা ও মেলায় গান গেয়েছেন, গানে গানে বঙ্গ-ভঙ্গ বিরোধিতার জাতীয় ভাবাবেগ সৃষ্টি করেছেন; দ্বিজেন্দ্রলালের গানে দেশভক্তি জাগিয়ে তুলেছে—অনুপ্রাণিত করেছে বিদেশী শাসন অবসানে এগিয়ে যেতে; মুকুন্দদাস চারণ গায়কের ভূমিকা নিয়ে গ্রাম-বাংলায় স্বাদেশিকতার বাণী ছড়িয়েছেন, তারপরে আমরা দেখি কাজী নজরুল ইসলামের এক অভিনব ভূমিকা। স্বাধীনতা আর সাম্যবাদের বাণী যুক্ত করে বিপ্লবের মশাল জ্বাললেন তরুণদের মনে। সভায়, মিছিলে নজরুলের আবৃত্তি ও গান হল জমায়েতের এক প্রধান আকর্ষণ। এই নজরুলকে দেখা গেছে প্রগতিশীল প্রার্থীর পক্ষে নির্বাচনে লড়াই করতে। বাংলার জনসংগ্রামে অমন করে মিশে যেতে পেরেছিলেন বলেই তিনি বাঙালীর বিদ্রোহী কবি।

তার পরে প্রবল সাম্রাজ্যবাদবিরোধী সংগ্রামে দেখা গেল গণনাট্য সঙ্ঘের এক নতুন ভূমিকা। কাশ্মীরের মুক্তি-সংগ্রামকে গানে ও নৃত্য-নাটিকায় ছড়িয়ে দিল সারা ভারতব্যাপী। সংস্কৃতির এই নতুন ভূমিকায় সকলে বিস্ময়মুগ্ধ হল। পরে পরে দেখা গেল পথ-নাটিকা, রাস্তার ওপর দাঁড়িয়ে নাটিকার সাহায্যে জনমত সৃষ্টি। গণসংগ্রামের পাশে দাঁড়িয়ে গান গেয়ে—নাটক করে আন্দোলনে উৎসাহ জোগানো। কৃষক ও শ্রমিক সংগ্রাম, শহীদের আত্মদানের ঘটনাকে নাচে ও গানে প্রকাশ করা ইত্যাদি। সংস্কৃতির এই নবরূপে অনুপ্রাণিত শিল্পীদের দেখা গেল শিক্ষক, ছাত্র, শ্রমিক-কর্মচারীদের ধর্মঘটে; নির্বাচনের প্রচার কাজে। সংস্কৃতির এই নতুন রূপকে কাজে লাগাবার জন্যে একসময় কংগ্রেসকেও 'কংগ্রেস সংস্কৃতি সঙ্ঘ' করতে হয়েছিল। কিন্তু সংস্কৃতি-কর্মীরা প্রগতিমুখীন। প্রগতি না থাকলে সংস্কৃতির বিকাশ ঘটে না। তাই পশ্চিমবাংলার মানুষ দেখেছেন যখনই গণসংগ্রাম ও নির্বাচন হয়েছে তখই শিল্পীরা এগিয়ে এসেছেন প্রগতিশক্তির সমর্থনে; জনগণের আশা-আকাঙ্ক্ষাকে ব্যক্ত করতে। এই সংস্কৃতিচেতনায় গণনাট্য সঙ্ঘের পাশে আমরা দেখেছি আরো নাটকের দল ও বিশিষ্ট অভিনেতাদের, দেখেছি তর্জাগায়ক গুরুদাস পালকে। হেমাঙ্গ বিশ্বাস, ক্ষিতীশ বসু প্রমুখ এই সংগ্রামের মধ্যেই জনপ্রিয় হয়েছেন। হেমন্ত মুখার্জী, সুচিত্রা মিত্র, সবিতাব্রত দত্ত, দ্বিজেন মুখোর্জীর মত শিল্পীদের দেখা যেত গণসংগ্রামের সাথীরূপে, নির্বাচনে প্রগতিশক্তির সমর্থনে।

১৯৬৯ সালের মধ্যবর্তীকালীন নির্বাচনে শিল্পীদের কি ভূমিকা ছিল এই প্রশ্ন মনে আসছে। এবারের নির্বাচন যদিও রাজনৈতিক ও সামাজিক দিক থেকে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ছিল; বাঁচা-মরার প্রশ্ন। কিন্তু নির্বাচনের গুরুত্ব একমাত্র গণনাট্যসঙ্ঘ ও ক্রান্তি শিল্পীসঙ্ঘ এবং ব্যক্তিগতভাবে ক্ষিতীশ বসু ছাড়া অন্য শিল্পীরা তেমন অনুভব করেছেন মনে হয় নি। এমন কি যুক্তফ্রন্টের মন্ত্রিত্বকালে বিভিন্ন কমিটিতে মনোনীত শিল্পীদেরও কোনও সভায় দেখা যায় নি। অথচ গ্রামে গ্রামে, পাড়ায় পাড়ায় যুবক-যুবতীরা নিজেরা ছড়া তৈরি করেছে, সুর দিয়ে গেয়েছে; অনামী ছেলে-মেয়েরা গান গেয়ে, কবিতা আবৃত্তি করে গ্রামাঞ্চলের মানুষকে উদ্বুদ্ধ করেছে। এই অবস্থায় কলকাতার শিল্পীদের কোন পক্ষেই কোনরূপ ভূমিকা ছিল না। দীর্ঘদিনের সংগ্রামী সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যে শিল্পীদের এমন সমাজবিমুখ নিশ্চেষ্টতা আর দেখা যায় নি।

কিন্তু এখন চাকা ঘুরেছে; সুতরাং তাল রেখে চলা শুরু হবে। তার প্রথম লক্ষণ দেখলাম কয়েকদিন আগে এক বিজ্ঞাপনে। যে শিল্পীরা সাংবাদিকদের ধর্মঘট সমর্থন করার মত কাজও সহ্য করতে না পেরে সংস্থা থেকে বেরিয়ে এসে নতুন দল গঠন করেছেন, তাঁরাও নাকি 'জাগ্রত গণশক্তির জয়ে' অভিনন্দন জানাচ্ছেন। যুক্তফ্রন্টের সভায় আবৃত্তি করবেন না প্রতিশ্রুতি দিয়ে যিনি একটু অনুগ্রহের জন্য তদ্বির করেছিলেন, এখন তিনি নাকি যুক্তফ্রন্টের উৎসবে আবৃত্তি করার জন্য উঠেপড়ে লেগেছেন। এসব শিল্পীরা এখন গানে, আবৃত্তিতে সভা জমাবেন। বাংলার শিল্পীদের এরূপ সুবিধাবাদী চরিত্র আগে দেখা যেত না। তার চেয়ে নিশ্চেষ্টতা ভাল ছিল। —সুজন।

লিলি চক্রবর্তী

চিত্রআলোচনা

বিবাহ বিভ্রাট

নামেই প্রকাশ পাচ্ছে একটি হাসির ছবি 'বিবাহ বিভ্রাট'। বিভ্রাট বেধেছিল মা-বাবার অমতে বিয়ে করার জন্য। পাশের বাড়ির মেয়ে মালার বিয়ের লগ্ন প্রায় শেষ

হয়ে আসছিল, অথচ বর আসে নি। সে সময় লগ্নভ্রষ্টা অবস্থা থেকে উদ্ধার করার জন্য অশোক মালাকে বিয়ে করে। পরদিন জাঁদরেল বাবা এসে তুমুল কাণ্ড বাধিয়ে দেয়। কিছুতেই এই বিয়ে স্বীকার করে না। অশোককে নিয়ে আসে নিজের বাড়িতে; মালা থাকে বাপের বাড়িতে। দু-জনার দেখা সাক্ষাৎ বারণ। অথচ দু'জনাই মিলনের প্রতীক্ষায় থাকে।

এমন সময় দেখা যায় আর এক বিপদ। মালার সঙ্গে তার গানের মাস্টারের অন্তরঙ্গতা দেখে অশোক জ্বলে ওঠে। শেষ পর্যন্ত অবশ্য এই মাস্টারের সহযোগিতায় তাদের মিলন ঘটে।

কাহিনী ও চিত্রনাট্য রচনা এবং পরিচালনা করেছেন অসীম ব্যানার্জী। পরিচালক হিসাবে নতুন। ছবির প্রথমাংশ খুবই একঘেয়ে হয়ে পড়েছে। কিন্তু দ্বিতীয়াংশে হাসির ব্যাপার যথেষ্ট আছে। অশোকের কল্পনায় ওয়েস্টার্ন ছবির গায়কের ধরণে মারামারি, বিখ্যাত গায়ক হবার স্বপ্ন ইত্যাদি দৃশ্যগুলির কল্পনা উপভোগ্য। সম্পাদনা ভাল হলে ছবিটি আরো উপভোগ্য হতে পারত। সঙ্গীত পরিচালনা ও গীতরচনা মামুলী।

ছবির উপভোগ্যতার জন্য অভিনেতাদের কৃতিত্ব অনেকখানি। তার মধ্যে অনুপকুমার ও রবি ঘোষের নাম বিশেষ করে উল্লেখযোগ্য। রবি ঘোষের উপস্থিতিই দর্শকদের হাসি জুগিয়েছে। তাঁর কথার ধরণ ও ভাবভঙ্গি—বিশেষ করে তবলা সঙ্গতের সময় গোমড়া মুখেও হাসি ফোটাবে। অন্যান্য ভূমিকায় লিলি চক্রবর্তী, উৎপল দত্ত, গঙ্গাপদ বসু, ভারতী দেবী যথাযথ অভিনয় করেছেন। একটি চরিত্রে রেণুকা রায়কেও দেখা গেছে—তিনি চরিত্রানুরূপ অভিনয় করেছেন। অন্যান্য চরিত্রে রয়েছেন অজয় গাঙ্গুলী, লতিকা দাশগুপ্ত, হরিধন মুখার্জী, সত্য ব্যানার্জী, দ্বিজু ভাওয়াল, অশোক মিত্র প্রমুখ।

দিল ঔর মহব্বত

হিন্দী ছবির আজকাল প্রধান বৈশিষ্ট্য রঙ, নাচ-গান এবং তার সঙ্গে অপরাধমূলক কোন ঘটনা। জ্যোতি ও শহরের কয়েকটি সিনেমায় মুক্তিলাভ করেছে 'দিল ঔর মহব্বত'। একজোড়া কলেজে পড়া ছেলেমেয়ের প্রেমের কথা। তার সঙ্গে রয়েছে, সেই ছেলেটি জুয়ার আড্ডায় যাবে, অনিচ্ছাসত্ত্বেও একটা খুনের মামলায় জড়িয়ে পড়বে। এক নর্তকী তাকে বাঁচাতে চেষ্টা করবে। নর্তকী হলেও তার যে দিল আছে সে কথা প্রমাণ করবার জন্য সেও মারা পড়বে। এই ছেলে এবং মেয়ে দু-জনারই বাবা পুলিশের উচ্চপদস্থ কর্মচারী। কিন্তু কর্তব্যে তাঁরা কত কঠোর সে কথাও প্রমাণিত হবে ঘটনায়।

এই কাহিনীকে চিত্রবদ্ধ করার জন্য সমুদ্রতটে নাচ-গান, প্রেমের রঙ্গরস, সমুদ্রের বুকে বোটে বসে প্রেম, জুয়ার আড্ডা, নাইট ক্লাবের নর্তকী, বাইজী বাড়ির গান ইত্যাদি যতরকমের রস আছে সবই রয়েছে। বলা বাহুল্য রঙিন ছবি বলে প্রাকৃতিক দৃশ্যাদি চমৎকার ফুটে উঠেছে। তার চেয়েও বেশি আকর্ষণ করবে নায়িকার ভূমিকায় শর্মিলা ঠাকুরের নানা পোষাকে এবং সুইমিং কস্ট্যুম পরে উপস্থিতি এবং প্রেমের অন্তরঙ্গ মুহূর্তগুলি। নায়ক-নায়িকার দেশ কালের পরিচয় অবশ্য জানা যাবে না; কারণ এই ছবিগুলি তো শুধু ভারতে দেখাবার জন্য নয়, আফ্রিকার বিভিন্ন দেশে ব্যবসার উদ্দেশ্যে নির্মিত। সুতরাং অতসব প্রশ্ন না করে অর্ধনগ্না শর্মিলা এবং রঙ্গরসের তৃপ্তি যাঁরা চান—তাঁরা ছবিটি উপভোগ করবেন।

ভারতনাট্যম নৃত্যে কুমারী চিত্রলেখা

স্টুডিও খবর

গুপী গাইন বাঘা বাইন

পূর্ণিমা পিকচার্সের 'গুপী গাইন বাঘা বাইন' এক বিশেষ টেলিভিশন প্রোগ্রামে দেখান হবে। বার্লিন চলচ্চিত্র উৎসবে এই ছবিটি প্রদর্শনের জন্য বিশেষ আমন্ত্রণ লাভ করেছে। সম্প্রতি টেলিভিশন কোম্পানীর প্রতিনিধি পরিচালক সত্যজিৎ রায়ের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে তাঁর কমেন্টারি রেকর্ড করেছেন।

উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরীর লেখা

'তিনভুবনের পারে' ছবিতে সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায় ও তনুজা

সংক্রান্তি

সম্প্রতি পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক রিক্রিয়েশন ক্লাব (লিলুয়া শাখা)-এর সভ্যবৃন্দ শ্রীবীরু মুখোপাধ্যায়ের মঞ্চসফল 'সংক্রান্তি' নাটকটি রঙমহল মঞ্চে সাফল্যের সঙ্গে মঞ্চস্থ করেন।

বিভিন্ন চরিত্রে শ্রীমতী শাশ্বতী রায়, অলোককুমার দাস, তাপসকুমার রায়, অমল-কৃষ্ণ বসু, শ্রীমতী অলকা গাঙ্গুলী, রামতনু ঘোষাল, নিতাই চ্যাটার্জী, শ্রীমতী জয়শ্রী কর ও হৃষীকেশ চ্যাটার্জীর অভিনয় যথেষ্ট প্রশংসার্হ। শ্রীশম্ভুনাথ চট্টোপাধ্যায় নাটকটির পরিচালনায় যথেষ্ট কৃতিত্বের দাবি রাখেন।

বড়ো পিসিমা

ব্যারাকপুরের চন্দনপুকুরস্থ সাংস্কৃতিক সংস্থা 'মিতালী'র বার্ষিক উৎসব সম্প্রতি স্থানীয় পৌরপ্রধান শ্রীগৌরীচরণ ভট্টাচার্যের সভাপতিত্বে এক মনোজ্ঞ পরিবেশে অনুষ্ঠিত হয়েছে।

এই উপলক্ষে স্থানীয় নাট্যসংস্থা 'তৌর্যত্রিক' গোষ্ঠী নাট্যকার বাদল সরকার বিরচিত 'বড়ো পিসিমা' নাটকটি সাফল্যের সঙ্গে মঞ্চস্থ করেন। অভিনয় ও প্রয়োগ-নৈপুণ্যে উক্ত নাটকাভিনয় উপস্থিত দর্শক-সাধারণের প্রশংসা অর্জন করে।

নাটকের কথা

রূপচক্রের "বিচার"

গত ৩রা ফেব্রুয়ারী রূপচক্র নাট্যসংস্থা অগ্নিদূত রচিত বিচার নাটকটি মঞ্চস্থ করলেন রঙমহল মঞ্চে। বিভিন্ন চরিত্রে রূপদান করেছেন: সর্বশ্রী নিশিকান্ত ঘোষ, সত্যনারায়ণ ঘোষ, জয়ন্ত দাঁ, অজিত আঢ্য, সন্তোষ মান্না, সঞ্জয় দত্ত, সুভাষ দে, বেচু মল্লিক, বিশ্বনাথ গরাই, রতন দে ও সন্ধ্যা নাথ। পরিচালনা করেছেন শ্রীঅবন্তী প্রসাদ।

সংবাদকণা

সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান

গত ৪ঠা ফেব্রুয়ারী মহাজাতি সদনে আধুনিক গানের আড়ম্বরপূর্ণ আসর

নতুন পাতা

গোরা পিকচার্সের 'নতুন পাতা' ২৮শে ফেব্রুয়ারী বসুশ্রী, বীণা প্রভৃতি সিনেমায় মুক্তিলাভ করবে। ছবিটি পরিচালনা করেছেন দীনেন গুপ্ত। বিভিন্ন ভূমিকায় অভিনয় করেছেন নবাগতা আরতি গাঙ্গুলী, কাজল গুপ্ত, শিপ্রা মিত্র, গীতা দে, আশা দেবী, শম্ভু মিত্র, জহর রায়, সমিত ভঞ্জ প্রমুখ।

মৌসুমী মন

নমিতা চৌধুরীর কাহিনী অবলম্বনে চৌধুরী প্রোডাকসনের 'মৌসুমী মন' চিত্রের কাজ সমাপ্ত প্রায়। চিত্রটির সম্পাদনা, চিত্রগ্রহণ, সঙ্গীত ও গীত রচনার দায়িত্ব পালন করছেন যথাক্রমে: অনিল সরকার, গণেশ বোস, অনিল দত্ত ও পুলক বন্দ্যোপাধ্যায়। চিত্রনাট্য ও পরিচালনা—সমর চৌধুরী। চরিত্র রূপায়ণ—সর্বেন্দর, মিতা চৌধুরী, অজিতেশ, শেফালী, জহর রায়, গীতা দে, মণি শ্রীমানী, রত্না ঘোষাল, সৌরভ মুখার্জী, প্রীতি মজুমদার, লতিকা দাশগুপ্তা, বেবী, সুচিত্রা ও সিনে আর্টিস্টের শিল্পিবৃন্দ।

একটি বিশিষ্ট চরিত্রে বম্বের খ্যাতনামা নৃত্য-শিল্পীকে দেখা যাবে।

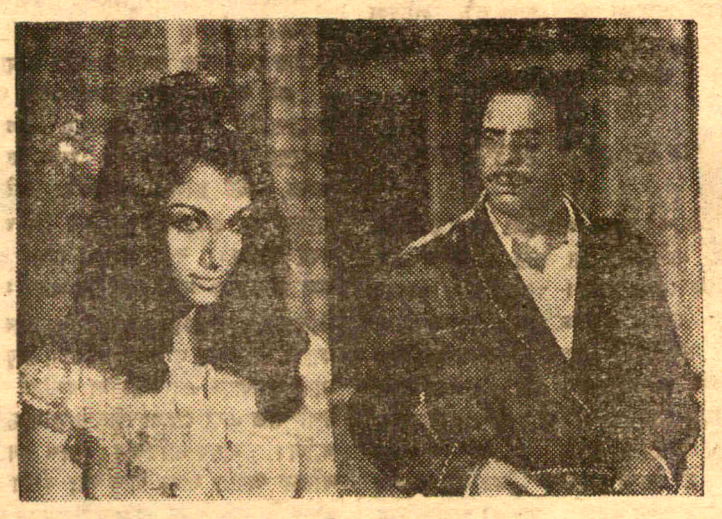

'দিল ঔর মহব্বত' ছবিতে শর্মিলা ও নাজির হোসেন

মুক্ত অঙ্গন থিয়েটারে 'লোনা জল মিঠে মাটি' নাটকের একটি দৃশ্য

বসে; শ্রীশ্রীমাধবানন্দ গিরি আশ্রমের সাহায্যার্থে অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন ডঃ নচিকেতা ঘোষ ও দ্বিজেন মুখোপাধ্যায়। উদ্যোক্তা দুজনই শিল্পী; তাই শিল্পী সমাবেশ অভাবনীয়। আসরের বিশেষ আকর্ষণ ছিল উত্তমকুমার ও সুপ্রিয়া দেবী এবং মান্না দে ও সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়ের দ্বৈত-কণ্ঠসঙ্গীত। উত্তম-সুপ্রিয়া গাইলেন, "এই মোম জোছনায় অঙ্গ ভিজিয়ে এস না গল্প করি"। আর মান্না দে-সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায় গাইলেন, "তুমি আমার চিরদিনের"; সুর দিয়েছেন ডঃ নচিকেতা ঘোষ। গান দুটির সঙ্গে অর্কেস্ট্রা পরিচালনা করেন সুরকার। এছাড়া একক কণ্ঠসংগীতে ছিলেন মান্না দে, সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়, তরুণ বন্দ্যোপাধ্যায়, সতীনাথ মুখোপাধ্যায়, আরতি মুখোপাধ্যায়, উৎপলা সেন, নির্মলা মিশ্র, দ্বিজেন মুখোপাধ্যায় ও সহশিল্পিবৃন্দ, ইলা বসু, প্রতিমা বন্দ্যোপাধ্যায় ও নির্মলেন্দু চৌধুরী। হাস্য-কৌতুকে ছিলেন সুশীল চক্রবর্তী।

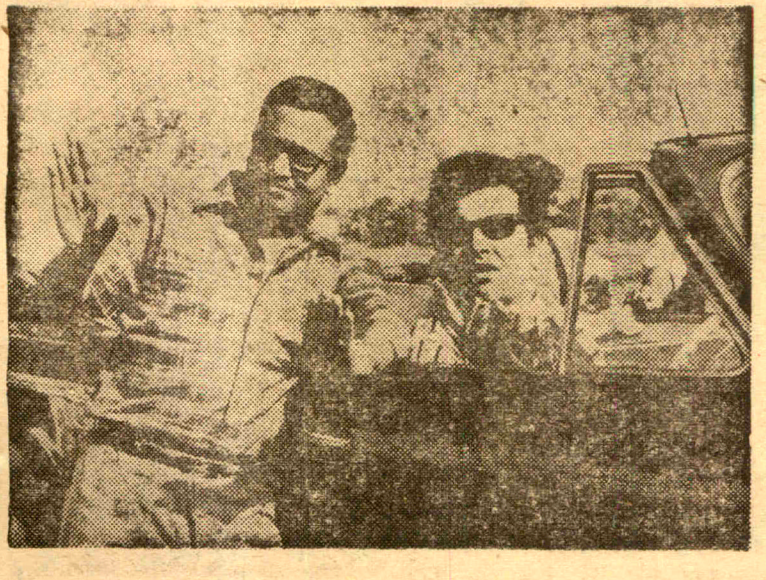

'মৌসুমী মন' ছবির বহির্দৃশ্য গ্রহণের পূর্বে পরিচালক সমর চৌধুরী দৃশ্যাবলী বুঝিয়ে দিচ্ছেন নরেন্দরকে।

বারাসাত শেঠপুকুর রবীন্দ্র ভবনে

সম্প্রতি বারাসাতে কে এম সি ফ্রেন্ডস্ ও বারাসাত পুলিশ ক্লাবের পরিচালনায় শেঠপুকুরে রবীন্দ্রভবনে একটি বিচিত্রানুষ্ঠান হয়। এতে সে-সব শিল্পী কণ্ঠসঙ্গীতে সকলকে আনন্দদান করেন তাঁদের মধ্যে ছিলেন তরুণ বন্দ্যোপাধ্যায়, নির্মলেন্দু চৌধুরী, নির্মলা মিশ্র, কৃষ্ণা রায়, সনৎ সিংহ, অলোক বাগচী, কল্যাণী সাহা ও বনশ্রী সেনগুপ্ত। হাস্যকৌতুকে হরবোলা, যন্ত্রসঙ্গীতে মন্টু ভট্টাচার্য এবং মূকাভিনয়ে তপন দত্ত দর্শকদের মুগ্ধ করেন।

সিনে সেন্ট্রাল ক্যালকাটা

সিনে সেন্ট্রাল ক্যালকাটা আগামী ২৮শে ফেব্রুয়ারী ও ৪ঠা থেকে ৬ই মার্চ অ্যাকাডেমী অফ ফাইন আর্টস প্রেক্ষাগৃহে চারটি চেকোশ্লোভাক ছবি দেখাবেন। ছবি চারটি হল 'ফ্লাইট', 'রিপোর্ট অন দি পার্টি এণ্ড গেস্টস্', 'ক্যাপ্রিসিয়াস সামার' ও 'লেফট্ উইথ ফাইভ গার্লস্'।

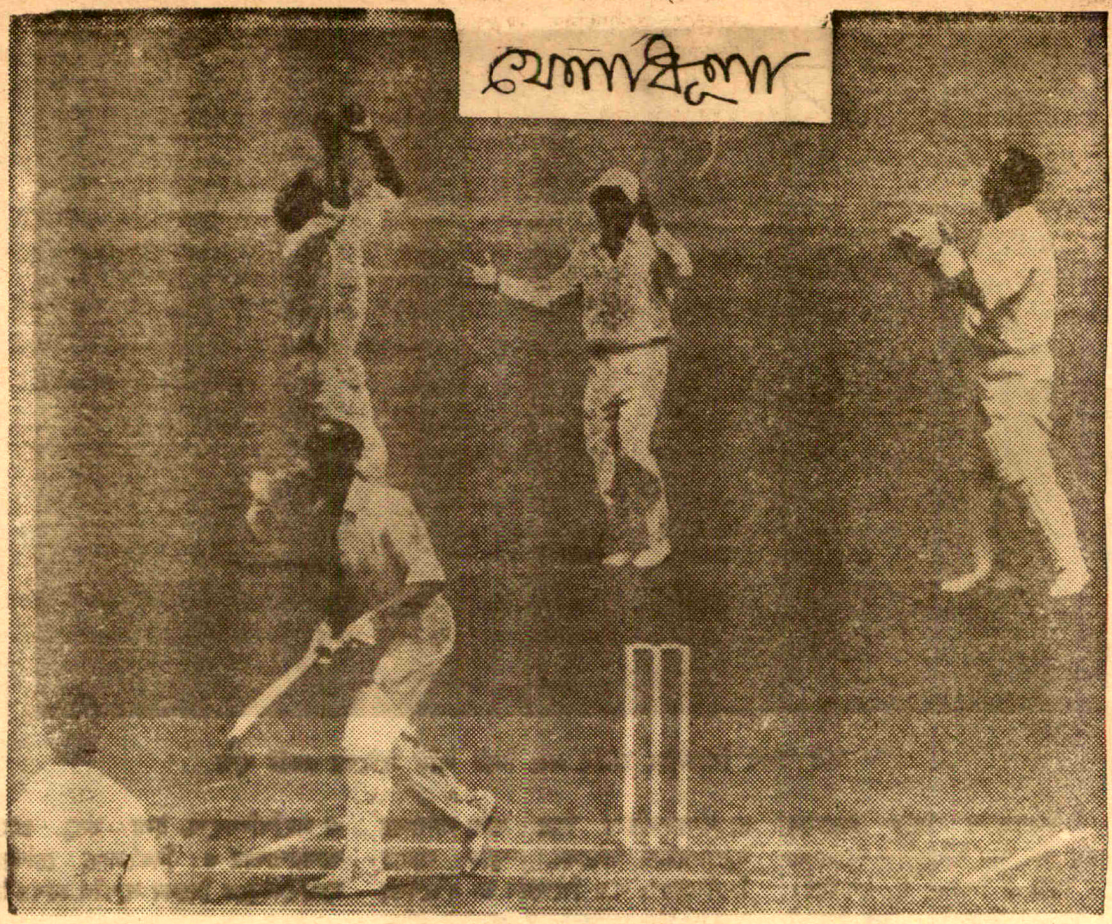

দল বদলের পালা

ক্রিকেটের শেষে হকির আগমনে কলকাতা ময়দানে শুরু হয় ফুটবল প্রস্তুতি। অবশ্য এ প্রস্তুতি শুধু এ দল বদলের পালার মধ্যেই সীমাবদ্ধ। কলকাতা ময়দানের নামী দলগুলো এই সময় টাগ অফ ওয়ার শুরু করেন। মধ্যে থাকেন নামী, দামী আর উঠতি খেলোয়াড়রা। ব্যাপারটা অনেকটা সেই নিলামের মতো। টাকার খেলা। খোলামকুচির মতো খরচ হয় টাকা। দেদার টাকা। হাজারের প্রথম দশকের কাছাকাছি সব অঙ্ক। অথচ বাংলাদেশ শুধু নয়, সমস্ত ভারতবর্ষেই ফুটবল অপেশাদার শ্রেণীর খেলার মধ্যেই পড়ে। তবে নামে ঠিক তাই আছে—হাব-ভাব আর কাজ-কর্মেও ঠিক তাই। কিন্তু ব্যাপারটা আসলে কি? তলায় তলায় যে কারবার চলে তা জানতে আজ বোধহয় আর কারো বাকী নেই। আজ-কাল স্কুলের নিচু ক্লাশের বাচ্চা ছেলেরাও ব্যাপারটা জানে। আর তারা এও জানে, যে দল বেশি টাকা দেবে এক শ্রেণীর খুব নাম করা খেলোয়াড়রা গিয়ে ভিড়বেন সেই দলে। আর দল বদলের পালা তো তাঁদের সেই সুযোগ করে দিয়েছে। কলকাতা ময়দানে এখন চলেছে সেই দল বদলের পালা। আর তাই ময়দান এখন সরগরম। কেউ আসছে, কেউ যাচ্ছে—এই নিয়ে ক্লাবে ক্লাবে চলেছে ভাঙা-গড়ার খেলা। কেউ দল গড়ছে নতুন করে আর কেউ খেলোয়াড় হারিয়ে দল গড়ার চিন্তায় বিভোর।

কিন্তু এই ভাঙাগড়ার মুখে পড়ে সন্তোষ ট্রফি ফুটবল প্রতিযোগিতায় বাংলা দলে যদি ভাঙন ধরে, তাহলে আর যাই হোক আমরা কিছুতেই খোলা মনে ব্যাপারটাকে মেনে নিতে পারবো না। কারণ এরই মধ্যে বাংলার কয়েকজন নাম করা খেলোয়াড়কে নিয়ে বিতর্ক শুরু হয়েছে। শেষ পর্যন্ত তাঁরা হয়তো জাতীয় ফুটবল প্রতিযোগিতায় যোগদান করতে পারবেন না। আর শেষ পর্যন্ত যদি তাই হয়, তাহলে তার চেয়ে দুঃখ আর পরিতাপের বিষয় কি হতে পারে। কারণ এই দল বদলের পালায় পাছে পালিয়ে যান, তাই অনেক খেলোয়াড়কে লুকিয়ে ফেলা হয়। তাঁদের কোন পাত্তাই পাওয়া যায় না। ওঁরা যেন বেমালুম হারিয়ে যান—হারিয়ে যান কেউ সই করার পরে, কেউ বা আবার সই করার আগে। কারণ এই সময় কলকাতা ময়দানে বড় ক্লাবগুলো পাখী ধরার মতো খেলোয়াড় ধরার ফাঁদ পেতে চুপটি করে বসে থাকেন। আর সেই সংগে খেলোয়াড়দের চোখের সামনে তুলে ধরেন নানা প্রলোভন। ফলে লোভ আর ফাঁদ এই কাছাকাছি দুটো জিনিষের একটায় পা দিলে আর দেখতে হবে না। সোজা আই এফ এ অফিস। সেখানে দল বদলের খাতায় নাম সই করে তবেই নিস্তার। কিন্তু সেই জন্যে যদি এবারের জাতীয় ফুটবল প্রতিযোগিতায় বাংলা দলকে এতটুকুও দুর্ভোগ পোয়াতে হয়, তাহলে কি খেলোয়াড় কি বাংলা-দেশের কর্মকর্তা কাউকেই আমরা ক্ষমা করতে পারবো না.....।

—শান্তিপ্রিয়

ক্রিকেটের খবর

রণজী ট্রফির ফাইন্যালে বাংলাকে শেষ পর্যন্ত প্রথম ইনিংসের ফলাফলে হার স্বীকার করতে হলো বম্বের কাছে। বাংলার এই কৃতিত্ব নিঃসন্দেহে স্মরণীয়। বিশেষ করে দীর্ঘ দশ বছর পরে ফাইন্যালে উঠে শক্তিশালী বম্বের সংগে পাল্লা দিয়ে খেলা খুব একটা সহজ কথা নয়।

শুধু তাই নয়—বাংলার খেলোয়াড়রা যদি বম্বের প্রথম ইনিংসে অতোগুলো ক্যাচ না ফেলে দিতেন, বলা যায় না খেলার ফলাফল তাহলে হয়তো অন্য রকম হতে পারতো। কারণ শেষ পর্যন্ত প্রথম ইনিংসের ফলাফলেই খেলার ভাগ্য নির্ধারিত হয়েছে আর বম্বের মতো দলের বিরুদ্ধে বাংলার ৩৮৭ রানের ইনিংস কোনমতেই কম ছিলো না।

যাই হোক আমাদের কাছে এইটাই সব থেকে বড় সান্ত্বনা যে, বম্বের বিরুদ্ধে সরাসরি ফলাফলে পরাজিত হয় নি বাংলা আর বম্বেও এবার তুড়ি মেরে জিতে নিতে পারে নি রণজী ট্রফি।

বম্বেকে হারিয়ে বাংলা রণজী ট্রফি লাভ করবে এমন আশা বোধহয় কেউই করেন নি। তবে মনের কোণে একটু আশা ছিলো যে, শেষ পর্যন্ত বম্বের বিরুদ্ধে বাংলা হয়তো তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতা গড়ে তুলতে পারবে। আমাদের সে আশা-বাস্তবে রূপান্তরিত করেছেন বাংলার খেলোয়াড়রা।

তবে আজ আমাদের সব থেকে বেশি দুঃখ হচ্ছে চুনী গোস্বামীর জন্যে। দুঃখ হবারই কথা। কারণ রণজী ট্রফিতে প্রথম আর ফাইন্যালে বম্বের মতো দলের বিরুদ্ধে সেঞ্চুরী করার সুযোগটা হাতের মুঠোর মধ্যে পেয়েও হারালেন তিনি। মাত্র চার রানের জন্যে তিনি পারেন নি শত রান করতে। শুধু তাই নয়—

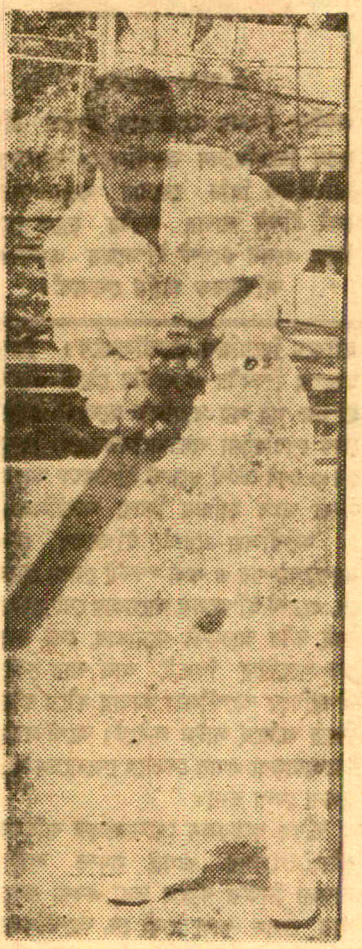

॥ চুনী গোস্বামী ॥
রণজী ট্রফির ফাইন্যালে বম্বের বিরুদ্ধে প্রথম ইনিংসে ৯৬ আর দ্বিতীয় ইনিংসে ৮৫ রান করে চুনী এবার এসেছেন ভারতীয় ক্রিকেটের লাইম লাইটে।

দ্বিতীয় ইনিংসেও তিনি ধীরে ধীরে এগিয়ে গিয়েছিলেন শত রানের দিকেই। কিন্তু এবারও পুরলো না তাঁর আশা। ৮৫ রানের মাথায় আউট হয়ে গেলেন তিনি। সেঞ্চুরী না করতে পারলেও ফাইন্যালে বম্বের বিরুদ্ধে চুনী গোস্বামীর ব্যাটিং-এর কথা আমাদের অনেকদিন মনে থাকবে।

বম্বের বিরুদ্ধে প্রথমে ব্যাটিং করার সুযোগ পেয়ে বাংলা প্রাথমিক বিপর্যয়

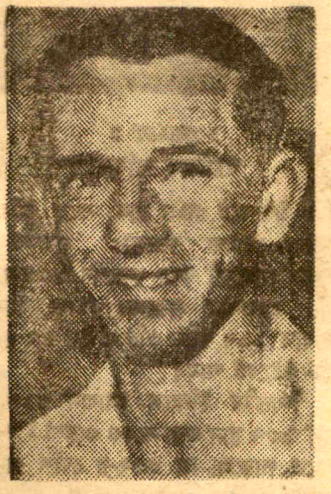

॥ ওয়ালটারস ॥
ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিরুদ্ধে প্রথম ইনিংসে ডাবল সেঞ্চুরী আর দ্বিতীয় ইনিংসে সেঞ্চুরী করে অস্ট্রেলিয়ার ওয়ালটারস

গল্প হলেও সত্যি

১৯৪৭ সালের ঘটনা। ইংলণ্ডের মিডলসেক্স ও ইয়র্কশায়ারের মধ্যে খেলা হচ্ছে। ইয়র্কশায়ারের হার নির্ঘাৎ। শেষ দু'জন ব্যাটসম্যান তখন ব্যাটিং করছিলেন। বল করছিলেন মিডলসেক্সের জিম সিমস। আর উইকেটের পেছনে দাঁড়িয়েছিলেন জন প্রাইস।

সিমসের একটা গুডলেংথ বল পিছিয়ে এসে ফসকালেন ব্যাটসম্যান। বলটা ব্যাটের গা ঘেঁষে চলে গেলো সোজা প্রাইসের হাতে। বলটা হাতে নিয়ে ভীষণভাবে চিৎকার করে উঠলেন প্রাইস, 'হা-উ-জ দ্যা-ট...'

প্রাইসের বৌ বলতেন, ঘুমের ঘোরে প্রাইস একবার এতো জোরে 'হাউজ দ্যাট' বলে চিৎকার করে উঠেছিলেন যে ঘরের জানলার সার্সি ভেঙে পড়েছিলো।

প্রাইসের মাঠের চিৎকার ছিলো নাকি তার চেয়েও জোরালো। ফলে ইয়র্কশায়ারের শেষ খেলোয়াড়কে আউটের নির্দেশ দিলেন আম্পায়ার।

দলের খেলোয়াড়রা ছুটে এলেন প্রাইসকে অভিনন্দন জানাতে। তাঁদের মধ্যে ছিলেন এডরিচ। এডরিচ যেই প্রাইসের পিঠ চাপড়ে বলতে গেলেন, 'বাঃ বেশ সুন্দর ধরেছো...।'

অমনি চাপা গলায় প্রাইস গোঁ গোঁ করে বলে উঠলেন 'হাউজ দ্যাট..।'

প্রাইসের আঙুল লক্ষ্য করে নিচের দিকে তাকাতেই সকলে দেখলেন যে এডরিচ দাঁড়িয়ে আছেন প্রাইসের বাঁধানো দাঁতের ওপর...।

হাউজ দ্যাট বলে চিৎকার করার সময় মুখ থেকে দাঁত খুলে গিয়ে ছিটকে পড়েছিলো মাঠের ওপরে...।

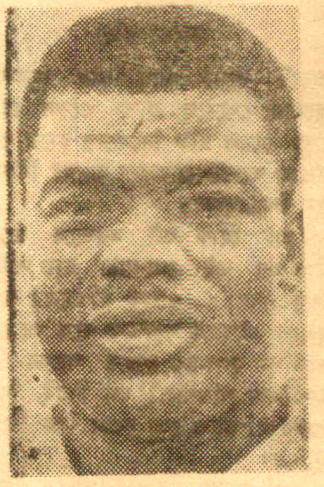

॥ নার্স ॥
শেষ টেস্টে অস্ট্রেলিয়ায় বিরুদ্ধে সেঞ্চুরী

রান। এর মধ্যে চুনী গোস্বামী করলেন ৯৬ রান আর দেবু মিত্র ও সুব্রত গুহ দুজনেই করেছিলেন ৬২ করে রান।

প্রথম ইনিংসের রানসংখ্যাতেই বম্বে বাংলার চেয়ে অনেক এগিয়ে যায়। ৪৬৯ রানে শেষ হয় বম্বের প্রথম ইনিংস। এর মধ্যে ওয়াদেকার করলেন ১৩৩ রান, এস নায়েক ৭৩ আর ভোঁসলে ৬৩ রান।

চুনী গোস্বামী ৮৫, অম্বর রায় ৪৮ আর গোপাল বসু ৩৭ রান করায় দ্বিতীয় ইনিংসে বাংলা ইনিংস সমাপ্তি ঘোষণা করলো ২৬১ রানের মাথায়। বম্বে দ্বিতীয় ইনিংসে ৩ উইকেটের বিনিময়ে ৭৭ রান করার পর খেলার সময় পার হয়ে গেলো ও বম্বে প্রথম ইনিংসের ফলাফলে হারিয়ে দিলো বাংলাকে।

এবার নিয়ে বম্বে পর পর এগারো বার লাভ করলো রণজী ট্রফি। গত বছরই তারা পর পর দশবার বিজয়ীর সম্মান লাভ করে প্রতিষ্ঠা করেছিল নতুন রেকর্ড।

ওদিকে অস্ট্রেলিয়া ৩—১ টেস্টে ওয়েস্ট ইণ্ডিজকে হারিয়ে আবার লাভ

॥ লরী ॥
বিজয়ী বীর

করেছে রাবার আর তার পুরস্কার হিসেবে পেয়েছে ফ্রাঙ্ক ওরেল ট্রফি। ফ্রাঙ্ক ওরেল ট্রফি নিজেদের হাতে রাখা সম্বন্ধে অস্ট্রেলিয়া অবশ্য আগেই নিশ্চিত হয়ে গিয়েছিলো।

যাই হোক এই মরশুমে ওয়েস্ট ইণ্ডিজের এই গো-হারা হার সত্যিই অস্বাভাবিক ওয়েস্ট ইণ্ডিজের মতো দল যে এইভাবে পরাজিত হবে তা কেউ কোনদিন কল্পনাও করতে পারেন নি। অস্ট্রেলিয়া শক্তিশালী দল ঠিকই, কিন্তু ওয়েস্ট ইণ্ডিজও তো কোন দিক দিয়েই কম নয়।

কম যে নয় তার প্রমাণ পাওয়া গিয়েছিল প্রথম টেস্টেই যখন ওয়েস্ট ইণ্ডিজ

॥ ফ্রাঙ্ক ওরেল ॥

একদিন নিজের হাতে যে ওরেল ট্রফি তুলে দিয়েছিলেন অস্ট্রেলিয়ার তখনকার অধিনায়ক রিচি বেনোর কাছে—আজ সেই ট্রফিই আবার লরীর হাতে তুলে দিয়ে এলেন ওয়েস্ট ইণ্ডিজের এখনকার অধিনায়ক গ্যারি সোবার্স।

হারিয়ে দিয়েছিল অস্ট্রেলিয়াকে। কিন্তু তারপর দ্বিতীয় ও তৃতীয় টেস্টে ওয়েস্ট ইণ্ডিজ পর পর পরাজিত হলো। চতুর্থ টেস্ট শেষ হলো অমীমাংসিতভাবে। কিন্তু ৫ম ও শেষ টেস্টে ওয়েস্ট ইণ্ডিজকে আবার যা-তা ভাবে হারিয়ে দিলো অস্ট্রেলিয়া।

অস্ট্রেলিয়া-ওয়েস্ট ইণ্ডিজের টেস্ট মরশুমের পর এ কথা স্পষ্টই বোঝা গেছে যে, ওয়েস্ট ইণ্ডিজের আগেকার সেই খেলা, সেই তীব্র আক্রমণী মনোভাব, সেই দলগত সংহতির কিছুই আজ আর নেই। অপরদিকে অস্ট্রেলিয়া আবার ধীরে ধীরে ফিরে আসছে লাইম লাইটে। অস্ট্রেলিয়ার খেলোয়াড়রা এবার যেভাবে খেলেছেন তার তুলনা মেলা ভার।

যদিও কয়েকজন খেলোয়াড়ের ব্যক্তিগত ক্রীড়ানৈপুণ্যের ওপর সমস্ত দলটার সাফল্য নির্ভর করছে তবু একথা বলতে আর কোন বাধা নেই যে, অস্ট্রেলিয়ার খেলোয়াড়রা কি ব্যাটিং, কি বোলিং সব দিক থেকেই দিয়েছেন অনেক বেশি নিপুণতার পরিচয়।

আরো একটা কথা এই প্রসংগে বলা দরকার। অস্ট্রেলিয়া সব সময়েই চেষ্টা করে নতুন খেলোয়াড় গড়ে তুলতে। আর সেদিক দিয়ে তারা যথেষ্ট সাফল্যও লাভ করেছে। কিন্তু ওয়েস্ট ইণ্ডিজ দলে আজো সেই পুরোন মুখগুলোই দেখা যাচ্ছে বড় বেশি করে।

যাই হোক এই মরশুমে ওয়েস্ট ইণ্ডিজ একদম ভালো খেলতে পারে নি বলেই অস্ট্রেলিয়া লাভ করেছে এতোটা সাফল্য। অস্ট্রেলিয়ার এই সাফল্যের জন্যে অধিনায়ক বিল লরীর কৃতিত্ব সব থেকে বেশি। তিনি শুধু অধিনায়কতাই করেন নি, ব্যাটিং-এও দিয়েছেন অসাধারণ কৃতিত্বের পরিচয়। লরীর পরেই করতে হবে ওয়ালটারস, চ্যাপেল, রেডপাথ প্রমুখের নাম। আর বোলিং-এ ম্যাকেঞ্জি, ফ্রিম্যান, কনোলী, গ্লিসন প্রমুখ বোলাররা দিয়েছেন কৃতিত্বের পরিচয়।

যাই হোক শেষ টেস্টে প্রথমে ব্যাট করে অস্ট্রেলিয়া করেছিল ৬১৯ রান। এর মধ্যে ওয়ালটারস করেছিলেন ২৪২ আর লরী ১৫১ রান। গ্রিফিথ ১৭৫ রানে ৩টি, হল ১৫৭ রানে ৩টি উইকেট পেয়েছিলেন। বাকি চারটি উইকেট সমাগ ভাগে ভাগ করে নিয়েছিলেন সোবার্স আর গিবস।

ওয়েস্ট ইণ্ডিজ কিন্তু এর উত্তরে ২৭৯-এর বেশি করতে পারলো না। এর মধ্যে কেরু করেছিলেন ৬৪, লয়েড ৫৩ আর কানহাই ৪৪ রান। কনোলী ৬১ রানে ৪টি ও ম্যাকেঞ্জি ৯০ রানে তিনটি উইকেট পেয়েছিলেন।

ওয়েস্ট ইণ্ডিজকে ফলো অন না করিয়ে অস্ট্রেলিয়া আবার ব্যাটিং করে

॥ সোবার্স ॥
পরাজিত অধিনায়ক

৬ উইকেটে ৩৯৪ রান করে ইনিংস সমাপ্তি ঘোষণা করলো। ওয়ালটারস আবার সেঞ্চুরী করে করলেন ১০৩ রান আর রেডপাথ করলেন ১৩২ রান। সোবার্স ১১৭ রানে ৩টি ও হল ৪৭ রানে ২টি উইকেট পান।

দ্বিতীয় ইনিংসে সোবার্স ১১৩ ও নার্স ১৩৭ রান করা সত্ত্বেও ওয়েস্ট ইণ্ডিজ করতে পারলো না ৩৫২-র বেশি রান। বোলিং-এ সব থেকে বেশি উইকেট পেলেন ম্যাকেঞ্জি ৯৩ রানে ৩টি ও গ্লিসন ৮৪ রানের বিনিময়ে ৩টি উইকেট।

ফলে শেষ টেস্টে অস্ট্রেলিয়া ২৮২ রানে হারিয়ে দিলো ওয়েস্ট ইণ্ডিজকে।

শারদা ভট্টাচার্য (ডাঙাপাড়া, কাঁচরাপাড়া)

প্রশ্ন : ইস্টার্ন রেলের কাজল মুখার্জী নাকি ব্যাঙ্কে কাজ পেয়েছেন এবং এ বছর নাকি ইস্টবেঙ্গল ক্লাবের পক্ষে সই করছেন? এ বছর ফুট-বলে দল বদল করে আরম্ভ হবে?

উত্তর : আমি জানি না?

আরম্ভ হলো বলে...!

অঞ্জন ব্যানার্জী (পশ্চিম পুটিয়ারী, কলকাতা—৪১)

প্রশ্ন : ডন ব্রাডম্যান ক'টি টেস্ট খেলেছেন? তিনি ক'টি সেঞ্চুরী করেছেন? জন রীড, ওয়ালকট, উইকস ও হ্যামণ্ডের টেস্ট এ্যাভারেজ জানতে চাই।

উত্তর :

	টেস্ট	ইনিংস	অঃ পঃ	রান	সর্বোচ্চ	শতরান সংখ্যা	গড়
ব্রাডম্যান	৫২	৮০	১০	৭৯৯৬	৩৩৪	২৯	৯৯'৯৪
হ্যামণ্ড	৮৫	১৪০	১৬	৭২৪৯	৩৩৬	২২	৫৮'৪৫
ওয়ালকট	৪৪	৭৪	৭	৩৭৯৮	২২০	১৫	৫৬'৬৮
উইকস	৪৮	৮১	৫	৪৪৫৫	২০৭	১৫	৫৮'৬১

জীতেশরঞ্জন দত্ত (লংকা, নগাঁও, আসাম)

উত্তর : আপনার চিঠিটি তুলে দিলাম :

৭৩ বর্ষ ৩১ সংখ্যায় পরিতোষ নাগের গল্প হলেও সত্যি বিভাগে 'পেলে' সম্বন্ধে লেখাটা খুব মজার। কিন্তু গত শারদীয় যুগান্তরে পেলে সম্বন্ধে লেখা কাহিনীর হুবহু নকল। কিছুদিন আগে যা অন্য একটি পত্রিকায় ছাপা হয়েছে তা কি আবার লেখা উচিত...?

মানু ও মন্টু সরকার (খেঁকিপাড়া রায়গঞ্জ)

প্রশ্ন : শুনেছি গত বছর সারা পৃথিবীর হা-ডু-ডু খেলার সম্মেলন হয়েছিল —সম্ভবত অস্ট্রেলিয়ায়। এতে কোন কোন দেশ যোগদান করেছিল? আর কোন দেশ কোন স্থান অধিকার করেছিল। এবারও কি তাঁরা খেলছেন? হা-ডু-ডু খেলায় ভারতের স্থান কোথায়?

উত্তর : আমি এ বিষয়ে বিশেষ কিছু জানি না। কেউ জানলে যদি জানিয়ে দেন তাহলে খুব ভালো হয়।

গোপাল পালচৌধুরী : (কালীপ্রসাদ ব্যানার্জী লেন, হাওড়া)

প্রশ্ন : মোহনবাগান, ইস্টবেঙ্গল ও বি এন আর দলের ক্যাপ্টেন কে কে?

উত্তর : এখনো ঠিক হয় নি। চুনী সম্বন্ধে আপনার প্রশ্নের উত্তর দু-এক সংখ্যা আগেই প্রকাশিত হয়েছে।

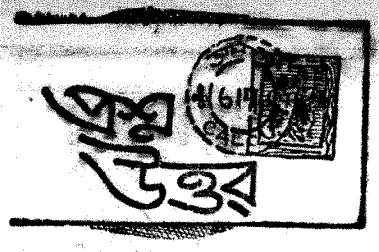

সুভাষচন্দ্র শীল (ঘুটিয়াবাজার, হুগলী)

প্রশ্ন : আমি ইস্টবেঙ্গল ও মোহনবাগান দলের খেলোয়াড়দের নাম জানতে চাই। ১৯৬৮ সালে ও ১৯৬৯ সালে ইস্টবেঙ্গল ও মোহনবাগান দল কতবার ফুটবল খেলেছিল এবং কে কতবার জিতেছিলো, হেরেছিল বা ড্র হয়েছিল?

সুভাষচন্দ্র শীল (ঘুটিয়া বাজার, হুগলী)

শুরু হয়েছে—খেলোয়াড়দের নাম কি আর এই মুহূর্তে জানানো সম্ভব?

"এখন চলেছে দল বদলের পালা"

১৯৬৯ সালের খেলা তো এখনো আরম্ভই হয় নি। আর ১৯৬৮ অর্থাৎ গত বছরের খেলার হাল-চাল তো আপনাদের সকলেরই জানা।

পরিতোষ নাগ (বেলাকোবা, জলপাই-গুড়ি)

প্রশ্ন : আজ পর্যন্ত যে সব ক্রিকেট ম্যাচ খেলা হয়েছে তাতে কোন বোলার এক ইনিংসে সবচেয়ে বেশি রান করেছেন?

উত্তর : গত সংখ্যাতেই তো এ প্রশ্নের উত্তর ছাপা হয়েছে। দেখেছো নিশ্চয়ই...!

বিকাশ বাগচী (ট্রাংগুলার কলোনী গৌহাটী, আসাম)

প্রশ্ন : প্রদীপ ব্যানার্জী, চুনী গোস্বামী, অমল দত্ত ও পঙ্কজ রায়ের ঠিকানা জানতে চাই।

উত্তর : চুনী গোস্বামী ৬২, যোধপুর পার্ক, কলকাতা-৪১

পি কে ব্যানার্জী টি/৫৪/৬, কাইজার স্ট্রীট, কলকাতা-৯

পঙ্কজ রায় ৮/বি, অভয় মিত্র স্ট্রীট, কলকাতা-৫

অমল দত্ত ২/এ, শিকদারপাড়া লেন, কলকাতা-৭

দীপককুমার রায়চৌধুরী (আনন্দম, মালদহ)

প্রশ্ন : ফ্রন্ট-ফুট রুল সম্বন্ধে জানতে চাই।

উত্তর : এই বিষয়ে একবার আলোচনা করা হয়েছে। সম্ভব হলে আবার ছবি দিয়ে বুঝিয়ে দেবার চেষ্টা করা হবে।

অপরাজিত চট্টোপাধ্যায় (আহমদপুর, বীরভূম)

প্রশ্ন : গল্প হলেও সত্যি বিভাগে শুধু ক্রিকেটের কথাই আলোচনা করা হয়, ফুটবলের কথা হয় না কেন?

উত্তর : কে বললে, হয় না—একবার তো হয়েছে। ভবিষ্যতেও হবে...।

শক্তিসাধন ভট্টাচার্য, রঞ্জিৎ চক্রবর্তী, সিরাজুল হক ও সুভাষরঞ্জন পাল (রহড়া, রামকৃষ্ণ মিশন বালকাশ্রম, খড়দহ, ২৪ পরগনা)

প্রশ্ন : ১৯৬৭ সালে ইডেন উদ্যানে অনুষ্ঠিত ইস্টবেঙ্গল বনাম মহামেডান স্পোর্টিং ক্লাবের যে খেলাটি হয়েছিল সেই খেলায় ইস্টবেঙ্গল ২—১ গোলে পরাজিত হয়। প্রথম লীগের সেই খেলায় মহামেডান দলের বিদ্যুৎ মজুমদারকে অবৈধ আচরণের জন্য রেফারী মাঠ থেকে বহিষ্কৃত করেন। সেই ঘটনাটি কোন্ অর্ধে ঘটেছিল?

উত্তর : আমারও সে ঠিক মনে নেই। আপনাদের যদি খুব দরকার তাহলে জানাবেন। আমি তখন বিদ্যুৎ মজুমদারকে না হয় জিজ্ঞেস করে জানাবো।

সুকুমার সরকার (ব্রাউন হোস্টেল, বাঁকুড়া খ্রীস্টান কলেজ)

উত্তর : তোমার রিপ্লাই কার্ড পেয়েছি। শীঘ্রই উত্তর পাবে।

পরিচিতি

রমাকান্ত দেশাই আর ক্রিকেট খেলবেন না। খেলা ছেড়ে দিলেন তিনি। এবারে রণজী ট্রফির ফাইন্যালে বাংলাকে হারিয়ে দেবার পরই বম্বে ও ভারতের প্রাক্তন পেস বোলার আর বি দেশাই জানালেন তাঁর সিদ্ধান্তটির কথা। প্রথম শ্রেণীর ক্রিকেট খেলা থেকে অবসর গ্রহণ করলেন দেশাই।

বড় তাড়াতাড়িই যেন শেষ হয়ে গেলো দেশাই-এর খেলোয়াড়-জীবন। আর সত্যিকথা বলতে কি এতো তাড়াতাড়ি যে তিনি খেলা ছেড়ে দেবেন—তা যেন কেউ ভাবতেও পারেন নি। তাই দেশাই-এর এই ঘোষণাটি বড় অপ্রত্যাশিত বলেই মনে হচ্ছে আজ।

কারণ আজ থেকে ঠিক দশ বছর আগে দেশাই শুরু করেছিলেন তাঁর খেলোয়াড়-জীবন। তখন সেই কুড়ি বছরের ছেলের বলের জোর দেখে অবাকই হয়েছিলেন সকলে।

অবাকই তো হবার কথা। কারণ ছোট্ট-খাট্টো দেশাই-এর বলে এতো জোর তা কেউ কল্পনাও করতে পারতেন না। পারবেনই বা কি করে? ওয়েস্ট ইণ্ডিজের বিরুদ্ধে প্রথম টেস্ট খেলতে নেমে ভারতের ছোট্ট-খাট্টো পেস বোলার যে ওয়েস্ট ইণ্ডিজের দুই দুর্ধর্ষ ফাস্ট বোলার হল আর গিলক্রীস্টের সংগে সমানে তাল দিয়ে বাম্পার আর বিমারের ফোয়ারা ছুটিয়ে ব্যস্ত করে তুলবেন ওয়েস্ট ইণ্ডিজের ব্যাটসম্যানদের তা বোধহয় কেউ কল্পনাও করতে পারেন নি।

দেশাই-এর অভাবনীয় সাফল্যে ভারতের ক্রিকেট-উৎসাহীরা তাই সেদিন আনন্দে হয়ে উঠেছিলেন উদ্বেল। কার যেন ঠিক মনে নেই, তবে এ কথা ঠিক যে ওয়েস্ট ইণ্ডিজের একজন নাম করা ব্যাটসম্যানের মাথার টুপি সেদিন উড়ে গিয়েছিল দেশাই-এর বাম্পার বলের আঘাতে। সত্যি অবাক হবার কথাই বটে।

প্রথম প্রথম তাই যেন ঠিক বিশ্বাস হতে চায় নি—মনে হয়েছিলো দেশাই-এর ঐ সাফল্য বুঝি সাময়িক। না, তা নয়। সে চিন্তা ভুল প্রমাণিত হতে বেশি সময় লাগে নি। একটার পর একটা খেলায় দেশাই লাভ করতে লাগলেন অভাবনীয় সাফল্য। খেলায় তাঁর উইকেট-দখলের সংখ্যা বাড়তে লাগলো ধীরে ধীরে। ভারতীয় ক্রিকেটের একটা বিরাট অভাব অন্তত কিছু অংশে পূরণ করতে সমর্থ হলেন তিনি। বাংলাদেশে তিনি পরিচিত হলেন ছোট্ট-খাট্টো দেশাই নামে।

ফাস্ট বোলারদের বলের জোর সাধারণত খুব বেশি দিন থাকে না। দেশাই-এরও থাকলো না। দেশাই খুব বেশি দিন জোরে বল করতে না পারার পেছনে ছিলো তাঁর শারীরিক গঠন। লম্বা-চওড়া চেহারার বোলারদের চেয়ে ছোট্ট-খাট্টো চেহারার ফাস্ট বোলারদের ধকল শরীরের ওপর অনেক বেশি পড়ে। তাই সম্ভবত তাঁরা বহু বছর ধরে এইভাবে বলের জোর বজায় রেখে বোলিং করতে পারেন না।

তবে দেশাই যে এতো তাড়াতাড়ি অবসর গ্রহণ করবেন—তা কেউই ভাবেন নি। কারণ বর্তমান ভারতে সুব্রত গুহ প্রমুখ কয়েকজন ছাড়া বাকী সকলের চেয়ে দেশাই-এর বল অনেক ভালো। তবে হয়তো দেশাই বুঝেছেন যে আজ তাঁর প্রয়োজন ফুরিয়েছে। ভারতীয় ক্রিকেটে আজ হয়তো সত্যিই আর দেশাই-এর প্রয়োজন নেই, কিন্তু তাঁর রাজ্য দলের কাছেও আজ তিনি মূল্যহীন? ঠিক যেন বিশ্বাস হতে চায় না। আবার মনের কোণে সন্দেহ জাগে যে, তাই যদি না হবে তাহলে বাংলার বিরুদ্ধে রণজী ট্রফির ফাইন্যাল খেলার পরই দেশাই তাঁর অবসর গ্রহণের কথা ঘোষণা করতেন না। আজ তাই ভাবতে সত্যি অবাক লাগে যে, মাত্র তিরিশ বছর বয়েসে দেশাইকে সরে আসতে হচ্ছে প্রথম শ্রেণীর ক্রিকেট খেলা থেকে...।

যাই হোক দেশাই প্রথম শ্রেণীর খেলায় তাঁর আত্মপ্রকাশের প্রথম বছরেই পেয়েছিলেন ৫০টি উইকেট। প্রথম শ্রেণীর খেলায় দেশাই পেয়েছেন মোট ৪৪১টি উইকেট। উইকেট প্রতি যার গড় দাঁড়ায় ১০·৬২ রান। রণজী ট্রফির খেলায় গড়ে উইকেট প্রতি ১৫·৪১ রান হিসেবে দেশাই লাভ করেছেন ২৩৯টি উইকেট। আর টেস্ট খেলায় দেশাই-এর সংগৃহীত উইকেটের সংখ্যা হলো ৭৪টি—উইকেট প্রতি যার গড় দাঁড়ায় ৩৭·২৯ রান। জোরে মারতে দেশাই ছিলেন তুখোড়। রণজী ট্রফিতে একটি সেঞ্চুরী (১০৭) সহ তিনি প্রথম শ্রেণীর খেলায় করেছেন মোট ১৮৯৫ রান।

আজ ভাবতে বড় খারাপ লাগছে যে, খেলার মাঠে দেশাইকে আর দেখবো না। রেডিওতে আর কোনদিন শোনা যাবে না "ছোট্ট-খাট্টো এখন ছুটে আসছেন বল করতে.....।"

সম্পাদিকা—জয়ন্তী সেন

বসুমতী (প্রাঃ) লিঃ-এর পক্ষে ১৬৬, বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী স্ট্রীটস্থ কলিকাতা-১২
বসুমতী প্রেস হইতে শ্রীসুকুমার গুহমজুমদার কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

দুইটি বা তিনটি সন্তানের পরিবারই আদর্শ পরিবার

জেনে রাখুন :

- পরিবারকল্যাণই পরিবার পরিকল্পনা
- যে কোন পরিবার পরিকল্পনাকেন্দ্রেই বিনামূল্যে নিরোধ এবং যাবতীয় পরামর্শ পাওয়া যায়
- হিন্দুস্থান লিভারে উৎপাদিত দ্রব্যাদি যে সব দোকানে বিক্রী হয় সেই সব দোকানে মাত্র ১৫ পয়সায় তিনটি করে নিরোধ কিনতে পাওয়া যায়
- তিনটি সন্তান না হওয়া পর্যন্ত নিরোধ ব্যবহার করে দুই সন্তানের জন্মের মধ্যবর্তী সময়ের ব্যবধান বাড়ান সম্ভব
- তিনটি সন্তানলাভের পর স্থায়ীভাবে জন্মনিরোধের জন্যে অস্ত্রোপচারই শ্রেষ্ঠ পদ্ধতি

আজই আপনার নিকটবর্তী যে কোন পরিবার পরিকল্পনাকেন্দ্র বা স্বাস্থ্যকেন্দ্রে যোগাযোগ করে বিনামূল্যে অভিজ্ঞ চিকিৎসকের পরামর্শ নিন।

(পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পরিবার পরিকল্পনা সংস্থা কর্তৃক প্রচারিত)

বিভিন্ন রুচিরই খেয়াল:

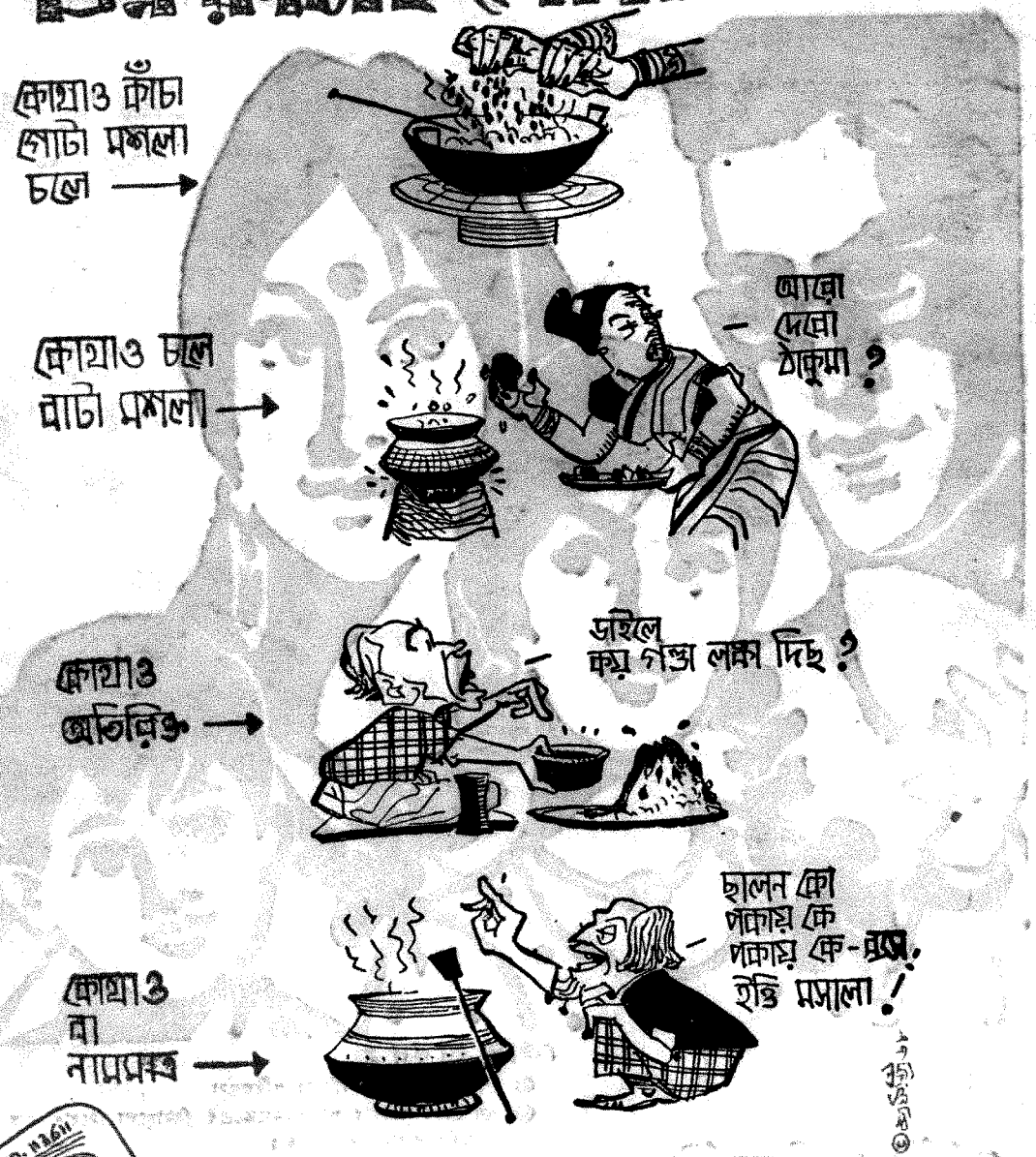

L 7 MAR 1969

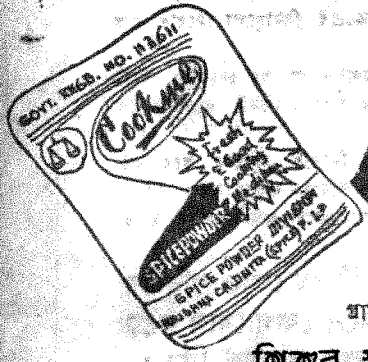

কিন্তু সবার রুচিকেই কুকমী পরিতৃপ্ত করে !

গ্রাম : 'স্পাইসমার্ট' মিল—কাশীপুর

শিশুর খাদ্যে ও রুগীর পথ্যেনির্ভয়ে ব্যবহৃত হয়

'কুকমী'—সর্বাধিক বিক্রীত গুঁড়ো মশলা

পনের লক্ষ প্যাকেট মাসিক বিক্রয়

১২০ বৎসরের অধিক প্রাচীন ও বর্তমানে মশলার বৃহত্তম প্রতিষ্ঠান

কৃষ্ণচন্দ্র দত্ত (স্পাইস) প্রাঃ লিঃ

২৩৫ নং মহর্ষি দেবেন্দ্র রোড, পোস্তা, কলিকাতা-৭

সাপ্তাহিক বসুমতী

উদ্বেলিত জনতার অভিনন্দনধন্য যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রিসভার অভিষেক

৩ বর্ষ : ৩৭শ সংখ্যা, বৃহস্পতি, ২২শে ফাল্গুন, ১৩৭৫ বঙ্গাব্দ | OLDEST WEEKLY OF NORTH INDIA | 73 year, No. 37, 6th March 1969

সূচীপত্র

বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা
সম্পাদকীয়		২৩০৭
আজকের মানুষ		২৩০৮
সুভাষচন্দ্র ও সমকালীন ভারতবর্ষ (ধারাবাহিক প্রবন্ধ)	— শঙ্করীপ্রসাদ বসু	২৩০৯
যেন কেউ মন্ত্রী হ'য়ে (কবিতা)	— বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়	২৩১৩
অগ্নি-দূত (কবিতা)	— প্রবীরকুমার চট্টোপাধ্যায়	২৩১৩
রঙ্গব্যঙ্গ		২৩১৪
ভারতদর্শন		২৩১৮
আন্তর্জাতিক		২৩২২
যুক্তফ্রন্টের সামনে কোন পথ?	— মনোরঞ্জন হাজরা	২৩২৪
ক্ষেত ও কারখানায় শান্তি	— শ্রীসওদাগর	২৩২৬
অস্তিত্বের মানে (কবিতা)	অশোক ভট্টাচার্য	২২৫৯
অবহেলিত ত্রিপুরী ভাষা	— রাহুল বর্মণ	২৩২৯

যে কোন
গয়না
আর
আসল
গ্রহরত্ন
কেনার
দক্ষিণ কোলকাতায়
নামকরা প্রতিষ্ঠান

ফোন : ৪৬-৬২৫৮

সব অ্যাণ্ড গ্র্যাণ্ডসন্স অব লেট
এম. বি. সরকার

সূচীপত্র

বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা
যুক্তফ্রন্ট সরকার সমীপেষু	শ্রীসর্বদর্শী	২৩৩০
জনমতের উৎস সন্ধানে	জীবন দে	২৩৩১
তিমিরপ্রান্ত ডুয়ার্স	অগ্নিবর্ণ	২৩৩৫
আমার ইউরোপ ভ্রমণ	ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায়	২৩৭০
বিংশ শতাব্দীর মার্কিন সাহিত্য	শমীক বন্দ্যোপাধ্যায়	২৩৪৭
যুগমন্ত্রণা (গল্প)	রেবন্ত বসু	২৩৪৯
পথ কে রুখবে? (ধারাবাহিক উপন্যাস)	মনোজ বসু	২৩৫৩
রঙ্গমঞ্চ ওদেশে এবং এদেশে	শিলাদিত্য	২৩৫৬
গ্রন্থমেলা		২৩৫৯
রঙ্গজগৎ		২৩৬০
খেলাধুলো	—শান্তিপ্রিয়	২৩৬৪

—সদ্য প্রকাশিত হইয়াছে!!—

বহুকাল পরে পুনর্মুদ্রণ

"নবীনবাবু বর্ণনা এবং গীতিতে একপ্রকার মন্ত্রসিদ্ধ।..... এই সকল বিষয়ে তাঁহার লিপিপ্রণালীর সঙ্গে বায়রনের লিপি-প্রণালীর বিশেষ সাদৃশ্য দেখা যায়।..... বায়রনের ন্যায় নবীনবাবু বর্ণনায় অত্যন্ত ক্ষমতাশালী।..... নবীনবাবুর যখন স্বদেশ-বাৎসল্য স্রোতঃ উচ্ছলিত হয়, তখন তিনিও রাখিয়া ঢাকিয়া বলিতে জানেন না।"—বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।

মহাকাব

নবীনচন্দ্র সেনের গ্রন্থাবলী

রৈবতক কাব্য ।। কুরুক্ষেত্র প্রভাস

গ্রন্থের পৃষ্ঠা সংখ্যা ৩০৮।

মূল্য মাত্র সাত টাকা।

বসুমতী প্রাইভেট লিমিটেড: ১৬৬, বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী ষ্ট্রীট, কলিকাতা—১২

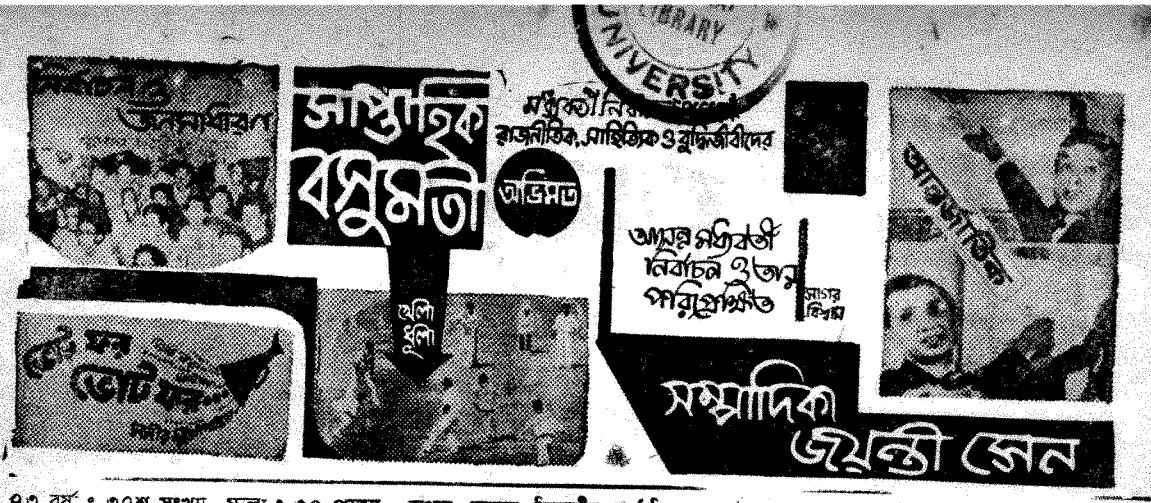

৭৩ বর্ষ ঃ ৩৭শ সংখ্যা—মূল্য ঃ ৩০ পয়সা
বৃহস্পতি, ২২শে ফাল্গুন, ১৩৭৫ বঙ্গাব্দ

বাংলা ভাষায় দ্বিতীয় সর্বাধিক প্রচারিত সাপ্তাহিক পত্রিকা

PRICE : 30 Paise
Thursday, 6th March, 1969

যুক্তফ্রন্ট সরকারের ঐতিহাসিক সিদ্ধান্ত

জনসাধারণই যুক্তফ্রন্টকে পুনরায় বিজয়-গৌরবে গৌরবান্বিত করেছে। যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রিসভাও জনসাধারণের যেরকম স্বতঃস্ফূর্ত অভিনন্দন ও শুভেচ্ছা লাভ করেছে—পশ্চিমবঙ্গের ইতিহাসে তাও এক অভূতপূর্ব ব্যাপার। রাজভবন ও ডালহৌসি অঞ্চলে কংগ্রেসী আমলে জনসাধারণকে ১৪৪ ধারার বেড়িতে শুধু টিয়ার গ্যাস আর গুলীর সম্মুখীন হোতে হোত। যুক্তফ্রন্ট-মন্ত্রিসভার শপথ গ্রহণের দিন জনসাধারণ প্রমাণ করেছে, তারা তাদের প্রিয় সরকারকে স্বাগত জানাতে শৃঙ্খলাপরায়ণতার কী রকম ইতিহাস সৃষ্টি করতে পারে। কংগ্রেস ও পি· ডি· এফ-এর আমলে পুলিশী-নির্ভর সরকার জনসাধারণকে উচ্ছৃঙ্খল আচরণের দায়ে দায়ী করে নিজেরাই বিশৃঙ্খল রাজত্ব চালিয়ে এসেছে। বারো বছর আগেই গরিষ্ঠ সংখ্যক জনসাধারণ কংগ্রেসকে বিদায় দিয়েছে জেনেও কংগ্রেসী সরকারের হুঁশ হয় নি। তবে জনসাধারণ তাদের বিদায় দিয়েছে একথা জেনেই তারা লাঠি, বন্দুক ও টিয়ার গ্যাসের সাহায্যে শাসন চালিয়ে এসেছে।

সেদিক দিয়ে বিচার করলে যুক্তফ্রন্ট সরকার ও জনসাধারণ অবিচ্ছেদ্য। তাই মুখ্যমন্ত্রী শ্রীঅজয় মুখোপাধ্যায় ও উপ-মুখ্যমন্ত্রী শ্রীজ্যোতি বসু শপথ গ্রহণের দিন জনতার অভিনন্দন ও শুভেচ্ছায় অভিভূত হয়ে বলেছেন, তাঁদের দায়িত্ব কতো বৃদ্ধি পেয়েছে। এবং আরো জানিয়েছেন, তাঁরা যোগ্য হবার চেষ্টা করবেন, জনসাধারণের মর্যাদা রক্ষা করবেন।

জনসাধারণের মর্যাদা রক্ষার প্রতিশ্রুতি গ্রহণ করেছিলেন বলেই বিগত যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রিসভাকে রাজ্যপাল শ্রীধর্মবীর কেন্দ্রীয় সরকারের গোপন চক্রান্তে খারিজ করেছিলেন। শুধু এখানেই শেষ নয়, বিশ্বাসঘাতকদেরও তখন গদিনসীন করা হয়েছিল। এবার জনসাধারণ তার প্রতিশোধ নিয়েছে। কিন্তু এখনো পর্যন্ত কেন্দ্রীয় সরকারের কোনো রকম শিক্ষা হয়েছে বলে মনে হয় না। কারণ কেন্দ্রীয় সরকার যুক্তফ্রন্ট সরকারের সঙ্গে বিবাদের সূত্রগুলিকে ছিন্ন করার পরিবর্তে সেগুলিকে বজায় রাখছেন। জনসাধারণ যুক্তফ্রন্ট সরকারকে বিপুলভাবে সমর্থন জানাচ্ছে দেখেও কেন্দ্রীয় সরকার জনতার রায়কে অবজ্ঞা করে কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারের মধ্যে বিবাদ সৃষ্টির চেষ্টা করছেন। আমরা মনে করি, কেন্দ্রীয় সরকার পুরাতন জিদ ত্যাগ করে নতুন কালের নতুন শিক্ষা গ্রহণ করবেন।

রাজ্যে রাজ্যে রাজনৈতিক পট-পরিবর্তনে কেন্দ্রীয় সরকারের স্বার্থেই ঐ সরকারের উচিত অনমনীয় মনোভাব অবিলম্বে ত্যাগ করা।

যুক্তফ্রন্ট সরকারের সঙ্গে কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক বিবাদ সৃষ্টির অর্থ পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের জনসাধারণের আশা-আকাঙ্ক্ষাকে রূপায়িত করার পথে বাধা সৃষ্টির চেষ্টা। অথচ পশ্চিমবঙ্গের যুক্তফ্রন্ট সরকার মন্ত্রিসভার প্রথম বৈঠকেই যে ঐতিহাসিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন—তা প্রমাণ করে, ঐ সরকার তাঁদের প্রতিশ্রুত দায়িত্ব পালন করতে কিভাবে বদ্ধপরিকর। যেহেতু কংগ্রেসী ও পি, ডি, এফ-এর শাসনে গরিষ্ঠ সংখ্যক জনগণের সমর্থন ছিল না, তাই জনসাধারণের বিরুদ্ধে অত্যাচার ও অবিচারেরও অন্ত ছিল না। এমন কি শ্রমিক, কৃষক ও মধ্যবিত্তদের প্রয়োজনীয় বস্তুর দাবি সরকার অস্বীকার করেছে এবং ঐ সব দাবির জন্য যে সব গণতান্ত্রিক আন্দোলন হয়েছে তাকে মহাত্মাজীর শিষ্যরাই নির্মম ও হিংস্রভাবে দমন করার চেষ্টা করেছে। সেই কারণে এখনো পর্যন্ত রাজনৈতিক নেতারা বিনা বিচারে জেলে পচছেন! তাছাড়া জনসাধারণের ন্যূনতম আয় না বাড়িয়ে ব্যয় বৃদ্ধির জন্য রাষ্ট্রপতির আমলেও ট্রাম ভাড়া বাড়িয়ে দেওয়া হয়েছে, বন্যার্ত এলাকার ঋণ আদায়ের জন্য অমানবোচিত ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে, বস্তিবাসীদের জন্য বিগত যুক্তফ্রন্ট সরকার কিছু সুরাহা করলেও পরবর্তীকালে তা' বানচাল করা হয়েছে।

তাই নব-নির্বাচিত যুক্তফ্রন্ট সরকার মন্ত্রিসভার প্রথম বৈঠকেই কুড়িটি জনকল্যাণকর সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে আগেকার আমলের অভিশাপ দূর করার জন্য জনগণের পুনরায় অভিনন্দনধন্য হয়েছেন। ঐ কুড়িটি সিদ্ধান্তের মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য হোল অবিলম্বে বিনা বিচারে আটক সমস্ত রাজবন্দীর মুক্তি, যুক্তফ্রন্ট সরকার উৎখাতের পর পুলিশী অত্যাচার সম্পর্কে তদন্ত, আই· জি· উপানন্দ মুখার্জীকে অপসারণ, বস্তিবাসীদের কর বৃদ্ধি রোধের জন্য অর্ডিন্যান্স, গণতান্ত্রিক আন্দোলনের ব্যাপারে পুলিশের রুজু করা মামলা প্রত্যাহার, বর্ধিত ট্রাম ভাড়া হ্রাস করা, পৌরসভা নির্বাচন দু'মাস পিছিয়ে দেওয়া, বন্যার্ত এলাকার ঋণ ও খাজনা আদায় স্থগিত রাখা, গত ১৯শে সেপ্টেম্বর কেন্দ্রীয় সরকারী কর্মচারীদের ধর্মঘটকে কেন্দ্র করে যে সকল মামলা চালানো হচ্ছিল তা প্রত্যাহার করে নেওয়া এবং গত ১৬ই মে (১৯৬৮) একদিনের প্রতীক ধর্মঘট করার জন্য রাজ্য সরকারী কর্মচারীদের একদিনের যে বেতন কেটে নেওয়া হয়েছিল সেই বেতন তাদের প্রত্যর্পণ প্রভৃতি।

নিঃসন্দেহে যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রিসভা প্রথম বৈঠকেই গুরুত্বপূর্ণ কয়েকটি ঐতিহাসিক সিদ্ধান্ত গ্রহণের দ্বারা তাঁদের যোগ্যতা ও দায়িত্ববোধের প্রমাণ দিয়েছেন।

সম্পাদকীয়

আজকের মানুষ

'একসঙ্গে দু'জনের কিছুতেই বাইরে থাকা চলবে না। হয় আমি জেলের বাইরে থেকে গভর্নরী করবো আর মুজিবর জেলে থাকবেন নয় তো....." অর্থাৎ পূর্ব পাকিস্তানের গভর্নর মোনেম খাঁ চেয়েছিলেন যতদিন তিনি প্রদেশের এই গুরুত্বপূর্ণ পদে অধিষ্ঠিত থাকবেন ততদিন যেন তিনি শেখ মুজিবর রহমানকে ছাড়া অবস্থায় না দেখতে পান, ততদিন যেন এই জননেতাকে কারাগারের অন্তরালে পাঠানো হয়। ডিক্টেটর আয়ুব খাঁ তাঁর ওপর যে-আস্থা স্থাপন করেছেন তার যেন মর্যাদা রক্ষিত হবে না। আয়ুবের নিমক খেয়ে বশংবদ মোনেম খাঁ নিমকহারামি করবেন কী করে! আজ অনুভব করতে পারি জনতার দাবিতে যখন শেষ পর্যন্ত শেখ মুজিবর রহমানকে মুক্তি দিতে হল, তখন মোনেম খাঁ সাহেবের লাল-মুখটায় কী চুনকালিই না পড়লো।

লোকে যাকে হাতে মারতে পারে না, তাকে ভাতে মারতে চায়। আয়ুব-শাহী শেখ মুজিবরকে হাতে এবং ভাতেই শুধু মারতে চান নি, ছলে-বলে-কৌশলে তাঁকে অপদস্থ করতে চেয়েছেন, তাঁর রাজনৈতিক অস্তিত্ব বিলোপ করে দিতে চেয়েছেন। কিন্তু যে-বনস্পতির শেকড় মাটির গভীরে, যে-ব্যক্তির বলভরসা জনতা, তাঁকে উৎপাটিত করা শক্ত নয় কি?

রাজনীতিতে মুজিবরের অদম্য আগ্রহ দেখা গিয়েছে তাঁর তরুণ বয়স থেকেই। পূর্ব পাকিস্তানের ফরিদপুর জেলায় শেখ মুজিবর রহমানের জন্ম। আর পাঁচজন বাঙালী তরুণের মত মুজিবরও দেশকে স্বাধীন করার কথা ভাবতেন, বিদেশী শাসনশৃঙ্খলা থেকে দেশমাতৃকার বন্ধন মুক্ত করতে চাইতেন। আর পাঁচজন মুসলমান যুবকের মত তাঁর চিন্তাধারাও সেদিন সাম্প্রদায়িক মনোভাবে আচ্ছন্ন হয়েছিল। জেলায় মুজিবর মুসলিম লীগের সংগঠনে আত্মনিয়োগ করলেন। কিন্তু আজাদী পাবার দু' বছরের মধ্যেই, তাঁর সাধের পাকিস্তান সৃষ্ট হবার অল্প সময়ের মধ্যেই মুজিবরের মোহমুক্তি ঘটলো। মুসলিম লীগ যে কায়েমী স্বার্থবাদদের আস্তাবলে পরিণত হয়েছে, সাধারণ লোকের ভালো করার সাদিচ্ছা যে মুসলিম লীগ সরকারের বিশেষ নেই মুজিবরের সন্ধানী চোখে তা ধরা পড়তে দেরি হলো না। ১৯৪৯ সালে বাংলা দেশের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী হাসান শহীদ সুরাবর্দী পাকিস্তানে নতুন দলের পত্তন করলেন: আওয়ামী লীগ। যুবক মুজিবর সহজেই আকৃষ্ট হলেন সুরাবর্দীর দিকে। যোগ দিলেন তিনি নতুন দলে।

আওয়ামী লীগের সদস্য হিসেবেই মুজিবর রহমান ১৯৫৪ সনে পূর্ব

শেখ মুজিবর রহমান

পাকিস্তান বিধানসভার সদস্য নির্বাচিত হন, সদস্য পদ পেলেন জাতীয় পরিষদেরও। আওয়ামী লীগ যখন আতাউর রহমানের নেতৃত্বে পূর্ব পাকিস্তানের জনপ্রিয় সরকার গঠন করেন, তখন শেখ মুজিবর রহমান তার বাণিজ্যমন্ত্রী হয়েছিলেন।

যুক্তিবাদী সুবক্তা হিসেবে মুজিবর রহমানের প্রচুর খ্যাতি। '৫৫ সনে তিনি পাক-বাণিজ্য প্রতিনিধি দলের নেতৃত্ব নিয়ে চীন গেলেন। সফল সফর সেরে মুজিবর দেশে ফিরলেন, কিন্তু মন্ত্রিত্ব রাখলেন না আর। বদলে তিনি আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদকের দায়িত্বভার নিয়ে দলটিকে পাকাপোক্ত করে তুলতে লাগলেন।

ক্ষমতাসীন মুসলিম লীগ এতদিন শেখ মুজিবরের জনপ্রিয়তা লক্ষ্য করেই যাচ্ছিলেন। ১৯৫৮ সনে আয়ুব খাঁ প্রেসিডেন্টের গদি দখল করার পর থেকেই সুপরিকল্পিতভাবে চেষ্টা চলতে থাকে মুজিবরকে অঙ্কুরে বিনাশ করার জন্যে। প্রথমে তাঁকে একই বছরের ১২ই অক্টোবর তারিখে পাকিস্তান নিরাপত্তা আদেশ অনুযায়ী গ্রেপ্তার করা হয়। একটানা দেড় বছর তাঁকে বিনা বিচারে আটক রাখা হলো। সে-কারাবাস যাতে দীর্ঘস্থায়ী করা যায় সে উদ্দেশ্যে ছ'টা ফৌজদারী মামলাও তাঁর বিরুদ্ধে আনা হয়। কিন্তু আদালত মুজিবরকে প্রত্যেকটি অপরাধ থেকে মুক্তি দেন। কিন্তু '৬০ সনের জানুয়ারীতে মুক্তির নিশ্বাস দম ভরে নেবার আগেই মুজিবরের ব্যক্তিস্বাধীনতা আবার খর্ব করা হলো তাঁর গতিবিধি নিয়ন্ত্রণ করে। '৬২ সনে সুরাবর্দীর সঙ্গে মুজিবরকেও আবার নিরাপত্তা আইনে গ্রেপ্তার করা হয়।

'৬৫ সনের প্রেসিডেন্ট পদে নির্বাচনে আয়ুব খাঁর বিরুদ্ধে ফাতিমা জিন্নার প্রচারে শেখ মুজিবর অন্যতম প্রধান ভূমিকা নিয়েছিলেন।

শেখ মুজিবর রহমানের রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি স্বচ্ছ। '৬৬ সনে লাহোরে সর্বদলীয় রাজনৈতিক সম্মেলনে তিনি যে পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের স্বায়ত্তশাসন এবং বয়স্ক ভোটাধিকারের ভিত্তিতে অবাধ নির্বাচন ইত্যাদি ছ'দফা কর্মসূচী পেশ করেছিলেন তা আজও বিরোধীদের মুখ্য দাবি। ফলে আয়ুব খাঁ আরো চটলেন, আবার তাঁকে গ্রেপ্তার করা হলো। আবার আদালত তাঁকে মুক্তি দিলেন। আবার তাঁকে গ্রেপ্তার করে শ্রীহট্ট চালান করা হল। সেখানেও জজ তাঁকে মুক্তির আদেশ দিলেন। কিন্তু পুলিশ ফেউ ছাড়ে না। তাঁকে নিয়ে যাওয়া হলো ময়মনসিংহ। এখানেও বিচারে মুক্তি পেলেন তিনি, গেলেন ঢাকা। কিন্তু গভর্নর মোনেম খাঁর আদেশে আবার কারাগারে নিক্ষেপ করা হলো। মুক্তিও পেলেন যথারীতি '৬৮ সনের জানুয়ারীতে। এত হয়রানি করেও আয়ুবশাহীর আশা মিটলো না। শেষ পর্যন্ত তাঁকে জড়ানো হলো তথাকথিত আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার সঙ্গে। বলা হলো শেখ মুজিবরই এই ষড়যন্ত্রের প্রধান নায়ক এবং পরিচালক। কিন্তু গণরোষের বহ্নিতে আয়ুব খাঁকে দগ্ধ হতে হলো, মুক্তি দিতে হলো তাঁকে বিনা শর্তে। মুজিবর আজ সারা পাকিস্তানের নয়নমণি।

সুভাষচন্দ্র ও শঙ্করীপ্রসাদ বসু সমকালীন ভারতবর্ষ

নাম পরিবর্তনের কৈফিয়ৎ

[সাপ্তাহিক বসুমতীর সহৃদয় পাঠকগণ দীর্ঘদিন ধরে বর্তমান লেখককে সহ্য করেছেন। "রবীন্দ্রনাথ ও সুভাষচন্দ্র" নামে বৎসরাধিককাল ধরে প্রকাশিত লেখাটির নাম পরিবর্তনও তাঁদের সহ্য করতে হবে। পরিবর্তনের কারণ একাধিক। আশু কারণ—সাপ্তাহিক বসুমতীতে এই লেখা প্রকাশকালেই একই নামেই অপর লেখকের একটি বই বেরিয়ে গেছে। এ সম্বন্ধে আমার বক্তব্য সাপ্তাহিক বসুমতীতে কিছুদিন আগেই জানিয়েছি। এমনিতেই আমি যথেষ্ট তপ্ত লেখা লিখছি, গ্রন্থনাম নিয়ে নতুন সংঘাতের উত্তাপবৃদ্ধিতে ইচ্ছা করছে না। রণভঙ্গকেই বীরকীর্তিরূপে গণ্য করছি।

নাম পরিবর্তনের মুখ্য কারণ কিন্তু ভিন্ন। কিছুদিন থেকে বর্তমান লেখকের মনে হচ্ছে, পাঠকের মনোভাবও সম্ভবত তাই—রচনার বিষয়ব্যাপ্তি গ্রন্থনামকে ছাপিয়ে যাচ্ছে। সমসাময়িক রাজনৈতিক ভারতবর্ষের কথা এত বেশি বলতে হচ্ছে, বলার প্রয়োজনও এত বেশি বোধ করছি যে, "রবীন্দ্রনাথ ও সুভাষচন্দ্র" নামটি তার পক্ষে অযথার্থ হয়ে পড়ছে। তাছাড়া গোড়া থেকেই বইয়ের মুখ্য চরিত্র সুভাষচন্দ্র, তাঁর সূত্রেই রবীন্দ্রনাথ ও অন্যান্য মানুষ এসেছেন। এই রচনার সূচনা-সংখ্যায় তা আমি জানিয়েছি। সুতরাং সুভাষচন্দ্রের নাম অগ্রে থাকা উচিত, অথচ রবীন্দ্রনাথের আগে সুভাষ-চন্দ্রের নাম বসতে পারে না সহজবোধ্য কারণে। এইসব কারণে নাম পরিবর্তনের তাগিদ ভিতরে ভিতরে বোধ করে-ছিলাম—একই নামে আর একটি গ্রন্থের প্রকাশ আমার নতুন সিদ্ধান্তকে ত্বরান্বিত করল মাত্র। ভরসা করি, এই নামটির প্রতি আর কোনো লেখক লোভ বোধ করবেন না!

শ্রীযুক্ত নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় বর্তমান নামটি করে দিয়েছেন। তাঁকে কৃতজ্ঞতা জানাই। —শঙ্করীপ্রসাদ বসু]

নতুন মানুষ

১৯৩৭ সালে মুক্তিপ্রাপ্ত সুভাষচন্দ্রের কথাবার্তায় এবং আচার-আচরণে নিঃসন্দেহে অভিনবত্ব ছিল। সকলেই জানত তিনি গান্ধী-সাম্রাজ্যে বিরোধী দলের নেতা। গান্ধীজীর আচরণ ও নীতির বিরুদ্ধে সুভাষচন্দ্রের প্রতিবাদের বহু দৃষ্টান্ত এ-পর্যন্ত আমরা দিয়ে এসেছি, পুনরুক্তির প্রয়োজন নেই। বিপ্লবীদের সঙ্গে সুভাষচন্দ্রের সম্পর্ক প্রমাণে সরকার সমর্থ না হলেও কি সরকার, কি দেশবাসী, কেউই সুভাষচন্দ্রকে অহিংসায় আত্মনিমগ্ন মনে করে নি। কিন্তু ১৯৩৭ সালে সকলে চমৎকৃত হয়ে দেখল, অহিংসার জন্য সুভাষচন্দ্রের বাড়াবাড়িরকম মাথাব্যথা। গান্ধীজী সম্বন্ধে সুভাষচন্দ্রের মনে সবসময়েই যথোচিত শ্রদ্ধা ছিল, সকলে দেখল সুভাষচন্দ্র কেবল শ্রদ্ধা বোধ করছেন না, জানাচ্ছেনও বটে। ১ অক্টোবর তারিখে গান্ধীজয়ন্তী উপলক্ষে সুভাষ-চন্দ্র কার্শিয়াঙ থেকে যে বার্তা পাঠিয়েছিলেন তাতে জোরের সঙ্গে বলেন, অহিংসাই কংগ্রেসের নীতি।১ তার আগে আন্দামান-বন্দীদের অনশনকালে ডালহৌসী থেকে যেসব বিবৃতি দেন, তার মধ্যে, আগে দেখেছি, রাজনৈতিক বন্দী-দের হিংসাত্মক পথ পরিহারের কথা জানিয়ে তিনি বাংলা দেশে গুপ্ত বিপ্লবের পন্থা আর অনুসৃত হবে না, কার্যত এমন প্রতিশ্রুতি পর্যন্ত দিয়েছেন। তারপরে স্বাস্থ্যের কারণে আবার যখন য়ুরোপে যাবেন, করাচী থেকে বিবৃতি-যোগে জানাবেন, বাংলার পক্ষে অহিংসার আবহাওয়া ছাড়া উপায় নেই, সে আবহাওয়া না থাকলে গান্ধীজী বন্দীমুক্তি আনতে পারবেন না। তিনি আরও বলবেন, গান্ধীজীকে তিনি জানিয়েছেন যে, এত বেশি অহিংসার হাওয়া এর আগে বাংলায় কখনো ছিল না।২

অহিংস নীতির প্রতি ঘোষিত আস্থার দ্বারাই শুধু নয়, ব্যক্তিগত আচরণেও সুভাষচন্দ্র গান্ধীজীর আস্থা অর্জনে সমর্থ হয়েছিলেন। বন্দেমাতরম প্রশ্নে সুভাষচন্দ্রের ভূমিকা নিশ্চয় গান্ধীজী ও হাইকম্যাণ্ডকে খুশি করেছিল। তাঁরা দেখেছিলেন, সুভাষচন্দ্র বাংলার প্রতি অবিচারের পুরনো কথাটা তোলেন নি, মন্ত্রিত্বের ব্যাপারে ফজলুল হকের সঙ্গে কোয়ালিশনে কংগ্রেস রাজী হয় নি বলে অবি-লম্বে প্রতিবাদের ঝড় ওঠান নি, বাঙালী-বিহারী প্রশ্ন নিয়ে হৈ-চৈ করছেন না, কিংবা বন্দেমাতরম নিয়ে ভাবাবেগে ভেঙে পড়ছেন না। বাংলার স্বার্থের প্রতিকূল ব্যবস্থাদি

---

১ অমৃতবাজার, ১ অক্টোবর, ১৯৩৭

২ অমৃতবাজার ও হিন্দুস্থান স্ট্যাণ্ডার্ড, ১৮ নভেম্বর,

করার পরে বাংলা থেকে প্রতিবাদ উঠলে যদিও তাকে 'প্রাদেশিকতা' বলে দেগে দেওয়া হত, তাহলেও কংগ্রেস-কর্তাদের আসল মতলবটা সবসময়ে চাপা থাকত না। না, সুভাষচন্দ্র এখন ওসব ঝঞ্ঝাট বাধাচ্ছেন না।

গান্ধীজী এই সময়েই সুভাষচন্দ্রকে খুব কাছ থেকে দেখার সুযোগ পান। কংগ্রেসের অধিবেশন উপলক্ষে তিনি কলকাতায় এসে শরৎচন্দ্র বসুর বাড়িতে আতিথ্য নিয়েছিলেন। এখানেই অতি বড় শারীরিক সংকটের মধ্যে পড়েছিলেন, সেবায় শুশ্রূষায় বসু-ভ্রাতারা দিনগুলি ভরিয়ে তুলেছিলেন। গান্ধীজীর মন প্রসন্ন হয়ে উঠেছিল। সেক্রেটারী মহাদেব দেশাইয়ের লেখায় সেই প্রসন্নতার স্নিগ্ধ আলোক পড়েছিল। 'হরিজন' পত্রিকায় তিনি লিখেছিলেন—

> "যে-উদ্দেশ্যে এবার কলকাতা যাত্রা, তার ফল ছাড়াও অন্য ফললাভ হয়েছিল, যাকে আমি খুবই মূল্যবান মনে করি। আমাদের আতিথ্য দিয়েছিলেন সহৃদয় বসু-ভ্রাতৃদ্বয়—শরৎ বসু ও সুভাষ বসু। তাঁদের সঙ্গে ও তাঁদের বৃহৎ পরিবারের সঙ্গে এইবার কলকাতা গমনের ফলেই গান্ধীজী ঘনিষ্ঠ সম্পর্কে আসতে পেরেছিলেন। গান্ধীজী অবশ্য তাঁদের জানতেন, কিন্তু ঘনিষ্ঠভাবে পরিচিত হবার জন্য একই ভবনে বসবাসের প্রয়োজন ছিল। অঢেল আতিথ্য বাংলার বৈশিষ্ট্য, কিন্তু ভ্রাতৃদ্বয়ের কাছ থেকে অধিকন্তু যে ভালবাসা ও বিশ্বাস গান্ধীজী পেয়েছেন, তাতে যেভাবে তাঁরা তাঁর প্রিয় হয়ে উঠেছেন, এমন আর কিছুতে হতে পারত না।"৩

কিন্তু সুভাষচন্দ্রর এই হঠাৎ গান্ধীভক্তির কারণ কি? শ্রীযুক্ত দেবপ্রসাদ ঘোষ যেমন লিখেছিলেন, সেই কটু কথাটাই কি সত্য—কংগ্রেস সভাপতিত্বের দৌড় প্রতিযোগিতায় নেমে সুভাষচন্দ্র গান্ধীজী বা হাইকম্যাণ্ডকে চটাতে চাইছেন না? বিশিষ্টার্থে কথাটা নিশ্চয় সত্য—সত্যই সুভাষচন্দ্র সভাপতি হতে চেয়েছিলেন, শুধু এইবার নয়, পরবর্তী বারেও। তবে ব্যাপারটার সঙ্গে ব্যক্তিস্বার্থের কোনো যোগ ছিল না। সেদিনকার মানুষদের কাছে হয়ত স্পষ্ট হয় নি, কিন্তু সুভাষচন্দ্র ১৯৩৩ সালে য়ুরোপ যাত্রার পর থেকে ভারতের স্বাধীনতার জন্য একটি বৃহত্তর পরিকল্পনা ছকে ফেলেছিলেন, গান্ধীজীর আস্থা অর্জন করে কংগ্রেস হাইকম্যাণ্ডের মধ্যে প্রবেশ করাও তার অন্তর্ভুক্ত ছিল। গান্ধীজীও অপরপক্ষে পরিকল্পনা অনুযায়ীই সুভাষচন্দ্রকে স্বদলভুক্ত করতে চাইবেন। তারপরে একদিন উভয় পরিকল্পনা বিপরীত উদ্দেশ্য নিয়ে মুখোমুখি হবে, সংঘর্ষ বাধবে, তার পরিণতি ভারতবর্ষের ইতিহাসকে বিচিত্র পথে আকর্ষণ করবে। ক্রমে সে ইতিহাস আমরা দেখব।

অহিংসা ছাড়া বাংলার উপায় নেই, একথা যদি সুভাষচন্দ্র বলে থাকেন, পরিবেশ অনুযায়ী ঠিকই বলেছিলেন। 'ইণ্ডিয়ান স্ট্রাগল' গ্রন্থে সুভাষচন্দ্র যা লিখেছিলেন, রোমা রোলাঁর কাছে যা বলেছিলেন, তার থেকে বোঝা যায়, ভারতের ক্ষেত্রে সেই সময়ের জন্য অহিংস সংগ্রাম ভিন্ন অন্য কোনো উপায় তিনি দেখেন নি। কিন্তু সংগ্রাম শেষ পর্যন্ত অহিংস থাকবেই এমন ভাবার মত শুদ্ধচিত্ত তিনি ছিলেন না। কথাটা দাঁড়িয়েছিল 'সংগ্রাম'—যে-কোনো পথে, হাতের কাছে রয়েছে অহিংসা—সুতরাং অহিংস সংগ্রাম। এই সংগ্রামে সুভাষচন্দ্র চেয়েছিলেন, দেশের প্রগতিশীল শক্তি পুরোপুরি অংশ নিক। গুপ্ত বৈপ্লবিক পন্থা সম্বন্ধে সুভাষচন্দ্রের মনে সশ্রদ্ধ মমত্ব থাকলেও তিনি মনে করেছিলেন, ঐ পথের দ্বারা সর্বোত্তম যা পাবার তা পাওয়া গেছে, এখন আর কার্যকরী পন্থা ওটি নয়, সুতরাং ঐ পথের মানুষগুলিকে যদি মুক্ত করে (মুক্ত করার প্রয়াসের পিছনে মানবিক কারণও ছিল) কংগ্রেসের বৃহত্তর আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত করে দেওয়া যায় তাহলে প্রয়োজনের ক্ষেত্রে এই শক্তিই মরণপণ লড়াইয়ে ঝাঁপিয়ে পড়বে—তখন, অহিংসার বহির্বাসের তলায় বর্ম যে দেখা যাবে না এমন নয়।

বাংলা দেশের বিশেষ সমস্যার প্রতিও বাঙালী সুভাষচন্দ্র উদাসীন থাকতে পারেন নি। ১৯৩৫ আইনে প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসনে বাংলা দেশের দুর্দশার চেহারা তিনি দেখেছেন। দীর্ঘদিন ধরে কংগ্রেসের বৃহত্তর নেতৃত্বে বাংলার কোনো ঠাঁই নেই। আইন অমান্য আন্দোলনের পরবর্তী পাঁচ বছরে বাংলা দেশে কংগ্রেস সংগঠনে কোনো উন্নতি হয় নি। বৈপ্লবিক কার্যাদি দেখা গিয়েছিল, তার প্রতি কংগ্রেস হাইকম্যাণ্ডের বিষদৃষ্টি ইংরাজ শাসকদের তুলনায় অল্প নয়। বিচ্ছিন্ন বৈপ্লবিক ঘটনায় বাঙালী মন হয়ত উত্তেজনা-শিহরিত হয়, কিন্তু সংঘবদ্ধ শক্তিপ্রকাশের শক্তি তার নেই। অথচ সুভাষচন্দ্র জানেন, বাংলা দেশের বেপরোয়া প্রাণের ঝড় ভিন্ন চরম আঘাত হানা কঠিন। কংগ্রেসের পতাকাতলে বাংলা দেশকে সমবেত করে, কংগ্রেস নেতৃত্বে বাংলা দেশকে প্রবেশ করিয়ে দিয়ে, সবচেয়ে আশাবাদী অথচ বর্তমানে আশাহত প্রদেশটিতে প্রাণশক্তি তিনি জাগাতে চেয়েছিলেন।

আঘাত হানতে হবে—সময় এসে গেছে—য়ুরোপে থাকতেই সুভাষচন্দ্র অনুভব করেছিলেন—যুদ্ধ আসছে য়ুরোপে। 'পরাধীন জাতির পক্ষে যুদ্ধ অবিমিশ্র অমঙ্গল নয়'—রোলাঁকে সুভাষচন্দ্র বলেছিলেন। ইতিমধ্যে যতটুকু সময় পাওয়া যায় প্রস্তুত হয়ে নাও। বন্দীমুক্তি আন্দোলন, কংগ্রেস-নেতৃত্বে প্রবেশ—সবই সেই প্রস্তুতিপর্বের অন্তর্গত। সেইজন্যই গান্ধীজীকে প্রণাম এবং জহরলালকে আলিঙ্গন।

১৯৩৭ সালের ২৫ অক্টোবর কংগ্রেস সভাপতি পণ্ডিত জহরলাল কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির সভায় যোগ দিতে কলকাতায় আসেন। "সুভাষচন্দ্রের সঙ্গে দীর্ঘদিন পরে পণ্ডিতজীর সাক্ষাৎ। পণ্ডিতজী সুভাষচন্দ্রকে জড়িয়ে ধরেন। সুভাষচন্দ্রের স্বাস্থ্যের প্রভূত উন্নতি লক্ষ্য করে তিনি বিশেষ সন্তোষ প্রকাশ করেন।৪

জহরলালের আলিঙ্গনে উষ্ণতা ছিল, তার বিশেষ কারণও

---

৩ অমৃতবাজার, ২১ নভেম্বর, ১৯৩৭

৪ অমৃতবাজার, ২৬ অক্টোবর, ১৯৩৭

ছিল। কিছুদিন থেকে সুভাষচন্দ্র জহরলালকে জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার মত দেখছেন। জহরলালের ব্যক্তিচরিত্রে সহসা মুগ্ধ হয়ে তিনি একাজ করেন নি। ভারতবর্ষের স্বাধীনতা ভিন্ন তাঁর আবেগ-উৎস আর কিছু ছিল না। আসন্ন সংকটে কংগ্রেসের মধ্যে বামপন্থী নেতৃত্ব গড়ে তুলতে হলে জহরলালের সাহায্যের একান্ত প্রয়োজন। তার সুন্দর সুযোগও উপস্থিত—জহরলাল এখন কংগ্রেস সভাপতি, যিনি দক্ষিণ ও বামকে মেলাবার যোগ্য ব্যক্তি। ১৯৩৬ সালে জহরলাল যখন লখনৌ কংগ্রেসের সভাপতি, সুভাষচন্দ্র স্থির করলেন জহরলালের পাশে গিয়ে দাঁড়াবেন, যাতে তিনি গান্ধীবাদীদের দ্বারা সম্পূর্ণ অধিকৃত না হয়ে পড়েন, উপযুক্ত সহকর্মীর সাহায্যের প্রতিশ্রুতি পান। ভারতে ফিরে যাওয়ার বিরুদ্ধে নিষেধাজ্ঞা ছিল—সুভাষচন্দ্র তাকে লঙ্ঘন করার সিদ্ধান্ত নিলেন। তার আগে কনিষ্ঠ ভ্রাতা কিভাবে জ্যেষ্ঠর কাছ থেকে অনুমতি চেয়েছিলেন দেখতে পাই সুভাষচন্দ্রের কয়েকটি চিঠি থেকে। 'পত্রগুচ্ছে' চিঠিগুলি পেয়েছি, দুটি উদ্ধৃত করছি, জহরলাল ও সুভাষচন্দ্রের পরবর্তী সম্পর্কের পটভূমিকার প্রয়োজনে তা কাজে লাগবে।

অস্ট্রিয়ার বাডগাস্টিন থেকে ১৩ মার্চ, ১৯৩৬, তারিখে সুভাষচন্দ্র জহরলালকে যে চিঠি লিখেছিলেন, তার গোড়ায় ভিয়েনার বৃটিশ কনসালের জরুরী চিঠি উদ্ধৃত করেন, যাতে দেখা যায়, সুভাষচন্দ্র ভারতে ফিরলে 'মুক্ত থাকবার আশা করতে পারবেন না', একথা ভারত সরকার জানিয়েছেন। সুভাষচন্দ্র তার পরে জহরলালকে লেখেন—

"যাত্রার ব্যবস্থা প্রায় সম্পূর্ণ করতে চলেছি, এমন সময়ে এই চিঠি পেলাম। বস্তুত, সমুদ্রপথে গেলে আমার বেশী সুবিধা না বিমানপথে, এই নিয়ে ভাবনা-চিন্তা করছিলাম বলেই তখনও আমি টিকিট বুক করিনি। বিমানপথে গেলে এখানে আমার পুরো কোর্সের চিকিৎসা সম্পূর্ণ হতে পারত। চিকিৎসায় মোট ২৫ দিন লাগে। এ-ব্যাপারে পরামর্শ করতে পারি, এমন কেউ এখানে নেই। কন্টিনেন্টেও এমন কেউ আছেন বলে আমার মনে হয় না। তোমারও নিজের প্রতিক্রিয়া থেকেই তুমি অনুমান করতে পারবে যে, এই সতর্কবাণীকে উপেক্ষা করে দেশে যেতেই এই মুহূর্তে আমি ইচ্ছুক। শুধু একটা বিষয় বিবেচনা করে দেখা দরকার : জনস্বার্থ কিসে অক্ষুণ্ণ থাকবে। ব্যক্তিগত ইচ্ছা-অনিচ্ছাকে আমি আদৌ আমল দিই না; এবং জনস্বার্থের খাতিরে যে-কোনো পথ অবলম্বনেই আমি প্রস্তুত। জনসেবার ক্ষেত্র থেকে এত দীর্ঘকাল ধরে আমি দূরে রয়েছি যে, কী ব্যবস্থা অবলম্বন করলে জনসাধারণের অধিকতর মঙ্গল হবে, সে বিষয়ে নিশ্চিত হওয়া আমার পক্ষে শক্ত। এই ধরনের সংকটের মুহূর্তে আর একজনকে উপদেশ দেওয়া যে তোমার পক্ষেও শক্ত তা আমরা জানি। এবং শুধু জনস্বার্থের দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করে দেশকর্মীকে তুমি উপদেশ দিতে পার। আমাদের দেশের জনসেবার ক্ষেত্রে যে অসামান্য প্রতিষ্ঠা তোমার রয়েছে তাতে এইরকমের অদ্ভুত ও অস্বস্তিকর অবস্থায় কাউকে উপদেশ দেবার প্রয়োজন দেখা দিলে তোমার দায়িত্বকে তুমি এড়িয়ে যেতে পার না।

এরকম একটা ব্যাপারে তোমাকে বিরক্ত করার সপক্ষে আমার একমাত্র যুক্তি এই যে, এমন আর কারও কথা আমি ভাবতে পারি না, যার উপর আমি অধিকতর আস্থা রাখতে পারি। সময় এতই অল্প যে, একগাদা লোকের কাছেও উপদেশ চাইতে পারছি না। আমার নিজের আত্মীয়-স্বজনদের কাছে উপদেশ চেয়ে লাভ নেই; তার কারণ ব্যাপারটাকে জনস্বার্থের দিক থেকে বিচার করা তাঁদের পক্ষে সম্ভব নাও হতে পারে। সুতরাং একটিমাত্র পথ আমার কাছে খোলা রয়েছে, সে হল তোমার উপদেশের উপর নির্ভর করা। ২০ তারিখ নাগাদ এই চিঠি তোমার হাতে পৌঁছাবার কথা। তার অব্যবহিত পরেই তুমি যদি আমাকে একটা তার পাঠাও, তাহলে সময়মতই তা আমার হাতে এসে পৌঁছবে। কে, এল, এম, বিমান ২রা এপ্রিল তারিখে রোম থেকে রওনা হবে। সে বিমান আমি ধরতে পারি। সুতরাং শেষ পর্যন্ত ভারতবর্ষে রওনা হব বলে ২১ তারিখ এমন কি ২২ তারিখেও যদি আমি সিদ্ধান্ত করি তাহলে ২রা এপ্রিল তারিখে যে-বিমান রোম ছাড়ছে, তাতে একটা আসন পাব বলেই আমার বিশ্বাস। এমনও সম্ভব যে, ২৯ মার্চ তারিখে যে-বিমান রওনা হচ্ছে তাতেও একটি আসন পেয়ে যেতে পারি।

লখনৌ কংগ্রেসে যোগদানের জন্য সময়মত দেশে যাব বলে যখন সংকল্প করেছিলাম তখন অবশ্য এমন সম্ভাবনা ছিল যে, দেশের জমিতে অবতরণ করা মাত্র আমাকে কারারুদ্ধ করা হবে, কিন্তু অন্তত কিছুকালের জন্য আমাকে মুক্ত থাকতে দেওয়া হবে, এমন সম্ভাবনাও তখন ছিল। শেষোক্ত সম্ভাবনাটি এখন সম্পূর্ণরূপে তিরোহিত হল এবং এখন দেশে যাওয়ার একমাত্র অর্থ হল কারাগারে যাওয়া। অবশ্য জনস্বার্থের দিক থেকে কারাগারে যাওয়ার একটা উপযোগিতা আছে এবং এই ধরনের একটা সরকারী আদেশ অমান্য করে জেনেশুনে কারাবরণ করার সপক্ষেও অনেক কিছুই বলা যেতে পারে।

সম্ভাসম্ভব শীগগির একটা উত্তর দিও।..

...সবে গতকাল সংবাদপত্রে একটি বিবৃতিতে আমি এই ইঙ্গিত দিয়েছিলাম যে, এখানকার চিকিৎসা সম্পূর্ণ হবার পর আমি বিমানযোগে রওনা হতে পারি।"৫

এই চিঠি থেকে স্পষ্ট বোঝা যায় সুভাষচন্দ্র সত্যই জহরলালকে এই কালে রাজনীতির দিক থেকে জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার মতই দেখেছিলেন। সদ্য-উদ্ধৃত পত্রের মাত্র ৯ দিন আগে

৫ পত্রগুচ্ছ : ১৫৪-৫৫

৪ মার্চ তারিখে জহরলালকে লেখা একটি পত্রে জহরলালের প্রতি সুভাষচন্দ্রের 'সুবিবেচনাপূর্ণ' ব্যবহারের কারণ স্পষ্ট হয়ে উঠেছে—

"দীর্ঘ ও ক্লান্তিকর পথের শেষে গতকাল সকালে এখানে এসে পৌঁছেছি। জায়গাটা সুন্দর এবং শান্ত। কর্মের আবর্তে আবার ঝাঁপিয়ে পড়বার আগে তুমি যদি ইউরোপে কিছুদিন বিশ্রাম নিতে পারতে, আমি খুশী হতাম।

তোমাকে যে সকল কথা বলেছি, সেই মত একটা বিবৃতি দেব কিনা, তোমার কাছ থেকে আসার পর থেকে সেই কথাই ভাবছি। দেওয়াই উচিত বলে আমার মনে হয়, তার কারণ আবার কারারুদ্ধ হবার সম্ভাবনা রয়েছে, এবং এমন কিছু লোক হয়তো আছে যারা আমার পরামর্শ কামনা করে। আমার বিবৃতি যথাসম্ভব ছোট হবে এবং তাতে স্পষ্টভাবে এই কথাই আমি বলব যে, তোমাকে আমার পূর্ণ সমর্থন দানের সিদ্ধান্তই আমি করেছি।

বর্তমানে যাঁরা অগ্রগণ্য নেতা, তাঁদের মধ্যে একমাত্র তোমার কাছেই আমরা এই আশা করতে পারি যে, কংগ্রেসকে প্রগতির পথে পরিচালনা করা হবে। তাছাড়া তোমার প্রতিষ্ঠাও অসামান্য এবং আমার মনে হয় যে, মহাত্মা গান্ধীও তোমার কথাকে যতখানি মেনে নেবেন, অন্য আর কারও কথাকে ততখানি মেনে নেবেন না। আমি খুবই আশা করছি যে, সিদ্ধান্ত গ্রহণের ব্যাপারে জনচিত্তে তোমার প্রতিষ্ঠাকে তুমি পুরোপুরি কাজে লাগাবে। যেটুকু শক্তি সত্যই তোমার রয়েছে, তার চাইতে কম শক্তিশালী বলে তুমি নিজেকে মনে কর না। তুমি যাতে বিচ্ছিন্ন হয়ে যেতে পার, এমন মনোভাব গান্ধীজী কখনও অবলম্বন করবেন না।

আমাদের সর্বশেষ আলোচনায় তোমাকে জানিয়েছি তোমার আশু কর্তব্য হবে দুটি : (১) দপ্তর-গ্রহণকে সর্বতোভাবে বাধা প্রদান করা, ও (২) ওয়ার্কিং কমিটির সংগঠনকে প্রশস্ত ও উদার করে তোলা। এ যদি তুমি করে তুলতে পার তো নৈতিক অবনতির হাত থেকে কংগ্রেসকে তুমি বাঁচাবে, দুর্গতি থেকে তাকে উদ্ধার করবে। বড় বড় সমস্যাগুলিকে ভবিষ্যতের জন্য তুলতুবি রাখা যেতে পারে; নৈতিক অবনতির হাত থেকে কংগ্রেসকে রক্ষা করা আমাদের আশু কর্তব্য।

শুনে আমি অত্যন্ত সুখী হয়েছি যে, কংগ্রেসে তুমি একটি বৈদেশিক বিভাগ খুলতে চাও। তোমার অভিমতের সঙ্গে এই কাজের সম্পূর্ণ মিল রয়েছে।

যাত্রার জন্য তুমি নিশ্চয়ই খুব ব্যস্ত আছ, যাত্রার আগে নিশ্চয়ই টুকিটাকি নানান কাজও তোমার রয়েছে। তাই এই চিঠি আর দীর্ঘ করতে চাই না। কামনা করি, নির্বিঘ্নে তুমি স্বদেশে ফিরতে পার, এবং যে ক্লান্তিকর কর্মভার তোমাকে তুলে নিতে হবে তাতে ভাগ্য যেন তোমার সহায় হয়। আমাকে যদি লখনৌ-এ যেতে দেওয়া হয়, তাহলে তোমাকে সাহায্য করবার জন্য আমি প্রস্তুত থাকব।"৬

এখানে আমাদের কয়েকটি কথা স্মরণ রাখতে হবে। প্রথমত এই চিঠি লেখার মাত্র সওয়া এক বছর আগে 'ইণ্ডিয়ান স্ট্রাগল' প্রকাশিত হয়েছে; জহরলাল সে গ্রন্থ পড়েছেন; সেই গ্রন্থে জহরলালের বুদ্ধি, ব্যক্তিত্ব, জনপ্রিয়তা ইত্যাদি সম্বন্ধে প্রচুর প্রশস্তির পরেও তাঁর রাজনীতি সম্বন্ধে কঠোর মন্তব্য করা আছে। জনপ্রিয়তার সঙ্গে জহরলালের জনপ্রিয়তার লোভ, বুদ্ধির সঙ্গে স্থিরবুদ্ধির অভাব, সাহসের সঙ্গে দ্বিধার মিশ্রণ, সাধারণ প্রশ্নের সঙ্গে ব্যক্তির প্রশ্ন জড়িয়ে ফেলার দুর্মর অভ্যাস, ইত্যাদি বিষয়ে জহরলালের দুর্বলতাকে সুভাষচন্দ্র আঘাত করেছেন খোলা-খুলি। সুভাষচন্দ্র জানতেন, মানবিক সম্পর্কের প্রতি স্বাভাবিক মমত্ব থাকার জন্য জহরলাল অনেক সময় রাজ-নৈতিক আদর্শকে নমনীয় করেও ব্যক্তি-সম্পর্কের মাধুর্যকে অক্ষুণ্ণ রাখেন।৭

অথচ তখনো বামপন্থীদের পক্ষে জহরলাল অপরিহার্য। কারণ, সুভাষচন্দ্রের ঈষৎ পূর্বের বক্তব্য অনুযায়ী : (১) নেতৃবৃন্দের মধ্যে তিনিই একমাত্র প্রগতিশীল; (২) জন-সাধারণের জন্য তাঁর প্রতিষ্ঠা অসাধারণ; (৩) গান্ধীজী তাঁকে সম্পূর্ণ অগ্রাহ্য করতে অসমর্থ। এহেন ব্যক্তিকে দূরে সরিয়ে রাখতে সুভাষচন্দ্র কদাপি পারেন না, কিন্তু তিনি অনুভব করছিলেন জহরলালের পালে নতুন বাতাস ধরেছে। ১৯৩৫-৩৬ সালে য়ুরোপে জহরলালের গতি-বিধির খবর তিনি রেখেছেন, সেখানে সাক্ষাতে আলোচনাও হয়েছে। সুভাষচন্দ্র এইকালীন জহরলাল সম্বন্ধে পরবর্তী-কালে লিখেছেন—

"১৯৩৫ সালের শরৎকালে পণ্ডিত নেহরু সহসা মুক্তি পেলেন যাতে ইউরোপে মৃত্যুশয্যায় শয়ান পত্নীর পাশে উপস্থিত হতে পারেন।...১৯৩৬ সালের মার্চ মাস পর্যন্ত তাঁর য়ুরোপবাসকালে তিনি লণ্ডন ও প্যারিসে সংযোগ স্থাপন করেন, যে সংযোগ তাঁর ভবিষ্যৎ কর্মনীতিকে প্রভাবিত করবে। তিনি কিন্তু বৃটিশ-বিরোধী রাশিয়া বা আয়ারল্যাণ্ডে গেলেন না, যদিও পূর্ববর্তী ভ্রমণে মস্কোয় গিয়েছিলেন। ইটালী বা জার্মানীর মত দেশের সঙ্গে সংযোগ তিনি সযত্নে পরিহার করলেন, তার কারণ ফ্যাসিজম বা নাজিজম সম্বন্ধে তাঁর বিরাগ, কিংবা তিনি ইংলণ্ড ও ফ্রান্সের বন্ধুদের চটাতে চাননি। ইংলণ্ডে অবস্থানকালে তিনি তাঁর আত্মজীবনী প্রকাশ করেন, যা তাঁকে বৃটিশ উদারনৈতিকদের কাছে দারুণ জনপ্রিয় করে তোলে।"৮

৬ পত্রগুচ্ছ, পত্র—১০৮

৭ এ সমালোচনা কেবল সুভাষচন্দ্রের নয়, যুক্তিবাদী ও বিপ্লবীরা একই মনোভাব পোষণ করতেন। —পত্রগুচ্ছের অনেক চিঠিতে তার প্রমাণ আছে। পরে এ বিষয়ে বিস্তৃত আলোচনা

৮ ইণ্ডিয়ান স্ট্রাগল, দ্বিতীয় খণ্ড।

যেন কেউ মন্ত্রী হ'য়ে

ধীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

যেন কেউ মন্ত্রী হ'য়ে এইসব মানুষের প্রেম, মানবতা
কিনে নেয় ; যেন দুর্ভিক্ষের বাংলা মন্ত্রীদের সোনার থালায়
পায়েস খাওয়াবে ব'লে এইসব খবরের কাগজের বার্তাবহদের
জলসাঘরে হাতছানি দিয়ে ডাকে।

এরা ভুলে যায়
দুদিন আগেও অন্য প্রভুদের বাহবায়
কীভাবে কেটেছে ভোর থেকে সন্ধ্যা!
ভুলে যায়, বিশ বছর জন্মভূমির দিকে
পিঠ রেখে অন্ধকার রাত্রির আড়ালে
গুপ্তচর, খুনী, গুণ্ডাদের সঙ্গে থানাপিনা,
যখন তখন ককটেল পার্টি ;
অতিভোজনের শেষে কীভাবে সামলাতে হ'তো
ছিঁড়ে যাওয়া প্যান্টের বোতাম!

এরা খবরের কাগজের সাংবাদিক ঃ
ভুলে যায়, নিরন্নের বাংলা দেশ মন্ত্রীর মুখের শোভা নয়,
অন্ন চায়.....
ভুলে যায়, বাংলার মানুষ আজ আগুনের পথ কাটছে!

অগ্নি-দূত

প্রবীরকুমার চট্টোপাধ্যায়

সমুদ্রের কল্লোলিত ঢেউ
বাঁধভাঙা বন্যাস্রোতে
উচ্ছল উদ্দাম।

ও-পারে—
কারা ওই
বিষাদের ধূমাস্তিতে
অশরীরী ঘোরে

এ-পারে—
স্পন্দিত কিশলয় নবারুণরাগে
রঞ্জিত ; বেলাভূমি নবোদয়ের
গানে মুখরিত!

জনতার রোষ ফেটে পড়ে।
বিঘূর্ণিত আকাশের তলে
স্নিগ্ধ সবুজ প্রাণে আনন্দ-জোয়ার
মুক্ত বিহঙ্গের।

আমরা সবাই নব-মানবের
অগ্নি-দূত ;
চলেছি মিছিলে
বিজয় উৎসবে ॥

ভারতে ফেরার পরে সুভাষচন্দ্রকে ভারত সরকার গ্রেপ্তার করে প্রতিশ্রুতি রক্ষা করলেন। লখনৌ কংগ্রেস এবং পরবর্তী ফৈজপুর কংগ্রেসেও জহরলাল সভাপতিত্ব করলেন। "পণ্ডিত নেহরুর সভাপতিকাল উদ্দীপনার সৃষ্টি করেছিল সন্দেহ নেই, কিন্তু বাস্তব ফলের দিকে বিশেষ কিছু করতে পারলেন না। সুভাষচন্দ্র দেখলেন—

"দুবার সভাপতি নির্বাচিত হওয়ার ব্যাপারে নেহরু কংগ্রেসের গান্ধীবাদীদের পূর্ণ সমর্থন পেলেন। সভাপতিরূপে তিনি গান্ধীদল ও কংগ্রেস সোস্যালিস্ট পার্টির মাঝামাঝি একটা অবস্থায় রইলেন—দুদলের কারোরই অসন্তোষ সৃষ্টি করলেন না—তবে দ্বিতীয় দলকে কিছু পরিমাণে নৈতিক সমর্থন জানালেন।"৯

দু নৌকায় পা দিয়ে চলার যা ফল এখানেও তাই হল, নৈতিক আপত্তি সত্ত্বেও ১৯৩৭ সালে কংগ্রেসের প্রাদেশিক নেতৃত্বগ্রহণ তিনি আটকাতে পারলেন না।—

"এই সময়ে কংগ্রেসের মন্ত্রিত্ব-বিরোধী আন্দোলন জোরদার হয়ে উঠছিল ক্রমে, কিন্তু কংগ্রেসের পার্লামেন্টারিয়ান (বা গান্ধীবাদী) নেতৃবৃন্দ এমন সর্বনাশের নিপুণতার সঙ্গে ঘটনাধারাকে নিয়ন্ত্রিত করলেন যে ১৯৩৭ সালের জুলাই মাসে মন্ত্রিত্ব-বিরোধী আন্দোলনকে সাফল্যের সঙ্গে টর্পেডো মেরে ফাঁসিয়ে দিলেন এবং মন্ত্রিত্ব গ্রহণের পক্ষে নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির সমর্থন পেয়ে গেলেন।"১০

জহরলালের আচরণ তাঁর অনুগতদের পর্যন্ত কি রকম বিচলিত করে তুলেছিল তার কিছু পরিচয় পাওয়া যায় রফি আহমেদ কিদোয়াইয়ের লেখা একটি চিঠিতে।

[ক্রমশঃ]

---

৯ ইণ্ডিয়ান স্ট্রাগল, দ্বিতীয় খণ্ড।

১০ ১৯৩৭ সালের ২৫ নভেম্বরে জহরলাল গোবিন্দবল্লভ পন্থকে এক গোপনীয় চিঠিতে লেখেন—

"সারা ভারত জুড়ে কংগ্রেস মন্ত্রিসভাগুলি সম্পর্কে ঘটনাবলী যে মোড় নিয়েছে, তাতে আমি অত্যন্ত দুঃখিত। ওয়ার্কিং কমিটির সদস্যদের কাছে আমার যে চিঠিগুলি পাঠানো হয়েছিল, আপনার কাছেও তার একখানি নকল গেছে। তাতে আমি আমার মনের কথা ব্যক্ত করেছিলাম। সে মতের প্রকাশে সংযম ছিল, কিন্তু সংযমের আড়ালে বিশ্বাসের তীব্রতাও ছিল। প্রয়োগিক ভাষায় বলতে গেলে, কংগ্রেসী মন্ত্রিসভাগুলি প্রতিবিপ্লবী হতে চলেছে।"

এই পত্রে জহরলাল স্বীকার করেছেন মন্ত্রিত্ব গ্রহণে কংগ্রেসের শক্তিলাভ হয়েছে, গুটিকয়েক প্রাথমিক নীতির ফল ফলেছে, কিন্তু তাঁর ধারণায় অগ্রগতিকে যথেষ্ট জোরদার করা হয় নি, বরং পিছিয়ে যাবার দিকে ঝোঁক দেখা দিয়েছে, কংগ্রেসী মন্ত্রিসভা বিভেদসৃষ্টির উদ্দেশ্যে অবিকল বৃটিশ নীতি গ্রহণ করেছে। "বিভেদ সৃষ্টি করে কংগ্রেস যে কংগ্রেসের একটি অংশকে বস্তুতঃই সাম্রাজ্যবাদ-ভাবাপন্ন নীতি গ্রহণ করাচ্ছি।"

সবই ঠিক, তবু জহরলালের সভাপতিত্বকালেই মন্ত্রিত্ব গৃহীত হয়েছিল। উক্তিতে জহরলাল বিপ্লবী, কেউই সন্দেহ করে না, এবং কাজে প্রতিবিপ্লবী, নিঃসন্দেহে।

বহুদর্শন

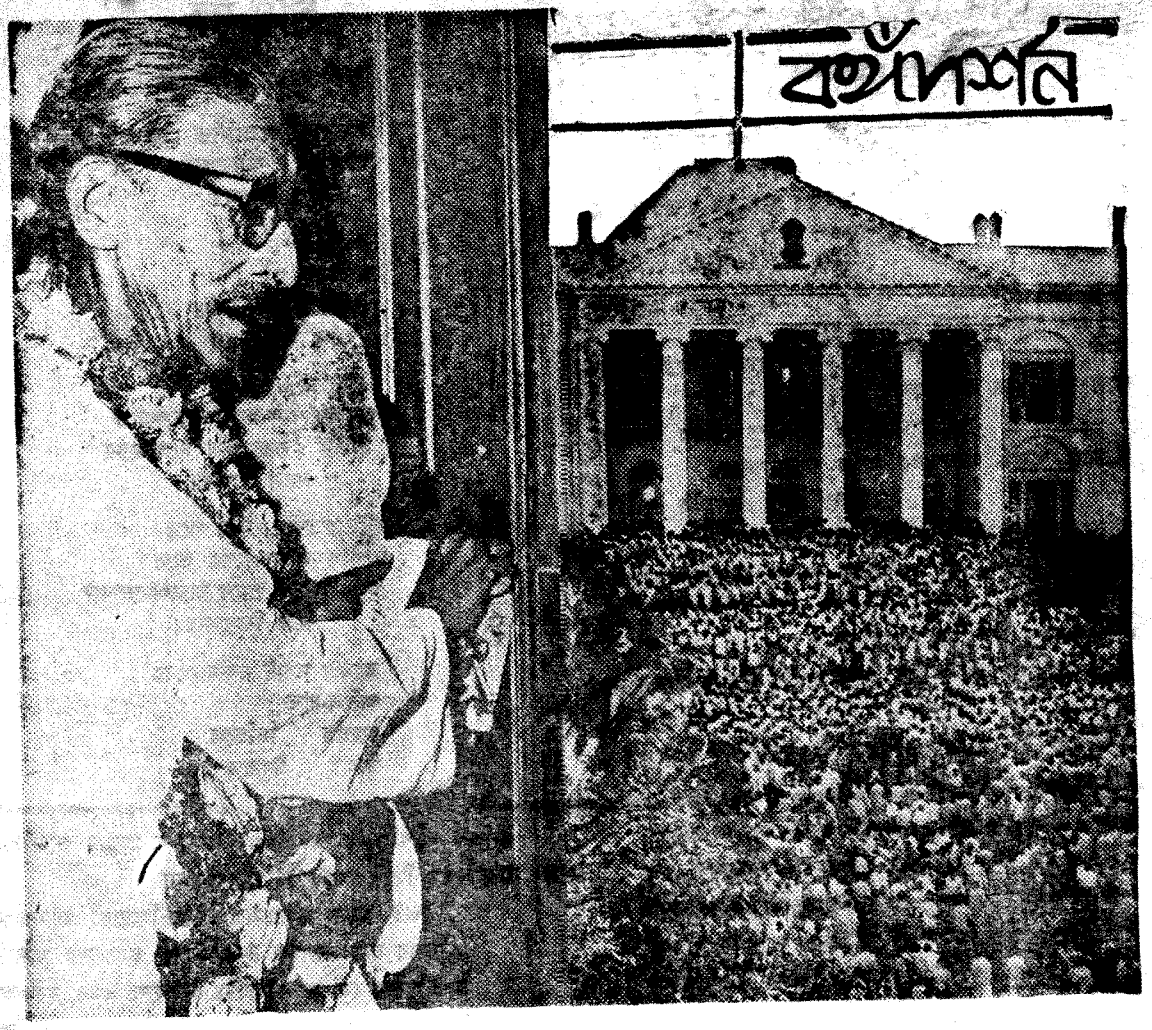

বিধানসভার বন্ধ দরজা খুলে দিলেন শ্রীবিজয় বন্দ্যোপাধ্যায়

২৩শে ফেব্রুয়ারী

পশ্চিমবঙ্গ তথা ভারতের ইতিহাসে ১৯৬৯ সালের ২৩শে ফেব্রুয়ারী যে বহুকাল মুদ্রিত থাকবে তাতে কোন সন্দেহ নেই, এই দিন অজস্র ইতিহাসের স্রষ্টা কলকাতা মহানগরী নতুন আর একটি ইতিহাসের সৃষ্টি করেছে। পশ্চিম আকাশে সূর্য নেমে আসার সঙ্গে সঙ্গে ব্রিগেড প্যারেড গ্রাউন্ডের জনসমুদ্রে যেন জোয়ার লাগে। যেদিকে তাকানো যায় শুধু জনসমুদ্রের ঢেউ আর ঢেউ। সেই ঢেউয়ের মধ্য থেকে লক্ষ লক্ষ কণ্ঠে ধ্বনিত হতে থাকে—যুক্তফ্রন্ট জিন্দাবাদ। এই ঐতিহাসিক সমাবেশে বিজয় অনুষ্ঠানের সভাপতি শ্রীবিজয় বন্দ্যোপাধ্যায় ঘোষণা করেন গণতন্ত্রের হত্যাকারীদের হাত থেকে গণতন্ত্রকে বাঁচাবার জন্য বিধানসভা ভবনে যে চাবি লাগিয়ে গিয়েছিলাম জনতা আবার আমাকে অধিকার দিয়েছে সেই চাবি খোলবার।' যুক্তফ্রন্টের নেতা শ্রীঅজয় মুখোপাধ্যায় আর সহকারী নেতা শ্রীজ্যোতি বসু ঘোষণা করলেন যে, যুক্তফ্রন্ট পশ্চিমবাংলাকে সুখী ও সমৃদ্ধিশালী করে গড়ে তুলতে চেষ্টা করবেন সীমিত সুযোগের মধ্যে। সতর্ক করে দিলেন এই বলে যে বিজয়োৎসবই শেষ কথা নয়, সংগ্রাম সবে শুরু, সকল চক্রান্তের বিরুদ্ধে সংগ্রাম। অনিচ্ছুক কেন্দ্রের হাত থেকে আরও অধিকার আদায় করতে হবে, এইজন্য দরকার হলে সংবিধানও বদলাতে হবে। অপরাপর নেতারাও একবাক্যে সকলে কণ্ঠে কণ্ঠ মিলিয়ে বললেন, দেশের শিল্প গড়তে হবে, খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতা আনতে হবে। শ্রমিক ও কৃষিমজুরের অবস্থার উন্নতি করতে হবে। কৃষক-শ্রমিকের ন্যায্য দাবি মেনে নিলে শিল্পপতিদের কোন অসুবিধা হবে না। মধ্যবিত্ত ও মাঝারি ব্যবসায়ীরাও তাঁদের সংগ্রামের সাথী।

মুখ্যমন্ত্রী আরও বলেন, "এই জনসমুদ্র সাক্ষী রেখে বলতে চাই কোন বড় প্রতিশ্রুতি দেব না, কিন্তু যুক্তফ্রন্টের ৩২ দফা কর্মসূচী রূপায়ণে আন্তরিকতার অভাব হবে না। আজ বাংলাদেশকে দুটি গম ও মাইলোর জন্য সারা বিশ্বে হাত পেতে বেড়াতে হয়। এই অবস্থার পরিবর্তন করতে হবে। শ্রমিকদের উপযুক্ত সম্মান ও প্রাপ্য দিতে হবে। কৃষি ও শিল্পক্ষেত্রে শান্তিরক্ষার সর্বপ্রকার ব্যবস্থা করতে হবে। বেকারী দূর করতে হবে। সব সম্পদ ও উৎপাদনের যাতে সুসম বণ্টন হয়, সকলে সমানভাবে ভোগ করতে পারে তার ব্যবস্থা করতে হবে। বাংলাদেশকে আবার ভারতের মানচিত্রে সবার আগে স্থাপন করতে হবে। বড় কথায় নয় আন্তরিক প্রচেষ্টায় নিজের কর্তব্যে এগিয়ে যেতে হবে।"

উপমুখ্যমন্ত্রী শ্রীজ্যোতি বসু আরও বলেন: "শুধু নির্বাচন আর আইন করে অবস্থার পরিবর্তন করা যাবে না, করতে চাইলেও ওরা করতে দেবে না, তার জন্য কঠিন ও কঠোর সংগ্রাম করতে হবে। আমরা কারো সঙ্গে বিবাদ চাই না, আমরা কেন্দ্রের অনিচ্ছুক হাত থেকে রাজ্যের ন্যায্য প্রাপ্য

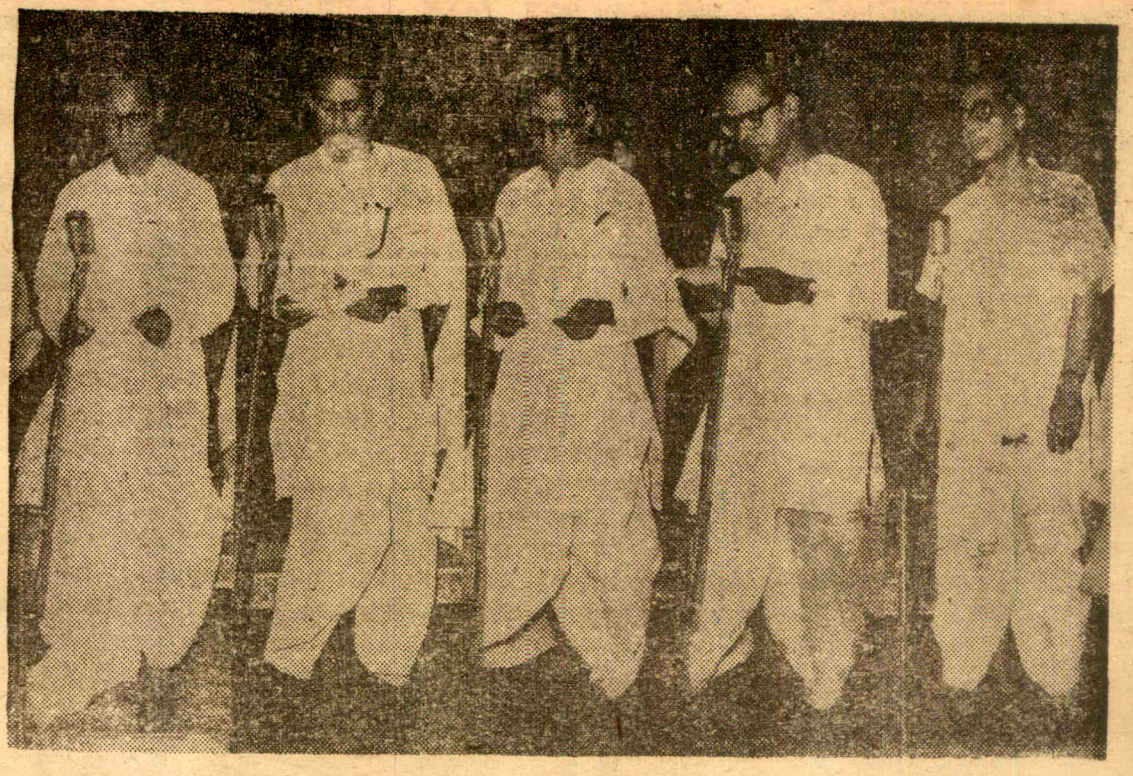

মন্ত্রগুপ্তির শপথ নিচ্ছেন (বাঁদিক থেকে) শ্রীসুবোধ বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীবরদা মুকুটমণি, শ্রীসুধীন কুমার, শ্রীজ্যোতি ভট্টাচার্য ও শ্রীবিশ্বনাথ মুখোপাধ্যায়।

পেতে চাই, কেন্দ্রীয় সরকার যদি বিরোধিতা ও তিক্ততার পথে যান তবে বাংলাদেশ চুপ করে থাকবে না। আইন করে রাজ্য সরকার সব দাবি পূরণ করতে পারে না, তার জন্য কেন্দ্রের কাছ থেকে দাবি আদায়ের প্রশ্ন আছে। সংঘবদ্ধ শক্তি আর সব ষড়যন্ত্র ব্যর্থ করতে না পারলে রাজ্যের স্বার্থ রক্ষা সম্ভব নয়। কর্মচারী ছাঁটাই বা কোন কারখানা বন্ধ হোক এ আমরা চাই না, যুক্তফ্রন্ট সরকার ১৯৬৭ সালে ন'মাস শাসন ক্ষমতায় না থাকলে আরও বেশি ছাঁটাই হত।...ধনী মালিকদের বুঝে নেওয়া উচিত কংগ্রেস আর নেই, এখন কংগ্রেসের উল্টো সরকার—তাঁদের সেটা বোঝা দরকার। মালিকেরা যদি ছাঁটাই না করে, জোতদারেরা যদি উচ্ছেদ না করে তবে আমাদের সঙ্গে কোন বিরোধ নেই। আমাদের পরিষ্কার কথা, আমরা গরীবের পক্ষ অবলম্বন করবো, ধনীদের নয় এই কথা সকলের জেনে রাখা ভাল।"

বিরাট মঞ্চ, যার পটভূমিতে কোন দলের প্রতীক নেই। সব প্রতীক মিলে একটি মাত্র প্রতীক, বিরাট অক্ষরে লিখিত যুক্তফ্রন্ট। এ উৎসব শুধু মহানগরীর একার নয়, দূর-দূরান্ত থেকে আসা অজস্র মানুষের উৎসব। পতাকায় পতাকায় আন্দোলিত ময়দান। রাত্রির অন্ধকার ময়দান গ্রাস করে ফেলার সঙ্গে সঙ্গে লক্ষ লক্ষ জনতার হাতের মশালগুলির প্রজ্বলন যেন রাত্রির অন্ধকারকে বিদ্রূপ করে নতুন সূর্যোদয়ের আভাস দিল। চিরস্মরণীয় হয়ে রইল ১৯৬৯ সালের ২৩শে ফেব্রুয়ারী।

মন্ত্রীদের শপথ গ্রহণ

ঠিক দু' বছর আগের দিনগুলি মনে পড়ে যাচ্ছিল। রাইটার্স বিল্ডিংস থেকে রাজভবন পর্যন্ত শুধু জনতা আর জনতা, সকলের মাথায় আবির, হাতে লাল পতাকা। মুখে লাল সেলাম। নেতারা একে একে ঢুকছেন। জনতাই প্রহরী। রাজভবন জনতারই অধিকৃত। নর্থ গেটের দেওয়ালে জনতা একটা ফলক এঁটে দিয়েছে, তাতে লেখা হয়েছে জনতা ভবন।

রাজভবনের চত্বরে মানুষ জমেছে কাতারে কাতারে। হাতে অসংখ্য লাল পতাকা। এরই মধ্যে ধ্বনি হচ্ছে ধরমবীর গদি ছোড়, আভি ছোড়, জলদি ছোড়। শপথবাক্য পাঠ করাতে করাতে রাজ্যপালের মুখের মৃদু হাস্যভঙ্গী অবলুপ্ত হয়েছে। জনতার শ্লোগান রাজভবনের থ্রোনরুমের ভিতরটা কাঁপিয়ে দিচ্ছে। শেষ পর্যন্ত উপমুখ্যমন্ত্রী শ্রীজ্যোতি বসুর অনুরোধে জনতা শান্ত হল, এবং পাঁচটার মধ্যেই শপথ গ্রহণ কার্য সম্পন্ন হল, সম্পূর্ণ অনাড়ম্বরভাবে।

পাঁচটা বাজার সঙ্গে সঙ্গে মন্ত্রীরা রাজভবন থেকে বেরিয়ে এলেন। জনতা পথ করে দিল এবং সেই ভিড় কেটে মন্ত্রীরা ধীরে ধীরে রাইটার্স বিল্ডিংসে প্রবেশ করলেন। লক্ষ লক্ষ মানুষের জয়ধ্বনি যুক্তফ্রন্ট জিন্দাবাদ! ডালহৌসী স্কোয়ারের বিশাল বিশাল অট্টালিকাগুলির ছাদে অলিন্দে মানুষ ঠাসা, রাস্তাগুলিতে তিলধারণের স্থান নেই। চারদিকে শুধু আলোর মালা আর রাত্রির আকাশকে কাঁপিয়ে বাজী পুড়ছে। ঊর্ধ্বাকাশে হাউইগুলি যেন যুক্তফ্রন্টের জয়ধ্বনি দিচ্ছে।

যুক্তফ্রন্টের মন্ত্রীরা রাইটার্স বিল্ডিংসে

রাণী ধূপ
কাকার প্রডাক্টস

সকলে মুখ্যমন্ত্রীর কক্ষে ঢুকলেন। করিডোরে জনসমুদ্রের জোয়ার। রাইটার্স বিল্ডিংসে মন্ত্রীদের প্রবেশের পর কয়েক মিনিটের মধ্যেই শ্রীজ্যোতি বসুকে বেরিয়ে আসতে হল বাইরে। জনতা নেতাদের না দেখে কিছু কথা না শুনে যাবে না। শ্রীজ্যোতি বসু মুখ্যমন্ত্রীর ঘরের সামনে একখানি চেয়ারে দাঁড়িয়ে সরকারী কর্মচারীদের শান্ত করেন। তাঁকে একবার রাইটার্স বিল্ডিংসের বারান্দায় গিয়েও পথে দাঁড়ানো জনতাকে অভিনন্দন জানাতে হয়। শ্রীজ্যোতি বসুর পরে শ্রীঅজয় মুখোপাধ্যায়কেও একবার বারান্দায় গিয়ে জনতার সামনে দাঁড়াতে হয়।

বস্তুত, যদি বলা যায় যে, সাম্প্রতিক জগতের ইতিহাসে জনগণ কর্তৃক মন্ত্রীদের অভিষেকের এ রকম দৃশ্য আর কোথাও দেখা যায় নি, তাহলে মোটেই অত্যুক্তি হবে না।

মন্ত্রিসভার প্রথম বৈঠক

নতুন যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রিসভা তার প্রথম বৈঠকে কয়েকটি ঐতিহাসিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন। রাজ্যের বিভিন্ন জেলে আটক সকল কয়েদীর এক মাসের কারাদণ্ড মকুব, ইতিমধ্যে যারা ১৪ বছরকাল জেল খাটছে তাদের মুক্তিদান, দুই মাসের জন্য পৌরসভার নির্বাচন মুলতুবী, গত বছরের ১৯শে সেপ্টেম্বর এবং ১৬ই মে'র কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারী কর্মচারীদের প্রতীক ধর্মঘটের দিন বিভিন্ন ঘটনাকে কেন্দ্র করে যে-সমস্ত সরকারী কর্মচারীর বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করা হয়েছিল তা প্রত্যাহার, পি ডি অ্যাক্টে আটক নকশালপন্থী নেতা ও কর্মীদের সকলকে অবিলম্বে মুক্তিদান প্রভৃতি সিদ্ধান্ত উল্লেখযোগ্য।

গদিতে বসার অনেক আগে থেকেই যুক্তফ্রন্ট প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন যে, ট্রামের ভাড়া হ্রাসের ব্যাপারটি তাঁরা ক্ষমতায় এলে পর্যালোচনা করে দেখবেন। জনগণের কাছে আগাম প্রতিশ্রুতির কথা মনে রেখে যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রিসভা বুধবার প্রথম দিনের বৈঠকেই মোটামুটি স্থির করেছেন, ভাড়া কমানো হবে। কতটা কমবে তা নিয়ে শীঘ্রই সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে।

সেচমন্ত্রী শ্রীবিশ্বনাথ মুখোপাধ্যায় জলপাইগুড়ির বন্যাপরিস্থিতির পর্যালোচনা করে ভবিষ্যৎ সতর্কতামূলক কয়েকটি ব্যবস্থা যাতে অবিলম্বে প্রযুক্ত হয় তার চেষ্টা করছেন। অনুরূপভাবে ভূমিরাজস্বমন্ত্রী শ্রীহরেকৃষ্ণ কোঙার বিশেষভাবে ইতিমধ্যেই নির্দেশ দিয়েছেন যে, গত বছরের বন্যাক্লিষ্ট ও অন্যান্য প্রাকৃতিক কারণে দুর্গত অঞ্চলগুলিতে যাতে ভূমিরাজস্ব মকুব করা হয়।

বস্তুত প্রথম দিনের বৈঠকেই অনেকগুলি গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে এবং এই সিদ্ধান্তগুলি জনসাধারণের আশা-আকাঙ্ক্ষার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ।

যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রিসভার প্রথম বৈঠক

তথ্য ও জনসংযোগমন্ত্রী শ্রীজ্যোতি ভট্টাচার্য তাঁর দপ্তরের দায়িত্ব গ্রহণ করবার পরই কয়েকটি বিভাগীয় ফাইল তলব করে পাঠিয়েছেন বলে জানা গেছে। এই ফাইলগুলি থেকে কিছু দুর্নীতিমূলক ও জনবিরোধী কাজকর্মের তথ্য পাওয়া যেতে পারে বলে সন্দেহ করা হচ্ছে। শ্রীভট্টাচার্য তাঁর দপ্তরকে ঢেলে সাজানোর কথা ভাবছেন। তিনি চান যে তাঁর দপ্তর এখন থেকে আসল জনতার কাছে সরকারের বক্তব্য পৌঁছে দিক। প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যেতে পারে যে গতবারে যুক্তফ্রন্ট সরকারের প্রচারের ক্ষেত্রটি খুবই সীমাবদ্ধ ছিল। বৃহৎ সংবাদপত্রগুলি তখন এ বিষয়ে কোন সাহায্যই করে নি, বেতার কর্তৃপক্ষের সঙ্গেও যুক্তফ্রন্টের কোন সম্পর্ক ছিল না।

কেন্দ্রের নিকট দাবি

যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রিসভার তরফ থেকে কেন্দ্রের কাছে দশ কোটি টাকার দাবি জানানো হয়েছে। এটাই মোট দাবি নয়। বিভিন্ন খাতে ভারত সরকারের কাছে যে অর্থ পাওনা রয়েছে, এই দশ কোটি টাকা তার অংশ মাত্র। আগামী ৬ই মার্চ মুখ্যমন্ত্রী ও উপমুখ্যমন্ত্রী দিল্লী যাচ্ছেন এই উদ্দেশ্যে। পঞ্চম অর্থ কমিশনের অন্তর্বর্তীকালীন রিপোর্টে এই রাজ্যের প্রতি অবিচার করা হয়েছে বলে সরকারী মহলে দারুণ ক্ষোভের সৃষ্টি করেছে। কেন্দ্রের কাছ থেকে বেশি টাকা চাইবার কারণগুলি রচনা করার জন্য মুখ্যমন্ত্রী রাজ্য সরকারের অর্থদপ্তরকে নির্দেশ দিয়েছেন। অর্থদপ্তর ভিন্ন ভিন্নভাবে কয়েকটা রিপোর্ট তৈরি করেছেন। নির্ভরযোগ্য সূত্রে জানা গেছে, অবিলম্বে যে টাকার দাবি জানানো হচ্ছে তার পরিমাণ দশ কোটি টাকার মত হবে। গত বছরের শেষ দিকে উত্তরবঙ্গে যে ভয়ঙ্কর প্লাবন হয়েছে সেখানকার লোকেদের জন্য কেন্দ্রীয় সরকার যে অর্থ মঞ্জুর করে তা ঋণ হিসাবে দেওয়া হয়েছে। রাজ্য সরকারের এ ব্যাপারে ঘোরতর আপত্তি আছে। কারণ তাঁরা দুর্দশাগ্রস্ত মানুষদের জন্য ঋণ হিসাবে এই টাকা মঞ্জুর করছেন না। রাস্তাঘাট মেরামত, গৃহনির্মাণ ইত্যাদির জন্য এই টাকা ব্যয় করা হচ্ছে। অতএব কেন্দ্রীয় সরকারকে ওই টাকা সাহায্য হিসাবেই দিতে হবে, ঋণ হিসাবে নয়। অর্থদপ্তরের ধারণা পরিকল্পনা কমিশন ও অর্থ কমিশন উভয়েই প্রাপ্য দেওয়ার ব্যাপারে পশ্চিমবঙ্গের প্রতি অবিচার করেছেন। আগামী পাঁচ বছর উন্নয়ন খাত বাদ দিয়ে অন্যান্য খাতে কি খরচ হতে পারে অর্থদপ্তর তার হিসাব সম্বলিত এক রিপোর্টও তৈরি করে ফেলেছেন। সেই রিপোর্ট মুখ্যমন্ত্রী ও উপমুখ্যমন্ত্রী দিল্লী নিয়ে যাচ্ছেন। রাজ্য সরকারের বেতন কমিশনের আসন্ন সুপারিশ ও সরকারী মাগ্‌গীভাতা পুনরায় বৃদ্ধি পেলে রাজ্য সরকারের বছরের খরচা কি পরিমাণে বৃদ্ধি পাবে তাও ওই রিপোর্টে বলা হয়েছে। তা ছাড়া কলকাতার উন্নয়নের জন্য কেন্দ্রীয় সরকার যে সাহায্যের প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন সে বিষয়ে প্রধানমন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করা হবে। পাট, চা ও আখের ওপর কেন্দ্রীয় সরকারের যে কর বসানো আছে তা তুলে নিয়ে রাজ্য সরকারকে কেন এই কর বসাবার অনুমতি দেওয়া হবে না, পশ্চিমবঙ্গের নেতারা কেন্দ্রের কাছ থেকে তার কৈফিয়ৎ দাবি করবেন।

খাদ্যভাণ্ডার গঠনের সিদ্ধান্ত

খাদ্য ঘাটতির মাসগুলির জন্য রাজ্যে একটি মজুত খাদ্যভাণ্ডার গড়ে তোলা হবে। খাদ্যমন্ত্রী শ্রীসুধীন কুমার এ ব্যাপারে খাদ্যদপ্তরের অফিসারদের সঙ্গে আলোচনা করেছেন এবং রাজ্যের আভ্যন্তরীণ সংগ্রহ অভিযান যাতে আরও ব্যাপক ও বেশি হয় তার জন্য কড়া প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা অবলম্বন করতে বিভাগীয় কর্তৃপক্ষকে নির্দেশ দিয়েছেন। পশ্চিমবঙ্গের জন্য আরও খাদ্য সাহায্যের দাবি নিয়ে তিনি ৬ই মার্চ মুখ্যমন্ত্রী ও উপমুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে দিল্লী যাচ্ছেন। সেখানে তাঁরা চাল ও গমের পরিমাণ বাড়ানোর জন্য কেন্দ্রের কাছে দাবি জানাবেন। বর্তমানে কেন্দ্র পশ্চিমবঙ্গে বেশি দামের যে আমদানী করা গম পাঠাচ্ছে তার পরিবর্তে সস্তা দরের দেশী গম যাতে বেশি পরিমাণে সরবরাহ করা হয় সেজন্য কেন্দ্রকে অনুরোধ করবেন। রাজ্যের আভ্যন্তরীণ সংগ্রহ জোরদার করার জন্য তিনি আবেদন জানিয়েছেন। রাজ্যের খাদ্য ও কৃষিদপ্তরকে এ বছর খাদ্য উৎপাদনের সঠিক তথ্য সহ পরিসংখ্যান প্রস্তুত করতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। এই তথ্যের ওপর নির্ভর করে যুক্তফ্রন্ট সরকারের খাদ্য সংগ্রহের লক্ষ্য ধরা হবে বলে খাদ্যমন্ত্রী জানিয়েছেন।

—(২৮।২।৬৯)

সাপ্তাহিক বসুমতীর মালিকানা ও অন্যান্য তথ্য

১। প্রকাশের স্থান—কলিকাতা।

২। প্রকাশের কাল—সাপ্তাহিক।

৩। মুদ্রকের নাম — সুকুমার গৃহমজুমদার, জাতি — ভারতীয় ঠিকানা — ১৬৬, বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী স্ট্রীট, কলিকাতা—১২।

৪। প্রকাশকের নাম — সুকুমার গৃহমজুমদার, জাতি — ভারতীয়, ঠিকানা — ১৬৬, বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী স্ট্রীট, কলিকাতা—১২।

৫। সম্পাদিকার নাম : জয়ন্তী সেন, জাতি — ভারতীয়, ঠিকানা—১৬৬, বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী স্ট্রীট, কলিকাতা—১২।

৬। মালিক—ঃ দি বসুমতী প্রাইভেট লিমিটেড।

৭। শতকরা ১ ভাগের অধিক মূলধনের মালিক—

(১) শ্রীকৃষ্ণকিশোর কর, ১১ বি, রমেশ মিত্র রোড, কলিকাতা—২৫।

(২) শ্রীমুরারিমোহন দত্ত, ১১/বি, নিবেদিতা লেন, কলিকাতা—৩।

(৩) শ্রীহৃষীকেশ ঘোষ, ৬১/৬/এ, মুরে এভেনিউ, কলিকাতা।

(৪) শ্রীমতী লতিকা সান্যাল, ৯৬/১/এ, ল্যান্সডাউন রোড, কলিকাতা।

(৫) শ্রীপ্রাণতোষ ঘটক, ১১১, বৈঠকখানা রোড, কলিকাতা।

(৬) শ্রীশম্ভুনাথ মুখার্জী, শ্রীশশাঙ্কশেখর মুখার্জী, শ্রী কে ভট্টাচার্য, ৫/এ, সুরী লেন, কলিকাতা—১৪।

(৭) শ্রী এস জি মজুমদার, শ্রী এস রায়, ৪৫/এ, কড়েয়া রোড, কলিকাতা—১৭।

(৮) শ্রীপঙ্কজ চোংদার, গুস্কড়া, বর্ধমান।

(৯) শ্রীধীরেন্দ্রনাথ দাস, ও শ্রীদেব চ্যাটার্জী, ৫, শাঁখারীটোলা স্ট্রীট, কলিকাতা।

(১০) শ্রীআদিত্যনারায়ণ রায় ও শ্রীপ্রবোধ চ্যাটার্জী, ৭৯, আপার চিৎপুর রোড, কলিকাতা।

(১১) শ্রীবিশ্বনাথ দত্ত ও শ্রীপ্রভাতকুমার মুখার্জী, ১৩৬, বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী স্ট্রীট, কলিকাতা।

(১২) কুমারী কৃষ্ণা সেন, ৯, রাইসিনা রোড, নিউ দিল্লী।

(১৩) কুমারী শ্যামলী সেন, ৯, রাইসিনা রোড, নিউ দিল্লী।

(১৪) শ্রীঅনিন্দ্য সেন, ৯, রাইসিনা রোড, নিউ দিল্লী।

(১৫) শ্রী এস এন বোস, ৬৩/এ, চক্রবেড়িয়া রোড নর্থ, কলিকাতা।

আমি শ্রীসুকুমার গৃহমজুমদার এতদ্দ্বারা ঘোষণা করিতেছি যে, উপরে প্রদত্ত তথ্য আমার জ্ঞান ও বিশ্বাসমত সত্য।

১লা মার্চ, ১৯৬৯ প্রকাশকের স্বাক্ষর
সুকুমার গৃহমজুমদার

ভারত দর্শন

কেন্দ্র-রাজ্য সম্পর্ক

মনে পড়ছে গত সাধারণ নির্বাচনের পর, যখন রাজ্যে রাজ্যে অকংগ্রেসী সরকার ক্ষমতা গ্রহণ করেন, তখন একবার বদান্য কেন্দ্রীয় ক্ষমতা শুভেচ্ছা প্রকাশ করে বলেছিলেন যে, সরকারের বর্ণ যেমনই হোক কেন্দ্র সর্বতোভাবে সাহায্যের বাহু প্রসারিত করে ধরবে। আমি স্মরণে আনতে চাই না সেই তিক্ততার দিনগুলি, কিন্তু সাধারণ মানুষ ভুলতে পারেন নি যে, কেন্দ্রীয় সহযোগিতা দূরের কথা, কেন্দ্রীয় আক্রোশের শিকারে পরিণত হয়েছিলেন একাধিক অকংগ্রেসী রাজ্য সরকার, বিশেষত পশ্চিমবঙ্গ। এবারেও যৎকালে প্রধানমন্ত্রী সেই একই সহযোগিতার সুরে কথা বলছেন, ঠিক তখনই পশ্চিমবঙ্গের একটি বিশেষ দাবি সম্পর্কে তাঁর আশ্চর্য নীরবতা এ-রাজ্যের জনগণকে দুশ্চিন্তাগ্রস্ত করে তুলেছে। পশ্চিমবঙ্গের জনসাধারণ যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রিসভাকে যথাযথ ক্ষমতায় ফিরিয়ে দিয়ে এবং সেই সঙ্গে দলত্যাগীদের এবং কংগ্রেসকে চূড়ান্তভাবে পরাস্ত করে সোজা রায় দিয়েছেন যে, রাজ্যের সাধারণ মানুষ রাজ্যপালের দ্বারা ফ্রন্ট সরকারের উচ্ছেদকে একেবারেই বরদাস্ত করতে নারাজ। ফ্রন্ট সরকারকে উচ্ছেদ করে ডঃ পি সি ঘোষ মহাশয় তাঁর পি ডি এফ মন্ত্রিসভা কায়েম করে সাধারণকে পিটিয়ে চুপ করাতে চেয়েছিলেন। শোচনীয়ভাবে তারই প্রত্যুত্তরে আজ তাঁকে পুনরায় রাজনীতি থেকে বিদায় নিতে হল।

বর্তমান রাজ্যপাল ধরমবীর সাধারণের যে বিরাগ অর্জন করেছেন, তাতে নির্বাচনী ফলাফল প্রকাশের পর তাঁর পক্ষে এই রাজ্যে গদি চেপে বসে থাকা মোটেও ভালো দেখায় না। তাঁকে ফিরিয়ে নেওয়ার দাবি যে শুধু ফ্রন্ট-মন্ত্রিসভার এমন কথা ভাবাই ভুল। ধরমবীরকে রাজ্য ছাড়ার নির্দেশ দিয়েছেন রাজ্যের ৫১·০৯ শতাংশ নাগরিক। তত্রাচ তাঁকে ফিরিয়ে নেওয়া হবে কিনা এই সাফা প্রশ্নের সোজা উত্তর প্রধানমন্ত্রী প্রদান করতে সক্ষম হন নি। কেন্দ্রের এমত বিচিত্র মনোভাবের পর পশ্চিমবঙ্গের সংখ্যাগুরু নাগরিকগণ এমন ভরসা রাখতে পারেন না যে, কেন্দ্রীয় শুভেচ্ছা এই রাজ্যের প্রতি বস্তুতই বর্ষিত হবে। কেন্দ্র-রাজ্যে সুস্থ সম্পর্ক স্থাপনার আগেই কেন্দ্রীয় নীরবতায় এই সম্পর্কে চিড় খাচ্ছে। এখনও সেই কংগ্রেসী প্রেস্টিজ অদ্ভূতভাবে ক্রিয়াশীল। বলা বাহুল্য এই প্রেস্টিজ-প্রাধান্যও একদিক দিয়ে কংগ্রেসকে গত কুড়ি বছর ধরে জন-অপ্রিয় করে তুলেছে। ঐ প্রেস্টিজের টনটনে জ্ঞানের জন্যই বহু ক্ষেত্রে অকারণে কংগ্রেস গণ-বিরোধী পলিসি গ্রহণ করেছেন এবং শুরুতে যা সমস্যাই ছিল না, ফলে কাঁধিয়ে বহু ক্ষেত্রে তাকেই জটিল সমস্যায় পরিণত করেছেন কংগ্রেসী কর্তারা। ধরমবীরকে ফিরিয়ে দেওয়া যে একটি জনপ্রিয় দাবি একথা কেন্দ্রীয় কংগ্রেস বুঝতে যদি এবার ভুল করেন, তবে সে ভুলের মূল্য আসন্ন পৌর নির্বাচনেও গুণে দিতে হতে পারে। যাঁকে ফিরিয়ে না নিলে পদে পদে সঙ্ঘর্ষ সুনিশ্চিত, তাঁকে ফিরিয়ে দেওয়াই শ্রেয় এবং সেই বাবদে অবিলম্বে ঘোষণার প্রয়োজন।

কেন্দ্র-রাজ্য সম্পর্ক তিক্ত না করে তাকে সম্ভাব্য সৌহার্দ্যের পর্যায়ে উন্নীত করার কেন্দ্রে ক্ষমতাসীন দলের আখেরে লাভ বই লোকসান আছে বলে তো মনে হয় না। তবে কেন্দ্রে চ্যবন সাহেবদের মতো গুটিকয় শঙ্ক মানুষ যদ্দিন থাকবেন, ততদিন সামনে-খোলা সহজ পথগুলি কি আর চোখে পড়বে।

নন্দসাহেবের আত্মপ্রচার

পশ্চিমবঙ্গে কংগ্রেসের বিপুল পরাভবে যখন কংগ্রেসীরা গভীর চিন্তা ও মনস্তাপে মাথা পরিয়ে বসেছেন, তখন প্রাক্তন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী গুলজারিলাল নন্দা মহাশয় মিটিং ডেকে বলেছেন, তাঁর কথা কানে না তোলার দরুণই কংগ্রেসের এমন বিপর্যয় দেখা দিল। পশ্চিমবঙ্গ কংগ্রেসকে যদি নন্দসাহেবের মানোমত রূপ দেওয়া হত, নন্দজীর বিশ্বাস, তাহলে এমনটি হত না। আত্মপ্রচারের পক্ষে কথাগুলি লাগসই সন্দেহ নেই। কেন না নন্দসাহেবের দাওয়াই বাস্তবে পরীক্ষিত হয় নি। হলে কী হত তা আর চ্যালেঞ্জ করবেন কে এখন। কিন্তু একটা কথা এই যে, টানা একুশ বছর কংগ্রেসী শাসনের রোগগুলি যে কোনো জনৈকের দাওয়াইয়ে নিরাময় হওয়ার ব্যাপার নয়, ভারতের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীরাই বোধ করি সে কথা বুঝতে অক্ষম। না হলে গণতন্ত্রে গণ-ঈশকে নিষ্পিষ্ট করার ব্যাপারে কংগ্রেসী রথ-চালনার সারথ্য যে দুই স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর ওপর ছিল তাঁরা যেভাবে ম্যারাথন রেস শুরু করে দিয়েছিলেন তাতে এতকাল যে জনগণেশ নড়েন নি সেটাই তো আশ্চর্য। আশ্চর্য এই যে, এখনও অন্যান্য রাজ্যে কংগ্রেসী রথের অভিযান অব্যাহত আছে। নন্দসাহেবের 'ভারত রক্ষা'য় (বিধিবলে) ভারতের কোন সম্পদ রক্ষিত হয়েছিল কিনা জানি না। তবে কংগ্রেসকে তা যে রক্ষা করতে অক্ষম হয়েছে, চতুর্থ নির্বাচন তার সাক্ষী। চ্যবন সাহেবের অতি সম্প্রতি সরকারী কর্মচারীদের ওপর স্টীম-রোলার চালনার মজা ভোটের বাক্সে মজাদার অর্থাৎ চমকপ্রদ ফলোৎপাদনে সাহায্য করেছে। দুই স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীই কংগ্রেসের অ-গণতান্ত্রিক মুখের মুখোস একেবারে বেবাক উন্মোচিত করে আসল মুখটি প্রদর্শনে সাহায্য করেছেন, এরপর কোন এ্যাড হক স্থাপনের দ্বারা কাজ হত, এও কী একটা হক কথা?

বড় দুশ্চিন্তা চারিদিকে

হায়, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীদের এবং সমগভাবে কংগ্রেসের আপ্রাণ প্রয়াস সত্ত্বেও কংগ্রেসের অভিপ্রেত ফল ভোট বাক্সে ফলছে না। বড়ই দুশ্চিন্তা তাই চতুর্দিকে। এই দুশ্চিন্তার বোঝায় কয়েকজন এতটা বিনিদ্র রাত্রি যাপনে বাধ্য হয়েছেন যে, তাঁরা আর কালবিলম্বে রাজী নন। এঁরা সংসদে সেই দুশ্চিন্তা ঝেড়ে ফেলারও চেষ্টা করেছেন। এঁদের মধ্যে অন্যতম হলেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভায় টিকতে না-পারা প্রাক্তন মন্ত্রী

শ্রীচাগলা। এঁদের বক্তব্য, কেন্দ্রের রাজনীতির গতি-প্রকৃতি সুবিধের নয়, বেলা থাকতে থাকতে দেশে রাষ্ট্রপতির শাসন চালু করে দেওয়াই বাঞ্ছনীয়। বটেই তো, এর পর কেউ যদি এমন প্রস্তাবও রাখেন যে, ভারতে আর একটি আয়ুবশাহী চালু হোক, তা হলেই সাধারণে খুব বেশি বিস্মিত হবেন কি।

এতকাল এমন চিন্তার কারণ ঘটে নি। কারণ রাজ্যে রাজ্যে কংগ্রেসী সাম্রাজ্য বিস্তৃত ছিল। আজ চেহারা পাল্টাচ্ছে, এখন কেন্দ্রে ক্ষমতা কুক্ষিগত করার প্রশ্ন কাজেই কাজেই দেখা দিয়েছে। এই সুরে সুর দিয়ে তাৎক্ষণিক নিবন্ধ ফেঁদে দেশ-ওয়ালী পত্রপত্রিকাও বিভ্রান্তির হাওয়া বহাবার কসুর করছেন না, ব্যাপারটি লক্ষণীয়।

দেশের সামগ্রিক পরিস্থিতিকে টেনে এনে এঁরা অনুক্তভাবে বলতে চাইছেন, সব সমস্যার ইতি হয়ে যাবে যদি ক্ষমতার কেন্দ্রীকরণ হয় এবং রাষ্ট্রপতির হাতে সেই ক্ষমতা দেওয়া যায়। সম্প্রতি কেরলে এবং বর্তমানে পশ্চিমবঙ্গ থেকে রাজ্যের হাতে অধিকতর ক্ষমতার দাবি উঠেছে। ঐ সব পত্রিকাগোষ্ঠী এই স্টেট অটোনমিকে প্রভিন্সিয়াল অটোনমি রূপে ব্যাখ্যা করে বলতে চাইছেন, এই স্বাতন্ত্র্যের দাবির ফলে যতরকম বিভেদচিন্তা মাথা চাড়া দিয়ে উঠবে। এই প্রসঙ্গে আশ্চর্যভাবে তাঁরা শিবসেনা তাণ্ডবকেও তেঁতেজলে মিশ খাওয়ানোর মতো মিশিয়ে ফেলতে চেয়েছেন। এঁদের অন্তরে ভয়টা কোথায় তা সহজবোধ্য। দুর্বোধ্য শুধু এই যে, রাজ্যের প্রাপ্য চাওয়ার সঙ্গে এঁরা শিবসেনা তাণ্ডবকে কীভাবে একই পর্যায়ে ব্যাখ্যা করার ও তার দ্বারা বিভ্রান্তি সৃষ্টি করার অপচেষ্টা করেন। রাজ্যের প্রাপ্য দাবিকে আঞ্চলিকতা বলে অপব্যাখ্যা করে কোনো কোনো রাজ্যের প্রতি অদ্যাবধি-কাল উত্তরভারী কেন্দ্রীয় শাসকবর্গ যে অন্যায় ও অবিচার চালিয়ে আসছেন বঞ্চিত রাজ্যের কোনও পত্রিকাগোষ্ঠী কীভাবে তাকেই প্রকারান্তরে সমর্থন জানাতে পারেন তা বোধেরও অগম্য। অবশ্য কোন রাজ্যে অমনঃপূত সরকার প্রতিষ্ঠিত হওয়ার জন্যই যদি এঁরা ওকালতির কালো চাপকান এখন চাপিয়ে নিতে চান, তবে বলতে হবে, নিজের ভাল নিজে কর্তনের জন্য পরে এঁদের দুঃখ করতে হবে। এঁরা এখন বেকায়দায় পড়ে ফেডারেল ভারতের স্বপ্নদ্রষ্টা সংবিধান-সন্তানদের দোষারোপ পর্যন্ত করতে বেসরম বেকসবে। কিন্তু জিজ্ঞাস্য এই, এতকাল এ দুশ্চিন্তা ছিল কোথায়। ছিল না, রাজ্যে রাজ্যে এঁদের মনঃপূত সরকার প্রতিষ্ঠিত বলেই কি।

ভারতের পক্ষে রাষ্ট্রপতির শাসন নয়, আরও ফেডারেলধর্মী শাসনই কাম্য। এদেশে নানা ভাষা ও বিভিন্ন আচার-আচরণ তার সঠিক স্বাতন্ত্র্য এইভাবেই বজায় রাখতে সক্ষম হবে। বিভিন্ন রাজ্যের স্বাতন্ত্র্য যেখানে কেন্দ্রের হাতে ক্ষমতা কুক্ষিগত করতে উৎসুক নয়, সেখানে যত-না জাতীয় ঐক্য নষ্ট হয়েছে এবং ভেদবুদ্ধি মাথাচাড়া দিয়েছে, অত্যল্পকাল মধ্যে তার চেয়ে ঢের বেশি হয়েছে ভারতে। তাছাড়া যে দেশের মানুষ ক্ষমতা হাতে পেলেই নবাবজাদা বনবার বাসনায় উন্মাদ হয়ে ওঠেন সে দেশে কেন্দ্রীভূত ক্ষমতার মালিক প্রতিষ্ঠা করে জনগণ অধিকতর নির্যাতনের দাসত্বই মাত্র বরণ করতে পারেন। এই কারণেই ভারতবাসী যতই দিন যাচ্ছে অনেক বেশি সচেতনভাবে গণতন্ত্রপ্রেমী হয়ে উঠছেন। এ পর্যন্ত যে লক্ষণ স্পষ্ট, তাতে দেখা যাচ্ছে যে, সাধারণ মানুষ যদি জাতীয় জীবনে কোনরূপ বিপ্লব চান তবে তা-ও ব্যালট বাক্সের মাধ্যমেই আনয়ন করতে উৎসুক। কোন ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর হাতে নিরঙ্কুশ ক্ষমতা তুলে দিতে তাঁরা নারাজ। দেশের মানুষের মেজাজ তাঁরা জানেন, 'লঙ্কা' ও 'রাবণের' প্রবাদ তাঁরা হাড়ে হাড়ে টের পান। নির্বাচনের সবটাই ভেল্কি আজ আর এমন কথা পূর্ণ গুরুত্ব দিয়ে বলা যাচ্ছে না। উল্টো যুক্তিও এসে পড়ছে। নির্বাচন বহাল থাকা চাই, এর মাধ্যমেই প্রেসকে বরণ করা সম্ভব হবে। সাধারণ স্বেচ্ছায় এই অধিকারটি পরের হাতে তুলে দেবেন না।

প্রেসিডেন্সিয়াল প্রথায় দেশের ঐক্য বজায় থাকবে, যদি একথাও তর্কের খাতিরে এই মুহূর্তের জন্য মানি, তবু বলতে হবে, সেই প্রেসিডেন্টকেও সাধারণ নির্বাচনের মুখোমুখি হতে হবে এবং তিনি হবেন একটি পার্টি। যাঁরা আজ ভাবছেন প্রেসিডেন্ট বজায় থাকলেই বুঝি বিশেষ এক শ্রেণীর হাতের সরকার টিকে যাবে, বলা বাহুল্য তাঁরা মর্ত্যের স্বর্গের বাসিন্দা। যেখানে প্রেসিডেন্সিয়াল প্রথা বজায় আছে সেখানেও মুহুর্মুহু এক দল থেকে অন্য দলে ক্ষমতা বদলা-বদলি হয়। এখানেও তাই-ই হবে। একশত পরিবার আবহমান-কাল ভারত শাসন ও শোষণ করবেন এমন আহ্লাদে কেউ যেন জবজবে হয়ে না থাকেন।

চাগলা সাহেব এবং তাঁর চিন্তায় চিন্তিত ব্যক্তি ও গোষ্ঠী উত্তর ভারতের দিকে তাকিয়ে যদি আরও কিছুকাল ক্ষমতা ধরে রাখার স্বপ্নে মশগুল থাকেন, তবে একুশ বছর আগে যে বিশ্বাসে কংগ্রেস গা ঢেলে দিয়েছিল আজও এঁরা সেই একই ভুল করবেন। ইতিহাস আপনি আপনাকে রচনা করবে এর মধ্যে কারও দিবাস্বপ্নের প্রশ্রয় নেই। এবং যা স্বাভাবিক নিয়মে চলছে তারই সঙ্গে তাল ঠুকে চলার চেষ্টাই শ্রেয়। নদী তার আপন গড়ানে গড়াবে। উল্টোমুখে তাকে ফিরিয়ে দিতে যাওয়া বৃথা। তাতে অন্য কূল ভেঙে পড়বে। কোনো বিশেষ শ্রেণী ও গোষ্ঠীর সুবিধার্থে জাতির অগ্রগতি স্থির হয়ে থাকতে পারে না। সে তার প্রকাশের পথ ধরবে, শ্রেণী ও গোষ্ঠীকে সেই পথানুসরণের জন্য তৈরি হতে হবে। এই সহজ সত্যটি হজম হলে, বদ-হজমের ঢেকুর ও হিক্কাগুলি উপযুক্ত দাওয়াই লাভ করে শান্ত হয়ে সুস্থ ও সুস্থির হতে পারবে, অন্যথা পিছিয়ে-পড়া শ্রেণী ও স্বার্থ মৎ-পাত্রের মতো নিজের স্থান করে নেবে আঁস্তাকুড়ে।

বিহারে বি কে ডি

গোল বাধিয়েছে বি কে ডি। ছয়টি সদস্য নিয়ে পাল্লার ভারসাম্য রক্ষার মারজিনাল সুযোগটা এঁদের হাতে। সর্দার হরিহর সিং-এর কংগ্রেসী কোয়ালিশন মন্ত্রিসভায় সমর্থন জানিয়ে অতঃপর সমর্থন প্রত্যাহার করে অপর রাজ্যের রাজনৈতিক পরিস্থিতিকে ওঁরা জটিল করে তুললেন। কান্ডারীরূপে এখন এগিয়ে আসছে স্বতন্ত্র পার্টি। কুল্যে এঁদের তিনটি আসন। হরিহর সিং-এর মন্ত্রিসভায় তাঁর সমর্থক-বৃন্দের সংখ্যা দাঁড়িয়েছিল একশ' বাষট্টি। অতঃ কিম্!

কংগ্রেসের বিপক্ষে ত্রিদলীয় পি এস পি, এল সি ডি এবং এস এস পি যদি আর একটু খোলা মন নিয়ে অন্যান্য দলের সঙ্গে যুক্তফ্রন্ট গঠন করে লড়তেন, তবে বিহার আজকে রাজনৈতিক অনিশ্চিতির আবর্তে তলিয়ে যেত না। কিন্তু পি এস পি যেমন এস এস পি-ও তেমনি হাড়ে-হাড়ে কম্যুনিস্ট-বিদ্বেষী। এস এস পি '৬৭ সালে একলাফেই ৬৮টি আসন দখল করে ভেবেছিল একাই লাঠি ঘোরাবে। লাঠি ঘুরেছিল ত্রিদলীয় ফ্রন্টে, কিন্তু দশ-দশটি আসন খুইয়ে এস এস পি-র বড়-মুখ ম্লান হয়ে গেছে। তবুও ত্রিদলীয় [illegible] নেতা শ্রীভোলা পাশওয়ান শাস্ত্রী সি পি আই ও সি পি এম-এর সমর্থন পাচ্ছেন মন্ত্রিসভা গঠন করতে পারলে। কিন্তু রাজ্যপাল তাঁকে ডাকেন নি। ডেকেছিলেন হরিহর সিং-কেই।

বিহারের টলমলে মন্ত্রিসভা কোন তরফেই স্থায়িত্বের আশ্বাস রাখতে পারছে না। বিভ্রান্ত গণ-রায়কে ভুলের মাশুল কড়ায়-গন্ডায় বুঝে নিতে হবে। বিশ্বেষ এবং ভয়কে দোসর করলে এমনিই দোলা-চল অনিশ্চিতিই হয়ে দাঁড়ায় ললাটলিপি।

সর্দার হরিহর সিং যে তাঁর কংগ্রেসী কোয়ালিশনে স্বতন্ত্র দলের সমর্থন পাচ্ছেন এতে সাধারণের সপ্রশ্ন হওয়ার কারণ আছে। কেন না একই স্বতন্ত্র দল কেন্দ্রে কংগ্রেস-বিরোধী। বি কে ডি-রও একই অবস্থা। এক রাজ্যে (উত্তর প্রদেশে) কংগ্রেসের বিপক্ষীয় দল, অন্য রাজ্যে অর্থাৎ বিহারে কংগ্রেসী মন্ত্রিসভা দলের সমর্থক বা সদস্য, এমন স্ববিরোধিতায় শেষ পর্যন্ত টিকে থাকার অসুবিধা গণনা করেই বিহারে বি কে ডি-কে মানে মানে সরে আসতে হয়েছে। কিন্তু স্বতন্ত্রের চরিত্রে এই স্ববিরোধিতায়ও কিছুই এসে যায় না। কারণ প্রতিক্রিয়াশীল এই দল কম্যুনিস্ট প্রভাব খর্ব করার জন্য একঘাটে মাথা মুড়িয়ে অন্যঘাটে পরচুলা পরিধান করতে পারে। এই পার্টির সদস্যরা হোমরা-চোমরা ব্যক্তি। এবং হোমরা-চোমরাদের স্বার্থচেতনা লাজ-লজ্জার বালাই বড় একটা রাখেই না; তাঁদের একটিই মাত্র নীতি, অপরের চেয়ে বেশি সুখে থাকার নীতি; একটিই মাত্র জীবনদর্শন, সারভাইভাল অব দি ফিটেস্ট, জবরদস্তি টিকে থাকা। এ-ব্যাপারে এঁরা এতই অন্ধ যে পাল্টা জবরদস্তির চেহারাটা ভুলে থাকতেই ভালোবাসেন। ফলত পাল্টা শক্তি ওঁদের বাঁধা-বাঁধির দড়ি-দড়া শক্ত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে চক্রবৃদ্ধিহারে বাড়তে থাকে, এক হিসেবে তাই ওঁরা নিজের হাতেই নিজের অন্তিমযাত্রার পথ তৈরি করতে থাকেন।

বর্তমান ভারতে পাল্টা শক্তির দ্বন্দ্ব। পোলারাইজড হতে শুরু করেছে। এখন এমন এক পরিস্থিতি দ্রুত পক্ষবিস্তার করছে যেজন্য দুটি সুস্পষ্ট শিবিরে জনগণকে আপনাপন স্বার্থরক্ষার খাতিরেই বিভক্ত হয়ে পড়তেই হবে। স্বতন্ত্র এই তথ্যটি হয়ত উপলব্ধি করছে। ক্রমে কেন্দ্রে ও অন্যত্রও হয়ত এঁরা কম্যুনিস্ট-বিরোধী ব্লক বাঁধবেন, বিহারে যার সূচনা। বি কে ডি প্রমুখ প্রতিক্রিয়াবাদীদেরও ঐ একই পথ। অন্য পথ নেই।

উত্তর প্রদেশে গুপ্ত ক্যাবিনেট

২৬শে ফেব্রুয়ারী সি বি গুপ্তের নেতৃত্বে ষোলজন ক্যাবিনেট মন্ত্রী রাজ্যপালের কাছে কংগ্রেসী মন্ত্রিসভা পত্তনের জন্য শপথ গ্রহণ করেছেন। রাষ্ট্রপতির শাসনকালের অবসান ঘটানো হয়েছে তারই আগের দিন।

সি বি গুপ্তের ক্ষমতাকাঙ্ক্ষা উত্তর প্রদেশে ইতিপূর্বেও প্রভূত জটিলতার সূত্রপাত করে, এবারও তার যে ব্যতিক্রম হয় নি তার দ্বারা প্রমাণিত হয়, শ্রীগুপ্ত রাষ্ট্রতরণীর পালে অনুকূল হাওয়া খেলাতে এখনো গররাজী। রাজ্য কংগ্রেসের প্রধান শ্রীত্রিপাঠির সঙ্গে যুক্ত নেতৃত্ব ভাগ করে নিতে শক্ত মানুষের আপত্তিই প্রথমে গোল বাধিয়েছিল। সি বি গুপ্ত ত্রিপাঠিকে উপ-মুখ্যমন্ত্রীরূপে সঙ্গে নিতে নারাজ ছিলেন। এমন কি সংবাদে প্রকাশ, গুপ্ত-ত্রিপাঠির দ্বারা একত্রে সমর্থিত নামের তালিকায়ও ইচ্ছেমত কাঁচি চালিয়েছেন শ্রীগুপ্ত। নিজের ঘাঁটি শক্ত করার জন্য বাদ দিয়েছেন যুক্তভাবে মনোনীত কয়েকজনের নাম। ফলে কংগ্রেসের ভাঙা-ঘরের চালে আর নতুন সমঝোতার খড় চাপানো সম্ভব হয় নি। ১৯৬৭-র পর সে-ঘরে যেমন কোন্দল মাথাচাড়া দিয়েছিল এবারও ঠিক তাই হতে চলেছে। মন্ত্রিসভায় এমন কয়েকজনের আমদানী হয়েছে রাজনীতির খাতায় যাঁরা বিগত পরিচ্ছেদ মাত্র। ফলত অনেকেই অখুশি। শেষ পর্যন্ত অবশ্য

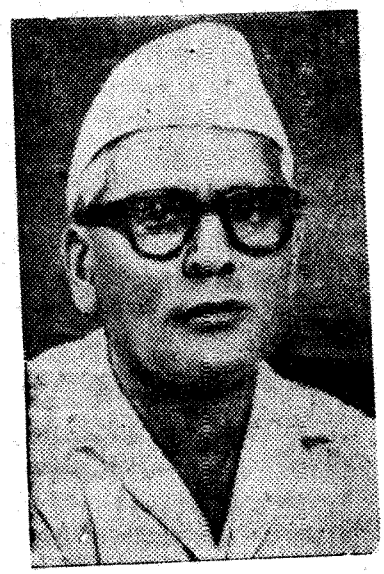

সি বি গুপ্ত

কমলাপতিকেই উপ-মুখ্যমন্ত্রী করতে হয়েছে।

ক্যাবিনেটে ব্রাহ্মণ সদস্য এসেছেন পাঁচজন, অনুন্নত শ্রেণী থেকে গ্রহণ করা হয়েছে দুজন, হরিজন সমাজ থেকে তিন ও কায়স্থ সমাজের প্রতিনিধি এক। একএকজন করে এসেছেন মুসলিম ও ভূমিহার প্রতিনিধি। মন্ত্রিসভায় স্থান পেলেন দুজন ঠাকুর এবং একমাত্র বৈশ্য স্বয়ং মুখ্যমন্ত্রী শ্রীগুপ্ত। কিন্তু কয়েকজন পুরনো মন্ত্রী ছাঁটাই হয়ে গেছেন এবং তাঁরা কাজে-কাজেই বিক্ষুব্ধ। অবশ্য শ্রীগুপ্ত ১৭ই মার্চ পর্যন্ত সকলকেই আশার ছলনে ভুলিয়ে রাখতে চান। কারণ মন্ত্রিসভা সম্প্রসারণের ইপ্সিত তিনি বরবাদ করে দেন নি। অনেক গর্দি আকাঙ্ক্ষীকে বিবেচনাসাপেক্ষে ঝুলিয়েও রেখেছেন। প্রকাশ্যে ঘোষণা করেছেন, আরও কয়েক ব্যক্তি তাঁর নজরে আছেন।

আগ্নেয়গিরির ওপর আসন

গুপ্ত বলেন, "আমরা আগ্নেয়গিরির ওপর বসে আছি।" আর সামান্যতম ভুল করলেই স-রাজ্য ভরাডুবি ঘটবে এ বিষয়েও গুপ্তজীর জ্ঞান টনটনে। তবে কি না শ্রীগুপ্ত চূড়ান্ত অবমাননা সহ্য করার জন্যও বদ্ধপরিকর। কেন না ভারতের বৃহত্তম রাজ্যের "মঙ্গলামঙ্গলের দিকে তাকিয়ে" তিনি এই আত্মত্যাগে প্রস্তুত।

রাজত্ব হাতে পেয়ে শ্রীগুপ্ত কি কি মঙ্গল করতে যাচ্ছেন তারও একটি ফিরিস্তি তিনি দিয়েছেন।

বলেছেন, সময় দাও, সব ঠিক করে দেব। খুব আশার কথা গুপ্তজী এতোকালে ভাবতে পারছেন, শ্রমিক-মালিক সম্পর্ক মধুর করে শ্রমিকদের ন্যায্য পাওনা মিটিয়ে দেবার ব্যবস্থা তাঁকে করতে হবে। অবশ্য গদিতে আরোহণের সময় চমকপ্রদ বাণী বিতরণে দলগতভাবে তাঁর অভিজ্ঞতাও প্রচুর। তবে বস্তুতই যদি আজকের বাস্তব পরিস্থিতির ফল হয় শ্রীগুপ্তের শুভ ইচ্ছা তবে সুস্থতার লক্ষণ দেখা দিচ্ছে বলেই ধরে নিতে হবে। কিন্তু সরকারী কর্মচারীদের জন্য তিনি কতদূর করবেন। কেন্দ্রে ক্ষমতাসীন তাঁর দল তো কেন্দ্রীয় কর্মচারীদের ওপর উদ্যত-খড়্গ নোয়াতে নারাজ। শ্রীগুপ্ত কী আর এই ঘুণে-ধরা চিন্তায় রেভলাুশন আনতে পারবেন! শিক্ষক ও ছাত্রদের তিনি এবার আশার বাণী শুনিয়েছেন। শুনলেও আনন্দ। কিন্তু ছাত্র ও শিক্ষক-নিপীড়নের সুদীর্ঘকালের স্বভাব কি হঠাৎ পরিবর্তিত হওয়া সম্ভব! না, শ্রীগুপ্ত স্বপ্ন দেখলেও সাধারণ মানুষ জেগে স্বপ্ন দেখতে পারেন না। সব মিলে সি বি গুপ্তের বাণী বেশ লাগলেও শেষ পর্যন্ত তা কেমন শোনাবে এখনই তা কেউ সঠিক বলতে পারেন না। কংগ্রেসের টাল-মাটাল অবস্থায় সি বি গুপ্ত এখন থেকে সামাল দিয়ে চলবার চেষ্টা করলেও করতে পারেন, অন্তত তাই করা উচিত। কিন্তু কেন্দ্রের দিকে তাকালে, মোরারজী সাহেবের বাজেট ও চ্যবন সাহেবের চোখ রাঙানী লক্ষ্য করলে মনেও হয় না কোথাও এতটুকু পরিবর্তনের হাওয়া বইছে।

তবে সুখের বিষয়, উত্তর প্রদেশ কোনও পরিবর্তিত বাতাসে শ্বাস নিতে চায় নি।

পরোক্ষ করের বোঝা

বাজেট মানেই নতুন কর প্রস্তাব এবং এই প্রস্তাব যখন মোরারজী ভাই-এর কাছ থেকে আসে তখন প্রস্তাব উত্থাপিত হওয়ার আগেই বোঝা যায়, করের বোঝা পাকে-প্রকারে গরীবের ঘাড়েই চাপবে, কেন না মোরারজীর কাছে গরীবের আর্জি আদৌ পাত্তা পায় না, গরীব সাধারণের কাছে তিনি পাক্কা মোরারজী সাহাব। এ-কারণেই মোরারজী দেশাই-এর কর-প্রস্তাবে পরোক্ষ করের বোঝা শুধু অধিক নয় বহু শতাংশ বেশি হয়ে থাকে। এবার একশ' পঞ্চাশ কোটি সাতাশ লক্ষ টাকার নতুন করের মধ্যে ঊনআশি কোটি টাকাই সাধারণের স্কন্ধে পরোক্ষ কর হিসেবে চাপানো হয়েছে। পরোক্ষ কর কর-আওতা-ভুক্ত দ্রব্যাদির ওপরই শুধু নয়, সেই দ্রব্যের ও বিষয়ের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত অন্যান্য দ্রব্যাদির ভোগকারীর ওপরই চাপে। সাধারণের সাহাব এবং ধনীবান্ধব মোরারজী যতটুকু বা প্রত্যক্ষ করের ব্যবস্থা রেখেছেন তারও একটি মোটা অংশই চাপছে উচ্চ-মধ্যবিত্ত শ্রেণীর ওপর আয়কর হিসেবে। প্রত্যক্ষ কর মাত্র এগারো কোটি টাকা।

মোরারজীর কর-প্রস্তাবে রপ্তানীশুল্ক হ্রাসের ব্যবস্থা আছে। আমদানীর ওপর চড়া হার। অর্থাৎ দেশে চড়া দামে মাল কিনে বিদেশে নরম দামে ভালো মাল পাঠাতে হবে। মোটর গাড়ি চাপতে হলে চার চাকার ওপর টিনের ঢাকনাই কিনতে হবে, কেন না ওটির ওপর এক ঘরানার একাধিপত্য, যাকে বলে মনোপলি।

মোরারজী সাহেব তাঁর সাধু উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা করে বলেছেন যে, উন্নয়নমূলক খাতে অধিক লগ্নীই তাঁর লক্ষ্য। গত কুড়ি বছর যাবৎ ঐ উন্নয়নের মেওয়াটি সাধারণের সামনে রেখে করের বোঝা চক্রবৃদ্ধি-হারে বাড়িয়ে যাওয়া হয়েছে। সাধারণকে আশা দেওয়া হয়েছে, এর ফলে ভবিষ্যতে সোনা ফলবে। উন্নয়নশীল দেশে প্রাথমিক অবস্থায় জনসাধারণকে ত্যাগ স্বীকার করতে হয় অবশ্যই। ভারতের জন-সাধারণও সেই ত্যাগ স্বীকারে পৃথিবীর কোন অংশের নাগরিকবৃন্দ থেকে পশ্চাদ-পদ নন। কিন্তু ত্যাগ যদি কেবলমাত্র একটি শ্রেণীকে বাঁচিয়ে বাকি অংশের ওপর দাবি করা হতে থাকে তবে শোষিত-সাধারণ অবশ্যই আপত্তি করবেন বিক্ষুব্ধ হবেন। আর সেই বিক্ষোভ দেশব্যাপী বেশ প্রত্যক্ষ আকারও ধারণ করেছে। গরীব-মারা করনীতির প্রতিবাদে সাধারণ মানুষ ক্ষুব্ধ হয়ে আছেন সর্বদাই।

এবার গরীব-মারা নীতি লক্ষিত হয়েছে পরোক্ষ করের বোঝায়। এই কর মূল্য-বৃদ্ধির ঊর্ধ্বমুখ গতিকে আরও ঊর্ধ্বমুখী করে স্বল্পবিত্ত মানুষকে চরম দুর্গতির মধ্যে ঠেলে দিতে বদ্ধপরিকর।

কেরোসিন, তৈরি খাবার, দানা চিনি, পারিবারিক প্রয়োজনীয় বৈদ্যুতিক সরঞ্জাম, সিগারেট প্রভৃতির ওপর কর সরাসরিভাবে অতি নিম্নস্তর থেকে সকলের ওপরই চাপ সৃষ্টি করতে চলেছে। বিশেষ করে কেরোসিনটা গ্রামদেশ ও সাধারণ নাগরিক সমাজকে আঘাত করবে। দানা চিনির মূল্যে একেই গগনচুম্বি, তার ওপর করভার। সরকার সাধারণের সঙ্গে মধুর সম্পর্ক যে একেবারেই বাতিল করতে চান মধুস্বাদের প্রতি মোরারজীর অকরুণ মনোভাব কি তারই পরিচায়ক! টেলিফোন যেখানে সবার ঘরে পেঁাছে দেওয়ার দায়িত্ব গ্রহণ করাই উচিত, সেখানে টেলিফোনকে

মোরারজী দেশাই

আরও উচ্চতর শ্রেণীর মধ্যে আবদ্ধ রাখার পরিকল্পনা ফেঁদেছেন অর্থমন্ত্রী। পেট্রোল পরোক্ষভাবে আক্রমণে উদ্যত। পেট্রোলের ওপর কর বসানোয় যানবাহন খরচা বাড়বে, ফলে সর্বস্তরে দ্রব্যাদির মূল্য সুযোগ বুঝে ফালতু মুনাফারও আয়োজন করবে। চিনির ওপর করবৃদ্ধির ফলে কতটা দামের হেরফের হবে তা কর চাপানোর পর বোঝার আগেই, চিনির দাম কিলো প্রতি ত্রিশ-চল্লিশ-পঞ্চাশ পয়সা হারে বেড়ে গেছে। দেশের ব্যবসায়ীসমাজ শোষণে উন্মুখ। মোরারজী সাহেবরা কর চাপানোর সঙ্গে সঙ্গে ফালতু মুনাফাবাজি বন্ধ করতে অক্ষম হওয়ায় কর যত না চাপে, দাম চাপে সে তুলনায় ঢের বেশি। এই ফালতু আর সরকারের ঘরে বদনাম ছাড়া আর কিছুই তুলে দেয় না।

সারের ওপর করের বোঝা কৃষিতে আঘাত হানবে।

মোরারজী সাহেবের কর-প্রস্তাবে ব্যবসায়িকুল নিশ্চিন্তে মন্তব্য করেছেন, 'খুব ভালো হইয়াছে, তোফা হইয়াছে।' হইবেই। বোঝা বইবেন সাধারণ মানুষ, নতুন করের সুযোগে দাম বাড়াবেন ওঁরা। সেয়ানে-সেয়ানে কোলাকুলিতে, এক প্রধান আর এক প্রধানের স্তুতিতে মুখর হবেন বৈ কি!

বিভিন্ন দলের প্রতিক্রিয়াও তাই বাজেটের বিমর্ষ ও আক্রমণকারী দিকের সমালোচনায় মুখরিত।

মোরারজী সাহেবের প্রতিক্রিয়াশীল বাজেট দেশের উন্নয়নমূলক কাজকেও যদি বিন্দুমাত্র ত্বরান্বিত করে তবে তারও ফল-ভোগী হবেন ঐ ধনিককুল যা তাঁরা আজ বিশ বছর ধরে হয়ে আসছেন। সমস্ত পরিকল্পনার ক্ষেত্রে বিরাট জাল টাঙানো আছে, যাতে জাতীয় আয় সোনাদানা জালে জমা রেখে ধুলো-বালিগুলি সাধারণের জন্য ছাঁকনি করে ঝরিয়ে দেয়। সোনাদানা ওঁদের, ধুলো-কাদায় আমাদের বসবাস।

সাধারণ মানুষের হতাশ জিজ্ঞাসাধরা চোখে আজ তাই প্রশ্ন, এই গরীব-মারা বাজেট আর কতবার?

(১।৩।৬৯)

উপনিষদ গ্রন্থাবলী :

১ম খণ্ড : ঐতরেয়, কৈবল্য, কাঠশ্রুতি, নৃসিংহতাপনী।

২য় খণ্ড : শ্বেতাশ্বতর, পরমহংস, সন্ন্যাস, নীলরুদ্রচুলিক, আরুণেয়, কণ্ঠশ্রুতি, জাবাল, পিণ্ড, আত্ম, ষটচক্র, ভৃগু, শিক্ষা, ব্রহ্মবিদ, নারদ, পরিব্রাজক, পৈঙ্গলা, তুরীয়াতীত, বাসুদেব, শাণ্ডিল্য, নারায়ণ (ক), নারায়ণ (খ)।

৩য় খণ্ড : ঈশ, কেন, প্রশ্ন, মুণ্ডক, মাণ্ডুক্য, তৈত্তিরীয়, পাশুপত-ব্রহ্ম, প্রাণাগ্নিহোত্র, ভাবন, গরুড়, শ্রীরামপূর্বতাপনীয়, শ্রীরামোত্তর-তাপনীয়, পঞ্চব্রহ্ম, কালাগ্নিরুদ্র, যাজ্ঞবল্ক্য, রামরহস্য, গোপাল-পূর্বতাপনীয়, গোপালোত্তরতাপনীয়, কৌষীতক্য, অমৃতবিন্দু, কালিকা সর্বসার ও অমৃতনাদ। কাপড় ও বোর্ডে বাঁধা। মূল্য : প্রতি খণ্ড—৪'০০ টাকা।

বসুমতী প্রাইভেট লিমিটেড
১৬৬, বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী স্ট্রীট,
কলিকাতা—১২

পাকিস্তান :

এখানে যে দ্রুতগতিতে পট পরিবর্তন এবং দৃশ্যান্তর ঘটছে তাতে পৌরাণিক গ্রীক বিয়োগান্ত নাটকও হার মানবে। প্রেসিডেন্ট আয়ুব প্রেসিডেন্ট পদে নির্বাচনপ্রার্থী হবেন না বলে ঘোষণা করার পর এখানকার রাজনৈতিক মহলে একটা আশার ভাব অবশ্যই সঞ্চারিত হয়েছে। তথাকথিত আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার নায়ক বলে বর্ণিত শেখ মুজিবর রহমানকে মুক্তি দিয়ে রাজনৈতিক পরিস্থিতি আরো একটু সহজ করা হয়েছে। এরপর সুরু হয়েছে সরকারী এবং বিরোধীপক্ষের মধ্যে নতুন এক ঠাণ্ডা লড়াই। প্রেসিডেন্ট আয়ুব চাইছেন কী করে বাকি ক'টা মাস নিরুপদ্রবে শাসন চালাবেন। আর বিরোধীপক্ষ নতুন করে মতলব আঁটছেন, আয়ুব খাঁর পিঠ যখন দেয়ালে গিয়ে ঠেকেছে, তখন সর্বশক্তি দিয়ে তাঁকে আঘাত করে পলায়নে বাধ্য করা যায় কী করে। এ পরিস্থিতিতেই রাওয়ালপিণ্ডি গোলটেবিল বৈঠকের প্রথম অধিবেশন হয়ে গেল।

ইতিমধ্যে বিরোধী নেতাদের কয়েকটি তাৎপর্যপূর্ণ উক্তিতে পাকিস্তানের আগামী দিনের রাজনীতিক চেহারার খানিকটা আভাস পাওয়া গেল।

প্রাক্তন এয়ার মার্শাল আসগর খাঁর রাজনৈতিক মতবাদ কী তা এতদিন স্পষ্ট করে বলেন নি। সম্প্রতি লাহোরে তিনি সাংবাদিক বৈঠকে যে আলোচনা করেছেন তাতে তাঁর রাজনৈতিক দর্শনের কিছু কিছু আভাস মেলে। আসগর খাঁ চান বড় বড় বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলি একত্র হয়ে মিশে যাক একটা সর্বনিম্ন অর্থনৈতিক কর্মসূচীর ভিত্তিতে তারা একটি রাজনৈতিক দল গঠন করুক। এতে কোন কোন দলকে অবশ্যই কিছু ত্যাগ স্বীকার করতে হবে, দেওয়া-নেওয়া করতে হতে পারে। কিন্তু আসগর খাঁ মনে করেন তাতে বিরোধী দলগুলির এবং সমস্ত পাকিস্তানবাসীর পক্ষে মঙ্গল হবে।

সংবিধানের সংশোধন সম্পর্কে আসগর খাঁর মত হল, আপাতত ছোটখাট সংশোধনীগুলো সেরে বাকিটা নতুন জাতীয় পরিষদের জন্যে রেখে দেওয়া। জাতীয় পরিষদের নির্বাচনের যখন দেরি নেই, তখন তাড়াহুড়ো করে সংবিধান সংশোধন করার কোনো যুক্তি নেই বলে তিনি মনে করেন। সরকারের গঠন পার্লামেন্টারী হবে কি প্রেসিডেন্সিয়াল হবে তা নিয়ে আসগর খাঁর বিশেষ মাথা-ব্যথা নেই। সরকারের রূপ যাই হোক, তাতে পূর্ব-পাকিস্তানীরা যাতে পুরো অংশ নিতে পারেন সে ব্যবস্থাই তিনি চান। গোলটেবিল বৈঠকে আয়ুবের

মুক্তির পর ঢাকায় এক জনসভায় ভাষণ দিচ্ছেন মুজিবর রহমান।

আন্তর্জাতিক

ভবিষ্যৎ সংবিধানের সংশোধন, অবাধ এবং দুর্নীতিমুক্ত নির্বাচনের ব্যবস্থা করাই হবে গোলটেবিল বৈঠকের মুখ্য উদ্দেশ্য।

আসগর খাঁ অর্থনীতির ওপর জোর দিয়েছেন ঠিকই, কারণ তিনি মনে করেন যে, যে কোন রাজনৈতিক দলের মেরুদণ্ডই হলো তার অর্থনৈতিক কর্মসূচী। কিন্তু সেই সঙ্গে তিনি একথাও স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন যে, শিল্পের রাষ্ট্রীয়করণ ইত্যাদি সমস্যা এমনভাবে দেখতে হবে যাতে দেশের অর্থনৈতিক প্রগতি ব্যাহত না হয়।

এ-ব্যাপারে পিপলস পার্টির প্রেসিডেন্ট প্রাক্তন পররাষ্ট্রমন্ত্রী জুলফিকার আলি ভুট্টোর মতটি ঠিক উল্টো। ভুট্টো প্রগতিশীলতা, সমাজতন্ত্রের কথা বলেছেন, কিন্তু সে সমাজতন্ত্র যেন তার শেষ লক্ষ্যে পৌঁছতে না পারে সে বিষয়েও তিনি সতর্কবাণী উচ্চারণ করেছেন। রাওয়ালপিণ্ডিতে এক বিশেষ সাংবাদিক সাক্ষাৎকারে তিনি বলেছেন যে, ভারী শিল্প, ব্যাঙ্ক, ইন্সিওরেন্স, পেট্রলিয়াম ইত্যাদি শিল্পের রাষ্ট্রীয়করণের তিনি পক্ষপাতী, কিন্তু তাই বলে বৈদেশিক পুঁজি দেশ থেকে তাড়াতে চান না। স্ক্যান্ডিনেভিয়ান দেশগুলিতে যে-ধরণের সমাজতন্ত্র চালু রয়েছে, ভুট্টো এশিয়ার মাটিতে তাই কাজে লাগাতে চান। কী ধরণের সরকার পাকিস্তানে হওয়া উচিত—সে সম্পর্কে ভুট্টো কিছুই বলেন নি। তবে তিনি সাংবাদিকদের একথা বলেছেন যে, পূর্ব পাকিস্তানের বিরোধী নেতারা যদি প্রেসিডেন্ট পদে প্রার্থী মনোনয়নের ব্যাপারে একমত হতে পারেন, তবে তিনি প্রতিদ্বন্দ্বিতা থেকে সরে দাঁড়াবেন।

জাতীয় আওয়ামী লীগ নেতা শেখ মুজিবর রহমান বলেছেন যে, বর্তমান প্রেসিডেন্ট প্রথার বদলে ফেডারেল পার্লামেন্টারী প্রথার প্রবর্তন করাই সমস্যা সমাধানের বড় উপায়। এ-প্রসঙ্গে তিনি একথাও জানিয়ে দেন যে, প্রেসিডেন্ট পদে নির্বাচন প্রার্থী হবার কোনো বাসনাই তাঁর নেই।

বিস্তর জল ঘোলা করার পর ঈদ পরবের আগের দিন ২৭শে ফেব্রুয়ারী রাওয়ালপিণ্ডি গোলটেবিল বৈঠক প্রথমবারের মত বসলো। তার আগে বিরোধী দলগুলি, গণতান্ত্রিক সংগ্রাম পরিষদের অন্তর্ভুক্ত আটটি রাজনৈতিক দলনেতাদের কেউ কেউ এবং আসগর খাঁ, প্রাক্তন বিচারপতি মুর্শেদ, প্রাক্তন রাজ্যপাল আজম খাঁ ইত্যাদি বৈঠকে তাঁদের আক্রমণের ধারা সম্পর্কে আলোচনা করেন।

প্রথম বৈঠকের স্থায়িত্ব ছিল স্বল্পকালীন, আবার অংশগ্রহণকারীরা মিলিত হবেন ১০ই মার্চ। বৈঠকে জাতীয় আওয়ামী পার্টির কোন প্রতিনিধি যোগ দেন নি. ছিলেন না পিপলস পার্টিরও কোন প্রতিনিধি। তবে শেখ মুজিবর রহমান এবং অন্য নেতারা এখন চেষ্টা করছেন জাতীয় আওয়ামী পার্টির নেতা মৌলানা ভাসানী এবং পিপলস পার্টির নেতা ভুট্টো যাতে আলোচনায় অংশ নেন তার জন্যে মৌলানা ভাসানী তাঁর দলের ১৪ দফা দাবি মেনে না নেওয়া পর্যন্ত বৈঠকে যোগ দেবেন না বলেছিলেন। ভুট্টো বলেছিলেন, শেখ মুজিবরকে ছেড়ে দিলেও বা আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা প্রত্যাহার করে নিলেও সরকারকে গোলটেবিল বৈঠকের পরিবেশ সৃষ্টির জন্যে আরো অনেক কিছু যেতে হবে। এক সময় ভুট্টো আয়ুব খাঁর পদত্যাগ দাবি করেছিলেন আলোচনায় অংশ গ্রহণের শর্ত হিসেবে।

এদিকে পূর্ব পাকিস্তানের সংগ্রামী ছাত্ররা আবার চঞ্চল হয়ে উঠেছেন। মুজিবর যখন মুক্তি পেলেন ছাত্র এবং সাধারণ লোক তাঁকে যে সম্বর্ধনা দেন তা ঢাকার ইতিহাসে অভূতপূর্ব। ছাত্ররা এখন দাবি করছেন যে, আগামী ৩০শে মার্চের মধ্যে যেন সমস্ত প্রাদেশিক প্রতিনিধি এবং মৌল গণতন্ত্রী পদত্যাগ করেন। তাঁরা তাঁদের ১১ দফা দাবি গৃহীত না হওয়া পর্যন্ত গোলটেবিল বৈঠকে অংশ না নেবার জন্যে বিরোধী নেতাদের কাছে আবেদন করেছেন।

বিরোধীপক্ষ জানেন, আয়ুবশাহীর সূর্য দ্রুত অস্তাচলে নেমে যাচ্ছে। তিনি এ-পর্যন্ত বহু গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে নতি স্বীকারে বাধ্য হয়েছেন। আর অন্যদিকে বিরোধীপক্ষ রাউণ্ডের পর রাউণ্ড জিতে চলেছেন। এ অবস্থায় গোলটেবল বৈঠকে বিরোধী দলের দাবিগুলি যদি আয়ুব খাঁ বা সরকারীপক্ষ মেনে না নেন, তবে তিন মাস আগে যে-সংগ্রাম সুরু হয়েছে তা আরো তীব্র হবে। অবশ্য ইতিমধ্যে করাচীতে আয়ুবের সমর্থনে ৫০ হাজার লোকের এক মিছিল-শোভাযাত্রা বেরোতে দেখা গিয়েছে। মিছিলের দাবি ছিল ঃ আয়ুব খাঁকে নির্বাচনপ্রার্থী হতে হবে, আয়ুব খাঁই জাতির নেতা ইত্যাদি।

বোঝা যাচ্ছে, পাকিস্তানে একটা গৃহযুদ্ধে আসান্ন।

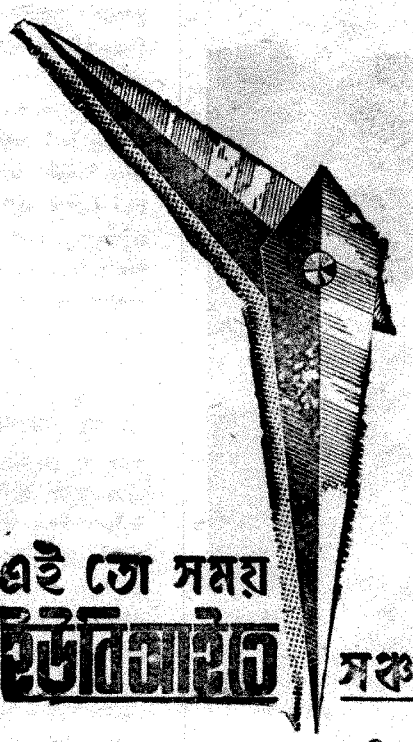

এই তো সময়
ইউনাইটেড সঞ্চয় করার

* সেভিংস অ্যাকাউণ্টে বছরে শতকরা ৩½ টাকা সুদ।
* মাত্র ৫৲ টাকা জমা দিয়ে হিসেব খুলতে পারেন।
* চেকবই ব্যবহার করা যায়।
* মাসে পাঁচবার টাকা তোলা চলে।
* মেয়াদী আমানতে মেয়াদ অনুসারে সর্বাধিক শতকরা ৬½ টাকা পর্যন্ত সুদ।
* পৌনঃপুনিক আমানতের (রেকারিং ডিপোজিট) শর্তাদি সুবিধাজনক।

আসুন···আমাদের এখানেই সঞ্চয় করুন

ইউনাইটেড ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়া লিঃ
রেজিস্টার্ড ও হেড অফিস ঃ ৪ ক্লাইভ ঘাট ষ্ট্রীট,
কলিকাতা-১

পশ্চিমবঙ্গে ১১০টিরও অধিক শাখা অফিস আছে

যুক্তফ্রন্টের সামনে কোন পথ?

মনোরঞ্জন হাজরা

অভিষেক শেষ হল। কিন্তু সে কি সিংহাসন ঘরে—না লক্ষ লক্ষ মানুষের দৃপ্ত মিছিলে আর স্বতঃস্ফূর্ত বক্ষ-উৎসারিত বিপুল প্রাণবন্যার আবেগে? সে যে কি তা পশ্চিম বাংলার সাংবাদিক, সাহিত্যিক, শিল্পী, রাজনীতিবিদ সবাই প্রত্যক্ষ করেছেন। ১৯২৮ সালে কলকাতা কংগ্রেসের সময় পণ্ডিত মতিলাল নেহরুর আগমন, এমন কি জওহরলালজী যখন তাঁর খ্যাতির উচ্চশিখরে—তখন সে সমস্ত দিনেও এমন ফেটেপড়া মানুষের শপথ-কঠিন আনন্দোচ্ছল অভিনন্দন কলকাতার রাজপথে কারোকে লক্ষ্য করে দেখা যায় নি, যা দেখা গেল ২৫শে ফেব্রুয়ারী যুক্তফ্রন্টের মন্ত্রিসভার শপথ গ্রহণের মুহূর্তটিতে। অধিক বর্ণনার প্রয়োজন নেই। কারণ মন্ত্রীরা বলেছেন আমরা সবাই মিলেমিশে কাজ করব। রূপায়িত করব জনতার আশা-আকাঙ্ক্ষাকে। উদ্বেলিত জনসমুদ্রের মাঝে তরংগ আর কর্ণধারদের দ্বৈত সুর তাই কাজের দিকেই প্রধাবিত।

অতি তুচ্ছ ক্ষুদ্র একটি কালে যুক্তফ্রন্টকে উপলক্ষ করে যে অপমান বাংলা দেশকে সহ্য করতে হয়েছিল তার অবসান বাংলা দেশই করেছে নিজেদের সংকল্পের মাধ্যমে। আবার যুক্তফ্রন্ট ক্ষমতায় আসীন হয়েছেন। হয়ত সেজন্য উচ্ছ্বাস, আনন্দ তাতে কিছুটা হবে, মানুষের হৃদয়াবেগের স্থান তাতে নিশ্চয়ই থাকবে, কিন্তু বর্তমানে যুক্তফ্রন্টকে নিয়ে দেশবাসীর পাশাপাশি একটা ভাবনাও রয়েছে। সে ভাবনা আপন সরকারের প্রতিটি পদক্ষেপ কি হবে, কিভাবে সে একই রাজ্যে আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে এবং বাইরে অর্থাৎ কেন্দ্রীয় সরকারের সঙ্গে যুঝে থেকে কাজ করে যাবে। বিগত যুক্তফ্রন্ট সরকারের অভিজ্ঞতা রয়েছে তাঁদের সামনে। সেকথা জনতাও যেমন ভোলে নি, তেমনি ফ্রন্টের নেতারাও ভোলেন নি। তাই সকল উচ্ছ্বাস ও আবেগের শেষকথা এখানেই এসে দাঁড়াচ্ছে—কিভাবে যুক্তফ্রন্টকে কাজ করতে হবে।

সহকারী মুখ্যমন্ত্রী শ্রীজ্যোতি বসু নির্বাচন ফলাফল বেরুনোর সঙ্গে সঙ্গে ধরানগরে তাঁর নির্বাচনকেন্দ্রে যে বক্তৃতা করেছিলেন, তা যে যুক্তফ্রন্টের মর্মকথা সেকথা বুঝতে কারো অসুবিধা হয় নি। তিনটি বিষয় তাঁর বক্তব্যে সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছিল—শ্রমনীতি বলতে যুক্তফ্রন্ট কি বলতে চায়, আইন ও শৃঙ্খলা রক্ষার কর্ণধার পুলিশ সম্পর্কে দৃষ্টিভঙ্গী কি হবে এবং পরিশেষে কেন্দ্র-রাজ্য সম্পর্ক কেমন দাঁড়াবে। শ্রীবসু বলেছিলেন, দেশে শিল্পপতিরা কলকারখানা চালু রাখুন এটা তিনি চান। অর্ডার প্রভৃতির অভাবে যদি তাঁদের কোন অসুবিধা হয় তো সেটাও ফ্রন্ট সরকার দেখবেন। ফ্রন্ট সরকার শিল্প জাতীয়করণের কথা বলছে না। কিন্তু তাই বলে সমস্ত বোঝা যদি শ্রমিকদের ঘাড়ে চাপানো হয়, তা হলে উক্ত মালিকশ্রেণীর কোন সুযোগসুবিধা থাকবে না। তাছাড়া কংগ্রেস এতদিন যেভাবে তাঁদের সেবা করে এসেছেন, যুক্তফ্রন্ট সরকারের কাছে সেটা তাঁরা আশা করতে পারেন না।

শ্রীবসু পুলিশ সম্পর্কে একথা বলেছেন যে, তাদের নিষ্ক্রিয় করে রাখা হবে না। বস্তুত পুলিশকে আগেও কোনদিন নিষ্ক্রিয় করে রাখে নি যুক্তফ্রন্ট সরকার। পুলিশের যা কাজ নয় কংগ্রেস সরকার এতদিন তাদের দিয়ে সেই কাজই করিয়েছে। সমাজের বিত্তশালী লোকেদের পক্ষে পুলিশকে একদিকে যেমন তারা নির্লজ্জভাবে ব্যবহার করে গেছেন, তেমনি মানুষের জীবন ও জীবিকা, ব্যক্তিস্বাধীনতা ও সমষ্টিগত গণতান্ত্রিক অধিকার রক্ষার আন্দোলনগুলিকে নির্দয় পুলিশ পীড়নে জর্জরিত করে তুলেছেন। যুক্তফ্রন্ট সেই সংবিধান-বিরোধী পথে পুলিশকে পরিচালনা করতে চান নি এবং এবারেও চাইবেন না। শান্তি ও শৃঙ্খলা রক্ষা করা, অসামাজিক কার্যকলাপ বন্ধ করা প্রভৃতি যেসব করণীয় কাজ পুলিশের আছে, পুলিশকে দিয়ে সেই কাজই করা হবে।

কেন্দ্র-রাজ্য সম্পর্ক বিষয়ে শ্রীবসু বলেছিলেন, প্রয়োজন হলে সংবিধানকে সংশোধন করতে হবে।

মুখ্যমন্ত্রী শ্রীঅজয়কুমার মুখোপাধ্যায়ও ফ্রন্টের নেতা নির্বাচিত হবার পর তাঁর প্রথম রাজনৈতিক বিবৃতিতে শ্রীবসুর মতই দৃপ্তকণ্ঠে যুক্তফ্রন্টের নীতি এইভাবেই ব্যাখ্যা করেছেন।

ফ্রন্টের বিগত অভিজ্ঞতার পরিপ্রেক্ষিতে

সহকারী মুখ্যমন্ত্রী ও মুখ্যমন্ত্রী উভয়েই যেকথা বলেছেন এই কথাগুলিই পশ্চিম বাংলার মানুষের মনের কথা। কিন্তু বিগত ফ্রন্ট সরকারের সময় এই শ্রমনীতি সম্বন্ধে দেশে একেবারে হৈ-চৈ পড়ে গিয়েছিল। অথচ আজ শিল্পপতিরা ফ্রন্টের সেই একই শ্রমনীতিকে নতুন করে ঘোষণার সময় একটা 'ওয়েট এ্যান্ড সী' মনোভাব নিয়ে দেখছেন বলে মনে হচ্ছে। এমন কি কোন কোন শিল্পগোষ্ঠী ফ্রন্টের এই শ্রমনীতিকে স্বাগতও জানাচ্ছেন বলে সংবাদপত্রে দেখা গেছে। তাই এর থেকে যে কথাটি বেরিয়ে আসছে তা হচ্ছে বিগত যুক্তফ্রন্টের সময় শিল্পপতিদের তেমন কোন অভিজ্ঞতা ছিল না। এখন বলা যেতে পারে তাঁদের সে অভিজ্ঞতাটুকু হয়েছে। অবশ্য একথাও ঠিক যে, শিল্পপতিরা গতবার দূরদৃষ্টি দিয়ে বা ব্যবসায়িক বুদ্ধি দিয়ে ব্যাপারটা যে না তলিয়ে দেখেছিলেন তা নয়—কিন্তু কংগ্রেস তখন তাঁদের ক্ষমতালিপ্সু প্রকৃতির বশে শিল্পপতিদের চেয়ে শিল্প-প্রেমিক হয়ে উঠেছিল দালালীর একান্ত অভ্যাসবশে। তাই গতবারে চিৎকারটা হয়েছিল বেশি তাদের দিক থেকেই। এবার কংগ্রেসদলের সে অস্তিত্ব আরও সঙ্কুচিত। শিল্পপতিরা তাই তাঁদের ওপর আর তেমন ভরসা রাখতে পারেন না এবং কারো কারো মত ওঁদের ওপর ভরসা করা উচিতও নয়। তাই এবারে ফ্রন্টের শ্রমনীতি যে অনেকাংশেই রাজনৈতিক আক্রোশে কোণঠাসা হবে না একথা খুব জোর দিয়েই বলা যায়।

পুলিশ সম্পর্কেও এই কথা। দীর্ঘদিন পুলিশ ঠ্যাঙাড়ের ভূমিকা পালন করে মানুষ ঠ্যাঙানো তাদের যেন পবিত্র অধিকারে দাঁড়িয়ে গিয়েছিল। গতবার সর্বপ্রথম তাদের সেই অধিকার বিতর্কের বিষয় হয়ে দাঁড়ালো। ফল তার দু'রকমই হয়েছে। পুলিশের একাংশ ঘোরতরভাবে ক্ষমতান্ধ হয়ে গেল—আরেক অংশ কিন্তু আইনের শাসনের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে পড়ল। সাধারণ প্রশাসন বিভাগেও এর প্রভাব বিস্তৃত হবার অপেক্ষায় রইল। এই অবস্থায় সব থেকে যেটা মারাত্মক হতে পারত সেটা হচ্ছে এই যে, যুক্তফ্রন্ট যদি আবার সেই পুরনো শীর্ণকায় মেজরিটি নিয়ে আসত। কিন্তু এবারে অন্তত সংখ্যাগরিষ্ঠতার সেরকম সম্ভাবনার আশংকা থাকলেও, ফ্রন্ট সরকার সৎ অফিসারদের মাধ্যমে তা সংযত করতে পারবেন আশা করা যায়।

কিন্তু মুস্কিল হচ্ছে কেন্দ্র-রাজ্য সম্পর্কে। অর্থ ও খাদ্যের ব্যাপারে কেন্দ্রের মনোভাব কংগ্রেস আমলেও যে খুব ভাল ছিল তা নয়। বিধানবাবুকে অনেকবারই কেন্দ্রের বিরুদ্ধে হুঁশিয়ারী দিতে হয়েছিল। গতবার ফ্রন্ট সরকারের আমলে কেন্দ্র যে মনোভাব দেখিয়েছিলেন তা নানাকারণে সমর্থনযোগ্য নয়।

এই রাজ্যের অধিবাসীদের অনেকেরই মনে আছে ফ্রন্ট সরকারের সহকারী মুখ্যমন্ত্রী ও অর্থমন্ত্রী শ্রীজ্যোতি বসু খাদ্য ক্রয় করা সম্পর্কে ৪ কোটি টাকা কেন্দ্রের কাছে চেয়েছিলেন কেন্দ্র তা দেন নি। রিজার্ভ ব্যাঙ্ক থেকে ওভারড্রাফ্ট চাওয়া হয়েছিল তারও অনুমতি দেওয়া হয় নি। চতুর্থ অর্থ কমিশনের সুপারিশ মত পশ্চিম বাংলার প্রাপ্য ১০ কোটি টাকা, সেটুকুও দিতে অস্বীকার করা হয়েছিল। শুধু তাই নয়, ইতিপূর্বেকার কংগ্রেস মন্ত্রিসভার আমলে কেন্দ্রের কাছে ২২ কোটি টাকার একটা ঋণবাবদ সুদসমেত ৩৫ কোটি টাকা আদায় স্থগিত রাখার কথা বলা হয়েছিল, তাতেও কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী মোরারজী দেশাই রাজী হন নি। এরপরে আসে বাঁকুড়া-পুরুলিয়ার দুর্ভিক্ষে ত্রাণকার্য করার জন্য ৪ অংশ পরিমাণ টাকাও কেন্দ্র দেন নি। এতগুলি ঘটনা কেন্দ্রীয় সরকারের কোন মানসিক কাঠামোর পরিচয় দেয় তা উপলব্ধি করতে বোধহয় কোন পাঠকেরই অসুবিধা হয় না।

তাই বর্তমানে কেন্দ্র যদি এই অতীতকে অনুসরণ করতে থাকেন তা হলে কেন্দ্র-রাজ্য সম্পর্ক যে খারাপ হবে সেকথাই শুধু নয়—সেই খারাপ সম্পর্কে অতিক্রম করে চলবার মত পরিস্থিতি যুক্তফ্রন্ট তার সরকারের জন্য সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়েছে। অর্থাৎ বাংলাদেশের যে বিপুল জনসমর্থন ফ্রন্টের পিছনে রয়েছে, সেই সমর্থন কেন্দ্রকে নতুন অভিজ্ঞতা লাভ করাতে সমর্থ হবে।

এই বাংলাদেশ থেকে ভারত সরকারের আদায়ীকৃত মোট রাজস্বের শতকরা প্রায় ৩৮ ভাগ সংগৃহীত হয়—সংগৃহীত চা, পাট, খনিজদ্রব্য, আয়কর, আমদানী-রপ্তানী শুল্ক থেকে। ডাক ও তারও আছে এর ওপর। এখন কেন্দ্রীয় সরকার যদি একটা রাজ্যকে ক্রমাগত অর্থ প্রভৃতি দিক থেকে বঞ্চিত করবার চেষ্টা করে, তখন পশ্চিম বাংলার মানুষ তার সরকারকে বাঁচিয়ে নিজেদের বাঁচার পথকে উন্মুক্ত রাখার উদ্দেশ্যে নিশ্চয়ই কোন না কোন পন্থা গ্রহণ করবে এবং সে পন্থা যদি এই হয় যে, কেন্দ্রীয় অর্থকরী দপ্তরগুলিকে লক্ষ লক্ষ লোক ঘেরাও করে বসে তখন কি হবে? কেন্দ্রীয় সরকার হয়তো তখন বলবেন—'দ্যাখো দ্যাখো ওরা সংবিধান মানছে না।' দেশের একশ্রেণী পণ্ডিতমূর্খ আছেন যাঁরা হয়ত তখন এই সংবিধান মানা না মানার প্রশ্নটাকেই তুলে ধরতে চাইবেন বড় করে, আর ভাড়াটিয়া সংবাদপত্রগুলির তো কথাই থাকবে না। কিন্তু প্রশ্নটা তো এইখানে এসেই দাঁড়াবে—সংবিধানের জন্য মানুষ, না, মানুষের জন্য সংবিধান?

বেরুবাড়ি দেয়ার জন্য বা যে কোন একটা অজুহাতে সংবিধানের যত বয়স ততবার যদি সংশোধন হতে পারে, তবে একটা রাজ্যের অর্থনৈতিক কাঠামোকে সুদৃঢ় করার উদ্দেশ্যে সুযোগ থাকা সত্ত্বেও তা করা হবে না কেন? তা ছাড়া এই ধরনের সমস্যা ও সমাধানের রাস্তা তো শুধু পশ্চিম বাংলারই কাছে অনুভূত হবে না, এ অনুভূতি তো সারা ভারতবর্ষের মানুষেরই হতে পারে। যুক্তফ্রন্ট এইরকম একটি সম্ভাবনাময় মুহূর্তের বাস্তব অবস্থার মধ্যে এসে দাঁড়িয়েছে। সংবাদপত্রের বিতর্ক দিয়ে বাস্তব অবস্থাকে চাপা দিয়ে রাখা যায় না—যেমন দেখা গেল মধ্যবর্তী নির্বাচনে চেপে রাখা গেল না।

তাছাড়া প্রতিবেশী রাষ্ট্র পাকিস্তানে আজ কি হচ্ছে? সংবিধান সংশোধন হবে না, কেন হবে না, কিসের জন্য হবে না? রক্ত দিয়ে সমগ্র পাকিস্তান তা আজ নতুন করে লিখছে।

এবার যুক্তফ্রন্ট তাই অমিতবিক্রমে কাজ করে যেতে পারবে। কারণ বাস্তব অবস্থাই তাকে সেদিকে ঠেলে নিয়ে যাচ্ছে।

—ফটো বিউটি স্টুডিও—
সুন্দর ছবি তোলাতে হ'লে
ফটো বিউটিতে আসুন
৪৩, নেতাজী সুভাষ রোড
কালী বাবুর বাজার (হাওড়া)
ফোন : ৬৭-৪৫২৬
(ইণ্ডিয়ান ওভারসীজ ব্যাঙ্কের নীচে)

ক্ষেত ও কারখানায় শান্তি

বিগত মধ্যবর্তী নির্বাচনে যুক্তফ্রন্টের বিরুদ্ধে প্রচারের মূল বক্তব্য ছিল, ফ্রন্ট ক্ষমতা পেলে ক্ষেত-খামার এবং কল-কারখানার শান্তি নষ্ট হবে। কংগ্রেসী নেতাদের বক্তৃতা এবং কংগ্রেসী প্রচারপত্রে এই কথাই বোঝাবার চেষ্টা হয়েছিল যে, যুক্তফ্রন্টের আমলে কলকারখানায় যে 'ঘেরাও' আন্দোলন দেখা দেয়, তার ফলে কলকারখানার দরজা বন্ধ হয়ে যায় এবং বহু লোক বেকার হয়ে পড়ে। দ্বিতীয়ত ঘেরাও-আতঙ্কে শিল্পপতিরাও নাকি কলকারখানা বাংলা দেশ থেকে তুলে নিয়ে অন্য রাজ্যে সরে পড়বার কথা চিন্তা করছেন। ক্ষেত-খামারে অশান্তির ধুয়োটা উঠেছে জোতদারদের খুশি করবার জন্য। কারণ দু'-দশ বিঘে জমির মালিক যে কৃষক তার জমিতে রাজনৈতিক অশান্তি প্রবেশের যে কোন সুযোগ নেই, সে কথা বুঝতে কারও কষ্ট হবার কথা নয়। যাঁরা অনেক জমির মালিক এবং বর্গাদার দিয়ে জমি চাষ করান অথবা বে-আইনীভাবে খাস জমি ভোগদখল করে আছেন, তাঁদের ক্ষেত-খামারে কখনও কখনও অশান্তি দেখা দেওয়া অসম্ভব নয় কারণ সেখানে জোতদারের সঙ্গে বর্গাদারের মালিক-শ্রমিক সম্পর্ক। বিংশ শতাব্দীর অধিকার সচেতন ভারতবর্ষে মালিক-শ্রমিক সম্পর্ক সব সময় মধুর থাকবে—এমন আশা করা বাতুলতা মাত্র। কাজেই ক্ষেত-খামারে শান্তির ধ্বনি তুলে যাঁরা নির্বাচন জয়ের আশা করেছিলেন, তাঁরা যে জমির বিত্তশালী মালিকদের তোষামোদ করে বাজী মাতের স্বপ্ন দেখেছিলেন, সেকথা বলাই বাহুল্য। যেহেতু বিত্তশালী জোতদারের সংখ্যা স্বল্পবিত্ত এবং ভূমিহীন কৃষকের চেয়ে বহুগুণ কম, সেহেতু ক্ষেত-খামারে তথাকথিত শান্তিকামীরা গ্রামাঞ্চলে শোচনীয় পরাজয় বরণ করতে বাধ্য হয়েছেন।

শান্তি সকলেরই কাম্য। কিন্তু কবরের শান্তি নিশ্চয়ই কেউ বাঞ্ছনীয় বলে মনে করেন না। ক্ষেত-খামারে সত্যিকারের শান্তি আনতে হলে সব চেয়ে আগে দরকার ভূমি-সংস্কার। যাঁরা লাঙল হাতে জমি চাষ করে থাকেন, তাঁরা যখন জমির মালিক হবেন, তখন ক্ষেত-খামারে অশান্তির কোন কারণ থাকবে না। কংগ্রেস দল ভূমি-সংস্কারে অঙ্গীকারবদ্ধ হয়েও গত ২০।২২ বছরে সেই কাজে হাত দেয় নি। তাই জমিদারী উচ্ছেদ হওয়া সত্ত্বেও ভিন্ন রূপে এখনও অটুট আছে বলা চলে। সেটা আমাদের দেশের সর্বাঙ্গীণ অগ্রগতির পথে মস্ত বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে। আমাদের অর্থ-নীতির প্রধান পেছুটান হচ্ছে খাদ্য-সঙ্কট। সে সঙ্কট মোচন করতে গেলে জমির ওপর মুষ্টিমেয় ফাটকাবাজ জোতদারের প্রভুত্ব শেষ হওয়া দরকার। প্রকৃত চাষীরা জমি পেলেই যে খাদ্য-সঙ্কট দূর হয়ে যাবে—এমন কথা কেউ নিশ্চয়ই বলবেন না। সঙ্গে সঙ্গে বীজ সার এবং সেচেরও সুব্যবস্থা করতে হবে এবং ছোট ছোট জমির মালিকরা যাতে জোটবদ্ধ হয়ে সমবায় খামারের দিকে এগোতে পারেন, সে সম্পর্কেও সচেষ্ট হতে হবে। ক্ষেত-খামারে শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য এর চেয়ে ভাল পন্থা আর কি হতে পারে তা আমার জানা নেই। নতুন যুক্তফ্রন্ট সরকার যদি এই নীতি নিয়ে অগ্রসর হন, তাহলে তাঁদের সাফল্য অনিবার্য।

এবার আসুন কলকারখানায় শান্তির প্রশ্নে। যুক্তফ্রন্ট সরকারের আমলে কল-কারখানায় শ্রমিক অসন্তোষ অনেকক্ষেত্রে উগ্রমূর্তি ধারণ করেছিল ঠিকই, কিন্তু তার পুরো দায়িত্বটা শ্রমিক শ্রেণী এবং যুক্তফ্রন্ট সরকারের ওপর চাপিয়ে দেওয়া বোধহয় যুক্তিযুক্ত হবে না। ধনতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থায় বণিক শ্রেণীর লক্ষ্য হচ্ছে অল্প পয়সা লগ্নী করে খুব তাড়াতাড়ি অনেক পয়সার মালিক হওয়া। শ্রমিককে বেশি খাটিয়ে কম মজুরী দিলে এবং ক্রেতার কাছ থেকে উৎপন্ন পণ্যের দাম বেশি করে আদায় করতে পারলে বণিক সম্প্রদায়ের মুনাফার পরিমাণটা অনায়াসেই বেড়ে যায়। স্বভাবতই তাঁরা সেই নীতি নিয়েই চলতে ভালবাসেন। অপর দিকে শ্রমিকের লক্ষ্য হচ্ছে মালিকের কাছ থেকে তার পরিশ্রমের উপযুক্ত মূল্য আদায় করা। কাজেই ধনতান্ত্রিক সমাজে কল-কারখানায় মালিক-শ্রমিক বিরোধ এড়ানো একেবারেই অসম্ভব। আমেরিকা, বৃটেন, ফ্রান্স, ইটালী সর্বত্রই এই বিরোধ রয়েছে এবং বিভিন্ন সময়ে সেই বিরোধ ধর্মঘট এবং হরতালের মধ্য দিয়ে আত্মপ্রকাশ করে থাকে। কংগ্রেসের বিশ বৎসরাধিক শাসন-কালে কলকারখানায় কোন দিনই শান্তি ছিল না। যুক্তফ্রন্টের আমলেও থাকে নি। সত্যিকারের সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত না হওয়া পর্যন্ত এ সমস্যার সমাধান সম্ভব নয়। তবে হ্যাঁ, যুক্তফ্রন্টের আমলে শ্রমিক-বিক্ষোভের মাত্রাটা বেড়েছিল। তার কয়েকটি বিশেষ কারণ আছে। ১৯৬৭ সালে যুক্তফ্রন্ট সরকার যখন ক্ষমতায় আসেন, তখন দেশে খাদ্য-সঙ্কট চরম অবস্থায় গিয়ে পৌঁচেছিল। পর পর দু' বছর নিদারুণ খরায় দেশে ফলন একে-বারেই হ্রাস পায়। ফলে খাদ্যশস্যের অস্বাভাবিক মূল্যবৃদ্ধি ঘটে। তারই সঙ্গে তাল রেখে নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির মূল্যও অস্বাভাবিক হারে বেড়ে যায়। ঠিক সেই সময় শিল্প-বাণিজ্যে নিদারুণ মন্দা দেখা দেয় এবং কল-কারখানায় ব্যাপক ছাঁটাই সুরু হয়। মন্দায় দেশের ইঞ্জিনীয়ারিং শিল্পই সব চেয়ে বেশি ঘায়েল হয়েছিল। যেহেতু পশ্চিমবঙ্গে ইঞ্জিনীয়ারিং শিল্পের প্রাধান্যই বেশি সেহেতু মন্দার পুরো চাপটা এসে পড়ে পশ্চিমবঙ্গের ওপর। শিল্প-বাণিজ্যের অবস্থা যখন ভাল থাকে তখন মালিক ও শ্রমিক উভয়পক্ষই লাভ-বান হন তবে মালিকের মুনাফাটা হয় অনেক বেশি। কিন্তু মন্দার সময় মালিক লোকসানের পুরো বোঝাটা শ্রমিকের ওপর চাপিয়ে দিতে চান। নিশ্চিত বেকারী এবং অনশনের সম্মুখীন হয়ে মানুষ সুস্থচিত্তে নিশ্চেষ্ট হয়ে বসে থাকবে—এমন আশা করা বাতুলতা মাত্র। তবে হ্যাঁ, বিক্ষোভের মাত্রাধিক্য এবং হিংসাত্মক ক্রিয়াকলাপ কোন সময়ই বাঞ্ছনীয় নয়। কিন্তু তাদের ঐ ধরনের ক্রিয়াকলাপের নিন্দা করার সময় তাদের তৎকালীন মানসিক অবস্থাটাও মনে রাখা দরকার। মানুষ দেবতা নয়। ভুল-ভ্রান্তি ত্রুটি-বিচ্যুতি তার সহজাত। মানুষের

কিস্তিতে ট্রানজিস্টর

"ন্যাশন্যাল ডিলাক্স"

১০, মাসিক কিস্তিতে ৩ ব্যাণ্ড অল ওয়ার্ল্ড পোর্টেবল ট্রানজিস্টর লাভ করুন। প্রতি গ্রাম ও শহরে প্রেরণের যোগ্য। আবেদন করুন:

Music & Sound (B.W.C.—10)
Post Box 1576, Delhi—6.

মধ্যে বিক্ষোভের যদি সত্যিই কোন কারণ থাকে, তাহলে সে বিক্ষোভ বন্ধের দুটি উপায় আছে। হয় বিক্ষোভের কারণগুলো দূর করতে হবে না হয় বলপ্রয়োগের দ্বারা সেই বিক্ষোভ দমন করতে হবে। ১৯৬৭ সালে যুক্তফ্রন্ট সরকার নিদারুণ সঙ্কটে পতিত শ্রমিক শ্রেণীর বিক্ষোভ বলপ্রয়োগের দ্বারা দমন করতে চান নি। সেখানে তাঁরা চিরাচরিত পন্থা পরিহার করেছিলেন বলে সম্পন্ন শ্রেণী তাঁদের ওপর অসন্তুষ্ট হন এবং গুজব রটতে থাকে যে শিল্পপতিরা বাংলা দেশ থেকে কলকারখানা অন্যত্র সরিয়ে নিয়ে যাবার চেষ্টা করছেন। সত্যিই কোন শিল্পপতি তেমন কোন কথা চিন্তা করছিলেন কি না তা আমাদের জানা নেই। তবে সম্প্রতি বেঙ্গল চেম্বার অব কমার্সের প্রেসিডেন্ট মিঃ পার্সন কথাটা অস্বীকার করেছেন। তাঁর চেম্বারের কোন সদস্য বাংলা দেশ ত্যাগ করার কথা কখনও চিন্তা করেন নি। শ্রমিক বিক্ষোভের ভয়ে শিল্পপতি-

সানলাইটে প্রতিবার
আপনার জামাকাপড়
আরো ঝলমলে ক'রে কাচে

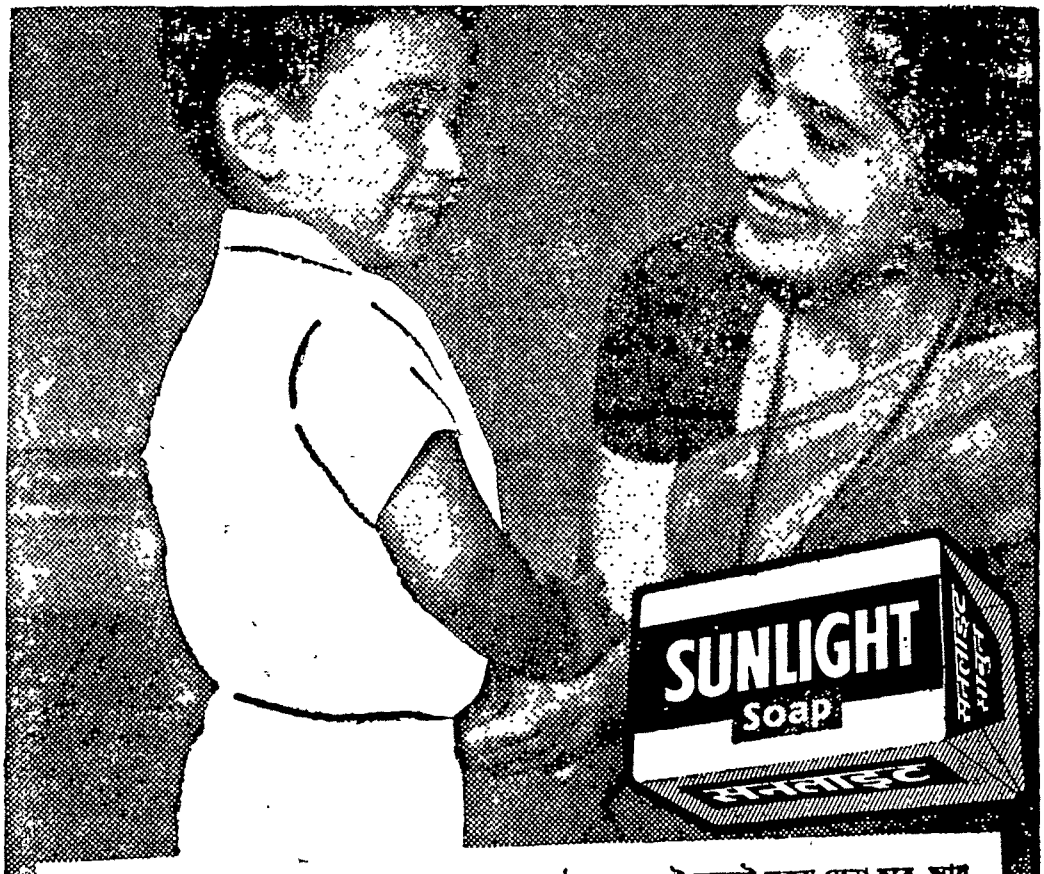

সানলাইট সাবান একবার নিজেই ব্যবহার ক'রে দেখুন···কী চমৎকার ঝলমলে হয় কাপড়চোপড়। দেখবেন, প্রতিবার কাচার সঙ্গে সঙ্গে আপনার জামাকাপড় কেমন আরো বেশী উজ্জ্বল হ'য়ে ওঠে। অল্প একটু ঘষলেই অজস্র ফেনা হবে, আর সেই ফেনা কাপড়চোপড় অনায়াসে সুন্দর পরিষ্কার ঝলমলে ক'রে দেবে। বাড়ীতে সব কাপড়চোপড়ই সানলাইটে কাচুন।

সানলাইটে আপনার
প্রতিদিনের সব জামাকাপড় কাচুন

লিনটাস-S. 62-140 BG (R)

হিন্দুস্থান লিভারের তৈরী

দের বাদ তালিকাভুক্ত গুটিয়ে অন্যত্র চলে যেতে হয়, তাহলে আমেরিকা, বৃটেন, ফ্রান্স অথবা ইটালীতে এতদিনে কোন শিল্পপতির অস্তিত্ব থাকত না। ফ্রান্সে শ্রমিক বিক্ষোভের ফলে সম্প্রতি সেখানে কি নিদারুণ মুদ্রা সঙ্কট দেখা দিয়েছিল, তা নিশ্চয়ই কারও অজানা নেই। কিন্তু তাতে ফ্রান্সের কোন শিল্পপতি অন্য দেশে পাড়ি দিয়েছেন বলে শোনা যায় নি। তাছাড়া দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে ভিন্ন ভিন্ন যে সব শিল্প গড়ে উঠেছে, তার একটা ভৌগোলিক ও প্রাকৃতিক ভিত্তি আছে। বাংলার পাটকলগুলো তুলে নিয়ে হিমাচলে গিয়ে বসানো যায় না। কারণ বাংলা দেশ পাটের প্রধান উৎপাদক এবং এখান থেকেই পাটজাত পণ্য বিদেশে রপ্তানি করা সব চেয়ে সুবিধাজনক। বাংলা দেশের অন্যান্য শিল্প সম্পর্কেও সেই একই কথা প্রযোজ্য। সুতরাং মূলধন (কলকারখানা) সরিয়ে নেবার কথাটা একেবারেই আজগুবী বলে মনে হয়। তা ছাড়া সরিয়ে নিয়ে যাবেন কোথায়? সরকারী সমীক্ষায় ধরা পড়েছে যে, কলকাতার চেয়ে বোম্বাইতে শ্রমিক বিক্ষোভের সংখ্যা অনেক বেশি। কলকারখানা যেখানেই খোলা হোক, সেখানেই শ্রমিকের প্রয়োজন হবে এবং শ্রমিকের আবির্ভাব ঘটলেই নানা বিষয়ে মালিকের সঙ্গে তার বিরোধ বাধবে।

এবার দেশের অবস্থা ১৯৬৭ সালের তুলনায় অনেক ভাল। প্রথমত খাদ্যশস্যের উৎপাদন মোটামুটি ভাল হওয়ায় তার মূল্য এখনও নিম্নাভিমুখী। তবে বাংলা দেশ খাদ্যশস্যে স্বনির্ভর নয়। কাজেই এ ব্যাপারে কেন্দ্রীয় সরকারের সাহায্য ছাড়া চলা সম্ভব নয়। তবে কেন্দ্রীয় এবং প্রাদেশিক সরকারের হাতে যে পরিমাণ খাদ্যশস্য মজুত আছে এবং আরও যে পরিমাণ খাদ্যশস্য সংগ্রহের সম্ভাবনা আছে, তাতে কেন্দ্রীয় সরকার প্যাঁচ না কষলে এবার খাদ্যশস্যে সঙ্কট দেখা দেওয়ার সম্ভাবনা কম।

কিন্তু শিল্পক্ষেত্র সম্পর্কে তেমন কথা বলা চলে না। গত বছর শিল্পোৎপাদন ৫।৬ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে ঠিকই কিন্তু বাংলার ইঞ্জিনীয়ারিং শিল্পের অবস্থা এখনও খুব কাহিল। পঞ্চাশ হাজার ওয়াগন নির্মাণের ক্ষমতা নিয়ে বাংলার সাতটি বড় বড় কারখানা অলস বসে আছে। রেল বিভাগ তাদের অর্ডার দিয়েছে মাত্র ১০ হাজার ওয়াগনের। ফলে ওয়াগন শিল্পের পরিপূরক অসংখ্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কারখানা যে কতদূর বিপন্ন হবে তা সহজেই অনুমেয়। পাটের ফলন গত বছর হ্রাস পাওয়ায় পাট-শিল্পেও সঙ্কট আসন্ন। বিশ্বের বাজারে চায়ের মূল্য অস্বাভাবিক হ্রাসের ফলে চা-শিল্পও বিপন্ন। তা ছাড়া গত কয়েক বছরে পশ্চিমবঙ্গে বড় শিল্পও কিছু গড়ে ওঠে নি।

রাজ্যের নিদারুণ বেকার সমস্যা সমাধানের জন্য শিল্পের সম্প্রসারণ যে অপরিহার্য, সে কথা কেউ অস্বীকার করতে পারবেন না। সুতরাং যুক্তফ্রন্ট সরকারের প্রধান কাজ হওয়া উচিত মুমূর্ষু শিল্পগুলোকে চাঙ্গা করা এবং নতুন নতুন শিল্প গড়ে তোলার ব্যবস্থা করা। আমাদের দেশের প্রচলিত সমাজ কাঠামোয় এবং কেন্দ্রীয় সরকারের নীতি অনুযায়ী শিল্প সম্প্রসারণে শিল্পপতিদের সাহায্য না নিলে চলে না। কারণ দেশের মূলধন তাঁদেরই নিয়ন্ত্রণাধীন। কাজেই এ ব্যাপারে যুক্তফ্রন্ট সরকারকেও তাঁদের সহযোগিতা গ্রহণ করতে হবে। শ্রমিক অসন্তোষ সেই সহযোগিতার পথে অন্তরায় হবে বলে মনে হয় না। শ্রমিকরা তাঁদের ন্যায্য পাওনা-গণ্ডা পেয়ে গেলে তাদের মধ্যে অসন্তোষের কোন কারণ থাকতে পারে না। আর শ্রমিকদের পাওনা গণ্ডা মিটিয়ে দিয়ে মালিক প্রয়োজনীয় মুনাফা অর্জন করতে পারবেন না—এমন ধারণাও ঠিক নয়। যুক্তফ্রন্ট সরকার যদি বিভিন্ন শিল্পের অবস্থা পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে পর্যালোচনা করে মালিকের মুনাফা ঠিক রেখে শ্রমজীবীদের বেতন হার নির্দিষ্ট করে দেন তাহলে শ্রমিক-মালিক বিরোধ যে অনেক হ্রাস পাবে, তাতে কোন সন্দেহ নেই। যুক্তফ্রন্ট সরকার সেই পথে অগ্রসর হলে লাভবান হবেন বলে আমাদের মনে হয়।

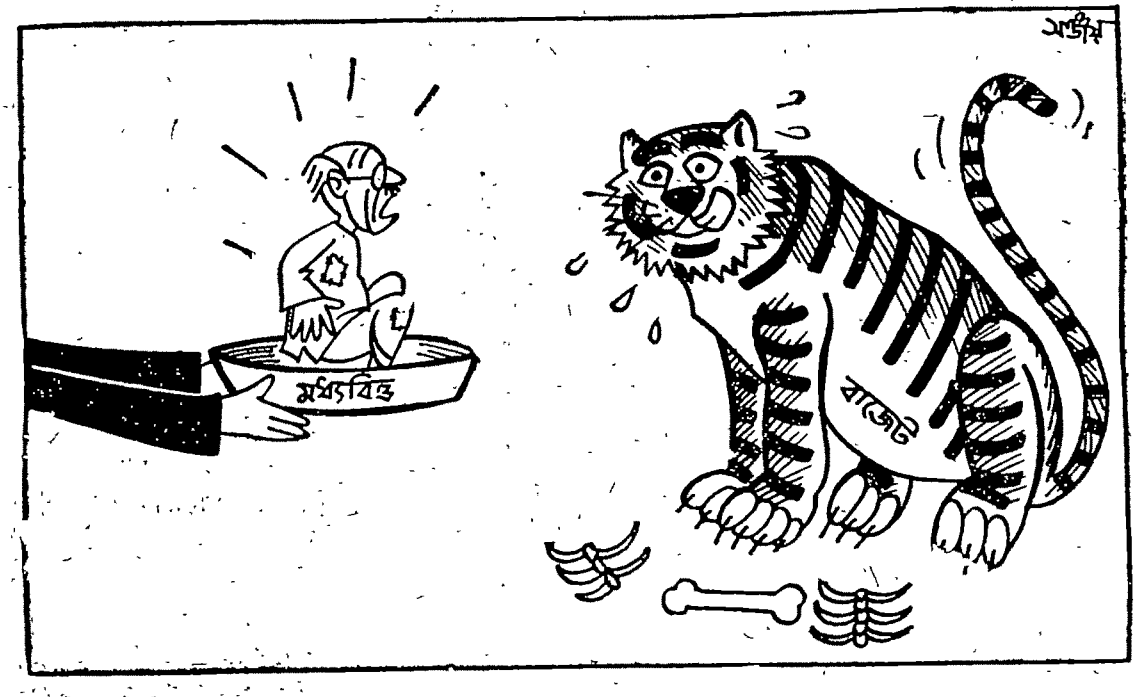

অবহেলিত ত্রিপুরী ভাষা

রাহুল বর্মণ

ত্রিপুরা বিচিত্র বর্ণের দেশ। ভৌগোলিক দিকে ত্রিপুরা রাজ্য সমতল, পার্বত্যাঞ্চল, অরণ্য এবং প্রাকৃতিক শোভা সমন্বিত উপত্যকায় পরিপূর্ণ। এই পার্বত্য রাজ্য ১৮ লক্ষ লোকের বাসভূমি। সর্বত্র নানা জাতীয় ধর্মীয় সম্প্রদায়ের সন্ধান মেলে। তাদের মধ্যে কথিত ভাষার সংখ্যা প্রচুর।

ভারতীয় প্রাচীন ভাষাসমূহের মধ্যে অস্ট্রিক সবচেয়ে পুরনো। অস্ট্রিকের অনুগামী হচ্ছে চীনা-তিব্বতীয় (Sino-Tibetan) ভাষা। ত্রিপুরায় এ ভাষার প্রভাবই সর্বত্র বর্তমান। রাজ্যের পনেরটি পার্বত্য উপজাতির কথ্যভাষা চীনা-তিব্বতীয়ের অপভ্রংশ ত্রিপুরী। ককবরক নামে এ ভাষা পার্বত্য ত্রিপুরায় প্রচলিত।

প্রবন্ধকার বিস্তৃত গবেষণাকার্য চালানোর পর দেখতে পেয়েছেন যে, ত্রিপুরী ভাষা বা ককবরক বদো নাগা, অসমীয়া-ব্রহ্মী, তিব্বতীয়-ব্রহ্মী প্রভৃতি পার্বত্য ভাষার দ্বারা অনেক প্রভাবিত। একটা অদ্ভুত সংযোগ রয়ে গেছে উক্ত পার্বত্য ভাষাগুলির মধ্যে। উক্ত ভাষাগুলি কোন এক বিলুপ্ত সভ্যতার চিহ্ন বয়ে চলেছে আজো।

ককবরক পার্বত্য ত্রিপুরার ভাষাসমূহের মধ্যে সবচেয়ে সমৃদ্ধ, গুরুত্বপূর্ণও। রাজ্যের অন্দরে-কন্দরে এ ভাষার প্রচলন। আনুমানিক ১ লক্ষ ৯০ হাজারের মতো উপজাতিদের কথ্যভাষা ত্রিপুরী। এদের মধ্যে রিয়াং, রুপনী, ত্রিপুরী, জমাতিয়া নোয়াতিয়া, মুলসং, উলছই প্রভৃতি উপজাতি সম্প্রদায় উল্লেখ্য।

ঐসব উপজাতি সম্প্রদায় ভিন্ন ভিন্ন বাচনভঙ্গি, উচ্চারণ পদ্ধতি ও শব্দভাণ্ডার ককবরক ব্যবহার করলেও মূলত সবগুলির গঠনপ্রণালী হুবহু এক রকম।

ত্রিপুরী ভাষার কোন লেখ্যরূপ পরিপূর্ণভাবে নেই। ফলে উপজাতিদের মধ্যে এ ভাষা মৌখিকভাবে প্রচলিত। ককবরক ভাষা প্রচুর প্রেম ও বীরত্বগাথায় ভরা। কতকগুলি ত্রিপুরী গানের বাংলা অনুবাদ সম্প্রতি প্রকাশিত হয়েছিল আগরতলার একটি সাপ্তাহিক পত্রিকায়।

তবু সবদিক থেকে বিচার করলে দেখা যাবে যে, ককবরক ভাষা ত্রিপুরা রাজ্যে প্রায় অবহেলিত। বিশেষ কোন সাহিত্য বা পুস্তক বর্তমান শতকে এ ভাষায় রচিত হয় নি। যে মুষ্টিমেয় ক'জন ত্রিপুরী ভাষাকে সভ্যসমাজে প্রচলন করার জন্য অক্লান্ত প্রচেষ্টা চালিয়েছিলেন, তাঁদের মধ্যে ত্রিপুরী রাজবংশীয় শ্রীযুক্ত রাধামোহন দেববর্মণের (প্রবন্ধ লেখকের প্রপিতামহ) নাম সর্বাগ্রে উল্লেখ্য। এই উদ্যোগী পুরুষের জীবনাদর্শ বর্তমান যুগের যুবসমাজের সামনে আদর্শস্বরূপ। তিনি ছিলেন একাধারে রাজকীয় ত্রিপুরী সেনাদলের প্রধান সেনাপতি, অন্যধারে ছিলেন ত্রিপুরার সর্বোচ্চ আদালতের প্রধান বিচারপতি। বিশ শতকের প্রারম্ভে ত্রিপুরী ভাষার একটি অভিধান এবং একটি ব্যাকরণ বই রচনা এবং তৎসহ কিছু ত্রিপুরী কবিতাকে বাংলা ভাষায় অনুবাদ তিনি করেছিলেন ১৯০২ সালে। বাংলা ও ত্রিপুরী ভাষার সংবৃদ্ধি প্রসারে উত্তরসূরীরূপে তিনি সর্বজনবিদিত। দীর্ঘদিন অতিক্রান্ত হবার পর তাঁর সাহিত্যকর্মে উৎসাহিত হয়ে ত্রিপুরা সরকারের সমাজসেবা দপ্তর গত ক'বৎসরে প্রচুর ত্রিপুরী ভাষার বই (বাংলা অক্ষরে) রচনা করেছেন। তাছাড়া আগরতলায় অবস্থিত নিউজিল্যান্ডীয় ব্যাপটিস্ট মিশনও কতকগুলি ত্রিপুরী ভাষার বই প্রকাশ করে উক্ত ভাষা সম্পর্কে উৎসাহ প্রকাশ করেছেন। ফলে, ত্রিপুরী ভাষা সম্পর্কে মানুষের মন আবার হয়ে উঠেছে উৎসাহী।

ভাষাতাত্ত্বিকদের মতে ককবরকের মতো ছোট কথ্যভাষার দীর্ঘদিন ধরে প্রচলিত থাকাটাই আশ্চর্যজনক এবং এ ভাষার লুপ্ত হয়ে যাবার সম্ভাবনা বেশি। কারণ একশো বছরের আগেই ত্রিপুরা রাজ্যে বাংলা ভাষাকে রাজস্বীকৃতি, শাসনতান্ত্রিক স্বীকৃতি ও জনমনের স্বীকৃতি দিয়ে অভিনন্দিত করা হয়েছে।

বাংলা ও ত্রিপুরার যোগসূত্র বহুকালের। ঐতিহাসিকদের মতে রাজ্যাবলী গ্রন্থ চর্যাপদের সমকালীন সময়ে ত্রিপুরায় রচিত। বাংলা ভাষায় রাজকুমারী অনঙ্গমোহিনী দেবী কতকগুলি উল্লেখযোগ্য কবিতা লিখেছিলেন ১৯১৮ সালে। ত্রিপুরা রাজ্যে বাংলা ভাষার প্রসারে তাঁর অবদান অনস্বীকার্য।

বাংলা ও ককবরক ত্রিপুরা রাজ্যে বহুদিন ধরে একত্রে প্রচলিত হওয়াতে প্রচুর বাংলা শব্দ মিশে গেছে ত্রিপুরী ভাষার সঙ্গে। ফলে বাংলা ও ককবরকের মধ্যে একটা যোগসূত্র গড়ে উঠেছে স্বাভাবিকভাবেই।

ত্রিপুরায় প্রায় ১৩ লক্ষ বাঙালী বাস করে। বাংলা ভাষার এ রাজ্যে দ্রুত প্রসার ঘটায় এটি এখন সরকারী ভাষারূপে বর্তমানে স্বীকৃত। বাংলার তুলনায় ত্রিপুরী বা ককবরকের ভবিষ্যৎ অনুজ্জ্বল। কারণ বাংলা ভাষা সাংস্কৃতিক ও ভাষাতাত্ত্বিক দিকে শক্তিশালী হওয়ায় ত্রিপুরীর চেয়ে অনেকদূর অগ্রসর।

ত্রিপুরা রাজ্যে আদিবাসী শিশুদের শিক্ষার মাধ্যম বাংলা। তবু ত্রিপুরী ভাষার প্রয়োজনীয়তা পরিলক্ষিত হয় শিক্ষক মহলে। তাই বর্তমানে ত্রিপুরী ভাষা শিক্ষা অবশ্য-পাঠ্যরূপে গৃহীত হয়েছে ত্রিপুরার বেসিক ট্রেনিং কলেজগুলিতে।

ত্রিপুরী ভাষাকে সম্পূর্ণভাবে লেখ্য রূপ দিয়ে উন্নত করতে হলে কতকগুলি ব্যবস্থা গ্রহণ করা প্রয়োজন। প্রথমত একটি উপযুক্ত লিখন-পদ্ধতির আবিষ্কার। দ্বিতীয়ত বাংলার অনুকরণে কতকগুলি অক্ষর সৃষ্টি করা, উচ্চারণ প্রকাশ সহজসাধ্য করার জন্য। ভাষার উচ্চারণভঙ্গি সহজসাধ্য হলে ত্রিপুরী ভাষা সহজেই বোঝা যাবে। তৃতীয়ত ভাষাতত্ত্বের পদ্ধতিকে বিশ্লেষণ করে ত্রিপুরী ভাষা কোন্ প্রণালীতে চলে তা বের করে একটি নতুন অভিধান তৈরি করা। চতুর্থত প্রচারের মাধ্যমে এ ভাষাকে সর্বসাধারণের কাছে জনপ্রিয় করে তোলা। ত্রিপুরী ভাষার সমাদর যদি সর্বত্র বাড়াতে হয়, তবে প্রচুর পাঠ্যপুস্তক ত্রিপুরী ভাষায় রচনা করে সেগুলি উপজাতি সম্প্রদায়গুলিতে শিক্ষার মাধ্যমে সম্প্রসারণ করা প্রয়োজন।

যে অনাবিষ্কৃত সাহিত্যসম্পদ ত্রিপুরী ভাষায় লুকিয়ে আছে, তার বহিঃপ্রকাশ ঘটবে তখনই—যে সময় এই অবহেলিত ভাষা ককবরক ত্রিপুরার জনমানসে সর্বত্র উপযুক্ত সমাদর অর্জন করবে।

ককবরক ভাষাকে পরিপূর্ণ লেখ্য রূপ দিয়ে সম্পূর্ণভাবে উন্নত করতে হলে ত্রিপুরা সরকারের শিক্ষাদপ্তরের এদিকে আরো বেশি দৃষ্টি দেওয়া উচিত। অন্তত আমি তো তাই মনে করি।

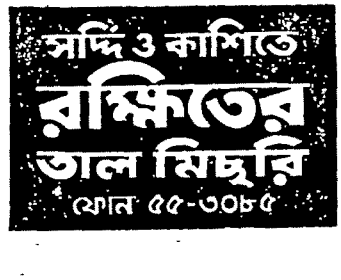

যুক্তফ্রন্ট সরকার

নয়া দিগন্ত

মাত্র কয়েকদিন আগে বিপুল অভিনন্দনের মধ্যে যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রিসভার অভিষেকপর্ব সম্পন্ন হয়েছে। সেদিন সারা ডালহৌসি স্কোয়ার অঞ্চলে যে স্বতঃস্ফূর্ত অভিনন্দনের জোয়ার বয়ে গিয়েছিল, রাজভবনে যে বিপুল জনসমাবেশ ঘটেছিল, রাজভবন থেকে রাইটার্স বিল্ডিংস পর্যন্ত যে অভূতপূর্ব দৃশ্য দেখা দিয়েছিল, তা সমস্ত প্রতিক্রিয়াশীল শক্তির মনে ত্রাসের সঞ্চার করেছে। জনতার এই বিপুল উচ্ছ্বাস ১৯৪৭ সালের পনেরোই আগস্টের দিনের কথা স্মরণ করিয়ে দিয়েছে। মানুষ যেন নতুন করে স্বাধীনতার স্বাদ পেয়েছে।

জনগণের অভিনন্দনধন্য যুক্তফ্রন্ট সরকারের কাছে জনগণের বিপুল প্রত্যাশা। সে প্রত্যাশা স্বর্গরাজ্য রচনার নয়—সে প্রত্যাশা সব দুঃখ ঘোচানোর নয়। রাজনৈতিক সচেতন পশ্চিমবাংলার মানুষ রাজ্যের সমস্যা সম্বন্ধে সচেতন। যাদুদণ্ড বুলিয়ে ২০ বৎসরের কুশাসনের সব অন্ধকারকে কাটিয়ে উজ্জ্বল আলোতে সারা দেশকে প্রদীপ্ত করে তোলার আশা কেউ করে না। সাংবিধানিক সীমাবদ্ধতা, কেন্দ্রীয় সরকারের বিরোধিতা, কায়েমী-স্বার্থের বাধাদান, আমলাতন্ত্রের অসহযোগিতার মত দুর্লঙ্ঘ্য কাঁটা সম্পর্কেও মানুষ সচেতন।

তবু পশ্চিমবাংলার মানুষ যুক্তফ্রন্টকে গদিতে বসিয়েছে সুস্পষ্ট রায় দিয়ে। এই রায় শুধু কংগ্রেসের বিরুদ্ধে নেতিবাচক রায় নয়—এই রায় যুক্তফ্রন্টের পক্ষে ইতিবাচক রায়। এই রায় এবার পাঁচ বৎসর শাসন চালাবার সুযোগ করে দিয়েছে যুক্তফ্রন্টকে।

মধ্যবর্তী নির্বাচনে কংগ্রেস জনগণের কাছে নতুন করে কোন কর্মসূচী পেশ করে নি। ১৯৬৭ সালে কংগ্রেসের যে কর্মসূচীকে পশ্চিমবাংলার মানুষ প্রত্যাখ্যান করেছিল তাই নিয়েই কংগ্রেস আবার মধ্যবর্তী নির্বাচনে জনগণের সামনে হাজির হয়েছিল। শেষ পর্যন্ত নিজেদের কর্মসূচীর উপর-ও তাঁরা আস্থা স্থাপন করতে না পেরে, নির্বাচনকালে মুখ্যত যুক্তফ্রন্টের বিরুদ্ধে নেতিবাচক প্রচার চালিয়ে জনসাধারণের সমর্থনলাভের চেষ্টা করেছে। জনসাধারণ কংগ্রেসকে সে সমর্থন দেয় নি।

অপরদিকে যুক্তফ্রন্ট অতীত দিনের অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগিয়ে সুনির্দিষ্ট কর্মপন্থা নিয়ে জনসাধারণের দরবারে হাজির হয়েছে। কংগ্রেসের কুশাসন, '৬৭ সালের জনগণের রায়কে পদদলিত করায় কেন্দ্রীয় সরকার ও কংগ্রেস দলের সমস্ত চক্রান্তকে খুলে ধরে ফ্রন্ট জনগণের সমর্থন চেয়েছে। এইটুকুই ফ্রন্টের নেতিবাচক প্রচার। এতে কংগ্রেসের বিরোধী মনোভাবকে আরো প্রকট করে তোলার কাজে সহায়তা করেছে সন্দেহ নেই।

কিন্তু আসলে জনসাধারণ সমর্থন করেছে যুক্তফ্রন্টের ৩২ দফা কর্মসূচীকে। এই কর্মসূচীর মধ্যে আছে একদিকে যেমন নতুন দিনের কর্মপদ্ধতির আভাস, তেমনি আছে বাধা আর প্রতিবন্ধকতার কথা। এই ৩২ দফার মধ্যেই ফ্রন্টের পক্ষে কি করা সম্ভব আর সম্ভব নয়, জনগণের কি করণীয় তার আভাস-ও আছে। জনসাধারণ এই কর্মসূচীতে আস্থা স্থাপন করেছে। জনগণ যে তাদের ভূমিকা সম্পর্কেও সজাগ তার প্রমাণ শুধু নির্বাচনের ফলাফলে মিলেছে তাই নয়, পরবর্তী দিন কয়টিতে জনসাধারণের আচার-আচরণের মধ্যে দিয়ে, ব্রিগেড প্যারেড গ্রাউণ্ডে বিজয়োৎসবের উচ্ছ্বাসে, শপথ গ্রহণের দিনে উদ্বেল জনসমুদ্রের তরঙ্গের মধ্য দিয়ে জনগণ তাদের ভূমিকা পালনের জন্য প্রস্তুতির কথা ঘোষণা করেছে।

এবার তাই কাজের পালা। একটি সৎ, কর্মঠ সরকারের কার্যাবলীর মধ্য দিয়ে মানুষ নতুন সমাজব্যবস্থা গড়ার দিকে এগিয়ে যাবে এইটুকুই জনগণের আশা। আজ তাই কাজ সুরুর দিনে যুক্তফ্রন্ট সরকারকে তাদের ৩২ দফা কর্মসূচীর কথা স্মরণ করিয়ে দিতে চাই।

কর্মসূচীর মুখবন্ধে মাত্র পৌনে নয়মাস শাসনকালে যুক্তফ্রন্ট সরকার নতুন কর্মযজ্ঞের যে উদ্যোগ গ্রহণ করেছিল তার আভাস দেওয়া হয়েছে। শুধু রাজনৈতিক পরিবেশ পরিবর্তনের দিকে নয়, শুধু আন্দোলনের পথ প্রশস্ত করার দিকে নয়, সম্পূর্ণ প্রতিকূল আবহাওয়ার মধ্য থেকেও প্রশাসনিক ব্যাপারে ফ্রন্ট সরকার যে দক্ষতা দেখিয়েছেন তার একটা সংক্ষিপ্ত ইতিহাস কর্মসূচীর ভূমিকায় আছে। পশ্চিমবাংলার রাজনৈতিক সচেতন মানুষ এই ভূমিকাকে সমর্থন জানিয়েছে।

তার পরে আছে ৩২ দফা কর্মসূচী। সাংবিধানিক সীমাবদ্ধতা আর কেন্দ্রীয় সরকারের বিরোধিতার কথা মনে রেখেই এই ৩২ দফা প্রণয়ন করা হয়েছে। কর্মসূচীর মধ্যে প্রতিটি দফার যে ইঙ্গিত আছে তার পিছনে আছে আরো অনেক কথা। ফ্রন্ট সরকার এখন গদিতে বসেছেন। বন্ধ বিধানসভার দরজা শীঘ্রই খুলবে। ইতোমধ্যেই মন্ত্রিসভার প্রথম বৈঠকে এবং মন্ত্রীরা দপ্তরে হাত দিয়েই কিছু কিছু কাজ সুরু করে দিয়েছেন। শুভারম্ভ সন্দেহ নেই।

কিন্তু এই সময়ে প্রতিটি দফার বিস্তৃত আলোচনার প্রয়োজন আছে। প্রতিটি দফা কার্যে রূপায়ণ করতে হলে চাই দৃঢ়তা, সততা আর বিপুল ঐক্যকে বজায় রাখা। এদিক থেকেই মন্ত্রিসভার কাছে তাদের-ই রচিত ৩২ দফার মধ্যে জনগণের যে আশা-আকাঙ্ক্ষার কথা আছে তা পেশ করতে চাই। সমস্ত পশ্চিমবাংলার ভবিষ্যৎ-ই শুধু নয়, সমগ্র ভারতের নতুন ইতিহাসের সঙ্কেত আছে এই ৩২ দফার মধ্যে।

কর্মসূচীর মুখবন্ধে বর্তমান অর্থনৈতিক মন্দা, অ-বৈজ্ঞানিক পরিকল্পনা, কংগ্রেস-শাসকদের সৃষ্ট অর্থের অভাব, বিদেশী সাহায্যের উপর ক্রমবর্ধমান নির্ভরশীলতা প্রভৃতি দুর্লঙ্ঘ্য বাধার কথা স্বীকার করেও বলা হয়েছে এসব সত্ত্বেও জনসাধারণের কিছু কিছু কাজ করা সম্ভব।

আমরা আগামী সংখ্যা থেকে সেই ধরণের কাজগুলির কথাই আলোচনা করে ফ্রন্ট সরকারকে তাদের দেওয়া প্রতিশ্রুতির কথা স্মরণ করিয়ে দেবো—তাদের কাজের দায়িত্ব আর বাইরের ও ভেতরের বাধার কথাগুলো মনে করিয়ে দিতে চাই।

—শ্রীসর্বদর্শী

[চলবে

সাপ্তাহিক বসুমতীর চাঁদার হার

সাপ্তাহিক বসুমতীর বাৎসরিক চাঁদা ডাকে ১৮ টাকা, ষাণ্মাসিক ৯ টাকা ও ত্রৈমাসিক ৪·৫০ টাকা। প্রতি সংখ্যা ৩০ পঃ।

তিন মাসের কমে গ্রাহক করা হয় না। গ্রাহক হতে হলে আপিসে অগ্রিম টাকা জমা দিতে কিংবা মনি অর্ডারে টাকা পাঠাতে হবে।

—কর্মাধ্যক্ষ, বসুমতী

জনমতের উৎস সন্ধানে

জীবন দে

গাছে গাছে মুকুলের সমারোহ তখনও সম্ভাবনার পথে। ঘনঘটায় আচ্ছন্ন চতুর্দিক। বার্তা পৌঁছে গেছে ডালে-ডালে, পাতায়-পাতায়। সৃষ্টির আনন্দ-বিভোর, অনাগত কিশলয়ের মধুময় হাতছানি। একটু বৃষ্টি কিংবা ক্ষেক প্রস্থ ঘন কুয়াশার অধীর অপেক্ষা। গেল মরশুমের ফলনকে কেবল ভাল বললেই সঠিক বলা হয় না। উপচে পড়েছিল এক কথায় বলতে পারা যায়। আমের ভারে বেসামাল ডাল-পালার ভেঙে পড়ার মধ্যেও অপার আনন্দ মিশেছিল কি-না কে বলবে এই আমের আশা মালদাবাসীদের জীবনে একটা প্রধান ভরসা। যেমন কেরালায় নারিকেল আর দার্জিলিংয়ে কমলালেবু।

শুধু এ কথাটা জানতেই যাঁরা মালদায় আসেন, হয় তাঁরা ফড়ে নয় তো দালাল। আমি তাঁদের কেউ নয়। আমার মতলব নির্বাচন প্রসঙ্গটা একটু তলিয়ে দেখা। নেহাৎ নভেম্বরেই শেষ হয় নি—তাই। এক রাউন্ড প্রচার প্রস্তুতি সব দলেরই হয়ে গেছে তখন।

এখানকার সবুজ ঘন আমের বন কার না মন কেড়ে নেয়? আমাকেও পেয়ে বসেছিল। বিশেষ করে রাম না জন্মাতেই রামায়ণ কাহিনী। মুকুল না ধরতেই বাগান নিয়ে ফাটকাবাজি প্রসঙ্গ। আমের মধ্যে সরু মোটা একটা করে [illegible] থাকে আমরা জানি। আমাদের [illegible]। উৎপাদন পদ্ধতিই [illegible] থেকে ভোগ [illegible] হয়ে থাকে, [illegible] যতই উপা- [illegible] কি না কেন— একাধিপত্য

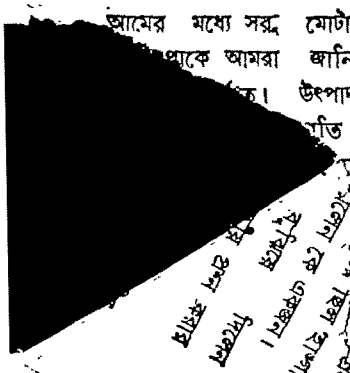

আমবাগানে [illegible]ন-পাট-তামাক [illegible]লার ক্ষেত- খামারে [illegible]গা হয়ে উঠল, বলতে পারব [illegible] একই দৃশ্য, এক অবস্থার বেড়াজাল সর্বত্র।

জমির জন্য সেখানে আছে বন্ধকী ব্যবস্থা। ফসলের উপর দাদন। এরই নাম কি কৃষিতে ধনতন্ত্রের অনুপ্রবেশ? যদি ফল কিংবা ট্রাক্টর এসে কাঠের লাঙলকে গিলে ফেলত, বুঝতে অসুবিধে ছিল না। সেখানে বিকাশ নেই, তাই ব্যবধানটা অন্তর্মুখী। জমির মালিকানা থেকে চাষী ঠিক বঞ্চিত হয়ে চলেছে। বেকারী বাড়ছে, উৎপাদিত ফসল গিয়ে জমা হচ্ছে মুষ্টিমেয় সুদখোর মহাজনের হাতে। তারপরও জমিহীন চাষী যদি গ্রাম ছেড়ে না পালায়, উৎপাদিত ধান-চালের ফড়েগিরি থেকে বড়জোর পাচার-কারীর দলে নাম লেখাতে পারে।

এ ব্যবস্থায় খাতকের মৃত্যু অবধারিত। পাঁচ শত টাকার দলিল হয় পাঁচ হাজার। গলাকাটা সুদ ছাড়াও জমি যাবে পাঁচ বিঘে। মহাজনের মুনাফা সবদিকে। লেভী নেই, নেই কোন কৃষি-করের ঝামেলা। সরকার তার হদিস পেলে তো! পুঁজির দাদন নিয়ন্ত্রণ করছে সব কিছুর মান থেকে কৃষকের জান পর্যন্ত। ক্ষয়িষ্ণু পুঁজিবাদের সর্বাধুনিক গ্রাম্য সংস্করণ। মধ্য চাষী পর্যন্ত এদের কাছে নস্যাৎ। কারণ লেভী থেকে কৃষি-করের যত বোঝা তার উপর। খরা-বন্যা-অজন্মা তো আছেই।

জমির বেনামদার এবং ভেস্ট জমির জবরদখলকারী জোতদারদেরই এটা পরিবর্ধিত সংস্করণ। মধ্য চাষীকে এদের থপ্পর থেকে উদ্ধার করতে পারাই এবারের নির্বাচনে প্রগতিশীল শক্তির সাফল্যের মাপকাঠি। নির্বাচন অন্তে দেখা যাবে কোথায় কে কতটা তা পেরেছে কি পারে নি। এখন কেবল আয়োজন।

গ্রামের নাম চ্যাংনা। কম করেও পঁচিশটি লিফ্ট হরিগেশান বা পাম্পিং মেশিন আছে এখানে। জলের কাঙাল লোভাতুর মনটা নেচে উঠল তাই দেখে। জমির বুক ফেটে চৌচির। একফোঁটা জল অভাবে পল্লী বাংলায় নিত্যকার হাহাকার। কোচবিহারে পঞ্চাশটা গ্রাম একত্র করেও এর অর্ধেক মেশিন পাওয়া যাবে কি-না সন্দেহ। কিন্তু কাছে গিয়েই হতাশ হলাম। অর্ধেকই বিকল হয়ে পড়ে আছে মেরামতি অভাবে। মালিক সখেদে বললেন, সারা ব্লকে একজন ইঞ্জিনীয়ার থাকলেও এমন বিপদ ঘটত না। আমরা না হয় পয়সা দিয়েই সারিয়ে নিতাম। এখন ইঞ্জিনীয়ার খুঁজতে কলকাতা যেতে হবে। যাতায়াত খরচই পড়বে কত জানেন?

নির্বাচনী সভাগুলোতে হাজার বার শুনতে পাওয়া আশি হাজার বেকার ইঞ্জিনীয়ারের সংখ্যাটা আমাকে প্রায় অস্থির করে তুলেছে ততক্ষণে। একটা নিশ্বাস ত্যাগ করা ভিন্ন কি-ই বা করতে পারি? মাঠ ভরে আছে আই-আর এইট্ থেকে তাইচুন এবং তাই-নানের আবাদ। নতুন পদ্ধতির চাষ-বাস, সার-জল-বীজ নিয়ে আধুনিক কৃষি-বিজ্ঞান মাথা তুলতে বদ্ধপরিকর। সেখানেও বাধা। তার চেয়েও যার আধি-পত্য, তার নাম অবহেলা। ভাগ্যক্রান্ত

জঙ্গে পাকোয়াহাট অভিমুখে চলতে সুরু করলাম। দূরত্বটা তেমন কিছু নয়।

এগিয়ে চলেছি একটা কুমোরপাড়ার ভেতর দিয়ে। গেল রাত্রে এখানেই সমগ্র একটি পরিবারকে দেখেছি অগ্নিদেবতা সাক্ষী করে কুণ্ডলী পাকিয়ে শুয়ে থাকতে। কে বলবে নিঃস্ব এবং রিক্ত মানুষ কিংবা কুকুর অথবা বিড়ালছানা? বসন এবং ভূষণের দায় থেকে প্রায় মুক্ত স্বাধীন দেশের বিশিষ্ট নাগরিক। চলতি ভোটের ভাগ্যবিধাতা। মাঘের হাড়-কাঁপানো শীতে হাত-পা গরম করব ভেবেছিলাম। মনটাও পাছে অসাড় হয়ে যায়, পালিয়ে এলাম তাই।

ডাঙ্গি থেকে ডোবার রাস্তা দেখতে বড় সুন্দর। ঢেউয়ের তালে তালে যেন ক্রমশ নিচের দিকে নেমে গেছে। গ্রামের গন্ধ। বাসরুট আছে। তবে হোটেল নেই এখনও। হাটের দিন জমজমাট। অন্যদিন বাস-টাইমে যা-কিছু নতুনত্ব।

একটা সেলুন আছে। হিন্দুস্থানী কে একজন মালিক তার। সাইনবোর্ডটা আগে লক্ষ্য করি নি। 'হিয়ার কাটিং' সেলুন। যে বাস-এ এসে নামলাম তার মালিক অবশ্যি বাঙালী। ভিড়ের প্রসঙ্গটা না তোলাই ভাল। আমি কিন্তু আরামেই বসে এসেছি। দৈনিক সংবাদপত্র এক-খানাই কেবল নজরে পড়েছে। তাও রাখেন রেশন দোকানের মালিক জনৈক ডিলার। তবে সংবাদপত্রের লোক হিসেবে আমাকে তারা খাতির করে স্টাফ সিটে বসিয়ে দিলেন। 'কর্তিপক্ষের' অনুমত্যানুসারেই তা নির্দিষ্ট। নির্দেশসূচক হরফ ক'টি মাথার ওপর জ্বল জ্বল করছে। বানানের বিশুদ্ধতা মার্জনীয়। হাই রোডের উত্তর পাশেই চায়ের দোকান। ট্রানজিস্টার আছে। কলকাতার নাচগানে সেখানে মুখরিত প্রাণ। শালপাতায় মোড়া-চুরুট টেনে মৌতাত করছেন সাঁওতাল ভোটদাতা। কাছ ঘেঁষে বেঞ্চে গিয়ে বসলাম। আচ্ছা মোড়ল-ভোট দিবি কাকে?

কাচিয়া ধান, সঙ্গে সঙ্গে জবাব দিলেন তিনি।

সে তো কমিউনিস্ট। ওরা রাজ্য পেয়ে পাঁচ টাকা চালের দাম করেছিল মনে নেই? —'পাঁচ হোক দশ হোক, হামরা একটা সরকার করলাম, তুরা খারিজ করিলি কেন এ?' পাল্টা আক্রমণে আমার তখন উল্টে পড়ার অবস্থা। ডঃ ঘোষের সভাতেও এটা দেখেছি। পচানি খেয়ে এসেছিল এক সাঁওতাল। করযোড়ে বলল, 'তুই তো মন্ত্রী ছিলি, কেন্ এ পাঁচ টাকা চাল করিলি বল হামারে?' উদ্যোক্তারা কয়েক-জন ধরে ফেলল তাকে। একদম শুয়ে পড়ল তখন। কিন্তু বক্তব্য চলছেই। 'হামারে বলিয়া দে, কেন্ এ তুই পাঁচ টাকা চাল করিলি?' ডঃ ঘোষ তার কি জবাব দিলেন তিনিই জানেন।

বহু সংগ্রামে সমৃদ্ধ রাজমহল সংলগ্ন মালদহের আদিবাসী জীবন। কত দুঃখ আর কষ্টে তাদের দিন কাটে না দেখে কল্পনা করা যায় না। একদম মাটির মানুষ যাকে বলা যায়। প্রাক্তন এম-পি শ্রীসরকার মুর্মুর সান্নিধ্যে আসবার সৌভাগ্য আমার হয়েছিল। কোনদিন ভুলব না তাকে। লক্ষ টাকা দিয়েও কারো সাধ্য নেই একটা সাঁওতাল ভোট কেউ বাগাতে পারে। 'হামি কি হাঁস না মুরগী, কিনতে চাস্ তুই?' সঙ্গে সঙ্গে জবাব পাবেন তার।

তীর-ধনুক-শিকার, নাগরা-মাদল-নাচ আর গানেভরা জীবন তাদের। শিশু ভোলানাথেরই এক অপূর্ব সংস্করণ। পাঁচ-সাতদিন হামেসাই কাটিয়ে দেয় সামান্য গম কিংবা পচানি খেয়ে! চাঁদনী রাতে বাঁশীর সুর এবং ডুং-ডুং মাদলের বাজনা প্রায় বাঁধা। পল্লী ছেড়ে গিয়েও যা ছেড়ে চায় না, এমনি তার মায়া!

গ্রামটার নাম সিমলা। দীপকে হারি একটা ভোট দিবে। বললেন আদিবাসী ভোটদাতা।

দীপ আবার কেন? আমি আপত্তি জানাই। সবাই জানে জনসঙ্ঘের প্রতীক চিহ্ন প্রদীপ।

—দীপ হামারে বিদেশে খুব সম্মান দিছে।

তবে তো মুস্কিল-ই! দেশের মাটিতে হলেও কোন কথা ছিল না। বিদেশে আপ্যায়ন। কোথায় সে বিদেশ?

বুলবুলি, নির্বিবাদে বললেন তিনি। হিসেব করে দেখলাম এখান থেকে তার দূরত্ব বারো থেকে চোদ্দ মাইল। কম কথা নাকি?

সব শেষে যাকে পেলাম তিনিও এক সাঁওতাল। দীপকে তারও একটা ভোট দিতে হবে। আচ্ছা মুস্কিল! দীপকে ভোট দিয়ে কি হবে? প্রশ্ন করি।

—অত বড়ো মন্ত্রীঠো হামার বাড়ি, গাড়ি লিয়ে গেল—সম্মান দিতে হবে।

এটা কথা ঠিক, জনসঙ্ঘের নেতারা বেশির ভাগই নধরকান্তি চেহারা। যে-কোন একজনকে মন্ত্রী বলে চালাতে বেগ পেতে হবে না। হাঙ্গেরী [redacted] আজ আর নেই। এক সময় [redacted] কোথায়? প্রশ্ন ক[redacted]

কোচবিহারে [redacted] আমাদের কমরেড। [redacted] সাহস হয় নি কারো!

কংগ্রেসের গাড়ির অভাব নেই। বাড়ি গাড়ির সমস্যাই সেখানে প্রবল। প্রত্যেকেই চায় সামনে গিয়ে বসতে। পেছনে বসার লোক নেই। —সবাই তোরা একটা করে জীপ বায়না দে। তারপর সামনে গিয়ে বস। বিরক্ত হয়ে বললেন সহকারী কংগ্রেস নেতা।

পাঁচ টাকা চাল্ করল কারা? যুক্তফ্রন্ট আবার কারা? মোটা কালির টানে দেয়ালের লিখন। শিলিগুড়ি শহরে এক মাতাল বারকয়েক পড়ল সেটা।

কেন ডালের কথা লিখিস্ নি শুনি? তিন টাকা ডাল করেছিস্ ভুলে গেলি? হাওড়া স্টেশনে কত ডাল ছিল বল দেখি? আমার শালা সব মনে থাকে। তোরা গোপন করলে কি হবে? বিড়-বিড় বকতে থাকে সে।

১৯৬৯ তে আপনার ভাগ্য

যে-কোন একটি ফুলের নাম লিখিয়া আপনার ঠিকানাসহ একটি পোস্টকার্ড আমাদের কাছে পাঠান। আগামী বাংলামাসে আপনার ভাগ্যের বিস্তারিত বিবরণ আমরা আপনাকে পাঠাইব, ইহাতে পাইবেন ব্যবসায়ে লাভ লোকসান, চাকুরিতে উন্নতি, বদলী, জন্ম, বিবাহ ও সুখ-সমৃদ্ধির বিবরণ; আর থাকিবে দুষ্ট-গ্রহের প্রকোপ হইতে আত্মরক্ষার নির্দেশ। একবার পরীক্ষা করিলেই বুঝিতে পারিবেন।

PT. DEV DUTT SHASTRI
RAJ JYOTISHI (B. M. W)
P. B. 86, JULLUNDUR CITY

ঐ সুন্দর কেশ বিন্যাস অতি দীর্ঘকাল সুন্দর থাকবে না - - -

শেলাক ব্যতীত

চুল আটকাবার প্রসাধন সামগ্রীতে, এরোসলযুক্ত ও এরোসলহীন কেশ সিঞ্চনে উভয়তই শেলাকেই প্রাথমিক আঠা।

শেলাকসমূহ ফ্লেক্সোগ্রাফিক কালি, পেষাই কল, পিল, কনফেকশনারী, জলীয় বাষ্প সেট করা কালি, প্রসাধন, বৈদ্যুতিক ইন-সুলেটর, কোল্ড টপ এনামেল ইত্যাদিতে বিভিন্ন প্রান্তিক ব্যবহার সামগ্রী পছন্দমত প্রস্তুত হয় পৃথিবীর বৃহত্তম শেলাক প্রস্তুতকারক, এঞ্জেলো ব্রাদার্স কর্তৃক। ইহারা নিখুঁতভাবে স্পেসিফিকেশন অনুযায়ী প্রস্তুত হয়। সমুদয় এঞ্জেলো গ্রেডই আই-এস-আই স্ট্যান্ডার্ড ও এতদ্ব্যতীত কঠোরতর এঞ্জেলো স্পেসিফিকেশন মত। সবচেয়ে বড় কথা এই যে, এঞ্জেলো ব্রাদার্স গুণের সমতা রক্ষা করেন।

Angelo Shellacs

এঞ্জেলো ব্রাদার্স লিমিটেড, কাশীপুর, কলিকাতা-২

লগ্ন তখন সমুপস্থিত। প্রচারে আর নে নেই। সবাই ব্যস্ত সংগঠন গড়তে। াতের অন্ধকারে দলবিশেষের গাড়ি তখন ছুটছে আর ছুটছে। একবাক্যে সবাই বলল টাকা ঢালছে ছিনিয়ে নে। ধর্ শালা-দের। হৈ-চৈ পড়ল একটা। ছি-ছি ধিক্কার পড়ল অনেক। অর্থাৎ সময়বিশেষে গাড়ি কিভাবে সর্বনাশের কারণ হতে পারে স্পষ্ট দেখতে পেলাম। বেচারা দুর্গা সেন। ভোটের মাত্র সাতদিন আগে জীপ গাড়িটি নিমজ্জিত হলো ফুলহরা নদীতে। মাইকটা ভেসে গেল। অল্পর জন্য বেঁচে গিয়ে নিজে শুয়ে থাকলেন চারদিন।

রাত তখন দুটো। ফ্রন্টের এক নির্বাচনী অফিসে এসে কান পাতলাম। আকস্মিক হাসিতে ফেটে পড়লেন কারা। আমাকে দেখতে পেয়ে নয় তো? তা নয়। কবিগুরুর ভাষায় 'নদী আপন বেগে পাগলপারা।' শুরেছিলেন কয়েকজন কৃষক-কর্মী। হাসির গমকে কম্বল সরে গিয়ে মুণ্ডুগুলো বাইরে এসে ঠোকাঠুকি লাগবার উপক্রম। জম-জমাট ব্যাপার!

কংগ্রেস রাজত্বে বৌকে পৃথক দেখিয়ে পঁচাত্তর বিঘে জমি রেখেছে কে একজন। ফ্রন্ট যদি গদিতে বসে, তার উপায় হবে কি? বৌ কিংবা জমি কোন্‌টা ছাড়ে সেটাই ছিল আলোচ্য বিষয়। হাসির গমকে সেহমনের ক্লান্তি ধুয়ে নিচ্ছিলেন তাঁরা। পৃথক যখন বলেছে, এখন ডাইভোর্স করলে তবেই রক্ষা। হা-হা-হা।

'যদি ক্ষেত-খামারে শান্তি চাও, কংগ্রেসকে ভোট দাও।' পশ্চিম দিনাজপুরের এক জনসভায় দেখলাম ফ্রন্টের বক্তাকে তা ছিন্ন-ভিন্ন করতে। অশান্তিটা কার জমিতে—আপনার আমার জমিতে অশান্তি আছে কোন? নেই। সবাই জানে কংগ্রেসের পঁচাত্তর বিঘে সিলিং আমরা স্বীকার করে নিয়েছি। ভাল বীজ-সার ও জল দিয়ে আমরা চাই এই জমিতে অধিক ফসল তুলতে। কিন্তু ভেস্ট জমি যে জোতদার ভোগ করছে, হাজার হাজার বিঘে যারা বেনামা করেছে তাকেও কি ছেড়ে দিতে হবে? এদের জমিতে শান্তি ফিরিয়ে আনাই ঐ পোস্টারের উদ্দেশ্য। কংগ্রেস তার পূর্বঘোষিত ভূমিনীতি থেকেও জমি চোরদের স্বার্থে আজ সরে যাচ্ছে না কি? প্রচণ্ড রকমের বিরোধিতা আছে আমাদের সাথে তাই। আমরা ক্ষমতা পেলে কোমরে দড়ি এবং হাতে হ্যাণ্ডকাপ লাগিয়ে রায়গঞ্জের রাস্তায় ওদের নিয়ে মিছিল করব। তখন দেখবেন বাপ্-বাপ্ ডাক ছেড়ে, জমি কেমন বেরিয়ে আসে! সহস্র জনতা করতালিতে সমর্থন জানায় বক্তাকে।

কালিয়াচক থেকে পঞ্চানন্দপুর। দীর্ঘ দশ মাইল কাঁচা রাস্তা টমটম ছাড়া পাড়ি দেওয়া অসাধ্য। একটা ঘোড়া নয়জন যাত্রী। গঙ্গার তীরে তীরে সায়াহ্নের মৃদুমন্দ হাওয়া। আবছা অন্ধকারে হিজোলিত গাছ-গাছালি। একটু অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছিলাম। কোচম্যান ছেলেটি কখন যে নেমে পড়েছে খেয়াল করি নি। লাগাম হাতে তীরবেগে ছুটে চলেছে সে। পেছনে ঘোড়া, গাড়িতে আমরা। গাছে লেগে কিংবা গর্তে পড়ে যাতে চুরমার না হয় তারই জন্য এ ব্যবস্থা। সাদা কেরোসিন কোথায় যে আলো জ্বালবে? গাড়ির সাথে আড়ি দিয়ে আমার সমস্ত শরীর রি-রি করে উঠল। এরই নাম বাংলা দেশের জীবিকা আর যৌবন! ঘোড়া ছুটছে দশ মাইল। মানুষ এগারো মাইল বেগে ধেয়ে তার রাশ টানছে! এককোঁটা কেরোসিন অভাবে। শত শত রেশন কার্ড দেখেছি গ্রামাঞ্চলে। করেক মাসের মধ্যেও এক ছটাক চিনি ওঠে নি তাতে। এমন কি ঈদের দিনেও না। বামনগোলাতেই দশ-বারো হাজার উদ্বাস্তু আবার কড়ই পুন নি এ পর্যন্ত।

পথ-ঘাট বাইশ বছরে কম হয় নি। বাস, ট্যাক্সি, মোটরও যে কত বৃদ্ধি পেয়েছে তা কে জানে? কিন্তু প্রদীপের তলা এখনও অন্ধকার তো অন্ধকারই। আলাপে-আলাপে উঠে পড়লেন প্রৌঢ় এক চাষী। বালুরঘাট যাবেন তিনি হেঁটে। কম করে সাতাশ মাইল রাস্তা। হেঁটে যাবেন কেন এত গাড়ি-ঘোড়া থাকতে?

পয়সা নাই বাবু। কিন্তু ডাকাতি কেস্। হাজিরা দিতে হবেই।

আচ্ছা ডাকাত তো বাস ভাড়াও জোটে না? আমার কথায় ঘরসুদ্ধ লোক হেসে ফেলল। টাকা বাবু। দারোগা যখন টাকা খায়, এরকমই করে। গরীব হওয়ার মধ্যে অনেক বিপদ।

জানা-অজানা শত-সহস্র লোক ছুটছে। নির্বাচন এসে গেছে। গুজব উঠেছে ভোটের দিন নাকি বিনা পয়সাতেই মাছ ধরা চলবে। এলাকা বিশেষে জোর গুজব রবিবার খয়রাতি বিলির দিন। সোমবার ভোট। একটা ঢোলও নাকি হাটে দেওয়া শেষ। কে দিল সঠিক জানে না কেউ। তাছাড়া দুটো করে ভোট। ওকে একটা, তার সঙ্গে আমাকেও একটা দিস্। প্রস্তাবটা খুব খারাপ লাগে নি অনেকের কাছেই। বরাবর তো দুটো করেই থাকে!

গাজল কেন্দ্রে ফ্রন্টের চারজন কর্মী গুরুতররূপে আহত অবস্থায় হাসপাতালে ভর্তি হলেন। কংগ্রেসীরা মেরেছে! হবিবপুরের বানপুরে তার প্রতিশোধ নেওয়া হলো। এখানে হাসপাতালে যায় একজন। অর্থাৎ মুখ থেকে হাতে এসে গেছে ব্যাপারটা। কে কার লোক ধরতে পারা কঠিন কিছু নয়। গাজলে আহত কমরেড তমিজউদ্দিন রক্তাক্ত কাপড় জামা এবং মাথায় ব্যাণ্ডেজ সহ নামলেন এসে পাকোয়াহাটের মিছিলে। সবার সামনে আছেন তিনি। পেছনে কমরেড নিমাই মুর্মু, শচী রায় এবং অন্যান্য। কেবল পার্টির চেহারাই নয়, পার্টিতে পার্টিতে পরস্পরের সম্পর্ক এতে বদলে যাচ্ছে। এত বেশি ঘনিষ্ঠ, একমাস আগেও যা ভাবতে পারা যায় নি।

কংগ্রেসের জোর প্রচার, জ্যোতিবাবুকে তাঁরা হারাচ্ছেন! অমরবাবু দাঁড়াতেই সিটটা একদম মার্জিনাল হয়ে গেছে! গ্রামে পর্যন্ত পৌঁছে গেছে এটা। দেখতে এলাম তাই। শহরে ঢুকেই নজরে পড়ল—দেয়ালের গায়ে অসংখ্য পোস্টার। 'সাম্রাজ্যবাদের দুই ফ্রন্ট। কংগ্রেস ও যুক্তফ্রন্ট।' এন, এস, সি। হাওড়ায় তার জবাব পাওয়া গেল। 'সাম্রাজ্যবাদের দুই প্রহরী। কংগ্রেস ও হঠকারী'—সি-পি-আই-এম। আমার নজর বরানগরের দিকে।

টালা পুল ধরে চলেছি। 'বাঙালী জাগো'। পুলের গায়ে কালির হরফে লিখে রেখেছে। বি-এন-ভি-পি। তার ঠিক নিচেই অন্য এক হাতের লেখা 'কাঁচা ঘুম ভাঙাইও না।' নাম-গোত্রবিহীন। উদ্বাস্তু অধ্যুষিত পল্লী, শান্তিনগর। কংগ্রেসের রিক্সা ফেরৎ গেছে। তার পরিবর্তে লাইন দিয়ে হেঁটে চলেছেন মেয়েরা। নেতৃত্ব দিচ্ছেন মুসলিম ঘরের বৌ! বিস্মিত হতচকিত আমি কিছুতেই মনে করতে পারছি নে—কোথায় তাকে দেখেছি? ঢাকা, করাচী না কলকাতায়? জন-জাগরণ একাকার করে দেয় নি তো!

অশীতিপর বৃদ্ধাও বসে নেই। হাত নাচিয়ে বললেন 'ছ্যামড়া ছেমড়িগুলোর কাম-কাজ নাই—হি-হি কইরা বেড়ায়। তাতে নিয়া আইল অপ্টমেশিন কতগুলা। কে কইল ঐগুলা আনতে? ওরা দেখবি হারবেই।' গ্রামে ছিলাম, অটোমেশান প্রসঙ্গটা ভুলেই গিয়েছিলাম প্রায়। বৃদ্ধার কথার ঠিক বুঝে নিলাম; পরিত্রাণ নেই। ওরা যে কারা তার মধ্যেই আমার জানা হয়ে গেছে।

কর্মখালি

আমাদের বিশ্ববিখ্যাত জাপান মডেল পকেট ট্রানজিস্টারের অর্ডার সংগ্রহ করিবার জন্য পুরা বা আংশিক সময়ে মাসিক ৪৫০৲ টাকা অথবা শতকরা ৩৫৲ কমিশনে সারা ভারতে স্ত্রী বা পুরুষ প্রার্থী আবশ্যক। স্যাম্পেল সেটের জন্য নিম্নঠিকানায় আবেদন করুন।

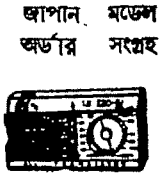

Employment Officer
(B.W.C.—88) Box 1564 Delhi-6

[পূর্ব-প্রকাশিতের পর]

তিমিরপ্রান্ত ডুয়ার্স

॥ অগ্নিবর্ণ ॥

॥ এক ॥

প্রাচীন ডুয়ার্স সম্পর্কে জানতে গেলে সরকারী নথীপত্রের সাহায্য নিতে হয়। একালের লোক ডুয়ার্স সম্পর্কে জানেই বা কী। জানার আগ্রহেরও নিতান্ত অভাব। ইতিহাস? ইতিহাস বলতে আছেই বা কী। ছেলেবেলায় যাকে আমরা ইতিহাস বলে জেনেছি তাকে ইতিহাস বলে কি? সে তো কিছু রাজার ব্যক্তিগত যুদ্ধবিগ্রহ, সার্থকতা ও ব্যর্থতার কাহিনী। কবে কোন্ বংশে কোন্ রাজা, সেনাপতি কিংবা দুর্ধর্ষ অত্যাচারী জন্মেছিলেন, তারপরে কি করে তার পতন, সেই কথাই ইতিহাস ফলাও করে প্রচার করেছে। সাল তারিখ সন শতাব্দী পুঞ্জপুঞ্জ হয়ে আছে সেখানে। তা-ও মোটামুটিভাবে একটা বিশেষ পটভূমিকায়। এক বিশেষ অঞ্চলকে কেন্দ্র করে ভারত-ইতিহাস আবর্তিত। বাংলাদেশের উত্তরপ্রান্তের এই ক্ষেত্রটুকু তাই অনেকটা নীরবেই রয়ে গিয়েছে। যে-বিশেষ জাতীয় ইতিহাসের কথামালায় সাধারণ মানুষ ও তার আশা-আকাঙ্ক্ষার জীবন্ত প্রতিচ্ছবির রূপায়ণ নেই, সেখানে উপেক্ষিত অনাদৃত ডুয়ার্স সম্পর্কে তো আশা করাই চলতে পারে না।

বলতে আরম্ভ করে বন্ধুটি থামলেন। চেনস্মোকার মানুষ। যতক্ষণ কথা ও কাজ চলে, রাত্রির মধ্যপ্রহরে ঘুম না-আসা পর্যন্ত তিনি একটানা সিগারেট টেনে চলেন। একটির থেকে আরেকটি ধরিয়ে নেন। অবলীলাক্রমে টানতে থাকেন। সিগারেট আছে তিনি নেই এমন অবস্থা কল্পনা করা শক্ত। তাই কথার মাঝে মাঝে এটুকু সময় তাঁকে দিতেই হয়।

নতুন সিগারেটটা দু' আঙুলের মাঝে ধরাতে যতটুকু সময় লাগল, তারপর তিনি আবার বলতে আরম্ভ করলেন একমুখ ধোঁয়া ছেড়ে।

যেখানে মানুষ আছে, সেখানেই আছে ইতিহাস—এ-সত্যটি বিস্মৃত হবার নয়। কাগজে-কলমে ইতিহাসকারের গবেষণা-মষ লেখা ডুয়ার্সকে নিয়ে নেই বটে, কিন্তু এ-ব্যাপারে ইংরাজ শাসকেরা এ-অঞ্চলে বিস্ময়কর উদাহরণ রেখে গেছেন। ভাবতে আশ্চর্য লাগে, ডুয়ার্স ইংরাজ অধিকারভুক্ত হবার পর থেকে এ-অঞ্চলে যাঁরা সিভিলিয়ন হয়ে এসেছিলেন, শাসনের মধ্যেও কিন্তু এর মানুষ ও তার জীবনধারণ সম্পর্কে তাঁরা কৌতূহল হারান নি। তাঁদের সরকারী নানা চিঠির গুরুত্বপূর্ণ নোট, ফাইল-পত্র ইত্যাদিতে তার পরিচয় ছড়ান রয়েছে। এবং সে-পরিচয় আদৌ ভাসা-ভাসা আকারে নয়। জীবন্ত আকারে উপস্থিত বলা চলে। একটা জাতির বিস্ময়কর জীবনীশক্তির প্রমাণ এগুলিতেও সুস্পষ্ট।

ভাবতে আশ্চর্য লাগে কথাটা। সাতসমুদ্র তেরো নদী পেরিয়ে বেণিয়া বেরিয়েছিল বাণিজ্যের সওদা করতে। তার লোক-লস্কর পাইক-বরকন্দাজ, নানা দাঁড়ে উৎসাহের কত চঞ্চল্য। ঢেউতে ভাসতে ভাসতে তারপর নৌকো লাগল এ-তটে। কিন্তু ইংরাজ শুধু বাণিজ্যই করে নি। শাসন ও শোষণ করেছে বিস্তর। তার ফাঁকে ফাঁকে নিজেদের বিস্ময়কর শিল্প, শিক্ষা এবং সাহিত্যের ভাণ্ডারও আমাদের সামনে খুলে দিয়েছে। রবীন্দ্রনাথই প্রথম এই সত্যটি আবিষ্কার করেন। তিনি নমস্য। ভারত-আত্মার শাশ্বত বাণীমূর্তি তিনি। ছোট ও বড়ো ইংরাজের বিচারটি তাঁরই। রক্তচক্ষু শাসকদের পিশাচ রূপটি যেমন তাঁর চোখে আটকায় নি, তেমনি ডেভিড হেয়ার, বেথুন প্রমুখ মনীষীদের দানও তিনি আমাদের জাতীয় জীবনে চিহ্নিত করতে ভোলেন নি।

যাক সে কথা। ইংরাজ জাতির শাসনতান্ত্রিক নিষ্ঠার কথা বলছিলাম। ডুয়ার্স শুধু তাঁরা অধিকারে রেখেই ক্ষান্ত হন নি। সদা সতর্কভাবে নিষ্ঠার সংগে গ্রহণ ও রক্ষণাবেক্ষণ করেছেন। বৃটিশ সাম্রাজ্যের বর্তমান সীমার গুরুত্ব তাঁরা বুঝেছিলেন। আর সেদিনকার ডুয়ার্স তো কোনো এক বিশেষ জাতির বাসভূমি নয়। এককথায় ডুয়ার্স এক মিলিত জাতির মেলা। সেদিনও যেমন আজো তাই। এক বিচিত্র সহাবস্থানের প্রত্যক্ষ লীলাক্ষেত্র ডুয়ার্স। একদিকে তা হিংস্র আরণ্য প্রকৃতির কোলে অবাধে লালিত অগণিত জীবজন্তুর অধিষ্ঠান। সর্প-ব্যাঘ্র-হস্তী-গণ্ডার-ভল্লুক সংকুল এক ভয়ংকরের লীলাভূমি। অন্যদিকে বিচিত্র মানুষ ও তার সভ্যতা, নানা জাতি, উপজাতি, বর্ণ ও শ্রেণী। এবং তাদের মিশ্র রীতি-নীতি-আচার ও সমাজব্যবস্থা।

বন্ধুটি একটানা বলে চলেছিলেন। তাঁকে থামিয়ে দিয়ে প্রশ্ন করলাম, এ-সম্পর্কে প্রাচীন সেনসাস্ কিছু আছে কি?

বন্ধুটি মাথা নাড়লেন। কোটের পকেটে মস্ত হাতটা চালান করে দিয়ে বার করে আনলেন একটি নোট-খাতা। বললেন, নিশ্চয় আছে।

অবাক আমি হই নি। বন্ধুটির বিস্ময়কর পঠন-পাঠনের সংগে আমি পরিচিত। জ্ঞান আহরণে তাঁর সীমাহীন আনন্দ। এবং এ-ব্যাপারে তাঁর কোন্ শুচিবাই নেই। সব জাতীয় জিনিষেই তাঁর সমান রুচি।

জীর্ণ নোট-খাতাটির পাতা ওল্টাতে ওল্টাতে তিনি গম্ভীর হয়ে গেলেন। তারপর এক জায়গায় থেমে বললেন, এই যে পেয়ে গেছি। ১৮৭২ খৃস্টাব্দে ডুয়ার্সের লোকসংখ্যা ১০০,১১১ জন। ১৮৮১ খৃস্টাব্দের সেনসাস্ রিপোর্ট বলছে লোকসংখ্যা ১৮২,৬৮৭ জন। আর ১৮৯১ খৃস্টাব্দের সেনসাস্ রিপোর্টে দেখা যাচ্ছে ২৯৬,৯৬৪ জন। সমীক্ষায় দেখা যাচ্ছে ১৮৮১ থেকে ১৮৯১ এই দশ বছরের মধ্যে লোকসংখ্যা বেড়ে গেছে ডুয়ার্সে ১১৪,২৭৭ জন। এই লোকসংখ্যারও একটি হিসাব পাওয়া যাচ্ছে—দার্জিলিং থেকে এসেছে ১,৫৮৮ জন। দিনাজপুর থেকে ৫০৫ জন, রংপুর থেকে ১০,১০১ জন, কুচবিহার থেকে ৩২,২২৪ জন। বাংলাদেশের অন্যান্য জেলা থেকে ১১,৩৬৪ জন, বিহার থেকে ৮,৪৯১ জন, উড়িষ্যা থেকে ২৯২ জন, ছোটনাগপুর থেকে ২০,৩৪১ জন, অন্যান্য প্রদেশ থেকে ২৯,৩৭১ জন। দার্জিলিং থেকে যারা আসে তারা সাধারণত আসে চা-বাগানগুলিতে কুলির প্রয়োজন মেটাতে। দিনাজপুর ও রংপুর থেকে আসে কৃষকেরা। কুচবিহার থেকে যারা আসে তাদের একটা প্রধান অংশ চকানিদার ও আধিয়ার শ্রেণী। এরা

ফালাকাটা ও আলিপুরদুয়ার অঞ্চলে জমি সংগ্রহ করে জোতদার হয়ে বসে। বিহার, ছোটনাগপুর, উড়িষ্যা অঞ্চলের অধিকাংশ লোকই আসে চা-বাগানে কুলির জীবিকায়। রাঁচার ওঁরাওদেরও অনেকেই ময়নাগুড়ি, ফালাকাটা, আলিপুর অঞ্চলে জোতদার হয়ে বসে। এই সব মানুষের নানাবর্ণ ও শ্রেণীর বিভাগ করতে গিয়ে দেখা যায় সেখানে ছিল—বেণিয়া, ভুইমালি, ভুটিয়া, ব্রাহ্মণ, চামার, গোয়ালা, যোগী, জালিয়া, কাহার, কৈবর্ত, লোহার, কামি, কপ্পলী, কায়স্থ, ক্ষত্রিয়, কুম্ভর, কোচ, লিম্বু, মেচ, মুণ্ডা, চণ্ডাল, ওঁরাও, রাজপুত, সাঁওতাল, সূত্রধর, টাটোয়া, ফলু, হিন্দুস্থানী এবং মুসলমানদের মধ্যে শেখ, পাঠান প্রভৃতি শ্রেণী।

এই বিরাট ও বিচিত্র মানবসমাজ সম্পর্কে শাসক ইংরাজ যে সহানুভূতি-সম্পন্ন ছিলেন, তার প্রমাণ তাঁদের চিঠিপত্র ও ফাইল ইত্যাদির মধ্যে পাওয়া যায়। সেগুলি পাঠ করতে বসলে তাঁদের বিস্ময়কর উৎসাহ, উদ্যম ও কর্মশক্তির প্রশংসা না করে পারা যায় না। ডুয়ার্সের সে-যুগের নানা মানুষ—রাজবংশী, কোচ, মুসলমান, মেচ, গারো, ভুটিয়া, টোটো প্রভৃতি শ্রেণীর প্রতিদিনের জীবন, রীতিনীতি, ধর্ম, সমাজ, কৃষি, ভাষা এই সব নিয়ে তাঁদের কৌতূহল ও আগ্রহ সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে। গতানুগতিক শাসনের শিথিলোলা স্রোতে তাদের কর্মজীবন যে আবর্তিত হয় নি এগুলিই তার প্রমাণ।

কিন্তু যাক সে-কথা। ডুয়ার্সের অবস্থান সম্পর্কে একটি সরকারী নথীর বক্তব্য উদ্ধৃত করা যাচ্ছে—তা থেকেই ভৌগোলিক ডুয়ার্সের অবস্থান-ক্ষেত্রটি স্পষ্ট হয়ে উঠবে আশা করি।

নোটবইটির পাতা উল্টে চলে গেলেন বন্ধুটি। তারপর এক জায়গায় থেমে একটি বক্তব্যের প্রতি আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করলেন। বললেন, এই জায়গাটি পড়ছি। Mr. D. H. E. Sunder's—কৃত পুরাতন সার্ভে ও সেটেলমেণ্ট রেকর্ডস বলছে —

"It forms a parallelogram with a length, east and west, of 86.75 miles, and breadth, north and south, of obout 38 miles. It lies between the parallels of 26°13′ and 27° north latitude, and between 88°30′ and 89°55′ east longitude."

ডুয়ার্সের উত্তরসীমা দেখা যাচ্ছে দার্জিলিং জেলা ও ভুটানরাজ্য। পূর্বে এর সীমা সংকোশ্ নদী ও আসামের গোয়ালপাড়া জেলা। দক্ষিণে কুচবিহার ও জলপাইগুড়ি জেলার অংশবিশেষ। পশ্চিমে এর সীমা উত্তরবাংলার বিখ্যাত নদী তিস্তা।

ডুয়ার্স সম্পর্কে জানতে গেলে প্রথমেই জানা দরকার এর রাজনৈতিক ইতিহাস। এই রাজনৈতিক ইতিহাস আজও সাধারণ মানুষের অজ্ঞাত। ভারতবর্ষের সাধারণ ইতিহাসে ডুয়ার্স সম্পর্কে কিছুই জানা যায় না। এবং যায় না বলেই ডুয়ার্স পাণ্ডববর্জিত অখ্যাত দেশ। এককালে টেরাই অঞ্চলও এমনি মানুষের আতঙ্কের দেশ ছিল। বর্তমানে টেরাই সভ্যতার আলোকে আসছে। ডুয়ার্সের অবস্থা তার চাইতেও শোচনীয়। কতদূরে কোথায় সে দেশ? সেখানেও মানুষ থাকে? ডুয়ার্সের যা-কিছু পরিচয় তার চা নিয়ে। চা একালের পানীয়। শুধু পানীয়? আর কিছু নয়? হ্যাঁ, আছে আরো পরিচয়। দুটি পাতা একটি কুঁড়িজাত এই বিস্ময়কর পানীয়টি দেশ-বিদেশে রপ্তানী হয়ে আমাদের জন্য বৈদেশিক মুদ্রা বহন করে আনছে, তাই তার সম্পর্কে দেশের ও রাষ্ট্রের কর্ণধারদের খানিকটা কৌতূহল আছে। অন্যদিকে চা জনগণের পানীয়। সাধারণের একাধারে বিলাস ও অন্যদিকে ভদ্রতা ও ভাববিনিময়ের মাধ্যম। এই চা জন্মায় এখানে। শিল্প-পতিদের ব্যক্তিগত প্রচেষ্টায়। চা-ই ডুয়ার্সের প্রধান পরিচয়। কিন্তু তার অন্য পরিচয়ও আছে। সে দিকগুলি আজও অবজ্ঞাত। কিন্তু সে-সম্পর্কে বারান্তরে আলোচনা করা যাবে।

আপাতত রাজনৈতিক ইতিহাস আলোচনা করা যাক।

বন্ধুটি নতুন একটা সিগারেট ধরালেন। বললেন, এ ব্যাপারে আগ্রহ আছে তো? না-থাকে তো আলোচনা না-করাই ভালো।

আমি তাড়াতাড়ি বলে উঠলাম, না, না আমার খুবই ভালো লাগছে। আমি কখনো শুনি নি। মনে হচ্ছে, একটা নতুন জগতে এসে যাচ্ছি।

নতুনই বটে। একেবারে নতুন। কবে যে ডুয়ার্স নিয়ে একেবারে একটা আলাদা ইতিহাস লেখা হবে!

অনেক জিনিসই ত' আপনার সন্ধানে আছে দেখছি। আপনিই লিখুন না কেন?

আমি লিখলে চলবে কেন? বন্ধুটি একমুখ সিগারেটের ধোঁয়া ছেড়ে হো-হো করে হেসে উঠলেন, বললেন, আর ইতিহাসের আমি জানিই বা কী।

কিন্তু সংগ্রহ তো সামান্য দেখছি না।

বন্ধুটি গম্ভীরভাবে বললেন, না না—এ নিতান্তই সামান্য। এত সামান্য উপকরণ নিয়ে কি ইতিহাস লেখা চলে? তার জন্যে চাই সামগ্রিক দৃষ্টি ও ইতিহাসবোধ। ইতিহাসবোধের প্রেরণা না-থাকলে চলে না। সমগ্র পৃথিবীর ইতিহাস মহাভারতবর্ষের প্রভূত জ্ঞান থাকা চাই। উপাদান অবশ্য সবই আছে। একটু চেষ্টা করলেই পুরাতন কাগজপত্র ঘেঁটে সাত্যকারের জ্ঞানী-গুণীরা এর ইতিহাস লিখতে পারেন। আমি হচ্ছি সামান্য একজন মজুর মাত্র। পড়ে আনন্দ পাই তাই খেয়ালের ঝোঁকে পড়ি। কখনো-সখনো টুকেও রাখি। আসল কথা কি জানেন? নতুন জিনিস পড়তে ভালো লাগে। একেবারে খাঁটি টাটকা জিনিস দেখলে একটু আস্বাদ নিয়ে দেখি। ব্যস, তার বেশি কিছু না।

আপনি এখানে কতদিন আছেন?

বেশি দিন না। পার্টিশানের পর থেকে আছি। ভাসতে ভাসতে হঠাৎ চলে এসেছিলাম। তারপর থেকে এখানেই আছি। দেখতেই পাচ্ছেন তো, একা মানুষ। চালচুলো নেই। ঘর-সংসারের ধার ধারি না। নিজেকে নিয়ে চলে যায় দিন। মাঝে মাঝে সময় পেলে ফাঁকা মন নিয়ে বেরিয়ে পড়ি। এ-সব অঞ্চলে সবই নতুন মানুষ। আমারই মতো।

আমি বললাম, এবারে আপনার রাজনৈতিক ইতিহাসটা শোনা যাক।

শোনবার জন্য মন চঞ্চল হয়ে উঠেছে।

আমার কথার উত্তরে তিনি গম্ভীর-ভাবে সিগারেটে একটা জোর টান দিলেন। তারপর একরাশ কুণ্ডলিত ধোঁয়ার মধ্যে মিনিটখানেক স্থির হয়ে বসে রইলেন। ঘরের মধ্যে আর কোনো শব্দ ছিল না। শুধু দেওয়ালে একটা বড় দেওয়ালঘড়িটি টং টং শব্দে বেজে উঠে শব্দায়মান মুহূর্তগুলিকে হঠাৎ স্মরণ করিয়ে দিল। যতক্ষণ সেটা বাজতে লাগল, আমি স্থির হয়ে তাঁর বক্তব্য শোনবার জন্যে অপেক্ষা করতে লাগলাম।

॥ সাত ॥

বাংলাদেশে বৃটিশ রাজশক্তির এক মিত্ররাজ্য ছিল কুচবিহার। কুচবিহারের অনেক প্রয়োজনেই এঁদের সাহায্য প্রয়োজন হত। এবং এঁরা তা পেতেনও। সীমান্তবর্তী রাজ্য ভুটান-এর সঙ্গে কুচবিহারের সাধারণ সম্পর্ক তখন আদৌ উন্নত ছিল না। পরন্তু উল্টোটাই ছিল বলা চলে। ভুটানীরা ছিল অনেক পরিমাণে হিংস্র ও আদিমস্বভাবযুক্ত। কারণে-অকারণে অনেক সময়ই তারা

নব্য বিকশিত গোলাপের মত সুন্দর আনন ও
কুসুম কোমল
অপড়ি পেলব তনু

সাধনা বিউটি ক্রীম-এর
এইতো সবচেয়ে বড় অবদান।
নিজেদের সৌন্দর্য্য সম্পর্কে
সচেতন আধুনিকারা তাই
এর প্রশংসায় মুখর।

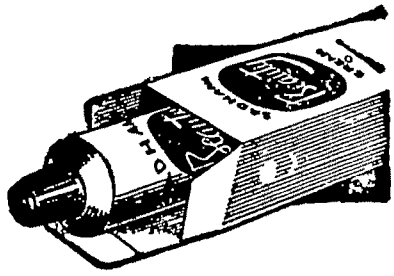

সাধনা
বিউটি
ক্রীম

প্রসাধনায় অপরিহার্য্য
অতি আধুনিক অঙ্গরাগ

সাধনা ঔষধালয়-ঢাকা কলিকাতা-৪৯

কুচবিহারে কাঁপিয়ে পড়ত। তারপর হিংস্র লুণ্ঠনের উন্মাদ আনন্দে মেতে উঠে এ-রাজ্যের অনেক অংশ ছারখার করে দিয়ে যেত। কুচবিহার রাজ্যের প্রজাদের নিশ্চিন্ত ও নিরুপদ্রব জীবন-যাত্রা অনেক সময়ই হত ব্যাহত। এই নিয়ে উভয়ের মধ্যে সম্পর্ক অত্যন্ত জটিল ও অশান্তিময় হয়ে উঠেছিল। বিখ্যাত Hunter সাহেব Statistical Account of Bengal গ্রন্থের ২১৯ পৃষ্ঠায় এ-সম্পর্কে খানিক বিবরণ পাওয়া যায়। Hunter সাহেব বলেছেন, ১৭৭২ খৃস্টাব্দে ভুটানীদের আক্রমণের ফলে একসময় কুচবিহার রাজ্যের প্রজাদের ধনপ্রাণ ও জীবন বিপন্নাপন্ন হয়ে ওঠে। ভারত-ইতিহাসের ১৭৭২ খৃস্টাব্দের কথা এর পাশাপাশি চিন্তা করে, দেখা যাক। এর অনেক আগে থেকেই ভারতবর্ষে এসে গেছে বেণিয়াজীবী ইংরাজ। শক্তিমান মুঘলরাজশক্তি তার আগেই অস্ত গেছে। আর সেই ভগ্ন-জীর্ণ সাম্রাজ্যের একটা পচনশীল মৃত-দেহের অধিকার নিয়ে কামড়াকামড়ি কাটাকাটি করছে নানা উঠতি রাজশক্তি। তারা সকলেই দুর্বল ও ভগ্নোদ্যম। একটা বিরাট সাম্রাজ্যকে নিজের অধিকারে নিয়ে সবল আত্মপ্রতিষ্ঠায় দাঁড়াবার মত শক্তি কারো ছিল না। ফলে সাম্রাজ্যের খণ্ডছিন্ন ভগ্ন অংশ-ভাগ নিয়ে নিজেদের মধ্যে ক্ষুদ্র সংঘাত ও প্রতিদ্বন্দ্বিতা। বাংলাদেশে প্রাদেশিক সুলতানেরাও দুর্বল ও ক্ষমতাহীন। বিলাস ও ব্যসনে, আড়ম্বর ও আয়োজনে, সুরায় ও নারীতে, নৃত্য-গীত ও বাদ্যে সুলতান ও আমীরেরা আত্মগর্বে স্ফীত এবং অন্তঃসারশূন্য। আত্মরক্ষার মত শক্তিও তাদের নেই। তরুণ নবাব সিরাজের রাজত্বকালে দেশময় চক্রান্ত ও গুপ্ত ষড়যন্ত্র, ঘৃণা ও বিদ্বেষ এবং ক্ষমতালাভের জন্য সুবিপুল ঈর্ষা ও কাড়াকাড়ি। এরই মধ্যে সুচতুর ক্লাইভের অসাধারণ রণবিদ্যা ও কূট-নীতিবুদ্ধির ক্ষুরধার বৈশিষ্ট্যে বাংলা-দেশে পলাশীর যুদ্ধে তরুণ নবাব সিরাজের পরাজয় ঘটল। ইংরাজের উপর সম্পূর্ণ নির্ভরশীল দুর্বল মীরজাফর বসলেন সিংহাসনে। প্রকৃতপক্ষে ১৭৫৭-তে পলাশীর যুদ্ধের পর মুর্শিদাবাদ ইংরাজের অধিকারে আসার পর থেকেই ভারতবর্ষে ইংরাজ প্রাধান্যের সূচনা। ইংরাজই প্রকৃতপক্ষে দেশের প্রকৃত পরিচালক। আর দেশীয় নবাব সিংহাসনে তার খেলনাস্বরূপ প্রতিনিধি-মাত্র।

Hunter বর্ণিত ১৭৭২ খৃস্টাব্দে কুচবিহার রাজ্যের উপর ভুটানীদের আক্রমণের বর্ণনায় দেখা যায়, মিত্ররাজ্য কুচবিহার ভুটানের হাত থেকে আত্মরক্ষার জন্য শক্তিমান ইংরাজের স্মরণাপন্ন হলেন। কুচবিহাররাজ সাহায্য প্রার্থনা করলেন। ইংরাজেরা তাঁদের সাহায্যের জন্য সৈন্য প্রেরণ করলেন। তাঁদের শৃঙ্খলাবদ্ধ আক্রমণের সামনে দাঁড়াতে পারল না ভুটানীরা। শক্তিমান সৈন্যবাহিনী-সমৃদ্ধ সামরিক শক্তি ত' ভুটানের ছিলই না। ইংরাজ সৈন্যদের আক্রমণের সামনে তাদের পক্ষে টেকা মুস্কিল ছিল। তাই তারা পরাজিত হয়ে নিজরাজ্যের নিরাপদ অভ্যন্তরে পালিয়ে গেল। ১৭৭৪ খৃস্টাব্দে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী ও ভুটান সরকারের মধ্যে এক সন্ধিসূত্র সম্পন্ন হয়। তিব্বতের রাজ-প্রতিনিধি এই ক্ষেত্রে উভয়ের মধ্যে মধ্যস্থতা করেন। দীর্ঘ ন' বছর পরে দেখা যাচ্ছে, বাণিজ্যিক সম্পর্কের উৎকর্ষতা-সাধন-সূত্রে কোম্পানীর প্রতিনিধি ক্যাপ্টেন টার্নারকে ভুটানে পাঠান হয়। কিন্তু তিনি ব্যর্থ হন। সেটা ১৭৮৩ খৃস্টাব্দকাল। এই সময় থেকে সম্পর্ক ও মিলনস্থাপনের কোন চেষ্টাকেই সুফল হতে দেখা যায় না। উভয়ের মধ্যে বিদ্বেষ, হিংসা ও বৈরিতা বেড়েই চলতে থাকে। ১৮২৬ খৃস্টাব্দে ইংরাজেরা আসাম অধিকার করেন। এই সময় ইংরাজ শাসকদের চোখে পড়ে পার্বত্য-সীমার এক বিস্তৃত অঞ্চল জুড়ে ভুটানের অবাঞ্ছিত আধিপত্য। জায়গা-গুলি তাদের অধিকারভুক্ত ছিল না। এখানে কতকগুলি গিরিপথ (Duars) ছিল, এবং এগুলি ব্যবহারের জন্য ভুটানীদের একটা বার্ষিক খাজনা বা কর দিতে হত। কার্যক্ষেত্রে, এই বার্ষিক খাজনার ব্যবস্থায় ভুটানের স্বীকৃতিই ছিল। কিন্তু তারা কখনো এ-সব শর্ত প্রতিপালন করে নি। উপরন্তু এই সকল ডুয়ার্স বা গিরিপথগুলির উপরে তাদের কর্তৃত্ব ও অধিকার বেড়েই চলেছিল। লুণ্ঠন ও ধ্বংসাত্মক প্রয়োজনে তারা এগুলি ব্যবহার করত অবাধে। উভয় শক্তির মধ্যে একটা সম্পর্ক ও সমাধানের প্রচেষ্টায় ক্যাপ্টেন পেম্বারটনকে সেখানে পাঠান হল। কিন্তু দৌত্য হল নিষ্ফল। এবং সমাধানের সকল প্রচেষ্টাই হল ব্যর্থ।

ইতিহাসের এই যুগ এক যুদ্ধ-অশান্তি ও অনিশ্চয়তার অন্ধকারে আচ্ছন্ন। আক্রমণ, প্রতি-আক্রমণ চলতেই থাকে। ভুটানীদের লুণ্ঠন, অপহরণ, অপব্যবহার চলতেই থাকে। ডুয়ার্সে বৃটিশ-প্রজাদের উপর অত্যাচার-অবিচার-নিপীড়ন চলতেই থাকে। বছরের পর বছর-এর ক্লান্তিহীন পুনরাবৃত্তি। শস্যক্ষেত্র ও গোলাবাড়ি পুড়তে লাগল। ধ্বংস হতে লাগল দরিদ্র সাধারণ প্রজার নিশ্চিন্ত জীবন। তার ক্ষেত ও খামার, ব্যক্তিগত সম্পদ ও অস্তিত্ব থেকে থেকে শিউরে উঠতে লাগল এক অজ্ঞাত ভয়ে ও আতঙ্কে। মাঝে মাঝে অতর্কিত আক্রমণে ঝাঁপিয়ে পড়ে তারা বেঁধে নিয়ে যেতে লাগল শান্তিকামী মানুষদের। এই সব মানুষদের দিয়ে তারা ক্রীতদাসের মত ব্যবহার করতে লাগল। কান্নায় ভারাক্রান্ত হল ডুয়ার্সের আকাশ ও বাতাস। প্রাণভয়ে তারা পালাতে লাগল নিশ্চিন্ত জীবনের উদ্দেশে।

এই সমরকার একটি সরকারী বিবরণী "Summary of Affairs in the Foreign Department of the Government of India, from 1864 to 1869" থেকে এর সংক্ষিপ্ত স্পষ্ট বিবরণ পাওয়া যায়। সেখানকার বর্ণিত বিবরণ থেকে দেখা যায়, ১৮৬৩ খৃস্টাব্দের শীতকালে অবশেষে, এইসব আর্ত প্রজাদের রক্ষার কল্পে ইংরাজেরা Mr. Ashley Eden নামক একজনকে রাজদূত হিসাবে ভুটানে প্রেরণ করেন। ১৮৬৪ খৃস্টাব্দের এপ্রিল মাসে হতদ্যোম রাজদূত ভুটান থেকে ব্যর্থ হয়ে ফিরলেন। না-তিনি আনতে পারলেন ভবিষ্যতের সুব্যবহার কোনো নিশ্চিত প্রতিশ্রুতি, না আদায় করতে পারলেন অতীতের ক্ষয় ও ক্ষতি-পূরণের কোনো ব্যবস্থা। বিবরণীটিতে স্পষ্ট এই সময়কার অবস্থা চিত্রিত হয়েছে—"He had been subjected to gross insults, and obliged by force to sign two papers, agreeing to make over the Assam and Bengal Duars to Bhutan and to surrender all runaway slaves and political offenders."

প্রকৃতপক্ষে, ভুটানের দেব ও ধরম রাজারা তখন কর্তৃত্বহীন ও দুর্বল। রাজ-শক্তির প্রকৃত কর্তৃত্ব বলপূর্বক অপহৃত হয়েছে Tongsa Penlo এবং তাঁর সাঙ্গোপাঙ্গদের হাতে। ইংরাজ রাজদূতের অবমাননা ও অবজ্ঞা প্রধানত তাদেরই হাতে। Mr. Ashley Eden-এর প্রত্যাবর্তনের সঙ্গে সঙ্গেই ইংরাজ রাজশক্তি ভুটান সরকারের এই দুর্ব্যবহারের প্রতিবাদে জোর করে স্থাপিত সন্ধির সকল শর্ত অস্বীকার করলেন। ভুটানের সঙ্গে সমস্ত সম্পর্কের যোগসূত্র হল ছিন্ন। সীমান্তে সৈন্য প্রেরণ করলেন ইংরাজেরা এবং তাঁদের সুরক্ষিত করে তোলার ব্যবস্থা করলেন। জুন মাসে দেব ও ধরম রাজাদের কাছে গেল চিঠি। ইতিপূর্বেকার চুক্তির শর্ত অনুযায়ী ইংরাজদের আমবাড়ি ফালাকাটা ও আসাম ডুয়ার্সের জন্য যে-কর দিতে হোত তা বন্ধ করা হল। সমস্ত অপহৃত ইংরাজ প্রজাদের মুক্তি দাবি করা হল এই পত্রে।

কুচবিহার এবং সিকিম রাজ্যের অধিবাসীদের মধ্যেও যারা ভুটানে বাধ্যতামূলক বন্দী জীবনযাপন করছিলেন, তাঁদের মুক্তির দাবি জোরালোভাবে উপস্থিত করা হল। এই সংখ্যা প্রায় তিন শতাধিক ছিল। তাদের লুণ্ঠিত দ্রব্য-সামগ্রী প্রত্যর্পণের দাবিও এই পত্রে ছিল। পত্রে স্পষ্ট জানান হল, যদি এই দাবিগুলির একটিও উপেক্ষিত হয় তাহলে তার জন্যে বাধ্য হয়ে তাঁদের কঠোর ব্যবস্থা অবলম্বন করতে হবে।

কিন্তু পত্র তো গেল। কা কস্য পরিবেদনা। দেব ও ধরম রাজাদের কোন জবাব নেই। প্রতীক্ষা, প্রতীক্ষা। অবশেষে আগস্ট মাসে এল ধরম রাজের উত্তর। কিন্তু যা আশা করা গিয়েছিল তার কোনো চিহ্নও নেই পত্রে। অন্যায় আচরণের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা জানান হয় নি সেখানে। ভীত হবার কোন লক্ষণও সেখানে নেই। শুধু নতুন করে আরেকজন রাজদূত পাঠাবার ব্যবস্থা করতে বলা হয়েছে।

কিন্তু তার আর কোন প্রয়োজনই ছিল না। ধৈর্যের বাঁধ অনেকদিন ভেঙে গিয়েছিল ইংরাজের। ভুটান রাজ্যের দম্ভ ও ঔদ্ধত্য সীমা অতিক্রম করেছিল। বার বার অপমানিত হতেহতে একটা স্থায়ী প্রতিকার সম্ভাবনায় ক্ষিপ্ত হয়ে উঠছিল ইংরাজ। পত্র যদি অন্যায় আচরণের জন্য ক্ষমা প্রার্থনার করুণ আবেদন বহন করে আনত, যদি তাতে নিরীহ প্রজাদের প্রত্যর্পণ ও তাদের ধন-সম্পত্তির ক্ষতিপূরণের স্বীকৃতি থাকত, তবে হয়ত নতুন রাজদৌত্য পাঠান চলতেও বা পারত।

কিন্তু তার আর প্রয়োজন ছিল না। ইতিহাসের সেই বিস্ময়কর রোমাঞ্চকর মুহূর্তগুলির চিত্র বিবরণীটি এইভাবে তুলে ধরেছে—"...It was resolved to carry out the permanent annexation of the Bengal Duars, amounting to an advance northward for a distance of from twenty to thirty miles along a line of about a hundred and eighty miles in length, so as to command all the passes into the plains; and at the same time to confine our occupation to a tract of country which was peopled by a race who had no affinity with the Bhutias, and had long suffered from their tyranny, but who were closely allied with the people of Bengal, and were expected to co-operate cordially with the British authorities."

১৮৬৪ খৃস্টাব্দের ১২ই নভেম্বর এক ঘোষণা প্রচার করলেন বৃটিশ সরকার। সেই ঘোষণাবলে স্থায়িভাবে বেঙ্গল-ডুয়ার্স-এর কর্তৃত্ব নিজেদের হাতে তুলে নিলেন তাঁরা। সৈন্যবাহিনী এগিয়ে চলল চারিটি সুশৃঙ্খলাবদ্ধ শ্রেণীতে। দেওয়ানগিরি, সিদলি, পাশাখা ও ডালিংকোটে তাদের প্রধান শিবিরগুলি স্থাপিত হল। ভুটানের সঙ্গে সমস্ত শর্ত হল উপেক্ষিত ও অস্বীকৃত। স্পষ্টভাবে উচ্চারিত হল—ভুটান সরকারকে সমস্ত বেঙ্গল-ডুয়ার্স অঞ্চল তিস্তার বাম তীরবর্তী পার্বত্য অঞ্চলের অধিকার হারাতে হবে। এগুলির ওপরে তাদের কোন কর্তৃত্বই স্বীকার করা হবে না। মিস্টার এডেনের প্রতি সকল অন্যায় আচরণের জন্য ক্ষমাভিক্ষা করতে হবে ভুটান সরকারকে এবং বলপূর্বক গৃহীত দুটি দলিলের মুসাবিদা ছিঁড়ে ফেলতে হবে। অন্যায়ভাবে লুণ্ঠিত ধনরত্ন সহ নিরপরাধ বৃটিশ প্রজাদের বন্দীদশা মোচন করতে হবে। এবং ভুটান সরকারকে ভবিষ্যতে সততা ও বন্ধুত্বপূর্ণ আচরণের পূর্ণ প্রতিশ্রুতি দিতে হবে। বৃটিশ সরকার অবশ্য এই সকলের প্রতিদানে, ভুটানীদের একটা নজরানা দিতে বাধ্য থাকবেন। কিন্তু তা-ও নির্ভর করবে ভুটানের সদ্ব্যবহার ও আন্তরিকতার ওপরে।

এগিয়ে চলল সৈন্যবাহিনী। ৭ই ডিসেম্বর, ১৮৬৪। চারদিক থেকে চলল অভিযান। অরণ্য ও বনভূমির সীমাহীন বিস্তার। দুর্ভেদ্য দুর্গের মত। দুর্গম ও দুরারোহ পথে এগিয়ে চলল সেনাবাহিনী। দীর্ঘ ছ'সপ্তাহ ধরে ভুটানীদের তাড়িয়ে নিয়ে ফিরতে লাগল। সীমান্তের দুর্ভেদ্য প্রায় একশ' আশি মাইল অঞ্চল ধরে জয়যাত্রা চলতে লাগল অব্যাহত গতিতে। অনেকগুলি স্থান অধিকারভুক্ত হল। প্রজাদের মনে নিশ্চয়তা ও বিশ্বাস ফিরিয়ে আনতে দ্রুত এইসব অঞ্চলে আইন ও শৃঙ্খলা সুপ্রতিষ্ঠিত করা হল।

কিন্তু যুদ্ধ শেষ হবার নয়। ভুটানীরাও পরাজয় মানতে প্রস্তুত নয় সহজে। ১৮৬৫ খৃস্টাব্দের প্রথম দিকে আবার ধেয়ে এল তারা। সীমান্তের প্রান্ত দিয়ে এগিয়ে এল হঠাৎ ইংরাজদের সামরিক বাহিনীর ঘাঁটিগুলিকে সচকিত করে দিয়ে। ১৮৬৫ খৃস্টাব্দের ৪ঠা ফেব্রুয়ারী পূর্ব প্রান্তের দেওয়ানগিরির ঘাঁটি তাদের আক্রমণে হল অবরুদ্ধ। তেজগাঁও নামক একটি ঘাঁটিতেও ইংরাজ সেনাবাহিনীকে হটতে হল। অবশেষে ১৫ই মার্চ ক্যাপ্টেন টিটলার (Tytler) তেজগাঁও পুনরুদ্ধার করলেন। দেওয়ানগিরি পুনরধিকার করলেন জেনারেল টম্ব (Tomb)। ভুটানীরা দুর্বল ও হতোদ্যম হল। ফিরে গেল তার ব্যর্থতায় মালিন্য বহন করে নিজরাজ্যে।

অবশেষে তারা ইংরাজদের প্রদত্ত শর্ত মেনে নিয়ে সন্ধি করতে বাধ্য হল। ইংরাজ সরকার অবশ্য সতর্ক প্রহরার ব্যবস্থা করলেন বক্সা পাহাড়ে ও দেওয়ানগিরিতে। ১৮৬৫ খৃস্টাব্দের ১১ই নভেম্বর স্থাপিত হল সন্ধি।

বক্তা থামলেন। তাঁর মুখের দিকে তাকিয়ে আছি আমি। তিনি নতুন একটি সিগারেট ধরাবার জন্য আকুলভাবে হাত বাড়ালেন সিগারেট প্যাকেটটার দিকে। বললাম, যুদ্ধবিগ্রহের কি এইখানেই পরিসমাপ্তি?

তিনি ফস্ করে দেশলাইকাঠি ধরালেন। বললেন, না, আর কখনো অতীতের অবস্থা ফিরে আসে নি। ভুটানের কাছ থেকে উদ্ধারপ্রাপ্ত অঞ্চলগুলি নতুন করে গড়ে তোলা হল ভবিষ্যতের উপনিবেশ হিসেবে। আজকের ডুয়ার্স তারই সফল রূপায়ণ। সে যুগের ভুটানীদের শক্তি-সাহসের কিন্তু প্রশংসাই করতে হয়, আমি তাঁর কথা থামতেই বলে উঠলাম।

তিনি বললেন, একশ'বার। অসমসাহসী দুর্ধর্ষ পার্বত্য যোদ্ধা। একথা স্বীকার করতেই হবে। ইংরাজদের নাজেহাল করে ছেড়েছে।

সিগারেট ধরিয়ে এতক্ষণ পরে ক্লান্তভাবে চেয়ারে পিঠ দিলেন বন্ধুটি, ডুয়ার্সে যখন আছেন যাবেন একদিন সাহেবপোতায়। নাম দেখেই অনুমান করতে পারছেন আশা করি।

সাহেবপোতা কি একটা নাম?

একটি অঞ্চলের নাম। বন্ধুটি সিগারেটে টান দিয়ে বললেন, ভুটানীদের সঙ্গে ইংরাজদের যুদ্ধের কালে শিলতোরসা নদীর তীরবর্তী অঞ্চলে ইংরাজদের একটা পোস্ট ছিল। যুদ্ধের সময় পাহাড়ের সে নদীর জলে ওপর থেকে ভুটানীরা বিষ মিশিয়ে দিয়েছিল। আর ইংরাজ সৈন্যরা না জেনে সেই জল পান করে দলে দলে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ে।

বলেন কি!

এখনো আছে সেই জায়গা। শ্বেতাঙ্গদের কবরগুলি ছিল নদীপ্রান্তে। ইংরাজ আমলে দু'একটা মোমবাতিও জ্বলেছে কখনো। যাবেন একদিন—দেখে আসবেন গিয়ে। এখন সে কবরও আছে কি না সন্দেহ। কিন্তু জায়গাটার নাম আজও ভুটান-ইংরাজদের একটা নীরব স্মৃতি বহন করে চলেছে।

অনেকক্ষণ ধরে বলার ক্লান্তি মোচনের জন্যেই কিনা জানি না, সিগারেটে একটা জোর টান পড়ল।

আমি বিস্ময়-বিমূঢ় দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছি। ধোঁয়ার কুণ্ডলীতে তাঁর মুখ ঢেকে যাচ্ছে।

ঘরের আলোটাও স্তিমিত হয়ে এসেছে।

[illegible]

আমার ইউরোপ ভ্রমণ

ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায়

[পূর্ব-প্রকাশিতের পর]

[পরিমল গোস্বামী কর্তৃক ১৮৮৯ সনে প্রকাশিত *A Visit to Europe* থেকে অনুবাদ]

॥ দ্বিতীয় অধ্যায় ॥

অপরাহ্ণ একটার সময় ইংল্যাণ্ডের মাটিতে পদার্পণ করিলাম। সেই সময়ে বহু রকম ভাবাবেগে আমার হৃৎপিণ্ড ভীষণভাবে স্পন্দিত হইতে লাগিল। যে ইংল্যাণ্ডের কথা শিশুকাল হইতে পুস্তকে পড়িয়া আসিতেছি, এবং সেই ইংরেজজাতি যাহার সঙ্গে বিধাতার অভিপ্রায়ে আমরা মিলিত হইয়াছি, আমি এখন সেই ইংল্যাণ্ড এবং সেই ইংরেজদের মধ্যে আসিয়া পড়িয়াছি। আমি যে ইংরেজদের স্বপরিবেশে আসিয়া দেখিতে পাইব, এবং যে সব গুণের জন্য বর্তমানে তাহারা পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ শক্তিরূপে গণ্য হইয়াছে, তাহা তাহাদের নিকটে আসিয়া বুঝিবার সুযোগ পাইলাম, এজন্য আমি কৃতজ্ঞ। পক্ষান্তরে ইহাও ভাবিতেছি যে, এইক্ষণে সম্ভবতঃ আমি আমার স্বদেশে জাতিচ্যুত হইয়াছি। যে পুরাতন পল্লী-গ্রামে [২৪ পরগণার শ্যামনগরের নিকট হাতুতা গ্রামে] আমাদের বংশ চারিশত বৎসর ধরিয়া বাস করিয়া আসিতেছে, সেখানে আমি জন্মগ্রহণ করিয়াছি [১২৫৪ সালে, ইং ১৮৪৭], যেখানে আমার শৈশব কাটিয়াছে, সে স্থানকে আমি আর আমার বলিয়া মনে করিতে পারিব না। সেই আমার জানালার দিকে চাওয়া বেঁটেখাটো পুরাতন আম গাছটি, যাহার দিকে তাকাইলেই যেন আমাকে বলিত, "আমি তোমার পিতাকে এখানে জন্মিতে ও মরিতে দেখিয়াছি, আমি তোমার পিতামহকে দেখিয়াছি, আমি এখানে তোমার সাতপুরুষের জন্মমৃত্যু দেখিয়াছি"—সেই গাছ তাহার ছায়ায় আমাকে আর দেখিতে না পাইয়া সম্ভবতঃ দুঃখ বোধ করিবে। পরিবারের জ্যেষ্ঠগণ, যাঁহাদের কোলেপিঠে মানুষ হইলাম, তাঁহারা এক্ষণে আমাকে অপবিত্র বলিয়া দূরে পরিহার করিবেন। কিন্তু আমার নিজের জন্য আমি দুঃখিত নহি, যাহাদের সঙ্গে আমার ভাগ্য একত্রে জড়িত, তাহাদের জন্যও আমার দুঃখ নাই। আমি আমার দেশবাসীর অযৌক্তিক সংস্কারের জন্য দুঃখিত। যে বিশ্বাস আন্তরিক, তাহার প্রতি আমার শ্রদ্ধা থাকিলেও আমি নৈতিক ভীরুতা এবং অসৎ বিরোধিতাকে ঘৃণা না করিয়া পারি না: যাঁহারা হিন্দুর বিলাত যাওয়ার বিরোধী, প্রকৃতপক্ষে তাঁহারা শিক্ষিত ব্যক্তি, নতুন শিক্ষাপ্রাপ্ত সমাজে তাঁহারা খুব উচ্চ-স্থানীয়। এবং তাঁহারা স্বদেশে রক্ষণ-শীল হিন্দুধর্মের সকল বিধিবিধান পদদলিত করিয়া থাকেন। অপেক্ষাকৃত অল্প অগ্রসর প্রদেশে—বম্বাইতে, পঞ্জাবে, রাজপুতানায় এবং উত্তর-পশ্চিম প্রদেশ-গুলিতে এই ক্ষতিকর কুসংস্কার ইতি-মধ্যেই দূর হইয়াছে। বিলাত হইতে ঘুরিয়া আসিলে যুবকদের জাতিচ্যুত করার অনিষ্টকর প্রথা একমাত্র অধিক অনুগ্রহপ্রাপ্ত বঙ্গদেশেই আছে। আমরা এক শতাব্দী কাল ইংরেজের সংস্পর্শে আসিয়াছি, এবং পঞ্চাশ বৎসর ধরিয়া ইংরেজী শিক্ষা লাভ করিতেছি, ইহাতেও যদি আমাদের মত ক্ষয়প্রাপ্ত জাতীয় জীবনের পুনরুজ্জীবনের জন্য বিদেশ ভ্রমণ যে কত বেশি দরকার এই প্রাথমিক সত্যটি আমরা না শিখিয়া থাকি তাহা হইলে এই এমন চরম অনুকূল অবস্থাতেও আমাদের প্রগতিপথের এই মন্থর গতির জন্য দেশের ইংরেজ শাসকেরা দুঃখ বোধ না করিয়া পারেন না। আমি বৈষয়িক কোনও সুবিধা-লাভের জন্য এখানে আসি নাই। কুসংস্কারের বিপরীত যে স্রোত এখন বহিতে আরম্ভ করিয়াছে, সেই স্রোতে আমি এক বিন্দু জল যুক্ত করিব ইহাই আমার অভিপ্রায়। প্রকৃতির অমোঘ বিধান এই স্রোতের অনুকূলে। প্রতিদিন ইহার শক্তি বাড়িতেছে। এবং সে সময় অতি দ্রুত অগ্রসর হইয়া আসিতেছে, যখন বর্তমানের যাঁহারা স্রোতের মুখ ঘুরাইয়া দিতে চাহিতেছেন তাঁহাদের অবস্থা, অসহায় বিধবাদের যাহারা স্বামীর চিতায় পুড়াইয়া মারিতেন তাঁহারা এখন হিন্দুসমাজের চোখে যেমন, তেমনি ঘৃণ্য হইবে।

আমরা জাহাজ হইতে নামিবামাত্র আমাদিগকে তত্ত্বাবধানের জন্য যে সরকারী কর্মচারী নিযুক্ত হইয়াছিলেন, তাঁহার হেপাজতে চলিয়া গেলাম। তিনি খুবই চতুর এবং অভিজ্ঞ ব্যক্তি। অল্প সময়ের মধ্যেই আমাদের মালপত্র শুল্ক অফিস পার হইয়া আসিল, এবং আমরা রেলগাড়িতে লণ্ডন অভিমুখে রওনা হইলাম। লিভারপুল স্ট্রীট স্টেশনে আসিতে আমাদের আধ ঘণ্টা লাগিল। এখানে ব্লুমসবেরিতে অবস্থিত "মিউ-জীয়াম হোটেলে" অভিমুখে যাইবার জন্য ঘোড়াটানা ক্যাব লইলাম। লণ্ডন পার হইবার সময় সবদিকের পরিচ্ছন্নতা দেখিয়া মুগ্ধ হইলাম। প্রত্যেকটি জিনিস ঝকঝকে তকতকে—পথ বাড়ি দোকান-সব। পথে কোথাও দুর্গন্ধ নাই, কোথাও জঞ্জাল জমে নাই। দোকানের কাঁচের জানালাগুলি যতদূর সম্ভব পরিষ্কার স্বচ্ছ। কাঠ বা পিতল এবং লোহা দোকান বা বাড়ি তৈরিতে যাহা কিছু লাগিয়াছে, সবই ঘষামাজার গুণে আয়-নার মত উজ্জ্বল দেখাইতেছে। দরজার সিঁড়িগুলি পর্যন্ত নিয়মিত সাবান জলে ধোয়ার ফলে চকচক করিতেছে। দোকানের ভিতরের জিনিসগুলি সুরুচিসংগতভাবে বিন্যস্ত, এবং প্রত্যেকটি নিজ নিজ স্থানে রক্ষিত। লণ্ডন কি রকম, তাহা কলিকাতার এসপ্লানেড অঞ্চল দেখিলে আংশিক অনুমান করা যাইবে। সভ্য দেশের নগর কিরূপ হওয়া উচিত এসপ্লানেড দেখিলে তাহারও কিছু পরিচয় মিলিবে। সাধারণ পরিচ্ছন্নতা বিষয়ে ইউরোপীয়দিগের নিকট হইতে আমাদের অনেক কিছু শিখিবার আছে। আমাদের ধর্মের বিধানসমূহে অনেক দিক হইতেই হিন্দুদিগকে পৃথিবীর পরিচ্ছন্নতম জাতিদের অন্যতম রূপে গড়িয়া তুলিয়াছে এ বিষয়ে সন্দেহ নাই, কিন্তু তবু আমরা এ বিষয়ে বেশি দূর

অগ্রসর হইতে পারি নাই। আধুনিক বিজ্ঞানসম্মতও সে সব বিধি সব সময়ে নহে। সে সব বিধিবিধানের উপর ধর্মের আবরণ পড়াতে তাহার বাস্তব রূপটি আমরা দেখি না, তাহা দেখিতে পাইলে আমরা সে সব নিয়মকে বেশি শ্রদ্ধা করিতে পারিতাম। খুব অল্পদিন হইল আমরা জানিতে পারিয়াছি যে, ধুলো, নোংরা জিনিস বা অস্বাস্থ্যকর জল হইতে বিপজ্জনক সব ব্যাধির উৎপত্তি হইয়া থাকে। এই জানা বুদ্ধির দিক হইতে জানা। হাতেকলমে প্রমাণ করা যাইতে পারে যে, পবিত্রতম শাস্ত্র অনুযায়ী যে জল আত্মার পক্ষে পরম কল্যাণকর, সেই জল দেহের পক্ষে অতি মারাত্মক। স্যানিটারি বা স্বাস্থ্যের জন্য যে পরিচ্ছন্নতা আবশ্যক, সে বিষয়ের নির্দেশগুলি ব্যাপকভাবে পালন করিলে বিরাট পরিমাণ দুঃখদুর্দশার হাত হইতে আমরা বাঁচিতে পারি। বিজ্ঞান যদি সত্য হয়, তাহা হইলে, তাহাকে অবহেলা করাতে যে পরিমাণ নিষ্ঠুর হত্যালীলা আমাদের মধ্যে সংঘটিত হইতেছে কে তাহার পরিমাপ করিবে? ব্যাপকভাবে প্রতিনিয়তই যে ভ্রাতা-ভগিনী-পুত্র-কন্যা-বন্ধু ও প্রতিবেশীদের হত্যা করা হইতেছে! যাহাদের মৃত্যু আমাদের বেদনার কারণ, তাহাদিগের অনেককে কি আমরা রক্ষা করিতে পারিতাম না? ইহার উত্তরে যাহা বলা হইবে তাহা যেন আমরা বিশ্বাস করিতে পারি। তাহা হইলে আমরা আমাদের ঔদাসীন্য ঝাড়িয়া ফেলিয়া ব্যাধির বিলম্বিত ব্যর্থ নিরাময়ের চেষ্টা না করিয়া ব্যাধির প্রতিষেধ ব্যবস্থা করিতে পারিতাম। যাহাতে ব্যাধি না হয় তাহা করিতে পারিতাম। আকবর কিংবা পিটার দি গ্রেটের মত জবরদস্ত শাসক থাকিলে আমাদের যা জানা উচিত, তা জানিতে ও শিখিতে বাধ্য করিতে পারিতাম।

আমরা হোটেলে আসিয়া উপস্থিত হইলাম। এখানেও সেই একই পরিচ্ছন্নতা। বসিবার ঘরের দেয়ালগুলি ছবির দ্বারা সাজান, ম্যান্টলপীসে সুদৃশ্য চিনামাটির পাত্র ও গেলাসে সাজান. আগুনের পাশে অ্যামেরিকা ও আফ্রিকা হইতে ক্রীত ঘাসফুলের শীষের সাজ. মেঝেতে মোটা কার্পেট, কারুকার্য খচিত সোফা ও চেয়ার সমস্ত ঘরে অনেক রহিয়াছে, এবং প্রকাণ্ড ভারী টেবিল ঘরের মাঝখানে রক্ষিত, তাহার উপরে ছবির অ্যালবাম ও লিখিবার সরঞ্জাম সমূহ রহিয়াছে। শুইবার ঘরে, কফি-ঘরে, ডাইনিং ঘরে একই জাতীয় রুচির প্রকাশ। মনে রাখা প্রয়োজন যে এটি খুব উচ্চশ্রেণীর হোটেল নহে। শহরে যে সব বণিক বা মধ্যবিত্ত শ্রেণীর পল্লীবাসী শহরে অল্প দিন বাস করিতে আসে শুধু তাহারাই এখানে থাকে। ল্যাণ্ডলেডি ও তাঁহার পরিচারিকাগণ আমরা উপস্থিত হইবামাত্র আমাদের তত্ত্বাবধানে লাগিয়া গেল, হোটেলে যাহারা ছিল তাহাদের প্রতি মনোযোগ দিতেছি দেখিয়া তাহারাও গর্ব অনুভব করিতে লাগিল, এবং প্রত্যেকেই আমাদের সম্মুখে তাহাদের প্রকাশ করিতে লাগিল, যাহার যাহা কিছু গুণ আছে বিদ্যা আছে সে সবের সঙ্গে আমরা পরিচিত হইলাম। ইহাদের মধ্যকার একজন নাম স্বাক্ষর দেখিয়া কোনো ব্যক্তির চরিত্র বলিয়া দিতে পারে। সে তাহার বিদ্যা দেখাইবার জন্য আমাদের নাম সই করিবার উদ্দেশ্যে একখণ্ড কাগজ আমাদের সম্মুখে রাখিল। জাহাজে থাকিবার কালে শুভাধ্যায়ী অনেক ইংরেজ বন্ধু আমাদের লণ্ডনের প্রতারকদের সম্পর্কে সতর্ক থাকিতে বলিয়াছিলেন। অতএব যখন আমাদের স্বাক্ষর চাওয়া হইল তখন বেশ কিছু ভয় পাইলাম। ভাবিলাম ইহার পিছনে জালিয়াতির উদ্দেশ্য থাকা সম্ভব। আমার বম্বাইয়ের বন্ধু মিস্টার গুপ্তেকে বলিলাম আপনি আগে সই করুন। মিস্টার গুপ্তে মিস্টার ইউ. সি. মুখার্জিকে কনুয়ের ঠেলা মারিলেন, মুখার্জি আমাকে ঠেলা মারিলেন। আমাদের ইতস্ততঃ ভাব দেখিয়া অটোগ্রাফ-প্রার্থী একখানি পকেট-বুক বাহির করিয়া দেখাইলেন তাহাতে শত শত ব্যক্তির স্বাক্ষর রহিয়াছে। কিন্তু ইহাতে আমাদের সন্দেহ আরও বাড়িয়াই গেল। সিঁদেল চোরও সততা প্রমাণের জন্য তাহার সিঁদকাঠি দেখাইতে পারে। যাহাই হউক শেষ পর্যন্ত মরীয়া হইয়া আমাদের নাম স্বাক্ষর করিলাম। সুখের বিষয় অদ্যাবধি আমাদের কোনো অনিষ্ট হয় নাই। পরে অভিজ্ঞতা যাহা হইয়াছে তাহা হইতে এইখানে বলা উচিত মনে করি যে, আমি আমাদের সন্দেহের কথা কিছু বাড়াইয়া বলিয়াছি।

পরদিন আমরা প্রদর্শনীতে গেলাম। ডক্টর ওয়াট আমাদের পূর্বেই ভারত হইতে এখানে আসিয়া পৌঁছিয়াছেন, তিনি অনুগ্রহ করিয়া আমাদের তত্ত্বাবধানের ভার নিলেন। তিনি সন্ধ্যাবেলা আমাদের তাঁহার বাড়িতে লইয়া গেলেন এবং অক্সফোর্ড স্ট্রীটের থেকে দূরে অবস্থিত ওয়েস্টমিন্স্টার ব্রিজ ও হোয়াইট হল প্যালেস দেখাইলেন। পথটি দৈর্ঘ্যে কুড়ি মাইল, পথের এক অংশের নাম অক্সফোর্ড স্ট্রীট, লণ্ডনের এক প্রান্ত হইতে আর এক প্রান্ত অবধি পথটি অনেকগুলি নামে বিভক্ত। জীবনে যতগুলি সেতু দেখিয়াছি তাহার মধ্যে ওয়েস্টামন্স্টার ব্রিজটি আমার কাছে সর্বাপেক্ষা সুন্দর বলিয়া বোধ হইয়াছে। আমরা ৭ই এপ্রিল (১৮৮৬) তারিখের হিমেল সন্ধ্যায় সেই অপরূপ সুন্দর সেতুটির উপর দাঁড়াইয়া যখন নিম্নে প্রবাহিত টেমস নদীর রূপালী জল দেখিতেছিলাম, তখন সেই দৃশ্যের মধ্যে আমাদের ব্যক্তিসত্তা যেন লুপ্ত হইয়া গিয়াছিল। সেতুটি দৈর্ঘ্যে ১১৬০ ফুট প্রস্থে ৮৫ ফুট, এবং দুইধারে পায়ে চলার পথ ১৫ ফুট করিয়া প্রশস্ত। লণ্ডনে বাসকালে খবরের কাগজে মাঝে মাঝে এই সেতু হইতে লাফাইয়া পড়িয়া কেহ কেহ আত্মহত্যা করিয়াছে এমন খবর পড়িয়াছি। আমরা হোয়াইট হল প্রাসাদের দৃশ্য ক্ষণকালের জন্য মাত্র দেখিয়াছি, এবং প্রথম চার্লস-এর যে স্থানে শিরশ্ছেদন করা হইয়াছিল তাহার নিকটস্থ জানালাটাও দেখিয়াছি।

আমরা প্রতিদিনই প্রদর্শনীতে উপস্থিত হইতে লাগিলাম। সন্ধ্যাবেলাটা আমরা লণ্ডন শহর দেখিতে বাহির হইতাম। একদিন প্রিন্স অভ ওয়েলস আসিলেন প্রদর্শনী দেখিতে। সার ফিলিপ কানলিফ ওয়েন আমাকে তাঁহার সহিত পরিচয় করাইয়া দিলেন। প্রিন্সকে বেশ সদাশয় মনে হইল, তিনি আমাদের সম্পর্কে ও ভারতবর্ষ সম্পর্কে অনেক প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিলেন।

আমরা সার জর্জ বার্ডউডের সঙ্গেও পরিচিত হইলাম। তিনি একজন শ্রেষ্ঠ ভারতবন্ধু। আমাদের সাহিত্য, আমাদের ধর্ম এবং আমাদের প্রাচীন দার্শনিক চিন্তাধারার সঙ্গে বিশেষ পরিচিত। মনে হয় আমাদের দেশের কার্পেন্টারের সঙ্গে তিনিই বিদেশীদের মধ্যে সর্বাধিক তথ্যজ্ঞানসম্পন্ন। তাঁহার রচিত গ্রন্থ 'দি ইনডাস্ট্রিয়াল আর্টস অভ ইণ্ডিয়া' প্রত্যেকটি পৃষ্ঠা ভারতীয়দের প্রতি এবং তাহাদের কর্মনৈপুণ্যের প্রতি গভীর সহানুভূতিতে ভরা। ইউরোপের লোকদের নিকট ভারতীয় প্রমশিল্পজাত দ্রব্যাদি জনপ্রিয় করিয়া তুলিতে এই বই বিশেষভাবে সাহায্য করিয়াছে। আমরা ইংল্যাণ্ডে সার জর্জ বার্ডউডের তত্ত্বাবধানে ছিলাম, এবং তিনি সর্বদা আমাদের প্রতি যে সদয় ব্যবহার করিয়াছেন, সে জন্য আমরা তাঁহার প্রতি গভীর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতেছি। ইংরেজদের সমাজের শ্রেষ্ঠ দিকটি তিনিই আমাদিগকে দেখিবার সুযোগ করিয়া দিয়াছিলেন। যতদূর মনে হয় তিনি বর্তমানে ভারতীয় শিল্প বিষয়ে বিস্তৃত তথ্যপূর্ণ গ্রন্থ রচনায় নিযুক্ত আছেন। প্রাচীন ভারতের বাণিজ্য ও শিল্পজাত দ্রব্যাদি বিষয়ে তাঁহার গ্রন্থে

অনেক তথ্য জানা যাইবে বলিয়া মনে করি।

ভূগর্ভস্থ রেলপথেই এ সময়ে আমরা অধিকাংশ সময়ে যাতায়াত করিতেছিলাম। লণ্ডনের এটি একটি বিস্ময়। মেট্রোপলিটান রেলওয়ে ও ডিস্ট্রিক্ট রেলওয়ে—এই দুটি প্রতিষ্ঠান ইহার মালিক। এই রেলওয়ে ইনার সার্কল ও আউটার সার্কল-এ বিভক্ত। প্রথমোক্তটি ঘনবসতিপূর্ণ মধ্য লণ্ডনে অবস্থিত—খিলানকরা ভূগর্ভস্থ সুরঙ্গের ভিতর দিয়া লাইন স্থাপিত। স্টেশনগুলি বাহিরে নির্মিত, যদিও উপরের জমি হইতে নিচের স্তরে, চওড়া সিঁড়ির সঙ্গে উপর নিচে যুক্ত। দুটি সার্কল-এ ৪৮টি স্টেশন আছে। সকাল সাড়ে সাতটা হইতে বেলা সাড়ে বারো অথবা একটা পর্যন্ত প্রতি তিন মিনিট অন্তর ট্রেন। প্রত্যেকটি যাত্রী বোঝাই। কয়েকটি স্টেশন বেশ বড়, এই সব স্টেশনে তিন অথবা চারটি প্ল্যাটফর্ম আছে, এখান হইতে ট্রেনগুলি বিভিন্ন দিকে যায়। কোনও স্টেশনে বিভিন্ন দিক হইতে আসা দুই তিনটি পর্যন্ত ট্রেন এক সঙ্গে দেখা যায়। এঞ্জিনের শব্দে যাত্রীদের চলাফেরার তৎপরতা ইত্যাদি মিলিয়া খুবই একটা কর্মব্যস্ততার মাহাত্ম্য ফুটিয়া উঠে। তাহা না দেখিলে সম্পূর্ণ হৃদয়ঙ্গম করা অসম্ভব। ভারতবর্ষের মত এখানে যাত্রীরা চিৎকার করে না। রেল স্টেশনে অথবা সাধারণের মিলন স্থানে, এমন কি বাড়িতেও সবাই চাপা স্বরে কথা বলে। আমাদের উচ্চ স্বরে কথা বলা অভ্যাস, তাহাতে এখানে প্রতিবেশীদের দৃষ্টি আমাদের দিকে ফিরিয়াছিল, যদিও মুখে কিছু বলে নাই। বুঝিতে পারিলাম উহাদের দৃষ্টি আকর্ষণ না করাই ভাল। বোর্ডে লেখা "এইখানে প্রথম শ্রেণীর জন্য অপেক্ষা করুন", "এইখানে দ্বিতীয় শ্রেণীর জন্য অপেক্ষা করুন", "এইখানে তৃতীয় শ্রেণীর জন্য অপেক্ষা করুন"। এই সমস্ত নির্দেশ প্ল্যাটফর্মের এক এক অংশে ঝোলান আছে। যাত্রীরা প্রয়োজন মত সেই সেই বিভাগে অপেক্ষা করে, এবং ট্রেন আসিলে সম্মুখেই তাহাদের নির্দিষ্ট শ্রেণীর গাড়ি দাঁড়াইতে হয়।

স্টেশনগুলি বিজ্ঞাপনে ভরা। এত যে দুটি বিজ্ঞাপনের মাঝখানে এক ইঞ্চি স্থানও ফাঁকা আছে কিনা সন্দেহ। এই বিজ্ঞাপনে প্রথমে বিভ্রান্ত হইয়াছিলাম। একটি স্টেশনের নাম মনে হয় "পিয়ার্স সোপ" অথবা "কলম্যানস মাস্টার্ড"। গাড়িগুলির ভিতরেও বিজ্ঞাপনে ভরা। মানুষ জীবনে যাহা কিছু প্রয়োজনীয় বোধ করে সেসমুহের মধ্যে যেগুলি শ্রেষ্ঠ এবং সর্বাপেক্ষা সস্তা সেই সব জিনিসের বিজ্ঞাপন এগুলি। এবং অদ্ভুত সব ছবি আঁকিয়া গুণাবলী প্রকাশ করা হইয়াছে। যে অমৃত পানীয় দ্বারা হতভাগ্য মানবজাতি তাহাদের পার্থিব দুঃখ ভুলিয়া থাকিতে পারে, তাহা অবশেষে চেরি ব্র্যান্ডির ভিতর পাওয়া গিয়াছে। এই বিজ্ঞাপনের সঙ্গে যে অপূর্ব ছবি আছে তাহাতে দেখা যায় এক হটেনটট (দক্ষিণ আফ্রিকার এক জাতীয় আদিবাসী) দম্পতি ঐ অমৃত পান করিয়া আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া উঠিয়াছে। মুখেচোখে একেবারে স্বর্গীয় দীপ্তি। শাদায় কালোয় যে জাতিভেদ এ বিষয়ে কত না অভিযোগ শোনা যায়। কৃষ্ণকায়দের আর ভয় নাই, শ্বেতকায়রা তাহাদের আর বর্ণবৈষম্যের জন্য খাইয়া ফেলিবে না, কারণ একবার মাত্র পিয়ার্স সোপ মাখামাত্র কৃষ্ণতম ব্যক্তিরও মুখ শ্বেতকায়দের মত হইবে। বিজ্ঞাপন শিল্পে মিস্টার পিয়ার্স ওস্তাদ ব্যক্তি। পেটেন্ট ঔষধ প্রস্তুতকারকগণ ইঁহার নিকট হইতে শিক্ষা গ্রহণ করিতে পারেন। যেখানেই যাই পিয়ার্স সোপের বিজ্ঞাপন হইতে মুক্তি নাই। এমন কি পেনি মুদ্রাগুলিতেও পিয়ার্স সোপ নামক যাদুমন্ত্রটির ছাপ দেখা যাইবে। ক্রমাগত 'পিয়ার্স সোপ'-এর বিজ্ঞাপন দেখিতে দেখিতে কত লোক পাগল হইয়া গিয়াছে, কে জানে? মিস্টার পিয়ার্সের সাবান ব্যাপক বিজ্ঞাপনের জন্য ব্যাপকভাবে বিক্রি হওয়া উচিত। রেল স্টেশনে, রেলগাড়িতে, এবং যে সব প্রাচীরে বিজ্ঞাপন দেওয়া চলে সেখানেই পিয়ার্স সোপ, পথে বড় বড় বোর্ডে পিয়ার্স সোপ, স্যান্ডুইচ বালকেরা (পিঠের দুই ধারে বিজ্ঞাপন বহনকারী) পথে পথে ঘুরিতেছে পিয়ার্স সোপের বিজ্ঞাপন লইয়া, ওমনিবাসে পিয়ার্স সোপ, স্টীমারে পিয়ার্স সোপ, সব স্থানে পিয়ার্স সোপ! বিজ্ঞাপনদাতাদের মতে এই বিজ্ঞাপনের খরচ বহু কোটি ক্রেতার মধ্যে ভাগ হইয়া যায় যে প্রতি ক্রেতার ভাগে সামান্য ভগ্নাংশ মাত্র পড়ে। কিন্তু সেই ভগ্নাংশ যে কত, তা আমাদের জানিবার উপায় নাই। বহু লোক এই বিজ্ঞাপনের কাজে নিযুক্ত আছে। ছাপাখানার লোক, এনগ্রেভার, স্যান্ডুইচ বালকেরা এবং অন্যান্য ছাড়াও যে সব এজেন্ট এই কাজের ভার নেয়, তারাও এতে যথেষ্ট উপার্জন করে। ইহারই জন্য নূতন নূতন পেন্টের উদ্ভাবন করিতে হইয়াছে, নূতন টাইপ, নূতন বোর্ড এবং নূতন যন্ত্রাদি প্রস্তুত করিতে হইয়াছে।

রেল স্টেশনের কি নাম তাহা জানিতে হইলে আলোর দিকে তাকাইতে হইবে, সেখানে কাঁচের উপর তাহা লেখা রহিয়াছে। এই পথে এতগুলি ট্রেন যাতায়াত করা সত্ত্বেও সমস্ত ব্যবস্থা সম্পাদনা এমন মনোযোগের সহিত করা হয় যে দুর্ঘটনা কদাচিৎ ঘটিয়া থাকে। আমরা এখানে উপস্থিত থাকাকালে ভূগর্ভস্থ রেলপথে এক জার্মান ভদ্রলোকের মারাত্মক দুর্ঘটনা ঘটিয়া গিয়াছে। ট্রেন চলিবার সময় তাঁহার মাথা জানালা দিয়া বাহির করিয়া অন্য কামরার যাত্রীদের দেখার বদ অভ্যাস ছিল। একবার কিসে মাথায় ধাক্কা লাগিয়া কিছু আহত হইয়াছিলেন, কিন্তু তথাপি সতর্ক হন নাই। শেষ বার যখন তিনি জানালার বাহিরে মাথা গলাইয়াছেন সে সময়ের খিলানের একটি প্রলম্বিত পাথরে গুঁতা লাগিয়া মাথাটি প্রায় চূর্ণ হইয়া গেল। এই দুর্ঘটনার তিন দিন পরে তাঁহার মৃত্যু হয়। সুরঙ্গ পথের রেলওয়ে ছাড়াও বহু সাবার্বান ও প্রাদেশিক রেলওয়ে লণ্ডনের চারিদিকেই বর্তমান রহিয়াছে। লিভারপুল স্ট্রীট স্টেশন হইতে গ্রেট ঈস্টার্ন রেলওয়ে ক্যামব্রিজ ও অন্যান্য স্থানে গিয়াছে। কিংস ক্রস হইতে স্কটল্যান্ডের দিকে গিয়াছে গ্রেট নর্দার্ন রেলওয়ে। প্যাডিংটন হইতে পশ্চিম দিকে গিয়াছে গ্রেট ওয়েস্টার্ন রেলওয়ে। ইউস্টন রোড হইতে ম্যানচেস্টার-লিভারপুল-স্কটল্যান্ড গিয়াছে লণ্ডন অ্যান্ড নর্দার্ন রেলওয়ে। ইউস্টন রোড হইতে স্কটল্যান্ডের দিকে গিয়াছে মিডল্যান্ড রেলওয়ে। লণ্ডন চ্যাটহ্যাম অ্যান্ড ডোভার রেলওয়ে ইংল্যান্ডের সহিত অস্টেন্ড ও ক্যালের পথে বেলজিয়াম ও ফ্রান্সকে যুক্ত করিয়াছে। লণ্ডন ব্রাইটন অ্যান্ড সাউথ কোস্ট রেলওয়ে পোর্টস্মাথ-এর দিকে গিয়া নরম্যান্ডির পথে লণ্ডনের সঙ্গে প্যারিসকে যুক্ত করিয়াছে। সাউথ ঈস্টার্ন রেলওয়ে ফোকস্টোন ও ডোভার গিয়াছে, সেখান হইতে বুলেন, ক্যালে ও অস্টেন্ড প্রভৃতি স্থান গামী ডাকবাহী স্টীমারের সঙ্গে যোগ রাখিয়াছে।

শহরের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত অবধি বহু ওমনিবাস চলাচল করে। ওমনিবাসগুলি আকারে বড়, ভিতরের আসনগুলি গদি আঁটা, উপরতলার বেঞ্চ। ট্রামগাড়ির মত ইহারা নিয়মিত সময় ধরিয়া পর পর যাতায়াত করে, এবং ঘোড়ায় টানে। এই বাস রেলের উপর চলে না। দুটি সুরঙ্গ পথের রেলওয়ে কম্পানি বৎসরে ১৩ কোটি ৬০ লক্ষ যাত্রী বহন করে, ওমনিবাস বহন করে ৭ কোটি ৮০ লক্ষ যাত্রী। ইহা ভিন্ন টেমস্ নদীতে প্রতি পাঁচ মিনিট অন্তর লণ্ডনের কর্মব্যস্ত অংশের একধার হইতে অন্যধার পর্যন্ত স্টীমবোট ছাড়ে। চেলসী হইতে লণ্ডন ব্রিজ এই অংশটিই সর্বাপেক্ষা কর্মচঞ্চল জনসমাগমে পূর্ণ। এই বোটগুলি মাঝখানে বিশেষভাবে নির্মিত কয়েকটি স্থানে থামে। এগুলি স্টেশনের কাজ করে। লণ্ডনের পথের ক্যাবগুলি কি

বোর্নভিটার নতুন ইকনমি টিন কিনে পয়সা বাঁচান

প্রতি কাপে খরচও কম-প্রতি টিনে বোর্নভিটাও বেশী

বোর্নভিটার নতুন ইকনমি টিনে আরও বেশী কাপ তৈরী করা যায় এবং কাপ প্রতি খরচও কম পড়ে। পুষ্টিকর বোর্নভিটা দুধ, মল্ট, চিনি ও কোকোর সুষম মিশ্রণ— সারা পরিবারের জন্য পুষ্টিকর পানীয়!

শক্তি, উৎসাহ ও স্বাদের জন্য— ক্যাড্‌বেরিস্ বোর্নভিটা!

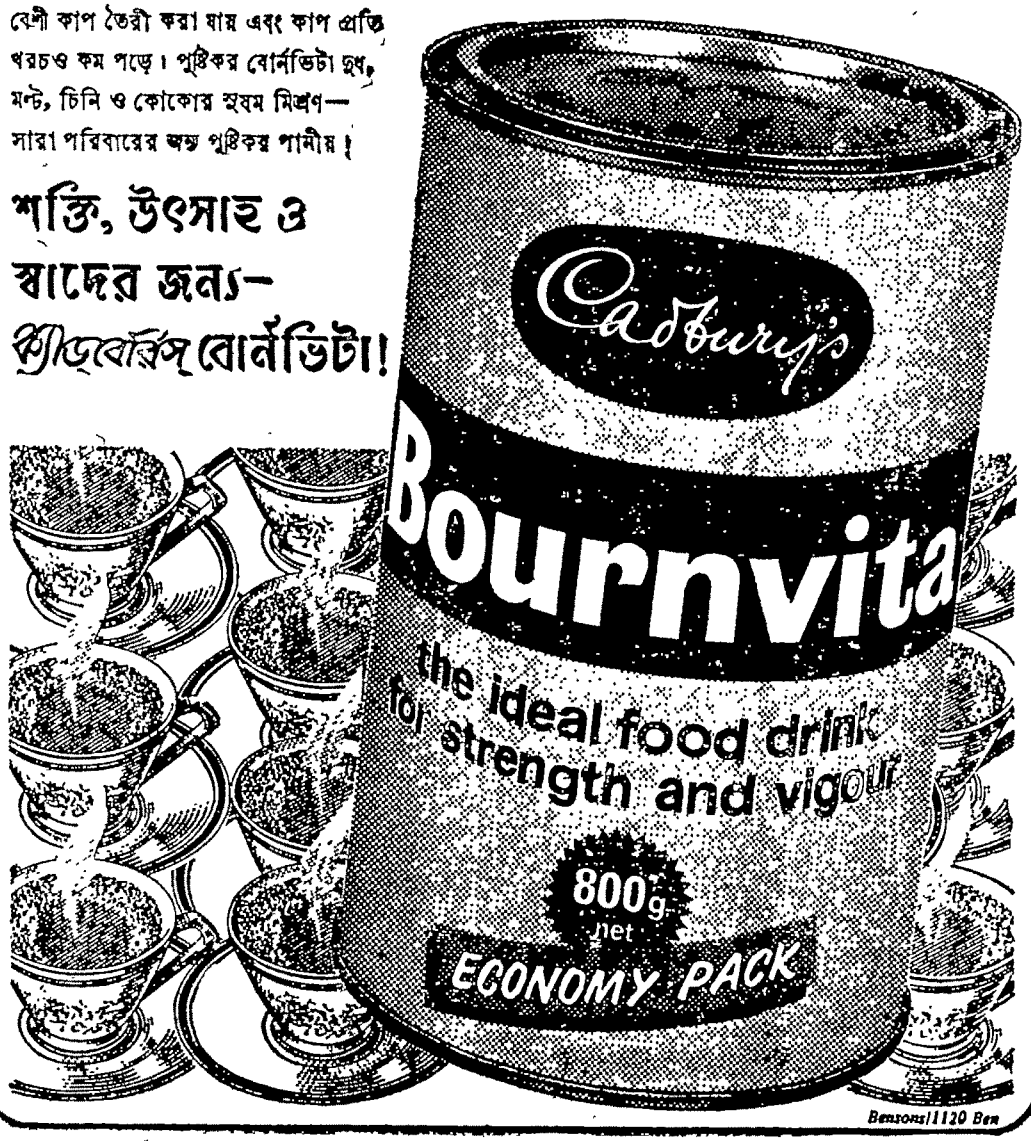

Bensons/1120 Ben

তাহা বুঝাইবার জন্য আমি যদি আমাদের দেশের ছ্যাকড়া গাড়ির সঙ্গে এগুলির তুলনা করি তাহা হইলে ক্যাবের অপমান করা হইবে। এবং তাহাতে যে ধারণার সৃষ্টি হইবে তাহাও একান্তই ভ্রমাত্মক। এককথায়, ক্যাব খুব উচ্চশ্রেণীর চারচাকার গাড়ি, শক্তিশালী সুপুষ্ট উজ্জ্বল ঝকঝকে দেহধারী ঘোড়ায় এগুলিকে টানে। ইহার সঙ্গে কলিকাতার কঙ্কালসার ঘোড়ায় টানা জীর্ণ, নোংরা, দ্বিতীয় শ্রেণীর গাড়ির তুলনা করা চলে না। ভারতবর্ষে বলদ যে কাজ করে এখানে সেই কাজ দীর্ঘাঙ্গা দৃঢ় পেশীযুক্ত ঘোড়ায় করিতেছে দেখিলে ভারতীয়ের চোখ জুড়ায়। ইহারা ক্ষেত্রের যাবতীয় কৃষিকাজে লাগে, ট্রাক টানে (যাহা আমাদের গোরুর গাড়ি করে) এবং খালে নৌকা টানে। রুটি অথবা মাংস যাহারা গাড়িতে করিয়া বিলি করে তাহাদের গাড়িটানা ঘোড়া খুব সুদর্শন না হইলে তাহা তাহাদের পক্ষে সম্মানজনক বোধ হয় না। দুচাকার গাড়িকে হ্যানসম বলে। লণ্ডনে ১৩০০০ এর বেশি হ্যানসম আছে। ভিড়ের পথে একের পর এক এমন বিরামহীনভাবে চলিতে থাকে যে তখন রাস্তা পার হওয়া বিপজ্জনক বোধ হয়। সেজন্য অনেক ক্রসিং এর স্থানে খানিকটা স্থান পথের মাঝখানে রেলিং দিয়া ঘিরিয়া রাখা হইয়াছে যাহাতে পথচারীরা অর্ধেক পথ পার হইয়া এইখানে কিছুক্ষণ দম লইতে পারে। এখান হইতে পরে সুবিধামত পথের অপরার্ধ পার হয়। এত রকমের এবং এত বেশি সংখ্যক যানবাহন এবং তা সব সময়েই যাত্রীপূর্ণ, তাহাতে মনে হইতে পারে পথগুলি বোধ হয় পথচারীশূন্য। আদৌ তাহা নহে। পথে এত লোক পায়ে হেঁটে চলে যে, এবং তারা তাদের অভ্যস্ত রীতিতে ভারতীয়দের তুলনায় এমন দ্রুত চলে যে, দুজন লোকও পাশাপাশি একসঙ্গে হেঁটে যাবার জায়গা খুব বেশি পায় না, অথচ তারা পাশাপাশি চলে, একজন আর একজনের পিছনে সারিবদ্ধ অবস্থায় চলে না। পথে চলতে পরস্পর ধাক্কাধাক্কি হয় না। অথবা আমরা যেমন করি, দুজন বিপরীত দিক হইতে আসিয়া মুখোমুখি হইলে কে কোন্ দিক ছাড়িয়া দিব তাহা ভাবিতে কিছু সময় নষ্ট হয়, এখানে তেমন ঘটিতে দেখা যায় না। তাহার কারণ এখানে পথচারীরা পথের ডান ধার দিয়া চলে এবং যানবাহন বাঁয়ের ধার দিয়া চলে। পথের দুই ধারেই পথচারীরা গাড়ির বিপরীত মুখে চলে, তাই তাহাদের কখনও পরস্পর বিপরীত দিক হইতে আগতকে পাশ কাটাইতে হয় না।

কর্মে চঞ্চল ব্যস্তসমস্ত বহু মানুষের ভিড় যে কি বস্তু তাহা দেখিতে হইলে লণ্ডন শহরে সকাল নয়টা হইতে দশটার মধ্যে দিয়া প্রত্যক্ষ করিতে হইবে। আমাদের দেশে মেলা হয়, সেখানেও হাজার হাজার লাখ লাখ লোকের ভিড় হইয়া থাকে, কিন্তু ভারতের এই সব ভিড় কেমন যেন প্রাণহীন বলিয়া বোধ হয়। কারাগারের বন্দীরা বাধ্যতামূলক কাজ করিবার সময় যেমন নিষ্প্রাণ চোখে তাকায়, অথবা ভারতের যে সব অংশে বাধ্যতামূলক শ্রম প্রথা প্রচলিত সেখানে কর্মরত শ্রমিকদের মুখের চেহারা যেমন, ভারতীয়দের সাধারণ মুখের ভাবেরই সেগুলি কিছু পরিবর্ধিত সংস্করণ। ভারতীয়দের ভাগ্যে-সমর্পিত মুখের ভাব দেখিয়া মনে হইবে এ মুখের মালিক বহু চিন্তার পর স্থির করিয়াছে তাহার জন্মিবার কোনও প্রয়োজনই ছিল না, সে এ সংসারে আসিয়াছে নীরবে অন্যায় সহ্য করিবার জন্য, ইহা যেন তাহার ইচ্ছার বিরুদ্ধে ঘটিয়া গিয়াছে। ক্ষুদে রাণা অথবা ইউরোপীয় টুরিস্টদের ক্যাম্পান বহন করিয়া বাধ্যতামূলকভাবে নিযুক্ত মোটবাহীরা হিমালের খাড়া পথে উঠিবার সময় যেমন কাতরভাবে পরিশ্রম করে, সেও তেমনি সমস্ত জীবন বন্দীর মত কাজ করিয়া যায়। প্রকৃতপক্ষে উচ্চস্তরের ভারতীয় বুদ্ধিজীবী, প্রকৃতির শক্তির কাছে পরাভূত হইয়া, নিজের গড়া এক কল্পজগতের আশ্রয়ে বাস করে, এবং সেই জন্যই তাহার মন অসুস্থ হয়। বয়স বাড়িবার সঙ্গে সঙ্গে তাহার এই মানসিক অসুস্থতা ক্রমশঃই বিষাক্ততর হইতে থাকে, এবং কোনও ব্যক্তি যদি প্রথমজীবনে দেশের নেতৃস্থানীয় হইবার মত উপযুক্ত শিক্ষা পাইয়া থাকে তবে তাহার এই মানসিক অসুস্থতা ব্যাপকভাবে দেশের কল্যাণের পক্ষে অনিষ্টকর হইয়া উঠে। বয়স বৃদ্ধিতে তার সম্মান বাড়ে এবং ছোটরা তাহার কথা বেদবাক্য বলিয়া মনে করে, তা সে কথা দেশের অর্থনৈতিক অবস্থা বিষয়ে যত অসম্ভব অবাস্তব অথবা অনিষ্টকরই হউক না কেন। আসলে সমস্ত জাতিটাই একটা মানসিক ধর্মভ্রষ্টতার ভুগিতেছে, আমার স্বদেশবাসীরা ইহাকেই বলিয়া থাকেন চরম ধর্মানুবর্তিতা। এই কারণেই সম্ভবতঃ তাহাদের দৃষ্টি প্রাণহীন। এইখানে ৬৩২ একর পরিমাণ ক্ষুদ্র স্থানটি, যাহা সিটি নামে অভিহিত, সেইখানে সকালে আসিয়া ইহাদের গুরুত্বপূর্ণ, আন্তরিকতাপূর্ণ, বাস্তব জীবনের প্রবলবেগে-প্রবাহিত স্রোতের দৃশ্যটি না দেখিলে কোনও হিন্দুর পক্ষে তাহা সম্পূর্ণ উপলব্ধি করা সম্ভব নহে। এই স্থানটুকুতে প্রতিদিন আট লক্ষ নরনারী এবং সম্ভবতঃ সহস্র শকট ছুটিয়া চলে। এটি পৃথিবীর হৃৎপিণ্ড, ইহা হইতে পৃথিবীর দিকে দিকে ধমনীসমূহ বিস্তৃত হইয়া বাণিজ্য-শোণিত শত ধারায় প্রবাহিত হইয়া চলিয়াছে। ইহারই প্রেরণায় গ্রীনল্যাণ্ডের উপকূলে এস্কিমোরা হিমশৈলের ভিতর সীল শিকার করিতেছে, তিমি শিকারীরা মেরু সমুদ্রে জীবন বিপন্ন করিতেছে, চীনারা পাহাড়ের ঢালু দেহ হইতে চায়ের পাতা ছিঁড়িতেছে, আফ্রিকাবাসীরা সীমাহীন মরুবুকে উটপাখীর দলকে তাড়া করিয়া ফিরিতেছে। এখানে ভাগ্য তাহার নিজ প্রাপ্য পায়, গুণ তাহার পুরস্কার পায়, কেহ ঐশ্বর্যলাভ করে, কেহ বা নিঃস্ব হয়, কিন্তু তাহারা সংখ্যায় কত কে তাহার হিসাব করিবে?

এই জনস্রোতে ধনী ব্যাঙ্কারকে দেখা যাইবে, যিনি অতি কঠিন সংগ্রামের পথে চলিয়া আজ সাফল্যের পথে প্রশান্তমুখে। তিনি সৎ পথে পরিশ্রমের পথে, মিতব্যয়িতার পথে অগ্রসর হইয়াছিলেন, তাঁহার একটা বাঁধা পথ ছিল, একটা কর্মপদ্ধতি ছিল, এবং সুযোগ উপস্থিত হইলে তৎক্ষণাৎ তাহা কি করিয়া গ্রহণ করিতে হয় তাহা তিনি জানিতেন, এবং কোনও সুযোগই তিনি ছাড়েন নাই। তিনি উচ্চ সাফল্য লাভ করিয়াছেন তাহা দৈবাৎ হয় নাই। হইয়াছে তাঁহার অদম্য ইচ্ছার জন্য, ইচ্ছার শক্তির জন্য। তিনি এখন প্রশস্ত উদ্যান যুক্ত প্রাসাদতুল্য বাড়ির মালিক। এ বাড়ি শহরতলীতে অবস্থিত। পাহাড়ী অঞ্চলে তাঁহার সুরক্ষিত মৃগদাব আছে। তাঁহার সন্তানদের শিক্ষার নিমিত্ত ইংরেজ গাভারনেস রাখা হইয়াছে, মেয়েদের পরিচর্যার জন্য সুইস্ পরিচারিকা নিযুক্ত হইয়াছে। তাঁর পরিবার রাজভোগ আহার করিয়া থাকেন, খাইবার টেবিলে ভোজ্য উপকরণগুলি দেখিলেই তাহা জানা যায়। একদিনের ভোজনের নমুনা দিই। প্রাতরাশের জন্য মাংস (হ্যাম) ও ডিম, সোল-মাছ, মটন-চপ, ভীল কাটলেট, অক্স-টাং, নানা জাতীয় রুটি, সব্জী, চা ও কফি। ব্যবসায়ী লোক বলিয়া প্রাতরাশ অন্য ধনী গৃহস্থের তুলনায় কিছু পূর্বেই (সকাল ৮-৩০) শেষ হইয়া যায়, এবং কিছু দ্রুতত্বের সঙ্গে। উক্ত ব্যাঙ্কার সিটির একটি রেস্টোরাঁতে লাঞ্চ খাওয়া শেষ করেন। পরিবারের অন্যান্যরা অপরাহ্ণ দেড়টার সময় বাড়িতে যে লাঞ্চ খান, তাহার তালিকা এইরূপ—ইম্পীরিয়াল সুপ, স্যামন মাছের মেয়োনেজ (ডিমের কুসুম, জলপাই তেল, ও ভিনিগার অথবা লেবুর রস দিয়া প্রস্তুত একপ্রকার সস্, অন্য খাদ্যের সঙ্গে মিশাইয়া খাইবার চাটনি বিশেষ) স্যামন মাছের আচার, গলদা চিংড়ির স্যালাড, ইয়র্ক হ্যাম, ট্রাফলসহ কবুতর মাংসের পাই, (ময়দার খোলসে ট্রাফল নামক ছত্রাক সহ পুর রূপে ব্যবহৃত ভাজা), মেষশাবকের ফোরকোর্টার (সম্মুখ মাংস) বীফ-এর সিরলয়েন (মধ্যপার্শ্বদেশের মাংস): ভিকটোরিয়া জেলি, স্ট্রবেরি ক্রীম, ফ্রেঞ্চ পেস্ট্রি, ভেনিস ব্রেড,

ফ্রাউট কেক, (পূর্বকালে উৎসবে ব্যবহৃত গুরুপাক কেক), ভোজনের শেষ পর্বে আনারস ও ফিলবার্ট-নাট্। এতৎসহ হক, ক্লারেট শেরী ও শ্যামপেন প্রভৃতি সব পানীয়। বৈকালের চা সাদাসিধা, অর্থাৎ চায়ের সঙ্গে শুধু রুটি, কেক, কিছু ঠাণ্ডা মাংস ও জিভের মাংস। অতঃপর ৭টায় ডিনার। ডিনারে পরিবারের সবাই এক-জন্সে বসেন। ডিনারের খাদ্যতালিকা—কচ্ছপ মাংসের সূপ, টাবরট মাছ ও গলদা চিংড়ির চাটনি, সোল-মাছের ভাজা খণ্ড, ভেনিসনের (হরিণের) পিছন দিকের মাংস, মেষের পিছন দিকের মাংস, বীফের রোস্ট সিরলয়েন, রোস্ট-ডাক্, সিন্ধ মুর্গীছানা, আনারসের ক্রীম, ফলের মাসেডোয়ান (নানা ফাটাফলের মিশ্রণ), কেক, চীজ, বিস্কুট, আঙুর, ফুটি, ফিলবার্ট (বাদাম জাতীয়) ওয়ালনাট্; শ্যামপেন, শেরী হক, ক্লারেট, এবং পোর্টওয়াইন পানীয়। মহিলাগণ বন্ধুদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিয়া ছুঁচের কাজ করিয়া অথবা ইংরেজী, জার্মান অথবা ফরাসী নভেল পড়িয়া সময় কাটান। মেয়েদের শিক্ষায় জার্মান ও ফরাসী ভাষা অপরিহার্য। তিনি তাঁহার প্রথম দুইটি কন্যাকে শিক্ষার জন্য ফ্রান্সে পাঠাইয়াছেন, ছোট জন হাইডেলবার্গে আছে, কারণ জার্মানিতে শিক্ষাগ্রহণ বর্তমানের একটি ফ্যাশান। একটি কন্যা ভাষাবিদ্ রূপে খ্যাতিলাভ করিয়াছে। ফরাসী ও জার্মান ছাড়াও সে স্প্যানিশ ও ইটালিয়ান ভাষা ভালভাবে আয়ত্ত করিয়াছে, উপরন্তু গ্রীক ও ল্যাটিনেও তাহার কিছু দখললাভ হইয়াছে। পরিবারের আরও দুইজন মহিলা উচ্চ বিজ্ঞানে শিক্ষিতা। এই শ্রেণীর মহিলারা সাধারণতঃ একটুখানি কঠোর প্রকৃতির হইয়া থাকেন, ইঁহাদিগকে বলা হয় "ব্লু স্টকিং।"

ডিনারের পরে ব্যাঙ্কারের বৈঠকখানায় সময় কাটে সর্বাপেক্ষা সুখের। এক সন্ধ্যার বর্ণনা দেওয়া যাইতে পারে। ডিনার শেষ হইবামাত্র সকলে এই কক্ষে আসিয়া মিলিত হইলেন। ঘরের একধারে অগ্ন্যাধার—সেখানে সমস্ত ঘরকে উষ্ণ করিয়া আগুন জ্বলিতেছে, প্রত্যেকেই তাহাতে আরাম বোধ করিতেছেন, বাহিরের অন্ধকার সেই পরিবেশকে আরও উপভোগ্য করিয়া তুলিয়াছে, কারণ সেই অন্ধকারে সোঁ সোঁ শব্দ করিয়া সবেগে বায়ু বহিতেছে এবং প্রবল তুষারপাত হইতেছে। যেখানে একটুখানি আড়াল, সেইখানেই তুষার আশ্রয় লইতেছে। দেরিতে ফেরা পিতাকে একটি মেয়ে দরজা খুলিয়া দিতেছে। গৃহকর্তা পরিবারের সমাবেশ-স্থলের শীর্ষে বসিয়াছেন, চেয়ারে বসিয়া তিনি সূচীকার্য চালাইতেছেন, ছোটরা তাঁহাকে ঘিরিয়া বসিয়াছে, কেহ মেঝের উপরে, কেহ সোফার উপরে, কেহ বেঁটে চেয়ারে; কুকুরটি ঘুমাইয়া আছে, ছোটরা তাহার গায়ে হাত বুলাইতেছে, বিরক্তও করিতেছে। ইউরোপ হইতে সদ্য আসা ছোট মেয়েটিকে পিয়ানো বাজাইতে অনুরোধ করাতে সে পিয়ানোতে গিয়া বসিয়া গান গাহিতেছে, একজন নিমন্ত্রিত অতিথি তাহার পাশে দাঁড়াইয়া স্বরলিপির পাতা উলটাইতেছে। গৃহকর্তা চেয়ারে ঘুমাইয়া পড়িয়াছেন। গান গাওয়া শেষ হইলে মেয়েটি সবার প্রশংসা লাভ করিল। নয় বৎসরের মেয়েটিকে একটি কবিতা আবৃত্তি করিতে বলা হইল। সে খুব সুন্দরভাবে আবৃত্তি করিল। কবিতার বিষয়টি বাহিরের দুর্যোগপূর্ণ আবহাওয়ার

কলগেট ব্যবহার করে মুখের দুর্গন্ধ দূর 3 সারাদিন দন্তক্ষয় রোধ করুন!

কারণ:
একবার ব্রাশ কলগেট ডেন্টাল ক্রীম দিয়ে দাঁত ব্রাশ করলেই দুর্গন্ধ ও ক্ষয়ের জন্য দায়ী বীজাণুর শতকরা ৮৫ ভাগ পর্যন্ত দূর হয়ে যাবে।

বৈজ্ঞানিক পরীক্ষায় প্রমাণিত হয়েছে যে কলগেট প্রতি ১০ জনের মধ্যে ৭ জনের মুখের দুর্গন্ধ সঙ্গে সঙ্গেই দূর করে দেয় এবং কলগেট ব্রাশিং শুরু করার ঠিক পরেই দাঁত ব্রাশ করার দৈনিক ভাগ লোকের ধ্বংসকর রোধ করা যায়—আজ পর্যন্ত দন্তচিকিৎসার ইতিহাসে সেরকম আর কখনো দেখা যায়নি। আর একমাত্র কলগেট-এর সেই প্রমাণ আছে।

তা ছাড়া এর পিপারমেন্টের সুবাস—তাই ছেলেমেয়েরা কলগেট ডেন্টাল ক্রীম দিয়ে নিয়মিত দাঁত ব্রাশ করতে ভালবাসে।

পরিষ্কার নির্মল শ্বাসপ্রশ্বাস নিতে এবং দাঁতকে উজ্জ্বল সাদা করতে...পৃথিবীর অন্য যে কোন টুথপেষ্টের চেয়ে কলগেট অনেক বেশী লোক কেনেন।

যদি পাউডার পছন্দ করেন, কলগেট টুথ পাউডারও এমনি ভালই পাবেন... এর ছোট্ট প্যাকেটে আছে অনেক দিন চলবে।

সঙ্গে বেশ মিলিয়া গিয়াছিল। কাহিনীটি এই—একটি লাইফ-বোটের চালকের স্ত্রী খুব অসুস্থ ছিল। যে রাত্রির ঘটনা সে রাত্রিটি বড়ই দুর্যোগপূর্ণ ছিল। স্বামীটি তাহার দুইখানি হাত নিজের হাতের মধ্যে লইয়া তাহার পাশে বসিয়া ছিল। মৃত্যু আসন্ন। স্ত্রীটিও তাহা বুঝিতে পারিয়াছিল। নীরন্ধ্র অন্ধকার রাত্রি, বাহিরে অতি প্রবল ঝড়। এই ঝড়ের শব্দ ভেদ করিয়া দূর হইতে বিপন্ন এক জাহাজের তোপধ্বনি শোনা গেল, বিপদের ইঙ্গিত এটি। ঝড়ের গর্জন, পাহাড়ী উপকূলে ঢেউ ভাঙার গর্জন। আরও একটি তোপধ্বনি। বোটম্যানকে এবারে যাত্রী রক্ষার জন্য যাইতে হইবে। ঘরে মুমূর্ষু স্ত্রী, বাহিরে কর্তব্যের আহ্বান। বোটম্যানের দ্বিধা। কিন্তু স্ত্রী বলিল, "জ্যাক, তোমাকে কর্তব্যের ডাকে সাড়া দিতেই হইবে, তুমি আমাকে লইয়া থাকিও না, ওঠ। আমাদের পুত্র অ্যালফ্রেড পাঁচ বৎসর বিদেশে আছে, কে জানে হয়ত সেও এমন ভয়াবহ ঝড়ের মধ্যে কোথাও সমুদ্রে রহিয়াছে, সেও হয়ত ঐ বিপন্ন জাহাজের লোকদের মতই অন্য কোথাও কোনও জাহাজে একইভাবে বিপন্ন হইয়াছে। তুমি যাও, ফিরিয়া আসিয়া হয়ত আমাকে আর জীবিত দেখিতে পাইবে না, কিন্তু জ্যাক, তোমার কর্তব্যপালনের জন্য তুমি ঈশ্বরের আশীর্বাদ লাভ করিবে, অ্যালফ্রেডও আশীর্বাদ পাইবে। মৃত্যুর পূর্বে তাহাকে একবার দেখিবার ইচ্ছা ছিল, কিন্তু তাহা যখন হইবার নহে, তখন আমি মৃত্যুর মুহূর্তে উপস্থিত হইলে আনন্দের সহিত আমার আত্মাকে তাঁহারই হস্তে সমর্পণ করিব, যিনি আমাদের কল্যাণের জন্যই যাহা কিছু করিয়া থাকেন। ঈশ্বর তোমার মঙ্গল করুন।" জ্যাক ও তাহার সহকর্মীরা দুঃসাহসিকতার সঙ্গে বিপন্ন জাহাজ লক্ষ্য করিয়া লাইফ-বোটটি সেই বিক্ষুব্ধ ঝটিকার মধ্যে ভাসাইয়া দিল। কিন্তু জাহাজটি ততক্ষণে সম্পূর্ণ ভাঙিয়া গিয়াছে, একটিমাত্র ছেলে প্রাণপণে তাহার মাস্তুলটির দড়ি জড়াইয়া ধরিয়া বাঁচিয়া আছে। মাস্তুলটি ঊর্ধ্বে মাথা তুলিয়া রহিয়াছে। বহু কষ্টে উহারা তাহাকে রক্ষা করিতে পারিল, তাহাতে নিজেদের জীবনও ভীষণভাবে বিপন্ন হইয়াছিল। জ্যাক আবিষ্কার করিল, সেই ছেলেটি তাহারই পুত্র অ্যালফ্রেড। বহুকাল সে নিখোঁজ ছিল, এতদিনে পাওয়া গেল তাহাকে। উহারা ঘরে ফিরিয়া দেখে জ্যাকের স্ত্রী তখনও জীবিত। তাহার অসুখ ক্রমে ভাল হইয়া গেল। উহারা পরে সুখে দিন কাটাইতে লাগিল। ছোট মেয়েটি এই কবিতাটি এমন জীবন্তভাবে আবৃত্তি করিল, এবং শেষ অংশটির পুনরাবৃত্তি করিল যে উপস্থিত সকলেই তাহার প্রশংসায় পঞ্চমুখ হইয়া উঠিল। এইভাবে সম্মানিত ইংরেজরা দিন যাপন করিয়া থাকেন। যদি কেউ অতিথিরূপে এই জাতীয় নির্দোষ- আনন্দভোগের শরিক হইয়া থাকেন, তবে তিনি ইংরেজগৃহের এই উচ্চ পরিবেশটি স্মরণ করিবামাত্র, ইংরেজদের আনন্দ উপভোগের এই উচ্চ এবং পরিমার্জিত রুচির কথাও স্মরণ না করিয়া পারিবেন না। এই দুঃখপীড়িত সংসারে মানুষের পক্ষে ইহা অপেক্ষা সুন্দরতর আর কি আনন্দভোগের কল্পনা হইতে পারে?

জনতা হইতে আর একটি যুবকের কথা পাশাপাশি উপস্থিত করিতেছি। এই যুবকটি এক দোকানের কর্মচারী। সে তাহার পিতার ইচ্ছার বিরুদ্ধে, দেখিতে মোটামুটি মন্দ নয়, এমন একটি স্ত্রীলোকদের পোষাক প্রস্তুতকারিণী মেয়েকে বিবাহ করিয়াছে। সুতরাং পিতা তাহাকে ত্যাজ্য করিয়াছেন। এই দম্পতি তাহাদের এক বৎসরের একটি শিশুসন্তান সহ সপ্তাহে ত্রিশ শিলিং ব্যয়ে পৃথকভাবে বাস করে। এই ত্রিশ শিলিং হইতে তাহাদের দুটি ছোট কামরার জন্য ভাড়া দিতে হয় সপ্তাহে ৮ শিলিং। ঘরের জন্য যে বিছানা আসবাবপত্র দরকার তাহা তাহারা ধারে কিনিয়াছে, মূল্য কিস্তিবন্দিভাবে শোধ করিতে হয়। এইরূপ 'হায়ার পার্চেজ' পদ্ধতি লন্ডনে এখন খুব প্রচলিত হইয়াছে। কলিকাতায় ঠেলাগাড়ি বা গোরুর গাড়ির চালকদের প্রায় এইরকম পদ্ধতিতে প্রতিদিন ঋণদাতার ঋণ শোধ করিতে হয়, উচ্চ সুদ সহ। পার্থক্য এই যে, এখানে কিস্তির টাকা সপ্তাহান্তে দিতে হয়। প্রতি সপ্তাহে ১০ শিলিং দিয়া ৫০ পাউন্ডের আসবাব কিনিতে পাওয়া যায়। যে যুবকটির কথা বলিতেছি তাহাকে তাহার ক্রয় করা জিনিসগুলির জন্য সপ্তাহে ৫ শিলিং করিয়া দিতে হয়। সে কিনিয়াছে ৩ পাউন্ড দামের কার্পেট, ১ পাউন্ডের, আয়না ও স্ট্যান্ড সহ হাতমুখ ধুইবার পাত্র, ২ পাউন্ড দামের সোফা, ছয়খানা চেয়ার কিনিয়াছে ২ পাউন্ড ২ শিলিঙের, মেহগনি ড্রয়ার ৫ পাউন্ডের, তিনখানা টেবিল ৭ পাউন্ডের, পেবাম্বুলেটর ১ পাউন্ড ১০ শিলিঙের, বইয়ের তাক ১ পাউন্ডের, মোট খরচ হইয়াছে ২৫ পাউন্ড ১২ শিলিং। সপ্তাহে পরিবারের খাইবার খরচ প্রায় ১৫ শিলিং ৬ পেনি। ভাগ করিলে দাঁড়ায়—মাংস ৬ শিলিং, রুটি ২ শিলিং ৪ পেনি, সব্জী ১ শিলিং ১ পেনি, মাখন ১ শিলিং, চা, চিনি, দুধ ২ শিলিং, পরিজের জন্য ওটমীল ১ শিলিং ৭ পেনি, বিয়ার ১ শিলিং ২ পেনি। মোট ১৫ শিঃ ১০ পেঃ। বাকি থাকে ১ শিলিং ২ পেনি, তাহা কয়লা, সাবান, কাপড়, ধোলাই খরচ ইত্যাদির জন্য যথেষ্ট নহে। কিন্তু তার স্ত্রী কিছু শেলাইয়ের কাজ করিয়া যাহা পায়, তাহাতে ঘাটতি পূরণ হইয়াও সামান্য কিছু উদ্বৃত্ত থাকে। তাহা দ্বারা ইহারা ক্রমে অবস্থার কিছু উন্নতি করিয়া লইতেছে। সে নিজ হাতে রান্না করে এবং কাপড় ধোয়া ব্যতীত আর সমস্ত গৃহস্থালীর কাজ করে। সাড়ে সাতটায় প্রাতরাশ খায়, খাদ্যসামগ্রী পরিজ রুটি মাখন ও চা। অপরাহ্ণ ২টার সময় তাহারা ডিনার খায়। রবিবারে গরম মাংস খায়, সোমবারে সেই মাংসই ঠাণ্ডা খায়, এবং মঙ্গলবারে তাহার স্টু খায়। বুধবারে নতুন আর এক খণ্ড জয়েন্ট (মাংস) আসে, সপ্তাহের শেষ পর্যন্ত তাহা দ্বারা চালাইয়া লয়। বাড়ি হইতে যাহাদের অনেক দূরে কাজ করিতে হয়, তাহারা, যাহার যেমন সাধ্য তেমনি ভোজনালয়ে বাহিরেই ডিনার খাইয়া লয়। এই রকম ডিনারের খরচ ৬ শিলিং অথবা বেশি। ৬ শিলিঙে এক প্লেট মাংস ও সব্জী দেওয়া হয়। কেহ কেহ ডিনার ৪ পেনিতেও সারিয়া লয়। তাহারা খায় পর্ক (শূকর মাংস)-চপ ও পেঁয়াজ ভাজা। শুধু এ রকম খাদ্য-পরিবেশনকারী ভোজনালয় অনেক আছে। ইংল্যান্ডে সব জিনিসেরই দাম চড়া, তাই এখানে কোনো গরিব লোক কত কমে তাহার পরিবার প্রতিপালন করিতে পারে—তাহা বলা কঠিন। এমন লোক আছে, পরিবারের পাঁচ ছয়টি সন্তান সহ যে সপ্তাহে ১ পাউন্ড খরচে চলিতে পারে। ভারতবর্ষের হিসাবে ইহা অনেক বেশি শুনাইবে, কিন্তু ইংল্যান্ডে তাহা নহে। ভারতবর্ষে একটি লোক দিন ১ পেনি (৪ পয়সা পরিমাণ) দ্বারা চালাইতে পারে, এবং বহু জিনিস সে বাদ দিয়া চলিতে পারে, কিন্তু ইংল্যান্ডে তাহা চলে না, এখানে স্বাস্থ্য রক্ষা করিতে হইলে অনেকগুলি জিনিস অপরিহার্য। এই যুক্ত রাজ্যের অনেক স্থানে গরিব মানুষ কদাচিৎ মাংস কিনিয়া খাইবার সামর্থ্য রাখে। তাহাদের প্রধান খাদ্য আলু রুটি ও ওটমীল। একজন ভারতীয় ছাত্র ইংল্যান্ডে ৩০ শিলিঙে খাওয়া ও থাকার খরচ চালাইতে পারে, কিন্তু কাপড়চোপড় ধোয়া, রেলভ্রমণ এবং অন্যান্য বিষয়ে আরও ৩০ শিলিং খরচ বাদ দিয়া চলিতে পারে না। এ সব খরচ, আগে অনুমান করা না থাকিলেও, তাহাকে করিতেই হইবে। মধ্যবয়সী কোনও ভদ্রলোক এখানে ভ্রমণ উদ্দেশ্যে আসিলে তাঁহার সপ্তাহে ৫ পাউন্ডের কমে চলিবে না।

[ক্রমশঃ]

বিশ শতাব্দীর মার্কিন সাহিত্য

শমীক বন্দ্যোপাধ্যায়

[পূর্ব-প্রকাশিতের পর]

১৯৫০-৬৮ : কবিতার রাজপথ ধরে

আগের পর্বের কবিতার একটি ধারা সমকালীন কবিতার মধ্যে প্রবহমাণ রয়ে গেছে। বরং রবার্ট লাওয়েল (১৯১৭—), উইলিয়ম্ কার্লস উইলিয়ম্স্ (১৮৮৩—১৯৬৩), থিওডোর রেট্‌কে (১৯০৮—১৯৬৩), চার্লস ওলসন (১৯১০—) ও রবার্ট পেন ওয়ারেনের (১৯০৫—) স্বীকৃতি বর্তমান পর্বেরই ঘটনা। এই পর্বের মধ্যে এঁদের রচনার বিবর্তনও লক্ষণীয়।

১৯৫০ অবধি টি এস্ এলিয়টের পঠনস্মৃতিনির্ভর অনুষেঙ্গ ও বাক্‌প্রতিমা কাব্যক্ষেত্রে এমনই মহিমান্বিত ছিল যে উইলিয়ম কার্লস উইলিয়ম্সের অন্য ধরণের কাব্যরীতি অবহেলিত থেকে গেছে। ১৯৫৭ সালে ওয়াশিংটন বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রদত্ত ভাষণে উইলিয়ম্স্ বলেন : "কবিতার উপাদান বলতে আবেগ নয়, শব্দ; শব্দেরই সেই বিশেষ বিন্যাস যাতে বিশেষ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়"—বা অন্যত্র, "শব্দের প্রয়োগে সার্থকতা লাভ করতে পারলেই রচনার সার্থকতা।" অথচ উইলিয়ম্স্ কখনই শব্দ সাজিয়ে ক্ষান্ত হন না, বরং দৃষ্টির সুগভীর অন্তরঙ্গতায় তুচ্ছাতিতুচ্ছ কোন অভিজ্ঞতাকে এমন শাণিত তীক্ষ্ণ রেখায় মূর্ত করে তোলেন যে চোখ যেন তার মধ্যে ডুবে যেতে চায়; এবং তারই মধ্যে শব্দের সুচিন্তিত প্রয়োগ সহসা ভাবিয়ে তোলে, অতিসাধারণের মধ্যেই একটা বিস্তার এসে পড়ে। "এত কিছু নির্ভর করে/একটা লাল ঠেলাগাড়ির উপর/বৃষ্টির জলে চিক্‌চিকে/সাদা মোরগছানার পাশে"—এর অস্পষ্ট ব্যঞ্জনার চেয়ে স্পষ্টতর 'প্রোলেতারিয় প্রতিকৃতি'— "বিশালা, তরুণী কোন মহিলা নিরাবরণ মাথা/পরণে এপ্রন/মাথার চুল টান করে আঁচড়ানো, দাঁড়িয়ে/রাস্তায়/মো জা য মোড়া একটা পা আঙুলে ভর করে/রাস্তার কিনারে/হাতে একপাটি জুতো। খুঁটিয়ে/দেখল ভিতরে/কাগজের সুকতলা টেনে বার করে আনল/একটা পেরেক খুঁজছে/পেরেকটা কতক্ষণ কষ্ট দিচ্ছে"। শেষ ছত্রটি একটি স্বতন্ত্র স্তবক হয়ে গিয়ে যে বিশিষ্টতা লাভ করে, তাতে দারিদ্র্য ও তুচ্ছ কষ্টের অনতিতুচ্ছ সমাহারের একটা আভাস পাওয়া যায়। তবে আভাসই। তাতে কোন নাটকে অশ্রুবর্ষণের সুযোগ নেই। উইলিয়ম্সের কাব্যচিন্তার ভিত্তি তাঁরই নিজের কথায় : "কিছুই অবহেলিত হবে না। সবই অন্তর্গত হবে।" তাই 'বসন্ত ও সব' কবিতায় বসন্তে নবপত্রোদ্গমের বর্ণনায় বুদ্ধিজারিত শব্দপ্রয়োগে বসন্তের নতুন পাতা যেন মানবজন্ম ও ব্যক্তিমানুষের আত্মবীক্ষণের জটিল রহস্যে অর্থপূর্ণ হয়ে ওঠে : "নতুন পৃথিবীতে ওদের নগ্ন প্রবেশ,/ঠাণ্ডা, কোন কিছুতেই নিশ্চিতি নেই/কেন্দ্র প্রবেশেই নিশ্চিত। ওদের চতুর্দিকে/ঠাণ্ডা, পরিচিত বাতাস—/আজ ঘাস. কুঁড়ি বুনো গাজরের পাতার কুঁকড়নো/একে সব বস্তুই সংশ্লিষ্ট হবে—/প্রাণে প্রাণবন্ত হবে : স্পষ্টতা পাবে, পত্রের নিটোল ছাঁদ/কিন্তু এখন কেবলই নগ্ন গর্ব/প্রবেশের—তবুও, গভীর পরিবর্তন/ওদের আবিষ্ট করেছে : শিকড়ে শিকড়ে ওরা/গভীরে আঁকড়ে ধরেছে, জাগতে শুরু করেছে"।

১৯৩০-এর কাছাকাছি উইলিয়ম্সের দীর্ঘ কবিতা 'পেটারসন'-এর সূত্রপাত; ১৯৫৮ সালে এর পঞ্চম ও শেষ সর্গের প্রকাশ। পেটারসন নিউ জারসির একটি শহরের নাম, একটি মানুষেরও নাম। পেটারসন শহরের মধ্য দিয়ে একটি নদী প্রবাহিত। শহর, নদী ও একটি ব্যক্তি—এই তিনকে মিলিয়ে উইলিয়ম্স্ তাঁর স্বভাবোচিত বস্তুলগ্ন রীতিতে এমন এক জীবনচিত্র রচনা করতে চেয়েছেন যার মধ্যে অতীত-বর্তমানের ঐতিহাসিক মিথস্ক্রিয়া, প্রেম ও কামনা, কল্পনা ও প্রাকৃত বাস্তব, অভিজ্ঞতার এমনি নানা প্রদেশের পারস্পরিক যোগ ও বিচ্ছেদের ব্যঞ্জনা রচনা করতে পারেন। তৃতীয় সর্গে উইলিয়ম্স্ যাকে 'বিউটিফুল থিং' বা 'সুন্দর' বলে আবাহন করেন, তাকে প্রথমে ফুলের গাছ মনে হয়, তারপর নববধূ, তারপর এক ধর্ষিতা অসহায়া। এই সুন্দরকে কখনও বা রূঢ় বাস্তবের রূপ বলেও মনে হয়। এক ধর্ষণের বর্ণনার মাঝে মাঝেই পুনরুক্ত এই দুটি কথা—'বিউটিফুল থিং'—পড়তে পড়তে সুন্দরের অথবা শুদ্ধতার ক্ষীণপ্রাণ ভঙ্গুরতার কথাও মনে আসতে পারে। 'পেটারসন' লেখার মধ্যেই ১৯৫২ সাল নাগাদ উইলিয়ম্স্ বেড়াভাঙা গদ্যছন্দ পরিহার করে প্রত্যেক পংক্তিতে তিনটি 'স্ট্রেস্' বা প্রস্তরের এক নতুন ছন্দোবন্ধ ব্যবহার করতে শুরু করেন। তিনি এই পর্বে আবার নতুন করে উপলব্ধি করেছিলেন যে "কীর্তিমান কবির দায়িত্বই হল তাঁর কাব্যকে সংযত করা।"

কবি, ঔপন্যাসিক ও নাট্যকার রবার্ট পেন ওয়ারেন কবি-পরিচয়েই সমধিক যশস্বী। ওয়ারেনের কবিচারিত্র্যের গঠনে তাঁর দক্ষিণী জন্ম ও জীবনের ছাপ পড়েছে। ঘটনা বা দৃশ্যগ্রাহ্য বাস্তবের চেয়েও একটা ঘটনা বা রূপকল্পকে কেন্দ্র করে মাকড়সার জালের মত চিন্তার জট বুনে যাওয়াই ওয়ারেনের ইদানীংকার কবিতার ধরণ। এই চিন্তার জাল প্রায়ই শিথিল সূত্রে গ্রথিত কবিতাগুচ্ছ হয়ে ওঠে। জনৈক ডক্টর নক্স্-এর আত্মহত্যায় কোন এক অপ্রাপ্তবয়সীর প্রথম ভাবনা—"সেই গ্রীষ্মেই আমি খেলেছিলাম/ঐ চিলেকোঠায়, এবং তাই জানা ছিল,/খড়ের গাদায় পিঠ পেতে শুলে/চোখে পড়ে কেবল মাকড়সার জালের গোধূলি অন্ধকার/ছাদ থেকে ঝুলন্ত, নয় তো একা একটা বোলতা/আঁধারে মন্থর গতি/তাকে ঘিরে আলোর দীপ্ত স্ফুরণ। /ঐ মানুষটা—কতক্ষণ শুয়ে ছিল, শুধু তাকিয়ে?/ঐ একটা কথাই আমার মাথায় এল। /আমি ভাবতে লাগলাম, মানুষটা কতক্ষণ ঐখানে শুয়েছিল।" অপ্রাপ্তবয়সী অতঃপর প্রবীণের শরণ নেয়। মৃত্যুর, বিশেষত "গরম সীসে আর ঠাণ্ডা ইস্পাতের" যন্ত্রণায় যে মৃত্যু সেই মৃত্যুর অভিজ্ঞতায় শ্রান্ত জীর্ণ বৃদ্ধ হাতড়ে হাতড়ে একটা

উত্তর খুঁজে পায় : "ছায়ার চেয়ে অন্ধকার তার মুখ খুলল।/ফ্যাকাশে লাল ভিজে ঠোঁট, আমি দেখলাম জিভটা নড়ছে/প্রবীণ দন্তরাজি পেরিয়ে মুখের অন্ধকার গহ্বরে।/অন্ধকারে নড়ল, তারপর জিভ কথা বলে উঠল : 'পুত্র—'/ জিভ বলল, 'কোন কোন লোক পৃথিবীটাকে যেন সইতে পারে না।' /অন্ধকারের মধ্যে জিভ নড়ল। বলল, 'কোন কোন লোক'।" ১৯৬৬ সালে লেখা 'দ ডে ডক্টর নক্স্ ডিড্ ইট্' নামে এই কবিতাগুচ্ছের শেষ কবিতায় কবি বলেন, মৃত্যু থেকে পালানো যায় না : "আমি পালিয়েছি নিজেরই দিকে, কেন না/কোন জলরাশিই তো পৃথিবীকে মুছে দিতে পারে না। /আমরাই পৃথিবী, আমরা কী করে ভাগ করব/আমরা শিশু, গোধূলিবেলায় জোনাকির খেলা দেখছি! /আমাদের আরো শক্ত হয়ে গড়তে হবে, যা ভালো, তারই শক্ত ভিত।/ আমার ছোটমেয়ের কুকুরটা আজ রাস্তায় চাপা পড়ে মরেছে। /এখন রাত্রিবেলা। পাশের ঘরে মেয়েটা কাঁদছে।" ওয়ারেনের কল্পনায় দার্শনিক মননের প্রাধান্য থেকেই তিনি সেই আশ্চর্য শূন্যতা কল্পনা করতে পারেন, ১৯৬৭-র এক অনুরূপ কবিতাগুচ্ছে : "আমি গেছি সেইখানে যেখানে/শূন্যতা স্থিতি, অথচ নীরব নয়,/কেন না কণ্ঠস্বর আছে,/ফাঁক নেই, কেন না মহতী পূর্ণতা,/শূন্যতার ভিড়/ শূন্যতায় সোচ্চার,/শূন্যতা যেন পাঁজরে ফ্লুইয়ের চাপ,/শূন্যতার ভার/গলায় কঠিন শ্লেষ্মার মত আটকায়/এবং সেই অন্ধকারে/যদি তুমি কাশো, জেনো,/ শূন্যতার সেই দেশে/কোন প্রতিধ্বনি নেই,/কেন না অন্ধকারের তো দেওয়াল নেই,/কিংবা যদি প্রতিধ্বনি থাকেই/ তবে তাও, প্রথম ধ্বনি যা-ই হোক না কেন./ শোনা যায় একটা হাসি। প্রত্যেক খাটের ধারে/প্রদীপ জ্বলে, অথচ আলো জ্বলে না।" আদর্শ ও বাস্তব, যুক্তি ও অযৌক্তিকের সম্পর্ক নিয়ে ওয়ারেনকে প্রায়ই চিন্তিত মনে হয়। মানুষের জীবনে 'পাপের অশুভ ছায়া ও যুক্তি-বিরহিত ত্রাসের ভয়ংকরতাও তিনি রচনা করে থাকেন। ওয়ারেনের বৈশিষ্ট্যই হল যুক্তিবিধৃত বাস্তবকে পেরিয়ে যাওয়া। স্বভাবতই বারে বারে তিনি অতীত স্মরণ করেন, অতীত থেকে বর্তমানের বিচারের সূত্র টেনে আনেন : "যা ছিল আমাদের,/যা ছিলাম আমরা./ কিছুই হারায় নি। /সবই সার্থকতা পায়/ জ্ঞানে।" কেন না, "অতীতের সত্যকে বাদ দিলে আমরা ভবিষ্যতের স্বপ্ন দেখতে পাব না।"

কবি জন বেরিম্যান, থিওডোর রেট্‌কে-কে তাঁর মৃত্যুর পর "বাগানের অধিপতি" বলে বর্ণনা করেছিলেন। মিশিগানে বাল্যকালে ফলফুল, লতা-পাতার, সঙ্গে তাঁর যে ঘনিষ্ঠ পরিচয় ঘটেছিল, তার স্মৃতি তিনি বহন করে চলেছিলেন। অথচ এ বোধও তাঁর ছিল, "বড় বেশি বাস্তব চোখ ঝলসে দেয়, অতিরেক মনে হয়;/বড় বেশি অন্ত-রঙ্গতায় ক্লান্তি আসে"। তাই প্রকৃতির এই অভিজ্ঞতাকে তিনি মনশ্চৈতন্যের স্বপ্ন ও কল্পনার সঙ্গে মিলিয়ে একাকার করে দিতেন। রেট্‌কে-র কবিতার এই স্বপ্নলোকে একটা বাদুড়ও যেমন মানুষের মুখ পায়, অর্কিড মানুষের নরম আঙুল পায়, তেমনি একটি জেরেনিয়ম ফুলের সঙ্গে কবির সম্পর্ক মানবিক হয়ে ওঠে : "আমরা দুজনেই একা, দুজনেই জীর্ণ,/আমি মদের দুর্গন্ধ ছোটাচ্ছি ওর দিকে,/আর ও টব থেকে জানলার দিকে হেলে। /শেষের দিকে ও যেন আমার কথা বুঝতে পারত—/আমি ভয় পেতাম।" অন্ত্যমিলে দীর্ঘস্বর ও হ্রস্বস্বরকে মিলিয়ে দিয়ে রেট্‌কে যেমন মজা পেতেন, তেমনি মাঝে মাঝে পেতেন নিতান্তই সহজ রসিকতায় বা মাতলামোর ভাণ করে।

রবার্ট লাওয়েল পঞ্চাশের দশক ধরে বিদেশী কবিতার অনুবাদ করে গেছেন, বিশেষত জুভেনাল, হরেস, বোদেলেয়র, র‍্যাঁবো, হাইনে, মনতালে, ও পাসতেরনাকের কবিতা। লাওয়েলের এই অনুবাদকর্মে কবি প্রায়ই মূল কবিতার তাৎপর্যকে নতুন ভাষার শক্তি দিয়ে আরো তীব্র করে তুলবার প্রয়াস পান, পুরনো কালের কবিতাকে আরো সাম্প্রতিক ইংগিতে অন্যতর মূল্য দেন। পাসতেরনাকের 'হ্যামলেট' কবিতার অনুবাদে লাওয়েল মূল কবিতাটিকে আয়তনে প্রায় দ্বিগুণ করে তোলেন, পাসতেরনাকের শান্ত বিক্ষোভকে প্রচণ্ড তিক্ত ও স্পষ্ট করে তোলেন। আরো আগে যে কবিতা লিখেছেন, লাওয়েল তাতেও অতীত ও বর্তমানের ঐতিহাসিক যোগের একটা প্রচ্ছন্নবোধ নিয়ে এসেছিলেন। অন্য দেশ ও অন্য কালের কবিতার এই অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে লাওয়েলের এই ইতিহাস-চেতনাই প্রগাঢ়তর হয়। কবি হিসেবে লাওয়েল ব্যক্তিকের চেয়ে ব্যাপকতর বা বিস্তৃততর অভিজ্ঞতারই অনুসারী। দেশ, জাতি, পৃথিবী ও সমকালের ব্যাপ্ত চেতনার মধ্যে বয়স ও ক্লান্তির একটা অন্তরঙ্গ অনুভব রচনা করার ক্ষমতাও অবশ্য লাওয়েল রাখেন : "কিসে বিচলিত হল এই বাড়িঘর ?/এত কাছেই,/পরিচিত মুখগুলো আপসা হয়ে ওঠে।/পঞ্চাশেই আমরা এত ভঙ্গুর,/ধনকো পাখির পালক.../চোখের কাজ তো সারা হল।)/ আলোকিত কাজের ডায়ালের গায়ে,/অমাবস্যার সবুজ পাঁজর :/ এক, দুই, তিন, চার, পাঁচ, ছয়।/আমি কাঁপছি, দীর্ঘশ্বাস ফেলছি,/ঘুমোতে পারছি না।/তারপর সকাল এসে/বলে, 'একটা রাত কেটে গেল'।" দেশের সংকটবোধে পীড়িত লাওয়েল ইদানীং বেশি কবিতা লিখছেন না, বরং নাগরিক অধিকারের আন্দোলনে ভূমিকা নিচ্ছেন। ১৯৬৫ সালের এক সাক্ষাৎকারে লাওয়েল আলভারেজকে বলে-ছিলেন, হোয়াইট হাউসে মালরোর সম্মা-নার্থে কেনেডির ভোজসভায় পরম আপ্যায়িত হয়ে ফিরে পরের দিন সকালে লাওয়েল কাগজে পড়েছিলেন, এশিয়ার সপ্তম নৌবহর পাঠানো হল : "মনে হয়ে-ছিল, আসলে শিল্পীমাত্রেই কী তুচ্ছ : এই সব আদর-আপ্যায়ন, এই সবই ঠাট; আপন সরকারের স্থান অন্যত্র। দেশটা আসলে চালাচ্ছে সেন্টাগনেরই কোন প্রতি-বেশী। সেইটেই বোধ হয় সঙ্গত।... আমাদের দেশের চিরকালের আদর্শ পৃথিবীকে রক্ষা করা'। আর এই রক্ষা করার ব্যাপার পৃথিবীকে ধ্বংস করারই নামান্তর।...আমরা হয়ত নিজেদের বাঁচাতে গিয়ে কিউবাকে উড়িয়ে দেব, তারপর সারা পৃথিবীটাকে। কিন্তু সবটাই ঘটবে আদর্শ-বাদের জেকের আড়ালে।"

জন বেরিম্যান (১৯১৪—) একেবারেই অন্যজাতের কবি। বেরিম্যান তাঁর নিজের কবিতাকে 'ড্রীম পোয়েম' বা 'স্বপ্নকবিতা' বলে বর্ণনা করে থাকেন। হেনরি হ্যাংকো-ভিচ নামে একটি মানুষের স্বপ্নের অসংলগ্ন টুকরোই বেরিম্যানের কবিতায় দেখা দেয়। তবু তারই মধ্যে অনুভব করা যায় তাঁর নৈতিক ক্ষোভ : একদিকে মদের আড্ডা চলে, মধ্যরাত্রে মদের ফেণা; আর তখনই "শেয়ালদা স্টেশনে কয়েকটা নিঃসম্বল শিশু বেঁচে থাকে, মরবার জন্যই।/চীনের কমিউনে কাজের ব্যস্ততা।/ দুটো মদের গেলাস/জমকালো ঘরের একটা কোণে চলে গিয়ে/একজন আরেকজনকে একটা মিথ্যেকথা বলল। ঘৃণা ও প্রবল আশাবাদ, স্বপ্নের বিকৃত জীবনমূর্তি ও বাস্তবের তীব্র অনুভব, বেরিম্যানের কবি-তায় পাশাপাশি স্থান পায়। গত বছরের এক কবিতায় এই কথাটাই বেরিম্যান বলে-ছিলেন : "আমাদের ধর্মই হল/যেমন আঘাত করা, তেমনিই/সুখের পৃথিবীর ঘোষণায় সোচ্চার হওয়া।"

বেরিম্যানের কবিতাতেই আধুনিক মার্কিন কবিতার যুক্তিবাহিত বিন্যাস ভাঙতে শুরু করে। কিন্তু এই বিন্যাসকে যিনি আরো ভেঙে 'বীট' কবিতার পথ করে দেন, তিনি চার্লস ওলসন। ওলসন থেকেই সমকালীন মার্কিন কবিতার আরেক পর্বের সূচনা, কবিতার রাজপথ

যন্ত্রণা

রেবন্ত বসু

সরোজ তার কাজে এসপ্লানেড বা হাই-কোর্ট বা ডালহৌসি বা খিদিরপুর বা হাওড়া বা অন্য কোথাও যাচ্ছিল ট্রামে করে। প্রচণ্ড ভিড়। দুটো কামরাই একেবারে ঠাসা। নিম্ন-মধ্যবিত্ত ও উচ্চ-মধ্যবিত্ত এই দুই শ্রেণীর প্রভেদ যাঁরা বুঝতে পারেন না তাঁদের জন্যেই বোধহয় এই দুটি কামরার সৃষ্টি। সরোজ এককালে ছিল ঐ দ্বিতীয় শ্রেণীর যাত্রী; তারপর ধীরে ধীরে ধাপে ধাপে আর্থিক উন্নতি করে প্রথম শ্রেণীতে নিজের স্থান করে নিয়েছে। কে বলতে পারে একদিন আরো এক ধাপ লাফিয়ে সে ট্যাক্সিতে চড়ে বসবে কি না এবং কোনো একদিন, কোনো এক সুপ্রভাতে বা শুভরাত্রিতে সে নিজের গাড়িতে করে স্ত্রীপুত্রদের নিয়ে বেড়াতে বেরোবে কি না কলকাতার রাস্তায়! যাই হোক, সে যবে হবে তবে হবে—আপাতত সে ট্রামের ফার্স্ট ক্লাসের একদম আগের দিকে ড্রাইভারের কেবিনের দরজায় অল্প হেলান দিয়ে একটা হাত দিয়ে রড ধরে তার কাজে চলেছে। কতো রকমের কতো চেহারার লোক এই ট্রামটিতে—উচ্চ-মধ্যবিত্ত, মধ্যবিত্ত এবং নিয়মের ব্যতিক্রম হিসেবে দু-চারটি ধনী ও নিম্নবিত্তের উপস্থিতি। কেউ ছেলে, কেউ মেয়ে, কেউ সুন্দর, কেউ কুৎসিত, কেউ সাধারণ, কেউ থেকেও-নেই অথবা নেই থেকেও-আছে। কন্ডাক্টর দাঁড়িয়ে আছে গেটের কাছে—ঝুলন্ত মানুষগুলির কাছে পয়সা চাইছে। পায়ের ওপর পা তুলে বসে থাকুক বা দু-হাত মাথার ওপর তুলে ধরে দাঁড়িয়ে থাকুক বা অন্য লোকের পায়ে পা লাগিয়ে ঝগড়া করতে করতে ঝুলতে থাকুক—সবাইকেই সমান পয়সা দিতে হবে। কে বলে ভারতে শৃঙ্খলা নেই! —সরোজ এই জীবন্ত উদাহরণটি চোখের সামনে দেখে একটি অপ্রাসঙ্গিক সমস্যার সমাধানের সন্তুষ্টি উপভোগ করতে লাগল। আসলে কোনো কাজ নেই যে। যতক্ষণ না সে ট্রাম থেকে নামছে ততক্ষণ সে সম্পূর্ণ নিষ্কর্মা, শুধু দাঁড়িয়ে থাকা, বোঝা থাকা—কিন্তু তাই বলে মন তো অলস থাকবে না—সে চিন্তার খোরাক খুঁজছে। যাদের সঙ্গে সরোজ চলেছে তাদের সে

চেনে না—ঐ বৃদ্ধ ভদ্রলোকটি তার মৃত পিতার মতো কিন্তু পিতা তো নন কাজেই, ঐ মহিলাটি তার স্ত্রীর চেয়ে ঢের সুন্দরী কিন্তু স্ত্রী তো নন, ঐ রমণীর কোলের শিশুটি তার তৃতীয় ও আপাতত কনিষ্ঠ সন্তানের মতো কিন্তু সন্তান তো নয় কাজেই ওদের ভক্তি ভালোবাসা আদর কিছুই করা যাবে না। তার কাছে ওরা কেবলমাত্র কতকগুলি অবয়ব মাত্র। আবার এক অপ্রাসঙ্গিক ও অদ্ভুত সমস্যা খুঁজে নিল তার মন: আচ্ছা, আমরা যে বলি এই পৃথিবীটা কি বিরাট, কিন্তু সত্যি বলতে আমরা এর ক'টি প্রাণীর সঙ্গে পরিচিত? আমার কথাই ধরা যাক না—আমার মৃত পিতামাতা, জীবিতা স্ত্রী ও তিনটি সন্তান, দুটি ভাই তাদের স্ত্রী ও ছেলেমেয়েরা, আপিসের বড়বাবু ও সমগোত্রীয় ক'টি বন্ধুবান্ধব, ছেলেবেলার জীবন্মৃত একটি প্রেমিকা ও আরো কিছু স্বার্থপর কারণে জড়িত নরনারী ছাড়া আমার জগতে আর কে আছে? এই যে এখন আমি চলেছি—আমার বিপদে ঝাঁপিয়ে পড়বে এমন প্রাণী এখানে কে আছে? নেই, নেই। প্রাণী কেন—এমন বস্তু কোথায় আছে এখানে যার সাহায্য আমি পেতে পারি? ঐ মহিলার হাতব্যাগ, ঐ ভদ্রলোকের ছাতা, ওনার পোর্টফোলিও, আ—আপনার নাকঝাড়া রুমাল—এদের কোন্‌টার ওপর আমার এতটুকু অধিকার আছে, ভরসা আছে? আজ এই মুহূর্তে কণ্ডাক্টর যদি আমায় বলে 'নেমে যান' কে আমায় ধরে রাখবে? ভাবতে ভাবতেই সরোজের হাত চলে গেল বুক পকেটে যেখানে একটি দশটাকার নোট ও একটি দশ পয়সা শুয়ে অপেক্ষা করছে তাকে সাহায্য করার প্রত্যাশায়। হ্যাঁ, সত্যি এরা ছাড়া এই ট্রামে আমার কোনো বান্ধব নেই—এখন যদি কণ্ডাক্টর এসে বলে 'নেমে যান' তাহলে.....

'নেমে যান' সত্যিই কণ্ডাক্টরটি বলল একটি আরোহীকে: 'পয়সা নেই—মজা করতে উঠেছেন—আশ্চর্য!'

লোকটির কাছে পয়সা নেই, এত লোক আছে—তবু কেউ নেই, কিছু নেই, আহা অসহায়। সঙ্গে আছে তার বয়স আর দারিদ্র্য যাদের ভারে সে নুব্জ। তার ভগ্নমত অবস্থা দেখে সরোজের মন হঠাৎ গড়গড় করে আউড়ে উঠল: ন যযৌ ন তস্থৌ।

কণ্ডাক্টর সাহেব এবার অ-সংস্কৃতভাবে লোকটির ঘাড়ে ধাক্কা দিয়ে বলে উঠলেন, 'নেমে যাও!' .....সরোজ তাড়াতাড়ি দশ পয়সাটি বার করে হাতের মুঠোয় রাখল। এটি গেল তো মান-ইজ্জত সব গেল। সে ভালো করে ভেবে দেখল, দশটাকার নোটটা বার করলে অবস্থা আর ভালো হবে না—বরং আরো অবনতি হবে। কণ্ডাক্টর হয়তো বলবে 'এটা একটা পুরনো চাল বাবু', কিংবা বলবে ' '—সরোজের মন তার উদ্ভাবনী শক্তি প্রয়োগ করতে লাগল। অতএব, এ পয়সাটা সযত্নে রাখাই ভালো। সত্যি, একটা দশ পয়সার যে এতখানি ক্ষমতা এটা সে আগে কোনোদিন ভাবে নি। এই পয়সা তাকে গন্তব্যস্থলে নিয়ে যাবে, তাকে অপমান গ্লানি শারীরিক শ্রম—সব কিছু থেকে বাঁচাবার ক্ষমতা এই এতটুকু গোল চাকতির। আজ এই মুহূর্তে সরোজের কাছে এর চেয়ে বেশি মূল্যবান আর কিছুই নয়: ঐ মেয়েটির কোমল দেহলতা—কতো পুরুষের কাতর লোভী দৃষ্টি তাকে ছুঁয়ে যাচ্ছে—দামী, নিশ্চয়ই দামী, কিন্তু দশ পয়সার চেয়ে কম; ঐ শিশুটির মুখের হাসি—সরল নিষ্পাপ সুন্দর হয়তো বা কাব্যিকও, কিন্তু কখনই দশ পয়সার চেয়ে বেশি দামী নয়। উঃ কি ক্ষমতা, কী ক্ষমতা! শুধু তাই কেন, তাই বা কেন, সরোজের মন স্লেট-পেন্সিল নিয়ে অঙ্ক কষতে বসে:

এক দশেতে—ছোলা ভাজা
দশ দশেতে—চারটে খাজা
একশ' দশে—চপ কাটলেট
হাজার দশে—'লোকাল সেট'
লক্ষ দশে—পয়নাগাঁটি
কোটি দশে—দাঁত কপাটি

না ভুল হলো; কোটি দশে—টাকা মাটি।

না, তাও ভুল হলো। যাকগে, অতটা ভাবার ক্ষমতা তার মনের নেই। মোটের ওপর দেখা যাচ্ছে যে অসীম ক্ষমতার অধিকারী এই পয়সা নামক বস্তুটি। পূর্ণের সঙ্গে পূর্ণ যোগ করলে বলে পূর্ণই থাকে অথচ এর পেছনে একটা শূন্য যোগ করলে এর সংখ্যা যাবে বেড়ে, আরো একটা শূন্য—আরো বাড়ল, আরো-আরো-আরো। না, এ জিনিসটি তো সহজে হাতছাড়া করা চলবে না! সরোজ ঠিক করল সে নেমে হেঁটে যাবে। কিন্তু ভাবা আর করার মধ্যে দুস্তর ফারাক। যাবে কি করে—মানুষের শরীর দিয়ে গড়া যে প্রাচীর তা চীনের প্রাচীরের চেয়েও দুর্লঙ্ঘ্য। তাছাড়া—মনে করা যাক সে অসাধ্য সাধন করল—তবু গেটের কাছে মূর্তিমান সমাজ হয়ে যে কণ্ডাক্টর হাত পেতে দাঁড়িয়ে আছে—যে আপন অধিকারে বলীয়ান—তার হাত থেকে তো রক্ষা পাবার কোনো উপায় নেই! 'আমার নেই'—'নেই!' অপমান, জ্বালা, বেদনা; 'আমার আছে'—'আছে—দাও!' হ্যাঁ, দিতে হবে, থাকলেই দিতে হবে, স্ত্রীকে দিতে হবে, ছেলেকে দিতে হবে, চাকরকে দিতে হবে, ট্রামকে বাসকে একে-ওকে-তাকে শুধু দিতে হবে, দিতে হবে। যদি না দিতে পারলাম, যদি বলি 'ফুরিয়ে গেছে' অর্থাৎ 'নেই', যদি বলি 'কোথায় পাব' অর্থাৎ 'নেই', যদি 'খুঁজে পাচ্ছি না' অর্থাৎ 'নেই' তাহলে স্ত্রী-পুত্র-পরিবার, আপনারা তারা এরা, ছেলেরা মেয়েরা সবাই বলবে—নানান জনে নানান কথা বলবে কিন্তু তার ফল বর্তাবে একটাই, ঐ কণ্ডাক্টরের সম্ভাব্য মন্তব্যেরই অনুরূপ—অপমান, জ্বালা, বেদনা। সত্যি, এই জন্যেই বোধহয় কণ্ডাক্টরকে চেয়ে চেয়ে তাগাদা দিয়ে নিতে হচ্ছে, না চাইলে কেউ দেবে না, কেন দেবে—এমন অমূল্য ধন কে আর স্বেচ্ছায় ত্যাগ করতে চায়? অমূল্য ধন, অমূল্য ধন—তার মন স্লেটটার ওপিঠ মেলে ধরে:

এক দশেতে—মিষ্টি হাসি
দশ দশেতে—'বেশ'
একশ' দশে—'ভালোবাসি'
হাজার দশে—মধুর আবেশ
লক্ষ দশে—'কাজের মানুষ'
কোটি দশে—রঙিন ফানুস

না, হলো না—কোটি দশে—ফাঁপা ফানুস!

না, তাও হলো না; অথচ না হলেও ঐ হলো; উপায় নেই—সরোজ অবাক হয়ে আবিষ্কার করে যে 'মানুষ' শব্দটার সঙ্গে 'ফানুস' ছাড়া আর কোনো শব্দেরই মিল হয় না—'আ মরি বাংলা ভাষা' অথবা সত্যিই বোধহয় তাই—একটু ভেবে দেখলে মানুষে আর ফানুসে বিশেষ তফাৎ আছে কি? সে থাকুক আর নাই থাকুক—সরোজ ভাবে, আমি মোটের ওপর আজ এখন এই পয়সাটি কিছুতেই হাতছাড়া করব না; দেব না হয় কিছু তার বদলে—বিবেক দেব, আত্মসম্মান দেব, কেন দেব না—কতো মহৎ প্রতিভাবান প্রতিষ্ঠিত লেখক শুধু আরো পয়সার লোভে, আমার ঐ ছড়াগুলির শেষের বা তার ওপরের লাইনে স্থান পাবার জন্যে জলাঞ্জলি দেন নি কি তাঁদের বিবেককে, লেখেন নি কি অপাঠ্য সব বই? অনুরূপ কারণে লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি লোক রোজ নিজেদের আত্মসম্মান বিক্রি করছে নাকি অন্যের কাছে? দেব, দেব, শরীর দেব—আমার ছড়ার কোনো লাইনে স্থান পাবার জন্যে গণিকারা, অসহায় অসুস্থ বাবার মেয়েরা, বেকার দাদার বোনেরা, ছোটো ভাই-বোনেদের প্রতিপালিকারা বিকিয়ে দেয় নি কি তাদের শরীর? শুধু তাই কেন—হাটে-বাজারে রাস্তার কারখানায় আপিসে রোদে পুড়ে, জলে ভিজে, আগুনের আঁচে, চিমনীর ধোঁয়ায়, ওভার টাইম খেটে, অক্লান্ত পরিশ্রমে শরীর পাত করে নি কি লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি মানুষ—করছে না কি? বৈশ্য আর বেশ্যাতে জগৎ ভরে গেছে।

এক দশেতে—বাসে চড়া
দশ দশেতে—রিক্সা করা
একশ' দশে—ট্যাক্সি করে
হাজার দশে—ফ্ল্যাটের ঘরে
লক্ষ দশে—মেমটি পেলাম
কোটি দশে—কোথায় এলাম?

না, হলো না: কোটি দশে—টেঁসে গেলাম।

তাও হলো না; হলো না তো ঐ হলো; উপায় নেই—কোটি দশ অবধি কিছুতেই পেরে উঠছে না সরোজের মন—অত মাথায় চড়ে তার মাথা ঘুরছে...মাথা ঘুরছে..পাখা ঘুরছে...বাঃ, দুনিয়াসুদ্ধ লোক কেবল ঘুরে মরছে এই একটি জিনিসের জন্যে। সরোজ ভাবে, সবাই সব দেয় এর জন্যে, আমিও দেব, কি দেব? আর কি দেবার আছে আমার.....ঐ যে, অবিনাশ উঠছে, আমার ভাইপো, ভায়েরা আমরা পৃথগন্ন কিন্তু ট্রামে উঠলে আমি 'কাকামণি' আর ও 'অরু'। ওর সঙ্গে যদি চোখাচোখি হয়ে যায় তাহলে ওর ভাড়াটাও আমাকে দিতে হবে, কিন্তু আমার পক্ষে তা সম্ভব নয়। কারণ আমার কাছে এই একটিই দশ পয়সা আছে, দশটাকার নোট বার করলে কণ্ডাক্টর বলবে (পূর্বে বর্ণিত কণ্ডাক্টরের সম্ভাব্য অনুক্ত দ্রষ্টব্য)...; দ্বিতীয়ত, যদি বা আমার থাকত তবু আমি দিতাম না। যা নিয়ে এত মাতামাতি, এত যুদ্ধ, এত ভাবনা-চিন্তা মান-অপমান ব্যবসা-বাণিজ্য আপিস-আদালত বাস-ট্রাম আমি আপনি সে তারা তাঁরা ইনি উনি তিনি ইত্যাদি ইত্যাদি যাবতীয় বিশেষ্য ও সর্বনাম তাকে আমি সামান্য ভাইপোর খাতিরে ছাড়তে রাজী নই—যার জন্যে নিজের সম্মান বিসর্জন দিতে চলেছি তার কাছে কা তব কান্তা কস্তে পুত্র—এ তো আবার ভ্রাতুষ্পুত্র। অতএব সরোজ নিচের দিকে চোখ নামিয়ে রাখে—চোখকে বলে মনের দর্পণ—সেই চোখ যদি অবিনাশ না দেখতে পায় তাহলে তার মাথার চুল দেখে আর অবিনাশ কি বুঝবে! সমস্ত শরীরের মধ্যে, সরোজের মনে হয়, চোখের গুরুত্বই সবার ওপরে, যেমন—'চক্ষুলজ্জা'—লজ্জার মধ্যে ঐটাই বোধহয় সবার শেষে পৃথিবী থেকে বিদায় নিয়েছে: আর অত বিশ্রী করে না ভাবলেও ধরুন 'চোখে চোখে' অর্থাৎ ইংরেজীতে যাকে বলা হয় 'লাভ অ্যাট ফার্স্ট সাইট'—প্রথমে চোখে চোখে, তার পর না হয় মুখে মুখে, তারপর..... আগে চোখ। আবার ঐ চোখই কদর্য ও সাংঘাতিক রূপ ধারণ করতে পারে: শকুনের চোখ ভাগাড়ের দিকে আর কণ্ডাক্টরের চোখ লোকের পকেটে। ঐই রে, উনি যে আবার গুটিগুটি এই দিকেই এগোচ্ছেন। কি বিপদ! সাধারণ নিরীহগোছের চেহারা, মাথাভরা টাক, পোষাকটিও ময়লাগোছের, এক বা দুই বা তিন বা চার-পাঁচ ছেলের বাপ অথবা ব্যাচিলার, ওঁর একমাসের রোজগার আমি এক সপ্তাহে কামাই—অথচ কি ভয়ঙ্কর—গুটিগুটি এগিয়ে আসছে এর-ওর-তার-আপনার আমার সর্বস্ব হরণ করে নেবে বলে। ওদের না দিয়ে উপায় নেই তাই দিচ্ছে, যার পনের পয়সা দেওয়া উচিত সে দশ পয়সা দিচ্ছে—অনেকটা নামমাত্র কিছু ধরে দিয়ে ইনকামট্যাক্স ভাঁওতা দেওয়ার মতো—তবু দিচ্ছে; ওদের দিয়ে দিয়ে অভ্যেস হয়ে গেছে, আমার অভ্যেস হয় নি—এই মুহূর্তে যখন আমি এত সব ভাবছি তখন নিশ্চয়ই আমার অভ্যেস হয় নি, কারণ অভ্যেস জিনিসটা আমাদের চিন্তাশক্তি, ভালোমন্দ বিচার করার ক্ষমতাকে নষ্ট করে দেয়—যেমন মদ-খাওয়া, রেসের মাঠে যাওয়া, গণিকালয়ে যাওয়া। আমি দেব না—সরোজ ঠিক করে ফেলে মনে মনে—আমি বলব না 'নেই', বলব না 'আছে'—এতক্ষণে লোকের ভিড়টা সামান্য একটু কমেছে—আমি ফাঁকি দেব। মনকে সে জিগ্যেস করে: বলো দেখি কেমন করে ফাঁকি দেব? 'ফাঁকি' কথাটার সঙ্গে মন তার বহুদিন ধরে পরিচিত: পড়ায় ফাঁকি, প্রেমে ফাঁকি, কর্তব্যে ফাঁকি, স্নেহে ফাঁকি—এসব মনই তাকে এতদিন ধরে শিখিয়ে-পড়িয়ে করিয়ে এসেছে; শুধু তাই নয়, নিজেকে ফাঁকি দেওয়া বড়ো চাট্টিখানি কথা নয়—সরোজবাবুর মন তাকে তাও করিয়েছে। অতএব সে-সবের কাছে আজকের এই সামান্য কাজটুকু তো নস্যি। মন তার শেলট বার করে একটা অঙ্ক কষে বুঝিয়ে দেয়: একটি ট্রেন ঘণ্টায় পাঁচ মাইল বেগে উত্তর হইতে দক্ষিণের দিকে যাইতেছে, অপর একটি সমানাকৃতি ট্রেন ঘণ্টায় দশ মাইল বেগে দক্ষিণ হইতে উত্তরের দিকে যাইতেছে—উহারা কতোক্ষণে পরস্পরকে অতিক্রম করিবে? উত্তর হলো: এক মুহূর্ত। 'এক মুহূর্ত' সময়টা এমন কিছু নয়, বলতে গেলে কিছুই নয়, একটিমাত্র মুহূর্তে ঘড়ির কাঁটার সামান্য নড়া ছাড়া আর জীবের মৃত্যু ছাড়া আর বোধহয় তেমন কিছুই হয় না। অতএব ঐ সময়টুকুর মধ্যে সরোজ নিশ্চয় ঐ কণ্ডাক্টরকে অতিক্রম করতে পারবে আর কণ্ডাক্টরও তাকে অতিক্রম করে যাবে—সরোজ ভাবে—আমি ফাঁকি দেব আর সে ফাঁকি পড়বে, আমার দশ পয়সা জমবে, তার কমবে—চমৎকার নিয়ম ভাই, আমার বাড়ল তো কোথাও কিছু নেই আপনার গেল কমে, আবার আপনার বাড়ল তো আমি বেচারা মারা পড়লাম। আপনার চকরি হলো তো আরেক জনের হলো না, আরেক জনের উন্নতি হলো তো আপনার তা হলো না। কেউ কাউকে চিনি না তবু একে অপরের সঙ্গে কি রকম অদৃশ্য অচ্ছেদ্য বন্ধনে বাঁধা। আমার দুনিয়া ছোট তবু গোটা দুনিয়াটাই একটা গোলকধাঁধা আর তার

কেশ প্রসাধনের শ্রেষ্ঠ উপকরণ
বেঙ্গল কেমিক্যালের
ক্যান্থারাইডিন
হেয়ার অয়েল

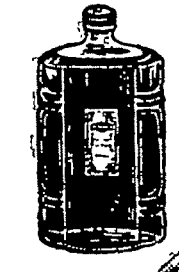

এই অতুলনীয় সুগন্ধি কেশ তৈল চুলের গোড়া সতেজ ও পরিপুষ্ট রাখে, কেশ-গুচ্ছকে ঘন, সুদীর্ঘ ও সমুজ্জ্বল করে তোলে এবং চুল পড়া বন্ধ করতে সাহায্য করে।

বেঙ্গল কেমিক্যাল
কলিকাতা • বোম্বাই
কানপুর • দিল্লী

মধ্যে আমারই অজান্তে ও অনিচ্ছায় আমি কাঁদছি বা কাঁদাচ্ছি, ডুবছি বা ডোবাচ্ছি। যাই হোক, কণ্ডাক্টরের সমস্যাটা তো প্রায় সমাধান হয়ে গেল, বাকি রইল অবিনাশ। কিন্তু সেটা কি আর তখনো সমস্যা থাকবে? যখন আমি কণ্ডাক্টরকে এড়িয়ে চলে গেছি, নিচে নামবার জন্যে হন্তদন্ত ব্যস্তবাগীশ তখন 'এই যে অবিনাশ কোথায় চললি রে' বলে নেমে যাওয়াটা নিশ্চয়ই অশোভন নয়। অতএব অবিনাশ আর তখন ভয়ঙ্কর থাকবে না, আর পাঁচটা আরোহীর সঙ্গে তার কোনো পার্থক্য থাকবে না। সত্যি একটা মানুষ নিজেরই অজ্ঞাতে কতোগুলো রূপই না ধারণ করতে পারে! এই অবিনাশের কথাই ধরা যাক—এই সে ছিল বিশ্বের সবচেয়ে বিপজ্জনক ব্যক্তি, এই হয়ে গেল নিরীহ গোবেচারা ছেলেমানুষ।—না, এখন থেকে আমি কাউকেই ভালো কি মন্দ কি সাধারণ কিছুই বলব না। অবস্থাবিশেষে একটা মানুষের নানারকম রূপান্তর ঘটতে পারে। থাকগে, এদিকে কণ্ডাক্টর যে প্রায় এসে পড়ল! সরোজ মনে মনে প্রস্তুত হয়ে নিল—চট করে বাইরের দিকে চোখ বুলিয়ে দেখে নিল তার গন্তব্যস্থানও প্রায় এসে গেছে— অতএব সবদিকেই তার স্বার্থ অটুট রয়েছে এখন এই বাধাটুকু কোনো-রকমে কাটাতে পারলেই হলো...কি হলো ...কেমন করে হলো...থাকগে ওসব পরে ভাবা যাবে—বর্তমানে—

একটি ট্রেন ঘণ্টায় পাঁচ মাইল বেগে উত্তর থেকে দক্ষিণে এলো, আরেকটি ট্রেন ঘণ্টায় দশ মাইল বেগে দক্ষিণ থেকে উত্তরে গেল—ফলে কি হলো? অঙ্কটা এইভাবে কষতে হবে: 'টিকিট, টিকিট', কয়েকটি লোকের পায়ে আঘাত লাগল, হাঁটুতে লাগল, 'দেখে চলতে পারেন না', 'রাজকার্যে চলেছেন নাকি', 'আস্তে আস্তে', 'কি রে কখন উঠলি', 'তোমাকে আগেই দেখেছি', 'দাদা, একটু দয়া করে', দয়া, অনিচ্ছা, নিরুপায়, গায়ের জোর, মিনতি, মুখে 'দয়া করে' কাজে গুঁতো দিয়ে... উত্তর হলো: সরোজ নেমে গেল টিকিট না কেটে। তক্ষুণি স্টপেজ ছাড়ল ট্রামটা—অচিরেই নিরাপদ দূরত্বে চলে গেল।

আপনি কি ভালোবেসে বিয়ে করে-ছেন? যদি করে থাকেন তাহলে জানেন, যদি না করে থাকেন তাহলে জানুন, যে মেয়ে বা ছেলেকে বিয়ের আগে মনে হয় দেবী বা দেবতা, সকল সৌন্দর্য পবিত্রতা ইত্যাদি ইত্যাদির আধার সে বিবাহোত্তর জীবনে হঠাৎ হয়ে যায় নিতান্তই আপনার —আমার মতো সাধারণ মানুষ। আপনি কি অ্যাকোয়ারিয়মের মাছ দেখেছেন? কি সুন্দর লাল নীল ইত্যাদি ইত্যাদি কিন্তু জল থেকে তুলে একবার হাতের তালুতে রাখুন—দেখবেন আপনার মোটেও ভালো লাগবে না আগের মতো, কেমন অস্বস্তি হবে, হাতময় আঁশটে গন্ধ হয়ে যাবে, মাছটাকে ছুঁড়ে ফেলে দিতে ইচ্ছে করবে। সরোজের দশ পয়সাটারও হলো তাই। সেটা এই এক মিনিটে হঠাৎ একটা মূল্যহীন ধাতুতে পরিণত হয়ে গেল। সরোজ বলল, —মন, একটা ছড়া বানাও। মন বলল:

এক দশেতে—দশ পয়সা
দশ দশেতে—একশ
একশ দশে—পয়সা হাজার

একি হচ্ছে! সরোজ খেঁকিয়ে ওঠে: মিল নেই, রূপ নেই, রস নেই—এ কেমন ছড়া? মন বলে—তোমার ঐ পয়সারই মতো। যার কিছু নেই তাকে নিয়ে কি ছড়া বানাবো বলো তো! সরোজ আর কি বলবে, শুধু ভাবে—যার জন্যে বিবেক দিলাম, আত্মীয়তা দিলাম, সম্মান দিলাম, শরীরকে যন্ত্রণা দিলাম, কণ্ডাক্টরকে দুনি-য়াকে এবং নিজেকে ফাঁকি দিলাম, যার জন্যে নিচে নেমে এলাম—রাস্তায় এসে এখন কিনা মন বলে ওটা কিছু দামী জিনিস নয়! এত তুচ্ছ যে তা নিয়ে সামান্য ছড়াও লেখা যায় না!...সরোজের হাতের তালুতে পয়সাটা ঘামতে লাগল; সরোজ হয়ে রইল কিংকর্তব্যবিমূঢ়। তার হাতে যে জিনিসটি রয়েছে যা উপকারী নয়, তা দামীও নয়—তুচ্ছ, সামান্য, একটি এ্যাটম বোমার মতোই সামান্য এটি—পরম বিধ্বংসী বলে এর পরিচিতি ও কুখ্যাতি, অতটুকু এর আকৃতি তবু যত প্রেম স্নেহ সভ্যতা কৃষ্টি এ ধ্বংস করেছে করছে ও করবে তার জুড়ি বোধহয় পৃথিবীতে আর কিছুই নেই। হ্যাঁ, এটি একটি বোমা, একটি সাংঘাতিক মানসিক ব্যাধি। যে করে হোক এর থেকে তাকে মুক্তি পেতেই হবে।

'বাবু, একটা পয়সা দিন!'
'এই নাও!'
'ভগবান আপনার ভালো করবেন বাবু!'

এর জন্যে ভগবান সরোজের ভালো করবেন? তবে কি পয়সা জিনিসটা সত্যিই খারাপ নয়? না-ভালো, না-মন্দ—যে যেমন ব্যবহার করে তেমনি? সরোজের সব কেমন গুলিয়ে যায়। যেমন মানুষ, তেমনি পয়সা। সব ভালো সব মন্দ—সবাই ভালো, সবাই মন্দ—তবে কি উপায়? দ্বিমুখী চরিত্রের কি মূল্য আছে?

'বাবু, আমায় একটা পয়সা দিন দয়া করে।'

'আর নেই!' কথাটা মিথ্যে নয়, সরোজ পকেটে হাত দিয়ে দেখেছে দশ টাকার নোটটা ট্রাম থেকে নামবার সময় পকেটমার হয়ে গেছে। সে যাকগে...কিন্তু ওকে পয়সা দিলে ভগবান ভালো করেন, একে না দিলে কিছুই করেন না—হয়তো বা মন্দই করেন। একটা লোককে ভালো মন্দ এক-সঙ্গে দুটো বর ও অভিশাপ তিনি দেবেন কি করে? আর তাদের মিলিত ফল কি হবে? গণিতে বলে, প্লাসে মাইনাসে মাইনাস হয়—এমন গুণ জগতে আছে কি যাতে সবারই শুধু প্লাস হয়? সেই সব মানুষদের শুধু ছবি-ই আমরা টাঙিয়ে রেখেছি আমাদের বসবার ঘরে, সেলুনে, হোটেলে, লাইব্রেরী, বিড়ির দোকানের দেয়ালে: তাঁদের আমরা হয়তো শ্রদ্ধা করি কিন্তু অনুকরণ করবার চেষ্টা করি না, তাঁদের আমরা হয়তো প্রণাম করি কিন্তু অনুসরণ করতে ইচ্ছে করি না। আমরা মানুষ হয়েও মানুষ নই। নাঃ, এ তো মহা বিপদ হলো—এমন করে ভাবলে তো বেঁচে থাকাই যায় না! কিন্তু বেঁচে থাকা জিনিসটা কি? শুধুই কি নিশ্বাস ফেলা, আপিস যাওয়া, ছেলেপুলের বাবা হওয়া, পকেটে পয়সা পোরা, নিরাপদ দূরত্ব থেকে মহাপুরুষদের প্রণতি জানানো? ভালো করে ভেবে দেখলে, কোনোটাই নয়। কিছুই নয়। আমাদের বেঁচে থাকা আর মরে যাওয়ার মধ্যে বোধহয় মূলত কোনো পার্থক্যই নেই।

ফুটপাথ থেকে অন্যমনস্কভাবে রাস্তায় পা বাড়াতেই একটা লরী কোথা থেকে ছুটে এসে সরোজকে একেবারে পিষে ফেলল। হৈ-হৈ, ধর্ ধর্ শালাকে', 'পুলিশ পুলিশ', 'অ্যাম্বুলেন্স', 'আহা রে', 'ইস্'...আর সেই সব চীৎকারের মধ্যেও সরোজের মন ভাঙা শ্লেটের একটি টুকরোয় লিখে ফেলল: আমি কোনোদিন বাঁচি নি কাজেই মরলামও না। আমি অপরি-বর্তিতই রইলাম। বাঁচা-মরা সে সব অন্য যুগের মানুষদের হবে যখন জগতে পয়সা বা জটিলতা বলে কিছু থাকবে না। যদি কখনো সে যুগ আসে আমি বাঁচব, আমি মরব।

মূর্খ সরোজের মরণ হলো। এ যুগের জয়ধ্বজা উড়িয়ে কলকাতা দিল্লী বোম্বাই মাদ্রাজ টোকিও লণ্ডন প্যারিস নিউইয়র্ক প্রভৃতিরা বেঁচে রইল। অথবা সরোজের ভাবনা মতো—কিছুই রইল না, কিছুই নেই, শুধু এই করুণ যুগযন্ত্রণা ছাড়া।

পথ কে রুখবে?

মনোজ বসু

[পূর্ব-প্রকাশিতের পর]

॥ উনচল্লিশ ॥

আরাফুলি ও হাসিম সাহেব আত্মীয়-স্বজনদের সঙ্গে দেখাসাক্ষাৎ করে বেড়াচ্ছেন। বহু গৃহস্থ পালিয়েছে, আছে তবু অনেক। হিন্দু-মুসলমানে সেই তো মেশাল হয়ে আছে আগেকার মতন—ভাগা-ভাগিতে মুনাফাটা কি করলে জিজ্ঞাসা করি, লোকহত্যা ও লোকের সর্বনাশ ছাড়া?

ফুল্লরার বিয়ের কথাবার্তাও না হচ্ছে এমন নয়। বিশ্বেশ্বর আর কল্যাণীর মধ্যে সে জিনিস। প্রণব মাঝে মাঝে মাথা ঢোকাতে গিয়ে ফুল্লরার ধমক খেয়ে মরে: নিজের বিয়েই হল না, পরের বিয়ের মাতব্বরি—ছোট মুখে বড় কথা কেন রে? শুনেছি, ছ-মাস বয়সে একবার কলকাতা এসেছিলাম। চলো, আমায় কলকাতা দেখিয়ে দেবে ভাল করে।

আর ছায়ার মতন সে দুর্গাশঙ্করের গায়ে গায়ে লেপটে আছে। মামার নিত্যসঙ্গী, সেই সুবাদে দুর্গাশঙ্করও মামা। 'বলুন মামা' 'বলুন মামা' করে অস্থির করে তুলেছে। দুর্গাশঙ্কর টিপি টিপি হাসেন শুধু। অতল সমুদ্র থেকে মণি-রত্ন বের করা চাট্টিখানি কথা নয়—নিতান্তই নাছোড়-বান্দা তো এক-আধটা শামুক-ঝিনুক ছুঁড়ে দেন কখনোসখনো। বলেন, পলায়ন-টাই ভাল পারি—শুনেছ তো হেমকান্তর কাছে। নবকান্ত সেই কাজই আমায় দিয়েছিল। রিভলভার হাতে গুঁজে দিয়ে ইসারায় সরে পড়তে বলে। বলেছিল, মানুষের চেয়ে মালের দাম ঢের বেশি।

মুখ বিস্তর মেলে—অ্যাকসনে যাবার জন্য হুড়োহুড়ি লেগে যায়। কিন্তু রিভলভার পটানো টাকতেই হয় না, কাঠখড় পোড়তে হয় রীতিমত।

হঠাৎ বা তিক্ত হয়ে দুর্গাশঙ্কর বলে উঠলেন, তোমার মামা ছিল বড় বুদ্ধিমান —এতদূরের এই আজাদির দিন অবধি আগেভাগে দেখতে পেয়েছিল। রিভলভার পাচার করে দিয়ে লোক-দেখানো সামান্য একটু ছুটোছুটি করেই দু হাত বাড়িয়ে দিল। তার মানে, হাত বাড়িয়ে ফাঁসির দড়ি গলায় পরা। যা তেজস্বী মানুষ—সেদিন ফাঁসি না হলে আজকে সে গরুর-দড়ি গলায় বেঁধে আপোসে ঝুলে পড়ত। পেটের দায়ে আমার মতন পেনসনের দরখাস্ত করতে যেতো না—

একটু থেমে জোর দিয়ে আবার বললেন, ইজ্জত নিয়ে ড্যাং-ড্যাং করে চলে গেল। ফাঁসির মড়া দেখনি কখনো—বিঘতখানেক জিভ বেরিয়ে পড়ে। সেই এক-বিঘত জিভ নেড়ে সাহেবদের ভ্যাংচাতে ভ্যাংচাতে হাজার মানুষের কাঁধে চড়ে নবকান্ত

শ্রীমনোজ বসুর

রাজনৈতিক উপন্যাস

পথ কে রুখবে?

বঙ্গভঙ্গের চক্রান্ত, ত্রীজেডি ও প্রত্যাশা ১৯৬৬-র খাদ্য আন্দোলন। গণ-মানুষের অন্তরাত্মা।

এ পুস্তক ছাপা হচ্ছে: গ্রন্থপ্রকাশ, কলিকাতা—১২

শ্মশানে এসে নামল। ভিড়ের মধ্যে আমিও একজন, মনে পড়ে সমস্ত।

ছাড়ল না ফুল্লরা। কলকাতা দেখার জন্য ভোরবেলা প্রণবের সঙ্গে বাসে চাপল। টেমেটুসে দুর্গাশঙ্করকেও সঙ্গে নিয়েছে। জু প্ল্যানেটোরিয়াম ইত্যাদির ইচ্ছা থাকলে সে সমস্ত ও-বেলায়। সকলের আগে প্রেসি-ডেন্সি জেল—নবকান্তদের কালের হরিণ-বাড়ি। ফাঁসি না গেলেও হরিণবাড়ির সঙ্গে দুর্গাশঙ্করের পুরানো ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক। এখনকার সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট মানুষটি ভাল—অনুমতি তো দিলেনই, একজনকে বলে দিলেন ভাল করে দেখিয়ে-শুনিয়ে দেবার জন্য।

ফাঁসিঘর। সেলের পিছন-দরজা থেকে পথ ক্রমশ মঞ্চ অবধি উঠে গেছে। কাঠের ফ্রেমে ডবল আংটা—কাজের মুখে ফাঁসের দড়ি ঐ আংটার সঙ্গে বেঁধে দেয়। পাইকারি হিসাবে একসঙ্গে ডবল ফাঁসিও হতে পারে, সেই ব্যবস্থা।

শেষরাত্রে কোন একদিন আচমকা সেলের দরজা খুলে যায়। সন্ধ্যায় উপর-তলার কয়েদিদের নিচে নামিয়ে দিল—বুঝতে তখন আর বাকি থাকে না। বাজে মানুষদের নিখরচায় অমন আহা-মরি জিনিস কেন দেখতে দেবে? ঘুমিয়েও তবু সারা জেলখানা উৎকর্ণ হয়ে আছে। রাত্রিশেষের তরল আঁধার বিকম্পিত করে রব উঠল: বন্দেমাতরম্। আহা রে, কোন্ স্বদেশী ছেলে চললেন—শোন ঐ।

দরজা খুলেছে তো ছেলেটি ঢালু পথ ধরে মঞ্চের প্লাটফরমে সাঁ করে ছুটে এসেছেন, সবুর সইছে না মোটে যেন। বন্দেমাতরম্, বন্দেমাতরম্, বন্দেমাতরম্—দেয়ালে দেয়ালে প্রতিহত হয়। দেয়াল-ঘেরা ভিতরেও গেছে, কণ্ঠে কণ্ঠে দূরতম প্রান্ত অবধি বিদ্যুৎ-তরঙ্গ বয়ে যাচ্ছে—বন্দেমাতরম্। আকাশের শুকতারা দপ দপ করে। পাষাণ-প্রাণ খুনি কয়েদিটাও শেলে, ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছে।

দোষ-ত্রুটি যা হয়েছে, ক্ষমা কোরো স্বদেশের ভাইবোনেরা। যাচ্ছি আমি, আবার আসব—

শেষক্ষণে মুখ ঢেকে দেবার বিধি। স্বদেশী ছেলে হাতের ধাক্কায় ঢাকা সরিয়ে দেন। চোখের দৃষ্টি যতক্ষণ আছে, পৃথিবী ও আকাশ দেখে যাবো। মালার মতন দড়ির ফাঁস নিজ হাতে গলায় ঢুকিয়ে দেন।

বন্দেমাতরম্।

হাতল টানে জল্লাদ। পায়ের নিচের প্লাটফরম আর নেই। লহমায় পাতালে পতন। গলায় ফাঁস এঁটে গিয়ে ঝুলছে।

মঞ্চের উল্টো দিকে মাটির লেবেলে খুপরি-দরজা। উষার আলো ফুটেছে। ঘড়ি দেখা হল—মৃত্যুর যথেষ্ট সময় দেওয়া হয়েছে। খুপরি-দরজা খুলে মড়া তুলে

এনে গলার দড়ি কেটে দিল। পায়ের শিরা কাটল। ডাক্তারি পরীক্ষা—বেঁচে না ওঠে যেন আবার। ওঠে নি আজ অবধি, তবু করতে হয়। এ সমস্ত রীতকর্ম, ফাঁসির বিধি।

জেলে জেলে এমনি ঊষা কত শত বার এসেছে। দূরে থাকি, ঘুমিয়ে থাকি আমরা—তাই জানি নে, কথাগুলো কানে পৌঁছয় না, মনে আঁচড় কাটে না তেমন।

ফুল্লরা সেই খুপরি-দরজার অদূরে হাঁটু মুড়ে বসে পড়ল প্রার্থনার ভঙ্গিতে। কে কী ভাবছে, গ্রাহ্য নেই। সম্বিতও নেই বুঝি তেমন। উজ্জ্বল রোদ। একটা গরু খুঁটে খুঁটে ঘাস খেয়ে বেড়াচ্ছে। শান্ত প্রসন্ন ফাঁসিক্ষেত্র। প্রাণ-চঞ্চল দুর্বার মানুষদের হত্যা করে সঙ্কীর্ণ ওই দ্বারপথ দিয়ে আলোর ভুবনে আবার তুলে আনে। হাজার হাজার জেল, হাজার হাজার ফাঁসিক্ষেত্র—এমনিধারা কত কত এনেছে। সঙ্কীর্ণ দরজায় বেরিয়ে এসে-ছিলেন সূর্য সেন, ভগত সিং আসফাক-উল্লা, রাজেন লাহিড়ী, অনন্তহরি, প্রদ্যোত ভট্টাচার্য—আরও কত, আরও কত! কত ফুল, কত তারা! নবকান্তও এক প্রত্যূষে বেরিয়েছিলেন—ফুল্লরার জন্ম হয়নি তখন। ফোটোতে দেখেছে—স্বাস্থ্যোজ্জ্বল হাস্যমুখ তরুণ ছেলে। এই পুষ্পশয্যায় বড়মামা নবকান্তকে শুইয়ে দিয়েছিল।

হঠাৎ কী হল ফুল্লরার—জন্মের অনেক আগেই যিনি শেষ হয়ে গেছেন, দুরন্ত শোক উথলে উঠল তাঁর জন্য। যেন নতুন করে ফাঁসি। মামাগো, কী হয়েছে দেখ—তোমাদের জীবনদান বিফল করে দিল মুষ্টিমেয়র স্বার্থবুদ্ধি আর বিদেশীর কুটিল পৃষ্ঠপোষণা। আমাদের এত প্রত্যাশা বানচাল করে দিল।

রিস্ট ওয়াচ

মাত্র ৬৲ টাকায়

আমাদের চেন পদ্ধতি স্কীমের মাধ্যমে মাত্র ৬৲ টাকায় ৫ বৎসরের গ্যারান্টী সমেত ৫ জুয়েল রিস্ট-ওয়াচ লাভ করুন। ডাকমাশুল ১/১৫ টাকা অতিরিক্ত।

দ্রষ্টব্য : আমাদের মধু-চন্দ্রিমা সেন্টের বিক্রয় বৃদ্ধির জন্যই এই স্কীম চালু করা হইল। পছন্দ না হইলে মূল্য ফেরৎ।

SWISS WATCH TRADING CO.
P. B. 87, (WBC) Jullundur City.

সূর্য সেন, মাস্টারদা, ফাঁসি-সেলে গান গাইতেন—'অস্তাচলের ধারে আসি' পূর্বাচলের পানে তাকাই'। 'চট্টগ্রাম-জেলে—ভোরবেলা নয়, রাতদুপুরে চোরের মত চুপিসারে ফাঁসি সেরে দেহ এমনি এক প্রাঙ্গণে এনে শুইয়েছিল। ফিরিঙ্গী মিলিটারি পুলিশগুলো জীবিত শার্দুলের শতহস্তের মধ্যে আসতে সাহস পেতো না—তারাই এখন নির্বিঘ্নে দেহের উপর বুটশুদ্ধ লাথির পর লাথি ঝেড়ে যাচ্ছে।

মনে রেখো। মনে রেখো নতুন মহা-ভারতের শত শত এমনি সব উপাখ্যান। 'অস্তাচলের ধারে আসি' পূর্বাচলের পানে তাকাই।'

আচ্ছন্ন ভাব কাটিয়ে ফুল্লরা উঠে দাঁড়াল। ফাঁসিমঞ্চে উঠে গিয়ে মাটির উপর প্রণাম করে। মামার শেষ ভূমির স্পর্শ নিল সর্বাঙ্গ দিয়ে, মামাকে প্রণাম করল। সেই সঙ্গে আরও সব উজ্জ্বল কিশোর—দেশের জন্য ফাঁসিমঞ্চে যাঁরা গিয়েছেন। বিড়বিড় করে বুঝি সঙ্কল্পও নিল : আত্মদান বিফল হতে দেবো না। দেবো না - - - ।

তর তর করে নেমে এসে দুর্গাশঙ্করকে বলল, চলুন মামা, হয়ে গেছে—

হেমকান্ত গঙ্গা, শয্যাশায়ী। ক্যাব-খানার বিস্ফোরণে এই দশা। আজব কিছু নয়। বিপ্লব-আমলে বোমা বানাতে গিয়েই বা কত মানুষ মরেছেন!

ফুল্লরা বলে, মায়ের হাতে রিভলভার দিলে ছোটমামা, মা একটা গুলীও ছোঁড়ে নি। রিভলভার ছাইগাদায় পুঁতেছে। খুঁজে পেলো না, তা হলে তোমায় ফেরত পাঠিয়ে দিত।

হেমকান্তর বেরিয়ে-আসা চোখটা চকচক করে উঠল শাণিত ছুরির ফলার মতো।

বীরেশ্বর হেসে বললেন, তা হলেও শত্রু-নিপাত। একেবারে নিঃশেষ হয়ে গেছে। —একটাও আর বাকি নেই।

হেমকান্ত দৃষ্টি ঘোরালেন তাঁর দিকে। বাজে-কথা ও-মুখে বেরুবে না। দৃষ্টিতে বিস্ময়।

জোর দিয়ে বীরেশ্বর বললেন, সত্যি নাই। ঝাড়ঝাপটা কেটে গেছে। আজকের যুবসম্প্রদায়, এই বিশ-বাইশ-পঁচিশ যাদের বয়স—জ্ঞান হওয়া ইস্তক হিন্দু-মুসলমান সমস্যা বলে কোন-কিছু সামনে আসে নি তাদের, হীনমন্যতা নেই কোনরকম, সাম্প্র-দায়িকতার নিশ্বাস তারা কখনো নেয় নি। হিন্দু-মুসলমানে কাটাকাটি করেছিল, অবাক লাগে একালের ছেলেদের কাছে। নেতৃত্ব এদেরই উপর আসছে—এসে গেল বলে, কাল না হয় তো পরশু। তবে আর ভয়ভাবনা কিসের?

ফুল্লরা বলে, মন্দ খবরগুলো পৌঁছে দেবার শতেক ব্যবস্থা, একগুণ হলে ফাঁপিয়ে শতেক গুণ করে। মা তাই বলল, চারিদিকে যা সমস্ত দেখিস, গল্প করে আসবি। জনমভোর সকলের কথা ভেবে এসেছ ছোট-মামা, অহোরাত্রি অচল হয়ে থেকে আরও বেশি বেশি করে ভাবো এখন। কিন্তু খবরের-কাগজে যা পড়ো আর রেডিওয় যা শোন সব তার সত্যি নয়—দরকার বুঝে মতলববীরা রুচিচিত্তির করে। কারখানা চালু রেখে আগাপাস্তলা যদি সাগরেদদের অস্ত্র সাজাতে, একবিন্দু লাভ ছিল না ছোট-মামা। শত্রু কোথা, কার উপরে হানবে তোমার অস্ত্র?

দেখাশোনা শেষ। হাসিম সাহেব ও তারাফুলির পাকিস্তানে ফেরা এবার। ফুল্লরা-বীরেশ্বর থেকে যাচ্ছেন, পরে যাবেন।

দুপুরের দিকে দেবকুমে রঞ্জন এসে উপস্থিত। প্রণব ভারি খুশিঃ খাসা হয়েছে। পারের দায় এঁর উপরে বর্তাল। যা-কিছু করতে হয়, ইনি করবেন। আপনাদের কোন ঝক্কি নেই। এ বেলাটা থাকুন তবে রঞ্জনবাবু—না কি রমজান মিঞা বলতে হবে? বিকালে একসঙ্গে সব বেরুবেন।

যাওয়ার সময় দু-জনে হেমকান্তর ঘরে ঢুকলেন। বীরেশ্বরও এখানে। ফাঁক পেলেই এসে বসেন—গল্পগাছা করেন। হেমকান্ত বললেন, কষ্ট করে কাঁহা-কাঁহা মুলুক থেকে চাল-গুড় বয়ে এনে পিঠে খাওয়ালেন—আমরা কি দিতে পারি হাসিম সাহেব? চাল এখানে তো ডুমুরের ফুল। কাঁচা-মিঠে গাছটার গুটি ধরেছে, চাঁপাগাছে ফুল ফুটেছে, এইসব চাটি চাটি নিয়ে যান।

আবুল হাসিম ঘাড় নেড়ে বললেন, মস্তবড় আমবাগান আপনাদের এখানকার ওই গাছে কাঁটা কাঁটা মাত্র গুটি, তাই ছিঁড়ে নিয়ে কি হবে? আপনাদের বাঁশতলি গাঁয়ে ফুলেরও কিছু অনটন নেই। বরঞ্চ এক-ঢেলা মাটি নিয়ে যাই—আমার ভিটের মাটি।

হেমকান্ত মুহূর্তকাল চুপ করে রইলেন তাঁর দিকে চেয়ে। ধরা গলায় বললেন, নিষ্কর্মা পড়ে পড়ে মন বড্ড দুর্বল হয়ে গেছে। আপনি আমায় না কাঁদিয়ে ছাড়বেন না হাসিম সাহেব। কাছে আসুন, বিছানায় এসে বসুন। আপত্তি করবেন না, একটুখানি বুকে হাত রাখব। আপনার বুক আমার বুক একই কথা বলছে।

আবুল হাসিম বললেন, সাত

পুরুষের নাড়ির টান—বাদশাহি পেলেও ভিটের দুঃখ যাবে না। ঐ যে মাটির ঢেলা—হীরে-মাণিক তার কাছে লাগে না। ঘরে নিয়ে রাখব, ভিটের গন্ধে ভুরভুর করবে আমার ঘর।

তারাফুলি খিলখিল করে হেসে উঠল ঃ কবিত্ব উপে যাবে মামা। ভিটের গন্ধ আরাম দেবে না তা জেনো, মনে আরও বেশি করে জ্বালা ধরাবে। একঢেলা মাটি শুধু নয়—পুরো ভিটেবাড়ির জন্য পাগল হয়ে উঠবে।

বীরেশ্বর চুপচাপ ছিলেন, সহাস্যে সায় দিয়ে উঠলেন ঃ এমনি কবিত্বের ইতিহাসেও নজির আছে। একফোঁটা ছেলেটাও ইতিহাসের বইয়ে পড়ে থাকে। স্বভূমির যতদিন উদ্ধার না হয় তৃণশয্যায় শয়ন বৃক্ষপত্রে ভোজন—রাণা প্রতাপসিংহের ব্রত। সেই নিয়ম মেনে উত্তরপুরুষেরা বরাবর থালার নিচে একটা পাতা বিছানার নিচে গোটাকতক ঘাস রেখে এসেছেন।

তারাফুলি ও ফুল্লরা খুব হাসছে।

হাসির জিনিষ—হাসবে বই কি তোমরা! তবু তলিয়ে দেখ, ছেলেখেলার ভিতরে ভিতরে অমোঘ সঙ্কল্প একটা। প্রতিদিন মনে পড়ে যাচ্ছে, স্বভূমি থেকে আমায় বঞ্চনা করেছে। ঘাসপাতার নিয়ম থেকে মুক্তি নিতেই হবে—এ-পুরুষে না-ই হল তো ভিন্ন পুরুষে। হারানোর ব্যথা পুরুষানুক্রমে রক্তের মধ্যে বয়ে নিয়ে চলেছে। হাসিম সাহেবের মাটির ঢেলাও তাই। দিনান্তে মনে করিয়ে দেবে ঃ দেশ-ভুঁই বাতকেরা কোতল করেছে, প্রাণপ্রতিষ্ঠা করতে হবে আবার। মূঢ় কাপুরুষ আমরা হেরে আছি—ছেলেপুলেরা এ হার মেনে নেবে না।

ব্যাকুল দৃষ্টিতে চেয়ে পড়ে আবুল হাসিম শুধালেন ঃ পারবে তারা?

বৃদ্ধ অধ্যাপকের প্রত্যয়-ভরা গম্ভীর কণ্ঠ, সংশয়ের ক্ষীণতম চাঞ্চল্য নেই। বললেন, ইহুদিরা দেশ-দেশান্তরে ছড়িয়ে ছিল—কত ধনসম্পদ, ব্যাপার-বাণিজ্য, পাণ্ডিত্য-গবেষণা। নিজের ভূমি হারিয়ে এসে দু-হাজার বছর অপেক্ষা করেছে—সেই বাইবেলের আমল থেকে। পুরুষপরম্পরান্তর ধরে স্বপ্ন দেখে এসেছে। তারপর অধিকার যেদিন পেয়ে গেল, দুনিয়ার যে-প্রান্তে যে ছিল ঐশ্বর্য-প্রতিষ্ঠা ধূলিমুঠির মতন ছুঁড়ে দিয়ে ছুটল নিজস্ব সেই অনুর্বর মরুপ্রায় দেশে। লক্ষ হাত মিলে দিকে দিকে ফ্যাক্টরি তুলছে, সোনা ফলাচ্ছে অহল্যাভূমিতে।

একটুখানি থেমে আবার বললেন, ইতিহাস ধীরগতি, কিন্তু অমোঘ। জীবনের হিসাব বছর ধরে, ইতিহাসের হিসাব শতাব্দী ধরে। ব্যস্ত হবার কি আছে? নিজের ঠাঁই ফিরে পেতে ইহুদিদের দু হাজার বছর লেগেছে, আমাদের তো বিশটা বছরও হয় নি এখনো। তারই মধ্যে কত কাছাকাছি এসে গেছি, দেখতে পাচ্ছেন। হাতিয়ারে হাতিয়ারে বেড়া বেঁধে দিয়েও পথ রুখতে পারে কই?

মনের মতন কথাটি পড়েছে। 'আমি জানি, আমি জানি—' করে পণ্ডগু মানুষ হেমকান্ত উত্তেজনায় অবস্থা ভুলে লাফিয়েই বা উঠে বসেন! বললেন, বিনিময় আর এক দফা আসছে—যে বার জিনিষ দেখে-শুনে ফেরত নেবে। অবধারিত জানি বলেই তো ঘরবাড়ি এত যত্নে রেখেছি। আপনাদের হাতে যা ছিল ঠিক ঠিক তেমনটি ফেরত পেয়ে যাবেন।

আবুল হাসিম বললেন, আমাদের চেয়েও ভাল।

প্রতিবাদ করেন না হেমকান্ত। ঘাড় নেড়ে সায় দিলেন ঃ হতে পারে। তাই-ই বোধহয়। নিজের জিনিষে হেলাফেলা, অন্যের জিনিষ বলে যত্নটা বেশি হয়ে যায়। হাতে পেয়ে নয়-ছয় করে রেখেছে, ফেরত পাবার পর না বলতে পারেন।

আবুল হাসিম বললেন, আপনাদের বেলাতেও তাই। ফেরত পেয়ে আপনাদেরও কিছু বলবার থাকবে না—জোর গলায় বলছি। এত গাছগাছালি—টুকরো একটা ডাল অবধি ভাঙি নি। যখন দিন আসবে, গণ্য থাকে তো মিলিয়ে হিসেব করে নেবেন।

প্রণবকে বললেন, চলো না হে। বাড়িয়ে বলছি কি না দেখতে পাবে। ফিরে এসে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে বোলো।

প্রণব বলে, যাবো বই কি! যা লোভ ধরালেন, না গিয়ে উপায় আছে? বরাবর শুনে এসেছি, সুন্দরবনে রয়্যাল-বেঙ্গল টাইগার আর পাকিস্তানে তারই দোসর—গণ্ডায় গণ্ডায় বাঘ নরাকার ধারণ করে বেড়ায়।

একচোট হেসে নিল। বলে, এখন নয়, জষ্ঠিমাসে ফুল্লরাদের সঙ্গে যাব। এ-বাড়ি সে-বাড়ি কুটুমভাতা খেয়ে আসব দিনকতক। ইস্কুলে পড়বার সময় গ্রীষ্মের ছুটিতে যেমন বাড়ি যেতাম। গাছে চড়ে জামরুল পাড়ব আম পাড়ব ডাব পাড়ব, জাল ফেলব খালে, ভিঙি বাইব, সাঁতার কাটব, হাট করতে যাব হাটখোলায়—

বলেই যাচ্ছে। জানলা দিয়ে একদৃষ্টে বাইরে তাকিয়ে সারা শৈশব চোখে দেখতে পাচ্ছে।

বেলা ডুবে ঘোর হয়ে এলো।

ও-ঘরে রঞ্জন বসে আছে, কথায় কথায় সে আর মনে নেই। চায়ের কাপ নিঃশেষ হয়েছে। পর পর দুটো বিড়িও। এবারে রঞ্জন তাগিদ দিল ঃ দেরি করবেন না। পঞ্চমী তিথি, ঘাটে যেতে যেতেই চাঁদ ডুববে। পারাপার আজ সকাল সকাল।

তারাফুলি হেমকান্তর পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করল। তারপর—কী কাণ্ড! হাসিম সাহেবও দেখি তাই। দু-হাতে পাদস্পর্শ করে বললেন, আসি দাদা—

প্রণবকে বললেন, জষ্ঠিমাসেই তবে কথা রইল। ভিতরে নিয়ে চলো, ভাবীকে বলে কয়ে যাই। উনিও যদি যেতে পারেন।

শেষ ॥

বাজারে একটি সাড়াজাগানো নতুন বই বেরিয়েছে

অমরেন্দ্রকুমার ঘোষের

মহাজীবন—টাঃ ১৮·০০

৮০০ পৃষ্ঠার ওপরে বহু দুষ্প্রাপ্য ছবিসহ একটি অমূল্য গ্রন্থ

প্রকাশক—মোহন লাইব্রেরী, ৩৫-এ, সূর্য সেন স্ট্রীট, কলিকাতা-৯

ফোন ঃ ৩৪-১৪০৮

রঙ্গালয় ও অভিনয় শিল্পীর কথা

[পূর্ব-প্রকাশিতের পর]

ইংলিশ থিয়েটার—পিটার গডফ্রে ও গেইট থিয়েটার : "প্রথম দর্শনে" লিখেছেন নর্ম্যান মার্শাল—গেইট থিয়েটারটি আমার খুবই বাজে লেগেছিল। কভেন্ট গার্ডেনের ফ্লোরেল স্ট্রীটের একটি জীর্ণ গুদামের সব থেকে ওপরতলায় এটি অবস্থিত ছিল। ঠাসাঠাসি করে বসবার আসন ছিল মাত্র আশি জনের। বিরামের সময় দর্শকদের জমায়েত হবার মত কোন হলঘর বা ফয়-এ ছিল না এই রঙ্গালয়টিতে। রঙ্গগৃহের পেছনে একটি ঘরে অবশ্য কফি বার ছিল —এর খবরদারি করতেন অতি অমায়িক মিসেস সেন্ট লো—গেইট থিয়েটারের শুভ উদ্বোধনের দিন থেকে ১৯৪০ সালে এর শেষ প্রদর্শনীর রাত্রি পর্যন্ত এই মহিলা যে কফি দর্শকদের সরবরাহ করতেন সারা লন্ডন শহরে এমন সেরা জাতের কফি আর কোথাও পাওয়া যেত না। মহিলার অন্তরটা ছিল যেমন মাধুর্যে ভরা, তেমনি আবার গেইট থিয়েটারের নাটকের এমন সুদক্ষ সমালোচকও সচরাচর দেখা যেত না।

স্টেজটি এত ছোট ছিল এবং ড্রেসিং-রুমেও এত জায়গার অভাব ছিল যে, অনেক নাটকে স্টেজের ওপরই বিরামের সময় পোষাক বদল করতে হোত। এই থিয়েটারের প্রতিষ্ঠাতা পিটার গডফ্রে ছিলেন একজন ভাল শ্রেণীর পেশাদারী প্রযোজক। শোদও তাঁর বয়স ছিল কুড়ি বছরের কিছু এপরে কিন্তু থিয়েটার সংক্রান্ত অভিজ্ঞতা ছিল তাঁর প্রচুর। শিশু বয়স থেকেই থিয়েটারের নানা বিভাগে তিনি কাজ করে এসেছেন। টুরিং পার্টির সঙ্গে সফরে গেছেন। বেন গ্রীটের সেক্সপীয়ার কম্পানীতে কাজ করেছেন, সার্কাস পার্টিতে ক্লাউন সেজে ঘুরে বেড়িয়েছেন, ছবিতে এক্সট্রার কাজ করেছেন। রেপারটরী কম্পানী-গুলোতে অভিনয় এবং পরিচালনা করেছেন থার্ডথেণ্ড, ওয়েকফিল্ড এবং প্লিমাউথে।

প্লিমাউথে থাকবার সময়ই জার্মানী এবং আমেরিকাতে যে অভিব্যক্তিবাদী—নবনাট্যের আন্দোলন শুরু হয়েছিল তার সম্বন্ধে গডফ্রে খোঁজখবর রাখতেন এবং ঐ জাতীয় নাটক পড়তেন। এইসব নাটক টেকনিক এবং বিষয়বস্তুর দিক থেকে ছিল সম্পূর্ণ অপ্রচলিত শ্রেণীর এবং অ-সনাতনী ধারায় রচিত। এসময় ওয়েস্ট এণ্ডে যেসব নাটক সাফল্যের সঙ্গে অভিনীত হত সেগুলো গতানুগতিক রীতিতে রচিত এবং অত্যন্ত একঘেয়ে। পিটার গডফ্রে বুঝেছিলেন রেপারটরী থিয়েটারে অংশ গ্রহণ করতে গেলে এই জাতীয় নাটকের প্রযোজক বা অভিনেতা হিসাবে তাঁকে কাজ করতে হবে। তাই তিনি এবং তাঁর স্ত্রী মলি ভেনেশ ঐ অদ্ভুত পরিকল্পনাটি করলেন—অর্থাৎ লন্ডনে তাঁদের নিজেদের একটি থিয়েটার প্রতিষ্ঠা করতে হবে। তাঁদের নিজস্ব কোনো টাকা ছিল না। লর্ড চেম্বারলেনের শাসনের আওতার বাইরে যাবার জন্য গেইটকে প্রাইভেট থিয়েটার করা হয় নি। লন্ডনের কাউণ্টি কাউন্সিলও এটিকে পাবলিক থিয়েটারের লাইসেন্স দেন নি। এর যথেষ্ট কারণও ছিল—ফ্লোরেন্স স্ট্রীটের গুদাম ঘরের সবার ওপরতলায় অবস্থিত এই থিয়েটারটিতে উঠতে হোত একটি অতি জীর্ণ ঝরঝরে কাঠের সিঁড়ি দিয়ে—এই সিঁড়িটিই ছিল থিয়েটারটিতে ঢোকবার এবং বের হবার একমাত্র পথ।

সুশান গ্ল্যাসপেলের 'বার্নিস' নাটকটি নিয়ে ১৯২৫ সালের ৩০শে অক্টোবর দি গেইট থিয়েটারের শুভ উদ্বোধন হয়। প্রথম প্রদর্শনী চলেছিল দিন চোদ্দ ধরে। তার-পরে একসঙ্গে দুটি নাটক দেখানো হোত—আরনেস্ট হাওয়ার্ড কালবার্টসনের 'দি এণ্ড অভ্ দি ট্রেইল' এবং কোপোর 'দি হাউস ইনটু হুইচ উই আর বর্ন'। এর পর মঞ্চস্থ হয় স্ট্রাণ্ডবার্গের 'দি ডান্স অভ ডেথ্'—তারপর আবার একসঙ্গে দুটি নাটক, স্লিট্জলারের 'দি ওয়েডিং মর্নিং'

গেইট থিয়েটার : পেয়ার জিণ্ট্

এবং দ্য মুশের 'এ ডোর মাস্ট বি আইদার ওপ্ন অর্ শাট্'। ক্রীসমাসের প্রডাকসন ছিল মলিয়েরের 'জর্জ দাঁদে'।

এ পর্যন্ত থিয়েটারটি শুধু সংগ্রাম করে চলেছিল, লোকজনের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে পারে নি। যে সামান্য মূলধন নিয়ে কাজ শুরু করা হয়েছিল তা অনেক আগেই নিঃশেষ হয়ে গিয়েছিল। কোন কোন সপ্তাহে অভিনেতাদের কয়েক শিলিং-এর বেশি বেতনও দেওয়া সম্ভব হোত না। থিয়েটারের একজন চার্জম্যান রাখাও বিলাসের ব্যাপার বলে গণ্য করা হোত। দুজন পরিচালক সকালে রিহার্সাল শুরু সপ্তাহের পর সপ্তাহ নিজেদের সামান্য বেতন থেকে কিছুটা করে বাঁচিয়ে শেষ পর্যন্ত কভেন্ট গার্ডেনের ঐ টপ ফ্লোরটি তাঁরা ভাড়া নিলেন।

গডফ্রে ফিল্ড আগে ভাবেন নি যে গেইটকে প্রাইভেট থিয়েটার হিসাবে চালা-বেন। পরে অবশ্য রটেছিল যে লোকে এখানে নিষিদ্ধ নাটক দেখতেই যায়। কিন্তু একথা মনে রাখা দরকার যে, প্রথম সিজনে যে আঠারোটি নাটকের প্রদর্শনী এখানে হয়েছিল, তার ভেতর একটি নাটকও পাবলিক শো করবার লাইসেন্স পায় নি লর্ড চেম্বারলেনের কাছ থেকে।

হবার ঘণ্টাখানেক আগে এসে থিয়েটারগৃহ ঝাড়পোঁছ করে পরিষ্কার করে নিতেন।

জেম্‌স এ্যাগেট-এর সাহায্য না পেলে গেইট থিয়েটারে প্রথম সিজনটিও শেষ করা সম্ভব হোত না। ওপরে বর্ণিত নাটকগুলোর পর মঞ্চস্থ হল 'ফ্রম মর্ন টু মিড-নাইট'। গেইটের প্রথম দিকের ইতিহাসে

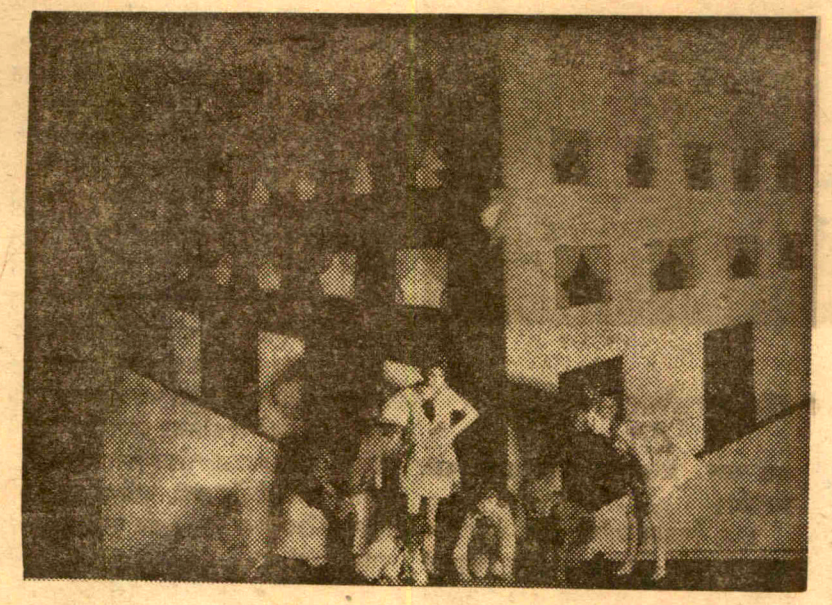

গেইট থিয়েটার ঃ অল্‌ গডস্‌ চিল্ড্রেন

ঘটালো। এর আগে অবধি অন্যান্য নাট্য-সমালোচকের মত এ্যাগেটও এই থিয়েটার সম্পর্কে মোটেই আকৃষ্ট হন নি। কিন্তু পূর্বকৃত অবহেলার যথাযোগ্য প্রতিবিধান তিনি করলেন 'ফ্রম মর্ন টু মিড-নাইট'-এর সমালোচনা করতে গিয়ে। শুধু যে নাটকটি একটি উৎকৃষ্ট প্রডাকসন এবং নাট্যরসিকদের এ নাটক দেখা অবশ্যকর্তব্য একথা বলেই তিনি ক্ষান্ত হলেন না—কিভাবে এই থিয়েটারের সঙ্গে যুক্ত হওয়া যায় এবং এখানকার টেলিফোন নাম্বার পর্যন্ত তাঁর লেখায় উল্লেখ করলেন। তিনি এমন কথাও বললেন—যাঁরা এই উচ্চ আদর্শের রঙ্গগৃহটির প্রতি সহানুভূতি-সম্পন্ন, তাঁরা আর দেরি না করে এর সাহায্যে এগিয়ে আসুন। রোগী মারা যাবার পর অক্সিজেন টিউব এনে কোন লাভ হবে না। আসলে দরকার সত্যিকার সাহায্যের এবং সেটা আসা চাই অবিলম্বে।

যেদিন সকালে এই প্রবন্ধটি প্রকাশিত হল সেটা ছিল রবিবার—সেই সন্ধ্যায় গেইট থিয়েটার লোকে ভর্তি হয়ে গেল। পরদিন সোমবারে বহু আবেদনপত্র এল পোস্টে এবং টেলিফোনের মাধ্যমে অনুরোধ আসতে লাগল মেম্বারশিপের জন্য। সোমবার সন্ধ্যার ভেতরই 'ফ্রম মর্ন টু মিড-নাইট' নাটকের বাকী সব ক'টি প্রদর্শনীর টিকেট বিক্রি হয়ে গেল। এর পরেও আরও অনেক দিন নাটকটি গেইটে প্রদর্শিত হতে পারতো। কিন্তু গডফ্রে সভ্যদের প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন এই সিজনে অনেকগুলো নাটক দেখাবেন—অর্থ লোভের লোভে সে প্রতিশ্রুতি তিনি ভঙ্গ করলেন নিয়ে যাওয়া হোল রিজেন্ট থিয়েটারে। সেখানে গডফ্রে অভিনীত ভূমিকায় নেমে-ছিলেন ক্লড রেইনস্‌—কারণ গডফ্রে গেইট থিয়েটার ছেড়ে রিজেন্টে গিয়ে অভিনয় করতে রাজী হন নি।

আজকের দিনে অভিব্যক্তিবাদী নাটক নাট্য-আন্দোলনের ইতিহাসে একটা অতীতের ব্যাপার বলেই চিহ্নিত হয়ে থাকে। যদিও পরের দিকে জে, বি, প্রিস্টলে এবং বেসিল ডীন প্রিস্টলের 'জনসন ওভার জর্ডন' নাটকটি নিয়ে প্রচেষ্টা করেছিলেন এক্সপ্রেসেনিস্টিক প্রডাকসনের রিভাইভ্যাল করতে। কিন্তু ১৯২৫ সালে এই আন্দোলন এবং এ-জাতীয় নাটক ইংলণ্ডের নাট্যজগতে মাত্র উঁকি-ঝুঁকি মারতে শুরু করেছে। লণ্ডনের রঙ্গমঞ্চে অভিনীত সম্পূর্ণ অভিব্যক্তিবাদী নাটক বলতে এই 'ফ্রম মর্ন টু মিডনাইট'-কেই বোঝায়। নাটকটির প্রডাকসনে লক্ষিত হয়েছিল বিরাট প্রাণশক্তি এবং প্রচণ্ড উত্তেজনা—পিটার গডফ্রে কণ্টিনেণ্ট্যাল ফরমুলা অনুসারে তাঁর নাটক প্রডিউস করেন নি—তিনি সম্পূর্ণ স্বাধীনভাবে এবং নিজস্ব ধারায় একে মঞ্চস্থ করেন। আগের প্রডাকসনগুলোতেও গেইটে অভিব্যক্তিবাদের ইঙ্গিত পাওয়া যেত। অর্থাভাবের দরুণ স্টেজকে বাস্তববাদী ভঙ্গিতে সজ্জিত করা সম্ভব ছিল না। এমন কি অর্থাভাব যদি নাও থাকতো, তাহলেও এত ছোট স্টেজকে রিয়ালিস্টিক করা সম্ভবপর হোত না। প্রথম থেকেই গডফ্রে বরাবর একটা কালো ব্যাকগ্রাউণ্ড ব্যবহার করতেন—দৃশ্যে বাস্তবতা আনবার জন্য স্বল্প প্রপার্টিজ এবং ফার্নিচারের সাহায্য নেওয়া

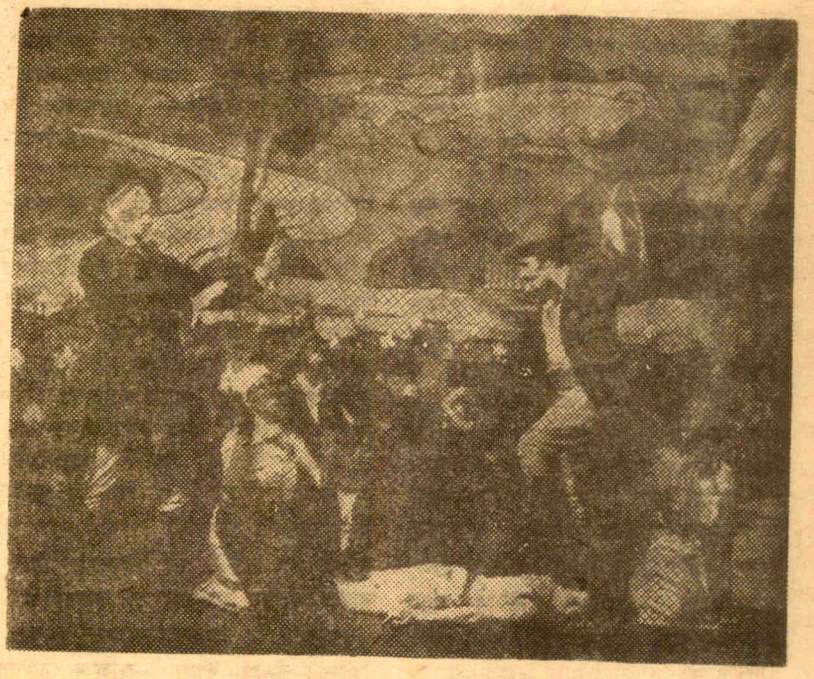

গেইট থিয়েটার ঃ আংকল টমস কেবিন

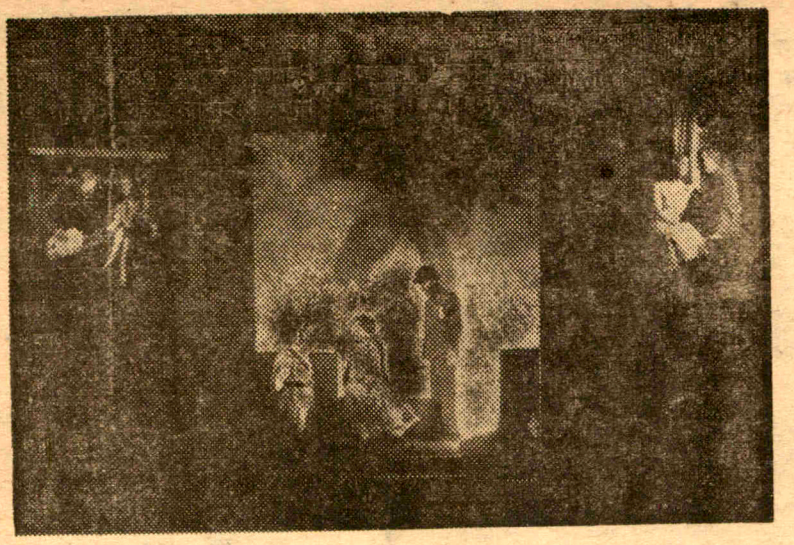

গেইট থিয়েটার ঃ দি ইটার অফ ড্রীমস্

হোত—পরিবেশ সৃষ্টি করবার জন্য সম্পূর্ণভাবে নির্ভর করা হোত আনরিয়া-লিস্টিক লাইটিং-এর ওপর। নাটক শুরু করবার একটা বিশেষ ভঙ্গি ছিল গডফ্রের —কার্টেন সরে যেতো অন্ধকারের মাঝে। তারপর ধীরে ধীরে আলো ফুটে উঠতো। কিন্তু এরও পেছনে একটা প্র্যাকটিকেল অরিজিন ছিল—মোটা ভারী কাপড়ের কার্টেন ব্যবহার করবার সঙ্গতি ছিল না গডফ্রের। সুতরাং স্টেজের ভেতর অন্ধ-কারের আবরণ না থাকলে পাতলা পর্দার সাহায্যে অভিনয় শুরু হবার আগে স্টেজের আভ্যন্তরীণ দৃশ্যকে ঠিক আয়ত্তে রাখা সম্ভব হোত না।" তাই আগে থেকে মঞ্চের ভেতরটায় অন্ধকার থাকতো।

'ফ্রম মর্ন টু মিডনাইট' নাটকটি অবশ্য অভিব্যক্তিবাদী রীতিতে প্রডিউস করা হবে জেনেই সেই ধারায় রচিত হয়েছিল। এ নাটক মঞ্চস্থ করবার একটা নিজস্ব পদ্ধতি গডফ্রে আগে থেকেই ছকে রেখেছিলেন। তিনি তাঁর নটনটীকে সার্থকতার সঙ্গে অনুপ্রাণিত করেছিলেন সম্পূর্ণ স্টাই-লাইজড্ ফর্মে অভিনয় করতে—অবশ্য একথাও তিনি স্পষ্টভাবে তাদের মনে গেঁথে দিয়েছিলেন যে, অভিনয় হবে প্রাণ-রসে ভরপুর। প্রত্যেক দৃশ্যে একটা নিজস্ব ছন্দের প্রাধান্য ছিল—যেমন উদ্বো-ধন দৃশ্যে ব্যাঙ্কে টাকার টুং-টাং শব্দ, ক্যাশিয়ারের বাড়িতে শিশুদের ছন্দোময় ক্রন্দন, নাইট ক্লাবে জাজ্ ব্যান্ডের দ্রুত-তালে বাদন, বাইসিকল্ রেসের সময় দর্শকদের দ্রুত মুভমেণ্ট, স্যালভেশন আর্মির দৃশ্যে বড় ড্রাম বাজানো। আমি বিনা দ্বিধায় বলতে পারি আজও পর্যন্ত এত ভাল প্রডাকসন আমি খুব কমই দেখেছি।

প্রথম সিজনে গেইটে প্রগ্রাম-বদল ছিল আঠারো বার—এর ভেতর ছিল তেইশটি নাটক (ষোলটি পূর্ণাঙ্গ এবং সাতটি একাঙ্ক)। আর সবসুদ্ধ প্রদর্শনী হয়ে-ছিল দুশো বাহান্নটি। ওপরে যেসব নাটকের নাম বলা হয়েছে তাছাড়া এই সিজনের অন্য প্লেগুলো ছিলঃ ইবসেনের "হেড্ডা গ্যাবলার, হাউপ্টমানের 'রোজ বার্নড', টোলারের 'হাইঙ্কমান', মেইস-ফিল্ডের 'দি ট্র্যাজেডী অভ্ নান্', চাপেকের 'দি ল্যান্ড অভ্ মেনি নেম্স', এভারি-নফের 'দি থিয়েটার অভ্ দি সোল', ডস্টয়েভস্কির 'দি ব্রাদার্স কারামাজভ্' এবং উইলহেল্ম ফন্ সোল্জের 'দি রেইস উইথ দি স্যাডো'। যে-কোনও থিয়ে-টারের পক্ষে এক সিজনে এতগুলো ভাল নাটকের প্রদর্শনী করা গৌরবের ব্যাপার—বিশেষত এক্ষেত্রে অভিনেতার দল এবং প্রডিউসারকে যে ভয়াবহ পরিস্থিতির মাঝে থেকে কাজ করতে হয়েছে সে-কথা স্মরণ করলে আরও বিস্মিত হতে হয়। আরও একটি উল্লেখযোগ্য ব্যাপার হল দুটি প্রডাকসনের মাঝে দুদিনের বেশি থিয়েটার কখনো বন্ধ রাখা হোত না।

এর পরের সিজনটি অত বেশি আলোড়নকারী হয় নি। এবারকার প্রগ্রামে ছিল চোদ্দটি প্রদর্শনী (তেরটি পূর্ণাঙ্গ নাটক এবং পাঁচটি একাঙ্ককা)। যেসব নাটক দেখানো হয়েছিল তার ভেতর ছিল —গোর্কির 'দি লোয়ার ডেপ্থস্', মেতার-লিঙ্কের 'মোন্না ভান্না', জুল্স রোম্যার 'ডক্টর নক্', এল্মার রাইসের 'দি এ্যাডিং মেসিন', ভেডেকিণ্ডের 'এরজেইস্ট' এবং স্যাট্রিয়েনের 'দি পোলিশ জু'। আগের প্রগ্রামের থেকে এবারের প্রদর্শনী-সূচী ছিল ছোট। কারণ মার্চ মাসে ফ্লোরেল স্ট্রীটের অট্যালিকাটি বন্ধ করে নতুন বাড়ি নেওয়া হোল ভিলিয়ার্স স্ট্রীটে।

রঙ্গগৃহের সংস্কার এবং পুনর্গঠনের জন্য অনেক অসুবিধা দেখা দিল—ফলে অনেক দেরিও হয়ে গেল থিয়েটার খুলতে। তৃতীয় সিজনের প্রথম দুটি প্রডাকসন করতে হোল রুডলফ স্টাইনার হল-এ। নতুন থিয়েটারের শুভ উদ্বোধন করা হোল ১৯২৭ সালের ২২শে মে—নাটকটি ছিল সিমন গ্যাঁতিল্-র 'মায়া'। এই রঙ্গগৃহটি আগে ছিল একটি রেস্তোরাঁযুক্ত মিউজিক হল। পরিমাপের দিক দিয়ে এটি ছিল পঞ্চান্ন ফুট দীর্ঘ এবং তিরিশ ফুট চওড়া —এটিকে থিয়েটারে পরিণত করতে যথেষ্ট কৌশল এবং দক্ষতার প্রয়োজন হয়েছিল—আবার খুব অল্প খরচে যাতে কাজ সম্পন্ন করা যায় সেদিকেও নজর রেখে থিয়েটারটি তৈরি হয়। গডফ্রে পরিকল্পনা করেছিলেন আগে স্টেজ তৈরি করে, তারপর অডিটো-রিয়াম ঠিক করা যাবে। এর ফলে চমৎকার সমতাপূর্ণ একটি মঞ্চ তৈরি হল। কিন্তু আকারের দিক থেকে মঞ্চের সঙ্গে অডি-টোরিয়ামের একটা অস্বাভাবিক পার্থক্য দেখা দিল। প্রেক্ষাগৃহের এক তৃতীয়াংশ জুড়ে রইল স্টেজটি। অবশ্য এর জন্য গডফ্রেকে অসম্ভব মনের জোর দেখাতে হয়েছিল—কারণ স্টেজের থেকে কয়েক ফিট কেটে নিয়ে তাতে দর্শক বসাবার ব্যবস্থা করলে থিয়েটারের দিকটার যথেষ্ট উন্নতিসাধন করা যেত।"

[আমাদের দেশে যাঁরা মঞ্চ নিয়ে ব্যবসা করেন তাঁরা স্বভাবতই এসব বিষয়ে ভাবেন না। তার কারণ বোধহয় তাঁরা আসলে থিয়েটারকে ব্যবসা হিসাবেই দেখেন—এর আর্টের দিকে নজর দিয়ে তো তাঁদের কোন লাভ নেই। সম্প্রতি দেখবেন কলকাতায় কয়েকটি রঙ্গগৃহ স্থাপিত হয়েছে—এগুলোতে এয়ার কণ্ডিশানের ব্যবস্থা আছে, বসবার আসনগুলো খুবই আরামদায়ক সে বিষয়েও কোন সন্দেহ নেই—তবে নাটকাভিনয়ের জন্য সব থেকে আগে যা প্রয়োজনীয় অর্থাৎ আসল স্টেজকে আধুনিক বৈজ্ঞানিক প্রথায় একুইপ করা, তার কোন চিহ্নই এসব স্টেজে দেখা যায় না। এইসব মঞ্চ-মালিকদের— কোন কোন ক্ষেত্রে এঁরা হচ্ছেন দেশের সরকার, আর সময় সময় পুঁজিবাদীর দল —থিয়েটার সম্বন্ধে দৃষ্টিভঙ্গি সম্পূর্ণ-ভাবে পাল্টাতে না পারলে রঙ্গমঞ্চের আসল উন্নতিবিধান করা কোনদিনই সম্ভব হবে বলে মনে হয় না।] [ক্রমশঃ]

গ্রন্থমেলা

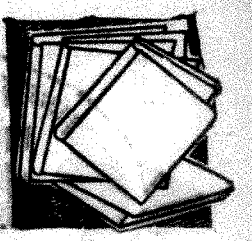

আর্ট : অন্নদাশঙ্কর রায় : প্রজাপতি। শ্রীগোপালদাস মজুমদার, ডি এম লাইব্রেরী, ৪২, বিধান সরণি, কলকাতা—৬। মূল্য—চার টাকা।

লেখকের প্রথম যৌবনে তাঁর মনে যে আর্ট জিজ্ঞাসা সঞ্চারিত হয়েছিল বর্তমান গ্রন্থটি তারই পরিণতি। তাঁর ত্রিশ থেকে চল্লিশ বছর বয়সের মধ্যে, যখন "সত্যাসত্য" রচনায় তিনি নিবিষ্ট ছিলেন, সে সময়ই এমন একটি গ্রন্থ রচনা করতে তিনি চেয়েছিলেন। 'আর্ট কী ও কী নয়' প্রবন্ধটিতে তিনি বলেছেন লেখার ভেতর দিয়ে লেখক নিজেকে দিচ্ছেন, যিনি পড়ছেন তিনিও তাঁকে পাচ্ছেন। দেওয়া বা পাওয়ার এই ছল বা উপলক্ষ্য বা মাধ্যম এরই নাম আর্ট। দ্বিতীয় প্রবন্ধ লক্ষ্য এবং উপলক্ষ্যের এক জায়গায় তিনি বলেছেন যে, বর্তমান যুগের সামাজিক অব্যবস্থার পেষণে আর্ট হয়ে দাঁড়িয়েছে বাজারের পণ্য। চাল, ডাল, মশলা, মাছ, মাংস, ডিমের মত নাটক, উপন্যাস, কাব্য, নাচ, গান, ছবিও আর্থিক তাড়নায় আর্টিস্টকে বিক্রি করতে হচ্ছে। ফলে তার বিচার হচ্ছে পণ্য হিসাবে।

আর্টের মূল্য প্রসঙ্গে লেখক বলেছেন আর্টের মূল্য কতক তার নিজের, কতক আর্টিস্টের। এ ছাড়া আর এক মূল্য আছে তা' হল বিষয়বস্তুর। আর্টের গোড়ার কথা পূর্ণতাবোধ ও পূর্ণতার অঞ্জলি শূন্য করার কামনা। আর্টের ইতিহাসে নানারকম পথিক দেখতে পাওয়া যায়। কেউ পথকে সর্বস্ব করে কালোয়াৎ হন, কেউ পথ-সংক্ষেপ করতে গিয়ে হন বেরসিক। কিন্তু হৃদয় থেকে উৎসারিত হৃদয়-রসই সেই রস যা হল সর্বশ্রেণীর আর্টের আত্মা। মানুষের এই রসের পিপাসা অনাদিকালের। প্রকৃতির কাছে, পার্থিব জীবনের কাছে মানুষ যে রস পায় তাতে সে তুষ্ট নয়। তাই তাকে তুষ্ট করার ভার নিয়েছে আর্টিস্ট। এই রসকে রূপদান করতে হলে কল্পনার সহায়তা নিতে হয়। লেখক বলেছেন রস থেকে রূপে পৌঁছতে হলে কল্পনাকে করতে হয় পথপ্রদর্শিকা তারা। এই প্রসঙ্গে ক্রোচের 'এসথেটিকস'-এর একটি উক্তি মনে পড়ে যায়। ক্রোচে বলেছিলেন—'শিল্প সর্বদাই কল্পনাশক্তির নিয়ন্ত্রণাধীন। কল্পনার প্রতিবিম্বনই তার একমাত্র ঐশ্বর্য।'

এই সুখপাঠ্য গ্রন্থটির মাধ্যমে আর্টের নানাদিক, বিশেষ করে আর্টের অন্তঃসার, অন্তর্লৌন্দর্য, সৃষ্টির স্বাধীনতা, বিশুদ্ধ আর্ট, আর্টের উদ্দেশ্য প্রভৃতি চিত্তাকর্ষক বিষয়গুলি সম্পর্কে লেখকের বক্তব্য যেভাবে ফুটে উঠেছে তার পর এই গ্রন্থটিকে বাংলা ভাষার একটি দুর্লভ রচনা হিসাবে বরণ করা যেতে পারে।

*

মহাপুরুষের সান্নিধ্যে : স্বামী উমানন্দ : ফার্মা কে এল মুখোপাধ্যায়—৬/১ এ, বাদুড়বাগান অক্রুর লেন, কলকাতা—১২। মূল্য—আট টাকা।

ভারতবর্ষের মাটিতে সাধক ও সাধনার বীজ ছড়ানো আছে। তাই এদেশে এত সাধক আবির্ভূত হয়েছেন এবং মানুষের অধ্যাত্মজীবনের প্রশ্নগুলি বারবার বিশ্লেষণ করবার প্রচেষ্টা হয়েছে। শ্রীশ্রীমৎ সাধু তারাচরণ পরমহংসদেব ছিলেন একজন সত্যদ্রষ্টা কবি। তাঁর বাহ্যিক আচার-ব্যবহারে তিনি এতই স্বাভাবিক ছিলেন যে, প্রথম দর্শনে তাঁর প্রচণ্ড আত্মিকশক্তির কথা কেউ কেউ বুঝতে পারত না। কিন্তু তাঁর অন্তর্দৃষ্টি স্বারা অনিত্য, পার্থিব সুখ ও দুঃখকে উপেক্ষা করে শাশ্বত মোক্ষলাভের যে উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত তিনি রেখে গিয়েছেন তা এদেশেও অত্যন্ত বিরল।

এই মহাপুরুষের সান্নিধ্যে এসে নির্মলাবাসিনী দেবীর যে আধ্যাত্মিক অভিজ্ঞতা হয়েছিল সে কাহিনী রূপকথার মত পাঠককে আকর্ষণ করে। গ্রন্থের দ্বিতীয় এবং তৃতীয় খণ্ড উমানন্দজীর কাহিনী। একদালের কলকাতা সংস্কৃত কলেজের বিদগ্ধ অধ্যাপক ডঃ মুণালকুমার দত্তকে আজ আমরা স্বামী উমানন্দ বলে জানি। সুপণ্ডিত, এই গৃহী পুরুষকে বৈরাগ্য এবং সাধন-ভজনের পথে নিয়ে এসেছিলেন সাধু তারাচরণ পরমহংসদেব। এ যেন এক অদ্ভুত তীর্থযাত্রার কাহিনী। এই তীর্থপথের আনন্দ-বেদনা, নিন্দা-প্রশস্তি, উত্থান-পতনের অভিজ্ঞতা এক অবিস্মরণীয় কাহিনী। পড়তে পড়তে বার বার মনে হয়েছে সত্য বা সমাধান যাই হোক, যুগে যুগে মানবাত্মার এই যাত্রা কোনদিন থামবে না।

বিচিত্রঃ রাসবিহারী রায়ঃ বেঙ্গল পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, ১৪, বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রীট, কলিকাতা—১২। দাম ঃ ৪, টাকা।

চলতি ইতিহাসের বাইরে নানা দেশের পরিচিত, অল্প পরিচিত এবং অপরিচিত মানুষের প্রায় কুড়িটি কাহিনী বর্ণনা করে এই গ্রন্থটি রচিত হয়েছে তা কেবলমাত্র সুখপাঠ্য নয় রীতিমত তথ্যবহুল। প্রতিটি কাহিনী, তার দেশ, কাল এবং পাত্র সম্পূর্ণ-ভাবে পৃথক হলেও লেখকের পরিবেশন ভঙ্গিমার গুণে সমগ্র রচনাটি একটি অবিচ্ছিন্ন ঐকতান সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়েছে। এর মধ্যে 'পাগানিনির কবর', 'টিউলিপ মেনিয়া' 'বাল্য প্রতিভা', 'আর্ক ও প্রতিভা' শীর্ষক কাহিনীগুলি সকল শ্রেণীর পাঠকের প্রশংসা অর্জন করবে বলে মনে হয়। অনাড়ম্বর এবং সরল ভাষায় লেখক ইতিহাসের বহু অজ্ঞাত বিষয় সম্পর্কে যেসব তথ্য পরিবেশন করেছেন সেগুলি খুবই চিত্তাকর্ষক।

*

সাহিত্যপত্র (পানিহাটি বালিকা বিদ্যালয়—পৌষ ১৩৭৫)—সম্পাদনায় শঙ্করী মুখোপাধ্যায়, প্রণতি দত্ত ও অলকানন্দা চট্টোপাধ্যায়।

পানিহাটী বালিকা বিদ্যালয় প্রকাশিত পত্রিকাটির অধিকাংশ রচনাতেই প্রগতিশীল চিন্তাধারা রূপ নিয়েছে। পত্রিকাটি ভাল লাগল। 'কাব্যে আধুনিকতা ও প্রমথ চৌধুরী' (মায়া পাল—শিক্ষিকা), 'মানবপূজারী গোর্কী' (শঙ্করী মুখোপাধ্যায়—শিক্ষিকা), 'অমর শিল্পী বিটোফেন' (মীরা চৌধুরী—শিক্ষিকা) প্রভৃতিতে মননশীলতার ছাপ আছে। 'বিচিত্র মানুষ' (সীমানন্দন—অষ্টম শ্রেণী) ভাল গল্প। 'তিস্তার সর্বনাশা-কীর্তি' (গীতা সিংহ—দশম শ্রেণী) একটি অনবদ্য রচনা। 'সংস্কৃত সাহিত্যের নারী কবি' (রামকৃষ্ণ শাস্ত্রী—শিক্ষক) কুরুচিপূর্ণ রচনা এবং এই পত্রিকাটিতে স্থান না পেলেই ভাল হত।

রঙ্গরাগ

মিনার্ভার তালা খুলেছে, আরো তিনটির খুলবে

গত শুক্রবার ২৮শে ফেব্রুয়ারী দীর্ঘদিনের তালাবন্ধ প্রেক্ষাগৃহ মিনার্ভা সিনেমা পুনরায় উদ্ঘাটিত হয়েছে। এই সিনেমা বন্ধ হবার কারণ শ্রমিক-মালিক বিরোধ নয়। কলকাতা পৌরসভার সঙ্গে উক্ত সিনেমামালিকের বিবাদ। মামলার কারণ যাই হোক শেষ পর্যন্ত বিচারালয়ের নির্দেশে উভয়পক্ষ মামলা নিষ্পত্তি করেছেন। দীর্ঘদিন প্রায় পরিত্যক্ত অবস্থায় থাকার পর পুনরায় মাজাঘষা করে শহরের কেন্দ্রস্থলে অবস্থিত মিনার্ভা সিনেমায় আবার ছবি দেখান শুরু হয়েছে। মিনার্ভার পুনরারম্ভ শেক্সপীয়রের 'টেমিং অব দি শ্রু'র চিত্ররূপ নিয়ে, যে ছবিতে রিচার্ড বার্টন ও এলিজাবেথ টেলর মুখ্য অভিনেতা। সিনেমাটি বন্ধ হওয়ায় বহুসংখ্যক কর্মচারী বেকার হয়েছিলেন; আশা করি, তাঁদেরও কাজে পুনর্নিয়োগ করা হয়েছে। এবার নবপর্যায়ে মিনার্ভার প্রধান ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন শ্রী এ, সেনগুপ্ত। তিনি সকলের প্রিয়, এবং অভিজ্ঞ। আমরা মনে করি মিনার্ভার পরিচালক শ্রীরুশি কে, মোদী উপযুক্ত ব্যক্তিকেই দায়িত্বভার দিয়েছেন।

শোনা যাচ্ছে, হুমায়ুন প্রপার্টিজের পরিচালনাধীন লাইট হাউস, নিউ এম্পায়ার, টাইগার সিনেমাও খোলার

পরিচালিত নতুন পাতা' ছবিতে নাটকীয় মুহূর্তে শর্মিলা ঠাকুর ও আরতি গাঙ্গুলী

কথাবার্তা চলছে। রাষ্ট্রপতির শাসনকালে মালিকপক্ষ এই সিনেমা তিনটি লক্ আউট করে রেখেছিল। শ্রমিকরা বহুবার সালিসীর দাবি করে ব্যর্থ হয়েছে। কর্মচারীদের দাবি মেনে নেওয়া দূরের কথা শ্রমিকদের সম্পূর্ণভাবে বঞ্চিত করার জন্য মালিকানা পরিবর্তনেরও চক্রান্ত করেছিল বলে শোনা গেছে। এতদিন কোম্পানী কোন কথাই কর্ণপাত করে নি। ফলে তিনটি সিনেমার বহু কর্মচারী বেকার হয়ে চরম দুর্দশা ভোগ করেছে। আরেক দিকে প্রমোদকর এবং শো ট্যাক্স বাবদ পাওনা থেকে সরকার বঞ্চিত হয়েছে। লক্ষ্য করার ব্যাপার যে, যে রাজ্যপালের প্রশাসনে কথায় কথায় লাঠি গুলী চলেছে, তিনি এই সিনেমা তিনটি খোলার ব্যাপারে একেবারে অসহায়ের মত চুপ ছিলেন। সম্প্রতি হাওয়া পরিবর্তনের লক্ষণ দেখা যাচ্ছে। ভোটের ফলাফল প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে দ্রুত বরফ গলতে শুরু করেছে। শ্রমিক ইউনিয়নের সঙ্গে মালিকপক্ষের আলোচনা শুরু হয়েছে ; লক্ষণ দেখে মনে হচ্ছে শীঘ্রই মীমাংসায় পৌঁছন সম্ভব হবে। মালিকপক্ষ এখন আর রাষ্ট্রপতি শাসনের সংরক্ষণ ব্যবস্থা পাবেন না। যুক্তফ্রন্ট সরকার শ্রমিক-স্বার্থ বিসর্জন দিয়ে তিনটি সিনেমা তালাবন্ধ থাকতে দেবে না। সুতরাং মীমাংসার জন্য মালিকপক্ষও এবার রাজী হয়েছেন।

এই সিনেমা তিনটির রাহুমুক্তি হলেই আমরা খুশি। লক্ আউটের কবলে পড়া শ্রমিকদের দুর্দশা এতে যেমন থাকবে না, শহরের মানুষও আবার ছবি দেখার সুযোগ পাবেন, আর সরকারেরও আয় কিছুটা বাড়বে। আশা করি সত্বর সিনেমা তিনটি খুলবে।

—সুজন

নাটকের কথা

লোনা জল মিঠে মাটি

দক্ষিণ কলকাতার মুক্তাঙ্গন মঞ্চে শৌভনিকের 'লোনা জল মিঠে মাটি' নাটকের পঞ্চাশ রজনী অভিনয় অতিক্রান্ত হয়েছে। সাহিত্যিক প্রফুল্ল রায় রচিত কাহিনীকে নাট্যরূপ দিয়েছেন সুধাংশু মণ্ডল। সুপরিচিত অভিনেতা ও পরিচালক গোবিন্দ গাঙ্গুলীর নির্দেশনায় নাটকটি মঞ্চরূপ লাভ করেছে। এই মঞ্চরূপ যে দর্শকদের কাছে আকর্ষণীয়

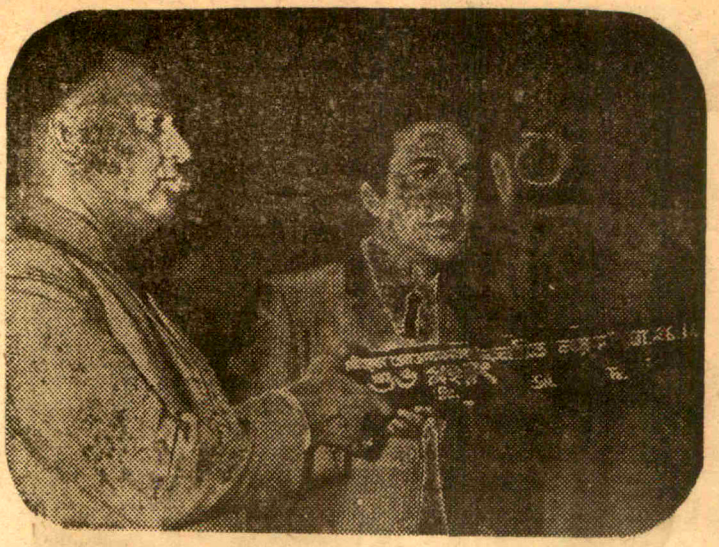

'কলঙ্কিত নায়ক' ছবির মহরতে ক্ল্যাপস্টিক দিচ্ছেন ডি, এন, ভট্টাচার্য। ছবির নায়ক উত্তম কুমার।

হয়েছে পূর্ণ প্রেক্ষাগৃহে পঞ্চাশ রজনীর অধিক অভিনয়েই তার প্রমাণ পাওয়া যাচ্ছে।

আন্দামানে একদল পূর্ববঙ্গের উদ্বাস্তু কিভাবে প্রতিকূল অবস্থার মধ্যে একমাত্র নিজেদের পরিশ্রম ও মনোবলে জমি আবাদ করে, নতুন করে বসতি স্থাপন করে তারই এক কাহিনী নিয়ে এই নাটক। দেশ বিভাগের বলি সরল সহজ, ভীরু এই লোকগুলিকে নিয়ে নির্বাসিত পাল সাহেব জীবনের অসম্পূর্ণ স্বপ্নকে বাস্তব করে তোলে। এই মানুষগুলিকে নিয়ে এক নতুন সমাজ গড়ে, যা পুরনো সমাজবোধ থেকে কিছুটা স্বতন্ত্র। সেখানে জলে যেমন হাঙর, কুমীর আছে, মানুষের মধ্যেও তেমন জানোয়ার আছে। কিন্তু পাশাপাশি আছে সৎ ও ভাল মানুষ। এখানে প্রথম যে শিশু জন্মলাভ করল সে দুটি সুস্থ নরনারীর ভালবাসার সন্তান।

নাটকটি বর্ণনাধর্মী। নিজের শক্তির ওপর নির্ভর করার, আপন শক্তিতে প্রতিকূল অবস্থাকে জয় করার বাণী নাটকে প্রতিফলিত। যদিও এই বাণী সত্য যেনেও বাস্তব অবস্থায় উদ্বাস্তু পুনর্বাসনে সরকারের দায়িত্বই মুখ্য হয়েছে এবং এই দায়িত্ব সরকার স্বীকার করেও আমলাতান্ত্রিকতায় উদ্বাস্তুদের দুর্ভোগ ভুগতে হয়েছে, আজও হচ্ছে। আন্দামান তার ব্যতিক্রম নয়। ছিন্নমূল নরনারীর কেবল আপন শক্তিতে জমি কুপিয়ে, লোনা জলের অসুবিধা দূর করে, নিজেদের অর্থে বলদ কিনে আবাদ করা ব্যতিক্রমমূলক ঘটনাই বলতে হবে। নতুবা আজো কেন উদ্বাস্তু সমস্যা মিটতে পারল না। মূল কাহিনীকার এই সমস্যার গভীরে যেতে পারেন নি, তিনি বাইরে থেকেই সহজ সমাধানে নিজের শক্তিতে নির্ভর করার প্রেরণা দিয়েছেন। তিনি উদ্বাস্তুদের সংগ্রাম দেখেন নি, কেবল দেখেছেন প্রকৃতির প্রতিকূলতা। তাই সরকারী ডোল বন্ধ হবার পর একরকম বিনা আয়াসেই মাছ বেচে, কাঠ কেটে, মজুরী খেটে উদ্বাস্তুরা বেঁচে যায়। অথচ উদ্বাস্তু জীবনের ইতিহাস সাক্ষ্য দেয় ভিন্ন কথা। এদিক থেকে এই নাটক আন্দামানের উদ্বাস্তু জীবনের সংগ্রামচিত্র যতটা নয় তার চেয়ে বেশি সরকারী বক্তব্য ঘেঁষা। এ-কারণে নাটকটির গতি বড় ধীর, অর্ধাংশের বেশি সময় একই কেন্দ্রে রয়ে গেছে। কেবলমাত্র শেষের দ্বন্দ্ব-মুহূর্তটি গতিলাভ করেছে। কাহিনীকে এই শিথিলতা মুক্ত করা হয়ত পরিচালকের আয়ত্তের বাইরে, তা হলে মূল কাহিনী ও বক্তব্যের পরিবর্তন করতে হয়।

তথাপি পরিচালনা দক্ষতায়, সঙ্গীত ও অভিনয় সমন্বয়ে নাটকটি দর্শকদের কিছুটা নতুন স্বাদ দিতে

বিবাহ রেজিষ্ট্রেশন অফিস
(স্পেশাল ম্যারেজ অ্যাক্ট—১৯৫৪)
শ্রীগিরিজাশঙ্কর ভাদুড়ী
ম্যারেজ অফিসার
কলিকাতা ও ২৪ পরগণা
১/১এ মহাত্মা গান্ধী রোড (শিয়ালদহ)
ফোন নং : ৩৫-৪৬১৭
কল্যাণনগর, (বহড়া) ২৪ পরগণা

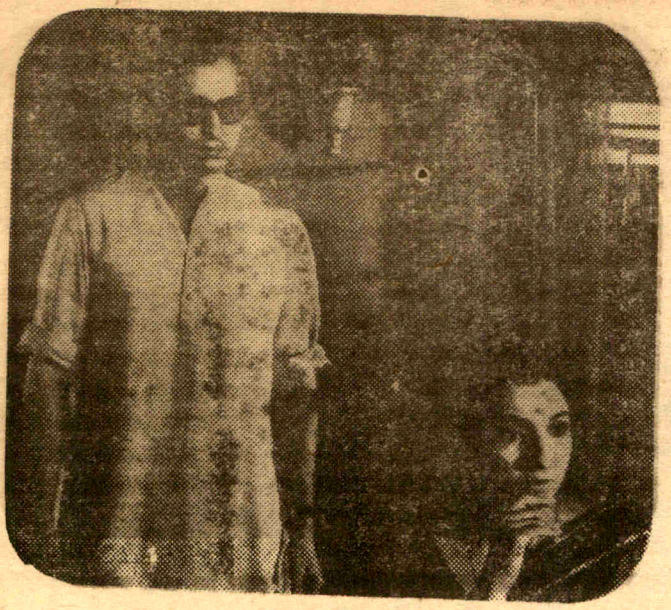

'তিন ভুবনের পারে' ছবিতে সৌমিত্র ও তনুজা

পেরেছে। পাল সাহেবের চরিত্রে গোবিন্দ গাঙ্গুলী সহজ ও স্বাভাবিক অভিনয়ে একটি চমৎকার চরিত্র সৃষ্টি করেছেন। যে চরিত্র দর্শকমনে মানবিক আবেদন সৃষ্টি করে। নারী চরিত্রগুলির মধ্যে তিলির কঠিন রূপায়ণে অনুরাধা দাশগুপ্তের অভিনয় সাফল্যে আমরা বিস্মিত হয়েছি। তেমনি সার্থক হয়েছে গীতা প্রধানের বাসিনী। কাপাসীর দুর্ভাগ্যকে সুতপা চক্রবর্তী দক্ষতার সঙ্গে ফুটিয়ে তুলেছেন কখনো উচ্ছল হাসিতে, কখনো মৌনতায়। উদ্ধবের চরিত্রে সুরেশ বিশ্বাসের অভিব্যক্তি ও গান প্রশংসনীয়। দলগত কাজের সার্থকতায় অন্যান্যদের অভিনয় যথাযথ।

দেবাশিস দাশগুপ্ত সঙ্গীত পরিচালনার দায়িত্ব পালন করেছেন। তাঁর সঙ্গীত চয়ন প্রশংসনীয় ; কণ্ঠসঙ্গীতাংশ সার্থক, কিন্তু আবহসঙ্গীত কিছুটা সোচ্চার এবং কৃত্রিম মনে হয়েছে। শেষ কথা : কাহিনীর দুর্বলতা সত্ত্বেও পরিচালকের কৃতিত্বেই নাটকটি সাফল্য লাভ করেছে।

চিত্রআলোচনা

নতুন পাতা

(পরিচালনা—দীনেন গুপ্ত)

'নতুন পাতা' একটি বাঙালী-মনের ছবি। গ্রামজীবনভিত্তিক এই কাহিনী-চিত্র গতানুগতিকভাবে অতিক্রম করে এক নতুন স্বাদ এনে দিয়েছে। ক্যামেরাম্যান দীনেন গুপ্তকে আমরা এতদিন একজন পারদর্শী চিত্রগ্রহণকারী হিসাবে দেখেছি, এই ছবিতে দেখলাম তাঁর শিল্পশোভন দৃষ্টিশক্তি। মানুষের প্রতি মমতাবোধ ও বিশ্বাস এবং প্রকৃতির প্রতি ভালবাসা এই ছবিতে পরিস্ফুট। কিশোরীমনের সারল্য আর প্রকৃতির সহজ আকর্ষণ ছবিতে এক মধুর ছন্দে মিলিত হয়েছে, যা দেখে দর্শকমাত্রই মুগ্ধ হবেন।

শ্রীমতী প্রতিভা বসু লিখিত কাহিনী অবলম্বনে ছবির চিত্রনাট্য রচনা করেছেন অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায়। চিত্রনাট্যকার মূল কাহিনী থেকে কিছুটা স্বাধীনতা গ্রহণ করে বিষয়বস্তুকে প্রকৃতির সঙ্গে কিশোরীমনের ঘনিষ্ঠতায় সীমাবদ্ধ রেখেছেন। এতে ছবির সার্বজনীন উপভোগ্যতা বেড়েছে। কাহিনীর নায়িকা সাবিত্রী বাল্যে পিতৃহীনা, স্নেহপরায়ণ জ্যেঠামশায়ের অভিভাবকত্বে রয়েছে বিধবা মাকে নিয়ে। ছেলেদের সঙ্গে মাঠে গাছে হেসে-খেলে বেড়ায়। মাছ ধরে, বাগানের আম চুরি করে। বিয়ের চেতনা না হতেই এই সাবিত্রীর একদা বিয়ে হল এক তরুণ গ্রামের স্কুল-মাস্টারের সঙ্গে। কিন্তু বিবাহিত জীবনে শাসন এবং লক্ষ্মী বউটি হয়ে বসে থাকা তার পক্ষে অসম্ভব। প্রকৃতি তাকে হাতছানি দিয়ে ডাকে। ছোট দেওর রঞ্জন তার খেলার সাথী।

শেষ পর্যন্ত শাশুড়ির শাসনের দাপটে শ্বশুরবাড়ি থেকে সে একা একা চলে আসে বাপের বাড়িতে। সেখানে অন্যরা বিব্রতবোধ করলেও জ্যেঠামশাই-এর স্নেহাশ্রয় থেকে সে বঞ্চিত হয় না। কিন্তু একদিন ঘটক এসে বলে গেল তার শাশুড়ি ছেলের আবার বিয়ে দেবার চেষ্টা করছে—পাত্রী ঠিক হয়েছে। এই সংবাদের আকস্মিক আঘাতে সাবিত্রীর মন যেন সেই কিশোরীমনের সীমা অতিক্রম করে আসে। আত্মসচেতন হয়ে ওঠে। আবার একাই সে ফিরে যায় শ্বশুরবাড়ি। হয়ত স্বামীর ঘরের জীবন অথবা মৃত্যু দুয়ের একটি তাকে গ্রহণ করতে হবে।

এই কাহিনী রূপায়ণে পরিচালক যথাসাধ্য বহির্দৃশ্যের সুযোগ গ্রহণ করেছেন। বহির্দৃশ্যে স্বাভাবিক প্রকৃতি, নতুন মুখের প্রধান চরিত্র এবং সহজ স্বাভাবিক অভিনয়রীতিতে ছবিটি খুবই উপভোগ্য। মার্টিন রেলপথের একটি স্টেশনের সঙ্গে মিলেমিশে গ্রামের সহজ মানুষ, সহজ বোধটি ছবিতে পরিস্ফুট। এই উপলব্ধিকে মনের মধ্যে পৌঁছে দিতে আরো সাহায্য করেছেন ওস্তাদ বাহাদুর খানের সঙ্গীত পরিচালনা। বাহাদুর খানের শিল্প পরিমিতি জ্ঞানে তথাকথিত ফিল্ম সঙ্গীত পরিচালকদের একঘেয়েমী ও বিদেশী যন্ত্রের বেখাপ্পা ঝঙ্কার থেকে এই ছবি দর্শকদের রেহাই দিয়েছে। পরিচালকের শিল্প-চিন্তা সত্যজিৎ রায় অনুসারী, তাঁর ছবির প্রভাব স্পষ্টভাবে লক্ষ করা যায়। কিন্তু এই অনুসরণ ছবিটিকে গতানুগতিতা থেকে মুক্ত হয়ে বৈশিষ্ট্য দান করেছে।

শিল্পী নির্বাচনে পরিচালকের সাহস প্রশংসনীয়। বিশেষ করে সাবিত্রীর চরিত্রে আরতি গাঙ্গুলীর কথা উল্লেখযোগ্য। আরতি গাঙ্গুলী সাবিত্রীর সঙ্গে এত একাকার হয়ে গেছে যে মনে হয়েছে কোন এক গ্রামের চঞ্চলা বালিকাকেই প্রত্যক্ষ করছি। মেয়েটি যেমন দেখতে মিষ্টি তেমন তার অভিব্যক্তি ও কথা। জ্যেঠামাশাইয়ের ভূমিকায় শম্ভু মিত্রকে বেশ ভাল লেগেছে। এই সঙ্গে দৃষ্টি আকর্ষণ করে বিধবা মায়ের বেদনাময় অভিব্যক্তিতে কাজল গুপ্তের অভিনয়। সাবিত্রীর দুরন্তপনায় প্রতিরূপ ; যাকে দেখলেই মনটা বেদনায় ভরে ওঠে। স্বামী সুনীলের ভূমিকায় সমিত ভঞ্জ সার্থকভাবে চরিত্র রূপায়ণ করেছেন, এই সঙ্গে উল্লেখযোগ্য দেবর রঞ্জনের ভূমিকায় কিশোর অভিনেতার সাফল্য। অন্যান্য ভূমিকায় রয়েছেন : আশাদেবী, উমানাথ ভট্টাচার্য, শিপ্রা মিত্র, গীতা দে। তুলনায় শেষোক্ত দু'জনকে মণ্ডঘেঁষা মনে হয়েছে।

একটি মাত্র দৃশ্যে অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায়কে দেখা গেছে।

ছবির সম্পাদনার কৃতিত্ব রমেশ যোশীর? সর্বাঙ্গীণ সাফল্যের মধ্যে একমাত্র শব্দ গ্রহণে কিছুটা দুর্বলতা অনুভব করা গেছে, হয়ত বহির্দৃশ্যের কারণে। আশা করা যায় ছবিটি জনপ্রিয় হবে।

সংবাদকণা

'নবপর্যায়ে নটতীর্থম'

মৌলিক নাটকের পরীক্ষা-নিরীক্ষার যুগে বহু নতুন নাটকের আবির্ভাব ঘটেছে। তার মধ্যে সত্যিকারের ভালো নাটকের সংখ্যা অত্যন্ত নগণ্য। সুপ্রযোজিত নাটক উপস্থাপনায় 'নটতীর্থম' আজ একটি বিশিষ্ট নাম। নটতীর্থমের শিল্পিগণ তাঁদের মৌলিক নাটক 'অন্ধকারের রং সাদা' নিয়ে পর্যায়ক্রমে অভিনয় করবেন বলে স্থির করেছেন। এ পর্যায়ের প্রথম অভিনয় মুক্তাঙ্গনে ১০ই মার্চ, দ্বিতীয় অভিনয় বিশ্বরূপায় আগামী ২২শে মার্চ এবং এপ্রিল মাস থেকে প্রতি রবিবার সকাল ১০টায় বরাহনগর 'আনন্দম' চিত্রগৃহে নাটকটির নিয়মিত অভিনয় চলতে থাকবে। নাট্যরচনা : আশুতোষ মণ্ডল ও সাধনবন্ধু চট্টোপাধ্যায়।

পাকুড়ে জীবনানন্দ জন্ম-জয়ন্তী

গত ১৯শে ফেব্রুয়ারী পাকুড় সরস্বতী পুস্তকালয় প্রাঙ্গণে নবসংগঠিত সাহিত্য সংস্থা "সাহিত্য-শ্রী"র উদ্যোগে শ্রীবিনোদগোপাল পাণ্ডের সভাপতিত্বে কবি জীবনানন্দ দাশের জন্ম-জয়ন্তী উদ্‌যাপিত হয়। এই অনুষ্ঠানে উদ্বোধনী সঙ্গীত পরিবেশন করেন শ্রীনীলকণ্ঠ দাশ, কুমারী তনুজা মিশ্র ও কুমারী রত্না গোস্বামী। জীবনানন্দ দাশের কবিতাবলী আবৃত্তি করেন—সর্বশ্রী অজিত বিশ্বাস, কবি মাস্টার বনআলি, জগন্নাথ মণ্ডল, সুকুমার সরকার, ক্ষীরোদ সাউ, সুভাষ রায়, নির্মল পাণ্ডে, অশোক চৌধুরী, আনন্দি প্রসাদ ও নজরুল ইস্‌লাম। জীবনানন্দের জীবনী ও কাব্য-সাহিত্য সম্পর্কে প্রবন্ধ পাঠ করেন—সর্বশ্রী নীহার ভট্টাচার্য, উৎপল সিন্‌হা ও মণিপুষ্পক আচার্য। বাংলা কবিতার যুগসন্ধিক্ষণে জীবনানন্দের আবির্ভাব এবং তাঁর অবদান সম্পর্কে স্বল্পপরিসরে আলোচনা করেন "সাহিত্য-শ্রী"র সাধারণ সম্পাদক মোহম্মদ সফী উদ্দীন। রবীন্দ্রোত্তর বাংলা কাব্য-সাহিত্যের গতি ও প্রকৃতি বিশ্লেষণ করে কবি জীবনানন্দের কাব্য বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে আলোকপাত করেন—স্থানীয় কুমার কালিদাস মেমোরিয়াল কলেজের অধ্যাপক শ্রীগণেশ সাউ। সঙ্গীত বিচিত্রা অনুষ্ঠানে কুমারী রত্না গোস্বামী ও কুমারী তনুজা মিশ্রের কণ্ঠসঙ্গীত উপস্থিত শ্রোতৃমণ্ডলীর বিশেষ প্রশংসা অর্জন করে। এই অনুষ্ঠানকে সাফল্যমণ্ডিত করার জন্য উল্লেখযোগ্য সহযোগিতা করেন সর্বশ্রী তুলসী প্রসাদ, সচ্চিদানন্দ তেওয়ারী, হরিনারায়ণ দাশ ও সুভাষ দাশ।

মুক্তিপ্রাপ্ত ছবি

বাংলা ছবি : নতুন পাতা শুক্রবার ২৮শে ফেব্রুয়ারী মুক্তিলাভ করেছে। ছবিটির পরিচালক দীনেন গুপ্ত।

*

এই সপ্তাহে মুক্তিপ্রাপ্ত হিন্দী ছবি 'পায়ল কি ঝঙ্কার'। পরিচালনা করেছেন এম, ভি, রামন। দ্বিতীয় ছবি 'ডঙ্কা'। পরিচালনা করেছেন বলদেও ঝিংগ।

*

এই শুক্রবার মিনার্ভা সিনেমার পুনর্দ্বারোদ্ঘাটন হল রিচার্ড বার্টন ও এলিজাবেথ টেলর অভিনীত 'টেমিং অব দি শ্রু' দিয়ে। শ্লোবে 'ইন লাইক ফ্লিন্ট'।

সোভিয়েট ইউনিয়নের সাংস্কৃতিক দপ্তরের মন্ত্রী ওয়াই. এ. ফুর্তসেভা মস্কো আর্ট থিয়েটারের ৭০ বছর পূর্তি উপলক্ষে ভাষণ দিচ্ছেন।

খেলাধুলা

ক্রীড়ামন্ত্রী সমীপেষু

ক্রীড়া বিভাগটা এতোকাল শিক্ষা দপ্তরের মধ্যেই ছিলো। শিক্ষাদপ্তরই ছিলো পশ্চিমবঙ্গ সরকারের ক্রীড়া বিভাগের হর্তা-কর্তা-বিধাতা। কিন্তু এবারের এই দিন বদলের পালায় বদলে গেছে এই বিভাগটাও। খেলাধুলাকে বিশেষ মর্যাদা দিয়েছেন নব-নির্বাচিত যুক্তফ্রন্ট সরকার। তাই একজন মন্ত্রীর দপ্তর হিসেবে রাখা হয়েছে ক্রীড়া বিভাগটি। বাংলাদেশের খেলাধুলার জগৎ এই প্রথম পেলো একজন ক্রীড়ামন্ত্রী। বাংলাদেশের প্রথম ক্রীড়ামন্ত্রীকে আমরা তাই স্বাগত জানাই—জানাই আমাদের আন্তরিক শুভেচ্ছা। সেই সংগে কয়েকটি বিষয়ের ওপর তাঁর দৃষ্টি আকর্ষণ করে শুধু মাত্র তার প্রতিকার কিম্বা সমাধানই কামনা করি না—আমাদের চাহিদা আরো একটু বেশি। আমরা চাই মাননীয় ক্রীড়ামন্ত্রী বাংলাদেশের খেলাধুলো জগতের কায়েমী স্বার্থে ভরা মানুষগুলোর ওপর একটু কঠোর হোন। এ কথা এবার যেন তাঁরা বুঝতে পারেন যে, দিন বদলেছে—সুখসজ্জায় পায়ের ওপর পা তুলে নাকে তেল দিয়ে আর আয়েস করা চলবে না। এবার তাঁদের নেমে আসতে হবে সাধারণ ক্রীড়ারসিকদের কাছা কাছি। আর সেই সংগে করতে হবে এতোকালের এতো দুর্নীতি, এতো যথেচ্ছাচারিতার প্রায়শ্চিত্ত।

এর পর মাননীয় ক্রীড়ামন্ত্রী মহাশয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করে জানাই যে--আপনি একটু সজাগ হোন যাতে (১) খুব তাড়াতাড়ি কলকাতায় একটা পূর্ণাঙ্গ ফুটবল স্টেডিয়াম তৈরির কাজ শুরু হয়। (২) রাজ্যপাল কৃত ইডেন উদ্যানে কম্পোজিট স্টেডিয়াম তৈরির প্রস্তাব বাতিল করে দিয়ে বিশ্বের অন্যতম শ্রেষ্ঠ ও ক্রিকেটের নন্দনকানন ইডেনকে বাঁচান। (৩) রাজ্য স্পোর্টস কাউন্সিলকে এমনভাবে ঢেলে সাজান যাতে এই প্রতিষ্ঠানটির কাজগুলো সত্যি সত্যিই ঠিকভাবে হয়। (৪) এমন একটা ইনডোর স্টেডিয়াম কিম্বা ঢাকা মাঠ (ছোট) তৈরি হোক যেখানে বাংলাদেশের ক্রিকেট খেলোয়াড়রা সারা বছর অনুশীলন করতে পারেন। (৫) সারা বছর ফুটবল খেলার অনুশীলনের ও রাত্তিরে ক্লাব লীগে ফুটবল খেলার ব্যবস্থা করার দরকার। (৬) স্কুল-কলেজের ছাত্র খেলোয়াড়দের বিভিন্ন সুযোগ-সুবিধা দেওয়া ও স্কুল-কলেজে খেলাধুলার প্রসার বাড়ানো। (৭) নিয়মিত ফুটবল ও ক্রিকেট কোচিং-এর ব্যবস্থা করা। (৮) খেলোয়াড়দের চাকরীর সুবিধা ও স্থানীয় খেলোয়াড়দের অগ্রাধিকার দেবার ব্যবস্থা করা। (৯) বড় বড় ক্লাবগুলোকে সংযত করা ও খেলাধুলার উন্নতির জন্যে তাদের যথাসম্ভব সাহায্য করা। (১০) রেফারী, আম্পায়ার ও কোচদের কিছু সুযোগ-সুবিধে দেওয়া ও চাকরির ব্যবস্থা করা। এ ছাড়াও করণীয় কাজ আরো অনেক আছে। তবু মনে হয় মোটামুটিভাবে এইগুলি দিয়ে আরম্ভ করলেই বাংলাদেশের খেলাধুলোর মান অন্তত কিছুটা ভালো হবে। দেখা যাক মাননীয় ক্রীড়ামন্ত্রী আমাদের নতুন কিছু দিতে পারেন কি না।

—শান্তিপ্রিয়।

ফুটবল-ফুটবল

ফুটবল খেলাকে নিয়ে শুধুমাত্র কলকাতাই নয়, সমস্ত বাংলাদেশ এখন সরগরম। বড় ক্লাবগুলোর সমর্থকরা এই সময় খুব আতঙ্কের মধ্যে থাকেন। দল ভেঙে কখন যে কে চলে যাবেন কে জানে। অবশ্য শুধুমাত্র চলে যাওয়াই নয়, দলে নতুন কে আসছেন এই নিয়েও ক্লাব-সমর্থকরা থাকেন যথেষ্ট আশান্বিত হয়ে।

আসা-যাওয়ার পালাকে কেন্দ্র করে শহর কলকাতায় এই সময় তাই ছড়ায় গুজবের পর গুজব। অনেক সময় সে গুজবের ভিত্তি থাকে অনেক সময় থাকে না।

॥ অশোক চ্যাটার্জী ॥
অশোক যে কোনদিন মোহনবাগান ক্লাব ছেড়ে আসবেন, তা' কেউ কল্পনাও করেন নি।

তাই ভিড় জমে আই· এফ· এ অফিসের সামনে। উৎসাহ আর উৎকণ্ঠা নিয়ে সেখানে গিয়ে ঘণ্টার পর ঘণ্টা দাঁড়িয়ে থাকেন ক্লাবের সমর্থকরা। প্রতি মুহূর্তে সেখানে উত্তেজনা। প্রতি মুহূর্তে সেখানে খবরের ছড়াছড়ি। গুজবে গুজবে ছয়লাপ।

তারপর যখন সেই গুজব সত্যি হয় আর কোন দলের নামকরা

॥ কানন ॥
দল বদলের পালায় মোহনবাগানের কানন এবার এসেছেন ইস্টবেংগলে।

খেলোয়াড়কে অন্য কোন দলের কর্তৃপক্ষের সংগে আসতে দেখা যায়, তখন যেন উত্তেজনায় ফেটে পড়তে চায় আই· এফ· এ অফিসের সামনেটা। ক্লাব সমর্থকরা মনে-প্রাণে চান বাধা দিতে। কিন্তু তাঁরা এও জানেন এ আর সম্ভব নয়। তাই নিজেদের চোখের সামনে দিয়ে দেখেন ক্লাবের নামকরা খেলোয়াড়দের দল ছেড়ে যেতে। আর সেই সংগে শুনতে হয় প্রতিপক্ষ দলটির সমর্থকদের সাফল্য উল্লাস। তারপর ক'টা দিন কাটে গভীর উৎকণ্ঠার মধ্যে দিয়ে। রোজ ক্লাব-সমর্থকরা হাজিরা দেন আই· এফ· এ অফিসের সামনে। যদি তাঁদের সেই প্রিয় খেলোয়াড়রা আবেদন প্রত্যাহার করে আবার ফিরে আসেন নিজেদের পুরনো দলে।

ক্লাব-সমর্থকরা এই সময়টা উৎসাহ আর উৎকণ্ঠার মধ্যে থাকেন, কিন্তু ক্লাব কর্তৃপক্ষের এই সময়টায় যেন আর কর্মব্যস্ততার সীমা থাকে না। কিভাবে নামকরা কোন খেলোয়াড়কে অন্য দল থেকে ভাঙিয়ে নিজেদের দলে আনবেন, আর কিভাবে নিজেদের খেলোয়াড়দের সামলে রাখবেন—এই চিন্তায় তাঁরা হয়ে থাকেন বিভোর।

শুধু তাই নয়—খেলোয়াড়দের নিয়েও এই সময়টায় চলে টানাটানি। কোন খেলোয়াড়কে হয়তো সই করিয়ে কিম্বা কোন খেলোয়াড় পাছে অন্য কোন দলে চলে যান, সেই ভয়ে তাঁদের সরিয়ে দেওয়া হয় বাংলাদেশের বাইরে কোন এক অজ্ঞাত স্থানে।

সে যাই হোক, একথা আজ বোধহয় আর কেউই অস্বীকার করতে পারবেন না যে, এই দল বদলের পালার মরশুমটা

দল বদলের পালায় এবার নাম লিখেছেন মহামেডান স্পোর্টিং-এর মুস্তাফা

কলকাতার খেলার আসরকে বেশ সরগরম রাখে। উৎসাহ আর উৎকণ্ঠায় ভরা এই দিনগুলোর আকর্ষণ আলাদা.....।

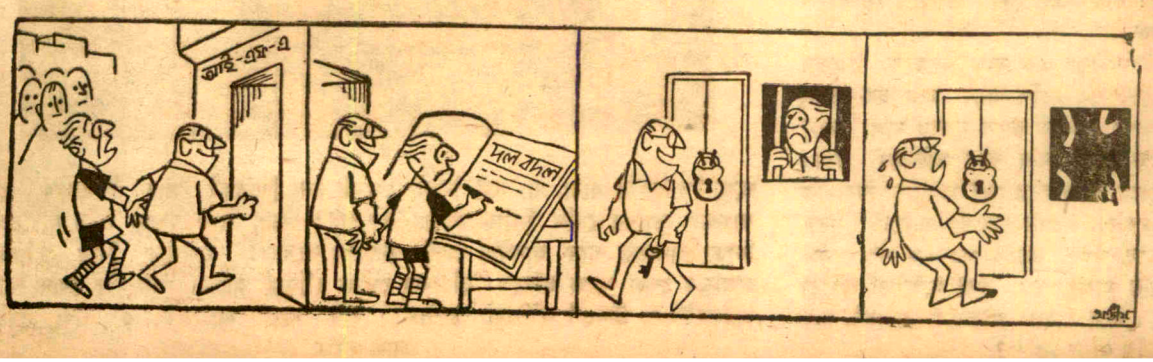

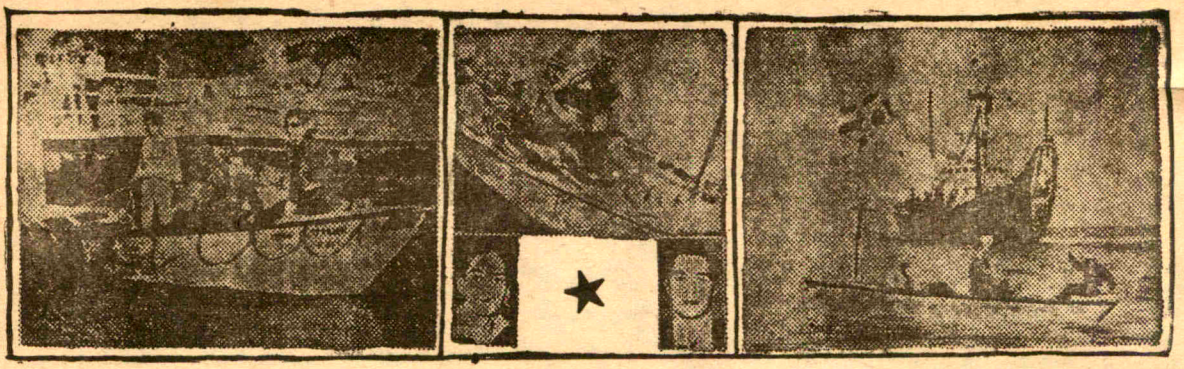

॥ সমুদ্রেতে যাবোই ॥

কনোজী আংরের হাল ধরে মাঝ-সমুদ্রের জানার, অচেনাকে চেনার স্বপ্ন। নিঃসঙ্গ বুক চিরে এগিয়ে চলেছেন দুই বীর। মনে তাঁদের দুর্জয় সাহস, চোখে অজানাকে নয়, পিনাকী আর ডিউক চলেছেন আন্দামানের পথে।

সমুদ্রেতে যাবোই

যাবোই আমি যাবোই, সমুদ্রেতে যাবোই। গেছে ওরা দু'জনে পিনাকী আর ডিউক। মাঝ সমুদ্রে ওরা এখন এগিয়ে চলেছে কনোজী আংরের হাল ধরে।

দিনে সূর্য, রাত্তিরে চাঁদ আর লক্ষ কোটি তারা আর আছে ওদের সংগে সামুদ্রিক সব প্রাণী—আছে হাঙর, আছে কারট, আছে শুশুক আছে নানাশ্রেণীর সাপ আর আছে হাজার রকমের মাছ।

তবু ওরা নিঃসঙ্গ। চারিদিকে শুধু জল আর জল, না জানি দেখে দেখে ওদের চিত্ত হয়েছে কি না বিকল। জল, চারিদিকে শুধু অথৈ জল, তার মাঝে আচমকা উড়ে আসা একদল গাঙচিল, নৌকোর গলুই-এ একটা করে নতুন দাগ কাটা, সন্তর্পণে সমুদ্রে স্নান করা, সময়মতো খবর পাঠানো আর একটানা দাঁড় টানা—এই তো ওদের রোজকার কাজ।

তারপর এক সময় নিজেকে নিজের কাছেই বড় বেশি একা মনে হয়—তখন চোখের সামনে ভাসে মায়ের মুখ, মনে পড়ে ছোট বোন আর ভাই-এর কথা। ভাবতে ইচ্ছে করে সেই মুহূর্তে বাবা কি করছেন। তখন চোখের সামনে দিয়ে ভেসে যায় একের পর এক সব চেনা-জানা মুখগুলো। সেই মুহূর্তে হয়তো যা মনে হয়—এইভাবে একাকী, যায় বুঝি থাকা কি...?

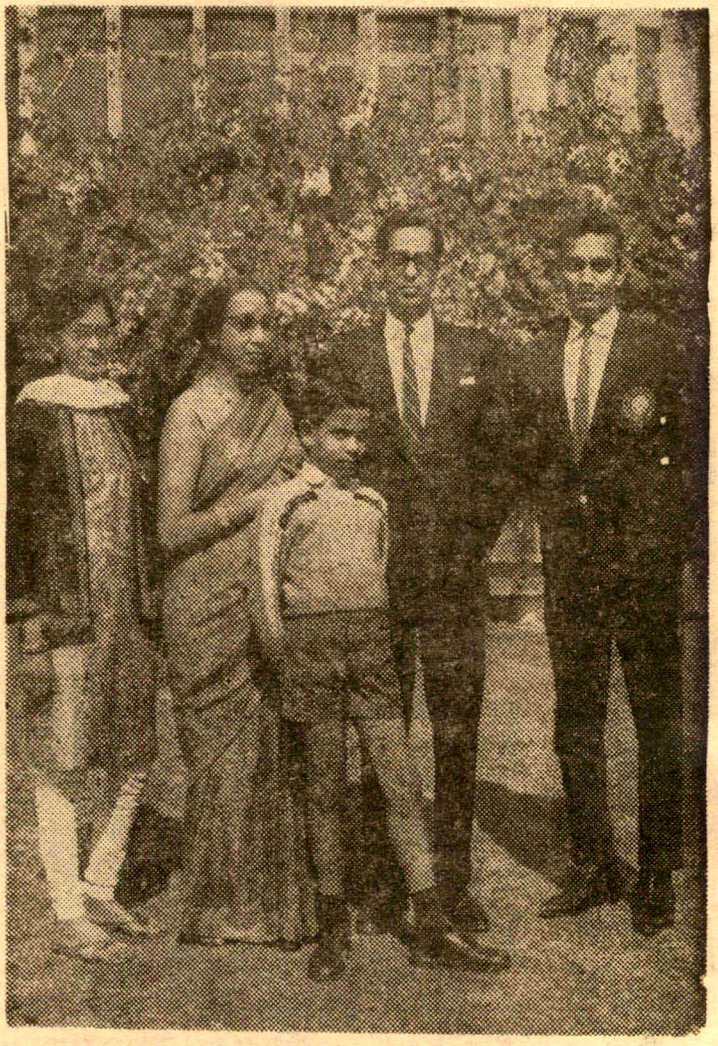

শুধু পিনাকীর বাবা, মা, ভাই কিম্বা বোনই নন, পিনাকী আর ডিউকের সুখ কামনায়, তাদের খোঁজ নিচ্ছি আমরা সকলেই। তবু আজ যাঁদের প্রতি মুহূর্তের চিন্তা সাগরের বুকে ভাসমান ছোট্ট নৌকো কনোজী আংরেকে ঘিরে তাঁদেরই ক'জনকে দেখা যাচ্ছে ছবিতে। বাঁ দিক থেকে দাঁড়িয়ে আছেন পিনাকীর বোন শুক্লা চ্যাটার্জী, মা শ্রীমতী নীলিমা চ্যাটার্জী, ভাই পার্থ চ্যাটার্জী ও বাবা রথীন চ্যাটার্জী।

আচমকা হয়তো ছিঁড়ে যায় কল্পনার রেশ। সমুদ্রের লোনা জলের স্রোতের সংগে আবার হারিয়ে যায় কল্পনার স্বপ্ন-বিলাস। আবার দাঁড় টানতে শুরু করে ওরা।

সময় নেই, সময় যে আর নেই। সুদূর সেই আন্দামান এখনও দেড় শ' মাইলেরও বেশি দূরে। অথচ মার্চ মাস এসে গেলো। আর মাত্র কয়েকটা দিন। তারপর শান্ত সমুদ্র আর স্থির থাকবে না। উত্তাল তরংগে ফুলে ফেঁপে একাকার হয়ে যাবে সাগরের জল।

তার আগেই যে কনোজী আংরেকে নিয়ে যেতে হবে নিরাপদ স্থানে। তাই শক্ত হাতে হাল ধরো, জোরে টানো দাঁড়—চলো এগিয়ে। চলো তুমি এগিয়ে পিনাকী, এগিয়ে চলো ডিউক। তোমাদের পথ চেয়েই যে আছি আমরা। তোমরা দিচ্ছো নৌকোর গলুই-এ নতুন দিনে নতুন দাগ—আর সে দাগ পড়ছে আমাদের মনে। এগিয়ে চলো ডিউক, এগিয়ে চলো পিনাকী। মনে রেখো কোন সময়ই তোমরা একা নও, প্রতি মুহূর্তে আমরা আছি তোমাদের সংগে... তোমাদের সংগে...।

গল্পহলেও সত্যি

১৯০৫ সালের কথা! চুঁচড়োর প্ল্যাডস্টোন কাপের ফাইন্যালে উঠেছে মোহনবাগান। ফাইন্যালে তাদের খেলতে হবে ডালহৌসীর বিরুদ্ধে। ডালহৌসী সেবার আই-এফ-এ শীল্ড ফাইন্যালে ক্যালকাটাকে ৪—৩ গোলে হারিয়ে দিয়েছে। খুব শক্তিশালী দল ডালহৌসী। মোহনবাগানের গোহারা হারার সম্ভাবনা।

কিন্তু স্টেশনে গিয়ে ডালহৌসীর মাত্র সাতজন খেলোয়াড়কে দেখা গেলো। মোহনবাগানের খেলোয়াড়রা এ-ওর মুখ চায়। ব্যাপারটা কি? শেষকালে কৌতূহল আর চেপে রাখতে না পেরে একজন তো জিজ্ঞেসই করে বসলেন, "কি ব্যাপার, আপনাদের আর সব খেলোয়াড় কোথায়?"

কথা শুনে সাহেব তো হেসেই খুন। বললো, "মোহনবাগানের সংগে খেলতে কি সাতজনের বেশি খেলোয়াড় লাগবে?"

কিন্তু মাঠে নেমে দেখা গেলো যে শীল্ড বিজয়ী ডালহৌসী দলের এগারোজন খেলোয়াড়ই হাজির। মোহনবাগানের খেলোয়াড়রা অবাক। ঠিক আছে। শিবদাস ভাদুড়ি অন্য ফরোয়ার্ডদের জানিয়ে দিলেন যে, খেলা শুরু হবার সংগে সংগে ওদের মাথা ঘুরিয়ে দিতে হবে।

যে কথা সেই কাজ। খেলা শুরু হতে না হতে শিবদাস ভাদুড়ি বল নিয়ে ছুটতে শুরু করলেন। তারপর কেউ কিছু বোঝার আগেই বল চলে গেলো ডালহৌসীর গোলের মধ্যে। আবার সেন্টার হতে না হতে ভোম্পা দত্ত বল ঠেলে দিলেন শিবদাসকে। শিবদাস আবার শুরু করলেন ছুটতে। ডালহৌসীর হাফ ব্যাক, ব্যাক আর গোলকীপার কিছু বোঝার আগেই বল চলে গেলো নেটের মধ্যে।

মোহনবাগান সারাক্ষণ খেললো ঠিক এইভাবে। খেলা যখন শেষ হলো তখন দেখা গেলো মোহনবাগান এগিয়ে আছে ৬—১ গোলে .....! সাতজন নয়, এগারোজনের পুরো দল নিয়েও ডালহৌসী বুঝতে পারলো না মোহনবাগানের খেলোয়াড়দের সংগে.....।

ওয়েস্ট ইণ্ডিজের বিরুদ্ধে শেষ [illegible]

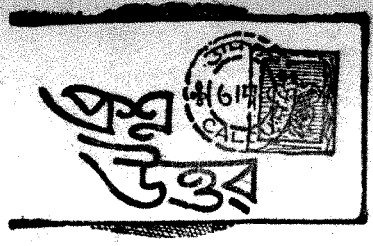

মানু মুখোপাধ্যায় (মনোহর পুকুর ২য় লেন, কলকাতা—২৯)

প্রশ্ন : মোহনবাগান যে সব খেলোয়াড়কে হারিয়েছেন তাঁদের স্থান পূর্ণ করার জন্যে কি বাইরে থেকে কোন খেলোয়াড় সংগ্রহ করবেন ?

উত্তর : চেষ্টা নিশ্চয়ই চলছে...!

অরুণকুমার গৃহকর্মকার (তেজগঞ্জ, বর্ধমান)

প্রশ্ন : ভারতীয় ক্রিকেট দলের খেলোয়াড়দের মধ্যে বর্তমানে কাকে ব্যাটিং ও বোলিং-এ সমান পারদর্শী বলা যায় ?

উত্তর : আমার মতে সুর্তিকেই...!

বিকাশ বাগচী (ট্রাংগুলার কলোনী, গৌহাটী—১২)

প্রশ্ন : সাপ্তাহিক বসুমতী পত্রিকার খেলাধুলা বিভাগে মাঝে মাঝে ফুটবলের আইনগুলি ধারাবাহিকভাবে প্রকাশ করলে মনে হয় খুব ভালো হয়। তাছাড়া খেলাধুলার উন্নতিকল্পে বিভিন্ন প্রবন্ধ (আন্তর্জাতিক খেলোয়াড়দের) প্রকাশ করলে আমরা পড়তে পারি।

উত্তর : এ ধরণের লেখা তো আমাদের পত্রিকায় প্রায়ই প্রকাশ করা হয়। সম্প্রতি ফুটবল খেলার মান ও সৌন্দর্যের বিষয়টি নিয়ে দেশ-বিদেশের খেলোয়াড় ও কোচদের মন্তব্য ধারাবাহিকভাবে ছাপা হয়েছে। আশা করি আপনিও তা দেখেছেন। আর 'ফুটবল খেলার আইন-কানুন' নিয়ে সচিত্র আলোচনা তো আমাদের পত্রিকায় বহুবার ছাপা হয়েছে—ভবিষ্যতেও হবে।

আর পত্রিকাগুলোর ঠিকানা তো জানানো আমার পক্ষে সম্ভব নয়। তবে আপনি কলকাতার পত্রিকা সিণ্ডিকেট লিণ্ডসে স্ট্রীট, কলকাতা—এই ঠিকানায় যোগাযোগ করতে পারেন।

নন্দদুলাল চট্টোপাধ্যায় (কলকাতা ২৫)

উত্তর : আপনার চিঠিটি হুবহু তুলে দিলাম :

"আপনাদের পত্রিকার ২০শে ফেব্রুয়ারী সংখ্যার প্রশ্ন-উত্তর বিভাগে কলকাতা ৫৩ থেকে শ্রীদিলীপ চক্রবর্তী মহাশয় লিখেছেন যে চুনি গোস্বামী শুধু প্রি-অলিম্পিক খেলেছেন—অলিম্পিকে নয়। কিন্তু আমি জানি যে, ১৯৬০ সালের রোম অলিম্পিকে চুনি গোস্বামী, প্রদীপ ব্যানার্জীর নেতৃত্বে ভারতীয় ফুটবল দলের হয়ে প্রতিনিধিত্ব করেন এবং সেইবার ভারত মূল অলিম্পিকে খেলার যোগ্যতা লাভ করেছিলো। এই বিষয়ে শ্রীচক্রবর্তী কি বলেন...?

সুভাষরঞ্জন দত্ত (ট্রাংগুলার কলোনী, পাণ্ডু আসাম)

প্রশ্ন : ধরুন কোন খেলোয়াড় বল করলো এবং ব্যাটসম্যান বলটি খেলার পর বলটি আবার ঘুরে উইকেটের দিকে এলো। ব্যাটসম্যান তখন পা দিয়ে মেরে বলটা ঠেলে দিলেন। কিন্তু বলটা গিয়ে লাগলো উল্টোদিকের উইকেটে। ব্যাটসম্যান কি আউট হবে ?

উত্তর : আউট হবে না।

সোমনাথ গঙ্গোপাধ্যায় (হালিসহর, গোলাবাড়ি, ২৪ পরগনা)

প্রশ্ন : বর্তমানে আপনার মতে ভারতীয় ক্রিকেটের মানের উন্নতি হচ্ছে—না অবনতি ঘটছে ?

উত্তর : দু'টোর একটাও না; মাঝামাঝি স্থানে আছে বলেই তো মনে হয়।

মৃদুলকান্তি দে (নামবাড়ি কলোনী, গৌহাটী—১১, আসাম)

প্রশ্ন : বিশ্ব ক্রিকেটে সর্ব বিষয়ে কার অবদান সর্বাধিক ?

উত্তর : আমার মতে ওয়েস্ট ইণ্ডিজের পরলোকগত অধিনায়ক স্যার ফ্রাঙ্ক ওরেলের...!

পরিতোষ নাগ ও আশিস রায়-চৌধুরী (বেলাকোবা, জলপাইগুড়ি)

প্রশ্ন : ১৫০০ মিটার দৌড়, বর্শা নিক্ষেপ ও ট্রিপল জাম্পের বিশ্ব রেকর্ড জানতে চাই।

উত্তর : ১৫০০ মিটার দৌড়—এইচ ইলিয়াট (অস্ট্রেলিয়া, ১৯৬০) ৩ মিঃ ৩৫·৬ সে

বর্শা নিক্ষেপ—টি পেডারসেন (নরওয়ে, ১৯৬৪) ৯১·৭২ মিঃ (৩০০ ফুঃ ১১ ইঞ্চি)

ট্রিপল জাম্প—জে· স্কিমিড্ (পোল্যাণ্ড, ১৯৬০) ১৭·০৩ মিঃ (৫৫ ফুঃ ১০¾ ইঞ্চি)

প্রবীর চ্যাটার্জী (গোপীমোহন দত্ত লেন, কলকাতা—৩)

প্রশ্ন : ভারতীয় ক্রিকেটারদের মধ্যে কে কে উইসডেনের স্বীকৃতি লাভ করেছেন ?

উত্তর :

কে· এস· রণজী সিংজী ১৮৯৬ সালে
কে· এস· দলীপ সিংজী ১৯২৬ সালে
সি· কে· নাইডু —১৯৩২ সালে
ভি· এম· মার্চেণ্ট—১৯৩৬ সালে
পতৌদির নবাব (বড়) ১৯৩৯ সালে
ভি মানকাদ—১৯৪৬ সালে
পতৌদির নবাব (ছোট) ১৯৬৮ সালে।

সুকুমার সরকার (ব্রাউন হোস্টেল, বাঁকুড়া খৃস্টান কলেজ)

প্রশ্ন : ১ম থেকে ১০ম পর্যন্ত পার্টনারশীপ রেকর্ড জানতে চাই।

উত্তর : ১ম—৪১৩ : মানকাদ ও পি রায় (ভারত) নিউজিল্যাণ্ডের বিরুদ্ধে ১৯৫৫-৫৬—মাদ্রাজ টেস্টে

২য়—৪৫১ : পনসফোর্ড ও ব্রাডম্যান (অস্ট্রেলিয়া) ইংলণ্ডের বিরুদ্ধে ১৯৩৪—ওভাল টেস্টে

৩য়—৩৭০ : এডরিচ ও কম্পটন (ইংল্যাণ্ড) সাউথ আফ্রিকার বিরুদ্ধে ১৯৪৭—লর্ডস

৪র্থ—৪১১ : মে ও কাউড্রে (ইংলণ্ড) ওঃ ইণ্ডিজের বিরুদ্ধে, ১৯৫৭—বার্মিংহাম

৫ম—৪০৫ : বার্নস ও ব্রাডম্যান (অস্ট্রেলিয়া) ইংলণ্ডের বিরুদ্ধে ১৯৪৬-৪৭—সিডনি

৬ষ্ঠ—৩৪৬ : ফ্রিংগিলটন ও ব্রাডম্যান (অস্ট্রেলিয়া) ইংলণ্ডের বিরুদ্ধে ১৯৩৬-৩৭—মেলবোর্ন

৭ম—৩৪৭ : এটকিনসন ও দেপেইজা (ওঃ ইণ্ডিজ) অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে ১৯৫৪-৫৫—ব্রিজটাউন

৮ম—২৪৬ : এমস ও এ্যালেন (ইংলণ্ড) নিউজিল্যাণ্ডের বিরুদ্ধে ১৯৩১—লর্ডস

৯ম—১৬৩ : কাউড্রে ও এ· সি· স্মিথ (ইংলণ্ড) নিউজিল্যাণ্ডের বিরুদ্ধে ১৯৬২-৬৩—ওয়েলিংটন

১০ম—১৩০ : ফস্টার ও রোডস (ইংলণ্ড) অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে ১৯০৩-০৪—সিডনি।

সম্পাদিকা—জয়ন্তী সেন

বসুমতী (প্রাঃ) লিঃ-এর পক্ষে ১৬৬, বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী স্ট্রীটস্থ কলিকাতা-১২,

বসুমতী প্রেস হইতে শ্রীসুকুমার মুখোপাধ্যায় কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

দুইটি বা তিনটি সন্তানের পরিবারই আদর্শ পরিবার

জেনে রাখুন ঃ

- পরিবারকল্যাণই পরিবার পরিকল্পনা
- যে কোন পরিবার পরিকল্পনাকেন্দ্রেই বিনামূল্যে নিরোধ এবং যাবতীয় পরামর্শ পাওয়া যায়
- হিন্দুস্থান লিভারে উৎপাদিত প্রব্যাদি যে সব দোকানে বিক্রী হয় সেই সব দোকানে মাত্র ১৫ পয়সায় তিনটি করে নিরোধ কিনতে পাওয়া যায়
- তিনটি সন্তান না হওয়া পর্য্যন্ত নিরোধ ব্যবহার করে দুই সন্তানের জন্মের মধ্যবর্তী সময়ের ব্যবধান বাড়ান সম্ভব
- তিনটি সন্তানলাভের পর স্থায়ীভাবে জন্মনিরোধের জন্যে অস্ত্রোপচারই শ্রেষ্ঠ পদ্ধতি

আজই আপনার নিকটবর্তী যে কোন পরিবার পরিকল্পনাকেন্দ্র বা স্বাস্থ্যকেন্দ্রে যোগাযোগ করে বিনামূল্যে অভিজ্ঞ চিকিৎসকের পরামর্শ নিন।

(পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পরিবার পরিকল্পনা সংস্থা কর্তৃক প্রচারিত)

Thursday, 6th March, 1969 SAPTAHIK BASUMATI Regn. No. C 71
PRICE : 30 Paise GRAM : "BASUMATI" PHONE : 34—7771, 72, 73, 74

বিভিন্ন রুচিরই মেজাজঃ

কোথাও কাঁচা
গোটা মশলা
চলে →

কোথাও চলে
বাটা মশলা →

আরো
দেবো
ঠাকুমা ?

কোথাও
অতিরিক্ত →

ডাইলে
কয় গন্ডা লঙ্কা দিছ ?

কোথাও
না
নামমাত্র →

ছালন কো
পকায় কে
পকায় কে-বসে
হুই মসালা !

কিন্তু সবার রুচিকেই কুকমী পরিতৃপ্ত করে !

গ্রাম : "স্পাইসমার্ট"

মিল—কাশীপুর

শিশুর খাদ্যে ও রুগীর পথ্যে নির্ভয়ে ব্যবহৃত হয়

'কুকমী'—সর্বাধিক বিক্রীত গুঁড়ো মশলা

পনের লক্ষ প্যাকেট মাসিক বিক্রয়

১২০ বৎসরের অধিক প্রাচীন ও বর্তমানে মশলার বৃহত্তম প্রতিষ্ঠান

কৃষ্ণচন্দ্র দত্ত (স্পাইস) প্রাঃ লিঃ

সাপ্তাহিক
বসুমতী

দুটি অনুচ্ছেদ বাদ দিয়ে রাজ্যপালের ভাষণঃ
সংসদীয় গণতন্ত্রের ইতিহাসে অভূতপূর্ব নজির

বিধানমণ্ডলীর ভিতরে ও বাইরে রাজ্যপালের আচরণের প্রতিবাদ

৭৩ বর্ষঃ ৩৮শ সংখ্যা, বৃহস্পতি, ২৯শে ফাল্গুন, ১৩৭৫ বঙ্গাব্দ | OLDEST WEEKLY OF NORTH INDIA | 73 year, No. 38, 13th March, 1969

সূচীপত্র

বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা
সম্পাদকীয়		২৩৭১
আজকের মানুষ		২৩৭২
শান্তাষচন্দ্র ও সমকালীন ভারতবর্ষ (ধারাবাহিক প্রবন্ধ)	— শঙ্করীপ্রসাদ বসু	২৩৭৩
আমরা তখন গান শুনছিলাম (কবিতা)	— রাধামোহন মহান্ত	২৩৭৬
বঙ্গদর্শন		২৩৭৭
ভারতদর্শন		২৩৮০
আন্তর্জাতিক		২৩৮৩
যুক্তফ্রন্ট সরকার সমীপেষু	— শ্রীসর্বদর্শী	২৩৮৫
নির্বাচনের পরে	— সাগর বিশ্বাস	২৩৮৭
পশ্চিম বাংলার নির্বাচন-ফলের রাজনৈতিক তাৎপর্য	— তুষার চট্টোপাধ্যায়	২৩৯০
সহস্র চরিত্রের পাশে (কবিতা)	— জয়ন্তী সেন	২৩৯৩

যে কোন
গয়না
আর
আসল
গ্রহরত্ন
কেনার
দক্ষিণ কোলকাতায়
নামকরা প্রতিষ্ঠান
ফোন : ৪৬-৬২৫৮

সন অ্যাণ্ড গ্র্যাণ্ডসন অব ভেট
এস. বি. সরকার

সূচীপত্র

বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা
মনের রঙকে মাটিতে আকাশে (কবিতা)	মলয়শঙ্কর দাশগুপ্ত	২৩৯৩
অন্যরা কি বলেন	...	২৩৯৪
সপ্তাহের বোঝা	কৃত্তিবাস ওঝা	২৩৯৬
পশ্চিম বাংলার বুদ্ধিজীবী ॥ শপথ, হতাশা এবং বিচ্ছিন্নতার সমস্যা	বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়	২৩৯৯
আমার ইউরোপ ভ্রমণ	ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায়	২৪০৩
তিমিরপ্রান্ত ভ্রমণ	অগ্নিবর্ণ	২৪০৮
নিশীথ সূর্য (গল্প)	শ্রীপ্রিয়দর্শন সেনশর্মা	২৪১৪
রঙ্গমঞ্চ ওদেশে এবং এদেশে	শিলালি	২৪২৮
রঙ্গজগৎ	...	২৪২৯
খবর বলছি	...	২৪২৬
খেলাধুলা	শান্তিপ্রিয়	২৪২৮

॥ নাটক ॥ নাটক ॥ নাটক ॥ নাটক ॥ নাটক ॥

বহুকাল পরে আবার পাওয়া যাচ্ছে।

ম হা ক বি

গিরিশচন্দ্র ঘোষের রচনাবলী

প্রথম খণ্ড : প্রফুল্ল, ম্যাকবেথ, ঠাকুর শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেব ও স্বামী বিবেকানন্দ সম্পর্কে চারটি প্রবন্ধ, তিনখানি গীতিনাট্য ও গ্রন্থপরিচয়। পৃষ্ঠা সংখ্যা ৪১২। মূল্য দশ টাকা।

দ্বিতীয় খণ্ড : সিরাজউদ্দৌলা ; য্যায়সা কা ত্যায়সা ; জনা ; দোললীলা ও গ্রন্থপরিচয়। পৃষ্ঠা সংখ্যা ৩৫৮। মূল্য দশ টাকা।

তৃতীয় খণ্ড : পাণ্ডবগৌরব, বলিদান, আবুহোসেন ও গ্রন্থপরিচয়। পৃষ্ঠা সংখ্যা ৩৫২। মূল্য দশ টাকা।

চতুর্থ খণ্ড : চৈতন্যলীলা, ভ্রান্তি, মলিনাবিকাশ, হীরার ফুল, বিবিধ রচনা ও গ্রন্থপরিচয়। পৃষ্ঠা সংখ্যা ৩০২। মূল্য দশ টাকা।

পরমহংসদেব শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁর ভক্ত-শিরোমণি অতি প্রিয় নোটো গিরিশকে বলেছিলেন, —"অভিনয়ের প্রয়োজন আছে বৈ-কি—ওতে লোকশিক্ষা হবে। আর তোমার লেখা—ও যে ভারি ভাল হয়েছে।"

প্রতিটি খণ্ড বোর্ডে বাঁধাই। মূল্যবান কাগজে ছাপা।

রচনাবলী সম্পাদনা : অরমেন চৌধুরী

আবলম্বে অর্ডার পেশ করুন।

বসুমতী প্রাইভেট লিমিটেড : ১৬৬, বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী স্ট্রীট, কলি-১২

সাপ্তাহিক বসুমতী

সম্পাদিকা—জয়ন্তী সেন

৭৩ বর্ষ ঃ ৩৮শ সংখ্যা—মূল্য ঃ ৩০ পয়সা
বৃহস্পতি, ২৯শে ফাল্গুন, ১৩৭৫ বঙ্গাব্দ

বাংলা ভাষায় দ্বিতীয় সর্বাধিক প্রচারিত সাপ্তাহিক পত্রিকা

PRICE : 30 Paise
Thursday, 13th March, 1969

সংবিধান ও রাজ্যপাল

স্বাধীনতার পর যে সংবিধান গৃহীত হয়েছিল, কেন্দ্র এবং রাজ্যগুলিতে একদলীয় সরকার প্রতিষ্ঠিত থাকায় ঐ সংবিধানের কতকগুলি ধারা সংশোধন করা প্রয়োজন হয়ে পড়লেও সংবিধানে ঘোষিত মূল বিষয়-গুলির ঔচিত্য সম্বন্ধে জনসাধারণ সজাগ ছিলেন না। রাজনৈতিক পালাবদলের সময় সংবিধানের কথা বারবার উঠছে, যে কটি রাজ্যে অকংগ্রেসী সরকার প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, তাঁরা যেমন কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারের অধিকার ও পারস্পরিক সম্পর্ক নিয়ে মীমাংসায় পৌঁছবার জন্য উদ্‌গ্রীব, তেমনি তাঁরা এমন অভিযোগ করছেন যে, কেন্দ্রীয় সরকার অকংগ্রেসী রাজ্যগুলিকে অপদস্থ করার জন্য সংবিধানের মূল নীতিগুলিকে লঙ্ঘন করে গণতন্ত্রকে অস্বীকার করছেন। অপরপক্ষে কেন্দ্রীয় সরকারের মুখপাত্রেরা তাঁদের জবানীতে জানাচ্ছেন যে, তাঁদের পথই ঠিক এবং তাঁরাই সংবিধানের পবিত্রতা রক্ষা করছেন।

এক্ষেত্রে আমরা পশ্চিমবঙ্গের বিধান-মণ্ডলীতে প্রদত্ত রাজ্যপালের ভাষণ সম্বন্ধে উল্লেখ করতে চাই। গত ৬ই মার্চ যুক্ত-ফ্রন্টের মন্ত্রিসভা কর্তৃক রচিত রাজ্যপালের ভাষণ রাজ্যপাল শ্রীধর্মবীর সম্পূর্ণ পাঠ করেন নি এবং স্বেচ্ছাকৃতভাবে তিনি মুখ্য-মন্ত্রী শ্রীঅজয়কুমার মুখোপাধ্যায়ের প্রতিবাদ সত্ত্বেও ভাষণের দ্বিতীয় ও তৃতীয় অনুচ্ছেদ বাদ দিয়ে পাঠ করেছেন।

বলা বাহুল্য, রাজ্যপাল যে কোনো রাজ্যের নিয়মতান্ত্রিক প্রধান মাত্র। স্বাধী-নতার পর থেকে রাজ্যপালের পদটি কী ধরনের ব্যক্তিরা পেয়েছেন, তাও কারো অজানা নেই। বিহারের প্রাক্তন রাজ্যপাল শ্রীআয়েঙ্গার বিদায়কালীন সম্বর্ধনা সভায় সুস্পষ্টভাবে জানিয়েছিলেন যে, তিনি যদি কেন্দ্রীয় সর-কারের মন যুগিয়ে চলতে পারতেন তাহলে আরো অনেক বছর তিনি ঐ পদে বহাল-তবিয়তে থাকতে পারতেন। সুতরাং রাজ্য-পালরা কেন্দ্রের নির্দেশে চলতে বাধ্য হন একথাও বলা যেতে পারে। অথচ দেশের পরিবর্তিত রাজনৈতিক অবস্থায় দেশের সংহতির স্বার্থেই কেন্দ্রীয় সরকারের দেখা উচিত, অকংগ্রেসী মন্ত্রিসভার সাংবিধানিক কার্যাবলীকে সফল করে তোলার জন্য রাজ্যপালরা তাঁদের দায়িত্ব পালন করতে পারছেন কিনা। ঐ অবস্থায় রাজ্যপাল হিসেবে যাঁরা দায়িত্ব পালন করবেন তাঁরা অবসরপ্রাপ্ত জীবনে শেষ পুরস্কারপ্রাপ্ত মামুলি প্রতিনিধি হলে, তাঁদের পক্ষে যথা-যথভাবে দায়িত্ব পালন করা সম্ভব নয়।

পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপাল দুটি অনুচ্ছেদ বাদ দিয়ে কেন্দ্রীয় সরকারকেই খুশি করতে চেয়েছেন এমন কথা এখন উঠছে। ঐ দুটি অনুচ্ছেদ বাদ দেবার অধিকার রাজ্যপালের নেই বলেই অনেকের অভিমত। এমন কি শ্রীজয়প্রকাশ নারায়ণও ঐ ঘটনার প্রতিবাদ জানিয়েছেন।

রাজ্যপালের অভিমতে, ঐ দুটি অনুচ্ছেদ বাদ দেওয়ার ঘটনাটি অসাংবিধানিক নয়।

বলা প্রয়োজন, আমাদের সংবিধানেও বহু ব্যাপার অস্পষ্ট। কারণ একটি ধারায় যে কথা বলা হয়েছে, অন্য একটি ধারায় বা উপধারায় যা বলা হয়েছে তা প্রথমোক্ত ধারার বিপরীত। কিন্তু 'কনভেনশনও' রাষ্ট্রনীতিতে এক অপরিহার্য ব্যাপার। এই-দিক দিয়ে বিচার করলে পুরো দুই দশকে মন্ত্রিসভা রচিত ভাষণই রাজ্যপাল হুবহু পাঠ করেছেন। হুবহু পাঠের সঙ্গে আরো যে জটিল বিষয় জড়িত, তা হচ্ছে, রাজ্যপালের প্রদত্ত ভাষণ মন্ত্রিসভার নীতির প্রকাশ এবং তাঁর ঐ ভাষণের প্রশ্নোত্তরে রাজ্যপালকে অংশ গ্রহণ করতে হয় না; অংশ গ্রহণ করেন মন্ত্রিসভাই। অতএব রাজ্যপালের উচিত হচ্ছে, মন্ত্রিসভা কর্তৃক রচিত ভাষণের অঙ্গ-চ্ছেদ না করা। আবার রাজ্যপাল কর্তৃক বাদ দেবার ঘটনায় আরো যে মৌলিক প্রশ্ন উঠতে পারে, তা হচ্ছে, রাজ্যপাল যদি স্বেচ্ছা-কৃতভাবে বাদ দেবার অধিকার গ্রহণ করেন, তাহলে তিনি তাঁর মনোমতো অংশবিশেষ যোগ করার অধিকারও প্রয়োগ করতে পারেন—যা হয়তো মন্ত্রিসভার নীতিবিরোধী।

আরো একটি বিষয় উল্লেখযোগ্য, মনো-নীত রাজ্যপালের অবাধ অধিকার যদি এক-বার স্বীকৃত হয়ে যায়, তাহলে বহু রাজ্যেই অনুরূপ ঘটনা ঘটবে এবং কেন্দ্রের সঙ্গে রাজ্যের মনোমালিন্য বৃদ্ধি পাবে—যা জাতীয় সংহতিসাধনের ক্ষেত্রে ভয়ানক বিপজ্জনক। এ ছাড়া আরো যা ঘটতে পারে তা হচ্ছে এই যে, কেন্দ্রে যদি রাজনৈতিক পরিবর্তন ঘটে এবং কোনো কোনো রাজ্যে কংগ্রেসী সরকার প্রতিষ্ঠিত থাকে, তখন ঐ রাজ্য-গুলি রাজ্যপালের স্বেচ্ছাকৃত অধিকার মেনে নিতে স্বীকৃত হবে কি?

এই সব কারণে আমরা মনে করি, রাজ্যপালের নিয়োগ সম্পর্কে নতুন করে বিবেচনা করার সময় এখন এসেছে। এবং রাজ্যপালদের মনোনীত করে কোনো রকম সমাধান সম্ভব নয়, প্রত্যক্ষভাবে নির্বাচনের দ্বারা রাজ্যপালদের নিয়োগের দ্বারাই সমাধান সম্ভব। এর জন্য অবশ্যই সংবিধান সংশোধন করতে হবে।

আপাতত রাজ্যপালের পদ সম্বন্ধে যে বিরূপ মনোভাবের সৃষ্টি হয়েছে, তা দূরীকরণের জন্যে এই মুহূর্তেই কেন্দ্রীয় সরকারের এগিয়ে আসা উচিত। অন্তত যে গণতন্ত্রের কথা কেন্দ্রীয় সরকার উচ্চৈঃস্বরে ঘোষণা করেন সেই বিপন্ন গণতন্ত্র তাঁরা কিভাবে রক্ষা করতে চান তা আমরা দেখতে চাই। কেন্দ্রীয় সরকার পশ্চিমবঙ্গের রাজ্য-পালকে দুটি অনুচ্ছেদ বাদ দেবার নির্দেশ দেন নি বলে জানিয়েছেন, কিন্তু রাজ্যপাল যে বিষময় নজির সৃষ্টি করলেন—তার বিরুদ্ধে তাঁরা কি প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করছেন তাও আমরা জানতে চাই। এর বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গৃহীত না হলে জনগণের নির্বাচিত মন্ত্রিসভার চেয়ে মনোনীত রাজ্য-পালের অধিকার বেশি বলে মনে হবে। ফলে, প্রজাতন্ত্র রাষ্ট্র হিসেবে ভারতকে তখন ঘোষণা করা হবে আরো লজ্জাকর এবং সংবিধানের ন্যায় ও সত্য সম্পূর্ণভাবে লঙ্ঘিত হবে।

সম্পাদকীয়

আজকের মানুষ

নাৎসীবাদ যখন নতুন করে পশ্চিম জার্মানীর আবহাওয়া বিষিয়ে তুলছে তখন তার মধ্যে গুস্তাফ হাইনম্যান উদারতার এক মুঠো শান্ত হাওয়া এনে জার্মানদের মন-প্রাণ ভরে দিলেন। সবকারী প্রার্থী খৃস্টান ডেমোক্রেটিক দলের গেরহার্ড শ্রোয়েডরকে পরাজিত করে বামপন্থী সোস্যাল ডেমোক্রেটিক দলপ্রার্থী গুস্তাফ হাইনম্যান পশ্চিম জার্মানীর নতুন প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হয়েছেন। আশা করা যায়, পশ্চিম জার্মানীর রাজনীতিতে এবার হাইনম্যান কিছু কিছু গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন সাধন করবেন।

এখানে নাৎসীবাদের ক্রমবর্ধমান প্রভাব দেখা সত্ত্বেও হাইনম্যানের নেতৃত্বে পশ্চিম জার্মানীতে পরিবর্তনের স্রোত বইবে বলে আশা করার কারণ নবনির্বাচিত প্রেসিডেন্টের অতীতের উজ্জ্বল ভূমিকা। তাঁর প্রগতিশীল দৃষ্টিভঙ্গীর এ-প্রমাণ দিলেই এখানে যথেষ্ট হবে যে, হাইনম্যান কয়েকটি জরুরী প্রশ্নে নাৎসীনায়ক ক্ষমতাদর্পী ডিক্টেটর হিটলারের বিরোধিতা করারও দৎসাহস দেখিয়েছিলেন।

বস্তুত গুস্তাফ হাইনম্যান পশ্চিম জার্মানীর একজন বিতর্কিত পুরুষ। তাঁর দৃষ্টিভঙ্গী স্বচ্ছ, প্রতিটি প্রশ্নে তিনি আপন বিচারবুদ্ধি ও বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণের মাধ্যমে সিদ্ধান্তে আসেন। স্বাধীন চিন্তাধারা ও মনোভাব পোষণের জন্যেই তাঁর সঙ্গে মত-বিরোধ দেখা দেয় এবং এ-মতবিরোধ কেবল বিপক্ষ দলের নেতার সঙ্গেই নয়, স্বদলের সহকর্মীদের সঙ্গেও।

রাজনীতির ক্ষেত্রে হাইনম্যানের অভিজ্ঞতা প্রচুর এবং মূল্যবান। জার্মানীর পশ্চিমাঞ্চল ওয়েস্টফেলিয়ার সওয়েলেম-এ যখন এক সম্ভ্রান্ত পরিবারে হাইনম্যান জন্মগ্রহণ করেন তখন হোয়েনজোলার্ন সাম্রাজ্য তার খ্যাতির উচ্চ শিখরে উঠেছে। কিন্তু তরুণ হাইনম্যানকে দেখতে হয়েছে কীভাবে এই সাম্রাজ্য ভেঙে টুকরো টুকরো হল কী করে তার জায়গায় নাৎসী শক্তির অভ্যুত্থান ঘটল। লেখাপড়ায় হাইনম্যান ভাল ছাত্র হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠা করেছিলেন, যদিও তাঁকে প্রায়ই স্কুল পাল্টাতে হয়েছে। মুনস্টার, মার্বার্গ, মিউনিক, গটিনজেন এবং বার্লিন বিশ্ববিদ্যালয়ে তিনি শিক্ষা গ্রহণ করেছেন। রাষ্ট্রবিজ্ঞানে ডক্টরেট লাভ করার পর হাইনম্যান আইন অধ্যয়ন করলেন এবং এ বিষয়েও ডক্টরেট উপাধিলাভ করেন। হাইনম্যানের বাবা ছিলেন জার্মানীর

হাইনম্যান

বিখ্যাত ইস্পাত শিল্প-কারখানার একজন কর্তাব্যক্তি, যে-প্রতিষ্ঠানটি নাৎসী যুদ্ধাস্ত্র নির্মাণে সহযোগিতা করছিল। আইন পাশ করে হাইনম্যানও এই কারখানার আইন উপদেষ্টা হিসেবে যোগ দেন।

কিন্তু শুধু বিত্ত নিয়ে খুশি হতে পারছিলেন না হাইনম্যান, তার সঙ্গে কিছু প্রতিপত্তিও চাইছিলেন, চাইছিলেন নিস্তরঙ্গ জীবনে বেগের আবেগ। কিছু উত্তেজনা কিছু উদ্বেগ। রাজনৈতিক মঞ্চ ছাড়া জীবনের এ উপসর্গগুলো আর কোন্ পেশা উপহার দেবে?

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে নাৎসীবাদের পরাভবের পর পশ্চিম জার্মানীর প্রথম চ্যান্সেলর ডঃ অ্যাদেন্যুয়েরের সঙ্গে ডঃ হাইনম্যান দেশে নতুন দলের পত্তন করলেন, খৃস্টান ডেমোক্রেটিক পার্টি। রাজনীতির প্রথম পুরস্কার পান তিনি ১৯৪৬ সালে যখন তিনি এসেন শহরে মেয়রের পদ লাভ করেন। এই পদে থেকে তিনি মৌলিকত্ব দেখিয়েছিলেন। যুদ্ধ-বিধ্বস্ত এসেন শহরটিকে পুনর্গঠনের দ্বারা নতুনরূপে তুলে ধরলেন। এই বলিষ্ঠতা দেখে অ্যাদেন্যুয়ের সহজেই তাঁর অনুরাগী হয়ে পড়লেন, হাইনম্যানকে তিনি তাঁর মন্ত্রিসভার আভ্যন্তরীণ মন্ত্রীর গুরুত্বপূর্ণ পদটি দিলেন।

কিন্তু কর্তার সঙ্গে হাইনম্যানের অচিরেই মতবিরোধ ঘটল, অ্যাদেন্যুয়েরের মন্ত্রিসভা ত্যাগ করলেন তিনি। মন্ত্রিত্বেই ইস্তফা দিলেন না কেবল, দলও ছাড়লেন। কাজের লোক হাইনম্যান, রাজনীতির চমকপ্রদ জীবনের স্বাদও পেয়েছেন, তাই রাজনীতি ছেড়ে আইন ব্যবসায় ফিরে যেতে পারলেন না। প্রথমে অল জার্মান পিপলস পার্টি নামে নতুন রাজনৈতিক দলের পত্তন করতে চেষ্টিত হলেন, কিন্তু সফল হলেন না। তখন '৫৮ সনে বিরোধী দল সোস্যাল ডেমোক্রেটিক দলের সদস্যপদ নিলেন।

হাইনম্যান পশ্চিম জার্মানীকে অস্ত্রসজ্জিত করার বিরোধী, কারণ তাঁর সুগত ধারণা তা যদি করা হয় পুনর্মিলিত জার্মানী দেখার স্বপ্ন তাঁর কখনোই সফল হবে না। ১৯৫৭ সাল থেকে তিনি বুন্দেস্ট্যাগ বা পার্লামেন্টের নিম্ন পরিষদের সদস্য। সেই সুবাদে তিনি ফৌজদারী আইন সংস্কারের জন্যে আন্দোলন করে আসছেন। রাজনৈতিক মতবাদের দিক থেকে হাইনম্যান উদারপন্থী। তিনি ইয়োরোপের শান্তির জন্যে পোলিশ রাপাকি পরিকল্পনার সমর্থক। তাঁর উৎসাহে পশ্চিম জার্মানীতে নতুন এক কমিউনিস্ট পার্টি গড়ে উঠছে। কিসিঙ্গারের ক্যাবিনেটে তিনি '৬৬ সনে বিচারমন্ত্রী নিযুক্ত হন। কিন্তু কোয়ালিশন মন্ত্রিসভার সদস্য হয়েও কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নে তিনি অন্য সকলের সঙ্গে একমত নন। এই স্বাধীনচেতা প্রেসিডেন্টের কাছে সাধারণ জার্মান অনেক কিছু আশা করে।

সুভাষচন্দ্র ও সমকালীন ভারতবর্ষ

শঙ্করীপ্রসাদ বসু

নতুন মানুষ—(২)

বামপন্থীদের প্রেরণামূর্তি পণ্ডিত জহরলাল কংগ্রেসের সভাপতি হয়েছেন কিন্তু তার ফলে ওয়ার্কিং কমিটি থেকে নাম কাটা গিয়েছে বামপন্থীদের। একই জিনিস ঘটেছিল ১৯২৯ সালে লাহোর কংগ্রেসে। গান্ধীজী জহরলালকে তাঁর সমর্থক দল থেকে টেনে এনে দল-কাটা সেনাপতি করে কংগ্রেসের সভাপতি বানিয়ে দিয়েছিলেন—সেবারে কোনো বামপন্থী ওয়ার্কিং কমিটিতে প্রবেশ করতে পারে নি। এর বিপরীত ছবি ১৯৩৯ সালে ত্রিপুরীতে—ওয়ার্কিং কমিটির চরিত্র নিয়ে গান্ধীজী ও গান্ধীপন্থীদের সঙ্গে সুভাষচন্দ্রের সংঘর্ষ—যার পরিণতি সুভাষচন্দ্রের পদত্যাগে।

২০ এপ্রিল, ১৯৩৬, তারিখে কিদোয়াই জহরলালকে লেখেন—

"বিগত কয়েকদিন আমি মানসিক যন্ত্রণাভোগ করেছি। আপনিই ছিলেন আমাদের একমাত্র ভরসা, কিন্তু সে ভরসা কি অলীক বলে প্রতিপন্ন হতে চলল? অবশ্য গান্ধীবাদের সমবেত বিরুদ্ধতা ও প্রভাবকে আপনি কতখানি ঠেকিয়ে রাখতে পারবেন, কিছু কিছু লোকের মনে সে বিষয়ে সন্দেহ ছিল। নতুন করে ওয়ার্কিং কমিটি গঠনের সুযোগ আপনি পেয়েছিলেন। ট্যাণ্ডন, নরীম্যান, পট্টভী ও শার্দুল সিংকে আপনি বাদ দিয়েছেন। গোবিন্দদাস ও শরৎবাবুকে না নিয়ে আপনি ভুলাভাই ও রাজাগোপালাচারীকে নিয়েছেন। অথচ তাঁদের নিজে আপনার শক্তিবৃদ্ধি হত। দালালদের কাছ থেকে আপনাকে দূরে রাখবার জন্যই এঁরা চেষ্টা করছেন। নিখিল ভারত রাষ্ট্রীয় সমিতি ও প্রতিনিধি প্রেরণ, উভয় ব্যাপারেই আমরা দুর্বল হয়ে পড়েছি। যে-ওয়ার্কিং কমিটি আপনি গঠন করেছেন, আগের ওয়ার্কিং কমিটির চাইতে তা আরও বেশী প্রতিক্রিয়াশীল হতে বাধ্য।

হতে পারে আমারই দৃষ্টি সংকীর্ণ। মতবাদ নিয়ে আলাপ-আলোচনার চাইতে সংখ্যার উপরে আমি বেশী আস্থা রাখি। তবে অবস্থা দেখে আমার মনে যে প্রতিক্রিয়া ঘটেছে, তা আপনাকে জানাতে আমি উদ্‌গ্রীব ছিলাম। অতঃপর আর এ বিষয়ের কোনো উল্লেখ আমি করবো না।"

পণ্ডিত নেহরুর দ্বিধা ও দুর্বলতায় বামপন্থীরা আশাহত হলেন। তাঁরা দেখলেন, এই ব্যক্তি বামপন্থীদের পালে বাতাস ভরে দেন কেড়ে নেওয়ার জন্যই। তাঁর চেহারা কয়েক লাইনে সুভাষচন্দ্র ধরে দিয়েছেন—

পণ্ডিত নেহরুর দ্বিধা ও দুর্বলতায় বামপন্থীরা আশাহত হলেন। তাঁরা দেখলেন, এই ব্যক্তি বামপন্থীদের পালে বাতাস ভরে দেন কেড়ে নেওয়ার জন্যই। তাঁর চেহারা কয়েক লাইনে সুভাষচন্দ্র ধরে দিয়েছেন—

"পণ্ডিত নেহরু আরও বেশী কিছু করতে পারতেন। ১৯৩৬-৩৭, এই দুই বৎসরে তাঁর জনপ্রিয়তার তরঙ্গ ঊর্ধ্বসীমা স্পর্শ করেছিল, এবং একদিক থেকে তাঁর অবস্থা তখন মহাত্মা গান্ধীর চেয়েও দৃঢ়, কারণ তাঁর পক্ষে তখন পরিপূর্ণ বামপন্থী সমর্থন, যা গান্ধীর ছিল না। কিন্তু সংগঠনের ব্যাপারে মহাত্মার অবস্থা অতীব সুদৃঢ়; তিনি কংগ্রেসের মধ্যে নিজের দল, গান্ধীবাদী দল, গড়ে তুলতে পেরেছেন, যে-দলের সাহায্যে তিনি কংগ্রেসে আধিপত্য করতেন। অপরপক্ষে প্রভূত জনপ্রিয়তা সত্ত্বেও নেহরুর নিজের দল ছিল না। ইতিহাসে যদি স্থান পেতে হয়, তাহলে তাঁর সামনে খোলা ছিল দুটি পথ—হয় গান্ধীবাদের নীতি স্বীকার করে কংগ্রেসের গান্ধীদলে যোগ দিতে হয়, নচেৎ গান্ধীদলের বিরুদ্ধে নিজের দল গড়ে তুলতে হয়। প্রথম কাজটি তিনি করতে পারেন না, গান্ধীজীর প্রতি ব্যক্তিগত আনুগত্য সত্ত্বেও গান্ধীনীতিকে যেহেতু তিনি সর্বাংশে মানেন না; অপরপক্ষে নিজের দল গঠনও করেননি, কারণ তাতে গান্ধীদল অসন্তুষ্ট হত, এবং মহাত্মার বিরুদ্ধে কিছু করার মত সাহস পণ্ডিত নেহরুর জীবনে হয়নি।[১১] সুতরাং পণ্ডিত নেহরু অবিরত নড়েচড়ে বেড়াতে লাগলেন, চেষ্টা করতে লাগলেন যাতে দক্ষিণ ও বাম দু'পক্ষই

১১ সুভাষচন্দ্র চরম ভুল করেছেন। তাঁর এই লেখা ১৯৪২ সালে। এর পাঁচ বছর পরে পণ্ডিত নেহরু গান্ধীজীর বিরুদ্ধে যাবার প্রচণ্ড সক্রিয় সাহস দেখিয়েছিলেন—তার দ্বারা সৃষ্টি হয়েছিল ভারতের ইতিহাসের অন্ধকার অধ্যায়। গান্ধীজীর ইচ্ছার বিরুদ্ধেই নেহরু ও প্যাটেল ভারত বিভাগে সায়কত্ব করেছিলেন।

সন্তুষ্ট হয়, গান্ধীদল বা চরমপন্থীদল কোনো দলেই যোগ দিলেন না, ফলে কংগ্রেসে নিঃসঙ্গ ব্যক্তি হয়ে রইলেন।"

তবু নেহরু সম্বন্ধে ভরসা ত্যাগ করা সুভাষচন্দ্রের পক্ষে সম্ভব হয় নি, নেহরু ভিন্ন বামপন্থী নেতৃত্বেও তিনি নিঃসঙ্গ। নেহরুকে এক পত্রে (২৬ মার্চ, ১৯৩৯) তিনি লিখেন—

"১৯৩৭ সালে অন্তরীণ থেকে বেরিয়ে আসার পর থেকে আমি তোমার সঙ্গে ব্যক্তিগতভাবে এবং গণ-জীবনে পরম শ্রদ্ধা ও বিবেচনার সঙ্গেই ব্যবহার করেছি। রাজনীতির দিক থেকে আমি তোমাকে জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা ও নেতার মতই দেখেছি, এবং প্রায়ই তোমার পরামর্শও চেয়েছি। গত বছর যখন তুমি ইউরোপ থেকে এলে, তুমি আমাদের কিভাবে নেতৃত্ব দেবে সেই সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করতে আমি এলাহাবাদ যাই।"

১৯৩৭ সালের নভেম্বর মাসের শেষভাগে সুভাষচন্দ্র যখন ইউরোপ চললেন চিকিৎসা সম্পূর্ণ করবার জন্য, তখন পিছনে ক্রমোচ্চ জয়ধ্বনি। এবং সেই 'জয়তু সুভাষচন্দ্র' ধ্বনির মধ্যে উঁকি মারতে লাগল—'জয়তু রাষ্ট্রপতি সুভাষ-চন্দ্র'। সুভাষচন্দ্রকে কংগ্রেস সভাপতি করার দাবি ক্রমেই বাড়ছিল, বাংলা দেশে এবং বাংলা দেশের বাইরেও। ১৯৩৬ সালে ভারতে ফিরে পুনশ্চ গ্রেপ্তার হবার পরেই কংগ্রেস সভাপতি পদের জন্য তাঁর নাম প্রস্তাব করেন মধ্যপ্রদেশ কংগ্রেস কমিটির সভাপতি শ্রীযুক্ত খারে। শ্রীযুক্ত রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত খারের প্রস্তাব সমর্থন করেন।[১২] এর কয়েক মাস পরে মডার্ন রিভিউ পত্রিকায় জুন, ১৯৩৭, সংখ্যায় রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় নিজস্বভাবে নানা যুক্তিসহকারে সুভাষচন্দ্রের নাম প্রস্তাব করেন। প্রবাসীতেও অতঃপর একই যুক্তি দেখিয়ে মন্তব্য করেন। গত ১৫ বৎসরে কোনো বাঙালী কংগ্রেস সভাপতি না হওয়ায় তিনি বিশেষ ক্ষোভ প্রকাশ করেন। এই সময়ের মধ্যে জনসংখ্যার অনুপাতে বাংলা দেশ থেকে অন্তত তিনজনের কংগ্রেস সভাপতি হওয়া উচিত ছিল। তাছাড়া বাংলা দেশ ত্যাগ ও দুঃখবরণে অগ্রণী। সর্বোপরি বাংলা দেশের উপর দিয়ে যে দুর্বি-পাকের ঝড় বয়ে যাচ্ছে, তাতে তার অবস্থার কথা সর্বভারতীয় নেতৃবৃন্দের গোচর করবার জন্যও কোনো যোগ্য বাঙালীর কংগ্রেস সভাপতি হওয়া দরকার। "কিন্তু যোগ্য বাঙালী কেহ আছে কি?"—রামানন্দ প্রশ্ন করেছেন, এবং উত্তর দিয়েছেন, "না থাকিলে আমরা এত কথা লিখিতাম না।" সেই যোগ্য বাঙালী সম্বন্ধে তিনি অতঃপর লিখেছেন—

"আমাদের বিবেচনায় শ্রীযুক্ত সুভাষচন্দ্র বসুকে কংগ্রেসের আগামী অধিবেশনের সভাপতি নির্বাচন করা উচিত। এই কাজের জন্য তাঁর যথেষ্ট বিদ্যা ও বুদ্ধি আছে। তিনি কলেজে ভাল ছাত্র ছিলেন, পাস ভাল করিয়াছিলেন। তাহার পর সিভিল সার্ভিসের পরীক্ষা-প্রতিযোগিতার ফলে সিভিল সার্ভিসে চাকরি পাইয়া-ছিলেন। সুশৃঙ্খলভাবে চাকরি করিবার ও করাইবার ক্ষমতা তাঁহার বেশ আছে। বস্তুতঃ ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভায় ভারত গভর্নমেন্টের স্বরাষ্ট্রসচিব তাঁহাকে আটক করিবার কারণ সম্বন্ধে যে বক্তৃতা করেন, তাহা হইতে স্পষ্ট বুঝা যায় যে, গভর্নমেণ্ট তাঁহাকে খুব বুদ্ধিমান এবং দল বাঁধিতে ও সুশৃঙ্খলভাবে দল চালাইতে সুদক্ষ মনে করেন। কলিকাতা মিউনিসিপ্যালিটির প্রধান কর্মকর্তারূপে তিনি এইসব গুণের পরিচয় দিয়াছিলেন। তিনি স্বেচ্ছায় সিভিল সার্ভিসের চাকরি ছাড়িয়া দিয়া স্বার্থত্যাগের দৃষ্টান্ত দেখাইয়াছেন। যাহাতে অর্থাগম হয় তিনি এখন এরূপ কোনো চাকরি করেন না ও ভবিষ্যতে করিবেন না, এবং পরিবার পালনের ভারগ্রস্ত তিনি নহেন। সুতরাং তিনি তাঁহার সমুদয় সময় ও শক্তি দেশের কাজে নিয়োগ করিতে সমর্থ। দুঃখবরণ ও দুঃখসহনে মানুষ গড়িয়া ওঠে। তাঁহার জীবনে দুঃখভোগ খুব ঘটিয়াছে, এবং তাহা ঘটিয়াছে তিনি দেশের সেবক বলিয়া। ইউরোপে থাকিতে তিনি প্রভুত্ব-কামী ও স্বাধীনতাকামী বিভিন্ন মনোবৃত্তিশালী নানা দলের কর্মপন্থার সহিত পরিচিত হইয়াছেন। তাহা স্বাধীনতাসংগ্রামে দেশের কাজে লাগিবে। ভারতবর্ষের আমদানী ও রপ্তানী বাণিজ্যের সুযোগে বিদেশে কোন্ কোন্ দেশের সহিত কিরূপ চুক্তি করিলে ভারতবর্ষের কতকগুলি যুবক ভিন্ন ভিন্ন রকম শিল্প ও যন্ত্র-নির্মাণ বিদ্যা শিখিতে পারে, তাহা তিনি ইউরোপে থাকিতেই অনেকবার লিখিয়াছেন। রাষ্ট্রীয় সংগ্রামের সহিত জাতীয় সংস্কৃতির যোগ আছে। যেসকল ভারতীয় ছাত্রছাত্রী বিদ্যালাভের জন্য ইউরোপে আছেন, সুভাষবাবু সুযোগ পাইলেই এই সকল বিষয়ে তাঁহা-দিগকে পরামর্শ দিয়াছেন। তিনি বৃদ্ধও নহেন, প্রৌঢ়ও নহেন। সেই কারণে কংগ্রেসী নূতন দলের সমর্থন লাভ করিতে পারিবেন।"

(প্রবাসী, আষাঢ়, ১৩৪৪)

'প্রবাসী' বাংলা দেশে এবং 'মডার্ন রিভিউ' ভারতবর্ষে তখন সম্মানিত পত্রিকা; রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের কথা শ্রদ্ধার সঙ্গে শোনা হয় সর্বত্র। পত্রিকা দুটি সুভাষচন্দ্র সম্বন্ধে প্রশংসামূলক যে-লেখাটি লিখেছিল, তা আজকের পাঠকের কাছে কিয়দংশে সার্টিফিকেট-জাতীয় মনে হলেও বিশেষ প্রয়োজনীয় রচনা ছিল সন্দেহ নেই। মডার্ন রিভিউয়ের

১২ "মধ্যপ্রদেশের কংগ্রেস কমিটির সভাপতি শ্রীযুক্ত খারে প্রস্তাব করিয়াছেন যে, সুভাষবাবুকে কংগ্রেসের আগামী অধিবেশনের সভাপতি নির্বাচন করা হউক। গভর্নমেণ্ট তাঁহাকে ছাড়িয়া না দিলে তিনি সভাপতির কাজ করিতে পারিবেন না বটে; তথাপি তাঁহার নির্বাচন দ্বারা বুঝা যাইবে, দেশের লোক তাঁহাকে কিরূপ বিশ্বাস করে ও সম্মানার্হ মনে করে। তিনি এইরূপ সম্মানের উপযুক্ত। এই সম্মান অনেক আগেই তাঁহার পাওয়া উচিত ছিল।" (প্রবাসী, অগ্রহায়ণ, ১৩৪৩)

প্রস্তাব অবিলম্বে সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে নাড়া দিয়েছিল, কারণ ক্ষেত্র বহুলাংশে প্রস্তুত ছিল। গান্ধী-নেতৃত্বের বিরুদ্ধে যাঁরা ঈষৎ অসন্তুষ্ট তাঁরা প্রস্তাবটি সমর্থন তো করলেনই, উপরন্তু সুভাষচন্দ্র তাঁর ত্যাগ ও প্রতিভার দ্বারা ভারতের সর্বমহলেই একটা প্রত্যক্ষ শ্রদ্ধার সৃষ্টি করেছিলেন। ইণ্ডিপেনডেন্স লীগের সংগঠক, সমাজতন্ত্রে আগ্রহী, নিরন্তর সংগ্রামে বিশ্বাসী ব্যক্তিত্বশালী এই মানুষটি 'ইণ্ডিয়ান স্ট্রাগল গ্রন্থ' ও নানা মূল্যবান্ প্রবন্ধের চিন্তাশীল লেখক হিসাবেও এইকালে পরিচিত হয়ে উঠেছেন। রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় এইসব দিকে দৃষ্টি আকর্ষণও করেছিলেন, যাতে সুভাষচন্দ্রের পক্ষ সমর্থনকে কেউ প্রাদেশিকতার সমর্থন বলে মনে না করেন।

রামানন্দের ১লা জুনের প্রস্তাব কয়েকদিনের মধ্যেই কিভাবে সমর্থিত হয়েছিল ভারতের দূর অপর প্রান্তে, তা বোঝা যায় আনন্দবাজার পত্রিকার ২৯ জ্যৈষ্ঠ, ১৩৪৪-এর সংবাদটি পড়লে—

> "করাচী—১১ জুন। শ্রীযুক্ত সুভাষচন্দ্র বসুকে আগামী হরিপুর কংগ্রেসের সভাপতি নির্বাচিত করিবার জন্য মডার্ন রিভিউ যে প্রস্তাব করিয়াছেন, করাচীর কংগ্রেস নেতাগণ উহা সমর্থন করিতেছেন। এখানে আলোচনায় প্রকাশ যে, সিন্ধু প্রাদেশিক রাষ্ট্রীয় সমিতি সর্বসম্মতিক্রমে তাঁহার পক্ষে ভোট দিবে, কারণ রাজনীতিক অবস্থা পরিষ্কার হওয়ায় কংগ্রেস সভাপতি পদের অপর প্রার্থী মিঃ সি রাজাগোপালাচারী তখন মাদ্রাজের প্রধানমন্ত্রী হইবেন।"১৩

করাচী ছাড়া লাহোরে, আমেদাবাদে, পুণায় ও অন্যত্রও সুভাষচন্দ্রের নাম সমর্থিত হল। কিন্তু নিশ্চয় আশা করা যায় না এ-ব্যাপারে সকলে একমত হবেন। বিশেষত যাঁরা ইংরাজ সরকারের সঙ্গে আপোষে উদ্‌গ্রীব, তাঁরা জানতেন, সুভাষচন্দ্র তাঁদের কতখানি শত্রুতা করবেন। সুতরাং মাদ্রাজের সত্যমূর্তি,—কুখ্যাত ফেডারেশন প্রস্তাবের খ্যাতিমান সমর্থকরূপে বছরখানেক পরেই যিনি দেখা দেবেন—তিনি হঠাৎ গান্ধীজীর নাম প্রস্তাব করে বসলেন। তাঁর মতে, কংগ্রেসী মন্ত্রিসভাকে জোরদার করে 'প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসন'কে সত্যই স্বায়ত্তশাসন করে তোলার জন্য গান্ধীজীর কংগ্রেস সভাপতি হওয়া প্রয়োজন। গভর্নররা তাঁকে চটাতে চাইবেন না। যেসব প্রদেশে কংগ্রেসী মন্ত্রিসভা হয় নি, সেখানেও তাঁর প্রভাবে কংগ্রেস মন্ত্রিসভা গঠন করতে পারবে। কংগ্রেস সভাপতিরূপে যদি তিনি ভারত-ভ্রমণ করেন দেশের সর্বত্র বিদ্যুৎ-প্রবাহ বয়ে যাবে। এমন ব্যাপার ঘটতে পারে যার ফলে হয়ত নতুন লড়াই ছাড়াই দেশ স্বাধীন হয়ে যাবে।

যাঁর অঙ্গুলিহেলনে কংগ্রেস চালিত হয়, তাঁকে কংগ্রেসের গদিতে বসাবার প্রস্তাবকে তিনি নিজে কতখানি সম্মানজনক মনে করেছিলেন জানি না, কিন্তু রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় সত্যমূর্তির এই চালাকিতে বিরত না হয়ে পারেন নি। সত্যমূর্তির যুক্তিগুলিকে খণ্ড করার পরে ঈষৎ বিদ্রূপভরে লিখলেন—

> "গান্ধীজী রাষ্ট্রনীতিক্ষেত্রে নূতন চিন্তাধারা ও নূতন কর্মপন্থা প্রবর্তিত করিয়াছেন। তাঁহার প্রভাবে কংগ্রেস তাহা গ্রহণ করিয়াছে। কংগ্রেসে এখনো তাঁহার প্রভাব অনতিক্রান্ত।...সুতরাং এখন কেহ যদি তাঁহাকে কংগ্রেসের আজীবন অমর্ত্য সভাপতি করিবার প্রস্তাব গ্রহণ করেন, তাহাও আশ্চর্যের বিষয় হইবে না। যোগ্যতম ব্যক্তি বলিয়া প্রতি বৎসরই তাঁহার নাম প্রস্তাবিত হইতে পারে।"১৪

গান্ধীজীকে সভাপতি করার প্রস্তাবে চালাকির ভাব এতই বেশি যে গুরুত্ব দিয়ে তাকে গ্রহণ করা হয় নি, কিন্তু যখন বলা হল কোনো একজন মুসলমানকে সভাপতি করা হোক, তখন ব্যাপারটা অবশ্য-বিবেচ্য কংগ্রেসের স্পর্শ-নমনীয় উদারতার কাছে। বলা হয়েছিল, অনেকদিন কোনো মুসলমান সভাপতি হন নি, মুসলমানদের মধ্যে কংগ্রেসের আদর্শ প্রচারের জন্য মুসলমান সভাপতি দরকার। তাছাড়া, আরও বলা হল, 'সুভাষচন্দ্রের স্বাস্থ্য এখনো ভাল নয়।'

রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় যেহেতু সুভাষচন্দ্রের পক্ষে দাঁড়িয়েছিলেন, সে কারণে ধৈর্যরক্ষা করে সর্বপ্রকার কুযুক্তির বিরুদ্ধে তাঁকে সুযুক্তি দিতে হলই। মুসলমানদের সম্বন্ধে সর্বাপেক্ষা সুবিবেচক ও সহনশীল দেশবন্ধুর শিষ্য সুভাষচন্দ্র যে মুসলমান সম্প্রদায়ের স্বার্থ সম্বন্ধে সচেতন তাতে সন্দেহ নেই, বিশেষত বাঙালী হিসাবে তাঁর আগ্রহ এক্ষেত্রে সর্বাধিক হওয়ার কথা, কেন না সাম্প্রদায়িক সমস্যা বাংলা দেশে সর্বাধিক। সুভাষচন্দ্রের স্বাস্থ্য সম্বন্ধে মাসীর দরদ যাঁরা দেখিয়েছিলেন, তাঁদের বিষয়ে কিছু কঠিন কথা পরিহাসের সঙ্গে না বলে পারলেন না—

> "সুভাষবাবুর বর্তমান স্বাস্থ্য কোনো কুস্তিগীর পালোয়ানের মত নহে, ইহা সত্য কথা। কিন্তু তাঁহার বর্তমান চিকিৎসক বলিয়াছেন, তিনি আগামী নভেম্বরের মাঝামাঝি নিরাময় হইবেন।.....কাহার স্বাস্থ্য কোন সময় কি রকম কাজের উপযোগী তাহা বিবেচনা করিবার ভার তাঁহার ও তাঁহার চিকিৎসকের উপরই থাকা উচিত। অন্যদের সে বিষয়ে কিছু বলা অনধিকারচর্চা ও 'আদিখ্যেতা'।"

এর পরে রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় সুভাষচন্দ্রের প্রভূত প্রশংসা করে যা বলেছিলেন, তার মধ্যে সুভাষ-সমর্থনের মূল যুক্তিগুলি ছিল—

> "যে সকল নেতা এখনও সভাপতি হন নাই, তাঁহাদের মধ্যে যোগ্যতা হিসাবে আমাদের বিবেচনায়

১৩ ১৩৪৪, আষাঢ় সংখ্যার প্রবাসীতে বিবিধ প্রসঙ্গে উদ্ধৃত।
১৪ প্রবাসী, শ্রাবণ, ১৩৪৪।

আমরা তখন গান শুনছিলাম

রামমোহন মহান্ত

আমরা তখন গান শুনছিলাম.....
অতীত থেকে বর্তমানের
বর্তমান থেকে ভবিষ্যতের।
কেন না, ভবি ভুলিতব্য নয়।

গান শুনছিলাম.....
আর গানের কথায় সুরের শৃঙ্গায়
কেমন অনাস্বাদিতপূর্বের
স্বর্গের সুষমা ঢেলে
দিগন্ত অবারিত ক'রে দেয়—
দেখছিলাম।

হঠাৎ সীমান্ত প্রহরী হেঁকে ওঠে
ঃ হুকুমদার ?.....
হুকুমদারি তখন হাতছাড়া,
হুকুম-মানার সনদ ওড়ে হাতে।
পাখি— খাঁচা-ছাড়া ; পাঁজরের
ছিন্নভিন্ন কাঠিগুলো দাঁত-খিঁচিয়ে হাসে।

কী করুণ মর্মান্তিক আনন্দের পৈশাচিক উল্লাস
ন্যায় বিশ্বে ছড়িয়ে দেয়—ঝরিয়ে দেয়
সোহাগ-সিঁদুর ;.....আধুনিক মাইকেল এঞ্জেলো!

বৃহৎ কারখানায় রেকর্ড-করা পলিথিনের ফিতের
একই সুর বাজে অফিসে-স্কুলে-কলেজে-কাছারিতে
কলে-কারখানায় মাঠে-মণ্ডপে
ট্রামে-বাসে বিধানসভায় ও পার্কে—
ঃ এগিয়ে চলো—এগিয়ে চলো
জোর কদম্ এগিয়ে চলো!
থামা যে আর চলবে না
মৃত্যু — জেনো, জীবন নয়!

আমরা তখনো গান শুনছিলাম,
গুরুর কাছে পাওয়া 'হ্রীং ক্রীং' নয়,
নির্ভেজাল পাশুপত বীজঃ সম্—প্রস্+মন্!
অর্থাৎ অতি-বর্তমানের জঠরে অতি-ভবিষ্যতের গান!

...তিনি যোগ্যতম। রাষ্ট্রনীতিজ্ঞতায়, রাষ্ট্রনৈতিক বিষয়ে, সুবিবেচকতায়, তাঁহার যোগ্যত্ব কাহারও অপেক্ষা কম নহে। দেশের জন্য তাঁহার স্বার্থত্যাগ, দুঃখবরণ ও নির্যাতনসহন ইঁহাদের মধ্যে অনতিক্রান্ত। আধুনিক সময়ে কোনো দেশের—বিশেষতঃ পরাধীন দেশের—কর্তব্যের পথ নির্ধারণ করিতে হইলে পৃথিবীর অন্যান্য দেশের অবস্থা, রাষ্ট্রনীতির গতি ও রাষ্ট্রনৈতিক প্রচেষ্টাসমূহের লক্ষ্য সম্বন্ধে জ্ঞান থাকা আবশ্যক। এই জ্ঞান কংগ্রেস নেতাদের কাহারও সুভাষবাবু অপেক্ষা অধিক নহে।

কংগ্রেসের কার্যপ্রণালী বারবার বা ঘনঘন বিবর্তিত হওয়া উচিত নহে। পণ্ডিত জহরলাল যেভাবে কাজ চালাইতেছেন, সুভাষবাবুর রাষ্ট্রনীতির মত মোটের উপর তাহার সমর্থক।...তিনি জনগণকে—বিশেষতঃ কৃষক ও কারখানার শ্রমিকদিগকে কংগ্রেসের নেতৃত্বে ও কংগ্রেসের পতাকাতলে সংঘবদ্ধ করিয়া স্বাধীনতা-প্রচেষ্টাকে শক্তিশালী করিবার পক্ষে।"

সুভাষচন্দ্রের সভাপতিত্বকে যে থামিয়ে রাখা যাবে না গান্ধীজী এবং কংগ্রেস হাইকম্যান্ড বুঝেছিলেন। সুভাষ-চন্দ্রের ক্রমবর্ধমান জনপ্রিয়তা[১৫] এবং ব্যক্তিগত সামর্থ্য তো ছিলই, অধিকন্তু বাংলা দেশের কোনো একজনকে সভাপতি না করে চলছিল না। সেখানকার সাম্প্রদায়িক সমস্যা, বন্দীমুক্তি সমস্যা ইত্যাদি ছিল, তদুপরি বন্দেমাতরম প্রশ্নে বাংলা দেশ অতিশয় বিক্ষুব্ধ, তাকে শান্ত করার প্রয়োজন আছে। সুভাষচন্দ্র বেয়াড়া, বেপরোয়া হয়ে যে অসুবিধা ইতিপূর্বে ঘটিয়েছেন, অনেকটা সে অবস্থার পরিবর্তন হয়েছে পূর্বোক্ত সমস্যাসমূহের ক্ষেত্রে তাঁর বিবেচনাপূর্ণ আচরণে এবং কংগ্রেসের অহিংসা নীতির প্রতি আনুগত্য ঘোষণায়। তাছাড়া মহাত্মার সেই প্রেমের ফাঁদখানি ছিলই, যার দ্বারা বাহাদুর জহরকে ধরেছিলেন ১৯২৯ সালে, করাচী কংগ্রেসের সভাপতি করে দিয়ে, একই ফাঁদে ধরা দিয়ে দুরন্ত সুভাষ কি কংগ্রেস হাইকম্যান্ডের সর্বাধুনিক সংযোজন হয়ে দাঁড়াবেন না?

সংবাদপত্রসমূহ এবং জনগণের আশান্বিত কল্পনাকে চরিতার্থ করে ১৪ জানুয়ারী, ১৯৩৮, তারিখে ঘোষিত হল —সুভাষচন্দ্র বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় সভাপতি নির্বাচিত হয়েছেন। সুভাষচন্দ্র অবশেষে রাষ্ট্রপতি সুভাষচন্দ্র। তখন তিনি ইংলণ্ডে। সুভাষচন্দ্র স্বস্তির নিশ্বাস ফেললেন, আনন্দিত হলেন, কৃতজ্ঞ হলেন গান্ধীজীর উপরে, কারণ গান্ধীজী বহু আকাঙ্ক্ষিত সুযোগ তাঁকে দিয়েছেন। ইউরোপের আকাশ কালো, ভারতের মাটিতে মশাল জ্বালতে হবে; সে মশাল জ্বালবার ক্ষমতা ছিল জহরলালের—তিনি মশালের স্বপ্নেই বিভোর হয়ে রইলেন—সুভাষচন্দ্র নিজের মধ্যে প্রচণ্ড যাতনাবোধ করছেন—নেতৃত্ব, দ্বিতীয় নেতৃত্ব চাই—যা প্রথম নেতৃত্বকে হয় উত্তোলন নয় অপসারিত করবে। গান্ধীজী সেই দ্বিতীয় নেতৃত্বের একটা পথ খুলে দিয়েছেন। সুভাষচন্দ্র সম্ভবত অনুভব করলেন—তাঁর মনোনয়ন গান্ধীজীর শ্রেষ্ঠ প্রগতিকর্ম।

---

১৫ দৃষ্টান্ত হিসাবে মে, ১৯৩৭-এর মডার্ন রিভিউ পত্রিকার Popularity of Subhas Bose নামক একটি সম্পাদকীয় মন্তব্যের উল্লেখ করা যায়। এলাহাবাদে সুভাষ চন্দ্র উপস্থিত হলে ছাত্ররা তাঁর দর্শনের জন্য দরবার করে; স্বাস্থ্যের কারণে তখন ছাত্ররা বহু হাজার স্বাক্ষর সহ কংগ্রেস সভাপতি পণ্ডিত জহরলালকে ঐ ব্যাপারে আবেদন জানায়, এবং সুভাষচন্দ্র অনুগত কংগ্রেসসেবীরূপে কংগ্রেস-সভাপতির অনুরোধ রক্ষা করেন।

কণ্ঠ দর্শন

এ কথাটা না বলে উপায় নেই যে, পশ্চিমবঙ্গের নবগঠিত বিধানসভায় উদ্বোধনী ভাষণ প্রদানের ক্ষেত্রে রাজ্যপাল একটি অদ্ভুত নজিরের সৃষ্টি করেছেন, এবং তা সৃষ্টি করার পিছনে পশ্চিমবঙ্গের যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রিসভার প্রতি কেন্দ্রীয় সরকারের অসহিষ্ণু মনোভাবের প্রতিফলন ঘটেছে। বিপুল ভোটাধিক্যে পশ্চিমবঙ্গে যুক্তফ্রন্ট সরকার আবার ফিরে আসার পর কেন্দ্রীয় সরকারের পক্ষ থেকে সহযোগিতার যে আশ্বাস দেওয়া হয়েছিল, তা যে সত্যই ভুয়ো সে কথাটা এই একটি ঘটনা থেকেই পরিষ্কার হয়ে গেছে। জনমতকে তোয়াক্কা না করে রাত্রির অন্ধকারে গোপন চক্রান্তের দ্বারা বিগত যুক্তফ্রন্ট সরকারকে উচ্ছেদ করা হয়েছিল এবং সেই চক্রান্তের ব্যাপারে রাজ্যপাল ধর্মবীর যে সাংখ্যদর্শনের পুরুষের মত সক্রিয় সাক্ষী ছিলেন না তাও নয়, বরং তিনিই ছিলেন সেই চক্রান্তের অন্যতম প্রধান শরিক। অন্তর্বর্তী নির্বাচনে যুক্তফ্রন্ট যখন বিপুলতর সংখ্যাধিক্যে পুনরায় ক্ষমতায় আসীন হলেন, তখনই স্বাভাবিক নিয়মে রাজ্যপাল ধর্মবীরের পক্ষে যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রিসভা ও জনসাধারণের নিকট অবাঞ্ছিত হিসাবে ঘোষিত হওয়া ভিন্ন আর কোন উপায় ছিল না। বস্তুত এই অবাঞ্ছিত ব্যক্তিটির পশ্চিমবঙ্গে অবস্থানের সকল সার্থকতাই কংগ্রেসের পরাজয় ও যুক্তফ্রন্টের অসাধারণ সাফল্যের মধ্য দিয়েই লুপ্ত হয়ে গিয়েছিল। কাজেই কেন্দ্রীয় সরকারের কর্তব্য ছিল সেই মুহূর্তেই ধর্মবীরকে অন্যত্র বদলী করে দেওয়া এবং তা করলে জনগণের মনোভাবের প্রতিও মর্যাদা দেওয়া হত, এবং কেন্দ্র-রাজ্য সম্পর্ক উন্নতির অভিমুখেই ধাবিত হত। এবং এটাই সভ্যজগতের রাজনীতির নিদর্শন হত, যেমন ১৯১৬ খৃস্টাব্দে নিউ সাউথ ওয়েলসে পশ্চিমবঙ্গের অনুরূপ ঘটনাই ঘটেছিল এবং তদ্দণ্ডেই সেখানকার গভর্নরকে ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। যুক্তফ্রন্টের তরফ থেকে বারবার কেন্দ্রের কাছে বলা হয়েছে যে, 'এ লোককে দিয়ে আমাদের চলবে না, কেন না আমরা এঁকে বিশ্বাস করি না.' সম্পর্কটা এমন দাঁড়িয়েছে যে, সামাজিক অনুষ্ঠানে পর্যন্ত আমরা এঁকে বর্জন করেছি।' কিন্তু এত জল ঘোলা হবার পরেও যা অবশ্যম্ভাবী সেটাকে মেনে নিতে কেন্দ্রীয় সরকার অহেতুক গররাজি হলেন, চ্যবনের অপরিণামদর্শী নীতির পরিণামে যে শেষ পর্যন্ত কি ঘটতে পারে সেটা অনুধাবন করার মত মস্তিষ্কের অভাব যে কেন্দ্রীয় সরকারের বর্তমান এটুকুই শুধু নতুন করে প্রমাণিত হল। রাজ্যপাল বা রাষ্ট্রপতি নিছক নিয়মতান্ত্রিক প্রধান, মন্ত্রিসভা যে রিপোর্ট প্রস্তুত করে দেবেন রাজ্যপাল তা পড়তেই বাধ্য। পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভায় এই ঘটনা ঘটার পর অপরাপর স্থানের রাজ্যপালেরা যদি তাঁদের জন্য মন্ত্রিসভা কর্তৃক প্রস্তুত ভাষণ পাঠ করতে রাজী না হন বা অংশবিশেষ বাদ দিয়ে পাঠ করেন, কিংবা বিধানসভা যদি রাজ্যপালের বক্তৃতার প্রতি ধন্যবাদসূচক প্রস্তাব না নিয়ে নিন্দা প্রস্তাব গ্রহণ করে, যা পশ্চিমবঙ্গে ঘটেছে, তাহলে শেষ পর্যন্ত অবস্থাটা কোথায় গিয়ে দাঁড়ায়। তবু পশ্চিমবঙ্গের যুক্তফ্রন্ট সরকারকে ধন্যবাদ কেন না তাঁরা মাত্রাধিক সংযম ও ভদ্রতা দেখিয়েছেন, তুরুপের তাস যখন মন্ত্রিসভার হাতে, বিধানসভায় যখন যুক্তফ্রন্টের নিরঙ্কুশতম সংখ্যাগরিষ্ঠতা, তখন রাজ্যপালকে নিজেদের মুঠোর মধ্যে পেয়ে অনেক কিছুই তাঁরা করতে পারতেন। রাজ্যপালকে তাঁরা আরও নানাভাবে উপহাস্যাস্পদ করে তুলতে পারতেন, যা তাঁরা করেন নি, বরং তাঁরা পূর্বাহ্নেই এই বিষয়ে তাঁদের কি নীতি হবে তা সংবাদপত্র মারফৎ ব্যক্ত করে রাজ্যপালকে অধিকতর বেকায়দায় পড়ার দায় থেকে অব্যাহতি দিয়েছেন। রাজ্যপাল দুটি অনুচ্ছেদ বাদ দিয়ে পড়লেও তা বিধানসভার কার্যবিবরণী থেকে বাদ যায় নি, অথচ তা পাঠ না করে রাজ্যপাল সাংবিধানিক আচরণবিধি লঙ্ঘন করেছেন। এই বিষয়টা শ্রীজয়প্রকাশ নারায়ণের মত ব্যক্তির দৃষ্টিও এড়ায় নি এবং শ্রীনারায়ণকে কেউই আশা করি কমিউনিস্ট বা যুক্তফ্রন্টের স্বয়ং নিযুক্ত ঢাক-পিটিয়ে বলে মনে করবেন না। পার্লামেন্টেও রাজ্যপালের এই আচরণ নিয়ে রীতিমত বিতণ্ডার সৃষ্টি হয়েছে এবং সংবিধান মানে যে চ্যবনপ্রাশ এটা বোধ হয় এখনো অনেকে মানতে রাজী নন। সর্বোপরি কেন্দ্রীয় সরকার তথা স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী শ্রীচ্যবনের এটুকু বোঝা উচিত ছিল যে, বর্তমান পরিস্থিতিটা আদৌ তাঁদের অনুকূলে নয় এবং তাঁরা সেমসাইডে গোল দিয়ে নিজেদের পরাজয়কে অধিকতর উপভোগ্য করে তুলছেন। এই ঘটনার দ্বারা কেন্দ্রের বিরুদ্ধে যুক্তফ্রন্ট সরকারের হাতে একটি শক্তিশালী অস্ত্র তুলে দেওয়া হল এবং কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী শ্রীচ্যবন ও তাঁর অনুগত শ্রীধর্মবীর পার্লামেন্টারী গণতন্ত্রের মূলনীতিকে পদদলিত করে যে কাণ্ডটা ঘটালেন তা বুমেরাং হয়ে তাঁদেরই গিয়ে আঘাত করবে।

অধিকতর অর্থ ও ক্ষমতা দাবি

৬ই মার্চ বিধানমণ্ডলীর যুক্ত অধিবেশনে রাজ্যপালের ভাষণের মাধ্যমে পশ্চিমবঙ্গের যুক্তফ্রন্ট সরকারের যে ভবিষ্যৎ কর্মসূচীর আভাস পাওয়া যায় তাতে কেন্দ্রের কাছে পশ্চিমবঙ্গ যে অধিকতর অর্থই শুধু দাবি করছে তা নয়, এমন কি অধিকতর ক্ষমতাও দাবি করবে তার সুস্পষ্ট ইঙ্গিত আছে। আর এ দাবি যুক্তফ্রন্ট করবেন শুধু পশ্চিমবঙ্গের জন্য নয়—তাঁরা সব রাজ্যের জন্যই এ দাবি জানাবেন। কেন্দ্রে যে শাসক দল আছেন তাঁরা ছাড়া অন্যান্য রাজনৈতিক দল কর্তৃক যে সব রাজ্যে সরকার গঠিত হয়েছে সেই সব রাজ্যে কয়েকটি প্রশ্ন স্বাভাবিক নিয়মেই বড় হয়ে উঠেছে। বর্তমানের পরিবর্তিত পরিস্থিতি সম্বন্ধে আমাদের সংবিধান রচয়িতারা সম্ভবত আগে থেকে ধারণা করতে পারেন নি, এই ধরণের শক্তি ও পরস্পরবিরোধী রাজনৈতিক চিন্তার উদ্ভব কেন্দ্রের সঙ্গে রাজ্যগুলির সম্পর্কে বিশেষ চাপ সৃষ্টি করছে। সীমাবদ্ধ সাংবিধানিক আইনগত এবং অর্থনৈতিক ক্ষমতার দরুণ রাজ্যগুলি জনগণের নিকট তাঁদের বহুমুখী প্রতিশ্রুতি পালনে ভীষণভাবে এবং অন্যায়ভাবে বাধার সম্মুখীন। পশ্চিমবঙ্গের যুক্তফ্রন্ট সরকার বিশেষ জোরের সঙ্গেই

এই মত পোষণ করেন যে জাতীয় সংহতি ও যে জনগণের সেবা তাঁরা করেন তাঁদের স্বার্থে দেশের নতুন অর্থনৈতিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক পরিবেশ কেন্দ্র ও রাজ্যগুলির মধ্যে অধিকতর যুক্তিসঙ্গত, বাস্তবসম্মত ও ন্যায়সঙ্গত ভিত্তিতে ক্ষমতা পুনর্বিন্যাসের দাবি রাখে। রাজ্যগুলি বর্তমানে বৃদ্ধি করা যায় না এমন সম্পত্তি ও শক্তি নিয়ে ক্রমবর্ধমান বহুমুখী দায়িত্ব পালনের সম্মুখীন, আর অন্য দিকে জনগণ থেকে বিচ্যুত হয়ে তুলনামূলকভাবে দূরে বসে কেন্দ্র অধিকাংশ সম্পদ ও সাংবিধানিক শক্তির অধিকারী বর্তমানের এই অবস্থা স্পষ্টতই অসহ্য। সুতরাং কেন্দ্র ও রাজ্যগুলির মধ্যে এই বিলম্বিত ক্ষমতার পুনর্বিন্যাস সাধন ও রাজ্যগুলি যাতে তাদের সংশ্লিষ্ট এলাকার জনগণের প্রতি বহুগুণে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত দায়িত্ব পালন করতে পারে ও তাদের গণতান্ত্রিক অভীপ্সা মেটাতে পারে সেই উদ্দেশ্যে সাংবিধানিক, আইনগত ও অর্থনৈতিক ক্ষমতালাভের জন্য নতুন সরকার যথাসাধ্য চেষ্টা করবেন।

ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প

এই দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী অধ্যাপক শ্রীশম্ভু ঘোষের সঙ্গে সাপ্তাহিক বসুমতীর বিশেষ প্রতিনিধি সাক্ষাৎ করেছিলেন। কোন বাঁধা প্রশ্ন নিয়ে নয়, পশ্চিমবঙ্গের বর্তমান অর্থনৈতিক পরিস্থিতিতে ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পের ভূমিকাকে কিভাবে সার্থক করে তোলা যায়, সেই বিষয়ে শম্ভুবাবু কি ভাবছেন তারই কিছুটা পরিচয় নেওয়া ছিল এই সাক্ষাৎকারের বিশেষ উদ্দেশ্য। শুরুতেই শম্ভুবাবু জানালেন যে, গত বিশ বছরের কংগ্রেসী শাসনে ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পসমূহের বিকাশের অনেক সুযোগ ছিল, কিন্তু কংগ্রেসের ভ্রান্ত নীতির জন্য তার সদ্ব্যবহার করা যায় নি। বর্তমান কালের দারুণ বেকার সমস্যার একটা প্রধান উৎস হচ্ছে গ্রাম। কেন না গ্রামে কর্মসংস্থানের সুযোগ নেই, এবং যারা জমিতে কাজ করে তারাও বছরের অধিকাংশ সময়ে কর্মহীন থাকে। এই কারণেই বছরের পর বছর ধরে গ্রাম থেকে শহরে কর্মের আশায় জনসমাগম হচ্ছে, অপর দিকে শহরের জনসংখ্যায় বেড়ে চলছে যার ফলে বর্তমানে বেকার সমস্যা একটা অদ্ভুত জটিল অবস্থায় এসে পৌঁচেছে। অথচ গ্রামে যদি কর্মসংস্থানের সুযোগ থাকত তা হলে এ অবস্থা হত না, গ্রাম থেকে শহরে দলে দলে আসার পরিবর্তে উল্টোটাই ঘটত যেটা সঠিকভাবে দেশের পক্ষে স্বাস্থ্যকর হত। এই কারণেই গ্রামে ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পের রীতিমত প্রসার দরকার। কাগজে-কলমে এ-সত্য বহুদিন স্বীকৃত এবং আজকে যাঁরা প্রবীণ ও প্রখ্যাত কংগ্রেস নেতা তাঁরা তাঁদের কিশোর বয়স থেকেই এ কথা বলে বলে গলার শির ফুলিয়ে ফেলেছেন, যদিও একুশ বছর একটানা ক্ষমতা ভোগ করা সত্ত্বেও তাঁরা এ বিষয়ে কার্যত কিছুই করেন নি, যদিও এই খাতে ব্যয়েরও কিছু কমতি হয় নি। দূরদৃষ্টিহীন পরিকল্পনায় সমবায়ের নাম করে কিছু লোক সরকারের কাছ থেকে দুহাতে পয়সা লুটে নেওয়া ভিন্ন আর কিছুই লভ্য হয় নি। সমস্যা যে রকম ছিল সেই রকমই আছে। বাংলার কুটিরশিল্পগুলি মূলধনের অভাবে, কাঁচামালের অভাবে এবং যথাযোগ্য বিক্রয় ব্যবস্থার অভাবে আজ একেবারে ধ্বংসের মুখোমুখি দাঁড়িয়েছে। দারিদ্র্য ও মূলধনের অভাবের সুযোগ নিয়ে মহাজন-ফড়িয়া শ্রেণী মাঝে মাঝে অগ্রিম দাদন দিয়ে নামমাত্র মূল্যে উৎপাদিত পণ্যগুলি কিনে নিয়ে যাচ্ছে। এবং কৌলিক বৃত্তিগুলি লাভজনক না হওয়ায় বিভিন্ন ধরণের কটিরশিল্পে নিযুক্ত ব্যক্তিরা বংশানুক্রমিক পেশা পরিবর্তন করতে বাধ্য হচ্ছেন। অপরাপর ক্ষুদ্র শিল্পগুলি যেগুলি বৃহৎ শিল্পের যোগানদার হিসাবে কাজ করে সেগুলিও অর্ডারের অভাবে মার খাচ্ছে। বর্তমান অবস্থা খুবই জটিল এবং অত্যন্ত সুপরিকল্পিত দৃষ্টিভঙ্গী ছাড়া বর্তমান অবস্থার প্রতিকার ও উন্নতিবিধান সম্ভবপর নয়। তথাপি, সীমাবদ্ধ পরিবেশেও যুক্তফ্রন্ট এ-বিষয়ে যথাসাধ্য করে যাবে বলে তিনি আশ্বাস দিয়েছেন। শ্রীঘোষের মতে যে কাজটা সর্বাগ্রে করা দরকার তা হচ্ছে প্রতি গ্রামে বিদ্যুৎ সরবরাহের ব্যবস্থা করা। শ্রীঘোষ জানালেন যে, এই কাজটি মাদ্রাজে ইতিপূর্বেই হয়ে গেছে এবং মাদ্রাজ হ্যাণ্ডলুমের জয়জয়কারের এটাই একটা বড় কারণ, অথচ বিদ্যুৎ চালিত তাঁত ব্যবহারের সুযোগের অভাবে পশ্চিমবঙ্গের তাঁতীদের উৎপাদনের গতি মন্থর। তিনি আরও জানালেন যে, মাদ্রাজে যেখানে শতকরা একশো ভাগ গ্রামেই বিদ্যুৎ সরবরাহ করা সম্ভব হয়েছে, পশ্চিমবঙ্গে সেক্ষেত্রে শতকরা মাত্র চারটি গ্রামে তা হয়েছে, বিগত কংগ্রেস সরকারের এমনই কর্মদক্ষতা, এবং এক্ষেত্রের ইউনিট প্রতি বিদ্যুৎশক্তির দাম এত বেশি আদায় করা হয় যে তা শিল্পক্ষেত্রে প্রয়োগ করা সম্ভবপর হয় না বহুক্ষেত্রেই। যুক্তফ্রন্ট যথাসাধ্য চেষ্টা করবে এই অবস্থা দূর করার জন্য। শম্ভুবাবুর ওপর আমরা এ বিষয়ে আস্থা রাখি।

স্বাস্থ্যমন্ত্রীর উদ্দেশ্যে

(১)

স্বাস্থ্যমন্ত্রী শ্রীননী ভট্টাচার্যের প্রতি আমাদের কিছু বক্তব্য আছে, যা আমরা এখানে সংক্ষেপে নিবেদন করছি। আশা করি মন্ত্রীমহোদয় এ-বিষয়ে দৃষ্টি দেবেন ও যথোপযুক্ত ব্যবস্থা করবেন।

স্বাস্থ্যদপ্তরের জনৈক পদস্থ আমলা (যাঁর প্রোমোশন পাওয়ার ব্যাপারে বহু গুরুতর অভিযোগের প্রামাণ্য তথ্য আমাদের কাছে আছে), যাঁর দুর্নীতিমূলক কীর্তিকলাপের কথা আমরা বছরের পর বছর ধরে প্রকাশ করেছি, যিনি প্রাক্তন স্বাস্থ্য-অধিকর্তার আমলে কার্যত ওই দপ্তরের সম্রাট ছিলেন, এবং বর্তমান স্বাস্থ্য অধিকর্তার আমলে যিনি রীতিমত কোণঠাসা হয়ে গিয়েছিলেন, সম্প্রতি আবার বিভিন্ন মহলে যাতায়াত করে কিছুটা সুযোগ খুঁজছেন। তাঁর অন্তপ্রকাশের নমুনা হিসাবে নির্ভরযোগ্য সূত্র থেকে সংবাদ এসেছে যে, তিনি কল্যাণীর জওহরলাল নেহরু মেমোরিয়াল হাসপাতালের প্রাক্তন সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টকে (যাঁর কীর্তি ফাঁস করতে আমরা কদাচ ক্লান্তিবোধ করি নি) পুনরায় কল্যাণী হাসপাতালে ফিরিয়ে আনার চক্রান্ত করছেন। উক্ত প্রাক্তন সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টকে স্বাস্থ্যদপ্তরের সচিব যে চার্জসীটে (এস্‌ট/৮৮৩০/৩এ-১৪৪/৬৮, ১৬ই ডিসেম্বর) কয়েকটি গুরুতর অপরাধে অপরাধী সাব্যস্ত করে ভিজিলান্স কমিশনের কমিশনার ফর ডিপার্টমেণ্টাল এনকোয়ারীজ শ্রী এ বি শ্যামকে তদন্ত করতে বলেছেন, সে সম্পর্কে পূর্বে বঙ্গদর্শনে বিস্তৃত আলোচনা করা হয়েছে।

কল্যাণী হাসপাতালের বর্তমান যিনি অস্থায়ী সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট, তিনি তরুণ এবং রীতিমত কাজের লোক। যাঁরা তিন-চার মাস আগে কল্যাণী হাসপাতাল দেখেছেন তাঁরা এখন বিস্ময়ে হতবাক হয়ে যাবেন—কি করে সহকর্মী অধিকাংশ ডাক্তারের নানারকম জঘন্য ক্লিককে তুচ্ছ করে, শতকরা নব্বইজন ডাক্তার, নার্স, জি-ডি-এ প্রভৃতির অসহযোগিতাকে অগ্রাহ্য করে অসাধারণ ধৈর্য অধ্যবসায়, সততা ও নিষ্ঠার সঙ্গে কাজ করে এই তরুণ ডাক্তার কল্যাণী হাসপাতালকে একটি প্রকৃত জনকল্যাণমূলক সেবা প্রতিষ্ঠানে পরিণত করার সার্থক প্রয়াস করে চলেছেন। কিন্তু এখানে কায়েমীস্বার্থের প্রচণ্ড বাধা, যেগুলির কথা আমরা একে একে বলছি।

প্রাক্তন সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টের আমলে কিছু মার্কামারা সমাজবিরোধীকে জি-ডি-এ পদে নিযুক্ত করা হয়েছিল। এরা এখনো বহালতবিয়তে আছে এবং ইণ্টার্নাল সাবোটাজ করছে।

নার্সিং বিভাগের একজনের বিরুদ্ধে পূর্বে বহু অভিযোগ হয়েছে, কল্যাণী হাসপাতালের সেই দিনের মধুচক্রের তিনি ছিলেন মক্ষিরাণী, মধুচক্র ভেঙে গেলেও ইনি কিন্তু দলবল সহ বহালতবিয়তেই আছেন।

করেকজন ডাক্তারের বিরুদ্ধে গুরুতর অভিযোগ। এঁদের একজন নাকি শ্রীরামপুর থেকে আসা-যাওয়া করেন। যদিও এঁর হাসপাতাল সংলগ্ন কোয়ার্টারে থাকবার কথা। ইনি সাড়ে এগারোটায় আসেন দেড়টায় চলে যান। এঁর বিরুদ্ধেও পূর্বে নানা অনাচারের অভিযোগ হয়েছে এবং এঁরও খুটি হচ্ছেন সেই মহামান্য পদস্থ আমলা এবং স্বাস্থ্যদপ্তরের জনৈক ডেপুটি ডিরেক্টর।

এঁদের আর একজন হলেন সাজ্ঞারি বিভাগের। আমরা সরেজমিনে অনুসন্ধান করে যা দেখেছি, যা বুঝেছি, তাতে বলা যায় যে, এঁদের শাসনে আনা অসম্ভব।

অস্থায়ী সুপারিন্টেন্ডেন্ট এঁদের কর্তব্যে অবহেলার জন্য কিছু করতে পারবেন না, কেন না এঁদের মুরুব্বির জোর আছে. খুঁটির জোরে সুপারিন্টেন্ডেন্টকেই এঁরা জলপাইগুড়ি বা মেদিনীপুর বা কোচবিহার পাঠিয়ে দেবেন। স্বাস্থ্যমন্ত্রী নিজে তদন্ত করলে আমরা যেসব অভিযোগ করলাম বা অতীতে করেছি, তার চেয়ে অধিকতর মারাত্মক অভিযোগের প্রমাণ নিশ্চয়ই পাবেন— চ্যালেঞ্জ করে বলতে পারি।

(৮।৩।৬৯)

সানলাইটে

প্রতিবার

আপনার জামাকাপড়

আরো ঝলমলে ক'রে কাচে

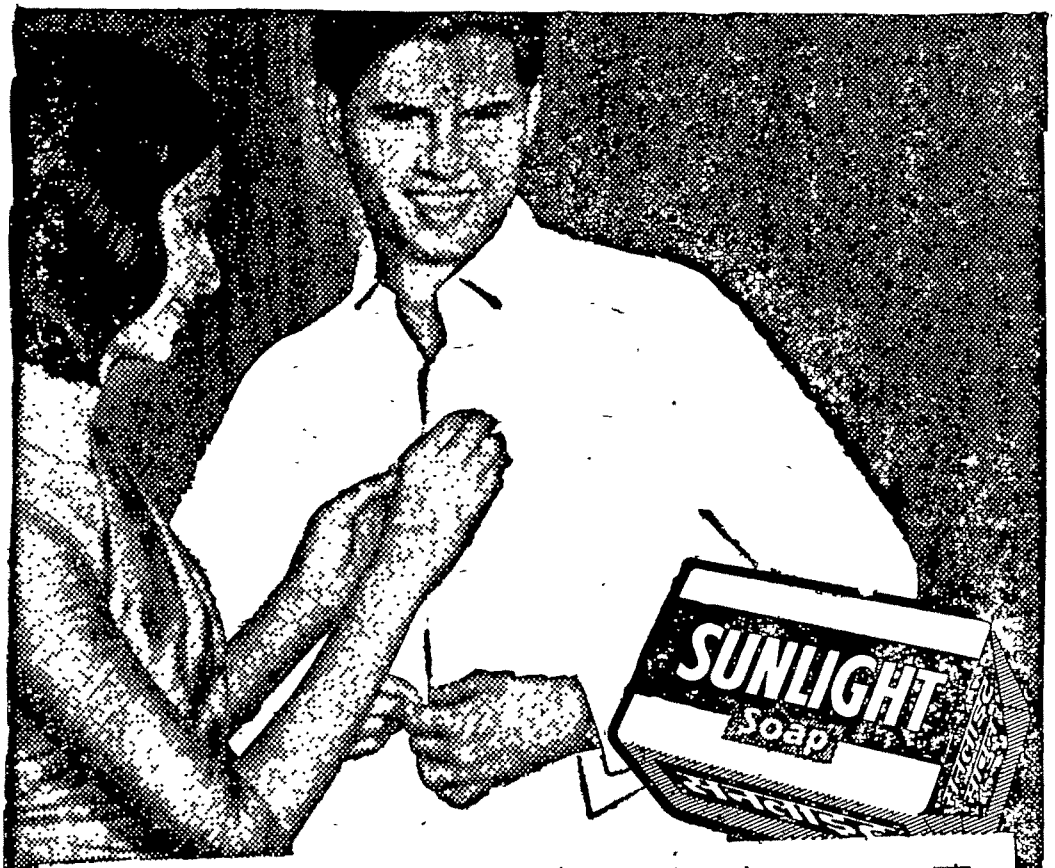

সানলাইট সাবান একবার নিজেই ব্যবহার ক'রে দেখুন···কী চমৎকার ঝলমলে হয় কাপড়চোপড়! দেখবেন, প্রতিবার কাচার সঙ্গে সঙ্গে আপনার জামাকাপড় কেমন আরো বেশী উজ্জ্বল হ'য়ে ওঠে। অল্প একটু ঘষলেই অজস্র ফেনা হবে, আর সেই ফেনা কাপড়চোপড় অনায়াসে সুন্দর পরিষ্কার ঝলমলে ক'রে দেবে। বাড়ীতে সব কাপড়চোপড়ই সানলাইটে কাচুন।

সানলাইটে আপনার প্রতিদিনের সব জামাকাপড় কাচুন

লিনটাস-S 69-140BG

হিন্দুস্থান লিভারের তৈরী

ভারত দর্শন

আবার পবিত্র সংবিধান নিয়ে বিতর্ক

হায়, সংবিধান রচনার সময় কে ভেবেছিল, এমনও দিন আসতে পারে, যখন কেন্দ্র দেখবে রাজ্যে নেই মনোমত আপন দলের সরকার; দেখবে, ভারতের মানচিত্রে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ব-দ্বীপের সৃষ্টি হয়েছে আর কেন্দ্রের ল' এন্ড অর্ডারের ঘৃণতরী সংবিধানের ব্যাখ্যা দাগছে বিতর্কের একতরফা কামান থেকে। অথচ ভাবা উচিত ছিল। এখন তো ভয়ানক গোল বেধেছে। চাই কি, চ্যবন সাহেবও অনেক সময় পাল্টা বিরোধী বিতর্কের ফাঁকা আওয়াজে (কারণ কেন্দ্রে ভোটের জোর স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী চ্যবন সাহেবের পাল্লায়) স্রেফ চুপসে যাচ্ছেন। অথচ স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর এতোটা কাহিল অবস্থা ১৯৬৭ সালের চতুর্থ সাধারণ নির্বাচনের পরও ছিল না। যদিও বিভিন্ন রাজ্যে তখনই কংগ্রেস পোড় খেয়েছে প্রচণ্ডভাবে। দু'বছর চ্যবনজীর রাজনীতির খেল এমনই কড়াপাকে পাক খেয়ে গেল যে, অন্তর্বর্তী নির্বাচনের পর এক পশ্চিমবঙ্গের ব্যাপারেই সেই কড়াপাক রাজনীতি দাঁতে কাটতে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী নিজেই হিমসিম খাচ্ছেন।

পশ্চিমবঙ্গ থেকে ধরমবীর মহাশয়কে মানে মানে ফিরিয়ে নিলে অথবা এ্যান্টি ক্লাইম্যাক্সের পরেও নাটক জমাবার গলদ-ঘর্ম দায়িত্ব ওঁনাকে গ্রহণ করতে হ'ত না। কিন্তু চ্যবনজী 'ওয়ান এ্যাক্ট প্লে'র যুগে পঞ্চাঙ্ক নাটকেও তুষ্ট নন বোঝা যাচ্ছে। তাঁর চাই শিবরাত্রির সিমুনি-ধরানো নাটক। এক শেষ হয় তো আর শুরু। ড্রপ সীনে ড্রপ্ট হয় না নাট্য-নেশা। তাই চ্যবন সাহেব পশ্চিমবঙ্গে নতুন করে ড্রপ সীন তুলে আরও দু'-একটা 'খেল্' প্রদর্শনীর আয়োজন করেছেন। এতে সংবিধান-কেন্দ্রিক সমস্যাগুলির সম্যক পরিচয় অবশ্য জনসাধারণের অবগতির আওতায় আসছে। চ্যবন সাহেবের দান ঐটুকুই। অবদান, সংবিধান নিয়ে টাগ অব ওয়ারের আবহ রচনার ঐতিহাসিক কৃতিত্ব। বাস্তবিক কংগ্রেস চুলোয় যাক ক্ষতি নেই, চ্যবন সাহেব চটপট ইতিহাসে অমর হওয়ার উপায় সন্ধান করে নিয়েছেন। এখন বিরোধীরা যদি জোট পাকিয়ে কেন্দ্রীয় ক্ষমতা পর্যন্ত অধিকার করেন, চ্যবন সাহেব অনায়াসেই বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ প্রদর্শন করে বলতে পারেন, আজ থেকে শতবর্ষ পরেও বই খুলো, দেখবে আমি আছি। কত স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসবে, কত যাবে, আমি থাকব, আমার হাঁক-ডাক নিয়ে, কংগ্রেস কেমন করে ডুবেছে, সংবিধানের কতরকম নতুন ব্যাখ্যা হয়েছে তারই কিছুটা দায়িত্ব নিয়ে আমি থাকব। সেদিন, যদি কংগ্রেস থাকে, আমায় হয়ত দুষবে, কিন্তু অন্যেরা বলবে, লোকটা কী প্রগ্রেসিভ ছিল? বস্তু আটুনির সঙ্গে কংগ্রেসকে ফস্কা গেরোয় ঝুলিয়ে দিয়ে গেছে। ভালো কাজ করতে গেলে অনেক সইতে হয়। তা চ্যবনজী ঢের সয়েছেন, আরও সইবেন বা সইবার ইচ্ছে আছে।

শুনেছি ভগবান বলেছিলেন; আমায় যদি পেতে চাও বন্ধু হিসেবে তবে সাত জন্ম সাটল্ ককের মতো স্বর্গ-মর্ত্য কর; আর যদি শত্রুরূপে সইতে চাও, তিন জন্মেই পাপক্ষয়। চ্যবন সাহেব নরম মেজাজী হলে বিরোধীরা গদি পেতেন সইষে সইয়ে। কিন্তু পশ্চিমবঙ্গে ধরমবীরের ব-কলমে ঘোড়ার চাল দিয়ে অবস্থা এমনি ত্বরান্বিত করে তুললেন যে, কাউকে আর হাপিত্যেশ করে ব'সে থাকতে হ'ল না। ক্ষুদ্র, নাতিক্ষুদ্র একলাটে মন্ত্রিসভায় জায়গা করে নিলেন। চ্যবনজীকে ধন্যবাদ অন্তত কেন্দ্রের এম-পি-রা জানাতে পারতেন। আর পশ্চিমবঙ্গে ধন্যবাদ প্রাপ্য ডঃ প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষের। ধরমবীরকে টানব না, আজকের রাজ্য মন্ত্রিগণই তাঁকে বেতনভোগী কর্মচারিরূপে চিহ্নিত করে দিয়েছেন। উনি আর কী করবেন। আমরা যাঁদের বেতন খাই, তাঁদের নির্দেশই পালন করি। ধরমবীরকে তাই টানব না। তবে হ্যাঁ, রাজ্যপালকে আলোচনায় বাদ রাখা যায় না। রাজ্যপালের পদাধিকারী বেতনভোগী হলেও, রাজ্যপালের বিশেষ মর্যাদা সংবিধানসম্মত। তিনি রাজ্যের মুকুট। সাধারণ বেতনভোগী আর রাজ্যপালে তাই ঢের তফাৎ। ঐ পদে যিনি থাকবেন তাঁকে তাই সব সময় মার্কা পয়লার দিকে নজর রাখলেই চলে না, পবিত্র সংবিধানকে রক্ষা করার দায়িত্বই তাঁর দৃষ্টিকে আবদ্ধ রাখবে। ধরমবীর মহাশয়ের নজরটুকু সংবিধানের প্রতি কতদূর আনুগত্য প্রদর্শন করেছে, এই সেই বিষয়টায় সন্দেহ জাগার জন্যই বোধহয় মন্ত্রীরা তাঁকে বেতনভোগী কর্মচারী মাত্র বলছেন। বস্তুত রাজ্যপাল তাঁর নীতিতে খাড়া থাকলে তাঁর প্রাপ্য সম্মান মারে কে।। ঐ পশ্চিমবঙ্গেই যুক্তফ্রন্ট সরকার প্রথম প্রতিষ্ঠার পর যখন রাজ্যপাল শ্রীমতী পদ্মজা নাইডু ভাষণ দিতে গেছলেন, তখন শ্রীমতী নাইডু জিন্দাবাদ ধ্বনি উঠেছিল—এও অতি-সাম্প্রতিক স্মরণকালের ঘটনা। তাঁর প্রতি মন্ত্রীরা, তখন 'বেতনভোগী' বলে মনের বিক্ষোভ প্রকাশ করেন, নি, তাই রাজ্যপালকে যে মার্কা পয়লার দিকে তাকিয়ে থাকতেই হবে এমন কথা নেই। যাই হোক, ধরমবীর মহাশয় আর কতদিন আসনে আসীন থাকতে চান না। চ্যবন সাহেবও সংসদে যেমন মিন মিন করে বলছেন, বিবেচনা করা হচ্ছে, বিবেচনা চলছে—তাতে মনে হয় শেষ পর্যন্ত ড্রপ সীন পড়বেই এবং সংবিধান নিয়ে ধুম্রজাল রচনার নাটকে বিরতিরা বিশ্রাম শ্বাস গ্রহণ করবে। মাঝ থেকে চ্যবন সাহেব আলোচ্য হয়ে উঠলেন ভয়ানক। সংসদে এখনও তাঁর লৌহহস্ত শাসনকে যাঁরা বাহবা জানাচ্ছেন তাঁরা সেই দেহাতী নাটকের দর্শকবৃন্দের মতো কলের পুতুল অবুঝে 'লেডকালোগ'। খেলার শুরু ও শেষে অধিকারী মহাশয় আপন কৃতিত্ব ঘোষণা করে বলবেন, "লেডকালোগ এক দফে তালি বাজা দো" আর লেডকালোগ মহানন্দে তালি বাজাবে। শেষে অধিকারী মশায় মেডেল নিয়ে বিদায় নেবেন, লেডকালোগ যে তিমিরে সেই তিমিরেই। সম্প্রতি এহেন নাটক সংসদের উভয় কক্ষ কেমন জমেছিল অতঃপর তারই সংক্ষিপ্ত পরিচিতি তুলে ধরা যাক।

'শেম শেম' ধ্বনি যেমন একদিকে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বলবন্ত রাও চ্যবনের কণ্ঠস্বর ডুবিয়ে দিয়েছিল; ঠিক তেমনিই

চিৎকার পাল্টা চিৎকারে সি-পি-আই নেতা শ্রীডাঙ্গের বক্তব্যও তলিয়ে যায়। বিতর্ক হচ্ছিল পশ্চিমবঙ্গ থেকে ধরমবীর মহাশয়কে ফিরিয়ে নেওয়ার দাবি অনুসরণ করে বিধানসভায় রাজ্যের রাজ্যপাল কর্তৃক পঠিত ভাষণের অংশবিশেষ বাদ দিয়ে পাঠ করার প্রশ্নকে কেন্দ্র করে। ডাঙ্গে প্রশ্ন করেছিলেন, রাজ্যপালকে কি কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীই ভাষণের অংশবিশেষ বাদ দিয়ে পাঠ করার পরামর্শ দান করেছিলেন। চ্যবন সাহেব তখন বলেছেন, "না"। সঙ্গে সঙ্গে দোর্দণ্ডপ্রতাপ স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর কণ্ঠস্বর ডুবে গেছে, "মিথ্যে কথা, মিথ্যে কথা (!)" এই সভ্য-রবে। শোনা গেছে কেন্দ্রীয় সরকার খবর পেয়েছেন, পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপাল তৈরি ভাষণের অংশবিশেষ পাঠ করেছেন।

জনসঙ্ঘের অটলবিহারী বাজপেয়ী বলেছেন, এমন নজীর সাম্বাতিক ভবিষ্যৎ তৈরি করতে চলল। এই সাংবিধানিক নজীরের বলে রাষ্ট্রপতিও কেন্দ্রীয় ক্যাবিনেট কর্তৃক প্রস্তুত ভাষণের অংশবিশেষ খুশিমত বাদ দেওয়ার ইচ্ছাকে কার্যে রূপায়িত করতে পারবেন। স্বতন্ত্র দলের সদস্য শ্রীবঙ্গও একই সুরে বলেন : এই ঘটনা গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক ও সাংবিধানিক ফলশ্রুতির বনিয়াদ রচনা করল। রাজ্যপাল তাঁর কার্যের দ্বারা সংসদীয় প্রথাকে বর্জন বা অতিক্রম করেছেন। এমন চলতে থাকলে গোষ্ঠী বা দলবিশেষও একইভাবে সংবিধান-বহির্ভূত আচরণের আশ্রয় গ্রহণ করবে। সি-পি-এম'এর এ, পি চট্টোপাধ্যায়ও একই বক্তব্য রাখেন। সংসদের উভয় কক্ষ বিক্ষোভে সরগরম। অর্থাৎ কোলগর ডুবু ডুবু নদে ভেসে গেল : তবু গলিল না চিত্ত চ্যবন সাহেবের। কোনো স্পষ্টোক্তি পাওয়া গেল না রাজ্যপালকে সরিয়ে নেওয়া সম্পর্কে।

পশ্চিমবঙ্গের নজীরটা অতঃপর ভারতব্যাপী ছড়িয়ে পড়লে কিছু বলার থাকবে না কারও। যেভাবে দ্রুত দেশের চেহারা পাল্টাচ্ছে তাতে কোন দলের রাজ্যপাল কখন ক্ষমতাধীশ হবেন, তারও ঠিক-ঠিকানা নেই। নজীরটা তখন অপর দলেও কাজে লাগাবেন যদি অকাজ কোথাও ঘটে যায় তাঁদের দ্বারাও।

সুতরাং যেভাবেই দেখা যাক, পশ্চিমবঙ্গের যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রিসভাকে ঘিরে জল যেমন ঘোলা হল, পাঁকও তেমনি জমল। কে কখন সে পাঁকে আটকে পড়বেন কেউ তা বলতে পারেন না। বলা যায় না যাহাত্তর সালের পরেই বা কি হবে, কিম্বা তারও আগে।

জয়প্রকাশের অসন্তোষ প্রকাশ

পশ্চিমবঙ্গে বিধিবহির্ভূতভাবে রাজ্যপাল তাঁর ভাষণাংশ বাদ দিয়ে পাঠ করার ক্ষুব্ধ হয়েছেন সর্বোদয় নেতা শ্রীজয়প্রকাশ নারায়ণও। তিনি বলেন, এইভাবে যুক্তফ্রন্টের হাতে কেন্দ্র ও কংগ্রেসের বিরুদ্ধে লড়াই করার অস্ত্র তুলে দেওয়া হল।

শ্রীজয়প্রকাশ নারায়ণ সহজে মুখ খোলেন না, তিনিও যখন রাজ্যপালের আচরণে উদ্বেগ প্রকাশ করছেন তখন এটা অনায়াসেই বলা যেতে পারে যে, পার্থ-মিত্র সবার মনেই সাংবিধানিক সঙ্কট যেচে ডেকে আনার ব্যাপারে উদ্বেগ জেগেছে। অর্থাৎ সবারই মনোভাব সেই সভাপর্বের মনোভাব, শকুনির শনি কুরুকুলকে গ্রাস করলে যে মনোভাব চাপা হলেও ব্যক্ত হয়েছিল সভাসদবর্গের আচরণে। তখন অথর্ব অন্ধ ধৃতরাষ্ট্র হিংসায় পাগল। অপরিণতবুদ্ধি দুর্যোধন ক্ষমতাগ্রাসে উন্মত্ত। দুঃশাসন লোলুপ। এই সময় বিকর্ণের বিদ্রোহই উল্লেখযোগ্য। যদিও কবি তাঁকে যথোচিত স্থান দিতে পারেন নি হয়ত বা রাজনৈতিক কারণেই। আজকের ভারতের চেহারাটাকে মহাভারতের আদলে দেখলে উদ্বেগ স্বাভাবিক। আর এই উদ্বেগ অত্যন্ত মিত্রজনোচিতও বটে।

কেন্দ্রীয় মন্ত্রী-সকাশে পশ্চিমবঙ্গীয় নেতৃবৃন্দ

না, একমাত্র চ্যবন সাহেবের সঙ্গেই দেখা করেন নি পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী এবং উপমুখ্যমন্ত্রী। দেখা করেছেন প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে, ভারতের খাদ্যাগার-খানার অধিপতি অর্থমন্ত্রীর সঙ্গে এবং খাদ্যভাণ্ডারের অধিকর্তা খাদ্যমন্ত্রীর সঙ্গে। রাজ্য মন্ত্রিসভার এবার অভূতপূর্ব দাবি যা নিয়ে কেন্দ্রকে কখনো মাথা ঘামাতে হবে ইতিপূর্বে তা ভাববার অবকাশ ঘটে নি। তখন রাজ্যে ছিল বশংবদ কংগ্রেস সরকার। কেন্দ্রীয় কর্তাদের দিকে তাঁরা হাপিত্যেশ তাকিয়ে থাকতে পারতেন মাত্র। রাজ্যের দাবি আদায় করবার জন্য সরাসরি কেন্দ্রের সঙ্গে সঙ্ঘর্ষে আসবার উপায় ছিল না তাঁদের। ফলত রাজ্যগুলি মাথাভারী কেন্দ্রের করুণা-ভিখারীতে পরিণত হচ্ছিল। বিমাতৃসুলভ মনোভাব প্রদর্শিত হয়েছে বলে হা-হুতাশ করা ছাড়া দ্বিতীয় করণীয় ছিল না আর কিছু। এবার কেন্দ্রায়িত ক্ষমতা বিপাকে পড়েছেন। অবশ্য রাজ্যের জন্য দাবি ইতিপূর্বে কেরালা তুলেছিল, এক[illegible]রাজ্যের কণ্ঠস্বরে স্বর মেলাল পশ্চিমবঙ্গ। রাজ্য নেতৃবর্গ বলেছেন প্রয়োজন হলে সংবিধান সংশোধন করেও রাজ্যের অভাব পূরণ করতে হবে। খাদ্য, অর্থ প্রভৃতি সবকটি গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার কেন্দ্রের খেয়ালখুশির ওপর ছেড়ে দিয়ে রাজ্যবাসী অনন্তকাল ভিক্ষুকবৃত্তি করে যেতে পারেন না। বস্তুতপক্ষে কেন্দ্রের হাতে সব ক্ষমতা কুক্ষিগত করার পক্ষে যুক্তিও তাই গভীর বিশ্লেষণে টেকে না। রাজ্যের তরফে অধিকতর স্ব-শাসন ও স্বাবলম্বনের দাবিকে আজ আর তাই ফুৎকারে উড়িয়ে দেওয়াও সম্ভব হচ্ছে না। অজয়-জ্যোতির এই ঐতিহাসিক অভিযানে দিল্লী তাই বস্তুতই বেকায়দায় পড়েছেন। অধিকতর আর্থিক স্ব-শাসনের দাবি কতদূর পূর্ণ করা হবে সে সম্পর্কে অর্থমন্ত্রী নিশ্চুপ থাকলেও তাঁকে বলতে হয়েছে, সাহায্য-সংক্রান্ত দাবি তিনি বিবেচনা করে দেখবেন।

কেন্দ্রকে প্রথম ঢোক গিলে মেনে নিতে হচ্ছে পশ্চিমবঙ্গের পয়লা দাবি, রাজ্যপালের আসন থেকে শ্রীধরমবীরের অপসারণ। প্রধানমন্ত্রী স্বীকার পেয়েছেন, কিছু একটা করতেই হবে। তবে ভাবটা এমন যেন ধরমবীর মহাশয় পশ্চিমবঙ্গে আর থাকতে চাইছেন না বলেই তাঁকে বদলাবদলি করে নেওয়া হবে। আসলে এই চোখ ধোঁয়ানো বক্তব্যের পেছনে যে প্রচণ্ড গণচাপ কাজ করছে, সাধারণের কিন্তু তা উপলব্ধি করতে বেগ পেতে হচ্ছে না। ধরমবীর মহোদয় যদি অক্টোবর মাসে তাঁর সরে যাওয়া সংক্রান্ত মহান সিদ্ধান্তটি স্বরাষ্ট্রমন্ত্রক বরাবর পেশ করেই থাকেন, তবে এতোদিনে বিষয়টি বিবেচনা করে ওঠা সম্ভব হল না! বাস্তবিক পশ্চিমবঙ্গে প্রেরিত পি-ডি-এফ কোয়ালিশনের ঘটকালি-পাশ ধরমবীর মহাশয় তাহলে কী ভয়ানক রকম ভেরি ইমপর্টান্ট পারসন। এমন ব্যক্তিকে কেন্দ্র কবে তাই কেন্দ্রকে এতোকাল মস্তক ঘর্মাক্ত করতে হয়েছে। পশ্চিমবঙ্গের চাপটা এখন এমন জোরালো যে, প্রয়োজন হলে এখন এক হাতে ঘাম মুছে অপর হাতে কলম ধরে ব্যবস্থাপত্র কেন্দ্রকে লিখতেই হবে।

এ তো গেল প্রথম পর্যায়। কিন্তু স্থায়ী মন্ত্রিসভার অস্তিত্ব বর্তমান থাকাকালে সাংবিধানিক প্রধান হিসেবে যিনিই রাজ্য-রাজধানীর কেন্দ্রস্থলের প্রকাণ্ড প্রসাদে বসবাস করুন না কেন, তিনি আনুষ্ঠানিক মোহর মাত্র।' তাই প্রথম পর্যায়ের জয়টুকু রাজ্যবাসীর পক্ষে একটি মর্যাদার লড়াইয়ে জিত মাত্র।

কিন্তু আসল সংগ্রাম রাজ্য মুখ্যমন্ত্রী

ও উপমুখ্যমন্ত্রীর রাজ্যের হাতে অধিকতর ক্ষমতার দাবিকে কেন্দ্র করে। দিল্লী অনেক দূরে নয়, কিন্তু ধরা-ছোঁয়ার বাইরে। অন্তত এতোকাল বাংলাদেশটা বেশ তফাতেই পড়েছিল। অতঃপর দিল্লীরও টনক নড়বে। এই বাংলা সেই বাংলা, অগ্নিগর্ভ বাংলা—একথা পুনরায় ভাবতে হবে, আর ঐ ভাবনা থেকেই পশ্চিমবঙ্গের পুনর্জাগরণের শুরু।

পশ্চিমবঙ্গের নতুন সরকার রাজ্যের কতটা অভাব মেটাতে পারবেন এই প্রশ্নের থেকেও যা বড় তা হল, এই রাজ্যের প্রতি কেন্দ্রের নিরুত্তাপ মনোভাবকে কতদূর পরিবর্তিত করতে পারছেন ক্ষমতাসীন নেতৃবৃন্দ নতুন ও নবীন উৎসাহ-উদ্দীপনা রাজ্যবাসীর মনে সঞ্চার করে, সেই প্রশ্ন। বেশ কিছুকাল যাবৎ পশ্চিমবঙ্গ সম্পর্কে অনেকের মনেই যে হতাশা পুঞ্জীভূত হয়ে উঠছিল, এখন থেকে তার অবসানের সূত্রপাত। বস্তুত পশ্চিমবঙ্গ নয়, পিছিয়ে পড়ছিলেন পশ্চিমবাংলার ক্ষমতাধীশ নেতারা। তাই সে রাজ্য বিমর্ষ ও পশ্চাদপদ হয়ে ম্রিয়মাণতা হচ্ছিল। আজ আবার নতুন উষার নতুন আলোক নবোদ্ভিন্ন চেতনায় পশ্চিমবঙ্গ তার বিমর্ষ মুখ উজ্জ্বল করে উন্নত শিরে নিজেকে প্রকাশের পথ খুঁজে পেয়েছে। দিল্লীর আত্মতৃপ্ত দরবারে পশ্চিমবঙ্গের সেই তেজস্বী ব্যক্তিত্বকে পশ্চিমবঙ্গের বর্তমান ক্ষমতাসীন নেতৃত্ব যদি প্রতিষ্ঠা দিতে পারেন, মনে হয়, সেটাই হবে এ রাজ্যের পক্ষে সর্বোত্তম মঙ্গল।

শোষণ ও শাসনের পাইপ ও বেড়ি ফেলে ফেলে পশ্চিমবঙ্গ আবার বলবে, উত্তিষ্ঠত জাগ্রত, প্রাপ্য বরান.....

লাভের যূপকাষ্ঠে (রাজ) নীতি ঃ বিহারের আলোকে চেতনার জন্ম ঃ

সাময়িক লাভের যূপকাষ্ঠে অনেক কংগ্রেসী নেতা কংগ্রেসের নীতি ও ঐতিহ্যকে বেমালুম বলি দিয়ে আসছিলেন এতকাল। সম্প্রতি ব্যাপারটা ওঁদের রীতিমত মালুমে এলো বিহারে কংগ্রেস কোয়ালিশন মন্ত্রিসভাকে কেন্দ্র করে।

প্রায় অভাবনীয় ঘটনা, কিন্তু অনিবার্যও বটে। বিহারে মন্ত্রিসভা গঠনে কংগ্রেস তার নীতি বিসর্জন দিয়েছে, এমনতর অভিযোগে ওয়ার্কিং কমিটি থেকে তাঁর সদস্যপদ ত্যাগ করেছেন শ্রী সি সুব্রহ্মণ্যম। অভাবনীয় এই পদত্যাগ সন্দেহ নেই, তবু এটাই ভাগ্যলিপি। কংগ্রেসের নীতিসচেতন নেতারা যদি আরো কিছুকাল আগে এই জাতীয় নীতিনিষ্ঠা দেখাতেন, তবে কংগ্রেসী মর্যাদার মন্দা মাঝপথে কিছুটা রোখা যেত।

বিভিন্ন সময় বিভিন্ন সাংবাদিক আলোচনায় এবং আমাদের এই আলোচনা নিবন্ধমালায় বারম্বার মাত্র একটিই বক্তব্য রাখা হয়েছে যে, সাময়িক লাভের প্রশ্নটা কংগ্রেসী কর্তাদের যেভাবে গ্রাস করছে তাতে রাজনৈতিক দূরদৃষ্টি হারিয়ে কংগ্রেসকে একটা সার্বিক বিপর্যয়ের মুখেই ঠেলে দিচ্ছেন তাঁরা। বিপর্যয় আজ বস্তুতই বাঁধ ভেঙেছে। পশ্চিমবঙ্গ জুড়ে রাজ্য কংগ্রেসে ক্ষমতাসীন কংগ্রেসী নেতাদের পদত্যাগের দাবি উঠেছে, মুহুর্মুহু শোনা যাচ্ছে কংগ্রেস থেকে সভ্যদের পদত্যাগের সংবাদ। এই বিপর্যয় অনিবার্য হয়ে পড়ছিল। কিন্তু ক্ষমতাপ্রিয় নেতৃত্ব সেদিকে চোখ বুজে বসে যতকাল শ্বাস, গদির বিলাসে মেতে উঠেছিলেন। আজ তাই দল হিসেবে সাধারণের চোখে কংগ্রেস যে কত ছোট হয়ে যাচ্ছে তা দলের ভেতরে-বাইরে সকলেই অনুভব করতে শুরু করেছেন।

শুধু যে বিভিন্ন রাজ্যেই কংগ্রেসী নেতৃত্ব ফাঁপরে পড়েছেন তাই নয়, শ্রীসুব্রহ্মণ্যমের পদত্যাগের অনুসরণে স্বয়ং কংগ্রেস সভাপতি শ্রীনিজলিঙ্গাপ্পাকেও পদত্যাগ করতে হল।

এখন কেন্দ্রীয় কংগ্রেসে জোর হুটোপাটি।

ঝরে-পড়া চুণবালিতে পলেস্তারা করে কংগ্রেসী ভাঙা প্রাসাদটিকে দাঁড় করিয়ে রাখার জন্য তৎপরতা চলছে। নিজলিঙ্গাপ্পা ও সুব্রহ্মণ্যমকে পদত্যাগ প্রত্যাহার করার জন্য উপরোধ-অনুরোধের মিছিল বের হয়েছে। কাজে কাজেই সমস্যার একটা আশু সমাধানের কথাও ভাবতে হচ্ছে।

ফরমলাটা মূল থেকে ছাড়িয়ে নিয়ে বিহার মন্ত্রিসভাকে এখন নীতিহীনতার কীটমুক্ত করার সমস্যা।

মূলে, অর্থাৎ বিহারে মন্ত্রিসভা গঠনের আগে ওয়ার্কিং কমিটি সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন যে, রামগড় রাজের সঙ্গে কোন সমঝোতা নয়, কিন্তু মন্ত্রিসভা কংগ্রেসের হাতছাড়া হয়-হয় অবস্থায় অকস্মাৎ রামগড় রাজের জনতা পার্টির সঙ্গে বন্দোবস্ত আসার জন্য সর্দার হরিহর সিং-কে অনুমতি দেওয়া হল। বাজপেয়ীকেও মন্ত্রিসভায় গ্রহণ করা হল।

সুব্রহ্মণ্যম এই নীতিহীন আচরণের জন্য তীব্র ভাষায় সমালোচনা করেছেন কংগ্রেস সভাপতির সিদ্ধান্তকে। তিনি একা নন, তাঁকে সমর্থন জ্ঞাপন করেছেন প্রবীণ কংগ্রেসী নেতা শ্রীকামরাজ, শ্রীজগজীবন রাম ও শ্রীসঞ্জীবায়া। শ্রীচন্দ্রশেখর ও শ্রীকৃষ্ণকান্ত জানিয়েছেন অভিনন্দন।

সাময়িক লাভের হাঁড়িকাঠে কংগ্রেসী ক্ষমতাসীন নেতৃত্ব সমস্ত নীতি ও দূরদৃষ্টিকে কাটছেন বলে ওঁদের মন্তব্য। নিজলিঙ্গাপ্পা আর করেন কি, ব্যাপারটা তাঁরই সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে অনাস্থা। সুতরাং পদত্যাগ তাঁকেও করতে হয়েছে। ফলত ফরিদাবাদের কংগ্রেস অধিবেশন শীঘ্রমধ্যে হচ্ছে কি না সন্দেহ।

তবে দুজনকেই পদত্যাগ প্রত্যাহার করে নেওয়ার জন্য পীড়াপীড়ি শুরু হবে। সে যাই হোক, সে তাঁদের দলগত ব্যাপার। কিন্তু এই ঘটনার পেছনের ইতিহাসটি আজ সকলকেই স্মরণে আনতে হচ্ছে যে, বস্তুত সাময়িক লাভের কড়ি বড় বেশি দিন মজুত থাকে না বরং বড় তাড়াতাড়িই তা খরচ হয়ে যায়।

বিহারে মন্ত্রিসভা গঠন নিয়ে অনেক নাটক জমে উঠেছিল। এই রাজ্য নিয়ে আর একটু ধীর বিবেচনার তাই প্রয়োজনও ছিল। এখন যদি কেঁচে গণ্ডুষ করতে হয়, তবে সে তো লজ্জার একশেষ। সঙ্কট মোচনের উপায় এখন রামগড় রাজাকে বাদ দিয়ে নতুন করে মন্ত্রিসভা ঢেলে সাজানো। সুব্রহ্মণ্যম তাহলে থেকে যেতে পারেন। কিন্তু কংগ্রেস সভাপতি পদে নিজলিঙ্গাপ্পা কী করবেন। ব্যাপারটা কি তাঁর পক্ষে একটা বড় রকমের পরাজয় বলে বিবেচিত হবে না?

পশ্চিমবঙ্গ কংগ্রেসে পুনর্গঠন দাবি

নয়াদিল্লীতে পশ্চিমবঙ্গ কংগ্রেসের ক্ষুব্ধ সদস্যরা ছুটে গিয়েছিলেন কংগ্রেস সভাপতির কাছে তাঁদের দাবি পেশ করতে। দাবি, কোন রকম 'এ্যাড হক' কমিটি নয়, রাজ্য কংগ্রেস নেতৃত্বের অবিলম্বে আমূল পরিবর্তন চাই। অন্যথা চব্বিশ পরগনা ও হাওড়ায় যেমন বিক্ষোভ দেখা গেছে, রাজ্য জুড়ে তাই-ই ছড়িয়ে পড়বে। প্রতিনিধি দলে ছিলেন শ্রীমতী পূরবী মুখোপাধ্যায়, শ্রীনিবারণ চৌধুরী এবং ডাঃ বলাই পাল।

যে নেতৃত্বকে অথর্ব ক্ষীণদৃষ্টি আজ আক্রমণ করেছে তার অপসারণে যে কংগ্রেসের ভগ্নস্বাস্থ্যে কিছুটা শক্তি-সঞ্চার করা যেত, এমন কথা বহুকাল থেকে বিভিন্ন আলোচনায় তুলে ধরেছি আমরা। আজ কংগ্রেসেরই সদস্যবর্গ এই দাবিতে দিগ্বিদিকে উত্তেজনায় ফেটে পড়ছেন। যা অনিবার্য প্রাকৃতিক নিয়মের বিরুদ্ধে তাকে রুখতে গেলেই বিস্ফোরণ, সেই বিস্ফোরণই আজ বৃদ্ধ নেতৃত্বের পায়ের তলার মাটি কাঁপিয়েছে। যা অত্যন্ত স্বাভাবিক তাকে মেনে নিতে আর কি গড়িমসি করা যুক্তিযুক্ত?

(৮।৩।৬৯)

পশ্চিম জার্মানী।

বার্লিন নিয়ে আবার একটা বড় রকমের সংকট দেখা দিয়েছিল। শেষ পর্যন্ত উভয় পক্ষের মধ্যে সংঘর্ষ শুরু না হলেও নতুন করে উত্তেজনা সৃষ্টি হয়েছে।

জার্মানীর মত বার্লিনও বিধাবিভক্ত। পশ্চিম বার্লিন পূর্ব জার্মানীর ভূখণ্ডের মধ্যে অবস্থিত হলেও শহরের এই অংশ পশ্চিম জার্মানী রাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত।

পশ্চিম জার্মানীর নতুন রাষ্ট্রপতি নির্বাচনের জন্য নির্বাচকমণ্ডলী-র (ইলেকটোরাল কলেজ) অধিবেশন বসবে ৫ই মার্চ পশ্চিম বার্লিন শহরে, এই সংবাদ ঘোষণার সঙ্গে সঙ্গে পূর্ব জার্মানী ও সোভিয়েট য়ুনিয়ন এর বিরুদ্ধে আপত্তি জানায়। তাদের বক্তব্য, পশ্চিম বার্লিনের একটা পৃথক রাজনৈতিক সত্তা রয়েছে। এখানে পশ্চিম জার্মানীর রাষ্ট্রপতি নির্বাচন করা চলবে না। জোর করে এখানে নির্বাচন অনুষ্ঠানের দ্বারা য়ুরোপের অশান্তি সৃষ্টিতে উস্কানি দেওয়া হচ্ছে এবং এর ফলে আন্তর্জাতিক উত্তেজনা বৃদ্ধি পাবে। সোভিয়েট কর্তৃপক্ষ আরও অভিযোগ করেন, পশ্চিম বার্লিনের ২৫টি কারখানায় যুদ্ধের কাজে ব্যবহারের উপযোগী নানা রকম জিনিস তৈরি করা হচ্ছে এবং এগুলি খাস পশ্চিম জার্মানীতে প্রেরণ করা হচ্ছে। এইসব জিনিসের কিছু কিছু বিদেশেও বিক্রি করা হচ্ছে।

স্বাভাবিকভাবেই পশ্চিম জার্মানীর সরকারী কর্তৃপক্ষ এইসব বক্তব্য মানতে রাজী হন নি। পশ্চিম বার্লিন পশ্চিম জার্মানীর অবিচ্ছেদ্য অংশ। ১৯৫৪ সাল থেকে প্রতি পাঁচ বৎসর অন্তর রাষ্ট্রপতি নির্বাচনের জন্য এই শহরেই নির্বাচকরা মিলিত হয়েছেন। ১৯৫৪, ১৯৫৯, ১৯৬৪—কোন বার পূর্ব জার্মানী কিংবা সোভিয়েট য়ুনিয়ন নির্বাচন অনুষ্ঠানে কোন আপত্তি জানায় নি। আর, 'মিত্রপক্ষের' অপর তিন শক্তি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, বৃটেন ও ফ্রান্সের তো পূর্ব-সম্মতিই ছিল এ ব্যাপারে। হঠাৎ এখন আপত্তি করলে চলবে কেন?

পশ্চিম বার্লিনের কারখানায় সমরোপকরণ নির্মাণের অভিযোগও সরকারী কর্তারা অস্বীকার করেছেন। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, বৃটেন ও ফ্রান্সের পক্ষ থেকে প্রদত্ত এক যুক্ত বিবৃতিতে এই অভিযোগকে ভিত্তিহীন বলে বর্ণনা করা হয়েছে।

তবু সোভিয়েট য়ুনিয়ন সতর্ক করে দিয়েছিল পশ্চিম জার্মানীর কর্তৃপক্ষকে। সোভিয়েটের পক্ষ থেকে বলা হয়েছিল, পশ্চিম জার্মানীর মূল ভূখণ্ড থেকে পশ্চিম বার্লিনে যাবার জন্য বিমানপথের নিরাপত্তার দায়িত্ব তারা গ্রহণ করবে না। স্থলপথে যাবার জন্য হেমসস্টেড হয়ে যে 'অটোবান' রয়েছে, তাও সাময়িকভাবে বন্ধ করে দেওয়া হয়েছিল।

পিকিং-এ সোভিয়েট দূতাবাসের সামনে বিক্ষোভ

এত উত্তেজনা সত্ত্বেও উভয় পক্ষের মধ্যে একটা মিটমাটের চেষ্টাও হয়েছে। পশ্চিম জার্মানীতে নিযুক্ত সোভিয়েট রাষ্ট্রদূত সেমিয়ন সারাপকিন পশ্চিম জার্মানীর চ্যান্সেলার কুর্ট জর্জ কিসিংগারের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে আড়াই ঘণ্টা ধরে আলোচনা করেছেন। শোনা গিয়েছিল, পশ্চিম জার্মান সরকার যদি নির্বাচন অনুষ্ঠানের জায়গা পশ্চিম বার্লিন থেকে অন্য কোথাও সরিয়ে নিতে রাজী হন, তবে দুই বার্লিনের মধ্যে যাতায়াত সহজ করা হবে এবং পশ্চিম বার্লিন তথা পশ্চিম জার্মানীর অধিবাসীদের আগামী ইস্টারের সময় তাদের আত্মীয়-স্বজনের সঙ্গে দেখা করার জন্য পূর্ব জার্মানীতে প্রবেশাধিকার দেওয়া হবে। চ্যান্সেলার কিসিংগার নাকি এই শর্তে রাজীও ছিলেন এবং এই উদ্দেশে কথাবার্তা বলার জন্য পশ্চিম জার্মানীর মেয়র সুইৎজ্‌কে নির্দেশও দেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত কোন আপোষ হয় নি।

সোভিয়েট পক্ষের তীব্র আপত্তি সত্ত্বেও ৫ই মার্চ নির্দিষ্ট তারিখে পশ্চিম বার্লিনের পশ্চিম জার্মানীর যুক্তরাষ্ট্রীয় আইনসভা ও অঙ্গরাজ্যগুলির আইনসভার মোট ১০৩৬ জন সদস্য মিলিত হয়ে নতুন রাষ্ট্রপতি নির্বাচন করেছেন। পূর্ব জার্মানী বা সোভিয়েট য়ুনিয়ন আপত্তি জানালেও কোন রকম বাধা দেবার চেষ্টা করে নি। মূল ভূখণ্ড থেকে সদস্যদের পশ্চিম বার্লিনে যাবার পথেও কোন বাধার সৃষ্টি করে নি। অনেকের ধারণা, মার্কিন রাষ্ট্রপতি রিচার্ড নিক্সনের সঙ্গে সোভিয়েট রাষ্ট্রনেতাদের যে বৈঠকের কথাবার্তা চলছে, সেদিকে তাকিয়ে সোভিয়েট পক্ষ থেকে কোন গোলমাল করা হয় নি। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য, নির্বাচনের মাত্র ক'দিন আগে নিক্সন পশ্চিম বার্লিন ঘুরে গেছেন।

হাইনরিখ লুবকের জায়গায় পশ্চিম জার্মানীর নতুন রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হয়েছেন সোস্যালিস্ট নেতা ডঃ গুস্তাভ হাইনেমান। হাইনেমান কিসিংগার মন্ত্রিসভায় বিচারমন্ত্রীর পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন।

ইজরায়েল :

গত সপ্তাহে প্রধানমন্ত্রী লেভি এশকল হঠাৎ হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে মারা গিয়েছেন। এশকলের জায়গায় নতুন প্রধানমন্ত্রী হয়েছেন সত্তর বৎসরের বৃদ্ধা অবসরপ্রাপ্ত ও অসুস্থ ঠাকুমা-সদৃশ গোল্ডা মেয়ার।

নিয়ত সংঘর্ষে রত ইজরায়েলের প্রধানমন্ত্রী তরুণতর কারও হওয়া উচিত ছিল, এমন একজন বৃদ্ধার নিয়োগ অনেকেরই

পছন্দ হয় নি। একাধিক পত্রিকা একথা প্রকাশ্যে বলেছে। কিন্তু গোল্ডা মেরকে প্রধানমন্ত্রী না করে কোয়ালিশন সরকারের প্রধান দল লেবার পার্টির অন্য কোন উপায়ও ছিল না। কারণ, এশকলের পর নেতৃত্বের প্রশ্নে দুই প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বী ইগাল অ্যালন ও মশে ডায়ানের মধ্যে মিটমাটের কোন সম্ভাবনা নেই। আগামী নভেম্বরে সাধারণ নির্বাচন। এখনই যদি নেতৃত্বের ব্যাপারে দলের মধ্যে বিরোধ উপস্থিত হয় তা হলে দলের ক্ষতি হবে, নির্বাচনে বিপর্যয় দেখা দেবে। তাই দু'জনের কাছে গ্রহণযোগ্য তৃতীয় ব্যক্তি হিসাবে, গোল্ডা মেরকে গ্রহণ করা হয়েছে। গোল্ডা মেরের সরকার নভেম্বরের সাধারণ নির্বাচন পর্যন্ত কাজ করবে।

গোল্ডা মের আপোষের প্রার্থী এবং বৃদ্ধা হলেও ইজরায়েলের রাজনীতিতে তিনি একজন বিশিষ্ট ব্যক্তি। তিনি ইজরায়েলের প্রাক্তন পররাষ্ট্রমন্ত্রী এবং প্রধান রাজনৈতিক দল লেবার পার্টির প্রাক্তন সাধারণ সম্পাদক। নিজের দল ছাড়াও দেশের অন্য দুটি প্রধান দল মাপাম ও কমিউনিস্ট পার্টিও তাঁর সমর্থক। আরবদের সম্পর্কে তাঁর মনোভাব খুবই কঠোর। তিনি আরবদের সঙ্গে যুদ্ধ চালিয়ে যাবার নীতিতে বিশ্বাসী। প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী ডেভিড বেন-গুরিয়নের মন্ত্রিসভাতেও ছিলেন গোল্ডা মের। বেন-গুরিয়ন গোল্ডা মের সম্পর্কে একবার বলেছিলেন, "তাঁর মন্ত্রিসভায় গোল্ডা মেরই হলেন একমাত্র পুরুষ"। কারণ, আরবদের বিরুদ্ধে সবচেয়ে কঠোর মনোভাব গ্রহণ করেছিলেন এই ভদ্রমহিলা।

তবু ৮ই মার্চ প্রধানমন্ত্রীর দায়িত্ব গ্রহণের পর প্রথম যে বিবৃতি দিয়েছেন গোল্ডা মের, তাতে তিনি বলেছেন, আরবদের সঙ্গে শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য তিনি আন্তরিকভাবে চেষ্টা করবেন এবং আরবরা যদি তাঁদের সঙ্গে একত্র বসে মীমাংসার চেষ্টা করে তবে অধিকৃত অঞ্চলের 'কিছু' ছেড়ে দিতেও তিনি রাজী আছেন।

গোল্ডা মের 'কেয়ারটেকার' সরকারের প্রধানমন্ত্রীরূপে ক মাস কাজ চালাবেন। কিন্তু তারপর কে? লেবার পার্টির নেতারা চাইবেন এশকল মন্ত্রিসভার সহকারী প্রধানমন্ত্রী ইগাল অ্যালনকে। দলের মধ্যে তাঁর সমর্থনই বেশি। কিন্তু সাধারণ মানুষের মধ্যে প্রতিরক্ষামন্ত্রী মশে ডায়ানের জনপ্রিয়তা বেশি। গোল্ডা মের সম্ভবত ইগাল অ্যালনকেই সমর্থন করবেন। তবে অ্যালন বা ডায়ান, যেই ইজরায়েলের কর্তা হোন না কেন, আরবদের সম্পর্কে নীতির

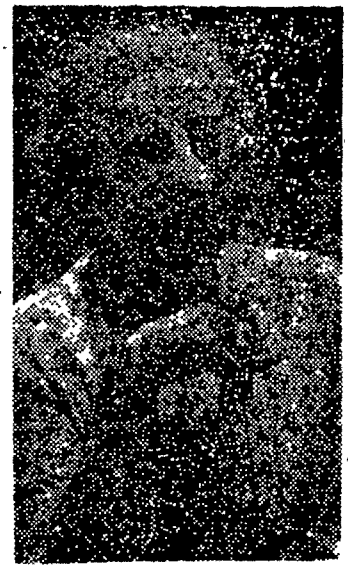

গোল্ডা মের

কোন পরিবর্তন হবে না। এ ব্যাপারে সবাই একমত।

সোভিয়েট য়ুনিয়ন :

চীনা সৈন্যরা জোর করে সোভিয়েট ভূখণ্ডে প্রবেশ করে সোভিয়েট সীমান্তরক্ষীদের মারধর করেছে এবং এই হামলার ফলে সোভিয়েট পক্ষে ৩১ জন নিহত ও ১৪ জন আহত হয়েছেন।

ঘটনাটি ঘটেছে ২রা মার্চ ভ্লাডিভস্টকের উত্তরে সোভিয়েট-চীন সীমান্তে উসুরি নদীর দ্বীপ দমনস্কিতে। সোভিয়েট সূত্রে বলা হয়েছে, ২০০ জন চীনা হানাদার বে-আইনীভাবে এই সোভিয়েট এলাকায় প্রবেশ করে হামলা চালিয়েছে। চীনের পক্ষ থেকে ঠিক এর পাল্টা বক্তব্য রাখা হয়েছে। তাদের কথা : এই অঞ্চলটি অবিসম্বাদিতভাবে চীনের অন্তর্ভুক্ত। এই দ্বীপের নাম চেনপাও। সংঘর্ষ সম্পর্কে চীনা ভাষ্য হল, সোভিয়েট য়ুনিয়নের লোকেরা অন্যায়ভাবে চেনপাও-তে প্রবেশ করে আক্রমণ করেছে।

সোভিয়েট য়ুনিয়নের প্রতিরক্ষামন্ত্রী মার্শাল গ্রেচকোর সঙ্গে নয়াদিল্লীতে সাক্ষাৎ ও আলোচনার পর ভারতের প্রতিরক্ষামন্ত্রী সর্দার স্বরণ সিং বলেছেন, কেবল ২রা মার্চ নয়, সারা ১৯৬৮ সাল ধরেই চীন-সোভিয়েট সীমান্তে উভয়পক্ষের মধ্যে সংঘর্ষ হয়েছে। আসলে ১৯৬০ সাল থেকেই চীন ও সোভিয়েট য়ুনিয়নের মধ্যে শুরু হয়েছে সীমান্ত বিরোধ। মাঝে-মাঝেই এই বিরোধ বড় সংঘর্ষের আকার ধারণ করে। যেমন এবার হয়েছে।

দমনস্কি (চেনপাও) সংঘর্ষকে উপলক্ষ করে পিকিং ও মস্কো দু'জায়গাতেই বিরাট বিক্ষোভ প্রদর্শিত হয়েছে। ৩রা মার্চ পিকিং-এ সোভিয়েট দূতাবাসের সম্মুখে বিক্ষোভ দেখানো হয়। বিক্ষোভকারীদের হাতে দূতাবাসের কর্মী ও 'তাস' এর সংবাদদাতারা প্রহৃত হন। বিক্ষোভকারীদের মুখে ধ্বনি ছিল : 'কোসিগিনকে ফাঁসি দাও', 'ব্রেজনেভকে পুড়িয়ে মারো'। ৭ই মার্চ মস্কোতে চীনা দূতাবাসের সম্মুখে লক্ষ লোকের বিক্ষোভ হয়েছে।

উভয় পক্ষই উভয় পক্ষকে সাম্রাজ্যবাদী, পররাজ্যগ্রাসী প্রভৃতি বলে গাল দিচ্ছে। সোভিয়েট পররাষ্ট্রদপ্তরের প্রেস বিভাগের প্রধান লিওনিদ জামিয়াতিন বলেছেন, "চীনে অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে যে বিপর্যয় সৃষ্টি হয়েছে, জনসাধারণের দৃষ্টি সেদিক থেকে ফেরানোর জন্যই এই সব হঠকারী কাজ করা হচ্ছে।" লক্ষণীয়, চীনের কমিউনিস্ট পার্টির নবম কংগ্রেসের ঠিক পূর্বে এই আক্রমণ চালানো হল। চীনাদের মধ্যে সোভিয়েট বিরোধী মনোভাব আরও বেশি করে জাগিয়ে তোলাই এর উদ্দেশ্য।

চীনের পক্ষ থেকে বলা হয়েছে, চিয়াং কাইশেকের সঙ্গে যোগসাজসে সোভিয়েট য়ুনিয়নের কমিউনিস্ট নেতারা চীনের ওপর হামলা চালিয়েছেন। এই প্রসঙ্গে চীনারা গত বৎসর রুশ সাংবাদিক ভিক্টর লুই-এর তাইওয়ান সফর এবং সেখানে জাতীয়তাবাদী চীন সরকারের প্রতিরক্ষামন্ত্রী ও চিয়াং কাইশেকের পুত্র চিয়াং চিং কুয়োর সঙ্গে তাঁর আলোচনার উল্লেখ করছে। চীনা বক্তব্যে বলা হয়েছে, সোভিয়েটের শোধনবাদী কমিউনিস্ট নেতারা জারের পদাঙ্ক অনুসরণ করছেন। পুরোনো জার সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠাই তাঁদের উদ্দেশ্য।

(৯-৩-৬৯)

যুক্তফ্রন্ট সরকার ময়ীদেখী

যুক্তফ্রন্টের ৩২ দফা কর্মসূচীতে যে বিরাট কর্মযজ্ঞের আভাস আছে তার মূল নির্দেশ করা হয়েছে প্রথম দফায়। এই একটি মাত্র দফা কার্যকরী করতে পারলে বাকী কাজ করার পথ প্রশস্ত হবে। এই একটি মাত্র দফা কার্যকরী করার দাবি সমস্ত মানুষের। অত্যন্ত সংগত কারণেই এই দফাকে ফ্রন্ট প্রথম স্থান দিয়েছে।

প্রথম দফায় খুব অল্প কথায় জনগণের কাম্য সরকারের চরিত্র পরিস্ফুট। এই দফায় বলা হয়েছেঃ যুক্তফ্রন্ট সরকার একটি সৎ এবং ক্লেদমুক্ত প্রশাসনিক ব্যবস্থা পত্তন করবে। প্রশাসনকে দক্ষ, নিরপেক্ষ এবং মিতব্যয়ী করে গড়ে তুলবে। সরকারের সিদ্ধান্তসমূহ দ্রুত কার্যকরী করা এবং জনগণের অসন্তোষ দূর করার জন্য অবলম্বনীয় ব্যবস্থাগুলি নির্ধারণের জন্য একটি প্রশাসনিক সংস্কার কমিটি গঠন করা হবে।

আই-সি-এস, আই-এ-এস এবং আই-পি-এস ক্যাডারের আমলারা যেসব বিধি দ্বারা পরিচালিত যুক্তফ্রন্ট সরকার সেগুলোকে এমনভাবে পরিবর্তন করার চেষ্টা করবে, যাতে তাদের নিয়ন্ত্রণ করার প্রকৃত এবং কার্যকরী ক্ষমতা রাজ্য সরকারের উপর বর্তায়। রাজ্য সরকার পুলিশ কোডকেও এমনভাবে বদলাবার চেষ্টা করবে, যাতে জনসাধারণের স্বার্থ এবং অধিকারের বিরুদ্ধে পুলিশ কাজ না করতে পারে। জেল কোডেরও প্রয়োজনীয় পরিবর্তন সাধন করা হবে।

জনসাধারণের মনের কথাটি এত স্পষ্ট করে ইতিপূর্বে আর কখনও বলা হয় নি। আজ তাই যুক্তফ্রন্ট সরকার এবং সরকার পরিচালক যুক্তফ্রন্ট কমিটিকে প্রথম স্ফাটির কথাই বারংবার স্মরণ করিয়ে দিতে চাই।

একটি সৎ ও ক্লেদমুক্ত সরকার, একটি দক্ষ প্রশাসনিক ব্যবস্থা যার মধ্যে আমাদের এই দরিদ্র দেশে অপব্যয়ের কোঁক থাকবে না এবং যাঁরা নিরপেক্ষভাবে রাষ্ট্রের কাজ-কর্ম চালাবেন। গত বিশ বৎসর ধরে এই ধরণের একটি সরকারের কামনা ছিল প্রতিটি মানুষের। ১৯৪৭ সালের ১৫ই আগস্টে দেশের মানুষ কংগ্রেস নেতৃত্বের কাছে এই ধরণের একটি সরকার-ই চেয়েছিল, বিশ বৎসরে তাদের সমস্ত আশা-আকাঙ্ক্ষা শেষ হয়েছে। অবাক বিস্ময়ে তারা তাকিয়ে দেখেছে সরকার দিনের পর দিন অকেজো হয়ে পড়েছে। সততার নামগন্ধ নেই—পক্ষপাতমূলক আচরণ সরকারের বৈশিষ্ট্য হয়ে দাঁড়িয়েছে। এর ফাঁকে ফাঁকে প্রশাসনিক ব্যবস্থা আবদ্ধ হয়েছে দুর্নীতির বেড়াজালে।

মাথাভারী প্রশাসনিক ব্যবস্থা সরকারের অর্থভাণ্ডার বিনা কাজে এবং অকাজে নিঃশেষ করার জন্য দায়ী। তারপর উপর থেকে নিচুস্তর পর্যন্ত যে দীর্ঘসূত্রতার জাল ছড়িয়ে পড়েছে, লাল ফিতার বাঁধন নামে তার পরিচিতি।

লাল ফিতার বাঁধন কাটানোর জন্য এবং জনসাধারণের অভিযোগের প্রতিকারের দ্রুত ব্যবস্থা করার উদ্দেশ্যে রাজ্যস্তরে প্রশাসনিক সংস্কার কমিটি গঠনের কথা বলা হয়েছে। সরকারী কাজে একটি সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে লাগে কয়েকমাস—তারপরে তা কার্যকরী করতে তার বহুগুণ সময় লেগে যায়। উপর থেকে শুরু করে সর্বনিম্নস্তরে গাফিলতি আর তার সঙ্গে সঙ্গে বাসা বেঁধে আছে দুর্নীতি।

ঊর্ধ্বস্তরে সৎ ও দক্ষ প্রশাসন ব্যবস্থা কায়েম না করা পর্যন্ত নিচুস্তরে উৎসাহ সঞ্চয় করা যাবে না। অত্যন্ত দুঃখের হলেও একথা আজ অস্বীকার করার উপায় নেই যে, গেজেটেড অফিসারদের সীমানা ছাড়িয়ে দুর্নীতি আর অকর্মণ্যতা অত্যন্ত নিম্নস্তরে ছড়িয়ে পড়েছে। একটি অতি সাধারণ কাজের জন্যও মানুষকে দিনের পর দিন হয়রান হতে হয়। উৎসাহ তার প্রেরণা যোগাতে পারলে এদেশ দিয়েও কাজ করানো সম্ভব যুক্তফ্রন্টের নয়মাসের শাসনকালে তার পরিচয় পাওয়া গেছে। যে স্টেট বাস আর ট্রামে কর্মীদের বিরুদ্ধে অজস্র অভিযোগ শোনা যায়, সেখানেও দেখা গেল নতুন উৎসাহ আর প্রেরণায় আয়বৃদ্ধির সূচনা। প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখযোগ্য রাজ্য সরকারের শিক্ষাদপ্তরের কর্মীরা কোন ওভারটাইম দাবি না করে রাত পর্যন্ত কাজ করে পূজার ছুটির আগে শিক্ষকদের বেতনের টাকা পাঠানোর ব্যবস্থা করে দিয়ে নজির সৃষ্টি করেছিলেন।

রাজ্য সরকারের যে-কোন দপ্তরে ঢুকে কোন কাজ সম্পন্ন করানোর জন্য জনসাধারণকে যে দুর্ভোগ ভোগ করতে হয় তা দূর করার ব্যবস্থা করলে নতুন কিছু পরিকল্পনা ছাড়াও, জনসাধারণের দীর্ঘদিনের পুঞ্জীভূত অসন্তোষ দূর করা যাবে। আর এ-কাজ করতে হলে আমলাতন্ত্রের মনোভাবের পরিবর্তন ঘটাতে হবে।

উপরের স্তরের কর্মচারীদের মধ্যে দক্ষ ও সৎ অফিসারের অভাব নেই। কিন্তু বর্তমানে যে প্রশাসনিক কাঠামো আছে তাতে কলুষমুক্ত হয়ে কাজ করা অসম্ভব। রন্ধ্রে রন্ধ্রে পঙ্কিল আবহাওয়া সমস্ত পরি-

নতুন চেতনার ও নবজীবনের ইংগিতে সম্পূর্ণ

গ্রামময় ভারতের অগণিত মানুষের সংগ্রামে মুখর সুবৃহৎ রাজনৈতিক উপন্যাস

সাগরসঙ্গমে

লিখছেন

শ্রীসুশীল জানা

[দীর্ঘ কয়েক বছর ধরে ইনি বাংলা সাহিত্যের এই লোকায়ত উপন্যাসের উপকরণ-চিন্তায় ব্যাপৃত রয়েছেন।]

উপন্যাসটি সাপ্তাহিক বসুমতীতে আগামী ২৭শে মার্চ থেকে ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হবে।

বেশকে বিষাক্ত করে রেখেছে। কোন সৎ ও দক্ষ অফিসার সৎপথে এগিয়ে চললে তাঁর জীবনে উন্নতি ঘটবে না। এছাড়া এই প্রশাসনিক কাঠামোর মধ্যে থেকে অনেক সৎ অফিসারেরও মধ্যে জনকল্যাণের মানসিকতা নষ্ট হয়ে গেছে বা জন্মাতে পারে নি। কাজেই যে-কোন সিদ্ধান্ত তাঁরা গ্রহণ করেন তা কায়েমীস্বার্থের অনুকূলে অজান্তেই গিয়ে পড়ে। এই মনোভাবের পরিবর্তনের দায়িত্ব গ্রহণ করতে হবে মন্ত্রিসভাকে।

যুক্তফ্রন্টের মন্ত্রিসভায় যেসব সদস্য আছেন, যোগ্যতার দিক থেকে বিবেচনা করলে বিগত বিশ বৎসরের সব কয়টি মন্ত্রিসভার সদস্যদের তুলনায় তাঁরা নিঃসন্দেহে শ্রেষ্ঠ। ব্যক্তিগত সততা জনসাধারণের প্রতি দরদ প্রভৃতি গুণ তাঁদের আছে। তাঁরা নিজেরা আদর্শ স্থাপন করে এবং পূর্বেকার কংগ্রেসী মন্ত্রিসভার মত আমলাতন্ত্রের উপর নির্ভরশীল হয়ে না থাকলে দপ্তরের আবহাওয়াকে পরিবর্তন করতে পারবেন। দুঃখের বিষয় যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রিসভার নয় মাসের আমলেও কোন কোন মন্ত্রীর আমলাতন্ত্রের উপর নির্ভরশীলতার উদাহরণও দেখা গেছে। এবার সর্বপক্ষে এই ঝোঁক কাটাতে হবে।

এ-কাজ সহজসাধ্য নয়। উপরের আমলাতন্ত্রকে সুনিয়ন্ত্রিত করে এবং সততা ও পক্ষপাতহীনতার দৃষ্টান্ত স্থাপন করে নিচেরতলায় কর্মপ্রেরণা বৃদ্ধি করতে হলে, শুধু কতকগুলি নিয়ম-কানুনের পরিবর্তন ঘটালেই চলবে না।

যুক্তফ্রন্টের কর্মসূচীতেই এই সমস্যার প্রকৃত সমাধানের হদিস আছে। বর্তমান ব্যবস্থার মধ্যে আমলাতন্ত্রকে সর্বশক্তিমান করে রাখার জন্য আই-সি-এস, আই-এ-এস, আই-পি-এস প্রভৃতি ক্যাডারের অফিসারদের নিয়ন্ত্রণ করার পূর্ণ ক্ষমতা রাজ্য সরকারের নেই। তাঁদের কার্যাবলী নিয়ন্ত্রণ কেন্দ্রীয় সরকারের অনুমোদন সাপেক্ষ। এজন্যই উক্ত স্তরের অফিসারদের মধ্যে ডোন্ট কেয়ারের মনোভাব লক্ষ্য করা যায়।

তাঁদের এই মনোভাবের পরিবর্তন ঘটাতে হলে সরকারী বিধির পরিবর্তন ঘটাতে হবে। ইংরেজ আমলের আমলাতান্ত্রিক ব্যবস্থা আজো অটুট। ফলে কায়েমীস্বার্থের সঙ্গে আমলাতন্ত্রের যোগসূত্র ও সম্পর্ক গভীরতর হয়ে আছে। কায়েমীস্বার্থের উপর যে-কোন আঘাত পড়লেই আমলাতন্ত্রের পরোক্ষ অসহযোগিতা শুধু নয়, তাঁদের পক্ষ থেকে প্রত্যক্ষ বাধা সৃষ্টি হয়। শুরু হয় নানা চক্র ও চক্রান্ত। আমলাতন্ত্রের এই প্রতিরোধকে ভাঙার জন্য তাঁদের উপর রাজ্য সরকারের নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতাকে দৃঢ় করে আনতে হবে।

এ-কাজে হাত দিলেই বাধা আসবে। চারদিক থেকে চীৎকার শুরু হবে, রাজ্য সরকার ভারতের সংহতিকে বিপন্ন করে তুলছে। কেন্দ্র এবং পশ্চিমবাংলার কায়েমী স্বার্থের পক্ষ থেকে "গেল গেল" ধ্বনি তুলে বিঘ্ন সৃষ্টি করতে হবে।

তাই যুক্তফ্রন্ট সরকার এবং যুক্তফ্রন্টকে একদিকে যেমন প্রশাসনিক ব্যবস্থার পরিবর্তন ঘটানোর চেষ্টা করতে হবে, অন্যদিকে এই প্রচেষ্টার পিছনে দেশের অগণিত মানুষের বিপুল সমর্থন গড়ে তোলার জন্য আন্দোলনের মাধ্যমে তার জমি প্রস্তুত করিয়ে নিতে হবে।

কেন্দ্র আর কায়েমীস্বার্থের বাধাকে প্রতিহত করার জন্য ভিতরে ও বাইরের এই আন্দোলনকে এগিয়ে নিয়ে গেলেই যুক্তফ্রন্টের প্রথম কর্মসূচী রূপায়ণের দিকে অগ্রসর হওয়া সম্ভব হবে।

তাই আজ এই মুহূর্তে যুক্তফ্রন্ট, যুক্তফ্রন্ট সরকার এবং যুক্তফ্রন্ট সরকারের প্রশাসনিক দপ্তরের মন্ত্রী শ্রীজ্যোতি বসুকে তাঁদের দেওয়া প্রথম প্রতিশ্রুতির কথা স্মরণ করিয়ে দিচ্ছি। রাজ্যের জনসাধারণ আপনাদের কাছে অনেক প্রত্যাশা করে। এবার আপনারা সময় পেয়েছেন—পেয়েছেন কাজ করবার পক্ষে উপযোগী বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠতা। অত্যন্ত স্বাভাবিকভাবেই ৩২ দফা কর্মসূচীর যে দফাকে আপনারা প্রথম স্থান দিয়েছেন। তাকে ধাপে ধাপে কার্যকরী করার উপর সরকারের সাফল্য, জনগণের কল্যাণ এবং বর্তমান সীমাবদ্ধতাকে অতিক্রম করে আপনাদের অভীপ্সিত সমাজতন্ত্রের দিকে সঠিক পদক্ষেপ নির্ভর করে। স্মরণ রাখবেন জনসাধারণ, আপনাদের প্রতিটি পদক্ষেপ অত্যন্ত সতর্কতার সঙ্গে লক্ষ্য করছে।

—শ্রীসর্বদর্শী

[চলবে]

বৈষ্ণব-সাহিত্যের অমূল্য অবদান

ভক্তিজগতের কৌস্তুভরত্ন, ভগবদ্ভক্তগণের সাধনার ধন, ভক্তের তুলসী-মালা সদৃশ মহাপবিত্র ভক্তিশাস্ত্র সমন্বয়।

বৈষ্ণব গ্রন্থাবলী

শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রলাপ ও শিক্ষাষ্টক

শ্রীচৈতন্যদেবের শ্রীকৃষ্ণলাভের জন্য যে উৎকণ্ঠা, এই 'প্রলাপে' তাহা অভিব্যক্ত। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শ্রীমুখনিঃসৃত 'শিক্ষাষ্টক শ্লোকই' তাঁহার একমাত্র রচনা। শ্রীল কৃষ্ণদাস গোস্বামীরা সুললিত পদ্যানুবাদে এই অমিয় মাধুরী লীলায়িত।

নরোত্তম বিলাস

বৈষ্ণবগণের পরম উপভোগ্য উপজীব্য ভক্তিচরিতামৃত।

দুর্লভসার

শ্রীচৈতন্যমঙ্গল-রচয়িতা শ্রীল লোচনদাস বিরচিত, বৈষ্ণবগণের সংপূজিত।

আত্মতত্ত্ব

বৈষ্ণব দর্শনের সংক্ষিপ্ততম অনুসরণ।

মনঃশিক্ষা

শ্রীপ্রেমানন্দ দাস ঠাকুর বিরচিত। বৈষ্ণব-সিদ্ধান্ত সাধন-ভজনের নিগূঢ় মর্মসমাহিত।

শ্রীচমৎকার চন্দ্রিকা

পরম পণ্ডিত শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী প্রণীত সংস্কৃত গ্রন্থ হইতে তাঁহার সুযোগ্য শিষ্য পরম বৈষ্ণব শ্রীল কৃষ্ণদাসের সুললিত পদ্যানুবাদ।

পাষণ্ড-দলন

মূর্তিমান বৈরাগ্য শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর বিরচিত প্রেমভক্তির লহর-লীলা।

ভক্তিতত্ত্বসার

হাটপত্তন, শ্রীশ্রীগুরুবন্দনা, নামসংকীর্তন, চৌত্রিশ পদাবলী, শ্রীকৃষ্ণের অষ্টোত্তর শতনাম, নরোত্তম দাসের প্রার্থনা, প্রেমভক্তি চন্দ্রিকা। সুলভে নামমাত্র মূল্যে বিতরিত।

মূল্য: ৬·৫০

বসুমতী প্রাইভেট লিমিটেড : ১৬৬, বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী স্ট্রীট, কলি-১২

নির্বাচনের পরে

সাগর বিশ্বাস

একদা এক কংগ্রেসী কর্মী সরোষে বলেছিল—আমরা যারা যুবকেরা কংগ্রেস করছি, তারা শুধু কংগ্রেস নয়—'নকশাল কংগ্রেস'। যখন ক্ষমতায় যাব তখন আমাদের প্রথম ও প্রধান কাজ হবে কমিউনিস্ট দেশদ্রোহীগুলিকে ঝেঁটিয়ে বিদেয় করা। সেই তরুণ কর্মী সেদিন উত্তেজিত হয়েই বলেছিল কথাগুলি। হয়তো উত্তেজনার কারণও ছিলো। কিন্তু কারণ যাই থাক—কমিউনিস্ট সম্পর্কে তার এ উক্তি কোন বিচ্ছিন্ন উক্তি নয়। এ উক্তি কংগ্রেস এবং চ্যবন সাহেবদের কথার সংগে একসুরে বাঁধা। নতুনত্ব যেটুকু তা ওই 'নকশাল' কথাটির মধ্যে। তবে 'নকশাল'কে এখানে বিশেষণের মতোই ব্যবহার করা হয়েছে।

কিন্তু নির্বাচনের পরে চ্যবন-অতুল্য-বাবুদের সংগে সুদূর গ্রামাঞ্চলের ওই তরুণ কর্মীরও অতবড়ো সাধের আসন ভেঙে চৌচির হয়ে গেলো। কংগ্রেসের পরীক্ষাগারে এখন এই দুর্বিপাকের কারণের রসায়ন করে পাচন তৈরি করবার পালা চলছে। যাঁরা নির্বাচনের আগে জয়লাভের ব্যাপারে সিওর-ওভারসিওর ছিলেন, মুহূর্তে তাঁরা ন্যাকা বনে গেলেন—'তাই ত'—ব্যাপারটা বড়োই রহস্যময়।' যে সকল সংবাদপত্র কংগ্রেসের জন্য জীবনপণ করে দাঁড়িয়েছিল তারাও রাতারাতি সব বামপন্থী হয়ে গেলো। তাই সেদিন জনৈক বন্ধু কৌতুকচ্ছলে বলছিলেন—বাংলা দেশের সঠিক, নির্ভীক এবং নিরপেক্ষ সংবাদ জানতে হলে প্রথম শ্রেণীর দৈনিকটি পড়ুন। কিন্তু ওই রহস্যময় ব্যাপারটির সত্যিই কি কোনো আভাস পাওয়া যায় নি? তাহলে কেন্দ্রীয় মন্ত্রীরা মৌমাছির ঝাঁকের মতো ছুটে এসেছিলেন কেন? চ্যবন-জগজীবনেরা 'দেশ কী অখণ্ডতা কে লিয়ে' বাংলার অজ-পাড়াগাঁয়ে চীৎকার করে বেড়িয়েছিলেন কেন? আর এখন মাছ না পেয়ে ছিপ কামড়াচ্ছেন এই বলে যে, বাংলা দেশের যুক্তফ্রন্টের অন্যান্য শরিক দলকে বাম কমিউনিস্ট দল গিলে, খেয়ে ফেলবে। এদিকে রাজ্য-কংগ্রেস নেতারা ত' সব বানপ্রস্থে যান আর কি? কংগ্রেস ক্ষমতায় এলে মুখ্যমন্ত্রিত্ব কার ভাগে পড়তো জানি না—তবে কোন তরুণের ভাগ্যে শিকে ছিঁড়তো না। কিন্তু বিরোধীদলের নেতৃত্ব করবার বেলায় আজ তরুণ রক্তের হঠাৎ আদর বেড়ে গেলো। অন্যরা সব সম্ভবত এখন বানপ্রস্থে যাবার কথা ভাবছেন! কিন্তু এগুলি আমাদের আলোচনার বিষয়বস্তু নয়। নির্বাচনের আগে গ্রামে গ্রামে, হাটে, বাজারে, গঞ্জে ঘুরে ঘুরে মানুষের মনের কথার ভাষা পড়তে চেয়েছিলাম। সে ভাষা যথারীতি পাঠকের কাছে রীলে করেছি বারবার। তার সত্যাসত্যের বিচারক তাঁরাই। তবু আত্মতৃপ্তি এখানে যে, রাজধানীর কোনো শীতলকক্ষে বসে সেসব সমীক্ষা আমরা তৈরি করি নি—

শ্রীমতী পারুল সাহা

মরুভূমির উটের মতোই গ্রামের ধূলি-বালির মধ্যে কান পেতে মানুষের মনের কথা বুঝতে চেয়েছি। সেই মনের কথা আজ ভাষায় রূপান্তরিত হয়েছে—অগুণতি মানুষের রায়ে কংগ্রেসকে বিদায় নিতে হয়েছে বাংলা দেশের শাসনক্ষমতা থেকে। প্রতিষ্ঠিত হয়েছে জনতার যুক্তফ্রন্ট। কিন্তু আজকের অবস্থা কি? আমরা আজও ঘুরছি কিন্তু সেদিনের মতো হাটে-বাজারে 'পনেরো আনা' মানুষের ভিড়ের মধ্যে নয়। সেই মানুষের প্রতিনিধি হয়ে যাঁরা এলেন তাঁরা কি ভাবছেন—কি বলছেন? জনতা তাঁদের ভাবনার সংগে পরিচিত হতে চায়। যেখানেই গেছি যুক্তফ্রন্ট বিধানসভার সদস্যদের জিজ্ঞেস করেছি—নির্বাচনের পরে স্পষ্টতই দেখা যাচ্ছে যে রাজ্যে যুক্তফ্রন্টের একটি 'ইমেজ' তৈরি হয়ে গেছে। জনগণের মনে এই ইমেজকে রক্ষা করবার দায়িত্ব যুক্তফ্রন্টের। কিন্তু বিভিন্ন কায়েমী স্বার্থের প্রতিকূলতার মধ্যে এই ইমেজকে রক্ষা করা কতটা সম্ভব হবে বলে আপনারা মনে করেন? ইতিমধ্যেই মন্ত্রিসভা গঠন সম্পর্কিত দরকষাকষিতে সাধারণের মধ্যে একটু উষ্মা লক্ষিত হয়েছে। সে উষ্মা কলকাতায় নেতারাও দেখেছেন। জনতা আজ যুক্তফ্রন্টের বিযুক্তির কথা কল্পনাও করতে পারে না—বিযুক্তি ঘটলে তা তারা সহ্যও করবে না। বিযুক্ত দলগুলিকে তারাই প্রকৃতপক্ষে যুক্ত করে গড়েছে। জনতার মনে সেই ইমেজকে রক্ষা করবার দায়িত্ব যুক্তফ্রন্ট অস্বীকার করতে পারে না। জিজ্ঞেস করেছি কেন্দ্রীয় কংগ্রেস সরকার কি যুক্তফ্রন্ট সরকারের সংগে পূর্ণ সহযোগিতা করবেন? যদি না করেন যুক্তফ্রন্ট কি করবে? উত্তর পেয়েছি সর্বত্রই প্রায় একই রকম। যুক্তফ্রন্ট জনতারই ফ্রন্ট! জনমনে এর ইমেজকে রক্ষা করবার দায়িত্ব সে অস্বীকার করতে পারে না। জনতার নিকট থেকে দূরে সরে গেলে রাজনীতিতে কোথায় স্থান হয়—কংগ্রেস তার অতি আধুনিক উদাহরণ। কাজেই জনতার স্বার্থ, জনতার অসন্তোষকে উপেক্ষা করে যুক্তফ্রন্টও রেহাই পেতে পারে না—ইতিহাস এই কথাই বলে। বিধানসভার কমিউনিস্ট সদস্য শ্রীঅজিত গাঙ্গুলী বললেন, 'যুক্তফ্রন্ট কয়েকটি বিভিন্ন দলের বিভিন্ন মতাদর্শের সমন্বয়ে গঠিত রাজনৈতিক শিবির। তবু একথা সত্য, একমাত্র Unification-ই যুক্তফ্রন্টের Image-কে অম্লান রাখতে পারে। অন্যথায় অঘটন ঘটলে তা অস্বাভাবিক কিংবা অনৈতিহাসিক হবে না। আজ যদি কেন্দ্র বিদ্বেষবশে এই সরকারের সংগে সহযোগী মনোভাব না দেখায়, তাহলে অনিবার্যভাবেই কেন্দ্র-রাজ্য সম্পর্ক তিক্ত হয়ে উঠবে। কেন্দ্রও তো রাজ্যের সহযোগিতার প্রশ্ন অস্বীকার করতে পারে না—তারও তো সহযোগিতা আবশ্যক।'

শ্রীগাঙ্গুলী আরো যা যা বললেন, একে একে বলছি। তার আগে তাঁর সংক্ষিপ্ত পরিচিতি জানানো দরকার।

শ্রীগাঙ্গুলীর রাজনৈতিক জীবন শুরু হয় ছাত্রাবস্থাতেই। পরাধীন ভারতে সন্ত্রাসবাদী দল 'যুগান্তরে'র সংগে তিনি জড়িত ছিলেন। বিখ্যাত মির্জাপুর বোমার মামলার অন্যতম আসামী হিসেবে প্রথম কারাবরণ করতে হয়। জেলখানার সংগে অবশ্য তাঁর আজীবনের আত্মীয়তা। পরবর্তীকালেও বহুবার কারাবাস করেছেন। বি-এ পাশ করেছেন কারাগারে থেকে। শান্ত সৌম্য স্বভাবের মানুষটিকে দেখে বোঝা কঠিন যে, ভেতরে কতবড় একটি দৃঢ়চেতা মানুষ লুকিয়ে আছে। ১৯৪২ সালের 'ভারত ছাড়ো' আন্দোলনের সময় বনগাঁয় অনেক কংগ্রেস কর্মীকে ছেড়ে দিলেও—পুলিশ ছেড়ে দেয় নি যশোর জেলা কমিউনিস্ট পার্টির নেতা তরুণ অজিত গাঙ্গুলীকে। সাড়ে তিন বছর পরে আবার ফিরে আসেন তিনি তাঁর মেহনতী কৃষকদের কাছে। এই সেদিনও খাদ্য-আন্দোলনের সময় তাঁকে কারাগারে ঢুকতে হয়েছিলো। বর্তমানে তিনি ২৪ পরগনা জেলা কমিউনিস্ট পার্টির সম্পাদক এবং পশ্চিমবঙ্গ প্রদেশ কৃষক-সভার সহ-সম্পাদক। ১৯৫২ সাল থেকে প্রতি নির্বাচনেই তিনি বনগাঁ থেকে কমিউনিস্ট প্রার্থীরূপে দাঁড়িয়েছেন। হার-জিতের মধ্যে দিয়ে তাঁকে এগিয়ে আসতে হয়েছে। '৫৭ সালে যে বিপুল ভোটে জয়লাভ করেছিলেন এবার তেমন হয় নি ; তবুও তাঁর নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী কংগ্রেস প্রার্থীর সংগে ভোটের ব্যবধান সাত হাজারেরও বেশি। ব্যক্তিগত জীবনে তিনি কমিউনিস্ট পার্টির সারাক্ষণের কর্মী : theoritical leader. সংসার বলতে শুধু এক স্ত্রী—তিনিও স্বামীর যোগ্য সহধর্মিণী—কমিউনিস্ট পার্টির কর্মী ও সদস্যা। আবাসস্থল তাও এতদঞ্চলে 'কমিউন' বলে খ্যাত। মানুষ হিসেবে তিনি সকলের 'অজিতদা'। প্রতিপক্ষ কংগ্রেস শিবিরকেও মানুষ হিসেবে কখনো তাঁর অবমূল্যায়ন করতে শুনি নি। তবুও তাঁরাই নির্বাচন-পূর্বকালে তাঁর জামানত বাজেয়াপ্ত হবে বলে প্রচার চালিয়েছিলেন। এবং এ জন্যই প্রাক্‌নির্বাচনী সমীক্ষায় ৩০শে জানুয়ারীর পত্রিকায় আমরা তাঁদের মানসিক সুস্থতা সম্পর্কে সন্দিহান হয়েছিলাম এবং বলেছিলাম, 'শুধুমাত্র দলীয় বৈরিতার অনুরোধে যাঁরা এই ধরণের দায়িত্বহীন মন্তব্য করতে পারেন, তাঁরা আর যা-ই হোন রাজনৈতিক দূরদৃষ্টিসম্পন্ন নন।' তাঁদের রাজনৈতিক অদূরদর্শিতার পরিচয় নির্বাচনের পরে সারা বাংলা দেশেই মিলেছে। কিন্তু থাক ওসব। প্রশ্ন করেছিলাম, "কেন্দ্র যদি পর্যাপ্ত খাদ্য এবং কলকারখানার জন্য কাঁচামাল সরবরাহ না করেন তাহলে রাজ্য সরকারের কর্তব্য কী হবে বলে আপনি মনে করেন?"

স্বভাব-সুলভ স্মিত হাসি হেসে তিনি বললেন, "এটাও একটা reciprocal ব্যাপার। কেন্দ্র যদি একটি autonomous state-কে জব্দ করবার policy গ্রহণ করে তা তাকে করতে হবে অসাংবিধানিকভাবে। সেক্ষেত্রে অশান্তি এবং তিক্ততা বৃদ্ধি অবশ্যম্ভাবী। রাজ্য সরকারের হাতেও তো কিছু কেন্দ্র-জব্দ' করার অস্ত্র আছে। শান্তি কখনো একতরফা হয় না।"

—যুক্তফ্রন্ট সরকারের সামনে অনেক সমস্যা। যথা খাদ্য, কৃষি, শিক্ষা, জনস্বাস্থ্য, চাকুরীবিনিয়োগ ইত্যাদি। আপনার মতে এগুলির মধ্যে কোন্‌গুলির ওপর বেশি গুরুত্ব দেওয়া উচিত?

—এ সম্পর্কে যুক্তফ্রন্টই সিদ্ধান্ত নেবে কোন্‌গুলিকে এবারে priority দেওয়া হবে। তবে সেচ ও কৃষির প্রতি আশু নজর দেওয়া দরকার।

—কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বলেছেন যে, বাংলাদেশে বাম কমিউনিস্ট পার্টি যুক্তফ্রন্টের অন্যান্য শরিক দলকে গ্রাস করে ফেলবে। এ সম্পর্কে আপনার বক্তব্য কী?

—বাজে কথা। গায়ের জ্বালা জুড়োনোর জন্য এই আত্মতৃপ্তি নিয়ে চ্যবনজী খুশি থাকুন।

—স্থানীয়ভাবে বনগাঁর অনেক সমস্যা আছে—যেমন, হাসপাতাল, সেলুলয়েড ইনডাস্ট্রিস এবং উদ্বাস্তু ও মিউনিসিপ্যালিটি সংক্রান্ত। বিধানসভার সদস্য হিসেবে এগুলি সম্পর্কে আপনি কি ভাবছেন?

—স্থানীয় সমস্যা বাদ দিলে তো আমার কোন ভাবনাই থাকতে পারে না। কাজেই এগুলিই তো আজকের ভাবনা। তবে এক্ষুণি স্পষ্ট কিছু বলতে পারছি না। প্রথমত স্বাস্থ্য, শিক্ষা, কৃষি প্রভৃতি সর্বস্তরে আমরা স্থায়িভাবে কিছু কমিটি গঠন করতে চাই।

—এটা কি সেই গণকমিটি?

—না। তথাকথিত গণকমিটি নয়। তবে জনতাকে নিয়েই সকল কমিটি গঠিত হবে। শাসনক্ষেত্রে জনতাকে অবশ্যই শরিক হতে হবে। সামগ্রিকভাবে জনতাকে কাজে লাগাতে না পারলে একটা-দুটো অজিত গাঙ্গুলী যে বিশ্বাসঘাতক হয়ে যাবে না তার গ্যারান্টি কোথায়?

দেখা করেছিলাম শ্রীমতী পারুল সাহার সংগে। ঢাকুরিয়া বালিকা বিদ্যালয়ের (চোদ্দপাড়া) প্রধানা শিক্ষয়িত্রী। স্কুলের মধ্যে তিনি 'বড়দিমণি'। আর বাইরেও কারো 'দিদি' কারো 'বৌদি' কারো বা মেয়ে। রাজনীতিতে নবাগতা বলা চলে। দীর্ঘকাল শিক্ষা ও শিক্ষক সমিতির সংগে জড়িত। শিক্ষক আন্দোলনে অংশ গ্রহণ করেছেন বারবার। এ ছাড়াও পশ্চিমবঙ্গ মহিলা সমিতির সংগে তিনি গভীরভাবে সম্পর্কযুক্ত। ১৯৩৫ সালে নোয়াখালি জেলার গুনিপুরে জন্ম। পিতা ছিলেন বিশিষ্ট শিক্ষানুরাগী এবং সমাজসেবী ডাক্তার রোহিণীকুমার সাহা। প্রগতিশীল পারিবারিক পরিবেশে এবং যুদ্ধকালীন আবহাওয়া ছেলেবেলা থেকেই তাঁকে সাহসী করে তুলেছিল। স্কুল-জীবনে এই সাহসিকতার জন্য বারবার পুরস্কৃত হয়েছেন। ১৯৪৬ সালের দাঙ্গার ফলে স্কুল-জীবন সমাপ্ত হয়ে যায় অষ্টম মাস পর্যন্ত পড়েই। এর পর প্রাইভেটে একে একে বি-এ পর্যন্ত পাশ করেন। এখন এম-এ বি-টি এবং বিদ্যালয়ের প্রধানা শিক্ষয়িত্রী। ১৯৫৪ সালে পূর্ব বাংলায় ফজলুল হক-মৌলানা ভাসানী যুক্তফ্রন্টের সপক্ষে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করেন এবং ঐ বছরের শেষ ভাগে ভারতে চলে আসেন। শিক্ষয়িত্রী জীবন শুরু ১৯৫৫ সালে—প্রথমে ত্রিপুরা, পরে কলকাতা এবং বর্তমানে চাঁদপাড়া। ১৯৫৫ সালে ত্রিপুরায় সরকারী কর্মচারী আন্দোলনে গুরুত্বপূর্ণ অংশ তিনি গ্রহণ করেন। ১৯৬০ সালে কলকাতায় আসার পর থেকে সমস্ত শিক্ষক আন্দোলনের তিনি শরিক। এ ছাড়াও নানা প্রগতিশীল আন্দোলনে অংশ গ্রহণ করেছেন বার বার। ১৯৬৬ সালে গোবরডাঙায় আসার পর (তখন থেকেই তিনি ঢাকুরিয়া বালিকা বিদ্যালয়ের হেড-মিস্ট্রেস) গোবরডাঙা এবং গাইঘাটা থানার বিভিন্ন অঞ্চলে তাঁরই প্রচেষ্টায় মহিলা সমিতি গড়ে উঠেছে। ১৯৬৭ সালে বাংলা কংগ্রেস প্রার্থী চন্ডী মিত্রের হয়ে তিনি যথেষ্ট কাজ করেছেন আবার চন্ডী মিত্রের দলত্যাগে, তাঁর মহিলা সমিতি বিক্ষোভ করেছেন, এমন কি পি. ডি. এফ সরকারের ১৪৪ ধারা ভঙ্গ করে গ্রেপ্তার বরণ করেছেন। অবশেষে মধ্যবর্তী নির্বাচন সেই দলত্যাগী চন্ডী মিত্রকে পরাজিত করে বিধানসভায় নির্বাচিত হয়েছেন।

চারিত্রিক দৃঢ়তা এবং সাহসিকতার সংগে ব্যক্তিগত জীবনে তিনি সতীত্বকারের মা, স্ত্রী, পুত্রবধূ। স্বামী শ্রীনগেন্দ্র কুমার সাহা গোবরডাঙা হিন্দু কলেজের বি-টি বিভাগের অধ্যাপক। স্বহস্তে

রান্না শুধু নয়—মেয়ে সন্ধ্যমিত্রা এবং ছেলে সৌম্যশঙ্খকে না থাইয়ে দিলে তাঁর দিনের সব কাজ যেন ব্যর্থ বলে মনে হয়।

স্বহস্তে চা নিয়ে এসে যখন বসলেন তখন জিজ্ঞেস করলাম—বাংলা কংগ্রেসের ৪৯টি প্রার্থীর মধ্যে আপনিই ছিলেন একমাত্র মহিলা প্রার্থী। শ্রীযুক্ত সুশীল ধাড়ার কথায় ৪৮টি ভাই-এর একমাত্র বোন। আপনার জয়লাভে বাংলা কংগ্রেস খুশি। আপনি খুশি তো ?

স্বভাব-সুলভ স্মিত হাসি হেসে শ্রীমতী সাহা বললেন—কেন নয় ? আরো খুশি এজন্য যে ফ্রন্টের ছ'জন মহিলা প্রার্থীর মধ্যে ছ'জনই জয়লাভ করেছেন। একটু থেমে হেসে বললেন,—অথচ অবিচারটা দেখুন একবার। দুশো আশিটা সীটের মধ্যে ওরা মাত্র ছ'টা সীটে আমাদের লড়তে দিলেন।

আমি বললাম, আপনি তো পশ্চিমবঙ্গ মহিলা সমিতির সংগেও জড়িত। যুক্তফ্রন্টের ৩২ দফা কর্মসূচীর মধ্যে মহিলাদের সম্পর্কে যা বলা হয়েছে তার রূপায়ণের জন্য স্থানীয়ভাবে আপনারা কি ভাবছেন ?

—গ্রামাঞ্চলে প্রথম প্রয়োজন মেয়েদের নিরক্ষরতা দূরীকরণ তথা সামাজিক শিক্ষা। তাদের জন্য বিভিন্ন শিল্প-শিক্ষাকেন্দ্র এবং সরকারী উদ্যোগে অথবা সমবায় ভিত্তিতে ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প গড়ে তোলা দরকার। আরো চাই দুস্থ ও সহায়সম্বলহীন মেয়েদের জন্য অনাথ আশ্রম।

প্রঃ আমাদের শিক্ষাব্যবস্থার অচলায়তন ভাঙ্গতে আশু কি কি করা দরকার বলে আপনার মনে হয় ?

উঃ সমস্যা এত বেশি যে এ-সম্পর্কে বিভ্রান্ত হতে পারে। তবে বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা অষ্টম মান পর্যন্ত শিক্ষা অবৈতনিক করা; পাঠ্যপুস্তক সমস্যা এবং মেয়েদের বিদ্যালয়-শিক্ষা অবৈতনিক করার কথা আশু বিবেচনা করা দরকার।

প্রঃ আপনি হেডমিস্ট্রেস, স্কুলের ম্যানেজিং কমিটি এবং স্কুল বোর্ড সম্পর্কে আপনার বক্তব্য কী ?

উঃ সত্যি কথা বলতে কি ওই প্রতিষ্ঠান দুটি তুলে দেওয়া উচিত।

প্রঃ শিক্ষামন্ত্রী বলেছেন, শিক্ষাকে র‍্যাশনালাইজ করা দরকার। এটা কিভাবে হতে পারে বলে আপনার মনে হয় ?

উঃ এ সম্পর্কে নতুন কিছু বলার নেই। এককথায় যুক্তফ্রন্টের শিক্ষা সংক্রান্ত কর্মসূচীর সার্থক রূপায়ণের দ্বারাই এটা সম্ভব।

প্রঃ স্কুলে দ্বাদশশ্রেণীর পরিকল্পনা সম্পর্কে আপনার অভিমত বলুন।

উঃ বর্তমান অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে বিদ্যালয়ে দ্বাদশশ্রেণীর শিক্ষাদান সম্ভবপর বলে ব্যক্তিগতভাবে আমার মনে হয় না।

প্রঃ কেন্দ্রীয় সরকার তো বলছেন সর্বতোভাবে তাঁরা যুক্তফ্রন্ট সরকারের সংগে সহযোগিতা করবেন। যদি না করেন, তাহলে গতবারের মতো সরকারের কি দিল্লীতে ধর্ণা দেওয়া উচিত হবে ?

উঃ না। ব্যক্তিগতভাবে আমি ধর্ণায় বিশ্বাসী নই। আর ও'দের সহযোগিতার কথা নিছক কথার কথা না হলেই মঙ্গল।

দৃশ্যকাব্য-পরিচয়

সত্যজীবন মুখোপাধ্যায়

দাম : দশ টাকা

বাংলা নাট্যসাহিত্যের প্রাচীন ও আধুনিককালের সম্পূর্ণ ইতিহাস, প্রাচ্য ও প্রতীচ্য মনীষীর তুলাদণ্ডে বিচারিত। বি-এ ও এম-এ পরীক্ষার্থীর অবশ্য পাঠ্য গ্রন্থ।

লব্ধপ্রতিষ্ঠ সাহিত্যিক ও নাট্যসমালোচক শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্রকুমার রায় এই গ্রন্থখানি সম্বন্ধে বলেছেন : —

* * তথাকথিত জ্যেষ্ঠতাত জাতীয় অকালপক্ক এবং বিচারশক্তিহীন আত্মহারা ও প্রিয়-ভাষী সমালোচকদের নিয়ে এতদিন বড়ই অস্বস্তি বোধ করছিলুম। এতদিন পরে এই বিভাগে দুইখানি অমূল্য গ্রন্থ আমাদের হস্তগত হয়েছে। প্রথমখানির কথা দৈনিক বসুমতীতে ইতিমধ্যেই আলোচনা হয়ে গেছে * *দ্বিতীয়খানির নাম 'দৃশ্যকাব্য-পরিচয়' রচনা করেছেন শ্রীযুক্ত সত্যজীবন মুখোপাধ্যায়। বইখানির আকার বিপুল। বাংলা নাটক নিয়ে এমনভাবে মস্তিষ্কচালনা করবার মানুষ যে আমাদের দেশে আছেন, এ তথ্য আমার কাছে ছিল সম্পূর্ণ অজ্ঞাত। সুদীর্ঘকালের সাধনা ছাড়া এমন গ্রন্থ কেউ রচনা করতে পারেন না। * * অথচ বাঙালীর সৃষ্ট নাট্যসাহিত্যের সম্পূর্ণ ইতিহাস এতদিন কেউ রচনা করেন নি। হালে শ্রীযুক্ত মন্মথমোহন বসু সেই চেষ্টা করেছেন এবং দৃশ্যকাব্যের পরিচয় দিতে গিয়ে সত্যজীবনবাবু অগ্রসর হয়েছেন অধিকতর। * * যাঁরা জ্যেষ্ঠতাতের ভূমিকায় অভিনয় করতে ইচ্ছুক নন, এই পুস্তকখানি পাঠ করলে তাঁরা বাংলা দেশের সমগ্র নাট্যসাহিত্য সম্বন্ধে একটি বিশদ ধারণা করতে পারবেন। এত খুঁটিয়া খুঁটিয়া আর কোন লেখকই বাঙালীর নাট্যসাহিত্য নিয়ে আলোচনা করতে পরেন নি। এইটিই হ'ল আলোচ্য গ্রন্থের প্রধান গৌরব। * * তাঁর সমালোচনাও পরম উপভোগ্য। সমালোচকের উপযোগী সূক্ষ্ম দৃষ্টি, নিরপেক্ষতা ও যুক্তিযুক্ত মনের পরিচয় দিয়ে তিনি আমাদের আনন্দিত করেছেন। তিনি কেবল গুণই দেখেন নি, দোষও দেখেছেন। কোথাও তিনি উচ্ছ্বসিত হয়ে অতিরিক্ত বাক্য ব্যয় ক'রে বক্তব্য-বিষয়কে ক'রে তোলেন নি ধোঁয়াটে। * * যাঁরা বাংলা নাটকের ইতিহাস নিয়ে আলোচনা করবেন, এই গ্রন্থখানি তাঁদের পক্ষে অবশ্য পাঠ্য। * * যাঁদের লাইব্রেরী আছে, এই বইখানি না থাকলে তাঁদের সংগ্রহ অসম্পূর্ণ থেকে যাবে। * *

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের বাংলা অনুবাদক সুপণ্ডিত শ্রীযুক্ত পতঞ্জলি ভট্টাচার্য এম-এ মহোদয় এই গ্রন্থখানি সম্বন্ধে স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া লিখিয়াছেন—

* * বাংলা নাটকের ইতিহাস সম্বন্ধে এই ধরণের বই বাংলা ভাষায় আর আছে কিনা জানি না; থাকিলেও খুব কমই আছে। গ্রন্থকার শুধু ঐতিহাসিকের দৃষ্টি দিয়াই তাঁহার আলোচ্য বিষয় দেখেন নাই। সঙ্গে সঙ্গে তিনি তাঁহার সমালোচনা-শক্তিরও পূর্ণ ব্যবহার করিয়াছেন। প্রত্যেকটি উল্লেখযোগ্য নাটকের গুণাগুণ তিনি বিচার করিয়াছেন। প্রাচ্য ও প্রতীচ্য এই উভয় নাট্যদর্শ সম্মুখে রাখিয়া তিনি এই বিচার করিয়াছেন। বইখানিতে যেমন তাঁহার অসাধারণ পরিশ্রম ও অধ্যবসায়, তেমন তাঁহার গভীর পাণ্ডিত্যের পরিচয় পাওয়া যায়। শিক্ষার্থীদের পক্ষে এই বই অবশ্য পাঠ্য। অন্য সাহিত্য-পিপাসুরাও এই বই হইতে বহু জ্ঞাতব্য বিষয় জানিতে পারিবেন। ভাষা এই ধরণের বই-এর সম্পূর্ণ উপযোগী—গাম্ভীর্য-পূর্ণ ও প্রাঞ্জল।"

বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের বর্তমান সম্পাদক, নাট্যশালার ইতিহাসলেখক ও নাটকীয় পরিসংখ্যানবিদ শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছেন :—

"এই বিরাট গ্রন্থে বাংলা দৃশ্যকাব্যগুলির ইতিহাস সঙ্কলিত হইয়াছে। কেবল জীবিত লেখকগণকে বাদ দেওয়া হইয়াছে। * * সত্যজীবনবাবুর পক্ষে শ্লাঘার বিষয় এই যে, তাঁহারই অক্লান্ত, পরিশ্রমের ফলে অভিনীত দৃশ্যকাব্যগুলির সমালোচনা একত্রে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হইল। * * 'দৃশ্যকাব্য-পরিচয়' বাস্তবিকই আমাদের একটা বহুদিনের অভাব বিদূরিত করিয়াছে। এজন্য লেখক সাহিত্যামোদিগণের কৃতজ্ঞতা দাবী করিতে পারেন।"

বসুমতী প্রাইভেট লিমিটেডঃ ১৬৬, বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী স্ট্রীট, কলি-১২

পশ্চিমবাংলার নির্বাচন-ফলের রাজনৈতিক তাৎপর্য

তুষার চট্টোপাধ্যায়

আপাতদৃষ্টিতে দেখলে মধ্যবর্তী নির্বাচনে পঃ বাংলার বিপুল সংখ্যা-গরিষ্ঠতা নিয়ে যুক্তফ্রন্ট-সরকার গঠনের ঘটনাটা শুধু যুক্তফ্রন্টের বিরাট জয় ও কংগ্রেসের শোচনীয় পরাজয়ই মনে হয়। কিন্তু একটু গভীরে প্রবেশ করলে দেখা যাবে যে, এই পরিবর্তনের রয়েছে একটা বিরাট রাজনৈতিক তাৎপর্য। সেই রাজ-নৈতিক তাৎপর্য শুধু পঃ বাংলার দিক থেকেই নয়, সর্বভারতের দিক থেকে এবং তার আন্তর্জাতিক প্রতিক্রিয়াও যথেষ্ট।

প্রথমেই পঃ বঙ্গের নির্বাচনটা কি পরিস্থিতির মধ্যে হয়েছে তা দেখা দরকার। বিহার, উঃ প্রদেশ ও পাঞ্জাবেও তো একই দিনে মধ্যবর্তী নির্বাচন হয়েছে এবং এই তিন রাজ্যেও পঃ বাংলার মতোই কংগ্রেসী কৌশলে যুক্তফ্রন্ট-সরকারের সংখ্যাগরিষ্ঠতা নষ্ট হয়ে যাওয়ার ফলেই এই নির্বাচন করতে হয়েছে। কেন্দ্রীয় সরকার এই তিন রাজ্যেও যথেষ্ট চেষ্টা করেছে মধ্যবর্তী নির্বাচন এড়িয়ে কোনো-রকমে কংগ্রেস-পৃষ্ঠপোষিত সরকারকে চালিয়ে যেতে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তা পারে নি। এই সব দিক থেকে পঃ বাংলা ও এই তিন রাজ্যের পরিস্থিতি দাঁড়িয়ে যায় একইরকম। কিন্তু পঃ বাংলার নির্বাচনটা এই সব রাজ্যের মতো কি শুধু নতুন করে শক্তি-পরীক্ষারই একটা ঘটনা? মোটেই তা নয়। পঃ বাংলার এই নির্বাচনটা হয়েছে কংগ্রেসের একটা বিশেষ অন্যায়ের বিরুদ্ধে যুক্তফ্রন্টের একটা প্রচণ্ড দীর্ঘ সংগ্রামের শেষ পর্যায়-রূপে। এ-সংগ্রাম শুরু হয়েছিল যেদিন যুক্তফ্রন্ট সরকারকে উৎখাত করা হয় এবং এ-সংগ্রাম চলেছে বিধানসভায়, মাঠে-ময়দানে, রাস্তায়, স্কুলে-কলেজে, অফিসে-কারখানায় সর্বত্র জনগণের একটানা দৃঢ়-সংকল্প প্রতিরোধ সংগ্রামরূপে এবং যার বিজয়-উৎসব হল নির্বাচন-পরবর্তী ২৩শে ফেব্রুয়ারীর বিরাট জনসমাবেশে। এই প্রতিরোধ সংগ্রামের রূপ যেমন স্পীকার বিজয় বন্দ্যোপাধ্যায় কর্তৃক প্রফুল্ল ঘোষের বে-আইনী বিধানসভা-আহ্বানকে বন্ধ করার মধ্যে, তেমনি রাজ্য জুড়ে হরতাল ও ধর্মঘটের জোয়ারে; যেমন প্রফুল্ল ঘোষের ১৪৪ ধারাকে অস্বীকার করে, পুলিশের লাঠি ও গুলীকে তুচ্ছ করে, জনতার সভা-মিছিল করায়, তেমনি রাজ্যব্যাপী একটানা আইন-অমান্য আন্দোলনে; এ-সংগ্রামের রূপ যেমন দৃঢ়-সংকল্প জনগণের দুর্বার অভিযানে, তেমনি সাংবিধানিক স্বৈরাচারের প্রতি-বাদে সর্বশ্রেণীর মানুষের মিলিত হওয়ায়। যুক্তফ্রন্ট-সমর্থনের সংগ্রামের পরিধি অতিক্রম করে এ-সংগ্রাম রূপ নিয়েছিল আরো মূলগত এক রাজনৈতিক সংগ্রাম হিসাবে, গণতন্ত্র-রক্ষার সংগ্রাম হিসাবে, যার তুলনা স্বাধীনতা-উত্তর ভারতে কোন-দিন পাওয়া যায় নি। এই সংগ্রামেরই অন্যতম আওয়াজ হয়ে দাঁড়িয়েছিল 'মধ্যবর্তী নির্বাচন চাই' এবং সেই মধ্যবর্তী নির্বাচন করিয়ে তার মধ্য দিয়ে পুনরায় বিপুল গৌরবে জনসাধারণ যুক্ত-ফ্রন্ট-সরকারকে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করল আরো শক্তিমান সরকাররূপে। এই নির্বাচনের এটাই হচ্ছে পটভূমি।

তাই এই নির্বাচনে কংগ্রেসের পরাজয় শুধু ভোটে পরাজয় নয়, কংগ্রেসের রাজ-নীতির পরাজয়, অভিযুক্ত কংগ্রেস হাই-কমান্ডের অভিযোগ প্রমাণিত হওয়া। কয়েকদিন আগে লোকসভায় বিরোধীপক্ষ থেকে এই কথা বলেই অনাস্থা-প্রস্তাব তোলা হয়। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী শ্রীচ্যবন সে-কথা মানতে চান নি। কিন্তু তিনি না মানলেও, ইতিহাস মিথ্যা হয়ে যায় না।

এই নির্বাচনের ফলের দিয়ে পঃ বাংলার কংগ্রেস যে ঘা খেল তার একটা প্রচণ্ড সর্বভারতীয় প্রতিক্রিয়া আছে। প্রতিক্রিয়া প্রচণ্ড বলেই অতুল্য ঘোষ এখানের পরাজয়ের গ্লানি সহ্য করতে না পেরে ওয়ার্কিং কমিটির সদস্যপদে ইস্তফা দিতে গিয়েছিলেন এবং দিল্লীর ষড়কর্তাদের কাছে গিয়ে বোঝাতে চেষ্টা করেছিলেন যে, কোনো 'রহস্যজনক' কারণেই এইরকম বিপর্যয় ঘটেছে। কংগ্রেস-সভাপতি নিজলিঙ্গাপ্পার বক্তব্য থেকেও বোঝা যায় পঃ বাংলার পরাজয়ে কংগ্রেস-নেতৃত্ব কতটা চিন্তান্বিত।

পঃ বাংলা কংগ্রেসের হাত থেকে বাম-পন্থীদের হাতে চলে যাওয়া মানে সর্ব-ভারতীয় কংগ্রেসের ক্ষমতার একটা স্তম্ভই ভেঙে যাওয়া। সাংগঠনিক শক্তির দিক থেকেই যে পঃ বাংলা কংগ্রেসের একটা বড় অবলম্বন ছিল তা শুধু নয়। বরং সাংগঠনিক দিক দেখলে বলতে হয়, এখানে কংগ্রেস-সংগঠন ধীরে ধীরে দুর্বল হয়ে গিয়েছে। সাধারণ মানুষের বেশি অংশের কাছ থেকেই পঃ বাংলার কংগ্রেস ক্রমশ দূরে সরে গিয়ে বিত্তশালী ও সুবিধা-ভোগী এক অংশের উপর নির্ভর করেই কংগ্রেস-সংগঠন এখানে দাঁড়িয়ে ছিল। রাজনৈতিক দিক থেকেই পঃ বাংলার আসল গুরুত্ব সর্বভারতের কাছে। এ-গুরুত্ব আজকের নয়। দেশের জাতীয় ভাবধারার বিকাশে ও স্বাধীনতা-আন্দোলনে বাংলাদেশের সুপ্রাচীন গৌরবময় ঐতিহ্যই এ-গুরুত্ব এনে দিয়েছে। ২০ শতকের প্রথম দশকের বিপ্লবী-আন্দোলনের ঐতিহ্য ও রবীন্দ্র-নাথের স্বদেশী-আন্দোলনের ঐতিহ্য থেকে শুরু করে নেতাজী সুভাষের ঐতিহ্য পর্যন্ত সব কিছুরই প্রেরণা শুধু বাংলার মানুষের কাছেই নয়, সর্বভারতের মানুষের কাছে। এবং তাই বাংলার সঙ্গে কেন্দ্রীয় কংগ্রেস-নেতৃত্বের একটা মানসিক ব্যবধান অনেক দিন আগে থেকে গড়ে উঠলেও, কংগ্রেস-নেতৃত্ব বাংলার সঙ্গে সম্পর্ক ঘনিষ্ঠ করার সর্বপ্রকার চেষ্টা করেছে। শান্তিনিকেতনে প্রধানমন্ত্রী ছুটে আসেন, নেতাজী সুভাষের অনুষ্ঠানে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী ছুটে আসেন। বাংলার ঐতিহ্যের কথা কংগ্রেস-নেতৃত্বের মুখ থেকে সরবে ঘোষিত হয়। বাংলাকে বাদ দিলে কংগ্রেসের পুরনো ঐতিহ্যটাই অনেক পরিমাণে চলে যায়। সেই বাংলা, সেই পঃ বাংলা যদি কংগ্রেসের হাত থেকে নিশ্চিতভাবে সরে গিয়ে বামপন্থীদের হাতে চলে যায়, তবে তার সুদূরপ্রসারী প্রতিক্রিয়া হবে অন্যান্য রাজ্যেও, তার ফলে কংগ্রেসের বে-ভাঙন হয়ে চলেছে দিনের পর দিন, তা আরও দ্রুত ও ব্যাপক হবে নিশ্চয়ই।

শুধু রাজনৈতিক দিক থেকে নয় যে অর্থনৈতিক 'পলিসির' সঙ্গে কংগ্রেসের সর্বভারতীয় রাজনীতি জড়িত, সেখানেও পঃ বাংলার এই পরিবর্তন একটা প্রতি-

ঐ সুন্দর
কেশ বিন্যাস
অতি দীর্ঘকাল
সুন্দর থাকবে
না - - -

শেলাক ব্যতীত

চুল আটকাবার প্রসাধন সামগ্রীতে, এরোসলযুক্ত ও এরোসলহীন কেশ সিঞ্চনে উভয়তই শেলাকই প্রাথমিক আঠা।

শেলাকসমূহ ফ্লেক্সোগ্রাফিক কালি, পেষাই কল, পিল, কনফেকশনারী, জলীয় বাষ্প সেট করা কালি, প্রসাধন, বৈদ্যুতিক ইন-সুলেটর, কোল্ড টপ এনামেল ইত্যাদিতে বিভিন্ন প্রান্তিক ব্যবহার সামগ্রী পছন্দমত প্রস্তুত হয় পৃথিবীর বৃহত্তম শেলাক প্রস্তুতকারক, এঞ্জেলো ব্রাদার্স কর্তৃক। উহারা নিখুঁতভাবে স্পেসিফিকেশন অনুযায়ী প্রস্তুত হয়। সমুদয় এঞ্জেলো গ্রেডই আই-এস-আই স্ট্যান্ডার্ড ও এতদ্ব্যতীত কঠোরতর এঞ্জেলো স্পেসিফিকেশন মত। সবচেয়ে বড় কথা এই যে, এঞ্জেলো ব্রাদার্স গুণের সমতা রক্ষা করেন।

Angelo Shellacs

এঞ্জেলো ব্রাদার্স লিমিটেড, কাশীপুর, কলিকাতা-২

ক্রিয়া সৃষ্টি করবে। দেশী ও বিদেশী একচেটিয়া পুঁজির তোষণ ও পোষণের ভিত্তিতেই কংগ্রেসের অর্থনৈতিক 'পলিসি' গড়ে উঠেছে। আর, পঃ বাংলা হচ্ছে এই পুঁজির একটা বড় ক্ষেত্র। পঃ বাংলার চা, পাট, কয়লা শিল্পের অধিকাংশই বৃটিশ-পুঁজি-কবলিত। চা ও পাট শিল্প থেকে ভারতের বিদেশী মূলধন অর্জন বেশি হয় বলে এই দুই শিল্পপতি কেন্দ্রীয় কংগ্রেস-সরকারের প্রশ্রয়ও পায় বেশি। ইঞ্জিনিয়ারিং শিল্পেও বৃটিশ মূলধন যথেষ্ট। বিদেশী পুঁজি ছাড়াও রয়েছে বিড়লা ও অন্যান্য দেশী একচেটিয়ার পুঁজি। কংগ্রেসের সঙ্গে এই সমস্ত পুঁজিপতিদের যোগাযোগ অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ। এই পুঁজিপতিরা যেমন কংগ্রেসকে পৃষ্ঠপোষকতা করে এসেছে বরাবর, তেমনি কংগ্রেসও এদের সাহায্য করেছে। প্রতি বছর এখানের বিদেশী পুঁজিপতিদের বাৎসরিক সভায় হয় প্রধানমন্ত্রী, না হয় অর্থমন্ত্রী এসে ভাষণ দেওয়ার একটা বাঁধা নিয়ম হয়ে গিয়েছে। কারণ, এই সব পুঁজিপতিদের বক্তব্য না শুনলে এবং কেন্দ্রের তরফ থেকে নানা আশ্বাস না দিলে এঁরা সন্তুষ্ট হন না। এক কথায়, এঁদের মতামত না নিয়ে কেন্দ্রের নীতি নির্ধারণ হয় না। একই ব্যাপার দেশী একচেটিয়া পুঁজিপতিদের সম্বন্ধেও।

দেশী-বিদেশী পুঁজিপতিগোষ্ঠীর একটা বড় ঘাঁটি এই পশ্চিম বাংলায় যুক্তফ্রন্ট-সরকার গঠন মানে যে কী, এ থেকেই তা বোঝা যায়। পুঁজিপতিগোষ্ঠীর ক্ষমতা-প্রাধান্য রক্ষা করার পথে যুক্তফ্রন্ট-সরকার হয়ে দাঁড়ায় একটা কাঁটা। পথের এই কাঁটা দূর করার জন্য তাই গতবারে এই পুঁজিপতিগোষ্ঠীই প্রধান উদ্যোগ নিয়েছিল। 'ঘেরাও'-এর ঘটনাকে ফুলিয়ে ফাঁপিয়ে, সোরগোল তুলে, সারা পুঁজিপতি-সমাজকে এবং তার সঙ্গে সঙ্গে কেন্দ্রীয় সরকারকেও যুক্তফ্রন্ট-সরকার-বিরোধী চক্রান্তে মিলিত করেছিল। কিন্তু ইচ্ছা থাকলেও, এবারে এই চক্রান্ত এত সহজে সফল হতে পারে কি? যুক্তফ্রন্টের নিশ্চিন্ত সংখ্যাগরিষ্ঠতার অবস্থায় এবারে এ-চক্রান্ত সফল হওয়া কঠিন বুঝে পুঁজিপতিগোষ্ঠী হয়ত কৌশল পরিবর্তন করবে। একদিকে কেন্দ্রেরও সাহায্যপ্রার্থী হবে অন্যদিকে যতটা সম্ভব যুক্তফ্রন্ট-সরকারের সঙ্গেও একটা বাধ্য সহযোগিতার ভাব দেখাবে—এই দুই কৌশলের সাহায্যে কিভাবে তারা তাদের শ্রেণী-স্বার্থরক্ষার চেষ্টা করে সেটা নিশ্চয়ই লক্ষণীয় হবে। স্বভাবতই কেন্দ্রীয় কংগ্রেস-সরকারের কৌশলও পুঁজিপতিগোষ্ঠীর এই কৌশলের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখেই রচিত হবে। মোটের উপর, পঃ বঙ্গের এবারের যুক্তফ্রন্ট-সরকার গঠনের একটা প্রবল প্রতিক্রিয়া আসবে ভারতের গোটা অর্থনৈতিক ক্ষেত্রের উপর।

পঃ বাংলার এই নির্বাচন-ফলাফলের আন্তর্জাতিক প্রতিক্রিয়াও কম নয়। ভারতে বিদেশী পুঁজির প্রধান কর্মস্থল পঃ বঙ্গ হওয়ায় এখানের রাজনৈতিক পরিবর্তনে আন্তর্জাতিক পুঁজিপতি-গোষ্ঠীর টনক যেমন নড়ে, তেমনি টনক নড়ে আন্তর্জাতিক সাম্রাজ্যবাদেরও। আরো বেশি টনক নড়ে এই জন্য যে সারা ভারতের রাজনীতির উপর পঃ বাংলার প্রভাব অত্যন্ত বেশি। গতবারে পঃ বঙ্গে যুক্তফ্রন্ট-সরকার গঠনের পর 'ঘেরাও' নিয়ে শুধু এ-দেশের মালিকগোষ্ঠীই সোরগোল করে নি, তার সঙ্গে সুর মিলিয়েছিল বিদেশের মালিকগোষ্ঠীও। 'ঘেরাও' কথাটাকে তারাই একটা আন্তর্জাতিক শব্দে দাঁড় করিয়ে দিয়েছে। যুক্তফ্রন্ট-সরকার দায়িত্বভার নেবার পরেই ট্রামের ভাড়াবৃদ্ধির সিদ্ধান্তের রদবদল যে হচ্ছে, তারও একটা প্রচণ্ড প্রতিক্রিয়া বিলাতী কোম্পানীর হবে। তা ছাড়া ট্রাম কোম্পানীর ভবিষ্যতের প্রশ্ন তো আছেই।

আর, বিদেশী পুঁজির স্বার্থ ছাড়াও, বিশেষ করে রয়েছে মার্কিনী-নীতি ভারতকে ক্রমশ বেশি করে মার্কিনী-প্রভাবের অধীন করে তোলার। মার্কিনী-সাহায্য না পেলে কংগ্রেস-সরকারের পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার অর্থসংস্থান হয় না, মার্কিনী-সাহায্য না পেলে কংগ্রেস-সরকার খাদ্য-সংকট দূর করতে পারে না—অর্থনীতির দিক থেকে দেশকে যতই এইভাবে মার্কিনী-সরকারের উপর নির্ভরশীল করে তোলা হচ্ছে, ততই মার্কিনী-অনুপ্রবেশের পথও প্রশস্ত হচ্ছে। পঃ বাংলাও এই মার্কিনী-অনুপ্রবেশের লক্ষ্যস্থল ইতিমধ্যেই বেশ ভালভাবেই হয়ে গিয়েছে। মার্কিনী-সাহায্য ও তদারকীতে এখানে 'কলকাতা মেট্রোপলিটান প্ল্যান অর্গানিজেশন' তৈরি হয়েছে, কলকাতা থেকে আরম্ভ করে আশেপাশের শহরগুলিকে কবলিত করার উদ্দেশ্য নিয়ে। শিক্ষা-সংস্কৃতি ক্ষেত্রেও অনুপ্রবেশ হচ্ছে এবং তার পরিচয় পাই এখান থেকে বাছাই করা অধ্যাপকদের অর্থ দিয়ে মার্কিন-মুলুকে নিয়ে যাওয়ার এবং আরো পরিচয় পাই বছরখানেক আগে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে মার্কিন-বাহাদুরের রুক্তাদানে। মধ্যবর্তী নির্বাচনের প্রাক্কালে মার্কিনমার্কার ভারতে আগমন ও বিশেষ করে পঃ বাংলায় কয়েকদিন থেকে সরকারী-কর্তা, সি-এম-পি-ও কর্তা ও শিল্পমালিকদের সানান অভিভাবকসুলভ নির্দেশদান—এ ঘটনা থেকে স্পষ্ট বোঝা যায় পঃ বাংলার সম্বন্ধে মার্কিনী-সরকার তথা আন্তর্জাতিক সাম্রাজ্যবাদের আগ্রহ কতটা। পঃ বাংলার বিরাট রাজনৈতিক পরিবর্তন এদের চিন্তিত ও শঙ্কিত করে তুলবে নিশ্চয়ই। মার্কিনী-সাম্রাজ্যবাদের গোটা ভারত-নীতিতেই পঃ বঙ্গ নির্বাচনের প্রতিক্রিয়া হয়ত দেখা দিতে পারে এবং তার ফলে কেন্দ্রের নীতিতেও একটা নতুন সংকট দেখা দিতে পারে।*

রাজ্য-কেন্দ্র সম্পর্কের প্রশ্নটাকেও একটা নতুন পরিপ্রেক্ষিত উন্মুক্ত হয়েছে পঃ বঙ্গের রাজনৈতিক পরিবর্তনের ফলে। ভারতের রাষ্ট্ররূপকে 'ফেডারেল' চরিত্রের বলে যতই ব্যাখ্যা করা হোক না কেন, এর এককেন্দ্রিক চরিত্রই প্রধান, অর্থাৎ কেন্দ্রের ক্ষমতার দ্বারাই রাজ্যের ক্ষমতা নিয়ন্ত্রিত। যতদিন সারা দেশে কংগ্রেসের প্রাধান্য ছিল, ততদিন ক্ষমতার এই তারতম্য প্রকট হয়ে ওঠে নি। কিন্তু ১৯৬৭-তে অনেকগুলি রাজ্যে অ-কংগ্রেসী সরকার গঠন হওয়ার পর থেকেই ক্ষমতার এই তারতম্য নিয়ে প্রশ্ন ও তর্ক উঠেছে। এ-তর্ক শুধু কংগ্রেসীদের সঙ্গে অ-কংগ্রেসীদেরই নয়, কংগ্রেসীদের মধ্যেও এ-তর্ক উঠেছে। অর্থ-ব্যবস্থার দিক থেকে রাজ্যের হাতে অধিকতর ক্ষমতা না দিলে চলে না, এ কথা কংগ্রেসী-রাজ্যের প্রতিনিধিরাও বলেছেন। পরিষ্কার বোঝা যায় যে, রাজ্যের হাতে অধিকতর ক্ষমতার প্রশ্নটি ছিল একটা স্বাভাবিক ও রাজনৈতিক মতামত নিরপেক্ষ প্রশ্ন, যা কংগ্রেসের একচ্ছত্র ক্ষমতার চাপে এতদিন ব্যক্ত হতে পারে নি। অ-কংগ্রেসী রাজ্যগুলির এবং বিশেষ করে কেরালার তরফ থেকে এই প্রশ্ন ওঠার ফলে অন্যদেরও কেউ কেউ সাহস করে এ-প্রশ্নে সমর্থন জানিয়েছেন। দিল্লীতে রাজ্যমন্ত্রীদের এক বৈঠকে এর পরিচয় পাওয়া গিয়েছে। পঃ বঙ্গে স্থায়ী যুক্তফ্রন্ট-সরকার গঠনের পর স্বভাবতই এ-প্রশ্ন আরো জোর পাবে এবং পঃ বঙ্গ ও কেরালার সঙ্গে অন্য কোন কোন রাজ্যও একযোগে এ-প্রশ্ন নতুন করে তুলতে পারে।

এই মূলগত প্রশ্ন ছাড়াও, রাজ্য-সরকারের ক্ষমতার একতিয়ার নিয়ে কেন্দ্রের সঙ্গে যে বিরোধ বেধে গিয়েছে গত ১৯ সেপ্টেম্বরের কেন্দ্রীয় কর্মচারীদের প্রতীক ধর্মঘটকে উপলক্ষ্য করে, সে-বিরোধও নতুন করে রূপ পেল পঃ বাংলার যুক্তফ্রন্ট-সরকার গঠনের পর। ১৯শে সেপ্টেম্বরের প্রতীক ধর্মঘটে অংশ গ্রহণকারীদের বিরুদ্ধে কেন্দ্রীয় গবর্নমেন্টের

* এ-সম্পর্কে 'পর্যবেক্ষক'-র ৯-১৫ ৬৯-এর প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য।

সহস্র চরিত্রের পাশে

জয়ন্তী সেন

কোনো ইচ্ছাকেই আমি সম্পূর্ণ কণ্ঠরোধ করে
নিঃশেষ করতে পারি না। অপরিবর্তনীয় আকাশ
অথবা স্থির স্মৃতিময় মাটির নিরানন্দ ভূমিকায়
জীবনের মৌন অভিনয় আবহমানকালের; সেখানে
আমারও মূর্তি রোজ কোনো দক্ষ কারিগর
সযত্নে স্থাপনা করে—। রৌদ্রে, আলোয়, অন্ধকারে
সহস্র চরিত্রের পাশে অনায়াসে অস্তিত্ব বাঁচাই।

ক্ষুধা তৃষ্ণা বোধ মৃত বলে যারা সহর্ষে আসীন
নিয়মানুবর্তী ঘরে, আমাকেও তাদের দেওয়ালে
বিবর্ণ দর্পণে সুখী প্রতিবিম্ব বলে চেনা যায়।

অথচ বাঁধানো সুস্থ মলাটের নিচে কোন্‌খানে
অদৃশ্য ইচ্ছায় দিশাহীন পাখিদের হৃদয় নিয়ে
অবোধ্য কবিতায় মিলে মিশে জীবন্ত হয়ে থাকে।

অনুভূতিহীন দৃষ্টি জানি তার মৃত্যুতে বিশ্বাসী।

বুকের রক্তকে মাটিতে আকাশে

মলয়শঙ্কর দাশগুপ্ত

দিনের পর দিন কুয়াশা আর অন্ধকার
রাতের পর রাত অন্ধকার আর কুয়াশা
দিনে পর দিন নিজেরই বিরুদ্ধে লড়তে লড়তে
রাতের পর রাত মানুষগুলি ধুঁকতে ধুঁকতে
বুকের রক্তে প্রতি মুহূর্তে স্বপ্ন দেখেছে
সূর্য উঠবে, আবার সূর্য উঠবে

দিন পেরিয়ে রাত পেরিয়ে অন্ধকারকে ছিন্নভিন্ন করে
বুকের রক্তকে মাটিতে আকাশে বাতাসে কে যেন
ছড়িয়ে দিয়েছে

মায়ের মলিন ললাটে আবার জয়ন্তী টিপ :
চতুর্দিকের ছড়ানো আবিরে নির্মেঘ আকাশ
রঙ মাখাতে মাখাতে ক্ষেত-খামার কল
কারখানা গৃহ উপনিবেশের

ধূলিকে ছড়িয়ে দিচ্ছে ফাল্গুনের সূর্য;
দুঃস্বপ্নের শেষে মানুষগুলি আবার নিশ্বাস
নিতে চাইছে, সূর্যের আলো মাখতে চাইছে শরীরে
বুকের রক্তকে মাটিতে আকাশে বাতাসে
কে যেন ছড়িয়ে দিয়েছে, কে যেন

মানুষগুলি আবার নিশ্বাস নিতে চাইছে,
ভালবাসার, প্রেমের নিশ্বাস।

অভিযোগ কেরালা গবর্নমেণ্ট স্বীকার করে নি। কেরালা-গবর্নমেণ্ট তার একতিয়ার প্রয়োগ করে সে-অভিযোগ প্রত্যাহার করে নিয়েছে। কেরালা-গবর্নমেণ্টের এই কেন্দ্র-বিরোধী কাজের জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের অনেক মাতব্বর এমন ক্ষিপ্ত হয়ে উঠেছিলেন যে, কেরালা-গবর্নমেণ্টের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা-গ্রহণের কথাই ভাবতে আরম্ভ করেছিলেন। কিন্তু সে-পথে সুবিধা হবে না বুঝে শেষ পর্যন্ত কেন্দ্রীয় সরকার এই অপমান হজম করে নেওয়াই স্থির করলেন। পঃ বাংলাতেও নতুন যুক্তফ্রন্ট-সরকার দায়িত্বভার নেবার পরমুহূর্তেই ১৯শে সেপ্টেম্বর সংক্রান্ত কেন্দ্রীয় সরকারের কর্মচারীদের বিরুদ্ধে আনীত সমস্ত অভিযোগ প্রত্যাহার করে নেওয়া হয়েছে। অর্থাৎ, কেরালা-সরকার যা করেছিল পঃ বঙ্গ সরকারও তাই করল। এবারেও নিশ্চয় কেন্দ্রীয় সরকার চুপ করেই যাবেন; কেন না, এখন এ-নিয়ে বাড়াবাড়ি করতে গেলে কেন্দ্রকেই আরো বেশি মুস্কিলে পড়তে হবে।

ঠিক এইরকম বিরোধ না হলেও, ক্ষমতার একতিয়ার নিয়ে রাজ্যের সঙ্গে কেন্দ্রের বিরোধ নানা প্রশ্নে হতে পারে—ট্যাক্সের অংশ নিয়ে, প্রকল্প নিয়ে, শিল্পনিয়ন্ত্রণ নিয়ে, দর-নিয়ন্ত্রণ নিয়ে, শ্রমসমস্যা নিয়ে এবং আরও অনেক কিছু নিয়ে। যুক্তফ্রন্ট-সরকারের গতবারের অভিজ্ঞতায় দেখা গিয়েছে যে, অনেক কাজের জন্যই কেন্দ্রের অনুমোদনের উপর রাজ্য-সরকারকে নির্ভর করতে হয়। স্বভাবতই এবারে যুক্তফ্রন্ট-সরকার এই সমস্ত বিষয়েই আগের চেয়ে বেশি গুরুত্ব দিয়ে ও বেশি দৃঢ়ভাবে নিজেদের কর্মসূচী রূপায়ণের চেষ্টা করবে। সুতরাং রাজ্য ও কেন্দ্রের মধ্যকার ক্ষমতা-সম্পর্কে প্রশ্নটি আজকের দিনের একটা প্রধান রাজনৈতিক প্রশ্ন হিসাবেই দাঁড়িয়ে যাচ্ছে।

এই পরিস্থিতিতে কেন্দ্রের মনোভাব কি হবে? তাঁরা কি সাংবিধানিক এক-কেন্দ্রিকতার জোর দেখিয়েই চলবেন সংঘাতের পথে? গত নির্বাচনের পর সে-কথাটা প্রধানমন্ত্রীর মুখ থেকে বেরোয় নি, এবার পরিস্থিতির আরো পরিবর্তন দেখে সেই কথাটা প্রধানমন্ত্রী বলেছেন। তিনি স্বীকার করেছেন যে, বিভিন্ন মতবাদের সরকার প্রতিষ্ঠিত হয়েছে বিভিন্ন রাজ্যে। এই স্বীকৃতির যদি কোনো মূল্য থাকে, তাহলে প্রথমেই যা করা দরকার তা হচ্ছে রাজ্যের অধিকার ও ক্ষমতা বৃদ্ধি করা, যাতে কেন্দ্রের পছন্দমতো পথে না হলেও, প্রকৃত গণতান্ত্রিক পথে রাজ্যের বিকাশ হতে পারে। এর জন্য সংবিধান সংশোধনের প্রয়োজন হবে এবং রাষ্ট্রের 'ফেডারেল' চরিত্রকে আরো স্পষ্ট ও প্রকৃত করতে হবে। কেন্দ্রীয় সরকার নতুন পরিস্থিতির এই প্রয়োজনকে যদি উপেক্ষা করে, তা হলে গণতান্ত্রিক শক্তিই এই প্রয়োজন মেটানোর জন্য অগ্রণী হবে।

কতকগুলি বিশেষ বিষয়েরই আলোচনা করলাম। এছাড়া সাধারণভাবেও সকলের কাছে অত্যন্ত স্পষ্ট যে রাজনৈতিক তাৎপর্য এই নির্বাচনের, তা তো ফুটে উঠেছে যুক্তফ্রন্টের কর্মসূচীর মধ্যেই। এই কর্মসূচী জনসাধারণের সামনে তুলে ধরেছে সামাজিক কল্যাণের এমন একটা পথ যা কংগ্রেস-সরকার রুদ্ধ করে রেখেছিল। দক্ষিণে কেরালা ও পূর্বে পঃ বাংলা যদি দৃঢ় শক্তি নিয়ে এই সামাজিক কল্যাণের পথে অগ্রসর হতে পারে, তবে এই দুই রাজ্যের বাইরেও জনসাধারণের বিরাট অংশকে অনুপ্রাণিত ও উদ্যোগী করে তুলবে, যার ফলশ্রুতি দেখা যাবে পরবর্তী পর্যায়ে।

কিন্তু পঃ বাংলার নির্বাচন-ফলের এই রাজনৈতিক তাৎপর্যকে কিন্তু শুধু এক-তরফাভাবে দেখলে চলবে না। যেমন বামপন্থী ও গণতান্ত্রিক শক্তির দিক থেকে অনুকূল এই রাজনৈতিক তাৎপর্য, তেমনি এর অন্যদিক হচ্ছে প্রতিপক্ষ-শক্তিগুলির বিরুদ্ধ-প্রতিক্রিয়ার রাজনৈতিক তাৎপর্য। তাই পঃ বাংলার নির্বাচন-ফল যেমন বিপুল সম্ভাবনা উন্মুক্ত করেছে, তেমনি বৃদ্ধি করেছে প্রতিপক্ষের প্রতিরোধ-কৌশলের মোকাবিলা করার দায়িত্বও। এ কথাটা এক মুহূর্তের জন্যও ভুলে গেলে চলবে না।

মন্ত্রীরা যা বলেন

শিক্ষামন্ত্রী
শ্রীসত্যপ্রিয় রায়

১। প্রঃ। নিখিল বঙ্গ শিক্ষক-সমিতির দাবি-দাওয়াগুলি সব মেটানো সম্ভব হবে কি?

উঃ। যতদূর সম্ভব চেষ্টা করা হবে। প্রাথমিক, মাধ্যমিক, কলেজ ও বিশ্ব-বিদ্যালয় শিক্ষকদের সমিতিগুলির দাবি-দাওয়া যতটা মেটানো যায়—সেই চেষ্টা করার জন্যই এসেছি।

২। প্রঃ। যে-সব শিক্ষকরা তৃতীয় শ্রেণীতে এম. এ পাশ করেছেন, তাঁদের শিক্ষাগত যোগ্যতা বৃদ্ধির জন্য যে-বিষয়ে তাঁরা এম.এ পাশ করেছেন, ঐ একই বিষয়ে আবার পরীক্ষা দেওয়ার ব্যবস্থা করা যায় কি?

উঃ। বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের সঙ্গে কথা বলে দেখব। আমি ব্যক্তিগত-ভাবে মনে করি যে, যে-সব শিক্ষকরা এম. এ পরীক্ষায় শতকরা ৪০ বা তার ওপরে নম্বর পেয়েছেন—তাঁদের বর্তমানের দ্বিতীয় শ্রেণীর এম-এ-দের মত সুযোগ-সুবিধা দেওয়া উচিত।

৩। প্রঃ। অনেক বিদ্যালয়ে শিক্ষক-শিক্ষিকারা নিয়মিত বেতন পান না, এর প্রতিকার সম্ভব কি?

উঃ। শিক্ষক-শিক্ষিকারা যাতে ঠিকমত বেতন পান—সেইদিকটা দেখাই আমার প্রধান কর্তব্য।

৪। প্রঃ। অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায় যে, কলেজ ও মাধ্যমিক শিক্ষকদের শিক্ষাগত যোগ্যতায় বেশি তফাৎ নেই। কাজেই এই দুই শ্রেণীর শিক্ষকদের বেতনের তারতম্য থাকা বাঞ্ছনীয় কি?

উঃ। সমস্ত ব্যাপারটাই এখন পে-কমিশনের কাছে আছে। পে-কমিশনের কাছে নিখিল-বঙ্গ-শিক্ষক সমিতি যে মেমোরেন্ডাম্ দিয়েছেন—তা যদি কমিশন মেনে নেন, তবে কলেজ ও মাধ্যমিক শিক্ষকদের মধ্যে বেতনের দিক থেকে কোনও তফাৎ থাকবে না।

৫। প্র। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সিনেট নির্বাচনের সময় সংস্কৃত কলেজে যে অসাধু ব্যাপার ঘটেছিল—সে সম্বন্ধে কিছু করবেন কি?

উঃ। বিষয়টি পর্যালোচনা করা যাবে।

৬। প্রঃ। শোনা যায়, সংস্কৃত কলেজের গ্রন্থাগার থেকে বেশ কিছু মূল্যবান পুস্তক উধাও হয়ে গেছে। এ-বিষয়টি সম্বন্ধে তদন্তের প্রয়োজন আছে কি?

উঃ। এ-বিষয়েও পর্যালোচনা করা যাবে।

৭। প্রঃ। বিগত যুক্তফ্রন্ট সরকার কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগার কর্মী-দের ইউ, জি, সি, বেতনক্রম চালু করার সুপারিশ করেছিলেন। এ-বিষয়ে কিছু বলবেন কি?

উঃ। কাগজ-পত্র দেখে বলব।

৮। প্রঃ। দ্বাদশশ্রেণীর বিদ্যালয়ের কথা শোনা যাচ্ছে। আপনার কাছ থেকে এ-সম্বন্ধে শুনতে চাই।

উঃ। এটা আমার ভাবনামাত্র। এ-বিষয়ে এখনও কোনও পাকা সিদ্ধান্ত হয় নি।

৯। প্রঃ। বিদ্যালয়ের পরিচালক-সমিতির মাধ্যমে অনেক সময়েই নানারকম দুর্নীতি প্রশ্রয় পায়। কায়েমী স্বার্থ নষ্ট করতে কি করবেন?

উঃ। 'রুলস্' তৈরি করছি নতুন করে। যাতে কোনও কায়েমী স্বার্থ না থাকতে পারে—তার ব্যবস্থা হচ্ছে।

১০। প্রঃ। বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশাসনিক বিভাগের উচ্চপদস্থ আমলাদের বেতন অনেক সময় অধ্যাপকদের থেকেও বেশি। এটা বাঞ্ছনীয় কি?

উঃ। আমি ব্যক্তিগতভাবে মনে করি বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশাসনিক বিভাগের আমলাদের বেতন বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক-দের বেতনের চেয়ে বেশি হওয়া উচিত নয়। এ-কথা অতীতে রাজ্য-বিধান-পরিষদে আমি বলেছি।

১১। প্রঃ। বর্তমানে বি-টি পাশ না করলে মাধ্যমিক শিক্ষকদের বেতন বৃদ্ধি হয় না। এ নিয়মের পরিবর্তন হওয়া বাঞ্ছনীয় নয় কি?

উঃ। ব্যক্তিগতভাবে আমি মনে করি বি-টি ডিগ্রিকে Additional qualification বলে ধরা উচিত। এবং তার জন্য অতিরিক্ত কিছু Allowance-ও দেওয়া উচিত। তবে বি-টি পাশ না করলেও শিক্ষকদের Scale বা Increment পেতে কোনও অসুবিধা হওয়া উচিত নয়।

১২। প্রঃ। বর্তমানে পশ্চিমবঙ্গে যে স্বল্প-সংখ্যক বি-টি কলেজ আছে, তাতে বি-টি পড়তে ইচ্ছুক শিক্ষকদের ভর্তি হওয়া দুঃসাধ্য ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে। এ-দিকে বৃত্তিগত যোগ্যতা বৃদ্ধির জন্য বি-টি বা ঐ ধরণের কোনও ট্রেনিং-এর দরকার তো রয়েছে। এ-বিষয়ে কি ভাবছেন?

উঃ। গ্রীষ্মাবকাশে ও পূজাবকাশে শিক্ষক-শিক্ষিকাগণ যদি কলেজে প্রায় ৩ মাস কাল 'থিয়োরিটিক্যাল ক্লাশ' করতে পারেন এবং নিজ নিজ বিদ্যালয়ে 'প্রাক্‌টিস্ টীচিং'-এর সুযোগ পান, তাহলে এ সমস্যার সমাধান সহজেই হতে পারে। সেই জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তৃ-পক্ষের সঙ্গে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব কথা-বার্তা বলা হবে।

তথ্য ও জনসংযোগমন্ত্রী শ্রীজ্যোতিভূষণ ভট্টাচার্য

১। প্রঃ। মধ্যবর্তী নির্বাচনে বাংলা দেশের পত্র-পত্রিকাগুলির ভূমিকা সম্পর্কে আপনার মতামত কি?

উঃ। অল্প কয়েকটি প্রগতিশীল দৃষ্টি-সম্পন্ন সংবাদপত্রকে বাদ দিলে এ-কথা বলা যায় যে, বাংলা দেশের সংবাদপত্রগুলি জনসাধারণের প্রতি তাঁদের দায়িত্ব বা গণতান্ত্রিক নির্বাচনে তাঁদের যোগ্য ভূমিকা গ্রহণ করতে ব্যর্থ হয়েছিলেন, অথবা অস্বীকার করেছিলেন।

যুক্তফ্রন্টের বিরুদ্ধে কল্পিত জনমতের সংবাদ পরিবেশন করে এই পত্রিকাগুলি জনমতকে প্রতিক্রিয়াশীলদের পক্ষে প্রভাবিত করতে চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু এঁদের এই চেষ্টা সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয়। এঁদের চেষ্টাকে ব্যর্থ করার কৃতিত্ব জনসাধারণের। এবং যে হাজার হাজার কর্মী নিঃস্বার্থভাবে অক্লান্ত পরিশ্রম করে জনসাধারণকে প্রকৃত সত্য বুঝতে সাহায্য করেছেন—তাঁদের।

২। প্রঃ। 'সাপ্তাহিক বসুমতী'র ভূমিকা কেমন ছিল?

উঃ। যতদূর পড়েছি তাতে মনে হয়, 'সাপ্তাহিক বসুমতী' সঠিক ভূমিকা পালন করেছে।

৩। প্রঃ। এবার আপনাদের সরকার বেতার ব্যবহার করবেন কি?

উঃ। বেতারকে ব্যবহার করা প্রয়োজন বলে মনে করি। কিন্তু বেতার যে সম্পূর্ণভাবে কেন্দ্রীয় সরকারের স্বেচ্ছাচারের অধীনে থাকবে এবং রাজ্যের বেতারের ওপর রাজ্য-সরকারের কোনও নিয়ন্ত্রণ থাকবে না—এ অবস্থাটা বদলাতে চাই।

স্থানীয় বেতার কর্তৃপক্ষ এবং কেন্দ্রীয় তথ্য ও বেতার দপ্তরের সঙ্গে পশ্চিম বাংলার বেতারের প্রোগ্রাম এবং পরিকল্পনা ব্যবস্থা বিষয়ে আলোচনা করতে চাই। এবং যোগ্য মীমাংসায় পৌঁছতে চাই।

৪। প্রঃ। 'কথা-বার্তা', 'পশ্চিমবঙ্গ' প্রভৃতি পত্রিকা পশ্চিমবঙ্গ সরকার প্রকাশ করেন। যদিও এ-গুলিতে জনমতের প্রতিফলন থাকে না। এর কিছু পরিবর্তনের প্রয়োজনীয়তা বোধ করেন কি?

উঃ। রাজ্য সরকারের তথ্য-প্রচার ও গণসংযোগের যা কিছু মাধ্যম আছে, সেগুলি জনসাধারণের স্বার্থে ব্যবহৃত হওয়া দরকার। এবং জনমতের প্রতিফলন সেখানে হওয়া চাই। এটা আমাদের উদ্দেশ্য। তবে এ-উদ্দেশ্যে পৌঁছতে নানা রকম বাধা অতিক্রম করতে হবে।

৫। প্রঃ। পশ্চিমবঙ্গে সংবাদ-সাপ্তাহিক পত্রিকাগুলির রিপোর্টারদের Accredition Card দেওয়া হয় না। দিল্লীতে দেওয়া হয়। পশ্চিমবঙ্গে তা দেওয়া সম্ভব কি?

উঃ। কিছু করা যায় কি না দেখব

অবশেষে পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভার বন্ধ দুয়ার খুলল। প্রায় তিনশ' সাতাশী দিন তালাবন্ধ থাকবার পর রাজ্য বিধানসভার ঘরে বাতি জ্বলল, এই বাতি পরিষদীয় গণতন্ত্রের বাতি—এই বাতি গণতান্ত্রিক প্রশাসন চালু হবার বাতি। কিন্তু বাতি জ্বললেই সব অন্ধকার দূর হয় না, বাতি জ্বললেই ঘরের সব অন্ধকার মুক্ত হয় না। আলো জ্বললেও আলোদানীর নিচেও অন্ধকার জমে থাকতে পারে। কিন্তু বাস্তববাদী মানুষ শুধু আলোর নিচে অন্ধকার দেখেই চোখ বুজে থাকেন না, অন্ধকারকে মেনে নিয়েই আলোর সুধা পান করেন।

বিগত কয়েকদিন ধরে রাজ্য রাজনীতির প্রধান গবেষণার বিষয় হয়েছিল রাজ্যপাল প্রসঙ্গ। রাজ্যে যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রিসভা গঠিত হবার পরই মন্ত্রিসভা এক প্রস্তাব গ্রহণ করে অবিলম্বে রাজ্যপালকে ফেরত নেবার দাবি জানালো এবং এই প্রস্তাবে বলা হল যে, ৬ই মার্চ বিধানসভা চালু হবার আগেই রাজ্যপালকে ফেরত নিতে হবে। রাজ্যপালকে ফেরত নেবার প্রসঙ্গে যুক্তফ্রন্টের দাবি কতটা যুক্তিসঙ্গত ছিল, সেই প্রসঙ্গে যাবার আগে প্রথম কথাই বলতে হয় যে, কেন্দ্রে কিছু ব্যক্তি আছেন, যাঁরা দেওয়ালের লেখা পড়তে অক্ষম। এই অক্ষমদের মধ্যে প্রথম সারির প্রথম হলেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী শ্রী ওয়াই বি চ্যবন। শ্রীচ্যবন জানতেন পশ্চিমবঙ্গে যুক্তফ্রন্ট জয়ী হয়েছে আর এই যুক্তফ্রন্টের সঙ্গে রাজ্যপাল শ্রীধরমবীরের সম্পর্ক কোনক্রমেই ভাল হতে পারে না—আর কেন ভাল হতে পারে না সেই কথা শ্রীচ্যবনই সবচেয়ে বেশি জানেন, কারণ শ্রীচ্যবনের উপদেশ ও পরামর্শ নিয়েই রাজ্যপাল শেষ দিন পর্যন্ত চলেছেন এবং চলবেন।

কিন্তু আজ সম্ভবত বড় প্রশ্ন শ্রীচ্যবন বা শ্রীধরমবীর নন, বড় প্রশ্ন পরিষদীয় গণতন্ত্র—দেওয়ালের লেখা যাঁরা পড়তে পারেন তাঁরা এই সত্য উপলব্ধি করতে পারছেন। পরিষদীয় গণতন্ত্রে রাজ্যগুলির যে স্বাধিকার আছে সেই স্বাধিকার যদি খর্ব করা হয়—তবে শুধু অসন্তোষ সৃষ্টি নয়, ভবিষ্যতে অসন্তোষ ভিন্ন খাতে প্রবাহিত হতে পারে। রাজ্যপালকে নিয়ে অযথা মর্যাদার প্রশ্ন সৃষ্টি করা হল কেন—এই প্রশ্ন উঠতে পারে। যে রাজ্যপালের কার্যকলাপ সম্পূর্ণভাবে জনগণের রায়ে ধিক্কৃত হয়েছে—সেই রায়কে মর্যাদা না দেবার একমাত্র কারণ বোকামী ছাড়া কি হতে পারে? পশ্চিমবঙ্গের নির্বাচনের রায় যদি কেন্দ্রীয় সরকার মেনে নিতেন, তবে সর্বাগ্রে প্রয়োজন ছিল শ্রীঅতুল্য ঘোষের মত শ্রীচ্যবনের পদত্যাগের অভিনয় করা। কারণ ১৯৬৭ সালের ২১শে নভেম্বর থেকে পশ্চিমবঙ্গ রাজনীতির মূল কলকাঠি নেড়েছেন শ্রীচ্যবন আর নির্বাচনের আগে বারে বারে পশ্চিমবঙ্গে এসে নির্বাচনী সভায় ভাষণ দিয়ে শ্রীধরমবীরের নীতির প্রতি আস্থা জানিয়ে প্রচার করে গেছেন। কিন্তু ফল কি হল? প্রকৃতপক্ষে চ্যবন নির্বাচনের সময় ২৬টি নির্বাচনী কেন্দ্রে ভাষণ দিয়েছেন, তার মধ্যে একমাত্র আরামবাগ ছাড়া অন্য কোন কেন্দ্রে একজন কংগ্রেস প্রার্থীও জয়ী হয় নি। এই প্রসঙ্গে একটা কাহিনী উল্লেখ করতে চাই। সিউড়িতে যেদিন ভারতের প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী সভা করেন, তার আগের দিন সেই একই জায়গায় সভা করেন শ্রীবিজয় বন্দ্যোপাধ্যায় আর শ্রীঅজয় মুখোপাধ্যায়। এই সভায় শ্রীবিজয় বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছিলেন—এই কেন্দ্রে একজন মহিলা প্রার্থী লড়াই করছেন যুক্তফ্রন্টের হয়ে—আর সেই প্রার্থীকে পরাজিত করতে ছুটে আসছেন ভারতের মহিলা প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী গান্ধী। একজন মহিলা—কুমারী বাচ্চা মেয়েকে পরাজিত করতে ভারতের প্রধানমন্ত্রীর এই আগমন আমরা চ্যালেঞ্জ হিসাবে গ্রহণ করছি। ভারতের প্রধানমন্ত্রী এসে এই বাচ্চা মেয়ে প্রতিভা মুখার্জীকে

ফাগুন লাগার দিনে

পথ চলতে পায়ের আরাম, চমৎকার খোলামেলা গড়ন, ছিমছাম
মনোরম স্টাইল...বাটার এই সব স্যান্ডাল বা চপ্পলে নিজেকে
আপনি অনেক বেশি পরিচ্ছন্ন এবং স্বচ্ছন্দ বোধ করবেন।
সুঠাম, কোমল ওপর-চামড়া, তেমনি মোলায়েম আর মজবুত সোল—
প্রত্যেক পদক্ষেপে আশ্চর্য আরাম। স্টাইলের বহুমুখী
বৈচিত্র্য এদের আরেকটি বৈশিষ্ট্য। আজই এসে দেখে যান বাটার দোকানে
স্যান্ডাল ও চপ্পলের নানাবিধ সুদর্শন নকশা।

Bata

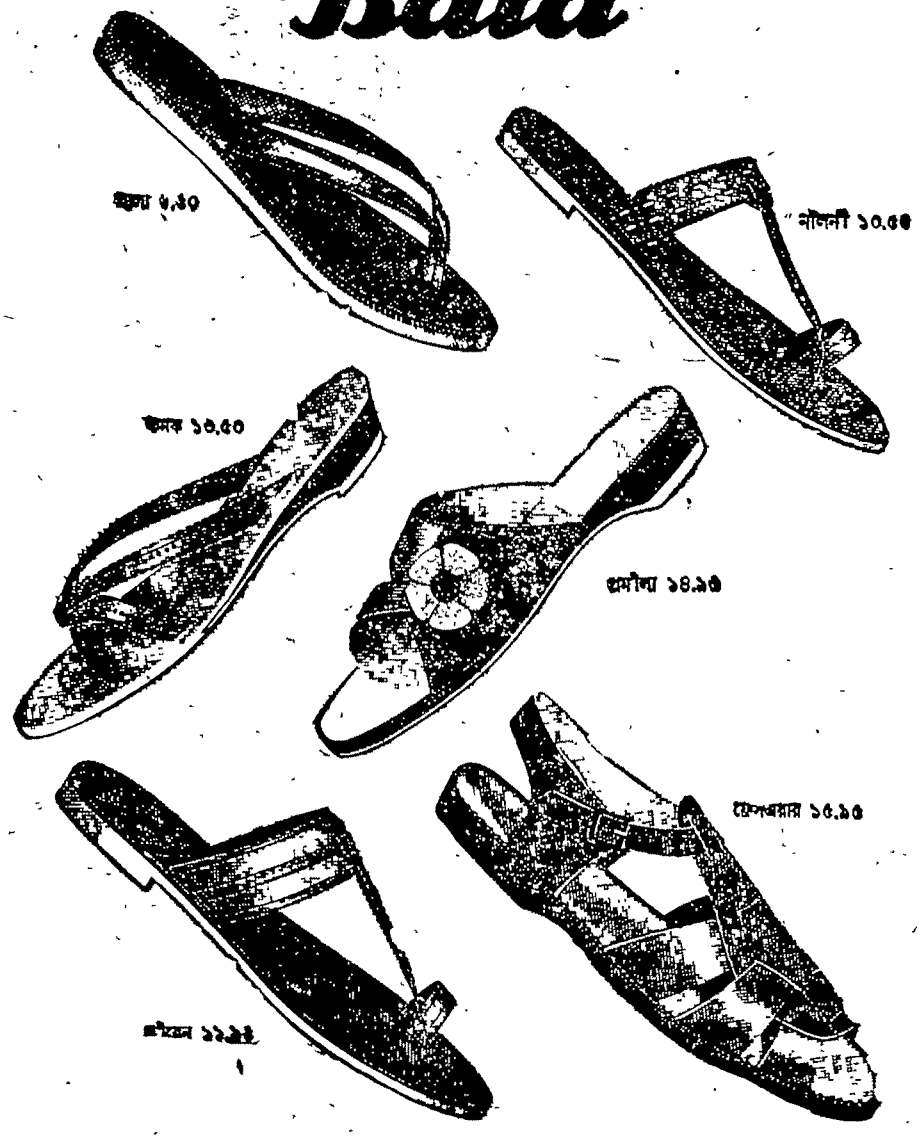

যদি পরাজিত করতে পারেন, তবে আমি পদত্যাগ করবো, রাজনীতি থেকে বিদায় নেব। আর প্রধানমন্ত্রীর প্রার্থী শ্রীবৈদ্যনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় যদি পরাজিত হন, তবে প্রধানমন্ত্রী যেন পদত্যাগ করেন।

নির্বাচনী রায়ে প্রধানমন্ত্রীর প্রার্থী পরাজিত হয়েছে আর বিজয় বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রার্থী বিজয়ী হয়ে মন্ত্রী হয়েছেন। কিন্তু এ ঘটনা সম্ভবত আজ আর শ্রীবিজয় বন্দ্যোপাধ্যায়ের মনে নেই, আর প্রধানমন্ত্রী সম্ভবত এই চ্যালেঞ্জের কথা শুনতেও পান নি। কিন্তু রাজা সব সময় চোখ দিয়ে সব দেখেন না, নিজের কানেও সব শোনেন না, তাই আগেই বলেছি প্রাজ্ঞ রাজা সব সময় সঠিকভাবে দেওয়ালের লেখা পড়তে পারেন।

কিন্তু এই ক্ষেত্রে আমাদের গণতান্ত্রিক পথে নির্বাচিত রাজারা না কানে শোনেন, না চোখে দেখেন, না দেওয়ালের লেখা পড়তে পারেন।

রাজ্যপাল ধরমবীরকে পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভা শুরুর আগে সরানো গেল না —ধরে নিলাম সেটা ভয়ানক অপমানের ব্যাপার হত, অতখানি অপমান সহ্য করার মত স্পোর্টসম্যানসুলভ স্পিরিট নেই, কিন্তু রাজ্যপালকে মন্ত্রিসভা-রচিত ভাষণ সবটা পাঠ না করতে পরামর্শ দেওয়া হল কোন্ বিবেচনায়? রাজ্যপাল পাঠ করবেন মন্ত্রিসভার নীতিসম্বলিত ভাষণ—এই ভাষণ পাঠ করার ক্ষেত্রে রাজ্যপাল একজন বেতনভুক কর্মচারী মাত্র, কিন্তু তিনি সেই ভাষণ থেকে অংশবিশেষ পাঠ করবার কে? ইংলণ্ডের রাণী কি কখনও মন্ত্রিসভার রচিত ভাষণে আপত্তি জানাতে পারেন? কখনই পারেন না। রাজ্যপাল কেন্দ্রের কাছ থেকে পাওয়া বিশেষ কিছু অধিকার ভোগ করেন, কিন্তু যেখানে রাজ্য সরকারের পরামর্শের প্রশ্ন আছে, সেখানে রাজ্যপাল রাজ্য সরকারের মত মানতে বাধ্য। কিন্তু এই ক্ষেত্রে কি হল? রাজ্যপাল তাঁর ভাষণের কয়েকটি ছত্র বাদ দিয়ে পড়লেন—এই ছত্রগুলিতে রাজ্যপালের সম্পর্কে প্রত্যক্ষভাবে কোন কথা ছিল না, অপ্রত্যক্ষভাবে গত বৎসরের রাজ্যপালের কাজের কিছু সমালোচনা ছিল। অতীতের ঘটনার উল্লেখ করতে রাজ্যপালের আপত্তি হবার কি কারণ হতে পারে, যদি সেই ঘটনা সত্য হয়।

রাজ্যপাল ঐ কটি লাইন পড়াতে কি ঘটনাগুলি মিথ্যে হয়ে গেল, না তিনি পড়েন নি বলে সেই কথাগুলি অকথিত রয়ে গেল। প্রকৃতপক্ষে যা হবার সবই হল, শুধু রাজ্যপাল একটা মিথ্যা অহমিকার শরিক হয়ে রাজ্য ও কেন্দ্রের সম্পর্কে নতুন প্রশ্নের অবতারণা করলেন।

পশ্চিমবঙ্গের মানুষ অতীতের অভিজ্ঞতায় ও রাজ্যপালের বর্তমান কার্যকরণে যদি মনে করেন যে, পূর্ব-পাকিস্তানে মোনেম খাঁ যেমন জেনারেল আয়ুবের প্রতিনিধি হিসাবে রাজ্যের জনগণকে শৃঙ্খলাবদ্ধ রাখতে চান, তেমনি শ্রীধরমবীরও শ্রীচ্যবনের প্রতিনিধিরূপে পশ্চিমবঙ্গের জনগণ তথা সরকারের নীতি ও চিন্তা-ভাবনাকে অবদমিত রাখতে চান —তা হলে অবস্থাটা কি পূর্ব-পাকিস্তানের মানুষ আজ যা করছে, সে পথে চলছে, পশ্চিমবঙ্গের মানুষকেও সেই পথে ঠেলে দেওয়া হয় না। কারণ একটা সত্য সকলেরই বোধহয় জানা যে, মেজাজ অথবা রক্তে পূর্ব ও পশ্চিমবঙ্গ দুই প্রান্তের মানুষই এক। শ্রীধরমবীর ও মোনেম খাঁ যদি এক পর্যায়ের কার্যকলাপের হোতা হন, তবে তাঁদের বিরুদ্ধে জেহাদও একই পথে হতে পারে। দেওয়ালের এই লেখাটাই লেখা হয়েছে সম্প্রতি শ্রীধরমবীরের আচরণে। এই লেখা পড়ে যাঁরা বুঝবেন তাঁরা সহজে সমস্যা সমাধানের পথ পাবেন, অন্যথায় তাঁদের অন্ধকারে পথ হাতড়াতে হবে।

পরিষদীয় গণতন্ত্রের জনক বা জননী হল ইংলণ্ড। এই কথা জানা আর ভারতের পরিষদীয় গণতন্ত্রের কাঠামো রচনা করা হয়েছে বৃটিশ পার্লামেন্টের অনুকরণে। পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপালের আচরণকে বৃটিশ পার্লামেন্টের ছকে ফেলে বিচার করলে অনেক সমস্যার জট খুলে যায়। তবে এই কাজ করবার জন্য অনেক বড় বড় রাষ্ট্রবিজ্ঞান পণ্ডিত আছেন, তাঁরা করবেন —আমি শুধু কয়েকটি কথা উল্লেখ করছি। ইংলণ্ডের রাজা প্রথম চার্লসের একটি জামা অতি মূল্যবান প্রদর্শনীয়রূপে হিসাবে বৃটিশ পার্লামেন্টে রক্ষিত আছে —কারণ চার্লসকে যখন গলা কেটে খুন করা হয়, তখন এই জামাটা তাঁর পরণে ছিল। তবু প্রশ্ন ওঠে জামাটার মূল্য কি শুধু চার্লসের জামা বলেই—না, জামাটার মূল্য এই কারণে যে, চার্লস পার্লামেন্টের বিরোধিতা করতে গিয়ে প্রাণ হারিয়েছিলেন, কাজেই পার্লামেন্টই বড়। আর একটা কথা মনে পড়ে, অষ্টম এডওয়ার্ড সিংহাসন ত্যাগ করলেন শ্রীমতী সিম্পসনকে বিয়ে করতে গিয়ে—কারণ পার্লামেন্ট এই বিবাহ অনুমোদন করলো না। শেষ কথাটা বলতে চাই, আজও বৃটিশ পার্লামেন্টের নিয়ম কি? হাউস অফ কমন্স ও হাউস অফ লর্ডসের যুক্ত বৈঠকে রাজা বা রাণী যেদিন ভাষণ দেন, সেদিন রাণী বা রাজা এসে প্রথম লর্ডস সভায় বসেন। কমন্স সভার সদস্যরা এই সময় ঘরে দরজা বন্ধ করে বসে থাকেন। লর্ডস সভা থেকে একজন দূত কমন্স সভার দরজায় বিনীতভাবে করাঘাত করেন। আর কমন্স সভার সদস্যরা দরজা খুলেই চরম বিরক্তি প্রকাশ করে বলে—"কি চাও"; সেই দূত বিনীতভাবে বলে—"রাণী এসেছেন—আপনাদের আহ্বান করেছেন।" এই সময় কমন্স সভার সদস্যরা ঘর থেকে বেরিয়ে চরম হল্লা চিৎকার করে লর্ডস সভায় যান। এই হল্লা চিৎকার করা হয় এই কারণে যে, দেখানো হয়—তুমি রাজা হও আর রাণী হও—তোমাকে গ্রাহ্য করি না—আমল দিই না, আমরাই হচ্ছি সর্বোচ্চ। আমাদের উপর কেউ নয়। আমাদের ওপর কেউ নয় বলে চার্লস-এর জামাটা ঝুলিয়ে রাখা হয়েছে, আমাদের কথাই শেষ কথা বলে অষ্টম এডওয়ার্ডকে সিংহাসন ত্যাগ করতে হয়েছে। আর আজও কমন্স সভার সদস্যরা রাণীর বক্তব্য শুনতে যাবার সময় বন্য চিৎকার করে বুঝিয়ে দেয়—আমরাই বড়। এই বিচারেই একবার ভেবে দেখা যায় শ্রীধরমবীর যা করলেন সেইটা সঙ্গত কাজ, না যা করেন নি সেইটা সঙ্গত কাজ। বৃটিশ আমলের আই-সি-এস শ্রীধরমবীর এত বৃটিশ কায়দা-কানুন জানেন, আর বৃটিশ পার্লামেন্টের ইতিহাস জানেন না —এই কথা বলার ধৃষ্টতা নেই। তবে তিনি যদি সব জেনে করে থাকেন, তাহলেও কিছু বলার নেই—শুধু বলতে হয় নজরুলের মত 'দে গরুর গা ধুইয়ে'।

(৭।৩।৬৯)

সাপ্তাহিক বসুমতীর চাঁদার হার

সাপ্তাহিক বসুমতীর বাৎসরিক চাঁদা ডাকে ১৮ টাকা, ষাণ্মাসিক ৯ টাকা ও ত্রৈমাসিক ৪·৫০ টাকা। প্রতি সংখ্যা ৩০ পয়সা।

তিন মাসের কমে গ্রাহক করা হয় না। গ্রাহক হতে হলে আপিসে অগ্রিম টাকা জমা দিতে কিংবা মনি অর্ডারে টাকা পাঠাতে হবে।

—কর্মাধ্যক্ষ, বসুমতী

পশ্চিমবাংলার বুদ্ধিজীবী ॥ শপথ, হতাশা এবং বিচ্ছিন্নতার সমস্যা

বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

(ক) প্রগতিশীল সাহিত্যিক ঃ আসল ও নকল

ইতিপূর্বে পশ্চিমবাংলার বুদ্ধিজীবী সমাজকে নিয়ে সামান্য আলোচনা করেছিলাম। সম্প্রতি অনুরোধ এসেছে তাঁদের সম্পর্কে, বিশেষ ক'রে এই রাজ্যের কবি, সাহিত্যিক ও সাংবাদিকদের সম্পর্কে আরেকটু স্পষ্ট ও খোলাখুলি বক্তব্য রাখবার।

এই নির্দেশ পালন করতে হলে আমাকে আস্ত একটি পুথি লিখতে হয়; কেন না, কোনো বিষয়ে স্পষ্টভাষায় নিজের বক্তব্য রাখতে হলে ঐ বিষয়টির ঐতিহাসিক ব্যাখ্যার প্রয়োজন হয়। বর্তমান নির্বাচনের মুখোমুখি পশ্চিমবাংলার কবি, সাহিত্যিক, শিল্পীরা কী ভূমিকা পালন করেছেন এবং কেন করেছেন, সে সম্পর্কেই যদি কিছু প্রশ্নোত্তর নেওয়া যায়, দেখা যাবে তাঁদের সমস্ত কথা ও কাজের পিছনে অন্তত কয়েক দশকের অতীত কাজ করেছে। তাঁদের ব্যক্তিগত অস্তিত্ব রক্ষার তাগিদ, উচ্চাশা, অর্থলোভ, স্বচ্ছন্দ জীবনযাপনের কামনা, অথবা মানবিক দায়িত্ববোধ, রাজনৈতিক স্বচ্ছ চেতনা, আদর্শ ইত্যাদি দীর্ঘকাল ধরে এইসব বুদ্ধিজীবীদের নানাভাবে আন্দোলিত ও পরিবর্তিত করেছে এবং কখনো বা স্বীয় মানবধর্মে অটল থাকতে উৎসাহ দিয়েছে।

কয়েকটি ঐতিহাসিক ঘটনাকে সামনে রেখেও পশ্চিমবাংলার বুদ্ধিজীবীদের চরিত্র ও আদর্শের কিছুটা ব্যাখ্যা করা যায়। যেমন, স্বাধীনতা লাভের সময় ও পরবর্তী অধ্যায়ে আমাদের কবি ও সাহিত্যিকরা কী ধরণের মানবধর্ম পালন করেছেন? দেশকে দু'ভাগ করে যে স্বাধীনতা অর্জিত হলো, তার কোনো প্রচণ্ড প্রতিক্রিয়া তাঁদের ওপর হয়েছিল কি না? ছিন্নমূল উদ্বাস্তুদের সম্পর্কে এ সময় থেকেই তাঁরা কোনো স্বচ্ছ, ভবিষ্যৎ দৃষ্টির পরিচয় দিয়েছিলেন কি? দেশের কয়েক কোটি মানুষের প্রতি যে চরম বিশ্বাসঘাতকতা এ সময়ে অনুষ্ঠিত হলো, তার বিরুদ্ধে কতটুকু ধিক্কার আমাদের কবি সাহিত্যিকদের কণ্ঠ থেকে শোনা গেছে?

ঠিক একই মাপের ঐতিহাসিক ঘটনা না হলেও চীন-ভারত সীমান্তের সংঘর্ষ, পাক-ভারত সীমান্তের লড়াই, দাঙ্গা, ভাষার যুদ্ধ, নাগাদের স্বাধীনতা আন্দোলন, স্বাধীন সাহিত্য, সমাজের রক্তচক্ষু আস্ফালন, নকশালবাড়ির অভ্যুত্থান, শিবসেনার তাণ্ডব, ভুখ মিছিলের ওপর প্রফুল্ল সেনের পুলিশবাহিনীর গুলীবর্ষণ এবং ঘোষ রাজত্বের নারকীয় ঘটনাবলী আমাদের কবি-সাহিত্যিকদের ইতিহাস চেতনায় কতটুকু এবং কী কাজ করেছে, সেই সম্পর্কেও কিছু তথ্যের অনুসন্ধান করা যেতে পারে। সাহিত্যের যে কোনো পরিশ্রমী ছাত্র যদি কয়েক বছরের বাংলা পত্র-পত্রিকার ফাইল ঘেঁটে তথ্য সংগ্রহ করেন, পশ্চিমবাংলার সমাজতত্ত্ববিদ পণ্ডিতদের এবং রাজনীতি ও সাহিত্যের পাঠকদের বিস্মিত করে দেওয়ার মত কিছু তথ্য তিনি অবশ্যই দিতে পারবেন। আমার সে সময় নেই, অনুরূপ পরিশ্রম করার ক্ষমতাও নেই।

আমি শুধু অল্প কথায় আমাদের ইতিহাস চেতনা সম্পর্কে নিজস্ব বক্তব্য রাখছি। মুষ্টিমেয় বুদ্ধিজীবীদের বাদ দিলে এই চৈতন্যের ছিঁটেফোঁটাও পশ্চিমবাংলায়, বিশেষ করে এখানকার কবিতায় ও সাহিত্যে উপস্থিত দেখা যায় না। তা হলে কি আমাকে এমন কথাও এখানে উচ্চারণ করতে হবে যে, এই রাজ্যে শুভবুদ্ধিসম্পন্ন বুদ্ধিজীবী মানুষের অভাব আছে?—আমি মোটেও এই ধরণের হঠকারী উক্তি করতে চাই না। পশ্চিমবাংলার মানুষ এবং বিশেষ করে তার বুদ্ধিজীবী সমাজ এখন পর্যন্ত এতটা নিচে নামেন নি। কিন্তু একথাও ঠিক, তাঁদের অধিকাংশই সংগ্রাম থেকে বিশ্রাম নিয়েছেন অথবা আমাদের সাধারণ মানুষের কাছে আজ যেমন ভোটে জেতাই সবচেয়ে বড় গণ-সংগ্রাম, আমাদের অধিকাংশ কবি-সাহিত্যিকের কাছেও তেমনি সহাবস্থানের মাধ্যমে যতটা প্রতিরোধের কণ্ঠস্বর তুলে ধরা যায়, ততটাই মানুষ ও মনুষ্যত্বের জন্য তাঁদের সংগ্রাম। বুঝতে পারছি, আমার বক্তব্য জটিল হয়ে যাচ্ছে। আরেকটু পরিষ্কার করে বলবার চেষ্টা করছি।

আমাদের কবি, শিল্পী, সাংবাদিকদের মধ্যে এমন মানুষ অনেক রয়েছেন—যাঁরা এখন পর্যন্ত মনুষ্যত্ব-বর্জিত হন নি। কিন্তু তাঁরা মানুষের সপক্ষে কথা বলেন বড়ই মৃদুকণ্ঠে, তাঁদের প্রতিবাদের ভাষাকেও নানা সময়ে জটিল করে তোলেন এবং কখনো বা আবেদন-নিবেদনের মাধ্যমে শত্রুপক্ষের শুভবুদ্ধিকে তাঁরা জাগিয়ে তুলবেন,—এমন বিশ্বাস থেকে, হাতের তলোয়ারটাকে শক্ত করে না ধরে গলার কণ্ঠীটাকেই বেশি করে বাতাসে ভাসতে দেন।

এর একটি কারণও আছে। এই ধরণের সাহিত্য বা কবিতা রচনা না করলে সাহিত্যের বাজারের কর্তাব্যক্তিরা তাঁদের বাজারে ঢুকতেই দেবেন না; প্রকাশকেরা তাঁদের বই কিনবেন না। আর যে সব ছিঁটেফোঁটা 'লিটল ম্যাগাজিন' রয়েছে, তাদের মাধ্যমে একজন পরিশ্রমী লেখকের অস্তিত্বই বজায় রাখা চলে না, আর্থিক অথবা অন্য যে কোনো সমস্যা মেটানোর কথা না হয় বাদ দিলাম। ফলে আমাদের প্রবীণ সাহিত্যিক ও কবিরা শেষ পর্যন্ত একটা মস্ত ফাঁদে ধরা দেন এবং তাঁদের এক সময়ের চওড়া কণ্ঠস্বর ক্রমে ক্ষীণ হতে হতে এমন একটা নিচু খাদে এসে আছাড় খেয়ে পড়ে, যেখান থেকে তাঁদের কিছু বলা আর না-বলা সমান হয়। এক সময়ে এই মৃদু কণ্ঠস্বরটুকুও থেমে যায়; তখন সর্বত্র নিস্তব্ধতা।

উদাহরণস্বরূপ, কয়েক বছর পূর্বেকার একটি ঐতিহাসিক ঘটনার মুখোমুখি হওয়া যাক। যখন প্রফুল্ল সেনের পুলিশবাহিনী ভুখ মিছিলের ওপর সমানে গুলীবর্ষণ করছে এবং বাংলাদেশের সর্বত্র গুলীখাওয়া মানুষের কণ্ঠে শপথ ও প্রতিরোধের আওয়াজ শোনা যাচ্ছে। পশ্চিমবাংলার কবি,—সাহিত্যিক ও শিল্পীরা কিন্তু এত রক্তস্নানের মধ্য দিয়েও সম্পূর্ণই বোবা ও বধির! যিনিই সে সময়কার সাহিত্য এবং সংবাদপত্রগুলিতে একবার চোখ বুলাবেন, তাঁর

সমস্ত মানবিকবোধ ও অনুভূতিই একটা প্রচণ্ড ধাক্কা খাবে—এই নিষ্ক্রিয়তা কী করে সম্ভব। অতি ক্ষীণকণ্ঠের দু'-একটি প্রতিবাদ হয়তো কোনো পরিশ্রমী পাঠকের চোখে পড়বে, কিন্তু তাতে পাশবিক শক্তির কিছু আসে যায় না ; কেন না, এই অস্পষ্ট প্রতিবাদগুলির মাধ্যমে আমাদের বক্তব্য প্রকাশের ভীরুতা এবং ক্লৈব্যই আরো বেশি করে প্রমাণিত হয়েছে।১

এবং, স্বাধীন সাহিত্য সমাজ গড়ে ওঠার দিন থেকেই, রক্তচক্ষু স্পর্ধা ও আস্ফালনের সামনে যেদিন আমাদের কবি ও সাহিত্যিকরা প্রতিজ্ঞা ভুলেছিলেন, অর্থাৎ যেদিন তাঁরা ভয় পেয়েছিলেন, এই পতন ও ইতিহাস-বিস্মৃতির সূত্রপাত হয়েছিল। সেদিন থেকেই আমাদের প্রগতিশীল সাহিত্যিকদের মধ্যে যে ভাঙন দেখা দিয়েছিল, আজও তার জোড়া লাগে নি। তাঁদের কণ্ঠস্বর ক্রমেই ক্ষীণ হয়ে আসতে লাগলো। যে কথা আগেই বলেছি। তবু, একথাও ঠিক, বাংলাদেশের বুদ্ধিজীবীরা তাঁদের শুভবুদ্ধিকে কখনোই পুরোপুরি বিসর্জন দেন নি; যদিও তাঁরা সংগ্রাম ভুলেছিলেন।

কিন্তু এই সংগ্রাম-বিস্মৃতিতার খেসারৎও তাঁদের কম দিতে হয় নি। সমাজবিরোধীরা তার সম্পূর্ণ সুযোগ নিয়েছে, এবং আমাদের প্রগতিশীল সাহিত্যিকরা ভয় পেয়ে গিয়ে যতই বিচ্ছিন্ন ও সহাবস্থানে বিশ্বাসী হয়ে উঠছিলেন, ততই বাজারের কেনা কবি ও সাহিত্যিকেরা সংঘবদ্ধ হয়েছে—ক্রমেই তাদের স্পর্ধা স্ফীত থেকে স্ফীততর হয়েছে এবং এক সময়ে তা আকাশ পর্যন্ত স্পর্শ করতে চেয়েছে। কিন্তু আমার আজকের আলোচনায় যেহেতু এই সকল নোংরা মানুষ বর্জিত, সুতরাং তাদের সম্পর্কে আর বেশি মন্তব্য প্রকাশ না করে আমি পূর্বেকার আলোচনাতেই ফিরে যেতে চাই।২

ভয় পাওয়ার, ইতিহাসকে ভুলে যাওয়ার, সংগ্রামের দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নেওয়ার পরিণাম সময়ে কীরকম হতাশা ও মানসিক শূন্যতার গর্ভে আমাদের ছুঁড়ে ফেলে, তার একটি সুন্দর উদাহরণ এখানে উপস্থিত করছি। দাঙ্গার বিরুদ্ধে কিছুদিন আগেও পূর্ব ও পশ্চিমবাংলায় অসংখ্য কবি কবিতা লিখেছিলেন। পূর্ববাংলার কবিরা কোনো কিছুর পরোয়া না করেই এই জঘন্য অপরাধকে ধিক্কার জানিয়েছেন। একটি কবিতার নাম রাখা হয়েছে 'কুকুরগুলো'। সেখান থেকে এই খবরও আমি পেয়েছিলাম যে রাজধানী ঢাকা শহরে কবি ও সাহিত্যিকেরা লাঠিসোটা সংগ্রহ করে দাঙ্গাবাজ গুণ্ডাদের পেটাতে সুরু করেছেন। আমাদের এখানে সমস্ত ব্যাপারটাই উল্টোভাবে ঘটেছে। আমাদের কবি-কণ্ঠের উচ্চারণ একই অপরাধের বিরুদ্ধে অত্যন্ত ক্ষীণ; এবং দাঙ্গার বিরুদ্ধে আমরা এখানে যে কার্যকরী ব্যবস্থা অবলম্বন করেছিলাম, তা হলো কয়েকটি শান্তি-মিছিল বের করা, কখনোই দুর্বৃত্তদের শায়েস্তা করা নয়। আমাদের মধ্যে একজন অতি-উৎসাহী কবি একসময়ে একই নিশ্বাসে আমির হোসেন, সমর সেন এবং অন্নদাশঙ্করের নাম এই বলে উচ্চারণ করেছিলেন যে, দাঙ্গাবিরোধী মানবিক শুভচৈতন্যের আলোকে এরা একইরকম উদ্ভাসিত। যদিও আমির হোসেন দাঙ্গাকে রুখতে গিয়ে প্রাণ দিয়েছিলেন, আর অন্নদাশঙ্কর লিখেছিলেন একটি ছড়া কবিতা ও দু'-একটি প্রবন্ধ। আমাদের কবির কাছে এই দুয়ের মূল্য সমান, কেন না আদর্শের জন্য মানুষের যে রক্তাক্ত সংগ্রাম তা আমরা দীর্ঘকাল ধরেই ভুলে গেছি।

অথচ এই দাঙ্গার বিরুদ্ধেই আজ থেকে একুশ-বাইশ বছর আগে জীবনানন্দ দাশ কী আশ্চর্য কবিতাই না লিখেছিলেন! তখনো আমাদের দেশ পরাধীন ছিল—আমাদের কবি-সাহিত্যিকদের বুকের মধ্যে তখনো প্রতিজ্ঞা ছিল।

একজন কবি বা লেখক যখন দাঙ্গার বিরুদ্ধে তাঁর লেখনীকে ব্যবহার করেন, তখন স্বাভাবিকভাবেই মানুষ এবং মনুষ্যত্বের কথা মনে আসে। একই মানবিক তাগিদে আমাদের কবিরা পরবর্তীকালে ভিয়েতনাম-কে নিয়ে কবিতা লিখেছিলেন। আমি নিজে দাঙ্গার বিরুদ্ধে এবং ভিয়েতনামের সংগ্রামী মানুষদের সমর্থনে, দুটি পৃথক কবিতা সংকলনের সম্পাদনা করেছি। কবিদের কাছ থেকে সহযোগিতা পেয়েছি প্রচুর। এই উভয় ঘটনা থেকে আমার পূর্বেকার মন্তব্যই সমর্থিত হয় যে, পশ্চিমবাংলার কবিরা অন্তত মানুষ ও মনুষ্যত্বের দিকে পিঠ ফিরিয়ে নেই। কবিতাগুলির অধিকাংশই কিন্তু প্রাণহীন; পড়ে মনে হয় যেন আমাদের প্রবীণ ও তরুণ কবিরা এখনো উপলব্ধি করতে পারছেন না, ভিয়েতনাম যুদ্ধের প্রকৃত অবস্থাটা কি? কখনো বা অত্যন্ত তরল কবিতা লিখেছেন তাঁরা; যেন এই কথাই সোচ্চারে প্রকাশ করতে চাইছেন, তাঁরা ভিয়েতনামকে নিয়েও ভাবনা-চিন্তা করেন। কেউ কেউ আবার কবিতাকে নানা রূপক ও ব্যঞ্জনার মাধ্যমে এইভাবে প্রকাশ করেছেন যে, ভিয়েতনাম চুলোয় যাক, তিনি বা তাঁরা যে মস্ত বড় কবি বাংলাদেশ, এবং তাঁদের কবিতার অনুবাদ হলে তামাম পৃথিবী যেন এই কথা ভুলে না যায়।

এই সকল সংগ্রামবিমুখতার, ইতিহাস-বিস্মৃতির লক্ষণ। ভয় পেয়ে একবার পিছন হটে এলে এমনই হয়। তখন আমরা শিবির পরিবর্তন না করলেও আর কোনো প্রথম সারির যোদ্ধা নই: বরং কখনো বা মিত্রপক্ষের কাছেই ভারস্বরূপ; কেন না ভয় মনুষ্যত্বের হানি ঘটায়, এবং তার পরিণাম সকল সময়েই অশুভ।

কিন্তু এ তো হলো নিজেদের অক্ষমতার জন্য বিলাপ; আমি কিন্তু এই সকল সংকলনের সঙ্গে যুক্ত হয়ে আরো কিছু অভিজ্ঞতা লাভ করেছিলাম। যেমন, ভিয়েতনামকে উপলক্ষ করে এমন সব কবিরাও কবিতা লিখেছেন যাঁরা স্পষ্টই সি-আই-এ'র প্রসাদপুষ্ট এবং যাঁদের অনেকেই মানবতাবিরোধী নানা অসৎ কর্ম করে যাচ্ছেন। যদিও তাঁদের মুখে একটি করে প্রগতিশীলের মুখোস রয়েছে; কিন্তু আমরা তাঁদের চিনি। এইসব বর্ণচোরা কবি-সাহিত্যিকরা কিন্তু এখন পর্যন্ত গাছের খাচ্ছেন এবং তলারটাও কুড়াচ্ছেন; অর্থাৎ বিভিন্ন বামপন্থী নেতা উপনেতাদের তাঁরা যন্ত্রস্থানীয়, এবং এই কারণে তাঁদের সমস্ত পাপকর্মই শেষ পর্যন্ত আড়াল হয়ে যায়। আমি পরবর্তী অধ্যায়ে এই ছদ্মবেশী সমাজ-শত্রুদের সম্পর্কে কিছু আলোকপাত করবো, এখন শুধু সূত্রাকারে আমাদের প্রগতিশীল কবি ও সাহিত্যিকদের সম্পর্কে আমার মতামত ও ধারণাগুলিকে আরেকবার সাজাতে চেষ্টা করছি। অবশ্য তাঁদের বিভিন্ন সমস্যাকেও আমি এই সঙ্গে তুলে ধরার চেষ্টা করবো।

(১) পশ্চিমবাংলায় শুভবুদ্ধিসম্পন্ন কবি, লেখক, সাংবাদিক চিরদিন ছিলেন এবং আজও আছেন।

(২) তাঁরা সংখ্যায় কম নন।

(৩) তাঁদের মধ্যে সংগ্রামী কবি সাহিত্যিকও রয়েছেন; কিন্তু এঁরা সংখ্যায় কম। এই সংখ্যা ক্রমেই আরো ক্ষীণ হয়ে আসছে।

(৪) এঁরা প্রায় সকলেই বিচ্ছিন্ন। স্বাধীন সাহিত্য সমাজের মত এঁদের

১। একটি কি দুটি ব্যতিক্রম আছে। যেমন ঐ সময়কার শারদীয় 'গণবার্তায়' প্রকাশিত চঞ্চলকুমার চট্টোপাধ্যায়-এর একগুচ্ছ কবিতা। তিনি সত্যিকারের কবির প্রতিবাদ জানিয়েছিলেন।

২। প্রগতিবিরোধী শিবির, স্বাধীন সাহিত্য সমাজ, বঙ্গ সংস্কৃতি সম্মেলন এবং মুক্তমেলা সম্পর্কে সময়মত আলোচনা করবো।

কোনো সংগঠন নেই। উৎসাহ দেওয়ার মত পত্র-পত্রিকাও প্রায় নেই। আবার এমনও দেখা যায়, যে পত্রিকাকে তাঁরা নিজেদের বলে মনে করছেন, তা বাজারের পত্রিকাগুলির মতই চরিত্রহীন। সেখানকার সম্পাদক এবং লেখকগোষ্ঠী অধিকতর ভ্রষ্ট ও কাপুরুষ। সহাবস্থানের নামে তাঁরা সকল রকম পাপকার্যে

(৫) একেই সংখ্যায় কম, তার ওপর ঐ সৃষ্টিমেয় সংগ্রামী সাহিত্যিককে অন্য দুর্ভোগও ভুগতে হয়। অর্থ এবং প্রচারের দারিদ্র্য এই প্রসঙ্গ থেকে বাদ দিচ্ছি; কেন না একই সঙ্গে নিজের সংগ্রামী ঐতিহ্যকে রক্ষা করা এবং দুঃখ ও স্বাচ্ছন্দ্যের মধ্যে অবগাহন করায় আর্ট কিছু নেই, থাকলে তার মধ্যে ভেজাল আছে। কিন্তু প্রচণ্ড আঘাত আসে অন্য দিক থেকে। এঁরা নিজেদের শিবির থেকেই নানাভাবে লাঞ্ছিত ও ধিক্কৃত হন। সুকান্ত অথবা মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, যাঁরা মরে রক্ষা পেয়েছেন, তাঁদের সামনে রেখে বাংলাদেশের অন্য সমস্ত কবি-সাহিত্যিককে ভ্রষ্ট এবং চরিত্রহীন আখ্যা দেওয়ার একটি রেওয়াজ আমাদের কোনো

লিনটাস-SU. 55-140 BG

তরুণ অপেরা

ফোনঃ ৫৫-৭১২১

১১৩নং রবীন্দ্র সরণী, কলিকাতা—৬

১৫০তম অভিনয় উৎসব ৪ঠা এপ্রিল ৫॥ ঘটিকায় মহাজাতি সদনে।

হিটলার

সভাপতি—ডক্টর রমা চৌধুরী, উপাচার্য, রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়।

প্রধান অতিথি—স্বাস্থ্যমন্ত্রী ননী ভট্টাচার্য। বিশেষ অতিথি—ডক্টর কানাই ভট্টাচার্য (কৃষিমন্ত্রী)।

উদ্বোধক—বিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায়।

তরুণ অপেরার 'হিটলার' নাটক সম্বন্ধে বিভিন্ন পত্র ও পত্রিকার অভিমত।

.....আসরে যুদ্ধচিত্র প্রায় একালের। আমাদের ঐতিহাসিক পালার রণদামামার সুর নয়, বিদেশীয় যুদ্ধ আবহ। এবং সেই তালে, আশ্চর্য মাত্রায় বাঁধা দ্রুত উত্তেজনাময় ছন্দ।.....আনন্দবাজার পত্রিকা

.....দেখতে দেখতে ক্ষণে ক্ষণে চমকিত হয়েছি—অভিভূত হয়েছি এর নাট্য প্রযোজনা দেখে আর বেরিয়ে এসেছি এক নূতন সূর্যের আলো দেখতে দেখতে—বাংলার লোকশিক্ষা যাত্রা তার আপন যাত্রাপথে ঠিকই এগিয়ে যাচ্ছে—যাবে। আর তরুণ অপেরার 'হিটলার' হচ্ছে সে যাত্রাপথের নূতন বাঁক।.....যুগান্তর

.....যতদূর মনে পড়ছে, সম্ভবতঃ আধুনিক যুদ্ধের উপর রচিত যাত্রাপালা এই প্রথম অভিনীত হল। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সূচনা কাল ১৯৩৯ সালের ১লা সেপ্টেম্বর থেকে যুদ্ধাবসান ১৯৪৫ খৃস্টাব্দের ২রা সেপ্টেম্বর পর্যন্ত বিস্তৃত যে কাল, তারই পটভূমিকায় লেখা এই পালা নিঃসন্দেহে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সামগ্রিক ছবি বহন করেছে।.....দৈনিক বসুমতী

.....যে কলাটি ছিল গ্রাম্য জীবনের একান্ত ও নিজস্ব আজ তা রূপান্তরিত হয়েছে বাংলা সংস্কৃতির একটি বিশিষ্ট অঙ্গরূপে.....'হিটলার' পালার- রুশ-জার্মান যুদ্ধের পটভূমিকায় হিটলারের চরিত্র উপস্থাপিত করা হয়েছে। দর্শকদের তুলে ধরা হয়েছে অশান্ত, চঞ্চল, বিশ্বজয়ের আশায় মত্ত মানুষটিকে, পৃথিবীর মানচিত্র যে বদলে দিতে চেয়েছিল।.....কালান্তর

.....হিটলারের চরিত্র চিত্রণে সমগ্র নাৎসী বীভৎসতা এবং ভয়াবহতা জীবন্ত হয়ে উঠেছিল ঃ রুশদের দেশপ্রীতি অত্যন্ত জাগরূক।.....অমৃত

.....ভার্সাই সন্ধিপত্র অগ্রাহ্য ও ছিন্ন করে হিটলারের নেতৃত্বে নাৎসী জার্মানীর অভ্যুদয়, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের হোতা বিশ্বগ্রাস হিটলারের বিশ্বগ্রাসী পরিকল্পনার ষড়যন্ত্রজাল বিস্তার—রাশিয়ার বিরুদ্ধে অভিযানের সঙ্কল্প—লাল ফৌজের মুক্তি সংগ্রাম—স্ট্যালিনগ্রাদে শোচনীয় পরাজয়—তারপর মদোন্মত্ত হিটলারের পতন এবং প্রণয়িনী এভা ব্রাউনের সঙ্গে সহমরণ ১৯৪১ থেকে ১৯৪৫ সালের দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের রোমহর্ষক কাহিনী দর্শকবৃন্দ বিস্ময়ে মঞ্চোপরি অভিনীত হতে দেখেছেন শম্ভু বাগ রচিত এই নাটকে।.....সাপ্তাহিক বসুমতী

.....ভারতে এই প্রথম এই (হিটলার) ভয়ানক দুঃসাহসিক নাটকের অভিনয়।

.....বর্ধমান শ্রমিক

.....This 'Pala' presents the thrilling story of the tragic end of Hitler.....*Amrita Bazar Patrika*

.....যাত্রাভিনয় জগতে তরুণ অপেরার 'হিটলার' নিঃসন্দেহে নূতন ইতিহাসের গৌরব নিয়ে দর্শকদের সামনে উপস্থিত হয়েছে।.....বিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায়

.....শক্তিশালী অভিনব প্রযোজনার ফসল তরুণ অপেরার 'হিটলার' প্রচণ্ড আলোড়ন সৃষ্টি করেছে।.....ডক্টর গৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্য

.....তরুণ অপেরার অভিনীত "হিটলার" যাত্রাজগতে অনবদ্য অবদান। আধুনিক ইতিহাসকে অবলম্বন করে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পটভূমিকায় এঁরা যে নূতন রীতির যাত্রার আয়োজন করেছেন তাতে মুগ্ধ হতে হয়।.....হরেন ঘোষ, উপাধ্যক্ষ, শিলিগুড়ি সান্ধ্য কলেজ।

.....তরুণ অপেরার 'হিটলার' যাত্রা নাটক এবং অভিনয়—নাটকে এবং অভিনয়ে যুগান্তর আনিয়াছে।.....ডক্টর সাধনকুমার ভট্টাচার্য

.....যাত্রাশিল্পিগণ—বিষয় নির্বাচন আঙ্গিক গঠনের দিক হইতে ইহাকে যুগোপযোগী করিয়া লইতে সক্ষম হইয়াছেন, তাহাতেই বাঙ্গালীর এই শ্রেষ্ঠ লৌকিক অনুষ্ঠানটি বিনাশের হাত হইতে রক্ষা পাইবে।.....ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য

.....তরুণ অপেরার 'হিটলার' পালার মধ্যে ঘটনার তীব্র ঘাত-প্রতিঘাত ও শ্বাসরোধকারী উত্তেজনা সৃষ্টি করতে নাট্যকার সম্পূর্ণ সক্ষম হয়েছেন। একদিকে আক্রান্ত রাশিয়ার প্রবল জাতীয়তাবাদ এবং অন্যদিকে দুর্ধর্ষ জাতির লৌহনায়ক হিলারের গম্ভীর ট্রাজেডি নাটকে মূর্ত হয়ে উঠেছে। এরকম যুদ্ধনাটক যাত্রায় দেখেছি বলে মনে হয় না।

.....ডঃ অজিত ঘোষ

কোনো বামপন্থী শিবিরে রীতিমত অভ্যাসে পরিণত হয়েছে।৩

(৬) এঁরা আরো অনুভব করেন, মাঝে-মধ্যেই বর্ণচোরা চরিত্রহীন কবি-সাহিত্যিক সাংবাদিকরা নানা বামপন্থী শিবির থেকে যথেষ্ট আদর ও প্রশ্রয় পেয়ে থাকেন। ফলে আমাদের শুভবুদ্ধি-সম্পন্ন ও সংগ্রামী বুদ্ধিজীবীদের মধ্যে হতাশা ও অবিশ্বাসের সৃষ্টি হয়।৪

(৭) কখনো কখনো এঁদের অস্তিত্ব মুছে যাওয়ার মতো ব্যাপার ঘটে। দারিদ্র্য এক কথা আর দিনের পর দিন অর্ধাহার ও অনাহার অন্য কথা। বিশেষ করে যাঁরা সংসারী মানুষ। এই অবস্থাকেও তাঁরা অনিবার্য মেনে নিয়ে সহ্য করেন; কিন্তু যখন দেখেন এমন কি সি-আই-এ'র দালালরাও বামপন্থী শিবিরগুলির কাছ থেকে প্রশ্রয় ও বাহবা পাচ্ছে, তখন চরম হতাশা আসে। এই হতাশা থেকেই এক সময় তাঁরা সহাবস্থানের দিকে ঝোঁকেন, এবং আত্মপ্রত্যয় হারিয়ে ফেলেন। [ক্রমশঃ]

৩। সম্প্রতি 'সুকান্ত নামা' কবিতা সংকলনের দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হয়েছে। এই সংকলনের সম্পাদকীয়টি এই ধরণের স্পর্ধিত প্রলাপের একটি প্রকৃষ্ট উদাহরণ। সম্পাদক নিজে 'অমৃত' পত্রিকায় নিয়মিত ছোট গল্প লিখে থাকেন। ঐ সকল রচনায় তিনি সুকান্ত অথবা মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের কোন ঐতিহ্য বহন করছেন, প্রশ্ন করতে ইচ্ছে হয়।

৪। এই সম্পর্কে আমার একটি ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা আছে। ম্যাক্সিম গোর্কিকে নিবেদিত কবিতার সংকলন 'অমল মানুষ' কিছুদিন আগে আমার সম্পাদনায় প্রকাশিত হয়েছে। রুশপন্থী প্রগতিশীলদের পুস্তকালয়ে যথাসময়ে কয়েক কপি জমা দিয়েছিলাম; আজ পর্যন্ত তাঁদের কাউন্টারে প্রদর্শিত হয় নি। অথচ এখানে বহু সি-আই-এজেন্ট-দের বইও দিনের পর দিন প্রদর্শিত হয়ে থাকে। বাজারের কেনা গোলামদের কবিতার বই ছেপে বের করতেও এঁদের প্রচণ্ড উৎসাহ। অন্যত্র, মার্ক্সবাদী সাম্যবাদী বন্ধুদের পত্রিকায় 'অমল মানুষ'কে ইচ্ছেমত তিরস্কার ও ধিক্কার জানানো হয়েছে; কিন্তু তার যুক্তিটা দেখানো হয়েছে বড় মজার। কবিতার সংকলন দিয়ে গোর্কির মত মানুষকে ঠিকমত শ্রদ্ধা নিবেদন করা যায় না. এই হলো সমালোচকের মূল বক্তব্য। এই বক্তব্যটুকু তিনি পরিবেশন করেছেন রীতিমত চোখ রাঙিয়ে। অথচ আমাদের মার্ক্সবাদী সাম্যবাদী বন্ধুদের কড়া দৃষ্টির ফাঁক দিয়েও প্রকৃত অপরাধীরা অনেক সময় উট হয়ে সূচের মধ্য দিয়ে গলে যান। সময়ে এসব তাঁদের চোখে পড়ে না।

আমার ইউরোপ ভ্রমণ

ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায়

[পূর্ব-প্রকাশিতের পর]

[পরিমল গোস্বামী কর্তৃক ১৮৮৯ সনে প্রকাশিত *A Visit to Europe* থেকে অনুবাদ]

এইবার একজন খেলনার দোকানের কর্মী মেয়ের কথা বলি। তাহার বয়স প্রায় কুড়ি বৎসর। সে তাহার বন্ধুকে বলিতেছিল শুধু ভালবাসা হইলেই সে বাঁচিতে পারে, তাহার বেশি আর তাহার কিছু দরকার নাই। বড়ই বেদনাদায়ক তাহার অবস্থা। তিন বৎসর পূর্বে এক শনিবার রাত্রে সাধারণ স্নানাগারে ছয় পেনি খরচ করিয়া একটি নাচঘরে প্রবেশ করিয়াছিল। সেইখানে তখন বল্-নাচ চলিতেছিল। লন্ডনে এরকম বল্-নাচের সাপ্তাহিক বা অর্ধসাপ্তাহিক অনুষ্ঠান ঘটিয়া থাকে। সাধারণ স্নানাগারের মত এই নাচের আয়োজনও কোনও কোনও ব্যক্তি কিছু লাভের উদ্দেশ্যে করিয়া থাকে। যে সব তরুণ-তরুণীর মন একটুখানি কোমল ও স্নেহাতুর তাহারাই এই জাতীয় নাচঘরের পৃষ্ঠপোষক। তাহারা এখানে ভালবাসার উপযুক্ত পাত্র বা পাত্রী খুঁজিতে আসে। আমি যে মেয়েটির কথা বলিতেছি সে এখানে এক রেলওয়ের প্লেটপাতা মিস্ত্রির সঙ্গে নাচিতেছিল। সময়টা তাহাদের খুবই আনন্দের ভিতর দিয়া কাটিয়া গেল। পরদিন ঐ যুবকটি মেয়েটির কর্মস্থলে সেই খেলনার দোকানের সম্মুখে আসিয়া দীর্ঘ দুই ঘন্টাকাল অপেক্ষা করিয়া বসিয়া রহিল। সে জানিত ৭টার আগে দোকান বন্ধ হইবে না, তবু সে অনেক আগে আসিয়াছিল। অবশেষে দুইজনের দেখা হইল, এবং মেয়েটিকে সে বাড়ি পৌঁছাইয়া দিতে চাহিল। মেয়ে তাহার বাড়ির ঠিকানা পরিষ্কারভাবে তাহাকে বুঝাইয়া দিল, তথাপি 'অন্যমনস্ক' যুবক পথ হারাইয়া ফেলিল, কিন্তু ভুল পথে চলায় মেয়েটি যে কেন আপত্তি করিল না তাহার ব্যাখ্যা দেওয়া হয় নাই। কত পথ যে তাহারা ঘুরিল এবং অবশেষে হাইড পার্কে পৌঁছিয়া সেখানে কিছুক্ষণ বিশ্রাম করিল, এবং পরে এক গেলাস করিয়া পোর্টওয়াইন পান করিয়া আরও একটুখানি শক্তিলাভ করিল। প্রথমে মেয়েটি উহাতে আপত্তি করিয়াছিল, কিন্তু যুবকটির পীড়াপীড়িতে অবশেষে রাজি হইল। ইহার পর হইতে যুবকটি প্রতিদিন ঐ খেলনার দোকানে নিয়মিত আসিয়া মেয়েটিকে বাড়ি পৌঁছাইয়া দিতে লাগিল—সোজা পথে নহে অবশ্যই, যতদূর সম্ভব ঘোরা পথে, যে সব পথ তাহার বাড়িতে যাইতে পার হইয়া যাইবার কোনও দরকারই নাই এমন সব পথে। একদিন মেয়েটিকে সে থিয়েটারে লইয়া গেল, এবং সেজন্য ৪ শিলিং ৬ পেনি খরচ করিল। অর্থাৎ দুইখানা টিকিট ৪ শিলিং, বরফ ১ শিলিং, দুই গেলাস পোর্টওয়াইন ৮ পেনি, ওমনিবাস্ ৮ পেনি। অবশেষে ঘনিষ্ঠতা একটি ক্লান্তি মুহূর্তে আসিয়া উপস্থিত হইল। সমস্ত দিন এবং রাত্রি মেয়ের মিষ্টি চেহারাটি যুবকের মন ভরিয়া রাখিল এবং মেয়েটিরও সেই অবস্থা। ঘড়ি সেদিন ৭টা বাজিতে এত বিলম্ব করিতেছে কেন, কখন সে বাহির হইয়া যুবকের সহিত মিলিত হইবে। এক রবিবার দুইজনে হাইড পার্কের একখানি বেঞ্চিতে পাশাপাশি নীরবে বসিয়া সারপেনটাইনের জলে বন্য হাঁসদের খেলা দেখিতেছিল। যুবকটিই সে নীরবতা প্রথম ভঙ্গ করিল। সে তাহার প্রেম নিবেদন করিল মেয়েটিকে, এবং বলিল সে তাহাকে বিবাহ করিতে চাহে। মেয়েটি প্রথমে লজ্জায় রাঙা হইয়া উঠিল, তাহার পর তাহার দুটি চক্ষু ভিজিয়া উঠিল, অবশেষে যুবকটির প্রশস্ত বক্ষে মাথাটি রাখিয়া অস্ফুটকণ্ঠে বলিল, "আচ্ছা"। তবে ইহাও বলিল যে সে তাহার পিতামাতার অনুমতি ছাড়া বিবাহ করিতে পারিবে না। যুবক সহজেই মেয়ের পিতামাতার সম্মতি আদায় করিল এবং উহারা পরস্পর বিবাহের জন্য 'এন্‌গেজড্' হইল, শপথে আবদ্ধ হইল। সুদীর্ঘ তিনটি বৎসর তাহারা পরস্পর শপথবদ্ধ অবস্থায় রহিল, তাহার কারণ তাহারা বিবাহের পক্ষে কম বয়স্ক ছিল, উপরন্তু ঐ যুবকের উপার্জন এমন ছিল না যাহাতে সে একটি পরিবার পালন করিতে পারে। অভিভাবকেরা এই সব কথাই বলিলেন, অতএব তাহারা অপেক্ষা করিতে বাধ্য হইল। অল্পদিন পূর্বে ঐ যুবক অন্য একটি রেলওয়েতে বেশি বেতনের কাজ পাইয়া এইবার বিবাহের সম্ভাবনা বিষয়ে আলোচনা করিতে লাগিল। কিন্তু হায় পুরুষের অস্থিরমতিত্ব! সাত দিনের ছুটি লইয়া যুবকটি মারগেটে চলিয়া গেল—বলিয়া গেল লন্ডন শহরের ধোঁয়া দেহ থেকে নিষ্কাশিত করাই উদ্দেশ্য। অর্থাৎ স্বাস্থ্য ফেরান। একটি প্রমোদভ্রমণে বোটের উপর একটি মেয়ের সঙ্গে তাহার পরিচয় হয়, তাহার মুখ আরও সুন্দর, এবং তাহাকে দেখিবামাত্র সে তাহার প্রেমে পড়িয়া যায়। মেয়েটিও তাহার মনোযোগ প্রত্যাখ্যান করে না। তাহাদের সম্পর্ক তখনও কোনও নির্দিষ্ট লক্ষ্য স্থির করিতে পারে নাই, কারণ প্রেমিক যুবকের মনে তখন বিশ্বাসভঙ্গের ভয়টা বড় হইয়া উঠিয়াছিল। কথা হয় তাহারা লন্ডনে পুনরায় মিলিত হইবে। সে ফিরিয়া আসামাত্র তাহার উদাসীন ব্যবহার আগের মেয়েটির লক্ষ্য এড়ায় না। ক্রমেই যুবকটি মেয়েটির নিকট হইতে দূরে সরিয়া যাইতে লাগিল, শেষে একদিন অবস্থা চরমে উঠিল যখন যুবকটি তাহার নূতন প্রণয়িনীকে লইয়া তাহার সম্মুখে দেখা দিল। মেয়েটির হৃদয় ভাঙিয়া গেল এ দৃশ্যে, কিন্তু তাহার নারীজনোচিত অহঙ্কার চরমতম ঘৃণার দ্বারা তাহার প্রণয়ীর নীচ ব্যবহারকে অভ্যর্থনা জানাইল। কিন্তু স্ত্রীলোকের হৃদয় হইতে ভালবাসার ছাপ একদিনে মুছিয়া যায় না, ভালবাসা আন্তরিক হইলে তাহার কোমল হৃদয়ে তাহা একটি গভীর ক্ষত রাখিয়া যায়। একটিমাত্র বন্ধুর কাছেই সে তাহার গভীর বেদনার কথা চোখের জলের সঙ্গে প্রকাশ করিয়া বলিয়াছিল, আর যদি কিছু নাও থাকে তবু শুধু ভালবাসার উপর নির্ভর করিয়া সে বাঁচিতে পারে।

এরকম ঘটনা অবশ্য সাধারণতঃ যাহা ঘটে তাহার ব্যতিক্রম। এরকম মিলন এবং

এরকম অগ্রসর হওয়া সাধারণতঃ পরিণয়েই আসিয়া শেষ হয়। ভালবাসা লাভের জন্য প্রণয়ীর দিক হইতে যে প্রণয় নিবেদনের পালা চলিতে থাকে, সেই সময়টার সঙ্গে যে ভালবাসার স্বপ্নময় অনুভূতি, প্রণয়িনীকে দেখিবার ঐকান্তিক আকাঙ্ক্ষা, মিলনের সুখানুভূতি, বিচ্ছেদের বেদনা, আশা ও সন্দেহের দোল, এবং অন্যান্য অনেক অপার্থিব আনন্দকর ছোটখাটো বিষয় বিজড়িত, তাহা যখন ভাঙিয়া পড়ে, সেই দিন অতীত হইলে সেই সব সুখ-স্মৃতি আবার মনে জাগিতে থাকে। প্রাচ্য দেশের যুবকের মনে ভালবাসার সাময়িক মোহ অবশ্যই জাগে, কিন্তু ভালবাসার রোমান্স বা ভালবাসার সঙ্গে দীর্ঘকাল মনে যে রহস্যময়, স্বপ্নময়, অপার্থিব রঙ-সরসের লীলা চলিতে থাকে, তাহার অভিজ্ঞতা কমই লাভ করিতে পারে। দেশের প্রথা তাহাকে জীবনের একটি মধুর উদ্দীপনা হইতে বঞ্চিত করিয়াছে।

কিন্তু যাঁহার এই রীতির বিরুদ্ধে ক্ষুব্ধ হইবার প্রবল যুক্তি রহিয়াছে, তিনি ভারতীয় উপন্যাস লেখক। প্রেমকে পরিহার করিয়া উপন্যাস রচনা হ্যামলেটকে বাদ দিয়া হ্যামলেট নাটক অভিনয়, অথবা রামকে বাদ দিয়া রামায়ণ রচনা, একই কথা। সেই জন্যই অনিচ্ছা সত্ত্বেও তাঁহাকে প্রাচীন কালের আশ্রমে ফিরিয়া যাইতে হয়, যেকালে যুবতীরা স্বেচ্ছায় বস্ত্রতত্র ঘুরিয়া বেড়াইতে পারিতেন। অথবা তাঁহাকে মুসলমান আক্রমণকারীদের যুগের পটে কাল্পনিক কাহিনী রচনা করিতে হয়, অথবা আরও পরের প্রাথমিক ব্রিটিশ যুগে যখন বাংলা পল্লী ডাকাতদের আক্রমণে বিধ্বস্ত হইত, সেই সময়ের আশ্রয় গ্রহণ করিতে হয়। চার্লস ডিকেনস এ জন্য অপহৃত হইবার আশঙ্কা হইতে বাঁচিয়া গিয়াছেন, কিন্তু ইউরোপের ঐতিহাসিক রোমান্স লেখকেরা তাঁহার হাতে খুব ভাল ব্যবহার পান নাই।

স্থির মস্তিষ্কে চিন্তা করিলে দেখা যায় প্রাচ্যগণ এই রোমান্সের অভাবে পীড়িত হয় নাই। অন্ততঃপক্ষে পারিবারিক আনন্দের ক্ষেত্রে তাহারা ইংরেজরা তাহাদের প্রতি যে কৃপাদৃষ্টি নিক্ষেপ করে তাহা অগ্রাহ্য করিতে পারে। পিতামাতা পিতৃব্য খুড়ী পিসি ভাই, ভগ্নী শ্যালক জামাতা ভ্রাতুষ্পুত্র পৌত্রপৌত্রী এবং যাবতীয় নিকট বা দূর আত্মীয় সহ যে পরিবার, তাহা ইংরেজের স্বামী স্ত্রী সন্তান ও শাশুড়ি মিলিয়া যে পরিবার তাহা হইতে অধিকতর শান্তিপূর্ণ। ভারতীয় ভগ্নী স্ত্রী অন্য লোক স্ত্রী হইলে কেমন হইত বা স্বামী হইলে কেমন হইত তাহা তুলনা করিয়া দেখিবার অবকাশ পায় না, এবং সেই জন্য তাহারা নিজ নিজ ভাগ্য লইয়া খুশি থাকে। শৈশব হইতেই তাহারা একত্র বাড়িয়া উঠে, এবং তাহারা পরস্পরকে পছন্দ করিয়া লয়, এবং অল্প বয়সেই তাহাদের যে সন্তান জন্মে তাহারই প্রতি তাহাদের স্নেহ আকৃষ্ট হইয়া পড়ে। আরও একটি কথা, ঝগড়া-বিবাদ করিতে ত কিছু তেজের দরকার হয়।

কিন্তু ইহাতে সুখ থাকুক বা না থাকুক, ভারত যদি পৃথিবীর সভ্য দেশগুলির মধ্যে আপনার স্থান করিয়া লইতে চাহে, তাহা হইলে তাহার বর্তমানের এ অবস্থা চলিতে পারে না। শিক্ষা ও স্বাধীনতা পাইলে মেয়েদের নূতন কল্পনা, নূতন আশা আকাঙ্ক্ষা জাগিলে তাহা তাহারা নিয়ন্ত্রণ করিবার জন্য একটুখানি ধৈর্যহীন হইতে পারে, এবং সেজন্য পারিবারিক শান্তিও কিছু বিঘ্নিত হইতে পারে, কিন্তু এ সব সামান্য ত্রুটিকে বেশি রকম বাড়াইয়া দেখিয়া ইহার অপরিমিত সুফলকে অগ্রাহ্য করা প্রভুত্ববিলাসী পুরুষদের দ্বারা চিরকালই হইয়া আসিয়াছে। শিশু বিবাহ অবশ্যই বন্ধ করিতে হইবে, এবং স্ত্রীলোককে পূর্ণ স্বাধীনতা দিতে হইবে, এবং শুধু ভারতে নহে পৃথিবীর সমস্ত দেশে। যাহাই হউক চীনারা তাহাদের patrise potestas বা সন্তানের উপর পিতৃ অধিকার লইয়া গর্ব করুক, ব্রিটিশ ভারতে কোনো আকারেই থাকা চলিবে না। ভারতীয় পিতামাতাদিগকে একথা মানাইয়া লইতে হইবে যে তাহাদের একজন অসহায় জীবকে বিক্রয় অথবা সম্প্রদান করার কোনও অধিকারই নাই—দানের পাত্র যত উপযুক্তই হউক না কেন। গত একপক্ষ কালের মধ্যে আমার পরিচিত জনৈক ব্রাহ্মণ ৩০০ টাকা মূল্য দিয়া চারি বৎসরের একটি কন্যাকে তাহার মায়ের নিকট হইতে কিনিয়া লইয়াছে। এ জাতীয় অনেক তথ্য সংগ্রহ করা যাইতে পারে এবং সে সব কথা শুনিলে হিন্দুসমাজের অতিবড় স্তাবকও আতঙ্কিত হইবেন। দরিদ্র শ্রেণীর মধ্যে বিবাহের নামে হাজার হাজার শিশুকে ক্রয় অথবা বিক্রয় করা হইয়া থাকে। ধর্মই যদি এই দুষ্কার্যের মূলে রহিয়া থাকে তাহা হইলে যাঁহারা ন্যায়ের পক্ষে তাঁহারা এ ধর্মকে সমর্থন করিতে পারেন না। কারণ তাঁহারা যেমন সদ্যোবিধবা বৃদ্ধামাতাকে চিতায় পুড়াইতে পারেন না, দেবতার কাছে নরবলি দিতে পারেন না, তেমনি ছোট মেয়েকে কিনিতে অথবা বিক্রি করিতে পারেন না।

কিন্তু স্ত্রী-স্বাধীনতার বিরুদ্ধে প্রবল যুক্তি এই যে তাহারা শিক্ষা পাইলেই ভ্রষ্টা হইবে। আমি বলি এ রকম ধারণা সম্পূর্ণ ভ্রমাত্মক। অনেক ইউরোপীয় প্রথা আমি সমর্থন করি না বটে, এবং তাহাদের রীতিনীতি এদেশে আসুক তাহাও চাহি না, কিন্তু এ কথা আমি অসঙ্কোচে বলিতেছি ইউরোপের মেয়েরা তাহাদের সমস্ত শিক্ষা, সমস্ত স্বাধীনতা এবং সকল বিষয়ে পরনির্ভরতা ত্যাগ সত্ত্বেও, ভারতবর্ষে যে পরিমাণ দুর্নীতি আছে, তাহা হইতে তাহা বেশি নহে। কলিকাতার কিদিগের আচরণের উপর নির্ভর করিয়া ভারতীয় নীতি বিষয়ে মত প্রকাশ, আর লন্ডনের বারাঙ্গনাদের আচরণের উপর নির্ভর করিয়া ও-দেশের নীতি বিষয়ে মত প্রকাশ, একই জাতের। নৈতিক বিচারে নিষ্কলঙ্ক থাকা ও সম্মানরক্ষা করা ভারতীয় নারীর কাছে যতটা মূল্যবান, ইংরেজ নারীর পক্ষেও ততটা মূল্যবান। নারীর কর্তব্যপরায়ণতা সম্পর্কে প্রবল নিষ্ঠার উপরে ইংরেজ পুরুষের স্বতঃই একটা নির্ভরতা আছে। যদি না থাকে, তবে ইংরেজ নারী তাহা তাহার নিকট হইতে আদায় করিয়া লইবার শক্তি রাখিয়া থাকে। ভারতীয় নারী যে নমনীয়তা, অহঙ্কারহীনতা, সুরুচি, স্নেহপ্রবণতা, ধর্মপরায়ণতা, আত্মসম্মানবোধ, সদ্‌গুণপ্রিয়তা প্রভৃতির স্বভাবতঃই অধিকারী তাহাতে তাহাকে ঘরে তালাবন্ধ না রাখিলে তাহাকে বিশ্বাস নাই, সে সমস্ত গুণই হারাইয়া বসিবে এরূপ মনে করা আমাদের পক্ষে অকৃতজ্ঞতার পরিচায়ক। মোট কথা, যে নারীকে বিশ্বাস করা যাইবে না, তাহাকে পালন করিয়াই বা লাভ কি? ভারতীয় প্রাচীন জ্ঞানীরা স্ত্রীপুরুষের সম্পর্ক খুব সূক্ষ্মভাবে নির্ণয় করিয়া গিয়াছেন। বিবাহ বন্ধন পবিত্র বন্ধন। সম্ভোগের নহে, মানুষের জীবনের কর্তব্যের দাবীতে এই বন্ধন। ইহা ভাগ্যের সঙ্গে ভাগ্যের বন্ধন, আত্মার সঙ্গে আত্মার বন্ধন। নরনারীর সম্পর্কের বিষয়ে ইহা অপেক্ষা উচ্চতর ভাব পৃথিবীর অন্য কোথাও কেহ এমন করিয়া প্রকাশ করেন নাই। তথাপি প্রাচীন যুগের সেই ব্রাহ্মণ ঋষিদের অরণ্য-গৃহে যে আলো মৃদুভাবে জ্বলিয়াছিল, বহির্জগতের গভীর অন্ধকারে তাহার দীপ্তিকম্পন মুহূর্তের জন্যও প্রকাশিত হইয়াছিল কি না সন্দেহ। বাহিরে সমস্তই অন্ধকার, এবং তখন হইতে যতগুলি সভ্যতার স্তর আসিয়াছে তাহাতে বিচিত্র জাতির বিভিন্ন চিন্তাধারা প্রবলভাবে সমাজকে প্রভাবিত করিয়াছে। অরণ্যের সেই প্রজ্বলিত আলো আজ নির্বাপিত। অতএব আমি স্বীকার করিতে বাধ্য হইতেছি যে, যে সম্মানজনক সম্ভ্রম ব্যবহার ইউরোপের নারীগণ পাইয়া থাকেন, আমাদের দেশে তাহার সাক্ষাৎ মেলা ভার। এখানে কোনও যুবতী

বর্তমান প্রথাকে অমান্য করিয়া দেখুক, তার প্রতি শিভালরি কেহ দেখাইবে না, স্ত্রীরোচিত ব্যবহার করিবে। তাহার এই অভিনব ব্যবহার, এবং সে যে এরূপ ব্যবহার করিতেছে ইহা অসম্মানজনক ইহাই বিবেচিত হইয়াছে এতকাল, তাই তাহার এরূপ সাহস দেখিলে তাহাকে সবাই অন্যায়ভাবে সন্দেহ করিবে, মনে করিবে সে ভ্রষ্টা। এবং সেজন্য তাহাকে যতভাবে পারে উত্যক্ত করিবে। পুরুষ তাহার আদিম কালের পুরুষদের নিকট হইতে স্ত্রীলোক সম্পর্কে যে ধারণা উত্তরাধিকারসূত্রে পাইয়াছে যাহা এখনও নিম্নশ্রেণীর প্রাণীর সঙ্গে সম্পর্ক রক্ষা করিয়া চলিতেছে, তাহা একমাত্র দূর হইতে পারে যদি সে স্বভাব-সরল মেয়েদের স্বাধীনভাবে চলাফেরার সঙ্গে নিজেকে মানাইয়া লইতে পারে। মেয়েরা এখন স্বাধীনভাবে পথে বাহির হইলে তাহাদিগকে চারিদিকের অতি নোংরা পরিবেশকে ঘৃণা করিয়া, অগ্রাহ্য করিয়া, চলিতে হইবে। কারণ জাতীয় চরিত্র অতি দুর্বল হইয়া পড়িয়াছে। এই ত্রুটিতে ভ্রূক্ষেপ না করিয়া সময়ের পূর্বেই, এমন অবস্থায় আমাদের মধ্যে যাহারা দুঃসাহসী হইয়া, যেখানে গভীর অন্ধকার ছিল, সেখানে সহসা আলোর প্লাবন বহাইয়া দেয়, তাহা হইলে তাহাকে তাহার ফল ভোগ করিতেই হইবে, তাহাকে একটা বেদনাদায়ক অগ্নিপরীক্ষার ভিতর দিয়া কিছুকাল চলিতেই হইবে। তাহাদিগের জয় হউক! স্ত্রীলোকদের এই অস্বাভাবিক অবস্থা আমাদের দেশের কি পরিমাণ ক্ষতি করিয়াছে সে বিষয়ে আমরা বিশেষ কিছুই জানি না। ইংরেজ মায়ের মত আমাদের মা হোক, তাহার মত সে আমাদের সন্তান পালন করুক, তরুণীরা দুর্দান্ত যুবকদের মহৎ কাজে প্রেরণা দিক, স্ত্রীগণ স্বামীদের নিরাপদে চালনা করিয়া জীবনের আবর্ত উত্তীর্ণ করিয়া দিক, সূক্ষ্ম রুচিসম্পন্ন মহিলারা আমাদের গোল্লায়-যাওয়া সমাজকে পরিমার্জিত, পুনরুজ্জীবিত এবং বলিষ্ঠ করিয়া দিক—তাহা হইলে মাত্র কুড়ি বৎসরের মধ্যে ভারতবর্ষ নূতন করিয়া জন্মিয়া উঠিতে সক্ষম হইবে।

আমাদের লন্ডন পৌঁছিবার পরের দিন আমরা 'ডেলি নিউজ' খুব উৎসাহের সঙ্গে ঘোষণা করিয়াছে যে, মিস্টার গ্ল্যাডস্টোন এইবার আয়ার্ল্যান্ডে উন্নত ধরনের শাসন প্রবর্তনের জন্য পার্লামেন্টে একটি বিল উপস্থিত করিতেছেন, এবং ইহার দ্বারা ঐ হতভাগ্য দেশের সকল অশান্তি ও বিবাদ চিরতরে মিটিয়া যাইবে। ইহাতে আয়ার্ল্যান্ডের অধিবাসীদিগকে সুখী ও সমৃদ্ধ করিবে, এবং ইংল্যান্ডের সহিত আয়ার্ল্যান্ডকে চির সখ্যসূত্রে বাঁধিবে। আমরা মাসখানেক বহির্জগৎ হইতে বিচ্ছিন্ন থাকাতে প্রথম পাঠের সঙ্গে সঙ্গে এ সংবাদের গর্ভে কোন্ ভবিষ্যতের ইঙ্গিত লুকাইয়া আছে তাহা উপলব্ধি করিতে পারিলাম না। ইংরেজসমাজে ইহার জন্য যে-ধিক্কার আবির্ভাব ঘটিবে বাহিরে তাহার কোনও লক্ষণই দেখিলাম না, দূরাগত কোনও শব্দও কানে আসিল না। কিন্তু আমাদের ভুল হইয়াছিল। বাহিরের শান্তভাবের তলায় তলায় রক্ষণশীল লন্ডনের মন টগবগ করিয়া ফুটিতেছিল। ঐ বৃদ্ধ গ্ল্যাডস্টোন আরও কি অনিষ্ট করিয়া বসে তাহা ভাবিয়া উদ্বেগের আর সীমা ছিল না। গ্ল্যাডস্টোনের পরিকল্পিত প্রস্তাবসমূহের খবর ইতিমধ্যেই ছড়াইয়া পড়িয়াছিল, প্রতিপক্ষ দল চিৎকার করিতেছিল গেল গেল আয়ার্ল্যান্ড হাতছাড়া হইল। আমাদের আসিবার চারদিন পূর্বে গিল্ড হলে একটি সভা অনুষ্ঠিত হইয়াছিল। সভায় আয়ার্ল্যান্ডকে 'হোম রুল' প্রদানের বিরোধিতা করিয়া প্রতিবাদধ্বনি উত্থিত হইয়াছিল। কেমন করিয়া এই বিল পার্লামেন্টে উত্থাপিত করা হইয়াছিল, সেই দিন সকাল হইতে পার্লামেন্ট হাউসে মেম্বার ও দর্শকদের কি প্রকার ভিড় হইয়াছিল, বিলের কি রকম অভ্যর্থনা লাভ ঘটিয়াছিল, কিভাবে উহা অগ্রাহ্য হইয়াছিল, পার্লামেন্টের অধিবেশন কিভাবে ভাঙিল, সে সব ইতিহাসের কাহিনী, এই বিবৃতির পক্ষে তাহা অবান্তর। মিস্টার গ্ল্যাডস্টোন বিলটিকে প্রায় সম্পূর্ণরূপেই সত্য ও ন্যায়ের ভিত্তিতে সমর্থন করিতে গিয়া ভুল করিয়াছিলেন, সেই বিষয়টিই আমার মনে সে সময়ে বিশেষ ছাপ আঁকিয়াছিল। তাঁহার বিরোধীরা বিদ্রূপের সঙ্গে বলিয়াছিলেন, "এরূপ নিরেট নির্বুদ্ধিতার কথা ইহার পূর্বে কি কোনও রাষ্ট্রনীতিবিদ্ উচ্চারণ করিয়াছেন? ন্যায়! সুবিচার! যেন একমাত্র ভাবাবেগ দিয়া পৃথিবী শাসিত হইতেছে! বিদেশী বেদখলকারীদের হাত হইতে যে সব দেশপ্রেমিক দেশকে মুক্ত করিতে চাহিতেছে তাহাদের হত্যাকাণ্ডের সমর্থনে অথবা নিরপরাধ শহরের উপর গোলাবর্ষণের সমর্থনে ওকালতি করিবার জন্য এ জাতীয় মহৎ নীতিকথা তুলিয়া রাখা উচিত ছিল।" এ রকম ব্যাপক একটি নীতির ব্যাপারে—যেখানে স্বার্থপরতাকে প্রায় সম্পূর্ণ বিসর্জন দিতে হইবে—সেখানে মিস্টার গ্ল্যাডস্টোন আপন দেশের লোকের ন্যায়বিচার বিষয়ে একটু অতিবিশ্বাসী হইয়াছিলেন। ন্যায়ের পক্ষে অতি জোরালো যুক্তি থাকিলেও তাঁহার স্বদেশবাসীকে বুঝিতে তাঁহার ভুল হইয়াছিল। কিন্তু তাহা সত্ত্বেও এরূপ একটি জরুরি যুগান্তকারী বিষয়ে ইংরেজের স্বভাবসিদ্ধ ন্যায়প্রিয়তার উপরে যে গ্ল্যাডস্টোনের মত একজন প্রবীণ রাজনীতিজ্ঞ সম্পূর্ণ নির্ভর করিয়াছিলেন তাহাতে ইংরেজ জাতির গৌরবই সূচিত করে।

পূর্বদেশসমূহে এমন জিনিস অজ্ঞাত। আমাদের দেশে যখন সুখ শান্তির যুগ ছিল, যখন অনেক বিষয়ে আমরা নৈতিক মানের উচ্চস্তরে উঠিয়াছিলাম, এবং যে স্তরে ইউরোপীয়গণ এখনও উঠিতে পারে নাই, সেই যুগেও আমরা কখনও এরূপ আন্তর্জাতিক বাধ্যবাধকতার কথা চিন্তা করি নাই। চার হাজার বৎসর পূর্বে, কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের ঠিক আগে তাহার সঙ্গে তুলনা করিলে জেনিভা কনভেনশনের ফলাফলকে শিশু বলিয়া বোধ হইবে। কিন্তু আমাদের দেশের নৃপতিগণ পররাজ্য হরণ করাকে কখনও পাপ বলিয়া গণ্য করিতেন না। অথবা পরাজিত জাতির জনগণের অবনত স্বাস্থ্য, শিক্ষার অভাব দূর করিবার জন্য বা নৈতিক মান উন্নত করিবার জন্য নির্দেশাদি পাঠাইয়া অথবা নূতন কোনও বিধান রচনা করিয়া তাহাদিগকে নিজেদের সমান স্তরে উন্নীত করিবার প্রয়োজন বোধ করেন নাই। যুদ্ধ করিয়া দিগ্বিজয় করাতে ধর্মের অনুমোদন ছিল, এবং ঐখানেই সব শেষ। বিজয়ীর আর কোনও কর্তব্য নাই। একমাত্র ইংরেজ জাতির বিধানসমূহ হইতেই আমরা নীতির দিক হইতে আন্তর্জাতিক রাষ্ট্রনীতি সমালোচনা করিতে শিখিয়াছি। কিন্তু আমরা সব বিষয়েই চরমে গিয়া উপস্থিত হই। নিজেরা দুর্বল এবং ক্ষমতাহীন, তাই আমরা বিবেচনাহীনভাবে শক্তিশালী জাতির ক্রিয়াকলাপের সমালোচনা করি। মানুষের চরিত্র স্বভাবতঃই অসম্পূর্ণ, সেজন্য তাহাকে আমরা ক্ষমা করিতে প্রস্তুত নহি। আমরা আশা করি ইংরেজ সর্বদা ন্যায়সঙ্গত কাজ করতে বাধ্য। আমরা আমাদের স্বর্গবাসী দেবতাদের নিকট হইতে যতটুকু প্রত্যাশা করি, ইহা তাহা অপেক্ষা বেশি। সমুদ্র মন্থনের কথা স্মরণ করুন। সেখানে দেবতা ও অসুরদের মিলিত শ্রমে যে অমৃত উঠিয়াছিল তাহা হইতে অসুরদিগকে প্রতারণা পূর্বক দেবতারা বঞ্চিত করিয়াছিলেন। বর্তমানের যে-কোনও আইনজীবী বলিবেন আইনতঃ এবং ধর্মতঃ তাহার অংশ অসুরদিগের প্রাপ্য। অথবা স্মরণ করুন দ্রৌপদীর রূপমুগ্ধ দেবতারা তাঁহার উপর কি শঠতার খেলাই না খেলিয়াছিলেন, যদিও তাহাতে তাঁহারা কৃতকার্য হইতে পারেন নাই। আমি যদি ইংরেজ হইতাম, তাহা হইলে ইজিপ্ট ও অন্যান্য স্থানে ইংরেজদের কার্যাবলীর সমালোচনা করিয়া তাহাদের শিরে যে তিরস্কার বর্ষিত হইতেছে, তাহাতে আমি গর্ববোধ করিতাম। আমি

ইহাকে ইংরেজ চরিত্রের প্রতি শ্রদ্ধাজ্ঞাপন বলিয়া মনে করিতাম। প্রাচ্যদেশবাসীরা ইংরেজ চরিত্রকে মনে মনে তাহাদের নিজেদের দেবতাদের অপেক্ষাও উৎকৃষ্ট বলিয়া জানে। অন্যায় কোনও কাজকেই আমি সমর্থন করি না, পৃথিবীটা যেমন, তেমনি ভাবেই তাহাকে মানিয়া লই, এবং নিজেদের স্বার্থে এমন অবস্থায় পড়িলে কতখানি ন্যায়ের পথ হইতে আমরা সরিয়া যাইতাম, সে কথা ভাবিতে চেষ্টা করি। জাতীয় নির্ধারণের ক্ষেত্রে সমালোচনা অবশ্যই বাঞ্ছনীয়, কিন্তু তাহা বুদ্ধিমানের সমালোচনা হওয়া চাই।

আমার মতে আমাদের দেশে যাকে বলা হয় পাবলভাবে অন্যায় করা, এমন কি সেদিক দিয়া বিচার করিলেও ইংরেজ জাতিকে প্রশংসা করিতে হয়, কারণ ইহাতে প্রমাণ হয়, দেশে অনেক সুচিন্তাশীল ব্যক্তি আছেন যাঁহাদিগকে এরূপ কাজ করিতে হইলে ধাপ্পা দিবার এবং প্রতারিত করিবার প্রয়োজন হয়। পৃথিবীর সমস্ত দেশের মধ্যে এই দল সবচেয়ে বেশি ক্ষমতাসম্পন্ন, এবং প্রতি বৎসরই ইহার ক্ষমতা বৃদ্ধি পাইতেছে। তাহা না হইলে দাসত্বপ্রথা দূর হইত না, ক্যাথলিকদের অক্ষমতা দূর হইত না, আয়ার্ল্যান্ডের প্রোটেস্টান্ট চার্চ তাহার জন্য ব্যবস্থিত সম্পত্তি হইতে বঞ্চিত হইত না, অথবা অ্যালাবামার সমস্যাও বিনাযুদ্ধে মিটিত না। মিস্টার গ্ল্যাডস্টোন এই দলকেই আবেদন করিয়াছিলেন। কিন্তু হয় তিনি ইহার ক্ষমতাকে বাড়াইয়া দেখিয়াছিলেন, অথবা তিনি বেশি দাবি করিয়া বসিয়াছিলেন। কারণ আয়ার্ল্যান্ড সাম্রাজ্য হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া যাইবে, এই চরম আত্মত্যাগ ইংল্যান্ডের নিকট হইতে আশা করা চলে না, যদিও মিস্টার গ্ল্যাডস্টোনের বিলে বিচ্ছিন্ন হওয়ার কথা ছিল না। কিন্তু ভুল বোঝার ফলেই এই বিরোধিতা। ইংল্যান্ডের এত কাছে একটি বিচ্ছিন্ন স্বাধীন রাষ্ট্রের অর্থ ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের ধ্বংস। কিন্তু মিস্টার গ্ল্যাডস্টোন তাঁর বিলে এই বিচ্ছিন্নতা কখনও চাহেন নাই।

মিস্টার গ্ল্যাডস্টোন যে নীতিকে সমর্থন করিতেছিলেন তাহার প্রধান শক্তি ব্রিটিশ স্বার্থের ভিত্তিতেই রচিত হইয়াছিল। এবং সে নীতির মধ্যে যেটুকু ন্যায়নিষ্ঠার কথা ছিল তাহা ছিল নিতান্তই দ্বিতীয় পর্যায়ের বিবেচনা। মিস্টার গ্ল্যাডস্টোন প্রথমটির উপরে বেশি জোর না দিয়া দ্বিতীয়টির উপর অতি বেশি জোর দিয়াছিলেন সেই জন্যই তা ব্যর্থ হইল। বাহিরের কোনো দর্শক যদি সেখানে উপস্থিত থাকিতেন, তাহা হইলে তিনি নিরপেক্ষ দৃষ্টিতে দেখিতে পাইতেন, গ্ল্যাডস্টোন খুব সহজেই বিরোধীদের উত্তেজনা প্রশমিত করিতে পারিতেন, এবং সম্মানের সঙ্গে, আরও প্রবলভাবে, এবং সাফল্যের অধিকতর সম্ভাবনার সঙ্গে, তাঁহার বক্তৃতার মধ্যে যে তাঁহার আয়ার্ল্যান্ডের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করার উদ্দেশ্য নাই, আয়ার্ল্যান্ডকে শান্ত করাই তাঁহার উদ্দেশ্য এবং দুই দেশের মধ্যে সহৃদয়তার বন্ধনই পরিকল্পিত, তাহা দেখাইয়া দিতে পারিতেন। যে-কোনও উপায়ে, ব্রিটিশ সাম্রাজ্য রক্ষার জন্য এবং সাধারণভাবে সকল মানুষের মঙ্গলের জন্য এই লক্ষ্যে পৌঁছান দরকার মনে করি, কারণ এই বিরাট শক্তি—যে শক্তি পৃথিবীর চারিদিকে নিজেকে বিস্তৃত করিয়া দিয়াছে, তাহা ধ্বংস হইলে পৃথিবীর ভারসাম্য নষ্ট হইবে, এবং রোমান সাম্রাজ্য ধ্বংসে যে বিপৎপাত ঘটিয়াছিল তাহা অপেক্ষা অনেক বেশি বিপৎপাত ঘটিবে। এমন কি সভ্যতাকেই ইহা কয়েক শতাব্দী পিছাইয়া দিবে। মিস্টার গ্ল্যাডস্টোন ও তাঁহার পার্টি পরে তাঁহাদের ভুল বুঝিতে পারিয়াছিলেন, কিন্তু তখন অনেক বিলম্ব হইয়া গিয়াছে। সমস্ত দেশ জুড়িয়া "আয়ার্ল্যান্ড গেল গেল" কোলাহলে "কাগজে বর্ণিত ইউনিয়ন" কথা কোথায় ডুবিয়া গেল। আয়ার্ল্যান্ড ও ইংল্যান্ডের মধ্যে ইউনিয়ন আছে কি? কখনও ছিল কি? না, ছিল না। আয়ার্ল্যান্ডকে সব সময়ে পরাজিত এবং অধিকৃত দেশরূপে গণ্য করা হইয়াছে। তাহার নিজস্ব একটি পার্লামেন্ট ছিল, কিন্তু তাহার কোনো স্বতন্ত্র ক্ষমতা ছিল না। মাত্র সতের বৎসরের (১৭৮৩-১৮০০) জন্য ছিল। সে সময়ে '২৩-জর্জ-৩, অধ্যায় ২৮' দ্বারা আইন ও বিচার বিভাগীয় পূর্ণ ক্ষমতা দেওয়া হইয়াছিল। কিন্তু ফরাসী বিদ্রোহের ফলে সে সময়টা ছিল অব্যবস্থিত, অতএব এই লব্ধ ক্ষমতার পরীক্ষা চালাইয়া যাওয়া সম্ভব হইল না। দেশে বিদ্রোহ লাগিয়াই ছিল, কখনও তাহা প্রকাশ্যে, কখনও গোপনভাবে। সাত শত বৎসর পূর্বে চতুর্থ পোপ অ্যাড্রিয়ান ঐ দেশের জমি অ্যাংলো-নরম্যানদের নিজেদের মধ্যে ভাগ করিয়া লইবার অধিকার দিয়াছিলেন। সেই সময় হইতেই আয়ার্ল্যান্ড ইংল্যান্ডের যখনই ঘরে বা বাইরে কোনও সঙ্কট দেখা দিয়াছে তাহার সুযোগ লইতে ছাড়ে নাই। ইংল্যান্ড যতকাল প্রথম শ্রেণীর সামরিক শক্তিরূপে গণ্য ছিল, ততদিন আয়ার্ল্যান্ডের আভ্যন্তরীণ অশান্তি অগ্রাহ্য করা চলিত, কিন্তু যুদ্ধ শক্তিতে ইউরোপের দেশগুলি ইংল্যান্ডকে অতিক্রম করিয়া যাওয়াতে, সে এখন আর আয়ার্ল্যান্ডকে বর্তমান অবস্থায় থাকিতে দিতে পারে না। আয়ার্ল্যান্ডকে সম্পূর্ণভাবে ইংল্যান্ডের সঙ্গে যুক্ত করিতেই হইবে। ইহার জন্য মাত্র দুইটি পথ উন্মুক্ত আছে। তাহার একটি হইতেছে মিস্টার গ্ল্যাডস্টোনের প্রস্তাব অনুযায়ী তাহাদের সঙ্গে সম্পূর্ণ বন্ধুত্বের পথে অগ্রসর হওয়া। আর অন্যটি হইতেছে জার্মানরা পরাজিত আলসাস প্রদেশের সঙ্গে যেরূপ ব্যবহার করিতেছে সেইরূপ করা। অর্থাৎ আয়ার্ল্যান্ডবাসীদিগকে আয়ার্ল্যান্ড হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দেশটি ইংরেজের দ্বারা ভরিয়া তোলা। কিন্তু এরূপ একটি চরম পন্থা গ্রহণ করিবার পূর্বে আইরিশদিগকে রাষ্ট্রে শান্তিপ্রিয় অধিবাসীরূপে টিকিয়া থাকিবার সুযোগ দেওয়া উচিত। যদি তাহারা এ সুযোগের অপব্যবহার করে তাহা হইলে সমস্ত জগৎ তাহাদিগকে ধিক্কার দিবে এবং তখন ইংল্যান্ড তাহার আত্মরক্ষার জন্য যদি অশান্ত লোকদের সরাইয়া দিবার ব্যবস্থা করে তাহা হইলে সে সকলের সমর্থন পাইবে। প্রথমত ইংল্যান্ড যথেষ্ট প্রবল, সুতরাং আয়ার্ল্যান্ডের প্রতি ন্যায়সঙ্গত ব্যবহার সে করিতে পারে। আর যদি দেখা যায় তাহা ব্যর্থ হইল, তখন সে তাহাদের জন্য শাস্তির ব্যবস্থা করিতে পারে। তৃতীয় পথ, আধা-অনিচ্ছাজাত বলপ্রয়োগ, এবং ভূমিসংক্রান্ত সমস্যা সমাধানে অসম্পূর্ণ ব্যবস্থা অবলম্বন, কিন্তু ইহা সর্বাপেক্ষা ক্ষতিকর এবং অকারণ সময় নষ্ট। শেষ পর্যন্ত ইহাতে কোনও ফল লাভ হয় না। আয়ার্ল্যান্ডের সম্পর্কে যে বিতর্ক চলিতেছে তাহা ভারতবাসীরা আগ্রহের সঙ্গে লক্ষ্য করিতেছে। কারণ তাহারা জানে এমন দিন আসিতেছে—এবং সে দিন যত দূরেই থাক—ইংল্যান্ডকে আরও বৃহৎ হোম রুল সমস্যার সমাধান করিতে হইবে:—এবং সেটি ভারতের জন্য হোম রুল। ইংল্যান্ডের প্রভাব হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া যাওয়া কোনো ভারতীয়েরই কাম্য নহে, ভারতীয়ের সর্বোচ্চ আকাঙ্ক্ষা ব্রিটিশ কলোনির সুবিধাগুলি ভোগ করা। তাহারা ভারতে ব্রিটিশ শাসনের জাতীয়করণ চাহে।

একজন ভারতীয়ের চোখে ইংল্যান্ডের মাটিতে বসিয়া এখানকার এই রাজনৈতিক তৎপরতা, কর্মব্যস্ততা ও উত্তেজনা দর্শন করা একটি অভিনব ঘটনা। পূর্বে দেশসমূহে কমনওয়েলথ সংক্রান্ত যাবতীয় বিষয়ে রাজ-ব্যক্তিরাই একমাত্র নীতিনির্দেশকরূপে গণ্য। দেশের মালিক রাজা, তিনি তাঁহার খুশিমত দেশটিকে বিক্রয় করিতে পারেন, কাউকে বিলাইয়া দিতে পারেন, দেশের ভাগ্য লইয়া জুয়া খেলিতে পারেন। ভারতের যখন সুদিন ছিল, এ রকম ঘটনা তখন ঘটিয়াছে, এবং তখন

লোকেরা পৌরুষ দেখাইয়া তাহার প্রতিবাদ জানায় নাই, তাহার পরিবর্তে তাহারা ঘরে বসিয়া নিজের মাথার চুল ছিঁড়িয়াছে এবং স্ত্রীলোকের মত কাঁদিয়াছে। ইংল্যাণ্ডের লোকের আচরণ অন্য জাতীয়। সেখানে প্রত্যেকটি ব্যক্তি রাষ্ট্রশক্তির এক একটি অঙ্গ এবং অংশ। তাহারা নিজেদের মূল্য জানে, দায়িত্ব বোঝে, এবং তাহারা বিশ্বাসভাজন। আয়ার্ল্যাণ্ডের হোম রুলের বিষয়ে যখন বিতর্ক চরমে উঠিয়াছিল তখন জনসাধারণ যে সম্মানজনক ব্যবহার করিয়াছিল তাহা অবশ্যই একজন ভারতীয়ের পক্ষে আনন্দদায়ক। থিয়েটারে, রেলগাড়িতে, ওমনিবাসে এবং অন্যান্য সমস্ত স্থানে আলোচনার বিষয় গ্ল্যাডস্টোন, হোম রুল, ইউনিয়ন ও সেপারেশন। সেপারেশন সর্বনাশ, আয়ার্ল্যাণ্ড পৃথক হইয়া যাইবে? ফ্যাশানেবল জেন্টলম্যানগণ তাঁহাদের ক্লাবে, বণিকেরা তাঁহাদের অফিসঘরে, যন্ত্রশিল্পীরা তাঁহাদের কারখানা ঘরে, ক্যাবচালকেরা ক্যাবে বসিয়া, রেস্টোরাণ্টের পরিবেশক পরিবেশিকাগণ রেস্টোরাণ্টে গুণ্ডাপ্রকৃতির লোকেরা পানালয়ে বসিয়া, রেলওয়ে পোর্টারগণ, খবরের কাগজের বিক্রেতাগণ, প্রত্যেকে স্বাধীনভাবে এই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টি লইয়া সবসময় আলোচনা করিতেছে। লণ্ডনে একটি লোককেও দেখিলাম না যে গ্ল্যাডস্টোনকে সমর্থন করে। তাঁহার অনুগামীগণ মফস্বলবাসীগণ, বিশেষ করিয়া স্কটল্যাণ্ডবাসীরা। মিস্টার গ্ল্যাডস্টোনের সম্পর্কে এ পর্যন্ত যাহা শোনা গেল তাহার অর্ধেকও যদি বিশ্বাস করিতে হয়, তাহা হইলে মনে হইবে তাঁহার অপেক্ষা বড় প্রতারক পৃথিবীতে আর জন্মগ্রহণ করে নাই। পক্ষান্তরে তাঁহার যাঁহারা সমর্থক তাঁহারা গ্ল্যাডস্টোনকে প্রায় দেবতা মনে করে। একদিন আমি এক খণ্ড পেলমেল গেজেট কিনিয়াছিলাম সাউথ কেনসিংটন রেলওয়ে স্টেশনে। সেখানে একটি লোক দাঁড়াইয়া ছিল, সে আমার হাতে কাগজ দেখিয়াই মিস্টার গ্ল্যাডস্টোনকে অকথ্য ভাষায় গাল পাড়িতে লাগিল। সে যাহা সব বলিয়াছিল, তাহার ভিতরের একটি কথা—মিস্টার গ্ল্যাডস্টোন "বুড়ী ধোপানী"। ইহা শুনিয়া একজন বলিল, "তাহা হইলে অন্ততঃপক্ষে তাঁহার হাত দুটি নিষ্কলঙ্ক আছে।" দলগত সূক্ষ্ম রাজনীতিতে এখনও আমরা অভ্যস্ত নহি, সেজন্য মিস্টার গ্ল্যাডস্টোনের বিল উপলক্ষে দেশের মধ্যে যে উত্তেজনা দেখা গেল, তাহাতে আমরা সম্পূর্ণ বিভ্রান্ত হইয়া পড়িয়াছিলাম। অবশ্য এই উত্তাপ কমিয়া যাইবে, আয়ার্ল্যাণ্ড হোম রুল পাইবে, এবং দুই দেশের সংযুক্তি কাগজেই আবদ্ধ থাকিবে না, হৃদয়েরও মিলন ঘটিবে, এবং ভবিষ্যৎ বংশীয়েরা এই উন্মাদনার যুগ স্মরণ করিয়া তখন হাসিবে। ১৭৮০ সনে গ্রাট্টান বলিয়াছিলেন—(গ্রাট্টান আইরিশ আইনজীবী ও রাষ্ট্রনীতিবিদ্) "আমি আর কিছুই চাহি না, আমি আমার স্বদেশবাসীদের সঙ্গে শুধু স্বাধীনতার হাওয়া নিশ্বাসে টানিতে চাহি। তোমাদের শৃঙ্খল ভাঙা ও তোমাদের গৌরব চিন্তা করার বাহিরে আমার কোনও উচ্চাকাঙ্ক্ষা নাই। যতদিন পর্যন্ত আয়ার্ল্যাণ্ডের দীনতা কুটিরবাসীর ছিন্নবস্ত্রে ব্রিটিশ শৃঙ্খল ঝন্‌ঝন্ করিতে থাকিবে, ততদিন পর্যন্ত আমি সন্তুষ্ট থাকিব না। সে বিবস্ত্র থাকিতে পারে, কিন্তু সে শৃঙ্খলিত থাকিবে না। আমি দেখিতেছি সময় আসিয়া গিয়াছে, প্রাণ জাগিয়া উঠিয়াছে, ঘোষণার বীজ বপন করা হইয়াছে; এবং যদিও উচ্চস্তরের ব্যক্তিগণ মত পরিবর্তন করেন, উদ্দেশ্য টিকিয়া থাকিবে, এবং সাধারণ্যে ভাষণদানকারী বক্তার (গ্রাট্টান নিজে আয়ার্ল্যাণ্ডের শ্রেষ্ঠ বক্তা ছিলেন) মৃত্যু হইলেও তিনি যে অনির্বাণ অগ্নিশিখা বহন করিতেছিলেন তাহা বাহককে অতিক্রম করিয়া জ্বলিতে থাকিবে, এবং স্বাধীনতার নিশ্বাস পুণ্যাত্মাদের বাণীর মতই তাঁহাদের মৃত্যুর সঙ্গে থামিবে না।" মিস্টার গ্ল্যাডস্টোনও এখন এই জাতীয় ভাব প্রকাশ করিতে পারেন।

আমাদের লণ্ডন পৌঁছিবার পরেই আমরা, নিহিলিস্টদের একটি সভা লণ্ডনে হইতেছে এই মর্মে একটি সংবাদ পড়িয়াছিলাম। (ইহারা নাস্তিবাদী)। একজন ভারতীয়ের পক্ষে একজন জীবন্ত নিহিলিস্টকে দেখা কৌতূহলোদ্দীপক। সভা যেখানে হইতেছিল সেখানে আমি গিয়াছিলাম। কিন্তু আমি পৌঁছিবার পূর্বেই সভার কাজ শেষ হইয়া গিয়াছিল। নিহিলবাদ কি বস্তু সে বিষয়ে আমার মনে কোনও স্পষ্ট ধারণা নাই। তাহারা কি চাহে তাহাও জানি না। অতএব তাহারা বিপথগামী একদল উগ্রপন্থী, অথবা মানবকল্যাণকামী কোনও দল যাহারা অন্যায়ভাবে তাহাদের সময়ের বহু পূর্বেই আবির্ভূত হইয়াছে তাহা বলিতে পারিলাম না। যাহাই হউক এরূপ দৃঢ় নিষ্ঠ উদাসীন মানবযূথ পৃথিবীতে সম্ভবতঃ ইতিপূর্বে আর দেখা যায় নাই। লোকে আত্মবিসর্জন দেয় বিশেষ একটা উদ্দেশ্য লইয়া। কেহ স্বর্গ কামনায় অবর্ণনীয় দুঃখ বরণ করিয়া মারা যায়। তাহার মৃত্যুর প্রেরণা যোগায় স্বর্গ। তাহার ধারণা মৃত্যুর পরে তাহার আত্মা স্বর্গে উড়িয়া যাইবে। গাজি মুসলমানদের স্বর্গে সুন্দরী হুরি, অমৃতের স্ফটিক ঝর্ণা ও অন্যান্য নানা সুখ লাভের উদ্দেশ্যে মৃত্যু বরণ করে। হিন্দু নারী নিজেকে পুড়াইয়া মারে, পরজীবনে স্বামীর সঙ্গে মিলিত হইবার পূর্ণ বিশ্বাস লইয়া। দেশপ্রেমী এবং যোদ্ধা মৃত্যু বরণ করে দেশের জন্য, ঈশ্বরে বিশ্বাস লইয়া এবং যে কারণের জন্য মৃত্যু বরণ করিতেছে তাহা ন্যায়সঙ্গত এই ধারণা লইয়া। কিন্তু নিহিলিস্টের মনে কোন্ আশা? নিহিলিস্ট পুরুষ অথবা নারী কেহই আত্মা অথবা ঈশ্বর এবং ভবিষ্যৎ জগৎ বিষয়ে বিশ্বাসহীন। নিহিলিস্ট পুরুষ অথবা নারী (নারীর সংখ্যাই বেশি) একটি অলীক ধারণার বশবর্তী হইয়া। খুবই দুঃখের বিষয় যে, ইহাদের আত্মোৎসর্গ নিরপরাধের রক্তে কলঙ্কিত। একটি ধারণার জন্য লড়াই করা অথবা প্রাণ দেওয়া ভারতীয় মনের পক্ষে কল্পনাতীত। কিন্তু এ ব্যাপার ইউরোপে প্রায় সর্বজনীন, সেখানে কোনো একটি নীতির জন্য মানুষ প্রচুর ত্যাগ স্বীকার করিতে সর্বদা প্রস্তুত। একটি বালকের সম্পর্কে একটি ঘটনার কথা বলি। সে যেভাবে আহত হইয়াছিল, তাহা দৃষ্টান্তস্বরূপ উল্লেখ করা যাইতে পারে। সে কি ভাবে চোখের পাশে ক্ষতচিহ্ন আঁকিল জিজ্ঞাসা করাতে বলিল অন্য একটি ছেলের সঙ্গে তাহার লড়াই হইয়াছে। সে বলিয়াছিল "তোর বোনের চোখ টেরা।" তাই তাহাকে আমি আক্রমণ করিয়াছিলাম। তাহাকে জিজ্ঞাসা করা হইল সত্যই কি তোমার বোনের চোখ টেরা? সে বলিল, না, না, আমার কোনও বোনই নাই। তাহা হইলে লড়াই করিতে গেলে কেন? সে বলিল আমি নীতির জন্য লড়াই করিয়াছি। বোন থাকুক বা না থাকুক সে কেন বলিবে যে তোর বোনের চোখ টেরা?—লড়াই করিবার পক্ষে যথেষ্ট যুক্তি বটে।

বিবাহ রেজিস্ট্রেশন অফিস
(স্পেশাল ম্যারেজ অ্যাক্ট—১৯৫৪)
শ্রীগিরিজাশঙ্কর ভাদুড়ী
ম্যারেজ অফিসার
কলিকাতা ও ২৪ পরগণা
১/১এ মহাত্মা গান্ধী রোড (শিয়ালদহ)
ফোন নং : ৩৫-৪৬১৭
কল্যাণনগর, (রহড়া) ২৪ পরগণা

তিমিরাচ্ছন্ন ডুয়ার্স

॥ অগ্নিবর্ণ ॥

[পূর্ব-প্রকাশিতের পর]

॥ আট ॥

রাতদুপুরে মানুষের কলশব্দ, ভেসে আসে।

ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। ঘুমটা ভাঙতে চকিত হয়ে উঠলাম। না, বিছানা থেকে উঠি নি। উঠতে কী ইচ্ছে করে! ফেব্রুয়ারীর মাঝামাঝি হলেও বেশ শীত। তীব্র ডিসেম্বরের শীতরাত্রির সঙ্গে এর যে কী তফাৎ বুঝে ওঠা কঠিন। বেশ জবর শীত! জানালা-দরজা বন্ধ করে দিয়ে উষ্ণ শয্যায় শুয়েও ঘুম আসে না। একটা পুরোদস্তুর দামী রাগ্ চড়িয়েছি আপাদ-মস্তক। যাতে কোনদিক দিয়ে শীত প্রবেশ না করতে পারে। আসলে আমরা সমতলের মানুষ। পূব বাংলার। দেশ বিভাগের পর রাষ্ট্রবিপ্লবের তরঙ্গে ভাসতে ভাসতে এসে জুটেছি এইখানে। তাই শীতের আধিক্য আমাদের বিড়ম্বিত করে। কিন্তু এমনও দেখছি ত' মানুষ এই শীতের রাত্রে অকাতরে পথে-প্রান্তরে একটেরে পাতার কুটিরে স্টেশনের প্ল্যাটফর্মে কাটিয়ে দিচ্ছে। তাদের কথা ভাবা যায় না। এবং একথা সত্যি, উত্তর বাংলার এ প্রান্তে এসে-জোটা বাঙালীদেরও নাইন্টি পার্সেন্ট পূব বাংলার। বোধ হয় কম করেই বললাম।

বাসুবাবু বলেন, তার চেয়েও বেশি।

বাসুবাবু এখানকার একজন কন্ট্রাক্টর। ঠিক কবে থেকে আছেন বলতে পারব না। তবে মনে হয় অনেকদিন থেকেই আছেন। এদিক সম্পর্কে বেশ খবর রাখেন। তিনি বলেন, ডুয়ার্সে অনেক আগে থেকেই পূব বাংলার বাঙালীরা আসছে এ কথা ঠিক। আসবে নাই-বা কেন?

জানবার উদ্দেশ্য নিয়ে আমি শুধিয়েছিলাম, আচ্ছা বলতে পারেন, ডুয়ার্সে ঠিক কবে তাঁরা আসতে শুরু করেন?

বাসুবাবু বলেছিলেন, সে অনেকদিনের কথা। ডুয়ার্সে প্রথম আসে ইংরাজেরা। আদিবাসী বলতে যাঁরা তাঁরা ত' ছিলেনই। তারপর আবিষ্কৃত হল চা-পাতা। কিন্তু তখনো ডুয়ার্স বলতে মানুষের কাছে এক বিভীষিকার দেশ। ভয়াল জঙ্গল, সাপ-খোপ, বাঘ-ভালুক ও জলা-জংলার দেশ। পাশে অবশ্য কুচবিহার অনেককাল আগে থেকেই জ্ঞানে-গরিমায় শীর্ষস্থানে। কুচবিহারে আসতেন বাঙালীরা। প্রধানত পড়াশুনো করতেই বেশি আসতেন। রাজার আনুকূল্যে জ্ঞান-বিস্তারের অবাধ আয়োজন। ছুটি-ছাটায় বাড়ি ফিরে যেতেন। ক্রমে ছড়িয়ে গেল ডুয়ার্সের কথা। পূব বাংলার নদীমাতৃক সভ্যতার সন্তানেরা চিরকালই দুঃসাহসী। প্রধানত সেখানকার জীবন-সংগ্রামে প্রতিযোগিতা ছিল খুব বেশি। সে আওতার বাইরে আসতেই অনেকেই ছুটেছিলেন এই অঞ্চলে। এখানকার অগাধ জমি অল্প আয়াসেই প্রচুর অর্থ উপার্জনের সম্ভাবনা এগুলি তাঁদের কিছু কিছু দুঃসাহসী যুবকদের আকর্ষণ জাগিয়ে তুলেছিল। ডুয়ার্স যে রত্নখনির এলাকা। সেখানে সহজেই কোটিপতি হবার স্বপ্ন নিয়ে তাঁরা পাড়ি জমাতে শুরু করেন এ অঞ্চলে। যাঁরা আসতেন তাঁরা আবার মাঝে মাঝে বাড়িতে ফিরতেন পুজোয় সংক্রান্তিতে দোলযাত্রা উপলক্ষে। তাঁদের কাছে শুনে শুনেও অনেকে এলেন পরে।

আমি বলেছিলাম, আসবার রাস্তাঘাট ছিল কি?

এখনকার মত কোথায় ছিল? তবু আসতেন অনেকেই। কিছু পথ ট্রেনে করে এসে তারপর হাঁটাপথে বা মোষের গাড়িতেও আসতেন। নদীপথেও অনেকে আসতেন। পূব বাংলা থেকে বড় বড় নৌকোর পাল তুলে দিয়ে হুঁসিয়ার মাঝি-মাল্লাদের সম্বল করে জলে ভাসতেন তাঁরা। কুড়িগ্রাম-কাউনিয়া হয়ে তিস্তা নদী উজিয়ে বড় বড় নৌকোগুলি এসে লাগত। আলিপুর-দুয়ারের নিকটবর্তী কালজানি নদীর পাড়ে খোলটা তখন বিখ্যাত বন্দর। আরো আসত মহাজনী নৌকো। চাল-ধান-পাট, কাঠের ফার্নিচার বোঝাই করে। আলিপুরে কিন্তু একবারে ট্রেন হয় নি। হয়েছে থেমে থেমে। খোলা গাড়িও কিছুদিন ছিল। ছাদ ছিল না ওপরে। সে সব অবশ্য আরো পরের কথা।

বাসুবাবুর কাছে শুনেছি অতীতের সেই সব দিনগুলির কথা। স্বপ্নের মত মনে হয়। ক্রমে ডুয়ার্সের কথা ছড়িয়ে গেল চারদিকে। রত্নসম্ভবা ডুয়ার্স। কানাকানি শুরু হল চারদিকে। ঢাকার গালা-মালের ব্যবসা তুলে দিয়ে চলে এলেন মতিলালবাবু। তাঁর চৌদ্দ পুরুষ গালা-মাল ব্যবসায়ী। চা-এলাকার নিঃশঙ্ক হাতছানি অস্বীকার করতে না পেরে এলেন শিবকালীবাবু। তিনি ওকালতি করতেন নারায়ণগঞ্জে। নসিরামবাবুর ছিল তালুক। ছিল পৈতৃক বাড়ি। তিনিও এলেন সব বেচেবুচে দিয়ে। জগদীশ সান্যাল যৌবনে ছিলেন দুর্দান্ত ডাকাবুকো। ভালো সাঁতার জানতেন। হাতবন্ধ অবস্থায় এক পুকুরে বারো ঘণ্টা সাঁতারে তদানীন্তন এস-ডি-ও সাহেবের হাত থেকে রুপোর মেডেল পেয়েছিলেন। কিন্তু তাঁর চাকরি-বাকরি কিছু হচ্ছিল না। আদিনাথবাবু তাঁকে ডেকে পাঠালেন, চলে এস ডুয়ার্স। সেখানে গিয়ে কি কিছু হবে? হবে, হবে। মা না-খেয়ে শয্যা নিয়েছিলেন। ছ'-সাত দিন ওঠেন নি খান নি পর্যন্ত। আশুবাবু, তাঁর পিতা, উঠতে-বসতে গালমন্দ করতেন ছেলেকে, হতভাগার কিছু হল না বলে। তিনিও চেঁচিয়ে স্ত্রীকে বলতে লাগলেন, তুমিও ক্ষেপেছ! আগে যাক ত'। ও-সব ছেলে আলাদা রকমের থাকে। তাঁর চোখের সামনেই ছেলে ট্রেনে উঠল। লাল-মণির হাট হয়ে ট্রেন আসত তখন। এই সব কথা।

নবাগত জীবিকা-সন্ধানীরা দলে দলে মিলতে লাগলেন একসঙ্গে। সাহেবদের সঙ্গে আড়াআড়ি করে গড়ে উঠতে লাগল চা-বাগানের আবাদ। দুটি পাতা একটি কুঁড়ি। সে যে কী আশ্চর্য দিনগুলি কল্পনা করা যায় না। "বাবা শ্রীপদ, তোমার অবর্তমানে কল্যাণীয়া বধূমাতা আমার গত দীর্ঘকাল হইতে শয্যা লইয়াছেন। তোমার মাতাঠাকুরাণী কাঁদিয়া কাঁদিয়া অনর্থ করিতেছেন। আমি এবম্বিধ বার্ধক্যে কি যে মহাপাতকের ফল ভোগ করিতেছি তাহা করুণাময় এক জগদীশ্বর ভিন্ন কে জানিবেন। বাবা শ্রীপদ, তুমি উপযুক্ত পুত্র। মাতাপিতাকে সাক্ষাৎ ঈশ্বর-সদৃশ বলিয়া গণ্য করিবে।..."

কাঁপা কাঁপা হাতে চিঠি লিখছেন ছেলেকে মোক্তার শশীকুমারবাবু। পাটাতলি গ্রাম থেকে। পূর্ব বাংলার গ্রাম। শশী-বাবুর কিছু জমি-জমা আছে। তার উপ-স্বত্বেই দিন চলে যাবার মত ব্যবস্থা আছে। কিন্তু কা কস্য পরিবেদনা। শ্রীপদবাবু ছাব্বিশ বছরের যুবক, মনে মনে লাখপতি হবার স্বপ্ন ফেঁদে বসেছেন। অতএব

পিতার কাকুতি-মিনতি করা পত্রের ভাষা ব্যর্থ হয়ে গেল।

"শ্রীচরণেষু, বাবা আপনার বধূমাতাকে সান্ত্বনা দিবেন। পূজ্যপাদা মাতাঠাকুরাণীর চরণে শত কোটি কোটি প্রণাম। তাঁহাকে জানাইবেন, অযথা আমার জন্য শোক না করেন। আপনাদের শ্রীচরণের আশীর্বাদে আমি ভালই আছি।..."

উত্তর যথাসময়ে গেল ডুয়ার্স থেকে। আশীর্বাদ শব্দটার বানান ভুল আগাগোড়া। কিন্তু খুব যত্ন করে লিখেছে চিঠি পুত্র শ্রীপদ—"এখানে পরমেশ্বরের ইচ্ছায় আমার কোনরূপ কষ্ট নাই—"

ইতিহাস জানে, মিথ্যাকথা। মিথ্যা-কথা লিখেছিল পুত্র শ্রীপদ। পরমেশ্বরের আশীর্বাদে দুঃখ-কষ্ট ও অসুবিধের অভাব ছিল না। বরং কিছু বেশিই ছিল। ডুয়ার্সের সেই বড় বড় রাজকীয় সংস্করণের বিখ্যাত মশা। তাদের দংশন মধুর ছিল না। তবে দেশে বেকার অবস্থায় শশী-বাবুর পুত্রবধূর বচনবিন্যাসের তুলনায় তা সামান্যই বলা চলে, শ্রীপদ তা তার ব্যক্তি-গত জীবনের অভিজ্ঞতা থেকে জানে। পিতা শশীকুমার না জানুন, পুত্র শ্রীপদ কল্যাণী-বধূরাণীর আরেক মূর্তি প্রত্যক্ষ করেছে, যাকে প্রসন্নমূর্তি ঠিক বলা চলে কি না, তবে তার সাক্ষ্য দিতে কাঁধের পাশে জামার তলায় খানিকটা জায়গা—এখনো উঁচু হয়ে আছে। না, না। সেই ভালো। ফিরে আর যাবার ইচ্ছে নেই শ্রীপদর। বড়-মানুষের মেয়েকে বিয়ে করার সখ তার হাড়ে হাড়ে মিটেছে। বধূর নাম সুন্দরী। শ্রীপদর ছোটবেলায় নিজে বধূ-নির্বাচনের রেওয়াজ ছিল না। পুত্রকে বিবাহ দিতেন বাবা-মা। ছেলেকে বোকা-বোকা একটি রোলের অভিনয় করতে হত। তার ব্যক্তিগত মতামতেরও কোন বালাই ছিল না। সুবোধ গোপালের মত বিবাহ-বাসরে প্রবেশ করতে হত। যথাবিহিতসম্মানপুরঃসর সম্ভাষণে সিন্দূরবিন্দু-অঙ্কিত পত্রে যেত আত্মীয়-স্বজনদের কাছে। লৌকিকতার পরিবর্তে আশীর্বাদ প্রার্থনীয়। আশীর্বাদ বর্ষণ নিশ্চয়ই প্রচুর হয়েছিল। নইলে সুন্দরী যার নাম, সে অমন রুদ্রাণী হতে গেল কেন? অমন কার্তিকের মত নধর-কান্তি বরকে নইলে অমন দুর্ব্যবহার করে কেন?

জীবন অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছিল শ্রীপদর। নববধূর গেঁজাদাঁতের হাসি যেমন মধুর ছিল, তেমনি তার হাতের কনুই-এর খোঁচাও ছিল নৌকোর গলুইয়ের মত। রাত্রে ঘরের দরজা বন্ধ হতে সে দৃশ্য অপরূপ শ্রীময়ী হয়ে উঠত। আর শ্রীপদকে নিঃশব্দে অপেক্ষা করতে হত। শ্বশুর-কুলের উদ্দেশে বাছা-বাছা বাক্যবাণ দিয়ে সে শুরু করত তার নিভৃত দাম্পত্য-লীলার ভূমিকা। বধূ শ্বশুর অর্থাৎ শ্রীপদর বাবাকে বলতো ঠক। জোচ্চুরি করে তার মূর্খ অপদার্থ ছেলের সঙ্গে বিবাহ ঘটিয়েছে। বানরের গলায় রত্নমালার প্রয়োজনই বা ছিল কী!

নিভৃত কক্ষে নিশীথরাত্রির অভিসারে সাধারণত এক-আধটু বুক দুরু-দুরু করেই থাকে। কিন্তু শ্রীপদর বুক দুরু-দুরুটা ছিল একটু অন্যরকমের এবং সেটা একলাই সে অনুভব করত। প্রথম দিন সে একটু আত্মপক্ষ সমর্থনের চেষ্টা যে না করেছিল, তা নয়—তবে সেটা টিকতেই পায় নি। অতএব শ্রীপদ অর্থাৎ বানর এবং বধূ মতান্তরে রত্নমালা দ্বেষের সম্পর্কটা অস্বাভাবিক হয়েই দাঁড়িয়েছিল। কিন্তু সেই বিখ্যাত প্রবাদটিকে সার্থক করতে বানর দাঁতে কেটে রত্নমালাটি চূর্ণ-চূর্ণ করতে পারে নি। বাগুইহাটির বিখ্যাত চৌধুরী বংশের কন্যাটি এবং শ্রীপদরা যার তুলনায় নিতান্তই বেচাকেনার ঘর, এবং শ্বশুর একজন শঠ ও প্রতারক—শ্রীপদ তাকে মনে মনে ডাকিনী-সম্বোধনে আপ্যায়িত করলেও মুখ খুলে তা প্রকাশ করতে পারে নি।

অতঃপর রঙ্গমঞ্চে শ্রীপদর প্রস্থান লক্ষপতি হবার বাসনায়। অতএব এখন কল্যাণীয়া বধূমাতার কান্নায় কী এসে যায়। এখানে এসে সে রাজার আরামে আছে। এক-আধটু যা অসুবিধে, লোকজন নেই, তাসপাশা চলে না। আর এখানকার জল-বায়ুও তত ভালো নয়। তথাপি সাহেব-ম্যানেজার মিঃ কলিন্সের নেকনজরে পড়েছে সে।

সাহেব সত্যিই তাকে ভালোবাসে। আর সাহেব সত্যিকার ভালো লোক। হবে নাই বা কেন? সাহেব জাত যে। স্বয়ং রাজার লোক কখনও খারাপ হতে পারে। সাহেব মস্ত বড়ো ঘোড়ায় চড়ে সারাদিন দপদপিয়ে বেড়ায়। সাদারঙের ঘোড়াটিও দেখবার মত। একটা মানুষ সমান উঁচু। সারাদিনই প্রায় ঘোড়ায় ঘোড়ায় কাটে সাহেবের। ঈষৎ সোনালী দাড়ি। লালচে চুল। চোখ নীলরঙের। ভীষণ পাইপ খায়। আর পরিশ্রমও করতে পারে প্রচুর। শ্রীপদ জানে, নতুন আবাদ বসাচ্ছে সাহেব এ-অঞ্চলে। না খাটলেই বা চলবে কেন? সাত সমুদ্র তেরো নদী পেরিয়ে এসেছে। অসাধারণ দুঃসাহসী।

শুধু রোববার দিন সাহেবের বিশ্রাম। ইতিমধ্যেই সাহেবরা একটা গীর্জা করেছে। কাঠের গীর্জা। ডুয়ার্সে কাঠ ভীষণ সস্তা। চূড়াটিও কাঠের। দেখতে ঝক-ঝক করে সাদারঙ। এক চিলতে বাগান।

আশপাশে আরো চার-পাঁচটা বাগান এরই মধ্যে হয়ে গেছে। সাহেব বাগান। রোববার দিন সাহেবরা কোন কাজ করে না। বিশ্রাম। অফুরন্ত বিশ্রাম সেদিন। কাঠের বাংলোর বারান্দার ধারে রেলিং-এর পাশে আর্মচেয়ারে বসে থাকে। সুদূরের দিকে দৃষ্টি মেলে। সিঙ্চুলা গিরিমালার দিকে উদভ্রান্ত দৃষ্টি।

শ্রীপদকে একদিন বলল, টুমি খুব কাজের লোক আছে। টোমাকে হামি খুশি করিবে।

একটু ভাঙা ভাঙা বাংলা। উচ্চারণটা জড়িত। সাহেব বাংলা শিখতে আরম্ভ করেছে অল্পদিন। শ্রীপদকেই প্রথমটায় বলেছিল, বাংলা শিখিয়ে দিতে। শুনে চোখ কপালে তুলেছিল শ্রীপদ। এখানেও সেই ভূত তাড়া করল শেষ পর্যন্ত। বাঙালীর ছেলে বটে শ্রীপদ। কিন্তু ঈশ্বর জানেন, বাংলাটা কোনদিন রপ্ত করতে পারল না। ছোটবেলায় বাংলা ক্লাশ পালাত। ভয়ে। নিবারণ পণ্ডিত ছিলেন সেকালের বিখ্যাত টুলো পণ্ডিত। তেত্রিশ কোটি দেবতার নাম উচ্চারণ করতে করতে যেত। সকালটাই বিষণ্ণ হয়ে যেত নিবারণ পণ্ডিতের নামে। বাবা আবার নিবারণ পণ্ডিতের খুবই ভক্ত। অসাধারণ শ্রদ্ধায় বিগলিত কণ্ঠে বলতেন, অমন পণ্ডিত এ তল্লাটে আর কে আছে? গোটা পাণিনি ব্যাকরণটা মুখস্থ বলতে পারেন।

ঈশ্বর জানেন, সেইটেই যা বিদ্যা বিপত্তির কারণ। ব্যাকরণ মুখস্থ করতে হত তাকে।

সংস্কৃত ব্যাকরণের মূল সূত্র। দাঁতে দাঁতে লাগত শ্রীপদর।

কখনো চৈতন্য ভাগবত পড়তেন নিবারণ পণ্ডিত। সুর করে পড়া। তিনি পড়তেন,

> প্রভু কহে বৈদ্য তুমি ইহা কেন পড়।
> লতাপাতা নিয়া গিয়া রোগী দড় কর॥
> ব্যাকরণ শাস্ত্র এই বিষম অবধি।
> জ্বরপিত্ত অজীর্ণ ব্যবস্থা নাহি ইথি॥

তখন ওই তৃতীয় চরণের অর্থটি তার কাছে একমাত্র বোধগম্য রুচিকর বলে মনে হত। শেষ পর্যন্ত স্কুলেও সেই বাংলাতেই ঠেকল। বাংলা আর ইতিহাস। এণ্ট্রেন্সটা পাশ দিতে পারল না শ্রীপদ। শেষকালে সাহেবও তাকে সেই বাংলা শেখাতেই বসছে। সাহেব অবশ্য বাংলা শেষ পর্যন্ত তার কাছে শেখে নি। একজন বুড়োমত মৌলভী শেখাত বাংলা। শ্রীপদ দেখেছে।

বেশ শিখেছে বাংলা সাহেব। সেই বাংলাতেই যখন তাকে বলতেন, টুমি কাজের আছে। টোমাকে হামি গার্ডেনের বড়াবাবু বনায়ে ডিবে। তখন শ্রীপদর আহ্লাদের আর সীমা-পরিসীমা থাকত না।

সেই সাহেবরা চলে গেছে। দেশ স্বাধীন হয়ে গেছে। মিঃ কলিন্সদের

পরবর্তী কালে অদের উত্তরপুরুষ শ্বেতাঙ্গ যারা এসেছিল, তারাও উনিশ শ' সাতচল্লিশের পনেরোই আগস্টের সঙ্গে সঙ্গে বিদায় নিয়ে গেছে। ডুয়ার্সে এখনও সাহেব বাগান কিছু কিছু আছে বটে। তবে এখন তার অধিকাংশই মাড়োয়ারীদের দখলে। এক অদ্ভুত জাত এরা। আর অবশ্য বাঙালীরাও কিছু কিছু আছে। দু-চার-পাঁচটা বাগানে অবশ্য সাহেবরাও আছে।

দেশ কাল পাল্টেছে। যুগজীবন পরিবর্তিত হয়েছে। কিন্তু এখনও আছে ডুয়ার্স। আরও জমজমাট হয়েছে। আরো চেকনাই বৃদ্ধি পেয়েছে। চা-পাতার কৌলীন্য বেড়েছে। ব্যবসা-বাণিজ্যের শ্রীবৃদ্ধি ঘটেছে। নতুন কালে নিজের ভূমিকা নিতে চলেছে ডুয়ার্স। নতুন কালের রূপসী বধূ ডুয়ার্স। সেকালের কল্যাণীয়া গৃহলক্ষ্মী মূর্তি নয়। একালের নিপুণা প্রসাধনচতুরা নারী। তার হাতে সুবর্ণ-বলয়ের সঙ্গে রিস্টওয়াচের সৌখিন ডায়াল চকচক করে। সীমন্তে সিন্দুরবিন্দু পড়া যায় কি না যায়। পরিবর্তে ঠোঁটে ও নখে লাল রঙের প্রাচুর্য। হাতে ভ্যানিটি—চোখে গগলস্। পশ্চিম কী দ্রুতই না হাত বাড়িয়েছে এদিকে।

রাতে ঘুম ভেঙে যায়। একরাশ মানুষের কলরব।

মধ্যবর্তী নির্বাচন হয়ে গেছে ক'দিন আগে। বিপুল ভোটে জিতেছে যুক্তফ্রন্ট পশ্চিমবঙ্গে। কংগ্রেসের সাজানো দুর্গ ধূলিসাৎ হয়ে গেছে। যুক্তফ্রন্টের জয়-জয়কার। এত রাতেও মিছিল চলেছে রাস্তায়। মশালসজ্জা সহযোগে। যুক্তফ্রন্ট জিন্দাবাদ! যুক্তফ্রন্ট লাল সেলাম!

অনেকগুলি শব্দব্রহ্ম রাত্রির নিথর ইথারের ঘুম ভাঙছে।

জানালা খুলে দেখতে ইচ্ছে করে। ঘুমভাঙা মানুষের মিলিত কণ্ঠধ্বনিতে বাতাস আলোড়িত। হিম-কনকনে বাতাসের চাবুক আর জোরালো শীতের আয়োজন উপেক্ষা করে চলেছে বিজয়ী মানুষের মিছিল।

হায় কলিন্স, হায় শ্রীপদ! কোথায় আজ তোমরা? তোমাদের দিন গিয়েছে। ডুয়ার্স আজ আর তিস্তির প্রান্ত নয়। নতুন কালের বিপ্লবী সংগ্রামী বাংলা এখানেও তার সংগ্রামী পা বাড়িয়েছে।

॥ নয় ॥

ভোজবাজি কা খেল দেখিয়েছে বাংলাদেশ!

নির্বাচনের কথা বলছি। মধ্যবর্তী নির্বাচন।

আমি চিরকাল দেখে আসছি, বাংলাদেশ হাড়ে-হাড়ে ভেলকি খেলতে জানে। এমনি করেই ইংরাজ রাজত্বের কালে বাংলাদেশ অসম্ভবকে সম্ভব করেছে। যখন বৃটিশসিংহের শাসন ও শোষণের ভিত্তি পাকা হয়ে গেছে, চারদিকে তার সদাজাগ্রত সতর্ক পাহারার খরদৃষ্টি—তখনও একদল বাঙালী ছেলে "জীবন মৃত্যু পায়ের ভৃত্য" করে দাসত্ব মোচনের অঙ্গীকারে নেমে পড়েছিল। রক্তচক্ষু শাসনকে পরোয়া করে নি। ফাঁসির মঞ্চে তারাই গেয়েছে জীবনের জয়গান। যুবকের তাজা রক্তে ভিজিয়ে দিয়েছে দেশমৃত্তিকার সবুজ অঞ্চল। মালা চায় নি, মন চায় নি, হাততালি চায় নি। ইতিহাসের সেটা অগ্নিযুগ। জাতীয় আন্দোলনের ক্ষেত্রে দেশকে যোগ্য নেতৃত্ব দিয়েছে অনেকবার বাঙালী। বড় বড় কংগ্রেস নেতাদের অনেকেই ছিলেন বাঙালী। বিপিন পাল, দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের মত নেতা জন্মেছেন এই দেশে। জন্মেছেন বংকিমচন্দ্রের মত চিন্তাশীল দেশনায়ক, বিবেকানন্দের মত তেজস্বী আত্মা। রামমোহন তো সারা দেশের নবজাগরণ-আন্দোলনেরই স্রষ্টা। ঋষি বিপ্লবী রাসবিহারী জন্মেছেন এখানে। ঋষি অরবিন্দ, জাতির প্রাণ-পুরুষ রামকৃষ্ণ ও রবীন্দ্রনাথের মত ব্যক্তিত্ব। নেতাজী সুভাষচন্দ্রের মেঘ-মন্দ্রিত কণ্ঠ এই সেদিনও পৃথিবীকে আলোড়িত করেছে।

দেশের স্বাধীনতার বাইশ বছর পরে আবার বাঙালী সেই যথাযোগ্য ভূমিকা গ্রহণ করেছে। শিশুরাষ্ট্রকে হাঁটাবার জন্য যাঁরা সময় চেয়েছিলেন, এত বছর হাঁটবার পর আজ দেখা গেল সেই প্রত্যাশা হয়েছে অন্তর্হিত। বামপন্থী দলগুলির দিকে প্রথম বাঙালী মানুষেরা তত্টা সচেতন হন নি। কিন্তু দিনের পর দিন তাঁরা দেখেছেন, স্বাধীনতা নামেমাত্র বস্তুতে পরিণত হয়েছে। তাঁদের প্রত্যাশা পূর্ণ হয় নি। দ্বিখণ্ডিত বাংলাদেশের এই সর্বশেষ অস্তিত্বটুকু পশ্চিমবাংলার বুকের ওপর দিয়ে চলেছে মৃত্যুর মিছিল ও ক্ষুধাতুর মানুষের মড়াকান্না। চোরা-কারবারে ভরে গেছে দেশ। সারা দেশব্যাপী বেকার-সমস্যার অধীর প্রবাহ। নিশ্চয়তা নেই জাতির জীবনে। অভাবের পর অভাব। কংকাল-করোটির ভারে মেদিনী আচ্ছন্ন হতে চলেছে। দিনের পর দিন মানবিক মূল্যবোধ হয়েছে অন্তর্হিত। শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান-গুলিতে চলেছে মানুষ গড়ার পরিবর্তে উচ্ছৃঙ্খলতা সৃষ্টির চেষ্টা। শিক্ষকদের সামনে আদর্শ নেই, ছাত্রদের সামনে অভ্রান্ত দিকনির্দেশ নেই। গ্রামে গ্রামে কৃষকের জীবন দরিদ্র থেকে দরিদ্রতর হয়েছে। কলে-কারখানার শ্রমিকদের জীবনে শোষণের ভিত্তি হয়েছে আরো সুদূরপ্রসারী। সুদূরে দিল্লীর মসনদে শাসক শ্রেণী সহানুভূতিহীন। নানা উপদলীয় চক্রান্তে ভারাক্রান্ত তাঁদের নিজেদেরই অবস্থা। ওদিকে দেশ গড়ার নামে বিদেশে কোটি কোটি টাকা ঋণের পরিমাণ দিনের পর দিন স্ফীত হয়ে উঠেছে।

বাংলার অসন্তোষের বেদনা জমছিল ধীরে ধীরে। প্রগতিশীল চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে উঠছিলেন তাঁরা দিনের পর দিন। তবু তাঁদের সামনে পথ খোলা ছিল না। অবশেষে তাঁদের চাপে নতিস্বীকার করল দেশের প্রগতিশীল দলগুলি। তাঁরা ঐক্যবদ্ধ হতে বাধ্য হলেন।

মাত্র ক'মাসে যুক্তফ্রন্টের শাসন তাঁদের কাছে ছিল অনেক আশা ও প্রতিশ্রুতির বিষয়। কিন্তু ক্ষমতার মদে দিল্লীশ্বর অন্ধ হলেন। তাঁদের সঙ্গে মিলিলেন কূটচক্রী কংগ্রেসের বাঙালী নেতারা। রাতারাতি নানা গোপন কূটচক্রে ছিনিয়ে নিলেন যুক্তফ্রন্টের শাসনাধিকার। অবাধে চলল রাষ্ট্রপতির শাসন দেশের আশা-আকাঙ্ক্ষাকে চূর্ণ-বিচূর্ণ করে গুঁড়িয়ে।

অবশেষে অন্তর্বর্তী নির্বাচন। বাংলার দেশপ্রেমিক মানুষেরা মনে মনে দিন গুণছিলেন প্রতিশোধের। মাত্র একটি দিনের নির্বাচনে ধস নামল বাংলাদেশে। বিপুলহারে সমর্থন পেল যুক্তফ্রন্ট। "দিল্লী প্রাসাদকূটে হোথা বারবার বাদশাজাদার তন্দ্রা যেতেছে টুটে"—রবীন্দ্রনাথের কথাটি যেন অক্ষরে অক্ষরে সত্য হয়ে উঠেছে।

উত্তরবাংলায় অবশ্য বিপুলহারে এই পরিবর্তন হয় নি। সারা বাংলাদেশ জুড়ে যখন একটির পর একটি প্রতি-ক্রিয়াশীল দুর্গ ভেঙেছে, রেডিও মুখর হয়ে উঠেছে যুক্তফ্রন্টের জয়যাত্রা-ঘোষণায়—তখনও কিন্তু যুক্তফ্রন্টের প্রত্যাশা পূরণ হয় নি এ-অঞ্চলে। প্রশ্নটা অনেকেরই মুখে মুখে ফেরে এ-অঞ্চলে।

স্বারিক মণ্ডলের সঙ্গে দেখা হল পরশু দিন। মধ্যবর্তী নির্বাচনে বাংলা-দেশে যুক্তফ্রন্টের বিপুল জয়ের কথা জানে দেখলাম। আর জানবেই বা না কেন? কিন্তু স্বারিক মণ্ডল দেখলাম শুধু জানেই না, এ-সম্পর্কে মোটামুটি তার একটা বক্তব্যও আছে। সে এ-অঞ্চলের চাষী মানুষ। অনগ্রসর সমাজের লোক। সাদাবাঁ হাটে তার বাড়ি আছে। একখণ্ড জমি সে চাষ করে। সেই জমিও নিতান্ত সাধারণ স্তরের জমি। গাইগরু আছে

দুটি। ফলদ-জোয়াল নিজের নেই। এক-বেলা ছাড়া দু'বেলা দু'মুঠো কোনদিনই খেতে পায় না। তাকে আমি মোটামুটি সাদামাটা নিরীহ গোবেচারী মানুষ বলে জানতাম। কিন্তু নির্বাচনের রায় বেরোবার পর সে নিজেই তার মনের কথাগুলি এসে আমাকে বলে গেল। তাকে ডাকতে হয় নি। নিজে থেকেই এসেছিল।

কি খবর, স্বারিক মণ্ডল?

লিখতে বসেছিলাম। তাকে দেখে কাগজকলম গুটিয়ে রাখতে রাখতে প্রশ্নটা করলাম।

স্বারিক মণ্ডল বলল, খবর তো এখন সারা দেশেই এক। তার মুখ হাসি-হাসি।

আমি বললাম, নির্বাচনের সব খবর জেনেছ?

স্বারিক যা বলল তাতে বোঝা গেল, খবর সব পুঙ্খানুপুঙ্খ জানে।

তুমি এত সব খবর জানলে কোত্থেকে? তোমার বাড়িতে তো রেডিও নেই।

আমি গরীব মানুষ, বাবু। বাড়িতে খাবারই জোটে না। রেডিও কোথায় পাব?

কিন্তু তুমি দেখছি, শেষ খবরটা পর্যন্ত জানো।

স্বারিক মণ্ডল লাজুক লাজুক মুখে হাসল।

এমন সময় আমার ভাগ্নে রতন ঘর থেকে বেরিয়ে এল। সে-ও স্বারিক মণ্ডলকে চেনে দেখলাম। হয়ত আমার এখানেই দেখে থাকবে। না, তা কেন? আমার ভাগ্নের মাদারীহাটে একটি সাইকেলের দোকান আছে। আমার কথা সে আন্দেকটা শুনতে পেয়েছিল। এখন স্বারিক মণ্ডলকে দেখে বলল, তুমি স্বারিকের কথা বলছ? সে তো সেই ইলেকশনে ভোটটি দেবার পর থেকেই মাদারীহাট থেকে নিরুদ্দেশ। নির্বাচনের গণনার দিন বেলা দশটা থেকে কোর্টের মাঠে বসা। আমি নিজের চোখে তাকে দেখেছি। কি, সত্যি না?

স্বারিক বলল, আজ্ঞে হাঁ। ভগবানের ইচ্ছায় ভোট দিলাম আর ভোটের খবরটা জানতে ইচ্ছে করে না? তাই ওইখানে এসে বসেছিলাম।

গুড্ হেভেন্স! তুমিও ওখানে ছিলে নাকি? দু'দিনই?

স্বারিক সরলভাবে তার নিজের অভিজ্ঞতাটুকু বলে গেল, আজ্ঞে ভোট গোণার দু'দিনই ওখানে ছিলাম। ননী-বাবুর ভোট গোণার দিন বিকেল পর্যন্ত মাঠে বসে আছি। ননীবাবু তখনও তিন-চার হাজার ভোটের তলায়। উঠতে কি ইচ্ছে করে? হাত-পা ঠকঠকিয়ে কাঁপছে খালি। কি হবে? ননীবাবু কি তাহলে হেরে যাবে? আর, হারবার বাকিই বা কী। একটার পর একটা গোণা হচ্ছে। ওই যে কি বলে, মাইকে বলে-বলে দিচ্ছে বাবু। কিছুতেই আর জিতবার আশা নেই। কংগ্রেসের লোকজন চারদিকে হাল্লা করছে। তাদের মুখ হাসি-হাসি। হা ভগবান, এবারও কি তাহলে কংগ্রেস জিতবে?

কংগ্রেসের ওপর তোমার রাগ কেন? কংগ্রেস তো স্বাধীনতা এনেছে।

না, বাবু রাগ আমার কারুর ওপরেই নেই। তবে কিনা কংগ্রেস আজকাল বড়-লোকের দল হয়েছেন। আমাদের গ্রামেও দু'চার-পাঁচজন বাবু যান বটে। তবে তাঁরা মোটরগাড়ি চড়ে যান। ওই যে কী বলে জিপগাড়ি না কী। ও'রা গিয়ে বসেন ও'দের প্রধানের বাড়ি। আলিপুরের বি-ডি-ও সাহেবকেও দেখি। ও'রাও বাবু ভালো লোকই। তবে কিনা গরীবের লোক না। গরীবের দল আমাদের। আমরা ও'দের ভোট দিয়ে পাঠালে কি হবে ভোটের পর আর আমাদের দিকে ফিরেও তাকান না। আমার ছেলেটার একটা চাকরি হল না। কত ধরলাম বাবুদের। ওই যে সীমানার চৌকিদার না কি বলে? বলে ঘুষ লাগবে একটা বড় পাতি। একশ' টাকা আমি পাই কোথায়? গরীব মানুষ। ছেলেপুলেগুলোকে ভাত খাওয়াতে পারি না। শেষটায় বড়ছেলেকে পাঠাতে হল সামান্য একটা চাকরির জন্য ভুটানে।

স্বারিকের গলা কাঁপল।

খুব অল্পে জিতলেন আমাদের ননী-বাবু। তবু তো হার হয় নি। বুকের ভিতরটা যা করছিল বললে বুঝবেন না বাবু। তবু যা হোক—

তোমাদের বেস্টার উইচ্ও তো জিতে-ছেন। আচ্ছা, বলতে পারো মণ্ডল, ননী-বাবুর ভোট এবারে এত কম হল কেন?

শুধু ননীবাবুর ভোট বলে কথা না বাবু। আমাদের ভোট হবে কি করে? আমরা নিজেরাই যে মুখ্যু চাষা।

আরে, চাষী-মজুররাই যে দেশের সম্পদ। তারাই যে দেশ।

সে একখান কথা বটে। তবে কিনা কথাগুলো একটু ভাববার। বলে, সে নিজে আমাকে যা বলল, তার অর্থ হচ্ছে দেশের মানুষ এখনও মুখ্যু। গাঁয়ে গাঁয়ে মুখ্যু চাষী প্রজারা কিছুই বোঝে না। কে তাদের নিজের লোক, কে তাদের বন্ধু মানুষ। কারা বড়লোক। এ-সব তো তাদের যেমন বুঝিয়ে দেওয়া হয়, তারা তেমনি ভাবে। আমাদের উত্তরবাংলার মানুষেরা এমনিতেই খুব সাদাসিধে শান্ত ভালোমানুষ। লেখা-পড়া জানে না বলে তারা ভোট দেবার লোকও স্থির করতে পারে না।

স্বারিক মণ্ডলের কথাগুলি ভাবলাম। মধ্যবর্তী নির্বাচনের পটভূমিকায় বর্তমানে কথাগুলি ভাববার মত। হয়ত সারা বাংলা-দেশের কৃষক-প্রজারাই দরিদ্র।

কিন্তু পশ্চিমবাংলার তুলনায় এ-অঞ্চলের মানুষদের—চাষীদের অবস্থা

আরো দরিদ্র। এরা অধিকাংশই জোতদারের কাছে বাঁধা। জোতদার কান টানলেই মাথাসুদ্ধু চলে আসে। তাছাড়া শিক্ষার অভাব তো মস্ত একটা কথা। এর ফলে অনেক ভোট নষ্টও হয়। একজন প্রিসাইডিং অফিসারের কাছে শুনলাম তিনি একটি চা-বাগানে গিয়েছিলেন নির্বাচন-পরিচালনায়। ভোটারকে ভোট কিভাবে দিতে হবে সেইটে তিনি বুঝিয়ে দিচ্ছিলেন। বলছিলেন, আপনি যাকে ভোট দেবেন তার ছবির পেটের মধ্যে এই সীলটার ছাপ বসিয়ে দিন। দেখা গেল, ভোটদাতা খানিক পরে ব্যালটখানা হাতে নিয়ে নিজের পেটে ছাপ বসিয়ে হাসতে হাসতে ফিরে আসছে। একজন বুথের ঘেরা জায়গায় গিয়ে দাঁড়িয়ে আছে অনেকক্ষণ। ডাকলেও জবাব নেই। দেখা গেল ভিতরে ঢুকে জোড় হাতে ব্যালট বাক্সের সামনে চোখ বুজে বসে আছে। অনেকটি নির্বাচনী এলাকার বুথে শুনলাম বাক্সে দশ টাকার নোট পাওয়া গেছে। এক নির্বাচনী এলাকার প্রচারকালে একজন সরলপ্রাণ চাষী প্রশ্ন করেছিল, কেন, আবার কেন? গেলবারে যে-বলদটাকে পাঠালাম সে কলকাতায় পৌঁছে নি? তারপর ভোটারদের টাকা দিয়ে কেনা, বস্তীতে বস্তীতে মদের পাত্র উজাড় করে ঢেলে দিয়ে ভোট জেতবার চেষ্টা। যাঁরা সচেতন তাঁরা অবশ্য এঁদের সঙ্গে যুঝেছেন প্রাণপণে। একজন সরল দোকানদার আমাকে বললেন, তাঁর দশটি ভোট ছিল। সে জন্যে তাঁকে অনেক প্রলোভন দেখান হয়েছিল।

ননীবাবুর ভোট গণনায় দেখা যায় গ্রামাঞ্চলে তিনি খুবই কম ভোট পেয়েছেন। কোন কোন চাষী বলেছে, বলদ-জোয়াল হচ্ছে মরদের। তাই মরদরাই তাকে ভোট দেবে। আর কাস্তে হচ্ছে জেনানার। জেনানারাই তাকে ভোট দিক। নকশাল-ওয়ালাদের প্রচারকার্যও অনেকটা নষ্ট করেছে। যাই হোক, শহর এলাকার দিকে যুক্তফ্রন্টের ভোট বাড়তে সুরু করে। আলিপুরদুয়ার এলাকায় দুটি বড় বাগানের তুলনামূলক ভোটসংখ্যা দেখা যাক। পাইটকাপাড়া বাগানে যুক্তফ্রন্টের প্রচার ও প্রভাব বেশি। সেখানে যুক্তফ্রন্ট পেয়েছে বারোশ'র মত ভোট। কংগ্রেস পেয়েছে গোটা কুড়ি ভোটমাত্র। আবার মথুরা-বাগানে প্রায় উনত্রিশ শত ভোটের মধ্যে যুক্তফ্রন্ট পেয়েছে মাত্র একশর মত। জংশনে কিছু ভোট এবার কংগ্রেসের জন্য দেখা গেছে। কিন্তু যুক্তফ্রন্টের জন্য যে শিক্ষিত মানুষের দরদ বেশি তা ফল গণনাকালে কাউন্টিং অফিসারদের মধ্যেও দেখা গেছে। ননীবাবু যতক্ষণ পিছিয়ে ছিলেন, ভোট গণনারত অফিসারদের অনেকেরই মুখে স্বস্তির ভাব ছিল না। তাঁদের কপালে ঘাম গড়াচ্ছিল। সন্ধ্যার দিকে ফল বেরিয়ে যেতে দেখা গেল ননীবাবু হাজার দুয়েকের কাছাকাছি ভোটে এগিয়ে। সারা শহর ভেঙে পড়ল আনন্দে। দ্বারিক মণ্ডলও নিশ্চয় ছিল ও ওদের মধ্যে। ননীবাবুকে রিক্সায় দাঁড় করিয়ে একজন পিছনে বসে তাঁকে ধরে থাকল। আর হাজার হাজার বিজয়ী খুশি মানুষের শোভাযাত্রা চলল এগিয়ে। একটু আগে নির্বাচনে জয়ী হয়ে কুমারগ্রামের কংগ্রেসী পীযূষবাবু যখন চলে গেলেন, তখন তাঁকে কেউ সম্বর্ধনা করতে যায় নি সঙ্গে সঙ্গে। সারা শহর যুক্তফ্রন্টের জয়ধ্বনিতে মুখর হয়ে উঠল।

জনতা ক্ষিপ্তের মত চীৎকার করছে। পরাজিত কংগ্রেসী প্রার্থীর বাড়ির পাশ দিয়ে মিছিল নিয়ে যাবার কী ব্যগ্র আবেদন জানাচ্ছেন তাঁরা। ননীবাবু বোঝাচ্ছেন তাঁদের বার বার। কে শোনে তাঁর কথা। রাস্তার ধারে-ধারে অগণিত মানুষ। মহিলারা দলে দলে এসেছেন সন্দেশের থালা বহন করে। কত খাবেন ননীবাবু? সাধ্য কী, এত অফুরন্ত স্বতঃস্ফূর্ত ভালোবাসার প্রতিদান দেওয়া যায়! যে মারোয়াড়ী সম্প্রদায় যুক্তফ্রন্টের নির্বাচনী তহবিলে সাহায্য দিতে পশ্চাদপদ হয়েছিলেন, তাঁরাও এলেন এগিয়ে। মুখের ওই হাসি কি সরল ও স্বাভাবিক? কংগ্রেসপ্রার্থীর জয়ের জন্য কুসুমচন্দন করে যে মালিকা গাঁথা হয়েছিল, হায় রে, আজ তা দুলছে ননীবাবুর গলায়। পরাজিতের জন্য থাকে সমবেদনা, সহানুভূতি। খানিকটা বা করুণাও। সঙ্গে সঙ্গে হাঁটছি। কংগ্রেস ঠিক জানি ধুলায় গড়িয়ে গেল বাংলাদেশে। রেডিওর সংবাদে তারই যেন সূচনা। ততক্ষণে প্রতাপচন্দ্রের পরাজয়ের খবর ছড়িয়ে পড়েছে। আরো ফরুর-ফরুর। জয়ধ্বনির উল্লাসে ফেটে পড়ল জনতা। যুক্তফ্রন্ট লাল সেলাম। আমার পাশে একজন চেঁচিয়ে বলে উঠলেন, জলপাইগুড়ির খবর কি খগেন দাশগুপ্তও যাই-যাই হয়েছেন জানেন তো? পলাশবাড়ি থেকে এসেছেন দলে দলে মানুষ। শিলতোর্সা নদীর ওপার থেকে। চলুন, আমাদের ওখানে চলুন ননীবাবু। ননীবাবু তো নয়, যুক্তফ্রন্ট। যেতেই হবে। ঘড়ি দেখছেন অনেকে। এখন রাত বারোটা বাজে। সর্বনাশ, এখন কি করে যাওয়া যায় নদী পেরিয়ে? যেতেই হবে। ছাড়ান নেই। রাত বারোটার পর জোর করে টেনে নিয়ে যাওয়া হল ননীবাবুকে।

কলেজ এলাকায় হৈ-হৈ। এই প্রথম অধ্যাপকদের বিরাট এক দল সোল্লাসে শ্লোগান দিয়ে রাত্রির আকাশ ভরে তুললেন: যুক্তফ্রন্ট জিন্দাবাদ। ইনকিলাব জিন্দাবাদ! সে কী উল্লাস। অধ্যাপকদের স্ত্রীরা বেরিয়ে এসেছেন বাইরে। রাস্তায় রাস্তায় শিশুদেরও আনন্দধ্বনি। কুমার-গ্রামে কি হল? রণজিৎ দাশগুপ্ত হারলেন বটে, কিন্তু বাঘের বাচ্চা। সামান্য ক'দিনে কত হাজার ভোটে এগিয়ে এসেছেন। এ অঞ্চলে কোন কলকারখানা নেই, কোন গণ-আন্দোলন নেই, তবু এত ভোট পাওয়া চাট্টিখানি কথা? জিতেছেন বেস্টার উইচও। জন আর্থারকে অবশ্য জেতান গেল না। তেরোই ননীবাবু বেরিয়েছেন ভোরে উঠে। পদযাত্রা। ঘরে ঘরে মানুষের সঙ্গে পায়ে হেঁটে দেখা করা। কলেজে বসে আছেন ছাত্র ও অধ্যাপকদের দল। রাত্রে একটা খণ্ডযুদ্ধ হয়ে গেছে অধ্যক্ষের সঙ্গে। তিনি কিছুতেই কলেজে অভি-নন্দনের পক্ষপাতী নন। দিতেই হবে। আপনি না থাকেন, আমরা দেব। বিজয়ীকে গলায় মালা দেব আমরা, গর্জে উঠেছেন টীচার্স কাউন্সিল। ভোরে ভয়-দুরু দুরু বুকে উঠে চলে এসেছেন অধ্যক্ষ সভায়। সে কী কাণ্ড। ননীবাবুর জন্য মালা বুনেছে ছোট ছোট মেয়েরা। সকালে সেই মালা গলায় দোলান হল। যুক্তফ্রন্টের জয়জয়কার সারা দেশে। উত্তরবাংলাও তার অংশ নিচ্ছে।

দ্বারিক মণ্ডল বলে গেল, কাগজে লিখবেন, বাবু। আমাদের কথা যেন ভোলেন না ও'রা। আমরাও আছি ও'দের সঙ্গে। তাকিয়ে দেখি। তার চোখ দুটি জ্বলজ্বল করে। উৎসাহের আনন্দে।

[ক্রমশঃ]

রিস্ট ওয়াচ

মাত্র ৬৲ টাকায়

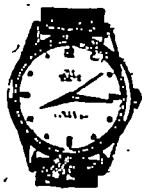

আমাদের চেন পদ্ধতি স্কীমের মাধ্যমে মাত্র ৬৲ টাকায় ৫ বৎসরের গ্যারাণ্টী সমেত ৫ জুয়েল রিস্ট-ওয়াচ লাভ করুন। ডাকমাশুল ১/১৫ টাকা অতিরিক্ত।

দ্রষ্টব্য: আমাদের মধু-চন্দ্রিমা সেন্টের বিক্রয় বৃদ্ধির জন্যই এই স্কীম চালু করা হইল। পছন্দ না হইলে মূল্য ফেরৎ।

SWISS WATCH
TRADING CO.
P. B. 87, (WBC) Jullundur City.

সদ্য বিকশিত গোলাপের মত সুন্দর আনন ও

কুসুম কোমল

পাপড়ি পেলব তনু

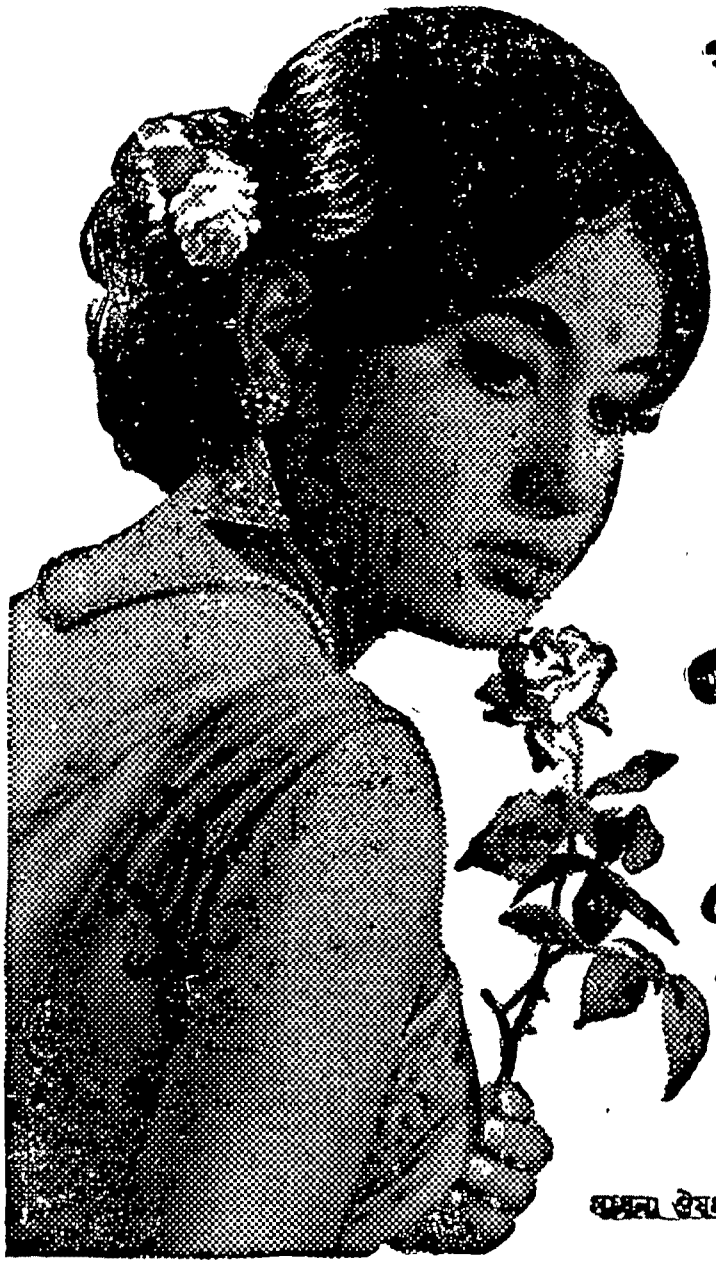

সাধনা বিউটি ক্রীম-এর
এইতো সবচেয়ে বড় অবদান
নিজেদের সৌন্দর্য্য সম্পর্কে
সচেতন আধুনিকারা তাই
এর প্রশংসায় মুখর।

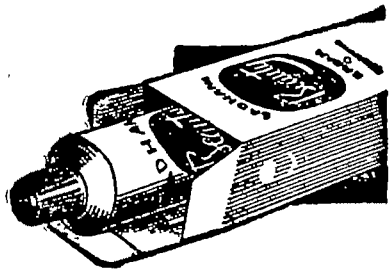

সাধনা
বিউটি
ক্রীম

অপরিহার্য
অতি আধুনিক অলঙ্কার

সাধনা ঔষধালয়-ঢাকা কলিকাতা-৯

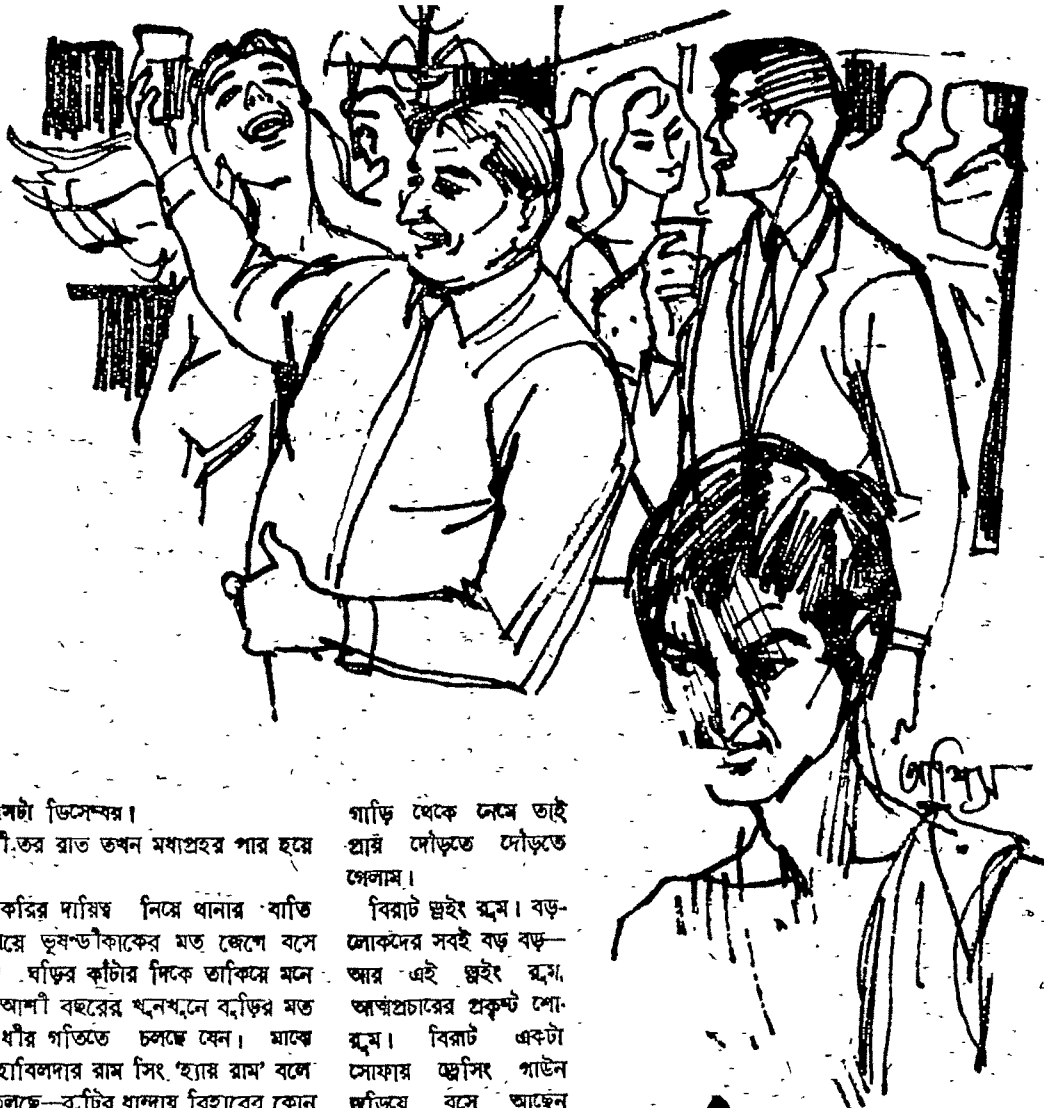

নিশীথ-সূর্য

শ্রীপ্রিয়দর্শিনী শর্মা

মাসটা ডিসেম্বর।

শীতের রাত তখন মধ্যপ্রহর পার হয়ে গেছে।

চাকরির দায়িত্ব নিয়ে থানার বাতি জ্বালিয়ে ভূষণ্ডীকাকের মত জেগে বসে আছি। ঘড়ির কাঁটার দিকে তাকিয়ে মনে হচ্ছে আশী বছরের খুনখুনে বুড়ির মত ক্লান্ত ধীর গতিতে চলছে যেন। মাঝে মাঝে হাবিলদার রাম সিং 'হ্যায় রাম' বলে হাই তুলছে—রুটির ধান্দায় বিহারের কোন এক অজ পাড়াগাঁয়ে বউবাচ্চা রেখে চলে এসেছে শহর কলকাতায়।

এমনি সময় হঠাৎ টেলিফোনটা ঝন্‌ঝন্‌ করে বেজে উঠল।

থানার ফোন মানেই একটা দুঃসংবাদ —স্বাভাবিক জীবনের বাইরে কারো পদক্ষেপ।

ফোনে খবরটা পেয়েই সজাগ হয়ে উঠল থানাটা।

র‍্যাক থেকে টুপিটা নামিয়ে কোমরের বেল্টটা এঁটে ঊর্ধ্বশ্বাসে গাড়িটা ছুটিয়ে চললাম ফোনের মালিকের উদ্দেশ্যে।

ফোনের মালিক অভিজাত পাড়ার বাসিন্দা। বড়লোক। জনসাধারণ অবশ্য বলে ব্ল্যাক মার্কেটের লীডার, ব্ল্যাকমানির কুবের। অশিনসাক্ষী রেখে কথাটাকে অসত্য আমরাও হয়ত বলতে পারিনে, তবু আমাদের তো সব কথা বলতে নেই।

পুলিশের গাড়ি দেখে দারোয়ান তাড়াতাড়ি গেট খুলে দিল, যাইয়ে সাব, মালিক আপকো ইন্তেজার মে বৈঠা হ্যায়।

কলকাতার ধনী নাগরিক আমার জন্য গভীর রাতে অপেক্ষা করে বসে আছেন। গাড়ি থেকে নেমে তাই প্রায় দৌড়তে দৌড়তে গেলাম।

বিরাট ড্রইং রুম। বড়লোকদের সবই বড় বড়—আর এই ড্রইং রুম, আত্মপ্রচারের প্রকৃষ্ট শো-রুম। বিরাট একটা সোফায় ড্রেসিং গাউন জড়িয়ে বসে আছেন বাড়ির মালিক। কুর্নিশ করতেই বললেন, বসুন।

নিঃশব্দে হুকুম তালিম করলাম। বাড়ির মালিকের পায়ের কাছে বসে থাকা বিরাট বিগডেন কুকুরটা আমায় দেখে যে খুশি হয় নি সেটা সে অকপটেই জানিয়ে দিচ্ছিল তার ভাষায়। বাড়ির মালিক ধমকে দিলেন, কুইন, কীপ কোয়াইট।

মনিবের ভাষা কুকুর বোঝে।

বাড়ির মালিক অনেকটা তাচ্ছিল্য জড়ানো অনুযোগের সুরেই বললেন, দেখুন দেখি কি কাণ্ড। আপনারা থাকতেও আমরা শান্তিতে ঘুমোতে পারি না।

অপরাধ স্বীকার করা ছাড়া গত্যন্তর নেই, তাই চুপ করেই বসে রইলাম।

ঘরের একটা কোণার দিকে দেখিয়ে বললেন, ঐ জানোয়ারটার দিকে তাকিয়ে দেখুন।

মালিকের নির্দেশিত কোণে তাকিয়ে যাকে দেখলাম, তাকে অনেক কষ্টে মানুষ বলে চিনতে পারা যায়। শতচ্ছিন্ন কাপড়—হাড়পাঁজরা বার করা—এক মাথা রুক্ষ চুল—উদোম গায়ে বসে আছে লোকটা।

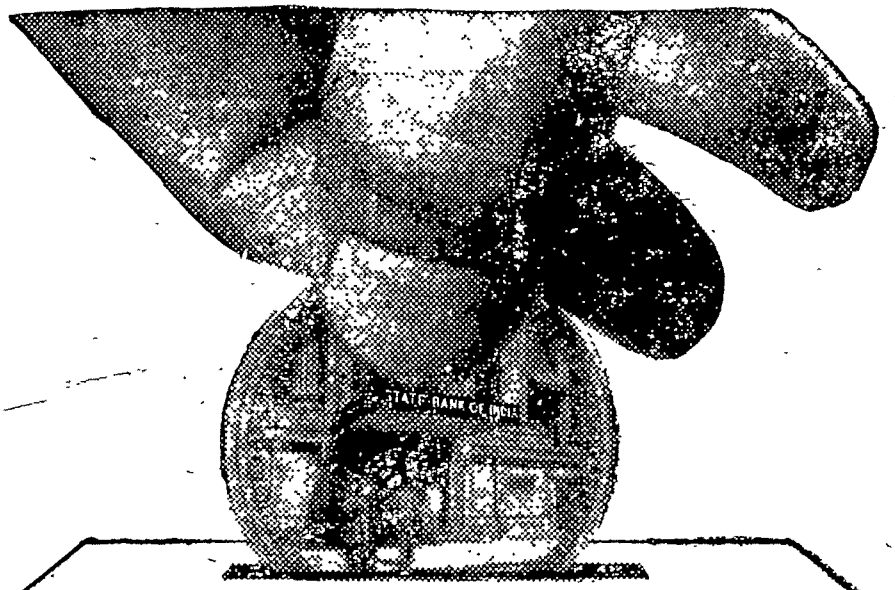

কোথায় আপনি টাকা জমা রাখেন তাতে আসে যায় বৈকি

সব ব্যাঙ্কই একরকমের নয়

একমাত্র ষ্টেট ব্যাঙ্ক

- আপনার সঞ্চয়ের জন্য সবচেয়ে বেশী নিরাপত্তা দেয়।
- তার শাখাপ্রশাখা মিলিয়ে ২৩০০-রও বেশী অফিস রেখে, ভারতের যেখানেই থাকুন আপনাকে সাহায্য করতে পারে।
- ১৮ লক্ষ আমানতকারীর সেবা করে। লক্ষ লক্ষ লোক ষ্টেট ব্যাঙ্কে আস্থা রেখেছেন। তাঁদের কেউই কখনও নিরাশ হন নি হতে পারেনও না।

মনে রাখবেন ষ্টেট ব্যাঙ্কে অর্থসঞ্চয় করা অনেক বেশী বিচক্ষণতার কাজ।

সঞ্চয়ের সেবায় ষ্টেট ব্যাঙ্ক

S.385 BN

তার হাত দুটো পিছমোড়া করে বাঁধা, আর দু-একটা আঘাতের চিহ্ন তখনও স্পষ্ট। সবচেয়ে বেশি জ্বলজ্বল করছিল কব্জির কাছে একটা ঘা—মনে হয় কেউ যেন সেখান থেকে খাবলে কিছুটা মাংস তুলে নিয়েছে। তখনও কষ গড়িয়ে গড়িয়ে রক্ত পড়ছিল।

বাড়ির মালিক বলতে লাগলেন, জানেন গ্র্যান্ড হোটেলে সেই ইজিপ্সিয়ান বিউটি বলে যে নতুন নাচিয়ে মেয়েটা এসেছে তাকে অনেক কষ্ট করে বহু টাকা ব্যয় করে আজ সন্ধ্যায় আমার বাড়িতে নাচিয়েছিলাম। সেই উপলক্ষে কয়েকজন বন্ধু-বান্ধবকেও একটা পার্টি দিয়েছিলাম। পার্টিটা ভাঙতে ভাঙতেই বেশ রাত হয়েছিল।

কথা বলতে বলতে ভদ্রলোক একটা ঢেকুর তুললেন। এতক্ষণ ধরে যে গন্ধটা চাপাচাপাভাবে পাচ্ছিলাম, এখন সে গন্ধটায় ঘর আচ্ছন্ন হয়ে গেল। বহু দিন ধরে পুলিশে চাকরি করছি—বিলাতী মদের গন্ধ চিনতে এতটুকু দেরি হয় না।

ভদ্রলোক আবার বলতে লাগলেন, পার্টি শেষ করে ঘুমুতে গেছি, এমন সময় এই হুজ্জুত। ব্যাটা ঢুকেছিল চুরি করতে।

ঃ কিন্তু লোকটাকে দেখে তো পাগল মনে হয়, আমতা আমতা করে বলি।

ঃ পাগল? দ্যাট্‌স্ এ মেক আপ্। এই বদমায়েসরা এরকম সেজেই মানুষের মন গলাতে চেষ্টা করে। ব্যাটা পাকা চোর।

লোকটা ডুকরে কেঁদে ওঠে, না বাবু আমি চোর নই, বিশ্বাস করুন আমি চোর নই।

ঃ চোপ্‌রাও বদমাস, বিপুল গর্জনে ধমকে উঠলেন বাড়ির মালিক।

সঙ্গে সঙ্গে কুইনও ঘেঁাৎ ঘেঁাৎ করে উঠল।

লোকটা একবার চমকে উঠে চুপ করে গেল।

ঃ কি কি জিনিস আপনার চুরি করেছে, অফিসিয়াল ঢঙে প্রশ্ন করি।

ঃ চুরি অবশ্য কিছুই করতে পারে নি, গর্বের হাসি হাসতে হাসতে বললেন বাড়ির মালিক, আমার দারোয়ানগুলো খুব এলার্ট, আর তা ছাড়া রয়েছে আমার এই কুইন।

কুকুরটা একবার লেজ নাড়ল।

ঃ তা ওর হাতে ঐ ঘাটা হলো কি করে? আবার একটা অফিসিয়াল প্রশ্ন করি।

দূরে থেকে লোকটা কেঁদে উঠল, এ বাড়ির—

ঃ চোপ্‌রাও হারামজাদা, বাজ পড়ার মত গর্জে উঠলেন বাড়ির মালিক, আমার বাড়ির পাঁচিল ডিঙিয়ে পালাবার চেষ্টা করতে গিয়ে পড়ে গিয়েছিল।

ততক্ষণে ঐ কোণে বসে-থাকা লোকটার প্রতি আমার যেন কেমন একটা মায়া জন্মে গিয়েছিল। তাই তাড়াতাড়ি বললাম, আচ্ছা আজ রাতে আপনাকে আর বিরক্ত করব না, লোকটাকে নিয়ে লকআপে তো রেখে দিই।

ঃ হ্যাঁ হ্যাঁ তাই ভাল, আচ্ছা করে আপনাদের দাওয়াই দিয়ে দিন।

উঠতে উঠতে বললাম, আপনার শান্তি-ভঙ্গের জন্য অত্যন্ত দুঃখিত।

ঐ লোকটার দিকে হাতের ব্যাটন তুলে ধরে বললাম, বাপধন, এবার চুপচাপ আমার গাড়িতে বস গিয়ে, তোমাকে একটু শ্বশুরবাড়ি থেকে ঘুরিয়ে আনি। ব্যাটা চোর কাঁহিকা।

লোকটা আবার কেঁদে উঠল, বিশ্বাস করুন বাবু, আমি চোর নই।

ঃ থাম থাম আর ন্যাকামো করতে হবে না। পুলিশী ধমক দিতে দিতে ওর হাতের বাঁধনটা খুলতে থাকি।

বাড়ির মালিক হাঁ হাঁ করে আসেন, কি করছেন; কি করছেন, ওরা অত্যন্ত ডেঞ্জারাস লোক মশায়!

মুচকি হেসে বলি, আমিও তো পুলিশ।

ব্যাটন উঁচিয়ে লোকটাকে গাড়িতে তুলি। বাড়ির মালিকের শান্তিভঙ্গের জন্য আর একদফা মার্জনা চেয়ে নিয়ে নিজেও গাড়িতে গিয়ে উঠি।

বাড়িটা অদৃশ্য হতেই গাড়ি থামিয়ে আমি পেছনে চলে যাই। লোকটা তখনো জবুথবু হয়ে বসে।

ঃ কি বাপধন কতদিন ধরে এ পেশা নিয়েছ? পুলিশী ঢঙেই প্রশ্ন করি।

কিন্তু এমনি একটা ঘটনার জন্য আমি প্রস্তুত ছিলাম না। লোকটা আমার কথা শুনেই আমার পায়ের ওপর হুমড়ি খেয়ে পড়ে, বিশ্বাস করুন বাবু আমি চোর নই।

ধরা পড়লে অনেকেই এই কথা বলে। তাই চট করে এসব কথাকে আমল দেওয়া আমাদের অভ্যেস নয়। কিন্তু লোকটাকে আমার সত্যি বিশ্বাস হচ্ছিল। তবু বলি, তবে কি ঐ বাড়িতে গেছিলে সাধনা করতে?

ঃ না বাবু একটু খেতে, অঝোরে কাঁদতে কাঁদতে বলে লোকটা, আজ সাতদিন ধরে পেটে কিছু পড়ে নি বাবু।

ঃ তাই বুঝি ঐ বাড়িতে এত রাতে ঢুকেছিলে?

ঃ না বাবু, ও-বাড়িতে তো আমি ঢুকি নি।

ঃ ফের মিথ্যে কথা?

ঃ সত্যি বলছি বাবু, আপনি দয়া করে আমার সব কথা শুনুন।

ঃ বল্—

লোকটা যা বলল তার সারাংশ হচ্ছে সে মেদিনীপুর জেলার এক ভাগ-চাষী। গেল বন্যায় ওর সব ভেসে গেছে—ঘরবাড়ি সব। কোনরকমে একটা উঁচু ঢিবিতে একটা গাছতলায় আশ্রয় নিয়েছিল ওরা—ও আর ওর পাঁচ বছরের একটা মেয়ে। আর সব কে কোথায় ভেসে গেছে সে খবর ও জানে না! কিন্তু বন্যার জল নামতেই ওর মেয়ের মা ওলাইচণ্ডীর দয়া হলো। সাহায্যের জন্য ওষুধের জন্য অনেকের কাছেই ও ঘোরাঘুরি করেছে, কিন্তু তবু শেষ পর্যন্ত একফোঁটা ওষুধ মেয়ের মুখে দিতে পারে নি। ওর বুকে মুখ রেখেই মেয়েটা মারা যায়। সেদিন থেকে ও আর দেশে টিকতে পারছিল না। স্মৃতির সুর্বহ ভার এড়িয়ে আত্মরক্ষার জন্য শহর কলকাতায় চলে এসেছে। কিন্তু এ শহর বড় নিষ্ঠুর। এখানে ওর কোন আশ্রয় নেই, কোন পরিচয় পর্যন্ত নেই। ওকে তখন কেই বা চাকরি দেয়! সত্যি বলতে ওর বেঁচে থাকতেও ইচ্ছে ছিল না। কিন্তু পেটের জ্বালা বড় জ্বালা! আজ সাতদিন ধরে ওর পেটে কিছু পড়ে নি। পথ ধরে হাঁটতে হাঁটতে আজ দুপুরেই এই রাস্তাটায় এসে পড়েছে। দুপুর থেকেই দেখেছে এ বাড়িতে লোকের আনা-গোনা। সন্ধ্যা থেকে টের পেয়েছে খানা-

১৯৬৯ তে আপনার ভাগ্য

যে-কোন একটি ফুলের নাম লিখিয়া আপনার ঠিকানাসহ একটি পোস্টকার্ড আমাদের কাছে পাঠান। আগামী বাংলামাসে আপনার ভাগ্যের বিস্তারিত বিবরণ আমরা আপনাকে পাঠাইব, ইহাতে পাইবেন ব্যবসায়ে লাভ লোকসান, চাকুরিতে উন্নতি, বদলী, জন্ম, বিবাহ ও সুখ-সমৃদ্ধির বিবরণ: আর থাকিবে দুষ্ট-গ্রহের প্রকোপ হইতে আত্মরক্ষার নির্দেশ। একবার পরীক্ষা করিলেই বুঝিতে পারিবেন।

PT. DEV DUTT SHASTRI
RAJ JYOTISHI (B. M. W)
P. B. 86. JULLUNDUR CITY

পিলার ঘটা। মাঝে মাঝেই বাড়ির চাকর-বাকররা অনেক উচ্ছিষ্ট সামনের ডাস্টবিনে ফেলেছে। উচ্ছিষ্ট বললে ভুল হবে, আমন্ত্রিত ব্যক্তির সম্মানে পরিবেশিত খাদ্যের উদ্বৃত্ত অংশ। এত উদ্বৃত্ত যে তা দিয়ে বেশ কিছু লোকের পেট ভরে যেতে পারে। ডাস্টবিন থেকেই কুড়িয়ে খেতে গিয়েছিল ও। কিন্তু পারে নি। চার-পাঁচটা নেড়িকুকুর ওকে তেড়ে এসে-ছিল। অতি কষ্টে তাদের হাত থেকে বেঁচে গেছে! বাড়ির দারোয়ানটা কিন্তু তখন থেকেই ওকে 'হেই পাগলা' 'হেই পাগলা' বলে জ্বালিয়েছে।

রাত্রিতে ঐ বাড়ির পিছনের গ্যারেজটার সামনে কুইনকে খেতে দিয়ে-ছিল এক প্লেট মাংস। কুকুরটা কিন্তু সবে খেতে পারে নি—অনেকটা মাংসই পড়েছিল। তখন থেকেই আশা নিয়ে বসেছিল লোকটা। বাড়ির লোকজনের আনাগোনা কমতেই হাত বাড়িয়ে কুকুরের প্লেটটা থেকে মাংস তুলে খেতে চেষ্টা করেছিল। কিন্তু হাতে নাগাল পায় নি বলে পেছনের গেটটা টপকে গেছিল।

ডুকরে ডুকরে কাঁদছিল লোকটা, বিশ্বাস করুন বাবু খিদের জ্বালাতেই এ কাজ আমি করেছি। কিন্তু তখন কি আমি জানতাম যে ওদের ঐ কুইন সারা রাত ঘুরে বেড়ায়। অন্ধকারে গা ঢাকা দিয়ে দরজা টপকে ঢুকে যেই মাংসের থালায় হাত দিয়েছি, অমনি কোত্থেকে যমদূতের মত ঐ কুকুরটা ঝাঁপিয়ে পড়ে আমার কব্জিটা কামড়ে ধরে। যন্ত্রণায় আমি চিৎকার করে উঠি বাবু। আমার চিৎকারে দারোয়ানগুলো ছুটে এসে আমাকে দমাদম পেটাতে থাকে আর চোর চোর বলে চেঁচায়। কুকুরটা কিন্তু তখনো আমাকে কামড়ে রয়েছে। গোল-মাল শুনে বাবু একটা বেত হাতে এগিয়ে এলেন। বাবুকে দেখে কুকুরটা আমার কব্জি ছেড়ে দেয়, কিন্তু বাবুর বেত ততক্ষণে পড়তে থাকে আমার সারা গায়ে। যন্ত্রণায় বাবুর পা জড়িয়ে ধরে বলি, বাবু আমায় বাঁচান, আমি চোর নই। বাবু তখন আমার কপালে একটা লাথি মেরে ছিটকে ফেলে দেন।

তাকিয়ে দেখি লোকটার ডান ভুরু-টার কাছটা ফুলে আছে।

লোকটা তখনো আমার পায়ের কাছে বসে ডুকরে ডুকরে কাঁদছে, বাবু বিশ্বাস করুন, আমি চোর নই গো, আমি চোর নই।

লোকটার দেহটা থরথর করে কাঁপছে।

সেই কেঁপে কেঁপে ওঠা নরদেহটার দিকে তাকিয়ে আমার মনের মধ্যে একটা বেয়াড়া চিন্তা কেবলই ঘুরপাক খাচ্ছিল, এ লোকটাও ভারতীয় নাগরিক। গণ-তান্ত্রিক ভারতীয় সংবিধান অনুযায়ী প্রতি পাঁচ বছর পর ভারতীয় সরকার গঠন করার জন্য এ লোকটাও একটা ভোট দিতে পারে। পুলিশ কর্মচারীর এ সব ভাববার অধিকার আছে কি না জানি না!

হৃদয়ের সংগে বিবেকের সংগ্রামের হাত থেকে বাঁচার জন্য বললাম, কিছু খাবি?

লোকটা আবার কেঁদে উঠল, আজ সাত দিন ধরে কিছু খাই নি বাবু!

ড্রাইভারকে বললাম, গাড়ি ঘোরাও, কেওড়াতলা চল।

অত রাত্রে শহর কলকাতায় তিনটে জায়গাই খোলা থাকে—পুলিশ থানা, শ্মশানঘাট আর হাসপাতালের এমার-জেন্সী ওয়ার্ড। এ ছাড়াও আরো কোথাও কোথাও হয়তো প্রাণের জোয়ার পাওয়া যায়, কিন্তু সে সব অঞ্চল তো আইনত নিষিদ্ধ।

কেওড়াতলায় শ্মশানযাত্রীদের খাবার জন্য একটা চায়ের দোকান খোলা ছিল। আমার কয়েদীকে সে দোকানে বসিয়ে দোকানদারকে ডাকলাম। দোকানদার আমায় চিনত, এসেই এক লম্বা সেলাম ঠুকল। পুলিশের লোকদের অনেকেই এই খাতিরটুকু করে।

দোকানীকে বললাম, এই লোকটাকে ভরপেট ভাত খাওয়াও।

দারোগার হুকুম অমান্য করার সাহস দোকানীর ছিল না। তাড়াতাড়ি দুটো ভাত ফুটিয়ে একটা ডিম সেদ্ধ করে একটু ঘি ঢেলে দিল।

আমার কয়েদী যেন নিজের চোখকে বিশ্বাস করতে পারল না। সাহস দিয়ে বলি, হাঁ করে দেখছ কি? ভাত, পেট ভরে খাও।

মানুষ যে অমন করে খেতে পারে বা খেয়ে অত তৃপ্তি পেতে পারে এ অভি-জ্ঞতা আমার আগে ছিল না। লোকটার খাবার ঢং দেখতে দেখতে মনে হচ্ছিল পুলিশী জীবনে এই বোধহয় প্রথম একটা পুণ্যকর্ম করলাম!

লোকটা পেট পুরে খেয়ে আমার পায়ে টিপ্ টিপ করে প্রণাম করতে লাগল।

ঃ আঃ! পাগলামো করো না, শান্ত হও।

ঃ না বাবু আমি পাগল নই। পাগল আর হতে পারছি কই?

কয়েদীকে আবার গাড়িতে তুলে ড্রাইভারকে বললাম, চলো ল্যান্সডাউন রোড।

ল্যান্সডাউন রোডে আমার এক বন্ধু ডাক্তারের হাসপাতাল ছিল। অত রাত্রে আমাকে দেখে ডাক্তারও একটু হকচকিয়ে গেল। ভরসা দিয়ে বললাম, ভয় নেই—একটা স্ট্রীট ডগবাইট কেস নিয়ে এসেছি।

তারপর একটু আড়ালে ডেকে নিয়ে গিয়ে সব খুলে বললাম, লোকটাকে হাসপাতালে এডমিট করে নাও, তবু তো দিন কয়েক খেতে পাবে।

সাধারণত ডগবাইট কেসে হাস-পাতালে এডমিট করা হয় না, তবু আমার বন্ধু আমার অনুরোধ অগ্রাহ্য করে নি।

আমার কয়েদীকে ডাক্তারের হাতে ছেড়ে দিয়ে আসার সময় বললাম, হাসপাতাল থেকে সুস্থ হয়ে আমার সংগে দেখা করো। ডাক্তারবাবু আমার ঠিকানা জানেন।

লোকটা কথা বলতে পারল না, শুধু কাঁদতে লাগল।

থানায় যখন ফিরে আসি তখন পূর্ব দিগন্তে নতুন সূর্যের আভাস দেখা দিয়েছে—সমস্ত আকাশটা লাল হয়ে আছে।

থানার ভেতরে ভীষণ হট্টগোল। কি ব্যাপার? ডাস্টবিন থেকে খাবার খুঁটে খেতে গিয়ে কয়েকটা ভিখিরী জোর মারপিট করেছে। ঘটনাটা বলতে বলতে সেকেন্ড অফিসার বললেন, বুঝলেন বড়বাবু লোকগুলো একদম পাগল!

হঠাৎ স্মৃতির পটে কলেজ জীবনের একটা নাট্যানুষ্ঠানের দৃশ্য ঝলসে উঠল ঃ চতুর্দশ লুইয়ের প্রাসাদকক্ষ। সম্রাট তাঁর পারিষদদের নিয়ে বসে আছেন। বাইরে ভীষণ গোলমাল শোনা গেল—যেন একদল ক্ষুব্ধ জনতা কিছু বলছে। উৎকণ্ঠিত সম্রাট তাঁর মিনিস্টার অব ইণ্টিরিয়ার এ্যাফেয়ার্সকে জিজ্ঞাসা করলেন, কি ব্যাপার?

মিনিস্টার আশ্বাস দিয়ে বললেন, ও কিছু নয় সম্রাট—একদল পাগল।

গোলমাল কিন্তু ক্রমেই বেড়ে যাচ্ছিল।

চতুর্দশ লুইয়ের চরিত্রে সেদিন আমিই অভিনয় করছিলাম!

সর্দ্দি ও কাশিতে
রক্ষিতের
তাল মিছরি
ফোন ৫৫-৩০৮৫

রঙ্গমঞ্চ ও দেশে দেশে

[পূর্ব-প্রকাশিতের পর]

পিটার গডফ্রে এবং গেইট থিয়েটার ঃ

নর্ম্যান মার্শাল এর পর লিখেছেন—সাধারণত ব্যবহৃত থিয়েটার ডিজাইনের নিয়ম-কানুনকে সম্পূর্ণভাবে অগ্রাহ্য করে গডফ্রে যথেষ্ট মৌলিকতা এবং সাহসের পরিচয় দিয়েছিলেন। তাঁর রঙ্গগৃহের ছাদটি থিয়েটারের পক্ষে ছিল অপেক্ষাকৃত নিচু। সুতরাং তিনি স্টেজের উচ্চতা করলেন মাত্র আঠারো ইঞ্চি—এর আসল উদ্দেশ্য হল সেটিংসের উচ্চতা যাতে দরকার মত বাড়িয়ে দেওয়া যায়। দর্শকদের বসবার জায়গা স্টেজের এত কাছে আনা হয়েছিল যে সামনের সারির লোকেরা স্টেজের কিনারা অবধি পা ছড়িয়ে বসতে পারতো। মাত্র একহাত দূরে দর্শকদের সারি থেকে প্রথম প্রথম অভিনেতাদের ভাবাবেগপূর্ণ দীর্ঘ দৃশ্যের অভিনয় করতে বেশ বেগ পেতে হোত। তবে আসলে এই স্টেজে অভিনয় করবার ব্যাপারে সুবিধা-অসুবিধার ভেতর সুবিধার দিকটাই ছিল বেশি। রেডিও এবং সিনেমার অভিনয়ে যেসব সুযোগ ও সাহায্য পাওয়া যায় গেইটের অভিনেতারা সেগুলো এখানে পেয়ে যেতেন। কণ্ঠস্বরের সমস্ত সূক্ষ্ম কাজ যা শুধু ব্রডকাস্টিং-এর মাধ্যমেই শ্রোতার কাছে পৌঁছিয়ে দেওয়া যায়, এখানকার অভিনেতারা তা করতে পারতেন এই ছোট মঞ্চগৃহে। অভিনেতার মুখভাবের যথাযথ অভিব্যক্তির সূক্ষ্ম রূপায়ণ বড় থিয়েটারের পেছনের সারির লোকেরা দেখতেই পায় না—এখানে সব সারির দর্শকেরাই স্পষ্ট-ভাবে তা প্রতিফলিত হতে দেখতো নট-নটীদের এক্সপ্রেশনে। গেইটের অভিনেতারা দ্রুততালে এবং ঘনিষ্ঠভাবে অভিনয় করে যেত—প্রচলিত আকারের থিয়েটারে এই ভঙ্গিতে অভিনয় করা সম্ভব হোত না। গ্যালারির পেছনের সারি বা আপার সার্কেলের দর্শকদের কাছে সংলাপ স্পষ্ট করবার জন্য অভিনেতার অতি-অভিনয় করা বা বেশি চেঁচিয়ে কথা বলার দরকার হোত না। সাধারণত স্টেজ এবং দর্শক-দের মাঝে থাকে অর্কেস্ট্রা পিট—এটাকে থিয়েটারের নো-ম্যানস-ল্যান্ড বলা চলে। গেইটে এই নো-ম্যানস-ল্যান্ড না থাকাতে দর্শকদের সঙ্গে নট-নটীদের সংযোগটা ছিল প্রত্যক্ষ এবং তাৎক্ষণিক। আবার এই অতিরিক্ত ঘনিষ্ঠ সংযোগের হেতু সামান্য রকম অনান্তরিক অভিনয় হলে তা দর্শক-দের চোখকে ফাঁকি দিতে পারতো না। অভিনয়ে কোন রকমের চাতুরী বা নাটুকে-পনা থাকলে তা গেইটের স্টেজে বিশ্রীভাবে প্রকট হয়ে উঠতো। অতি-অভিনয় যেমন এখানে সহজেই পরিস্ফুট হয়ে পড়তো। কিন্তু একথাও ঠিক যে অন্যান্য থিয়েটারের মত গেইট থিয়েটারেও অভিনেতা প্রাণ ঢেলে অভিনয় করতে পারতেন—প্রাণ-ঢালা অভিনয় বলতে আন্তরিক অভিনয়ের কথাই বোঝাতে চাইছি, অর্থাৎ যে অভিনয়ে অস্বাভাবিক আত্মপীড়নের স্থান থাকে না। গেইটে প্রাণ-ঢালা বা আন্তরিক অভিনয় করে তখন যেসব অভিনেত্রী প্রতিষ্ঠা লাভ করেছিলেন, তাঁরা অনেকেই ভবিষ্যতে বৃটিশ স্টেজের সেরা অভিনেত্রী হিসাবে যশ এবং খ্যাতি অর্জন করতে পেরে-ছিলেন—উদাহরণ হিসাবে ফ্লোরা রোবসন, বিয়াত্রিস্ লেম্যান, জেন ফ্রাঙ্কন ডেভিস এবং মার্গারেট রলিংসের নাম করা যেতে পারে। এঁরা প্রত্যেকেই মহৎ শ্রেণীর ইমো-শনাল এ্যাকট্রেস—গেইট থিয়েটারে থাকা-কালীন এঁরা প্রত্যেকেই সেরা অভিনয়ের পরাকাষ্ঠা দেখিয়ে এসেছেন।

গেইট থিয়েটার যেভাবে তৈরি হয়েছিল তার দরুণ আর একটি বিশেষত্বের সৃষ্টি হয়েছিল। আপাতদৃষ্টিতে ঐ বৈশিষ্ট্যকে অনেকের অত্যন্ত অসুবিধাজনক বলেই

গেইট রেভ্যুজের স্টার অভিনেত্রী হারমিয়োন জিনগোল্ড

হলে হোত। আসলে কিন্তু এটি অভিনেতাদের সহায়ক হিসাবেই দাঁড়িয়ে গিয়েছিল। ব্যাপারটা পরিষ্কার করে বলছি—স্থানাভাবে গেইটের স্টেজের দু'পাশে ড্রেসিংরুম করা হয়েছিল। উইংস-এর থেকে এগুলো ছিল মাত্র কয়েক ফিট দূরে—সুতরাং ড্রেসিংরুমে বসেই অভিনয় এবং প্রেক্ষাগারের প্রতিক্রিয়া বেশ ভালভাবেই শুনতে পাওয়া যেত। সাধারণ থিয়েটারে ড্রেসিংরুম এবং মঞ্চের মাঝে থাকে যথেষ্ট দূরত্বের ব্যবধান। সুতরাং যে অভিনেতা নাটক চলবার সময় ড্রেসিংরুমে থাকে সে অভিনয়ের থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন হয়েই পড়ে। স্টেজে ঢোকবার কয়েক মুহূর্ত আগে সে যখন উইংসের কাছে এসে দাঁড়ায়

আসুন... ইউবিআইতেই সঞ্চয় করুন

- ইউবিআইতে আপনার সঞ্চয়ের বার্ষিক সুদ পাবেন সেভিংস অ্যাকাউণ্টে শতকরা ৩½ টাকা, মেয়াদী আমানতে সর্বোচ্চ শতকরা ৬½ টাকা।
- ইউবিআইতে আপনার সঞ্চয়ের ফলে ঠিক প্রয়োজনের সময়টিতে আপনার টাকা খরচ করতে পারবেন।
- ইউবিআইতে আপনার ও আরও অনেকের সঞ্চয় একত্র করেই ব্যবসা-বাণিজ্যে, শিল্পে, কৃষিতে, রপ্তানীর জন্যে, আর বিভিন্ন উন্নয়নমূলক পরিকল্পনার জন্যে সরকারকে আমরা আরও বেশী ঋণ দিয়ে দেশের আর্থিক উন্নতিতে সাহায্য করব।

ইউবিআই

ইউনাইটেড্ ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়া লিঃ

রেজিস্টার্ড ও হেড অফিস : ৪, ক্লাইভ ঘাট স্ট্রীট, কলিকাতা-১

UBF 9a /48

পশ্চিমবঙ্গে ১১০টিরও অধিক শাখা আছে

তখনই সে নাটকের সঙ্গে নিজেকে সংযুক্ত করবার জন্য প্রস্তুত হয়—স্টেজ থেকে বেরিয়ে এলেই আবার নাটকের থেকে বিযুক্ত হয়—আবার মঞ্চে আসবার সময় অভিনয়ের সঙ্গে নিজেকে সংযুক্ত করবার জন্য সচেষ্ট হতে হয়। এইভাবে বারবার চলতি নাটকের সঙ্গে তাকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়তে হয় এবং নিজের অভিনয়ের সময় সংযুক্ত হবার প্রচেষ্টা করতে হয়—each new entrance means a renewed effort to attune himself to the key of the performance. গেইটের নট-নটীরা ওপরে বর্ণিত বৈশিষ্ট্যের জন্য সব সময়েই মঞ্চের প্রদর্শনীর সঙ্গে সংযোগ রাখতে পারতেন—এর জন্য তাঁদের সচেতন বা সক্রিয় হয়ে থাকতে হোত না, তাঁদের অবচেতন মানসেই এই সংযোগের ভাবটা থাকতো—ড্রেসিং-রুমে থাকাকালীনও মঞ্চে প্রদর্শিত নাটকের সঙ্গে তাঁদের আন্তরিক বিচ্ছিন্নতা ঘটতো না।

নতুন থিয়েটার খোলবার পরই সাফল্য অর্জন করা বেশ দুরূহ ব্যাপার। গেইট থিয়েটার এই প্রচলিত নিয়মের ব্যতিরেক হিসাবেই নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতে পেরেছিল। সব থেকে বেশি সাফল্যলাভ করেছিল 'মায়া' নাটকটি—এর নায়িকার ভূমিকায় নেমেছিলেন জেন ক্র্যাংকন ডেভিস। এর প্রদর্শনী হয়েছিল তিপ্পান্নটি—পরের নাটক ইউজিন ও' নীলের 'দি হেয়ারি এইপ'—এটিও এখানকার সফল নাটক—তেত্রিশটি প্রদর্শনী হয়েছিল। এই সিজনে আর যেসব নাটক সাফল্য অর্জন করেছিল, সেগুলো হচ্ছে: 'ফ্রম মর্ন টু মিডনাইট', ককতোর 'অর্ফি' এবং রবার্ট নিকল্‌স ও জিম্‌ টলির 'টোয়েন্টি বিলো'। সর্বসমেত এই সিজনে দুশো চল্লিশটি প্রদর্শনী হয়েছিল—আর চেঞ্জ অভ্‌ প্রোগ্রাম হয় নব্বার।

চতুর্থ সিজনটি অপেক্ষাকৃত কম সাফল্য লাভ করে। সব থেকে বেশি প্রদর্শনী হয়েছিল উইলহেলম্‌ ফন সোল্‌জের 'দি রেইস উইথ দি স্যাডো'-র রিভাইভ্যালের'—সাতাশটি শো হয়। টোলারের 'হপ্‌লার' দীর্ঘদিন অভিনয় হতে পারতো—দৈব-দুর্বিপাকের জন্য সেটা সম্ভব হয় নি। ঊনিশবার নাটকটির মঞ্চরূপায়ণ হবার পর ভূমিকাভিনেতারা সবাই মাম্পস রোগে অসুস্থ হয়ে পড়লো। আগে থেকেই গডফ্রে অনুমান করেছিলেন যে এ নাটক অনেকদিন চলবে। তাই অন্য কোন নাটকের মহড়াও এ সময় হচ্ছিল না। থিয়েটার বন্ধ করতে হোত, যদি না কেন্দ্রিজ ফেস্টিভ্যাল কম্পানী এসে পরিত্রাতার ভূমিকা গ্রহণ করতেন। তাঁদের সিজন এই সময় শেষ হয়ে গিয়েছিল—তাঁরা গেইটে এসে মঞ্চস্থ করল 'দি ম্যান হু এইট দি পোপো-ম্যাক' চোদ্দ রাত্রির জন্য।

এই সিজনের দর্শনীয় বৈশিষ্ট্য হয়েছিল ক্রিশম্যাসে পিটার গডফ্রেকৃত মিউজিক্যাল বার্‌লেস্কের শ্রেণীবিন্দ্ধ ধারাটি। এগুলোর প্রডাকসন হোত চমৎকার। প্রথমটির নাম ছিল 'ফ্যাশন' বা 'হাই লাইফ ইন নিউ ইয়র্ক'—লেখিকা মিসেস মোয়াট। এটি পরে কিংসওয়েতে নিয়ে যাওয়া হয়। ক্রিশমাসে আর যেসব শো হয়েছিল তার ভেতর ছিল—'টেন নাইটস্‌ ইন এ বার রুম': বা 'রুইন্ড বাই ড্রিংক', 'দি রেড রোভার্স রিভেঞ্জ', 'আঙ্কল টম্‌স ক্যাবিন', 'লিট্‌ল লর্ড ফন্টল রয়'—নাম-ভূমিকায় ছিলেন এ্‌সা ল্যাঞ্চেস্টার, পিটার্স প্যারেড নামে দুটি রেভ্যুউ। এতেই হারমিওন জিন-গোল্ড প্রথম অভিনয় করতে নামেন—পরে তিনি অনেক গেইট রেভ্যুউতে তারকা অভিনেত্রী হিসাবে খ্যাতি পেয়েছিলেন।

পঞ্চম সিজনে সবচেয়ে সাফল্য অর্জন করেছিল এ্যালফ্রেড স্যাভয়ার 'দি লায়ন টেমার: বা ইংলিশ এজ সি ইজ ইট্‌স'। প্রধান ভূমিকায় ছিলেন আরনেস্ট মেসিগার এবং জ্যাঁ দ্য ক্যাসালিস—প্রদর্শনী হয় একচল্লিশটি। প্রোগ্রামে যে দুটি নাটক সব থেকে বেশি খ্যাতি পেয়েছিল সেগুলো হচ্ছে—লেনোরম্যানডের 'দি ইটার অভ্‌ ড্রিম্‌স' এবং জ্যাঁ জাক্‌স বার্নার্ডের "মার্টিন"। এ নাটকটি পরে এ্যামবাসাডরস-এ স্থানান্তরিত হয়েছিল।

এই সিজনের সব থেকে অসফল প্রডাকসন ছিল "মার্টিন"। এর প্রদর্শনী হয়েছিল ঊনিশটি। এর থেকে বেশ বোঝা যায় গেইটের দর্শকরা সে সময় বার্নার্ডের নাটকের স্বাদ গ্রহণ করতে পারে নি। পরে অবশ্য তিনি গেইট রেপারটয়ারের অন্যতম জনপ্রিয় নাট্যকার হিসাবে প্রতিষ্ঠা অর্জন করেছিলেন। গেইটে সমস্ত নাট্যকারদের ভেতর বার্নার্ডেরই লেখা নাটক সব থেকে বেশি অভিনীত হয়েছিল।

ষষ্ঠ সিজনটির (১৯৩০—৩১) অন্য ধরণের বিশেষত্ব ছিল। সে সময় প্রায়-অখ্যাত বহু অভিনেতা এবং অভিনেত্রী এই সিজনে অদ্ভুত অভিনয়-প্রতিভার পরিচয় দিয়েছিলেন। ভইজদার 'দি প্রফেশ্যনাল লাভার' নাটকের অভিনয়ে আগুন জ্বালিয়ে দিয়েছিলেন ভেরনিকা টারলে এবং এরিক পোর্টম্যান। পরে ও' নীলের নিষিদ্ধ নাটক 'ডিজায়ার আণ্ডার দি এল্‌মস্‌' নাটকে তিনি আবার চমৎকার অভিনয় করেন। তাঁর বিপরীতে অভিনয় করেছিলেন তখনকার অপরিচিত অভিনেত্রী ফ্লোরা রোব্‌সন। আমার নিজের মত হল ফ্লোরা রোব্‌সনের মত অভিনয় দেখেছি তার ভেতর এটিই শ্রেষ্ঠ। মার্গারেট বর্লিংস ছিলেন আর একজন অখ্যাত অভিনেত্রী যিনি একসময় গেইটে অভিনয় করতেন। তাঁর খ্যাতির সূত্রপাতও হয় এই সিজনে গেইট থিয়েটারে। অস্কার ওয়াইল্ডের 'সালোমেতে' তিনি অভিনয় করেন—অন্যান্য যাঁরা এ নাটকে তাঁর সঙ্গে অভিনয়ে সহযোগিতা করেছিলেন, তাঁরা হচ্ছেন—ফ্লোরা রোব্‌সন, রবার্ট স্পেইট, জন ক্লেমেণ্টস, হেডলে ব্রিগ্‌স এবং এজমণ্ড নাইট। নৃত্য-পরিকল্পনায় ছিলেন নিনেৎ দ্য ভ্যালোয়া, সেটিং এবং কস্‌টিউমে জন আর্মস্ট্রং এবং সঙ্গীত পরিচালনায় কনস্ট্যান্ট ল্যামবার্ট। ক্রিশমাসের সময় এলসা ল্যাঞ্চেস্টার 'লিট্‌ল লর্ড ফন্টল রয়তে' অদ্ভুত বারলেস্ক অভিনয় দেখান। উইলফ্রিড ওয়াল্টার তাঁর নিজের রচিত নাটক 'হ্যাপি এ্যাণ্ড গ্লোরিয়াস'-এ মিরিয়াম এ্যাডামসের সহযোগিতায় দুর্দান্ত বেগের সঙ্গে অভিনয় করেন। এই সিজনেই এজমে পারসি গেইটে দুটি বিপরীতধর্মী চরিত্রে বিরাট অভিনয়-প্রতিভার স্বাক্ষর রাখেন—একটি মলিয়েরের 'দুয়ামৎ' এবং অপরটি আন্তয়েন শিবেস্কোর 'দি এয়ার'।

গেইটের থিয়েটারের ইতিহাসে এইটিই তাঁদের শ্রেষ্ঠ সিজন। অনেকগুলো নাটকেরই চল্লিশটি করে প্রদর্শনী করতে হয়েছিল। এর পর থেকেই গেইটের ক্রমাগত অবনতি ঘটতে থাকে এবং পিটার গডফ্রে শেষ পর্যন্ত থিয়েটার ছেড়ে যেতে বাধ্য হন। পরের সিজনের উদ্বোধনের সময় পিটার গডফ্রে এবং চার্লস স্পেনসারের পার্টনারশিপ ভেঙে গেল। এর আগের চার বছর এই দুজনের যুগ্ম অধিনায়কত্বে থিয়েটারটি চলেছিল। ১৯৩১—৩২ থেকেই স্পেনসারের অনুপস্থিতি বেশ ভালভাবেই উপলব্ধি করা যাচ্ছিল। কারণ এখন থেকেই প্রোগ্রামের উৎকর্ষের দিকটা ধাপে ধাপে নেমে আসছিল। গেইট প্রদর্শনীর ব্যাপারে যে মানের প্রতিষ্ঠা করেছিল তার তুলনায় অনেক নিম্নস্তরের দুটি-তিনটি নাটক মঞ্চস্থ হল। সিজনের শেষের দিকে অতীতের কয়েকটি সাফল্য-অর্জিত নাটকের পুনরভিনয়ের ব্যবস্থা করতে বাধ্য হলেন গডফ্রে—এর ভেতর ছিল 'ফ্রম মর্ন টু মিডনাইট' এবং 'মায়া'। কাস্টিং-এর অবনতিই দর্শকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করছিল। প্রডাকসনগুলো দেখে মনে হোত যেন প্রাণহীন এবং খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে চলছে। ছ' বছর অক্লান্ত পরিশ্রম করে এবং দুরতিক্রম্য বাধা কাটিয়ে থিয়েটার পরিচালনায় পিটার গডফ্রেও যেন ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলেন। তার ওপর স্পেনসার যেসব কাজ দেখতেন সবই এসে তাঁর ঘাড়ে পড়ল—ফলে প্রডাকসনগুলোর খুবই ক্ষতি হতে লাগলো।

[ক্রমশঃ]

বিচার

একটি প্রস্তাব

বছরের সেরা ছবি, সেরা পরিচালক, সেরা অভিনেতা ইত্যাদি বিচারের একটা ঝোঁক আছে। কোন প্রতিষ্ঠান, কোন পত্রিকা সাধারণত এরূপ বিচারের উদ্যোগ গ্রহণ করে থাকে। আমেরিকা, ইউরোপের নানা দেশে এরূপ রেওয়াজ রয়েছে। চিত্রামোদীরা এরূপ বিচারের ওপর আস্থাশীল কি না জানি না, তবে কৌতূহলী। সম্প্রতি সোভিয়েত ইউনিয়নেও দেখা যাচ্ছে সিনেমা পত্রিকার পাঠকদের মতামতে সেরা ছবি, সেরা অভিনেতা ইত্যাদির বিচার হচ্ছে। আমাদের দেশে বোম্বাইয়ের কোন কোন পত্রিকা খুব ঘটা করে এরূপ বিচার করে থাকে। বাংলাদেশেও পাইকারীভাবে একটা বিচার চলে আসছে অনেকদিন থেকে। সেই তালিকা এত দীর্ঘ যে পাঠক এবং দর্শকদের মনে রাখাই মুস্কিল। তবে এসব ঘোষণায় পাঠক বা দর্শকরা যে খুব গুরুত্ব দেন এমন মনে হয় না। তার কারণ ছবি ও শিল্পীর গুণাগুণ বিচার যাঁরা করেন তাঁদের বিচার ক্ষমতার ওপর দর্শকরা সব সময় আস্থাশীল নয়। যাঁরা এই বিচার • পদ্ধতির সঙ্গে পরিচিত তাঁরাও মোটেই আস্থাশীল হবেন না। অথচ বছরের পর বছর এরূপ একটা বিচার-বিচার খেলা চলে আসছে।

বছরের ছবির একটা আনুষ্ঠানিক বিচার হওয়া ভাল। যদি যথাযোগ্য বিচার হয় এবং সে বিচার যদি দর্শক ও শিল্পীদের আস্থা অর্জন করতে পারে তা হলে শিল্পের পক্ষে তা মঙ্গলকর হয়। এতে সত্যিকার ভাল ছবির প্রযোজকরা উৎসাহ লাভ করেন, ক্ষমতাশীল পরিচালকরা প্রেরণা লাভ করেন। তাঁদের শিল্পক্ষমতা জনসাধারণকে বুঝিয়ে দেওয়া হয়। অনেকক্ষেত্রে শিল্পশোভন ছবি দর্শকদের কাছে ব্যাখ্যা করে দেবার প্রয়োজন হয়। প্রচলিত বিচারগুলি এই ভূমিকা পালন করলে তবে বিচারের সার্থকতা, এবং ভাল ছবি করার প্রেরণা সৃষ্টি হয়। কিন্তু অনেকক্ষেত্রে ভাল ছবি বলতে শিল্পশোভন ছবির পরিবর্তে জনপ্রিয় ছবিকে প্রাধান্য দেওয়া হয় অথবা দুই শ্রেণীর ছবিকে একাকার করে ফেলা হয়। এভাবে একাকার করে ফেলার জন্য বিচার যথার্থ হতে পারে না, এবং তার ফলও প্রেরণাদায়ক হয় না।

আমাদের দেশে বর্তমানে ফিল্ম সোসাইটি মুভমেন্টের যথেষ্ট বিকাশ হয়েছে। ফিল্ম সোসাইটি মুভমেন্টের ফলে ভাল ছবির দর্শক যেমন কিছুটা বেড়েছে, তেমন ভাল ছবি দেখার সুযোগও হয়েছে। ফিল্ম সোসাইটিগুলির সদস্য সংখ্যা প্রায় দশ হাজার। এই দশ হাজার শিক্ষিত চলচ্চিত্র দর্শকের মতামত যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ হতে পারে। গত কয়েক বছর ফিল্ম সোসাইটি মুভমেন্টের অভিজ্ঞতায় এখন সদস্যরা বাংলা ছবি সম্পর্কে স্পষ্ট মতামত জানাতে পারেন। ফিল্ম সোসাইটিগুলি সম্মিলিতভাবে এরূপ একটা ব্যবস্থার উদ্যোগ গ্রহণ করতে পারেন। বেশি জটিলতায় না গিয়ে বছরের সেরা ছবি, সেরা সম্পাদক, সেরা ক্যামেরাম্যান এবং অভিনেতা-অভিনেত্রী পর্যন্ত সীমাবদ্ধ থাকতে পারলে ভাল। এই মতামতটা বুদ্ধিজীবী দর্শকদের মতামত বলে গণ্য হবে এবং তার প্রভাব যথেষ্ট। এরূপ বিচার ব্যবস্থায় বাংলা ছবির মর্যাদা বৃদ্ধি পাবে, ব্যবসাবুদ্ধিসম্পন্ন বিচার ব্যবস্থা থেকে ভাল ছবির নির্মাতারা মুক্তি পাবেন।

—সুজন

'দাদু' ছবিতে অনুভা ঘোষ

চিত্রআলোচনা

তের নদীর পারে

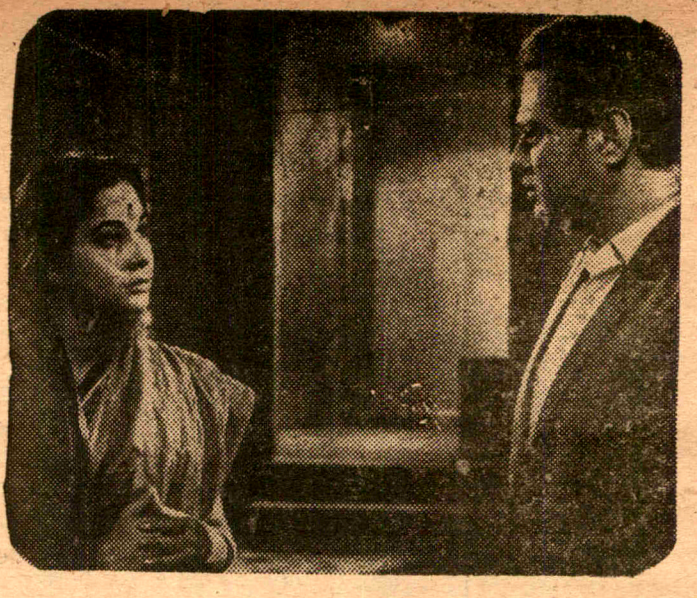

নির্মল দে'র অসমাপ্ত ছবি 'অন্তরাল'-এর একটি দৃশ্যে মাধবী মুখার্জী ও অনিল চ্যাটার্জী।

ঝারীন সাহার 'তের নদীর পারে' অবশেষে মুক্তির দ্বারে এসে উপস্থিত হয়েছে। আর কোন বাধা না পড়লে ছবিটি এবার সত্যিই মুক্তিলাভ করবে। 'তের নদীর পারে' নির্মিত হবার পরে আট বছর সময় লেগেছে একটা রিলিজ চেন পেতে। প্রযোজকের ধৈর্য এবং পরিচালকের সৃষ্টি-ক্ষমতার পরিচিতির জন্য এতদিনে মুক্তি লাভ করতে পারছে। নতুবা এরূপক্ষেত্রে অন্য প্রযোজককে হতাশ হয়ে চলচ্চিত্রজগৎ থেকে বিদায় নিতে হত। এদেশের চলচ্চিত্রজগতের এই হচ্ছে আসল চেহারা।

'তের নদীর পারে' ছবির কাজ শেষ হয়েছে ১৯৬০ সালের অক্টোবর মাসে। একটি যথার্থ পরীক্ষামূলক ছবি। এরূপ ছবি তৈরির উদ্যোগ আমাদের দেশে এই প্রথম বলা চলে। এতে যেমন সাহস ও অর্থব্যয় করার ক্ষমতা দরকার, তেমন ঝুঁকি কম নয়। যেমন এই ছবির ক্ষেত্রে হয়েছে। কারণ আমাদের দেশে ছবি বলতে পণ্য-চিত্র বোঝায়; একমাত্র ব্যবসার উদ্দেশ্যেই লোকে ছবি করে। পরীক্ষানিরীক্ষার স্থান এদেশের চলচ্চিত্রজগতে এরকম নেই। ঝারীন সাহা ইতালীতে শিক্ষাপ্রাপ্ত এক দক্ষ চিত্রধারক। বিদেশে বিখ্যাত চলচ্চিত্র-স্রষ্টাদের সান্নিধ্যে থেকে তিনি কাজ শিখেছেন। দেশে ফিরে এসে এই ছবি তাঁর প্রথম চলচ্চিত্র উদ্যোগ। ছবিটি তুলেছেন মেদিনীপুর জেলার নন্দীগ্রাম থানার তের-পাখিয়া বাজারে। প্রায় আট মাস কাল শিল্পী এবং টেকনিশিয়ানদের নিয়ে দুটো সার্কাস পার্টির সঙ্গে তাঁরা ছিলেন। বাস্তবিক পক্ষে সার্কাস পার্টির সঙ্গে একাকার হয়ে গিয়ে সেই শিল্পীদের সহযোগে এই ছবি নির্মিত হয়েছে। ছবি নির্মাণের সময় পরিচালক সব সময় চিত্র-নাট্য অনুসরণ করেন নি, অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে কতকগুলি নতুন ঘটনার চিত্রগ্রহণ করে তা কাহিনীর সঙ্গে যুক্ত করেছেন। এরূপ দৃশ্যের মধ্যে নদীর জলে নর্তকীর দৌড়ান, আর ঝাঁকে ঝাঁকে মাছের খেলা বা উড়ে যাওয়ার চমৎকার দৃশ্যটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। তেরপাখিয়ার মত গ্রামে বিদ্যুৎ নেই, অথচ বিদ্যুৎ না হলে চিত্র-গ্রহণের কাজ চলবে না; এই কাজের জন্য কলকাতা থেকে ইলেকট্রিক জেনারেটর নিয়ে যেতে হয়েছিল। ছবিটি আগাগোড়া বাইরে তোলা, একমাত্র রসায়নাগারের এবং শব্দ গ্রহণের কাজ ছাড়া স্টুডিওর সঙ্গে এই ছবির কোন সম্পর্ক নেই। চিত্রগ্রহণ-রীতিতেও কিছু বৈশিষ্ট্য লক্ষণীয়। কখনো কাহিনীচিত্রের রীতিতে, কখনো তথ্যচিত্রের রীতিতে দৃশ্য গ্রহণ করা হয়েছে। যেমন, তিনফলা তলোয়ারের খেলাটি প্রামাণিক রীতিতে গৃহীত। এই খেলার সময় দর্শকরা রুদ্ধশ্বাসে অপেক্ষা করেন, একটা উৎকণ্ঠা জেগে থাকে। গ্রাম্য সার্কাসের খেলোয়াড়রা যে কত দক্ষ এবং কত প্রশংসনীয় এই খেলাটি তার একটি নিদর্শন। 'তের নদীর পারে' ছবির মুক্তির জন্য একটা আন্দোলন হয়েছে, ছবিটি দেখলে বোঝা যায় এই আন্দোলনের সার্থকতা ছিল।

'তের নদীর পারে' ছবির বক্তব্য শিল্পিজীবনের সংকটকে কেন্দ্র করে। শিল্পীর নিজস্ব বৈশিষ্ট্যের সঙ্গে মনো-রঞ্জনী হালকা দিকগুলির সংঘাত এই ছবিতে একটি নাটকীয় পরিস্থিতি সৃষ্টি করেছে। সিনেমা থিয়েটার নাচে, গানে এবং সাহিত্যে শিল্পগত বৈশিষ্ট্যগুলির সঙ্গে আপোষ করে আজকাল মনোরঞ্জনী দিকগুলি প্রবল হয়ে উঠেছে। এই মনো-রঞ্জনী দিকগুলির সঙ্গে শিল্পীরা আপোষ করতে বাধ্য হচ্ছে শিল্প ব্যবসায়ীদের চাপে। শিল্প বা সাহিত্য যখন নিছক ব্যবসায় পরিণত হয়, তখন এই অবস্থা সৃষ্টি হয়, আর তাতে মৃত্যু ঘটে প্রকৃত শিল্পীর। এইক্ষেত্রেও পাশাপাশি দুটি সার্কাসের মধ্যে প্রতিযোগিতা শুরু হয়েছে। একটি সার্কাস খুব জমিয়েছে খেলার চেয়েও নর্তকীদের খেমটা নাচ দিয়ে। সার্কাসের বিস্ময়কর খেলা তখন নর্তকীর নাচের কাছে গৌণ হয়ে পড়েছে। তখন ম্যানেজার সার্কাসকে বাঁচাবার জন্য নর্তকীর খেমটাকে যুক্ত করবার চেষ্টা করছে। এতে আসল খেলোয়াড় ওস্তা-দের শিল্পীসত্তায় প্রবল আপত্তি সৃষ্টি হয়। সে চায় সার্কাস বেঁচে থাকবে তার খেলার বৈশিষ্ট্য নিয়ে, নাচের আঙ্গিকে নয়। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তাকে বশ্যতা স্বীকার করতে হয়। তার সার্কাসেও নর্ত-কীর আগমন ঘটে। দর্শকরুচি তখন এমন নিচে নেমে গেছে যে, তারা তিনফলার মত বিপজ্জনক খেলা অপেক্ষা নাচের প্রতি বেশি উৎসুক হয়ে উঠেছে। এমন পরি-স্থিতিতে নর্তকীকে কেন্দ্র করে ম্যানে-জারের সঙ্গে ওস্তাদের দ্বন্দ্ব দেখা দেয়। তখন প্রশ্ন আসে মনোরঞ্জনী দিকগুলি নিয়ে সার্কাসের বৈশিষ্ট্য বিসর্জন দিবে ম্যানেজার থাকবে, অথবা খেলার বৈশিষ্ট্য নিয়ে ওস্তাদ থাকবে। শেষ পর্যন্ত ম্যানেজার বিদায় নেয়; সার্কাসকে বেঁচে থাকার সুযোগ দিয়ে। তার পিছু পিছু নর্তকীও চলে যায়। সে তখন বুঝেছে তার উপস্থিতি শিল্পের অপমৃত্যু ঘটাবে। তখন দেখা গেল ওস্তাদ আবার সার্কাস এরেনায় নেমেছে সেই বিপজ্জনক তিনফলা

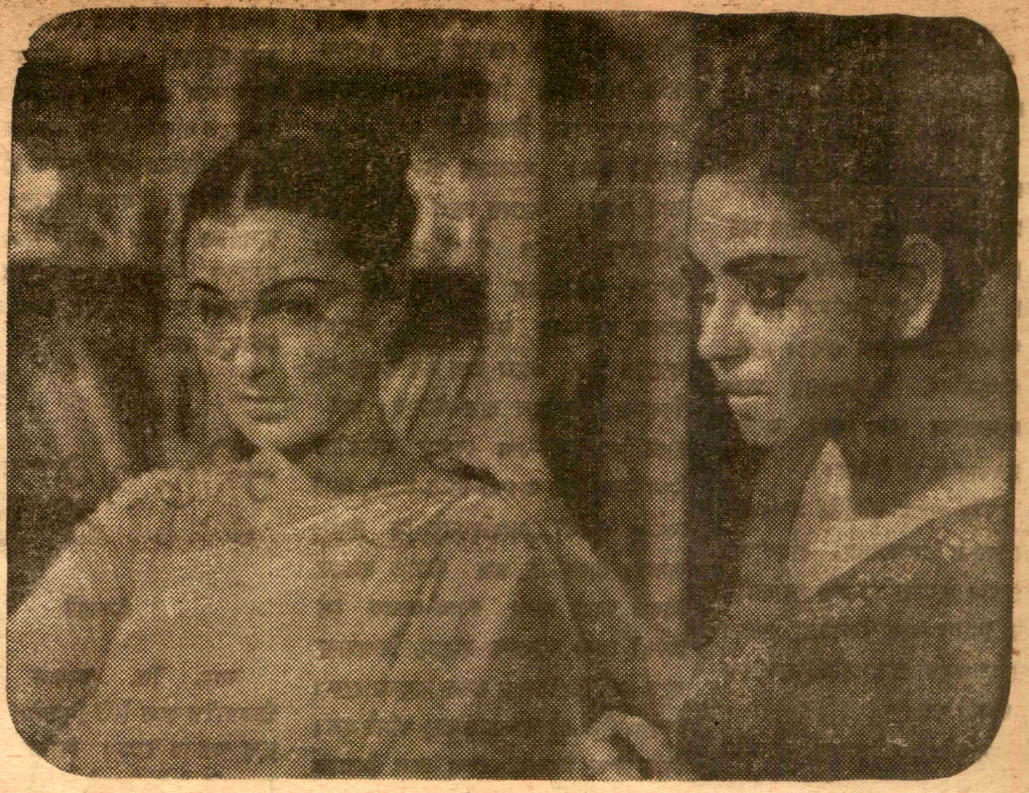

চিত্রযুগের 'পিতাপুত্র' ছবিতে তনুজা ও সুব্রতা চ্যাটার্জী

তলোয়ারের খেলায়। ওস্তাদের তখন বিশ্বাস ফিরে এসেছে নাচ না দেখিয়েও সার্কাস বেঁচে থাকতে পারে।

শিল্পের সঙ্গে ব্যবসার সংঘাত ছবিতে যথাযথভাবে পরিস্ফুট হয়ে উঠেছে। এই প্রশ্ন আজকের নয়, চিরন্তন। শিল্পকে একদল মানুষ পণ্যে পরিণত করে ব্যবসায়ে নেমেছে। বিশেষ করে আজকের দিনেও প্রকৃত শিল্পীর বেঁচে থাকাই কঠিন হয়েছে। এই পরিস্থিতিতে ছবিটিতে এক বলিষ্ঠ বাণী উচ্চারিত হয়েছে। অবশ্য একস্থানে পরিচালক দর্শকদের ওপর দোষারোপ করে বলেছেন, দর্শকরাও মাছির মত, নর্দমায়ও বসে আবার রাবড়িতেও বসে। কিন্তু শিল্পকে পণ্যে পরিণত করার জন্য দোষ যতটা দর্শকের নয়, তার চেয়ে বেশি তাদের যারা মনোরঞ্জনী উপাদানে দর্শকরুচিকে নিচের দিকে নামাচ্ছে; এবং যারা দর্শকদের শিক্ষা ও রুচির মানকে বিকশিত হবার সুযোগ দিচ্ছে না। দারিদ্র্য, অশিক্ষা ইত্যাদি। সুতরাং পরিচালক সেদিকে অঙ্গুলিনির্দেশ করলেই তাঁর ছবির বক্তব্য আরো বলিষ্ঠ হতে পারত। দর্শকরা যদি মাছির মত হত তা হলে প্রকৃত শিল্প ও শিল্পী এখনো সগৌরবে থাকতে পারত না, এবং শেষ পর্যন্ত যে শিল্পীর জয় নিশ্চিত এ কথা এত জোর দিয়ে পরিচালক বলতে সাহস পেতেন না। ভাল জিনিস দর্শকরা গ্রহণ করতে পারেন, তবে পরিবেশনরীতি যদি যথার্থ হয়।

নতুন আঙ্গিকে অনন্য শিল্পসৃষ্টি

রচনায় ও অভিনয়ে
আকাদমী পুরস্কারপ্রাপ্ত
বাদল সরকার

শুভমুক্তি
সমাসন্ন

রূপবাণী - ভারতী - অরুণা

ছবিতে গতানুগতিক অভিনয়ের স্থান নেই বললেই চলে। এখানে যে কয়েকজন বাইরের শিল্পী রয়েছেন তাঁদের মধ্যে প্রধান জ্ঞানেশ মুখার্জী (ওস্তাদ) এবং প্রিয়ম হাজারিকা (নর্তকী)। তাঁরা সার্কাসের শিল্পীদের সঙ্গে এমন মিশে গেছেন যে ওঁদের স্বতন্ত্র সত্তা প্রায় নেই বললে চলে। এখানেই তাঁদের অভিনয়-সার্থকতা। অবশ্য এই সার্থকতা নির্ভর করেছে পরিচালকের শক্তির ওপর। ছবিটিতে গ্রাম্যজীবন, নিঃসঙ্গতার মধ্যে সার্কাসের মাদকতা এবং গ্রাম বাংলার প্রকৃতি চমৎকার ফুটে উঠেছে।

'তের নদীর পারে' ছবিটির সম্পাদনা-সার্থকতা বিশেষ উল্লেখযোগ্য। বহির্দৃশ্যে তোলা টুকরো টুকরো ঘটনাকে কাহিনী-বদ্ধ করে, বিশেষ করে 'তিনফলা' খেলায় উদ্বেগ সৃষ্টি যথার্থ প্রশংসনীয়। সম্পাদনা করেছেন দুলাল দত্ত।

ছবির সঙ্গীত পরিচালনা করেছেন জ্ঞানপ্রকাশ ঘোষ। চিত্রগ্রহণের কৃতিত্ব বারীন সাহার।

শনিবার

'তের নদীর পারে' ছবির দৈর্ঘ্য প্রচলিত ছবির দৈর্ঘ্যের তুলনায় কিছুটা কম। এই ঘাটতি পূরণের জন্য সঙ্গে যুক্ত হয়েছে একটি স্বল্পদৈর্ঘ্যের ছবি 'শনিবার'। বাদল সরকার রচিত একাঙ্ক নাটক এই ছবির চিত্রনাট্যের অবলম্বন। দিব্যেন্দু এক ঠিকাদারী কোম্পানীতে চাকরী করে। সংসারের সমস্ত দায়িত্ব তার ওপর। কাজের চাপে সে পিষ্ট। রবিবারের দিনটাও তার মাটি হবার উপক্রম; শনিবারের বিকালে বাড়ি এসে বসেছে অফিসের ফাইল নিয়ে জরুরী কাজে। কিন্তু কাজে তার মন বসছে না, দিবাস্বপ্নে মশগুল হয়ে উঠেছে। ফাইল হাতে নিয়ে সে স্বপ্ন দেখছে লটারীতে টাকা পেয়ে তার অবস্থা ফিরে গেছে; ছোট বোনের বান্ধবী সাগরিকাকে সে ভালবাসছে; চাকরীতে তার উন্নতি হয়েছে, আবার তারই সঙ্গে স্বপ্ন দেখছে সে চাকরী থেকে বরখাস্ত হয়েছে, দিশাহারা হয়ে সে গুলী করে বসল ম্যানেজারকে। শেষ পর্যন্ত এই অপরাধে তার ফাঁসী হল। যিনি দণ্ড দিলেন, দেখা গেল বিচারক আর ম্যানেজার চেহারার দিক থেকে একই।

মধ্যবিত্ত কেরানীর শ্রমপিষ্ট জীবন, তার স্বপ্নসাধ এবং বাস্তবজীবনের সঙ্গে কল্পনার দ্বন্দ্ব ছবিতে প্রতিফলিত। দিশাহারা কেরানী জীবন বিকাশের পথ না পেয়ে কখনো নির্ভর করে ভাগ্যের ওপর, লটারী ইত্যাদি নিয়ে মেতে থাকে; কখনো যায় হঠকারী পথে। জীবনে ভারসাম্য না থাকলে এক বিন্দু থেকে আর এক বিন্দুতে ঘড়ির দোলার মত দুলতে থাকে। স্বল্প পরিসরে এই দ্বন্দ্ব ছবিতে স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। হালকা সুরে, লঘু ছন্দে রূপায়িত হয়েছে একটি বক্তব্য, একটি মানবিক আবেদন। ছবিতে অভিনয় করেছেন বাদল সরকার, বেবি গুপ্ত, রীণা সেনগুপ্ত প্রমুখ।

'নূপুর' ডান্স একাডেমির দ্বিতীয় বার্ষিক অনুষ্ঠানে সমবেত কথক নৃত্যের দৃশ্য

স্টুডিও খবর

চৈতালী

আর, ডি, বনসাল প্রযোজিত 'চৈতালী'র কাজ নিউ থিয়েটার্স স্টুডিওতে দ্রুত অগ্রসর হচ্ছে। পরিচালক সুধীর মুখার্জী নিউ থিয়েটার্স স্টুডিও (১)তে দ্বিতীয় দফায় চিত্রগ্রহণের কাজ করেছেন। এইবার চিত্রগ্রহণে অংশ গ্রহণ করেছে তনুজা, বসন্ত চৌধুরী, বিশ্বজিৎ, জহর রায়, বীরেন চ্যাটার্জী, তরুণকুমার। বসন্ত চৌধুরী এই ছবিতে এক সঙ্গীত-রসিক ও দার্শনিক নবাবসাহেবের ভূমিকায় অভিনয় করছেন। পরিচালক মার্চের দ্বিতীয় সপ্তাহে নেপাল সীমান্তে যাবেন চিত্রগ্রহণ করতে।

মৌসুমী মন

মমিতা চৌধুরীর কাহিনী অবলম্বনে চৌধুরী প্রোডাকসনের 'মৌসুমী মন' চিত্রের কাজ সমাপ্তপ্রায়। ছবিটির সম্পাদনা, চিত্রগ্রহণ, সঙ্গীত ও গীত রচনার দায়িত্ব পালন করছেন যথাক্রমে শ্রীঅনিল সরকার, গণেশ বোস, অনিল দত্ত ও পুলক বন্দ্যোপাধ্যায়। চিত্রনাট্য ও পরিচালনা করেছেন সমর চৌধুরী। অভিনয়ে আছেন:—সর্বেন্দু, মিতা চৌধুরী, অজিতেশ, শেফালী বন্দ্যোপাধ্যায়, জহর রায়, গীতা দে, মণি শ্রীমানী, রত্না ঘোষাল, সৌরভ মুখার্জী, লতিকা দাশগুপ্তা, বেবী সুচিত্রা ও সিনে আর্টিস্টের শিল্পি-বৃন্দ।

বালসেবিকা শিক্ষণ প্রকল্পে

বালসেবিকা শিক্ষণ প্রকল্পের ছাত্রীবৃন্দ বার্ষিক প্রদর্শনীর আয়োজন করেন। এই প্রদর্শনীর উদ্বোধন করেন অধ্যাপক কমলাকান্ত মুখোপাধ্যায়, ডীন অব দি ফ্যাকাল্টি অব এডুকেশন। বালসেবিকাদের শিশুদের মনোরঞ্জনকারী ও শিক্ষামূলক হাতের কাজ ভূয়সী প্রশংসা অর্জন করে। এই শিক্ষণ কেন্দ্রের ছাত্রীরা গত ৩রা মার্চ রবীন্দ্র সরোবর হলে কথাশিল্পী নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের 'ভাড়াটে চাই' নাটকটি মঞ্চস্থ করেন। এই উৎসবের আয়োজন করেন পশ্চিমবঙ্গ শিশু কল্যাণ পরিষদ।

শোক-সংবাদ

প্রবীণ চলচ্চিত্রকারের মৃত্যু

গত ১৯শে ফাল্গুন সোমবার ইংরাজী ৩রা মার্চ ১৯৬৯ বিকাল ৪-৪০-এ প্রবীণ চলচ্চিত্রকার শ্রীশ্যাম দাশ তাঁর অশোকনগরস্থ বাসভবনে পরলোকগমন করেন। তাঁর সম্পাদিত বহুসংখ্যক চলচ্চিত্রের মধ্যে 'আলিবাবা' (বাংলা), 'অভিনয়', 'রাজনর্তকী', 'শেষের কবিতা', 'মাইকেল মধুসূদন' প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। তাঁর পরিচালনায় মুক্তিপ্রাপ্ত ছবি—'স্বয়ংসিদ্ধা' (হিন্দী), 'মধুরাতি', 'বীর হাম্বির', ইত্যাদি। তাঁর সম্পাদিত সর্বশেষ হিন্দী ছবি মুন্সী প্রেমচাঁদ লিখিত 'গো-দান'। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৫৬ বৎসর। স্ত্রী, তিন পুত্র, দুই কন্যাসহ বহু শোকসন্তপ্ত আত্মীয়বন্ধু তাঁর আত্মার সদ্‌গতি কামনা করেন।

মুরারিমোহন ভাদুড়ী

নাট্যাচার্য শিশিরকুমারের অনুজ রঙ্গাভিনেতা মুরারিমোহন ভাদুড়ী গত ১লা মার্চ মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে পরলোকগমন করেছেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৬৩ বছর। শ্রীরঙ্গম নাট্যমঞ্চে তিনি নিয়মিত অভিনেতা ছিলেন এবং শিশিরকুমারের সঙ্গে শেষের দিকে তাঁর সব কয়টি নাটকে অভিনয় করেছেন।

সমর চৌধুরী পরিচালিত 'মৌসুমী মন' ছবিতে নবাগতা মিতা চৌধুরী

সঙ্গীত কথা

'নূপুর'-এর অনুষ্ঠান

গত ২২শে ফেব্রুয়ারী নূপুর ডান্স একাডেমীর উদ্যোগে শ্রীশিক্ষায়তন হলে এক মনোজ্ঞ নৃত্যনাট্য অনুষ্ঠিত হয়েছে। লোকনৃত্য ও উচ্চাঙ্গনৃত্যের মাধ্যমে এই অনুষ্ঠান আনন্দদায়ক হয়েছে। কত্থক নৃত্যশিল্পী বন্দনা সেন নূপুর একাডেমীর স্রষ্টা। তাঁর উদ্যোগে এই অনুষ্ঠান সার্থক হয়েছে।

অনুষ্ঠান আরম্ভ হয় বাণী সেনের পল্লীগীতি দিয়ে। মাতিয়ে রেখেছিল চাষী নৃত্য ও জিপসী নৃত্য। ছোটদের কত্থক ব্যালে সকলের ভাল লেগেছে। একক কত্থক নৃত্যে মঞ্জুষা ব্যানার্জী তাল ও বোলের সঙ্গে মোটামুটি ভাল নেচেছে। নিতাই বসুর তবলা সঙ্গত উচ্চমানের পরিচায়ক।

'শকুন্তলা' নৃত্যনাট্য শ্রীকানাই মজুমদারের পরিচালনায় ও শ্রীমতি সেনের প্রযোজনায় কত্থক, মণিপুরী ও ভরতনাট্যমের মাধ্যমে উপভোগ্য হয়েছে।

সঙ্গীত পরিচালনায় অজিত নন্দী ও ধারাভাষ্যে বাদল রায় এবং আলোকসম্পাতে শ্রীশান্তনু দাস অংশ গ্রহণ করেছেন।

আকাশবাণীর নীতি

আকাশবাণীর নীতি কি?

জনকল্যাণ? সত্য, শিব, সুন্দরের প্রতিষ্ঠা? আত্মপ্রচার? না, কর্তাতোষণ আর স্বজনপোষণ?

আকাশবাণীর জনবিরোধী মনোভাবের বিরুদ্ধে যতোই বলা যাক বা লেখা যাক না কেন—আকাশবাণীর শুধুমাত্র মুখবিবরই আছে, ঐ প্রতিষ্ঠান কর্ণহীন!

আকাশবাণী জনকল্যাণের কতটুকু কাজ আজ পর্যন্ত করতে সক্ষম হয়েছে—এই বিষয়ে তথ্যানুসন্ধান করলে দেখা যাবে, আকাশবাণী থেকে প্রচারিত যাবৎ বাণী কোনো রকম ফলপ্রসূ নয়। কারণ তা থেকে যা শোনা যায়, বাস্তবের সঙ্গে তার মিল অত্যন্ত কম দেখা যায়; আর যা ভদ্রলোকের পক্ষে দেখা অসম্ভব—তা নিয়ে আকাশবাণী যা বলে বলুক, অতিবাস্তব হোলেও যে কোনো ভদ্রলোকের পক্ষে তা অবিশ্বাস্য।

তাঁবেদার প্রতিষ্ঠান

সুতরাং জনসাধারণের 'করে'র টাকায় আকাশবাণী চললেও এবং জনসাধারণের পকেট কেটে যারা মিথ্যা প্রচার করে ও পেটোয়া লোক ধরে এনে অর্থ দিয়ে মিথ্যা প্রচার করায় ও স্বৈরাচারের দ্বারা জনগণকে বিভ্রান্ত করে, এবার তাঁর বিরুদ্ধে জনসাধারণকে সোচ্চার হতে হবে। মনে রাখতে হবে, কেন্দ্রীয় সরকার এখনো যা বলে তা অসত্য। বিশেষত বিগত যুক্তফ্রন্টের শাসনের কাল থেকে কেন্দ্রীয় সরকার যা করেছে ও করে আসছে, পশ্চিমবঙ্গের জনসাধারণই তার সদুত্তর দিলে কি হয়—কেন্দ্রীয় সরকারের তবু শিক্ষা হয় নি। ঐ সরকারের শিক্ষা না হওয়ায় তার তাঁবেদার প্রতিষ্ঠানগুলি ক্রমশ বাড়বাড়ন্ত। এর ফলে জনকল্যাণ-বিরোধী কাজ আরো বেড়ে চলেছে। আর আকাশবাণী যেহেতু সরকারের সেরা মুখপাত্ররূপে পরিণত—তাই সেখানে চলছে যতো রকমের

কিস্তিতে ট্রানজিস্টর

"ন্যাশন্যাল ডিলাক্স"

১০, মাসিক কিস্তিতে ৩ ব্যান্ড অল ওয়ার্ল্ড পোর্টেবল ট্রানজিস্টর লাভ করুন। প্রতি গ্রাম ও শহরে প্রেরণের ব্যবস্থা। আবেদন করুন:

Music & Sound (B.W.C.—10)
Post Box 1576, Delhi—6.

দুষ্কার্য। আর ঐ দুষ্কার্য যারা করছে তাদের চিত্র ও চরিত্র প্রায় অনেকেরই জানা।

ঘোষক ও প্রচারক

দুষ্কার্য যারা করে তাদের বিরুদ্ধে ব্যক্তিগত অভিযোগ করার চেয়ে সরকারী নীতির বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করা ও নীতি পরিবর্তন করানোর কথা কেউ কেউ বলতে পারেন। কিন্তু আকাশবাণী কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক একটি নিরপেক্ষ প্রতিষ্ঠান হিসেবে পরিচালিত হলেও আকাশবাণীতে যারা নিজেদের নাম ঘোষণা ও প্রচার করে অপকর্ম করে—তারাই বা জনতার রোষবহ্নি থেকে কিভাবে রেহাই পেতে পারে। সংবাদপত্রে কেউ স্বনামে লিখলে বা প্রচার করলে কাগজের সম্পাদক, প্রকাশক ও মুদ্রক থেকে লেখক পর্যন্ত দায়ী হন, সেইরকম আকাশবাণীতে কেউ জনবিরোধী কিছু প্রচার করলে বা প্রচার করতে সাহায্য করলে আইনের চোখে সমানভাবে দোষী হওয়া উচিত সংশ্লিষ্ট সকলেরই। তা হলে ঐ কাজ করতে আর কেউ সাহসী হবে না।

তবে হ্যাঁ প্রচার করে কোন্ সাহসে? আত্মপ্রচারের দ্বারা দুষ্কর্ম করেও আত্মরক্ষা করে কিভাবে?

অলিখিত নীতি

এই ব্যাপারেও যেন কেন্দ্রীয় সরকারের একটা অলিখিত নীতি আছে। আর সেই নীতি হচ্ছে—পরিবর্তনের ভয় থেকে বাঁচবার সুবিধাবাদী নীতি। কিন্তু সেই নীতিতে কি শেষ রক্ষা হয়। কারণ অনেক অপপ্রচার ও দুষ্কর্ম করেও কি পশ্চিমবঙ্গের জনসাধারণকে প্রগতিমূলক চিন্তাধারা থেকে বিচ্ছিন্ন করতে কেন্দ্রীয় সরকার পেরেছেন? মধ্যবর্তী নির্বাচনে কংগ্রেসের ভরাডুবি হলেও ঐ সরকারের চৈতন্য হয় নি। চৈতন্য না হওয়ার অর্থ কেন্দ্রীয় সরকার মুখে বড় বড় কথা বললেও সত্য, শিব, সুন্দরের প্রতিষ্ঠা চায় না। ঐ সরকার চায় বিকৃত প্রচার চালাতে। সেই সঙ্গে আকাশবাণীর একশ্রেণীর চাকুরিয়াও চালায় আত্মপ্রচার। তারা একদিকে কর্তাকে তোষণ করে, আর একদিকে পোষণ করে স্বজনদের। এই স্বজনদের মধ্যে, প্রচার মাহাত্ম্যে প্রভাবশালী (?) অথচ চরম প্রতিক্রিয়াশীল পত্রিকার (দালালী করাও এদের কাজ) লোকজনরাই বেশি। অর্থাৎ আকাশবাণী এদেরই কুক্ষিগত। এমন হবার কারণ, এরা হাতে থাকলে প্রচারকের নিজের সমালোচনা হবে না, বরং শত্রুদের বিরুদ্ধে জেহাদ চালাতে গোপনে ও বেনামে সেই পত্রিকার সাহায্য গ্রহণ করা সম্ভব হবে। এমন কি আকাশবাণীতে কেউ অন্যায়মূলক কাজের বিরোধিতা করলেও সংবাদপত্রে তাকে হেয় ও হেনস্থা করা হবে।

সেরকম হয়েছে। আমাদের হাতে তার প্রমাণ রয়েছে।

কিন্তু এসব যারা করে তারা কেমন জাতের লোক? লোক? রেডিওতে তাদের নাম প্রচারিত হয়। সুতরাং তাদের রঙ জানারও ইচ্ছা কার না হয়।

পোষা লেখক—অনুচর

রঙ বদল করাও এখন প্রতিক্রিয়াশীল রাজনীতিকদের একচেটিয়া। কেন্দ্রীয় সরকার রাজ্যগুলিতে রাজত্ব রক্ষার সাথে রঙ বদলের জন্য এখন মদত দিচ্ছেন ও বিশ্বাসঘাতকতার পথ প্রশস্ত করছেন। রাজনীতির ক্ষেত্রে এমন ঘটনা ঘটছে বলেই আকাশবাণীর একদল স্বৈরাচারী সরকারী চাকুরিয়ার কার্যকলাপে ও চক্রান্তে অমন ঘটনা ঘটলে বোধ হয় কেন্দ্রীয় সরকারের কিছু বলার নেই। কারণ কিছুদিন আগেও দেখলাম, কেন্দ্রীয় সরকার মুখে সরকারী চাকুরিয়াদের ব্যাপারে সার্ভিস রুলের কথা বললেও আকাশবাণী কলকাতার কোনো কোনো মহিলা চাকুরিয়া বিশ্বাসঘাতক দলছুটদের পরামর্শক্রমে নয়া বাঙলার স্বপ্নে বিভোর হয়ে চুটিয়ে কলম ছুটিয়েছে। অবশ্য ঐ সব বিশ্বাসঘাতকদের স্বপ্ন দুঃস্বপ্নে পরিণত হয়েছে। কিন্তু যুক্তফ্রন্ট অর্থাৎ জনগণের নয় বাঙলায় ঐ সব বিশ্বাসঘাতকদের পোষা লেখক-অনুচররা পদচারণা করে কোন সাহসে? অথবা এখনো তারা আকাশবাণীর চাকরিতে বহাল তবিয়তে থাকতে পারে কোন নিয়মে?

অবশ্য কেন্দ্রীয় সরকারের চাকরিতে পাকা হবার ব্যবস্থাও কোনো কোনো ক্ষেত্রে রহস্যময়, বড়ই বিচিত্র।

আমাদের জানা একটি ঘটনা পাঠকদের নিবেদন করছি।

একবার একজন চাকুরিপ্রার্থী আকাশবাণী, কলকাতায় ধরে কয়ে একটা চাকরি সংগ্রহ করেন। কিন্তু সংগ্রহ করলেই তা রক্ষা করা যায় না। কারণ পুলিশ রিপোর্ট তখনো বাকি। আর শোনা যায়, বামছাত্রমহলে একদা তার গতায়াত ছিল। পুলিশ সে গন্ধ বের করেছিল। চাকুরিও তার যায়-যায়। কিন্তু আকস্মিকভাবে এমন এক ঘটনা ঘটে—যা সদ্য চাকুরিজীবীর ভাগ্য ফিরিয়ে দেয়। তার চাকরি পাকা হয়। এক্সটেনসন পাবার পথও পরিষ্কার হয়।

বিকৃত রুচির পৃষ্ঠপোষকতা

কিন্তু অমন অঘটন ঘটলো কেন? ঘটবার কারণ, আকাশবাণী, কলকাতা মারফৎ একটি বিকৃত রুচির আলোচনা। আর ঐ আলোচনা প্রচারের বিরুদ্ধে একটি পত্রিকায় বিরুদ্ধ মন্তব্য প্রকাশ হতেই তার চাকরি পাকা হয়ে যায়। সম্ভবত এক্ষেত্রে সরকারী নীতি ছিল এই যে, ঐ চাকুরিয়া আর প্রতিক্রিয়াশীলতার পথে বিশ্বাসভঙ্গ করবে না। তাহলে আকাশবাণীর শ্রোতারা, অবস্থাটা বুঝুন! কিন্তু পালা বদলের পদধ্বনি যে আর দূরাগত নয়। জনসাধারণের সচেতনতায় সব রকম চক্রান্তই যে ধরা পড়ছে। এমন একটি চক্রান্তের বিরুদ্ধে আমাদের কাছে আকাশবাণীর বহু শ্রোতার কাছ থেকে অভিযোগ এসেছে।

একদা যাঁরা 'বিবর'-এর অসৎ উদ্দেশ্য-প্রণোদিত আলোচনার বিরুদ্ধে আলোচনা করেছিলেন, এই অভিযোগে তাঁরাও অংশ গ্রহণ করছেন। উপরন্তু আরো অনেকেই আছেন।

সংবাদ বিচিত্রা

তবে এবারে অভিযোগ হচ্ছে 'সংবাদ বিচিত্রা'র বিরুদ্ধে। ঐ সংবাদ-বিচিত্রা আমরা গত ৩রা মার্চ সকাল সাড়ে নটায় শুনেছি। অনুষ্ঠানটি ২রা মার্চ রাত্রেও হয়েছে।

পশ্চিমবঙ্গের জনগণকে অসুস্থ করার জন্য ঢাক-ঢোল পিটিয়ে বিবর-কাহিনী প্রচার করা হয়েছিল। তার প্রচারের পেছনে ছিল বিদেশী অর্থপুষ্ট একটি পত্রিকা এবং সে বার আকাশবাণী কলকাতাও জঘন্যভাবে আসরে নেমেছিল। এখন লোকজন আরো সাবধান। তাই ময়দানে অনুষ্ঠিত মুক্ত মেলা নিয়ে কাগজে কাগজে অভিযোগ বের হচ্ছে। কোনো একটি পত্রিকা মুক্ত মেলার সপক্ষে মদত দিচ্ছে। কিন্তু মুক্ত মেলা যাঁরা প্রত্যক্ষ করেছেন, তাঁরা জানেন যে, কিভাবে সেখানে ইয়াংকি কালচারের অনুকরণে অনাচারমূলক কার্যকলাপ ঘটছে। আর মুক্ত মেলার পেছনে যারা আছে—তাদের অনেকেই দাগী আসামী। বাকি কিছু গেছেন কৌতূহল মেটাতে এবং আসল ব্যাপার কি তা প্রত্যক্ষ করতে। প্রত্যক্ষদর্শীরা ঐ মেলা বন্ধ করতে চাইলেও দীর্ঘদিন রাজ্যপালের পুলিশ বাধা দিয়েছে।

মুক্ত মেলার বিরুদ্ধে জনমত উষ্মা প্রকাশ করছে, কিন্তু কলকাতার আকাশবাণী তার প্রচারকার্যে ঝাঁপিয়ে পড়েছে। আকাশবাণী কর্তৃপক্ষ নিজের খেয়াল-খুশি মাফিক না চললে, এমন অসৎ উদ্দেশ্যপ্রণোদিত প্রচার সম্ভব হতে পারে এ আমাদের ধারণার বাইরে।

নামে নিরপেক্ষ, আসলে পাপের পীঠস্থান থেকে

আকাশবাণী এ ব্যাপারে নিরপেক্ষতার জবাবদিহিও করতে পারে না। কারণ একটি দুষ্কার্যরত পীঠস্থান থেকে চোরাই-পচাই যা চালানোই হোক না কেন—কলকাতার আকাশবাণী কর্তৃপক্ষ তাকে বেমালুম চালিয়ে দিতে ইচ্ছুক। (শুধু এখানেই শেষ নয় সেখান থেকেই দাগীদের ধরে এনে বারবার বলিয়ে অর্থ দিতেও আকাশবাণীর করুণার সীমা নেই!) কিন্তু এই ধরণের অরুচিকর ঘটনাকে চালিয়ে দেবার বিরুদ্ধে এখন জনমত আরো বেশি সোচ্চার। পশ্চিমবঙ্গের বর্তমান সুযোগ্য তথ্য ও প্রচার মন্ত্রী এই ধরণের অঘটনের বিরুদ্ধে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন—এটা আমরা আশা করি। এ রাজ্যের জনসাধারণকে বিভ্রান্ত ও অসুস্থ করার অধিকার আকাশবাণী, কলকাতাকে কে দিয়েছে? প্রসঙ্গত আমরা তামিলনাড়ুর কথা স্মরণ করতে পারি। সেখানে বেতার কর্তৃপক্ষ যা ইচ্ছে তাই করতে চেয়েছিল এবং সেখানের রাজ্য সরকার তা থেকে তাকে সংযত করতে পেরেছে। পশ্চিমবঙ্গের মুক্ত-ফ্রন্টের পেছনে আছে কোটি কোটি মানুষ। আকাশবাণী, কলকাতা এদের সহজ নিবেদনে কর্ণপাত না করলে আকাশবাণীর কান পরিষ্কার করে দেওয়ার দায়িত্ব এখন রাজ্য সরকারের সঙ্গে প্রতিবাদমুখর অসংখ্য বেতার শ্রোতার।

শিশু সাহিত্য সংসদ-এর বই

এক যে ছিল শেয়াল	শিল্পী শ্রীপ্রতুল বন্দ্যোপাধ্যায়ের আঁকা রঙীন ছবি ও বৈঠকী ঢঙে লেখায় অরণ্যের পশুপাখিদের জীবনযাত্রার মনোরম কাহিনী। [১·৫০]
খেলার সাথী	স্বপনবুড়োর রচনা ও শ্রীসমর দে-র বর্ণালী ছবি। ভারত সরকার কর্তৃক প্রশংসিত। [২·৫০]
শ্যামলা দীঘির ঈশান-কোণে	ডঃ শশিভূষণ দাশগুপ্তের ছন্দে ও শ্রীসূর্য রায়ের বর্ণালী ছবিতে অপরূপ। [২·৫০]
ছবির খেলা	শ্রীবাদল সরকার রচিত ও চিত্রিত ছোটদের ধাঁধার বই। বাঙলায় এমন বই এই প্রথম। [২·০০]
ছোটদের বৌদ্ধ গল্প	সুলতা-কর রচিত বৌদ্ধজাতকের সেরা গল্পগুলির সঙ্কলন। শ্রীসূর্য রায়ের ছবি। [১·৫০]
চেঙাবেঙা ৩	মৌমাছির লেখা শ্রীধীরেন বলের আঁকা মজাদার বই। [১·০০]
ছবিতে পৃথিবী ১ (আদিম যুগ) ২ (প্রস্তর যুগ)	শ্রীমনোমোহন চক্রবর্তী রচিত ও শ্রীপ্রতুল বন্দ্যোপাধ্যায় চিত্রিত দুই যুগের সচিত্র সরল ইতিহাস। লেখক ভারত সরকার কর্তৃক পুরস্কৃত। [প্রতি ভাগ ১·২৫]
যুগে যুগে ভারত শিল্প	শ্রীপূর্ণ চক্রবর্তী রচিত ও চিত্রিত ভারতের শিল্পনিদর্শনের ইতিহাস। বহু ছবি। বাঙলায় অদ্বিতীয় বই। [৭·০০]

শিশু সাহিত্য সংসদ প্রাইভেট লিমিটেড

৩২এ আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড : : কলিকাতা—৯

কলকাতার হকি মরশুমের এখন ভরা যৌবন। ময়দানের আকাশে বাতাসে এখন হকি স্টিকের শব্দ। দুপুরে গড়িয়ে বিকেল হতে না হতেই হকি স্টিক হাতে খেলোয়াড়রা গিয়ে হাজির হন ময়দানে। তারপর আরম্ভ হয় বড়-মেজো, সেজো, ছোট সব খেলাই। লীগের খেলায় পয়েন্ট সংগ্রহের পালাও চলে। চলে লীগ চ্যাম্পিয়ানশীপ লাভ করার জন্যে বড় বড় দলগুলোর মধ্যে টাগ-অফ-ওয়ার। প্রধান দলগুলোর নিজেদের মধ্যের খেলাগুলোকে কেন্দ্র করে ময়দানী আবহাওয়াই যায় পাল্টে। তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতায় মাঠ-ময়দান প্রতি পদে সাফল্য আর নৈরাশ্যের আশঙ্কায় অধীর হয়ে ওঠে। কিন্তু সেই অধিরতার সীমা বড়ই সীমিত। হকি খেলা কলকাতার দর্শকদের মনে কিছুতেই যেন দোলা লাগাতে পারে না। কিছুতেই পারে না দর্শকদের মাঠে টেনে আনতে। সব খেলাতেই মাঠ পড়ে থাকে ফাঁকা। একদম ফাঁকা। যে দলগুলোর মধ্যে ফুটবল খেলা হলে মাঠ উপচে পড়ে দর্শকে। পা রাখার জায়গা থাকে না। কালোবাজারে দেদার টিকিট বিক্রি হয়, কিন্তু তারাই যখন আবার হকি খেলতে নামে তখন যেন আঙুল গুণে মাঠের লোক গোনা যায়। এমন কি মোহনবাগান-ইস্টবেঙ্গলের হকি ম্যাচেও মাঠে বেশি লোক হয় না। আশ্চর্য, এ কথা যেন ভাবাও যায় না—মোহনবাগান-ইস্টবেঙ্গলের খেলা, অথচ খেলার মাঠে সীমিত সংখ্যক দর্শক। কিন্তু কেন এমন হয়—কেন দর্শকরা বড় দলগুলোর মধ্যের খেলাও দেখতে যান না? এর পেছনে মনে হয় একটি মাত্র কারণ আছে। আর সে কারণটিও জলের মতো প্রাঞ্জল।

কলকাতায় হকি খেলা উপেক্ষিত। শীতে উপেক্ষিত শৈল শহরগুলোর চেয়ে হকি খেলার ওপর কলকাতার দর্শকদের উপেক্ষা আরো অনেক বেশি। সত্যি কথা বলতে কি, কলকাতা তথা বাংলা দেশে হকি খেলার কদর খুব একটা বেশি নেই। বড় বড় ক্লাবগুলো থেকে আরম্ভ করে স্কুল-কলেজে পর্যন্ত কোথাওই হকি খেলার ওপর আন্তরিক টান দেখতে পাওয়া যায় না কারো। কেউই যেন ঠিক ফুটবল কিম্বা ক্রিকেটের মতো হকি খেলাকেও সহজ মনে উৎসাহের সঙ্গে আন্তরিকভাবে নিতে চান না। শীতের শেষে ক্রিকেট যখন যাই-যাই করে আর বসন্তের প্রারম্ভে ফুটবল যখন আসি-আসি করতে শুরু করে তখনই হকি খেলা এসে আসর জমিয়ে বসে। আসলে কিন্তু আসর একদমই জমে না। পাকা আমের মতো দেখতে দেখতে এক সময় টুপ করে শেষ হয়ে কলকাতা তথা বাংলা দেশের সংক্ষিপ্ত হকি মরশুম। টের পাবার আগেই, ভালোভাবে বোঝার আগেই হকি খেলা বিদায় নেয় কলকাতা ময়দান থেকে। ভাবতে সত্যি অবাক লাগে যে আন্তর্জাতিক ক্রীড়াঙ্গনে, অলিম্পিকের প্রাঙ্গণে যে খেলা আমাদের একমাত্র আশা-ভরসা, যে খেলা বার বার আমাদের এনে দিয়েছে অমূল্য সম্মান—কি করে সেই খেলাকেই আমরা এমনভাবে অবহেলা করি। এমন হেলা ভরে দূরে ফেলে রাখি। কিন্তু এমনভাবে তো বেশিদিন নিজেদের শ্রেষ্ঠত্ব বজায় রাখা যায় না। শেষ পর্যন্ত গেলোও না। মেক্সিকো অলিম্পিকে হকি প্রতিযোগিতার ফাইন্যালে পর্যন্ত উঠতে পারে নি ভারত। তবু আমাদের চোখ খোলে না। অথচ এখনো যদি আমরা সাবধান না হই তাহলে হকি খেলাতেও আমাদের দশা একদিন-না-একদিন শোচনীয় হয়ে উঠবে।

—শান্তিপ্রিয়

বসন্তে উপেক্ষিত

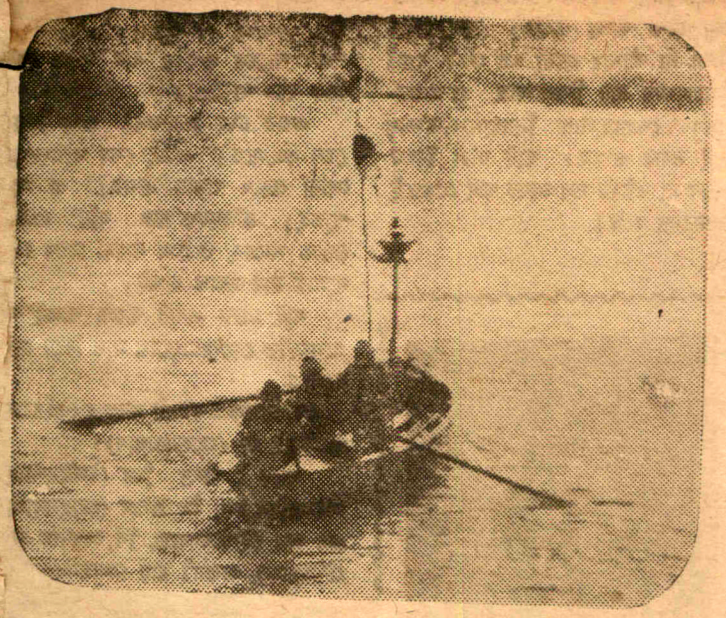

সমুদ্রেতে যাবোই

ওরা দু'জনে গিয়েছিল, আবার ফিরেও সছে। ফিরে এসেছে আমাদের মধ্যে। দ্রের নিঃসঙ্গতার বেড়া ডিঙিয়ে ওরা বার ফিরে এসেছে সভ্যসমাজে। ডিউক র পিনাকী তাদের দুঃসাহসিক অভিযান ফল্যের সঙ্গে শেষ করে শুধুমাত্র াদের মুখই উজ্জ্বল করে নি, সৃষ্টি ছে একটি ঐতিহাসিক নজির।

একটানা তেত্রিশ দিন জলের ওপর নোর পর কনোজী আংরে গত ৫ই আন্দামান দ্বীপপুঞ্জের অন্তর্গত ডফল দ্বীপের মাটি স্পর্শ করে। র্ণ সুস্থ শরীরে মাটিতে নেমেছে এলবার্ট ডিউক ও পিনাকীরঞ্জন াজী। তারপর তারা ল্যাণ্ডফল পের পাহাড় চূড়ায় উত্তোলন করল তের জাতীয় পতাকা। সেই সঙ্গে ল, এক্সপ্লোরার্স ক্লাবের পতাকা।

অসম্ভবকে সম্ভব করে আমাদের দুই ল ছেলে মৃত্যু-ভয়কে তুচ্ছ করে যে হসিকতার স্বাক্ষর রাখলে এই ভিযাত্রাকে কেন্দ্র করে তার তুলনা ভার।

চত্রিশ দিন আগে কলকাতা থেকে যে রু হয়েছিল আনুষ্ঠানিকভাবে সে যাত্রা ৫ই মার্চ শেষ হলেও, পিনাকী আর ডিউক ল্যাণ্ডফল দ্বীপ থেকে কনোজী আংরের হাল ধরে আরো ১৫০ মাইল দূরে পোর্ট ব্লেয়ার বন্দরে গিয়ে শেষ করল তাদের সমুদ্রযাত্রা।

উত্তাল-রঙ্গে ঝঞ্ঝা-বিক্ষুব্ধ সমুদ্রের সম্মুখীন তাদের হতে হয় নি বটে—কিন্তু তারা বার বার নিজেদের মনের মধ্যেই নিজেরা হারিয়ে গিয়েছিলো। আর এক-বার আমাদের চোখে সত্যি-সত্যিই বুঝি ওরা হারিয়ে যেতে বসেছিলো। দিনের পর দিন আমরা পাই নি তাদের কোন খোঁজ। প্রতি মুহূর্তে তাদের সংবাদের জন্যে সমস্ত দেশ জুড়ে বয়েছিল প্রশ্নের বান। কিন্তু তারা তখন ছিলো বহাল তবিয়তে।

আজ তাই সবার মুখেই এক কথা। মুখে মুখে ঘুরছে আজ পিনাকী, ডিউক আর কনোজী আংরের কথা। মনে আছে আমার সেদিনের কথা। ৫ই মার্চ রাত্তিরে বাড়ি ফিরেছি। তখন রাত দশটা। রেডিওয় খবর হচ্ছে। খবরে জানানো হলো ডিউক আর পিনাকী ল্যাণ্ডফল দ্বীপে পৌঁছে গেছে। খবরটা শুনেই একটা বাচ্চা ছেলে, বয়েস বড়জোর ৮—১০, রাস্তায় বেরিয়ে এসে লাফাতে শুরু করলো —'পৌঁছে গেছে, পৌঁছে গেছে' বলে।

আমাদের ঐ নগেন ঘোষ লেনের ছেলেটা প্রতীক মাত্র। এ আনন্দ আজ সবার। আমরা সকলেই আজ আনন্দে উদ্বেল। মনে হচ্ছে আমরাও যেন ঐ দুঃসাহসিক অভিযান-সাফল্যের অংশীদার। কারণ পিনাকী বা ডিউক যে আমাদেরই একজন।

পিনাকী আর ডিউককে অভিনন্দন জানিয়ে ভারতের রাষ্ট্রপতি ও প্রধানমন্ত্রী তারবার্তা পাঠিয়েছেন। তারবার্তায় তাঁরা বলেছেন যে, তাঁদের ঐ অভিযান ভারতের যুবসমাজকে অনুপ্রাণিত করবে।

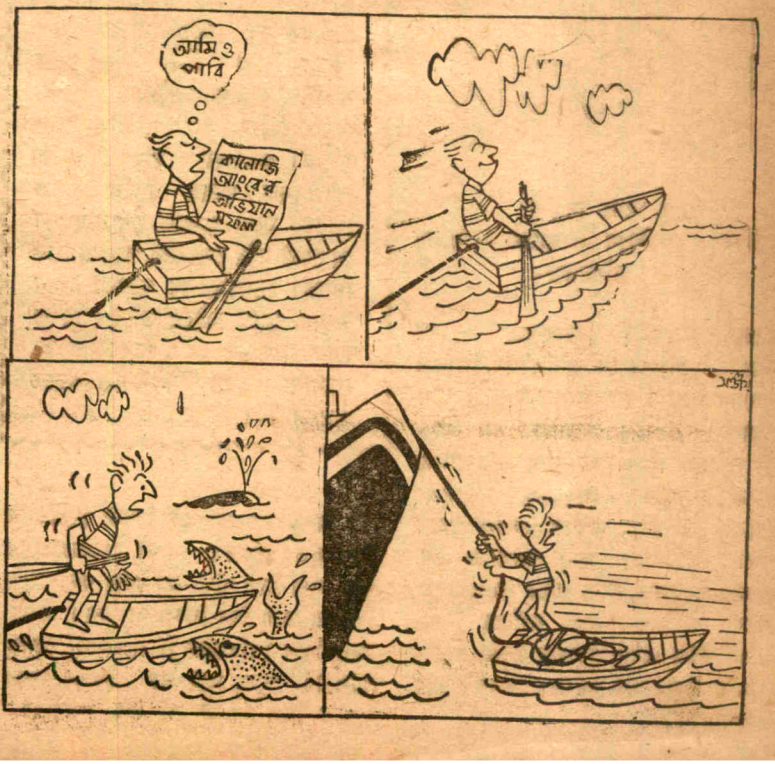

ফুটবল-ফুটবল

এবারের জাতীয় ফুটবল প্রতিযোগিতায় যোগদানের জন্যে বাংলা দল গত ৮ই মার্চ মাদ্রাজ মেলে বাঙ্গালোরের পথে রওনা হয়ে গেছে। বৃহস্পতিবার ১৩ই মার্চ বাংলার প্রথম খেলা। আর বাংলা দল পরিচালনার ভার এবার পড়েছে পরিমল দের ওপর। তাঁর সহকারী হয়েছেন শান্ত মিত্র।

যাই হোক বাংলা দল গঠন নিয়ে এবার অনেক জল ঘোলা হয়েছে। তবে একটা বিষয়ে কর্তৃপক্ষ এবার যেন একটু

॥ শান্ত মিত্র ॥
জাতীয় ফুটবলে বাংলা দলের সহ-অধিনায়ক।

কঠোর হয়েছেন। নিঃসন্দেহে সুখের কথা। নিয়মিতভাবে অনুশীলন শিবিরে যোগদান না করার জন্যে বাংলার বেশ কয়েকজন নাম-করা খেলোয়াড় দল থেকে বাদ পড়েছেন। এঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন মুস্তাফা, লাওনেল, সাদাতুল্লা, কানন, পাঁপানা, এন্টনি এমব্রজ প্রমুখ খেলোয়াড়রা। তা ছাড়া নঈম ও এস কর্মকার পরীক্ষার জন্যে দলের সঙ্গে যেতে পারবেন না বলে আগেই জানিয়ে দিয়েছেন। নঈম এবার দিচ্ছেন বি-এ পার্ট-ওয়ান পরীক্ষা, আর কর্মকার দেবেন হায়ার সেকেণ্ডারী।

এতদিন পরে যেন একটু আশার আলো দেখা যাচ্ছে এবার। অনুশীলন শিবিরে না আসার জন্যে দল থেকে নামী খেলোয়াড়দের বাদ নিঃসন্দেহে প্রশংসার-যোগ্য। খেলাধূলায় নিয়মানুবর্তিতার স্থানই সবার ওপরে। তাই যাঁরা নিয়ম মানবেন না তাঁদের দল থেকে বাদ দেওয়াই বুদ্ধিমানের কাজ।

শেষ পর্যন্ত পকেটমারের পাল্লায় পড়তে হলো ইংলণ্ডের অধিনায়ক কলিন কাউড্রেকে। তবে আর যাই হোক পকেটমারটিও বোধহয় ক্রিকেট-রসিক। তা না হলে খেলার মাঠেই বা কেন সে যেতে যাবে। আর ভিড়ের মধ্যে ঠিক সময় বুঝে সকলের অলক্ষ্যে কাউড্রের পকেট থেকে দিব্যি ৩০ স্টারলিং তুলে নিলো। কাউড্রের দুঃখ হওয়া স্বাভাবিক, কারণ তিনি নাকি ভিড়ের মধ্যে বুঝতে পেরেছিলেন যে কেউ তাঁর পেছনের পকেটে হাত দিচ্ছে। ভেবেছিলেন হয়তো কোন 'ফ্যান', ছুঁতে চাইছে তাঁকে। কিন্তু ফ্যান নয় সে যে পকেটমার তা বোধহয় কাউড্রে কল্পনাও করতে পারেন নি।

কিন্তু এতকাল এই দিকটা বিশ্রীভাবে উপেক্ষিত হয়েছে। নামী খেলোয়াড়দের দলে স্থান ছিল বাঁধা—তা তাঁরা অনুশীলন শিবিরে যোগ দিন কিম্বা না দিন! ফলে অনুশীলন শিবিরটাই ছিলো একটা ফালতু ব্যাপার। শুধু তাই নয় বিশেষ কোন মূল্যও ছিল না ঐ প্রশিক্ষণ শিবিরের। অনেকটা সেই করতে হয় করা গোছে অনুশীলনের অ.সর। যাঁরা দলে স্থান পাবেন তাঁদের নাম আগে থেকেই ঠিক হয়ে থাকতো।

এবার সেই চিরন্তনী প্রথা কিছুটা যেন বদলেছে। একটু যেন পরিবর্তনের ছোঁয়া চোখে পড়ছে এবার। এ সূচনা শুভই। ক্রীড়াকর্তৃপক্ষ যদি এইভাবে চলতে পারেন, তাহলে বাংলা দেশে খেলাধূলার মান উন্নত হবেই।

যাই হোক এবার বাংলা দলের পক্ষে মনোনীত খেলোয়াড়দের নাম নিচে দেওয়া হলো ঃ

গোলরক্ষক ঃ কানাই সরকার (এরিয়ান্স) ও বলাই দে (মোহনবাগান)।

ব্যাক ঃ শান্ত মিত্র (ইস্টবেঙ্গল)—সহ-অধিনায়ক, সি প্রসাদ (মোহনবাগান), এম জন (ইস্টবেঙ্গল), বি দেবনাথ (জর্জ টেলিগ্রাফ), ভবানী রায় (মোহনবাগান) ও তন্ময় দত্ত (এরিয়ান্স)।

॥ পরিমল দে ॥
গত বছর যিনি দলে স্থান পান নি এবার তাঁরই ওপর পড়েছে জাতীয় ফুটবল প্রতিযোগিতায় বাংলা দল পরিচালনার ভার।

হাফব্যাক ঃ এ লতিফ (মোহনবাগান), কালন গুহ (ইস্টবেঙ্গল), কাজল মুখার্জি (ইস্টবেঙ্গল) ও নেতা ঘোষ (স্পোর্টস কমিশনার্স)।

ফরোয়ার্ড ঃ পি দে (ইস্টবেঙ্গল)—সহ-অধিনায়ক, এস ঘোষদস্তিদার (মোহনবাগান), এস ভৌমিক (ইস্টবেঙ্গল), হাবিব (মোহনবাগান), পি গাঙ্গুলি (মোহনবাগান) ও পীতেশ দাস (মোহনবাগান)।

...মাচারদর্পণ

...আসছে শীতে অস্ট্রেলিয়া আসবে ... সফরে। ভারত সরকারই ...লিয়ার খেলোয়াড়দের নাম সরকারী- ... ঘোষণা করেছেন অস্ট্রেলিয়ার ...ট কর্তৃপক্ষ। বিল লরীর ওপর ...ছ দল পরিচালনার ভার। আয়ান ...ল হয়েছেন সহকারী অধিনায়ক। ...মী অক্টোবর মাসের মাঝামাঝি লরী ... নিয়ে ভারতে আসবেন তাঁদের ...নিচে দেওয়া হলো :

...বিল লরী (অধিনায়ক), আয়ান চ্যাপেল (সহ-অধিনায়ক), এ কনোলী, ই ফ্রিম্যান, গিলসন, জে আইয়ারভিন, আর জরডান, জি ম্যাকেঞ্জি, এ ম্যালেট, এল, ম্যায়নে, আই রেডপাথ, পি সিহান, কে স্টাকপোল, বি টেবার ও ডি ওয়ালটার্স।

* * *

ওয়েস্ট ইণ্ডিজের সময়টা বোধহয় এখন খারাপ যাচ্ছে। একে তো অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে রাবার হারানোর দুঃখ, তার ওপর আবার তাদের শিবিরে আহতের সংখ্যা বৃদ্ধি। সম্প্রতি ওয়েস্ট ইণ্ডিজের পরম নির্ভরযোগ্য ৩৩ বছরের ব্যাটসম্যান রোহন কানহাইকে ইংলণ্ডে ফিরে যেতে হয়েছে। কানহাই-এর হাঁটুতে একটা দুরূহ অপারেশন করতে হবে খুব তাড়াতাড়িই। ফলে ওয়েস্ট ইণ্ডিজ দলের আগামী ইংলণ্ড সফরের সময় কানহাই খেলতে পারবেন না বলেই মনে হয়।

আর একজন খেলোয়াড়ের সাহায্য থেকে কিছুদিনের জন্যে বঞ্চিত হচ্ছে ওয়েস্ট ইণ্ডিজ। অস্ট্রেলিয়ায় পড়ে গিয়ে ক্যামাচো কাঁধে আঘাত পান। সে আঘাত এখনো তাঁকে যথেষ্ট কষ্ট দিচ্ছে।

* * *

এ বছরের ডেভিস কাপ টেনিস প্রতিযোগিতার প্রথম খেলায় ভারত সরাসরি সব ক'টি খেলাতেই মালয়েশিয়াকে পরাজিত করেছে। পরবর্তী রাউণ্ডে ভারত সিংহলের বিরুদ্ধে খেলবে। খেলা হবে কলম্বোয় এপ্রিল মাসের ২১ তারিখ থেকে।

* * *

তিন বছর পরে পশ্চিমাঞ্চল আবার দলীপ ট্রফি লাভ করলো। প্রথম ইনিংসের ফলাফলে দক্ষিণাঞ্চল দলীপ ট্রফির ফাইন্যালে পরাজিত হলো। খেলার ফলাফল : পশ্চিম অঞ্চল ১ম ইনিংসে ৩৩৩ রান ও ২য় ইনিংসে ৭ উইকেটে ৩৮৮ রান। দক্ষিণাঞ্চল, ১ম ইনিংস ২৫১ ও দ্বিতীয় ইনিংসে ৪ উইকেটে ১৪৩ রান।

॥ কানহাই ॥

আঘাতের জন্যে খুব শিগ্‌গিরই কানহাই-এর হাঁটুতে অপারেশন করা হবে ইংলণ্ডের কোন একটি হাসপাতালে।

...অকল্যাণ্ডে নিউজিল্যাণ্ডের ...দ্ধে খেলার সময় ওয়েসলি হল ...য়ে ফেলেছিলেন তাঁর পয়া ...। সোনার ঐ ক্রসটা সব সময় ...তো হলের গলায়। যেমন প্রিয় ...ন পয়া ছিল ঐ ক্রসটা। আর ...ক্রসটাই কি-না হারিয়ে গেলো। ...রের বারবেলায় বল করতে ... পড়ে গিয়েছিলেন হল। ...র মাংসপেশীতে টান ধরলো ... সংগে। খোঁড়াতে খোঁড়াতে ...র বাইরে চলে যেতে হলো ...ক্ক। আর খেলতে পারলেন না। ...তারপরই দেখা গেলো যে হল ...য়ে ফেলেছেন তাঁর পয়া ...। কি দুঃখ! অবশ্য হলের ...ঘুচে গিয়েছিলো পরে যখন ...থকেই খুঁজে পাওয়া গেলো ...।

গল্পহলেও সত্যি

অনেক দিন আগের কথা। বিলেতে গ্লাস্টারশায়ার আর সারের মধ্যে ম্যাচ হচ্ছে। গ্রেস তখন ব্যাট করছিলেন। একটা বল জোরে মেরে দু' রান নেবার পর গ্রেস দৌড়চ্ছিলেন তৃতীয় রানটি নেবার জন্যে। একজন ফিল্ডার বাউণ্ডারী লাইনের কাছা-কাছি বলটা পেয়ে ছুঁড়ে দিল উইকেট লক্ষ্য করে। উইকেটে লাগা তো দূরের কথা, বলটা গিয়ে লাগলো গ্রেসের জানুর। তারপর টুপ করে ঢুকে গেলো বুক পকেটের মধ্যে। গ্রেসের লম্বা লম্বা দাড়ির আড়ালে বলটা বুক পকেটের মধ্যে অদৃশ্য হলো।

আর যায় কোথায়! পকেটে বল নিয়ে গ্রেস আবার রান নিতে শুরু করলেন। একের পর এক রান নিয়ে চলেছেন গ্রেস। ফিল্ডাররা তো থ। কি করবে কেউ কিছু বুঝতে পারে না। তারপর একজন বুদ্ধি করে ছুটে গিয়ে গ্রেসের পকেট থেকে বলটা তুলে নিলো। কিন্তু গ্রেসের ততক্ষণে ছ'টা রান নেওয়া হয়ে গেছে।

তখন ক্রিকেট কর্তৃপক্ষ দেখলেন--এ তো ভারি মুশকিল। পোষাকের মধ্যে বল নিয়ে এইভাবে রান করতে দেওয়া চলে না কিছুতেই, এর একটা বিহিত করা দরকার। তা না হলে ব্যাটসম্যানরা এই-ভাবে বেশি রান করার সুযোগ নেবে। তখন তাঁরা অনেক চিন্তা আর আলোচনার পর নিয়ম করে দিলেন যে, বল যদি ব্যাটসম্যানের জামা-কাপড় অর্থাৎ পোষাকের মধ্যে আটকে যায়, তাহলে তখন আর রান নেওয়া যাবে না। বলটা 'ডেড' হয়ে যাবে।

ক্রিকেট আইনে সৃষ্টি হলো একটা নতুন নিয়ম 'ডেড বল'।

প্রশ্ন উত্তর

কমলকুমার সরকার (কর্নওয়ালিস স্ট্রীট, কলকাতা-৪)

প্রশ্ন : টেস্ট খেলায় সবচেয়ে বেশি সেঞ্চুরী করার রেকর্ড কার? টেস্টে কুড়িটি বা তার বেশি সেঞ্চুরী করেছেন কে কে?

ডন ব্র্যাডম্যানের ব্যাটিং ও বোলিং এ্যাভারেজ জানতে চাই।

উত্তর : টেস্ট খেলায় সবচেয়ে বেশি সেঞ্চুরী করেছেন ডন ব্র্যাডম্যান।

কুড়িটি বা তার বেশি সেঞ্চুরী করেছেন—

ব্র্যাডম্যান (অস্ট্রেলিয়া)—২৯ বার
হ্যামণ্ড (ইংলণ্ড)—২২ বার
কাউড্রে (ইংলণ্ড)—২১ বার
হার্ভে (অস্ট্রেলিয়া)—২১ বার
সোবার্স (ওঃ ইণ্ডিজ)—২১ বার
র‍্যারিংটন (ইংলণ্ড)—২০ বার।

মানকাদের ব্যাটিং গড় :

টেস্ট—ইনিংস—নঃ আঃ—রান—সর্বোচ্চগড়
৪৪—৭২—৫—২১০৯—২৩১—৩১·৪৭

বোলিং :

বল—মেডেন ওভার—রান—উইকেট—গড়
১৪৬৮৬ - ৭৭৭ - ৫২৩৫-১৬২-৩২·৩১

অমিতাভ মুখোপাধ্যায় (রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রম, রহড়া)

প্রশ্ন : পাতৌদির নবাবের ব্যাটিং এ্যাভারেজ জানতে চাই।

উত্তর :

টেস্ট—ইনিংস—নঃ আঃ—সর্বোচ্চ—রান—
৩১ — ৫৬ — ২ — ২০৩* — ২২০৩—
শতরান—গড় ৬—৪৭·৬৫

সোমনাথ গঙ্গোপাধ্যায় (হালিশহর, গোলাবাড়ি, ২৪ পরগনা)

প্রশ্ন : তুলনামূলক বিচারে আপনার মতে বর্তমান ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে ক্রিকেট খেলায় কে বেশি উন্নত?

উত্তর : আমার মতে ভারতই...।

হীরেন্দ্রমোহন ভদ্র (সুভাষপল্লী, শিলিগুড়ি)

প্রশ্ন : গত ৩৬শ সংখ্যায় সাপ্তাহিক বসুমতীতে ব্র্যাডম্যানের ব্যাটিং এ্যাভারেজ প্রকাশিত হয়েছিল। ব্র্যাডম্যানের মোট রান দেওয়া হয়েছে ৭৯৯৬। কিন্তু আসলে হবে ৬৯৯৬। ওটা ভুল! আশা করি শুদ্ধ করে দেবেন।

উত্তর : ধন্যবাদ। ছাপার ভুলের জন্যে আমরা দুঃখিত।

অভিজিৎ ব্যানার্জী (কোন্নগর, মনসাতলা)

প্রশ্ন : ক্রিকেট খেলায় সবচেয়ে বেশি 'নো বল' কে করেছে? নো বলের নিয়মগুলো জানতে চাই।

উত্তর : সবচেয়ে বেশি 'নো বল' কে করেছেন তা তো আমি জানি না। যদি কেউ জানেন, জানালে জানিয়ে দেবো।

ক্রিকেট খেলার আইকানুনের ২৬ নম্বর নিয়মটি হলো নো বলকে নিয়ে। এই নিয়মে বলা হয়েছে যে—

বল যদি ছোঁড়া বা ঝাঁকানি দিয়ে অর্থাৎ জার্কিং না করে হয়, তবেই সেই বলকে ঠিক বল বলা হবে। যে কোন আম্পায়ার যদি বোলারের বোলিং-এ সন্তুষ্ট না হন তাহলে 'নো বল' বলবেন এবং ইশারায় তার নির্দেশ দেবেন। বোলারের দিককার আম্পায়ার 'নো বল' ঘোষণা করবেন এবং তার সংকেত জানাবেন যখন তিনি সন্তুষ্ট নন যে :—

(১) বল করার ঠিক মুহূর্তে বোলারের সামনের পা পপিং ক্রীজের পেছনে আছে কিন্তু ক্রীজ স্পর্শ করে নেই আর পেছনের পা রিটার্ন ক্রীজের মধ্যে আছে কিন্তু রিটার্ন ক্রীজ কিম্বা বোলিং ক্রীজের সংযুক্ত রেখা স্পর্শ করে নেই।

(২) থ্রোয়িং

কোন একটি বলকে ছোড়া হয়েছে বলা হবে যদি আম্পায়ার মনে করেন যে বল ডেলিভারী করার মুহূর্তে বোলার বলসুদ্ধ হাতটা অর্ধ কিম্বা সম্পূর্ণভাবে সোজা করতে গিয়েছিলেন।

(৩) নো বলের এই পরীক্ষামূলক নিয়মের সঙ্গে নিম্নোক্ত আইন দুটিও প্রযোজ্য :—

(ক) রিটার্ন ক্রীজ লম্বায় ৪ ফুট হবে।

(খ) পপিং ক্রীজকে স্টাম্পের দু'ধারে ৬ ফুট পর্যন্ত বাড়িয়ে দেওয়া হবে।

প্রত্যেক বিরতির পরে রিটার্ন ও পপিং ক্রীজ চুন দিয়ে এঁকে দিতে হবে।

হিমাদ্রীকান্ত ব্যানার্জী (আনন্দচন্দ্র কলেজ হোস্টেল, জলপাইগুড়ি)

উত্তর : আপনার চিঠি পাবার পর ঐ সংখ্যাটা আমরা দেখেছি। কিন্তু ও ভুলটা যে কি করে হলো বুঝতে পারছি না। যাই হোক আপনার কাছে ঠিক। ওরেল ট্রফি চালু হবার পর প্রথম অস্ট্রেলিয়া পেয়েছিল। সেবার ওরেল নি ওরেল ট্রফি তুলে দিয়েছিলেন বে হাতে। ১৯৬৫ সালে ওয়েস্ট ই অস্ট্রেলিয়াকে হারিয়ে ফ্রাঙ্ক ওরেল ট্র পায়। সিম্পসন সেবার কাপ তুলে দি ছিলেন সোবার্সের হাতে। আর এ সোবার্সকেই সেই ফ্রাঙ্ক ওরেল ট্রফি দিতে হলো বিল লরীর হাতে।

যাই হোক চিঠিটির জন্যে আপন ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

আপনার আর একটা চিঠি পেয়ে মনে হয় সেটির উত্তর দেবার এখন কোন প্রয়োজন নেই।

বীরেন্দ্রনাথ পাল (বংশীহারী, দিনাজপুর)

উত্তর : বিল লরীর জীবনী তো একবার ছাপা হয়েছে। ভবিষ্যতে যদি সম্ভব হয় তাহলে না হয় আর একবার প্রকাশ করা যাবে। 'গল্প হলেও সত্যি' বিভাগটা তো চালু রাখারই ইচ্ছে। কিন্তু ঐ সব মজার মজার ঘটনা সংগ্রহ ক খুবই মুশকিলের ব্যাপার। তাই জ না কতদিন এই বিভাগটা চালু রাখা স হবে।

বাবুল (নেহালপুর, ২৪ পরগনা)

প্রশ্ন : আপনার চিঠির কিছু অংশ উ দিলাম :

"প্রশ্ন-উত্তর বিভাগে কয়েক প্রশ্নের উত্তরে জানাচ্ছি যে, সালে যে খেলায় মহামেডান ইস্টবেঙ্গলকে ২—১ গোলে জিত করেছিল, সেই খেলায় মজুমদারকে অবৈধ আচরণের প্রথমার্ধেই (৯/১০ মিনিটে) ষ্কার করে দেওয়া হয়েছিল।"

উত্তর : ধন্যবাদ।

আবিদ আলীর জীবনী সময় প্রকাশ করা হবে।

অচিন্তানারায়ণ চক্রবর্তী (দীনেশ গুপ্ত রোড, কলকাতা-৩৪)

প্রশ্ন : সদ্য-সমাপ্ত রঞ্জি ট্রফি যোগিতায় বাংলার পক্ষে অংশ গ্রহণ সব খেলোয়াড়ের ব্যাটিং ও বোলি পূর্ণ তালিকা অর্থাৎ মোট খেলা, ই মোট রান, সর্বোচ্চ রান, নট আউ ওভার, মেডন, রান, উইকেট ও গড় এই বছরের জন্যে) যদি জানান তো হয়।

উত্তর : দুঃখিত। প্রথমত অতো নেই দ্বিতীয় সংগ্রহ করাও মুশকিল

সম্পাদিকা—জয়ন্তী সেন

বসুমতী (প্রাঃ) লিঃ-এর পক্ষে ১৬৬, বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী স্ট্রীটস্থ কলিকাতা-১২

বসুমতী প্রেস হইতে শ্রীসুকুমার গুহমজুমদার কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

বিজ্ঞপ্তি

এতদ্দ্বারা জানানো হচ্ছে যে, কুমার পি এন রায় গ্রুপ অব হসপিটালস্-এ (বি টি রোড, বনহুগলী, কলিকাতা-৩৫) মহিলাদের বন্ধ্যাকরণ অস্ত্রোপচারের জন্যে ৩রা মার্চ থেকে ১৭ই মার্চ পর্যন্ত একটি বিশেষ ব্যবস্থা চালু থাকবে। বন্ধ্যাকরণ অস্ত্রোপচার করাতে আগ্রহী মায়েরা কলকাতা, ২৪ পরগণা, বারাসত ও হাওড়া অঞ্চলের যে কোন নিকটবর্তী পরিবার পরিকল্পনা কেন্দ্রের সঙ্গে অবিলম্বে যোগাযোগ ক'রে এই সুযোগ গ্রহণ করতে পারেন।

অস্ত্রোপচারের দরুণ প্রতি কেসে নিম্নহারে অর্থ সাহায্যও দেওয়া হবে—

যে মহিলা অস্ত্রোপচার করাবেন— ১৫৲ টাকা।
প্রমোটার বা যিনি তাঁকে আনবেন— ৩৲ টাকা।

তাছাড়া, হাসপাতালে থাকাখাওয়া ও ওষুধপত্রের খরচ এবং [illegible]গিণীকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া ও বাড়ী ফিরিয়ে [illegible]র ব্যয়ভার সরকার বহন করবেন।

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের পক্ষে
অতিরিক্ত স্বাস্থ্য অধিকর্তার
নির্দেশক্রমে প্রচারিত।

প্রত্যহ রুচিকর মশলা:

কোথাও কাঁচা
গোটা মশলা
চলে →

কোথাও চলে
বাটা মশলা →

কোথাও
অতিরিক্ত →

কোথাও
বা
নামমাত্র →

কিন্তু সবার রুচিকেই কুকমী পরিতৃপ্ত করে !

গ্রাম : 'স্পাইসমার্ট'

ফিল—

শিশুর খাদ্যে ও রুগীর পথ্যে নির্ভয়ে ব্যবহৃত হয়

'কুকমী'—সর্বাধিক বিক্রীত গুঁড়ো মশলা

পনের লক্ষ প্যাকেট মাসিক বিক্রয়

১২০ বৎসরের অধিক প্রাচীন ও বর্তমানে মশলার বৃহত্তম প্রতি

কৃষ্ণচন্দ্র দত্ত (স্পাইস) প্রাঃ লিঃ

২৩৫ নং মহর্ষি দেবেন্দ্র রোড, হুগলী, কলিকাতা-৭

18 MAR 1968